বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিম খান

রবি চক্রবর্তী

এই শব্দার্থকোষ কী কাজে লাগতে পারে

শব্দের ভেতর থেকে
তার মানে বের করা যাবে।

এক ক্রিয়াজাত অনেক শব্দ
গুচ্ছ ধরে শেখা যাবে।

বাংলা শব্দভাণ্ডার সহজেই
পাঠকের আয়ত্তে এসে যাবে।

বাংলাভাষার বিপুল ঐশ্বর্যের
উপলব্ধি ঘটবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে
হীনমন্যতা থেকে মুক্তি আসবে।

প্রকৃত বঙ্গমানসকে চিনে নিয়ে
তাকে পুনরুদ্ধার করা যাবে।

রামায়ণ-পুরাণাদি গ্রন্থের মানে
বোঝার উপায় পাওয়া যাবে।

দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানার
উপায় পাওয়া যাবে।

প্রবাদ প্রবচন ছড়া জনশ্রুতি
আচার সংস্কার ইত্যাদির মানে
বোঝার উপায় পাওয়া যাবে।

বাংলাভাষীর মনুষ্যত্বকে
পূর্ণমহিমায় পুনরুদ্ধার করা যাবে।

মানবসভ্যতার আদিম ইতিহাস
স্পষ্ট রূপে জানা যাবে।

যে ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হয়
তা আগাগোড়া বদলে যাবে।

ইংরেজি ভাষার শাসন থেকে
বাংলা মনকে মুক্ত করা যাবে।

ইংরেজি সহ দুনিয়ার সব ভাষাকে
পথ দেখানো যাবে।

নয় শত টাকা

“... ... বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী রাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ ‘গতানুগতিক পন্থা’, ‘প্রাচীন ঐতিহ্য’-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, — যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না। ...”

সৈয়দ মুজতবা আলী

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিম খান

রবি চক্রবর্তী

ভাষাবিন্যাস

Bangiya Sabdarthakosh
A Collection of Bengali Words
with their Verb-based and Letter-based Meanings
by Kalim Khan & Ravi Chakravarti
Price : Rs 900.00

ISBN : 978 81 908349 4 0

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৭

প্রচ্ছদ
রাজু দেবনাথ

প্রকাশক
ভাষাবিন্যাস
আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪১৬ বি, পর্ণশ্রী পল্লী
কলকাতা ৭০০ ০৬০
ফোন : (০৩৩) ২৪৯২-৫১৬৪, ২৪৫৩-৭০৬৬

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১ এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বাঁধাই
ওরিয়েন্টাল বাইন্ডার্স
৪৭ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পরিবেশক
একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন : ৯৮৩০২৯৪৬৪৯

নয় শত টাকা

যে বঙ্গমানস
কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মঙ্গলকাব্যপ্রণেতাগণের সৃষ্টিতে ভরে উঠেছিল
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণবদর্শনের ও হিন্দুমুসলিম পদকর্তাদের বিশাল পদাবলী সাহিত্যের ধারক হয়ে উঠেছিল
কবিগানে কথকতায় নামসঙ্কীর্তনে ও মুর্শীদা ফকিরি জারি আলকাপ পটুয়ার গানে যা বিধৃত ছিল
রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ ভবাপাগলা লালনফকির হাসনরাজাদের গানের ধারায় প্রবাহিত ছিল
ভারতচন্দ্র, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, ফয়জউল্লাহ্-রা যে-ধারায় মগ্ন থাকতেন
যার খবর রাখতেন রবীন্দ্রনাথ, হরিচরণ, নজরুল, সৈয়দ মুজতবা আলী
এখনও যা বিধৃত হয়ে রয়েছে বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের সকল প্রান্তে
রয়েছে সমগ্র গ্রামবাংলায়, মেয়েদের ভাষায়, আচারে-সংস্কারে
রয়েছে তথাকথিত 'মূর্খ-বাঙালি'র বয়ানে ...
সেই বঙ্গমানস সরোবরে এই অঞ্জলি
নিবেদিত হল।

লেখকদ্বয়ের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ

(ক) বাংলা বানান বাংলা ভাষা (২০০৪ কলকাতা)
(খ) বাংলাভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ (২০০৬, ২য় মুদ্রণ ২০০৮, কলকাতা)
(গ) অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে (২০০৮, কলকাতা)

কলিম খান-এর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

(ঘ) মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে (১৯৯৫, ২য় সংস্করণ ২০০৪, কলকাতা)
(ঙ) দিশা থেকে বিদিশায় (১৯৯৯ কলকাতা)
(চ) ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ (২০০০ কলকাতা)
(ছ) পরমাভাষার সংকেত (২০০১ ঢাকা)
(জ) আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা (২০০২ কলকাতা)
(ঝ) পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন (২০০২ কলকাতা)

রবি চক্রবর্তী-র পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

(ঞ) India Rediscovered (2002)

সূচীপত্র

এই শব্দার্থকোষ পড়বেন কীভাবে —

ক) **আপনি যদি শুধুমাত্র এক বা একাধিক শব্দের অর্থ জানতে চান** — সবার আগে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো নির্ঘণ্ট বা Index-এ আপনার প্রয়োজনীয় শব্দটি রয়েছে কি না, দেখুন। শব্দটিকে সেখানে না পেলে বুঝতে হবে, এই শব্দার্থকোষে শব্দটি এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি; অর্থাৎ এই শব্দার্থকোষ এখনও আপনার চাহিদা মেটানোর যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। আর, শব্দটিকে সেখানে পেয়ে গেলে দেখবেন, শব্দটি কত পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে, সেকথা পাশেই লেখা রয়েছে; তখন সেই পৃষ্ঠাতে যান। সেখানে শব্দটির বিস্তারিত অর্থ পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন। না-পেলে কী করতে হবে, সেকথা পরে বলছি। যদি পেয়ে যান, তাহলে দেখবেন, সেই অর্থ দেওয়া আছে মোট ছয়রকম ভাবে। সর্বাগ্রে **১.** সংখ্যায় পাবেন শব্দটির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, তার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা নেওয়া হয়েছে বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে। অন্য কোনো অভিধান থেকে নেওয়া হয়ে থাকলে পাশে সেকথার উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। **২.** সংখ্যায় পাবেন শব্দটির ক্রিয়ামূল থেকে জাত ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ, যা আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল। এটি দেওয়া হয়েছে বাঁকা হরফে। অন্য কোনো সূত্রে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পাওয়া গেলে, '/' চিহ্নের পরে সে-অর্থও সরবরাহ করা হয়েছে, অবশ্যই উৎস উল্লেখ ক'রে। **৩.** সংখ্যায় পাবেন শব্দটির প্রতীকী অর্থ, প্রচলিত অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে যা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষের ক্ষেত্রে (ব.শ.), ছাত্রবোধ অভিধানের ক্ষেত্রে (ছা.অ.), ঢাকার বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে (ব্য.বা.অ.ঢাকা), কলকাতার সংসদ বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে (স.বা.অ.কল.) এবং পৌরাণিক-অভিধানের ক্ষেত্রে (পৌ.অ.) প্রভৃতি লিখে উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। **৪.** সংখ্যায় শব্দটি বর্তমানে বাংলাভাষীদের মধ্যে কী অর্থে প্রচলিত কিংবা শব্দটি অপ্রচলিত কি না, সেকথা জানতে পারবেন। **৫.** সংখ্যায় পাবেন শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা; দেখানো হয়েছে কেমন করে তা প্রতীকী অর্থগুলিতে পরিণত হল। যা কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তার অধিকাংশই বলা হয়েছে এইখানে। **৬.** সংখ্যায় পাবেন সেই শব্দের সমপর্যায়ের উত্তরাধিকার পাশ্চাত্যের ভাষা কী শব্দে পেয়েছে, তার সংবাদ।

কিন্তু নির্ঘণ্টে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় শব্দটির পৃথক ভুক্তি যদি না পান, তাহলে তাকে সেই পৃষ্ঠায় বর্ণানুক্রমিকভাবে কোনো বিশেষ শব্দ-পরিবারের সদস্য রূপে অবশ্যই পাবেন। সেক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ আপনি প্রস্তুত বা রেডিমেড পাবেন না। পাবেন, শব্দটির পরিবার-কর্তার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য শব্দসমূহের উল্লেখ; পাবেন পরিবার-কর্তার অর্থ, সেই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য-শব্দের অর্থ। তাদের সাহায্যে আপনাকে নিজেকেই অতঃপর শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করে নিতে হবে। এই কষ্ট করে উঠতে না পারলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন পর্যন্ত 'ক্রিয়াভিত্তিক–বর্ণভিত্তিক সম্পূর্ণ বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' সংকলিত হয়ে বাজারে না আসে।

খ) **আপনি যদি আপনার প্রয়োজনীয় শব্দটির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে চান** — তাহলে আপনাকে এই গ্রন্থের **ভূমিকা** (দ্র. ১ম খণ্ড) আগাগোড়া পড়ে নিতে হবে। গ্রন্থটির কাঠামোর দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। প্রথমটিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে রয়েছে প্রায় ২২,০০০ শব্দ। দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে সেই ২২০০০ শব্দ যে ১২৮টি শব্দ-পরিবারে জন্মেছে, সেই পরিবারগুলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। যে শব্দ কোন পরিবারের সদস্য, তা এখনও ঠিকঠাক জানা যায়নি, তাকে রাখা হয়েছে 'নিপাত'-এর ঘরে। অতঃপর সেই ১২৮টি শব্দ-পরিবার যে ৬টি (প, ফ, ব, ব, ভ, ম) বর্ণ থেকে প্রসূত হয়েছে, সেই ১২৮টি শব্দ পরিবারের প্রারম্ভে যে ক্রিয়ামূল রয়েছে, তাকে শনাক্ত করে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে দেওয়া হয়েছে বর্ণের অর্থ ও ব্যাখ্যা। যেমন **প**-বর্ণের শুরুতে দেওয়া হয়েছে 'প'-এর মানে। তারপর দেখানো হয়েছে, সেই বর্ণ থেকে মোট কতগুলি ক্রিয়ামূল উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ কতগুলি শব্দবংশের সূত্রপাত হয়েছে (**প**-এর ক্ষেত্রে যেমন ২৭টি)। এর পর বর্ণানুক্রমিকভাবে শব্দবংশের নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, পং, পক্ষ্‌, পচ্‌, পট্‌ ... ইত্যাদি। তারপর প্রথম শব্দবংশটির নাম লিখে, সেই শব্দবংশে কী কী শব্দের জন্ম হয়েছে তা বর্ণানুক্রমিকভাবে লেখা হয়েছে। তারপর সেই শব্দবংশে জাত শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশন করা হয়েছে। সবার আগে বংশকর্তার নাম ও তার ব্যাখ্যা, এবং তারপর তার থেকে জাত শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে নির্বাচনের আশ্রয় নিতে হয়েছে; সকল শব্দের অর্থ দেওয়া হয়নি। কারণ, শব্দবংশের কর্তার মানে জেনে নেওয়ার পর পাঠক বহু ক্ষেত্রে নিজেই সদস্য শব্দদের অর্থ বুঝে নিতে পারবেন। শব্দার্থকোষের অবয়বের কথা ভেবেও এই নীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

বয়ানের ভেতরে যেখানেই মোটা হরফ রয়েছে, বুঝতে হবে সেটির অর্থ তার নিজস্ব ভুক্তিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, যদি কোনো বিবরণের ভিতরে মোটা হরফে **পদ** লেখা থাকে, বুঝতে হবে, এই শব্দার্থকোষে যেখানে **পদ** শব্দটিকে পাওয়ার কথা, সেখানে তার বিস্তারিত অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে। 'ক', 'খ', 'গ' ... ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য লেখা থাকলে বুঝতে হবে, সূচীপত্রের আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া গ্রন্থগুলির কোনো একটির কথা বলা হচ্ছে।

বানানের ক্ষেত্রে আমাদের ঘোষিত নীতি ছিল (দ্র. **ভূমিকা**, ১ম খণ্ড), উদ্ধৃতিসমূহের বানানের ক্ষেত্রে উৎসের অনুসৃত বানানই অনুসরণ করা হবে; নিজেদের বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান অনুসরণ করা হবে। আর, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ বানান ছাড়া অন্য কোনো রীতি অনুসরণ করার উপায় থাকে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে ১ম খণ্ডে এই নীতি অনুসারে বানান দেখে দেওয়ার সহযোগী কাউকে না পাওয়ায় আমরা ঐ নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারিনি, বহু ভুল হয়েছিল। এই ২য় খণ্ডে আমরা পেয়েছিলাম শ্রী সঞ্জয় তরফদারকে। তিনি সোৎসাহে আমাদের ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বানান দেখে দিয়েছেন। তবে বানানের নৈরাজ্য দূর করতে হলে আগাগোড়া অর্থভিত্তিক বানান অনুসরণ করতে হবে। সে কাজ এখনও কল্পনা মাত্র।

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অ			অতিবেল	বেল্	৩৫৯	অনাবিদ্ধ	ব্যধ্	৩৬০	অনুপান	পা	৫৪	অপভ্রষ্ট	ভ্রংশ্	৪৩৮
অওঁধা	মুহ্	৫৬৮	অতিব্যথন	ব্যথ্	৩৫৯	অনাবিল	বিল্	৩২০	অনুপাম	মা	৫৩১	অপমান	মন্	৪১৫
অকপট	পট্	১৭	অতিভক্ত	ভজ্	৩৬৮	অনাবিষ্ট	বিশ্	৩২১	অনুপ্ত	বপ্	২৪৬	অপমানিত	মন্	৪৮১
অগ্নিমাঠর	মট্	৪৫৬	অতিভার	ভৃ	৪২৯	অনাবৃত	বর্ণ্	২৪৯	অনুপ্রবেশ	বিশ্	৩২১	অপমানী	মন্	৪৮১
অগ্রভূমি	ভূ	৪০৯	অতিভূমি	ভূ	৪০৯	অনাবৃত্তি	বৃৎ	৩৪৫	অনুবাদ	বদ্	২৩৩	অপয়া	পী	৭২
অঙ্গনাবল্লভ	বল্	২৬৩	অতিভোজন	ভু	৪০৫	অনাবৃষ্টি	বৃষ্	৩৫৫	অনুভব	ভূ	৪০৯	অপর	পৃ	১০৩
অজুহাত	বজ্	২১৮	অতিমধ্যন্দিন	মন্	৪৮১	অনামক	ম্না	৫৯৪	অনুভূত	ভূ	৪২২	অপরকায়	পৃ	১০০
অণিমাগুব্য	মণ্	৪৬৪	অতিমর্ত্ত্য	মৃ	৫৭৩	অনাময়	মি	৫৩৮	অনুমতি	মন্	৪৮৩	অপরঞ্চ	পৃ	১০০
অণুপ	পা	৫৪	অতিমাত্র	মা	৫৩১	অনামা	ম্না	৫৯৪	অনুমিত	মা	৫৩১	অপরত্র	পৃ	১০০
অতনু	—	২৯৮	অতিমান	মা	৫৩১	অনামিকা	ম্না	৫৯৪	অনুমোদন	মুদ্	৫৬২	অপরপক্ষ	পৃ	১০০
অতিপত্তি	পদ্	৩৮	অতিমানী	মন্	৪৮১	অনামিষ	মিষ্	৫৫০	অনোআন	মা	৫৩১	অপরস্বা	পৃ	১০০
অতিপর	পৃ	১০০	অতিমানুষ	মন্	৪৮১	অনামৃষ্ট	মৃশ্	৫৯০	অন্তর্ভুক্ত	ভু	৪০৬	অপররাত্র	পৃ	১০০
অতিপাত	পত্	৩১	অতিমায়	মি	৫৩৮	অনাস্বাদিতপূর্ব্ব	পৃ	৮৯	অপ	পৃ	১৬৫	অপরবর্ষা	পৃ	১০০
অতিপাতক	পত্	৩১	অতিমারুত	মৃ	৫৭৩	অনিবর্ত্তী	বৃৎ	৩৪৫	অপ	পা	৫৪	অপরস্পরসম্ভূত	পৃ	১০০
অতিপাতিত	পত্	৩১	অতিমুক্ত	মুচ্	৫৫৫	অনিবার	বর্ণ্	২৪৯	অপক্তি	পচ্	১২	অপরা	পৃ	১০৩
অতিপাতী	পত্	৩১	অতিমৃত্যু	মৃ	৫৭৩	অনিবার্য্য	বর্ণ্	২৪৯	অপক্ব	পচ্	১২	অপরাধ	রাধ্	৬১৮
অতিপাত্য	পত্	৩১	অতিমোদ	মদ্	৪৬৮	অনিবৃত	বর্ণ্	২৪৯	অপক্ষ	পক্ষ্	১২	অপরান্ত	পৃ	১০০
অতিপ্রবন্ধ	বন্ধ্	২৪৪	অতিরিক্ত	রিচ্	৬১৮	অনিবেদিত	বিদ্	৩০৮	অপক্ষপাত	পক্ষ্	১১	অপরার্দ্ধ	পৃ	১০০
অতিপ্রবৃত্তি	বৃৎ	৩৪৫	অত্যাপন্ন	পদ্	৩৮	অনিভৃত	ভৃ	৪২৯	অপক্ষপাতী	পক্ষ্	১১	অপরাপর	পৃ	১০০
অতিপ্রবৃদ্ধ	বৃধ্	৩৫৩	অত্যুক্তি	বচ্	২১৩	অনির্ব্বচনীয়	বচ্	২১৩	অপঙ্ক	পং	২	অপরাহ্ন	পৃ	১০০
অতিপ্রমাণ	মা	৫৩১	অত্যুক্তিপ্রসক্তি	বচ্	২১৩	অনির্ব্বাচ্য	বচ্	২১৩	অপচয়	—	৩০৬	অপরিক্রম	পৃ	১০০
অতিপ্রৌঢ়	বহ্	২৭৮	অদলবদল	বদ্	২৩১	অনির্ব্বাণ	বা	২৮৭	অপটী	পট্	১৭	অপরিগণিত	পৃ	১০০
অতিবড়	বহ্	২৭৮	অদ্ভুত	ভূ	৪১১	অনির্ব্বাহ	বহ্	২৭৮	অপটীক	পট্	১৭	অপরিগ্রহ	পৃ	১০০
অতিবর্ত্তন	বৃৎ	৩৪৫	অদ্ভুতরস	ভূ	৪০৯	অনির্ব্বিণ্ণ	বিদ্	৩০৮	অপটীক্ষেপ	পট্	১৭	অপরিচ্ছদ	পৃ	১০০
অতিবর্ত্তুল	বৃৎ	৩৪৫	অধঃপতন	পত্	৩১	অনির্ব্বেদ	বিদ্	৩০৮	অপটু	পট্	১৭	অপরিচ্ছিন্ন	পৃ	১০০
অতিবল	বল্	২৬৩	অধঃপাত	পত্	৩১	অনিষ্পত্তি	পদ্	৩৮	অপড়	পঠ্	২৩	অপরিচ্ছেদ	পৃ	১০০
অতিবাড়	বহ্	২৭৮	অধরপল্লব	পল্	৪৫	অনুপ	পা	৫৪	অপতি	পা	৫৪	অপরিচ্ছেদ্য	পৃ	১০০
অতিবাত	বা	২৮৭	অধিগ্রহণ	—	২৯৭	অনুপবীতী	বী	৩৩৩	অপতিকা	পা	৫৪	অপরিণাম	পৃ	১০০
অতিবাদ	বদ্	২৩৩	অধিপ	পা	৫৪	অনুবর্ত্তন	বৃৎ	৩৪৬	অপতিত	পত্	৩১	অপরিণামদর্শী	পৃ	১০০
অতিবাহ	বহ্	২৭৮	অধিপতি	পা	৫৪	অনুবর্ত্তিত	বৃৎ	৩৪৬	অপত্নী	পা	৫৪	অপরিপক্ব	পৃ	১০০
অতিবাহক	বহ্	২৭৮	অধিবাস	বস্	২৭০	অনুক্ত	বচ্	২১৩	অপত্নীক	পা	৫৪	অপরিবৃত	পৃ	১০০
অতিবাহন	বহ্	২৭৮	অধিবাসন	বস্	২৭০	অনূঢ়	বহ্	২৭৮	অপত্য	পত্	৩২	অপরিমাণ	পৃ	১০০
অতিবাহিক	বহ্	২৭৮	অধিবেশ	বিশ্	৩৩২	অনৃতভাষ	ভাষ্	৩৯২	অপত্যনির্ব্বিশেষে	পত্	৩১	অপরিষ্কার	পৃ	১০০
অতিবাহিত	বহ্	২৭৮	অধিবেশন	বিশ্	৩৩২	অন্নদামঙ্গল	মঙ্	৪৫০	অপত্যবিক্রয়	বি	২৯০	অপরিষ্কৃত	পৃ	১০০
অতিবাহ্য	বহ্	২৭৮	অধিভূত	ভূ	৪২২	অনিমিক	মিষ্	৫৫০	অপত্যবিক্রয়ী	পত্	৩২	অপরিসর	পৃ	১০০
অতিবিদ্ধ	ব্যধ্	৩৬০	অধিরাষ্ট্র	—	১৪৭	অনিমিখ	মিষ্	৫৫০	অপত্যস্নেহ	পত্	৩১	অপরিসীম	পৃ	১০০
অতিবিধ	বি	২৯০	অধ্যুষিত	বস্	২৭০	অনিমিত্ত	মিদ্	৫৪৪	অপথ	পথ্	৩৭	অপরিস্ফুট	পৃ	১০০
অতিবিষ	বিশ্	৩২১	অনতিবেগ	বজ্	২১৮	অনিমিষ	মিষ্	৫৫০	অপথ্য	পথ্	৩৭	অপরিহরণীয়	পৃ	১০০
অতিবিষা	বিশ্	৩২১	অনপত্য	পত্	৩১	অনিমেষ	মিষ্	৫৫০	অপদ	পদ্	৩৮	অপরিহার্য্য	পৃ	১০০
অতিবুদ্ধি	বুধ্	৩৩৭	অনবদ্য	বদ্	২৩২	অনির্ব্বন্ধ	বন্ধ্	২৪৪	অপদার্থ	পদ্	৩৮	অপরূপ	রূপ্	৬২২
অতিবৃংহিত	বংহ্	১৯২	অনবর	বর্ণ্	২৪৯	অনুপ	পা	৫৪	অপবর্গ	বৃজ্	৩৪৪	অপর্ণ	পৃ	১০০
অতিবৃত্ত	বৃৎ	৩৪৫	অনবেলি	বেল্	৩৫৯	অনুপপত্তি	পদ্	৩৮	অপবাদ	বদ্	২৩৩	অপর্ণা	পৃ	১০২
অতিবৃদ্ধ	বৃধ্	৩৫৩	অনভিব্যক্ত	বচ্	২১৩	অনুপম	মা	৫৩১	অপবারক	বর্ণ্	২৪৯	অপর্ব্ব	পৃ	১০০
অতিবৃদ্ধি	বৃধ্	৩৫৩	অনভিমত	মন্	৪৮১	অনুপমিত	মা	৫৩১	অপবিত্র	পূ	৮৯	অপর্য্যন্ত	পৃ	১০০
অতিবৃষ্টি	বৃষ্	৩৫৫	অনাথপিণ্ডদ	পিণ্ড্	৬৮	অনুপাত	পত্	৩১	অপভ্রংশ	ভ্রংশ্	৪৩৮	অপর্য্যাপ্ত	পৃ	১০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অপর্য্যুষিত	পৃ	১০০	অপেয়	পী	৭২	অৰদ্ধ	ৰন্ধ্	২৪৪	অবাচ্য	বচ্	২১৩	অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ	মৃশ্	৫৯০
অপলায়ন	পৃ	১০০	অপৈতক	প্	১৬৫	অবদ্য	বদ্	২৩২	অবাত	বা	২৮৭	অবিমৃষ্টবিধেয়াংশভাব	মৃশ্	৫৯০
অপশ্চিম	পৃ	১০০	অপৈশুন	পিশ্	৬৯	অবধ	ৰধ্	২৩৪	অবাধ	ৰাধ্	২৩৪	অবিয়ত	বহ্	২৭৮
অপহ্নব	প্	১৬৫	অপোষ্য	পুষ্	৮২	অৰধিয়া	ৰুধ্	৩৩৭	অবাধক	ৰাধ্	২৩৪	অবিষ	বিশ্	৩২১
অপাংশুলা	পং	২	অপৌরুষ	পৃ	১০০	অবধ্য	ৰধ্	২৩৪	অবাধিত	ৰাধ্	২৩৪	অবিসংবাদ	বদ্	২৩৩
অপাক	পচ্	১২	অপৌরুষেয়	পৃ	১০২	অবনিপাল	পল্	৪৫	অবাধ্য	ৰাধ্	২৩৪	অবীচি	বে	৩৫৮
অপাঙ্‌ক্ত	পং	২	অপ্রতিকর্ম্মা	প্র	১৩৯	অবনিবনাও	বন্	২৩৬	অৰান্ধব	ৰন্ধ্	২৪৪	অবীচিময়	বে	৩৫৮
অপাঙ্‌ক্তেয়	পং	৩	অপ্রতিঘ	প্র	১৩৯	অবন্দ্য	বন্দ্	২৪২	অবাম	বা	২৮৭	অবীচিমান	বে	৩৫৮
অপাঙ্‌ক্ত্য	পং	২	অপ্রতিদ্বন্দ্ব	প্র	১৩৯	অৰন্ধক	ৰন্ধ্	২৪৪	অবারিত	বর্ণ্	২৪৯	অবীর	বীর্	৩৩৫
অপাট	পট্	১৭	অপ্রতিপত্তি	প্র	১৩৯	অৰন্ধান	ৰন্ধ্	২৪৪	অৰাল	ৰল্	২৬৩	অৰুজ	বু	৩৩৬
অপাঠ্য	পঠ্	২৪	অপ্রতিবন্ধ	প্র	১৩৯	অৰন্ধু	ৰন্ধ্	২৪৪	অবাস্তব	বস্	২৭৮	অৰুঝ	বু	৩৩৬
অপাঠ্যপুস্তক	পঠ্	২৪	অপ্রতিবল	প্র	১৩৯	অৰন্ধুদায়াদ	ৰন্ধ্	২৪৪	অবাহ্য	বহ্	২৭৮	অৰুঝা	বু	৩৩৬
অপাতক	পত্	৩১	অপ্রতিবিধেয়	প্র	১৩৯	অৰন্ধ্য	ৰন্ধ্	২৪৪	অবিদিত	বিদ্	৩০৮	অৰুদ্দিয়া	ৰুধ্	৩৩৭
অপাত্র	পা	৫৪	অপ্রতিবীর্য্য	প্র	১৩৯	অৰন্ধ্যজন্মা	ৰন্ধ্	২৪৪	অবিদ্ধ	ব্যধ্	৩৬০	অৰুদ্ধ	ৰুধ্	৩৩৭
অপাত্রদায়ী	পা	৫৪	অপ্রতিভ	ভা	৩৯০	অবভাষণ	ভাষ্	৩৯৩	অবিদ্ধকর্ণী	ব্যধ্	৩৬০	অৰুদ্ধিপূর্ব্ব	ৰুধ্	৩৩৭
অপাত্রবর্ষী	পা	৫৪	অপ্রতিম	প্র	১৩৯	অবভাস	ভাস্	৩৯৬	অবিদ্যমান	বিদ্	৩০৮	অৰুদ্ধিপূর্ব্বক	ৰুধ্	৩৩৯
অপাত্রীকরণ	পা	৫৪	অপ্রতিমান	প্র	১৩৯	অবমান	মন্	৪৮১	অবিদ্যা	বিদ্	৩০৯	অৰুধ	ৰুধ্	৩৩৭
অপাপ	পা	৫৪	অপ্রতিযোগী	প্র	১৩৯	অবমানিত	মন্	৪৮১	অবিদ্বান	বিদ্	৩০৮	অৰুধিনী	ৰুধ্	৩৩৭
অপাপী	পা	৫৪	অপ্রতিরথ	প্র	১৩৯	অবমূর্দ্ধা	মুহ্	৫৬৮	অবিনাভাব	ৰ,ব	৩৬২	অৰুধিয়া	ৰুধ্	৩৩৭
অপার	পৃ	১০০	অপ্রতিরূপ	প্র	১৩৯	অবর	বর্ণ্	২৪৯	অবিপক্ক	পচ্	১২	অবৃক্ষ	বৃক্	৩৪১
অপারক	পৃ	১০০	অপ্রতিলোম	প্র	১৩৯	অবরজ	বর্ণ্	২৪৯	অবিপাক	পচ্	১২	অবৃত্ত	বৃৎ	৩৪৫
অপার্থিব	পৃ	১০০	অপ্রতিশাসন	প্র	১৩৯	অবরবর্ণজ	বর্ণ্	২৪৯	অবিপ্লুত	প্লু	১৬৪	অবৃথা	ৰ,ব	৩৬২
অপালন	পল্	৪৫	অপ্রতিষিদ্ধ	প্র	১৩৯	অবর্ণ	বর্ণ্	২৪৯	অবিবক্ষা	বচ্	২১৩	অবৃষ্টি	বৃষ্	৩৫৫
অপালা	পল্	৪৫	অপ্রতিষ্ঠা	প্র	১৩৯	অবর্ণনীয়	বর্ণ্	২৪৯	অবিবাদ	বদ্	২৩১	অবৃদ্ধিক	বৃধ্	৩৫৩
অপিতৃক	পা	৫৪	অপ্রতিষ্ঠিত	প্র	১৩৯	অবর্ণ্য	বর্ণ্	২৪৯	অবিবাহ	বহ্	২৭৮	অবেকত	বচ্	২১৩
অপিত্র্য	পা	৫৪	অপ্রতিস্তব্ধ	প্র	১৩৯	অবর্ত্তমান	বৃৎ	৩৪৫	অবিবাহিত	বহ্	২৭৮	অবেক্ষণ	—	৩০২
অপীত	পা	৫৪	অপ্রতীকী	প্র	১৫৩	অবর্ষ	বৃষ্	৩৫৫	অবিবাহী	বহ্	২৭৮	অবেদন	বিদ্	৩০৮
অপুংস্কা	পা	৫৪	অপ্রবাস	বস্	২৭০	অৰল	ৰল্	২৬৩	অবিবাহ্য	বহ্	২৭৮	অবেদ্য	বিদ্	৩০৮
অপুংস্ত্ব	পা	৫৪	অপ্রভু	ভূ	৪০৯	অৰলধৰল	ৰল্	২৬৩	অবিবিক্ত	বিচ্	৩০৬	অবেল	বেল্	৩৫৯
অপুণ্য	পু	৭৩	অপ্রমত্ত	মদ্	৪৬৮	অৰলা	ৰল্	২৬৩	অবিবেক	বিচ্	৩০৬	অবৈতনিক	বী	৩৩৩
অপুত্র	পু	৭৩	অপ্রমাদ	মদ্	৪৬৮	অবশ	বশ্	২৬৮	অবিবেকী	বিচ্	৩০৬	অৰোধ	ৰুধ্	৩৩৭
অপুত্রক	পু	৭৩	অপ্রমাণ	মা	৫৩১	অবশী	বশ্	২৬৭	অবিবেচক	বিচ্	৩০৬	অৰোধিনী	ৰুধ্	৩৩৭
অপুত্রিণী	পু	৭৩	অপ্রমিত	মা	৫৩১	অবশ্য	বশ্	২৬৮	অবিবেচনা	বিচ্	৩০৬	অৰোধিয়া	ৰুধ্	৩৩৭
অপুমান	পু	৭৩	অপ্রমেয়	মি	৫৩৮	অবশ্যকরণীয়	বশ্	২৬৭	অবিভক্ত	ভজ্	৩৬৮	অৰোধী	ৰুধ্	৩৩৭
অপুষ্ট	পুষ্	৮২	অপ্রমেয়াত্মা	মি	৫৩৮	অবশ্যকার্য্য	বশ্	২৬৭	অবিভাই	বহ্	২৭৮	অবোল	ৰল্	২৬৩
অপুষ্প	পুষ্	৮২	অপ্রমোদ	মুদ্	৫৬২	অবশ্যভব্য	বশ্	২৬৭	অবিভাগ	ভজ্	৩৬৮	অব্যক্ত	বচ্	২৯৫
অপূজা	পূজ্	১০০	অপ্রযত্ন	যম্	৬০২	অবশ্যম্	বশ্	২৬৭	অবিভাজ্য	ভজ্	৩৬৮	অব্যক্তমূর্ত্তি	বচ্	২১৩
অপূত	পূ	৮৯	অপ্রামাণিক	মা	৫৩১	অবশ্যম্ভাবিতা	বশ্	২৬৭	অবিভাতি	বহ্	২৭৮	অব্যক্তরাগ	বচ্	২১৩
অপূপ	পূ	৮৯	অপ্রিয়	প্রী	১৬২	অবশ্যম্ভাবী	বশ্	২৬৮	অবিভাবনা	ভূ	৪০৯	অব্যথ	ব্যথ্	৩৫৯
অপূর্ণ	পৃ	১০০	অপ্রিয়ংবদ	প্রী	১৬২	অবশ্যা	বশ্	২৬৭	অবিভাবিত	ভূ	৪০৯	অব্যাপন্ন	পদ্	৩৮
অপূর্ব্ব	পৃ	১০০	অপ্রীত	প্রী	১৬২	অবস্তু	বস্	২৭০	অবিভাব্য	ভূ	৪০৯	অব্যাপার	পৃ	১০০
অপূর্ব্ব	পৃ	১০২	অবক্তৃ	বচ্	২১৩	অৰা	ৰুধ্	৩৩৭	অবিভ্রম	ভ্রংশ্	৪৩৭	অব্যুৎপত্তি	পদ্	৩৮
অপূর্ব্বদৃষ্ট	পৃ	১০০	অবচন	বচ্	২১৩	অবাক	বচ্	২১৩	অবিমুক্ত	মুচ্	৫৫৪	অব্যূঢ়	বহ্	২৭৮
অপৃক্ত	পৃ	১০০	অবচনীয়	বচ্	২১৩	অবাক্য	বচ্	২১৩	অবিমৃশ্য	মৃশ্	৫৯০	অব্রত	বর্ণ্	২৪৯
অপৃষ্ট	প্র	১৩৯	অবড়	বহ্	২৭৮	অবাগিণী	ভজ্	৩৬৮	অবিমৃশ্যকারিতা	মৃশ্	৫৯০	অব্রতিক	বর্ণ্	২৪৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অব্রতী	বর্ণ্	২৪৯
অব্রহ্মণ্য	বংহ্	১৯২
অব্রাহ্মণ	বংহ্	১৯৩
অব্রেথা	ব,ব	৩৬২
অভক্ত	ভজ্	৩৬৮
অভক্ষণ	ভক্ষ্	৩৬৬
অভক্ষিত	ভক্ষ্	৩৬৬
অভক্ষ্য	ভক্ষ্	৩৬৬
অভক্ষ্যভক্ষণ	ভক্ষ্	৩৬৬
অভক্ষ্যভক্ষজ	ভক্ষ্	৩৬৬
অভ্যাক্ষভোজ্য	ভক্ষ্	৩৬৬
অভগ্ন	ভঞ্জ্	৩৭৬
অভঙ্গ	ভঞ্জ্	৩৭৭
অভদ্র	ভঞ্জ্	৩৭৬
অভব	ভূ	৪০৯
অভব্য	ভূ	৪০৯
অভয়	ভী	৪০১
অভয়ঙ্কর	ভী	৪০১
অভয়ডিণ্ডিম	ভী	৪০১
অভয়দক্ষিণ	ভী	৪০১
অভয়দান	ভী	৪০১
অভয়প্রদান	ভী	৪০১
অভয়বচন	ভী	৪০১
অভয়মুদ্রা	ভী	৪০১
অভরণ	ভৃ	৪২৯
অভরসা	ভৃ	৪২৯
অভাগ	ভজ্	৩৬৮
অভাগা	ভজ্	৩৬৯
অভাগি	ভজ্	৩৬৮
অভাগিনী	ভজ্	৩৬৮
অভাগিয়া	ভজ্	৩৬৮
অভাগিনী	ভজ্	৩৬৮
অভাগী	ভজ্	৩৬৯
অভাগীয়া	ভজ্	৩৬৮
অভাগ্য	ভজ্	৩৬৮
অভাজন	ভজ্	৩৭৫
অভাব	ভূ	৪০৯
অভাবনা	ভূ	৪০৯
অভাবী	ভূ	৪০৯
অভি	ভূ	৪১১
অভিক	ভূ	৪০৯
অভিকম্পন	ভূ	৪০৯
অভিকাঙ্ক্ষা	ভূ	৪০৯
অভিকাঙ্ক্ষিত	ভূ	৪০৯
অভিকাঙ্ক্ষী	ভূ	৪০৯

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অভিকাম	ভূ	৪০৯
অভিক্রম	ভূ	৪০৯
অভিক্রমণ	ভূ	৪০৯
অভিক্রান্তি	ভূ	৪০৯
অভিক্রুদ্ধ	ভূ	৪০৯
অভিক্রোশ	ভূ	৪০৯
অভিগন্তব্য	ভূ	৪০৯
অভিগম	ভূ	৪০৯
অভিগম্য	ভূ	৪০৯
অভিগর্জ্জন	ভূ	৪০৯
অভিগর্জ্জিত	ভূ	৪০৯
অভিগুপ্ত	ভূ	৪০৯
অভিগৃহীত	ভূ	৪০৯
অভিগ্রহ	ভূ	৪০৯
অভিগ্রহণ	ভূ	৪০৯
অভিঘাতক	ভূ	৪০৯
অভিঘাতী	ভূ	৪০৯
অভিচরণ	ভূ	৪০৯
অভিচরণ	ভূ	৪১১
অভিচার	ভূ	৪০৯
অভিচারক	ভূ	৪০৯
অভিচারণীয়	ভূ	৪০৯
অভিচারযজ্ঞ	ভূ	৪০৯
অভিচারহোম	ভূ	৪০৯
অভিচারী	ভূ	৪০৯
অভিজন	ভূ	৪০৯
অভিজাত	ভূ	৪০৯
অভিজাতি	ভূ	৪০৯
অভিজিৎ	ভূ	৪১১
অভিজিত	ভূ	৪১১
অভিজিন্মুহূর্ত্ত	ভূ	৪০৯
অভিজুষ্ট	ভূ	৪০৯
অভিজ্ঞ	ভূ	৪১২
অভিজ্ঞা	ভূ	৪১২
অভিজ্ঞাত	ভূ	৪১২
অভিজ্ঞান	ভূ	৪১২
অভিজ্ঞানশকুন্তল	ভূ	৪০৯
অভিডীন	ভূ	৪০৯
অভিতঃ	ভূ	৪০৯
অভিতপ্ত	ভূ	৪০৯
অভিতাপ	ভূ	৪০৯
অভিতাপিত	ভূ	৪০৯
অভিতাম্র	ভূ	৪০৯
অভিত্তি	ভিদ্	৩৯৮
অভিদর্শন	ভূ	৪০৯

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অভিদেবন	ভূ	৪০৯
অভিদ্রুত	ভূ	৪০৯
অভিদ্রুগ্ধ	ভূ	৪০৯
অভিধর্মপিটক	পট্	২৩
অভিধা	ভূ	৪০৯
অভিধাতব্য	ভূ	৪০৯
অভিধাতা	ভূ	৪০৯
অভিধান	ভূ	৪০৯
অভিধানীয়	ভূ	৪০৯
অভিধাবক	ভূ	৪০৯
অভিধাবন	ভূ	৪০৯
অভিধায়ক	ভূ	৪০৯
অভিধায়ী	ভূ	৪০৯
অভিধেয়	ভূ	৪০৯
অভিধ্বস্ত	ভূ	৪০৯
অভিনন্দ	ভূ	৪০৯
অভিনন্দন	ভূ	৪০৯
অভিনন্দনীয়	ভূ	৪০৯
অভিনন্দী	ভূ	৪০৯
অভিনন্দ্য	ভূ	৪০৯
অভিনব	ভূ	৪০৯
অভিনম্র	ভূ	৪০৯
অভিনিঃসৃত	ভূ	৪০৯
অভিনিবিষ্ট	ভূ	৩৩২
অভিনিবেশ	ভূ	৩৩২
অভিনিবেশিত	ভূ	৪০৯
অভিনিবেশী	ভূ	৪০৯
অভিনিয়োগ	ভূ	৪০৯
অভিনির্জ্জিত	ভূ	৪০৯
অভিনির্ম্মিত	ভূ	৪০৯
অভিনির্ম্মুক্ত	ভূ	৪০৯
অভিনির্য্যাণ	ভূ	৪০৯
অভিনির্বর্ত্তিত	ভূ	৪০৯
অভিনিশ্চিত	ভূ	৪০৯
অভিনিষ্ক্রমণ	ভূ	৪০৯
অভিনীত	ভূ	৪০৯
অভিনেতব্য	ভূ	৪০৯
অভিনেয়	ভূ	৪০৯
অভিন্ন	ভিদ্	৩৯৮
অভিন্নপুট	পু	৭৩
অভিপদ্ম	ভূ	৪০৯
অভিপন্ন	ভূ	৪০৯
অভিপরিগ্লান	ভূ	৪০৯
অভিপরিপ্লুত	ভূ	৪০৯
অভিপরীত	ভূ	৪০৯

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অভিপারা	ভূ	৪০৯
অভিপালিত	ভূ	৪০৯
অভিপীড়িত	ভূ	৪০৯
অভিপুষ্প	ভূ	৪০৯
অভিপূজিত	ভূ	৪০৯
অভিপৃষ্ঠ	ভূ	৪০৯
অভিপ্রণয়ন	ভূ	৪০৯
অভিপ্রদক্ষিণ	ভূ	৪০৯
অভিপ্রবিষ্ট	ভূ	৪০৯
অভিপ্রবৃত্ত	ভূ	৪০৯
অভিপ্রয়াত	ভূ	৪০৯
অভিপ্রায়	ভূ	৪০২
অভিপ্রেত	—	১৬১
অভিপ্রেপ্সু	ভূ	৪০৯
অভিপ্লব	ভূ	৪০৯
অভিবন্দ	ভূ	৪০৯
অভিবন্দন	ভূ	৪০৯
অভিবর্ত্তী	ভূ	৪০৯
অভিবর্ষণ	ভূ	৪০৯
অভিবর্ষিত	ভূ	৪০৯
অভিবর্ষী	ভূ	৪০৯
অভিবাদ	ভূ	২৩৩
অভিবাদক	ভূ	৪০৯
অভিবাদন	ভূ	২৩৩
অভিবাদনীয়	ভূ	৪০৯
অভিবাদয়িতা	ভূ	৪০৯
অভিবাদ্য	ভূ	৪০৯
অভিবাহ্য	ভূ	৪০৯
অভিবিখ্যাত	ভূ	৪০৯
অভিবিদীপিত	ভূ	৪০৯
অভিবিদ্রুত	ভূ	৪০৯
অভিবিধি	ভূ	৪০৯
অভিবিনীত	ভূ	৪০৯
অভিবিরাজিত	ভূ	৪০৯
অভিবিশ্রুত	ভূ	৪০৯
অভিবিষ্ট	ভূ	৪০৯
অভিবৃদ্ধি	ভূ	৪০৯
অভিবৃষ্ট	ভূ	৪০৯
অভিব্যাপক	ভূ	৪০৯
অভিভব	ভূ	৪১৩
অভিভবন	ভূ.	৪১৩
অভিভাবক	ভূ	৪১৩
অভিভাবিকা	ভূ	৪১৩
অভিভাবী	ভূ	৪১৩
অভিভাষণ	ভাষ্	৩৯৩

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অভিভাষণ	—	৪১৪
অভিভাষা	ভাষ্	৩৯৪
অভিভাষা	—	৪১২
অভিভূ	ভূ	৪০৯
অভিভূত	ভূ	৪১৪
অভিভূত	—	৪২২
অভিভূতি	ভূ	৪০৯
অভিমত	ভূ	৪০৯
অভিমত	মন্	৪৮১
অভিমনাঃ	ভূ	৪০৯
অভিমন্তব্য	ভূ	৪০৯
অভিমন্ত্রণ	ভূ	৪০৯
অভিমন্যু	ভূ	৪১৪
অভিমর্দ্দ	ভূ	৪০৯
অভিমর্শ	ভূ	৪০৯
অভিমর্শক	ভূ	৪০৯
অভিমর্শন	ভূ	৪০৯
অভিমর্ষ	ভূ	৪০৯
অভিমর্ষক	ভূ	৪০৯
অভিমর্ষণ	ভূ	৪০৯
অভিমর্ষী	ভূ	৪০৯
অভিমান	ভূ	৪১৫
অভিমান	মন্	৫০৭
অভিমানী	মন্	৪৮১
অভিমানী	ভূ	৪১৫
অভিমুখ	ভূ	৪০৯
অভিমুখতা	ভূ	৪০৯
অভিমুখীকরণ	ভূ	৪০৯
অভিমুখীভাব	ভূ	৪০৯
অভিমূর্চ্ছিত	ভূ	৪০৯
অভিমৃষ্ট	ভূ	৪০৯
অভিযাত	ভূ	৪০৯
অভিযাতা	ভূ	৪০৯
অভিযাতি	ভূ	৪০৯
অভিযায়ী	ভূ	৪০৯
অভিযোক্তব্য	ভূ	৪০৯
অভিযোক্তা	ভূ	৪০৯
অভিযোগ	ভূ	৪০৯
অভিযোগী	ভূ	৪০৯
অভিরক্ষা	ভূ	৪০৯
অভিরক্ষা	ভূ	৪০৯
অভিরক্ষিত	ভূ	৪০৯
অভিরক্ষিতা	ভূ	৪০৯
অভিরক্ত	ভূ	৪০৯
অভিরত	ভূ	৪০৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অভিরতি	ভূ	৪০৯	অভিষ্যন্দনগর	ভূ	৪০৯	অভীর	ভূ	৪০৯	অভ্যর্হণা	ভূ	৪০৯	অমনাঃ	মন্	৪৮১
অভিরমণ	ভূ	৪০৯	অভিষ্যন্দবমন	ভূ	৪০৯	অভীর	ভী	৪০১	অভ্যর্হণীয়	ভূ	৪০৯	অমনি	মন্	৪৮৩
অভিরমিত	ভূ	৪০৯	অভিষ্যন্দী	ভূ	৪০৯	অভীরু	ভী	৪০১	অভ্যর্হিত	ভূ	৪০৯	অমনস্য	মন্	৪৮১
অভিরম্য	ভূ	৪০৯	অভিস্বঙ্গ	ভূ	৪০৯	অভীল	ভী	৪০১	অভ্যলঙ্কৃত	ভূ	৪০৯	অমনুষ্য	মন্	৪৮১
অভিরাম	ভূ	৪০৯	অভিসংযুক্ত	ভূ	৪০৯	অভুক্ত	ভু	৪০৫	অভ্যসূয়	ভূ	৪০৯	অমনোযোগ	মন্	৪৮১
অভিরামিণী	ভূ	৪০৯	অভিসংরক্ত	ভূ	৪০৯	অভূত	ভূ	৪০৯	অভ্যসূয়ক	ভূ	৪০৯	অমন্ত্র	মন্	৪৮১
অভিরুচিত	ভূ	৪০৯	অভিসংরব্ধ	ভূ	৪০৯	অভূততদ্ভাব	ভূ	৪০৯	অভ্যসূয়ক	ভূ	৪০৯	অমন্ত্রক	মন্	৪৮১
অভিরুচির	ভূ	৪০৯	অভিসংবৃত	ভূ	৪০৯	অভূতপূর্ব্ব	ভূ	৪০৯	অভ্যসূয়া	ভূ	৪০৯	অমন্ত্রজ্ঞ	মন্	৪৮১
অভিরুত	ভূ	৪০৯	অভিসংবৃত্ত	ভূ	৪০৯	অভূতি	ভূ	৪০৯	অভ্যস্ত	ভূ	৪১৫	অমন্ত্রতন্ত্র	মন্	৪৮১
অভিরূপ	ভূ	৪০৯	অভিসংশ্রয়	ভূ	৪০৯	অভূমি	ভূ	৪০৯	অভ্যস্তমিত	ভূ	৪১৫	অমন্ত্রবিৎ	মন্	৪৮১
অভিরূপক	ভূ	৪০৯	অভিসংহিত	ভূ	৪০৯	অভৃত	ভৃ	৪২৯	অভ্যাকর্ষ	ভূ	৪০৯	অমন্দ	মন্	৪৮১
অভিরূপপতি	ভূ	৪০৯	অভিসংক্ষিপ্ত	ভূ	৪০৯	অভৃতক	ভৃ	৪২৯	অভ্যাগম	ভূ	৪০৯	অমম	মদ্	৪৬৮
অভিরোষ	ভূ	৪০৯	অভিসঙ্খ্যা	ভূ	৪০৯	অভেদ	ভিদ্	৩৯৯	অভ্যাগমন	ভূ	৪০৯	অমমকার	মদ্	৪৬৮
অভিলক্ষিত	ভূ	৪০৯	অভিসন্তপ্ত	ভূ	৪০৯	অভেদাত্মা	ভিদ্	৩৯৮	অভ্যাবৃত্ত	ভূ	৪০৯	অমমতা	মদ্	৪৬৮
অভিলঙ্ঘন	ভূ	৪০৯	অভিসন্ত্রস্ত	ভূ	৪০৯	অভেদ্য	ভিদ্	৩৯৯	অভ্যাশ	ভূ	৪০৯	অমর	মৃ	৫৭৩
অভিলষণ	ভূ	৪০৯	অভিসন্দেহ	ভূ	৪০৯	অভোজন	ভু	৪০৫	অভ্যাস	ভূ	৪১৫	অমরকোষ	মৃ	৫৭৩
অভিলষণীয়	ভূ	৪০৯	অভিসন্ধক	ভূ	৪০৯	অভোজ্য	ভু	৪০৫	অভ্যাসযোগ	ভূ	৪০৯	অমরতটিনী	মৃ	৫৭৩
অভিলষিত	ভূ	৪০৯	অভিসন্ধা	ভূ	৪০৯	অভোজ্যান্ন	ভু	৪০৫	অভ্যাহত	ভূ	৪০৯	অমরতরু	মৃ	৫৭৪
অভিলাষ	ভূ	৪০৯	অভিসন্ধি	ভূ	৪০৯	অভ্যক্ত	ভূ	৪০৯	অভ্যুক্ষণ	ভূ	৪০৯	অমরতা	মৃ	৫৭৩
অভিলাষক	ভূ	৪০৯	অভিসম্পন্ন	ভূ	৪০৯	অভ্যগ্র	ভূ	৪০৯	অভ্যুচ্ছ্রিত	ভূ	৪০৯	অমরত্ব	মৃ	৫৭৩
অভিলাষী	ভূ	৪০৯	অভিসম্পাত	পত্	৩১	অভ্যঙ্গ	ভু	৪০৫	অভ্যুৎপতন	ভূ	৪০৯	অমরনগর	মৃ	৫৭৩
অভিলাষুক	ভূ	৪০৯	অভিসম্বন্ধ	ভূ	৪০৯	অভ্যঞ্জন	ভু	৪০৫	অভ্যুদয়	ভূ	৪১৬	অমরপ্রভু	মৃ	৫৭৩
অভিলীন	ভূ	৪০৯	অভিসম্বুদ্ধ	ভূ	৪০৯	অভ্যঞ্জনীয়	ভু	৪০৫	অভ্যুদিত	ভূ	৪১৬	অমরভর্ত্তা	মৃ	৫৭৩
অভিলেখিত	ভূ	৪০৯	অভিসম্ভূত	ভূ	৪০৯	অভ্যতীত	ভূ	৪০৯	অভ্যুদ্যত	ভূ	৪০৯	অমররাজ	মৃ	৫৭৩
অভিশংসক	ভূ	৪০৯	অভিসম্মূঢ়	ভূ	৪০৯	অভ্যধিক	ভূ	৪০৯	অভ্যুদ্গত	ভূ	৪০৯	অমরলোক	মৃ	৫৭৩
অভিশংসন	ভূ	৪০৯	অভিসর	ভূ	৪০৯	অভ্যনুজ্ঞা	ভূ	৪০৯	অভ্যুদ্গম	ভূ	৪০৯	অমরাধিপ	মৃ	৫৭৩
অভিশংসী	ভূ	৪০৯	অভিসান্ত্ব	ভূ	৪০৯	অভ্যন্তর	ভূ	৪০৯	অভ্যুদ্গমন	ভূ	৪০৯	অমরানগর	মৃ	৫৭৩
অভিশঙ্কা	ভূ	৪০৯	অভিসার	ভূ	৪০৯	অভ্যন্তরীণ	ভূ	৪০৯	অভ্যুন্নত	ভূ	৪০৯	অমরাপতি	মৃ	৫৭৩
অভিশঙ্কিত	ভূ	৪০৯	অভিসারক	ভূ	৪০৯	অভ্যবকীর্ণ	ভূ	৪০৯	অভ্যুপগত	ভূ	৪০৯	অমরাপুরী	মৃ	৫৭৩
অভিশঙ্কী	ভূ	৪০৯	অভিসারণ	ভূ	৪০৯	অভ্যবস্থিত	ভূ	৪০৯	অভ্যুপগন্তব্য	ভূ	৪০৯	অমরাবতী	মৃ	৫৭৪
অভিশঙ্ক্য	ভূ	৪০৯	অভিসারস্থান	ভূ	৪০৯	অভ্যবহরণ	ভূ	৪০৯	অভ্যুপগম	ভূ	৪০৯	অমরাবাস	মৃ	৫৭৩
অভিশপন	ভূ	৪০৯	অভিসারিকা	ভূ	৪০৯	অভ্যবহার	ভূ	৪০৯	অভ্যুপপত্তি	ভূ	৪০৯	অমরাবাস	মৃ	৫৭৩
অভিশাপ	ভূ	৪০৯	অভিসারিণী	ভূ	৪০৯	অভ্যবহার্য্য	ভূ	৪০৯	অভ্যুপস্থিত	ভূ	৪০৯	অমরাভুবন	মৃ	৫৭৩
অভিশব্দিত	ভূ	৪০৯	অভিসারী	ভূ	৪০৯	অভ্যবহৃত	ভূ	৪০৯	অভ্যুপায়	ভূ	৪০৯	অমরাস্থল	মৃ	৫৭৩
অভিশস্ত	ভূ	৪০৯	অভিসৃষ্ট	ভূ	৪০৯	অভ্যর্চ্চন	ভূ	৪০৯	অভ্যুপায়ন	ভূ	৪০৯	অমরী	মৃ	৫৭৩
অভিসিঞ্চন	ভূ	৪০৯	অভিস্নেহ	ভূ	৪০৯	অভ্যর্চ্চা	ভূ	৪০৯	অভ্যুপেত	ভূ	৪০৯	অমরেন্দ্র	মৃ	৫৭৩
অভিষেক্তা	ভূ	৪০৯	অভিহরণ	ভূ	৪০৯	অভ্যর্চ্চ্য	ভূ	৪০৯	অভ্যুষিত	ভূ	৪০৯	অমরেশ্বর	মৃ	৫৭৩
অভিষেচন	ভূ	৪০৯	অভিহর্ত্তা	ভূ	৪০৯	অভ্যর্ণ	ভূ	৪০৯	অভ্রম	ভ্রংশ্	৪৩৭	অমরোপম	মৃ	৫৭৩
অভিষেচনীয়	ভূ	৪০৯	অভিহার	ভূ	৪০৯	অভ্যর্থন	ভূ	৪১৫	অভ্রান্ত	ভ্রংশ্	৪৩৭	অমর্ত্ত	মৃ	৫৭৩
অভিষেচিত	ভূ	৪০৯	অভী	ভূ	৪০৯	অভ্যর্থনা	ভূ	৪১৫	অমঙ্গল	মঙ্গ্	৪৫০	অমর্ত্ত্য	মৃ	৫৭৪
অভিষেচ্য	ভূ	৪০৯	অভীক	ভূ	৪০৯	অভ্যর্থনীয়	ভূ	৪০৯	অমঙ্গল্যা	মঙ্গ্	৪৫০	অমর্য্যাদ	মৃ	৫৭৩
অভিষেণন	ভূ	৪০৯	অভীক্ষ্ণ	ভূ	৪০৯	অভ্যর্থিত	ভূ	৪০৯	অমৎসর	মদ্	৪৬৮	অমর্ষ	মৃশ্	৫৯০
অভিষ্টুত	ভূ	৪০৯	অভীত	ভী	৪০১	অভ্যর্থ্য	ভূ	৪০৯	অমন	মন্	৪৮৩	অমর্ষণ	মৃশ্	৫৯০
অভিষ্যন্দ	ভূ	৪০৯	অভীন	ভিদ্	৩৯৮	অভ্যর্দ্দিত	ভূ	৪০৯	অমনধারা	মন্	৪৮১	অমর্ষিত	মৃশ্	৫৯০
অভিস্যন্দ	ভূ	৪০৯	অভীপ্সিত	ভূ	৪০৯	অভ্যর্হণ	ভূ	৪০৯	অমনস্ক	মন্	৪৮১	অমর্ষী	মৃশ্	৫৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অমল	মল্	৫১৬	অমিশ্রিত	মিশ্র্	৫৪৯	অমৃতাশী	মৃ	৫৭৩	অসম্ভব	ভূ	৪০৯	আতিবাহিক	বহ্	২৭৯
অমলধবল	মল্	৫১৬	অমীমাংস্য	মন্	৪৮১	অমৃতাহূ	মৃ	৫৭৩	অসম্ভ্রম	ভ্রংশ্	৪৩৭	আত্মমেধ	মেধ্	৫৯৩
অমলমণি	মল্	৫১৬	অমুক্ত	মুচ্	৫৫৪	অমৃতি	মৃ	৫৭৩	অসম্মত	মন্	৪৮১	আপ	পী	৭২
অমলরত্ন	মল্	৫১৬	অমুক্তহস্ত	মুচ্	৫৫৪	অমৃতী	মৃ	৫৭৩	অসামাল	বর্ণ্	২৪৯	আপ	প্	১৬৫
অমলিন	মল্	৫১৬	অমুক্তি	মুচ্	৫৫৪	অমৃতীকরণ	মৃ	৫৭৩	অসুবিধা	বি	২৯০	আপক্ক	পং	২
অমহিমা	মহ্	৫২১	অমুষ্মিন	মুষ্	৫৬৬	অমৃতোদ্ভব	মৃ	৫৭৩	অস্তব্যস্ত	বি	৩০৫	আপজ	প্	১৬৫
অমাতৃক	মা	৫৩১	অমুষ্য	মুষ্	৫৬৬	অমৃষ্ট	মৃশ্	৫৯০	অস্ত্রমার্জ্জ	মৃজ্	৫৮৭	আপটল	পট্	১৭
অমাত্র	মা	৫৩১	অমূর্ত্ত	মৃ	৫৬৯	অমেধা	মেধ্	৫৯৩	অহীর	ভূ	৪০৯	আপণ	পণ্	২৬
অমাত্রা	মা	৫৩১	অমূর্ত্তগুণ	মৃ	৫৬৯	অমেধাঃ	মেধ্	৫৯৩				আপণিক	পণ্	২৬
অমানন	মা	৫৩১	অমূর্ত্তি	মৃ	৫৬৯	অমেধ্য	মেধ্	৫৯৩	আ			আপতন	পত্	৩১
অমাননা	মা	৫৩১	অমূর্ত্তিমান	মৃ	৫৬৯	অমেয়	মি	৫৩৮	আঅর	পৃ	১০০	আপৎকল্প	পত্	৩১
অমানব	মন্	৪৮১	অমূল	মৃ	৫৬৯	অমোঘ	মুহ্	৫৬৮	আইবড়	বহ্	২৭৮	আপৎকাল	পত্	৩১
অমানান	মা	৫৩১	অমূলক	মৃ	৫৬৯	অমোঘা	মুহ্	৫৬৮	আইবুড়ভাত	বহ্	২৭৮	আপথ	পথ্	৩৭
অমানী	মা	৫৩১	অমূল্য	মৃ	৫৬৯	অম্লান	ম্লেচ্ছ্	৫৯৭	আইবুড়ী	বহ্	২৭৮	আপদ	পদ্	৩৯
অমানুষ	মন্	৪৮১	অমৃত	মৃ	৫৭৪	অযাচক	যাচ্	৬০৪	আইহাঁড়া	ভণ্	৩৮২	আপৎকাল	পদ্	৩৮
অমানুষী	মন্	৪৮১	অমৃতকুণ্ড	মৃ	৫৭৩	অযাচী	যাচ্	৬০৪	আইহাঁড়ি	ভণ্	৩৮২	আপত্তি	পদ্	৩৮
অমান্য	মা	৫৩১	অমৃতকেলি	মৃ	৫৭৩	অযাচীব্রাহ্মণ	যাচ্	৬০৪	আউট	বৃৎ	৩৪৫	আপত্য	পদ্	৩৮
অমায়	মি	৫৩৮	অমৃতকেলিকা	মৃ	৫৭৩	অযোগবাহ	যুজ্	৬০৬	আউটা	বৃৎ	৩৪৫	আপদ	পদ্	৩৮
অমায়া	মি	৫৩৮	অমৃতগুটিকা	মৃ	৫৭৩	অযোধ	যুধ্	৬০৭	আউটন	বৃৎ	৩৪৫	আপদর্থে	পদ্	৩৮
অমায়িক	মি	৫৪৩	অমৃতগোটিকা	মৃ	৫৭৩	অযোধ্য	যুধ্	৬০৮	আউটান	বৃৎ	৩৪৫	আপদুদ্ধরণ	পদ্	৩৮
অমায়ী	মি	৫৩৮	অমৃতদীধিতি	মৃ	৫৭৩	অযোধ্যা	যুধ্	৬০৮	আউটোঁ	বৃৎ	৩৪৫	আপদ্গ্রস্ত	পদ্	৩৮
অমার্গ	মৃগ্	৫৮৩	অমৃতদ্যুতি	মৃ	৫৭৩	অযোনিজ	যুজ্	৬০৬	আউট্যা	বৃৎ	৩৪৫	আপদ্ধর্ম্ম	পদ্	৩৮
অমার্জ্জিত	মৃজ্	৫৮৭	অমৃতদ্রব	মৃ	৫৭৩	অযোনিসম্ভব	যুজ্	৬০৬	আউল-বাউল	বা	২৮৭	আপদ্ভঞ্জন	পদ্	৩৮
অমিঞা	মৃ	৫৭৩	অমৃতধুনী	মৃ	৫৭৩	অযোনিসম্ভূত	যুজ্	৬০৬	আওয়াজ	ভজ্	৩৬৮	আপন্ন	পদ্	৩৮
অমিত	মি	৫৪৩	অমৃতপ	মৃ	৫৭৩	অরণ	রণ্	৬১১	আওআরি	বর্ণ্	২৪৯	আপন্নসত্ত্বা	পদ্	৩৮
অমিতাত্মা	মি	৫৩৮	অমৃতপুর	মৃ	৫৭৩	অরিষ্ট	রিষ্	৬১৯	আওআস	বস্	২৭০	আপুনি	পণ্	২৬
অমিতাভ	মি	৫৪৩	অমৃতফল	মৃ	৫৭৩	অরিষ্টনেমা	রিষ্	৬১৯	আওজন	বৃজ্	৩৪৪	আপরুচি	পণ্	২৬
অমিতাশন	মি	৫৩৮	অমৃতফেণী	মৃ	৫৭৩	অরিষ্টনেমি	রিষ্	৬১৯	আওজান	বৃজ্	৩৪৪	আপাক	পচ্	১২
অমিতৌজাঃ	মি	৫৩৮	অমৃতভাষী	মৃ	৫৭৩	অরু	পৃ	১০০	আওটা	বৃৎ	৩৪৫	আপাখালা	পক্ষ্	১১
অমিত্র	মিদ্	৫৪৪	অমৃতমণি	মৃ	৫৭৩	অরুন্ধতী	রুধ্	৬২১	আওড়	বৃৎ	৩৪৫	আপাণ্ডু	পণ্	২৬
অমিত্রকর্শন	মিদ্	৫৪৪	অমৃতমণ্ডা	মৃ	৫৭৩	অর্থভেদ	ভিদ্	৩৯৮	আওড়া	বৃৎ	৩৪৫	আপাণ্ডুর	পণ্	২৬
অমিত্রকর্ষণ	মিদ্	৫৪৪	অমৃতমন্থন	মৃ	৫৭৩	অর্ব্বুদ	ব,ব	৩৬২	আওবাস	বস্	২৭০	আপাত	পত্	৩১
অমিত্রঘাতী	মিদ্	৫৪৪	অমৃতমূর্ত্তি	মৃ	৫৭৩	অশ্মময়	মি	৫৩৮	আওয়াজ	বজ্	২১৮	আপাতক	পত্	৩১
অমিত্রঘ্ন	মিদ্	৫৪৪	অমৃতযোগ	মৃ	৫৭৩	অশ্বমেধ	মেধ্	৫৯৩	আওয়ারি	বর্ণ্	২৪৯	আপাততঃ	পত্	৩১
অমিত্রজিৎ	মিদ্	৫৪৪	অমৃতরস	মৃ	৫৭৩	অষ্টবসু	বস্	২৭২	আওয়াস	বস্	২৭০	আপাতদুঃসহ	পত্	৩১
অমিত্রতা	মিদ্	৫৪৪	অমৃতলোক	মৃ	৫৭৩	অসংপাঠ্য	পঠ্	২৩	আওর	পৃ	১০০	আপাতমধুর	পত্	৩১
অমিত্রহা	মিদ্	৫৪৪	অমৃতস্রাব	মৃ	৫৭৩	অসংবর	বর্ণ্	২৪৯	আঁতিপাঁতি	পং	২	আপাতরমণীয়	পত্	৩১
অমিত্রাক্ষর	মিদ্	৫৪৪	অমৃতস্রাবিণী	মৃ	৫৭৩	অসংবীত	বে	৩৫৮	আঁদাড়-পাঁদাড়	পণ্	২৬	আপাতসুরস	পত্	৩১
অমিথ্যা	মথ্	৪৬৫	অমৃতস্রাবী	মৃ	৫৭৩	অসংবৃত	বর্ণ্	২৪৯	আকনাদি	ব্যধ্	৩৬০	আপাতী	পত্	৩১
অমিয়	মৃ	৫৭৩	অমৃতস্রুৎ	মৃ	৫৭৩	অসন্নিবৃত্তি	বৃৎ	৩৪৫	আগুপিছু	পি	৬২	আপাদ	পদ্	৩৮
অমিয়া	মৃ	৫৭৩	অমৃতহ্রদ	মৃ	৫৭৩	অসপত্ন	পা	৫৪	আগেকার	—	১২৭	আপাদন	পদ্	৩৮
অমিয়াদিঠ	মৃ	৫৭৩	অমৃতাঞ্জন	মৃ	৫৭৩	অসপিণ্ড	পিণ্ড্	৬৮	আগেপিছে	পি	৬২	আপাদপর্যন্ত	পদ্	৩৮
অমিয়ামিঠ	মৃ	৫৭৩	অমৃতায়মান	মৃ	৫৭৩	অসবর্ণ	বর্ণ্	২৪৯	আগ্রহ	—	২৯৭	আপাদমস্তক	পদ্	৩৮
অমিল	মিল্	৫৪৮	অমৃতাশ	মৃ	৫৭৩	অসভ্য	ভা	৩৯১	আঙদ	বন্ধ	২৪৪	আপান	পী	৭২
অমিশ্র	মিশ্র্	৫৪৯	অমৃতাশন	মৃ	৫৭৩	অসম্বর	বর্ণ্	২৪৯	আঞান	ভূ	৪০৯	আপান	পা	৫৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
আপানল	পৃ	১৬৫	আবর্ত্তন	বৃৎ	৩৪৬	আবৃষ্টি	বৃষ্	৩৫৫	আভিজনন	ভূ	৪০৯	আমুষ্মিক	মুষ্	৫৬৬
আপামর	পা	৬০	আবর্ত্তনী	বৃৎ	৩৪৫	আবেগ	বজ্	২১৮	আভিজাতিক	ভূ	৪০৯	আমুষ্যায়ণ	মুষ্	৫৬৬
আপামরজন	পা	৫৪	আবর্ত্তনীয়	বৃৎ	৩৪৫	আবেদক	বিদ্	৩০৮	আভিজাত্য	ভূ	৪০৯	আমূল	মূ	৫৬৯
আপামরসাধারণ	পা	৫৪	আবর্ত্তমান	বৃৎ	৩৪৬	আবেদন	বিদ্	৩১৪	আভিজিত	ভূ	৪০৯	আমূলক	মূ	৫৬৯
আপাবন	পূ	৮৯	আবর্ত্তিত	বৃৎ	৩৪৬	আবেদনীয়	বিদ্	৩০৮	আভিধানিক	ভূ	৪০৯	আমূলশিরঃপর্যন্ত	মূ	৫৬৯
আপার	পৃ	১০০	আবর্ত্তী	বৃৎ	৩৪৫	আবেদিত	বিদ্	৩০৮	আভিমুখ্য	ভূ	৪০৯	আমৃষ্ট	মৃশ্	৫৯০
আপিঙ্গল	পং	২	আবর্হ	বর্ণ	২৪৯	আবেদী	বিদ্	৩০৮	আভিরূপ্য	ভূ	৪০৯	আমোক্ষণ	মুচ্	৫৫৪
আপীড়	পীড়	৭২	আবর্হণ	বর্ণ	২৪৯	আবেদ্য	বিদ্	৩০৮	আভিষেচনিক	ভূ	৪০৯	আমোচন	মুচ্	৫৫৪
আপীত	পী	৭২	আবলতাবল	বদ্	২৩১	আবেধ্য	বিদ্	৩০৮	আভিহারিক	ভূ	৪০৯	আমোটন	মূ	৫৯৯
আপূপিক	পূ	৮৯	আবলি	বল্	২৬৩	আবেশ	বিশ্	৩২১	আভীক্ষ্ণ্য	ভূ	৪০৯	আমোদ	মুদ্	৫৬২
আপূর	পৃ	১০০	আবলী	বল্	২৬৩	আবেশন	বিশ্	৩২১	আভীর	ভী	৪০১	আমোদন	মুদ্	৫৬২
আপূর্ত্ত	পৃ	১০০	আবল্লিত	বল্	২৬৩	আবেশময়	বিশ্	৩২১	আভীরা	ভী	৪০১	আমোদিত	মুদ্	৫৬২
আপূর্য্যমাণ	পৃ	১০০	আবশ্যক	বশ্	২৬৮	আবেশরস	বিশ্	৩২১	আভীরিণী	ভী	৪০১	আমোদী	মুদ্	৫৬২
আপৃচ্ছা	প্র	১৩৯	আবসথ	বস্	২৭০	আবেশিক	বিশ্	৩২১	আভীল	ভী	৪০১	আম্নাত	ম্না	৫৯৪
আপোড়া	পুড়্	৭৯	আবহ	বহ্	২৭৯	আবেশিত	বিশ্	৩২১	আভুগ্ন	ভূ	৪০৫	আম্রবন	বন্	২৩৬
আপোষ	পুষ্	৮২	আবহন	বহ্	২৭৮	আবেশনী	বিশ্	৩২১	আভূতসংপ্লব	ভূ	৪০৯	আয়স্ত	বস্	২৭০
আপ্রচ্ছন	প্র	১৩৯	আবহমান	বহ্	২৭৮	আবেষ্ট	বিশ্	৩২১	আভূমি	ভূ	৪০৯	আর	পৃ	১০০
আপ্রপদ	পদ্	৩৮	আবহমানকাল	বহ্	২৭৮	আবেষ্টক	বিশ্	৩২১	আভৃত	ভৃ	৪২৯	আরণ্যক	রণ	৬১১
আপ্লব	প্লু	১৬৪	আবহাওয়া	পী	৭২	আবেষ্টন	বিশ্	৩২১	আভোগ	ভু	৪০৫	আরতি	রম্	৬১৩
আপ্লবন	প্লু	১৬৪	আবাগি	ভজ্	৩৬৮	আবোলতাবোল	বদ্	২৩১	আভ্যন্তর	ভূ	৪০৯	আরাম	রম্	৬১৩
আপ্লবব্রতী	প্লু	১৬৪	আবাগী	ভজ্	৩৬৮	আব্রহ্মভুবন	বংহ্	১৯২	আভ্যন্তরীণ	ভূ	৪০৯	আরাধনা	রাধ্	৬১৮
আপ্লাব	প্লু	১৬৪	আবাগে	ভজ্	৩৬৮	আব্রহ্মস্তম্ভ	বংহ্	১৯২	আভ্যাসিক	ভূ	৪০৯	আলা	বল্	২৬৩
আপ্লাবিত	প্লু	১৬৪	আবাজ	ভজ্	৩৬৮	আভঙ্গ	ভঞ্জ্	৩৭৬	আভ্যুদয়িক	ভূ	৪১৬	আলুবাড়ি	বট্	২২২
আপ্লুত	প্লু	১৬৫	আবাটা	বট্	২২২	আভর	ভা	৩৯০	আভ্যুদিক	ভূ	৪০৯	আশীর্বাদ	বদ্	২৩৩
আপ্লুতবতী	প্লু	১৬৪	আবাদ	পা	৫৪	আভরণ	ভৃ	৪২৯	আমট	মট্	৪৫৬	আসম্বাধ	বধ্	২৩৪
আপ্লুতি	প্লু	১৬৪	আবাধ	বধ্	২৩৪	আভরণ	ভূ	৪০৯	আমনা	মন্	৪৮১	আস্পদ	পদ্	৩৮
আপ্লুষ্ট	প্লু	১৬৪	আবাপ	বপ্	২৪৬	আভরণপেড়ি	ভূ	৪০৯	আমন্ত্র	মন্	৪৮১	আস্যপবন	পূ	৮৯
আফত	পদ্	৩৮	আবার	বর্ণ	২৬০	আভা	ভা	৩৯০	আমন্ত্রণ	মন্	৪৯৯	আহীর	ভী	৪০১
আব	পী	৭২	আবাল	বল্	২৬৩	আভাগী	ভজ্	৩৬৮	আমন্ত্রণা	মন্	৪৮১			
আব	ব,ব	১৬৫	আবালবৃদ্ধবনিতা	বল্	২৬৩	আভাগিনী	ভজ্	৩৬৮	আমন্ত্রয়িতা	মন্	৪৮১	**ই**		
আবওয়াব	পী	৭২	আবাল্য	বল্	২৬৩	আভাঙা	ভঞ্জ্	৩৭৬	আমন্ত্রিত	মন্	৪৮১	ইক্ষুবন	বন্	২৩৬
আবখোরা	পী	৭২	আবাস	বস্	২৭০	আভাঙ্গা	ভঞ্জ্	৩৭৬	আমন্ত্র্য	মন্	৪৮১	ইতিবৃত্ত	বৃৎ	৩৪৯
আবগারী	পী	৭২	আবাহন	বহ্	২৭৮	আভাণক	ভণ্	৩৮২	আমন্দ্র	মন্	৪৮১	ইত্যাদি	—	৪৩৬
আবন্ধ	বন্ধ্	২৪৪	আবিদ্ধ	ব্যধ্	৩৬০	আভাতি	ভা	৩৯০	আময়	মি	৫৩৮	ইন্বল	—	২৮৮
আবন্ধ	বন্ধ্	২৪৪	আবিধ	বি	২৯০	আভাষ	ভাষ্	৩৯৩	আময়াবী	মি	৫৩৮			
আবপন	বপ্	২৪৬	আবির্ভাব	ভূ	৪০৯	আভাষণ	ভাষ্	৩৯৩	আমরণ	মৃ	৫৭৩	**উ**		
আবর	বর্ণ	২৪৯	আবির্ভূত	ভূ	৪২২	আভাষিত	ভাষ্	৩৯৩	আমরণান্ত	মৃ	৫৭৩	উঁই	পদ্	৩৮
আবরক	বর্ণ	২৪৯	আবিল	বিল্	৩২০	আভাষ্য	ভাষ্	৩৯২	আমরণান্তিক	মৃ	৫৭৩	উই	পদ্	৩৮
আবরিত	বর্ণ	২৪৯	আবীত	বে	৩৫৮	আভাস	ভাস্	৩৯৬	আমর্দ্দ	মৃৎ	৫৮৯	উইচারা	পদ্	৩৮
আবরিতা	বর্ণ	২৪৯	আবৃত	বর্ণ	২৪৯	আভাসন	ভাস্	৩৯৬	আমর্শ	মৃশ্	৫৯০	উইটিপি	পদ্	৩৮
আবরু	বর্ণ	২৪৯	আবৃতি	বর্ণ	২৪৯	আভাসুর	ভাস্	৩৯৬	আমর্ষ	মৃশ্	৫৯০	উক্ত	বচ্	২১৩
আবর্জ্জন	বৃজ্	৩৪৪	আবৃত্ত	বৃৎ	৩৪৫	আভাস্বর	ভাস্	৩৯৬	আমিক্ষা	মিহ্	৫৫১	উক্তপুংস্ক	বচ্	২১৩
আবর্জ্জনা	বৃজ্	৩৪৪	আবৃত্তি	বৃৎ	৩৪৯	আভিচারণিক	ভূ	৪০৯	আমীলন	মিল্	৫৪৮	উক্তপূর্ব্ব	বচ্	২১৩
আবর্ত্ত	বৃৎ	৩৪৬	আবৃত্তিদীপক	বৃৎ	৩৪৫	আভিচারিক	ভূ	৪০৯	আমুক্ত	মুচ্	৫৫৪	উক্তপ্রত্যুক্ত	বচ্	২১৩
আবর্ত্তক	বৃৎ	৩৪৫	আবৃৎ	বৃৎ	৩৪৫	আভিজন	ভূ	৪০৯	আমুদে	মুদ্	৫৬২	উক্তি	বচ্	২১৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পঙ্খ	পক্ষ্	১১	পঞ্চকোল	পং	৬	পঞ্চবর্ণ	পং	২	পঞ্চাইত	পং	২	পঞ্জুড়ি(ড়ী)	পং	২
পঙ্খা	পক্ষ্	১১	পঞ্চকোষ	পং	৬	পঞ্চবাণ	পং	৮	পঞ্চাগ্নি	পং	২	পট	পট্	১৭
পঙ্খি(খী)	পক্ষ্	১১	পঞ্চক্রোশী	পং	২	পঞ্চবাহু	পং	২	পঞ্চাঙ্গ	পং	২	পটক	পট্	১৯
পঙ্খুড়ী	পক্ষ্	১১	পঞ্চগব্য	পং	৬	পঞ্চবিংশতি	পং	২	পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি	পং	২	পটকর্ম্ম	পট্	১৯
পঙ্খ্যা	পক্ষ্	১১	পঞ্চগুণ	পং	৬	পঞ্চবিধপ্রকৃতি	পং	২	পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন	পং	২	পটকা	পট্	১৯
পঙ্গত	পং	৩	পঞ্চগুণী	পং	৬	পঞ্চবৃক্ষ	পং	৮	পঞ্চাঙ্গুল	পং	২	পটকান	পট্	১৯
পঙ্গপাল	পত্	৩১	পঞ্চগৌড়	পং	৬	পঞ্চবৃত্ত	পং	২	পঞ্চাতপা	পং	২	পটকার	পট্	১৯
পঙ্গু	পণ্	২৬	পঞ্চগ্রাস	পং	৬	পঞ্চভদ্র	পং	২	পঞ্চানন	পং	২	পটগৃহ	পট্	১৭
পঙ্গুজন	পণ্	২৬	পঞ্চচত্বারিংশৎ	পং	২	পঞ্চভুজ	পং	২	পঞ্চানন্দ	পং	২	পটচ্চর	পট্	১৭
পচ	পচ্	১২	পঞ্চচূড়া	পং	৭	পঞ্চভূত	পং	৮	পঞ্চান্ন	পং	২	পটপট	পট্	১৭
পচক	পচ্	১২	পঞ্চজন	পং	৬	পঞ্চভৌতিক	পং	৮	পঞ্চাপ্সরঃ	পং	২	পটপটি(টী)	পট্	১৯
পচ(ছ)তা	পশ্	৫৪	পঞ্চঝুঁটি	পং	৭	পঞ্চম	পং	২	পঞ্চাবট	পং	২	পটবাপ	পট্	১৯
পচতাব	পশ্	৫৪	পঞ্চতত্ত্ব	পং	২	পঞ্চমী	পং	২	পঞ্চামর্ত্ত	পং	২	পটবাস	পট্	১৭
পচন	পচ্	১৬	পঞ্চতন্ত্র	পং	২	পঞ্চমকার	পং	২	পঞ্চামৃত	পং	২	পটভূমি	পট্	১৯
পচনী	পচ্	১২	পঞ্চতন্মাত্র	পং	৭	পঞ্চমহাপাতক	পং	২	পঞ্চাম্নায়	পং	২	পটমঞ্জরী	পট্	১৭
পচপচ	পচ্	১৬	পঞ্চতপ	পং	২	পঞ্চমহাযজ্ঞ	পং	৮	পঞ্চাম্র	পং	২	পটমণ্ডপ	পট্	১৭
পচলা	পচ্	১৬	পঞ্চতপাঃ	পং	২	পঞ্চমুখ	পং	২	পঞ্চাম্ল	পং	২	পটল	পট্	১৯
পচা	পচ্	১৬	পঞ্চতা	পং	২	পঞ্চমুদ্রা	পং	২	পঞ্চায়ত	পং	২	পটলী	পট্	১৭
পচাই	পচ্	১৬	পঞ্চতিক্ত	পং	২	পঞ্চমুণ্ডী	পং	২	পঞ্চায়তী	পং	২	পটহ	পট্	১৭
পচাখসা	পচ্	১৬	পঞ্চত্রিংশৎ	পং	২	পঞ্চযজ্ঞ	পং	৮	পঞ্চায়েত	পং	২	পটা	পট্	১৭
পচাগলা	পচ্	১৬	পঞ্চত্ব	পং	৫	পঞ্চযাম	পং	২	পঞ্চাল	পং	৯	পটাংপটাং	পট্	১৭
পচাগন্ধ	পচ্	১৬	পঞ্চদশ	পং	২	পঞ্চরং	পং	২	পঞ্চালি	পং	২	পটাৎ	পট্	১৭
পচাগরম	পচ্	১৬	পঞ্চদশী	পং	২	পঞ্চরত্ন	পং	২	পঞ্চালিকা	পং	৯	পটান	পট্	১৭
পচা-ঘা	পচ্	১২	পঞ্চদীপ	পং	২	পঞ্চরাত্র	পং	২	পঞ্চালী	পং	৯	পটাপট	পট্	১৭
পচাল	পচ্	১৬	পঞ্চদেবতা	পং	২	পঞ্চরাশিক	পং	২	পঞ্চাশ	পং	২	পটালুকা	পট্	১৭
পচেলিম	পচ্	১২	পঞ্চনখ	পং	২	পঞ্চলক্ষণ	পং	৯	পঞ্চাশৎ	পং	২	পটাশ	পট্	১৭
পচ্চাত	পশ্	৫০	পঞ্চনদ	পং	২	পঞ্চলক্ষণা	পং	৯	পঞ্চাশিকা	পং	২	পটাহ	পট্	১৭
পচ্ছাত	পশ্	৫০	পঞ্চনবতি	পং	২	পঞ্চলবণ	পং	২	পঞ্চাশী	পং	২	পটি	পট্	১৭
পচ্চিম	পশ্	৫০	পঞ্চনিম্ব	পং	২	পঞ্চলোহ	পং	২	পঞ্চাশীতি	পং	২	পটী	পট্	১৯
পছতাবা	পশ্	৫৪	পঞ্চপঞ্চাশ	পং	২	পঞ্চশত	পং	২	পঞ্চাস্য	পং	২	পটীয়সী (১৭)	পট্	১৯
পছতান	পশ্	৫৪	পঞ্চপঞ্চাশৎ	পং	২	পঞ্চশব্দ	পং	২	পঞ্চীকরণ	পং	২	পটীয়ান	পট্	১৯
পছতানি	পশ্	৫৪	পঞ্চপদী	পং	২	পঞ্চশব্দী	পং	২	পঞ্চেষু	পং	২	পটীর	পট্	১৭
পছন্দ	পশ্	৫০	পঞ্চপর্ব্ব	পং	২	পঞ্চশর	পং	২	পঞ্চোপচার	পং	২	পটু	পট্	২০
পছন্দসই	পশ্	৫০	পঞ্চপল্লব	পং	২	পঞ্চশস্য	পং	২	পঞ্জতনামা	পং	২	পটুকা	পট্	১৭
পজ্ঝাটিকা	পদ্	৩৮	পঞ্চপাত্র	পং	২	পঞ্চশাখ	পং	২	পঞ্জন	পং	২	পটুয়া	পট্	২০
পঞ্জর	প্র	১৩৯	পঞ্চপিতা	পং	২	পঞ্চশিখ	পং	৭	পঞ্জনী	পং	২	পটোল	পট্	১৭
পঞ্জান	প্র	১৩৯	পঞ্চপিত্ত	পং	২	পঞ্চষ	পং	২	পঞ্জর	পং	৯	পটোলভাজা	ভৃশ্	৪৩৭
পঞ্চ্	পং	২	পঞ্চপুষ্প	পং	২	পঞ্চষষ্টি	পং	২	পঞ্জরাখেট	পং	৯	পট্ট	পট্	২০
পঞ্চ	পং	৫	পঞ্চপ্রদীপ	পং	২	পঞ্চসট	পং	২	পঞ্জা	পং	১০	পট্টক	পট্	২০
পঞ্চক	পং	৫	পঞ্চপ্রাণ	পং	৭	পঞ্চসপ্ততি	পং	২	প(পা)ঞ্জাব	পং	১০	পট্টজ	পট্	২০
পঞ্চকন্যা	পং	৬	পঞ্চপ্রাসাদ	পং	২	পঞ্চসায়ক	পং	২	প(পা)ঞ্জাবী	পং	১০	পট্টজাত	পট্	১৭
পঞ্চকপাল	পং	২	পঞ্চবংশী	পং	২	পঞ্চসেরি	পং	২	পঞ্জি	পং	২	পট্টডোরী	পট্	১৭
পঞ্চকর্ম্ম	পং	৬	পঞ্চবক্ত্র	পং	২	পঞ্চসূনা	পং	২	পঞ্জিকা	পং	২	পট্টন	পট্	২০
পঞ্চকষায়	পং	৬	পঞ্চবটী	পং	৭	পঞ্চস্বর	পং	২	পঞ্জী	পং	২	পট্টনায়ক	পট্	২০
পঞ্চকোণ	পং	২	পঞ্চবর্গ	পং	৩৪৪	পঞ্চস্বরা	পং	২	পঞ্জীকৃত	পং	২	পট্টনী	পট্	১৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পদা	পদ্	৩৮	পদ্মপাণি	পদ্	৪১	পন্থ-বিপন্থ	পণ্	২৬	পমেটম	প্	১৬৫	পয়োমুক্	মুচ্	৫৫৪
পদাঘাত	পদ্	৩৮	পদ্মপুরাণ	পদ্	৪১	পন্থা	পণ্	২৮	পম্প	প্	১৬৫	পয়োরাশি	পী	৭২
পদাঙ্ক	পদ্	৩৮	পদ্মপ্রিয়া	পদ্	৪১	পন্থা	পথ্	৩৭	পম্পা	প্	১৬৫	পয়োষ্ণী	পী	৭২
পদাত	পদ্	৩৮	পদ্মবন্ধ	পদ্	৪১	পন্থিক	পণ্	২৬	পয়ঃ	পী	৭২	পর	প্	১০৩
পদাতি	পদ্	৩৮	পদ্মবাসা	পদ্	৪১	পন্থিক	পথ্	৩৭	পয়গম্বর	প্	১৬৫	পরওয়ানা	প্	১০০
পদাতিক	পদ্	৩৮	পদ্মবন্ধু	পদ্	৪১	পন্থী	পণ্	২৬	পয়গাম	প্	১৬৫	পরঃশত	প্	১০০
পদানুশাসন	পদ্	৩৮	পদ্মভব	পদ্	৪১	পন্থী	পথ্	৩৭	পয়ান	প্	৮৯	পরঃসহস্র	প্	১০০
পদান্তর	পদ্	৩৮	পদ্মভূ	পদ্	৪১	পন্নগ	পণ্	২৬	পয়্	পী	৭২	পরক(খ)	প্	১০০
পদাবলী	পদ্	৩৮	পদ্মমালিনী	পদ্	৪১	পন্নগকেশর	পণ্	২৬	পয়	পী	৭২	পরকলত্র	প্	১০০
পদাব্জ	পদ্	৩৮	পদ্মমুখ	পদ্	৪১	পন্নগারি	পণ্	২৬	পয়ঃপান	পী	৭২	পরকালা	প্	১৬৫
পদাভিষিক্ত	পদ্	৩৮	পদ্মমুখী	পদ্	৪১	পন্নগাশন	পণ্	২৬	পয়ঃপ্রণালী	পী	৭২	পরকিতা	প্	১০০
পদাম্বুজ	পদ্	৩৮	পদ্মযোনি	পদ্	৪১	পন্নগী	পণ্	২৬	পয়কার	পী	৭২	পরকীয়	প্	১০০
পদাম্ভোজ	পদ্	৩৮	পদ্মরাগ	পদ্	৪১	পনপন	পণ্	২৬	পয়খানা	পী	৭২	পরকীয়া	প্	১০০
পদারবিন্দ	পদ্	৩৮	পদ্মরাজ	পদ্	৪১	পপাত	পত্	৩১	পয়গম্বর	পী	৭২	পরকুট	প্	১০০
পদার্থ	পদ্	৪০	পদ্মরেখা	পদ্	৪১	পপিহ	পা	৫৪	পয়জার	পী	৭২	পরকোলা	প্	১৬৫
পদার্থন	পদ্	৩৮	পদ্মলাঞ্ছন	পদ্	৪১	পপিহা	পা	৫৪	পয়দল	পী	৭২	পরক্ষেত্র	প্	১০০
পদার্থবিদ্যা	পদ্	৪০	পদ্মলাঞ্ছনা	পদ্	৪১	পবন	প্	৯০	পয়দা	পী	৭২	পরখ	প্	১০০
পদার্পণ	পদ্	৩৮	পদ্মলোচন	পদ্	৪১	পবনগমন	প্	৯০	পয়দার	পী	৭২	পরগণা	প্র	১৩৯
পদে-পদে	পদ্	৩৮	পদ্মসম্ভব	পদ্	৪১	পবনতনয়	প্	৯০	পয়নালা	পী	৭২	পরগাছা	প্	১০৪
পদোন্নতি	পদ্	৩৮	পদ্মহস্ত	পদ্	৪১	পবননন্দন	প্	৯০	পয়পয়	পদ্	৩৮	পরগামী	প্	১০০
পদ্ধতি(তী)	পদ্	৪১	পদ্মা	পদ্	৪৩	পবনপথ	প্	৯০	পয়মন্ত	পী	৭২	পরঘর	প্	১০০
পদ্ম	পদ্	৪১	পদ্মাকর	পদ্	৪৩	পবনপুত্র	প্	৯০	পয়মাল	পী	৭২	পরচক্র	প্	১০০
পদ্ম-আঁখি	পদ্	৩৮	পদ্মাক্ষ	পদ্	৪৩	পবনবাহন	প্	৯০	পয়লা	প্র	১৩৯	পরচর্চক	প্	১০০
পদ্মকন্দ	পদ্	৩৮	পদ্মাক্ষী	পদ্	৪৩	পবনবিজয়	প্	৯০	পয়স্	পী	৭২	পরচা	প্	১১২
পদ্মকর	পদ্	৩৮	পদ্মাবতী	পদ্	৪৩	পবনব্যাধি	প্	৯০	পয়সা	পী	৭২	পরচুল	প্	১০০
পদ্মকর্ণিকা	পদ্	৩৮	পদ্মালয়	পদ্	৪৩	পবনভক্ষ	প্	৯০	পয়সি	পী	৭২	পরচুলা	প্	১০০
পদ্মকাঁটা	পদ্	৪১	পদ্মাসন	পদ্	৪৩	পবনসূত	প্	৯০	পয়স্ত	পী	৭২	পরচিতেন	প্	১০০
পদ্মকাষ্ঠ	পদ্	৪১	পদ্মিনী	পদ্	৪৩	পবনাত্মজ	প্	৯০	পয়স্তি	পী	৭২	পরচ্ছন্দ	প্	১০০
পদ্মকেলি	পদ্	৪১	পদ্মিনীকণ্টক	পদ্	৪৩	পবনাল	প্	৯০	পয়স্য	পী	৭২	পরছিদ্র	প্	১০০
পদ্মকোশ	পদ্	৪১	পদ্মিনীকান্ত	পদ্	৪৩	পবনালম্বী	প্	৯০	পয়স্যা	পী	৭২	পরজ	প্	১০০
পদ্মগন্ধ	পদ্	৪১	পদ্মিনীখণ্ড	পদ্	৪৩	পবনাশ	প্	৯০	পয়স্বী	পী	৭২	পরজন	প্	১০০
পদ্মগন্ধি	পদ্	৪১	পদ্মী	পদ্	৪৩	পবনাশন	প্	৯০	পয়স্বিনী	পী	৭২	পরজয়	প্	১০০
পদ্মগর্ভ	পদ্	৪১	পদ্মোদ্ভব	পদ্	৩৮	পবনাশনাশ	প্	৯০	পয়া	পী	৭২	পরজা	প্র	১৩৯
পদ্মগোখুরা	পদ্	৪১	পদ্য	পদ্	৪৩	পবনী	প্	৯০	পয়াণ(ন)	প্র	১৩৯	পরজাত	প্	১০০
পদ্মচিনি	পদ্	৪১	পদ্যা	পদ্	৩৮	পবমান	প্	৯০	পয়ার	পদ্	৩৮	পরজায়ী	প্	১০০
পদ্মজ	পদ্	৪১	পনই	পণ্	২৬	পবিত	প্	৮৯	পয়োঘন	পী	৭২	পরজিত	প্	১০০
পদ্মজাত	পদ্	৪১	পনবাহা	পণ্	২৬	পবিতা	প্	৮৯	পয়োদ	পী	৭২	পর(রো)টা	প্	১৬৫
পদ্মতন্তু	পদ্	৪১	পনস	পণ্	২৬	পবিত্র	প্	৯৪	পয়োদ্ভব	পী	৭২	পরণ	প্	১০০
পদ্মদল	পদ্	৪১	পনসা	পণ্	২৬	পবিত্রক	প্	৯৪	পয়োধর	পী	৭২	পরণতি	প্র	১৩৯
পদ্মনাভ	পদ্	৩৮	পনা	পণ্	২৬	পবিত্রধান্য	প্	৮৯	পয়োধারা	পী	৭২	পরণাম	প্র	১৩৯
পদ্মনাল	পদ্	৪১	পনি	পণ্	২৬	পবিত্রপ্রারোপণ	প্	৮৯	পয়োধি	পী	৭২	পরত	প্	১০০
পদ্মনিধি	পদ্	৪১	পনির	পণ্	২৬	পবিত্ররোহন	প্	৮৯	পয়োনিধি	পী	৭২	পরতঃ	প্	১০০
পদ্মপত্র	পদ্	৪১	পন্ত	পণ্	২৬	পবিত্রা	প্	৯৪	পয়োবহ	পী	৭২	পরতন্ত্র	প্	১০০
পদ্মপর্ণ	পদ্	৪১	পন্থ	পণ্	২৬	পবিত্রিত	প্	৮৯	পয়োব্রত	পী	৭২	পরতাল	প্	১০০
পদ্মপলাশ	পদ্	৪১	পন্থ	পথ্	৩৭	পবীতক	প্	৮৯	পয়োমুক(চ)	পী	৭২	পরতীত	প্র	১৩৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
পরতেক	প্র ১৩৯	পরভাগ	পৃ ১০০	পরস্ব	পৃ ১০০	পরার্থ	পৃ ১০০	পরিগ্রহণ	পৃ ১১২
পরতেখ	প্র ১৩৯	পরভাগোপজীবী	পৃ ১০০	পরা	পৃ ১০৩	পরার্দ্ধ	পৃ ১০০	পরিগ্রহ	পৃ ১১২
পরতে-পরতে	পৃ ১০০	পরভৃৎ	পৃ ১০০	পরা	— ১০৬	পরাশর	পৃ ১০৮	পরিগ্রহীতা	পৃ ১১২
পরত্র	পৃ ১০০	পরভৃত	পৃ ১০০	পরাক্(চ্)	পৃ ১০০	পরাসন	পৃ ১০০	পরিঘ	পৃ ১০০
পরত্ব	পৃ ১০০	পরম্	পৃ ১০০	পরাক	পৃ ১০০	পরাসু	পৃ ১০০	পরিঘাতন	পৃ ১০০
পরথাপ(ব)	প্র ১৩৯	পরম	পৃ ১০৪	পরাকরণ	পৃ ১০০	পরাস্ত	পৃ ১০০	পরিঘট্টন	পৃ ১০০
পরদল	পৃ ১০০	পরমক	পৃ ১০০	পরাকাষ্ঠা	পৃ ১০০	পরাহ	পৃ ১০০	পরিচয়	পৃ ১১২
পরদার	পৃ ১০০	পরমকাষ্ঠা	পৃ ১০০	পরাক্রম	পৃ ১০০	পরাহত	পৃ ১০০	পরিচয়-পত্র	পৃ ১১২
পরদারিক	পৃ ১০০	পরমগতি	পৃ ১০০	পরাক্রান্ত	পৃ ১০০	পরাহ্ন	পৃ ১০০	পরিচর	পৃ ১১৩
পরদেশ	পৃ ১০০	পরমপদ	পৃ ১০০	পরাগ	পৃ ১০০	পরি	পৃ ১১১	পরিচরণ	পৃ ১১৩
পরদেশিয়া	পৃ ১০০	পরমপুরুষ	পৃ ১৩২	পরাগকেশর	পৃ ১০০	পরিকম্প	পৃ ১০০	পরিচর্য্যা	পৃ ১১৩
পরদেশী	পৃ ১০০	পরমপুরুষার্থ	পৃ ১৩৪	পরাগত	পৃ ১০০	পরিকর	পৃ ১০০	পরিচার	পৃ ১১৩
পরদ্রোহ	পৃ ১০০	পরমব্রহ্ম	বৃন্হ্ ১৯৯	পরাঙ্মুখ	পৃ ১০০	পরিকর্ত্তা	পৃ ১০০.	পরিচারক	পৃ ১১৩
পরদ্বেষী	পৃ ১০০	পরমম্	পৃ ১০০	পরাচীন	পৃ ১০০	পরিকর্ম্মা	পৃ ১০০	পরিচারিক	পৃ ১১৩
পরধর্ম্ম	পৃ ১০০	পরমর্ষি	পৃ ১০৪	পরাজয়	পৃ ১০০	পরিকর্ম্মী	পৃ ১০০	পরিচারিকা	পৃ ১১৩
পরনারী	পৃ ১০০	পরমহংস	পৃ ১০০	পরাজিত	পৃ ১০০	পরিকঙ্কন	পৃ ১০০	পরিচারিণী	পৃ ১১৩
পরনারীচোর	পৃ ১০০	পরমা	পৃ ১০৪	পরাজিত	ভূ ৪১১	পরিকল্পন	পৃ ১০০	পরিচালক	পৃ ১১৩
পরনিপাত	পৃ ১০০	পরমাই	পৃ ১০০	পরাণ	প্র ১৩৯	পরিকল্পনা	পৃ ১১১	পরিচালনা	পৃ ১১৩
পরন্তপ	পৃ ১০০	পরমাউ	পৃ ১০০	পরাণপুতলি(লী)	প্র ১৩৯	পরিকীর্ণ	পৃ ১১২	পরিচালিত	পৃ ১১৩
পরন্তু	পৃ ১০৪	পরমাঞ্জি	পৃ ১০০	পরাণি(ণী)	প্র ১৩৯	পরিকীর্ত্তন	পৃ ১০০	পরিচিত	পৃ ১১২
পরপক্ষ	পৃ ১০০	পরমাণ	প্র ১৩৯	পরাত্তমা	পৃ ১০০	পরিকীর্ত্তিত	পৃ ১০০	পরিচিন্তক	পৃ ১০০
পরপদ	পৃ ১০০	পরমাণু	পৃ ১০০	পরাৎপর	পৃ ১০৩	পরিকূজন	পৃ ১১২	পরিচ্ছদ	পৃ ১০০
পরপাকনিবৃত্ত	পৃ ১০০	পরমাত্মা	পৃ ১০০	পরাৎপরা	পৃ ১০৩	পরিকূজিত	পৃ ১০০	পরিচ্ছন্ন	পৃ ১০০
পরপিণ্ড	পৃ ১০০	পরমাদ	প্র ১৩৯	পরাত্মা	পৃ ১০০	পরিকৃত	পৃ ১০০	পরিচ্ছিত্তি	পৃ ১০০
পরপিণ্ডাদ	পৃ ১০০	পরমানন্দ	পৃ ১০০	পরাধিকার	পৃ ১০০	পরিক্রম	পৃ ১১২	পরিচ্ছিন্ন	পৃ ১০০
পরপুরঞ্জয়	পৃ ১০০	পরমান্ন	পৃ ১০০	পরাধিনী	পৃ ১০০	পরিক্রমা	পৃ ১১২	পরিচ্ছেদ	পৃ ১০০
পরপুরুষ	পৃ ১০০	পরমাপ্রকৃতি	পৃ ১০৪	পরাধীন	পৃ ১০০	পরিক্রয়	পৃ ১০০	পরিচ্ছেদ্য	পৃ ১০০
পরপুষ্ট	পৃ ১০০	পরমায়ুঃ	পৃ ১০০	পরান্ন	পৃ ১০০	পরিক্রয়ণ	পৃ ১০০	পরিচ্যুতি	পৃ ১০০
পরপূর্ব্বা	পৃ ১০০	পরমার্থ	পৃ ১৩৪	পরাপর	পৃ ১০০	পরিক্রান্ত	পৃ ১০০	পরিজন	পৃ ১০০
পরবত্তা	পৃ ১০০	পরমেশ	পৃ ১০০	পরাবর	পৃ ১০০	পরিক্রান্তি	পৃ ১০০	পরিজল্পিত	পৃ ১০০
পরপ্রপৌত্র	পৃ ১০০	পরমেশ্বর	পৃ ১০০	পরাবর্ত্ত	পৃ ১০০	পরিক্রিয়া	পৃ ১০০	পরিজ্ঞাত	পৃ ১০০
পরবর্ত্তী	পৃ ৩৪৮	পরমেষ্ঠ	পৃ ১০০	পরাবসু	পৃ ১০৭	পরিক্রীত	পৃ ১০০	পরিডীন	পৃ ১০০
পরবশ	পৃ ১০০	পরম্পরা	পৃ ১০০	পরাবহ্	পৃ ১০০	পরিক্ষয়	পৃ ১০০	পরিডীনক	পৃ ১০০
পরবশ্য	পৃ ১০০	পরম্পরাগত	পৃ ১০০	পরাবৃত্ত	পৃ ১০০	পরি(রী)ক্ষিৎ	পৃ ১০০	পরিণত	পৃ ১১৩
পরবাণা	পৃ ১০০	পরম্পরাপ্রাপ্ত	পৃ ১০০	পরাবৃত্তি	পৃ ১০০	পরিক্ষিপ্ত	পৃ ১০০	পরিণতি	পৃ ১১৩
পরবাদ	পৃ ১০০	পরম্পরীণ	পৃ ১০০	পরাভব	ভূ ৪১৩	পরিক্ষেপ	পৃ ১০০	পরিণদ্ধ	পৃ ১০০
পরবাদী	পৃ ১০০	পরলোক	পৃ ১০৫	পরাভূত	পৃ ১০০	পরিক্ষেপক	পৃ ১০০	পরিণমন	পৃ ১১৩
পরবান	পৃ ১০০	পরশু	পৃ ১০০	পরামর্শ	মৃশ্ ৫৯১	পরিখ	পৃ ১০০	পরিণয়	পৃ ১১৪
পরবীণ(ন)	প্র ১৩৯	পরশুরাম	পৃ ১০৫	পরামর্শন	পৃ ১০০	পরিখা	পৃ ১০০	পরিণয়ার্হ	পৃ ১০০
পরবীরঘ্ন	পৃ ১০০	পরশ্বঃ	পৃ ১০০	পরামাণি(নি)ক	প্র ১৩৯	পরিখাত	পৃ ১০০	পরিণাম	পৃ ১১৩
পরবীরহা	পৃ ১০০	পরশ্বধ	পৃ ১০০	পরামৃষ্ট	পৃ ১০০	পরিখেদ	পৃ ১০০	পরিণামদর্শী	পৃ ১১৩
পরবেশ	প্র ১৩৯	পরসঙ্গ	প্র ১৩৯	পরায়	প্র ১৩৯	পরিগণন	পৃ ১০০	পরিণামপথ্য	পৃ ১১৩
পরবোধ	প্র ১৩৯	পরস্তাৎ	পৃ ১০০	পরায়ণ	পৃ ১০০	পরিগণনা	পৃ ১০০	পরিণামবাদ	পৃ ১১৩
পরব্যোম	পৃ ১০০	পরস্পর	পৃ ১০০	পরায়ত্ত	পৃ ১০০	পরিগত	পৃ ১০০	পরিণামশূল	পৃ ১০০
পরব্রহ্ম	পৃ ১০০	পরস্মৈপদ	পৃ ১০০	পরায়ন	পৃ ১০০	পরিগৃহীত	পৃ ১১২	পরিণায়ক	পৃ ১১৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
পরিগ্রহ	পৃ ১০০	পরিনির্ব্বাণ	পৃ ১১৬	পরিবর্দ্ধন	পৃ ১০০	পরিব্যয়	পৃ ১০০	পরিমেয়	পৃ ১০০
পরিগ্রহবান	পৃ ১০০	পরিনিষ্ঠা	পৃ ১০০	পরিবর্দ্ধিত	পৃ ১০০	পরিব্রজ	ব্রজ্ ৩৬০	পরিমোক্ষ	পৃ ১০০
পরিগ্রাহী	পৃ ১০০	পরিপক্ক	পৃ ১০০	পরিবর্হ	পৃ ১০০	পরিব্রজ্যা	পৃ ১০০	পরিমোহণ	পৃ ১০০
পরিণীত	পৃ ১১৪	পরিপণ	পৃ ১০০	পরিবর্হণ	পৃ ১০০	পরিব্রাজ	পৃ ১০০	পরিমোহী	পৃ ১০০
পরিণীতা	পৃ ১১৪	পরিপণন	পৃ ১০০	পরিবহ	পৃ ১০০	পরিব্রাজক	পৃ ৩৬০	পরিম্লান	পৃ ১০০
পরিণেতা	পৃ ১১৪	পরিপণিত	পৃ ১০০	পরিবহন	পৃ ১০০	পরিব্রাজক	ব্রজ্ ৩৬০	পরিয়ঙ্ক	পৃ ১০০
পরিণেয়	পৃ ১১৪	পরিপতন	পৃ ১০০	পরিবাদ	পৃ ১১৬	পরিব্রাট	পৃ ১০০	পরিরক্ষণ	পৃ ১০০
পরিতঃ	পৃ ১০০	পরিপন্তি	পৃ ১০০	পরিবাদন	পৃ ১০০	পরিভব	পৃ ১০০	পরিরক্ষণ	পৃ ১০০
পরিতর্পণ	পৃ ১০০	পরিপন্থিক	পৃ ১০০	পরিবাদী	পৃ ১০০	পরিভাব	পৃ ১০০	পরিরক্ষণীয়	পৃ ১০০
পরিতাপ	পৃ ১১৫	পরিপন্থী	পৃ ১১৬	পরিবাদিনী	পৃ ১০০	পরিভাবন	পৃ ১০০	পরিরক্ষিণী	পৃ ১০০
পরিতুষ্ট	পৃ ১০০	পরিপাক	পৃ ১০০	পরিবাদী	পৃ ১০০	পরিভাবনা	পৃ ১০০	পরিরক্ষিতা	পৃ ১০০
পরিতুষ্টি	পৃ ১০০	পরিপাক	পচ্ ১২	পরিবাধা	পৃ ১০০	পরিভাবী	পৃ ১০০	পরিরক্ষী	পৃ ১০০
পরিতোলন	পৃ ১০০	পরিপাটল	পৃ ১০০	পরিবাপ	পৃ ১০০	পরিভাষণ	পৃ ১১৭	পরিরব্ধ	পৃ ১০০
পরিতোষ	পৃ ১০০	পরিপাটী	পট্ ২২	পরিবাপ	বপ্ ১০০	পরিভাষা	পৃ ১১৭	পরিরম্ভ	পৃ ১০০
পরিতোষণ	পৃ ১০০	পরিপাণ্ডু	পৃ ১০০	পরিবাপণ	পৃ ১০০	পরিভুক্ত	পৃ ১০০	পরিরম্ভণ	পৃ ১০০
পরিত্যক্ত	পৃ ১১৫	পরিপালন	পৃ ১০০	পরিবাপিত	পৃ ১০০	পরিভূত	পৃ ১০০	পরিরম্ভী	পৃ ১০০
পরিত্যাগ	পৃ ১১৫	পরিপালয়িতা	পৃ ১০০	পরিবার	পৃ ১১৬	পরিভূতি	পৃ ১০০	পরিলঘু	পৃ ১০০
পরিত্যাগী	পৃ ১১৫	পরিপালিত	পৃ ১০০	পরিবারিত	পৃ ১১৬	পরিভোক্তা	পৃ ১০০	পরিলোপ	পৃ ১০০
পরিত্যাজ্য	পৃ ১১৫	পরিপাল্য	পৃ ১০০	পরিবাস	পৃ ১০০	পরিভোগ	পৃ ১০০	পরিলোলিত	পৃ ১০০
পরিত্রাই(হি)	পৃ ১০০	পরিপিঙ্গ	পৃ ১০০	পরিবাহ	পৃ ১০০	পরিভ্রংশ	পৃ ১০০	পরিশঙ্কনীয়	পৃ ১০০
পরিত্রাণ	পৃ ১১৫	পরিপীড়ন	পৃ ১০০	পরিবাহিত	পৃ ১০০	পরিভ্রংশন	পৃ ১০০	পরিশঙ্কিত	পৃ ১০০
পরিত্রাত	পৃ ১০০	পরিপীড়া	পৃ ১০০	পরিবাহী	পৃ ১০০	পরিভ্রম	পৃ ১০০	পরিশঙ্কী	পৃ ১০০
পরিত্রাতব্য	পৃ ১০০	পরিপুটন	পৃ ১০০	পরিবিত্ত	পৃ ১০০	পরিভ্রমণ	পৃ ১০০	পরিশিষ্ট	পৃ ১০০
পরিত্রাতা	পৃ ১০০	পরিপূত	পৃ ১০০	পরিবিত্তি	পৃ ১০০	পরিভ্রষ্ট	পৃ ১০০	পরিশীলন	পৃ ১০০
পরিত্রাহি	পৃ ১১৫	পরিপূর	পৃ ১০০	পরিবিন্দক	পৃ ১০০	পরিভ্রামণ	পৃ ১০০	পরিশীলিত	পৃ ১০০
পরিদংশিত	পৃ ১০০	পরিপূরণ	পৃ ১০০	পরিবিন্ন	পৃ ১০০	পরিমণ্ডল	পৃ ১০০	পরিশুদ্ধ	পৃ ১০০
পরিদর্শক	পৃ ১০০	পরিপূর্ণ	পৃ ১১৬	পরিবীত	পৃ ১০০	পরিমন্থর	পৃ ১০০	পরিশুদ্ধি	পৃ ১০০
পরিদান	পৃ ১০০	পরিপূর্ণতা	পৃ ১০০	পরিবৃংহিত	পৃ ১০০	পরিমন্দ	পৃ ১০০	পরিশোধ	পৃ ১০০
পরিদায়ী	পৃ ১০০	পরিপৃচ্ছা	পৃ ১০০	পরিবৃঢ়	পৃ ১০০	পরিমর্দ্দ	পৃ ১০০	পরিশোধন	পৃ ১০০
পরিদৃশ্যমান	পৃ ১০০	পরিপ্রশ্ন	পৃ ১০০	পরিবৃত	পৃ ১১৬	পরিমল	পৃ ১১৭	পরিশূন্য	পৃ ১০০
পরিদেব	পৃ ১০০	পরিপ্রেপ্সু	পৃ ১০০	পরিবৃতি	পৃ ১০০	পরিমলসখা	পৃ ১০০	পরিশেষ	পৃ ১০০
পরিদেবক	পৃ ১০০	পরিপ্লব	পৃ ১০০	পরিবৃত্ত	পৃ ১০০	পরিমাণ	পৃ ১০০	পরিশ্রম	পৃ ১০০
পরিদেবনা	পৃ ১০০	পরিপ্লবতা	পৃ ১০০	পরিবৃত্তি	পৃ ১০০	পরিমাপ	পৃ ১০০	পরিশ্রমী	পৃ ১০০
পরিদেবিত	পৃ ১০০	পরিপ্লাবন	পৃ ১০০	পরিবেত্তা	পৃ ১০০	পরিমার্গ	পৃ ১০০	পরিশ্রান্ত	পৃ ১০০
পরিদেবী	পৃ ১০০	পরিপ্লুত	পৃ ১০০	পরিবেদন	পৃ ১০০	পরিমার্গণ	পৃ ১০০	পরিষদ	পৃ ১০০
পরিদ্যুন	পৃ ১০০	পরিফুল্ল	পৃ ১০০	পরিবেদনা	পৃ ১০০	পরিমার্গিতব্য	পৃ ১০০	পরিষ্কার	পৃ ১০০
পরিধান	পৃ ১০০	পরিবৎসর	পৃ ১০০	পরিবেদনীয়া	পৃ ১০০	পরিমার্গ্য	পৃ ১০০	পরিষ্কৃত	পৃ ১০০
পরিধানীয়	পৃ ১০০	পরিবন্ধ	পৃ ১০০	পরিবেদিনী	পৃ ১০০	পরিমার্জ্জন	পৃ ১০০	পরিস্কৃতি	পৃ ১০০
পরিধায়ী	পৃ ১০০	পরিবর্জ্জন	পৃ ১০০	পরিবেশ	পৃ ১১৭	পরিমিত	পৃ ১০০	পরিস্ক্রিয়া	পৃ ১০০
পরিধি	পৃ ১০০	পরিবর্জ্জিত	পৃ ১০০	পরিবেশক	পৃ ১১৭	পরিমিতি	পৃ ১০০	পরিষ্টো(স্তো)ম	পৃ ১০০
পরিধিস্থ	পৃ ১০০	পরিবর্ত্ত	পৃ ৩৪৭	পরিবেশন	পৃ ১১৭	পরিমুণ্ডা	পৃ ১০০	পরিষ্ট	পৃ ১০০
পরিধূপিত	পৃ ১০০	পরিবর্ত্তক	পৃ ১০০	পরিবেষ্টন	পৃ ১০০	পরিমূঢ়	পৃ ১০০	পরিষ্বক্ত	পৃ ১০০
পরিধূসর	পৃ ১০০	পরিবর্ত্তন	পৃ ৩৪৭	পরিবেষ্টা	পৃ ১০০	পরিমৃজ্য	পৃ ১০০	পরিষ্বঙ্গ	পৃ ১০০
পরিধেয়	পৃ ১০০	পরিবর্ত্তিত	পৃ ৩৪৭	পরিবোধ	পৃ ১০০	পরিমৃদিত	পৃ ১০০	পরিষ্বঞ্জন	পৃ ১০০
পরিনাতি	প্র ১৩৯	পরিবর্ত্তী	পৃ ১০০	পরিবোধন	পৃ ১০০	পরিমৃষ্ট	পৃ ১০০	পরিসংখ্যা	পৃ ১০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পরিসংখ্যাত	পৃ	১০০
পরিসংখ্যান	পৃ	১০০
পরিসন	পৃ	১০০
পরিসমাপ্ত	পৃ	১০০
পরিসমূহন	পৃ	১০০
পরিসর	পৃ	১০০
পরিসর্প	পৃ	১০০
পরিসারী	পৃ	১০০
পরিস্থিতি	পৃ	১০০
পরিস্পন্দ	পৃ	১০০
পরিস্পন্দন	পৃ	১০০
পরিস্ফুট	পৃ	১০০
পরিস্ফুটন	পৃ	১০০
পরিস্ফুরণ	পৃ	১০০
পরিস্ফুরিত	পৃ	১০০
পরিস্য(ষ্য)ন্দ	পৃ	১০০
পরিস্রব	পৃ	১০০
পরিস্রুত	পৃ	১০০
পরিহ	পৃ	১০০
পরিহত	পৃ	১০০
পরিহর	পৃ	১০০
পরিহরণ	পৃ	১০০
পরিহর্ত্তব্য	পৃ	১০০
পরিহার	পৃ	১০০
পরিহার্য্য	পৃ	১০০
পরিহাস	পৃ	১০০
পরিহাস্য	পৃ	১০০
পরিহিত	পৃ	১০০
পরিহীণ	পৃ	১০০
পরিহৃত	পৃ	১০০
পরী	পৃ	১০০
পরীক্ষক	পৃ	১১৭
পরীক্ষণ	পৃ	১১৭
পরীক্ষা	পৃ	১১৭
পরীক্ষিত	পৃ	১১৭
পরীক্ষিৎ	পৃ	১১৮
পরীত	পৃ	১০০
পরীপ্সা	পৃ	১০০
পরীপ্সু	পৃ	১০০
পরুষ	পৃ	১০০
পরে	পৃ	১০০
পরেত	পৃ	১০০
পরেতর	পৃ	১০০
পরেশ	পৃ	১০০
পরেশান	পৃ	১০০

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পরোক্ষ	পৃ	১০০
পরোঢ়া	পৃ	১০০
পরোপকার	পৃ	১০০
পরোপদেশ	পৃ	১০০
পরোয়া	পৃ	১০০
পরোয়ানা	পৃ	১০০
পরোরজাঃ	পৃ	১০০
পর্কটি(টী)	পৃ	১০০
পর্চিত	পৃ	১০০
পর্জন্য	পৃ	১১৯
পর্জন্যা	পৃ	১১৯
পর্ণ	পৃ	১১৯
পর্ণকুটিকা	পৃ	১০০
পর্ণকুটী	পৃ	১০০
পর্ণকুটীর	পৃ	১০০
পর্ণকৃচ্ছ্র	পৃ	১১৯
পর্ণনর	পৃ	১০০
পর্ণলতা	পৃ	১০০
পর্ণবীটিকা	পৃ	১০০
পর্ণমণি	পৃ	১০০
পর্ণল	পৃ	১০০
পর্ণশয্যা	পৃ	১০০
পর্ণশালা	পৃ	১০০
পর্ণা	পৃ	১১৯
পর্ণাদ	পৃ	১০০
পর্ণাহার	পৃ	১০০
পর্দ্দ	পৃ	১০০
পর্দ্দা	পৃ	১০০
পর্দ্দা(পর্দা)নসীন	পৃ	১০০
পর্পট	পৃ	১০০
পর্পট	পৃ	১৬৫
পর্পটি	পৃ	১৬৫
পর্ব্ব	পৃ	১১৯
পর্ব্বক	পৃ	১০০
পর্ব্বকাল	পৃ	১১৯
পর্ব্বগামী	পৃ	১০০
পর্ব্বণী	পৃ	১০০
পর্ব্বত	পৃ	১২০
পর্ব্বতকুমারী	পৃ	১২২
পর্ব্বতজ	পৃ	১২২
পর্ব্বতজা	পৃ	১২২
পর্ব্বতপতি	পৃ	১২২
পর্ব্বতবাসী	পৃ	১০০
পর্ব্বতরাজ	পৃ	১২২
পর্ব্বতীয়	পৃ	১০০

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পর্ব্বতেশ	পৃ	১০০
পর্ব্বভাগ	পৃ	১০০
পর্ব্বাস্ফোট	পৃ	১০০
পর্ব্বাহ	পৃ	১০০
পর্য্যঙ্ক	পৃ	১০০
পর্যঙ্কবন্ধন	পৃ	১০০
পর্য্য(র্য্যা)টক	পৃ	১০০
পর্য্যটন	পৃ	১০০
পর্য্যটন্ত	পৃ	১০০
পর্য্যটিত	পৃ	১০০
পর্য্যন্ত	পৃ	১০০
পর্য্যবসান	পৃ	১০০
পর্য্যবসিত	পৃ	১০০
পর্য্যবস্থা	পৃ	১০০
পর্য্যবস্থান	পৃ	১০০
পর্য্যবস্থাতা	পৃ	১০০
পর্য্যবস্থিত	পৃ	১০০
পর্য্যবেক্ষক	পৃ	১০০
পর্য্যবেক্ষণ	বি	৩০২
পর্য্যয়	পৃ	১০০
পর্য্যয়ণ	পৃ	১০০
পর্য্যশ্চ	পৃ	১০০
পর্য্যসন	পৃ	১০০
পর্য্যস্ত	পৃ	১০০
পর্য্যাকুল	পৃ	১০০
পর্য্যাচান্ত	পৃ	১০০
পর্য্যাণ	পৃ	১০০
পর্য্যাপ্ত	পৃ	১০০
পর্য্যাপ্তি	পৃ	১০০
পর্য্যাবিল	পৃ	১০০
পর্য্যায়	পৃ	১২২
পর্য্যায়কার্য্য	পৃ	১০০
পর্য্যায়শয়ন	পৃ	১২২
পর্য্যায়সেবা	পৃ	১০০
পর্য্যায়ান্ন	পৃ	১০০
পর্য্যায়োক্ত	পৃ	১০০
পর্য্যালোচন	পৃ	১০০
পর্য্যালোচনা	পৃ	১০০
পর্য্যাস	পৃ	১০০
পর্য্যুক্ষণ	পৃ	১০০
পর্য্যুৎসুক	পৃ	১০০
পর্য্যুদস্ত	পৃ	১০০
পর্য্যুদাস	পৃ	১০০
পর্য্যুপাসীন	পৃ	১০০
পর্য্যুষিত	পৃ	১০০

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পর্শু	পৃ	১০০
পর্শ্বধ	পৃ	১০০
পর্ষদ	পৃ	১০০
পল	পল্	৪৫
পলক	পল্	৪৫
পলকা	পল্	৪৫
পলট	পল্	৪৫
পলটন	পল্	৪৫
পলতা	পল্	৪৫
পলতে	পল্	৪৫
পলব	পল্	৪৫
পলয়ার	পল্	৪৫
পলল	পল্	৪৫
পলসাই	পল্	৪৬
পলসাঁঞি	পল্	৪৬
পল(লে)স্তারা	পল্	৪৫
পলা	পল্	৪৫
পলা	প্র	১৩৯
পলাইত	পল্	৪৫
প(পো)লাও	পল্	৪৫
পলাকড়া	পল্	৪৫
পলাকড়ী	পল্	৪৫
পলাণ্ডু	পল্	৪৫
পলাতক	পল্	৪৫
পলাতকা	পল্	৪৫
পলাদ	পল্	৪৫
পলান্ন	পল্	৪৫
পলা(রা)য়ন	পৃ	১০০
পলায়ন	পল্	৪৬
পলায়মান	পল্	৪৬
পলায়িত	পল্	৪৬
পলায়ী	পল্	৪৫
পলাল	পল্	৪৫
পলাশ	পল্	৪৬
পলাশী	পল্	৪৬
পলি	পল্	৪৫
পলিত	পল্	৪৫
পলিতা	পল্	৪৫
পলিতা	প্র	১৩৯
পলু	পল্	৪৫
পলুই	পল্	৪৫
পলুটিগাই	প্র	১৩৯
পলোয়া	পল্	৪৫
পলো	পল্	৪৫
পল্ল	পল্	৪৫

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পল্লব	পল্	৪৫
পল্লব	পত্	৩৪
পল্লবক	পল্	৪৫
পল্লবগ্রাহী	পল্	৪৫
পল্লবিত	পল্	৪৫
পল্লবিত	পত্	৩৪
পল্লবী	পত্	৩৪
পল্লবী	পল্	৪৫
পল্লি(ল্লী)	পল্	৩৪
পল্লিকা	পল্	৪৫
পল্লী	পল্	৪৫
পল্লীগ্রাম	পল্	৪৫
পল্বল	পল্	৪৫
পশ(স)	পশ্	৫০
পশ	প্র	১৩৯
পশব্য	পশ্	৫০
পশম	পশ্	৫০
পশরি	পশ্	৫০
পশরিপাল্লা	পশ্	৫০
পশলা	পশ্	৫০
পশিল	প্র	১৩৯
পশু	পশ্	৫০
পশুগায়ত্রী	পশ্	৫০
পশুচর্য্যা	পশ্	৫০
পশুধর্ম্ম	পশ্	৫০
পশুপ	পশ্	৫০
পশুপতি	পশ্	৫১
পশুপাল	পশ্	৫০
পশুপাল	পল্	৪৫
পশুপালক	পশ্	৫০
পশুপালন	পশ্	৫০
পশুপাশ	পশ্	৫০
পশুপ্রেরণ	পশ্	৫০
পশুমার	মৃ	৫৭৩
পশু(সু)রী	পং	২
পশ্চাৎ	পশ্	৫৩
পশ্চাতে	পশ্	৫০
পশ্চাত্তাপ	পশ্	৫৪
পশ্চার্দ্ধ	পশ্	৫০
পশ্চিম	পশ্	৫৪
পশ্চিমক্রতু	পশ্	৫৪
পশ্চিমজন	পশ্	৫৪
পশ্চিমবঙ্গ	বঙ্	২১২
পশ্চিমযামিনী	পশ্	৫৪
পশ্চিমা	পশ্	৫৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পশ্চিমোত্তরা	পশ্	৫০	পাইন	প্	১৬৫	পাঁজর(ড়)	পং	২	পাকমোড়া	পচ্	১২	পাকাসির্ণি	পচ্	১২
পশ্য	পশ্	৫০	পাইশাল	পদ্	৩৮	পাঁজরা(ড়া)	পং	২	পাকযজ্ঞ	পচ্	১২	পাকাহাড়	পচ্	১২
পশ্যতোহর	পশ্	৫০	পাউই	প্	১৬৫	পাঁজা	পং	১০	পাকযজ্ঞিক	পচ্	১২	পাকাহাত	পচ্	১২
পশ্যন্তী	পশ্	৫০	পাউখ	প্র	১৩৯	পাঁজা-কোলা	পং	১০	পাকল	পচ্	১২	পাকি	পচ্	১২
পশ্বাচার	পশ্	৫০	পাউডার	পী	৭২	পাঁজি(জী)	পং	২	পাকলিয়া	পচ্	১২	পাকিয়ে-তোলা	পচ্	১২
পস	পশ্	৫০	পাউড়ি	পৃ	১০০	পাঁজিপুঁথি	পু	৭৩	পাকশাট	পক্ষ্	১১	পাকিল	পচ্	১২
পসন্দ	পশ্	৫০	পাউস	পং	২	পাঁটা(ঠা)	প্	১৬৫	পাকশালা	পচ্	১২	পাকুড়(ড়ি)	পৃ	১০০
পসরা	প্র	১৩৯	পাউস	প্র	১৩৯	পাঁড়	পণ্	২৬	পাকশাসন	পচ্	১২	পাকোয়ান	পচ্	১২
পসার	প্র	১৩৯	পাও	পদ্	৩৮	পাঁড়ে	পণ্	২৬	পাকশাসনি	পচ্	১২	পাক্যালা	পদ্	৩৮
পসারা	প্র	১৩৯	পাও(য়)জামা	পদ্	৩৮	পাঁতর	প্র	১৩৯	পাকসাঁড়াশি	পচ্	১২	পাক্ষিক	পক্ষ্	১১
পসারি(রী)	প্র	১৩৯	পাওন	প্র	১৩৯	পাঁতি	পং	২	পাকসাট	পক্ষ্	১১	পাখ	পক্ষ্	১১
পসাহন	প্র	১৩৯	পাওয়া	প্র	১৩৯	পাঁতি (পত্রী)	পত্	৩১	পাকসাধন	পচ্	১২	পাখছাট	পক্ষ্	১১
পসুরিপাল্লা	পং	২	পাওল	প্র	১৩৯	পাঁতিয়া	পং	২	পাকস্থান	পচ্	১২	পাখড়া	প্র	১৩৯
পস্তা	পশ্	৫৪	পাংশন	পং	২	পাঁতী	পং	২	পাকস্থলী	পচ্	১২	পাখণ্ড	পা	৫৪
পস্তান	পশ্	৫৪	পাংশব	পং	২	পাঁথার	প্	১৬৫	পাকস্পর্শ	পচ্	১২	পাখণ্ডী	পা	৫৪
পস্তানি	পশ্	৫৪	পাংশু	পং	২	পাঁদ	পণ্	২৬	পাকা	পচ্	১২	পাখনা	পক্ষ্	১১
পহর	প্র	১৩৯	পাংশুর	পং	২	পাঁদাড়	পণ্	২৬	পাকাকাঠ	পচ্	১২	পাখপাখালি	পক্ষ্	১১
পহরা	প্র	১৩৯	পাংশুল	পং	২	পাঁপড়	পৃ	১০০	পাকাখাতা	পচ্	১২	পাখ(খো)য়াজ	পক্ষ্	১১
পহরি	প্র	১৩৯	পাংশুলা	পং	২	পাঁপড়	প্	১৬৫	পাকাগার	পচ্	১২	পাখর	প্র	১৩৯
পহরী	প্র	১৩৯	পাঁইজ	পং	২	পাঁপড়ি	পৃ	১০০	পাকাগাঁথনি	পচ্	১২	পাখরিয়া	প্র	১৩৯
পহির	পৃ	১৩৯	পাঁইজোড়	পদ্	৩৮	পাঁপর	পৃ	১০০	পাকাঘুঁটি	পচ্	১২	পাখলানী	প্র	১৩৯
পহিরণ	পৃ	১০০	পাঁইজোর	পদ্	৩৮	পাঁব	পৃ	১০০	পাকাচামড়া	পচ্	১২	পাখশা(সা)ট	পক্ষ্	১১
পহিরা	পৃ	১০০	পাঁও	পণ্	২৬	পাঁয়জোর	পৃ	১০০	পাকাচাল	পচ্	১২	পাখাজু	পক্ষ্	১১
পহিরাণ	পৃ	১০০	পাঁওদল	পদ্	৩৮	পাঁশ	পং	২	পাকাচিটে	পচ্	১২	পাখানি	পচ্	১২
পহিল	প্র	১৩৯	পাঁক	পং	৪	পাক(খ)	পক্ষ্	১১	পাকাছিট	পচ্	১২	পাখা	পক্ষ্	১১
পহিলা	প্র	১৩৯	পাঁক(কু)ই	পং	২	পাক	পচ্	১২	পাকাছেলে	পচ্	১২	পাখাল	প্র	১৩৯
পহিলাল	পৃ	১০০	পাঁকাল	পং	২	পাকচক্র	পচ্	১২	পাকাঠি	পট্	১৭	পাখি(খী)	পক্ষ্	১১
পহুঁ	প্	১৬৫	পাঁচ	পং	২	পাকছাট	পক্ষ্	১১	পাকাদলি(লী)ল	পচ্	১২	পাখুড়া	পক্ষ্	১১
পহুব	প্	১৬৫	পাঁচই	পং	২	পাকজ	পচ্	১২	পাকাদেখা	পচ্	১২	পাখুরা	পক্ষ্	১১
পহ্লব	প্	১৬৫	পাঁচকান-করা	পং	২	পাকড়	প্র	১৩৯	পাকান	পচ্	১৪	পাগ	পচ্	১৭
পহ্ন	পৃ	১০০	পাঁচচুলা(ল্যা)	পং	২	পাকড়	পচ্	১২	পাকানী	পচ্	১২	পাগড়ি(ড়ী)	পচ্	১৭
পহ্নি	পৃ	১০০	পাঁচ(চো)ট	পং	২	পাকড়ান	প্র	১৩৯	পাকাপাকি	পচ্	১৪	পাগল	পচ্	১৭
পা	পা	৫৬	পাঁচড়া	পং	২	পাকড়ী	পক্ষ্	১১	পাকাপোক্ত	পচ্	১৪	পাগলা	পচ্	১৭
পা	পদ্	৩৮	পাঁচথুপী	পং	২	পাকড়ীগুয়া	পক্ষ্	১১	পাকাফলার	পচ্	১২	পাগলি(লী)	পচ্	১৭
পাই	পদ্	৩৮	পাঁচন	পং	২	পাকতঃ	পচ্	১২	পাকাফোঁড়া	পচ্	১২	পাগলিনী	পচ্	১৭
পাই	পৃ	১২২	পাঁচনি(নী)	পং	২	পাকতেল	পচ্	১২	পাকাবাড়ী	বট্	২২২	পাঙা(ঙ্গা)শ	পং	২
পাইক	পদ্	৩৮	পাঁচপাঁচি	পং	২	পাকনা	পচ্	১২	পাকাভিমুখ	পচ্	১২	পাঙা(ঙ্গা)শ	পি	৬৩
পাইকড়	পৃ	১০০	পাঁচমিশালি	মিশ্র্	৫৪৯	পাকনাই	পচ্	১২	পাকাম	পচ্	১৫	পাঙ্কা	পক্ষ্	১১
পাইকশাল	পদ্	৩৮	পাঁচালি(লী)	পং	৯	পাকনা(লা)ড়া	পচ্	১২	পাকামাছ	পচ্	১২	পাঙ্খা	পক্ষ্	১১
পাইকার	পী	৭২	পাঁচপীর	পং	২	পাকনাভি	পচ্	১২	পাকামাটি	পচ্	১২	পাঙ্খি	পক্ষ্	১১
পাই(য়)খানা	পী	৭২	পাঁচফল	পং	২	পাকপরশ	পচ্	১২	পাকামাল	পচ্	১২	পাঙ্‌ক্ত	পং	২
পাইঘর	পদ্	৩৮	পাঁচফোড়ন	পং	২	পাকপাত্র	পচ্	১২	পাকামি	পচ্	১৫	পাঙ্‌ক্তেয়	পং	৩
পাইচারি	পদ্	৩৮	পাঁচভূত	পং	২	পাকপুটী	পচ্	১২	পাকারঙ	পচ্	১২	পাঙ্‌ক্ত্য	পং	২
পাইট	পট্	১৭	পাঁচিল(র)	প্র	১৩৯	পাকভাণ্ড	পচ্	১২	পাকারোকড়	পচ্	১২	পাচক	পচ্	১৬
পাইটকা	পট্	১৭	পাঁজ	পং	২	পাকভাণ্ডার	পচ্	১২	পাকাসাধ	পচ্	১২	পাচড়া	পং	২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পাচতি	প্	১৬৫	পাঞ্চালী	পং	৯	পাটি(টী)কেল	পট্	২২	পাণিতল	পণ্	২৯	পাতকো	পত্	৩১
পাচন	পচ্	১৬	পাঞ্জর	পং	২	পাটিখান	পট্	২২	পাণিধর্ম্ম	পণ্	২৯	পাতখাড়ু	পত্	৩১
পাচনি(নী)	পচ্	১৬	পাঞ্জা	পং	১০	পাটিত	পট্	২২	পাণিনি	পণ্	২৯	পাতক্ষীর	পত্	৩১
পাচলা	পং	২	পাঞ্জাব	পং	১০	পাটী	পট্	২২	পাণিনীয়	পণ্	২৯	পাতখোলা	পত্	৩১
পাচার	পচ্	১৬	পাঞ্জাবী	পং	১০	পাটীগণিত	পট্	২২	পাণিন্ধম	পণ্	২৬	পাতঞ্জল	পত্	৩২
পা-চারি	পদ্	৩৮	পাঞ্জার	পং	২	পাটুয়া	পট্	১৭	পাণিশঙ্খ	পণ্	২৬	পাতড়া	পত্	৩১
পা-চালি	পদ্	৩৮	পাঞ্জি	পং	২	পাটুলী	পট্	২২	পাণিপাত্র	পণ্	২৬	পাততাড়ি	পত্	৩১
পাচিকা	পচ্	১২	পাট	পট্	২০	পাটেশ্বরী	পট্	১৭	পাণিপাদ	পণ্	২৬	পাত-দত	পত্	৩১
পাচ্য	পচ্	১৬	পাটক	পট্	১৭	পাটোয়ার	পট্	২০	পাণিপীড়ন	পণ্	২৬	পাতন	পত্	৩৫
পাছ	পশ্	৫০	পাটকাঠি	পট্	১৭	পাটোয়ারী	পট্	২০	পাণিপুট	পণ্	২৬	পাতনকাঁড়	পত্	৩১
পাছকুড়	পং	২	পাটকিলা	পট্	১৭	পাটোয়ারীগিরী	পট্	১৭	পাণিবন্ধ	পণ্	২৬	পাতনা	পত্	৩৫
পাছদুআর	পশ্	৫০	পাটকিলে	পট্	১৭	পাটোয়ারীবুদ্ধি	পট্	১৭	পাণিবাদক	পণ্	২৬	পাতয়ান	পত্	৩১
পাছড়	পশ্	৫০	পাটকেল	পট্	১৭	পাট্টা	পট্	১৭	পাণিমুক্ত	পণ্	২৬	পাতয়াল	পত্	৩১
পাছড়া	পশ্	৫০	পাটচ্চর	পট্	১৭	পাঠ	পঠ্	২৫	পান্টালুন	পং	২৬	পাতর	পত্	৩১
পাছড়ান	পশ্	৫০	পাটটাকুর	পট্	১৭	পাঠক	পঠ্	২৫	পাণ্ডব	পণ্	৩০	পাতর	প্র	১৩৯
পাছতলা	পশ্	৫০	পাটথোপ	পট্	১৭	পাঠন	পঠ্	২৫	পাণ্ডববর্জ্জিত	পণ্	২৬	পাতল	পত্	৩৪
পাছদেউড়ি	পশ্	৫০	পাটথোপা	পট্	১৭	পাঠনা	পঠ্	২৫	পাণ্ডবীয়	পণ্	২৬	পাতলা	পত্	৩৪
পাছদোর	পশ্	৫০	পাটধড়া	পট্	২০	পাঠশালা	পঠ্	২৫	পাণ্ডবেয়	পণ্	২৬	পাতা	পত্	৩৫
পাছদ্বার	পশ্	৫০	পাটন	পট্	১৭	পাঠা	প্র	১৩৯	পাণ্ডর	পণ্	২৬	পাতা	পা	৫৪
পাছমোড়া	পশ্	৫০	পাটনী	পট্	২০	পাঠান	প্র	১৩৯	পাণ্ডা	পণ্	২৮	পাতা	প্র	১৩৯
পাছা	পশ্	৫০	পাটব	পট্	২০	পাঠানজাতি	প্র	১৩৯	পাণ্ডিত্য	পণ্	২৬	পাতাড়	পত্	৩১
পাছাড়	পশ্	৫০	পাটবার	পট্	২০	পাঠান্তর	পঠ্	২৫	পাণ্ডু	পণ্	৩০	পাতান	পত্	৩৫
পাছাড়ি	পশ্	৫০	পাটফুল	পট্	১৭	পাঠিত	পঠ্	২৫	পাণ্ডুক	পণ্	২৬	পাতাপাতি	পত্	৩১
পাছাপাড়	পশ্	৫০	পাটভাঙা	পট্	২০	পাঠী	পঠ্	২৫	পাণ্ডুকম্বল	পণ্	২৬	পাতামল	পত্	৩১
পাছাপেড়ে	পশ্	৫০	পাটমহল	পট্	১৭	পাঠীন	পঠ্	২৫	পাণ্ডুকী	পণ্	২৬	পাতাল	পত্	৩৬
পাছি	পশ্	৫০	পাটয়ার	পট্	২০	পাঠ্য	পঠ্	২৫	পাণ্ডুতরু	পণ্	৩১	পাতালগঙ্গা	পত্	৩৬
পাছিলা	পশ্	৫০	পাটরাণী	পট্	২০	পাঠ্যজাতি	পঠ্	২৫	পাণ্ডুপতি	পণ্	২৬	পাতালবর্গ	বৃজ্	৩৪৪
পাছু	পশ্	৫০	পাটল	পট্	২২	পাঠ্যপুস্তক	পঠ্	২৫	পাণ্ডুবিজয়	পণ্	২৬	পাতাহাল	পত্	৩১
পাছুআন	পশ্	৫০	পাটলা	পট্	২২	পাড়	পঠ্	২৫	পাণ্ডুভূম	পণ্	৩১	পাতি	পত্	৩৭
পাছুটান	পশ্	৫০	পাটলি	পট্	২২	পাড়ন	পঠ্	২৫	পাণ্ডুমৃত্তিকা	পণ্	২৬	পাতিআ	পত্	৩১
পাছুড়	পশ্	৫০	পাটলিপুত্র	পট্	১৯	পাড়া	পঠ্	২৫	পাণ্ডুয়া	পণ্	২৬	পাতিকাক	পত্	৩৭
পাছুড়া	পশ্	৫০	পাটলোপল	পট্	১৭	পাড়াগ্রাম	পঠ্	২৫	পাণ্ডুর	পণ্	৩১	পাতিচোর	পত্	৩৭
পাছুড়ি	পশ্	৫০	পাটশাক	পট্	১৭	পাড়াপড়শী	পঠ্	২৫	পাণ্ডুরিত	পণ্	৩১	পাতিজান	প্র	১৩৯
পাছুয়ান	পশ্	৫০	পাটশাল	পট্	২০	পাড়াপাড়ি	পঠ্	২৫	পাণ্ডুরোগ	পণ্	২৬	পাতিঝিনুক	পত্	৩৭
পাছে	পশ্	৫০	পাটা	পট্	২১	পাড়ি	পঠ্	২৫	পাণ্ডুল	পণ্	২৬	পাতিডাল	পত্	৩৭
পাজলা	প্র	১৩৯	পাটাকৃমি	পট্	২১	পাড়ী	পঠ্	২৫	পাণ্ডুলিপি	পণ্	৩১	পাতিনেড়ে	পত্	৩৭
পাজা	প্র	১৩৯	পাটাতন	পট্	২১	পাড়োয়ান	পঠ্	২৩	পাণ্ডুলেখ	পণ্	২৬	পাতিনেবু	পত্	৩৭
পাজামা	পদ্	৩৮	পাটাবুক	পট্	২১	পাণ	পণ্	২৯	পাণ্ডুসোপাক	পণ্	২৬	পাতি-পাতি	পং	২
পাজাল	প্র	১৩৯	পাটাবুকী	পট্	২১	পাণি	পণ্	২৯	পাণ্ডে	পণ্	২৬	পাতিব্রত্য	পা	৫৪
পাজি(জী)	প্	১৬৫	পাটাশেয়ালা	পট্	২১	পাণিগৃহিত্রী	পণ্	২৯	পাণ্ড্য	পণ্	২৬	পাতিমাতাল	পত্	৩৭
পাঞ্চজন্য	পং	৬	পাটাসেলামী	পট্	২১	পাণিগৃহীতী	পণ্	২৬	পাত	পত্	৩৪	পাতিমৌড়	পত্	৩১
পাঞ্চভৌতিক	পং	২	পাটালি	পট্	২১	পাণিগ্রহণ	পণ্	২৯	পাতক	পত্	৩৪	পাতিয়া	প্র	১৩৯
পাঞ্চশাব্দিক	পং	২	পাটি	পট্	১৭	পাণিগ্রাহ	পণ্	২৬	পাতকিনী	পত্	৩৪	পাতিয়ায়	প্র	১৩৯
পাঞ্চাল	পং	৯	পাটিকা	পট্	২২	পাণিঘাত	পণ্	২৯	পাতকী	পত্	৩৪	পাতিয়ারা	প্র	১৩৯
পাঞ্চালিকা	পং	২	পাটি(টী)কাল	পট্	২২	পাণিজ	পণ্	২৯	পাতকুয়া	পত্	৩১	পাতিশিয়াল	পত্	৩৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পিয়াস	পি	৬২	পিষ্টিত	পিশ্	৬৯	পীতসার	পা	৫৪	পুঃ	পু	৭৩	পুটপাক	পু	৭৩
পিয়াস	পী	৭২	পিষ্ঠ	পিশ্	৬৯	পীতসালক	পা	৫৪	পুঁছ	পু	৭৩	পুটকিত	পু	৭৩
পিয়াসী	পি	৬২	পিসা	পা	৫৪	পীতা	পা	৫৪	পুঁছ	প্র	১৩৯	পুটকিনী	পু	৭৩
পি(পী)র	পি	৬২	পিসী	পা	৫৪	পীতাব্ধি	পা	৫৪	পুছ	প্র	১৩৯	পুটপাণি	পু	৭৩
পিরান	পি	৬২	পিহিত	পি	৬২	পীতাম্বর	পা	৫৪	পুছা	প্র	১৩৯	পুটপুটে	পু	৭৩
পিরাহন	পি	৬২	পী	পী	৭২	পীতি	পা	৫৪	পুছারি	প্র	১৩৯	পুটভেদ	পু	৭৩
পিরিচ্(জ্)	পি	৬২	পী	পা	৫৪	পীতী	পা	৫৪	পুঁজ	পু	৭৫	পুটলি(লী)	পু	৭৩
পিরিত	প্রী	১৬২	পীউস	পী	৭২	পীন	পী	৭২	পুঁজি	পু	৭৫	পুটহাত	পু	৭৩
পিরি(রা)লি	প্রী	১৬২	পীঁজ(জি)র	পি	৬২	পীনস	পী	৭২	পুঁজিপতি	পু	৭৫	পুটাঞ্জলি	পু	৭৩
পিরিলী	প্রী	১৬২	পীক	পি	৬২	পীনসী	পী	৭২	পুঁজিবাদ	পু	৭৫	পুটি	পু	৭৩
পিরীত	প্রী	১৬২	পীকদানি	পি	৬২	পীনস্তনী	পী	৭২	পুঁজিবাদী	পু	৭৫	পুটিকা	পু	৭৩
পিরীতি	প্রী	১৬২	পীঠ	পি	৬৭	পীনোধ্নী	পী	৭২	পুঁটলি(লী)	পু	৭৩	পুটী	পু	৭৩
পিলীহা	প্	১৬৫	পীঠকেলি	পী	৭২	পীবর	পী	৭২	পুঁটি(ঠী)	পু	৭৩	পুটুল্যা	পু	৭৩
পিল(লে)	পি	৬৭	পীঠগ	পী	৭২	পীয়ল	পী	৭২	পুঁটুলী	পু	৭৩	পুড়্	পুড়্	৭৯
পিলপা	পি	৬২	পীঠনায়িকা	পী	৭২	পীয়লী	পী	৭২	পুঁটে	পু	৭৩	পুড়	পুড়্	৭৯
পিলপিল	পি	৬৭	পীঠন্যাস	পী	৭২	পীযূষ	পী	৭২	পুঁড়	পুড়্	৭৯	পুড়ন	পুড়্	৭৯
পিলসুজ	পি	৬২	পীঠস্থান	পি	৬৭	পীযূষগ্রন্থিল	পী	৭২	পুঁড়া	পুড়্	৭৯	পুড়া	পুড়্	৭৯
পিলু	পি	৬২	পীঠা	পি	৬২	পীযূষবর্ষ	পী	৭২	পুঁত	পু	৭৪	পুড়ি	পুড়্	৭৯
পিল্লা	পি	৬২	পীঠিকা	পী	৭২	পীযূষরুচি	পী	৭২	পুঁতা	পু	৭৪	পুণ	পু	৭৩
পিশ্	পিশ্	৬৯	পীড়্	পীড়্	৭২	পীযূষী	পী	৭২	পুঁতি(থি)	পু	৭৪	পুণবত	পু	৭৩
পিশঙ্গ	পিশ্	৬৯	পীড়	পীড়্	৭২	পীয়োপীয়ো	প্রী	৭২	পুঁথি(থী)	পু	৭৩	পুণবতী	পু	৭৩
পিশঙ্গক	পিশ্	৬৯	পীড়ক	পীড়্	৭২	পীর	পি	৭২	পুঁয়ে	পুড়্	৭৯	পু(পূ)ণমি	পূ	১০০
পিশঙ্গী	পিশ্	৬৯	পীড়ন	পীড়্	৭২	পীরিত	প্রী	১৬২	পুকুর	পুষ্	৮৩	পুণি	পু	৭৩
পিশাচ	পিশ্	৭০	পীড়া	পীড়্	৭২	পীল	পি	৬২	পুকুর-চুরি	পুষ্	৮৩	পুণ্ড	পু	৭৩
পিশাচকী	পিশ্	৭০	পীড়াকর	পীড়্	৭২	পীলা	প্	১৬৫	পুক্কশ	পু	৭৩	পুণ্ডরীক	পু	৭৩
পিশাচবৃক্ষ	পিশ্	৬৯	পীড়াকৃৎ	পীড়্	৭২	পীলু	পি	৬২	পুক্কষ(স)	পু	৭৩	পুণ্ডরীকাক্ষ	পু	৭৩
পিশাচভাষা	পিশ্	৬৯	পীড়াপীড়ি	পীড়্	৭২	পীলে	প্	১৬৫	পুখরি(রী)	পুষ্	৮২	পুণ্ডী	পু	৭৩
পিশাচমোচন	পিশ্	৭০	পীড়ি	পীড়্	৭২	পীসেপীসে	পা	৫৪	পুখুর	পুষ্	৮২	পুণ্ড্র	পুড়্	৭৯
পিশাচসভ	পিশ্	৬৯	পীড়িত	পীড়্	৭২	পুং	পু	৭৩	পুঙ্খ	পু	৭৫	পুণ্য	পু	৭৬
পিশাচিকা	পিশ্	৬৯	পীত	পা	৫৪	পুংক্ষীর	পু	৭৩	পুঙ্খানুপুঙ্খ	পু	৭৫	পুণ্যক	পু	৭৩
পিশাচিনী	পিশ্	৬৯	পীতক	পা	৫৪	পুংযোগ	পু	৭৩	পুঙ্খিত	পু	৭৫	পুণ্যকর্ম্ম	পু	৭৩
পিশিত	পিশ্	৬৯	পীতকদলী	পা	৫৪	পুংরত্ন	পু	৭৩	পুঙ্গব	পু	৭৩	পুণ্যকাল	পু	৭৩
পিশিতভুক	পিশ্	৬৯	পীতকাষ্ঠ	পা	৫৪	পুংরাশি	পু	৭৩	পুঙ্গি	পু	৭৩	পুণ্যকীর্ত্তন	পু	৭৬
পিশিতা	পিশ্	৬৯	পীতগন্ধ	পা	৫৪	পুংরূপ	পু	৭৩	পুচ্ছ	পু	৭৩	পুণ্যকীর্ত্তি	পু	৭৬
পিশিতাশন	পিশ্	৬৯	পীততণ্ডুল	পা	৫৪	পুংবৎ	পু	৭৩	পুছ	পু	৭৩	পুণ্যকৃৎ	পু	৭৩
পিশিতাশী	পিশ্	৬৯	পীতদারু	পা	৫৪	পুংবদ্ভাব	পু	৭৩	পুঞ্জ	পু	৭৫	পুণ্যক্ষেত্র	পু	৭৩
পিশুন	পিশ্	৬৯	পীতবাস	পা	৫৪	পুংবৎস	পু	৭৩	পুঞ্জি	পু	৭৫	পুণ্যগন্ধ	পু	৭৬
পিশুনবচন	পিশ্	৬৯	পীতবাসাঃ	পা	৫৪	পুংলিঙ্গ	পু	৭৩	পুঞ্জিকস্থলা	পু	৭৫	পুণ্যগৃহ	পু	৭৩
পিশুনবাক্য	পিশ্	৬৯	পীতমণি	পা	৫৪	পুংশাবক	পু	৭৩	পুঞ্জিকৃত	পু	৭৫	পুণ্যজন	পু	৭৬
পিষ	পিশ্	৭১	পীত(তি)ম	পা	৫৪	পংশ্চল	পু	৭৩	পুঞ্জিত	পু	৭৩	পুণ্যতীর্থ	পু	৭৩
পিষ্ট	পিশ্	৭১	পীতমুদগ	পা	৫৪	পুংশ্চলী	পু	৭৩	পুঞ্জীভূত	পু	৭৩	পুণ্যদ	পু	৭৩
পিষ্টক	পিশ্	৬৯	পীতযূথী	পা	৫৪	পুংশ্চিহ্ন	পু	৭৩	পুট্	পু	৭৩	পুণ্যদর্শন	পু	৭৩
পিষ্টপুর	পিশ্	৬৯	পীতরাগ	পা	৫৪	পুংসবন	পু	৭৩	পুট	পু	৭৩	পুণ্যপরম্পরা	পু	৭৩
পিষ্টময়	পিশ্	৬৯	পীতল	পা	৫৪	পুংস্কোকিল	পু	৭৩	পুটকর	পু	৭৩	পুণ্যফল	পু	৭৬
পিষ্টসৌরভ	পিশ্	৬৯	পীতশাল	পা	৫৪	পুংস্ত্ব	পু	৭৩	পুটক	পু	৭৩	পুণ্যবন্ত	পু	৭৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পুণ্যবান	পু	৭৩	পুত্রাচার্য্য	পু	৭৩	পুনর্ব্বিভা	পু	৭৩	পুরস্করণ	পৃ	১২৭	পুরুষ-প্রকৃতি	পৃ	১৪৫
পুণ্যভাক	পু	৭৩	পুত্রিকা	পু	৭৩	পুনর্ব্বিয়া	পু	৭৩	পুরস্কার	পৃ	১২৭	পুরুষনাথ	পৃ	১০০
পুণ্যভূমি	পু	৭৩	পুত্রিকাপুত্র	পু	৭৩	পুনর্ভব	পু	৭৩	পুরস্কৃত	পৃ	১২৭	পুরুষবর	পৃ	১০০
পুণ্যযোগ	পু	৭৩	পুত্রিকাভর্ত্তা	পু	৭৩	পুনর্ভূ	পু	৭৩	পুরস্ক্রিয়া	পৃ	১০০	পুরুষবাহ	পৃ	১০০
পুণ্যরাত্র	পু	৭৩	পুত্রিকাসুত	পু	৭৩	পুনশ্চ	পু	৭৭	পুরস্তাৎ	পৃ	১০০	পুরুষবেভার	পৃ	১০০
পুণ্যলোক	পু	৭৬	পুত্রিণী	পু	৭৩	পুনি(নী)	পু	৭৩	পুরা	পৃ	১২৮	পুরুষব্যবহার	পৃ	১০০
পুণ্যশকুন	পু	৭৩	পুত্রী	পু	৭৩	পুনীত	পু	৭৩	পুরাকথা	পৃ	১২৮	পুরুষব্যাঘ্র	পৃ	১০০
পুণ্যশ্লোক	পু	৭৩	পুত্রীকৃত	পু	৭৩	পুনীহি	পু	৭৩	পুরাকল্প	পৃ	১২৮	পুরুষভেদ	ভিদ্	৩৯৮
পুণ্যা	পু	৭৩	পুত্রীয়	পু	৭৩	পুনু	পু	৭৩	পুরাকৃত	পৃ	১২৮	পুরুষমাত্র	পৃ	১০০
পুণ্যানুভব	পু	৭৩	পুত্রেষ্টি	পু	৭৩	পুন্নাগ	পু	৭৩	পুরাণ	পৃ	১২৮	পুরুষমানী	পৃ	১০০
পুণ্যারণ্য	পু	৭৬	পুত্রেষ্টিকা	পু	৭৩	পুন্নামা	পু	৭৩	পুরাণপুরুষ	পৃ	১০০	পুরুষমেধ	পৃ	১৩৪
পুণ্যাহ	পু	৭৩	পুত্র্য	পু	৭৩	পুপ্প	পুষ্	৮২	পুরাতন	পৃ	১২৮	পুরুষরতন	পৃ	১০০
পুণ্যে	পু	৭৩	পুথি(থী)	পু	৭৩	পুপ্ফুস	পুষ্	৮২	পুরান	পৃ	১২৮	পুরুষরাশি	পৃ	১০০
পুণ্যোদয়	পু	৭৩	পুথিপত্তর	পু	৭৩	পুমপত্য	পু	৭৭	পুরাবিৎ	পৃ	১০০	পুরুষর্ষভ	পৃ	১০০
পুং	পু	৭৩	পুথিপত্র	পু	৭৩	পুমর্থ	পু	৭৭	পুরাবৃত্ত	পৃ	১০০	পুরুষশার্দ্দুল	পৃ	১০০
পু(পূ)ত	পু	৭৪	পুদীনা	পৃ	১৬৫	পুমান	পু	৭৭	পুরারাতি	পৃ	১০০	পুরুষসিংহ	পৃ	১০০
পুতকী	পু	৭৩	পুদগল	পু	৭৩	পুয়া	পু	৮৯	পুরারি	পৃ	১০০	পুরুষসূক্ত	পৃ	১০০
পুতখাগী	পু	৭৪	পুন	পু	৭৭	পুর	পৃ	১২৬	পুরি	পৃ	১৩০	পুরুষাঙ্গ	পৃ	১০০
পুততী	পু	৭৩	পুনঃ	পু	৭৭	পুরকোট্ট	পৃ	১০০	পুরিয়া	পৃ	১৩০	পুরুষাদ	পৃ	১০০
পুতনা	পু	৭৩	পুনঃপুনঃ	পু	৭৭	পুরজিৎ	পৃ	১০০	পুরী	পৃ	১৩০	পুরুষাধিকার	পৃ	১০০
পুতর	পু	৭৩	পুনঃপুনা	পু	৭৩	পুরদেবতা	পৃ	১০০	পুরীষ	পৃ	১৩০	পুরুষানুক্রমিক	পৃ	১০০
পুতলি(লী)	পু	৭৩	পুনকেশরু	পু	৭৩	পুরদ্বিট্	পৃ	১০০	পুরু	পৃ	১৩১	পুরুষায়ুষ	পৃ	১০০
পুতা	পু	৭৩	পু(পূ)নমি	পৃ	১০০	পুরপাল	পৃ	১০০	পুরুখ	পৃ	১০০	পরুষার্থ	পৃ	১৩৪
পুতি	পু	৭৩	পু(পূ)ব	পৃ	১০০	পুরবাসী	পৃ	১০০	পুরুজিৎ	পৃ	১০০	পুরুষাশন	পৃ	১০০
পুতী	পু	৭৩	পুররপি	পু	৭৩	পুরভিৎ	পৃ	১০০	পুরুট	পৃ	১০০	পুরুষাশী	পৃ	১০০
পুতু-পুতু	পু	৭৩	পুনরাগত	পু	৭৩	পুরভেত্তা	ভিদ্	৩৯৮	পুরুত	পৃ	১৩১	পুরুষেন্দ্র	পৃ	১০০
পুতুল	পু	৭৩	পুনরাগম	পু	৭৩	পুরমার্গ	পৃ	১০০	পুরুতগিরী	পৃ	১৩১	পুরুষোত্তম	পৃ	১০০
পুতুলী	পু	৭৩	পুনরাগমন	পু	৭৩	পুররিপু	পৃ	১০০	পুরুতঠাকুর	পৃ	১৩১	পুরুষ্ট	পুষ্	৮২
পুত্তল	পু	৭৩	পুনরাচমনী	পু	৭৩	পুরশাসন	পৃ	১০০	পুরুতঠাকরুণ	পৃ	১৩১	পুরুষ্টু	পুষ্	৮২
পুত্তলক	পু	৭৩	পুনরাস্তদূষণ	পু	৭৩	পুরঃ (পুরস্)	পৃ	১২৭	পুরুব	পৃ	১০০	পুরুহূত	পৃ	১০০
পুত্তলি	পু	৭৩	পুনরাধান	পু	৭৩	পুরঃপাক	পৃ	১০০	পুরুল	পৃ	১০০	পুরূরবা	পৃ	১৩৫
পুত্তলিকা	পু	৭৩	পুনরাবর্ত্তী	পু	৭৩	পুরঃপ্রহর্ত্তা	পৃ	১২৭	পুরুষ	পৃ	১৩২	পুরোগ	পৃ	১৩৫
পুত্তলী	পু	৭৩	পুনরায়	পু	৭৭	পুরঃফল	পৃ	১০০	পুরুষক	পৃ	১০০	পুরোগামী	পৃ	১৩৫
পুত্তিকা	পু	৭৩	পুনরুক্ত	পু	৭৩	পুরঃসর	পৃ	১২৭	পুরুষকার	পৃ	১৩৩	পুরোডাশ	পৃ	১৩০
পুত্তুর	পু	৭৩	পুনরুক্তবদাভাস	পু	৭৩	পুরঞ্জন	পৃ	১০০	পুরুষকুঞ্জর	পৃ	১০০	পুরোধা	পৃ	১৩৫
পুত্র (পুত্ত্র)	পু	৭৬	পুনরুক্তি	পু	৭৩	পুরঞ্জয়	পৃ	১২৮	পুরুষকেশরী	পৃ	১০০	পুরোধাঃ	পৃ	১৩৫
পুত্রক	পু	৭৩	পুনরুপগম	পু	৭৩	পুরট	পৃ	১০০	পুরুষক্ষেত্র	পৃ	১০০	পুরোবর্ত্তী	পৃ	১৩৫
পুত্রকর্ম্ম	পু	৭৩	পুনরূঢ়া	পু	৭৩	পুরতঃ	পৃ	১০০	পুরুষগ্রহ	পৃ	১০০	পুরোবাত	পৃ	১০০
পুত্রকাম	পু	৭৩	পুনর্জ্জন্ম	পু	৭৩	পুরস্ত	পৃ	১০০	পুরুষজ্ঞান	পৃ	১৩৩	পুরোভাগ	পৃ	১৩৫
পুত্রকৃতক	পু	৭৩	পুনর্জ্জন্মা	পু	৭৩	পুরন্দর	পৃ	১২৮	পুরুষডাকিনী	পৃ	১৩৪	পুরোভাগী	পৃ	১৩৫
পুত্রজগ্ধী	পু	৭৩	পুনর্নব	পু	৭৩	পুরন্দরা	পৃ	১০০	পুরুষত্ব	পৃ	১০০	পুরোহিত	পৃ	১০০
পুত্রজাত	পু	৭৩	পুনর্নবা	পু	৭৭	পুরন্ধ্রি (ন্ধ্রী)	পৃ	১০০	পুরুষনাগ	পৃ	১০০	পুর্য্যষ্টক	পৃ	১০০
পুত্রজীব	পু	৭৩	পুনর্ব্বসু	পু	৭৭	পুরশ্চরণ	পৃ	১২৭	পুরুষপাগলী	পৃ	১০০	পুল	পুল্	৮০
পুত্রপৌত্রীণ	পু	৭৩	পুনর্ব্বার	পু	২৬০	পুরশ্চর্য্যা	পৃ	১২৭	পুরুষপুঙ্গব	পৃ	১০০	পুলক	পুল্	৮০
পুত্রহানী	পু	৭৩	পুনর্ব্বিবাহ	পু	৭৩	পুরস্কর	পৃ	১২৭	পুরুষপুণ্ডরীক	পৃ	১০০	পুলককুল	পুল্	৮০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পুলকঘটা	পুল্	৮০	পুষ্কলক	পুষ্	৮২	পুষ্পমাস	পুষ্	৮৮	পুস্তানি	পুষ্	৮২	পূতিকা	পূ	৭৭
পুলকপাঁতি	পুল্	৮০	পুষ্ট	পুষ্	৮৩	পুষ্পরজঃ	পুষ্	৮৮	পুস্তিকা	পুষ্	৮২	পূতিকাষ্ঠ	পূ	৭৭
পুলকপাঁতিয়া	পুল্	৮০	পুষ্টি	পুষ্	৮২	পুষ্পরেণু	পুষ্	৮৮	পুহপ	পুষ্	৮২	পূতিগন্ধ	পূ	৭৭
পুলকবলিত	পুল্	৮০	পুষ্টিকর	পুষ্	৮২	পুষ্পরথ	পুষ্	৮৮	পু(পো)হা	পুষ্	৮২	পূতিগন্ধ	পূ	৮৯
পুলকমণ্ডল	পুল্	৮০	পুষ্টিকান্ত	পুষ্	৮২	পুষ্পরাগ	পুষ্	৮৮	পূ	পূ	৮৯	পূতিতুণ্ড	পূ	৭৭
পুলকাঙ্কুর	পুল্	৮০	পুষ্টিকাম	পুষ্	৮২	পুষ্পলাব	পুষ্	৮৮	পূগ	পূ	৮৯	পূতিতুণ্ড	পূ	৭৩
পুলকায়িত	পুল্	৮০	পুষ্টিজনক	পুষ্	৮২	পুষ্পলাবী	পুষ্	৮৮	পূগপাত্র	পূ	৮৯	পূতিনস্য	পূ	৮৯
পুলকিত	পুল্	৮০	পুষ্টিবর্দ্ধন	পুষ্	৮২	পুষ্পলিট	পুষ্	৮৮	পূগপীঠ	পূ	৮৯	পূতিবক্ত্র	পূ	৮৯
পুলকী	পুল্	৮০	পুষ্প	পুষ্	৮৪	পুষ্পশর	পুষ্	৮৬	পূগপোত	পূ	৮৯	পূতিবাত	পূ	৮৯
পুলটিশ	পুল্	৮০	পুষ্পক	পুষ্	৮৪	পুষ্পসার	পুষ্	৮৬	পূগফল	পূ	৮৯	পূতিমৃত্তিকা	পূ	৮৯
পুলবন্দী	বন্ধ্	২৪৪	পুষ্পকাল	পুষ্	৮৫	পুষ্পস্বেদ	পুষ্	৮৬	পূজ্	পূজ্	১০০	পূৎকৃত	পূ	৮৯
পুলস্তি	পুল্	৮০	পুষ্পকাসীস	পুষ্	৮৬	পুষ্পহাস	পুষ্	৮৮	পূজ	পূজ্	১০০	পূপ	পূ	৮৯
পুলস্ত্য	পুল্	৮০	পুষ্পকেতন	পুষ্	৮৬	পুষ্পহীনা	পুষ্	৮৪	পূজক	পূজ্	১০০	পূপলা	পূ	৮৯
পুলহ	পুল্	৮১	পুষ্পকেতু	পুষ্	৮৬	পুষ্পাকর	পুষ্	৮৮	পূজন	পূজ্	১০০	পূপলিকা	পূ	৮৯
পুলা	পুল্	৮০	পুষ্পক্ষেপণী	পুষ্	৮৭	পুষ্পাগম	পুষ্	৮৫	পূজনীয়	পূজ্	১০০	পূপালী	পূ	৮৯
পু(পূ)লাক	পুল্	৮০	পুষ্পচাপ	পুষ্	৮৬	পুষ্পাজীব	পুষ্	৮৮	পূজনীয়া	পূজ্	১০০	পূয়	পূ	৯৭
পুলায়িত	পুল্	৮০	পুষ্পজ	পুষ্	৮৬	পুষ্পাজীবী	পুষ্	৮৮	পূজয়িতা	পূজ্	১০০	পূয়গন্ধ	পূ	৮৯
পুলি(লী)	পুল্	৮০	পুষ্পঝারা	পুষ্	৮৭	পুষ্পাঞ্জন	পুষ্	৮৮	পূজা	পূজ্	১০০	পূয়রক্ত	পূ	৮৯
পুলিন	পুল্	৮১	পুষ্পদন্ত	পুষ্	৮৪	পুষ্পায়ুধ	পুষ্	৮৬	পূজাকর	পূজ্	১০০	পূয়া	পূ	৯৭
পুলিনবতী	পুল্	৮১	পুষ্পদাম	পুষ্	৮৭	পুষ্পারণ্য	পুষ্	৮৮	পূজাপান	পূজ্	১০০	পূয়ারি	পূ	৯৭
পুলিনবিহারী	পুল্	৮১	পুষ্পদ্রব	পুষ্	৮৬	পুষ্পাসব	পুষ্	৮৬	পূজারী	পূজ্	১০০	পূর্	পূ	৮৯
পুলিনভোজন	পুল্	৮১	পুষ্পধনু	পুষ্	৮৬	পুষ্পাসার	পুষ্	৮৭	পূজার্হ	পূজ্	১০০	পূর	পূ	৯৭
পুলিন্দ	পুল্	৮০	পুষ্পধনুঃ	পুষ্	৮২	পুষ্পিকা	পুষ্	৮৮	পূজিত	পূজ্	১০০	পূরক	পূ	৯৭
পুলিন্দা	পুল্	৮০	পুষ্পধন্বা	পুষ্	৮৬	পুষ্পিণী	পুষ্	৮৫	পূজ্য	পূজ্	১০০	পূরকপিণ্ড	পূ	৮৯
পুলিশ(স)	পুল্	৮০	পুষ্পধ্বজ	পুষ্	৮৬	পুষ্পিত	পুষ্	৮২	পূজ্যতমতমোত্তর	পূজ্	১০০	পূরণ	পূ	৯৭
পুলোম	পুল্	৮২	পুষ্পনির্য্যাস	পুষ্	৮৬	পুষ্পিতা	পুষ্	৮৫	পূজ্যবান	পূজ্	১০০	পূরণী	পূ	৯৭
পুলোমজা	পুল্	৮২	পুষ্পন্ধয়	পুষ্	৮৭	পুষ্পী	পুষ্	৮৫	পূজ্যমান	পূজ্	১০০	পূরন্ত	পূ	৮৯
পুলোমজিৎ	পুল্	৮০	পুষ্পপত্রী	পুষ্	৮৬	পুষ্পেষু	পুষ্	৮৬	পূণ	পূ	৭৩	পূরব	পূ	৮৯
পুলোমদ্বিট	পুল্	৮০	পুষ্পপাত্র	পুষ্	৮৭	পুষ্পোৎকটা	পুষ্	৮৮	পূণ্ণ	পূ	৮৯	পূরবী	পূ	৮৯
পুলোমভিৎ	পুল্	৮০	পুষ্পপুট	পুষ্	৮৭	পুষ্পোৎসব	পুষ্	৮২	পূত	পূ	৭৪	পূরয়িতা	পূ	৮৯
পুলোমা	পুল্	৮২	পুষ্পপুর	পুষ্	৮৭	পুষ্য	পুষ্	৮৯	পূত	পূ	৭৭	পূরা	পূ	৮৯
পুষ্	পুষ্	৮২	পুষ্পপ্রচয়	পুষ্	৮৭	পুষ্যা	পুষ্	৮৯	পূতকরণ	পূ	৭৭	পূরান(নো)	পূ	৮৯
পুষ	পুষ্	৮২	পুষ্পপ্রস্তার	পুষ্	৮৭	পুষ্যাভিষেক	পুষ্	৮৯	পূতক্রতু	পূ	৭৭	পূরি(রী)	পূ	৮৯
পুষ্কর	পুষ্	৮৩	পুষ্প-ফেলাফেলি	পুষ্	৮৭	পুষ্যি	পুষ্	৮২	পূতগন্ধ	পূ	৭৭	পূরিকা	পূ	৮৯
পুষ্করনাভ	পুষ্	৮২	পুষ্পবড়্	পুষ্	৮৭	পুষ্যিপুত্তুর	পুষ্	৮২	পূতধান্য	পূ	৭৭	পূরিত	পূ	৮৯
পুষ্করপত্র(পর্ণ)	পুষ্	৮২	পুষ্পবতী	পুষ্	৮৫	পুস	পুষ্	৮২	পূতপাপ	পূ	৮৯	পূরী	পূ	৮৯
পুষ্করমূল	পুষ্	৮২	পুষ্পবর্ষণ	পুষ্	৮৭	পুসি	পুষ্	৮২	পূতনা	পূ	৭৭	পূরুব	পূ	৮৯
পুষ্করলোচন	পুষ্	৮২	পুষ্পবৃষ্টি	পুষ্	৮৭	পুসিদা	পুষ্	৮২	পূতা	পূ	৮৯	পূর্ণ	পূ	৯৮
পুষ্করাক্ষ	পুষ্	৮২	পুষ্পবাটিকা	পুষ্	৮৭	পুস্ত্	পুষ্	৮২	পূতাত্মা	পূ	৭৭	পূর্ণককুদ্	পূ	৮৯
পুষ্করাহ্ব	পুষ্	৮২	পুষ্পবাণ	পুষ্	৮৬	পুস্ত	পুষ্	৮২	পূতাত্মা	পূ	৭৩	পূর্ণকাম	পূ	৮৯
পুষ্করাহ্বয়	পুষ্	৮২	পুষ্পবান	পুষ্	৮৮	পুস্তক	পুষ্	৮২	পূতাম্বর	পূ	৮৯	পূর্ণকুম্ভ	পূ	৮৯
পুষ্করেক্ষণ	পুষ্	৮২	পুষ্পবৃক্ষ	পুষ্	৮৮	পুস্তকর্ম্মা	পুষ্	৮২	পূতি	পূ	৭৭	পূর্ণঘট	পূ	৮৯
পুষ্করিণী	পুষ্	৮৩	পুষ্পবেণী	পুষ্	৮৮	পুস্তকাগার	পুষ্	৮২	পূতিক	পূ	৭৩	পূর্ণপাত্র	পূ	৮৯
পুষ্কর্ণী	পুষ্	৮২	পুষ্পভঙ্গ	পুষ্	৮৮	পুস্তন	পুষ্	৮২	পূতিকরঞ্জ	পূ	৮৯	পূর্ণমা	পূ	৮৯
পুষ্কল	পুষ্	৮২	পুষ্পমালা	পুষ্	৮৮	পুস্তান	পুষ্	৮২	পূতিকর্ণক	পূ	৮৯	পূর্ণমাঃ	পূ	৮৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পূর্ণমাস	পূ	৮৯	পূর্ব্ববর্ত্তী	পূ	৯৯	পৃথগন্ন	পৃ	১৩৬	পৃষ্ঠ্য	পৃ	১০০	পেতি	প্র	১৩৯
পূর্ণহোম	পূ	৮৯	পূর্ব্ববৃত্ত	পূ	৮৯	পৃথা	পৃ	১৩৬	পৢ	পৃ	১০০	পেতিনী	প্র	১৩৯
পূর্ণাঙ্ক	পূ	৮৯	পূর্ব্বভাদ্রপদ	পূ	৮৯	পৃথিবী	পৃ	১৩৬	পেঁকো	পং	২	পেত্নী	প্র	১৬১
পূর্ণান(ল)ক	পূ	৮৯	পূর্ব্বভাব	পূ	৮৯	পৃথিবীদোহন	পৃ	১৩৭	পেঁচ (১৬)	পং	১০	পেতে	পত্	৩১
পূর্ণানন্দ	পূ	৮৯	পূর্ব্বমীমাংসা	পূ	৯৯	পৃথিবীপাল	পৃ	১০০	পেঁচড়া	পং	২	পেত্যয়	প্র	১৩৯
পূর্ণাবতার	পূ	৮৯	পূর্ব্বরঙ্গ	পূ	৮৯	পৃথিবীভুক	পৃ	১০০	পেঁচা	পং	১০	পেথা	পত্	৩১
পূর্ণাহুতি	পূ	৮৯	পূর্ব্বরাগ	পূ	৮৯	পৃথিবীভৃৎ	পৃ	১০০	পেঁচানো	পং	১০	পেথে	পত্	৩১
পূর্ণিত	পূ	৮৯	পূর্ব্বরাত্র	পূ	৮৯	পৃথিবীশ	পৃ	১০০	পেঁচাল	পং	১০	পেদো	প্	১৬৫
পূর্ণিমা	পূ	৯৮	পূর্ব্বরূপ	পূ	৮৯	পৃথিবীশ্বর	পৃ	১০০	পেঁচো	পং	১০	পেনটুলন	পণ্	২৬
পূর্ণেন্দু	পূ	৯৮	পূর্ব্বসন্ধ্যা	পূ	৮৯	পৃথু	পৃ	১৩৮	পেঁটরা	পট্	১৭	পেয়	পা	৫৪
পূর্ণোপমা	পূ	৮৯	পূর্ব্বসারী	পূ	৮৯	পৃথুক	পৃ	১০০	পেঁড়া	পিণ্ড্	৬৮	পেয়	পী	৭২
পূর্ত্ত	পূ	৯৮	পূর্ব্বাচল	পূ	৯৯	পৃথুল	পৃ	১০০	পেঁপে	প্	১৬৫	পেয়া	পা	৫৪
পূর্ত্তকর্ম্ম	পূ	৮৯	পূর্ব্বাঞ্চল	পূ	৮৯	পৃথুলা	পৃ	১০০	পেওঁপেওঁ	প্	১৬৫	পেয়াজ	পা	৫৪
পূর্ত্তদপ্তর	পূ	৯৮	পূর্ব্বাপর	পূ	৮৯	পৃথ্বী	পৃ	১৩৬	পেকম	পক্ষ্	১১	পেয়াদা	পা	৫৪
পূর্ত্তি	পূ	৯৮	পূর্ব্বাবেদক	পূ	৮৯	পৃথ্বীজ	পৃ	১০০	পেকাম্বর	পী	৭২	পেয়ারা	পা	৫৪
পূর্ব্ব	পূ	৯৯	পূর্ব্বাভিভাষী	পূ	৮৯	পৃথ্বীশ	পৃ	১০০	পেখ	পশ্	৫০	পেয়ালা	পা	৫৪
পূর্ব্বক	পূ	৮৯	পূর্ব্বাভ্যাস	পূ	৮৯	পৃদাকু	পৃ	১০০	পেখন	পশ্	৫০	পেয়ালা	পী	৭২
পূর্ব্বকর্ম্ম	পূ	৮৯	পূর্ব্বার্দ্ধ	পূ	৮৯	পৃষ্	পৃ	১০০	পেখন	পক্ষ্	১১	পেল	পল্	৪৫
পূর্ব্বকায়	পূ	৮৯	পূর্ব্বাশা	পূ	৯৯	পৃষৎ	পৃ	১০০	পেখনু	পশ্	৫০	পেল	পি	৬২
পূর্ব্বকাল	পূ	৮৯	পূর্ব্বাশ্রম	পূ	৯৯	পৃষতাশ্ব	পৃ	১০০	পেখম	পক্ষ্	১১	পেলব	পি	৬২
পূর্ব্বকৃত	পূ	৮৯	পূর্ব্বাষাঢ়া	পূ	৮৯	পৃষতী	পৃ	১০০	পেচ	পং	১০	পেলা	পি	৬২
পূর্ব্বকোটি	পূ	৮৯	পূর্ব্বাহ্ণ	পূ	৮৯	পৃষৎক	পৃ	১০০	পেচক	পচ্	১৬	পেলা	পল্	৪৫
পূর্ব্বগাঁই	পূ	৮৯	পূর্ব্বাহ্ণিক	পূ	৮৯	পৃষদশ্ব	পৃ	১০০	পেচপেচে	পচ্	১৬	পেলাপেলি	পল্	৪৫
পূর্ব্বচিত্তি	পূ	৯৯	পূর্ব্বোত্তর	পূ	৮৯	পৃষত্তি	পৃ	১০০	পেছন	পশ্	৬৪	পেল্লাদেপুতুল	পি	৬২
পূর্ব্বজ	পূ	৮৯	পূর্য্য	পূ	৮৯	পৃষোদর	পৃ	১০০	পেছু	পশ্	৫০	পেশ	পিশ্	৭১
পূর্ব্বজন্ম	পূ	৮৯	পূল	পূল্	৮০	পৃষ্ট	প্র	১৩৯	পেট	পট্	৬৪	পেশকার	পিশ্	৭১
পূর্ব্বজন্মা	পূ	৮৯	পূলক	পূল্	৮০	পৃষ্ঠ	পৃ	১০০	পেটক	পট্	১৭	পেশবা	পিশ্	৬৯
পূর্ব্বজা	পূ	৮৯	পূলাক	পূল্	৮০	পৃষ্ঠক	পৃ	১০০	পেটপঁ(পোঁ)দ	প্	১৬৫	পেশবাজ	পিশ্	৬৯
পূর্ব্বজ্ঞান	পূ	৮৯	পূলিকা	পূল্	৮০	পৃষ্ঠগোপ	পৃ	১০০	পেটভর	ভৃ	৪২৯	পেশবাজি	পিশ্	৬৯
পূর্ব্বতন	পূ	৯৯	পূষণ	পূষ্	৮৮	পৃষ্ঠগ্রন্থি	পৃ	১০০	পেটলা-পেটা	পট্	৬৪	পেশ(ষ,স)ল	পিশ্	৭১
পূর্ব্বদক্ষিণা	পূ	৮৯	পূষণা	পূষ্	৮৮	পৃষ্ঠতঃ	পৃ	১০০	পেটা	পট্	৬৪	পেশ(ষ)লী	পিশ্	৬৯
পূর্ব্বদিক	পূ	৮৯	পূষা	পূষ্	৮৮	পৃষ্ঠপোষক	পৃ	১০০	পেটাঙ্গি	পট্	১৭	পেশস্কৃৎ	পিশ্	৬৯
পূর্ব্বদিগীশ	পূ	৯৯	পৃক্কা	পৃ	১০০	পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃ	১০০	পেটারি	পট্	১৭	পেশা	পিশ্	৭১
পূর্ব্বদিষ্ট	পূ	৮৯	পৃক্ত	পৃ	১০০	পৃষ্ঠফল	পৃ	১০০	পেটারিক	পট্	১৭	পেশাব	প্র	১৩৯
পূর্ব্বদেব	পূ	৯৯	পৃক্তি	পৃ	১০০	পৃষ্ঠবংশ	পৃ	১০০	পেটারিকা	পট্	১৭	পেশি(শী)	পিশ্	৭১
পূর্ব্বদেবতা	পূ	৯৯	পৃচ্	পৃ	১০০	পৃষ্ঠবাস্তু	পৃ	১০০	পেটার্থী	পট্	১৭	পেশোয়াজ	পিশ্	৬৯
পূর্ব্বনিপাত	পূ	৮৯	পৃচ্ছক	পৃ	১০০	পৃষ্ঠবাহ	পৃ	১০০	পেটি(টী)	পট্	১৭	পেষ	পিশ্	৭১
পূর্ব্বপক্ষ	পূ	৮৯	পৃচ্ছা	পৃ	১০০	পৃষ্ঠব্রণ	পৃ	১০০	পেটিকা	পট্	১৭	পেষক	পিশ্	৭১
পূর্ব্বপদ	পূ	৮৯	পৃতনা	পৃ	১০০	পৃষ্ঠভঙ্গ	পৃ	১০০	পেটুক	পট্	১৭	পেষণ	পিশ্	৭১
পূর্ব্বপীঠিকা	পূ	৮৯	পৃথক্	পৃ	১৩৫	পৃষ্ঠমাংস	পৃ	১০০	পেটে	পট্	১৭	পেষণী	পিশ্	৭১
পূর্ব্বপুরুষ	পূ	৮৯	পৃথক্করণ	পৃ	১০০	পৃষ্ঠরক্ষ	পৃ	১০০	পেটো	পট্	১৭	পেষা	পিশ্	৭১
পূর্ব্বফল্গুনী	পূ	৮৯	পৃথক্ত্ব	পৃ	১৩৫	পৃষ্ঠশয়	পৃ	১০০	পেড়া	পট্	১৭	পেষাণ	পিশ্	৭১
পূর্ব্ববঙ্গ	বঙ্	২১২	পৃথগ্জন	পৃ	১৩৫	পৃষ্ঠাঘাত	পৃ	১০০	পেড়ি(ড়ী)	পট্	১৭	পেসা	পিশ্	৬৯
পূর্ব্ববৎ	পূ	৮৯	পৃথগ্বিধ	পৃ	১৩৫	পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি	পৃ	১০০	পেণ্টুলন	পণ্	২৬	পেস্তা	পিশ্	৭১
পূর্ব্ববাদ	পূ	৮৯	পৃথক্পিণ্ড	পৃ	১০০	পৃষ্ঠাস্থি	পৃ	১০০	পেতা	প্র	১৩৯	পৈঁচি	পশ্	৬৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
পৈঁছে	পশ্	৫০	পোওয়া	পু	৭৩	পোতভঙ্গ	পু	৭৯	পোষ্টাই	পুষ্	৮২	পৌরুষেয়	পৃ	১০০
পৈগম্বর	পী	৭২	পোঁ	পু	৭৩	পোতমাঝি	পূ	৮৯	পোষ্য	পুষ্	৮৯	পৌরুহূত	পৃ	১০০
পৈঘর	পী	৭২	পোঁআর	প্	১৬৫	পোতলি	পু	৭৩	পোষ্যপুত্র	পুষ্	৮৯	পৌরুহূতী	পৃ	১০০
পৈছি	পশ্	৫০	পোঁচ	পচ্	১২	পোতস্বামী	পু	৭৯	পোষ্যবর্গ	পুষ্	৮৯	পৌরোভাগ্য	পৃ	১০০
পৈঠ	প্র	১৩৯	পোঁচ(ছ)	প্	১৬৫	পোতপ্লব	পু	৭৯	পোষ্যমঙ্গল	পুষ্	৮২	পৌরোহিত্য	পৃ	১০০
পৈঠর	পৃ	১০০	পোঁচা(ছা)	প্	১৬৫	পোতা	পু	৭৪	পোস্ত	পুষ্	৮২	পৌর্ণমাস	পৃ	১০০
পৈঠা	প্র	১৩৯	পোঁটলা	পু	৭৩	পোতাঘর	পূ	৮৯	পোস্তা	পুষ্	৮২	পৌর্ত্তিক	পৃ	১০০
পৈঠে	প্র	১৩৯	পোঁটা	পু	৭৩	পোতাধান	পু	৭৩	পোহ	পূ	৮৯	পৌর্ব্বদেহিক	পৃ	১০০
পৈতা	পূ	৮৯	পোঁতা	পু	৭৪	পোতামাজী(ঝি)	পূ	৮৯	পোহা	পূ	৮৯	পৌর্ব্বাপর্য্য	পৃ	১০০
পৈতাধারী	পূ	৮৯	পোঁদ	পণ্	২৬	পোতিক	পু	৭৩	পোহান	পূ	৮৯	পৌর্ব্বাহ্নিক	পৃ	১০০
পৈতান	পূ	৮৯	পোঁদপিছেলি	পণ্	২৬	পোতী	পু	৭৩	পোহাবারো	পূ	৮৯	পৌর্ব্বিক	পৃ	১০০
পৈতামহ	পা	৫৪	পোক	পচ্	১২	পোত্র	পূ	৮৯	পৌংশ্চলেয়	পু	৭৩	পৌলস্তী	পুল্	৮০
পৈতৃক	পা	৫৪	পোকা	পচ্	১২	পোত্রী	পূ	৮৯	পৌংস্ন	পু	৭৩	পৌলস্ত্য	পুল্	৮০
পৈতৃকযাজ্ঞিক	পা	৫৪	পোক্ত	পচ্	১২	পোথা	পুষ্	৮২	পৌঁচ	পং	২	পৌলোম	পুল্	৮২
পৈতৃষ্বসেয়	পা	৫৪	পোখরী	প্	১৬৫	পোদ্দার	পু	৭৯	পৌঁছ	পং	১০	পৌলোমী	পুল্	৮২
পৈতৃষ্রীয়	পা	৫৪	পোগণ্ড	প্	১৬৫	পোন	পু	৭৩	পৌঁছা	পং	১০	পৌষ	পুষ্	৮৯
পৈত্তিক	পা	৫৪	পোঙা	প্	১৬৫	পোনা	পু	৭৩	পৌঁছান	পং	১০	পৌষ্য	পুষ্	৮২
পৈত্র	পা	৫৪	পোঙ্গা	প্	১৬৫	পোপান	পুল্	৮০	পৌখ	পুষ্	৮২	পৌষ্টিক	পুষ্	৮২
পৈত্রিক	পা	৫৪	পোচ	প্	১৬৫	পো-মশায়	পু	৭৩	পৌগণ্ড	পু	৭৩	পৌষ্ণ	পুষ্	৮২
পৈথান	পদ্	৩৮	পোট	পু	৭৩	পোয়া	পু	৭৩	পৌগণ্ডক	পু	৭৩	পৌষ্প	পুষ্	৮২
পৈপ্পল	পি	৬২	পোটলিকা	পু	৭৩	পোয়া	পূ	৮৯	পৌটি(টী)	পট্	১৭	পৌষ্পী	পুষ্	৮২
পৈবস্তি	প্র	১৩৯	পোটা	পু	৭৩	পোয়াতী	পু	৭৩	পৌণ্ড্র	পুড়্	৭৯	প্যাংটা	প্	১৬৫
পৈয়িস	পী	৭২	পোট্টলিকা	পু	৭৩	পোয়ান	পী	৭২	পৌণ্ড্রক	পুড়্	৭৯	প্যাঁচ	পং	১৬
পৈর	প্	১৬৫	পোট্টলী	পু	৭৩	পোয়াবারো	পূ	৮৯	পৌণ্ড্রিক	পুড়্	৭৯	প্যাঁচা	পং	১৬
পৈরণ	প্	১৬৫	পোড়া	পু	৭৩	পোয়ান	পূ	৮৯	পৌণ্ড্রিকবাসুদেব	পুড়্	৭৯	প্যাঁচানো	পং	২
পৈরা	প্	১৬৫	পোড়	পুড়্	৭৯	পোলাপান	পুল্	৮০	পৌতিনাসিক্য	পূ	৮৯	প্যাঁটরা	পট্	১৭
পৈরাগ	প্	১৬৫	পোড়ন	পুড়্	৭৯	পোলিন্দ	পূ	৮৯	পৌত্তলিক	পু	৭৩	প্যাট	পট্	১৭
পৈরানা	প্	১৬৫	পোড়নি(নী)	পুড়্	৭৯	পোলো	পূ	৮৯	পৌত্তিক	পু	৭৩	প্যাটেরা	পট্	১৭
পৈল	প্	১৬৫	পোড়া	পুড়্	৭৯	পোয়াল	পল্	৪৫	পৌত্তুর	পু	৭৩	প্যাদা	শ্বি	৬২
পৈশ(স)	প্র	১৩৯	পোড়াকপালী	পুড়্	৭৯	পোশ	পুষ্	৮২	পৌত্র	পু	৭৩	প্যান	পী	৭২
পৈশ	পিশ্	৬৯	পোড়ামুখী	পুড়্	৭৯	পোশা(যা)ক	পুষ্	৮২	পৌত্ত্র	পু	৭৩	প্যায়ন	পী	৭২
পৈশাচ	পিশ্	৬৯	পোড়ামুখো	পুড়্	৭৯	পোষ	পুষ্	৮৯	পৌনঃপুনিক	পু	৭৩	প্যানপ্যান	পী	৫৬
পৈশাচী	পিশ্	৬৯	পোড়ারমুখী	পুড়্	৭৯	পোষক	পুষ্	৮৯	পৌনরুক্ত(ক্ত্য)	পু	৭৩	প্যায়্	পী	৭২
পৈশুন	পিশ্	৬৯	পোড়েল	পুড়্	১২৫	পোষকতা	পুষ্	৮৯	পৌনর্ভব	পু	৭৩	প্যার	প্রী	১৬২
পৈশুন্য	পিশ্	৬৯	পোণ	প্	১৬৫	পোষণ	পুষ্	৮৯	পৌনে	পু	৪৫	প্যালা	পি	৬২
পৈষ্ট	পুষ্	৮২	পোন	প্	১৬৫	পোষণীয়	পুষ্	৮৯	পৌনে	পদ্	৩৮	প্র	প্র	১৪২
পৈষ্টিক	পুষ্	৮২	পোত	পূ	৭৯	পোষণীয়া	পুষ্	৮২	পৌর	পৃ	১০০	প্রকট	প্র	১৪৩
পৈষ্ঠী	পুষ্	৮২	পোতক	পু	৭৩	পোষা	পুষ্	৮৯	পৌরব	পৃ	১০০	প্রকটন	প্র	১৩৯
পৈস	পিশ্	৬৯	পোতজ	পূ	৮৯	পোষাণ	পুষ্	৮৯	পৌরষ	পৃ	১০০	প্রকটিত	প্র	১৩৯
পো	পু	৯৭	পোতগামী	পূ	৮৯	পোষিণী	পুষ্	৮২	পৌরস্ত্য	পৃ	১০০	প্রকটীকরণ	প্র	১৩৯
পোঅ	পু	৭৩	পোতদার	পূ	৭৯	পোষিত	পুষ্	৮৯	পৌরহিত্য	পৃ	১০০	প্রকত	প্র	১৩৯
পোআতি	পু	৭৩	পোতন	পূ	৮৯	পোষিতা	পুষ্	৮২	পৌরাণ	পৃ	১০০	প্রকম্প	প্র	১৩৯
পোআল	প্	১৬৫	পোতপ্লব	পু	৭৩	পোষী	পুষ্	৮২	পৌরাণিক	পৃ	১০০	প্রকর	প্র	১৩৯
পোয়াল	পু	৭৩	পোতবণিক	পূ	৭৯	পোষিত্রী	পুষ্	৮২	পৌরী	পৃ	১০০	প্রকরণ	প্র	১৩৯
পোই	পু	৭৩	পোতবাহ	পু	৭৯	পোষ্টা	পুষ্	৮২	পৌরুষ	পৃ	১০০	প্রকরণী	প্র	১৩৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
প্রকরী	প্র ১৩৯	প্রক্ষেপ	প্র ১৩৯	প্রচার	প্র ১৩৯	প্রজাধব	প্র ১৩৯	প্রণালী	প্র ১৩৯
প্রকর্ষ	প্র ১৩৯	প্রক্ষেপণ	প্র ১৩৯	প্রচারক	প্র ১৩৯	প্রজানাথ	প্র ১৩৯	প্রণাশ	প্র ১৩৯
প্রকর্ষণ	প্র ১৩৯	প্রক্ষেপ্তব্য	প্র ১৩৯	প্রচারণ	প্র ১৩৯	প্রজাপতি	প্র ১৪৩	প্রণাশন	প্র ১৩৯
প্রকর্ষী	প্র ১৩৯	প্রক্ষ্বেড়ন	প্র ১৩৯	প্রচারিত	প্র ১৩৯	প্রজাপতিতন্ত্র	প্র ১৪৩	প্রণাশী	প্র ১৩৯
প্রকল্পনা	প্র ১৩৯	প্রখর	প্র ১৩৯	প্রচারী	প্র ১৩৯	প্রজাপাল	প্র ১৩৯	প্রণিধান	প্র ১৩৯
প্রকল্প্য	প্র ১৩৯	প্রখ্য	প্র ১৩৯	প্রচিকীর্ষু	প্র ১৩৯	প্রজাপোষ	প্র ১৩৯	প্রণিপাত	পত্‌ ৩১
প্রকাণ্ড	প্র ১৩৯	প্রখ্যা	প্র ১৩৯	প্রচিত	প্র ১৩৯	প্রজাবান	প্র ১৩৯	প্রণিহিত	প্র ১৩৯
প্রকাম	প্র ১৩৯	প্রখ্যাত	প্র ১৩৯	প্রচিত্র	প্র ১৩৯	প্রজাবৃদ্ধি	প্র ১৩৯	প্রণী	প্র ১৩৯
প্রকার	প্র ১৩৯	প্রখ্যাতি	প্র ১৩৯	প্রচুর	প্র ১৩৯	প্রজারঞ্জন	প্র ১৩৯	প্রণীত	প্র ১৩৯
প্রকাশ	প্র ১৪৩	প্রখ্যান	প্র ১৩৯	প্রচেতা	প্র ১৪৫	প্রজালোপ	প্র ১৩৯	প্রণীতা	প্র ১৩৯
প্রকাশক	প্র ১৩৯	প্রখ্যাপন	প্র ১৩৯	প্রচেতাঃ	প্র ১৪৫	প্রজেশ্বর	প্র ১৩৯	প্রণুত	প্র ১৩৯
প্রকাশন	প্র ১৩৯	প্রগণ্য	প্র ১৩৯	প্রচেষ্টা	প্র ১৩৯	প্রজাসৃষ্টি	প্র ১৪৬	প্রণুত্ত	প্র ১৩৯
প্রকাশিত	প্র ১৩৯	প্রগণ্ড	প্র ১৩৯	প্রচোদন	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞ	প্র ১৪৯	প্রণুন্ন	প্র ১৩৯
প্রকাশ্য	প্র ১৩৯	প্রগণ্ডী	প্র ১৩৯	প্রচোদিত	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞপ্তি	প্র ২৯৮	প্রণেতা	প্র ১৩৯
প্রকীর্ণ	প্র ১৩৯	প্রগত	প্র ১৩৯	প্রচ্ছ্‌	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞা	প্র ২৯৭	প্রণেয়	প্র ১৩৯
প্রকীর্ণক	প্র ১৩৯	প্রগতি	প্র ১৩৯	প্রচ্ছক	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞাচক্ষুঃ	প্র ১৩৯	প্রণোদিত	প্র ১৩৯
প্রকীর্ত্তন	প্র ১৩৯	প্রগল্‌ভ	প্র ১৩৯	প্রচ্ছদ	প্র ১৪৬	প্রজ্ঞাত	প্র ১৪৯	প্রণোদ্য	প্র ১৩৯
প্রকীর্ত্তিত	প্র ১৩৯	প্রগল্‌ভতা	প্র ১৩৯	প্রচ্ছন্ন	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞান	প্র ১৪৯	প্রততি	প্র ১৩৯
প্রকুপিত	প্র ১৩৯	প্রগল্‌ভা	প্র ১৩৯	প্রচ্ছর্দ্দন	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞাবাদ	প্র ১৩৯	প্রতনু	প্র ১৩৯
প্রকৃত	প্র ১৪৩	প্রগাঢ়	প্র ১৩৯	প্রচ্ছর্দ্দিকা	প্র ১৩৯	প্রজ্ঞাবান	প্র ১৩৯	প্রতর	প্র ১৩৯
প্রকৃতি	প্র ১৪৩	প্রগাতা	প্র ১৩৯	প্রচ্ছাদৃক	প্র ১৩৯	প্রজ্বলন	প্র ১৩৯	প্রতরণ	প্র ১৩৯
প্রকৃতিজ	প্র ১৩৯	প্রগীত	প্র ১৩৯	প্রচ্ছাদন	প্র ১৩৯	প্রজ্বলিত	প্র ১৩৯	প্রতল	প্র ১৩৯
প্রকৃতিপুত্র	প্র ১৩৯	প্রগুণ	প্র ১৩৯	প্রচ্ছাদিত	প্র ১৩৯	প্রজ্বালিত	প্র ১৩৯	প্রতান	প্র ১৫০
প্রকৃতি-প্রত্যয়	প্র ১৪৫	প্রগুণিত	প্র ১৩৯	প্রচ্ছায়	প্র ১৩৯	প্রডীন	প্র ১৩৯	প্রতানী	প্র ১৩৯
প্রকৃতি-প্রত্যয়	প্র ১৫৪	প্রগৃহ্য	প্র ১৩৯	প্রচ্ছায়া	প্র ১৩৯	প্রণত	প্র ১৫০	প্রতান্ত	প্র ১৩৯
প্রকৃতিমান	প্র ১৩৯	প্রগে	প্র ১৩৯	প্রচ্যবন	প্র ১৩৯	প্রণতি	প্র ১৫০	প্রতাপ	প্র ১৩৯
প্রকৃতিরঞ্জন	প্র ১৩৯	প্রগ্রহ	প্র ১৩৯	প্রচ্যুতি	প্র ১৩৯	প্রণদিত	প্র ১৩৯	প্রতাপন	প্র ১৩৯
প্রকৃতিসিদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রগ্রহণ	প্র ১৩৯	প্রজন	প্র ১৪৬	প্রণন্তব্য	প্র ১৩৯	প্রতাপী	প্র ১৩৯
প্রকৃতিস্থ	প্র ১৪৩	প্রগাহ	প্র ১৩৯	প্রজনন	প্র ১৪৬	প্রণব	প্র ১৪৯	প্রতারক	প্র ১৫০
প্রকৃষ্ট	প্র ১৩৯	প্রঘ(ঘা)ণ	প্র ১৩৯	প্রজনয়িতা	প্র ১৩৯	প্রণম	প্র ১৩৯	প্রতারণা	প্র ১৫০
প্রক্খর	প্র ১৩৯	প্রঘাত	প্র ১৩৯	প্রজন্ম	প্র ১৪৬	প্রণমিত	প্র ১৫০	প্রতি	প্র ১৫০
প্রকৢপ্ত	প্র ১৩৯	প্রঘুণ	প্র ১৩৯	প্রজবন	প্র ১৩৯	প্রণম্য	প্র ১৫০	প্রতিআশ	প্র ১৩৯
প্রকোপ	প্র ১৩৯	প্রঘূর্ণ	প্র ১৩৯	প্রজবী	প্র ১৩৯	প্রণয়	প্র ১৫০	প্রতিকণ্ঠ	প্র ১৩৯
প্রকোপন	প্র ১৩৯	প্রঘোষ	প্র ১৩৯	প্রজল্প	প্র ১৩৯	প্রণয়ন	প্র ১৫০	প্রতিকর্ত্তা	প্র ১৩৯
প্রকোপিত	প্র ১৩৯	প্রচণ্ড	প্র ১৩৯	প্রজল্পন	প্র ১৩৯	প্রণয়বান	প্র ১৩৯	প্রতিকর্ম্ম	প্র ১৩৯
প্রকোষ্ঠ	প্র ১৩৯	প্রচণ্ডা	প্র ১৩৯	প্রজল্পনা	প্র ১৩৯	প্রণয়াপরাধ	প্র ১৩৯	প্রতিকর্ষ	প্র ১৩৯
প্রকোষ্ঠক	প্র ১৩৯	প্রচয়	প্র ৩০৬	প্রজা	প্র ১৪৬	প্রণয়ী	প্র ১৫০	প্রতিকায়	প্র ১৩৯
প্রক্রিয়া	প্র ১৩৯	প্রচয়ন	প্র ১৩৯	প্রজাকাম	প্র ১৩৯	প্রণয়িনী	প্র ১৩৯	প্রতি(কী)কার	প্র ১৫১
প্রক(ক্বা)ণ	প্র ১৩৯	প্রচর	প্র ১৩৯	প্রজাকর	প্র ১৩৯	প্রণষ্ট	প্র ১৩৯	প্রতি(তী)কাশ	প্র ১৩৯
প্রক্ষরণ	প্র ১৩৯	প্রচরদ্রূপ	প্র ১৩৯	প্রজাগর	প্র ১৩৯	প্রণাদ	প্র ১৩৯	প্রতিকিতব	প্র ১৩৯
প্রক্ষাল	প্র ১৩৯	প্রচল	• প্র ১৪৫	প্রজাত	প্র ১৩৯	প্রণাম	প্র ১৫০	প্রতিকূল	প্র ১৩৯
প্রক্ষালক	প্র ১৩৯	প্রচলন	প্র ১৪৫	প্রজাতন্তু	প্র ১৩৯	প্রণামি(মী)	প্র ১৫০	প্রতিকৃত	প্র ১৩৯
প্রক্ষালন	প্র ১৩৯	প্রচলিত	প্র ১৪৫	প্রজাতন্ত্র	প্র ১৪৯	প্রণায্য	প্র ১৩৯	প্রতিকৃতি	প্র ১৫১
প্রক্ষালিত	প্র ১৩৯	প্রচলাকী	প্র ১৩৯	প্রজাতি.	প্র ১৩৯	প্রণাল	প্র ১৩৯	প্রতিক্রিয়া	প্র ১৫০
প্রক্ষিপ্ত	প্র ১৩৯	প্রচায়	প্র ১৩৯	প্রজাতীর্থ	প্র ১৩৯	প্রণালিকা	প্র ১৩৯	প্রতিক্রিয়াশীল	প্র ১৫০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
প্রতিক্ষণ	প্র ১৩৯	প্রতিপদ	প্র ১৫২	প্রতিবস্তু	প্র ১৩৯	প্রতিভাস	প্র ১৩৯	প্রতিশ্রব	প্র ১৩৯
প্রতিক্ষিপ্ত	প্র ১৩৯	প্রতিপদ	পদ্ ৪০	প্রতিবাক্	প্র ১৩৯	প্রতিভিন্ন	প্র ১৩৯	প্রতিশ্রবণ	প্র ১৩৯
প্রতিক্ষেপ	প্র ১৩৯	প্রতিপদা	প্র ১৩৯	প্রতিবাক্য	প্র ১৩৯	প্রতিভূ	প্র ১৩৯	প্রতিশ্রুৎ	প্র ১৩৯
প্রতিগত	প্র ১৩৯	প্রতিপন্ন	প্র ১৫২	প্রতিবাত	প্র ১৩৯	প্রতিভূ	ভূ ৪১৬	প্রতিশ্রুত	প্র ১৩৯
প্রতিগৃহীত	প্র ১৩৯	প্রতিপাণ	প্র ১৩৯	প্রতিবাদ	প্র ১৩৯	প্রতিভেদন	প্র ১৩৯	প্রতিশ্রুতি	প্র ১৩৯
প্রতিগ্রহ	প্র ১৫১	প্রতিপাত্র	প্র ১৩৯	প্রতিবাদ	বদ্ ২৩৩	প্রতিম	প্র ১৩৯	প্রতিশ্রয়	প্র ১৩৯
প্রতিগ্রহণ	প্র ১৩৯	প্রতিপাদক	প্র ১৩৯	প্রতিবাদিনী	প্র ১৩৯	প্রতিম	মা ৫৩২	প্রতিষিদ্ধ	প্র ১৩৯
প্রতিগ্রহীতা	প্র ১৩৯	প্রতিপাদন	পদ্ ১৫২	প্রতিবাদী	প্র ২৩৩	প্রতিমল্ল	প্র ১৩৯	প্রতিষেদ্ধা	প্র ১৩৯
প্রতিগ্রাহ	প্র ১৩৯	প্রতিপাদয়িতা	প্র ১৩৯	প্রতিবাদী	বদ্ ২৩১	প্রতিমা	প্র ১৩৯	প্রতিষেধ	প্র ১৩৯
প্রতিগ্রাহী	প্র ১৩৯	প্রতিপাদিত	প্র ১৫২	প্রতিবাধক	প্র ১৩৯	প্রতিমা	মা ৫৩২	প্রতিষেধক	প্র ১৩৯
প্রতিঘ	প্র ১৩৯	প্রতিপাদ্য	পদ্ ১৫২	প্রতিবাধন	প্র ১৩৯	প্রতিমান	প্র ১৩৯	প্রতিষেধন	প্র ১৩৯
প্রতিঘাত	প্র ১৩৯	প্রতিপালক	প্র ১৩৯	প্রতিবারণ	প্র ১৩৯	প্রতিমিত	প্র ১৩৯	প্রতিষেধনীয়	প্র ১৩৯
প্রতিঘাতন	প্র ১৩৯	প্রতিপালক	পল্ ১৫৩	প্রতিবাসর	প্র ১৩৯	প্রতিমুক্ত	প্র ১৩৯	প্রতিষ্টব্ধ	প্র ১৩৯
প্রতিঘাতী	প্র ১৩৯	প্রতিপালন	প্র ১৫৩	প্রতিবাসিনী	প্র ১৩৯	প্রতিমুখ	প্র ১৩৯	প্রতিষ্টম্ভ	প্র ১৩৯
প্রতিচন্দ্র	প্র ১৩৯	প্রতিপালনীয়	প্র ১৫৩	প্রতিবাসী	প্র ১৩৯	প্রতিমূর্ত্তি	প্র ১৩৯	প্রতিষ্ঠ	প্র ১৩৯
প্রতিচিকীর্ষা	প্র ১৩৯	প্রতিপালয়িতব্য	প্র ১৫৩	প্রতিবিধ(া)	প্র ১৩৯	প্রতিমোচন	প্র ১৩৯	প্রতিষ্ঠা	প্র ১৩৯
প্রতিচ্ছন্দ	প্র ১৩৯	প্রতিপালিত	প্র ১৫৩	প্রতিবিধান	প্র ১৩৯	প্রতিযত্ন	প্র ১৩৯	প্রতিষ্ঠাতা	প্র ১৩৯
প্রতিচ্ছায়া	প্র ১৩৯	প্রতিপালী	প্র ১৫৩	প্রতিবিধিৎসা	প্র ১৩৯	প্রতিযাতন	প্র ১৩৯	প্রতিষ্ঠান	প্র ১৩৯
প্রতিজিহ্বা	প্র ১৩৯	প্রতিপুরুষ	প্র ১৩৯	প্রতিবিম্ব	প্র ১৩৯	প্রতিযাতনা	প্র ১৩৯	প্রতিষ্ঠাপন	প্র ১৩৯
প্রতিজ্ঞা	প্র ১৫২	প্রতিপুস্তক	প্র ১৩৯	প্রতিবিম্বন	প্র ১৩৯	প্রতিযুদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রতিষ্ঠিত	প্র ১৩৯
প্রতিজ্ঞাত	প্র ১৫২	প্রতিপূজক	প্র ১৩৯	প্রতিবিম্বিত	প্র ১৩৯	প্রতিযুবতী	প্র ১৩৯	প্রতিসংহার	প্র ১৩৯
প্রতিজ্ঞান	প্র ১৫২	প্রতিপূজন	প্র ১৩৯	প্রতিবীর	প্র ১৩৯	প্রতিযোগ	প্র ১৩৯	প্রতিসন্দেশ	প্র ১৩৯
প্রতিতান	প্র ১৩৯	প্রতিপূজিত	প্র ১৩৯	প্রতিবীর্য্য	প্র ১৩৯	প্রতিযোগিতা	প্র ১৩৯	প্রতিসন্ধান	প্র ১৩৯
প্রতিদর্শন	প্র ১৩৯	প্রতিপোষক	প্র ১৩৯	প্রতিবুদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রতিযোগী	প্র ১৩৯	প্রতিসর	প্র ১৩৯
প্রতিদান	প্র ১৫২	প্রতিপ্রণাম	প্র ১৩৯	প্রতিবেদন	প্র ১৩৯	প্রতিযোদ্ধা	প্র ১৩৯	প্রতিসর্গ	প্র ১৩৯
প্রতিদিন	প্র ১৩৯	প্রতিপ্রদান	প্র ১৩৯	প্রতিবেদন	বিদ্ ৩১৪	প্রতিযোধ	প্র ১৩৯	প্রতিসারণ	প্র ১৩৯
প্রতিদিবস	প্র ১৩৯	প্রতিপ্রয়াণ	প্র ১৩৯	প্রতিবেশ	প্র ৩৩২	প্রতিরথ	প্র ১৩৯	প্রতিসীরা	প্র ১৩৯
প্রতিদেয়	প্র ১৩৯	প্রতিপ্রসব	প্র ১৩৯	প্রতিবেশিনী	প্র ১৩৯	প্রতিরব	প্র ১৩৯	প্রতিসূর্য্য	প্র ১৩৯
প্রতিদ্বন্দ্ব	প্র ১৩৯	প্রতিপ্রস্থান	প্র ১৩৯	প্রতিবেশী	প্র ৩৩২	প্রতিরাজ	প্র ১৩৯	প্রতিসূর্য্যক	প্র ১৩৯
প্রতিদ্বন্দ্বী	প্র ১৩৯	প্রতিপ্রহার	প্র ১৩৯	প্রতিবেশী	বিশ্ ৩২১	প্রতিরুদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রতিস্পর্দ্ধা	প্র ১৩৯
প্রতিধ্বনি	প্র ১৫২	প্রতিপ্রিয়	প্র ১৩৯	প্রতিবেশ্ম	প্র ১৩৯	প্রতিরূপ	প্র ১৩৯	প্রতিস্পর্দ্ধী	প্র ১৩৯
প্রতিধ্বান	প্র ১৩৯	প্রতিফল	প্র ১৩৯	প্রতিবৈর	প্র ১৩৯	প্রতিরূপক	প্র ১৩৯	প্রতিস্রোতঃ	প্র ১৩৯
প্রতিনব	প্র ১৩৯	প্রতিফলন	প্র ১৩৯	প্রতিবোধ	প্র ১৩৯	প্রতিরোদ্ধা	প্র ১৩৯	প্রতিস্বন	প্র ১৩৯
প্রতিনাদ	প্র ১৩৯	প্রতিফলিত	প্র ১৩৯	প্রতিবোধক	প্র ১৩৯	প্রতিরোধ	প্র ১৩৯	প্রতিস্বর	প্র ১৩৯
প্রতিনায়ক	প্র ১৩৯	প্রতিবক্তব্য	প্র ১৩৯	প্রতিবোধন	প্র ১৩৯	প্রতিরোধক	প্র ১৩৯	প্রতিহত	প্র ১৩৯
প্রতিনিতি	প্র ১৩৯	প্রতিবচঃ	প্র ১৩৯	প্রতিবোধিত	প্র ১৩৯	প্রতিরোধন	প্র ১৩৯	প্রতিহতি	প্র ১৩৯
প্রতিনিধি	প্র ১৫২	প্রতিবচন	প্র ১৩৯	প্রতিব্যূহ	প্র ১৩৯	প্রতিরোধী	প্র ১৩৯	প্রতিহর্ত্তা	প্র ১৩৯
প্রতিনিবর্ত্তন	প্র ১৩৯	প্রতিবদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রতিভ	ভা ৩৯০	প্রতিলিপি	প্র ১৩৯	প্রতিহস্তক	প্র ১৩৯
প্রতিনিয়ত	প্র ১৫২	প্রতিবনিতা	প্র ১৩৯	প্রতিভট	প্র ১৩৯	প্রতিলোম	প্র ১৩৯	প্রতি(তী)হার	প্র ১৩৯
প্রতিনির্দ্দেশ	প্র ১৩৯	প্রতিবন্ধ	প্র ২৪৪	প্রতিভয়	প্র ১৩৯	প্রতিশব্দ	প্র ১৩৯	প্রতিহারী	প্র ১৩৯
প্রতিপক্ষ	প্র ১৩৯	প্রতিবন্ধক	প্র ২৪৪	প্রতিভা	প্র ১৩৯	প্রতিশয়ন	প্র ১৩৯	প্রতিহিংসা	প্র ১৩৯
প্রতিপণ	প্র ১৩৯	প্রতিবন্ধী	প্র ২৪৪	প্রতিভা	ভা ৩৯০	প্রতিশাসন	প্র ১৩৯	প্রতিহিংসিত	প্র ১৩৯
প্রতিপত্তি	প্র ১৩৯	প্রতিবর্ণ	প্র ১৩৯	প্রতিভাত	প্র ১৩৯	প্রতিশীর্ষক	প্র ১৩৯	প্রতীক	প্র ১৫৩
প্রতিপত্তি	পদ্ ৩৮	প্রতিবল	প্র ১৩৯	প্রতিভাতি	প্র ১৩৯	প্রতিশ্যা	প্র ১৩৯	প্রতীকী	প্র ১৫৩
প্রতিপথ	প্র ১৩৯	প্রতিবসথ	প্র ১৩৯	প্রতিভান	প্র ১৩৯	প্রতিশ্যায়	প্র ১৩৯	প্রতীক্ষক	প্র ১৩৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
প্রতীক্ষণ	প্র	১৩৯	প্রত্যবস্কন্দ	প্র	১৩৯	প্রত্যাহরণ	প্র	১৩৯	প্রদর	প্র	১৩৯	প্রধ্বংসী	প্র	১৩৯
প্রতীক্ষা	প্র	১৩৯	প্রত্যবস্থাতা	প্র	১৩৯	প্রত্যাহার	প্র	১৩৯	প্রদর্শক	প্র	১৩৯	প্রনপ্তা	প্র	১৩৯
প্রতীক্ষিত	প্র	১৩৯	প্রত্যবস্থান	প্র	১৩৯	প্রত্যাহৃত	প্র	১৩৯	প্রদর্শন	প্র	১৩৯	প্রনষ্ট	প্র	১৩৯
প্রতীক্ষী	প্র	১৩৯	প্রত্যবহার	প্র	১৩৯	প্রত্যুক্ত	প্র	১৩৯	প্রদর্শনী	প্র	১৩৯	প্রনাতি	প্র	১৩৯
প্রতীক্ষ্য	প্র	১৩৯	প্রত্যবায়	প্র	১৩৯	প্রত্যুজ্জীবন	প্র	১৩৯	প্রদর্শিত	প্র	১৩৯	প্রনৃত্ত	প্র	১৩৯
প্রতীচী	প্র	১৩৯	প্রত্যবেক্ষণ	প্র	১৩৯	প্রত্যুত	প্র	১৩৯	প্রদর্শী	প্র	১৩৯	প্রপক্ষ	প্র	১৩৯
প্রতীচীন	প্র	১৩৯	প্রত্যব্দ	প্র	১৩৯	প্রত্যুত্তর	প্র	১৩৯	প্রদান	প্র	১৩৯	প্রপঞ্চ	প্র	১৩৯
প্রতীচ্য	প্র	১৩৯	প্রত্যভিজ্ঞা	প্র	১৩৯	প্রত্যুত্থান	প্র	১৩৯	প্রদায়ক	প্র	১৩৯	প্রপঞ্চন	প্র	১৩৯
প্রতীচ্ছক	প্র	১৩৯	প্রত্যভিজ্ঞান	প্র	১৩৯	প্রত্যুত্থিত	প্র	১৩৯	প্রদায়ী	প্র	১৩৯	প্রপঞ্চিত	প্র	১৩৯
প্রতীত	প্র	১৩৯	প্রত্যভিবাদ	প্র	১৩৯	প্রত্যুৎপন্ন	প্র	১৩৯	প্রদার	প্র	১৩৯	প্রপতন	প্র	১৩৯
প্রতীতি	প্র	১৩৯	প্রত্যভিবাদক	প্র	১৩৯	প্রত্যুৎপন্ন	পদ্	৩৮	প্রদারিক	প্র	১৩৯	প্রপদ	প্র	১৩৯
প্রতীপ	প্র	১৩৯	প্রত্যভিবাদন	প্র	১৩৯	প্রত্যুদাহরণ	প্র	১৩৯	প্রদাহ	প্র	১৩৯	প্রপন্ন	প্র	১৩৯
প্রতীয়মান	প্র	১৩৯	প্রত্যবাদয়িতা	প্র	১৩৯	প্রত্যুদ্গত	প্র	১৩৯	প্রদিক	প্র	১৩৯	প্রপা	প্র	১৩৯
প্রতীর	প্র	১৩৯	প্রত্যমিত্র	প্র	১৩৯	প্রত্যুদ্গতি	প্র	১৩৯	প্রদিগ্ধ	প্র	১৩৯	প্রপাঠক	প্র	১৩৯
প্রতুদ	প্র	১৩৯	প্রত্যয়	প্র	১৫৪	প্রত্যুদ্গম	প্র	১৩৯	প্রদিষ্ট	প্র	১৩৯	প্রপাণ(ন)	প্র	১৩৯
প্রতুল	প্র	১৩৯	প্রত্যায়ন	প্র	১৩৯	প্রত্যুদ্গমন	প্র	১৩৯	প্রদীপ	প্র	১৫৬	প্রপাত	পত্	৩১
প্রতেক	প্র	১৩৯	প্রত্যয়িত	প্র	১৫৪	প্রত্যুদ্ঘাত	প্র	১৩৯	প্রদীপক	প্র	১৩৯	প্রপাত	পা	১৩৯
প্রতোদ	প্র	১৩৯	প্রত্যয়ী	প্র	১৫৪	প্রত্যুপকার	প্র	১৩৯	প্রদীপন	প্র	১৩৯	প্রপান	প্র	১৩৯
প্রতোলী	প্র	১৩৯	প্রত্যর্চ্চিত	প্র	১৩৯	প্রত্যুপক্রিয়া	প্র	১৩৯	প্রদীপ্ত	প্র	১৩৯	প্রপানক	প্র	১৩৯
প্রত্ন	প্র	১৩৯	প্রত্যর্থী	প্র	১৩৯	প্রত্যুপদেশ	প্র	১৩৯	প্রদেয়	প্র	১৩৯	প্রপিতামহ	প্র	১৩৯
প্রত্নতত্ত্ব	প্র	১৩৯	প্রত্যর্পণ	প্র	১৩৯	প্রত্যুপহার	প্র	১৩৯	প্রদেশ	প্র	১৩৯	প্রপীড়ন	প্র	১৩৯
প্রত্যক্(চ্)	প্র	১৩৯	প্রত্যস্ত্র	প্র	১৩৯	প্রত্যুপ্ত	প্র	১৩৯	প্রদেশন	প্র	১৩৯	প্রপীড়ন	পীড়্	৭২
প্রত্যক্ষ	প্র	১৩৯	প্রত্যহ	প্র	১৩৯	প্রত্যুলূক	প্র	১৩৯	প্রদেশনী	প্র	১৩৯	প্রপূজিত	পূজ্	১০০
প্রত্যক্ষজ্ঞান	প্র	১৩৯	প্রত্যাইব	প্র	১৩৯	প্রত্যুষ	প্র	১৩৯	প্রদেশিনী	প্র	১৩৯	প্রপূজিত	প্র	১৩৯
প্রত্যক্ষদর্শন	প্র	১৩৯	প্রত্যাখ্যান	প্র	১৫৬	প্রত্যূষঃ	প্র	১৩৯	প্রদেহ	প্র	১৩৯	প্রপৌত্র	প্র	১৩৯
প্রত্যক্ষপ্রমাণ	প্র	১৩৯	প্রত্যাখ্যেয়	প্র	১৩৯	প্রত্যূহ	প্র	১৩৯	প্রদোষ	প্র	১৩৯	প্রফুল্ল	প্র	১৮৬
প্রত্যক্ষফল	প্র	১৩৯	প্রত্যাঘাত	প্র	১৩৯	প্রত্যেক	প্র	১৫০	প্রদোষক	প্র	১৩৯	প্রফুল্লিত	প্র	১৮৬
প্রত্যক্ষবাদী	প্র	১৩৯	প্রত্যাগতি	প্র	১৩৯	প্রথ্	প্র	১৩৯	প্রদোষকাল	প্র	১৩৯	প্রবক্তব্য	প্র	১৩৯
প্রত্যক্ষভূত	প্র	১৩৯	প্রত্যাগম	প্র	১৩৯	প্রথক	প্র	১৩৯	প্রদ্যুম্ন	প্র	১৫৬	প্রবক্তা	প্র	১৩৯
প্রত্যক্ষসিদ্ধ	প্র	১৩৯	প্রত্যাগমন	প্র	১৩৯	প্রথম	প্র	১৫৬	প্রদ্যোত	প্র	১৩৯	প্রবক্তা	বচ্	২১৩
প্রত্যগাত্মা	প্র	১৩৯	প্রত্যাগার	প্র	১৩৯	প্রথমা	প্র	১৩৯	প্রদ্যোতন	প্র	১৩৯	প্রবচন	বচ্	২১৬
প্রত্যগ্র	প্র	১৩৯	প্রত্যাদিষ্ট	প্র	১৩৯	প্রথমাশ্রম	প্র	১৩৯	প্রদ্রব	প্র	১৩৯	প্রবচন	প্র	১৩৯
প্রত্যঙ্গ	প্র	১৩৯	প্রত্যাদেশ	প্র	১৩৯	প্রথমোদিত	প্র	১৩৯	প্রদ্রাব	প্র	১৩৯	প্রবচনীয়	প্র	১৩৯
প্রত্যঙ্মুখ	প্র	১৩৯	প্রত্যানয়ন	প্র	১৩৯	প্রথয়িতা	প্র	১৩৯	প্রদ্বেষী	প্র	১৫৬	প্রবঞ্চক	প্র	১৩৯
প্রত্যনন্তর	প্র	১৩৯	প্রত্যাবর্ত্তন	প্র	৩৪৬	প্রথা	প্র	১৫৬	প্রধন	প্র	১৩৯	প্রবঞ্চক	বঞ্চ্	২২০
প্রত্যনিল	প্র	১৩৯	প্রত্যায়ক	প্র	১৩৯	প্রথিত	প্র	১৩৯	প্রধর্ষক	প্র	১৩৯	প্রবঞ্চনা	বঞ্চ্	২২০
প্রত্যনীক	প্র	১৩৯	প্রত্যায়ন	প্র	১৩৯	প্রথিমা	প্র	১৩৯	প্রধর্ষণ	প্র	১৩৯	প্রবঞ্চনা	প্র	১৩৯
প্রত্যনুমান	প্র	১৩৯	প্রতায়না	প্র	১৩৯	প্রথিষ্ঠ	প্র	১৩৯	প্রধান	প্র	১৩৯	প্রবঞ্চিত	প্র	১৩৯
প্রত্যন্ত	প্র	১৩৯	প্রত্যার্দ্রীকৃত	প্র	১৩৯	প্রথীয়ান	প্র	১৩৯	প্রধানা	প্র	১৩৯	প্রবঞ্চিত	বঞ্চ্	২২০
প্রত্যপকার	প্র	১৩৯	প্রত্যালীঢ়	প্র	১৩৯	প্রদ	প্র	১৩৯	প্রধি	প্র	১৩৯	প্রবণ	প্র	১৩৯
প্রত্যবকর্শন	প্র	১৩৯	প্রত্যাশা	প্র	১৩৯	প্রদক্ষিণ	প্র	১৩৯	প্রধূপিত	প্র	১৩৯	প্রবত্ত	প্র	১৩৯
প্রত্যবভাস	প্র	১৩৯	প্রত্যাশী	প্র	১৩৯	প্রদক্ষিণা	প্র	১৩৯	প্রধূমিত	প্র	১৩৯	প্রবন্ধ	বন্ধ্	২৪৪
প্রত্যবয়ব	প্র	১৩৯	প্রত্যাশ্বস্ত	প্র	১৩৯	প্রদক্ষিণাবর্ত্ত	প্র	১৩৯	প্রধ্বংস	প্র	১৩৯	প্রবন্ধন	বন্ধ্	২৪৪
প্রত্যবর	প্র	১৩৯	প্রত্যাসার	প্র	১৩৯	প্রদক্ষিণার্চ্চিঃ	প্র	১৩৯	প্রধ্বংসন	প্র	১৩৯	প্রবন্ধন	প্র	১৩৯
প্রত্যবসান	প্র	১৩৯	প্রত্যাহত	প্র	১৩৯	প্রদত্ত	প্র	১৩৯	প্রধ্বংসিত	প্র	১৩৯	প্রবয়ণ	প্র	১৩৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
প্রবয়াঃ	প্র ১৩৯	প্রবাহক	প্র ১৩৯	প্রব্রজ্যা	ব্রজ্ ৩৬২	প্রমদা	প্র ১৩৯	প্রমেহ	প্র ১৩৯
প্রবর	প্র ১৩৯	প্রবাহিণী	প্র ১৩৯	প্রব্রাজন	প্র ১৩৯	প্রমদাকানন	প্র ১৩৯	প্রমোচন	প্র ১৩৯
প্রবর	বর্ণ্ ২৪৯	প্রবাহিত	প্র ১৩৯	প্রব্রাজিকা	প্র ১৩৯	প্রমদাবন	প্র ১৩৯	প্রমোদ	প্র ১৩৯
প্রবর্গ	প্র ১৩৯	প্রবাহিত	বহ্ ২৭৮	প্রব্রাজিত	প্র ১৩৯	প্রমদামিষ	প্র ১৩৯	প্রমোদ	মদ্ ৪৬৮
প্রবর্গ্য	প্র ১৩৯	প্রবাহিনী	বহ্ ২৭৮	প্রভঞ্জন	প্র ১৩৯	প্রমনাঃ	প্র ১৩৯	প্রমোদন	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্ত	প্র ১৩৯	প্রবাহিনী	প্র ১৩৯	প্রভব	ভূ ৪১৩	প্রমন্যু	প্র ১৩৯	প্রমোদিত	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তক	প্র ১৩৯	প্রবাহী	প্র ১৩৯	প্রভবিতা	প্র ১৩৯	প্রমা	প্র ১৩৯	প্রযত	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তক	বৃৎ ৩৪৫	প্রবিদারণ	প্র ১৩৯	প্রভবিষ্ণু	প্র ১৩৯	প্রমা	মা ৫৩১	প্রযত্ন	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তন	বৃৎ ৩৪৬	প্রবিদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রভা	ভা ৩৯০	প্রমাই	প্র ১৩৯	প্রযাতা	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তনা	বৃৎ ৩৪৬	প্রবিষ্ট	প্র ১৩৯	প্রভাকর	ভা ৩৯০	প্রমাণ	মা ৫০৯	প্রয়াগ	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তয়িতা	প্র ১৩৯	প্রবিষ্ট	বিশ্ ৩২১	প্রভাকরপুত্র	প্র ১৩৯	প্রমাণকোটি	প্র ১৩৯	প্রয়াণ	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তিত	প্র ৩৪৬	প্রবিষ্টক	প্র ১৩৯	প্রভাকীট	প্র ১৩৯	প্রমাণদৃষ্ট	প্র ১৩৯	প্রয়াণকাল	প্র ১৩৯
প্রবর্ত্তী	প্র ১৩৯	প্রবীণ	প্র ১৩৯	প্রভাত	ভা ৩৯০	প্রমাণপত্র	প্র ১৩৯	প্রয়াত	প্র ১৩৯
প্রবর্ষ	প্র ১৩৯	প্রবীণ	বী ৩৩৩	প্রভাতবেলা	বেল্ ৩৫৯	প্রমাণপথ	প্র ১৩৯	প্রয়াম	প্র ১৩৯
প্রবর্ষী	প্র ১৩৯	প্রবীর	প্র ১৩৯	প্রভাতী	প্র ১৩৯	প্রমাণপুরুষ	প্র ১৩৯	প্রয়াস	প্র ১৩৯
প্রবল	ৰল্ ২৬৩	প্রবীর	বীর্ ৩৩৫	প্রভাব	প্র ১৩৯	প্রমাণসূত্র	প্র ১৩৯	প্রযুক্ত	প্র ১৩৯
প্রবসন	প্র ১৩৯	প্রবুদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রভাব	ভূ ৪০৯	প্রমাণাধিক	প্র ১৩৯	প্রযুক্তি	প্র ১৩৯
প্রবসিত	প্র ১৩৯	প্রবুদ্ধ	বুধ্ ৩৩৭	প্রভাবন	প্র ১৩৯	প্রমাণানুরূপ	প্র ১৩৯	প্রযোক্তব্য	প্র ১৩৯
প্রবহ	প্র ১৩৯	প্রবৃত্ত	বৃৎ ৩৪৯	প্রভাবান	প্র ১৩৯	প্রমাণী	প্র ১৩৯	প্রযোক্তা	প্র ১৩৯
প্রবহ	বহ্ ২৭৮	প্রবৃত্তি	বৃৎ ৩৪৯	প্রভাবতী	প্র ১৩৯	প্রমাতা	প্র ১৩৯	প্রয়োগ	প্র ১৩৯
প্রবহণ	প্র ১৩৯	প্রবৃদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রভাবতী	ভা ৩৯০	প্রমাতামহ	প্র ১৩৯	প্রয়োগবিজ্ঞান	প্র ১৩৯
প্রবহমান	প্র ১৩৯	প্রবৃদ্ধ	বৃধ্ ৩৫৩	প্রভাবী	প্র ১৩৯	প্রমাথ	প্র ১৩৯	প্রয়োগাতিশয়	প্র ১৩৯
প্রবহমান	বহ্ ২৭৮	প্রবৃদ্ধি	প্র ১৩৯	প্রভাস	প্র ৩৯৬	প্রমাথী	প্র ১৩৯	প্রযোজক	প্র ১৩৯
প্রবাক্	প্র ১৩৯	প্রবেক	প্র ১৩৯	প্রভাসিত	প্র ১৩৯	প্রমাদ	প্র ১৩৯	প্রয়োজন	প্র ১৩৯
প্রবাণী	প্র ১৩৯	প্রবেগ	প্র ১৩৯	প্রভামণ্ডল	প্র ১৩৯	প্রমাদ	মদ্ ৪৬৮	প্রয়োজনীয়	প্র ১৩৯
প্রবাত	প্র ১৩৯	প্রবেদন	প্র ১৩৯	প্রভিন্ন	প্র ১৩৯	প্রমাদিয়া	প্র ১৩৯	প্রযোজ্য	প্র ১৩৯
প্রবাদ	প্র ২৩৩	প্রবেদী	প্র ১৩৯	প্রভু	ভূ ৪১৬	প্রমাদী	প্র ১৩৯	প্ররূঢ়	প্র ১৩৯
প্রবাদক	প্র ১৩৯	প্রবেরিত	প্র ১৩৯	প্রভুপণ	প্র ১৩৯	প্রমাপণ	প্র ১৩৯	প্ররোচন	প্র ১৩৯
প্রবাদী	প্র ১৩৯	প্রবেশ	প্র ১৫৮	প্রভুপাদ	প্র ১৩৯	প্রমাপী	প্র ১৩৯	প্ররোচনা	প্র ১৩৯
প্রবাধক	প্র ১৩৯	প্রবেশক	প্র ১৩৯	প্রভূত	প্র ৪২২	প্রমিত	প্র ১৩৯	প্ররোহ	প্র ১৩৯
প্রবাপী	প্র ১৩৯	প্রবেশন	প্র ১৩৯	প্রভৃতি	প্র ৪৩৬	প্রমিত	মা ৫৩১	প্ররোহণ	প্র ১৩৯
প্রবার	প্র ১৩৯	প্রবেশিত	প্র ১৩৯	প্রভেদ	প্র ১৩৯	প্রমিতি	প্র ১৩৯	প্ররোহী	প্র ১৩৯
প্রবারণ	প্র ১৩৯	প্রবেশী	প্র ১৩৯	প্রভেদ	ভিদ্ ৩৯৮	প্রমিতি	মা ৫৩১	প্রলপন	প্র ১৩৯
প্রবাল	প্র ১৩৯	প্রবেশ্য	প্র ১৩৯	প্রভেদন	প্র ১৩৯	প্রমীত	প্র ১৩৯	প্রলপিত	প্র ১৩৯
প্রবাল	ৰল্ ২৬৩	প্রবেষ্ট	প্র ১৩৯	প্রভ্রংশী	প্র ১৩৯	প্রমীলন	মী ৫৫২	প্রলব্ধ	প্র ১৩৯
প্রবালকীট	প্র ১৩৯	প্রবোধ	প্র ১৩৯	প্রভষ্টক	প্র ১৩৯	প্রমীলা	প্র ১৩৯	প্রলম্ব	প্র ১৩৯
প্রবালপদ্ম	প্র ১৩৯	প্রবোধক	প্র ১৩৯	প্রমত্ত	মদ্ ৪৬৯	প্রমুখ	প্র ৪৩৬	প্রলম্বিত	প্র ১৩৯
প্রবালভস্ম	প্র ১৩৯	প্রবোধন	প্র ১৩৯	প্রমথ	প্র ১৩৯	প্রমুখতঃ	প্র ১৩৯	প্রলম্ভ	প্র ১৩৯
প্রবাস	বস্ ১৫৭	প্রবোধনী	প্র ১৩৯	প্রমথন	প্র ১৩৯	প্রমুখাৎ	প্র ১৩৯	প্রলম্ভন	প্র ১৩৯
প্রবাসন	প্র ১৩৯	প্রবোধিত	প্র ১৩৯	প্রমথনাথ	প্র ১৩৯	প্রমুদিত	প্র ১৩৯	প্রলয়	প্র ১৩৯
প্রবাসিত	প্র ১৩৯	প্রবোধবাড়ি	প্র ১৩৯	প্রমথপতি	প্র ১৩৯	প্রমুদিনী	প্র ১৩৯	প্রলয়ঙ্করী	প্র ১৩৯
প্রবাসী	প্র ১৩৯	প্রব্যথিত	প্র ১৩৯	প্রমথা	প্র ১৩৯	প্রমৃত	প্র ১৩৯	প্রলয়ান্ত	প্র ১৩৯
প্রবাসী	বস্ ২৭০	প্রব্রজন	প্র ১৩৯	প্রমথিত	প্র ১৩৯	প্রমৃষ্ট	প্র ১৩৯	প্রলাপ	প্র ১৩৯
প্রবাহ	প্র ১৩৯	প্রব্রজিত	প্র ১৩৯	প্রমথী	প্র ১৩৯	প্রমেয়	প্র ১৩৯	প্রলাপী	প্র ১৩৯
প্রবাহ	বহ্ ২৭৮	প্রব্রজিতা	প্র ১৩৯	প্রমদ	প্র ১৩৯	প্রমেয়	মি ৫৩৮	প্রলীন	প্র ১৩৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
প্রলুঠিত	প্র ১৩৯	প্রসঙ্গপ্রতিষেধ	প্র ১৩৯	প্রসূত	প্র ১৩৯	প্রস্বাপ	প্র ১৩৯	প্রাংশু	প্র ১৩৯
প্রলেপ	প্র ১৩৯	প্রসত্তি	প্র ১৩৯	প্রসূতি	প্র ১৩৯	প্রস্বাপন	প্র ১৩৯	প্রাক্(চ্)	প্র ১৩৯
প্রলোভ	প্র ১৩৯	প্রসন্ন	প্র ১৩৯	প্রসূতিকা	প্র ১৩৯	প্রস্বেদ	প্র ১৩৯	প্রাকট্য	প্র ১৩৯
প্রশংস	প্র ১৩৯	প্রসন্নময়ী	প্র ১৩৯	প্রসূতিবায়ু	প্র ১৩৯	প্রহত	প্র ১৩৯	প্রাকরণিক	প্র ১৩৯
প্রশংসক	প্র ১৩৯	প্রসন্না	প্র ১৩৯	প্রসূতিমারুতি	প্র ১৩৯	প্রহর	প্র ১৩৯	প্রাকাম্য	প্র ১৩৯
প্রশংসন	প্র ১৩৯	প্রসব	প্র ১৩৯	প্রসূন	প্র ১৩৯	প্রহরণ	প্র ১৩৯	প্রাকার	প্র ১৩৯
প্রশংসনীয়	প্র ১৩৯	প্রসবগৃহ	প্র ১৩৯	প্রসূনস্তবক	প্র ১৩৯	প্রহরণীয়	প্র ১৩৯	প্রাকাশ্য	প্র ১৩৯
প্রশংসমান	প্র ১৩৯	প্রসববেদনা	প্র ১৩৯	প্রসৃত	প্র ১৩৯	প্রহরা	প্র ১৩৯	প্রাকৃত	প্র ১৩৯
প্রশংসা	প্র ১৩৯	প্রসবিতা	প্র ১৩৯	প্রসৃতা	প্র ১৩৯	প্রহরিণী	প্র ১৩৯	প্রাকৃতা	প্র ১৩৯
প্রশংসিত	প্র ১৩৯	প্রসবী	প্র ১৩৯	প্রসৃতি	প্র ১৩৯	প্রহরী	প্র ১৩৯	প্রাকৃতাপ্রাকৃত	প্র ১৩৯
প্রশংসস্তব্য	প্র ১৩৯	প্রসব্য	প্র ১৩৯	প্রসৃপ্ত	প্র ১৩৯	প্রহর্তব্য	প্র ১৩৯	প্রাকৃতিক	প্র ১৩৯
প্রশংস্য	প্র ১৩৯	প্রসভ	প্র ১৩৯	প্রসেক	প্র ১৩৯	প্রহর্তা	প্র ১৩৯	প্রাকৃতী	প্র ১৩৯
প্রশন	প্র ১৩৯	প্রসর	প্র ১৩৯	প্রসেবক	প্র ১৩৯	প্রহর্ষ	প্র ১৩৯	প্রাক্কাল	প্র ১৩৯
প্রশম	প্র ১৩৯	প্রসরণ	প্র ১৩৯	প্রস্কন্দন	প্র ১৩৯	প্রহর্ষণ	প্র ১৩৯	প্রাক্কুল	প্র ১৩৯
প্রশমন	প্র ১৩৯	প্রসর্প	প্র ১৩৯	প্রস্ত	প্র ১৩৯	প্রহর্ষণী	প্র ১৩৯	প্রাক্তন	প্র ১৩৯
প্রশমিত	প্র ১৩৯	প্রসর্পণ	প্র ১৩৯	প্রস্তর	প্র ১৩৯	প্রহর্ষিণী	প্র ১৩৯	প্রাক্তনিক	প্র ১৩৯
প্রশস্ত	প্র ১৩৯	প্রসর্পী	প্র ১৩৯	প্রস্তরযুগ	প্র ১৩৯	প্রহসন	প্র ১৩৯	প্রাক্তনী	প্র ১৩৯
প্রশস্তব্য	প্র ১৩৯	প্রসত্তি	প্র ১৩৯	প্রস্তাব	প্র ১৩৯	প্রহসন্তী	প্র ১৩৯	প্রাক্সন্ধ্যা	প্র ১৩৯
প্রশস্তি	প্র ১৩৯	প্রসহ্	প্র ১৩৯	প্রস্তাবনা	প্র ১৩৯	প্রহসিত	প্র ১৩৯	প্রাকস্রোতাঃ	প্র ১৩৯
প্রশস্য	প্র ১৩৯	প্রসহন	প্র ১৩৯	প্রস্তাবিত	প্র ১৩৯	প্রহস্ত	প্র ১৩৯	প্রাগ	প্র ১৩৯
প্রশাখা	প্র ১৩৯	প্রসহ্য	প্র ১৩৯	প্রস্তার	প্র ১৩৯	প্রহাণ	প্র ১৩৯	প্রাগভাব	প্র ১৩৯
প্রশাখিকা	প্র ১৩৯	প্রসাদ	প্র ১৩৯	প্রস্তুত	প্র ১৩৯	প্রহাণি	প্র ১৩৯	প্রাগুক্ত	প্র ১৩৯
প্রশান্ত	প্র ১৩৯	প্রসাদভক্ষণ	প্র ১৩৯	প্রস্থ	প্র ১৩৯	প্রহার	প্র ১৩৯	প্রাগজ্যোতিষ	প্র ১৩৯
প্রশান্তচিত্ত	প্র ১৩৯	প্রসাদক	প্র ১৩৯	প্রস্থান	প্র ১৩৯	প্রহারক	প্র ১৩৯	প্রাগ্দেশ	প্র ১৩৯
প্রশাসক	প্র ১৩৯	প্রসাদন	প্র ১৩৯	প্রস্থানকৌতুক	প্র ১৩৯	প্রহারণ	প্র ১৩৯	প্রাগ্ভাব	প্র ১৩৯
প্রশাসিতা	প্র ১৩৯	প্রসাদাৎ	প্র ১৩৯	প্রস্থাপন	প্র ১৩৯	প্রহারী	প্র ১৩৯	প্রাগসর	প্র ১৩৯
প্রশিষ্য	প্র ১৩৯	প্রসাদি(দী)	প্র ১৩৯	প্রস্থাপনা	প্র ১৩৯	প্রহাস	প্র ১৩৯	প্রাগহর	প্র ১৩৯
প্রশ্চ্যোতন	প্র ১৩৯	প্রসাধক	প্র ১৩৯	প্রস্থাপিত	প্র ১৩৯	প্রহাসক	প্র ১৩৯	প্রাগ্য	প্র ১৩৯
প্রশ্ন	প্র ১৩৯	প্রসাধন	প্র ১৩৯	প্রস্থিত	প্র ১৩৯	প্রহাসী	প্র ১৩৯	প্রঘুণ	প্র ১৩৯
প্রশ্নপত্র	প্র ১৩৯	প্রসাধনী	প্র ১৩৯	প্রস্নিগ্ধ	প্র ১৩৯	প্রহিত	প্র ১৩৯	প্রাঘুণক	প্র ১৩৯
প্রশ্নোত্তর	প্র ১৩৯	প্রসাধিকা	প্র ১৩৯	প্রস্নুত	প্র ১৩৯	প্রহুঁ	প্র ১৩৯	প্রাঘুণিক	প্র ১৩৯
প্রশ্রয়	প্র ১৩৯	প্রসাধিত	প্র ১৩৯	প্রস্নুষা	প্র ১৩৯	প্রহুত	প্র ১৩৯	প্রাঘূর্ণ	প্র ১৩৯
প্রশ্রিত	প্র ১৩৯	প্রসার	প্র ১৩৯	প্রস্ফুট	প্র ১৩৯	প্রহৃত	প্র ১৩৯	প্রাঘূর্ণক	প্র ১৩৯
প্রশ্লিষ্ট	প্র ১৩৯	প্রসারণ	প্র ১৩৯	প্রস্ফুটন	প্র ১৩৯	প্রহৃষ্ট	প্র ১৩৯	প্রাঘূর্ণিক	প্র ১৩৯
প্রশ্লেষ	প্র ১৩৯	প্রসারিত	প্র ১৩৯	প্রস্ফুরণ	প্র ১৩৯	প্রহেলক	প্র ১৩৯	প্রাঙ্গণ	প্র ১৩৯
প্রশ্বাস	প্র ১৩৯	প্রসারিণী	প্র ১৩৯	প্রস্ফোটন	প্র ১৩৯	প্রহেলা	প্র ১৩৯	প্রাঙন্যায়	প্র ১৩৯
প্রষ্টব্য	প্র ১৩৯	প্রসারী	প্র ১৩৯	প্রস্যন্দ	প্র ১৩৯	প্রহেলি	প্র ১৩৯	প্রাঙ্মুখ	প্র ১৩৯
প্রষ্টা	প্র ১৩৯	প্রসিক্ত	প্র ১৩৯	প্রস্যন্দন	প্র ১৩৯	প্রহেলিকা	প্র ১৩৯	প্রাচী	প্র ১৩৯
প্রষ্ঠ	প্র ১৩৯	প্রসিত	প্র ১৩৯	প্রস্যন্দী	প্র ১৩৯	প্রহেলী	প্র ১৩৯	প্রাচীন	প্র ১৩৯
প্রসংখ্যান	প্র ১৩৯	প্রসিতি	প্র ১৩৯	প্রস্রব	প্র ১৩৯	প্রহ্রাদ	প্র ১৩৯	প্রাচীনা	প্র ১৩৯
প্রসকল	প্র ১৩৯	প্রসিদ্ধ	প্র ১৩৯	প্রস্রবণ	প্র ১৩৯	প্রহ্রাদিয়া	প্র ১৩৯	প্রাচীনাবীত	প্র ১৩৯
প্রসক্ত	প্র ১৩৯	প্রসিদ্ধি	প্র ১৩৯	প্রস্রবী	প্র ১৩৯	প্রহ্লাদ	প্র ১৩৯	প্রাচীনাবীতক	প্র ১৩৯
প্রসক্তি	প্র ১৩৯	প্রসীদ	প্র ১৩৯	প্রস্রাব	প্র ১৩৯	প্রহ্লাদক	প্র ১৩৯	প্রাচীর	প্র ১৩৯
প্রসঙ্গ	প্র ১৩৯	প্রসুপ্ত	প্র ১৩৯	প্রস্রুত	প্র ১৩৯	প্রহ্লাদন	প্র ১৩৯	প্রাচুর্য্য	প্র ১৩৯
প্রসঙ্গী	প্র ১৩৯	প্রসূ	প্র ১৩৯	প্রস্ব(স্বা)ন	প্র ১৩৯	প্রহ্ব	প্র ১৩৯	প্রাচেতস	প্র ১৪৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
প্রেক্ষণ	প্র	১৩৯	প্রেমবিশ্বাসভূমি	প্রী	১৬২	প্রোথিত	প্র	১৩৯	প্লুষ্	প্লু	১৬৪	ফড়	ফ	১৮৭
প্রেক্ষণীয়	প্র	১৩৯	প্রেমবৈচিত্ত্য	প্রী	১৬২	প্রোদ্ভিন্ন	প্র	১৩৯	প্লুষ্ট	প্লু	১৬৪	ফড়কি	ফ	১৮৬
প্রেক্ষণীয়ক	প্র	১৩৯	প্রেমভক্তি	প্রী	১৬২	প্রোষিত	প্র	১৩৯	প্লেগ	প্লু	১৬৪	ফড়ফড়	ফ	১৮৭
প্রেক্ষা	প্র	১৩৯	প্রেমমুগ্ধা	প্রী	১৬২	প্রোষিত	বস্	২৭০	প্লেট	প্লু	১৬৪	ফড়া	ফ	১৮৬
প্রেক্ষিত	প্র	১৩৯	প্রেমা	প্রী	১৬৩	প্রোষিতভর্তৃকা	বস্	২৭০	প্লোষ	প্লু	১৬৪	ফড়িং	ফ	১৮৭
প্রেক্ষী	প্র	১৩৯	প্রেমারা	প্রী	১৬২	প্রো(প্রৌ)ষ্ঠ	প্র	১৩৯	প্লোষণ	প্লু	১৬৪	ফড়িংচোষা	ফ	১৮৭
প্রেক্ষ্য	প্র	১৩৯	প্রেমিক	প্রী	১৬৩	প্রো(প্রৌ)ষ্ঠপদ	প্র	১৩৯	প্লোষ্টা	প্লু	১৬৪	ফড়িংপেয়ে	ফ	১৮৭
প্রেঙ্খ	প্র	১৩৯	প্রেমিকা	প্রী	১৬৩	প্রো(প্রৌ)ষ্ঠপদী	প্র	১৩৯	প্ল্যাটফর্ম	প্লু	১৬৪	ফড়িঙ	ফ	১৮৬
প্রেঙ্খা	প্র	১৩৯	প্রেমী	প্রী	১৬৩	প্রোষ্যৎপতিকা	প্র	১৩৯				ফড়িঙ্গ	ফ	১৮৬
প্রেত	প্র	১৬১	প্রেয়	প্রী	১৬২	প্রোষ্যৎভর্তৃকা	প্র	১৩৯	**ফ**			ফড়িঙ্গা	ফ	১৮৬
প্রেতকায়	প্র	১৬১	প্রেয়স	প্রী	১৬২	প্রৌঞ্ছন	প্র	১৩৯	ফ	ফ	১৮৬	ফড়িয়া	ফ	১৮৬
প্রেতগত	প্র	১৩৯	প্রেয়সী	প্রী	১৬২	প্রৌঢ়	প্র	১৩৯	ফইজৎ	ফ	১৮৬	ফ'ড়ে	ফ	১৮৬
প্রেতগৃহ	প্র	১৬১	প্রেয়ান	প্রী	১৬২	প্রৌঢ়	বহ্	২৭৮	ফউজ	ফ	১৮৬	ফণ	ফং	১৬৯
প্রেততর্পণ	প্র	১৬১	প্রের	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়জলদ	প্র	১৩৯	ফকফক	ফক্ক	১৭৩	ফণধর	ফং	১৬৮
প্রেতদেশ	প্র	১৬১	প্রেরক	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়পাদ	প্র	১৩৯	ফ-কার	ফ	১৮৬	ফণপঙক্তি	ফং	১৬৮
প্রেতদেহ	প্র	১৩৯	প্রেরণ	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়পুষ্প	প্র	১৩৯	ফঁ	ফং	১৬৮	ফণমণ্ডল	ফং	১৬৮
প্রেতধূম	প্র	১৩৯	প্রেরণা	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়যৌবন	প্র	১৩৯	ফঁক	ফং	১৬৮	ফণাবান	ফং	১৬৮
প্রেতনদী	প্র	১৬১	প্রেরয়িতা	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়া	প্র	১৩৯	ফঁপ	ফং	১৭২	ফণা	ফং	১৬৯
প্রেতনাথ	প্র	১৬১	প্রেরিত	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়ি	প্র	১৩৯	ফঁপর	ফং	১৬৮	ফণাকর	ফং	১৬৯
প্রেতনির্হারক	প্র	১৩৯	প্রেষণ	প্র	১৩৯	প্রৌঢ়িমা	প্র	১৩৯	ফঁপর-দালাল	ফং	১৭২	ফণাধর	ফং	১৬৯
প্রেতপক্ষ	প্র	১৩৯	প্রেষিত	প্র	১৩৯	প্রৌষ্ঠ	প্র	১৩৯	ফঁপরা	ফং	১৭২	ফণাফণ	ফং	১৬৯
প্রেতপতি	প্র	১৩৯	প্রেষ(ষি)ণী	প্র	১৩৯	প্রৌষ্ঠপদ	প্র	১৩৯	ফঁস	ফং	১৬৮	ফণিকার	ফং	১৬৯
প্রেতপিণ্ড	প্র	১৩৯	প্রেষ্ঠ	প্র	১৩৯	প্রৌষ্ঠপদা	প্র	১৩৯	ফক	ফক্ক	১৭৩	ফণিধর	ফং	১৬৯
প্রেতপুর	প্র	১৩৯	প্রেষ্য	প্র	১৩৯	প্রৌষ্ঠপদী	প্র	১৩৯	ফকর	ফক্ক	১৭৩	ফণিনী	ফং	১৬৮
প্রেতপুরী	প্র	১৬১	প্রেষ্যজন	প্র	১৩৯	প্রৌষ্ঠপাদ	প্র	১৩৯	ফকরা	ফক্ক	১৭৩	ফণিপ	ফং	১৬৮
প্রেতভূমি	প্র	১৬১	প্রেষ্যনারী	প্র	১৩৯	প্রৌষ্ঠী	প্র	১৩৯	ফকি(কী)র	ফক্ক	১৭৩	ফণী	ফং	১৭০
প্রেতমেধ	প্র	১৩৯	প্রেষ্যবধূ	প্র	১৩৯	প্লক্ষ	প্লু	১৬৪	ফকিরফাকরা	ফক্ক	১৭৩	ফণীকেশর	ফং	১৬৯
প্রেতরাজ	প্র	১৩৯	প্রেষ্যভাব	প্র	১৩৯	প্লব	প্লু	১৬৪	ফকিরান	ফক্ক	১৭৩	ফণীচক্র	ফং	১৬৯
প্রেতলোক	প্র	১৬১	প্রেস	প্র	১৩৯	প্লবক	প্লু	১৬৪	ফকিরি (রী)	ফক্ক	১৭৩	ফণীনায়ক	ফং	১৭০
প্রেতশিলা	প্র	১৩৯	প্রৈষ	প্র	১৩৯	প্লবগ	প্লু	১৬৪	ফকিরী	ফক্ক	১৭৪	ফণীন্দ্র	ফং	১৭০
প্রেতশুদ্ধি	প্র	১৬১	প্রৈষ্য	প্র	১৩৯	প্লবঙ্গ	প্লু	১৬৪	ফ(ফো)ক্কড়	ফক্ক	১৭৪	ফণীপতি	ফং	১৭০
প্রেতশ্রাদ্ধ	প্র	১৬১	প্রোক্ত	প্র	১৩৯	প্লবঙ্গম	প্লু	১৬৪	ফক্কা	ফক্ক	১৭৪	ফণীফেন	ফং	১৬৯
প্রেতাধিপ	প্র	১৩৯	প্রোক্ত	বচ্	২১৩	প্লবন	প্লু	১৬৪	ফক্কি	ফক্ক	১৭৪	ফণীবর	ফং	১৭০
প্রেতাত্মা	প্র	১৬১	প্রোক্ষণ	প্র	১৩৯	প্লবমান	প্লু	১৬৪	ফক্কিকা	ফক্ক	১৭৪	ফণীভাষ্য	ফং	১৭০
প্রেতান্ন	প্র	১৬১	প্রোচ্চ	প্র	১৩৯	প্লাব	প্লু	১৬৪	ফক্কিকার	ফক্ক	১৭৪	ফণীভুক্	ফং	১৬৯
প্রেতিনী	প্র	১৬১	প্রোজ্জ্বলিত	প্র	১৩৯	প্লাবন	প্লু	১৬৪	ফক্কিকারি	ফক্ক	১৭৪	ফণীমনসা	ফং	১৬৯
প্রেঙ্খ	প্র	১৩৯	প্রোজ্ঝিত	প্র	১৩৯	প্লিহা	প্	১৬৫	ফঙ্গবেনে	ফং	১৬৮	ফণীমুখ	ফং	১৬৯
প্রেম	প্রী	১৬৩	প্রোঞ্ছন	প্র	১৩৯	প্লীহা	প্	১৬৫	ফচকে	ফ	১৮৬	ফণীরাজ	ফং	১৭০
প্রেমচিন্তা	প্রী	১৬২	প্রোত	প্র	১৩৯	প্লু	প্লু	১৬৪	ফচকেমি	ফ	১৮৬	ফণীশ্বর	ফং	১৭০
প্রেমচিন্তামণি	প্রী	১৬২	প্রোত	বে	৩৫৮	প্লুত	প্লু	১৬৫	ফজর	ফ	১৮৬	ফগু	ফং	১৭১
প্রেমদা	প্রী	১৬২	প্রোৎকণ্ঠ	প্র	১৩৯	প্লুতগতি	প্লু	১৬৫	ফজলী	ফ	১৮৬	ফত	ফ	১৮৮
প্রেমনাট	প্রী	১৬২	প্রোত্থিত	প্র	১৩৯	প্লুতগামী	প্লু	১৬৫	ফজিয়ত	ফ	১৮৬	ফতকা	ফ	১৮৮
প্রেমবন্ধ	প্রী	১৬২	প্রোৎফুল্ল	প্র	১৩৯	প্লুতস্বর	প্লু	১৬৫	ফজীহৎ	ফ	১৮৬	ফতমাবিবি	ফ	১৮৬
প্রেমবন্ধন	প্রী	১৬২	প্রোথ্	প্র	১৩৯	প্লুতা	প্লু	১৬৪	ফঞ্জিকা	ফ	১৮৬	ফতুই	ফ	১৮৬
প্রেমবান	প্রী	১৬২	প্রোথ	প্র	১৩৯	প্লুতি	প্লু	১৬৫	ফট্	ফ	১৮৭	ফতুয়া	ফ	১৮৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ফতুর	ফ্ ১৮৮	ফর্দ্দ	ফ্ ১৮৬	ফলাফল	ফল্ ১৭৫	ফাঁকতাল	ফং ১৭২	ফাগু	ফং ১৬৮
ফতে	ফ্ ১৮৮	ফর্দ্দা	ফ্ ১৮৬	ফলার	ফল্ ১৭৫	ফাঁকা	ফং ১৭২	ফাতনা	ফ্ ১৮৮
ফতো	ফ্ ১৮৬	ফর্ফরায়তে	ফ্ ১৮৬	ফলারে	ফল্ ১৭৫	ফাঁকি	ফং ১৭২	ফাতা	ফ্ ১৮৮
ফতোয়া	ফ্ ১৮৬	ফল	ফল্ ১৭৬	ফলাশন	ফল্ ১৭৫	ফাঁড়	ফং ১৭১	ফাতাড়ু	ফ্ ১৮৮
ফন	ফং ১৭১	ফল(ল্)ই	ফল্ ১৭৭	ফলাশী	ফল্ ১৭৫	ফাঁড়া	ফং ১৭১	ফ্যাতাড়ু	ফ্ ১৮৮
ফন্দ	ফং ১৭১	ফলক	ফল্ ১৭৭	ফলাসক্ত	ফল্ ১৭৫	ফাঁড়ি(ড়ী)	ফং ১৭১	ফানুস	ফং ১৬৮
ফন্দি(ন্দী)	ফং ১৭১	ফলকর	ফল্ ১৭৫	ফলাসঙ্গ	ফল্ ১৭৫	ফাঁৎফাঁৎ	ফং ১৬৮	ফান্দ	ফং ১৭১
ফম	ফং ১৬৮	ফলকরা	ফল্ ১৭৫	ফলাসব	ফল্ ১৭৫	ফাঁতরা-ফাঁতরা	ফং ১৬৮	ফান্দনি(নী)	ফং ১৭১
ফয়তা	ফ্ ১৮৬	ফলকাম	ফল্ ১৭৭	ফলাহত	ফল্ ১৭৫	ফাঁদ	ফং ১৭১	ফাফর	ফ্ ১৮৬
ফয়দা	ফ্ ১৮৬	ফলকামনা	ফল্ ১৭৭	ফলাহার	ফল্ ১৭৫	ফাঁদ(দু)নি	ফং ১৭১	ফায়দা	ফ্ ১৮৬
ফয়লা	ফ্ ১৮৬	ফলকী	ফল্ ১৭৭	ফলাহারে	ফল্ ১৭৫	ফাঁদা	ফং ১৭১	ফার	ফ্ ১৮৯
ফয়শালা	ফ্ ১৮৬	ফলকোশ	ফল্ ১৭৫	ফলি	ফল্ ১৭৫	ফাঁদাল	ফং ১৬৮	ফারক(গ)	ফ্ ১৮৯
ফয়সালা	ফ্ ১৮৬	ফলখণ্ডন	ফল্ ১৭৭	ফলিকা	ফল্ ১৭৫	ফাঁদি(দী)	ফং ১৬৮	ফারাক	ফ্ ১৮৯
ফরকা	ফ্ ১৮৬	ফলগছানব্রত	ফল্ ১৭৫	ফলিত	ফল্ ১৭৮	ফাঁপ(ফ)	ফং ১৭২	ফারখত	ফ্ ১৮৯
ফরগুল	ফ্ ১৮৬	ফলগ্রহ	ফল্ ১৭৫	ফলিতা	ফল্ ১৭৮	ফাঁপ(ফ)র	ফং ১৭২	ফারখতি	ফ্ ১৮৯
ফরজন্দ	ফ্ ১৮৬	ফলগ্রাহী	ফল্ ১৭৫	ফলিন	ফল্ ১৭৫	ফাঁপা	ফং ১৭২	ফারম	ফ্ ১৮৬
ফরদা	ফ্ ১৮৬	ফলঙ্গ	ফল্ ১৭৫	ফলিনী	ফল্ ১৭৫	ফাঁপান	ফং ১৭২	ফারল	ফ্ ১৮৯
ফর্দ্দা	ফ্ ১৮৬	ফলতঃ	ফল্ ১৭৭	ফলী	ফল্ ১৭৫	ফাঁফ	ফং ১৬৮	ফারশী(সী)	ফ্ ১৮৬
ফর্দ্দাফাঁই	ফ্ ১৮৬	ফলত্রিক	ফল্ ১৭৫	ফলীকরণ	ফল্ ১৭৫	ফাঁফর	ফং ১৬৮	ফারাজ	ফ্ ১৮৬
ফরফর	ফ্ ১৮৬	ফলদ	ফল্ ১৭৮	ফলীকার	ফল্ ১৭৫	ফাঁস	ফং ১৭২	ফাল	ফল্ ১৮২
ফরবা	ফ্ ১৮৬	ফলন	ফল্ ১৭৮	ফলেগ্রহি	ফল্ ১৭৫	ফাঁসা	ফং ১৭২	ফালকৃষ্ট	ফল্ ১৮২
ফরমা	ফ্ ১৮৬	ফলনির্বৃত্তি	ফল্ ১৭৫	ফলোদয়	ফল্ ১৭৫	ফাঁসান	ফং ১৭২	ফালত	ফল্ ১৭৮
ফর্ম্মা	ফ্ ১৮৬	ফলনিষ্পত্তি	ফল্ ১৭৫	ফলোদ্ভব	ফল্ ১৭৫	ফাঁসি	ফং ১৭২	ফালসা	ফল্ ১৭৫
ফরমাইশ	ফ্ ১৮৬	ফলন্ত	ফল্ ১৭৮	ফলোপজীবী	ফল্ ১৭৫	ফাঁসুড়িয়া	ফং ১৭২	ফা(ফ্যা)লসানি	ফল্ ১৭৫
ফরমাইস	ফ্ ১৮৬	ফলপরিণতি	ফল্ ১৭৫	ফল্গু	ফল্ ১৮১	ফাঁসুড়ে	ফং ১৭২	ফালা	ফল্ ১৮২
ফরমান	ফ্ ১৮৬	ফলপাক	ফল্ ১৭৫	ফল্গুন	ফল্ ১৮১	ফাক	ফক্ক ১৭৩	ফালাটী	ফল্ ১৭৫
ফরমানী	ফ্ ১৮৬	ফলপাকড়	ফল্ ১৭৫	ফল্গুনী	ফল্ ১৮১	ফাকড়া	ফক্ক ১৭৩	ফালি	ফল্ ১৮২
ফরমাবরদার	ফ্ ১৮৬	ফলপাকান্ত	ফল্ ১৭৫	ফল্গুবল্গন	ফল্ ১৮১	ফাকরা	ফক্ক ১৭৪	ফাল্গুন	ফল্ ১৮১
ফরমায়েস	ফ্ ১৮৬	ফলপাদপ	ফল্ ১৭৫	ফল্গুৎসব	ফল্ ১৮১	ফাকা	ফক্ক ১৭৩	ফাল্গুনি	ফল্ ১৮১
ফরমাশী	ফ্ ১৮৬	ফলপুর	ফল্ ১৭৫	ফষ্টি	ফ্ ১৮৭	ফাকি	ফক্ক ১৭৩	ফাল্গুনিক	ফল্ ১৭৫
ফরমাশে	ফ্ ১৮৬	ফলপ্রদ	ফল্ ১৭৫	ফষ্টি-নষ্টি	ফ্ ১৮৭	ফাক্কা	ফক্ক ১৭৩	ফাল্গুনী	ফল্ ১৮১
ফরমাস	ফ্ ১৮৬	ফলবান	ফল্ ১৭৫	ফস	ফ্ ১৮৮	ফাগ	ফল্ ১৭৫	ফাসফুস	ফ্ ১৮৮
ফরমাসী	ফ্ ১৮৬	ফলবিক্রয়ী	ফল্ ১৭৫	ফসকা	ফ্ ১৮৮	ফাগু	ফল্ ১৭৫	ফাসা	ফ্ ১৮৮
ফরর-ফরর-ফরাৎ	ফ্ ১৮৬	ফলভাগী	ফল্ ১৭৫	ফসকান	ফ্ ১৮৮	ফাগুয়া	ফল্ ১৭৫	ফাসুরফুসুর	ফ্ ১৮৮
ফররা	ফ্ ১৮৬	ফলযোগ	ফল্ ১৭৫	ফসফস	ফ্ ১৮৬	ফাগুণ(ন)	ফল্ ১৭৫	ফি	ফ্ ১৮৬
ফরশা(সা)	ফ্ ১৮৬	ফলশ্রুতি	ফল্ ১৭৮	ফসফসে	ফ্ ১৮৬	ফাজিল	ফ্ ১৮৬	ফিক	ফ্ ১৭৪
ফরশী	ফ্ ১৮৬	ফলসা	ফল্ ১৭৮	ফসল	ফ্ ১৮৮	ফাজিল-পাওনা	ফ্ ১৮৬	ফিকফিক	ফ্ ১৭৪
ফরাশ(স)	ফ্ ১৮৬	ফলসিদ্ধি	ফল্ ১৭৫	ফসলী	ফ্ ১৮৮	ফাজিল-বাকী	ফ্ ১৮৬	ফিকা	ফক্ক ১৭৪
ফরাসি(সী)	ফ্ ১৮৬	ফলা	ফল্ ১৭৮	ফাইফরমাইশ	ফ্ ১৮৬	ফাট	ফ্ ১৮৬	ফিকির	ফক্ক ১৭৪
ফরিক	ফ্ ১৮৬	ফলাও	ফল্ ১৭৮	ফাইফরমাস	ফ্ ১৮৬	ফাটা	ফ্ ১৮৬	ফিকিরী	ফক্ক ১৭৩
ফরিকান	ফ্ ১৮৬	ফলাগম	ফল্ ১৭৫	ফাইয়র	ফ্ ১৮৬	ফাড়	ফ্ ১৮৬	ফিকে	ফক্ক ১৭৪
ফরিকাল	ফ্ ১৮৬	ফলান	ফল্ ১৭৮	ফাইল	ফ্ ১৮৬	ফাড়া	ফ্ ১৮৬	ফিঙা	ফং ১৬৮
ফরিয়াদ	ফ্ ১৮৬	ফলানা	ফল্ ১৭৫	ফাউ	ফ্ ১৮৬	ফাড়ি	ফ্ ১৮৬	ফিঙে	ফং ১৬৮
ফরিয়াদী	ফ্ ১৮৬	ফলানুবন্ধ	ফল্ ১৭৫	ফাউড়া	ফ্ ১৮৬	ফাণিত	ফং ১৬৮	ফিঙ্গক	ফং ১৬৮
ফর্কিকা	ফ্ ১৮৬	ফলানুমেয়	ফল্ ১৭৫	ফাঁ(ফা)ক	ফং ১৭২	ফাণ্ট	ফং ১৬৮	ফিঙ্গা	ফং ১৬৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
ফিঙ্গে	ফং	১৬৮	ফুৎকার	ফ্	১৮৬	ফুলঝাড়	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্ল	ফুল্ল্	১৮৬	ফেণা(না)	ফং	১৬৮
ফিচেল	ফ্	১৮৬	ফুৎকার	ফ্	১৮৬	ফুলঝাড়ু	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্লতুবরী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেণি(নী)	ফং	১৬৮
ফিট	ফ্	১৮৬	ফুৎকৃত	ফ্	১৮৬	ফুলঝা(ঝাঁ)পা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্লন	ফুল্ল্	১৮৩	ফেৎকার	ফ্	১৮৬
ফিটকারী	ফ্	১৮৬	ফুৎকৃত	ফ্	১৮৬	ফুলঝারা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্লনয়ন	ফুল্ল্	১৮৩	ফেৎকারিণী	ফ্	১৮৬
ফিটকিরি	ফ্	১৮৬	ফুৎকৃতি	ফ্	১৮৬	ফুলঝুমকা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্লনেত্র	ফুল্ল্	১৮৩	ফেন	ফং	১৬৮
ফিটন	ফ্	১৮৬	ফুপা	ফ্	১৮৬	ফুলঝুরি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্ললোচন	ফুল্ল্	১৮৩	ফেফাতুড়া(রা)	ফ্	১৮৯
ফিটান	ফ্	১৮৬	ফুপা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলটঙ্গি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্লিত	ফুল্ল্	১৮৬	ফের	ফ্	১৮৯
ফিতা	ফ্	১৮৬	ফুফা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলটুকি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুস	ফ্	১৮৮	ফেরত	ফ্	১৮৬
ফিতে	ফ্	১৮৬	ফুফা	ফ্	১৮৬	ফুলটুসি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসফাস	ফ্	১৮৮	ফেরতা	ফ্	১৮৬
ফিদবি	ফ্	১৮৬	ফুপ্‌ফুস	ফ্	১৮৬	ফুলডাব	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসফুস	ফ্	১৮৮	ফেরফার	ফ্	১৮৬
ফিন	ফং	১৭৩	ফুফু	ফ্	১৮৬	ফুলতা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসফুসানি	ফ্	১৮৮	ফেরব	ফ্	১৮৬
ফিনকি	ফং	১৭৩	ফুফুস	ফ্	১৮৬	ফুলদল	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসলা	ফ্	১৮৮	ফেরা	ফ্	১৮৬
ফিনফিনে	ফং	১৭৩	ফুফা	ফ্	১৮৬	ফুলদান	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসলান	ফ্	১৮৮	ফেরাও	ফ্	১৮৬
ফিনিক	ফং	১৭৩	ফুফী	ফ্	১৮৬	ফুলদার	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসুরফা(ফু)সুর	ফ্	১৮৮	ফেরান	ফ্	১৮৬
ফির	ফ্	১৮৯	ফুফু	ফ্	১৮৬	ফুলদানি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুসফুস	ফ্	১৮৬	ফেরাফেরি	ফ্	১৮৬
ফিরঙ্গ	ফ্	১৮৯	ফুফুৎকার	ফ্	১৮৬	ফুলদিদি	ফুল্ল্	১৮৪	ফুহারা	ফ্	১৮৬	ফেরার	ফ্	১৮৬
ফিরত	ফ্	১৮৯	ফুয়ল	ফ্	১৮৬	ফুলদোল	ফুল্ল্	১৮৩	ফে	ফ্	১৮৯	ফেরাল	ফ্	১৮৬
ফিরা	ফ্	১৮৯	ফুর্	ফ্	১৮৬	ফুলধনু	ফুল্ল্	১৮৩	ফেউ	ফ্	১৮৯	ফেরি(রী)	ফ্	১৮৯
ফিরিঙ্গি(ঙ্গী)	ফ্	১৮৬	ফুল	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলধনুঃ	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁক	ফক্ক্	১৭৪	ফেরীওয়ালা	ফ্	১৮৯
ফিরিস্তি	ফ্	১৮৬	ফুলকপি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলপাণ	ফুল্ল্	১৮৫	ফেঁকড়া	ফক্ক্	১৭৪	ফেরীঘাট	ফ্	১৮৯
ফিরে	ফ্	১৮৬	ফুলকা(কো)	ফুল্ল্	১৮৪	ফুলপানী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁকড়ি	ফক্ক্	১৭৪	ফেরু	ফ্	১৮৯
ফিরোজা	ফ্	১৮৬	ফুলকাকা	ফুল্ল্	১৮৪	ফুলবড়ী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁকা	ফক্ক্	১৭৩	ফেরেক্কা	ফ্	১৮৬
ফির্নি	ফ্	১৮৬	ফুলকাটা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলবন	ফুল্ল্	১৮৬	ফেঁকাসে	ফক্ক্	১৭৩	ফেরেব	ফ্	১৮৬
ফিলখানা	ফ্	১৮৬	ফুলকাড়ান	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলবাণ	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁখা	ফক্ক্	১৭৩	ফেরেব্বাজ	ফ্	১৮৬
ফিলঘর	ফ্	১৮৬	ফুলকারী	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলবাড়ী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁচ	ফং	১৬৮	ফেরেব্বাজি	ফ্	১৮৬
ফিব্ব	ফ্	১৮৬	ফুলকি	ফুল্ল্	১৮৫	ফুলবাতাসা	ফুল্ল্	১৮৬	ফেঁপড়া	ফং	১৬৮	ফেল	ফল্	১৭৮
ফিসফাস	ফ্	১৮৮	ফুলকুল	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলবাবু	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁপো	ফং	১৬৮	ফেলত	ফল্	১৭৮
ফিসফিস	ফ্	১৮৮	ফুলকুলদল	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলমেলী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁসাদ	ফং	১৬৮	ফেলনা	ফল্	১৭৮
ফিসফিসানি	ফ্	১৮৮	ফুলকুলপতি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলমোজা	ফুল্ল্	১৮৩	ফেঁসো	ফং	১৬৮	ফেলফেল	ফল্	১৭৮
ফুঁ	ফক্ক্	১৭৫	ফুলকুলেশ্বরী	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলরণ	ফুল্ল্	১৮৩	ফেক	ফক্ক্	১৭৩	ফেলা	ফল্	১৭৮
ফুঁক	ফক্ক্	১৭৫	ফুলখড়ি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলল	ফুল্ল্	১৮৩	ফেকড়া	ফক্ক্	১৭৩	ফেলাফেলি	ফল্	১৭৫
ফুঁকা	ফক্ক্	১৭৫	ফুলখাসি	ফুল্ল্	১৮৫	ফুলি	ফুল্ল্	১৮৩	ফেকন	ফক্ক্	১৭৩	ফেলি	ফল্	১৭৫
ফুঁড়	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলগাভা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলেল	ফুল্ল্	১৮৩	ফেকনা	ফক্ক্	১৭৩	ফেসাদ	ফ্	১৮৬
ফুঁপা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলগুণ	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলোল	ফুল্ল্	১৮৩	ফেকনি	ফক্ক্	১৭৩	ফেসাদে	ফ্	১৮৬
ফুঁপি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলগুণা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলশয্যা	ফুল্ল্	১৮৩	ফেকো	ফক্ক্	১৭৩	ফৈজত	ফ্	১৮৬
ফুক	ফক	১৭৫	ফুলগেঁড়ু	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলশর	ফুল্ল্	১৮৩	ফেচফেচানি	ফ্	১৮৬	ফৈজতি	ফ্	১৮৬
ফুকর	ফক্ক্	১৭৫	ফুলঘর	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলসন্ন্যাস	ফুল্ল্	১৮৩	ফেচাৎ	ফ্	১৮৬	ফৈদ	ফ্	১৮৬
ফুকা	ফক্ক্	১৭৫	ফুলঘরা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলহাতা	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটন	ফ্	১৮৬	ফৈরাদ	ফ্	১৮৬
ফুকার	ফক্ক্	১৭৫	ফুলঘুটি	ফুল্ল্	১৮৫	ফুলা	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটা	ফ্	১৮৬	ফৈরাদি(দী)	ফ্	১৮৬
ফুক্কল	ফ্	১৮৬	ফুলচন্দন	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলান	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটান	ফ্	১৮৬	ফোই	ফ্	১৮৬
ফুট	ফ্	১৮৬	ফুলচিনি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলাম	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটি	ফ্	১৮৬	ফোঁকর	ফং	১৮৬
ফুটকল	ফ্	১৮৬	ফুলচৌকি	ফুল্ল্	১৮৫	ফুলুরী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটিন	ফ্	১৮৬	ফোঁটা	ফং	১৮৬
ফুড়ুক	ফ্	১৮৬	ফুলছড়ি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলেশ্বরী	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটিং	ফ্	১৮৬	ফোঁড়	ফং	১৬৮
ফুড়ুৎ	ফ্	১৮৬	ফুলঝাঁটি	ফুল্ল্	১৮৩	ফুলো	ফুল্ল্	১৮৩	ফেটী	ফ্	১৮৬	ফোঁড়া	ফং	১৬৮
ফুৎ	ফ্	১৮৬	ফুলঝাঁপা	ফুল্ল্	১৮৩	ফুল্ল্	ফুল্ল্	১৮৩	ফেট্টী	ফ্	১৮৬	ফোঁত	ফং	১৬৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ফোঁপড়া	ফং ১৬৮	বউগিন্নী	বহ্ ২৭৮	বংশভোজ্য	বম্ ২৪৭	বকবক	বচ্ ২১৪	বক্ত্রশোধন	বচ্ ২১৩
ফোঁপল	ফং ১৬৮	বউড়ী	বহ্ ২৭৮	বংশমণি	বম্ ২৪৭	বকবকম	বচ্ ২১৪	বক্ত্রাসব	বচ্ ২১৩
ফোঁপা	ফং ১৬৮	বউবেটি	বহ্ ২৭৮	বংশযব	বম্ ২৪৭	বকবৃত্তি	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্র	বঞ্চ্ ২২১
ফোঁপান	ফং ১৬৮	বউঠাকরা(রু)ণ	বহ্ ২৭৮	বংশরো(লো)চনা	বম্ ২৪৮	বকবৈরী	ৰঙ্ক্ ২১০	বক্রখড়্গ	বঞ্চ্ ২২০
ফোঁপানি	ফং ১৬৮	বউদিদি	বহ্ ২৭৮	বংশলোচন	বম্ ২৪৮	বকব্রতচর	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্রগতি	বঞ্চ্ ২২১
ফোঁ-ফোঁ	ফং ১৬৮	ৰউনী	ৰুধ্ ৩৩৭	বংশশর্করা	বম্ ২৪৮	বকব্রতপর	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্রদৃষ্টি	বঞ্চ্ ২২১
ফোঁস	ফং ১৬৮	বউপরচা	বহ্ ২৭৮	বংশস্থবিল	বম্ ২৪৭	বকব্রতিক	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্রবাক্য	বঞ্চ্ ২২১
ফোকর	ফক্ক্ ১৭৫	বউভাত	বহ্ ২৮০	বংশস্থিতি	বম্ ২৪৭	বকব্রতী	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্রভণিত	বঞ্চ্ ২২০
ফোকলা	ফক্ক্ ১৭৩	বউমা	বহ্ ২৭৮	বংশহীন	বম্ ২৪৭	বকমবকম	বচ্ ২১৪	বক্রসংস্থ	বঞ্চ্ ২২০
ফোক্কড়	ফক্ক্ ১৭৩	বউমানুষ	বহ্ ২৭৮	বংশাঙ্কুর	বম্ ২৪৭	বকযন্ত্র	ৰঙ্ক্ ২১০	বক্রি	বঞ্চ্ ২২০
ফোড়ে	ফ্ ১৮৬	বউয়া	বহ্ ২৭৮	বংশানুকীর্ত্তন	বম্ ২৪৭	বকরবকর	বচ্ ২১৪	বক্রিমা	বঞ্চ্ ২২০
ফোতা	ফ্ ১৮৬	বউয়ারী	বহ্ ২৭৮	বংশানুক্রম	বম্ ২৪৭	বকরা	বচ্ ২১৪	বক্রী	বঞ্চ্ ২২০
ফোতো	ফ্ ১৮৬	বউয়ালা	বহ্ ২৭৮	বংশানুচরিত	বম্ ২৪৮	বকরী	বচ্ ২১৪	বক্রীকৃত	বঞ্চ্ ২২০
ফোল	ফুল্ল্ ১৮৩	বউল	বচ্ ২১৩	বংশাবলী	বম্ ২৪৭	বকলম	ৰ,ব ৩৬২	বক্রোক্তি	বঞ্চ্ ২২১
ফোলা	ফুল্ল্ ১৮৩	বউলা	বচ্ ২১৩	বংশিক	বম্ ২৪৭	বকলস	বচ্ ২১৩	বক্ষ	বচ্ ২১৬
ফোলান	ফুল্ল্ ১৮৩	বউলি(লী)	বচ্ ২১৩	বংশিকা	বম্ ২৪৭	বক্শীষ	বি ২৯০	বক্ষস্থল	বচ্ ২১৩
ফোস্কা	ফ্ ১৮৮	বএল	বী ৩৩৩	বংশী	বম্ ২৪৭	বক্সিস	বি ২৯০	বক্ষশ্ছদ	বচ্ ২১৩
ফৌজ	ফ্ ১৮৬	বএস	বী ৩৩৩	বংশীদূতী	বম্ ২৪৭	বক্সী	বি ২৯০	বক্ষস্তট	বচ্ ২১৩
ফৌজদার	ফ্ ১৮৬	বওয়াটে	বী ৩৩৩	বংশীধর	বম্ ২৪৭	বর্ক্সীস	বি ২৯০	বক্ষোজ	বচ্ ২১৬
ফৌজদারী	ফ্ ১৮৬	বং	ৰ,ব ৩৬২	বংশীধারী	বম্ ২৪৭	বকা	বচ্ ২১৪	বক্ষোরুহ	বচ্ ২১৩
ফৌত	ফ্ ১৮৬	বংগলা	বঙ্গ্ ২১২	বংশীরব	বম্ ২৪৭	বকাট	বচ্ ২১৩	বক্ষ্যমাণ	বচ্ ২১৬
ফ্যাকাসে	ফক্ক্ ১৭৩	বংশ	বম্ ২৪৭	বংশীবট	বট্ ২২২	বকা(খা)টে	বচ্ ২১৩	বক্ষঃ	বচ্ ২১৬
ফ্যাকফ্যাক	ফক্ক্ ১৭৩	বংশক	বম্ ২৪৭	বংশীবদন	বম্ ২৪৭	বকান	বচ্ ২১৩	বক্ষঃস্থল	বচ্ ২১৩
ফ্যাচফ্যাচ	ফক্ক্ ১৭৩	বংশকর	বম্ ২৪৭	বংশীবয়ান	বম্ ২৪৭	বকাবকি	বচ্ ২১৩	বক্‌কড়ি	ৰঙ্ক্ ২১০
ফ্যাচাং	ফক্ক্ ১৭৩	বংশকর্ম্ম	বম্ ২৪৭	বংশ্য	বম্ ২৪৭	বকাবকি	ৰঙ্ক্ ২১০	বক্‌ত	ৰঙ্ক্ ২১০
ফ্যাটা	ফ্ ১৮৬	বংশকার	বম্ ২৪৭	বংহ্	বংহ্ ১৯২	বকাম	বচ্ ২১৩	বক্‌তা	ৰঙ্ক্ ২১০
ফ্যাণা	ফং ১৬৮	বংশকৃৎ	বম্ ২৪৭	বঃ	ৰ,ব ৩৬২	ব-কার	ৰ,ব ৩৬২	বখরা	বি ২৯০
ফ্যাফ্যা	ফ্ ১৮৬	বংশক্রম	বম্ ২৪৭	বঁ	ৰ,ব ৩৬২	বকাল	ৰল্ ২৬৩	বখিল	বি ২৯০
ফ্যালোয়া	ফল্ ১৭৫	বংশক্ষয়	বম্ ২৪৭	বঁইচ	বঞ্চ্ ২২০	বকাসুর	বঙ্ক্ ২১১	বখ্শিশ	বি ২৯০
ফ্যাশন	ফ্ ১৮৬	বংশক্ষীরী	বম্ ২৪৭	বঁইচি (বৌঁচি)	বঞ্চ্ ২২০	বকী	ৰঙ্ক্ ২১০	বখ্শী	বি ২৯০
		বংশচরিত	বম্ ২৪৭	বঁইটি	বণ্ ২২৬	বকুনি	ৰঙ্ক্ ২১০	বগ	ৰঙ্ক্ ২১০
ৰ, ব		বংশচর্ম্মকৃৎ	বম্ ২৪৭	বঁটি	বণ্ ২২৬	বকুনি	বচ্ ২১৩	বগদুল	ৰঙ্ক্ ২১০
ৰ	ৰ,ব ৩৬২	বংশজ	বম্ ২৪৭	বঁড়শী	ৰ,ব ৩৬২	বকুল	বচ্ ২১৫	বগল	ৰঙ্ক্ ২১০
ব	ৰ,ব ৩৬২	বংশজা	বম্ ২৪৭	বঁদে	ৰ,ব ৩৬২	বকুলফুল	বচ্ ২১৫	বগলবাদ্য	ৰঙ্ক্ ২১০
বই (বৈ)	বি ২৯০	বংশতণ্ডুল	বম্ ২৪৭	ৰঁধু	ৰন্ধ্ ২৪৫	বকুলা	বচ্ ২১৫	বগলা	ৰঙ্ক্ ২১০
বই	বহ্ ২৭৮	বংশধর	বম্ ২৪৮	ৰঁধুয়া	ৰন্ধ্ ২৪৫	বকুলী	বচ্ ২১৫	বগলামুখী	ৰঙ্ক্ ২১০
বইঠা	বহ্ ২৭৮	বংশনাড়ি(লি)কা	বম্ ২৪৭	বঁমচুলি	বংহ্ ১৯২	বকেয়া	বচ্ ২১৩	বগলী	ৰঙ্ক্ ২১০
বইন	ভজ্ ৩৬৮	বংশনাথ	বম্ ২৪৭	বক	বঙ্ক্ ২১১	বক্তব্য	বচ্ ২১৫	বগা	ৰঙ্ক্ ২১০
বইৰল	বহ্ ২৭৮	বংশানুক্রম	বম্ ২৪৭	বক	বচ্ ২১৪	বক্তব্যতা	বচ্ ২১৩	বগি(গী)	ৰ,ব ৩৬২
বইরা	ৰধ্ ২৩৪	বংশপত্রক	বম্ ২৪৭	বকজিৎ	ৰঙ্ক্ ২১০	বক্তা	বচ্ ২১৫	বগি(গু)লা	ৰঙ্ক্ ২১০
বইরি	বীর্ ৩৩৫	বংশপোত	বম্ ২৪৭	বকধর্ম্মী	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্তৃতা	বচ্ ২১৫	বগী	ৰঙ্ক্ ২১০
বইস	বস্ ২৭০	বংশবর্দ্ধন	বম্ ২৪৭	বকধার্ম্মিক	ৰঙ্ক্ ২১১	বক্ত্র	বচ্ ২১৫	বগুনা	বংহ্ ২১০
বউ	বহ্ ২৮০	বংশবিততি	বম্ ২৪৭	বকন	ৰ,ব ৩৬২	বক্ত্রজ	বচ্ ২১৩	বগুলা-ভকত	ভজ্ ৩৬৯
বউকথাকও	বহ্ ২৭৮	বংশবিশুদ্ধ	বম্ ২৪৭	বকনা	ৰ,ব ৩৬২	বক্ত্রদ্বার	বচ্ ২১৩	বঙ্ক	ৰঙ্ক্ ২১১
বউকাঁটকি(কী)	বহ্ ২৭৮	বংশভব	বম্ ২৪৭	বকনিষূদন	ৰঙ্ক্ ২১০	বক্ত্রবাস	বচ্ ২১৩	বঙ্কবিহারী	ৰঙ্ক্ ২১১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বঙ্কভঙ্গী	বঙ্ক্ ২১০	বচনস্থিত	বচ্ ২১৩	বজ্রমুঠি	বজ্ ২১৮	বটু	বট্ ২২২	বণিক(জ)	বণ্ ২২৬
বঙ্করাজ	বঙ্ক্ ২১০	বচা	বচ্ ২১৩	বজ্রমুষ্টি	বজ্ ২১৮	বটুক	বট্ ২২২	বণিককটক	বণ্ ২২৬
বঙ্করাজপাতা	বঙ্ক্ ২১০	বচাবচ	বচ্ ২১৩	বজ্রযান	বজ্ ২১৯	বটুকখানা	বট্ ২২২	বণিককর্ম্ম	বণ্ ২২৬
বঙ্কা	বঙ্ক্ ২১১	বচ্চর	বদ্ ২৩১	বজ্ররথ	বজ্ ২১৮	বটুকভৈরব	বট্ ২২২	বণিকক্রিয়া	বণ্ ২২৬
বঙ্কিম	বঙ্ক্ ২১১	বচ্ছ	বদ্ ২৩১	বজ্রলম্ফ	বজ্ ২১৮	বটুব্রাহ্মণ	বট্ ২২২	বণিকপথ	বণ্ ২২৬
বঙ্কিমচন্দ্র	বঙ্ক্ ২১১	বচ্ছর	বদ্ ২৩১	বজ্রলেপ	বজ্ ২১৮	বটুয়া	বট্ ২২২	বণিকসার্থ	বণ্ ২২৬
বঙ্কু	বঙ্ক্ ২১০	বছর	বদ্ ২৩১	বজ্রশিলা	বজ্ ২১৮	ব'টে	বট্ ২২২	বণিকিনী	বণ্ ২২৬
বঙ্কিু	বঙ্ক্ ২১০	বজ	বজ্ ২১৮	বজ্রসংঘাত	বজ্ ২১৮	বটেক	বট্ ২২২	বণিক্য	বণ্ ২২৬
বঙ্ক্ষণ	বচ্ ২১৩	বজবজ	বজ্ ২১৮	বজ্রসার	বজ্ ২১৮	বটের	বট্ ২২২	বণিগ্গ্রাম	বণ্ ২২৬
বঙ্ক্ষু	বচ্ ২১৩	বজর	বজ্ ২১৮	বজ্রসূচি(চী)	বজ্ ২১৮	বটোরলুঁ	বট্ ২২২	বণিগ্জন	বণ্ ২২৬
বঙ্খুর	বঙ্ক্ ২১০	ব(বা)জরা	বজ্ ২১৮	বজ্রহস্ত	বজ্ ২১৮	বটোরলোঁ	বট্ ২২২	বণিগ্বৃত্তি	বণ্ ২২৬
বঙ্গ	বঙ্গ্ ২১২	বজা	বজ্ ২১৮	বজ্রহৃদয়	বজ্ ২১৮	বট্ঠাকুর	বট্ ২২২	বণিঙ্মার্গ	বণ্ ২২৬
বঙ্গজ	বঙ্গ্ ২১২	বজায়	বজ্ ২১৮	বজ্রা	বজ্ ২১৮	বড় (বট)	বট্ ২২৩	বণিজ	বণ্ ২২৬
বঙ্গদেশী	বঙ্গ্ ২১২	ব(বা)জেট	বজ্ ২১৮	বজ্রাকর	বজ্ ২১৮	বড়-আদালত	বট্ ২২২	বণিজি	বণ্ ২২৬
বঙ্গন	বঙ্গ্ ২১২	বজ্জর	বজ্ ২১৮	বজ্রাকার	বজ্ ২১৮	বড়্গাছ	বট্ ২২৩	বণিজ্য	বণ্ ২২৬
বঙ্গবাসী	বঙ্গ্ ২১২	বজ্জাত	বদ্ ২৩১	বজ্রাকৃতি	বজ্ ২১৮	বড়ঠাকুর	বট্ ২২২	বণিজ্যা	বণ্ ২২৬
বঙ্গভাষা	বঙ্গ্ ২১২	বজ্জাতি(তী)	বদ্ ২৩১	বজ্রাভ্যাস	বজ্ ২১৮	বড়ঠাকুরঝি	বট্ ২২২	বণ্ট	বণ্ ২২৭
বঙ্গযান	বঙ্গ্ ২১২	বজ্র	বজ্ ২১৮	বজ্রাসন	বজ্ ২১৮	বড়দিন	বট্ ২২২	বণ্টক	বণ্ ২২৭
বঙ্গাল	বঙ্গ্ ২১২	বজ্রক	বজ্ ২১৮	বজ্রী	বজ্ ২১৮	বড়ফট্টাই	বট্ ২২৩	বণ্টন	বণ্ ২২৭
বঙ্গীয়	বঙ্গ্ ২১২	বজ্রকণ্টক	বজ্ ২১৮	বঞি	বি ২৯০	বড়বড়	বট্ ২২২	বণ্টিত	বণ্ ২২৬
বচ	বচ্ ২১৪	বজ্রকবচ	বজ্ ২১৮	বঞ্চ	বঞ্চ্ ২২০	বড়বা	বট্ ২২৩	বণ্ঠ	বণ্ ২২৬
বচঃ	বচ্ ২১৩	বজ্রকামড়	বজ্ ২১৮	বঞ্চ	বঞ্চ্ ২২০	বড়বাগ্নি	বট্ ২২৩	বণ্ড	বণ্ ২২৭
বচঃক্রম	বচ্ ২১৩	বজ্রকিল	বজ্ ২১৮	বঞ্চক	বঞ্চ্ ২২১	বড়বাড়ী	বট্ ২২২	বত	বদ্ ২৩১
বচঃপ্রবৃত্তি	বচ্ ২১৩	বজ্রকীট	বজ্ ২১৮	বঞ্চনা	বঞ্চ্ ২২১	বড়বানল	বট্ ২২৩	বতুল	বৃৎ ৩৪৫
বচন	বচ্ ২১৬	বজ্রকীল	বজ্ ২১৮	বঞ্চনীয়	বঞ্চ্ ২২০	বড়বাপ	বট্ ২২২	বত্ত	বৃৎ ৩৪৫
বচনকর	বচ্ ২১৩	বজ্রক্ষার	বজ্ ২১৮	বঞ্চয়িতব্য	বঞ্চ্ ২২০	বড়বামুখ	বট্ ২২২	বতংস	বদ্ ২৩১
বচনকার	বচ্ ২১৩	বজ্রঘোষ	বজ্ ২১৮	বঞ্চয়িতা	বঞ্চ্ ২২০	বড়মা	বট্ ২২২	বৎ	বদ্ ২৩১
বচনকারী	বচ্ ২১৩	বজ্রচড়	বজ্ ২১৮	বঞ্চিত	বঞ্চ্ ২২১	বড়মানুষ	বট্ ২২২	বৎস	বদ্ ২৩১
বচনক্রম	বচ্ ২১৩	বজ্রচাপড়	বজ্ ২১৮	বঞ্চা	বঞ্চ্ ২২১	বড়রাণী	বট্ ২২২	বৎসক	বদ্ ২৩১
বচনগোচর	বচ্ ২১৩	বজ্রচিহ্ন	বজ্ ২১৮	বঞ্জর	বন্ ২৩৬	বড়লাট	বট্ ২২২	বৎসকবীজ	বদ্ ২৩১
বচনগৌরব	বচ্ ২১৩	বজ্রজিহ্বা	বজ্ ২১৮	বঞ্জুল	বঞ্চ্ ২২০	বড়শী	বল্ ২৬৩	বৎসকাম	বদ্ ২৩১
বচনগ্রাহী	বচ্ ২১৩	বজ্রজ্বালা	বজ্ ২১৮	বট	বট্ ২২২	বড়শী	ব,ব ৩৬২	বৎসতর	বদ্ ২৩১
বচনচঞ্চুতা	বচ্ ২১৩	বজ্রঠোকর	বজ্ ২১৮	বটক	বট্ ২২২	বড়া	বট্ ২২৩	বৎসতরী	বদ্ ২৩১
বচনজাত	বচ্ ২১৩	বজ্রদংষ্ট্র	বজ্ ২১৮	বটকৃষ্ণ	বট্ ২২২	বড়াই	বট্ ২২৩	বৎসদন্ত	বদ্ ২৩১
বচনদেবতা	বচ্ ২১৩	বজ্রধর	বজ্ ২১৮	বটকেরা	বট্ ২২২	বড়াল	বট্ ২২২	বৎসনাভ	বদ্ ২৩১
বচনবিরোধ	বচ্ ২১৩	বজ্রনাভ	বজ্ ২১৮	বটবটি	বট্ ২২২	বড়ি	বট্ ২২২	বৎসপত্তন	বদ্ ২৩১
বচনমাত্র	বচ্ ২১৩	বজ্রপাণি	বজ্ ২১৮	বটবাসী	বট্ ২২২	বড়িশ	বল্ ২৬৩	বৎসপদ	বদ্ ২৩১
বচনস্তব	বচ্ ২১৩	বজ্রপাত	বজ্ ২১৮	বটবাসিনী	বট্ ২২২	বড়িশী	বল্ ২৬৩	বৎসপাল	বদ্ ২৩১
বচনরচনা	বচ্ ২১৩	বজ্রপাতন	বজ্ ২১৮	বটবৃক্ষ	বট্ ২২২	বড়ু	বট্ ২২৩	বৎসপালক	বদ্ ২৩১
বচনশত	বচ্ ২১৩	বজ্রপুষ্প	বজ্ ২১৮	বটব্যাল	বট্ ২২২	বড়্আ(য়া)ই	বট্ ২২২	বৎসর	বদ্ ২৩১
বচনসর্বস্ব	বচ্ ২১৩	বজ্রফণা	বজ্ ২১৮	বটসাবিত্রী	বট্ ২২২	বড়ুয়া	বট্ ২২৩	বৎসল	বদ্ ২৩১
বচনীয়	বচ্ ২১৬	বজ্রবেদন	বজ্ ২১৮	বটি	বট্ ২২২	ব'ড়ে	বট্ ২২২	বৎসাসুর	বদ্ ২৩১
বচনীয়তা	বচ্ ২১৩	বজ্রব্যূহ	বজ্ ২১৮	বটিকা	বট্ ২২২	বড্ড	বট্ ২২৩	বদ	বদ্ ২৩১
বচনোপন্যাস	বচ্ ২১৩	বজ্রমণি	বজ্ ২১৮	বটিয়া	বট্ ২২২	বড্র	বদ্ ২৩১	বদকথা	বদ্ ২৩১
বচসা	বচ্ ২১৬	বজ্রমুটকি	বজ্ ২১৮	বটী	বট্ ২২২	বণ্	বণ্ ২২৬	বদকাম	বদ্ ২৩১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বদকার	বদ্ ২৩১	বদরসিক	বদ্ ২৩১	বন্ধপাগল	বন্ধ্ ২৪৪	বধৈষী	বধ্ ২৭৮	বনজ্যোৎস্না	বন্ ২৩৬
বদকারী	বদ্ ২৩১	বদরাগ	বদ্ ২৩১	বন্ধপ্রতিজ্ঞ	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্য	বধ্ ২৭৮	বনদাব	বন্ ২৩৬
বদখত	বদ্ ২৩১	বদরিকা	বদ্ ২৩১	বন্ধবৈর	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যঘাতক	বধ্ ২৭৮	বনদাহ	বন্ ২৩৬
বদখদ	বদ্ ২৩১	বদরিকাশ্রম	বদ্ ২৩১	বন্ধভাব	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যঘ্ন	বধ্ ২৭৮	বনদুর্গ	বন্ ২৩৬
বদখাসলত	বদ্ ২৩১	বদরাগী	বদ্ ২৩১	বন্ধভূমি	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যডিণ্ডিম	বধ্ ২৭৮	বনদেব	বন্ ২৩৬
বদখেয়াল	বদ্ ২৩১	বদরী	বদ্ ২৩১	বন্ধমণ্ডল	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যপট	বধ্ ২৭৮	বনদেবতা	বন্ ২৩৬
বদখেয়ালি	বদ্ ২৩১	বদরীতি	বদ্ ২৩১	বন্ধমন্যু	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যপটহ	বধ্ ২৭৮	বনদেবী	বন্ ২৩৬
বদজবান	বদ্ ২৩১	বদরীনাথ	বদ্ ২৩১	বন্ধমুষ্টি	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যপাল	বধ্ ২৭৮	বনদ্বিপ	বন্ ২৩৬
বদজাত	বদ্ ২৩১	বদরুচি	বদ্ ২৩১	বন্ধমূল	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যভূ	বধ্ ২৭৮	বনধারা	বন্ ২৩৬
বদজাতি	বদ্ ২৩১	বদরোখা	বদ্ ২৩১	বন্ধমৌন	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যভূমি	বধ্ ২৭৮	বনধেনু	বন্ ২৩৬
বদজোবান	বদ্ ২৩১	বদল	বদ্ ২৩২	বন্ধরাগ	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যমালা	বধ্ ২৭৮	বননীবার	বন্ ২৩৬
বদদোয়া	বদ্ ২৩১	বদলা	বদ্ ২৩২	বন্ধলেঠেল	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যশিলা	বধ্ ২৭৮	বনপতি	বন্ ২৩৬
বদন	বদ্ ২৩২	বদলান	বদ্ ২৩২	বন্ধস্নেহ	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যস্থল	বধ্ ২৭৮	বনপর্ব্ব	বন্ ২৩৮
বদনকঞ্জ	বদ্ ২৩১	বদলাবদলি	বদ্ ২৩২	বন্ধাঞ্জলিপুট	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যস্থলী	বধ্ ২৭৮	বনপাদপ	বন্ ২৩৬
বদনচন্দ্রমা	বদ্ ২৩১	বদলি(লী)	বদ্ ২৩২	বন্ধানুরাগ	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যস্থান	বধ্ ২৭৮	বনপাল	বন্ ২৩৬
বদপঙ্কজ	বদ্ ২৩১	বদস(শ)লা	বদ্ ২৩১	বন্ধানুশয়	বন্ধ্ ২৪৪	বধ্যা	বধ্ ২৭৮	বনপালক	বন্ ২৩৬
বদনপবন	বদ্ ২৩১	বদস্তর	বদ্ ২৩১	বদ্য	বদ্ ২৩২	বধ্র	বন্ধ্ ২৪৪	বনপুঁই	বন্ ২৩৬
বদনবাদ্য	বদ্ ২৩১	বদছু(সু)রত	বদ্ ২৩১	বধ	বধ্ ২৩৪	বন	বন্ ২৩৬	বনপ্রস্থ	বন্ ২৩৬
বদনমদিরা	বদ্ ২৩১	বদহজম	বদ্ ২৩১	বধক	বধ্ ২৩৪	বনআরি	বন্ ২৩৬	বনপ্রিয়	বন্ ২৩৬
বদনশ্যামিকা	বদ্ ২৩১	বদহজমি	বদ্ ২৩১	বধকর্ম্মাধিকারী	বধ্ ২৩৪	বনকপোত	বন্ ২৩৮	বনফ্শা	বন্ ২৩৬
বদনসিব	বদ্ ২৩১	বদহাল	বদ্ ২৩১	বধকাম	বধ্ ২৩৪	বনকপোতিনী	বন্ ২৩৮	বনবন	বন্ ২৩৬
বদনসুধাকর	বদ্ ২৩১	বদান্য	বদ্ ২৩১	বধজীবী	বধ্ ২৩৪	বনকর	বন্ ২৩৭	বনবরা	বন্ ২৩৬
বদনা	বদ্ ২৩২	বদাবদ	বদ্ ২৩১	বধদণ্ড	বধ্ ২৩৪	বনকরী	বন্ ২৩৭	বনবর্হিণ	বন্ ২৩৬
বদনাম	বদ্ ২৩১	বদাবদি	বদ্ ২৩১	বধনিগ্রহ	বধ্ ২৩৪	বনকার্পাসী	বন্ ২৩৬	বনবহ্নি	বন্ ২৩৬
বদনাসব	বদ্ ২৩১	বদাম	বদ্ ২৩১	বধনির্ণেক	বধ্ ২৩৪	বনকুঞ্জর	বন্ ২৩৭	বনবাইগুন	বন্ ২৩৬
বদনিয়ত	বদ্ ২৩১	বদাল	বদ্ ২৩১	বধভূমি	বধ্ ২৩৪	বনকুসুম	বন্ ২৩৬	বনবাত	বন্ ২৩৬
বদনী	বদ্ ২৩২	বদি	বদ্ ২৩১	বধস্থলী	বধ্ ২৩৪	বনখণ্ড	বন্ ২৩৬	বনবাদাড়	বন্ ২৩৬
বদবখ্ত	বদ্ ২৩১	বদিয়াতী	বদ্ ২৩১	বধস্থান	বধ্ ২৩৪	বনগজ	বন্ ২৩৭	বনবাস	বন্ ২৩৬
বদবখতি	বদ্ ২৩১	বদ্দি	বিদ্ ৩০৮	বধাঙ্গ	বধ্ ২৩৪	বনগব	বন্ ২৩৬	বনবাসী	বন্ ২৩৬
বদবু	বদ্ ২৩১	বন্ধ	বন্ধ্ ২৪৪	বধার্হ	বধ্ ২৩৪	বনগরু	বন্ ২৩৬	বনবীজক	বন্ ২৩৬
বদবো	বদ্ ২৩১	বন্ধকক্ষ	বন্ধ্ ২৪৪	বধির	বধ্ ২৩৫	বনগহন	বন্ ২৩৬	বনব্রীহি	বন্ ২৩৬
বদভ্যাস	বদ্ ২৩১	বন্ধকক্ষ্য	বন্ধ্ ২৪৪	বধিরীকৃত	বধ্ ২৩৪	বনগাঁ	বন্ ২৩৮	বনভবন	বন্ ২৩৬
বদমতলব	বদ্ ২৩১	বন্ধকদম্বক	বন্ধ্ ২৪৪	বধূ	বহ্ ২৭৮	বনগাহন	বন্ ২৩৬	বনভূ	বন্ ২৩৬
বদমাইশ	বদ্ ২৩১	বন্ধকালা	বন্ধ্ ২৪৪	বধূ	বহ্ ২৮০	বনগোচর	বন্ ২৩৬	বনভূমি	বন্ ২৩৬
বদমাইশি	বদ্ ২৩১	বন্ধকেশর	বন্ধ্ ২৪৪	বধূকাল	বহ্ ২৭৮	বনগোরু	বন্ ২৩৬	বনভোজন	বন্ ২৩৬
বদমাশ	বদ্ ২৩১	বন্ধকোশ	বন্ধ্ ২৪৪	বধূগৃহপ্রবেশ	বহ্ ২৭৮	বনগ্রাহী	বন্ ২৩৬	বনমক্ষিকা	বন্ ২৩৬
বদমাশি	বদ্ ২৩১	বন্ধগ্রহ	বন্ধ্ ২৪৪	বধূজন	বহ্ ২৭৮	বনচন্দন	বন্ ২৩৮	বনমল্লিকা	বন্ ২৩৬
বদমায়েশ	বদ্ ২৩১	বন্ধচিত্ত	বন্ধ্ ২৪৪	বধূটী	বহ্ ২৭৮	বনচন্দ্রিকা	বন্ ২৩৬	বনমল্লী	বন্ ২৩৬
বদমায়েশি	বদ্ ২৩১	বন্ধতূণীর	বন্ধ্ ২৪৪	বধূধন	বহ্ ২৭৮	বনচর	বন্ ২৩৬	বনমানুষ	বন্ ২৩৬
বদমেজাজ	বদ্ ২৩১	বন্ধদৃষ্টি	বন্ধ্ ২৪৪	বধূপক্ষ	বহ্ ২৭৮	বনচর্য্যা	বন্ ২৩৮	বনমাল	বন্ ২৩৮
বদমেজাজি	বদ্ ২৩১	বন্ধনেত্র	বন্ধ্ ২৪৪	বধূবন্ধু	বহ্ ২৭৮	বনচাঁড়াল	বন্ ২৩৬	বনমালা	বন্ ২৩৮
বদর	বদ্ ২৩১	বন্ধনিষ্যন্দ	বন্ধ্ ২৪৪	বধূবর	বহ্ ২৭৮	বনচারী	বন্ ২৩৬	বনমালী	বন্ ২৩৮
বদরং	বদ্ ২৩১	বন্ধনেপথ্য	বন্ধ্ ২৪৪	বধূসংযান	বহ্ ২৭৮	বনচালিতা	বন্ ২৩৬	বনমালিনী	বন্ ২৩৬
বদরক্ত	বদ্ ২৩১	বন্ধপদ্মাসন	বন্ধ্ ২৪৪	বধূসর	বহ্ ২৭৮	বনচ্ছিৎ	বন্ ২৩৬	বনমৃগ	বন্ ২৩৬
বদরবল্লী	বদ্ ২৩১	বন্ধপরিকর	বন্ধ্ ২৪৪	বধূসরা	বহ্ ২৮০	বনজ	বন্ ২৩৬	বনযাত্রা	বন্ ২৩৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বনরাজি(জী)	বন্ ২৩৬	ৱন্দক	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধনালয়	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপুঃ	বপ্ ২৪৬	বয়ঃসন্ধি	বী ৩৩৩
বনলক্ষ্মী	বন্ ২৩৬	বন্দক	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধনী	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপুষ্টমা	বপ্ ২৪৭	বয়ঃস্থ	বী ৩৩৩
বনলতা	বন্ ২৩৬	ৱন্দকী	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধনীয়	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপুষ্মান	বপ্ ২৪৬	বয়ঃস্থা	বী ৩৩৩
বনলেখা	বন্ ২৩৬	বন্দগী	বন্দ্ ২৪৩	ৱন্ধয়িতা	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপ্তব্য	বপ্ ২৪৬	বয়ন	বে ৩৫৮
বনসোণা(না)	বন্ ২৩৬	বন্দন	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধান	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপ্তা	বপ্ ২৪৬	বয়নামা	বন্ ২৩৬
বনস্থ	বন্ ২৩৬	বন্দনবার	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধী	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপ্র	বপ্ ২৪৬	বয়বাত	ৱ,ব ৩৬২
বনস্থলী	বন্ ২৩৬	বন্দনমালা	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধু	ৱন্ধ্ ২৪৫	বপ্রক্রিয়া	বপ্ ২৪৬	বয়শ্চোর	বী ৩৩৩
বনস্পতি	বন্ ২৩৮	বন্দনা	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুকাম	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপ্রক্রীড়া	বপ্ ২৪৬	বয়স	বী ৩৩৩
বনা	বন্ ২৩৬	বন্দনী	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুজন	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপ্রপঙ্ক	বপ্ ২৪৬	বয়সকাল	বী ৩৩৩
বনাওত্(ট্)	বন্ ২৩৬	বন্দনীয়	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুজীব	ৱন্ধ্ ২৪৪	ব-ফলা	ৱ,ব ৩৬২	বয়সদোষ	বী ৩৩৩
বনাজ	বন্ ২৩৬	বন্দনীয়া	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুজীবক	ৱন্ধ্ ২৪৪	বকম	ৱ,ব ৩৬২	বয়সফোঁড়া	বী ৩৩৩
বনাত	বন্ ২৩৬	বন্দর	বন্ ২৪২	ৱন্ধুতা	ৱন্ধ্ ২৪৫	বক্কাল	ৱ,ব ৩৬২	বয়সসন্ধি	বী ৩৩৩
বনাদ্য	বন্ ২৩৬	বন্দা	বন্ ২৪১	ৱন্ধুদত্ত	ৱন্ধ্ ২৪৫	বখেয়া	ৱ,ব ৩৬২	বয়সী	বী ৩৩৩
বনানি(নী)	বন্ ২৩৬	ৱন্দা	ৱন্ধ্ ২৪৩	ৱন্ধুদায়াদ	ৱন্ধ্ ২৪৪	বত্রিশ	ৱ,ব ৩৬২	বয়স্ক	বী ৩৩৩
বনান্ত	বন্ ২৩৬	ৱন্দি(ন্দী)	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধুপ্রীতি	ৱন্ধ্ ২৪৪	বত্রিশলক্ষণ	ৱ,ব ৩৬২	বয়স্কা	বী ৩৩৩
বনান্তঃ	বন্ ২৩৬	বন্দি	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুবাবা	ৱন্ধ্ ২৪৪	বত্রিশা	ৱ,ব ৩৬২	বয়স্থ	বী ৩৩৩
বনান্তর	বন্ ২৩৬	বন্দিঘাটীগাঁই	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুয়া	ৱন্ধ্ ২৪৫	ব-দ্বীপ	ৱ,ব ৩৬২	বয়স্থা	বী ৩৩৩
বনাম	বন্ ২৩৮	বন্দিত	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুর	ৱন্ধ্ ২৪৫	বব	ৱ,ব ৩৬২	বয়স্য	বী ৩৩৩
বনায়ু	বন্ ২৩৬	বন্দিনী	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুল	ৱন্ধ্ ২৪৪	ববকরণ	ৱ,ব ৩৬২	বয়স্যা	বী ৩৩৩
বনালি(লী)	বন্ ২৩৬	বন্দিব	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধুহা	ৱন্ধ্ ২৪৪	ববরম	ৱ,ব ৩৬২	বয়া	বী ৩৩৩
বনাশ্রম	বন্ ২৩৮	ৱন্দিয়ান	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধুহীন	ৱন্ধ্ ২৪৪	ববব্যোম	ৱ,ব ৩৬২	বয়াটে	বী ৩৩৩
বনাশ্রমী	বন্ ২৩৮	বন্দী	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধূক	ৱন্ধ্ ২৪৪	ববমবম	ৱ,ব ৩৬২	বয়ান	বী ৩৩৩
বনি	বন্ ২৩৬	ৱন্দীকৃত	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধূর	ৱন্ধ্ ২৪৪	বব্বল	বর্ণ্ ২৪৯	বয়ার	বী ৩৩৩
বনিয়া	বন্ ২৩৬	বন্দীশালা	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধূলি	ৱন্ধ্ ২৪৪	বব্বলে	বর্ণ্ ২৪৯	বয়িসী	বী ৩৩৩
বনিতা	বন্ ২৩৬	বন্দুক	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধ্য	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱভ্রু (ভ্রূ)	ভৃ ৪২৯	বয়ুন	বী ৩৩৩
বনিবনা	বন্ ২৩৬	বন্দুকি(কী)	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধ্যফল	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱভ্রুবর্ণ	ভৃ ৪২৯	বয়ুনা	বী ৩৩৩
বনিবনাও	বন্ ২৩৬	ৱন্দুয়ান	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধ্যা	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱভ্রুবাহ	ভৃ ৪২৯	বয়েত	বী ৩৩৩
বনিকা	বন্ ২৩৬	বন্দে	বন্দ্ ২৪৩	ৱন্ধ্যাপুত্র	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱভ্রুবাহন	ভৃ ৪২৯	বয়েদ	বী ৩৩৩
বনিত	বন্ ২৩৬	বন্দেগী	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধ্যাবাদ	ৱন্ধ্ ২৪৪	বম্	বম্ ২৪৭	বয়ে-যাওয়া	বী ৩৩৩
বনিতা	বন্ ২৩৬	ৱন্দেজ	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধাসুতা	ৱন্ধ্ ২৪৪	বম	বম্ ২৪৭	বয়েল	বী ৩৩৩
বনিদী	বন্ ২৩৬	ৱন্দোবস্ত	ৱন্ধ্ ২৪৪	বন্ধুক	বন্দ্ ২৪২	বমথু	বম্ ২৪৭	বয়েস	বী ৩৩৩
ব(বু)নিয়াদি(দী)	বন্ ২৩৬	বন্দ্য	বন্দ্ ২৪৩	বন্ন	বর্ণ্ ২৪৯	বমন	বম্ ২৪৯	বয়োগত	বী ৩৩৩
বনী	বন্ ২৩৬	বন্দ্যঘটি	বন্দ্ ২৪৩	বন্নক	বর্ণ্ ২৪৯	বমনী	বম্ ২৪৭	বয়োজ্যেষ্ঠ	বী ৩৩৩
বনীয়ক	বন্ ২৩৬	বন্দ্যবংশ	বন্দ্ ২৪৩	বন্য	বন্ ২৩৮	বমনীয়	বম্ ২৪৭	বয়োতীত	বী ৩৩৩
বনেচর	বন্ ২৩৬	বন্দ্যোঘটি	বন্দ্ ২৪৩	বন্যপশু	বন্ ২৩৬	বমাল	ৱ,ব ৩৬২	বয়োধিক	বী ৩৩৩
বনেদ	বন্ ২৩৬	বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দ্ ২৪৩	বন্যবৃত্তি	বন্ ২৩৬	বমিত	বম্ ২৪৭	বয়োধিকা	বী ৩৩৩
বনেদি(দী)	বন্ ২৩৬	ৱন্ধ	ৱন্ধ্ ২৪৪	বন্যা	বন্ ২৩৮	বমিতব্য	বম্ ২৪৭	বয়োবস্থা	বী ৩৩৩
বনেশ্বরী	বন্ ২৩৬	ৱন্ধক	ৱন্ধ্ ২৪৪	বন্যাজল	বন্ ২৩৬	বমী	বম্ ২৪৭	বয়োবৃদ্ধ	বী ৩৩৩
বনৈকদেশ	বন্ ২৩৬	ৱন্ধকি(কী)	ৱন্ধ্ ২৪৪	বন্যাত্রাণ	বন্ ২৩৬	ৱম্ভগাঁটি	বংহ্ ১৯২	বর	বর্ণ্ ২৪৯
বনোদ্দেশ	বন্ ২৩৬	ৱন্ধন	ৱন্ধ্ ২৪৪	বন্যার্ত	বন্ ২৩৬	ৱম্ভতেল	বংহ্ ১৯২	বরই	বর্ণ্ ২৪৯
বনৌকস্	বন্ ২৩৬	ৱন্ধনপালক	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপন	বপ্ ২৪৬	ৱম্ভরালী	বংহ্ ১৯২	বরং	বর্ণ্ ২৫০
বনৌকাঃ	বন্ ২৩৬	ৱন্ধনবেশ্ম	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপনী	বপ্ ২৪৬	ৱম্ভা	বংহ্ ১৯২	বরক	বর্ণ্ ২৪৯
ৱন্ত	বন্ ২৩৬	ৱন্ধনভঙ্গ	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপনীয়	বপ্ ২৪৬	বয়	বী ৩৩৩	বরকত	বর্ণ্ ২৪৯
বন্দ	বন্দ্ ২৪২	ৱন্ধনস্থ	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপা	বপ্ ২৪৬	বয়ঃ	বী ৩৩৩	বরকন্দাজ	বর্ণ্ ২৪৯
ৱন্দ	ৱন্ধ্ ২৪৪	ৱন্ধনাগার	ৱন্ধ্ ২৪৪	বপু	বপ্ ২৪৬	বয়ঃক্রম	বী ৩৩৩	বরকরারি	বর্ণ্ ২৪৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বরকর্ত্তা	বর্ণ্ ২৪৯	বরপ্রস্থান	বর্ণ্ ২৪৯	বরানগর	বর্ণ্ ২৫২	বরুণা	বর্ণ্ ২৫২	বর্ণচোরা	বর্ণ্ ২৫৩
বরকামান(নো)	বর্ণ্ ২৪৯	বরফ	বর্ণ্ ২৪৯	বরাননা	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণানী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণজ্যেষ্ঠ	বর্ণ্ ২৪৯
বরখ	বৃষ্ ৩৫৫	বরফি(ফী)	বর্ণ্ ২৪৯	বরাননী	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণাবাস	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণতুলি	বর্ণ্ ২৪৯
বরখা	বৃষ্ ৩৫৫	বরবটি	বর্ণ্ ২৪৯	বরাবর	বর্ণ্ ২৫১	বরুণালয়	বর্ণ্ ২৫২	বর্ণতুলিকা	বর্ণ্ ২৪৯
বরখাস্ত	বৃষ্ ৩৫৫	বরবধূ	বর্ণ্ ২৪৯	বরাবরী	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণাস্ত্র	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণতুলী	বর্ণ্ ২৪৯
বরখাস্তী	বৃষ্ ৩৫৫	বরবর্ণ	বর্ণ্ ২৪৯	বরাভয়	বর্ণ্ ২৪৯	বরুল	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণদূষক	বর্ণ্ ২৪৯
বরগা	বৃজ্ ৩৪৪	বরবর্ণিনী	বর্ণ্ ২৪৯	বরাভরণ	বর্ণ্ ২৪৯	বরুলী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণদেবতা	বর্ণ্ ২৪৯
বরগাঁ	বৃজ্ ৩৪৪	বরবর্ণী	বর্ণ্ ২৪৯	বরাভীতি	বর্ণ্ ২৪৯	বরূথ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণদ্বিজ	বর্ণ্ ২৪৯
বরগী	বর্ণ্ ২৪৯	বরবাদ	বর্ণ্ ২৪৯	বরামদ	বর্ণ্ ২৪৯	বরূথিনী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণধর্ম্ম	বর্ণ্ ২৪৯
বরগোঁ	বৃজ্ ৩৪৪	বরবাদ	বদ্ ২৩১	বরামুদে	বর্ণ্ ২৪৯	বরূথী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণন	বর্ণ্ ২৫৩
বরঙ্গ	বৃজ্ ৩৪৪	বরভোজন	বর্ণ্ ২৪৯	বরারোহ	বর্ণ্ ২৪৯	বরেণ্য	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণনা	বর্ণ্ ২৪৯
বরচলনি	বর্ণ্ ২৪৯	বরম্	বর্ণ্ ২৪৯	বরাসন	বর্ণ্ ২৪৯	বরেন্দ্র	বর্ণ্ ২৫৩	বর্ণনীয়	বর্ণ্ ২৪৯
বরজ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰরমা-পনি	বংহ্ ১৯২	বরাহ	বর্ণ্ ২৫১	বরেন্দ্রভূমি	বর্ণ্ ২৫৩	বর্ণপরিচয়	বর্ণ্ ২৫৩
বরঞ্চ	বর্ণ্ ২৪৯	বরযাত্তর	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহকল্প	বর্ণ্ ২৫১	বরেন্দ্রী	বর্ণ্ ২৫৩	বর্ণপাত	বর্ণ্ ২৪৯
বরট	বর্ণ্ ২৪৯	বরযাত্র	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহগিরি	বর্ণ্ ২৫২	বরেশ্বর	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণপাত্র	বর্ণ্ ২৪৯
বরটা	বর্ণ্ ২৪৯	বরযাত্রা	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহনগর	বর্ণ্ ২৫২	বরেহঁা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণপ্রকর্ষ	বর্ণ্ ২৪৯
বরটী	বর্ণ্ ২৪৯	বরযাত্রী	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহপুরাণ	বর্ণ্ ২৪৯	বরোঙ্গ	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণবর্ত্তি	বর্ণ্ ২৪৯
বরণ	বর্ণ্ ২৫০	বরযুবতি(তী)	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহভূম	বর্ণ্ ৪২৫	বরোরু	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণবর্ত্তিকা	বর্ণ্ ২৪৯
বরণঅঙ্গুরী	বর্ণ্ ২৪৯	বররামা	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহমিহির	মিহ্ ৫৫২	বরোল	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণবিপর্যয়	বর্ণ্ ২৪৯
বরণকুলা	বর্ণ্ ২৫০	বররুচি	বর্ণ্ ২৫১	বরাহাবতার	বর্ণ্ ২৫২	বর্কর	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণবিবর্ণ	বর্ণ্ ২৪৯
বরণডালা	বর্ণ্ ২৫০	বরল	বর্ণ্ ২৪৯	বরাহী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্গ	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণবৃত্ত	বর্ণ্ ২৪৯
বরণমালা	বর্ণ্ ২৫০	বরলা	বর্ণ্ ২৪৯	ৰরাহ্মণজ্ঞান	বংহ্ ১৯২	বর্গক্ষেত্র	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণব্যবস্থিতি	বর্ণ্ ২৪৯
বরণীয়	বর্ণ্ ২৪৯	বরলী	বর্ণ্ ২৪৯	বরিখ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্গপদ	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণময়	বর্ণ্ ২৪৯
বরণ্ড	বর্ণ্ ২৪৯	বরশা	বর্ণ্ ২৪৯	বরিখ	বৃষ্ ৩৫৫	বর্গমূল	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণমাতৃকা	বর্ণ্ ২৪৯
বরত	বর্ণ্ ২৪৯	বরশি	ৰ,ব ৩৬২	বরিখন	বৃষ্ ৩৫৫	বর্গা	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণমাত্র	বর্ণ্ ২৪৯
বরতরফ	বর্ণ্ ২৪৯	বরষ	বৃষ্ ৩৫৫	বরিবস্যা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্গি	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণমালা	বর্ণ্ ২৫৮
বরতরফি	বর্ণ্ ২৪৯	বরষা	বৃষ্ ৩৫৫	বরিয়াত	বর্ণ্ ২৪৯	বর্গীয়	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণশ্রেষ্ঠ	বর্ণ্ ২৪৯
বরতিনী	বর্ণ্ ২৪৯	বরসজ্জা	বর্ণ্ ২৪৯	বরিয়াতি	বর্ণ্ ২৪৯	বর্গ্য	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণসংযোগ	বর্ণ্ ২৪৯
বরত্র	বর্ণ্ ২৪৯	বরসূতা	বর্ণ্ ২৪৯	বরিয়াতী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্চ্চ	ৰ,ব ৩৬২	বর্ণসংসর্গ	বর্ণ্ ২৪৯
বরত্রা	বর্ণ্ ২৪৯	বরহা	বর্ণ্ ২৪৯	বরিষ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্চ্চঃ	ৰ,ব ৩৬২	বর্ণসঙ্কর	বর্ণ্ ২৫৩
বরদ	বর্ণ্ ২৫০	বরাক	বর্ণ্ ২৫১	বরিষ	বৃষ্ ৩৫৫	বর্চ্চস্বী	ৰ,ব ৩৬২	বর্ণসঙ্কারক	বর্ণ্ ২৪৯
বরদা	বর্ণ্ ২৫০	বরাক	— ৪৬৩	বরিষণ	বৃষ্ ৩৫৫	বর্চ্চা	ৰ,ব ৩৬২	বর্ণসমাম্নায়	বর্ণ্ ২৪৯
বরদাঅ	বর্ণ্ ২৪৯	বরাঘুরে	বর্ণ্ ২৪৯	বরিষা	বৃষ্ ৩৫৫	বর্হ্ব	ৰ,ব ৩৬২	বর্ণস্থান	বর্ণ্ ২৪৯
বরদাই	বর্ণ্ ২৪৯	বরাঙ্গ	বর্ণ্ ২৪৯	বরিষ্ঠ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জ	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণহীন	বর্ণ্ ২৪৯
বরদান	বর্ণ্ ২৪৯	বরাঙ্গনা	বর্ণ্ ২৪৯	বরিহা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জন	বৃজ্ ৩৪৫	বর্ণা	বর্ণ্ ২৪৯
বরদায়	বর্ণ্ ২৪৯	বরাঙ্গী	বর্ণ্ ২৪৯	বরীয়স	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জনীয়	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণাপেত	বর্ণ্ ২৪৯
বরদায়ী	বর্ণ্ ২৪৯	বরাট	বর্ণ্ ২৪৯	বরীয়ান	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জনীয়া	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণাশ্রম	বর্ণ্ ২৫৩
বরদার	বর্ণ্ ২৪৯	বরাটক	বর্ণ্ ২৪৯	বরুই	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জয়িতব্য	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণিক	বর্ণ্ ২৪৯
বরদাস্ত	বর্ণ্ ২৪৯	বরাটিকা	বর্ণ্ ২৪৯	বরুজ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জয়িতা	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণিকা	বর্ণ্ ২৪৯
বরনারী	বর্ণ্ ২৫০	বরাটিয়া	বর্ণ্ ২৪৯	বরুড়	বর্ণ্ ২৪৯	বর্জ্জিত	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণিত	বর্ণ্ ২৪৯
বরনাহ	বর্ণ্ ২৪৯	বরাটী	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণ	বর্ণ্ ২৫২	বর্জ্জ্য	বৃজ্ ৩৪৪	বর্ণিনী	বর্ণ্ ২৪৯
বরপক্ষ	বর্ণ্ ২৪৯	বরাড়ী	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণদেব	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণ	বর্ণ্ ২৫৩	বর্ণী	বর্ণ্ ২৪৯
বরপুত্র	বর্ণ্ ২৫০	বরাত	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণদৈবত	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণক	বর্ণ্ ২৫৩	বর্ত্ত	বৃৎ ৩৪৬
বরপূর্ব্ব	বর্ণ্ ২৪৯	বরাতী	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণপাশ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণকা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ত্তক	বৃৎ ৩৪৫
বরপ্রদান	বর্ণ্ ২৪৯	বরান্দ	বর্ণ্ ২৪৯	বরুণলোক	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ণকূপিকা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ত্তন	বৃৎ ৩৪৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বর্ত্তনার্থী	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষ	বৃষ্ ৩৫৫	বর্হী	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলয়বান	ৰল্ ২৬৩	ৰলি(লী)বর্দ্দ	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তনী	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষকর	বৃষ্ ৩৫৫	ৰল	ৰল্ ২৬৩	ৰলরাম	ৰল্ ২৬৩	ৰলিমান	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তমান	বৃৎ ৩৪৬	বর্ষগিরি	বৃষ্ ৩৫৫	ৰল	ৰল্ ২১৪	ৰলসূদন	ৰল্ ২৬৩	বলিশা	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্ত্র	বৃৎ ৩৪৮	বর্ষণ	বৃষ্ ৩৫৫	বলই	ৰল্ ২৬৩	ৰলস্থ	ৰল্ ২৬৩	ৰলিহারি	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তান	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষত্র	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলক	ৰল্ ২৬৩	ৰলহন্তা	ৰল্ ২৬৩	ৰলী	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তি(র্ত্তী)	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষত্রাণ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলকর	ৰল্ ২৬৩	ৰলহা	ৰল্ ২৬৩	ৰলীক	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তিক	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষধর	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলকৃৎ	ৰল্ ২৬৩	ৰলা	ৰল্ ২১৪	ৰলীবর্দ্দ	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তিকা	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষপর্ব্বত	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলক্রমে	ৰল্ ২৬৩	বলা	ৰল্ ২৬৩	ৰলীয়ান	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তিত	বৃৎ ৩৪৬	বর্ষপাত	বৃষ্ ৩৫৫	বলক্ষ	ৰল্ ২৬৩	ৰলাই	ৰল্ ২৬৩	ৰলোৎকট	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তিতব্য	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষপ্রতিবন্ধ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলক্ষোভ	ৰল্ ২৬৩	বলাক	ৰল্ ২৬৩	ৰলৌঘ	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তিষ্ণু	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষপ্রবেশ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলগণ্ডিভোগ	ৰল্ ২৬৩	বলাকা	ৰল্ ২৬৩	বল্ক	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তী	বৃৎ ৩৪৮	বর্ষশত	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলচক্র	ৰল্ ২৬৩	বলাকিনী	ৰল্ ২৬৩	বল্কক	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তুল	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষশতী	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলজ	ৰল্ ২৬৩	বলাকী	ৰল্ ২৬৩	বল্কল	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্তুলা	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষা	বৃষ্ ৩৫৭	ৰলজা	ৰল্ ২৬৩	ৰলাৎ	ৰল্ ২৬৩	বল্কলা	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্ম	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষাকাল	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলজ্যেষ্ঠ	ৰল্ ২৬৩	ৰলাৎকার	ৰল্ ২৬৩	বল্কলী	ৰল্ ২৬৩
বর্ত্মকর্ম্ম	বৃৎ ৩৪৫	বর্ষাকালিক	বৃষ্ ৩৫৫	বড়(ল)ভি(ভী)	ৰল্ ২৬৩	ৰলাৎকৃত	ৰল্ ২৬৩	বল্‌গ্	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধ্	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাকালীন	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলদ	ৰল্ ২৬৩	ৰলাধান	ৰল্ ২৬৩	বল্‌গ	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধক	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাগম	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলদা	ৰল্ ২৬৩	ৰলাধিক	ৰল্ ২৬৩	বল্‌গন	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধকি	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাতী	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলদ্বিট্	ৰল্ ২৬৩	ৰলাধিকরণ	ৰল্ ২৬৩	বল্গা	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধকী	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাবসান	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলদে	ৰল্ ২৬৩	ৰলাধ্যক্ষ	ৰল্ ২৬৩	বল্গি	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধন	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাবসায়	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলদেব	ৰল্ ২৬৩	ৰলানুজ	ৰল্ ২৬৩	বল্গিত	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধনী	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাভব	বৃষ্ ৩৫৫	বলন	ৰল্ ২৬৩	ৰলাৰল	ৰল্ ২৬৩	বল্‌গা	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধমান	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাভূ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলন	ৰল্ ২৬৩	ৰলাবলেপ	ৰল্ ২৬৩	বল্‌গাহরিণ	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধয়িতা	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষাম্বু	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলনাশন	ৰল্ ২৬৩	ৰলাহক	ৰল্ ২৬৩	বল্‌গিত	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধাপন	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষান্তঃ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলনিষূদন	ৰল্ ২৬৩	বলাবলি	ৰল্ ২৬৩	বল্‌তা	বর্ণ্ ২৪৯
বর্দ্ধিত	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষারম্ভ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলনিগ্রহ	ৰল্ ২৬৩	ৰলি	ৰল্ ২৬৩	বল্মু	বল্ ২৬৩
বর্দ্ধিষ্ঠ	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষিষ্ঠ	বৃষ্ ৩৫৫	বলনি(নী)	ৰল্ ২৬৩	ৰলিকর্ম্ম	ৰল্ ২৬৩	বল্মুক	ৰল্ ২৬৩
বর্দ্ধিষ্ণু	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষী	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলপতি	ৰল্ ২৬৩	ৰলিদ্বিট্	ৰল্ ২৬৩	বল্মিক	ৰল্ ২৬৩
বর্ধ্র	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষীয়	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলপ্রদ	ৰল্ ২৬৩	ৰলিধ্বংসী	ৰল্ ২৬৩	বল্মিকি	ৰল্ ২৬৩
বর্ধ্রিকা	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষীয়স	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলবৎ	ৰল্ ২৬৩	ৰলিনিষূদন	ৰল্ ২৬৩	বল্মী	ৰল্ ২৬৩
বর্ধ্রী	বৃধ্ ৩৫৩	বর্ষীয়ান	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলবর্দ্ধন	ৰল্ ২৬৩	ৰলিপুষ্ট	ৰল্ ২৬৩	বল্মীক	ৰল্ ২৬৫
বর্ব্বট	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ষুক	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলবন্ত	ৰল্ ২৬৩	ৰলিভুক	ৰল্ ২৬৩	বল্মীকজন্মা	ৰল্ ২৬৫
ৰর্ব্বণা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ষোপল	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলবান	ৰল্ ২৬৩	ৰলিভোজন	ৰল্ ২৬৩	বল্মীকাগ্র	ৰল্ ২৬৩
ৰর্ব্বর	বর্ণ্ ২৪৯	বর্ষ্ম	বৃষ্ ৩৫৫	ৰলবিন্যাস	ৰল্ ২৬৩	ৰলিবেশ্ম	ৰল্ ২৬৩	ৰল্য	ৰল্ ২৬৩
ৰর্ব্বরী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হ্	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলবীর	ৰল্ ২৬৩	ৰলিমন্দির	ৰল্ ২৬৩	ৰল্যা	ৰল্ ২৬৩
বর্ব্বুর	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলবৃত্তি	ৰল্ ২৬৩	ৰলিসদ্ম	ৰল্ ২৬৩	বল্ল্	ৰল্ ২৬৩
বর্ম্ম	বর্ণ্ ২৬০	বর্হণ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলবৃত্রহা	ৰল্ ২৬৩	ৰলিব্যাকুল	ৰল্ ২৬৩	বল্ল	ৰল্ ২৬৩
বর্ম্মণ	বর্ণ্ ২৬০	বর্হনেত্র	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলভদ্র	ৰল্ ২৬৩	ৰলিভৃৎ	ৰল্ ২৬৩	বল্লকী	ৰল্ ২৬৩
বর্ম্মা	বর্ণ্ ২৬০	বর্হা	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলভি(ভী)	ৰল্ ২৬৩	ৰলি	ৰল্ ২৬৩	বল্লব	ৰল্ ২৬৩
বর্ম্মি	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হিঃ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলভিৎ	ৰল্ ২৬৩	বলি(লী)	ৰল্ ২৬৩	বল্লবী	ৰল্ ২৬৩
বর্ম্মী	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হিণ	বর্ণ্ ২৪৯	বলভৃৎ	ৰল্ ২৬৩	ৰলিকা	ৰল্ ২৬৩	বল্লভ	ৰল্ ২৬৩
বর্ম্মুষ	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হির্ম্মুখ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলমুখ্য	ৰল্ ২৬৩	ৰলিচক্র	ৰল্ ২৬৩	বল্লভজ্ঞা	ৰল্ ২৬৩
বর্য্য	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হিষৎ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলয়	ৰল্ ২৬৩	ৰলিত	ৰল্ ২৬৩	বল্লভপাল	ৰল্ ২৬৩
বর্য্যা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হিষদ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলয়িত	ৰল্ ২৬৩	ৰলিদান	ৰল্ ২৬৩	বল্লভা	ৰল্ ২৬৩
বর্শা	বর্ণ্ ২৪৯	বর্হিষ্মান	বর্ণ্ ২৪৯	ৰলয়ী	ৰল্ ২৬৩	বলিষ্ঠ	ৰল্ ২৬৩	বল্লভাচার্য্য	ৰল্ ২৬৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বল্লম	বল্ ২৬৩	বসন্তজা	বস্ ২৭০	বসুমাতা	বস্ ২৭৩	বহতা	বহ্ ২৮০	বহুক্ষম	বংহ্ ১৯২
বল্লর	বল্ ২৬৩	বসন্ততিলক	বস্ ২৭০	বসুমান	বস্ ২৭০	বহন	বহ্ ২৮০	বহুক্ষীরা	বংহ্ ১৯২
বল্লরি(রী)	বল্ ২৬৩	বসন্ততিলকা	বস্ ২৭০	বসুষেণ	বস্ ২৭৩	বহনীয়	বহ্ ২৭৮	বহুগুষ্টি	বংহ্ ১৯২
বল্লা	বর্ণ্ ২৪৯	বসন্তদূত	বস্ ২৭০	বসোর্ধারা	বস্ ২৭০	বহমান	বহ্ ২৭৮	বহুড়ি(ড়ী)	বংহ্ ১৯২
বল্লি(ল্লী)	বল্ ২৬৩	বসন্তদূতী	বস্ ২৭০	বস্ত	বস্ ২৭০	বহর	বহ্ ২৮০	বহুৎ	বংহ্ ১৯৩
বল্লুর	বল্ ২৬৩	বসন্তপঞ্চমী	বস্ ২৭০	বস্তব্য	বস্ ২৭০	বহরি	বহ্ ২৭৮	বহুত	বংহ্ ১৯৩
বল্বজ	বল্ ২৬৩	বসন্তবউ	বস্ ২৭০	বস্তা	বস্ ২৭০	বহরী	বহ্ ২৭৮	বহুতন্ত্রীক	বংহ্ ১৯২
বশ	বশ্ ২৬৮	বসন্তবউরি	বস্ ২৭০	বস্তাপচা	বস্ ২৭০	বহল	বহ্ ২৭৮	বহুতন্ত্রিকা	বংহ্ ১৯২
বশংবদ	বশ্ ২৬৮	বসন্তবন্ধু	বস্ ২৭০	বস্তি	বস্ ২৭০	বহল	বংহ্ ১৯২	বহুতম	বংহ্ ১৯২
বশকর	বশ্ ২৬৭	বসন্তলতা	বস্ ২৭০	বস্তিকর্ম্ম	বস্ ২৭০	বহলা	বহ্ ২৭৮	বহুতর	বংহ্ ১৯২
বশক্রিয়া	বশ্ ২৬৭	বসন্তসখ	বস্ ২৭০	বস্তিকোশ	বস্ ২৭০	বহস্	বহ্ ২৭৮	বহুতিথ	বংহ্ ১৯২
বশগ	বশ্ ২৬৭	বসন্তব্রণ	বস্ ২৭০	বস্তিশিরঃ	বস্ ২৭০	বহস্ (বহ্)	বদ্ ২৩১	বহুতৃণ	বংহ্ ১৯২
বশতঃ	বশ্ ২৬৮	বসন্তমহোৎসব	বস্ ২৭০	বস্তু	বস্ ২৭৪	বহা	বহ্ ২৭৮	বহুদক্ষিণ	বংহ্ ১৯৪
বশতা	বশ্ ২৬৭	বসন্তলক্ষ্মী	বস্ ২৭০	বস্তুজাত	বস্ ২৭০	বহানা	বন্ ২৩৬	বহুদর্শী	বংহ্ ১৯২
বশবর্ত্তী	বশ্ ৩৪৮	বসন্তসহায়	বস্ ২৭০	বস্তুজ্ঞান	বস্ ২৭৪	বহাল	বংহ্ ১৯২	বহুদৃশ্বা	বংহ্ ১৯২
বশা	বশ্ ২৬৭	বসন্তী	বস্ ২৭০	বস্তুত	বস্ ২৭০	বহাল	বহ্ ২৭৮	বহুদোষ	বংহ্ ১৯২
বশাৎ	বশ্ ২৬৭	বসন্তোৎসব	বস্ ২৭০	বস্তুতঃ	বস্ ২৭০	বহালী	বহ্ ২৭৮	বহুধা	বংহ্ ১৯৪
বশানুগ	বশ্ ২৬৭	বসবাস	বস্ ২৭১	বস্তুতন্ত্র	বস্ ২৭০	বহালী	বংহ্ ১৯২	বহুনিষ্ঠ	বংহ্ ১৯২
বশিতা	বশ্ ২৬৭	বসমাতা	বস্ ২৭০	বস্তুধর্ম্ম	বস্ ২৭০	বহি	বহ্ ২৮১	বহুপ্রেয়সী	বংহ্ ১৯২
বশিষ্ঠ	বশ্ ২৬৮	বসহা	বৃষ্ ৩৫৫	বস্তুনির্দ্দেশ	বস্ ২৭০	বহিঃ	বহ্ ২৭৮	বহুবচন	বংহ্ ১৯২
বশী	বশ্ ২৬৭	বসা	বস্ ২৭১	বস্তুবিচার	বস্ ২৭০	বহিত্র	বহ্ ২৭৮	বহুবল্লভ	বংহ্ ১৯২
বশীকর	বশ্ ২৬৭	বসাগন্ধী	বস্ ২৭০	বস্তুবিবর্ত্ত	বস্ ২৭০	বহিন	বহ্ ২৭৮	বহুবল্লভা	বংহ্ ১৯২
বশীকরণ	বশ্ ২৬৭	বসামেহ	বস্ ২৭০	বস্তুভাব	বস্ ২৭০	বহিন	ভজ্ ৩৬৮	বহুবার	বংহ্ ১৯২
বশীকৃত	বশ্ ২৬৭	বসান	বস্ ২৭০	বস্তুভেদ	বস্ ২৭০	বহিনী	ভজ্ ৩৬৮	বহুবিধ	বি ২৯৯
বশীকৃতি	বশ্ ২৬৭	বসিষ্ঠ	বস্ ২৬৮	বস্তুমাত্র	বস্ ২৭০	বহিরঙ্গ	বহ্ ২৭৮	বহুবিধ	বংহ্ ১৯৪
বশীভূত	বশ্ ২৬৭	বসু	বস্ ২৭২	বস্তুপমা	বস্ ২৭০	বহিরিন্দ্রিয়	বহ্ ২৭৮	বহুবিধি	বংহ্ ১৯২
বশীন্দ্র	বশ্ ২৬৭	বসুজ	বস্ ২৭০	বস্ত্র	বস্ ২৭৫	বহির্গমন	বহ্ ২৮১	বহুবিস্তর	বংহ্ ১৯২
বশ্য	বশ্ ২৬৮	বসুজা	বস্ ২৭০	বস্ত্রকোষ	বস্ ২৭০	বহির্জগৎ	বহ্ ২৮১	বহুব্যয়ী	বংহ্ ১৯২
বশ্যতা	বশ্ ২৬৮	বসুদ	বস্ ২৭২	বস্ত্রখণ্ড	বস্ ২৭০	বহির্দ্দেশ	বহ্ ২৭৮	বহুব্রীহি	বংহ্ ১৯৪
বশ্যা	বশ্ ২৬৭	বসুদা	বস্ ২৭০	বস্ত্রগুপ্ত	বস্ ২৭০	বহির্দ্বার	বহ্ ২৭৮	বহুভক্ষ	বংহ্ ১৯২
বষ্কয়ণী	ৰ,ব ৩৬২	বসুদেব	বস্ ২৭২	বস্ত্রগৃহ	বস্ ২৭০	বহির্ব্বাস	বহ্ ২৭৮	বহুভক্ষক	বংহ্ ১৯২
বষ্কয়িণী	ৰ,ব ৩৬২	বসুধা	বস্ ২৭৩	বস্ত্রনির্ণেজক	বস্ ২৭০	বহির্ভূত	বহ্ ২৮১	বহুভাষী	বংহ্ ১৯২
বষ্টম	বিশ্ ৩২১	বসুধাতল	বস্ ২৭০	বস্ত্রপ	বস্ ২৭০	বহির্ম্মুখ	বহ্ ২৭৮	বহুভূমিক	বংহ্ ১৯২
বষ্টুম	বিশ্ ৩২১	বসুধাধর	বস্ ২৭০	বস্ত্রপূত	বস্ ২৭০	বহিশ্চর	বহ্ ২৭৮	বহুভোজী	বংহ্ ১৯২
বস	বস্ ২৭১	বসুধারা	বস্ ২৭৩	বস্ত্রবন্ধ	বস্ ২৭০	বহিষ্করণ	বহ্ ২৮১	বহুমত	বংহ্ ১৯২
বসত	বস্ ২৭১	বসুধারী	বস্ ২৭৩	বস্ত্রবন্ধন	বস্ ২৭০	বহিষ্কার	বহ্ ২৮১	বহুমতি	বংহ্ ১৯২
বসতি	বস্ ২৭১	বসুধারিণী	বস্ ২৭০	বস্ত্রবেশ্ম	বস্ ২৭০	বহিষ্কার্য্য	বহ্ ২৭৮	বহুমান	বংহ্ ১৯২
বসতিক্রম	বস্ ২৭০	বসুধালিঙ্গন	বস্ ২৭০	বস্ত্রযোনি	বস্ ২৭০	বহিষ্কৃত	বহ্ ২৮১	বহুমায়	বংহ্ ১৯২
বসন	বস্ ২৭১	বসুনাথ	বস্ ২৭৩	বস্ত্ররঞ্জন	বস্ ২৭০	বহিষ্কৃতি	বহ্ ২৭৮	বহুমুখ	বংহ্ ১৯২
বসনসদ্ম	বস্ ২৭০	বসুন্ধরা	বস্ ২৭৩	বস্ত্রসংবীত	বস্ ২৭০	বহিস্থ	বহ্ ২৭৮	বহুমূত্র	বংহ্ ১৯২
বসনা	বস্ ২৭০	বসুন্ধরাধর	বস্ ২৭০	বস্ত্রাবকর্ত্ত	বস্ ২৭০	বহিস্থিত	বহ্ ২৭৮	বহুযাজক	বংহ্ ১৯২
বসন্ত	বস্ ২৭১	বসুপতি	বস্ ২৭০	বস্ত্রার্দ্ধ	বস্ ২৭০	বহু	বংহ্ ১৯৩	বহুয়ারী	বংহ্ ১৯২
বসন্তকাট	বস্ ২৭০	বসুমতী	বস্ ২৭৩	বস্বোকসারা	বস্ ২৭০	বহুঁ	বংহ্ ১৯২	বহুরাশিক	বংহ্ ১৯২
বসন্তকোকিল	বস্ ২৭০	বসুমনা	বস্ ২৭০	বহ	বহ্ ২৮০	বহুআরি	বংহ্ ১৯২	বহুরি(রী)	বংহ্ ১৯২
বসন্তঘোষ	বস্ ২৭০	বসুমাই	বস্ ২৭০	বহড়া	বি ২৯০	বহুকর	বংহ্ ১৯২	বহুরূপ	বংহ্ ১৯২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বহুরূপা	বংহ্	১৯২	বাইচ	বা	২৮৭	বাংলা	বঙ্	২১২	বাঁটনা	বট্	২২২	বাকচাতুরী	বচ্	২১৩
বহুরূপী	বংহ্	১৯২	বাইছ	বা	২৮৭	বাংলাদেশ	বঙ্	২১২	বাঁটনা-বাটা	বট্	২২২	বাকড়া	বল্	২৬৩
বহুরোমা	বংহ্	১৯২	বাইজ	বা	২৮৭	বাংলাদেশি	বঙ্	২১২	বাঁটা	বণ্	২২৬	বাকড়াগুয়া	বল্	২৬৩
বহুল	বংহ্	১৯৪	বাইতি	বা	২৮৭	বাংলাদেশী	বঙ্	২১২	বাঁ(বা)টালি	বণ্	২২৬	বাকদত্ত	বচ্	২১৩
বহুলা	বংহ্	১৯২	বাইতি	বদ্	২৩১	বাংলাভাষা	ভাষ্	৩৯২	বাঁ(বা)টুল	বণ্	২২৬	বাকপটু	বচ্	২১৩
বহুলী	বংহ্	১৯২	বাইন	বদ্	২৩১	বাংলো	বঙ্	২১২	বাঁ(বা)টোয়ারা	বণ্	২২৬	বাকবিতণ্ডা	বচ্	২১৩
বহুলীভাব	বংহ্	১৯২	বাইন	বজ্	২১৮	বাংশিক	বম্	২৪৭	বাঁড়	বট্	২২২	বাকম	বচ্	২১৩
বহুলীভূত	বংহ্	১৯২	বাইন	বন্ধ্	২৪৪	বাঃ	বা	২৮৭	বাঁড়রি(ড়ী)	বন্দ্	২২৭	বাকল	বল্	২৬৩
বহুশঃ	বংহ্	১৯২	বাইনানী	বণ্	২২৬	বাঁ	বা	২৮৭	বাঁড়া	বট্	২২২	বাকলা	বল্	২৬৩
বহুশাখ	বংহ্	১৯২	বাইর	বহ্	২৭৮	বাঁও (ব্যাম)	বি	২৯০	বাঁড়া	বণ্	২২৭	বাকসংযম	বচ্	২১৩
বহুশ্রুত	বংহ্	১৯২	বাইশ	ব,ব	৩৬২	বাঁওড়	বা	২৮৭	বাঁড়ুজ্জে	বন্দ্	২৪২	বাকসিদ্ধ	বচ্	২১৬
বহুস্বামিক	বংহ্	১৯২	বাইশী	ব,ব	৩৬২	বাঁওন	বংহ্	১৯২	বাঁড়ুয্যা(য্যে)	বন্দ্	২২৭	বাকসিদ্ধা	বচ্	২১৬
বহূ	বংহ্	১৯২	বাইশে	ব,ব	৩৬২	বাঁক	বঙ্ক্	২১১	বাঁড়ুয্যে	বণ্	২২৭	বাকী	বচ্	২১৬
বহূরী	বংহ্	১৯২	বাইস	ব,ব	৩৬২	বাঁক	ব,ব	৩৬২	বাঁদর	বন্	২৪১	বাকীবকেয়া	বচ্	২১৩
বহেড়া	বি	২৯০	বাইসাইকেল	ব,ব	৩৬২	বাঁকচুর	বঙ্ক্	২১০	বাঁদরাগাছ	বন্	২৩৬	বাকুচী	বচ্	২১৩
বহেস	বি	২৯০	বাঈ	বা	২৮৭	বাঁকচোর	বঙ্ক্	২১০	বাঁদরামি	বন্	৫৪৩	বাকুড়ি	বা	২৮৭
বহ্নি	বহ্	২৮১	বাউ	বাধ্	২৩৪	বাঁকতুলসী	বঙ্ক্	২১০	বাঁদরী	বন্	২৩৬	বাকুল	বা	২৮৭
বহ্নিকর	বহ্	২৭৮	বাউ	বা	২৮৭	বাঁকনল	বঙ্ক্	২১০	বাঁদা(ধা)	বন্দ্	২৪২	বাকোপবাক	বচ্	২১৩
বহ্নিকুণ্ড	বহ্	২৭৮	বাউ	বহ্	২৭৮	বাঁকপাতামল	বঙ্ক্	২১০	বাঁদী	বন্দ্	২৪৩	বাকোবাক্য	বচ্	২১৩
বহ্নিকোণ	বহ্	২৭৮	বাউই	বা	২৮৭	বাঁকমল	বঙ্ক্	২১০	বাঁদুরে	বন্	২৩৬	বাক্চপল	বচ্	২১৩
বহ্নিকোপ	বহ্	২৭৮	বাউক্ষ	বা	২৮৭	বাঁকশালি	বঙ্ক্	২১০	বাঁদু(ধু)লি	বন্ধ্	২৪৪	বাক্চাপল্য	বচ্	২১৩
বহ্নিগর্ভা	বহ্	২৭৮	বাউক্ষ(ক্ষা)	বি	২৯০	বাঁকসাল	বঙ্ক্	২১০	বাঁদু(ধু)লী	বন্ধ্	২৪৪	বাক্চাতুরী	বচ্	২১৩
বহ্নিগৃহ	বহ্	২৭৮	বাউক্ষা	বা	২৮৭	বাঁক(কু)ই	বঙ্ক্	২১০	বাঁধ	বন্ধ্	২৪৪	বাক্ছল	বচ্	২১৩
বহ্নিজ্বালা	বহ্	২৭৮	বাউটি(টী)	বাধ্	২৩৪	বাঁকা	বঙ্ক্	২১১	বাঁধন	বন্ধ্	২৪৪	বাক্দত্ত	বচ্	২১৩
বহ্নিদাহ	বহ্	২৭৮	বাউটিসুট	বাধ্	২৩৪	বাঁকুয়া	বঙ্ক্	২১০	বাঁধন-ছাঁদন	বন্ধ্	২৪৪	বাক্দত্তা	বচ্	২১৩
বহ্নিপ্রিয়া	বহ্	২৭৮	বাউড়ি	বৃধ্	৩৫৩	বাঁকারি	বা	২৮৭	বাঁধ(দ)নদার	বন্ধ্	২৪৪	বাক্পতি	বচ্	২১৩
বহ্নিবধূ	বহ্	২৭৮	বাউতি	বহ্	২৭৮	বাঁকি(কী)	বা	২৮৭	বাঁধনি	বন্ধ্	২৪৪	বাক্পটু	বচ্	২১৩
বহ্নিবাণী	বহ্	২৭৮	বাউনি	বন্ধ্	২৪৪	বাঁকুড়া	বা	২৮৭	বাঁধনি-ছাঁদনি	বন্ধ্	২৪৪	বাক্পারুষ্য	বচ্	২১৩
বহ্নিবীজ	বহ্	২৭৮	বাউবেগ	বা	২৮৭	বাঁকুয়া	বা	২৮৭	বাঁধা	বন্ধ্	২৪৪	বাক্বাণী	বচ্	২১৩
বহ্নিভোগ্য	বহ্	২৭৮	বাউয়াস	বা	২৮৭	বাঁখারি	বা	২৮৭	বাঁধিপোতা	বন্ধ্	২৪৪	বাক্বাদিনী	বচ্	২১৩
বহ্নিভোজ্য	বহ্	২৭৮	বাউর	বা	২৮৭	বাঁচ	বঞ্চ্	২২১	বাঁয়া	বা	২৮৭	বাক্বিতণ্ডা	বচ্	২১৩
বহ্নিশালা	বহ্	২৭৮	বাউরা	বা	২৮৭	বাঁচন	বঞ্চ্	২২১	বাঁশ(স)	বম্	২৪৭	বাক্রোধ	বচ্	২১৩
বহ্নিশিখা	বহ্	২৭৮	বাউল	বা	২৮৭	বাঁচা	বঞ্চ্	২২১	বাঁশই	বম্	২৪৭	বাক্শক্তি	বচ্	২১৩
বহ্নিসংস্কার	বহ্	২৭৮	বাউলি(লী)	বাধ্	২৩৪	বাঁচাও	বঞ্চ্	২২১	বাঁশগজাল	বম্	২৪৭	বাক্শর	বচ্	২১৩
বহ্নিসখ	বহ্	২৭৮	বাউলিয়া	বা	২৮৭	বাঁচোয়া	বঞ্চ্	২২১	বাঁশগাড়ি	বম্	২৪৭	বাক্শল্য	বচ্	২১৩
বহ্নিসখা	বহ্	২৭৮	বাউস	বা	২৮৭	বাঁজা	বা	২৮৭	বাঁশপাতা	বম্	২৪৭	বাক্স	বচ্	২১৩
বহ্বারম্ভ	বহ্	২৭৮	বাউস	বাধ্	২৩৪	বাঁজী	বা	২৮৭	বাঁশফুল	বম্	২৪৭	বাক্য	বচ্	২১৪
বহ্বাশী	বহ্	২৭৮	বাএন	বদ্	২৩১	বাঁঝ	বা	২৮৭	বাঁশবন	বম্	২৪৭	বাক্য	—	২১৬
বহুলে	বি	২৯০	বাও	বা	২৮৭	বাঁঝা	বা	২৮৭	বাঁশরী	বম্	২৪৭	বাক্যকর	বচ্	২১৩
বহ্বৃচ	বহ্	২৭৮	বাওঁ	বা	২৮৭	বাঁঝি	বা	২৮৭	বাঁশী	বম্	২৪৭	বাক্যগর্বিত	বচ্	২১৩
বা	বা	২৮৭	বাওন	বংহ্	১৯২	বাঁঝিয়া	বা	২৮৭	বাঁ(বা)সমতী	বস্	২৭০	বাক্যগ্রহ	বচ্	২১৩
বাঅ	বা	২৮৭	বাওয়া	বপ্	২৪৬	বাঁঝী	বা	২৮৭	বাঁহুক	বা	২৮৭	বাক্যদণ্ড	বচ্	২১৩
বাঅন	বা	২৮৭	বাওয়া	বা	২৮৭	বাঁট	বট্	২২২	বাঃ	বস্	২৭০	বাক্যদত্ত	বচ্	২১৩
বাই	বা	২৮৭	বাওয়াজি	বপ্	২৪৬	বাঁট	বণ্	২২৬	বাক্(চ্)	বচ্	২১৬	বাক্যদান	বচ্	২১৩
বাইগন	বা	২৮৭	বাং	বা	২৮৮	বাঁ(বা)টখারা	বণ্	২২৬	বাক	বচ্	২১৪	বাক্যনবাব	বচ্	২১৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বাক্যপদীয়	বচ্	২১৩	বাগীশ	বচ্	২১৩	বাঘলেঙ্গুড়ে	বি	২৯০	বাচাট	বচ্	২১৩	বাজপেয়ী	বজ্	২২০
বাক্যপাত্র	বচ্	২১৩	বাগীশা	বচ্	২১৩	বাঘহাথা	বি	২৯০	বাচারম্ভ	বচ্	২১৩	বাজবহরি(রী)	বজ্	২১৮
বাক্যবাজ	বচ্	২১৩	বাগীশ্বর	বচ্	২১৩	বাঘা	বি	২৯০	বাচাল	বচ্	২১৩	বাজরা	বজ্	২১৮
বাক্যবাণ	বচ্	২১৩	বাগীশ্বরী	বচ্	২১৩	বাঘা-আড়	বি	২৯০	বাচি	বা	২৮৭	বাজসনী	বজ্	২২০
বাক্যবিশারদ	বচ্	২১৩	বাগুড়ি	ৰল্	২৬৩	বাঘা-কুকুর	বি	২৯০	বাচিক	বচ্	২১৩	বাজসনেয়	বজ্	২২০
বাক্যব্যয়	বচ্	২১৩	বাগু(গো)য়ান	বি	২৯০	বাঘা-তেঁতুল	বি	২৯০	বাচিকপত্র	বচ্	২১৩	বাজসনেয়ী	বজ্	২২০
বাক্যযুদ্ধ	বচ্	২১৩	বাগুলা	ৰল্	২৬৩	বাঘা-হামা	বি	২৯০	বাচোযুক্তি	বচ্	২১৩	বাজসনেয়িসংহিতা	বজ্	২২০
বাক্যালাপ	বচ্	২১৩	বাগুরা	বা	২৮৭	বাঘাম্বর	বি	২৯০	বাচ্চা	বদ্	২৩১	বাজা	বজ্	২১৯
বাক্যশেষ	বচ্	২১৩	বাগুরিক	বা	২৮৭	বাঘাম্বরা	বি	২৯০	বাচ্ছা	বদ্	২৩১	বাজার	বজ্	২১৯
বাক্যসিদ্ধ	বচ্	২১৬	বাগুলা	বা	২৮৭	বাঘিনী	বি	২৯০	বাচ্য	বচ্	২১৩	বাজারদর	বজ্	২১৮
বাক্যস্ফুরণ	বচ্	২১৩	বাগুলাবন্ধ	বা	২৮৭	বাঘী	বি	২৯০	বাচ্যতা	বচ্	২১৩	বাজারি(রী)	বজ্	২১৮
বাক্যস্ফূর্ত্তি	বচ্	২১৩	বাগুলাবৃত্তি	বা	২৮৭	বাঙাল	বঙ্গ্	২১২	বাচ্যলিঙ্গ	বচ্	২১৩	বাজারু	বজ্	২১৮
বাক্যহঠ	বচ্	২১৩	বাগুস	বা	২৮৭	বাঙালি(লী)	বঙ্গ্	২১২	বাচ্যলিঙ্গক	বচ্	২১৩	বাজারে	বজ্	২১৮
বাক্যালঙ্কার	বচ্	২১৩	বাগে-আনা	ৰল্	২৬৩	বাঙ্(ঞ)	বা	২১৬	বাচ্যার্থ	বচ্	২১৩	বাজি	বজ্	২১৯
বাক্যালাপ	বচ্	২১৩	বাগোয়া	বা	২৮৭	বাঙন	বা	২৮৭	বাছ	বচ্	২১৭	বাজিনী	বজ্	২১৮
বাখর	বচ্	২১৩	বাগ্গুদ	বচ্	২১৩	বাঙভাগ	বা	২৮৭	বাছন	বচ্	২১৭	বাজিপাল	বজ্	২১৮
বাখর	ৰল্	২৬৩	বাগ্দত্তা	বচ্	২১৩	বাঙ্ক	ৰঙ্ক্	২১০	বাছনি	বচ্	২১৭	বাজিমাৎ	বজ্	২১৮
বাখর	বা	২৮৭	বাগ্দান	বচ্	২১৩	বাঙ্কুয়া	ৰঙ্ক্	২১০	বাছনিদার	বচ্	২১৭	বাজিমেধ	বজ্	২১৮
বাখান	বি	২৯০	বাগ্দি	বচ্	২১৩	বাঙ্গ	বা	২৮৭	বাছপড়া	বচ্	২১৭	বাজিয়ে-দেখা	বজ্	২১৮
বাখানি	বি	২৯০	বাগ্দিনী	বচ্	২১৩	বাঙ্গাটুনি	বঙ্গ্	২১২	বাছবিচার	বচ্	২১৭	বাজিশাল	বজ্	২১৮
বাখানী	বি	২৯০	বাগ্দেবতা	বচ্	২১৩	বাঙ্গাল	বঙ্গ্	২১২	বাছা	বচ্	২১৭	বাজিশালা	বজ্	২১৮
বাখার	বা	২৮৭	বাগ্দেবী	বচ্	২১৩	বাঙ্গাল-ব্যাঙ্ক	বঙ্গ্	২১২	বাছা	বদ্	২৩১	বাজী	বজ্	২১৯
বাখারি	বা	২৮৭	বাগ্দৈবত্য	বচ্	২১৩	বাঙ্গালা	বঙ্গ্	২১২	বাছাই	বচ্	২১৭	বাজীকর	বজ্	২১৮
বাগ	বচ্	২১৬	বাগ্দোষ	বচ্	২১৩	বাঙ্গালি(লী)	বঙ্গ্	২১২	বাছান	বচ্	২১৭	বাজীকরণ	বজ্	২১৮
বাগ	বৃজ্	৩৪৪	বাগ্বজ্র	বচ্	২১৩	বাঙ্গি(ঙ্গী)	বা	২১২	বাছাল(লো)	বচ্	২১৭	বাজীকরণী	বজ্	২১৮
বাগ	ৰল্	২৬৩	বাগ্বান	বচ্	২১৩	বাঙ্মন	বচ্	২১৩	বাছুনি	বচ্	২১৭	বাজীক্রিয়া	বজ্	২১৮
বাগ (বাঘ)	বি	২৯০	বাগ্বাদিনী	বচ্	২১৩	বাঙ্মনস	বচ্	২১৩	বাছুর	বদ্	২৩১	বাজু (ৰাহু)	ৰধ্	২৩৪
বাগড়া	ৰল্	২৬৩	বাগ্বিদগ্ধ	বচ্	২১৩	বাঙ্ময়	বচ্	৫৩৮	বাছুরি	বদ্	২৩১	বাজুবন	ৰধ্	২৩৪
বাগডোর	বচ্	২১৩	বাগ্বিভব	বচ্	২১৩	বাঙ্ময়ী	বচ্	২১৩	বাজ	বদ্	২৩১	বাজুবন্দ	ৰধ্	২৩৪
বাগপহারক	বচ্	২১৩	বাগ্বৈদগ্ধ	বচ্	২১৩	বাঙ্মুখ	বচ্	২১৩	বাজ	বজ্	২১৯	বাজুবন্ধ	ৰধ্	২৩৪
বাগ-মানা	ৰল্	২৬৩	বাগ্ব্যবহার	বচ্	২১৩	বাঙ্নিষ্ঠা	বচ্	২১৩	বাজখাঁই	বজ্	২১৮	বাজুমল	ৰধ্	২৩৪
বাগর্থ	বচ্	২১৩	বাগ্মিতা	বচ্	২১৩	বাঙ্নিষ্পত্তি	বচ্	২১৩	বাজন	বজ্	২১৯	বাজে	ৰধ্	২৩৪
বাগসি	বচ্	২১৩	বাগ্মী	বচ্	২১৩	বাঙ্মধুর	বচ্	২১৩	(বাদন)	বজ্	২১৮	বাজেয়াপ্ত	ৰধ্	২৩৪
বাগাড়ম্বর	বচ্	২১৩	বাগ্যত	বচ্	২১৩	বাঙ্লা	বঙ্গ্	২১২	বাজন	বদ্	২৩৩	বাজেয়াফ্‌ত্	ৰধ্	২৩৪
বাগাত	বি	২৯০	বাগ্যমন	বচ্	২১৩	বাচ	বচ্	২১৩	বাজনঘুণ্টি	বজ্	২১৮	বাঝ	ৰধ্	২৩৪
বাগাত্মা	বচ্	২১৩	বাগ্যুদ্ধ	বচ্	২১৩	বাঁচ	বা	২৮৭	বাজনদার	বজ্	২১৮	বাঝ	বজ্	২১৮
বাগান	ৰল্	২৬৩	বাগ্রোধ	বচ্	২১৩	বাচংযম	বচ্	২১৩	বাজনমল	বজ্	২১৮	বাঝা	বজ্	২১৮
বাগান	বি	২৯০	বাঘ	বি	২৯০	বাচক	বচ্	২১৭	বাজনযন্ত্র	বজ্	২১৮	বাঝা	ৰধ্	২৩৪
বাগানবাড়ি	বট্	২২২	বাঘআঁকড়া	বি	২৯০	বাচন	বচ্	২১৭	বাজনা	বজ্	২১৮	বাঞে	বা	২৮৭
বাগানি	বি	২৯০	বাঘছড়ি	বি	২৯০	বাচনিক	বচ্	২১৩	বাজনি	বজ্	২১৮	বাঞো	বা	২৮৭
বাগাল	বি	২৯০	বাঘছাল	বি	২৯০	বাচ(ছ)বিচার	বচ্	২১৭	বাজনিঞা	বজ্	২১৮	বাঞ্ছ্	বচ্	২১৩
বাগালি	বি	২৯০	বাঘজাল	বি	২৯০	বাচস্পতি	বচ্	২১৩	বাজনি(নী)য়া	বজ্	২১৮	বাঞ্ছ্	বচ্	২১৩
বাগিচা	বি	২৯০	বাঘডাঁশা	বি	২৯০	বাচস্পত্য	বচ্	২১৩	বাজপড়া	বজ্	২১৮	বাঞ্ছন	বচ্	২১৩
বাগিনী (বাঘিনী)	বি	২৯০	বাঘথাবা	বি	২৯০	বাচা	বচ্	২১৩	বাজপতি	বজ্	২১৮	বাঞ্ছনা	বচ্	২১৩
বাগী	বি	২৯০	বাঘনখ	বি	২৯০	বাচা	বঞ্চ্	২২০	বাজপেয়	বজ্	২২০	বাঞ্ছনীয়	বচ্	২১৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বাঞ্ছা	বচ্ ২১৩	বাড়া	বট্ ২২২	বাৎস্যায়ন	বদ্ ২৩২	বাতিগম	বৃৎ ৩৪৫	বাদিত্র	বদ্ ২৩৩
বাঞ্ছাকল্পতরু	বচ্ ২১৩	বাড়ান	বট্ ২২৪	বাত	বা ২৮৭	বাতিঙ্গণ(ন)	বৃৎ ৩৪৫	বাদিয়া	বদ্ ২৩১
বাঞ্ছাতরু	বচ্ ২১৩	বাড়াবাড়ি	বট্ ২২৪	বাতকর্ম্ম	বা ২৮৭	বাতিল	বৃৎ ২৮৭	বাদী	বদ্ ২৩৩
বাঞ্ছারাম	বচ্ ২১৩	বাড়াভাত	বট্ ২২২	বাতগ্রস্ত	বা ২৮৭	বাতুল	বা ২৮৭	বাদীপক্ষ	বদ্ ২৩১
বাঞ্ছিত	বচ্ ২১৩	বাড়ি	বট্ ২২৪	বাতঘ্ন	বা ২৮৭	বাতেরিত	বা ২৮৭	বাদীয়া	বদ্ ২৩১
বাঞ্জা	বা ২৮৭	বাড়িখোর	বট্ ২২৪	বাতচিত	বা ২৮৭	বাতেলা	বা ২৮৭	বাদুড়	বদ্ ২৩১
বাট	বট্ ২২৪	বাড়িমারা	বট্ ২২৪	বাতজ	বা ২৮৭	বাতেলাবাজ	বা ২৮৭	বাদুয়া	বদ্ ২৩১
বাটআরি	বট্ ২২৪	বাড়ী	বট্ ২২৪	বাতজ্বর	বা ২৮৭	বাত্তকি	বৃৎ ৩৪৫	বাদুর্ব্বাদ	বদ্ ২৩১
বাটওয়ার	বট্ ২২৪	বাড়ীওলা(লী)	বট্ ২২২	বাততুল	বা ২৮৭	বাত্তেলা	বা ২৮৭	বাদে	বদ্ ২৩৪
বাটধান	বট্ ২২২	বাড়ীঘর	বট্ ২২২	বাতপাট	বা ২৮৭	বাত্যা	বা ২৮৭	বাদ্য	বদ্ ২৩৩
বাটন	বট্ ২২২	বাঢ়	বট্ ২২৪	বাতপ্রমী	বা ২৮৭	বাথান	বস্ ২৭০	বাদ্যপুর	বদ্ ২৩৩
বাটনা	বট্ ২২২	বাঢ়	বহ্ ২২৪	বাতপ্রেরকযন্ত্র	বা ২৮৭	বাথানি(নী)য়া	বস্ ২৭০	বাদ্যভাণ্ড	বদ্ ২৩৩
বাটপাড়	বট্ ২২৪	বাঢ়খাওয়া	বট্ ২২৪	বাতব্যাধি	বা ২৮৭	বাথুয়া	বস্ ২৭০	বাদ্যা	বদ্ ২৩১
বাটপাড়	পঠ্ ২৫	বাঢ়ডোবা	বহ্ ২৭৮	বাতমজ	বা ২৮৭	বাদ	বদ্ ২৩৩	বাদ্যোদ্যম	বদ্ ২৩১
বাটপাড়ী	পঠ্ ২৫	বাঢ়বন্যা	বহ্ ২৭৮	বাতমৃগ	বা ২৮৭	বাদক	বদ্ ২৩৩	ৰাধ	ৰধ্ ২৩৫
বাটপাড়ি(ড়ী)	বট্ ২২৪	বাঢ়া	বট্ ২২২	বাতরক্ত	বা ২৮৭	বাদন	বদ্ ২৩১	ৰাধক	ৰধ্ ২৩৫
বাটলা	বট্ ২২২	বাঢ়ি	বট্ ২২২	বাতরথ	বা ২৮৭	বাদবাকী	বচ্ ২৩৪	বাধন	ৰধ্ ২৩৫
বাটলোই	বট্ ২২২	ৰাণ	বণ্ ২২৭	বাতল	বা ২৮৭	বাদবিসংবাদ	বদ্ ২৩১	ৰাধা	ৰধ্ ২৩৫
বাটা	বট্ ২২৪	বাণগোচর	বণ্ ২২৬	বাতলা	বা ২৮৭	বাদযুদ্ধ	বদ্ ২৩৩	বাধাই	ৰধ্ ২৩৪
বাটাওল	বট্ ২২২	বাণতৃণ	বণ্ ২২৬	বাতলান	বা ২৮৭	বাদর	বদ্ ২৩১	বাধান	ৰধ্ ২৩৫
বাটাজোড়া	বট্ ২২২	বাণপথ	বণ্ ২২৬	বাতশোণিত	বা ২৮৭	বাদরায়ণ	বদ্ ২৩১	ৰাধিত	ৰধ্ ২৩৫
বাটাপানা	বট্ ২২২	বাণবর্ষণ	বণ্ ২২৬	বাতশীর্ষ	বা ২৮৭	বাদরায়ণি	বদ্ ২৩১	ৰাধ্য	ৰধ্ ২৩৫
বাটাভরা	বট্ ২২২	বাণবর্ষী	বণ্ ২২৬	বাতশূল	বা ২৮৭	বাদল	বদ্ ২৩১	ৰাধ্যৰাধক	ৰধ্ ২৩৫
বাটালি	বট্ ২২২	বাণবার	বণ্ ২২৬	বাতশ্লেষ্মা	বা ২৮৭	বাদলমালা	বদ্ ২৩১	বাধ্যবাধকতা	ৰধ্ ২৩৫
বাটিআ	বট্ ২২২	বাণভট্ট	ভট্ ৩৮০	বাতসহ	বা ২৮৭	বাদলা	বদ্ ২৩১	বান	বন্ ২৩৮
বাটিকা	বট্ ২২৪	বাণ-মারা	বণ্ ২২৬	বাতহত	বা ২৮৭	বাদলি	বদ্ ২৩১	বান	বে ৩৫৮
বাটিয়া	বট্ ২২৪	বাণমুক্তি	বণ্ ২২৬	বাতা	বা ২৮৭	বাদশা	বদ্ ২৩১	ৰা'ন	ৰন্ধ ২৪৪
বাটী	বট্ ২২৪	বাণমোক্ষণ	বণ্ ২২৬	বাতাতিসার	বা ২৮৭	বাদশাই	বদ্ ২৩১	বানচাল	বন্ ২৩৬
বাটুয়া	বট্ ২২২	বাণলিঙ্গ	বণ্ ২২৭	বাতাপি	বা ২৮৮	বাদশাহ	বদ্ ২৩১	বানপ্রস্থ	বন্ ২৩৯
বাটুল	বট্ ২২২	বাণা	বণ্ ২২৬	বাতাবি	বা ২৮৭	বাদশাহী	বদ্ ২৩১	বানর	বন্ ২৪১
বাটুলা	বট্ ২২২	বাণাসন	বণ্ ২২৬	বাতাভিহত	বা ২৮৭	বাদসাদ	বদ্ ২৩৪	বানরকেতু	বন্ ২৪১
বাটোআড়(ড়ী)	বট্ ২২২	বাণি	বণ্ ২২৬	বাতাম	বা ২৮৭	বাদহাটা	বদ্ ২৩১	বানরমুখ	বন্ ২৩৬
বাটোয়ার	বট্ ২২৪	বাণি	বে ৩৫৮	বাতাভ্র	বা ২৮৭	বাদা	বদ্ ২৩৪	বানরমুয়া	বন্ ২৩৬
বাটোয়ারা	বট্ ২২৪	বাণী	বণ্ ২২৮	বাতায়ন	বা ২৮৭	বাদাকাঠ	বদ্ ২৩৪	বানস্পত্য	বন্ ২৩৬
বাটোয়ারি(রী)	বট্ ২২৪	বাণিজ	বণ্ ২২৬	বাতালি(লী)	বা ২৮৭	বাদাচিংড়ি	বদ্ ২৩৪	বানা	বন্ ২৩৬
বাট্টা	বট্ ২২২	বাণিজক	বণ্ ২২৬	বাতাস	বা ২৮৭	বাদাড়	বদ্ ২৩৪	বানাইল	বন্ ২৩৬
বাড়	বট্ ২২৪	বাণিজিক	বণ্ ২২৬	বাতাসা	বা ২৮৭	বাদাবন	বদ্ ২৩৪	বানান(নো)	বন্ ২৩৬
বাড়ই	বট্ ২২২	বাণিজ্য	বণ্ ২২৬	বাতাসী	বা ২৮৭	বাদানুবাদ	বদ্ ২৩১	বানারসি	বন্ ২৩৬
বাড়তি(তী)	বট্ ২২৪	বাণিয়া	বণ্ ২৩০	বাতাহত	বা ২৮৭	বাদাবাদ	বদ্ ২৩১	বানি(নী)	বন্ ২৩৬
বাড়ন	বট্ ২২৪	বাণিয়ানী	বণ্ ২৩০	বাতাহতি	বা ২৮৭	বাদাবাদি	বদ্ ২৩১	বানী	বন্ ৩৫৮
বাড়ন্ত	বট্ ২২৪	বাণেশ্বর	বণ্ ২২৬	বাতাহার	বা ২৮৭	বাদাম	বদ্ ২৩১	বানিয়া	বন্ ২৩৬
বাড়ব	বট্ ২২২	বাণ্ডিল	বণ্ ২২৬	বাতি	বৃৎ ৩৪৫	বাদাম	বা ২৮৭	বানীর	বন্ ২৩৬
বাড়বাগ্নি	বট্ ২২২	বাণ্যা	বণ্ ২২৬	বাতিক	বা ২৮৭	বাদামী	বদ্ ২৩১	বানেয়	বন্ ২৩৬
বাড়বানল	বট্ ২২২	বাণ্যানী	বণ্ ২২৬	বাতিদান	বৃৎ ৩৪৫	বাদি	বদ্ ২৩১	বান্ত	বম্ ২৪৭
বাড়বাড়া	বট্ ২২২	বাৎসল্য	বদ্ ২৩১	বাতিগ	বৃৎ ৩৪৫	বাদিত	বদ্ ২৩১	বান্তাশী	বম্ ২৪৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বারিবিহার	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাক	বৃৎ ৩৪৫	ৰালখিল্য	ৰল্ ২৬৬	ৰালাদিত্য	ৰল্ ২৬৩	বাশি(সি)ষ্ঠ	বশ্ ২৬৭
বারিমুক	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাকর্ম্ম	বৃৎ ৩৪৯	ৰালগজ	ৰল্ ২৬৩	ৰালাধাত	ৰল্ ২৬৩	বাশিষ্ঠী	বশ্ ২৬৭
বারিযন্ত্র	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাকী	বৃৎ ৩৪৫	ৰালগোপাল	ৰল্ ২৬৩	ৰালাপত্য	ৰল্ ২৬৩	বাশী	বশ্ ২৬৭
বারিরাশি	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাকু	বৃৎ ৩৪৫	ৰালগ্রহ	ৰল্ ২৬৩	বালাপোশ	ৰল্ ২৬৩	বাশুলি(লী)	বশ্ ২৬৭
বারিরুহ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তানুজীবী	বৃৎ ৩৪৯	ৰালঘ্ন	ৰল্ ২৬৩	ৰালাবলা	ৰল্ ২৬৩	বাষট্টি	ৰ,ব ৩৬২
বারিশ(ষ)	বদ্ ২৩১	বার্ত্তাপতি	বৃৎ ৩৪৫	ৰালচন্দ্র(মা)	ৰল্ ২৬৩	ৰালাভোলা	ৰল্ ২৬৩	বাষ্প	ৰাধ্ ২৩৫
বারিষ	বৃষ্ ৩৫৫	বার্ত্তাবৃত্তি	বৃৎ ৩৪৯	ৰালচরিত	ৰল্ ২৬৩	বালাম	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পকণ্ঠ	ৰধ্ ২৩৪
বারিসম্ভব	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাবহ	বৃৎ ৩৪৯	বালচর্য্যা	ৰল্ ২৬৩	ৰালারুণ	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পকল	ৰধ্ ২৩৪
বারিস্থ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তামূল	বৃৎ ৩৪৯	ৰালচূত	ৰল্ ২৬৩	ৰালার্ক	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পগদগদ	ৰধ্ ২৩৪
বারী	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তারম্ভ	বৃৎ ৩৪৫	ৰালতন্ত্র	ৰল্ ২৬৩	বালি(বালুকা)	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পচালিত	ৰধ্ ২৩৪
বারীন্দ্র	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাহর	বৃৎ ৩৪৫	ৰালতি(তী)	ৰল্ ২৬৩	বালি(লী)	ৰল্ ২৬৭	ৰাষ্পদুর্দ্দিন	ৰধ্ ২৩৪
বারীশ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাহার	বৃৎ ৩৪৫	বালতি	ৰ,ব ৩৬২	বালিআড়	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পপর্য্যাকুল	ৰধ্ ২৩৪
বারুই	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাহারী	বৃৎ ৩৪৫	বালতিপোতা	ৰল্ ২৬৩	বালিআড়ি	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পপিহিত	ৰধ্ ২৩৪
বারুণ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাহারিণী	বৃৎ ৩৪৫	ৰালতৃণ	ৰল্ ২৬৩	বালিআড়ং	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পপীড়িত	ৰধ্ ২৩৪
বারুণা	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তাহর্ত্তা	বৃৎ ৩৪৫	ৰালধন	ৰল্ ২৬৩	ৰালিকা	ৰল্ ২৬৬	ৰাষ্পপুর	ৰধ্ ২৩৪
বারুণি	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তিক	বৃৎ ৩৪৯	বালধি	ৰল্ ২৬৩	বালিখোলা	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পপোত	ৰধ্ ২৩৪
বারুণী	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ত্তিককার	বৃৎ ৩৪৯	ৰালপাদপ	ৰল্ ২৬৩	বালি(লী)ঘট	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পপ্রসর	ৰধ্ ২৩৪
বারুণীবল্লভ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধক	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালপাশ্যা	ৰল্ ২৬৩	বালি(লী)ঘড়ী	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পবারি	ৰধ্ ২৩৪
বারুণীশ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধক্য	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালব	ৰল্ ২৬৩	বালিবন্ধ	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পবিমোচন	ৰধ্ ২৩৪
বারুণী	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধুষ	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালবৎস	ৰল্ ২৬৩	বালিবান্ধ	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পবিক্লব	ৰধ্ ২৩৪
বারুণীমত্ত	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধুষি	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালবনিতা	ৰল্ ২৬৩	বালিয়া	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পবৃষ্টি	ৰধ্ ২৩৪
বারুণীমদ	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধুষিক	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালবাচ্চা	ৰল্ ২৬৩	ৰালিশ	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পমোক্ষ	ৰধ্ ২৩৪
বারুণীমদিরা	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধুষী	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালবিধবা	ৰল্ ২৬৩	বালিহংস	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পমোচন	ৰধ্ ২৩৪
বারুণীস্থান	বর্ণ্ ২৪৯	বার্দ্ধিণস	বৃধ্ ৩৫৩	ৰালবৈধব্য	ৰল্ ২৬৩	বালিহাঁস	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পযান	ৰধ্ ২৩৪
বারুদ	ৰ,ব ৩৬২	বার্য্য	বর্ণ্ ২৪৯	ৰালব্যজন	ৰল্ ২৬৩	বালু	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পরথ	ৰধ্ ২৩৪
বারেক	বা ২৬০	বার্য্যয়ন	বর্ণ্ ২৪৯	ৰালভাব	ৰল্ ২৬৩	বালুকা	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পসন্দিগ্ধ	ৰধ্ ২৩৪
বারেকমাত্র	বা ২৮৭	বার্য্যোকাঃ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰালভার	ৰল্ ২৬৩	বালুকাযন্ত্র	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পাকুল	ৰধ্ ২৩৪
বারেন্দ্র	বর্ণ্ ২৪৯	বার্লি	ৰ,ব ৩৬২	ৰালভোগ	ৰল্ ২৬৩	বালুচর	ৰল্ ২৬৩	বাষ্পাকুল	ৰাধ্ ২৩৪
বারেন্দ্রী	বর্ণ্ ২৪৯	বার্ষদংশ	বৃষ্ ৩৫৫	ৰালমতি	ৰল্ ২৬৩	বালুচরে	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পাবিল	ৰধ্ ২৩৪
বারেবার	বা ২৮৭	বার্ষপার্ব্বণী	বৃষ্ ৩৫৫	ৰালমূষিকা	ৰল্ ২৬৩	ৰালেন্দু	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পাম্বু	ৰধ্ ২৩৪
বারোইয়ারী	ৰ,ব ৩৬২	বার্ষিক	বৃষ্ ৩৫৫	ৰালমৃগ	ৰল্ ২৬৩	ৰালেয়	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পাম্ভঃ	ৰধ্ ২৩৪
বারোএয়ারী	ৰ,ব ৩৬২	বার্ষিকী	বৃষ্ ৩৫৫	ৰালমৃণাল	ৰল্ ২৬৩	বাল্মীক	ৰল্ ২৬৩	ৰাষ্পাসার	ৰধ্ ২৩৪
বারোভাজা	ভৃশ্ ৪৩৭	বার্ষেয়	বৃষ্ ৩৫৫	ৰালরণ্ডা	ৰল্ ২৬৩	বাল্মীকি	ৰল্ ২৬৫	বাস	বস্ ২৭৫
বারোভূত	ৰ,ব ৩৬২	বার্হদ্রথ	বর্ণ্ ২৪৯	ৰালরবি	ৰল্ ২৬৩	ৰাল্য	ৰল্ ২৬৩	বাসক	বস্ ২৭০
বারোভূঁইয়া	ৰ,ব ৩৬২	বার্হস্পত্য	বর্ণ্ ১৯৬	ৰাললতা	ৰল্ ২৬৩	ৰাল্যকাল	ৰল্ ২৬৩	বাসকসজ্জা	বস্ ২৭০
বারোয়াঁ	ৰ,ব ৩৬২	ৰাল	ৰল্ ২৬৬	ৰাললীলা	ৰল্ ২৬৩	ৰাল্যভোগ	ৰল্ ২৬৩	বাসকসজ্জিতা	বস্ ২৭০
বারোয়ারী	ৰ,ব ৩৬২	ৰালক	ৰল্ ২৬৬	ৰালশা(সা)	ৰল্ ২৬৩	ৰাল্হক	ৰল্ ২৬৩	বাসকা	বস্ ২৭০
বার্ক্ষ	বৃক্ ৩৪১	ৰালকচন্দ	ৰল্ ২৬৩	ৰালসন্ধ্যা	ৰল্ ২৬৩	ৰাল্হিক	ৰল্ ২৬৩	বাসগৃহ	বস্ ২৭০
বার্ণিক	বর্ণ্ ২৪৯	ৰালকচন্দ্র	ৰল্ ২৬৩	ৰালসূর্য্য	ৰল্ ২৬৩	বাল্হীক	ৰল্ ২৬৩	বাসগেহ	বস্ ২৭০
ৰার্ণিশ	ৰ,ব ৩৬২	বালকচন্দ্রিমা	ৰল্ ২৬৩	ৰালা	ৰল্ ২৬৬	বাহ্লীক	ৰল্ ২৬৩	বাসঘর	বস্ ২৭০
ৰার্ত্ত	বৃৎ ৩৪৯	ৰালকদলী	ৰল্ ২৬৩	বালা-আঁচলা	ৰল্ ২৬৩	বাশ(স)	বশ্ ২৬৭	বাসড়িয়া	বস্ ২৭০
ৰার্ত্তকী	বৃৎ ৩৪৫	ৰালকভানু	ৰল্ ২৬৩	ৰালাই	ৰল্ ২৬৩	বাশক	বশ্ ২৬৭	বাসতেয়	বস্ ২৭০
ৰার্তঘ্ন	বৃৎ ৩৪৫	ৰালকাণ্ড	ৰল্ ২৬৩	বালাখানা	ৰল্ ২৬৩	বাশন	বশ্ ২৬৭	বাসন্তরি	ৰ,ব ৩৬২
ৰার্ত্তন	বৃৎ ৩৪৫	ৰালকৃষ্ণ	ৰল্ ২৬৩	ৰাল(লু)ঞ্চি	ৰল্ ২৬৩	বাশিত	বশ্ ২৬৭	বাসদেব	বস্ ২৭০
ৰার্ত্র	বৃৎ ৩৪৯	ৰালক্রীড়নক	ৰল্ ২৬৩	ৰালাতপ	ৰল্ ২৬৩	বাশিতা	বশ্ ২৬৭	বাসন	বস্ ২৭৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বাসনকোশন	বস্ ২৭৫	(পুর)বাসী	বস্ ২৭০	বাহানা	বন্ ২৩৬	ৰাহুব্যায়াম	ৰধ্ ২৩৪	বিকথন	বি ২৯০
বাসনা	বস্ ২৭৫	বাসী-পান্তা	বস্ ২৭০	বাহান্ন	ৰ,ব ৩৬২	ৰাহুমূল	ৰধ্ ২৩৪	বিকথা	বি ২৯০
বাসনি(নী)	বস্ ২৭০	বাসুকি	বস্ ২৭৭	বাহার	বহ্ ২৭৮	ৰাহুযুদ্ধ	ৰধ্ ২৩৪	বিকথী	বি ২৯০
বাসনি-বাঁশ	বস্ ২৭০	বাসুকেয়	বস্ ২৭০	বাহারী	বহ্ ২৭৮	ৰাহুযোধ	ৰধ্ ২৩৪	বিকম্প	বি ২৯০
বাসন্ত	বস্ ২৭০	বাসুড়িয়া	বস্ ২৭০	বাহারে	বহ্ ২৭৮	ৰাহুযোধী	ৰধ্ ২৩৪	বিকম্পন	বি ২৯০
বাসন্তিক	বস্ ২৭০	বাসুদেব	বস্ ২৭০	বাহাল	বহ্ ২৭৮	ৰাহুলক	বংহ্ ১৯২	বিকম্পিত	বি ২৯০
বাসন্তী	বস্ ২৭৬	বাসুদেবী	বস্ ২৭০	বাহালী	বহ্ ২৭৮	ৰাহুলতা	ৰধ্ ২৩৪	বিকম্পী	বি ২৯০
বাসব	বস্ ২৭৬	বাসুয়া	বৃষ্ ৩৫৫	বাহিক	বহ্ ২৭৮	ৰাহুল্য	বংহ্ ১৯৪	বিকর	বি ২৯০
বাসবচাপ	বস্ ২৭০	বাসুলি(লী)	বশ্ ২৬৭	বাহিত	বহ্ ২৭৮	ৰাহুশালী	ৰধ্ ২৩৪	বিকরণ	বি ২৯০
বাসবজ	বস্ ২৭০	বাসোদ	বস্ ২৭০	বাহিনী	বহ্ ২৭৮	ৰাহুসম্ভব	ৰধ্ ২৩৪	বিকরাল	বি ২৯০
বাসবজিৎ	বস্ ২৭০	বাসোয়া	বৃষ্ ৩৫৫	বাহিনীনিবেশ	বহ্ ২৭৮	ৰাহুসাট	ৰধ্ ২৩৪	বিকরালা	বি ২৯০
বাসবজেতা	বস্ ২৭০	বাস্কল	বস্ ২৭০	বাহির	বহ্ ২৮১	ৰাহুস্বস্তিক	ৰধ্ ২৩৪	বিকরুণ	বি ২৯০
বাসবত্রাস	বস্ ২৭০	বাস্কলি	বস্ ২৭০	বাহিরদ্বার	বহ্ ২৭৮	ৰাহুস্ফোট	ৰধ্ ২৩৪	বিকর্ণ	বি ২৯৫
বাসবদত্তা	বস্ ২৭৬	বাস্ত	বস্ ২৭০	বাহিরবাড়ী	বহ্ ২৭৮	বাহের	বহ্ ২৭৮	বিকর্ণী	বি ২৯০
বাসবদিক	বস্ ২৭০	বাস্তব	বস্ ২৭৮	বাহিরা	বহ্ ২৭৮	ৰাহ্য	বহ্ ২৮৫	বিকর্ত্তন	বি ২৯৫
বাসববিজয়ী	বস্ ২৭০	বাস্তবিক	বস্ ২৭৮	বাহী	বহ্ ২৭৮	ৰাহ্যকরণ	বহ্ ২৮৫	বিকর্ত্তা	বি ২৯০
বাসবি	বস্ ২৭৬	বাস্তব্য	বস্ ২৭০	বাহীক	বহ্ ২৭৮	ৰাহ্যকৃত্য	বহ্ ২৮৫	বিকর্ম্ম	বি ২৯০
বাসবী	বস্ ২৭৬	বাস্তু	বস্ ২৭৮	ৰাহু (বাজু)	ৰধ্ ২৩৬	ৰাহ্যক্রিয়া	বহ্ ২৮৫	বিকর্ম্মকৃৎ	বি ২৯০
বাসবেয়	বস্ ২৭৬	বাস্তুকর্ম্ম	বস্ ২৭০	ৰাহু	ৰাধ্ ২৩৪	ৰাহ্যদৃশ্য	বহ্ ২৮৫	বিকর্শিত	বি ২৯০
বাসবেশ্মন	বস্ ২৭০	বাস্তুকাল	বস্ ২৭০	ৰাহুক	ৰাধ্ ২৩৪	ৰাহ্যনাম	বহ্ ২৮৫	বিকর্ষ	বি ২৯০
বাসবোপম	বস্ ২৭০	বাস্তুঘুঘু	বস্ ২৭০	ৰাহুঁক	ৰধ্ ২৩৪	ৰাহ্যপ্রকৃতি	বহ্ ২৮৫	বিকর্ষণ	বি ২৯০
বাসভবন	বস্ ২৭০	বাস্তুদেব	বস্ ২৭০	ৰাহুক	ৰধ্ ২৩৪	ৰাহ্যস্পর্শ	বহ্ ২৭৮	বিকল	বি ২৯৬
বাসভূমি	বস্ ২৭০	বাস্তুদেবতা	বস্ ২৭০	ৰাহুকুণ্ঠ	ৰধ্ ২৩৪	ৰাহ্যহীন	বহ্ ২৭৮	বিকলচিত্ত	বি ২৯০
বাসমন্দির	বস্ ২৭০	বাস্তুপাল	বস্ ২৭০	ৰাহুকুব্জ	ৰধ্ ২৩৪	ৰাহ্যিক	বহ্ ২৮৫	বিকলা	বি ২৯০
বাসসজ্জা	বস্ ২৭০	বাস্তুপুরুষ	বস্ ২৭০	ৰাহুগুণ্য	ৰধ্ ২৩৪	বাহ্লি(হ্লী)ক	বহ্ ২৭৮	বিকলি	বি ২৯০
বাসসদন	বস্ ২৭০	বাস্তুবিদ্যা	বস্ ২৭০	ৰাহুজ	ৰাধ্ ২৩৪	বি	বি ২৯০	বিকলিত	বি ২৯০
বাসর	বস্ ২৬০	বাস্তুমধ্য	বস্ ২৭০	ৰাহুজাত	ৰধ্ ২৩৪	বিঅনি(নী)	বি ২৯০	বিকলিনী	বি ২৯০
বাসর	— ২৭৭	বাস্তুযাগ	বস্ ২৭০	ৰাহুজ্যা	ৰধ্ ২৩৪	বিআ	বি ২৯০	বিকলী	বি ২৯০
বাসরঘর	বস্ ২৭০	বাস্তুসম্পাদন	বস্ ২৭০	ৰাহুটি(টী)	ৰাধ্ ২৩৪	বিআধ	বি ২৯০	বিকল্প	বি ২৯৬
বাসঃ	বস্ ২৭০	বাস্তুসাপ	বস্ ২৭০	ৰাহুড়	ৰধ্ ২৩৪	বিআধি	বি ২৯০	বিকল্পন	বি ২৯০
বাসলি(লী)	বশ্ ২৬৭	বাস্তুক	বস্ ২৭০	ৰাহুড়া	ৰধ্ ২৩৪	বিউনি(নী)	বি ২৯০	বিকল্পনা	বি ২৯০
বাসা	বস্ ২৭৫	বাস্তোষ্পতি	বস্ ২৭০	ৰাহুতরণ	ৰধ্ ২৩৪	বিউলি	বি ২৯০	বিকল্পিত	বি ২৯০
বাসাঘর	বস্ ২৭০	বাহ	বহ্ ২৭৮	ৰাহুত্রাণ	ৰধ্ ২৩৪	বিএ	বি ২৯০	বিকশল	বি ২৯০
বাসাবাড়ী	বস্ ২৭০	বাহক	বহ্ ২৭৮	ৰাহুদণ্ড	ৰধ্ ২৩৪	বিংশতি	ৰ,ব ৩৬২	বিকশিত	বি ২৯০
বাসাড়িয়া	বস্ ২৭০	বাহচাপ্লি	বহ্ ২৭৮	ৰাহুদা	ৰাধ্ ২৩৪	বিংশী	ৰ,ব ৩৬২	বিকস	বি ২৯০
বাসাড়ে	বস্ ২৭০	বাহ(হু)ড়	বহ্ ২৭৮	ৰাহুনা(লা)ড়া	ৰধ্ ২৩৪	বিঃ	ৰ,ব ৩৬২	বিকসিত	বি ২৯০
বাসায়া	বৃষ্ ২৭০	বাহন	বহ্ ২৮১	ৰাহুপাশ	ৰধ্ ২৩৪	বিঁদ(ধ)	বি ৩১২	বিকস্বর	বি ২৯০
বাসি(সী)	বস্ ২৭০	বাহনা	বহ্ ২৭৮	ৰাহুপ্রতিবন্ধ	ৰধ্ ২৩৪	বিঁধা	বি ২৯০	বিকা	বি ২৯০
বাসিক	বস্ ২৭০	বাহবা	বহ্ ২৭৮	ৰাহুপ্রহরণ	ৰধ্ ২৩৪	বিক্থ	বৃক্ ৩৪১	বিকাঙ্ক্ষা	বি ২৯০
বাসিত	বস্ ২৭০	বাহা	বহ্ ২৭৮	ৰাহুবন্ধ	ৰধ্ ২৩৪	বিক্রয়	বি ২৯০	বিকার	বি ২৯৬
বাসিতা	বস্ ২৭০	বাহাতরি	ৰ,ব ৩৬২	ৰাহুবন্ধন	ৰাধ্ ২৩৪	বিকঙ্কট	বি ২৯০	বিকারিত	বি ২৯০
বাসিন্দা	বস্ ২৭০	বাহাত্তর	ৰ,ব ৩৬২	ৰাহুবল	ৰধ্ ২৩৪	বিকঙ্কত	বি ২৯০	বিকারী	বি ২৯০
বাসি-বিয়া	বস্ ২৭০	বাহাদুর	বহ্ ২৮৫	ৰাহুবল্লী	ৰধ্ ২৩৪	বিকচ	বি ২৯০	বিকার্য্য	বি ২৯০
বাসি-মালা	বস্ ২৭০	বাহাদুরী	বহ্ ২৮৫	ৰাহুবিঘট্টন	ৰধ্ ২৩৪	বিকচিত	বি ২৯০	বিকাল	বি ২৯৬
বাসিষ্ঠ	বশ্ ২৬৭	বাহানা	বহ্ ২৭৮	ৰাহুবীর্য্য	ৰধ্ ২৩৪	বিকট	বি ২৯০	বিকাশ	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিকাশক	বি ২৯০	বিক্রিয়া	বি ২৯৭	বিগর্হণ	বি ২৯০	বিচ্	বিচ্ ৩০৬	বিচ্ছর্দ্দন	বি ২৯০
বিকাশন	বি ২৯০	বিক্রীড়া	বি ২৯০	বিগর্হণা	বি ২৯০	বিচ	বিচ্ ৩০৬	বিচ্ছর্দ্দিকা	বি ২৯০
বিকাশী	বি ২৯০	বিক্রীড়িত	বি ২৯০	বিগর্হিত	বি ২৯০	বিচক্ষুঃ	বি ২৯০	বিচ্ছা	বৃক্ ৩৪১
বিকাস	বি ২৯০	বিক্রীত	বি ২৯০	বিগলিত	বি ২৯০	বিচনী	বি ২৯০	বিচ্ছু	বৃক্ ৩৪১
বিকাসন	বি ২৯০	বিক্রুষ্ট	বি ২৯০	বিগাড়	বি ২৯০	বিচয়	বি ২৯০	বিচ্ছায়	বি ২৯০
বিকাসিত	বি ২৯০	বিক্রেতা	বি ২৯০	বিগাঢ়	বি ২৯০	বিচয়	বিচ্ ৩০৬	বিচ্ছায়া	বি ২৯০
বিকাসী	বি ২৯০	বিক্রেয়	বি ২৯০	বিগান	বি ২৯০	বিচয়ন	বিচ্ ৩০৬	বিচ্ছিত্তি	বি ২৯০
বিকি(কী)	বি ২৯০	বিক্রোধ	বি ২৯০	বিগাহ	বি ২৯০	বিচয়ন	বি ২৯০	বিচ্ছুর	বি ২৯০
বিকিকিনি	বি ২৯০	বিক্রোশ	বি ২৯০	বিগীতি	বি ২৯০	বিচরণ	বি ২৯০	বিচ্ছুরিত	বি ২৯০
বিকিনী	বি ২৯০	বিক্রোষ্টা	বি ২৯০	বিগুণ	বি ২৯০	বিচর্চ্চিকা	বি ২৯০	বিচ্ছেদ	বি ২৯৭
বিকির	বি ২৯০	বিক্লব	বি ২৯০	বিগুত	বি ২৯০	বিচল	বি ২৯০	বিচ্ছেদন	বি ২৯০
বিকিরণ	বি ২৯০	বিক্লিত্তি	বি ২৯০	বিগূঢ়	বি ২৯০	বিচলন	বি ২৯০	বিচ্যুত	বি ২৯০
বিকীরণ	বি ২৯০	বিক্লিন্ন	বি ২৯০	বিগৃহীত	বি ২৯০	বিচার	বি ২৯৭	বিচ্যুতি	বি ২৯৭
বিকীর্ণ	বি ২৯০	বিক্লেদ	বি ২৯০	বিগ্রহ	বি ২৯৭	বিচারক	বি ২৯০	বিছমিল্লা	ৱ,ব ৩৬২
বিকুক্ষি	বি ২৯০	বিক্ষত	বি ২৯০	বিগ্রহী	বি ২৯০	বিচারণ	বি ২৯০	বিছরণ	বি ২৯০
বিকুণ্ঠ	বি ২৯৬	বিক্ষাব	বি ২৯০	বিঘট	বি ২৯০	বিচারণা	বি ২৯০	বিছনপুড়া	বি ২৯০
বিকুণ্ঠা	বি ২৯০	বিক্ষালিত	বি ২৯০	বিঘটন	বি ২৯০	বিচারণীয়	বি ২৯০	বিছনি	বি ২৯০
বিকুর্ব্বাণ	বি ২৯০	বিক্ষিপ্ত	বি ২৯০	বিঘটিত	বি ২৯০	বিচার-বিবেচনা	বি ৩০৭	বিছন্দ	বি ২৯০
বিকুলি	বি ২৯০	বিক্ষুব্ধ	বি ২৯০	বিঘট্টন	বি ২৯০	বিচারয়িতব্য	বি ২৯০	বিছা	বি ৩৪৩
বিকূজ	বি ২৯০	বিক্ষেপ	বি ২৯০	বিঘট্টনা	বি ২৯০	বিচারার্হ	বি ২৯০	বিছাতি	বৃক্ ৩৪৩
বিকূজন	বি ২৯০	বিক্ষেপণ	বি ২৯০	বিঘত	বি ২৯০	বিচারিত	বি ২৯০	বিছাতি	বি ২৯০
বিকৃত	বি ২৯০	বিক্ষেপ্তা	বি ২৯০	বিঘতিয়া	বি ২৯০	বিচারী	বি ২৯০	বিছান	বি ২৯৭
বিকৃতাকার	বি ২৯০	বিক্ষেপশক্তি	বি ২৯০	বিঘন	বি ২৯০	বিচারু	বি ২৯০	বিছানা	বি ২৯৭
বিকৃতাকৃতি	বি ২৯০	বিক্ষোভ	বি ২৯০	বিঘস	বি ২৯০	বিচাল	বি ২৯০	বিছু	বৃক্ ৩৪১
বিকৃতদর্শন	বি ২৯০	বিক্ষোভিত	বি ২৯০	বিঘা	বি ২৯০	বিচালি	বি ২৯০	বিছুটি	বৃক্ ৩৪১
বিকৃতবুদ্ধি	বি ২৯০	বিখ	বিশ্ ৩২১	বিঘাট	বি ২৯০	বিচার্য্য	বি ২৯০	বিছুর	বি ২৯০
বিকৃতি	বি ২৯০	বিখণ্ডন	বি ২৯০	বিঘাত	বি ২৯০	বি(বী)চি	বি ২৯০	বিছুরণ	বি ২৯০
বিকৃষ্ট	বি ২৯০	বিখনাঃ	বি ২৯০	বিঘাতন	বি ২৯০	বিচিকিৎসা	বি ২৯০	বিছে	বৃক্ ৩৪১
বিকেলবেলা	বেল্ ৩৫৯	বিখল	বি ২৯০	বিঘাতী	বি ২৯০	বিচিত	বি ২৯০	বিছেনা	বি ২৯০
বিক্রোশ(ষ)	বি ২৯০	বিখেদ	বি ২৯০	বিঘিন	বি ২৯০	বিচিতি	বি ২৯০	বিছোহ	বি ২৯০
বিক্রম	বি ২৯৭	বিখ্যাত	বি ২৯০	বিঘিনি	বি ২৯০	বিচিত্ত	বি ২৯০	বিজ্	বি ২৯০
বিক্রমণ	বি ২৯০	বিখ্যাতি	বি ২৯০	বিঘূর্ণন	বি ২৯০	বিচিত্র	বি ২৯৭	বিজন	বি ২৯৭
বিক্রমরাজ	বি ২৯০	বিগড়	বি ২৯০	বিঘূর্ণিত	বি ২৯০	বিচিত্রবীর্য্য	বি ২৯৭	বিজনন	বি ২৯০
বিক্রমার্ক	বি ২৯০	বিগড়া	বি ২৯০	বিঘোর	বি ২৯০	বিচিত্রিত	বি ২৯০	বিজনবান্ধব	বি ২৯০
বিক্রমাদিত্য	বি ২৯০	বিগড়ান	বি ২৯০	বিঘ্ন	বি ২৯৭	বিচিন্তন	বি ২৯০	বিজনী	বি ২৯০
বিক্রয়	বি ২৯৭	বিগণন	বি ২৯০	বিঘ্ননাশক	বি ২৯০	বিচিয়া	বি ২৯০	বিজন্মা	বি ২৯০
বিক্রয়পত্র	বি ২৯০	বিগত	বি ২৯০	বিঘ্নরাজ	বি ২৯০	বিচূর্ণন	বি ২৯০	বিজবিজ	বি ২৯০
বিক্রয়পত্র	পত্ ৩১	বিগতকল্মষ	বি ২৯০	বিঘ্নহারী	বি ২৯০	বিচেত	বি ২৯০	বিজবিজিনি	বি ২৯০
বিক্রয়ানুশয়	বি ২৯০	বিগতক্লম	বি ২৯০	বিঘ্নাধিপ	বি ২৯০	বিচেতন	বি ২৯০	বিজয়	বি ২৯০
বিক্রয়িক	বি ২৯০	বিগতজ্বর	বি ২৯০	বিঘ্নান্তক	বি ২৯০	বিচেতব্য	বি ২৯০	বিজয়কুঞ্জর	বি ২৯০
বিক্রয়ী	বি ২৯০	বিগতভী	বি ২৯০	বিঘ্নিত	বি ২৯০	বিচেতাঃ	বি ২৯০	বিজয়চ্ছন্দ	বি ২৯০
বিক্রান্ত	বি ২৯০	বিগতস্পৃহ	বি ২৯০	বিঘ্নেশ	বি ২৯০	বিচেয়	বি ২৯০	বিজয়ডিণ্ডিম	বি ২৯০
বিক্রান্তি	বি ২৯০	বিগতি	বি ২৯০	বিঘ্নেশ্বর	বি ২৯০	বিচেষ্টন	বি ২৯০	বিজয়ঢাক	বি ২৯০
বিক্রায়ক	বি ২৯০	বিগ(ঘ)তিয়া	বি ২৯০	বিঙ্গাচিঙ্গা	বি ২৯০	বিচেষ্টা	বি ২৯০	বিজয়দুন্দুভি	বি ২৯০
বিক্রি(ক্রী)	বি ২৯০	বিগম	বি ২৯০	বিচ	বি ২৯০	বিচেষ্টিত	বি ২৯০	বিজয়মন্দির	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিজয়মর্দ্দল	বি ২৯০	বিজেতা	বি ২৯০	বিট্লবণ	বিশ্ ৩২১	বিতর্কণ	বি ২৯০	বিদংশ	বি ২৯০
বিজয়দ্বাদশী	বি ২৯০	বিজোরি	বি ২৯০	বিট্সারিকা	বিশ্ ৩২১	বিতর্দ্দি	বি ২৯০	বিদকুটে	বিদ্ ৩১০
বিজয়পতাকা	বি ২৯০	বিজ্ঞ	বি ২৯৭	বিড়	বিশ্ ৩২১	বিতল	বি ২৯০	বিদখুটে	বিদ্ ৩০৮
বিজয়লক্ষ্মী	বি ২৯০	বিজ্ঞপ্ত	বি ২৯০	বিড়ঙ্গ	বিশ্ ৩২১	বিতস্তা	বি ২৯০	বিদগধ	বি ২৯০
বিজয়শ্রী	বি ২৯০	বিজ্ঞপ্তি	বি ২৯৮	বিড়বিড়	বিশ্ ৩২১	বিতস্তি	বি ২৯০	বিদগধি(ধী)	বি ২৯০
বিজয়া	বি ২৯০	বিজ্ঞাত	বি ২৯০	বিড়াল	বিশ্ ৩২১	বিতান	বি ২৯০	বিদগ্ধ	বি ২৯০
বিজয়াগমন	বি ২৯০	বিজ্ঞাতা	বি ২৯০	বিড়ালতপস্বী	বিশ্ ৩২১	বিতানক	বি ২৯০	বিদগ্ধতা	বি ২৯০
বিজয়াদশমী	বি ২৯০	বিজ্ঞান	বি ২৯৭	বিড়ালসন্ন্যাসী	বিশ্ ৩২১	বিতানিত	বি ২৯০	বিদগ্ধা	বি ২৯০
বিজয়ী	বি ২৯০	বিজ্ঞানময়কোষ	বি ২৯০	বিড়ালী	বিশ্ ৩২১	বিতারিখ	বি ২৯০	বিদম	বি ২৯০
বিজয়োৎসব	বি ২৯০	বিজ্ঞানী	বি ২৯৭	বিড়্বরাহ	বিশ্ ৩২১	বিতীর্ণ	বি ২৯০	বিদর	বি ২৯০
বিজর	বি ২৯০	বিজ্ঞানীয়	বি ২৯০	বিড়্ভুক(জ্)	বিশ্ ৩২১	বিতৃট্(ষ্)	বি ২৯০	বিদরণ	বি ২৯০
বিজর-বিজর	বি ২৯০	বিজ্ঞাপন	বি ২৯৮	বিড়ম্ব	বি ২৯০	বিতৃণ	বি ২৯০	বিদরা	বি ২৯০
বিজরি(রী)	বি ২৯০	বিজ্ঞাপনা	বি ২৯০	বিড়ম্বন	বি ২৯০	বিতৃষ	বি ২৯০	বিদর্ভ	বি ২৯৮
বিজল	পিশু ৬৮	বিজ্ঞাপনীয়	বি ২৯০	বিড়ম্বনা	বি ২৯০	বিতৃষ্ণ	বি ২৯০	বিদর্ভজা	বি ২৯০
বিজল্প	বি ২৯৭	বিজ্ঞাপিত	বি ২৯০	বিড়ম্বিত	বি ২৯০	বিত্ত	বিদ্ ৩০৯	বিদর্ভতনয়া	বি ২৯০
বিজল্পিত	বি ২৯০	বিজ্ঞাপ্য	বি ২৯০	বিড়ম্বী	বি ২৯০	বিত্তকাম	বি ২৯০	বিদর্ভনগরী	বি ২৯০
বিজলি(লী)	বি ২৯০	বিজ্ঞেয়	বি ২৯০	বিড়ম্ব্য	বি ২৯০	বিত্তগোপ্তা	বি ২৯০	বিদর্ভভূ	বি ২৯০
বিজাত	বি ২৯০	বিজ্য	বি ২৯০	বিড়্লবণ	বিশ্ ৩২১	বিত্তনাথ	বি ২৯০	বিদর্ভরাজ	বি ২৯০
বিজাতি	বি ২৯০	বিজ্বর	বি ২৯০	বিড়া	বি ২৯০	বিত্তপ	বি ২৯০	বিদর্ভা	বি ২৯০
বিজাতীয়	বি ২৯০	বিতিকিচ্ছিরি	বি ২৯০	বিড়ার	বি ২৯০	বিত্তপতি	বি ২৯০	বিদল	বি ২৯০
বিজাতীয়া	বি ২৯০	বিট্	বিশ্ ৩২১	বিড়ি	বি ২৯০	বিত্তপাল	বি ২৯০	বিদলন	বি ২৯০
বিজিগিচ্ছি	বি ২৯০	বিট্	ৰ,ব ৩৬২	বিড়ী	বি ২৯০	বিত্তপেটা	বি ২৯০	বিদলা	বি ২৯০
বিজিগীশ	বি ২৯০	বিট	বিশ্ ৩২২	বিডীন	বি ২৯০	বিত্তপেটী	বি ২৯০	বিদলিত	বি ২৯০
বিজিগীষা	বি ২৯০	বিটকাল	বি ২৯০	বিড়ে	বি ২৯০	বিত্তবর্দ্ধন	বি ২৯০	বিদশা	বি ২৯০
বিজিগীষী	বি ২৯০	বিটকিলে	বি ২৯০	বিড়োজা	বি ২৯০	বিত্তবিবর্দ্ধী	বি ২৯০	বিদা	বি ২৯০
বিজিগীষু	বি ২৯০	বিটকেল	বি ২৯০	বিড়ো(ড়ৌ)জাঃ	বি ২৯০	বিত্তসমাগম	বি ২৯০	বিদায়	বি ২৯০
বিজিত	ভূ ৪১১	বিটঙ্ক	বি ২৯০	বিণ্মূত্র	বিশ্ ৩২১	বিত্তাঢ্য	বি ২৯০	বিদায়ী	বি ২৯০
বিজিতি	বি ২৯০	বিটঙ্কিত	বি ২৯০	বিপ্লা	বীর্ ৩৩৫	বিত্তি	বিদ্ ৩০৮	বিদার	বি ২৯০
বিজিৎ	ভূ ৪১১	বিটনুন	বিশ্ ৩২১	বিৎ(দ্)	বিদ্ ৩০৮	বিত্তি	বৃৎ ৩৪৫	বিদারক	বি ২৯০
বিজিবিজি	বি ২৯০	বিটপ	বিশ্ ৩২৩	বিতং	বি ২৯০	বিত্তায়	বৃৎ ৩৪৫	বিদারণ	বি ২৯০
বিজির-বিজির	বি ২৯০	বিটপী	বিশ্ ৩২৩	বি(বী)তংস	বি ২৯০	বিত্তেশ	বৃৎ ৩৪৫	বিদারিকা	বি ২৯০
বিজিল	বি ২৯০	বিটপোদর	বিশ্ ৩২৩	বিতণ্ডা	বি ২৯০	বিত্তেশ্বর	বৃৎ ৩৪৫	বিদারিত	বি ২৯০
বিজিহ্ম	বি ২৯০	বিটল	বিশ্ ৩২৩	বিতত	বি ২৯০	বিত্তেহা	বৃৎ ৩৪৫	বিদারী	বি ২৯০
বিজীবিত	বি ২৯০	বিটলা	বিশ্ ৩২৩	বিততি	বি ২৯০	বিত্রস্ত	বি ২৯০	বিদাহ	বি ২৯০
বিজুগ	বি ২৯০	বিটলামী	বিশ্ ৩২৩	বিতথ	বি ২৯০	বিত্রাস	বি ২৯০	বিদাহী	বি ২৯০
বিজুত	বি ২৯০	বিটলী	বিশ্ ৩২১	বিতথবাদিন	বি ২৯০	বিত্রাসন	বি ২৯০	বিদিক্(শ্)	বি ২৯০
বিজুবন	বি ২৯০	বিটলে	বিশ্ ৩২১	বিতথা	বি ২৯০	বিত্রাসিত	বি ২৯০	বিদিত	বিদ্ ৩০৯
বিজুরি(রী	বি ২৯০	বিটাল	বিশ্ ৩২১	বিতথ্য	বি ২৯০	বিথর	বি ২৯৮	বিদিতবেদ্য	বিদ্ ৩০৮
বিজুলি(লী)	বি ২৯০	বিটি(টী)	বিশ্ ৩২১	বিতনু	বি ২৯৮	বিথান	বি ২৯৮	বিদিশা	বি ২৯০
বিজৃম্ভ	বি ২৯০	বিটীছেলে	বিশ্ ৩২১	বিতন্ত্রী	বি ২৯০	বিথার	বি ২৯৮	বিদীঘল	বি ২৯০
বিজৃম্ভণ	বি ২৯০	বিট্কুল	বিশ্ ৩২১	বিতমাঃ	বি ২৯০	বিথারিত	বি ২৯৮	বিদীর্ণ	বি ২৯০
বিজৃম্ভা	বি ২৯০	বিট্কৃমি	বিশ্ ৩২১	বিতর	বি ২৯০	বিথারিল	বি ২৯৮	বিদুআ	বি ২৯০
বিজৃম্ভিত	বি ২৯০	বিট্পণ্য	বিশ্ ৩২১	বিতরণ	বি ২৯৮	বিথারী	বি ২৯৮	বিদুর	বিদ্ ৩১০
বিজেতা	বি ২৯০	বিট্পতি	বিশ্ ৩২১	বিতরিত	বি ২৯০	বিদ্	বিদ্ ৩০৮	বিদুলা	বি ২৯০
বিজেতব্য	বি ২৯০	বিট্বরাহ	বিশ্ ৩২১	বিতর্ক	বি ২৯০	বিদ	বিদ্ ৩০৮	বিদুষী	বিদ্ ৩০৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিদুষী	বি ২৯০	বিদ্যান্ত	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যোতক	বি ২৯০	বিধায়ী	বি ২৯০	বিন	বি ২৯০
বিদুন	বি ২৯০	বিদ্যাপ্রদান	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রধি	বি ২৯০	বিধি	বি ২৯০	বিন (বর্ণন)	বর্ণ্ ২৪৯
বিদূর	বি ২৯০	বিদ্যাবল	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রব	বি ২৯০	বিধিকর	বি ২৯০	বিন	বে ৩৫৮
বিদূরগ	বি ২৯০	বিদ্যাবাগীশ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রবণ	বি ২৯০	বিধিজ্ঞ	বি ২৯০	বিনত	বি ২৯০
বিদূরজ	বি ২৯০	বিদ্যাবান	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রাব	বি ২৯০	বিধিৎসা	বি ২৯০	বিনতা	বি ২৯০
বিদূরভূমি	বি ২৯০	বিদ্যাবিক্রয়	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রাবক	বি ২৯০	বিধিৎসু	বি ২৯০	বিনতানন্দন	বি ২৯০
বিদূররত্ন	বি ২৯০	বিদ্যাবিরিঞ্চি	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রাবণ	বি ২৯০	বিধিদর্শী	বি ২৯০	বিনতাসুত	বি ২৯০
বিদূষক	বি ২৯০	বিদ্যাবিশারদ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রাবী	বি ২৯০	বিধিদৃষ্ট	বি ২৯০	বিনতি	বি ২৯০
বিদূষণ	বি ২৯০	বিদ্যাবিহীন	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রুত	বি ২৯০	বিধিপূর্ব্বক	বি ২৯০	বিনদ	বি ২৯০
বিদূষিত	বি ২৯০	বিদ্যাবৃদ্ধ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রুম	বি ২৯০	বিধিপ্রযুক্ত	বি ২৯০	বিনদ্যা	বি ২৯০
বিদে	বি ২৯০	বিদ্যাব্যসন	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রুমচ্ছায়	বি ২৯০	বিধিবশ	বি ২৯০	বিনন	বি ২৯০
বিদেশ	বি ২৯০	বিদ্যাব্রতস্নাতক	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রুমদণ্ড	বি ২৯০	বিধিবিপর্য্যয়	বি ২৯০	বিনন	বর্ণ্ ২৪৯
বিদেশগমন	বি ২৯০	বিদ্যামদ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রূপ	বি ২৯০	বিধিবিৎ	বি ২৯০	বিনন	বে ৩৫৮
বিদেশজ	বি ২৯০	বিদ্যামদ	মদ্ ৪৬৮	বিদ্রূপী	বি ২৯০	বিধিবোধিত	বি ২৯০	বিননী	বে ৩৫৮
বিদেশবাসী	বি ২৯০	বিদ্যামন্দির	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রোহ	বি ২৯০	বিধিযজ্ঞ	বি ২৯০	বিনমন	বি ২৯০
বিদেশবিভূঁই	বি ২৯০	বিদ্যারণ্য	বিদ্ ৩০৮	বিদ্রোহী	বি ২৯০	বিধিযোগ	বি ২৯০	বিনম্র	বি ২৯০
বিদেশবিভূম	বি ২৯০	বিদ্যারত্ন	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বজ্জন	বিদ্ ৩০৮	বিধিলিপি	বি ২৯০	বিনয়	বি ২৯০
বিদেশিনী	বি ২৯০	বিদ্যারম্ভ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বৎকল্প	বিদ্ ৩০৮	বিধিলোপ	বি ২৯০	বিনয়গ্রাহী	বি ২৯০
বিদেহ	বি ২৯৮	বিদ্যার্থী	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বত্তর	বিদ্ ৩০৮	বিধিহীন	বি ২৯০	বিনয়নম্র	বি ২৯০
বিদেহজা	বি ২৯৮	বিদ্যালাপ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বত্তম	বিদ্ ৩০৮	বিধু	ব্যধ্ ৩৬০	বিনয়পিটক	পট্ ৬৪
বিদেহনগরী	বি ২৯৮	বিদ্যাসাগর	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বত্তা	বিদ্ ৩০৮	বিধুকায়	ব্যধ্ ৩৬০	বিনয়পূর্ব্বক	পূ ৮৯
বিদেহপতি	বি ২৯৮	বিদ্যাস্নাত	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বত্ত্ব	বিদ্ ৩০৮	বিধুক্ষয়	ব্যধ্ ৩৬০	বিনয়বধির	বি ২৯০
বিদেহরাজ	বি ২৯৮	বিদ্যাস্নাতক	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বান	বিদ্ ৩০৯	বিধুত	বি ২৯০	বিনয়ন	বি ২৯০
বিদ্দমান	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যোৎসাহী	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বিট্(ষ্)	বিদ্ ৩০৮	বিধুতি	বি ২৯০	বিনয়া	বি ২৯০
বিদ্দা	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যাহীন	বিদ্ ৩০৮	বিদ্বিষ্ট	বিদ্ ৩০৮	বিধুন্তুদ	ব্যধ্ ৩৬০	বিনয়াধান	বি ২৯০
বিদ্ধ	ব্যধ্ ৩৬০	বিদ্যুৎ	বি ২৯০	বিদ্বেষ	বিদ্ ৩০৮	বিধুভূষণ	ব্যধ্ ৩৬০	বিনয়ী	বি ২৯০
বিদ্ধক	ব্যধ্ ৩৬০	বিদ্যুৎকটাক্ষ	বি ২৯০	বিদ্বেষক	বিদ্ ৩০৮	বিধুবন	বি ২৯০	বিনশন	বি ২৯০
বিদ্ধিত	ব্যধ্ ৩৬০	বিদ্যুৎকম্প	বি ২৯০	বিদ্বেষণ	বিদ্ ৩০৮	বিধুমুখী	ব্যধ্ ৩৬০	বিনশ্যতি	বি ২৯০
বিদ্যমান	বিদ্ ৩১০	বিদ্যুৎবাজিকর	বি ২৯০	বিদ্বেষ্টা	বিদ্ ৩০৮	বিধুর	বি ২৯০	বিনশ্বর	বি ২৯০
বিদ্যা	বিদ্ ৩১১	বিদ্যুৎত্বান(ত্বৎ)	বি ২৯০	বিধ	বি ২৯৯	বিধুরা	বি ২৯০	বিনষ্ট	বি ২৯০
বিদ্যাগম	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুৎপাত	বি ২৯০	বিধব	বি ২৯০	বিধুরাজ	ব্যধ্ ৩৬০	বিনষ্টি	বি ২৯০
বিদ্যাগুরু	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুৎপুঞ্জ	বি ২৯০	বিধবা	বি ২৯৯	বিধুরিত	বি ২৯০	বিনা	বি ২৯০
বিদ্যাতীর্থ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুৎপ্রভা	বি ২৯০	বিধর্ম্ম	বি ২৯০	বিধৃত	বি ২৯০	বিনা	বর্ণ্ ২৪৯
বিদ্যার্থী	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুৎস্পৃষ্ট	বি ২৯০	বিধর্ম্মা	বি ২৯০	বিধৃতি	বি ২৯০	বিনা	বে ৩৫৮
বিদ্যাদাতা	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুদুন্মেষ	বি ২৯০	বিধর্ম্মী	বি ২৯০	বিধূনন	বি ২৯০	বিনা	ব,ব ৩৬২
বিদ্যাদান	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুদ্গর্ভ	বি ২৯০	বিধা	বি ২৯৯	বিধূনিত	বি ২৯০	বিনাকৃত	বি ২৯০
বিদ্যাদিগ্গজ	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুদ্দাম(মন্)	বি ২৯০	বিধাতব্য	বি ২৯০	বিধূম	বি ২৯০	বিনাট	বে ৩৫৮
বিদ্যাদেবী	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুদ্দৃষ্টি	বি ২৯০	বিধাতা	বি ২৯০	বিধূমিত	বি ২৯০	বিনাড়ি	বি ২৯০
বিদ্যাধন	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুদ্বল্লী	বি ২৯০	বিধাত্রী	বি ২৯০	বিধৃত	বি ২৯০	বিনাড়িকা	বি ২৯০
বিদ্যাধর	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুৎবল্লী	বল্ ২৬৩	বিধান	বি ২৯০	বিধেয়	বি ২৯০	বিনাড়ী	বি ২৯০
বিদ্যাধরী	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুন্মালা	বি ২৯০	বিধানদাতা	বি ২৯০	বিধেয়জ্ঞ	বি ২৯০	বিনান	বি ২৯০
বিদ্যাধিদেবতা	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুন্মালী	বি ২৯০	বিধানসভা	বি ২৯০	বিধেয়াত্মা	বি ২৯০	বিনান	বে ৩৫৮
বিদ্যাস্ত্র	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুল্লতা	বি ২৯০	বিধায়	বি ২৯০	বিধ্বংস	বি ২৯০	বিনানি(নী)	বে ৩৫৮
বিদ্যানিধি	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যুল্লেখা	বি ২৯০	বিধায়ক	বি ২৯০	বিধ্বংসন	বি ২৯০	বিনানি(নী)	বি ২৯০
বিদ্যানুপালী	বিদ্ ৩০৮	বিদ্যোত	বি ২৯০	বিধায়িনী	বি ২৯০	বিধ্বংসী	বি ২৯০	বিনানিএগ্রা	বর্ণ্ ২৪৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বিনানিয়া	বর্ণ্	২৪৯	বিনিয়োজিত	বি	২৯০	বিন্দুবাসিনী	বিদ্	৩০৮	বিপৎকাল	বি	২৯০	বিপর্য্যাস	বি	২৯০
বিনানী	বর্ণ্	২৪৯	বিনিযোজ্য	বি	২৯০	বিন্দুবিসর্গ	বিদ্	৩১২	বিপৎপাত	বি	২৯০	বিপর্য্যাসোপমা	বি	২৯০
বিনাভব	বি	২৯০	বিনির্গত	বি	২৯০	বিন্দুমাধব	বিদ্	৩০৮	বিপত্তি	বি	২৯০	বিপল	বি	২৯০
বিনাভাব	বি	২৯০	বিনির্গম	বি	২৯০	বিন্দুয়ান	বিদ্	৩০৮	বিপজ্জনক	বি	২৯০	বিপশ্চিৎ	বি	২৯০
বিনাভূত	বি	২৯০	বিনির্জ্জয়	বি	২৯০	বিন্দুরূপিণী	বিদ্	৩১২	বিপত্ত	বি	২৯০	বিপাক	বি	২৯০
বিনামা	বি	২৯০	বিনির্জ্জিত	বি	২৯০	বিন্দুরেখা	বিদ্	৩০৮	বিপত্তি	বি	২৯০	বিপাক	পচ্	১৫
বিনায়	বে	৩৫৮	বিনির্ণয়	বি	২৯০	বিন্দুসরঃ	বিদ্	৩০৮	বিপত্তি	পদ্	৩৮	বিপাক্যা	বি	২৯০
বিনায়ক	বি	২৯০	বিনির্ণীত	বি	২৯০	বিন্দুসরোবর	বিদ্	৩০৮	বিপত্তিকর	বি	২৯০	বিপাট	বি	২৯০
বিনায়িকা	বি	২৯০	বিনির্ব্বন্ধ	বি	২৯০	বিন্দুহ্রদ	বিদ্	৩০৮	বিপত্তিকাল	বি	২৯০	বিপাটন	বি	২৯০
বিনাশ	বি	২৯০	বিনির্বৃত্ত	বি	২৯০	বিন্ধ	বিদ্	৩১২	বিপত্ত্য	বি	২৯০	বিপাটিত	বি	২৯০
বিনাশক	বি	২৯০	বিনির্ম্মাণ	বি	২৯০	বিন্ধশালী	বিদ্	৩০৮	বিপত্য	বি	২৯০	বিপাঠ	বি	২৯০
বিনাশন	বি	২৯০	বিনির্ম্মিত	বি	২৯০	বিন্ধা	বিদ্	৩০৮	বিপথ	বি	২৯০	বিপাণ্ডু	বি	২৯০
বিনাশিত	বি	২৯০	বিনির্ম্মিত	মা	৫৩১	বিন্ধ্য	বি	২৯০	বিপথগামী	বি	২৯০	বিপাতন	বি	২৯০
বিনাশী	বি	২৯০	বিনির্ম্মুক্ত	বি	২৯০	বিন্ধ্যনিলয়া	বি	২৯০	বিপথী	বি	২৯০	বিপাপ্মা	বি	২৯০
বিনাশোন্মুখ	বি	২৯০	বিনির্য্যাণ	বি	২৯০	বিন্ধ্যবন	বি	২৯০	বিপদ	বি	২৯০	বিপাল	বি	২৯০
বিনাশ্য	বি	২৯০	বিনিশ্চয়	বি	২৯০	বিন্ধ্যবাসিনী	বি	২৯০	বিপদ	পদ্	৩৮	বিপাশা	বি	৩০০
বিনাস	বি	২৯০	বিনিশ্চল	বি	২৯০	বিন্ধ্যবাসী	বি	২৯০	বিপদগ্রস্ত	পদ্	৩৮	বিপাশা	পশ্	৫০
বিনাহ্	বি	২৯০	বিনিশ্চিত	বি	২৯০	বিন্ধ্যস্থ	বি	২৯০	বিপদভঞ্জিনী	ভঞ্জ্	৩৭৬	বিপিন	বি	২৯০
বিনি	বি	২৯০	বিনিষ্পাত	বি	২৯০	বিন্ধ্যা	বি	২৯০	বিপদসঙ্কুল	পদ্	৩৮	বিপিনবিহারী	বি	২৯০
বিনিঃসরণ	বি	২৯০	বিনিষ্পেষ	বি	২৯০	বিন্ধ্যাটবী	বি	২৯০	বিপদাক্রান্ত	বি	২৯০	বিপিনমালতী	বি	২৯০
বিনিঃসৃত	বি	২৯০	বিনিষ্পেষণ	বি	২৯০	বিন্ধ্যাবলি(লী)	বি	২৯০	বিপদাপন্ন	বি	২৯০	বিপীড়	বি	২৯০
বিনিকার	বি	২৯০	বিনিহত	বি	২৯০	বিন্ন	বিদ্	৩০৮	বিপদুদ্ধরণ	বি	২৯০	বিপুল	বি	২৯০
বিনিগ্রহ	বি	২৯০	বিনিহিত	বি	২৯০	বিন্না	বীর্	৩৩৫	বিপদুদ্ধার	বি	২৯০	বিপুল	পুল্	৮০
বিনিগ্রাহ্য	বি	২৯০	বিনীত	বি	২৯০	বিন্নাখোপ	বীর্	৩৩৫	বিপদ্‌গ্রস্ত	বি	২৯০	বিপুলা	বি	২৯০
বিনিদ্র	বি	২৯০	বিনিতাত্মা	বি	২৯০	বিন্নি	বীর্	৩৩৫	বিপদ্দশা	বি	২৯০	বিপূয়	বি	২৯০
বিনিদ্রিত	বি	২৯০	বিনীতি	বি	২৯০	বিন্যস্ত	বি	২৯০	বিপদ্‌বারী	বি	২৯০	বিপ্র	বি	৩০০
বিনিন্দক	বি	২৯০	বিনীবী	বি	২৯০	বিন্যাস	বি	২৯০	বিপদ্‌ভঞ্জন	বি	২৯০	বিপ্রকর্ষ	বি	৩০০
বিনিন্দন	বি	২৯০	বিনীয়	বি	২৯০	বিন্যাসিত	বি	২৯০	বিপদ্‌সঙ্কুল	বি	২৯০	বিপ্রকার	বি	২৯০
বিনিপাত	বি	২৯০	বিনু	বি	২৯০	বিপক্তিম	বি	২৯০	বিপষ্থ	বি	২৯০	বিপ্রকীর্ণ	বি	২৯০
বিনিবর্ত্তন	বি	২৯০	বিনুনি(নী)	বে	৩৫৮	বিপক্ব	বি	২৯০	বিপন্ন	বি	২৯০	বিপ্রকৃত	বি	২৯০
বিনিবর্ত্তিত	বি	২৯০	বিনে	বি	২৯০	বিপক্ষ	বি	২৯০	বিপন্ন	পদ্	৩৮	বিপ্রকৃতি	বি	২৯০
বিনিবৃত্ত	বি	২৯০	বিনেতা(তৃ)	বি	২৯০	বিপক্ষ	পক্ষ্	১১	বিপরিণত	বি	২৯০	বিপ্রকৃষ্ট	বি	২৯০
বিনিবৃত্তি	বি	২৯০	বিনেয়	বি	২৯০	বিপক্ষী	বি	২৯০	বিপরিণতি	বি	২৯০	বিপ্রচিত্তি	বি	৩০০
বিনির্বহন	বি	২৯০	বিনোক্তি	বি	২৯০	বিপক্ষীয়	বি	২৯০	বিপরিণাম	বি	২৯০	বিপ্রতিপত্তি	বি	২৯০
বিনিবেশ	বি	২৯০	বিনোদ	বি	২৯০	বিপঞ্চিকা	বি	২৯০	বিপরিশ্রম	বি	২৯০	বিপ্রতিপত্তি	পদ্	৩৮
বিনিবেশ	বিশ্	৩৩২	বিনোদন	বি	২৯০	বিপঞ্চী	বি	২৯০	বিপরীত	বি	৩০০	বিপ্রতিপন্ন	বি	২৯০
বিনিবেশী	বি	২৯০	বিনোদিত	বি	২৯০	বিপণ	বি	২৯০	বিপরীতকারী	বি	২৯০	বিপ্রতিষিদ্ধ	বি	২৯০
বিনিভাব	বি	২৯০	বিনোদিনী	বি	২৯০	বিপণন	বি	২৯০	বিপরীতকারক	বি	২৯০	বিপ্রতিষেধ	বি	২৯০
বিনিময়	বি	২৯৯	বিনোদিয়া	বি	২৯০	বিপণন	পণ্	২৬	বিপরীতরত	বি	২৯০	বিপ্রতি(তী)সার	বি	২৯০
বিনিময়	মি	৫৩৮	বিন্তি	ৰ,ব	৩৬২	বিপণী	পণ্	২৬	বিপরীতরতা	বি	২৯০	বিপ্রতীপ	বি	৩০০
বিনিমেয়	বি	২৯০	বিন্দ	বিদ্	৩০৮	বিপণি	বি	২৯০	বিপরীতা	বি	২৯০	বিপ্রপাত	বি	২৯০
বিনিয়ত	বি	২৯০	বিন্দক	বিদ্	৩০৮	বিপণী	বি	২৯০	বিপরীতি	বি	২৯০	বিপ্রপাত	পত্	৩১
বিনিয়ম	বি	২৯০	বিন্দু	বিদ্	৩১২	বিপণিজীবিকা	বি	২৯০	বিপর্যয়	বি	২৯০	বিপ্রবাস	বি	২৯০
বিনিযুক্ত	বি	২৯০	বিন্দুচিত্র	বিদ্	৩০৮	বিপণিপথ	বি	২৯০	বিপর্য্যস্ত	বি	২৯০	বিপ্রবাসন	বি	২৯০
বিনিয়োগ	বি	২৯০	বিন্দুজ্বাল	বিদ্	৩০৮	বিপৎ(দ্)	বি	৪০	বিপর্য্যায়	বি	২৯০	বিপ্রবিন্না	বি	২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিপ্রযুক্ত	বি ২৯০	বিবরণ	বর্ণ্ ৩০১	বিবাহকৌতুক	বি ২৯০	বিবৃত্তি	বি ২৯০	বিভক্তজ	বি ২৯০
বিপ্রয়োগ	বি ২৯০	বিবরনালিকা	বি ২৯০	বিবাহগৃহ	বি ২৯০	বিবৃদ্ধ	বি ২৯০	বিভঙ্গ	বি ২৯০
বিপ্ররায়	বি ২৯০	বিবরপ্রবেশ	বি ২৯০	বিবাহদীক্ষা	বি ২৯০	বিবৃদ্ধ	বৃধ্ ৩৫৩	বিভঙ্গ	ভঞ্জ্ ৩৭৭
বিপ্রর্ষি	বি ৩০০	বিবরণ	বি ২৯০	বিবাহনীয়	বি ২৯০	বিবৃদ্ধি	বি ২৯০	বিভজন	বি ২৯০
বিপ্রলব্ধ	বি ৩০০	বিবর্জ্জক	বি ২৯০	বিবাহনেপথ্য	বি ২৯০	বিবেক	বি ২৯০	বিভজ্য	বি ২৯০
বিপ্রলব্ধা	বি ২৯০	বিবর্জ্জন	বি ২৯০	বিবাহবিধি	বি ২৯০	বিবেক	বিচ্ ৩০৭	বিভঞ্জন	বি ২৯০
বিপ্রলম্ভ	বি ২৯০	বিবর্জ্জনীয়	বি ২৯০	বিবাহমঙ্গল	বি ২৯০	বিবেকজ্ঞ	বিচ্ ৩০৬	বিভব	বি ২৯০
বিপ্রলম্ভন	বি ২৯০	বিবর্জ্জিত	বি ২৯০	বিবাহমণ্ডপ	মণ্ ৪৬১	বিবেকজ্ঞ	বি ২৯০	বিভব	ভূ ৪১৩
বিপ্রলম্ভী	বি ২৯০	বিবর্ণ	বি ২৯০	বিবাহাগ্নি	বি ২৯০	বিবেকজ্ঞান	বিচ্ ৩০৬	বিভবক্ষয়	বি ২৯০
বিপ্রলয়	বি ২৯০	বিবর্ত্ত	বি ২৯০	বিবাহিত	বি ২৯০	বিবেকপদবী	বি ২৯০	বিভয়	বি ২৯০
বিপ্রলাপ	বি ২৯০	বিবর্ত্ত	বৃৎ ৩৪৬	বিবাহী	বি ২৯০	বিবেকপদবী	বিচ্ ৩০৬	বিভল	বি ২৯০
বিপ্রলিপ্সা	বি ২৯০	বিবর্ত্তন	বৃৎ ৩৪৬	বিবাহ্য	বি ২৯০	বিবেকবান	বি ২৯০	বিভলা	বি ২৯০
বিপ্রলুম্পক	বি ২৯০	বিবর্ত্তন	বি ২৯০	বিবি (বিবী)	বি ২৯০	বিবেকবিরহ	বি ২৯০	বিভা	বি ২৯০
বিপ্রসেবা	বি ২৯০	বিবর্ত্তিত	বি ৩৪৬	বিবি-আনা	বি ২৯০	বিবেকবিরহ	বিচ্ ৩০৬	বিভা	ভা ৩০২
বিপ্রহাণ	বি ২৯০	বিবর্ত্তী	বি ২৯০	বিবিক্ত	বি ২৯০	বিবেকবিশ্রান্ত	বিচ্ ৩০৬	বিভাকর	বি ২৯০
বিপ্রিয়	বি ২৯০	বিবর্দ্ধন	বৃধ্ ৩৫৩	বিবিক্ত	বিচ্ ৩০৬	বিবেকবিশ্রান্ত	বি ২৯০	বিভাপণ	বি ২৯০
বিপ্রুট্(ষ্)	বি ২৯০	বিবর্দ্ধন	বি ২৯০	বিবিক্ষু	বি ২৯০	বিবেকভ্রষ্ট	বিচ্ ৩০৬	বিভাগ	বি ২৯০
বিপ্রেক্ষিত	বি ২৯০	বিবর্দ্ধী	বি ২৯০	বিবিগ্ন	বি ২৯০	বিবেকভ্রষ্ট	বি ২৯০	বিভাগ	ভজ্ ৩৬৮
বিপ্রোষিত	বি ২৯০	বিবশ	বি ২৯০	বিবিজান	বি ২৯০	বিবেকমন্থর	বি ২৯০	বিভাগকল্পনা	বি ২৯০
বিপ্লব	বি ১৬৪	বিবশ	বশ্ ২৬৭	বিবিৎসা	বি ২৯০	বিবেকমন্থর	বিচ্ ৩০৬	বিভাগধর্ম্ম	বি ২৯০
বিপ্লব	প্লু ১৬৪	বিবশা	বি ২৯০	বিবিৎসু	বি ২৯০	বিবেকিতা	বি ২৯০	বিভাগনিহ্নব	বি ২৯০
বিপ্লবী	বি ২৯০	বিবসন	বি ২৯০	বিবিদিষা	বি ২৯০	বিবেকিতা	বিচ্ ৩০৬	বিভাগপত্র	বি ২৯০
বিপ্লাব	বি ২৯০	বিবসনা	বস্ ২৭০	বিবিধ	বি ২৯৯	বিবেকী	বিচ্ ৩০৬	বিভাগভাক্(জ্)	বি ২৯০
বিপ্লাবিত	বি ২৯০	বিবস্ত্র	বি ২৯০	বিবিয়ানা	বি ২৯০	বিবেকী	বি ২৯০	বিভাগভাবনা	বি ২৯০
বিপ্লাবিত	প্লু ১৬৪	বিবস্বান্(স্বৎ)	বি ৩০১	বিবীত	বি ২৯০	বিবেচক	বি ২৯০	বিভাগরেখা	বি ২৯০
বিপ্লাবী	বি ২৯০	বিবস্বতী	বি ২৯০	বিবীতভর্ত্তা	বি ২৯০	বিবেচক	বিচ্ ৩০৭	বিভাজক	বি ২৯০
বিপ্লুত	বি ২৯০	বিবা	বি ২৯০	বিবীতস্বামী	বি ২৯০	বিবেচন	বিচ্ ৩০৬	বিভাজক	ভজ্ ৩৬৮
বিপ্লুতি	বি ২৯০	বিবাও	বি ২৯০	বিবুদ্ধ	বি ২৯০	বিবেচন	বি ২৯০	বিভাজন	ভজ্ ৩৬৮
বিপ্লুষ্ট	বি ২৯০	বিবাগ	বি ২৯০	বিবুধ	বি ২৯০	বিবেচনা	বি ৩০৭	বিভাজন	বি ২৯০
বিফল	বি ২৯০	বিবাগিনী	বি ২৯০	বিবুধ	বুধ্ ৩৩৭	বিবেচনা	বিচ্ ৩০৬	বিভাজনীয়	বি ২৯০
বিফলতা	বি ২৯০	বিবাদ	বি ২৩৩	বিবুধগুরু	বি ২৯০	বিবেচনীয়	বিচ্ ৩০৬	বিভাজ্য	বি ২৯০
বিবক্ষা	বি ২৯০	বিবাদপদ	বি ২৯০	বিবুধতটিনী	বি ২৯০	বিবেচনীয়	বি ২৯০	বিভাণ্ডক	বি ২৯০
বিবক্ষা	বচ্ ২১৩	বিবাদ-বিসংবাদ	বি ২৩৩	বিবুধনদী	বি ২৯০	বিবেচিত	বি ২৯০	বিভাত	বি ২৯০
বিবক্ষিত	বি ২৯০	বিবাদিত	বি ২৯০	বিবুধনাথ	বি ২৯০	বিবেচিত	বিচ্ ৩০৬	বিভাত	ভা ৩৯০
বিবক্ষু	বি ২৯০	বিবাদিনী	বি ২৯০	বিবুধস্ত্রী	বি ২৯০	বিবেচ্য	বিচ্ ৩০৬	বিভাব	ভূ ৪০৯
বিবংস	বি ২৯০	বিবাদী	বি ২৩৩	বিবুধেশ্বর	বি ২৯০	বিবেচ্য	বি ২৯০	বিভাব	বি ২৯০
বিবদমান	বি ২৯০	বিবাধ	বি ২৯০	বিবৃত	বি ২৯০	বিবোধ	বি ২৯০	বিভাবক	বি ২৯০
বিবদমান	বদ্ ২৩১	বিবাধা	বি ২৯০	বিবৃত	বর্ণ্ ২৪৯	বিবোধন	বি ২৯০	বিভাবন	বি ২৯০
বিবাদ	বদ্ ২৩১	বিবার	বি ২৯০	বিবৃতদ্বার	বি ২৯০	বিবোধিত	বি ২৯০	বিভাবনা	বি ২৯০
বি(বী)বধ	বি ২৯০	বিবাস	বি ২৯০	বিবৃতস্ময়ন	বি ২৯০	বিব্বোক	বি ২৯০	বিভাবনীয়	বি ২৯০
বিবধিক	বি ২৯০	বিবাসন	বি ২৯০	বিবৃতা	বি ২৯০	বিব্রত	বি ২৬১	বিভাবরী	বি ২৯০
বিবন্ধ	বি ২৯০	বিবাসিত	বি ২৯০	বিবৃতি	বি ২৯০	বিভক্ত	বি ২৯০	বিভাবরী	ভা ৩০২
বিবন্ধু	বি ২৯০	বিবাহ	বি ২৯০	বিবৃতী	বি ২৯০	বিভক্ত	ভজ্ ৩৬৯	বিভাবসু	ভা ৩৯০
বিবর	বি ৩০১	বিবাহ	বহ্ ২৮৫	বিবৃত্ত	বি ২৯০	বিভক্তি	ভজ্ ৩৭১	বিভাবসু	বি ২৯০
বিবর	বর্ণ্ ২৪৯	বিবাহকাম	বি ২৯০	বিবৃত্ত	বৃৎ ৩৪৫	বিভক্তি	বি ২৯০	বিভাবিত	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিভাব্য	বি ২৯০	বিভোল	বি ২৯০	বিম্হী	বংহ্ ১৯২	বিমোহন	বি ২৯০	বিয়ে	বহ্ ২৮৫
বিভাষা	বি ২৯০	বিভোলা	বি ২৯০	বি(বী)মা	ব,ব ৩৬২	বিমোহিত	বি ২৯০	বিয়েন	বি ২৯০
বিভাষা	ভাষ্ ৩৯২	বিভ্রংশ	বি ২৯০	বিমাংস	বি ২৯০	বিমোহিনী	বি ২৯০	বিয়োগ	বি ২৯০
বিভাস	বি ২৯০	বিভ্রংশী	বি ২৯০	বিমাতা(তৃ)	বি ২৯০	বিমোহী	বি ২৯০	বিয়োগমন্ত্রণা	বি ২৯০
বিভাস	ভাস্ ৩৯৬	বিভ্রম	বি ২৯০	বিমান	বি ২৯০	বিম্ব	বী ৩৩৩	বিয়োগযন্ত্রণা	বি ২৯০
বিভাসা	বি ২৯০	বিভ্রমা	বি ২৯০	বিমান	মা ৫০৯	বিম্বক	বী ৩৩৩	বিয়োগসারথি	বি ২৯০
বিভাসিত	বি ২৯০	বিভ্রাট্(জ্)	বি ৪৪১	বিমানগৃহ	বি ২৯০	বিম্বকি	বী ৩৩৩	বিয়োগিনী	বি ২৯০
বিভাহ	বি ২৯০	বিভ্রাট	বি ২৯০	বিমানচারী	বি ২৯০	বিম্বফলক	বী ৩৩৩	বিয়োগী	বি ২৯০
বিভিদা	বি ২৯০	বিভ্রাট	ভ্রাজ্ ৪৪১	বিমাননা	বি ২৯০	বিম্বা	বী ৩৩৩	বিয়োজন	বি ২৯০
বিভিন্ন	বি ২৯০	বিভ্রম	ভ্রংশ্ ৪৩৭	বিমানিত	বি ২৯০	বিম্বাধর	বী ৩৩৩	বিয়োজনীয়	বি ২৯০
বিভিন্ন	ভিদ্ ৪০০	বিভ্রান্ত	ভ্রংশ্ ৪৩৯	বিমান্য	বি ২৯০	বিম্বিকা	বী ৩৩৩	বিয়োজিত	বি ২৯০
বিভিন্নতা	বি ২৯০	বিভ্রান্ত	বি ২৯০	বিমানপথ	বি ২৯০	বিম্বিত	বী ৩৩৩	বিযোড়	বি ২৯০
বিভী	বি ৪০১	বিভ্রান্তি	ভ্রংশ্ ৪৩৭	বিমানপ্রতিম	বি ২৯০	বিম্বী	বী ৩৩৩	বিযোনি(নী)	বি ২৯০
বিভীত	বি ৪০১	বিভ্রান্তি	বি ২৯০	বিমানযান	বি ২৯০	বিম্বু	বী ৩৩৩	বিরক্ত	বি ২৯০
বিভীতক	বি ২৯০	বিভ্রোল	বি ২৯০	বিমানরত্ন	বি ২৯০	বিম্বুক	বী ৩৩৩	বিরক্তা	বি ২৯০
বিভীতক	ভী ৪০১	বিমজ্জিম	বি ২৯০	বিমানশিখর	বি ২৯০	বিম্বুকি(কী)	বী ৩৩৩	বিরক্তি	বি ২৯০
বিভীতকী	বি ২৯০	বিমজ্জিম	ব,ব ৩৬২	বিমানস্থায়ী	বি ২৯০	বিম্বোষ্ঠ	বী ৩৩৩	বিরঙ	বি ২৯০
বিভীতা	বি ২৯০	বিমণ্ডিত	বি ২৯০	বিমার্গ	বি ২৯০	বিম্বৌষ্ঠ	বী ৩৩৩	বিরঙ্গ	বি ২৯০
বিভীষক	বি ৪০৪	বিমত	বি ২৯০	বিমার্গণ	বি ২৯০	বিম্লাপন	বী ৩৩৩	বিরঙ্গী	বি ২৯০
বিভীষণ	বি ৪০৪	বিমতি	বি ২৯০	বিমার্গা	বি ২৯০	বিয়ঙ্গ	বি ২৯০	বিরচ	বি ২৯০
বিভীষা	বি ৪০৪	বিমৎসর	বি ২৯০	বিমার্গগামী	বি ২৯০	বিয়ড়ী	বি ২৯০	বিরচন	বি ২৯০
বিভীষিকা	বি ৪০৪	বিমদ	বি ২৯০	বিমার্গপ্রস্থিত	বি ২৯০	বিয়ৎ	বি ২৯০	বিরচনা	বি ২৯০
বিভু	বি ২৯০	বিমন	বি ২৯০	বিমিশ্র	বি ২৯০	বিয়ৎচর	বি ২৯০	বিরচিত	বি ২৯০
বিভু	ভূ ৪১৬	বিমনা	বি ২৯০	বিমিশ্রিত	বি ২৯০	বিয়ৎগঙ্গা	বি ২৯০	বিরজ	বি ২৯০
বিভুতা	বি ২৯০	বিমনা	মন্ ৪৮১	বিমুকি	বী ৩৩৩	বিয়ন	বি ২৯০	বিরজস্ক	বি ২৯০
বিভুভাব	বি ২৯০	বিমনস্ক	বি ২৯০	বিমুক্ত	বি ২৯০	বিয়নি(নী)	বি ২৯০	বিরজা	বি ২৯০
বিভুলা	বি ২৯০	বিমনা	বি ২৯০	বিমুক্ত	মুচ্ ৫৫৪	বিয়লি	বি ২৯০	বিরজাঃ	বি ২৯০
বিভুঁই	বি ২৯০	বিমনাঃ	বি ২৯০	বিমুক্তি	মুচ্ ৫৫৪	বিয়া	বি ২৯০	বিরঞ্ঝ	বি ২৯০
বিভূত	ভূ ৪২২	বিমন্যু	বি ২৯০	বিমুক্তি	বি ২৯০	বিয়া(হা)ই	বি ২৯০	বিরঞ্চি	বি ২৯০
বিভূতি	বি ৪২২	বিমরিষ	বি ২৯০	বিমুখ	বি ২৯০	বিয়াকুল	বি ২৯০	বিরণ	বীর্ ৩৩৫
বিভূতি	ভূ ৪২৪	বিমর্দ্দ	বি ২৯০	বিমুখিয়া	বি ২৯০	বিয়াখিত	বি ২৯০	বিরণি	বহ্ ২৭৮
বিভূতিদ্বাদশী	বি ২৯০	বিমর্দ্দক	বি ২৯০	বিমুখী	বি ২৯০	বিয়াজ	বি ২৯০	বিরত	বি ২৯০
বিভূতিভূষণ	ভূ ৪২৪	বিমর্দ্দন	বি ২৯০	বিমুগ্ধ	বি ২৯০	বিযাত	বি ২৯০	বিরতি	বি ২৯০
বিভূষণ	বি ২৯০	বিমর্দ্দিত	বি ২৯০	বিমুগ্ধ	মুহ্ ৫৬৮	বিয়াধি	বি ২৯০	বিরথ	বি ২৯০
বিভূষণা	বি ২৯০	বিমর্দ্দী	বি ২৯০	বিমুদ্র	বি ২৯০	বিয়ান	বি ২৯০	বিরথি	বি ২৯০
বিভূষিত	বি ২৯০	বিমর্দ্দোত্থ	বি ২৯০	বিমুষ্ট	বি ২৯০	বিয়ানি(নী)	বি ২৯০	বিরথিয়া	বি ২৯০
বিভূষিতা	বি ২৯০	বিমর্শ	বি ৫৯১	বিমূঢ়	বি ২৯০	বিয়াপি	বি ২৯০	বিরথী	বি ২৯০
বিভেদ	ভিদ্ ৩৯৮	বিমর্শন	বি ২৯০	বিমূঢ়	মুহ্ ৫৬৮	বিয়াপিত	বি ২৯০	বিরম	বি ২৯০
বিভেদক	বি ২৯০	বিমর্ষ	বি ৫৯২	বিমৃশ্য	বি ২৯০	বিয়ারাম	বি ২৯০	বিরমণ	বি ২৯০
বিভেদন	বি ২৯০	বিমর্ষিত	বি ২৯০	বিমৃশ্যকারী	বি ২৯০	বিয়ালা	বি ২৯০	বিরমিত	বি ২৯০
বিভেদিনী	বি ২৯০	বিমল	বি ২৯০	বিমৃষ্ট	বি ২৯০	বিয়াল্লিশ	বি ২৯০	বিরল	বি ২৯০
বিভেদী	বি ২৯০	বিমলদান	বি ২৯০	বিমোক্ষ	বি ২৯০	বিয়াল্লিশ	ব,ব ৩৬২	বিরলদ্রবা	বি ২৯০
বিভেদ্য	বি ২৯০	বিমলমণি	বি ২৯০	বিমোক্ষণ	বি ২৯০	বিয়াত্তা	বি ২৯০	বিরলভক্তি	বি ২৯০
বিভোগ	বি ২৯০	বিমলা	বি ২৯০	বিমোচন	বি ২৯০	বিযুক্ত	বি ২৯০	বিরশ্মি	বি ২৯০
বিভোর	বি ২৯০	বিমলাপ	বি ২৯০	বিমোহ	বি ২৯০	বিয়ে	বি ২৯০	বিরস	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিশস	বি ২৯০	বিশেষক	বি ২৯০	বিশ্রাণিত	বি ২৯০	বিশ্ববঞ্চক	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাঙ্গ	বিশ্ ৩২১
বিশসন	বি ২৯০	বিশেষগুণ	বি ২৯০	বিশ্রান্ত	বি ২৯০	বিশ্ববাঙ্গালা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাচী	বিশ্ ৩২১
বিশসিত	বি ২৯০	বিশেষজ্ঞ	বি ২৯০	বিশ্রান্তি	বি ২৯০	বিশ্ববন্ধু	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাত্মক	বিশ্ ৩২১
বিশস্ত	বি ২৯০	বিশেষণ	বি ২৯০	বিশ্রাব	বি ২৯০	বিশ্ববাস	বিশ্ ৩২১	বিশ্বানর	বিশ্ ৩২৭
বিশস্তা	বি ২৯০	বিশেষত	বি ২৯০	বিশ্রাম	বি ২৯০	বিশ্ববিজয়ী	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাবসু	বিশ্ ৩২৭
বিশা	বিশ্ ৩২১	বিশেষতঃ	বি ২৯০	বিশ্রী	বি ২৯০	বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ ৩২১	বিশ্বামিত্র	বিশ্ ৩২৭
বিশা	ৰ,ব ৩৬২	বিশেষবাদ	বি ২৯০	বিশ্রুত	বি ২৯০	বিশ্ববিভাবন	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাস	বিশ্ ৩২১
বিশাই	বিশ্ ৩২১	বিশেষবিধি	বি ২৯০	বিশ্রুতি	বি ২৯০	বিশ্ববিশ্রুত	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসঘাত	বিশ্ ৩২১
বিশাখ	বি ২৯০	বিশেষবৃত্তি	বি ২৯০	বিশ্লথ	বি ২৯০	বিশ্ববীজ	বিশ্ ৩২৫	বিশ্বাসঘাতক	বিশ্ ৩২১
বিশাখা	বি ২৯০	বিশেষলক্ষণ	রি ২৯০	বিশ্লিষ্ট	বি ২৯০	বিশ্ববেদাঃ	বিশ্ ৩২৫	বিশ্বাসঘাতী	বিশ্ ৩২১
বিশাতন	বি ২৯০	বিশেষলিঙ্গ	বি ২৯০	বিশ্লেষ	বি ২৯০	বিশ্বব্রহ্মাণ্ড	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসন	বিশ্ ৩২১
বিশাপ	বি ২৯০	বিশেষশাস্ত্র	বি ২৯০	বিশ্লেষণ	বি ২৯০	বিশ্বভণ্ড	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসপাত্র	বিশ্ ৩২১
বিশাম্পতি	বি ২৯০	বিশেষিত	বি ২৯০	বিশ্লেষিত	বি ২৯০	বিশ্বভব	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসভঙ্গ	বিশ্ ৩২১
বিশারদ	বি ২৯০	বিশেষোক্তি	বি ২৯০	বিশ্ব	বিশ্ ৩২৩	বিশ্বভর্ত্তা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসভাজন	বিশ্ ৩২১
বিশাল	বি ২৯০	বিশেষ্য	বি ২৯০	বিশ্বকর্ত্তা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বভাবন	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসহন্তা	বিশ্ ৩২১
বিশালকুল	বি ২৯০	বিশোক	বি ২৯০	বিশ্বকর্ম্মা	বিশ্ ৩২৩	বিশ্বভুক্	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসিক	বিশ্ ৩২১
বিশালসম্ভব	বি ২৯০	বিশোকা	বি ২৯০	বিশ্বকায়	বিশ্ ৩২১	বিশ্বময়	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসিত	বিশ্ ৩২১
বিশালা	বি ২৯০	বিশোধন	বি ২৯০	বিশ্বক্সেন	বিশ্ ৩২১	বিশ্বমানব	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসী	বিশ্ ৩২১
বিশালাক্ষ	বি ২৯০	বিশোধনী	বি ২৯০	বিশ্বগুরু	বিশ্ ৩২১	বিশ্বমূর্ত্তি	বিশ্ ৩২৫	বিশ্বাসঘাতকী	বিশ্ ৩২১
বিশালাক্ষী	বি ২৯০	বিশোধিত	বি ২৯০	বিশ্বজগৎ	বিশ্ ৩২১	বিশ্বম্ভর	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসৈকভূ	বিশ্ ৩২১
বিশালী	বি ২৯০	বিশোধী	বি ২৯০	বিশ্বজন	বিশ্ ৩২১	বিশ্বযোনি	বিশ্ ৩২১	বিশ্বাসোপগম	বিশ্ ৩২১
বিশালোরসী	বি ২৯০	বিশোধ্য	বি ২৯০	বিশ্বজনীন	বিশ্ ৩২১	বিশ্বরমা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বেদেব	বিশ্ ৩২১
বিশালোরস্ক	বি ২৯০	বিশোয়াস	বি ২৯০	বিশ্বজিৎ	বিশ্ ৩২১	বিশরাট্(জ্)	বিশ্ ৩২১	বিশ্বেশ	বিশ্ ৩২১
বিশাশয়	ৰ,ব ৩৬২	বিশোষ	বি ২৯০	বিশ্বতঃ	বিশ্ ৩২১	বিশ্বরূপ	বিশ্ ৩২৫	বিশ্বেশী	বিশ্ ৩২১
বিশাসয়	ৰ,ব ৩৬২	বিশোষণ	বি ২৯০	বিশ্বতনু	বিশ্ ৩২১	বিশ্বরূপ	— ৩৫১	বিশ্বেশ্বর	বিশ্ ৩২১
বিশিখ	বি ২৯০	বিশোষিত	বি ২৯০	বিশ্বতোমুখ	বিশ্ ৩২১	বিশ্বরূপদর্শন	বিশ্ ৩২৬	বিষ্	বিশ্ ৩২২
বিশিখা	বি ২৯০	বিশোষী	বি ২৯০	বিশ্বদেব	বিশ্ ৩২৫	বিশ্বরেতাঃ	বিশ্ ৩২১	বিষ	বিশ্ ৩২৮
বিশিরস্ক	বি ২৯০	বিশ্র(শ্রা)ণন	বি ২৯০	বিশ্বদেবগণ	বিশ্ ৩২৫	বিশ্বলোকনাথ	বিশ্ ৩২১	বিষকণ্ঠ	বিশ্ ৩২১
বিশিরাঃ	বি ২৯০	বিশ্রবণ	বি ৩০৮	বিশ্বদেবতা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বশ্রবা	বিশ্ ৩০৮	বিষকন্যা	বিশ্ ৩২১
বিশিষ্ট	বি ২৯০	বিশ্রবণ	— ৩২৬	বিশ্বদেবা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বশ্রবা	— ৩২৬	বিষকুম্ভ	বিশ্ ৩২১
বিশিষ্টবৃদ্ধি	বি ২৯০	বিশ্রবস্	বি ২৯০	বিশ্বধর	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসংপ্লব	বিশ্ ৩২১	বিষক্ত	বিশ্ ৩২১
বিশিষ্টা	বি ২৯০	বিশ্রবাঃ	বি ৩০৮	বিশ্বধাতা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসখ	বিশ্ ৩২১	বিষঘ্ন	বিশ্ ৩২১
বিশিষ্টাদ্বৈত	বি ২৯০	বিশ্র(স্র)ব্ধ	বি ২৯০	বিশ্বধারিণী	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসত্তম	বিশ্ ৩২১	বিষঘ্না	বিশ্ ৩২১
বিশীর্ণ	বি ২৯০	বিশ্রম	বি ২৯০	বিশ্বধ্যেয়	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসনীয়	বিশ্ ৩২১	বিষঙ্গ	বিশ্ ৩২১
বিশীল	বি ২৯০	বিশ্রমণ	বি ২৯০	বিশ্বনাথ	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসম্ভব	বিশ্ ৩২১	বিষজুষ্ট	বিশ্ ৩২১
বিশুদ্ধ	বি ২৯০	বিশ্র(স্র)স্ত	বি ২৯০	বিশ্বনাভি	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসিত	বিশ্ ৩২১	বিষণ্ড	বিশ্ ৩২১
বিশুদ্ধসত্ত্ব	বি ২৯০	বিশ্রম্ভকথা	বি ২৯০	বিশ্বনাশী	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসতিব্য	বিশ্ ৩২১	বিষণ্ণ	বিশ্ ৩২১
বিশুদ্ধি	বি ২৯০	বিশ্রম্ভকথিত	বি ২৯০	বিশ্বনিন্দক	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসৃক্	বিশ্ ৩২১	বিষণ্ণচেতা	বিশ্ ৩২১
বিশুষ্ক	বি ২৯০	বিশ্রম্ভণ	বি ২৯০	বিশ্বনিন্দুক	বিশ্ ৩২১	বিশ্বসৃট্(সৃজ্)	বিশ্ ৩২১	বিষণ্ণরূপ	বিশ্ ৩২১
বিশূল	বি ২৯০	বিশ্রম্ভবয়স্যা	বি ২৯০	বিশ্বপতি	বিশ্ ৩২১	বিশ্বস্ত	বিশ্ ৩২১	বিষতরু	বিশ্ ৩২১
বিশৃঙ্খল	বি ২৯০	বিশ্রম্ভভাষণ	বি ২৯০	বিশ্বপর্ণী	বিশ্ ৩২১	বিশ্বস্তা	বিশ্ ৩২১	বিষদ	বিশ্ ৩২১
বিশৃঙ্খলা	বি ২৯০	বিশ্রম্ভভূমি	বি ২৯০	বিশ্বপা	বিশ্ ৩২১	বিশ্বস্রষ্টা	বিশ্ ৩২১	বিষদন্ত	বিশ্ ৩২১
বিশেখ	বি ২৯০	বিশ্রম্ভালাপ	বি ২৯০	বিশ্বপাচক	বিশ্ ৩২১	বিশ্বহর্ত্তা	বিশ্ ৩২১	বিষদাঁত	বিশ্ ৩২১
বিশেশয়	ৰ,ব ৩৬২	বিশ্রম্ভী	বি ২৯০	বিশ্বপাবন	বিশ্ ৩২১	বিশ্বহেতু	বিশ্ ৩২১	বিষদিগ্ধ	বিশ্ ৩২১
বিশেষ	বি ২৯০	বিশ্রাণন	বি ২৯০	বিশ্বপ্রেম	বিশ্ ৩২১	বিশ্বা	বিশ্ ৩২১	বিষদূষণ	বিশ্ ৩২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিষদৃষ্টি	বিশ্ ৩২১	বিষলতা	বিশ্ ৩২১	বিষ্টব্ধ	বি ২৯০	বিষ্ফুলিঙ্গ	বিশ্ ৩২১	বিসিনী	বি ২৯০
বিষক্রম	বিশ্ ৩২১	বিষবন	বিশ্ ৩২১	বিষ্টম্ভ	বি ২৯০	বিষ্যন্দ	বিশ্ ৩২১	বিসূচিকা	বি ২৯০
বিষধর	বিশ্ ৩২১	বিষশূক	বিশ্ ৩২১	বিষ্টম্ভিত	বি ২৯০	বিষ্যন্দন	বিশ্ ৩২১	বিসূচী	বি ২৯০
বিষধাত্রী	বিশ্ ৩২১	বিষহন্ত্রী	বিশ্ ৩২১	বিষ্টম্ভী	বি ২৯০	বিষ্বক্	বিশ্ ৩২১	বিসূরণ	বি ২৯০
বিষনয়ন	বিশ্ ৩২১	বিষহর	বিশ্ ৩২১	বিষ্টর	বি ২৯০	বিষ্বক্সেন	বিশ্ ৩২১	বিসূর্য্য	বি ২৯০
বিষনাশক	বিশ্ ৩২১	বিষহরা	বিশ্ ৩২১	বিষ্টরভাক্(জ্)	বি ২৯০	বিষ্বক্সেনা	বিশ্ ৩২১	বিসৃজ্য	বি ২৯০
বিষনাশী	বিশ্ ৩২১	বিষহরি	বিশ্ ৩২১	বিষ্টরশ্রবাঃ	বি ২৯০	বিস	বিশ্ ৩২১	বিসৃত	বি ২৯০
বিষপাথর	বিশ্ ৩২১	বিষহরী	বিশ্ ৩২১	বিষ্টি	বিশ্ ৩২৯	বিস	বি ২৯০	বিসৃত্বর	বি ২৯০
বিষপাদপ	বিশ্ ৩২১	বিষহ্য	বিশ্ ৩২১	বিষ্টু	বিশ্ ৩২৯	বিসংজ্ঞ	বি ২৯০	বিসৃমর	বি ২৯০
বিষফোড়া	বিশ্ ৩২১	বিষা	বিশ্ ৩২১	বিষ্ঠা	বি ২৯০	বিসংবাদ	বি ২৯০	বিসৃষ্ট	বি ২৯০
বিষবল্লরী	বিশ্ ৩২১	বিষাই	বিশ্ ৩২১	বিষ্ঠিত	বি ২৯০	বিসংবাদ	বদ্ ২৩১	বিসৃষ্টি	বি ২৯০
বিষবল্লী	বিশ্ ৩২১	বিষাক্ত	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণু	বিশ্ ৩২৯	বিসংবাদী	বি ২৯০	বিস্কম্ভ	বি ২৯০
বিষবিটপী	বিশ্ ৩২১	বিষাঙ্গনা	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুউদক	বিশ্ ৩২১	বিসংসর্পী	বি ২৯০	বিস্কুট	বি ২৯০
বিষবিদ্যা	বিশ্ ৩২১	বিষাণ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুকায়া	বিশ্ ৩২৯	বিসকণ্ঠিকা	বিশ্ ৩২১	বিস্ত	বি ২৯০
বিষবৃক্ষ	বিশ্ ৩২১	বিষাণকোশ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুক্রম	বিশ্ ৩২১	বিসকিশলয়	বিশ্ ৩২১	বিস্তর	বি ২৯০
বিষবৃষ্টি	বিশ্ ৩২১	বিষাণবাদক	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুক্রান্ত	বিশ্ ৩২১	বিসকুসুম	বিশ্ ৩২১	বিস্তার	বি ২৯০
বিষবৈদ্য	বিশ্ ৩২১	বিষবাদিনী	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুগৃহ	বিশ্ ৩২১	বিসগ্রন্থি	বিশ্ ৩২১	বিস্তারয়িতা	বি ২৯০
বিষভুজঙ্গ	বিশ্ ৩২১	বিষাণী	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুগ্রন্থি	বিশ্ ৩২১	বিসঙ্কট	বি ২৯০	বিস্তারিত	বি ২৯০
বিষম	বিশ্ ৩২১	বিষাদ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুচক্র	বিশ্ ৩২১	বিসঙ্গ	বি ২৯০	বিস্তারী	বি ২৯০
বিষমকর্ম্ম	বিশ্ ৩২১	বিষাদন	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুতিথি	বিশ্ ৩২১	বিসজ	বিশ্ ৩২১	বিস্তীর্ণ	বি ২৯০
বিষমকাল	বিশ্ ৩২১	বিষাদিত	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুতৈল	বিশ্ ৩২১	বিসতন্তু	বিশ্ ৩২১	বিস্তৃত	বি ২৯০
বিষমগত	বিশ্ ৩২১	বিষাদী	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুদেবতা	বিশ্ ৩২১	বিসদৃশ	বি ২৯০	বিস্তৃতি	বি ২৯০
বিষমচতুরশ্র	বিশ্ ৩২১	বিষাপহ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুদৈবত	বিশ্ ৩২১	বিসনাভি	বিশ্ ৩২১	বিস্পষ্ট	বি ২৯০
বিষমচ্ছদ	বিশ্ ৩২১	বিষাপহরণ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর	বিশ্ ৩২১	বিসন্ধি	বি ২৯০	বিস্ফার	বি ২৯০
বিষমজ্বর	বিশ্ ৩২১	বিষাপহা	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুপঞ্জর	বিশ্ ৩২১	বিসন্নাহ	বি ২৯০	বিস্ফারণ	বি ২৯০
বিষমত্রিভুজ	বিশ্ ৩২১	বিষাপহার	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুপদ	বিশ্ ৩২১	বিসপুষ্প	বিশ্ ৩২১	বিস্ফারিত	বি ২৯০
বিষমদৃষ্টি	বিশ্ ৩২১	বিষাস্বাদ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুপদী	বিশ্ ৩৩১	বিসপ্রসূন	বিশ্ ৩২১	বিস্ফাল	বি ২৯০
বিষমধাতু	বিশ্ ৩২১	বিষুব	বিশ্ ৩২৯	বিষ্ণুপদোদক	বিশ্ ৩৩১	বিসবল্লী	বিশ্ ৩২১	বিস্ফুট	বি ২৯০
বিষমনেত্র	বিশ্ ৩২১	বিষুবৎ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুপুর	বিশ্ ৩২১	বিসম্বাদ	বি ২৯০	বিস্ফুরণ	বি ২৯০
বিষমপদ	বিশ্ ৩২১	বিষুবদ্দিন	বিশ্ ৩২৯	বিষ্ণুপুরাণ	বিশ্ ৩২১	বিসম্বাদী	বি ২৯০	বিস্ফুলিঙ্গ	বি ২৯০
বিষমবাণ	বিশ্ ৩২১	বিষুববৃত্ত	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুবল্লভা	বিশ্ ৩২১	বিসর	বি ২৯০	বিস্ফুর্জ্জথু	বি ২৯০
বিষমবিভাগ	বিশ্ ৩২১	বিষুবরেখা	বিশ্ ৩২৯	বিষ্ণুবাহন	বিশ্ ৩২১	বিসরণ	বি ২৯০	বিস্ফুর্জ্জন	বি ২৯০
বিষমবিলোচন	বিশ্ ৩২১	বিষূচিকা	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুভোগ	বিশ্ ৩২১	বিসর্গ	বি ২৯০	বিস্ফুর্জ্জিত	বি ২৯০
বিষমন্ত্র	বিশ্ ৩২১	বিষূচী	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুমণ্ডপ	বিশ্ ৩২১	বিসর্গচুম্বন	বি ২৯০	বিস্ফোট	বি ২৯০
বিষমলক্ষ্মী	বিশ্ ৩২১	বিষূচিকা	বি ২৯০	বিষ্ণুমন্দির	বিশ্ ৩২১	বিসর্জ্জ	বি ২৯০	বিস্ফোটক	বি ২৯০
বিষমশিষ্ট	বিশ্ ৩২১	বিষূচী	বি ২৯০	বিষ্ণুমায়া	বিশ্ ৩৩১	বিসর্জ্জন	বি ২৯০	বিস্ফোটন	বি ২৯০
বিষমশীল	বিশ্ ৩২১	বিষ্ক	বিশ্ ৩২১	বিষ্ণুযশাঃ	বিশ্ ৩২১	বিসর্জ্জনীয়	বি ২৯০	বিস্ময়	বি ২৯০
বিষমস্থ	বিশ্ ৩২১	বিষ্কন্ধ	বি ২৯০	বিষ্ণুরথ	বিশ্ ৩২১	বিসর্প	বি ২৯০	বিস্ময়াকুল	বি ২৯০
বিষমাক্ষ	বিশ্ ৩২১	বিষ্কম্ভ	বি ২৯০	বিষ্ণুরাত	বিশ্ ১১৮	বিসর্পণ	বি ২৯০	বিস্ময়ান্বিত	বি ২৯০
বিষমায়ুধ	বিশ্ ৩২১	বিষ্কম্ভক	বি ২৯০	বিষ্ণুশক্তি	বিশ্ ৩২১	বিসর্পি	বি ২৯০	বিস্ময়াবিষ্ট	বি ২৯০
বিষমিত	বিশ্ ৩২১	বিষ্কম্ভিত	বি ২৯০	বিষ্ণুশিলা	বিশ্ ৩২১	বিসর্পী	বি ২৯০	বিস্ময়োৎফুল্ল	বি ২৯০
বিষমীকৃত	বিশ্ ৩২১	বিষ্কম্ভী	বি ২৯০	বিষ্ণুশৃঙ্খল	বিশ্ ৩২১	বিসলতা	বিশ্ ৩২১	বিস্মর	বি ২৯০
বিষমুখী	বিশ্ ৩২১	বিষ্কির	বি ২৯০	বিষ্ফার	বিশ্ ৩২১	বিসাই	বিশ্ ৩২১	বিস্মরণ	বি ২৯০
বিষমেক্ষণ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ট	বিশ্ ৩২১	বিষ্ফাল	বিশ্ ৩২১	বিসার	বি ২৯০	বিস্মরিত	বি ২৯০
বিষমেষু	বিশ্ ৩২১	বিষ্টপ	বিশ্ ৩২১	বিষ্ফুরণ	বিশ্ ৩২১	বিসিনী	বিশ্ ৩২১	বিস্মাপক	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বিস্মাপণ	বি ২৯০	বিহাই	বি ২৯০	বীচি	বি ২৯০	বীড়	বি ২৯০	বীরকাছ	বীর্ ৩৩৩
বিস্মাপিত	বি ২৯০	বিহাণ	বি ২৯০	বীচী	বি ২৯০	বীড়া	বি ২৯০	বীরকানী	বীর্ ৩৩৩
বিস্মারণ	বি ২৯০	বিহান	বি ২৯০	বীজ্	বি ২৯০	বীড়ি	বি ২৯০	বীরকাম	বীর্ ৩৩৫
বিস্মারিত	বি ২৯০	বিহাপিত	বি ২৯০	বীজ	বি ৩০৩	বীড়ী	বি ২৯০	বীরকালি(লী)	বীর্ ৩৩৩
বিস্মিত	বি ২৯০	বিহায়ঃ	বি ২৯০	বীজক	বি ২৯০	বীণ	বী ৩৩৩	বীরকীট	বীর্ ৩৩৫
বিস্মিতি	বি ২৯০	বিহায়ঃস্থলী	বি ২৯০	বীজকর্ত্তা	বি ৩০৩	বীণা	বী ৩৩৫	বীরকুঞ্জর	বীর্ ৩৩৩
বিস্মৃত	বি ২৯০	বিহায়স	বি ৩০২	বীজকৃৎ	বি ২৯০	বীণাদণ্ড	বী ৩৩৩	বীরকুল	বীর্ ৩৩৩
বিস্মৃতি	বি ২৯০	বিহায়সা	বি ২৯০	বীজকোশ(ষ)	বি ২৯০	বীণাপাণি	পণ্ ২৯	বীরকেশরী	বীর্ ৩৩৩
বিস্মের	বি ২৯০	বিহায়স্তল	বি ২৯০	বীজকোশী	বি ২৯০	বীণাপাণি	বী ৩৩৫	বীরগতি	বীর্ ৩৩৫
বিস্র	বি ২৯০	বিহায়াঃ	বি ২৯০	বীজগণিত	বি ৩০৩	বীণাবাণী	বী ৩৩৩	বীরঘণ্টা	বীর্ ৩৩৩
বিস্রগন্ধী	বি ২৯০	বিহার	বি ২৯০	বীজগুপ্তি	বি ৩০৩	বীণাবাদ	বী ২৩৩	বীরচক্র	বীর্ ৩৩৩
বিস্রব	বি ২৯০	বিহারক্রীড়ামৃগ	বি ২৯০	বীজধান	বি ২৯০	বীণাবাদন	বী ৩৩৩	বীরচরিত	বীর্ ৩৩৩
বিস্রব্ধ	বি ২৯০	বিহারগৃহ	বি ২৯০	বীজধান্য	বি ২৯০	বীণাবাদ্য	বী ৩৩৩	বীরচূড়ামণি	বীর্ ৩৩৩
বিস্রম্ভ	বি ২৯০	বিহারদাসী	বি ২৯০	বীজন	বি ৩০৩	বীণাভেদ	বী ৩৩৩	বীরছাঁদ	বীর্ ৩৩৩
বিস্রম্ভী	বি ২৯০	বিহারদেশ	বি ২৯০	বীজিত	বি ৩০৩	বীণাহস্ত	বী ৩৩৩	বীরটুপি	বীর্ ৩৩৩
বিস্রসা	বি ২৯০	বিহারভূমি	বি ২৯০	বীজনির্ব্বপণ	বি ২৯০	বীণানুবন্ধ	বী ৩৩৩	বীরঢাক	বীর্ ৩৩৩
বিস্রস্ত	বি ২৯০	বিহারবন	বি ২৯০	বীজপূর	বি ২৯০	বীণী	বী ৩৩৩	বীরণ	বীর্ ৩৩৩
বিস্রাবণ	বি ২৯০	বিহারবারি	বি ২৯০	বীজপূরক	বি ২৯০	বীত	বি ৩০৪	বীরণমূল	বীর্ ৩৩৩
বিস্রুত	বি ২৯০	বিহারশয়ন	বি ২৯০	বীজপুরুষ	বি ২৯০	বীতংস	বি ২৯০	বীরদম্ফ	বীর্ ৩৩৩
বিস্রুতি	বি ২৯০	বিহারশৈল	বি ২৯০	বীজপূর্ণ	বি ২৯০	বীতকল্মষ	বি ২৯০	বীরদাপ	বীর্ ৩৩৩
বিস্বর	বি ২৯০	বিহারাজির	বি ২৯০	বীজপেশিকা	বি ২৯০	বীততৃষ্ণ	বি ২৯০	বীরধটি(টী)	বীর্ ৩৩৩
বিস্বাদ	বি ২৯০	বিহারী	বি ২৯০	বীজপ্রদ	বি ২৯০	বীতভয়	বি ২৯০	বীরধড়ী	বীর্ ৩৩৩
বিহগ	বি ৩০২	বিহি	বি ২৯০	বীজপ্ররোহী	বি ২৯০	বীতভী	বি ২৯০	বীরপঞ্চমীব্রত	বীর্ ৩৩৩
বিহগপতি	বি ২৯০	বিহিংসন	বি ২৯০	বীজবাপ	বি ৩০৩	বীতভীতি	বি ২৯০	বীরপট্ট	বীর্ ৩৩৩
বিহঙ্গ	বি ৩০২	বিহিংসা	বি ২৯০	বীজবোকা	বি ৩০৩	বীতমৎসর	বি ২৯০	বীরপণ	বীর্ ৩৩৩
বিহঙ্গম	বি ৩০২	বিহিংস্র	বি ২৯০	বীজমন্ত্র	বি ৩০৩	বীতমল	বি ২৯০	বীরপণা(না)	বীর্ ৩৩৩
বিহঙ্গমা	বি ৩০২	বিহিত	বি ২৯০	বীজমাতৃকা	বি ২৯০	বীতরাগ	বি ৩০৪	বীরপত্নী	বীর্ ৩৩৩
বিহঙ্গমিকা	বি ৩০২	বিহিতি	বি ২৯০	বীজমাত্র	বি ২৯০	বীতশঙ্ক	বি ২৯০	বীরপত্রা	বীর্ ৩৩৫
বিহঙ্গমী	বি ৩০২	বিহিদানা	বি ২৯০	বীজমালা	বি ২৯০	বীতশোক	বি ৩০৪	বীরপরিধান	বীর্ ৩৩৩
বিহঙ্গিকা	বি ৩০২	বিহীন	বি ২৯০	বীজরত্ন	বি ২৯০	বীতশোকাভয়	বি ২৯০	বীরপাটা	বীর্ ৩৩৩
বিহঙ্গিনী	বি ৩০২	বিহৃত	বি ২৯০	বীজরুহ	বি ২৯০	বীতসূত্র	বি ২৯০	বীরপাণ(ন)	বীর্ ৩৩৩
বিহড়া	বি ২৯০	বিহেঠক	বি ২৯০	বীজসঞ্চয়	বি ২৯০	বীতস্পৃহ	বি ৩০৪	বীরপুত্রধাত্রী	বীর্ ৩৩৩
বিহত	বি ২৯০	বিহ্ল	বি ২৯০	বীজসূ	বি ২৯০	বীতহোত্র	বি ২৯০	বীরপুরুষ	বীর্ ৩৩৩
বিহতি	বি ২৯০	বিহ্লোল	বি ২৯০	বীজসেক্তা	বি ২৯০	বীতি	বী ৩০৪	বীরপ্রজাবতী	বীর্ ৩৩৩
বিহনন	বি ২৯০	বিহ্ন	বি ২৯০	বীজাকৃত	বি ২৯০	বীতিহোত্র	বী ৩০৪	বীরপ্রজায়িনী	বীর্ ৩৩৩
বিহনি	বি ২৯০	বী	বী ৩৩৩	বীজাক্ষর	বি ৩০৩	বীথি	বি ২৯০	বীরপ্রসবা	বীর্ ৩৩৩
বিহনে	বি ২৯০	বীকাশ	বি ২৯০	বীজী	বি ২৯০	বীথিকা	বি ২৯০	বীরপ্রসবিনী	বীর্ ৩৩৩
বিহন্তা	বি ২৯০	বীক্ষণ	বি ৩০২	বীজোৎকৃষ্ট	বি ২৯০	বীথী	বি ২৯০	বীরপ্রসূ	বীর্ ৩৩৩
বিহর	বি ২৯০	বীক্ষণীয়	বি ২৯০	বীজোপ্তি	বি ২৯০	বীথ্যঙ্গ	বি ২৯০	বীরপ্রসূন	বীর্ ৩৩৩
বিহরণ	বি ২৯০	বীক্ষা	বি ২৯০	বীট	বি ২৯০	বীনাহ	বি ২৯০	বীরবৎসা	বীর্ ৩৩৩
বিহর্ষ	বি ২৯০	বীক্ষিত	বি ২৯০	বীটক	বি ২৯০	বীপ্সা	বি ২৯০	বীরবল	বীর্ ৩৩৩
বিহস	বি ২৯০	বীক্ষিতব্য	বি ২৯০	বীটা	বি ২৯০	বীভৎস	বধ্ ২৩৪	বীরবস্ত্র	বীর্ ৩৩৩
বিহসন	বি ২৯০	বীক্ষিতা	বি ২৯০	বীটি	বি ২৯০	বীর	বীর্ ৩৩৫	বীরবাণা(না)	বীর্ ৩৩৩
বিহস্ত	বি ২৯০	বীক্ষ্য	বি ২৯০	বীটিকা	বি ২৯০	বীরআনা	বীর্ ৩৩৩	বীরবাদ	বীর্ ৩৩৩
বিহা	বি ২৯০	বীচ	বি ২৯০	বীটী	বি ২৯০	বীরকাঁসী	বীর্ ৩৩৩	বীরবিদ্যা	বীর্ ৩৩৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বীরবিপ্লাবক	বীর্	৩৩৩	বীর্য্যসম্পন্ন	বীর্	৩৩৩	বুটী	বু	৩৩৬	বুদ্ধিশালী	বুধ্	৩৩৭	বুরুশ	বু	৩৩৬
বীরবৌলি(লী)	বীর্	৩৩৩	বীর্য্যহানি	বীর্	৩৩৩	বুড়	বু	৩৩৬	বুদ্ধিশুদ্ধি	বুধ্	৩৩৭	বুল	বু	৩৩৭
বীরব্রত	বীর্	৩৩৩	বীর্য্যহীন	বীর্	৩৩৩	বুড়বুড়ি	বু	৩৩৬	বুদ্ধিসখ	বুধ্	৩৩৭	বুলবাল	বু	৩৩৬
বীরভদ্র	বীর্	৩৩৬	বীর্য্যাতিশয়	বীর্	৩৩৩	বুড়া	বু	৩৩৬	বুদ্ধিসহায়	বুধ্	৩৩৭	বুলবুল	বু	৩৩৭
বীরভদ্র	—	৩৮৫	বীর্য্যাধান	বীর্	৩৩৩	বুড়াটিয়া	বু	৩৩৬	বুদ্ধিসম্পন্ন	বুধ্	৩৩৭	বুলবুলি	বু	৩৩৭
বীরভাগ	বীর্	৩৩৩	বীর্য্যাবদান	বীর্	৩৩৩	বুড়াটে	বু	৩৩৬	বুদ্ধিস্থ	বুধ্	৩৩৭	বুলা	বু	৩৩৭
বীরভূম	বীর্	৪২৫	বু	বচ্	২১৩	বুড়া-ভাম	বু	৪২১	বুদ্ধিহত	বুধ্	৩৩৭	বুলান	বু	৩৩৭
বীরভোগ্য(া)	বীর্	৩৩৩	বু	বু	৩৩৬	বুড়াম	বু	৩৩৬	বুদ্ধিহারা	বুধ্	৩৩৭	বুলি	বু	৩৩৭
বীরমদ	বীর্	৩৩৩	বুঁজ	বু	৩৩৬	বুড়ামি	বু	৩৩৬	বুদ্ধিহীন	বুধ্	৩৩৭	বুলু	বু	৩৩৬
বীরমর্দ্দল	বীর্	৩৩৩	বুঁজলা	বু	৩৩৬	বুড়াসুড়া	বু	৩৩৬	বুদ্ধীন্দ্রিয়	বুধ্	৩৩৭	বুলেট	বু	৩৩৬
বীরমাটি(টী)	বীর্	৩৩৫	বুঁজা	বু	৩৩৬	বুড়ি(ড়ী)	বু	৩৩৬	বুদ্ধ্	বুধ্	৩৩৯	বুষ	বু	৩৩৬
বীরমাদল	বীর্	৩৩৩	বুঁজান	বু	৩৩৬	বুড়ো	বু	৩৩৬	বুদ্বুদ	বুধ্	৩৩৭	বুস	বু	৩৩৬
বীরমুদ্রিকা	বীর্	৩৩৩	বুঁদ	বু	৩৩৬	বুড়োম	বু	৩৩৬	বুদ্বুদ	বু	৩৩৬	বুস্ত্	বু	৩৩৬
বীরযোনি	বীর্	৩৩৩	বুঁদেলা	বু	৩৩৬	বুড়োমি	বু	৩৩৬	বুধ	বুধ্	৩৪০	বুস্ত	বু	৩৩৬
বীররজঃ	বীর্	৩৩৩	বুক	বু	৩৩৬	বুড়োসুড়ো	বু	৩৩৬	বুধজন	বুধ্	৩৩৭	বুহিত	বু	৩৩৬
বীররস	বীর্	৩৩৩	বুক	বচ্	২১৩	বুড়োহাবড়া	বু	৩৩৬	বুধবার	বুধ্	৩৩৭	বুহিতাল	বু	৩৩৬
বীরলোক	বীর্	৩৩৫	বুকড়ি	বু	৩৩৬	বুঢ়	বু	৩৩৬	বুধবাসর	বুধ্	৩৩৭	বৃ	বংহ্	১৯২
বীরশয়	বীর্	৩৩৩	বুকনি	বু	৩৩৬	বুঢ়া	বু	৩৩৬	বুধরত্ন	বুধ্	৩৩৭	বৃ	বর্ণ্	২৪৯
বীরশয্যা	বীর্	৩৩৩	বুকনি	বচ্	২১৩	বুঢ়ী	বু	৩৩৬	বুধা	বুধ্	৩৩৭	বৃ	বৃক্	৩৪১
বীরশ্রেষ্ঠ	বীর্	৩৩৩	বুকবুক	বু	৩৩৬	বুদ্ধ	বুধ্	৩৩৮	বুধাষ্টমী	বুধ্	৩৩৭	বৃংহ্ (বৃংহি)	বংহ্	১৯৪
বীরসিংহ	বীর্	৩৩৩	বুকভাঙা	বু	৩৩৬	বুদ্ধকল্প	বুধ্	৩৩৭	বুধিত	বুধ্	৩৩৭	বৃংহণ	বংহ্	১৯৪
বীরসেন	বীর্	৩৩৩	বুকভাঙ্গা	বু	৩৩৬	বুদ্ধগয়া	বুধ্	৩৩৭	বুধি	বুধ্	৩৩৭	বৃংহিত	বংহ্	১৯৪
বীরস্থান	বীর্	৩৩৩	বুক্ক	বু	৩৩৬	বুদ্ধধর্ম্ম	বুধ্	৩৩৭	বুধ্ন	বন্ধ্	২৪৪	বৃক	বর্ণ্	২৪৯
বীরহা	বীর্	৩৩৩	বুক্কন	বু	৩৩৬	বুদ্ধবচন	বুধ্	৩৩৭	বুন	বে	৩৫৮	বৃক	বৃক্	৩৪১
বীরাঙ	বীর্	৩৩৩	বুক্কা	বু	৩৩৬	বুদ্ধি	বুধ্	৩৩৮	বুনন	বে	৩৫৮	বৃকভানু	বৃক্	৩৪১
বীরাঙ্গজ	বীর্	৩৩৩	বুক্কার	বু	৩৩৬	বুদ্ধিকৃত	বুধ্	৩৩৭	বুনা	বে	৩৫৮	বৃকী	বৃক্	৩৪১
বীরাঙ্গনা	বীর্	৩৩৬	বুচকি	বু	৩৩৬	বুদ্ধিগম্য	বুধ্	৩৩৭	বুনান	বে	৩৫৮	বৃকোদর	বৃক্	৩৪১
বীরাশংসন	বীর্	৩৩৩	বুজ	বু	৩৩৭	বুদ্ধিগ্রাহ্য	বুধ্	৩৩৭	বুনিয়াদ	বন্	২৩৬	বৃক্ক	বৃক্	৩৪১
বীরাসন	বীর্	৩৩৫	বুজগুড়ি	বু	৩৩৭	বুদ্ধিচ্ছায়া	বুধ্	৩৩৭	বুনিয়াদী	বন্	২৩৬	বৃক্কক	বৃক্	৩৪১
বীরুৎ(ধ্)	বীর্	৩৩৩	বুজরুক্	বু	৩৩৬	বুদ্ধিজীবী	বুধ্	৩৩৯	বুনো	বন্	২৩৬	বৃক্কা	বৃক্	৩৪১
বীরেন্দ্র	বীর্	৩৩৩	বুজরুকী	বু	৩৩৬	বুদ্ধিনাশ	বুধ্	৩৩৭	বুনোট	বে	৩৫৮	বৃক্থ	বৃক্	৩৪১
বীরেশ	বীর্	৩৩৩	বুজরুগ্	বু	৩৩৬	বুদ্ধিপূর্ব্বক	বুধ্	৩৩৯	বুভুক্ষা	ভু	৪০৬	বৃক্ণ	বৃক্	৩৪১
বীরেশ্বর	বীর্	৩৩৩	বুজরুগি(গী)	বু	৩৩৬	বুদ্ধিপূর্ব্বক	পৃ	৮৯	বুভুক্ষু	ভু	৪০৬	বৃক্ষ	বৃক্	৩৪২
বীর্য্য	বীর্	৩৩৩	বুজা	বু	৩৩৭	বুদ্ধিবন্ত	বুধ্	৩৩৭	বুভুৎসা	বুধ্	৩৩৭	বৃক্ষক	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যকর	বীর্	৩৩৩	বুজান	বু	৩৩৭	বুদ্ধিবিনাশ	বুধ্	৩৩৭	বুভুৎসিত	বুধ্	৩৩৭	বৃক্ষখণ্ড	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যকাম	বীর্	৩৩৩	বুজিয়ে-ফেলা	বু	৩৩৬	বুদ্ধিবিবর্দ্ধন	বুধ্	৩৩৭	বুভুৎসু	বুধ্	৩৩৭	বৃক্ষচ্ছায়	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যগুপ্ত	বীর্	৩৩৩	বুঝ	বু	৩৩৭	বুদ্ধিবিষয়	বুধ্	৩৩৭	বুভুবু	বুধ্	৩৩৭	বৃক্ষতক্ষক	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যপণ	বীর্	৩৩৩	বুঝন	বু	৩৩৭	বুদ্ধিভেদ	বুধ্	৩৩৭	বুমবুম	বে	৩৫৮	বৃক্ষদল	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যপ্রপাত	বীর্	৩৩৩	বুঝা	বু	৩৩৭	বুদ্ধিভ্রম	বুধ্	৩৩৭	বুম্বুকা	বী	৩৩৩	বৃক্ষদেবতা	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যবন্ত	বীর্	৩৩৩	বুঝান	বু	৩৩৭	বুদ্ধিমন্ত	বুধ্	৩৩৭	বুম্বুকি	বী	৩৩৩	বৃক্ষধূপ	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যবান	বীর্	৩৩৩	বুঝান্ত	বু	৩৩৭	বুদ্ধিমান	বুধ্	৩৩৮	বুর	বু	৩৩৬	বৃক্ষনাথ	বৃক্	৩৪২
বীর্য্যবৃদ্ধিকর	বীর্	৩৩৩	বুট	বু	৩৩৬	বুদ্ধিমোহ	বুধ্	৩৩৭	বুরা	বু	৩৩৬	বৃক্ষনির্য্যাস	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যমত্ত	বীর্	৩৩৩	বুটতোলা	বু	৩৩৬	বুদ্ধিযুক্ত	বুধ্	৩৩৭	বুরুজ	বু	৩৩৬	বৃক্ষপাল	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যশালী	বীর্	৩৩৩	বুটা	বু	৩৩৬	বুদ্ধিযোগ	বুধ্	৩৩৭	বুরুজা	বু	৩৩৬	বৃক্ষবাটিকা	বৃক্	৩৪১
বীর্য্যশুল্ক	বীর্	৩৩৩	বুটি	বু	৩৩৬	বুদ্ধিলাঘব	বুধ্	৩৩৭	বুরুল	বু	৩৩৬	বৃক্ষমূল	বৃক্	৩৪১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বৃক্ষরাজ	বৃক্ ৩৪২	বৃত্তি	বৃৎ ৩৪৯	বৃদ্ধক	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষকেতন	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহৎ	বর্ণ্ ২৪৯
বৃক্ষকুসুম	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিকর	বৃৎ ৩৪৯	বৃদ্ধকাল	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষকেতু	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহৎকথা	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষরুহা	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিকর্ষিত	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধকোশ	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষণ	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহৎকন্দ	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষসঙ্কট	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিকার	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধগঙ্গা	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষদংশক	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহৎকীর্ত্তি	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষসেচন	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিকৃৎ	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধদারক	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষধ্বজ	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহৎকুক্ষি	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষাদন	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিচক্র	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধনাভি	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষনাদী	বৃষ্ ৩৫৫	বহৎত্বক	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষাদনী	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিচ্ছেদ	বৃৎ ৩৪৯	বৃদ্ধ প্রপিতামহ(হী)	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষপতি	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহৎদেবতা	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষাম্ল	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিদান	বৃৎ ৩৪৯	বৃদ্ধ প্রমাতামহ(হী)	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষপর্ব্বা	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহৎসহায়	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিনিবন্ধন	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধভাব	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষপর্ব্বা	পৃ ১০০	বৃহতী	বংহ্ ১৯২
বৃক্ষারোপক	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিনিরোধ	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধশ্রবাঃ	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষবাহন	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহদারণ্যক	বংহ্ ১৯৫
বৃক্ষেশয়	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিভঙ্গ	বৃৎ ৩৪৯	বৃদ্ধসূত্রক	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভ	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহদ্রথ	বর্ণ্ ২৪৯
বৃখভানু	বৃক্ ৩৪১	বৃত্তিভাক্(জ্)	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধসেবী	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভকেতু	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহদ্বধ	বংহ্ ১৯২
বৃজ্	বৃজ্ ৩৪৪	বৃত্তিহন্তা	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধাঙ্গুলি	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভধ্বজ	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহদ্বাদী	বংহ্ ১৯২
বৃজন	বৃজ্ ৩৪৪	বৃত্তিহেতু	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভযান	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহদ্ভানু	বংহ্ ১৯২
বৃজিন	বৃজ্ ৩৪৪	বৃত্তোরু	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধাশ্রম	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভাক্ষ	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহদ্রথ	বংহ্ ১৯২
বৃজিনী	বৃজ্ ৩৪৪	বৃত্তৌজাঃ	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধি	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভাঙ্ক	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহন্দ	বংহ্ ১৯২
বৃটন	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্ত্যনুপ্রাস	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধিজীবক	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভানু	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহন্নল	বংহ্ ১৯২
বৃৎ	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্ত্যুপায়	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধিজীবন	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষভাসুর	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহন্নলা	বংহ্ ১৯৫
বৃত	বৃক্ ৩৪১	বৃত্র	বৃৎ ৩৫১	বৃদ্ধিজীবিকা	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষল	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহন্নাল	বংহ্ ১৯২
বৃতি	বৃক্ ৩৪১	বৃত্রদ্বিট্	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধিমান	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষলপতি	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহন্নালিক	বংহ্ ১৯২
বৃত্ত	বৃৎ ৩৪৯	বৃত্রনাশন	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষলরাজ	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহন্মাতা	বংহ্ ১৯২
বৃত্তক	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্রবিজয়ী	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধোক্ষ	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষলী	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহস্পতি	বংহ্ ১৯৬
বৃত্তকর্কটী	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্রশত্রু	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধ্যাজীব	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষলীপতি	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহস্পতি	বর্ণ্ ২৪৯
বৃত্তকায়	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্রহন্তা	বৃৎ ৩৪৫	বৃদ্ধ্যুপজীবী	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষলীফেনপীত	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহস্পতিবার	বংহ্ ১৯৬
বৃত্তখণ্ড	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্রারি	বৃৎ ৩৪৫	বৃধ্	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষলীসেবন	বৃষ্ ৩৫৫	বৃহস্পতিসংহিতা	বংহ্ ১৯৬
বৃত্তগন্ধ	বৃৎ ৩৪৫	বৃত্রাসুর	বৃৎ ৩৫১	বৃন্ত	বৃক্ ৩৪১	বৃষস্কন্ধ	বৃষ্ ৩৫৫	বে	বি ৩০৪
বৃত্তগন্ধি	বৃৎ ৩৪৫	বৃথা	বৃক্ ৩৪২	বৃন্ত	বর্ণ্ ২৪৯	বৃষস্যন্তী	বৃষ্ ৩৫৫	বে	বে ৩৫৮
বৃত্তচূড়	বৃৎ ৩৪৫	বৃথা	ব,ব ৩৬২	বৃন্তাক	বৃক্ ৩৪১	বৃষা	বৃষ্ ৩৫৫	বেআইন	বি ৩০৪
বৃত্তচূল	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাকথা	বৃক্ ৩৪১	বৃন্তাকী	বৃক্ ৩৪১	বৃষাকপায়ী	বৃষ্ ৩৫৫	বেআকার	বি ৩০৪
বৃত্ততণ্ডুল	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাকার	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দ	বৃক্ ৩৪৩	বৃষাকপি	বৃষ্ ৩৫৫	বেআকুব	বি ২৯০
বৃত্তপুষ্প	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাজন্ম	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দ	বর্ণ্ ২৪৯	বৃষাঙ্ক	বৃষ্ ৩৫৫	বেআকুল	বি ২৯০
বৃত্তফল	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাজাত	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দা	বৃক্ ৩৪৩	বৃষাচার	বৃষ্ ৩৫৫	বেআক্কেল	বি ২৯০
বৃত্তবন্ধ	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাট্যা	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দাবন	বৃক্ ৩৪৩	বৃষী	বৃষ্ ৩৫৫	বেআজ	বি ২৯০
বৃত্তবান	বৃৎ ৩৪৯	বৃথাদান	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দাবন	বর্ণ্ ২৪৯	বৃষোৎসর্গ	বৃষ্ ৩৫৫	বেআড়া	বি ৩০৪
বৃত্তভঙ্গ	বৃৎ ৩৪৯	বৃথাপক্ক	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দাবনচন্দ্র	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্ট	বৃষ্ ৩৫৮	বেআদব	বি ৩০৪
বৃত্তশস্ত্র	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাপলিত	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দাবনবিনোদিনী	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্টি	বৃষ্ ৩৫৮	বেআন্দাজ	বি ২৯০
বৃত্তশালী	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাপশুঘ্ন	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দাবনবিপিন	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্টিজীবন	বৃষ্ ৩৫৫	বেআপ	বি ২৯০
বৃত্তসম্পন্ন	বৃৎ ৩৪৯	বৃথাপাক	বৃক্ ৩৪২	বৃন্দাবনবিলাসিনী	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্টিপাত	বৃষ্ ৩৫৫	বেআবরু	বি ৩০৪
বৃত্তসাদী	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাবাদী	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দার	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্টিমান	বৃষ্ ৩৫৫	বেআরাম	বি ২৯০
বৃত্তস্থ	বৃৎ ৩৪৫	বৃথাবৃদ্ধ	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দারক	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্ণি	বৃষ্ ৩৫৫	বেআলি	বি ২৯০
বৃত্তহীন	বৃৎ ৩৪৫	বৃথামতি	বৃক্ ৩৪১	বৃন্দারণ্য	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্য	বৃষ্ ৩৫৫	বেআল্লিশ	বি ২৯০
বৃত্তা	বৃৎ ৩৪৫	বৃথামাংস	বৃক্ ৩৪২	বৃন্দারবৃন্দ	বৃক্ ৩৪১	বৃষ্যা	বৃষ্ ৩৫৫	বেই	বি ২৯০
বৃত্তানুপূর্ব্ব	বৃৎ ৩৪৫	বৃথামাংস	— ৫০৬	বৃশ্চিক	বৃক্ ৩৪৩	বৃসী	বৃষ্ ৩৫৫	বেইজ্জত	বি ৩০৪
বৃত্তানুবর্ত্তী	বৃৎ ৩৪৯	বৃথালিঙ্গী	বৃক্ ৩৪১	বৃশ্চিকালী	বৃক্ ৩৪৩	বৃহ	বংহ্ ১৯২	বেইমান	বি ৩০৪
বৃত্তান্ত	বৃৎ ৩৪৯	বৃদ্ধ	বৃধ্ ৩৫৩	বৃষ	বৃষ্ ৩৫৭	বৃহৎ	বংহ্ ১৯৪	বেইল	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বেউড়বাঁশ	বি	২৯০	বেগবাত	বজ্	২১৮	বেজন্মা	বি	৩০৪	বেণীমোক্ষ	বণ্	২৩০	বেতাল	বি	২৯০
বেউলা	বি	২৯০	বেগবান	বজ্	২১৮	বেজাতক	বি	৩০৪	বেণীসংহার	বণ্	২৩০	বেতি	বি	২৯০
বেউশ্যা	বি	২৯০	বেগবাহী	বজ্	২১৮	বেজায়	বি	৩০৪	বেণীস্নান	বণ্	২৩০	বেত্তা(ত্তৃ)	বিদ্	৩০৮
বেএক্তিয়ার	বি	৩০৪	বেগবৃষ্টি	বজ্	২১৮	বেজার	বি	৩০৪	বেণু	বণ্	২২৮	বেত্র	বী	৩৩৩
বেও	বি	২৯০	বেগম	বি	৩০৪	বেজি	বি	২৯০	বেণুক	বণ্	২৩০	বেত্রকবীর	বী	৩৩৩
বেওজর	বি	২৯০	বেগর	বি	২৯০	বেজিত	বজ্	২১৮	বেণুকার	বণ্	২৩০	বেত্রকার	বী	৩৩৩
বেওয়া	বি	২৯০	বেগার	বি	৩০৪	বেঝা	বি	২৯০	বেণুগুল্ম	বণ্	২৩০	বেত্রগ্রহণ	বী	৩৩৩
বেওয়ারিষ(স)	বি	২৯০	বেগারি(রী)	বি	৩০৪	বেটন	বট্	২২২	বেণুজ	বণ্	২৩০	বেত্রধর	বী	৩৩৩
বেওরা	বি	২৯০	বেগারী	বি	২৯০	বেটা	বট্	২২২	বেণুদল	বণ্	২৩০	বেত্রধারক	বী	৩৩৩
বেং	বি	২৯০	বেগরোধ	বজ্	২১৮	বেটি(টী)	বট্	২২২	বেণুবাদক	বণ্	২৩০	বেত্রপাণি	বী	৩৩৩
বেঁউ(ও)	বি	২৯০	বেগসম্পন্ন	বজ্	২১৮	বেটুয়া	বট্	২২২	বেণুবাদন	বণ্	২৩০	বেত্রবতী	বী	৩৩৩
বেঁউতিজাল	বি	২৯০	বেগসবী	বজ্	২১৮	বেটে	বট্	২২২	বেণুবাদ্য	বণ্	২৩০	বেত্রভৃৎ	বী	৩৩৩
বেঁক	বি	২৯০	বেগাবতরণ	বজ্	২১৮	বেটে	বণ্	২২৬	বেণুবীজ	বণ্	২৩০	বেত্রহস্ত	বী	৩৩৩
বেঁকা	বি	২৯০	বেগিত	বজ্	২১৮	বেটো	বট্	২২২	বেণুযব	বণ্	২৩০	বেত্রাসন	বী	৩৩৩
বেঁকী	বি	২৯০	বেগী	বজ্	২১৮	বেঠ	বট্	২২২	বেণুযষ্টি	বণ্	২৩০	বেথা	বি	২৯০
বেঁজি	বি	২৯০	বেগুন	বি	২৯০	বেঠিক	বি	৩০৪	বেণুশয্যা	বণ্	২৩০	বেথি	বি	২৯০
বেঁটে	বি	২৯০	বেগুনবাড়ি	বণ্	২২৬	বেড়(ঢ়)	বট্	২২২	বেণে	বণ্	২৩০	বেথুয়া	বি	২৯০
বেঁড়ে	বি	২৯০	বেগুনভাজা	ভৃশ্	৪৩৭	বেড়বাঁশ	বট্	২২২	বেণেবউ	বণ্	২৩০	বেদ	বিদ্	৩১৩
বেঁড়েলা	বি	২৯০	বেগুনী	বি	২৯০	বেড়-বান্ধা	বট্·	২২২	বেণেতি(তী)	বণ্	২৩০	বেদকণ্ঠ	বিদ্	৩১৪
বেকইর-গুয়া	বি	২৯০	বেগোছ	বি	৩০৪	বেড়ল	বট্	২২২	বেণেনী	বণ্	২৩০	বেদকর্ত্তা	বিদ্	৩১৪
বেকট	বি	২৯০	বেগ্র	বি	২৯০	বেড়া	বট্	২২২	বেণো	বণ্	২৩১	বেদখল	বি	৩০৪
বেকত	বি	২৯০	বেঙ	বি	৩০৫	বেড়া-আগুন	বট্	২২২	বেণ্যা	বণ্	২৩১	বেদগুহ্য	বিদ্	৩১৪
বেকতয়ে	বি	২৯০	বেঙতে	বি	২৯০	বেড়াকীল	বট্	২২২	বেণ্যানী	বণ্	২৩১	বেদচক্ষুঃ	বিদ্	৩০৮
বেকতি	বি	২৯০	বেঙনী	বি	২৯০	বেড়ান	বট্	২২২	বেণ্টুয়া	বট্	২২২	বেদজননী	বিদ্	৩১৫
বেকতে	বি	২৯০	বেঙাচি(ছি)	বি	২৯০	বেড়াপাক	বট্	২২২	বেত	বী	৩৩৩	বেদজ্ঞ	বিদ্	৩০৮
বেকয়েদ	বি	২৯০	বেঙাপিতল	বি	২৯০	বেড়ি(ড়ী)	বট্	২২২	বেতঅগ্র	বী	৩৩৩	বেদড়া	বি	৩০৪
বেকল	বি	৩০৪	বেঙ্কা	বি	২৯০	বেড়ুবাঁশ	বট্	২২২	বেতআগা	বী	৩৩৩	বেদতত্ত্বার্থ	বিদ্	৩০৮
বেকলা	বি	২৯০	বেঙ্গ	বি	২৯০	বেড়ে	বট্	২২২	বেতআছাড়	বী	৩৩৩	বেদদর্শী	বিদ্	৩০৮
বেকসুর	বি	৩০৪	বেঙ্গতড়কা	বি	২৯০	বেডৌল	বি	৩০৪	বেতস্থির	বি	৩০৪	বেদদৃষ্ট	বিদ্	৩০৮
বেকায়দা	বি	৩০৪	বেঙ্গমা	বি	৩০৫	বেঢঙ	বি	৩০৪	বেতন	বী	৩৩৫	বেদধারণ	বিদ্	৩০৮
বেকার	বি	৩০৪	বেঙ্গমী	বি	২৯০	বেঢপ(ব)	বি	৩০৪	বেতন	বৃৎ	৩৪৫	বেদধ্বনি	বিদ্	৩০৮
বেকুফ(ব)	বি	৩০৪	বেঙ্গী	বি	২৯০	বেঢ়ানৃত্য	বট্	২২২	বেতনার্থী	বৃৎ	৩৪৫	বেদন	বিদ্	৩১৪
বেকেজো	বি	৩০৪	বেচ	বিচ্	৩০৬	বেণ(ন্)	বণ্	২২৬	বেতনী	বী	৩৩৫	বেদনা	বিদ্	৩১৪
বেক্ত	বি	২৯০	বেচন	বিচ্	৩০৬	বেণ	বণ্	২২৮	বেতমিজ	বি	৩০৪	বেদনাদ	বিদ্	৩০৮
বেক্ষণ	বি	২৯০	বেচা	বিচ্	৩০৬	বেণব	বণ্	২২৬	বেতর	বি	২৯০	বেদনিধি	বিদ্	৩১৫
বেখরচা	বি	৩০৪	বেচাকেনা	বিচ্	৩০৬	বেণা(না)	বি	২৯০	বেতরিবৎ	বি	৩০৪	বেদনিন্দক	বিদ্	৩১৫
বেখ'প	বি	৩০৪	বেচান	বিচ্	৩০৬	বেণানী	বণ্	২২৬	বেতস	বে	৩৫৮	বেদনিষ্ঠ	বিদ্	৩০৮
বেগ	বজ্	২১৮	বেচারা	বি	৩০৪	বেণি	বণ্	২২৬	বেতসকুঞ্জ	বে	৩৫৮	বেদনী	বিদ্	৩০৮
বেগড়	বি	৩০৪	বেচারাম	বিচ্	৩০৬	বেণিয়া	বণ্	২২৬	বেতসগৃহ	বে	৩৫৮	বেদপতি	বিদ্	৩০৮
বেগতি	বি	৩০৪	বেচারি	বি	২৯০	বেণী	বণ্	২২৯	বেতসবৃত্তি	বে	৩৫৮	বেদপথ	বিদ্	৩০৮
বেগতিক	বি	৩০৪	বেচাল	বি	৩০৪	বেণী	বে	৩৫৮	বেতসাজা	বী	৩৩৩	বেদপাঠ	বিদ্	৩০৮
বেগত্ত্যা	বি	২৯০	বেচি	বিচ্	৩০৬	বেণীগারদ	বণ্	২২৬	বেতস্কির	বি	৩০৪	বেদপারগ	বিদ্	৩০৮
বেগনা	বি	৩০৪	বেচুনি	বিচ্	৩০৬	বেণীবন্ধ	বণ্	২২৬	বেতসী	বে	৩৫৮	বেদপুণ্য	বিদ্	৩০৮
বেগনী	বি	২৯০	বেছন্নর	বি	৩০৪	বেণীবোধিনী	বণ্	২৩০	বেতাগ	বি	৩০৪	বেদপ্লাবী	বিদ্	৩০৮
বেগবন্ত	বজ্	২১৮	বেজ	বি	২৯০	বেণীমাধব	বণ্	২৩০	বেতার	বি	৩০৪	বেদফল	বিদ্	৩০৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বেদবতী	বিদ্ ৩১৫	বেদিতব্য	বিদ্ ৩০৮	বেবহার	বি ২৯০	বেরেশা	বি ২৯০	বেশবধূ	বিশ্ ৩২১
বেদবন্ত	বিদ্ ৩০৮	বেদিয়া	বদ্ ২৩১	বেবাক	বি ৩০৪	বেল	বেল্ ৩৫৯	বেশবনিতা	বিশ্ ৩২১
বেদবাদ	বিদ্ ৩০৮	বেদিল	বিদ্ ৩০৮	বেবার	বি ২৯০	বেল	বিল্ ৩২১	বেশবান	বিশ্ ৩২১
বেদবাদী	বিদ্ ৩০৮	বেদী	বিদ্ ৩১৯	বেবুদ্ধিয়া	বি ২৯০	বেলক	বেল্ ৩৫৯	বেশ(স)বার	বিশ্ ৩২১
বেদবাহ্য	বিদ্ ২৮৫	বেদীন	বি ২৯০	বেভার	বি ২৯০	বেলকুল	বেল্ ৩৫৯	বেশ(স)র	বিশ্ ৩২১
বেদবাহ্য	— ৩১৫	বেদুয়া	বি ২৯০	বেভুল	বি ২৯০	বেলগ	বি ২৯০	বেশযুবতি	বিশ্ ৩২১
বেদবিক্রয়ী	বিদ্ ৩১৬	বেদুয়ি(য়ী)ন	বি ২৯০	বেম	বি ২৯০	বেলদার	বেল্ ৩৫৯	বেশযোধা	বিশ্ ৩২১
বেদবিৎ(দ্)	বিদ্ ৩০৮	বেদে	বদ্ ২৩১	বেমক্কা	বি ৩০৪	বেলন	বেল্ ৩৫৯	বেশযোষিৎ	বিশ্ ৩২১
বেদবিদাম্বর	বিদ্ ৩০৮	বেদে	বিদ্ ৩২০	বেমন	বি ২৯০	বেলফুল	বিল্ ৩২০	বেশস্ত্রী	বিশ্ ৩২১
বেদবিদ্যা	বিদ্ ৩০৮	বেদোক্ত	বিদ্ ৩০৮	বেমা	বি ২৯০	বেলবরণ	বিল্ ৩২১	বেশস্থা	বিশ্ ৩২১
বেদবিধান	বিদ্ ৩০৮	বেদোদয়	বিদ্ ৩০৮	বেমান	বি ২৯০	বেলবরণী	বিল্ ৩২০	বেশাত	বিশ্ ৩২১
বেদবৃত্ত	বিদ্ ৩০৮	বেদোদিত	বিদ্ ৩০৮	বেমানান	বি ৩০৪	বেলমোক্তা	বেল্ ৩৫৯	বেশা(সা)র	বিশ্ ৩২১
বেদব্যাস	বিদ্ ৩১৬	বেদোপবৃংহণ	বিদ্ ৩০৮	বেমারী	বি ২৯০	বেললণ্ঠন	বেল্ ৩৫৯	বেশী	বিশ্ ৩৩২
বেদম	বি ৩০৪	বেদ্য	বিদ্ ৩০৮	বেমালুম	বি ৩০৪	বেলা	বেল্ ৩৫৯	বেশী	ৰ,ব ৩৬২
বেদমাতা(তৃ)	বিদ্ ৩১৫	বেদ্যো	বিদ্ ৩০৮	বেয়াকুল	বি ২৯০	বেলাকুল	বেল্ ৩৫৯	বেশ্ম	বিশ্ ৩২১
বেদমার্গ	বিদ্ ৩০৮	বেদ্ধব্য	বি ২৯০	বেয়াক্কেল	বি ৩০৪	বেলাতট	বেল্ ৩৫৯	বেশ্মান্ত	বিশ্ ৩২১
বেদশাখা	বিদ্ ৩০৮	বেদ্ধা	বি ২৯০	বেয়াজ	বি ২৯০	বেলাতিক্রম	বেল্ ৩৫৯	বেশ্য	বিশ্ ৩৩২
বেদশাস্ত্র	বিদ্ ৩১৭	বেধ	বি ২৯০	বেয়াড়া	বি ৩০৪	বেলাতিগ	বেল্ ৩৫৯	বেশ্যা	বিশ্ ৩৩২
বেদশ্রুতি	বিদ্ ৩০৮	বেধক	বি ২৯০	বেয়াদপি(বি)	বি ৩০৪	বেলা-পড়া	বেল্ ৩৫৯	বেশ্যাগমন	বিশ্ ৩২১
বেদসংহিতা	বিদ্ ৩১৮	বেধন	বি ২৯০	বেয়াধি	বি ২৯০	বেলাবেলি	বেল্ ৩৫৯	বেশ্যাঘটক	বিশ্ ৩২১
বেদসন্ন্যাস	বিদ্ ৩১৮	বেধনিকা	বি ২৯০	বেয়াপ	বি ২৯০	বেলাবীচি	বেল্ ৩৫৯	বেশ্যাজন	বিশ্ ৩২১
বেদসম্মত	বিদ্ ৩০৮	বেধনী	বি ২৯০	বেয়ারা	বি ২৯০	বেলাবেলি	বেল্ ৩৫৯	বেশ্যাপতি	বিশ্ ৩২১
বেদাগম	বিদ্ ৩১৮	বেধ্য	বি ২৯০	বেয়ারাম	বি ২৯০	বেলাভূমি	বেল্ ৩৫৯	বেশ্যাপুত্র	বিশ্ ৩২১
বেদাঙ্গ	বিদ্ ৩১৮	বেধড়ক	বি ৩০৪	বেয়ালা	বি ২৯০	বেলাল	বিল্ ৩২০	বেশ্যাবাস	বিশ্ ৩২১
বেদাতি	বিদ্ ৩০৮	বেধাঃ	বি ২৯০	বের	বহ্ ২৭৮	বেলি	বিল্ ৩২০	বেষ	বিশ্ ৩২১
বেদাত্মা	বিদ্ ৩০৮	বেনটা	বন্ ২৩৬	বেরঙ	বি ৩০৪	বেলে	ৰল্ ২৬৩	বেষধর	বিশ্ ৩২১
বেদাদি	বিদ্ ৩০৮	বেনা	বীর্ ৩৩৫	বেরঙ্গ	বি ২৯০	বেলেমাছ	ৰল্ ২৬৩	বেষধারী	বিশ্ ৩২১
বেদাদিবীজ	বিদ্ ৩০৮	বেনাঝাড়	বীর্ ৩৩৫	বেরন	বহ্ ২৭৮	বেলেমাটি	ৰল্ ২৬৩	বেষ্ট্	বিশ্ ৩২১
বেদাধিগম	বিদ্ ৩০৮	বেনাম	বি ৩০৪	বেরসিক	বি ৩০৪	বেলেল্লা	বি ২৯০	বেষ্ট	বিশ্ ৩২১
বেদাধিদেব	বিদ্ ৩১৫	বেনামা	বি ৩০৪	বেরা	বহ্ ২৭৮	বেলেস্তারা	ৰ,ব ৩৬২	বেষ্টক	বিশ্ ৩২১
বেদাধিপ	বিদ্ ৩১৮	বেনামী	বি ৩০৪	বেরাদর	ৰ,ব ৩৬২	বেলোয়ার	ৰ,ব ৩৬২	বেষ্টন	বিশ্ ৩২১
বেদাধ্যাপন	বিদ্ ৩০৮	বেনামুল	বীর্ ৩৩৫	বেরাদারী	ৰ,ব ৩৬২	বেলোয়ারি	ৰ,ব ৩৬২	বেষ্টনক	বিশ্ ৩২১
বেদানধ্যয়ন	বিদ্ ৩০৮	বেনে	বন্ ২৩৬	বেরাপত্র	বি ২৯০	বেল্লন	বেল্ ৩৫৯	বেষ্টিত	বিশ্ ৩২১
বেদানন	বিদ্ ৩০৮	বেনো	বন্ ২৩৬	বেরাল	বিশ্ ৩২১	বেল্লি	বেল্ ৩৫৯	বেষ্টিতব্য	বিশ্ ৩২১
বেদানা	বি ৩০৪	বেপ্	বে ৩৫৮	বেরালব্রতী	বিশ্ ৩২১	বেল্লিক	বি ২৯০	বেস	বিশ্ ৩২১
বেদান্ত	বিদ্ ৩১৮	বেপথু	বে ৩৫৮	বেরি	বা ২৮৭	বেল্লিত	বেল্ ৩৫৯	বেস	ৰ,ব ৩৬২
বেদান্তকর্ত্তা	বিদ্ ৩০৮	বেপন	বে ৩৫৮	বেরিজ	ৰ,ব ৩৬২	বেল্লিক	বেল্ ৩৫৯	বেসাতি	বি ২৯০
বেদান্তকৃৎ	বিদ্ ৩০৮	বেপমান	বে ৩৫৮	বেরিবেরি	ৰ,ব ৩৬২	বেল্যা	বেল্ ৩৫৯	বেসুর	বি ৩০৪
বেদান্তজ্ঞ	বিদ্ ৩০৮	বেপরোয়া	বি ৩০৪	বেরিয়ে-যাওয়া	বহ্ ২৭৮	বেশ(স)	বিশ্ ৩৩১	বেসুরো	বি ৩০৪
বেদান্তবাগীশ	বিদ্ ৩০৮	বেপর্দ্দা	বি ৩০৪	বেরু	ৰ,ব ৩৬২	বেশআল	বিশ্ ৩২১	বেসো	বস্ ২৭০
বেদান্তবাদ	বিদ্ ৩০৮	বেপার	বি ২৯০	বেরুচ	ৰ,ব ৩৬২	বেশধর	বিশ্ ৩২১	বেহতর	বি ২৯০
বেদান্তী	বিদ্ ৩০৮	বেপারী	বি ২৯০	বেরুণ	বি ২৯০	বেশধারী	বিশ্ ৩৩১	বেহদ্দ	বি ৩০৪
বেদাভ্যাস	বিদ্ ৩০৮	বেপালট	বি ৩০৪	বেরুণিয়া	বি ২৯০	বেশন	বিশ্ ৩২১	বেহাই	বি ২৯০
বেদি	বিদ্ ৩১৯	বেফাঁশ	বি ৩০৪	বেরুণ্যা	বি ২৯০	বেশবস্ত	বিশ্ ৩২১	বেহাগ	বি ২৯০
বেদিকা	বিদ্ ৩১৯	বেবন্দোবস্ত	বি ৩০৪	বেরেওয়া	বি ২৯০	বেশনারী	বিশ্ ৩২১	বেহাত	বি ৩০৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বেহান	বি ২৯০	বৈজয়ন্তিক	বি ২৯০	বৈদ্যশাস্ত্র	বিদ্ ৩০৮	বৈমাত্রী	বি ২৯০	বৈশারদ	বি ২৯০
বেহানী	বি ২৯০	বৈজয়ন্তিকা	বি ২৯০	বৈদ্যসঙ্কট	বিদ্ ৩০৮	বৈমাত্রেয়	বি ২৯০	বৈশারদ্য	বি ২৯০
বেহায়া	বি ৩০৪	বৈজয়ন্তী	বি ২৯০	বৈদ্যা	বিদ্ ৩০৮	বৈমানিক	বি ২৯০	বৈশিক	বিশ্ ৩২১
বেহার	বি ২৯০	বৈজিক	বি ২৯০	বৈদ্যী	বিদ্ ৩০৮	বৈমুখ	বি ২৯০	বৈশিষ্ট	বি ২৯০
বেহারা	বি ২৯০	বৈজ্ঞানিক	বি ২৯০	বৈদেশ	বি ২৯০	বৈমুখী	বি ২৯০	বৈশিষ্ট্য	বি ২৯০
বেহাল	বি ৩০৪	বৈঠ	বিশ্ ৩২১	বৈদেশিক	বি ২৯০	বৈমুখ্য	বি ২৯০	বৈশেষিক	বি ২৯০
বেহালা	বি ২৯০	বৈঠক	বিশ্ ৩২১	বৈদেশী	বি ২৯০	বৈমূল্য	বি ২৯০	বৈশ্য	বিশ্ ৩৩২
বেহালাদার	বি ২৯০	বৈঠকী	বিশ্ ৩২১	বৈদেহ	বি ২৯৮	বৈয়গ্র্য	বি ২৯০	বৈশ্যকর্ম্ম	বিশ্ ৩২১
বেহিসাব	বি ৩০৪	বৈঠা	বিশ্ ৩২১	বৈদেহক	বি ২৯৮	বৈয়র্থ্য	বি ২৯০	বৈশ্যবৃত্তি	বিশ্ ৩২১
বেহিসাবী	বি ৩০৪	বৈঠান	বিশ্ ৩২১	বৈদেহিক	বি ২৯৮	বৈয়াকরণ	বি ২৯০	বৈশ্যভাব	বিশ্ ৩২১
বেহিসাবে	বি ২৯০	বৈড়ালব্রত	বিশ্ ৩২১	বৈদেহী	বি ২৯৮	বৈয়াঘ্র	বি ২৯০	বৈশ্যরায়	বিশ্ ৩২১
বেহুঁশ	বি ৩০৪	বৈড়ালব্রতিক	বিশ্ ৩২১	বৈদেহীনাথ	বি ২৯৮	বৈয়াঘ্রপদ্য	বি ২৯০	বৈশ্যা	বিশ্ ৩২১
বেহুদা	বি ৩০৪	বৈড়ালব্রতী	বিশ্ ৩২১	বৈদেহীহর	বি ২৯৮	বৈয়াঘ্র্য	বি ২৯০	বৈশ্যানী	বিশ্ ৩২১
বেহেড	বি ৩০৪	বৈণ	বণ্ ২৩১	বৈদ্যুত	বি ২৯০	বৈয়াত্য	বি ২৯০	বৈশ্রবণ	বি ২৯০
বৈ	ৰ,ব ৩৬২	বৈণব	বণ্ ২৩১	বৈদ্যুতিক	বি ২৯০	বৈয়াসকি	বি ২৯০	বৈশ্ব	বিশ্ ৩২১
বৈঁচি	ৰ,ব ৩৬২	বৈণবিক	বণ্ ২৩১	বৈদ্যুতাগ্নি	বি ২৯০	বৈয়াসিক	বি ২৯০	বৈশ্বদেব	বিশ্ ৩২১
বৈকঙ্কত	বি ২৯০	বৈণিক	বণ্ ২৩১	বৈদ্যোত্তর	বিদ্ ৩০৮	বৈর	বীর্ ৩৩৫	বৈশ্বা	বিশ্ ৩২১
বৈকণ্ঠ	বি ২৯০	বৈণবী	বণ্ ২৩১	বৈধ	বি ২৯০	বৈরঙ্গ	বহ্ ২৭৮	বৈশ্বানর	বিশ্ ৩২৭
বৈকর্ত্তন	বি ২৯৫	বৈণ্য(ন্য)	বণ্ ২৩১	বৈধব্য	বি ২৯০	বৈরতা	বীর্ ৩৩৫	বৈশ্বানরপথ	বিশ্ ৩২১
বৈকল্পিক	বি ২৯০	বৈতংসিক	বি ২৯০	বৈধর্ম্ম্য	বি ২৯০	বৈরস্য	বি ২৯০	বৈশ্বানরমিত্র	বিশ্ ৩২১
বৈকল্য	বি ২৯০	বৈতরণি(ণী)	বি ২৯৮	বৈধুর্য্য	বি ২৯০	বৈরাগ	বি ২৯০	বৈষম	বিশ্ ৩২১
বৈকারিক	বি ২৯৬	বৈতস	বী ৩৩৩	বৈধৃত	বি ২৯০	বৈরাগি	বি ২৯০	বৈষম্য	বিশ্ ৩২১
বৈকাল	বি ২৯৬	বৈতান	বি ২৯০	বৈধৃতি	বি ২৯০	বৈরাগিনী	বি ২৯০	বৈষয়িক	বিশ্ ৩২১
বৈকালিক	বি ২৯৬	বৈতানিক	বি ২৯০	বৈধেয়	বি ২৯০	বৈরাগী	বি ২৯০	বৈষ্টম	বিশ্ ৩২১
বৈকুণ্ঠ	বি ২৯৬	বৈতালিক	বি ২৯০	বৈনতেয়	বি ২৯০	বৈরাগ্য	বি ২৯০	বৈষ্ণব	বিশ্ ৩৩৩
বৈকুণ্ঠনাথ	বি ২৯৬	বৈতালী	বি ২৯০	বৈনয়িক	বি ২৯০	বৈরাজ	বি ২৯০	বৈষ্ণবী	বিশ্ ৩৩৩
বৈকুণ্ঠপুরী	বি ২৯৬	বৈতৃষ্ণ	বি ২৯০	বৈনস	বি ২৯০	বৈরাট	বি ২৯০	বৈসাদৃশ্য	বিশ্ ৩২১
বৈকুণ্ঠলোক	বি ২৯৬	বৈদগধ	বি ২৯০	বৈনায়ক	বি ২৯০	বৈরাটি	বি ২৯০	বৈসাম্য	বিশ্ ৩২১
বৈকুণ্ঠা	বি ২৯০	বৈদগধি	বি ২৯০	বৈপরীত্য	বি ২৯০	বৈরাত	বর্ণ্ ২৪৯	বৈসারিণ	বিশ্ ৩২১
বৈকৃত	বি ২৯০	বৈদগ্ধ	বি ২৯০	বৈপিত্র	বি ২৯০	বৈরাতি	বর্ণ্ ২৪৯	বৈস্বর্য্য	বিশ্ ৩২১
বৈকৃতিক	বি ২৯০	বৈদগ্ধী	বি ২৯০	বৈপুল্য	বি ২৯০	বৈরাতী	বর্ণ্ ২৪৯	বৈহায়স	বিশ্ ৩২১
বৈকৃত্য	বি ২৯০	বৈদগ্ধ্য	বি ২৯০	বৈফল্য	বি ২৯০	বৈরী	বীর্ ৩৩৫	বৈহারিক	বিশ্ ৩২১
বৈক্লব	বি ২৯০	বৈদর্ভ	বি ২৯০	বৈবক্ষিক	বি ২৯০	বৈরূপ্য	বি ২৯০	বৈহার্য্য	বিশ্ ৩২১
বৈক্লব্য	বি ২৯০	বৈদর্ভী	বি ২৯০	বৈবর্ণ্য	বি ২৯০	বৈরোচন	বি ২৯০	বৈহাসিক	বিশ্ ৩২১
বৈক্ষ	বচ্ ২১৩	বৈদল	বি ২৯০	বৈবশ্য	বি ২৯০	বৈরোচনি	বি ২৯০	বোঁচা	বিশ্ ৩২১
বৈখরী	বি ২৯০	বৈদান্তিক	বিদ্ ৩০৮	বৈবস্বত	বি ৩০১	বৈল	বিল্ ৩২০	বোঁচা	বঞ্চ ২২১
বৈখানস	বি ২৯০	বৈদিক	বিদ্ ৩০৮	বৈবস্বতী	বি ২৯০	বৈল্ব	বিল্ ৩২০	বোঁট	বৃক্ ৩৪১
বৈগুণ্য	বি ২৯০	বৈদূর্য্য	বি ২৯০	বৈবাহিক	বি ২৯০	বৈলক্ষণ্য	বি ২৯০	বোঁটা	বৃক্ ৩৪১
বৈচক্ষণ	বি ২৯০	বৈদুষ	বিদ্ ৩০৮	বৈবোধিক	বি ২৯০	বৈলক্ষ্য	বি ২৯০	বোঁদেলা	বু ৩৩৬
বৈচিত্ত	বি ২৯০	বৈদুষ্য	বিদ্ ৩০৮	বৈভব	বি ২৯০	বৈশ(স)	বিশ্ ৩২১	বোঁবোঁ	বু ৩৩৬
বৈচিত্র	বি ২৯০	বৈদ্য	বিদ্ ৩২০	বৈভব	ভূ ৪০৯	বৈশদ্য	বি ২৯০	বোকচা	বু ৩৩৬
বৈচিত্রবীর্য	বি ২৯০	বৈদ্যক	বিদ্ ৩০৮	বৈভবশালী	বি ২৯০	বৈশম্পায়ন	বি ২৯০	বোকড়া	বু ৩৩৬
বৈচিত্রী	বি ২৯০	বৈদ্যক্রিয়া	বিদ্ ৩০৮	বৈমনস্য	বি ২৯০	বৈশস	বি ২৯০	বোকস	বু ৩৩৬
বৈচিত্র্য	বি ২৯০	বৈদ্যনাথ	বিদ্ ৩০৮	বৈমল্য	বি ২৯০	বৈশাখ	বি ২৯০	বোকা	বু ৩৩৬
বৈজয়ন্ত	বি ২৯০	বৈদ্যরাজ	বিদ্ ৩০৮	বৈমাত্র	বি ২৯০	বৈশাখী	বি ২৯০	বোকামি	বু ৩৩৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
বোক্কা	বু ৩৩৬	বোধিবৃক্ষ	বুধ্ ৩৩৮	বৌয়ারী	বহ্ ২৭৮	ব্যতিব্যস্ত	বি ৩০৫	ব্যবকলন	বি ২৯০
বোগনো	বংহ্ ১৯২	বোধিসত্ত্ব	বুধ্ ৩৩৭	বৌয়ালা	বহ্ ২৭৮	ব্যতিরিক্ত	বি ২৯০	ব্যবচ্ছিন্ন	বি ২৯০
বোগলা	বা ২৮৭	বোধ্য	বুধ্ ৩৩৭	বৌল	বচ্ ২১৩	ব্যতিরেক	বি ২৯০	ব্যবচ্ছেদ	বি ২৯০
বোগাল	বু ৩৩৬	বোন	ভজ্ ৩৬৮	বৌলি	বচ্ ২১৩	ব্যতিরেকব্যাপ্তি	বি ২৯০	ব্যবচ্ছেদক	বি ২৯০
বোচকা	বু ৩৩৬	বোনাই	ভজ্ ৩৬৮	বৌষট্	বচ্ ২১৩	ব্যতিরেকমুখ	বি ২৯০	ব্যবধা	বি ২৯০
বোজা	বু ৩৩৬	বোনাইভাতারী	ভজ্ ৩৬৮	বৌহারা	বহ্ ২৭৮	ব্যতিলঙ্ঘী	বি ২৯০	ব্যবধান	বি ২৯০
বোজান	বু ৩৩৬	বোনাজ	বন্ ২৩৬	বৌহারি(রী)	বহ্ ২৭৮	ব্যতিষক্ত	বি ২৯০	ব্যবধায়ক	বি ২৯০
বোঝন	বু ৩৩৬	বোবা	বু ৩৩৬	ব্যংসক	বি ২৯০	ব্যতিষঙ্গ	বি ২৯০	ব্যবধি	বি ২৯০
বোঝা	বু ৩৩৬	বোম	ৰ,ব ৩৬২	ব্যংসন	বি ২৯০	ব্যতি(তী)হার	বি ২৯০	ব্যবসা	বি ২৯০
বোঝান	বু ৩৩৬	বোম	বে ৩৫৮	ব্যংসয়িতব্য	বি ২৯০	ব্যতিহাস	বি ২৯০	ব্যবসায়	বি ২৯০
বোঝাপড়া	বু ৩৩৬	বোমা	বে ৩৫৮	ব্যংসিত	বি ২৯০	ব্যতীত	বি ২৯০	ব্যবসায়ী	বি ২৯০
বোঝাই	বু ৩৩৬	বোমা	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্ত	বি ৩০৪	ব্যতীপাত	বি ২৯০	ব্যবসিত	বি ২৯০
বোট	ৰ,ব ৩৬২	বোম্বাচাক	বে ৩৫৮	ব্যক্তগণিত	বি ২৯০	ব্যতীহার	বি ২৯০	ব্যবসিতি	বি ২৯০
বোটকা	বু ৩৩৬	বোম্বেটে	বে ৩৫৮	ব্যক্তদৃষ্টার্থ	বি ২৯০	ব্যত্যয়	বি ২৯০	ব্যবস্থা	বি ২৯০
বোটকেরা	বু ৩৩৬	বোম্বেটে	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্তবাক	বি ২৯০	ব্যত্যস্ত	বি ২৯০	ব্যবস্থান	বি ২৯০
বোড্	ৰ,ব ৩৬২	বোয়াল	বু ৩৩৬	ব্যক্তবিক্রম	বি ২৯০	ব্যত্যাস	বি ২৯০	ব্যবস্থাপক	বি ২৯০
বোড়লা	বু ৩৩৬	বোয়ালি	বু ৩৩৬	ব্যক্তরাশি	বি ২৯০	ব্যথ	ব্যথ্ ৩৬০	ব্যবস্থাপনীয়	বি ২৯০
বোড়া	বু ৩৩৬	বোয়েন	বহ্ ২৭৮	ব্যক্তরূপ	বি ২৯০	ব্যথক	ব্যথ্ ৩৫৯	ব্যবস্থাপিত	বি ২৯০
বোড্র	বু ৩৩৬	বোর	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্তলবণ	বি ২৯০	ব্যথন	ব্যথ্ ৩৫৯	ব্যবস্থিত	বি ২৯০
বোড্রী	বু ৩৩৬	বোরব	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্তি	বি ৩০৪	ব্যথা	ব্যথ্ ৩৬০	ব্যবস্থিতি	বি ২৯০
বোঢ়ব্য	বহ্ ২৭৮	বোরা	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্তিগত	বি ২৯০	ব্যথিত	ব্যথ্ ৩৬০	ব্যবহর্ত্তব্য	বি ২৯০
বোঢ়া	বহ্ ২৭৮	বোরো	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্তিমালিকানা	বি ৫১৬	ব্যথী	ব্যথ্ ৩৬০	ব্যবহার	বি ২৯০
বোতল	বৃৎ ৩৪৫	বোর্খা	ৰ,ব ৩৬২	ব্যক্তীকৃত	বি ২৯০	ব্যধ্	ব্যধ্ ৩৬০	ব্যবহারক	বি ২৯০
বোতল	ৰ,ব ৩৬২	বোল	বচ্ ২১৩	ব্যক্তীভূত	বি ২৯০	ব্যধ	ব্যধ্ ৩৬০	ব্যবহারজ্ঞ	বি ২৯০
বোতাম	ৰ,ব ৩৬২	বোলচাল	বচ্ ২১৩	ব্যগ্র	বি ৩০৪	ব্যধক	ব্যধ্ ৩৬০	ব্যবহারতন্ত্র	বি ২৯০
বোদ	বু ৩৩৬	বোলতা	বচ্ ২১৩	ব্যগ্রতা	বি ৩০৪	ব্যধন	ব্যধ্ ৩৬০	ব্যবহারদর্শন	বি ২৯০
বোদা	বু ৩৩৬	বোলবোলাও	বচ্ ২১৩	ব্যঙ্কুশ	বি ২৯০	ব্যধ্য	ব্যধ্ ৩৬০	ব্যবহারদ্রষ্টা	বি ২৯০
বোদাল	বু ৩৩৬	বোলমাটী	বচ্ ২১৩	ব্যঙ্গ	বি ৩০৫	ব্যধিকরণ	ব্যধ্ ৩৬০	ব্যবহারপদ	বি ২৯০
বোদালি	বু ৩৩৬	বোলা	বচ্ ২১৩	ব্যঙ্গার	বি ২৯০	ব্যধ্ব	বি ২৯০	ব্যবহারপাদ	বি ২৯০
বোদ্ধব্য	বুধ্ ৩৩৭	বোলান	বচ্ ২১৩	ব্যঙ্গিতা	বি ২৯০	ব্যন্তর	বি ২৯০	ব্যবহারপ্রাপ্ত	বি ২৯০
বোদ্ধা	বুধ্ ৩৩৭	বোলাবুলি	বচ্ ২১৩	ব্যঙ্গী	বি ২৯০	ব্যপগত	বি ২৯০	ব্যবহারবাণী	বি ২৯০
বোধ	বুধ্ ৩৪১	বোলবোলি	বচ্ ২১৩	ব্যঙ্গ্য	বি ৩০৫	ব্যপগম	বি ২৯০	ব্যবহারবিৎ	বি ২৯০
বোধক	বুধ্ ৩৩৭	বোলি(লী)	বচ্ ২১৩	ব্যজন	বি ২৯০	ব্যপদিষ্ট	বি ২৯০	ব্যবহারবিধি	বি ২৯০
বোধকর	বুধ্ ৩৩৭	বোসজা	বস্ ২৭০	ব্যজনী	বি ২৯০	ব্যপদেশ	বি ২৯০	ব্যবহারবেত্তা	বি ২৯০
বোধগম্য	বুধ্ ৩৪১	বোস্তা	ৰ,ব ৩৬২	ব্যজনীচামর	বি ২৯০	ব্যপয়ান	বি ২৯০	ব্যবহারমণ্ডপ	বি ২৯০
বোধন	বুধ্ ৩৪১	বোহারি	বহ্ ২৭৮	ব্যঞ্জ	বি ২৯০	ব্যপরোপণ	বি ২৯০	ব্যবহারমার্গ	বি ২৯০
বোধনী	বুধ্ ৩৪১	বোহিনী	বহ্ ২৭৮	ব্যঞ্জক	বি ২৯০	ব্যপাকৃতি	বি ২৯০	ব্যবহাররস	বি ২৯০
বোধনীয়	বুধ্ ৩৪১	বৌ	বহ্ ২৮০	ব্যঞ্জন	বি ২৯০	ব্যপায়	বি ২৯০	ব্যবহারশাস্ত্র	বি ২৯০
বোধপূর্ব্ব	বুধ্ ৩৩৭	বৌঅন্ত	বহ্ ২৭৮	ব্যঞ্জনা	বি ২৯০	ব্যপাশ্রয়	বি ২৯০	ব্যবহারস্থান	বি ২৯০
বোধয়িতা	বুধ্ ৩৩৭	বৌআড়া	বহ্ ২৭৮	ব্যতিকর	বি ২৯০	ব্যপেক্ষ	বি ২৯০	ব্যবহারাজীব	বি ২৯০
বোধশোধ	বুধ্ ৩৩৭	বৌও	বহ্ ২৭৮	ব্যতিকরিত	বি ২৯০	ব্যপেক্ষক	বি ২৯০	ব্যবহারাজীবী	বি ২৯০
বোধি	বুধ্ ৩৩৮	বৌকাঁটকী	বহ্ ২৭৮	ব্যতিকীর্ণ	বি ২৯০	ব্যপেক্ষা	বি ২৯০	ব্যবহারাযোগ্য	বি ২৯০
বোধিত	বুধ্ ৩৩৭	বৌগিরি	বহ্ ২৭৮	ব্যতিক্রমণ	বি ২৯০	ব্যপেত	বি ২৯০	ব্যবহারার্থী	বি ২৯০
বোধিতরু	বুধ্ ৩৩৭	বৌঠাকরুণ	বহ্ ২৭৮	ব্যতিক্রান্ত	বি ২৯০	ব্যপোঢ়	বি ২৯০	ব্যবহারাসন	বি ২৯০
বোধিদ্রুম	বুধ্ ৩৩৭	বৌদ্ধ	বুধ্ ৩৩৮	ব্যতিপাত	বি ২৯০	ব্যপোহ	বি ২৯০	ব্যবহারিক	বি ২৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ব্যবহারী	বি ২৯০	ব্যাকুলি	বি ২৯০	ব্যাধিকর	বি ২৯০	ব্যামহ	বি ২৯০	ব্যুৎক্রম	বি ২৯০
ব্যবহিত	বি ২৯০	ব্যাকুলিত	বি ২৯০	ব্যাধিঘ্ন	বি ২৯০	ব্যামিশ্র	বি ২৯০	ব্যুত্থান	বি ২৯০
ব্যবহৃত	বি ২৯০	ব্যাকোশ(ষ)	বি ২৯০	ব্যাধিত	বি ২৯০	ব্যামো	বি ২৯০	ব্যুৎপত্তি	বি ২৯০
ব্যবহৃতি	বি ২৯০	ব্যাক্রোশ	বি ২৯০	ব্যাধিনিগ্রহ	বি ২৯০	ব্যামোহ	বি ২৯০	ব্যুৎপত্তি	পদ্ ৩৮
ব্যবায়	বি ২৯০	ব্যাক্ষেপ	বি ২৯০	ব্যাধিনী	বি ২৯০	ব্যায়	বি ২৯০	ব্যুৎপন্ন	বি ২৯০
ব্যবায়ী	বি ২৯০	ব্যাখা	বি ২৯০	ব্যাধিবহুল	বি ২৯০	ব্যায়ত	বি ২৯০	ব্যুৎপাদক	বি ২৯০
ব্যবেত	বি ২৯০	ব্যাখ্যাত	বি ২৯০	ব্যাধূত	বি ২৯০	ব্যায়রাম	বি ২৯০	ব্যুৎপাদন	বি ২৯০
ব্য(ব্যা)ভার	বি ২৯০	ব্যাখ্যাতা	বি ২৯০	ব্যান	বি ২৯০	ব্যায়রাম-শ্যায়রাম	বি ২৯০	ব্যুদস্ত	বি ২৯০
ব্যভিচার	বি ২৯০	ব্যাখাত্রী	বি ২৯০	ব্যান্নন	বি ২৯০	ব্যায়াম	বি ২৯০	ব্যুদাস	বি ২৯০
ব্যভ্র	বি ২৯০	ব্যাখ্যান	বি ২৯০	ব্যাপ	বি ২৯০	ব্যায়ামী	বি ২৯০	ব্যুপবীত	বি ২৯০
ব্যয়	বি ২৯০	ব্যাখ্যানা	বি ২৯০	ব্যাপক	বি ২৯০	ব্যাল	বি ২৯০	ব্যুপরত	বি ২৯০
ব্যয়কর	বি ২৯০	ব্যাখ্যেয়	বি ২৯০	ব্যাপৎ(দ্)	বি ২৯০	ব্যালক	বি ২৯০	ব্যুপরম	বি ২৯০
ব্যয়কুণ্ঠ	বি ২৯০	ব্যাগ	ৰ,ব ৩৬২	ব্যাপন	বি ২৯০	ব্যালগ	বি ২৯০	ব্যুপ্ত	বি ২৯০
ব্যয়পর	বি ২৯০	ব্যাঘট্টন	বি ২৯০	ব্যাপন্ন	বি ২৯০	ব্যালগ্রাহ	বি ২৯০	ব্যুষিত	বি ২৯০
ব্যয়ব্যসন	বি ২৯০	ব্যাঘাত	বি ২৯০	ব্যাপহ	বি ২৯০	ব্যালগ্রাহী	বি ২৯০	ব্যুষিতাশ্ব	বি ২৯০
ব্যয়ভূষণ	বি ২৯০	ব্যাঘাতক	বি ২৯০	ব্যাপাদ	বি ২৯০	ব্যালমৃগ	বি ২৯০	ব্যুষ্ট	বি ২৯০
ব্যয়শীল	বি ২৯০	ব্যাঘ্রনখ	বি ২৯০	ব্যাপাদন	বি ২৯০	ব্যালম্ব	বি ২৯০	ব্যুষ্টি	বি ২৯০
ব্যয়শুদ্ধি	বি ২৯০	ব্যাঘ্রকৃত্তি	বি ২৯০	ব্যাপাদনীয়	বি ২৯০	ব্যালরূপ	বি ২৯০	ব্যুঢ়	বি ২৯০
ব্যর্থ	বি ২৯০	ব্যাঘ্রশ্বা	বি ২৯০	ব্যাপাদয়িতব্য	বি ২৯০	ব্যালাঙ্গনা	বি ২৯০	ব্যুত	বি ২৯০
ব্যর্থক	বি ২৯০	ব্যাঘ্রী	বি ২৯০	ব্যাপার	বি ২৯০	ব্যালোল	বি ২৯০	ব্যুতি	বি ২৯০
ব্যলীক	বি ২৯০	ব্যাঙ	বি ২৯০	ব্যাপার	পৃ ১২৩	ব্যাস	বি ২৯০	ব্যূহ	বি ২৯০
ব্যশ্ব	বি ২৯০	ব্যাঙাচি	বি ২৯০	ব্যাপারণ	বি ২৯০	ব্যাসকাশী	বি ২৯০	ব্যূহভঙ্গ	বি ২৯০
ব্যষ্টি	বি ২৯০	ব্যাঙ্গ	বি ৩০৫	ব্যাপারিত	বি ২৯০	ব্যাসবারাণসী	বি ২৯০	ব্যূহভেদ	বি ২৯০
ব্যস	বস্ ২৭০	ব্যাঙ্গমা	বি ৩০৫	ব্যাপারী	বি ১২৩	ব্যাসকূট	বি ২৯০	ব্যূহভেদ	ভিদ্ ৩৯৮
ব্যস	বি ২৯০	ব্যাঙ্গমি(মী)	বি ৩০৫	ব্যাপিকা	বি ২৯০	ব্যাসক্ত	বি ২৯০	ব্যো	বে ৩৫৮
ব্যসন	বি ২৯০	ব্যাজ	বি ২৯০	ব্যাপিত	বি ২৯০	ব্যাসঙ্গ	বি ২৯০	ব্যোম	বে ৩৫৮
ব্যসনী	বি ২৯০	ব্যাজতপোধন	বি ২৯০	ব্যাপী	বি ২৯০	ব্যাসদেব	বি ২৯০	ব্যোমকেশ	বে ৩৫৮
ব্যসনোদয়	বি ২৯০	ব্যাজনিন্দা	বি ২৯০	ব্যাপৃত	বি ১২৩	ব্যাসপূজন	বি ২৯০	ব্যোমকেশী	বে ৩৫৮
ব্যসু	বি ২৯০	ব্যাজপূর্ব্ব	বি ২৯০	ব্যাপৃত	পৃ ১০০	ব্যাসসমাস	বি ২৯০	ব্যোমগ	বে ৩৫৮
ব্যস্ত	বি ৩০৫	ব্যাজব্যবহার	বি ২৯০	ব্যাপৃতি	বি ২৯০	ব্যাসস্	বি ২৯০	ব্যোমগঙ্গা	বে ৩৫৮
ব্যস্তকেশ	বি ২৯০	ব্যাজসুপ্ত	বি ২৯০	ব্যাপ্ত	বি ২৯০	ব্যাসসূত্র	বি ২৯০	ব্যোমগুণ	বে ৩৫৮
ব্যস্তক্ষৌর	বি ২৯০	ব্যাজস্তুতি	বি ২৯০	ব্যাপ্তি	বি ২৯০	ব্যাসস্মৃতি	বি ২৯০	ব্যোমচর	বে ৩৫৮
ব্যস্তন্যাস	বি ২৯০	ব্যাজার	বি ২৯০	ব্যাপ্য	বি ২৯০	ব্যাসাসন	বি ২৯০	ব্যোমচারী	বে ৩৫৮
ব্যস্তপদ	বি ২৯০	ব্যাজে	বি ২৯০	ব্যাবর্ত্ত	বি ২৯০	ব্যাসিদ্ধ	বি ২৯০	ব্যোমদেব	বে ৩৫৮
ব্যস্তবাগীশ	বি ২৯০	ব্যাজোক্তি	বি ২৯০	ব্যাবর্ত্ত	বৃৎ ৩৪৫	ব্যাসেধ	বি ২৯০	ব্যোমপথ	বে ৩৫৮
ব্যস্তবৃত্তি	বি ২৯০	ব্যাট	ৰ,ব ৩৬২	ব্যাবর্ত্তক	বি ২৯০	ব্যাহত	বি ২৯০	ব্যোমপাদ	বে ৩৫৮
ব্যস্তসমস্ত	বি ৩০৫	ব্যাটন	ৰ,ব ৩৬২	ব্যাবর্ত্তন	বি ২৯০	ব্যাহতত্ব	বি ২৯০	ব্যোমযান	বে ৩৫৮
ব্যস্তানুপাত	বি ৩০৫	ব্যাটা	বট্ ২২২	ব্যাবর্ত্তনা	বি ২৯০	ব্যাহতার্থতা	বি ২৯০	ব্যোমসরিৎ	বে ৩৫৮
ব্যাই	বি ২৯০	ব্যাড়	বি ২৯০	ব্যাবহারিক	বি ২৯০	ব্যাহরণ	বি ২৯০	ব্রংহণ	বংহ্ ১৯২
ব্যাং	বি ২৯০	ব্যাত্ত	বি ২৯০	ব্যাবৃত্ত	বি ২৯০	ব্যাহার	বি ২৯০	ব্রক্ষ	বৃক্ ৩৪১
ব্যাকরণ	বি ৩০৬	ব্যাত্যুক্ষী	বি ২৯০	ব্যাবৃত্তি	বি ২৯০	ব্যাহৃত	বি ২৯০	ব্রজ	ব্রজ্ ৩৬০
ব্যাকলা	বি ২৯০	ব্যাদান	বি ২৯০	ব্যাভার	বি ২৯০	ব্যাহৃতি	বি ২৯০	ব্রজকিশোর	ব্রজ্ ৩৬০
ব্যাকার	বি ২৯০	ব্যাদেশ	বি ২৯০	ব্যাভারবেণে	বি ২৯০	ব্যুচ্ছিন্ন	বি ২৯০	ব্রজধাম	ব্রজ্ ৩৬০
ব্যাকীর্ণ	বি ২৯০	ব্যাধ	বি ২৯০	ব্যাম	বি ২৯০	ব্যুত	বি ২৯০	ব্রজন	ব্রজ্ ৩৬০
ব্যাকুল	বি ২৯০	ব্যাধি	বি ২৯০	ব্যামন	বি ২৯০	ব্যুতি	বি ২৯০	ব্রজনাথ	ব্রজ্ ৩৬০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ব্রজবধূ	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রতী	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মতি	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবিদ্যা	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মসাবর্ণি	বংহ্ ১৯২
ব্রজবনিতা	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রতী	বর্ণ্ ২৬১	ব্রহ্মতীর্থ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবিন্দু	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মসূত্র	বংহ্ ১৯২
ব্রজবসতি	বস্ ২৭০	ব্রধ্ন	বন্ধ্ ২৪৪	ব্রহ্মতেজঃ	বংহ্ ২০২	ব্রহ্মবিহার	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মস্তেয়	বংহ্ ১৯২
ব্রজবুলি	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রশ্চ্	বৃক্ ৩৪১	ব্রহ্মত্র	বংহ্ ২০২	ব্রহ্মবীজ	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মস্ব	বংহ্ ১৯২
ব্রজভাব	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রশ্চন	বৃক্ ৩৪১	ব্রহ্মত্ব	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবেদ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মহত্যা	বংহ্ ২০০
ব্রজভাষা	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্)	বংহ্ ১৯৭	ব্রহ্মত্বর	বংহ্ ২০২	ব্রহ্মবেদী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মহবিঃ	বংহ্ ১৯২
ব্রজমণ্ডল	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মঅসুর	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মদণ্ড	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মহা	বংহ্ ২০০
ব্রজমোহন	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মঋষি	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদত্ত	বংহ্ ২০৩	ব্রহ্মবৃত্তি	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মহিংসক	বংহ্ ২০০
ব্রজরাজ	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মকন্যকা	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদত্তি	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মবৃত্তি	বৃৎ ৩৪৫	ব্রহ্মা	বংহ্ ২০৫
ব্রজলীলা	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মকরোটি	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মদাতা	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মব্রত	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাক্ষর	বংহ্ ১৯২
ব্রজসুন্দরী	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মকর্ম্ম	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মদান	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মভাব	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাঙ্গভূ	বংহ্ ১৯২
ব্রজাঙ্গনা	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মকাণ্ড	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মদায়	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মভুবন	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাচুলি	বংহ্ ১৯২
ব্রজেন্দ্র	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মকুণ্ড	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদায়াদ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মভূত	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাঞ্জলী	বংহ্ ১৯২
ব্রজেশ্বর	ব্রজ্ ৩৬০	ব্রহ্মকোশ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদারু	বংহ্ ২০৩	ব্রহ্মভূয়	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাণী	বংহ্ ১৯২
ব্রজ্যা	ব্রজ্ ৩৬২	ব্রহ্মগীতা	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদিন	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মমণ্ডল	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাণ্ড	বংহ্ ২০৬
ব্রণ্	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মগোল	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদুয়ার	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মমন্ত্র	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর	বংহ্ ১৯২
ব্রণ	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মগৌরব	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদৈত্য	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মমন্যু	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মাদ্য	বংহ্ ১৯২
ব্রণধূপন	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মগ্রন্থি	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মদ্বার	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মময়	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মাধিগম	বংহ্ ১৯২
ব্রণপট্ট	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মঘাতক	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মদ্বিট্	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মময়ী	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মানন্দ	বংহ্ ২০৭
ব্রণবিরোপণ	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মঘাতী	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মধর্ম্ম	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মমুহূর্ত্ত	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাবর্ত্ত	বংহ্ ২০৭
ব্রণশোধন	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মঘোষ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মন	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মমীমাংসা	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাভ্যাস	বংহ্ ১৯২
ব্রণসংরোহণ	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মঘ্ন	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মনির্ব্বাণ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মযজ্ঞ	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মারণ্য	বংহ্ ১৯২
ব্রণহৃৎ	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মঘ্নী	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মনিষ্ঠ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মযষ্টি	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মারম্ভ	বংহ্ ১৯২
ব্রণিত	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মচক্র	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মনীর	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মযাগ	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মার্পণ	বংহ্ ১৯২
ব্রণী	ব্,ব ৩৬২	ব্রহ্মচর্য্য	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মপদ	বংহ্ ২০৩	ব্রহ্মযুগ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাসন	বংহ্ ১৯২
ব্রত	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মচর্য্যা	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মপারায়ণ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মযোগ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মাস্ত্র	বংহ্ ১৯২
ব্রত	বর্ণ্ ২৬১	ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মপাশ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মযোনি	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মিষ্ঠ	বংহ্ ১৯২
ব্রতচর্য্যা	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মচারী	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মপিশাচ	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মযোনী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মিষ্ঠা	বংহ্ ১৯২
ব্রততি(তী)	বৃ ২৬১	ব্রহ্মচারিণী	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মপুত্র	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মরক্ষঃ	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মী	বংহ্ ১৯২
ব্রততী	বর্ণ্ ২৪৯	ব্রহ্মজনু	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মপুত্রী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মরন্ধ্র	বংহ্ ২০৫	ব্রহ্মোত্তর	বংহ্ ২০২
ব্রততিথি	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মজন্ম	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মপুর	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মরাক্ষস	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মোদ্য	বংহ্ ১৯২
ব্রতদাস	বৃ ২৬১	ব্রহ্মজাল	বংহ্ ১৯৯	ব্রহ্মপুরাণ	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মরাত্র	বংহ্ ১৯২	ব্রাত	বৃক্ ২৬১
ব্রতদাসী	বৃ ২৬১	ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মপুরী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মরাত্রি	বংহ্ ১৯২	ব্রাতীন	বৃক্ ২৬১
ব্রতধারণ	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মজীবী	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মপ্রলয়	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মরেখা	বংহ্ ১৯২	ব্রাত্য	বৃক্ ২৬১
ব্রতনিয়ম	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মজ্ঞ	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মবক্তা	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মর্ষি	বংহ্ ২০৫	ব্রাত্যা	বৃক্ ৩৪১
ব্রতপারণা	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মজ্ঞান	বংহ্ ২০১	ব্রহ্মবধিয়া	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মলিখিত	বংহ্ ১৯২	ব্রাণ্ডি	ব্,ব ৩৬২
ব্রতপ্রতিষ্ঠা	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মজ্যোতিঃ	বংহ্ ২০২	ব্রহ্মবধ্যা	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মলেখ	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্ম	বংহ্ ২০৭
ব্রতভঙ্গ	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মডাঙ্গা	বংহ্ ২০২	ব্রহ্মবন্ধু	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মলোক	বংহ্ ২০৫	ব্রাহ্মদেয়া	বংহ্ ১৯২
ব্রতভিক্ষা	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মডিম্ব	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবর্চ্চস	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মশাসন	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্মপুরাণ	বংহ্ ১৯২
ব্রতমাস	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মণস্পতি	বংহ্ ১৯৬	ব্রহ্মবর্চ্চসী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মশিরঃ	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্মবিবাহ	বংহ্ ১৯২
ব্রতলোপ	বৃ ২৬১	ব্রহ্মণ্য	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবর্চ্চস্বী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মশীর্ষ	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্মণ	বংহ্ ২০৭
ব্রতস্থ	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মণ্যতা	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবাদ	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মসংহিতা	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্মণকুল	বংহ্ ১৯২
ব্রতস্নাতক	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মতাল	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মবাদিনী	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মসত্র	বংহ্ ২০৪	ব্রাহ্মণঘাত	বংহ্ ১৯২
ব্রতাদেশন	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মতালু	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মবাদী	বংহ্ ২০৪	ব্রহ্মসভা	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্মণঘ্ন	বংহ্ ১৯২
ব্রতামৃত	বৃ ২৪৯	ব্রহ্মতালুয়া	বংহ্ ২০০	ব্রহ্মবিৎ(দ্)	বংহ্ ১৯২	ব্রহ্মসাজুয্য	বংহ্ ১৯২	ব্রাহ্মণচণ্ডাল	বংহ্ ১৯২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ভদ্রতা	ভণ্ ৩৮৪	ভবতারিণী	ভূ ৪০৯	ভবিতব্যতা	ভূ ৪০৯	ভয়ভঙ্গি	ভী ৪০১	ভরা	ভৃ ৪২৯
ভদ্রদারু	ভণ্ ৩৮২	ভবদীয়	ভূ ৪০৯	ভবিতা	ভূ ৪০৯	ভয়ভাঙ্গা	ভী ৪০১	ভরাট	ভৃ ৪২৯
ভদ্রপদ	ভণ্ ৩৮৫	ভবধব	ভূ ৪০৯	ভবিষ্ণু	ভূ ৪০৯	ভয়ভীত	ভী ৪০১	ভরাটী	ভৃ ৪২৯
ভদ্রপদা	ভণ্ ৩৮৫	ভবন	ভূ ৪১৭	ভবিষ্য	ভূ ৪১৭	ভয়মৈত্রতা	ভী ৪০১	ভরাডুবি	ভৃ ৪২৯
ভদ্রপীঠ	ভণ্ ৩৮২	ভবনশিখী	ভূ ৪০৯	ভবিষ্যজ্ঞান	ভূ ৪০৯	ভয়স্থান	ভী ৪০১	ভরাঁতি	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভদ্রবল্লী	ভণ্ ৩৮২	ভবনাথ	ভূ ৪০৯	ভবিষ্যৎ	ভূ ৪১৭	ভয়হারী	ভী ৪০১	ভরাতি	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভদ্রমন্দ	ভণ্ ৩৮২	ভবনোদর	ভূ ৪০৯	ভবিষ্যতি	ভূ ৪০৯	ভয়হেতু	ভী ৪০১	ভরাপুরা	ভৃ ৪২৯
ভদ্রমহিলা	ভণ্ ৩৮৫	ভবনোদ্যান	ভূ ৪০৯	ভবিষ্যদ্বক্তা	ভূ ৪১৭	ভয়াতুর	ভী ৪০১	ভরাভর	ভৃ ৪২৯
ভদ্রমুখ	ভণ্ ৩৮২	ভবপারাবার	ভূ ৪১৭	ভবিষ্যদ্বাণী	ভূ ৪১৭	ভয়ানক	ভী ৪০১	ভরি	ভৃ ৪২৯
ভদ্রমুস্ত	ভণ্ ৩৮২	ভববারিনিধি	ভূ ৪১৭	ভবিষ্যদ্বাদী	ভূ ৪০৯	ভয়াপহ	ভী ৪০১	ভরিত	ভৃ ৪২৯
ভদ্রমুস্তা	ভণ্ ৩৮২	ভববীতি	ভূ ৪০৯	ভবিষ্যপুরাণ	ভূ ৪০৯	ভয়াবহ	ভী ৪০১	ভরিল	ভৃ ৪২৯
ভদ্রমৃগ	ভণ্ ৩৮২	ভবভঙ্গ	ভূ ৪০৯	ভবেশ	ভূ ৪০৯	ভয়াল	ভী ৪০১	ভর্গ	ভৃ ৪২৯
ভদ্রযব	ভণ্ ৩৮২	ভবভবন	ভূ ৪০৯	ভবোচ্ছেদ	ভূ ৪০৯	ভয়ার্ত্ত	ভী ৪০১	ভর্গঃ	ভৃ ৪২৯
ভদ্রলোক	ভণ্ ৩৮৪	ভবভয়	ভূ ৪০৯	ভবোদ্ভব	ভূ ৪০৯	ভয়াহর্ত্তা	ভী ৪০১	ভর্চ্চ	ভৃ ৪২৯
ভদ্রশ্রী	ভণ্ ৩৮২	ভবভামিনী	ভূ ৪০৯	ভব্য	ভূ ৪১৮	ভর	ভৃ ৪২৯	ভর্চ্চনা	ভৃ ৪২৯
ভদ্রস্থ	ভণ্ ৩৮২	ভবভীত	ভূ ৪০৯	ভব্যতা	ভূ ৪০৯	ভরছন	ভৃ ৪২৯	ভর্চ্ছ	ভৃ ৪২৯
ভদ্রস্থতা	ভণ্ ৩৮২	ভবভীরু	ভূ ৪০৯	ভব্যরূপ	ভূ ৪০৯	ভরণ	ভৃ ৪২৯	ভর্জ্জন	ভৃশ্ ৪৩৭
ভদ্রাভদ্র	ভণ্ ৩৮২	ভবভৃত	ভূ ৪০৯	ভব্যা	ভূ ৪০৯	ভরণপোষণ	ভৃ ৪২৯	ভর্জ্জনপাত্র	ভৃশ্ ৪৩৭
ভদ্রালী	ভণ্ ৩৮৫	ভবভূতি	ভূ ৪০৯	ভভম্	ভ্ ৪৪২	ভরণী	ভৃ ৪২৯	ভর্জ্জিত	ভৃশ্ ৪৩৭
ভদ্রাশ্ব	ভণ্ ৩৮৫	ভবভোগ	ভূ ৪০৯	ভভম্ভম্	ভ্ ৪৪২	ভরণীয়	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তা (ভর্ত্তৃ)	ভৃ ৪২৯
ভদ্রাসন	ভণ্ ৩৮৫	ভবমণ্ডল	ভূ ৪১৭	ভমভম	ভ্ ৪৪২	ভরত	ভৃ ৪৩০	ভর্ত্তি	ভৃ ৪২৯
ভদ্রা	ভণ্ ৩৮২	ভবমোচন	ভূ ৪০৯	ভমর	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভরতজ্ঞ	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃগুণ	ভৃ ৪২৯
ভদ্রিকা	ভণ্ ৩৮২	ভবরাণী	ভূ ৪০৯	ভমরা	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভরতপুত্রক	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃদারক	ভৃ ৪২৯
ভদ্রেশ	ভণ্ ৩৮২	ভবলোক	ভূ ৪১৭	ভমরি	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভরতবর্ষ	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃদেবতা	ভৃ ৪২৯
ভদ্রেশ্বর	ভণ্ ৩৮৫	ভবশেখর	ভূ ৪০৯	ভম্ভরালিকা	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভরতবাক্য	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃবৎসলা	ভৃ ৪২৯
ভন্জ্	ভঞ্জ্ ৩৭৬	ভবসংসার	ভূ ৪১৭	ভম্ভরালী	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভরতর্ষভ	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃবতী	ভৃ ৪২৯
ভন্দ্	ভণ্ ৩৮২	ভবসন্ততি	ভূ ৪০৯	ভয়	ভী ৪০১	ভরতশার্দ্দুল	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃবল্লভা	ভৃ ৪২৯
ভন্ভন্	ভণ্ ৩৮২	ভবসমুদ্র	ভূ ৪১৭	ভয়কর	ভী ৪০১	ভরতশাস্ত্র	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃব্রত	ভৃ ৪২৯
ভনভন	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভবসাগর	ভূ ৪১৭	ভয়ঙ্কর	ভী ৪০১	ভরতশ্রেষ্ঠ	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃমতী	ভৃ ৪২৯
ভনভন	ভ্ ৪৪২	ভবসিন্ধু	ভূ ৪১৭	ভয়কৃৎ	ভী ৪০১	ভরতসত্তম	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃহরি	ভৃ ৪২৯
ভনভন	ভণ্ ৩৮২	ভবসাযুজ্য	ভূ ৪০৯	ভয়জনক	ভী ৪০১	ভরতি	ভৃ ৪২৯	ভর্ত্তৃহার্য্য	ভৃ ৪২৯
ভনি	ভ্ ৪৪২	ভবসার	ভূ ৪০৯	ভয়ডিণ্ডিম	ভী ৪০১	ভরদ্বাজ	ভৃ ৪৩২	ভর্ত্রিণী	ভৃ ৪২৯
ভন্না	ভৃ ৪২৯	ভবাটবী	ভূ ৪১৭	ভয়তরাসে	ভী ৪০১	ভরনিশি	ভৃ ৪২৯	ভর্ৎস্	ভৃ ৪২৯
ভপঞ্জর	ভ্ ৪৪২	ভবাদৃক্	ভূ ৪০৯	ভয়ত্রস্ত	ভী ৪০১	ভরন্ত	ভৃ ৪২৯	ভর্ৎস	ভৃ ৪২৯
ভব	ভূ ৪১৭	ভবাদৃক্ষ	ভূ ৪০৯	ভয়ত্রাতা	ভী ৪০১	ভরপুর	ভৃ ৪২৯	ভর্ৎসক	ভৃ ৪২৯
ভবকর্ণধার	ভূ ৪০৯	ভবাদৃশ	ভূ ৪০৯	ভয়দ	ভী ৪০১	ভরপুর	পৃ ৯৭	ভর্ৎসন	ভৃ ৪২৯
ভবকাণ্ডারী	ভূ ৪০৯	ভবান	ভূ ৪০৯	ভয়দায়	ভী ৪০১	ভরভর	ভৃ ৪২৯	ভর্ৎসনা	ভৃ ৪২৯
ভবক্ষিতি	ভূ ৪০৯	ভবানী	ভূ ৪০৯	ভয়দায়ী	ভী ৪০১	ভরভরাট	ভৃ ৪২৯	ভর্ৎসিত	ভৃ ৪২৯
ভবঘুরে	ভূ ৪১৭	ভবাপায়	ভূ ৪০৯	ভয়নাশন	ভী ৪০১	ভরম	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভর্ম্ম	ভৃ ৪২৯
ভবজ	ভূ ৪০৯	ভবাব্ধি	ভূ ৪১৭	ভয়প্রদ	ভী ৪০১	ভরমি.	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভল্ল	ভল্ল্ ৩৮৭
ভবজন্য	ভূ ৪০৯	ভবাভব	ভূ ৪০৯	ভয়প্রস্তাব	ভী ৪০১	ভরমিত	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভল্লক	ভল্ল্ ৩৮৭
ভবচ্ছিৎ	ভূ ৪০৯	ভবাম্বুধি	ভূ ৪১৭	ভয়বিহ্বল	ভী ৪০১	ভরযুয়ান	ভৃ ৪২৯	ভল্লা	ভল্ল্ ৩৮৭
ভবচ্ছেদ	ভূ ৪০৯	ভবার্ণব	ভূ ৪১৭	ভয়ব্যাকুল	ভী ৪০১	ভরযুবতী	ভৃ ৪২৯	ভল্লাত	ভল্ল্ ৩৮৭
ভবৎ	ভূ ৪০৯	ভবিক	ভূ ৪০৯	ভয়ব্যাকুলিত	ভী ৪০১	ভরল	ভৃ ৪২৯	ভল্লাতক	ভল্ল্ ৩৮৭
ভবতল	ভূ ৪০৯	ভবিতব্য	ভূ ৪১৭	ভয়াব্যুহ	ভী ৪০১	ভরসা	ভৃ ৪২৯	ভল্লী	ভল্ল্ ৩৮৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
ভল্লুক	ভল্ল্	৩৮৭	ভাইব্রাদার	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাগকুলি	ভজ্	৩৬৮	ভাঙরি	ভ্রংশ্	৪৩৭	ভাট	ভট্	৩৮১
ভল্লূক	ভল্ল্	৩৮৭	ভাইভাতারী	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাগধেয়	ভজ্	৩৬৮	ভাঙানী	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাটক	ভট্	৩৮০
ভষ্	ভষ্	৩৮৯	ভাইয়া	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাগনা	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্চি	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাটপাড়া	ভট্	৩৮১
ভষ	ভষ্	৩৮৯	ভাউ	ভূ	৪০৯	ভাগনে	ভজ্	৩৭৫	ভাঙুর	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাটা	ভট্	৩৮১
ভষক	ভষ্	৩৮৯	ভাউচার	ভূ	৪০৯	ভাগপত্র	ভজ্	৩৬৮	ভাঙুরি	ভ্রংশ্	৪৩৭	ভাটা	ভূ	৪৪২
ভষল	ভষ্	৩৮৯	ভাউজ	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাগবত	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্কার	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাটি	ভট্	৩৮১
ভস্	ভষ্	৩৮৯	ভাউয়া	ভূ	৪০৯	ভাগবাঁটা	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্কৃত	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাটিয়ার	ভট্	৩৮০
ভসকা	ভষ্	৩৮৯	ভাউলিয়া	ভূ	৪০৯	ভাগবাঁটোয়ারা	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্কৃতি	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাটিয়ারী	ভট্	৩৮০
ভসন	ভষ্	৩৮৯	ভাউলী	ভূ	৪০৯	ভাগভাক্	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গ	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাটিয়াল	ভট্	৩৮১
ভসম	ভষ্	৩৮৯	ভাউলে	ভূ	৪০৯	ভাগভুক্	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গক	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাটিয়ালী	ভট্	৩৮১
ভসিত	ভষ্	৩৮৯	ভাও	ভূ	৪০৯	ভাগলক্ষণা	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গচি	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাটী	ভট্	৩৮১
ভস্ত্রকা	ভষ্	৩৮৯	ভাং	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাগলেখ্য	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গচুর	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাট্টা	ভট্	৩৮০
ভস্ত্রা	ভষ্	৩৮৯	ভাংচি	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাগহর	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গড়	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাড়	ভণ্	৩৮২
ভস্ত্রিকা	ভষ্	৩৮৯	ভাঁওভাঁও	ভণ্	৩৮২	ভাগহার	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গন	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাড়া	ভট্	৩৮০
ভস্ত্রী	ভষ্	৩৮৯	ভাঁগ	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাগহারী	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গভাঙ্গ	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাড়াটিয়া	ভট্	৩৮০
ভস্ম	ভষ্	৩৮৯	ভাঁগিল	ভঞ্জ্	৩৭৬	(ভাগারী)	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গর	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাড়াটে	ভট্	৩৮০
ভস্মক	ভষ্	৩৮৯	ভাঁজ	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাগা	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গরা	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাড়ানী	ভট্	৩৮০
ভস্মকীট	ভষ্	৩৮৯	ভাঁজা	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাগা	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাঙ্গা	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাড়িয়া	ভট্	৩৮০
ভস্মকূট	ভষ্	৩৮৯	ভাঁজাল	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাগা	ভজ্	৩৭৫	ভাঙা(ঙ্গা)	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাড়ুআ(য়া)	ভট্	৩৮০
ভস্মগুণ্ঠন	ভষ্	৩৮৯	ভাঁটগাছ	ভূ	৪৪২	ভাগাড়	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গাচোরা	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাড়ুনী	ভট্	৩৮০
ভস্মধারণ	ভষ্	৩৮৯	ভাঁটা	ভূ	৪৪২	ভাগান	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গা(ঙা)ন	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাণ	ভণ্	৩৮২
ভস্মপ্রিয়	ভষ্	৩৮৯	ভাঁটি	ভূ	৪৪২	ভাগান	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাঙ্গানী	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাণ্ড	ভণ্	৩৮৬
ভস্মমেহ	ভষ্	৩৮৯	ভাঁটুই	ভূ	৪৪২	ভাগাভাগি	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ্গাভরতি	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাণ্ডন	ভণ্	৩৮৬
ভস্মরেণু	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়	ভণ্	৩৮৬	ভাগার্থী	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গি	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাণ্ডনা	ভণ্	৩৮৬
ভস্মরোগ	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়া	ভণ্	৩৮৬	ভাগি	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গিল	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাণ্ডপতি	ভণ্	৩৮৬
ভস্মললাটিকা	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়ান	ভণ্	৩৮৬	ভাগিক	ভজ্	৩৭৫	ভাঙ্গী	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাণ্ডপূর্ণ	ভণ্	৩৮৬
ভস্মলোচন	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়াভাঁড়ি	ভণ্	৩৮২	ভাগিনা	ভজ্	৩৭৫	ভাচা	ভূ	৪৪২	ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক	ভণ্	৩৮৬
ভস্মসাৎ	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়ামি	ভণ্	৩৮৬	ভাগিনী	ভজ্	৩৭৫	ভাচাতি	ভূ	৪৪২	ভাণ্ডবাদন	ভণ্	৩৮৬
ভস্মস্নান	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়ামো	ভণ্	৩৮৬	ভাগিনে	ভজ্	৩৭৫	ভাজ্	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডমূল্য	ভণ্	৩৮৬
ভস্মান্ত	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়ারি(রী)	ভণ্	৩৮৬	ভাগিনেয়	ভজ্	৩৭৫	ভাজ	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডরঞ্জক-মৃত্তিকা	ভণ্	৩৮২
ভস্মাবশেষ	ভষ্	৩৮৯	ভাঁড়ি	ভণ্	৩৮২	ভাগিল	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাজ	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাণ্ডশালা	ভণ্	৩৮২
ভস্মীকরণ	ভষ্	৩৮৯	ভাঁতি	ভজ্	৩৬৮	ভাগী	ভজ্	৩৭৫	ভাজ্রি	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাণ্ডা	ভণ্	৩৮৬
ভস্মীকৃত	ভষ্	৩৮৯	ভাঁতি	ভা	৩৯০	ভাগীরথ	ভজ্	৩৬৮	ভাজক	ভৃশ্	৩৭৫	ভাণ্ডাগার	ভণ্	৩৮৬
ভস্মীভাব	ভষ্	৩৮৯	ভাঁপ	বাধ্	২৩৪	ভাগীরথী	ভজ্	৩৭৪	ভাজক	ভজ্	৩৬৮	ভাণ্ডাগারিক	ভণ্	৩৮৬
ভস্মীভূত	ভষ্	৩৮৯	ভাক্	ভজ্	৩৬৮	ভাগ্	ভজ্	৩৬৮	ভাজন	ভজ্	৩৬৮	ভাণ্ডান	ভণ্	৩৮৬
ভা	ভা	৩৯০	ভাখ	ভাষ্	৩৯২	ভাগ্‌গিস্	ভজ্	৩৭৫	ভাজন	ভৃশ্	৩৭৫	ভাণ্ডার	ভণ্	৩৮৬
ভাই	ভ্রাজ্	৪৪১	ভাখন	ভাষ্	৩৯২	ভাগ্য	ভজ্	৩৭৫	ভাজনা	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডারিক	ভণ্	৩৮৬
ভাইআল	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাখা	ভাষ্	৩৯২	ভাগ্যধর	ভজ্	৩৭৫	ভাজা	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডারী	ভণ্	৩৮৬
ভাইখাগী	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাগ(জ্)	ভজ্	৩৬৮	ভাগ্যবান	ভজ্	৩৭৫	ভাজাচাউলী	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডি	ভণ্	৩৮৬
ভাইগনা	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাকু(কৃ)ট	ভজ্	৩৬৮	ভাঙ(ঙ্গ)	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাজাভাজা	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডিক	ভণ্	৩৮৬
ভাইজ্র	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাক্কা	ভজ্	৩৬৮	ভাঙচা	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাজাভুজা	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডিনী	ভণ্	৩৮৬
ভাইট	ভূ	৪৪২	ভাক্ত	ভজ্	৩৬৮	ভাঙচুর	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাজাভাজি	ভৃশ্	৪৩৭	ভাণ্ডীর	ভণ্	৩৮৬
ভাইড়	ভণ্	৩৮২	ভাগ	ভজ্	৩৭৫	ভাঙন	ভঞ্জ্	৩৭৮	ভাজী	ভৃশ্	৪৩৭	ভাত	ভা	৩৯০
ভাইফোঁটা	ভ্রাজ্	৪৪১	ভাগ	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাঙনি	ভঞ্জ্	৩৭৬	ভাজ্য	ভৃশ্	৩৭৫	ভাতঘুম	ভা	৩৯০
ভাইবেরাদর	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাগকল্পনা	ভজ্	৩৭৬	ভাঙর	ভ্রাজ্	৪৪০	ভাজ্য	ভজ্	৩৬৮	ভাতপানি	ভা	৩৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ভাতবাড়া	বহ্ ২৭৮	ভাপ	বাধ্ ২৩৪	ভাবানুগ	ভূ ৪০৯	ভারতমণ্ডল	ভূ ৪২৯	ভাললোচন	ভা ৩৯১
ভাতা	ভা ৩৯০	ভাপরা	বাধ্ ২৩৪	ভাবানুগা	ভূ ৪০৯	ভারতমহীশ	ভূ ৪২৯	ভালা	ভল্ল্ ৩৮৮
ভাতানি	ভা ৩৯০	ভাপসা	বাধ্ ২৩৪	ভাবান্তর	ভূ ৪০৯	ভারতী	ভূ ৪২৯	ভালাই	ভল্ল্ ৩৮৮
ভাতার	ভা ৩৯০	ভাপা	বাধ্ ২৩৪	ভাবান্দোলন	ভূ ৪২১	ভারদ্বাজ	ভূ ৪৩২	ভালী	ভল্ল্ ৩৮৭
ভাতারআউলী	ভা ৩৯০	ভাপান	বাধ্ ২৩৪	ভাবার্থ	ভূ ৪০৯	ভারবাহ	ভূ ৪২৯	ভালু(লু)ক	ভল্ল্ ৩৮৭
ভাতারকামড়া	ভা ৩৯০	ভাব	ভূ ৪১৮	ভাবি	ভূ ৪০৯	ভারবাহক	ভূ ৪২৯	ভালে	ভল্ল্ ৩৮৭
ভাতারখোর	ভা ৩৯০	ভাবক	ভূ ৪০৯	ভাবিক	ভূ ৪০৯	ভারবাহন	ভূ ৪২৯	ভালো	ভল্ল্ ৩৮৭
ভাতারখাগী	ভা ৩৯০	ভাবকানি	ভূ ৪০৯	ভাবিত	ভূ ৪০৯	ভারবাহিক	ভূ ৪২৯	ভাল্লুক	ভল্ল্ ৩৮৭
ভাতারনড়	ভা ৩৯০	ভাবকালি(লী)	ভূ ৪০৯	ভাবিতা	ভূ ৪০৯	ভারবাহী	ভূ ৪২৯	ভাশুর	ভ্রাজ্ ৪৪০
ভাতারপুত	ভা ৩৯০	ভাবকি(কী)	ভূ ৪০৯	ভাবিতাত্মা	ভূ ৪০৯	ভারবি	ভূ ৪২৯	ভাষ	ভাষ্ ৩৯২
ভাতারী	ভা ৩৯০	ভাবগম্ভীর	ভূ ৪০৯	ভাবিত্ব	ভূ ৪০৯	ভারভুর	ভূ ৪২৯	ভাষক	ভাষ্ ৩৯৩
ভাতার্ত্তি	ভা ৩৯০	ভাবগম্য	ভূ ৪০৯	ভাবিনী	ভূ ৪০৯	ভারহর	ভূ ৪২৯	ভাষণ	ভাষ্ ৩৯৩
ভাতি	ভা ৩৯০	ভাবগ্রাহী	ভূ ৪০৯	ভাবী	ভূ ৪০৯	ভারহার	ভূ ৪২৯	ভাষা	ভাষ্ ৩৯৩
ভাতিজ	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভাবজ	ভূ ৪০৯	ভাবুক	ভূ ৪০৯	ভারহারী	ভূ ৪২৯	ভাষাপত্র	ভাষ্ ৩৯২
ভাতিজা	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভাবড়া	ভূ ৪০৯	ভাবুকতা	ভূ ৪০৯	ভারা	ভূ ৪২৯	ভাষাবিভ্রাট	ভাষ্ ৩৯৫
ভাতিজী	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভাবন	ভূ ৪১৮	ভাবুকি(কী)	ভূ ৪০৯	ভারি	ভূ ৪২৯	ভাষারামায়ণ	ভাষ্ ৩৯২
ভাতুড়ে	ভা ৩৯০	ভাবনা	ভূ ৪১৮	ভাব্য	ভূ ৪০৯	ভারিক	ভূ ৪২৯	ভাষাসম	ভাষ্ ৩৯২
ভাদই	ভণ্ ৩৮২	ভাবনা-চিন্তা	ভূ ৪১৮	ভাব্যমান	ভূ ৪০৯	ভারিক্কি	ভূ ৪২৯	ভাষিত	ভাষ্ ৩৯২
ভাদর	ভণ্ ৩৮২	ভাবনি	ভূ ৪০৯	ভাম	ভূ ৪২১	ভারিভুরি	ভূ ৪২৯	ভাষিতা	ভাষ্ ৩৯২
ভাদাম	ভণ্ ৩৮২	ভাবনীয়	ভূ ৪০৯	ভামা	ভূ ৪২১	ভারিভূরি	ভূ ৪২৯	ভাষিণী	ভাষ্ ৩৯২
ভাদুরে	ভণ্ ৩৮২	ভাবপ্রবণ	ভূ ৪১৯	ভামিনী	ভূ ৪২১	ভারিভূরী	ভূ ৪২৯	ভাষী	ভাষ্ ৩৯২
ভাদুল্যা	ভণ্ ৩৮২	ভাববাচ্য	ভূ ৪০৯	ভামী	ভূ ৪২১	ভারী	ভূ ৪২৯	ভাষ্য	ভাষ্ ৩৯২
ভাদো	ভণ্ ৩৮২	ভাববাদ	ভূ ৪২০	ভায়	ভজ্ ৩৬৮	ভারীভূরী	ভূ ৪২৯	ভাষ্যকার	ভাষ্ ৩৯২
ভাদ্দর	ভণ্ ৩৮২	ভাববাদী	ভূ ৪২০	ভায়রা	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভারুই	ভূ ৪২৯	ভাস্স	ভাষ্ ৩৯২
ভাদ্দরবউ	ভণ্ ৩৮২	ভাববোধক	ভূ ৪০৯	ভায়া	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভারোদ্ধারণ	ভূ ৪২৯	ভাঃ	ভাস্ ৩৯৬
ভাদ্র	ভণ্ ৩৮৫	ভাবভক্তি	ভূ ৪০৯	ভায়াদ	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভারোদ্বহ	ভূ ৪২৯	ভাস	ভাস্ ৩৯৬
ভাদ্রপদ	ভণ্ ৩৮৫	ভাবভঙ্গি	ভূ ৪০৯	ভায্যা	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভারোদ্বহন	ভূ ৪২৯	ভাসঃ	ভাস্ ৩৯৬
ভাদ্রপদা	ভণ্ ৩৮৫	ভাব-ভালবাসা	ভূ ৪২১	ভার	ভূ ৪২৯	ভার্গব	ভূ ৪৩৪	ভাসক	ভাস্ ৩৯৭
ভাদ্রপদী	ভণ্ ৩৮৫	ভাবমিশ্র	ভূ ৪০৯	ভার	— ৪৩২	ভার্গবী	ভূ ৪২৯	ভাসন	ভাস্ ৩৯৭
ভাদ্রবধূ	ভণ্ ৩৮২	ভাবরূপ	ভূ ৪০৯	ভারজীবী	ভূ ৪২৯	ভার্গী	ভূ ৪২৯	ভাসন্ত	ভাস্ ৩৯৭
ভাদ্রী	ভণ্ ৩৮৫	ভাবশবলতা	ভূ ৪০৯	ভারত	ভূ ৪৩২	ভার্য্যা	ভূ ৪৩৪	ভাসমান	ভাস্ ৩৯৭
ভান	ভা ৩৯১	ভাবশান্তি	ভূ ৪০৯	ভারতবর্ষ	বৃষ্ ৩৫৫	ভার্য্যাজিত	ভূ ৪২৯	ভাসা	ভাস্ ৩৯৭
ভান	ভঞ্জ্ ৩৭৬	ভাবশুদ্ধি	ভূ ৪০৯	ভারতবর্ষ	— ৪৩৩	ভার্য্যাট	ভূ ৪৩৪	ভাসান	ভাস্ ৩৯৭
ভানাকুটা	ভঞ্জ্ ৩৭৬	ভাবশূন্য	ভূ ৪০৯	ভারতী	ভূ ৪৩২	ভার্য্যাপতি	ভূ ৪২৯	ভাসানো	ভাস্ ৩৯৭
ভানা	ভঞ্জ্ ৩৭৬	ভাবসন্ধি	ভূ ৪০৯	ভারবাহী	ভূ ৪২৯	ভার্য্যোঢ়	ভূ ৪৩৪	ভাসা-ভাসা	ভাস্ ৩৯৭
ভানান	ভঞ্জ্ ৩৭৬	ভাবসমন্বিত	ভূ ৪০৯	ভারবাহী	বহ্ ২৭৮	ভাল	ভল্ল্ ৩৮৮	ভাসিত	ভাস্ ৩৯৭
ভানানী	ভঞ্জ্ ৩৭৬	ভাবসমাহিত	ভূ ৪০৯	ভারভৃৎ	ভূ ৪২৯	ভাল	ভা ৩৯১	ভাসু	ভাস্ ৩৯৭
ভানু	ভা ৩৯১	ভাবসর্গ	ভূ ৪০৯	ভারযষ্টি	ভূ ৪২৯	ভালচন্দ্র	ভা ৩৯১	ভাসুর	ভাস্ ৩৯৭
ভানুকন্যা	ভা ৩৯১	ভাবসাব	ভূ ৪২১	ভারসহ	ভূ ৪২৯	ভালদর্শন	ভা ৩৯১	ভাসুর	ভ্রাজ্ ৪৪০
ভানুবংশ	ভা ৩৯১	ভাবস্থ	ভূ ৪০৯	ভারই (ভারুই)	ভূ ৪৩২	ভালনয়ন	ভা ৩৯০	ভাসুরঝি	ভ্রাজ্ ৪৪০
ভানুবার	ভা ৩৯১	ভাবস্থির	ভূ ৪০৯	ভারণ্ড	ভূ ৪২৯	ভালপট্ট	ভা ৩৯১	ভাসুরঠাকুর	ভ্রাজ্ ৪৪০
ভানুমতী	ভা ৩৯০	ভাবস্নিগ্ধ	ভূ ৪০৯	ভারণ্ডী	ভূ ৪২৯	ভালবাসা	ভল্ল্ ৩৮৭	ভাসুরতা	ভাস্ ৩৯৬
ভানুমান	ভা ৩৯০	ভাবা	ভূ ৪১৮	ভারত	ভূ ৪২৯	ভালবাসা	বস্ ৩৮৮	ভাসুরতাপাদন	ভাস্ ৩৯৭
ভানুসুত	ভা ৩৯০	ভাবাট	ভূ ৪০৯	ভারতপঙ্কজ	ভূ ৪২৯	ভালবাসাবাসি	ভল্ল্ ৩৮৭	ভাসুরপুষ্পা	ভাস্ ৩৯৭
ভাপ	ভূ ৪০৯	ভাবাদর্শ	ভূ ৪২০	ভারতবর্ষ	ভূ ৪২৯	ভালভাগ	ভা ৩৯০	ভাসুরপো	ভ্রাজ্ ৪৪০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ভাস্কর	ভাস্ ৩৯৭	ভিগ	ভজ্ ৩৭৬	ভিন্নরুচি	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমরুল	ভী ৪০১	ভুখ	ভু ৪০৫
ভাস্করদ্যুতি	ভাস্ ৩৯৬	ভিঙ্গার	ভৃ ৪২৯	ভিন্নশ্লিষ্ট	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমসেন	ভী ৪০১	ভুখল	ভু ৪০৫
ভাস্করপ্রিয়	ভাস্ ৩৯৬	ভিগা	ভজ্ ৩৭৬	ভিন্নসংহতি	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমসেনী	ভী ৪০১	ভুখলি	ভু ৪০৫
ভাস্কর্য্য	ভাস্ ৩৯৭	ভিজ	ভজ্ ৩৭৬	ভিন্নস্বর	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমা	ভী ৪০১	ভুখা	ভু ৪০৫
ভাস্মন	ভস্ ৩৮৯	ভিজা	ভজ্ ৩৭৬	ভিন্নহৃদয়	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমৈকাদশী	ভী ৪০১	ভুখিল	ভু ৪০৫
ভাস্বত	ভাস্ ৩৯৮	ভিজান	ভজ্ ৩৭৬	ভিন্নাঞ্জন	ভিদ্ ৩৯৮	ভীরু	ভী ৪০৩	ভুগ (ভোগ)	ভু ৪০৬
ভাস্বতী	ভাস্ ৩৯৮	ভিজানা	ভজ্ ৩৬৮	ভিন্নার্থ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীরুক	ভী ৪০১	ভুগলামি	ভু ৪০৫
ভাস্বর	ভাস্ ৩৯৮	ভিজে	ভজ্ ৩৭৬	ভিরমি	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভীরূ	ভী ৪০৩	ভুগ্ন	ভু ৪০৬
ভাস্বান	ভাস্ ৩৯৮	ভিটকিলামি	বিশ্ ৩২১	ভিমরাজ	ভৃ ৪২৯	ভীলুক	ভী ৪০১	ভুজ	ভু ৪০৭
ভিঁয়া	ভৃ ৪৪২	ভিটা	ভট্ ৩৮০	ভিমরুল (ভী-)	ভৃ ৪২৯	ভীষক	ভী ৪০৪	ভুজকোটর	ভু ৪০৫
ভিক	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিটামাটি	ভট্ ৩৮০	ভিয়া	ভৃ ৪৪২	ভীষণ	ভী ৪০৪	ভুজগ	ভু ৪০৮
ভিকারি	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিটি	ভট্ ৩৮০	ভিয়ান	ভৃ ৪৪২	ভীষা	ভী ৪০৪	ভুজগপতি	ভু ৪০৫
ভিকিরী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিঠা	ভট্ ৩৮০	ভিল (ভীল)	ভল্ল্ ৩৮৭	ভীষিত	ভী ৪০৪	ভুজগবলয়	ভু ৪০৫
ভিক্ষ্	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিড় (ভীড়)	ভট্ ৩৮০	ভিল্ল	ভল্ল্ ৩৮৭	ভীষ্ম	ভী ৪০৪	ভুজগভোজী	ভু ৪০৫
ভিক্ষণ	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিড়ন	ভট্ ৩৮০	ভিল্লগবী	ভল্ল্ ৩৮৭	ভীষ্মক	ভী ৪০১	ভুজগান্তক	ভু ৪০৫
ভিক্ষা	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিড়া	ভট্ ৩৮০	ভিল্লতরু	ভল্ল্ ৩৮৭	ভীষ্মজননী	ভী ৪০১	ভুজগারি	ভু ৪০৫
ভিক্ষাকপাল	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিড়াভিড়ি	ভট্ ৩৮০	ভিষক্(জ্)	ভষ্ ৩৮৯	ভীষ্মপঞ্চক	ভী ৪০১	ভুজগাশন	ভু ৪০৫
ভিক্ষাকরণ	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিড়ান	ভট্ ৩৮০	ভিষক্প্রিয়া	ভষ্ ৩৮৯	ভীষ্মপর্ব্ব	ভী ৪০১	ভুজগিনী	ভু ৪০৫
ভিক্ষাকাল	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিত	ভিদ্ ৩৯৯	ভিষক্বর	ভষ্ ৩৮৯	ভীষ্মমাতৃভুবন	ভী ৪০১	ভুজগী	ভু ৪০৫
ভিক্ষাচর	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিতর	ভিদ্ ৩৯৯	ভিষক্বিৎ	ভষ্ ৩৮৯	ভীষ্মরত্ন	ভী ৪০১	ভুজগেন্দ্র	ভু ৪০৫
ভিক্ষাচার	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিৎ(দ্)	ভিদ্ ৩৯৯	ভিষজ্	ভষ্ ৩৮৯	ভীষ্মসূ	ভী ৪০১	ভুজগেশ্বর	ভু ৪০৫
ভিক্ষাচর্য্যা	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিত্তি	ভিদ্ ৩৯৯	ভিস্তি (ভিস্তী)	ভৃ ৪৪২	ভীষ্মাষ্টমী	ভী ৪০১	ভুজঙ্গ	ভু ৪০৮
ভিক্ষাজীবী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিদির	ভিদ্ ৩৯৮	ভী	ভী ৪০১	ভুআ	ভু ৪০৫	ভুজঙ্গপ্রয়াত	ভু ৪০৫
ভিক্ষাটন	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিদুর	ভিদ্ ৩৯৮	ভীকর	ভী ৪০১	ভুঁক (ভুক)	ভু ৪০৫	ভুজঙ্গম	ভু ৪০৮
ভিক্ষান্ন	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিদ্য	ভিদ্ ৩৯৮	ভীড়	ভট্ ৩৮০	ভুঁজ	ভু ৪০৫	ভুজঙ্গমী	ভু ৪০৮
ভিক্ষাপাত্র	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন	ভিদ্ ৩৯৮	ভীত	ভী ৪০১	ভুঁড়ি	ভু ৪০৮	ভুজঙ্গিনী	ভু ৪০৮
ভিক্ষাপুত্র	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিনগাঁ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীতভীত	ভী ৪০১	ভুঁড়ে	ভু ৪০৫	ভুজঙ্গেন্দ্র	ভু ৪০৮
ভিক্ষাবৃত্তি	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিনাভিনি	ভিদ্ ৩৯৮	ভীতসন্ত্রস্ত	ভী ৪০১	ভুঁড়ো	ভু ৪০৫	ভুজঙ্গেশ	ভু ৪০৫
ভিক্ষা-মা	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিনু	ভিদ্ ৩৯৮	ভীতি	ভী ৪০১	ভুঁতি (ভুতি)	ভু ৪০৫	ভুজচ্ছায়া	ভু ৪০৫
ভিক্ষার্থী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্দিপাল	ভিদ্ ৩৯৮	ভীদত্ত	ভী ৪০১	ভুঁতুড়ি	ভু ৪০৫	ভুজদণ্ড	ভু ৪০৫
ভিক্ষাশী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্ধি	ভিদ্ ৩৯৮	ভীতু	ভী ৪০১	ভুঁদী	ভু ৪০৫	ভুজবন্ধন	ভু ৪০৫
ভিক্ষাহার	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্ন	ভিদ্ ৪০০	ভীম	ভী ৪০২	ভুঁদো	ভু ৪০৫	ভুজমধ্য	ভু ৪০৫
ভিক্ষিত	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্নকট	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমকর্ম্মা	ভী ৪০১	ভুক্ (ভুজ্)	ভু ৪০৫	ভুজমূল	ভু ৪০৫
ভিক্ষিনী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্নকর্ণ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমকান্ত	ভী ৪০১	ভুক	ভু ৪০৫	ভুজলতা	ভু ৪০৫
ভিক্ষু	ভক্ষ্ ৩৬৮	ভিন্নক্রম	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমকার্ম্মুক	ভী ৪০১	ভুকল	ভু ৪০৫	ভুজশালী	ভু ৪০৫
ভিক্ষুক	ভক্ষ্ ৩৬৮	ভিন্নজাতি	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমধন্বা	ভী ৪০১	ভুক্ত	ভু ৪০৬	ভুজশিখর	ভু ৪০৫
ভিক্ষুকী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্নদেশ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমতিথি	ভী ৪০১	ভুক্তন	ভু ৪০৫	ভুজশিরঃ	ভু ৪০৫
ভিক্ষুচর্য্যা	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্ননৌ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমদর্শন	ভী ৪০১	ভুক্তপীত	ভু ৪০৫	ভুজা	ভু ৪০৭
ভিক্ষুণী	ভক্ষ্ ৩৬৮	ভিন্ননৌক	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমদ্বাদশী	ভী ৪০১	ভুক্তভোগ	ভু ৪০৬	ভুজাগ্র	ভু ৪০৫
ভিক্ষুসঙ্ঘ	ভক্ষ্ ৩৬৮	ভিন্নবর্ণ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমপরাক্রম	ভী ৪০১	ভুক্তভোগী	ভু ৪০৬	ভুজান্তর	ভু ৪০৫
ভিক্ষুসূত্র	ভক্ষ্ ৩৬৮	ভিন্নবৃত্ত	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমপলশ্রী	ভী ৪০১	ভুক্তমাত্র	ভু ৪০৫	ভুজান্তরাল	ভু ৪০৫
ভিখমাঙ্গা	মঙ্ ৪৫২	ভিন্নবৃত্তি	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমপলাশী	ভী ৪০১	ভুক্তশেষ	ভু ৪০৫	ভুজাপীড়	ভু ৪০৫
ভিখারিনী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্নভাত	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমবাহু	ভী ৪০১	ভুক্তি	ভু ৪০৬	ভুজালী	ভু ৪০৫
ভিখারী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্নভিন্ন	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমরতি	ভী ৪০১	ভুক্তিপাত্র	ভু ৪০৫	ভুজাস্ত্র	ভু ৪০৫
ভিখিরি	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভিন্নমর্য্যাদ	ভিদ্ ৩৯৮	ভীমরথী	ভী ৪০১	ভুক্ভুক	ভু ৪০৫	ভুজাস্ফাল	ভু ৪০৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
ভূমিপাদ	ভূ	৪০৯	ভূরিবৃষ্টি	ভূ	৪০৯	ভৃগুতনয়	ভৃ	৪৩৪	ভৃত্যবৃত্তি	ভৃ	৪২৯	ভেড়	ভী	৪০১
ভূমিপায়	ভূ	৪০৯	ভূরিমায়	ভূ	৪০৯	ভৃগুতুঙ্গ	ভৃ	৪২৯	ভৃত্যা	ভৃ	৪২৯	ভেড়া	ভট্	৩৮০
ভূমিপাল	ভূ	৪০৯	ভূরিশঃ	ভূ	৪০৯	ভৃগুপতি	ভৃ	৪৩৪	ভৃমি	ভ্রংশ্	৪৩৭	ভেড়ি	ভট্	৩৮০
ভূমিবর্গ	বৃজ্	৩৪৪	ভূরিশ্রবাঃ	ভূ	৪২৭	ভৃগুপাত	ভৃ	৪২৯	ভৃশ্	ভৃশ্	৪৩৭	ভেড়ী	ভট্	৩৮০
ভূমিভাগ	ভূ	৪০৯	ভূরিশ্রম	ভূ	৪০৯	ভৃগুবার	ভৃ	৪৩৪	ভৃশ	ভৃশ্	৪৩৭	ভেড়ুয়া	ভট্	৩৮০
ভূমিভৃৎ	ভূ	৪০৯	ভূরিস্বামী	ভূ	৪০৯	ভৃগুবাসর	ভৃ	৪৩৪	ভৃষ্ট	ভৃশ্	৪৩৭	ভেড়ে	ভট্	৩৮০
ভূমিমালী	ভূ	৪০৯	ভূরুট্	ভূ	৪০৯	ভৃগুরাম	ভৃ	৪৩৪	ভৃষ্টতণ্ডুল	ভৃশ্	৪৩৭	ভেড়ো	ভট্	৩৮০
ভূমিরুহ	ভূ	৪০৯	ভূরুহ	ভূ	৪০৯	ভৃগুশার্দ্দুল	ভৃ	৪৩৪	ভৃষ্টপিষ্ট	ভৃশ্	৪৩৭	ভেতব্য	ভী	৪০১
ভূমিলতা	ভূ	৪০৯	ভূর্জ্জ	ভূ	৪০৯	ভৃগুশ্রেষ্ঠ	ভৃ	৪৩৪	ভৃষ্টযব	ভৃশ্	৪৩৭	ভেত্তব্য	ভিদ্	৩৯৮
ভূমিলোক	ভূ	৪০৯	ভূর্জ্জকণ্টক	ভূ	৪০৯	ভৃগুসংহিতা	ভৃ	৪৩৪	ভৃষ্টি	ভৃশ্	৪৩৭	ভেত্তা	ভিদ্	৩৯৮
ভূমিশয়	ভূ	৪০৯	ভূর্জ্জত্বক	ভূ	৪০৯	ভৃগুসত্তম	ভৃ	৪৩৪	ভেউঁড়	ভী	৪০১	ভেদ	ভিদ্	৪৩৬
ভূমিশয্যা	ভূ	৪০৯	ভূর্জ্জদ্রুম	ভূ	৪০৯	ভৃগুসুত	ভৃ	৪৩৪	ভেউভেউ	ভী	৪০১	ভেদক	ভিদ্	৩৯৮
ভূমিষ্ঠ	ভূ	৪০৯	ভূর্জ্জপত্র	ভূ	৪০৯	ভৃগুসূনু	ভৃ	৪৩৪	ভেউর	ভী	৪০১	ভেদকর	ভিদ্	৩৯৮
ভূমিসত্র	ভূ	৪০৯	ভূর্লোক	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গ	ভৃ	৪৩৫	ভেউরি(রী)	ভী	৪০১	ভেদকৃৎ	ভিদ্	৩৯৮
ভূমিসন্নিবেশ	ভূ	৪০৯	ভূলোক	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গপ্রিয়া	ভৃ	৪২৯	ভেওরি	ভী	৪০১	ভেদপ্রত্যয়	ভিদ্	৪৩৬
ভূমিসুত	ভূ	৪০৯	ভূলোকেশ	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গবল্লভ	ভৃ	৪২৯	ভেংচা	ভী	৪০১	ভেদবুদ্ধি	ভিদ্	৪৩৬
ভূমিসুর	ভূ	৪০৯	ভূশয়	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গরজ	ভৃ	৪২৯	ভেক	ভী	৪০১	ভেদবাদী	ভিদ্	৪৩৬
ভূমী	ভূ	৪০৯	ভূশয্যা	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গরজাঃ	ভৃ	৪২৯	ভেকর	ভী	৪০১	ভেদসহ	ভিদ্	৩৯৮
ভূমীশ্বর	ভূ	৪০৯	ভূশুণ্ডী	ভূ	৪০৫	ভৃঙ্গরাজ	ভৃ	৪৩৫	ভেকা	ভী	৪০১	ভেদন	ভিদ্	৩৯৮
ভূম্যনন্তর	ভূ	৪০৯	ভূশুদ্ধি	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গরিটি	ভৃ	৪২৯	ভেকী	ভী	৪০১	ভেদনীয়	ভিদ্	৩৯৮
ভূম্যনৃত	ভূ	৪০৯	ভূষ	ভূ	৪২৮	ভৃঙ্গরীট	ভৃ	৪২৯	ভেকুট	ভী	৪০১	ভেদা	ভিদ্	৩৯৮
ভূম্যামলকী	ভূ	৪০৯	ভূষণ	ভূ	৪২৮	ভৃঙ্গরীটী	ভৃ	৪২৯	ভেকুয়া	ভী	৪০১	ভেদাভেদ	ভিদ্	৩৯৮
ভূম্যামলী	ভূ	৪০৯	ভূষণীয়	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গরোল	ভৃ	৪২৯	ভেকো	ভী	৪০১	ভেদিত	ভিদ্	৩৯৮
ভূয়	ভূ	৪০৯	ভূষয়িতব্য	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গাধিপ	ভৃ	৪২৯	ভেক্কা	ভী	৪০১	ভেদী	ভিদ্	৩৯৮
ভূয়ঃ (ভূয়স্)	ভূ	৪০৯	ভূষণপেটিকা	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গার	ভৃ	৪৩৫	ভেক্‌টি	ভী	৪০১	ভেদ্য	ভিদ্	৩৯৮
ভূয়শঃ	ভূ	৪০৯	ভূষণাচ্ছাদনাশন	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গারিকা	ভৃ	৪২৯	ভেক্‌ভেক্	ভী	৪০১	ভেপসা	বাধ্	২৩৪
ভূয়সী	ভূ	৪০৯	ভূষণ্ডী	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গারী	ভৃ	৪২৯	ভেখ	ভক্ষ	৩৬৮	ভেবড়া	ভূ	৪০৯
ভূয়ান (ভূয়স্)	ভূ	৪০৯	ভূষনাই	ভূ	৪০৯	ভৃঙ্গি	ভৃ	৪২৯	ভেখধারী	ভক্ষ	৩৬৮	ভেবরা	ভূ	৪০৯
ভূয়িষ্ঠ	ভূ	৪০৯	ভূষা	ভূ	৪২৮	ভৃঙ্গী	ভৃ	৪৩৫	ভেগিনী	ভী	৪০১	ভেবাগঙ্গারাম	ভূ	৪০৯
ভূয়োগুণ	ভূ	৪০৯	ভূষি	ভূ	৪২৮	ভৃজ (ভৃজী)	ভৃ	৪২৯	ভেঙভেঙ	ভী	৪০১	ভেবাচাকা	ভূ	৪০৯
ভূয়োদর্শন	ভূ	৪০৯	ভূষিকা	ভূ	৪০৯	ভৃৎ	ভৃ	৪২৯	ভেঙেরি	ভী	৪০১	ভেভাচাকা	ভূ	৪০৯
ভূয়োবিদ্য	ভূ	৪০৯	ভূষিত	ভূ	৪২৮	ভৃত	ভৃ	৪৩৬	ভেঙ্গা	ভী	৪০১	ভেভুক্(জ্)	ভী	৪০১
ভূয়োভূয়	ভূ	৪০৯	ভূষো	ভূ	৪২৮	ভৃতক	ভৃ	৪৩৬	ভেঙ্গুর	ভী	৪০১	ভের	ভী	৪০১
ভূয়োভূয়ঃ	ভূ	৪০৯	ভূষ্ণু	ভূ	৪২৮	ভৃতকাধ্যয়ন	ভৃ	৪৩৬	ভেজ	ভজ্	৪০১	ভেরণ্ড	ভী	৪০১
ভূর্	ভূ	৪০৯	ভূসুত	ভূ	৪০৯	ভৃতকাধ্যাপক	ভৃ	৪৩৬	ভেজা	ভজ্	৩৭৬	ভেরাণ্ডা	ভী	৪০১
ভূর	ভূ	৪০৯	ভূসুতা	ভূ	৪০৯	ভৃতকাধ্যাপন	ভৃ	৪৩৬	ভেজান	ভজ্	৩৭৬	ভেরি	ভী	৪০১
ভূরা	ভূ	৪০৯	ভূসুর	ভূ	৪০৯	ভৃতকাধ্যাপিত	ভৃ	৪৩৬	ভেজাল	ভজ্	৩৬৮	ভেরী	ভী	৪০১
ভূরি	ভূ	৪২৭	ভূস্তৃণ	ভূ	৪০৯	ভৃতি	ভৃ	৪৩৬	ভেট	ভট্	৩৮০	ভেরু	ভী	৪০১
ভূরিকাল	ভূ	৪০৯	ভূস্থ	ভূ	৪০৯	ভৃতিভুক্(জ্)	ভৃ	৪৩৬	ভেটা	ভট্	৩৮০	ভেল	ভী	৪০১
ভূরিতেজাঃ	ভূ	৪২৭	ভূস্বর্গ	ভূ	৪০৯	ভৃত্য	ভৃ	৪৩৬	ভেটান	ভট্	৩৮০	ভেলক	ভী	৪০১
ভূরিদ	ভূ	৪০৯	ভূস্বামী	ভূ	৪০৯	ভৃত্যজন	ভৃ	৪২৯	ভেটি	ভট্	৩৮০	ভেলভেল	ভী	৪০১
ভূরিদক্ষিণ	ভূ	৪২৭	ভৃ	ভৃ	৪২৯	ভৃত্যবর্গ	বৃজ্	৩৪৪	ভেটেরাখানা	ভট্	৩৮০	ভেলসা	ভী	৪০১
ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ	ভূ	৪২৭	ভৃকুটি(টী)	ভৃ	৪২৯	ভৃত্যভরণ	ভৃ	৪২৯	ভেটেল	ভট্	৩৮০	ভেলা	ভল্ল্	৩৮৭
ভূরিপ্রয়োগ	ভূ	৪০৯	ভৃগু	ভৃ	৪৩৪	ভৃত্যভাবী	ভৃ	৪২৯	ভেটো	ভট্	৩৮০	ভেলি	ভল্ল্	৩৮৭
ভূরিবিক্রম	ভূ	৪০৯	ভৃগুজ	ভৃ	৪৩৪	ভৃত্যবর্গ	ভৃ	৪২৯	ভেড়	ভট্	৩৮০	ভেল্কি	ভল্ল্	৩৮৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ভেল্কী	ভল্ল্ ৩৮৭	ভোঁড়ুয়ে	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভোগিনী	ভূ ৪০৫	ভোট	ভট্ ৩৮০	ভ্যাজানো	ভজ্ ৩৬৮
ভেষ্	ভী ৪০১	ভোঁতা	ভূ ৪০৫	ভোগী	ভূ ৪০৫	ভোটকম্বল	ভট্ ৩৮০	ভ্যাটা	ভট্ ৩৮০
ভেষজ	ভী ৪০১	ভোঁৎভোঁৎ	ভূ ৪০৫	ভোগীন্দ্র	ভূ ৪০৫	ভোটর	ভট্ ৩৮০	ভ্যানভ্যান	ভণ্ ৩৮২
ভেষজকরণ	ভী ৪০১	ভোঁদড়	ভূ ৪০৫	ভোগীশ	ভূ ৪০৫	ভোটা	ভট্ ৩৮০	ভ্যানরভ্যানর	ভণ্ ৩৮২
ভেষজাগার	ভী ৪০১	ভোঁদা	ভূ ৪০৫	ভোগোল	ভূ ৪০৫	ভোটাঙ্গ	ভট্ ৩৮০	ভ্যাপসা	ভূ ৪০৯
ভেষজ	ভষ্ ৩৮৯	ভোঁদোড়	ভূ ৪০৫	ভোগ্য	ভূ ৪০৫	ভোটান্ত	ভট্ ৩৮০	ভ্যাপসা	ভা ৩৯০
ভেষজগার	ভষ্ ৩৮৯	ভোঁভোঙ	ভূ ৪০৫	ভোগ্যা	ভূ ৪০৫	ভোটি	ভট্ ৩৮০	ভ্যাপসা	বাধ্ ২৩৪
ভেস	ভী ৪০১	ভোঁয়া	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভোজ	ভূ ৪০৭	ভোড়ং	ভট্ ৩৮০	ভ্যাপসো	ভূ ৪০৯
ভেশ	ভ্ ৪৪২	ভোঁহা	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভোজং	ভজ্ ৩৬৮	ভোড়ঙ্গ	ভট্ ৩৮০	ভ্যাবড়া	ভূ ৪০৯
ভেসতে-দেওয়া	ভ্ ৪৪২	ভোক	ভূ ৪০৫	ভোজক	ভূ ৪০৫	ভোড়া	ভট্ ৩৮০	ভ্যাবা	ভূ ৪০৯
ভেস্ত	ভ্ ৪৪২	ভোকছানি	ভূ ৪০৫	ভোজকট	ভূ ৪০৫	ভোনভোন	ভ্ ৪৪২	ভ্যালা	ভল্ল্ ৩৮৭
ভেস্তা	ভ্ ৪৪২	ভোকশোষ	ভূ ৪০৫	ভোজদেব	ভূ ৪০৫	ভোম	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্যালা	ভূ ৪০৫
ভৈ	ভী ৪০১	ভোক্তব্য	ভূ ৪০৫	ভোজন	ভূ ৪০৫	ভোমর	ভ্রংশ্ ৪৩৮	ভ্যাস্তা	ভ্ ৪৪২
ভৈঃ	ভী ৪০১	ভোক্তব্য	ভজ্ ৩৬৮	ভোজনকণ্টক	ভূ ৪০৫	ভোমরা	ভ্রংশ্ ৪৩৮	ভ্রংশ	ভ্রংশ্ ৪৩৮
ভৈঁরো	ভী ৪০১	ভোক্তা	ভজ্ ৩৬৮	ভোজনকাল	ভূ ৪০৫	ভোম্বল	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রংশন	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষ	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোক্তা	ভূ ৪০৫	ভোজনত্যাগ	ভূ ৪০৫	ভোম্ভল	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রংশিত	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষকাল	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোক্তৃ	ভজ্ ৩৬৮	ভোজনপাত্র	ভূ ৪০৫	ভোম্ভোলা	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রংশী	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষচরণ	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোক্তৃ	ভূ ৪০৫	ভোজনভাণ্ড	ভূ ৪০৫	ভোর	ভূ ৪০৫	ভ্রন্শ্	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষচর্য্যা	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোক্তৃত্ব	ভূ ৪০৫	ভোজনভাজন	ভূ ৪০৫	ভোর	ভূ ৪২৮	ভ্রন্স্	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষজীবিকা	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোখ	ভূ ৪০৫	ভোজনবিশেষ	ভূ ৪০৫	ভোর	ভূ ৪২৯	ভ্রম্	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষণ	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোখি	ভূ ৪০৫	ভোজনবৃত্তি	ভূ ৪০৫	ভোর	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রম	ভ্রংশ্ ৪৩৮
ভৈক্ষবৃত্তি	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোখিল	ভূ ৪০৫	ভোজনবেলা	ভূ ৪০৫	ভোরঙ্গ	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রমণ	ভ্রংশ্ ৪৩৮
ভৈক্ষাশিন্	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোখী	ভূ ৪০৫	ভোজনব্যয়	ভূ ৪০৫	ভোরঙ্গ	ভূ ৪০৫	ভ্রমণী	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষাশী	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোগ	ভূ ৪০৫	ভোজনমন্দির	ভূ ৪০৫	ভোরণী	ভূ ৪০৫	ভ্রমণীয়	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈক্ষ্য	ভক্ষ্ ৩৬৬	ভোগকর	ভূ ৪০৫	ভোজনা	ভূ ৪০৫	ভোরণী	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রমন্ত	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈন	ভজ্ ৩৬৮	ভোগগৃহ	ভূ ৪০৫	ভোজনাচ্ছাদন	ভূ ৪০৫	ভোরা	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রমর	ভ্রংশ্ ৪৩৮
ভৈম	ভী ৪০১	ভোগতৃষ্ণা	ভূ ৪০৫	ভোজনাধিকার	ভূ ৪০৫	ভোরা	ভূ ৪০৫	ভ্রমরক	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈমসেনি	ভী ৪০১	ভোগদেহ	ভূ ৪০৫	ভোজনীয়	ভূ ৪০৫	ভোরি	ভূ ৪০৫	ভ্রমরকরণ্ডক	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈমি	ভী ৪০১	ভোগপতি	ভূ ৪০৫	ভোজনীয়তব্য	ভূ ৪০৫	ভোরি	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রমরকীট	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈমী	ভী ৪০১	ভোগপত্র	ভূ ৪০৫	ভোজনৃপতি	ভূ ৪০৫	ভোল	ভূ ৪০৫	ভ্রমরপ্রিয়	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈরটাঙ্গি	ভী ৪০১	ভোগবতী	ভূ ৪০৫	ভোজপতি	ভূ ৪০৫	ভোলা	ভূ ৪০৫	ভ্রমরবাধা	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈরব	ভী ৪০৩	ভোগবান	ভূ ৪০৫	ভোজপুরী	ভূ ৪০৭	ভোলান	ভূ ৪০৫	ভ্রমরা	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈরবা	ভী ৪০১	ভোগভূমি	ভূ ৪০৫	ভোজবাজি	ভূ ৪০৭	ভোলানাথ	ভূ ৪০৫	ভ্রমরাভিলীন	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈরবানন্দ	ভী ৪০১	ভোগভৃতক	ভূ ৪০৫	ভোজবিদ্যা	ভূ ৪০৭	ভোলাভালা	ভূ ৪০৫	ভ্রমরালক	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈরবী	ভী ৪০৩	ভোগমণ্ডপ	ভূ ৪০৫	ভোজয়িতব্য	ভূ ৪০৫	ভৌঁরি	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রমরিকা	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈল	ভল্ল্ ৩৮৭	ভোগরাই	ভূ ৪০৫	ভোজয়িতা	ভূ ৪০৫	ভৌঁহ	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভ্রমরী	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈলা	ভল্ল্ ৩৮৭	ভোগরাগ	ভূ ৪০৫	ভোজরাজ	ভূ ৪০৫	ভৌত	ভূ ৪০৯	ভ্রমা	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈলী	ভল্ল্ ৩৮৭	ভোগা	ভূ ৪০৫	ভোজাই	ভ্রাজ্ ৪৪০	ভৌতিক	ভূ ৪০৯	ভ্রমি	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈষজ	ভষ্ ৩৮৯	ভোগান	ভূ ৪০৫	ভোজালি	ভূ ৪০৫	ভৌতী	ভূ ৪০৯	ভ্রমী	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভৈষজযজ্ঞ	ভষ্ ৩৮৯	ভোগান্ত	ভূ ৪০৫	ভোজী	ভূ ৪০৫	ভৌম	ভূ ৪০৯	ভ্রষ্ট	ভ্রংশ্ ৪৩৮
ভৈষজ্য	ভষ্ ৩৮৯	ভোগান্তি	ভূ ৪০৫	ভোজেন্দ্র	ভূ ৪০৫	ভৌমন	ভূ ৪০৯	ভ্রষ্টা	ভ্রংশ্ ৪৩৮
ভৈষী	ভষ্ ৩৮৯	ভোগাবলী	ভূ ৪০৫	ভোজ্য	ভূ ৪০৫	ভৌমিক	ভূ ৪০৯	ভ্রস্জ্	ভ্রংশ্ ৪৩৭
ভো	ভ্ ৪৪২	ভোগাভোগ	ভূ ৪০৫	ভোজ্যব্যয়	ভূ ৪০৫	ভৌমী	ভূ ৪০৯	ভ্রাজ্	ভ্রাজ্ ৪৪১
ভোঃ	ভ্ ৪৪২	ভোগায়তন	ভূ ৪০৫	ভোজ্যা	ভূ ৪০৫	ভ্যা	ভ্ ৪৪২	ভ্রাজ	ভ্রাজ্ ৪৪১
ভোঁ	ভ্রংশ্ ৪৩৭	ভোগালয়	ভূ ৪০৫	ভোজ্যান্ন	ভূ ৪০৫	ভ্যা	ভূ ৪০৯	ভ্রাজক	ভ্রাজ্ ৪৪০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মঙ্গলহাঁড়ি	মঙ্	৪৫০	মজুর	মক্	৪৪৮	মঞ্জুভাষী	মঞ্জ্	৪৫৪	মণি	মণ্	৪৬০	মণ্ড	মণ্	৪৬১
মঙ্গলা	মঙ্	৪৫০	মজুরা	মক্	৪৪৪	মঞ্জুর	মঞ্জ্	৪৫৬	মণিকণ্ঠ	মণ্	৪৬০	মণ্ডক	মণ্	৪৬১
মঙ্গলাচরণ	মঙ্	৪৫০	মজুরী	মক্	৪৪৮	মঞ্জুরী	মঞ্জ্	৪৫৬	মণিক	মণ্	৪৫৯	মণ্ডন	মণ্	৪৬১
মঙ্গলাচার	মঙ্	৪৫০	মজ্জ	মক্	৪৪৪	মঞ্জুল	মঞ্জ্	৪৫৪	মণিকর্ণিকা	মণ্	৪৫৯	মণ্ডনপ্রিয়	মণ্	৪৫৯
মঙ্গলাদেশবৃত্ত	মঙ্	৪৫২	মজ্জন	মক্	৪৪৪	মঞ্জুলা	মঞ্জ্	৪৫৪	মণিকর্ণী	মণ্	৪৫৯	মণ্ডনবিধি	মণ্	৪৫৯
মঙ্গলাবহ	মঙ্	৪৫০	মজ্জমান	মক্	৪৪৪	মঞ্জুশ্রী	মঞ্জ্	৪৫৪	মণিকা	মণ্	৪৫৯	মণ্ডপ	মণ্	৪৬১
মঙ্গলালঙ্কৃত	মঙ্	৪৫০	মজ্জঃ	মক্	৪৪৪	মঞ্জুষা	মঞ্জ্	৪৫৪	মণিকাঞ্চনযোগ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডপক	মণ্	৪৫৯
মঙ্গলালম্ভন	মঙ্	৪৫০	মজ্জা	মক্	৪৪৪	মঞ্জুস্বন	মঞ্জ্	৪৫৪	মণিকার	মণ্	৪৫৯	মণ্ডপপ্রতিষ্ঠা	মণ্	৪৫৯
মঙ্গলাষ্টক	মঙ্	৪৫০	মজ্জাকর	মক্	৪৪৪	মঞ্জুস্বর	মঞ্জ্	৪৫৪	মণিকারক	মণ্	৪৫৯	মণ্ডপিকা	মণ্	৪৫৯
মঙ্গলী	মঙ্	৪৫০	মঝু	ম্	৫৯৯	মট্	মট্	৪৫৬	মণিকৃৎ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডব	মণ্	৪৫৯
মঙ্গলীয়	মঙ্	৪৫০	মঞিঁ	মু	৫৫৩	মটক	মট্	৪৫৬	মণিকোটা(ঠা)	মণ্	৪৬০	মণ্ডবস্ত্র	মণ্	৪৫৯
মঙ্গল্য	মঙ্	৪৫০	মঞে	ম্	৫৯৯	মটকা	মট্	৪৫৬	মণিখনি	মণ্	৪৫৯	মণ্ডল	মণ্	৪৬২
মঙ্গল্যা	মঙ্	৪৫০	মঞ্চ (-চি)	মঞ্চ	৪৫৩	মটকান	মট্	৪৫৬	মণিগোঁসাই	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলকার্মুক	মণ্	৪৫৯
মচ্	মক্	৪৪৭	মঞ্চ	মঞ্চ	৪৫৩	মটন	মট্	৪৫৬	মণিত	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলচিহ্ন	মণ্	৪৫৯
মচকা	মক্	৪৪৭	মঞ্চক (মাচা)	মঞ্চ	৪৫৩	মটমটি	মট্	৪৫৬	মণিদীপ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলনাভি	মণ্	৪৫৯
মচকান	মক্	৪৪৭	মঞ্চপ	মঞ্চ	৪৫৩	মটর	মট্	৪৫৬	মণিদ্বীপ	মণ্	৪৬০	মণ্ডলনৃত্য	মণ্	৪৫৯
মচমচে	মক্	৪৪৭	মঞ্চাধার	মঞ্চ	৪৫৩	মটুক	মক্	৪৪৪	মণিধনুঃ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলন্যাস	মণ্	৪৫৯
মচ্চিত্ত	মক্	৪৪৪	মঞ্চার	মঞ্চ	৪৫৩	মট্টক	মট্	৪৫৬	মণিপুর	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলবন্ধ	মণ্	৪৫৯
মচ্ছ	মক্	৪৪৪	মঞ্চিকা	মঞ্চ	৪৫৩	মট্টন	মট্	৪৫৬	মণিপুষ্পক	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলভাগ	মণ্	৪৫৯
মচ্ছব	মক্	৪৪৪	মঞ্জ্	মঞ্জ্	৪৫৪	মঠ্	মট্	৪৫৬	মণিবন্ধ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলবর্ত্তী	মণ্	৪৫৯
মচ্ছব	মহ্	৫২১	মঞ্জন	মঞ্জ্	৪৫৩	মঠ	মট্	৪৫৭	মণিবন্ধন	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলবর্ষ	মণ্	৪৫৯
মচ্‌মচ্	মক্	৪৪৭	মঞ্জর	মঞ্জ্	৪৫৪	মঠি	মট্	৪৫৭	মণিবেণে	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলশঃ	মণ্	৪৫৯
মজ	মক্	৪৪৮	মঞ্জরি	মঞ্জ্	৪৫৪	মঠিকা	মট্	৪৫৭	মণিবেদী	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলাকার	মণ্	৪৬২
মজক	মক্	৪৪৪	মঞ্জরিত	মঞ্জ্	৪৫৪	মঠী	মট্	৪৫৭	মণিভদ্র	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলাগ্র	মণ্	৪৫৯
মজকুর	মক্	৪৪৪	মঞ্জরী	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়ক	মট্	৪৫৬	মণিভূ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলাধিপ	মণ্	৪৬২
মজগ	মক্	৪৪৪	মঞ্জরিত	মঞ্জ্	৪৫৩	মড়চা	মট্	৪৫৬	মণিমঞ্জরী	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলাধীশ	মণ্	৪৬২
মজদুর	মক্	৪৪৪	মঞ্জিম	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়মড়	মট্	৪৫৬	মণিমঞ্জীর	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলাবৃত্তি	মণ্	৪৬২
মজদুরি	মক্	৪৪৪	মঞ্জিমা	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়মড়ায়িত	মট্	৪৫৬	মণিমঞ্জীর	মঞ্জ্	৪৫৩	মণ্ডলিত	মণ্	৪৬২
মজবুত	মক্	৪৪৪	মঞ্জিষ্ঠ	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়মড়ি	মট্	৪৫৬	মণিমর্ণিকা	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলি(লী)য়া	মণ্	৪৬২
মজবুতি	মক্	৪৪৪	মঞ্জিষ্ঠা	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়মড়ে	মট্	৪৫৬	মণিমন্তর	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলী	মণ্	৪৬২
মজবুর	মক্	৪৪৪	মঞ্জিষ্ঠারাগ	মঞ্জ্	৪৫৩	মড়া	মট্	৪৫৬	মণিমন্ত্র	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলীকৃত	মণ্	৪৬২
মজবুরি	মক্	৪৪৪	মঞ্জীর	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়া	মৃ	৫৭৩	মণিমন্দির	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলীস্বত্ব	মণ্	৪৬২
মজমুন	মক্	৪৪৪	মঞ্জু	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়াই (মরাই)	মট্	৪৫৬	মণিমালা	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলে	মণ্	৪৫৯
মজলিশ(স)	মক্	৪৪৪	মঞ্জুকেশী	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়াচির	মট্	৪৫৬	মণিমেখলা	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলেশ	মণ্	৪৬২
মজা	মক্	৪৪৮	মঞ্জুগমন	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়াছিয়া	মট্	৪৫৬	মণিযষ্টি	মণ্	৪৫৯	মণ্ডলেশ্বর	মণ্	৪৬২
মজাড়ে	মক্	৪৪৪	মঞ্জুগমনা	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়াঞ্চে	মট্	৪৫৬	মণিয়া	মণ্	৪৫৯	মণ্ডা	মণ্	৪৬১
মজাদার	মক্	৪৪৮	মঞ্জুগীঃ	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়ি	মট্	৪৫৬	মণিরাগ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডিত	মণ্	৪৬১
মজান	মক্	৪৪৮	মঞ্জুগুঞ্জ	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়িঘাটা	মট্	৪৫৬	মণিরাজ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডুক	মণ্	৪৫৯
মজানী	মক্	৪৪৮	মঞ্জুনাশিনী	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়িপুকুর	মট্	৪৫৬	মণিশৈল	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূক	মণ্	৪৫৯
মজারখোলা	মক্	৪৪৪	মঞ্জুনাশী	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়িপোড়া	মট্	৪৫৬	মণিসর	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূকগতি	মণ্	৪৫৯
মজিঠ	মঞ্জ্	৪৫৩	মঞ্জুবাক	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়িপোড়ানী	মট্	৪৫৬	মণিস্তম্ভ	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূকপর্ণী	মণ্	৪৫৯
মজুত	মক্	৪৪৮	মঞ্জুবাদ	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়ুঞ্চে	মট্	৪৫৬	মণিহার	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূকপ্লুত	মণ্	৪৫৯
মজুতদার	মক্	৪৪৮	মঞ্জুবাদিনী	মঞ্জ্	৪৫৪	মড্ডুকবাদ্য	মট্	৪৫৬	মণিহারা	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূকপ্লুতি	মণ্	৪৫৯
মজুদ	মক্	৪৪৪	মঞ্জুবাদী	মঞ্জ্	৪৫৪	মড়িত	মণ্	৪৫৯	মণিহারি(রী)	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূকী	মণ্	৪৫৯
মজুমদার	মক্	৪৪৪	মঞ্জুভাষিণী	মঞ্জ্	৪৫৪	মণ্	মণ্	৪৫৯	মণ্ড্	মণ্	৪৫৯	মণ্ডূর	মণ্	৪৫৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মণ্ডোদক	মণ্	৪৫৯	মত্তেভ	মদ্	৪৬৮	মৎস্যাদ্	মদ্	৪৬৮	মদনক্লিষ্ট	মদ্	৪৬৮	মদব্যাধি	মদ্	৪৬৮
মত	মন্	৪৮৩	মত্তেভগমনা	মদ্	৪৬৮	মৎস্যাবতার	মদ্	৪৭৬	মদনগত	মদ্	৪৬৮	মদভঙ্গ	মদ্	৪৬৮
মতঙ্গ	মদ্	৪৬৮	মত্য	মদ্	৪৬৯	মৎস্যাশন	মদ্	৪৬৮	মদনগৃহ	মদ্	৪৬৮	মদমত্ত	মদ্	৪৬৮
মতঙ্গজ	মদ্	৪৬৮	-মৎ	মন্	৪৮১	মৎস্যাশী	মদ্	৪৬৮	মদনগোপাল	মদ্	৪৭৯	মদমন্থর	মদ্	৪৬৮
মতঙ্গম	মদ্	৪৬৮	মৎ	মদ্	৪৭০	মৎস্যেন্দ্র	মদ্	৪৮০	মদনচতুর্দ্দশী	মদ্	৪৭৯	মদমুক্	মদ্	৪৬৮
মতন	মন্	৪৮৩	মৎ	মা	৫৩১	মৎস্যোদরী	মদ্	৪৬৮	মদনতন্ত্র	মদ্	৪৬৮	মদমোহিত	মদ্	৪৬৮
মতবাদ	মন্	৪৮৩	মৎক	মদ্	৪৭১	মৎস্যোপজীবী	মদ্	৪৬৮	মদনত্রয়োদশী	মদ্	৪৬৮	মদয়ন্তী	মদ্	৪৬৮
মতবাদ	বদ্	২৩৩	মৎকুণ	মদ্	৪৬৮	মথ্	মন্	৪৮১	মদনদমন	মদ্	৪৬৮	মদয়িতা	মদ্	৪৬৮
মতবাদী	মন্	৪৮১	মৎকুণা	মদ্	৪৬৮	মথ	মন্	৪৮১	মদনদলন	মদ্	৪৬৮	মদয়িত্নু	মদ্	৪৬৮
মতভেদ	মন্	৪৮১	মৎকর্ম্ম	মদ্	৪৭১	মথ	মথ্	৪৬৫	মদনদহন	মদ্	৪৬৮	মদর্থে	মদ্	৪৬৮
মতল	মন্	৪৮১	মৎকৃত	মদ্	৪৭১	মথন	মথ্	৪৬৫	মদনদাপুনি	মদ্	৪৬৮	মদর্পিত	মদ্	৪৬৮
মতলব	মন্	৪৮৩	মৎপরায়ন	মদ্	৪৭১	মথন	মন্	৪৮১	মদনদ্বাদশী	মদ্	৪৭৯	মদলেখা	মদ্	৪৬৮
মতলেব	মন্	৪৮১	মৎসদৃশ	মদ্	৪৭১	মথনী	মথ্	৪৬৫	মদনপক্ষী	মদ্	৪৭৯	মদস্থল	মদ্	৪৬৮
মতলেব	ম্	৫৯৯	মৎসর	মদ্	৪৭১	মথনী	মন্	৪৮১	মদনপীড়া	মদ্	৪৬৮	মদস্থান	মদ্	৪৬৮
মতালক	ম্	৫৯৯	মৎসরা	মদ্	৪৬৮	মথি	মন্	৪৮১	মদনবাধা	মদ্	৪৬৮	মদস্রাব	মদ্	৪৬৮
মতাক্ষ	মন্	৪৮১	মৎসরী	মদ্	৪৭১	মথি	মথ্	৪৬৫	মদনমঞ্জরী	মদ্	৪৭৯	মদস্রুতি	মদ্	৪৬৮
মতান্তর	মন্	৪৮৩	মৎসী	মদ্	৪৬৮	মথিত	মথ্	৪৬৫	মদনমথন	মদ্	৪৬৮	মদাতঙ্ক	মদ্	৪৬৮
মতাহিয়া	মন্	৪৮১	মৎস্য	মদ্	৪৭১	মথিত	মন্	৪৮১	মদনমদ	মদ্	৪৬৮	মদাত্যয়	মদ্	৪৬৮
মতি	মন্	৪৮৩	মৎস্যকরণ্ডিকা	মদ্	৪৬৮	মথা	মন্	৪৬৫	মদনমদোন্মাদ	মদ্	৪৬৮	মদান্ধ	মদ্	৪৬৮
মতি	মুচ্	৫৫৪	মৎস্যকেতু	মদ্	৪৭৪	মথা	মথ্	৪৬৫	মদনমহোৎসব	মদ্	৪৭৯	মদাবস্থা	মদ্	৪৬৮
মতিকর্ম্ম	মন্	৪৮১	মৎস্যগন্ধ	মদ্	৪৭৪	মথুরা	মন্	৪৬৫	মদনমোহন	মদ্	৪৭৯	মদালস	মদ্	৪৬৮
মতিকাঁটা	মুচ্	৫৫৪	মৎস্যগন্ধা	মদ্	৪৭৫	মথুরানাথ	মন্	৪৮১	মদনমৌলি	মদ্	৪৬৮	মদালসা	মদ্	৪৬৮
মতিগতি	মন্	৪৮৩	মৎস্যঘণ্ট	মদ্	৪৬৮	মথুরামণ্ডল	মন্	৪৮১	মদনরস	মদ্	৪৬৮	মদি	মদ্	৪৬৯
মতিগর্ভ	মন্	৪৮১	মৎস্যঘাত	মদ্	৪৬৮	মদ্	মদ্	৪৬৮	মদনরসায়ন	মদ্	৪৬৮	মদিকা	মদ্	৪৬৯
মতিচু(চূ)র	মুচ্	৫৫৪	মৎস্যঘাতক	মদ্	৪৬৮	মদ	মদ্	৪৭৭	মদনরিপু	মদ্	৪৬৮	মদির	মদ্	৪৭৭
মতিচ্ছন্ন	মন্	৪৮৩	মৎস্যজীবী	মদ্	৪৬৮	মদক	মদ্	৪৭৭	মদনলতা	মদ্	৪৬৮	মদিরদৃক্	মদ্	৪৬৮
মতিদর্শন	মন্	৪৮১	মৎস্যণ্ডিকা	মদ্	৪৬৮	মদকট	মদ্	৪৬৮	মদনলেখ	মদ্	৪৭৯	মদিরনয়ন	মদ্	৪৬৮
মতিদ্বৈধ	মন্	৪৮১	মৎস্যণ্ডী	মদ্	৪৬৮	মদকরী	মদ্	৪৬৮	মদনলেখা	মদ্	৪৭৯	মদিরলোচন	মদ্	৪৬৮
মতিনিশ্চয়	মন্	৪৮১	মৎস্যদেশ	মদ্	৪৭৬	মদকল	মদ্	৪৬৮	মদনশয়ান	মদ্	৪৬৮	মদিরা	মদ্	৪৭৭
মতিপূর্ব্বক	মন্	৪৮১	মৎস্যদ্বাদশী	মদ্	৪৬৮	মদকারী	মদ্	৪৬৮	মদনশিকলি	মদ্	৪৬৮	মদিরেক্ষণ	মদ্	৪৬৮
মতিপ্রকর্ষ	মন্	৪৮১	মৎস্যধানী	মদ্	৪৬৮	মদখোর	মদ্	৪৬৮	মদনসারিকা	মদ্	৪৭৯	মদিরাগৃহ	মদ্	৪৬৮
মতিবিভ্রম	মন্	৪৮১	মৎস্যধ্বজ	মদ্	৪৬৮	মদগন্ধ	মদ্	৪৬৮	মদনা	মদ্	৪৭৯	মদিরাশালা	মদ্	৪৬৮
মতিভ্রম	মন্	৪৮৩	মৎস্যপুচ্ছ	মদ্	৪৬৮	মদগন্ধা	মদ্	৪৬৮	মদনাতুর	মদ্	৪৬৮	মদিরাসব	মদ্	৪৬৮
মতিমৎ	মন্	৪৮১	মৎস্যপুরাণ	মদ্	৪৬৮	মদগন্ধি	মদ্	৪৬৮	মদনান্তক	মদ্	৪৬৮	মদিরোৎকট	মদ্	৪৬৮
মতিমন্ত	মন্	৪৮১	মৎস্যবন্ধ	মদ্	৪৬৮	মদগল	মদ্	৪৬৮	মদনারি	মদ্	৪৬৮	মদী	মদ্	৪৬৮
মতিমান	মন্	৪৮৩	মৎস্যবন্ধন	মদ্	৪৬৮	মদগুরু	মদ্	৪৬৮	মদনার্ত্ত	মদ্	৪৬৮	মদীয়	মদ্	৪৭৭
মতি(তী)য়া	মুচ্	৫৫৪	মৎস্যবন্ধী	মদ্	৪৬৮	মদচ্যুৎ	মদ্	৪৬৮	মদনালয়	মদ্	৪৭৯	মদেকসদয়	মদ্	৪৬৮
মতিলাল	মন্	৪৮৩	মৎস্যবেধন	মদ্	৪৬৮	মদজল	মদ্	৪৬৮	মদনাসন	মদ্	৪৭৯	মদো	মদ্	৪৬৮
মতিহীন	মন্	৪৮৩	মৎস্যবেধসী	মদ্	৪৬৮	মদৎ	মদ্	৪৬৮	মদনী	মদ্	৪৬৮	মদোৎকট	মদ্	৪৬৮
মত্ত	মদ্	৪৬৯	মৎস্যমাংস	মদ্	৪৬৮	মদদ্বিপ	মদ্	৪৬৮	মদনোৎসব	মদ্	৪৬৮	মদোৎকটা	মদ্	৪৬৮
মত্তকাশিনী	মদ্	৪৬৮	মৎস্যরঙ্ক	মদ্	৪৬৮	মদন	মদ্	৪৭৭	মদনোৎসবা	মদ্	৪৬৮	মদোদগ্র	মদ্	৪৬৮
মত্তগামিনী	মদ্	৪৬৮	মৎস্যরঙ্গ	মদ্	৪৬৮	মদনকড়ি	মদ্	৪৭৮	মদপটু	মদ্	৪৬৮	মদোদ্ধত	মদ্	৪৬৮
মত্তবারণ	মদ্	৪৬৮	মৎস্যসগন্ধী	মদ্	৪৬৮	মদনকণ্টক	মদ্	৪৭৯	মদপ্রসেক	মদ্	৪৬৮	মদোন্মত্ত	মদ্	৪৬৮
মত্তমান	মদ্	৪৬৮	মৎস্যা	মদ্	৪৬৮	মদনকলহ	মদ্	৪৬৮	মদপ্রস্রবণ	মদ্	৪৬৮	মদ্দ	মৃৎ	৫৮৯
মত্তা	মদ্	৪৬৮	মৎস্যাৎ	মদ্	৪৬৮	মদনকুন্ত	মদ্	৪৬৮	মদবিহ্বল	মদ্	৪৬৮	মদ্দনা	মৃৎ	৫৮৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মদ্দানী	মৃৎ ৫৮৯	মধুগয়া	মন্ ৪৮১	মধুভিৎ	মন্ ৪৮১	মধুরী	মন্ ৪৮১	মধ্যদেশীয়	মন্ ৪৮১
মদ্বচন	মদ্ ৪৬৮	মধুগায়ন	মন্ ৪৮৬	মধুমক্ষিকা	মন্ ৪৮১	মধুরুচি	মন্ ৪৮১	মধ্যদেশ্য	মন্ ৪৮১
মদ্বিধ	মদ্ ৪৬৮	মধুচক্র	মন্ ৪৮৭	মধুমঙ্গল	মন্ ৪৮১	মধুলিট্(হ্)	মন্ ৪৮১	মধ্যদেহ	মন্ ৪৮১
মদ্য	মদ্ ৪৭৭	মধুচ্যুৎ	মন্ ৪৮১	মধুমতী	মন্ ৪৮৯	মধুলিহ	মন্ ৪৮১	মধ্যন্দিন	মন্ ৪৮১
মদ্যপ	মদ্ ৫৪	মধুচ্ছদা	মন্ ৪৮৮	মধুমতীসিদ্ধি	মন্ ৪৮১	মধুলেহ	মন্ ৪৮১	মধ্যন্দিনীয়	মন্ ৪৮১
মদ্যপঙ্ক	মদ্ ৪৬৮	মধুছন্দা	মন্ ৪৮৮	মধুমত্ত	মন্ ৪৮১	মধুলেহী	মন্ ৪৮১	মধ্যপথ	মন্ ৪৮১
মদ্যপীত	মদ্ ৪৬৮	মধুচ্ছন্দাঃ(ন্দস্)	মন্ ৪৮৮	মধুমথ	মন্ ৪৮১	মধুশর্করা	মন্ ৪৮১	মধ্যপদ	মন্ ৪৮১
মদ্যবীজ	মদ্ ৪৬৮	মধুজিৎ	মন্ ৪৮১	মধুমথন	মন্ ৪৮১	মধুশিষ্ট	মন্ ৪৮১	মধ্যপদলোপী	মন্ ৪৮১
মদমণ্ড	মদ্ ৪৬৮	মধুজালক	মন্ ৪৮১	মধুমদ্	মন্ ৪৮১	মধুশেষ	মন্ ৪৮১	মধ্যপন্থা	মন্ ৪৮১
মদ্যসন্ধান	মদ্ ৪৬৮	মধুজীব	মন্ ৪৮১	মধুমদ্য	মন্ ৪৮১	মধুশ্চ্যুৎ	মন্ ৪৮১	মধ্যপন্থী	মন্ ৪৮১
মদ্র	মদ্ ৪৭৭	মধুজীবী	মন্ ৪৮১	মধুমন্থ	মন্ ৪৮১	মধুশ্রী	মন্ ৪৮১	মধ্যবয়স্ক	মন্ ৪৮১
মদ্রক	মদ্ ৪৬৮	মধুত্রয়	মন্ ৪৮১	মধুমল্লি(ল্লী)	মন্ ৪৮৯	মধুসখ	মন্ ৪৮১	মধ্যবয়াঃ	মন্ ৪৮১
মদ্রনাথ	মদ্ ৪৬৮	মধুদ্রুম	মন্ ৪৮১	মধুমস্তক	মন্ ৪৮১	মধুসখা	মন্ ৪৮১	মধ্যবর্ত্তী(র্ত্তিন্)	মন্ ৪৮১
মদ্রপ	মদ্ ৪৬৮	মধুদ্বিট্	মন্ ৪৮১	মধুমাখা	মন্ ৪৮১	মধুসহায়	মন্ ৪৮১	মধ্যবিৎ(দ্)	মন্ ৪৮১
মদ্ররাজ	মদ্ ৪৬৮	মধুধাতু	মন্ ৪৮১	মধুমাছি	মন্ ৪৮১	মধুসারথি	মন্ ৪৮১	মধ্যবিত্ত	মন্ ৪৮১
মদ্ররায়	মদ্ ৪৬৮	মধুনাড়ী	মন্ ৪৮১	মধুমাধব	মন্ ৪৮১	মধুসুহৃৎ	মন্ ৪৮১	মধ্যভক্ত	মন্ ৪৮১
মদ্রসুতা	মদ্ ৪৬৮	মধুনির্গম	মন্ ৪৮১	মধুমাধবী	মন্ ৪৮৯	মধুসূদন	মন্ ৪৯০	মধ্যভাগ	মন্ ৪৮১
মদ্রিকা	মদ্ ৪৬৮	মধুনিশা	মন্ ৪৮৮	মধুমাধ্বীক	মন্ ৪৮১	মধুস্রব	মন্ ৪৮১	মধ্যম	মন্ ৪৮৪
মদ্রী	মদ্ ৪৬৮	মধুনিষূদন	মন্ ৪৮১	মধুমান(মৎ)	মন্ ৪৮৯	মধুস্রবাঃ	মন্ ৪৮১	মধ্যমকক্ষা	মন্ ৪৮১
মদ্রেশ	মদ্ ৪৬৮	মধুপ	মন্ ৫৪	মধুমাস	মন্ ৪৮৯	মধুহা(হন্)	মন্ ৪৮১	মধ্যমগ্রাম	মন্ ৪৮১
মদ্রেশ্বর	মদ্ ৪৬৮	মধুপক্ক	মন্ ৪৮১	মধুমুরনরকবিনাশন	মন্ ৪৮১	মধুহারী	মন্ ৪৮১	মধ্যমণি	মন্ ৪৮১
মদ্‌গুর	মদ্ ৪৬৮	মধুপটল	মন্ ৪৮১	মধুমেহ	মন্ ৪৮১	মধূক	মন্ ৪৮১	মধ্যমপাণ্ডব	মন্ ৪৮১
মদ্‌গু	মক্ ৪৪৪	মধুপতি	মন্ ৪৮৮	মধুযষ্টি	মন্ ৪৮১	মধূচ্ছিষ্ট	মন্ ৪৮১	মধ্যমবয়ঃ	মন্ ৪৮১
মদ্‌গুর	মক্ ৪৪৪	মধুপবন	মন্ ৪৮৮	মধুযষ্টিকা	মন্ ৪৮১	মধূত্থ	মন্ ৪৮১	মধ্যমবয়স্ক	মন্ ৪৮১
মধাই	মন্ ৪৮১	মধুপর্ক	মন্ ৪৮১	মধুযামিনী	মন্ ৪৮৮	মধূত্থিত	মন্ ৪৮১	মধ্যমলোক	মন্ ৪৮১
মধি (মধ্য)	মন্ ৪৮১	মধুপর্ক্য	মন্ ৪৮১	মধুর	মন্ ৪৮৪	মধূৎসব	মন্ ৪৮১	মধ্যমসংগ্রহ	মন্ ৪৮১
মধু	মন্ ৪৮৪	মধুপর্ণিকা	মন্ ৪৮১	মধুরত্রয়	মন্ ৪৮১	মধূদ্যান	মন্ ৪৮১	মধ্যমসাহস	মন্ ৪৮১
মধুক	মন্ ৪৮১	মধুপাত্র	মন্ ৪৮১	মধুরভাষিতা	মন্ ৪৮১	মধূপঘ্ন	মন্ ৪৮১	মধ্যমা	মন্ ৪৮১
মধুকণ্ঠ	মন্ ৪৮৬	মধুপাল	মন্ ৪৮৯	মধুরভাষী	মন্ ৪৮১	মধূলক	মন্ ৪৮১	মধ্যমান	মন্ ৪৮১
মধুকর	মন্ ৪৮৬	মধুপালী	মন্ ৪৮১	মধুরমধুর	মন্ ৪৮১	মধ্য	মন্ ৪৮৪	মধ্যমোপল	মন্ ৪৮১
মধুকরী	মন্ ৪৮১	মধুপিঙ্গল	মন্ ৪৮১	মধুররস	মন্ ৪৮১	মধ্যকাল	মন্ ৪৮১	মধ্যযব	মন্ ৪৮১
মধুকারী	মন্ ৪৮১	মধুপী	মন্ ৪৮১	মধুরস	মন্ ৪৮১	মধ্যগ	মন্ ৪৮১	মধ্যরত্ন	মন্ ৪৮১
মধুকাল	মন্ ৪৮৬	মধুপুর	মন্ ৪৮১	মধুরসা	মন্ ৪৮১	মধ্যগত	মন্ ৪৮১	মধ্যরাত্র	মন্ ৪৮১
মধুকুল্যা	মন্ ৪৮৬	মধুপুরী	মন্ ৪৮৯	মধুরা	মন্ ৪৮১	মধ্যগাঙ্গ	মন্ ৪৮১	মধ্যরাত্রি	মন্ ৪৮১
মধুকৃৎ	মন্ ৪৮১	মধুপুষ্প	মন্ ৪৮১	মধুরাই	মন্ ৪৮১	মধ্যগ্রহণ	মন্ ৪৮১	মধ্যরেখা	মন্ ৪৮১
মধুকৈটভ	মন্ ৪৮৭	মধুপূর্ণিমা	মন্ ৪৮৯	মধুরাক্ষর	মন্ ৪৮১	মধ্যচারী	মন্ ৪৮১	মধ্যলোক	মন্ ৪৮১
মধুকৈটভারি	মন্ ৪৮১	মধুপ্রমেহ	মন্ ৪৮১	মধুরাম্ল	মন্ ৪৮১	মধ্যছন্দ	মন্ ৪৮১	মধ্যলোপ	মন্ ৪৮১
মধুকোশ(ষ)	মন্ ৪৮৭	মধুপ্রিয়	মন্ ৪৮১	মধুরাম্লক	মন্ ৪৮১	মধ্যজ	মন্ ৪৮১	মধ্যসূত্র	মন্ ৪৮১
মধুক্রম	মন্ ৪৮১	মধুপ্লুত	মন্ ৪৮১	মধুরালাপ	মন্ ৪৮১	মধ্যত	মন্ ৪৮১	মধ্যস্থ	মন্ ৪৮১
মধুক্ষর	মন্ ৪৮১	মধুবন	মন্ ৪৮৯	মধুরালাপা	মন্ ৪৮১	মধ্যতরঙ্গ	মন্ ৪৮১	মধ্যস্থতা	মন্ ৪৮১
মধুক্ষরা	মন্ ৪৮১	মধুবল্লী	মন্ ৪৮১	মধুরি	মন্ ৪৮১	মধ্যদন্ত	মন্ ৪৮১	মধ্যস্থল	মন্ ৪৮১
মধুক্ষীর	মন্ ৪৮১	মধুবার	মন্ ৪৮১	মধুরিকা	মন্ ৪৮১	মধ্যদহ	মন্ ৪৮১	মধ্যাঙ্গুলি(লী)	মন্ ৪৮১
মধুখর্জ্জুরী	মন্ ৪৮১	মধুব্রত	মন্ ৪৮৯	মধুরিপু	মন্ ৪৮১	মধ্যদিন	মন্ ৪৮১	মধ্যান্ত	মন্ ৪৮১
মধুগন্ধি(ন্ধিন্)	মন্ ৪৮১	মধুব্রতী	মন্ ৪৮১	মধুরিম	মন্ ৪৮১	মধ্যদীপক	মন্ ৪৮১	মধ্যায়ন	মন্ ৪৮১
মধুগন্ধী	মন্ ৪৮১	মধুভিক্ষু	মন্ ৪৮১	মধুরিমা	মন্ ৪৮১	মধ্যদেশ	মন্ ৪৮১	মধ্যাহ্ন	মন্ ৪৮১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মধ্যে	মন্ ৪৮১	মন-না-মতি	মন্ ৪৮১	মনীষী	মন্ ৪৯৩	মনোজন্মা	মন্ ৪৮১	মনোরথসিদ্ধি	মন্ ৪৮১
মধ্ব	মন্ ৪৯০	মন-পবন	মন্ ৪৮১	মনু	মন্ ৪৯৩	মনোজব	মন্ ৪৮১	মনোরম	মন্ ৪৮১
মধ্বক্ষ	মন্ ৪৮১	মনমথ	মন্ ৪৮১	মনুজ	মন্ ৪৯৩	মনোজ্ঞ	মন্ ৪৮১	মনোরমা	মন্ ৪৮১
মধ্বাচার্য্য	মন্ ৪৯০	মনমরা	মন্ ৪৮১	মনুজনাথ	মন্ ৪৮১	মনোজ্ঞা	মন্ ৪৮১	মনোরম্য	মন্ ৪৮১
মধ্বাপাত	মন্ ৪৮১	মনমর্জ্জি	মন্ ৪৮১	মনুজপতি	মন্ ৪৮১	মনোদণ্ড	মন্ ৪৮১	মনোলোভা	মন্ ৪৮১
মধ্বালুক	মন্ ৪৮১	মনসব	মন্ ৪৮১	মনুজব্যাঘ্র	মন্ ৪৮১	মনোদুষ্ট	মন্ ৪৮১	মনোসাধ	মন্ ৪৮১
মধ্বাসব	মন্ ৪৮১	মনসবদার	মন্ ৪৮১	মনুজরাজ	মন্ ৪৮১	মনোধন্ধ	মন্ ৪৮১	মনোহত	মন্ ৪৮১
মধ্বাসবিক	মন্ ৪৮১	মনসবা	মন্ ৪৮১	মনুজলোক	মন্ ৪৮১	মনোনাশ	মন্ ৪৮১	মনোহর	মন্ ৪৮১
মধ্বিজা	মন্ ৪৮১	মনসা	মন্ ৪৯২	মনুজা	মন্ ৪৯৩	মনোনীত	মন্ ৪৮১	মনোহরশাহী	মন্ ৪৮১
মন্	মন্ ৪৮১	মনসাদেবী	মন্ ৪৮১	মনুজাত	মন্ ৪৮১	মনোনুকূল	মন্ ৪৮১	মনোহরা	মন্ ৪৮১
মন	মন্ ৪৯১	মনসাপঞ্চমী	মন্ ৪৮১	মনুজাধিপ	মন্ ৪৮১	মনোনুগ	মন্ ৪৮১	মনোহর্ত্তা	মন্ ৪৮১
মন-আপ	মন্ ৪৮১	মনসি	মন্ ৪৮১	মনুজাধিপতি	মন্ ৪৮১	মনোবন্ধু	মন্ ৪৮১	মনোহারী	মন্ ৪৮১
মনঃ	মন্ ৪৯১	মনসিজ	মন্ ৪৮১	মনুজী	মন্ ৪৯৩	মনোবল	মন্ ৪৮১	মনোহিত	মন্ ৪৮১
মনঃকথা	মন্ ৪৮১	মনসিজরুক্	মন্ ৪৮১	মনুজেন্দ্র	মন্ ৪৯৩	মনোবাঙ্মূর্ত্তি	মন্ ৪৮১	মনোহৃৎ	মন্ ৪৮১
মনঃকল্পিত	মন্ ৪৮১	মনসিশয়	মন্ ৪৮১	মনুজেশ্বর	মন্ ৪৮১	মনোবাঞ্ছা	মন্ ৪৮১	মন্ত	মন্ ৪৮১
মনঃকষ্ট	মন্ ৪৮১	মনসুবা	মন্ ৪৮১	মনুভু	মন্ ৪৮১	মনোবাঞ্ছিত	মন্ ৪৮১	মন্তর	মন্ ৪৮১
মনঃক্ষুণ্ণ	মন্ ৪৮১	মনস্কান্ত	মন্ ৪৮১	মনুমেন্ট	মন্ ৪৮১	মনোবিকার	মন্ ৪৮১	মন্তব্য	মন্ ৪৯১
মনঃক্ষেপ	মন্ ৪৮১	মনস্কাম	মন্ ৪৮১	মনুযুগ	মন্ ৪৮১	মনোবিনয়ন	মন্ ৪৮১	মন্তা	মন্ ৪৮১
মনঃক্ষোভ	মন্ ৪৮১	মনস্কার	মন্ ৪৮১	মনুরা	মন্ ৪৮১	মনোবিরুদ্ধ	মন্ ৪৮১	মন্তু	মন্ ৪৮১
মনঃপীড়া	মন্ ৪৮১	মনস্তাপ	মন্ ৪৮১	মনুষী	মন্ ৪৮১	মনোবিষয়	মন্ ৪৮১	মন্তুয়	মন্ ৪৮১
মনঃপূত	মন্ ৪৮১	মনস্তুষ্টি	মন্ ৪৮১	মনুষ্য	মন্ ৪৯৫	মনোবৃত্তি	মন্ ৪৮১	মন্ত্র্	মন্ ৪৮১
মনঃপ্রণীত	মন্ ৪৮১	মনস্থ	মন্ ৪৮১	মনুষ্যত্ব	মন্ ৪৯৭	মনোবেগ	মন্ ৪৮১	মন্ত্র	মন্ ৪৯৯
মনঃপ্রসাদ	মন্ ৪৮১	মনস্পথো	মন্ ৪৮১	মনুষ্যদুর্গ	মন্ ৪৯৮	মনোব্যথা	মন্ ৪৮১	মন্ত্রকরণ	মন্ ৪৮১
মনঃশল্য	মন্ ৪৮১	মনস্বিনী	মন্ ৪৮১	মনুষ্যদেব	মন্ ৪৯৮	মনোভঙ্গ	মন্ ৪৮১	মন্ত্রকার	মন্ ৪৮১
মনঃশিল	মন্ ৪৮১	মনস্বী(স্বিন্)	মন্ ৪৮১	মনুষ্যধর্ম্ম	মন্ ৪৯৮	মনোভব	মন্ ৪৮১	মন্ত্রকাল	মন্ ৪৮১
মনঃশিলা	মন্ ৪৮১	মনাক্	মন্ ৪৮১	মনুষ্যধর্ম্মা	মন্ ৪৯৮	মনোভিরাম	মন্ ৪৮১	মন্ত্রকুশল	মন্ ৪৯৯
মনঃশীঘ্র	মন্ ৪৮১	মনাক্কা	ম্ ৫৯৯	মনুষ্যমারণ	মন্ ৪৮১	মনোভীষ্ট	মন্ ৪৮১	মন্ত্রকৃৎ	মন্ ৪৯৯
মনঃষষ্ঠ	মন্ ৪৮১	মনাগুণ(ন)	মন্ ৪৮১	মনুষ্যযজ্ঞ	মন্ ৪৮১	মনোভূ	মন্ ৪৮১	মন্ত্রকোবিদ	মন্ ৪৮১
মনঃসঙ্গ	মন্ ৪৮১	মনান্তর	মন্ ৪৮১	মনুষ্যযান	মন্ ৪৮১	মনোমত	মন্ ৪৮১	মন্ত্রগুপ্তি	মন্ ৪৯৯
মনঃসমুন্নতি	মন্ ৪৮১	মনি(ণি)	মন্ ৪৮১	মনুষ্যযোনি	মন্ ৪৮১	মনোমথ	মন্ ৪৮১	মন্ত্রগূঢ়	মন্ ৪৮১
মনঃসুখ	মন্ ৪৮১	মনি-অর্ডার	মন্ ৪৮১	মনুষ্যলোক	মন্ ৪৮১	মনোমথন	মন্ ৪৮১	মন্ত্রগৃহ	মন্ ৪৮১
মনঃস্থ	মন্ ৪৮১	মনিত	মন্ ৪৯১	মনুষ্যশৃঙ্গ	মন্ ৪৮১	মনোময়	মন্ ৪৮১	মন্ত্রজ	মন্ ৪৮১
মনঃস্থৈর্য্য	মন্ ৪৮১	মনিব	মন্ ৪৮১	মনুষ্যসভা	মন্ ৪৮১	মনোমালা	মন্ ৪৮১	মন্ত্রজ্ঞ	মন্ ৪৯৯
মনঃস্পৃক্	মন্ ৪৮১	মনিবঠাকুর	মন্ ৪৮১	মনুষ্যহারী	মন্ ৪৮১	মনোমালিন্য	মন্ ৪৮১	মন্ত্রণ	মন্ ৪৯৯
মনকথন	মন্ ৪৮১	মনিবঠাকরুণ	মন্ ৪৮১	মনুষ্যেন্দ্র	মন্ ৪৮১	মনোমুগ্ধকর	মন্ ৪৮১	মন্ত্রণা	মন্ ৪৯৯
মনকথা	মন্ ৪৮১	মনিবানা	মন্ ৪৮১	মনুষ্যেশ্বর	মন্ ৪৮১	মনোমুগ্ধকারী	মন্ ৪৮১	মন্ত্রণালয়	মন্ ৪৯৯
মনকলা	মন্ ৪৮১	মনি-ব্যাগ	মন্ ৪৮১	মনুহর	মন্ ৪৮১	মনোমোহন	মন্ ৪৮১	মন্ত্রতন্ত্র	মন্ ৫০০
মনকষাকষি	মন্ ৪৮১	মনিষ	মন্ ৪৮১	মনে	মন্ ৪৮১	মনোমোহা	মন্ ৪৮১	মন্ত্রদ	মন্ ৪৮১
মন-খুঁতখুঁতে	মন্ ৪৮১	মনিষ্য	মন্ ৪৮১	মনে-মনে	মন্ ৪৮১	মনোমোহিনী	মন্ ৪৮১	মন্ত্রদর্শী	মন্ ৪৮১
মনখোলসা	মন্ ৪৮১	মনিস্য	মন্ ৪৮১	মনোগত	মন্ ৪৮১	মনোযায়ী	মন্ ৪৮১	মন্ত্রদাতা	মন্ ৪৮১
মনগড়া	মন্ ৪৮১	মনিস্যি	মন্ ৪৮১	মনোগতি	মন্ ৪৮১	মনোযোগ	মন্ ৪৮১	মন্ত্রদৃক্(দৃশ্)	মন্ ৪৮১
মনচোর	মন্ ৪৮১	মনিস্ব	মন্ ৪৮১	মনোগ্রহণ	মন্ ৪৮১	মনোরঞ্জন	মন্ ৪৮১	মন্ত্রদেবতা	মন্ ৪৮১
মনচোরা	মন্ ৪৮১	মনীষা	মন্ ৪৯৩	মনোগ্রাহী(হিন্)	মন্ ৪৮১	মনোরথ	মন্ ৪৮১	মন্ত্রদ্রষ্টা	মন্ ৪৮১
মনঝুরী	মন্ ৪৮১	মনীষিকা	মন্ ৪৮১	মনোগ্রাহ্য	মন্ ৪৮১	মনোরথবন্ধ	মন্ ৪৮১	মন্ত্রধর	মন্ ৪৮১
মনন	মন্ ৪৯১	মনীষিত	মন্ ৪৮১	মনোজ	মন্ ৪৮১	মনোরথমোদক	মন্ ৪৮১	মন্ত্রধারী	মন্ ৪৮১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মন্ত্রপত্র	মন্ ৪৮১	মন্থদণ্ডক	মন্ ৪৮১	মন্দমতি	মন্ ৪৮১	মন্মথসুহৃৎ	মন্ ৪৮১	ময়লা	ম্লেচ্ছ্ ৫৩৮
মন্ত্রপূত	মন্ ৫০০	মন্থপর্ব্বত	মন্ ৪৮১	মন্দমন্দ	মন্ ৪৮১	মন্মথাবিষ্ট	মন্ ৪৮১	ময়লাটে	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭
মন্ত্রপ্রযুক্তি	মন্ ৪৮১	মন্থবিষ্কম্ভ	মন্ ৪৮১	মন্দমেধা	মন্ ৪৮১	মন্মথালয়	মন্ ৪৮১	ময়া	মি ৫৩৮
মন্ত্রপ্রয়োগ	মন্ ৪৮১	মন্থশৈল	মন্ ৪৮১	মন্দর	মন্ ৫০২	মন্মন	মন্ ৪৮১	ময়াজি(জী)	ম্ ৫৯৯
মন্ত্রফাঁস	মন্ ৪৮১	মন্থন	মন্ ৫০১	মন্দরা	মন্ ৪৮১	মন্মনঃ	মন্ ৪৮১	ময়ান	মি ৫৩৮
মন্ত্রবচন	মন্ ৪৮১	মন্থনঘটী	মন্ ৪৮১	মন্দরশ্মি	মন্ ৪৮১	মন্মনাঃ	মন্ ৪৮১	ময়াল	মহ্ ৫২১
মন্ত্রবান(বৎ)	মন্ ৪৮১	মন্থনপাত্র	মন্ ৪৮১	মন্দশিশির	মন্ ৪৮১	মন্যা	মন্ ৪৮১	ময়ালি	মহ্ ৫২১
মন্ত্রবাদী	মন্ ৪৮১	মন্থনদণ্ড	মন্ ৫০১	মন্দসন্দ	মন্ ৪৮১	মন্যু	মন্ ৫০৫	ময়ূখ	মা ৫৩১
মন্ত্রবিৎ(দ্)	মন্ ৪৮১	মন্থনযন্ত্রক	মন্ ৪৮১	মন্দস্মিত	মন্ ৪৮১	মন্যুপরীত	মন্ ৪৮১	ময়ূখমালা	মা ৫৩১
মন্ত্রবিদ্যা	মন্ ৪৮১	মন্থনী	মন্ ৫০১	মন্দহাস	মন্ ৪৮১	মন্যুময়	মন্ ৫০৫	ময়ূখমালিকা	মা ৫৩১
মন্ত্রভবন	মন্ ৪৮১	মন্থর	মন্ ৫০১	মন্দহাস্য	মন্ ৪৮১	মন্যুমান(মৎ)	মন্ ৫০৫	ময়ূখমালী	মা ৫৩১
মন্ত্রভেদ	মন্ ৪৮১	মন্থরগামী	মন্ ৪৮১	মন্দা	মন্ ৫০৩	মন্বন্তর	মন্ ৪৯৩	ময়ূখী	মা ৫৩১
মন্ত্রমুগ্ধ	মন্ ৪৮১	মন্থরবিবেক	মন্ ৪৮১	মন্দাকিনী	মন্ ৫০৩	মফঃসল	ম্ ৫৯৯	ময়ূর	মী ৫৫২
মন্ত্রমূর্ত্তি	মন্ ৪৮১	মন্থরা	মন্ ৫০১	মন্দাক্রান্তা	মন্ ৫০২	মফঃস্বল	ম্ ৫৯৯	ময়ূরকণ্ঠ	মী ৫৫২
মন্ত্রমূল	মন্ ৪৮১	মন্থা	মন্ ৪৮১	মন্দাক্ষ	মন্ ৫০৩	মফস্বল	ম্ ৫৯৯	ময়ূরকণ্ঠি(ণ্ঠী)	মী ৫৫২
মন্ত্রযন্ত্র	মন্ ৪৮১	মন্থাচল	মন্ ৫০১	মন্দাগ্নি	মন্ ৪৮১	ম-ফলা	ম্ ৫৯৯	ময়ূরকেতু	মী ৫৫২
মন্ত্রযুক্তি	মন্ ৪৮১	মন্থাদ্রি	মন্ ৫০১	মন্দাত্মা	মন্ ৪৮১	মবলগ	ম্ ৫৯৯	ময়ূরগ্রীব	মী ৫৫২
মন্ত্রযোগ	মন্ ৪৮১	মন্থান	মন্ ৪৮১	মন্দাদর	মন্ ৪৮১	মবারক	ম্ ৫৯৯	ময়ূরতুত্থ	মী ৫৫২
মন্ত্রসংবরণ	মন্ ৪৮১	মন্থিত	মন্ ৪৮১	মন্দানল	মন্ ৪৮১	মম	মন্ ৫০৫	ময়ূরপঙ্খী	মী ৫৫২
মন্ত্রসংস্কার	মন্ ৪৮১	মন্থিনী	মন্ ৪৮১	মন্দায়ুঃ	মন্ ৪৮১	ম-ম করা	মন্ ৫৯৯	ময়ূরপত্রী	মী ৫৫২
মন্ত্রসংহিতা	মন্ ৪৮১	মন্থী	মন্ ৪৮১	মন্দার	মন্ ৫০৩	মমকার	মন্ ৫০৫	ময়ূরপদক	মী ৫৫২
মন্ত্রসাধন	মন্ ৪৮১	মন্দ্	মন্ ৪৮১	মন্দারক	মন্ ৪৮১	মমকৃত্য	মন্ ৫০৫	ময়ূরপিচ্ছ	মী ৫৫২
মন্ত্রসিদ্ধ	মন্ ৪৮১	মন্দ	মন্ ৫০১	মন্দারমালা	মন্ ৫০৪	মমতা	মন্ ৫০৫	ময়ূরপুচ্ছ	মী ৫৫২
মন্ত্রসূত্র	মন্ ৪৮১	মন্দকর্ণ	মন্ ৫০২	মন্দারমালিকা	মন্ ৫০৪	মমতাময়	মন্ ৪৮১	ময়ূরপেখম	মী ৫৫২
মন্ত্রস্নান	মন্ ৪৮১	মন্দকারী	মন্ ৪৮১	মন্দারষষ্ঠী	মন্ ৪৮১	মমতাময়ী	মন্ ৫০৫	ময়ূরব্যংসক	মী ৫৫২
মন্ত্রস্তুতি	মন্ ৪৮১	মন্দগ	মন্ ৫০২	মন্দারসপ্তমী	মন্ ৪৮১	মমতাযুক্ত	মন্ ৫০৫	ময়ূররথ	মী ৫৫২
মন্ত্রারাধন	মন্ ৪৮১	মন্দগতি	মন্ ৫০২	মন্দির	মন্ ৫০৪	মমতাশূন্য	মন্ ৫০৫	ময়ূরশাল	মী ৫৫২
মন্ত্রি	মন্ ৪৮১	মন্দগমন	মন্ ৫০২	মন্দিরা	মন্ ৫০৪	মমত্ব	মন্ ৫০৫	ময়ূরশিখা	মী ৫৫২
মন্ত্রিণী	মন্ ৪৮১	মন্দগামী	মন্ ৫০২	মন্দীভূত	মন্ ৪৮১	মমি	ম্ ৫৯৯	ময়ূরিণী	মী ৫৫২
মন্ত্রিত	মন্ ৪৮১	মন্দগ্রহ	মন্ ৫০২	মন্দুরা	মন্ ৪৮১	ময়	মি ৫৩৮	ময়ূরী	মী ৫৫২
মন্ত্রী	মন্ ৪৯৯	মন্দচেতাঃ	মন্ ৪৮১	মন্দুরাপতি	মন্ ৪৮১	ময়ঙ্ক	মি ৫৩৮	মর	মৃ ৫৭৫
মন্ত্রীপতি	মন্ ৪৮১	মন্দছন্দ	মন্ ৫০২	মন্দুরাপাল	মন্ ৪৮১	ময়ঙ্ক	মৃগ্ ৫৮৩	মরক	মৃ ৫৭৩
মন্ত্রীপ্রধান	মন্ ৪৮১	মন্দচ্ছায়	মন্ ৪৮১	মন্দুরাসংশ্রয়ী	মন্ ৪৮১	ময়ট্	মি ৫৩৮	মরকট	মৃ ৫৭৩
মন্ত্রীবর	মন্ ৪৮১	মন্দধার	মন্ ৪৮১	মন্দোৎকণ্ঠ	মন্ ৪৮১	ময়দা	মি ৫৩৮	মরণ	মৃ ৫৭৫
মন্ত্রীমুখ্য	মন্ ৪৮১	মন্দধী	মন্ ৪৮১	মন্দোৎসাহ	মন্ ৪৮১	ময়দান	মি ৫৩৮	মরণান্তক	মৃ ৫৭৩
মন্ত্রীরাজ	মন্ ৪৮১	মন্দপুণ্য	মন্ ৪৮১	মন্দোদরী	মন্ ৫০৪	ময়দানব	মি ৫৪০	মরকত	মৃ ৫৭৩
মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ	মন্ ৪৮১	মন্দপ্রজ্ঞ	মন্ ৪৮১	মন্দোষ্ণ	মন্ ৪৮১	ময়ন	মি ৫৩৮	মরকতমণি	মৃ ৫৭৩
মন্ত্রীশ্রোত্রিয়	মন্ ৪৮১	মন্দবিভব	মন্ ৪৮১	মন্দ্র	মন্ ৪৮১	ময়না	মি ৪৭৯	মরকতময়	মৃ ৫৭৩
মন্ত্রোদক	মন্ ৪৮১	মন্দবিষ	মন্ ৪৮১	মন্দ্রিত	মন্ ৪৮১	ময়নামতী	মি ৪৭৯	মরকতশকল	মৃ ৫৭৩
মন্থ্	মন্ ৪৮১	মন্দবিসর্পী	মন্ ৪৮১	মন্মথ	মন্ ৫০৫	ময়মত	মদ্ ৪৬৮	মরকতশিলা	মৃ ৫৭৩
মন্থ	মন্ ৫০১	মন্দবুদ্ধি	মন্ ৪৮১	মন্মথকর	মন্ ৪৮১	ময়মত্ত	মদ্ ৪৬৮	মরকতশ্যাম	মৃ ৫৭৩
মন্থগিরি	মন্ ৪৮১	মন্দভাঃ	মন্ ৪৮১	মন্মথবন্ধু	মন্ ৪৮১	ময়মদ	মদ্ ৪৬৮	মরণকাঁপুনি	মৃ ৫৭৩
মন্থগুণ	মন্ ৪৮১	মন্দভাস্	মন্ ৪৮১	মন্মথমোহিনী	মন্ ৪৮১	ময়রা	মুদ্ ৫৬২	মরণকাঠি	মৃ ৫৭৩
মন্থজ	মন্ ৫০১	মন্দভাগী	মন্ ৪৮১	মন্মলেখ	মন্ ৪৮১	ময়রাণী	মুদ্ ৫৬২	মরণকামড়	মৃ ৫৭৩
মন্থদণ্ড	মন্ ৪৮১	মন্দভাগ্য	মন্ ৪৮১	মন্মথসখ	মন্ ৪৮১	ময়রাপটী	মুদ্ ৫৬২	মরণপাখা	মৃ ৫৭৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মরণবাঁচন	মৃ ৫৭৩	মরীচ	মৃ ৫৭৫	মর্কটতিন্দুক	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মভেদন	মৃ ৫৭৩	মলদ্রাবী	মল্ ৫১৬
মরণবাড়	মৃ ৫৭৩	মরীচি	মৃ ৫৭৫	মর্কটবাস	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মভেদী	মৃ ৫৭৩	মলদ্বার	মল্ ৫১৬
মরণান্ত	মৃ ৫৭৩	মরীচিকা	মৃ ৫৭৫	মর্কটবৈরাগ্য	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মর	মৃ ৫৭৮	মলধাত্রী	মল্ ৫১৬
মরণান্তক	মৃ ৫৭৩	মরীচিগর্ভ	মৃ ৫৭৩	মর্কটশীর্ষ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মরিত	মৃ ৫৭৩	মলন	মল্ ৫১৬
মরণাপন্ন	মৃ ৫৭৩	মরীচিতোয়	মৃ ৫৭৩	মর্কটী	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মরী	মৃ ৫৭৩	মলন	মৃৎ ৫৮৯
মরণাশৌচ	মৃ ৫৭৩	মরীচিপ	মৃ ৫৭৩	মর্জ্জ	মৃজ্ ৫৮৭	মর্ম্মস্থল	মৃ ৫৭৩	মলনা	ম্ ৫৯৯
মরণোন্মুখ	মৃ ৫৭৩	মরীচিমালী	মৃ ৫৭৫	মর্জ্জি	মৃজ্ ৫৮৭	মর্ম্মস্থান	মৃ ৫৭৩	মলপঙ্কী	মল্ ৫১৬
মরত	মৃ ৫৭৩	মরীচী	মৃ ৫৭৩	মর্জ্জিনা	মৃজ্ ৫৮৭	মর্ম্মস্পৃক্	মৃ ৫৭৩	মলপৃষ্ঠ	মল্ ৫১৬
মরদ	মৃৎ ৫৮৯	মরীয়া	মৃ ৫৭৩	মর্জ্জী	মৃজ্ ৫৮৭	মর্ম্মহা	মৃ ৫৭৩	মলবাহী	মল্ ৫১৬
মরদানা	মৃৎ ৫৮৯	মরু	মৃ ৫৭৬	মর্টগেজ	ম্ ৫৯৯	মর্ম্মাঘাত	মৃ ৫৭৩	মলবিশোধন	মল্ ৫১৬
মরদানি	মৃৎ ৫৮৯	মরুকচ্ছ	মৃ ৫৭৩	মর্ত্ত	মৃ ৫৭৭	মর্ম্মাতিগ	মৃ ৫৭৩	মলবিষ্টম্ভ	মল্ ৫১৬
মরন্দ	মক্ ৪৪৪	মরুজা	মৃ ৫৭৩	মর্ত্তব্য	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মান্তিক	মৃ ৫৭৮	মলবিসর্গ	মল্ ৫১৬
মরম	মৃ ৫৭৩	মরুৎ	মৃ ৫৭৬	মর্ত্তমান	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মাবরণ	মৃ ৫৭৩	মলবিসর্জ্জন	মল্ ৫১৬
মরমর	মৃ ৫৭৩	মরুৎকর্ম্ম	মৃ ৫৭৩	মর্ত্ত্য	মৃ ৫৭৭	মর্ম্মাবিৎ(ধ্)	মৃ ৫৭৩	মলবেগ	মল্ ৫১৬
মরমি(মী)	মৃ ৫৭৩	মরুৎকোণ	মৃ ৫৭৩	মর্ত্ত্যলোক	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মাহত	মৃ ৫৭৮	মলভেদিনী	মল্ ৫১৬
মরভূমি	মৃ ৫৭৩	মরুৎপট	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দ	মৃৎ ৫৮৯	মর্ম্মিক	মৃ ৫৭৩	মলম	মৃৎ ৫৮৯
মরষ(স)	মৃশ্ ৫৯০	মরুৎপতি	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দক	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদা	মৃ ৫৭৮	মলম	ম্ ৫৯৯
মরস্থান	মৃ ৫৭৩	মরুৎপথ	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দন	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদাঅচল	মৃ ৫৭৯	মলমথন	মল্ ৫১৬
মরা	মৃ ৫৭৫	মরুৎপাল	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দনিয়া	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদাগিরি	মৃ ৫৭৯	মলমল	ম্ ৫৯৯
মরাই	মৃ ৫৭৫	মরুৎপুত্র	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দনীয়	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদাতিক্রম	মৃ ৫৭৯	মলমাস	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭
মরা-কটাল	মৃ ৫৭৩	মরুৎসখ	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দল	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদাপর্ব্বত	মৃ ৫৭৯	মলম্বা	ম্ ৫৯৯
মরা-কান্না	মৃ ৫৭৩	মরুৎসুত	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দানা	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা	মৃ ৫৮০	মলয়	মল্ ৫১৮
মরা-গাঙ	মৃ ৫৭৩	মরুৎসূনু	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দানী	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদাভেদক	মৃ ৫৭৩	মলয়গিরি	মল্ ৫১৬
মরা-চামড়া	মৃ ৫৭৩	মরুত	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দিত	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদামত্ত	মৃ ৫৭৩	মলয়জ	মল্ ৫১৮
মরা-জরা	মৃ ৫৭৩	মরুত্ত	মৃ ৫৭৭	মর্দ্দিতব্য	মৃৎ ৫৮৯	মর্য্যাদী	মৃ ৫৭৩	মলয়জপঙ্ক	মল্ ৫১৬
মরা-টাকা	মৃ ৫৭৩	মরুত্বান্	মৃ ৫৭৩	মর্দ্দী	মৃৎ ৫৮৯	মর্শ	মৃশ্ ৫৯১	মলয়জরজঃ	মল্ ৫১৬
মরাঠা	মহ্ ৫২১	মরুদ্গণ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্ম	মৃ ৫৭৭	মর্শন	মৃশ্ ৫৯১	মলয়জরস	মল্ ৫১৬
মরাঠী	মহ্ ৫২১	মরুদ্বর্ত্ম	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মগ	মৃ ৫৭৩	মর্ষ	মৃশ্ ৫৯২	মলয়জসার	মল্ ৫১৬
মরা-ধার	মৃ ৫৭৩	মরুদ্বিপ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মঘাত	মৃ ৫৭৩	মর্ষকাম	মৃশ্ ৫৯০	মলয়দ্রুম	মল্ ৫১৬
মরা-পথ	মৃ ৫৭৩	মরুদ্বেগ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মঘাতী	মৃ ৫৭৮	মর্ষণ	মৃশ্ ৫৯২	মলয়বাত	মল্ ৫১৬
মরা-পেট	মৃ ৫৭৩	মরুপথ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মঘ্ন	মৃ ৫৭৩	মর্ষণীয়	মৃশ্ ৫৯০	মলয়বাসিনী	মল্ ৫১৬
মরা-বান	মৃ ৫৭৩	মরুপৃষ্ঠ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মচ্ছিৎ	মৃ ৫৭৩	মর্ষিত	মৃশ্ ৫৯২	মলয়ভূভৃৎ	মল্ ৫১৬
মরা-মাটি	মৃ ৫৭৩	মরুব	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মচ্ছেদ	মৃ ৫৭৩	মর্ষিণী	মৃশ্ ৫৯০	মলয়মরুৎ	মল্ ৫১৬
মরা-মানুষ	মৃ ৫৭৩	মরুবক	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মচ্ছেদী	মৃ ৫৭৮	মর্ষ্য	মৃশ্ ৫৯০	মলয়রুহ	মল্ ৫১৬
মরা-মাস	মৃ ৫৭৩	মরুভূ	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মজ্ঞ	মৃ ৫৭৩	মর্‌চা	মৃ ৫৭৩	মলয়সমীর	মল্ ৫১৬
মরাল	মৃ ৫৭৩	মরুভূমি	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মত্র	মৃ ৫৭৩	মর্‌চা	মৃ ৫৭৩	মলয়া	মল্ ৫১৬
মরালক	মৃ ৫৭৩	মরুমহী	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মপারগ	মৃ ৫৭৩	মর্‌সুম	ম্ ৫৯৯	মলয়াচল	মল্ ৫১৬
মরালী	মৃ ৫৭৩	মরুয়া	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মপীড়ণ	মৃ ৫৭৩	মল	মল্ ৫১৭	মলয়াদ্রি	মল্ ৫১৬
মরা-সোনা	মৃ ৫৭৩	মরুস্থল	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মপীড়া	মৃ ৫৭৮	মল	মৃৎ ৫৮৯	মলয়ানিল	মল্ ৫১৬
মরি	মৃ ৫৭৩	মরুস্থলী	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মবিৎ	মৃ ৫৭৩	মলকর্ষণ	মল্ ৫১৬	মলয়াপবন	মল্ ৫১৬
মরিচ	মৃ ৫৭৩	মরেসা	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মবিদারণ	মৃ ৫৭৩	মলঘ্ন	মল্ ৫১৬	মলয়োদ্ভব	মল্ ৫১৬
মরিজাদ	মৃ ৫৭৩	মর্ক	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মবেদী	মৃ ৫৭৩	মলজ	মল্ ৫১৬	মলয়াবাস	মল্ ৫১৬
মরি(রী)যা	মৃ ৫৭৩	মর্কট	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মবেধী	মৃ ৫৭৩	মলদ	মল্ ৫১৭	মলয়াবায়ু	মল্ ৫১৬
মরিয়াদ	মৃ ৫৭৩	মর্কটক	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মব্যথা	মৃ ৫৭৮	মলদিগ্ধ	মল্ ৫১৬	মলয়োদ্ভব	মল্ ৫১৬
মরিল	মৃ ৫৭৩	মর্কটখেলা	মৃ ৫৭৩	মর্ম্মভেদ	মৃ ৫৭৮	মলদূষিত	মল্ ৫১৬	মলশুদ্ধি	মল্ ৫১৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মলস্রুতি	মল্	৫১৬	মল্লযুদ্ধ	মল্	৫১৮	মসিকুর্চ্চক	মক্	৪৪৪	মস্তুলুঙ্গক	মক্	৪৪৪	মহৎচণ্ডা	মহ্	৫২১
মলহারক	মল্	৫১৬	মল্লরাষ্ট্র	মল্	৫১৬	মসিদ	মক্	৪৪৪	মস্যাধার	মক্	৪৪৪	মহৎচমূ	মহ্	৫২১
মলা	মল্	৫১৮	মল্লশালা	মল্	৫১৬	মসিধান	মক্	৪৪৪	মহ	মহ্	৫২২	মহৎজব	মহ্	৫২১
মলা	মৃৎ	৫৮৯	মল্লা	মল্	৫১৬	মসিধানী	মক্	৪৪৪	মহঃ	মহ্	৫২১	মহৎজল	মহ্	৫২১
মলাঘষা	মৃৎ	৫৮৯	মল্লার	মল্	৫১৯	মসিনা	মক্	৪৪৪	মহকুমা	মহ্	৫২১	মহৎজ্ঞানী	মহ্	৫২১
মলাট	মল্	৫১৮	মল্লারী	মল্	৫১৯	মসিপটল	মক্	৪৪৪	মহড়া	মহ্	৫২১	মহৎজ্যোতিষিক	মহ্	৫২১
মলাপকর্ষণ	মল্	৫১৬	মল্লি(ল্লী)	মল্	৫১৯	মসিপণ্য	মক্	৪৪৪	মহৎ	মহ্	৫২২	মহৎডীন	মহ্	৫২১
মলাপহ	মল্	৫১৬	মল্লিক	মল্	৫১৯	মসিপাত্র	মক্	৪৪৪	মহৎকন্দ	মহ্	৫২১	মহত্তত্ত্ব	মহ্	৫২১
মলাবহ	মল্	৫১৬	মল্লিকা	মল্	৫১৯	মসিবর্ণ	মক্	৪৪৪	মহৎকপর্দ্দ	মহ্	৫২১	মহত্তম	মহ্	৫২১
মলাশয়	মল্	৫১৬	মল্লিকাক্ষ	মল্	৫১৬	মসিভাণ্ড	মক্	৪৪৪	মহৎকপিত্থ	মহ্	৫২১	মহত্তর	মহ্	৫২১
মলি	মল্	৫১৬	মল্লিকাখ্য	মল্	৫১৬	মসিল	মহ্	৫২১	মহৎকর	মহ্	৫২১	মহত্ত্ব	মহ্	৫২২
মলিদা	মল্	৫১৬	মল্লী	মল্	৫১৬	মসী	মক্	৪৪৮	মহৎকর্ম্মা	মহ্	৫২১	মহৎতপাঃ	মহ্	৫২১
মলিন	মল্	৫১৮	মশ্	মক্	৪৪৪	মসীদ	মক্	৪৪৪	মহৎকলা	মহ্	৫২১	মহৎতল	মহ্	৫২১
মলিনতা	মল্	৫১৬	মশক	মক্	৪৪৪	মসীনা	মক্	৪৪৪	মহৎকল্ক	মহ্	৫২১	মহৎতিক্ত	মহ্	৫২১
মলিনত্ব	মল্	৫১৬	মশকবারণ	মক্	৪৪৪	মসীযুদ্ধ	মক্	৪৪৪	মহৎকবি	মহ্	৫২১	মহৎতিথি	মহ্	৫২১
মলিনপ্রভ	মল্	৫১৬	মশকহরী	মক্	৪৪৪	মসুর	মক্	৪৪৪	মহৎকার্ত্তিকী	মহ্	৫২১	মহৎতীর্থ	মহ্	৫২১
মলিনমুখ	মল্	৫১৬	মশকার্থ	মক্	৪৪৪	মসূর	মক্	৪৪৪	মহৎকীর্ত্তি	মহ্	৫২১	মহৎতৈল	মহ্	৫২১
মলিনা	মল্	৫১৬	মশগুল	মক্	৪৪৪	মসূরক	মক্	৪৪৪	মহৎকুমার	মহ্	৫২১	মহৎত্যাগ	মহ্	৫২১
মলিনিত	মল্	৫১৬	মশমশ	মক্	৪৪৪	মসূরা	মক্	৪৪৪	মহৎকুল	মহ্	৫২১	মহৎত্যাগী	মহ্	৫২১
মলিনী	মল্	৫১৬	মশলা	মক্	৪৪৪	মসূরিকা	মক্	৪৪৪	মহৎকুষ্ঠ	মহ্	৫২১	মহৎদণ্ড	মহ্	৫২১
মলিনীকরণ	মল্	৫১৬	মশল্লা	মক্	৪৪৪	মসূরী	মক্	৪৪৪	মহৎকৃচ্ছ্র	মহ্	৫২১	মহৎদশা	মহ্	৫২১
মলিনীকরণীয়	মল্	৫১৬	মশহরী	মক্	৪৪৪	মসৃণ	মক্	৪৪৪	মহৎকৃষ্ণ	মহ্	৫২১	মহৎদারু	মহ্	৫২১
মলিনীকৃত	মল্	৫১৬	মশা	মক্	৪৪৪	মসৃণা	মক্	৪৪৪	মহৎকেশ	মহ্	৫২১	মহৎদিক্	মহ্	৫২১
মলিম্লুচ	মল্	৫১৬	মশাই	মহ্	৫২১	মসৃণিত	মক্	৪৪৪	মহৎকোশ	মহ্	৫২১	মহৎদুর্গ	মহ্	৫২১
মলীমস	মল্	৫১৬	মশায়	মহ্	৫২১	মস্ক	মক্	৪৪৪	মহৎকোশী	মহ্	৫২১	মহৎদেশ	মহ্	৫২১
মলোৎসর্গ	মল্	৫১৬	মশান	মক্	৪৪৮	মস্কর	মক্	৪৪৪	মহৎক্রতু	মহ্	৫২১	মহৎদ্রুম	মহ্	৫২১
মলোপহত	মল্	৫১৬	মশারি(রী)	মক্	৪৪৪	মস্করা	মক্	৪৪৮	মহৎক্রম	মহ্	৫২১	মহৎদ্রাবক	মহ্	৫২১
মল্ল	মল্	৫১৮	মশাল	মক্	৪৪৪	মস্করী	মক্	৪৪৪	মহৎখর্ব্ব	মহ্	৫২১	মহৎদ্বার	মহ্	৫২১
মল্লক	মল্	৫১৬	মশালচী	মক্	৪৪৪	মস্কারা	মক্	৪৪৪	মহৎখাত	মহ্	৫২১	মহৎদ্বিজ	মহ্	৫২১
মল্লক্রীড়া	মল্	৫১৬	মষ্	মক্	৪৪৪	মস্কা-লাগানো	মক্	৪৪৪	মহৎগণ	মহ্	৫২১	মহৎদ্বিপ	মহ্	৫২১
মল্লগুরু	মল্	৫১৬	মষি(ষী)	মক্	৪৪৪	মস্জ্	মক্	৪৪৪	মহৎগদ	মহ্	৫২১	মহৎধাতু	মহ্	৫২১
মল্লঘটী	মল্	৫১৬	মস্	মক্	৪৪৪	মস্ত্ (মন্ত)	মক্	৪৪৪	মহৎগল	মহ্	৫২১	মহৎধ্বনি	মহ্	৫২১
মল্লজ	মল্	৫১৬	মসক	মক্	৪৪৪	মস্ত	মক্	৪৪৮	মহৎগব	মহ্	৫২১	মহৎনট	মহ্	৫২১
মল্লডোর	মল্	৫১৬	মসজিদ	মক্	৪৪৪	মস্তক	মক্	৪৪৮	মহৎগারুড়ী	মহ্	৫২১	মহৎনবমী	মহ্	৫২১
মল্লতুর্য্য	মল্	৫১৬	মসজিয়া	মক্	৪৪৪	মস্তকজ্বর	মক্	৪৪৪	মহৎগীত	মহ্	৫২১	মহৎনরক	মহ্	৫২১
মল্লতোর	মল্	৫১৬	মসনদ	মক্	৪৪৪	মস্তকলুঙ্গ	মক্	৪৪৪	মহৎগুণ	মহ্	৫২১	মহৎনাগ	মহ্	৫২১
মল্লতোড়ল	মল্	৫১৬	মসমস	মক্	৪৪৪	মস্তকশূল	মক্	৪৪৪	মহৎগৌরী	মহ্	৫২১	মহৎনাটক	মহ্	৫২১
মল্লদার	মল্	৫১৬	মসলন্দ	মক্	৪৪৪	মস্তকস্নেহ	মক্	৪৪৪	মহৎগ্রহ	মহ্	৫২১	মহৎনাড়ী	মহ্	৫২১
মল্লনাগ	মল্	৫১৬	মসলিন	মক্	৪৪৪	মস্তদারু	মক্	৪৪৪	মহৎঘূর্ণা	মহ্	৫২১	মহৎনিদ্রা	মহ্	৫২১
মল্লবিদ্যা	মল্	৫১৬	মসান	মক্	৪৪৪	মস্তান	মক্	৪৪৪	মহৎঘৃত	মহ্	৫২১	মহৎনিম্ব	মহ্	৫২১
মল্লবেশ	মল্	৫১৬	মসার	মক্	৪৪৪	মস্তানজী	মক্	৪৪৪	মহৎঘোর	মহ্	৫২১	মহৎনিরয়	মহ্	৫২১
মল্লভূ	মল্	৫১৬	মসারক	মক্	৪৪৪	মস্তানী	মক্	৪৪৪	মহৎঘোষ	মহ্	৫২১	মহৎনির্ব্বাণ	মহ্	৫২১
মল্লভূম	মল্	৫১৮	মসারি	মক্	৪৪৪	মস্তিষ্ক	মক্	৪৪৮	মহৎচক্র	মহ্	৫২১	মহৎনৃত্য	মহ্	৫২১
মল্লভূমি	মল্	৫১৬	মসি	মক্	৪৪৮	মস্তু	মক্	৪৪৪	মহৎচক্রবর্ত্তী	মহ্	৫২১	মহৎপক্ষ	মহ্	৫২১
মল্লযাত্রা	মল্	৫১৬	মসিকুপী	মক্	৪৪৪	মস্তুলুঙ্গ	মক্	৪৪৪	মহৎচণ্ড	মহ্	৫২১	মহৎপশু	মহ্	৫২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মহৎপাপ্মা	মহ্	৫২১	মহৎমৃগ	মহ্	৫২১	মহৎহনু	মহ্	৫২১	মহাকুলীন	মহ্	৫২১	মহাপঞ্চবিষ	মহ্	৫২১
মহৎপুণ্য	মহ্	৫২১	মহৎমেঘ	মহ্	৫২১	মহৎহবিঃ	মহ্	৫২১	মহাক্ষত্রপ	মহ্	৫২১	মহাপঞ্চমূল	মহ্	৫২১
মহৎপূত	মহ্	৫২১	মহৎযজ্ঞ	মহ্	৫২১	মহৎহরি	মহ্	৫২১	মহাগন্ধ	মহ্	৫২১	মহাপথ	মহ্	৫২১
মহৎপৌর্ণমাসী	মহ্	৫২১	মহৎমোহন	মহ্	৫২১	মহৎহাস	মহ্	৫২১	মহাগুরু	মহ্	৫২১	মহাপদ্ম	মহ্	৫২১
মহৎপ্রকৃতি	মহ্	৫২১	মহৎযন্ত্র	মহ্	৫২১	মহতী	মহ্	৫২১	মহাগোলক	মহ্	৫২১	মহাপবন	মহ্	৫২১
মহৎপ্রতীহার	মহ্	৫২১	মহৎযশাঃ	মহ্	৫২১	মহত্তত্ত্ব	মহ্	৫২১	মহাঙ্গ	মহ্	৫২১	মহাপরাহ্ণ	মহ্	৫২১
মহৎপ্রদান	মহ্	৫২১	মহৎযাত্রা	মহ্	৫২১	মহত্তম	মহ্	৫২১	মহাঙ্গা	মহ্	৫২১	মহাপাটেশ্বরী	মহ্	৫২১
মহৎপ্রভ	মহ্	৫২১	মহৎযান	মহ্	৫২১	মহত্ত্ব	মহ্	৫২১	মহাজঙ্গ	মহ্	৫২১	মহাপাত	মহ্	৫২১
মহৎপ্রভাব	মহ্	৫২১	মহৎযুগ	মহ্	৫২১	মহদতিক্রম	মহ্	৫২১	মহাজন	মহ্	৫২১	মহাপাতক	মহ্	৫২১
মহৎবংশ	মহ্	৫২১	মহৎযোগী	মহ্	৫২১	মহদনুগ্রহ	মহ্	৫২১	মহাজনী	মহ্	৫২১	মহাপাত্র	মহ্	৫২১
মহৎবক্ষাঃ	মহ্	৫২১	মহৎযোধ	মহ্	৫২১	মহদাশয়	মহ্	৫২১	মহাজ্ঞান	মহ্	৫২১	মহাপায়া	মহ্	৫২১
মহৎবন	মহ্	৫২১	মহৎরক্ত	মহ্	৫২১	মহদাশ্রয়	মহ্	৫২১	মহাজ্ঞানী	মহ্	৫২১	মহাপাল	মহ্	৫২১
মহৎবন্ধ্যা	মহ্	৫২১	মহৎরজত	মহ্	৫২১	মহদ্গুণ	মহ্	৫২১	মহাটবী	মহ্	৫২১	মহাপীঠ	মহ্	৫২১
মহৎবরাহ	মহ্	৫২১	মহৎরজন	মহ্	৫২১	মহদ্দোষ	মহ্	৫২১	মহাঢ্য	মহ্	৫২১	মহাপুরাণ	মহ্	৫২১
মহৎবাদী	মহ্	৫২১	মহৎরব	মহ্	৫২১	মহদ্ভয়	মহ্	৫২১	মহাতেজস্কর	মহ্	৫২১	মহাপুরুষ	মহ্	৫২১
মহৎবায়ু	মহ্	৫২১	মহৎরাব	মহ্	৫২১	মহনীয়	মহ্	৫২১	মহাতেজাঃ	মহ্	৫২১	মহাপ্রতীহার	মহ্	৫২১
মহৎবারুণী	মহ্	৫২১	মহৎরুদ্র	মহ্	৫২১	মহফিল	মহ্	৫২১	মহাতোদ্য	মহ্	৫২১	মহাপ্রপঞ্চ	মহ্	৫২১
মহৎবার্ত্তিক	মহ্	৫২১	মহৎরৌদ্র	মহ্	৫২১	মহন্ত	মহ্	৫২১	মহাত্মা	মহ্	৫২১	মহাপ্রভু	মহ্	৫২১
মহৎবিভূতি	মহ্	৫২১	মহৎরৌরব	মহ্	৫২১	মহম্মদ	মহ্	৫২১	মহাত্রান	মহ্	৫২১	মহাপ্রলয়	মহ্	৫২১
মহৎবিরাট্	মহ্	৫২১	মহৎলক্ষ্মী	মহ্	৫২১	মহরম	মহ্	৫২১	মহাদণ্ডনায়ক	মহ্	৫২১	মহাপ্রসাদ	মহ্	৫২১
মহৎবীচি	মহ্	৫২১	মহৎলোল	মহ্	৫২১	মহরী	মহ্	৫২১	মহাদান	মহ্	৫২১	মহাপ্রস্থান	মহ্	৫২১
মহৎবৈদ্য	মহ্	৫২১	মহৎলোহ	মহ্	৫২১	মহর্জগৎ	মহ্	৫২১	মহাদানী	মহ্	৫২১	মহাপ্রাণ	মহ্	৫২১
মহৎব্যাধি	মহ্	৫২১	মহৎশঙ্ক	মহ্	৫২১	মহর্দ্ধি	মহ্	৫২১	মহাদেও	মহ্	৫২১	মহাপ্রাণী	মহ্	৫২১
মহৎব্রণ	মহ্	৫২১	মহৎশাল	মহ্	৫২১	মহর্লোক	মহ্	৫২১	মহাদেব	মহ্	৫২৬	মহাফল	মহ্	৫২১
মহৎভট	মহ্	৫২১	মহৎশালি	মহ্	৫২১	মহর্ষভ	মহ্	৫২১	মহাদেবা	মহ্	৫২১	মহাফলা	মহ্	৫২১
মহৎভয়	মহ্	৫২১	মহৎশ্মশান	মহ্	৫২১	মহর্ষি	মহ্	৫২৫	মহাদেবী	মহ্	৫২১	মহাফেজ	মহ্	৫২১
মহৎভর	মহ্	৫২১	মহৎশ্বাস	মহ্	৫২১	মহল	মহ্	৫২১	মহাধন	মহ্	৫২১	মহাফেজখানা	মহ্	৫২১
মহৎভাগবত	মহ্	৫২১	মহৎশ্বেতা	মহ্	৫২১	মহলা	মহ্	৫২১	মহাধন্দ	মহ্	৫২১	মহাবলা	মহ্	৫২১
মহৎভাণ্ড	মহ্	৫২১	মহৎসংক্রান্তি	মহ্	৫২১	মহলানবিশ	মহ্	৫২১	মহাধমাধম	মহ্	৫২১	মহাবলাধ্যক্ষ	মহ্	৫২১
মহৎভাষ্য	মহ্	৫২১	মহৎসত্তা	মহ্	৫২১	মহল্ল	মহ্	৫২১	মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ	মহ্	৫২১	মহাবাই	মহ্	৫২১
মহৎভাস্বর	মহ্	৫২১	মহৎসভা	মহ্	৫২১	মহল্লক	মহ্	৫২১	মহান	মহ্	৫২২	মহাবাউল	মহ্	৫২১
মহৎভিক্ষু	মহ্	৫২১	মহৎসর্গ	মহ্	৫২১	মহল্লা	মহ্	৫২১	মহানদ	মহ্	৫২১	মহাবাক্য	মহ্	৫২১
মহৎভুজ	মহ্	৫২১	মহৎসারথি	মহ্	৫২১	মহল্লিক	মহ্	৫২১	মহানন্দ	মহ্	৫২১	মহাবান	মহ্	৫২১
মহৎভূত	মহ্	৫২১	মহৎসার্থ	মহ্	৫২১	মহশীল	মহ্	৫২১	মহানন্দা	মহ্	৫২১	মহাবাহু	মহ্	৫২১
মহৎমণি	মহ্	৫২১	মহৎসিংহ	মহ্	৫২১	মহস্	মহ্	৫২১	মহানস	মহ্	৫২১	মহাবিদ্যা	মহ্	৫২৭
মহৎমণ্ডুক	মহ্	৫২১	মহৎসূক্ত	মহ্	৫২১	মহসিল	মহ্	৫২১	মহানসী	মহ্	৫২১	মহাবিভাষা	মহ্	৫২১
মহৎমতি	মহ্	৫২১	মহৎসেন	মহ্	৫২১	মহা	মহ্	৫২২	মহানাদ	মহ্	৫২১	মহাবিষুব	মহ্	৫২১
মহৎমৎস্য	মহ্	৫২১	মহৎসেনা	মহ্	৫২১	মহাঁমদ	মহ্	৫২১	মহানায়ক	মহ্	৫২১	মহাবিষুবান	মহ্	৫২১
মহৎমনাঃ	মহ্	৫২১	মহৎসেবা	মহ্	৫২১	মহাকচ্ছ	মহ্	৫২১	মহানিশা	মহ্	৫২১	মহাবিষ্ণু	মহ্	৫২১
মহৎমন্ত্র	মহ্	৫২১	মহৎসৌখ্য	মহ্	৫২১	মহাকরণ	মহ্	৫২৫	মহানীল	মহ্	৫২১	মহাবীর	মহ্	৫২১
মহৎমন্ত্রী	মহ্	৫২১	মহৎস্নেহ	মহ্	৫২১	মহাকাব্য	মহ্	৫২৫	মহানীলী	মহ্	৫২১	মহাবীরা	মহ্	৫২১
মহৎমান্য	মহ্	৫২১	মহৎস্রষ্টা	মহ্	৫২১	মহাকায়	মহ্	৫২১	মহানুভব	মহ্	৫২১	মহাবীর্য্য	মহ্	৫২১
মহৎমার্গ	মহ্	৫২১	মহৎস্বন	মহ্	৫২১	মহাকাল	মহ্	৫২১	মহান্ত	মহ্	৫২১	মহাবীর্য্যা	মহ্	৫২১
মহৎমূল্য	মহ্	৫২১	মহৎস্বর	মহ্	৫২১	মহাকালী	মহ্	৫২১	মহান্বয়	মহ্	৫২১	মহাবৃন্দ	মহ্	৫২১
মহৎমূষিক	মহ্	৫২১	মহৎহংস	মহ্	৫২১	মহাকুমারগুপ্ত	মহ্	৫২১	মহাপক্ষ	মহ্	৫২১	মহাবেগ	মহ্	৫২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মহাবেজ	মহ্	৫২১	মহামেদ	মহ্	৫২১	মহাসান্তপন	মহ্	৫২১	মহীদুর্গ	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রগুরু	মহ্	৫২১
মহাবৈকুণ্ঠ	মহ্	৫২১	মহামেদা	মহ্	৫২১	মহাসামন্ত	মহ্	৫২১	মহীধর	মহ্	৫৩০	মহেন্দ্রচাপ	মহ্	৫২১
মহাবোধি	মহ্	৫২১	মহামোহ	মহ্	৫২১	মহাসাহস	মহ্	৫২১	মহীধ্র	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রজিৎ	মহ্	৫২১
মহাব্যাহৃতি	মহ্	৫২১	মহামোহা	মহ্	৫২১	মহাসাহসিক	মহ্	৫২১	মহীন	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রনগরী	মহ্	৫২১
মহাব্যাহৃতি	বি	৫২১	মহাযমক	মহ্	৫২১	মহাসিদ্ধি	মহ্	৫২১	মহীনাথ	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রমন্দির	মহ্	৫২১
মহাব্যোম	মহ্	৫২১	মহারথ	মহ্	৫২১	মহাসোয়ার	মহ্	৫২১	মহীন্দ্র	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রবারুণী	মহ্	৫২১
মহাব্রত	মহ্	৫২১	মহারথী	মহ্	৫২১	মহাস্থান	মহ্	৫২১	মহীপ	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রাণী	মহ্	৫২১
মহাব্রহ্ম	মহ্	৫২১	মহারস	মহ্	৫২১	মহাস্বন্	মহ্	৫২১	মহীপতন	মহ্	৫২১	মহেন্দ্রী	মহ্	৫২১
মহাব্রহ্মা	মহ্	৫২১	মহারাজ	মহ্	৫২১	মহাহ্ব	মহ্	৫২১	মহীপতি	মহ্	৫২১	মহেশ	মহ্	৫২১
মহাব্রাহ্মণ	মহ্	৫২১	মহারাজা	মহ্	৫২১	মহাহি	মহ্	৫২১	মহীপাল	মহ্	৫২১	মহেশনেত্র	মহ্	৫২১
মহাভাগ	মহ্	৫২১	মহারাজিক	মহ্	৫২১	মহাহিগন্ধা	মহ্	৫২১	মহীপুত্র	মহ্	৫২১	মহেশমোহিনী	মহ্	৫২১
মহাভাগ	ভজ্	৩৭৫	মহারাজ্ঞী	মহ্	৫২১	মহাহ্রদ	মহ্	৫২১	মহীপুত্রী	মহ্	৫২১	মহেশান	মহ্	৫২১
মহাভাগী	মহ্	৫২১	মহারাণী	মহ্	৫২১	মহি	মহ্	৫২১	মহীপুর	মহ্	৫২১	মহেশানী	মহ্	৫২১
মহাভাগ্য	মহ্	৫২১	মহারাত্রি	মহ্	৫২১	মহিত	মহ্	৫২১	মহীপ্রদান	মহ্	৫২১	মহেশ্বর	মহ্	৫২১
মহাভারত	মহ্	৫২৭	মহারাষ্ট্র	মহ্	৫২১	মহিতা	মহ্	৫২১	মহীপ্ররোহ	মহ্	৫২১	মহেশ্বরকরচ্যুতা	মহ্	৫২১
মহাভিযোগ	মহ্	৫২১	মহারাষ্ট্রী	মহ্	৫২১	মহিত্ব	মহ্	৫২১	মহীপ্রাচীর	মহ্	৫২১	মহেশ্বরী	মহ্	৫২১
মহাভিষ	মহ্	৫২১	মহারোগ	মহ্	৫২১	মহিম	মহ্	৫২১	মহীভর্ত্তা	মহ্	৫২১	মহেষু	মহ্	৫২১
মহাভীড়	মহ্	৫২১	মহার্ঘ	মহ্	৫২১	মহিষ্মতী	মহ্	৫২১	মহীভুক	মহ্	৫২১	মহেষ্বাস	মহ্	৫২১
মহাভোগ	মহ্	৫২১	মহার্ঘ্য	মহ্	৫২১	মহিমনঃ	মহ্	৫২১	মহীভৃৎ	মহ্	৫২১	মহোক্ষ	মহ্	৫২১
মহাভোগা	মহ্	৫২১	মহার্ণব	মহ্	৫২১	মহিমা	মহ্	৫২৮	মহীভৃৎ	ভৃ	৪২৯	মহোচ্ছব	মহ্	৫২১
মহামণ্ডল	মহ্	৫২১	মহার্থ	মহ্	৫২১	মহিম্ন	মহ্	৫২১	মহীমণ্ডল	মহ্	৫২১	মহোৎপল	মহ্	৫২১
মহামহত্তর	মহ্	৫২১	মহার্দ্রক	মহ্	৫২১	মহিলা	মহ্	৫২২	মহীময়	মহ্	৫২১	মহোৎসব	মহ্	৫২১
মহামহা	মহ্	৫২১	মহার্ব্বুদ	মহ্	৫২১	মহিলা	মহ্	৫২৪	মহীয়	মহ্	৫২১	মহোৎসাহ	মহ্	৫২১
মহামহাপ্রসাদ	মহ্	৫২১	মহার্হ	মহ্	৫২১	মহিষ	মহ্	৫২২	মহীয়সী	মহ্	৫২১	মহোদধি	মহ্	৫২১
মহামহিম	মহ্	৫২১	মহাল	মহ্	৫২১	মহিষ	মহ্	৫২৪	মহীয়ান্	মহ্	৫২১	মহোদয়	মহ্	৫২১
মহামহিমা	মহ্	৫২১	মহালী	মহ্	৫২৮	মহিষচর	মহ্	৫২১	মহীরন্ধ্র	মহ্	৫২১	মহোদয়া	মহ্	৫২১
মহামহীয়ান	মহ্	৫২১	মহাশক্তি	মহ্	৫২১	মহিষবাহন	মহ্	৫২৮	মহীরুহ	মহ্	৫২১	মহোদর	মহ্	৫২১
মহামহোৎসব	মহ্	৫২১	মহাশঙ্খ	মহ্	৫২১	মহিষমর্দ্দিনী	মহ্	৫২১	মহীরুহব্যূহ	মহ্	৫২১	মহোদরী	মহ্	৫২১
মহামহোদর	মহ্	৫২১	মহাশন	মহ্	৫২১	মহিষা	মহ্	৫২১	মহীলতা	মহ্	৫২১	মহোদ্যম	মহ্	৫২১
মহামহোপাধ্যায়	মহ্	৫২১	মহাশনিধ্বজ	মহ্	৫২১	মহিষার্দ্দন	মহ্	৫২১	মহীশ	মহ্	৫২১	মহোদ্যোগ	মহ্	৫২১
মহামাই	মহ্	৫২১	মহাশয়	মহ্	৫২১	মহিষাল	মহ্	৫২১	মহীশ্বর	মহ্	৫২১	মহোন্নতি	মহ্	৫২১
মহামাংস	মহ্	৫২১	মহাশয়া	মহ্	৫২১	মহিষাসুর	মহ্	৫২৮	মহীসুত	মহ্	৫৩০	মহোন্মদ	মহ্	৫২১
মহামাত্য	মহ্	৫২১	মহাশঙ্ক	মহ্	৫২১	মহিষাসুরমর্দ্দিনী	মহ্	৫২৮	মহীসুতা	মহ্	৫৩০	মহোপাধ্যায়	মহ্	৫২১
মহামাত্র	মহ্	৫২১	মহাশাসন	মহ্	৫২১	মহিষী	মহ্	৫২২	মহীসুর	মহ্	৫২১	মহোরগ	মহ্	৫২১
মহামাত্রী	মহ্	৫২১	মহাশূদ্র	মহ্	৫২১	মহিষী	মহ্	৫২৪	মহীসুরা	মহ্	৫২১	মহোরস্ক	মহ্	৫২১
মহামানব	মহ্	৫২১	মহাশূদ্রী	মহ্	৫২১	মহিষ্ঠ	মহ্	৫২১	মহীসূনু	মহ্	৫২১	মহোল্কা	মহ্	৫২১
মহামান্য	মহ্	৫২১	মহাশূন্য	মহ্	৫২১	মহিষ্মান্	মহ্	৫৩০	মহু (মধু)	মন্	৪৮১	মহোষ্ঠ	মহ্	৫২১
মহামায়	মহ্	৫২৭	মহাশোকী	মহ্	৫২১	মহী	মহ্	৫৩০	মহুকুপ	মন্	৪৮১	মহৌঘ	মহ্	৫২১
মহামায়া	মহ্	৫২৭	মহাশ্বেতা	মহ্	৫২১	মহীকম্প	মহ্	৫২১	মহুকুপ	মন্	৪৮১	মহৌজস	মহ্	৫২১
মহামায়ী	মহ্	৫২১	মহাষ্টমী	মহ্	৫২১	মহীকর	মহ্	৫২১	মহুয়া	মন্	৫০৬	মহৌজস্ক	মহ্	৫২১
মহামার	মহ্	৫২১	মহাসত্ত্ব	মহ্	৫২১	মহীক্ষিৎ	মহ্	৫২১	মহুরি	মন্	৪৮১	মহৌজাঃ	মহ্	৫২১
মহামারি	মহ্	৫২১	মহাসন	মহ্	৫২১	মহীচর	মহ্	৫২১	মহুরী	মন্	৪৮১	মহৌষধ	মহ্	৫২১
মহামারী	মহ্	৫২১	মহাসন্ধিবিগ্রহ	মহ্	৫২১	মহীজ	মহ্	৫৩০	মহুল	মন্	৫০৬	মহৌষধি	মহ্	৫২১
মহামাষ	মহ্	৫২১	মহাসান্ধিবিগ্রহিক	মহ্	৫২১	মহীজা	মহ্	৫৩০	মহেচ্ছ	মহ্	৫২১	মহৌষধী	মহ্	৫২১
মহামুনি	মহ্	৫২১	মহাসাগর	মহ্	৫২১	মহীতল	মহ্	৫২১	মহেন্দ্র	মহ্	৫২১	মহৌষ্ঠ	মহ্	৫২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মা	মা ৫৩৩	মাংসল	মন্ ৪৮১	মাগধ	মক্ ৪৪৪	মাছিপোকা	মক্ ৪৪৪	মাঞ্জস	মঞ্জ্ ৪৫৩
মাঅ	মা ৫৩১	মাংসসার	মন্ ৪৮১	মাগধী	মক্ ৪৪৪	মাছিমারা	মক্ ৪৪৪	মাঞ্জা	মঞ্জ্ ৪৫৪
মাআ	মা ৫৩১	মাংসসাৎ	মন্ ৪৮১	মাগন	মঙ্ ৪৫২	মাছিয়া	মঞ্চ্ ৪৫৩	মাঞ্জিষ্ঠ	মঞ্জ্ ৪৫৩
মাই	মা ৫৩১	মাংসসাদ	মন্ ৪৮১	মাগনা	মঙ্ ৪৫২	মাছুয়া	মদ্ ৪৬৮	মাঞ্জিষ্ঠক	মঞ্জ্ ৪৫৩
মাইআ	মা ৫৩১	মাংসসাদী	মন্ ৪৮১	মাগা	মঙ্ ৪৫২	মাজ(ঝ)	মক্ ৪৪৪	মাঞ্জিষ্ঠিক	মঞ্জ্ ৪৫৩
মাইকেল	ম্ ৫৯৯	মাংসস্নেহ	মন্ ৪৮১	মাগান	মঙ্ ৪৫০	মাজ	মঞ্জ্ ৫৮৭	মাঞ্জুরী	মন্ ৪৮১
মাইজ	মা ৫৩১	মাংসাদ	মন্ ৪৮১	মাগী	মঙ্ ৪৫২	মাজ	মৃজ্ ৫৮৭	মাট (মাঠ)	মট্ ৪৫৬
মাইএঞা	মা ৫৩১	মাংসাদী	মন্ ৪৮১	মাগু	মঙ্ ৪৫২	মাজদা	মক্ ৪৪৪	মাট	মৃশ্ ৫৯০
মাইতি	মহ্ ৫৩০	মাংসার্ব্বুদ	মন্ ৪৮১	মাগুয়া	মঙ্ ৪৫০	মাজন	মঞ্জ্ ৪৫৩	মাটকলাই	মট্ ৪৫৬
মাইনদার	মহ্ ৫২১	মাংসাশন	মন্ ৪৮১	মাগুর	মদ্ ৪৬৮	মাজন	মৃজ্ ৫৮৭	মাটকোঠা	মট্ ৪৫৬
মাইনা	মহ্ ৫২১	মাংসাশী	মন্ ৫০৬	মাগ্‌গি	মঙ্ ৪৫২	মাজনা	মৃজ্ ৫৮৭	মাটা	মট্ ৪৫৬
মাইনে	মহ্ ৫২১	মাংসাষ্টকা	মন্ ৪৮১	মাগ্যি	মঙ্ ৪৫২	মাজনা	মঞ্জ্ ৪৫৩	মাটাপালাম	মট্ ৪৫৬
মাই-বাপ	মা ৫৩১	মাংসিক	মন্ ৪৮১	মাঘ	মক্ ৪৪৪	মাজা	মঞ্জ্ ৪৫৩	মাটাবালাম	মট্ ৪৫৬
মাইর	মৃ ৫৭৩	মাংসোন্নতি	মন্ ৪৮১	মাঘ	মুহ্ ৫৬৮	মাজা	মক্ ৪৪৪	মাটাম	মট্ ৪৫৬
মাইরি	মা ৫৩১	মাংসোপজীবী	মন্ ৪৮১	মাঘচাপ	মক্ ৪৪৪	মাজা	মৃজ্ ৫৮৭	মাটামসহি	মট্ ৪৫৬
মাইল	ম্ ৫৯৯	মাঃ	মা ৫৩১	মাঘবত	মক্ ৪৪৪	মাজাঘষা	মৃজ্ ৫৮৭	মাটি	মট্ ৪৫৬
মাইলানি	মল্ ৫১৬	মাঁইয়া	মা ৫৩১	মাঘবতী	মক্ ৪৪৪	মাজান	মৃজ্ ৫৮৭	মাটিয়া	মট্ ৪৫৬
মাইসর	মৃগ্ ৫৮৩	মাঁগ	মঙ্ ৪৫২	মাঘবন	মক্ ৪৪৪	মাজান	মঞ্জ্ ৪৫৩	মাটী	মট্ ৪৫৬
মাইসরা	মৃগ্ ৫৮৩	মাকড়	মৃ ৫৭৩	মাঘবনী	মক্ ৪৪৪	মাজিভাত	মক্ ৪৪৪	মাটো (মাঠো)	মট্ ৪৫৬
মাউই	মা ৫৩১	মাকড়সা	মৃ ৫৭৩	মাঘী	মক্ ৪৪৪	মাজিল	মৃজ্ ৫৮৭	মাটে-ঘাটে	মট্ ৪৫৬
মাউগ	মঙ্ ৪৫০	মাকড়া	মৃ ৫৭৩	মাঘী-পূর্ণিমা	মক্ ৪৪৪	মাজিস্ট্রেট	ম্ ৫৯৯	মাঠ	মট্ ৪৫৭
মাউগা	মঙ্ ৪৫০	মাকড়ি	মক্ ৪৪৪	মাঘী-শুক্ল	মক্ ৪৪৪	মাজুফল	মক্ ৪৪৪	মাঠ-করা	মট্ ৪৫৬
মাউরী	মা ৫৩১	মাকনা	মদ্ ৪৬৮	মাঘ্য	মক্ ৪৪৪	মাজুম	ম্ ৫৯৯	মাঠকরুণ	মা ৫৩১
মাউসা	মা ৫৩১	মাকন্দ	মদ্ ৪৬৮	মাঙ্গ	মঙ্ ৪৫২	মাজুর	মঞ্জ্ ৪৫৩	মাঠনি	মট্ ৪৫৬
মাও	মা ৫৩১	মাকন্দী	মদ্ ৪৬৮	মাঙ্গলিক	মঙ্ ৪৫০	মাজুর	মন্ ৪৮১	মাঠর	মট্ ৪৫৭
মাওড়া	মা ৫৩১	মাকর	মক্ ৪৪৪	মাঙ্গল্য	মঙ্ ৪৫০	মাজুরি	মন্ ৪৮১	মাঠ-হারে	মট্ ৪৫৬
মাং	মন্ ৫০৬	মাকরাকর	মক্ ৪৪৪	মাঙ্গা	মঙ্ ৪৫২	মাজুষ	মঞ্জ্ ৪৫৩	মাঠা	মট্ ৪৫৬
মাং	ম্ ৫৯৯	মাকরন্দ	মক্ ৪৪৪	মাঙ্গন	মঙ্ ৪৫২	মাঝ	মক্ ৪৪৪	মাঠাতোলা	মট্ ৪৫৬
মাংস	মন্ ৫০৬	মাকরী	মক্ ৪৪৪	মাচ	মক্ ৪৪৪	মাঝ	মন্ ৫০৭	মাঠে-মাঠে	মট্ ৪৫৬
মাংসকচ্ছপ	মন্ ৪৮১	মাকসা	মৃ ৫৭৩	মাচ	মদ্ ৪৬৮	মাঝখান	মক্ ৪৪৪	মাড়ডুক	মট্ ৪৫৬
মাংসকন্দী	মন্ ৪৮১	মাকাঠি	মা ৫৩১	মাচা	মঞ্চ্ ৪৫৩	মাঝখানে	মক্ ৪৪৪	মাড়ডুকিক	মট্ ৪৫৬
মাংসকর	মন্ ৪৮১	মাকাল	মহ্ ৫২১	মাচাঙ্গ	মঞ্চ্ ৪৫৩	মাঝগঙ্গা	মক্ ৪৪৪	মাড়	মণ্ ৪৫৯
মাংসকীল	মন্ ৪৮১	মাকু	মা ৫৩১	মাচাড়	মদ্ ৪৬৮	মাঝদরিয়া	মক্ ৪৪৪	মাড়	মৃৎ ৫৮৯
মাংসগ্রন্থি	মন্ ৪৮১	মাকুন্দ	মা ৫৩১	মাচান	মঞ্চ্ ৪৫৩	মাঝদা	মক্ ৪৪৪	মাড়ন	মৃৎ ৫৮৯
মাংসজ	মন্ ৫০৬	মাকুন্দে	মা ৫৩১	মাচি	মক্ ৪৪৪	মাঝপথ	মক্ ৪৪৪	মাড়ব	মৃৎ ৫৮৯
মাংসতেজঃ	মন্ ৪৮১	মাকোসা	মৃ ৫৭৩	মাচিকা	মক্ ৪৪৪	মাঝামাঝি	মক্ ৫০৭	মাড়লি(লী)	মণ্ ৪৫৯
মাংসপ	মন্ ৪৮১	মাক্ষিক	মক্ ৪৪৪	মাচিয়া	মঞ্চ্ ৪৫৩	মাঝার	মক্ ৪৪৪	মাড়া	মণ্ ৪৫৯
মাংসপচন	মন্ ৪৮১	মাক্ষিকজ	মক্ ৪৪৪	মাছ	মদ্ ৪৭১	মাঝারি	মক্ ৪৪৪	মাড়া	মৃৎ ৫৮৯
মাংসপেশী	মন্ ৪৮১	মাক্ষিকফল	মক্ ৪৪৪	মাছমাংস	মদ্ ৪৬৮	মাঝারি	মন্ ৫০৭	মাড়ি	মৃৎ ৫৮৯
মাংসবিক্রেতা	মন্ ৪৮১	মাখ	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	মাছরাঙা(ঙ্গা)	মদ্ ৪৬৮	মাঝারি-গোছ	মক্ ৪৪৪	মাড়িল	মৃৎ ৫৮৯
মাংসভক্ষ	মন্ ৪৮১	মাখন	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	মাছা	মদ্ ৪৬৮	মাঝি(ঝী)	মক্ ৪৪৪	মাড়ুয়া	মণ্ ৪৫৯
মাংসভেত্তা	মন্ ৪৮১	মাখা	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	মাছাল	মদ্ ৪৬৮	মাঝি(ঝী)	মন্ ৫০৭	মাড়ুয়াবাদী	মণ্ ৪৫৯
মাংসযোনি	মন্ ৪৮১	মাখামাখি	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	মাছি	মক্ ৪৪৪	মাঝিমাল্লা	মন্ ৫০৭	মাড়োয়া	মণ্ ৪৫৯
মাংসরস	মন্ ৪৮১	মাখান	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	মাছিতা	মক্ ৪৪৪	মাঝিমাল্লা	মক্ ৪৪৪	মাড়োয়ার	মণ্ ৪৫৯
মাংসরুচি	মন্ ৪৮১	মাগ	মঙ্ ৪৫২	মাছিটেপা	মক্ ৪৪৪	মাঝিয়া	মক্ ৪৪৪	মাড়োয়ারী	মণ্ ৪৫৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মাঢ়ি	মৃৎ ৫৮৯	মাতরি	মা ৫৩১	মাতৃপক্ষ	মা ৫৩১	মাথট	মক্ ৪৪৪	মাদ্রীসুত	মদ্ ৪৬৮
মাণ	মণ্ ৪৫৯	মাতরিপুরুষ	মা ৫৩১	মাতৃপিতৃ	মা ৫৩১	মাথা	মক্ ৪৪৯	মাদ্‌রাজি	মদ্ ৪৬৮
মাণ(ন)ক	মণ্ ৪৫৯	মাতরিশ্বা	মা ৫৩১	মাতৃবৎ	মা ৫৩১	মাথাইল	মক্ ৪৪৪	মাদ্রেয়	মদ্ ৪৬৮
মাণব	মণ্ ৪৬৩	মাতরিশ্বা	মদ্ ৪৬৮	মাতৃবৎসল	মা ৫৩১	মাথাঘষা	মক্ ৪৪৪	মাধব	মন্ ৫০৭
মাণব	— ৪৯৫	মাতল	মদ্ ৪৬৯	মাতৃবন্ধু	মা ৫৩১	মাথাধরা	মক্ ৪৪৪	মাধবক	মন্ ৫০৭
মাণবক	মণ্ ৪৬৩	মাতলামি	মদ্ ৪৬৮	মাতৃবান্ধব	মা ৫৩১	মাথাপাগলা	মক্ ৪৪৪	মাধবিকা	মন্ ৫০৭
মাণবিকা	মণ্ ৪৬৩	মাতলি	মদ্ ৪৬৮	মাতৃভক্তি	মা ৫৩১	মাথাফাড়া	মক্ ৪৪৪	মাধবপ্রিয়	মন্ ৪৮১
মাণবীন	মণ্ ৪৬৩	মাতলি	মন্ ৪৮১	মাতৃভাষা	মা ৫৩১	মাথাব্যথা	মক্ ৪৪৪	মাধববল্লী	মন্ ৪৮১
মাণব্য	মণ্ ৪৬৩	মাতা	মদ্ ৪৬৯	মাতৃভূমি	মা ৫৩১	মাথাভারী	মক্ ৪৪৪	মাধবশ্রী	মন্ ৫০৭
মাণিক	মণ্ ৪৬৪	মাতা (মাতৃ)	মা ৫৩৩	মাতৃমণ্ডল	মা ৫৩১	মাথামাথি	মক্ ৪৪৪	মাধবী	মন্ ৫০৮
মাণিকজোড়	মণ্ ৪৬৪	মাতাগুরু	মা ৫৩১	মাতৃমাতা	মা ৫৩১	মাথামারা	মক্ ৪৪৪	মাধবীকুঞ্জ	মন্ ৪৮১
মাণিকনয়ন	মণ্ ৪৫৯	মাতান	মদ্ ৪৬৯	মাতৃযজ্ঞ	মা ৫৩১	মাথামুটে	মক্ ৪৪৪	মাধবীবন	মন্ ৪৮১
মাণিকপীর	মণ্ ৪৬৪	মাতাপিতা	মা ৫৩১	মাতৃযাগ	মা ৫৩১	মাথামুণ্ডু	মক্ ৪৪৪	মাধবীমণ্ডপ	মন্ ৪৮১
মাণিকভাণ্ডার	মণ্ ৪৫৯	মাতাপুত্র	মা ৫৩১	মাতৃস্বসা	মা ৫৩১	মাথাল	মক্ ৪৪৪	মাধবীলতা	মন্ ৪৮১
মাণিকা	মণ্ ৪৫৯	মাতাম	মা ৫৩১	মাতৃস্বসৃ	মা ৫৩১	মাথালো	মক্ ৪৪৪	মাধাই	মন্ ৪৮১
মাণিক্য	মণ্ ৪৬৪	মাতামহ	মা ৫৩১	মাতৃহা	মা ৫৩১	মাথি	মক্ ৪৫০	মাধুক	মন্ ৪৮১
মাণিক্যা	মণ্ ৪৫৯	মাতামহী	মা ৫৩১	মাতোআল	মদ্ ৪৬৮	মাথুর	মন্ ৪৪৪	মাধুকর	মন্ ৪৮১
মাণিমন্থ	মণ্ ৪৫৯	মাতামাতি	মদ্ ৪৬৮	মাতোআর	মদ্ ৪৬৮	মাথুর্য্য	মন্ ৪৮১	মাধুকরী	মন্ ৪৮৬
মাণ্ডবী	মণ্ ৪৬৪	মাতাল	মদ্ ৪৬৯	মাতোয়ারা	মদ্ ৪৬৮	মাদ	মদ্ ৪৬৮	মাধুকুরি(রী)	মন্ ৪৮১
মাণ্ডব্য	মণ্ ৪৬৪	মাতালি	মদ্ ৪৬৮	মাতোয়াল(লা)	মদ্ ৪৬৮	মাদক	মদ্ ৪৬৮	মাধুপর্কিক	মন্ ৪৮১
মাণ্ডলিক	মণ্ ৪৫৯	মাতি	মদ্ ৪৬৮	মাৎ	মন্ ৪৮১	মাদন	মদ্ ৪৬৮	মাধুর	মন্ ৫০৯
মাণ্ডূক	মণ্ ৪৫৯	মাতিয়া	মদ্ ৪৬৮	মাৎ	মৃৎ ৫৮৯	মাদনী	মদ্ ৪৬৮	মাধুরী	মন্ ৫০৯
মাণ্ডূকি(কী)	মণ্ ৪৫৯	মাতিল	মদ্ ৪৬৮	মাৎ-করা	মন্ ৪৮১	মাদনীয়	মদ্ ৪৬৮	মাধুর্য্য	মন্ ৫০৯
মাণ্ডুকেয়	মণ্ ৪৫৯	মাতু	মা ৫৩১	মাৎসর	মদ্ ৪৬৮	মাদল	মৃৎ ৫৮৯	মাধুর্য্যব্যঞ্জক	মন্ ৪৮১
মাণ্ডুয়া	মণ্ ৪৫৯	মাতুস্বসাপতি	মা ৫৩১	মাৎসর্য্য	মদ্ ৪৭১	মাদা	মা ৫৩১	মাধুক	মন্ ৪৮১
মাত	মদ্ ৪৬৮	মাতুল	মা ৫৩১	মাৎস্য	মদ্ ৪৬৮	মাদা-দেওয়া	মা ৫৩১	মাধ্যন্দিন	মন্ ৪৮১
মাত	মন্ ৪৮১	মাতুলা	মা ৫৩১	মাৎস্যন্যায়	মদ্ ৪৬৮	মাদার	মা ৫০৩	মাধ্যন্দিনীয়	মন্ ৪৮১
মাত	মা ৫৩১	মাতুলানী	মা ৫৩১	মাৎস্যিক	মদ্ ৪৬৮	মাদার	মন্ ৪৮১	মাধ্যম	মন্ ৫০৯
মাত	মৃৎ ৫৮৯	মাতুলিঙ্গ	মা ৫৩১	মাৎস্যেয়	মদ্ ৪৬৮	মাদী	মা ৫৩১	মাধ্যমক	মন্ ৪৮১
মাতঃ	মা ৫৩১	মাতুলী	মা ৫৩১	মাত্তা	মা ৫৩১	মাদীয়ান	মা ৫৩১	মাধ্যমিক	মন্ ৫০৯
মাত-কাটা	মৃৎ ৫৮৯	মাতুলেয়	মা ৫৩১	মাত্র	মা ৫৩৪	মাদুর	মন্ ৪৮১	মাধ্যস্থ	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গ	মদ্ ৪৬৮	মাতুল্য	মা ৫৩১	মাত্রা	মা ৫৩৪	মাদুরী	মন্ ৪৮১	মাধ্যাহ্নিক	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গকুমারী	মদ্ ৪৬৮	মাতৃক	মা ৫৩৪	মাত্রাগুরু	মা ৫৩১	মাদুল	মা ৫৩১	মাধ্ব	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গজ	মদ্ ৪৬৮	মাতৃকা	মা ৫৩৪	মাত্রাচ্যুতক	মা ৫৩১	মাদুলি	মা ৫৩১	মাধ্বিক	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গনক্র	মদ্ ৪৬৮	মাতৃগণ	মা ৫৩৪	মাত্রাচ্ছন্দঃ	মা ৫৩১	মাদৃক্	মা ৫৩১	মাধ্বী	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গপতি	মদ্ ৪৬৮	মাতৃগন্ধিনী	মা ৫৩১	মাত্রাবৃত্ত	মা ৫৩১	মাদৃক্ষ	মা ৫৩১	মাধ্বীক	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গমকর	মদ্ ৪৬৮	মাতৃগোত্র	মা ৫৩১	মাত্রাভস্ত্রা	মা ৫৩১	মাদৃশ	মা ৫৩১	মাধ্বীকফল	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গমোতি	মদ্ ৪৬৮	মাতৃগ্রাম	মা ৫৩১	মাত্রার্দ্ধ	মা ৫৩১	মাদ্র	মদ্ ৪৮০	মান্	মন্ ৪৮১
মাতঙ্গরাজ	মদ্ ৪৬৮	মাতৃঘাত	মা ৫৩১	মাত্রালাভ	মা ৫৩১	মাদ্রবতী	মদ্ ৪৮০	মান	মন্ ৫০৯
মাতঙ্গিনী	মদ্ ৪৬৮	মাতৃঘাতী	মা ৫৩১	মাত্রাসঙ্গ	মা ৫৩১	মাদ্রাজ	মদ্ ৪৮০	মান	মা ৫৩১
মাতঙ্গী	মদ্ ৪৮০	মাতৃচক্র	মা ৫৩১	মাত্রাসমক	মা ৫৩১	মাদ্রাজি	মদ্ ৪৮১	মানক	মন্ ৪৮১
মাতন	মদ্ ৪৬৮	মাতৃতঃ	মা ৫৩১	মাত্রাস্পর্শ	মা ৫৩১	মাদ্রাসা	মদ্ ৪৬৮	মানকচু	মন্ ৪৮১
মাতবর	মন্ ৪৬৮	মাতৃদেব	মা ৫৩১	মাত্রিকা	মা ৫৩১	মাদ্রী	মদ্ ৪৬৮	মানকলহ	মন্ ৪৮১
মাতব্বরী	মন্ ৪৬৮	মাতৃদেবী	মা ৫৩১	মাথ	মন্ ৪৮১	মাদ্রীনন্দন	মদ্ ৪৬৮	মানকলি	মন্ ৪৮১
মাতরপিতৃ	মা ৫৩১	মাতৃনন্দন	মা ৫৩১	মাথ	মৃৎ ৫৮৯	মাদ্রীপতি	মদ্ ৪৬৮	মানকা	মন্ ৪৮১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মানকৃৎ	মন্	৪৮১	মানভূম	মন্	৪২৫	মানুষ	মন্	৪৯৫	মাবদি	মা	৫৩১	মায়াপটু	মি	৫৩৮
মানক্ষতি	মন্	৪৮১	মানভৃৎ	মন্	৪৮১	মানুষতা	মন্	৪৮১	মাভৈ	মা	৫৩১	মায়াপতি	মি	৫৩৮
মানগ্রন্থি	মন্	৪৮১	মানমহান	মন্	৪৮১	মানুষতীর্থ	মন্	৪৮১	মা ভৈ	মা	৫৩১	মায়াপ্রপঞ্চ	মি	৫৩৮
মানচাকী	মন্	৪৮১	মানয়িতব্য	মন্	৪৮১	মানুষদৈবিক	মন্	৪৮১	মা ভৈঃ	মা	৫৩১	মায়াপ্রয়োগ	মি	৫৩৮
মানচিত্র	মন্	৫১২	মানয়িতা	মন্	৪৮১	মানুষ-মানসেতা	মন্	৪৮১	মাম	মা	৫৩১	মায়াফল	মি	৫৩৮
মানত	মন্	৫১০	মানযোগ	মন্	৪৮১	মানুষমুনুষ	মন্	৪৮১	মামক	মা	৫৩১	মায়াফাঁশ(স)	মি	৫৩৮
মানদ	মন্	৫১২	মানরম্ভা	মন্	৪৮১	মানুষরাক্ষস(সী)	মন্	৪৮১	মামকী	মা	৫৩১	মায়াবচন	মি	৫৩৮
মানদণ্ড	মন্	৫১২	মানস	মন্	৫১২	মানুষলৌকিক	মন্	৪৮১	মামকীন	মা	৫৩১	মায়াবতী	মি	৫৪২
মানদল	মন্	৪৮১	মানসচারী	মন্	৪৮১	মানুষসম্ভব	মন্	৪৮১	মামড়ি	মা	৫৩১	মায়াবন্ধ	মি	৫৩৮
মানদা	মন্	৫১২	মানসজন্মা	মন্	৪৮১	মানুষাদ	মন্	৪৮১	মামলা	মা	৫৩১	মায়াবাজি	মি	৫৩৮
মানদ্রবিণ	মন্	৪৮১	মানসজপ	মন্	৪৮১	মানুষিক	মন্	৪৮১	মামলা	ম্	৫৯৯	মায়াবাদ	মি	৫৪২
মানধন	মন্	৪৮১	মানসতীর্থ	মন্	৫১২	মানুষিণী	মন্	৪৮১	মামলাবাজ	বজ্	২১৮	মায়াবাদী	মি	৫৪২
মানধ্মাত	মন্	৪৮১	মানসপুত্র	মন্	৫১২	মানুষ্য	মন্	৪৮১	মামা	মা	৫৩৬	মায়াবান	মি	৫৩৮
মানন	মন্	৪৮১	মানসপূজা	মন্	৪৮১	মানুষ্যক	মন্	৪৮১	মামাইত	মা	৫৩১	মায়াবারি	মি	৫৩৮
মাননা	মা	৫৩১	মানসবেদ	মন্	৪৮১	মানে	মন্	৫১৩	মামাত	মা	৫৩১	মায়াবিৎ	মি	৫৩৮
মাননা	মন্	৪৮১	মানসব্রত	মন্	৪৮১	মানোজ্ঞক	মন্	৪৮১	মামাবাড়ী	মা	৫৩১	মায়াবী	মি	৫৪২
মাননি	মন্	৪৮১	মানসরুক্	মন্	৪৮১	মানোৎসাহ	মন্	৪৮১	মামী	মা	৫৩৬	মায়াবীজ	মি	৫৩৮
মাননীয়	মন্	৪৮১	মানসসন্তাপ	মন্	৪৮১	মানোন্নতি	মন্	৪৮১	মামু	মা	৫৩৬	মায়ামনুজ	মি	৫৩৮
মাননীয়	মা	৫৩১	মানসসরোবর	মন্	৫১২	মানোন্মাদ	মন্	৪৮১	মামুর	ম্	৫৯৯	মায়ামমতা	মি	৫৪২
মাননীয়া	মন্	৪৮১	মানসিক	মন্	৫১০	মানোভূ	ভূ	৪০৯	মামুল	ম্	৫৯৯	মায়াময়	মি	৫৩৮
মানপত্র	মন্	৪৮১	মানসসরস	মন্	৪৮১	মান্ত্রিক	মন্	৪৮১	মামুলী	ম্	৫৯৯	মায়াময়ী	মি	৫৩৮
মানপরিখণ্ডন	মন্	৪৮১	মানসসেবন	মন্	৪৮১	মান্থর্য্য	মন্	৪৮১	মাম্‌দো	ম্	৫৯৯	মায়ামুণ্ড	মি	৫৩৮
মানপর	মন্	৪৮১	মানসা	মন্	৪৮১	মান্দার	মন্	৪৮১	মাম্‌দো	মহ্	৫২১	মায়ামৃগ	মি	৫৩৮
মানপ্রাণ	মন্	৪৮১	মানসালয়	মন্	৪৮১	মান্দাল	মৃৎ	৫৮৯	মাম্‌লেট	ম্	৫৯৯	মায়ামো	মি	৫৩৮
মানব	মন্	৪৯৫	মানসী	মন্	৫১২	মান্দাস	মন্	৪৮১	মায়	মি	৫৩৮	মায়ামোহ	মি	৫৩৮
মানবতা	মন্	৪৯৭	মানসুরে	মন্	৪৮১	মান্দ্য	মন্	৪৮১	মায়া	মি	৫৪০	মায়াযন্ত্র	মি	৫৩৮
মানবতাবাদ	মন্	৪৯৭	মানসূত্র	মন্	৪৮১	মান্ধাতা	মন্	৫১৩	মায়াকাজল	মি	৫৪১	মায়াযোগ	মি	৫৩৮
মানবদেব	মন্	৪৮১	মানসৌকাঃ	মন্	৪৮১	মান্মথ	মন্	৪৮১	মায়াকান্দন	মি	৫৩৮	মায়াযোধী	মি	৫৩৮
মানবড়ী	মন্	৪৮১	মানহা	মন্	৪৮১	মান্য	মন্	৪৮১	মায়াকান্না	মি	৫৪২	মায়ারণ	মি	৫৩৮
মানবপতি	মন্	৪৮১	মানহানি	মন্	৪৮১	মান্যগণ্য	মন্	৪৮১	মায়াকার	মি	৫৩৮	মায়ারথ	মি	৫৩৮
মানবপুরাণ	মন্	৪৮১	মানা	মন্	৫১৩	মান্যতা	মন্	৪৮১	মায়াকিরাত	মি	৫৩৮	মায়ারসিক	মি	৫৩৮
মানবরাক্ষস	মন্	৪৮১	মানান	মন্	৫১৩	মান্যত্ব	মন্	৪৮১	মায়াকৃৎ	মি	৫৩৮	মায়াল	মহ্	৫২১
মানবর্দ্ধন	মন্	৪৮১	মানান্তর	মন্	৪৮১	মান্যবর	মন্	৪৮১	মায়াচণ	মি	৫৩৮	মায়াসরোবর	মি	৫৩৮
মানবলীলা	মন্	৪৮১	মানান্ধ	মন্	৪৮১	মান্যমান	মন্	৪৮১	মায়াচার	মি	৫৩৮	মায়াসীতা	মি	৫৩৮
মানবসূত্র	মন্	৪৮১	মানানসই	মন্	৫১৩	মান্যস্থান	মন্	৪৮১	মায়াছান্দ	মি	৫৩৮	মায়াসুত	মি	৫৩৮
মানবাধিকার	মন্	৪৯৭	মানাপমান	মন্	৪৮১	মান্যানী	মন্	৪৮১	মায়াজল	মি	৫৩৮	মায়ি	মি	৫৩৮
মানবান্	মন্	৪৮১	মানার্হ	মন্	৪৮১	মাপ	মা	৫৩৫	মায়াজাল	মি	৫৩৮	মায়িক	মি	৫৪৩
মানবিক	মন্	৪৯৭	মানাসক্ত	মন্	৪৮১	মাপন	মা	৫৩৫	মায়াজীবী	মি	৫৩৮	মায়ী	মি	৫৪৩
মানবিকতা	মন্	৪৯৭	মানিকা	মন্	৪৮১	মাপনা	মা	৫৩৫	মায়াতন্ত্র	মি	৫৩৮	মায়ু	মা	৫৩১
মানবিনী	মন্	৪৮১	মানিত	মন্	৪৮১	মাপা	মা	৫৩৫	মায়াত্মক	মি	৫৩৮	মায়ুর	মী	৫৫২
মানবীয়	মন্	৪৮১	মানিতা	মন্	৪৮১	মাপাজোখা	মা	৫৩৫	মায়াদেবী	মি	৫৩৮	মায়ূরক	মী	৫৫২
মানবেন্দ্র	মন্	৪৮১	মানিত্ব	মন্	৪৮১	মাপান	মা	৫৩৫	মায়াদ্যুত	মি	৫৩৮	মায়ূরিক	মী	৫৫২
মানভঙ্গ	মন্	৪৮১	মানিনী	মন্	৪৮১	মাপি	মা	৫৩১	মায়াধর	মি	৫৩৮	মায়ূরী	মী	৫৫২
মানভঞ্জন	মন্	৪৮১	মানী	মন্	৪৮১	মাফ	মা	৫৩১	মায়াধিক	মি	৫৩৮	মায়্যা	মা	৫৩১
মানভাক্	মন্	৪৮১	মানুখ	মন্	৪৮১	মাফিক	মা	৫৩১	মায়ানাট	মি	৫৩৮	মায়ের	মা	৫৩১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মার	মা	৫৩১	মারীচ	মৃ	৫৮১	মার্গশীর্ষী	মৃগ্	৫৮৪	মালক	মল্	৫১৬	মালশাট	মল্	৫১৬
মার	মৃ	৫৮০	মারীচ্য	মৃ	৫৭৩	মার্গশোধক	মৃগ্	৫৮৪	মালকা	মল্	৫১৬	মালশী(সী)	মল্	৫১৬
মারক	মৃ	৫৭৩	মারুণ্ড	মৃ	৫৭৩	মার্গস্থ	মৃগ্	৫৮৩	মালকাঠ	মল্	৫১৬	মালশ্রী	মল্	৫১৯
মারকত	মৃ	৫৭৩	মারুত	মৃ	৫৭৩	মার্গসংস্করণ	মৃগ্	৫৮৪	মালকোঁচা	মল্	৫১৬	মালসা	মল্	৫১৬
মারকাট	মৃ	৫৮১	মারুতকোপন	মৃ	৫৭৩	মার্গসংস্কার	মৃগ্	৫৮৪	মালকোশ	মল্	৫১৯	মালসী	মল্	৫১৬
মারকুটে	মৃ	৫৮১	মারুতপূর্ণ	মৃ	৫৭৩	মার্গহর্ম্ম্য	মৃগ্	৫৮৩	মালকৌশ	মল্	৫১৯	মালা	মল্	৫১৬
মারকেট	মা	৫৩১	মারুতব্রত	মৃ	৫৭৩	মার্গাগত	মৃগ্	৫৮৩	মালখণ্ডী	মল্	৫১৬	মালাই	মল্	৫১৬
মারগ	মৃগ্	৫৮৩	মারুতরোগ	মৃ	৫৭৩	মার্গায়াত	মৃগ্	৫৮৩	মালখাজনা	মল্	৫১৬	মালাইচা	মল্	৫১৬
মারজিৎ	মৃ	৫৭৩	মারুতসুত	মৃ	৫৭৩	মার্গিক	মৃগ্	৫৮৩	মালখানা	মল্	৫১৬	মালাইচাকি	মল্	৫১৬
মারণ	মৃ	৫৮০	মারুতাত্মজ	মৃ	৫৭৩	মার্গিত	মৃগ্	৫৮৩	মালগাড়ী	মল্	৫১৬	মালাকর	মল্	৫২০
মারণযজ্ঞ	মৃ	৫৭৩	মারুতায়ন	মৃ	৫৭৩	মার্গী	মৃগ্	৫৮৩	মালগুজার	মল্	৫১৬	মালাকার	মল্	৫২০
মারদস্তর	মৃ	৫৭৩	মারুতাশন	মৃ	৫৭৩	মার্গ্য	মৃগ্	৫৮৩	মালগুজারি(রী)	মল্	৫১৬	মালাকারী	মল্	৫২০
মারধর	মৃ	৫৮১	মারুতি	মৃ	৫৭৩	মার্জ্জ	মৃজ্	৫৮৮	মালগুদাম	মল্	৫১৬	মালাগুণ	মল্	৫১৬
মারপিট	মৃ	৫৮১	মারুতী	মৃ	৫৭৩	মার্জ্জন	মৃজ্	৫৮৮	মালচক্রক	মল্	৫১৬	মালাগ্রন্থি	মল্	৫১৬
মারপিঠ	মৃ	৫৭৩	মারুলি	মৃ	৫৭৩	মার্জ্জনা	মৃজ্	৫৮৮	মালজমি	মল্	৫১৬	মালাতৃণ	মল্	৫১৬
মারপেঁচ	মৃ	৫৮১	মারোআ(য়া)	মণ্	৪৫৯	মার্জ্জনী	মৃজ্	৫৮৮	মালজামিন	মল্	৫১৬	মালাদীপক	মল্	৫১৬
মারপেঁচি	মৃ	৫৭৩	মার্কণ্ড	মৃ	৫৮২	মার্জ্জনীয়	মৃজ্	৫৮৮	মালঝাঁপ	মল্	৫১৬	মালাধর	মল্	৫১৬
মারফত	ম	৫৯৯	মার্কণ্ডেয়	মৃ	৫৮২	মার্জ্জার	মৃজ্	৫৮৮	মালট	মল্	৫১৬	মালানিদর্শনা	মল্	৫১৬
মারফতি	ম	৫৯৯	মার্কণ্ডেয়পুরাণ	মৃ	৫৮২	মার্জ্জারক	মৃজ্	৫৮৭	মালঞ্চ	মল্	৫১৬	মালাম	মল্	৫১৬
মারফতী	ম	৫৯৯	মার্কা	মা	৫৩১	মার্জ্জারকণ্ঠ	মৃজ্	৫৮৭	মালতি	মল্	৫১৬	মালামাল	মল্	৫১৬
মারফতে	ম	৫৯৯	মার্কিন	মা	৫৩১	মার্জ্জারকরণ	মৃজ্	৫৮৭	মালতী	মল্	৫১৯	মালারূপ	মল্	৫১৬
মারব	মৃ	৫৭৩	মার্গ্	মৃগ্	৫৮৩	মার্জ্জারকর্ণী	মৃজ্	৫৮৭	মালতীক্ষারক	মল্	৫১৬	মালারূপক	মল্	৫১৬
মারবেল	ম	৫৯৯	মার্গ	মৃগ্	৫৮৪	মার্জ্জারলিঙ্গী	মৃজ্	৫৮৮	মালতীতীরজ	মল্	৫১৬	মালি	মল্	৫১৬
মারমুখ	মৃ	৫৭৩	মার্গক্লেশ	মৃগ্	৫৮৩	মার্জ্জারী	মৃজ্	৫৮৭	মালতীপত্রিকা	মল্	৫১৬	মালিক	মল্	৫২০
মারমুখী	মৃ	৫৭৩	মার্গণ	মৃগ্	৫৮৪	মার্জ্জালীয়	মৃজ্	৫৮৮	মালতীফল	মল্	৫১৬	মালিকা	মল্	৫১৬
মারমুখো	মৃ	৫৭৩	মার্গতোরণ	মৃগ্	৫৮৪	মার্জ্জিত	মৃজ্	৫৮৮	মালতীমাধব	মল্	৫১৯	মালিকান	মল্	৫১৬
মারমূর্ত্তি	মৃ	৫৭৩	মার্গদর্শক	মৃগ্	৫৮৪	মার্জ্জিতা	মৃজ্	৫৮৭	মালতীমালা	মল্	৫১৬	মালিকানা	মল্	৫২০
মারমোহিত	মৃ	৫৭৩	মার্গদ্রুম	মৃগ্	৫৮৩	মার্ত্তণ্ড	মৃ	৫৮২	মালতীলতা	মল্	৫১৯	মালিকী	মল্	৫১৬
মাররিপু	মৃ	৫৭৩	মার্গধেনু	মৃগ্	৫৮৩	মার্ত্তণ্ডমণ্ডল	মৃ	৫৭৩	মালদার	মল্	৫১৬	মালিনী	মল্	৫২১
মারন্সি	ম	৫৯৯	মার্গধেনুক	মৃগ্	৫৮৩	মার্ত্তিক	মৃৎ	৫৮৯	মালপুয়া	মল্	৫১৬	মালিন্য	মল্	৫১৮
মারা	মৃ	৫৮০	মার্গপ	মৃগ্	৫৮৩	মার্ত্ত্য	মৃ	৫৭৩	মালপো	মল্	৫১৬	মালিন্য	ম্লেচ্ছ্	৫৯৭
মারাঙ্ক	মৃ	৫৭৩	মার্গপতি	মৃগ্	৫৮৩	মার্দ্দঙ্গ	মৃ	৫৭৩	মালব	মল্	৫১৯	মালিম	মল্	৫১৬
মারাঠা	মহ্	৫২১	মার্গপথ	মৃগ্	৫৮৩	মার্দ্দঙ্গিক	মৃ	৫৭৩	মালবদেশ	মল্	৫১৬	মালিয়াৎ	মল্	৫১৬
মারাঠী	মহ্	৫২১	মার্গপরিণায়ক	মৃগ্	৫৮৩	মার্দ্দব	মৃ	৫৭৩	মালবিষয়	মল্	৫১৬	মালিশ	মৃৎ	৫৮৯
মারাত্মক	মৃ	৫৭৩	মার্গব	মৃগ্	৫৮৪	মার্দ্দল	মৃৎ	৫৮৯	মালবশ্রী	মল্	৫১৯	মালী	মল্	৫২০
মারামারি	মৃ	৫৭৩	মার্গবন্ধন	মৃগ্	৫৮৩	মার্দ্বীক	মৃৎ	৫৮৯	মালবাধীশ	মল্	৫১৬	মালী	মল্	৫২১
মারি	মৃ	৫৭৩	মার্গভূমি	মৃগ্	৫৮৩	মার্ব্বল	ম	৫৯৯	মালবিদ্যা	মল্	৫১৬	মালু	মল্	৫১৬
মারিকা	মৃ	৫৭৩	মার্গবশানুগ	মৃগ্	৫৮৩	মার্ম্মিক	মৃ	৫৭৩	মালবীয়	মল্	৫১৬	মালুধান	মল্	৫১৬
মারিচ	মৃ	৫৭৩	মার্গবশায়াত	মৃগ্	৫৮৩	মার্ষ	মৃশ্	৫৯০	মালবেন্দ্র	মল্	৫১৬	মালুবুড়ো	মল্	৫১৬
মারিচিক	মৃ	৫৭৩	মার্গরক্ষক	মৃগ্	৫৮৩	মার্ষ্টব্য	মৃশ্	৫৯০	মালভারী	মল্	৫১৬	মালম	ম	৫৯৯
মারিত	মৃ	৫৭৩	মার্গশাখী	মৃগ্	৫৮৩	মার্ষ্টি	মৃশ্	৫৯০	মালভূমি	মল্	৫১৬	মালুম	ম	৫৯৯
মারিষ	মৃ	৫৭৩	মার্গশির	মৃগ্	৫৮৪	মারকুলি	মা	৫৩১	মালমাত্তা	মল্	৫১৬	মালুমকাঠ	ম	৫৯৯
মারিষা	মৃ	৫৮১	মার্গশিরী	মৃগ্	৫৮৪	মাল	মল্	৫১৮	মালমশ(স)লা	মল্	৫১৬	মালুমগাছ	ম	৫৯৯
মারী	মৃ	৫৭৩	মার্গশীর্ষ	মৃগ্	৫৮৪	মাল-আদালত	মল্	৫১৬	মালয়	মল্	৫২০	মালুমাত	ম	৫৯৯
মারীগুটিকা	মৃ	৫৭৩	মার্গশীর্ষক	মৃগ্	৫৮৪	মালই	মল্	৫১৬	মালয়েশিয়া	মল্	৫২০	মালুর	মা	৫৩১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মিথিল	মথ্	৪৬৬	মিথ্যাভিশস্তি	মথ্	৪৬৫	মিরমিঞা	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রবৃত্ত	মিশ্র্	৫৪৯	মীনধ্বজ	মী	৫৫২
মিথিলা	মথ্	৪৬৬	মিথ্যাভিশাপ	মথ্	৪৬৫	মিরমুনশী	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রব্যবহার	মিশ্র্	৫৪৯	মীননাথ	মী	৫৫২
মিথিলাধিপতি	মথ্	৪৬৬	মিথ্যাভিষঙ্গ	মথ্	৪৬৫	মিরজাই	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রিত	মিশ্র্	৫৪৯	মীনরঙ্ক	মী	৫৫২
মিথিলেশ	মথ্	৪৬৫	মিথ্যামতি	মথ্	৪৬৫	মিরাশ	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রিতা	মিশ্র্	৫৪৯	মীনরঙ্গ	মী	৫৫২
মিথুন	মথ্	৪৬৭	মিথ্যাযোগ	মথ্	৪৬৫	মির্জ্জা	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রীকরণ	মিশ্র্	৫৪৯	মীনরাশি	মী	৫৫২
মিথুনভাব	মথ্	৪৬৭	মিথ্যাসাক্ষী	মথ্	৪৬৫	মির্ত্তু	মৃ	৫৭৩	মিশ্রী	মি	৫৩৮	মীনলাঞ্ছন	মী	৫৫২
মিথুনযমক	মথ্	৪৬৫	মিথ্যাসাক্ষ্য	মথ্	৪৬৫	মিল	মিল্	৫৪৮	মিশ্রেয়া	মিশ্র্	৫৪৯	মীনা	মী	৫৫২
মিথুনব্রতী	মথ্	৪৬৭	মিথ্যাহার	মথ্	৪৬৫	মিলজুল	মিল্	৫৪৮	মিষ	মিষ্	৫৫০	মীনাকার	মী	৫৫২
মিথুনীভাব	মথ্	৪৬৫	মিথ্যুক	মথ্	৪৬৫	মিলাজুলা	মিল্	৫৪৮	মিষ্ট	মিষ্	৫৫০	মীনাকারী	মী	৫৫২
মিথুনেচর	মথ্	৪৬৭	মিথ্যোত্তর	মথ্	৪৬৫	মিলন	মিল্	৫৪৮	মিষ্টকর্ত্তা	মিষ্	৫৫০	মীনাঙ্ক	মী	৫৫২
মিথো	মথ্	৪৬৫	মিথ্যোপচার	মথ্	৪৬৫	মিলমিলা	মিল্	৫৪৮	মিষ্টকুমুড়	মিষ্	৫৫০	মীনাণ্ড	মী	৫৫২
মিথ্যা	মথ্	৪৬৮	মিদ্	মিদ্	৫৪৪	মিলমিশ	মিল্	৫৪৮	মিষ্টপাক	মিষ্	৫৫০	মীনাণ্ডী	মী	৫৫২
মিথ্যাকর্ম্ম	মথ্	৪৬৫	মিদুল	মৃ	৫৭৩	মিলা	মিল্	৫৪৮	মিষ্টবাত	মিষ্	৫৫০	মীনালয়	মী	৫৫২
মিথ্যাকারুণিক	মথ্	৪৬৫	মিধ্	মি	৫৩৮	মিলামিলি	মিল্	৫৪৮	মিষ্টমুখ	মিষ্	৫৫০	মীনেন্দ্র	মী	৫৫২
মিথ্যাকৃত	মথ্	৪৬৫	মিন	মি	৫৪৪	মিলামিশা	মিল্	৫৪৮	মিষ্টান্ন	মিষ্	৫৫০	মীমাংসক	মী	৫৫২
মিথ্যাকোপ	মথ্	৪৬৮	মিনতি	মি	৫৪৪	মিলান	মিল্	৫৪৮	মিষ্টি	মিষ্	৫৫০	মীমাংসন	মী	৫৫২
মিথ্যাক্রোধ	মথ্	৪৬৮	মিনমিন	মি	৫৪৪	মিলায়ন	মিল্	৫৪৮	মিষ্টিমুখ	মিষ্	৫৫০	মীমাংসা	মী	৫৫২
মিথ্যাক্রয়	মথ্	৪৬৮	মিনমিনে	মি	৫৪৪	মিলিত	মিল্	৫৪৮	মিসকাল	মিশ্র্	৫৪৯	মীমাংসা	মী	৫০৬
মিথ্যাগ্রহ	মথ্	৪৬৮	মিনষে	মন্	৪৮১	মিলিন্দ	মিল্	৫৪৮	মিসকালি	মিশ্র্	৫৪৯	মীমাংসিত	মী	৫০৬
মিথ্যাগ্রহণ	মথ্	৪৬৮	মিনসা	মন্	৪৮১	মিশ	মিশ্র্	৫৪৯	মিসকালো	মিশ্র্	৫৪৯	মীমাংসিতব্য	মী	৫৫২
মিথ্যাচর্য্যা	মথ্	৪৬৫	মিনসে	মন্	৪৮১	মিশ(স)কাল	মিশ্র্	৫৪৯	মিসমিসে	মিশ্র্	৫৪৯	মীমাংস্য	মী	৫৫২
মিথ্যাচার	মথ্	৪৬৫	মিনা	মি	৫৩৮	মিশকালি	মিশ্র্	৫৪৯	মিসাল	মিশ্র্	৫৪৯	মীর	মী	৫৫২
মিথ্যাজল্পিত	মথ্	৪৬৫	মিনার	মি	৫৩৮	মিশকিন	মিশ্র্	৫৪৯	মিসী	মিশ্র্	৫৪৯	মীর	মন্	৪৮১
মিথ্যাজ্ঞান	মথ্	৪৬৫	মিনাহ	মি	৫৩৮	মিশনারি	মিশ্র্	৫৪৯	মিস্ত্রী	মিশ্র্	৫৪৯	মীল	মী	৫৫২
মিথ্যাদর্শন	মথ্	৪৬৫	মিনি	মি	৫৩৮	মিশমিশ	মিশ্র্	৫৪৯	মিহ্	মিহ্	৫৫১	মীলই	মী	৫৫২
মিথ্যাদৃষ্টি	মথ্	৪৬৫	মিনিট	মি	৫৩৮	মিশমিশে	মিশ্র্	৫৪৯	মিহি(হী)	মিহ্	৫৫১	মীলন	মী	৫৫২
মিথ্যাধ্যবসিতি	মথ্	৪৬৫	মিনিসা	মন্	৪৮১	মিশা	মিশ্র্	৫৪৯	মিহিকা	মিহ্	৫৫১	মীলিত	মী	৫৫২
মিথ্যানিরসন	মথ্	৪৬৫	মিন্মিন	মি	৫৩৮	মিশান	মিশ্র্	৫৪৯	মিহিজা	মিহ্	৫৫১	মু	মু	৫৫৩
মিথ্যাপণ্ডিত	মথ্	৪৬৫	মিনে	মি	৫৩৮	মিশামিশি	মিশ্র্	৫৪৯	মিহিদানা	মিহ্	৫৫১	মুই	মু	৫৫৩
মিথ্যাপুরুষ	মথ্	৪৬৫	মিমঙ্ক্ষা	মি	৫৩৮	মিশাল	মিশ্র্	৫৪৯	মিহির	মিহ্	৫৫২	মুঁ	মু	৫৫৩
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ	মথ্	৪৬৫	মিমঙ্ক্ষু	মি	৫৩৮	মিশালি	মিশ্র্	৫৪৯	মিহিরনন্দন	মিহ্	৫৫১	মুঁই	মু	৫৫৩
মিথ্যাপ্রত্যয়	মথ্	৪৬৫	মিমর্দ্দিষু	মি	৫৩৮	মিশি	মিশ্র্	৫৪৯	মিহিরবংশ	মিহ্	৫৫১	মুঁড়া	মু	৫৫৩
মিথ্যাপ্রবৃত্তি	মথ্	৪৬৫	মিয়া	মি	৫৩৮	মিশুক	মিশ্র্	৫৪৯	মিহিরমণ্ডল	মিহ্	৫৫১	মুক্ (মুচ্)	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাবচন	মথ্	৪৬৫	মিয়ামল্লার	মি	৫৩৮	মিশ্র	মিশ্র্	৫৫০	মিহিরস্যান্দন	মিহ্	৫৫১	মুকতি	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাবাক্য	মথ্	৪৬৫	মিয়াদ	মি	৫৩৮	মিশ্রক	মিশ্র্	৫৫০	মিহী	মিহ্	৫৫১	মুকতিপদ	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাবাদ	মথ্	৪৬৫	মিয়াদি(দী)	মি	৫৩৮	মিশ্রকেশী	মিশ্র্	৫৪৯	মী	মী	৫৫২	মুকটি(টী)	মুষ্	৫৬৬
মিথ্যাবাদী	মথ্	৪৬৫	মিয়াদখাটা	মি	৫৩৮	মিশ্রচোর	মিশ্র্	৫৪৯	মীড়	মী	৫৫২	মুকয়	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাবার্ত্তা	মথ্	৪৬৫	মিয়ানী	মি	৫৩৮	মিশ্রজ	মিশ্র্	৫৫০	মীঢ়	মিহ্	৫৫১	মুকল	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাব্যাপার	মথ্	৪৬৫	মিয়োঁ	মন্	৪৮১	মিশ্রজাতি	মিশ্র্	৫৪৯	মীঢ্বান	মিহ্	৫৫১	মুকা	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাভিধা	মথ্	৪৬৫	মির	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রণ	মিশ্র্	৫৫০	মীন	মী	৫৫২	মুকাবিলা	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাভিধান	মথ্	৪৬৫	মিরগাল	মৃৎ	৫৮৯	মিশ্রধন	মিশ্র্	৫৫০	মীনকেতন	মী	৫৫২	মুকু	মুচ্	৫৫৫
মিথ্যাভিযোগ	মথ্	৪৬৫	মিরগী	মৃগ্	৫৮৩	মিশ্রধান্য	মিশ্র্	৫৪৯	মীনকেতু	মী	৫৫২	মুকুট	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাভিশংসন	মথ্	৪৬৫	মিরজা	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রপুষ্পা	মিশ্র্	৫৪৯	মীনগন্ধা	মী	৫৫২	মুকুট	মু	৫৫৩
মিথ্যাভিশপ্ত	মথ্	৪৬৫	মিরজাদা	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রবর্ণ	মিশ্র্	৫৪৯	মীনঘাতী	মী	৫৫২	মুকুটমণি	মুচ্	৫৫৪
মিথ্যাভিশস্ত	মথ্	৪৬৫	মিরবকশী	মৃজ্	৫৮৭	মিশ্রবর্ণা	মিশ্র্	৫৪৯	মীনধাবনতোয়	মী	৫৫২	মুকুটামুকুটি	মুচ্	৫৫৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মুকুটি(টী)	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাকলাপ	মুচ্‌	৫৫৪	মুগধি	মুহ্‌	৫৬৮	মুছল্লম	মুচ্‌	৫৫৪	মুড়মুড়	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুটি(টী)	মুষ্‌	৫৬৬	মুক্তাগার	মুচ্‌	৫৫৪	মুগধিনী	মুহ্‌	৫৬৮	মুছা	মুচ্‌	৫৫৮	মুড়লা	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুতা	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাগুণ	মুচ্‌	৫৫৪	মুগধী	মুহ্‌	৫৬৮	মুছান	মুচ্‌	৫৫৮	মুড়লী	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুতি	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাজাল	মুচ্‌	৫৫৪	মুগসাউলী	মুহ্‌	৫৬৮	মুছাপ	মুচ্‌	৫৫৪	মুড়া	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুতিপদ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাঝুরি	মুচ্‌	৫৫৪	মুগা	মুহ্‌	৫৬৮	মুছি	মুচ্‌	৫৫৮	মুড়াপেট	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুন্দ	মুচ্‌	৫৫৫	মুক্তাত্মা	মুচ্‌	৫৫৪	মুগুধা	মুহ্‌	৫৬৮	মুছিদ	মুচ্‌	৫৫৪	মুড়ামাখন	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুন্দক	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাদাম	মুচ্‌	৫৫৪	মুগুধিনি	মুহ্‌	৫৬৮	মুজরা	ম্‌	৫৯৯	মুড়ামুড়ি	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুর	মুচ্‌	৫৫৫	মুক্তাপটল	মুচ্‌	৫৫৪	মুগুধিনী	মুহ্‌	৫৬৮	মুজরা	মু	৫৫৩	মুড়াসা	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুল	মুচ্‌	৫৫৬	মুক্তাপাঁতি	মুচ্‌	৫৫৪	মুগুর	মুদ্‌	৫৬২	মুজাইম	ম্‌	৫৯৯	মুড়ি (ড়ী)	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুলভাব	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাপ্রলম্ব	মুচ্‌	৫৫৪	মুগোরা	মুদ্‌	৫৬২	মুজাহেম	ম্‌	৫৯৯	মুড়িআনি	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুলাগ্র	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাপ্রসূ	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধ	মুহ্‌	৫৬৮	মুঝে	ম্‌	৫৯৯	মুড়িআলা	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুলিকা	মুচ্‌	৫৫৫	মুক্তাফল	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধকর	মুহ্‌	৫৬৮	মুঝে	মু	৫৫৩	মুড়িআলী	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুলিত	মুচ্‌	৫৫৫	মুক্তাবলি(লী)	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধতা	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞিঃ	মু	৫৫৩	মুড়িওয়ালী	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুলিতাক্ষ	মুচ্‌	৫৫৫	মুক্তামণি	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধত্ব	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞেঃ	মু	৫৫৩	মুড়িবেচুনী	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকুলী	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তামণিসর	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধদৃক্‌	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্চ	মুচ্‌	৫৫৪	মুড়িমালা	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকুলীকৃত	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তামাতা	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধধী	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জ্‌	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুড়ো	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকেদ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তামালা	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধবধূ	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জ	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মু(মু)ঢ়া	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুকেরি	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তারত্ন	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধবিলোকিত	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জকেশ	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ড	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুকোশ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তালতা	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধবুদ্ধি	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জকেশী	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডক	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্ত	মুচ্‌	৫৫৬	মুক্তাশুক্তি	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধবোধ	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জবন্ধন	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডচণক	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তক	মুচ্‌	৫৫৬	মুক্তাসন	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধভাব	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জবাসাঃ	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডধান্য	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তকচ্ছ	মুচ্‌	৫৫৭	মুক্তাসার	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধমতি	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জমেখলী	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডন	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তকঞ্চুক	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাস্থূল	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধস্বভাব	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জর	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডপাত	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তকণ্ঠ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তাস্ফোট	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধাক্ষী	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জরিত	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডমণ্ডলী	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুক্তকর	মুচ্‌	৫৫৭	মুক্তাস্রক্‌	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধাগ্রণী	মুহ্‌	৫৬৮	মুঞ্জ্‌	মঞ্জ্‌	৪৫৩	মুণ্ডমালা	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তকেশ	মুচ্‌	৫৫৭	মুক্তাহার	মুচ্‌	৫৫৪	মুগ্ধানন	মুহ্‌	৫৬৮	মুট্‌	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডশালী	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তচেতাঃ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তি	মুচ্‌	৫৫৬	মুগ্ধালোক	মুহ্‌	৫৬৮	মুট	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডলৌহ	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুক্তধ্বনি	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিক্ষেত্র	মুচ্‌	৫৫৭	মুগ্ধেন্দু	মুহ্‌	৫৬৮	মুট(ঠ)কলম	মুষ্‌	৪৫৮	মুণ্ডা	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তনিদ্র	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিদরখাস্ত	মুচ্‌	৫৫৪	মুঙা	মু	৫৫৩	মুট(ঠ)কি	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডায়স	মুণ্ড্‌	৫৫৯
মুক্তনির্মোক	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিপদ	মুচ্‌	৫৫৪	মুচক	মুচ্‌	৫৫৭	মুট(ঠ)কী	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডি	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তপুরীষ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিমণ্ডপ	মুচ্‌	৫৫৭	মুচকা	মুচ্‌	৫৫৭	মুটমুট	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডিত	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তবন্ধন	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিমার্গ	মুচ্‌	৫৫৪	মুচকি	মুচ্‌	৫৫৭	মুটা(ঠা)	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডী	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তবর্ষী	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিমুক্ত	মুচ্‌	৫৫৪	মুচকুন্দ	মুচ্‌	৫৫৭	মুটি(ঠি)	মুষ্‌	৫৬৬	মুণ্ডু	মুণ্ড্‌	৫৬০
মুক্তবসন	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্তিয়ার	মুচ্‌	৫৫৪	মুচকুন্দপ্রসাদক	মুচ্‌	৫৫৪	মুটিয়া	মুষ্‌	৫৬৬	মুত	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তবেণী	মুচ্‌	৫৫৭	মুক্‌খি	মুচ্‌	৫৫৪	মুচড়	মুচ্‌	৫৫৪	মুটিয়া	মট্‌	৪৫৬	মুতা	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তমূর্দ্ধজ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্‌খু	মুচ্‌	৫৫৪	মুচড়া	মুচ্‌	৫৫৪	মুটে	মট্‌	৪৫৬	মুতীম	মুচ্‌	৫৫৪
মুক্তল	মুচ্‌	৫৫৪	মুখ্‌খী	মুচ্‌	৫৫৪	মুচড়ান	মুচ্‌	৫৫৪	মুঠী(ঠী)	মুষ্‌	৫৬৬	মুৎ (মুদ্‌)	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তলজ্জ	মুচ্‌	৫৫৪	মুক্‌খী	মুষ্‌	৫৬৬	মুচলকা	মুচ্‌	৫৫৪	মুটুকামুটুকি	মুষ্‌	৫৬৬	মুৎফরাক্কা	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তশিখ	মুচ্‌	৫৫৪	মুখ্‌খু	মুচ্‌	৫৫৪	মুচি	মুচ্‌	৫৫৪	মুটুকি	মুষ্‌	৫৬৬	মুৎসদ্দি(দ্দী)	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তশৈশব	মুচ্‌	৫৫৪	মুখ	মুচ্‌	৫৫৪	মুচুটী	মুচ্‌	৫৫৪	মুটে	মুষ্‌	৫৬৬	মুৎসুদ্দি(দ্দী)	ম্‌	৫৯৯
মুক্তসংশয়	মুচ্‌	৫৫৪	মুখ	মু	৫৫৩	মুচুড়	মুচ্‌	৫৫৪	মুটেমজুর	মট্‌	৪৫৬	মুথা	মুষ্‌	৫৬৬
মুক্তসঙ্গ	মুচ্‌	৫৫৪	মুখাদিম	ম্‌	৫৯৯	মুচ্ছুদ্দি(দ্দী)	ম্‌	৫৯৯	মুঠামুঠি	মুষ্‌	৫৬৬	মুথো	মুষ্‌	৫৬৬
মুক্তহস্ত	মুচ্‌	৫৫৭	মুগ	মুদ্‌	৫৬২	মুচমুচ	মুচ্‌	৫৫৪	মুড়	মুণ্ড্‌	৫৫৯	মুদ	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তা	মুচ্‌	৫৫৬	মুগধ	মুহ্‌	৫৬৮	মুছ	মুচ্‌	৫৫৮	মুড়কি(কী)	মুণ্ড্‌	৫৫৯	মুঁদ	মুদ্‌	৫৬২
মুক্তাজাল	মুচ্‌	৫৫৪	মুগধল	মুহ্‌	৫৬৮	মুছ্‌	মুচ্‌	৫৫৪	মুড়ন	মুণ্ড্‌	৫৫৯	মৃদঙ্গ	মৃৎ	৫৮৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মুদ্দড়ী	মুদ্ ৫৬২	মুদ্রি	মুদ্ ৫৬২	মুনিস্া	মন্ ৪৮১	মুরব্বা	ম্ ৫৯৯	মুষী	মুষ্ ৫৬৬
মুদমতি	মুদ্ ৫৬২	মুদ্রিকা	মুদ্ ৫৬২	মুনিস্থল	মন্ ৫১৫	মুরল	মু ৫৫৪	মুষ্ক	মুষ্ ৫৬৬
মুদরি	মুদ্ ৫৬২	মুদ্রিত	মুদ্ ৫৬২	মুনিস্থান	মন্ ৫১৫	মুরলা	মু ৫৫৪	মুষ্ককচ্ছু	মুষ্ ৫৬৬
মুদসদন	মুদ্ ৫৬২	মুদ্রিতাক্ষ	মুদ্ ৫৬২	মুনী	মন্ ৪৮১	মুরলী	মু ৫৫৪	মুষ্কদেশ	মুষ্ ৫৬৬
মুদা	মুদ্ ৫৬২	মুদ্রিতাক্ষর	মুদ্ ৫৬২	মুনীন্দ্র	মন্ ৫১৫	মুরলীধ্বনি	মু ৫৫৩	মুষ্কদ্বয়	মুষ্ ৫৬৬
মুদাফৎ	মুদ্ ৫৬২	মুধা	মুদ্ ৫৬২	মুনীশ	মন্ ৫১৫	মুরশিদ	মু ৫৫৩	মুষ্কর	মুষ্ ৫৬৬
মুদারা	মুদ্ ৫৬২	মুন	মুদ্ ৫৬২	মুনীশ্বর	মন্ ৪৮১	মুরা	মু ৫৫৩	মুষ্কিল	মুষ্ ৫৬৬
মুদি (মুদী)	মুদ্ ৫৬২	মুন	মন্ ৪৮১	মুন্যন্ন	মন্ ৫১৫	মুরাদ	মু ৫৫৩	মুষ্কশোফ	মুষ্ ৫৬৬
মুদিখানা	মুদ্ ৫৬২	মুনকির	মন্ ৪৮১	মুন্যষভ	মন্ ৪৮১	মুরারি	মু ৫৫৩	মুষ্কহীন	মুষ্ ৫৬৬
মুদিত	মুদ্ ৫৬২	মুনকির	মুদ্ ৫৬২	মুন্দ (মুন)	মুদ্ ৫৬২	মুরুক্ষ	মুহ্ ৫৬৮	মুষ্ট	মুষ্ ৫৬৬
মুদিতা	মুদ্ ৫৬২	মুনাফা	মুদ্ ৫৬২	মুন্‌শী	মন্ ৪৮১	মুরুগা	মুহ্ ৫৬৮	মুষ্টক	মুষ্ ৫৬৬
মুদিতোন্মুখ	মুদ্ ৫৬২	মুনাফা	মন্ ৪৮১	মুন্‌শীগিরী	মন্ ৪৮১	মুরোদ	মু ৫৫৩	মুষ্টামুষ্টি	মুষ্ ৫৬৬
মুদির	মুদ্ ৫৬২	মুনাদি	মন্ ৪৮১	মুন্‌শীজী	মন্ ৪৮১	মুর্দ্ধ	মৃ ৫৭৩	মুষ্টি	মুষ্ ৫৬৭
মুদিরেক্ষণ	মুদ্ ৫৬২	মুনাদি	মুদ্ ৫৬২	মুন্‌শীয়ানা	মন্ ৪৮১	মুর্দ্ধা	মৃ ৫৭৩	মুষ্টি	মু ৫৫৩
মুদিরেক্ষণা	মুদ্ ৫৬২	মুনাসিব	মুদ্ ৫৬২	মুন্‌সিব	মন্ ৪৮১	মুর্দ্ধাফরাস	মৃ ৫৭৩	মুষ্টিক	মুষ্ ৫৬৭
মুদো	মুহ্ ৫৬৮	মুনাসিব	মন্ ৪৮১	মুন্‌সী	মন্ ৪৮১	মুর্ব্ব	মু ৫৫৩	মুষ্টিকরণ	মুষ্ ৫৬৬
মুদগ	মুদ্ ৫৬২	মুনি	মন্ ৫১৪	মুন্‌সেফ	মন্ ৪৮১	মুর্ম্মুর	মু ৫৫৩	মুষ্টিকা	মুষ্ ৫৬৬
মুদগপর্ণী	মুদ্ ৫৬২	মুনি	মণ্ ৪৫৯	মুন্‌সেফী	মন্ ৪৮১	মুলতবি	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিগ্রহ	মুষ্ ৫৬৬
মুদগবড়া	মুদ্ ৫৬২	মুনি	মুদ্ ৫৬২	মুমুক্ষা	মু ৫৫৩	মুলতান	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিগ্রাহ্য	মুষ্ ৫৬৬
মুদগমোদক	মুদ্ ৫৬২	মুনিকন্যা	মন্ ৪৮১	মুমুক্ষা	মুচ্ ৫৫৪	মুলতানী	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিঘাত	মুষ্ ৫৬৬
মুদগর	মুদ্ ৫৬২	মুনিকুমার	মন্ ৪৮১	মুমুষিষু	মু ৫৫৩	মুলা	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিদেশ	মুষ্ ৫৬৬
মুদগল	মুদ্ ৫৬৩	মুনিচ্ছদ	মন্ ৪৮১	মুমূর্ষা	মু ৫৫৩	মুলাকাত	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিদ্যূত	মুষ্ ৫৬৬
মুদগাঙ্কুর	মুদ্ ৫৬২	মুনিতনয়া	মন্ ৪৮১	মুফেদ	ম্ ৫৯৯	মুলিবাঁশ	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিন্ধম	মুষ্ ৫৬৬
মুদগার্দ্রবট	মুদ্ ৫৬২	মুনিতরু	মন্ ৪৮১	মুফ্‌তী	ম্ ৫৯৯	মুল্‌ক	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিন্ধয়	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্দ	মৃ ৫৭৩	মুনিত্রয়	মন্ ৫১৫	মুয়া	মুদ্ ৫৬২	মুল্লা	মৃ ৫৬৯	মুষ্টিপাত	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্দই	মুদ্ ৫৬২	মুনিদারক	মন্ ৪৮১	মুর্	মু ৫৫৩	মুশল	মুষ্ ৫৬৭	মুষ্টিপ্রহার	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্দত	মুদ্ ৫৬২	মুনিদ্রুম	মন্ ৪৮১	মুর	মু ৫৫৩	মুশলধারা	মুষ্ ৫৬৬	মুষ্টিবন্ধ	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্দতী	মুদ্ ৫৬২	মুনিপিত্তল	মন্ ৪৮১	মুরগণ্ড	মু ৫৫৩	মুশকিল	মুষ্ ৫৬৬	মুষ্টিবিসর্গ	মুষ্ ৫৬৭
মুদ্দা (মোদ্দা)	মুদ্ ৫৬৪	মুনিপুঙ্গব	মন্ ৪৮১	মুরগী	মু ৫৫৩	মুষ্	মুষ্ ৫৬৬	মুষ্টিভিক্ষা	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্দাই	মুদ্ ৫৬২	মুনিপুত্র	মন্ ৪৮১	মুরগী	মৃগ্ ৫৮৩	মুষ (মুস)	মুষ্ ৫৬৬	মুষ্টিমেয়	মুষ্ ৫৬৭
মুদ্রণ	মুদ্ ৫৬৪	মুনিপুষ্প	মন্ ৪৮১	মুরচা	মু ৫৫৩	মুষক	মুষ্ ৫৬৬	মুষ্টিযুদ্ধ	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রা	মুদ্ ৫৬৪	মুনিপূগ	মন্ ৪৮১	মুর(রু)ছ	মৃ ৫৬৯	মুষক	মুষ্ ৫৬৬	মুষ্টিযোগ	মুষ্ ৫৬৭
মুদ্রাকার	মুদ্ ৫৬২	মুনিব	মন্ ৪৮১	মুরছা	মৃ ৫৬৯	মুষ্(স্)ড়া	মুষ্ ৫৬৭	মুষ্ট্যষ্টক	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাক্ষর	মুদ্ ৫৬২	মুনিবন	মন্ ৫১৫	মুরছান	মৃ ৫৬৯	মুষল	মুষ্ ৫৬৭	মুসবিদা	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাঙ্ক	মুদ্ ৫৬২	মুনিবৃক্ষ	মন্ ৪৮১	মুরজ	মু ৫৫৩	মুষলধারা	মুষ্ ৫৬৬	মুসব্বর	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাঙ্কণ	মুদ্ ৫৬২	মুনিবৃত্তি	মন্ ৫১৫	মুরজা	মু ৫৫৩	মুষলী	মুষ্ ৫৬৭	মুসমা	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাঙ্কিত	মুদ্ ৫৬২	মুনিবেশ	মন্ ৪৮১	মুরজিৎ	মু ৫৫৩	মুষলধারী	মুষ্ ৫৬৬	মুসম্মৎ	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাদোষ	মুদ্ ৫৬৪	মুনিব্রত	মন্ ৫১৫	মুরত	মৃ ৫৬৯	মুষলমান	মুষ্ ৫৬৬	মুসল	মুষ্ ৫৬৭
মুদ্রামার্গ	মুদ্ ৫৬২	মুনিভেষজ	মন্ ৪৮১	মুরতি	মৃ ৫৬৯	মুষলিম	মুষ্ ৫৬৬	মুসলমান	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাযন্ত্র	মুদ্ ৫৬২	মুনিমস্ত	মন্ ৪৮১	মুরদ	মু ৫৫৩	মুষা	মুষ্ ৫৬৬	মুসলমানী	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রারক্ষক	মুদ্ ৫৬৪	মুনিমন্ত্র	মন্ ৪৮১	মুরদ	মৃ ৫৭৩	মুষাকানী	মুষ্ ৫৬৬	মুসলামুসলি	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রারাক্ষস	মুদ্ ৫৬৪	মুনিয়া	মণ্ ৪৫৯	মুরদ্বিট্	মু ৫৫৩	মুষিত	মুষ্ ৫৬৭	মুসলিম	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রালিপি	মুদ্ ৫৬২	মুনিষ	মন্ ৫১৫	মুরবৈরী	মু ৫৫৩	মুষিতচেতা	মুষ্ ৫৬৬	মুসলী	মুষ্ ৫৬৭
মুদ্রাশঙ্খ	মুদ্ ৫৬২	মুনিষ্য	মন্ ৪৮১	মুররিপু	মু ৫৫৩	মুষিতত্রপ	মুষ্ ৫৬৬	মুসলোলূখল	মুষ্ ৫৬৬
মুদ্রাস্থান	মুদ্ ৫৬২	মুনিস	মন্ ৪৮১	মুরব্বি	মু ৫৫৩	মুষিতস্মৃতি	মুষ্ ৫৬৬	মুসল্য	মুষ্ ৫৬৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মুসা	মুষ্ ৫৬৬	মূত	মুদ্ ৫৬২	মূর্চ্ছাপরিপ্লুত	মূ ৫৬৯	মূলকারিকা	মূ ৫৬৯	মূষক	মুষ্ ৫৬৬
মুসাফির	মুষ্ ৫৬৬	মূত	মূ ৫৬৯	মূর্চ্ছাপরীত	মূ ৫৬৯	মূলকৃচ্ছ্র	মূ ৫৬৯	মূষগ	মুষ্ ৫৬৬
মুসাবিদা	মুষ্ ৫৬৬	মূতা	মূ ৫৬৯	মূর্চ্ছাপ্রদ	মূ ৫৬৯	মূলখানক	মূ ৫৬৯	মূষণ	মুষ্ ৫৬৬
মুসাহেব	মুষ্ ৫৬৬	মূতান	মূ ৫৬৯	মূর্চ্ছাল	মূ ৫৬৯	মূলগুণ	মূ ৫৬৯	মূষা	মুষ্ ৫৬৬
মুসাহেবী	মুষ্ ৫৬৬	মূত্র্	মূ ৫৬৯	মূর্চ্ছিত	মূ ৫৬৯	মূলগ্রন্থ	মূ ৫৬৯	মূষিক	মুষ্ ৫৬৮
মুস্ক	মুষ্ ৫৬৬	মূত্র	মূ ৫৬৯	মূর্খ	মুহ্ ৫৬৮	মূলচ্ছিন্ন	মূ ৫৬৯	মূষিকনির্ব্বিশেষ	মুষ্ ৫৬৬
মুস্কিল,	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রকর	মূ ৫৬৯	মূর্খতা	মুহ্ ৫৬৮	মূলচ্ছেদ	মূ ৫৭১	মূষিকপর্ণী	মুষ্ ৫৬৬
মুস্ত	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রকৃচ্ছ্র	মূ ৫৬৯	মূর্খমণ্ডল	মুহ্ ৫৬৮	মূলজ	মূ ৫৬৯	মূষিকবিষাণ	মুষ্ ৫৬৬
মুস্ত	মু ৫৫৩	মূত্রকোশ	মূ ৫৬৯	মূর্খরাজ	মুহ্ ৫৬৮	মূলজাতি	মূ ৫৬৯	মূষিকরথ	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তক	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রক্ষয়	মূ ৫৬৯	মূর্খশত	মুহ্ ৫৬৮	মূলত্রিকোণ	মূ ৫৬৯	মূষিকস্থল	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তফি(ফী)	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রজঠর	মূ ৫৬৯	মূর্ত্ত	মূ ৫৭০	মূলধন	মূ ৫৬৯	মূষিকা	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তা	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রদোষ	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তি	মূ ৫৭০	মূলধাতু	মূ ৫৬৯	মূষিকাঙ্ক	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তা	মু ৫৫৩	মূত্রনিরোধ	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিধর	মূ ৫৭০	মূলনগর	মূ ৫৬৯	মূষিকাদ	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তাক্ষতি	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রপথ	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিবিঘ্নেশ	মূ ৫৬৯	মূলপুরুষ	মূ ৫৬৯	মূষিকোৎকর	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তাপ্ররোহ	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রপরীক্ষা	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিমৎ	মূ ৫৬৯	মূলপ্রকৃতি	মূ ৫৭১	মূষী	মুষ্ ৫৬৬
মুস্তাভ	মুষ্ ৫৬৬	মূত্রপুট	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিমতী	মূ ৫৬৯	মূলবচন	মূ ৫৬৯	মূষীক	মুষ্ ৫৬৬
মুহ্	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রপ্রসেক	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিমন্ত	মূ ৫৬৯	মূলবিত্ত	মূ ৫৬৯	মূষীকা	মুষ্ ৫৬৬
মুহরি	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রবর্দ্ধক	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিমান	মূ ৫৬৯	মূলবিনাশন	মূ ৫৬৯	মূষীকরণ	মুষ্ ৫৬৬
মুহান	মুহ্ ৫৬৯	মূত্রবহ	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিসঞ্চর	মূ ৫৬৯	মূলব্যসনবৃত্তি	মূ ৫৭১	মৃ	মৃ ৫৭৩
মুহি	মু ৫৫৩	মূত্রমার্গ	মূ ৫৬৯	মূর্ত্তিসেবন	মূ ৫৭০	মূলব্রতী	মূ ৫৬৯	মৃকণ্ড	মৃ ৫৮২
মুহির	মুহ্ ৫৬৮	মূত্ররোধ	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধ	মুহ্ ৫৬৮	মূলভব	মূ ৫৬৯	মৃকণ্ডু	মৃ ৫৭৩
মুহুঃ	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রশূল	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধক	মুহ্ ৫৬৮	মূলভৃত্য	মূ ৫৭১	মৃগ	মৃগ্ ৫৮৫
মুহুর্চ্ছিত	মূ ৫৬৯	মূত্রসংক্ষয়	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধন্য	মুহ্ ৫৬৮	মূলমন্ত্র	মূ ৫৬৯	মৃগ-আঁখি	মৃগ্ ৫৮৩
মুহুর্মুহুঃ	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রসঙ্গ	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধা	মুহ্ ৫৬৮	মূলরাশি	মূ ৫৬৯	মৃগকানন	মৃগ্ ৫৮৫
মুহুর্ভাষা	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রাঘাত	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাজ	মুহ্ ৫৬৮	মূলশকুন	মূ ৫৬৯	মৃগকেতন	মৃগ্ ৫৮৫
মুহূর্ত্ত	মু ৫৫৩	মূত্রাতিসার	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাধর	মুহ্ ৫৬৮	মূলসাধন	মূ ৫৬৯	মৃগক্ষীর	মৃগ্ ৫৮৩
মুহূর্ত্ত	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রার্ত্তি	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধান্ত	মুহ্ ৫৬৮	মূলস্থান	মূ ৫৬৯	মৃগগ্রহণ	মৃগ্ ৫৮৩
মুহ্যমান	মুহ্ ৫৬৮	মূত্রাশয়	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাপিণ্ড	মুহ্ ৫৬৮	মূলস্রোতঃ	মূ ৫৬৯	মৃগঙ্ক	মৃগ্ ৫৮৫
মূ	মূ ৫৬৯	মূত্রিত	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাবসিক্ত	মুহ্ ৫৬৮	মূলস্বামী	মূ ৫৬৯	মৃগচারী	মৃগ্ ৫৮৩
মূক	মূ ৫৭০	মূত্রোৎসর্গ	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাবেষ্টন	মুহ্ ৫৬৮	মূলহর	মূ ৫৬৯	মৃগজাতি	মৃগ্ ৫৮৩
মূকতা	মূ ৫৬৯	মূরছ	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাভিষিক্ত	মুহ্ ৫৬৮	মূলা	মূ ৫৬৯	মৃগজালিকা	মৃগ্ ৫৮৩
মূকত্ব	মূ ৫৬৯	মূরছা	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধাভিষেক	মুহ্ ৫৬৮	মূলাধার	মূ ৫৭১	মৃগজীবন	মৃগ্ ৫৮৩
মূকাগুজ	মূ ৫৬৯	মূরছান	মূ ৫৬৯	মূর্দ্ধনিবর্ত্তী	মুহ্ ৫৬৮	মূলান	মূ ৫৬৯	মৃগজীবী	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়	মুহ্ ৫৬৮	মূরখ	মুহ্ ৫৬৮	মূর্ব্ব্	মূ ৫৬৯	মূলায়তন	মূ ৫৬৯	মৃগণা	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়গর্ভ	মুহ্ ৫৬৮	মূরত	মূ ৫৬৯	মূর্ব্বা	মূ ৫৬৯	মূলিক	মূ ৫৬৯	মৃগতৃষা	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়গ্রাহ	মুহ্ ৫৬৮	মূরতি	মূ ৫৬৯	মূর্ব্বিকা	মূ ৫৬৯	মূলী	মূ ৫৬৯	মৃগতৃষ্ণা	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়চেতন	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছ	মূ ৫৭০	মূর্ব্বী	মূ ৫৬৯	মূলীকরণ	মূ ৫৬৯	মৃগতৃষ্ণিকা	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়চেতাঃ	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছন	মূ ৫৭০	মূর্ষা	মন্ ৪৮১	মূলোচ্ছেদ	মূ ৫৬৯	মৃগদংশ	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়ধান্য	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছনা	মূ ৫৭০	মূল্	মূ ৫৬৯	মূলোৎখাত	মূ ৫৬৯	মৃগদংশক	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়প্রভু	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছমান	মূ ৫৬৯	মূল	মূ ৫৭১	মূলোৎপাটন	মূ ৫৬৯	মৃগদাব	মৃগ্ ৫৮৫
মূঢ়বুদ্ধি	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছল	মূ ৫৬৯	মূলক	মূ ৫৬৯	মূল্য	মূ ৫৭২	মৃগদ্যু	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়মতি	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছা	মূ ৫৭০	মূলকপণ	মূ ৫৬৯	মূল্যক	মূ ৫৭২	মৃগদৃক্	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়যোনি	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছাগতি	মূ ৫৬৯	মূলকর্ম্ম	মূ ৫৬৯	মূল্যবান	মূ ৫৭২	মৃগদ্বিট্	মৃগ্ ৫৮৩
মূঢ়া	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছাপগম	মূ ৫৬৯	মূলকার	মূ ৫৬৯	মূষ্	মুষ্ ৫৬৬	মৃগধর	মৃগ্ ৫৮৫
মূঢ়াত্মা	মুহ্ ৫৬৮	মূর্চ্ছাপন্ন	মূ ৫৬৯	মূলকারণ	মূ ৫৬৯	মূষ	মুষ্ ৫৬৬	মৃগধূর্ত্ত	মৃগ্ ৫৮৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মৃগনয়না	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগশাব	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজাবিহীন	মৃজ্ ৫৮৭	মৃতমাতৃক	মৃ ৫৭৩	মৃৎকুণ্ডিকা	মৃৎ ৫৮৯
মৃগনয়নী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগশাবক	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজু	মৃজ্ ৫৮৭	মৃতশঙ্কা	মৃ ৫৭৩	মৃৎপাত্র	মৃৎ ৫৯০
মৃগনাথ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগশির	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজ্জ	মৃৎ ৫৮৯	মৃতশব্দ	মৃ ৫৭৩	মৃৎপিণ্ড	মৃৎ ৫৯০
মৃগনাভি	মৃগ্ ৫৮৬	মৃগশ্রেষ্ঠ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজ্য	মৃজ্ ৫৮৭	মৃতসংস্কার	মৃ ৫৭৩	মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি	মৃৎ ৫৯০
মৃগপতি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগহন্তা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃড্	মৃ ৫৭৩	মৃতসঞ্জীবন	মৃ ৫৭৩	মৃৎপ্রক্ষেপ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগপোত	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাক্ষি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃড়	মৃ ৫৭৩	মৃতসঞ্জীবনী	মৃ ৫৭৩	মৎসা	মৃৎ ৫৮৯
মৃগপ্রভু	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাঙ্ক	মৃগ্ ৫৮৫	মৃড়ন	মৃ ৫৭৩	মৃতসূতক	মৃ ৫৭৩	মৃৎস্ন	মৃৎ ৫৮৯
মৃগবধাজীব	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাঙ্কতনয়	মৃগ্ ৫৮৩	মৃড়া	মৃ ৫৭৩	মৃতস্নাত	মৃ ৫৭৩	মৃৎস্না	মৃৎ ৫৮৯
মৃগবধূ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাঙ্কবন্ধু	মৃগ্ ৫৮৩	মৃড়ানী	মৃ ৫৭৩	মৃতস্নান	মৃ ৫৭৩	মৃদ্	মৃৎ ৫৮৯
মৃগবন	মৃগ্ ৫৮৫	মৃগাঙ্কমণি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃড়ানীপতি	মৃ ৫৭৩	মৃতহার	মৃ ৫৭৩	মৃদং	মৃৎ ৫৮৯
মৃগবন্ধনী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাঙ্কমৌলি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃড়ী	মৃ ৫৭৩	মৃতহারী	মৃ ৫৭৩	মৃদঙ্কুর	মৃৎ ৫৮৯
মৃগবাহন	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাঙ্কশেখর	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণাল	মৃৎ ৫৮৯	মৃতা	মৃ ৫৭৩	মৃদঙ্কুরু	মৃৎ ৫৮৯
মৃগবৃত্তি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাঙ্গনা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালকোমল	মৃৎ ৫৮৯	মৃতাশু	মৃ ৫৭৩	মৃদঙ্গ	মৃৎ ৫৯০
মৃগব্য	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাজিন	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালজালক	মৃৎ ৫৮৯	মৃতাশৌচ	মৃ ৫৭৩	মৃদঙ্গার	মৃৎ ৫৯০
মৃগব্যাধ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাজীব	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালধবল	মৃৎ ৫৮৯	মতাহ্	মৃ ৫৭৩	মৃদঙ্গী	মৃৎ ৫৮৯
মৃগমণি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাটবী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালপত্র	মৃৎ ৫৮৯	মৃতি	মৃ ৫৭৩	মৃদা	মৃৎ ৫৮৯
মৃগমদ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাগুজা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালবলয়	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্তিকা	মৃৎ ৫৮৯	মৃদিত	মৃৎ ৫৮৯
মৃগমদবাসাঃ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাদ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালবল্লী	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্তিকালিঙ্গ	মৃৎ ৫৮৯	মৃদঙ্গ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগমন্দ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাদন	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালভঙ্গ	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যু	মৃ ৫৮৩	মৃদু	মৃৎ ৫৯০
মৃগমন্দ্র	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাদনী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালসূত্র	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যুকন্যা	মৃ ৫৭৩	মৃদুক	মৃৎ ৫৮৯
মৃগমাস	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাধিপ	মৃগ্ ৫৮৩	মণালহার	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যুকর	মৃ ৫৭৩	মৃদুকার্ষ্ণায়স	মৃৎ ৫৮৯
মৃগমুখ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগান্তক	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালিকা	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যুকল্প	মৃ ৫৭৩	মৃদুকীল	মৃৎ ৫৮৯
মৃগযূথ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাবিৎ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালিনী	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যুঞ্জয়	মৃ ৫৭৩	মৃদুকৃষ্ণায়স	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়া	মৃগ্ ৫৮৬	মৃগাবিধ্	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণালী	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যুঞ্জয়ী	মৃ ৫৭৩	মৃদুকোপ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াক্রীড়ন	মৃগ্ ৫৮৬	মৃগারাতি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃণ্ময়	মৃৎ ৫৮৯	মৃত্যুতূর্য্য	মৃ ৫৭৩	মৃদুকোষ্ঠক	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াক্রীড়া	মৃগ্ ৫৮৬	মৃগারি	মৃগ্ ৫৮৩	মৃত	মৃ ৫৮৩	মৃত্যুদ	মৃ ৫৭৩	মৃদুগণ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াধর্ম্ম	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাল	মৃৎ ৫৮৯	মৃতক	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুদূত	মৃ ৫৭৩	মৃদুগমন	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াপবাদী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগাস্য	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতকল্প	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুদ্বার	মৃ ৫৭৩	মৃদুগামী	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াবন	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগিণী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতগর্ভা	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুনাশক	মৃ ৫৭৩	মৃদুচ্ছদ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াবিহার	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগিত	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতগৃহ	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুনাশন	মৃ ৫৭৩	মৃদুতা	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াবিহারী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতচেল	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুপতি	মৃ ৫৭৩	মৃদুতীক্ষ্ণ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াবেশ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগীলোচনা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতজীবন	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুপথ	মৃ ৫৭৩	মৃদুত্বক	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াযান	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগেক্ষণা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতগু	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুপা	মৃ ৫৭৩	মৃদুপর্ব্বক	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়ারণ্য	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগেন্দ্র	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতদার	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুপাশ	মৃ ৫৭৩	মৃদুপাণি	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়াশীল	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগেন্দ্রাসন	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতদেহ	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুবাণ	মৃ ৫৭৩	মৃদুপাশ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়ী	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগেশ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতধবা	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুভীত	মৃ ৫৭৩	মৃদুপূর্ব্ব	মৃৎ ৫৮৯
মৃগয়ু	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগেশ্বর	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতনির্য্যাতক	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুরাট্(জ্)	মৃ ৫৭৩	মৃদুপ্রযত্ন	মৃৎ ৫৮৯
মৃগরমণ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগোত্তম	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতপ	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুরায়	মৃ ৫৭৩	মৃদুপ্রৌঢ়	মৃৎ ৫৮৯
মৃগরাট্	মৃগ্ ৫৮৩	মৃগ্য	মৃগ্ ৫৮৩	মৃতপা	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুলোক	মৃ ৫৭৩	মৃদুবর্গ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগরিপু	মৃগ্ ৫৮৩	মৃচ্চয়	মৃৎ ৫৮৯	মৃতপ্রায়	মৃ ৫৭৩	মৃত্যুহেতু	মৃ ৫৭৩	মৃদুবাক	মৃৎ ৫৮৯
মৃগরোচনা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃচ্ছকটিক	মৃৎ ৫৮৯	মৃতবৎ	মৃ ৫৭৩	মৃৎ (মৃদ্)	মৃৎ ৫৮৯	মৃদুবাত	মৃৎ ৫৮৯
মৃগরোমজ	মৃগ্ ৫৮৩	মৃচ্ছকটিকা	মৃৎ ৫৮৯	মৃতবৎসা	মৃ ৫৭৩	মৃৎকণ	মৃৎ ৫৯০	মৃদুভাষী	মৃৎ ৫৮৯
মৃগলক্ষ্মা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজ্	মৃজ্ ৫৮৭	মৃতবৎসিকা	মৃ ৫৭৩	মৃৎকর	মৃৎ ৫৯০	মৃদুমন্দ	মন্ ৫০১
মৃগলাঞ্ছন	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজ	মৃজ্ ৫৮৭	মৃতবাসর	মৃ ৫৭৩	মৃৎকর্ম্ম	মৃৎ ৫৮৯	মৃদুমুখ	মৃৎ ৫৮৯
মৃগলোচনা	মৃগ্ ৫৮৩	মৃজা	মৃজ্ ৫৮৭	মৃতভর্ত্তৃকা	মৃ ৫৭৩	মৃৎকাংস্য	মৃৎ ৫৮৯	মৃদুল	মৃৎ ৫৮৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
মৃদুলগামিনী	মৃৎ	৫৮৯	মেক্	মি	৫৩৮	মেঘপুষ্প	মিহ্	৫৫১	মেঘোদক	মিহ্	৫৫১	মেটো	মট্	৪৫৬
মৃদুস্পর্শ	মৃৎ	৫৮৯	মেকদার	মি	৫৩৮	মেঘবপু	মিহ্	৫৫১	মেঘ্নী	মিহ্	৫৫১	মেঠ	মিহ্	৫৫১
মৃদুহাসী	মৃৎ	৫৮৯	মেকল	মি	৫৩৮	মেঘবর্ণ	মিহ্	৫৫১	মেচক	মক্	৪৪৪	মেঠাই	মিষ্	৫৫০
মৃদুহৃদয়	মৃৎ	৫৮৯	মেকলকন্যকা	মি	৫৩৮	মেঘবর্ত্ম	মিহ্	৫৫১	মেচকিত	মক্	৪৪৪	মেঠি	মথ্	৪৬৫
মৃদূৎপল	মৃৎ	৫৮৯	মেকলাদ্রিজা	মি	৫৩৮	মেঘবহ্নি	মিহ্	৫৫১	মেচুনী	মদ্	৪৬৮	মেঠী	মথ্	৪৬৫
মৃদ্‌ঘট	মৃৎ	৫৮৯	মেকামেকি	মি	৫৩৮	মেঘবাহন	মিহ্	৫৫১	মেছ(স্)মার	মি	৫৩৮	মেচি	মথ্	৪৬৫
মৃদ্‌ভাণ্ড	মৃৎ	৫৮৯	মেকি(কী)	মি	৫৩৮	মেঘবিতান	মিহ্	৫৫১	মেছুয়া	মদ্	৪৬৮	মেঠে	মট্	৪৫৬
মৃদ্‌ভাজন	মৃৎ	৫৮৯	মেকুর	মি	৫৩৮	মেঘবিস্ফূর্জ্জিত	মিহ্	৫৫১	মেছো	মদ্	৪৬৮	মেঠো	মট্	৪৫৬
মৃদ্গ	মৃৎ	৫৮৯	মেখ্	মি	৫৩৮	মেঘভাঙ্গা	মিহ্	৫৫১	মেছোহাটা	মদ্	৪৬৮	মেঠোইংরেজি	মট্	৪৫৬
মৃদ্বঙ্গ	মৃৎ	৫৮৯	মেখল	মি	৫৩৮	মেঘমণি	মিহ্	৫৫১	মেজ	মক্	৪৪৪	মেঠোগান	মট্	৪৫৬
মৃদ্বী	মৃৎ	৫৮৯	মেখলকন্যা	মি	৫৩৮	মেঘমন্দ্র	মিহ্	৫৫১	মেজকী	মক্	৪৪৪	মেঠোবক্তৃতা	মট্	৪৫৬
মৃদ্বীকা	মৃৎ	৫৮৯	মেখলদাম	মি	৫৩৮	মেঘমল্লার	মিহ্	৫৫২	মেজদা	মক্	৪৪৪	মেঠোসুর	মট্	৪৫৬
মৃধ্	মৃৎ	৫৮৯	মেখলপদ	মি	৫৩৮	মেঘমল্লারিকা	মিহ্	৫৫১	মেজমান	মি	৫৩৮	মেড়	মণ্	৪৫৯
মৃধ	মৃৎ	৫৮৯	মেখলবন্ধ	মি	৫৩৮	মেঘমার্গ	মিহ্	৫৫১	মেজমেজ	মক্	৪৪৪	মেড়মেড়ে	মণ্	৪৫৯
মৃধা	মৃৎ	৫৮৯	মেখলা	মি	৫৩৮	মেঘমালা	মিহ্	৫৫১	মেজর	মক্	৪৪৪	মেড়া	মিহ্	৫৫১
মৃন্ময়	মৃৎ	৫৯০	মেখলি	মি	৫৩৮	মেঘমেদুর	মিহ্	৫৫১	মেজরাপ	মি	৫৩৮	মেডাল	মণ্	৪৫৯
মৃন্ময়ী	মৃৎ	৫৯০	মেখলিক	মি	৫৩৮	মেঘযামিনী	মিহ্	৫৫১	মেজরাপ(ব)	মৃজ্	৫৮৭	মেড়্দাড়া	মণ্	৪৫৯
মৃল্লোষ্ট	মৃৎ	৫৮৯	মেখলিগঞ্জ	মি	৫৩৮	মেঘযোনি	মিহ্	৫৫১	মেজরাব	মি	৫৩৮	মেড়্য়া	মণ্	৪৫৯
মৃশ্	মৃশ্	৫৯০	মেখলী	মি	৫৩৮	মেঘরব	মিহ্	৫৫১	মেজাজ	মি	৫৩৮	মেড়্য়াবাদী	মণ্	৪৫৯
মৃশ্য	মৃশ্	৫৯২	মেখেচুকে	ম্রক্ষ্	৫৯৭	মেঘরাব	মিহ্	৫৫১	মেজিষ্টার	মক্	৪৪৪	মেডেল	মণ্	৪৫৯
মৃষ্	মৃশ্	৫৯০	মেঘ	মিহ্	৫৫২	মেঘরাজি	মিহ্	৫৫১	মেজেষ্টর	মক্	৪৪৪	মেড়ে	মৃৎ	৫৮৯
মৃষা	মৃশ্	৫৯০	মেঘ-আন্ধারী	মিহ্	৫৫১	মেঘরাজী	মিহ্	৫৫১	মেজো	মক্	৪৪৪	মেড়ো	মণ্	৪৫৯
মৃষাজ্ঞান	মৃশ্	৫৯০	মেঘকফ	মিহ্	৫৫১	মেঘরুচিবসন	মিহ্	৫৫১	মেঝা	মক্	৪৪৪	মেঢ়া	মিহ্	৫৫১
মৃষাদৃষ্টি	মৃশ্	৫৯০	মেঘকাল	মিহ্	৫৫১	মেঘরেখা	মিহ্	৫৫১	মেঝাম	মক্	৪৪৪	মেঢ্র	মিহ্	৫৫১
মৃষাধ্যায়ী	মৃশ্	৫৯০	মেঘাগম্ভীর	মিহ্	৫৫১	মেঘলা	মিহ্	৫৫১	মেঝো	মক্	৪৪৪	মেঢ্রক	মিহ্	৫৫১
মৃষাবচন	মৃশ্	৫৯০	মেঘগর্জ্জন	মিহ্	৫৫১	মেঘলেখা	মিহ্	৫৫১	মেট	মট্	৪৫৬	মেণ্ঢ	মিহ্	৫৫১
মৃষাবাদ	মৃশ্	৫৯০	মেঘঘটা	মিহ্	৫৫১	মেঘশ্যাম	মিহ্	৫৫১	মেট	মৃশ্	৫৯০	মেণ্ঢক	মিহ্	৫৫১
মৃষাবাদী	মৃশ্	৫৯০	মেঘঙ্কর	মিহ্	৫৫১	মেঘসংঘাত	মিহ্	৫৫১	মেটন	মট্	৪৫৬	মেতর	মিহ্	৫৫১
মৃষোদ্য	মৃশ্	৫৯০	মেঘচাপ	মিহ্	৫৫১	মেঘসখা	মিহ্	৫৫১	মেটমিস্তিরি	মট্	৪৫৬	মেথরানী	মিহ্	৫৫১
মৃষ্ট	মৃশ্	৫৯০	মেঘজ	মিহ্	৫৫১	মেঘসার	মিহ্	৫৫১	মেটল	মট্	৪৫৬	মেথি	মথ্	৪৬৫
মৃষ্টকর্ত্তা	মৃশ্	৫৯০	মেঘজাল	মিহ্	৫৫১	মেঘসুহৃৎ	মিহ্	৫৫১	মেটা	মট্	৪৫৬	মেথিকা	মথ্	৪৬৫
মৃষ্টকুণ্ডল	মৃশ্	৫৯০	মেঘজ্যোতিঃ	মিহ্	৫৫১	মেঘস্তনিত	মিহ্	৫৫১	মেটান	মট্	৪৫৬	মেথিনী	মথ্	৪৬৫
মৃষ্টগন্ধ	মৃশ্	৫৯০	মেঘডম্বর	মিহ্	৫৫১	মেঘস্বন	মিহ্	৫৫১	মেটাইয়া	মট্	৪৫৬	মেথী	মথ্	৪৬৫
মৃষ্টবাক্য	মৃশ্	৫৯০	মেঘডম্বুর	মিহ্	৫৫১	মেঘহ্রাদ	মিহ্	৫৫১	মেটাইল	মট্	৪৫৬	মেদ	মিদ্	৫৪৬
মৃষ্টযশাঃ	মৃশ্	৫৯০	মেঘডুম্বুর	মিহ্	৫৫১	মেঘাকাশ	মিহ্	৫৫১	মেটাল	মট্	৪৫৬	মেদঃ	মিদ্	৫৪৪
মৃষ্টসলিল	মৃশ্	৫৯০	মেঘতিমির	মিহ্	৫৫১	মেঘাগম	মিহ্	৫৫১	মেটুলি	মট্	৪৫৬	মেদক	মিদ্	৫৪৪
মৃষ্টানুলেপন	মৃশ্	৫৯০	মেঘদূত	মিহ্	৫৫১	মেঘাটোপ	মিহ্	৫৫১	মেটে	মট্	৪৫৬	মেদস্বী	মিদ্	৫৪৪
মৃষ্টাশন	মৃশ্	৫৯০	মেঘনাদ	মিহ্	৫৫১	মেঘাড়ম্বর	মিহ্	৫৫১	মেটেগর্ব্ব	মট্	৪৫৬	মেদা	মিদ্	৫৪৬
মৃষ্টি	মৃজ্	৫৮৭	মেঘনাদজিৎ	মিহ্	৫৫১	মেঘাত্যয়	মিহ্	৫৫১	মেটেচিল	মট্	৪৫৬	মেদি	মিদ্	৫৪৪
মে	ম্	৫৯৯	মেঘনাদানুলাসী	মিহ্	৫৫১	মেঘান্ত	মিহ্	৫৫১	মেটেজোঁক	মট্	৪৫৬	মেদিনী	মিদ্	৫৪৬
মেওমেও	ম্	৫৯৯	মেঘনাদী	মিহ্	৫৫১	মেঘাবতত	মিহ্	৫৫১	মেটেতেল	মট্	৪৫৬	মেদিনীকোষ	মিদ্	৫৪৬
মেও-ধরা	ম্	৫৯৯	মেঘনাল	মিহ্	৫৫১	মেঘাম্বর	মিহ্	৫৫১	মেটেরঙ	মট্	৪৫৬	মেদিনীজ	মিদ্	৫৪৬
মেওয়া	ম্	৫৯৯	মেঘনির্ঘোষ	মিহ্	৫৫১	মেঘালোক	মিহ্	৫৫১	মেটেল	মট্	৪৫৬	মেদিনীধর	মিদ্	৫৪৬
মেওয়াতি	ম্	৫৯৯	মেঘনির্হ্রাদ	মিহ্	৫৫১	মেখিনী	মিহ্	৫৫১	মেটেলি	মট্	৪৫৬	মেদিনীপতি	মিদ্	৫৪৪
মেওয়াতি	মি	৫৩৮	মেঘপঙ্‌ক্তি	মিহ্	৫৫১	মেঘী	মিহ্	৫৫১	মেটেসিঁদুর	মট্	৪৫৬	মেদিনীপুর	মিদ্	৫৪৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মোচাট	মুচ্ ৫৫৯	মোড়লী	মুণ্ড্ ৫৬১	মোয়াক্কেল	ম্ ৫৯৯	মোহনিদ্রা	মুহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জীতৃণাখ্য	মঞ্জ্ ৪৫৩
মোচাথোড়	মুচ্ ৫৫৪	মোড়া	মুণ্ড্ ৫৬১	মোয়াফেল	ম্ ৫৯৯	মোহনী	মুহ্ ৫৬৯	মৌঞ্জীধর	মঞ্জ্ ৪৫৩
মোচাফল	মুচ্ ৫৫৯	মোড়া	মুষ্ ৫৬৬	মোর	মী ৫৫২	মোহনীয়	মুহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জীনিবন্ধন	মঞ্জ্ ৪৫৩
মোচিকা	মুচ্ ৫৫৪	মোড়াই	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোর	মু ৫৫৩	মোহন্ত	মহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জীপত্রা	মঞ্জ্ ৪৫৩
মোচিত	মুচ্ ৫৫৯	মোড়ামুড়ি	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোরছল	মী ৫৫২	মোহপাশ	মুহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জীমৌঞ্জী	মঞ্জ্ ৪৫৩
মোচ্ছব	মহ্ ৫২১	মোড়াসা	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোরছা	মী ৫৫২	মোহমন্ত্র	মুহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জীয়	মঞ্জ্ ৪৫৩
মোচ্ছব	মু ৫৫৩	মোড়োক	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোরগ	মু ৫৫৩	মোহমোহ	মহ্ ৫৬৮	মৌড়	মী ৫৫২
মোচ্য	মুচ্ ৫৫৯	মোণ	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোরগ	মু ৫৫৩	মোহর	ম্ ৫৯৯	মৌড়	মুণ্ড্ ৫৫৯
মোছ	মুচ্ ৫৫৮	মোণ্ডা	মণ্ ৪৫৯	মোরপিঞ্ছ	মী ৫৫২	মোহর	মুহ্ ৫৬৮	মৌড়লা	মী ৫৫২
মোছ	ম্ ৫৯৯	মোত	ম্ ৫৯৯	মোরব্বা	ম্ ৫৯৯	মোহরাত্রি	মুহ্ ৫৬৮	মৌঢ্য	মুহ্ ৫৬৮
মোছদী	ম্ ৫৯৯	মোতলা	ম্ ৫৯৯	মোরশিখণ্ডক	মী ৫৫২	মোহরি	ম্ ৫৯৯	মৌত	ম্ ৫৯৯
মোছন	মুচ্ ৫৫৮	মোতান	ম্ ৫৯৯	মোরামোরী	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোহরে	ম্ ৫৯৯	মৌতখানা	ম্ ৫৯৯
মোছলমান	মুষ্ ৫৬৬	মোতাবেক	ম্ ৫৯৯	মোরি	মুণ্ড্ ৫৫৯	মোহরের	ম্ ৫৯৯	মৌতাত	ম্ ৫৯৯
মোছলমানী	মুষ্ ৫৬৬	মোতায়ন	ম্ ৫৯৯	মোলাকাত	মল্ ৫১৬	মোহান্ত	মুহ্ ৫৬৮	মৌতাতি	ম্ ৫৯৯
মোছা	মুচ্ ৫৫৪	মোতায়েন	ম্ ৫৯৯	মোলাম	মল্ ৫১৬	মোহিত	মুহ্ ৫৬৯	মৌদক	মুদ্ ৫৬২
মোছা	ম্ ৫৯৯	মোতালক	ম্ ৫৯৯	মোলায়েম	মল্ ৫১৬	মোহিনী	মুহ্ ৫৬৯	মৌদকিক	মুদ্ ৫৬২
মোছা	মৃজ্ ৫৫৮	মোতি	মুচ্ ৫৫৪	মোলাহেজা	মল্ ৫১৬	মোহী	মুহ্ ৫৬৯	মৌদগ	মুদ্ ৫৬২
মোছান	মৃজ্ ৫৫৮	মোতিচুর	মুচ্ ৫৫৪	মোল্লা	মল্ ৫১৬	মোহে	মুহ্ ৫৬৮	মৌদগলি	মুদ্ ৫৬২
মোছান	ম্ ৫৯৯	মোতিম	মুচ্ ৫৫৪	মোশাল	মক্ ৪৪৪	মোহোঁ	মুহ্ ৫৬৮	মৌদগল্য	মুদ্ ৫৬২
মোজা	ম্ ৫৯৯	মোতিয়া	মুচ্ ৫৫৪	মোষ	মহ্ ৫২১	মৌ	মন্ ৪৮১	মৌন	মন্ ৫১৬
মোজাম	ম্ ৫৯৯	মোৎফরেক্কা	ম্ ৫৯৯	মোষ	মুষ্ ৫৬৬	মৌআলু	মন্ ৪৮১	মৌনগতি	মন্ ৪৮১
মোজাহেম	ম্ ৫৯৯	মোথড়া	ম্ ৫৯৯	মোষকৃৎ	মহ্ ৫২১	মৌকলস	মন্ ৪৮১	মৌনধারী	মন্ ৪৮১
মোঞে	মু ৫৫৩	মোদ	মুদ্ ৫৬৫	মোষণ	মহ্ ৫২১	মৌক(কু)লি	মন্ ৪৮১	মৌনবৃত্তি	মন্ ৪৮১
মোট	মট্ ৪৫৮	মোদক	মুদ্ ৫৬৫	মোষিতা	মহ্ ৫২১	মৌকুফ	ম্ ৫৯৯	মৌনব্রত	মন্ ৪৮১
মোটক	মট্ ৪৫৮	মোদকিকা	মুদ্ ৫৬২	মোষ্টা	মহ্ ৫২১	মৌক্তিক	মুচ্ ৫৫৪	মৌনমুদ্রা	মন্ ৪৮১
মোটকথা	মট্ ৪৫৮	মোদন	মুদ্ ৫৬৫	মোসাফির	ম্ ৫৯৯	মৌক্তিকগুম্ফিকা	মুচ্ ৫৫৪	মৌনসম্মতি	মন্ ৪৮১
মোটকী	মট্ ৪৫৬	মোদনীয়	মুদ্ ৫৬২	মোসাহেবী	ম্ ৫৯৯	মৌক্তিকদাম	মুচ্ ৫৫৪	মৌনী	মন্ ৪৮১
মোটন	মট্ ৪৫৮	মোদা	মুদ্ ৫৬৫	মোসিল	ম্ ৫৯৯	মৌক্তিকপ্রসবা	মুচ্ ৫৫৪	মৌপালান	মন্ ৪৮১
মোটন	মুষ্ ৫৬৬	মোদিত	মুদ্ ৫৬৫	মোহ	মন্ ৪৮১	মৌক্তিকমালা	মুচ্ ৫৫৪	মৌপালানে	মন্ ৪৮১
মোটনক	মট্ ৪৫৬	মোদিনী	মুদ্ ৫৬৫	মোহ	মুহ্ ৫৬৯	মৌক্তিকশুক্তি	মুচ্ ৫৫৪	মৌমাছি	মন্ ৪৮১
মোটমাট	মট্ ৪৫৯	মোদী	মুদ্ ৫৬২	মোহক	মুহ্ ৫৬৮	মৌক্তিকসর	মুচ্ ৫৫৪	মৌয়া	মন্ ৪৮১
মোটর	মট্ ৪৫৬	মোদ্দা	মুদ্ ৫৬২	মোহকলিল	মুহ্ ৫৬৮	মৌক্তিকহার	মুচ্ ৫৫৪	মৌয়ালু	মন্ ৪৮১
মোটা	মট্ ৪৫৯	মোদ্দাৎ	মুদ্ ৫৬২	মোহকে	মুহ্ ৫৬৮	মৌক্তিকাবলী	মুচ্ ৫৫৪	মৌর	মী ৫৫২
মোটাই	মট্ ৪৫৯	মোন	মন্ ৪৮১	মোহজাল	মুহ্ ৫৬৮	মৌক্য	মুচ্ ৫৫৪	মৌরছল	মী ৫৫২
মোটান	মট্ ৪৫৯	মোনকষা	মন্ ৪৮১	মোহড়া	মহ্ ৫৬৮	মৌখল	মন্ ৪৮১	মৌরজিক	মু ৫৫৩
মোটামুটি	মট্ ৪৫৯	মোনসব	মন্ ৪৮১	মোহন	মুহ্ ৫৬৯	মৌগ্ধ্য	মুহ্ ৫৬৮	মৌরলা	মু ৫৫৩
মোটাসোটা	মট্ ৪৫৯	মোনা	মন্ ৪৮১	মোহনকাজল	মুহ্ ৫৬৮	মৌচ	মুচ্ ৫৫৪	মৌরি	মু ৫৫৩
মোটিয়া	মট্ ৪৫৬	মোনাসি	মন্ ৪৮১	মোহনপাক	মুহ্ ৫৬৮	মৌচাক	মন্ ৪৮৭	মৌরী	মন্ ৪৮১
মোটুক	মট্ ৪৫৬	মোনাসেব	মন্ ৪৮১	মোহনভোগ	মুহ্ ৫৬৮	মৌজ	মক্ ৪৪৪	মৌর্খ্য	মুহ্ ৫৬৮
মোটে	মট্ ৪৫৬	মোনে	মন্ ৪৮১	মোহনমন্দির	মুহ্ ৫৬৮	মৌজী	মক্ ৪৪৪	মৌর্ব্ব	মূ ৫৬৯
মোটের-উপর	মট্ ৪৫৬	মোন্‌সব	মন্ ৪৮১	মোহনমালা	মুহ্ ৫৬৮	মৌজা	মঞ্জ্ ৪৫৩	মৌর্ব্বী	মূ ৫৬৯
মোট্টায়িত	মট্ ৪৫৬	মোম	মি ৫৩৮	মোহনলাল	মুহ্ ৫৬৮	মৌজাদার	মঞ্জ্ ৪৫৩	মৌর্ব্বীকিণ	মূ ৫৬৯
মোড়	মুণ্ড্ ৫৬১	মোয়া	মি ৫৩৮	মোহনা	মুহ্ ৫৬৯	মৌজুদ	মঞ্জ্ ৪৫৩	মৌর্ব্বীমেখলী	মূ ৫৬৯
মোড়ক	মুণ্ড্ ৫৬১	মোয়া	ম্ ৫৯৯	মোহনাস্ত্র	মুহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জ	মঞ্জ্ ৪৫৩	মৌর্য্য	মু ৫৬৯
মোড়ল	মুণ্ড্ ৪৬২	মোয়া	মুদ্ ৫৬২	মোহনিদ্রা	মুহ্ ৫৬৮	মৌঞ্জী	মঞ্জ্ ৪৫৩	মৌর্য্যমণি	মূ ৫৬৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
মৌল	মৃ ৫৭২	ম্লেচ্ছ	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শাপভ্রষ্ট	ভ্রংশ্ ৪৩৭	সভাস্থ	ভা ৩৯০	সম্ভাষিত	ভাষ্ ৩৯২
মৌলবাদ	মৃ ৫৭২	ম্লেচ্ছকন্দ	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৮	শাপভ্রষ্টা	ভ্রংশ্ ৪৩৭	সভ্য	ভা ৩৯০	সম্ভৃত	ভৃ ৪০৯
মৌলবী	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছজাতি	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৮	শিলাবর্ষ	বৃষ্ ৩৫৫	সমন্তপঞ্চক	পং ২	সম্ভোগ	ভু ৪০৫
মৌলি	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছতক	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শীতলপাটী	পট্ ১৭	সমভূমি	ভূ ৪০৯	সম্ভোগী	ভু ৪০৫
মৌলিক	মৃ ৫৭২	ম্লেচ্ছদেশ	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৮	শূলপাণি	পণ্ ২৬	সমাবর্ত্তন	বৃৎ ৩৪৫	সম্ভোগ্য	ভু ৪০৫
মৌলিপৃষ্ঠ	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছন	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শ্রুতপূৰ্ব্ব	পৃ ৮৯	সমাবিষ্ট	বিশ্ ৩২১	সম্ভ্রম	ভ্রংশ্ ৪৩৭
মৌলিমণি	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছনিবহ	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭			সমাবৃত	বর্ণ্ ২৪৯	সম্ভ্রান্ত	ভ্রংশ্ ৪৩৭
মৌলিমগুন	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছভাষা	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৮	**ষ**		সমাবৃত্ত	বৃৎ ৩৪৫	সম্ভ্রান্তি	ভ্রংশ্ ৪৩৭
মৌলিমালা	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছভোজন	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	ষট্পদ	পদ্ ৩৮	সমাম্নাত	ম্না ৫৯৪	সম্মত	মন্ ৪৮১
মৌলিমালিক	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছমণ্ডল	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	ষট্পদী	পদ্ ৩৮	সমাম্নায়	ম্না ৫৯৪	সম্মতি	মন্ ৪৮১
মৌলী	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছমুখ	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	ষড়বর্গ	বৃজ্ ৩৪৪	সমুদ্ভব	ভূ ৪০৯	সম্মান	মন্ ৪৮১
মৌলীন্দু	মৃ ৫৬৯	ম্লেচ্ছসেবী	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	ষড়ভাগ	ভঞ্জ্ ৩৭৬	সমুদ্রবেলা	বেল্ ৩৫৯	সম্মিলন	মিল্ ৫৪৮
মৌষ(স)ল	মুষ্ ৫৬৬	ম্লেচ্ছিতক	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	ষড়ভাব	ভূ ৪০৯	সমুপভোগ	ভু ৪০৫	সম্মিলিত	মিল্ ৫৪৮
মৌষলপৰ্ব্ব	মুষ্ ৫৬৬	ম্লেচ্ছিতবিকল্প	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৮	ষড়ভুজ	ভু ৪০৫	সমূলক	মৃ ৫৬৯	সম্মীলন	মী ৫৫২
মৌষললীলা	মুষ্ ৫৬৬	ম্লেচ্ছ্	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	ষড়াম্নায়	ম্না ৫৯৪	সম্পত্তি	পদ্ ৩৮	সম্মেলন	মিল্ ৫৪৮
মৌষ্টা	মুষ্ ৫৬৬	ম্লে	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭			সম্পদ	পদ্ ৩৮	সম্মোহন	মুহ্ ৫৬৮
মৌসম	ম্ ৫৯৯			**স**		সম্পন্ন	পদ্ ৩৮	সম্মোহনী	মুহ্ ৫৬৮
মৌসুমী	ম্ ৫৯৯	**য**		সংপ্লব	প্লু ১৬৪	সম্পর্ক	পৃ ১০০	সম্মোহিত	মুহ্ ৫৬৮
মৌরুস	ম্ ৫৯৯	যথাভাব	ভূ ৪০৯	সংবরণ	বর্ণ্ ২৪৯	সম্পাত	পত্ ৩১	সহব্রত	বর্ণ্ ২৪৯
মৌহাফিক	ম্ ৫৯৯	যেমন	মন্ ৪৮৩	সংবর্দ্ধক	বৃধ্ ৩৫৩	সম্পাতন	পত্ ৩১	সহভাব	ভূ ৪০৯
মৌহাফিক	মা ৫৩১	যেমনি	মন্ ৪৮৩	সংবর্দ্ধনা	বৃধ্ ৩৫৩	সম্পাদক	পদ্ ৩৮	সহভোজন	ভু ৪০৫
মৌহারী	মন্ ৪৮১	যোগমায়া	মি ৫৪৩	সংবাদ	বদ্ ২৩১	সম্পাদন	পদ্ ৩৮	সহমরণ	মৃ ৫৭৩
ম্না	ম্না ৫৯৪	যৌবনমদ	মদ্ ৪৬৮	সংবিৎ	বিদ্ ৩০৮	সম্পাদিত	পদ্ ৩৮	সহমৃতা	মৃ ৫৭৩
ম্নাত	ম্না ৫৯৪			সংবৃত	বর্ণ্ ২৪৯	সম্পাদ্য	পদ্ ৩৮	সার্ব্বভৌম	ভূ ৪০৯
ম্যাজিস্ট্রেট	ম্ ৫৯৯	**র**		সংবেদন	বিদ্ ৩০৮	সম্পীড়ন	পীড়্ ৭২	সার্ব্বভৌমিক	ভূ ৪০৯
ম্যাজিস্ট্রেট	মক্ ৪৪৪	রঞ্জিত	রম্ ৪১১	সঞ্জিত	ভূ ৪০৯	সম্পূজন	পূজ্ ১০০	সীমাভেত্তা	ভিদ্ ৩৯৮
ম্যালেরিয়া	ম্ ৫৯৯	রণজিত	রণ্ ৪১১	সঞ্জিৎ	ভূ ৪০৯	সম্পূরক	পৃ ৮৯	সুজিত	ভূ ৪০৯
ম্যাড়ম্যাড়ে	মণ্ ৪৫৯	রসভেদ	ভিদ্ ৩৯৮	সদাব্রত	বর্ণ্ ২৪৯	সম্পূর্ণ	পৃ ৮৯	সুজিৎ	ভূ ৪০৯
ম্যাড়া	মথ্ ৪৬৫	রসমঞ্জরী	মঞ্জ্ ৪৫৩	সন্নিবিষ্ট	বিশ্ ৩২১	সম্পূর্ত্তি	পৃ ৮৯	সুনাম	ম্না ৫৯৪
ম্যানেজার	মন্ ৪৮১	রহস্যভেদ	ভিদ্ ৩৯৮	সন্নিবেশ	বিশ্ ৩২১	সম্পৃক্ত	পৃ ১০০	সুপঠ	পঠ্ ২৩
ম্যাপ	মা ৫৩১	রাখাল-বাগাল	বি ২৯০	সন্নিবেশিত	বিশ্ ৩২১	সম্বন্ধী	বন্ধ্ ২৪৪	সুপদ্য	পদ্ ৩৮
ম্রক্ষ্	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	রাজমার্গ	মৃগ্ ৫৭৩	সন্নিভ	ভা ৩৯০	সম্বন্ধীয়	বন্ধ্ ২৪৪	সুপর্ণ	পৃ ১০০
ম্রক্ষণ	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	রাধাবিনোদ	বি ২৯০	সপক্ষীয়	পক্ষ্ ১১	সম্বরণ	বর্ণ্ ২৪৯	সুপুত্র	পু ৭৩
ম্রক্ষিত	ম্রক্ষ্ ৫৯৭	রুটি-বেলা	বেল্ ৩৫৯	সপ্রতিভ	ভা ৩৯০	সম্বল	বল্ ২৬৩	সুপুরুষ	পৃ ১০০
ম্রজাই	ম্ ৫৯৯			সপ্রমাণ	মা ৫৩১	সম্বলিত	বল্ ২৬৩	সুপ্রবেশ	বিশ্ ৩২১
ম্রদিমা	মৃৎ ৫৮৯	**ল**		সবন্ধু	বন্ধ্ ২৪৪	সম্বিৎ	বিদ্ ৩০৮	সুপ্রভ	ভা ৩৯০
ম্রদিষ্ঠ	মৃৎ ৫৮৯	লক্ষ্মীবট	বট্ ২২২	সবল	বল্ ২৬৩	সম্বুদ্ধ	বুধ্ ৩৩৭	সুপ্রভা	ভা ৩৯০
ম্রদীয়ান	মৃৎ ৫৮৯	লোহাপটি	পট্ ১৭	সবাধ	বাধ্ ২৩৪	সম্বোধন	বুধ্ ৩৩৭	সুপ্রভাত	ভা ৩৯০
ম্রিয়মাণ	মৃ ৫৭৩			সবিভ্রম	ভ্রংশ্ ৪৩৭	সম্ভব	ভূ ৪০৯	সুপ্রিয়	প্রী ১৬২
ম্লান	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	**শ**		সব্যাপার	পৃ ১০০	সম্ভাবন	ভূ ৪০৯	সুবচন	বচ্ ২১৩
ম্লানমনা	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শতপত্র	পত্ ৩১	সভয়	ভী ৪০১	সম্ভাবনা	ভূ ৪০৯	সুবদন	বদ্ ২৩১
ম্লানব্রীড়	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শতভুজা	ভু ৪০৫	সভা	ভা ৩৯০	সম্ভাবনীয়	ভূ ৪০৯	সুবর্ণ	বর্ণ্ ২৪৯
ম্লানি	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শতমূল	মৃ ৫৬৯	সভাখণ্ড	ভা ৩৯০	সম্ভাব্য	ভূ ৪০৯	সুবর্ণকার	বর্ণ্ ২৪৯
ম্লানিমা	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শম্ভু	ভূ ৪০৯	সভাজন	ভা ৩৯০	সম্ভার	ভূ ৪০৯	সুবর্ণকেতকী	বর্ণ্ ২৪৯
ম্লিষ্ট	ম্লেচ্ছ্ ৫৯৭	শান্তিবাচন	বচ্ ২১৩	সভাসদ	ভা ৩৯০	সম্ভাষণ	ভাষ্ ৩৯২	সুবর্ণগর্ভা	বর্ণ্ ২৪৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)

দ্বিতীয় খণ্ড

কীভাবে এই শব্দার্থকোষ পড়তে হবে, সূচির বিপরীত পৃষ্ঠায় তা জানান হয়েছে 'এই শব্দার্থকোষ পড়বেন কীভাবে' শীর্ষক বয়ানে। এখানে সেকথা পুনরায় সংক্ষেপে জানান হল : —

এই গ্রন্থে শব্দের অর্থ প্রকাশ করার জন্য মোট ছয়টি উপায় গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দের পরেই সর্বাগ্রে **১.** সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে শব্দটির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, তার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়েছে বঙ্গীয় শব্দকোষ (ব.শ.) থেকে। অন্য কোনো অভিধান থেকে নেওয়া হয়ে থাকলে পাশে সেকথার উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। **২.** সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে শব্দটির ক্রিয়ামূল থেকে জাত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ, যা আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল। এটি সবসময়ই দেওয়া হয়েছে বাঁকা হরফে। অন্য কোনো সূত্রে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পাওয়া গেলে, '/' চিহ্নের পরে সে-অর্থও সরবরাহ করা হয়েছে, অবশ্যই উৎস উল্লেখ করে। **৩.** সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে শব্দটির প্রতীকী অর্থ, প্রচলিত অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে যা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষের ক্ষেত্রে (ব.শ.), ছাত্রবোধ অভিধানের ক্ষেত্রে (ছা.অ.), ঢাকার বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে (ব্য.বা.অ.ঢাকা), কলকাতার সংসদ বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে (স.বা.অ.কল) এবং পৌরাণিক-অভিধানের ক্ষেত্রে (পৌ.অ.) প্রভৃতি লিখে উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। **৪.** সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছি, শব্দটি বর্তমানে কী অর্থে প্রচলিত রয়েছে। আদৌ প্রচলিত না থাকলে 'অপ্রচলিত' লেখা হয়েছে। **৫.** সংখ্যায় আমরা শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি, দেখিয়েছি কেমন করে তা প্রতীকী অর্থগুলিতে পরিণত হল। যা কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তার অধিকাংশই দেওয়া হয়েছে এইখানে। **৬.** সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে পশ্চিমের ভাষায় শব্দটির স্বরূপ কী, তার সংবাদ। বয়ানের ভেতরে যেখানেই মোটা হরফ রয়েছে, বুঝতে হবে সেটির অর্থ তার নিজস্ব ভুক্তিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, যদি কোনো বিবরণের ভিতরে মোটা হরফে **পদ** লেখা থাকে, বুঝতে হবে, এই শব্দার্থকোষে যেখানে **পদ** শব্দটিকে পাওয়ার কথা, সেখানে তার বিস্তারিত অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

আর, সমগ্র কোষগ্রন্থটি লেখা হয়েছে এইভাবে — প্রথমে আমরা বর্গের নাম লিখেছি এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করেছি। যেমন **প**-বর্গের শুরুতে দেওয়া হয়েছে 'প'-এর মানে। তারপর সেই বর্ণ থেকে যে শব্দবংশগুলির জন্ম হয়েছে সেগুলির নাম লিখেছি। দেখিয়েছি, সেই বর্ণ থেকে মোট কতগুলি শব্দবংশের বা শব্দ-পরিবারের সূত্রপাত হয়েছে। এর পর বর্ণানুক্রমিকভাবে শব্দবংশের নামগুলি লিখেছি। তারপর প্রথম শব্দবংশটির নাম লিখে, সেই শব্দবংশে কী কী শব্দের জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ সেই শব্দপরিবারের সকল সদস্যদের নাম বর্ণানুক্রমিক ভাবে লিখেছি। অতঃপর বর্ণানুক্রমিকভাবে সেই শব্দবংশে জাত শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় করতে শুরু করেছি। সবার আগে বংশকর্তার নামের অর্থনির্ণয় করা হয়েছে। তারপর তার থেকে জাত শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। সব শব্দের অর্থ দিইনি। কারণ, শব্দবংশের কর্তার মানে জেনে নেওয়ার পর পাঠক বহু ক্ষেত্রে নিজেই সদস্য শব্দদের অর্থ বুঝে নিতে পারবেন। শব্দার্থকোষের অবয়বের কথা ভেবেও এই নীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

বানানের ক্ষেত্রে আমাদের ঘোষিত নীতি ছিল (দ্র. **ভূমিকা**, ১ম খণ্ড), উদ্ধৃতিসমূহের বানানের ক্ষেত্রে উৎসের অনুসৃত বানানই অনুসরণ করা হবে; নিজেদের বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান অনুসরণ করা হবে। আর, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ বানান ছাড়া অন্য কোনো রীতি অনুসরণ করার উপায় থাকে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে ১ম খণ্ডে এই নীতি অনুসারে বানান দেখে দেওয়ার সহযোগী কাউকে না পাওয়ায় আমরা ঐ নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারিনি, বহু ভুল হয়েছিল। এই ২য় খণ্ডে আমরা পেয়েছিলাম শ্রী সঞ্জয় তরফদারকে। তিনি সানন্দে আমাদের ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বানান দেখে দিয়েছেন। তবে বানানের নৈরাজ্য দূর করতে হলে আগাগোড়া অর্থভিত্তিক বানান অনুসরণ করতে হবে। সে কাজ এখনও কল্পনা মাত্র।

প

প্ বর্ণের অর্থ : প = প্-অন করে যে; প-কারী। ক্রিয়া একটিই — প্-করা। এই প-করণ যে কীরূপ ব্যাপার, তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। ত-বর্গে আমরা দেখেছিলাম, ত = অস্তিত্বের তারণ, থ = তারণস্থিতি, দ = দান, ধ = দানস্থিতি বা ধারণ, ন = অন্-করণ বা নাকরণ। প্-এ দেখছি, প্রদত্তকে গ্রহণ বা প্রাপণ। এই প্রাপণ সম্ভব হয় তখনই, যখন সে অন্যকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ ধারণ করে রাখে। ক খ'কে কিছু একটা দেয়, এবং খ সেটি আত্মস্থ করে নেয়; কারণ, অন্যকে ধারণ করার মতো অবকাশ সে আগে থেকেই ধরে রেখেছে। তার মানে, **প** হল সেই সত্তা যে পাওয়ার জন্য যে অবকাশ বা সুযোগ লাগে, সেই অবকাশ ধরে রেখেছে; অর্থাৎ **প** = অবকাশধারী = পায়ী। সেই কারণে, এই প্রাপণ বা পাওয়া পান করাও বটে; প্রাপ্তকে পালন করাও বটে। তাই প্-করণ কথাটির মানে প্রথম স্তরে 'পায়ী'-মাত্র, দ্বিতীয় স্তরে পান করা ও পালন করা। কী পেয়ে সে পায়ী? শক্তি তেজ মেধা না বাহ্যবস্তু ... ইত্যাদির কোনটি পেয়ে? এর উত্তর অসীম অসংখ্যের যে-কোনোটি এবং তা কিন্তু প্রেক্ষাপট অনুসারে বদলে যায়। অতএব প্-করণ অর্থে আমরা অবকাশধারণ, প্রাপণকরণ, পানকরণ, পালনকরণ ইত্যাদি বুঝলেই এর মূল অর্থের কাছাকাছি যেতে পারব; যদিও তাসত্ত্বেও প-এর এই 'প-কারী' অর্থটি যথেষ্ট ব্যক্ত নয়, বেশ খানিকটা অব্যক্ত। **কার্যত প-বর্গের পাঁচটি বর্ণই অন্য বর্ণগুলির তুলনায় জটিল ও বহু অর্থধারী।** এই 'প-কারী' প্-করণের আধার মাত্র, যাকে 'প-করণ'-এর বিশেষ্যরূপ বলা যেতে পারে। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প-এর পানকারী ও পালনকারী অর্থই কথিত হয়ে থাকে। যথা — 'মদ্যপ', 'সোমপ' প্রভৃতি শব্দে প = 'পানকারী'; আবার 'নৃপ', 'গোপ' প্রভৃতি শব্দে প = 'পালনকারী'। উভয় ক্ষেত্রে মূলে রয়েছে অবকাশ পূর্ণ করে নেওয়া বা প্রাপণ করা। 'মদ্যপ' শব্দটিকে 'মদ্য পায় (পান করে পায়) যে', 'গোপ' শব্দটিকে 'গো (পালন করে) পায় যে' — এইভাবেও বোঝা যায়। অতএব আমরা প্-করণ বোঝাতে লিখব প = প-কারী বা পায়ী; কিন্তু প্রেক্ষিত অনুসারে তাকে আমরা 'অবকাশধারী', 'প্রাপণকারী', 'পানকারী', 'পালনকারী' ... ইত্যাদি বুঝব।

প খানিকটা ব্যক্ত হলেও **পং** কিন্তু একেবারেই অব্যক্ত। এই **পং**-এর খানিকটা ব্যক্ত রূপ হল — পণ, পন, পম্। কিন্তু তা হওয়ার আগেই তা পঙ ও পঞ্ হতে পারে, হয়ও। আগেও বলা হয়েছে, ং-এর পরে ক-বর্গ থাকলে ং পরিণত হয় ঙ্-এ, চ-বর্গ থাকলে পরিণত হয় ঞ্-এ, ট-বর্গ থাকলে পরিণত হয় ণ্-এ, ত-বর্গ থাকলে পরিণত হয় ন্-এ, এবং প-বর্গ থাকলে পরিণত হয় ম্-এ। তাই পং বর্গানুসারে পঙ্, পঞ্, পণ্, পন্, পম্-এ পরিণত হয়ে থাকে। এই পঙ/পঞ্ ইত্যাদি প-এর রহস্যরূপ অতঃপর করণ, চয়ন, জনন ঘটালে যথাক্রমে **পঙ্ক, পঞ্চ, পঞ্জ** হয়। **পঞ্জ**-এর (পাঁজা-র) বিকাশ সাধিত হলে বা **পঞ্জ** গতিশীল হলে, সে হয় **পঞ্জি** (পঞ্জিকরণ, পাঁজি); তবে তার আগেই সেই প-কারীই যদি গতিশীল হয়ে যায়, তবে সে হয়ে যায় **পিঞ্জ** (পিঁজা, পেঁজা); তখন তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর **পঞ্জি** নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে বিপরীত হলে সেই **পিঞ্জ** আর তুলোধোনা হয়ে ছড়ায় না, উলটে সংহত হয়ে হয়ে যায় **পুঞ্জ** (পুঁজ) এবং তা গতিশীল বা সচল থাকলে হয় **পুঞ্জি** (পুঁজি)।

এই সব কারণে আমরা খুব নমনীয় একটা সিদ্ধান্ত এভাবে করতে পারি — **প** = প্-অন্ (on) করে যে = প-কারী; প-এর আধার যে = পা; প গতিশীল যাহাতে = পি; পি-এর আধার যে = পী; প নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = পু; পু-এর আধার যে = পূ; প আবর্তিত যাহাতে = পৃ; পৃ-র আধার যে = পৄ; প দিশাগ্রস্ত যাহাতে = পে; পে-র আধার যে = পৈ; প-এর সর্বরূপ যাহাতে = পো; পো-র আধার যে = পৌ।

প্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *পং (পংশ্, পঙ্ক্, পঞ্জ্, পন্চ্, পন্জ্)*, *পক্ষ্*, পচ্, *পট্ (পটি, পাটি, পিট্)*, *পঠ্ (পড়্)*, *পণ্ (পন্)*, পত্ (পাতি, পড়্), *পথ্*, পদ্ (পাদি), *পল্* (পাল্, *পালি)*, *পশ্*, পা, পি (পিং, পিচ্, পিঞ্জ্), *পিশ্*, পিশ্ (পিষ্, পষ্), *পী (পয়্, প্যায়্)*, পীড় (পীড়ি), *পু (পুং, পুচ্ছ্, পুট্, পুৎ, পুম্স্)*, পুড়্, *পুল্ (পুল্)*, পুষ্ (পুষ্প্, পোষি), পূ, পূজ্, পৃ (পৄ, পরা, পরি, পার, পারি, *পৃচ্, পৃষ্*,), *প্র (প্রচ্ছ্, প্রতি, প্রথ্)* প্রী, প্লু, প্ = ২৬ + ১

***পং (পংশ্, পঙ্ক্, পঞ্জ্, পন্চ্, পন্জ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপক্ক, অপাংশুলা, অপাঙ্‌ক্ত, অপাঙ্‌ক্তেয়, অপাঙ্‌ক্ত্য, আঁতিপাঁতি, আঁপক, আপিঙ্গল, পংক্তি (পঁক্তি), পংশ(স্), পঁই(য়)ত্রিশ, পঁচাত্তর, পঁচানই, পঁচানব্বই, পঁচাশী, পঁচিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঁয়ষট্টি, পঙ্ক, পঙ্ককীর, পঙ্কজ, পঙ্কজন্ম, পঙ্কজনয়ন, পঙ্কজনাভ, পঙ্কজাঙ্ঘ্রি, পঙ্কজিনী, পঙ্কপট্ট, পঙ্করুট্, পঙ্করুহ, পঙ্কিল, পঙ্কী, পঙ্কেশয়, পঙ্কোৎসব, পঙ্‌ক্তি, পঙ্‌ক্তিকণ্টক, পঙ্‌ক্তিগ্রীব, পঙ্‌ক্তিদূষক, পঙ্‌ক্তিদূষণ, পঙ্‌ক্তিপাবন, পঙ্‌ক্তিভোজন, পঙ্‌ক্তিরথ (দশরথ), পঙ্গত, পঞ্চ্, পঞ্চ, পঞ্চক, পঞ্চকপাল, পঞ্চকর্ম্ম, পঞ্চকষায়, পঞ্চকোণ, পঞ্চকোল, পঞ্চকোষ, পঞ্চক্রোশী, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুণ, পঞ্চগুণী, পঞ্চগৌড়, পঞ্চগ্রাস, পঞ্চচত্বারিংশৎ, পঞ্চজন, পঞ্চঝুঁটি, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চতন্ত্র, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতপ, পঞ্চতপাঃ, পঞ্চতা, পঞ্চতিক্ত, পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চত্ব, পঞ্চদশ, পঞ্চদশী, পঞ্চদীপ, পঞ্চদেবতা, পঞ্চনখ, পঞ্চনদ, পঞ্চনবতি, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চপঞ্চাশ, পঞ্চপঞ্চাশৎ, পঞ্চপদী, পঞ্চপর্ব্ব, পঞ্চপল্লব, পঞ্চপাত্র, পঞ্চপিতা, পঞ্চপিত্ত, পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চপ্রাসাদ, পঞ্চবংশী, পঞ্চবক্ত্র, পঞ্চবটী, পঞ্চবর্গ, পঞ্চবর্ণ, পঞ্চবাণ, পঞ্চবাহু, পঞ্চবিংশতি, পঞ্চবিধপ্রকৃতি, পঞ্চবৃত্ত, পঞ্চভদ্র, পঞ্চভুজ, পঞ্চভূত, পঞ্চভৌতিক, পঞ্চম, পঞ্চমী, পঞ্চমকার, পঞ্চমহাপাতক, পঞ্চমহাযজ্ঞ, পঞ্চমুখ, পঞ্চমুদ্রা, পঞ্চমুণ্ডী, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চযাম, পঞ্চরং, পঞ্চরত্ন, পঞ্চরাত্র, পঞ্চরাশিক, পঞ্চলক্ষণ, পঞ্চলবণ, পঞ্চলোহ, পঞ্চশত, পঞ্চশব্দ, পঞ্চশব্দী, পঞ্চশর, পঞ্চশস্য, পঞ্চশাখ, পঞ্চশিখ, পঞ্চষ, পঞ্চষষ্টি, পঞ্চসট, পঞ্চসপ্ততি, পঞ্চসায়ক,

পঞ্চসেরি (পসুরিপাল্লা), পঞ্চসূনা, পঞ্চস্বর, পঞ্চস্বরা, পঞ্চাইত, পঞ্চাগ্নি, পঞ্চাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি, পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন, পঞ্চাঙ্গুল, পঞ্চাতপা, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, পঞ্চান্ন, পঞ্চাপ্সরঃ, পঞ্চাবট, পঞ্চামর্ত, পঞ্চামৃত, পঞ্চাম্নায়, পঞ্চাস্ত্র, পঞ্চাম্ল, পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তী, পঞ্চায়েত, পঞ্চাল, পঞ্চালি, পঞ্চালিকা, পঞ্চালী, পঞ্চাশ, পঞ্চাশৎ, পঞ্চাশিকা, পঞ্চাশী, পঞ্চাশীতি, পঞ্চাস্য, পঞ্চীকরণ, পঞ্চেষু, পঞ্চোপচার, পঞ্জতনামা, পঞ্জন, পঞ্জনী, পঞ্জর (পাঁজরা), পঞ্জা (পাঞ্জা, পাঁজা), প(পা)ঞ্জাব, প(পা)ঞ্জাবী, পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী (পাঁজি), পঞ্জীকৃত, পঞ্জুড়ি(ড়ী), পশু(সু)রী, পসুরি(রী)পাল্লা, পাউস, পাংশন, পাংশব, পাংশু, পাংশুর, পাংশুল, পাংশুলা, পাঁইজ, পাঁক, পাঁক(কু)ই, পাঁকাল, পাঁচ, পাঁচই, পাঁচকান-করা, পাঁচচুলা(ল্যা), পাঁচ(চো)ট, পাঁচড়া (আঁচড়-পাঁচড়, অঞ্চড়-পঞ্চড়), পাঁচথুপী, পাঁচন, পাঁচনি(নী), পাঁচপাঁচি, পাঁচালি (পাঁচালী), পাঁচপীর, পাঁচফল, পাঁচফোড়ন, পাঁচভূত, পাঁজ, পাঁজর (পাঁজড়), পাঁজরা(ড়া), পাঁজা (পঞ্জা), পাঁজা (ইটপাঁজা), পাঁজা (পদবী), পাঁজা-কোলা, পাঁজি(জী), পাঁতি (পঙ্‌ক্তি), পাঁতিয়া, পাঁতী, পাঁশ (ছাইপাঁশ), পাঙা(ঙ্গা)শ, পাঙ্‌ক্ত, পাঙ্‌ক্তেয়, পাঙ্‌ক্ত্য, পাচড়া, পাচলা, পাছকুড় (পাঁশকুড়া, পাংশুকুণ্ড), পাঞ্চজন্য, পাঞ্চভৌতিক, পাঞ্চশাব্দিক, পাঞ্চাল, পাঞ্চালিকা, পাঞ্চালী, পাঞ্জর, পাঞ্জা, পাঞ্জার, পাঞ্জি, পান্টালুন, পাতি (পাঁতি, পঙ্‌ক্তি, আঁতিপাঁতি), পাতি-পাতি, পাদ, পাদকুড়াপোক, পিঙ্গল, পেঁকো, পেঁচ, পেঁচড়া, পেঁচা (পঙ্ক পঞ্চ ও পচ এতে মিলেমিশে গেছে), পেঁচানো, পেঁচাল, পেঁচো, পেচ, পৌঁচ, পৌঁছ, পৌঁছা, পৌঁছান, প্যাঁচ, প্যাঁচা, প্যাঁচানো।

পং (পংশ্, পঞ্চ্, পঞ্জ্, পন্‌চ্, পন্‌জ্) = প-কারীর (প-করণের) রহস্যরূপ যাহাতে। **পংশ** = প-কারীর (প-করণের) রহস্যরূপের শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। **পঞ্চ (পন্‌চ)** = প-কারীর (প-করণের) রহস্যরূপ (নাকরণ-অন্‌করণ) চয়িত যাহাতে। **পঞ্জ (পন্‌জ)** = প-কারীর (প-করণের) রহস্যরূপ (নাকরণ-অন্‌করণ) জনিত যাহাতে।

[সবার আগে জানা দরকার, **পং** (পঙ্, পঞ্, পণ্, পন্, পম্) **শব্দের** ভিতরে ঠিক কী অর্থ থাকে। প-বর্ণের অর্থ 'প-কারী' বলে আমরা আগেই জেনেছি এবং তাদের অন্যান্য রূপের বিষয়ে কিছু জেনেছি। প-এর স্বরূপ আরও স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় যদি প বর্ণের বাংলা উত্তরাধিকারের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার উত্তরাধিকারকে রেখে তুলনা করে দেখি। সে কাজটি অনেক বড়, এখানে তা অতি সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যাক। নিয়মানুসারে 'পক' শব্দের অর্থ হবে '**প-কারীর** (পায়ীর বা অবকাশধারীর) করণ থাকে যাহাতে' এবং **একই** নিয়মে 'পচ' শব্দের অর্থ হবে 'প-কারীর (পায়ীর বা **অবকাশ**ধারীর) চয়ন থাকে যাহাতে'। কিছু করতে গেলে প্রথমে সেটিকে ধরতে হয়, তাই ক-এর সঙ্গে চ-এর নিকট সম্বন্ধ। দ্র. **চ বর্ণের** অর্থ। সেই সুবাদে পক্ব, পক্ষ (পক্‌ষ), পাকা, পচা প্রভৃতি **শব্দগুলি** বাংলাভাষায় আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু সরাসরি 'পক্' (**পকা**, পকে-যাওয়া) শব্দটি নেই; বাংলাভাষার কোনো প্রান্তে **থাকলেও** এখনও আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু হিন্দিতে ('পক্‌না' = **পেকে** ওঠা) ও ইংরেজিতে (pack, packet, pocket ... ইত্যাদি) **রয়েছে**। 'পক'-এর এই সর্বভাষিক উত্তরাধিকারের ভিতরে 'প-কারীর (= **অবকাশ**ধারীর অবকাশ পূর্ণ করার) করণ থাকে'। কী সেই 'প-কারীর করণ'? সে হল আপন অবকাশ পূর্ণকারী এক 'পানকারী বা পালনকারী'-সত্তা, যে কিনা আপন কেন্দ্রের দিকে সবকিছুকে চয়ন করে নিয়ে আসে; ব.শব্দকোষ বলছেন 'জীর্ণীকরণ' করে; পাকায়, নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, pack করে, pocket-স্থ করে। অবশ্য তদ্রূপ 'পক্' করার আগে সে 'পচ্' (patch) করে, 'প-কারীর চয়ন থাকে যাহাতে', তদ্রূপ ক্রিয়া করে; তাতে 'পচপচ' শব্দ হয়, সেই পচ্ পরিণত হয় পক্ (পাক্ বা pack) ক্রিয়ায়।

কিন্তু যেই না তার ভিতরে **অংরূপিণী**র প্রবেশ ঘটে ('পক' হয়ে যায় 'পঁক' কিংবা 'পঙ্ক'), তৎক্ষণাৎ শব্দটি আর তার দৃশ্য মর্তরূপে থাকে না, অদৃশ্য দেবলোকে ঢুকে পড়ে। (তাছাড়া আমরা তো জানিই, অদৃশ্যলোকের সত্তাগুলিকে বোঝাতেই মানুষের শব্দ ব্যবহার।) তখন প-কারীর করণের ভিতরে শুধুমাত্র পক্ (pack) করা থাকে না, তার ভিতরে মেধা, বুদ্ধি, শ্রম ইত্যাদি **অংরূপিণী**র বিভিন্ন রূপ ঢুকে পড়ে। তখনই পক হয়ে যায় পং-ক, পঙ্-ক বা পঙ্ক। মর্তলোকে এই পঙ্ক 'পাঁক'মাত্র (mud-মাত্র), কিন্তু দেবলোকে এই পঙ্ক হল মানবসভ্যতার উৎপাদিত বিপুল পণ্যসম্ভার, অর্থাৎ সংসারের পাঁক। এই পঙ্ক থেকে জন্মায় পঙ্কজ, অর্থাৎ, এই পাঁকে পদ্মফুল ফোটে; যা কিনা আসলে 'কারীর মল' বা **কমল**। সেই পদ্মের উপর বিরাজ করেন স্বয়ং জ্ঞানজীবী-সত্তা — **ব্রহ্মা**। গুরুজনেরা বলেন, বাঁচতে গেলে সংসারের এই পাঁকে না থেকে উপায় থাকে না, তাই থাকতে হয়, কিন্তু গায়ে সেই পাঁক লাগতে দিতে নেই! ... তবে এ সবই হল অদৃশ্যলোকের **পঙ্ক** বা পাঁক।

দৃশ্যলোকের **পঙ্ক** বা পাঁক থাকে পুষ্করিণীতে (পুকুরে), থাকে 'পঁক করে পাদায় (বাতকর্মে)'। এসব কথা যাঁদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে, তাঁরা গ্রামবাংলার বাংলাভাষীর শরণাপন্ন হতে পারেন। (মহাভারত ও হরিবংশ পুরাণেও এরকম তথাকথিত 'অশ্লীল' আলোচনার নিদর্শন রয়েছে।) 'বুড়াটা পঁক করে পাদে' — গাঁয়ে এরকম বাংলাবাক্য সবাই বোঝে। এই 'পঁক' বা **পঙ্ক** যে স্থান থেকে বেরিয়ে আসে, তাঁকে বলে 'পঁদ' (পঁ দান করে যে)! শব্দটির উত্তরাধিকার ইংরেজির রয়েছে pond রূপে, যেখানে মর্তলোকে **পঙ্ক** (পঁক) জন্মায়। ... স্পষ্ট বোঝা যায়, অদৃশ্যলোকের সমান্তরালে এই দৃশ্য সত্তাগুলির নামকরণ করা হয়েছিল।

অতএব ব্যাপারটি শেষমেষ এইরকম দাঁড়ায় —

পুষ্করতীর্থ	পঁক/পঙ্ক	পঙ্কজ/পদ্ম পদ্মনাভ পদ্মযোনি
পুষ্করিণী	পঁক/পঙ্ক	পঙ্কজ/পদ্ম পদ্মাসনা
পঁদ/pond	পঁক/পঙ্ক	পাদন/উৎপাদন পাদা/বাতকর্ম]

পংক্তি (পঙ্‌ক্তি, পঙ্‌ক্তিকণ্টক, পঙ্‌ক্তিগ্রীব, পঙ্‌ক্তিদূষক, পঙ্‌ক্তিপাবন, পঙ্‌ক্তিভোজন, পঙ্‌ক্তিরথ, পাঙ্‌ক্তেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়, পঙ্গত) : ১. ✓পন্‌চ্ + তি (ক্তিন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পঙ্‌ক্তি (পংক্তি)*** *= যাহাতে প-কারীর রহস্যময় চয়ন (করণ) গতিশীলভাবে তারিত হয়; অথবা, পানকারী-পালনকারীর রহস্যকরণ গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***পঙ্‌ক্তিকণ্টক*** *=* ***পঙ্‌ক্তির*** *কাঁটা যে।* ***পঙ্‌ক্তিগ্রীব*** *=* ***পঙ্‌ক্তি*** *গ্রীবা যাহার।* ***পঙ্‌ক্তিদূষক*** *=* ***পঙ্‌ক্তি*** *দূষিত করে যে।* ***পঙ্‌ক্তিপাবন*** *=* ***পঙ্‌ক্তি****কে পবিত্র করে*

*যে। **পঙ্‌ক্তিভোজন** = **পঙ্‌ক্তি**তে যে ভোজন হয়। **পঙ্‌ক্তিরথ** = **পঙ্‌ক্তি** রথ যাহার। **পাঙ্‌ক্তেয়** = **পঙ্‌ক্তি**তে যায় যে। **অপাঙ্‌ক্তেয়** = যে **পাঙ্‌ক্তেয়** নহে। **পঙ্গত** = **পং** গত যাহাতে।* **৩. পংক্তি, পঙ্‌ক্তি** = শ্রেণী, রাজি, সামাজিক ভোজনে সমাজের লোকের শ্রেণী, সজাতীয় পদার্থের সান্তর স্থিতিবিশেষ, বীথি, সঙ্ঘ, ভোজনার্থ আসীন সজাতীয় ভোক্তৃগণ-শ্রেণী, দশাক্ষরপাদ ছন্দোভেদ, দশসংখ্যা, পৃথিবী। **পঙ্‌ক্তিকণ্টক** = পঙ্‌ক্তিদূষক। **পঙ্‌ক্তিগ্রীব** = দশগ্রীব, রাবণ। **পঙ্‌ক্তিদূষক** = একপঙ্‌ক্তিভোজনে পঙ্‌ক্তির দোষজনক, অপাঙ্‌ক্তেয় স্মৃতিনির্দিষ্ট অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **পঙ্‌ক্তিপাবন** = শ্রাদ্ধে ভোজনার্থ উপবিষ্ট বিপ্রগণের পঙ্‌ক্তির পবিত্রতাজনক স্মৃতিনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ, পাঙ্‌ক্তেয়। **পঙ্‌ক্তিভোজন** = সমাজে সজাতি শ্রেণীতে ভোজন। **পঙ্‌ক্তিরথ** = দশরথ। **পাঙ্‌ক্তেয়** = পঙ্‌ক্তিভোজনার্হ ব্রাহ্মণ। **অপাঙ্‌ক্তেয়** = পঙ্‌ক্তিভোজনের অযোগ্য, সাধুলোকের সহিত একত্র ভোজনাদির অযোগ্য; পঙ্‌ক্তিদূষণ, সমাজচ্যুত (excommunicated)। **পঙ্গত** = ভোজনকালে ভোক্তাদিগের পঙ্‌ক্তি। (ব.শ.)। **৪. পঙ্‌ক্তি** 'শ্রেণী' অর্থে এবং **অপাঙ্‌ক্তেয়** 'সমাজচ্যুত' অর্থে প্রচলিত। বাকি সমস্ত শব্দই অপ্রচলিত। **৫.** উপরে **পং** শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। অমরকোষ জানাচ্ছেন, পংক্তি হল 'শতসহস্রাদি ক্রমাদ্দশগুণোত্তরম্'। অর্থাৎ, পংক্তি হল 'দশ হইতে ক্রমে দশ বৃদ্ধি করিয়া এক একটি সংখ্যা ও সংখ্যাবিশিষ্টের বাচক'। তার মানে, দশের সারির সঙ্গে দশের সারির ক্রমান্বয় যোগ করতে থাকলে, প্রতিটি স্তরে এক ও ক্রমান্বয়ে একাধিক পঙ্‌ক্তি (পংক্তি) হয়। এই পঙ্‌ক্তিকে আমরা পদ্যে বা কবিতায় দেখতে পাই, বহুব্যক্তির একত্র ভোজনকালে দেখতে পাই, বহু বিষয় বা বস্তুকে সুবিন্যস্ত করে রাখার কালে দেখতে পাই। মোটকথা বহুসংখ্যক বস্তুকে বহু সারিতে গুছিয়ে রাখলেই **পঙ্‌ক্তি**কে দেখতে পাওয়া যায়। দ্র. **পট, পাট, পাটীগণিত**। কিন্তু প্রশ্ন হল, এগুলির প্রতিটিকে **পঙ্‌ক্তি** বলে কেন?

প্রথমত, গরু ছাগল প্রভৃতি জীবেরা এক দুই তিন চার ইত্যাদি গুনতে জানে না। জগতে যত কিছু বিষয় ও বস্তু আছে, তাদের প্রত্যেককে মাথার ভিতরে ধরে নিয়ে গুণে গুণে রাখার মতো ব্যাপার-স্যাপারগুলি মূলত মানুষের রহস্যময় মানবিক ক্রিয়া। **পঙ্‌ক্তি** বা **পংক্তি**র ভিতরে সেই বস্তুর সংখ্যা গণনার ব্যাপারটি রয়েছে বলেই তা **অংরূপিণী**র নানা (ং, ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্,ঁ) শাব্দিক রূপে প্রকাশিত হয়। **পং** বা পঙ্ অর্থে তাই 'প-করণের রহস্যরূপ' বোঝায়।

দ্বিতীয়ত, প্রাপ্ত বস্তু বা বিষয়কে দশ, বার, চৌদ্দ (চতুর্দ্দশপদী কবিতা স্মর্তব্য) প্রভৃতি সংখ্যায় সাজিয়ে রাখতে থাকাকেই **পঙ্‌ক্তি** বলে। সম্ভবত আদিতে সংগৃহীত বস্তুসমূহকে সাজিয়ে রাখতে গিয়েই শব্দটির প্রচলন হয়। পাঁচের বা দশের গেরো দিয়ে এক একটি দড়ি ঝুলিয়ে এই গণনার ব্যবস্থা করা হত। এই রীতি প্রাচীন মানবসমাজে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এমনকি ১৯৩০-৪০ সালেও বিহারের গ্রামে দড়িতে গিঁট দিয়ে এই হিসেব রাখার চল ছিল। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাসংকলনে 'ঘোড়েওয়ালা বাবু' *রিপোর্টাজে* তার স্পষ্ট ব্যাখাসহ বিবরণ রয়েছে। মোটকথা, প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে একত্রে সুবিন্যস্ত করে বা **পাট** করে হিসেব করার একটি উপায় ছিল **পঙ্‌ক্তি**তে সাজিয়ে ফেলা। এই রীতি ক্রমে সর্বপ্রকার হিসাবের ক্ষেত্রে পরিপ্রসারিত হয়ে যায়। পরে পরে এমনকি বহু ব্যক্তির ভোজনকালে ভোজনকারীগণকেও ধরা হত 'সংখ্যা' হিসেবে। অর্থাৎ, ছন্দোবদ্ধ পদ্যের এক একটি লাইনের মতো ভোজনকারীদের এক একটি সারিও **পঙ্‌ক্তি**-পদবাচ্য হয়ে যায়। এই হিসেবের সারিগুলিই এক-একটি **পঙ্‌ক্তি**। তাই শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের [যাহাতে প-কারীর রহস্যময় চয়ন (করণ) গতিশীলভাবে তারিত হয়] সঙ্গে এই অর্থগুলি খাপ খেয়ে যায়। ...

ভারতের ইতিহাস অনুসারে মানবসমাজে বিভাজনের পর মানুষকে চার ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। প্রতি ভাগের আলাদা সারি বা **পঙ্‌ক্তি**। যে-মানুষ যে-ভাগে পড়ে, তাকে সেই ভাগের পঙ্‌ক্তিতে রেখে গণনার রীতি প্রচলিত হয়ে যায়। ফলত সেই **পঙ্‌ক্তি**কে নিয়ে বা তার বিষয়ে নানারকম ক্রিয়াকর্মের ঘটনাও ঘটে। সেগুলিকে শব্দে প্রকাশ করার জন্য স্বভাবতই **পঙ্‌ক্তিকণ্টক, পঙ্‌ক্তিগ্রীব, পঙ্‌ক্তিদূষক, পঙ্‌ক্তিপাবন, পঙ্‌ক্তিভোজন, পঙ্‌ক্তিরথ, পাঙ্‌ক্তেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়, পঙ্গত** প্রভৃতি বহু শব্দের জন্ম হয়। ... **৬.** ইংরেজি punctuate।

পঙ্ক (পঙ্কজ, পঙ্কিল, পাঁক) : ১. পঙ্ক = ✓পঞ্চ্‌ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। **পঙ্কজ** = পঙ্ক + ✓জন্ + অ (ড) - কর্ত্তৃবাচ্যে। **পঙ্কিল** = পঙ্ক + ইল (ইলচ্)। (ব.শ.)। **২. পঙ্ক** = **পঞ্চ্‌** *(প-করণের রহস্যমূলক চয়নকর্ম্ম) কৃত যাহাতে। **পঙ্কজ** = **পঙ্কে** জন্ম যাহার। **পঙ্কিল** = **পঙ্ক** গতিশীলরূপে লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে। **পাঁক** = প-কারীর রহস্যরূপের আধার কৃত যাহাতে।* **৩. পঙ্ক** = কর্দম, পাঁক, দ্রব্য, রস, পাপ, অট্টালিকার ভিত্তিতে বা তলদেশে লেপনার্থ দৃঢ় কল্কবিশেষ। **পঙ্কজ** = পদ্ম, শ্রেষ্ঠ। **পঙ্কিল** = পঙ্কযুক্ত, কর্দমময়, ঘোলা, পাপযুক্ত, কলুষিত, মলিন, কলঙ্কিত। **পাঁক** = কাদা, পচা কাদা। (ব.শ.)। **৪. পঙ্ক** ও **পাঁক** mud অর্থে, **পঙ্কজ** lotus অর্থে এবং **পঙ্কিল** muddy, dirty, বা vicious অর্থে প্রচলিত। **৫. পং** ও **পঞ্চ** দ্রষ্টব্য। বাংলাভাষায় যেমন বৃষ্টি-সংক্রান্ত বহু শব্দ আছে, তেমনি এস্কিমোদের ভাষায় বরফ-সংক্রান্ত বহু শব্দ রয়েছে। এর কারণ হল, ভৌগোলিক অবস্থান বাঙালির জীবনে বৃষ্টির ভূমিকাকে এবং এস্কিমোদের জীবনে বরফের ভূমিকাকে অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। এই হিসেবে, যে বস্তু বা বিষয়ের ভূমিকা আমাদের জীবনে অধিক, সে-সংক্রান্ত অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় থাকা স্বাভাবিক। সেই সুবাদে যে বস্তু বা বিষয়ের ভূমিকা আমাদের জীবনে লক্ষণীয়ভাবে অধিক নয়, তৎসংক্রান্ত অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় থাকার কথা নয়। অথচ **পঙ্ক** ও **পঙ্ক**জাত বিষয় ও বস্তু সংক্রান্ত শব্দের ক্ষেত্রে আমরা উলটো দেখছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্য ভাষার তুলনায় এতৎসংক্রান্ত অনেক বেশি শব্দ রয়েছে আমাদের ভাষায়; যথা — কাশ্মীরপঙ্ক, কুঙ্কুমপঙ্ক, চন্দনপঙ্ক, পঙ্ককীর, পঙ্কজকোষ, পঙ্কজন্ম, পঙ্কজনয়ন, পঙ্কজনাভ, পঙ্কজনেত্র, পঙ্কজলতা, পঙ্কজাঙ্ঘ্রি, পঙ্কজিনী, পঙ্কপট্ট, পঙ্করুট্, পঙ্করুহ, পঙ্কী, পঙ্কিনী, পঙ্কেশয়, পঙ্কোৎসব ... এবং পঁক, পাঁক, পাঁকাল, পাঁকুই, পেঁকো ... ইত্যাদি। তার ওপর রয়েছে প্রবাদ-বাগ্‌ধারা, যথা — 'পাঁকাল মাছের মতো পাঁকে থাকবে, কিন্তু গায়ে

পাঁক লাগতে দেবে না' ... ইত্যাদি। এইসব থেকে বোঝা যায়, বাংলাভাষীর জীবনে **পঙ্ক** ও **পঙ্কজ**-এর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল; হয়তো এখনও আছে কিন্তু সেভাবে আমরা তাদের চিহ্নিত করতে পারি না। ...

হ্যাঁ, এককালে **পঙ্ক** বা তজ্জাত শব্দসমূহের বিপুল ভূমিকা ছিল আমাদের জীবনে। আমাদের ভাষার শব্দসৃজনকারীগণ ছিলেন উত্তম-অধিকারী। পার্থিব mud ও lotus তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামাজিক **পঙ্ক** ও সামাজিক **পঙ্কজ**। দেহসম্বল মানুষের শরীর থেকে **পঙ্ক (পঁক)** করে পাদা-রূপে (বাতকর্মরূপে) সে যেমন বেরোয়, তেমনি সামাজিক মানুষের কৃতকর্মের ফলও **পঙ্ক (পঁক)** করে **পণ্য**রূপে বেরিয়ে বাজারে চলে আসে। এ হল নিসর্গ-প্রকৃতির স্বাভাবিক **পাক**-এর ক্লেদাক্ত রূপ **পাঁক**। (দ্র. **পঙ্ক**)। স্বভাবতই এই **পঙ্ক** থেকেই জন্মায় **পঙ্কজ**। নিম্ন-অধিকারীর জন্য এই **পঙ্কজ** কেবল বাহ্যিক lotus মাত্র, কিন্তু উত্তম-অধিকারীর জন্য এই **পঙ্কজ** প্রধানত পণ্যসম্ভার থেকে বা **মলয়জপঙ্ক** (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতা 'ধাত্রী পান্না'র একটি পদ হল 'মলয়জপঙ্ক হল দুর্গন্ধ পূরীষ') থেকে জাত সামাজিক উচ্চ-পদসমূহের সমাহার বা **পদ্ম**। বাংলা-ভাষীদের পূর্বপুরুষেরা সেই অদৃশ্য **পঙ্ক** ও **পঙ্কজ**কেই তাঁদের বয়ানে প্রাধান্য দিয়েছিলেন; দৃশ্য **পঙ্ক** (mud) ও **পঙ্কজ** (lotus) তাঁদের বয়ানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; সেসব তো আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন হল, এগুলিকে **পঙ্ক** ও **পঙ্কজ** বলা হত কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শব্দ দুটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে। সেখানে রয়েছে **পঞ্চ্ (পন্চ্)** ক্রিয়া। তার অর্থ কী জানার জন্য, অতএব, নিম্নে প্রদত্ত **পঞ্চ** শব্দের অর্থ অনুধাবন করা যাক।

পঞ্চ (পঞ্চত্ব) : ১. ✓পন্চ্ + অন্ - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. *প-করণের রহস্যমূলক চয়ন (চয়নকর্ম) থাকে যাহাতে; অথবা, প-করণের নাকৃত-অনকৃত চয়ন অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. পঞ্চসংখ্যক, পাঁচ, বহু, পাঁচজন। (ব.শ.)। ৪. অ্যাকাডেমিতে শুধুমাত্র five অর্থে প্রচলিত, কিন্তু বঙ্গসমাজে 'পাঁচ', 'দশ', এবং 'বহু' অর্থে প্রচলিত। ৫. পাওয়ার জন্য আমরা কোনো কিছুকে যখন হাত দিয়ে ধরি, তখন বস্তুটির কীরূপ চেহারা হয়? বস্তুটি ধুলো বা কাদার মতো হলে পাঁচ আঙুলের থাবায় টানা হয়ে মুঠোর ভিতরে চলে আসে, যেন পাঁচ-কোদালে কেটে নেওয়া ও একত্র করা বস্তুপিণ্ড। তবে কিনা এ তো কেবল ধুলোকাদার ক্ষেত্রেই ঘটে না, সমগ্র বাহ্যপ্রকৃতির ক্ষেত্রেই ঘটে। মনীষীরা বলেন, আমাদের নাকি 'পাওয়ার জন্য রয়েছে সারা পৃথিবীটাই।' আর সে পৃথিবীটা কীরকম? আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা বুঝেছিলেন যে, এই পৃথিবীটা আসলে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম — এই **পঞ্চ**ভূতের সমাহার!

তাহলে কি মানুষ হাত দিয়ে চয়ন করতে গিয়ে দেখেছিল, চয়নীয় বিষয় কার্যত পাঁচ আঙুলের থাবায় ধরা দিচ্ছে? তাহলে কি সেই **পাঁচ** আঙুলের থাবার ধারণা থেকেই আদিতে **পঞ্চ** ধারণাটি গড়ে উঠেছিল? নাকি, উত্তম-অধিকারীরা **পঞ্চ**ভূতের ধারণায় পৌঁছনোর পর নিম্ন-অধিকারীদের বোঝানোর জন্য **পাঁচ** আঙুলের ধারণায় নেমে এসেছিলেন? আমাদের মনে হয়, বিশ্বজগৎকে অখণ্ডভাবে বুঝতে গিয়েই এই **পঞ্চ** ধারণায় প্রাচীন চিন্তাবিদগণ পৌঁছোতে পেরেছিলেন। অবশ্য আমরা আরও দেখছি যে, এই **পঞ্চ** ধারণার সমর্থন মেলে ইংরেজি উত্তরাধিকার থেকেও। নিয়মানুসারে পাঁচ আঙুলের থাবা নবরূপে উত্তীর্ণ হলে শব্দটি হবে 'পুঞ্চ' (punch), যাকে 'পুঁছে' নেওয়া বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে punch শব্দটি এর খুব কাছাকাছি অর্থে আজও প্রচলিত রয়েছে।

তা সে যাই হোক এবং যেভাবেই সেই **পঞ্চ**-ধারণার জন্ম হোক না কেন, আমরা দেখছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিশ্বের সমস্ত কিছুকে **পঞ্চ** ও **সপ্ত** — এই 'সাত-পাঁচ'-এর ধারণার ভিতরে ধরে নিয়ে বিশ্বজগৎকে অখণ্ডরূপে বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাই 'সাতে-পাঁচে নেই' মানে এই বিশ্বব্যাপারের কোনো কিছুতেই নেই। স্বভাবতই **পঞ্চতত্ত্ব**-এর (এবং **সপ্ত**-বোধের) এলাকাটি অত্যন্ত বিশাল। আর সেই বিশাল এলাকাকে শনাক্ত করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা **পঞ্চ**-শব্দ যোগে অজস্র শব্দ বানিয়েছিলেন। উপরে **পং** ক্রিয়া-পরিবারের **পঞ্চ্, পঞ্চ (punch), পঞ্চক, পঞ্চকপাল, পঞ্চকর্ম, পঞ্চকষায, পঞ্চকোণ, পঞ্চকোল, পঞ্চকোষ, পঞ্চক্রোশী, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুণ, পঞ্চগুণী, পঞ্চগৌড়** ... ... প্রভৃতি শতাধিক শব্দের দিকে তাকালেই সেই বিশাল এলাকাটির আধার স্বরূপ তাদের চিহ্নিতকরণকারী শব্দগুলিকে আমরা দেখতে পাব।

তবে দুহাতে চয়ন করলে **পঞ্চ** ধারণাটি আর পাঁচ থাকে না, হয়ে যায় দশ। সেকারণেই **পঞ্চ** শব্দটি 'দশ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যথা এক কবি যখন বলেন — 'পাঁচ জনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা ...' ইত্যাদি, তখন অন্য কবি বলেন — 'দশে মিলি করি কাজ ...' ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, **পঞ্চ** এবং **দশ** দুটি শব্দই 'বহু'কে বোঝাচ্ছে। দ্র. **দশ**। তবে, সেকালের মানুষ তাঁদের এই হাতের **পাঁচ**-এ থেমে থাকেননি। পঞ্চাঙ্গুলি থেকে পঞ্চভূত পর্যন্ত বিশ্বজগতের তাবৎ **পঞ্চ**কে তাঁরা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা জেনেছিলেন, এক থেকে পাঁচে বা পঞ্চে এবং সেই পঞ্চ থেকেই এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়েছে। পুনরায় সেই পঞ্চে ফিরে যাওয়াকে সেকারণেই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন '**পঞ্চত্ব** প্রাপ্ত হওয়া'। ... ৬. ইংরেজি punch।

পঞ্চক : ১. পঞ্চন্ + ক (কন্)। (ব.শ.)। ২. **পঞ্চ** *করে যে। /* পঞ্চ দ্বারা ক্রীত। (ব.শ.)। ৩. পঞ্চ, পঞ্চপরিমাণ, প্রতি শতে দেয় পঞ্চবৃদ্ধিযুক্ত (শতকরা পাঁচ টাকা সুদ সহিত), পঞ্চাংশযুক্ত, পঞ্চসংখ্যা, ধনিষ্ঠাদি পঞ্চনক্ষত্র, গ্রামের পাঁচ জনের (অর্থাৎ গ্রামবাসীর) কৃত হিতার্থ নির্ণীত কোনো পর্য্যায় বা পালা, রাজা বা জমিদার মালিকানার চিহ্নস্বরূপ যে অত্যল্প করে জমি বিলি করেন সেই কর (যথা 'পঞ্চকী-জমি' = অত্যল্প করের জমি)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. জমির মালিকানার ও করের উপরোক্ত প্রকার রীতিনীতি বদলে গেছে। ফলে শব্দটির সেভাবে ব্যবহার আর নেই। তবে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে বা 'সিধা' (= ক্ষেতমজুরদের দেয় প্রতিদিনের মজুরি স্বরূপ চাউল প্রদান) দেওয়ার সময় আগে-পরে 'পাঁচমুঠা চাল' দেওয়ার 'পঞ্চকী' রীতিটি সত্তরের দশকেও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত দেখা যেত। এখনও

হয়তো কোথাও কোথাও রয়েছে।

পঞ্চকন্যা : ৩. কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, অহল্যা, দ্রৌপদী। ৪. সাধারণভাবে অপ্রচলিত। কিন্তু যাঁরা এখনও সন্ধ্যাহ্নিক-আদি করেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনও 'পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্' মন্ত্রের দ্বারা **পঞ্চকন্যা**কে প্রত্যহ স্মরণ করেন। গ্রামবাংলার যাত্রাপালায় বা গানে এখনও এঁদের কাহিনী খুব ক্ষীণভাবে হলেও প্রচলিত রয়েছে। ৫. দ্র. **দ্রৌপদী**। তথ্য অনুসারে এই **পঞ্চকন্যা** হলেন — **কুন্তী তারা মন্দোদরী অহল্যা দ্রৌপদী**। একালের তথাকথিত আধুনিকতা-বাদীদের চোখে এঁরা প্রত্যেকেই অসতী। কেননা, এঁদের প্রত্যেকেরই স্বামীর সংখ্যা একাধিক। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গেলেন, এঁরাই পঞ্চসতী, এঁদেরকে প্রত্যহ প্রাতে স্মরণ করতে। করলে নাকি মহাপাপ নাশ হয়ে যায়। কেন সেরকম বলতে গেলেন তাঁরা?

এর উত্তর পাওয়া যায় তাঁদের **সতী**-ধারণায়। (দ্র. **সতী**।) **দ্রৌপদী** ও **তারা** শব্দে তার খানিকটা ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি। এক্ষেত্রে শুধু এইমাত্র বলা যায় যে, এই **পঞ্চকন্যা** সাধারণভাবে পাঁচরকম সামাজিক সত্তাকে বোঝায়। এর মধ্যে সেকালের কৃষিকর্ম-জ্ঞানের (কর্ষণজ্ঞানী মহর্ষিদের) আধারশক্তি স্বরূপ জনগোষ্ঠীকে বলা হত **অহল্যা**; প্রশাসকদের (রাষ্ট্রের) আধারশক্তি স্বরূপ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীশ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে বলা হত **তারা** ও **মন্দোদরী**; ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধারশক্তি স্বরূপ জনগোষ্ঠীকে বলা হত **কুন্তী** ও **দ্রৌপদী**।

পঞ্চকর্ম্ম : ৩. বমন রেচন নস্য নিরূহ অনুবাসন — এই পঞ্চ শারীরিক চিকিৎসা। উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রসারণ গমন — এই পঞ্চকর্ম্ম। (ব.শ.)। দ্র. **ষড়্‌যন্ত্র**।

পঞ্চকষায় : ৩. জম্বু শাম্মলি বাট্যাল বকুল বদরী — এই পঞ্চদ্রব্যের বল্কলরস। দেবীর মহাস্নানার্থ জম্বু-প্রভৃতি পঞ্চকষায়দ্রব্য। (ব.শ.)।

পঞ্চকোল : ৩. পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরমুস্তক — এই পঞ্চদ্রব্যের পাচন। (ব.শ.)।

পঞ্চকোষ : ৩. অন্নময়কোষ (দেহ), প্রাণময়কোষ (পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত পঞ্চ প্রাণ), মনোময়কোষ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত মন), বিজ্ঞানময়কোষ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত বুদ্ধি), আনন্দময়কোষ (আনন্দপ্রচুর কারণশরীর)। (ব.শ.)।

পঞ্চগব্য : ৩. দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় গোমূত্র — এই পঞ্চ গোসম্বন্ধী দ্রব্য। (ব.শ.)।

পঞ্চগুণ : ৩. শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ — এই পঞ্চমহাভূতগুণ। (ব.শ.)।

পঞ্চগুণী : ২. *পঞ্চগুণ আছে যাহার।* ৩. পৃথিবী। (ব.শ.)।

পঞ্চগৌড় : ৩. সারস্বতপ্রদেশ কান্যকুব্জ গৌড় মিথিলা উৎকল — এই পঞ্চদেশ। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **গৌড়**।

পঞ্চগ্রাস : ৩. ব্রাহ্মণাদির ভোজনে গণ্ডুষের পরে পঞ্চ প্রাণের নামে দেয় পঞ্চভাগ অন্ন। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ইন্দ্রিয, পঞ্চকোষ**। সমাজদেহের যে-পরিচালক (যে-মহর্ষি) সমাজের (সম্প্রদায়ের) ভিতরে সক্রিয় নিয়মগুলি জানেন, তিনি সবার আগে তাঁর পাঁচ শ্রেণীর কর্মীদের অন্নের ব্যবস্থা করবেন, তারপর সমাজদেহের (সম্প্রদায়ের) বাকি অংশের জন্য অন্ন বিতরণ করবেন। যিনি (যে-ইন্দ্র) জগতের (জগৎশরীর, সমাজশরীর, মানবশরীর প্রভৃতির) ভিতরে সক্রিয় নিয়মগুলি জানেন, তিনি সবার আগে তাঁর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। যে-**ব্রহ্ম**গুণসম্পন্ন (বা নিয়মজ্ঞান-সম্পন্ন) ব্রাহ্মণ এই বিষয়টি জানেন, তিনি তাঁর নিজ শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জন্য পঞ্চগ্রাসের ব্যবস্থা করে সেই **ব্রহ্মজ্ঞানে**র প্রতীকী আচরণ করবেন — এটাই ছিল আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের বিধি।

পঞ্চজন (পাঞ্চজন্য) : ২. *পঞ্চজন থাকে যাহাতে।* / পঞ্চ (পঞ্চভূত) হইতে জন (জাত)। (ব.শ.)। ৩. দেবতা গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ মনুষ্য সরীসৃপ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও চণ্ডাল; শঙ্খরূপধর অসুরবিশেষ (পঞ্চজন সংহ্রাদভার্য্যা কৃতির পুত্র। প্রভাসে মহাসমুদ্রে ইহার বাস ছিল। কৃষ্ণের গুরু সান্দীপনির পুত্র এই অসুর কর্ত্তৃক নিহত হয়। কৃষ্ণ গুরুর আদেশ অনুসারে গুরুপুত্র দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত পঞ্চজনকে নিহত করেন এবং গুরুপুত্র না পাইয়া সংযমনীতে যমের নিকট হইতে গুরুপুত্র উদ্ধার করিয়া গুরুকে অর্পণ করেন। এই পঞ্চজনের অস্থিতে কৃষ্ণের **পাঞ্চজন্য** শঙ্খ নির্ম্মিত হয়। (ব.শ.)। কৃষ্ণের শঙ্খ। পঞ্চজন নামক রাক্ষসকে হত্যা করার পর তার অস্থি হতে এই শঙ্খ নির্মিত হয়। (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের গুরু সান্দীপনিকে) গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে সান্দীপনি তাঁর মৃত পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। প্রভাসতীর্থে স্নানের সময় পঞ্চজন নামে একটি শঙ্খাসুর সান্দীপনির ভাসমান পুত্রকে ধরে সাগর গর্ভে নিয়ে যায়। এই অসুর একটি নাতিবিশাল দুর্ভেদ্য ও দুচ্ছেদ্য শঙ্খের মধ্যে নিরাপদে বাস করত। সান্দীপনির অনুরোধে কৃষ্ণ ও বলরাম এই শঙ্খাসুর পঞ্চজনকে বধ করে তাঁর পুত্রকে উদ্ধার করেন এবং এই শঙ্খটি নিয়ে একটি ফুৎকার দেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ এই শঙ্খাসুরের দেহ দিয়ে নিজের শঙ্খ তৈরি করেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য নামে প্রসিদ্ধ। (পৌ.অ.)। ৪. গ্রামবাংলার কোথাও কোথাও এখনও গ্রামের সমস্ত অধিবাসীদের একত্রে 'পঞ্চজন' বা 'পাঁচজন' বলে। অন্যথায় শব্দ কয়টি অপ্রচলিত। ৫. জীবজন্তুর হাড় থেকে কোনোরকম অস্ত্র তৈরি করার কথা শুনলে আধুনিকতাবাদীরা হাসেন। ওদিকে কারও অস্থি দিয়ে শঙ্খ, অস্ত্র বা বজ্র তৈরি করার কথা পুরাণাদি গ্রন্থে বারংবার শোনা যায়। এর থেকেই 'আধুনিক' পণ্ডিতেরা মনের মতো ব্যাপারটি পেয়ে যান — তাঁরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, হাড়গোড় দিয়ে অস্ত্রাদি তৈরি করে আদিবাসী অসভ্যেরা; এবং অতএব পুরাণাদি গ্রন্থে যে অস্থি দিয়ে অস্ত্রাদি তৈরির কথা বলা হয়েছে সেসব অবশ্যই অসভ্যদের ব্যাপার-স্যাপারই হবে। অর্থাৎ কিনা, শ্রীকৃষ্ণ, দধীচি ...

প্রভৃতি হল অসভ্যদের যুগের কথা। দেশের ইতিহাস, ভাষাজ্ঞান হারিয়ে ফেললে এরকম তো হবেই! তা সে যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসা যাক।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে **অস্**-এর বা অস্তিত্বের স্থিতি যাহাতে, তাহার গতিশীল রূপকে বলে 'অস্থি' বা **হাড়**। মানবশরীরের ক্ষেত্রে এই 'অস্থি' স্বভাবতই **কঙ্কাল** পদবাচ্য; আর সমাজশরীরের ক্ষেত্রে এই 'অস্থি' অবশ্যই ব্যবস্থা (system) পদবাচ্য। কঙ্কালের উপর যেমন মেদমাংস নিয়ে সমগ্র শরীর গড়ে ওঠে, তেমনি এই ব্যবস্থা-র উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার বাকি অবয়ব। সেই সুবাদে **তথ্য**সমৃদ্ধ কোনো ব্যাপারের মূলে যে **তত্ত্ব** থাকে, তাকেও 'অস্থি' বলা যায়। একটি পরিবার কিংবা ব্যবসায়িক সংগঠন অথবা একটি সামরিক সংগঠনও তার নিজ নিজ ব্যবস্থা (system) বা সাংগঠনিক তত্ত্বের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই নিয়ম বা নিয়মাবলীই 'অস্তিত্বের স্থিতির গতিশীল রূপ' হওয়ায় তাকেও 'অস্থি' বলে। **দধীচি**র অস্থি দিয়ে সেভাবেই ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হয়েছিল। দ্র. **দধীচি**। একই নিয়মে **পঞ্চজন**-অসুরের অস্থি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের **শঙ্খ** নির্মিত হয়েছিল।

১৯৬০ সালেও মেদিনীপুরের প্রায় প্রতিটি গ্রামে নিজ নিজ 'গ্রামসমাজ' ও 'গ্রামসভা' ছিল, এখনও কোনো কোনো গ্রামে রয়েছে। গ্রামের মন্দির, মসজিদ, ছেলেমেয়েদের বিয়েসাদি ... ইত্যাদি নানা বিষয়ে সেই সভা সক্রিয় ভূমিকা নিত। মুসলিম গ্রামগুলিতে এই সভার একটি সাংগঠনিক কাঠামো ছিল এই প্রকার — ১ জন 'বড়া-ভাই' অর্থাৎ মোড়ল; ১ জন 'ছোটা-ভাই' অর্থাৎ সহ-মোড়ল; ১ জন 'খাজাঞ্চি' অর্থাৎ হিসাবরক্ষক (যার কাছে মসজিদের সম্পত্তির ও গ্রামের যৌথজমির দেখাশোনার ও তার টাকাপয়সার হিসাব ইত্যাদি থাকত); ১ জন **ডাকুয়া** অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে ডেকে আনত সভায়; এবং বাকি সবাই সাধারণ সদস্য অর্থাৎ 'দেশের ভাই'। মোটামুটি এইরকম ছিল গ্রামগুলির গ্রামবাসীদের নিজ নিজ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। এদের সভাকে বলা হত 'পঞ্চজনের সভা' কিংবা শুধুই 'পঞ্চজন' বা 'পাঁচজন'। বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হত 'পঞ্চ'। (দ্র. **অশ্বত্থ**)। বর্তমানে এই **পঞ্চ**-এর উত্তরাধিকার ঘটেছে 'পঞ্চাইৎ', 'পঞ্চায়ত' বা 'পঞ্চায়েত' শব্দে। এই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার আদিকালের সাংগঠনিক রূপটিকেই (সিস্টেমটিকেই) **পঞ্চজন** অসুরের 'অস্থি' বা **হাড়** বলে। পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সেই অস্থি দিয়েই তাঁর **শঙ্খ**টি তৈরি করেছিলেন। তবে সেই শঙ্খ দিয়ে তিনি শত্রুর **শঙ্কা** জনন করার জন্য punch **জনন** (পাঞ্চজন্য) করতেন কি না, তাও ভেবে দেখা দরকার। দ্র. **শঙ্খ**। স্মরণ রাখা ভাল, জারের সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ বিদ্রোহী হয়ে লেনিন-স্টালিনদের সঙ্গে যোগ দেয়। পরবর্তীকালে তাদের উপর নির্ভর করে ইউ এস এস আর-এর (সোভিয়েত রাশিয়ার) সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল, যার মূলে ছিল জার-এর সামরিক বাহিনীর ধারণার কঙ্কাল বা অস্থি।

পঞ্চঝুঁটি (পঞ্চশিখ, পঞ্চচূড়া) : ২. *পঞ্চ ঝুঁটি (শিখা, চূড়া) যস্যর।* ৩. পঞ্চঝুঁটি (শিখা) করিয়া বাঁধা শিশুর কেশ; শিখণ্ডক। (ব.শ.)। **পঞ্চশিখ** = ইনি বিখ্যাত দার্শনিক এবং আসুরির শিষ্য। আসুরি সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের শিষ্য। পঞ্চশিখ সাংখ্যদর্শনের মতবাদ সমগ্র ভারতে প্রচার করেন। আসুরির স্ত্রীর নাম কপিলা। পঞ্চশিখ পুত্রভাবে গুরুপত্নীর স্তন্যপান করতেন বলে ইনি কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামেও অভিহিত ছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও পুরাণাদি গ্রন্থে বারংবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রামায়ণে কৃত্তিবাস সরাসরি লেখেন 'দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি'। কিন্তু তাতে বড়জোর এইমাত্র বোঝা যায় যে, সামাজিক-স্তরে নিয়োগপুঁজির (finance capital-এর) পাঁচটি মালিকানা-সূত্রকে তাঁরা দেখতে পেতেন। অবশ্য শব্দগুলির অর্থ বিষয়ে আরও কিছু আমরা জানতে পারি **অঞ্জনা, কাকপক্ষ, পুঞ্জিকস্থলা, ঝুট, ঝুঁটি** প্রভৃতি শব্দে। জানতে পারি, সেকালে ছেলেমেয়েদের ঝুঁটি করে চুল বেঁধে দেওয়া হত, ক্ষত্রিয়সন্তানদের তিনটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচটি করে ঝুঁটি করে চুল বেঁধে দেওয়া হত। কিন্তু তার অধিক আর কিছু বোঝা যায় না।

তবে **কপিল** বা তার শিষ্য **পঞ্চশিখ** সারা ভারতে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ প্রচার করেছিলেন — কথাটি শুনলেই **পঞ্চঝুঁটি**র নিহিতার্থ বেশ কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যায়। (দ্র. **কপিল, কপিলাবস্তু**, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। তখন সন্দেহ হয়, সেকালের জ্ঞানীরা সম্ভবত জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের **পঞ্চগুণ**কেই পঞ্চঝুঁটিতে প্রতীকীকরণ করেছিলেন। ...

পঞ্চতন্মাত্র (দ্র. পঞ্চগুণ) : দ্র. **তন্মাত্র**।

পঞ্চপ্রাণ : ৩. প্রাণ অপান উদান ব্যান সমান — এই পঞ্চপ্রাণবায়ু। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **প্রাণবায়ু**।

পঞ্চবটী : ২. *যে স্থানে পঞ্চ বট (অশ্বত্থ, বট, বেল, আমলকী, অশোক) আছে।* ৩. অশ্বত্থ বট বিল্ব ধাত্রী অশোক — এই পঞ্চ বৃক্ষের সমাহার, দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ। রাম এই বনভাগে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বহুবর্ষ অবস্থান করেন। এই স্থানে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন ও রাম যুদ্ধে খর-দূষণের সহিত বহু রাক্ষস-সেনা নিধন করেন। রাবণ মারীচের সাহায্যে এই স্থানে সীতা হরণ করে। (ব.শ.)। গোদাবরী নদীর উৎসস্থানের নিকট এক রমণীয় অরণ্য। এ স্থলে রাম নির্বাসনের কয়েক বৎসর আশ্রম নির্মাণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বসবাস করেন। এই পঞ্চবটী বন থেকেই সীতা অপহৃতা হন। এখানেই লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা কর্তন করেন। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী — এই পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষের সমন্বয় স্থান বলে এই বন পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত। বর্তমান নাসিক শহর পঞ্চবটী নামে কথিত ছিল। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. উপরোক্ত তথ্য অনুসারে **বট** শুধুমাত্র banian tree নয়। এই **বট** হল **বৃক্ষ** (শুধুমাত্র tree নয়, দ্র. **বৃক্ষ**), এবং তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার। এই **বট**কে একালের বাংলাভাষীরা শুধুমাত্র উদ্ভিদ-লোকেই দেখতে পান; আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকে অন্তত দুটো লোকে অবশ্যই দেখতে পেতেন — উদ্ভিদলোকে ও মানবসমাজে। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে তাঁদের সেই দর্শনলব্ধ ধারণা আমরাও আজ কিছু কিছু আত্মস্থ করতে পেরেছি। সেই সুবাদে

বোঝা যায় — উদ্ভিদজগতে আমরা যাকে **অশ্বত্থ** বা আশুথ গাছ নামে চিনি, সমাজলোকে তাকেই বলা হয় যৌথ-সামাজিক সংগঠন (যৌথ পরিবার, যৌথ-উৎপাদন-সংগঠন, সার্বজনীন-পূজা-কমিটি ... ইত্যাদি)। অর্থাৎ বিষয়টি মোটামুটি এরকম —

	উদ্ভিদসমাজ	**মানবসমাজ**
অশ্বত্থ	আশুথ গাছ	যৌথ সংগঠন
বিল্ব	বেল গাছ	সামরিক সংগঠন
বট	বট গাছ	ব্যবসায়ী সংগঠন
অশোক	অশোক গাছ	বিনোদন সংগঠন
আমলকী	ধাত্রী গাছ	আমলা-সংগঠন

এর মধ্যে ইচ্ছাখুশি বা আন্দাজ নেই, রয়েছে গভীর বোধ। বস্তুতই আশুথ বেল বট অশোক ধাত্রী প্রভৃতি গাছের অন্তর্নিহিত স্বভাব ও যৌথ সামরিক ব্যবসায়ী বিনোদন আমলা সংগঠনের স্বভাব সর্বৈব এক প্রকারের। আমাদের অনুভবশীল জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা তাঁদের বিপুল অনুভবশক্তির জোরে সেই অন্তর্নিহিত সমধর্মিতাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্র. **অশ্বত্থ**। আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা তার ধ্বংসাবশেষকে আজও কিছু কিছু ধরে রেখেছেন। ...

তার মানে, উদ্ভিদজগতে আমরা যাকে বেলগাছ বলে চিনি, মানবসমাজে তাকেই পুলিশ-মিলিটারি প্রভৃতি সামরিক-সংগঠন বলে। উদ্ভিদজগতে যাকে বটগাছ বলা হয়, সমাজে তাকেই ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যবসা-সংগঠন বলা হয়ে থাকে। উদ্ভিদজগতে যাকে অশোক বলে, সমাজে তাকেই ক্রীড়া-সংগঠন বা বিনোদন-সংগঠন বলে। আর উদ্ভিদজগতে যাকে ধাত্রীগাছ বলে, মানুষের সমাজে সেটিকেই আমলাতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। (দ্র. **কায়স্থ**)।

মনে রাখা দরকার, আমাদের এই বোধ আমাদের স্বকপোল কল্পিত নয়। **অশ্বত্থা**দি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থই আমাদের সেই বোধে পৌঁছে দেয়। দ্র. **অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী**। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতসমাজে পাইকারি পণ্যধারার বা **গোদাবরী** নদীর তীরে এই **পঞ্চবটী** বা পাঁচ প্রকার সামাজিক সংগঠন ছিল, **রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সীতা**কে সঙ্গে নিয়ে সেখানেই বাস করতেন।

পঞ্চবাণ : দ্র. **পুষ্পকেতন, পুষ্পবাণ**।

পঞ্চবৃক্ষ : **৩.** স্বর্গের পাঁচটি বৃক্ষের নাম — মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, ও হরিচন্দন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যে গাছগুলিকে **পঞ্চবৃক্ষ** বলা হয়েছে, উদ্ভিদজগতে তেমন কোনো গাছের দেখা আমরা পাইনি। তবে কারও কারও মতে 'মাদার' ও 'রক্তচন্দন' গাছকেই সেকালে যথাক্রমে **মন্দার** ও **হরিচন্দন** বলা হত। অবশ্য সমাজে যে-সকল সামাজিক সংগঠনকে **বৃক্ষ** বলে, তাদের মধ্যে উপরোক্ত প্রতিটি বৃক্ষকেই দেখতে পাওয়া যায়। এদের **দেবতরু**ও বলা হয়ে থাকে। কল্পবৃক্ষ-এর কথা আগেই **কল্পতরু**-তে বলা হয়েছে। **মন্দার, পারিজাত, সন্তান,** ও **হরিচন্দন**কে তাদের নিজ নিজ ভুক্তিতে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলে রাখা যেতে পারে যে, এই পাঁচটি বৃক্ষই আসলে এমন পাঁচরকম সামাজিক সংগঠনের নাম, যেগুলি একালের নানা প্রকারের ব্যবসায়িক সংগঠনের আদি রূপ। **মন্দার** = **মন্দার** বলা হত সেই ধরনের যৌথ সামাজিক সংগঠনকে, যা **মন্দ**-এর আধার ছিল (দ্র. **মন্দার**)। **পারিজাত** = কিছু পণ্য কেবলমাত্র সমাজের এলাকার ওপারে (পারি) পাঠানোর জন্যই উৎপাদিত হত; যে সামাজিক সংগঠন তদ্রূপ উৎপাদন কর্মে রত ছিল, তাদের বলা হত **পারিজাত**। তার মানে আজ আমরা যাকে export quality-সম্পন্ন exportable goods বলি, সেকালে যে-ব্যবস্থার দ্বারা তেমন পণ্য উৎপাদিত ও বিদেশে রপ্তানি করা হত, তাকে বলা হত **পারিজাত বৃক্ষ**। (আর, কী আশ্চর্য! আমাদের অ্যাকাডেমি এসবের বাংলা অনুবাদই করতে পারে না! export quality-র তো কোনো বাংলাই নেই, exportable goods-কে সম্ভবত 'রপ্তানিযোগ্য পণ্য' বলা হয়ে থাকে। অথচ এখন আমরা সহজেই এই অনুবাদ করে ফেলতে পারি। export quality = পারিজাত-গুণী বা পারিজাত-গন্ধী; এবং exportable goods = পারিজাত পুষ্প। দ্র. **পারুল** পুষ্প।) **সন্তান** = অন্য উৎপাদিত বস্তুকে জুড়ে-মুড়ে নতুন বিক্রয়যোগ্য পণ্য যে সামাজিক সংগঠন বানাত, তাদের বলা হত **সন্তান**; একালে যাকে বলা হয় manufacturing industry। তবে কোন ধরনের সামাজিক সংগঠনকে **হরিচন্দন** বলা হত, তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়নি। **কল্পবৃক্ষ**-এর কথা অবশ্য আগেই আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চভূত (পঞ্চভৌতিক) : **২.** *পঞ্চ রূপে* **ভূত** *বা জাত।* **৩.** **পঞ্চভূত** = ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম — এই পঞ্চমহাভূত। **পঞ্চভৌতিক** = পঞ্চভূতঘটিত। (ব.শ.)। **৪.** কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** **পঞ্চত্ব** প্রাপ্তি বললে আমরা 'মরে যাওয়া' বুঝি কেন? — আসলে ধারণা এইরূপ যে, এ-জগৎ আদিতে ছিল এক, তারপর তা ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (শক্তিবীজ), মরুৎ (হাওয়া), ও ব্যোম (শূন্যস্থান) — এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এদেরই বলা হয় **পঞ্চমহাভূত**। পরবর্তীকালে সেই পাঁচ সত্তা থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্তা নির্মিত হয়েছে। সেই কারণে এই মহাবিশ্ব হল আসলে **পঞ্চভৌতিক** জগৎ মাত্র। প্রতিটি জীবশরীর এই **পঞ্চভূত**-এর বিকশিত রূপ মাত্র। জীব তার শরীর ত্যাগ করলে সেই শরীর পুনরায় ফিরে যায় এই **পঞ্চভূত**-এ। তখন একে **পঞ্চত্ব** প্রাপ্তি বলে।

পঞ্চযজ্ঞ (পঞ্চমহাযজ্ঞ) : **৩.** ব্রহ্মযজ্ঞ নৃযজ্ঞ দৈবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ — এই পঞ্চমহাযজ্ঞ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** দ্র. **যজ্ঞ**। মানুষ নানা প্রকার উৎপাদনমূলক কর্মযজ্ঞে লিপ্ত থাকে। সেই কর্মকাণ্ডসমূহকে সেকালের মানুষ মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত বলে মনে করেছিলেন। **ব্রহ্মযজ্ঞ** = যে কর্মযজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানের আধারস্বরূপ জ্ঞানীরা চালাতেন, তাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **ব্রহ্মযজ্ঞ**। একালেও এরকম অজস্র **ব্রহ্মযজ্ঞ** চলছে। একালের ভাষায় তেমন একটি উদাহরণ দিতে হলে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ'-এর কর্মকাণ্ডকে সেরকম একটি **ব্রহ্মযজ্ঞ** বলা যেতে পারে। **নৃযজ্ঞ** = যে কর্মযজ্ঞ **নৃ**-গণ চালাতেন, তাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **নৃযজ্ঞ**। একালে প্রচলিত তেমন একটি কর্মযজ্ঞের উদাহরণ দিতে হলে 'ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর ঔষধ তৈরির কর্মকাণ্ডকে সেরকম

একটি **নৃযজ্ঞ** বলা যেতে পারে। **দৈবযজ্ঞ** = যে কর্মযজ্ঞ **দেবগণ** চালাতেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল **দৈবযজ্ঞ**। একালের সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডকে **দৈবযজ্ঞ** বলা যেতে পারে, যে-কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হল তাদের উৎপাদিত বস্তু বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হবে। **পিতৃযজ্ঞ** = যে কর্মযজ্ঞ সমাজ, গোষ্ঠী, পরিবারের পরিচালকগণ তাঁদের সমাজের-গোষ্ঠীর-পরিবারের সদস্যদের ভোগের জন্য পরিচালন করেন, সেগুলিকে **পিতৃযজ্ঞ** বলে। একালের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা, প্রতিটি কৃষক পরিবার ... যে কর্মকাণ্ড চালনা করেন, সেগুলিকে **পিতৃযজ্ঞ** বলা যেতে পারে। **ভূতযজ্ঞ** = যে কর্মকাণ্ড **ভূতগণ** চালনা করে থাকেন, তাকে **ভূতযজ্ঞ** বলে। একালের দলবদ্ধ জেলে, কাঠুরে প্রভৃতি মানুষেরা যে সকল কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকেন, তাদের **ভূতযজ্ঞ** বলা যেতে পারে। বলে রাখা যেতে পারে, কর্মজগতের ইত্যাকার বিভাজন একালে বহু বহু গুণ বিভক্ত হয়ে গেছে। ফলে, উপরোক্ত **পঞ্চমহাযজ্ঞ**-এর ধারণা থেকে আমাদের সমাজ এখন বহু দূরে এগিয়ে চলে এসেছে।

পঞ্চলক্ষণ (পঞ্চলক্ষণা) : ২. *পঞ্চ (পাঁচটি) লক্ষণ আছে যার।* ৩. পুরাণের পাঁচটি বিশেষ লক্ষ্মণ —এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত না হলে তাকে পুরাণ বলা হয় না। এই পঞ্চলক্ষ্মণ হচ্ছে — সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পুরাণাদি গ্রন্থকে একালের পণ্ডিতরা মানবসভ্যতার ইতিহাসের মর্যাদা দেন না। কারণ, এর **পঞ্চলক্ষণ**-এর মানেই তাঁরা বুঝতে পারেননি। তবে সেজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বৃথা। ... যাই হোক, আজ আমরা জানতে পারছি পুরাণাদির যে পাঁচটি লক্ষণ রয়েছে, তা আসলে মানবসমাজের ইতিহাসেরই পাঁচটি মাত্রা। এগুলি জানলেই সমাজের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারা যায়। আর তা জানার জন্য **সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর,** ও **বংশানুচরিত** শব্দের অর্থ জানতে হয়। অতএব আগে এই শব্দগুলির অর্থ জানতে হবে, তখনই বোঝা যাবে **পঞ্চলক্ষণা**-পুরাণ মাত্রেই মানবসভ্যতার লিখিত ইতিহাস কেন। দ্র. **পুরাণ**।

পঞ্চাল (পঞ্চালিকা, পঞ্চালী, পাঞ্চাল, পাঞ্চালী, পাঁচালি, পাঁচালী) : ২. **পঞ্চাল** = *পঞ্চের আধার লালিত হয় যাহাতে। /* যে দেশের রক্ষণে মুদগল-প্রভৃতি 'পঞ্চ' রাজা 'অলম্' (সমর্থ), তাহা পঞ্চাল। (ব.শ.)। **পাঞ্চাল** = ***পঞ্চাল**-এ ভব বা জাত বা স্থিত।* ***পাঞ্চালী** = **পঞ্চাল**-এ ভবা বা জাতা বা স্থিতা। /* পঞ্চালভবা। (ব.শ.)। ৩. **পঞ্চাল** = পাঞ্চালক্ষত্রিয়গণের নিবাসস্থান জনপদ (ইহা দ্রুপদের রাজ্য। ভাগীরথীর উত্তর ও দক্ষিণ কূলে ইহা বহুদূর বিস্তৃত ছিল।), পঞ্চালবাসী ক্ষত্রিয়গণ, পঞ্চালরাজগণ। **পঞ্চালী, পঞ্চালিকা, পাঞ্চালিকা, পাঁচালী** = বস্ত্রপুত্রিকা, কানির পুতুল, পুত্তলিকা, পুতুল, গীতিবিশেষ, পাঁচালী (পাঞ্চালী রীতিতে রচিত (?) গীতবিশেষ। '**পাঁচালী**'র এই অর্থই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সেই গীতপ্রবন্ধ কি প্রকার ছিল এবং বাঙ্‌লাভাষায় প্রথমে তাহা কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় নাই। কাশীদাসী মহাভারতে যে 'পাঁচালীর গাথা', 'পাঁচালী প্রবন্ধ' আছে, তাহা পয়ার ছন্দ। গদাধর দাসের '**জগৎমঙ্গল**' কাব্যে 'পাঁচালি ছন্দ', 'পাঁচালির মতে' বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তাহাও ঐ পয়ার ছন্দেরই কথা। কবিকঙ্কণ পয়ার ত্রিপদী উভয় ছন্দেরই গীত 'পাঁচালী', 'পঞ্চালিকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দাশু রায়ের পাঁচালীর প্রবন্ধ ঠিক পয়ার বা ত্রিপদী নহে, ইহা ছড়া।)। **পাঞ্চাল** = পঞ্চালদেশে স্থিত বা জাত, পঞ্চালবাসী ক্ষত্রিয়গণ, পঞ্চাল-অধ্যুষিত দেশ, পঞ্চালরাজ। **পাঁচালি, পাঁচালী, পাঞ্চালী** = দ্রৌপদী, পুত্তলিকা, রীতি (পদবন্ধ) বিশেষ (ইহাতে বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির ব্যঞ্জক বর্ণ থাকে না এবং পাঁচ বা ছয় পদের সমস্তপদ থাকে। এই রীতি পঞ্চাল কবিগণের সম্মত ও তদ্দেশে প্রচলিত।), শারি-শৃঙ্খলা, পাশার ছক। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **দ্রৌপদী**কে **পাঞ্চালী** বলা হয়; আবার এই **পাঞ্চালী** কাব্যের একটি রীতিও বটে। তার মানে, পঞ্চালদেশে দ্রৌপদী ও বিশেষ-কাব্যরীতি উভয়েই জন্মেছিল বলেই তাদের উভয়কেই **পাঞ্চালী** বলা হত। সেই পাঞ্চালীই বাংলার **পাঁচালী**-কাব্যরীতিতে রূপান্তরিত হয়ে আজও প্রচলিত আছে।

এর থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। ক) পয়ার কাব্যরীতিটির উদ্ভব হয়েছিল **বিদর্ভ** (দ্র. **দর্ভ**) ও **গৌড়**-এর (রাজধানীর কেল্লার) বাইরে, সম্ভবত আদিম সমাজতন্ত্রবাদী বা বেদবাদী শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে। খ) আদিম ধনতন্ত্রবাদী শক্তিরূপে **দ্রৌপদী** ও **পাঁচালী**র উদ্ভব ঘটেছিল **পাঞ্চাল** দেশে। গ) এই পাঞ্চাল দেশটি ভাগীরথীর দুই তীর বরাবর হওয়ায় এটি বঙ্গদেশও বটে। ঘ) বাংলাভাষায় **পাঁচালী**র জীবন্ত উত্তরাধিকার প্রমাণ করে, এই ধনতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল বঙ্গদেশেই। লক্ষ্মীপুঁজির বিকাশের ঘটনাবলীই তো মঙ্গলকাব্যের জন্মদাতা। আমরা তো আগেই দেখেছি, সামাজিক উথাল-পাথালই বিশাল সাহিত্যসম্ভারের জন্ম দেয়! তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া দরকার। ...

পঞ্জর (পঞ্জরাখেট, পাঁজরা) : ১. ✓পঞ্জ্ (রোধ) + অর (অরন) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **পঞ্জর** = *পঞ্জ্ (পায়ীর রহস্যরূপী জনন) রহে যাহাতে।* **পাঁজরা** = *পালনের বা পাওয়ার রহস্যরূপী আধার জনিত হইয়া রহে যে আধারে।* ৩. শরীরাস্থিসমূহ, পার্শ্বাস্থি, পাঁজরা, পিঞ্জর, খাঁচা, আধার, শয্যা, কলিযুগ, গবীর নীরাজনবিধি, আশ্রয়। **পঞ্জরাখেট** = মাছ ধরার পঞ্জরযন্ত্র, পোলো। (ব.শ.)। ৪. 'the ribs' অর্থে **পাঁজর** বা **পাঁজরা** শব্দ দুটি প্রচলিত। **পঞ্জর** অপ্রচলিত। **পঞ্জরাখেট** গ্রামাঞ্চলে কোথাও প্রচলিত থাকলেও থাকতে পারে, আমরা জানি না; তবে 'পোলো' ও 'পিঞ্জরা' বা 'পিঁজরা' মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। ৫. বাঘের সামনে পড়ে গেলে বুনো গাইয়ের দঙ্গল বৃত্তাকার ব্যূহ তৈরি করে যে বিশেষ নিয়মে সিং উঁচিয়ে দাঁড়ায় এবং বৎসদের ও নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করে, তাকে বলে 'গবীর নীরাজনবিধি'। তাতে বাছুরেরা থাকে কেন্দ্রে, আর পরিধিতে বাইরের দিকে সিং উঁচিয়ে গাইয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা করে। গাইগুলির এইরূপ দাঁড়ানো অনেকটাই মানুষের দেহের পাঁজরের মতোই। তাই তাকেও **পঞ্জর** বলা হত। মোট কথা **পঞ্জ** রহে যাহাতে, সেটিই পঞ্জর; তা সে মানবদেহের পাঁজরা হতে পারে, অন্যরকম (ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া ফাঁকা ফাঁকা) পাঁজরাও হতে পারে।

পঞ্জা (পাঞ্জা, পাঁজা, পাঁজাকোলা) : ২. **পঞ্জা (পাঞ্জা, পাঁজা)** = ***পং*** *(অবকাশধারী-পায়ীর রহস্যরূপ) জনিত যাহাতে, তাহার আধার।* ***পাঁজাকোলা*** *=* ***পাঁজা*** *কোল যাহাতে।* **৩. পঞ্জা, পাঞ্জা** = প্রসারিত পঞ্চাঙ্গুলির সহিত করতল, থাবা, প্রসারিতাঙ্গুলি করতলের ছাপ, পায়ের বা জুতার অগ্রভাগ, পাঁচ ফোঁটার তাস। **পাঁজা** = ইঁট পোড়ানোর ভাঁটা, পাকার্থ সজ্জিত ইষ্টকরাশি; হস্তপ্রসারণপূর্বক পঞ্জায় পঞ্জায় যোগ করিয়া দেহ বেষ্টন করা বা জড়ান, পাঁজায় যতটা ধরে তৎপরিমাণ দ্রব্য। **পাঁজাকোলা** = পাঁজারূপ কোল। (ব.শ.)। **৪. ৫. পং** জনন করে যে, অথবা **পং** জনিত যাহাতে, তাকে পঞ্জ বলে। অর্থাৎ অবকাশধারী অভাবী-পায়ীর রহস্যরূপ জাত হয় বা জমা হয় যেখানে বা যার দ্বারা ... তাকে পঞ্জ বলে। ইংরেজিতে এর উত্তরাধিকার sponge শব্দে। তবে পদবী রূপে **পাঁজা** শব্দটি এসেছে রাষ্ট্রের বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারীর উত্তরাধিকার থেকে। এঁরা প্রশাসনের সেই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই মনে হয়, যে বাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাঁজরের কাজ করত। একালে তেমন বাহিনী কর্মরত হলে তাকে বলা হয় 'রেইড করা'। সেকালে যারা 'রেইড করত', সম্ভবত তাদের প্রত্যেককেই বলা হত **পাঁজা**।

পঞ্জাব (পাঞ্জাব, পঞ্জাবী, পাঞ্জাবী) : **১.** ফারসি — পন্জ্‌ + আব্‌। সংস্কৃত — পঞ্চ + অপ্‌। (ব.শ.)। **২.** *পঞ্চ নদীর অপ্‌ (দ্বারা গঠিত যে দেশ)।* **৩.** শতদ্রু-প্রভৃতি পঞ্চনদী বেষ্টিত দেশ, শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা — এই পঞ্চ নদীযুক্ত দেশ, (মহাভারতের মদ্র সিন্ধু গান্ধার এবং মনুসংহিতার ব্রহ্মর্ষি দেশ পঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল।), পঞ্জাববাসী। **পঞ্জাবী (পাঞ্জাবী)** = পঞ্জাব-সম্বন্ধী, পঞ্জাবে জাত বা প্রচলিত। (ব.শ.)। **৪. পাঞ্জাব** দেশবাচক শব্দ রূপে এবং **পাঞ্জাবী** একপ্রকার পুরুষপোষাকের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** পাঁচটি নদীর দ্বারা সমৃদ্ধ দেশ রূপে কিংবা পঞ্চ অপের সমাহার রূপে দেশটির নাম প্রচলিত হলেও, পরবর্তীকালে এটি ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দ রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমরা দেখছি, **পঞ্চ** ও **অপ্‌**-এর উত্তরাধিকার ফারসি ভাষা পেয়েছিল যথাক্রমে 'পন্জ্‌' ও 'আব' রূপে। সুতরাং এ আমাদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারও বটে। ...

পেঁচ (পেঁচা, পেঁচান, পেঁচাল, পেঁচো, পেচ, পেচক) : **২.** ***পেচ*** *= দিশাগ্রস্ত (এক দিশায়) প্রাপন চয়িত যাহাতে।* ***পেচক*** *=* ***পেচ*** *করে যে।* ***পেঁচ*** *= দিশাগ্রস্ত প্রাপনের রহস্যরূপ চয়িত যাহাতে।* ***পেঁচা*** *=* ***পেঁচ****-এর আধার যে।* ***পেঁচান*** *=* ***পেঁচ*** *অন থাকে যাহাতে।* ***পেঁচাল*** *=* ***পেঁচ*** *আধেয় রূপে লালিত যাহাতে।* ***পেঁচো*** *=* ***পেঁচ****-এর সার্বিক আধার যে।* **৩. পেচ, পেঁচ, প্যাঁচ** = বেষ্টন, বেড়, কুটিলতা, শঠতা, ফের, সঙ্কট, গোল, ঝঞ্ঝাট, কৌশল, ফিকির, ফন্দি। **পেচক, পেঁচা, প্যাঁচা** = উলূক, পেচা, হস্তীর পুচ্ছমূল-উপান্ত, হুতুমপেচা, নিন্দার্থক। **পেঁচা, পেঁচান** = পেঁচ দিয়া ধরা, বেড়া, জড়ান, জড়িত। **পেঁচাল** = পেঁচ দেওয়া, জড়ান, আবর্ত্তিত, কুটিল, খল, ধূর্ত্ত। **পেঁচো** = বালরোগের উপদেবতাবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** পাওয়া একদিকে বা একদিশায় হতে থাকলে তাকে বলা হয় **পে** (pay)। বাংলায় এটি প্রাপণকারীর দিক থেকে দেখা হয়, আর ইংরেজিতে এটা দাতার দিক থেকে দেখা হয়; ক্রিয়াটি কিন্তু একই। এই **পে** যখন চয়িত হয়, অর্থাৎ, প্রাপণকারী যখন চয়ন করতে বা নিজের দিকে আকর্ষণ করে গ্রহণ করতে থাকে, তখন তাকে বলে **পেচ**। এই **পেচ** করে যে, তাকে বলে **পেচক**। তবে এই পেচন-কর্মটি খুব একটা সরল-সিধে ব্যাপার নয়, তার অজস্র রূপ ও রহস্যরূপও রয়েছে। তকলি পেচন (fetch-on) করে নিজের কেন্দ্রে সুতো চয়ন করে; গ্রামের সুদখোর থেকে শুরু করে IMF (International Monetary Fund) পর্যন্ত সব কুবেররাই নানা রকমের সরল-জটিল-রহস্যময় **পেচ**-on করে করে নিজ নিজ অর্থভাণ্ডারে অর্থ চয়ন করে। সেই কারণে **পেচ** আর পেচ থাকে না, হয়ে যায় **পেঁচ**। যারা সেই **পেঁচ**-কর্ম করে, অর্থাৎ, **পেঁচ**-এর আধার তারা হয়ে যায় **পেঁচা**। তবে এই **পেঁচ, পেঁচা, পেঁচো** প্রভৃতি শব্দ প্রধানত মানবসমাজের **পেঁচা**দের বোঝানোর উদ্দেশ্যেই সৃজিত হয়েছিল। ভাষা সংস্কারের কালে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০) মানবসমাজে **পেচ**-on করা তখনও খুবই সরল ও সিধে ছিল, আদৌ রহস্যময় হয়ে ওঠেনি; কেননা সমাজে তখন সবেমাত্র পেঁচ-মারামারির সূত্রপাত হয়েছে। সেই কারণে সংস্কৃতকারগণ তাদের নাম দিয়েছিলেন **পেচক**। কিন্তু যত দিন গেছে, **পেচ** ক্রমশ জটিল ও রহস্যময় হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলাভাষা এই **পেচক**দের যখন দেখছে, তখন স্বয়ং **নগদ-নারায়ণ** শ্রীকৃষ্ণ বা কালো-টাকা রূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। স্বভাবতই বাংলাভাষা সেই পেচকদের **পেঁচ**-কারী **পেঁচা** এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে **পেঁচ-মারা, পেঁচান, পেঁচাল** প্রভৃতি শব্দে শনাক্ত করে। ... তবে শব্দগুলির বানান যদি **প্যাঁচ, প্যাঁচা** ইত্যাদি লেখা হয়, তবে অর্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়; প্রাপণের একদিশাগ্রস্ততার ব্যাপারটিই থাকে না। তাই এই বানান ভুল। দ্র. **উলূক, পক**।

পৌঁছ, পৌঁছা, পৌঁছান : ২. ***পৌঁছ*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ প্রাপণ সার্ব্বিকভাবে ছাদিত যাহাতে।* ***পৌঁছা*** *=* ***পৌঁছ****-এর আধার যে, অর্থাৎ, থাকে যাহাতে।* ***পৌঁছান*** *=* ***পৌঁছ*** *অন যাহাতে।* **৩.** উপস্থিত হওয়া। (ব.শ.)। নাগাল, গন্তব্যস্থানে উপস্থিতি, উপস্থিত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে আসা বা গিয়ে হাজির হওয়া, নাগাল পাওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে রেখে আসা বা নিয়ে যাওয়া, নিকটে নিয়ে যাওয়া। (সংসদ বাংলা অভিধান, কলকাতা)। **৪.** reaching অর্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** এই একটি শব্দ, যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রবোধ অভিধান শব্দটিকে অন্তর্ভুক্ত করেননি, ব.শ. করলেও নামে-মাত্র, আর ঢাকার ব্য.বা. অভিধান ও কলকাতার স.বা.অভিধান শব্দটির বর্তমান ব্যবহার অনুসারে তার প্রায় একই রকম প্রতীকী অর্থ সরবরাহ করেছে। তবে শব্দটি হিন্দি থেকে এসেছে বলে মনে করেছে ঢাকার অভিধান, আর কলকাতার অভিধানটির ধারণা শব্দটি এসেছে 'প্রাকৃত' থেকে।

যাই হোক, আমরা দেখছি, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে **পৌ** হল 'নবরূপে উত্তীর্ণ প'-এর বা **পু**-এর শেষ অনুবর্তিত রূপ (পুত্র > পৌত্র) । সেই হিসেবে **পৌ**-এর অর্থ হয়, 'নবরূপে উত্তীর্ণ

প্রাপণ'-এর (অর্থাৎ দেওয়ার) নানা অনুবর্তিত রূপের শেষ অনুবর্তিত রূপ বা শেষাবস্থা। সেই শেষাবস্থা যখন রহস্যরূপে গ্রহীতার স্বীকৃতি পেয়ে যায়, তখনই তা হয়ে যায় **পৌঁছ**। তার মানে, দান গ্রহীতার হাত ছুঁয়ে ফেললে তবেই **পৌঁছ**। এই **পৌঁছ** অন থাকে **পৌঁছান**তে। এর এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ যতগুলি প্রতীকী অর্থের জন্ম দিতে পারে, সেগুলি সবই প্রচলিত হয়েছে পরবর্তীকালের বাংলাভাষায়। অর্থাৎ, শব্দটি বিকশিত হয়েছে মধ্যযুগের পরবর্তীকালে, যেকারণে প্রাচীন অভিধানগুলিতে শব্দটি স্থান পায়নি; কিন্তু বাংলাভাষী জনসাধারণের ভাষায় যথারীতি স্থান পেয়েছে। সেখান থেকেই একালের অভিধানকারগণ শব্দটির প্রচলিত অর্থ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু কেন সেরূপ অর্থে বাংলাভাষী শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারল, অভিধানগুলি সে-ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

পক্ষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপক্ষ, অপক্ষপাত, অপক্ষপাতী, আপাখালা, পঙ্খ, পঙ্খা, পঙ্খি, পঙ্খী, পঁখী, পক্ষুড়ী (পাপড়ি, পাকড়ী, পক্ষ্মল), পক্ষ্যা, পক্ষ্, পক্ষ, পক্ষক, পক্ষগ্রহণ, পক্ষগ্রাহী, পক্ষচ্ছিৎ, পক্ষতা, পক্ষতি, পক্ষদ্বার, পক্ষধর, পক্ষপাকাড়ি, পক্ষপাত, পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতী, পক্ষপুট, পক্ষবান, পক্ষবাহন, পক্ষভাগ, পক্ষমূল, পক্ষরাজ, পক্ষসম, পক্ষসন্ধি, পক্ষাতোদ্য, পক্ষান্ত, পক্ষান্তর, পক্ষান্তরে, পক্ষাপক্ষ, পক্ষাভাস, পক্ষিণী, পক্ষিরাজ, পক্ষী, পক্ষীপতি, পক্ষীমারা, পক্ষীন্দ্র, পক্ষ্ম, পক্ষ্মমালা, পক্ষ্মল, পক্‌খি, পাক(খ), পাকছাট, পাকড়ী, পাকড়ীগুয়া, পাকশাট, পাকসাট, পাক্ষিক, পাখ, পাখছাট, পাখনা, পাখ(খো)য়াজ, পাখাজু, পাখপাখালি, পাখশা(সা)ট, পাখা, পাখি(খী), পাখি (আরা, মইয়ের পা-দানি), পাখুড়া, পাখুরা (পক্ষ-উ-রা), পাঙ্কা, পাঙ্খা, পাঙ্খি, পাপড়ি, পেকম, পেখন, পেখম, বিপক্ষ, সপক্ষ, সপক্ষীয়, হাতপাখা।

পক্ষ্ = পায়ীর **ক্ষ**-অন। **পক্ষ** = পায়ীর **ক্ষ**-অন থাকে যাহাতে।

পক্ষ (পক্ষক, পাখা) : ১. ✓পক্ষ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পক্ষ*** = *পায়ীর (প্রাপণকারীর) ক্ষয়-হওয়ন বা ক্ষয়-করণ থাকে যাহাতে।* ***পক্ষক*** = ***পক্ষ*** *কৃত যাহাতে।* / **পক্ষ** = **চন্দ্রকলার** হ্রাসবৃদ্ধি গ্রহণ করে যে; যে পদার্থে সাধ্যের সংশয় থাকে; **পক্ষ** আছে যার (পক্ষবান)। (ব.শ.)। ৩. **পক্ষ** = প্রতিপদাদি **পঞ্চদশ**তিথিকাল, পতত্ত্র, পত্র, পাখা, বাণমূলস্থ পত্র, পার্শ্ব, সৈন্যপার্শ্ব, **বর্গ**, সাধ্য, সন্দিগ্ধসাধ্যবান পদার্থ, বিতর্কবিষয়দ্বয়ের একতর বিষয়, **উত্তর**, উত্তরপক্ষ, সহায়, বল, পার্ষ্ণিগ্রাহ, সখা, গৃহ, পার্শ্বগৃহ, ভিত্তি, **গেহ**, **বলয়**, **চুল্লীরন্ধ্র**, রাজকুঞ্জর, সমূহ, প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখনীয় **বাদীর** নিবেদিত বিষয়, বিরোধ, মূলসূত্রের সাধ্যবিষয়, সমীকরণের **একাংশ**, **পক্ষানুসারে** ২ সংখ্যা, শুদ্ধি, পক্ষী, পাখী, পুচ্ছ, বিবাহের **বর**। **পক্ষক** = পক্ষসদৃশ দ্বারবিশেষ, পক্ষদ্বার, খিড়কি, সহায়, **পার্শ্ব** (ব.শ.)। ৪. বহু অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **পক্ষী**।

পক্ষী : ১. পক্ষ + ইন্ (ইনি); স্ত্রী পক্ষিণী। (ব.শ.)। ২. ***পক্ষ****-এর* *গতিশীল আধার যে।* / **পক্ষ** আছে যাহার (পক্ষবান); পুচ্ছপক্ষ যুক্ত যে। (ব.শ.)। ৩. বিহঙ্গ, (অরুণ ও শ্যেনী হইতে পক্ষীর উৎপত্তি — অগ্নিপুরাণ), বাণ, পক্ষিবিশেষের রবের অনুকারী মনুষ্য। (ব.শ.)। পাখি, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, শকুন্ত, খগ। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. শুধুমাত্র bird অর্থে প্রচলিত। ৫. কার্যত **পক্ষ** শব্দটির ক্রিয়াবাচকতাই (অনেকটা **অজয়** শব্দের মতো) দু'রকম — যাহার দ্বারা **প** (প্রাপণকারী) অন্যকে ক্ষয় করে; যাহার দ্বারা অন্যে **প**-কে (প্রাপণকারীকে) ক্ষয় করে। (দ্র. **ক্ষ** বর্ণের অর্থ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৩)। তার মানে, **পক্ষ** হল কাউকে **ক্ষ**-করার, ক্ষয় করার, খাবলে নেওয়ার উপায়রূপ একটি সত্তা। আপনি তার সাহায্যে কাউকে খাবলে নিয়ে আপন অভাবের ফাঁক বা অবকাশ পূর্ণ করতে পারেন, কেউ তার সাহায্যে আপনাকে খাবলে নিয়ে তার আপন অভাব পূর্ণ করতে পারে। আর সে তো ঠিকই; এই বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতিটি খাবলামির (ক্রিয়ার) সমান এবং বিপরীত খাবলামি (প্রতিক্রিয়া) ঘটবেই। তাই **পক্ষ** শব্দটি স্বভাবতই তার বিপরীত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে; অর্থাৎ **পক্ষ** শব্দটি বলেই দেয়, সে নিজে যেন মটরদানার আধখানা, তার বাকি আধখানা কোথাও না কোথাও রয়েছে। বাংলাভাষীর জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা সেকারণেই তাঁদের সন্তানদের শৈশব থেকেই শিখিয়ে আসছেন, **পক্ষ** সবসময়ই দুই প্রকার হয় — দুই-এ **পক্ষ**। চাঁদের যে দুটি **পক্ষ**, তার একটিতে সে অন্যের আলো **ক্ষ**ইয়ে আনে এবং বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে তার আলো **ক্ষ**ইয়ে অন্যে নিয়ে চলে যায়, আর সে ক্রমে আলোহীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে অমাবস্যা ঘটিয়ে বসে। বিচারকের যে দুটি **পক্ষ**, তার একটি রোধী-পক্ষ (বাদী-পক্ষ) ও অপরটি বিরোধী-পক্ষ (আসামী-পক্ষ)। ক্ষ-কারীর **ক্ষ**-কর্ম্মকে রোধ করে যে, সেই রোধী-পক্ষ যায় বিচারকের কাছে এবং আসামীকে ক্ষ-করণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বিচার চায়; বিপরীতে আসামী এই রোধের বিরোধিতা করে। তেমনি, দোকানদারেরও দুই **পক্ষ**, প্রথম বিক্রেতা-পক্ষ যাদের কাছ থেকে সে পণ্য কিনে আনে; এইটি তার পণ্যের আগম-পক্ষ — বাম-কান। আর ক্রেতা-পক্ষ যাদেরকে সে তার পণ্য বিক্রি করে; এইটি তার পণ্যের নিগম-পক্ষ — ডান-কান। এক কান দিয়ে পণ্য ঢুকে তার পণ্যসম্ভারের বৃদ্ধি ঘটায়, অন্য কান দিয়ে সেই পণ্য বেরিয়ে গিয়ে তার পণ্যসম্ভারের হ্রাস ঘটায়। এই দুই কানকে বা দুই **পক্ষ**কে নিয়ে চলে তার দো-কানদারী, এই দুই পক্ষের উপর নির্ভর করে গোলোকের আকাশে সে তার লোকযাত্রা নির্বাহ করে বা উড়ে বেড়ায়। পার্থিব আকাশে একই ভাবে দুই পক্ষের বা দুই **ডানা**র উপর নির্ভর করে যে উড়ে বেড়ায়, তাকেও সেকারণে **পক্ষী** বা পাখী বলে। ...

স্বভাবতই, **পক্ষ** শব্দটি পরস্পর-বিরোধী ও বিচিত্র সত্তাসমূহকে শনাক্ত করতে পারে। এই সেই কারণ, যে কারণে **পক্ষ**যুক্ত বহু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত হতে পেরেছে। যথা — **পক্ষগ্রহণ, পক্ষগ্রাহী, পক্ষচ্ছিৎ, পক্ষতা, পক্ষতি, পক্ষদ্বার, পক্ষধর, পক্ষপাকাড়ি, পক্ষপাত, পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতী, পক্ষপুট, পক্ষবান, পক্ষবাহন, পক্ষভাগ, পক্ষমূল, পক্ষরাজ, পক্ষসম, পক্ষসন্ধি, পক্ষাতোদ্য, পক্ষান্ত, পক্ষান্তর, পক্ষান্তরে, পক্ষাপক্ষ,**

পক্ষাভাস ... ইত্যাদি। বাংলায় এই **পক্ষ**কে **পাখা**ও বলা হয় এবং মইয়ের মাঝের পাদানীগুলিকে **পাখী** বলা হয়ে থাকে। গ্রামবাংলায় শব্দটি **পাখ-পাখালী** রূপেও প্রচলিত। দ্র. **নিকুঞ্জ, কুঞ্জ**।

এখানে অবশ্য দুটি সমস্যা দেখা যায়। প্রথমত, ব.শ. **পক্ষী** শব্দের অর্থে **পাখি** বা **পাখী** লিখে যাননি, যদিও ঢাকার অভিধান **পাখি** শব্দটি লিখে গেছেন। আমরা দেখছি, **পক্ষী**কে **পাখী** ('পায়ীর ক্ষয়করণের গতিশীল আধার যে') বললে অর্থের খুব একটা বদল ঘটে না, কিন্তু **পাখি** ('পায়ীর ক্ষয়করণের গতিশীলতা') বললে অর্থ বদলে যায়। তবে কলকাতার সংসদ বাংলা অভিধান সেই সমস্যার গোড়াটাই কেটে দিয়েছেন। তাঁরা শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, **পক্ষী** হল 'দুই পা ও দুই ডানাওয়ালা ডিমপ্রসবকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী'। অতীতহারা-ইংরেজির অভিধানে বহু ক্ষেত্রে এভাবেই অর্থ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সংসদ অনেকটা স্বেচ্ছায় অতীত হারিয়ে সেভাবেই ইংরেজির পোঁ ধরেছেন।

পচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপক্তি, অপক্ব, অপাক, অবিপক্ব, অবিপাক, আপাক, কড়াপাক, গাছপাকা, ঘোঁটপাকান, দড়ি-পাকান, দুর্ব্বিপাক, দৈবদুর্ব্বিপাক, পক্বণ, পক্তা, পক্তিৃম, পক্ব, পক্বকেশ, পক্বকৃৎ, পক্বরস, পক্ববারি, পক্বাধান, পক্বান্ন, পক্বরোটিকা (পাউরুটি), পক্বাশয়, পক্বেষ্টক, পক্বেষ্টকা, পক্বেষ্টকাচিত, পচ্, পচ, পচক, পচন, পচনী, পচপচ, পচলা, পচা, পচাই, পচাখসা, পচাগলা, পচাগন্ধ, পচাগরম, পচা-ঘা, পচেলিম, পরিপাক, পাক, পাকচক্র, পাকজ, পাকড়, পাকতঃ, পাকতেল, পাকনা, পাকনাই, পাকনাভি, পাকনা(লা)ড়া, পাকপরশ, পাকপাত্র, পাকপুটী, পাকভাণ্ড, পাকভাণ্ডার, পাকমোড়া, পাকযজ্ঞ, পাকযজ্ঞিক, পাকল, পাকলিয়া, পাকশালা, পাকশাসন, পাকশাসনি, পাকসাঁড়াশি, পাকসাধন, পাকস্থান, পাকস্থলী, পাকস্পর্শ, পাকা, পাকাকাঠ, পাকাখাতা, পাকাগার, পাকাগাঁথনি, পাকাঘুঁটি, পাকাচামড়া, পাকাচাল, পাকাচিটে, পাকাছিটি, পাকাছেলে, পাকাদলি(লী)ল, পাকান, পাকাপাকি, পাকাপোক্ত, পাকাফলার, পাকাফোঁড়া, পাকাভিমুখ, পাকাম (পাকামো), পাকামাছ, পাকামাটি, পাকামাল, পাকারঙ, পাকারোকড় (record, রোকড়া), পাকাসাধ, পাকাসির্ণি, পাকাহাড়, পাকাহাত, পাকাদেখা, পাকান, পাকিয়ে-তোলা, পাকানী, পাকি (কাঁচি, কঞ্চ), পাকিল, পাকোয়ান (পক্বান্ন), পাখানি, পাগ, পাগড়ি(ড়ী) (পাকের আড়ী), পাগল (পাকে লীন যে), পাগলা, পাগলি(লী), পাগলিনী, পাচক, পাচন, পাচনি (পাচনী), পাচার, পাচিকা, পাচ্য, পেচক (দ্র. পেঁচা), পেচপেচে (প্যাচপ্যাচে, পেঁচপেঁচে), পোক, পোকা, পোক্ত, পোঁচ, বিপাক, সপ্তপাক, সাতপাকে-বাঁধা, হাতপাকা।

পচ্ = পায়ীর (অবকাশধারীর) চয়ন। **পচ** = পায়ীর চয়ন থাকে যাহাতে।

অপক্ব : ১. পচ্ = পাক। ২. *যাহা* ***পক্ব*** *নহে।* ৩. পক্বভিন্ন, কাঁচা। অসিদ্ধ, আম। (পক্বান্ন শব্দের বিপরীত শব্দ আমান্ন)। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যাহা **পক্ব** নয়, সেটি তবে কী? সেটি কাঁচা হতে পারে, অসিদ্ধ হতে পারে, এমনকি **আম**ও হতে পারে। খুব সহজ করে যদি ভাবা যায়, তাপ গ্রহণ করেই যে সত্তা পাকে তাই **পক্ব**, তাহলে তো অতাপগ্রাহী, অত্যল্পতাপগ্রাহী, অসম্পূর্ণ-তাপগ্রাহী মাত্রেই **অপক্ব**। হয়তো সেই কারণে কাঁচা, অসিদ্ধ ও **আম**কে **অপক্ব** বলা হয়। সেই সুবাদে সমাজস্বীকৃত নয়, এমন সর্বপ্রকারের দৈহিক ও মানসিক ভোজনই অসিদ্ধ বা **অপক্ব**।

পক্ব (পাক, পাকা) : ১. **পক্ব** = ✓পচ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। **পাক** = ✓পচ্ + অ (ঘঙ্) - ভাববাচ্যে। ✓পা (পান) + ক (কন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ঘ (ব.শ.)। ২. ***পক্ব*** = ***পচ্*** *তারিত যাহাতে অর্থাৎ পায়ীর চয়ন করণে পরিণত হইয়া বাহিত যাহাতে।* ***পাক*** = ***পক্ব*** *(< পচ্) হইতে জাত।* ***পাকা*** = ***পাক****-এর আধার যে; যে সত্তা তার* ***পাক*** *(আবর্ত্তনপথ বা জীবনচক্র) সম্পূর্ণ করিয়াছে। /* ***পাক*** = যাহার দ্বারা পাক সাধিত হয়; যে পান করে। **পাকা** = যাহা মেকি নয়। (ব.শ.)। ৩. **পক্ব** = কৃতপাক, সূর্য্যতাপে কৃতপাক, কন্দুপক্ব, ভাঁটিতে পোড়া, পরিণত, দগ্ধ, জরাশুক্ল, জীর্ণ, বিনাশোন্মুখ, ভৃষ্ট, ক্বথিত, নিপুণ, সপূয। **পাক** = পরিণত, পচন, রন্ধন [ব্যঞ্জনের পাক = ভর্জ্জন, তলন (স্নেহদ্রব্যে), স্বেদ (ছেকা), পচন (জলে), ক্বথন (সিদ্ধ করা), তান্দুর (বদ্ধমুখপাকযন্ত্রে), পুটপাক (উর্দ্ধাধঃ অগ্নিতাপে) — এই সাতপ্রকার পাক] দহন, ভুক্তপরিপাক, পরিণতি, পক্বতা, জরাজন্য কেশশুক্লতা, সিদ্ধি, স্ফোটকাদির পরিণতি, রাষ্ট্রাদিভঙ্গ, ভীতি, বিস্ফোটক, অন্ন, পাকপাত্র, অগ্নি, শিশু, অজ্ঞ, শাবক, পেচক, দৈত্যবিশেষ, হেতু, কারণ, দৈবদুর্ব্বিপাক, দুর্ভাগ্য, দোষ, বিপদ; আবর্ত্ত, ঘূর্ণন, জলাবর্ত্ত, চক্রাকার গতি, প্রদক্ষিণীকরণ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, কৌশল, বেষ্টন, পেঁচ, গড়াগড়ি, লাঙ্গলের ফালরেখার বেড়, উপায়, অধিকার, প্রকার, ঘটনাচক্র, বিঘ্ন, দড়ীর কুঞ্চন, পাকা, ফোড়া পুঁজে ভরিয়া যাওয়া, ঘুঁটি সব ঘর ঘুরিয়া নিজের ঘরে আসা ...। **পাকা (পক্ব)** = পরিণত (ফল, পাতা), পোড়া (ইট), ঠিক ৮০ সিক্কা পরিমিত বা পাকি (ওজন, সের), বিশুদ্ধ বা খাঁটি (সোনা), ঠিক, স্থির, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ইট পাথর ইত্যাদি দ্বারা রচিত (ঘর, বাড়ী, মেঝে, রাস্তা), টিকসই, নিপুণ, জরাশুক্ল বা পলিত (চুল), অগ্নিপক্ব বা সিদ্ধ, অধিকবয়স্ক; পক্ব করা, পাকান (ফল), কার্য্যপটু করা, (খেলায়) ঘুঁটি সব ঘর ঘুরাইয়া নিজের ঘরে আনিয়া তোলা, আবর্ত্তিত করা, পাক দিয়া রচনা করা, পাক দিয়া জড়ান। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপকভাবে যথার্থে প্রচলিত। ৫. ইংরেজের rot, ripe, cooking, winding এবং going-round — পরস্পরের সঙ্গে শব্দগুলির কোনো সম্পর্ক নাই। আমাদের কিন্তু সেরকম নয়; আমাদের **পচা**, **পাচক, পাচ্য, পাক**-করা, **পাক**-দেওয়া, **পাকা**, বি**পাক**, **পাকে**-চক্রে, দৈবদুর্বি**পাক** ... প্রভৃতি উপরোক্ত সমস্ত শব্দই একই **পচ্** শব্দবংশের সন্তান; স্বভাবতই শব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত। আমাদের **পচ, পচপচ, পচক, পাচক, পচা, পচাই, পচান, পচাল, পাচন** ... প্রভৃতি শব্দ যে ক্রিয়ার প্রকাশক শব্দরূপে জন্মেছে, একই ক্রিয়ার রকমফের থেকে জন্মেছে **পক্ব** বা **পাক**যুক্ত সমস্ত উপরোক্ত শব্দ। তথ্যানুসারে **পচ্** ক্রিয়ার অনুবর্তন থেকেই আমাদের চুল পাকে,

কান পাকে, বুদ্ধি পাকে, হাত পাকে, ফোঁড়া পাকে, ছেলে পাকে, **ছেলের** পঁদ পাকে, ফল পাকে, ইট পাকে, রং পাকে, ঘুঁটি পাকে, **ঘোঁট** পাকে, দেখা পাকে (পাকা-দেখা), কথা পাকে (পাকা-কথা) ... এবং কী পাকে না! কিন্তু প্রশ্ন হল, **পচ্** শব্দটি কী এমন ক্রিয়া করে যে, তার থেকে এতরকম ঘোঁট সে একাই পাকাতে পারে?

পচ্ শব্দের অর্থ হল 'পায়ীর (**প**-এর) চয়ন'। তার মানে, কোনো কিছুকে পায়ী বা প্রাপণকারী (**প**) নিজের দিকে আনয়ন করছে। এরকম ক্রিয়া ঘটলে, তাকেই বলে **পচ্**। এর ফলে নিজের ভেতরে একপ্রকার 'জীর্ণীকরণ' হতে শুরু করে। যেমন, কাঁচা আম বাইরের থেকে তাপ চয়ন করে আনে, নিজের সমস্ত কোষগুলির ভিতরে সেই তাপকে সমানভাবে সঞ্চারিত করে দেয় এবং তার ফলে তার কোষগুলি যে পরিণতির জন্য (পাকার জন্য) অপেক্ষা করছিল তা ঘটতে শুরু করে। তখন এই **পচ্**-অন ক্রিয়া রূপান্তরিত হয়ে যায় **পক্**-অন ক্রিয়ায়। কিন্তু একসময় তাপ সঞ্চারণের এই গতি শ্লথ হয়ে যায়, তখন পুনরায় সেই **পক্**-অন ফিরে যায় **পচ্**-অন ক্রিয়ায়, এবং আমটি পচতে শুরু করে। অতএব দেখা যাচ্ছে, যার ভিতরে **পচ্**-অন (ক্রিয়া) চলে, সে **পাকে**, পেকে যায়, সিদ্ধ হয়, তারপর আবার **পচে**ও যেতে পারে। সর্বোপরি, **পাক**-করা আর **পাক**-দেওয়া দুটি ক্রিয়াই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ক্রিয়া; অথচ তারা একই **পচ্** শব্দ থেকে জন্মায়। প্রশ্ন হল, একই **পচ্** ক্রিয়া থেকে এতসব কীভাবে সম্ভব হয়?

গাছের প্রাণ আছে, একথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা অব্যক্তভাবে (tacitly) জানতেন, জগদীশচন্দ্র বসু তাকেই পুনরাবিষ্কার করে ব্যক্তভাবে (explicitly) উপস্থাপন করেছিলেন। কেন **পচ্**-অন থেকে **পাকা** ও **পচা** দুটো ঘটনাই ঘটে, সেকথা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা অব্যক্তভাবে জানতেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে **পচ্**-ক্রিয়া পরিবারের শব্দগুলি সৃষ্টি করে গিয়েছেন; জানিয়ে গেছেন যে, এর সঙ্গে **পাক**-খাওয়ার বা ঘূর্ণনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষয়টিকে কতখানি আবিষ্কার করে ব্যক্তভাবে প্রকাশ করেছে, একালের বিজ্ঞানীরা হয়তো সেকথা বলতে পারবেন। এই মুহূর্তে আমরা তা জানি না। তবে প্রাচীন শব্দবিদগণ বিষয়টি কীভাবে এবং কতখানি বুঝেছিলেন, তাঁদের **পচা**, **পাকা**, **পাক**-করা, **পাক**-দেওয়া প্রভৃতি শব্দ থেকে আমরা সেকথা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

কথা হল, **পচ্**-এর যে চয়ন-ক্রিয়া, তা একটি একটি করে হতে পারে, অবিরাম ধারার মতোও হতে পারে। আবার, চয়নের এই গতিশীলতা প্রাপণকারীর (**প**-এর) আকর্ষণের কারণে হতে পারে, বাইরে থেকে ঠেলে পাঠানোর ফলে হতে পারে, এমনকি চয়িত নিজের আগ্রহেই **প**-এর দিকে দৌড়তে পারে। যেভাবেই হোক না কেন, **প**-এর এই চয়ন-ক্রিয়াটি যখন অবিরাম ধারার মতো **প**-এর কাছে পৌঁছতে থাকে, তখন দেখা যায়, **প** স্থির দাঁড়িয়ে নেই, বন বন করে দর্জির ববিনের মতো ঘুরছে এবং চয়িতের অবিরাম ধারাটিকে সুতোর মতো নিজের গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে। জলের ঘূর্ণির ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াটি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। বিশেষত, চয়িত বস্তুটির আসতে চাইছে না, আর পায়ী তাকে টেনে নেবেই, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে দেখা যায়, **প**-এর এই ঘূর্ণন অনিবার্য হয়ে ওঠে। পুকুরে বড় জাল টানার সময় জেলেরা প্রত্যেকে নিজে দু-তিনবার ঘুরে জালের দড়িকে এভাবেই কোমরে জড়িয়ে নেয়। মজা হল, এইরূপ চয়নের গতিধারা একটি 'বিশেষ মাত্রা'য় উত্তীর্ণ হলেই এই চক্রাকার আবর্তনটি সক্রিয় হয়, অন্যথায় ওই আবর্তন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ঠিক এইখানে রয়েছে **চ**-এর **ক**-এ পরিণতির নিয়মটি। চয়ন যখন দিশাগ্রস্ত হয়ে একদিকে ক্রমশ আরও গতিশীল হয়ে চয়িত হতে থাকে, তখন হয় **পেচ**। কিন্তু সেই গতিশীলতা যদি উপরোক্ত 'বিশেষ মাত্রা' অতিক্রম করে, তখনই **চ** হয়ে যায় **ক** (ঠিক যেমন একটি বিশেষ মাত্রার গতি লাভ করলেই সাইকেল দু'চাকাতেই খাড়া দৌড়তে পারে, অন্যথায় খাড়া থাকতে পারে না, দৌড়নো তো অনেক দূরের কথা)। তখন **পচ্** হয়ে যায় **পক্**। কিন্তু যেই না, সেই গতি শ্লথ হয়ে যায়, তখনই **পচ্** পুনরায় **পেচ্**-এ নেমে আসে এবং তার থেকে আরও শ্লথ হয়ে পুনরায় **পচ**-এ পরিণত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, **পচ্** ক্রিয়া থেকে যত-না **পচ**-যুক্ত বা **পেচ**-যুক্ত শব্দ (যথা পচা, পচান, পাচক, পেচক ইত্যাদি) জন্মেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে **পক**-যুক্ত (যথা পাক, পাকা, পাকামি ... ইত্যাদি) জন্মেছে কেন এবং সেই শব্দগুলির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় কেন?

ভারতে আদি ভাষা-সংস্কার কালে moon-কে বলা হত 'চন্দ্র'। কিন্তু মানুষ তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তার সভ্যতা এগোয়, ভাষাও সমান তালে এগোয়। আদিতে ভারতসমাজ যে সত্তাকে 'চন্দ্র' শব্দে বুঝত-বোঝাত, ক্রমান্বয়ে সেই সত্তার বদল ঘটেছে, ব্যাপকতা ঘটেছে, আরও পরিণত হয়েছে সে। স্বভাবতই তাকে শনাক্তকারী শব্দেরও বদল ঘটার কথা এবং ঘটেছেও। বাস্তবের বদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাভাষী সেই 'চন্দ্র'কে 'চন্দ', 'চান্দ', 'চাঁদ' বানিয়ে ফেলেছে এবং সেখানেই সে থেমে থাকেনি। সমাজবাস্তব যতক্ষণে পরিণতি লাভ করতে করতে আধুনিক যুগ পেরিয়ে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পা রেখেছে, ততক্ষণে বাংলার ভাষাও তার সেই 'চাঁদ' থেকে 'চাঁদনী', 'চাঁদী', 'চাঁদা' ... ইত্যাদি পেরিয়ে 'চাঁদু'তে পৌঁছে গেছে। সমাজ জটিল হচ্ছে, নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে, আর তার ভাষা জটিল হবে না, নতুন নতুন রূপ নেবে না, সেরকম তো হতে পারে না। একই ঘটনা ঘটেছে সমস্ত বাংলা শব্দের ক্ষেত্রেই এবং **পচা**, **পাকা**, **পাকামি** ... প্রভৃতি শব্দ সেই নিয়মের বাইরে নয়। অর্থাৎ কিনা সমাজবাস্তবে **পচামির** চেয়ে **পাকামি** বেড়েছে, তাই বাংলাভাষার শব্দজগতেও **পাক**-এর রমরমা বেড়েছে। ...

তা সে যাই হোক, কালে কালে শব্দের এই যে রূপ-বদল, তাকে মানুষের সমাজবাস্তব থেকে পৃথক করে কেবলমাত্র শব্দের 'তদ্ভব', 'তৎসম' বা 'অর্ধ-তৎসম' ইত্যাদি রূপ বলে দিয়ে সংজ্ঞায়িত করে ছেড়ে দিলে, নব নব রূপের শব্দেরা অনাথ হয়ে পড়ে। মানুষকে যেমন তার পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির মাঝে রেখেই বুঝতে হয়, শব্দকেও তার পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির মাঝে রেখেই বুঝতে হয়। তাই, যে কোনো শব্দকে তার বংশের স্রোতধারা থেকে পৃথক করে বোঝার চেষ্টা ঠিক নয়। তাতে শব্দের যথাযথ স্বরূপ বোঝা যায় না। ...

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, **পচ্** ক্রিয়া-পরিবারে যেসকল

শব্দের জন্ম হয়েছে, মোটামুটিভাবে তাদের বংশধারার দুটি স্রোত দেখা যাচ্ছে। একটি **পচ্**-এর ধারা, অপরটি **পক্**-এর ধারা। তবে তথ্য আমাদের জানাচ্ছে, দুটি ধারাই আদিতে যে মূলধারা থেকে উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে; সেটি **পচ্**। তার থেকেই তারই শাখানদী রূপে **পক্** ধারাটি জন্মলাভ করে প্রবাহিত হতে শুরু করে, যদিও পরে পরে সেটিই প্রধান ধারা রূপে সক্রিয় হতে পেরেছে এবং **পচ্** ধারাটি তুলনায় অপ্রধান হয়ে গেছে। সেকারণেই **পচ**-যুক্ত শব্দরূপে যেখানে আমরা **পচ্, পচ, পচক, পচন, পচনী, পচপচ, পচলা, পচা, পচাই, পচাখসা, পচাগলা, পচাগন্ধ, পচাগরম, পচা-ঘা, পচাল, পচেলিম, পাচক, পাচন, পাচনি(নী), পাচার, পাচিকা, পাচ্য, পেচক (দ্র. পেঁচা), পেচপেচে (প্যাচপ্যাচে), পোঁচ** ... প্রভৃতি শব্দ পাচ্ছি, সেখানে **পক**-যুক্ত শব্দ পাচ্ছি অনেক বেশি। পাঠক, উপরে **পচ্** ক্রিয়ার শব্দ-পরিবারটি দেখে নিন।

এখন আমরা আর একটি সমস্যার সমাধান খুঁজব। প্রাচীন শব্দজ্ঞানীগণ যখন 'পাকা'কে **পক্ব** বলে শনাক্ত করলেন, এবং জানিয়ে দিলেন যে, সেটি **পচ্** ক্রিয়া থেকেই জন্মেছে; তখন পরবর্তীকালের বাংলাজ্ঞানীরা সেই **পক্ব**কে **পাকা** বলতে গেলেন কেন এবং কেনই বা মাঝ থেকে একটি নতুন শব্দরূপে **পাক** শব্দের জন্ম দিতে গেলেন? এর কারণ যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তা হল, চয়ন কর্মটি সুনির্দিষ্ট গতি লাভ করলেই সেটি **চ্** থেকে **ক্** হয়ে যায়, একথা নিশ্চয় তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন এবং যে-সত্তা সেইরূপ সুনির্দিষ্ট-গতিসম্পন্ন চয়নকর্ম বা (**পচ্** থেকে জাত) **পক্** বহন করে, তাকে **পক্**-বাহী বা **পক্ব** বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলাজ্ঞানীরা দেখলেন, এই **পক্** থেকেই তো **পাক**-টা (***পাক*** = ***পক্*** *হইতে জাত*) জন্মাচ্ছে, **পাক** দিচ্ছে, **পাক** করছে, **পাকাচ্ছে**। যে-সত্তা সেভাবে **পাক** খেয়ে পেকে উঠছে, তাকে **পাকা** বলাই উচিত বলে তাঁদের মনে হয় এবং তেমন মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। জীবৎকালের আবর্তন পূর্ণ করে এলেই সে **পাক** খেয়ে এল, অতএব **পাকা** হয়ে গেল! একটি খেলার ঘুঁটিও যখন তার সুনির্দিষ্ট **পাক** ঘুরে আসে তখন সে '**পাকা**-ঘুঁটি'তে পরিণত হয়ে যায় (কোনো কারণে ঘোরা শেষ করতে না পারলে ঘুঁটিটি 'কেঁচে' যায়)। একইভাবে একজন মানুষও তার জীবনের আবর্তন সম্পূর্ণ করে ফেললে সেও যে '**পাকা**-মাথা'র অধিকারী হয়ে উঠবে, '**পাকা**-বুড়ো' হয়ে যাবে, সে তো জানা কথা। একটা চুল লালচে হলুদ হয়ে জন্মায়, ক্রমে কালো হয় এবং একসময় পুনরায় হলদেটে হতে হতে সাদা হয়ে তার জীবনচক্র পূর্ণ করে, স্বভাবতই সেও '**পাকা**-চুল' হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে! ... তাছাড়া, সত্যিই তো, এই পৃথিবী নিজেই কেবল **পাক** খাচ্ছে না, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই নানাভাবে **পাক** খেয়ে চলেছে, তার অভ্যন্তরের প্রতিটি বস্তুই **পাক** খাচ্ছে, **পেকে** উঠছে, **পাকা-পোক্ত** হচ্ছে, pact-কৃত হচ্ছে। নেচারের নিজস্ব সবকিছুই কোনো না কোনো **পাক**-এর মধ্যেই বিরাজ করছে, যে **পাক** অস্তিত্বের বিকাশের অনুকূলও বটে। এইরকম শুভঙ্কর-**পাক** শব্দটিকে আমরা পাই বাংলার **পাকস্পর্শ** (= বউভাত) এবং ফারসির **পাক, নাপাক** (= পবিত্র, অপবিত্র) প্রভৃতি শব্দে। একটি পরিবার যে **পাক**-এর অন্তর্ভুক্ত থেকে কালাতিপাত করে, নতুন বউয়ের বউভাতের **পাকস্পর্শ** সেই **পাক**-এর ভিতর তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ হল নেচারের স্বাভাবিক **প্রাকৃতিক পাক**। তবে এতে ক্লেদ জমলে, এই পাক আর **পাক** থাকে না, **নাপাক** হয়ে যায়, হয়ে যায় **পাঁক** বা **পঙ্ক**। উলটোও হয় — নেচারের স্বাভাবিক পাকের বিপরীত **পাক**, যাকে বলা হয় **বিপাক**। এর স্বরূপ তাঁরা সবাই জানেন যাঁরা কখনো না কখনো **বিপাকে** পড়েছেন।

কার্যত জগতের প্রতিটি সত্তাই তার নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **পাকের** বা আবর্তনের পথে হাঁটে, হাঁটতে থাকে; সেই হাঁটাই তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জীবনচক্র বা **পাক**-চক্র। এই **পাকে-চক্রে** স্বাভাবিকভাবেই সে থাকে, থাকতে বাধ্য হয়, **পাকে-চক্রেই** তার অনেক কিছু প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ঘটে যায়; যার জন্য সে কাউকে দায়ী করতে পারে না। তবে, মানুষ তার এই চক্রানুসার যাত্রার গতিকে সঠিক পথে রাখতে বা ত্বরান্বিত করতে গিয়ে যে কৃত্রিম চেষ্টা চালায়, তার চ্যুতি-বিচ্যুতি থেকে **পাক** পরিণত হয় **বিপাক**-এ। এই বিপাক মানুষের পক্ষে অনেক সময় ক্ষতিকর হয়। তাই **বিপাক** মাত্রেই **পাক** নয়, পবিত্র নয়, শুভ নয়। তবে সেই **বিপাক** যখন কখনো অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে যায়, তখন আমরা তাকে বলি **দুর্বিপাক**। আর, সেই দুর্বিপাক যদি মানবসভ্যতায় বিনিময়জীবীদের দৌরাত্ম্যের কারণে ঘটে, তখন মানুষ যে **পাক**-এ পড়ে তাকে বলা হয় **দৈবদুর্বিপাক**। আপনি বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো একটা বস্তু উৎপাদন করে বা করতে গিয়ে যে সমস্যায় পড়েছেন; কিংবা আপনার ছেলেকে কিছু একটা পড়াচ্ছেন কোনো একটা বড় চাকরি-বাকরি করবে বলে, এবং তাই করতে গিয়ে আপনি বা আপনার ছেলে যে **বিপাকে** পড়েছেন, সেটিই হল **দৈবদুর্বিপাক**। বিক্রির উদ্দেশ্যে যদি এসব না করতেন, তাহলে আপনি এইরকম **বিপাকে** পড়তেন না। কিন্তু সমগ্র মানবসমাজ যদি **দৈবের** অধীন এবং **দৈবের বিপাকের** অধীন হয়ে যায়, মানুষ তো **দৈবদুর্বিপাকে** পড়বেই। আপনি একা কীই-বা করতে পারেন। তার মানে বিশ্বায়নের অধীন বর্তমান মানবসমাজ সামগ্রিকভাবেই **দৈবদুর্বিপাক**গ্রস্ত, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **পাকস্থান** এখন নেই বললেই চলে। **৬.** ইংরেজি pack, package, pact, impact, compact ... ইত্যাদি।

পাকাদেখা : ২. *দেখাদেখির যে আবর্তন-পথ বা পাক শেষ হয় যে দেখায়।* **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** সাধারণ বাঙালি বাবা-মা তাঁদের পুত্রকন্যার বিবাহের উদ্দেশ্যে হবু-বর ও হবু-কনেকে দেখার ও দেখানোর যে অধ্যায়গুলি অতিক্রম করেন বা করতে বাধ্য হন, তার শেষ হয় যে-দেখায়, তাকেই **পাকাদেখা** বলে। এতে যে দেখাদেখির একটা পুরো **পাক** ঘুরে আসা হয়, একথা আমরা একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতরা ভাবতেই পারি না, কিন্তু যে সাধারণ বাংলাভাষী **পাকাদেখা** শব্দটি তৈরি করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় তা ভাবতে পারতেন। অন্যথায় এরকম শব্দ তাঁরা তৈরি করলেন কীভাবে।

পাকান : ২. ***পাক*** *অন থাকে যাহাতে।*

পাকাপাকি : দ্র. **কচাকচি**। পৃষ্ঠা ১৩১।

পাকাপোক্ত : ২. *পাকা যে, পোক্তও সে।* **৩.** সুনিপুণ, প্রবীণ, স্থায়ী, মজবুত। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত, অর্থাৎ ইংরেজি permanent, settled, fixed ... ইত্যাদি বহু অর্থে প্রচলিত। **৫.**

পাঠান মোগলদের ভারত আগমনের পর আমাদের বাংলাভাষায় কেমন করে সমার্থক শব্দজোড় প্রচলিত হয়, তার নিদর্শন দিয়ে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। আমরা এখানে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেব, কেননা এধরনের বহু শব্দের ক্ষেত্রে মুজতবা আলীর এই ভাষাজ্ঞান প্রযোজ্য। তিনি লিখছেন —

"'... হাট-বাজার, শাক-সবজি, দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ — ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশী ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রু গয়রহ্), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ, ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থসূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কি প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই তবে ইংরিজী অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু, (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসনকর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার' হুজুর! — দেশ —' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে 'হুজুর কি "দেশ" শব্দটা জানেন। হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না' — (অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক' — ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক "বাদশা" বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের (গরীব আরবী) দুখ-দরদ্ (দরদ্, দর্দ ফার্সী) কে বুঝবে? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবী), ধন-দৌলত (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়েছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক)ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী (খুশী ফার্সী) নেই। হুজুর অনুমতি দেন — ভাই-বেরাদর (বেরাদর ফার্সী) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুকুম দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিনীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী, হুজুর যা আমায় খাতির —' (বলেই থমকে দাঁড়ালো; হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে দুশ্চিন্তায় পড়লো, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি — তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে) 'যত্ন — হুজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো! আবার দোকান (ফের মুশকিল — দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে "হাট" [হট্ট] হাট খুলবে, — কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ।'" (*পঞ্চতন্ত্র ২য় পর্ব*-এর *'ভাষা'* নিবন্ধ থেকে হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়া হল।)

পাকাপোক্ত শব্দটিও উপরোক্ত কারণে বাংলাভাষায় সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে **পাকা** বাংলা শব্দ এবং **পোক্ত** শব্দটি ফারসি। উভয় শব্দকে সেকালের বাংলাভাষী সমার্থক বলে মনে করেছিল।

পাকাম, পাকামি (পাকামো) : **১.** পাকা + আম। (ব.শ.)। **২.** *পাকাম (পাকামো) = পাক-এর আধার সীমায়িত যাহাতে।* *পাকামি = পাকাম গতিশীল যাহাতে।* **৩. পাকাম** = জ্যেঠাম, গোঁড়াম। (ব.শ.)। **পাকামি, পাকামো** = অপরিণত বয়সে প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ক্রিয়াভিত্তিক শব্দসৃষ্টি যে আজও চলছে, উপরোক্ত শব্দগুলি তারই নিদর্শন। অসচেতনভাবেই এরকম শব্দ সৃষ্টি হয়ে চলেছে প্রায় সব ভাষাতেই, তবে বাংলায় এরকম শব্দসৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অধিক বলেই মনে হয়। **পাকাম** শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল, একটি সত্তা তার নির্দিষ্ট আবর্তনপথ বা **পাক** সম্পূর্ণ না করেই এমন ব্যবহার করছে যে, সে যেন ওই **পাক** সম্পূর্ণ করেছে এবং সেকারণে **পাকা**-সত্তার মতো আচরণ করছে বা করার চেষ্টা করছে কিংবা সেরকম করবার অধিকার দাবি করছে। অনেক সময় এরকমও হয় যে, সত্যিই সত্তাটি **পাক** সম্পূর্ণ করে **পাকা** হয়েছে, কিন্তু তার জন্য সে বিশেষ মর্যাদা দাবি করছে; যা কিনা **পাকা** হওয়ার স্বাভাবিক মর্যাদার চেয়ে বেশি। তখনও তার সেই আচরণকে **পাকাম** বলা হয়ে থাকে। এইরূপ **পাকাম** করাকেই **পাকামি** বলে এবং সেই পাকামির আধারস্বরূপ আচরণকে **পাকামী** বলে। ব.শ. **পাকাম** শব্দের অন্তর্নিহিত এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ জানতেন বলেই **পাকাম** শব্দের অর্থ দিয়ে গেছেন 'গোঁড়াম'। একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীগণ সাধারণ বাঙালির তৈরি করা আধুনিক ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ **পাকাম** শব্দটির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি বলেই ইংরেজি fundamentalism শব্দের অনুবাদ করেছেন 'মৌলবাদ'। অন্যথায় তাঁরা fundamentalism শব্দের অনুবাদ করতেন **পাকামী**। দ্র. **পাষণ্ড**।

বিপাক : **১.** বি + ✓পচ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বিশেষ বা বিপরীত পাক যাহাতে।* **৩.** পচন, পাক, পরিণাম, পরিপক্বভাব, ভুক্তদ্রব্যের পচন, পরিপাক, দশাবিপর্য্যাস, বিপত্তি, দার্ঢ্য, স্বাদ, স্বেদ, ভবিতব্যতা, দুর্দ্দৈবজন্য শোক। (ব.শ.)। **৪.** কেবলমাত্র in some predicament অর্থে প্রচলিত। **৫.** প্রকৃতির যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **পাক**, তাকে পাশে রেখে অপর যে বিশেষ পাক, সেটিই **বিপাক**। অর্থাৎ, এটি প্রচলিতের পাশাপাশি দ্বিতীয় **পাক**। এটি বস্তুর **বিপাক** অর্থে যেমন প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনি সামাজিক (কর্মাদি) ও প্রাকৃতিক **বিপাক** অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে। এই **বিপাক** মানুষের পক্ষে শুভ হতে পারে, অশুভও হতে পারে। অশুভ হলে তাকে বলা হয় **দুর্ব্বিপাক**। তবে বস্তুর বিপাকীকরণ অর্থে যে **বিপাক** তা প্রায়শই অশুভ নয়।

সাতপাকে-বাঁধা : **৫.** আগুনের চারদিকে সাতবার পাক খেয়ে যে বিবাহবন্ধন হয় তাকে **সাতপাকে-বাঁধা** বলে। **অগ্নিসাক্ষী** থেকে আমরা বুঝতে পারি, মাঝের আগুন এই বিবাহের সাক্ষী। কিন্তু সাতপাকে-বাঁধা কেন? এমনিতে **সপ্তপাক** মানে হল ভাজা, তলা, সেঁকা, পচা, সিদ্ধা, তান্দুরা, ও পুটপাকা। তবে এটি রন্ধনের **সপ্তপাক**। দাম্পত্যজীবনের **সপ্তপাক** কী, আমরা যথেষ্ট জানি না। যদি রন্ধনের পাকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে দেখি, তাহলে বলতে হয়, দাম্পত্য জীবনেও মানবমানবী ভাজা-ভাজা হয়, সেঁকা হয়, সিদ্ধ হতে পারে, পচেও যেতে পারে ... এবং এইরকম সাতভাবে তাদের জীবনের **পাক** পূর্ণ করে পরিপক্ব বা **পাকা** হলেও হতে পারে। ...

হাতপাকা : **৫.** যে হাত কোনো কাজের সমস্ত কৌশলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পর্যায়ক্রম বা **পাক** অতিক্রম করে **পাকা** হতে পেরেছে, সেই হাতের অধিকারীকে বলে **হাতপাকা**।

পচন (পচপচ, পচলা) : **১.** ✓পচ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পচন*** = ***পচ্*** *অন যাহাতে।* ***পচপচ*** = ***পচ***-*এর অনুবর্ত্তন যাহাতে।* ***পচলা*** = ***পচ*** *লালিত যাহাতে তাহার আধার।* / **পচন** = পাক করে যে; যাহার দ্বারা পাক সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. পচন** = পাককারক, পাকসাধন, পাক, রন্ধন, পরিণতি (ripening, maturing); পাকসাধন কাষ্ঠপাত্রাদি। **পচপচ** = পাঁকে চলিয়া যাওয়ার শব্দ। **পচলা** = পচা গোময়াদির সার। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত, এখনও কমবেশি আছে। তবে **পচলা** শব্দটি এখন আর ব্যবহৃত হয় না। **৫.** দ্র. **পক্ব**। পচন মূলত জীর্ণীকরণ করে, তবে সেই জীর্ণীকরণ দুই প্রকার। প্রথম প্রকারে জীর্ণীকৃত বস্তু মানুষের পক্ষে গ্রাহ্য নয়, তাই তাকে **পচা** অর্থাৎ মানুষের পক্ষে অগ্রহণীয় বলা হয়; দ্বিতীয় প্রকারে জীর্ণীকৃত বস্তু মানুষের পক্ষে গ্রাহ্য, তাকে **পাকা** বলা হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার জীর্ণীকরণ আসলে জীর্ণীকরণের মাঝের পরিস্থিতি। তার পরেও **পচন** চলে, চলতে পারে। কিন্তু সে বস্তু মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় থাকে না; তাকে **পচা** বলে।

পচপচ শব্দটিকে ধ্বন্যাত্মক বলে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যত কোনো শব্দই শুধুমাত্র ধ্বন্যাত্মক বা অর্থহীন-আওয়াজ মাত্র হয় না। তাছাড়া, শব্দটি **পচপচ** নয় বলেই আমাদের মনে হয়, এটি হবে **পেচপেচ** বা **প্যাচপ্যাচ**। এক্ষেত্রে ইংরেজি patch শব্দ তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। বাংলায় তারই রকমফেরকে পাওয়া যায় **পেচ, পেঁচ** প্রভৃতি শব্দে। পরে **পেচক** দেখুন।

পচা (পচাই, পচাখসা, পচাগলা, পচাগন্ধ, পচাগরম, পচাল) : **১.** পচ + আ। (ব.শ.)। **২.** ***পচা*** = ***পচ***-*এর আধার যে।* ***পচাই*** = ***পচা*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পচাখসা*** = *যাহা* ***পচা*** *এবং সেকারণেই খসিয়াছে। ...* ***পচাল*** = ***পচা*** *(কথা) লালিত যাহাতে।* / **পচা** = যাহা পচিয়াছে। **পচাখসা** = যাহা পচিয়া স্খলিত। **পচাগলা** = যাহা পচিয়া গলিত। **পচাগরম** = যে গরমে পচায়। (ব.শ.)। **৩. পচা** = বিকৃত, পূতি, অকিঞ্চিৎকর, ঘৃণার্হ। **পচাগরম** = বাষ্পভরা শ্রাবণ-ভাদ্রের গরম। **পচাল** = তিরস্কার, কটুকথা, কুৎসা। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পক্ব**। পচাকে লালন করে যে, তাকেই বলা হয় **পচাল**। তবে শব্দটি বাহ্যিক **পচাল**-এর চেয়ে মানসিক **পচাল**-এর ক্ষেত্রেই অধিক প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেই কারণে লোকে কুৎসাদি অর্থেই শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে **পচাল** কিন্তু 'কটুকথা', 'কুৎসা' কিংবা 'তিরস্কার' নয়। কেননা, বারংবার ব্যবহৃত হতে হতে যে কথার অর্থ নষ্ট হয়ে গেছে, যে কথা শুনে কেউ কোনোরকম সক্রিয়তা দেখায় না, এবং সেই কারণে কথাটি অর্থহীন এক বা একাধিক ধ্বনি মাত্রতে পরিণত হয়ে গেছে, সেই ধরনের কথাকে বা কথাগুলিকে **পচাল** বলা যায়। সেই সুবাদে পুরোহিত-মোল্লাদের মন্ত্রপাঠ, একালের সমাজতন্ত্রীদের বইপত্র ও বক্তৃতাদিকে **পচাল** বলা যায়। দ্র. **পেচক, অশ্লীল**।

পাচক (পাচ, পাচন, পাচনী, পাচার, পাচ্য) : **১. পাচক** = ✓পচ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। **পাচন** = ✓পচ্ + ই (ণিচ্) - অন্ (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পাচ*** = ***পচ*** *হইতে জাত।* ***পাচক*** = ***পাচ*** *করে যে।* ***পাচন*** = ***পাচ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পাচনী*** = ***পাচন***-*এর গতিশীল আধার যে।* ***পাচার*** = ***পাচ***-*এর আধার রহে যাহাতে; অথবা প্রাপণ (=* ***প****) রূপ আচার থাকে যাহাতে।* ***পাচ্য*** = ***পাচ*** *থাকে যাহাতে।* / **পাচক** = পাক করে যে, জীর্ণতা করে যে। **পাচন** = পাক জনন করে যে (পাকজনক)। **পাচনী** = পরিপাক করে যে (পরিপাককারিণী)। **পাচার** = লুকাইয়া বা গোপনে অন্যত্র চালান বা সরান (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. পাচক** = সূপকার, অগ্নি, অন্নাদিপাককারক পিত্ত। **পাচন** = বিক্লেদকারক, পাচক, জারক, পূযজনক, অগ্নি, অম্লরস, রক্ত, এরণ্ড, পাক, পাপক্ষয়কর প্রায়শ্চিত্ত, দোষনাশক ঔষধ-ক্বাথ, স্ফোটকাদিপাক-জনক ঔষধ। **পাচনী** = হরীতকী। **পাচার** = লুকাইয়া চালান, নিঃশেষ, সাবাড়। **পাচ্য** = অবশ্য পচনীয়। (ব.শ.)। **৪. পাচ** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। **৫. পাচার** শব্দটি ঠিক কীভাবে প্রস্তুত হয়, তা নিয়ে নানা সংশয় হয়। যৌথসমাজে বাহ্য বস্তুর যে সাধারণ গতিবিধি, যাকে **চার** বলা যায় (চারিয়ে যাওয়া, তদ্রূপ আচার), সেই **চার** থেকে মাঝপথে কিছু পান করে নেওয়া, প্রাপণ করে নেওয়াই **পাচার** শব্দে উক্ত হত বলেই মনে হয়। যেভাবেই হোক না কেন, এই **পা** পাওয়া বা পেয়ে যাওয়া বা পান করে নেওয়া অর্থেই হয়ে থাকবে।

পেচক (পেচপেচে, প্যাচপ্যাচে, পেঁচ, পেঁচা, পেঁচান, পেঁচাল, প্যাঁচ, প্যাঁচা, প্যাঁচাল) : **১. পেচক** = ✓পচ্ + অক (বুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পেচ*** = *দিশাগ্রস্ত পায়ীর চয়ন যাহাতে।* ***পেচক*** = ***পেচ*** *করে যে।* ***পেঁচ*** = *দিশাগ্রস্ত পায়ীর রহস্যরূপী চয়ন যাহাতে।* ***পেঁচা*** = ***পেঁচ***-*এর আধার যে।* ***পেঁচান*** = ***পেচ*** *অন যাহাতে।* ***পেঁচাল*** = ***পেঁচ***-*এর আধার লালিত যাহাতে।* **৩. পেচক** = উলূক, পেচা, হস্তীর পুচ্ছমূলোপান্ত। **পেঁচ, প্যাঁচ, পেচ** = বেষ্টন, বেড়, কুটিলতা, শঠতা, ফের, সঙ্কট, গোল, ঝঞ্ঝাট, কৌশল, ফিকির, মল্লের ক্রীড়াকৌশল। **পেচা, পেঁচা, প্যাঁচা** = উলূক, হুতুমপেচা, (সাদৃশ্যে) নিন্দার্থক, পেঁচ দিয়া ধরা, বেড়া, জড়ান। **পেঁচান** = জড়ান। **পেঁচাল** = পেঁচ-দেওয়া, কুটিল (বুদ্ধি), খল,

ধূর্ত্ত (লোক)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে যথেষ্ট প্রচলিত। ৫. দ্র. **পক্ক**। **পেচক** পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃত উত্তরাধিকার। কিন্তু বাংলাভাষী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেননি। পরবর্তীকালে সমাজের বিকাশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে **পেঁচ, পেঁচা, পেঁচান** ... প্রভৃতি শব্দ বানিয়ে নিয়েছে। তবে লেখার সময় অনেক সময়ই এগুলি **প্যাঁচ** ... ইত্যাদি বানানে লেখা হয়েছে। তাতে অর্থের একটুখানি বদল ঘটে যায়। কেননা **প্যাঁচ** শব্দের মানে দাঁড়ায় — পায়ীর রহস্যরূপীর আধারের চয়ন থাকে যাহাতে। আর **পেঁচ**-এর অর্থ হল — দিশাগ্রস্ত পায়ীর রহস্যরূপ চয়ন যাহাতে। **প্যাঁচ**-এর ভিতরে দিশাগ্রস্ততার ব্যাপারটিই নাই। অথচ একটি খুঁটিতে দড়ি **পেঁচিয়ে** বাঁধলেই দিশাগ্রস্ত টানটি আপনার চোখে পড়বেই। সেই কারণে, 'য'-ফলা যুক্ত বানানগুলি ঠিক নয় বলেই আমাদের মনে হয়। ৬. ইংরেজি fetch।

পাগ, পাগড়ী, পাগল, পাগলা, পাগলী, পাগলিনী : ২. ***পাগ*** = *পাক > পাগ। (পাক হইতে জাত?)।* ***পাগড়ী*** = ***পাক****-এর সাহায্যে* ***আড়*** *গতিশীল যে আধারে।* ***পাগল*** = ***পাক****-এর ভেতরে লালিত বা লয়প্রাপ্ত যে।* ***পাগলা*** = ***পাগল****-এর আধার যে।* ***পাগলী*** = ***পাগল****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পাগলিনী*** = ***পাগল****-এর গতিশীল রহস্যরূপ যাহার।* ৩. **পাগ** = উষ্ণীষ, পাগড়ী, মুকুট। **পাগড়ী** = উষ্ণীষ। **পাগল** = উন্মত্ত, বিষয়জ্ঞানহীন, অবোধ, অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল, বিমূঢ়, প্রেমবিহ্বল, শোকোন্মত্ত। **পাগলা** = ক্ষেপা, দুরন্ত, অবুঝ। **পাগলী** = দুর্গা, অবুঝ বা দুরন্ত মেয়ে (আদরে)। **পাগলিনী** = উন্মত্ত, জ্ঞানহারা। (ব.শ.)। ৪. **পাগ** মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে অপ্রচলিত। **পাগড়ী** turban অর্থে, **পাগল, পাগলী, পাগলিনী** mad এবং 'পাকে মত্ত' অর্থে এবং আদুরে সম্বোধন রূপে প্রচলিত। ৫. **পাগ** শব্দটির মূলে ছিল **পাক**। মৈথিলী ভাষায় এবং মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটি পরিণত হয় **পাগ**-এ। শির বা মাথাকে যে **পাকের** আড়ালে রাখা হয়, সেই পাকের আড়ীকে বলে **পাগড়ী**। দ্র. **আড়, আড়ঙ্গ, আড়িবক**। কিন্তু **পাগল** শব্দটির মাহাত্ম্য বহুদূর ব্যাপ্ত। **পক্ক** ও **পাকা** শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, পরমাপ্রকৃতি প্রতিটি মানুষকেই জন্ম দিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক-দার্শনিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ... **পাক**-এর মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। তার ভিতরে থেকেই মানুষ এমন একপ্রকার আত্মসচেতন থাকে, যাকে তৎকালীন সমাজ 'স্বাভাবিক' নাম দেয়। কিন্তু যার মধ্যে সেরূপ 'স্বাভাবিক' আত্মসচেতনতা দেখা যায় না, মনে করা হয়, সে প্রদত্ত **পাক**-এ এমনই **পাক**গ্রস্ত কিংবা **পাক**-এ এমনই লীন যে, তাকে **পাক**-মত্ত মনে হয়। তখন তাকে সমাজ **পাগল** বা **পাগলী** কিংবা **পাগলিনী** বলে। কিন্তু বাংলাভাষী শব্দটিকে এখানেই সীমিত করে নেয়নি। নেয়নি বলেই বাংলাভাষায় তেমন মানুষদেরও **পাগল, পাগলা, পাগলী** ইত্যাদি বলার চল রয়েছে, যাঁরা পরমাপ্রকৃতির **বিশ্ব-পাকের** ভিতর লীন হয়ে থাকেন। ভবা **পাগলা**র মতো রসিক পাগলেরা তদ্রূপ **পাগলই** বটে। বঙ্গমানসের আরাধ্য শিব-কালী অধিকাংশ বঙ্গীয় মনীষীদের চোখেই এইরূপ **পাগলা-পাগলী**। খনাকে উদ্ধৃত করে ব.শ. জানাচ্ছেন, 'পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট। এই নিয়ে কাল কাট।।' অর্থাৎ, খনা বলছেন — 'অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্যের মোট চৌদ্দ **পাক**-এ যিনি মত্ত থাকেন সেই শিবের চৌদ্দ **পাক** এবং অষ্টচণ্ডীরূপে যিনি **পাক**গ্রস্ত থাকেন সেই কালীর আট-**পাক** নিয়ে সর্বমোট বাইশ **পাক**-এ লীন থেকে জীবনকাল অতিবাহিত করো।' কার্যত মনীষী মাত্রেই ইত্যাকার **পাক**-এ লীন থাকেন। সেই কারণে, বাংলাভাষায় **পাগল৷ পাগলী** বড়ো আদরের ডাক, একান্ত আপন জনকে 'নিন্দার ছলে কৃষ্ণভজনা' করা।

***পট্* (পটি, পাটি, পিট্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অকপট, অপটী, অপটীক, অপটীক্ষেপ, অপটু, অপাট, আপটল, উৎপাটিত, কপট, ঘটপট, ঝাঁট-পাট, পট্, পট, পটক, পটকর্ম্ম, পটকা, পটকান, পটকার, পটগৃহ, পটচ্চর, পটপট, পটপটি(টী), পটবাপ, পটবাস, পটভূমি, পটমঞ্জরী, পটমণ্ডপ, পটল, পটলী, পটহ, পটা, পটাংপটাং, পটাৎ, পটান, পটাপট, পটালুকা, পটাশ, পটাহ, পটি, পটী, পটীয়ান, পটীর, পটু, পটুকা, পটুয়া, পটোল, পট্ট, পট্টক, পট্টজ, পট্টজাত, পট্টডোরী, পট্টন, পট্টনায়ক, পট্টনী, পট্টপাড়ি, পট্টমহিষী, পট্টবস্ত্র, পট্টমহাদেবী, পট্টরঙ্গ, পট্টশাক, পট্টশাটী, পট্টার্হা, পট্টি, পট্টিকা, পট্টিশ(স), পট্টী, পট্টু, পড়াহ, পাইট, পাইটকা, পাকাঠি, পাট, পাটক, পাটকাঠি, পাটকিলা, পাটকিলে, পাটকেল, পাটচ্চর, পাটটাকুর, পাটথোপ, পাটথোপা, পাটধড়া, পাটন, পাটনী, পাটব, পাটবার (পাটোয়ার, পাটোয়ারি), পাটফুল, পাটভাঙা, পাটমহল, পাটয়ার, পাটরাণী, পাটল, পাটলা, পাটলি, পাটলিপুত্র, পাটলোপল, পাটশাক, পাটশাল, পাটা, পাটা (যেখানে কিছু পেটা হয়), পাটাকৃমি, পাটাতন, পাটাবুক, পাটাবুকী, পাটাশেয়ালা, পাটাসেলামী, পাটালি, পাটি, পাটিকা, পাটি(টী)কাল, পাটি(টী)কেল, পাটিখান, পাটিত, পাটী, পাটীগণিত, পাটুয়া, পাটুলী, পাটেশ্বরী, পাটোয়ার, পাটোয়ারী, পাটোয়ারীগিরী, পাটোয়ারী-বুদ্ধি, পাট্টা, পারুল, পিট, পিটপিট, পেঁটরা, পেট, পেটক, পেটা, পেটাঙ্গি, পেটারি, পেটারিক, পেটারিকা, পেটার্থী, পেটি(টী), পেটিকা, পেটুক, পেটে, পেটো পেট্যা, পেড়া, পেড়ি (পেড়ী), পৌটি(টী), লোহাপটি, সোনাপটি, প্যাঁটরা, প্যাট, প্যাটেরা। **পট্ (পটি, পাটি, পিট্)** = পায়ীর টঙ্কারণ। **পট** = পায়ীর টঙ্কার থাকে যাহাতে। **পটি** = পায়ীর টঙ্কারের গতি যাহাতে। **পাটি** = পটজাত গতিশীল যাহাতে। **পিট** = গতিশীল পায়ী টঙ্কারিত যাহাতে।

পট (পটা, পটি, পটীয়সী, পাটন, পাটনী, পাটি, পাটীগণিত — শব্দগুলি পরে পুনরায় আলোচিত হবে) : ১. **পট** = পটি + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পট*** = *পায়ী (অবকাশধারী) টঙ্কার যাহাতে। /* **পট** = যাহার দ্বারা বেষ্টন (বেড়) সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **পট** = লেখনার্থ বা চিত্রীকরণার্থ কার্পাসিকবস্ত্র, চিত্রার্থ কাষ্ঠাদি-পট্ট, চিত্রপট, যবনিকা, পিয়ালবৃক্ষ, ছদি, চাল, ছই; হঠাৎ জোরে ফাটার শব্দ, বেত্রাদির আঘাতের শব্দ, স্থূলবৃষ্টিবিন্দুপাতের শব্দ, পাকাটি প্রভৃতি ভাঙার শব্দ, ক্ষিপ্রতা, আকস্মিকভাব; দুই জনের মনে-মনে মিল হওয়া, খাপ খাওয়া, বনা, রাজী হওয়া, লাভ বা প্রাপ্য হওয়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. সংস্কৃত যুগে এই ক্রিয়া

পরিবারের উদ্ভব ঘটলেও তার অধিকাংশ সদস্যদের জন্ম হয়েছে বাংলাভাষীদের স্বর্ণযুগে অর্থাৎ বাংলার মধ্যযুগে। যেকারণে, অতীতে এই শব্দপরিবারের বহু সদস্যের দেখা মেলে না। যাই হোক, **পট** কথাটি শুনলে আমরা সাধারণত 'বস্ত্র' বা 'কাপড়' বুঝি। কিন্তু যখনই **পটে-যাওয়া, পটান, পটা, পটিয়ে-ফেলা** প্রভৃতি শব্দ শুনি, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। **পট**-এর ভিতরে কেমন 'পায়ীর টঙ্কার' থাকে যে, তা একই সঙ্গে কাপড়কে যেমন বোঝায়, তেমনি **পটা**-কেও (বশে আনা বা রাজি হওয়াকেও) বোঝায়? **গল** শব্দে আমরা এই রহস্যের কিছুটা ব্যাখ্যা পেয়েছি। তাতে **গল, গলা, গাল, গালব, গালি** প্রভৃতি শব্দ কোন অঙ্কে বা নিয়মে প্রসূত হয়েছে, তা আমরা দেখেছি। প্রায় একই নিয়মের দেখা পাওয়া যায় **পট, পটা, পটি, পাট, পাটব, পাটি, পাটী, পাটীগণিত** প্রভৃতি শব্দে। কার্যত, যে বাংলা-ভাষাজ্ঞানীগণ arithmetic ও algebra-র বাংলা অনুবাদ করেছিলেন **পাটীগণিত** ও **বীজগণিত**, তাঁরা বাংলাভাষার অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা জানতেন, এই বিশ্বব্যবস্থার সবকিছুকে **পাট** (বিন্যস্ত) ক'রে ক'রে তবেই আমরা তাদের হিসেবের মধ্যে ধরতে পারি। যার সাহায্যে সেইভাবে হিসেব করা যায় বা গণনার কাজ চালানো যায়, তাকে সেকারণেই **পাটীগণিত** নাম দেওয়াই উচিত বিবেচনা করেছিলেন তাঁরা।

আসলে, **পট** শব্দে রয়েছে 'পায়ীর টঙ্কারণ', যে-পায়ী অভাবী এবং স্বভাবতই অবকাশধারী, এবং অতএব প্রাপণকারীও হতে পারে বটে; তার টঙ্কারণ। বিষয়টি একটু বিশদ করে নেওয়া যাক।

অস্তিত্বমাত্রেই অন্য অস্তিত্বকে স্বীকার করে, করতে বাধ্য; অন্যথায় তার নিজের অস্তিত্ব থাকে না। নিজের অস্তিত্বের কারণে অন্য অস্তিত্বকে এই যে স্বীকার করে নিচ্ছি, তাতে করে আমরা প্রতিটি অস্তিত্বই অন্যের জন্য অবকাশ ছেড়ে দিচ্ছি। এখন সেই অবকাশ কেউ যদি গ্রহণ করে, তাতে আমাদের আপত্তি নেই ঠিকই; কিন্তু যতটুকু বা যতটা অবকাশ ছেড়ে রেখেছিলাম, তার সমগ্রটাই কেউ যদি দখল করে তখন একেবারে গায়ে গা লেগে যায়। তাতে আপত্তি উঠুক না-উঠুক, যার গায়ে পড়া হয়ে যায়, তার সাড়া জাগে। সেই হল টঙ্কার। এ হল অবকাশ-প্রাপকের বা পায়ীর টঙ্কার। এই ব্যাপারটি খুব স্পষ্ট দেখা যায় কাপড়ের টানা সুতোর উপর পোড়েনের সুতোর চেপে পড়ায় এবং তারপর পুনরায় পোড়েনের সুতোর উপর টানার সুতোর চেপে পড়ায়। যেনবা বিয়োগ চিহ্নের মতো কেউ বেরিয়েছিল তির্যকভাবে, ঊর্ধ্বভাবে অন্য কেউ তারই উপর চেপে পড়ে যোগ চিহ্নের সৃষ্টি করেছে। তালপাতার আসন কিংবা দড়ির খাটিয়া বোনার ক্ষেত্রেও এই টানাপোড়েন বা যোগচিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বাঁশের বা বেতের বোনা ধামা কুলো ডোল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করতে দেখা যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে টানা যতটা অবকাশ দিয়ে রাখে, পোড়েন সেই অবকাশ গ্রহণ করে সমান অবকাশ ছেড়ে দেয় টানার জন্য। এইভাবে গড়ে ওঠে **পট**, যার প্রতিটি কণায়, প্রতিটি যোগ চিহ্নে রয়েছে পায়ীর টঙ্কার। কেবল তাই নয়, সামগ্রিকভাবেও ছাড়া থাকে টঙ্কারের অবকাশ। সম্পূরক অবকাশ-দখলকারী যেমন সেখানে টঙ্কারিত হয়, তেমনি আমাদের দৃষ্টিও সেখানে টঙ্কারিত হয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, **পট্** বা পায়ীর টঙ্কারণ নানাভাবে ঘটতে পারে। প্রথমত, অভাব পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে টঙ্কারণ ঘটতে পারে। যেমন, টানা-পোড়েনের সুতোর মধ্যে আমরা এই টঙ্কার দেখতে পাই। তাতে টানার সুতো যথাযথ অবকাশ তৈরি ক'রে পোড়েনের সুতোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পোড়েনের সুতো সেই অবকাশ পূর্ণ করে টঙ্কারিত হয় এবং পুনরায় টানার সুতোর জন্য অবকাশ তৈরি ক'রে অপেক্ষা করতে থাকে। ব্যাপারটি অনেকটা খোপের মাপে **খাপ** খাওয়ানোর মতো। তার মানে, অবকাশ মাত্রেই কোনো না কোনো সম্পূরক সত্তার জন্য অপেক্ষা করে। বস্ত্র বা কাপড়, তালপাতার আসন, দড়ির খাট ইত্যাদি এই নিয়মেই বোনা হয়ে থাকে। মোটকথা, এতে টানার সুতোর / পাতার/ দড়ির অবকাশের সঙ্গে পোড়েনের সুতো /পাতা/ দড়ি **পটে** যায়। অর্থাৎ, এতে পায়ী (= **প**) টঙ্কারিত (= **ট**) হয়ে যায়, বা পটে যায়। বস্ত্র বা কাপড়ের প্রতিটি বিন্দুতেই রয়েছে এই **পটান**র সক্রিয়তা। এই **পট**-বিন্দুর যোগে তৈরি হয় এক একটি বৃহৎ **পট**। তাকেই আমরা কাপড় বা বস্ত্র বলি। তাতে আবার যেমন অন্য একটি **পট** এসে সমান ভাবে **পটে** যেতে পারে, অর্থাৎ একটি কাপড়ের উপর সমান অন্য একটি কাপড় বিছানো যেতে পারে, তেমনি আমাদের দৃষ্টির সামনে যে বিশাল অবকাশ থাকে, সেখানে সেটি খাড়া করে ঝুলিয়ে দিলে, আমাদের দৃষ্টি তাতে টঙ্কারিত হয়ে যায়। সেকারণেই সেটি তখন **পট**-পদবাচ্য হয়ে যায়।

আর, সেই **পট**কে অর্ধেক ভাঁজ করে **পট**-এর উপর পালটি **পট**ও করে দেওয়া যেতে পারে; আর তা করলেই **পাট** করা হয়ে যায়। **পট** থেকে জাত বলে একে তাই **পাট** করা বলে। এই **পাট** অন (on) করা থাকলে হয় **পাটন**। একটি লম্বা শাড়িকে যদি ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু (যাদের মধ্যেকার দূরত্ব ধরা যাক এক ফুট) পর্যন্ত বারংবার **পাটন** করা হয়, তাহলে শাড়িটি সম্পূর্ণ রূপে পাট করা হয়ে এক ফুট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে শাড়ি পাট না করে কেউ যদি নিজে ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু পর্যন্ত যাতায়াত করে এবং বিন্দু দুটি যদি আসলে একটি নদীর এপাড় ওপাড় (এই **পাড়** কাপড়ের দুই পারে থাকে নদীর দুদিকের বাঁধ বা পাড়ের মতো) হয়, তাহলে এই **পাটনি** কর্মের আধারস্বরূপ নৌচালক বা মাঝিকে বলা হয় **পাটনী**। তবে কিনা **পাটনী** তো এভাবে **পাটন** করে করে লোক পারাপার করে মাত্র; কিন্তু কোনো স্থানে উৎপাদিত বস্তুসমুদয়কে যদি এইভাবে অন্যত্র পার করে দেওয়া হয় এবং পার থেকে অন্য বস্তুসমুদয় পুনরায় সেই স্থানে আনা হয়, এই পণ্যপারাপারকারী স্থানটিকে কী বলা হবে? আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তার নাম দিয়েছিলেন **পাটনা**। আরও আগে তাঁরা তাকে সম্বোধন করেছিলেন **পাটলিপুত্র, কুসুমপুর, পুষ্পপুর** ইত্যাদি নামে। তবে সেই **পাটলি** নামটি দেওয়া হয়েছিল অন্য কারণে। দ্র. **পটল**।

৬. ইংরেজিতে এই **পট** শব্দের উত্তরাধিকারী রয়েছে pat (pat came the reply), pat (patting), pattern প্রভৃতি শব্দে। কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটি থেমে থাকেনি বলেই মনে হয়। ইংরেজি put শব্দটির যে ব্যাপকতা, ইংরেজ তার কারণ জানে না। সেই কারণ

পাওয়া যায় বাংলা **পট (পাট)** শব্দের ব্যাপকতায়।

পটক : ১. পট + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *পট করে যে।* ৩. পট, বস্ত্র, পটবাস, শিবির, গ্রামার্দ্ধ, গ্রামাংশ, পাড়া। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। তবে **পটক** থেকে জাত **পাটক** শব্দটি বর্তমানে বিবর্তিত হয়ে **পাড়া** রূপে প্রচলিত। ৫. এখানে নজর করা দরকার যে, ব.শ. বলছেন — **পট** মানে বস্ত্র এবং **পটক** মানেও বস্ত্র। এর কারণটি উপরে **পট** শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা কিছুটা জেনেছি। কার্যত, **পট**-এর প্রতিটি যোড়বিন্দু যেমন **পট**-পদবাচ্য, তেমনি সেই বিন্দুসমূহের যোগফলও (কাপড়ও) **পট**-পদবাচ্য। আর তা বিশেষত এইজন্য যে, সেখানে গিয়ে আমাদের দৃষ্টির অবকাশ আটকায় এবং অপরদিকে তার পেছনে কেউ ঢাকা পড়ে। স্বভাবতই লক্ষণার্থে **পট** শব্দটি কোনো কিছুর আবরক হয়ে যায়। ফলে 'পট করে যে', সে হয়ে যায় আবরণকারী দৃশ্য**পট**, প্রেক্ষা**পট** ইত্যাদি, যার পেছনে রয়েছে অন্য কোনো সত্তা। সেই কারণেই গায়ের কাপড় যেমন **পটক**-পদবাচ্য, তেমনি শিবির, গ্রামাংশ, পাড়া (**পাটক**) প্রভৃতিও **পটক**-পদবাচ্য হয়ে যায়।

পটকর্ম্ম (পটকার) : ২. ***পটকর্ম্ম*** *=* ***পট*** *তৈরি করা হয় যে কর্ম্মের দ্বারা।* ***পটকার*** *=* ***পট*** *তৈরি করা কার্য্য যাহার।* ৩. **পটকর্ম্ম** = বস্ত্রবয়ন-কার্য্য। **পটকার** = তন্তুবায়। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত।

পটকা (পটকান) : ২. ***পটকা*** *=* ***পটক****-এর আধার যে।* ***পটকান*** *=* ***পটক*** *(পট করা) অন যাহাতে। /* **পটকা** = যাহা 'পট' করিয়া ফাটে। (ব.শ.)। ৩. **পটকা** = আতসবাজিবিশেষ (cracker), মাছের পেটের বায়ুর থলি, পোঁটা (bladder)। **পটকান** = ধাক্কা খাইয়া পড়া, পরাস্ত হওয়া, দুর্ব্বল হওয়া, রোগজীর্ণ হওয়া, মরা, ধাক্কা দিয়া ফেলা, পাছড়ান, পরাস্ত করা। দ্র. **পটভূমি**। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **পটকা** শব্দটির প্রথম অর্থ দাঁড়ায় **'পটক**-এর আধার **যে'**, অর্থাৎ পট করে যে তার আধার। এই অর্থে যে কোনো **পটভূমি বা প্রেক্ষাপট**ই **পটকা**-পদবাচ্য হয়। কিন্তু এই অর্থে শব্দটি এখন অপ্রচলিত। শব্দটি এখন প্রধানত **পটান** অর্থে প্রসারিত হয়ে গেছে।

পটান ও **পটকান** দুটি শব্দের মধ্যে মিল আছে, পার্থক্যও আছে। অন্যের খাপে (অবকাশে) নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া (টঙ্কারিত করা) কিংবা নিজের খাপে (অবকাশে) অন্যকে খাপ খাইয়ে (টঙ্কারিত করে) নেওয়াকে বলে **পটান**। (দ্র. **চট, চটপট, চটান-পটান, ঘটপট**) কিন্তু এই কাজটি যদি গায়ের জোরে ঘটানো হয়, তখন তাকে বলা হয় **পটকান**। তার জন্য সম্পূরক বা বিপরীত পক্ষকে আছড়ে-পাছড়ে মেরে-ধরে বেঁধে-মুচড়ে নিজের অবকাশ-মাফিক করে নেওয়াকে বলা হয় **পটকান**। কিন্তু সেভাবে সেটা করতে গেলে যাকে **পট** করা হয় বা **পটান** হয়, অর্থাৎ জোর করে **পট**-করা হয়, সে তো চিৎকার করবেই। সেই চিৎকারকে বলা হয় **পট** শব্দ করে **পটে** যাওয়া। এভাবে যে সত্তা শেষ পর্যন্ত **পটে**, তাকে বলে **পটকা**। পরে পরে **পটকা** শব্দটি শুধুমাত্র 'যে-সত্তা **পট** শব্দ করে' অর্থে প্রচলিত হয়ে যায়। যেমন, 'পাকাঠি **পট** করে ভাঙে', 'ধানি-পটকা **পট পট** করে ফাটে' ... ইত্যাদি। এখান থেকে শব্দটি পরে পরে **রোগা-পটকা** পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে যায়; অর্থাৎ কিনা এতই রোগা যে, তাকে চাইলেই **পটকান** যায়, পাকাঠির মতো **পট** করে ভেঙে ফেলা যায়।

পটপটী (পটি, পটী, পটীয়ান, পটীয়সী) : ২. ***পটপটী*** *= যে গতিশীলভাবে* ***পটপট*** *করে।* ***পটি*** *=* ***পট*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পটী*** *=* ***পটি****-র আধার যে।* ***পটীয়ান*** *=* ***পটী****রূপ যাওয়া অন যাহাতে।* ***পটীয়সী*** *=* ***পটী****-রূপ গতিশীলতার আধার যে।* ৩. **পটপটী** = চাবুকের 'পটপট' শব্দ। **পটি, পটী** = পট, বস্ত্র, বস্ত্রভেদ, ক্যাম্বিস্, যবনিকা, পটগৃহের বেষ্টনবস্ত্র, বস্ত্রখণ্ড। **পটীয়ান, পটীয়সী** = পটুতর। (ব.শ.)। ৪. একমাত্র **পটীয়সী** যথার্থে প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত; কিন্তু **পটপটী** শব্দটি গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. মেদিনীপুরের গ্রামে **পটপটী** শব্দটি শোনা যায় মায়েদের মুখে। কোনো শিশুকন্যা যদি খুব সাজগোজ করে, সাফসুফ থাকে, নিজের হাতে পায়ে কোনো রকম নোংরা লাগতেই দেয় না, লাগলেই তা ধুয়ে মুছে ফেলে, সেই কন্যাকে তাঁরা বলেন — 'এ তো খুব পটপটী মেয়ে গো! এ রাজকুমারীর বর পাব কুথা!' **পটপটী** শব্দটির এরূপ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, 'যে-সত্তা নিজেকে যথাযথভাবে **পট** করে রাখে (দ্র. **চটপট**)', তাকে **পটপটী** বলা হয়। তাকেই শহুরে বাংলায় খানিকটা পরিশীলিতভাবে **পটীয়সী** বলা হয়ে থাকে।

পটভূমি (পটবাপ, পটকা) : ২. *যে* ***পট*** *(দৃশ্যপট) অন্যের ভূমি রূপে সক্রিয় থাকে।* ৩. পটের বা ছবির পারিপার্শ্বিক বা সমীপবর্ত্তী স্থান, পশ্চাদ্বর্ত্তী বিষয় বা স্থান (background)। (ব.শ.)। ৪. **পটভূমি** background অর্থে প্রচলিত। বাকি শব্দ দুটি অপ্রচলিত।

পটল (পটল-তোলা, পটল-চেরা চোখ, পাটলিপুত্র) : ১. **পটল** = ✓পট্ + অল (কলচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পটল*** *=* ***পটের*** *(= আচ্ছাদনের) দ্বারা লালিত হয় যে। /* যাহা তৃণাদি বেষ্টিত। (ব.শ.)। ৩. **পটল** = ছদি, চাল, আচ্ছাদন, নেত্ররোগভেদ, ছানি, চক্ষুরাবরণ, চোখের পাতা, পিটক, পেঁটরা, পরিচ্ছদ, তিলক, সমূহ, রাশি, পুঞ্জ, পরিজন, গ্রন্থবিভাগ, পরিচ্ছেদ, বৃক্ষ। ফলশাকবিশেষ। **পটল-তোলা** = বাস তোলা, মরা, পলায়ন করা। **পাটলিপুত্র, পাটলিপুর** = প্রাচীন নগরবিশেষ, কুসুমপুর — ইহা মগধের রাজধানী এবং শোণগঙ্গাসঙ্গমে অবস্থিত ছিল। ইহা আধুনিক পাটনা। 'পাটলিক', 'কুসুমপুর', 'পুষ্পপুর' ইহার নামান্তর। (ব.শ.)। ৪. একমাত্র 'পটল' নামক সবজি অর্থে প্রচলিত, বাকি সমস্ত অর্থে শব্দটি অপ্রচলিত। তবে 'পটল-তোলা', 'পটল-চেরা চোখ' প্রভৃতি খুবই প্রচলিত। ৫. **পটল** শব্দটি আমাদের ভারি সমস্যায় ফেলে। কেন যে বাংলাভাষী 'পটল-তোলা' বলতে 'মরে-যাওয়া' বোঝে, তার কূলকিনারা পাওয়া যায় না। অথচ ব্যাপারটি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। অন্তত ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থে এর যাথার্থ বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না। কেননা **পটল** মানে তো '**পট** লালিত যাহাতে', তা সে ঘরবাড়ির খড়ের চাল, চোখের পাতা, বাক্স, পেঁটরা, কিংবা সেই

পেঁটরায় বা থলেতে থাকা পুঞ্জ, সমূহ, অথবা গ্রন্থাদির পরিচ্ছেদ হতেই পারে। একেই ব.শ. বলেছেন 'যাহা তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত'। কথাটির মানে গ্রামবাংলার কৃষক সহজেই বুঝতে পারেন। কারণ, **পটল** নামক সবজিটি সাধারণত ঘাসের আড়ালেই ফলে, ফলত। (অবশ্য এখনকার হাইব্রিড ও ক্যাশক্রপ রূপে যে-**পটল** চাষ হয়, তা একটু অন্যভাবে হয়।) অন্তত ১৯৬৫-৭০ সাল পর্যন্ত গ্রামবাংলায় **পটল** চাষ হত প্রাচীন চিরাচরিত নিয়মে। আর তাতে পটল-ক্ষেত করা হত উঁচু ঢিবি-মতো স্থানে, এবং সেখানে ঘাসের মধ্যেই **পটল** নামক সবজিটি ফলত। তো, পটল (নামক সবজি) বা ঘরবাড়ি যেমন তৃণাচ্ছাদিত ছিল, **পণ্য**ও তৃণাচ্ছাদিত ছিল কারণ তা রাষ্ট্রের নজর এড়িয়ে উৎপাদন করা হত। সেকালে একে **পটল, পাটল** বা **পারুল**ও বলা হত। দ্র. **একপটলা**।

এখন কথা হল, কেউ যদি ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে পাড়া থেকে, গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চলে যায়, সে তো **পটল** তুলে নিয়ে চলে যায়। তেমন ব্যক্তি তো গোষ্ঠীর চোখে মরেই যায়। তাই **পটল-তোলা** কথাটির মানে দাঁড়িয়ে যায় মরে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া। আসলে **পটল-তোলা** মানে ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে চলে যাওয়া। আর **পটল-চেরা চোখ** কথাটির মানে একেবারেই চাক্ষুষ অর্থে প্রচলিত। কারণ পটলকে চিরে ফেললে আমরা যে আকারটি দেখতে পাই, মেয়েদের টানা বা আয়ত চোখের সঙ্গে তার খুব মিল। সাধারণত সেরকম মেয়েলি চোখ বোঝাতেই **পটল-চেরা-চোখ** শব্দবন্ধের প্রচলন রয়েছে। আমাদের ভাষায় হরিণের চোখও রয়েছে। চোখ সম্বন্ধে আমাদের এরকম বহু শব্দ রয়েছে, যথা — বিশালাক্ষী, ময়ূরাক্ষী ... ইত্যাদি। **৬.** খুব সম্ভব ইংরেজি potato শব্দটি একই শব্দবংশের সন্তান, কেননা সেই সবজিটিও আচ্ছাদিত হয়ে জন্মায়।

পটু, পটুয়া (পাটব, পাটবার, পাটয়ার, পাটোয়ার, পাটোয়ারী) : **১. পটু** = ✓পাটি (পটি) + উ - কর্ত্তৃবাচ্যে; ✓পট্ + উ - কর্ত্তৃবাচ্যে। **পাটব** = পটু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***পটু*** = *পায়ীর টঙ্কার নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***পটুয়া*** *=* ***পটু*** *(গুণ) চলতে থাকে (যায়) যে আধারের দ্বারা।* ***পাটব*** *=* ***পটু****-গুণ বাহিত যাহাতে।* ***পাটবার, পাটোয়ার, পাটোয়ারী*** *=* ***পাটব*** *গতিশীলভাবে রহে যাহাতে।* ***পাটবার, পাটয়ার, পাটোয়ার*** *=* ***পাট*** *(পট্ট বা বস্ত্র) দ্বারা বারিত বা আবৃত যে।* / **পাটোয়ারী** = যে কর্ম্মচারী প্রজার জমিজমার পরিষ্কার হিসাব-কিতাব রাখেন। (ব.শ.)। **৩. পটু** = দক্ষ, নিপুণ, চতুর, তীক্ষ্ণ, তীব্র, মধুর, গম্ভীরনাদী, দৃঢ়, সমর্থ, নিষ্ঠুর, নীরোগ, ধূর্ত্ত, স্ফুট, উদ্যোগী, পটোল, কারবেল্ল, করেলা, পটোলপত্র, ছত্ত্রা, লবণ, পাংশুলবণ; লোমজাত বস্ত্রবিশেষ। **পটুয়া** = চিত্রকর জাতিবিশেষ, চিত্রকর। **পাটব** = পটুভাব, নৈপুণ্য, দক্ষতা, আরোগ্য। **পাটবার (পাটোয়ার, পাটোয়ারী)** = নিপুণ, কুশল, চতুর, ধূর্ত্ত। (পাটোয়ারী-বুদ্ধি = হিসাবী বুদ্ধি)। **পাটবার** (> পাটয়ার, পাটোয়ার) = বস্ত্রাবরণ, বস্ত্রবেষ্টন, যূপকাষ্ঠ, যাত্রা; প্রাচীর, বেড়, সারি, কাতার, জনশ্রেণী, জনতা। (ব.শ.)। **৪.** expert অর্থে **পটু** এবং painter by caste অর্থে **পটুয়া** প্রচলিত। **৫. পট, পটান, পটি** মূলত কোনো অবকাশে টঙ্কারিত হওয়া বা পটে যাওয়াকেই বোঝান হয়ে থাকে। কিন্তু এই **পটানর** ক্রিয়াটি যদি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখনই তা হয়ে **পটু**। এই **পটু** নিজে পটে না, দুই বা ততোধিক সত্তাকে পরস্পরের সঙ্গে **পটে** যাওয়ার উপায় বের করে এবং তাদের ভিতরে অনায়াসে **পট** খাইয়ে দেয়; সত্তাগুলিকে **পটিয়ে** ফেলে, খাপ খাইয়ে দেয়। সেই কারণে তাকে **পটু** বলে। তবে কিনা, যেহেতু এই বিশ্বজগৎ পুরুষ-প্রকৃতি রূপে কামসূত্রে গ্রথিত, সারা জগৎ জুড়েই **পটানর** কাজটি সবসময় রয়েছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র রং ও রেখার দুনিয়ায় যে **পটানর** কাজ করা হয়, এবং সেই কাজ করেই যে তার জীবনযাত্রা চালায়, তাকে বলে **পটুয়া**।

কিন্তু **পাটোয়ারী** শব্দটি দুদিক থেকে জন্মলাভ করেছে। প্রথমত, **পাটব** থেকে, যা কিনা **পটুত্ব**ব্যঞ্জক। এই **পাটব** অতঃপর বিবর্ত্তিত হয়ে **পাটবার, পাটয়ার, পাটোয়ার, পাটোয়ারি, পাটোয়ারী** প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়েছে এবং তাদের অর্থ থেকেছে মূলত 'পটুত্ব-ভিত্তিক'। দ্বিতীয়ত, **পাট-বারণ** থেকে, যদর্থ **পাট** দ্বারা বারণ বা আবৃত করা। এই **পাট-বার** অতঃপর বিবর্তিত হয়ে **পাটবার, পাটয়ার, পাটোয়ার** শব্দে পরিণত হয়েছে এবং তাদের অর্থ থেকেছে মূলত 'নিবারণ-ভিত্তিক'। যেকোনো কারণেই হোক, ব.শ.-তে এই ব্যাপারটি পরস্পর-বিজড়িত হয়ে রয়েছে; আমরা সাধ্যমতো সেই জট ছাড়ানর চেষ্টা করলাম।

পট্ট, পট্টক, পট্টজ, পট্টন, পট্টনায়ক, পট্টবস্ত্র, পট্টমহিষী, পট্টশাক, পট্টশাটী : **১. পট্ট** = ✓পট্ + ত (ক্ত)। (ব.শ.)। **২.** ***পট্ট*** *=* ***পট্*** *টঙ্কারিত যাহাতে।* ***পট্টক*** *=* ***পট্ট*** *করে যে।* ***পট্টজ*** *=* ***পট্ট*** *হইতে জাত যে।* ***পট্টন*** *=* ***পট্ট*** *অন থাকে যাহাতে।* ***পট্টনায়ক*** *=* ***পট্ট*** *বিষয়ে নায়ক যে।* ***পট্টবস্ত্র*** *=* ***পট্ট****-এর বস্ত্র।* ***পট্টমহিষী*** *=* ***পট্ট*** *যে মহিষী।* ***পট্টশাক*** *=* ***পট্ট****-এর শাক।* ***পট্টশাটী*** *=* ***পট্ট****-এর শাটী (শাড়ী)।* / **পট্ট** = পত্রবৎ বিস্তৃত ও সমতল যে। (ব.শ.)। **৩. পট্ট** = ফলক, পাটা, তখ্‌তা, পীঠ, পীঁড়ি, রাজাদির শাসনপত্র, পাট্টা, হুকুমনামা, ঢাল, পেষণপাষাণ, পট্টী, কৌষেয়, রেশম, পাট, উষ্ণীষ, উত্তরীয়, কৌষেয় বস্ত্র, সিংহাসন, কাষ্ঠাসন, পত্রাকার খণ্ড, পাত, ঘন, চতুষ্পথ, নগর, পাটন, ললাটভুষা, অশ্বের বক্ষঃস্থলের বন্ধনরজ্জু। **পট্টক** = ধাতুময় রাজশাসনপত্র, পট্টিকা, ভূস্বামীপ্রদত্ত ভূমির অধিকারপত্র, পাট্টা। **পট্টজ** = পট্টজাতবস্ত্র, রেশমী কাপড়। **পট্টন** = প্রধাননগর, নগর। **পট্টনায়ক** = উপাধিভেদ। **পট্টবস্ত্র** = কৌষেয় বস্ত্র। **পট্টমহিষী** = কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, পাটরাণী। **পট্টশাক** = পাটশাক, নালিতা। **পট্টশাটী** = পাটশাড়ী, রেশমী শাড়ী। (ব.শ.)। **৪.** কেবলমাত্র **পট্টনায়ক** শব্দটি পদবীরূপে প্রচলিত, বাকি সব শব্দগুলিই বর্তমানে অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পাট**।

পাট, পাটধড়া, পাটন, পাটনী, পাটভাঙা, পাটরাণী, পাটশাল : **২.** ***পাট*** *=* ***পট*** *হইতে জাত।* ***পাটধড়া*** *=* ***পাট*** *(পট্টবস্ত্র) ধড়ে যাহার।* ***পাটন*** *=* ***পাট*** *অন যাহাতে।* ***পাটনী*** *=* ***পাটন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পাটভাঙা*** *= যাহার* ***পাট*** *(বিন্যাস) ভাঙা হইয়াছে।* ***পাটরাণী*** *= (রাজ্য)* ***পাট****-এর রাণী যে।* ***পাটশাল*** *= শালা (কামারশালা, পাঠশালা ...ইত্যাদি)-র মধ্যে* ***পাট*** *যে।* / **পাটনী** =

যে পাটনের নদীতে পার করে (?)। (ব.শ.)। ৩. **পাট** = রেশম, পট্টবস্ত্র, শণসূত্র, শণবস্ত্র, কোষ্টাগাছ, কোষ্টার আঁশ, কাষ্ঠফলক, পাটা, ধোপার কাপড় কাচার তখ্‌তা, ফলকমাত্র, পীঠ, কাষ্ঠাসন, পীঁড়ি, সিংহাসন, রাজধানী, নগর, (সিংহাসন সাদৃশ্যে) উদয়াচল, অস্তাচল, দেবতার সাধুর বা ভক্তের অধিষ্ঠিত বা পীঠবিশিষ্ট স্থান ... ইত্যাদি (মোট ২২ টি)। **পাটধড়া** = পট্টবস্ত্র। **পাটন** = ছেদন, বিদারণ, চেরা, ছেদক তীক্ষ্ণ বাণবিশেষ; নগর, রাজ্য, দেশ, পাটনে বাণিজ্যার্থ যাত্রা। (উত্তর পাটন = নগরের উত্তরে স্থিত বধস্থান। দক্ষিণ পাটন = নগরের দক্ষিণে স্থিত বধস্থান। ভারতের দক্ষিণে বাণিজ্যসমৃদ্ধ নগর — সিংহলের রাজা শালবানের রাজধানী।)। **পাটনী** = খেয়ারী, ঘাটমাঝী, শ্মশানঘাটের করগ্রাহক। **পাটভাঙা** = ধোব ভাঙা। **পাটরাণী** = কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, বড়রাণী। **পাটশাল** = রাজসভা; বৈঠকখানা। ৪. **পাট** বহু অর্থে প্রচলিত। **পাটধড়া, পাটন, পাটনী** অপ্রচলিত, কিন্তু **উৎপাটন** 'উপড়ে ফেলা' অর্থে প্রচলিত। **পাটভাঙা পাটরাণী, পাটশাল** প্রায় অপ্রচলিত। ৫. **পাট** শব্দটির ব্যাপকতা এত বেশি যে, তাকে একত্রে ধারণ করে ব্যাখ্যা করতে গেলে শুধু **পাট** শব্দ নিয়েই একটি আলাদা গ্রন্থ লেখার দরকার পড়ে। এখানে সে অবকাশ নেই। অতএব সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করা যাক।

সর্বাগ্রে **পট্ট** কী করে **পাট** হল, সেই প্রসঙ্গে যাওয়া চাই। **পট** তো যোগ চিহ্নের বিন্দুটুকুমাত্র, যেখানে **প** টঙ্কারিত হয়। সেইরকম অজস্র বিন্দুসমূহের যোগে গড়ে ওঠে একটি ধুতি, শাড়ি, গামছা বা অন্য কোনো বস্ত্র। বিন্দুরূপী **পটসমূহ** বিপুল সংখ্যায় সুবিন্যস্ত ও দলবদ্ধ হয়ে এই বস্ত্রে টঙ্কারিত হয়; তাই এইরূপ বস্ত্রকে **পট্ট** ('পট্ টঙ্কারিত যাহাতে') বলে। কিন্তু এক বিচারে, এই **পট্ট** তো আসলে '**পট** হইতে জাত'। শব্দার্থের নিজস্ব নিয়মে '**পট** হইতে জাত যে', তাকে **পাট** বলা হয়। সেই কারণে বাংলাভাষী সংস্কৃত **পট্ট**কে বাংলায় **পাট** করে নিতে দ্বিধা করেননি। স্বাভাবিকভাবেই **পট্ট** ও **পাট** উভয়ের মানে হয়ে যায় বস্ত্র।

এইখানে একটি বড় সংশয়ের স্থান দেখা দেয়। তাহলে **পট্টশাক** বা **পাটশাক**, কিংবা **পাটগাছ**-এর (jute-এর) নামে **পাট** শব্দটি এল কীভাবে? **পট** থেকে তো **পাটগাছ** হয় না, বরং উলটো হয়। **ঠিক** তাই। যে-সকল গাছের ছাল দিয়ে **পট** বা **পাট** তৈরি হয়, তাদের বলা হত **কোষ্টাগাছ** (কোষ = খাপ, খোলস, ছাল। অতএব **কোষ্টা** = কোষ বা ছাল টঙ্কারিত যে আধারে।); যেমন লেপ বালিশ তৈরি হয় শিমূল গাছের তুলো দিয়ে। এখন কেউ যদি শিমূলগাছকে তুলোগাছ বলে, তাতে খুব একটা দোষ হয় না। সেইরকম যে গাছের ছাল দিয়ে **পাট** (বস্ত্র) তৈরি হয়, তাকে **পাটগাছ** (= বস্ত্রগাছ) বলার প্রথা ক্রমে প্রচলিত হয়ে যায়। ...

তবে আমরা যখন বলি 'জামাটি **পাট** করে রাখ', তখন কিন্তু **পাট** শব্দটির অর্থ বস্ত্র থাকে না। এক **পটের** পরে অন্য অন্য **পট** রেখে রেখে গোটা জামাটিকে দুই বা ততোধিক **পট**-এ সুবিন্যস্ত করা; এই হল **পাট** করা। শব্দার্থের নিয়মে এও **পট** হইতে জাত, তাই **পাট** করা। জামাটি পরার আগে যখন এই **পাট** খুলে বা ভেঙে ফেলা হয়, তখনই তাকে বলা হয় **পাটভাঙা**। তারপর তা যখন গায়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়, তখন সে হল **পাটধড়া**। কারণ, সে তখন ধড়কে জড়িয়ে থাকে। একেই **কাপড়** (কাপট্ট) বলে। গায়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন বস্ত্রকে **পাটধড়া** কিংবা **কাপড়** বলা যায় না।

তবে কিনা, যুক্তচিহ্নধারী টানাপোড়েনের **পট** জুড়ে জুড়েই যখন '**পট** হইতে জাত' **পাট** হয়, তখন শুধুমাত্র কার্পাস সুতোর টানাপোড়েনের **পট** জুড়ে জুড়েই **পাট** হবে কেন? যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সূত্রের বা আঁশের টানাপোড়েনের **পট** দিয়েও তো **পাট** হতে পারে। যেমন, সামাজিক সম্পর্ক-সূত্রের টানাপোড়েনের **পট**, লেনদেন-এর টানাপোড়েনের **পট**, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক-সূত্রের **পট**, ... নিদেনপক্ষে কাঠের আঁশের টানাপোড়েনের **পট**ও তো হতে পারে। হতে পারে নয়, হয়ই। সেই কারণে রাজ্য**পাট** হয়, দোকান**পাট** হয়, **নেতপাট** হয়, ধোপার **পাট** হয়, এমনকি চোট**পাট**, পিট**পাট**, লুঠ**পাট**ও হয়, ... আর **পাটাম্বর** (= পাটবস্ত্র) তো হয়ই। শুধু কি তাই? তারপর সেই **পাট** চুকিয়ে দেওয়ার দরকারও পড়ে, সে **পাট** অনেক সময় তুলেও দিতে হয় (**পটল**-তুলতে হয়)। ...

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই **পাট**-এর যে কি বিপুল ব্যবহার হত, ব.শ. প্রদত্ত উদাহরণ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কৃত্তিবাস যখন রামায়ণে লিখছেন, 'নন্দীগ্রামে **পাট** করি কর রাজকার্য্য', তখন সুস্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ও তাঁর সময়ের শ্রোতা-পাঠকগণ জানতেন — মানুষে মানুষে সম্পর্কসূত্রের টানাপোড়েনের **পট** জুড়ে জুড়েই সামাজিক **পাট** তৈরি করতে হয় এবং সেই **পাট**-এর উপরই গড়ে তুলতে হয় রাজ্য**পাট**। বড়রাণী হয়ে যান **পাটরাণী, পাটেশ্বরী, পট্টমহিষী**। একথা না জানলে মধ্যযুগের কবিরা 'দেবানন্দের পাট', 'পাটের বেসাতি', 'রামচন্দ্র পাটে রাজা হইলা' — ইত্যাদি বাক্য লিখতেই পারতেন না। আরও বড় কথা এই যে, সেকালের সাধারণ বাংলাভাষী এসব কথা তখন বুঝতেও পারতেন।

আর, সেই **পাট** যদি অন (on) কৃত হয়ে **পাটন** করা হয়ে যায়, তখন তো আর কেবল **পাট**-এর উপর **পাট** রেখে **পরিপাটন** করাই হয় না, প্রয়োজনে **উৎপাটন**ও করা হয়। এর থেকেই আমরা **পরিপাটী** ও **উৎপাটিত** শব্দের হদিশ পেয়ে যাই।

পাটা, পাটাকৃমি, পাটাতন, পাটাবুক, পাটাবুকী, পাটাশেয়ালা, পাটাসেলামী, পাটালি : ২. *পাটা = পাট-এর আধার যে।* ৩. **পাটা** = কাষ্ঠফলক, তখ্‌তা, পুঁথির কাষ্ঠাবরণ, ধোবার পাট, হাটে মাছ রাখার পাটা, চওড়া কোমরের অলঙ্কার, ঘানিচালকের বসার পাটা, রাজমিস্ত্রির পলস্তারার পাটা, নদী প্রভৃতির বিস্তার ... ...। **পাটাকৃমি** = ফিতাকৃমি (tape-worm)। **পাটাতন** = নৌকায় বসার তখ্‌তার মঞ্চ (deck)। **পাটাবুক** = নির্ভীক। **পাটাবুকী** = অতিসাহসিকা নারী, নির্ভীকা। **পাটাশেয়ালা** = ফিতার মতো শৈবালবিশেষ। **পাটাসেলামী** = পাটা (জমির পাট্টা) লওয়ার সময়ে জমিদারের সম্মানার্থ দেয় অর্থ। **পাটালি** = পাটার মতো চওড়া জমাট গুড়, গুড়ের তখ্‌তী। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় সবগুলিই কমবেশি প্রচলিত। ৫. **পাট** শব্দে আগেই আমরা দেখেছি, যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সূত্রের বা আঁশের টানাপোড়েনের **পট** দিয়ে **পাট** সঞ্জাত হয়। সেই **পাট**-এর আধার মাত্রেই **পাটা**-পদবাচ্য; তা সে গুড়ের **পাটা**, শৈবালের **পাটা**, কাঠের **পাটা**, ধোপার **পাটা**,

রাজমিস্ত্রির **পাটা,** মাঝির **পাটা,** কলুর **পাটা** কিংবা সেলামির **পাটা,** কৃমির **পাটা,** অথবা নিদেনপক্ষে বুকের **পাটা,** যাই হোক না কেন। এগুলির অধিকাংশই কাঠের আঁশের **পট** থেকে জাত **পাটা,** বাকি কয়েকটি অন্যান্য প্রকারের সূত্রের **পট** থেকে জাত। আরও সহজ করে ভাবলে, অন্তত কাঠের আঁশের **পট** বিষয়ে বলা যায় — যেখানে কোনো কিছু পেটা যায়, সেই স্থানকে **পাটা** বলা যায়। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা ভাল যে, **পাতা** ও **পাটা** খুব কাছাকাছি ব্যাপার। ব.শ. **পট্ট** শব্দের অর্থে স্পষ্ট জানিয়েছেন — এ হল পাতার মতো বিস্তারিত ও সমতল সত্তা। তাছাড়া আমরা তো শুনিই, বাংলাভাষীরা একই সঙ্গে 'দোকানপাট' ও 'দোকানপত্র' সমার্থেই বলে থাকেন।

পাটি, পাটিকা, পাটিকাল (পাটিকেল, পাটকেল), পাটিখান, পাটিত, পাটী (পরিপাটী), পাটীগণিত, শীতলপাটী : ১. ✓দ + ইন (ব.শ.)। ২. ***পাটি*** = ***পাট*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পাটিকা*** = ***পাটি*** *করে যে, তাহার আধার।* ***পাটিকাল (পাটিকেল, পাটকেল)*** = ***পাটিকা*** *লালিত যাহাতে।* ***পাটিখান*** = ***পাটি****-র খণ্ড।* ***পাটিত*** = ***পাটি*** *তারিত যাহাতে।* ***পাটী*** = ***পাটি****-র আধার যে।* ***পরিপাটী*** = *পরি ভাগে (সামগ্রিকভাবে)* ***পাটি*** *কৃত হইয়াছে যাহার।* ***পাটীগণিত*** = *পাটী কৃত হয় যে গণিতে।* ***শীতলপাটী*** = ***শীতল*** *যে* ***পাটী****।* ৩. **পাটি** = পরিপাটি, শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সংসারের কাজকর্ম্ম, নির্ম্মাণপরিপাটি, রচনাকৌশল, বেতির মাদুরবিশেষ, মাদুর, তালপাতার বা খেজুর পাতার চেটা, কোমরবন্ধ, নীবি, তখ্‌তা, ছালা, পঙ্‌ক্তি, রেখা, সমূহ, শ্রেণীবদ্ধ বসতি, পটী, পাশফলক। **পাটিকা** = ইট। **পাটিকাল (পাটিকেল, পাটকেল)** = ইষ্টক। **পাটিখান** = ইষ্টকখণ্ড, ইষ্টক। **পাটিত** = ছিন্ন, বিভক্ত, ক্ষত, বিদারিত, উৎপাটিত। **পাটী** = অনুক্রম, পরিপাটি, স্পষ্টক্রম, কাষ্ঠফলক, তখ্‌তার টুকরা। **পরিপাটী** = আনুপূর্ব্বী, অনুক্রম, ক্রম, পঙ্‌ক্তি, পদ্ধতি, চাষ-কারকিত, জমির পাট, শুদ্ধি, সংস্কার, গৃহপরিমার্জ্জন, বৈচিত্র্য অঙ্কননৈপুণ্য, চিত্তবৃত্তি, বাক্যকৌশল। **পাটীগণিত** = সঙ্কলনব্যবকলন-গুণভাগাদিক্রমযুক্ত গণিত, গণিতবিশেষ (Arithmetic)। **শীতলপাটী** = বেতের মতো ক্ষুপবিশেষের ত্বকে নির্ম্মিত শীতলস্পর্শ মসৃণ পাতলা মাদুরবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. **পাটিকা, পাটিকাল, পাটিকেল, পাটিখান** অপ্রচলিত। বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **পাট** করা চলতে থাকলে তাকে বলে **পাটি**; সার্বিকভাবে সে ক্রিয়া চালানো হলে, তাকে বলা হয় **পরিপাটি** করা। যে সত্তায় সেই ক্রিয়া করা হয়ে গেছে, সেই সত্তাটিকে বলা হয় যথাক্রমে **পাটী** ও **পরিপাটী**। যে গণনার পদ্ধতিতে বিশ্বের সবকিছুকে **পাটী-পাটী** করে গণনা করা হয়, তাকে সেকারণেই **পাটীগণিত** বলা হয়। এই শব্দার্থকোষের প্রচ্ছদে রয়েছে এই **পাটী**। এরই রকমফেরকে আমরা পাই **শীতলপাটী**তে। তবে **পাটিকা** কিন্তু ঠিক ইষ্টক নয়, যদিও সেরকম অর্থই ব.শ. দিয়ে গেছেন। আগেকার দিনে, এমনকি ব্রিটিশ যুগেও, দুরকম ইট পাওয়া যেত। একটির প্রচলন আজও আছে, সেটি সবাই চেনেন, যার মাপ মোটামুটি ১০-৫-৩ ইঞ্চি। সেকালে তাকেই বলা হত ইষ্টক বা ইট। আর একরকম ইট ছিল অনেকটা মোটা তখ্‌তা বা গুড়ের পাটালির মতো, যাকে বলা হত 'পট্টিকা' বা **পাটিকা,** যার মাপ মোটামুটি ১২-৬-১ ইঞ্চি। এগুলি দিয়ে প্রধানত ছাদ তৈরি হত। আমরা যে প্রবাদটি শুনি — 'ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়' — এর ভিতরে এই **পাটিকা** ও **পাটিকাল** শব্দের উত্তরাধিকার আজও বেঁচে রয়েছে। ঐ প্রবাদে 'ইট' কথাটির মানে হল 'ইষ্টকখণ্ড' বা 'ইটের টুকরো', এবং 'পাটকেল' কথাটির মানে হল 'পট্টিকাখণ্ড' বা 'পাটিকাখণ্ড' বা 'পাটিকার টুকরো'। গ্রামবাংলার সেকেলে মানুষের মুখে এখনও শব্দদুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'ইটকাল' ও 'পাটকাল' রূপে। 'ইটকাল' শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং **পাটিকাল** বা 'পাটকাল' শব্দটি **পাটকেল**-এ পরিণত হয়ে গেছে। 'লালচে-মেটে-রং' বা 'পাটকিলে-রং' রূপেও শব্দটিকে পাওয়া যায়। তার মানে, উপরোক্ত প্রবাদটির মর্ম ছিল — তুমি ইটের টুকরো বা ইটকাল ছুঁড়ে আমায় মারলে, আমি **পাটিকা**র টুকরো বা **পাটকাল** ছুঁড়ে তোমায় মারব। বাল্যে যাঁরা ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি করেছেন, তাঁরা জানেন, ছুঁড়ে মারার ক্ষেত্রে ইটের টুকরোর চেয়ে পাটিকার টুকরো বা পাটকাল অনেক উচ্চমানের অস্ত্র; ছুঁড়তে যেমন সুবিধা, লাগেও তেমনি মোক্ষম।

পাটল, পাটলা, পাটলি, পাটুলী (পারুল) : ২. ***পাটল*** = ***পাট*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***পাটলা*** = ***পাটল****-এর আধার।* ***পাটলি*** = ***পাটল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পাটুলী*** = ***পাট*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে গতিশীলভাবে লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যে আধারে।* ***পারুল*** = ***পার*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে। (দ্র.* ***পারিজাত****)।* ৩. **পাটল** = পাটলবর্ণযুক্ত, শ্বেতরক্ত, পাটকিলে, অরুণ, পাটলবৃক্ষ, শ্বেতরক্ত বর্ণ, পাটলাপুষ্প, পারুলফুল, কুঙ্কুম। **পাটলা** = পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ, পাটলি, পারুলগাছ, পাটলিপুষ্প, রক্তলোধ্র, দুর্গা। **পাটলি** = পাটলবৃক্ষ, পারুলগাছ (Bignonia suaveolens), পাটলিকুসুম। **পাটুলী** = পাটলিপুষ্প। **পারুল** = পাটলবৃক্ষ, পাটলপুষ্প। ৪. স্থান নাম রূপে **পাটুলী** এবং মেয়েদের নাম রূপে **পারুল** প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **পাটলিপুত্র**। এতদিন কখনো ভেবে দেখা হয়নি, 'সাতভাই **চম্পা** জাগো রে' বলে **পারুল** বোন যে গান গায়, তার পিছনে ভাই-বোনের আবেগ ছাড়া অন্য কিছু ছিল বা থাকতে পারে কি না। আজ যখন দেখা যাচ্ছে, এর সঙ্গে **পাটল, পাটলি**পুষ্প, **পাটুলী, পাটলীপুত্র,** ও **অরুণ**-এর সম্পর্ক রয়েছে, তখন সন্দেহ হয়, এ তো কেবলই ভাইবোনের আবেগের সম্পর্ক নয়, আরও অনেক কিছু! এসব শব্দ তো ভারতসমাজে পণ্যের উদ্ভব, বিনিময় ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। আদিম-সমাজতান্ত্রিক যৌথসমাজের (বৈদিক সমাজের) ভিতরে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যৌথ সামাজিক শ্রমতেজের (**সূর্য্যে**র) বাহক রূপে যে খঞ্জ, **পাণ্ডু**র, **পাটকিলে** রঙের বা **পাটলবর্ণের সূর্য্য**সারথী **অরুণ**-এর আবির্ভাব, সে তো আদিম-সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিষিদ্ধ (**পটল** = 'তৃণাচ্ছাদিত') পণ্যই বটে; তার ভাই স্বরূপে ধনতান্ত্রিক পণ্যবাহী নগদ-নারায়ণের বাহক **গরুড়**-এর জন্ম তার পরেই। ...

হ্যাঁ, প্রথম যুগের বা আদিম-সমাজতান্ত্রিক যুগের প্রাচীন ভারতীয় পণ্য তো সম্পূর্ণ পণ্য নয়, খঞ্জ, পাণ্ডুর, অরুণবর্ণ। আর, **চম্পা**কে তো আমরা আগেই চিনেছি। সে হল যৌথসমাজের নিয়মে নিষিদ্ধ

হওয়া সত্ত্বেও যৌথসমাজের শাসনের ফাঁক গলে সেই সমাজেই উদ্ধৃত **পণ্য**রূপে সে যথেষ্ট পরিমাণে আবির্ভূত হত। তবে সেই আদিম-সমাজতান্ত্রিক পণ্যের কোনো অংশ বিদেশে রপ্তানি হত কি না, সে কথা এতদিন আমরা জানতাম না। যদিও পরবর্তীকালে **পারিজাত**-পুষ্পকে আমরা বিদেশে প্রেরিত ধনতান্ত্রিক পণ্য রূপে দেখেছি। **পারুল** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, সেই আদিম-সমাজতান্ত্রিক পণ্য বিদেশেও প্রেরিত হত, ঠিক যেভাবে লোকে তাদের কন্যাদের বিবাহ দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। **চম্পা** পণ্যের সেই 'পারে প্রেরিত' বোনই **পারুল**। সেই **পারুল** বোনই ডাক দেয় 'সাতভাই **চম্পা** জাগো রে'। হয়তো-বা সে ফিরে আসতে চায় অথবা **চম্পা**দেরও সে বলতে চায় তার মতো বিদেশে চলে আসার জন্য। বাংলাভাষীর নাইওরী কন্যার আবেগের সঙ্গে এই '**পারুল** বোন আমার'-এর গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়। [পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামবাংলায় 'নাইওরী (নায়রী) কন্যা' বা 'নাইওরী-মেয়ে' বলতে সেই বিবাহিত মেয়েকে বোঝাতো, যে-মেয়ে নায়ে বা নৌকায় চেপে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। হায়, কবে সে আসবে, আসতে পারবে কিনা, কিংবা এলেও ক'দিন পরেই তাকে চলে যেতে হবে — এই নিয়ে তার মা ভাই ও সেই কন্যার নানান দুঃখ-ব্যথা-আবেগের গান কথা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এখনো পদ্মাপারের গ্রামেগঞ্জে ব্যাপারটির যথেষ্ট চল রয়েছে।]

কার্যত, **দক্ষ**নীতি অনুসরণ করার ফলে যৌথসমাজের ভিতরে স্বাভাবিকভাবেই **পণ্য** জন্মায় এবং পণ্য তার স্বভাববশতই দেশে বিদেশে যেতে শুরু করে। কিন্তু যৌথসমাজের মানুষের মন তো তখনও যৌথতার আবেগে ভরপুর। তাঁরা **দক্ষ**নীতি অনুসরণের ঠেলায় ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনে ঢুকে পড়েছেন, অথচ তাঁদের দার্শনিক-সাংস্কৃতিক জীবন তখনও পড়ে রয়েছে তৎপূর্বকালীন যৌথযুগের আবেগের দুনিয়ায়। আপন সন্তানস্বরূপ উৎপাদিত বস্তুর প্রতি একালের পণ্যউৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের মতো নির্লিপ্ত তখনও তাঁরা হতে পারেননি; কেননা তার জন্য জনজীবনে যতখানি যান্ত্রিকতার দৌরাত্ম্যের প্রচলন হওয়ার দরকার ছিল, তখনও তা হয়ে ওঠেনি। স্বভাবতই আপন উৎপন্নের প্রতি মানুষের মায়া তখনও যথেষ্ট পরিমাণে ছিলই। আপন সন্তানস্বরূপ নিজ উৎপন্নের প্রতিও সেকালের মানুষের কী গভীর মমতা ছিল, তার অজস্র চিহ্ন এখনও সমাজমনের চোখের জলের অজস্র দাগে আজও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামবাংলায় বিয়ের পর কন্যার বিদায়কালে মা সে দৃশ্য দেখবেন না, এ-প্রথা এখনো কোনো কোনো পরিবারে প্রচলিত আছে। কিংবা ঘরের গরুবাছুর বিক্রির সময় গৃহস্থেরা এখনও কয়েকটি আচার-আচরণ পালন করেন। যেমন পাইকারের হাতে গরুটি তুলে দেওয়ার সময় গরুটিকে তার গলার দড়িসহ দেওয়া হয় না, দড়ি খুলে চালে গুঁজে রেখে দেওয়া হয়, সে দড়ি অন্য কোনো কাজে লাগানোও নিষিদ্ধ। পাইকার সাধারণত গরুটির গলায় আপন গামছা বেঁধে নিয়ে যায়। আপন উৎপাদিত বস্তু বেচে দেওয়ার সময় এরকম আরও নানা আচারের প্রচলন ছিল এবং সেগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও নানা রূপে বিদ্যমান রয়েছে দেখা যায়।

সর্বোপরি, মানুষের আচরণের গা থেকে দার্শনিক পোষাক (যেমন খাওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ্' ... ইত্যাদি বলা, যা সব ধর্মেই নিজের নিজের মতো প্রচলিত ছিল) খুলে দিয়ে, আচরণকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও যান্ত্রিক করবার যে রীতি পাশ্চাত্যে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে, ভারত কোনোদিন তাতে সায় দিতে পারেনি। পণ্য উৎপাদন করব, অন্যের হাতে তুলে দিয়ে জীবিকানির্বাহ করব — সমগ্র জীবন জুড়ে থাকা এমন প্রধান আচরণের কোনো দার্শনিক পোষাক থাকবে না, ভারতীয় মনন কোনোদিন তা মানতে পারেনি। শুভকাজের সূত্রপাতে তাকে ধূপ জ্বালতে হয়েছে, নারকেল ফাটাতে হয়েছে। কার্যত, ভারতসমাজে পণ্যসংশ্লিষ্ট আচার আচরণগুলি দার্শনিক-সাংস্কৃতিক পোষাকে কেবল সম্পূর্ণভাবে আবৃতই ছিল না, সেই পোষাকের তলায় সেগুলি প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। এর কুফল হয়েছে এই যে, ভারতসমাজই যে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার আদি উদগাতা, পুরাণাদি গ্রন্থে তার সেসব কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হলেও সেগুলিকে বুঝতেই পারা যায়নি এতদিন।

পিট, পিটক, পিটন, পিটনা, পিটনি, পিটপিট, পিটপিটে (ত্রিপিটক, সূত্রপিটক, অভিধর্ম্মপিটক, বিনয়পিটক) : ২. *পিট = গতিশীল পান/পালন টঙ্কারিত যাহাতে। (দ্র. **টিপ**)। **পিটক** = **পিট** করা হয় যাহাতে। **পিটন** = **পিট** অন (on) যাহাতে। **পিটনা** = **পিটন**-এর আধার যে। **পিটনি** = **পিটন** গতিশীল যাহাতে। **পিটপিট** = **পিট**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **পিটপিটে** = **পিটপিট** দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. **পিট** = তাড়না করা, মারা, পেটা, আঘাত করা, আঘাতে সংহত বা নিরেট করা, ধ্বনিত করা, বাজান; তাসখেলায় একবার তাড়িত বা নিক্ষিপ্ত তাস। **পিটক** = মঞ্জুষা, পেটক, পেঁটরা, বাঁশের পেটি, আধার, বিস্ফোট, ফোঁড়া। **পিটন** = প্রহার, মার। **পিটনা, পিটনি** = ঘরের মেঝে ছাদ ইত্যাদি পিটানর মুগুর, কোপা। **পিটপিট** = কর্কশ তিরস্কার, খিটখিট। **পিটপিটে** = রুক্ষপ্রকৃতি, খিটখিটে। (ব.শ.)। ৪. **পিটক** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **টিপ**। তেজ (তাড়নার শক্তি) পালিত হইয়া গতিশীল ভাবে গিয়ে টঙ্কারিত হওয়াই **পিট** করা বা **পিটা**, যা দিশাগ্রস্ত হলে **পেটা** হয়। এই **পিট** অন (on) থাকলে **পিটন**। যা দিয়ে সেই **পিটন** হয়, তাকে বলে **পিটনা**। ক্ষুদ্র **পিটন** হাতিয়ারকে বলে **পিটনি**। তবে যার ভিতরে **পিটিয়ে পিটিয়ে** ঢোকান হয়, তাকে বলে **পিটক**। এ যেমন বাক্স-পেঁটরা হতে পারে, তেমনি গ্রন্থও হতে পারে। হতে পারে বলেই কোনো কোনো গ্রন্থের নাম হয় **ত্রিপিটক**। অর্থাৎ, এতে তিনটি **পিটক** (পেঁটরা) বা অধ্যায় একত্রে রয়েছে — সুত্তপিটক (সূত্রপিটক), অভিধম্মপিটক (অভিধর্ম্মপিটক), ও বিনয়পিটক (বিনয়পিটক)। ...

পঠ্ (পড়্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (পঠ = টানা-লেনদেন, পড় = প'ড়েন-লেনদেন) অপড়, অপাঠ্য, অপাঠ্যপুস্তক, অসংপাঠ্য, চতুষ্পাঠী, চালপড়া, জলপড়া, তোলপাড়, তোলাপাড়া, নিপাঠ, পঠ্, পঠ, পঠদ্দশা, পঠন, পঠনপাঠন, পঠনীয়, পঠমঞ্জরী, পঠিতব্য, পড়, পড়তা, পড়তি, পড়ন, পড়ন্ত, পড়পড়,

পড়া, পড়া-করা, পড়া-দেওয়া, পড়ান, পড়াপড়, পড়াশুনা, পড়াশোনা, পড়া-হওয়া, পড়ুয়া, প'ড়ো, পাঠ, পাঠক, পাঠন, পাঠনা, পাঠশালা, পাঠান্তর, পাঠিত, পাঠী, পাঠীন, পাঠ্য, পাঠ্যজাতি, পাঠ্যপুস্তক, পাড়, পাড়ন, পাড়া, পাড়াগ্রাম, পাড়াপড়শি, পাড়াপাড়ি, পাড়ী, পাড়োয়ান, বাটপাড়, বাটপাড়ী, লেখাপড়া, সহপাঠী, সুপঠ।

পঠ্ (পড়্) = পায়ীর টঙ্কারের স্থির হওয়ন। **পঠ** = পায়ীর টঙ্কার স্থির যাহাতে। **পড়** = পায়ীর গড়ান-উড়ান যাহাতে।

অপাঠ্য : ২. *অপাঠ (ন-পাঠ থেকে অপপাঠ) থাকে যাহাতে।* / যাহা পড়া যায় না। (ব.শ.)। ৩. পাঠের অযোগ্য, অস্পষ্টাক্ষরে লিখিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **পাঠ্য** = **পাঠ** + য। তার মানে, **পাঠ** থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, **পাঠ**-এর গুণ, বিষয়, রস, ক্রিয়া ... ইত্যাদি থাকে যাহাতে। যার মধ্যে সেসব গুণ নেই, তা **পাঠ** করা যায় না; তা সে অস্পষ্টাক্ষর হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের **পাঠ** হতে পারে, মানসিক আনন্দ দিতে পারলেও বাহ্যফললাভের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে ... এমনকি অশ্লীলও হতে পারে। তাই সেগুলি **অপাঠ্য**। এদিকে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের **পাঠের** জন্য চিহ্নিত বইপত্রকে বলা হয় **পাঠ্যপুস্তক**। সেই সুবাদে যে সকল বইপত্র স্কুল-কলেজে পড়ান হয় না, তা সে যতই সৃষ্টিশীল বইপত্র হোক না কেন, সেগুলিকে **অপাঠ্যপুস্তক** বলাও যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই ঠাট্টাটাই করেছিলেন, বলেছিলেন 'পুস্তক দুই প্রকার — পাঠ্যপুস্তক ও অপাঠ্যপুস্তক।' তাহলে **অপাঠ্য** শব্দের মানে দাঁড়াল — যে গ্রন্থাদি স্কুলকলেজের ছাত্রদের পড়তে হয় না, যে গ্রন্থাদি **পাঠ** করে কোনো বাহ্য-অর্থ (টাকা) পাওয়া যায় না, যে গ্রন্থাদি **পাঠ** করে কোনো রস-অর্থ (জ্ঞান) পাওয়া যায় না, ... ইত্যাদি। মাঝ থেকে রবীন্দ্রনাথ **অপাঠ্য** শব্দটিকে **অজয়** বা **অমূল্য**-র মতো মহা-অর্থবান করে দিলেন — 'যা এতই নিরর্থক যে পাঠ করা যায় না', তাই **অপাঠ্য**; 'যা এতই অর্থময় যে পাঠ করে তার অন্ত পাওয়া যায় না', তাই **অপাঠ্য**।

তবে কিনা, কার্যত কোন পুস্তক **পাঠ্য** আর কোন পুস্তক **অপাঠ্য**, তার অনেকটাই নির্ভর করে 'যোগী'র (= participator-এর) ওপর। স্কুলের বহু ছেলেমেয়ের কাছে রূপকথার বা কমিক্‌স্‌-এর বই **পাঠ্য**, শ্রেণীর বা ক্লাসের বই **অপাঠ্য**; যখন কিনা তাদের অভিভাবকদের অনেকের কাছেই ব্যাপারটি উল্টো। আবার, কম বয়সে যে গ্রন্থকে **অপাঠ্য** মনে হয়, অধিক বয়সে তাকেই মনে হয় অবশ্য-**পাঠ্য**। ...

পঠন, পঠদ্দশা, পঠনপাঠন, পঠনীয়, পঠিত : ১. **পঠন** = ✓পঠ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। ২. *পঠ = (জ্ঞান)-পানের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে।* ***পঠন** = **পঠ** অন (on) যাহাতে।* ***পঠদ্দশা** = **পঠ**-এর (**পঠ্**-অ-এর বা 'পঠনকারী'র) দশা।* ***পঠনপাঠন** = **পঠন** ও **পাঠন** যাহাতে।* ***পঠনীয়** = **পঠন** গতিশীল হয়ে যায় যাহাতে।* ***পঠিত** = যাহার **পঠ** গতিশীল হইয়া তারিত।* / **পঠদ্দশা** = পঠত্ + দশা = পঠত্-এর দশা = পঠতের (যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, তাহার) দশা। (ব.শ.)। ৩. **পঠন** = পাঠ, আবৃত্তি। **পঠদ্দশা** = পঠতের **দশা, ছাত্রাবস্থা**। **পঠনপাঠন** = পাঠ করা ও পাঠ করান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। **পঠনীয়** = পাঠ্য, বাচনীয়। **পঠিত** = কৃতপাঠ, অধীত। (ব.শ.)। ৪. **পঠদ্দশা** অপ্রচলিত। বাকি শব্দগুলি reading, learning অর্থে প্রচলিত। ৫. কাগজে লেখা আছে, আপনি পড়ছেন। এতে যে ক্রিয়াটি হচ্ছে, তা হল, কাগজে লেখা বর্ণগুলিকে তাদের ধ্বনিতে বদলে নিচ্ছেন। এই যে বর্ণগুলিকে ধ্বনিরূপে বদলে নিয়ে গ্রহণ করছেন, পাচ্ছেন, পান করছেন, একেই বলে **পঠ্** ক্রিয়া করা। এইরূপ পাওয়া-ক্রিয়া বা পান-ক্রিয়া টঙ্কারিত হয়ে একপ্রকার স্থিতি পাচ্ছে — একেই বলা হয় **পঠ্** ক্রিয়া। সরলভাবে বললে, উচ্চারণ করে করে পড়াকে বলা হয় **পঠ**। এই **পঠ** শব্দটি কিন্তু বাংলায় নেই, রয়েছে **পাঠ**, রয়েছে **পঠনপাঠন, পঠনীয়, পঠিত**; তবে তাদের ব্যবহার চলে প্রধানত অ্যাকাডেমিতেই। বাংলাভাষীগণ শব্দটিকে নিজেদের মতো গড়ে নিয়েছেন **পড়া** ও '**পাঠ**-করা'য়।

পড় (পড়া) : ১. ✓পত্ > পড়, পড়া। : ১. ✓পঠ্ > পড়, পড়া। (ব.শ.)। ২. ***পড়** = (জ্ঞানাদি) প্রাপণ/পান-এর গড়ান উড়ান যাহাতে।* ***পড়া** = **পড়** থাকে যাহাতে।* ৩. পতিত হওয়া, আছাড় খাওয়া, ঝরা, সংঘটিত হওয়া, ঘটা, প্রণত হওয়া, আঘাত করা ... ইত্যাদি; পাঠ করা, উচ্চারণ করা, অভ্যাস করা, অভিমন্ত্রিত করা, পাঠ করান, বিদ্যাশিক্ষা করান, শিখান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. **পড়** (**পড়া**) শব্দটি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। সংস্কৃতে **পড়** ছিল না, ছিল **পত্** (পতিত হওয়া) ও **পঠ্** (পাঠ করা)। বাংলাভাষী দুটোকেই নামিয়ে আনলেন **পড়ায়**। তারপর এই দুরকম ক্রিয়াকে একমাত্র **পড়** শব্দে এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করলেন যে, দশটি ক্রিয়া দিয়েও অত বিষয়কে বোঝানো যায় কিনা সন্দেহ! তাঁদের কাছে কেবল জড় জীবেরাই পড়ে না, বাধা পড়ে, কাজ পড়ে, মহামারী পড়ে, চরণে পড়ে, নজরে পড়ে, কাল পড়ে, উঠে পড়ে, দক্ষিণে পড়ে, বামে পড়ে, মনে পড়ে, টান পড়ে, মরচা পড়ে, ছাতা পড়ে, চর পড়ে, ডাকাত পড়ে, ধরা পড়ে, বেলা পড়ে ... এবং কী পড়ে না! ব.শ. এই **পড়** ক্রিয়ার প্রায় ৫০ রকমের ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ দিয়ে গেছেন। প্রশ্ন হল বাংলাভাষীরা এরকম করতে গেলেন কেন?

কার্যত, উপর থেকে পতিত হয়েই নিষ্ক্রিয় হয়, এমন একটিও বস্তু বা বিষয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রায় সকল বস্তু বা বিষয়ই উপর থেকে পতিত হওয়ার পর পরই অন্য কোনো না কোনো ধরনের ক্রিয়া করে বা করতে বাধ্য হয়। কেউ পতিত হয়ে আবর্তিত হয়ে থামে, কেউ পতিত হয়েই উড়তে শুরু করে, কেউবা পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে শুরু করে, ... অন্তত পক্ষে পতিত হওয়ার পরই স্থির হওয়ন ক্রিয়া করবেই। অতএব, ব্যাপারটি কার্যত শুধুমাত্র **পত্** (সত্তার পালন-পানের তারণ) থাকে না, **পড়্** (সত্তার পালন-পানের গড়ান-উড়ান) হয়ে যায়। ...

শব্দতত্ত্বের বিপ্রতীপ নিয়মে **ড়প** থেকে **পড়** এবং **পড়** থেকে **ড়প** হয়, ঠিক যেমন মা-উ থেকে **উমা**, **টিমটিম**-মিটমিট, হিংসা-সিংহ হয়। আমাদের ধারণা, নেচারের নিজস্ব নিয়মে **পড়** শব্দের গভীরে এর ধ্বনি ও অর্থের সমন্বয়টি সম্ভবত এইভাবে থাকে —

ড়প্ (গড়ান-উড়ানের প্রাপণ-পান-পালন) করে যে, সে হল **পড়্** (প্রাপণ-পান-পালন-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে); ঠিক যেমন হিংসা করে যে, সে হয় সিংহ কিংবা মা-উ করে যে, সে হয় উমা। এই **পড়্** তো আসলে < প্ + অ + ড় + র্ (= p+a/o+d+r)। একে বিপরীতভাবে লিখলে হয় ড় + র + অ + প্ (= d+r+o+p) অর্থাৎ **ড়প**। এই **ড়প**-এর উত্তরাধিকার আমাদের নেই, রয়েছে ইংরেজির — drop। এর অর্থ 'পড়া' বা 'পতিত হওয়া'।

কিন্তু **পঠ** কেমন করে **পড়** হল, তা সহজে বোধগম্য হতে চায় না; তবে একটু আঁচালেই ক্রমে বুঝতে পারা যায়। 'আপনার **অবগতি**র জন্য জানান যাচ্ছে ... ইত্যাদি' কিংবা 'আপনি **অবহিত** আছেন যে ... ইত্যাদি' — বাংলায় এরকম বাক্য প্রায়শই বলা হয়ে থাকে। এই বাক্যে **অবগতি** বা **অবহিত** শব্দটি 'জানতে পারা'র সমার্থক। (দ্র. ১ম খণ্ড, ৩৩ ও ৩৫ পৃষ্ঠা)। ইংরেজিতে একে বলে under-stand। কোনো বিষয়ে আপনার নেওয়া stand বা ধারণা কাউকে বলে দিলে সে যদি তা জানতে-বুঝতে পারে, তখন সে আপনার ধারণাটিকে under-stand করে বা **অবগত** কিংবা **অবহিত** হয়। তার মানে তার বোধ আপনার চেয়ে একটুখানি অধঃপতিত। এই under-standing কিন্তু learning-এর সমতুল নয়, তার চেয়ে নীচে। কেউ যখন কোনো কিছু **পাঠ** করে, তখন ওই 'কিছু' তার মনের ভিতরে পতিত হয়, তার মনে **পড়ে**, হৃদয়ঙ্গম (হৃদয়ে গমন) হয়; কিন্তু সেখানেই তা থেমে থাকতে নাও পারে। অতঃপর তার **অবগত** বিষয়টি তাকে অন্য কোনো চিন্তায় বা কর্মে উদ্বুদ্ধ করে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই **পঠ** করলে খানিকটা নীচে যাওয়া বা **পড়া** হয়, **পাঠ** (**পঠ** হইতে জাত) করা হয়। এই **পড়া**র ফলে কেউ নীচে অধঃপতিত হয়ে স্থির থাকতে পারে, আবার তেমন তেমন বিষয় হলে তা **পড়ে** তার মন উড়তে শুরু করতে পারে। ... সেই কারণে বাংলাভাষায় **পত্** ও **পঠ্** উভয়কেই **পড়া**য় উত্তীর্ণ করে নেওয়া হয়েছে। **৬.** ইংরেজি drop।

পড়তা, পড়তি, পড়ন, পড়ন্ত, পড়পড়, পড়া, পড়াশুনা (পড়াশোনা) : ২. ***পড়তা*** *=* ***পড়ন*** *তারিত যাহাতে তাহার আধার।* ***পড়তি*** *=* ***পড়ন****-এর গতিশীলভাবে তারণ (থাকে যাহাতে)।* ***পড়ন*** *=* ***পড়*** *অন (on) যাহাতে।* ***পড়ন্ত*** *=* ***পড়ন*** *তারিত হইতেছে (যাহাতে)।* ***পড়পড় (পড়োপড়ো)*** *=* ***পড়*** *বারংবার যাহাতে, যাহা* ***পড়া****র উপক্রমে আছে।* ***পড়া*** *=* ***পড়****-এর আধার যে।* ***পড়াশুনা (পড়াশোনা)*** *=* ***পড়া*** *ও* ***শোনা****।* / **পড়তি** = মালের যে অংশ নাড়া-চাড়ায় পড়ে। **পড়ন্ত** = যাহা পড়িতেছে, যাহার তেজ কমিতেছে। **৩. পড়তা (পড়ন)** = মালের প্রত্যেকের হিসাব তৈয়ার করা — খরিদ করা ও আনা ইত্যাদির খরচ, মাথা পিছু প্রত্যেকের অংশ, সৌভাগ্যোদয়, খেলায় অভিমত দান পড়া, কোনো বিষয়ের অনুকূল সময়। **পড়তি** = অবনতি। **পড়পড় (পড়োপড়ো)** = বেগে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগতি অস্ত্রের শব্দ, পড়ার মতো। **পড়া** = পতিত, স্থিত, পঠিত, অধীত, অভিমন্ত্রিত, পাঠ, আবৃত্তি, পাঠ্য বিষয়। **পড়াশুনা (পড়াশোনা)** = অধ্যয়ন ও গুরু-উপদেশ শ্রবণ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. পড়ন** বলতে পড়া অন থাকা। বইয়ে ছাপা লেখা ইত্যাদি **পড়ন** যেমন হয়, তেমনি উপর থেকে কোনো কিছুর **পড়ন**ও হয়; অর্থাৎ **ওত**। একে 'উর্দ্ধ'ও বলা হয়। এই **পড়ন (পড়েন)** শব্দটি তাই বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্র. **টানাপড়েন (টানাপড়ন)**। বিষয়টি বোঝাতে তিন-তিনটি শব্দ (**উর্দ্ধ-তির্য্যক, ওতপ্রোত, টানাপোড়েন**) বাংলায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও একালের শিক্ষিত বাংলাভাষীদের অধিকাংশই সেই বাংলা শব্দগুলি বলতে পারেন না; তাঁরা বলেন horizontal-vertical। একালের বাংলা অ্যাকাডেমিগুলির বাংলা শেখানোর ফল এরকমই হয়েছে!

পাঠ, পাঠক, পাঠন, পাঠনা, পাঠশালা, পাঠান্তর, পাঠিত, পাঠী, পাঠীন, পাঠ্য, পাঠ্যজাতি, পাঠ্যপুস্তক : ১. ✓দ + অ **২.** ***পাঠ*** *=* ***পঠ*** *হইতে জাত।* ***পাঠক*** *=* ***পাঠ*** *করে যে।* ***পাঠন*** *=* ***পাঠ*** *অন (on) যাহাতে।* ***পাঠনা*** *=* ***পাঠন****-এর আধার যে।* ***পাঠশালা*** *=* ***পাঠ****-ক্রিয়া চলে যে* ***শালা****য়।* ***পাঠান্তর*** *=* ***পাঠ****-এর অন্তর যাহাতে।* ***পাঠিত*** *=* ***পাঠ*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***পাঠ্য*** *=* ***পাঠ*** *আছে যাহাতে।* ***পাঠ্যপুস্তক*** *=* ***পাঠ্য*** *যে পুস্তক।* / **পাঠক** = পাঠ করে যে (পাঠকর্ত্তা); পুরাণাদি বাচন করে যে (পুরাণাদিবাচক)। (ব.শ.)। **৩. পাঠ** = পঠন, পড়া, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মযজ্ঞ, পাঠ্য, মূলগ্রন্থ (text), অধ্যাপনা। **পাঠক** = পাঠকর্ত্তা, ছাত্র, শিষ্য, পুরাণাদিবাচক, অধ্যাপক, উপাধ্যায়, ধর্ম্মভাণক, উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। **পাঠন, পাঠনা** = অধ্যাপনা। **পাঠান্তর** = অন্য পাঠ, পৃথক পাঠ, বিরোধ, শত্রুতা, প্রভেদ। **পাঠিত** = অধ্যাপিত, শিক্ষিত। **পাঠ্য** = পঠনীয়, অধ্যেতব্য, গেয়। **৪.** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পড়া**। উচ্চারণ করে পড়াকে বলে **পঠ**। সেই **পঠ** হইতে মানে বোঝা হয়, জানা হয়, রসলাভ হয়, পড়ানও হয় ... এবং আরও অনেক কিছু হয় বা হতে পারে। এ-সবগুলিই **পঠ** হইতে জাত বলে, এগুলিকে **পাঠ** বলে। অতএব **পাঠক** শুধুমাত্র লিপিকে শব্দে পরিবর্তিত করে **পঠ** করতেই পারেন না, বুঝতে পারেন, রসগ্রহণ করতে পারেন, বোঝাতে পারেন ... ইত্যাদি। তাই তিনি **পঠক** নন, তিনি **পাঠক**। তাঁর ক্রিয়াটি তাই **পাঠন** ক্রিয়া। সেই ক্রিয়া যেখানে যান্ত্রিকভাবে পুনঃ পুনঃ একইরকম চালান হয়, তাকে বলে **পাঠশালা**। এই যান্ত্রিক **পাঠন** শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, তার শেষ দেখিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্র. **অপাঠ্য**। এ প্রসঙ্গে একথা এখন স্মরণ করা একান্ত জরুরি যে, একালের প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কামারশালা, পাকশালার মতো কার্যত **পাঠশালা**য় পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা' নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাড়, পাড়ন, পাড়া, পাড়াগ্রাম, পাড়াপড়শী, পাড়াপাড়ি, পাড়ি (পাড়ী), বাটপাড়, বাটপাড়ী : ২. ***পাড়*** *=* ***পড়*** *হইতে জাত।* ***পাড়ন*** *=* ***পাড়*** *অন (on) যাহাতে।* ***পাড়া*** *=* ***পাড়****-এর আধার যে।* ***পাড়াগ্রাম*** *=* ***পাড়া*** *ও* ***গ্রাম****।* ***পাড়াপড়শী*** *= একই* ***পাড়া****র প্রতিবেশী বা পড়শী যে।* ***পাড়াপাড়ি*** *= দ্র.* ***কেশাকেশি****।* ***পাড়ি (পাড়ী)*** *=* ***পাড়*** *গতিশীল থাকে যাহাতে।* / **পাড়ন** = যাহা পাড়া যায়, যাহাতে

পাড়া যায়। **পাড়াগ্রাম (পাড়াগাঁ)** = পাড়ার মতো গ্রাম বা গাঁ। (ব.শ.)। **৩. পাড়** = নদী-প্রভৃতির তীর, তট, কূল, প্রান্ত, উচ্চস্থান, ঢেঁকি উঠানর নিমিত্ত ঢেঁকির পিছনে পদাঘাত, পাতিত, নীচু, পাতিত করা, পাড়া, ফেলা, শায়িত করা, আকর্ষণপূর্ব্বক নামান, হিঁচড়াইয়া আনা, নামান, নিহিত বা স্থাপিত করা, পাতা, সংঘটিত করা, ঘটান ... ইত্যাদি। (তাছাড়া গালি-পাড়া, পচাল-পাড়া, ডাক-পাড়া, ডিম-পাড়া, নাম-পাড়া, বাটে-পাড়া, লাজে-পাড়া, ঘুম-পাড়ান ... ইত্যাদিও রয়েছে।)। **পাড়ন** = পাতন, অস্ত্রপাতন বা অস্ত্রাঘাত, আস্তরণ, চাদর, আধার, পাটাতন, ঢেঁকির গড়কাঠ। **পাড়া** = পাতিত করা, গ্রামের অংশ, পল্লী, বিভাগ, পাড়ার অধিবাসী, প্রতিবেশী ভাব, বাসস্থান। **পাড়াগ্রাম (পাড়াগাঁ)** = ছোটগ্রাম, পল্লীগ্রাম। **পাড়াপড়শী** = পাড়াবাসী, প্রতিবাসী। **পাড়াপাড়ি** = মল্লযুদ্ধে জয়েচ্ছায় পরস্পরকে পাতিত করা বা পাড়িয়া ফেলা, পুনঃপুনঃ পাড়া বা পাতা, তোলাপাড়া। **পাড়ি (পাড়ী)** = নদী-প্রভৃতির তীর, জলাশয়ের তট, নদী-প্রভৃতির পরপারে উত্তরণ, উভয় পারের মধ্যস্থ নদী-প্রভৃতির বিস্তার বা পাতা, পাতিত করা, পাড়ন, আস্তরণ ... ইত্যাদি। বাট**পাড়,** বাট**পাড়ী** = দ্র. **বাট, বাটপাড়**। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** শব্দার্থতত্ত্বের নিজস্ব নিয়মে **পড়** করা বা পতিত করাকে বলে **পাড়,** অর্থাৎ যা **পড়** (ক্রিয়া বা শব্দ) হইতে জাত। আর সে তো ঠিকই। যা কিছু উপরে রয়েছে, সেগুলি যদি উপর থেকে নীচে না পড়ে, অথচ সেগুলিতে যদি আমাদের প্রয়োজন থাকে, তবে তো সেগুলি যাতে নীচে আমাদের পাওয়ার এলাকার ভূমিতে পতিত হয়ে যায় বা **পড়ে** যায়, তার ব্যবস্থা করতেই হয়। আর তা করলেই **পড়** হয়ে যায় **পাড়,** অর্থাৎ পতিত করা বা **পাড়ন** করা, অর্থাৎ **পাড়া** বা **পেড়ে** আনা। কিন্তু এই **পাড়** তো কেবল **পতন** ঘটানো নয়, **পঠন** ঘটানোও বটে। সেই কারণে নামানো মাত্রেই যেমন **পাড়া** হয়, তেমনি **উৎ-চারণ** (উচ্চারণ করে **পড়া**) মাত্রেও **পাড়া** হয়ে যায়। স্বভাবতই নামানো অর্থে আম পাড়া, জাম পাড়া, ডিম পাড়া, বাটে পাড়া, লাজে পাড়া ... এমনকি ঘুম পাড়া (দ্র. **ঘুমপাড়ানি**) যেমন হয়, তেমনি উচ্চারণ করা অর্থে গালি-পাড়া, পচাল-পাড়া, ডাক-পাড়া, নাম-পাড়া ... ইত্যাদিও হয়। কিন্তু এই যে **চারণ** করা, এ তো সত্তার আপন পরিধির বাইরে **পাঠান**ও বটে। এও তো **পেড়ে** নিজের পরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়া। তাই একেও বলে **পাড়** — শাড়ির **পাড়,** নদীর বা পুকুরের **পাড়** ... ইত্যাদি (দ্র. **পট**)। মূল গ্রামের থেকে কোনো গোষ্ঠীকে গ্রামের এক প্রান্তে বসতি করতে দিলে সেটিও তাই **পাড়া** — কায়েত **পাড়া,** সর্দার **পাড়া** ... ইত্যাদি। এই বিচারে **পাড়াগ্রাম** বা **পল্লীগ্রাম** হল মূল গ্রামের বাইরের দিকে পল্লবিত গ্রামাংশ, অর্থাৎ গ্রামের বাইরে বসান নতুন গ্রাম। আগের কালে জমিদাররা প্রায়শই নিজেদের লেঠেলদের পৃথক **পাড়া** বসাতেন। তবে **পাড়** বললে যদি **পা**-এর গড়ান-উড়ান ভাবা হয়, তাহলে **পাড়ান** হয়ে যায় 'পা-এর গড়িয়ে বা উড়ে চলা', আর তা অন্যকে পা দিয়ে মাড়ানও হতে পারে। কিন্তু তা যদি গতিশীল হয়ে **পাড়ি** হয়ে যায়, তখন সেই পরিধির বাইরে যাওয়ার ক্রিয়া হয়ে যায় **পাড়** টপকে যাওয়া বা উত্তীর্ণ হওয়া।

পণ্‌ (পন্‌) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা **:** আঁদাড়-পাঁদাড়, আপণ, আপণিক, আপরুচি, আপাণ্ডু, আপাণ্ডুর, আপুনি, চক্রপাণি, দণ্ডপাণি, পঁদ (pond), পঁদমারা, পঁদু, পঁদে-পঁদে, পঙ্গু, পঙ্গুজন, পণ্‌, পণ (pawn, বন্ধক), পণকীয়া, পণিকা, পণন, পণবন্ধ, পণা, পণাঙ্গনা, পণাপণ, পণিত, পণিতা, পণী, পণ্ড, পণ্ড (পৌণ্ড, pound, দ্র. পাউণ্ড) পণ্ডা, পণ্ডিত, পণ্ডিতমণ্ডল, পণ্ডিতম্মন্য, পণ্ডিতবাদী, পণ্ডিতসভা, পণ্ডিতানি, পণ্ডিতী, পণ্য, পণ্যপতি, পণ্যবীথিকা, পণ্যশালা, পণ্যযোষিৎ, পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা, পণ্যাজীব, পন্‌, পনই, পনবাহা, পনস, পনসা, পনা, পনি, পনির, পন্ত, পন্থ, পন্থ-বিপন্থ, পন্থা, পন্থিক, পন্থী, পন্নগ, পন্নগকেশর, পন্নগারি, পন্নগাশন, পন্নগী, পনপন, পাঁও (pan, o, pantry), পাঁড় (পাণ্ড-া), পাঁড়ে, পাঁদ (পাদ, বাতকর্ম্ম), পাঁদাড় (পঁদ, পঁদের আড়), পাণ, পাণি, পাণিগৃহিত্রী, পাণিগৃহীতী, পাণিগ্রহণ, পাণিগ্রাহ, পাণিঘাত, পাণিজ, পাণিতল, পাণিধর্ম্ম, পাণিনি, পাণিনীয়, পাণিন্ধম, পাণিশঙ্খ, পাণিপাত্র, পাণিপাদ, পাণিপীড়ন, পাণিপুট, পাণিবন্ধ, পাণিবাদক, পাণিমুক্ত, পাণ্ডব, পাণ্ডববর্জ্জিত, পাণ্ডবীয়, পাণ্ডবেয়, পাণ্ডর, পাণ্ডা, পাণ্ডিত্য, পাণ্ডু, পাণ্ডুক, পাণ্ডুকম্বল, পাণ্ডুকী, পাণ্ডুতরু, পাণ্ডুপতি, পাণ্ডুবিজয়, পাণ্ডুভূম, পাণ্ডুমৃত্তিকা, পাণ্ডুয়া, পাণ্ডুর, পাণ্ডুরিত, পাণ্ডুরোগ, পাণ্ডুল, পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ, পাণ্ডুসোপাক, পাণ্ডে, পাণ্ড্য, পান্থ, পান্থশালা, পান্দাড়, পেন্টুলন, পেনটুলন, পোঁদ, পোঁদপিছেলি, বিপণন, বিপণী, বীণাপাণি, শূলপাণি।

পণ্‌ (পন্‌) = পায়ীর রহস্যরূপের বোধন। **পণ** = পায়ীর রহস্যরূপের বোধন যাহাতে। **পন** = পায়ীর নাকরণ-অনকরণ যাহাতে।

আপণ (আপণিক, বিপণি) : ১. আ + ✓পণ্‌ + অ (ঘ) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***আপণ*** = ***পণ****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***আপণিক*** = ***আপণ****-কে গতিশীল করে যে।* ***বিপণি*** *= যে স্থান থেকে* ***বি-পণন*** *করা হয়। /* **আপণ** = যে স্থানে ক্রয়বিক্রয় করা হয়। **আপণিক** = আপণ হইতে আগত বা প্রাপ্ত (করাদি)। **বিপণি** = যে স্থানে বিক্রয় করা হয়। (ব.শ.)। **৩. আপণ** = ক্রয়বিক্রয়স্থান, পণ্যস্থান, পণ্যশালা, বিপণি, দোকান, পণ্যপ্রসারণস্থান, হট্ট, হাট। **আপণিক** = আপণসম্বন্ধী, ব্যবহারিক, বণিক, ব্যবসায়ী, দোকানদার, আপণের অবক্রয় (রাজগ্রাহ্য দ্রব্য), হট্টাদির রাজকরদ্রব্য, হাটের বা বাজারের তোলা। **বিপণি** = পণ্যবিক্রয়শালা, দোকান, হট্ট, বাজার, হট্টমণ্ডপ, হাটচালা, হট্টমধ্যস্থ পণ্যবিক্রয়বীথী বা দোকানসমূহ। (ব.শ.)। **৪. আপণ** 'দোকান' অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত, **আপণিক** অপ্রচলিত। **৫.** যেখানে 'তুমি এই বস্তু দিলে আমি এই বস্তু দিব' এইরূপ **পণ (সত্যঙ্কার)** করা হয়, সেই স্থানকে **আপণ** বলে; 'কেবল দেওয়া' কিংবা 'কেবল নেওয়া' সেখানে চলে না, দুটোই চলে। অর্থাৎ **আপণ** হল লেন-দেনের স্থান। কারণ, সে হল **পণ**-এর আশ্রয়, তাই **আপণ**। সেই বিচারে বলতে হয়, যেখান থেকে **পণ্য** শুধুমাত্র বিক্রয় হয়, যেখান থেকে পরিবর্তে বা অন্য কোনোভাবে কোনোকিছু কেনাকাটা করা হয় না, তাকেই **বিপণি** বলে। দ্র. **নিষণ্ণ, নিষদ্যা।**

পণ (পণন, পণবন্ধ, পণা, পণাঙ্গনা, পণিত, পণিতা) : ১. **পণ** = ✓পণ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পণ*** = *পায়ীর রহস্যরূপের বোধন যাহাতে; সত্তার আপন অভাব (অবকাশ) পূরণের বোধ যাহাতে।* ***পণন*** = ***পণ*** *অন (on) যাহাতে।* ***পণবন্ধ*** = ***পণ*** *দ্বারা বদ্ধ (যে চুক্তি)।* ***পণা*** = ***পণ****-এর আধার যে।* ***পণাঙ্গনা*** = ***পণ*** *দ্বারা লভ্য যে অঙ্গনা।* ***পণিত*** = ***পণ*** *গতিশীল রূপে তারিত যাহাতে।* ***পণিতা*** = ***পণিত****-এর আধার যে।* / **পণ** = স্তবনীয় বা যাহার স্তব করা হয়; বিবাহে যে অর্থ কন্যাকে বা বরকে দেওয়া হয়। **পণবন্ধ** = 'যদি তুমি ইহা কর, তবে তোমাকে ইহা দিব' — এইরূপ সময়করণ (যাহাতে)। **পণাঙ্গনা** = পণ দ্বারা লভ্যা যে স্ত্রী। (ব.শ.)। ৩. **পণ** = ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি, বিক্রয়ার্থ মূলকাদির পরিমিত বদ্ধ মুষ্টি বা আটি, ক্রয়বিক্রয়দ্রব্য, দ্যূতে পণনীয় দ্রব্য, বাজি, কর্ষপরিমিত তাম্র, সময় (agreement), অশীতি বরাটক, কুড়ি গণ্ডা কড়ি, কার্যাপণ, মূল্য, ভৃতি, বেতন, ধন, ক্রয্যশালা, বিপণী, দোকান, গৃহ, বিক্রেতা, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), বিষ্ণু, দ্যূত, অক্ষক্রীড়া, কুড়ি গণ্ডা দ্রব্যমাত্র। **পণন** = ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি। **পণবন্ধ** = সন্ধি, ফলসিদ্ধি। **পণা** = বিক্রয়ার্থ মূলকাদির পরিমিত বদ্ধ মুষ্টি বা আটি। **পণাঙ্গনা** = পণ্যস্ত্রী, বেশ্যা। **পণিতা** = বিক্রেতা। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় শব্দগুলির কিছু কিছু ব্যবহার থাকলেও অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতদের মধ্যে শুধুমাত্র promise অর্থে **পণ** শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **অক্ষক্রীড়া** (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৮), **প্রতিজ্ঞা, অর্পণ, আপণ, পণ্য**। স্কুল-কলেজে পড়ান হয় **পণ** মানে **প্রতিজ্ঞা**। তার মানে **জ্ঞা**-এর বিপরীতে যে **জ্ঞা**, তাই হল **প্রতি-জ্ঞা** বা **পণ**। তুমি আমাকে একটা গরু দিলে, আমি তোমাকে তিনটা ছাগল দিব — এই হল **প্রতিজ্ঞা**। একটা গরু দিতে চেয়েছ, এটা হল **জ্ঞা**, আমি তোমাকে তিনটা ছাগল দিব, এই হল **প্রতিজ্ঞা** বা **পণ**। কিন্তু এ তো বিনিময় হয়ে গেল! সম-অয়করণ (= agreement) হয়ে গেল, উভয় পক্ষের **আয়**-করণ হয়ে গেল! অর্থাৎ, **পণ** শব্দের নিহিতার্থ হল 'নিচ্ছি যখন অবশ্যই দেব', এইরূপ নিশ্চিত **অঙ্গীকারকরণ**। অতএব **পণ**-অন বা **পণন** করা মানেই 'লেন-দেন করা' এবং বিশেষ্যার্থে **পণ** মানে 'লেন-দেন'।

হ্যাঁ, মানবসমাজে এইরূপ **পণ**-এর মাধ্যমে **আয়**-এর সূচনা হয় **বিনিময়**-প্রথার সূত্রপাত থেকে। তবে এই বিনিময়-প্রথার প্রচলন খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না; অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তিতিক্ষা, সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এক দিকে সমাজ-সংহতির ক্ষেত্রে শিবতার নীতি অনুসরণ করে যৌথসমাজ (বৈদিকসমাজ) তখনও চলছে, অন্যদিকে দক্ষতার নীতি অনুসরণ করে উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালানো শুরু হয়ে গেছে। ফলে, এক একটি সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর কিছু কিছু উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার কিছু গতি করা যাচ্ছে না। কারণ শিবতার নীতিতে যৌথসমাজ চলার কারণে সেই উৎপন্নকে চাইলেও অন্যকে দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না; উদ্বৃত্তকে 'আবর্জনা নিক্ষেপস্থানে' ফেলে দিতে হচ্ছে, কিংবা দিতে গেলে এমনি এমনিই দিয়ে দিতে হয়; 'বিনিময়ে দেওয়া' ব্যাপারটিতে মানুষ সম্পূর্ণ অনভ্যস্তও বটে। কেননা, তখনও **নিষন্ন, নিষদ্যা** (পণ্যবিক্রয়-শালা) গড়েই ওঠেনি, এমনকি তদ্রূপ মানসিকতাও জনসাধারণ্যে গড়ে ওঠেনি। ফলে, কাউকে কিছু দিলে, সে যে পরিবর্তে সমান কিছু দেবে, জনমানসে তার ধারণাই নেই, দেওয়া তো দূরের কথা। আজকের আগাপাছতলা পণ্যবাহী সমাজে আমরা বাস করি বলে আমাদের মন এতই দশাপ্রাপ্ত (conditioned) হয়ে গেছে যে, ওইরকম সামাজিক পরিস্থিতির কথা একালের মানুষ আমরা ভাবতেই পারি না। ...

তা সে যাই হোক, **পণ**-এর ভিতরে যে ক্রিয়াটি রয়েছে আমরা এখন সেটিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝবার চেষ্টা করব। আমার মনোভূমিতে একটি অভাব (অবকাশ) রয়েছে যার চেহারা 'ক' আকৃতির গর্তের মতো; আর একটি উদ্ভাব (উদ্বৃত্ত) জন্মেছে যার চেহারা 'খ' আকৃতির ফোঁড়ার মতো। একইরকম ঘটনা ঘটেছে আপনার মনোভূমিতেও। এমতাবস্থায় আমি আপনি দুজনেই বুঝতে পারছি যে, আমার অভাব আপনার উদ্বৃত্তের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে এবং আপনার অভাব আমার উদ্বৃত্তের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। এখন যদি সেই পারস্পরিক অভাবের ফাঁকটি পূরণের জন্য আমরা উভয়েই স্থিরনিশ্চয় করি যে, আমরা যে-সামাজিক গোষ্ঠীতে থাকি, তারা না চাইলেও আমরা উভয়েই নিজের নিজের কথা (চুক্তি) রাখব, তখনই **পণ** করা হয়। বিনিময় করতে হলে এই **পণ** করা একান্তই আবশ্যক হয়ে দেখা দিয়েছিল। আদিম অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক যৌথসমাজের (বৈদিকসমাজের) সামাজিক নিয়মের নিগড় থেকে বেরোতে হলে এইভাবে **পণ** করা ছাড়া উপায় ছিল না। ...

এই **পণ** তিন রকম। মানুষের অভাব যেহেতু তিন রকমের — দৈহিক, মানসিক, ও দৈহিক-মানসিক — **পণ**ও মূলত তিনরকম হয়ে থাকে। রাম শ্যামের গা মালিশ করে দিলে, শ্যাম রামের উকুন বেছে দেবে — এটা হল দৈহিক **পণ**। রাম শ্যামকে একটি গান শোনালে, শ্যামও রামকে একটি কথকতা শোনাবে — এ হল মানসিক **পণ**। আর, রাম শ্যামকে একটি খাট বানিয়ে দিলে, শ্যামও রামকে ১০টা রুইমাছ দেবে — এ হল দৈহিক-মানসিক **পণ**। তবে কিনা এসবই হল বিনিময়, এতে উৎপন্ন **পণ্যে** পরিণত হয় না, এই **পণ** গঙ্গাধারায় বা **পণ্যধারায়** স্খালন করে (পাপস্খালন করে) **পুণ্য** অর্জন করা যায় না। তার জন্য মর্তলোকে **গঙ্গা** আনয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। দ্র. **পণ্য, পুণ্য**।

তবে **পণ** শব্দের এই অভিধা-অর্থের ব্যবহার এইখানে থেমে থাকেনি। যে কোনো কাজ করার জন্য আমরা যখন মনপ্রাণ এক করে কাজ করি, তখনই বলা হয়, '**পণ** করেছি, অমুক করব।' এই যে **পণ**, এ কিন্তু **পণ** শব্দের লক্ষণা-অর্থ। অভিধা-অর্থটির বারংবার ব্যবহার এরূপ লক্ষণা-অর্থের জন্ম দিয়েছে। সেই কারণে এই অর্থের সঙ্গে **পণ** শব্দটির নিহিত অর্থের সরাসরি সম্পর্ক নেই। সেকালের মানুষ প্রাণ দিয়েও **পণ** রক্ষা করত বলে জনসাধারণ্যে এই বিশ্বাস ক্রমে বলবৎ হয়ে যায় যে — কোনো কাজের **পণ** যখন কেউ করেছে, তখন কাজটা সে করবেই; তা সে **পণ** লেন-দেনের কাজ হোক আর অন্য কোনো কিছু করার কাজই হোক। দ্র. **পণ্য, পান**। ৬. ইংরেজিতে **পণ** শব্দের উত্তরাধিকার রয়েছে pawn শব্দে।

পণ্য (পণ্যপতি, পণ্যবীথিকা, পণ্যশালা, পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা, পণ্যাজীব) : ১. ✓পণ্ + য (যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পণ্য***

= *পণ থাকে যাহাতে।* ***পণ্যপতি*** *=* ***পণ্যের*** *পতি যে।* ***পণ্যবীথিকা*** *=* ***পণ্যের*** *বিশেষ উপস্থাপন থাকে যেখানে।* ***পণ্যশালা*** *=* ***পণ্যের শাল****-এর আধার।* ***পণ্যস্ত্রী*** *=* ***পণ্য****রূপে যে স্ত্রী (লভ্যা)।* ***পণ্যাঙ্গনা*** *=* ***পণ্য****রূপে যে অঙ্গনা (লভ্যা)।* ***পণ্যাজীব*** *=* ***পণ্য*** *আজীব (জীবিকার আশ্রয়) যাহার। /* **পণ্য** = যাহাকে ক্রয় (বা) বিক্রয় করা হয় (ক্রয়বিক্রয়ার্হ বস্তু)। **পণ্যাজীব** = পণ্য বিক্রয় বৃত্তি যাহার। (ব.শ.)। **৩. পণ্য** = ব্যবহর্ত্তব্য, বিক্রেতব্য, বিক্রেতব্য বস্তু। **পণ্যপতি** = বণিক। **পণ্যবীথিকা** = পণ্যবিক্রয়স্থান, বিপণি, দোকান, হাট, বাজার, হাটখোলা। **পণ্যশালা** = বিপণি। **পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা** = বেশ্যা। **পণ্যাজীব** = বণিক, সওদাগর। (ব.শ.)। **৪.** কেবলমাত্র **পণ্য** শব্দটি commodity অর্থে অ্যাকাডেমিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, বাকি প্রায় সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। তাদের পরিবর্তে সেখানে এসে গেছে ইংরেজি শব্দ — goods, ware, shop, shoping mall, market, retailer, bussinessman ... ইত্যাদি। **৫.** দ্র. **প্রেত, আতিবাহিক**। **পণ** রয়েছে যে বস্তু বা বিষয়ে, যা দেওয়ার বা নেওয়ার জন্য **পণ** (pawn) করা যায়, তাকে বলে **পণ্য**। ইংরেজিতে এই **পণ্য**কে বলে commodity। বাংলা **পণ্য** শব্দের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, মানুষের মুখের কথা ও কাজে কোনো ফারাক হয় না; এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই ভারতবর্ষে আদি **পণ্য**-বিনিময়ের সূচনা হয়েছিল। ইংরেজি commodity শব্দে এরকম বিশ্বাস নেই। **পণ্য** মানবসভ্যতার আত্মমর্যাদাবোধ হ্রাস করে না, commodity করে। সেই কারণে **পণ্য**-জাত **পুঁজি** লক্ষ্মীপুঁজিতে উত্তীর্ণ হতে পারে, কিন্তু commodity-জাত পুঁজি তা পারে না, কুবের-পুঁজিতে পর্যবসিত হয়ে যায়। ... দ্র. **পুষ্প, উত্তানপাদ, মাল, গু, কোণ, দাম, পুঁজি**।

যাই হোক, আমরা (দ্র. **পণ**) দেখেছি নিজের উদ্বৃত্তকে অন্যের অভাবের ফাঁক পূর্ণ করার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সূচনা হয় **পণ** দেওয়া-নেওয়ার; বিনিময়ের প্রচলন হয়। কিন্তু তাতে আর যাই হোক, উৎপন্ন 'স্বাধীন' হতে পারে না, অর্থাৎ, যৌথসমাজের নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তিলাভ করে উৎপন্ন **পণ্যে** পরিণত হতে পারে না। তা হতে পারে কেবল তখনই যখন (ক) উৎপাদক তার উৎপন্ন যাকে খুশি তাকে দিতে পারার স্বাধীনতা লাভ করে; (খ) যখন সমাজে 'স্বাধীন-উৎপন্নের ধারা' বা **পণ্য**ধারা (গঙ্গাধারা) প্রবাহিত হয়ে গেছে; (গ) যখন সেই প্রবাহে 'সাধারণ-পরিবর্ত রূপে 'পবিত্রতাসম্পাদক-পদার্থ' (= **পুণ্য**) বা **অর্থ** (= money) প্রচলিত হয়ে গেছে; একালের অর্থনীতিবিদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'বিনিময়ের মাধ্যম'-এর প্রচলন; এবং (ঘ) জনসাধারণকে বোঝানো গেছে যে, ঐ **গঙ্গায়** স্নান করা খুব ভাল, শুভ, **পুণ্য**দায়ক, মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক; অর্থাৎ কিনা জনমানসে দর্শনের বদল ঘটানো গেছে; অখণ্ড **আধ্যাত্মিকতা** থেকে খণ্ডদর্শনের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ঘটে গেছে।

এইরকম কমপক্ষে চার-চারটি পরিস্থিতি না থাকলে উৎপন্ন **পণ্যে** পরিণত হতে পারে না; সমাজে উৎপন্ন থাকে কিন্তু বিনিময়ের জন্য বা **পণ** করার জন্য কোনো **পণ্য** থাকে না। একালের অর্থনীতির ভাষায় তাই বলা হয় — কেবলমাত্র বিনিময়ের উদ্দেশ্য উৎপাদিত বস্তু বা বিষয়কেই **পণ্য** (= commodity) বলে। অর্থাৎ কিনা, সব পণ্যই উৎপন্ন; কিন্তু সব উৎপন্ন **পণ্য** নহে। ...

পণ্ড (পণ্ডা, পণ্ডিত, পণ্ডিতম্মন্য, পণ্ডিতবাদী, পণ্ডিতানি, পণ্ডিতী, পাণ্ডা) : **১.** ✓পণ্ড্‌ (গতি) + অ (অচ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. পণ্ড** = *পণ ডয়িত (উড্ডয়ন-কৃত) যাহাতে।* ***পণ্ডা*** *=* ***পণ্ড****-এর আধার যে।* ***পণ্ডিত*** *=* ***পণ্ড*** *(পণ-ড করিবার বুদ্ধি) গতিশীল রূপে তারিত যাহাতে।* ***পাণ্ডা*** *=* ***পণ্ডা*** *হইতে জাত। /* **পণ্ড** = যাহা বিফলতায় গত হইয়াছে। **পণ্ডিত** = যাহা হইতে পণ্ড সঞ্জাত (হইয়া থাকে); 'সঞ্জাতপণ্ড'। **পণ্ডিতম্মন্য** = যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে। **পণ্ডিতবাদী** = যে পণ্ডিতের মতো কথা বলে। (ব.শ.)। **৩. পণ্ড** = বিফল, ব্যর্থ; নপুংসক। **পণ্ডা** = তর্কসাহিত্যসিদ্ধান্তবেদান্ত-গামিনী বুদ্ধি, বুদ্ধি, তত্ত্বানুগাবুদ্ধি। **পণ্ডিত** = বুদ্ধিমান, কুশল, নিপুণ, প্রগল্‌ভ, চতুর, বিদগ্ধ, বিদ্বান, বুধ, জ্ঞানী, শিব, সিহ্লক, ব্রাহ্মণের উপাধি, ধর্ম্মের পুরোহিত। **পণ্ডিতম্মন্য** = পাণ্ডিত্যাভিমানী, ব্রহ্মবিদগণের বহুমাননীয়। **পণ্ডিতানি** = পণ্ডিতের স্ত্রী। **পণ্ডিতী** = পণ্ডিতের কর্ম্ম, পাণ্ডিত্য। **পাণ্ডা** = তীর্থস্থানের পুরোহিত, পূজারী, (গৌণার্থে) প্রধান উদ্যোগী, গোঁড়া, সরদার, মোড়ল। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ভাবুন, আমরা একটি যৌথসমাজে বাস করি, যেখানে আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু (ধরা যাক, ধান) উৎপাদন করার কর্মকাণ্ড করছি। কয়েকজন বলল, 'আমাদের ভাগের ফসলটা আমরাই তো পাব, আমাদের সেটা এখনই দিয়ে দেওয়া হোক।' সেই আন্দাজে কয়েক বস্তা ধান তাদের দিয়ে দেওয়া হল এবং তারা তা নিয়ে অপেক্ষারত এক পাইকারকে বেচে দিল। যে কয়জন তাদের ভাগের উৎপন্ন এইভাবে **পণ** করে ডয়ন (**পণ্‌-ড** বা **পণ্ড**) করল, **পণ** করে নিজেদের **পণ্য** অন্যকে বেচে দিল, তারা তো তাদের কর্মফল (পরিবর্ত বস্তু, টাকা ইত্যাদি রূপে) ভালভাবেই পেয়ে গেল; কিন্তু এই প্রক্রিয়া ক্রমে ক্রমে যৌথ-উৎপাদন-কর্মযজ্ঞটিকেই যে নষ্ট ও ধ্বংস করে দেবেই, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আদিম যৌথসমাজ থেকে পরবর্তীকালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে উত্তরণকালে ঠিক সেরকমই ঘটেছিল। ফলত, পরবর্তী সমাজের চোখে এই **পণ্ডন্‌** কর্মটি ছিল বুদ্ধিমত্তার কাজ, যে ব্যক্তি তা সফলতার সঙ্গে করতে পারত এবং অন্যকে শেখাতে পারত তাকে সেই সমাজ সম্মান দিয়েছিল **পণ্ডিত** বলে। আর, পূর্বতন সমাজের চোখে এই **পণ্ডন্‌** কর্মটির মানে দাঁড়িয়ে যায় 'সবকিছু ধ্বংসকারী কর্ম'; এবং যারা সেই **পণ্ডন্‌** কর্মের পক্ষে ওকালতি করে তারা হয়ে যায় **পণ্ডিতম্মন্য, পণ্ডিতবাদী, পাণ্ডিত্যাভিমানী** ... ইত্যাদি। ফলত, **পণ্ড, পণ্ডিত** ও **পণ্ডিতী** শব্দের অভিধার্থের চেয়ে লক্ষণার্থই প্রধান হয়ে যায়। প্রায় একই ঘটনা ঘটে **পাণ্ডা** শব্দের ক্ষেত্রেও। নিয়ত **পণ্ডন্‌**-এর ফলে জাত **পণ্য**ধারা বা **গঙ্গা**ধারার ঘাটে ঘাটে গড়ে ওঠা **তীর্থ**ক্ষেত্রগুলিতে অত্যন্ত সক্রিয় **পাণ্ডা**রাও হয়ে যায় একই সঙ্গে অনুসরণীয় এবং নিন্দনীয়। কেবল তাই নয়, **পাণ্ডা** শব্দের লক্ষণার্থ গিয়ে পৌঁছে যায় দলের **পাণ্ডায়**, 'নাটের গুরু'তে। ... **৬.** ইংরেজি pound।

পন্থা : দ্র. **পথ**।

পাণ, পাণি (পাণিগৃহীতী, পাণিগ্রহণ, পাণিঘাত, পাণিজ, পাণিতল, পাণিধর্ম্ম, বীণাপাণি) : ১. **পাণ** = ✓পণ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। **পাণি** = ✓পণ্ + ই (ইণ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পাণ** = **পণ** হইতে জাত। **পাণি** = **পাণ** গতিশীল যাহাতে। **পাণিঘাত** = **পাণি**র আঘাত যাহাতে। **পাণিতল** = **পাণি**র তল। **বীণাপাণি** = বীণা **পাণি**তে যাঁহার।* / **পাণি** = যাহার দ্বারা ব্যবহার সাধিত হয়। **পাণিগৃহীতী** = পাণি গৃহীত যে স্ত্রীর। **পাণিগ্রহণ** = যাহাতে পাণিগ্রহণ আছে। **পাণিঘাত** = কর দ্বারা তাড়ন (যাহাতে)। **পাণিজ** = পাণি হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. **পাণ** = পণন, ব্যবহার, ব্যবসায়, সময় (সম-অয়, agreement), পণ, হস্ত; তাম্বূললতা, তাম্বূল। **পাণি** = মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলিপ্রান্ত পর্য্যন্ত হস্তাংশ; কর, হস্ত, পণ্যবীথী, হট্ট, হাট। **পাণিগৃহীতী** = পত্নী। **পাণিগ্রহণ** = বিবাহ। **পাণিঘাত** = করতাড়ন, মুষ্ট্যাঘাত, ঘুসি। **পাণিজ** = নখ। **পাণিতল** = করতাল, হাতের চেটো। **বীণাপাণি** = সরস্বতী। (ব.শ.)। ৪. **পাণি, পাণিগ্রহণ, বীণাপাণি** শব্দ তিনটি যথাক্রমে hand, marriage, the goddess Saraswati অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **পণ** কথাটির ভিতরে যে 'সম-অয়' বা 'সময়' বা agreement রয়েছে, সেকথা আমরা আগেই **পণ** ও **পণ্য** শব্দে জেনেছি। শব্দার্থের নিজস্ব নিয়মে **পণ** থেকে জাত সত্তাকে **পাণ** বলে। তার মানে, ক্রিয়ারূপে **পণ** শব্দের মানে হল 'লেন-দেন করা' (দ্র. **পণ**)। যে সত্তার সাহায্যে সেই লেন-দেন করা হয়, তাকে তাই **পাণি** বলে। এই **পাণি** স্বভাবতই 'হাত' হতে পারে, কারণ লোকে হাত দিয়েই লেন-দেন করে থাকে। আবার 'দোকান' বা 'হাট' কিংবা 'বাজার'ও হতে পারে। সেজন্যই ব.শ. **পাণি** শব্দের মানে দিয়ে গেছেন — মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলিপ্রান্ত পর্য্যন্ত হস্তাংশ; কর, হস্ত, পণ্যবীথী, হট্ট, হাট। **পাণি** শব্দের এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের দৃশ্যরূপটি কর, হস্ত, হস্তাংশ হয়ে থেকে গেল কিন্তু তার অদৃশ্য অর্থটি পণ্যবীথী, হাট-বাজার বাদ পড়ে গেল কিংবা ভুলে গেলাম! কেন? কারণ, কেবলমাত্র বৌদ্ধযুগ ছাড়া ভারতসমাজ দোকানদারিকে কোনোদিনই **মর্য্যাদা** দেয়নি। বৌদ্ধযুগের আগে-পরে সর্বযুগেই দোকানদারদের বাঁচতে হয়েছে চরম ঘৃণা সহ্য করে করে। ফলত, **পাণি** শব্দের দোকানদারসুলভ ব্যবহার চলেছে গোপনে, ফিসফিস করে, এবং তুলনায় কম। আর সেজন্যই **পাণি** শব্দের 'হাত' অর্থটি শক্তিলাভ করে প্রতীকী রূপ লাভ করবার সুযোগ পেয়ে গেছে এবং 'পণ্যবীথী' অর্থটি সমাজমন থেকে বিস্মৃত হয়ে স্থান পেয়েছে কেবল শব্দকোষকারগণের পুঁথিতে।

পাণ-কারীদের প্রতি বা **পণ্যজীবী**দের প্রতি এই যে ঘৃণা, তা কত শক্তিমান ছিল তার নিদর্শন পাওয়ার জন্য বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই; **পাণ** শব্দের অর্থে যে 'তাম্বূললতা' ও 'তাম্বূল'কে আমরা পাচ্ছি তার বিষয়ে জানার চেষ্টা করলেই আমরা সেই সামাজিক অবহেলার নিদর্শন পেয়ে যাব। এই তাম্বূলীদের একালে বলা হয় 'তামলি'। (১ম খণ্ডে আমরা **তাম্বূল** শব্দে এ বিষয়ে কিছু তথ্য আমরা দিয়েছি।) এঁরা ভারতসমাজের আদি **পণ্যবীথী**র পরিচালক ছিলেন, আদি দোকান চালাতেন। আজও এঁদের 'ভূষিমাল' (grocery) দোকান চালাতে দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পর প্রতিক্রিয়া রূপে যে হিন্দুযুগের সূচনা হয়েছিল, তাতে **পণ্যজীবিতা** ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয়। ফলে **তিলি, তাম্বূলী**রা হয়ে যান অন্ত্যজ শ্রেণীর। সামাজিক বৃক্ষ, লতা ইত্যাদির বয়ানে এই **তাম্বূলী**ই তাম্বূলীলতা বা **পাণ (পর্ণ)** পদবাচ্য, যাকে প্রায়শই ভুল বানানে **পান** লেখা হয়। সর্বোপরি, **বঙ্গে**র ও বাংলাভাষার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী বাংলাভাষী কুবের-বিরোধী হলেও লক্ষ্মীপূজক বটে। তাই **পাণ** তার কাছে খুবই গ্রাহ্য ব্যাপার। সেই কারণে আজও গ্রামবাংলায় 'পাণ-সুপুরী', 'গুয়া-পাণ' দিয়ে আপ্যায়নের প্রথা কমবেশি প্রচলিত আছে, রয়েছে তৎসংশ্লিষ্ট লোকসঙ্গীতও। ... ৬. ইংরেজিতে এই **পাণ**-এর উত্তরাধিকার রয়েছে Punic War শব্দে। ভূমধ্যসাগরের আদি **পণ্যজীবী** ফিনিশিয়দের উত্তরসূরি কার্থেজীয়দের এই যুদ্ধে পতন ঘটেছিল।

পাণিনি (পাণিনীয়) : ১. পণিন্ + অ (অণ্) অপত্যার্থে 'পাণিন্' (প্রকৃতিভাব) + ই (ইঞ্) যুবা অপত্যার্থে। (ব.শ.)। ২. ***পাণিন** (লেন-দেন) গতিশীলভাবে অনকৃত যাহাতে। **পাণিনীয়** = **পাণিন** হইতে জাত বা আগত।* ৩. **পাণিনি** = পাণিনের যুবা অপত্য, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মুনিবিশেষ। ইঁহার মাতা দাক্ষী, বাসস্থান শালাতুর গ্রাম। এইজন্য ইঁহার নাম 'দাক্ষেয়', 'শালাতুরীয়'। নন্দের শাসনকালে বর্ষ পণ্ডিতের নিকট ইনি বিদ্যাভ্যাস করেন। ইঁহার ব্যাকরণ 'পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী'। ... **পাণিনীয়** = পাণিনিসম্বন্ধী, পাণিনিপ্রোক্ত, পাণিনি কর্তৃক উপজ্ঞাত (উপদেশ বিনা জ্ঞাত), পাণিনিপ্রোক্তব্যাকরণের অধ্যেতা বা বেদিতা; পাণিনি ব্যাকরণবিৎ। (ব.শ.)। ৪. একজন প্রাচীন ব্যাকরণবিদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. **পণন** করা হয় যে **পাণি**র দ্বারা, সে 'হাত' হতে পারে, দোকানও হতে পারে, একথা আমরা আগেই জেনেছি। তবে যে কর্মশালায় **দক্ষের** উত্তরসূরি (দাক্ষীনন্দন) দাক্ষেয়গণ তুরীয় বস্তু উৎপাদন করেন, সে তো 'শালাতুরীয়' **পণ্য**ই হবে। অর্থাৎ কিনা, যে বস্তু পাঠশালার মতো কোনো **শালা**য় বানিয়ে **পণন** করা বা বিক্রি করা হয়, নিঃসন্দেহে সে হল 'জ্ঞানপণ্য' বিক্রির দোকান। তার মানে, এই **পাণিনি** হলেন সেই সত্তা, যিনি পাঠ**শালা**র মাধ্যমে তুরীয় **পণ্য** বা জ্ঞানপণ্য বিক্রয় করতেন। অর্থাৎ, এই **পাণিনি** নামক সম্প্রদায় জ্ঞানপণ্যের **পাণ** (= পণ্যবীথী) চালাতেন। তাঁদের সম্প্রদায়ের একজন বা কয়েকজন মিলে লিখেছিলেন 'অষ্টাধ্যায়ী'। সেটিই আজও **পাণিনীয়** ব্যাকরণ নামে প্রচলিত আছে। ...

আসলে, **পণন** করে বলেই তো **পাণি, পাণিন্**। এবং নিঃসন্দেহে সেই **পাণিন**-করাকে গতিশীল করে যে, সেই তো **পাণিনি**। ইনি **পাণিনি** বংশের এক বা একাধিক **পাণিনি** হতে পারেন। তাছাড়া, সেকালের সকল গোষ্ঠীর যেমন নাম, **অগস্ত্য, কণ্ব, কপিল** ... ইত্যাদির মতো **পাণিনি**ও একটি গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের নাম, যাঁদের বংশপরম্পরায় **পাণিনি** বলা হত, যাদের প্রতি সদস্যকে যেমন **পাণিনি** নামে ডাকা হত, আবার সবাইকে একত্রেও **পাণিনি** নামে ডাকা হত, যাদের একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক দর্শনও ছিল; ঠিক যেরকম আজকের পশ্চিমবাংলায় 'সিপিএম' বললে একজন সিপিএম-পার্টির সদস্যকে যেমন বোঝানো যেতে পারে, সমগ্র পার্টিটিকে বোঝানো যেতে পারে, আবার সিপিএম-এর আদর্শকেও বোঝানো যেতে পারে।

এই 'সিপিএম' তো এক বলিষ্ঠ সামাজিক সত্তাই বটে। কিন্তু তাকে শুধুমাত্র ব্যক্তি ভেবে নিলে তার সম্পর্কে কতখানি সঠিক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে?

এসব কথা আমরা অন্যত্র অন্য পৌরাণিক নামশব্দের ক্ষেত্রেও বলেছি। **পাণিনি**ও ছিলেন এইরকম একটি সামাজিক সত্তা। কিন্তু একালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা প্রাচীন ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে খুঁজতে যান, তাঁরা তো ব্যক্তিকে খোঁজেন, তার পিতা, মাতা, জন্মস্থান ... ইত্যাদি খোঁজেন। কিন্তু 'সিপিএম'-এর বাপ কে, মা কে, কোন গ্রামে তার জন্ম, এসব খুঁজতে গেলে যেমন ভুল উত্তরে গিয়ে হাজির হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের চরিত্রগুলির অন্বেষণের ক্ষেত্রেও সেরকমই হয়েছে। আমাদের পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই এইসব ক্ষেত্রে ভুল উত্তরে গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছেন। যে কারণে **পাণিনি, যাস্ক, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ** ... প্রভৃতি সত্তাগুলির বিষয়ে একালের ঐতিহাসিকরা প্রায়শই দিশেহারা। তাঁদের অধিকাংশের অনুসন্ধানলব্ধ ফলগুলি বিচার করলে দেখা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই 'অন্ধের হস্তীদর্শন' করেছেন। ফলে, তাঁরা যে একেবারে কিছুই দেখেননি, তা কিন্তু ঠিক নয়। যিনি বলছেন, হস্তী হল থামের মতো একটি জীব, তিনি কিন্তু একশো ভাগ ভুল কথা বলছেন না। হাতির পা-টি তিনি ঠিকই দেখেছেন। ... যেমন কিনা **পাণিনি** ছিলেন **যাস্ক**-পরবর্তী একজন বৈয়াকরণ এবং সেকালে প্রচলিত শব্দতত্ত্বের যে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা ছিল, তার আদি ধারাটির সমর্থক ছিলেন **যাস্ক** এবং নব্য ধারাটির সমর্থক ছিলেন **পাণিনি** — এসব কথা তাঁরাই উদ্ধার করে এনেছেন। ...

আজ আমরা জানতে পারছি, **যাস্ক** ছিলেন আদি ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের পরিপোষক এবং **পাণিনি** ছিলেন নব্যপন্থীদের সমর্থক, যাঁরা তৎকালে সেই তত্ত্বের বিরোধিতা করতেন, যদিও তখনও তাঁরা শব্দার্থের 'প্রতীকী তত্ত্ব' খাড়া করতে পারেননি। শব্দার্থতত্ত্বের (semantics-এর) ক্ষেত্রে এই বিরোধিতা থাকলেও শব্দবিন্যাসের (syntax-এর) ক্ষেত্রে **পাণিনি** ছিলেন আদিপন্থী। তাঁদের 'অষ্টাধ্যায়ী'তে শব্দের পাশে শব্দ গাঁথবার নিয়মটির বিষয়ে **পাণিনি** অনাদিকাল থেকে আগত নিয়মগুলিকে যথার্থভাবেই সন্নিবিষ্ট ও বিন্যস্ত করে যান। ...

পাণিনির এই **যাস্ক**-বিরোধিতা যে স্বাভাবিক ছিল, সে বিষয়ে আজ আমরা নিঃসন্দেহ। কেননা, **যাস্ক**-পরিপোষিত অনাদিকাল থেকে আগত শব্দার্থের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক রীতিটি ছিল **পণ্য**জীবিতার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কারণ তাতে একটি শব্দে বহু সত্তাকে চিহ্নিত করাই ছিল শব্দার্থের সাধারণ নিয়ম। সেই নিয়মে **অজ** বললে বহু কিছুকেই বোঝায়। কিন্তু **দক্ষ**নীতি অনুসরণের ফলে সমাজ যখন **পণ্য**জীবিতার দিকে মোড় নিয়ে নিয়েছে, তখন এই নিয়ম মানুষকে ভারী মুশকিলে ফেলে দেয়। কাউকে একটি **অজ** আনতে বললে সে কাকে ধরে আনবে — ছাগলকে, মেষকে, বদ্ধপুরুষকে, নাকি স্বয়ংসৃষ্ট কোনো সত্তাকে? ব্যাপারটি এরকম অনিশ্চিত হয়ে গেলে তো দোকানদারের দোকানদারি চলে না। **পণ্য**জীবিতার জন্য শব্দের সুনির্দিষ্ট (প্রতীকী) অর্থ একান্ত প্রয়োজন। আর **পাণিনি** ছিলেন সেই **পণ্যজীবীদেরই এক গোষ্ঠী**। ... আজকের পণ্যজীবী দুনিয়ার চমস্কি পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদেরা যে তাঁদের ভাষাতত্ত্বের জনক রূপে এই **পাণিনি**কে বুঝতে পেরে আপ্লুত হয়ে থাকেন, তার মূল কারণটি রয়েছে এখানেই। নিজেদের মনের স্বভাববশত তাঁরা **যাস্ক**কে বুঝতেই পারেননি, কিন্তু **পাণিনি**কে পেরেছেন এবং তাঁর 'শব্দবিন্যাস' (syntax) তত্ত্বকে করজোড়ে প্রণাম জানিয়েছেন। সবাই জানেন, ভাষার কার্যত দুটো পা, শব্দার্থতত্ত্ব ও শব্দবিন্যাসতত্ত্ব বা ব্যাকরণ (semantics, syntax); আজকের ভাষাতত্ত্ব **পাণিনি**কে অনুসরণ করে শব্দবিন্যাসতত্ত্বকে প্রায় সম্পূর্ণত ধারণ করার যোগ্য হয়ে উঠেছে এবং এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন নোয়াম চমস্কি। কিন্তু শব্দার্থতত্ত্বের ক্ষেত্রে আজকের ভাষাতত্ত্ব প্রায় অন্ধ। তার কারণ হল, মানুষের সমাজে শব্দার্থের যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে, তার তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের **যাস্ক**-পরিপোষিত ধারাটি **পাণিনি**-পরবর্তীকালে ক্রমশ সমাজের উপরিতল থেকে সমাজমনের মাটির ভিতরে প্রবেশ করে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আজ এই 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এর মাধ্যমে আমরা দুজন তাকে 'অন্তঃসলিলা' বলে অনুভব করতে পারছি এবং সে যাতে সমাজমনের মাটির থেকে বাইরে বেরোতে পারে তার জন্য পথ কাটার চেষ্টা চালাচ্ছি, যাতে তা পুনরায় সমাজমনের মাটির উপরিতল দিয়েই প্রবাহিত হতে পারে। ...

পাণ্ডব = একালের ভাষায় 'প্রাইভেট সেকটর কোম্পানি'। দ্র. **নকুল**।

পাণ্ডু : ১. ✓পণ্ড (গতি) + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে; পাণ্ডু + মৎ (মতুপ)। (ব.শ.)। **২.** ***পাণ*** *চয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩.** পাণ্ডুবর্ণবান, পাণ্ডুর, শ্বেতপীত, শ্বেত, হরিণ, ফেকাশে রং, শ্বেত হস্তী, রোগবিশেষ, ন্যাবা (jaundice)। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ... মুনিশাপে স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত হইয়া ইনি তপস্যার্থ শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতে বাস করেন এবং মাদ্রীর সহিত সহবাসে মুনিশাপে ইঁহার প্রাণান্ত হয়। (ব.শ.)। ইনি চন্দ্রবংশীয় শান্তনুপুত্র বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। শ্বশ্রূ সত্যবতীর অনুরোধে অম্বালিকা শয়নগৃহে প্রবেশ করে ব্যাসের মূর্তি দেখে ভীতিতে পাণ্ডুবর্ণা হয়ে যান। মাতার দোষজাত এই পুত্রের বর্ণ সেকারণে পাণ্ডুর হয় এবং ইনি পাণ্ডু নামে খ্যাত হন। ... কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীকে তিনি স্বয়ংবর সভায় লাভ করেন। ভীষ্ম মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দেন। ... একদা বনমধ্যে মৃগয়াকালে সংগমরত এক মৃগমিথুনকে পাণ্ডু পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করেন। কিমিন্দম মুনি মৃগরূপে তখন পুত্রকামনায় হরিণী-সংগম করছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় বলেন, 'আমি লোকলজ্জার ভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্বক মৃগীসংগমে রত ছিলাম। তুমি আমাকে উক্ত অতৃপ্ত অবস্থাতেই বধ করলে। এতে তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ না হলেও আমার অভিশাপে স্ত্রীসংগম কালে তুমিও অতৃপ্ত অবস্থায় দেহত্যাগ করবে।' এই অভিসম্পাতের ফলে পুত্রজন্ম অসম্ভব বিবেচনায় পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বনবাসী হন। বনবাসকালে কয়েকজন ব্রহ্মর্ষির ইঙ্গিতে তিনি পিতৃঋণ হতে মুক্ত হবার জন্য কুন্তীকে ক্ষেত্রজ

পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। ... কুন্তী ক্রমান্বয়ে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে লাভ করেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে ঐ মন্ত্র শিক্ষা দিলে তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন। একদা বসন্তকালে নির্জনে মাদ্রীকে দেখে পাণ্ডু কামার্ত হয়ে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে ... সহবাস করেন এবং ... তাঁর মৃত্যু হয়। মাদ্রীও পাণ্ডুর সহগমন করে প্রাণত্যাগ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. পৌরাণিক নাম রূপে স্মৃত, অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. আপনি কোনো বস্তু উৎপাদন করছেন, তা আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে, অগত্যা চাইছেন যে, কেউ এসে আপনার **পণ্য**গুলি নিয়ে নিক, পরিবর্তে আপনাকে কিছু দিক। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এরকম হয় যে, আপনার চারিদিকে লোকে তাদের **পণ্য** নিয়ে অপেক্ষা করছে আপনাকে দেওয়ার জন্য এবং পরিবর্তে দাম চাইছে, আর তারা বেশি অপেক্ষা করতেও চাইছে না, কারণ, কে যেন তাদের মারবে বলে ধেয়ে আসছে এবং সেকারণে সে তার **পণ্য**টি আপনার মতো কাউকে দিয়ে-থুয়ে সরে পড়তে চায়, তখন সেই পলায়ন-উন্মুখ সত্তাটিকে কী বলা হবে?

তাকে বলতে হবে **পাণ্ডু**। কারণ, যদিও সে **পাণ**-এর পরিচালক, **পাণ্** ডয়ন করতে চায়, **পণ্য**বিনিময় করতে চায় এবং করছেও, কিন্তু সমাজ-শাসক ব্রাহ্মণের চোখে সে অভিশাপগ্রস্ত। তাই তার মুখ ফেকাশে, **পাণ্ডুর** বর্ণ, ন্যাবা। যেনবা তার পেটে **পাণ্ডুল** হয়েছে। দ্র. **গোদ**। ভারতসমাজে এই **পাণ্ডু**সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল **কিমিন্দম** মুনির অভিশাপ নিয়ে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে যৌথতার ভিতরেই (অধঃপতিত আদিম সমাজতন্ত্র বা বৈদিক সমাজতন্ত্রের ভিতরেই জাত) যে-হেনস্থাগ্রস্ত নিপীড়িত খর্ব ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল, এই **পাণ্ডু** হল সেই সত্তা। পৌরাণিক ভাষায় সেই ইতিহাসই লেখা রয়েছে মহাভারতে, চন্দ্রবংশীয় রাজা **পাণ্ডু**র কাহিনীতে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে সেই কাহিনীর অর্থ জানলে ভারতসমাজে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের একটি পর্যায়ের কথা বিস্তারিতভাবে আমরা জানতে পারি।

পাণ্ডুতরু, পাণ্ডুভূম, পাণ্ডুর, পাণ্ডুরিত, পাণ্ডুলিপি : ২. ***পাণ্ডুর*** = ***পাণ্ডু***(ত্ব) *রহে যাহাতে।* ***পাণ্ডুল*** = ***পাণ্ডু***(ত্ব) *লালিত যাহাতে।* ***পাণ্ডুলিপি*** = ***পাণ্ডু*** *বর্ণ হয়ে যায় যে লিপি।* ৩. **পাণ্ডুতরু** = ধববৃক্ষ। **পাণ্ডুভূম** = শ্বেতভূমিদেশ, খড়িমাটির দেশ। **পাণ্ডুয়া** = পাণ্ডুবর্ণযুক্ত, শ্বেত। (পাণ্ডুয়া = শ্বেত কুষ্মাণ্ড)। **পাণ্ডুর** = পাণ্ডুবর্ণবান, শ্বেতপীত, ফেকাশে, কামলা রোগ, ধবলকুষ্ঠ। **পাণ্ডুরিত** = বিবর্ণ, ফেকাশে। **পাণ্ডুলিপি** = প্রথমে লিখিত বিষয়, মুসাবিদা (draft)। (ব.শ.)। ৪. **পাণ্ডুর** 'ফেকাশে' অর্থে এবং **পাণ্ডুলিপি** manuscript অর্থে প্রচলিত। **পাণ্ডুল** গ্রামবাংলায় 'পেটফোলা রোগ' অর্থে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **পাণ্ডুতরু** হল ধবগাছ, কোথাও বা তাকে মরুবকবৃক্ষ বা কুড়চী বৃক্ষ ... ইত্যাদি বলা হয়েছে। এমনকি সাদাটে কুমড়ো (কাটলে পরিধিতে সবুজ এবং বাকি অংশ লালচে রঙের), সাদাটে বা ধূসর পটল, সাদাটে কুড়চি কলাইকেও **পাণ্ডুর** বলা হত। **অর্জ্জুন** গাছের চেহারা তো পুরোই সাদা। অর্থনীতির জগতে তাকে আমরা 'সাদা টাকা' রূপে আগেই চিনেছি। সে কিন্তু উপরোক্ত সাদাটে ধববৃক্ষের বা **পাণ্ডুর** সন্তান। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি, সমাজের কিছুটা স্বীকৃতি **পাণ্ডু** পেয়েছিল, তাই সে সম্পূর্ণ সাদা নয়, সাদাটে, শ্বেতপীতবর্ণ। অবশ্য অর্থনীতি জগতের **পাণ্ডু, অর্জ্জুন** প্রভৃতি সত্তার সঙ্গে উদ্ভিদজগতের ও জীবজগতের (মানবসমাজের) সমনামা সত্তাদের মিলের কারণ আমরা খুব একটা জানি না। তা জানতে-বুঝতে হলে যতখানি অনুভবশীল হওয়া দরকার, আমরা ততখানি অনুভবশীল নই, সে ক্ষমতা আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। সে-অনুভবশীলতা আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল বলেই তাঁরা এক একটি সত্তাকে একইসঙ্গে সর্বলোকে শনাক্ত করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা অনেক চেষ্টায় তার কিছু কিছু বোঝার চেষ্টা করছি মাত্র। ...

পাণ্ডুলিপি শব্দটি এখন manuscript অর্থে প্রচলিত। ব.শ. জানাচ্ছেন এর অর্থ 'প্রথমে লিখিত বিষয়' বা draft। আমাদের মনে হয়, 'প্রথমে লিখিত বিষয়' সাধারণত হাতে লেখা হয়, কোরা কাগজে লেখা হয়, দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ করা যায় না, করলে সেগুলি **পাণ্ডু**বর্ণ হয়ে যায়। সম্ভবত সেকারণেই তাদের **পাণ্ডুলিপি** বলে। ... দ্র. **গোদ**।

পত্ (পাতি, পড়্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপাত, অতিপাতক, অতিপাতিত, অতিপাতী, অতিপাত্য, অধঃপতন, অধঃপাত, অনপত্য, অনুপাত, অপতিত, অপত্য, অপত্যনির্ব্বিশেষে, অপত্যবিক্রয়ী, অপত্যস্নেহ, অপাতক, অভিসম্পাত, আপতন, আপৎকল্প, আপৎকাল, আপাত, আপাতক, আপাততঃ, আপাতদুঃসহ, আপাতমধুর, আপাতরমণীয়, আপাতসুরস, আপাতী, উঠতিপড়তি, উৎপতন, উৎপাত, চরণপাত, ঝরতিপড়তি, দৃকপাত, দৃষ্টিপাত, নপ্তা, নিপতন, নিপাত, নিপাতন, পঙ্গপাল (পতঙ্গপাল), পত্, পতগ, পতঙ্গ, পতঙ্গকান্ত, পতঙ্গম, পতঙ্গপাল, পতঙ্গান্বয়, পতঙ্গিকা, পতঙ্গিনী, পতঞ্জলি, পতত্‌ত্র, পতত্র, পতত্‌ত্রী, পতত্রী, পতত্‌ত্রীরাজ, পতত্রি, পতদ্‌গ্রহ, পতন্, পতন, পতনীয়, পতপত, পতর, পতাকা, পতাকাস্থান, পতাকিক, পতাকিনী, পতিঙ্গা, পতিত, পতিতপাবন, পতিতসাবিত্রীক, পতিদণ্ডী, পতিদেবতা, পতিদেবা, পতিনী, পতিপ্রাণা, পতিবতী, পতিবত্নী, পতিবন্ধু, পতিব্রত, পতিব্রতা, পত্তন, পত্তনী, পত্তনীদার, পত্তর, পত্র (পত্‌ত্র), পত্রনাড়িকা, পত্রপাঠ, পত্রপুট, পত্রবল্লরী, পত্রবল্লী, পত্রবাহ, পত্রবাহক, পত্রবিশেষ, পত্রবিশেষক, পত্রভঙ্গ, পত্রভঙ্গি(ঙ্গী), পত্রমঞ্জরী, পত্ররথ, পত্ররথেশ্বর, পত্ররেখা, পত্রলেখা, পত্রশিরা, পত্রশেষ, পত্রহারিকা, পত্রহারী, পত্রাঙ্গ, পত্রাঙ্গুলি, পত্রাবলি(লী), পত্রারূঢ়, পত্রিক, পত্রিকা (পত্‌ত্রিকা), পত্রী, পপাত, পল্লব (দ্র.পল্), পল্লবিত, পল্লবী, পাঁতি (পত্রী), পাত, পাতক, পাতকিনী, পাতকী, পাতকুয়া, পাতকো, পাতখাড়ু, পাতক্ষীর, পাতখোলা, পাতঞ্জল, পাতড়া, পাততাড়ি, পাত-দত, পাতন, পাতনকাঁড়, পাতনা, পাতয়ান, পাতয়াল, পাতর, পাতল, পাতলা, পাতা (পত্র), পাতা (পাতিত করা, বিস্তৃত করা), পাতাড়, পাতান, পাতাপাতি, পাতামল, পাতাল, পাতালগঙ্গা, পাতাহাল, পাতি (পেটি, petti), পাতিআ, পাতিকাক, পাতিচোর, পাতিঝিনুক,

পাতিডাল, পাতিনেড়ে, পাতিনেবু, পাতিমাতাল, পাতিমৌড়, পাতিশিয়াল, পাতিহাঁস, পাতিত, পাতিল, পাতিলী, পাতী, পাতুক, পাতুনি, পাতোয়ান, পাতোয়াল, পাত্তর, পাত্তা (পতিত হয়েছে যেখানে), পাত্র, পেতে, পেথা, পেথে, প্রণিপাত, প্রপাত, বিক্রয়পত্র, বিপ্রপাত, শতপত্র, সম্পাত, সম্পাতন, সূত্রপাত।

পত্ (পাতি, পড়্) = পায়ীর তারণ। **পত** = পায়ীর তারণ যাহাতে। **পাতি** = পতজাত গতিশীল যাহাতে। **পড়** = **পঠ্** দ্রষ্টব্য।

অপত্য (অপত্যবিক্রয়ী) : ১. দ্রঃ **পতন**। ২. **অপত**ন *(= নেই পতন যাহাতে) থাকে যাহাতে।* / যাহা দ্বারা বংশ পতিত হয় না। (ব.শ.)। ৩. পুত্ত্র বা কন্যা, শাবক, পিতামহাদির অপতনে হেতুভূত পৌত্রাদি, (ব্যাকরণে) অপত্যার্থে প্রত্যয়। (ব.শ.)। ৪. son অর্থে প্রচলিত। ৫. পক্ষী যেমন আপন বাসা থেকে **পত পত** করে উড়ে চলে যায়, উৎপাদিত সব কিছুই **পত্** করে আপন পূর্বাশ্রম থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, আপন সত্তার সেই বহির্গত সৃজনই **অপত্য** — সন্তানসন্ততি, পোষা জীবজন্তু, শস্যাদি, যাদের প্রত্যেকের পেছনে মূলসত্তার শ্রম, মেধা, শক্তি, তেজ ... ইত্যাদি রয়েছে। এর ভিতর সেসকল বস্তুও থাকে, যা দিয়ে মানুষের চলে কিংবা যা কিছু বিক্রি করে মানুষের সংসার চলে। সেকালে সন্তানসন্ততি বিক্রয়েরও রেওয়াজ ছিল। দ্র. **শুনঃশেফ**। অর্থাৎ, যা কিছুর দ্বারা বংশরক্ষা হয়, পতিত হয় না, তারা সবাই অপত্য। আর **অপত্যবিক্রয়ী** শব্দটিও পুরাণাদিতে যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া, পুরাণাদিতে রাজাদের তো একটাই সমস্যা — পুত্র নাই পুত্র চাই। সুতরাং যজ্ঞ করো! এই সকল **অপত্য**কাম যজ্ঞের একটাই মানে — দেশে উৎপাদন বাড়াতে হবে। একালের সরকারগুলি কি একই সমস্যায় ভুগছে না?

নিরুক্তে নিজ উৎপাদিত **পণ্য** ও বাজারের (**অরণ**-এর) **পণ্য**, এই দুই পণ্যের ভেতরে নিজ উৎপাদিত পণ্যের প্রশংসা করে **বশিষ্ঠ** ও **অগ্নি**র যে বিতর্ক হয়, ঋগ্বেদের সেই দুটি শ্লোকের (৭/৪/৭ ও ৭/৪/৮) উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন যাস্ক; যেখানে বশিষ্ঠ বলছেন — 'আমাদের পিতৃপিতামহ আচরিত পথ বিদূষিত করিয়ো না।' ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সাহায্যে এই তর্কগুলির প্রকৃত অর্থ জানতে পারলে বোঝা যায় কত কত বিষয় নিয়ে সমাজের কত সংশয় পেরিয়ে এসেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। পরের মাল আমি নেব কেন? কিনব কেন? আমার মাল আমিই বানাব। পরের জিনিস কি নিজের হয়? গ্রামবাংলায় ১৯৬০-সালেও এরকম কিছু বিষয় আমরা দেখেছি — লোকের কাছে চাকরি করে যত টাকাই পাওয়া যাক, সে তো চাকরের রোজগার! চাকরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না। যে নিজের জমিতে চাষ করে সারা বছরের খোরাকি নিজে (কিংবা মুনিষ খাটিয়ে) উৎপাদন করে নেয়, সেই যোগ্য বর হতে পারে! এইরকম বিচার! কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকটির অনুবাদক তার যতটা ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব, তার সবটাই করেছেন। আর সেই অনূদিত নিরুক্তটিই এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ানো হয়। (উপরোক্ত অনুবাদগুলির জন্য দ্র. *'নিরুক্তম্'*, The Ashutosh Sanskrit Series, Part II পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৪০)।

পতগ, পতঙ্গ : ১. পতগ = পত + ✓গম্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। **পতঙ্গ** = পত + ✓গম্ + অ (খচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পতগ*** *= যে-পায়ী তারিত হইয়া গমন করে।* ***পতঙ্গ*** *=* ***পতন****শীল অঙ্গ যাহার; যে পড়িতে পড়িতে গমন করে।* / **পতগ** = যে উড্ডীয়মান হইয়া যায়। **পতঙ্গ** = যে পতনে সমর্থ। (ব.শ.)। **৩. পতগ** = পক্ষী। **পতঙ্গ** = পক্ষী, সূর্য্য, শলভ, পঙ্গপাল, ফড়িং, অগ্নি, মার্জ্জার, শর, শালিধান্যভেদ, পারদ, চন্দনবিশেষ, বাদুড়। (ব.শ.)। **৪. পতঙ্গ** insect অর্থে প্রচলিত, **পতগ** অপ্রচলিত। **৫.** কার্যত **পতগ** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল 'যে পতপত করে গমন করে' অর্থে। বাসা থেকে বেরিয়ে দুই ডানা ঝাপটে তির্যকভাবে পাখিরা যে যায়, সেই যাওয়াকে বোঝাতে 'পতপত-গমনকারী' **পতগ** শব্দের প্রচলন। আর উপর থেকে পড়তে পড়তে কোনোমতে যে যাওয়া, সেরকম যারা করে, তাদের বলা হত **পতঙ্গ**। মোটকথা যার অঙ্গ পতনশীল, তাকে **পতঙ্গ** বলে। যেহেতু পতনশীল তেজ বা অঙ্গ ফেলতে ফেলতে **সূর্য্য** যায়, তাই তাকেও **পতঙ্গ** বলে। অগ্নির তাপ যে বিকীর্ণ হয়, সেও একরকম পতনশীল অঙ্গ। তাই অগ্নিও **পতঙ্গ** পদবাচ্য। তা না হলে তাদের **পতঙ্গ** বলার কী কারণ থাকতে পারে!

পতঞ্জলি (পাতঞ্জল দর্শন) : ২. *অঞ্জলি পতিত হয় যাহাতে।* / পতন্ অঞ্জলি যাহাতে। (ব.শ.)। পতৎ (পতনশীল) অঞ্জলিতে যিনি। (ছা.অ.)। ৩. মতান্তরে গোনর্দ্দদেশে কোনো ঋষির সন্ধ্যোপসনসময়ে অঞ্জলি হইতে নির্গত, এই কিংবদন্তী হেতু ইনি **পতঞ্জলি** পদবাচ্য। ইনি যোগদর্শনকারক ও পাণিনিসূত্রের ভাষ্যকার। ইনি অনন্তদেবের অবতার, এই হেতু ভাষ্যগ্রন্থ 'মহাভাষ্যে'র অপর নাম 'ফণিভাষ্য'। **পাতঞ্জল দর্শন** = ইহা সমাধি সাধন বিভূতি কৈবল্য — এই চারি পাদে বিভক্ত। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের পদার্থ বিভাগ এক, কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব অতিরিক্ত। ইহা সাংখ্যের পরিশিষ্ট, সেইহেতু ইহার আসল নাম 'সাংখ্য-প্রবচন'। যোগে আত্মদর্শন ও কৈবল্যলাভ ইহার উদ্দেশ্য। যোগের বিস্তৃত বিবরণ হেতু ইহা যোগশাস্ত্র। (ব.শ.)। **পতঞ্জলি** = ইনি পাতঞ্জল দর্শন ও পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই দর্শন ও মহাভাষ্য পতঞ্জলির অসাধারণ কীর্তি। এই মহাভাষ্যে পতঞ্জলি মহামুনি কাত্যায়ন পাণিনিসূত্রের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শনার্থে যে বার্তিক (টীকাগ্রন্থ) রচনা করেন; তা খণ্ডন করেন। এই গবেষণার ফলে পতঞ্জলির জন্মকাল স্থিরীকৃত হয়। ... অনুমান করা হয় যে পতঞ্জলি ১৫০ খ্রিষ্টপূর্বে ... সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। ... যে সময় মুনিবর পাণিনি অঞ্জলিবদ্ধ করে তপস্যা করছিলেন, সেই সময় পতঞ্জলি সর্পদেহধারণে স্বর্গ হতে এঁর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পতিত হন; সেই থেকে এঁর নাম পতঞ্জলি। ... এই পতঞ্জলি মুনি যে দর্শন প্রবর্তিত করেন, তার **পাতঞ্জল দর্শন**। ... তিনি মানুষের পরিত্রাণ সাধনের উদ্দেশে 'যোগশাস্ত্র' প্রবর্তন করেন। ... এর আটটি অঙ্গ — যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ... (পৌ.অ.)। ৪. পৌরাণিক নাম হিসেবে পুরাণচর্চাকারী ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের মধ্যে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। সম্প্রতিকালে **যোগ**-এর নবকলেবরে আরাধনা চলছে। সেই সুবাদে আধুনিক শিক্ষিতদের কেউ কেউ নামটির সঙ্গে পরিচিত

হয়েছেন। **৫.** আমাদের একটিই প্রশ্ন : কোন সামাজিক সত্তাকে বা সম্প্রদায়কে সেকালে **পতঞ্জলি** নাম দেওয়া হয়েছিল? **অগস্ত্য, কপিল, পাণিনি** প্রভৃতি সত্তাগুলির ক্ষেত্রে আমরা জেনেছি, এঁরা এক একটি গোষ্ঠীর এক বা একাধিক মানুষ। **পতঞ্জলি** নিশ্চয় সেরকমই কোনো এক সত্তা হবেন। উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি, **পতঞ্জলি** ছিলেন সর্পশ্রেষ্ঠ অনন্তনাগের অবতার। এই সর্প বা **নাগ** কারা, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। (দ্র. **অহিনকুল, নাগ** - ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৮, ৬৭১)। **অনন্তনাগ**-এর অবতার বলেই **পতঞ্জলি**র বিখ্যাত 'মহাভাষ্য'কে বলা হয় 'ফণিভাষ্য'। অর্থাৎ, তাঁর 'ফণিভাষ্য'-এর পিছনে **ফণা** আছে, সমাজশাসকের ফোঁসফাঁস আছে। ...

যাই হোক, আমাদের মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষ অধ্যায়ে ভারতসমাজ যখন অধঃপতিত বৈদিক যৌথতায় ক্লান্ত, ক্লেদাক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল, সেই সময় প্রচলিত বৈদিক ব্যবস্থার ভিতরে থেকেই পুঁজিবাদিতার দিকে যেসকল অগ্রগতি হয়, সেই সকল অগ্রগতির ধারক-বাহকদের মধ্যে **পতঞ্জলি** সত্তাটিও সক্রিয় হয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজের নিয়মানুসারে এই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর অঞ্জলিতে রাজা ও প্রজাগণের অর্ঘ্য পতিত হত। স্বভাবতই সমাজকে তার ক্লেদ থেকে মুক্ত করে তোলার একটা দায় ছিল তাঁরও। সেই উদ্দেশ্যে এই **পতঞ্জলি** একদিকে আদি সনাতন যুগের যোগীশ্বর শিবের যোগদর্শনকে নিজের যুগের মতো করে 'তৎকালীকরণ' (update) করেন (সাংখ্যকার মহর্ষি **কপিল** যাকে তার আগে একবার 'আপডেট' করেছিলেন) এবং অপরদিকে **বিপণন**-সমর্থক **পাণিনি**র শব্দতত্ত্বের সামনে থেকে সমস্ত আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে লেখেন তাঁর 'মহাভাষ্য'। বলে রাখা ভাল, **পতঞ্জলি**র এই যোগদর্শন মানবসভ্যতার যোগ-সংক্রান্ত আদি অর্জনের নবরূপায়ণ ছিল। এটি না থাকলে আমরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষের যোগসংক্রান্ত অর্জন হারিয়ে ফেলতাম। সম্প্রতি সেই যোগদর্শনই নানা হাত ঘুরে ঘুরে বর্তমানে নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে একালীকরণ হচ্ছে, যেগুলির মধ্যে 'রামদেব'-এর একালীকরণ-চেষ্টা তুলনায় মানসম্পন্ন বলেই আমাদের মনে হয়। যোগ মানে তো পুরুষ-প্রকৃতির যোগ, আর তা কেবল মন-শরীর, মানুষ-নিসর্গ ... এইরকম দু-তিনটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, জগতে যতকিছুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আছে (প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ... ইত্যাদি সম্বন্ধ আছে), তাদের সকলের সঙ্গেই যথার্থ যোগসাধনা করতে হয়, তবেই কৈবল্যলাভ হয়। একমাত্র রামদেবকে দেখা যায়, তিনি শুধুমাত্র দৈহিক-মানসিক ক্ষেত্রেই যোগসাধনে আবদ্ধ থাকেন না; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ... প্রভৃতি আরও কয়েকটি দিকের যোগসাধনের কথাও বলে থাকেন। দ্র. **যোগ, যোগদর্শন**।

পত্ত্র (পত্র, পত্ত্রিকা, পত্রিকা, পত্ত্রী, পত্রী) : **১.** পত্ত্র = ✓পত্ + ত্র (ষ্ট্রন্) - কর্তৃবাচ্যে। **২.** ***পত্ত্র*** = *পতন হইতে ত্রাণ করে যে।* ***পত্র*** = *পতন তারিত যাহাতে।* ***পত্ত্রিকা*** = ***পত্ত্র****-কে গতিশীল করে যে।* ***পত্রিকা*** = ***পত্র****-কে গতিশীল করে যে।* ***পত্ত্রী*** = ***পত্ত্র****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পত্রী*** = ***পত্র****-এর গতিশীল আধার যে।* / **পত্ত্র, পত্র** = যাহা পড়ে; যাহার দ্বারা উড্ডয়ন সাধিত হয়; যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. পত্ত্র, পত্র** = পর্ণ, পাতা, পুষ্পদল, পাপড়ি, লেখনস্থান, লিপি, পৃষ্ঠা, লেখা দলিল, ধাতুর পাত, তেজপত্র ...; পক্ষিপক্ষ, শরপক্ষ, বাহন, বিবাহনির্ণয়পূর্ব্বক লিখিত অঙ্গীকারপত্র। **পত্ত্রিকা, পত্ত্রী** = লিপি, লেখনস্থান, পত্ত্রবান, পক্ষবান, বৃক্ষ, পক্ষী, শ্যেন, বাণ, পর্ব্বত, তালবৃক্ষ। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি বর্তমানে শুধুমাত্র **পত্র** ও **পত্রিকা** রূপে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **পত্র** letter ও leaf অর্থে এবং **পত্রিকা** newspaper ও magazine অর্থে প্রচলিত। **৫.** এই যে দুরকম বানান — **পত্ত্র, পত্র** ... ইত্যাদি, এর কতখানি যাথার্থ্য রয়েছে, সেকথা আমরা আগেই **ছাত্র** শব্দে জানিয়েছি। পুনরুক্তি অবান্তর। এখানে কেবল আমরা জানতে চাইব, **পত্ত্র** ও **পত্র** শব্দের এই বানানের ফলে তাদের অর্থে কী পার্থক্য ঘটছে। অবশ্যই গুরুতর পার্থক্য ঘটছে। যে পাতা নীচে পড়ে যায়, কিংবা নীচে ফেলে দেয়, সে হল 'পতন তারিত যাহাতে'। যেমন গাছের পাতা, ফুলের পাতা, খবরের কাগজের পাতা, বাহ্যিক বিষয় লিখিত রয়েছে এমন কাগজের পাতা। এগুলি সবই **পত্র**-পদবাচ্য। কিন্তু যে পাতা পড়তে পড়তে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পতন থেকে ত্রাণ করে, সে সবই **পত্ত্র**-পদবাচ্য। যেমন, পক্ষিপক্ষ, শরপক্ষ, হাজার টাকার নোট, সম্পত্তির দলিলের পাতা, অতি উচ্চমানের সাহিত্য, দর্শন ... ইত্যাদি বইয়ের পাতা। ... দ্র. **জিনিসপত্র, তৈজসপত্র, গায়ত্রী, গায়ত্ত্রী**।

পতন (পতনীয়, পতপত) : **১.** ✓পত্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পতন*** = ***পত্*** *(পায়ীর তারণ) অন (on) যাহাতে।* ***পতনীয়*** = ***পতন*** *গতিশীল হইয়া যায় যাহাতে।* ***পতপত*** = ***পত****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **৩. পতন** = অধোগমন, পাত, পড়া, গমন, ভ্রংশ, চ্যুতি, অবনতি, ব্যসন, উৎপতন, উড্ডয়ন, ধ্বংস, গর্ভস্রাব, অস্তগমন, স্বধর্ম্মত্যাগ, (গণিতে) বিয়োগ, পাপ, গ্রহপথ। **পতনীয়** = পতনসাধন, জাতিকর্ম্মহানিকর, পাতক। **পতপত** = জলপ্রবাহের ধ্বনি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** একালে প্রতীকী শব্দার্থবিধিতে অভ্যস্ত আমরা সাধারণভাবে **পতন** শব্দের অর্থ বুঝি 'পড়ে যাওয়া'। এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই **পতন** পড়ে-যাওয়া বটে, উড়ে যাওয়াও বটে, এমনকি সামাজিকভাবে অধঃপতিত হওয়াও বটে। এরকম অর্থ হওয়ার কারণ হল, **পতন** শব্দের ভিতরে লাউডগার মতো আপন অস্তিত্বের পরিধি পেরিয়ে পতনোন্মুখ হয়ে এগোনোকে বোঝানো হচ্ছে। এভাবেই পাখিরা **পতপত** করে পড়তে পড়তে উড়ে যায়। ব.শ. **পতপত** শব্দের এই অর্থটি দেননি। মোট কথা, পাওয়ার জন্য যে সত্তা তার বর্তমান অস্তিত্বের এলাকা থেকে বেরিয়ে তারিত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং ফলত নীচে পড়ে যাচ্ছে, তাকেই **পত** বলে; সেই ক্রিয়া অন বা চলমান থাকলে সে পড়ে যায়। তাই **পতন** মানে দাঁড়ায় নীচে পড়া।

পতাকা : **১.** ✓পত্ + আক - করণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***পত্*** *(পতপত) করে যে, তাহা হইতে জাত।* / যাহার দ্বারা ভেদজ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** কেতন, বৈজয়ন্তী, ধ্বজ,

নিশান, পতাকাদণ্ড, নৌকার বাতপট, জয়প্রদমন্ত্রাঙ্কিত কেতু, অঙ্ক, চিহ্ন, সৌভাগ্য, ৪. flag অর্থে প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, শব্দটির ভিতরের ভাব হল — পত পত করে যে, অর্থাৎ, পড়ে-যাবো পড়ে-যাবো করে যে — **পতক**। কিন্তু সেই ভাবেই সে ঠায় দাঁড়িয়ে নেই। অন্যের পতন ঘটিয়ে দিয়ে বৈজয়ন্তীভাবও শব্দটি ঘোষণা করে ব'লে সে **পতাকা** হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক কীভাবে হয়েছে, তা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

পতিত (পতিতপাবন, পতিতা) : ১. ✓পত্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে; নিপাতনে 'ই' (ইট্)। (ব.শ.)। ২. ***পতিত*** = ***পতন*** *তারিত যাহাতে।* ***পতিতপাবন*** = ***পতিত****-কে পবিত্র করে যে।* ***পতিত*** *হইয়াছে যে আধারশক্তি।* / **পতিত** = যে জমি আবাদ হয়নি (পড়ে আছে)। **পতিতপাবন** = যাহা পাপীকে পবিত্র করে। (ব.শ.)। ৩. **পতিত** = গত, ভ্রষ্ট, গলিত, স্বধর্ম্মচ্যুত, পাতকাদি-দোষান্বিত, কলুষিত, দানের অযোগ্য, আচষা, ক্ষয়প্রাপ্ত। **পতিতপাবন** = পাপীর পবিত্রীকরণ, পতিতোদ্ধারক, পরমেশ্বর। (ব.শ.)। ৪. **পতিত** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **পতিতপাবন** প্রায় অপ্রচলিত। ৫. যা কিছুর পতন ঘটেছে, পড়ে গেছে, বা পড়ে আছে তারা প্রত্যেকেই **পতিত**। বাহ্যিক দুনিয়ায় দৃশ্য **পতিত**কে সবাই দেখতে পায়, কিন্তু অদৃশ্যের দুনিয়ায় যারা **পতিত** তাদেরকে সবাই দেখতে পায় না। সমাজের বিভিন্ন উচ্চস্থান থেকে যার **অধঃপতন** ঘটেছে, সেই অদৃশ্য **পতিত**কে বেশি করে বোঝানোর জন্যই বাংলায় **পতিত** শব্দটির অধিক ব্যবহার ঘটেছে। গ্রামবাংলায় যে জমি চাষ করা হয়নি, আচষা অবস্থায় পড়ে আছে, তাকে বোঝাতে **পতিত** জমি শব্দটির খুবই প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া সমাজের স্বাভাবিক ও যথোপযুক্ত মর্যাদার স্থান থেকে অধঃপতিত নারীকে **পতিতা** বলার চল রয়েছে খুবই। মোট কথা গ্রামবাংলায় **পতিত** জমি ও **পতিতা** নারী শব্দদুটি অধিক প্রচলিত। শহরে শব্দদুটির ব্যবহার নেই বললেই চলে।

পল্লব (পল্লবিত, পল্লবী, পল্লী) : ১. পত্ (✓পত্ + ক্বিপ - কর্তৃবাচ্যে) + লব (অল্প), ষষ্ঠীতৎপুরুষ। (ছা.অ.)। ২. ***পল্লব*** = *পায়ীর তারণকে লালনপূর্ব্বক বহন করে যে।* ***পল্লবিত*** = ***পল্লব*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***পল্লবী*** = ***পল্লব****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পল্লী*** = *পায়ীর তারণ গতিশীলভাবে লালিত হয় যে আধারে।* / **পল্লব** = পৎ (পত্র), তাহার লব (অল্পতা)। **পল্লবিত** = যে পল্লব জাত হইয়াছে। **পল্লবী** = কিসলয় আছে যার। (ব.শ.)। ৩. **পল্লব** = নবপত্রাদিযুক্ত শাখাগ্রপর্ব্ব, কিসলয়, নবপত্র-স্তবক, পর্ব্বপত্রাদিসমবায় শাখা, শাখা, (সাদৃশ্যে) অলক্তরাগ, আলতা, শৃঙ্গার, বলয়, বল, বিস্তার, চাপল, জাতিবিশেষ, গোপবিশেষ, চোখের পাতা। **পল্লবিত** = পল্লবযুক্ত, লাক্ষারাগযুক্ত, তত, বিস্তারিত, বিস্তার। **পল্লবী** = পল্লবযুক্ত, কিসলয়বান, বৃক্ষ। **পল্লী** = ক্ষুদ্রগ্রাম, গ্রামক, গ্রামার্দ্ধ, গ্রামাংশ, পাড়া, কুটী, গৃহ, নগরবিশেষ, লতা, গৃহগোধিকা। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. গাছের শাখার নতুন অংশকেই সাধারণত **পল্লব** বলা হয়ে থাকে, গ্রামবাংলায় যাকে বলা হয় 'ডালের ফেঁকড়া'। কিন্তু যেহেতু তা **পল্লবিত** অংশ বা **তত** (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪) মাত্র, সেইহেতু যেকোনো সত্তার বিস্তার-বাহক অংশ মাত্রেই **পল্লব**-পদবাচ্য হয়ে যায়। ব.শ. **পল্লব** শব্দের অর্থ রূপে সেকারণেই কিসলয় থেকে শুরু করে চোখের পাতা পর্যন্ত সমস্ত 'সত্তার-অগ্রণী-অংশ'কে শনাক্ত করে দেন। আর **পল্লী** তো গ্রামের নতুন করে গ্রামের বাইরের দিকে বেরোনো **পাড়া**ও বটে। দ্র. **পাড়া**।

পাত : ১. ✓পত্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পাত*** = ***পত*** *হইতে জাত; যাহা* ***পত্*** *করিয়াছে বা পতিত হইয়াছে।* ৩. **পাত** = পতন, পড়া, ভ্রংশ, চ্যুতি ... ইত্যাদি; পাতা, ভোজনার্থ কদলী-প্রভৃতির পত্র ... ইত্যাদি; পাতিত করা, ধারণার্থ স্থাপন করা, দেবতার অধিষ্ঠানার্থ স্থাপন করা, বিস্তার করা, অবতারণ করা, বিছান, প্রতিষ্ঠিত করা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. পতনের ফল হল **পাত**। এই শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। স্বভাবতই শব্দটির সঙ্গে উপসর্গের যোগে অজস্র শব্দ জন্মেছে (যথা **অনুপাত, অভিসম্পাত, আপাত, আপাততঃ, উৎপাত, চরণপাত, দৃক্‌পাত, দৃষ্টিপাত, নিপাত, প্রণিপাত, প্রপাত, বিপ্রপাত, সম্পাত, সূত্রপাত** ... ইত্যাদি), সন্ধি-সমাস হয়েও নেহাত কম শব্দের জন্ম হয়নি (যথা **পাতঝাড়ু, পাতক্ষীর, পাতখোলা, পাতড়া, পাততাড়ি** ... ইত্যাদি)। এর মধ্যে চরণের পড়া হল **চরণপাত**, দৃশ্-এর পড়া হল **দৃক্‌পাত**, দৃষ্টির পড়া হল **দৃষ্টিপাত**, নিঃসৃত হয়ে পড়া হল **নিপাত**, প্রণামের পড়া হল **প্রণিপাত**, প্রকৃষ্টরূপে পড়া হল **প্রপাত**, বিপরীতভাবে **প্রপাত** হলে **বিপ্রপাত**, সম্যক পড়া হলে **সম্পাত**, উপর থেকে **সম্পাত** হলে **অভিসম্পাত**, সূত্রের পড়া হলে **সূত্রপাত**, উপর থেকে পড়া হলে **উৎপাত**, অনুরূপ পড়া হলে **অনুপাত**, এবং পাত-এর আশ্রয় যাহাতে সে হল **আপাত**। এই **আপাত**-এর তারিত হওয়ার নির্যাসত্যাগ যাহাতে, তাকে বলে **আপাততঃ**। এর মধ্যে **অনুপাত** বললে আমরা ratio বুঝি কেন? বুঝি এইজন্য যে, তার ভিতরে 'অনুরূপ পাতন' থাকে। (২:৩ হলে ৪:৬ হবে)। ... দ্র. **পাতা**।

পাতক (পাতকিনী, পাতকী, পাতল, পাতলা) : ১. ✓পাতি + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পাতক*** = ***পাত*** *করে যে।* ***পাতকিনী*** = ***পাতক****-এর গতিশীল আধাররূপিণী যে।* ***পাতকী*** = ***পাতক****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পাতল*** = ***পাত*** *লালিত/লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***পাতলা*** = ***পাতল****-এর আধার যে।* ৩. **পাতক** = দুরিত, কলুষ, পাপ। (অতিপাতক, মহাপাতক, উপপাতক, অনুপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, পাত্রীকরণ, মলাবহ, প্রকীর্ণক ভেদে পাতক নববিধ।) **পাতকিনী** = স্ত্রী-পাপী। **পাতকী** = পাপী। **পাতল** = সূক্ষ্ম, লঘু, হালকা, শুষ্ক। **পাতলা** = কৃশ, রোগা (গড়ন), সূক্ষ্ম (fine-কাপড়), তরল, পুরু বা মোটা নয় (thin), ফাঁক-ফাঁক, তীক্ষ্ণ (sharp)। (পাতলা ঘুম)। (ব.শ.)। ৪. **পাতলা** যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত।

পাতা (পাতন, পাতনা, পাতান, পাতিত) : ২. *পাতা* = *পাত-এর আধার যে। **পাতন** = **পাত** অন (on) যাহাতে। **পাতনা** = **পাতন**-এর আধার যে। **পাতান** = **পাতা** অন (on) থাকে যাহাতে। **পাতিত** = যাহাকে **পাতন** করা হইয়াছে।* **৩. পাতা** = বৃক্ষপত্র, ভোজনার্থ আধার কদলীপত্র, ফুলের পাপড়ি, চক্ষুর আবরণ, পুস্তকের পত্র, পাতার মতো বস্তুমাত্র; বিস্তৃত করা, বিছান ইত্যাদি, পাতিত, প্রসারিত, বিস্তারিত; পাতিত করান, বিস্তৃত করান, প্রত্যয় করান। **পাতন** = অধঃপ্রাপণ, অধোনয়ন, নিক্ষেপ, স্রাবণ, স্বস্থানভ্রংশন। **পাতিত** = অধোনীত, ভ্রংশিত, শায়িত, স্থাপিত। (ব.শ.)। **৪. পাতা** বহু অর্থে প্রচলিত। অন্য শব্দগুলিও কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের প্রাচীন জ্ঞানী পুরুষেরা বলতেন, 'হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর **পাতন**'। বাংলায় পৌঁছে আমরা কিন্তু সেই **পাতন**কে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছি। কার্যত বাংলায় **পাত** শব্দটি নানাভাবে প্রসারিত ও ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, অথচ অর্থ ধারণ করেছে মূলত **পত্** ক্রিয়া থেকে। **পত-পতন-পাত-পাতন-পাতা-পাতান** — এই প্রক্রিয়ায় শব্দটি এগিয়েছে, তার অর্থও বিস্তার লাভ করেছে এবং গাছের **পাতা**কে তা বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। একা রবীন্দ্রনাথই কেবল 'আমি কান **পেতে** রই' কিংবা 'আকাশে **পাতিয়া** কান, আমি শুনেছি তোমার গান' বলে গান করেননি, সাধারণ বাংলাভাষী একইভাবে **পাত** শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করে থাকেন। বাংলায় লোকে মাথা **পাতে**, বুক **পাতে**, হাত **পাতে**, কান **পাতে**, আঁচল **পাতে**, দোকান **পাতে**, আড়ি **পাতে**, দই **পাতে**, ভোজবাড়িতে **পাত পাতে** ... এবং কী পাতে না! গ্রামবাংলায় এখনও লোকে ঘরের মুখ **পাতে** তুলসীগাছ নিমগাছ অবশ্যই রাখে, এখনও মায়েরা শিশুদের জন্য গান গায় — 'ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী মোদের বাড়ি এসো / খাট নাই পালং নাই চোখ **পেতে** বসো।' অর্থাৎ খোকার চোখের **পাতা পেতে** তাতেই বসো! নইলে খোকার চোখে ঘুম আসবে কী করে! তার মানে, **পাতা** শুধুমাত্র **পত্র** নয়, হাত **পাতা**, **পাত পাতা**, **পেতে** দেওয়া, **পাতান** ... ইত্যাদিও বটে। অর্থাৎ কিনা, বাংলাভাষায় এই **পাত** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির ব্যবহার ও তাদের অর্থের বিপুল বিস্তার ঘটেছিল, এখনো সে বিস্তার কমবেশি রয়েছে; যদিও **পাতান** শব্দটির ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও 'বন্ধু-পাতান', 'স্যাঙাত-পাতান', 'সখা-পাতান', 'সই-পাতান', 'গঙ্গাজল-পাতান', বকুলফুল-পাতান' ... প্রভৃতি শব্দবন্ধ খুব শোনা যেত। শ্রীকৃষ্ণ তো ছিলেন দ্রৌপদীর **পাতান** সখা। শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন অর্জুন, শ্রীদামসখাও ছিলেন। সবই **পাতান** সম্পর্ক, স্বাভাবিক-সামাজিক বা রক্তসম্পর্ক নয়। এইসব **পাতান** সম্পর্ক তাই বলে অসামাজিক ছিল না, ছিল 'ধর্ম্মানুসারে কৃত' — **ধর্ম্ম**বেটা, **ধর্ম্ম**বেটি, **ধর্ম্ম**মা, **ধর্ম্ম**বাপ ... ইত্যাদি।

যতদূর বোঝা যায়, এই **পাতান** সম্পর্কগুলি ছিল ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক-সম্পর্কজালের ছিন্ন অংশ বা জালের ভিতরে উদ্ভূত ফাঁকসমূহ পূরণ করার উপায়। আসলে ঝাঁকপ্রাণী হওয়ার কারণে আদিম যৌথমানবসমাজ একপ্রকার সম্পর্কজালে আবদ্ধ ছিল। **দক্ষোৎপত্তির** পর রক্তসম্পর্ক-ভিত্তিক সেই আদিম যৌথসমাজ ভেঙে গিয়ে যে বৈদিক সমাজের সূচনা হল, স্বভাবতই তা ছিল ভেদমূলক, যা কিনা তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কজালকে নানা স্থানে ছিঁড়ে দিয়ে ফাঁক করে **দক্ষ**-স্বার্থের সুবিধা করে দিত এবং দিয়েছিল। প্রচলিত রক্তসম্পর্ক সেই ফাঁকগুলি পূর্ণ করতে পারে না, মেরামত করে নিতে বা **সেরে** নিতে পারে না, পারেনি। সমগ্র মানবঝাঁককে, সমগ্র মানবসমাজকে পরিচালনা করতে হলে, সেই সামাজিক সম্পর্কজালের ঐ ছিন্ন অংশগুলি, ছিদ্রগুলি মেরামত করার বা **সেরে** নেওয়ার দরকার ছিল। **পাতান** সম্পর্কগুলির উদ্ভব ঘটেছিল, বলা ভালো, ঘটানো হয়েছিল, সেই অনিবার্য সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আর, সামঞ্জস্যবাদী বঙ্গদেশ ছিল সে ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী।

তাই, এই **পাতান** সম্পর্কের উত্তরাধিকার বাংলাভাষীদের সমাজে বিপুলভাবে প্রচলিত ছিল, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল, এখনো হয়তো কিছু কিছু আছে। আর সেটি যে কেবল হিন্দুবাঙালিদের ক্ষেত্রেই ছিল, এমন নয়; গ্রামবাংলার মুসলমানদের মধ্যেও সমানভাবে প্রচলিত ছিল। 'মু-বোলি-মা', 'মু-বোলি-বেটি', 'মু-বোলা বেটা' ... প্রভৃতি সম্পর্কের রমরমা ছিল গ্রামবাংলার মুসলমানদের মধ্যে। শুধু কি তাই? রায়টের হাত থেকে বাঁচাতে হিন্দু-মাকে নিয়ে তাঁর **পাতান** মুসলমান-পুত্র তাঁকে গোয়ালন্দঘাট পার করে তার হিন্দুভাইয়ের হাতে কেবল তুলেই দেয়নি, পরবর্তী 'তুলনামূলক-শান্ত' সময়ে সেই মায়ের একটা পোস্টকার্ড পেয়েই গোয়ালন্দঘাটে ছুটে এসেছে, অপেক্ষা করেছে, সেই মাকে আপন দায়িত্বে নিয়ে গিয়ে মায়ের 'শ্বশুরের ভিটেতে শেষ কালীপুজো' সেবছরের মতো করিয়ে আবার তাঁকে গোয়ালন্দঘাটে পৌঁছে দিয়েছে। আর ঐ মা? অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ঐ মা কিন্তু কোনোদিন একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁর **পাতান-পুত্র**কে রক্তসম্পর্কের পুত্রের থেকে বিন্দুমাত্র আলাদা করে দেখেননি। **পাতান**-পুত্রকে খেতে দেওয়ার সময় তিনি কোনো রীতিই মানতেন না। ছেলের আবার জাত কী! সব ধর্মই তাঁর এই বিস্ময়বোধক প্রশ্নের সামনে ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে যেত। একই কাণ্ড ঘটাতেন মা সারদামণি তাঁর আমজাদকে নিয়ে। ...

এই **পাতান** সম্পর্ক কত মধুর ছিল, কত মহিমাময় ও নির্ভরযোগ্য ছিল, গ্রামবাংলার মানুষেরা আজও সেসব কথা বলে থাকেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম ও মৃণালের মধ্যে **পাতান** দাদা-বোন সম্পর্ককে এনেছেন সেই একই মহিমায়। আরও বহু বাংলাভাষী সাহিত্যিক নিশ্চয় এই সামাজিক সম্পর্কটি নানাভাবে দেখে থাকবেন। ...

বাংলাভাষী ছাড়া অন্য কোনো জাতি ভাবতেই পারে না **পাতান** সম্পর্ক বলেও একটা সম্পর্ক ছিল, থাকতে পারে। ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে **ধর্ম্ম**পুত্র, **ধর্ম্ম**কন্যা ... ইত্যাদির কিছু কিছু বোধ থাকলেও, বাংলার আবেগ সেখানে ততটা দেখা যায় না। যান্ত্রিকতা ও আধুনিকতা এই **পাতান** সম্পর্ককে আজ চিনতে পারে না, যদিও এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই একদিন আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। সেই আধুনিকতার কারণে আজকের সামাজিক পরিস্থিতি এমন যে, এমনকি আমাদের এই বাংলাতেও, শহরে তো এইসব **পাতান** সম্পর্কের কথা আজকাল একেবারেই শোনা যায় না, গ্রামবাংলায়ও আজকাল খুব কমই শোনা যায়।

চল্লিশ/পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামবাংলার মানুষ তাদের সামাজিক-

পারিবারিক-সম্পর্ক ও **পাতান**-সম্পর্কের সূত্রের জালে এমন গভীরভাবে আবদ্ধ ছিল যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ঐশ্বর্য-দারিদ্র্য — এসব ভেদ ঢেকে রাখার জন্য নতুন করে 'সামঞ্জস্যের চাদর' বিছানোর দরকারই পড়ত না। কিন্তু এখন আর সে পরিবেশ নেই, পরিস্থিতিও নেই; সেই সম্পর্কের জাল এখন শতধা ছিন্ন, তাতে ছোটখাট খুনোখুনি তো চুনোমাছের মতো গলে যায়, বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা রায়টও গলে যায়, বিদ্রোহের নামে অজস্র খুনখারাপি গলে যায়, বিদ্রোহদমনের নামে লক্ষ মানুষের গণহত্যাও গলে যায়, বড়-ছোট যুদ্ধ গলে যায়, এমনকি সুনামিও গলে যায়; এবং তার ফলে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের দেহ আর মন দুটোই মরে যায়, অথচ অন্য মানুষেরা সেই মৃত্যু ও তার কারণ অনুভবই করতে পারে না। জালটা যে ছিঁড়ে গেছে!

এসবের কারণ এখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। যথাযথ শ্রম না করে সস্তায় বাজিমাত করার দক্ষনীতির উপর ভিত্তি করে যে আধুনিকতার জন্ম তারই ফলস্বরূপ প্রবল যান্ত্রিকতার (ঘোর কলির) সংস্কৃতি এসেছে আমাদের দেশে। স্বাধীনতালাভের আগে পর্যন্ত আমরা নির্ভর করতাম আমাদের পিতৃপরম্পরায় অর্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জ্ঞানের উপর, তারই উপর নির্ভর করে পশ্চিমী জগৎকে বুঝতাম, বিরোধিতা করতাম পশ্চিমী শাসনের। রবীন্দ্রনাথও তাই করতেন। স্বাধীনতালাভের পর আমরা আমাদের অর্জনকে অবহেলা করে পশ্চিমকে আগাপাছতলা নকল করতে শুরু করি। ফলস্বরূপ পশ্চিমী যান্ত্রিকতা এখন এতই চেপে বসেছে যে, নিজেদের সর্বস্ব হারাতে বসেছি আমরা। তারই কারণে এমনকি গ্রামবাংলাতেও ঘোর কলির প্রাদুর্ভাব এতই প্রবল হয়েছে যে, বাংলাভাষীর মন থেকে সমস্ত আবেগ মুছে দেওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে, হচ্ছেও।

আর সেকারণেই সই-**পাতান**, বন্ধুত্ব-**পাতান**র মতো আবেগ ক্রমশ কমে গেছে, কমে যাচ্ছে। ফলত **পাতান** শব্দের ব্যবহারও কমে গেছে। বর্তমানে এমনই দুরবস্থা যে, 'গঙ্গাজল-পাতান', 'বকুলফুল-পাতান' ... প্রভৃতি কীভাবে পাতান হত, তার কী কী উপকরণ বা ভিত্তি ছিল, সেসব কথা এমনকি গ্রামবাংলার মানুষের মন থেকেও হারিয়ে গেছে। অথচ কী উচ্চ-মার্গের ব্যবহার ছিল এই **পাতান** সম্পর্কগুলিতে, একালে তা কল্পনাও করা যায় না। **পটান**তে যেখানে স্বার্থ থাকে, একপক্ষের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অপরপক্ষকে ব্যবহার করে নেওয়ার ব্যাপার থাকে, **পাতান**র ভিত্তিতে থাকে ঠিক তার উলটো ব্যাপার — পরার্থ। আর, তার কোনো সীমা থাকে না, মাপ থাকে না। **বন্ধু**র জন্য বন্ধু যা যা করতে পারে, **সখা**র জন্য সখা যা যা করতে পারে, **সই**য়ের জন্য সই যা যা করতে পারে ... সবই করত তারা। আর **গঙ্গাজল**-সই, **বকুলফুল**-সই? কত কোমল সম্বন্ধের বন্ধন ছিল এই সকল সই-**পাতান**তে, আজ তা কল্পনা করাও কষ্টকর! ... এসব নিয়ে উত্তরসূরিরা ভাবুন। আমরা এখানেই ইতি টানছি।

পাতাল (পাতালগঙ্গা) : ১. ✓পত্ + আল (আলঙ্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***পাতাল*** = ***পাতা*** *লালিত হয় যেখানে।* ***পাতালগঙ্গা*** = *যে* ***গঙ্গা*** *পাতালে প্রবাহিত রয়েছে।* **৩. পাতাল** = সপ্ত অধোভুবনের সপ্তম নিম্নতম ভুবন, নাগলোক, পাতালবৎ সদ্যোনাশক, বিবর ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **পাতাল** = পৃথিবীর নীচে অবস্থিত স্থান। পাতালের সংখ্যা সাতটি। দেবীভাগবত অনুসারে অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবীর অধোদিকে সপ্ত বিবর আছে। এদের পাতাল বলা হয়। এই সপ্ত পাতাল স্বর্গের চেয়েও সুখপ্রদ স্থান। এখানে দৈত্য, দানব ও সর্পরা তাদের পরিবার নিয়ে বাস করে। এরা সকলেই মায়াবী। এই পাতালগুলির নাম — অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, ও পাতাল। মায়ার অধীশ্বর ময়দানব এইসকল স্থানে নানাবিধ পুরী, মণিরত্ন-সুশোভিত বিচিত্র বাসগৃহ নির্মাণ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী এই পাতালগুলির নাম — অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিতল, মহাতল, সুতল, ও পাতাল। এই সকল পাতালের প্রত্যেকের পরিমাণ এক যোজন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** মাটির তলার জলময় লোক অর্থে **পাতাল** শব্দটি আজও প্রচলিত, **পাতালগঙ্গা** অপ্রচলিত। **৫.** পাতাল জিনিসটি কী? 'যে **পাতা** লালন করে, অভীষ্ট দান করে', তাকে **পাতাল** বলে। আপনার যদি একটি বাড়ি বা গাড়ি থাকে, বুঝতে দেরি হবে না। ধরুন, কেউ এসে আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়ল, বলল, এখন থেকে এ বাড়িতে আমি থাকব। আপনি চিৎকার করে বলবেন, এটা আমার বাড়ি। লোকটা বলতেই পারে, প্রমাণ করুন। আপনি সঙ্গে সঙ্গে আলমারি থেকে দলিলটা বের করে দেখিয়ে দেবেন, দেখো, এতে আমার নাম লেখা রয়েছে। এরপর লোকটা যদি দলিলটা কেড়েও নেয়, তার সুবিধা হবে না। ওটার সাক্ষী রয়েছে **সূর্য্য**, যার আধুনিক নাম রাষ্ট্রযন্ত্র। **সূর্য্য**সাক্ষী (দ্র. **অগ্নিসাক্ষী**) রেখে আপনি এই বাড়ি (সম্পত্তি) কিনেছেন, তার জন্য **সূর্য্য**কে (সরকারকে) আপনি সাত পার্সেন্ট রেজিস্ট্রেসন ফি দিয়েছেন। সেও ঐ ফি নিয়েছে এবং আপনার দলিলের একটি কপি রেখে দিয়েছে — প্রয়োজনে সাক্ষী দেবে বলে। এরপরও যদি লোকটা ঝামেলা করে, আপনি যাবেন '**সূর্য্যে**র তনয় যম'-এর কাছে। ইনি **ধর্ম্ম**বিতার **যম** অর্থাৎ কোর্ট। তার চেলাচামুণ্ডা থানা-পুলিশ-মিলিটারি সবই রয়েছে পিছনে। দেখবেন, বাড়িটা যে আপনারই, সমাজের অভিভাবক সত্তাগুলি সবাই সেই কথা বলতে লেগেছে।

তাহলে দেখলেন তো, বাড়িটি আপনার দৃশ্যত বাইরে মাটির উপর খাড়া রয়েছে বটে কিন্তু কার্যত ওখানে নেই, ঢুকে গেছে একটা কাগজের পাতার ভিতর, তার নাম দলিল। তার মানে, আপনার সামনে যত গাছপালা, পুকুর, বাদাড়, ঘরবাড়ি, জমিজায়গা, শিল্পকারখানা, গাড়িঘোড়া, হাইরাইজ-মল ... যা সব দেখছেন, সেগুলো চোখের সামনে দেখা গেলেও আসলে ওখানে নেই। তারা রয়েছে কাগজের পাতায়। জগতে সূচ্যগ্র মেদিনীও নেই যেটি পাতায় ঢুকে যায়নি। আপনি এক চিলতে ঘাসে পা রাখুন কিংবা একটা গাছের ডালেই হাত রাখুন, আপনি কিন্তু কারও না কারও দলিলে পা রাখলেন। সে এসে আপনার কলারে হাত রাখতে পারে। কারণ সমগ্র জগৎ বলতে গেলে **সূর্য্য**সাক্ষী রেখে ঢুকে বসে আছে দলিল নামক কাগজের পাতায় পাতায়। অর্থাৎ সমগ্র বাহ্যজগতের **পাতাল**প্রবেশ ঘটে গেছে। হাজার টাকার নোটের বা চেকের কাগজটা ঠিকভাবে নাড়ান, দেখবেন তার থেকে হাজারটা এক টাকার মুদ্রা

ঝনঝন করে পড়ছে! কাগজের পাতার এই জগৎটাকে দেখছেন মানেই হল আপনি **পাতাল**কে দেখতে পাচ্ছেন।... আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য কলিম খান-এর 'দিশা থেকে বিদিশায়' নামক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের 'নরকদর্শন ...' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পাতি (খেলনাপাতি, যন্ত্রপাতি ..., পাতিএঁড়ে, পাতিকাক, পাতিচোর, পাতিঝিনুক, পাতিডাল, পাতিনেড়ে, পাতিনেবু, পাতিবুর্জোয়া, পাতিমাতাল, পাতিশিয়াল, পাতিহাঁস ...) : ২. ***পাতি*** = ***পাত*** *গতিশীল যাহাতে।* **৩. পাতি** = পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, সমূহ, পাশার বিন্দু-পঙ্‌ক্তি অনুসারে দান, খেলাবিশেষ, বাঘবন্দি খেলা, পত্রিকা, পত্র, পাত, মাদুরের উপাদান, পাতার মতো পাতলা বাঁশের বেতি; পাতসম্বন্ধী, পাতের মতো, সামান্য, নিকৃষ্ট, ছোট। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে খুবই প্রচলিত। **৫. পত্‌** কথাটি যেহেতু অস্তিত্বের পরিধির বাইরে মুখ বের-করা অংশকে বোঝায়, আর যা বেরোয় তা সেই অস্তিত্বের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র, তাই অস্তিত্বের যে কোনো ধরনের ক্ষুদ্র-সহোদর মাত্রেই **পাতি** পদবাচ্য হয়ে যায়। খেলনার সঙ্গে যেসব খুচরো বস্তু থাকে, তাদের নিয়ে যেমন **খেলনাপাতি,** যন্ত্রের সঙ্গে যেগুলি থাকে তাদের নিয়ে তেমনি **যন্ত্রপাতি**। আবার, একই নিয়মে কাকসমাজের সঙ্গে তাদের যে নিকৃষ্ট সঙ্গীরা থাকে, তারা হল **পাতিকাক**। একই নিয়মে যে কোনো সত্তার ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকা উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-ক্ষুদ্র-অগ্রগামী-অনুগামী মাত্রকেই **পাতি** শব্দে উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত হয়ে যায়। বলতে কী, প্রায় প্রতিটি বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে **পাতি** শব্দটি জুড়ে ফেলে অজস্র শব্দ বানিয়ে ফেলেন বাংলাভাষীরা। যেমন **পাতিরাম, পাতিশ্যাম, পাতিমাস্তান, পাতিশয়তান, পাতিহাবামি, পাতিনেতা, পাতিডাক্তার, পাতিমাস্টার, পাতিকেষ্ট, পাতিবিষ্টু, পাতিমেকুর, পাতিঢেকুর, পাতিপুকুর, পাতিকুকুর** ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি ইংরেজ জাতির মানুষেরাও জানতেন, এই **পাতি** (= petty) ব্যাপার-স্যাপার যাদেরই রয়েছে, তাদেরই **পাতি** বা petty বলা যায়। স্বাধীনতার প্রাক্কালের বাংলাভাষী শিক্ষিত মানুষেরা প্রায় সবাই এসব কথা জানতেন, বুঝতেন। তাঁরা ছিলেন দেহের দিক থেকে পরাধীন, কিন্তু মনের দিক থেকে স্বাধীন; প্রকৃতই স্বাধীনচেতা। তাই, এমনকি সেকালের মার্কসবাদীরাও ইংরেজি 'পেটিবুর্জোয়া' শব্দের মানে লিখতেন **পাতিবুর্জোয়া**। স্বাধীনতা-উত্তর কালের আ্যা-শিক্ষিতরা হয়ে যান মুখে-বাংলাপ্রেমী কিন্তু মনে মনে ইংরেজির দাস, তাঁরা আর **পাতিবুর্জোয়া** বলেন না, বলেন 'পেটিবুর্জোয়া', লেখেনও তাই। বিগত বামশাসনকালে এই অধঃপতন এত ব্যাপকভাবে ঘটেছে যে, তাঁরা **পাতিশিক্ষক**কে বা **পাতিমাস্টার**কে তাঁরা বলেন **প্যারাটিচার**। এরকম করার ফলে সরকারের পক্ষে উত্তরপ্রজন্মের শিক্ষককে **পাতিশিক্ষকে** পরিণত করে ঠকানোর সুবিধা হয়ে গেছে। ... **৬.** ফরাসি petit, ইংরেজি petty।

পথ্ **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপথ, **অপথ্য** (দ্র. নেপথ্য), আপথ, পঁথ, পথ্, পথ, পথকর, পথখরচ, পথদর্শক, পথপ্রান্ত, পথবিপথ, পথভ্রম, পথভ্রান্ত, পথহারা, পথাপথ, পথি, পথিক, পথিকা, পথিকবনিতা, পথিকসার্থ, পথিকাশ্রয়, পথিন (আকাশপথিন), পথিনী, পথিভয়, পথী, পথুয়া, পথেপড়া, পথ্য (নেপথ্য), পথ্যাবক্ত্র, পন্থ, পন্থ-বিপন্থ, পন্থা, পন্থিক, পন্থী, পাথেয়। **পথ্** = পায়ীর তারণস্থিতি। **পথ** = পায়ীর তারণস্থিত যাহাতে।

পথ (পন্থ, পন্থা, পন্থিক, পন্থী, পথিক, পথ্য) : **১.** ✓পথ্ + অ (ঘঞর্থে, ক) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পন্থ*** = *পায়ীর (প্রাপণকারীর) নাকরণ-অনকরণ থাকে যাহাতে।* ***পন্থা*** = ***পন্থ****-এর আধার যে।* ***পন্থিক*** = ***পন্থ****-ন্ গতিশীলভাবে করে যে।* ***পন্থী*** = ***পন্থ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পথ*** = *পায়ীর বা প্রাপণকারীর তারণ থাকে যাহাতে।* ***পথিক*** = ***পথ****-এ গমন করে যে।* ***পথ্য*** = ***পথ*** *থাকে যাহাতে।* **৩. পন্থ** = পথ, উপায়, কর্ম্মমার্গ। **পন্থা** = পথ, উপায়। **পন্থিক** = পথিক। **পন্থী** = সম্প্রদায়বিশেষের বিহিত ধর্ম্মপথাবলম্বী। **পথ** = মার্গ, উপায়, অধিকার, দ্বার। **পথিক** = দেশান্তরগমনার্থ পথিগামী, অধ্বগ, পান্থ, পথিকুশল। **পথ্য** = হিত, শুভকর, শাস্ত্রসম্মত, আয়ুধ্য, স্বাস্থ্যকর, পথিভব, মার্গসাধু, হরীতকী বৃক্ষ, আরোগ্য, হিতবাক্য, স্বাস্থ্যকর দ্রব্য। (ব.শ.)। **৪. পন্থিক** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫. পথ** ও **পন্থা** দুটি শব্দই 'উপায়' বা 'রাস্তা'কে বোঝালেও, তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। **'ং'রূপিণী**-রহস্যরূপিণীর কনিষ্ঠ রূপ হল **'ন্'**। এই 'ন্' রয়েছে **পন্থায়**। **পথ**-এ তা নেই। সুতরাং পার্থক্য তো থাকবেই।

আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায় আমাদের শরীর, আর বিপদটাও তাকেই নিয়ে। পরমাপ্রকৃতি আমাদের তো শুধু জন্ম দিয়েই ছাড়েননি, কতকগুলি অভাবের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন; এইবার সেই ফাঁক বোজানোর চেষ্টায় জীবন কাটাও! সেই ফাঁকগুলির পূরণকে আমরা একালে 'প্রয়োজন' বলে থাকি। তা পাওয়ার জন্য এদিক ওদিক এগোতে হয়। কিন্তু কোন দিকে এগোব? আর, কাকে নিয়েই বা এগোব? স্রষ্টা তো আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন করে ছেড়ে দেননি যে, যখন খুশি যেদিকে খুশি যেমনভাবে খুশি এগিয়ে যাব। আমাদের প্রত্যেককেই তিনি জন্ম দিয়েছেন একজন 'চাষা' বা 'হেলে-কৈবর্ত' করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের সামনে একেবারে নিজস্ব সহজাত দুটো করে বলদ রয়েছে — আমাদের শরীর আর মন; যাবেন তো কাকে নিয়ে যাবেন? শরীর নিয়ে যাবেন, না মন নিয়ে যাবেন? অর্থাৎ মনে মনে যাবেন না কি হেঁটে হেঁটে বাহ্যিকভাবে যাবেন? সবাই জানেন, হেঁটে হেঁটে যাওয়ার রাস্তা এবং মনে মনে যাওয়ার রাস্তা একেবারেই আলাদা। শরীর দিয়ে হাঁটার রাস্তাকে বলে **পথ** এবং মনে মনে যাওয়ার রাস্তাকে বলে **পন্থা**। অর্থাৎ **পথ** দুরকম — 'গতরে হাঁটার পথ' (**পথ**) ও 'মনে হাঁটার পথ' (**পন্থা**)।

পন্থ ও **পথ** শব্দদুটির ভিতরে পার্থক্য কেবল একটি 'ন্'-এর। অথচ দেখা যাচ্ছে, শব্দদুটি প্রায় একই অর্থ বহন করছে। বলতে কি, বর্তমানে **পন্থা** ও **পথ** উভয় শব্দই অনেকসময় সমার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আদিতে এরূপ ছিল বলে মনে হয় না। আদিতে দৃশ্য বাহ্য

পার্থিব রাস্তা বা road-কে বলা হত **পথ**, কিন্তু অদৃশ্য মানসিক উপায়কে (way) বলা হত **পন্থ** বা **পন্থা**। যিনি বিশেষ আদর্শ বা দর্শন অনুসরণ করে চলেন, তিনি সেই **পন্থার পন্থী** ছিলেন, একালে যেমন বুদ্ধ**পন্থী**, গান্ধী**পন্থী**, মার্কস**পন্থী** ... ইত্যাদি। এখনও পর্যন্ত এঁদের বুদ্ধপথী, গান্ধীপথী ... এরকম বলার প্রচলন হয়নি, যদিও একালে দৃশ্য-অদৃশ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই **পথ** শব্দের ব্যবহার হয়ে চলেছে। ... তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'তোমার বাস কোথা হে পথিক, দেশে কি বিদেশে?' তখন সেই **পথিক** দেখন্তি-পথে চলা **পথিক** না কি অদৃশ্য-পন্থায় চলা **পন্থিক**, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় হয়। ...

তবে **পথ্য** শব্দটি, যদর্থ '**পথ** থাকে যাহাতে', এখন তার সব অর্থ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র 'রুগীর ভক্ষ্য'তে পরিণত হয়ে গেছে। তার না আছে শাস্ত্রীয় পথের অধিকার, না আছে সাধুপথের বা শুভপথের অধিকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মুহূর্তে আপনি দেখবেন, জ্বর কেটে যাওয়ার পরে লাউশাক-কলার টপ্‌কা-ঝোলের তরকারি রোগী খাচ্ছে, তখনই মনে হতে পারে, এ কি এখন 'আরোগ্যের **পথে**' এগোচ্ছে? তখন আর বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ঐ তরকারিতে আরোগ্যের **পথ** রয়েছে বলেই ওটিকে **পথ্য** বলে। আমাদের ধর্মগুরুরা অবশ্য এই দৈহিক **পথ্যে** থেমে যাননি, তাঁরা মানসিক **পথ্যের** কথা, এমনকি **পরিণামপথ্যের** কথাও বলে গেছেন; আমরা তা ভুলেছি। (দ্র. **পরিণাম**)। বোধকরি রবীন্দ্রসংগীতকে একালের বাংলাভাষীর মানসিক **পথ্য** বলা যায়। **৬.** ইংরেজি path।

পদ্ (পাদি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপত্তি, অত্যাপন্ন, অনিষ্পত্তি, অনুপপত্তি, অপদ, অপদার্থ, অব্যাপন্ন, অব্যুৎপত্তি, আপদ, আপৎকাল, আপত্তি, আপত্য, আপদ, আপদর্থে, আপদুদ্ধরণ, আপদ্‌গ্রস্ত, আপদ্ধর্ম্ম, আপদ্‌ভঞ্জন, আপন্ন, আপন্নসত্ত্বা, আস্পদ, আপাদ, আপাদন, আপাদপর্যন্ত, আপাদমস্তক, আপ্রপদ, আফত (আপদ), উঁই, উই, উইচারা, উইটিপি, উৎপত্তি, উৎপন্ন, উৎপাদন, উপদিকা, উপপন্ন, একপদ, নিরাপদ, নিষ্পত্তি, পইথান, পইপই (পায়েপায়ে), পএজার, পএয়ার, পগ, পজ্ঝটিকা, পৎকাষী, পত্তি, পত্তিগণক, পত্তিপাল, পত্তিসংহতি, পদ্, পদ, পদ-উধ, পদক, পদকমল, পদক্রম, পদগ, পদ-চার (পয়ার), পদচিহ্ন, পদছায়া, পদচ্ছেদ, পদগতি, পদন্যাস, পদপঙ্‌ক্তি, পদপঙ্কজ, পদপল্লব, পদপাঠ, পদবন্ধ, পদবি, পদবিগ্রহ, পদবী, পদব্রজ, পদভঞ্জন, পদভ্রংশ, পদম, (পদুম), পদরথ, পদরথী, পদলেহন, পদসংবাহন, পদসেবা, পদস্থ, পদস্থান, পদা, পদাঘাত, পদাঙ্ক, পদাত, পদাতি, পদাতিক, পদানুশাসন, পদান্তর, পদাবলী, পদাব্জ, পদাম্বুজ, পদাম্ভোজ, পদারবিন্দ, পদার্থ, পদার্থন, পদার্থবিদ্যা, পদার্পণ, পদে-পদে, পদ্ধতি(তী), পদ্ম, পদ্ম-আঁখি, পদ্মকন্দ, পদ্মকর, পদ্মকর্ণিকা, পদ্মকাঁটা, পদ্মকোশ, পদ্মগন্ধ, পদ্মগন্ধি, পদ্মগর্ভ, পদ্মগোখুরা, পদ্মচিনি, পদ্মজ, পদ্মজাত, পদ্মতন্ত, পদ্মদল, পদ্মনাভ, পদ্মনাল, পদ্মনিধি, পদ্মপত্র, পদ্মপর্ণ, পদ্মপলাশ, পদ্মপাণি, পদ্মপুরাণ, পদ্মপ্রিয়া, পদ্মবন্ধ, পদ্মবাসা, পদ্মবন্ধু, পদ্মভব, পদ্মভূ, পদ্মমালিনী, পদ্মমুখ, পদ্মমুখী, পদ্মযোনি, পদ্মরাগ, পদ্মরাজ, পদ্মরেখা, পদ্মলাঞ্ছন, পদ্মলোচন, পদ্মসম্ভব, পদ্মহস্ত, পদ্মা, পদ্মাকর, পদ্মাক্ষ, পদ্মাক্ষী, পদ্মাবতী, পদ্মালয়, পদ্মাসন, পদ্মিনী, পদ্মিনীকণ্টক, পদ্মিনীকান্ত, পদ্মিনীখণ্ড, পদ্মী, পদ্মোদ্ভব, পদ্য, পদ্যা, পয়পয় (পায়েপায়ে), পয়ার, পা, পাই, পাইক (পদাতিক), পাইকশাল, পাইঘর, পাইচারি, পাইশাল, পাও, পাও(য়)জামা, পাঁইজোড়, পাঁইজোর, পাঁওদল, পাক্যালা, পা-চারি, পা-চালি, পাজামা, পাদ, পাদকটক, পাদকৃচ্ছ্র, পাদক্ষেপ, পাদগ্রন্থি, পাদগ্রহণ, পাদচংক্রমণ, পাদচাপল্য, পাদচার, পাদচারী, পাদজ, পাদজল, পাদতল, পাদত্র, পাদত্রাণ, পাদদেশ, পাদদাহ, পাদন্যাস, পাদপ, পাদপঙ্কজ, পাদপদ্ম, পাদপদ্ধতি, পাদপা, পাদপাশ, পাদপীঠ, পাদপূরণ, পাদপ্রণাম, পাদপ্রতিষ্ঠান, পাদপ্রহার, পাদবন্দনা, পাদবন্ধন, পাদবিক্ষেপ, পাদভাগ, পাদমূল, পাদরজঃ, পাদশঃ, পাদশাহ (পাৎশা, পাৎসা, পাৎসাহ), পাদশৈল, পাদশোথ, পাদশৌচ, পাদসংবাহন, পাদসেবন, পাদসেবা, পাদস্ফোট, পাদহত, পাদাঘাত, পাদাঙ্গদ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, পাদাত, পাদান, পাদানুধ্যাত, পাদাবনেজন, পাদাবসেচন, পাদাম্বু, পাদান্তঃ, পাদারবিন্দ, পাদার্ঘ্য, পাদার্দ্ধ, পাদাসন, পাদাস্ফালন, পাদিক, পাদী, পাদুকা, পাদু, পাদোদক, পাদোন (পৌনে), পাদ্ম, পাদ্য, পাদ্রি, পাপোষ (পা-পোঁছ), পায়, পায়চারি(রী), পায়জামা, পায়তাবা, পায়দল, পায়া, পায়াভারী, পায়ে-পায়ে, পৈথান, পৌনে (পাদোন), প্রতিপত্তি, প্রতিপাদন, প্রত্যুৎপন্ন, বিপদ, বিপত্তি, বিপদগ্রস্ত, বিপদসঙ্কুল, বিপন্ন, বিপ্রতিপত্তি, ব্যুৎপত্তি, শতপদ, ষট্‌পদ, ষট্‌পদী, সম্পত্তি, সম্পদ, সম্পন্ন, সম্পাদক, সম্পাদন, সম্পাদিত, সম্পাদ্য, সুপদ্য, সুসম্পন্ন।

পদ্ (পাদি) = পায়ীর (প্রাপণকারীর) দান। **পদ** = পায়ীর দান থাকে যাহাতে। **পাদি** = পদজাত গতিশীল যাহাতে।

অপদার্থ : ২. *পদের অর্থ (ক্রিয়া, কার্য্য) নাই যাহাতে*। / যাহাতে তৎপদবাচ্য অর্থ নাই; যে মনুষ্যপদবাচ্য নহে। (ব.শ.)। ৩. পদার্থভিন্ন, অদ্রব্য, অবস্তু। মনুষ্যত্বহীন, অসার, অযোগ্য। (ব.শ.)। ৪. কোনো কাজের নয়, নিষ্কর্মা অর্থে প্রচলিত। ৫. **পদার্থ** শব্দে বিষয়টি আলোচিত হবে। এখানে সংক্ষেপে বলা যাক — সালফিউরিক অ্যাসিড যদি তার স্বাভাবিক আচরণ না করে, তবে সে বিশ্বব্যবস্থায় যে আসন বা পদ দখল করে আছে, তদনুযায়ী ক্রিয়া করল না। সেক্ষেত্রে সে যেরূপ পদ দখল করে ছিল, সেইরূপ আচরণ করেনি, তাই **পদার্থ**রূপে তার যাথার্থ্য থাকছে না। তখন সেটি অপদার্থ। কথাটি মানুষের ক্ষেত্রেও খাটে। দর্জি যদি তার স্বাভাবিক আচরণ না করে, তবে সমাজের যে আসনে সে প্রতিষ্ঠিত, সেই পদের জন্য নির্দিষ্ট ক্রিয়াটি সে করল না। তখন সে পদার্থ রূপে ব্যর্থ, তাই অপদার্থ। দ্র. **পদার্থ**, **সিদ্ধার্থ**।

পদ (পদচ্যুতি, পদত্যাগ, পদাভিষিক্ত, পদোন্নতি) : ১. ✓পদ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *পাওয়া (পালন-পান) দেয় যে*। / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. পাদ, চরণ, পাদচিহ্ন, পাদক্ষেপ, পাদাক্রান্তস্থান, পাদক্ষেপকাল, চিহ্ন, স্থান, আস্পদ, বিষয়, নাম, বসতি, অবকাশ, অধিকার, বস্তু, বিভক্ত্যন্ত শব্দ, বাক্য,

শব্দ, ব্যাজ, ব্যবসায়, ত্রাণ, শ্লোকচরণ, উপদেশ, প্রদেশ, দ্যুতফলকস্থ কোষ্ঠ, (গণিতে) বর্গমূল, বৈষ্ণবভক্তরচিত গান, সম্মানসূচক, ভিন্ন ভিন্ন ভোজ্য দ্রব্য — ব্যঞ্জনাদি, কার্য্যাধিকার, চাকরী। (ব.শ.)। **৪.** নানার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫. পদ** শব্দের গভীরে 'পাওয়া (পালন-পান) দেয় যে' অর্থ রয়েছে বটে, এবং তা সম্পূর্ণ অর্থও বটে, তবে মানতেই হবে যে ঐ অর্থ অনেকটাই অব্যক্ত। সে তুলনায় যথেষ্ট ব্যক্ত অর্থ দিয়ে গেছেন ব.শব্দকোষ। তাঁর মতে, **পদ** হল 'গমনসাধন'। তার মানে, যা দিয়ে চলা হয়, বা চলে। এর সাথে শুধু একটা কথা জুড়ে নেওয়া দরকার, যে, যার উপরে দাঁড়ায়, সেও **পদ**, কেননা, তাও 'পালন দান করে'। ...

সে যাই হোক, জগতের চলা হয় তার প্রতিটি বস্তুর ভিতর দিয়ে, তাই বাহ্যজগতের বস্তুমাত্রেই **পদ**। সমাজশরীরের চলা হয় তার শাসনতন্ত্রের (আমলাতন্ত্রের) প্রতিটি সাংগঠনিক আসনগুলির সাহায্যে, তাই সমাজসংগঠনের আসন মাত্রেই **পদ**। উদ্ভিদ (পাদপ) এমনকি জড় (খাট ... ইত্যাদি) যার উপর দাঁড়ায়, সেও তার পদ। তাছাড়া জীবের শরীরের গমন সাধিত হয় তার পা দিয়ে, তাই জীবের পা (leg) বা চরণই **পদ**। আমাদের মনের গমন সাধিত হয় তার কাব্যকবিতার **চরণ** দিয়ে, তার ভাষার বাক্যের শব্দাংশ (syllable) দিয়ে, তাই সেগুলিও **পদ**। এরকম অজস্র **পদ** জুড়ে জুড়ে যেমন শারীরিক হাঁটা বা চলা হয়, তেমনি অজস্র **পদ** জুড়ে প্রস্তুত ভাষার ভাষণে মনের হাঁটা হয়ে থাকে। একইভাবে অজস্র ব্যঞ্জনের **পদ** জুড়ে জুড়ে পরিবেশিত হয় আমাদের ভোজন, আবার আমাদের জীবনযাত্রা চলে সমাজে রাষ্ট্রে কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত **পদ** রয়েছে, সেই **পদ**-এ আসীন হয়ে। সেখানে আমাদের বিভিন্ন **পদ**-এ **পদাভিষিক্ত** হতে হয়, তার পর তাতে **পদোন্নতি** হয়, এমনকি **পদত্যাগ** কিংবা **পদচ্যুতি**ও ঘটতে পারে। এবং এইসব **পদ**-ব্যবহারকে আমরা আমাদের দৈহিক-ভোজনিক-বাহ্যিক **পদ**-এর সঙ্গে কখনোই গুলিয়ে ফেলি না। সর্বোপরি এই বাহ্যজগতের প্রতিটি **অর্থ**পূর্ণ **পদ** বা **পদার্থ** জুড়ে জুড়েই যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ গড়ে উঠেছে। সেই কারণে আমাদের **পদ**-বোধ সার্বিকভাবেই বহুরৈখিক।

এ প্রসঙ্গ আমরা আগেও আলোচনা করেছি ('খ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), এখানে পুনরায় সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি একটি বাক্যের দ্বারা শব্দের অর্থ প্রকাশ করে বলেই, সেই শব্দে অনেক সত্তাকেই বোঝানো যেতে পারে। ফলে এই শব্দগুলি স্বভাবতই বহুরৈখিক হয়ে যায়। কিন্তু তাতে সুনির্দিষ্ট ভাষণের সমস্যা হওয়ার কথা। অথচ তা হয় না, হত না। সেকালের ভাষাব্যবহার-কারীদের মন বহুরৈখিকতায় অভ্যস্ত ছিল বলেই কোনো অসুবিধা হত না, হয় না। এখনও, একালেও সর্বনাম শব্দগুলির বেলায় একই নিয়মে আমাদের মন সক্রিয় থাকে, এবং তা সব ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটে। কিন্তু সাধারণভাবে প্রায় সব ভাষাভাষীরাই ক্রিয়াভিত্তিক-মন ত্যাগ করে প্রতীকী-মনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এবং একটি শব্দের একটি মানে বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু বাংলাভাষীদের মন এখনও তার অতীত অভ্যাস ত্যাগ করেনি, অথচ নতুন মনও আত্মস্থ করে নিয়েছে। সেই কারণেই এখনও বাংলাভাষীর পক্ষে ক্রিয়াভিত্তিক বহুরৈখিক বাংলা শব্দের ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধাই হয় না। আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি **পদত্যাগ** বললে 'পা কেটে ফেলে দেওয়া' বোঝায় না, এবং **পদাবলী** বললে কোন **পদ**সমূহকে বোঝায়। আমাদের মনের এই যোগ্যতা রয়েছে বলেই **পদ**যুক্ত শব্দগুলিকে (যথা, **অতিপত্তি, অনুপপত্তি, অনিষ্পত্তি, অব্যুৎপত্তি, আপদ, আপৎকাল, আপত্তি, আপদ, আপদর্থে, আপদুদ্ধরণ, আপদ্গ্রস্ত, আপদ্ধর্ম্ম, আপদ্ভঞ্জন, আপন্ন, আপন্নসত্ত্বা, আস্পদ, আপাদ, আপাদন, আপাদপর্যন্ত, আপাদমস্তক, আপ্রপদ, আফত (আপদ), উপপদ, উপপত্তি, নিরাপদ, নিষ্পত্তি, পদব্রজ, পদভঞ্জন, পদভ্রংশ, পদম, পদরথ, পদরথী, পদলেহন, পদসংবাহন, পদসেবা, পদস্থ, পদস্থান, পদা, পদাঘাত, পদাঙ্ক, পদাত, পদাতি, পদাতিক, পদানুশাসন, পদান্তর, পদাবলী, পদাব্জ, পদাম্বুজ, পদাম্ভোজ, পদারবিন্দ ... প্রতিপত্তি, প্রতিপদ, বিপদ, বিপত্তি, বিপদগ্রস্ত, বিপদসঙ্কুল, বিপন্ন, বিপ্রতিপত্তি, ব্যুৎপত্তি ... সম্পত্তি, সম্পদ ...**) আমরা অনায়াসে বুঝে যেতে পারি; বুঝতে পারি কোন **পদ**-অর্থ কোথায় প্রযোজ্য। মধ্যযুগের বাংলাভাষীর এই বোধ যদি না থাকত বিশাল **পদাবলী** সাহিত্য লেখা যেত কি না সন্দেহ। দ্র. **চমক, কমল**। ...

তাছাড়া সাধারণ বাংলাভাষী **পদ** শব্দটিকে কত ভালভাবে এখনও বহন করে নিয়ে চলেছেন, উপসর্গ-যোগে **পদ** শব্দটির যে ব্যবহার (**আপদ, বিপদ, সম্পদ**) আজও তাঁরা করেন, তা দেখলেই টের পাওয়া যায়। এমনকি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবও তাঁদের এই অভ্যাসে বিশেষ দাঁত ফোটাতে পারেনি। **৬.** ল্যাটিন pedis।

আপদ : ১. আ + ✓পদ্ + ক্বিপ্ - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। **২.** *পদ-এর আশ্রয় যাহাতে।* **৩.** বিপত্তি, বিপৎ, সঙ্কট, অশুভসংঘটন, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, অনিষ্টাপাত, দুর্ঘটনা। (ছা.অ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. পদ** তো বহু প্রকারের, জগতের সবকিছুই তো **পদ**! তার মধ্যে কোনোটি আমাদের মানসিক ভোজনের **পদ**, কোনোটি-বা দৈহিকভাবে ভোজনের **পদ**; আর সেজন্যই সেগুলি আমাদের খুব প্রিয়; তাদের আমরা বলি **সম্পদ**। কোনোটি-বা তেমন প্রিয় নয়, কারণ তা আমাদের কোনো কাজে লাগে না; তাদের আমরা বলি **অপদ** বা **অপদার্থ**। কোনো কোনোটি আবার কাজে না লাগলেও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না, জড়িয়ে থাকে বা থাকতে চায়। অনেক সময় তাদের সঙ্গ খুব একটা খারাপ লাগে না, কখনো-বা তাদের আধিক্য আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও চলার পথে বাধাজনক হয়ে দেখা দেয়। যেমন কিনা, সন্তানসন্ততি আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু গরিবের অনেক সন্তান তার পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও বাধাজনক হয়ে দেখা দেয়। হয়তো সেই কারণেই Hindu Law গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'children are luxury to the riches and encumbrance to the poor'। এইরূপ অস্বস্তিকর বাধাজনক **পদ**-এর আশ্রয় যাহাতে, তাকে বলে **আপদ**। আবার কোনো কোনো **পদ** আমাদের পক্ষে সরাসরি বিপরীত স্বভাবের এবং ক্ষতিকরও বটে, তাদের আমরা ভয় পাই, তাদের থেকে দূরে সরে থাকি কিংবা তাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করি। এইগুলিকে বলা হয় **বিপদ**। বাংলাভাষী যখন বলেন **'আপদ** বিদায় করো', তখন বোঝা যায়, যাকে বিদায় করার কথা বলা হচ্ছে, সে অত্যন্ত ক্ষতিকর না হলেও

অস্বস্তিকর ও বাধাজনক বটে। আর যখন সে '**বিপদ**-জনক' বলছে, তখন সে তার থেকে সরে থাকতে চায়, তাকে ভয় পায়; সেটি তার স্বভাবের বিপরীত এবং ক্ষতিকর। বলে রাখা যাক, ফারসি 'আফত' শব্দটি **আপদ**-এরই বিবর্তিত রূপ মাত্র। নিম্নে **বিপদ** দ্রষ্টব্য।

উপপদ : ২. *যে পদ* ***উপ*** *(সহকারী) রূপে (মূল পদের আগে বা পরে) উচ্চারিত হয়; অথবা,* ***উপ*** *(সহকারী) যে পদ।* / উপ-উচ্চারিত পদ যে; যে পদ পরে প্রযুক্ত হয়; পূর্ব্বোচ্চারিত (পূর্ব্বপ্রযুক্ত) পদ যে। (ব.শ.)। ৩. ব্যাবর্ত্তক পদ, নামের পূর্ব্বে বা পরে প্রযোজ্য জাতিসম্মানাদিসূচক আর্য্য শর্ম্মা প্রভৃতি পদ, উপাধি, (ব্যাকরণে) প্রত্যয়বিধায়ক সূত্রে সপ্তম্যন্ত পদ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বাংলার ছাত্রদের পড়তে হয় 'উপপদ তৎপুরুষ'। এছাড়া এই শব্দটির আর কোনো ব্যবহার নেই। এর একটি কারণ এই যে, এটি সংস্কৃতকারদের ভাষাসংস্কারের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা শব্দ। বাস্তবের ব্যবহারে এই শব্দের উদ্ভব হয়নি, ব্যবহারও দেখা যায় না।

নিরাপদ : ১. নির্ + **আপদ**। ২. / নির্গত আপদ যাহা হইতে। (ব.শ.)। ৩. বিপদ্‌বিহীন, ব্যসনহীন। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. আজকাল স্কুলকলেজের শিক্ষার দুনিয়ায় **নিরাপদ** শব্দের অর্থ করা হয় safe বা 'বিপদ-মুক্ত'। অথচ কথাটি স্পষ্ট বলা আছে **নিরাপদ** শব্দের ভিতরেই — **আপদ** নেই যাহাতে, অর্থাৎ কিনা 'আপদ-মুক্ত'। **আপদ** আর **বিপদ** যে এককথা নয়, সে কথা আমরা আগেই **আপদ** শব্দে জেনেছি। আরও জানব **বিপদ** শব্দে।

প্রতিপদ : দ্র. **প্র, প্রতি**।

বিপদ : ১. বি + ✓পদ্ + ক্বিপ (০) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বিপরীত বা বিশেষ* ***পদ*** *থাকে যাহাতে।* ৩. বিপত্তি, আপদ, বিপৎকাল, বিনাশ, মরণ। (ব.শ.)। ৪. danger অর্থে প্রচলিত। ৫. বাংলাভাষী শিক্ষিত জনেরা **আপদ** ও **বিপদ** এই শব্দদুটির মধ্যেকার পার্থক্য নিজেরা ভুলে গেছেন। অথচ গ্রামবাংলার বাংলাভাষীরা এখনও শব্দদুটির যথার্থ ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা অনেক গরুবাছুর, মুরগিছাগল, কাচ্চাবাচ্চা, এমনকি কন্যাসন্তান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত বা জেরবার হলেই বলেন —'কী **আপদ**! যা না যা, মরগে যা!' কিংবা '**আপদ** বিদায় হলেই বাঁচি!' কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কখনোই তাঁরা **বিপদ** শব্দটি ব্যবহার করেন না। আসলে **পদ** শব্দের যে বোধ থেকে গ্রামবাংলার বাংলাভাষীরা **আপদ, বিপদ, সম্পদ** প্রভৃতি শব্দকে বুঝতেন, তার নিদর্শন আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে; এমনকি ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সময়ও সেই বোধ বাংলাভাষীর ছিল। ব.শ. রামপ্রসাদের গান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, 'মনের মতো **পদ** পাই তো সে **পদ** লয়ে **বিপদ** সারি'।

সম্পদ : ১. সম্ + ✓পদ্ + ক্বিপ্ (০) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সম্যক* ***পদ*** *থাকে যাহাতে।* ৩. ভূতি, সমৃদ্ধি, বৈভব, ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, ধন, বিত্ত, গুণোৎকর্ষ, অতিশয়, প্রাচুর্য্য, বিভূতি, বাসনাসন্ততি, সম্পাদয়িতব্য বস্তু, ফলসম্পত্তিহেতু, সৌভাগ্য, ফলসম্পত্তি, সিদ্ধিলাভ, হারবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. wealth অর্থে প্রচলিত। ৫. যেহেতু **পদ** শব্দটি মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকারের **পদ**কেই বোঝায়, সেই কারণে **সম্পদ** শব্দটি মানসিক বৈভব ও বাহ্যিক বৈভব উভয়প্রকারের ধনসম্পত্তিকেই বোঝায়। সেই জন্য আমাদের ভাষায় **সম্পদ** কেবলমাত্র টাকাপয়সা ধনরত্নকে বোঝায় না, গুণোৎকর্ষ, বিভূতি, বাসনাসন্ততি, সিদ্ধিলাভ ... ইত্যাদিকেও বোঝায়। তাই **সম্পদ** শব্দের মানে দিতে গিয়ে ব.শ. সেই অর্থগুলিও দিয়ে গিয়েছেন। ৬. ইংরেজি pad, pod, podium, ... ইত্যাদি।

পদবী (প্রত্যেকটি পদবী ও উপাধির অর্থ জানার জন্য এই গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্ট-২ দেখুন) : ১. ✓পদ্ + অবি - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পদ****-কে গতিশীলভাবে বহন করে যে, তাহার আধার।* ৩. মার্গ, পথ, কর্ম্মমার্গ, অধিকার, দশা, পদপরিমিত স্থান, উপাধি (title), বংশসূচক শব্দ (surname), গুণবিদ্যাজন্য উপনাম। (ব.শ.)। ৪. surname অর্থে প্রচলিত। ৫. **পদবী** জিনিসটি কী, মানুষের নামের সঙ্গে তা যুক্ত হল কীভাবে, দেশে দেশে তার রূপ কী, নামের শেষে সেই পদবী আজও বহন করা উচিত কি না ... ইত্যাদি অজস্র জিজ্ঞাসা রয়েছে এই বিষয়টিকে ঘিরে। তাছাড়া এই বিষয়টি এতই বড় যে, এখানে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তা নিয়ে সাধ্যমতো আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য।

পদার্থ (পদার্থবিদ্যা, অপদার্থ) : ২. ***পদার্থ*** = *যে পদের অর্থ আছে।* ***পদার্থবিদ্যা*** = *যার দ্বারা* ***পদ*** *ও তার* ***অর্থ*** *বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়।* ***অপদার্থ*** = *যাহা* ***পদার্থ*** *নহে, কিংবা, যে* ***পদ****-এর অর্থ নাই।* / **অপদার্থ** = যাহাতে তৎপদবাচ্য অর্থ নাই; যে মনুষ্য-পদবাচ্য নহে। (ব.শ.)। ৩. **পদার্থ** = পদের অর্থ, অভিধেয়, দ্রব্য, বস্তু, (ন্যায়ে) প্রমাণপ্রমেয়াদি ষোড়শবিধ, (বৈশেষিকে) দ্রব্যগুণকর্ম্ম-প্রভৃতি সপ্তবিধ, (সাংখ্যে) প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি ও পুরুষ — এই পঞ্চবিংশতি, (পাতঞ্জলে) সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি ও ঈশ্বর — এই ষড়বিংশতি, (বেদান্তে) চিৎ ও অচিৎ (আত্মা ও অনাত্মা) — এই দ্বিপ্রকার, (বাংলায়) বাস্তবিক বা মূল জিনিস, সার, মনুষ্যত্ব। **অপদার্থ** = পদার্থভিন্ন, অদ্রব্য, অবস্তু, মনুষ্যত্বহীন, অসার, অযোগ্য। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **পদার্থ** কয় প্রকার ও কী কী? প্রাচীন ভারত এই প্রশ্নের উত্তর কখন কী পেয়েছিল? ব.শ. আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে সেই প্রশ্নের যা যা উত্তর পেয়েছিলেন, তা সব একত্রে (উপরে ৩. দ্রষ্টব্য) সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আমরা জানি, ভারতের ঐতিহ্যানুসারে মূলধারার দর্শন যুগানুসারে ক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত এই ষড়দর্শন রূপে উপলব্ধ হয়ে নানা ঋষির হাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গৌতমকৃত ন্যায়দর্শন, কণাদ-এর বৈশেষিক, কপিল-এর সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগদর্শন, জৈমিনির মীমাংসাদর্শন, এবং ব্যাসাদিকৃত বেদান্তদর্শন রয়েছে। এছাড়াও নাস্তিক-বৌদ্ধ-জৈন-বৈষ্ণববাদি মতভেদে আরও অনেকগুলি দর্শন রয়েছে। এই দর্শনগুলির প্রত্যেকটিতেই **পদার্থ**-এর স্বরূপ নিয়ে যে যার যুগে তৎকাল পর্যন্ত যা যা উপলব্ধি করতে পারা গেছে, তদনুযায়ী নিজ নিজ দৃষ্ট **পদার্থ**-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাতে একালের পণ্ডিতদের খুব বেশি সুবিধা হয়নি। কেননা, সন্নিবেশিত ঐ তথ্যগুলি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় লেখা থাকায়

এখন আর বোঝা যায় না। এবার সেগুলিকে একালীকরণ ('আপডেট') করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ...

আপাতত এখন আমরা **পদার্থ** শব্দের নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। **পদ** + **অর্থ** = **পদার্থ**। এই **পদ** শব্দের মূলে রয়েছে 'পায়ীর দান', আর **অর্থ** শব্দের মূলে রয়েছে 'কার্য্য' বা ক্রিয়া। যে-**পদ** যা করে (বা যা দান করে), সেটিই সেই **পদ**-এর 'কার্য্য' বা **অর্থ**। **পদ** আছে অথচ তার কোনো **অর্থ** বা 'কার্য্য' নেই, এমন হতেই পারে না। বিশ্বের প্রতিটি **পদ**-এর নিজ নিজ **অর্থ** আছে বলেই তারা **পদার্থ**-পদবাচ্য। কথাটি সেকালের বাংলাভাষা-জ্ঞানীরা জানতেন বলেই তাঁদের পক্ষে **অপদার্থ**-এর মতো শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। এমনকি স্বাধীনতাপূর্ব কালের দৈহিকভাবে ব্রিটিশের অধীন কিন্তু মানসিকভাবে স্বাধীনচেতা বাংলাভাষী শিক্ষিতজনেরাও বিষয়টি জানতেন, বুঝতেন। সেই বোধ থাকার ফলেই তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল physics শব্দের উন্নততর অনুবাদ রূপে **পদার্থবিদ্যা** শব্দের সৃষ্টি করা। এই শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যে নেই, এমনকি মধ্যযুগের সাহিত্যেও ছিল না। ... তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে পরিস্থিতি ঠিক উল্টো হয়ে যায়; আমরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা দৈহিকভাবে স্বাধীন হই এবং মানসিকভাবে ইংরেজির দাসে পরিণত হয়ে যাই; যদিও গ্রামবাংলার মূর্খ বাংলাভাষীরা এই কলুষ থেকে মুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল। পশ্চিমবঙ্গের 'মুখে বাংলাপ্রেমী কিন্তু কাজে ইংরেজির পূর্ণদাস বামশাসন' সেই গ্রামবাংলাকে বর্তমানে অনেকটাই কলুষিত করে দিয়েছে। দ্র. **তন্ত্র, তুষার, বস্তু**।

পদ্ধতি : ১. পদ + ✓হন্ + ক্তি - কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***পদ** দ্বারা হতকরণ (আঘাত) গতিশীল যাহাতে, যে প্রক্রিয়ায়। /* পাদ দ্বারা হতি (হননীয়)। (ব.শ.)। ৩. মার্গ, সরণি, পথ, নিয়ম, বিধি, রেখা, রাজি, পঙ্ক্তি, পর্য্যায়, প্রকার, শূদ্রের উপনাম — বসু, ঘোষ ইত্যাদি, পদচিহ্ন, পূজাদির বিধানগ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **পদ্ধতি**তে **পদ** শব্দের ব্যবহার থাকলেও এই **পদ** বা পা সম্পূর্ণতই মনের পা। আপনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মনে মনে পা ফেলে ফেলে যে পথে গিয়ে সফল হচ্ছেন, সেই মানসপথে পা ফেলার রকমফেরকেই বলে **পদ্ধতি**। এটি সম্পূর্ণ মানসিক হতে পারে, খানিকটা বাহ্যিকও হতে পারে। যেমন, আপনি প্রথমে একটি পাত্র নিলেন, তাতে চাল দিলেন, জল দিয়ে ধুয়ে জলটা ফেলে দিলেন, তারপর আবার খানিকটা জল দিলেন এবং উনুন জ্বেলে তার উপর পাত্রটি বসালেন, খানিকক্ষণ পরে পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখলেন চালগুলো গলে গেছে কি না, তারপর নামিয়ে ফেনটা গেলে দিলেন; হয়ে গেল আপনার ভাত। চালকে ভাতে পরিণত করার এই হল **পদ্ধতি**। এরকম অজস্র **পদ্ধতি** মানুষ অনুসরণ করে। লক্ষ কোটি বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ যে কোটি কোটি **পদ্ধতি** অনুসরণ করে আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিজ নিজ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেছেন, তাকেই বলা হয় মানবসভ্যতার অগ্রগতি।

পদ্ম (পদ্মনাভ, পদ্ম-আঁখি, পদ্মকন্দ, পদ্মকর, পদ্মকর্ণিকা, পদ্মকলি, পদ্মকাঁটা, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকোশ, পদ্মগন্ধ, পদ্মগন্ধি, পদ্মগর্ভ, পদ্মগোখুরা, পদ্মচিনি, পদ্মজ, পদ্মজাত, পদ্মতন্তু, পদ্মদল, পদ্মনাল, পদ্মনিধি, পদ্মপত্র, পদ্মপর্ণ, পদ্মপলাশ, পদ্মপাণি, পদ্মপুরাণ, পদ্মপ্রিয়া, পদ্মবন্ধ, পদ্মবাসা, পদ্মবন্ধু, পদ্মভব, পদ্মভব, পদ্মভূ, পদ্মসম্ভব, পদ্মমালিনী, পদ্মমুখ, পদ্মমুখী, পদ্মযোনি, পদ্মরাগ, পদ্মরাজ, পদ্মরেখা, পদ্মলাঞ্ছন, পদ্মলাঞ্ছনা, পদ্মলোচন, পদ্মসম্ভব, পদ্মহস্ত) : ১. ✓পদ্ + ম (মন্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***পদ্ম** = **পদ** (পালন-পানের দাতা) সীমায়িত যাহাতে। /* **পদ্ম** = যাহাতে লক্ষ্মী যান। **পদ্মনাভ** = পদ্ম নাভিতে যাঁহার অথবা পদ্মাকার নাভি যাঁহার। **পদ্মকর** = করে ধৃত কমল যাঁহার; পদ্মে যাঁহার কিরণহস্ত। **পদ্মকাষ্ঠ** = যাহার কাষ্ঠে পদ্মতুল্য সুরভি (থাকে)। **পদ্মগন্ধ, পদ্মগন্ধি** = পদ্মের তুল্য গন্ধ যাহার। **পদ্মগর্ভ** = বিষ্ণুনাভিপদ্ম যাঁহার গর্ভ; যাঁহার হৃৎপদ্ম গর্ভ। **পদ্মপাণি** = পদ্ম পাণিতে যাঁহার; পদ্মগতকিরণহস্ত যিনি। **পদ্মবন্ধ** = যাহাতে পদ্মাকৃতি বর্ণপ্রবন্ধ (থাকে)। **পদ্মবাসা** = পদ্মে বাস যাঁহার। **পদ্মভব, পদ্মভূ, পদ্মসম্ভব** = পদ্ম যাঁহার জন্মস্থান। **পদ্মলাঞ্ছন** = পদ্মচিহ্নযুক্ত যে। **পদ্মহস্ত** = হস্তে পদ্ম যাঁহার। (ব.শ.)। ৩. **পদ্ম** = পদ্মচিহ্নযুক্ত হস্তী, সর্পবিশেষ, দাশরথি, রাম, কুবেরের নিধিবিশেষ, রতিবন্ধবিশেষ, গুগ্গুলুবিশেষ, পদ্মমূল, পদ্মকাষ্ঠ ওষধি, পদ্মাকৃতি ব্যূহবিশেষ, পদ্মাকার ভূষণবিশেষ, হস্তীর মুখাদিস্থ পদ্মচিহ্ন, শত নিখর্ব্ব বা দশ শঙ্খ সংখ্যা, সীসক, (তন্ত্রে) ষট্‌চক্রের পদ্মাকার চক্র, দেহস্থ গোল চিহ্ন, পদ্মকাঁটা। **পদ্মনাভ** = বিষ্ণু। **পদ্ম-আঁখি** = কমললোচন কৃষ্ণ, রাম। **পদ্মকন্দ** = পদ্মমূল, পদ্মের গেঁড়। **পদ্মকর** = বিষ্ণু, সূর্য্য। **পদ্মকর্ণিকা** = পদ্মের বীজকোষ। **পদ্মকলি** = পদ্মের কুঁড়ি, কমলকোরক। **পদ্মকাঁটা** = খরস্পর্শ গোলচর্ম্মরোগ-ভেদ। **পদ্মকাষ্ঠ** = ওষধিভেদ। **পদ্মকোশ** = পদ্মমুকুল। **পদ্মগন্ধ, পদ্মগন্ধি** = পদ্মকাষ্ঠ। **পদ্মগর্ভ** = ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পদ্মমধ্য, কমলাভ্যন্তর। **পদ্মগোখুরা** = মস্তকে পদ্মচিহ্নযুক্ত গোক্ষুরসর্প। **পদ্মচিনি** = পদ্মতুল্য শ্বেতশর্করাবিশেষ। **পদ্মজ, পদ্মজাত** = নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা। **পদ্মতন্তু** = মৃণাল। **পদ্মদল** = কমলপত্র, পদ্মের পাপড়ি। **পদ্মনাল** = মৃণাল। **পদ্মনিধি** = পদ্মনামক রত্নবিশেষ। **পদ্মপত্র, পদ্মপর্ণ** = কমলদল, পুষ্করমূল, পদ্মের পাতা। **পদ্মপলাশ** = পদ্মপত্র। **পদ্মপাণি** = বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য, বুদ্ধদেব। **পদ্মপুরাণ** = অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত মহাপুরাণ-বিশেষ। **পদ্মপ্রিয়া** = মনসা। **পদ্মবন্ধ** = শব্দালঙ্কারে চিত্রকাব্যবিশেষ। **পদ্মবন্ধু** = সূর্য্য, ভ্রমর। **পদ্মবাসা** = পদ্মালয়া লক্ষ্মী, পদ্মা। **পদ্মভব, পদ্মভূ, পদ্মসম্ভব** = ব্রহ্মা। **পদ্মমালিনী** = লক্ষ্মী। **পদ্মমুখ** = পদ্মতুল্যমুখযুত, প্রসন্নবদন। **পদ্মমুখী** = সীতা। **পদ্মযোনি** = বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা। **পদ্মরাগ** = কোকনদরাগবৎ লোহিত মণি, লোহিতক (ruby)। **পদ্মরাজ** = ধান্যবিশেষ ও তাহার তণ্ডুল। **পদ্মরেখা** = করতলস্থ পদ্মাকৃতি রেখা। **পদ্মলাঞ্ছন** = ব্রহ্মা, কুবের, সূর্য্য, রাজা। **পদ্মলাঞ্ছনা** = লক্ষ্মী, সরস্বতী, তারা। **পদ্মলোচন** = শ্রীকৃষ্ণ। **পদ্মহস্ত** = বিষ্ণু, পদ্মকর, পদ্মতুল্য কোমল হস্ত, পাণিকমল। (ব.শ.)। ৪. **পদ্ম** শব্দটি lotus অর্থে প্রচলিত বটে, বাকি অধিকাংশই অপ্রচলিত। ৫. উপরে লিখিত **পদ্ম** ও **পদ্ম**যুক্ত শব্দগুলি ছাড়াও নীচে **পদ্মা** ও

তৎসংশ্লিষ্ট আরও কিছু শব্দ রয়েছে। এগুলি একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আমাদের ভাষায় **পদ্ম** শব্দের ব্যাপক ব্যবহার ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। এই **পদ্ম**কে শুধু যদি lotus বলে মনে করা হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে, কোনো একটি জাতির ভাষায় কেবলমাত্র একটি ফুল নিয়ে এত শব্দ কেন? দেখা যায়, বাংলায় বৃষ্টির রকমফের (**ঝমঝম, ঝিমঝিম** ... ইত্যাদি) নিয়ে অজস্র শব্দ রয়েছে, আবার এস্কিমোদের ভাষায় বরফ নিয়ে বহু শব্দ রয়েছে। তার কারণ হল বাংলাভাষীর জীবনে বৃষ্টির আধিক্য এবং এস্কিমোদের জীবনে বরফের আধিক্য রয়েছে বলেই তাদের নিজ নিজ ভাষাতেও তার প্রতিফলন পড়েছে। এসব কথা আমরা আগেও বলেছি। এখন প্রশ্ন হল, **পদ্মফুল** কি বাংলাভাষীর জীবনে অনেক বেশি স্থান দখল করে রয়েছে বলেই **পদ্ম** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের এত আধিক্য?

এর উত্তরে 'হাঁ' বলতে পারলেই সহজ হত। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ, আমাদের জীবনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধাও খুব কম যায় না, বরং বহু ক্ষেত্রে তারা পদ্মফুলের চেয়ে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাহলে বাংলাভাষায় **পদ্ম** শব্দের এত রমরমা কেন? কেনই বা একালে **পদ্ম**যুক্ত শব্দগুলি ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে বা গেছে? ...

তার কারণ হল, যাকে বোঝাতে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা **পদ্ম** শব্দের সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটি lotus নয়; lotus-কে তো আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেই কাজ চলে যেত। তবুও **পদ্ম** শব্দটি দিয়ে যে lotus-কেও বোঝানো হল, তার দুটো কারণ। এক, যাকে বোঝানোর জন্য **পদ্ম** শব্দের সৃষ্টি করতে হয়েছিল, সেই অদৃশ্য কিন্তু মানবজীবনে অতি-নিয়ামক শক্তিরূপে সর্বদাই অত্যন্ত সক্রিয় অতি প্রভাবশালী সত্তাটি lotus-এর মতো দেখতে; এবং দুই, সেই সত্তার স্বরূপ কেমন সেকথা নিম্ন-অধিকারীদের বোঝানোর জন্য lotus-কেও **পদ্ম** বলে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল। আগেও জানানো হয়েছে যে, শব্দ সৃষ্টির এটিই ছিল মূল নীতি — অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাকে বোঝানো। ... যাই হোক, প্রশ্ন হল, কাকে বোঝানোর জন্য **পদ্ম** শব্দের সৃষ্টি করতে হয়েছিল?

আসলে হয়েছিল কী, **দক্ষ**তার নীতি অনুসরণ করে মানুষের সমাজ তো একদিকে যেমন ক্রমশ পণ্যবান ও বাহ্যসম্পদবান হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তেমনি তার সামাজিক যৌথতা অজস্র সম্প্রদায়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে হয়ে ক্রমে 'অবিভাজ্য'-এ (individual-এ) বা 'আত্মকথা-ব্যক্তকারী' 'ব্যক্তি'তে পরিণত হয়ে গেছে। পুঁজি বা **নগদ নারায়ণ** জন**সমুদ্রে** আপনার শয্যা পেতে শয়ান হয়ে গেছেন, অর্থাৎ জনসমাজে অর্থময়-বাগ্‌বিনিময় ও অর্থময়-**পণ্য**বিনিময় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়ে গেছে। ওদিকে বেদজীবী-জ্ঞানজীবীরা সেই খণ্ড-বিখণ্ড সমাজকে নানান বিধি-বিধানে বেঁধে 'বিধি' (ব্রহ্মা) রূপে সক্রিয় হয়ে সমগ্র সমাজ পরিচালনা করছেন। মর্তলোকের শাসক রূপে ক্ষত্রিয়-রাজার জন্ম দেওয়া হয়েছে বটে, তবে সে তার জন্য বেদজীবীদের দ্বারা নির্দিষ্ট **ক্ষত্রিয়ধর্ম** পালন করে; সে সমাজ**ধর্ম** নিয়ন্ত্রণ করে না, সমাজশাসনও করে না। (এমনকি দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাষট্টি বছরের পরও ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রাম শাসিত হয় গ্রামবাসীদের 'সমাজ' দ্বারা, যদিও সে শাসন অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। মনে রাখা দরকার, ভারতে সমাজশাসনই ছিল মূল শাসনব্যবস্থা, সরকারি বা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল সহযোগী মাত্র। এই উত্তরাধিকার ক্রমক্ষীয়মান হলেও আজও কমবেশি বিদ্যমান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের এই পার্থক্যের কথা বারংবার বলে গেছেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশ হল 'সমাজপ্রধান দেশ', 'রাষ্ট্রপ্রধান দেশ' নয়।)

তা সে যাই হোক, ভারতসমাজের ইতিহাসের বিশেষ কালখণ্ডে এই যে বেদজীবী-জ্ঞানজীবীদের তুমুল সমাজশাসন চলছে, পুঁজির রমরমা চলছে, এই **'সমাজশাসনকেন্দ্র ও তার ব্যবস্থা'**কে বোঝা হবে কীভাবে, মানুষকে বোঝানোই বা যাবে কীভাবে? কী বলা হবে জ্ঞানজীবীদের এই শাসনকেন্দ্রটিকে? আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা এই শাসনকেন্দ্রটির নাম দিয়েছিলেন **পদ্ম**, যার প্রতিটি **পদ** বা পাপড়ি অলঙ্কৃত করছেন জ্ঞানজীবীরা। আর এই **পদ্ম** খাড়া ছিল তার **পদ্মনাল**-এর উপর, যে **পদ্মনাল** কার্যত জনগণমধ্যে (সাগরশয্যায়) বিস্তারিত **নগদ নারায়ণ**-এর **নাভি** (উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ) থেকে উদগত হয়ে **অনন্তনাগ**-এর (অজস্র ব্যক্তিমালিকের) **ফণা**র ছায়ায় সক্রিয় থাকতে পেরেছিল। ...

এই পরিস্থিতি আজও কমবেশি সক্রিয় রয়েছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, মাঝে কিছুদিন **পদ্ম**টির কেন্দ্রে বসে গিয়েছিলেন রাজা বা সম্রাট। এখন সেখানে বসেছেন গণনির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কিন্তু সেই বোধ যে এখনও সম্পূর্ণ সক্রিয়, তা শুধুমাত্র কল্পনায় বোঝার দরকার নেই। বিভিন্ন দেশের 'পার্লামেন্ট', বিধানসভা, লোকসভা, এমনকি রাষ্ট্রসংঘের মহাসভার চিত্রটির দিকে তাকালেই সেকথা বুঝতে পারা যায়। কেননা, দেখা যায়, সেগুলি যেন **পদ্ম**-এর নানা রকম চিত্রকল্প মাত্র — কোনোটি অর্ধ-**পদ্ম**, কোনোটি তিন-চতুর্থাংশ **পদ্ম**, কোনোটি-বা প্রায় গোটা একটি **পদ্ম**ই। দেশের নির্বাচনের সময় কোন দল কত আসন (পাপড়ি) দখল করল, তার যে চিত্র দেখানো হয়, তাতে এই চিত্রটি আরও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার মানে আজকের সারা দুনিয়ার সব দেশের শিক্ষিত জনসাধারণই শাসনকেন্দ্রটিকে **পদ্ম**-রূপে বোঝেন ও বুঝিয়ে থাকেন। কারণ, এরকমভাবে বোঝা ছাড়া অন্য কোনো যথার্থ উপায় ছিল না, নেই। এবং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা বহুকাল আগেই ঠিক সেভাবেই বুঝেছিলেন, এবং বোঝানোর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। ...

আমরা আগেই দেখলাম, '**পদ্** সীমায়িত যাহাতে' অর্থটি রয়েছে **পদ্ম** শব্দের ভিতরে। কেননা শাসনকেন্দ্র মাত্রেই একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে তার শাসন পরিচালনা করে। তার জন্য থাকে একটি নির্দিষ্ট আচরণের বিধিবিধান, একালে যাকে 'সংবিধান' বলা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ 'মনুসংহিতা'র (বা 'ভৃগুসংহিতা'র) মাধ্যমে সেই 'নির্দিষ্ট আচরণের বিধিবিধান'-এর সূচনা করেছিল। এই গ্রন্থটিই বিশ্বের আদি আইনশাস্ত্র। আজকের আমেরিকাও সেকথা জানে বলেই তারা তাদের আইনসভার উঠোনে মনুর মূর্তি স্থাপন করে রেখেছে। আমাদের আত্মবিস্মৃত ভারতীয় আইনবিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনুকে ভুলে গেছে এবং আইনবিষয়ক জ্ঞানের জন্য ইয়োরোপ আমেরিকার দাসত্ব করছে। অথচ বিশ্বের সবাই জানত, ভারত হল 'ধর্ম্ম' (=

আইন) সৃষ্টির দেশ। দ্র. **অরবিন্দ, কমল, কৌমুদী**।

পদ্মা (পদ্মাকর, পদ্মাক্ষ, পদ্মাক্ষী, পদ্মাবতী, পদ্মালয়, পদ্মাসন, পদ্মিনী, পদ্মিনীকণ্টক, পদ্মিনীকান্ত, পদ্মিনীখণ্ড, পদ্মী) : ২. *পদ্ম-এর আধার যে। **পদ্মাকর** = **পদ্ম**-এর আকর যে।* / **পদ্মাক্ষ** = পদ্মতুল্য অক্ষি যাহার। **পদ্মালয়** = পদ্ম যাঁহার আলয়। **পদ্মাসন** = যাঁহার আসন পদ্ম; পদ্মরূপ আসন। (ব.শ.)। ৩. **পদ্মা** = কমললতা, পদ্মযুক্তা, কমলা, লক্ষ্মী, মনসা দেবী, লবঙ্গ, গৌরীর সখী পদ্মাবতী, নদীবিশেষ। **পদ্মাকর** = সপদ্ম অগাধ জলাশয়, তড়াগ, জলাশয়মাত্র। **পদ্মাক্ষ** = কমলদলনেত্র, বিশালাক্ষ, পদ্মপলাশলোচন, বিষ্ণু, পদ্মের অক্ষিতুল্য, পদ্মবীজ। **পদ্মাক্ষী** = পদ্মনেত্রা, বিশালাক্ষী, সুন্দরী। **পদ্মাবতী** = মনসা দেবী, পদ্মানদী, কবি জয়দেবের পত্নী, চণ্ডীর সখী। **পদ্মালয়** = পদ্মযোনি, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, লবঙ্গ। **পদ্মাসন** = কমলাসন, ব্রহ্মা, শিব, যোগীর আসনবিশেষ। (এই আসনে বাম উরুতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ উরুতে বাম পদ রাখিয়া, পৃষ্ঠে বিবর্ত্তিত বাম হস্তে বাম পদের এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া, হৃদয়ে চিবুক সংলগ্ন করিয়া নাসাগ্র দেখিতে হয়।)। **পদ্মিনী** = পদ্মযুক্তদেশ, পদ্মপূর্ণ সরোবরাদি, সরোবর, পদ্মলতা, পদ্মঝাড়, মৃণাল, পদ্ম, পদ্মসমূহ, পদ্মগন্ধা স্ত্রীবিশেষ, হস্তিনী, পদ্মাসীনা নারী, কমল-কামিনী। **পদ্মিনীকণ্টক** = চর্ম্মরোগবিশেষ, পদ্মকাঁটা। **পদ্মিনীকান্ত** = পদ্মিনীর প্রিয়, সূর্য্য। **পদ্মিনীখণ্ড** = পদ্মিনীসমূহ, পদ্মের ঝাড়সকল। **পদ্মী** = পদ্মবান, বিষ্ণু, হস্তী। (ব.শ.)। (ক) ভগবান কল্কি অবতারে বৃহদ্রথ-রাজকন্যা পদ্মাকে বিবাহ করবেন। (খ) লক্ষ্মীর অন্য নাম। দেবী মনসা, পদ্মা ও পদ্মাবতী নামে পরিচিতা। (পৌ.অ.)। ৪. নদীর নাম ও মেয়েদের নাম রূপে **পদ্মা** ও **পদ্মিনী** শব্দ দুটি প্রচলিত রয়েছে। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. আশা করা যায়, কেবল তিনটি বিষয় (**পদ্মানদী, লবঙ্গ,** ও **পদ্মাসন**) ছাড়া বাকি শব্দগুলির অর্থের বিষয়ে উপরোক্ত **পদ্ম** ও **পদ্মা** শব্দের অর্থই পথপ্রদর্শন করতে পারবে। সেই কারণে আপাতত আমরা **পদ্মানদী, লবঙ্গ,** ও **পদ্মাসন** বিষয়ে কিছু জানতে চাইব।

দুটি নদী রয়েছে আমাদের এই বঙ্গে — **গঙ্গা** ও **পদ্মা**। **পণ্যধারা**কে যে **গঙ্গানদী** বলে সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। আর সরকারিভাবে যে উৎপন্নের ধারা প্রজাদের জন্য প্রবাহিত রাখা হয়, একালের ভাষায় যাকে 'রেশনিং-ব্যবস্থা' বলে, তার প্রাচীন নাম ছিল **যমুনানদী**। কিন্তু বিভিন্ন **পদ**-এ আসীন নানা রসিকজন কর্তৃক উৎসারিত যে-বাচিক-উৎপন্নের ধারা 'সাংস্কৃতিক-ধারা'রূপে প্রবাহিত থাকে, যার রসপান করে প্রজাসাধারণ তাঁদের মানসিক তৃষ্ণা নিবারণ করেন, তাকে বলে **পদ্মানদী**। স্মরণ করা যেতে পারে, যে, গঙ্গা বা যমুনাকে নিয়ে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর আবেগময় বাকফসল নেই বললেই চলে, কিন্তু **পদ্মা**কে নিয়ে তা যথেষ্টই রয়েছে। এই প্রসঙ্গে এমন কথাও ভাবা চলে যে, জ্ঞানরসের জগৎ আবেগময় বলে এবং বিনিময়ের জগৎ তুলনায় আবেগহীন বলেই **পদ্মা**র ইলিশ **গঙ্গা**র ইলিশের তুলনায় সুস্বাদু হয়। ...

সবশেষে **লবঙ্গ**-এর কথায় যাওয়া যাক। হ্যাঁ, **লবঙ্গ** দেখতে অনেকটা **পদ্মের** মতো। কিন্তু সেটুকুই তাকে **পদ্মা**র সমগুণসম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করে না। আসলে মানবসমাজে যে শ্লেষ্মা জমে তাকে দূর করে **পদ্মা**, আর মানবদেহে যে শ্লেষ্মা জমে, তাকে দূর করে **লবঙ্গ**। সেকারণেই মানবদেহের **পদ্মা**কে **লবঙ্গ** বলে।

পদ্য : ১. পদ + য (যৎ)। (ব.শ.)। ২. ***পদ** থাকে যাহাতে।* / যাহাতে পদচিহ্ন দৃশ্য (হয়)। (ব.শ.)। ৩. নাতিশুষ্ক, পদহিতকর, পদবন্ধ (শ্লোক), ছন্দোবদ্ধ চতুষ্পদী, কবিকৃতি (শ্লোক), ছন্দোবদ্ধ তালের বোল। (ব.শ.)। ৪. poetry অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষ জন্মেই হাঁটতে পারে না, দৌড়তে পারে না; হাঁটা তাকে শিখতে হয়, রপ্ত করতে হয়, একটি বিশেষ নিয়মের ভিতরে থেকে চলতে হয়, তবে তার হাঁটা হয়, দৌড়নো হয়। ... আমাদের মনও যে একইভাবে হাঁটতে চলতে দৌড়তে শেখে, সেকথা আমরা খেয়াল করি না। অর্থাৎ আমাদের দেহের যেমন **পদ** বা **চরণ** বা পা আছে, আমাদের মনেরও তেমনি **পদ** বা **চরণ** বা পা আছে। মর্তলোকের লৌকিক বাস্তব ভূমিতে আমরা দৈহিক **পদচারণা** করে একস্থান থেকে অন্যত্র যাই, **স্বর্গ**লোকের অলৌকিক অবাস্তব ভূমিতে আমরা মানসিক **পদচারণা** করে একস্থান থেকে অন্যত্র যাই। দৈহিক **পদচারণ**-এর একটি অধ্যায়কে বলে 'যাত্রা', কারণ তাতে অনেক দৈহিক **পদচারণ** একত্রে সংহত। একইভাবে মানসিক **পদচারণ**-এর একটি অধ্যায়কে বলে **পদাবলী**, কারণ তাতে অনেক মানসিক **পদচারণ** সন্নিবিষ্ট। এইরূপ চারটি মানসিক **পদ**কে একত্রে বলে **পদ-চার** বা **পয়ার**। মধ্যযুগের **পদাবলী** সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এইরকম অজস্র **পদ-চার** বা **পয়ার** নিয়ে। যেহেতু এর প্রতিটি অংশে '**পদ** থাকে', তাই এদের **পদ্য**ও বলা হত।

পাদ : ১. ✓পদ্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পদ** হইতে জাত।* / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. চরণ, পা, গৌরবসূচক, পূজ্যবাচী, (সাদৃশ্যে) খট্টাদির অবয়বভেদ, পায়া, বৃক্ষের মূল, শিকড়, স্তম্ভ, থাম, মন্ত্রের বা শ্লোকের চতুর্থাংশ, শ্লোকের চরণ, চতুর্থাংশ, সিকিভাগ, পোয়া ...। (ব.শ.)। ৪. **পদ** শব্দের মতো **পাদ**যুক্ত বহু শব্দ অপ্রচলিত হয়ে গেলেও শব্দটি এখনও এককভাবে এবং অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে যথার্থে বহুল প্রচলিত, আজও। ৫. বাংলায় **পদ** ও **পদ**যুক্ত শব্দের পরিমাণ যেমন অনেক, তেমনি **পাদ** ও **পাদ**যুক্ত শব্দের পরিমাণও বিপুল পরিমাণে ছিল। তার বহু শব্দ অপ্রচলিত হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও এখনও বহু শব্দ আছে। আমরা কেবল **পাদ** শব্দটি নিয়েই আলোচনা করব। ...

পদ থেকে জাত **পাদ**। তাই **পদ** ও **পাদ**-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। 'দুই **পদ** ফেলিয়া' এবং 'দুই **পাদ** ফেলিয়া' কথা দুটির তুলনা করলে সেই পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে মানে দাঁড়ায় 'foot বা leg দুটি ফেলে দিয়ে'; এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানে দাঁড়ায়, 'দুটি step ফেলে'। তার মানে এক্ষেত্রে **পদ** হল শরীরের অংশ, আর **পাদ** হল সেই অংশের ক্রিয়া, যা কিনা '**পদ** হইতে জাত'। **পদ** থেকে আরও যা কিছু জাত হয়, তাদেরও নিশ্চয় **পাদ** বলা যায়; নইলে **পাদ** বললে বাংলাভাষী 'বাতকর্ম' বুঝতেন না। ... স্বভাবতই **পদ**-এর সঙ্গে **পাদ**-এর পার্থক্য আছে, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও

আছে। ইংরেজিতে অবশ্য foot বা leg-এর সঙ্গে step-এর সরাসরি কোনো সম্বন্ধ নেই। তার জন্য step-এর সামনে foot-কে এনে বলতে হয় footstep। আমরা বাংলাভাষীরা অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই 'দুই পা' ব্যবহার করি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ঘরের সমুখে দুই পা ফেলিয়া'। ... **৬.** ইংরেজি paddle, padang, padlock, padre, ... ইত্যাদি।

পাদুকা : **১.** পাদ্ + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***পাদন**-কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে, তাহার আধার।* / যাহার দ্বারা সুখে গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** কাষ্ঠাদিরচিত পাদত্রাণ, খড়ম, চর্ম্মময় পাদত্রাণ, উপানহ, জুতা। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** কাঠের কিংবা চামড়ার আবরণ, যা কিনা **পাদ**-কে বা **পাদন** ক্রিয়াকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে, চলার সুবিধা করে দেয়, ব.শ. যাকে বলছেন চলা 'সুখের' করে দেয়, সেই **পাদত্রাণ**কে বলে **পাদুকা**। ইংরেজির প্রভাব এই শব্দটিকে সরিয়ে দিয়েছে। ১৯৬০-৭০ সালেও **পাদুকা, পাদুকালয়, পাদুকাপুরাণ, পাদুকাপ্রহার** ... এরকম শব্দ বাংলাভাষায় যথেষ্টই প্রচলিত ছিল। এখন বাংলাভাষীর প্রায় সকল জুতোর দোকানই 'Shoe Store' (= জুতার আড়ৎ) কিংবা 'Leather House' (= চামড়ার বাড়ি)। এক তো এইসব ইংরেজি শব্দগুলি যথার্থক নয়, দুই, এইসব ইংরেজি প্রতিশব্দগুলির একটিও বলে না যে, তারা আমাদের চলাকে কোনো সাহায্য করে কি না। **পাদুকা** কিন্তু স্পষ্ট বলে দেয়, সে আমাদের **পাদন**কে নবরূপে বা সুখের জগতে উত্তীর্ণ করে (**পাদু**) করে (**ক**) দেয় বলেই সেগুলিকে **পাদুকা** বলা হত। তাকে বাদ দিয়ে এখন ইংরেজি অর্থহীন শব্দকে গ্রহণ করা হয়েছে। কী ফেলে আমরা কী গ্রহণ করছি! একেই বোধহয় বলে 'নাকের বদলে নরুণ পেলুম, টাক ডুমাডুম ডুম।'

পাদোদক (পাদোদক-মূঢ়তা) : **১.** **পাদ** + **উদক**। **২.** ***পাদ** ধৌত উদক।* **৩.** পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, চরণামৃত। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** **পাদোদক** বলতে বাংলাভাষী এখন বোঝেন, 'যে পা-ধোয়া জল পান করা হয় বা পান করতে হয়'। ব.শ. এই হীনতা থেকে মুক্তি খুঁজেছেন দুদিক দিয়ে। প্রথমত তিনি এর মানে করে দিয়েছেন 'পা ধোয়া হয় যে-জলে'; দ্বিতীয়ত তিনি বলে দিয়েছেন, এ ঠিক পা-ধোয়া জল-টল নয়, এ হল 'চরণামৃত'। কেন যে তিনি এরকম বলতে গেলেন, তা নিয়ে প্রথমে আমরা ধন্ধে পড়ি। ...

আসলে **উদক** শব্দটিই এতদিন আমরা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনি। এটি **উন্দ্** ক্রিয়া থেকে জাত (দ্র. **সুন্দর**)। বাহ্যিকভাবে দেখলে এর স্বরূপ হল, আপনি ভূমিতে একটা কোদালের কোপ মারলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে জল আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল — একেই বলে **উদক**; একালে এরকম জলের দেখা পাওয়া যায় যে কূপ থেকে তাকে 'আর্টিজীয় কূপ' বলা হয়। (এরকম একটি আর্টিজীয় কূপ মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার আষাড়িবাঁধ নামক স্থানের চাষের ক্ষেতে ছিল, এখনও বোধহয় আছে।) শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যখন অর্জুনের কাছে তৃষ্ণা-নিবারণের ব্যবস্থা করতে বলেন, অর্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করে এভাবেই তাঁকে **উদক**-দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর, মানসিকভাবে দেখলে এর স্বরূপ হল উপর দিকে উঠে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়া যে কোনো দৈহিক বা মানসিক তৃষ্ণা-নিবারক বিষয় বা বস্তুই হল **উদক**। এর আগে (১ম খণ্ডে) **তর্পণ** (**পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ**) শব্দে আমরা যে তথ্যের সন্ধান পেয়েছি, **উদক**-কর্ম স্বভাবত তাকেও বোঝায়। জেনে রাখা ভাল, **তর্পণ**-এর যত মন্ত্র রয়েছে, তাতে বারংবার জলের কথা বলা আছে বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি বলা হয়েছে **উদক** শব্দের প্রয়োগ করে। ...

তা সে যাই হোক, এখন তাহলে আমরা বলতে পারি, **পাদোদক** হল এমন ধরনের **উদক** যা কারো **পাদ** থেকে বা **পাদন** করা (পা ফেলে ফেলে এগোনো) থেকে উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেভাবেই **উদক**-পানকারীদের কাছে আসে। তার মানে, এই **পাদোদক** আসলে **উৎ-পাদন** করা বস্তু বা বিষয়! তাহলে তো রসিকদের সকল রসোৎ**পাদন**, জ্ঞানীদের সমস্ত উৎ-**পাদিত** বাণী, ও **পণ্য**-উৎ-**পাদন**কারীদের সমস্ত উৎ-**পাদনই** তাঁদের **পাদন**-কর্মের ফল রূপে বা **পাদোদক** রূপে ছড়িয়ে পড়ছে! সেই **পাদোদকই** তো সবাই পান করে থাকে! আর তাছাড়া, মনীষী-পদবাচ্য রসিক ও জ্ঞানীজনেরা **পদে পদে** বা **চরণে চরণে** তাঁদের যে রসের কথার ও জ্ঞানের কথার উৎ-**পাদন** করেন, সেই **পাদোদক**কেই তো 'চরণামৃত' বলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের **চরণে চরণে** বা **পদে পদে** যে **পাদোদক** দিয়ে গেছেন, আমরা বাংলাভাষীরা কি রবীন্দ্রনাথের সেই **চরণামৃত** বা **পাদোদক** নিত্য পান করি না? সর্বোপরি স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি এই বিশ্বজগতের সর্বত্র, সমস্ত **পদে পদে** তাঁর সমস্ত কুসুমে কুসুমে **চরণ** চিহ্নের মাধ্যমে যে **পাদোদক** বা **চরণামৃত** দিয়ে রেখেছেন, সেসব কথা বরং উত্তম-অধিকারীদের জন্য তোলাই থাক। ...

কিন্তু সমস্যা তো সেখানে নয়। সমস্যা বয়ানে ও তা বুঝবার কেতায়। একালের ভাষায় বলা যেত, 'ওরে, কর্ম্মযজ্ঞে হার্ড-ক্যাশ আর লিকুইড মানি যা পারিস ঢালিস, তাতে আখেরে লাভ হবে'; কিন্তু প্রাচীনভারত তার স্বভাবসুলভ ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বললেন, 'যজ্ঞে গোময় ও গোমূত্র অতীব পবিত্র, অতএব তার ব্যবহার অবশ্যকর্ত্তব্য।' ফলত ভারতবাসীকে তার অতীতহারা পুরোহিত গোবর-গোমূত্র গায়ে ছিটিয়ে মাখিয়েই শান্তি পায়নি, খাইয়েছে এবং এখনও খাওয়াচ্ছে। বলার দরকার ছিল, 'ওরে, পণ্যজীবী হওয়ার দিকে যাস না, তাতে মানুষটাই তার পণ্যের তলায় চাপা পড়ে যাবে'; প্রাচীন ভারত তার স্বাভাবিক ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বললেন, 'গো-মাংস ভক্ষণ করিস না'। ফল হয়েছে এই যে, ভারতবাসীর একাংশ গরুর মাংস খায়নি এবং অন্যে যাতে না খায় তার জন্য লাঠালাঠি পর্যন্ত করেছে, অথচ আসল উপদেশটিই বুঝতে পারেনি এবং প্রায় পুরোপুরি পণ্যজীবীতে পরিণত হয়ে পণ্যের তলায় চাপা পড়ে মরতে বসেছে। বলার কথা ছিল, 'জ্ঞানের কথা রসের কথা শুনলে ও তদনুযায়ী জীবনযাত্রা অতিবাহিত করলে মনের শান্তি ও তৃপ্তি হয়, জীবন সার্থক হয়'; প্রাচীন ভারত বললেন, 'চরণামৃত পান কোরো, **পাদোদক** পান কোরো।' অতীতহারা পুরোহিত ভারতবাসীকে দেবদেবীর প্রতিমার পা ধোয়া জল খাওয়ানো থেকে শুরু করে

নিজের পা-ধোয়া জল পর্যন্ত খাইয়েছে এবং সেখানেই থেমে থাকেনি, বহু স্ত্রীলোককেই তাঁদের নিজ নিজ স্বামীর পা-ধোয়া নোংরা জল পর্যন্ত খাইয়ে তাদের আশ মিটিয়েছে। ...

এর পরে এলেন আধুনিকতাবাদী মার্কসবাদীরা। তাঁরা অতি সেয়ানা। অ্যাকাডেমিতে উচ্চশিক্ষিত। বিজ্ঞানবাদী। এঁদের অনেকেই হিন্দুসন্তানও বটে। তাঁরা বললেন, 'ছি ছি, শেষে কিনা গোময় গোমূত্র পা-ধোয়া জল! কুসংস্কার, কুসংস্কার! অতীতের সবই কুসংস্কার। ফেলে দাও, নষ্ট করো, ধ্বংস করো। অতীতের বেশিটাই হল জঞ্জাল!' এই বলে তাঁরা গেলেন ইয়োরোপ আমেরিকার পুঁজি-পূজারী পণ্য-উৎ**পাদক**দের **পাদোদক** পান করতে। আর তা পান করার ফল এমনি হয়েছে যে, তাঁরা সেই **পাদোদক** পান করেই ক্ষান্ত দেননি, সারা দেশের সমস্ত জনসাধারণকে তাঁরা সেই **পাদোদক** পান করাতে লেগেছেন, পান করাচ্ছেন এবং যারা তা পান করতে রাজি নয়, সম্প্রতি বিশ্বায়নের নামে তাদের জোর করে সেই **পাদোদক** পান করাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। ...

পাদোদক শব্দের এই যে ফলিত প্রয়োগ, অমৃতপানকে পা-ধোয়া নোংরা জলপানে পরিণত করা এবং তার শুভ দিকটিকে একেবারেই দেখতে না পাওয়া ও ভুলে যাওয়া, একে আমরা '**পাদোদক-মূঢ়তা**' নাম দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই মূঢ়তার কথা জানতেন। কোনো একস্থানে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেছেন যে, ভারত যে মহাসত্য পেয়েছে, তা অতি মহৎ, কিন্তু তাকে ঠিকভাবে বোঝা ও কাজে লাগানো কঠিন। আর, ঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে জাতির জীবন মূঢ়তার গ্লানিতে নিমজ্জিত হবে। এবং তাই হয়েছেও।

পাদোন (পৌনে) : ২. *(এক) **পাদ** উন যাহাতে। /* পাদ দ্বারা উন (ব.শ.)। ৩. পাদন্যূন, পৌনে; সিকি-কম, বার-আনা-রকম। (ব.শ.)। ৪. **পাদোন** অপ্রচলিত, **পৌনে** quarter অর্থে প্রচলিত। ৫. যে কোনো সত্তাকে চার পাদে ভাগ করে বোঝার একটা রীতি ছিল সেকালে। সেই সুবাদে বিশেষ বিশেষ পরিমাপের চার **পাদের** এক **পাদ** কম থাকলে বলা হত 'এক পাদ উন যাহাতে' অর্থাৎ **পাদোন**। পরে পরে শব্দটি বিবর্ত্তিত হয়ে হয়ে **পৌনে**-তে পরিণত হয়েছে। ৬. ল্যাটিন paene (= almost), যার উচ্চারণ 'পাএনে' বা 'পাইনে', যাকে আমরা ইংরেজিতে penultimate ও penumbra শব্দের মধ্যে পাই।

সম্পাদক (সম্পাদন, সম্পাদনা, সম্পাদিত, সম্পাদ্য) : ১. সম - ✓পাদি + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***সম্পাদন*** = *সম্যক **পাদ** অন (on) থাকে যাহাতে। **সম্পাদক** = **সম্পাদন** করে যে। **সম্পাদনা** = **সম্পাদন**-এর আধার যে। **সম্পাদিত** = সম্যক **পাদ** গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে। **সম্পাদ্য** = সম্যক **পাদ** থাকে যাহাতে।* ৩. **সম্পাদক** = সাধক, কারক, কার্য্যনির্ব্বাহক, অধ্যক্ষ (secretary), গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা ও সংস্কারক। **সম্পাদন** = সাধন, করণ, বয়ন, সংশোধন। **সম্পাদিত** = সাধিত, অনুষ্ঠিত, কৃত, সঙ্কলিত ও সংস্কৃত (গ্রন্থ), পরিচালিত (সংবাদপত্রাদি)। **সম্পাদ্য** = সাধ্য, করণীয়, জ্যামিতিতে যে প্রতিজ্ঞায় ক্ষেত্রাদি-অঙ্কন আবশ্যক (problem)। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. যে কাজের অনেকগুলি **পাদ** (= steps) আছে, সেই কাজ করবার সময় কারক প্রতিটি **পাদে** যথাযথভাবে **পাদন** করে করে কাজটির শেষ সীমায় পৌঁছে যান, ফলত তাতে কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যায়। এইভাবে **পাদন** করাকে **সম্পাদন** করা বলে। **সম্পাদক** সেইরূপ সম্যক **পাদন** করেন বলেই তাকে **সম্পাদক** বলে। **সম্পাদ্য**-এর বেলায় মানসলোকের সেই সম্যক **পাদন** কর্মটি ছাত্রদেরকে তাদের জ্যামিতির খাতায় করে দেখাতে হয়। তার কোনো **পাদন**-এ (step-এ) ঠিকঠাক **পাদন** করা না হলে শিক্ষকেরা ছাত্রদের বকাবকি করেন, 'এই সোজা **সম্পাদ্য**টি step by step (**পাদন** করে করে) ঠিকঠাক করতে পারলে না!'

***পল্ (পাল্, পালি)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অধরপল্লব, অপালন, অপালা, অবনিপাল, অশ্বপাল, উলটা-পালটা, ওষ্ঠপল্লব, কপাল, করপল্লব, গোপাল, দ্বারপাল, নৃপাল, পল্, পল, পল (পলাল), পলক, পলকা, পলট, পলটন, পলতা, পলতে (পলিতা), পলব, পলয়ার, পলল, পলসাই, পলসাঁঞি, পল(লে)স্তারা (পল-স্তর, পলিস্তর), পলা, পলাইত, প(পো)লাও, পলাকড়া, পলাকড়ী (পকোড়া), পলাণ্ডু (পিয়াঁজ), পলাতক, পলাতকা, পলাদ, পলান্ন, পলায়ন, পলায়মান, পলায়ী, পলাল (পোয়াল), পলাশ, পলাশী, পলি, পলিত, পলিতা, পলু, পলুই, পলোয়া, পলো, পল্ল, পল্লব, পল্লবক, পল্লবগ্রাহী, পল্লবিত, পল্লবী, পল্লি(ল্লী), পল্লিকা, পল্লী, পল্লীগ্রাম, পল্বল, পশুপাল, পাল্, পাল, পালই, পালং, পালক, পালকাপ্য, পালকি(কী), পাল-খাওয়ান, পালগ্রহণ, পালঙ্ক (দ্র.পৃ, পর্য্যঙ্ক), পালঝাড়া, পালট (দ্র.পর্য্যঙ্ক), পালটা, পালটি(টী), পালট্যা (পালিটা, পালিতা, পারিভদ্র), পালধি(ধী), পালন, পালনীয়, পালপার্ব্বণ, পালয়িতা (পাতা), পালা, পালান (মউপালান, মাসপালান), পালাশ, পালি, পালিকা, পালিত, পালিত্য, পালিশ (পালিস), পালী, পালো, পাল্লা, পাল্লা-পাল্লি, পাল্লাভারী, পেল, পেলা, পেলাপেলি, পোলো, পোয়াল, প্রতিপালক।

পল্ (পাল্, পালি) = পায়ীর লালন-লয়ন। **পল** = পায়ীর লালন-লয়ন যাহাতে। **পাল** = **পল** হইতে জাত। **পালি** = পাল গতিশীল যাহাতে।

পল (পলক, পলকা, পলি) : ১. ✓পল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পল*** = *পায়ীর লালন-লয়ন থাকে যাহাতে। **পলক** = **পল** করে যে। **পলকা** = **পলক**-এর আধার যে। **পলি** = **পল** গতিশীল যাহাতে। /* **পলকা** = যাহা সহজে পড়ে (ভাঙ্গে)। (ব.শ.)। ৩. **পল** = মাংস, কর্ষচতুষ্টয়, চার তোলা, দশ ধরণ বা শতমান, পলপরিমিত দ্রবদ্রব্য, দণ্ডের ষষ্টিতম অংশ, অত্যল্পকাল, তুচ্ছ ধান্য। **পলক** = দণ্ডের ষষ্টিতম অংশ, চক্ষুর পাতা, চক্ষুর নিমেষ কাল, অত্যল্পকাল। **পলকা** = পলায়নশীল, ভঙ্গপ্রবণ

(fragile)। **পলি** = ঘোলা জলের থিতানো মাটি (alluvium, sediment)। (ব.শ.)। ৪. 'অত্যল্পকাল' অর্থে **পল** কম প্রচলিত থাকলেও, 'নিমেষ' অর্থে **পলক** ও fragile অর্থে **পলকা** যথেষ্ট প্রচলিত। ৫. **পল** শব্দটি কেমন করে একই সঙ্গে 'মাংস', 'চার তোলা', এবং 'অত্যল্পপরিমাণ' অর্থকে ধারণ করে, সেকথা সহজে বোধগম্য হতে চায় না। কার্যত **পল** শব্দের অর্থ যথেষ্ট অব্যক্ত। তবুও চেষ্টা করলে যতটুকু ব্যক্ত করতে পারা সম্ভব, ততটুকু চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

আগেই আমরা জেনেছি যে, **প**-এর ভিতরে রয়েছে একধরনের অবকাশ এবং সেই অবকাশ পূরণের ইচ্ছা ও চেষ্টা; **প** তাই 'প্রাপণকারী' বা 'পায়ী' হয়। কিন্তু সেই প্রাপণেচ্ছা যদি মুহূর্তে সাহস পায় ভয়ও পায়, তখন তাকে বলতে হয় **পল**। কেননা, **ল**-এর ভিতরে লালন যেমন রয়েছে, তেমনি লয় করাও রয়েছে। তার মানে **পল** হল এমন এক ক্রিয়াকারী সত্তা, যে ক্ষণে আগ্রাসী ক্ষণে নির্লিপ্ত, এখুনি পেতে চায় পালাতেও চায়, এখুনি দারুণ আছে এখুনি একদম নেই। সেই কারণে **পল** সহজেই অত্যল্প স্থান-কাল-পাত্রকে বোঝাতে পারে।

গ্রামবাংলার রান্নাঘরে এখনও লোহার তৈরি **পল** বা **পলা** ব্যবহৃত হয়, যাতে প্রায় ১০ গ্রাম তেল মাপা যায়। আর সময় গণনার ক্ষেত্রে **পল**-এর হিসেব এখনও জ্যোতিষীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এই সময়টুকুকে খুব সহজে চেনা যায় **পলক** শব্দে। 'এক **পলকে** একটু দেখা' গান রয়েছে বাংলায়। এই **পলক**কে **নিমিষ** বা **নিমেষ**ও বলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একখানা দিলে **নিমেষ** ফিরাতে তিনখানা করে আনে।' কিন্তু এই যে **নিমেষ** বা **পলক**, এ তো আসলে মুহূর্তের জন্য চোখের (মনের) জানালার **পাল্লা** দুটি খুলে দৃষ্টি ছুঁড়ে কাঙিক্ষত বস্তুকে দেখেই জানালার **পাল্লা** বন্ধ করে দেওয়া! এ তো মুহূর্তের সক্রিয়তাই বটে! সেই মুহূর্তটুকুর পরে সত্তাটিই নেই, তার সক্রিয়তা তো দূরের কথা। মুন্সিবেড়ের আমবাগানে স্কুলফেরত ছাত্রদের আমপাড়ার দলটি মুন্সিদের কুকুরের আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়; দলটির সংহতি মুহূর্তে ভেঙে পড়ে, কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দলের সক্রিয়তা তো দূরের কথা, দলটিই আর নেই। **পলকা** শব্দের ভিতরে রয়েছে এই সংহতি ভেঙে পড়ার কথা। এই কারণে ব.শ. **পলকা** শব্দের মানে দিয়েছেন 'পলায়নশীল'। ...

অতএব **পল** শব্দ ক্ষুদ্রতম স্থান-কাল-পাত্র থেকে 'পলায়নশীল' পর্যন্ত নানা সত্তাকেই বোঝাতে পারে। **পল** বললে কতটা কালকে বোঝায়, তা প্রায় সবাই বুঝতে পারেন। কিন্তু কতখানি স্থান বা পাত্রকে তা বোঝায়, তা নির্ণীত হয়েছে সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ কালখণ্ডে। আমরা এই তথ্য পাচ্ছি যে, চার তোলা বস্তু ও প্রায় ১০ গ্রাম তেলকে এক **পল** বস্তু বা এক **পল** তেল বলে। ... এই **পল** গতিশীল যাহাতে, তাকে বলে **পলি**। কেননা, **পল পল** করে করে তা জমে জমে একটা চেহারা লাভ করে। যাঁরা নিজের চোখে ঘোলা জলের **পলি** পড়তে দেখেছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দেবেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু **পল** বললে 'মাংস' বোঝায় কেন, তা সহজে বোধগম্য হতে চায় না। **পল** শব্দের ভিতরে 'মাংস'-ধারণা এত গভীরে রয়েছে যে, তার যাথার্থ নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তবে **পলাশ** শব্দে পৌঁছে সেই সংশয়ের নিরসন হয়। একজন 'প্রাপণকারী'র (**প**-এর) পেয়েই পালানোর (**ল**) ইচ্ছে হয় কখন? যখন পাওয়া তার আবশ্যক, কিন্তু সেই পাওয়া স্বাভাবিক নয় — প্রকৃতির বা সমাজের নিয়মের বিরোধী। ফলে পালানো জরুরি হয়ে পড়ে। আর, তেমন পরিস্থিতি কখনো কখনো দেখা দিতেও পারে। তখন **পলন** করা মানেই নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়ের যতটুকু পারা যায় নিয়মবিরুদ্ধভাবে তা নিয়েই পালিয়ে যাওয়া। এইরূপ আচরণ, অস্তিত্বের চরম সঙ্কটে পড়ে গেলে কেবলমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। আর সেই পরিস্থিতি জীবদেহের কিছু কিছু কোষের, সমাজদেহের কিছু কিছু সদস্যের আসেও। জীবদেহের ক্ষেত্রে সেই **পলন**কে বলে মাংসভক্ষণ, সমাজদেহের ক্ষেত্রে সেই **পলন**কে বলে আপন অংশ (ব্যক্তিমালিকানা) নেওয়া ... ইত্যাদি। এই **পল** রয়েছে **দক্ষ** সত্তার মূলে। এটির আবিষ্কারক **শিব**, কিন্তু এর ধারক-বাহক হন **দক্ষ**। **শিব**সত্তার আপত্তি এই যে, বিপদে পড়ে গেলে কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই **পল**-আচরণ করা চলতে পারে, কিন্তু তাকেই জীবনের মূলনীতি করলে মানুষ তার মনুষ্যত্ব থেকে সরে যাবে। **শিব** তাই **দক্ষে**র 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি'র বিরুদ্ধাচরণ করেন। ... ৬. **পলিস্তর** > পলস্তর > পলেস্তারা, পলস্তারা > plaster। তাছাড়া ইংরেজি pollen, Apollon (গ্রীক পুরাণের দেবতা = সূর্য)।

পলসাই, পলসাঁঞি : দ্র. **পদবী**।

পলায়ন (পলায়মান, পলায়িত) : ১. পরা + ✓অয়্‌ + অন (ল্যুট্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পলায়ন*** = ***পল****-এর অয়ন যাহাতে।* ৩. **পলায়ন** = ভয়াদি হেতু প্রস্থান। **পলায়মান** = পলায়নপর। **পলায়িত** = কৃতপলায়ন, প্রদ্রুত, পরাঙ্মুখ। (ব.শ.)। ৪. escape বা run away অর্থের কয়েকটি রূপে শব্দগুলি প্রচলিত। ৫. দ্র. **পল**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

পলাশ (পলাশী) : ২. ***পলাশ*** = ***পল****-এর প্রতি* ***আশা*** *যাহার।* ***পলাশী*** = ***পলাশ****-এর গতিশীল আধার যে। /* **পলাশ** = প্রশস্ত পত্র আছে যাহার। (ব.শ.)। পলে আশ যাহার সে; অথবা, পল অথচ অশ। (ছা.অ.)। **পলাশী** = পত্র আছে যাহার; মাংস ভক্ষণ করে যে (রাক্ষস)। (ব.শ.)। ৩. **পলাশ** = কিংশুকবৃক্ষ (Butea frondosa), হরিদ্বর্ণ, মগধদেশ, রাক্ষস, পর্ণ, পত্র, পলাশপুষ্প, পুষ্পদল, ফুলের পাপড়ি। (ব.শ.)। ... শ্যামবর্ণ, শ্যামবর্ণবিশিষ্ট, নির্দ্দয়, রাক্ষস, প্রেত। (ছা.অ.)। **পলাশী** = (পলাশজাত) লাক্ষা, বৃক্ষ, ক্ষীরী বৃক্ষ। (ব.শ.)। রাক্ষস, রাক্ষসী, গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামবিশেষ; ইহা মুর্শিদাবাদ হইতে পঞ্চক্রোশ দূরবর্তী; ... ... এই স্থানে ইংরাজী ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভের সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ও বঙ্গে ইংরাজরাজ্যের মূল প্রতিষ্ঠা হয়। (ছা.অ.)। ৪. ফুলের নাম রূপে **পলাশ** এবং উপরোক্ত ভৌগোলিক স্থাননাম রূপে **পলাশী** প্রচলিত। ৫. **পলাশ**-এ নাকি

পল ও **আশ** একত্রে থাকে। কীভাবে থাকে? অনেকেই জানেন, **কিংশুক** বা **অশোক**-এর মতো **পলাশ** ফুলেরও কোনো গন্ধ নেই এবং তার রং পাকা ইটের মতো এত উজ্জ্বল লাল যে, যখন ফুল ফোটে তখন মনে হয় গোটা গাছে যেন আগুন লেগে গেছে। ... এসব যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, জেনেছেন, তাঁরা হয়তো আরও ভাল বলতে পারবেন, এই গাছ ও তার ফুলের ভিতরে **পল** এবং **আশ** একত্রে কীভাবে থাকে। আমরা শুধু নিশ্চিতভাবে এটুকু জেনেছি যে, নেচারের অমোঘ নিয়মে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের স্বভাব বিশেষ বিশেষ সমাজ-সংগঠনের স্বভাবের হুবহু সমান্তরাল। সেই সুবাদে দেখা যাচ্ছে, ভারতের ইতিহাসে যে আদি যৌথ-সমাজসংগঠন ছিল, তাতে ফুল (পণ্য) হত না, কিন্তু ফল (উৎপন্ন) হত। তাদের বলা হত **বনস্পতি**, যেমন **অশ্বত্থ**। পরবর্তীকালে আর এক ধরনের যৌথ-সমাজসংগঠনের দেখা মেলে, যাদের কয়েকটির চরিত্র **অশোক, কিংশুক, শাল্মলী (শিমূল)**, ও **পলাশ**-এর মতো। এগুলিতে ফুল হয়, এক-এক ধরনের ফলও হয়। অর্থাৎ যৌথসমাজের ভিতরেই **পণ্য** উৎপাদিত হয়, কিন্তু গন্ধ ছড়িয়ে তারা পণ্যকামীকে আকৃষ্ট করে না, করে শুধু রূপ দেখিয়ে, যে রূপ কোনো ক্ষেত্রে ভয়ানকও বটে। এই সব যৌথ সামাজিক সংগঠনের গন্ধহীন পণ্য কিছুটা গোপন, কিছুটা প্রকাশ্য, সরকারিভাবে নিন্দিত, তাও লেনদেন শুরু হয়ে গেছে, চলছে — এই ধরনের। (দ্র. **চম্পা**)। আর, এসব চলছে রাষ্ট্রশক্তির চোখরাঙানির তলায়। স্বভাবতই রাষ্ট্রও এখানে মাঝে মাঝে 'রাক্ষস'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সংস্কৃতিতে ব্যক্তি-মালিকানা নিন্দিত হলেও সমাজের সর্বত্র তলায় তলায় তার অধিকার পুরোদমে চলছে, কিন্তু সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। জনসাধারণ এই সকল **পলাশ** বৃক্ষের (সামাজিক-সংগঠনের) **পলাশ** ফুলের (পলাশ-পণ্যের) শোভা দেখে উৎফুল্ল হচ্ছে, লোভাতুর হচ্ছে, গ্রহণ করছে, ভয়ও পাচ্ছে। এইসব কারণে, উপরে **পলাশ** শব্দের **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে হলেও আসলে কিন্তু সম্পর্কহীন নয়; তারা সহোদরই বটে। ...

তবে **পলাশী**র যুদ্ধটি বেশ অদ্ভুত এক ঘটনা। ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন করে ইংরেজ ভারতে এসেছিল। ভারতে তার আটশো বছর আগেই বিশ্বের আদি শিল্পবিপ্লব (বৌদ্ধবিপ্লব, দ্র. **জনমেজয়, আস্তিক**) সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুযুগের সূচনার পর থেকে পুনরায় **কিংশুক, শাল্মলী, পলাশ**-এর (অর্থাৎ তদ্রূপ সমাজ-সংগঠনের) পূজাই চলছে। সেই **পলাশ**-এর গতিশীল আধার **পলাশী**র প্রান্তরে ব্যর্থ-শিল্পবিপ্লবী-ভারতের মুখোমুখি হল সফল-শিল্পবিপ্লবের প্রতিনিধি ইংরেজ। এবং ভারতের পরাজয় ঘটল। **পলাশী**র প্রান্তরেই! মানসিক **পলাশী**, সামাজিক **পলাশী** এমনকি ভৌগোলিক **পলাশী**র প্রান্তরেই! একি পরমাপ্রকৃতির অদ্ভুত লীলা নয়! ...

পাল (গোপাল, দ্বারপাল, নৃপাল, পালং, পালক, পালকি, পালন, পালনীয়, পালা, পালান) : ১. ✓পাল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পাল*** = ***পল*** *হইতে জাত।* ***গোপাল*** = *গো পালন করে যে।* ***দ্বারপাল*** = *দ্বার পালন করে যে।* ***নৃপাল*** = ***নৃ*** *পালন করে যে।* ***পালং*** = ***পালন****ের রহস্যরূপ থাকে যাহাতে।* ***পালক*** = ***পালন*** *করে যে।* ***পালকি*** = ***পাল****-করণ গতিশীল যাহাতে।* ***পালন*** = ***পাল*** *অন (on) যাহাতে।* ***পালনীয়*** = ***পালন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পালা*** = ***পাল****-এর আধার যে।* ***পালান*** = ***পালা*** *অন (on) যাহাতে।* **৩. পাল** = পালক, রক্ষক, রাজা, পশুরক্ষক, রাখাল, গোপ, পতদ্গ্রহ, পিকদান, ত্রাতা, পালিত গো-মহিষাদিযূথ, হিন্দুর উপাধি, বন্যপশুযূথ, দল, গো-প্রভৃতি পশুর সঙ্গম; কাপড়ের দুচালা তাঁবু, নৌকাদির মাস্তুলে বদ্ধ বায়ুরোধক প্রসারিত পট, শামিয়ানা, চাঁদোয়া; পালন করা, রক্ষা করা, প্রতিপালন করা, পূরণ করা, শাসন করা, যত্ন করিয়া রাখা, তিথিজন্য নিয়ম রক্ষা করা। **গোপাল** = গোপালক, গোরক্ষক, রাখাল, কৃষ্ণ, শ্রীদামাদি দ্বাদশ/ষোড়শ গোপবালক, ভূপাল, রাজা, শিব, আদরের ডাক। **দ্বারপাল** = দ্বাররক্ষক, দ্বারবান। **পালং** = শাকবিশেষ। **পালক** = রক্ষক, ত্রাতা, ধারক, রক্ষাকর্ত্তা, অশ্বরক্ষক, চিত্রকবৃক্ষ; পাখীর ডানার অংশ, পাখনা। **পালকি** = শিবিকা, ডুলীবিশেষ। **পালন** = পালনসাধন, সদ্যপ্রসূত ধেনুর দুগ্ধ, রক্ষণ, ত্রাণ, চৌরাদি হইতে ধনাদিরক্ষণ, পোষণ, ভরণ, অনুষ্ঠান। **পালনীয়** = রক্ষণীয়, পোষণীয়, অনুষ্ঠেয়। **পালা** = পল্লব, ঘরের আশ্রয়, খুঁটী, পর্য্যায়, পরম্পরা, কার্য্যার্থ নির্ণীত সময়পরম্পরা, বার, পর্য্যায়ক্রমে রচিত মঙ্গলকাব্যের গেয় বিষয় বা গান; পলায়ন করা, পালান, নিক্ষেপ করা, ফেলা, পালাই-পালাই করা। **পালান** = আরোহণার্থ বা ভারবহনার্থ অশ্বাদির পৃষ্ঠে বদ্ধ গদি, স্ত্রীগোমহিষাদির স্তন (udder), (**মউ পালান** = ছোট পালান কিন্তু অধিক দুগ্ধযুক্ত; **মাস পালান** = মাংসল বড় পালান কিন্তু অল্প দুগ্ধযুক্ত।) (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। **৫.** অনেকে মনে করেন বাংলাভাষায় শব্দ সংখ্যা কম, তাই বাংলায় অনেক কথা বলা যায় না। আমরা তাঁদের প্রথম কথাটিতে আপত্তির কারণ দেখি না। সত্যিই তো, বাংলা শব্দ তো সংখ্যায় কম। কিন্তু তাঁদের দ্বিতীয় কথাটি অত্যন্ত ভুল কথা। গালিভারের মতো শব্দ আর লিলিপুটের মতো শব্দ কি সমান অর্থ বহন করতে পারে? বাংলার 'গ্রাম্য-শব্দ', 'পৌরাণিক-শব্দ', 'অসাধু-শব্দ', 'অশ্লীল-শব্দ' ... ইত্যাদি বাদ দিলেও অবিন্যস্তভাবে পাওয়া যায় প্রায় হাজার দশেক গালিভারের মতো অর্থবহন-শক্তিসম্পন্ন শব্দ, আর ইংরেজির রয়েছে সুবিন্যস্তভাবে গোছানো প্রায় দু'লক্ষ লিলিপুটের মতো অর্থবহন-শক্তিসম্পন্ন শব্দ। তাহলে কোন ভাষার অর্থপ্রকাশ ক্ষমতা বেশি? একটি গালিভারই তো দু'লক্ষ লিলিপুটের ভারবহন করতে পারে, পারে না কি? বাংলাভাষায় শব্দের ঐন্দ্রজালিক প্রয়োগকৌশল এবং তার **কর, ধর, চল, বল, হর, মর, পল** ... প্রভৃতি শব্দের বিপুল অর্থবহন-ক্ষমতা শব্দগুলিকে ইংরেজি শব্দের তুলনায় কতখানি শক্তিধর করে তোলে, যথার্থভাবে সেই তুলনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অধিক কী, **পাল**-এর মতো এক একটি শব্দের প্রয়োগের বিশাল এলাকার দিকে তাকালেই তার যাথার্থ বোধগম্য হয়ে যেতে পারে।

পাল কথাটি '**পল** হইতে জাত'। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রাণপণেচ্ছার (**প**-এর) লালনকারী ও লয়নকারীর (**ল**-এর) থেকে এই সত্তা সক্রিয় হয়। যখন **প-লা**লনকারী (= **পল**) থেকে সে জাত হয়, তখন সে জীবজন্তুর **পাল** হতে পারে, নৌকাদির **পাল** হতে

পারে, ভূ**পাল**, গো**পাল**, নৃ**পাল**, দ্বার**পাল**, ধর্ম**পাল**, দেব**পাল**, প্রজা**পাল**, ... এমনকি থুতু**পাল** (পিকদান) ইত্যাদিও হতে পারে। তবে সামাজিক ইতিহাসের নিরিখে পণ্যের **পালক** রূপে গো**পাল** ও দেব**পাল**গণই ভারত তথা বাংলায় আজও স্মরণীয়। আজ তাঁদের সেই **পণ্যপাল**নের গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার তাঁদের সকল উত্তরসূরিদের না থাকলেও উপাধি রূপে তাঁদের নামের শেষে **পাল** অবশ্যই রয়েছে, আজও। ...

আবার, যখন **প-লয়**নকারী (= **পল**) থেকে সে জাত হয়, তখন সে **পাল**-খাওয়ানো, পূরণ করা ... ইত্যাদিও হতে পারে; হতে পারে **পালগ্রহণ, পালঝাড়া** ... ইত্যাদি। গ্রামবাংলায় এসব শব্দ কমবেশি প্রচলিত থাকলেও অ্যাকাডেমিতে তাদের ব্যবহার হয় না। তবে এই **পাল** যে কেবলমাত্র গরুমহিষ প্রভৃতি জীবজন্তু কিংবা প্রজাসাধারণের দলকেই বোঝায় না, ত্রিলোকপালিনীর মহাবিদ্যার বোধগুলির **পাল**কেও বোঝাতে পারে, সেকথা আগেই আমরা **গোপাল** (দ্র. ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯) শব্দে আলোচনা করেছি।

নর ও **নৃ** শব্দের পার্থক্য আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। তাদের **পাল** যথাক্রমে **নরপাল, নৃপাল** হতেই পারে। অবশ্য **পালং** শাকের ক্ষেত্রে একালের বিজ্ঞান বলেন, শাকটি নাকি যথেষ্ট শক্তিবর্ধক, লৌহগুণবিশিষ্ট ... ইত্যাদি। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা যেভাবেই হোক বুঝেছিলেন, শাকটির ভিতরে **পল**-এর গুণ আছে। তাই তাঁরা তার অমন একটি নাম দিয়েছিলেন। তাঁরা কিন্তু মাছ, মাংস, ডিমের নামকরণ করার সময় সেগুলির মধ্যে আর যাই দেখে থাকুন, যথেষ্ট **পালন**-গুণ দেখেননি। তবে সদ্যপ্রসূত ধেনুর দুধের মধ্যে সেটি নিশ্চয় দেখে থাকবেন। তা নইলে তার নাম তাঁরা **পালন** দিতে যাবেন কেন! ... শুধু তাই নয়, এই **পালন**-এর আধারকে তাঁরা বলতেন **পালান** (পালান্)। ব.শ. তা সংকলন করে অতি মধুর দুটি শব্দজোড় আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন — **মউ-পালান, মাস-পালান**। শব্দদুটি গ্রামবাংলায় আজও যথাযথ অর্থে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; যদিও অ্যাকাডেমি এধরনের শব্দের খবর রাখে কি না সন্দেহ, রাখলেও তাদের মর্ম বোঝে না। বুঝলে অ্যাকাডেমির অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। যে সকল সংস্থা বিশেষ **কানন**সজ্জা বা 'উইন্ডো ড্রেসিং' করে না, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে এবং ভাল পরিষেবা দেয়, তাদের সেই পরিষেবাকে কী বলা হবে? কিংবা তার বিপরীত চরিত্রের সংস্থাগুলির পরিষেবাকেই বা কী বলা হবে? না, তার জন্য তেমন কোনো শব্দ অ্যাকাডেমি-ব্যবহৃত আধুনিক প্রতীকী বাংলায় তো নেইই, এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও নেই। অথচ বাংলায় তাদের অনায়াসে **মউ-পালান** ও **মাস-পালান** (শব্দদুটি **পালান্** রূপে উচ্চারিত হয়) বলা যেতে পারত। ...

পাল-এর আধার যে, সে হল **পালা**। গাছ**পালা**য় যে **পালা** আমরা দেখতে পাই, সে নাকি '**পল্লব**' শব্দের বিবর্তিত রূপ। হতে পারে। কিন্তু বাংলাভাষী তাকে আস্ত রাখেনি, **পাল**-এর **পালা**র সঙ্গে তাকে একঘরের বাসিন্দা করে নিয়েছে। সে **পালা** হাঁসমুরগি **পালা** বা **পালন** করা যেমন বোঝায়, তেমনি **পালা** বা **পালা**ই-**পালা**ই করা অর্থাৎ **পালান**ও (পালানোও) বোঝায়। আর সেরকম সে করবে নাই বা কেন! তার **পল** তো লালন বটে, লয়নও বটে! এই যে একবার **পালা** বা **পালন** করা এবং তারপরে আবার **পালা** বা **পালান**, এই পরম্পরা চললে সে তো এক-এক বারের এক-একটা **পালা** (বার) হয়ে গেল! সে **পালা**র তাহলে 'পর্য্যায়ক্রমে রচিত মঙ্গলকাব্যের গেয় বিষয়' বা **পালা**গান হতে দোষ কোথায়! সর্বোপরি বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে **পালা** করে যে সমস্ত **পালাপার্ব্বণ** আসে, তারা তো রয়েছেই। ...

তা সে যাই হোক, শব্দের স্বাভাবিক নিয়ম আমাদের জানায় '**পাল**-অন করে যে', সে হল **পালক** অর্থাৎ **পালন**কারী। এই **পালক**কে গতিশীল করে যে, সে হল **পালকি**। হ্যাঁ, সেকালে রাজা ও রাজপুরুষেরা ছিলেন প্রজার **পালক** এবং সেই **পালক**দের বহন করা হত বলে যানটির নাম **পালকি** হয়ে যায়। অবশ্য সুদূর প্রাচীনকালে, যখন মানুষ মানুষের কাঁধে চাপতে পারে এমন কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারত না, তখনই কিন্তু এই **পালকি**র আদিপুরুষের জন্ম হয়ে গিয়েছিল এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল **শিবিকা**। আমাদের 'জ' গ্রন্থের 'মানুষ মানুষের ঘাড়ে চাপল কেমন করে অথবা পালকির কথা' নিবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ...

পালট (পালটা, পালটি) : ২. **পালট** = **পাল** *টঙ্কারিত যাহাতে।* **পালটা** = **পালট**-*এর আধার যে।* **পালটি** = **পাল**-*এর টঙ্কার গতিশীল যাহাতে।* / **পালটি, পালটী** = বিবাহে যে বরে কন্যাদান-আদানে কুলমর্য্যাদা রক্ষা হয়। (ব.শ.)। ৩. **পালট** = বিপরীতমুখ বা পরাবৃত্ত হওয়া, মুখ ফিরান, পশ্চাতে ফেরা, ফেরা, বিপর্যস্ত বা অধোমুখ হওয়া, উলটান, বিপর্য্যস্ত করা, ঘুরান, পরিবর্ত্তন করা, বদলান। **পালটি, পালটী** = পালটাসম্বন্ধী, সমানকুলমর্য্যাদাপন্ন। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উলট** (১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮)। পার্থিব বস্তুমাত্রেই বিশেষভাবে থাকে, যার একটি উপর দিক এবং বিপরীত দিকটি নীচের দিক বলে মনে করা হয়। উপর দিকটিকে নীচের দিকে ঠেলে দিলে বা নীচের দিকটিকে উপর দিকে করে দিলে আমরা তাকে বলি **উলটে**-দেওয়া। এভাবেই কলসি **উলটে** দেওয়া হয়, তার জল ঢালা হয়ে গড়াতে থাকে; এভাবেই টেবিল **উলটান**ও হয়, এমনকি ইংরেজির 'প্রস্তাবাদি' (turn down, table turning) ইত্যাদি **উলটে** ফেলে দেওয়াও যেতে পারে। তবে সর্বোচ্চ **উলটান**-র ঘটনা ঘটে 'গণেশ **উলটা**'লে। তাতে দৃশ্য লোকে ব্যবসায়ীর দোকানের গণেশ ঠাকুরটি দোকানের সামনে **উলটে** পড়ে থাকে বটে, অদৃশ্য লোকে কত মানুষ যে সর্বস্ব খোয়ায় তার হিসাব পাওয়া যায় না।

তবে এ হল খাড়াই বস্তুর পড়ে যাওয়ার কথা। যে সমস্ত বস্তু মাটিতে লম্বমান থাকে, যাদের উচ্চতার চেয়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেশি, তাদের ক্ষেত্রে নীচের দিকটিকে উপরের দিকে আনলে তাকে বলে **পালটে** দেওয়া। শায়িত মানুষকে চিৎ থেকে উপুড় কিংবা উপুড় থেকে চিৎ করে দিলে তাকেও তাই **পালটে** দেওয়া বলে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দুরকম কথাই বলা হয়ে থাকে। যেমন বইয়ের পৃষ্ঠা কেউ **উলটায়**, কেউ-বা **পালটায়**। তাছাড়া, বিপরীত কথা বললেই বলা হয়, 'এখন তুমি **উলটা** কথা বলছ কেন? আগে তো এরকম

বলোনি?' কিংবা কেউ প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিছিয়ে গেলে তাকে এরকমও বলা হয়, 'আরে, সেদিনকার পিকনিকের সভায় ওই তো বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছিল, আর আজ চাঁদা আনতে গেলে লোকটা **পালটি** খেয়ে গেল, কিংবা **পালটি** মারল!' মোটকথা, যদিও **উলট**-এর মূলে ছিল খাড়াই অবস্থা থেকে পড়ে যাওয়া এবং **পালট** শব্দের মূলে ছিল শায়িত অবস্থা থেকে ডাইনে বা বাঁয়ে এমনভাবে সরানো যাতে বস্তুটির নীচের দিকটি উপরে চলে আসে। দেখা যাচ্ছে, **উলট পালট** শব্দদুটি আজকাল আরও ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। মোটকথা, শব্দদুটি পৃথকভাবে, পরস্পরের বিপরীত অর্থে, সমার্থক শব্দরূপে, কখনো-বা শব্দদুটি একটি শব্দজোড় রূপে নানার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ...

পালি (পালিকা, পালিত, পালিত্য, পালী) : **১.** ✓পাল্ + ই (ইচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পালি*** = ***পাল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পালিকা*** = ***পালি*** *করে যে তাহার আধার।* ***পালিত*** = ***পাল*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***পালিত্য*** = ***পলিত*** *(**পল** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে) হইতে জাত।* ***পালী*** = ***পালি****-র আধার যে।* **৩. পালি, পালী** = কর্ণলতা, কানের পাতা, অস্ত্রের কোণ, কোটি, প্রান্ত, গৃহাদিকোণ, অঙ্ক, চিহ্ন, সেতু, আলি, ছাত্রাদিকে দেয় বৃত্তি, উৎসঙ্গ, ক্রোড়, প্রস্থ, পরিমাণবিশেষ, প্রদেশ, যূকা, উকুন, জাতশ্মশ্রু স্ত্রী, ধান মাপার পাত্র; প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভাষাবিশেষ (ইহা বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা।)। **পালিকা** = কর্ণলতা ... ইত্যাদি; অস্ত্রাগ্র, কোটি, দধ্যাদিচ্ছেদনী (butter-knife)। **পালিত** = রক্ষিত, অনুষ্ঠিত, কৃত, কৃতপোষণ, লালিত, কায়স্থের উপাধি। **পালিত্য** = পলিতভাব, জরাজন্য কেশের শুক্লতা বা চুল পাকা। **পালী (পালিন্)** = পালক, রক্ষিতা। (ব.শ.)। **৪. পালিত্য** ও **পালী** প্রায় অপ্রচলিত; বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ব.শ. কথিত **পালি** ও **পালী** শব্দের প্রদত্ত অর্থগুলির মধ্যে কর্ণলতা, কানের পাতা, অস্ত্রের কোণ, কোটি, প্রান্ত, গৃহাদিকোণ, অঙ্ক, চিহ্ন, সেতু, আলি, ছাত্রাদিকে দেয় বৃত্তি, উৎসঙ্গ, ক্রোড়, পরিমাণবিশেষ, প্রদেশ, ধান মাপার বেতের পাত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে **পালন** ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অতএব তাদের **পালি** নামে চিহ্নিত করার হেতু বোঝা যায়। কিন্তু প্রস্থ, যূকা, উকুন, জাতশ্মশ্রু স্ত্রী এবং বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা প্রাচীন মাগধী ইত্যাদিকে কেন **পালি** বা **পালী** বলা হত, তা ভাববার বিষয়। ছাত্রদের পালনের উদ্দেশ্যে যে বৃত্তি দেওয়া হত, তাকে যেমন **পালি** বলার কারণ বোঝা যায়, তেমনি গ্রামবাংলায় মুনিষ পরিপালনের জন্য যে বেতের চুপড়িতে ধান-চাল ইত্যাদি দেওয়া হত, তাকেও **পালি** বলার কারণ বুঝতে পারা যায়। স্বভাবতই অনেক সময় ঘরে রাখার আগে আগত ধানচাল সেই **পালি**তেই মেপে রাখা হত, সেই সুবাদে **পালি** একটি পরিমাণবিশেষও বটে। নৌকার পালের মতো বলে কানের পাতাও **পালি**-পদবাচ্য হতে পারে। ... বাকি শব্দগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো না কোনো ভিত্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'প্রস্থ, যূকা, উকুন, জাতশ্মশ্রু স্ত্রী' এবং সর্বোপরি 'পালি-ভাষা'কে কেন **পালি** বলা হত, তা চট করে বোঝা যায় না। তবুও প্রস্থ, যূকা বা উকুনের ক্ষেত্রে **পালি** শব্দ ব্যবহারের একটা কারণ আন্দাজ করা যেতে পারে যে — প্রস্থ বা প্রকৃষ্টস্থিতি তারই হয়, যে ঠিকঠাক পালিত হয় এবং উকুনকে মানুষই মাথায় পালন করে। কিন্তু জাতশ্মশ্রু স্ত্রী? আধুনিক বাংলায় কেউ কেউ এরকম মেয়েদের 'পুরুষালী' বলে থাকেন, যদিও প্রাচীন বাংলায় এরূপ মেয়েদেরই বলা হত **পালি**। আমাদের ধারণা, এঁদেরই সেকালে 'পুরুষী'ও বলা হত। তার কারণ সম্ভবত এই যে, এইরূপ মহিলাগণ সংসারের কর্ত্রীর ভূমিকায় অত্যন্ত সফল হন। তবে এ বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা বা সেকালের মগধের ভাষাকে কেন **পালি** বলা হত?

বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা কী ছিল, সেকথা আমরা **ভাষা** শব্দের আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছি। তাছাড়া, এখানে সেটি আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা হল, **পালি**-ভাষাকে **পালি**-ভাষা বলা হত কেন। আমরা দু'জন **পালি**-ভাষা জানি না। তবুও, যে নীতিতে আমরা সব ভাষার শব্দের অর্থের বিচার করি, তাতে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, কোনো না কোনো কারণে ভাষাটির ভিতরে 'পালন গতিশীল' ছিল বলেই তার নাম রাখা হয়েছিল **পালি**। কিন্তু ঠিক কী প্রকারে তা সত্য, সে সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে যে কয়টি তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হল। বাকিটা ভবিষ্যতের হাতে।

(ক) যাঁরা **পণ্যপাল** ছিলেন, সেই গো**পাল** ও দেব**পাল**গণের ভাষা ছিল **পালি**। (খ) সামাজিক যৌথতার নীতির ভিতরে থেকেই যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যবাদিতার দিকে যে কয়টি প্রদেশ সেকালে ঝুঁকে পড়েছিল, **জরাসন্ধের** দেশ মগধ ছিল তাদের অন্যতম। (গ) সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হত, দেবনাগরী লিপিতেও লেখা হত এবং এখনও হয়। ব্রাহ্মী লিপি বহু প্রাচীন হলেও **দেবনাগরী** লিপি ছিল পরবর্তীকালের অর্জন এবং তা **পণ্যজীবী**দের হাতেই সম্ভব হয়েছিল বলেই তার নাম হয়েছিল **দেবনাগরী**। ... (ঘ) বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়েছিল বৈদিকসভ্যতা ও বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপে এবং তা ছিল ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম শিল্পবিপ্লব, পণ্যজীবিতার সামাজিক স্বীকৃতির সরব ঘোষণা; যদিও তা কয়েকশ বছর পরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। (দ্র. **জনমেজয়**)। পণ্যজীবিতার (দৈহিক ভোগ্যবস্তু বিনিময়ের) এবং ধর্মপ্রচারের (মানসিক ভোগ্যবস্তু বিনিময়ের) জন্য প্রয়োজন হয় জনসাধারণ্যে প্রচলিত সাধারণ লোকবোধ্য ভাষা। যিশু খ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ, গৌতম বুদ্ধ — সবাই তাঁদের নিজ নিজ সময়ের লোকবোধ্য ভাষাতেই (যা কিনা সেসময়ের জ্ঞানীদের চোখে ছিল 'ছোটলোকদের ভাষা', তাতেই) ধর্মপ্রচার করে গেছেন। স্বভাবতই মগধ ও বৌদ্ধধর্ম **পালি** ভাষাকে কোল দিতে বাধ্য হয়। (ঙ) পাশ্চাত্যে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের কারণ ও ফলরূপে যেমন ধনতন্ত্র এসেছিল, ভারতেও বৌদ্ধধর্মের কারণ ও ফলরূপে এসেছিল বিশ্বের আদি ধনতন্ত্র; যদিও তার বীজ উপ্ত হয়েছিল প্রায় ১৫০০ বছর আগে, **দক্ষযজ্ঞে**। ধনতন্ত্রের প্রয়োজনেই ভাষার সুনিশ্চিত অর্থের (অর্থাৎ ভাষার শব্দের প্রতীকীকরণের) ও সর্বমান্য ও সর্বজনবোধ্য লিপির প্রয়োজন হয়। সেকালের সেই বিশেষ কালখণ্ডে মগধের **পালি** সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল।

পাল্লা : ২. *পাল ল (বা লালিত যাহাতে), তাহার আধার।* ৩. তুলাদণ্ডের প্রান্তে লম্বিত আধার (scale-pan), কপাট, দূর, ব্যবধান, গৃহাদির দৈর্ঘ্য, বস্ত্রপ্রান্ত, আঁচল, অধিকার, আয়ত্ততা, গোলা-গুলির বেগের দূরত্ব বা সীমা, প্রতিযোগিতা, তরফ, পক্ষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দৃশ্য **পাল** লালিত হয় দাঁড়িপাল্লায়, কপাটের পাল্লায়, গৃহাদির দৈর্ঘ্যে, বস্ত্রপ্রান্তে, **আঁচলে**, গোলা-গুলির গতির শেষ সীমা পর্যন্ত দূরত্বে বা ব্যবধানে। আর অদৃশ্য **পাল** লালিত হয় অধিকারে, আয়ত্ততায়, প্রতিযোগিতায়, তরফে, পক্ষে। তাই তাদের সবাইকে **পাল্লা** বলে। সেই অধিকারের বা আয়ত্ততার **পাল্লায়** পড়ে গেলে তখনই টের পাওয়া যায়, **পাল্লায়** পড়লে কী হয়।

পশ্ (দৃশ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আছাড়-পাছাড়, নাগপাশ, পচ(ছ)তা, পচতাব, পচ্চাত, পচ্ছাত, পচ্চিম, পছতাবা, পছতান, পছতানি, পছন্দ (পসন্দ্), পশ্, পশ(স) (posterior), পশব্য, পশম, পশরি, পশরিপাল্লা, পশলা, পশু, পশুগায়ত্রী, পশুচর্য্যা, পশুধর্ম্ম, পশুপ, পশুপতি, পশুপাল, পশুপালক, পশুপালন, পশুপাশ, পশুপ্রেরণ, পশ্চাৎ (ফা. পস), পশ্চাতে, পশ্চাত্তাপ, পশ্চার্দ্ধ, পশ্চিম (posterior), পশ্চিমক্রতু, পশ্চিমজন, পশ্চিমযামিনী, পশ্চিমা, পশ্চিমোত্তরা, পশ্য, পশ্যতোহর, পশ্যন্তী, পশ্বাচার, পস, পসন্দ, পস্তা, পস্তান, পস্তানি, পাছ, পাছদুআর, পাছড়, পাছড়া, পাছড়ান, পাছতলা, পাছদেউড়ি, পাছদোর, পাছদ্বার, পাছমোড়া, পাছা, পাছাড়, পাছাড়ি, পাছাপাড়, পাছাপেড়ে, পাছি, পাছিলা, পাছু, পাছুআন, পাছুটান, পাছুড়, পাছুড়া, পাছুড়ি, পাছুয়ান, পাছে, পাশ, পাশ (pass), পাশক, পাশব, পাশবদ্ধ, পাশ(স)র, পাশরি, পাশরিব, পাশরিয়া, পাশা, পাশাটি, পাশাপ্তি(ষ্টী), পাশুপত, পাশুপাল্য, পাশুলি(লী), পাশোয়ার, পাশ্চাত্য, পেখ, পেখন, পেখনু, পেছন, পেছু, পৌঁচি, পৌঁছে, পৌছি, বিপাশা।

পশ্ = পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ। **পশ** = পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।

পছন্দ (পছন্দসই) : ২. *পছন্দ (পশন্দ) = পশ-এর রহস্যরূপী দান থাকে যাহাতে। পছন্দসই = পছন্দ-এর শেষ গতিশীল যাহাতে।* ৩. **পছন্দ** = মনোনীত, মনের মতো, রুচির অনুরূপ, মনোনয়ন, রুচি। **পছন্দসই** = মনের মতো পছন্দ হওয়া, মনের মতো হওয়া। (ব.শ.)। ৪. choice বা liking অর্থে প্রচলিত। ৫. আমাদের ধারণা, শব্দটি আদিতে ছিল **পশন্দ**, যা কিনা **পশ্** শব্দপরিবারের সদস্য। সেই **পশন্দ** থেকেই তা ফারসিতে 'পসনদ্', গুজরাটিতে 'পসংদ' এবং মারাঠিতে 'পসংত', এবং বাংলায় **পছন্দ**-তে পরিণত হয়েছে। **পশন্দ** থেকেই যে **পছন্দ** শব্দটি এসেছে, তার আরও প্রমাণ এই যে, গ্রামবাংলায় 'ওকে আমার খুব পশন্দ' — এরূপ বাক্য আজও শোনা যায়। দ্র. **পশ্য**।

পশ্য (পশ, পশলা, পশ্যন্তী) : ১. ✓দৃশ্ + অনুজ্ঞা, মধ্যমপুরুষ - ১বচন। (ব.শ.)। ২. *পশ = পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। পশলা = পশ লালিত/লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে তাহার আধার। পশ্য = পশ্ থাকে যাহাতে। পশ্যন্তী = পশ্য-এর রহস্যরূপ গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ৩. **পশ (পস)** = প্রবেশ করা, ঢোকা, অবগাহন করা, নামা, প্রাপ্ত হওয়া, লওয়া, উৎপতিত হওয়া, উঠা, দেখা। **পশলা** = ধারাসার। **পশ্য** = দেখ, দেখুন। **পশ্যন্তী** = চতুর্ব্বিধ বাগ্‌বৃত্তির একতম — দ্যোতিতার্থ বাক্। (পরা বা সূক্ষ্মা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী — এই চতুর্ব্বিধ বাগ্‌বৃত্তি।) (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র **পশলা** শব্দটি বৃষ্টিধারার একটি অধ্যায়ের পরিমাপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাকি তিনটি শব্দ বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. 'প্রবেশ কর' বা 'প্রবেশ' ('প্রবেশ্' নয়) শব্দটির যা অর্থ, ব.শ. জানাচ্ছেন **পশ** শব্দটিরও সেই অর্থ ছিল। 'প্রবেশ' থেকেই তা **পশ**-তে পরিণত হয়েছে। সেই **পশ** শব্দটি এখন অপ্রচলিত। তবে **পশ্** শব্দ-পরিবারের সদস্যরূপে **পশ্য, পশ্যন্তী, পশ্চাৎ, পশ্চিম, পাছ, পাছা, পাছে, পাশ্চাত্য, পাশ** (নাগ**পাশ**), **পিছন** ... ইত্যাদি বহু শব্দ ছিল, তাদের কিছু কিছু প্রচলিত রয়েছে। এমনকি pass, **পেশ, পেশকার** প্রভৃতি শব্দও রয়েছে, যেগুলিকে মনে করা হয় যে তারা ইংরেজি বা ফারসি থেকে আগত।

আমরা কিন্তু দেখছি, 'পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে' তাকে **পশ** বলে, এবং তার থেকেই বাংলা, ইংরেজি, ফারসি সব ভাষার **পশ** জাতীয় শব্দগুলি জন্মেছে। **পশ** যেভাবে এরূপ অর্থ ধারণ করে তা হল — আমরা যেদিকে তাকাই, আমাদের 'দৃষ্টি' সেদিকেই চলে যায়, গিয়ে, যাকে দেখতে চাই, তাকে দেখে। এ তো নিজের দিক থেকে বেরিয়ে নিজের বাইরে কোনো দিকে দৃষ্টিরূপে পৌঁছে যাওয়া হল, অর্থাৎ দেখা হল, সেদিকে 'প্রবেশ করা' হল, pass করা হল, **পেশ** করা হল। কারণ, **পশ** দিশাগ্রস্ত হলে শব্দার্থের নিয়মে তাকে তো **পেশ** করা বা দৃষ্টিগোচরে আনাই বলতে হবে; আর, সেরকম কাজ যে করবে, তাকে নিশ্চয় বলতে হবে **পেশকার**। তার মানে, যে **পেশ** করে, সে তো আসলে দৃষ্টির গোচরীভূত এলাকায় নিয়ে আসে, **প্রবেশ** করায়, **পশ** করে। তাই রবীন্দ্রনাথ এই **পশ**কে সরাসরি ব্যবহার করেছেন এইভাবে — 'আজি এ প্রভাতে রবির কর / কেমনে **পশিল** প্রাণের 'পর / কেমনে **পশিল** গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান ...।'

যাই হোক, **সংস্কৃত**কারদের সময় থেকে সব শব্দবিদগণই বলে গেছেন যে, **দৃশ্** ক্রিয়াই **পশ্** ক্রিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ, দৃশ্যতি ও পশ্যতি পাশাপাশি কথা। কেন এবং কীভাবে হয়, সেকথা ইতোপূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। দ্র. **দৃ, দৃশ্য** (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৭)। দ্র. **পশ্চাৎ**।

পশু (পশুগায়ত্রী, পশুচর্য্যা, পশুধর্ম্ম, পশুপ, পশুপাল) : ১. ✓দৃশ্ + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে। দৃশ্ > পশ। (ব.শ.)। ২. *পশু = পশ্* (দেখা) *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। পশুগায়ত্রী = পশুর নিমিত্ত যে গায়ত্রী। পশুচর্য্যা = পশুর ন্যায় চর্য্যা যাহাতে। পশুধর্ম্ম = পশুর ধর্ম্মের মতো যে ধর্ম্ম। পশুপ = পশু-কে পালন করে যে। পশুপাল = পশুর যে পাল (দঙ্গল), অথবা পশুর যে পালক। / পশু* = যে সব অবিশেষে দেখে। **পশুগায়ত্রী** = পশুর কানে যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ

করিতে হয়। (ব.শ.)। **৩. পশু** = লোমলাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদ প্রাণী, সিংহাদি প্রাণী, ইন্দ্রাদিকীটপর্যন্ত প্রাণী, কৃষিকার্য্যার্থ গো-মহিষাদি, প্রাণিমাত্র, যজ্ঞের বলি — ছাগাদি, ছাগ, পশুসাধ্য যাগ, যজ্ঞোদুম্বর, প্রমথ, দেব, তান্ত্রিকসাধকবিশেষ, (দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ। অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তম স্মৃতঃ।।), ব্রহ্মতত্ত্বহীন কেবল যজ্ঞোপবীতধারণে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ, সংসারাসক্ত জনের আত্মা, অবিবেক জন, মূঢ়, সাহিত্যাদিরসহীন জন। **পশুচর্য্যা** = স্বেচ্ছাচার। **পশুধর্ম্ম** = পশুলক্ষণ, মনুষ্যের পশুসম্বন্ধী ব্যবহার, বিধবাবেদন, বিধবাবিবাহ। **পশুপ** = গোপ। **পশুপাল** = পশুরক্ষক, রাখাল। (ব.শ.)। **৪.** animal অর্থে **পশু** খুবই প্রচলিত, কিন্তু বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** চব্বিশ খণ্ডে প্রণীত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৬৭ জন পণ্ডিতের প্রায় ২৪ বছর ধরে লেখা 'বাঙ্গালা বিশ্বকোষ' গ্রন্থটিতে 'বৈষ্ণবাচার' শব্দের অর্থ দেখতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বৈষ্ণবাচারে কী কী করণীয় তার বিধানগুলি যথাযথ-ভাবে উল্লেখ করা আছে। বৈষ্ণবগণ সেগুলি কমবেশি পালনও করে থাকেন। কৌতূহলবশত 'শৈবাচার'-এ কী কী করণীয় তার বিধান জানতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় — 'শৈবাচারের একটিই মাত্র বিধান, পশুহত্যা।' সেই **পশু** কে? বলা হয়েছে, তিনিই 'উত্তম পশু', যিনি প্রতিদিন দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা, এবং শিবপূজা অবশ্যই করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় শব্দকোষকার সেকথার উল্লেখ করতেও ভোলেননি। কী মুশকিল!

অগত্যা সেই মুশকিলের আসান খুঁজতে যেতে হয়। একদিকে জানা যায়, এই **পশু** শুধুমাত্র animal-কে বোঝায় না; যারাই **পশ্-উ** করে তাদের সবাইকে বোঝায়। ... অপরদিকে জানা যায়, উপরোক্ত বয়ানটি বেদবিরোধী তান্ত্রিকদের, যাঁরা ছিলেন বেদবাদী-দুর্গা-বিষ্ণু-শিবপূজারীদের ঘোর বিরোধী। ফলত, বয়ানটিকে বোঝার জন্য একদিকে যেমন **পশু** শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা জরুরি, তেমনি ভারত ইতিহাসে বৈদিকদের সঙ্গে তান্ত্রিকদের বিরোধের ইতিহাসটাও অনুধাবন করা জরুরি হয়ে পড়ে।

ব.শ. **পশু** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন — 'যে সব অবিশেষে দেখে'; আর আমরা শব্দটির অর্থ পাচ্ছি, '**পশ্** (দেখা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে'। তার মানে, এ-দেখা সাধারণ দেখা নয়, বিশেষ রকমের দেখা। নিশ্চয় animal-রা সেরকম দেখে এবং উপরিকথিত পূজারীরাও সেরকমই দেখেন; তাই উভয় শ্রেণীকেই **পশু** বলা উচিত মনে করেছিলেন আমাদের পূর্বসূরি শব্দবিদগণ। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই **পশ্-উ** করে দেখা কীরকম দেখা?

'উ'কার যোগ করার নিয়ম সম্পর্কে আমরা বুঝেছিলাম, যে ক্রিয়ার সঙ্গে 'উ'কার যুক্ত হয়, সেই ক্রিয়া তার বিপরীত আচরণ করতে শুরু করে। এখানে তাহলে 'উ'কার যোগের পর এই **পশ** বা 'দেখা' আর সাধারণ দেখা নয়, এমন দেখা যা, দেখার ঠিক উলটো ব্যাপারে পর্যবসিত হয়। কোনো কিছুকে দেখে আমরা আসলে তাকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করতে পারি (দ্র. **চক্ষু**), মনের ভিতরে তার ছবি এনে (দ্র. **নয়ন**) আলোচনা করে (দ্র. **লোচন**) জানতে ও বুঝতে পারি বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কী। **পশু** সেরকম **দর্শন** করতে বা দেখতে পারে না। সে আর পাঁচটা **বস্তুর** সঙ্গে তার দেখাটাকে গুলিয়ে ফেলে। ব.শ. তাই বলছেন, তারা 'অবিশেষে দেখে'। তার মানে animal-রা বা 'লোমলাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদ প্রাণী'রা 'বিশেষ' ভাবে দেখতে পারে না এবং 'ব্রহ্মতত্ত্বহীন কেবল যজ্ঞোপবীতধারণে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ'রাও 'বিশেষ'ভাবে দেখতে পারে না। তারা তাদের দেখার সঙ্গে না-দেখাকে গুলিয়ে ফেলে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সেটা ঘটে কীভাবে? animal-এর ক্ষেত্রে সেটা প্রকৃতির নির্দেশ ভেবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে? এইখানে এসে আমরা যখন পথ হাতড়াচ্ছি, তখন একদিকে ব.শ. এবং অন্যদিকে ভাগবত আলোকবর্তিকা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যান। ব. শব্দকোষ বলেন, এই **পশু** হল 'কৃষিকার্য্যার্থ গো-মহিষাদি' (আগ্রহী পাঠক 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বৃষোৎসর্গ' নিবন্ধটি দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।), 'যজ্ঞের বলি — ছাগাদি' বা 'ছাগ' এবং '... গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ', 'সংসারাসক্ত জনের আত্মা', 'অবিবেক জন' ইত্যাদি। অপরদিকে ভাগবত **দক্ষযজ্ঞ**-এর বর্ণনার মাধ্যমে জানিয়ে দেন ভারতের এক বিশাল ইতিহাসের ঘটনাবলীর কথা, একালের অন্ধগজন্যায়পন্থী ঐতিহাসিকরা যাকে 'মিথ' বা 'মিথলজি' মনে করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে চির-অন্ধ হয়ে থেকে গেছেন। সেই ইতিহাসের সব কথা এখানে বলা যাবে না, আমরা অতি সংক্ষেপে সারব। (আগ্রহী পাঠক আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ৫১-৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।)

একটা সময় ছিল যখন সমাজের সব মানুষ সব কাজ করত। আজ যে বনে যেত কাঠ আনতে, গাছ-গাছালি আনতে, কাল সে চলে যেত মাঠে চাষ করতে, পরশু চলে যেত মাছ ধরতে, অপরশু বসে যেত কাপড় বুনতে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যেই না সমাজে **দক্ষের** মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি জীবনযাত্রার মূলনীতি হয়ে গেল, কিছুকালের মধ্যেই যে মাছ ধরতে যেত তার উত্তরসূরি হয়ে গেল জেলে, যে কাপড় বুনত তার উত্তরসূরি হয়ে গেল তাঁতি, যে গাছগাছালি আনত তার উত্তরসূরী হয়ে গেল কবিরাজ ... ইত্যাদি। এইভাবে বিগত অনাদিকাল থেকে চলে আসা **মহান**-মানুষ ক্রমে জেলে-মানুষ তাঁতি-মানুষ কবিরাজ-মানুষ চাষী-মানুষ কাঠুরে-মানুষ ব্যাধ-মানুষ শিক্ষক-মানুষ ... ইত্যাদি অজস্র রকমের খণ্ড-মানুষে পরিণত হয়ে গেল। এর ফলে মানুষ নিজ নিজ কাজে **দক্ষ** হল বটে, কিন্তু কার্যত তার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। আগে সে সব কাজই কমবেশি জানত, কিন্তু এখন থেকে সে নিজের কাজটুকু ছাড়া অন্য কোনো কাজই আর জানতে-করতে পারল না এবং তার ফলে সমগ্র কাজের জগতে তার নিজের কাজটির স্থান কোথায়, ক্রমে সেটিও সে গুলিয়ে ফেলল। ভাগবত জানায়, এই পরিস্থিতি যে হবেই, সেকথা সেকালের **দক্ষযজ্ঞ-বিরোধী শিব** ও তাঁর অনুগামীরা দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁরা **দক্ষযজ্ঞ**-এর সমর্থক ভৃগুকে বলেছিলেন — 'দক্ষ দেহের প্রতি অহং জ্ঞানে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, সুতরাং এ **পশু**তুল্য। ... দক্ষ কর্ম্মময়ী অবিদ্যাকেই তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছে, অতএব এ বস্তুতই **ছাগ**। ...'

এই হল **পশু** এবং **ছাগ**। সেকালের শব্দতত্ত্ববিদ প্রকৃত ব্রাহ্মণ কিন্তু এইসব তত্ত্বকথা সম্পূর্ণই জানতেন, বুঝতেন। জানতেন বলেই

তাঁদের পক্ষে **পশু**-যুক্ত **পশুগায়ত্রী, পশুচর্য্যা, পশুধর্ম্ম, পশুপ, পশুপতি, পশুপাল, পশুপাশ, পশুপ্রেরণ, পশুরাজ, পাশুপত** ... ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি করে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই ভাষাতেই তখন দু'পক্ষের কথা হত বলেই, বেদপন্থী ও বেদবিরোধীরাও পরস্পরের কথাবার্তা বুঝতেন। ভাগবতের বয়ান যেমন তাঁরা বুঝতেন তেমনি 'উত্তম পশু' কাকে বলে তাও তাঁরা বুঝতেন। যাঁরা বলতেন, তাঁরা তো বুঝতেনই। ...

তার মানে আবার সেই একই সমস্যা। এই সমস্যার কথাই আমরা একবার **পাদোদক** শব্দে আলোচনা করেছি। এই সমস্যার কথাই সুনির্দিষ্টভাবে বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারত যা পেয়েছিল সে এক মহত্তম অর্জন এবং তাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা কঠিন। করতে পারলে সমগ্র জাতির জীবন সর্বোচ্চ সার্থকতা লাভ করতে পারে। কিন্তু ঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে সমগ্র জাতি মূঢ়তার গ্লানিতে নিমজ্জিত হতে পারে। হ্যাঁ, নিমজ্জিতই হয়েছে এবং বর্তমানে মরতে বসেছে। তাকে বলা হল, 'ওরে, স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি এবং আমাদের মনীষীরা তাঁদের **পদে পদে** বা **চরণে চরণে** যে **পাদোদক** দিয়ে রেখেছেন, তাই পান করিস বাছা, জীবন সার্থক হবে।', আমরা কারও পা-ধোয়া জল পান করতে বাকি রাখলুম না! ... যাই হোক, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কেঁদে আর কী হবে! তার চেয়ে বরং এখনও যখন সবকিছু বোঝার পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চেষ্টা করা যাক, সবকিছু বুঝে নিয়ে পুনরায় সঠিক পথে চলার।

পশুগায়ত্রীর কথাই ধরা যাক। goat কিংবা cow-এর কানে সংস্কৃত উচ্চারণে **গায়ত্রী (গায়ত্‌ত্রী)** মন্ত্র জপার তো কোনো মানেই হয় না, তবু সেকথাই বলা হল কেন? বলা হল দুটো কারণে। ক) যৌথসমাজের মানসিক ও দৈহিক উৎপাদন-মন্ত্র হল **সাবিত্রী**-মন্ত্র, সেই একই মন্ত্র যখন ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজের উৎপাদন-মন্ত্র হিসেবে গাওয়া হয়, তখন তাকে বলে **গায়ত্রী (গায়ত্‌ত্রী)** মন্ত্র। সমাজসদস্যদেরকে তো তাঁদের মনের খোরাকের জন্য ও দেহের খোরাকের জন্য মানসিক-দৈহিক উৎপাদন-মন্ত্র জপাতেই হবে, তা সে যৌথসমাজে হোক আর অযৌথসমাজেই হোক। খ) সমাজ **দক্ষনীতি**কে মানুষের জীবনযাত্রার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে নেবার পর, **প্রজা**সাধারণের অধিকাংশই **মহান**-মানুষ থেকে **ব্যক্তি**মানুষে পরিণত হয়ে গেছেন। এই **ব্যক্তি**মানুষ তো **ছাগ** বা **বলদ** পদবাচ্যই বটে। এদের কানে প্রতিনিয়তই তো উৎপাদন-মন্ত্র দেওয়া চলছেই, আজও। **পশুগায়ত্রী**র নির্দেশ বা উপদেশের মর্মার্থ ছিল সেটিই। তবে কিনা, উৎপাদন-মন্ত্রের মানসিক দিকটি এখন এতই অবহেলিত যে, মানুষের মন বলে একটা পদার্থ আছে, আজকের সামাজিক ব্যবস্থা তা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। ...

পশুপতি : **২.** ***পশু**র পতি।* / যিনি প্রমথগণের নাথ; যিনি ইন্দ্রাদিকীটপর্য্যন্ত প্রাণীর পতি। (ব.শ.)। **৩.** শিবের যজমানমূর্ত্তি, নেপালের শিবমূর্ত্তি, পশুস্বামী। (ব.শ.)। পশু অর্থাৎ সমস্ত জীবের পতি। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ব্রহ্মা একটি পুত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; যার ফলে রুদ্রের জন্ম হয়। এই পুত্র কাঁদতে কাঁদতে একটি নাম প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা এঁর নাম রাখেন 'রুদ্র'। কিন্তু এই পুত্র এর পরেও সাতবার কেঁদেছিলেন বলে সাতটি নাম প্রাপ্ত হন — ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। এই নামগুলি রুদ্র ও শিবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। (পৌ.অ.)। **৪.** শিবঠাকুরের নাম রূপে প্রচলিত, কদাচিৎ ব্যক্তিনাম রূপেও শব্দটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। **৫.** নিম্ন-অধিকারীদের জন্য **পশুপতি** হলেন animal-দের **ঈশ্বর**। উত্তম-অধিকারীদের জন্য তিনি **পশু**তে পরিণত আত্মাসমূহের **পতি**। আমরা মর্তলোকের **পশুপতি**কে খানিকটা চিনতে পারি, যিনি **পশু**তে পরিণত মানুষদের পরিচালক রূপে সমাজে সক্রিয় থাকেন। আদি সমাজের পরিচালক ছিলেন আবিষ্কারগুণ বা সৃষ্টিগুণ-সম্পন্ন বা ব্রহ্মগুণসম্পন্ন মানুষ, তাঁদেরই বলা হত সনাতন শিব বা আদি ব্রাহ্মণ। তখন রাষ্ট্র তো দূরের কথা, কোনো ধরনের কোনো তন্ত্রেরই উদ্ভব হয়নি। মানুষ ভালবেসে নিজেদের পরিচালক নেতাকে মহানন্দে কাঁধে করে, **শিবিকা**য় করে তুলে নিয়ে যেত; তাঁর উপদেশ অনুসারেই তাদের কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করত। ... কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে **দক্ষযজ্ঞের** প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেই মানুষেরা ক্রমে **পশু**তে পরিণত হয়ে যায়। তার পরেও তারা কিন্তু সেই শিবের নেতৃত্বকেই মানতেন, মানেন, ফলত শিবই হয়ে যান **পশুপতি**। অর্থাৎ কিনা **দক্ষ** পরিচালিত সামাজিক উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরেও দেখা যায়, কর্মযজ্ঞে বহুক্ষেত্রেই স্বয়ং **শিব** অধঃপতিত **শঙ্কর** রূপে কর্মপরিচালনার কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। সেটিই শিবের **যজমান**-মূর্তি। এঁকেই **পশুপতি** বলা হয়। পৌরাণিকগণ তাঁকেই বিভিন্ন পুরাণে নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। ...

পাশ (পাশা, পাশাপাশি, নাগপাশ) : **১.** **পাশ** = ✓পশ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পাশ** = **পশ** হইতে জাত। **পাশা** = **পাশ**-এর আধার যে। **পাশাপাশি** = **পাশা** ও **পাশ** গতিশীল যাহাতে। **নাগপাশ** = **নাগ**-এর **পাশ**।* / **পাশ** = যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** **পাশ** = রজ্জু, বিহগাদিবন্ধন, ফাঁদ, জাল, বন্ধনরজ্জু, রজ্জুরূপ আয়ুধবিশেষ, কুবেরের অস্ত্র, সমূহ, শোভন, কুৎসিতার্থে তদ্ধিত; pass, প্রবেশের অভিজ্ঞানপত্র বা টিকিট, (পাশ করা = পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া।); পার্শ্বদেশ, দেহপার্শ্ব, নিকট, অন্তরাল, ভাগ। **পাশা** = অক্ষ; কর্ণভূষণবিশেষ; তুর্কী সরদারের উপাধি; কোদালের হাতল ঢুকানোর পাশবৎ লৌহবলয়, লাঙলের ফালের মাথা আঁটার নিমিত্ত বাঁকা লোহার পাত-প্রেক। **পাশাপাশি** = পার্শ্বস্থ, কাছাকাছি। **নাগপাশ** = সর্পের সার্দ্ধদ্বয় আবর্ত্তন (আড়াই পেঁচ), বরুণের পাশাস্ত্র, যুদ্ধায়ুধ-বিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** side ও pass অর্থে **পাশ**, খেলা অর্থে **পাশা**, beside অর্থে **পাশাপাশি** প্রচলিত। **নাগপাশ** অপ্রচলিত। **৫.** প্রাচীন বাংলায় **পাশ** কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বন্ধনসাধন' অর্থেই ব্যবহৃত হত। বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে বা মধ্যযুগেও শব্দটি সেভাবে ব্যবহৃত হত, অন্যান্য অর্থেও হত। আমাদের কিন্তু জানা দরকার, **পাশ**, যা কিনা **পশ** হইতে জাত, তা কেমন করে একই সঙ্গে 'বন্ধনসাধন', 'পাশে' ও pass বা 'পাশ'-করাকে অর্থরূপে ধারণ করে থাকে।

দৃষ্টি যখন দ্রষ্টার চোখ থেকে বেরিয়ে কোনো কিছুর উপর গিয়ে পড়ে, তখন সেই ক্রিয়াকে বলা হয় **পশ** করা। একাদিক্রমে

সেই বস্তুটির উপরই যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, শব্দার্থের নিয়মে তখন তাকে **পাশ** বলা যেতে পারে। তাতে বস্তুটি আবদ্ধ হয় কিনা, তা ভেবে দেখার বিষয়। প্ল্যানচেট ইত্যাদির কথা আপাতত তোলা থাক। তবে খুব আক্রমণাত্মক ভয়ানক কুকুরকেও দেখা গেছে, তার চোখের দিকে কোনো পৌরুষসম্পন্ন মানুষ যদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, সে প্রচণ্ড রাগে গরগর করে বটে, ঘেউ ঘেউ করে বটে, কিন্তু আগ বাড়িয়ে কামড়াতে সাহস পায় না। তার আচরণ এমন হয়, যেন-বা কেউ তাকে বেঁধে রেখেছে; তাই সে এগিয়ে এসে কামড়াতে পারছে না। রাশিয়ান ছায়াছবি 'রাসপুটিন'-এ এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে আমরাও এরকম দৃশ্য দেখেছি। এর পক্ষে আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। কোনো ছাগলের চোখে হঠাৎ যদি শেয়ালের চোখ পড়ে যায়, কিংবা কোনো মানুষের চোখে যদি অকস্মাৎ বাঘের চোখ পড়ে যায়, সে আর এক পাও হাঁটতে পারে না, ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ে; যেন-বা কেউ তাকে বেঁধে ফেলেছে। ...

এ তো গেল জীবজগতে দৃশ্য বন্ধনসাধনের লীলা। এবার সমাজে যে বন্ধনসাধন সক্রিয় তার কথা হোক। **নাগ** কাকে বলে আমরা আগেই জেনেছি। তার **পাশ** বা **নাগপাশ** তো ধনীর বা সুদখোরের চুক্তি, টাকা নিলে তার চুক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়তেই হয়। একে 'কুবেরের অস্ত্র'ও বলা হয়। এটি **বরুণ**-এর **পাশ**-অস্ত্রও বটে। ইংরেজিতে একে বলা হয় rein বা **ঋণ**। এই rein দিয়েই খাতককে নিজের ইচ্ছানুরূপ পরিচালনা করা যায়, rein মানে তাই লাগাম। লাগামই বটে!

কিন্তু একই বস্তুর উপর একাদিক্রমে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা হল না, বরং সেই বস্তুটির পরবর্তীতে, এবং ঠিক তার পরের পর বস্তুগুলির উপরে যদি একের পর এক দৃষ্টি ফেলে ফেলে, তাদের প্রত্যেককে দেখে দেখে এগিয়ে যাওয়া হয়, শব্দের নিয়মে তাকেও **পাশ**ই (pass-ই) বলতে হবে। **পাশ** (pass) করা মানে পরের পর দেখে দেখে পেরিয়ে যাওয়াই বটে! তার মানে, দ্রষ্টার **পশ** প্রথমে পতিত হল ক-এর উপর, তারপর খ-এর উপর, তারপর গ-এর উপর ... এভাবে এগোনোর মানে ক **পাশ** করে খ-এ, খ **পাশ** করে গ-এ ... যাওয়া। সেক্ষেত্রে ক-খ-গ-এরাও তো **পাশ**-এর আধার রূপে **পাশা-পাশি** হয়ে গেল। ...

হ্যাঁ, ঠিক এখানেই বাংলাভাষা তার অনন্য উদ্ভাবনমূলক অর্জন করে চলেছে। সে '**স্পর্শ**' শব্দ থেকে '**পার্শ্বে**' শব্দ বানিয়ে রেখেছিল, এখন সে তাকেই অনায়াসে এই **পাশ**-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তাকেও তার শব্দপরিবারের অঙ্গীভূত করে নেয়। (দ্র. **আশেপাশে**)। কিন্তু কোদালের **পাশা**, কানের **পাশা**, খেলার **পাশা**, কামাল **পাশা** — তাদের অবস্থান কী? কোদালের ফুটোর চার**পাশেই** তো লোহাটা থাকে, লাঙলেরও। কানেরও তাই। আর খেলার **পাশার** এ-**পাশ** ও-**পাশ** দুটো পিঠ থাকে, তাতে থাকে লুডোর ফুটকি। **পাশ** ফিরলেই দান পড়ে। তাই **পাশা**। (দ্র. **দেব, দেবন** করা, **অনুদ্যূত**।) তবে কামাল **পাশা**রা পরিশ্রম-বিমুখ আধুনিকের হাতে সংক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। ছিল 'পাত্শাহ্', তাকে ছেঁটেছুঁটে 'পাশা' করা হয়েছে। শব্দার্থের সঙ্গে এই তুর্কী-**পাশার** সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না, অন্তত আমরা এখনও দেখতে পাইনি। ...

পশ্চাৎ (পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যবৈদিক) : **১.** অপর + আৎ (আতি) ... 'অপর' স্থানে 'পশ্চ'। ... (ব.শ.)। **২.** ***পশ্চাৎ*** = ***পশ্‌-চ*** *(এবং তদনুরূপ) হইতে আগত।* ***পাশ্চাত্য*** = ***পশ্চাৎ*** *হইতে জাত।* **৩.** **পশ্চাৎ** = অপরভাগ হইতে, অপরভাগে, অনন্তর, পরে, পৃষ্ঠদেশে, পেছনে, অবশেষে, পরিণামে। **পাশ্চাত্য** = পশ্চাৎভব, পশ্চাৎস্থিত বা জাত, পশ্চিমদেশভব, পশ্চিম, অন্তিম, পরবর্ত্তী। **পাশ্চাত্যবৈদিক** — কতকগুলি বৈদিক পশ্চিম ও দ্রাবিড়াদি দেশ হইতে পূর্ব্ব দেশে আগমন করেন বলিয়াই হউক, অথবা দাক্ষিণাত্যদিগের পশ্চাতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, ইঁহাদিগকে সকলে পাশ্চাত্য কহিত, তদনুসারে ইঁহারা পাশ্চাত্যবৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন। (ব.শ.)। **৪.** behind অর্থে **পশ্চাৎ** এবং the West অর্থে **পাশ্চাত্য** প্রচলিত। **৫.** উপরে **পাশ** শব্দে আমরা দেখেছি, পরের পর **পশ** করে যাওয়াতেই **পাশ** করা হয়। কিন্তু এই যে 'পরের পর' সত্ত্বাগুলি, তাদের থেকে কিছু যদি অগ্রগামীর নিকট আসে, সেটিকেই 'অপর-আৎ' বা **পশ্চ**-আৎ অর্থাৎ **পশ্চাৎ** বলে। পাণিনিকে উল্লেখ করে ব.শ. সেকথাই জানিয়েছেন। অর্থাৎ **পশ্চাৎ** মানেই হল, যে অধ্যায় পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানবসভ্যতাকে একত্রে ধরলে, সবচেয়ে অগ্রণী দেশ ছিল প্রাচ্যদেশ। তারা সভ্যতার যে অধ্যায়গুলি পেরিয়ে এসেছিল, ইউরোপীয় দেশগুলি সেই অধ্যায় পেরোয় তার পরে পরে। সেই কারণে তাদের **পাশ্চাত্য** দেশ বলা হয়। মানব-সভ্যতার এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে যে দেশের মানুষ প্রাচ্যদেশের মানুষের পেছনে পেছনে হাঁটত, তাদের নামই যে **পাশ্চাত্য** হয়েছে, এই সহজ কথাটি আজকাল অনেকে বুঝতেই পারেন না। দ্র. **পশ্চিম**। এ বিষয়ে কারও যদি সন্দেহ থাকে, তিনি নীডহ্যাম সাহেবের ইতিহাস পড়ে দেখতে পারেন। কিংবা হাঁপর, কম্পিক্দল, সাঁড়াশি, তুরপুন, উখা, চাকা, চিনি, গুড়, মিষ্টি ... এসব কোন দেশে কবে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল, তার থেকেই সেটা বোঝা যেতে পারবে। আমাদের 'চ' গ্রন্থের ৬৩-৮২ পৃষ্ঠায় তার কিছু উল্লেখ আছে। তবে একথাও ঠিক যে, পরবর্তীকালে মানবসভ্যতা (রবীন্দ্রকথিত) 'একঝোঁকা' হয়ে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেলে প্রাচ্যের মানুষ পিছনে পড়ে যান। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাঁর 'স্বদেশ সমাজ' বিষয়ক নিবন্ধগুলি, বিশেষত, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' ... ইত্যাদি পড়লেই সেই সত্যের সাক্ষাৎ মেলে। ...

আর **পাশ্চাত্যবৈদিক** শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ব্যাপারটি একেবারেই আলাদা। তাঁরা কেউ ইউরোপ থেকে আসেননি। বঙ্গদেশে তাঁরা অন্যান্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের পরে বা পশ্চাতে এসেছিলেন বলেই তাঁদের **পাশ্চাত্যবৈদিক** বলা হয় — এমন ধারণা করেছিলেন 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু এর আগে আমরা দেখেছি, উপাধি বিষয়ে গ্রন্থটি বহু ভুল তথ্য দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাঁর দেওয়া তথ্যটি সঠিক বলে মনে হয়নি আমাদের। একথা সত্যি হলেও হতে পারে যে, তাঁরা দৈহিকভাবে কোনো গোষ্ঠীর পেছনে পেছনে এসেছিলেন। কিন্তু তাতেই তাঁদের **পাশ্চাত্য-বৈদিক** বলা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তাহলে তো **পাশ্চাত্য**-গৌড়ীয়, **পাশ্চাত্য**-সারস্বত ... ইত্যাদি নামেরও ব্রাহ্মণশ্রেণী থাকতেন। আমাদের মনে হয়েছে, বৈদিক যুগের

সূত্রপাতের কালে বৈদিকগণের যে আচার-সংস্কার ছিল, সেই ধারা যাঁরা খানিকটা হলেও এখনও ধরে রেখেছেন, তাঁদেরকেই **পাশ্চাত্য-বৈদিক** বলা হত; সেই নামই এখনও চলে আসছে। ... ৬. ইংরেজি posterior, posterity, postern।

পশ্চাত্তাপ (পচতা, পচতাব, পছতা, পছতাবা, পছতান, পছতানি, পস্তা, পস্তান, পস্তানি) : ২. ***পশ্চাত্তাপ*** = *ঘটনার* ***পশ্চাতে*** *যে তাপ করা হয়।* ৩. **পশ্চাত্তাপ** = অনুশয়, অনুতাপ। **পচতা, পচতাব, পছতা, পছতান, পস্তা, পস্তান** = পশ্চাৎ তাপ করা, অনুতাপ করা, অনুতাপ। (ব.শ.)। ৪. repentance অর্থে **পশ্চাত্তাপ, পছতাবা** শব্দদুটি হিন্দি ও মারাঠি ভাষায় এখনও প্রচলিত থাকলেও বাংলায় নেই বললেই চলে। ৫. বাংলাভাষী **পশ্চাত্তাপ** শব্দটিকে বিবর্তিত করে করে কেবল উপরোক্ত আটটি শব্দই বানায়নি; **পাছ, পাছদুআর, পাছড়, পাছড়া, পাছড়ান, পাছতলা, পাছদেউড়ি, পাছদোর, পাছদ্বার, পাছমোড়া, পাছা, পাছাড়, পাছাড়ি, পাছাপাড়, পাছাপেড়ে, পাছি, পাছিলা, পাছু, পাছুআন, পাছুটান, পাছুড়, পাছুড়া, পাছুড়ি, পাছুয়ান, পাছে, পিছন, পেছন, পেছু** ... ইত্যাদি মোট ছত্রিশটি নতুন শব্দ সেই **পশ্চাৎ** শব্দ থেকেই বানিয়ে ফেলেছে। এগুলি সবই সেই **পশ্চাৎ** শব্দেরই বিবর্তিত রূপ। অনেকে বলেন, বাংলায় শব্দসংখ্যা কম, নতুন শব্দ তৈরি হয় না! এসব তাহলে কীসের নিদর্শন?

পশ্চিম (পশ্চিমক্রতু, পশ্চিমজন, পশ্চিমযামিনী, পশ্চিমা) : ১. পশ্চাৎ + ইম (ডিমচ্)। (ব.শ.)। ২. ***পশ্চিম*** = ***পশ্চ*** *গতিশীল হইয়া সীমায়িত যাহাতে।* ***পশ্চিমক্রতু*** = *যে* ***ক্রতু*** *(মৃত্যুর) পশ্চাতে বা পরে করা হয়।* ***পশ্চিমজন*** = ***পশ্চিম****-এর জন যে।* ***পশ্চিমযামিনী*** = *যামিনীর* ***পশ্চিমে*** *থাকে যে।* ***পশ্চিমা*** = ***পশ্চিম****-এর আধার যে। /* **পশ্চিম** = পশ্চাতে ভবন বা হওয়ন যাহার (পশ্চাদ্ভব)। (ব.শ.)। ৩. **পশ্চিম** = পশ্চাৎস্থিত, অপর, সায়ংকালিক, অন্তিম, চরম, বৃদ্ধ, শেষ, অপরদিগ্‌বর্ত্তী, অপর, পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত। **পশ্চিমক্রতু** = অন্ত্য যজ্ঞ, অন্ত্যেষ্টিবিধি। **পশ্চিমজন** = পাশ্চাত্যজন। **পশ্চিমযামিনী** = রাত্রির পশ্চিমভাগ, রাত্রিশেষ। **পশ্চিমা** = পশ্চিমদিক, প্রতীচী। (ব.শ.)। ৪. west অর্থে **পশ্চিম** এবং from the western side অর্থে **পশ্চিমা** শব্দটি প্রচলিত। ৫. **পশ্চিম** ও তদ্‌যুক্ত উপরোক্ত শব্দগুলির ব.শ. প্রদত্ত অর্থ একথা স্পষ্টভাবে জানায় যে, এগুলির মূলে রয়েছে **পশ্চাৎ** শব্দটি। **পশ্চিম** কথাটির মানে হল 'পশ্চাতে জন্ম যাহার' বা 'পশ্চাদ্ভব'। **পশ্চিম** দেশ বা **পাশ্চাত্য** দেশ যখন ইউরোপীয় দেশসমূহকে বোঝায়, তখন একথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে, ঐ দেশগুলি পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছে। অথচ কথাটি একালের শিক্ষিত বাংলাভাষীরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। তার কারণ হল, তাঁদের মনে এই কথাটি গেড়ে বসে গেছে যে, **পশ্চিম** মানে west side of the horizon। শব্দটি যে **পশ্চাতে** আগমনকারী সত্তাকে বোঝাতে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেকথা তাঁরা বুঝতেই পারেন না। অথচ **পূর্ব্ব** কথাটির মানেই তো 'আগে', **পশ্চিমের** 'পরে' হতে বাধা কোথায়? ...

পা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অধিপ, অধিপতি, অনুপান, অপ, অপতি, অপতিকা, অপত্নী, অপত্নীক, অপাত্র, অপাত্রদায়ী, অপাত্রবর্ষী, অপাত্রীকরণ, অপাপ, অপাপী, অপিতৃক, অপিত্র্য, অপীত, অপুংস্কা, অপুংসত্ব, অসপত্ন, আপান, আপামরজন, আপামরসাধারণ, আবাদ (আবাৎ), উপানহ্, কচ্ছপ, ধূমপান, নিপান, নৃপ, প, পতি, পতিংবরা, পতিকুল, পতিগৃহ, পতিঘাতিনী, পতিঘ্ন, পত্নী, পত্নীশালা, পপিহ্, পপিহা, পা, পাখণ্ড, পাখণ্ডী, পাতা, পাতাল, পাতিব্রত্য, পাত্র, পাত্রমিত্র, পাত্রপাল, পাত্রসংস্কার, পাত্রসাৎ, পাত্রাপাত্র, পাত্রী, পাত্রীকৃত, পাত্রীয়, পাত্রেসমিত, পাথঃ, পাথোজ, পাথোদ, পাথোধি, পান (দ্র. পণ, পন), পানই, পানক, পানকর্পূর, পানকাঁটা, পানকৌড়ি (পানিকৌড়ি), পানতা, পানতুয়া, পানপাত্র, পান-পানী, পানফুল, পানভাণ্ড, পানভূমি, পানমণ্ডল, পানযোগানী, পানশি (পানসী), পান্‌সে, পানশে, পানশৌণ্ড, পানস, পানসা, পানা, পানাগার, পানাত্যয়, পানাহি, পানি(নী), পানিআমলা, পানিকচু, পানিকাল, পানিকৌড়ী, পানিতর, পানিফল, পানিবসন্ত, পানিশালা, পানিশিয়লী, পানীয়, পানীসার, পানুই, পান্ত, পান্তা, পাম্বা, পান্সে, পাপ, পাপকর, পাপকর্ম্মা, পাপকারী, পাপকুয়া, পাপকৃৎ, পাপক্ষয়, পাপগ্রহ, পাপঘ্ন, পাপচর্য্যা, পাপদৃষ্টি, পাপধী, পাপনাশন, পাপনিশ্চয়, পাপপতি, পাপপুরুষ, পাপবিনিশ্চয়, পাপবুদ্ধি, পাপভাক্, পাপমিত্র, পাপযোনি, পাপরাশি, পাপরোগ, পাপর্দ্ধি, পাপশমন, পাপসঙ্কল্প, পাপহা, পাপা, পাপাধম, পাপানুবন্ধী, পাপাপনুত্তি, পাপাহ, পাপিয়া, পাপিহা(য়া), পাপিষ্ঠ, পাপী, পাপীয়, পাপীয়ান, পাপ্মা, পাম, পামঘ্ন, পামঘ্নী, পামর, পামরি(রী), পায়ক, পায়কি, পায়না, পায়নায়িত, পায়িত, পায়ু (দ্র.পী), পাল্লুই, পাহ্নি, পি, পিআ, পিউড়ি, পিউলি, পিত, পিতরি, পিতরিশূর, পিতল, পিতঃ, পিতা (পিতৃ), পিতামহ, পিতাড়ী, পিতামহ, পিতুঃস্বসাপুত্রী, পিতৃঋণ, পিতৃকর্ম্ম, পিতৃকল্প, পিতৃকার্য্য, পিতৃক্রিয়া, পিতৃগণ, পিতৃগৃহ, পিতৃতর্পণ, পিতৃতাত, পিতৃতীর্থ, পিতৃদান, পিতৃদেব, পিতৃদেবতা, পিতৃদৈবত, পিতৃপক্ষ, পিতৃপতি, পিতৃপদ, পিতৃপিতামহ, পিতৃপুরুষ, পিতৃপ্রসূ, পিতৃবন্ধু, পিতৃবান্ধব, পিতৃব্য, পিতৃব্রত, পিতৃমন্দির, পিতৃমাতৃবৃত্তান্ত, পিতৃমান, পিতৃযজ্ঞ, পিতৃযাণ (পিতৃযান), পিতৃরাজ, পিতৃলোক, পিতৃষ্বসা (পিসা), পিতৃসদ্ম, পিতৃস্থান, পিতৃস্থানীয়, পিতৃহা, পিতৃহূ, পিত্র্য, পিত্র্যা, পি(পী)ব, পিসা, পিসী, পী, পীত, পীতক, পীতকদলী, পীতকাষ্ঠ, পীতগন্ধ, পীততণ্ডুল, পীতদারু, পীতবাস, পীতবাসাঃ, পীতমণি, পীত(তি)ম, পীতমুদগ, পীতযূথী, পীতরাগ, পীতল, পীতশাল, পীতসার, পীতসালক, পীতা, পীতাব্ধি, পীতাম্বর, পীতি, পীতী, পীসেপীসে, পেয়, পেয়া, পেয়াজ, পেয়াদা, পেয়ারা, পেয়ালা, পৈতামহ, পৈতৃক, পৈতৃকযাজ্ঞিক, পৈতৃষ্বসেয়, পৈতৃত্রীয়, পৈত্তিক, পৈত্র, পৈত্রিক, প্রপাত।

পা = পায়ীর আধার; অর্থাৎ পাওয়া হয় যাহাতে; কিংবা পায় (পান/পালন করে) যে।

প (অণুপ, অধিপ, অনুপ, অপ, কচ্ছপ, গোপ, নৃপ, মদ্যপ, মধুপ) : ১. ✓পা + অ (ক); ✓পত্, ✓পা + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***প*** = *পাওয়া থাকে যাহাতে।* ***অণুপ*** = *অণু*

*পালন-পান করে যে। **অধিপ** = যে অধিষ্ঠিত হইয়া পালন-পান করে। **অনুপ** = নেই **উপ** যাহার; এবং **অনু**-কে পালন-পান করে যে। **অপ** = (শুধুমাত্র দৈহিক) অস্তিত্ব পালন-পান করে যে। **উপ** = নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পালন-পান করে যে। **কচ্ছপ** = **কচ্ছ** দ্বারা পালিত যে। **গোপ** = **গো** পালন করে যে। **নৃপ** = নৃ-কে পালন করে যে। **মদ্যপ** = **মদ্য** পান করে যে। **মধুপ** = **মধু** পান করে যে। /* **প** = পালন-রক্ষা-পান করে যে। **অধিপ** = যে উপরিস্থ হইয়া পালন করে। (ব.শ.)। **৩. প** = পালক, রক্ষক, পানকারক, বায়ু, পত্র, চরিত্র। **অধিপ** = অধিপতি, পতি, স্বামী, প্রভু, রাজা, ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠ, অধিকারী। **অনুপ** = উপমাহীন, অতুল, অদ্বিতীয়। **অপ** = (দ্র. **আপ্**)। **উপ** = (দ্র. **উৎ**)। **কচ্ছপ** = (দ্র. ১ম খণ্ড, ১৩৩)। **গোপ** = (দ্র. ১ম খণ্ড, ২৮৯)। **নৃপ** = (দ্র. ১ম খণ্ড, ৬৬৭)। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. প**-এর ভিতরে 'পায় যে', 'পাওয়ায় যে', 'পালে যে', 'পান করে যে' ইত্যাদি অর্থ থাকলেও, এমন কিছু শব্দ রয়েছে যাদের অন্তে **প** বর্ণটি পালনকারী বা পানকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অমরকোষ এধরনের একটি নিয়মে বেশ কিছু শব্দের তালিকা দিয়ে গেছেন। একালের অভিধানগুলিতে যেমন প্রারম্ভিক বর্ণ ধরে ধরে শব্দ সাজানো হয়, যাকে ইংরেজি alphabetical-এর অনুকরণে 'বর্ণানুক্রমিক' বলা হয়, অমরকোষে ঠিক তার উলটো পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে — অন্তবর্ণ ধরে ধরে সাজান। যেমন ক-অন্ত বর্ণ বা কান্তবর্ণ, খ-অন্ত বর্ণ বা খান্তবর্ণ, গ-অন্ত বর্ণ বা গান্তবর্ণ ... এবং এইভাবে প-অন্ত বর্ণ বা পান্তবর্ণও রয়েছে। তাতে তিনি **কলাপ, পরীবাপ, গোপ, বৃষাকপি, বাষ্প, কশিপু, তল্প, বিটপ, প্রাপ্তরূপ, স্বরূপ, অভিরূপ, কচ্ছপী** — এই শব্দগুলি দিয়ে গিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, শব্দসমূহকে তাদের প্রারম্ভিক বর্ণ ধরে ধরে, অর্থাৎ মাথা ধরে ধরে সাজালে অর্থ গুলিয়ে যাওয়ার যেমন সমূহ সম্ভাবনা থাকে, তেমনি অন্ত বর্ণ ধরে ধরে অর্থাৎ লেজ ধরে ধরে সাজালেও সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রোধ করা যায় না; কিছু অন্যতর সমস্যাও দেখা দেয়। শব্দের স্বরূপকে কমবেশি অক্ষত রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল, তাকে তার ক্রিয়ার ভিত্তিতে সাজানো। যাই হোক, এখানে আমরা **প**-অন্ত বর্ণগুলিকে সাজিয়ে অর্থ দেওয়ার একটা উদাহরণ রাখলাম। তার মধ্যে দুটি নতুন শব্দের প্রস্তাবও রাখলাম। যেমন, **অণুপ** ও **অনুপ**। এই **অণু**কে আধুনিক বিজ্ঞান সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করেছে। যে **অণু** কণাগুলি **অণু**কে বুকের মধ্যে পালন করে, তাদের **অণুপ** বলা যেতেই পারে। আর, **অনুপ** শব্দটির ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাকে **অনুপমা**র বা উপমাহীনের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু যা পেছনে পেছনে যায় বলে **অনু** (অনুসরণ) পদবাচ্য, বহু সত্তা বিদ্যমান যাদের এতাদৃশ **অনু** রয়েছে সহগামী হয়ে। সেই সত্তাদেরও **অনুপ** বলা যেতে পারে। যেমন একালের রাজনীতির 'দাদা' ও মাস্তানদের 'ভাই'। এরা অবশ্যই **অনুপ**-পদবাচ্য হতেই পারেন। তবে **অনুপ** একেবারেই আলাদা বিষয়। দ্র. **১ম খণ্ড**। **৬.** ইংরেজিতে শব্দটি pa, papa, pope ইত্যাদি বেশ কয়েকটি রূপে প্রচলিত রয়েছে।

পতি (পতিব্রতা) : **১.** ✓পা + অতি (ডতি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. পতি** = **পত্** *(পাওয়ার তারণ) গতিশীল যাহাতে।* ***পতিব্রতা*** = ***পতি****র ব্রতই যাহার ব্রত। /* **পতিব্রতা** = যাহার পতি ব্রতবৎ সদা উপাস্য; যাহার পতিবিষয়ে নিয়ম। (ব.শ.)। **৩. পতি** = পালক, রক্ষক, অধিপতি, প্রভু, নায়ক, অধিকারী, স্বামী, প্রধান, অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ, শাসক, ভর্ত্তা, বর। **পতিব্রতা** = সতী, সাধ্বী। (ব.শ.)। **৪. পতি** শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে যেমন প্রচলিত, তেমনি **সভাপতি, রাষ্ট্রপতি, অধিপতি, দম্পতি** ... ইত্যাদি রূপেও সমান প্রচলিত। **৫. পতি** শব্দটির অর্থে দেখা যাচ্ছে, **পা** ক্রিয়ার চেয়ে **পত্** ক্রিয়ার গুরুত্ব বেশি। তাছাড়া শব্দটির মূলে **পত্** ক্রিয়াটিও রয়েছে, যাকে আমরা **পা** ক্রিয়াতেও পাই। উপরে দ্র. **প**। ব.শ. কিন্তু কেবলমাত্র **পা** ক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করেছেন। আমরা শব্দটিকে **পত্** ক্রিয়াপরিবারের অন্তর্ভুক্ত রেখেছি, এখানেও রেখেছি। অর্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে **পত্** ক্রিয়ার উপর নির্ভর করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তাই এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেওয়া হয়েছে — ***পত*** *(পায়ীর তারণ) গতিশীল যাহাতে।* দ্র. **পত্নী**। ...

যাই হোক, এই **পতি** শব্দটি যখন সভার, রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তার লিঙ্গ নিয়ে মাথা খারাপ করে থাকেন একালের ইংরেজি প্রভাবিত বাংলাজ্ঞানীদের **অধিপতি** জাতীয় **পাতিবিশেষজ্ঞ**রা। তাঁদের মতে কোনো **সভাপতি** বা **রাষ্ট্রপতি** মহিলা হলে তাকে **সভানেত্রী** বা **রাষ্টনেত্রী** বলতে হবে। কারণ ইংরেজিতে chairman আর chairperson দুটো কথা রয়েছে। কিন্তু তাঁদের এই মনস্কাম পূর্ণ হয়নি। শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল ভারতের **রাষ্ট্রপতি** হওয়ার পর সরকারিভাবে তাঁকে **রাষ্টনেত্রী** বা **সভাপত্নী** কিছুই বলা হয়নি, বলা হয় **রাষ্ট্রপতি** প্রতিভা পাতিল। এক্ষেত্রে শেষরক্ষা করেছে দিল্লির উপরে হিন্দিভাষার প্রভাব। ...

পতিব্রতা শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পতির ব্রতই যার ব্রত, সেইরূপ নারীকে **পতিব্রতা** বলা হয়। এর অর্থ হল, পতি কৃষিকর্মের ব্রত গ্রহণ করলে, স্ত্রীও যদি পতির সেই কৃষিকর্মে সহায়তা করেন বা কৃষিকর্ম করেন, তবে সেই স্ত্রীই পতিব্রতা। পতি দান-ধ্যান বা চুরি-চামারি করলে, স্ত্রীও যদি তাই করেন বা সেই কাজে সহায়তা করেন, তিনিই পতিব্রতা। পতি বিশেষ রাজনীতিতে (ধর্মে) সমাজ-পরিচালনার চেষ্টা করলে (অর্থাৎ পলিটিক্স করলে) স্ত্রীও যদি তাই করেন, সেই স্ত্রীই পতিব্রতা। (যেমন নূরজাহান, সারদামণি, রাবড়ি দেবী ও সোনিয়া গান্ধি।) পতি দুনিয়া না-দেখতে পেলে, স্ত্রীও যদি তার না-দেখার শরিক হন, সেই স্ত্রীই পতিব্রতা (যেমন গান্ধারী)। ডাক্তারের স্ত্রী যদি মাস্টারনি হন, তিনি **সাধ্বী**ও নন, পতিব্রতাও নন। তবে তা সত্ত্বেও তিনি **সাধ্বী** এবং পতিব্রতা হতে পারেন, যদি ডাক্তারটির চিকিৎসা-কর্মের মূল উদ্দেশ্য রুগীকে সুস্থ করা না-হয়ে টাকা রোজগার হয় এবং স্ত্রীরও শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া না-হয়ে স্বামীর টাকা বাড়ানোর সাধনায় সাহায্য করা বোঝায়, তাহলেও তিনি **সাধ্বী** ও পতিব্রতা হতে পারেন। অর্থাৎ স্বামীর মূল সাধনা বা ব্রতটি কী, তা জেনেবুঝে নিয়ে, সেই সাধনায় সাহায্য করা এবং সেই ব্রতকে নিজের ব্রত করে নেওয়া। এটা যিনি করবেন তিনিই **সাধ্বী** ও পতিব্রতা। দ্র. **সাধ্বী**।

পত্নী : পতি + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্), 'ন' আগম; যজ্ঞসংযোগে পতি-নী > পত্নী। (ব.শ.)। ২. *পত্-এর (পায়ীর তারণের) গতিশীলতার রহস্যরূপ ধারণ করে যে।* / যে (স্ত্রীলোক) পতিকৃত যজ্ঞফল ভোগ করেন। (ব.শ.)। ৩. বেদবিধানে বিবাহিতা স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, ভার্য্যা, জায়া, পত্নীতুল্যা পাণিগ্রহণাদি ধর্ম্মযুক্তা নারী। (ব.শ.)। ৪. wife অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. সন্দিগ্ধভাবে জানিয়েছেন, **পতি**র স্ত্রীলিঙ্গে **পতিনী** শব্দটিই সম্ভবত **পত্নী**তে পরিণত হয়েছে, যেমন একইভাবে ভগিনী শব্দটির অন্য রূপটি হয় ভগ্নী। কিন্তু এরকম হয় কেন? ব.শ. একটি সূত্র দিচ্ছেন — 'যজ্ঞসংযোগে'। তার মানে, একই **পুত্র**-উৎপাদন কর্মযজ্ঞে আধেয়রূপে **পতি** এবং আধাররূপে স্ত্রী লিপ্ত হন বলেই **পতি** শব্দের সঙ্গে একটি 'ন' আগম হয়, এবং **পতি** শব্দটি তখন **পত্নী**তে পরিণত হয়। **পুত্র** অর্থে কৃষিজ-ফসল বুঝলে এবং সামাজিকভাবে দেখলে, দশজন কর্মীকে নিয়ে কোনো বড়চাষী তার কৃষিকর্ম সম্পন্ন করলে, সেই চাষীকে **পতি** এবং সেই দশজন কর্মীকে **পত্নী** বলতে হয়। কিন্তু তা হতে পারে কীভাবে?

আমাদের ধারণা, সেটি হতে পারে এইভাবে — **পতি** শব্দের অর্থ **পত্** গতিশীল যাহাতে, সেই হল **পতি**। এতে পায়ীর তারণ (**পত্**) গতিশীল থাকে, অর্থাৎ পায়ী পতিত হতে হতে, পড়তে পড়তে চলতে থাকে। যে **পতি** যথাযথ ক্ষেতে ধান বুনছে, কিংবা শুক্র বুনছে, কিংবা তত্ত্ব বুনছে, সেরকম যে কোনো **পতি**ই হতে পারে, যদি তার সেই গতিশীল পতনকে (**পত্করণ**কে) কোনো রহস্যরূপিনী (**ন**) ধরে রাখে, তাহলেই হতে পারে। তখন স্বভাবতই সেই রহস্যরূপিণী আধারশক্তিকে **পত্নী** বলতে হয়। দ্র. **পতিব্রতা**।

পা : ১. পিবতি, পাবয়তি = পান; পাতি, পালয়তি = পালন, রক্ষণ; এবং, প্র + ✓আপ্ = প্রাপ > প্রা > ✓পাব (পৈ) = পা = প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া। (ব.শ.)। ২. *পাওয়া হয় যাহাতে।* ৩. পান, পালন, রক্ষণ, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, লাভ করা, শিক্ষা করা, ভোগ করা, অধিরোহণ করা, আবিষ্ট করা, বোধগম্য হওয়া ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **প** বর্ণের অর্থ।

পাত্র (পাত্রমিত্র, পাত্রী) : ১. ✓পা + ত্র (ষ্ট্রন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পাত্র*** *= **পা**-এর (পাওয়ার, পানের, পালনের) সমস্যা থেকে ত্রাণ করে যে।* ***পাত্রমিত্র*** *=* ***পাত্র*** *ও* ***মিত্র****।* ***পাত্রী*** *=* ***পাত্র****-এর গতিশীল আধার যে।* / **পাত্র** = আধেয়কে রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ৩. **পাত্র** = আধার, ভাণ্ড, কলস, ভোজনযোগ্য আধার, যজ্ঞিয় স্রুবাদি, পূর্ণভাজন, নদীখাত, যোগ্য, ষড়ঙ্গবিদবেদপারগ, তপঃশ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, বিদ্যাদিসম্পন্ন দানার্হ ব্রাহ্মণ, শ্রুত্যধ্যয়ন-শমদমাদিসম্পন্ন অনুষ্ঠানবান ব্রাহ্মণ, রাজমন্ত্রী, নায়কাদি অভিনেতা, কুশীলব, আঢ়কপরিমাণ, চারিপ্রস্থ, পানভাজন, রাজাদির পত্রলেখক, পত্রনবিশ, কন্যাদানযোগ্য বর, হিন্দুর উপাধি। **পাত্রী** = আধার, ভাজন, দুর্গা, বিবাহযোগ্যা কন্যা। (ব.শ.)। ৪. **পাত্র** ও **পাত্রী** যথার্থে প্রচলিত, **পাত্রমিত্র** অপ্রচলিত। ৫. 'পাওয়ার, পানের, পালনের সমস্যা থেকে ত্রাণ করে যে', তাকেই বলে **পাত্র**। সেই **পাত্র** কাকে বলা হবে, অর্থাৎ, কে কে উপরোক্ত সমস্যা থেকে ত্রাণ করে। ইংরেজিতে তাদের প্রত্যেকের পৃথক নাম আছে, যথা — a pot, a vessel, a container, a minister, a counsellor, a deserving man or object (প্রশংসার **পাত্র**), a man, a fellow (ভবি ভোলার **পাত্র** নয়, কিংবা ছাড়ার **পাত্র** নয়), অভিনেতা-**পাত্র** বা a male character in a play, bridegroom ... ইত্যাদি ...। বাংলায় এদের সবাইকে বলা হয় **পাত্র**। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান তার পারমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় যে participator-কে খুঁজে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়েছে, তাকেও আমাদের বাংলা শব্দবিদগণ বহুকাল আগেই **পাত্র** নামে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। (দ্র. **দেশ**, ১ম খণ্ড ৫৩৯)।

যাই হোক, আমরা স্পষ্ট দেখছি, দশটি সত্তাকে বোঝাতে ইংরেজির যখন দশটি শব্দ লাগছে, তখন বাংলার সেখানে একটি শব্দেই কাজ চলে যাচ্ছে। কারণ বাংলার শব্দটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ধারণ করে — 'পাওয়ার, পানের, পালনের সমস্যা থেকে ত্রাণ করে যে' সেই হল **পাত্র**। উপরোক্ত দশটি সত্তাই সেই কাজ করে বলেই তারা প্রত্যেকেই **পাত্র** পদবাচ্য। এই কারণে দশটি সত্তাকে বোঝাতে ইংরেজির যখন দশটি পৃথক শব্দ লাগছে, বাংলার তখন একটি শব্দতেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়, আরও কেউ যদি একই ক্রিয়া করে, বাংলায় তাকেও **পাত্র**ই বলা যাবে অনায়াসেই। 'উগ্রপন্থী ও সরকারের মধ্যে আলোচনা চালানোর জন্য নির্ভরযোগ্য **পাত্র** রূপে সাংবাদিক শ্রী অমুককে যখন পাওয়াই যাচ্ছে ...' এরূপ বাক্যে negotiator বা mediator শব্দের স্থানে **পাত্র** শব্দটি অনায়াসেই কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। তার মানে, দশটি সত্তাকে শনাক্ত করেই **পাত্র** শব্দটি তার ধারণক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলেনি; তার ধারণক্ষমতা অসীম। এই কারণেই ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দকে আমরা বলেছি 'গালিভার' এবং ইংরেজি সহ যে কোনো ভাষার প্রতীকী শব্দকে আমরা নাম দিয়েছি 'লিলিপুট'। সবশেষে একথা বলে রাখা দরকার যে, উত্তম-অধিকারীদের বিচারে **পাত্র** হল সেই সত্তা, **দেশ** ও **কাল**-এর সঙ্গে যার স্থিতি একান্তই আবশ্যিক; অন্যথায় এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই 'থেকেও নেই' হয়ে যায়। বিষয়টি ১ম খণ্ডের ৫৩৯ পৃষ্ঠায় **দেশ-কাল-পাত্র** শব্দবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পান (আপান, নিপান, পানকর্পূর, পানকাঁটা, পানকৌড়ি, পানতা, পানতুয়া, পানপাত্র, পান-পানী, পানফুল, পানভূমি, পানমণ্ডল, পানযোগানী, পানশি, পানসী, পানশে, পানসা, পানা, পানাগার, পানান, পানি, পানিআমলা, পানিকচু, পানিকাল, পানিফল, পানিবসন্ত, পানী, পানীয়, পায়না, প্যানপ্যান) : ১. ✓পা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পান*** *=* ***পা*** *(পাওয়া) অন (on) থাকে যাহাতে।* ***আপান*** *=* ***পান****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***নিপান*** *= নিঃসারিত* ***পান*** *যাহা হইতে।* ***পানতা*** *=* ***পান*** *তারণের আধার।* ***পানতুয়া*** *=* ***পান*** *তারণপূর্ব্বক নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে।* ***পানশি*** *=* ***পান****-এর (পানীর) শক্তি গতিশীল যাহাতে।* ***পানসা*** *=* ***পানীয়****-র মতো স্বাদ যাহার।* ***পানা*** *=* ***পান****-এর আধার যে।* ***পানান*** *=* ***পান*** *অন (on) যাহাতে।* ***পানি*** *=* ***পান*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পানী*** *=* ***পানি****র আধার যে।* ***পানীয়*** *=* ***পান*** *গতিশীল*

হইয়া যায় যাহাতে। ***প্যানপ্যান*** *=* ***প্যা*** *(পাওয়া-র স্থিররূপে থাকা) অন (on) যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***পায়না*** *=* ***পা*** *(পান) গতিশীল হইয়া অন (on) থাকে যাহাতে। /* **পানযোগানী** = যে পান যোগায়। (ব.শ.)। **৩. আপান** = পান, সুরাপান, সুরাপানস্থান, পানার্থসভা, পানগোষ্ঠী, মাতালের চক্র। **নিপান** = পশুগণের জলপানার্থ কূপসমীপস্থ জলাধার, উপকূপজলাশয়, পুষ্করিণ্যাদি জলাধার, কূপ, গোদোহনপাত্র, নিঃশেষে পান। **পান** = দ্রবদ্রব্যের গলাধঃকরণ, মদ্যপান, রক্ষণ, পেয়দ্রব্যমাত্র, পানভাজন, পানপাত্র, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন-ব্যাপারভেদ, একমাত্রা ঔষধ, মাদকধূম-সেবন, শৌণ্ডিক, নিঃশ্বাস; পর্ণ, সাজা পান, বিড়া, খিলি, তাম্বুলরাগ। (পূর্ব্বকালে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কার্য্যে নিয়োগ করার সময়ে 'পান, পানফুল, গুয়াপান' দিয়া বরণ করার প্রথা ছিল। দ্বিতীয়ত, কার্য্যের উল্লেখপূর্ব্বক সভামধ্যে পান রাখা হইত, কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি সেই পান উঠাইয়া লইয়া কার্য্য স্বীকার করিত। ... কবিকঙ্কণে, কালকেতুর পান দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বাসার্থ আহ্বান করার বিষয় বর্ণিত আছে। ... 'বাইশকবি-মনসা'য় সসম্মান বিদায়কালে 'গুয়াপান' দেওয়ার প্রথা দেখা যায়। ... এখনও বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে পান সুপারি তেল দিয়া প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করার প্রথা আছে।)। **পানকর্পূর** = পাতায় কর্পূরের গন্ধযুক্ত গুল্মবিশেষ। **পানকাঁটা, পানফুল** = কাঁটাযুক্ত রৌপ্যাদির ফুল-দেওয়া পানের আকারে কেশের রৌপ্যাদির অলঙ্কারবিশেষ। **পানকৌড়ি** = কালো কুক্কুটতুল্য জলচরপক্ষিবিশেষ। ইহারা জলে সাঁতার দেয় ও ডুব দিয়া মাছ ধরে। **পানতা, পান্ত, পান্তা, পান্থা** = পানীভাত, বাসি ভিজা ভাত। **পানতুয়া** = ঘৃতপক্ক রসপূর্ণ ছানার মিষ্টান্নবিশেষ। **পানপাত্র** = মদ্যপানপাত্র, চষক। **পান-পানী** = পেয় শরবত ইত্যাদি ও জল। **পানভূমি** = সুরাপানস্থান, পানগৃহ। **পানমণ্ডল** = পানগোষ্ঠীকা। **পানযোগানী** = তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী। **পানশি, পানসী** = তখতার পাটাতন দেওয়া সওয়ারী নৌকাবিশেষ। **পানশে, পানসা** = পানীয়স্বাদ, জলের মতো স্বাদযুক্ত, বিস্বাদ, জলো (insipid)। **পানা** = পানক, অম্লমধুর পেয়বিশেষ, শরবত, পেয়দ্রব্য; বারিপর্ণী, শৈবাল, শেওলা (কচুরিপানা); প্রায়, তুল্য, মতো; দোহনকালে গো-প্রভৃতির স্তনে দুধ নামা, (গৌণার্থে) যোগাড় করা, **পানান** = গাইয়ের পালানে দুধ নামা, পায়না দ্বারা তীক্ষ্ণ করা। **পানাগার** = সুরাপানগৃহ, পানগোষ্ঠীকা। **পানি, পানী** = জল, বৃষ্টিজল, চক্ষুর জল, মণির চমক, কান্তি। **পানিআমলা** = পানীয় আমলক, ত্রিদোষজ্বরনাশক বৃক্ষবিশেষ। **পানিকচু** = জলজাত কচুবিশেষ, সোলাকচু। **পানিকাল** = জলজ শাকবিশেষের ফুল। **পানিফল** = জলজ ফল, পানফল, শিঙ্গুড়। **পানিবসন্ত** = জলবসন্ত, পানবসন্ত (chicken-pox)। **পানীয়** = পেয়, রক্ষণীয়, জল, পেয় দ্রব্যমাত্র, শরবত, পানা। **প্যানপ্যান** = কান্নার শব্দ। **পায়না (পাইন)** = পান করান, অস্ত্রতীক্ষ্ণীকরণার্থ ব্যাপারবিশেষ, পান দেওয়া, পানান, (পায়না ত্রিবিধ — শর শল্য অস্থিচ্ছেদনার্থের পায়না ক্ষারে, মাংসের ছেদন ভেদন ও উৎপাটনের অস্ত্রের পায়না জলে, শিরাবেধন ও স্নায়ুচ্ছেদনের অস্ত্রের পায়না তৈলে হয়)। (ব.শ.)। **৪. শব্দগুলি যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. পান** ও **পানি** সহযোগে বাংলাভাষী অজস্র শব্দ সৃষ্টি করেছে। এখানে আপাতত তাদের অধিকাংশ প্রচলিত এবং কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছে।

রোপওয়েতে চড়ে নদীর এপার থেকে ওপারে সোঁ করে পৌঁছে যাওয়া আর হাঁটার মধ্যে যে পার্থক্য, **পান** করা ও খাওয়ার মধ্যে সেই পার্থক্য। খাওয়ার মধ্যে খাদকের মুখের ভিতরে খাদ্যের যাওয়ার ক্রিয়াটিতে মাঝে মাঝে ছেদ রয়েছে, খাদ্য যায় ধাপে ধাপে; কিন্তু **পান**-এর মধ্যে খাদ্যের অন্তর্গমনে তেমন ছেদ নেই। তার মানে খাওয়ার সময় আমরা মাঝে মাঝে খাওয়া বন্ধ রাখি, মুখ বন্ধ রাখি, চিবাই, গলাধঃকরণ করি, তারপর আবার মুখ খুলি, খাই। **পান**-এর সময় তেমন করি না আমরা, যতটা পান করার ততটা টানা পান করি। এতে 'পাওয়া অন থাকে', তাই এই ক্রিয়াকে **পান** বলে। **পান** শব্দের ভিত্তিতে এই ক্রিয়া থাকার কারণে বাংলাভাষী সর্বপ্রকারের তরল, বায়বীয় ও মানসিক দ্রব্য **পান** করেন বা করতে পারেন। যেমন অমৃত**পান**, অমৃতরস**পান**, চন্দ্রকর**পান** (দ্র. **চকোর**), জল**পান**, দুগ্ধ**পান**, ধূম**পান**, পীযূষ**পান**, মদ্য**পান**, মধু**পান**, রস**পান**, রূপরস**পান**, সুধা**পান**, সুরা**পান** ... এবং বাক্যের পদে পদে **পাদোদক** বা কবিতার চরণে চরণে স্রষ্টা, কবি ও মনীষীদের দিয়ে যাওয়া 'চরণামৃত**পান**' বা জ্ঞানামৃতরস**পান** তো রয়েছেই। আর, এইসব **পান** ক্রিয়া বাংলাভাষী কেবল মুখ দিয়ে করেন না, প্রায় সব ক'টি ইন্দ্রিয় দিয়েই তাঁরা তাঁদের নানারকমের **পান** ক্রিয়া করে থাকেন। এর সঙ্গে ইংরেজির drink-এর তুলনা করা অর্থহীন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানরস**পান** বোঝাতে অর্ধশতাব্দী আগে পর্যন্ত ইংরেজিতে গ্রীক শব্দ symposion-এর ল্যাটিনায়িত রূপ symposium ব্যবহার করা হত। সেই sym-এর অর্থ ছিল 'একত্রে', আর posium (< posion)-এর মূলে ছিল potion বা 'পান'। আশ্চর্য মনে হলেও একথা ভেবে দেখার মতো বিষয় যে, ইংরেজের সেই 'জ্ঞানরসপান-যজ্ঞ' বা symposium-কে মার্কিনী যান্ত্রিকতা তাড়িয়ে দিয়ে সে জায়গায় যে শব্দটিকে বসিয়ে দিয়েছে সেটি হল workshop। সম্মিলিতভাবে জ্ঞানরস পানের জন্য এখন তাঁরা সেমিনারের workshop-এ যান!

যাই হোক, এখন কথা হল জল-প্রভৃতি **পান**-করা, কাটারি-ছুরিচাকু প্রভৃতি অস্ত্রে **পান**-দেওয়া (**পায়না** দেওয়া), এবং **পান**পাতা — এই তিনটি বিষয়কে ঠিকঠাকভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। কামারশালায় কোনো অস্ত্র যখন শান দেওয়া হয়, তখন তাকে কেবলমাত্র শান-পাথরে ঘষে ধারাল করাই হয় না, হাপরের আগুনে গরম করে নরম করে নেওয়া হয় এবং অতিগরম অবস্থায় ধারাল-অংশটুকুতে মৃদু মৃদু জল (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষার বা তেল) **পান** করানো হয়; পুনরায় গরম করা হয় এবং পুনরায় জল**পান** করানো হয়। অস্ত্রের ধারাল দিকটার পাতলা অংশে এইভাবে কয়েকবার গরম করা এবং জল-ছপছপে কাপড় হাতে নিয়ে সেই অংশকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে অস্ত্রটিকে জল**পান** করানোকেই বলে **পান**-দেওয়া। তাতে অস্ত্রের ধার দীর্ঘজীবী হয়, অস্ত্রটি দিয়ে দু-চারবার কাটাকাটি করলেই তার ধার ক্ষয়ে যায় না। অস্ত্রে যত শানই দেওয়া হোক না কেন, **পান** দেওয়া না হলে সেই অস্ত্রে কোনো কিছু কাটলেই তার ধারাল অংশটি থ্যাবড়া হয়ে যায়। আবার, কড়া**পান** হয়ে

গেলে, অর্থাৎ অত্যধিক **পান** দেওয়া হয়ে গেলে সেই অস্ত্রে (ধরা যাক সেটি একটি কাটারি) কোনো কিছু কাটতে গেলেই তার ধারাল অংশ ভেঙে পড়ে যায়; একে বলে 'কাটারির দাঁত পড়ে যাওয়া'। তার মানে, অস্ত্রে কেবল শান দিলেই চলে না, **পান**ও দিতে হয়। ব্যাপারটিকে উত্তম-অধিকারীদের স্তরে তুলে বুঝতে চাইলে আপনি ভারত সরকারের মিলিটারির কথা ভাবতে পারেন। এককালে (চিন যুদ্ধের সময়) তাতে এত কম **পান** দেওয়া ছিল যে অধিকাংশ ধারই থ্যাবড়া হয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। আবার, পরবর্তীকালে এত বেশি **পান** দেওয়া হয়ে যায় যে, কথায় কথায় ভারতের সামরিক শক্তির দাঁত পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে; অর্থাৎ যে কোনো অগ্রগতির ক্ষেত্রেই ভারতের মিলিটারির অগ্রণী অংশের বহু সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুপক্ষের দিকে গিয়ে আটকা পড়ে যায় বা মারা পড়ে। ...

এবার আসা যাক **পান**পাতার কথায়। এই ব্যাপারটিকে প্রথমে খুব সহজ ব্যাপার বলে আমাদের মনে হয়েছিল — **পান** আসলে 'পর্ণ' বা পাতা, বাংলাভাষী যে-**পর্ণ**কে নিজেদের উচ্চারণ প্রক্রিয়ার স্বভাবের কারণে **পান** বা **পান**পাতা করে নিয়েছে! কিন্তু **পান** পাতা নিয়ে বাংলাভাষীদের সমাজে যেসকল আচার-আচরণ প্রচলিত রয়েছে, তার দিকে চোখ পড়তেই সন্দেহ হতে শুরু করে। নতুন মানুষ ঘরে এলে তাকে সাঁচি-**পান** দিয়ে আপ্যায়ন করার প্রথা সব বাংলাভাষী পরিবারেই কমবেশি ছিল এবং এখনও গ্রামবাংলায় কিছু কিছু আছে। তাছাড়া, গুয়া-**পান** না দিয়ে বিবাহের নেমন্তন্নের কথা বাংলাভাষী ভাবতেই পারত না। এখনও সেই প্রথার ধ্বংসাবশেষ কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-বন্ধনে এই **পান** এমন অনিবার্য ভূমিকা পেল কেন এবং কীভাবে? সে কি হৃদয়-দানের প্রতীক রূপে হৃদয়ের মতো ♥ দেখতে ব'লে? তারই উত্তরাধিকার কি ইংরেজ তার প্রেমের চিহ্ন রূপে ধরে রেখেছে? একশো বছর আগেও **পান** না দিয়ে বাংলাভাষী যে কাউকে আমন্ত্রণ বা আপ্যায়নই করতে পারত না, একথা সর্বজনবিদিত। এখনও গ্রামবাংলায় এবং অভিজাত পরিবারে তার প্রচলন কমবেশি রয়েছে। ব্যাপারটি এতই সর্বজনগ্রাহ্য ছিল যে, এমনকি শিশুরাও '... আজ বলেছে যেতে / **পান**-সুপারি খেতে ...' বলে নেচে নেচে খেলা করে থাকে, আজও। একালে আমাদের উত্তরপ্রজন্মের চাকরির ক্ষেত্রে 'পাঁচ বছরের মধ্যে এই চাকরি বা কাজের দায়িত্ব ছাড়িয়া যাইব না' জাতীয় যেসকল 'বন্ড' সই করিয়ে নেওয়া হয়, ব.শ. জানাচ্ছেন, সেকালেও তদ্রূপ 'বন্ড' লেন-দেন হত যাকে বলা হত '**পান**-বন্দি'। কেবল তাই নয়, '**পান** থেকে চুন খসলে' তুলকালাম হয়ে যাওয়ার ব্যাপার তো ছিলই। প্রশ্ন হল মানুষের সামাজিক বন্ধনগুলির ক্ষেত্রে **পান**-এর এই ভূমিকার পিছনে কোন রহস্য বিদ্যমান? সে কি **পান**-এর চেহারা হৃদয়ের মতো বা নারায়ণ-শিলার মতো বলে? **পান**পাতা কি তবে বেহিসেবি হৃদয়দানের কিংবা হিসেবি লেনদেন-এর প্রতীকের ভূমিকা পালন করত? ...

না, **পান**পাতা নিয়ে গবেষণার এই কাজটি এ-পরিসরে সারা যাবে না। আর তাছাড়া **পান** নিয়ে আর যেসকল শব্দ রয়েছে, এই আলোচনায় তাদের জন্যও কিছু স্থান বরাদ্দ করা দরকার। তারা তো আর বানের জলে ভেসে আসেনি। আলোচিত হওয়ার হক্ তাদেরও আছে। কিন্তু এখন যদি আমরা এক এক করেও এগোই, তাহলেও এর শেষ দেখা যাবে বলে মনে হয় না। অতএব কমপক্ষে সকলের 'প্রেজেন্ট স্যার' লিখিয়ে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। ...

পানশি কেন **পানি**তে ভাসে? **পানসে** কেন **পানীয়** জলের মতো স্বাদহীন লাগে? **পানা** কেন মিশরির-**পানা**র মতো পেয়দ্রব্য হয়, আবার কচুরি**পানা**ও হয়? এসব কথা আমরা যদি চাঁদ**পানা** বা হাঁড়ি**পানা** মুখ করে ভাবতে বসি, **পান** যোগাবে কে? তাছাড়া **পানান** করলে বা **পানা**লে কেন গাইয়ের দুধ নামে, কাটারি **পানান**ও হয়ে যায়, তার খবর মিলবে কোথা থেকে? আরও বড় কথা, **ধা** করার জন্য **ধানাই** করেই কি কেউ ছাড়ে? **পানায়**, **পানাই**ও করে; সেজন্যেই কি ধানাই-**পানাই**য়ের **প্যানপ্যানানি** শুনতে হয় না?

সবশেষে একালের বাংলাভাষী পণ্ডিতদের দুরবস্থা নিয়ে একটি কথা বলতেই হয়। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর আমরা ইংরেজ হওয়ার পণ করেছি, ইংরেজির আত্মাকে বাদ দিয়ে তার দেহের একশোভাগ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছি, ইংরেজি খাচ্ছি, ইংরেজি ঘুমাচ্ছি, কথায় কথায় ভুল ইংরেজি ঝাড়ছি, এবং 'ছোটো-ইংরেজ'দের নকলে বিপুল পরিমান মদ্যপানও করতে শিখেছি। ফলে দেশের প্রায় সমস্ত শহর-নগর-উপনগরীতে 'বার' নামক অজস্র **আপান** ও **নিপান** গড়ে উঠেছে। ... দ্র. **পণ**। **৬.** ইংরেজি sym*posium* (উপরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

পাপ (পাপকর, পাপকর্ম্মা, পাপকারী, পাপকুয়া, পাপকৃৎ, পাপক্ষয়, পাপগ্রহ, পাপঘ্ন, পাপচর্য্যা, পাপদৃষ্টি, পাপধী, পাপনাশন, পাপনিশ্চয়, পাপপতি, পাপপুরুষ, পাপবিনিশ্চয়, পাপবুদ্ধি, পাপভাক্, পাপমিত্র, পাপযোনি, পাপরাশি, পাপরোগ, পাপর্দ্ধি, পাপসঙ্কল্প, পাপহা, পাপা, পাপাধম, পাপানুবন্ধী, পাপিয়া, পাপিহা, পাপিষ্ঠ, পাপী, পাপ্‌মা) : ১. ✓পা + প - অপাদানবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পাপ*** = *পা-এর (পাওয়ার, পালকের, পানের) পালন করে যে।* ***পাপকর*** = ***পাপ*** *করে যে।* ***পাপকর্ম্মা*** = ***পাপ*** *কর্ম্ম করে যে।* ***পাপকারী*** = ***পাপ*** *কার যাহার।* ***পাপকুয়া*** = ***পাপ****-রূপ কূপ বা কুয়া যে।* ***পাপকৃৎ*** = *যে* ***পাপ*** *কৃত হইয়াছে।* ***পাপক্ষয়*** = ***পাপ****-এর ক্ষয় যাহাতে।* ***পাপগ্রহ*** = ***পাপ*** *গ্রহণ করে যে।* ***পাপঘ্ন*** = ***পাপ*** *হনন করে যে।* ***পাপচর্য্যা*** = ***পাপ*** *আচরণ যাহার।* ***পাপদৃষ্টি*** = ***পাপ*** *দৃষ্টি যাহার।* ***পাপধী*** = ***পাপ*** *ধী বা বুদ্ধি যাহার।* ***পাপনাশন*** = ***পাপ*** *নাশ করেন যিনি।* ***পাপনিশ্চয়*** = ***পাপ*** *নিশ্চয় বা সঙ্কল্প করে যে।* ***পাপপতি*** = ***পাপ*** *রূপ পতি যে।* ***পাপপুরুষ*** = ***পাপ*** *যে পুরুষ।* ***পাপবিনিশ্চয়*** = ***পাপ*** *বিশেষভাবে নিশ্চয় বা সঙ্কল্প যাহার।* ***পাপবুদ্ধি*** = ***পাপ*** *বুদ্ধি যাহাতে।* ***পাপভাক্*** = ***পাপ*** *ভজনা করে যে।* ***পাপমিত্র*** = ***পাপ*** *কর্ম্মে মিত্র যে।* ***পাপযোনি*** = ***পাপ*** *জাত যাহা হইতে।* ***পাপরাশি*** = ***পাপ*** *যে রাশি।* ***পাপরোগ*** = ***পাপ*** *হইতে যে রোগ হয়, তাহা।* ***পাপর্দ্ধি*** = ***পাপ*** *বৃদ্ধি যাহা হইতে।* ***পাপহা*** = ***পাপ****কে হনন করে যে।* ***পাপা*** = ***পাপ****-এর আধার যে।* ***পাপাধম*** = ***পাপ****-এর অধম যে।* ***পাপানুবন্ধী*** = ***পাপ*** *অনুবন্ধ যাহার।* ***পাপিয়া, পাপিয়া*** = ***পাপ.***

গতিশীল হইয়া যায় যাহাতে। ***পাপী*** *=* ***পা****-এর (পালকের) পালক গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে।* ***পাপ্মা*** *=* ***পা*** *-এর পালন সীমায়িত যাহাতে। /* **পাপ** = যাহা হইতে আত্মা রক্ষিত হয়। **পাপনাশন** = পাপ নাশ করে যে। **পাপর্দ্ধি** = যাহাতে পাপের ঋদ্ধি (বৃদ্ধি)। (ব.শ.)। ৩. **পাপ** = পাপবান, ক্রূর, অশুভ, নীচ, হিংস্র, গর্হ্য, সরোষ, পাপকর্ম্মারব্ধ শরীর, ধিকৃত, অনিষ্টাশঙ্কী, নরকহেতু দুরদৃষ্ট, পাতক, কলুষ, অনুচিতশ্রবণজদোষ, অপকার, জ্বালা। **পাপকর, পাপকর্ম্মা, পাপকারী, পাপকৃৎ** = পাপী, পাপাচারী। **পাপকুয়া** = পাপকূপ, নরককুণ্ড। **পাপক্ষয়** = পাপনাশ। **পাপগ্রহ** = অশুভগ্রহ, ক্রূরগ্রহ, মঙ্গল, রাহু, শনি, মঙ্গলাদিযুত বুধ, রবি, অর্দ্ধোনচন্দ্র, ন্যূন চন্দ্র। **পাপঘ্ন** = পাপক্ষয়কর। **পাপচর্য্য** = পাপী, দৈত্য, রাক্ষস। **পাপদৃষ্টি** = ক্রূরদৃষ্টি। **পাপধী** = পাপবুদ্ধি, দুরাত্মা। **পাপনাশন** = পাপঘ্ন, শিব, বিষ্ণু, প্রায়শ্চিত্ত। **পাপনিশ্চয়, পাপবিনিশ্চয়** = পাপসঙ্কল্প, ক্রূরমতি। **পাপপতি** = উপপতি। **পাপপুরুষ** = পাপী জন, পাপরূপ পুরুষ, পুরুষাকৃতি বা মূর্ত্ত পাপ (ইহার ব্রহ্মহত্যা শিরঃ, স্বর্ণস্তেয় ভুজ, সুরাপান হৃদয়, গুরুতল্প কটি, উপপাতক রোম। ইহা কজ্জলবর্ণ, বামপার্শ্বে স্থিত।)। **পাপমিত্র** = কপটমিত্র, দুষ্টবন্ধু। **পাপভাক্** = পাপযুক্ত, পাপী। **পাপযোনি** = পাপজন্মা, নিকৃষ্টজন্মা, অন্ত্যজ। **পাপরাশি** = অশুভরাশি। **পাপরোগ** = পাপজন্য কুষ্ঠাদি রোগ, মসূরীরোগ, বসন্ত। **পাপর্দ্ধি** = মৃগয়া। **পাপাধম** = পাপগণে অধম। **পাপানুবন্ধী** = পাপকর্ম্মনিরত। **পাপিয়া, পাপীয়া, পাপিহা** = চাতক। **পাপিষ্ঠ** = অতিপাপী, পাপিতম, ক্রূরতম, নিদারুণ, প্রচণ্ড, মারাত্মক। **পাপী** = পাপবান, পাতকী, দুরাত্মা। **পাপ্মা** = পাপ, কলুষ, সর্ব্বপাপমূল, পাপাচার, দুষ্কৃত। (ব.শ.)। ৪. sin অর্থে **পাপ** শব্দটি প্রচলিত, বাকি সমস্ত শব্দই কমবেশি অপ্রচলিত। ৫. 'ধর্মতত্ত্বে আদি পাপ যে-ভূমিকা পালন করে, রাজনৈতিক-অর্থনীতিশাস্ত্রে আদি পুঁজিভবন সেই ভূমিকা পালন করে। আদম আপেলে কামড় দিলেন, মানবজাতির উপর পাপ পতিত হল। ...' ['Primitive accumulation plays in Political Economy about the same part as original sin in theology. Adam bit the apple, and thereupon sin fell on the human race....' (Capital, p. 667. Progress Publishers. Moscow, Reprint 1977)]। আদি **পুঁজি** ও আদি **পাপ** সম্বন্ধে এ হল মার্কসসাহেবের বয়ান। আদি **পুণ্য** (= পুঁজি) আর আদি **পাপ** যে একই বস্তু, **পাপ**ই যে রূপান্তরিত হয়ে (= পুঞ্জীভূত হয়ে) **পুণ্যে** (= পুঁজিতে) পরিণত হয়, সেকথা মার্কসসাহেবের হাতে ধরা দিতে দিতে দিল না। এ যেন — গুপ্তধন লুকোনো ছিল জমিদার-বাড়ির চিলেকোঠার খুপরিতে পুতুলের ছেঁড়া কাপড়চোপড়ের পেছনে। খুঁজতে খুঁজতে চিলেকোঠায় গিয়েও ছেঁড়া কাপড়চোপড় দেখে কেউ ফিরে এলে সে যেমন সত্যের একেবারে নাকের ডগায় পৌঁছেও ধোঁকা খেয়ে যায়, মার্কসসাহেবের অবস্থা অনেকটা সেইরকম। তিনি জ্ঞানবৃক্ষের ফল দেখলেন, আদমকে খেতে দেখলেন, **পাপ**কে মানবজাতির উপর পড়তে দেখলেন; আবার আদি **পণ্য**কে আদি পুঁজিতে পুঞ্জীভূত হতে দেখলেন, মানবসভ্যতায় তার **কুফল**ও দেখলেন, কিন্তু দেখতেই পেলেন না যে, তার আগেই দর্শনের জগতে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করার ফলেই সমাজে জ্ঞানবৃক্ষের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল, তাতে ফল ফলেছিল, সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণের জন্যই **পণ্যের** বা **পাপের** উদয় হতে শুরু করেছিল এবং সেই **পণ্যই** ক্রমে **পুণ্যে** বা পুঁজিতে পরিণত হয়ে মানবসমাজকে পদদলিত করবার উদ্যোগ নিচ্ছিল। সর্বোপরি, **পুণ্য** বা পুঁজি যে দুরকমের রূপে দেখা দিয়েছিল — লক্ষ্মী-পুঁজি ও কুবের পুঁজি — মার্কস সাহেবের তা চোখেই পড়েনি। **পুণ্য** যে ভালও হয়, লক্ষ্মী-পুঁজি যে আদিতে **সূর্য্যে**র আধারশক্তি ছিলেন, পরে সত্যের বা সত্য**নারায়ণের** আধারশক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, ভারতের তথা বাংলার মানুষ যে সুপ্রাচীন কাল থেকে সেই লক্ষ্মী-পুঁজির উপাসনা করে এসেছে, এসব তথ্যের কোনো খবরই তাঁর কাছে ছিল না। মার্কস সাহেব যাকে নিয়ে মত্ত হয়েছেন, সে হল আজকের কুবের পুঁজি। নিঃসন্দেহে তা ভয়ানক এবং মানবসভ্যতার অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক। কিন্তু তার চর্চা করতে গিয়ে সমস্ত পুঁজিকেই মানবসভ্যতা-বিরোধী রূপে ভাববার একটা প্রবণতা মার্কসের রচনাবলী ও কার্যক্রমে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে এবং আজ তার কুফলও ফলতে শুরু করেছে। মার্কসের পুঁজি আলোচনা যদি এরকম একদেশদর্শী না হত, আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের কাছে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পরাজয় ঘটত কি না সন্দেহ। ...

শব্দার্থতত্ত্ব অনুসারে **পাপ** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল 'পালকের পালয়িতা', অর্থাৎ, আপনি যাকে পালন করলেন, সে পালিত হওয়ার পরে আপনার পালন-পোষণে সাহায্য করল; এই হল **পাপ**। এক কথায় মানুষের উৎপাদিত বস্তু কখনও কখনও **পাপ**-এ পরিণত হয়। যখন সেটি উৎপাদিত হয়ে উৎপাদককে সরাসরি বা পরোক্ষে পালন করছে তখন সে **পাপ** নয়। যখন সে উৎপাদিত হয়ে জমা হয়ে যাচ্ছে, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকছে, একমাত্র তখনই সে **পাপ** রূপে অভিধেয়; তার আগেও নয়, পরেও নয়। (**পুনশ্চ** শব্দের ব্যাখ্যায় 'বঙ্কিম রচনাবলী' থেকে ব.শ. উদ্ধৃতি দিচ্ছেন — '... পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি।) অর্থাৎ কিনা উৎপাদিত বস্তু যখন ভোগে না লেগে বিক্রির জন্য পড়ে থাকে, তখনই তাকে **পাপ** বলে। তার মানে, **পাপ** হল বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির উৎপাদিত এবং অপেক্ষারত বস্তু; একালের ভাষায় যাকে বলা হয় **পণ্য**। তবে এ হল মর্তলোকের **পাপ**। মানুষের মানসলোকেও এরকম **পাপ**-এর সাক্ষাৎ মেলে। যে সমাজে বিক্রির জন্য **পণ্য** উৎপাদন নিষিদ্ধ, যৌথসমাজের নিয়মে বস্তু উৎপাদন করাই ধর্ম, সেই সমাজে **পণ্য** উৎপাদন করে বিক্রি করলে **অধর্ম** করা হয়। ফলে **অধর্ম**-জনিত মনঃপীড়ার বোধ হয়। এ হল **পাপ**-বোধ। এর বিপরীতে থাকে **পুণ্য**-এর বোধ। তবে সে ব্যাপারটি উত্তম-অধিকারীরাই ভাল বুঝতে পারেন; আমরা বড়জোর খানিকটা চেষ্টা করতে পারি। ... (দ্র. **গঙ্গা, উপনিষদ**)

আদি সনাতন যুগের সামাজিক জীবনে উৎপন্ন ও সম্পদ এবং মানসজীবনে পুত্র ও মোক্ষের বোধ এসেছিল হাত ধরাধরি করে। কিন্তু পরবর্তীকালের বৈদিকযুগের প্রারম্ভে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র **দক্ষনীতি** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যাপারটি বদলে যেতে লাগল। সমাজজীবনের উৎপন্ন ও সম্পদ যথাক্রমে **পণ্য** ও **পুঁজি**তে এবং মানসজীবনের পুত্র ও মোক্ষের বোধ যথাক্রমে **পাপ** ও **পুণ্যের**

বোধে পরিবর্তিত হয়ে গেল; যদিও তারাও পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগোতে ভুলল না। অতঃপর **দক্ষতার** ও **পণ্যজীবী**র অচেতন চেষ্টায় ভাষার প্রতীকীকরণ হল, **পণ্যের** সঙ্গে **পাপের**, পুঁজির সঙ্গে **পুণ্যের** স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। লোকে লক্ষ্মী-পুঁজিকে কুবের-পুঁজির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে লাগল এবং ক্রমে লক্ষ্মীর নামে কার্যত কুবের-পুঁজির আরাধনায় মত্ত হয়ে **পাপকর্ম্মা** হতে লাগল, **পাপকারী, পাপকুয়া, পাপকৃৎ, পাপগ্রহ, পাপচর্য্যা**য় সমাজ ভরে যেতে লাগল। **পাপদৃষ্টি, পাপধী, পাপনিশ্চয়**কারী **পাপবুদ্ধি**তে জগৎ ভরে যেতে লাগল। **পণ্যের** 'চাহিদা' ('...চাহি, দাও!', '...চাহি, দাও!') ঘোষণা করে **পাপিষ্ঠা**রা 'পিউ পিউ', বা 'পান করিব', 'পান করিব' বলে চেঁচাতে লাগল। গোটা সমাজটাই কুবের-পুঁজির আরাধানায় মত্ত হয়ে **পণ্যের** বা **পাপের** পাহাড়ের তলায় চাপা পড়তে লাগল। ...

কিন্তু সবক্ষেত্রে আমাদের সমাজপরিচালক মৌলবাদীরা যা করেছেন, এক্ষেত্রেও তাই করেছেন তাঁরা। **দক্ষোৎপত্তির** পর সমাজ যে স্বাভাবিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আ**বর্ত্তমান** হতে হতে এগোতে বাধ্য হয়, সেই নিয়মে মানুষ সামাজিক নিয়ম লঙঘন করে ক্রমান্বয়ে **পণ্য-পাপে** ডুবতে থাকে এবং নানারকমের **নরক**-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। মৌলবাদীরা সেই **পণ্য-পাপকর্ম্ম** দেখতে পেলেন না, দেখলেন সামাজিক নিয়মলঙঘন এবং তাকেই **পাপ** বলে শনাক্ত করে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধানে বিধানে মানুষের জীবনযাত্রাকে অজস্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে প্রায় অচল করে তুললেন। যেন, **পাপ** যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করার দরকার নেই; **পাপকর্ম্ম** চলুক, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে। ... দ্র. **কুষ্ঠ**, **কুষ্ঠঘ্ন**।

পাম (পামঘ্ন, পামঘ্নী, পামর, পামরি, পামরী, আপামর) : ১. ✓পা + মন্ (মনিন্) - অপাদানবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পাম*** = *(বাহ্যবস্তু) পাওয়াতেই মন যাহার।* ***পামঘ্ন*** = ***পাম****-কে হনন করে যে।* ***পামঘ্নী*** = ***পামঘ্ন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***পামর*** = ***পাম*** *রহে যাহাতে।* ***পামরি*** = ***পামর*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পামরী*** = ***পামরি****র আধার যে।* ***আপামর*** = ***পামর*** *হইতে (আরম্ভ করিয়া সমাজপরিচালকের ঠিক পরের জন পর্যন্ত) সকল শাসিত (জন)।* **৩. পাম** = বিচর্চ্চিকা, কচ্ছু, খোস, চুলকানি। **পামঘ্ন** = গন্ধক। **পামঘ্নী** = কটুকা। **পামর** = প্রাকৃত, নীচ, ইতর, খল, মূর্খ, পামরোগযুক্ত, খ'সো (scabby)। **পামরি, পামরী** = রেশমী বস্ত্রবিশেষ, রেশমী উত্তরীয়, দোপাট্টা। **আপামর** = পামর হইতে সর্ব্বজন বা সাধারণ লোক, নীচ মূর্খ হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলই। (ব.শ.)। **৪.** general people অর্থে **আপামর** শব্দটি প্রচলিত, বাকি সবই অপ্রচলিত। **৫. পামর** শব্দটি **পাষণ্ড** শব্দের মতোই প্রাচীন। **পামর** বলতে সেই মানুষদের বোঝানো হত, যাদের গা দাদ, খোস-পাঁচড়া, চুলকানিতে ভরা এবং অধিকাংশের গায়ে **কুষ্ঠ**রোগের ছোপ-চিহ্ন, যারা জনসমাজের প্রান্তে থাকত, যাদের সামাজিক **মর্য্যাদা** একেবারেই ছিল না, সমাজ যাদের খানিকটা ঘৃণার চোখে দেখত। এরকম মানুষদের দেখা পাওয়া যেত অতি প্রাচীন কালের যৌথসমাজে। প্রাচীন ইউরোপে সমাজের বসবাসের এলাকা থেকে এদের বিতাড়িত করে পাহাড়ের ওপারে ঘেরা অঞ্চলে গিয়ে থাকতে বাধ্য করা হত। এশিয়ায় এরা সমাজের ভিতরে থাকলেও তারা বাস করত নগর ও গ্রামের প্রান্তে; সমাজ এদের নিতান্তই করুণার চোখে দেখত। চীনা সাহিত্যিক লু সুন তাঁর True Story of Ah Q গল্পে তেমনই এক চরিত্রকে হাজির করেছেন। ...

আদিতে এই মানুষদের **পামর** বলা হত এইজন্য — এরা যৌথসমাজের স্বাভাবিক নীতি মান্য না করে সবসময় **পাম পাম** করত অর্থাৎ 'এটা আমি পাব', 'এটা আমি পাব' এইরকম লালায়িত আচরণ করত। তাই এদের **পামর** বলা হত। কিন্তু বৈদিক যুগের সূচনায় **দক্ষতার মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠার পর সমাজের উপরিতলের বাসিন্দা সমাজপরিচালক **দক্ষ**রা স্বভাবতই খানিকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে উঠেছিল, যদিও সমাজ তখনও সম্পূর্ণতই যৌথ এবং বাকি সমস্ত সমাজসদস্যই ছিল যৌথতাবাদী। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সমাজ-পরিচালকদের গুপ্ত-আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ছাপ ফেলে সমাজের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশে। (এরূপ ঘটনা আজও একইভাবে ঘটে।) আর, তারা প্রকাশ্যেই আত্মকেন্দ্রিক হতে শুরু করে। অথচ, যৌথসমাজের নিয়মে তখনও এরকম আচরণ স্বভাবতই নিন্দনীয় ছিল। সেজন্যই তাদের প্রতি সমাজ-পরিচালকদের অত্যাচার নেমে আসত। (কেননা, শাসকের গোপন কথা শাসিতের আচরণ প্রকাশ করে দিচ্ছে। শাসকের চোখে এরা স্বভাবতই ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।) এই অত্যাচার সেকালের অত্যাচারিতের চোখে ছিল 'ভাইয়ের প্রতি দাদার অত্যাচার' এবং অতএব অত্যন্ত মনোব্যথার কারণ। (মনে রাখা দরকার, তখনকার মানুষ এখনকার মানুষের তুলনায় বহুগুণ 'আবেগময়' ছিল।) এর দুরকম ফল ফলত। সামাজিক দিক থেকে তারা হয়ে যেত অপাঙ্‌ক্তেয়, জৈবিক দিক থেকে হয়ে যেত 'সোরাগ্রস্ত' (psora-গ্রস্ত)। **পাম-পাম** (পামু-পামু বা পাইব-পাইব) করার ব্যক্তিমালিকানা-গুণবিশিষ্ট মানসিক চুলকানি দেখা দিত তাদের শরীরেও। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের জনক হ্যানিম্যান একেই চিহ্নিত করেন 'সোরা'(Psora)-দোষ বলে। ... (এ বিষয়ে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ৫৮-৬৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা আছে।)

এই সব কারণে, **আপামর** শব্দের অর্থ জানতে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেলেও বাকি শব্দগুলির আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। কারণ মানুষের ঝাঁকে বা সমাজে শাসকের সংখ্যা যদি ৫ শতাংশও হয়, ৯৫ শতাংশই শাসিত। এই ৯৫ শতাংশকে একশব্দে উল্লেখ করার প্রাচীন শব্দ হল **আপামর**। একটি সমাজের শাসিতদের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশ থেকে শুরু করে সবচেয়ে অগ্রণী অংশ পর্যন্ত সমস্ত শাসিত মানুষকে বলা হত **আপামর** জনসাধারণ। 'আসমুদ্রহিমাচল' শব্দে 'সমুদ্র' থেকে 'হিমাচল' পর্যন্ত সবাইকে বোঝানো হয়। কিন্তু **পামর** থেকে কোথা পর্যন্ত, সেকথাটি স্পষ্ট করে **আপামর** শব্দে বলা নেই। এরকম হওয়ার কারণ চট করে বোঝা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথ একটি কারণের কথা বলে গেছেন। 'কালান্তর' নিবন্ধে একস্থানে তিনি বলছেন, 'আজকাল দেখছি, আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে।' কিন্তু প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতার সেই দায়িত্ববোধ অনেকটাই ছিল। সেই কারণে, সমগ্র শাসিত জনসাধারণ বোঝাতে

পামর থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত, সেকথাটি বলতে তাঁদের ভদ্রতায় বেধেছিল। প্রায় একই কথা আরও দু-একটি ক্ষেত্রে বলা যায়। দ্র. **ইতর**। কেননা, যে জ্ঞানজীবী-সম্প্রদায় সমাজ চালাতেন, তাঁদের ঠিক কোন অংশ থেকে নীচের দিকে শাসিতশ্রেণীর সূচনা, তা স্পষ্ট করে বলা তাঁদের ভদ্রতায় বেধেছিল। তাছাড়া সেই ভেদরেখাটি খুব স্পষ্টও ছিল না। ...

আপামর শব্দটি আজও প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তা ব্যবহৃত হয় 'সমগ্র জনসাধারণ' বা general people বোঝাতে। অর্থাৎ কিনা, **আপামর** শব্দের ভিতরের অর্থটি বাদ দিয়ে তার প্রতীকী অর্থে শব্দটির প্রয়োগ চলে।

পায়ু (পায়ুকাম, পঁদু) : ১. **পায়ু** = ✓পা + উ (উণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পায়ু*** = ***পা****-এর (পাওনের বা পালনের বা পানের) যাওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***পায়ুকাম*** *= 'পায়ু'র (মলদ্বারের) প্রতি কামনা যাহার।* ***পঁদু*** *=* ***পঁদ*** *(পাওয়া-পালনাদির রহস্যরূপ দান করে যে) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. মলদ্বার, গুহ্য। (ব.শ.)। ৪. rectum অর্থে প্রচলিত। ৫. জীব মুখ দিয়ে পায়, মলদ্বার বা **পায়ু** দিয়ে ত্যাগ করে। তার মানে, জীবশরীরের মুখ দিয়ে খাদ্য ঢোকে এবং তার **পায়ু** দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। পাওয়া বা 'পেয়ে ভরে ওঠা' **পায়ুতে** গিয়ে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে 'খালি করে দেওয়া'য় পরিণত। এই যে রিক্ত করে দেওয়া, ইংরেজিতে তারই উত্তরাধিকার রয়েছে 'রিক্তম্' বা rectum শব্দে। ধারণাগত বিচারে, দুটি শব্দই যথার্থ বটে। অন্যদিকে যারা '**পঁদ**-মারামারি করে', সেই sodomite-দের বোঝাতে **পঁদু** শব্দটি একালের বঙ্গদেশের জেলখানায়, ভারতের সামরিকবাহিনীর বাংলাভাষীদের মহলে এবং সমগ্র গ্রামবাংলায় শুনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যভিচারী ব্রহ্মচর্যবাদীদের মধ্যেও শব্দটির গোপন যাতায়াত রয়েছে। দ্র. **পঙ্ক, পঁদ** (pond)।

কিন্তু বাংলাভাষার সাম্প্রতিককালের বিশেষজ্ঞরা 'অতি চালাক'। তাঁরা তো 'পঁদমারা' কিংবা **পঁদু** শব্দটি কোনোদিনই শোনেননি। তাই তাঁরা একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছেন — **পায়ুকাম**। শব্দটি তাঁদের শব্দজ্ঞানের দৌড়ের স্পষ্ট নিদর্শন। এই কুকর্মটি তাঁরা করেছেন ইংরেজি sodomy শব্দের বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে। (বাইবেলের Old Testament অংশে বর্ণিত Sodom শহরের নাম থেকে সম্পূর্ণ প্রতীকী রীতিতে সৃষ্ট শব্দ হল sodomy।) আমরা দেখতে পাচ্ছি, **পায়ু** শব্দের উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের ধারণাগত দিকটি (বের করে দেওয়া, খালি করা) বাংলা ও ইংরেজি (ল্যাটিন) উভয় ভাষায় রয়েছে। সেই **পায়ু** বা rectum-কে তাঁরা বুঝেছেন একটি 'গর্ত' রূপে এবং সেই 'গর্তের প্রতি কামনা' বোঝাতে তাঁরা **পায়ুকাম** শব্দটি তৈরি করেছেন। এধরনের শব্দসৃষ্টি না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে থেকে যায়। **পায়ু** শব্দটিকে তাঁরা প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু **কাম** শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে। ফলে শব্দটি আধা-স্থির আধা-চলমান স্বভাবের হয়ে গেছে। বস্তুজগতে কিন্তু এরকম জীবের অস্তিত্ব নেই, যার আধখানা চলে এবং বাকি আধখানা দাঁড়িয়ে থাকে! শব্দজগৎ যেহেতু বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবি বহন করে, সেখানে তেমন শব্দ থাকা সেকারণেই ত্রুটিপূর্ণ। অথচ সাধারণ বাংলাভাষী বহু আগেই তদ্রূপ sodomite সত্তাকে বোঝাতে **পঁদু** শব্দটি তৈরি করে রেখেছেন। কেননা তাদের বিচারে **পঁদ** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে **যোনি**র কার্য্য করতে বাধ্য হয়, তখন তদ্রূপ কার্যকারীকে **পঁদু** বলাই যুক্তিযুক্ত।

পিতা (পিতৃ) : ১. ✓পা + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পিতা*** *=* ***পি****-র (= গতিশীল পালনের) তারণ থাকে যাহাতে।* ***পিতৃ*** *=* ***পি****-তারণ আবর্তমান যাহাতে।* / **পিতা, পিতৃ** = পালন করে যে; জনন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **পিতা, পিতৃ** = জনয়িতা, শিক্ষারক্ষণাদিহেতু পিতৃত্বাপন্ন জন, ধর্ম্মতঃ পিতৃবৎ পূজ্য, মন্ত্রদাতা, গৌণ পিতৃব্যাদি, ... শ্রাদ্ধোদ্দেশ্যে প্রাপ্তপিতৃলোকক। (ব.শ.)। ৪. **পিতা** father অর্থে প্রচলিত, **পিতৃ** অপ্রচলিত। ৫. যিনি পালনকর্মটিকে গতিশীল করে সন্তানের ভিতরে তারণ করেন, তিনিই পিতা। বিষয়টিকে স্পষ্ট বোঝা যায় **পিতৃঋণ** শব্দে। ... ৬. Greek, Latin - pater, Teutonic - fadar, Kelt - fathir, Danish, Swedish - fader, Aanglo-Saxon - fæther, English - father (ব.শ.)। Avestan - pitar।

পিতৃঋণ (পিতৃতর্পণ) : ২. / **পিতৃতর্পণ** = যার দ্বারা পিতৃতৃপ্তি সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. **পিতৃঋণ** = পিতৃগণের ঋণ। **পিতৃতর্পণ** = জলদানরূপ পিতৃগণের তৃপ্তিজনক ব্যাপার, পিতৃযজ্ঞনামক নিত্যশ্রাদ্ধ। (ব.শ.)। ৪. ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে কার্যকারণ-বিস্মৃত আচার রূপে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ১ম খণ্ডের **ঋণ** ও **তর্পণ** শব্দে।

পিতৃগণ (পিতৃদেবগণ) : ৩. পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ, পিতামহাদি, চন্দ্রলোকস্থ সপ্তপিতৃগণ — বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুকাল, হবিষ্মান্, সুস্বধা, সোমপ (মতান্তরে কব্যবাল, অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, আগ্নিস্বাত্ত, বর্হিষদ্, সোমপ — সপ্ত পিতৃদেবতা।)। (ব.শ.)। মনুসংহিতা অনুসারে, হিরণ্যগর্ভ মনু থেকে মরীচি প্রভৃতি যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই পুত্রপরম্পরায় 'পিতৃগণ' নামে অভিহিত। দ্রষ্টব্য স্বধা। এই পিতৃগণের মধ্যে বিরাটপুত্র সোমসদগণ সাধ্যগণের, মরীচিপুত্র অগ্নিস্বত্তাদি দেবগণের, এবং অত্রিপুত্র বর্হিষদগণ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, সুপর্ণ, ও মানুষদের পিতৃগণ। (পৌ.অ.)। ৪. ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে শব্দদুটি কমবেশি প্রচলিত থাকলেও সাধারণভাবে অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নিস্বাত্ত**। এই **পিতৃগণ** কারা, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী, তাঁদের ইতিহাসই বা কী, কেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উত্তরাধিকার আজও কিছু পরিমাণে প্রচলিত আছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা কেবল এটুকু বুঝতে পারছি যে, উপরোক্ত 'চন্দ্রলোক', এবং সেই লোকে অবস্থানকারী 'সপ্তপিতৃগণ'কে বা 'সপ্তপিতৃদেবগণ'কে তাঁদের নামের অর্থ ধরে ধরে বুঝে নিতে পারলে তবেই আমরা তাঁদের সম্পর্কে খানিকটা জানতে পারি। কিন্তু সে কাজ খুব সহজ নয়, এই পরিসরে তা করাও কঠিন। শুধুমাত্র এই উল্লেখটুকু করে যাওয়া সমীচীন মনে করি, যে, **সপ্তর্ষিগণ**-

এর আদি রূপকেই সম্ভবত **সপ্তপিতৃগণ** বলা হত। ...

পিতৃযান : ২. / পিতাদের যান। (ছা.অ.)। ৩. পিতৃগণের চন্দ্রলোকে গমনমার্গ, আবৃত্তিফল ধূমাদিমার্গ। যজ্ঞ বেদপাঠ দান ও তপস্যা পিতৃযানপথে অবস্থিত, অর্থাৎ পিতৃযানের অনুকূল অনুষ্ঠান। গৃহস্থগণ গ্রামে ইষ্ট পূর্ত্ত ও দানাদির অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে ধূমাদিদেবতাক্রমে পিতৃলোক ও তৎপরে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং কর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে নিবৃত্ত হন। তন্ত্রমতে, ইড়া পিতৃযান। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দেবযান**। বিষয়টি ১ম খণ্ডে **দেবযান** শব্দে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা যোগ করা দরকার। সেকালের ভাষায় **যান** বোঝাত দর্শনকে, যার সাহায্যে মানুষের মানসিক গমন চলে। প্রাচীন ভারত সর্বপ্রকারের দর্শনকে অখণ্ডভাবে বুঝত এবং তার নাম দিয়েছিল **অধ্যাত্ম**। সমাজ বিভাজিত হলে, তার অখণ্ডদর্শন ভেঙে নানা খণ্ড দর্শনের জন্ম হয়। প্রথমে জন্মায় দুই ভাই — **পিতৃযান** ও **দেবযান**। **পিতৃযান**কে আদিম সমাজতন্ত্রের দর্শন বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এই দর্শন অধঃপতিত হলে, তাকে 'অসুরস্বামিক **দেবযান**' বলা হয়। তখন উদ্ভূত হয় বিশ্বের আদি ধনতান্ত্রিক দর্শন। তাকে বলা হত 'ইন্দ্রস্বামিক **দেবযান**'। পরবর্তীকালে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দর্শনই **দেবযান** পদবাচ্য হয়ে যায়। তারও পরে উপরোক্ত **অধ্যাত্মবাদ**-এর দুই সন্তান **পিতৃযান** ও **দেবযান**-এর আরও অনেক সন্তান জন্মায়। **মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, সহজযান** ... ইত্যাদি তাদেরই নাম। ...

পিতৃলোক : ২. / পিতাদের লোক। (ছা.অ.)। ৩. দিব্য পিতৃগণের অধ্যুষিত লোক। (ব.শ.)। এই পৃথ্বীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে ভাগ বিভিন্ন এবং নামও বিভিন্ন। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন অনুসারে সমস্ত লোকের মধ্যে পিতৃলোকও একটি। এই পিতৃলোকে পিতৃ, ঋষি ও প্রজাপতিরা বাস করেন। (পৌ.অ.)। ৫. সহজে বুঝলে **পিতৃলোক** হল এমন একটি লোক (sphere), যেখানে সেকালের **পিতৃগণ** থাকতেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড চালাতেন। একালের ইংরেজি ভাষায় সেই **পিতৃলোক**কে sphere of the guardians বলা যেতে পারে। আসলে 'সনাতন সমাজ' ছিল স্বভাবগতভাবে আদিম সাম্যবাদী; আর তারপরে যে বৈদিক সমাজের সূচনা হয়েছিল, তা ছিল স্বভাবগতভাবে আদিম সমাজতন্ত্রবাদী। এই বৈদিকযুগের সমাজ-পরিচালকদের বলা হত **পিতৃগণ**। তথ্যানুসারে **ঋষি**, **প্রজাপতি** ও পূর্বসূরিগণ **পিতৃগণ** রূপে গণ্য হতেন। বলে রাখা ভাল, **পিতৃগণ** যখন পূর্ণরূপে সক্রিয় তখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি। ... দ্র. **গাঁটছড়া**।

***পি (পিং, পিচ্, পিঞ্জ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আগুপিছু, আগেপিছে, ছেলেপিলে, পিআদা (পেয়াদা), পিওন (পি-অন্, peon), পিঁজ, পিঞ্জ, পিঁপড়া, পিঁপড়ে, পিঁপুল, পিঁয়াজ, পিক, পিকবন্ধু, পিকবল্লভ, পিকরাগ, পিঙল, পিঙ্গ, পিঙ্গল, পিঙ্গলা, **পিঙ্গা**, **পিঙ্গাক্ষ**, **পিঙ্গাশ**, পিচ্, পিচকারি(রী), পিচ(ছ)পা, পিচপিচ পিচবোর্ড, **পিচ(ছ)মোড়া**, পিচিণ্ড, পিচিণ্ডিকা, পিচু, পিচুটি, পিচ্চট, **পিচ্ছ**, **পিচ্ছল**, **পিচ্ছিকা**, **পিচ্ছিল**, পিচ্ছিলা, পিছ, পি(পে)ছন, পিছপা, **পিছমোড়া**, **পিছল**, **পিছলা**, পিছলিনী, পিছা, পিছাড়ি (পিছাড়ী), পিছারে, **পিছিলা**, **পিছু**, **পিছে**, পিছোড়া, পিঞ্জ, পিঞ্জ, পিঞ্জ, পিঞ্জন, পিঞ্জর, পিঞ্জরা, পিঞ্জা, পিঞ্জিকা, পিঞ্জিরা, পিট্, পিট, পিটক, পিটকা, পিটন, পিটনি, পিটনা, পিটপিট, পিটা, পিটা(ঠা)লি, পিটা(ঠা)লী, পিটুলি, পিট্টু, পিট্টু, পিট্টান, পিঠ্, পিঠ, পিঠউঁড়া, পিঠ-পিঠ, পিঠ-বোচকা, পিঠমোড়া, পিঠর, পিঠরী, পিঠা, পিঠাপিঠি, পিঠাল, পিঠালি, পিড়া, পিড়ি, পিড়িং, পিড়িংপিড়িং, পিড়ী, পিণাক, **পিতুলা**, পিত্ত, **পিত্তকোষ**, পিত্তঘ্ন, পিত্তঘ্নী, পিত্তজ্বর, পিত্তদোষ, পিত্তপ্রকৃতি, **পিত্তপ্রকোপ**, **পিত্তরক্ত**, পিত্তশমন, পিত্তল, পিত্তারি, পিত্তি, পিত্তি-পড়া, পিন্, পি(পী)ন, পিনদ্ধ, পিনাক, পিনাকটঙ্কার, পিনাকগোপ্তা, পিনাকপাণি, পিনাকিনী, পিনাকী, পিনাশ, পিনাস, পিনীস, পিনেস, পিন্দ(ন্ধ), পিন্দ(ন্ধ)ন, পিন্দা, পিন্ধা, পিপ(পু)ললতা, পিপলিয়াশৌল, পিপা, পিপারমেন্ট, পিপাসা, পিপাসু, পিপী, পিপীড়া, পিপীতকী, পিপীল, পিপীলক, পিপীলা, পিপীলাঞ্চি, পিপীলিক, পিপীলিকা, পিপীলী, পিপুল, পিপ্পল (people), পিপ্পলাই, পিপ্পলাদ, পিপ্‌লাই, পিপ্পলি(লী), পিপ্পু, পিশাচ, পি(পে)য়াদা, পি(পে)য়ারা, পিয়াল, পি(পে)য়ালা, পিয়াশা(সা)ল, পিয়াস, পিয়াসী, পি(পী)র, পিরান, পিরাহন, পিরিচ্(জ্), পিল(লে), পিলপা, পিলপিল, পিলসুজ, পিলু, পিল্লা, পিহিত, পীঁজ(জি)র, পীক, পীকদানি, পীঠ, পীঠা, পীর, পীল, পীলু, পেল, পেলা, পেলাপেলি, পেলব, পেল্লাদেপুতুল, পৈপ্পল, প্যাদা, প্যালা।

পি (পিং, পিচ্, পিঞ্জ্) = গতিশীল পায়ী। **পিং** = গতিশীল পায়ীর রহস্যরূপ যাহাতে। **পিচ** = গতিশীল পায়ীর চয়ন যাহাতে। **পিঞ্জ** = গতিশীল পায়ীর রহস্যরূপের জনন যাহাতে।

পিক (পিকদানী, পিকবন্ধু, পিকবল্লভ, পিকরাগ, পিকবান্ধব, পিকসীমন্তিনী) : ১. পি + ✓কৈ (শব্দ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পিক** = পি (পান-করি, পান-করি) করে যে।* ৩. **পিক** = কোকিল, 'পিক' বা 'পিচ' শব্দে নির্গত চর্ব্বিত পানের রস, ছেপ। **পিকদানী** = পিক ফেলার পাত্র, প্রতিগ্রাহ। **পিকবন্ধু, পিকবল্লভ, পিকরাগ** = আম্রবৃক্ষ। **পিকবান্ধব** = বসন্তকাল। **পিকসীমন্তিনী** = কোকিলা। (ব.শ.)। ৪. সবগুলিই অপ্রচলিত। ৫. বাংলাভাষার কত শব্দ যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেকথা আর একবার মনে করাতে এই শব্দকয়টি দেওয়া হল। কার্যত মধ্যযুগের বাংলাতে **পিক** ও **পিক**-যুক্ত প্রচুর শব্দ ছিল, যেগুলিকে ঝাড়েবংশে পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, যে বিষয়গুলিকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে শব্দগুলি সৃজিত হয়েছিল, সেই ব্যাপার হাজারগুণ বেড়ে গেছে। কী সেই ব্যাপার? সে ব্যাপার হল **আম**, আমার, **আম**-গাছের বা ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থার বিপুল বৃদ্ধি। তার ফল ফলছে, তার গৌরব গাইছে **পিক** ও পিকীরা। লোকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেগুলি আর দেখতে বা বুঝতে পারছে না, দেখছে

অতি খণ্ডভাবে, টুকরো টুকরো করে। ফলে তাদের চিন্তাভাবনার এলাকা অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, যাচ্ছে। ...

লোকে যখন পান চিবিয়ে খায়, তখন তার প্রিয় রসটুকু গ্রহণ করে এবং কিছু অংশ বাইরে ফেলে দেয়। অর্থাৎ তাদের **পি** করার অর্থ হল, 'পান-করি, পান-করি' বলে কিছু অংশ তারা গ্রহণ করে এবং বাকি অংশ বাইরে ফেলে দেয়; যেখানে কিনা কোকিলেরা 'পান-করি, পান-করি' বলে কিছু শব্দ বাইরে ত্যাগ করে। পান-খাওয়া মানুষের সেই **পি**-করণ 'দান করা হয় যে পাত্রে', তাকে বলে **পিকদানী**। একে 'থুতুপাল'ও বলা যেতে পারত। (দ্র. **পাল**)। বলা হয়ে থাকে যে, **দান** শব্দটি ফারসি থেকে আগত; পরে আমাদের পূর্বসূরি বাংলাভাষীরা তাকে শব্দের প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করে নিয়েছেন — 'ফুলদানী', 'বাতিদানী' ... ইত্যাদি। দেখাই যাচ্ছে, মূলে শব্দটি আদৌ অনাত্মীয় নয়। ... **৬.** ইংরেজি pick, pitch ... ইত্যাদি।

পিঙ্গ (পিঙ্গল, পিঙ্গলা, পিঙ্গা, পিঙ্গাশ, পাঙাশ) : **১.** পিঙ্গ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***পিঙ্গ*** = *পি-র জন্য (প্রাপণেচ্ছায়) রহস্যময়ভাবে গমন করে যে।* ***পিঙ্গল*** = ***পিঙ্গ*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***পিঙ্গলা*** = ***পিঙ্গল****-এর আধার যে।* ***পিঙ্গা*** = ***পিঙ্গ****-র আধার যে।* ***পিঙ্গাশ*** = ***পিঙ্গ*** *ব্যাপ্ত যাহাতে।* ***পাঙাশ*** < *পিঙ্গাশ।* **৩.** **পিঙ্গ** = পিঙ্গলবর্ণবান, স্বর্ণবর্ণ, দীপশিখাভবর্ণ, নীলপীতবর্ণ, কপিল, মূষিক, মহিষ, হরিতাল। **পিঙ্গল** = নীলপীতমিশ্রবর্ণ, অগ্নি, কপি, নকুল, ক্ষুদ্রোলূক, কুবেরনিধিভেদ, রুদ্রভেদ, প্রাকৃতভাষায় ছন্দোগ্রন্থ রচয়িতা পিঙ্গল নাগ, পিঙ্গলকৃত ছন্দোগ্রন্থ, পিত্তল, হরিতাল। **পিঙ্গলা** = দক্ষিণদিগ্‌গজের স্ত্রী, কর্ণিকা, (তন্ত্রে) নাড়ীভেদ (ইহা দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত, দক্ষিণ নাসার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে সূর্য্য অবস্থিত।)। রাজরীতি, পিত্তলভেদ, বেশ্যাবিশেষ। **পিঙ্গা** = গোরোচনা, হিঙ্গু, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, বংশরোচনা, চণ্ডিকা। **পিঙ্গাশ** = পিঙ্গলমুখ, পাঙাশমাছ। **পাঙাশ (পাঙ্গাশ)** = শল্কহীন চেপ্টা মৎস্যবিশেষ (Pangasius buchanani), পিঙ্গল, ফেকাশে। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র **পাঙাশ** ছাড়া আর সমস্ত শব্দই কমবেশি অপ্রচলিত। **৫. পিঙ্গ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি কত বিশাল এলাকাকে বোঝাতো, উপরোক্ত **৩**-এ প্রদত্ত অর্থগুলির দিকে তাকালেই সেকথা বোঝা যায়। শব্দগুলিকে ফেলে দেওয়া মানে, জ্ঞানের সেই বিশাল এলাকা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। অথচ এমনকি ইংরেজও তাঁদের pink (যার উচ্চারণ বিলিতি অভিধানেই লেখা রয়েছে pingk) শব্দটি নিয়ত ব্যবহার করছেন। এমনকি তাঁরা এর ধারণাটিকেও ধরে রেখেছেন তাঁদের pink of perfection শব্দবন্ধের ভিতরে। আমরা কিন্তু আমাদের **পিঙ্গ, পিঙ্গল**দের ভুলে গেছি, মনের ঘর থেকে শব্দগুলি ও তাদের ধরে রাখা ধারণাগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর গেছি ইংরেজির শরীরের নকল করতে। তাঁদের pink-কে নিয়ে এসে নিজের নিজের মেয়ের নাম রেখেছি 'পিঙ্কি' (Pinky)। আর **পিঙ্গলা**? তন্ত্রে এই 'ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ...' ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে মানবশরীরতন্ত্র ও সমাজশরীরতন্ত্রের কোনো কিছুই বোঝার উপায় থাকে না। অতএব এক্ষেত্রে ইংরেজের নকল করাই ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো থেকে শুরু করে মার্কস পর্যন্ত সকলের কাছে হাত পাতি ... শিখি — ইহাকে রাষ্ট্র বলে, উহাকে গণতন্ত্র বলে ইত্যাদি বলতে বলতে of the people, for the people, by the people মুখস্থ করি। এইভাবে পাশ্চাত্যের সমাজশরীর-বিষয়ক অতি খণ্ড জ্ঞান ধার করে আনি এবং শেষমেষ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না — পিতৃশ্রাদ্ধে-কন্যাদায়ে যদি গ্রামের পঞ্চজনের কাছে যাই, তবে সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্য কোর্টে যাব কেন? আমাদের সমাজ বড় না রাষ্ট্র বড়, কোর্টের রায় মানব নাকি গ্রামের পঞ্চজনের বিচারের রায় মানব? মাঝ থেকে আমাদের সমাজশরীর-রাষ্ট্রশরীরকে আর বুঝতেই পারি না, তার বিকাশসাধন করা বহু দূরের কথা। রইল বাকি **পিঙ্গ** ও তজ্জাত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কী, সে সকল কথা জানার চেষ্টা।

পিঙ্গ, পিঙ্গল, পিঙ্গলা প্রভৃতি শব্দের অর্থ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি — **পিঙ্গল**বর্ণ, নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলপীতমিশ্রবর্ণ, কপিলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ এবং সর্বোপরি pink-বর্ণ — এসব যেন খুবই কাছাকাছি ব্যাপার, যেকারণে তারা এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে একত্র জড়িয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র রঙের দুনিয়ায় যদি এর কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে তার থৈ মিলবে না। কেননা, রং বা colour-গুলির বিষয়ে আমাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এখনও সেই সূক্ষ্মতায় পৌঁছয়নি। অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই যে, আমরা বলতে পারি কোন ক্রিয়া করার কারণে লালকে লাল, নীলকে নীল, পীতকে পীত, পিঙ্ককে পিঙ্ক ... ইত্যাদি বলে।

বাংলার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি কিন্তু স্পষ্টরূপে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবার যোগ্যতা ধরে, আমরা তা উদ্ধার করতে পারি আর নাই পারি। যেমন **পিঙ্গ** ও **পিঙ্গল**-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, 'প্রাপণেচ্ছায় রহস্যময়ভাবে গমন করে যে' সেই সত্তাই দেখতে **পিঙ্গল**বর্ণ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটিকে অতি সূক্ষ্মতায় যেমন বোঝা কঠিন, তেমনি অতি বৃহৎ অবস্থাতেও বোঝা সম্ভব নয়। আমরা একে খানিকটা চিনতে পারি মাঝারি ক্ষেত্রে। এই মাঝারি ক্ষেত্রটি হল মানুষের সমাজ। সেখানে যার বিন্দুমাত্র প্রাপণেচ্ছা নেই, তাকে বলা হয় 'শ্বেত' বা 'সিত' (দ্র. **দেবল**)। একাধারে লালনেচ্ছা ও লয়করণেচ্ছা নিয়ে যে এগোয়, সে হয় 'লাল', যেকারণে রুদ্রের **যতিধর্ম্ম**-রূপের রং হয় 'লাল'। কিন্তু যাদের মধ্যে 'প্রাপণেচ্ছা' নানাভাবে নানামাত্রায় থাকে, তাদের রং হয় **কপিল, নীল, পীত, হরিদ্রা, ধূসর** ... ইত্যাদি। উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সোনার রং, দীপশিখাভ রং, নীলপীতমিশ্র রং, আগুনের রং, পিতলের রং, কপিল রং, হরিদ্রা রং, এবং ফেকাশে রং — **পিঙ্গ** বা **পিঙ্গল** বা pink বোঝাতে এই সবগুলি রংকেই আনা হয়েছে। আবার, জড়জগতে গোরোচনা, হিঙ্গু, কুঙ্কুম, বংশরোচনা ... প্রভৃতিকে বলা হয়েছে যে তারা **পিঙ্গ বা পিঙ্গ**জাত। ওদিকে জীবজগতে মূষিক, ক্ষুদ্রোলূক (ছোট পেঁচা), কপি, নকুল, মহিষ, হরিতাল (হরিয়াল পাখি) ... প্রভৃতি জীবকে একই গুণসম্পন্ন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আর, আমরা তো ইতোমধ্যে জেনেই গেছি যে, মানবসমাজেও **মূষিক, উলূক, কপি, নকুল, মহিষ** ... প্রভৃতি মানবিক সত্তাও রয়েছে। রইল বাকি কুবের-নিধিভেদ, রুদ্রভেদ, চণ্ডিকা, প্রাকৃতভাষায় ছন্দোগ্রন্থ রচয়িতা পিঙ্গল নাগ, পিঙ্গলকৃত ছন্দোগ্রন্থ, দক্ষিণদিগ্‌গজের স্ত্রী,

কর্ণিকা, রাজরীতি, বেশ্যাবিশেষ ... ইত্যাদি এবং সর্বোপরি তন্ত্রের **পিঙ্গলা** নাড়ী। আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ জড়জগৎ, জীবজগৎ তথা মানবসমাজের উপরোক্ত প্রতিটি সত্তাকে **পিঙ্গ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দে চিহ্নিত করে গিয়েছেন। কীভাবে তাঁরা বুঝলেন, ওগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনোভাবে 'প্রাপণেচ্ছা'-গুণবিশিষ্ট তা আমরা জানি না। শুধুমাত্র মানবসমাজের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সত্তাগুলি যে কমবেশি 'প্রাপণেচ্ছা'-গুণবিশিষ্ট, সেকথা আমরা এখন বুঝতে ও বোঝাতে পারি। বাকি ক্ষেত্রগুলির ব্যাপারে আমরা নিরুপায়। যে প্রকৃতিসংলগ্নতা ও স্পর্শকাতরতা থাকলে সেসব বোঝা সম্ভব হত, শুধুমাত্র আকাট-গণতন্ত্র ও আকাট-পদার্থবিজ্ঞান ভিত্তিক আকাট-আধুনিকতা সেবন করতে গিয়ে সেসব আমরা হারিয়েছি। ... **৬.** ইংরেজি pink ... ইত্যাদি।

পিছন (আগুপাছু, আগেপিছে, পিছপা, পিছমোড়া, পিছা পিছাড়ি, পিছাড়ি-মারা, পিছান, পিছা-নেওয়া, পিছারে, পিছিয়ে-পড়া, পিছু, পিছু-পিছু, পিছে, পিছোড়া, পেছন, পেছনে-লাগা, পেছনে-পড়া) : **২.** *দ্র.* ***পশ, পশ্চাৎ****। **পিছ** = **পি** (গতিশীল **প** বা প্রাপক) কর্তৃক পরিত্যক্ত বা **ছাড়া** যে। **পিছন** = **পিছ** অন (on) যাহাতে। **আগুপাছু** = আগ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে এবং পাছ (পশ্চাৎ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **আগেপিছে** = আগ দিশাগ্রস্ত যাহাতে এবং **পিছ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। **পিছপা** = **পিছ** হইয়াছে পা যাহার। **পিছমোড়া** = **পিছ** হইয়াছে মোড়া যাহার। **পিছা** = **পিছ**-এর আধার যে। **পিছাড়ি** = **পিছ**-এর **আড়ে** গতিশীলভাবে গড়ান-উড়ান যাহার। **পিছাড়ি-মারা** = **পিছাড়ি**-তে মার যাহার। **পিছান** = **পিছা** অন যাহাতে। **পিছু** = **পিছ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **পিছে** = **পিছ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।*
৩. পিছন, পেছন = পশ্চাৎ, পশ্চাদ্‌ভাগ, পৃষ্ঠদেশ। **আগুপাছু, আগেপিছে** = সামনে ও পেছনে। **পিছপা** = পশ্চাদ্‌পদ, পরাঙ্মুখ, অপারগ। **পিছমোড়া** = পিছে দুই হাত মোড়া দিয়া কৃতবন্ধন। **পিছা** = পশ্চাদ্‌ভাগ, ভাবী ফল, পরিণাম। **পিছাড়ি, পিছাড়ী** = পশ্চাদ্‌ভাগ, ঘোড়ার পিছনের পায়ে বাঁধা দড়ি। **পিছাড়ি মারা** = **চাট** মারা। **পিছান** = পরাঙ্মুখ হওয়া, অগ্রসর না হওয়া। **পিছা নেওয়া** = অনুসরণ করা। **পিছারে** = পিছনে। **পিছু** = পশ্চাৎ, পরে, পিছনে। **পিছু-পিছু** = পিছনে পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে। **পিছে** = পশ্চাদ্ভাগে, পিছনে, ভবিষ্যতে, পরিণামে, পরে, অনুপস্থিতিতে, পরোক্ষে, আড়ালে, প্রত্যেকে, ফি (per)। **পিছোড়া** = পশ্চাদ্‌গামী লোক, অনুচর। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। **৫.** বাংলায় কত শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছে, তার যেমন অজস্র উদাহরণ আমরা দিয়েছি, তেমনি মধ্যযুগে কত নতুন শব্দ বানানো হয়েছিল, তারও কিছু কিছু উদাহরণ আমরা দিয়েছি। পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অ্যাকাডেমিক-বাংলা আগের শব্দ তো ফেলেই দিয়েছে, এমনকি মধ্যযুগের নতুন শব্দগুলিকেও সারি দিয়ে পরিত্যাগ করেছে। কেবলমাত্র ইংরেজি শব্দের অনুবাদ করে যেসকল বাংলা শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলি ছাড়া কোনো বাংলা শব্দই তাদের বিচারে বাংলাভাষায় থাকা উচিত নয়। ...

যাই হোক, অন্য অন্য এশীয় ভাষার মতো বাংলাভাষাও আদিভাষার **শব্দসম্ভারের উত্তরাধিকার** পেয়েছিল জন্মসূত্রেই। ভারতীয় ভাষা হওয়ার সুবাদে বাড়তি পেয়েছিল সংস্কার করা **সংস্কৃত** ভাষার শব্দসম্ভার এবং সেই শব্দ তৈরির নিয়ম। আজ আমরা জানি, কার্যত এই নিয়মটিই ভাষার শব্দ তৈরির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়ম। এই উত্তরাধিকার বাংলার মতো তামিল, তেলুগু, মারাঠি, হিন্দি প্রভৃতি সমস্ত ভারতীয় ভাষাই পেয়েছিল। ...

কিন্তু তারপর যা হল, সেটি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়, থাকেনি। আদি উত্তরাধিকার যে যার নিজের মতো বহন করলেও সংস্কৃত শব্দসম্ভারের উত্তরাধিকার বহনের ক্ষেত্রে দেখা গেল, বাংলা ছাড়া প্রায় সব উত্তর-ভারতীয় ভাষাই সংস্কৃতের দেহ বহন করলেও আত্মাকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। বাংলা ভাষাকে দেখা যাচ্ছে, সে সংস্কৃতের দেহকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বহন করেনি, কিন্তু সংস্কৃতের আত্মাকে (শব্দ তৈরির নিয়মকে) সম্পূর্ণভাবে বহন করেছে। কেবল তাই নয়, তাকে আরও পরিণত করে সাধ্যমতো বিকশিত করে নিয়েছে। সেই কারণে বাংলাভাষায় আমরা অজস্র নতুন শব্দ পাচ্ছি, যা তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে, যাকে আপনি সংস্কৃতের নিয়মও বলতে পারেন। এখানে আমরা দেখছি, **পশ, পশ্চাৎ**-এর মতো শব্দের বিবর্তনে বাংলাভাষী **পিছন** ও তৎসংশ্লিষ্ট কত শব্দই না তৈরি করেছে। এসব শব্দ বাংলা নিজে বানিয়ে নিয়েছে এবং বানিয়েছে ভাষার শব্দ তৈরির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করেই। ... **৬.** আবেস্তা - passna, ইংরেজি postern।

পিট (পিটক, পিটকা, পিটন, পিটনি, পিটনা, পিটপিট, পিটপিটে, পিটা, পিট্ট, পিট্টু, পেট, পেটা, পেটলা-পেটা, টাঁচরা-পেটা, তাস-পেটা, বাক্স-পেটরা, ত্রিপিটক, বিনয়পিটক) : **১.** ✓পিট্ট। (ব.শ.)। **২.** ***পিট*** = ***পি*** *(গতিশীল প্রাপক) টঙ্কারিত যাহাতে।* ***পিটক*** *=* ***পিট*** *করে যে।* ***পিটকা*** *=* ***পিটক****-এর আধার যে।* ***পিটন*** *=* ***পিট*** *অন (on) যাহাতে।* ***পিটনা*** *=* ***পিটন****-এর আধার যে।* ***পিটনি*** *=* ***পিটন*** *গতিশীল যাহাতে (ছোট পিটনা)।* ***পিটপিট*** *=* ***পিট****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে (দ্র.* ***টিপটিপ****)।* ***পিটপিটে*** *=* ***পিটপিট*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***পিটা*** *=* ***পিট****-এর আধার যে।* ***পিট্ট*** *=* ***পি****-র টঙ্কারণ টঙ্কারিত যাহাতে।* ***পিট্টু*** *=* ***পিট্ট*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***পেট*** *=* ***পে*** *(দিশাগ্রস্ত প্রাপক) টঙ্কারিত যাহাতে।* ***পেটা*** *=* ***পেট****-এর আধার যে।* ***পেটলা-পেটা*** *=* ***পেটলা*** *(****পেট****-লালিত যাহাতে)* ***পেট*** *যাহার।* ***টাঁচরা-পেটা*** *= যাহাতে টাঁচরা পেটা হয়।* ***তাস-পেটা*** *= যাহাতে তাস পেটা হয়।* ***ত্রিপিটক*** *= তিনটি* ***পিটক*** *বা পেটরা আছে যাহাতে।* ***বিনয়পিটক*** *= বিনয়ের পেটরা।* **৩. পিট, পিটা** = তাড়না করা, মারা, পেটা, আঘাত করা, আঘাতে সংহত বা নিরেট করা, ধ্বনিত করা, বাজান; তাসখেলায় একবার তাড়িত বা নিক্ষিপ্ত তাস। **পিটক** = মঞ্জুষা, পেটক, পেটরা, ফলমূলাদ্যাহরণযোগ্য বংশপেটী, আধার, ভাজন। **পিটকা** = বিস্ফোটক, ফোড়া। **পিটন, পিটনি** = প্রহার, মার। **পিটনা** = ঘরের মেজে ছাদ ইত্যাদি পিটানর মুগুর, কোপা। **পিটপিট** = কর্কশ তিরস্কার, খিটখিট। **পিটপিটে** = রুক্ষপ্রকৃতি, খিটখিটে (মিটমিটে প্রদীপ, পিটপিটে ভাতার অসহ্য — প্রবচন)। **পিট্ট** = কুট্টনবিশেষ,

কুট্টন দ্বারা অধঃপ্রবেশন, পেটা। **পিট্টু** = তাড়না করা, তাড়া করা। **পেট, পেটা, পেটি** = বাঁশ বেত ইত্যাদির ঢাকনাদার পেটারী, পিটক, মঞ্জুষা, ঝাঁপী, বাক্স, পেঁটরা। **পেট** = উদর, খাদ্যাধার, পাকস্থলী, গর্ভ, বুদ্ধি, উদরান্ন, শূন্যগর্ভ স্থান, শরীর। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই কমবেশি প্রচলিত। ৫. বাংলাভাষী একটিমাত্র **পিট** শব্দ থেকে কত শব্দ বানিয়েছে, তার একটি নিদর্শন এই শব্দগুলি। অ্যাকাডেমিতে এর সবগুলি শব্দ না চললেও গ্রামবাংলায় ও সাধারণ বাংলাভাষীর বয়ানে এদের সবগুলিই কমবেশি প্রচলিত রয়েছে।

আসলে, প্রাচীনকালে নিসর্গ-প্রকৃতি এতই প্রাচুর্যে ভরা ও ঐশ্বর্যশালিনী ছিল যে, মানুষকে নিজের পেট ভরানর জন্য খুব একটা ভাবতে হত বলে মনে হয় না, ঐতিহাসিকেরা অতীত সম্পর্কে যতই লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিন। কেননা, আমরা বিগত ১৯৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দেও দেখেছি, চারিদিকে এত আম-জাম-কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান ছিল যে, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলেও লোকে বনে বাদাড়ে ফলমূল খেয়েই সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারত। স্বভাবতই তারও শত শত বছর আগে এই প্রাকৃতিক প্রাচুর্য যে আরও অধিক মাত্রায় ছিল, সেবিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। তাই **পেট** নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি সেকালের মানুষকে; অন্তত শব্দশাস্ত্র বেশ জোরালোভাবে সেইরকম সাক্ষ্যই দিচ্ছে। কেননা, প্রাচীন সাহিত্যে, সংস্কৃতে **পেট** শব্দের উল্লেখ করার জন্য **উদর** ও তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাত্র শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে উদরই প্রধান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আজকাল জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।' এক-পেট খাওয়ার জন্য মানুষ আজ কী না করে! এমনকি উত্তরপ্রজন্মকে তাদের পেটের ভাতের অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয় আজকের বুদ্ধিমান মানুষ, তারপর পাঠিয়ে দিয়ে বসে বসে কাঁদে — সমস্ত বড় শহরের রাজকীয় কুঠরীতে বসে বসে কাঁদতে থাকে আমাদের প্রৌঢ় মা-বাবারা। আর আমাদের সমাজের মাথামোটা শাসক-পরিচালকেরা নির্লজ্জের মতো বসে বসে এসব দেখে! ... (সেকালে জ্ঞানদানের জন্য বা জ্ঞানার্জ্জন করে আনার জন্য কিংবা মনুষ্যত্ব বাঁচানোর জন্য দেশান্তরের বিধান মনীষীগণের দ্বারা স্বীকৃত ছিল, কিন্তু পেটের দায়ে দেশান্তর?! সেরকম কথা সেকালের ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীরা ভাবতেও পারত না। এ পরিস্থিতি গড়েছে কারা? কারা তাতে ইন্ধন দিয়েছে? কারা বুঝিয়েছে, এই দেশান্তর শুভ, ভাল? অ্যাকাডেমিশিয়ানরা না?)

যাই হোক, **পেট** নিয়ে সমস্যা যত বেড়েছে, **পেট** সম্পর্কে বাংলাভাষীর কথাও তত বেড়েছে। কত বেড়েছে, তার কিছু নিদর্শন দিয়ে গেছেন স্বয়ং ব.শব্দকোষ। যথা —পেট-পালা, পেট-পোড়া, পেট-পোষ, পেট-পোষা, পেট-ভাতা, পেট-মরা, পেট-রোগা, পেট-আঁটা, পেট-করা, পেট-ডাকা, পেট-কামড়ান, পেট-খামচান, পেট-খসা, পেট-চলা, পেট-ছাড়া, পেট-টালা, পেট-ধরা, পেট-নামা, পেট-পালা, পেট-ফাঁপা, পেট-ফুলা, পেট-ফাটা, পেট-বাড়া, পেট-ভরা, পেট-ভুটভাটকরা, পেট-মরা, পেট-সাফহওয়া, পেট-হওয়া, পেটে-ধরা, পেটের-দায়, পেটের-ভাত ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ওপর 'পেটে আসে তো মুখে আসে না', 'পেটে একখান মুখে একখান', 'পেটে খিধে মুখে লাজ', 'পেটে খেলে পিঠে সয়', 'পেটে পেটে শয়তানি', 'পেট থেকে কথা বের করা' ... এসব জ্ঞানবাক্য তো রয়েছেই। মহামতি কবীর তো বলেই গেছেন, যত জ্ঞান জন্মায় সবই ঐ পেটের ভাতের চিন্তা থেকে! — 'না কুছ দেখা ভাব-ভজনমে না কুছ দেখা পোঁথি মে। / কহৈঁ কবীর শুনো ভাই সন্তো, যো দেখা সো রোটিমে।।' ('না ভজনপূজনে কিছু দেখলাম, না দেখলাম গ্রন্থাদিতে। কবীর বলছে, শোনো সাধুসন্ত ভাইয়েরা, যা দেখলাম সে কেবল রুটিতেই।' অর্থাৎ পেটের ভাতেই।)। এখানে কেবল এটুকু যোগ করে রাখা চাই যে, পেটের ভাতের চিন্তাই মানুষকে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ বিষয়ে ভাবতে প্ররোচিত করে এবং যেহেতু সেই সামাজিক কর্মযজ্ঞই 'ভুবনের **নাভি**', ভাবনাটি গিয়ে হাজির হয়ে যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের **নাভি**তে! তাই, কবীর বলেন, একনিষ্ঠভাবে পেটের ভাতের চিন্তা করলে তা থেকেই বিশ্বদর্শন সম্ভব হয়ে যায়। ...

পিনাক (পিনাকী, পিনাকপাণি) : ১. ✓পা (রক্ষণ) + আক - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পিনাক*** = ***পি***-*র (গতিশীল প্রাপকের) না-করণ থাকে যাহাতে।* ***পিনাকী*** = ***পিনাক***-*এর গতিশীল আধার যে।* ***পিনাকপাণি*** = ***পিনাক*** *পাণিতে যাহার।* / **পিনাক** = অপিহৃত নাক (স্বর্গ) যাহা কর্তৃক; যাহা ত্রিপুরদাহে স্বর্গও আবৃত করিয়াছিল। (ব.শ.)। ৩. **পিনাক** = শিবশূল, শূল, যষ্টি; তত বাদ্যবিশেষ। **পিনাকী** = তন্তুবাদ্যবিশেষ, শূলধারী, পিনাকবান, শূলী, শিব, রুদ্রবিশেষ। **পিনাকপাণি** = শিব। (ব.শ.)। মহাদেবের অন্য নাম। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্র পিনাক নামে খ্যাত। এর আকার ধনুকের মতো। এটি স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট একটি যষ্টি। এর দুই দিক তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহা দ্বারা শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে ইহা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন। এই জন্য মহাদেবের নাম পিনাকপাণি। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **পিনাক** বস্তুটি কী, করেই বা কী, তা অনেকটাই অব্যক্ত, ঠিকঠাক বোঝা যায় না। আমরা বড়জোর ভাবতে পারি, **পিনাকপাণি** এমন এক সত্তা, যিনি এমন গানবাজনা শোনান যা একইসঙ্গে শত্রুবিনাশ করে, আবার আত্মীয়-পরিজনদের আনন্দরসে ডুবিয়েও রাখে। অর্থাৎ, তিনি এমন এক 'বিশেষ ধরনের নীতি'র (= **ধনু**-র) প্রচার করেন, যা একই সঙ্গে শোষণকারীদের ঠেকিয়ে দেয় এবং শোষিতদের আনন্দরসে আপ্লুত রাখে। এমন নীতি আদৌ প্রণয়ন করা সম্ভব কি না, করা গেলে কীভাবে প্রণয়ন করা যায়, আমরা জানি না। এখানেই হয়তো **পিনাকপাণির** বা **শিবের** মহিমা। আর, শিবের মহিমা বোঝা কি সহজ কথা!

পিপাসা (পিপাসিত, পিপাসু) : ১. ✓পা + স (সন্) - ✓পিপাস + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***পিপাসা*** = ***পি***-*র (গতিশীল পানকারীর) পানের ইচ্ছা যাহাতে।* ***পিপাসিত*** = ***পিপাস*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***পিপাসু*** = ***পিপাস*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. **পিপাসা** = পানেচ্ছা, তৃষ্ণা, তৃষা। **পিপাসিত** = সঞ্জাতপিপাস, তৃষিত। **পিপাসু** = পানেচ্ছু। (ব.শ.)। ৪. thirst অর্থে **পিপাসা**, thirsty অর্থে **পিপাসিত** ও **পিপাসু** প্রচলিত। ৫. দ্র. **চিকিৎসা, জিজ্ঞাসা**।

পিপীল (পিপীলক, পিপীলা, পিপীলাঞ্চি, পিপীলি, পিপীলিক, পিপীলিকা, পিপীলী, পিপুল, পিপ্পল, পিপ্পলাই, পিপ্পলাদ, পিপ্‌লাই, পিপ্পলি, পিপ্পলী, পিঁপড়া, পিঁপড়ে, পিপীড়া) : ২. ***পিপীলিকা*** = ***পিল*** *(গতিশীল পায়ীর লালন যাহাতে)* ***পিল*** *করে চলে যে; অর্থাৎ, 'পান করে লালিত হই' 'পান করে লালিত হই' করে করে চলে যে।* ***পিঁপড়া*** = *গতিশীল রহস্যময় পায়ীর পালনের উড্ডয়ন থাকে যাহাতে।* ***পিপ্পল*** = ***পিপ্*** *(গতিশীল পায়ীর পালন) পালিত যাহাতে।* ***পিপুল*** = ***পি*** *(গতিশীল পায়ীর)* ***পু*** *(পালন নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া লালিত হয় যাহাতে।* ***পিপ্পলাই (পিপীলাঞ্চি, পিপ্‌লাই)*** = ***পিপ্পল****-এর আধার গতিশীল যাহাতে; অথবা* ***পিপ্পল****-ধর্ম্মকে গতিশীল করে যে।* ***পিপ্পলাদ*** = ***পিপ্পল*** *হইতে জাত যে।* ৩. **পিপীলিকা (পিপীল, পিপীলক, পিপীলা, পিপীলি, পিপীলিক, পিপীলী)** = পিঁপড়া, চান্দ্রায়ণবিশেষ, পিপীলির শ্রেণী। **পিঁপড়া (পিপীড়া, পিঁপড়ে)** = পিপীলিকা, কীটবিশেষ, (পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।)। **পিপ্‌লাই (পিপীলাঞ্চি, পিপ্পলাই)** = রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্র ব্রাহ্মণের গাঁই বা উপাধিবিশেষ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধীর পিপ্পলী (পিপ্‌লাই) গ্রামে বাস করেন; তদনুসারে ঐরূপ গাঁই। **পিপুল, পিপ্পল** = অশ্বত্থবৃক্ষ, বন্ধনশূন্য পক্ষী, পিপ্পলফল, (গৌণার্থে) বিষয়সুখ, (পিপ্পলসাদৃশ্যে?) স্তনবৃন্ত, চুচুক, (পিপ্পলপত্রসাদৃশ্যে?) বস্ত্রখণ্ডভেদ। **পিপ্পলি, পিপ্পলী** = কণা, পিঁপুলগাছ, পিপ্পলীফল। **পিপ্পলাদ** = (ক) মহর্ষি পিপ্পলাদ একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি। সুকেশ, সত্যকাম, গার্গ্য, কৌশল্য ইত্যাদি এঁর শিষ্য ছিলেন। (খ) স্কন্দপুরাণ অনুসারে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কংসারী নামে এক ভগিনী ছিল। একবার কংসারী ভ্রাতার রেতঃপরিপ্লুত বস্ত্র পরিধান করে স্নান করেন। স্নান করবার সময় রেতোদক তার উদরে প্রবেশ করায় তিনি গর্ভবতী হন এবং একটি পুত্র প্রসব করেন। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি সেই পুত্রকে রাত্রে একটি পিপ্পল বৃক্ষমূলে ত্যাগ করে চলে যান। সেইজন্য সেই শিশুর নাম পিপ্পলাদ। (পৌ.অ.)। ৪. ant অর্থে **পিপীলিকা** বা **পিঁপড়ে**, ব্রাহ্মণের পদবী রূপে **পিপ্‌লাই** বা **পিপীলাঞ্চি** এবং **অশ্বত্থ**-গাছকে বোঝাতে **পিপুল** শব্দ প্রচলিত। বাকি অপ্রচলিত। ৫. আগে অনেকবার বলা হয়েছে, আবারও বলি, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের প্রধান সমস্যা ছিল অদৃশ্য কিন্তু সমাজে অত্যন্ত সক্রিয় বিষয়কে মুখের ভাষায় কথা বলে বোঝানো। মানুষের সমাজ তখন সম্পূর্ণতই যৌথ, স্বাতন্ত্র্যের নামগন্ধ নেই, ব্যক্তিমালিকানা কয়েক হাজার বছর দূরের ব্যাপার, তখন সবেমাত্র কৃষিকাজ আবিষ্কৃত হয়েছে, মানুষ তার যাযাবর জীবন ত্যাগ করে সবে একটা সুবিধাজনক এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে, মেয়েদের হাত থেকে সমাজের শাসনভার পুরুষের হাতে যেতে শুরু করেছে, আর বিশাল সংখ্যক মানুষকে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন **দক্ষ** পুরুষের নেতৃত্বে সারাদিন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে যাচ্ছে, আর তার ফলে যা উৎপাদিত হচ্ছে, তা-সব সংগৃহীত হচ্ছে এক জায়গাতে এবং সেখান থেকেই সমগ্র গোষ্ঠীর শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের প্রয়োজন পূর্ণ করে বাকিটা সেই **দক্ষ** পুরুষেরা অন্য সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে এবং নিজেরাও নিচ্ছে। এই যে এক ঝাঁক মানুষের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা সমাজ, যারা **পিপ্ পিপ্ পিপ্** (পাই পাই, পালন-করি পালন-করি, পান-করি পান-করি) করে সারাদিন ধরে কাজ করে চলেছে, তারা এমন এক বিশেষ প্রকারের সংহতি (**পল**) গড়ে তুলেছে যে, তাতেই গোষ্ঠীর সকলের বেশ ভালভাবেই পালিত হওয়ার একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে — একে কী বলা হবে? আমাদের সেই প্রাচীন অনুভূতিশীল পূর্বপুরুষেরা স্বভাবতই এই অদৃশ্য কিন্তু যথার্থভাবেই সক্রিয় সমাজব্যবস্থাকে নাম দিয়েছিলেন **পিপ্পল**-বৃক্ষ বা **অশ্বত্থ**-বৃক্ষ। তাঁরা নিশ্চিতভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, অদৃশ্য মানবজগতের ব্যবস্থাগুলি দৃশ্য উদ্ভিদজগতের নিজ নিজ ব্যবস্থাগুলির সমান্তরাল। সেই সুবাদে তাঁরা একই সঙ্গে Peepul tree বা আশুথ গাছকেও নাম দিয়েছিলেন **পিপ্পল**-বৃক্ষ, 'যে বৃক্ষে **অশ্বেরা** (দক্ষেরা) থাকে' ব'লে, পরবর্তীকালে তাঁরা তার নাম দিয়েছিলেন **অশ্বত্থ**-বৃক্ষ। তাঁদের বিচারে এই **পিপ্পল** বা **অশ্বত্থ**-জাতীয় **বনস্পতি**গুলি ['যাহাতে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না, অর্থাৎ যাহাতে উৎপন্ন হয় কিন্তু পণ্য হয় না' (= **বনস্পতি**)] দৃশ্য উদ্ভিদজগতের সমান্তরালে অদৃশ্য জনসমাজেও সমানভাবে সক্রিয় ছিল।... কীটপতঙ্গের জগতে তাঁরা এরই সমান্তরালে একটি পতঙ্গকে দেখেছিলেন ঠিক একইভাবে একটা সংহতি গড়ে তুলে নিজ নিজ গোষ্ঠী চালাতে। তাঁদের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **পিপীলিকা**। এদের পুরুষেরাও কোনো কাজ করে না, সম্ভবত **পিপ্পল**-সমাজের **দক্ষ**-পুরুষদের মতো তারাও নির্দেশাদি দেয়। এই যে **পিপ্পল** ব্যবস্থা বা **পিপীলিকা**দের ব্যবস্থা, এই **পিপ্পল**-এর মানবিক-ভাষিক উত্তরাধিকার বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে। তাঁরা **পিপীলিকা**-প্রতিম এই **পিপ্পল**দের উত্তরসূরিদেরকে আজও people বলে থাকেন। আমাদের ধারণা, হয়তো **দক্ষ**দের নির্দেশ নির্বিচারে মান্য করে চলত বলেই তাদের **পিউপিল**ও বলা হয়ে থাকবে, যার উত্তরাধিকার ইংরেজি বহন করে pupil রূপে।

এই যে ব্যবস্থা, একে নিজের আত্মার স্বভাবের সঙ্গে এক করে মান্য করে অনুসরণ করে চলা অবশ্যই একটি বিশেষ **ধর্ম্ম**ও বটে। সেই **ধর্ম্ম**দর্শন যাঁরা মানতেন, প্রচার করতেন, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে নিয়ে চলতেন, তাঁদের সেকালে বলা হত **পিপীলাঞ্চি**, যা পরে পরে **পিপ্‌লাই**-তে গিয়ে ঠেকে। তাঁদের উত্তরসূরিরা নিজেদের নামের শেষে সেই গৌরবজনক উত্তরাধিকার পদবীরূপে আজও বহন করেন। সেই **পিপ্পল**-বৃক্ষ ছেড়ে **বটবৃক্ষ বিল্ববৃক্ষ অর্জুনবৃক্ষ** ইত্যাদি পেরিয়ে নানাশ্রেণীর **পর্ব্বতে পর্ব্বতে** মানুষের কত যুগ কেটে গেল, আজও কাটছে। কিন্তু **পিপ্পল**-এর **ধর্ম্ম**দর্শনের বাহকেরা তাঁদের নামে সেই ইতিহাসের চিহ্ন আজও ধরে রেখেছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যরা আসেন **পিপ্পল**-এর পরবর্তীকালে। একসময় তাঁরা **পিপ্পল**-বিরোধী (আদিম সমাজতন্ত্র বিরোধী) হয়ে **বটবৃক্ষ**-পন্থী (আদিম ধনতন্ত্র-পন্থী) হয়ে পড়েন। তাঁদের আধারস্বরূপ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের 'ভগিনী' (সেকালে আধারশক্তিকে কখনও ভগিনী, কখনও স্ত্রী বলা হত — যেমন কোনো কোনো রামকাহিনীতে সীতা রামের ভগিনী) আপন **সন্তান**কে **পিপ্পল**-এর ছায়ায় বড় করার কথা ভেবেছিলেন। এ ছিল আদিম সমাজতন্ত্র থেকে আদিম ধনতন্ত্রে উত্তরণের মধ্যবর্তীকাল। কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে না থেকে স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে **সন্তান** উৎপাদন করলে সে থাকবে কোথায়, খাবে কী, বড় হবে কোথায়? এই ছিল **বিশ্বামিত্র** ও **মেনকা**র সমস্যা, **দুষ্মন্ত**

ও **শকুন্তলা**র সমস্যা; একই সমস্যায় পড়েছিলেন **যাজ্ঞবল্ক্য** ও 'কংসারী'। যাই, হোক তাঁর সন্তান কিন্তু শেষ পর্যন্ত **পিপ্পল**-এর ছায়ায় বড় হয়ে **পিপ্পলাদ** হতে পেরেছিল। **৬.** ইংরেজি people, pupil।

পিল (পিলপিল, পিলে, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে) : **২.** ***পিল*** = *গতিশীল পায়ীর লালন যাহাতে, কিংবা যাহাকে পান করাইয়া লালন করিতে হয়। দ্র.* ***ছা, ছাওয়াল, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে****। ১ম খণ্ড।* **৩. পিল, পিলে, পীল** = শিশু, বালক, শাবক। **পিলপিল** = পিপীলিকার মতো কৃত শ্রেণী, সা'র, শ্রেণীবদ্ধভাব, দল। (ব.শ.)। **৪.** line অর্থে **পিলপিল**, এবং child ও children অর্থে **পিলে, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে** খুবই প্রচলিত। **৫.** বাংলাভাষী নেচারের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে নিজেদের অজ্ঞাতসারে কত যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ শব্দ আজও বানিয়ে চলেছেন, **ছেলেপিলে** ও **ছেলেপুলে** শব্দদুটি তার একটা ভাল উদাহরণ। 'যাদের আচ্ছাদন করে লালন করতে হয়', তাদের বলে **ছাওয়াল** বা **ছেলে** এবং 'যাদের পান করিয়ে লালন করতে হয়', তাদের বলে **পিলে**। আর সেই 'পান নবরূপে উত্তীর্ণ হলে', যথা জ্ঞানরস পান করানো, তখন '**পি** হয়ে যায় **পু**'। ফলে, **পিলে** হয়ে যায় **পুলে**। ছেলেমেয়েদের তো আমরা শুধুমাত্র দুধ পান করিয়েই লালন করি না, নিজেরা যে অমৃতরসাক্ত বা বিষাক্ত সংস্কৃতিরসে দিনরাত ডুবে থাকি, সেটিও প্রতিদিন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবশ্যই পান করাই। তাই তারা আর **পিলে** থাকে না, **পুলে** হয়ে যায়। সেই হিসেবে, আজকের শহুরে বাংলাভাষীদের পরিবারে **ছেলেপিলে** নেই বললেই চলে, সবই হয়ে যায় **ছেলেপুলে**। গ্রামের অবস্থা যে খুব ভাল, তাও নয়; তারাও এখন অনেকাংশে **ছেলেপুলে** হিসেবেই বড় হয়। দ্র. **ছা, ছাওয়াল, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে**।

পীঠ (পীঠস্থান) : **১.** ✓পিঠ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পীঠ*** = *গতিশীল পায়ীর আধারের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে।* ***পীঠস্থান*** = ***পীঠ****-রূপ স্থান। /* উপবিষ্টের শ্রম নাশ করে যে। (ব.শ.)। **৩. পীঠ** = আসনবিশেষ, পীঁড়ি, পাদস্থাপনাধার, পাদাসন, ব্রতীর আসন, দেববিগ্রহ স্থাপনাধার পিণ্ডিকা, (জ্যামিতিতে) বৃত্তখণ্ডের পরিপূরক অংশ, (তন্ত্রে) দেবতা-পূজাঙ্গে হৃদয়রূপ আধার, বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীদেহের অবয়বখণ্ডের পতন হেতু তীর্থভূত একান্ন সংখ্যক স্থান। (ব.শ.)। **পীঠস্থান** = তন্ত্র অনুসারে ৫২টি স্থান, যেখানে সতীর দেহাংশ শিব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। দক্ষযজ্ঞে সতী মৃত হলে তাঁর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করে পৃথিবী ভ্রমণকালে শিব তাঁর দেহ ছিন্ন করে ৫২টি স্থানে নিক্ষেপ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** সাধারণভাবে অপ্রচলিত বটে, কিন্তু যাঁরা তীর্থাদি দর্শন করেন এবং তন্ত্র ও পুরাণাদি বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের মহলে শব্দটির প্রচলন রয়েছে। **৫.** দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ৫১ (মতান্তরে ৫২) পীঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যদিও অধিকাংশ পণ্ডিতই সেই ইতিহাস ভুলে গেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এশিয়ার ৫১টি কালীক্ষেত্র সেই বিশাল সামাজিক বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ রূপে আজও বিদ্যমান রয়েছে, রয়েছে holy place বা 'তীর্থ'ক্ষেত্র রূপে। আমরা সেই ইতিহাসের যেটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি, তা নিম্নরূপ।

জীবজগতের সর্বোচ্চ ধাপের 'ঝাঁক-প্রাণী' হল মানুষ, যার শরীরের পাশাপাশি মন বলে একটা পদার্থ আছে। বাইরের আঘাতে অর্থাৎ, মহাপ্রলয়, ভূকম্প ইত্যাদির আঘাতে সেই ঝাঁকের আদি বিভাজন শুরু হয়েছে অনেক আগে; হয়তো-বা ষাট-সত্তর হাজার বছর আগেই। ভাষার ইতিহাস, ভাষার বিভাজন ও স্বভাব থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, হাজার দশেক বছর আগেও পৃথিবীতে মাত্র তিন-চারটি পৃথক হয়ে পড়া মানুষের ঝাঁক ঘুরে বেড়াত, যারা পরস্পরের ভাষা অনেকটাই বুঝতে পারত বলেই মনে হয়। তবুও তাদের মধ্যে ভাষার যে ফারাক গড়ে উঠছিল, তার কারণ ছিল ভৌগোলিক ও কালের দূরত্ব। কিন্তু তারপরে ভাষাগুলি যেভাবে অজস্র খণ্ডে বিচূর্ণীভূত হয়েছে তার কারণ হল, মানবজাতির পরবর্তী ভাঙনগুলি ঘটেছিল ভেতরের আঘাত থেকে, এককথায় যাকে বলা যেতে পারে অন্তর্কলহ। অন্তর্কলহের ফলেই মানবজাতির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ঐক্য এবং তার ভাষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ...

অন্তর্কলহের কারণে ভাষার এই যে বিচূর্ণীভবন, তার আদি ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে **দক্ষযজ্ঞে**। (কী কারণে সেই অন্তর্কলহ, সেসব কথা আমরা **দক্ষযজ্ঞ** শব্দে ব্যাখ্যা করেছি)। তার আগে মানুষের ঝাঁকে ভিতর থেকে কোনো আঘাত আসেনি, এলেও তার কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। সেই **দক্ষযজ্ঞের** ঘটনাকেই Atlantis-এর রূপকথায় এবং বাইবেলের Tower of Babel ... ইত্যাদি গল্পে যে যার নিজের মতো করে বর্ণনা করেছে। **দক্ষযজ্ঞের** এই ঘটনার সম্ভাব্য কাল আজ থেকে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ বছর আগে। এই ঘটনার ফলেই, অনাদিকাল থেকে চলে আসা সনাতন সভ্যতার বুক চিরে বৈদিক সভ্যতার ও বৈদিক যুগের সূচনা হয়েছিল। তার আগে মানব-ঝাঁকের শরীর তিন-চার টুকরো হয়েছিল বটে, কিন্তু তার মন ভাঙেনি। এই প্রথম মানব-ঝাঁকের মনটা অন্তর্কলহে ভেঙে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং শত শত ভাষার জন্ম হওয়ার পথটি উন্মুক্ত হয়ে গেল। এক 'হিসেবে এই সময়টিকেই সভ্যযুগের সূত্রপাতের কাল বলা যেতে পারে। ...

দক্ষযজ্ঞের ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীন ঝাঁক-পরিচালকেরা (**শিবগণ**) নবীন ঝাঁক-পরিচালকদের (**দক্ষদের**) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। যতদূর বোঝা যায়, তার আগে মানুষের সঙ্গে মানুষের দলবদ্ধ যুদ্ধের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত আমাদের চোখে পড়েনি। সেই যুদ্ধে প্রাচীন ঝাঁক-পরিচালকেরা (**শিবগণ**) জিতেও যান। কিন্তু পরে তাঁদের তোয়াজ করে বা **পূজা** করে অথচ তাঁদের নীতি অমান্য করে তাঁদের শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দেওয়া হয়। ইত্যবসরে সেই **শিবগণ** তাঁদের অনুগামীদের (সতীর দেহ) নিয়ে সারা উপমহাদেশ জুড়ে যে তাণ্ডব চালান, আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের একান্নটি ভৌগোলিক স্থানকে কেন্দ্র করে সেই অনুগামীরা সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে তাঁদের যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। সেকালের জ্ঞানজীবীদের (ব্রহ্মার) একান্ত অনুরোধে **শিবগণ** যখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন, তখন এক ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, আজকের যুগে বসে সেই

পরিস্থিতি কল্পনা করা খুবই কঠিন। ...

অজস্র ছোট ছোট ঘটনার, অনেক তোয়াজের, অনেক চুক্তির, অনেক সাধ্যসাধনার ফলে **শিবগণের** সেই অনুগামীদের শান্ত করা গেল বটে কিন্তু সমস্যা মিটল না। সমস্যাটি খানিকটা এইরকম — যৌথসমাজের **শৈব**নিয়মে যে সামাজিক উৎপাদন কর্ম এত যুগ ধরে তাঁরা করে এসেছেন, এবং তার ফলে উৎপাদিত যে বস্তুসম্ভার তার কী হবে? তাছাড়া, এক্ষেত্রে এতকালের পারস্পরিক নির্ভরশীলতারই বা কী হবে? সেকালের জ্ঞানজীবীদের (ব্রহ্মার) বিধানে শেষ পর্যন্ত একটিই পথ বেরোল — পারস্পরিক লেনদেন। আর সেটার প্রচলন হোক ঐ ৫১টি কেন্দ্র থেকেই। ফলত, ঐ ৫১টি কেন্দ্রই সতীর বা কালীর, অর্থাৎ ভারতবর্ষের শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি উৎপাদনশীল জনতার আদিপুরুষদের সক্রিয় থাকার **পীঠস্থান** হয়ে গেল। ... সেই থেকে ঐ ৫১টি কেন্দ্র 'একান্নপীঠ' রূপে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজে স্বীকৃতিলাভ করে আসছে। ... কালে কালে সে গৌরবও তার ক্রমান্বয়ে ক্ষীয়মাণ হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু সমাজমনে মানসিক ফসিল রূপে ইতিহাস যে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের মানব-ঝাঁকের মনে ইতিহাসের ফসিল রূপে সেই স্মৃতিচিহ্ন আজও বেঁচে আছে।

পীঠ শব্দের মানে কী, সেকথার উল্লেখ উপরে **২.** ও **৩.**-এ আমরা দিয়েছি। কেন ঐ কেন্দ্রগুলিকে **পীঠ** বা **সতীপীঠ** বা **কালীপীঠ** ... ইত্যাদি বলা হত, সেকথাও এতক্ষণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। আপনি **পীঠ** শব্দের ইংরেজি অনুবাদ করতে গেলেই টের পাবেন, **পীঠ**-এর অর্থবহনক্ষমতা এত ব্যাপক যে, ইংরেজি ভাষায় তার অনুবাদ করাই যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজিতে base (military base) বলতে যা বোঝায়, **পীঠ** শব্দটি তার কাছাকাছি — 'বসিবার স্থান'; এখানে 'প্রাপণকারীর টঙ্কার তার স্থিতিরূপ ধরে বিরাজিত'। যে যে স্থান **কালী**র বা **তারা**র অর্থাৎ সেকালের শ্রমিকজনতার 'বসি'বার স্থান (base) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিই পরবর্তীকালে ৫১ পীঠ নামে প্রখ্যাত হয়ে যায়। ... বলে রাখা ভাল, এগুলিই ভারত ইতিহাসের তথা বিশ্বইতিহাসের আদি অন্তর্কলহের মানসিক ফসিলে রূপান্তরিত স্মৃতিচিহ্ন, ভারতসমাজ যা আজও বহন করে নিয়ে চলেছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের বিশ্বসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ইতিহাসের উপর।

আজ যেমন লোকে বলে, 'আজকের ব্যাঙ্গালোর শহর কমপিউটার প্রযুক্তির **পীঠস্থান** হয়ে উঠেছে', ভারতীয় উপমহাদেশের ঐ ৫১টি কেন্দ্রও সেভাবেই সেযুগের মতো করে কর্মজীবী জনতার **পীঠস্থান** হয়ে উঠেছিল। তবে একালের **পীঠস্থান**-এর সঙ্গে সেকালের **পীঠস্থান**-এর পার্থক্য এই যে, সেকালে কর্মজগতের সঙ্গে মানবিক ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি-আবেগ ... ইত্যাদি ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ ও একত্রিত ছিল; একালের কর্মজগৎ সে তুলনায় একেবারেই নেংটো। ফলত, সেকালের কর্মজগৎ নষ্ট হয়ে গেলেও তার জামাকাপড়-সহ সমগ্র আবহটাকে অনেককাল পর পর্যন্ত কমবেশি পাওয়া যেত। অর্থাৎ, **পীঠস্থান**-এর আত্মাকে না পাওয়া গেলেও দেহটাকে পাওয়া যেত, তা সে মৃতদেহ হলেও এবং তা মমিতে পরিণত হলেও। একালের কর্মজগৎ নষ্ট হয়ে গেলে তার আর প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না।

***পিণ্ড্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অনাথপিণ্ডদ, অসপিণ্ড, পিংপিং, পিঁ(পীঁ)ড়া, পিঁ(পীঁ)ড়ি, পিঁ(পীঁ)ড়ী, পিঁ(পীঁ)ড়ে, পিণ্ড, পিণ্ডক, পিণ্ডকন্দ, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিণ্ডজীবী, পিণ্ডদ, পিণ্ডদাতা, পিণ্ডপাত, পিণ্ডপুষ্প, পিণ্ডবিচ্ছেদ, পিণ্ডভাক, পিণ্ডমূল, পিণ্ডলেপ, পিণ্ডসম্বন্ধ, পিণ্ডসম্বন্ধী, পিণ্ডা, পিণ্ডায়স, পিণ্ডার, পিণ্ডালু, পিণ্ডাশ, পিণ্ডাশী, পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন, পিণ্ডিত, পিণ্ডিরা, পিণ্ডী, পিণ্ডীশূর, পিণ্যাক, পেঁড়া, বিজল (পিচ্ছিল)।

পিণ্ড্ = গতিশীল পায়ীর বোধের গড়ান-উড়ান। **পিণ্ড** = গতিশীল পায়ীর বোধের গড়ান-উড়ান যাহাতে।

পিণ্ড (পিণ্ডক, পিণ্ডজীবী, পিণ্ডদ, পিণ্ডদাতা, পিণ্ডপাত, পিণ্ডপুষ্প, পিণ্ডবিচ্ছেদ, পিণ্ডভাক, পিণ্ডমূল, পিণ্ডলেপ, পিণ্ডসম্বন্ধ, পিণ্ডসম্বন্ধী, পিণ্ডা, পিণ্ডায়স, পিণ্ডার, পিণ্ডালু, পিণ্ডাশ, পিণ্ডাশী, পিণ্ডি, পিণ্ডিকা) : **১.** ✓পিণ্ড্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পিণ্ড*** = *গতিশীল পায়ীর বোধের গড়ান-উড়ান যাহাতে।* / **পিণ্ডার** = পিণ্ড গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। **৩.** **পিণ্ড** = সংহত বৃত্তাকার দ্রব্য, ডেলা (lump), গোল, শ্রাদ্ধে পিতৃ-প্রভৃতিকে দেয় বিল্বাকার অন্নাদি, আহার, কবল, গ্রাস, আজীবন, আজীব, জীবিকা, ভিক্ষান্ন, মাংস, দেহ, পিণ্ডিকা, জঙ্ঘাপশ্চাদ্ভাগ, পায়ের ডিম (the calf of the leg), দেহৈকদেশ, গৃহৈকদেশ, দ্বারপ্রকোষ্ঠ, ভ্রূণের প্রথম অবস্থা, গজকুম্ভ, সিহ্লক, ওড্রপুষ্প, দ্রব্যমাত্র, বৃন্দ, সমূহ, রাশি, (গণিতে) যোগফল, (জ্যোতিষে) বৃত্তের চতুর্থাংশের চতুর্ব্বিংশভাগ, (জ্যামিতিতে) বেধ, ঘনত্ব (thickness), গোল বোতাম, গন্ধরস, বেদি, বল, অয়ঃ, নবনীত, সৈন্য। **পিণ্ডক** = পিণ্ড, গোলক, কবল, সিহ্লক, পিণ্ডমূল, গাজর, পিণ্ডালু, পিশাচ, ভূতবিশেষ, বিস্ফোটক। **পিণ্ডজীবী** = পরান্নভোজী। **পিণ্ডদ** = শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানকারী পুত্রাদি, অন্নদাতা, প্রভু, স্বামী। **পিণ্ডদাতা** = পিণ্ডদানকর্ত্তা, শ্রাদ্ধাধিকারী। **পিণ্ডপাত** = ভিক্ষান্নদান। **পিণ্ডপুষ্প** = পদ্ম, অশোক, জবা, তগর। **পিণ্ডভাক** = পিণ্ডভাগী, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ — এই পুরুষত্রয়। **পিণ্ডমূল** = গাজর। **পিণ্ডসম্বন্ধ** = শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানসম্বন্ধ, দেহের সহিত সম্বন্ধ। **পিণ্ডা** = পিণ্ডায়স, ইস্পাত, কস্তূরীভেদ, পিঁড়া, বারাণ্ডা, বেদি। **পিণ্ডায়স** = সংহত লৌহ, তীক্ষ্ণায়স, ইস্পাত। **পিণ্ডার** = ভিক্ষুক, ক্ষপণক, গোপালক, মহিষরক্ষক, বিকঙ্কত, বঁইচগাছ। **পিণ্ডালু** = পিণ্ডাকৃতি আলু, চুপড়ি-আলু। **পিণ্ডাশ, পিণ্ডাশী** = পরপিণ্ডভোজী, ভিক্ষু। **পিণ্ডি** = পিণ্ড, ডেলা, চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠপিণ্ড, পীঠ, পীঁড়ি, খর্জ্জুরবিশেষ, প্রতিমাদির আধার, অশোকবৃক্ষ, অলাবু। **পিণ্ডিকা** = পিণ্ডি, পিণ্ড, পীঠ, গৌরীপট্ট, লিঙ্গপীঠ। (ব.শ.)। **৪.** lump অর্থে **পিণ্ড** ও **পিণ্ডি** কমবেশি প্রচলিত থাকলেও বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে **পিণ্ডদাতা** ... প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। **৫.** দ্র. **অনাথপিণ্ডদ**। আমরা **পিণ্ড** শব্দের যে ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পেয়েছি, সন্দেহ নেই যে, তা যথেষ্ট অব্যক্ত। (উপরে **২.** দ্রষ্টব্য)। তাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলে খানিকটা একদৈশিক হয়ে যায়। তবুও ব্যক্ত করার চেষ্টা করতেই হবে।

পণ্ড শব্দে আমরা দেখেছি, তার অভিধা অর্থে **পণ**-এর গড়ান-উড়ান রয়েছে; কিন্তু সেই অভিধা-অর্থ জনসাধারণ্যে প্রচলিত নেই, রয়েছে লক্ষণা-অর্থ — (পূর্বতন ব্যবস্থা) 'নষ্ট' করে দেওয়া। কিন্তু তাই বলে অভিধা-অর্থটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। **পিণ্ড**-এর বেলায় আমরা দেখছি, **পণ্ডন** না করে **পিণ্ডন** করা হচ্ছে। ফলত, **পণ**-এর বোধ দলা পাকিয়ে সংহত হয়ে পরিণত হচ্ছে গোল সত্তায়। তার বাস্তব চেহারা স্বভাবতই বিম্বাকার অন্নপিণ্ড থেকে শুরু করে দ্রব্যমাত্রতে পৌঁছে যায়। কেবল তাই নয়, **পিণ্ড**-এর এই সংহতি বৃন্দ, সমূহ, রাশি পেরিয়ে গণিতের যোগফলে, জ্যোতিষের বৃত্তের ১/৯৬ অংশে এবং জ্যামিতির বেধ বা ঘনত্বে গিয়ে ঠেকে। এমন হলেও হতে পারে, কিন্তু কেমন করে হয়, তা আমরা এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছি না। সর্বোপরি, এই **পিণ্ড** কেমন করে 'সৈন্য'কে পর্যন্ত চিহ্নিত করবার যোগ্যতা লাভ করে, সেকথার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে নিশ্চয় করে। তা নইলে ব.শ. তেমন অর্থ দিয়ে যাবেন কেন! ক্ষুধার্তকে খাদ্যের **পিণ্ড** দান করা একটা মহৎ ধর্ম ছিল সেকালে। **অনাথপিণ্ডদ** শব্দে সে জিনিস আমরা দেখেছি। কিন্তু সেই **পিণ্ড** কেমন করে গাজর হয়, তা আমরা জানি না। তবে **পিণ্ডি**-চটকান আমাদের খুবই পরিচিত শব্দ। দৃশ্যলোকে এই ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় অন্নাদি চটকে খাওয়ায়, আর অদৃশ্যলোকে এই ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় কারও কাজকর্মের কঠোর সমালোচনায়। ...

পিশ্ (পিষ্, পষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপৈশুন, নিষ্পেষণ, পখাণ, পাষ, পাষক, পাষণ্ড, পাষণ্ডী, পাষাণ, পাষাণবুকো, পাষাণী, পাষু(সু)লি, পাসান, পিচাশ(স), পিশ্, পিশঙ্গ, পিশঙ্গক, পিশঙ্গী, পিশাচ, পিশাচকী, পিশাচবৃক্ষ, পিশাচভাষা, পিশাচসভ, পিশাচিকা, পিশাচিনী, পিশিত, পিশিতভুক, পিশিতা, পিশিতাশন, পিশিতাশী, পিশুন, পিশুনবচন, পিশুনবাক্য, পিষ্, পিষ, পিষ্ট, পিষ্টক, পিষ্টপুর, পিষ্টময়, পিষ্টসৌরভ, পিষ্টিত, পিষ্ঠ, পেশ, পেশকার, পেশবা, পেশবাজ, পেশবাজি, পেশ(ষ,স)ল, পেশ(ষ)লী, পেশস্কৃৎ, পেশা, পেশি(শী), পেশোয়াজ, পেষ, পেষক, পেষণ, পেষণী, পেষা, পেষান, পেসা, পেস্তা, পৈশ, পৈশাচ, পৈশাচী, পৈশুন, পৈশুন্য, পৈস।

পিশ্ (পিষ্, পষ্) = গতিশীল পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ। **পিশ** = গতিশীল পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। **পিষ** = গতিশীল পায়ীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। **পষ** = পায়ীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।

পাষণ্ড (পাষণ্ডী) : ১. **পাষণ্ড** = ✓পা + ষণ্ড + অন - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***পাষণ্ড*** = *পায়ীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের বোধের উড়ান যাহাতে।* ***পাষণ্ডী*** = ***পাষণ্ড****-এর গতিশীলতার আধার যে।* / **পাষণ্ড** = পাপচিহ্ন আছে যাহার; বেদবিরুদ্ধ আচার যাহার; সর্ব্ববর্ণচিহ্ন ধারণ করে যে; বেদানুসারী-ব্যবহার হইতে বহিষ্কৃত যে; সর্ব্বাশ্রম চিহ্ন ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **পাষণ্ড** = অধার্ম্মিক, সর্ব্বলিঙ্গী, নাস্তিক, পাপচিহ্ন, বেদবাহ্যরক্তপট-মৌণ্ডাদিব্রতচর্য্যা, শ্রুতিস্মৃতিবাহ্যব্রত, জৈনবৌদ্ধকাপালিকাদি, অধর্ম্ম, পাপ। **পাষণ্ডী** = বেদবাহ্যব্রতলিঙ্গধারী শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদি, অধার্ম্মিক, বেদনিন্দক, বেদাচারহীন কাপালিকাদি, নিদারুণ, নিষ্ঠুর। (ব.শ.)। ৪. গালাগালি রূপে **পাষণ্ড** শব্দটি বাংলায় কদাচিৎ শোনা যায়, তবে হিন্দিতে **পাষণ্ডী** বোঝাতে **পাখণ্ডী** শব্দটি এখনও প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. দ্র. **দক্ষযজ্ঞ, ছাগ, অপগামী, অজ**। মানবসভ্যতার ইতিহাসে তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে **পাষণ্ড** শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। একালের বাংলা ও হিন্দি ভাষায় শব্দটি শুধুমাত্র গালাগালি রূপে প্রচলিত থাকলেও এর মর্মবস্তুকে একালের বাংলায় **মৌলবাদী** এবং ইংরেজিতে fundamentalist বলা হয়ে থাকে। ঘটনাটি সুপ্রাচীন, উপরোক্ত **দক্ষযজ্ঞ** প্রভৃতি শব্দগুলিতে এবং আগের পৃষ্ঠায় **পীঠ** শব্দে যে ঘটনার কথা আমরা বলেছি।

উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থগুলি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সর্বাগ্রে এদের বলা হত 'সর্ব্বলিঙ্গী', অর্থাৎ, **পাষণ্ড**গণ দক্ষদের উপদেশ মতো চাষী, তাঁতি, জেলে ... ইত্যাদি বিশেষ ধরণের কাজ করতে রাজি হয়নি, তারা যে-কোনো ধরনের কাজ করবার নিয়ম মানত। তারপরে এদের বলা হয় 'বেদবাহ্যরক্তপট-মৌণ্ডাদি-ব্রতচর্য্যা'কারী, অর্থাৎ, এরা বৈদিকদের দ্বারা নিন্দিত লাল কাপড় পরত এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধিতা করে যৌথতার সমর্থনে মাথা মুড়িয়ে নিত। এ ছিল ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিরোধী আচরণ। (পরে বৌদ্ধরাও একইভাবে মাথা মুড়িয়ে রাখার বা নেড়া হওয়ার নীতি অনুসরণ করে।) এই **পাষণ্ড**দের 'শ্রুতিস্মৃতিবাহ্যব্রত'ও বলা হত, অর্থাৎ, বৈদিকসভ্যতা এদের নিন্দাই করে গেছে এবং এরাও সেই নিন্দা শুনেও নিজেদের নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি বরং বিপরীতে যথারীতি 'বেদনিন্দা' করে গেছে একটানা। পরবর্তীকালে এই বেদনিন্দক-বেদবিরোধীরাই **তান্ত্রিক** হয়ে যায়, তারও পরে এরা বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গে হাত মেলায়। যেকারণে পরে পরে এদের 'জৈনবৌদ্ধকাপালিকাদি' বলা হত, বলা হত 'শাক্যভিক্ষুক্ষপণকাদি'।

আসলে ছিল দুটো নীতি, ফলে মানুষ দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দলে শিবপন্থীরা, দ্বিতীয় দলে দক্ষপন্থীরা। শুরু হল ঝগড়া। শিবপন্থীরা সনাতন প্রথায় বিশ্বাসী। তাঁরা বললেন — প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নিত্যনতুন আবিষ্কারমূলক নীতিতে যৌথসমাজের উৎপাদন কর্মযজ্ঞ এতদিন যেমন চালান হচ্ছিল, এখনও সেই নীতিতেই সব চলবে। দক্ষপন্থীরা বললেন — যা আবিষ্কার হয়ে গেছে তারই উপর নির্ভর করে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে যৌথসমাজের উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালান হোক; আবার যথাপূর্বং আবিষ্কার-চেষ্টার কী দরকার! কেননা, প্রচলিতের পুনরাবৃত্তিতেই যখন বিপুল সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, তখন শুধু শুধু বাড়তি শ্রমের প্রয়োজন কী! তাছাড়া, পুনরাবৃত্তিতে দোষ কোথায়? ... শিবপন্থীরা দক্ষপন্থীদের বললেন — তোরা **ছাগ**, তোদের **বিবেক** থাকবে না। দক্ষপন্থীরা শিবপন্থীদের বললেন — তোরা **পাষণ্ড** হয়ে থাকবি। ... (বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ৫১-৬৪, এবং ১১৪-১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইতোপূর্বে **ছাগ** ও **পশু** বলতে কী বোঝায়, তার বিস্তারিত

ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **বিবেক** কাকে বলে, সেকথা **বিবেক** শব্দে পাওয়া যাবে। এখন জানতে হবে **পাষণ্ড** বলতে ঠিক কাকে বোঝায়। ব.শ. শব্দটির মূলে যাননি, ছা.অভিধান মূলে যাওয়ার চেষ্টা করে শব্দটিকে তিনরকম ভাবে ভেঙেছেন, কিন্তু কোনো ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ তাঁরা কেউই দেননি। আমরা বর্ণের উপর নির্ভর করে দেখতে পাচ্ছি, 'যে সত্তার গড়ান-উড়ান দিশাগ্রস্তভাবে চলে', তাকে **পাষণ্ড** বলে। তার মানে, সুদীর্ঘকাল ধরে একাদিক্রমে আবিষ্কারমূলক 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি'র বা **শিব**নীতিতে চলাও এক ধরনের দিশাগ্রস্ততা। অর্থাৎ **শিবপন্থী**দের বিরুদ্ধে দক্ষপন্থীরা অভিযোগ তুলেছিলেন যে, শিবপন্থীরা 'সেকেলে' হয়ে পড়েছে, দিশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, **মৌলবাদী** হয়ে পড়েছে। ওদিকে দক্ষপন্থীদের নীতিটিই হল 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি', যা কিনা শুধুমাত্র দিশাগ্রস্তই নয়, শতকরা একশো ভাগই **মৌলবাদ**! তার মানে, বিশ্বের আদি **মৌলবাদ** (দক্ষনীতি) সেকেলে হয়ে-পড়া আবিষ্কারমূলক 'স্বাভাবিক-বিশুদ্ধিবাদ'-এর (শিবনীতির) বিরুদ্ধে 'মৌলবাদী' হয়ে-পড়ার অভিযোগ তুলেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম শুরু করেছিল। অদ্ভুত মনে হলেও এটাই ছিল সত্যি!

নিঃসন্দেহে এ ভারী অদ্ভুত পরিস্থিতি! যাঁরা কার্যত ধর্মত স্বভাবত এবং নীতিগতভাবে **মৌলবাদী**, সেই দক্ষপন্থীরাই, যাঁরা কার্যত ধর্মত স্বভাবত মৌলবাদবিরোধী এবং স্বাভাবিক-বিশুদ্ধিবাদী, সেই শিবপন্থীদের বিরুদ্ধে **মৌলবাদী** হয়ে-পড়ার অভিযোগ আনছে এবং ইতিহাসের সেই বিশেষ কালখণ্ড সেই অভিযোগকারীকেই সমর্থন করছে। ...

এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতি কখনো কখনো হতে দেখা যায়। একালে খানিকটা এধরনের পরিস্থিতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাঙাল-ঘটীর বিতর্কে। **ঘটী**-হওয়া বা **পণ্যজীবী**-হওয়া খুব একটা ভাল কাজ নয়, কেননা, তাতে মানুষ মনুষ্যত্ব-অর্জনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়। আর বাঙাল (বঙ্গনীতির ধারক) হওয়ার মানেই হল দুইকে একত্রে নিয়ে চলা, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ধারক হওয়া, পূর্ববিধান-নববিধানের মিলন ঘটিয়ে স্বাভাবিক-বিশুদ্ধিবাদের (শিবের) নীতি অনুসরণ করে চলা, অর্থাৎ কিনা মনুষ্যত্ব-চর্চার সর্বোচ্চ পন্থা অনুসরণ করা। অথচ কলকাতার বাংলাভাষী যখন **ঘটী**তে পরিণত হচ্ছিল, ইতিহাসের সেই কালখণ্ড ছিল **ঘটী**র পক্ষে এবং বাঙালের (বা বঙ্গনীতির) বিপক্ষে। বাঙালকে (বঙ্গনীতিকে) তখন তারা 'সেকেলে' বলেই গাল পেড়েছিল, এবং সার্বিক পরিস্থিতি সেই গালাগালিকে সমর্থন করেছিল। ...

মোট কথা, **পাষণ্ড** শব্দের অর্থ হল 'একদিশায় শক্তিবিচ্ছুরণের বোধ নিয়ে যে উড়ে বেড়ায়।' একালের বাংলাভাষী তাকে **মৌলবাদী** নাম দিয়েছে। মধ্যযুগের বাংলাভাষী তাকে নাম দিয়েছিলেন — **পাকাম, পাকামি**। ... দ্র. **গণ**।

পাষাণ (পাষাণবুকো, পাষাণী) : ১. ✓পিষ্ + আন (আনচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পাষাণ*** = *পায়ীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ অন (on) রয়েছে যাহাতে।* ***পাষাণী*** = ***পাষাণ****-এর গতিশীল আধার যে। /* **পাষাণবুকো** = যাহার বুক পাষাণের মতো কঠিন; যাহার বুক পাষাণময়। (ব.শ.)। **৩. পাষাণ** = প্রস্তর, শিলাখণ্ড, করকা, শিল (hail-stone), **হিমালয়**, গিরিরাজ; তুলার সাম্যার্থ ধটে (ধাড়ায়) স্থাপিত ভার (make-weight)। **পাষাণবুকো** = দয়ালেশহীন। দৃঢ়বক্ষাঃ। **পাষাণী** = তুলামান-শিলাখণ্ড, পাথরের বাটখারা, গিরিরাজপত্নী মেনকা, কঠিনহৃদয়া গিরিসুতা, পাষাণময়ী নারী, পাষাণহৃদয়া, নিষ্ঠুরা। (ব.শ.)। **৪.** Stone অর্থে **পাষাণ** প্রচলিত। দাঁড়িপাল্লার 'একপেশেমি' ঠিক করাকে বলা হয় **পাষাণ**-ভাঙা। আর, 'কঠিনহৃদয়া নারী অর্থে **পাষাণী** শব্দটিও কমবেশি প্রচলিত। **৫.** প্রসঙ্গটি **পাষণ্ড** শব্দেই এসেছিল। পাললিক শিলায় স্তর পড়ে পড়ে কঠিন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট। **পাষাণ**-এ এই দিশাগ্রস্ত স্তর পড়ে যাওয়ার ক্রিয়াটি রয়েছে। তাই তাকে **পাষাণ** বলে। তবে এ হল শব্দটির দৃশ্য অর্থ। কিন্তু শব্দের গৌরব তো তার অদৃশ্য অর্থে, বাংলার উত্তরাধিকারে যা খুব ভালভাবেই রয়েছে। তবে সে প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই আসছি।

পাথরের বাটখারাকে **পাষাণী** বলা যেতেই পারে, কিন্তু বাংলার হাটবাজারের মানুষেরা সে অর্থে **পাষাণী** শব্দটির ব্যবহার করেন না; অন্তত আমাদের কানে পড়েনি। তাঁরা বরং দাঁড়িপাল্লার 'একপেশেমি' ঠিক করা বা 'তুলার সাম্যাবস্থাকরণ'কেই 'পাষাণ-ভাঙা' বলে থাকেন। ব.শ. দেখিয়েছেন, কথাটি ফারসি 'পাসন্‌গ্', হিন্দি ও মারাঠি 'পাসংগ' পাঞ্জাবি ও উড়িয়া 'পাসঙ্গ' থেকে এসেছে। সেক্ষেত্রে শব্দটি দাঁড়ায় 'পাসান-ভাঙা'। আমাদের মনে হয়, এটি 'পাষাণ-ভাঙা'ই হবে। কেননা, **পাষাণ**-এর ভিতরে একদিশায় বা একপাশে ঝুঁকে পড়ার অর্থটি রয়েছে।

কিন্তু **পাষাণী** কেন নিষ্ঠুরহৃদয়া? গিরিরাজপত্নী **মেনকা** কি সত্যিই নিষ্ঠুরহৃদয়া ছিলেন? পাষাণময়ী নারী বলতে ঠিক কী বোঝায়? **গিরি, গিরিজা** এবং **পর্বত** শব্দে আমরা **পর্ব্বে পর্ব্বে** বা স্তরে স্তরে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনকে আগেই শনাক্ত করেছি। সেইরূপ সামাজিক সংগঠনসমূহের রাজা বা **গিরিরাজ** হলেন **হিমালয়**। একালের ভাষায় একে রাষ্ট্র বা সরকার বলে। তার আধারশক্তি হলেন সরকারি কর্মচারীরা। সেকালের ভাষায় তিনিই 'গিরিরাজপত্নী' **মেনকা**। তা সরকারি কর্মচারীরা **পাষাণের** মতো **পর্ব্বে পর্ব্বে** বা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত কি না, তাঁরা কঠিনহৃদয়া কি না বা তদ্রূপ হতে বাধ্য কি না, তার সাক্ষ্য ভুক্তভোগী বাংলাভাষী মাত্রেই দিতে পারবেন। আমাদের বলা লাগবে না। ...

পিশাচ (পিশাচকী, পিশাচমোচন) : ১. পিশিত + ✓অশ্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। 'পিশিতাশ' > পিশাচ। (ব.শ.)। **২.** ***পিশাচ*** = *গতিশীল পায়ীর গতিশীল শক্তিবিচ্ছুরণ তারিত যাহাতে তাহার ব্যাপন করে যে।* **৩. পিশাচ** = দেবযোনিবিশেষ, অশুচিমরুদেশবাসী, প্রেত। (ব.শ.)। (ক) কুবেরের অনুচর এক যক্ষপতি। (খ) জনৈক রাক্ষস। ইনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। (গ) ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। বেদমন্ত্র অনুসারে রাক্ষসদের চেয়ে এদের স্থান নিম্নে। এরা অত্যন্ত ঘৃণিত প্রাণী। এদের জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের মতে অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে ব্রহ্মা কর্তৃক এরা সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার যে জলবিন্দু হতে দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছিল, সেই জলবিন্দুর সামান্য অংশ অন্যত্র পতিত হওয়ায় এই

পিশাচ ও রাক্ষসদের সৃষ্টি হয়। মনুর মতানুসারে এরা প্রজাপতি হতে উদ্ভূত। পুরাণ অনুসারে কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ক্রোধবসার গর্ভে পিশাচদের জন্ম হয়। এদের প্রধান কাজ মানুষদের বিপথগামী করা। রাক্ষসের সঙ্গে তুলনায় এদের প্রভেদ অল্প। মৃতদেহ ভক্ষণ, শ্মশান ও কবরস্থানে বিচরণ প্রভৃতি এদের কাজ। (পৌ.অ.)। **পিশাচকী** = কুবের। **পিশাচমোচন** = স্বনামখ্যাত তীর্থবিশেষ। (ছা.অ.)। ৪. cruel অর্থে **পিশাচ** শব্দটি প্রচলিত, বাকি সব অপ্রচলিত। ৫. 'ব্যাটা পয়সার পিশাচ' — এমন বাক্য গ্রামবাংলায় এখনও শুনতে পাওয়া যায়, কদাচিৎ 'রক্তপিশাচ' শব্দটিও শোনা যায়। এমনকি **পিশাচকী** শব্দের অর্থ **কুবের** (আদি ব্যাঙ্ক বা সুদখোর), এমন কথা অভিধানে লেখা থাকলেও আমাদের মনে পড়ে না যে, **কুবের** কোনো অলৌকিক জানোয়ার নয়। ইনি আমাদের চিরপরিচিত 'সুদখোর'। কিন্তু এই সুদখোরের জন্ম হয় কীভাবে? উপরোক্ত ৩.-এ প্রদত্ত তথ্যগুলি থেকে তার কিছু কিছু হদিশ পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে 'জগৎসৃষ্টি' নামে যে অধ্যায়টি রয়েছে, তাতে এর স্থান 'মুখ্যসৃষ্টি'র ভিতরেই, যারা 'জরায়ুজ' নামে পৃথকভাবে চিহ্নিত, যথা — 'পশু, মৃগ, ব্যাল, উভয়তদত, রাক্ষস, পিশাচ, ও মনুষ্য।' (বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ১৪৩-১৪৬ পৃষ্ঠায়।)

পিশাচ শব্দটির গড়ে ওঠা সম্পর্কে সব শব্দকোষ বা অভিধানেই কিছুটা অনিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে শব্দটি যে **পিশিত** শব্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সেকথা প্রায় সব অভিধানেই রয়েছে। এই যে **পিশিত**, এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হয় '**পিশ** গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে'। বলা হয়েছে, সেটিই মাংস। দৃশ্যজগতে এ হল, কোনো কিছুর উপর কামড় বসিয়ে, কিংবা বলা ভাল, কামড়ে কামড়ে পিশ পিশ (piece piece) করে মুখে তুলে তুলে একটু একটু করে খেয়ে নেওয়া। এই যে বার বার কামড় বসানো, একেই বলে 'পায়ীর শক্তিবিচ্ছুরণ'। তার ফলস্বরূপ মুখে উঠে চলে আসে **পিশিত**, তাকেই 'মাংস' বলে। পাণিনিকে উল্লেখ করে ব.শ. জানাচ্ছেন, এই **পিশিত**-গ্রহণেচ্ছা ব্যাপ্ত করে **পিশাচ**। দৃশ্যজগতে সে মাংসাশী হতে পারে, কিন্তু অদৃশ্যজগতে সে অবশ্যই সুদখোর না হয়ে যায় না। সাক্ষী হিসেবে '**পিশাচকী** = **কুবের**' তো উপস্থিত রয়েছেই। ৬. ইংরেজি piece।

পিষ্ট (পিষ, পিষ্টক, পেষ, পেষক, পেষণ, পেষণি, পেষণী, পেষা, পেষান) : ১. **পিষ্ট** = ✓পিষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পিষ*** = *পায়ীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।* ***পিষ্ট*** = ***পিষ*** *তারিত বা টঙ্কারিত যাহাতে।* ***পিষ্টক*** = ***পিষ্ট*** *কৃত যাহাতে।* ***পেষ*** = ***পিষ*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***পেষক*** = ***পেষ*** *করে যে।* ***পেষণ*** = ***পেষ*** *অন (on) যাহাতে।* ***পেষণি*** = ***পেষণ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পেষণী*** = ***পেষণি****র আধার যে।* ***পেষা*** = ***পেষ****-এর আধার যে।* ***পেষাণ*** = ***পেষা*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* / **পেষণ** = যাহার দ্বারা চূর্ণন করা যায়। **পেষণি, পেষণী** = যাহার দ্বারা পেষণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **পিষ** = পেষণ করা, গুঁড়া করা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা, বাটিয়া ফেলা, ঘর্ষণ করা, পেষা। **পিষ্ট** = কৃতপেষণ, চূর্ণিত, ঘৃষ্ট, দলিত, চূর্ণিত দ্রব্যমাত্র, গোধূমচূর্ণ। **পিষ্টক** = পিষ্টবিকারবিশেষ, তণ্ডুলচূর্ণ-বিকারবিশেষ, চালের পিঠা, রোটিকা, নেত্ররোগভেদ, তিলচূর্ণ। **পেষ** = পেষণ, চূর্ণন। **পেষক** = চূর্ণয়িতা। **পেষণ** = চূর্ণন, গুঁড়ান, পেষণদ্রব্য, ঔষধাদিপেষণস্থান, খল। **পেষণি, পেষণী** = পেষণশিলা, শিলনোড়া, জাঁতা। (ব.শ.)। **পেষা** = পেষণ করা। **পেষান** = অন্যের সাহায্যে পেষণ করা। ৪. crushed অর্থে **পিষ্ট,** a kind of cake অর্থে **পিষ্টক,** grinding অর্থে **পেষা,** এবং to cause to grind অর্থে **পেষান** প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত। **পিষ, পেষ, পেষক, পেষণ, পেষণি, পেষণী** প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **পেশ**। ৬. ইংরেজি paste, pestle, pistachio।

পেশ (পেশকার, পেশল, পেষল, পেসল, পেশা, পেশাদারী, পেশি, পেশী, পেস্তা) : ২. ***পেশ*** = ***পশ*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***পেশকার*** = ***পেশ*** *করে যে।* ***পেশল*** = ***পেশ*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***পেষল*** = ***পেষ*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***পেশা*** = ***পেশ****-এর আধার যে।* ***পেশাদারী*** = ***পেশা দার*** *যাহার।* ***পেশি*** = ***পেশ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পেশী*** = ***পেশি****র আধার যে।* / **পেশকার** = যিনি আদালতে মোকদ্দমার নথি বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। **পেশাদারী** = যাহা বৃত্তিরই জন্য (সখের নহে)। **পেশি, পেশী** = যাহার সঙ্কোচন-প্রসারণে অঙ্গ চালিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **পেশ** = বিচারার্থ বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপিত। **পেশকার** = সহকারী কর্ম্মচারী। **পেশল, পেষল, পেসল** = সুন্দর, সুকুমার, আপাততঃ রম্য, ভারাক্ষম, দক্ষ, ধূর্ত, সৌকুমার্য্য, ভদ্র। **পেশা** = ব্যবসায়, বৃত্তি। **পেশি, পেশী** = অণ্ড, ডিম্ব, মাংসপিণ্ড। **পেস্তা** = বাদামজাতীয় ফলবিশেষ (pistachio nut)। (ব.শ.)। ৪. submit অর্থে **পেশ,** bench-clerk অর্থে **পেশকার,** muscular অর্থে **পেশল,** profession অর্থে **পেশা,** professional অর্থে **পেশাদারী,** muscle অর্থে **পেশী,** এবং pistachio-nut অর্থে **পেস্তা** প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **পশ**। সত্তার আপন স্থান থেকে কোনো দিকে আপন শক্তিকে প্রেরণ করাই **পিশ**। তা দিশাগ্রস্ত হলে **পিষ**। সেই **পিষ** তারিত হয়ে টঙ্কারিত হলে তাকে বলে **পিষ্ট**। বাংলায় **পিষ্ট** অন হতে থাকার কোনো শব্দ নেই, কিন্তু ইংরেজিতে আছে; তাঁরা বলেন piston। তবে **পিষ** বা **পিষা** (অর্থাৎ, **পেষণ** করা) শব্দের বিষয়ে একালের বাংলাভাষী জেনে গেছেন যে, এই ক্রিয়া প্রধানত একদিশায় চলে। সেই কারণে 'বাটা' (বাটনা বাটা) অর্থে **পিষা** না বলে **পেষা** বলা হয়। ফারসিতে সেটিই **পেশ**-করা রূপে প্রচলিত। এই **পেশ** যদি অন (on) থাকে, তাকে বলে **পেশন**। এই শব্দের উত্তরাধিকার বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজির passion শব্দে। আসলে **পেশ**-এর মূল ক্রিয়াটিকে একদিকে একস্থানে বারংবার প্রেরণ করাই হল **পেষ**। তার ফলে বস্তুটি **পিষ্ট** হয়ে paste হয়ে যায়। তবে এই **পেষণ** যদি আবর্তমান হয়, তখন তাকে বলতে হবে **প্রেষ**। এর উত্তরাধিকার বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজির press শব্দে। ... ৬. ইংরেজি passion, paste, piston, press।

***পী (পয়্, প্যায়্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপয়া, অপেয়, আপান, আপীত, আপ, আব, আবওয়াব, আবগারী, আবখোরা, আবহাওয়া, নিপান, পয়্, পয় (প-য, নিম্নগামী), পয়ঃপান, পয়ঃপ্রণালী, পয়কার (পাইকার), পয়খানা (পায়খানা), পয়গম্বর, পয়জার, পয়দল, পয়দা, পয়দার (powder, পাউডার), পয়নালা, পয়মন্ত, পয়মাল, পয়স্, পয়সা (টাকা যেখানে নেমে আসে), পয়সি, পয়ন্ত, পয়স্তি, পয়স্য, পয়স্যা, পয়স্বী, পয়স্বিনী, পয়া, পয়োঘন, পয়োদ, পয়োদ্ভব, পয়োধর, পয়োধারা, পয়োধি, পয়োনিধি, পয়োবহ, পয়োব্রত, পয়োমুক্(চ্), পয়োরাশি, পয়োষ্ণী, পাইকার (পয়কার), পাই(য়)খানা, পাউডার, পায়খানা, পায়স, পায়ু, পিআসল, পিংপিং, পিপাসা, পিব, পিয়াস, পিউষ(স), পী, পীউস, পীঠ, পীঠকেলি, পীঠগ, পীঠনায়িকা, পীঠন্যাস, পীঠস্থান, পীঠিকা (দ্র.পিণ্ড্), পীন, পীনস, পীনসী, পীনস্তনী, পীনোধ্নী, পীবর, পীয়ল, পীয়লী, পীযূষ, পীযূষগ্রন্থিল, পীযূষবর্ষ, পীযূষরুচি, পীযূষী, পেকাম্বর, পেয়, পেয়ালা, পৈগম্বর, পৈঘর, পৈয়িস, পোয়ান, প্যান, প্যায়ন, প্যানপ্যান, প্যায়্।

পী (পয়্, প্যায়্) = গতিশীল পায়ীর আধার যে। **পয়** = পায়ী যায় যাহাতে। **প্যায়** = পায়ীধারকের যাওয়া যাহাতে।

পয়ঃ (পয়, পয়দা, পয়মন্ত, পয়া, অপয়া) : ১. পয়ঃ = ✓পী (পান) + অস্ (অসুন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *পয় = পায়ী যায় যাহাতে।* ***পয়ঃ*** *=* ***পয়****-এর চূড়ান্ত যাহাতে।* ***পয়দা*** *=* ***পয়*** *দান থাকে যাহাতে।* ***পয়মন্ত*** *=* ***পয়****-এর অন্ত পর্যন্ত (যাহা যায়)।* ***পয়া*** *=* ***পয়****-এর আধার যে।* ***অপয়া*** *= নেই* ***পয়*** *যাহাতে, তাহার আধার।* / **পয়ঃ** = যাহা পেয়; যাহা নিম্নে গমন করে। (ব.শ.)। **৩. পয়ঃ** = জল, ক্ষীর, দুগ্ধ, বীর্য্য। **পয়** = দুগ্ধ, ঘনদুগ্ধ, জল। **পয়দা** = জনিত, জাত, নির্ম্মিত, উৎপাদিত। **পয়মন্ত** = সৌভাগ্যবতী, সুলক্ষণা। **পয়া** = ভাগ্য, লক্ষণ। **অপয়া** = অপায়যুক্ত, অভাগ্যবান, অলক্ষণ, হতভাগ্য। (ব.শ.)। **৪.** good luck অর্থে **পয়া** এবং bad luck অর্থে **অপয়া** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি কমবেশি অপ্রচলিত। **৫. পী** ক্রিয়ার শব্দপরিবারে বহু ফারসি শব্দ আত্মীয় হিসেবে ঢুকে পড়েছে। ফলে এই পরিবারের সদস্যদের বুঝে নিতে একটু অসুবিধে হয়। বিশেষত, **পয়গম্বর, পয়দা, পয়জার, পয়দল** ... ইত্যাদি শব্দ নিয়ে বারে বারে ধাঁধায় পড়তে হয়। বিশ্বাসই হতে চায় না যে, **পয়কার** আর **পাইকার** একই শব্দ, **পয়খানা** আর **পাইখানা** বা **পায়খানা** একই শব্দ। এমনকি **পয়দা** থেকে **পয়দার** করে যদি কাউকে পাওয়া যায়, দেখা যাবে তার সঙ্গে powder-এর সম্পর্ক খুব দূরের নয়। তবে সেসব প্রতি স্তরে বুঝে নিতে গেলে আরও গভীরে যাওয়া দরকার। ...

কিন্তু অত বিশদে যাওয়ার অবকাশ বর্তমানে আমাদের নেই। আমাদের গন্তব্য **পয়** শব্দের ভিতরের রহস্যটুকু। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নোংরা-জল থেকে শুরু করে সুপেয় জল, দুধ, ক্ষীর ... ইত্যাদি সবই **পয়** পদবাচ্য। তার মানে, অতি-অপেয় থেকে অতি-পেয় পর্যন্ত **পেয়** এবং **অপেয়**সমূহের দিকে **পয়** অঙ্গুলিনির্দেশ করে। অর্থাৎ কিনা, **পয়**-এর ভিতরে 'পায়ীর নিঃসৃত হয়ে যাওয়া'র ব্যাপারটি আছে, তা সেটি ভাল-অংশ ছেঁকে বের করা তরল হোক আর মন্দ-অংশ ছেঁকে বের করে দেওয়া তরলই হোক। সেই কারণে **পয়** যেমন **ক্ষীর, দধি** প্রভৃতি **পয়োবিকার** হতে পারে, তেমনি নর্দমার নোংরা জলও হতে পারে। মোটকথা, পেয়-বস্তু ভালর দিকে যেখানে পৌঁছয় সেগুলি যেমন **পয়**-পদবাচ্য, যথা দুধ ক্ষীর পয়োধর-স্রাবিত পায়স ইত্যাদি, তেমনি মন্দের দিকে যেখানে পৌঁছয় সেগুলিও **পয়**-পদবাচ্য, যথা **পয়ঃপ্রণালী, পয়খানা** বা **পায়খানা** ইত্যাদি। এমনকি, এই **পয়** যখন উৎপন্নের ধারা বা **পণ্য**ধারা তখনও, যে-সত্তা সেই ধারার প্রবাহ বহন করে তাকে **পয়কার** বা **পাইকার** রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তবে **পয়** শব্দ প্রধানত ভালই বোঝায় বলেই **পয়** যার কপালে থাকে তাকে **পয়া** বলা হয়ে থাকে। **পয়মন্ত** সেকারণেই সকলের কাম্য। দ্র. **পীযূষ**।

পীযূষ : ১. ✓পী + যূষ (যূষন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাহাতে পায়ীর গতিশীল আধার নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে একদিশায় শক্তি দেয়; যে* ***যূষ*** *(juice) অবশ্য পেয়।* **৩.** রসভূত পয়ঃ, অমৃত, সুধা, নবপ্রসূতা গবীর সপ্তদিবসাধি ক্ষীর, দুগ্ধ, মধু। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** আমরা যাকে **পীযূষ** বলি, ইংরেজ তাকেই juice বলে, এমন কথা চট করে বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে কথাটি ঠিক। এমনিতে মাছ মাংসের ঝোলকে **যূষ** বলা হয়ে থাকে। তবে ফলের **যূষ**ই বেশি প্রচলিত। সন্দেহ নেই, এগুলি সবই **পয়**-এর ভাল দিক। **৬.** ইংরেজি juice।

পীড়্ (পীড়ি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আপীড়, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, পিড়ক, পিড়কা, পীড়্, পীড়, পীড়ক, পীড়ন, পীড়া, পীড়াকর, পীড়াকৃৎ, পীড়াপীড়ি, পীড়ি, পীড়িত, প্রপীড়ন, সম্পীড়ন।

পীড়্ (পীড়ি) = গতিশীল পায়ীর আধারের গড়ান-উড়ান। **পীড়** = গতিশীল পায়ীর আধারের গড়ান-উড়ান যাহাতে। **পীড়ি** = পীড় গতিশীল যাহাতে।

পীড়ক (আপীড়, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, পীড়, পীড়ন, পীড়া, পীড়াকর, পীড়াপীড়ি, পীড়ি, পীড়িত, প্রপীড়ন, সম্পীড়ন) : ১. ✓পীড়্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *পীড় = পড় গতিশীল (হয়ে আপতিত) হয় যাহাতে (যে ক্রিয়ায়)।* ***পীড়ক*** *=* ***পীড়ন*** *করে যে।* ***আপীড়*** *=* ***পীড়****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***উৎপীড়ন*** *= যে* ***পীড়ন*** *উদ্‌লোক হইতে আপতিত হয়।* ***নিপীড়ন*** *= নিপতিত* ***পীড়ন*** *যাহাতে।* ***পীড়ন*** *=* ***পীড়*** *অন (on) যাহাতে।* ***পীড়া*** *=* ***পীড়****-এর আধার যে।* ***পীড়াকর*** *= যাহা* ***পীড়া*** *করে, অর্থাৎ* ***পীড়া*** *দেয়।* ***পীড়াপীড়ি*** *=* ***পীড়া*** *ও* ***পীড়ি****।* ***পীড়িত*** *=* ***পীড়*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***প্রপীড়ন*** *= প্রকৃষ্ট* ***পীড়ন*** *যাহাতে।* ***সম্পীড়ন*** *= সম্যক* ***পীড়ন*** *যাহাতে।* / **আপীড়** = শিখা পীড়ন করে যে। (ব.শ.)। **৩. পীড়ক** = পীড়য়িতা, বাধক। **আপীড়** = নিপীড়ক,

ক্লেশকর, নিপীড়ন, শিখামাল্য, শিরোভূষণ, মাল্যমাত্র। **উৎপীড়ন** = অতিপীড়ন, উন্মথন, সংক্লেশন, সংমর্দ্দন। **নিপীড়ন** = নির্ব্যথন, সংক্লেশন, নিষ্পীড়ন, মর্দ্দন। **পীড়** = পীড়ন করা, আহত করা। **পীড়ন** = বাধন, ব্যথন, দুঃখজনন, শত্রুকৃত পীড়া, বিলোড়ন, আঘাত, গ্রাস, গ্রহণ, শস্যাদিমর্দ্দন, চাপ দেওয়া ... ইত্যাদি। **পীড়া** = আর্ত্তি, ব্যথা, বাধা, ক্ষয়, হিংসা, বেদনা, দুঃখ, রোগ, কৃপা, শিরোমালা, সরলবৃক্ষ। **পীড়াকর** = পীড়াজনক, পীড়ক। **পীড়াপীড়ি** = অতিশয় পীড়ন, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। **পীড়িত** = পীড়ন, রতিবন্ধবিশেষ, (তন্ত্রে) মন্ত্রভেদ। **প্রপীড়ন** = নিপীড়ন, নিষ্পেষণ। **সম্পীড়ন** = নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, নির্ম্মথন, সংক্লেশন, বাধন। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। ৫. **পীড়** বা **পীড়া** শব্দটি তৈরি হয় **পড়** থেকে। **পড়** গতিশীলতা গুণসম্পন্ন হয়ে কারও উপর **পড়লে**, তাকে বলে **পীড়**। যার উপর **পড়ে**, তার পক্ষে সেটি **পীড়া** বা **পীড়াদায়ক**। ... এই নিয়মে সব শব্দগুলি তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে কথাটি এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, তা হল, উপসর্গ যোগে যে **পীড়া**-বাচক শব্দগুলি তৈরি হয়েছে, তাদের প্রতীকী অর্থ (উপরে ৩. দ্রষ্টব্য) দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য থেকে সরে যাওয়া হয়েছে। যেন-বা **আপীড়ন, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, প্রপীড়ন, সম্পীড়ন** সবই এক ব্যাপার, যেন-বা তাদের অর্থে কোনো ফারাক নেই। আমরা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে সেই ফারাক কমবেশি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

পু (পুং, পুচ্ছ, পুট্, পুৎ, পুম্‌স্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপুণ্য, অপুত্র (অপুত্ত্র), অপুত্রক (অপুত্ত্রক), অপুত্রিণী (অপুত্ত্রিণী), অপুমান, অভিন্নপুট, কিশলয়পুট, কৃতাঞ্জলিপুট, নাতিপুতি, পাঁজিপুঁথি, পুং, পুংক্ষীর, পুংযোগ, পুংরত্ন, পুংরাশি, পুংরূপ, পুংবৎ, পুংবদ্ভাব, পুংবৎস, পুংলিঙ্গ, পুংশাবক, পংশ্চল, পুংশ্চলী, পুংশ্চিহ্ন, পুংসবন, পুংস্কোকিল, পুংস্ত্ব, পুঃ, পুঁছ, পুঁজ, পুঁজি, পুঁটলি(লী), পুঁটি(ঠী), পুঁটুলী, পুঁটে, পুঁত (পোঁতা), পুঁতি(থি), পুঁথি(থী), **পুঙ্কশ**, পুঙ্কষ(স), পুঙ্খ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, পুঙ্খিত, পুঙ্গব, পুঙ্গি, পুচ্ছ, পুছ, পুঞ্জ, পুঞ্জি, পুঞ্জিকস্থলা, পুঞ্জিত, পুঞ্জীভূত, পুট্, পুট, পুটকর, পুটক, পুটপাক, পুটকিত, পুটকিনী, পুটপাণি, পুটপুটে, পুটভেদ, পুটলি(লী), পুটহাত, পুটাঞ্জলি, পুটি, পুটিকা, পুটী, পুটুল্যা, পুণ, পুণবত, পুণবতী, পুণ, পুণি, পুণ্ড, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডী, পুণ্য, পুণ্যক, পুণ্যকর্ম্ম, পুণ্যকাল, পুণ্যকীর্ত্তন, পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যকৃৎ, পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যগন্ধ, পুণ্যগৃহ, পুণ্যজন, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যদ, পুণ্যদর্শন, পুণ্যপরম্পরা, পুণ্যফল, পুণ্যবন্ত, পুণ্যবান, পুণ্যভাক, পুণ্যভূমি, পুণ্যযোগ, পুণ্যরাত্র, পুণ্যলোক, পুণ্যশকুন, পুণ্যশ্লোক, পুণ্যা, পুণ্যানুভব, পুণ্যারণ্য, পুণ্যাহ, পুণ্যে, পুণ্যোদয়, পুৎ, পু(প্)ত, পুতকী, পুতখাগী, পুততী, পুতনা, পুতর, পুতলি(লী), পুতা, পুতি, পুতী, পুতু-পুতু, **পুতুল**, পুতুলী, পুত্তল, পুত্তলক, পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী, পুত্তিকা, **পুত্তুর**, **পুত্র** (পুত্ত্র), পুত্রক (পুত্ত্রক) পুত্রকর্ম্ম, পুত্রকাম, পুত্রকৃতক, **পুত্রজগ্ধী**, পুত্রজাত, পুত্রজীব, পুত্রপৌত্রীণ, পুত্রহানী, পুত্রাচার্য্য, পুত্রিকা (**পুত্ত্রিকা**), পুত্রিকাপুত্র, পুত্রিকাভর্ত্তা, পুত্রিকাসুত, পুত্রিণী, পুত্রী, পুত্রীকৃত, পুত্রীয়, পুত্রেষ্টি (পুত্ত্রেষ্টি), পুত্রেষ্টিকা, পুত্র্য, পুথি(থী), পুথিপত্তর, পুথিপত্র, পুদগল, পুন, পুনঃ, পুনঃপুনঃ, পুনঃপুনা, পুনকেশরু, পুনরপি, পুনরাগত, পুনরাগম, পুনরাগমন, পুনরাচমনী, পুনরাস্তদূষণ, পুনরাধান, পুনরাবর্ত্তী, পুনরায়, পুনরুক্ত, পুনরুক্তবদাভাস, পুনরুক্তি, পুনরুপগম, পুনরূঢ়া, পুনর্জ্জন্ম, পুনর্জ্জন্মা, পুনর্নব, পুনর্নবা, পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বার, পুনর্ব্বিবাহ, পুনর্ব্বিভা, পুনর্ব্বিয়া, পুনর্ভব, পুনর্ভূ, পুনশ্চ, পুনি(নী), পুনীত, পুনীহি, পুন্নাগ, পুন্নামা, পুনু, পুমপত্য, পুমর্থ, পুমান, পুগ, পুণ, পুত, পুতাত্মা, পুতি, পুতিগন্ধ, পুতিতুণ্ড, পো, পোঅ, পোআতি, পোয়াল, পোই, পোওয়া, পোঁ, পোঁটলা, পোঁটা, পোঁতা, পোট, পোটলিকা, পোটা, পোট্টলিকা, পোট্টলী, পোড়া, পোত, পোতক, পোতদার, পোতন, পোতপ্লব, পোতবণিক, পোতবাহ, পোতভঙ্গ, পোতলি, পোতা, পোতাধান, পোতিক, পোতী, পোদ্দার, পোন, পোনা, পো-মশায়, পোয়া, পোয়াতী, পৌংশ্চলেয়, পৌংস্ন, পৌগণ্ড, পৌগণ্ডক, পৌত্তলিক, পৌত্তিক, পৌত্তুর, পৌত্র, পৌত্ত্র, পৌনঃপুনিক, পৌনরুক্ত(ক্ত্য), পৌনর্ভব, পৌনে, সুপুত্র, সুতপুত্র।

পু (পুং, পুচ্ছ, পুট্, পুৎ, পুম্‌স্) = পু = যে পায়ী নবরূপে উত্তীর্ণ। **পুং** = নবরূপী পায়ীর রহস্যরূপ যাহাতে। **পুচ্ছ** = নবরূপী পায়ীর চয়ন-ছাদিত যাহাতে। **পুট** = নবরূপী পায়ীর টঙ্কার যাহাতে। **পুৎ** = নবরূপী পায়ীর উল্লম্ফন যাহাতে। **পুম্‌স** = নবরূপী পায়ীর সীমায়নের শেষ যাহাতে। (**পু** ক্রিয়াটি নবরূপে উত্তীর্ণ **প** বলে, এটি পাওয়ার ঠিক বিপরীত — দেওয়া। তা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ শক্তি তেজ ... ইত্যাদি যে কোনো কিছুই দেওয়া হতে পারে, নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের উপর। **পুক্** বা **পু-করণ**, **পুচ্** বা **পু-চয়ন**, **পুট্** বা **পু-টঙ্কারণ**, **পুত্** বা **পু-তারণ** ... প্রভৃতি ব্যাপারগুলি 'সত্তার থেকে বাইরে কিছু দেওয়া'র কোনো ক্রিয়াই বোঝায়। গ্রামবাংলায় 'পুক্' ও 'পুচ্' শব্দটির ব্যবহার রয়েছে 'পুক্ করে বাতকর্ম করা'য়, এবং 'পুচ্ করে কিঞ্চিৎ পায়খানা বা তজ্জাতীয় তরল বা অর্ধতরল কিছু বেরিয়ে যাওয়া'য়। হিন্দিতে 'পু-কার' (চীৎ-কার-এর মতো) শব্দে রয়েছে 'ডাক-দেওয়া'; আর ইংরেজির po-, poo-, pu-যুক্ত বেশ কিছু শব্দ রয়েছে একই অর্থের নানান রূপের ধারক হিসেবে।)

পুং (পুংলিঙ্গ, পুংশ্চল, পুংশ্চলী, পুংসবন, পুংস্ত্ব) : ১. **পুং** = পুমস্ > পুম্ > পুং। ২. **পুং** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (কোনো কিছু দাতার) রহস্যরূপ যাহাতে।* ***পুংলিঙ্গ*** = ***পুং লিঙ্গ*** *যাহার (দ্র. **লিঙ্গ**)।* ***পুংশ্চল*** = *যে **পুং** চলমান (অর্থাৎ স্থির নহে)।* ***পুংশ্চলী*** = ***পুং*** *হইতে চলে যায় যে।* ***পুংসবন*** = *যাহাতে **পুং**-এর **সু** (অস্তিত্বের বিন্দু-দান) অন (দ্র. **সবন**) করা হয়।* ***পুংস্ত্ব*** = ***পুং****-এর অস্তিত্ব বহন করে যে।* / **পুংলিঙ্গ** = যাহার লিঙ্গ পুংতুল্য। **পুংশ্চল** = যে পুরুষ পরস্ত্রী গমন করে। **পুংসবন** = যাহার দ্বারা পুত্রের প্রসব সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **পুং** = পুরুষ। **পুংলিঙ্গ** = পুংস্ত্বযুক্ত (শব্দ), (ব্যাকরণে) পুংস্ত্ববোধক শব্দ, পুংশ্চিহ্ন, শিশ্ন, শব্দের পুংস্ত্ববোধকতা। **পুংশ্চল** = ব্যাভিচারী। **পুংশ্চলী** = অসতী কুলটা, পতিচঞ্চলা, ইন্দ্রিয়চপলা। **পুংসবন** = পুত্রোৎপত্তি-কারণ,

পুত্রোৎপত্তিকারণ গর্ভিণীর সংস্কারভেদ। **পুংস্ত্ব** = পুরুষভাব, পুরুষাকৃতি, পুরুষত্ব, বীর্য্য, শুক্র, (ব্যাকরণে) পুংলিঙ্গতা। (ব.শ.)। **৪. পুং** ও **পুংলিঙ্গ** যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত, তবে পুরাণাদি পাঠে প্রয়োজনীয়। **৫. প** যে পর্যন্ত তার নানারকমের 'পাওয়া' স্বভাবকে অতিক্রম করে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে 'দেওয়া'র স্বভাব অর্জন করে, তখন তাকে **পু** বলে। অর্থাৎ **পু**-এর অর্থে 'পাওয়া'র বদলে 'দেওয়া', 'পালন করা'র বদলে 'পালিত হওয়া', 'পান করা'র বদলে 'পান করানো' — এইরূপ বিপরীত ভাবের প্রকাশ থাকে। সেই **পু**-এর রহস্যরূপ হল **পুং**। এর অর্থকে যথার্থভাবে ব্যক্ত করা যায় না, করতে গেলেই অর্থ কিছু না কিছু বদলে যায়। তবুও বাংলাভাষা তাকে ব্যক্ত করার চেষ্টায় সর্বোচ্চ যে রূপে পৌঁছেছে, তা হল **পুং**-এর সর্বোচ্চ 'সীমায়িত' রূপ — **পুম্**। তার জন্য তাকে **পুঙ্ পুঞ্ পুণ্ পুন্** পেরিয়ে আসতে হয়েছে। তাতেও যে তার অর্থ যথেষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে, তা নয়। দ্র. **পুমর্থ**, **পুমান**। সেই **পুং** বা **পুম্**কে কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়ার জন্য আরও কয়েকটি অধ্যায় অতিক্রম করে **পুরুষ**-এ পরিণত হতে হয়। অতএব, **পুং**, **পুম্**, **পুরুষ** একই ক্রিয়ার বা ভাবের নানান বিবর্তিত রূপ বটে, কিন্তু এক ক্রিয়ার বোধক বা ধারক বা প্রকাশক নয় অর্থাৎ, মূলে তারা এক ক্রিয়া থেকে জাত হলেও তাদের সক্রিয়তার বিভিন্ন স্তর রয়েছে, কার্যক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ এক সত্তা নয়।

শাস্ত্র বলেছেন, এই বিশ্বজগৎ 'পুরুষ-প্রকৃতি রূপে কামসূত্রে গ্রথিত'। স্বভাবতই বিন্দু থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সবকিছুতেই, এমনকি মানুষের মানসলোকেও, চিন্তা-ভাবনায় তত্ত্বে তথ্যে, সর্বত্র **পুরুষ**ও রয়েছে, **প্রকৃতি**ও রয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি দেহভিত্তিক চিন্তায় অধঃপতিত হয়ে **পুং**-এর অলৌকিক রূপগুলিকে দেখতে পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তখন সে **পুং**-এর শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপকেই দেখতে পায়। প্রোটেস্টান্ট ইউরোপ শিল্পবিপ্লব সমাধা করার পর ধীরে ধীরে তাদের আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে এবং শুধুমাত্র দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই জগদ্দর্শন করতে থাকে। তারই অনুকরণ করে আজকের ভারতীয় তথা বাংলাভাষীদের অনেকেই আমাদের আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মহান ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই জগদ্দর্শন করতে লেগেছেন। এর ফল এতই মন্দ হয়েছে যে, বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকদের কেউ কেউ এখন **পুংলিঙ্গ** শব্দটি শুনলেই penis-এর ছবি দেখতে পান এবং অন্য কিছুই দেখতে পান না। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমাদের 'খ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।) সমগ্র জগৎ যে আসলে **পুরুষ** আর **প্রকৃতি**র বা **পুং-স্ত্রী**-র নানা রকমের জোড় ছাড়া আর কিছুই নয়, তা দেখবার যোগ্যতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। কেউ কেউ তো মেয়ের নাম রেখে দেন **সবিতা**। তাছাড়া, **সবন**-কারী **সবিতা** কেন **পুংলিঙ্গ**-শব্দ, **সভা** কেন **স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দ তা বুঝতেই পারেন না তাঁরা; বড়জোর ব্যাকরণ বই থেকে ধারণা করেন — এইটি আ-কারান্ত **পুংলিঙ্গ** শব্দ, ঐটি আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। কিন্তু কেন, সে প্রশ্ন তোলা এবং তার উত্তর খুঁজে বের করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। অথচ **পুরুষ-প্রকৃতি** ধারণা থাকলে এসব ব্যাপার অনায়াসে বোঝা যেতে পারে।

যাই হোক, যেহেতু এই বিষয়টি আমরা **পুরুষ-প্রকৃতি** শব্দে অনেক বিস্তারিত করেছি, **লিঙ্গ** শব্দটিও তার নিজস্ব ভুক্তিতে বিস্তারিত করা হবে; এখানে সেসব বিষয়ে আর যাব না। আপাতত কেবল একটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার। পুরাণাদি পাঠের সময় **পুংশ্চল** এবং **পুংসবন** জাতীয় শব্দগুলির সাক্ষাৎ মেলে প্রায়শই। সেই সুবাদে শব্দগুলির অর্থ জানার দরকার পড়ে। সহজ কথায় পুরুষের অস্তিত্বের মূল বিন্দু (**পুং**-জিন) বীর্যরূপে প্রকৃতির গর্ভে ন্যস্ত করাই **পুংসবন** করা। (দ্র. **সবন, সবিতা**)। স্বভাবতই এই **পুংসবন**-এর অর্থ কেবল নারীগর্ভে নরের শুক্রনিষেক বোঝায় না, কর্মকাণ্ডে অর্থ বিনিয়োগ করা, কর্মযজ্ঞের গর্ভে পরিকল্পনা নিষেক করা, প্রয়োগের (practice-এর) গর্ভে তত্ত্বের (theory-র) নিষেক করা, ছাত্রদের মনে জ্ঞানের নিষেক করা ... ... ইত্যাদি আরও অনেক কিছুকেও বোঝায়। এখন কেউ যদি **পুং** শুনলেই penis দেখতে পান, তিনি **পুংসবন** শুনলে বড়জোর নারীর গর্ভে নরের শুক্রনিষেক দেখতে পাবেন, আর কিছুই দেখতে পাবেন না। ... ইংরেজির দেহের নকল করে এভাবেই আধুনিক ইংরেজি-প্রেমী-বাংলাভাষীর দর্শনের এলাকা ছোট হয়ে গেছে এবং ছোট হয়ে যাচ্ছে; ফলে মনের এলাকাও ছোট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বাংলাভাষীর মনটাই ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে বড়ো-বাঙালি দিনদিন ছোট-বাঙালিতে বা মধ্যমেধার ও নিম্নমেধার বাঙালিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। ...

পুত (পুঁত, পুঁতা, পুঁতি, পোঁতা, পুতখাগী, পুত, পোতা) : ২. ***পুত*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ী (শক্তিদান) তারিত যাহাতে।* ***পুঁত*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (শক্তিদানের) রহস্যরূপ তারিত যাহাতে।* ***পুঁতা*** = ***পুঁত****-এর আধার যে।* ***পুঁতি*** = ***পুঁত*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পোঁতা*** = *রহস্যরূপী* ***পুঁত*** *গতিশীলভাবে তারিত হইয়া স্থিত যাহাতে।* ***পুতখাগী*** = ***পুত*** *খাইয়া চলে যাহার।* ***পুত*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর আধার তারিত যাহাতে।* ***পোতা*** = ***পুত*** *গতিশীলভাবে তারিত হইয়া স্থিত যাহাতে।* **৩. পুত (পুত)** = পুত্র, পুত্র বা তদ্বৎস্নেহপাত্র, বৎস, পুত্রবৎ শিষ্য, বাছা; গর্ভে নিহিত করা, পোতা, রোপণ করা। **পুতখাগী** = মায়ের প্রতি গালিবিশেষ। (**পুঁত** ও **পুঁতা** শব্দ দুটি ব.শব্দকোষে নেই, তবে **পোঁতা** রয়েছে এবং তার মানে দেওয়া আছে এইরকম —) **পোঁতা** = (পোতা > পোঁতা, 'চন্দ্রবিন্দু' আগম) ভূমিনিখাত। **পুঁতি** = কাচের ক্ষুদ্র সচ্ছিদ্র গুলী বা গুলীর মালা। **পোতা** = শিশু, শাবক, বালবৃক্ষ, ভ্রূণ, দশবর্ষীয় হস্তী, গৃহস্থান, সমুদ্রযান, বস্ত্র; ভূমিতে নিখনন, খুঁটি ইত্যাদির ভূমিতে নিখাত অংশ; পৌত্র, গৃহভূমি। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলায় **পুত** (= son) আর **পুঁত** (= to plant, bury, drive into earth বা পুঁতে দেওয়া বা পোঁতা) — এভাবেই শব্দদুটির প্রচলন রয়েছে। ব.শ. অবশ্য দুটোকেই **পুত** বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে ভাবতে হয়, নারীগর্ভ ও ভূমিগর্ভ একই ব্যাপার এবং সেখানে কিছু রাখাই **পুত** করা। শব্দসৃষ্টির নিয়মে **পুত**-করার বিশেষ্যরূপ **পুত**-ও হতে পারে। গ্রামবাংলা অবশ্য নারীগর্ভে **পুত** করে পাওয়া সন্তাকে **পুত** (son) এবং ভূমিগর্ভে **পুত** করাকে **পুঁত** (= drive into earth বা ভূমিগর্ভে ঢুকিয়ে

দেওয়া) বলাই পছন্দ করে এবং সেক্ষেত্রে 'চন্দ্রবিন্দু'র সাহায্যে বা **পুঁ**-এর রহস্যরূপের মাধ্যমে গাছের চারা, খুঁটি, লাশ ... ইত্যাদি নানান বিষয়কে এক 'চন্দ্রবিন্দু'র সাহায্যেই উল্লেখ করে দেয়। আর **পুঁতা** বা **পোঁতা** শব্দটির প্রচলন রয়েছে **পুঁত**-করা অর্থে, কিন্তু **পোতা** শব্দটি প্রচলিত রয়েছে 'পুত্রের পুত্র' বা 'পৌত্র' অর্থে। দ্র. **পুত্র**, **পুত**।

পুঙ্খ (পুঙ্খানুপুঙ্খ, পুঙ্খিত) : ১. পুম্‌স্ + ✓খন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / **পুঙ্খানুপুঙ্খ** = পুঙ্খের অনু পুঙ্খ যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. **পুঙ্খ** = বাণমূল, কর্ত্তরী। **পুঙ্খানুপুঙ্খ** = এক শরের পুঙ্খে সংলগ্ন অন্য শরের পুঙ্খ যেরূপে হয়, তদ্‌ভাবে; পরম্পরাভাবে, নিরন্তর। **পুঙ্খিত** = পুঙ্খযুক্ত। (ব.শ.)। ৪. **পুঙ্খানুপুঙ্খ** শব্দটি thorough অর্থে প্রচলিত, কিন্তু **পুঙ্খ** ও **পুঙ্খিত** অপ্রচলিত। ৫. বাণ বা শরের পিছনে থাকে পক্ষ বা পালক। মহাভারতে এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যে, কূপে পড়ে যাওয়া একটি বস্তুকে একটি শর দিয়ে গেঁথে তার পর সেই শরের পিছনে আর একটি শর গেঁথে — এভাবে একের পেছনে এক শর গেঁথে গেঁথে লম্বা একটি কাঠির মতো করে নিয়ে কূপের ভিতরে পড়ে যাওয়া বস্তুকে উপরে তুলে এনেছিলেন গুরু **দ্রোণাচার্য্য**। এই যে শরের **পুঙ্খে** এবং তার **অনুপুঙ্খে** আর একটি শর — এভাবে কোনো কিছু হওয়া বা করাকে বলে **পুঙ্খানুপুঙ্খ**-ভাবে। এই ধারণাটি আমরা হারিয়েছি, শব্দটিও হারাতে বসেছি। তবে শহুরে বাংলাভাষী এরকম ক্ষেত্রে 'পিছনে-পিছনে' শব্দজোড় ব্যবহার করে থাকেন এবং গ্রামবাংলার মানুষ এক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় 'পঁদে-পঁদে' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। তবে সেগুলি ঠিক **পুঙ্খানুপুঙ্খ**-ভাবে বোঝায় না। কেননা, **পুঙ্খানুপুঙ্খ**তে মাঝে কোনো ফাঁক নেই, 'পিছনে-পিছনে' কিংবা 'পঁদে-পঁদে' শব্দে অনুসরণকারীদের মাঝে ফাঁক রয়েছে বা থাকতে পারে।

পুঞ্জ (পুঞ্জি, পুঞ্জিকস্থলা, পুঞ্জীকৃত, পুঁজ, পুঁজি, পুঁজিপতি, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদী) : ১. পুম্‌স্ + ✓জি + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পুঞ্জ*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (দানের) রহস্যরূপ জনিত যাহাতে।* ***পুঞ্জি*** = ***পুঞ্জ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পুঞ্জিকস্থলা*** = ***পুঞ্জি*** *করণের স্থল বা স্থান রূপে ব্যবহৃত হয় যে।* ***পুঞ্জীকৃত*** = ***পুঞ্জির*** *আধার কৃত যাহাতে।* ***পুঁজ*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (দানের) রহস্যরূপ জনিত যাহাতে।* ***পুঁজি*** = ***পুঁজ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পুঁজিপতি*** = ***পুঁজির*** *পতি যে।* ***পুঁজিবাদ*** = ***পুঁজির*** *পক্ষে সওয়াল করে যে-মতবাদ।* ***পুঁজিবাদী*** = ***পুঁজিবাদ****-এর গতিশীল আধার যে।* / **পুঞ্জ** = যাহা উচ্চতায় পুরুষকে জয় করিতে পারে। (ব.শ.)। **পুঁজিবাদ** = যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ বা পুঁজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়; যে ব্যবস্থায় পুঁজিপতি উৎপাদন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুঁজির মালিকের ব্যক্তিগত মুনাফা স্বীকৃত হয়। (স.বা. অভিধান, কলকাতা)। ৩. **পুঞ্জ** = ধান্যাদিরাশি, স্তূপ, সমূহ, সঙ্ঘ। **পুঁজ** = স্ফোটকাদির ঘন বিকৃত রক্ত। **পুঁজি** = রাশি, সঞ্চিত ধন, ব্যবসায়ে মূলধন, গণ্ডা, ভাণ্ডার, সঞ্চিত দ্রব্য, বিদ্যা-বুদ্ধির বা কলা-কৌশলের ভাণ্ডার। **পুঞ্জি** = ব্যবসায়ে মূলধন। **পুঞ্জীকৃত** = পুঞ্জীভূত, রাশিভূত, মহাস্তূপীভূত। **পুঞ্জিকস্থলা** = (ক) অপ্সরাবিশেষ। একবার ইন্দ্রের প্ররোচনায় মার্কণ্ডেয় মুনির তপোভঙ্গের চেষ্টা করতে গিয়ে পুঞ্জিকস্থলা অকৃতকার্য হয়। এঁর অন্য নাম অঞ্জনা। এই অপ্সরা অঞ্জনা বানররাজ কেশরীর স্ত্রী। অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। একবার পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মার কাছে যাওয়ার সময় রাবণ এঁকে বিবসনা করে। পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মাকে এই বিষয়ে অনুযোগ করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বলেন যে, আজ হতে কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রকাশ করলে রাবণের মস্তক শতধা চূর্ণ হবে। (দ্র. রম্ভা)। বায়ুপুরাণ অনুসারে পুঞ্জিকস্থলা পঞ্চচূড়াবিশিষ্টা অপ্সরাদের অন্যতমা। (পৌ.অ.)। **পুঁজিপতি** = প্রচুর পুঁজির মালিক। **পুঁজিবাদ** = ধনতন্ত্রবাদ, capitalism। **পুঁজিবাদী** = পুঁজিবাদসম্বন্ধীয়, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, পুঁজিবাদের অংশীদার বা সমর্থক। (স.বা.অ.কলকাতা))। ৪. **পুঞ্জিকস্থলা** বাদে বাকি সব শব্দগুলিই প্রচলিত। ৫. ঁ ও **ঞ**-এর ভিতরে যে পার্থক্য, **পুঁজ** (পু+ঁ+জ) ও **পুঞ্জ** (পু+ঞ্+জ)-এর ভিতরে সেই পার্থক্য। অন্যথায় **পুঁজ** যা **পুঞ্জ**ও তাই। ফোঁড়ার ভিতরে বদরক্তের কণাসমূহ ও মরা কোষরাশি জনিত হয়ে একস্থানে জমা হলে তাকে আমরা **পুঁজ** বলি। আর, ধানচাল, জামাকাপড়, হাঁড়িকুড়ি, তুলোমুলো, কাঠকুঠ ... ইত্যাদি একস্থানে জমা করা হয়ে গেলে তাকে আমরা **পুঞ্জ** বলি। মানবদেহের বাইরের দিকে ঠেলে বের করা ফোঁড়ার **পুঁজ** ও সমাজদেহের (পরিবারের) বাইরে ঠেলে বের করা উদ্বৃত্তের **পুঞ্জ**, দুটোই 'জনিত বস্তুসমাহার'ই বটে; পার্থক্য এই যে, প্রথমটি সূক্ষ্মবস্তুর রাশি, দ্বিতীয়টি তুলনায় স্থূলবস্তুর রাশি।

তবে আর একরকমের **পুঁজ** আছে, যার ভিতরে **পুঞ্জ**-গুণও বিদ্যমান এবং সেই **পুঁজ** ও **পুঞ্জ**-এর মিলিত রূপটিকে গতিশীল করলে তবেই তাকে চেনা যায়। কেননা, সে যত না বাহ্যিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক। একে বলে **পুঁজি**। সমাজদেহের উদ্বৃত্ত (চর্বি) বিশেষ বিশেষ স্থানে (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে) জমে গিয়ে বা **পুঞ্জীভূত** হয়ে যে সামাজিক ফোঁড়ায় পরিণত হয়, সেই সামাজিক সম্পদের **পুঞ্জ**-এর ভিতরে এই **পুঁজ** গতিশীল হয় বলে একে **পুঁজি** বলে। সমাজদেহের এই ফোঁড়া ও তার ভিতরের **পুঁজ**-এর ভয়াবহ টনটনানিতেই দু'খানি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে এবং বর্তমানে আবার সেই টনটনানি এতই বেড়েছে যে আরও একখানি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর মন আজ কণ্টকিত।

এর একটা কারণ এই যে, **পুঁজি** বা 'সামাজিক-উদ্বৃত্ত' নিয়ে কী করা হবে, সভ্যতার সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে সামাজিক সম্পদের উদ্বৃত্ত হওয়া, **পুঞ্জীভূত** হওয়া, সমাজদেহের **পুঁজ**-এ এবং বিপুল **পুঁজি**তে পরিণত হয়ে যাওয়া কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না। মহাসমস্যা! কেননা, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে **দক্ষ**নীতি অনুসরণ করলে সমাজে অনিবার্যভাবে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবেই; আর **দক্ষনীতি**র প্রতিষ্ঠা করেই তো মানুষের 'সভ্যতা'র বা 'সভ্যযুগ'-এর সূচনা হয়েছিল এবং এখনও সারা বিশ্বের অধিকাংশ শাসকই **দক্ষনীতি** মান্য করেই সমাজ পরিচালনা করছেন; অন্য কোনোরকম নীতির কথা (**শিবনীতি**র কথা) তাঁরা আজ আর ভাবতেই পারেন না। অর্থাৎ কিনা, আমরা এমন একধরনের মানব-সমাজে (মানবঝাঁকে) বাস করছি, যার কাছে

দক্ষনীতি অনিবার্য, অতএব সম্পদের **পুঞ্জীভবন** অনিবার্য, অতএব সমাজদেহে **পুঁজি**-ভরা বিস্ফোটক-ফোঁড়া অনিবার্য, তার টনটনানি অনিবার্য, অতএব সেই টনটনানি থেকে মুক্তির দুরাশায় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য ... অতএব 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'! এই বগাই আজকের মানবসমাজ, ইনিই ধর্মবক, ইনিই 'জনসাধারণ'। এরাই কাঁদছে!

ব.শ. কিংবা ছা.অভিধান অথবা ঢাকার ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে **পুঁজিপতি, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদী** শব্দগুলি নেই, রয়েছে কলকাতার সাহিত্য সংসদের 'সংসদ বাংলা অভিধান'-এ। এবং মজা হল, যদিও তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে **পুঁজ, পুঁজি, পুঞ্জি** প্রভৃতি শব্দের মূলে একই ক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে, তবুও তাঁরা **পুঁজিপতি, পুঁজিবাদ** ... প্রভৃতি নতুন শব্দের ভুক্তি ঘটিয়েছেন এবং নিজেদের অজান্তেই, ত্রুটিপূর্ণ হলেও, একপ্রকার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়ে বসেছেন। ... ... দ্র. **অঞ্জন, অঞ্জনা, পঞ্চশিখ**। (আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে' শীর্ষক নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।) **৬.** ইংরেজি e*xpunge, pungent* ইত্যাদি।

পুণ্য (পুণ্যকীর্ত্তন, পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যগন্ধ, পুণ্যজন, পুণ্যজনেশ্বর, পুণ্যফল, পুণ্যলোক, পুণ্যারণ্য) : **১.** ✓পৃ + উন্য (ডুণ্য) - কর্তৃবাচ্যে; ✓পৃ + য (যৎ) - ণ্ (ণুক্)। (ব.শ.)। **২.** ***পুণ্য*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ **প**-এর (দানের) বোধ থাকে যাহাতে।* ***পুণ্যকীর্ত্তন*** = *যাহাতে **পুণ্য**-এর **কীর্ত্তন** করা হয়।* ***পুণ্যকীর্ত্তি*** = ***পুণ্য কীর্ত্তি*** *যাহার।* ***পুণ্যগন্ধ*** = ***পুণ্য গন্ধ*** *যাহার।* ***পুণ্যজন*** = ***পুণ্য*** *করে যে জন।* ***পুণ্যজনেশ্বর*** = ***পুণ্যজন****দিগের* ***ঈশ্বর*** *যে।* ***পুণ্যফল*** = ***পুণ্য*** *রূপে প্রাপ্ত ফল।* ***পুণ্যলোক*** = ***পুণ্য*** *যে* ***লোক****।* ***পুণ্যারণ্য*** = *যে অরণ্যে **পুণ্য** অর্জনের কাজ চলে।* / **পুণ্যজন** = পুণ্যোৎপাদক-তপঃশীল (অর্থাৎ, পুণ্য উৎপাদনের জন্য তপঃ আচরণ করে যে।) (নীলকণ্ঠ / ব.শ.)। **৩. পুণ্য** = পাবন, পবিত্র, পাপহর, চারু, প্রশস্ত, সুরভি, সদাচার, নির্ম্মল, শোভনকর্ম্মান্বিত, শুভাদৃষ্টবান, ধর্ম্ম, পুণ্যফল, (জ্যোতিষে) লগ্নাবধিক নবম স্থান। **পুণ্যকীর্ত্তন** = পবিত্রনামকীর্ত্তন, বিষ্ণু। **পুণ্যকীর্ত্তি** = পূতযশাঃ, পুণ্যশ্লোক। **পুণ্যগন্ধ** = চম্পকবৃক্ষ, সুরভিগন্ধ। **পুণ্যজন** = (বিরুদ্ধলক্ষণা) পাপী জন, রাক্ষস, যক্ষ। **পুণ্যজনেশ্বর** = যক্ষপতি, কুবের। **পুণ্যফল** = সুকর্ম্ম-পরিণাম, সুকর্ম্মসন্তান। **পুণ্যলোক** = ধার্ম্মিকজন, পুণ্যপ্রাপ্য লোক, স্বর্গ। **পুণ্যারণ্য** = ধর্ম্মারণ্য, তপোবন। (ব.শ.)। **দ্র. নিপুণ**। **৪.** ইংরেজি-শিক্ষিত বাংলাভাষীদের মধ্যে **পুণ্য** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের প্রচলন নেই বললেই চলে, যদিও সাধারণ ও গ্রাম্য বাংলাভাষীদের মধ্যে **পুণ্য** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি অলৌকিক প্রাপ্তি বা খানিকটা virtue ও তৎসংশ্লিষ্ট অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পণ্য, পাপ**। উপরোক্ত শব্দগুলির ব.শ. প্রদত্ত (**৩.**) অর্থগুলিতে আমরা **পুণ্যগন্ধ** অর্থে 'চম্পকবৃক্ষ' (দ্র. **চম্পা**) পাচ্ছি, **পুণ্যজনেশ্বর** অর্থে পাচ্ছি 'যক্ষপতি' **কুবের**কে, যখন কিনা **পুণ্যজন** শব্দে পাচ্ছি এমন মানুষদের যাঁরা **তপোবনে** বা কারুশিল্প-অঞ্চলে (সেকালের **আশ্রমে** বা একালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে) **পণ্য** উৎপাদন করে বিক্রির জন্য **তপ** বা শ্রম করেন। **পুণ্যারণ্য** শব্দের ভিতরে যে **অরণ্য** রয়েছে, তার কথাও আমরা আগে জেনেছি যে, এখানে 'রণ নেই', রয়েছে মাল নিয়ে মল্লযুদ্ধ, 'কেনাকাটা'র মারামারি কাটাকাটি। বিষয়টি বিস্তারিত করা আছে **গঙ্গা** শব্দে। এ হল সমাজে প্রবাহিত **পণ্যধারা**, যে ধারায় আপন আপন **পণ্য** বা **পাপ** স্খালন করে **পুণ্য** বা 'পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ' লাভ করা যায়। (দ্র. **পূত**) ...

তার মানে, **পাপ** শব্দের একটি অর্থ যেমন **পণ্য**, তেমনি **পুণ্য** শব্দের একটি অর্থ 'বিনিময়মূল্য' বা টাকা। স্বভাবতই **পাপ** শব্দের দ্বিতীয় যে অর্থ — **অধর্ম্ম**জনিত-মর্মপীড়ার বোধ, **পুণ্য** শব্দেরও সেরকম অর্থ রয়েছে। এই **পুণ্য**-বোধকে যৌথসমাজে দেখতেই পাওয়া যায় না, দেখা যায় কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে। কারণ, যৌথসমাজে **পণ্য**-করা বা **পাপ**-করা **অধর্ম্ম**। সমাজে সেই 'অধর্ম্মের-মর্যাদা' প্রতিষ্ঠিত না হলে **পণ্য** বেচে **পুণ্য** অর্জিত হয় না। আবার, 'অধর্ম্মের-মর্যাদা' প্রতিষ্ঠিত হলে যৌথসমাজ বদলে যায় ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে, তখন **পণ্য** বেচলেই **পুণ্য** অর্জিত হয়, অথচ **অধর্ম** করা হয়েছে বলে মনে হয় না; ফলে **পুণ্য**-এর বোধ জন্মাতেও অসুবিধা হয় না।

অতএব **পুণ্য** দুই প্রকার। বাহ্যিক **পুণ্য** হল বিনিময়মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা সোনাদানা ইত্যাদি, এককথায় **পুঁজি** বা ক্যাপিটাল; যা কিনা অর্জিত হয় **গঙ্গায় পাপ স্খালন** করে। আর, মানসিক **পুণ্য** হল **ধর্ম্ম**জনিত-মর্মসুখকর বোধ, মানসিক স্বস্তিবোধ, যা কিনা অর্জিত হয় সামাজিক **ধর্ম্ম** বা নিয়মাদি অনুসারে **কর্ম্ম**াদি করে। ...

পুত্র (পুত্‌ত্র) : **১. পুত্র** = ✓পৃ + ত্র (ক্ত্র) - কর্তৃবাচ্যে। **পুত্‌ত্র** = পুৎ + ✓ত্রৈ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. পুত্র** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (শ্রম-মেধাদি দানের) তারণ রহে যাহাতে।* **পুত্‌ত্র** = **পুত্** *(নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর তারণ বা বীজরূপ থেকে) ত্রাণ করে যে।* / **পুত্র, পুত্‌ত্র** = পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে যে; স্ববংশ-শুদ্ধি করে যে। (ব.শ.)। **৩.** সুত, তনয়, পুত্রবৎ স্নেহভাজন, বৎস, তজ্জাতি ক্ষুদ্রবস্তু, শিশু, শাবক, (জ্যোতিষে) লগ্নাবধিক পঞ্চম স্থান। (ব.শ.)। **৪.** son অর্থে প্রচলিত। **৫.** কেন **পুত্র** শব্দটি **পুত্‌ত্র** ও **পুত্র** এই দুরকম বানানে লিখতে বাধ্য হয়েছি, সেকথা ১ম খণ্ডে **ছত্‌ত্র (ছত্র; ছাত্র)** শব্দে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কার্যত, শব্দ দুটি আলাদা শব্দ এবং তাদের অর্থও একেবারেই আলাদা। বলতে কী, আমাদের 'আত্মবিস্মৃতি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এই শব্দ দুটি — **পুত্র** ও **পুত্‌ত্র**। সেকালে যেকোনো উৎপন্নকেই বলা হত **পুত্র**, কিন্তু **পুত্‌ত্র** বলা হত শুধুমাত্র জীবের উত্তরসূরিকে অর্থাৎ son-কে। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে যে 'রাজার পুত্র নাই, পুত্র চাই' ... ইত্যাদি হাহাকার প্রায় প্রতি রাজার কাহিনীতে শোনা যায়, সে কিন্তু son-এর বা উত্তরসূরির জন্য হাহাকার নয় আদৌ; সে হল রাজ্যের বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ ধান চাল গম ... ইত্যাদি উৎপন্নের জন্য হাহাকার। এ হাহাকার তো নতুন কিছু নয়, আজও আমরা প্রতিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-পরিচালকদের মুখে সেই একই কথা শুনি অন্য ভাষায় — 'উৎপাদন বাড়াতে হবে', 'উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এখনও আমরা দূরে রয়েছি' ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হল **পুত্র**-এর জন্য হাহাকার! কিন্তু **পুত্‌ত্র**-এর জন্য আদৌ নয়।

ব.শ. শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন সঠিকভাবেই। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেওয়ার সময় তাঁর সন্দেহ হয়েছে এবং দুটোকে একটুখানি গুলিয়ে ফেলেছেন। আসলে **পু** ক্রিয়াটি হল পবিত্রকরণ। **পণ্য** নামক **পাপ-পুত্র**-কে **গঙ্গায়** স্খালন করে **পুণ্য** বা 'পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ' অর্জন করে নিতে হয়। এটি 'স্ববংশ-শুদ্ধি'র ব্যাপার নয়। আর 'পুং থেকে ত্রাণ' করার ক্রিয়াটি করে বা করতে পারে কেবলমাত্র **পুত্‌ত্র** নামক উত্তরসূরিই।

কোন কিছুকে চিরকালের জন্য বিদায় জানালে আমরা তাকে ভূমিগর্ভে পুঁতে দিই। মা-বসুমতী সবকিছু আপন গর্ভে ধারণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী (আধুনিক মানুষের নষ্টামির ফলস্বরূপ প্লাস্টিক ইত্যাদি ছাড়া)। যা কিছু এভাবে চিরকালের জন্য কোথাও পোঁতা হয়ে থেকে যায়, বেরোতে পারে না, তাকে বলা হয়, 'সে পুৎ নামক (পুন্নামা) নরকে পতিত হয়েছে'। তা সে যাই হোক, সাধারণভাবে মনে করা হয়, জীবের বংশধারা প্রবাহিত হয় সেই জীবপ্রজাতির **পুংলিঙ্গ**ধারী পুরুষের দ্বারা। সে তার আপন শরীরের মাধ্যমে প্রবাহিত ধারাকে সেই জীবপ্রজাতির নারীগর্ভে **পুতে** দেয়। অতঃপর সেই **পুত** সেখান থেকে **পুত্‌ত্র** রূপে উত্থিত হয়ে পুনরায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। কিন্তু সে যদি চিরকালের জন্য সেইভাবে পোতা হয়ে থেকে যেত, তাহলে জীবের বংশধারার 'পুং'নরক বাস হয়ে যেত অবধারিত এবং চিরন্তন। তা কিন্তু ঘটে না। বংশধারার প্রবাহকে **পুত্‌ত্র** সেই নরকবাস থেকে ত্রাণ করে। তাই সে **পুত্‌ত্র**। সে সাধারণ **পুত্র** মাত্র নয়, সে অসাধারণ **পুত্‌ত্র**ই বটে। কেননা, সে 'পুং-নামা' নরক থেকে ত্রাণ করে, যে **নরক** সম্পর্কে পৌরাণিক অভিধান জানাচ্ছেন — এটি হল "নরকবিশেষ। যেখানে নিঃসন্তান মানুষদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। (এই) 'পুত' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বলে সন্তানের নাম পুত্র। 'পুন্নাম' অর্থাৎ পুং নামে যে নরক বিদ্যমান।"

পুন (পুনঃ, পুনঃপুনঃ, পুনরায়, পুনর্নবা, পুনর্ব্বসু, পুনশ্চ) : **১.** **পুনঃ** > পুনর্ > পুনশ্, পুনষ্, পুনস্ > পুন। **২.** ***পুন*** = *নবরূপে **উত্তীর্ণ** পায়ীর (দানের) নাকরণ-অনকরণ যাহাতে।* ***পুনঃ, পুনর্*** = ***পুন** রহে যাহাতে।* ***পুনঃপুনঃ*** = ***পুনঃ**-র পরে **পুনঃ** যাহাতে।* **পুনরায়** = ***পুনঃ**-র আধার যায় যাহাতে।* ***পুনর্নবা*** = *যাহা **পুনরায়** স্বীকৃত হয়।* ***পুনশ্চ*** = ***পুনঃ**-র সহিত চয়িত যে। /* **পুনর্নবা** = **ছিন্ন হইলেও** পুনঃ নূতন (হয় যাহা)। **পুনর্ব্বসু** = 'ক্ষেত্রজ্ঞরূপে **পুনঃ পুনঃ** দেহবাসী' (যিনি)। **পুনর্ভূ** = যে নারী পুনর্ব্বার জায়া **হয়; যে নারী** বাগ্‌দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহবাসে থাকে **ও তৎপরিবারের** অন্তর্গত হয়; যে নারী ক্লীব পতিত বা উন্মত্ত **পতিকে ত্যাগ করিয়া** অন্য পতি গ্রহণ করে বা এক স্বামীর মরণে **অন্য স্বামী আশ্রয়** করে। (ব.শ.)। **৩.** **পুন** = দ্বিতীয় বার, আবার, **ক্রি. পক্ষান্তরে**। **পুনঃ (পুনর্)** = অপ্রথম, দ্বিতীয় বার, আবার, **অব্য. বিশেষ,** অবধারণ, অধিকার, পক্ষান্তর, প্রত্যাবর্ত্তন। **পুনঃপুনঃ** = **ক্রি. বার**-বার। **পুনরায়** = পুনর্ব্বার, পুনরপি। **পুনর্নবা** = নখ, **শাকভেদ**। **পুনর্ব্বসু** = বিষ্ণু, শিব, কাত্যায়ন মুনি, লোকবিশেষ, **সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের** সপ্তম নক্ষত্র (ইহাতে দুইটি তারা। ইহার দেবতা অদিতি। ইহাতে জন্মিলে নর প্রভূতমিত্র শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌রত্নাভিলাষী দাতা প্রবাসী রাজশ্রীক হয়।)। **পুনর্ভূ** = অন্যপূর্ব্বাবিশেষ। (অন্যপূর্ব্বা দ্বিবিধা — পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী। পুনর্ভূ আবার দ্বিবিধ — ক্ষতা, অক্ষতা। ক্ষতা বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষসম্বন্ধদূষিতা; অক্ষতা বিবাহের পরে পরপুরুষসম্বন্ধদূষিতা। **পুনশ্চ** = পুনঃ, পুনর্ব্বার। (ব.শ.)। **৪.** again and again অর্থে **পুনঃপুনঃ,** again অর্থে **পুনরায়,** once again অর্থে **পুনশ্চ** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** **পুনঃ, পুনর্ব্বার, পুনরায়** ইত্যাদি শব্দে আমরা again বুঝি। কোনো ক্রিয়াকারী তার ক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পর সে আর আগের অবস্থায় থাকে না, নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়; অর্থাৎ, ক্রিয়াকারীটি তার ক্রিয়াটুকু সম্পূর্ণ হতে না হতেই নবরূপে উত্তীর্ণ 'ক্রিয়াফলপায়ী' বা **পু** হয়ে যায়। এরপর সে যদি আগের ব্যাপারটিকে নিঃশেষে না-করণ করে দিয়েই সেই ক্রিয়াটিকেই আবার অন্-করণ করে দেয়, তখন তাকে বলতে হয় **পুন**। তার মানে, একই ক্রিয়ার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষকরণ ও পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনাকরণকারী সত্তাকে **পুন** বলে। এই **পুন**-র রহনকে বলে **পুনর্** বা **পুনঃ**। এই সুবাদে যা কিছুই দ্বিতীয় বার অয়ন করে বা একইভাবে অগ্রগমন করে, তাকেই **পুনরায়** বলা চলে। ...

পুমান (পুমপত্য, পুমর্থ) : **১.** ✓পা + উম্‌স্ (ডুমসুন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পুমান*** = ***পুম** (দ্র. **পুং**) অন যাহাতে।* ***পুমপত্য*** = ***পুম** (পুং) এর অপত্য যে।* ***পুমর্থ*** = *যাহা **পুম**-এর **অর্থ** বা কার্য্য। /* **পুমপত্য** = পুমানের অপত্য। (ব.শ.)। **৩.** **পুমান** = পুরুষ, পুত্র, জন, লোক, মনুষ্যজাতি, বিশ্বজন, পুরুষপদবাচ্য, যথার্থ পুরুষ, পুংলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ শব্দ, পরমেশ্বর, (সাংখ্যে) পুরুষ, মনুষ্য, অনুচর, ভৃত্য। **পুমপত্য** = পুংসন্তান, পুত্র। **পুমর্থ** = চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ, পুরুষ-প্রয়োজন। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আমরা বাংলাভাষীরা যে সমস্ত অতি মূল্যবান শব্দ হারিয়েছি, **পুমর্থ** ও **পুমান** তাদের মধ্যে পড়ে। **পুমর্থ** শব্দটি এখনও খানিকটা বেঁচে রয়েছে **পুরুষার্থ** শব্দের মাধ্যমে। দ্র. **পুং, পুরুষ**। ...

পূত (পূতকরণ, পূতক্রতু, পূতগন্ধ, পূতধান্য, পূতনা, পূতাত্মা, পূতি, পূতিক, পূতিকা, পূতিকাষ্ঠ, পূতিগন্ধ, পূতিতুণ্ড) : **১.** পূত = ✓পূ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **পূত** = ***পূ*** *(নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর আধার বা কোনোকিছু দাতা) তারিত যাহাতে।* ***পূতি*** = ***পূত** গতিশীল যাহাতে।* ***পূতিক*** = ***পূতি** করে যে।* ***পূতিকা*** = ***পূতিক**-এর আধার যে।* **৩.** **পূত** = পবিত্রীকৃত, পবিত্র, শোধিত, শুদ্ধ, মেধ্য, প্রযত, অপনীতবুস, আগড়ারহিত, ব্রতাদি-শোধিত, নিষ্কলুষ, শঙ্খ, শ্বেতকুশ, সত্য। (ব.শ.)। নরকবিশেষ। যেখানে নিঃসন্তান মানুষদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। 'পুত' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বলে সন্তানের নাম পুত্র। 'পুন্নাম' অর্থাৎ পুং নামে যে নরক বিদ্যমান। মৃত্যুর পর সকলকে সেখানে গমন করতে হয়। ... (পৌ.অ.)। **পূতক্রতু** = ইন্দ্র। **পূতগন্ধ** = বর্ব্বর, বাবুই তুলসী। **পূতধান্য** = তিল। **পূতনা** = বালগ্রহবিশেষ, অহিপূতনা নামক বালরোগভেদ, বালমাতৃকাভেদ, কামচারিণী

বালঘাতিনী রাক্ষসীবিশেষ। কংসপ্রেরিত পূতনা স্তনে কালকূট মাখাইয়া স্তন্যপানচ্ছলে কৃষ্ণকে বধ করিতে গোকুলে গিয়াছিল। কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া স্তন্যপানচ্ছলে বিষসহিত প্রাণবায়ু পান করিয়া রাক্ষসীর প্রাণসংহার করেন। (ব.শ.)। বকাসুরের ভগিনী ও বালীর কন্যা পূতনা কংসরাজের অনুচরী ছিল। এই মায়াবিনী দানবী কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস কর্তৃক গোকুলে প্রেরিত হয়। পূতনা মায়াবলে সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি ধারণপূর্বক নন্দের গৃহে উপস্থিত হয় ... ... শিশু কৃষ্ণকে কপট স্নেহের সাহায্যে নিজের বিষাক্ত স্তন তাঁর মুখে অর্পণ করে স্তন্যদান করতে থাকে। কিন্তু ... কৃষ্ণ ... স্তন্যপানরত অবস্থায় তার জীবনীশক্তি শোষণ করে তাকে বধ করেন। ... (পৌ.অ.)। **পূতাত্মা** = শুদ্ধচিত্ত, বিষ্ণু। **পূতি** = দুর্গন্ধবিশিষ্ট, দুর্গন্ধ, পচাগন্ধ, পুঁজ। **পূতিক** = পূতিকরঞ্জ, নাটাকরমচা, বিষ্ঠা। **পূতিকা** = শাকভেদ, পুঁইশাক, কীটভেদ, গাঁধিপোকা। **পূতিকাষ্ঠ** = পাবনার্থ কাষ্ঠ, দেবদারু। **পূতিগন্ধ** = কুৎসিতগন্ধ, মদ্যাদিগন্ধ, রক্ত, ইঙ্গুদীবৃক্ষ। **পূতিতুণ্ড** = বাৎস্যগোত্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই বা উপাধি। (ছান্দড়ের পুত্র শঙ্কর পূতিতুণ্ড গ্রামে বাস করেন, সেই হেতু তাঁহার সন্তানগণের ঐ গাঁই।) (ব.শ.)। **৪. পূত, পূতি, পূতিগন্ধ, পূতিতুণ্ড** প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে sacred, stench, fetid smell, ও ব্রাহ্মণের পদবীরূপে প্রচলিত। অবশ্য **পূতিতুণ্ড** শব্দটি আজকাল **পতিতুণ্ডি** রূপে লিখিত হয়ে থাকে। **পূতিকা** শব্দটি অপ্রচলিত হয়ে গেলেও **পুঁইশাক** রূপে প্রচলিত রয়েছে। **পূতকরণ** শব্দটি আমরা নতুন করে লিখলাম। **৫.** আমরা দেখছি **পূ** ক্রিয়ার শব্দপরিবারে **পূত** শব্দটি জন্মেছে। একই পরিবারে জন্মেছে **পুত্র** (উৎপন্নমাত্র) ও **পবিত্র**। তবে **পুত্‌ত্র** (son) কিন্তু এ-শব্দপরিবারের সদস্য নয়। স্বভাবতই **পূ** ক্রিয়াটি **পুত্র, পূত** ও **পবিত্র** তিনটি শব্দের মূলেই রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, **পূ** হল 'নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর আধার', যা কিনা প্রাপণকারীর বদলে দানকারীতে পরিণত। কোনো সত্তা মানুষের শ্রম ও মেধা ... ইত্যাদি পেয়ে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে সেবাদাতায় বদলে গেলে তাকে বলে **পূ**। সেই **পূ**-এর ত্রাণ ঘটে উৎপন্নে বা **পুত্রে**। তাকে বিশেষ বিশেষ সামাজিক আচার-আচরণ দ্বারা সিদ্ধ বা শুদ্ধ করে নিলে, সে হয়ে যায় **পূত** বা **পবিত্রীকৃত** বা **পবিত্র**। এই আচার-আচরণ নানা রকমের হতে পারে এবং তার এখতিয়ারের এলাকা সর্বপ্রকারের **পুত্র**কে ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর ব্যাপ্ত হতে পারে। সেকালে লোকে পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রিকে দিয়ে সন্তানাদির বিবাহকে **পূত** বা **পবিত্র** করে নিত, একালে লোকে রেজিস্ট্রি করিয়ে বিবাহকে **পূত** বা **পবিত্র** করে নেয়। সেকালে লোকে রাজপুরুষকে খাজনা দিয়ে নিজের উৎপন্নকে **পূত** বা **পবিত্র** করে নিত, একালে লোকে লাইসেন্স করিয়ে কর দিয়ে আপন আপন উৎপন্নকে **পূত** বা **পবিত্র** করে নেয়। তবে উৎপন্ন যখন **পণ্যে** বা **পাপে** পরিণত, তখন একমাত্র উপায় **গঙ্গাধারায়** সেই **পাপ** স্খালন করা ও **পুণ্য** বা '**পবিত্র**তা-সম্পাদক পদার্থ' অর্জন করা। একালের ভাষায় এই কাজটিকে বলা হয় আপন আপন **পণ্য** বাজারে বেচে টাকা কামিয়ে নেওয়া। ...

এই যে **পূতকরণ** বা **পবিত্রকরণ**-এর ধারণা, এটি কিন্তু মানবসমাজের একটি সর্বব্যাপ্ত ধারণা। বিশ্বের প্রায় সমস্ত জাতিই বহু প্রাচীনকাল থেকেই তাদের কাজকর্মকে **পূতকরণ** করে আসছে। এর থেকে বোঝা যায়, অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষের সমাজ তার সমস্ত কাজকর্মকে **পূত** করে নেওয়ার ভাবনা ভেবেছিল। এই ভাবনার রহস্য এই যে, সেকালের মানুষ নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ ও অংশ ভাবত এবং সমগ্রকে সম্মান জানিয়েই কোনোকিছু করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করত। এমনকি আধুনিক যুগ পর্যন্ত সেই মানসিকতার রেশ চলেছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রতিদিনের শিক্ষাদান কর্ম শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। এমনকি মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিটিং-এর আগে প্রার্থনা করে গভর্নিং বডির মিটিং শুরু হয়। তার মানে, এমনকি কলেজের পরিচালক সমিতির সভাকেও **পূতকরণ** করে নেওয়া হয়। বলা হয়, 'হে ঈশ্বর, আমাদের শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, যাতে আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।' নিজেকে 'একেলষাঁড়', 'সবজান্তা', 'সর্বকর্মক্ষম' ভাবার বোকামিতে তখনও মানুষকে পেয়ে বসেনি। তাই আজও 'সেকেলে' মানুষেরা জন্ম মৃত্যু বিবাহকেও **পূতকরণ** করে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করে থাকেন। ... আধুনিকতাবাদী ও মার্কসবাদীরা এর ঘোর বিরোধী হয়ে দেখা দেন। বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁরা এরকম প্রশ্ন তুলতে লজ্জা বোধ করেন না যে, 'পুরুষ-নারীর সঙ্গমকে **পূতকরণ** করে কী হয়?' একই কথা 'গৃহপ্রবেশ', 'ষষ্ঠী', 'সাধভক্ষণ' ... ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁরা বলে থাকেন। অথচ সারা পৃথিবীতেই প্রতিটি অনুষ্ঠানকে **পূত** বা **পবিত্র** করে নেওয়ার রেওয়াজ আজও প্রচলিত। কারণ, এটি সর্বৈব ঠিক প্রথা, বড়জোর একে আপনি 'একালীকরণ' করার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু ত্যাগ করতে পারেন না। কেননা, মানুষের আচরণে তার **ধর্ম** সক্রিয়রূপে ধরা থাকে। সেই আচরণকে আভরণ দান করে **পূতকরণ**। আধুনিকতাবাদী ও মার্কসবাদীরা মানুষের জীবনের সেই সমস্ত আচরণকে আভরণহীন করে উলঙ্গ করে দিয়েছে। ফলে আচরণগুলি থেকে আর সুরভির গন্ধ বা **পূতগন্ধ** বেরোয় না, বেরোয় **পূতিগন্ধ**।

কিন্তু প্রশ্ন হল, **পূত** গতিশীল হলে তা **পূতি**তে পরিণত হয় কেন এবং তা আমাদের ভাল লাগে না কেন, কেন **পূতগন্ধ**কে সুরভিগন্ধ এবং **পূতিগন্ধ**কে দুর্গন্ধ বলে? এর কারণ হল, প্রতিটি কাজেরই একটি ক্ষণ থাকে। আপনি আচার-অনুষ্ঠান করে একদিন গৃহপ্রবেশ করলেন। আপনার 'গৃহপ্রবেশ' **পূত** হয়ে গেল। কিন্তু আপনি যদি রোজই সেই অনুষ্ঠান করে গৃহপ্রবেশ করতে থাকেন, তখন **পূত** আর **পূত** থাকে না, গতিশীল হয়ে **পূতি** হয়ে যায়। আর সেকারণেই উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হয়ে গেলে আপনি কারও সাথে সেই উদ্বৃত্ত বিনিময় করে নিলেন, বেচে দিলেন, তাতে আপনার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন **পূত** হয়ে গেল। কিন্তু আপনি যদি রোজই কেবলমাত্র বিক্রয় করবার জন্যই উৎপন্ন করতে থাকেন, **পণ্য** করতে থাকেন এবং তাকে **পূত** করতে থাকেন, আপনার **পূতকরণ** আর **পূতকরণ** থাকে না, **পূতিকরণ** হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। এইরূপ দুর্গন্ধবতী **মৎস্যগন্ধা**কে সমাজপরিচালক '**বর**' দিয়ে 'সুগন্ধবতী' করে নিতে পারেন, কিন্তু তাতে সত্য বদলে যায় না। আজকাল 'বানাও আর বেচো আর টাকা কামাও' নীতির সুউচ্চ ঘোষণা শোনা যায় এবং তদ্রূপ ঘোষণাকারীরা তাদের ঘোষণার জন্য লজ্জাবোধ

পর্যন্ত করে না। কিন্তু তাতেও সত্য চাপা যাচ্ছে না। লোকে প্রশ্ন তুলছে — জন্মাও, বড় হও, কামাও, আর মরে যাও — এই কী জীবন? শুধুমাত্র 'টাকা-কামানোর যন্ত্র' রূপে মনুষ্যজীবন কাটানোর কোনো মানে খুঁজে পায় না আজকের তরুণ-তরুণীরা। ...

পোত (পোতদার, পোতস্বামী, পোতপ্লব, পোতবণিক, পোতবাহ, পোতভঙ্গ, পোদ্দার) : ১. ✓পূ + ত (তন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পোত*** = ***পুত****-এর (পুত্রের) আশ্রয় যাহাতে।* ***পোতদার*** = ***পোত****-এর অধিকারী যে।* ***পোতস্বামী*** = ***পোত****-এর স্বামী যে।* ***পোতপ্লব*** = ***পোত*** *দ্বারা প্লবন করে যে।* ***পোতবণিক*** = ***পোত****-এর বণিক।* ***পোতবাহ*** = ***পোত*** *বাহন করে যে, অর্থাৎ বায় যে।* ***পোতভঙ্গ*** = *যে* ***পোত*** *ভাঙিয়াছে।* ***পোদ্দার*** < ***পোতদার***। ৪. শুধুমাত্র পদবীরূপে **পোতদার** বা **পোদ্দার** শব্দটি প্রচলিত, কদাচিৎ 'বিমানপোত' বা 'পোতাশ্রয়' শব্দটি যথাক্রমে 'বিমানবন্দর' ও 'জাহাজঘাটা-বন্দর' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য শব্দগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কপোত**। **পুত, পূত, পুত্র** ইত্যাদি শব্দে আমরা আগেই দেখেছি, সেগুলি **পণ্য**কেও বোঝায়। সেই পণ্যসমুদয় বা **পুত**-রা যেখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পায়, তাকে বলে **পোত** বা জাহাজঘাটা বা বন্দর। সেই **পোতের** দেখভাল করে যে, তাকে সেকালে বলা হত **পোতদার**। শব্দটি পরে বিবর্তিত হয়ে **পোদ্দার**-এ পরিণত হয়েছে। তবে ব.শ. এই শব্দের ব্যুৎপত্তিতে **পূ**-কে শনাক্ত করলেও, son বা **পুত্র**কেন্দ্রিক **পুত**কে ভিত্তি করেই অর্থগুলি দিয়ে গেছেন। যদিও, **পোতস্বামী, পোতবণিক** ... প্রভৃতি যোড় শব্দগুলির ক্ষেত্রে তাঁর শনাক্তকরণে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। সেই কারণে তাঁর দেওয়া অর্থগুলি এখানে দেওয়া হল না।

যাই হোক, একালে এই **পোত** ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড বিপুল পরিমাণে বেড়েছে কিন্তু **পোদ্দারি**তে বাঙালির অধিকার চাঁদ সদাগরের পর থেকে ক্রমশ কমেছে এবং তার পর এসেছে ইংরেজ। ফলে, **পোতাশ্রয়ে** ব্যবহৃত শব্দগুলিও বদলে গেছে অজস্র ইংরেজি শব্দে। তার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আবার অতীতের উত্তরাধিকার বহন করে। যথা potent, potence, potency, port, portable, portage, Portuguese ...। দ্র. **পদবী**।

পুড়্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আপোড়া, পুঁড়্, পুঁড়া, পুঁয়ে, পুড়্, পুড়, পুড়া, পুড়ি, পুণ্ড্র, পোড়, পোড়ন, পোড়নি(নী), পোড়া, পোড়াকপালী, পোড়ামুখী, পোড়ামুখো, পোড়ারমুখী, পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রক, পৌণ্ড্রিক, পৌণ্ড্রিক বাসুদেব।
পুড়্ = নবরূপী পায়ীর গড়ান-উড়ান। **পুড়** = নবরূপী পায়ীর গড়ান-উড়ান যাহাতে।

পুড় (পুড়ন, পুড়া, পোড়, পোড়ন, পোড়া, পোড়াকপালী, পোড়ামুখী, পোড়ামুখো, পোড়ারমুখী) : ২. ***পুড়*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (দানের) গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ***পুড়ন*** = ***পুড়্*** *অন (on) যাহাতে।* ***পুড়া*** = ***পুড়্****-এর আধার যে।* ***পোড়*** = ***পুড়্****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***পোড়ন*** = ***পোড়*** *অন (on) যাহাতে।* ***পোড়া*** = ***পোড়্****-এর আধার যে।* ***পোড়াকপালী*** = ***পোড়া কপাল*** *যাহার।* ***পোড়ামুখী*** = ***পোড়া*** *মুখ যাহার।* ***পোড়ামুখো*** = ***পোড়ামুখ****-এর আধার যে।* ***পোড়ারমুখী*** = ***পোড়া*** *রহে যে মুখে, তাহার গতিশীল আধার।* ৩. **পুড়, পোড়** = দগ্ধ হওয়া, তাপে জ্বলিত হওয়া, অতিব্যথিত হওয়া, কামপীড়িত হওয়া, কলঙ্কে মলিন হওয়া, জঠরানলে পীড়িত হওয়া, জ্বলা, দগ্ধ করা, পীড়িত বা ব্যথিত করা, লবণাধিক্যে দাহজনক করা, পোড়ান, কিরণে সন্তপ্ত করা, অতিব্যথিত করা, জ্বালান। **পুড়ন, পোড়ন** = জ্বলন, জ্বালা, দাহ। **পুড়া, পোড়া** = দগ্ধ, ভস্মীভূত, দগ্ধ নিরামিষ ব্যঞ্জনবিশেষ, হত, মন্দ, নিন্দার্থক। **পোড়াকপালী** = হতভাগিনী। **পোড়ামুখী, পোড়ামুখো, পোড়ারমুখী** = দগ্ধমুখ, কালমুখ, গালি, সস্নেহ গালি। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি গ্রামবাংলায় যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। সংস্কৃতে এই শব্দগুলি নেই। তাপ বা আগুন পেয়ে নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ী যে গড়ান বা উড়ান করে, তাকে **পুড়** বলে। আগুন জ্বললে আমরা তার শিখার উড়ান দেখতে পাই। কিন্তু আগুনের জ্বলনের গড়ান চট করে চোখে পড়ে না। তবে শুষ্ক তৃণভূমিতে আগুন লাগলে দেখা যায়, হু হু করে জ্বলা আগুন মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ধেয়ে আসছে। সেই গড়ান আগুনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মাত্র উপায় আবিষ্কার করেছিলেন বনবাসী মানুষেরা। তাঁরা ধাবমান আগুনের চেয়ে দ্রুতবেগে দৌড়ে সামনের কিছুটা অংশে আগুন ধরিয়ে দিতেন, তারপর সেই স্থান পুড়ে গেলে সেখানেই আশ্রয় নিতেন। ধাবমান আগুন আর তাদের ক্ষতি করতে পারত না। সুতরাং আগুনের গড়ানও ঘটে এবং সে গড়ান আগুনও কম ভয়ানক নয়।

পুণ্ড্র (পৌণ্ড্রিক বাসুদেব) : ১. ✓পুণ্ড্ (মর্দন) + র (রক্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পুণ্ড্র*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর (দানের) বোধের উড়ান রহে যাহাতে।* ***পৌণ্ড্রিক বাসুদেব*** = *যে* ***বাসুদেব****-সত্তা* ***পুণ্ড্র*** *জাতিতে জাত হয়েছিলেন।* ৩. **পুণ্ড্র** : ইক্ষুভেদ, পুঁড়ি আক, দেশবিশেষ, তদ্দেশবাসীগণ, (সাদৃশ্যে) তিলক, অতিমুক্তক, মাধবী, অশ্বদেহস্থ চিহ্নভেদ, শ্বেতপদ্ম, কৃমি। (ব.শ.)। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজা বলি ঊর্ধ্বরেতা ছিলেন। বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভের ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ড্র নিজের নামীয় রাজ্যের রাজা হন। (পৌ.অ.)। **পৌণ্ড্রিক বাসুদেব** : বাসুদেব পৌণ্ড্রদেশের একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ... ইনি জরাসন্ধের পরম মিত্র ছিলেন। হরিবংশ মতে বাসুদেবের দুই স্ত্রী ছিল — সুতনু ও নারাচী। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রিক ও নারাচীর গর্ভে কপিল জন্মগ্রহণ করেন। কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করেন এবং পৌণ্ড্রিক পৌণ্ড্ররাজ্য লাভ করেন পৌণ্ড্র বাসুদেব নামে বিখ্যাত হন। ... রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীম এঁকে পরাজিত করেছিলেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ মতে মহর্ষি নারদ এঁর সভায় এসে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। ... তিনি কৃষ্ণকে শাস্তি দেবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করেন। ... অবশেষে তিনি ... কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দীর্ঘতমা**। 'পুঁড়া' শব্দটির

ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল 'নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর রহস্যরূপের উড়ান যে আধারে'। একে **পুণ্ড্র**ও বলে। ইক্ষু, অতিমুক্তক, মাধবী, অশ্বদেহস্থ চিহ্নভেদ, শ্বেতপদ্ম, কৃমি ... প্রভৃতিকে কেন **পুণ্ড্র** বা 'পুঁড়া' বলা হত, আমরা জানি না। কেননা, সেসব বুঝবার জন্য যে মানের অনুভবশক্তি লাগে, তা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের ছিল, আমাদের নেই। আমরা বড়জোর সমাজের ক্ষেত্রে সেই **পুণ্ড্র** বা **পুঁড়া**কে শনাক্ত করার চেষ্টা করতে পারি। ...

আমাদের মনে হয়, মানুষ যৌথসমাজে থাকলে তাদের বাহ্যসম্পদই কেবল যৌথভাবে থাকে না, মানসসম্পদও যৌথভাবে থাকে। প্রথম ভাঙনটি ঘটে মানসিক ক্ষেত্রে। লোকে 'আমার মন', 'আমার চিন্তাভাবনা', 'আমার জ্ঞান', 'আমার আবিষ্কৃত কৌশল' ... ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে প্রথমে স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠে। (অর্থাৎ আদিম intellectual property right-ই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি তোলে এবং যৌথমনকে ভেঙে দেয়, তার বহু পরে আসে বাহ্যসম্পদের ব্যক্তিমালিকানার প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে।) ফলত যৌথমন ভেঙে যায়, যৌথ মানসসম্পদও বিভাজিত হয়ে যায় — আমি আগুন জ্বালতে জানি, আমি চাষ করতে জানি, আমি জন্তুজানোয়ারদের পোষ মানাতে জানি ... ইত্যাকার বোধ জন্মায়। এর ফলে, যৌথসমাজের ভেতরে কিছু মানুষ মনে মনে স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে যৌথ বাহ্যসম্পদ কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ব্যক্তিমালিকের হাতে চলে যায় না। শত শত মানসিক স্তর পেরিয়ে যৌথসমাজের মানুষ যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়, তেমনি শত শত বাস্তব স্তর পেরিয়ে আদিম যৌথমনের মানুষ ব্যক্তিমালিকানাবাদী-মানুষ হয়।

পুণ্ড্র বা **পুঁড়া** হল সেই শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা তখনও ব্যক্তিগত পণ্য বা সম্পদ কিছুই অর্জন করেনি কিংবা করার চেষ্টাও করেনি, কিন্তু ব্যক্তিগত মানসসম্পদের অধিকারী হয়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে গেছে। তার মানে, যৌথসমাজের ভেতরে উদীয়মান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষদের গোষ্ঠীকে বা তদ্রূপ মতবাদকে বলা হত **পুণ্ড্র**। আর, **পৌণ্ড্রিক বাসুদেব** সেই সত্তারই আরও পরিণত রূপ বলেই মনে হয়।

পুল্ (পুল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : পুল্, পুল, পুলক, পুলককুল, পুলকঘটা, পুলকপাঁতি, পুলকপাঁতিয়া, পুলকবলিত, পুলকমণ্ডল, পুলকাঙ্কুর, পুলকায়িত, পুলকিত, পুলকী, পুলটিশ, পুলস্তি, পুলস্ত্য, পুলহ, পুলা, পু(পৃ)লাক, পুলায়িত, পুলি (পুলী), পুলিন, পুলিনভোজন, পুলিন্দ, পুলিন্দা, পুলিশ(স), পুলোম, পুলোমজা, পুলোমজিৎ, পুলোমদ্বিট, পুলোমভিৎ, পুলোমা, পূল্, পূল, পূলক, পূলাক, পূলিকা, পোপান, পোলাপান, পৌলস্তী, পৌলস্ত্য, পৌলোম, পৌলোমী, বিপুল।

পুল্ (পুল্) = নবরূপী পায়ীর (দানের) লালন-লয়ন। **পুল** = নবরূপী পায়ীর লালন-লয়ন যাহাতে। **পূল** = নবরূপী পায়ীর আধারের (দাতার) লালন-লয়ন যাহাতে।

পুলক (পুল, পুলকিত, পুলায়িত, পুলি, পুলী) : ১. ✓পুল্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে (কন্) সংজ্ঞার্থে। (ব.শ.)। ২. ***পুল*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর লালন-লয়ন যাহাতে।* ***পুলক*** = ***পুল*** *করে যে।* ***পুলকিত*** = ***পুলক*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***পুলায়িত*** = ***পুল****-এর আধার গতিশীলভাবে গিয়ে তারিত যাহাতে।* ***পুলি*** = ***পুল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পুলী*** = ***পুলি****র আধার যে।* ৩. **পুল** = মহত্ত্ব, বিশালতা, উচ্চীভাব হওয়া। **পুলক** = রোমাঞ্চ, প্রস্তরবিশেষ, মণিদোষভেদ, গজান্নপিণ্ড, হরিতাল, শরীরের অন্তর্ভব ও বহির্ভব কৃমি, পেয়ালা, সর্ষপভেদ, অসম্পূর্ণতণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হর্ষ, রোমাঞ্চ-রূপ কদম্বকেশর। **পুলকিত** = সঞ্জাতপুলক, রোমাঞ্চিত, হর্ষিত, আনন্দিত। **পুলায়িত** = অশ্বের 'পুলা'গতিতে গমন, অশ্বের প্লুতগতি (gallop)। **পুলি (পুলী)** = খাদ্যবিশেষ, নারিকেলের পুর দেওয়া পিষ্টকবিশেষ (জামাই-পুলী, দুগ্ধপুলী, চন্দ্রপুলী, আর। গোটাপুলী, মিঠাপুলী অনেক প্রকার)। ৪. bridge অর্থে **পুল**, 'পিঠাপুলী' অর্থে **পুলী** কমবেশি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। ৫. বাংলাভাষীদের কি আর **পুলক** জাগে না? তারা কি আর কোনো ব্যাপারেই **পুলকিত** হয় না? হ্যাঁ, জাগে, কিন্তু তাকে **পুলক** নামে চিহ্নিত করতে আমরা ভুলে গেছি। অথচ সেকালে কাঠের দরজায় যে কাঠের বা মোটা উঁচু পেরেকের গুল বসানো হত, বাংলাভাষীরা তাকেও **পুলক** বলতেন। এসব তো ভুলেছি, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে; এমনকি আমরা টপকে চলা ট্রেনে প্রতিদিনই চড়ি, তাকে galloping train বলিও, কিন্তু সেটিই যে **পুলায়িত** 'ট্রেন' বা 'তারণ' (train) সেকথা ভাবতেও ভুলে গেছি। ...

তা সে যাই হোক, নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ী বা **পু** পেয়ে পেয়ে লালিত হলে ফুলে উঠতে থাকে। তার এই ফুলে-ওঠা ফারসির চোখে রামধনুর মতো ফুলে ওঠা **পুল** বা bridge-ই বটে। তাছাড়া ইটের তৈরি রামধনুর মতো আধা-গোল 'আর্চ' করা **পুল**-এর ধারণাটির ব্যাপক ব্যবহার ছিল উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায়। ফলে ফারসিতে **পুল** ফুলে-ওঠা সাঁকোকে বোঝাতেই পারে। ...

তবে দ্রষ্টা যদি এই ফুলে-ওঠা ব্যাপারটির পেছনে থাকে, অর্থাৎ ভেতরের দৃষ্টিতে এই ফুলে-ওঠাকে দেখে, তাহলে সে দেখবে, ব্যাপারটি আসলে উপরের দিকে লয়প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে এ হল দ্রষ্টার দিকে টানা হয়ে আসা। ইংরেজি একেই বলে pull। তবে কিনা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা দৃশ্য কোনো বস্তুর ফুলে ওঠা পেরিয়ে অদৃশ্য বস্তুর ফুলে-ওঠাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। মানুষের মন ফুলে উঠলে তখনই তাকে তাঁরা বলতেন **পুল** এবং সেরকম **পুল** করে যে আচরণ, তাকে তাঁরা বলতেন **পুলক**। কেউ সেভাবে মনে মনে ফুলে উঠলে, সেই ব্যক্তিকে তাঁরা বলতেন **পুলকিত**। ...

পুলস্তি, পুলস্ত্য (পৌলস্তী, পৌলস্ত্য) : ১. **পুলস্তি** = পুল্ + অস্ + ত্তি - করণবাচ্যে। **পুলস্ত্য** = পুল্ + স্ত্যৈ + ড - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***পুলস্তি*** = ***পুল*** *দ্বারা অস্তিত্ব যাহার।* ***পুলস্ত্য*** = ***পুল*** *দ্বারা অস্তিত্ব গঠিত থাকে যাহাতে।* ৩. **পুলস্তি, পুলস্ত্য** = সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার কর্ণজাত। কর্দমকন্যা হবির্ভূ ইঁহার

পত্নী এবং অগস্ত্য বিশ্রবাঃ পুত্র। রামায়ণে বিশ্রবাঃ তৃণবিন্দুদুহিতার গর্ভজাত পুলস্ত্যপুত্র। (ব.শ.)। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ — এই সাতজন (সপ্তর্ষি/পিতৃগণ) ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুলস্ত্য ব্রহ্মার কর্ণ হতে জাত অন্যতম মানসপুত্র। ... ইনি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন ... পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা। ... ব্রহ্মার নিকট হতে ব্রহ্মপুরাণ প্রাপ্ত হয়ে তিনি তা পরাশরকে জ্ঞাত করান। ... সুমেরু পর্বতের নিকট তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমপ্রান্তে তপোনিরত থাকাকালীন অপ্সরা ও মুনিকন্যাদের নৃত্যগীতে এঁর তপোভঙ্গ হয়। সে কারণে পুলস্ত্য বিরক্ত হয়ে এক অদ্ভুত অভিশাপ দেন। তিনি বলেন, যে নারী এই স্থানে এসে তাঁর নেত্রপথে পতিত হবে, সে গর্ভবতী হবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূ একদা নির্ভয়ে আশ্রমে এসে পুলস্ত্যের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে তাঁর বেদপাঠ শ্রবণকালে গর্ভবতী হন। তখন পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর অনুরোধে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। এঁরই গর্ভে বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্রবা মুনি রাবণাদির পিতা। কথিত আছে, সমস্ত রাক্ষস পুলস্ত্য হতে জন্মগ্রহণ করে বলে পৌলস্ত্য নামে খ্যাত। **পৌলস্তী** = পুলস্ত্য-কন্যা শূর্পনখা ও কুম্ভীনসী। **পৌলস্ত্য** = পুলস্ত্যের পুত্র — কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বৈদিক সভ্যতার সূচনাকালে **দক্ষ**তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর সমাজ-পরিচালকদের পক্ষে একই জ্ঞান ও কর্মের পুনরাবৃত্তির কারণে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান তো ফুলে ফেঁপে উঠতই, আর তাই ঘটেছিল। আদি জ্ঞানজীবী শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে, তাদের জ্ঞান কানে শুনে অনেকেই জ্ঞানী হচ্ছে, জ্ঞানজীবীর (ব্রহ্মার) কান থেকে **পুলস্ত্যের** জন্মও অবধারিত হয়ে দেখা দিচ্ছে — এসবই ছিল যৌথসমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে **দক্ষনীতি** গ্রহণের স্বাভাবিক ফসল। স্বভাবতই সেই **পুলস্ত্যের** আধারশক্তিরূপে যে জনগোষ্ঠী উঠে আসবে, সে **হবির্ভূ** হতে বাধ্য। তাদের সন্তানরা তো নিজেরা কোনোদিন কোনো কিছু আবিষ্কারই করেনি, এমনকি নিজেরা তার প্রয়োগলব্ধ জ্ঞানও নিজেরা অর্জন করেনি, সবই শিখেছে শুনে এবং দেখে। কোনো দিকেই এদের কোনো দায়-দায়িত্ব-মায়া-মমতা থাকার কথা নয়। স্বভাবতই তারা যৌথসমাজের ধনসম্পদ রক্ষা করব রক্ষা করব বলবে কিন্তু সেসব খেয়ে ফেলবে, এটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আর সেটাই তারা করত বলে, তাদের **রাক্ষস** না হয়ে উপায় ছিল না। সেই কারণে, 'কথিত আছে, সমস্ত রাক্ষস পুলস্ত্য হতে জন্মগ্রহণ করে বলে **পৌলস্ত্য** নামে খ্যাত।' ... দ্র. **কপিল, কর্দ্দম**। ৬. **pull** ও pul-যুক্ত অনেক ইংরেজি শব্দ।

পুলহ : ১. পুল + হ্ন + ড - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***পুল**-কে **হ্ন** (হনন ও ত্যাগ) করে যে।* ৩. সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার নাভিজাত। কর্দ্দমসুতা গতি ইঁহার পত্নী এবং কর্ম্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু ইঁহার পুত্রত্রয়। (ব.শ.)। ব্রহ্মার মানসপুত্র ও প্রজাপতিগণের মধ্যে অন্যতম। ইনি ব্রহ্মার নাভিজাত। এঁর স্ত্রীর নাম ক্ষমা ও তিনটি পুত্রের নাম কর্দম, আর্যাবৎ ও সহিষ্ণু। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই সত্তাটি বৈদিক সমাজের উৎপাদন কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র বা নাভি থেকে জন্মায়। যৌথসমাজের কর্মযজ্ঞ চালানোর ক্ষেত্রে এই **পুলহ** সত্তা অনেকটাই নির্বিকারভাবে আপন কর্তব্যকর্ম করতেন বলে মনে হয়। বৈদিক সমাজের চোখে এঁর পত্নী ও পুত্রেরা ভাল, তাদের নাম যথাক্রমে গতি, কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্, ও সহিষ্ণু। আর, সনাতন সমাজের চোখে সেই একই সত্তা অন্য নামে চিহ্নিত — ক্ষমা, কর্দম, আর্যাবৎ, ও সহিষ্ণু। ...

পুলিন (পুলিনবতী, পুলিনবিহারী, পুলিনভোজন) : ১. ✓পুল্ + ইন (ইনন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পুলিন** = **পুল** ইন (in) যাহাতে, অর্থাৎ **পুল** গতিশীল হইয়া না-কৃত বা স্থির হয় যাহাতে। **পুলিনবতী** = **পুলিন** আছে যে সত্তার। **পুলিনবিহারী** = **পুলিনে পুলিনে** বিহার করেন যিনি। **পুলিনভোজন** = **পুলিনে** যে ভোজন করা হয়। /* **পুলিন** = জল বা তোয় হইতে উত্থিত যে। (ব.শ.)। ৩. **পুলিন** = দ্বীপ, চর, চড়া, তীর, তট। **পুলিনবতী** = প্রশস্ততটা নদী। **পুলিনভোজন** = যমুনাতীরে সখাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ফলাদি-ভোজন। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র নাম রূপে **পুলিন** বা **পুলিনবিহারী** শব্দ দুটি প্রচলিত। ৫. আমাদের পদাবলী সাহিত্যে **পুলিন** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের বিপুল ব্যবহার দেখা যায়। তার অন্যতম কারণ হল, শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা ও যাথার্থ্য। একালের বাংলা অ্যাকাডেমি শব্দটিকে ফেলে দিয়েছে। কারণ, তার মানে বোঝার যোগ্যতা হারিয়েছে তারা।

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, কোনো সত্তা যখন ফুলে রামধনুর মতো অর্ধগোলাকৃতি হয়ে ওঠে, তখন তাকে **পুল** বলে; কারণ, তাতে 'নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর লালন' থাকে। দ্বীপ মাত্রেই জলের মাঝে জেগে এই কারণে যে, সে ভেতর থেকে ফুলে জলের উপরে উঠে যায়; ঠিক যেন **পুলি**পিঠার খানিকটা অংশ জলে ভাসছে এবং তার পিঠটা দেখা যাচ্ছে। এই জলধারার স্রোতের মাঝে জেগে ওঠা দ্বীপভূমি, একেই বলা হয় **পুলিন**। **যমুনা** হল এরকমই এক **পুলিনবতী** নদী। হতে পারে তাতে এক বা একাধিক **পুলিন** রয়েছে। তবে সে হল বাহ্যিক **পুলিন**-এর কথা। আজ আমরা জানি, এই **পুলিন, যমুনা** বাহ্যিক হতে পারে, মানসিকও হতে পারে। ...

তা সে যাই হোক, এই **যমুনাপুলিন**-এর কথা প্রথম আমরা জানতে পারি **ব্যাস**-এর জন্মকথায়। **পরাশর মৎস্যগন্ধা**কে নিয়ে সেখানে বিহার করেছিলেন এবং তাতেই **ব্যাস**-এর জন্ম হয়েছিল। পরে আমরা সেইরূপ **যমুনাপুলিন**কে পাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের লীলায়। ব.শ. চৈতন্যচরিতামৃত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের নিয়ে ফলাদিভোজন করেছিলেন। ...

তবে আমাদের ধারণা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, সে **পুলিন** বাহ্যিক নয়, মানসিক। যেমন কিনা, সর্বোচ্চ স্তরে জ্ঞানধারার মাঝে মাঝে গড়ে ওঠা দ্বীপ বা **পুলিন** হল নতুন অর্জনের এক একটি সত্তা বা কেন্দ্র। সেই ধরনের **পুলিনে পুলিনে** যিনি বিহার করেন, তিনিই তো **পুলিনবিহারী** শ্রীকৃষ্ণই বটে! সেখানে বসে যাঁরা অমৃতরসাদি পানভোজন করেন, তাঁদের ভোজনকেই তো **পুলিনভোজন** বলা সঙ্গত। কিংবা ধারণাটিকে নিম্নস্তরে নামিয়ে আর একভাবেও বলা যায়। সমাজের সরকারি সম্পদ-বিতরণের ধারায় (একালের ভাষায় যাকে 'রেশনিং' বলে) বা **যমুনায়** যে **পুলিন**গুলি গড়ে ওঠে, সেখানে বসে ফলাদিভোজন করলে তখন

তাকে **পুলিনভোজন** বলা যেতেই পারে। সেই **পুলিনে পুলিনে** বিহার করেন যিনি, তিনিও **পুলিনবিহারী** হতে পারেন। ...

তার মানে, তিনটি লোকে **পুলিন, পুলিনবতী, পুলিনবিহারী, পুলিনভোজন** প্রভৃতি সত্তাকে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পূর্বসূরি জ্ঞানী মানুষেরা তাঁদের চিহ্নিত করে উপরোক্ত শব্দগুলির সাহায্যে তাদের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। একালের শিক্ষিত মানুষেরা কিন্তু সেই শব্দগুলির ব্যবহার এবং অর্থ দুই ভুলেছেন; গ্রামবাংলা ভুলেছে অর্থ, ব্যবহার এখনও ভোলেনি। আমরা দেখলাম, কোনো অভিধানেই **পুলিনবিহারী** শব্দটি নাই। একশো বছর আগেও **পুলিন** বা **পুলিনবিহারী** নামটি ছিল খুবই চলিত নাম, আজকাল এ নাম কেউ রাখেন না। ...

শুধু কি তাই? আজকাল শহুরে জীবন যতই যন্ত্রকেন্দ্রিক অতএব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে এবং উঠছে, শহুরে মানুষের আত্মা ততই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠছে। রোজকার সেই আত্মগ্লানি থেকে মুক্তির দুরাশায় আজকাল কোনো একটা ছুতোয় ফাঁক পেলেই লোকে হুজুগে মাতে। সেই হুজুগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল 'পিকনিক'। তার কোনো বাংলা নামই এখন আর শোনা যায় না। কিন্তু সেকালে 'বনভোজন', **পুলিনভোজন** ... ইত্যাদি তো ছিলই।

পুলোম (পুলোমজা, পুলোমা, পৌলোম, পৌলোমী) : ১. পুলোমা = ✓পুল্‌ + উ + মন্‌ - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। **২.** *পুলোম = **পুল**-এর নবরূপী আশ্রয় সীমায়িত যাহাতে। **পুলোমজা** = পুলোম হইতে জাত। **পুলোমা** = **পুলোম**-এর আধার যে। **পৌলমী** = **পুলোম** হইতে জাতা যে স্ত্রী।* **৩. পুলোম, পুলোমা** = দনুগর্ভজাত কশ্যপপুত্র দানববিশেষ। (ব.শ.)। (ক) দানববিশেষ। ইনি কশ্যপপুত্র দনুর পুত্র এবং ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পিতা। রাবণ স্বর্গ জয় করবার জন্য যুদ্ধে রত হলে রাবণপুত্র মেঘনাদ ও ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মেঘনাদ মায়াবলে রণস্থল তমসাচ্ছন্ন করে জয়ন্তকে বিপদগ্রস্ত করলে পুলোমা দৌহিত্রকে নিয়ে পলায়ন করেন। কথিত আছে, পুলোমার কন্যা শচীকে পুলোমার অনুমতি নিয়ে অনুহ্লাদ হরণ করেন। নিজের স্ত্রী এইরূপে অপহৃতা হয়েছে দেখে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের শ্বশুর ও অনুহ্লাদকে নিহত করেন। (খ) ভৃগুমুনির স্ত্রীর নাম পুলোমা। ইনি চ্যবনের জননী। এঁর পিতা দৈত্যরাজ বৈশ্বানর। একদা মুনি, স্নানার্থ অনুপস্থিত থাকাকালীন, পুলোমা নামে তাঁর (ভৃগুপত্নী-পুলোমার) প্রতি পূর্বানুরক্ত এক রাক্ষস তাঁকে হরণ করে। এই সময় তিনি গর্ভিণী ছিলেন। এই দুরবস্থার মধ্যে রোরুদ্যমানা অবস্থায় ইনি সন্তান প্রসব করেন। সেই সদ্যোপ্রসূত শিশুর ব্রহ্মতেজে রাক্ষস ভস্মীভূত হয়। এই শিশুই চ্যবন। **পুলোমজা** = দৈত্যরাজ পুলোমার কন্যা বলে শচী পুলোমজা নামে খ্যাতা। (পৌ.অ.)। **পৌলোম, পৌলোমী** = পুলোমকন্যা শচী। (ব.শ.)। বায়ুপুরাণ মতে, মারীচ রাক্ষসের অন্যতমা স্ত্রী ও বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমার সন্তানরা পৌলোমদৈত্য নামে খ্যাত। ভাগবতপুরাণ মতে কশ্যপের ঔরসে ও বৈশ্বানর দানবের কন্যা পুলোমার গর্ভে পৌলোমেরা জন্মগ্রহণ করে। এরা সংখ্যায় ৬০,০০০। অর্জুনের হাতে এরা সকলেই নিহত হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** শুধুমাত্র **পৌলোমী** শব্দটি নাম রূপে প্রচলিত, বাকি সব শব্দই অপ্রচলিত। **৫.** প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দুটি নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — **পুলোমা** ও **জরৎকারু** (মনসা)। **পুলোমা** হল একটি পুরুষের নাম, যে কিনা **পুলোমা** নামের একটি নারীকে বিবাহ করেছিল। **জরৎকারু**ও এমন এক মুনি যিনি **জরৎকারু** নাম্নী এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। এরকম আর কোনো ঘটনার কথা আমরা পুরাণাদিতে পাইনি। পুরাণাদি জানায়, এই নামগুলি আলটপকা নয় যে, ঘটনাচক্রে এরকম 'কাকতালীয় ঘটনা' ঘটে গেছে। আগে থেকে বলাই ছিল, সবাই জানত, যে, **জরৎকারু**র বিয়ে হবে **জরৎকারু** নামের একটি নারীর সঙ্গে; আর **পুলোমা**র তো সিধে নিয়ম ছিল, **পুলোমা**দের বিয়ে হবে শুধুমাত্র **পুলোমা**দের সঙ্গেই! ...

তবে কিনা, যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয়, **পুলোমা**র ঘটনা **দক্ষযজ্ঞে**র আগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের ঘটনা; আর **জরৎকারু**দের ঘটনাবলী আজ থেকে মাত্র ১৪০০ বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু তাই বলে **পুলোমা** সত্তাটির কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না, তা নয়। সমাজে যে-সত্তা যে সময় জন্মায় কালচক্রের নিয়মে কেবলমাত্র 'কাল পূর্ণ হলে' তবেই তার মৃত্যু ঘটে। বলতে গেলে আজও ভারতসমাজে **পুলোমা** সত্তা সক্রিয় রয়েছে। তবে কিনা, সত্তাটিকে চেনা কঠিন। আমরা শুধুমাত্র এটুকু বলতে পারি, জ্ঞানসম্পদমূলক এবং বা ধনসম্পদমূলক আত্মকেন্দ্রিকতার একটি সীমায়িত রূপ নিয়ে সক্রিয় থাকত যে সামাজিক সত্তা, সেকালে তাকেই **পুলোমা** বলা হত। ... দ্র. **অগ্নিসাক্ষী, কালকা, চ্যবন, ভৃগু**।

পুষ্‌ (পুষ্প, পোষি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপুষ্ট, অপুষ্প, অপোষ্য, আপোষ, পউখ, পখরি, পখুর, পুকুর, পুখরি(রী), পুখুর, পুপ্‌প, পুপ্‌ফুস, পুরুষ্ট, পুরুষ্টু, পুষ্‌, পুষ (পোষ), পুষ্কর, পুষ্করনাভ, পুষ্করপত্র(পর্ণ), পুষ্করমূল, পুষ্করলোচন, পুষ্করাক্ষ, পুষ্করাহ্ব, পুষ্করাহ্বয়, পুষ্করেক্ষণ, পুষ্করিণী, পুষ্কর্ণী, পুষ্কল, পুষ্কলক, পুষ্ট, পুষ্টি, পুষ্টিকর, পুষ্টিকান্ত, পুষ্টিকাম, পুষ্টিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধন, পুষ্প্‌, পুষ্প, পুষ্পক, পুষ্পকাল, পুষ্পকাসীস, পুষ্পকেতন, পুষ্পক্ষেপণী, পুষ্পচাপ, পুষ্পজ, পুষ্পঝারা, পুষ্পদন্ত, পুষ্পদাম, পুষ্পদ্রব, পুষ্পধনু, পুষ্পধনুঃ, পুষ্পধন্বা, পুষ্পনির্য্যাস, পুষ্পন্ধয়, পুষ্পপত্রী, পুষ্পপাত্র, পুষ্পপুট, পুষ্পপুর, পুষ্পপ্রচয়, পুষ্পপ্রস্তার, পুষ্প-ফেলাফেলি, পুষ্পবড়ু, পুষ্পবতী, পুষ্পবর্ষণ, পুষ্পবৃষ্টি, পুষ্পবাটিকা, পুষ্পবাণ, পুষ্পবান, পুষ্পবৃক্ষ, পুষ্পবেণী, পুষ্পভঙ্গ, পুষ্পমালা, পুষ্পমাস, পুষ্পরজঃ, পুষ্পরেণু, পুষ্পরথ, পুষ্পরাগ, পুষ্পলাব, পুষ্পলাবী, পুষ্পলিট, পুষ্পশর, পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পহাস, পুষ্পহীনা, পুষ্পাকর, পুষ্পাগম, পুষ্পাজীব, পুষ্পাজীবী, পুষ্পাঞ্জন, পুষ্পায়ুধ, পুষ্পারণ্য, পুষ্পাসব, পুষ্পাসার, পুষ্পিকা, পুষ্পিণী, পুষ্পিত, পুষ্পিতা, পুষ্পী, পুষ্পেষু, পুষ্পোৎকটা, পুষ্পোৎসব, পুষ্য, পুষ্যা, পুষ্যাভিষেক, পুষ্যি, পুষ্যিপুত্তুর, পুস, পুসি, পুসিদা, পুস্ত্‌, পুস্ত, পুস্তক, পুস্তকর্ম্মা, পুস্তকাগার, পুস্তন, পুস্তান, পুস্তানি, পুস্তিকা, পুহপ, পুহা (পোহা), পূষ্‌, পূষণ, পূষা, পৈষ্ট, পৈষ্টিক, পৈষ্টী, পোথা, পোশ, পোশাক (পোষাক), পোশাকী, পোষ, পোষক, পোষকতা, পোষণ, পোষণীয়,

পোষণীয়া, পোষা, পোষান, পোষিণী, পোষিত, পোষিতা, পোষী, পোষিত্রী, পোস্টা (পোষ্ট্, post), পোস্টাই, পোষ্য, পোষ্যপুত্র, পোষ্যবর্গ, পোষ্যমঙ্গল, পোস্ত, পোস্তা, পৌখ, পৌষ, পৌষ্য, পৌষ্টিক, পৌষ্ণ, পৌষ্প, পৌষ্পী, শতপুষ্প, হৃষ্টপুষ্ট।

পুষ্ (পুষ্প্, পোষি) = নবরূপী পায়ীর (শক্তিদানের) দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **পুষ** = নবরূপী পায়ীর (শক্তিদানের) দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **পুষ্প** = **পুষ্** পালিত হয় যাহাতে। **পোষি** = **পুষ্**-এর আধার গতিশীল যাহাতে।

পুষ্কর (পুষ্করিণী, পুকুর — পুকুর-চুরি) : ১. ✓পুষ্ + কর (করন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **পুষ্কর** = **পুষ্** *(নবরূপী পায়ীর বা দানীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ) কৃত যাহাতে।* **পুষ্করিণী** = **পুষ্কর** *গতিশীল থাকে যে সত্তায়।* **পুকুর** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর করণ উত্তীর্ণ হয়ে রয় যাহাতে।* / **পুষ্কর** = শব্দ পোষণ করে যে। **পুষ্করিণী** = পুষ্করের স্থান যাহা। (ব.শ.)। ৩. **পুষ্কর** = জলাশয়, সপ্তদ্বীপের একতম, রোগভেদ, নাগভেদ, নলরাজের ভ্রাতা, পুষ্করদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ, বরুণপুত্র, মেঘনায়কভেদ, বাদ্যবিশেষ, ক্রূরবার-ভদ্রাতিথি-ভগ্নপাদনক্ষত্র-ঘটিত অশুভযোগভেদ, সূর্য্য, কৃষ্ণ, শিব, সারসপক্ষী; জল, পদ্ম, সিতপদ্ম, হস্তিশুণ্ডাগ্র, আকাশ, বাদ্যভাণ্ডমুখ, খড়্গফলক, খড়্গকোষ, কাণ্ড, বাণ, যুদ্ধ, কুষ্ঠৌষধ, অজমীরস্থ তীর্থবিশেষ, ব্রহ্মকৃত সরোভেদ, পিঞ্জর। (ব.শ.)। (ক) নিষধরাজ নলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কলির প্ররোচনায় ইনি নলকে অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত করে নলের রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করেন এবং দময়ন্তীকেও পণ রাখতে বলেন। পরে নল শাপমুক্ত হয়ে নিজরাজ্যে ফিরে পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় পুষ্করকে পরাজিত করে নষ্টরাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু পুষ্করকে শাস্তিদানের পরিবর্তে তাঁকে অর্ধরাজ্য দান করেন। (খ) পুরাণ-প্রসিদ্ধ সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপ। (গ) আজমীড় হতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জলাশয়। (পৌ.অ.)। **পুষ্করিণী** = জলস্থান, জলাশয়ভেদ, পুখুর, জলাশয়মাত্র, পদ্মিনী, পদ্মলতা, স্থলপদ্মিনী, পদ্মসমূহ, পুষ্করমূল। **পুকুর** = পুষ্করিণী। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র **পুকুর** ও তারই সমার্থক **পখরি, পখুর, পুখরি, পুখরী, পুখুর** প্রভৃতি শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। **পুষ্কর** ও তৎসংশ্লিষ্ট বহু শব্দ, যথা — **পুষ্করিণী, পুষ্করনাভ, পুষ্করপত্র, পুষ্করপর্ণ, পুষ্করমূল, পুষ্করলোচন, পুষ্করাক্ষ, পুষ্করাহ্ব, পুষ্করাহ্বয়, পুষ্করেক্ষণ** প্রভৃতি সবই অপ্রচলিত। ৫. **পুষ্কর** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ এমন যে, তা অজস্র বিচিত্র বস্তুকে বোঝানর যোগ্যতা ধরে। আমরা দেখছি, এর ভিতর '**পুষ** বা পোষণ করে যে' অর্থটি রাখা হয়েছে। ব.শ. জানাচ্ছেন, 'শব্দ পোষণ করে যে', যেমন 'আকাশ'। অর্থাৎ তাঁর মতে **পুষ্কর** শব্দের একটি অর্থ হল 'আকাশ'।

আমরা সেরকম কোনো বিশেষীকরণ করতে যাইনি। কারণ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে 'পোষণ করে যে', সেই হল **পুষ্কর**। কী পোষণ করে, কাকে পোষণ করে, সেকথা পরে। কেননা, প্রেক্ষাপট অনুসারে এই 'কী' বা 'কাকে' প্রশ্নের উত্তর নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেই উত্তরগুলি একেবারেই পৃথক হতে পারে। হয়তো সেজন্যেই **পুষ্কর** শব্দটি অত বিচিত্র বস্তু বা বিষয়কে শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু ঠিক কীভাবে করে, তা আমরা যথার্থভাবে উদ্ধার করতে পারিনি। হ্যাঁ, গ্রামবাংলায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ির সংলগ্ন একটি **পুষ্কর** বা **পুষ্করিণী** থাকে, সেই **পুষ্কর** গৃহস্থ ও তার পরিবারের পালনপোষণে অবশ্যই সহায়তা করে; গৃহস্থও উদ্বৃত্ত খাদ্যাদি পুকুরে ফেলে মাছ ইত্যাদি পোষণ করে থাকেন এবং পুকুরের মোহনার রক্ষণাবেক্ষণ করে, ঝোপঝাড় সরিয়ে, শ্যাওলা মেরে, 'সাঁচী-হদ' (একপ্রকার শ্যাওলা যা ছানা কাটার মতো জলের ময়লা কাটিয়ে জলকে সাফ করে তাকে স্ফটিকস্বচ্ছ করে দেয়) ফেলে ... পুকুরের পোষণ করে থাকেন। কিন্তু তা দিয়ে উপরোক্ত সব অর্থগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায় না। ...

আরও সমস্যা আছে। পুরাণাদি আমাদের জানাচ্ছে, এই ভুবনকমলে নাকি সাতটি দ্বীপ রয়েছে — জম্বু, শাক, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, ও **পুষ্কর**। তার মধ্যে ছয়টি দ্বীপের প্রত্যেকটিতেই সাতটি করে **কুলগিরি** রয়েছে — মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র; কিন্তু **পুষ্কর** দ্বীপে রয়েছে মাত্র একটি, তার নামও নাকি **পুষ্কর**। ...

এটি একটি অতিবড় সমস্যা। আমাদের পূর্বসুরি মহাত্মা দুর্গাদাস লাহিড়ী একটানা প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে চেষ্টা করেছেন 'ভুবনকমল'-এর এই পৌরাণিক ধারণাকে নকশা তৈরি করে করে পার্থিব ভূগোলের সঙ্গে মেলানোর এবং ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে, একথা বলা চলে না যে, **পুষ্কর** নামে কোনো **তীর্থ** বা কোনো 'কুলগিরি' কোথাও নেই। আজমীরে যে **পুষ্কর** রয়েছে, তা তো আর মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু মানসলোকের **পুষ্কর**টি কোথায়? তার স্বরূপ কী? না, এখনও আমরা তা উদ্ধার করতে পারিনি। আমরা কতকগুলি তথ্য দেখতে পাচ্ছি, যা লিখে রেখে যাওয়া দরকার। (ক) অধিকাংশ তীর্থই নদীর ধারে, কিন্তু **পুষ্কর** একটি **পুষ্করিণী** মাত্র। (খ) ভারতীয় সংস্কৃতিতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই **পুষ্করিণী** খনন করা একটি **ধর্ম্ম**সম্মত কাজ হিসেবে স্বীকৃত; এমনকি ৫০/৬০ বছর আগেও ভারতীয় উপমহাদেশের ধনী-মানী মানুষেরা নিজ নিজ এলাকায় সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য **পুষ্করিণী** খনন করাতেন। (গ) উদ্বৃত্ত দুধ বা রান্না করা খাদ্যাদি গৃহসংলগ্ন **পুষ্করিণী**তে ঢেলে দেওয়ার রীতি গ্রামবাংলায় আমরা ৩০/৪০ বছর আগেও দেখেছি; মনে হয় এই রীতি বৈদিক যুগের প্রাক্কাল থেকেই চলে আসছে। (ঘ) আমাদের মনে হয়, বিনিময়ের সূচনার আগে উদ্বৃত্ত সম্পদ যখন 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপস্থানে ফেলে দিয়ে আসা হত' (দ্র. **কিরাত**), সেই প্রথা কখনো হয়তো বা পুকুরে ফেলে দেওয়াতেও পরিণত হয়েছিল। (ঙ) **পুষ্কর** তীর্থেই কেবল ব্রহ্মার মন্দির রয়েছে দেখা যায়। তবে **পুকুর-চুরি** বাক্ধারাটি আমাদের অন্য এক সত্যের সন্ধান দেয়। দ্র. **মধুকুল্যা**।

পুষ্ট (হৃষ্টপুষ্ট) : ১. ✓পুষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **পুষ্ট** = **পুষ** *(পোষণ) টঙ্কারিত যাহাতে।* **হৃষ্টপুষ্ট** = **হৃষ্** *(হাসি) টঙ্কারিত যাহাতে এবং* **পুষ্** *(পোষি) টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. **পুষ্ট** = কৃতপোষণ, স্থূল, ধনাদিসমৃদ্ধ, দারিদ্র্যকৃশতারহিত, পরিণতিপ্রাপ্ত ... ইত্যাদি। **হৃষ্টপুষ্ট** = চিত্তসন্তোষ-দেহপুষ্টিযুক্ত, সানন্দ ও পুষ্টদেহ।

(ব.শ.)। ৪. **পুষ্ট** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে **পুষ্টিকান্ত, পুষ্টিকাম, পুষ্টিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধন** ... প্রভৃতি শব্দগুলি এখন অপ্রচলিত, তবে **পুষ্টি, পুষ্টিকর, হৃষ্টপুষ্ট, অপুষ্ট, অপুষ্টি** ... প্রভৃতি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. কোনো সত্তা যথার্থভাবে পোষিত হলে, তাকে বলে **পুষ্ট**। কারণ, তখন তার ভিতরে **পোষণ** টঙ্কারিত হতে থাকে। ফলে **পুষ্ট** শব্দটির লক্ষণার্থ দাঁড়িয়ে গেছে 'স্থূল' বা 'মোটাসোটা'। তবে এসবই দেহের **পুষ্টির** কথা। কিন্তু মানুষের তো শুধুমাত্র দেহই নেই, তার মন বলে একটি পদার্থ আছে এবং সেই মনেরও **পুষ্টি** দরকার। আমাদের পূর্বসূরিরা তার কথা ভেবেছেন আগে। তার **পুষ্টি** হয় বাহ্যিক খাদ্যাদি থেকে নয়, মানসিক খাদ্য থেকে। এই খাদ্যকে বলে সুখ, তৃপ্তি, আমোদ, আহ্লাদ, রসিকজনের পেয় রস, শিল্পরস, কাব্যরস, **ধর্ম্ম**রস, অধ্যাত্মরস, ব্রহ্মরস (আবিষ্কার-রস বা সৃষ্টিরস) ... ইত্যাদি, যার সর্বোচ্চ রূপের নাম **আনন্দ**রস। সেই খাদ্য আহরণ করে মানুষের মন। সে যা কিছু আহরণ করে (**হৃষ** করে), সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে টঙ্কারিত হলে, সত্তাটি হয় **হৃষ্ট**; আর অন্যের দ্বারা যথেষ্ট **পুষ্** বা পোষণ করা হয়ে থাকলে, সত্তাটি হয়ে যায় **পুষ্ট**। তার মানে আমরা মনের খোরাক পেয়ে যথেষ্ট তৃপ্ত হলে **হৃষ্ট** হই, দেহের খোরাক পেয়ে যথেষ্ট তৃপ্ত হলে **পুষ্ট** হই। জোড়শব্দের ক্ষেত্রে (দ্র. **আশেপাশে**) ইংরেজির প্রভাব যেমন একটি শব্দের মানেই ভুলিয়ে দিয়েছে ('খ' গ্রন্থের ১ম নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য, **আশেপাশে**র মানে করা হয় beside, যেন **আশে**র কোনো মানেই নেই।), তেমনি আজকাল **হৃষ্টপুষ্ট** শব্দের মানে করা হয় 'নাদুসনুদুস', যেন **হৃষ্ট** শব্দের কোনো মানেই নেই!

মোটকথা পাশ্চাত্যের দেহভিত্তিক নিম্নমানের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত বাংলাভাষী শিক্ষিত জনেরাও আজকাল শুধুমাত্র **পুষ্ট** হওয়ার কথা বলেন, **হৃষ্ট** হওয়ার কথা বলেন না। আমাদের পূর্বসূরিরা কিন্তু আগে মনের তৃপ্তির কথা বলতেন, পরে দেহের তৃপ্তির কথা বলতেন, বলতেন **হৃষ্টপুষ্ট**। দেহে **পুষ্ট** মনে রুগ্ন, কিংবা মনে **হৃষ্ট** দেহে রুগ্ন — কোনোটাই ভাল নয়। **বঙ্গ**-এর গৌরব, দুইকে সমানভাবে বহন করা, অবিলম্বে এক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ হওয়া দরকার। মন ও দেহ উভয়ের সমান পোষণ হওয়া দরকার। মনে রাখা দরকার, দেহবাদীদের গাধাবুদ্ধিতে পড়ে মাঠে গিয়ে দলবেঁধে দু'হাত তুলে হো-হো করে হাসলে মানুষ **হৃষ্ট** হয় না। ... ৬. ইংরেজি push ... ইত্যাদি।

পুষ্প (পুষ্পরাজ, পুষ্পহীন-বৃক্ষ, পুষ্পহীনা) : ১. ✓পুষ্প্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পুষ্*** *বা পোষণ (ভিতরে ঢুকে গিয়ে) পালিত হয় যাহাতে।* ***পুষ্পরাজ*** *=* ***পুষ্প****সমূহের রাজা যে।* ***পুষ্পহীনা*** *=* ***পুষ্প*** *নেই বা হয় না যাহার। /* **পুষ্পহীন-বৃক্ষ** = যাহার ফুল হয় না, ফল হয়, তাদৃশ বৃক্ষ। (দ্র. **বনস্পতি**, ব.শ.)। ৩. **পুষ্প** = কুসুম, স্ত্রীরজঃ, পুষ্পরাগমণি (topaz), চক্ষুরোগভেদ, ফুলী, পুষ্পকরথ। **পুষ্পরাজ** = দিব্যপুষ্প, পারিজাত। **পুষ্পহীন-বৃক্ষ** = বনস্পতি, অশ্বত্থপনসাদি। (দ্র. **বনস্পতি**)। **পুষ্পহীনা** = উদুম্বর, রজোহীনা নারী। (ব.শ.)। ৪. flower অর্থে প্রচলিত। ৫. রবীন্দ্রনাথ 'কুসুমে কুসুমে' অরূপরতনের 'চরণচিহ্ন' দেখেছিলেন; অরূপরতনের সঙ্গে মানুষের প্রেম, এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর প্রেমকে, অর্থাৎ, সিন্ধু ও বিন্দুকে তিনি একসঙ্গে ধরতে পারতেন। তাঁর 'ফুটে ওঠা' **পুষ্পের** 'ভরে', 'হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে' ব'লে, তার 'ব্যথা সইতে পারি নে' — এরকম গান তিনি গেয়ে যেতে পেরেছিলেন।

আমরা মধ্যমেধার মানুষ, অত মহৎ ও সূক্ষ্মকে আমরা ধরতে বা বুঝতে পারি না, দেখতে পাই না। আমরা দেখছি, **পুষ্প**-এর ভিতরে '**পুষ্** পালিত হয়ে থাকে'। তবে এই **পুষ্** শুধুমাত্র 'মধু', 'পরাগরেণু', 'ফলের ভ্রূণ'ই হতে হবে, এমন দিব্যি কেউ আমাদের দেয়নি। অতএব সে মানুষের 'শ্রম-মেধা', 'ভক্তি-শ্রদ্ধা', 'প্রেম-ভালবাসা' ... এমনকি ঈশ্বরের 'চরণচিহ্ন' হলেও হতে পারে! এরকম কথা আমরাও চেষ্টা করলে ভাবতেও পারি। সেক্ষেত্রে আমাদের সেই **পুষ্**-পালনকারী **পুষ্প** অতএব **পণ্য** হতে পারে, **অর্ঘ** (১ম খণ্ড, ৪৪) হতে পারে, 'উৎসর্গ-সঙ্গীত'ও হতে পারে।

এরকম যে হয়ই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা বিশদভাবে দেখবার যোগ্যতা ধরতেন এবং সেভাবে দেখেই সেরকম নামকরণও তাঁরা করে গিয়েছেন। আমরা সব ক্ষেত্রে সেরকম দেখতে না পেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখতে পাই, অন্তত 'শ্রম-মেধা'র ক্ষেত্রে তো প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। আমাদের উৎপাদিত **পণ্য**সমূহ, যেগুলির প্রত্যেকটির ভিতরে আমরা 'শ্রম-মেধা' ঢুকিয়ে রাখি, সেগুলিও যে **পুষ্প**, সেকথা আমাদের পূর্বসূরিরা সুস্পষ্ট করে বলে গেছেন। তাঁরা সেই **পুষ্প**সমূহের রাজা বলতেন **পারিজাত পুষ্প**কে, উদ্ভিদজগতে যার দেখাই মেলে না, যা কিনা 'পারে যাওয়ার জন্য জাত' হয়; একালের ভাষায় যাকে বলা হয় export-quality material। তাঁরা জানতেন, উদ্ভিদজগতের **পুষ্পহীন-বৃক্ষে**র (**বনস্পতি**সমূহের) সমান্তরালে মানবসমাজেও এককালে যে সমস্ত সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেই সমস্ত 'আদিম সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠন'-এর **পণ্য** (**পুষ্প**) উৎপাদিত হত না, কিন্তু 'উৎপন্ন' (**ফল**) উৎপাদিত হত। ... দ্র. **উত্তানপাদ, কোণ, গু, দাম, পণ্য, মাল** ৬. ইংরেজি push।

পুষ্পক : ১. ✓পুষ্প্ + ক (কন্) - স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. ***পুষ্প*** *করে যে।* ৩. পুষ্প, নেত্ররোগভেদ, কুবেরবিমান, রত্নকঙ্কণ, রসাঞ্জন, রীতিপুষ্প, মৃত্তিকার অগ্নিপাত্র। (ব.শ.)। চতুর্লোক কপাল কুবেরের আকাশচারী সর্বগতি রথ। ব্রহ্মা কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই অপূর্ব পুষ্পকরথ দান করেন। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে এই রথ হরণ করে নিয়ে আসেন। বহুদিন এই রথ তাঁর অধিকারে ছিল। রাম রাবণকে নিহত করলে এই রথ কুবেরের করায়ত্ত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যে সত্তা **পুষ্প** করে, তাকেই **পুষ্পক** বলে; কিন্তু কে **পুষ্প** করে? অর্থাৎ, একালে কারা **পুষ্প** বা **পণ্য** উৎপাদন করে, বাজারে পাঠায়, মোটকথা 'কমার্শিয়াল ক্রপ্' ... ইত্যাদি উৎপন্ন করে, সে প্রশ্ন নিয়ে এগোলেই আমরা সমাজলোকে **পুষ্পক**কে চিনে ফেলতে পারি। দেখা যায়, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানা প্রকারের লক্ষ লক্ষ সত্তা সক্রিয় থাকলেও, তাদের মূল চরিত্র হল বিনিয়োগ-পুঁজি বা finance capital। একালে এই পুঁজির প্রধান উৎস হল ব্যাঙ্ক, সেকালে তাকেই বলা হত **কুবের**। এই 'বিনিয়োগ-পুঁজি' **কুবেরের** কাছ থেকে নিয়ে উৎপাদন কর্মযজ্ঞে বিনিয়োগ

করা হয়, **পণ্য** উৎপাদিত হয়, তাসব বিক্রয় করা হয়, এবং **কুবেরের** টাকা ফেরত দেওয়া হয়। বিনিয়োগ-পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে **পুষ্প** বা **পণ্য** উৎপাদন করে, বেচে, পুনরায় তা **কুবেরের** ঘরে পৌঁছে দেওয়ার এই যে আ**বর্ত্তন**, এই 'আ**বর্ত্তন** থাকে যাহাতে' তাকে বলে **রথ**। আ**বর্ত্তন**কারী এই বিনিয়োগ-পুঁজি **পুষ্প** বা **পণ্য** করতে সাহায্য করে বলেই, একে বলা হয় **পুষ্পক-রথ**। ... দ্র. **রথ**।

পুষ্পদন্ত : ২. ***পুষ্প*** *হরণই* ***দন্ত*** *(দমন তারিত হয় যাহার দ্বারা) যাহার। /* পুষ্পতুল্য শুভ্র দন্ত যাহার। (ব.শ.)। **৩.** বায়ুকোণস্থ দিগগজ, জিনভেদ, বিদ্যাধরবিশেষ (ইনি প্রত্যহ প্রত্যূষে কাশীধামে আসিয়া রাজোদ্যানে পুষ্প হরণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেন। 'কোনো স্বর্গীয় ব্যক্তিই পুষ্প হরণ করে', জানিয়া রাজা উদ্যানে শিবনির্ম্মাল্য বিল্বপত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখেন। পুষ্পচয়নকালে অন্ধকারে নির্ম্মাল্য চরণপৃষ্ট হওয়ায় ইঁহার আকাশগমন নষ্ট হয়। তখন অপরাধভঞ্জনার্থ তিনি শিবমহিমার স্তব করেন। হরিহর-ভেদে পাছে অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় ইনি এই স্তবে উভয়েরই স্তব করেন। প্রথম পদ 'মহিম্ন' বলিয়া, ইহা 'মহিম্ন-স্তবঃ' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। (ক) একজন গন্ধর্ব ও শিবের বিশিষ্ট চরবিশেষ। একবার শিবের সহিত পার্বতীর গোপনীয় কথোপকথন নিভৃতে শ্রবণকরতঃ তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করার জন্য ইনি মহাদেবের ক্রোধভাজন হন। এই অপরাধে তাঁকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং তিনি বররুচি নামে প্রসিদ্ধ হন। দুর্গার সখি জয়া এঁর স্ত্রী। (খ) অষ্ট দিগগজের অন্যতম। উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি বায়ু এই পুষ্পদন্তের উপর অবস্থান করে ঐ দিক রক্ষা করেন। (গ) পুষ্পদন্ত নামে একজন গন্ধর্ব ছিল। এর পুত্রের নাম মাল্যবান। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. পুষ্পদন্ত** সত্তাটির বিষয়ে যে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যা আমরা উপরে **৩.**-এ উল্লেখ করেছি, সেগুলিকে শনাক্ত করা আমাদের বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রায় অসম্ভব। আমরা বড়জোর তার সামাজিক রূপটির বিষয়ে দু-চার কথা বলতে পারি। ...

বৈদিক ব্যবস্থার বা আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে **ক্রমান্বয়ে** 'পণ্যবাহী-সমাজ'-এর দিকে এগোনোর জন্য ভারতসমাজকে **শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র** স্তর পেরোতে হয়েছিল। 'শিবকাশী'র নির্মাণ ছিল **তার** মধ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। এ হল **বারাণসী**, যার অবস্থান **রামায়ণ** অনুসারে 'পৃথিবীর বাইরে'। অর্থাৎ কিনা, বৈদিকনীতি মান্যকারী সরকারের (**পৃথুর**) এলাকার বাইরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল '**শিবকাশী**'র। এখানে স্বীকৃতভাবেই **পণ্যের** বিক্রিবাটা চলত। যেহেতু **নারায়ণ** সরাসরি **পণ্য**বাহিতার সঙ্গে জড়িত, তাই এক্ষেত্রে **শিব** ও **নারায়ণ** অর্থাৎ **হরি** ও **হর** দুজনেই ব্যবস্থাটির পক্ষে। এই অধ্যায়ে কেউ যদি পূর্বতন বৈদিকনীতির সাধক হয়, তার পক্ষে **নারায়ণ-বিরোধী** হওয়াই স্বাভাবিক। আবার কেউ যদি **শিব**সাধক হন, তাঁর **পক্ষে** এই **পণ্য**সহায়তা অস্বাভাবিক। অথচ এই সেই অধ্যায় যেখানে **হরিহর** একত্রে মিলিত।

পুষ্পিতা (পুষ্পিণী, পুষ্পকাল, পুষ্পসময়, পুষ্পবতী, পুষ্পাগম, পুষ্পী) : **১. পুষ্পিতা** = ✓পুষ্প্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***পুষ্পিতা*** = ***পুষ্প*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে, তাহার আধার।* **৩. পুষ্পিতা** = রজঃস্বলা। **পুষ্পিণী** = পুষ্পবতী, রজঃস্বলা। **পুষ্পকাল, পুষ্পসময়** = বসন্তকাল, স্ত্রীরজঃকাল। **পুষ্পবতী** = রজঃস্বলা। **পুষ্পাগম** = পুষ্প-আবির্ভাবকাল, বসন্ত। (**পুষ্পহীনা** = ডুমুর, রজোহীনা নারী। দ্র. **পুষ্প**।)। (ব.শ.)। **৪. পুষ্প**-যুক্ত শব্দের সংখ্যা অনেক এবং তাদের অধিকাংশই অপ্রচলিত। উপরোক্ত শব্দগুলি অতি প্রয়োজনীয়, বাংলাভাষী মেয়েদের মুখে, গ্রামবাংলায় এগুলি আজও কমবেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু অ্যাকাডেমি এগুলির ব্যবহার একেবারেই ভুলে গেছে। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, বিষয়টি বোঝাতে একালের শহুরে বাংলাভাষীরা অতি সংকীর্ণ দুটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ফলে নিজেদের বাংলার **পুষ্পিতা** ... ইত্যাদি শব্দগুলি শহুরে বাংলায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। **৫.** আপনার যা কিছু জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ, ঐতিহ্য, সামাজিক সম্মান, এককথায় আপনার 'ইজ্জৎ' — সেকালের বাংলাভাষায় তাকে বলা হত **নাক**। (১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। লোকে তাই নিয়ে (সদর্থে) **নাক** করে, নিজেকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সবাই জানেন, যে মানুষ নিজেকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, কেউই তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে আমরা সেই নাকের বদলে নরুণ পেয়েছি, বিশ্বাস করতে শিখেছি, ইংরেজিতেই সব আছে। স্বাধীনতার আগে আমাদের এই রোগে ধরেনি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, নিজেদের ইতিহাস ও ভাষাটাকে তখনও আমরা আমাদের ইজ্জৎ ও সম্পদ বলে জানতাম, তার উপর নির্ভর করে চলতাম। ইংরেজি আমরা শিখতাম না তা নয়, এখনকার চেয়ে অনেক ভালভাবে শিখতাম। কিন্তু মনের পা থাকত নিজেদের বাংলাভাষার মাটিতে। ...

সিভিল সার্ভিসের অফিসার গান্ধীবাদী অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর গ্রন্থে নায়িকার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন — মেয়েদের মাসে চারদিন 'রেইনি-সিজন, বর্ষাকাল'। গ্রামবাংলার মেয়েদের সেরকম 'রেইনি সিজন' এলেও তাঁরা বোঝেন তাঁদের **পুষ্পকাল** বা **পুষ্পসময়** এসেছে, **পুষ্পাগম** হয়েছে; এরকম হলে তাঁরা **পুষ্পিতা** হন, **পুষ্পিণী** হন, **পুষ্পবতী** হন, **পুষ্পী** হন এবং সেসব কথা তাঁরা পরস্পরকে এই **পুষ্প**-যুক্ত শব্দগুলির সাহায্যে বাংলা ভাষাতেই বলেন — 'দিদিগো, কাল থেকে মেয়েটা আমার **পুষ্পিতা** হল, এবার তো বিয়ের কথা ভাবতে হবে।'

না, তাঁরা 'রেইনি-সিজন, বর্ষাকাল' — এসব বলেন না। আর, আমাদের শহুরে বাঙালির শিক্ষিত মেয়েদের সেসব হলে তাঁদের লজ্জার শেষ থাকে না, তাঁরা বলেন, তাঁদের 'শরীর খারাপ হয়েছে', কিংবা বড়জোর বলেন, 'মাসিক' হয়েছে। পরিস্থিতি আরও পীড়াপীড়ি করলে তাঁরা বাধ্য হয়ে বলেন, 'পিরিয়ড' (period) বা 'মেন্স্' (menstruation) হয়েছে। বেচারিরা নিজেদের কথা নিজেদের ভাষায় বলতেও পর্যন্ত পারেন না! একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষী পণ্ডিতদের দুরবস্থার এটি একটি বাস্তব উদাহরণ। ... **৬.** এসবের মানে কিন্তু এই নয় যে, পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে মেয়েদের **পুষ্পবতী** হওয়ার কোনো ধারণাই ছিল না। কিছুদিন আগেও তাঁরা 'কুমারী মেয়েকে ধর্ষণ করা' বোঝাতে বলতেন deflower-করা,

যার মানে ছিল 'to deprive of flowers', 'to deprive of virginity', অর্থাৎ 'কৌমার্যহরণ করা'।

পুষ্পকাসীস : ৩. হিরাকশ (sulphate of iron)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বস্তুটিকে বোঝানর জন্য **পুষ্পকাসীস** শব্দটি আমাদের ছিল, আরব দেশ থেকে মোগল-পাঠানেরা আসার পর সেই শব্দটি ফেলে দিয়ে আমরা ফারসির 'হিরাকশ' গ্রহণ করেছিলাম। তারপর ইংরেজ আসার পর সেটিও ফেলে দিয়ে এখন আমরা বস্তুটিকে 'আয়রন সালফেট' বলে থাকি। এরপর যদি জাপান বা চীন চলে আসে, তখন আমরা আবার কী যে বলব, কে জানে!

পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু, পুষ্পধ্বজ, পুষ্পচাপ, পুষ্পধনু, পুষ্পবাণ, পুষ্পশর, পুষ্পশরাসন, পুষ্পসায়ক, পুষ্পায়ুধ, পুষ্পেষু, পুষ্পধন্বা, পুষ্পপত্রী : ২. *যথাক্রমে — **পুষ্পই কেতন** যাহার, **কেতু** যাহার, **ধ্বজা** যাহার, **চাপ** যাহার, **ধনু** যাহার, **চাপ** যাহার, **শর** যাহার, **শরাসন** যাহার, **সায়ক** যাহার, **আয়ুধ** যাহার, **ইষু** যাহার, কিংবা **পুষ্পকেই ধনু**রূপে বহন বা **পত্রী**রূপে ধারণ করেন যিনি।* ৩. কামদেব। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এতগুলি শব্দ আমরা অকাতরে ফেলে দিয়েছি। কেন ফেলে দিয়েছি? ফেলে দিয়েছি, কারণ তাদের মানে বোঝার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তাই বলে, যে ক্রিয়া বা ক্রিয়াকারীদের বোঝাতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শব্দগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ক্রিয়া বা ক্রিয়াকারীরা কেউই আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি; বরং তাদের রমরমা আরও বহু বহু গুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে। আমাদের জীবনের সর্বস্তরে তারা এখন প্রবল প্রতাপে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই কারণে, সেগুলিকে আমাদের উল্লেখ করার, বলার, তাদের নিয়ে চর্চা করার অত্যন্ত প্রয়োজন পড়ে। আর সে কাজ আমাদের চালাতে মাত্র দু-একটি প্রতীকী বাংলা শব্দ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের সাহায্যে।

কী আর করা যাবে! অর্বাচীনেরা যদি আপনার নিজের ঘরের অস্ত্রভাণ্ডারের সব অস্ত্র অবহেলায় ফেলে দেয়, বিপদের সময় হাতের কাছে যা পাবেন, তা নিয়েই আপনাকে ডাকাতের সামনে দাঁড়াতে হবে। বর্তমানে আমাদের সেই 'সবেধন নীলমণি' অস্ত্রটির নাম 'বিজ্ঞাপন' বা advertisement। **কামদেব**কে নিয়ে উপরোক্ত চোদ্দোটি শব্দাস্ত্র ফেলে দিয়ে এখন আমরা এই একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি শব্দ নিয়েই কাজ চালাই।

এই 'বিজ্ঞাপন' আমাদের জীবনের কতখানি অংশ জুড়ে আছে, তা বোঝার জন্য যে কোনোদিন শুধুমাত্র 'আনন্দবাজার' বা 'টাইম্‌স্ অফ্ ইন্ডিয়া' পত্রিকাটির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে। পত্রিকা তো সমাজজীবনের ছবি। পত্রিকাটির সব পৃষ্ঠা মিলিয়ে যদি ১০০ বর্গফুট হয়, তবে দেখবেন, তার প্রায় ৬০/৭০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ কিনা, 'বিজ্ঞাপন' আমাদের জীবনের অর্ধেকের বেশি স্থান দখল করে বিরাজ করছে।

কিন্তু সেই 'বিজ্ঞাপন' নামের ব্যাপারটি করে-টা কী? না, একালের 'অ্যাডভার্টাইজমেন্ট-গুরু'রা সে বিষয়ে খণ্ড খণ্ড রূপে দু-চার কথা বললেও তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা করেননি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু এই বিজ্ঞাপনকে তার সামগ্রিক রূপেই চিহ্নিত করেছিলেন — লোকে যেমন একটা মুখ দেখে সেই মুখের অধিকারী গোটা মানুষটাকে চিহ্নিত করতে পারে, সেইরকম। সে যতরকম কাণ্ড করে তার ততরকম নাম দিয়েছিলেন তাঁরা। ১ম খণ্ডে **অনঙ্গ, কন্দর্প, কামদেব** প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যায় সেই সমস্ত (**মদন, অভিরূপ, মন্মথ, মনোজ** ... ইত্যাদি প্রায় ৩০ টি) শব্দের কথা আমরা জানিয়েছি। এখন জানা দরকার, এগুলির মধ্যে **কামদেব**-এর কোন্ রূপটিকে একালের ভাষায় 'বিজ্ঞাপন' বলা হয়?

একালে আমরা যাকে 'বিজ্ঞাপন' বলি, সেকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকে নাম দিয়েছিলেন 'পুষ্পরচিত পঞ্চশর' বা **পুষ্পশর** বা **পুষ্পশরাসন**। **কামদেব** এই **পুষ্পশর** চালান বলে তাঁর এক নাম **পঞ্চবাণ**ও বটে। এই **শর** পাঁচ প্রকারে জনসাধারণকে ঘায়েল করে বলেই তাঁরা তার নাম দিয়েছিলেন **পঞ্চবাণ** বা **পঞ্চশর**। এগুলি হল —

'সম্মোহন' = মোহগ্রস্ত করা, মোহিত করা, মুগ্ধ করা, আত্মহারা করে দেওয়া ...

'উন্মাদন' = উন্মাদনা সৃষ্টি করা, উন্মাদিত করা, উন্মত্ত করা, হুজুগে পাগলা করে দেওয়া ...

'শোষণ' = শুষে নেওয়া, রসাকর্ষণ করা, নিঃস্নেহীকরণ করা, তেল বের করে নেওয়া, তেজ বের করে নেওয়া ...

'তাপন' = তপ্ত করা, গরম করা, গরম খাওয়ান, গাছে তোলা, পাম্প খাওয়ান ...

'স্তম্ভন' = স্তম্ভিত করা, থমকে দেওয়া, ঘাবড়ে দিয়ে পকেট কেটে নেওয়া, স্তম্ভিত করে বা থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পকেট মেরে নেওয়া ...

একালের 'বিজ্ঞাপন'ও এই পাঁচটি কাজ করে বা করতে সাহায্য করে থাকে। সেকালের **কামদেব** তাঁর শতাধিক ক্রিয়ার মধ্যে এই পাঁচটি ক্রিয়াও করতেন বলেই তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল **পুষ্পশর**। এছাড়াও **কামদেব** যে সকল ক্রিয়া করতেন সেগুলির জন্য তাঁর আরও অনেক নাম ছিল, সেগুলির উল্লেখ **কন্দর্প, কামদেব** প্রভৃতি শব্দে রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা **কামদেব**কে তাঁর সকল রূপে সকল লোকে বুঝতেন এবং চিহ্নিত করবার যোগ্যতা ধরতেন। ধারণার সেই বিশাল এলাকা আমরা হারিয়েছি। সেই কারণে শুধুমাত্র 'বিজ্ঞাপন' শব্দটুকু নিয়ে আমাদের কাজ চালাতে হচ্ছে। উপরোক্ত শব্দগুলির 'আপডেট' করে নিতে পারলে আমরা **কামদেব**কে তার সার্বিক রূপে বুঝতে পারব এবং উপরোক্ত শব্দগুলির যথার্থ ব্যবহারও হতে পারবে; ডাকাতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অনেক অস্ত্র এসে যাবে আমাদের হাতে। দ্র. **বাণ**।

পুষ্পজ, পুষ্পদ্রব, পুষ্পনির্য্যাস, পুষ্পভব, পুষ্পরস, পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পাসব : ৩. এই আটটি শব্দের অর্থই — পুষ্পমধু ও মকরন্দ। ৪. অপ্রচলিত। ৫. শুধুমাত্র honey বা মধুকে বোঝানোর জন্য আমাদের শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা যে উপরোক্ত আট আটটি শব্দের সৃষ্টি করেননি, আশা করা যায়, এখন সেকথা নতুন করে বলার দরকার হবে না। কিন্তু কাদের বোঝানোর জন্য শব্দগুলি

তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, সেকথা প্রাচীনকালে হয়তো বোঝা যেত, আজকাল সহজে বোঝা যায় না।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা অশোক কিংবা হর্ষবর্ধনের কালে (২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ, ৭০০ খ্রিস্টাব্দ) যে সমস্যায় পড়েছিলেন, জার্মান পণ্ডিত কার্ল মার্কস সেই একই সমস্যায় পড়েছিলেন ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। ওরা তো পশ্চাতে বিকশিত দেশ, পাশ্চাত্য; ১০০০ বছর পরে একই সমস্যায় পড়ার কারণ ছিল সেটাই। সেকালের ভারতীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের (tacit-knowledge-এর বা) 'অব্যক্ত-জ্ঞান'-এর সাহায্যে যখন প্রশ্ন তুলছেন — নানা জাতের সমাজবৃক্ষে ফুটে ওঠা এই **পুষ্প**গুলিকে এবং তাদের নিয়ে সমাজের অজস্র প্রকারের আচরণসমূহকে বিন্যস্ত করে রাখা যাবে কোন নিয়মে? কোন কোন **পুষ্প** দিনে ফোটে (অতএব দেবতাদের) এবং কোন কোন **পুষ্প** রাতে ফোটে (অতএব অসুরদের)? ... সর্বোপরি, একটি **পুষ্পের** ভিতর কী জাতের 'মধু' আছে এবং কী পরিমাণেই বা আছে, তা বোঝাই বা যাবে কীভাবে? তখন মার্কস সাহেব তাঁর (explicit-knowledge-এর বা) 'ব্যক্ত-জ্ঞান'-এর সাহায্যে প্রশ্ন তুলছেন — এই **পণ্য**সমূহের ভিতরের গোপন রহস্যটি কী (the fetishism of commodities and the secret thereof)? একটি **পণ্যের** (commodity-র) ভিতর কী গুণের এবং কী পরিমাণের 'মূল্য' (value) রয়েছে, তা বোঝা যাবে কীভাবে? অর্থাৎ কিনা প্রায় একই প্রশ্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই যুগের দুই শ্রেণীর পণ্ডিতদের ভাবিয়ে তুলেছিল। মার্কসের মতে, এমন যন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয়নি, যার ভিতরে কোনো একটি **পণ্য**কে ঢুকিয়ে দিলে যন্ত্রটি সেই **পণ্যে** ঢুকে থাকা শ্রমকে গলিয়ে বের করে নিয়ে বলে দেবে যে, এই পণ্যে মোট 'এত' শ্রম ঢুকে থাকে, অতএব এর দাম হবে 'এত' টাকা। (**পণ্যের** ভিতরে মেধা ঢুকে থাকলেও মার্কস সাহেব তাকে হিসেবের মধ্যে ধরার দরকার মনে করেননি।) তাঁর ব্যক্ত-জ্ঞানের প্রকাশ শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে অজস্র আধা-ব্যক্ত আধা-অব্যক্ত জ্ঞানে — general form of value, money form of value, elementary form of value, accidental form of value, relative form of value, equivalent form of value, quantitative determination of value, expanded form of value, exchange value ... ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ৭০০ খ্রিস্টাব্দের প্রাচ্যের পণ্ডিতেরা যেখানে **পুষ্প** ও **মধু** নিয়ে জেরবার, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা তখন **commodity** আর **value** নিয়ে জেরবার। ...

স্বভাবতই আমাদের ভাষায় **পুষ্প** নিয়ে, **মধু** নিয়ে অনেক কথাই থাকবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিশ্বের প্রথম **পণ্য**রপ্তানিকারী দেশ ও **পারিজাত-পুষ্পের** দেশ হিসেবে আমাদের **পুষ্প** ও **মধু** অর্থাৎ **পণ্য** ও **মূল্য** (commodity & value) নিয়ে প্রচুর কথা ছিল, শব্দ ছিল। **পুষ্পে পুষ্পে ফুলে ফুলে, মধুতে, মাধবে ও মাধবীতে** আমাদের সমাজ পরিকীর্ণ ছিল। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির কলাকৌশল হারিয়ে আমাদের সব থাকা সত্ত্বেও আজ আমরা নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছি, আমরা **পুষ্প** ও **মধু**কে এবং তৎসংশ্লিষ্ট শব্দসমূহকে ফেলে দিয়ে commodity ও value-কে বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছি। ব্যর্থ চেষ্টা এইজন্য যে, তবু **পুষ্প** ও **মধু** শব্দ দুটি যাদের বোঝাত বা বোঝায়, তারা কী করে, সেকথা শব্দদুটির ভিতরেই বলা ছিল, কিন্তু commodity ও value শব্দদুটির ভিতরে তো সেসব কিছু বলা নেই, তারা যে প্রতীকী শব্দ, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে তাদের বোঝার তো কোনো উপায়ই নেই। ...

যাই হোক, আমরা এখানে আরও কিছু **পুষ্প**-যুক্ত শব্দের ব.শ. প্রদত্ত অর্থ জেনে নিয়ে সেগুলিকে সংক্ষেপে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। উপরোক্ত 'মহৎ' ও 'সূক্ষ্ম' স্তরে তাদের বোঝার চেষ্টা না করে আমরা মুখ্যত সামাজিক স্তরে বা **পণ্যের** স্তরে তাদের বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। একথা আমরা সর্বদাই মনে রাখব যে, শব্দগুলি flower-এর দুনিয়াতে অর্থাৎ পার্থিব উদ্ভিদলোকে যেমন সত্য, তেমনি অন্য কোনো কোনো লোকেও সত্য; সমাজলোকে তো বটেই। প্রয়োজনমতো দু-একটি মন্তব্যও রাখব আমরা।

পুষ্পক্ষেপণী : ৩. ফুলের তোড়া। (ব.শ.)। ৫. পণ্যের গুচ্ছ?

পুষ্পঝারা : ৩. ফুলের ঝারা। (ব.শ.)। ৫. ...?

পুষ্পদাম : ৩. পুষ্পমালা, ছন্দোভেদ। (ব.শ.)। ৫. মুখের কথাও **পুষ্প**। ছন্দে তার প্রকাশ ঘটলে, তারও এরকম নাম হতে পারে।

পুষ্পন্ধয় : ৩. পুষ্পরসপায়ী। (ব.শ.)। ৫. পুষ্পের রস (মধু) বের করে পান করে যে। The person who extracts use value of commodity।

পুষ্পপাত্র : ৩. পুষ্পের আধার। (ব.শ.)। ৫. পণ্যাধার?

পুষ্পপুট : ৩. পুষ্পের বহিঃকোষ, বাহ্যপুষ্পগর্ভ। (ব.শ.)। ৫. packaging of commodity।

পুষ্পপুর : ৩. কুসুমপুর, পাটলিপুত্র। (ব.শ.)। ৫. অর্থাৎ পাটনা। ভারতের পাটনা শহরটি ইতিহাসের বিশেষ সময়ে পণ্যচলাচলের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, আজ তা যতই পিছিয়ে-পড়া রাজ্যের রাজধানী হোক।

পুষ্পপ্রচয় : ৩. চৌর্য্যপূর্ব্বক পুষ্পচয়ন। (ব.শ.)। ৫. প্রকৃষ্টরূপে চয়ন করাকে বলে 'প্রচয়'। আমরা জানি, সরকারি আইন বাঁচিয়ে দক্ষতার সঙ্গে **পণ্য** সংগ্রহ করাকে **পুষ্পপ্রচয়** বলা চলে। আমাদের দেশ কেবল সরকারি আইননির্ভর নয়, সামাজিক রীতিনীতিও এখনও কমবেশি সক্রিয় রয়েছে। সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। ফলে এমন কিছু কিছু **পুষ্পপ্রচয়** দেখা যায়, যা সরকারি আইনে সঙ্গত বটে, কিন্তু সামাজিক-নীতিসম্মত নয়। ব.শ.-এর মতে সেরকম **পুষ্পপ্রচয়** চৌর্যই বটে।

পুষ্পপ্রস্তার : ৩. পুষ্পাস্তরণ শয্যা। (ব.শ.)। ৫. ফুলশয্যা?

পুষ্প-ফেলাফেলি : ৩. বিবাহে বর-কন্যার পরস্পরের প্রতি পুষ্পবর্ষণরূপ আচার। (ব.শ.)।

পুষ্পবড়ু : ৩. পুষ্পচয়নকারী ব্রাহ্মণ। (ব.শ.)। ৫. ইনি কি শুধুই flower-চয়ন করেন? ভেবে দেখা দরকার।

পুষ্পবর্ষ, পুষ্পবর্ষণ, পুষ্পবৃষ্টি, পুষ্পাসার : ৩. কুসুমাসার, কুসুমবর্ষ, পুষ্পসম্পাত। (ব.শ.)। ৫. এ কি ফুল বা flower-বৃষ্টি, নাকি **পণ্য**-বৃষ্টি, নাকি আশীর্বাদ-বৃষ্টি? কী আছে এর ভিতরে যে, চার চারটি শব্দ লেগেছে তাকে বোঝাতে?

পুষ্পবাটিকা, পুষ্পবাড়ী : ৩. পুষ্পোদ্যান। (ব.শ.)। ৫. **পণ্য**বাটিকা কিংবা **পণ্যের** বাড়ি নয় তো? কুটিরশিল্পের কুটির?

পুষ্পবান : ৩. পুষ্পযুক্ত, পুষ্পিত। (ব.শ.)। **পণ্য** আছে যার।

পুষ্পবৃক্ষ : ৩. পুষ্পপ্রধান বৃক্ষ, ফুলগাছ। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **পুষ্পহীন-বৃক্ষ**। অর্থাৎ, যে সামাজিক সংগঠন বা সংস্থা পণ্য উৎপাদন করে তাকে **পুষ্পবৃক্ষ** বলে।

পুষ্পবেণী, পুষ্পমালা : ৩. পুষ্পের বেণীতুল্য, পুষ্পদাম। (ব.শ.)। ৫. ১ম খণ্ডে **দাম**, এবং এই খণ্ডে **বেণী** ও **মালা** শব্দের অর্থ বলে দেবে এগুলি কীরূপ বস্তু।

পুষ্পভঙ্গ : ৩. পুষ্পসম্মর্দ্দ। (ব.শ.)। ৫. কোন **পুষ্প**কে ভাঙা?

পুষ্পমাস : ৩. চৈত্র, বসন্তকাল। (ব.শ.)। ৫. 'বস-এর অন্ত বা শেষ যাহাতে', 'যাহাতে **কামদেব**-এর বাস', সেই **বসন্ত**কাল কি শুধু 'মাস' বা month মাত্র, নাকি অন্য কিছুও বোঝায়?

পুষ্পরজঃ, পুষ্পরেণু : ৩. পরাগ। (ব.শ.)। ৫. 'যার চেয়ে উঁচু মানের গমন আর নেই', তেমন বস্তুকেই তো **পরাগ** বলে?

পুষ্পরথ : ৩. লীলাগমন-প্রয়োজন রথ, বিহারার্থ রথ, পুষ্পক। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **পুষ্পক**।

পুষ্পরাগ, পুষ্পরাজ : ৩. মণিবিশেষ, পোখরাজ (topaz), দিব্যপুষ্প, পারিজাত। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **পারিজাত**।

পুষ্পলাব, পুষ্পলাবী : ৩. পুষ্পচয়নকারী, মালাকার, মালাকার-স্ত্রী, পুষ্পাবচায়িকা। (ব.শ.)। ৫. পাইকার কিংবা manufacturer কি মালাকার নয়, **পুষ্পলাব** কিংবা **পুষ্পলাবী** নয়?

পুষ্পলিট : ৩. পুষ্পমধুলেহক, ভ্রমর। (ব.শ.)। ৫. আচ্ছা, দোকানে দোকানে মাল দেখে দেখে ঘুরে বেড়ায় যারা, তাদের কি **পুষ্পলিট** বলা যায় না?

পুষ্পহাস : ৩. পুষ্পবিকাস, বিষ্ণু। (ব.শ.)। ৫. ফুলের হাসিকে না হয় **পুষ্পহাস** বলা গেল, কিন্তু বিষ্ণুকে কেন **পুষ্পহাস** বলেছিলেন আমাদের পূর্বসূরিরা? না, এখনও তার কূলকিনারা করা যায়নি।

পুষ্পাকর : ৩. পুষ্পযোনি, চৈত্রমাস, বসন্ত। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **যোনি**। **পুষ্পমাস**।

পুষ্পাজীব, পুষ্পাজীবী : ৩. পুষ্পব্যবসায়বৃত্তি, মালাকার, পুষ্পব্যবসায়জীবী। (ব.শ.)। ৫. দোকানদারের ভাল নাম হতে পারত **পুষ্পাজীব** ও **পুষ্পাজীবী**। সেকালের রূপকথাগুলিতে কেন যে এত মালী, মালা, মালিনী ... প্রভৃতি সত্তার দেখা পাওয়া যায়, তার একটা কারণ এখানে বারবার উঁকিঝুঁকি মারে।

পুষ্পাঞ্জন : ৩. নেত্ররোগবিশেষের অঞ্জন, রীতিপুষ্প। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **রীতি**।

পুষ্পারণ্য : ৩. পুষ্পবন। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **অরণ্য**। তাহলেই জানা যাবে, এই ফুলের বন আর আধুনিক 'বিগবাজার' একই বস্তু।

পুষ্পিকা : ৩. দন্তমল, লিঙ্গমল, গ্রন্থাধ্যায়সমাপ্তিতে তৎপ্রতিপাদ্য-বিষয়ক গ্রন্থাংশ। (ব.শ.)। ৫. এখানে বোঝা যায়, মানুষের শাব্দিক উৎপাদনকে কখনই **পুষ্প** শব্দের এলাকার বাইরে রাখা হয়নি।

পুষ্পোৎকটা : ৩. (ক) কূর্মপুরাণ মতে, বিশ্রবার অন্যতম স্ত্রী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও খর নামে চার পুত্র ও কুম্ভীনসী নামে এক কন্যার জন্ম হয়। (খ) রামায়ণ অনুসারে, রাক্ষসরাজ **সুমালী**র ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎকটা প্রভৃতি চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. 'উৎকট পুষ্পের ধারিকা' যে **পুষ্পোৎকটা**, তাঁকে আমরা পাচ্ছি **সুমালী, মাল্যবান, কেতুমতী, কেতুমাল** ... ইত্যাদি 'মাল' বা **পণ্য** বা **পুষ্প**-যুক্ত অনেকগুলি শব্দে। আর 'কুম্ভীনসী' তো টাকার-কুমীরেরও আগে! সমাজের কোন সত্তাকে তাঁরা প্রকাশ করতেন, তাঁদের নামই সেসব কথা কমবেশি বলে দিতে চায়। এখন, আমরা যদি সেসব বুঝতে না চাই, ইংরেজের চোখে রামায়ণাদি পড়ি, আমাদের 'সুতো-কাটা-ঘুড়ি হওয়া' রুখবে কার সাধ্যি! পাঠক-পাঠিকা, নিজেরাই বিচার করুন।

পূষা (পূষাদন্তহর, পূষণ, পূষণা) : ১. ✓পূষ্ + অন্ (কনিন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পূষা*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর আধারের (শক্তিদাতার) দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত শক্তি বৃদ্ধির আধার যে।* ***পূষাদন্তহর*** = ***পূষা****র দন্তকে হরণ করে যে।* ***পূষণ*** = ***পূষ্*** *(পোষা) অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পূষণা*** = ***পূষণ****-এর আধার যে।* ৩. **পূষা** = আদিত্যভেদ, সূর্য্য। **পূষাদন্তহর** = পূষার দন্তের উৎপাটয়িতা, বীরভদ্র। **পূষণ** = আদিত্যবিশেষ, সূর্য্য। (ব.শ.)। **পূষণা** = (ক) বৈদিক ঋষিদের অন্যতম দেবতা। সূর্যের অপর নাম পূষা। ঋষিরা এঁর স্তব করবার জন্য বহু ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। পূষার বাহন ছাগল। বেদে পূষা কোথাও পশুদের পোষক, কোথাও মানুষের পোষক, কোথাও আবার সূর্যদেবরূপে পৃথিবী পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সাহায্যেই দিন ও রাতের প্রকাশ। অনেক স্থলে ইন্দ্র ও ভগের সঙ্গে ইনি স্তুত হয়েছেন। নিরুক্ত ও পরবর্তী গ্রন্থে ইনি সূর্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন। (খ) কূর্মপুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের সময় মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র পূষার দন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। (গ) মহাভারতেও কথিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের সময় মহাদেব ভগের চক্ষু উৎপাটন করেন এবং পূষাকে পদাঘাত করে তাঁর দন্ত উৎপাটন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালের ভাষায় বললে বলতে হয়, সমাজের সদস্যসমূহকে **পূষ্** বা **পূষণ** বা **পোষণ** করে যে, সেই হল **পূষা** বা **পূষণা**। এ হল যৌথসমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্রীয় সত্তা। ব্যাসদেবের বেদজ্ঞান বমি করে ফেলে দিয়ে এঁর কাছ থেকে সরাসরি বেদ গ্রহণ করেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। দ্র. **ত্রিশিরা**। তৎকালীন মানবসমাজের স্বাভাবিক নিয়মে এই সত্তা সামাজিক উৎপন্ন গ্রহণ করে বিলিবণ্টনের জন্য তাঁর কেন্দ্রীয় সম্পদ ভাণ্ডারে রাখতেন। ...

নিষেধ করা সত্ত্বেও **দক্ষ** যখন 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি' অনুসরণ করে সামাজিক কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে উৎপন্নসমূহ কেন্দ্রীভূত করছিল, **পূষা** তখন স্বাভাবিক নিয়মেই সেগুলি তাঁর লোকজন দিয়ে মাপজোক করে গুছিয়ে তুলছিলেন তাঁর কেন্দ্রীয় সম্পদভাণ্ডারে। সেকালের ভাষায় একেই বলা হয়েছে, **পূষা** বা **সূর্য্য** তখন **দক্ষযজ্ঞের** 'যজ্ঞীয় পুরোডাশ' (= product) ভক্ষণ করছিলেন। শিবের অনুচরেরা তাঁর দাঁত ভেঙে দেন। অর্থাৎ, **পূষা**র সংগ্রহকারী মাপজোককারী লোকজনকে মারধোর করেন। ... দ্র. **দক্ষযজ্ঞ, পুরোডাশ**।

পুষ্য (পুষ্যা, পুষ্যাভিষেক, পৌষ, পৌষী) : ১. ✓পুষ্ + য (ক্যপ্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পুষ্য*** = ***পুষ্*** *থাকে যাহাতে।* ***পুষ্যা*** = ***পুষ্য****-এর আধার যে।* ***পুষ্যাভিষেক*** = ***পুষ্য*** *রূপে অভিষেক যাহাতে।* ***পৌষ*** = ***পুষ্য*** *হইতে জাত যে (কাল)।* ***পৌষী*** = ***পৌষ****-এর গতিশীল আধার যে। /* **পৌষী** = পৌষী পৌর্ণমাসী যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. **পুষ্য** = অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অষ্টম নক্ষত্র (ইহা বাণাকৃতি একতারক। ইহাতে জন্মিলে, নর প্রসন্নগাত্র মাতৃপিতৃভক্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সম্মানিত স্বর্ণবাহনাঢ্য হয়। বৃহস্পতি ইহার দেবতা।), পৌষমাস, কলিযুগ, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ। **পুষ্যা** = পুষ্য-স্ত্রী। **পুষ্যাভিষেক** = পুষ্যস্নান, পুষ্যনক্ষত্রযুক্তকালে শাস্ত্রবিধানে রাজার অভিষেকভেদ। **পৌষ** = পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত, পুষ্যসমীপস্থ চন্দ্রযুক্ত। **পৌষী** = পৌষমাস, পুষ্যযুক্তা পৌর্ণমাসী। (ব.শ.)। ৪. বাংলার বারোমাসের একটি নাম রূপে **পৌষ** শব্দটি প্রচলিত। ৫. আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজের **নক্ষত্র**গুলিকে আকাশের সাতাশ **নক্ষত্রে** ভাগ করে দেখেছিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের নাম রাখা হয়েছিল অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ... ইত্যাদি (দ্র. **সাতাশ নক্ষত্র**)। তার মধ্যে **পুষ্যা**র স্থান অষ্টম। আমাদের প্রাচীন অর্থশাস্ত্রী বা **জ্যোতিষশাস্ত্রী**রা কীভাবে সমাজ-আকাশে সক্রিয় সাতাশটি জনগোষ্ঠীকে আকাশের সাতাশটি **নক্ষত্রে**র সঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করেছিলেন, কীভাবেই তাদের সঙ্গে **চন্দ্রে**র বিবাহ হয়েছে বুঝেছিলেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য এখনও বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবে, **পৌষ** মাসটি যে ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষিসভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, তা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু তার নাম, তার সঙ্গে **পুষ্যা নক্ষত্রের** সম্পর্ক সুস্পষ্ট বোঝা যায় না। ...

পোষ (পোষক, পোষকতা, পোষণ, পোষণীয়, পোষা, পোষাক, পোষাণ, পোষিত, পোষ্য, পোষ্যপুত্র, পোষ্যবর্গ) : ১. ✓পুষ্ + (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পোষ*** = ***পুষ্****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***পোষক*** = ***পোষ*** *করে যে।* ***পোষকতা*** = ***পোষক*** *তারিত যাহাতে।* ***পোষণ*** = ***পোষ*** *অন (on) যাহাতে।* ***পোষণীয়*** = ***পোষণ*** *গতিশীলভাবে যায় যাহাতে।* ***পোষা*** = ***পোষ****-এর আধার যে।* ***পোষাক*** = ***পোষা*** *করে যে।* ***পোষাণ*** = ***পোষা*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পোষিত*** = ***পোষ*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***পোষ্য*** = ***পোষ*** *থাকে যাহাতে।* ***পোষ্যপুত্র*** = ***পোষ*** *হেতু পুত্র যে।* ***পোষ্যবর্গ*** = *যে বর্গকে* ***পোষ*** *করিতে হয়।* ৩. **পোষ** = পোষণ, পালন, বৃদ্ধি, উপচয়, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি। **পোষক** = পোষণকর্ত্তা, পালক, আনুকূল্যকারক, সমর্থক। **পোষকতা** = সমর্থন, আনুকূল্য। **পোষণ** = পালন, রক্ষণ, অনুগ্রহ। **পোষণীয়** = পালনীয়। **পোষা** = পালিত, প্রয়োজনানুরূপ সুবিধা হওয়া, বনা। **পোষাক (পোশাক)** = পরিচ্ছদ, জামা কোট ইত্যাদি। **পোষাণ** = পোষা। **পোষিত** = পালিত। **পোষ্য** = পোষণীয়, পালনীয়, অবশ্যপোষণীয় (মাতৃপিতৃ-প্রভৃতি)। **পোষ্যপুত্র** = পোষণাদি হেতু পুত্রতাপন্ন শিশু (কৃত্তিকাগণের কার্ত্তিকেয়), দত্তকপুত্র। **পোষ্যবর্গ** = অবশ্যপোষ্যগণ। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ষ** বর্ণটির ভিতরে [illegible] শক্তিবিচ্ছুরণের কথা রয়েছে, খানিকটা টর্চের আলোর মতো। ফলত, যাকে **পোষণ** করা হয় বা **পোষা** হয়, তার যেদিকে বৃদ্ধি ঘটছে, সেদিকেই শক্তিদান করা হয়, বৃদ্ধি ঘটানো হয়। যে কারণে **পুষ** শব্দের অর্থে সবসময় 'বৃদ্ধি'র কথাই বলা হয়ে থাকে। এ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।

তবে মানবদেহকে পোষণ করে তার পোষাক। কিন্তু ফারসি 'পোশাক'-এর সংস্পর্শে এসে অনেকে 'পোশাক' লেখা শুরু করেন। তাতে শব্দের ভেতরে অর্থ রাখার নিয়মটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের বিচারে এটি **পোষাক** লেখাই বিধেয়। ৬. ইংরেজি position।

পূ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অপবিত্র, অপূত, অপূপ, অপূর্ব্ব, আপাবন, আপূপিক, আস্যপবন, কলহংসপোত, নাগপোত, দৃষ্টপূর্ব্ব, নিশ্বাসপবন, নিষ্পবন, পইতা, পওঁনঘরা, পবন (পোয়ান), পবনগমন, পবনতনয়, পবননন্দন, পবনপথ, পবনবাহন, পবনবিজয়, পবনব্যাধি, পবনভক্ষ, পবনসুত, পবনাত্মজ, পবনাল, পবনালম্বী, পবনাশ, পবনাশন, পবনাশনাশ, পবনী, পবমান, পবিত, পবিতা, পবিত্র, পবিত্রক, পবিত্রধান্য, পবিত্রপ্রারোপণ, পবিত্ররোহন, পবিত্রা, পবিত্রিত, পবীতক, পয়ান, পাবক, পাবকি, পাবকী, পাবন, পাবনি, পাবনী, পাবিত, পুয়া, পূ, পূগ, পূগপাত্র, পূগপীঠ, পূগপোত, পূগফল, পূপ্ন, পূত, পূতঃকরণ, পূতক্রতু, পূতগন্ধ, পূতধান্য, পূতপাপ, পূতনা, পূতা, পূতাত্মা, পূতাম্বর, পূতি (বি. সুরভি), পূতিক, পূতিকরঞ্জ, পূতিকর্ণক, পূতিকা, পূতিকাষ্ঠ, পূতিগন্ধ, পূতিতুণ্ড, পূতিনস্য, পূতিবক্ত্র, পূতিবাত, পূতিমৃত্তিকা, পুংকৃত, পূপ, পূপলা, পূপলিকা, পূপালী, পূয়, পূয়গন্ধ, পূয়রক্ত, পূয়ারি, পূর্, পূর, পূরক, পূরকপিণ্ড, পূরণ, পূরণী, পূরন্ত, পূরব, পূরবী, পূরয়িতা, পূরা, পূরান(নো), পূরি(রী), পূরিকা, পূরিত, পূরী, পূরুব, পূর্ণ (বি.প্রদীপ্ত), পূর্ণককুদ্, পূর্ণকাম, পূর্ণকুম্ভ, পূর্ণঘট, পূর্ণপাত্র, পূর্ণমা, পূর্ণমাঃ, পূর্ণমাস, পূর্ণহোম, পূর্ণাঙ্ক, পূর্ণান(ল)ক, পূর্ণানন্দ, পূর্ণাবতার, পূর্ণাহুতি, পূর্ণিত, পূর্ণিমা, পূর্ণেন্দু, পূর্ণোপমা, পূর্ত্ত, পূর্ত্তকর্ম্ম, পূর্ত্তদপ্তর, পূর্ত্তি, পূর্ব্ব্, পূর্ব্ব, পূর্ব্বক, পূর্ব্বকর্ম্ম, পূর্ব্বকায়, পূর্ব্বকাল, পূর্ব্বকৃত, পূর্ব্বকোটি, পূর্ব্বগাঁই, পূর্ব্বজ, পূর্ব্বজন্ম, পূর্ব্বজন্মা, পূর্ব্বজা, পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বতন, পূর্ব্বদক্ষিণা, পূর্ব্বদিক, পূর্ব্বদিগীশ, পূর্ব্বদিষ্ট, পূর্ব্বদেব, পূর্ব্বদেবতা, পূর্ব্বনিপাত, পূর্ব্বপক্ষ, পূর্ব্বপদ, পূর্ব্বপাদ, পূর্ব্বপীঠিকা, পূর্ব্বপুরুষ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্ববাদ, পূর্ব্ববর্ত্তী, পূর্ব্ববৃত্ত, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বভাব, পূর্ব্বমীমাংসা, পূর্ব্বরঙ্গ, পূর্ব্বরাগ, পূর্ব্বরাত্র, পূর্ব্বরূপ, পূর্ব্বসন্ধ্যা, পূর্ব্বসারী, পূর্ব্বাচল, পূর্ব্বাঞ্চল, পূর্ব্বাপর, পূর্ব্বাবেদক, পূর্ব্বাভিভাষী, পূর্ব্বাভ্যাস, পূর্ব্বার্দ্ধ, পূর্ব্বাশা, পূর্ব্বাশ্রম, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্নিক, পূর্ব্বোত্তর, পূর্য্য, পৈতা, পৈতাধারী, পৈতান, পোত, পোতজ, পোতগামী, পোতদার, পোতন, পোতমাঝি, পোতবণিক, পোতাঘর, পোতামাজী(ঝি), পোত্র, পোত্রী, পোয়া, পোয়াবারো, পোয়ান, পোলিন্দ, পোলো, পোহ, পোহা, পোহান, পোহাবারো, পৌতিনাসিক্য, বিনয়পূর্ব্বক, বুদ্ধিপূর্ব্বক, ভরপূর, ভূতপূর্ব্ব, শ্রুতপূর্ব্ব, সম্পূরক, সম্পূর্ণ, সম্পূর্ত্তি।

পূ = নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর আধার যে। (**পূ** ক্রিয়ার বেলায় আমরা দেখেছিলাম, **প** বর্ণটি মূলে 'পাওয়া' ক্রিয়ার আধার বটে,

কিন্তু যখন তাতে উ-কার যুক্ত হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তা 'পাওয়া'র ঠিক উল্টো 'দেওয়া' বোঝায়। সেই সুবাদে 'পুক্' মানে দাঁড়ায় 'কোনো কিছু দান-করণ', তা শব্দ-স্পর্শ-শক্তি-তেজ ... যা কিছু হতে পারে। আর, **প**-উ-কারের বেলায় সেই দেওয়াই শুধু থাকে না, যাতে করে দেওয়া হচ্ছে সেই আধারটিও থাকে। তার মানে, **পু**-এর মানে যদি 'টাকা-দেওয়া' হয়, তবে **পূ**-এর মানে হবে 'টাকার থলি দেওয়া'; **পু**-এর মানে যদি 'জ্ঞান বা অর্থ দেওয়া' হয়, তবে **পূ**-এর মানে হবে 'অর্থময় আওয়াজ-দেওয়া', অর্থাৎ হিন্দিতে যাকে বলে 'পু-কার' বা 'ডাক-দেওয়া'।)

পবন (পবনী, পবনগমন, পবনতনয়, পবননন্দন, পবনপুত্র, পবনসুত, পবনাত্মজ, পবনপথ, পবনবাহন, পবনবিজয়, পবনব্যাধি, পবনভক্ষ, পবনাশ, পবনাশন, পবনাল, পবনালম্বী, পবনাশনাশ, পবমান) : **১. পবন** = ✓পূ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পবন*** = ***পূ*** *(= নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ী বা কোনোকিছু-প্রদানকারী) অন যাহাতে;* ***পূ*** *(= কোনোকিছু দাতা) অন যাহাতে।* ***পবনী*** = ***পবন****-এর গতিশীল আধার যে। /* **পবন** = পূতীকরণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. পবন** = বায়ু, প্রাণবায়ু, শরীরস্থবায়ু, বিষ্ণু, বায়ুদেবতা, আবসথ্যাগ্নি, পবিত্রীকরণ, নিস্তুষীকরণ, কুম্ভকারের আমমৃৎপাত্র পাকের স্থান। (ব.শ.)। (ক) সুমেরু পর্বতে বানররাজ কেশরী রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা হতে পবনরাজের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। (খ) বায়ুর অন্য নাম। রামায়ণ অনুসারে, একবার ইনি রাজা কুশনাভের শতকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁদের সঙ্গ কামনা করেন। কিন্তু এঁরা অস্বীকৃত হলে ইনি এঁদের বিকলাঙ্গ করে দেন। পরে কাম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত এই শতকন্যাদের বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। **পবনী** = সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। **পবনগমন** = বায়ুগতি, অতিশীঘ্রগামী। **পবনতনয়, পবননন্দন, পবনপুত্র, পবনসুত, পবনাত্মজ** = হনুমান, ভীম, বহ্নি। **পবনপথ** = আকাশ, বায়ুসঞ্চারপথ। **পবনবাহন** = অগ্নি। **পবনবিজয়** = শুভাশুভসূচক শ্বাসবায়ুর বিজয়বিষয়ক গ্রন্থ। **পবনব্যাধি** = বায়ুরোগ, বাতব্যাধি, উদ্ধব। **পবনভক্ষ, পবনাশ, পবনাশন** = বায়ু ভক্ষণ করে যে, সর্প। **পবনাল** = দেবধান্য, দেধান। **পবনালম্বী** = পবনাশ্রিত, বায়ুচালিত। **পবনাশনাশ** = সর্পভক্ষণ করে যে, গরুড়, ময়ূর। **পবমান** = পবন, বায়ু, গার্হপত্যাগ্নি। (ব.শ.)। ৪. দুটি শব্দই প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** প্রথমে আমরা যথারীতি **পবন** শব্দের নিহিতার্থ জানার চেষ্টা করি। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে '**পূ-অন** করে যে', কিংবা '**পূ-অন** হয়ে রয়েছে যে-সত্তায়', তাকে **পবন** বলে। এই '**পূ অন** হয়ে থাকা' ব্যাপারটি কীরকম? আমরা দেখি, এ হল এমন একটি সত্তা যে কিনা 'বিশেষ কিছু বস্তু বা বিষয় দান করার জন্য' (**পূ**-করার জন্য) উন্মুখ হয়ে বা অন (on) হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ কেউ তাকে সেভাবে **অন** (on) করে (বা উন্মুখ করে) রেখেছে, কিংবা যে নিজে থেকেই সেভাবে **অন** (on) হয়ে (উন্মুখ হয়ে) রয়েছে। একেই **পবন** বলে।

এখন প্রশ্ন, মানুষের সামনে বা তার সমাজে সেরকম সদাদানোন্মুখ সত্তা হয়ে দেখা দিয়েছিল কে, যাকে **পবন** শব্দে চিহ্নিত করার দরকার পড়েছিল আমাদের শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষদের? আমরা শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের দিকে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করি — 'কোনো কিছু দাতা অন থাকে যাহাতে', তাকে **পবন** বলে। সবাই জানেন, বাতাসকে **পবন** বলে। আর সেই বাতাস বা air-এর ভিতরে অম্লজান বা অক্সিজেন প্রাণবায়ুদাতা রূপে সদা সক্রিয় থাকে! কার্যত পার্থিব স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিটি বিন্দুতে সে সদা সক্রিয় রয়েছে বলেই সকল জীব বেঁচেবর্তে রয়েছে।

পবন শব্দের এরকম অর্থ জেনে আমরা একরকম নিশ্চিত হয়ে যাই যে, এই **পবন** হল আমাদের চিরপরিচিত **বাতাস**, যা কিনা বিশাল এক বায়ুলোক (atmosphere) রূপে আমাদের সর্বদিকে বিদ্যমান রয়েছে, কার্যত যার ভিতরে আমরা ডুবে রয়েছি, মাছ যেরকম জলে ডুবে থাকে, সেইরকম। নিঃসন্দেহে এর ভিতরে সর্বদা আমাদের প্রাণবায়ু দেওয়ার জন্য অম্লজান (অক্সিজেন) অন (on) হয়ে রয়েছে। অতএব আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হই যে, 'প্রাণবায়ুদাতা অন থাকে যাহাতে', সেই হল **পবন** বা air।

কিন্তু খেয়াল করি না যে, আমাদের পূর্বসূরিরা প্রধানত সেই সকল সত্তাকে বোঝানোর জন্যই শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না। এই air বা বাতাসকে তো স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বুঝতেই পারি, স্বভাবতই তাকে বোঝানোর জন্য তাঁরা নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে যাবেন কেন? তবুও একেই **পবন** ভেবে নিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। এর ফল যা হবার তাই হয়, খানিকটা এগোতেই মুশকিলে পড়ে যাই। ...

দেখা যায়, **পবন**-যুক্ত অন্যান্য শব্দগুলির অর্থ (যথা **পবনপুত্র, পবনভক্ষ** ... ইত্যাদি) এই air-বাচক স্পৃষ্ট-**পবনে**র (স্পৃষ্ট = যাকে স্পর্শ করে বুঝতে পারা যায়) সঙ্গে কিছুতেই ঠিকঠাক মিলছে না। **পবনপুত্র** হনুমান কি air-এর ছেলে? সাপ কি air খেয়ে বেঁচে থাকে? নইলে তাকে **পবনভক্ষ** বলে কেন? **পবনপুত্র, পবনভক্ষ**দের পেছনে পেছনে ক্রমশ **পূতীকারক-পবন, পবনাত্মজ ভীম** ও **বহ্নি, পবনাশনাশ গরুড়, উনপঞ্চাশ-পবন** ... প্রভৃতি সত্তা এসে আমাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের দিয়ে যাওয়া **পবন** শব্দটি শুধুমাত্র air-কেই বোঝায় না, অন্য কাউকেও বোঝায়; এমন কাউকে, **হনুমান** যার পুত্র হতে পারে। কে সেই **হনুমান**-জনক? কেই-বা পূতীকারক, সর্পখাদ্যরূপ **পবন**? অগত্যা নতুন করে পুনরায় অনুসন্ধানের দরকার পড়ে।

বাইবেলের আদিপুস্তক ৩-এর শুরু হচ্ছে এইভাবে — প্রভু ঈশ্বর স্থলভূমির উপর যে সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত প্রাণী ছিল সাপ। সে একদিন নারীকে বলল : ঈশ্বর কি সত্যিই এই কথা বলেছেন — এই উদ্যানের কোনো গাছের ফলই তোমরা খাবে না? ... (অর্থাৎ সাপ জ্ঞানবৃক্ষের তাৎপর্য জানত।) ইংরেজিতে একটি পুরোনো phrase হল 'As wise as the serpent'। এই সাপ তো হল **দক্ষ**পন্থী সরপালনকারী **সর্প** বা নগরবাসী **নাগ**! একে প্রথম সম্পদসঞ্চয়ের যুগে **পবনাশ** বলা হয়ে থাকবে। কেননা, পরে একেই তো **গরুড়** ভক্ষণ করে। ... কিন্তু এসব জেনেও **পবন**কে ঠিকঠাক বোঝা যায় না। ...

যাই হোক, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর আমরা মহাবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, **পবন** শব্দের যে অর্থটি আমরা বুঝেছি, সেটি শব্দটির সবচেয়ে নিকৃষ্ট অর্থ; তার ক্রমশ উচ্চতর অর্থ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ অর্থ পর্যন্ত বাকি অর্থগুলিকে আমরা দেখতেই পাইনি। আর সেজন্যই **পবনপুত্র**কে, **পবনভক্ষ**কে, পূতীকারক-**পবন** ... ইত্যাদিকে আমরা বুঝতেই পারিনি। তার মানে আমরা সেইরকম ভুলই করে বসে আছি, **পাদোদক** শব্দের অর্থ বুঝতে গিয়ে সাধারণত যেধরনের ভুল হয়ে থাকে। যাক গে, সময় নষ্ট না করে আমরা বরং **পবন** শব্দের বাকি অর্থগুলিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি।

আমরা যে বায়ুসমুদ্রে (বায়ুলোকে) বা atmosphere-এ ডুবে আছি, সেরকম আরও একটি লোক (sphere) আছে এবং তার এলাকাটি আরও বড়, আরও সূক্ষ্ম; এবং তাতে 'বায়ুলোক'ও ডুবে রয়েছে। বাহ্য পৃথিবীর সমস্ত সত্তাই তাতে ডুবে থাকে। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা মূলত তাকেই বোঝাতে **পবন**াদি শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। এই **পবন**কে স্পর্শ করে টের পাওয়া যায় না, অর্থাৎ এ **পবন** স্পৃষ্ট-**পবন** নয়, অস্পৃষ্ট-**পবন**। একালের ভাষায় তাকে '**স্বাভাবিক-চৈতন্যলোক**' বলা যেতে পারে। সে কীরকম?

'বায়ুলোকে' বা atmosphere-এ যেমন সমগ্র পৃথিবী ডুবে রয়েছে, চৈতন্যলোকে তেমনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবে রয়েছে। 'বায়ুলোকে' যেমন সর্বদা 'বায়ুপ্রবাহ' বা air-flow চলতে থাকে, তেমনি এই চৈতন্যলোকেও সর্বদা চেতনাপ্রবাহ চলতে থাকে। 'বায়ুলোক'-এর প্রতিটি বিন্দুতে যেমন জীবের দৈহিক প্রাণদাতারূপে প্রাণবায়ু উন্মুখভাবে সদা সক্রিয় থাকে, চৈতন্যলোকের প্রতিটি বিন্দুতেও তেমনি জীবের মনের সজীবতাদাতা বা মনের প্রাণদাতারূপে চেতন-চিন্তামণি উন্মুখভাবে সদা সক্রিয় থাকে। এই 'স্বাভাবিক-চৈতন্যলোক'কে সেকারণেই **পবন** বলে এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রধানত একে বোঝাতেই **পবন** শব্দটির সৃজন করেছিলেন।

তার মানে, প্রাণবায়ুপূর্ণ বাহ্যিক বায়ুলোকে বা air-বাহী physical atmosphere-এর (বা তথাকথিত biosphere-এর) পাশাপাশি তার চেয়ে আরও মহান ও সূক্ষ্ম আর একটি লোক বা sphere রয়েছে; বিশ্বজগতের সঙ্গে আমরাও তাতে ডুবে রয়েছি। সেই চেতনা-সমুদ্রে ডুবে রয়েছি বলেই 'সচেতনভাবে' বেঁচে বর্তে আছি। এই সমুদ্রটিকে চেতনাবাহী চৈতন্যসমুদ্র বা consciousness-বাহী conscious-atmosphere বলা যেতে পারে; একালের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় information-world। প্রাচ্যের পণ্ডিতগণের কাছে এই চৈতন্যলোক ছিল অত্যন্ত পরিচিত, তাঁরা একে নানা নামে চিহ্নিত করে রেখে গেছেন — চিৎস্বরূপ, চিদংশ, চিদম্বর, চিদাকাশ, চিদাত্মা, চিদানন্দ, চিদাভাস, চিন্ময়, চিন্ময়-শিব, শুদ্ধচৈতন্য, পরমাত্মা ... ইত্যাদি।

এই **পবন**-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করলে বলতে হয় — বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্যবিন্দুসমূহ চেতন-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকে; সেই সম্ভাবনাময় শূন্যের দ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্নচৈতন্যস্বরূপ যে অসীম অনন্ত লোক জীবকে **পূ-অন** করার জন্য বা মানসিকভাবে সজীব করে রাখার জন্য (সচেতন রাখার জন্য) সদা উন্মুখ হয়ে থাকে তাকেই **পবন** বলে। প্রকৃতপক্ষে ইনিই সেই সত্তা, যাকে জগতে সমাজে অত্যন্ত সক্রিয় দেখেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়েও এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র মনের চোখ দিয়ে একে দেখতে হয়, তবেই চেনা যায়। এই অস্পৃষ্ট-**পবন**ই জগতে সমাজে আমাদের জীবনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সক্রিয়। তাই তার কথা সবাইকে জানানো ও বোঝানোর জন্য তার নাম দিতে হয়েছিল **পবন**। ...

ক্রমশ টের পাই, বাহ্যিক air বা 'বাতাস'কে বোঝানোর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা **অনিল, পবন, বাত, বাতাস, বায়ু, মলয়, সমীর, হাওয়া** প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করেননি; প্রধানত অস্পৃষ্ট-**পবন**কে বোঝানোর জন্যই তাঁরা **অনিল-পবন**াদি শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন।

একালের মানুষ আমরা খেয়ালই করি না যে, আমরা প্রত্যেক মানুষই এক একটি দ্বৈতাদ্বৈত (two in one) সত্তা। দেহ ও মন নিয়ে তবেই আমরা প্রত্যেকে এক একটি মানুষ। আমাদের এই শরীর ও মন নিয়ে আমরা থাকি কোথায়? দেখা যাচ্ছে, পরমাপ্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের শরীরটা নিয়ে 'বাহ্যিক বায়ুসমুদ্রে' (atmosphere-এ) ডুবে থেকে প্রতিনিয়ত 'দৈহিক-প্রাণবায়ু' লাভ করে বেঁচেবর্তে থাকি; আর আমাদের মনটাকে নিয়ে আমরা চৈতন্যলোকে বা 'চেতনার বায়ুসমুদ্রে' (= conscious-atmosphere-এ) ডুবে থেকে প্রতিনিয়ত 'মানসিক-প্রাণবায়ু' লাভ করে তবেই সচেতনভাবে বেঁচেবর্তে থাকি। 'বাহ্যিক-বায়ুসমুদ্রে' চলে বাহ্যিক বায়ুপ্রবাহ, 'চেতনার বায়ুসমুদ্রে' চলে চেতনার বায়ুপ্রবাহ। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধিতে উভয় প্রবাহকেই **পবন** বলা যেতে পারে। বাহ্যিক-বায়ুসমুদ্রকে স্পর্শ করে বোঝা যায়, চেনা যায়, কিন্তু 'চেতনার বায়ুসমুদ্র'কে সহজে চেনা-বোঝা যায় না। অথচ মানুষের জীবনে তার ভূমিকা অসীম। নিয়মিত মানসিক-প্রাণবায়ু লাভ করতে না পারলে মানুষ 'মনমরা' হয়ে শুধুমাত্র শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, যে বেঁচে-থাকাকে 'মরার বাড়া' বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল এই চৈতন্যলোক বা 'চেতনার বায়ুসমুদ্র', এবং তার থেকে লব্ধ 'মানসিক প্রাণবায়ু' — চিদানন্দ। তাকে বোঝাতেই তাঁদেরকে **অনিল-পবন**াদি শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। মাঝ থেকে 'বাহ্যিক বায়ুসমুদ্র' বা air সত্তাটি একই ধরনের ক্রিয়া করে বলে **অনিল-পবন**াদি শব্দে air-কেও শনাক্ত করা হয়ে যায়। সেও **পূ**-অন করে রাখে, তবে কিনা, তার সেই **পূ**-এর ভেতরে থাকে অন্নজানাদি যা কিনা শরীরকে প্রাণবায়ু দিয়ে থাকে। ফলত, একই **পবন**াদি শব্দে মানসলোক ও বাহ্যলোক দুই লোকের **পবনের** কথাই বলা হয়ে যায়।

তবে এই চৈতন্যলোক কীভাবে সক্রিয় রয়েছে, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না; পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতাবাদীরা তো একেবারেই পারেন না। প্রাণবায়ুদাতা বায়ুলোক বা atmosphere-টাই তাঁদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট। কিন্তু চৈতন্যলোককে তাঁরা কিছুতেই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। অগত্যা দুটো বিষয়কে সাধ্যমতো স্পষ্ট করার জন্য আর একটু বিস্তারে আমাদের যেতেই হবে।

গ্রামবাংলার কিশোরদের একটি প্রিয় খেলা হল — গাব গাছের ডাল ভেঙে তার রসকে গাব-পাতায় ধরে ঘাসের তৈরি পেঁচ তাতে ডুবিয়ে ফুঁ দিয়ে শত শত বায়ু-গোলক বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া।

একালের শহরে শিশুদের জন্য সাবান জল দিয়ে এই খেলার খেলনা বিক্রি হয়। এই যে 'ফুঁ দিয়ে হাওয়া-গোলককে ছেড়ে দেওয়া', অনেকের বিশ্বাস, এই জগতের সবকিছুকেই সেইরকম ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মনের গভীরে এই বিশ্বাস এমন গেড়ে বসে রয়েছে যে, শিশুরা হঠাৎ পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলে মা-ঠাকুমারা তাদের কোলে তুলে নিয়ে কানে ফুঁ দিতে থাকেন; যেন-বা শিশুটির হাওয়া (প্রাণবায়ু) বেরিয়ে গেছে, যা তিনি পুনরায় শিশুটির ভিতরে পুরে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। গাড়িতে চাপা পড়ে পিষে যাওয়া একটি মানুষের পেছনে সাইকেলের পাম্প দিয়ে তিনি পাম্প দিতে শুরু করেছিলেন এবং লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিয়েছিল! মোল্লা-পুরোহিত-তান্ত্রিক-সাধুরা যে ফুঁ দিয়ে নানা রকম চিকিৎসা করেন, তার মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, প্রতিটি জীবকে 'ফুঁ দিয়ে' বা প্রাণবায়ু দিয়ে জগতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে আমাদের দৈহিক সত্তাগুলি অস্তিত্বলাভ করে বেঁচেবর্তে থাকে। ... খ্রিস্টানের বাইবেল গ্রন্থেও প্রথম মানুষ আদমের সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা আছে — একসময় প্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে তা দিয়ে মানুষকে গড়ে তুললেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণের নিঃশ্বাস জাগিয়ে তুললেন। মানুষ তখন হয়ে উঠল সজীব এক প্রাণী। (আদিপুস্তক ২:৭)

একইভাবে আমাদের মনের চারদিকেও একইরকম মনের প্রাণবায়ু দিয়ে রাখা হয়েছে। চারিদিকে ঘিরে থাকা দেহের প্রাণবায়ুর সাহায্যে যেমন আমাদের দেহের প্রাণ বাঁচে, তেমনি মনের চারদিকে ঘিরে থাকা সেই মনের প্রাণবায়ুর সাহায্যে আমাদের মনও বাঁচে। এই উভয় প্রকারের প্রাণবায়ুর লোক ও সেই লোকের বায়ুপ্রবাহকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নাম দিয়েছিলেন **পবন**।

এত কথা বলার আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের শরীরের ভেতরে বাইরে এই যে বাতাস বা air, এ যেন এক বিশালকায় কোনো সত্তার কীর্তি — তিনি ফুঁ দিয়ে এই পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়েছেন। বিশেষত্ব এই যে, সেই ফুঁ-র হাওয়া বেলুনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বেলুনের ভেতরেই থাকে, পৃথিবীর ও তার বস্তুসমুদয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ভেতরে বাইরে সর্বত্র, সর্ব অস্তিত্বের ভেতরে-বাইরে। তার মানে, কোনো দৈত্য যেন ফুঁ দিয়ে হাওয়ার বিশাল বলয় তৈরি করে তার ভিতরে পৃথিবীকে ডুবিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আর ঠিক সেকথাটাই বলে রাখা হয়েছে **পূ**-অন বা **পবন** শব্দে — বিশালকায় কেউ যেন মুখ দিয়ে তাঁর '**পূ**' অন করে দিয়েছেন, আর সেটিই **পবন** রূপে আমাদের অস্তিত্বের ভিতরে বাইরে সর্বত্র বিরাজ করছে। বাহ্যিক **পবন** দিয়ে আমাদের দেহকে সজীব রেখেছেন, মানসিক **পবন** দিয়ে আমাদের মনকে সচেতন রেখেছেন।

তার মানে আমাদের এই মানসিক **পবন** বা 'স্বাভাবিক চৈতন্যলোক' হল বিশ্বব্যাপী পরিপ্রসারিত অবিচ্ছিন্ন চেতনাপ্রবাহ, যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চেতনাপ্রবাহের কারণে গাছেরা কুড়ুলধারী কাঠুরেকে চিনতে পারে, গাছের গোড়ায় জল ঢালে যে, তাকেও চিনতে পারে। (দ্র. **দোহদ**)। চৈতন্যলোকরূপী সেই **পবন**-এর কারণেই ভূকম্পের খবর আরশুলা পেয়ে যায়, মধুর গন্ধ পেয়ে যায় ভ্রমর, চিনির দানার খবর পেয়ে যায় পিঁপড়ে, বিষহর গাছের শেকড় চিনে ফেলে নেউল, গাধাকে মরে যেতে দেখলে অন্য গাধা তৎক্ষণাৎ মরে যায়, বিদ্যুতের তারে লটকে গেলে কাকের পরিজনেরা দু-মাইল দূর থেকেও তা টের পেয়ে গিয়ে ছুটে এসে তাকে ঘিরে ব্যর্থ কান্নায় সদলবলে ভেঙে পড়ে, প্রবাসী পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে মায়ের মন অস্থির হয়ে ওঠে, সুনামির সম্ভাবনা আগেভাগে বুঝে যায় জীবজন্তু এবং আদিবাসী মানুষেরা। ...

এককথায় একে অব্যক্তজ্ঞানের (বা tacit-knowledge-এর) দুনিয়া বলা যেতে পারে। এই স্বাভাবিক-চৈতন্যপ্রবাহের কারণে বা **পবন**-এর কারণেই মানুষ জগৎকে চিনতে বুঝতে ও আত্মস্থ করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, সনাতন বেদ অর্জন করেছে ... এবং সর্বোপরি তার অরূপরতনকে দেখবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মানুষ হতে পেরেছে চিন্ময় শিব। এই অব্যক্তজ্ঞানধারী-মনই ছিল সেকালের মানুষের সবচেয়ে বড় সহায়। আইনস্টাইন এই অব্যক্তজ্ঞানধারী-মনকে বলতেন intuitive mind এবং **দক্ষ**জ্ঞান বা অ্যাকাডেমিক-জ্ঞান ধারণকারী মনকে বলতেন faithful servant। একালের মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, তার **দক্ষবাদী**-সুবিধাবাদী স্বভাবের কারণে সে সেই 'বড় সহায়'টিকে ইতোমধ্যে অনেকটাই হারিয়েছে। আইনস্টাইনের ভাষায় — 'The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.'।

কার্যত মানুষের সমাজে **দক্ষতার মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে মানুষ কেবল নিজেই অস্বাভাবিক হয়নি, পাশাপাশি সবকিছুকেই অস্বাভাবিক না করে, দূষিত না করে সে থাকতে পারেনি। পরমাপ্রকৃতির মহত্তম অবদানকে (sacred gift-কে) সে ভুলে যায়, স্বাভাবিক চৈতন্যলোককে সে অবজ্ঞা করে, natural-information-কে সে আর information ভাবে না, একমাত্র অ্যাকাডেমিক-জ্ঞানের দুনিয়াকেই সে চৈতন্যলোক বলে মনে করে ও বিশ্বাস করে নেয়। ফলত সে তার নিজের ভৃত্যটিকে সেলাম জানিয়ে তারই গোলামে পরিণত হয়ে যায়। স্বভাবতই চৈতন্যলোককেও সে দূষিত না করে থাকতে পারেনি।

তবে চৈতন্যলোককে কলুষিত করার প্রক্রিয়া বা **পবন**দূষণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় **দক্ষ**যজ্ঞের পরে। ততদিনে **দক্ষ**মানুষ তার স্বোপার্জিত জ্ঞানকে আপন সেবাদাসে বা 'বিশ্বস্ত ভৃত্যে' পরিণত করে ফেলেছিল। সেই 'বিশ্বস্ত ভৃত্যে'র (faithful servant-এর) জয়গান দিয়েই **পবন**দূষণ-এর সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল, আর সেটা হয়েছিল বৈদিকযুগের প্রারম্ভের প্রাক্কালেই। তখনও যৌথসমাজ চলছে, তখনই **পবন**-এর ভিতরে প্রথম ঢুকে পড়েছিল আদি-মালিকানার গন্ধ। সেই গন্ধ **পবন**বাহিত আদিম যৌথসমাজে মানবসভ্যতার আদি সংঘাত বা 'গন্ধতন্মাত্রাত্মক সংঘাত' রূপে দেখা দেয়। সকল ভারতীয় পুরাণ সাক্ষ্য দেয় যে, সেই 'গন্ধতন্মাত্রাত্মক সংঘাত'-এর ফলেই আদিম যৌথসমাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ও মন্দিরকেন্দ্রিক বৈদিকসভ্যতার সূত্রপাত হয়। অতঃপর মানুষের সমাজই কেবল অজস্র সম্প্রদায়ে বিভাজিত হয়ে যায়নি, **পবন**ও বিভাজিত হয়ে **উনপঞ্চাশ-পবনে** পরিণত হয়ে যায়। ফলত, এরপর থেকে

স্বাভাবিক-চৈতন্যলোক বা **পবন** আর অকলুষিত থাকার অবকাশ পায়নি, দূষণ ক্রমশ বেড়েছে এবং বর্তমানে তা প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছেছে। বলতে কী, আজকের চৈতন্যলোক বা information-world কলুষিত-অকলুষিত নানাপ্রকার অস্বাভাবিক চেতনায় গ্লানিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

সর্বাগ্রে স্বাভাবিক-চৈতন্যলোকে বা **পবনে** ঢুকে পড়ে মানুষের **দক্ষ**জ্ঞান, সেই জ্ঞানের চেতনা প্রবাহিত করার জন্য গড়ে ওঠে সামাজিক সংগঠন, জ্ঞানবৃক্ষ জন্মায়, তাতে ফল ফলে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল (অ্যাকাডেমিক-জ্ঞানের চেতনা প্রবাহিত হতে শুরু করে), লোকে সেই ফল খায়, সেই ফল খেলে **নর** পরিণত হয় **বানরে**, তাদের ডিগ্রির লেজ গজায়, যে বানর সবচেয়ে বেশি ফল খায়, সে হয়ে যায় **পবনপুত্র** হনুমান, শ্রেষ্ঠ বানর। সেকালের প্রায় সমস্ত অ্যাকাডেমিক জ্ঞান বা information তাঁর করায়ত্ত ছিল। ২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের শ্রেষ্ঠ-ডিগ্রিধারী জ্ঞানজীবীদের লেজ ৫০০ খ্রিস্টাব্দের শ্রেষ্ঠ-ডিগ্রিধারী জ্ঞানজীবী তুলে সরিয়ে দিয়ে নিজের চলার পথ মুক্ত করতে পারে না, হনুমানের লেজের ভার ভীম তুলতে পারে না। আজও কি পারে? জীবনযুদ্ধের যোদ্ধারা যত সঠিক কথাই বলুক না কেন, অ্যাকাডেমিক ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ **দক্ষ**রা যা ইতোমধ্যে বলে রেখেছে তার ভার সরিয়ে নিজেদের কথা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না ঐ জীবনযোদ্ধারা। ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ **দক্ষ**দের লেজের ভারে তাদের কথা আজও চাপা পড়ে যায়। ...

ইতোমধ্যে **পবন** তার 'শূন্যদ্বারা বিষয়ীকৃত' রূপকে পেরিয়ে 'শব্দদ্বারা বিষয়ীকৃত' রূপ গ্রহণ করে মানুষের ভাষাপ্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং ভাষণরূপে **দেশে-উপদেশে** প্রবাহিত হতে শুরু করে। আরও পরে সে 'পণ্যগন্ধদ্বারা বিষয়ীকৃত' হয়ে **মলয়পবন** রূপে দেখা দেয়। ... এভাবে ক্রমে সে **উনপঞ্চাশ পবনে** পরিণত হয়ে যায়। তার সব কথা এখানে ব্যাখ্যা করা কঠিন, আগ্রহী পাঠকপাঠিকা আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ১৩৮-৪১ পৃষ্ঠায় **বায়ু** শব্দের ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। এখানে আমরা **মলয়পবন** সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে মূল বিষয়ে চলে যাব।

দক্ষ-এর পর আসে প্রজাপতি **বেণ** এবং তাঁর উত্তরসূরিরা, **বেনিয়ারা**, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পুঁজিবাদী আধুনিকতাবাদীরা। **পবন**বাতাস পণ্যগন্ধময় হয়ে ওঠে — **চম্পা, চামেলি, পারুল, পারিজাত** ... প্রভৃতি **পুষ্পের** ও **পুষ্প**গন্ধের রমরমা হয়। মনের **জানালা** বেয়ে **মলয়পবন** আসে, নানারকম **পুষ্পের** বা পণ্যের জাত হওয়ার খবর নিয়ে **হাওয়া** আসে, **বাতায়ন**পথে সমাজের **বাত**চিত আসে, সমাজশরীরের **বাত**কর্মের গন্ধ নিয়ে **বাতাস** আসে; বায়ুভুক **বাশে**দের বিষবাষ্পে ভরে ওঠে উতল **হাওয়া**। ক্রমান্বয়ে একদিন **আধুনিক পবনপুত্র** রূপে দেখা দেয় একালের 'মিডিয়া', information highway। **পুষ্পাজীব** পণ্যজীবীরা তাতেই তাদের **কনসুমনা** air করে দেয়। ...

অতএব, পবনকে আমরা তার **উনপঞ্চাশ** রূপে না চিনলেও **অন্তত তিনটি** রূপে তাকে সুস্পষ্টরূপে চিনতে পারি। প্রথমত, সে **আমাদের** দেহের প্রাণবায়ু দেয়, আমরা শারীরিকভাবে বাঁচি। দ্বিতীয়ত **সে আমাদের** মনের প্রাণবায়ু দেয়, আমরা মানসিকভাবে বাঁচি। **তৃতীয়ত সে** আমাদের সমাজের প্রাণবায়ু দেয়, আমরা সামাজিকভাবে বাঁচি। তিন ক্ষেত্রেই এই **পবন**-এর স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক রূপ ছিল, তিন ক্ষেত্রেই আমরা মানুষেরা **দক্ষনীতি** অনুসরণ করে তার স্বাভাবিকতা নষ্ট করেছি, তিন ক্ষেত্রেই আমরা তাকে দূষিত করেছি। তার মধ্যে শুধুমাত্র বাহ্যিক **পবন**-দূষণকেই একালে 'বায়ুদূষণ' নামে শনাক্ত করে নানান চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। বাকি দুটি ক্ষেত্রের বিষয়ে এখনও মানুষের টনক নড়েনি। ...

পবন শব্দের অর্থে ব.শ. 'পূতীকারক', পবিত্রীকরণ, নিস্তুষীকরণ, এবং কুমোরের হাঁড়ি পাকানোর উনুনের কথা বলেছেন, বলেছেন আবসথ্যাগ্নির কথা। মনের কথা, বাগানের **পুষ্প**, কর্মক্ষেত্রের উৎপন্ন ... ইত্যাদিকে অন্যত্র যাওয়ার উপায় করে দেয় **পবন**; তাই সে 'পূতীকারক'। অন্যথায় সেগুলি তাদের উৎসে জমে গিয়ে পূতিগন্ধ ছড়াত। তাই **পবনই** 'পবিত্রীকরণ' পদবাচ্য। বাহ্যিক হাওয়ায় আগড়া উড়িয়ে ধান পাওয়া কিংবা কুঁড়ো উড়িয়ে চাল পাওয়াকে 'নিস্তুষীকরণ' বলে। এও একপ্রকারের 'পবিত্রীকরণ'। কুমোরের পোয়ানের আগুনও তাই, সে কাঁচামালকে পাকা করে দেয়, পবিত্র করে দেয়। আর বহু অখাদ্যকেই তাদের দোষনাশ করে খাদ্যরূপে গ্রহণযোগ্য করে দেয় ঘরের আগুন বা আবসথ্যাগ্নি। সংক্ষেপে এই হল এগুলিকে **পবন** বলার কারণ।

এবার আমাদের ঐতিহাসিক তথ্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তথ্য হল, সুমেরু পর্বতে বানররাজ কেশরী রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা হতে পবনরাজের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। এগুলিকে বোঝার জন্য **অঞ্জনা, কেশর** ও **হনুমান** শব্দের অর্থ যথাস্থানে দেখুন। যে-**পবন** কিংবা **বায়ু** রাজা কুশনাভের শতকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সঙ্গ কামনা করেন, তিনি বৈদিকসমাজ (বা আদিম সমাজতান্ত্রিক সমাজ) ও পণ্যবাদী সমাজের মধ্যবর্তী কালে সেই সব উৎপাদকদের 'পাণি' প্রার্থনা করেন, যাঁরা নিজেদের জন্যই কেবল উৎপাদন করেননি, যথেষ্ট অধিক পরিমাণে করেছেন যা অন্যকে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এঁদের পিতার **নাভি**তে **কুশ** ছিল। কিন্তু এঁরা অস্বীকৃত হলে **পবন**দেবতা এঁদের বিকলাঙ্গ বা হাফ পণ্যজীবী করে দেন। দ্র. **কন্যাকুব্জ, কান্যকুব্জ, কনৌজ**। পরে **কাম্পিল্য**নগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত এই শতকন্যাদের বিবাহ করেন অর্থাৎ সেই উৎপাদকদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তারা স্বাভাবিকতা ফিরে পায়। ... আজকাল এসব কথাকে ইতিহাস ভেবে এগুলির নিহিতার্থ বুঝতে যাই না আমরা, প্রাণ বাঁচে না বলে তাকে **হাওয়া বাতাস** air ইত্যাদি বলি, ইংরেজের পছন্দ হবে কি না ভেবে সেকেলে শব্দ **বায়ু** ও **পবন** পারতপক্ষে উচ্চারণ করি না, এমনকি **পবনী**র মতো শব্দকে ফেলেই দিয়েছি, পরিবর্তে ব্যবহার করি broom কিংবা **ঝাঁটা**। অথচ একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখলেই জানা যায়, ইংরেজ তার pub, publish, publication ... প্রভৃতি শব্দের ভিতরে '**পবন**-এর ইচ্ছা'কেই ('পব-৯-ইষ্'-কেই) নিজেদের মতো ঢুকিয়ে রেখেছে, উৎস না জেনেই। আবার, **সমীর** শব্দের উৎসে গেলে আমরা দেখতে পাই শব্দটির ভেতরে যে **ঈর** কথাটি রয়েছে, সেটি তৈরিই হয়েছিল 'অ + ইর' (= a + ir) যোগ করে; আর সেকথা লিখে রেখে গেছেন আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরাই। ইংরেজ তো সেই **সমীর**কে air বলতেই পারে!

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখতে চাই। ১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত বাংলাভাষীরা ইংরেজি শব্দের উৎকৃষ্ট অনুবাদ করতে পারতেন। তাঁরা ইংরেজি শব্দের ভিতরে যে ধারণা রয়েছে, সমজাতীয় বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বঙ্গীয় ধারণাকে নিয়ে আসতেন ইংরেজি শব্দটির অনুবাদের বেলায়। এভাবেই তাঁরা physics, algebra, arithmetic ... প্রভৃতি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করেছিলেন যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা, বীজগণিত, পাটিগণিত। পরে এই মানের বাংলাভাষাজ্ঞানীর অভাব পড়ে। তাঁরা থাকলেও ক্ষমতার অলিন্দে যে শয়তানি চলে, তা পেরিয়ে যাওয়ার দক্ষতা তাঁদের ছিল না। ফলে একপ্রকার নিম্নমানের বাংলাজ্ঞানীদের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁরা কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ করেন, যেগুলি লোকে ব্যবহার করে না, কিংবা করলেও কদাচিৎ। যেমন air-conditioner এর বাংলা করা হয় 'শীতাতপনিয়ন্ত্রকযন্ত্র'। লোকে এটি ফেলে দিয়ে বরং ইংরেজি শব্দটিকেই ব্যবহার করা পছন্দ করে। কেউ কেউ হিন্দি থেকে আনীত 'বাতানুকূলযন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই ঘটনাটি বলে দেয়, আজকের বাংলায় যে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শব্দ ঢুকেছে, তার কারণ সাধারণ বাংলাভাষী নয়, ক্ষমতাসীন বাংলাভাষা-বিশেষজ্ঞরাই তার জন্য একশো ভাগ দায়ী। বস্তুগুলি বিদেশ থেকে আসছে, তার ইংরেজি নাম থাকাই স্বাভাবিক। তাকে যদি যথাযথভাবে বাংলা নাম দেওয়া না যায়, লোকে তো ইংরেজি নামটাই ব্যবহার করবে। তাদের দোষ কোথায়! আমরা তো অনায়াসেই office-কে 'কর্মতীর্থ', office-colleague-কে 'কর্মতীর্থের সতীর্থ' বলতেই পারতাম। যেমন কিনা 'এয়ার-কন্ডিশনার'কেও তো বলতে পারতাম 'পবনযমুনা' (the entity that conditions the air)। ঘরে তার ঠাণ্ডা হাওয়া চললে বলতেই পারতাম, এঘরে এখন 'যমুনাপবন' বইছে। দ্র. **যমুনা**। ... **৬.** ইংরেজি pub, publish etc.

পবিত্র (পবিত্রক, পবিত্রা) : **১.** ✓পূ + ইত্র - করণবাচ্যে; পবি (বজ্র) + ✓ত্রৈ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পবিত্র*** *= দান গতিশীলভাবে ত্রাণ পায় যাহাতে;* ***পূ****-করণ গতিশীলভাবে ত্রাণ পায় যাহাতে (অর্থাৎ,* ***পূ*** *তারিত হয় যাহাতে =* ***পূত****,* ***পূ*** *ক্রিয়াপদের বংশে* ***পূত*** *শব্দ দ্রষ্টব্য)।* ***পবিত্রক*** *=* ***পবিত্র*** *করে যে।* ***পবিত্রা*** *=* ***পবিত্র****-এর আধার যে। /* **পবিত্র** = যাহার দ্বারা শুদ্ধি সাধিত হয়; পাপ নাশ করে যে; বজ্রবৎ জন্মমরণাদি দুঃখ হইতে ত্রাণ করে যে; যাহাকে ব্রতশৌচাদি দ্বারা শুদ্ধ করা হইয়াছে; যে বস্তু শুদ্ধিকরণ করে। (ব.শ.)। **৩. পবিত্র** = শুচি, পূত, শুদ্ধ, তিলবৃক্ষ, পাবন তপস্যাদি বা যজ্ঞদানাদি, ঘৃতসংস্কারার্থ সাগ্র নির্গর্ভপ্রাদেশমাত্রপরিমাণ কুশপত্রদ্বয়, শুদ্ধিকর কুশরচিত অনামিকাবেষ্টন বা কুশাঙ্গরীয়কবিশেষ, যজ্ঞোপবীত, পইতা, কুশ, বর্ষণ, বৃষ্টি, তাম্র, জল, ঘৃত, মধু, ঘর্ষণ, মার্জ্জন, ঋষি, বেদমন্ত্র, মন্ত্র, দেবতা, বিষ্ণু, শিব, অশ্লীলতাহীন ভদ্রোচিত মিষ্ট। **পবিত্রক** = কুশ, অশ্বত্থ, উদুম্বর, ক্ষত্রিয়ের উপবীতসূত্র, শণসূত্র, শণসূত্র-কৃত জাল। **পবিত্রা** = তুলসী, হরিদ্রা। **পবিত্রধান্য** = যব। **পবিত্রপ্রারোপণ, পবিত্রপ্রারোহণ** = উপবীত দান, পৈতা দেওয়া। **পবিত্রিত** = পবিত্রীকৃত, শোধিত। **পবিত** = পূত, পবিত্রীকৃত, শোধিত, মরিচ। **পবীতক** = উপবীত। (ব.শ.)। **৪.** sacred এবং holy অর্থে **পবিত্র** প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পাবক**। সেখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা একত্রে রাখা হয়েছে। কারণ **পবিত্র** করে যে, সেই তো **পাবক**।

পাবক (পাবকি, পাবকী, পাবন, পাবনি, পাবনী) : **১.** ✓পূ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পাবন*** *=* ***পবন*** *হইতে জাত।* ***পাবক*** *=* ***পাবন*** *করে যে।* ***পাবকি*** *=* ***পাবক*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পাবকী*** *=* ***পাবকির*** *আধার যে।* ***পাবনি*** *=* ***পাবন*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পাবনী*** *=* ***পাবনির*** *আধার যে। /* **পাবক** = পূতীকরণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. পাবক** = শোধক, অগ্নি (পাবক সাতাশ প্রকার — অঙ্গিরাঃ, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহ্বনীয় ইত্যাদি), অগ্নিদেব, অষ্টবসুর একতম, বৈদ্যুতাগ্নি, অগ্নিসংখ্যানুসারে তিন (৩) এই সংখ্যা, চিত্রক, রক্তচিত্রক, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, (সাদৃশ্যে) কুসুম্ভ, সদাচার, শোধয়িতৃনর, স্বাহাপুত্র। (ব.শ)। **দক্ষ** প্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান, ও শুচি — এই তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁরা সকলেই ঘৃতভোজী। (পৌ.অ.)। **পাবকি** = পাবকের অপত্য, কার্ত্তিকেয়। **পাবকী** = অগ্নিপত্নী। **পাবন** = পবিত্রীকারক, শোধয়িতা, পাবক, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্যাস, সিদ্ধ, সিহ্লক, জল, গোময়, রুদ্রাক্ষ, প্রায়শ্চিত্ত, তিলক, সম্প্রদায়চিহ্ন, চিত্রক, পবিত্রীকরণোপায়, শোধন, পবিত্রীকরণ। **পাবনি** = পবনপুত্র হনুমান। **পাবনী** = তুলসী, গঙ্গা, গবী, হরীতকী। (ব.শ.)। **৪. পাবক** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি প্রায় সবগুলিই অপ্রচলিত। তার কারণ হল, সেকালে যে ক্রিয়াগুলিকে ঐ শব্দগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হত, তার প্রায় সবগুলিই এখনও প্রচলিত থাকলেও, বরং বলা ভাল, আরও বেশি করে প্রচলিত থাকলেও, সেই শব্দগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পরিবর্তে আনা হয়েছে অজস্র ইংরেজি শব্দ। সেই শব্দগুলি কী কী তার কয়েকটির উদাহরণ থাকছে নীচের ব্যাখ্যায়। **৫.** ব.শ. **পবিত্র** শব্দটির মোট পাঁচটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়ে গেছেন। সেই অর্থগুলির মূলে রয়েছে এমন একপ্রকার আচরণ, যার থেকে মনে হতে পারে কেউ যেন কাউকে একটা কিছুর সাহায্যে (ধরা যাক, সাবানের সাহায্যে) সাফ করে ধুয়ে-মুছে আপন করে নিচ্ছে এবং এই সমগ্র আচরণটিকেই **পবিত্র** বলা হচ্ছে। যেন-বা এরকম করার ফলে 'পবিত্রীকৃত' বস্তুটির থেকে তার সব অশুদ্ধতা, অশুদ্ধতার বোধ (**পাপ**), তার উদ্ভব ও বিলয়ের আবেগ দূর করা গেছে। তবে কখনো **পবিত্র** বলা হয়েছে সাফ হয়ে যাওয়া বস্তুটিকে, কখনো **পবিত্র** বলা হয়েছে সাফ করার উপায়গুলিকে, কখনো-বা সাফকরণকেই। উপরোক্ত **৩.**-এ ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলি থেকে সেরকম সাফকরণ, সাফকারক বস্তু এবং সাফকৃত বস্তুগুলিকে অনায়াসে চিনে ফেলা যেতে পারে, যেমন— শুচি, পূত, শুদ্ধ, তিলবৃক্ষ (তিলবৃক্ষের ছাই থেকে ভাল ক্ষার হয়), বর্ষণ, বৃষ্টি, জল, ঘৃত ও মধু (অসারত্যক্ত সারাংশ), ঘর্ষণ, মার্জ্জন, **তুলসী**, হরিদ্রা, মরিচ। কিন্তু বাকি অর্থগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেগুলির সঙ্গে দৈহিক সাফসুফ হওয়ার বা করার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন — পাবন তপস্যাদি বা যজ্ঞদানাদি, ঘৃতসংস্কারার্থ সাগ্র নির্গর্ভপ্রাদেশমাত্র-পরিমাণ কুশপত্রদ্বয়, শুদ্ধিকর কুশরচিত অনামিকাবেষ্টন, যজ্ঞোপবীত, কুশ, তাম্র, ঋষি, বেদমন্ত্র,

মন্ত্র, দেবতা, বিষ্ণু, শিব, অশ্লীলতাহীন ভদ্রোচিত মিষ্ট, অশ্বত্থ, উদুম্বর, ক্ষত্রিয়ের উপবীতসূত্র, শণসূত্র ... ইত্যাদি। তাহলে এগুলি কী ধরনের **পবিত্র**তার কথা বলছে?

এই প্রশ্ন মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে পড়ে যেতে পারে — আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তো দেখন্তী ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে ভাবিত ছিলেন না, তাঁদের সমস্যা ছিল ইন্দ্রিয়ের অগোচর সত্তা ও সেই সত্তাদের কাজ কারবার ও তজ্জনিত সমস্যার মোকাবিলা করা, এবং জনসাধারণকে সেসব বিষয়ে অবগত করানো। তার মানে, এই শব্দগুলির সঙ্গে সামাজিক ও মানসিক **পবিত্র**তার সম্বন্ধ আছে এবং মূলত সেগুলিকে বোঝাতেই **পবিত্র** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেই অর্থগুলিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

'পাবন তপস্যাদি বা যজ্ঞদানাদি' = বিক্রিবাটার জন্য উৎপাদিত বস্তুর গোছাগুছি, বস্তাবন্দীকরণ, বহন, এবং বাজারে আনয়ন বা কাউকে দিয়ে দেওয়া।

'ঘৃতসংস্কারার্থ সাগ্র নির্গর্ভপ্রাদেশমাত্রপরিমাণ কুশপত্রদ্বয়' = এই আচরণটিও উৎপাদিত বস্তুর সারসংগ্রাহক আচরণের সঙ্গে জড়িত, তবে ঠিক কী বোঝায়, তা এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

'শুদ্ধিকর কুশরচিত অনামিকাবেষ্টন' = আপনি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিকে প্রণাম করে **অর্ঘ** নিবেদন করলেন, তিনি আপনার আঙুলে কুশঘাসের আংটি পরিয়ে দিলেন। আপনি **পবিত্র** হয়ে গেলেন, সমাজ আর আপনার কাছে **অর্ঘ** দাবি করবে না। যখন কাগজপত্র লেখালিখির চলই হয়নি, তখন এরকম হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। **কুশ**ঘাসের আংটি পরানোর হুবহু এরকম অর্থ না হলেও এই ধরনেরই কোনো ব্যাপার হত নিশ্চয়ই।

'যজ্ঞোপবীত' = দ্র. **উপবীত**। একটি বিশেষ বস্তু বা বিষয় সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য, প্রচলনযোগ্য ... ইত্যাদি কি না, তা ঠিক করতেন যজ্ঞোপবীতধারী। তাঁর উপবীতটিই এক্ষেত্রে **পবিত্র**তা সম্পাদন করে থাকে। তার মানে, কোনো বস্তু বা বিষয় **পবিত্র** মানেই হল, তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত। সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় যে, সেই হল **অপবিত্র**।

কুশ, তাম্র, ঋষি, বেদমন্ত্র, মন্ত্র, দেবতা, বিষ্ণু, শিব, অশ্লীলতাহীন ভদ্রোচিত মিষ্ট, অশ্বত্থ, উদুম্বর, ক্ষত্রিয়ের উপবীতসূত্র, শণসূত্র ... প্রভৃতি অর্থগুলিও একইরকমভাবে **পবিত্রী**করণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে এই সামাজিক-পবিত্রীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে একপ্রকার মানসিক-পবিত্রীকরণ প্রক্রিয়াও স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত হয়ে যায়। তার থেকেই **পবিত্র**-বোধের ভিতর মানসিক **পাপ-পুণ্য** এবং শ্লীল-অশ্লীল ধারণাও ঢুকে পড়ে।

তবে পুরাণাদিতে **পবিত্র** করা প্রধানত সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করাকেই বোঝায়। **পতিতপাবনী গঙ্গায়** যে **পাপ** স্খালন করে **পবিত্র** করার কথা বলা হয়, তা শারীরিকভাবেও বটে, সামাজিকভাবেও বটে। মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, '**গো** প্রভৃতি **পবিত্রতাসম্পাদক** পদার্থসমূহের মধ্যে সুবর্ণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' তার মানে gold money-ই সবচেয়ে ভাল বিনিময়ের মাধ্যম। ... দ্র. **গো**। এখানে স্মর্তব্য যে **পূত, পবন, পাবক, পবিত্র** প্রভৃতি শব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। ব.শ. এদের যেসকল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন, সেগুলি দেখলেই বোঝা যায় সেই সম্পর্ক কত কাছাকাছি। যথা — **পূত** = যাহা **পবিত্রা**কৃত হইয়াছে। **পবন** = **পূতা**করণ করে যে। **পাবক** = **পূতা**করণ করে যে। **পবিত্র** = শুদ্ধিসাধন করে যে। ...

কে কে বা কারা বস্তু বা বিষয়কে **পবিত্র** করে, তার তালিকা আমরা পেয়ে যাই **পাবক** শব্দের ব.শব্দকোষ প্রদত্ত অর্থগুলিতে। সেখানে যাদের নাম করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে তাদের নামের অভিধার্থ থেকে এবং পুরাণাদির বর্ণনা থেকে আমরা কমবেশি চিনে নিতে পারি। একটু পরেই সেগুলির কিছুটা ব্যাখ্যা আমরা করব।

সুতরাং বিশেষণ রূপে **পবিত্র** শব্দটির অর্থ হল, যাকে **পবিত্র** করা হয়ে গেছে। আর **পবিত্র**-করা কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'গ্রহণযোগ্য' করা এবং সে ব্যাপারটি মোটামুটিভাবে তিনপ্রকার — শারীরিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা, এবং মানসিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা; অর্থাৎ **পবিত্র** তিনপ্রকার। এক) গঙ্গাধারায় বা জলধারায় ধুয়ে মুছে সাফ করে বা সেদ্ধ করে খাদ্যরূপে বস্ত্ররূপে দৈহিকভাবে ব্যবহারযোগ্য রূপে গ্রহণযোগ্য করা ... এসবই হল দৈহিকভাবে **পবিত্র** করা। দুই) সরকারিভাবে খাজনা বা ট্যাক্স নিয়ে বা না নিয়ে কোনো বস্তু বা বিষয়কে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা বা সমাজে প্রচলিত থাকার অনুমতি দেওয়া, লাইসেন্স দেওয়া, উৎপন্নকে বা **পাপ**কে হাটবাজারে (**গঙ্গায়**) বেচে দিয়ে (স্খালন করে) বিনিময়মুদ্রা বা **পুণ্য** নিয়ে নেওয়া ... এসবই হল সামাজিকভাবে **পবিত্র** করা। এবং, তিন) মানসিক গ্লানি, কলঙ্ক, পাপ বা রীতিনীতি-বিগর্হিত মানসিক বোধকে প্রায়শ্চিত্ত, শাস্তি, আত্মলাঞ্ছনা ... ইত্যাদির দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যে উত্তীর্ণ করা বা মানসিকভাবে গ্রহণযোগ্য করাই হল মানসিকভাবে **পবিত্র** করা। দেখা যায়, **পবিত্র** শব্দের উপরোক্ত ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলির সবগুলিই এই **পবিত্র** ধারণার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে মিলে যাচ্ছে। ...

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার এখানে চোখে পড়ে, তা হল, মানসিক **পবিত্রতা**র ধারণাটি হল বাকি দু'রকম **পবিত্রতা**র ধারণার থেকে জাত মানসফসল মাত্র। বাকি দু'রকম **পবিত্রতা**র ধারণা সকল সমাজে কার্যত সক্রিয় থাকে এবং রয়েছেও। শারীরিক **পবিত্রতা**র ধারণাটি সকল দেশেই প্রায় এক প্রকার। স্থানকালপাত্র-ভেদে যে যেখানে যাকে যত বেশি নোংরা অশুদ্ধ বলে বুঝেছে, তাকে তত বেশি **অপবিত্র** ঘোষণা করেছে এবং তাকে যে যার নিজের বুদ্ধিবিবেচনা মতো সাফসুতরো করার উপায় ভেবেছে, **পবিত্র** করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ...

সামাজিক **পবিত্রতা**র ধারণাটি কিন্তু নানা দেশে নানা রকম হয়ে গেছে। এর কারণ এককথায় বললে যূথতন্ত্র ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বিরোধ; ঝাঁকে থাকা ও একা থাকা, এই দুই ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবের ফল। মানবসমাজে **দক্ষ**তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে ঝাঁকের সঙ্গে ব্যক্তির, যূথতার সঙ্গে স্বতন্ত্রতার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, বিরোধ বাধে। ভারতীয় উপমহাদেশ বাদে দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই আদিম যৌথসমাজ কেবল ভেঙেই পড়েনি, তার স্থান দখল করে নিয়েছে রাষ্ট্র; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'-ভিত্তিক গণতন্ত্র। প্রায় সমস্ত

সামাজিক বা যূথতার ব্যাপারই রাষ্ট্রীয় বা সরকারি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে; এমনকি কুবেরপুঁজির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক (ব্যক্তির বিলাসভিত্তিক বা উচ্ছৃঙ্খলতাভিত্তিক) পুঁজিবাদী **পবিত্র**তার ধারণাও তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে ঐ দেশগুলির সামাজিক **পবিত্রতা**র ধারণাটি বদলে গেছে সরকারি **পবিত্রতা**র ধারণায়। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশেই সরকারিভাবে 'গ্রহণযোগ্য' মানেই রাষ্ট্রের চোখে **পবিত্র**; সমগ্র জাতির চোখে তা **পবিত্র** হোক বা না হোক। সরকার যাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বা অগ্রাহ্য করে, রাষ্ট্রের চোখে সেটাই **অপবিত্র**, বেআইনি; সমগ্র জাতি তাকে **অপবিত্র** ভাবুক আর না ভাবুক।

ভারতীয় উপমহাদেশে তা কিন্তু হয়নি। এমনকি ব্রিটিশ আসার পরও এখানে সমাজশাসন কমবেশি চলেছে এবং এখনও বেশ খানিকটা চলছে। 'ভারতবর্ষ সমাজপ্রধান দেশ, রাষ্ট্রপ্রধান নয়' — এরকম কথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলে গেছেন। রাষ্ট্রীয় শাসন এখানে উপর থেকে বসানো একটি পরগাছা। সমাজের মনোভূমি থেকে সে সরাসরি রস আহরণ করে না। ফলে, এখানে এখনও সামাজিক **পবিত্রতা**র ধারণা কমবেশি বলবৎ রয়েছে। সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি **পবিত্রতা**র ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বটে, তবে তা জনসাধারণের মনে গেড়ে বসেনি। আমাদের দেশে রাষ্ট্র যাকে বেআইনি বা **অপবিত্র** বলে, সমাজ যে তাকে বহু ক্ষেত্রেই আদৌ **অপবিত্র** ভাবে না — এরকম অজস্র ব্যাপারের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যে পুঁজি জনহিতকর, তা সে যৌথপুঁজি হোক আর ব্যক্তিপুঁজিই হোক, তার **পবিত্রতা**র ধারণাকে ভারতীয় উপমহাদেশে সামাজিকভাবে **পবিত্র** বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য ও ব্যক্তির বিলাসের জন্য পুঁজির সাধনাকে ভারতীয় সমাজ কখনো 'গ্রহণযোগ্য' বা **পবিত্র** বলে মনে করেনি। এর কারণ হল, বৌদ্ধযুগে সারা ভারতে এবং পালযুগে বঙ্গদেশে লক্ষ্মীপুঁজির সাধনা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল ব'লে লক্ষ্মীবাদী পুঁজিবাদী **পবিত্রতা**র ধারণা সমাজমনে গেড়ে বসতে পেরেছিল। মোটকথা, ভারতে যূথতার ধারণাটি বা সমাজশাসন এখনও কমবেশি বলবৎ রয়েছে। লোকে জানে কোনটি তার দায়, **পবিত্র** কর্তব্য। সেই দায়দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে সে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রীয় শাসন এযাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে মানুষের সেই দায়বোধকে আইনি 'দেয়-বোধে' বদলে নেওয়ার। পাশ্চাত্যে যা কিছু আইনসঙ্গত, তাই **পবিত্র**, লোকে সেরকম আচরণ করতে বাধ্য। এদেশে আজও যা কিছু আইনসঙ্গত তা অনেক সময় অবশ্যকরণীয় হলেও **পবিত্র** নয়, নেহাৎ বাধ্যতামূলক বা নিপীড়নমূলক। **দায়** এখানে আজও **পবিত্র**, কিন্তু 'দেয়' এখানে জোরজুলুমমাত্র, তাতে সমাজের কিংবা সমাজ-সদস্যদের সুস্পষ্ট সায় থাকে না। ...

এসব কথা বলার আর একটি কারণ এই যে, ঝাঁকের ও ব্যক্তির, সমাজের ও এককের সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজ পরিচালনার বিদ্যা ও যোগ্যতা পাশ্চাত্য রাজনীতির নেই, তাদের গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকার শাসনতন্ত্রের নেই। নেচার মানুষকে ঝাঁকপ্রাণী রূপে কোন্ নিয়মে চালাত, চালাতে চায়, সেসব বিষয়ে তাদের 'পলিটিক্যাল ইকনমি', 'পলিটিক্যাল সায়েন্স' প্রায় কিছুই জানে না। এইখানে ভারতবর্ষের অর্জন অনেক উচ্চমার্গের। সারা বিশ্বে ভারত যে '**ধর্মসৃষ্টির দেশ**' (সামাজিক রীতিনীতি সৃষ্টির দেশ) রূপে আজও খ্যাত হয়ে রয়েছে, তার কারণ তার অর্জন। আজ যে গ্লোবালাইজেশন ও লোকালাইজেশনের বা ঝাঁকের ও ব্যক্তির ঝগড়া বেধেছে, একমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশই তার সুরাহা করতে পারে। সেই পারে মানুষকে রাষ্ট্রের হাত থেকে পুনরায় সমাজের হাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে; সমাজের **পবিত্রতা**র ধারণায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কারণ সেই অর্জন এখনও তার আছে, তাকে সে পুরোপুরি নস্যাৎ করে ফেলেনি, আজও। আর সে ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় শক্তি রূপে বাংলাভাষীদের। মানুষকে রাষ্ট্রের যান্ত্রিক শাসন থেকে মানুষকে সমাজের হাতে তুলে দেওয়ার সেই প্রকল্পের রূপরেখা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমাদের 'গ' গ্রন্থের শেষ নিবন্ধগুলিতে।

পাবক বলতে সাধারণভাবে আমরা 'আগুন' বুঝে থাকি। আগুনে শোধন করে নেওয়া মানুষের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। সেই বিচারে অগ্নিকে 'শোধক' বলা যেতেই পারে। কিন্তু আমাদের তো রোগ আছে। আমরা তো কোনো শব্দের সবচেয়ে নীচের মানেটাই আগে বুঝি, সর্বোচ্চ মানেটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। 'জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবহনকারী' (= শিব) আদি ব্রাহ্মণের বিচারে যে সত্তা 'গ্রহণযোগ্য'রূপে উত্তীর্ণ, সেও তো **অগ্নিপরীক্ষা**য় পরীক্ষিত এবং অতএব **পবিত্র**। সে আগুনও তো **পাবক**ই বটে। তবুও 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' শুনলেই আমরা জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে জ্যান্ত নারীদেহকে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা তৎক্ষণাৎ ভেবে ফেলি; একবারও ভাবতেই পারি না যে, জ্ঞানী জুরিদের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ আত্মপক্ষ সমর্থন করছে। অথচ সেই আদি ব্রাহ্মণের অগ্নিশিখাই তো আজও সক্রিয় রয়েছে নানাভাবে, বরং বহুগুণ বেশি পরিমাণেই রয়েছে। সেকালে **পবিত্র** করার প্রয়োজন কতটুকুই বা হত, কতজনই বা **পাবক** ছিল। একালে **পাবক** ও **পবিত্রীকরণ**-এর তো শেষ নেই। তবে সেকথায় আমরা একটু পরে আসছি। এখানে শুধু এই কথাটি স্মরণ করিয়ে যাই যে, যত নষ্ট ও মৌলবাদী হয়ে যাক না কেন, আদি ব্রাহ্মণের সেই শিখাই তার সমস্ত অর্থ হারিয়ে প্রতীকরূপে বামুনের মাথায় চুলের টিকিরূপে এবং মৌলবীর মাথায় টুপির টিকিরূপে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে। আপনি এখন রাজকীয় ফ্লাটে থাকেন বলে কি আদি গৃহের কোনো চিহ্ন থাকবে না ভারতভূমিতে? সেই আদি ব্রাহ্মণ নানা রূপে রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক ক্ষমতার বিভিন্ন পদে সক্রিয় থেকে আজও **পাবক**-এর কাজ করে চলেছেন, আমরা তাকে চিনতে বুঝতে ভুলে গেছি, এ তাঁর দোষ নয়, কালের দোষ।

যাই হোক, ব.শ. স্পষ্ট করে বলে গেছেন যে, **পাবক** সেই যে 'পূতীকরণ করে' অর্থাৎ কোনো বস্তু বা বিষয়কে **পবিত্র** করে দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা হয়েছিল যে, 'অগ্নি' এই **পবিত্র** করে দেওয়ার কাজটি করে দেয়। তাঁরা মোট সাতাশ রকমের **পাবক**-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন — অঙ্গিরাঃ, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহ্বনীয় ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁরা 'অগ্নিদেবতা' নামে একজনকে **পাবক**রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। দ্র. **অগ্নি**। আর ছিলেন অষ্টবসুর একতম, বৈদ্যুতাগ্নি, চিত্রক, রক্তচিত্রক, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, (সাদৃশ্যে) কুসুম্ভ,

সদাচার, শোধয়িতুনর — এঁরাও ছিলেন সেকালের **পাবক**। তাছাড়া বিষ্ণু, ব্যাস, সিদ্ধ, সিহ্লক, জল, গোময়, রুদ্রাক্ষ, প্রায়শ্চিত্ত, তিলক, সম্প্রদায়চিহ্ন — এসবই **পাবক**-এর নানারূপ সত্তা। এক্ষেত্রেও সব ছেড়ে ভাষাজ্ঞানহারা নিম্ন-অধিকারীরা কেবলমাত্র **গোময়**কেই একমাত্র **পাবক** মনে করে মানুষকে তা খাইয়ে ছেড়েছে। ... মোটকথা **পাবক** মানেই 'পবিত্রীকরণোপায়' বা 'পবিত্রীকরণ' বা 'শোধন'কে বোঝানো হত, একালের অর্থহারা মানুষ তার যাই প্রয়োগ ঘটাক। তুলসী, গঙ্গা, গবী, হরীতকী — এরাও **পাবক**-এরই নানা রূপ। সামাজিক ইতিহাস অনুসারে **দক্ষ** প্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান, ও শুচি — এই তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁরা সকলেই ঘৃতভোজী। সমাজের ইতিহাসের কোন বিশেষ কালখণ্ডে কোন কোন সত্তার এইরূপ নাম রাখা হয়েছিল, তা আমরা এখনও স্পষ্ট জানি না। তবে **পাবকি** বা পাবকের অপত্য কার্ত্তিকেয় যে সমাজের আদি সামরিক শক্তি (পুলিশ-মিলিটারি) তা নিয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নেই।

আসুন আমরা একালের **পাবক**দের চিনে নেবার চেষ্টা করি। সবার আগে যাদের সহজে চেনা যায়, তাঁরা হলেন সরকারের সেই সমস্ত আধিকারিকেরা, যাঁরা কোনো না কোনো বস্তু, বিষয় ও কর্মের সরকারি অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র, লাইসেন্স, পারমিট ... ইত্যাদি দিয়ে থাকেন এবং তার ফলে ঐ সকল বস্তু, বিষয় ও কর্ম সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে ছাড়পত্র পেয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা সেগুলি সামাজিকভাবে **পবিত্র** হয়ে যায়। এই আধিকারিকদের আদি রূপগুলিকেই সেকালে অগ্নি বা **পাবক** বলা হত। একালে এঁদের অজস্র নাম হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামগুলি ইংরেজি ভাষার শব্দের সাহায্যে বলা হয়ে থাকে। সমস্ত সেক্রেটারি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসডিও, বিডিও ... প্রভৃতি আধিকারিকেরা যখনই কোনো কিছুর লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি দিয়ে থাকেন তখনই **পাবক**-এর ভূমিকা পালন করেন। সেকালে এঁদের অনেককে 'সিদ্ধ' বা 'সিদ্ধপুরুষ'ও বলা হত। তবে অ্যাকাডেমিক দুনিয়ায় যে সকল ছাড়পত্র লাগে, সেকালে সেরকম ছাড়পত্র যাঁরা দিতেন তাঁদের বলা হত 'ব্যাস'; একালে সেরকম ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত, মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাথমিক শিক্ষাদপ্তর পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই নানা নামের আধিকারিক রয়েছেন। এঁরা সবাই একালের **পাবক**। তবে তুলসী, জল, সিহ্লক, গোময় ... এসব ছিল শারীরিকভাবে **পবিত্র** করার উপায়। ঘরের দাওয়া, উঠান, খামার, হামার ... এসব শুদ্ধ বা **পবিত্র** করার জন্য সেগুলির ব্যবহার হত বলেই সেগুলি ছিল **পাবক** পদবাচ্য।

পূত, পূতঃকরণ, পূতক্রতু, পূতগন্ধ, পূতধান্য, পূতনা, পূতাত্মা, পূতি, পূতিক, পূতিকরঞ্জ, পূতিকা, পূতিকাষ্ঠ, পূতিগন্ধ, পূতিতুণ্ড : পূ ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দপরিবারে দ্রষ্টব্য।

পূয (পূয়া, পূয়ারি, পো) : ১. ✓পূয্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *পূয*** = ***পূ*** *(নবরূপী পায়ী-আধার বা দাতা) যায় যাহাতে।* ***পূয়া*** = ***পূয***-*এর আধার যে।* ***পূয়ারি*** = ***পূয়া*** *গতিশীলভাবে রহে যাহাতে।* ***পো*** = ***পূ***-*এর আধার যে।* **৩. পূয** = ব্রণাদিনির্গত রক্তবিকার, পুঁজ, বিশরণ। **পূয়ারি** = নিম্ববৃক্ষ। **পো** = পুত্র, ছেলে, বালক, শিশু, শাবক, চারাগাছ। (ব.শ)। **৪. পূয়া** ও **পো** শব্দ দুটি 'পুত্র' (son) ও 'চারাগাছ' (sapling) অর্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত, বাকি দুটি অপ্রচলিত। **৫. পূয** শব্দটির মূলে রয়েছে সত্তার ভিতর থেকে তারই কিয়দংশের 'বিশরণ' হয়ে যাওয়া, বেরিয়ে যাওয়া। ফোঁড়ার পুঁজ বেরোনোও তার মানে হতে পারে, আবার কোনো সত্তার সন্তান বেরোনোও হতে পারে। **পূয়া** ঐ **পূয**-এর আধার অর্থাৎ 'যাহা পূয-রূপে বেরিয়ে এসেছে'। গ্রামবাংলায় লোকে ব্রাহ্মণের ছেলেকে 'বামুন-পূয়া', পাঠানের ছেলেকে 'পাঠান-পূয়া', বেগুনের চারাকে 'বেগুন-পূয়া' ... আজও বলে থাকেন। আজকাল এই কথাটা বহুক্ষেত্রে **পো** হয়ে গেছে, যথা 'মাইতির-পো'। তবে নিম্ববৃক্ষ বা নিমগাছকে **পূয়ারি** বলা হয় অন্য কারণে। নিমপাতার রস খাওয়া, লাগানো, দু'ভাবেই ফোঁড়ার পুঁজ বার করা হয়। নিমের ব্যবহারিক ক্রিয়ার কারণে নিমগাছকে **পূয়ারি** বলা যেতেই পারে। 'যেমন পূজা করে যে', সে যেমন **পূজারি (পূজারী)** পদবাচ্য, তেমনি **পূয়া** কর্মটি করে যে, তাকে নিঃসন্দেহে **পূয়ারি** বলা যায়। **৬.** গ্রীক puon, pyon, ল্যাটিন pus।

পূর (পূরক, পূরণ, পূরণী, ভরপূর) : ১. ✓পূর্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *পূর*** = ***পূ*** *(কোনোকিছু দাতা) রহে যাহাতে।* ***পূরক*** = ***পূর*** *করে যে।* ***পূরণ*** = ***পূর*** *অন (on) যাহাতে।* ***পূরণী*** = ***পূরণ*** *গতিশীলরূপে আধারিত যাহাতে।* ***ভরপূর*** = *যাহা* ***ভর*** *('ভরিত') এবং* ***পূর*** *(পূরিত) উভয়ই বটে। /* **পূর** = পূর্ত্তি করে যে। **পূরক** = পূর্ত্তি করে যে। **পূরণ** = যাহার দ্বারা সংখ্যাপূরণ সাধন করা যায়। **পূরণী** = যাহার দ্বারা ক্ষতাদিপূরণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। **৩. পূর** = পূরক, জলরাশি, জলবৃদ্ধি, প্রবাহ, বীজপূরবৃক্ষ, খাদ্যবিশেষ, পূরণ, তৈলাদিসেক, ব্রণশুদ্ধি, বাহ্যবস্তুর অন্তঃপ্রবেশন; পূর্ণ, চরিতার্থ, সিদ্ধ, পুরা, সমস্ত, যথাস্থানে বিন্যস্ত বা সজ্জিত, পিঠার ভিতরের পূরক পদার্থ, পাত্রের মুখপূরক দ্রব্য বা লেপ। **পূরক** = পূর্ত্তিকারক, পূরয়িতা, সফলতাপাদক, বীজপূরবৃক্ষ, অশৌচকালে দেয় অতিবাহিকদেহনাশ-পূর্ব্বক প্রেতদেহপূরক পিণ্ড, (গণিতে) গুণক অঙ্ক (multiplier)। **পূরণ** = পূরক, সেতু, বিষ্ণুতৈল, সমুদ্র, পূরকপিণ্ড, পটারম্ভক সূত্র, পূর্ত্তি, কার্য্যতঃ সম্পাদন, বৃষ্টি, ধনুর্গুণাকর্ষণ, (গণিতে) গুণন। **পূরণী** = সংখ্যার পূরণসাধনী সংখ্যা, পূরণবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, শাল্মলি। **ভরপূর** = কানায় কানায় পূর্ণ, পরিপূর্ণ, তন্ময় চিত্ত, আত্মহারা, সম্পূর্ণভাবে, নিঃশেষে। (ব.শ.)। **৪. পূর, পূরণ, ভরপূর** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, **পূরক** ও **পূরণী** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পূর**। যদি প্রশ্ন তোলা হয়, বাংলাভাষী আজও কোন কোন শব্দকে সার্বিকভাবে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধি মেনে ব্যবহার করেন? এর উত্তরে এখন হয়তো অনেকেই একটি শব্দের তালিকা তৈরি করে দেখিয়ে দিতে পারবেন। তবে সেরকম কোনো তালিকা কেউ তৈরি করলে, আমাদের মনে হয়, এই **পূর** শব্দটি তার প্রথম দিকেই থাকবে। তবে এই **পূর** শব্দটির স্বরূপ আজকাল অনেকেই ভুলে গেছেন, ব্যবহার করেন অভ্যাসবশে। যেমন কিনা, লোকে

ভরপুর বলতে 'ভর্ত্তি' বা full বোঝেন। ব্যাপারটি কিন্তু অত সরল নয়। একটি গামলায় মুখ সমান করে বালু **ভরে** দিলে সেটি হল **ভর**, এবার তাতেই জল ঢালুন, ততক্ষণ, যতক্ষণ না গামলা থেকে জল উপচে পড়ে। এবার হল **পুর**। অর্থাৎ এবার গামলাটি **ভরপুর** হল, 'পরিপূর্ণ' হল, কানায় কানায় **পূর্ণ** হল। ব্যাপারটিকে ইংরেজিতে বলা হয় loaded and filled। শুধুমাত্র তরল বস্তু দিয়েও কোনো পাত্রকে **পূর্ণ** করা যায়, কিন্তু **ভরপুর** করতে হলে কিছু **ভরতে** হয়, এবং কঠিন বস্তু দিয়েই **ভরা** যায়, **ভার** তুলে দেওয়া যায়। তার মানে কোনো আধারে কিছু **ভরলে** আধারটির ভেতরে ফাঁক থাকতেই পারে, কিন্তু **পূরণ** করলে বিন্দুমাত্র ফাঁক থাকতেই পারবে না। তাই **পুর** মানেই 'পরিপূর্ণ', filled-up। **ভরপুর** বললে কঠিন তরল বায়বীয় সব দিক থেকেই পরি**পূর্ণ** বোঝায়। তবে বাহ্যিক বিষয়ে **ভরপুর** শব্দের ব্যবহার হয় কম, মানসিক বিষয়েই এর অধিক ব্যবহার। যথা 'তার মন আনন্দে **ভরপুর** হয়ে উঠেছে।'

এক্ষেত্রে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিশাল অর্জন ভুলেছি, তার একটি নিদর্শন এখানে আছে। তাঁরা জানতেন, শিমূলগাছ বা শাল্মলী হল এমন একটি গাছ যার ছাল দিয়ে জীবের ক্ষতস্থানের মাংসাদি **পূরণ** করা যায়। সেকারণেই সেকালে গাছটিকে **পূরণী** বলা হত। বাংলার গ্রামে কোনো বড় শিমুলগাছে প্রায়শই দেখা যায়, তার কাণ্ডের নীচের দিকটায় ছাল কেটে তুলে নেওয়ার অজস্র চিহ্ন। তার মানে মানুষের বা গরুবাছুরের **ক্ষতস্থান** পূরণ করার কাজে ঐ ছালের ব্যবহার হয়েছে। গ্রামবাংলার মানুষ এখনও এসব কমবেশি জানেন। আমরা শিক্ষিতরা পুরাই ভুলেছি। আমাদের আয়ুর্বেদাচার্যগণ হয়তো কিছুটা জানেন।

পূরী : দ্র. **পুরী**।

পূর্ণ : ১. ✓পূরি + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *পূর্ণ = যাহাকে **পূরণ** করা হইয়াছে; যাহা পূরিত হইয়াছে — এমন বোধ থাকে যাহাতে। (দ্র. **পুর**)।* / **পূর্ণমা, পূর্ণমাঃ, পূর্ণমাস্** = পূর্ণ মাঃ (চন্দ্র) যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. **পূর্ণ** = পূরিত, কৃৎস্ন, বিচ্ছেদরহিত, সারবান, সম্পূর্ণ, চরিতার্থ, আকৃষ্ট, শক্ত, আপ্তকাম, অপেক্ষাশূন্য, স্বেচ্ছায় নানাশক্তিপ্রকাশক, রববিশেষকারী, ব্যাপী। **পূর্ণককুদ** = তরুণাবস্থাপন্ন বৃষ। **পূর্ণকাম** = আপ্তেচ্ছ, আপ্তকাম। **পূর্ণকুম্ভ** = জলপূর্ণ ঘট বা কলশ, মল্লযুদ্ধবিশেষ, পূর্ণকুম্ভাকার সন্ধিবন্ধন। **পূর্ণঘট** = মঙ্গলার্থ জলপূর্ণ ঘট। **পূর্ণপাত্র** = বস্ত্রপূর্ণ বা জলপূর্ণ পাত্র, উৎসবকালে আনন্দ হেতু বলপূর্ব্বক গৃহীত বস্ত্রভূষণাদি, হোমান্তে ব্রহ্মার দক্ষিণারূপে দেয় তণ্ডুলমুদগগোধূমাদি যজ্ঞিয়ধান্যপূর্ণ পাত্র। **পূর্ণমা, পূর্ণমাঃ, পূর্ণমাস** = পূর্ণিমা। **পূর্ণহোম** = পূর্ণাহুতি। **পূর্ণাঙ্ক** = গণিতে পূর্ণরাশি (an integer)। **পূর্ণানক** = পূর্ণপাত্র, দুন্দুভি। **পূর্ণানন্দ** = দুঃখলেশহীন বা বিশুদ্ধ আনন্দ। **পূর্ণাবতার** = নৃসিংহ, রাম। **পূর্ণাহুতি** = হোমান্তে হোমদ্রব্যসমূহের আহুতি, কোনো কর্ম্মের সমাপ্তিকালে করণীয় ক্রিয়া। **পূর্ণিত** = পূর্ণ, চরিতার্থ। (ব.শ.)। ৪. **পূর্ণ** full অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলির অধিকাংশই সাধারণভাবে অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **পুর, পুর**। এখানেও সেই হাহুতাশ — কত শব্দ যে ব্যবহার না করে **নষ্ট করা হচ্ছে**! যাই হোক, এখানে বক্তব্য এই যে, **পূর্ণ** বলতে ঠিক **কী** বোঝায় সেকথা আমরা আগেই **পুর** (**ভরপুর**) শব্দে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু একথাটি খেয়াল করা হয়নি যে, কোনো সত্তা (পাত্রাদি) **পূর্ণ** মানেই, বাইরে থেকে যা-কিছু তাতে **ভরা** বা **পোরা** হয়েছে, তা সবই তার কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে, অর্থাৎ অন্তর্মুখী, বাইরের দিকে তার প্রকাশ নেই। সেই কারণে পাত্রটির বা আধারটির আধেয় সম্পূর্ণতই অন্তর্মুখী, সুপ্ত। এর বিপরীত শব্দ হতে পারে 'প্রদীপ্ত', আর সেটাই জানিয়ে গেছেন ব.শব্দকোষ। তবে এই **পূর্ণতা** যদি কঠিন বস্তুর হয়, সেক্ষেত্রে বিপরীত শব্দ হবে **চূর্ণ**।

পূর্ণিমা (পূর্ণেন্দু) : ১. পূর্ণি + ✓মা + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *পূর্ণিমা = পূর্ণ গতিশীল যে পরিমিত আধারে। পূর্ণেন্দু = পূর্ণ যে ইন্দু (দ্র. ইন্দু)।* / **পূর্ণিমা** = পূর্ণতার পরিমাণ করেন যিনি। (ব.শ.)। ৩. **পূর্ণিমা** = পৌর্ণমাসী। **পূর্ণেন্দু** = পূর্ণচন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. full moon অর্থে **পূর্ণিমা** প্রচলিত, এবং বাঙালির নামরূপে **পূর্ণেন্দু** প্রচলিত। ৫. ১৯৬৪ সালে পাঁশকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র কর প্রথম বর্ষের ছাত্রদের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসে বলেছিলেন, 'আমাদের কলেজে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশকরা ছাত্ররা ভর্তি হয় না, অধিকাংশই সেকেন্ড বা থার্ড ডিভিশন। আমার কিন্তু তা নিয়ে শোক নেই, একাদশীর চাঁদও ভেতরে ভেতরে পূর্ণিমার চাঁদ! আমার একাদশীর চাঁদেরাই একদিন পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে দেখা দেবে, অর্ধেন্দুরাই একদিন **পূর্ণেন্দু** হয়ে উঠবে, এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা আমাদের অধ্যাপনাব্রত পালন করে যেতে চাই।' সেকালে আমাদের বয়স্কমানুষেরা উত্তরসূরিদের 'পূর্ণিমার চাঁদ' হিসেবে ভাবতে ভালবাসতেন। কেনই বা মা-ঠাকুমারা তাঁদের সন্তানদের 'পূর্ণিমার চাঁদ', 'সোনার চাঁদ' ... ইত্যাদি বলতেন? এ কি নেহাৎই কথার কথা? ...

সূর্য্যের সকল আলো (যৌথব্যবস্থার সকল মানসসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকার, দ্র. **পূষা**) লাভ করে পূর্ণ হয়ে ওঠা অথচ **সূর্য্যের** তাপের (শাসন-নিপীড়নশক্তির) বিন্দুমাত্র উত্তরাধিকার গ্রহণ না করা — এটাই ছিল **পূর্ণিমার** চাঁদের গৌরব। সেই গৌরবের মর্মকথা ভুলে গেলেও কথাটি কিন্তু বাংলাভাষী আজও ভোলেনি। তাই **পূর্ণিমা** নিয়ে, **পূর্ণেন্দুকে** নিয়ে বাংলাভাষীর 'আদিখ্যেতা' আজও কমবেশি বলবৎ রয়েছে।

পূর্ত্ত (পূর্ত্তদপ্তর, পূর্ত্তি) : ১. ✓পূ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *পূর্ত্ত = পুর্ তারিত হয় যাহাতে; যে কর্ম্মের দ্বারা (সমাজদেহের) অভাব পূরিত হয়। পূর্ত্তদপ্তর = পূর্ত্ত করিবার জন্য যে দপ্তর। পূর্ত্তি = পূর্ত্ত গতিশীল যাহাতে।* ৩. **পূর্ত্ত, পূর্ত্তিন্, পূর্ত্তী** = পূর্ণ, পালিত, ছন্ন, আবৃত, পূরণ, পালন, খাতসভাপুষ্করিণ্যাদি কর্ম্ম, খাতাদিকর্ম্মে দান, গ্রহণকালে দান, সফলীকরণ, সাধন, চরিতার্থ, গুণন। (ব.শ.)। ৪. **পূর্ত্তদপ্তর** শব্দটি public works department অর্থে শহুরে বাংলাভাষায় প্রচলিত। ৫. এককালে যে কর্মের দ্বারা কোনো সমাজদেহের নানান ফাঁক বা অভাব **পূর্ণ** করা হত, তাকেই

পূর্ত্ত বলা হত। ফলে, উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত সব সত্তাগুলিকেই **পূর্ত্ত** শব্দে চিহ্নিত করা যেত। পরে কী হল, কেবলমাত্র পুষ্করিণ্যাদি খনন করার কর্মকেই **পূর্ত্ত** শব্দের উদ্দিষ্ট করে নেওয়া হল এবং শব্দটি প্রায় স্থির রূপ পেয়ে গেল। এসে পৌঁছল ইংরেজ। তাদের public works department-এর (= PWD-র) বাংলা করে নেওয়া হল **পূর্ত্ত-দপ্তর**কে। এখন শব্দটির মানে দাঁড়িয়েছে, সরকারের যে বিভাগ শহরের রাস্তাঘাট নর্দমা ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অথচ অর্থধারণ ক্ষমতার বিচারে আমরা দেখতেই পাচ্ছি, PWD যে ধারণা শব্দটির ভেতরে ধরে রেখেছে, তার তুলনায় অনেক বড়, ব্যাপক এবং যথোচিত অর্থ ধারণ করে রাখত **পূর্ত্ত** শব্দটি।

পূর্ব্ব : **১.** ✓পূর্ব্ (পূরণ্) + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **পূর্** *(প্রদত্তের রক্ষণ) বহন বাহিত যাহাতে; যার দ্বারা* **পূর্** *বহন বাহিত হইয়াছে।* **৩.** নিত্য, প্রথম পূজ্য, পূর্ব্বদিকসম্বন্ধী, পূর্ব্বদিগ্ভব, পূর্ব্বদেশস্থিত, পূর্ব্বদেশসম্বন্ধী, পূর্ব্বকালসম্বন্ধী, পূর্ব্বকালীন, আদ্য, আদি, প্রথম, প্রাক্তন, অতীতকালসম্বন্ধী, প্রাঙ্নির্দ্দিষ্ট, প্রাতঃকালীন, সন্তানপরম্পরায় পূর্ব্ববর্ত্তী, পূর্ব্ব দেশ কাল, পিতৃগণ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** previous ও East অর্থে প্রচলিত। **৫.** মূল শব্দটি হল **পূর্**। তার থেকে হয় **পূর্ব্ব**। সেই **পূর্ব্ব**ই একসময় **পুরা** হয়ে যায়। তার থেকে **পুরাণ, পুরাতন** ইত্যাদি শব্দের উদ্ভব। তবে সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। আপাতত আমাদের জানা দরকার, **পূর্ব্ব** বললে উপরোক্ত (৩.-এ প্রদত্ত) অর্থগুলি বোঝায় কেন।

পূর কাকে বলে, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এর ক্রিয়ারূপটি হল প্রদত্তের রক্ষণ বা **পূর্**। এই **পূর্** বহন বাহিত যাহাতে তাকে বলে **পূর্ব্ব**। তার মানে, এতে পুরে দেওয়ার কাজটি করা হয়ে গিয়েছে বলেই সে তা বহন করে নিয়ে চলেছে। তাই সে **পূর্ব্ব** অর্থাৎ 'আগে', 'প্রথমে', অতীতকালে ... ইত্যাদি। স্থান-কাল-পাত্র সকলের ক্ষেত্রে এই **পূর্ব্ব** বিশেষণ-শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, **পূর্ব্বস্থান, পূর্ব্বকাল, পূর্ব্বপরিচিত** ইত্যাদি। এরকম কত শব্দ যে আমাদের ছিল, এর ক্রিয়াপরিবারে তাদের উল্লেখ আছে। ...

এই পর্যন্ত ব্যাপারটি ঠিকঠাক বোঝা যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা **পূর্ব্বদিক** বলতে east side এবং **পূর্ব্বদেশ** বলতে The East বা 'প্রাচ্যদেশ' বুঝি তখনই সমস্যা দেখা দেয়। তবে সে সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের পাঁচ কথা বলার দরকার নেই, রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র বাক্যই সে সমস্যার সমাধান অনেকটাই দিয়ে চলে গেছে। সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ভারতবর্ষে হয়েছিল বলতে গিয়ে তিনি লেখেন — 'ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্ব দিকে ওঠে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। (*'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'* — রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর)। এই বাক্যে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ভৌগোলিক **পূর্ব্ব-পশ্চিম** দিককে (বা geographical east-west দিককে) এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞানের আলোর আবির্ভাবের **পূর্ব্ব-পশ্চিম** (previous-after) দিককে একবাক্যে সেরে দিয়েছেন। তার মানে, ভারতকে যে **পূর্ব্বদেশ** বা **প্রাচ্যদেশ** বলা হয়, তার কারণ হল, এখানেই সভ্যতার বিকাশ সবার আগে হয়েছিল। আর সূর্য সবার আগে যেদিকে ওঠে সেদিকটিকে তো 'আগের দিক' বা 'প্রথম দিক' বা **পূর্ব্বদিক** বলাই সঙ্গত। ...

পূর্ব্ব শব্দ সহযোগে প্রচুর শব্দ তৈরি করেছিলেন আমাদের পূর্বসূরিরা। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটির অর্থ ও কিছু মন্তব্য দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাব।

পূর্বচিত্তি : **২.** **পূর্ব্ব**তন *চিত্ত গতিশীল যাহাতে।* **৩.** (ক) বায়ুপুরাণ মতে ইনি পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট অপ্সরা। (খ) ভাগবত মতে অপ্সরাবিশেষ। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে ইনি রাজা আগ্নীধ্রের (অগ্নীধ্র) নিকট উপস্থিত হলে রাজা এঁকে গ্রহণ করেন। আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে নয় পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **পুঞ্জিকস্থলা**।

পূর্ব্বতন : দ্রষ্টব্য **নূতন**।

পূর্ব্বদিগীশ : **৩.** পূর্ব্বদিকপাল ইন্দ্র। (ব.শ.)।

পূর্ব্বদেব : **৩.** অসুর (ইহারা পূর্ব্বে দেবতা ছিল, দেবদ্বেষ হেতু দেবত্বভ্রষ্ট হয়।), নর-নারায়ণ ঋষি। (ব.শ.)। **৫.** অসুর ও দেবতা আদিতে একই সত্তা ছিলেন, একথা ভুলে গেলে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়।

পূর্ব্বদেবতা : **৩.** অনাদি দেবতা, পিতৃগণ। (ব.শ.)।

পূর্ব্ববর্ত্তী : **৩.** পূর্ব্বস্থ, পুরঃসর। (ব.শ.)। **৫.** রামবাবুর আগে আগে বা **পূর্ব্বে** যে সত্তা 'আবর্ত্তিত হয়ে হয়ে চলেছে' বা 'বর্ত্তী' রূপে চলেছে, সেই হল রামবাবুর **পূর্ব্ববর্ত্তী**। তবে, এই কথাটি একথাও জানিয়ে দিয়ে যায়, আমরা প্রত্যেকেই 'আবর্ত্তিত হয়ে হয়ে' চলেছি।

পূর্ব্বাচল : **৩.** পূর্ব্বপর্ব্বত, উদয়গিরি। (ব.শ.)। **৫.** পূর্ব্বতন সামাজিক সংগঠন। প্রথম যুগে বা উদয়ের যুগে যে সমাজশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

পূর্ব্বাশা : **৩.** পূর্ব্ব দিক, প্রাচী। (ব.শ.)। **৫.** বোঝাই যাচ্ছে যে, **পূর্ব্ব** + **আশা** যোগ করে **পূর্ব্বাশা** শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। ইতোপূর্বে **আশা** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, শব্দটি 'মন যে পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারে', ততদূর পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছাকে কিংবা ততদূরের বস্তু বা বিষয় পাওয়ার ইচ্ছাকে বোঝায়। তাহলে, **পূর্ব্বাশা** শব্দের মানে দাঁড়ায়, **পূর্ব্বের** বা আগের **আশা**, **পূর্ব্ব** দিকের **আশা**, **পূর্ব্ব** দেশের বা প্রাচ্যের **আশা**, এবং অথবা পুরাতনের প্রতি **আশা**।

পূর্ব্বাশ্রম : **৩.** সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে বাসবংশপরিচয়াদি। (ব.শ.)। **৫.** শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে আমাদের সন্ন্যাসী মহলে। বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুসন্ন্যাসীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় লোকে শব্দটির ব্যবহার করেন এইভাবে — 'অমুক মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়' ... ইত্যাদি কিংবা 'অমুক মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন' ... ইত্যাদি। এর থেকে আর কিছু জানা যাক আর নাই যাক, **আশ্রম** কথাটির অর্থ আসলে কী ছিল, সেকথা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আপনি চাষবাস করছেন এবং পরিবার পরিজন সামলাচ্ছেন মানে আপনি একপ্রকারের **আশ্রম**-এর **আশ্রমিক**, এক্ষেত্রে **গৃহস্থাশ্রম**-এর **আশ্রমিক**। যিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, তিনি আগের **আশ্রম** ছেড়ে নতুন **আশ্রম** (সন্ন্যাস-**আশ্রম**) গ্রহণ করেছেন। দ্র. **তপস্যা**।

পূর্ব্বমীমাংসা : দ্র. **মীমাংসা**।

পূজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপূজা, পূজ্, পূজ, পূজক, পূজনীয়, পূজনীয়া, পূজয়িতা, পূজা, পূজাকর, পূজাপান, পূজারী, পূজার্হ, পূজিত, পূজ্য, পূজ্যতমতমোত্তর, পূজ্যবান, পূজ্যমান, প্রপূজিত, সম্পূজন।

পূজ্ = নবরূপী পায়ী-আধারের জনন; (কোনো কিছু) দাতার জনন।
পূজ = নবরূপী পায়ী-আধারের বা প্রদানকারীর জনন থাকে যাহাতে।

পূজা (পূজ, পূজক, পূজন, পূজারী) : ১. ✓পূজ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *পূজ = পূ (দাতা) জনিত হয় যাহাতে। পূজক = পূজন করে যে। পূজন = পূজ অন (on) যাহাতে। পূজা = পূজ-এর আধার যে। পূজারী = পূজা রহে যাহাতে তাহার গতিশীল আধার যে।* ৩. **পূজ** = অর্চ্চনা করা, সম্মান করা, আদর করা, সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করা, মানা। **পূজক** = অর্চ্চয়িতা, পূজাকারী। **পূজন** = পূজা, সম্মাননা। **পূজা** = অর্চ্চনা, সম্মাননা, সৎকার, পূজাদ্রব্য, পুরস্কার। **পূজারী** = দেবালয়ে পূজার্থ নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, দেবল। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. যে আচরণের দ্বারা প্রতিকূল / উদাসীন শক্তিমানের মনে প্রসন্নতা আনার চেষ্টা হয় এবং যার ফলে প্রসন্নচিত্তে শক্তিমান প্রসাদ বা বর ইত্যাদি দিতে পারেন, অর্থাৎ (পূজাকারীর) যে আচরণের দ্বারা শক্তিমানের তরফে 'পূ' জনিত হয়, সেটিকে সঙ্গতভাবে **পূজা** বলা যায়। 'আচরণ' বলতে বলতে মুখে কিছু বলা, তা সে প্রশংসাসূচক সম্মানসূচক কথা জনন করা হতে পারে (যেসব কথা সত্য হতে পারে, না-ও হতে পারে), অর্থপূর্ণ মন্ত্র হতে পারে, অর্থহীন মন্ত্রও হতে পারে; আচারমূলক কিছু ক্রিয়াকলাপ হতে পারে — যেমন ফুল দেওয়া, বেলপাতা দেওয়া, জল দেওয়া, প্রণাম করা ... ইত্যাদি, সেগুলি তত্ত্ব্ আচারমাত্র হতে পারে, প্রতীকও হতে পারে। যতদূর বোঝা যায়, একালে খেলায় জিতে যাওয়া ক্লাবের ফুটবল টিমের ক্যাপটেনকে যেমন ক্লাবের সদস্যরা আবেগে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় কাঁধে নিয়ে নাচতে নাচতে আনন্দে আপ্লুত হয়, ভাল ভাল কথা বলে, ভাল খাবার দেয়, **অর্ঘ্য** দেয়, সেবা করে ... অনেকটা সেইরকমভাবে বৈদিকযুগের অনেক আগেই আদিম যৌথ মানবঝাঁকের সদস্যরা তাদের পরিচালককে নিয়ে (জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবহনকারী **শিব**কে নিয়ে) আবেগে আপ্লুত হত। এটাই ছিল **পূজা**র আদি রূপ। তখন স্বভাবতই কোনো প্রতিমা ছিল না, মিথ্যাচার ছিল না, যাকে পূজা করা হচ্ছে তার সঙ্গে পূজারী জনসাধারণের অতি-ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক ছিল, ভক্তি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল। তখন প্রত্যেক সমাজসদস্য যেমন তাঁদের পরিচালকের জন্য প্রাণ দিতে পারতেন, তেমনি পরিচালকও সমাজের জন্য জীবনপ্রাণ সর্বস্ব দিতে পারতেন। এখানে বলে রাখা ভাল, ভারতবর্ষকে বলা হয় শিবঠাকুরের দেশ।

যাই হোক, এই প্রকৃত **পূজা** অনুষ্ঠান অক্ষত থাকেনি। বৈদিক যুগের সূত্রপাতে **দক্ষযজ্ঞের** পর দেখন্তী-পূজার বা আধুনিক **পূজা**র প্রচলন হয়। এই **পূজা**র সূত্রপাত ঘটান শিববিরোধীরা। তাঁরা প্রকৃত শিবকে বাদ দিয়ে শিবের রুদ্রমূর্তি গড়ে নানারকম প্রকাশ্য আচারআচরণমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রুদ্রের দেখন্তী-**পূজা** শুরু করেন এবং শিবনীতি অমান্য করার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। (ঠিক যেভাবে একালে কিছু লোক গান্ধী ও মার্কসের মূর্তি বসিয়ে বা ছবি টাঙিয়ে গান্ধীপূজা মার্কসপূজা ইত্যাদি করে এবং গান্ধী ও মার্কসের নীতি অমান্য করে, এও সেইরকম।) ... এর ফলে প্রকৃত শিবপন্থীরা পড়ে যান মুশকিলে। তাঁরা দেখতে পান তাঁদের শত্রুরাই তাঁদের চেয়ে বড় শিবপন্থী হয়ে গেছে। ... (দ্র. **অর্ঘ, অর্ঘ্য, দেবল**) ...

বাস্তব পরিস্থিতি অবশ্য এখানেই থেমে থাকে না। ক্রমে মিথ্যা-পূজারীদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়, পাল্টা মূর্তিপূজার সূচনা হয়, মূর্তিঘাতী বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, নতুন নতুন শক্তিসাধনার সূত্রপাত হয়, সাংখ্য আসে, উপনিষদ আসে, তান্ত্রিকেরা আসেন, বৌদ্ধরা আসেন ... **পূজা**-সংস্কৃতিতে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মন কলরবমুখর হয়ে ওঠে। ... (বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের 'ঘ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।)

পৃ (পৃ., পরা, পরি, পার্, পারি, পৃচ্, পৃষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপর, অপর, অপরকায়, অপরঞ্চ, অপরত্র, অপরপক্ষ, অপরস্বা, অপররাত্র, অপরবর্ষা, অপরস্পরসম্ভূত, অপরান্ত, অপরার্দ্ধ, অপরাপর, অপরাহ্ন, অপরিক্রম, অপরিগণিত, অপরিগ্রহ, অপরিচ্ছদ, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছেদ, অপরিচ্ছেদ্য, অপরিণাম, অপরিণামদর্শী, অপরিপক্ব, অপরিবৃত, অপরিমাণ, অপরিষ্কার, অপরিষ্কৃত, অপরিসর, অপরিসীম, অপরিস্ফুট, অপরিহরণীয়, অপরিহার্য্য, অপর্ণ, অপর্ণা, অপর্ব্ব, অপর্য্যন্ত, অপর্য্যাপ্ত, অপর্য্যুষিত, অপলায়ন, অপশ্চিম, অপার, অপারক, অপার্থিব, অপূর্ণ, অপূর্ব্ব, অপূর্ব্বদৃষ্ট, অপৃক্ত, অপৌরুষ, অপৌরুষেয়, অব্যাপার, অরু, আঅর, আওর, আগেকার, আপার, আপূর, আপূর্ত্ত, আপূর্য্যমাণ, আর, কর্ণপৃষ্ঠ, গৃহপৃষ্ঠ, পর, পরওয়ানা (পরবাণা), পরঃশত, পরঃসহস্র, পরক(খ), পরকলত্র, পরকিতা, পরকীয়, পরকীয়া, পরকূট, পরক্ষেত্র, পরখ, পরগাছা, পরগামী, পরঘর, পরচক্র, পরচর্চ্চক, পরচা (পরিচয়), পরচুল, পরচুলা, পরচিতেন, পরচ্ছন্দ, পরছিদ্র, পরজ, পরজন, পরজয়, পরজাত, পরজায়ী, পরজিত, পরণ (পরিধান), পরত (স্বতঃপ্রণোদিত-পরতপ্রণোদিত), পরত (পরতে-পরতে, পর্ব্বে-পর্ব্বে), পরতঃ, পরতন্ত্র, পরতাল (পরিতোলন), পরতে-পরতে, পরত্র, পরত্ব, পরদল, পরদার, পরদারিক, পরদেশ, পরদেশিয়া, পরদেশী, পরদ্রোহ, পরদ্বেষী, পরধর্ম্ম, পরনারী, পরনারীচোর, পরনিপাত, পরন্তপ, পরন্ত, পরপক্ষ, পরপদ, পরপাকনিবৃত্ত, পরপিণ্ড, পরপিণ্ডাদ, পরপুরঞ্জয়, পরপুরুষ, পরপুষ্ট, পরপূর্ব্বা, পরবত্তা, পরপ্রপৌত্র, পরবর্ত্তী, পরবশ, পরবশ্য, পরবাদ, পরবাদী, পরবান, পরবীরঘ্ন, পরবীরহা, পরব্যোম, পরব্রহ্ম, পরভাগ, পরভাগ্যোপজীবী, পরভৃৎ, পরভৃত, পরম্, পরম, পরমক, পরমকাষ্ঠা, পরমগতি, পরমপদ, পরমপুরুষ, পরমপুরুষার্থ, পরমম্, পরমর্ষি, পরমহংস, পরমা, পরমাই, পরমাউ, পরমাঞ্জি, পরমাণু, পরমাত্মা, পরমানন্দ, পরমান্ন, পরমাপ্রকৃতি, পরমায়ুঃ, পরমার্থ, পরমেশ, পরমেশ্বর, পরমেষ্ঠ, পরম্পরা, পরম্পরাগত, পরম্পরাপ্রাপ্ত,

পরম্পরীণ, পরবাণা (পরওয়ানা), পরলোক, পরশু, পরশুরাম, পরশ্বঃ, পরশ্বধ, পরস্তাৎ, পরস্পর, পরস্মৈপদ, পরস্ব, পরা, পরাক্(চ্), পরাক, পরাকরণ, পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম, পরাক্রান্ত, পরাগ, পরাগকেশর, পরাগত, পরাঙ্মুখ, পরাচীন (অর্বাচীন), পরাজয়, পরাজি, পরাত্মা, পরাৎপর, পরাত্মা, পরাধিকার, পরাধিনী, পরাধীন, পরান্ন, পরাপর, পরাবর, পরাবর্ত্ত, পরাবসু, পরাবস্থ, পরাবৃত্ত, পরাবৃত্তি, পরাভব, পরাভূত, পরামর্শ, পরামর্শন, পরামৃষ্ট, পরায়ণ, পরায়ত্ত, পরায়ন, পরার্থ, পরার্দ্ধ, পরাশর, পরাসন, পরাসু, পরাস্ত, পরাহ, পরাহত, পরাহ্ণ, পরি, পরিকম্প, পরিকর, পরিকর্ত্তা, পরিকর্ম্মা, পরিকর্ম্মী, পরিকক্ষন, পরিকল্পন, পরিকল্পনা, পরিকীর্ণ, পরিকীর্ত্তন, পরিকীর্ত্তিত, পরিকূজন, পরিকূজিত, পরিকৃত, পরিক্খা (পরীক্ষা), পরিক্রম, পরিক্রমা, পরিক্রয়, পরিক্রয়ণ, পরিক্রান্ত, পরিক্রান্তি, পরিক্রিয়া, পরিক্রীত, পরিক্ষয়, পরি(রী)ক্ষিৎ, পরিক্ষিপ্ত, পরিক্ষেপ, পরিক্ষেপক, পরিখ, পরিখা, পরিখাত, পরিখেদ, পরিগণন, পরিগণনা, পরিগত, পরিগৃহীত, পরিগ্রহণ, পরিগ্রহীতা, পরিঘ, পরিঘাতন, পরিঘট্টন, পরিচয়, পরিচর, পরিচরণ, পরিচর্য্যা, পরিচার, পরিচারক, পরিচারিকা, পরিচালক, পরিচালিত, পরিচিত, পরিচিন্তক, পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছিত্তি, পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ্য, পরিচ্যুতি, পরিজন, পরিজল্পিত (জল্প), পরিজ্ঞাত, পরিডীন, পরিডীনক, পরিণত, পরিণতি, পরিণদ্ধ, পরিণমন, পরিণয়, পরিণয়ার্হ, পরিণাম, পরিণামদর্শী, পরিণামপথ্য, পরিণামবাদ, পরিণামশূল, পরিণায়ক, পরিণাহ, পরিণাহবান, পরিণাহী, পরিণীত, পরিণীতা, পরিণেতা, পরিণেয়, পরিতঃ, পরিতর্পণ, পরিতাপ, পরিতুষ্ট, পরিতুষ্টি, পরিতোলন, পরিতোষ, পরিতোষণ, পরিত্যক্ত, পরিত্যাগ, পরিত্যাগী, পরিত্যাজ্য, পরিত্রাই(হি), পরিত্রাণ, পরিত্রাত, পরিত্রাতব্য, পরিত্রাতা, পরিত্রাহি, পরিদংশিত, পরিদর্শক, পরিদান, পরিদায়ী, পরিদৃশ্যমান, পরিদেব, পরিদেবক, পরিদেবনা, পরিদেবিত, পরিদেবী, পরিদ্যূন, পরিধান, পরিধানীয়, পরিধায়ী, পরিধি, পরিধিস্থ, পরিধূপিত, পরিধূসর, পরিধেয়, পরিনির্ব্বাণ, পরিনিষ্ঠা, পরিপক্ক, পরিপণ, পরিপণন, পরিপণিত, পরিপতন, পরিপন্তি, পরিপন্থিক, পরিপন্থী, পরিপাক, পরিপাটল, পরিপাটী, পরিপাণ্ডু, পরিপালন, পরিপালয়িতা, পরিপালিত, পরিপাল্য, পরিপিঙ্গ, পরিপীড়ন, পরিপীড়া, পরিপুটন, পরিপূত, পরিপূর, পরিপূরণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণতা, পরিপৃচ্ছা, পরিপ্রশ্ন, পরিপ্রেপ্সু, পরিপ্লব, পরিপ্লবতা, পরিপ্লাবন, পরিপ্লুত, পরিফুল্ল, পরিবৎসর, পরিবদ্ধ, পরিবর্জ্জন, পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্তক, পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তী, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্হ, পরিবর্হণ, পরিবহ, পরিবহন, পরিবাদ, পরিবাদন, পরিবাদী, পরিবাদিনী, পরিবাধী, পরিবাধা, পরিবাপ, পরিবাপণ, পরিবাপিত, পরিবার, পরিবারিত, পরিবাস, পরিবাহ, পরিবাহিত, পরিবাহী, পরিবিত্ত, পরিবিত্তি, পরিবিন্দক, পরিবিন্ন, পরিবীত, পরিবৃংহিত, পরিবৃঢ়, পরিবৃত, পরিবৃতি, পরিবৃত্ত, পরিবৃত্তি, পরিবেত্তা, পরিবেদন, পরিবেদনা, পরিবেদনীয়া, পরিবেদিনী, পরিবেশ, পরিবেশক, পরিবেশন, পরিবেষ্টন, পরিবেষ্টা, পরিবোধ, পরিবোধন, পরিব্যয়, পরিব্রজ্যা, পরিব্রাজ, পরিব্রাজক, পরিব্রাট, পরিভব, পরিভাব, পরিভাবন, পরিভাবনা, পরিভাবী, পরিভাষণ, পরিভাষা, পরিভুক্ত, পরিভূত, পরিভূতি, পরিভোক্তা, পরিভোগ, পরিভ্রংশ, পরিভ্রংশন, পরিভ্রম, পরিভ্রমণ, পরিভ্রষ্ট, পরিভ্রামণ, পরিমণ্ডল, পরিমন্থর, পরিমন্দ, পরিমর্দ্দ, পরিমল, পরিমলসখা, পরিমাণ, পরিমাপ, পরিমার্গ, পরিমার্গণ, পরিমার্গিতব্য, পরিমার্গ্য, পরিমার্জ্জন, পরিমিত, পরিমিতি, পরিমুণ্ডা, পরিমূঢ়, পরিমৃজ্য, পরিমৃদিত, পরিমৃষ্ট, পরিমেয়, পরিমোক্ষ, পরিমোহণ, পরিমোহী, পরিম্লান, পরিযক্ষ, পরিরক্ষণ, পরিরক্ষণ, পরিরক্ষণীয়, পরিরক্ষিণী, পরিরক্ষিতা, পরিরক্ষী, পরিরব্ধ, পরিরম্ভ, পরিরম্ভণ, পরিরম্ভী, পরিলঘু, পরিলোপ, পরিলোলিত, পরিশঙ্কনীয়, পরিশঙ্কিত, পরিশঙ্কী, পরিশিষ্ট, পরিশীলন, পরিশীলিত, পরিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধি, পরিশোধ, পরিশোধন, পরিশূন্য, পরিশেষ, পরিশ্রম, পরিশ্রমী, পরিশ্রান্ত, পরিষদ, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত, পরিস্কৃতি, পরিস্ক্রিয়া, পরিষ্টো(স্তো)ম, পরিষ্ট, পরিষ্বক্ত, পরিষ্বঙ্গ, পরিষ্বঞ্জন, পরিসংখ্যা, পরিসংখ্যাত, পরিসংখ্যান, পরিসন, পরিসমাপ্ত, পরিসমূহন, পরিসর, পরিসর্প, পরিসারী, পরিস্থিতি, পরিস্পন্দ, পরিস্পন্দন, পরিস্ফুট, পরিস্ফুটন, পরিস্ফুরণ, পরিস্ফুরিত, পরিস্য(ষ্য)ন্দ, পরিস্রব, পরিস্রুত, পরিহ, পরিহত, পরিহর, পরিহরণ, পরিহর্ত্তব্য, পরিহার, পরিহার্য্য, পরিহাস, পরিহাস্য, পরিহিত, পরিহীণ, পরিহৃত, পরী, পরীক্ষক, পরীক্ষণ, পরীক্ষা (পরখ), পরীক্ষিত, পরীক্ষিৎ, পরীত, পরীপ্সা, পরীপ্সু, পরুষ, পরে, পরেত, পরেতর, পরেশ, পরেশান, পরোক্ষ, পরোঢ়া, পরোপকার, পরোপদেশ, পরোয়া (পর-বহ), পরোয়ানা (পর-বাণা), পরোরজাঃ, পর্কটি(টী), পর্চিত, পর্জন্য, পর্জন্যা, পর্ণ, পর্ণকুটিকা, পর্ণকুটী, পর্ণকুটীর, পর্ণকৃচ্ছ্র, পর্ণনর, পর্ণলতা, পর্ণবীটিকা, পর্ণমণি, পর্ণল, পর্ণশয্যা, পর্ণশালা, পর্ণাদ, পর্ণাহার, পর্দ্দ, পর্দ্দা (পর্দা), পর্দ্দা(পর্দা)নসীন, পর্পট (পাঁপড়), পর্ব্ব, পর্ব্বক, পর্ব্বকাল, পর্ব্বগামী, পর্ব্বণী, পর্ব্বত, পর্ব্বতকুমারী, পর্ব্বতজা, পর্ব্বতপতি, পর্ব্বতবাসী, পর্ব্বতরাজ, পর্ব্বতীয়, পর্ব্বতেশ, পর্ব্বভাগ, পর্ব্বাস্ফোট, পর্ব্বাহ, পর্য্যঙ্ক, পর্যঙ্কবন্ধন, পর্য্য(র্য্যা)টক, পর্য্যটন, পর্য্যটন্ত, পর্য্যটিত, পর্য্যন্ত, পর্য্যবসান, পর্য্যবসিত, পর্য্যবস্থা, পর্য্যবস্থান, পর্য্যবস্থাতা, পর্য্যবস্থিত, পর্য্যবেক্ষক, পর্য্যয়, পর্য্যয়ণ, পর্য্যশ্রু, পর্য্যসন, পর্য্যস্ত (বিপর্য্যস্ত), পর্য্যাকুল, পর্য্যাচান্ত, পর্য্যাণ, পর্য্যাপ্ত, পর্য্যাপ্তি, পর্য্যাবিল, পর্য্যায় (পাই), পর্য্যায়কার্য্য (shift-duty), পর্য্যায়শয়ন, পর্য্যায়সেবা, পর্য্যায়ান্ন, পর্য্যায়োক্ত, পর্য্যালোচন, পর্য্যালোচনা, পর্য্যাস, পর্য্যুক্ষণ, পর্য্যুৎসুক, পর্য্যুদস্ত, পর্য্যুদাস, পর্য্যুপাসীন, পর্য্যুষিত, পর্শু, পর্শ্বধ, পর্ষদ, পলায়ন (পরায়ন), পহির, পহিরণ, পহিরা, পহিরাণ, পহিলাল, পট্ট, পট্টি, পাই (পর্য্যায়), পাইকড়, পাউড়ি (পর্ব্ব), পাঁপড়, পাঁপড়ি, পাঁপর, পাঁব, পাঁয়জোর, পাকুড়(ড়ি) (পর্কটি), পান্না, পাপড়ি (পাবড়ি), পাব, পাব (pub), পাবড়া, পাবদা, পাবুড়ি, পায়রা, পার, পারক, পারক্য, পারগ, পারগত, পারগমন, পারগামী, পারঘাটা, পারণ, পারণীয়, পারতন্ত্র, পারৎপক্ষে, পারত্রিক, পারদ, পারদর্শক, পারদর্শী, পারদা, পারদারিক, পারদৃশ্বা, পারদেশ্য, পারমহংস, পারমার্থিক, পারম্পরীণ, পারম্পর্য্য, পারলৌক্য, পারলৌকিক, পারশব, পারশী(সি)ক, পারশ্বধিক, পারসী, পারসীক, পারস্ত্রৈণেয়, পারা, পারান, পারানী, পারাপার, পারাবত, পারাবার, পারায়ণ, পারাশর, পারাশরী, পারি(রী)ক্ষিত, পারিখ (পারেখ?), পারিজাত (দ্র. অমরতরু), পারিজাতক, পারিণায্য, পারিণায্য, পারিণাহ্য, পারিতোষিক,

পারিতোষ্য, পারিপাট্য, পারিপা(যা)ত্র, পারিপার্শ্ব(র্শ্বি)ক, পারিপ্লব, পারিবর্হ, পারিবিত্ত্য, পারিভদ্র (পালট্যা, পালধি), পারিভদ্রবৃক্ষ, পারিভাষিক, পারিমিত্য, পারিযাত্র, পারিযাত্রক, পারিযাত্রিক, পারিয়াল, পারিষদ, পারিহাই, পারিহাস্য, পারীণ, পারীন্দ্র, পারুল, পারুলডিহি, পারুষ্য, পারোক্ষ, পার্জ্জন্য, পার্থ, পার্থজ, পার্থক্য, পার্থিব, পার্থিবী, পার্থিবাকর্ষণ, পার্ব্বণ, পার্ব্বণী, পার্ব্বত, পার্ব্বতিয়া, পার্ব্বতী, পার্ব্বতীয়, পার্ব্বত্য, পার্য্যমাণে, পার্শ্ব, পার্ষত, পার্ষতী, পার্ষদ, পার্ষদ্য, পার্ষ্ণি, পার্ষ্ণিগ্রহ, পার্ষ্ণিগ্রহণ, পার্ষ্ণিঘাত, পার্ষ্ণিত্র, পার্ষ্ণিসারথি, পালঙ্ক(ঙ্কি), পালঙ্গ, পিঁধ, পিঁধান (পরিধান, পহননা), পিথিবি (পিথিবী), পিধ, পিধন, পিধাতব্য, পিধান, পিধায়ক, পু(পূ)ণমি, পু(পূ)নমি, পু(পূ)ব, পুর, পুরকোট্ট, পুরজিৎ, পুরদেবতা, পুরদ্বিট্, পুরপাল, পুরবাসী, পুরভিৎ, পুরমার্গ, পুররিপু, পুরশাসন, পুরঃ (পুরস্), পুরঃপাক, পুরঃপ্রহর্ত্তা, পুরঃফল, পুরঃসর, পুরঞ্জন, পুরঞ্জয়, পুরট, পুরতঃ, পুরস্ত, পুরন্দর, পুরন্দরা, পুরন্ধ্রি(ন্ধ্রী), পুরশ্চরণ, পুরশ্চর্য্যা, পুরস্কর, পুরস্করণ, পুরস্কার, পুরস্কৃত, পুরস্ক্রিয়া, পুরস্তাৎ, পুরা, পুরাকথা, পুরাকল্প, পুরাকৃত, পুরাণ, পুরাণপুরুষ, পুরাতন, পুরাবিৎ, পুরাবৃত্ত, পুরারাতি, পুরারি, পুরি, পুরিয়া, পুরী, পুরীষ, পুরু, পুরুখ, পুরুজিৎ, পুরুট, পুরুত, পুরুতগিরী, পুরুতঠাকুর, পুরুতঠাকরুণ, পুরুব, পুরুল, পুরুষ, পুরুষক, পুরুষকার, পুরুষকুঞ্জর, পুরুষকেশরী, পুরুষক্ষেত্র (স্ত্রীক্ষেত্র), পুরুষগ্রহ, পুরুষজ্ঞান, পুরুষডাকিনী, পুরুষত্ব, পুরুষনাগ, পুরুষপাগলী, পুরুষপুঙ্গব, পুরুষপুণ্ডরীক, পুরুষনাথ, পুরুষবর, পুরুষবাহ, পুরুষবেভার, পুরুষব্যবহার, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষমাত্র, পুরুষমানী, পুরুষমেধ, পুরুষরতন, পুরুষরাশি, পুরুষর্ষভ, পুরুষশার্দ্দুল, পুরুষসিংহ, পুরুষসূক্ত, পুরুষাঙ্গ, পুরুষাদ, পুরুষাধিকার, পুরুষানুক্রমিক, পুরুষায়ুষ, পুরুষার্থ, পুরুষাশন, পুরুষাশী, পুরুষেন্দ্র, পুরুষোত্তম, পুরুহূত, পুরূরবা, পুরোগ, পুরোগামী, পুরোডাশ (পিঠা, পৈঠর), পুরোধা, পুরোধাঃ, পুরোবর্ত্তী, পুরোবাত, পুরোভাগ, পুরোভাগী, পুরোহিত, পুর্য্যষ্টক, পৃ, পৃক্কা, পৃক্ত, পৃক্তি, পৃচ্, পৃচ্ছক, পৃচ্ছা, পৃতনা, পৃথক্, পৃথক্করণ, পৃথক্ত্ব, পৃথগ্জন, পৃথগ্বিধ, পৃথক্পিণ্ড, পৃথগন্ন, পৃথা, পৃথিবী, পৃথিবীদোহন, পৃথিবীপাল, পৃথিবীভুক, পৃথিবীভৃৎ, পৃথিবীশ, পৃথিবীশ্বর, পৃথু, পৃথুক, পৃথুল, পৃথুলা, পৃথ্বী, পৃথ্বীজ, পৃথ্বীশ, পৃদাকু, পৃষ, পৃষৎ, পৃষতাশ্ব, পৃষতী, পৃষৎক, পৃষদশ্ব, পৃষন্তি, পৃষোদর, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠক, পৃষ্ঠগোপ, পৃষ্ঠগ্রন্থি, পৃষ্ঠতঃ, পৃষ্ঠপোষক, পৃষ্ঠপ্রদর্শন, পৃষ্ঠফল, পৃষ্ঠবংশ, পৃষ্ঠবাস্তু, পৃষ্ঠবাহ, পৃষ্ঠব্রণ, পৃষ্ঠভঙ্গ, পৃষ্ঠমাংস, পৃষ্ঠরক্ষ, পৃষ্ঠশয়, পৃষ্ঠাঘাত, পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি, পৃষ্ঠাস্থি, পৃষ্ঠ্য, পূ, পৈঠর, পৌর, পৌরব, পৌরষ, পৌরস্ত্য, পৌরহিত্য, পৌরাণ, পৌরাণিক, পৌরী, পৌরুষ, পৌরুষেয়, পৌরুহূত, পৌরুহূতী, পৌরোভাগ্য, পৌরোহিত্য, পৌর্ণমাস, পৌর্ত্তিক, পৌর্ব্বদেহিক, পৌর্ব্বাপর্য্য, পৌর্ব্বাহ্ণিক, পৌর্ব্বিক, বৃষপর্ব্বা, ব্যাপার, ব্যাপৃত, সব্যাপার, সম্পর্ক, সম্পৃক্ত (সম্পর্ক), সুপর্ণ, সুপুরুষ, সেনাপৃষ্ঠ, স্তম্ভপৃষ্ঠ, হর্ম্মপৃষ্ঠ।

পৃ (পৃ, পরা, পরি, পার, পারি, পৃচ্, পৃষ্) = পায়ীর আবর্ত্তন; পারী। (প্রি)। **পৃ** = পারীর আধার। **পরা** = পায়ী রহে যাহাতে (**পর**) তাহার আধার। **পরি** = পায়ীর রহন গতিশীল যাহাতে। **পার** = পর হইতে জাত। **পারি** = পার গতিশীল যাহাতে। **পৃচ** = পারী চয়িত হয় যাহাতে। **পৃষ** = পারীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।

অপর্ণা : ১. দ্র. **পর্ণ**। ২. *নাই 'পর্ণ' (যাহা পরিপূরক রূপে ক্রিয়া করে) যাহার, তাহার আধার যে।* / যাঁহার ভক্ষণার্থ পর্ণও ছিল না, এমন প্রকৃতি। যিনি ব্রতকালে পত্রভক্ষণও ছাড়িয়াছিলেন, এমন প্রকৃতি। (ব.শ.)। ৩. পার্ব্বতী, উমা। (ব.শ.)। ৪. কেবল নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার প্রথম কন্যার নাম **একপর্ণা**। অর্থাৎ যে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট কর্মের নীতি মান্য করে তদনুযায়ী কর্ম করে তার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আর কোনো কিছু করে না। দ্র. **একপটলা**। সেরকম কর্মও যিনি ত্যাগ করেছিলেন, তাকে **অপর্ণা** বলে।

অপূর্ব্ব : ২. *যা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।* / যাহার সদৃশ পূর্ব্ব বস্তু নাই; যাহা পূর্ব্ব নহে; যাহা অন্য প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। (ব.শ.)। ৩. অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অসাধারণ, অলৌকিক, আশ্চর্য্য ... যাগাদিজন্য স্বর্গাদিজনক গুণবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. very beautiful বা wonderful অর্থে বেশি প্রচলিত। ৫. সেকালে invention এবং/বা innovation কে 'যাগাদিজন্য স্বর্গাদিজনক গুণবিশেষ' (= উদ্ভাবন, আবিষ্কার প্রভৃতি **স্বর্গ** ইত্যাদি জননকারী গুণবিশেষ) বলা হত। **পূর্ব্বে** থাকে প্রচলিত জ্ঞান বা ন্যায়; **উদ্ভাবন** বা **আবিষ্কার পূর্ব্বে** থাকে না, তাই **অপূর্ব্ব**। কর্মযজ্ঞে এই গুণটির বিশেষ প্রয়োজন হয়। দ্র. **অন্যায়, অদৃষ্ট**।

অপৌরুষেয় : ১. দ্র. **পুরুষ**। ২. *যা পৌরুষেয় নয়।* / যাহা পুরুষ কৃত নহে, যাহা করা অশক্য। (ব.শ.)। ৩. অপুরুষ-কৃত, নিত্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যে কাজ অগ্রগামী বা পালক-পূরক (পুরুষ) করেনি, করেছে অন্যে, সেটি **অপৌরুষেয়**। ভারতসমাজে প্রজাপতিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরিচালক শাসকরাও '**পুরুষ**' পদবাচ্য হয়ে যায়, তারা যা করেনি তাও একসময় **অপৌরুষেয়** হয়ে যায়। আবার ব্যক্তি না করে দল বা গোষ্ঠীকৃত কাজও **অপৌরুষেয়** নামে চিহ্নিত হয়, কারণ তেমন কাজ একজন মাত্র পুরুষের কাজ নয়, অনেকের; তাই **অপৌরুষেয়**। কখনও বা সমাজতন্ত্রবাদীরা **অসুর**রা যা করে তা হয় **পৌরুষেয়** এবং ধনতন্ত্রবাদী দেবতারা যা করে তা ঘোষিত হয় **অপৌরুষেয়** বা '**দৈব**' বলে। ভারতের ইতিহাসে এই 'দৈব' বনাম '**পুরুষকার**'-এর ঝগড়া সুদীর্ঘকালের। (দ্র. **ঋণ**)। আবার, সৃজনশীল মানুষদের মধ্যে যে 'Trance' বা 'Inspiration' বা 'Grace' ধরা পড়ে, যাকে গ্রামবাংলায় বলে 'ভর' হওয়া, তেমন অবস্থায় যে সৃষ্টি সেও কিন্তু **অপৌরুষেয়**, কারণ মানুষটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ সৃজন করছে না, তার মাধ্যমে 'অপুরুষ' (**ব্রহ্ম, ঈশ্বর,** প্রকৃতির নিয়ম) সৃজনের কাজটি করছে। তবে আজকাল ধূর্ত লোকেরা কুকর্ম করে আত্মগোপন করে এই 'অপৌরুষেয়' শব্দটির আড়ালে। কোম্পানির, পার্টির, সরকারের পদাধিকারী ধূর্তেরা নিজেরা কুকর্মটি করে, তারপর বলে

দেয় — ওটা কোম্পানির সিদ্ধান্ত, পার্টির সিদ্ধান্ত, সরকারের সিদ্ধান্ত। কুকর্মকারী অপরাধী পুরুষটিকে আর দেখা যায় না। এ আর এক রকমের **অপৌরুষেয়**। ...

পর (অপর, অপরা, পরা, পরাৎপর, পরাৎপরা) (উপসর্গরূপী **পরা** রয়েছে তার নিজস্ব ভুক্তিতে।) : ১. ✓পৃ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পর*** = *পালন রহে যাহাতে; পায়ীর রক্ষা করে যে। **অপর** = নয় **পর** যে। **অপরা** = **অপর**-এর আধার যে। **পরা** = **পর**-এর আধার যে। **পরাৎপর** = যাহা হইতে **পর** আর নাই। **পরাৎপরা** = **পরাৎপর**-এর আধার যে।* / **অপর** = যাহা **পর** নহে। **পরাৎপর** = পর হইতে পর। (ব.শ.)। ৩. **পর** = অন্য, প্রকৃষ্ট, পরম, ব্যতিরিক্ত, পূর্ব্ব, অনন্তরভাবী, দূর, অত্যন্ত, প্রচণ্ড, উত্তর, উচ্চৈঃ, অনাত্মীয়, অতিশয়িত, প্রতিকূল, ঊর্দ্ধ, অধিক, অধিকদেশবৃত্তি, সীমাপরিচ্ছিন্ন, পরপদসম্বন্ধী, তাৎপর্য্যার্থক, তাৎপর্য্যগোচর, উত্তম, বিষ্ণু, শিব ... ইত্যাদি; উপরি ...; দেহে ধারণ করা বা পরা, পরিধান করা, আরোপন করা, পরিহিত, ধৃত। **অপর** = অন্য, অধিক, উত্তমভিন্ন, অর্ব্বাচীন, পরবর্ত্তী, বিজাতীয়, পশ্চিম, দ্বিতীয়, তদ্‌ভিন্ন, নিকৃষ্ট, অধম ...। **অপরা** = বেদবেদাঙ্গ বিদ্যা, **অপরা**-বিদ্যা। **পরাৎপর** = সর্ব্বোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, স্বপ্রকাশ, ধর্ম্মদেব, পরতম, শ্রেষ্ঠ। **পরাৎপরা** = দুর্গা, কালী। (ব.শ.)। ৪. **পরাৎপর, পরাৎপরা, অপরা** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. নিজের দেহের বাইরের যা-কিছুতে মানুষের 'প্রতিপালন রহে' ('পালন রহে যাহাতে'), ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে তাকে **পর** বলে। সেই সুবাদে মানুষের দেহের খোরাক ও মনের খোরাক, যার জন্য মানুষ তার নিজের বাইরে হাত বাড়ায়, তা-সবই **পর** পদবাচ্য। প্রাচীন ভারতবাসী দেহের খোরাকের চেয়ে মনের খোরাককে বেশি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান মনে করতেন। তাই মনের খোরাকের সর্বোচ্চ বিদ্যাকে তাঁরা বলতেন **পরাবিদ্যা**। সেই খোরাকে তার মন বাঁচে, মন সুস্থ-সবল-সতেজ হয়, চলার পথে আটকে গেলে তার থেকে ত্রাণ পায়। এই **পরাবিদ্যা** তাই মন্ত্রের আধার। তবে বাংলাভাষী এখানেই দাঁড়িয়ে থাকেননি, তাঁরা এই **পর**কে আপন পরিধির চারদিকে জড়িয়ে নেওয়াকে নাম দিয়েছেন **পরা** বা পরিধান করা (কাপড় পরা)।

আর, যা-কিছু **পর** নয়, 'ন-পর', যাদের না হলেও আমাদের নিজ নিজ পালন-পোষণের কাজ চলে যায়, অর্থাৎ যে-বিষয় ও বস্তুগুলিতে আমাদের শরীর ও মনের পালন-পোষণ নাই, নিজের বাইরের সেই সব কিছুই **অপর** পদবাচ্য। এই দৃষ্টিতে মানুষের বাইরের জগৎ বা **পর** দু'ভাগে বিভক্ত, মানুষের প্রয়োজনের জগৎ ও অপ্রয়োজনের জগৎ। প্রয়োজনের জগৎকে **পর** (আপন) বলে এবং অপ্রয়োজনের জগৎকে **অপর** (আপন নয়) বলে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই 'আপন নয়'কেও **পর** বলা হয়ে থাকে।

আরও একরকম **অপর** রয়েছে। 'যাহা হইতে পর নাই' তাও **অপর**-পদবাচ্য। **অপর** তাই দুই রকমের — প্রথমটি 'ন-পর' এবং দ্বিতীয়টি 'যাহা হইতে পর নাই' অর্থাৎ পরের চেয়েও বেশি পর, বা **পরাৎপর**। প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদেরা দ্বিতীয় **অপর**কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে **পরাৎপর** বলেই উল্লেখ করে গেছেন। তাঁরা প্রথম **অপর** (ন-পর) বিষয়ক বিদ্যাকে বলতেন **অপরাবিদ্যা**, আর দ্বিতীয় **অপর** বিষয়ক বিদ্যাকে বলতেন **পরাৎপরাবিদ্যা**। তবে, বহু ক্ষেত্রেই তাকে **পরাৎপরাবিদ্যা** না বলে 'শ্রেষ্ঠ **পরাবিদ্যা**'ও বলা হত।

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা জগৎকে মোট তিন ভাগে ভাগ করে দেখেছিলেন — প্রয়োজনের জগৎ, অপ্রয়োজনের জগৎ, অতি-প্রয়োজনের জগৎ। তাই বিদ্যাও তাঁদের ছিল তিন প্রকার — **পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা, পরাৎপরাবিদ্যা**। পরের থেকেও যে পর, প্রয়োজনীয় থেকেও যে বেশি প্রয়োজনীয়, যার পরে আর পর নাই সে-'অপর' তাই 'অমূল্য'র মতো — 'যার কোনো দাম নেই' এবং 'যার এত দাম যে দেওয়াই যায় না'। প্রয়োজনের জগতের নিম্নসীমার নীচে যে-থাকে উন্মাদের মতো এবং প্রয়োজনের জগতের ঊর্ধ্বসীমার ওপরে যে-থাকে বিজ্ঞানীর মতো; তাদের দুজনকেই দেখতে একরকম বলে উভয়কেই সমাজ 'পাগল' বলে থাকে— এই দুই **অপর**ও সেরকমই। যার কোনো প্রয়োজন নেই সেও **অপর**, যার এত বেশি প্রয়োজন যে, সর্ব প্রকারের পয়োজনকে সে ছাড়িয়ে যায়, সেও **অপর**। এই দ্বিতীয় **অপর** বিষয়ক বিদ্যার নাম তাই **পরাৎপরাবিদ্যা**। পরবর্তীকালে তা 'শ্রেষ্ঠ **পরাবিদ্যা**' রূপে চর্চিত হতে হতে একসময় শুধুমাত্র **পরাবিদ্যা** নামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেও এই দ্বিতীয় **অপর** বা **পরাৎপর** কিন্তু মন্ত্র নয়, **পর** নয়, তার চেয়েও বেশি; এ হল মন্ত্র-সৃষ্টির বা মনকে ত্রাণ করার উপায়-উদ্ভাবনের বিদ্যা। এ হল **পুরুষ-প্রকৃতি**র বা আধেয়-আধারের মধ্যেকার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান; একে তন্ত্রও (system) বলা হয়ে থাকে। **পুরুষ-প্রকৃতি**, এই দুইকে কী কী নিয়মে কতরকমভাবে একত্র ও পারস্পরিকভাবে কর্মরত রাখা যায়, তদ্বিষয়ক চর্চাই এই **পরাৎপরাবিদ্যা**র মূল পাঠ্য। একালের বিজ্ঞান তার খণ্ডদৃষ্টিতে একে দেখে এর নামকরণ করেছে 'দুইকে একত্রে দাঁড় করানো'র বিদ্যা বা 'system designing'-এর বিদ্যা (system = standing together)। সমগ্র বিশ্ব যে '**পুরুষ-প্রকৃতি** রূপে বিভাজিত হয়ে কাম**সূত্রে** গ্রথিত' হয়ে রয়েছে, সমাজ যে শাসক-শাসিতে বিভাজিত হয়ে কর্ম**সূত্রে** পরস্পরনির্ভর হয়ে টিকে রয়েছে (দ্র. বাৎস্যায়নের কামসূত্র), মানুষ যে মন ও দেহে বিভাজিত হয়ে এক**সূত্রে** গ্রথিত হয়ে রয়েছে, সেই **সূত্র**গুলিকে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে বুঝে নিয়ে তদনুযায়ী মন্ত্র সৃষ্টি করার এই বিদ্যাই হল দ্বিতীয় **অপর** বিষয়ক বিদ্যা। এই বিদ্যা যার হস্তগত তাকেই বলা হত **পুরুষ**। এই বিদ্যাই নিজের নাম হারিয়ে, বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে, আজকের পৃথিবীর সমস্ত নতুন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। একমাত্র এই **পরাৎপরাবিদ্যা**ই আসন্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন সূত্রে নিজেদের গ্রথিত করার মন্ত্র উদ্ভাবনের যোগ্যতা ধরে।

যাই হোক, এই তিনরকম বিদ্যাকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বা অখণ্ড মানববিদ্যা। তার মধ্যে **পরাৎপর** পদবাচ্য দ্বিতীয় **অপর** বিষয়ক বিদ্যাই ছিল সবচেয়ে সম্মানীয়। মানুষের আগামীকাল, তার মনের সম্ভাব্য বন্দীদশা ও তার থেকে তার মুক্তিই

ছিল এই বিদ্যার মূল বিষয়। উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে তার নানা 'ভার্সন' রয়েছে। আগ্রহী পাঠকের জন্য শিবপুরাণ থেকে, একালে দুর্বোধ্য, তারই একটি বর্ণনাকে সাজিয়ে দেওয়া হল; যার থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যাবে **পরাৎপর**-পদবাচ্য **অপর**-এর স্থান কোথায়?

অখণ্ড অধ্যাত্মবিদ্যার বিষয়

		(১)	(২)	(৩)
সমগ্র	:	**অপর (ন-পর)**	**পর**	**পরাৎপর (অপর)**
মানুষ	:	মন	দেহ	আত্মা (আমি)
সমগ্র	:	অজড়	জড়	নিয়ন্তা
সমগ্র	:	সচেতন	অচেতন	পরিচালক
সমাজ	:	পশু (শাসক)	পাশ (শাসিত)	পতি (সম্বন্ধ)
পৃথিবী	:	জীব	মায়া	ঈশ্বর
সমগ্র	:	অক্ষর	ক্ষর	ক্ষরাক্ষরপর
অস্তিত্বমাত্র	:	পুরুষ	প্রকৃতি	পরমেশ্বর (পরমাপ্রকৃতি)
মহামায়া	:	মায়াবৃত ব্রহ্ম	মায়া	পরমেশ্বর শিব (ব্রহ্ম)
কর্মজগৎ	:	চৈতন্যস্বরূপ-পুরুষ	পরমেশ্বরের শক্তি	স্বাভাবিক বিশুদ্ধি বা শিবতা
সমগ্র	—	আধেয়	আধার	সম্বন্ধ

জগৎকে এইভাবে দেখবার, বুঝবার, ভাববার যে-রীতি, আত্মাকে বা নিজেকে জানতে গিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই সমগ্র মানববিদ্যার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন; জেনেছিলেন আগামীকালের 'মন্ত্র' উদ্ভাবনই তাঁদের প্রধান সমস্যা এবং তার সুরাহার পথ দেখাতে পারে একমাত্র **পরাৎপরাবিদ্যা**র চর্চা বা দ্বিতীয়-**অপর** বিষয়ক চর্চা।

বলে রাখা দরকার — যাঁরা ইয়োরোপের 'Other' ধারণাটিকে বাংলার আধুনিক সারস্বত মহলে **অপর** নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা **অপর** বিষয়ে বাংলাভাষীর নিজস্ব যে-উত্তরাধিকার তা দেখতে পাননি। প্রতীকী বাংলাভাষায় **পর** ও **অপর** দুটি শব্দই একার্থবাচক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা **পর**কে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র **অপর** শব্দটিকে ইংরেজি Other শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করে **অপর**কে অকারণ কলুষিত করেছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টার ফল হয়েছে এই যে, আমাদের **অপর**-এর সমগ্র অতীতটাই বাদ পড়ে গেছে; **অপর** বিষয়ে আমাদের যেন কোনো অর্জনই নেই, যা আছে তা পাশ্চাত্যের! বলে দেওয়া হয়েছে — এই যে হরি জানা, এ আমাদের বাংলার কেউ নয়, তার কোনো বাঙালি-অতীত কিংবা বাঙালি বাপ-ঠাকুরদা নেই; এ আসলে ইয়োরোপের Harry Jones, হরি জানা সেজে বাংলার মাটিতে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। এইভাবে নিজের লগ্ন অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে তাই সুস্পষ্টভাবে বলে রাখা দরকার, 'Other' হল আদার ব্যাপারী, **অপর**-এর জাহাজের খবর সে কিছুই জানে না। ... এ বিষয়ে আরও আলোচনা রয়েছে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'অপরের সন্ধানে' নিবন্ধে। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন। ... **৬.** ইংরেজিভাষীগণ far এবং far-, par- যুক্ত বহু শব্দই এই একই **পর** শব্দের উত্তরাধিকার থেকে পেয়েছেন।

পরগাছা : ২. ***পর*** *(অন্য) গাছ আধার যাহার।* **৩.** গাছের গায়ে জাত অন্য গাছ (parasite), হেয় বস্তু। (ব.শ.)। **৫.** কথাটি এই বাহ্যিক অর্থেই স্থির থাকেনি, অদৃশ্যলোকেও শব্দটির বিস্তার ঘটেছে। বাংলাভাষী মানুষেরা অন্য ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সামাজিক সংগঠন ... ইত্যাদির উপর বসে খাওয়া বা নির্ভর করে চলা কিংবা তাদের শোষণ করে বেঁচে থাকা সত্তাদেরও **পরগাছা** বলে থাকেন। **৬.** ইংরেজি parasite ... ইত্যাদি।

পরন্তু (কিন্তু) : ১. পরন্তু = পরম্‌ + তু (একার্থক)। **কিন্তু** = কিম্‌ + তু। (ব.শ.)। **২.** ***পরন্তু*** = ***পর*** *তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***কিন্তু*** = ***কিম*** *তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩. পরন্তু** = কিন্তু। **কিন্তু** = পূর্ব্ববাক্যের সঙ্কোচ-জ্ঞাপন, পূর্ব্বকথিত বিষয়ের বিরোধ, তথাপি, তাহা হইলেও, কিম্পুনঃ, পুনঃ, পক্ষান্তরে, সংশয়, সন্দেহ, দ্বৈধ, আপত্তি, সঙ্কুচিত, অপ্রতিভ। **কিন্তু কিন্তু করা** = সন্দেহ বা আপত্তি করা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ১ম খণ্ডে **কিন্তু** শব্দটির ব্যাখ্যা করা নেই, কিন্তু **কিম** শব্দটির ব্যাখ্যা কমবেশি আছে। শব্দটির সহজ অর্থ হল সমাজশাসক। বাংলায় আপনি **কিন্তু** বলুন আর **পরন্তু**ই বলুন, দুটো শব্দই পূর্বঘটিত কোনো কিছুর বিরুদ্ধে মৃদু বা কঠোর আপত্তির সূচনা ঘটায়। কিন্তু মজা হল, **কিন্তু**র ক্ষেত্রে আপত্তিটা **কিম্**-এর — অর্থাৎ রাজপুরুষদের, রাজার, তাঁর সমর্থক নীতির, নীতিপ্রচারকদের। কিন্তু **পরন্তু**র বেলায় আপত্তিটা অন্যদের, বিরোধীপক্ষের। ...

পরম (পরমপুরুষ, পরমর্ষি) : ১. পর + ✓মা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পরম*** = ***পর*** *সীমায়িত যাহাতে।* **৩. পরম** = উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, উত্তম, প্রধান, আদ্য, প্রথম, অত্যন্ত, অতিশয়িত। **পরমপুরুষ** = প্রধানপুরুষ, পুরুষোত্তম, বিষ্ণু। **পরমর্ষি** = ব্যাসাদি ঋষি। (ব.শ.)। **৪.** the best অর্থে **পরম** শব্দটি প্রচলিত। **৫.** রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে **পরমপুরুষ** শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কিন্তু শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তবে **পরমহংস** শব্দটি আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্র. **হংস**।

পরমা, পরমাপ্রকৃতি : ২. ***পরমা*** = ***পরম****-এর আধার যে।* ***পরমাপ্রকৃতি*** = ***পরমা*** *যে* ***প্রকৃতি****।* **৪.** কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** দ্র. **আদ্যা**। শব্দটি যথাযথভাবে (এবং সম্ভবত সর্বাগ্রে) ব্যবহার করেছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। এই **পরমাপ্রকৃতি**ই যে সর্বসৃষ্টির জননী, সেকথা তাঁর নিম্নলিখিত বয়ান থেকেই বোঝা যায়। এই বিষয়ে আমাদের একটি খুব বড় নিবন্ধ রয়েছে। তাতে বিষয়টি অতি বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিবন্ধটির নাম 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব : গ্র্যান্ডইকোফেমিনিজম'। এটি সংকলিত হয়েছে আমাদের 'ঙ' গ্রন্থে। এখানে আমরা কেবল 'অন্নদামঙ্গল' থেকে ভারতচন্দ্রের বয়ানটির উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছি।

'... ... কালীমূর্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জান, কেন পাশরিলে এবে॥
পরমাপ্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিনজনে॥
তিনজনে তোমরা কারণজলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে।

শব রূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচা গন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥ ... ...'

পরলোক : ২. *যে লোকে পরে যাওয়া হয়।* ৩. অন্যলোক, লোকান্তর, স্বর্গাদি, মৃত্যু। (ব.শ.)। ৪. 'রহস্যময় স্বর্গাদিলোক' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **লোক, স্বর্গ**। ব্যাপারটি আসলে খুবই সরল। ইতিহাসের নানা ঘটনাবলী তাকে জটিল করে রেখেছে। ছিল বরফ, হয়ে গেল জল, পুনরায় তা বদলে গেল বাষ্পে। যিনি জলের এই যে তিন কালে তিন রূপ দেখতে পান, তিনি **ত্রিকালদর্শী**। আর, জল যে এক রূপ থেকে আর এক রূপে চলে যাচ্ছে, এই তার **পরলোকে** চলে যাওয়া। আমরা মানুষেরা আগে ছিলাম এই পৃথিবীর নানা পার্থিব বস্তুরূপে, বর্তমানে মানবশরীর নিয়ে আছি, বিগত লোক থেকে বর্তমান লোকে আছি। এর পর যে রূপে বদলে যাব, সেও তো একটা **লোক** (sphere)। সেই আমাদের পরবর্তী লোক, এবং অতএব **পরলোক**।

কিন্তু মানুষের অর্জনের ইতিহাসে এই ধারণা ঠিক এভাবে থাকেনি। সে জেনে যায় কমপক্ষে তিনটি **লোক** রয়েছে — স্বর্গ, মর্ত, পাতাল। **ত্রিপথগামিনী গঙ্গা** এই তিনলোকে প্রবাহিতা রয়েছেন। এই তিন **লোকের** মধ্যে মানুষের **পরলোক** কোনটি তা নিয়ে তার নানা সংশয় হয়। আসলে মানুষের সমাজে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন সে বোঝে, তার যা কিছু আপনার বা **স্ব**, তা রহে যাহাতে, সে হল তার **স্বর**। সেই **স্বর** যেখানে যায়, সে তার **স্বর্গলোক**; তার মালিকানার বোধের লোক। আর যেখানে সে নিজে থাকে, সে হল **মর্ত্যলোক**। এবং সবশেষে যেখানে তার মালিকানার সবকিছু লিখে রাখা হয়, সে তার **পাতাললোক**। মানুষ তার মৃত্যুর পর কোন লোকে যায়, তা নিয়ে তার সংশয়ের অন্ত নেই। এই সংশয় থাকত না, যদি তার গলার আওয়াজের বা **স্বর**-এর মতো তার **পণ্য**ও **স্বর্গলোকে** না যেত; তাদের **গঙ্গাপ্রাপ্তি** না ঘটত। ফলে তার **পণ্য**কে নিয়ে সে যা করে, তার দেহকে নিয়েও সেইরকম ভাবনা তার মাথায় আসে। ... হয়তো সেকালের মানুষ এই বিষয়টি আরও ভাল দেখতে পেতেন। আমরা যতখানি বুঝেছি, সেই অনুসারে বর্তমানে আমরা যে **লোকে** বা sphere-এ আছি, আমাদের দেহমনের যৌথ অস্তিত্বটা তার থেকে পরিবর্তিত হয়ে যেখানে পৌঁছবে, সেটিই **পরলোক**। এর আগে **তর্পণ** শব্দে আমরা দেখেছি, আমাদের দৈহিক রূপ, মানসিক রূপ, ও দেহমনের যৌথ রূপ আমাদের মৃত্যুর পরে বদলে গিয়ে এই জগতেই থাকে। ...

পরশুরাম : ২. *পরকে শক্তিরূপে প্রদত্ত যে রাম।* ৩. পরশুধারী রাম, জামদগ্ন্য। ইঁহার পিতা জমদগ্নি, মাতা রেণুকা। ইনি দশাবতারের একতম। পিতার আদেশে ইনি মাতার **শিরশ্ছেদ** করেন এবং প্রসন্ন পিতার নিকটে মাতার পুনর্জীবন মাতৃবধপাপে মুক্তি যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দীর্ঘায়ু — এই চারি বর প্রাপ্ত হন। বলপূর্ব্বক সবৎস-হোমধেনু হরণ হেতু দৃপ্ত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইঁহার হস্তে নিহত হন। কার্ত্তবীর্যের পুত্রগণ পিতৃবধে ক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নিকে বিনাশ করিলে, ইনি তাহাদিগকে নিহত করিয়া, একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন এবং সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধির হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করেন। মহাযজ্ঞের দক্ষিণারূপে কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে ইনি অবস্থান করেন। সীতাপরিণয়ের পরে অযোধ্যাগমনপথে রামচন্দ্র ধনুর্গ্রহণচ্ছলে ইঁহার দেহস্থ বিষ্ণুতেজ হরণ করিয়া ইঁহাকে পরাজিত করেন। (ব.শ.)।

ইনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এবং জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র। পিতার দিক থেকে ইনি ভৃগুবংশ থেকে উদ্ভূত বলে ভার্গব নামেও পরিচিত। মাতার দিক থেকে ইনি কুশিক-বংশোদ্ভূত। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার দমন করবার জন্য এঁর জন্ম হয়। মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক। ... তাঁর পুত্র গাধি। ... তাঁর কন্যা সত্যবতী। ভৃগুপুত্র ঋচীক এই কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন ... সত্যবতী ও তাঁর মাতার ঋষিপ্রদত্ত চরু-ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটে। ... ভৃগু দিব্যজ্ঞানে এই ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে সত্যবতীকে বললেন যে, মাতার প্ররোচনাতেই এই বিপরীত কার্য সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে সত্যবতীর পুত্র ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি পাবে, আর তাঁর মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণ-বৃত্তি লাভ করবে। তখন সত্যবতী বারংবার ভৃগুর কাছে অনুনয়-বিনয় করে বললেন যে, তাঁর পুত্র যেন ক্ষত্রিয়াচারী না হয়, এবং এই দোষ যেন তাঁর পৌত্রে বর্তায়। ভৃগু 'তথাস্তু' বলে সম্মতি জানান। যথাকালে সত্যবতীর জমদগ্নি নামে এক তেজস্বী পুত্র ... হয়। ... এঁর সঙ্গে প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ হয়। রেণুকার গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে — বসু, বিশ্বাবসু, বৃহদ্ভানু, বৃহৎকণ্ব, ও রাম। এই কনিষ্ঠ পুত্র রামই পরশুরাম ও বিষ্ণুর অবতার বলে বিদিত হন।

একদিন মার্তিকাবর্ত দেশের রাজা গন্ধর্ব চিত্ররথকে সস্ত্রীক জলবিহারে রত দর্শনে রেণুকা কামস্পৃহ হয়ে পড়েন। স্ত্রীর এই মানসিক বিকার সহ্য করতে না পেরে জমদগ্নি একে একে চার পুত্রকে মাতৃহত্যার জন্য আজ্ঞা দেন। ... তারা অস্বীকৃত হলে জমদগ্নি তাদের পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবার অভিশাপ দেন। ... পরশুরাম সে আদেশ পালন করেন। ... প্রসন্ন জমদগ্নি বর দিতে চাইলে পরশুরাম পাঁচটি বর চান ... (১) রেণুকার পুনর্জীবন ... (২) হত্যা বিষয়ে মাতার স্মৃতিবিলোপ ... (৩) যুদ্ধে অজেয় হওয়া ... (৪) মাতৃহত্যার পাপস্পর্শ যেন না হয় ... (৫) ভ্রাতাদের স্বাভাবিক হওয়া ও তাঁর নিজের দীর্ঘজীবন।

ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে পরশুরামের ক্রোধের সূত্রপাত এইরূপে হয় — একদা জমদগ্নির পুত্রগণ অন্যত্র গমন করলে সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়রাজা কার্তবীর্য (কার্তবীর্যার্জুন) আশ্রমে এসে সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ ও আশ্রমের জিনিসপত্র বিপর্যস্ত করে প্রস্থান করেন। ... পরশুরাম আশ্রমে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে কার্তবীর্যের প্রতি ধাবিত হন ও তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্রবাহু ছেদন করে তাঁকে বধ করেন। এর ফলে কার্তবীর্যের পুত্রেরা আশ্রমে এসে তপোনিরত জমদগ্নিকে

অতর্কিত আক্রমণে বধ করে। ... পিতাকে নিহত দেকে পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেন যে, এদের বিনাশ করে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে তিনি ধ্বংস করবেন। তিনি একাই কার্তবীর্যের পুত্র ও তাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দের বিনাশ ... করেন। এইরূপে একুশ বার তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন ও স্যমন্তপঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ করেন। শেষে পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয়হত্যা হতে নিবৃত্ত হন এবং এক মহাযজ্ঞের দ্বারা মহাত্মা কশ্যপকে এই পৃথিবী দান করে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। ... দানবদের নিহত করায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে পরশুরামকে তেজোময় পরশু অস্ত্র দান করেন। ... পরিচয় গোপন করে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করায় ইনি কর্ণকে শাপ দেন, '... যথাকালে এই অমোঘ অস্ত্র-প্রয়োগে তোমার বিস্মৃতি আসবে। ...'

রামায়ণ অনুসারে, সপ্তম অবতার দাশরথি রামের পূর্বে ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব হয়, কিন্তু দুই অবতার একই সময়ে জীবিত ছিলেন। ... হরধনু ভঙ্গের সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরাম রামের সম্মুখে এসে বলেন, 'তুমি হরধনু ভঙ্গ করেছ বটে, কিন্তু আমার নিকট বৈষ্ণব ধনু আছে। এই বৈষ্ণব ধনু ভঙ্গ করতে সমর্থ হলে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হব।' রাম এই কথা শ্রবণান্তে তৎক্ষণাৎ ভার্গবের হাত হতে ধনু গ্রহণপূর্বক অনায়াসে শর-যোজন করে পরশুরামের তপস্যার্জিত সমস্ত লোক বিনষ্ট করেন। এইরূপে পরশুরামের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি জড়বৎ নির্বীর্য হয়ে পড়েন। তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করে মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে **পরশুরাম** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **অবতার, কার্তবীর্য্য, ভৃগু**। যাঁরা বলেন ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, তাঁরা ভারত সম্পর্কে কিছু জানেন না। ভারতের সব ইতিহাস আছে, তবে কিনা লেখা রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়, যার কিছু কিছু আমরা উদ্ধার করে চলেছি। সে তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলির বরং বহু ইতিহাস নেই, এমন কথা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়। বিশ্বাস না হলে আপনি পাশ্চাত্যের বড় বড় অর্থনীতি বিশারদদের দ্বারস্থ হয়ে জানতে চান — আদি পুঁজির উদ্ভব হয়েছিল কেন এবং কীভাবে? কোন পথ বেয়ে সে তার বর্তমান 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল' রূপে এসে পৌঁছল? কোন সময় সুদখোর পুঁজি বা usurer's capital জন্মেছিল, কীভাবে জন্মেছিল? না, তার কোনো স্পষ্ট ইতিহাস পাশ্চাত্যের হাতে নেই। মার্কসসাহেব তো লিখেই গেছেন, তাঁরা যখন আদি পুঁজির সাক্ষাৎ পাচ্ছেন ততদিনে সুদখোর পুঁজি ও বেণিয়া পুঁজি জন্মে গেছে। তার আগের কোনো খবর তাঁদের হাতে নেই। ...

আমাদের হাতে কিন্তু পুঁজির বিকাশের পুরো ইতিহাসটাই রয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে রয়েছে। একে বলা হয় দশাবতার তত্ত্ব। এতে পুঁজি কীভাবে একের পর এক দশটি রূপে দেখা দিল, 'অখণ্ড দৃষ্টিতে' তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তার মধ্যে **পরশুরামের** স্থান ষষ্ঠ। ক্যাপিটালের ষষ্ঠ রূপকেই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় **পরশুরাম** বলা হয়। আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলি, তাঁর আধ্যাত্মিক রূপটি নিয়ে আমরা কিছু বলছি না, কারণ, সেটি আমরা এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা তাঁর মর্ত রূপটি নিয়েই কথা বলব। এই রূপেই তিনি ক্যাপিটালের বা **নগদ নারায়ণের** ষষ্ঠ অবতার। বৌদ্ধবিপ্লবের প্রাক্কালে যে সামাজিক সত্তা (পুঁজি ও তার মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী কিছু মানুষ) সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা **পরশুরাম** নামে চিহ্নিত হন। এই সত্তাকে খণ্ডভাবে দেখে অর্থাৎ এর মাত্র একটি দিক বিচার করে একে 'সুদখোর' ও 'সুদখোর পুঁজি' বলা হয়। ভারতসমাজের বিকাশের বিশেষ কালখণ্ডে এই সত্তা কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে **পরশুরামের** কাহিনীতে। তবে সবটাই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় লেখা, এবং সেভাবেই তাকে পাঠ করতে হয়। এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, বৌদ্ধবিপ্লবের আগেই ভারতের ক্ষত্রিয়শক্তিকে (রাষ্ট্রশক্তিকে) তিনি একুশবার ধ্বংস করে ভারতসমাজকে মিলিটারিহীন করে খানিকটা অরক্ষিত করে দিয়েছিলেন এবং আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে (বৈদিক ব্যবস্থাকে) খানিকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বৌদ্ধবিপ্লবের আগে **পরশুরাম** না জন্মালে বৌদ্ধ-বিপ্লবটাই হতে পারত না। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ না হলে এবং তাতে জারের রাশিয়া দুর্বল হয়ে না পড়লে রুশ বিপ্লব হতেই পারত না, সেইরকম।

পরা : ২. ***পরা*** = ***পর****-এর আধার যে; পালন-পান রহে যাহাতে তাহার আধার; পরে থাকে যে।* ৩. **পরা** = প্রাতিলোম্য, প্রতিকূলতা, প্রাধান্য, ধর্ষণ, আভিমুখ্য, বিক্রম, ভৃশ, অত্যন্ত, তিরস্কার, প্রত্যাবৃত্তি, ন্যূনীভাব, ভঙ্গ, অনাদর, বধ, বিমোক্ষ, ত্যাগ। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। ৫. ব্যাকরণবিদগণের মতে আমাদের ভাষায় ২২টি **উপসর্গ** রয়েছে। এরা হল শব্দের দিশারী। যেমন, একথা বললে খুব ভুল হয় না যে — **কার** হল এমন একটি শব্দ, যার বিশেষীকরণ না হলে বাস্তবরূপে তাকে পাওয়া যায় না। **উপসর্গ** যুক্ত হয়ে সেই **কার**কে বিশেষীকৃত করে দেয়। তখন আমরা তাকে কার্যকরীরূপে বুঝতে পারি। যেমন **আ**কার, **প্র**কার, **বি**কার, **অপ**কার, **উপ**কার, **সং**স্কার, **অধি**কার ... ইত্যাদি। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে **আ, প্র, বি, অপ, উপ, সম্‌, অধি** প্রভৃতি **উপসর্গ**গুলি ঠিক করে দিচ্ছে **কার** শব্দটির অর্থ কোন দিশায় আঙুল দেখাচ্ছে। সেই কারণে **উপসর্গ** হল শব্দের **দিশারী**। আমরা দেখছি তার ভিতরে সাতটির মূলেই রয়েছে **প** বর্ণটি। যথা — **অপ, অপি, উপ, পরা, পরি, প্র, প্রতি**। নিরুক্তে এই বক্তব্যটি প্রথমেই রয়েছে যে, সব শব্দেরই অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে, এমনকি **উপসর্গ**সমূহেরও। পরবর্তীকালের শব্দবিদগণ সেকথা মানেননি, এবং পরে পরে তাঁরা কোনো শব্দেরই অন্তর্নিহিত অর্থ (= **অভিধা-অর্থ**) মানতে পারেননি। যদিও-বা ব্রিটিশ যুগের আগে পর্যন্ত খানিকটা মানতেন, ব্রিটিশ যুগে পাশ্চাত্যের ভাষাবিদগণের প্রচণ্ড প্রভাবে এবং তাঁদের সমর্থনে দেশীয় 'অভিধা-অর্থ'মূলক ধারণাকে তাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন এবং শব্দের মানে খুঁজতে শুরু করেন শব্দের বাইরে গিয়ে; অর্থাৎ কিনা তাঁরা পশ্চিমের 'প্রতীকী শব্দার্থবিধি'কেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করেন। তবুও, এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও, স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত

আমাদের দেশীয় কবিসাহিত্যিকেরা নিরুক্তকথিত শব্দার্থের দেশীয় নীতি (শব্দের ভেতরেই শব্দের মানে আছে) কমবেশি অনুসরণ করতেন, স্বাধীনতা লাভের পর সকলের অগোচরে অথচ সকলের চোখের সামনেই দেশীয় নীতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় এবং অন্ধ পাশ্চাত্য-অনুসরণই শব্দার্থজ্ঞানের একমাত্র রীতি হয়ে যায়। আমাদের অ্যাকাডেমিগুলি বর্তমানে শব্দার্থের সেই 'মাগ্না-নীতি'কেই ('ভিক্ষা মেগে আনা' নীতিকেই) তাঁদের একমাত্র শব্দার্থনীতি হিসেবে অনুসরণ করছেন। ...

তা সে যাই হোক, আমাদের সকল শব্দের ভিতরে তো বটেই এমনকি উপসর্গগুলির ভিতরেও অর্থ ছিল এবং আছেও। বলে রাখা ভাল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা এই পথে একটুখানি এগিয়েছিলেন। আজ যেমন আমরা জেনে গেছি যে, পাশ্চাত্যের ভাষার শব্দের এবং আমাদের ভাষার শব্দের যেগুলি **দিশারী — প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ — অন্** (on), **ইন্** (in), **ইক্** (ic) ... **প্র** (pra, pro), **পরা** (par, para) ... ইত্যাদি, সেগুলি অর্থের এবং উচ্চারণের দিক থেকে ওদের আমাদের উভয় ভাষাতেই আজও হুবহু একই রয়েছে, বিশেষ বদলায়নি। রবীন্দ্রনাথও জেনে গিয়েছিলেন যে, ইংরেজি ও বাংলার উপসর্গগুলি অনেকটাই একরকম। আগ্রহী পাঠকেরা এ বিষয়ে রবীন্দ্র রচনাবলী দেখতে পারেন। তবে এ এক দীর্ঘ এবং বহুভাষা-জ্ঞানীদের একত্রে বসে পৃথকভাবে গবেষণা করার ব্যাপার। পাথেয়র অভাবে আমরা সে পথে হাঁটবার কথা ভাবতেও পারিনি।

পরা উপসর্গটির অর্থ উপরে দেওয়া আছে। অন্য ছয়টি সমজাতীয় উপসর্গের অর্থ তাদের নিজ নিজ ভুক্তিতে কমবেশি দেওয়া হয়েছে, তথাপি এখানে পুনরায় দেওয়া হল — **অপ** = *যথাযথভাবে পালিত বা প্রাপ্ত নয় যে; দৈহিক অস্তিত্বমাত্রকে পালন করে যে।* **অপি** = **অপ** *গতিশীল যাহাতে।* **উপ** = *উপরি পালন-পান থাকে যাহাতে।* **পরি** = **পর** *গতিশীল যাহাতে।* **প্র** = *প্রকৃষ্ট (করণ) রহে যাহাতে।* **প্রতি** = **প্রকৃষ্ট** *তারণ গতিশীল যাহাতে।* এরা উপসর্গ-পদবাচ্য কেন? কারণ এরা প্রত্যেকে আপন গুণাগুণ তার সঙ্গে সংযোজিত শব্দকে দান করে দিয়ে স্বয়ং শব্দটির আগে প্রায় নির্গুণভাবে বিরাজ করে। (দ্র. **প্র**)।

পরা উপসর্গটির অর্থ হল — **পর**-এর আধার যে। তার মানে যাদের **পর** বলা হয়, তারা থাকে যাতে, সেগুলিই **পরা**-পদবাচ্য। অর্থাৎ, দ্রষ্টার বা বক্তার অস্তিত্বের বাইরে যে **পর** থাকে, তার আচরণগুলি **পরা**-আচরণ বা **পরা**-ক্রিয়া। সে আচরণ দ্রষ্টা-বক্তার নিজের আচরণের বা বিচারের তুলনায় হীন কিংবা অধিক এবং বিরোধী হতে পারে, কিন্তু কখনও সমান হবে না। যেমন **পরাকরণ, পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম, পরাক্রান্ত, পরাগ, পরাগত, পরাঙ্মুখ, পরাজয়, পরাজি, পরাভব, পরাবর্ত্ত, পরাবৃত্ত, পরাবর্ত্তিত, পরাবৃত্তি, পরাবস্থ, পরামর্শ, পরামৃষ্ট, পরাশর, পরাসন, পরাসু, পরাস্ত, পরাহত** ... ইত্যাদি। ইংরেজিতে এধরনের সমার্থক উপসর্গযুক্ত শব্দের সংখ্যা নেহাত কম নয় এবং সেগুলির কয়েকটি হল — para-military, para-teacher, paradigm, paradise, paradox, paragenesis, paragraph, paralanguage, parameter, paranormal, paraphernalia, paraphrase, parasite, parasuicide, parathesis, parasynthesis ... ইত্যাদি ইত্যাদি। ... ৬. উপরে দ্রষ্টব্য।

পরাবসু : ২. *পরা যে বসু।* **৩.** অসুরগণের হোতৃবিশেষ। (ছা.অ.)। মহর্ষি রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র ছিল। ভরদ্বাজের প্রতিবেশী ও সখা রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্র পরম বিদ্বান ছিলেন; আর ভরদ্বাজ শুধু তপস্বী ছিলেন এবং অধ্যয়ন না করে তিনি বেদজ্ঞান লাভের চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্মণরা ভরদ্বাজকে সম্মান করতেন না, কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্রকে সম্মান করতেন দেখে ভরদ্বাজ-পুত্র যবক্রীত ... গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ... অবশেষে ইন্দ্র পিতাপুত্রকে বেদজ্ঞ হবার বর দান করলেন। ... এই জ্ঞানলাভের পর যবক্রীত দাম্ভিক ও ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়েন ও মহানন্দে ঋষিদের অনিষ্টসাধন করতে থাকেন। একদিন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে যবক্রীত পরাবসুর রূপবতী স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলেন। পরাবসুর স্ত্রী ভীত হয়ে 'তাই হবে' বলে পলায়ন করেন। যবক্রীতের এই ব্যবহারে রৈভ্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই লম্বমান জটা ছিন্ন করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, এক রূপবতী নারী ও এক ভীষণাকৃতি রাক্ষসের সৃষ্টি হয়। রৈভ্য এদের যবক্রীতকে হত্যা করার আদেশ দেন। উক্ত নারী যবক্রীতের কমণ্ডলু হরণ করে এবং রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্রীতকে নিহত করে। এইরূপে পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে ভরদ্বাজ সন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ রৈভ্যকে অভিসম্পাত দেন যে, ... পুত্র পরাবসুর হাতে রৈভ্যের মৃত্যু হবে। ... একদা অর্বাবসু ও পরাবসু এক যজ্ঞে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে সাহায্য করছিলেন। সেই সময় একদিন রাত্রে পরাবসু আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে বনমধ্যে কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে দেখে মৃগ মনে করে আত্মরক্ষা করবার জন্য পিতাকে বধ করেন। পিতৃহত্যার পর পরাবসু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসুকে এই সংবাদ দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর হয়ে ব্রহ্মহত্যার জন্য এখনই প্রায়শ্চিত্ত করেন। তিনি (পরাবসু) একাকীই রাজা বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। তখন অর্বাবসু আশ্রমে গমনপূর্বক পিতার মৃত্যুজনিত প্রায়শ্চিত্ত শেষ করে বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞস্থানে ফিরে যান। তখন পরাবসু রাজাকে জানালেন যে, তাঁর ভ্রাতাই ব্রহ্মহত্যাকারী, সে কারণ তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিলে রাজার অনিষ্ট হবে। ... রাজা অর্বাবসুকে বিতাড়িত করলেন। তখন অর্বাবসু অরণ্যে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন। ... ফলে সূর্য ও দেবতারা প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা ও পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এঁদের বরে রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন এবং পরাবসুর পাপ দূর হল। ... তখন যবক্রীত দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বেদাধ্যায়ী, তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও রৈভ্য কেমন করে তাঁকে বধ করলেন? উত্তরে দেবতারা বললেন — গুরুর সাহায্য না নিয়ে কেবল তপস্যার ফলে বেদ শিক্ষা হয়েছিল, কিন্তু রৈভ্য অতি কষ্টে গুরুর কাছে দীর্ঘকাল বেদপাঠ করেছিলেন; সেইজন্য তাঁর স্থানই শ্রেষ্ঠ। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** না, ইনি **বসুদেব** নন, **উপরিচর বসু** বা উপবসু কিংবা প্রবসু, পরিবসু, প্রতিবসু কিংবা **ভূর্ব্বসু**ও নন, ইনি **পরাবসু**, **অর্ব্বাবসু**র ভাই। **ঋভু** থেকে জাত রৈভ্যর সন্তান

এই **পরাবসু** ও **অর্ব্বাবসু**। **অর্ব্বাকস্রোতাঃ** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, এই **অর্ব্বা**-সত্তা হলেন তাঁরাই যাঁরা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ব্যবহার অনুসরণ না করে নতুন পদ্ধতিতে কিছু করেন। এই **অর্ব্বাবসু** তৎকালীন বসুদের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেন না, নতুন ধরনের 'বসু-রীতি' অনুসরণ করেন। আর **পরাবসু** অনুসরণ করেন বসুদের অনুসৃত রীতির পরিসীমার বাইরের কোনো রীতি। সেই রীতিতেই তিনি গিয়ে বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ করতে যখন ব্যস্ত, তখন তার নিজের আধারশক্তিস্বরূপ জনগোষ্ঠীকে **ভরদ্বাজ**-এর পুত্র যবক্রীত তার রীতিতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায়। এটা ছিল সেকালের সমাজনীতির চোখে অন্যের স্ত্রীকে আহ্বান জানানোর মতো অপরাধ। সেই কারণে যবক্রীতের শাস্তি হয় 'মৃত্যু'। ... বোঝাই যাচ্ছে, এই কাহিনী ভারতসমাজের একটি বিশেষ কালখণ্ডের ঘটনাবলির ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় কথিত বয়ান। কাহিনীটিকে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে **দ্রোণ, ভরদ্বাজ, ঋভু, দীর্ঘতমা, ভরত, বৃহস্পতি, উতথ্য, মমতা** ... এই সত্তাগুলিকে ভাল করে জেনে নিতে হয়। তারপর ঘটনাগুলিকে মেলানোর চেষ্টা করতে হয়। এখানে সেই সমস্ত সত্তাগুলিকে একত্রে দেওয়া সম্ভব নয়। পাঠকপাঠিকা, যথাস্থানে তাদের ভুক্তিগুলি দেখুন এবং তারপর বিচার বিবেচনা করুন।

পরাশর : ১. পরা - আ + ✓শৃ + অন - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***পরা*** *শর থাকে যাহাতে; যিনি* ***পরা*** *শর নিক্ষেপ করেন।* ৩. কলি-ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক ঋষিবিশেষ। ইনি ব্যাসদেবের পিতা। বশিষ্ঠপুত্র শক্তি, ইঁহার পিতা, এবং অদৃশ্যন্তী ইঁহার মাতা। রাক্ষসেরা ইঁহার পিতাকে বধ করিয়াছিল বলিয়া, ইনি তাহাদের উচ্ছেদসাধনার্থ এক রাক্ষসবধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ বহু রাক্ষসের নিধন করিয়াছিলেন। পরে পুলস্ত্যমুনির সানুরোধপ্রার্থনায় ঐ যজ্ঞ নিবারিত হয়। দাসরাজতনয়া মৎস্যগন্ধ্যা ইঁহার বরে পদ্মগন্ধা ও যোজনগন্ধা হইয়া শেষে অতুলরূপলাবণ্যবতী সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধা হন ও তদ্‌গর্ভে ইঁহার ঔরসে মহর্ষি ব্যাসদেবের উদ্ভব হয়। পরাশরসংহিতা গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। (ছা.অ.)। মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র। ... ... পরাশর বৈদিক ঋষি। বেদের অনেক মন্ত্রের ইনি রচয়িতা। এঁর রচিত সংহিতার নাম 'পরাশর-সংহিতা'। কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা একদিন মৃগয়াকালে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথে চলছিলেন। সেই পথে বশিষ্ঠের জ্যৈষ্ঠ পুত্র শক্তি,কে আসতে দেখে রাজা কল্মাষপাদ তাঁকে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু শক্তি, এতে রাজী হলেন না। কারণ, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। ... কিছুতেই পথ না ছাড়ায় রাজা তাঁকে কশাঘাত করেন। ... তখন ক্রুদ্ধ হয়ে শক্তি, অভিশাপ দেন, 'তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হও।' ... ফলে কল্মাষপাদ রাক্ষসে পরিণত হলেন। রাক্ষস হয়ে তিনি প্রথমেই শক্তি,কে হত্যা করে ভক্ষণ করলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রাক্ষস কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রের সকলকেই অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করে ফেললেন। পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ দুঃখে ... আত্মহত্যার চেষ্টা করে ... ব্যর্থ হন। আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পশ্চাদভাগে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পান। ... তিনি জানতে পারলেন যে, ... শক্তি,র বিধবা পত্নী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে বারো বৎসর বয়সের এক ... পুত্রই বেদপাঠ করছিলেন। পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভক্ষণ করতে অগ্রসর হলেন। তখন বশিষ্ঠ ভীতা পুত্রবধূকে আশ্বস্ত করে অভয় দিলেন এবং বললেন যে, ইনি রাজা কল্মাষপাদ। তারপর তিনি রাজার দেহে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করে তাঁকে শাপমুক্ত করেন এবং রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে বলেন; অতঃপর তিনি (বশিষ্ঠ) অদৃশ্যন্তীকে পুত্ররত্ন লাভের বরদান করেন। যথাসময়ে অদৃশ্যন্তী এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন বশিষ্ঠ নিজের জীবন 'পরাশু' অর্থাৎ বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হয় পরাশর। একদিন পরাশর বশিষ্ঠকে পিতা বলে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী পুত্রকে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁর পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করেছে। তখন পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষসবংশ বিনাশের সংকল্প করে এক রাক্ষস-সত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞে সকল রাক্ষস দগ্ধ হতে থাকে। তখন অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। পুলস্ত্য বললেন, 'এই রাক্ষসরা তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না। তোমার পিতৃহন্তা কল্মাষপাদ এখন শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে আছেন। তোমার পিতাই শাপ দিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন।' এই কথা শ্রবণান্তে পরাশর তাঁর যজ্ঞ শেষ করেন।

দেবী ভাগবত অনুসারে পরাশর বেদের বিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা। ... একদিন মৎস্যগন্ধা (দ্র. **অদ্রিকা, উপরিচব**) যখন যমুনায় নৌকা পারাপার করছিলেন, তখন পরাশর মুনি তীর্থ-পর্যটন করতে করতে ঐ স্থানে এসে উপস্থিত হন এবং রূপবতী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে তাঁকে নদী পার করে দিতে বলেন। কিন্তু নৌকায় অবস্থানকালে পরাশর কামাতুর হয়ে মৎস্যগন্ধার কাছে তাঁর বংশরক্ষার্থে পুত্র প্রার্থনা করেন। এর উত্তরে মৎস্যগন্ধা বলেন যে, মৎস্যকুলের মধ্যে জন্ম বলে তাঁর দেহ মৎস্যের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ, সে কারণ তিনি যেন তাঁকে এই কার্য থেকে নিষ্কৃতি দেন। তখন পরাশর মৎস্যগন্ধাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী যোজনগন্ধা করে দেন। নদীগর্ভে কোনো অসংগত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হলে তা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাহেতু মৎস্যগন্ধা ভীতা হয়ে পরাশরকে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। পরাশর তখন চারিদিকে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, এবং মৎস্যগন্ধাকে বলেন, 'আমার অভিলাষ পুর্ণ করায় তুমি কুমারী অবস্থাতেই থাকবে।' পরাশর অতঃপর মৎস্যগন্ধাকে আরও বহু বর প্রদান করেন। এর ফলে বিষ্ণুর অংশ হতে তাঁর এক যশস্বী পুত্র হয়। ... যমুনাদ্বীপজাত এই পরাশর-পুত্রের নাম হয় দ্বৈপায়ন। ইনি জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই মাতার অনুমতি লাভ করে তপস্যার জন্য বনগমন করেন। ... মাতাকে বলে যান যে, তাঁকে স্মরণ করামাত্রই তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হবেন। (পৌ.অ.)। ৪. বছর পঞ্চাশ আগেও **পরাশর** শব্দটি কারও কারও নাম রূপে প্রচলিত ছিল, এখন কেবলমাত্র যাঁরা পুরাণাদি চর্চা করেন, মহাভারত-কথা শোনেন, রামায়ণ-গান শোনেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন। ৫. ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যে কয়টি সত্তাকে পাওয়া যায় **পরাশর** তাঁদের একজন।

ইনি স্বাভাবিক **শর** নন, **পরাশর**। তাছাড়া **দক্ষ** ব্রাহ্মণের তো একদিন **পরাশর** না হয়ে উপায় ছিল না, একই কারণে বহু পরে তাকেই তো **পরশুরাম** হতে হয়েছিল। কেননা একবার একই জ্ঞানকর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মেনে নিলে (দক্ষযজ্ঞের সময় থেকে যা মেনে নিতে হয়েছিল), একদিন তার থেকে **অত্রি বেণ পৃথু** ... এসব তো এক এক করে পর্যায়ক্রমে জন্মাবেই এবং ক্রমশ একই জ্ঞানের অনুসরণকারী বেদজীবী ব্রাহ্মণকে তারই সৃষ্ট পেশীশক্তি-ক্ষত্রিয় ও ধনশক্তি-বৈশ্য অবহেলা করবেই। তাই হয়েও ছিল। এবং তার বিরুদ্ধে একসময় অনন্যোপায় ব্রাহ্মণকেই কলম ছেড়ে ধনুর্বাণ হাতে নিতে হয়েছিল। তেমনই এক সত্তা **পরাশর**। ভারতীয় ঋষিগণের মধ্যে সেই **পরাশর** (নামের এক বা একাধিক ব্রাহ্মণ) সত্তাটি আজও এতই জীবন্ত যে, তাঁর রচিত 'পরাশর-সংহিতা' আজও ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের অনেকেই পাঠ করে থাকেন। ...

আসলে প্রশ্ন তো একটাই — কে কাকে পথ ছেড়ে দেবে? বশিষ্ঠপুত্র ব্রাহ্মণ শক্তি, ক্ষত্রিয় রাজা সৌদাসকে (শাপগ্রস্ত হওয়ার আগে **কল্মাষপাদে**র নাম ছিল সৌদাস) পথ ছেড়ে দেবেন নাকি সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেবেন? কে কাকে পথ ছাড়বে? রাজা ব্রাহ্মণকে নাকি ব্রাহ্মণ রাজাকে? কে বড়? জ্ঞানজীবী-বেদজীবী-মনোবলজীবী ব্রাহ্মণ, নাকি দেহবলজীবী-শরজীবী ক্ষত্রিয়? জ্ঞানের জোর না গায়ের জোর? কলম না তরোয়াল? বৈদিক যুগের সূচনাকালে রুদ্রের হাত থেকে **দক্ষ**কে তো আদি-বেদবাদী ব্রাহ্মণরাই বাঁচিয়েছিলেন। আদি ক্ষত্রিয় (আদি রাষ্ট্র) **পৃথু**কে সেই জ্ঞানজীবী-বেদজীবীরাই ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। তাহলে কে কাকে সম্মান জানাবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে নাকি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে? ব্রাহ্মণ যাকে ক্ষত্রিয়রূপে বা রাজারূপে নিয়োগ করে সেই তো রাজা! এটাই তো ছিল সেকালের রীতি। আর সে রীতি চলে আসছিল আদি রাষ্ট্র বা আদি ক্ষত্রিয় **পৃথু**র কাল থেকেই। অতএব ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেবার কথা বলতে পারে!

ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন উঠেছিল মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের ঠাকুরদার আমলে, আমাদের হিসেবে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে। ইউরোপের সভ্যতা তখনও পলাতকদের শিশুসভ্যতা মাত্র এবং তাদের জীবনের গতিপথ ঠিক করে দিচ্ছিল এশিয়া থেকে আসা জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের ছিঁটেফোঁটা। স্বভাবতই এই প্রশ্ন তোলার যোগ্য হয়ে উঠতে ইউরোপের প্রায় ২০০০ বছর খরচ হয়ে যায়। তারা এই প্রশ্ন তোলে দশম শতাব্দীতে পৌঁছে। ...

আজকালকার খণ্ডজ্ঞানী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস হল 'কলোনির ইতিহাস' বা উপনিবেশের ইতিহাস। আসলে ব্যাপারটি উলটো। ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস আগাগোড়াই 'উপনিবেশের ইতিহাস'। এশীয় দেশগুলি থেকে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের ছিঁটেফোঁটা যা কিছু তারা পেয়েছে (বিশ্বাস না হলে ফ্রিডরিখ শ্লেগেল কিংবা এম. ফ্রেটিস পড়ুন।), তাই নিয়ে তাদের এগোতে হয়েছে। ফলে, আমাদের এখানে যখন মানসিক গুণ্ডার (মানসিক-শক্তিজীবী বা জ্ঞানজীবী ব্রাহ্মণ-ধর্মগুরুদের) ও দৈহিক গুণ্ডার (দৈহিক-শক্তিজীবী বা ক্ষত্রিয়-সামরিকশক্তিধরদের) বিরোধ শুরু হয়েছে, তার প্রায় ২০০০ বছর পরে তাদের দেশে সেই একই ধরনের বিরোধ দেখা গেছে। আর সেরকম না হয়ে উপায়ও তো ছিল না, কেননা, ইউরোপের সামাজিক গোষ্ঠীগুলি তো এশিয়ার পথ অনুসরণ করেই বিকশিত হচ্ছিল।

আমরা দেখছি, দশম শতাব্দী থেকেই ইউরোপে জ্ঞানজীবীদের বিরুদ্ধে নানা রকমের ছোট-বড় বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অবশেষে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ পোপের বা জ্ঞানজীবীর সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার কথা ঘোষণা করে। এই ঘোষণার পিছনে যে অদ্ভুত ব্যাপারটি কাজ করেছিল তা হল, পোপ তো মৌলবাদী-হয়ে-পড়া ইউরোপীয় ব্রাহ্মণ, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল নতুন ব্রাহ্মণ মার্টিন লুথার, তার নবধর্ম (প্রোটেস্টান্ট ধর্ম) নিয়ে, এবং তাকে সাহায্য করেছিল ইউরোপের ক্ষত্রিয়শক্তি। সেই পথের অনুসারী হয়ে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ড ঘোষণা করে যে, ইংলন্ডের রাজাই ইংলন্ডের চার্চের অধীশ্বর। তার মানে, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের ক্ষত্রিয় তরোয়াল ও কলম দুটোরই অধিকারী হয়ে যায়, এবং নতুন ব্রাহ্মণ (প্রোটেস্টান্ট-ইজম) ক্রমে তার সেবাদাসে পরিণত হয়ে যায়। আজও ইংলন্ডের চার্চসমূহের প্রধানকে ইংলন্ডের রাজার হাতে মুকুট প'রে তবেই চার্চের ক্ষমতায় বসতে হয়।

তবে ইংলন্ডে ক্ষত্রিয়শক্তির বিকাশ ঐ পর্যন্তই। কেননা তার পরই আসে বণিক। সে গণতন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ঘটিয়ে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের রাজার গলা কাটে। একই ঘটনা ফ্রান্সে ঘটে ১৭৯৩ সালে। এইভাবে গণতন্ত্রের আড়ালে বৈশ্যশক্তি বা বণিকসম্প্রদায় কলম ও তরোয়াল দুটোরই অধিকারী হয়ে যায় এবং ইউরোপের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুজনই তার সেবাদাসে পরিণত হয়ে যায়। আজও সেখানে সেই ব্যবস্থাই চলছে।

ভাটিকান সিটির অধিকর্তা পোপ অবশ্য কোনো ক্ষত্রিয়ের অধীনতা স্বীকার করেন না, তিনি নাকি স্বাধীন, যদিও তাঁর প্রতাপ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বলতে গেলে, সারা পৃথিবীতেই এখন কলম ও তরোয়াল উভয়ের অধিকারী কুবেরসাধক বৈশ্য এবং বর্তমানে তারই শাসনই চলছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুজনেই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছে লক্ষ্মীসাধক বৈশ্যও। মাঝে কিছু নতুন ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে রাশিয়া চীন প্রভৃতি দেশে কিছুদিনের জন্য শূদ্রের শাসনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, বর্তমানে সেসবই কুবের-বৈশ্যের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এত কিছু সত্ত্বেও কেন সেই কুবেরসাধক বৈশ্য আড়ালে থাকে, কীভাবে থাকে? কেন তাকে চিহ্নিত করে ধরাশায়ী করা যাচ্ছে না? এর উত্তর আমাদের শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে — 'কুবেরের শক্তি অন্তর্দ্ধান'। ...

যাই হোক, আমরা এখন ভারতীয় **পরাশর**-এর কথায় আবার ফিরে যাব। জন্মসূত্রে ইনি ক্ষত্রিয়বিরোধী এবং স্বভাবশত তৎকালীন বৈদিকসমাজের রাষ্ট্রশক্তির বিরোধী। তখনও ব্যক্তিমালিকানার জন্মই হয়নি, পণ্য নেই, বিনিময় দূর অস্ত্। চলছে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বদলা-বদলি। আর সেটা চলছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং তা চালাচ্ছেন সম্প্রদায়শীর্ষে বসে থাকা মহর্ষিরা। কিন্তু সেই উৎপন্ন এ-গোষ্ঠী থেকে ও-গোষ্ঠীতে পারাপার করছে কে? করছে সেই সম্প্রদায়সমূহের মাঝে বা সমাজের ফুটোয় (বা মার্কসকথিত 'pores of society'-

তে) থাকা নৌজীবী **ধীবর** সম্প্রদায় (fisherman নয় কিন্তু)। তাদের নিজেদের কোনো উৎপন্ন নেই, কোনো সম্প্রদায়ের তারা সদস্যও নয়; ফলে সম্প্রদায়ের যৌথউৎপন্নে তাদের অধিকারও নেই। তাদের সংসার চলে সম্প্রদায়সমূহের ভিতরে তাদের উদ্বৃত্ত মাল পারাপার করে। পরিবর্তে তারা পারাপারের পারানিস্বরূপ সেই সেই চালানি মালের অংশ পায়। আর, সেই পারানিরূপে পাওয়া মাল কেবল তাদের ব্যক্তিগতমালিকানাধীন সম্পদই হয়ে যায় না, হয়ে যায় মানবসভ্যতার প্রথম ও আদি ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ, আদি **মৎস্য**। তবে কিনা, এই মালিকানা তখনও সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানা হয়ে ওঠেনি, সবে মাত্র তার ভিতরে ব্যক্তিমালিকানার গন্ধটুকু এসেছে। (কেননা, যৌথ উৎপন্নকে ব্যক্তিমালিকানাধীন **পণ্যে** পরিণত হতে হলে সর্বাগ্রে যৌথসমাজদেহের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্পর্ক বা umbilical cord ছিন্ন হওয়া দরকার, তারপর তার থেকে ব্যক্তির আবেগকে ছিন্ন করা দরকার। তবেই উৎপন্ন **পণ্যে** পরিণত হতে পারে। তা হতে তখনও অনেক বাকি।) ফলে, সেই 'মৎস্যজীবী'দের গায়ে 'এটি আমার', 'এটি আমার' — এইরূপ 'আমি আমি গন্ধ' বা '**আমিষ**গন্ধ' বা 'মৎস্যগন্ধ' লেগে যায়, ব্যক্তিমালিকানার গন্ধ লেগে যায়, **মৎস্যগন্ধা**র আবির্ভাব হয়। তখনকার যৌথসমাজের **নাকে** এই গন্ধ ছিল অতীব দুর্গন্ধ। আজ প্রায় ৩০০০ বছর পরেও সেই দুর্গন্ধের ভাবটির ধ্বংসাবশেষ বাংলাভাষীদের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও বাঙালির সংস্কৃতিতে ব্যক্তিমালিকানার দুর্গন্ধের অবশেষের বা দুর্গন্ধের ভাবের দেখা মিলত। কারও বহু মালের মালিক হওয়ার তাড়া দেখলে লোকে এরকমভাবেও কথা বলত — 'কলিমটা তো একটা পিশাচ! শুধু আমার আমার করে খাবলে বেড়ায়। সব নিয়ে পিশাচটা কব্বরে যাবে!'

পরাশর গিয়ে সেই নৌজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। চারিদিকে 'কুয়াশা' সৃষ্টি করে রাখেন, যাতে কেউ জানতে না পারে। ফল কী হয়? 'মৎস্যগন্ধ্যা ইঁহার বরে পদ্মগন্ধা ও যোজনগন্ধা হইয়া শেষে অতুলরূপলাবণ্যবতী সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধা হন ও তদ্‌গর্ভে ইঁহার ঔরসে মহর্ষি ব্যাসদেবের উদ্ভব হয়।' তার মানে, **পরাশরের** পর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা আর দুর্গন্ধযুক্ত থাকল না, পদ্মগন্ধময় হয়ে গেল। লোকে বলতে লাগল, 'জানিস, কলিমবাবু কী করেছে জানিস, একটা গাড়ি কিনেছে, একটা বাগান বানিয়েছে, তার মাঝখানে রাজপ্রাসাদের মতো একটা বাড়ি বানিয়েছে! আহা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!' একে বলে আমিষগন্ধ। নিজের বাদ দিন, পাশের বাড়িতেও মাংস রান্না হলে তার গন্ধে মন জুড়িয়ে যায়, যদিও ক্ষুধার্তের ক্ষুধা তাতে বাড়ে বই কমে না। **মৎস্যগন্ধা** এইভাবে পদ্মগন্ধা হয়ে যায়, এবং তার গন্ধ এক যোজন দূর পর্যন্ত লোকে শুঁকতে পারে — জানো তো, অমুক গ্রামের কলিমবাবু এখন কী রাজকীয় বাড়ি গাড়ি করেছে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে পদ্মগন্ধা ক্রমশ যোজনগন্ধাতেও পরিণত হয়ে যায়।

তার মানে, সমাজে ব্যক্তিগতমালিকানা প্রতিষ্ঠা করার আগে দরকার ছিল সমাজের সংস্কৃতিতে বদল ঘটানো। সেটা না করে যে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, মার্কসসাহেবের সেকথা মাথাতেই আসেনি। আসবে কী করে? সভ্যতার অগ্রগতির এই বন্ধুর পথটা তো **পরাশর মৎস্যগন্ধা**দের হাত ধরে ভারতসমাজকেই পেরোতে হয়েছিল। ভারতের সেই বহু তিতিক্ষা ও কষ্টের অর্জন ইউরোপ বিনা পরিশ্রমে রেডিমেড পেয়েছিল বলেই তারা সেই ইতিহাসের সব কথা জানে না। ...

এ বিষয়ে যাঁদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রয়েছে, তাঁরা একটি বারের জন্য রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করুন। তিনি বলছেন, ' জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না।' অতীতের (শিল্পবিপ্লব-পূর্ববর্তী কালের) ক্ষেত্রে দুঃখের সেই লম্বা রাস্তাটা পাশ্চাত্যকে মাড়াতে হয়নি, তারা সেটি রেডিমেড পেয়ে গেছে প্রাচ্যের কাছ থেকে। আর বর্তমানের (শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী কালের) ক্ষেত্রে সেই লম্বা রাস্তাটা প্রাচ্যকে মাড়াতে হয়নি, তারা সেটি রেডিমেড পেয়ে গেছে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে। তবে শিল্পবিপ্লব ও তৎপরবর্তীকালের অর্জন তো মানবসভ্যতার পক্ষে যত না অমৃতমন্থন করেছে, তার চেয়ে বিষমন্থন করেছে অনেক বেশি! দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েও সে থামতে পারেনি, আরও এক মহাবিশ্বযুদ্ধের দিকে ক্রমশ সে এগিয়ে চলেছে। তবে সেসব কথা আর অধিক বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

কলম ও শরের বা জ্ঞানের জোর ও গায়ের জোরের এই যুদ্ধে আমাদের **পরাশর** শেষ পর্যন্ত কী করলেন? তিনি **মৎস্যগন্ধা**র ভিতরে বৈশ্যবৃত্তির এমন বীজ বপন করে দিলেন, যে, ভারতসমাজে ক্ষত্রিয়শক্তি যেন কোনোদিনই চূড়ান্ত শক্তি রূপে সমাজের উপরিতলে উঠে আসতে না পারে। প্রথম দিকে হলও তাই, **পরশুরাম** এলেন, ভারতসমাজকে ক্ষত্রিয়মুক্ত করার যারপরনাই চেষ্টা করলেন, এক-দু বার নয়, একুশবার। ব্রাহ্মণ **ঔর্ব**-র উত্তরসূরি **সগর** রাজা এলেন, ব্রাহ্মণবিরোধীদের একের পর এক ঝাড়েবংশে 'ধর্মভ্রষ্ট' করে দিলেন। সগররাজের নির্দেশে '... তদবধিই শকগণ অর্দ্ধমুণ্ডিত, যবন ও কম্বোজগণ মুণ্ডিতমুণ্ড, পারদগণ মুক্তকেশ, এবং পহ্নবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। তদবধি তাহাদের মধ্যে কাহারও বেদ ও মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার রহিল না।' (হরিবংশ পুরাণ)।

কিন্তু তারপর? এতদিন যাদের সাহায্য নিয়ে বেদজীবী-ব্রাহ্মণ ভারতসমাজ থেকে ক্ষত্রিয়শক্তিকে প্রায় নির্মূল করে ফেলেছিল, একেবারে অঙ্কের নিয়মে এবার তারাই এল — ভারতের বৈশ্যশক্তি। কেননা, গায়ের জোরের পূজারী ক্ষত্রিয় তো নাই, মাঠ তো ফাঁকা। আর বৈদিকধর্ম তো প্রায় জরাগ্রস্ত! অতএব ১০০ খ্রিস্টাব্দে নতুন ধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) হাতে করে সম্রাট অশোকের সাহায্য নিয়ে বৈশ্য এসে গেল ক্ষমতায়, এবং বৈদিকসভ্যতাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে ব্রাহ্মণকে একেবারে পথে বসিয়ে দিল। প্রায় একই ঘটনা-পরম্পরাকে আমরা দেখলাম ইউরোপেও, দশম শতাব্দীর পর থেকে; ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যের বন্ধুত্ব এবং ব্রাহ্মণের বিনাশ। এর পরে ইউরোপে ক্ষত্রিয়কে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে কলম ও তরোয়াল উভয়ের অধিকারী হয়ে যায় ইউরোপের কুবেরসাধক বৈশ্য।

ভারতে কিন্তু তা হয়নি। এখানে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বৈশ্যকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে ব্রাহ্মণ পুনরায় ক্ষমতায় আসে এবং হিন্দুযুগের

সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাতে কী! ক্ষত্রিয়হীন বা সামরিক শক্তিহীন এই দেশে 'আঠারো জন অশ্বারোহী' থাকলেই তো ঢুকে পড়া যায়, ধনসম্পদের কেন্দ্রস্বরূপ মন্দিরগুলো লুঠ করা যায়! আর তাই হতেও লাগল। পাঠান এল, মোগল এল, ব্রিটিশ এল। তারপর কী কী হল, সবাই জানেন। ...

আমরা ১৯৬০-৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্কুলে গিয়ে জানতে পারলাম, সবচেয়ে ফেকলু মাস্টারমশাই হলেন দুজন — পণ্ডিতস্যার আর মৌলবীস্যার। ব্রিটিশভারত পেরিয়ে স্বাধীন ভারতে পৌঁছে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান ব্রাহ্মণের মর্যাদা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, তখনই সেটা টের পেয়েছিলাম। পরে পরে বাংলাভাষার প্রফেসরদেরও একই হাল হয়। এখন, এই ২০১০ সালে, সমগ্র শিক্ষকশ্রেণীটাই সমাজের চোখে 'ফালতু' হয়ে গেছে। একই ঘটনা ঘটেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরসেনানী ও দেশবরেণ্য কর্মবীরদের ক্ষেত্রেও। তার মানে, স্বাধীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের **মর্য্যাদা**ই ধূলিলুণ্ঠিত, উভয়েই অবহেলিত, অপাঙ্‌ক্তেয়, ধিকৃত এবং বহুক্ষেত্রে লাঞ্ছিতও বটে। এই স্বাধীন ভারতে এখন একমাত্র সম্মানীয় শ্রেণী তারাই যাদের পকেটে অঢেল টাকা আছে, অর্থাৎ কুবেরসাধকেরাই এযুগের ক্ষমতাধর-শাসক। এমনকি লক্ষ্মীসাধকেরাও একেবারে কোণঠাসা। পরিস্থিতি এতই মন্দ যে, আজকের বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অ্যাকাডেমিগুলিতে কুবেরের ক্রীতদাস-ব্রাহ্মণেরাই এই তত্ত্ব প্রচার করছেন যে, কুবেরই একমাত্র অনুসরণীয়; আর কেউ নয়। টাকা কামাও, টাকা রোজগারের যন্ত্র হয়ে ওঠো, বলো — 'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকাহি পরমন্তপঃ।'

সমস্যা একটাই। বাংলার মানুষ এই কুবেরসাধক ক্ষমতাধর ও তাদের চেলাচামুণ্ডাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি করে না, মনের গভীরে তাদের 'ছোটলোক' মনে করে এবং ঘৃণা করে। এর ফল ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে বলা কঠিন। **৬.** ইংরেজি parasite।

পরি : **২.** ***পর** গতিশীল যাহাতে।* **৩.** চতুর্দিক, ব্যাপ্তি, দোষকথন, ভূষণ, আশ্লেষ, পূজন, বর্জন,, মর্যাদা, সর্ব্বতোভাব, শেষ, লক্ষণ, ইত্থম্ভাব, ভাগ, বীপ্সা, আলিঙ্গন, নিরসন, অতিশয়, নিয়ম, উপরি, উপরি, শোক, উপরম, পূর্ণতা, বিনিময়, নিষেধ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে অত্যন্ত প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পর, পরা, প্র**। 'পর গতিশীল যাহাতে' সেটিই **পরি** পদবাচ্য। এটি একটি উপসর্গ, স্বভাবতই উপসর্গের নিয়ম মেনে চলে (দ্র. **প্র**)। এই **পরি**-র প্রথম অর্থ কালার্থক, বর্তমানের পর, তাহার পর, ততঃপর — এই ক্রমশ পরবর্তীকাল বা 'পর' গতিশীল যাতে, সেই হল **পরি**। দ্বিতীয় অর্থ স্থানার্থক বা পাত্রার্থক। অস্তিত্বের বাইরে যা কিছু আছে, তারাই **পর**। বাইরের সেই **পর**গুলি সক্রিয় থাকে যাহাতে, সেটিই **পরি**-পদবাচ্য। একে সহজে চেনার উপায় হল **পরিধি** কথাটি মাথায় রাখা। একটি গোলকের সর্বদিকের যে সীমারেখা, সেই সীমারেখায় তাকে ধরলে তার **পরিধি**কে ধরা হয়। তার মানে, যে কোনো সত্তাকে তার সম্ভাব্য সামগ্রিকতা বা সার্বিকতায় (totality-তে) দেখলে সত্তাটির '**পরি**' দৃষ্ট হয়।

এই পর্যন্ত খুবই সহজ এবং সরল। কিন্তু যদি একটি সত্তার পরিধির গায়ে অন্য একটি সত্তার পরিধি লেগে থাকে? দুটি দাঁতওয়ালা চাকার কথা ভাবুন। একটি চাকার পরিধির দাঁতগুলি চাকাটির সংলগ্ন অন্য দাঁতওয়ালা চাকাটিকে ঘোরাচ্ছে। এখানে দুটি চাকার পরিধিতে যে '**পর** গতিশীল আছে' অর্থাৎ **পরি** আছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। এই **পরি** কিন্তু একেবারেই পরস্পরের বিপরীত দুরকম ক্রিয়া করছে, অর্থাৎ দুরকম অর্থ ধারণ করছে। দেখা যায় 'ক' চাকাটি যেদিকে ঘুরছে 'খ' চাকাটি ঠিক তার বিপরীত দিকে ঘুরছে। এমন হতেই পারে যে, 'ক' চাকাটি 'খ' চাকাকে ঘোরাচ্ছে, কিংবা তার উলটোটাও হতে পারে। মোট কথা একটি চাকার কেন্দ্রের শক্তি তার পরিধিতে পৌঁছে সংলগ্ন চাকাটির পরিধিকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তার মানে একটি চাকার কেন্দ্রের শক্তি অপর চাকাটির কেন্দ্রকে বিপরীত দিকে চালিত করছে।

তাহলে তো **পরি**র ব্যাপারটি আর সরল সহজ থাকছে না। **পরি** এখানে তার 'সার্বিক' অর্থটি পেরিয়ে দুই চাকার পরিধিতে সক্রিয় থেকে একটি মাত্র ক্রিয়ার সাহায্যে 'ক' চাকাটিকে যেদিকে ঘোরাচ্ছে, 'খ' চাকাটিকে ঠিক তার বিপরীত দিকে ঘোরাচ্ছে; একটি চাকার কেন্দ্র আপন ঘূর্ণমানতাকে, গতিকে, শক্তিকে দিয়ে দিচ্ছে অন্য চাকাটির কেন্দ্রকে; অবশ্যই উলটো করে। স্বভাবতই **পরি** এখানে সার্বিক হলেও শক্তি-বিনিময় বটে, আ**বর্ত্তন**মূলক বদল বা **পরিবর্ত্তন**ও বটে, বিপরীত দিকে চালিত করা বা **পরি**পন্থীও বটে। তার মানে **পরি** এখানে বহুপ্রকারের অর্থ ধারণ করে বা করতে পারে। দাঁতওয়ালা চাকার স্থানে যেই না মানুষ, সমাজ ইত্যাদিকে রাখা হবে, **পরি** তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত শক্তি-বিনিময় থেকে জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ ইত্যাদি নানা কিছুর বিনিময়ের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করতে থাকবে। একই কথা বলা যাবে **পরিবর্ত্তন** বা **পরি**পন্থীর ক্ষেত্রেও।

যাই হোক, আমরা দেখছি আমাদের শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা এই **পরি** উপসর্গযোগে বহু শব্দ সৃষ্টি করে গেছেন। সেগুলির অধিকাংশের ব্যবহার বাংলাভাষী ভুলেও গেছেন। যেগুলির ব্যবহার আজও প্রচলিত রয়েছে, প্রধানত সেগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এখানে আমরা **পরি** উপসর্গযুক্ত কিছু শব্দের শব্দার্থ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। **৬.** আদিতে par, per, অথবা peri যুক্ত অধিকাংশ ইংরেজি শব্দ একই উত্তরাধিকার থেকে এসেছে। ফলে সেগুলির অর্থে **পরি**-র কিছু না কিছু অর্থকে অবশ্যই পাওয়া যায়।

পরিকল্পনা : **১.** পরি + ✓কল্পি + অন (ল্যুট্, যুচ্) - ভাববাচ্যে, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *সামগ্রিক **কল্পনা** থাকে যাহাতে।* **৩.** পরিগ্রহ, নির্দ্ধারণ, রণসজ্জাবিশেষ, করণ, বিধান। (ব.শ.)। **৪.** planning অর্থে প্রচলিত। **৫.** আপনার একটি বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছা হল। কিন্তু কীভাবে করবেন? স্থান নির্বাচন, অর্থ সংস্থান, বাড়িটি কেমন হবে তার নকশা প্রস্তুত করা, তদনুযায়ী মালপত্র ও লোকজন যোগাড়যন্ত্র করা এবং নকশা অনুসারে ধাপে ধাপে কাজটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো — বাড়ি তৈরি করার এই সমগ্র কর্মপরম্পরা একের পর এক এবং ধাপের পর ধাপ **কল্পনা** করে করে সেগুলিকে একত্রে মনে ধরে রাখলে বা কাগজে লিখে ফেললে যে কল্পনাবলী বা 'কল্পনাশ্রেণী'কে পাওয়া যায়, তাকেই **পরিকল্পনা** বলে। যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই এইরকম **পরিকল্পনা** করে এগোনো

যায়, তা সে পিকনিকের-**পরিকল্পনা**, বিবাহ অনুষ্ঠানের **পরিকল্পনা** ... এমনকি পঞ্চবার্ষিক-**পরিকল্পনা**ও হতে পারে। দ্র. **কল্পনা**।

পরিকীর্ণ : ৫. **কীর্ণ** কথাটির অর্থ হল 'করে রাখা', তা সে গেঁথে গেঁথে রাখা, গর্ত করে করে রাখা হোক কিংবা শুধুমাত্র ছড়িয়ে রাখাই হোক। কিন্তু ঠিক কীভাবে তা করে রাখা হয়েছে? সেই বিশেষীকরণের জন্য 'শব্দের দিশারী'র দরকার পড়ে। (দ্র. **পরা**)। **উপসর্গ** তেমনি এক দিশারী। সে এসে শব্দের আগে বসে শব্দটির অর্থ কোন দিকে যাবে তা ঠিক করে দেয়। এক্ষেত্রে যেমন **আকীর্ণ** = 'সর্ব দিকে গেঁথে গেঁথে ছড়িয়ে রাখা', যার কোনো মাপজোক বা বিন্যাস নেই। **প্রকীর্ণ** = 'প্রকৃষ্টরূপে ছড়িয়ে রাখা', অর্থাৎ, ঠিক যেখানে যেখানে কীর্ণ করে রাখলে ভাল হয়, ঠিক হয়, যুক্তিযুক্ত হয়, সেই সেই দিকে সেইভাবে রাখা। **সঙ্কীর্ণ** = '**পরিকীর্ণ**কে কমিয়ে ছোট করে রাখা। **বিকীর্ণ** = 'বিশেষ দিকে ছড়িয়ে রাখা'। **উৎকীর্ণ** = '(কোনো কিছুর) উপরে গেঁথে গেঁথে রাখা'। এবং **পরিকীর্ণ** = 'সার্বিকভাবে ছড়িয়ে রাখা', এমনভাবে যেন তার একটা সামগ্রিকতা থাকে।

পরিকূজন : ৫. 'সার্বিক **কূজন** থাকে যাহাতে' সেই হল **পরিকূজন**। কিন্তু এই **কূজন** যদি মাল বিক্রিবাটা করার জন্য দোকানদারের চেঁচামেচি (= **পক্ষী**র কূজন) হয়, তাহলে, তার সার্বিক **কূজন**কেই **পরিকূজন** বোঝাবে। দ্র. **অনুদ্যুত**।

পরিক্রম (পরিক্রমা, নর্ম্মদা পরিক্রমা) : ২. ***পরিক্রম*** *= সার্ব্বিক* ***ক্রম*** *থাকে যাহাতে।* ***পরিক্রমা*** *=* ***পরিক্রম****-এর আধার যে।* ৩. **পরিক্রমা** = চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, গমন, প্রদক্ষিণীকরণ, অনুষ্ঠানক্রম। **পরিক্রমা** = পরিভ্রমণ, প্রদক্ষিণীকরণ। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ক্রম**। কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে যদি কোনো পরিধি রেখা টানা হয়, সেই রেখা বরাবর ঘুরে আসাকে বলা হয় **পরিক্রমা**। সেইভাবে সেকালে **নর্ম্মদা-পরিক্রমা**, পঞ্চকোশী-পরিক্রমা, নবদ্বীপ-পরিক্রমা, মন্দির-পরিক্রমা ... ইত্যাদির চল হয়। কিন্তু কেন সেইরকম **পরিক্রমা** করতে হয়, তার নানা রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। **নর্ম্মদা-পরিক্রমা** সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা ধর্মপ্রাণ হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

আমরা মনে করি, এইসকল সামাজিক-ঐতিহাসিক **পরিক্রমা**র বাহ্যিক আচরণগুলিই প্রচলিত রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মূল যে মানসিক আচরণ বা ব্যবহার তার প্রচলন নেই বললেই চলে। **নর্ম্মদা** শব্দে আমরা **নর্ম্মদা-পরিক্রমা**র কথা ব্যাখ্যা করে সেকথা আগেই কমবেশি বলেছি। দ্র. **নর্ম্মদা**।

পরিগ্রহ (পরিগ্রহণ, পরিগৃহীত, পরিগ্রহীতা) : ১. পরি + ✓গ্রহ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিগ্রহ*** *= সার্ব্বিকভাবে* ***গ্রহণ*** *থাকে যাহাতে।* ***পরিগ্রহণ*** *=* ***পরিগ্রহ*** *অন থাকে যাহাতে।* ***পরিগৃহীতা*** *= যাহাকে* ***পরিগ্রহণ*** *করা হইয়াছে।* ***পরিগ্রহীতা*** *=* ***পরিগ্রহ*** *করিয়াছে যে।* ৩. **পরিগ্রহ** = গ্রহণ, ধারণ, স্বীকার, পাণিগ্রহণ, পরিণয়, প্রতিগ্রহ, অবগতি, পরিবেষ্টন, বশীকরণ, সমষ্টি, পরিধান, অনুপ্রবেশ, অতিথিপূজন, উপরাগ, শাসন, পত্নী, পরিজন, অনুচর, পরিগ্রাহ্য বস্তু, বসন, স্ত্রী-প্রভৃতি বাহ্যবিষয়, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য, সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ, পরিগৃহীত দেশ, শপথ, পরিমাণ, মূল (root), অন্তঃপুর, পাণিগ্রহীতা, স্বামী, বিষ্ণু। **পরিগৃহীত** = সম্যক গৃহীত, স্বীকৃত, পরিণীত। **পরিগ্রহীতা** = গ্রাহক, পতি, প্রতিগ্রহীতা। (ব.শ.)। ৪. কেবল মাত্র marriage অর্থে 'দার **পরিগ্রহ**' শব্দটি কিছুটা প্রচলিত, অন্যথায় সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। ৫. ভাবতেও কষ্ট হয় যে, একজন মানুষের হাতি ঘোড়া মোটরগাড়ি লোকলস্কর সব রয়েছে, আর মানুষটা কিনা নিয়মিত রিকশা ভাড়া করে যাতায়াত করে! আমাদের অবস্থা হয়েছে সেইরকম। বিয়ে করে বউ আনাকে সেকালে বলা হত 'দার **পরিগ্রহ**' করা, অর্থাৎ স্ত্রীকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা। তাঁর শরীর মন ক্ষুধা তৃষ্ণা আশা আশঙ্কা চিন্তা ভাবনা আচার-আচরণ দর্শন সংস্কৃতি — এক কথায় একটি মানুষকে তার শরীর মন ও তার সমগ্র আবহসহ গ্রহণ করা; শুধু গ্রহণ করা নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা বা **পরিগ্রহণ** করা। শব্দটি কত বিপুল অর্থ ধারণ করত, উপরোক্ত অর্থগুলি থেকে সেকথা জানা যায়। আমরা সেসব ফেলে দিয়ে এখন marriage করে থাকি! তবে **বিবাহ** শব্দটি সে তুলনায় অনেক অনেক ভাল। সেই **বিবাহ** বা **বিয়ে** শব্দটি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখনও বেঁচেবর্তে আছে। তার মানে আমাদের দার-**পরিগ্রহ** গেছে, **বিবাহ**টা এখনও আছে! ঈশ্বর, আমাদের **বিবাহ**কে দীর্ঘজীবী করুন! আমেন!

পরিচয় (পরিচয়পত্র, পরচা, পরিচিত) : ১. পরি + ✓চি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিচয়*** *= সার্ব্বিক* ***চয়*** *(রাশিকৃত বা দঙ্গলভুক্ত অবস্থান) থাকে যাহাতে।* ***পরিচয়পত্র*** *= যে পত্র হইতে (কারও)* ***পরিচয়*** *জানা যায়।* ***পরচা*** *= < পরিচয়পত্র — নিম্নে ব.শ. দ্রষ্টব্য।* ***পরিচিত*** *= যার* ***পরিচয়*** *জানা হয়ে গেছে।* ৩. **পরিচয়** = বিশেষ জ্ঞান, পরিজ্ঞান, অভ্যাস, প্রণয়, দীর্ঘসাহচর্য্য। **পরচা** = জরিপে জমি কর ভূস্বামী ইত্যাদির পরিচয়পত্র। **পরিচিত** = পরিচয়যুক্ত, পরিজ্ঞাত, অনুভূত, সংসৃষ্ট, সংসর্গযুক্ত। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় জানতে চাওয়া হয়, 'তুমি কার ঘরের ছাওয়াল বাছা?' কিংবা 'কাদের কুলের বউগো তুমি কাদের কুলের বউ?' হিন্দিতে খানিকটা হীনার্থে বলা হয় 'বহ্ কীস ক্ষেতকি মূলি?' অর্থাৎ 'সে কোন ক্ষেতের মুলো?' — কাউকে চিহ্নিত করার বা চেনার এই যে পদ্ধতি, এতে যাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক সত্তাগুলির খবর নিয়ে তবেই তাকে চিহ্নিত করা হয়। কার ছেলে, কোন বংশ, কোন প্রজাতি, কোন জাতি ... ইত্যাদি সবগুলির মাঝে রেখে তাকে চিহ্নিত করা। ... নিঃসন্দেহে কাউকে চিহ্নিত করার এটিই ছিল মানবসভ্যতার আদি পদ্ধতি। আমাদের দেশে অভিজাত ব্রাহ্মণ ও সৈয়দ পরিবারগুলিতে এই রেওয়াজ এতই উচ্চ মাত্রায় ছিল যে, অনেকে চৌদ্দতম পুর্বপুরুষের নাম অনায়াসে বলে দিতে পারতেন। এখনও হয়তো অনেকে পারেন। অনেকে আবার আপন আপন বংশের পুরুষানুক্রমের তালিকা তৈরি করে রেখে গেছেন, যার উত্তরাধিকার কোনো কোনো বংশের

উত্তরসূরির হাতে আজও রয়েছে দেখা যায়। যাই হোক না কেন, পূর্বপুরুষদের নাম মনে রাখা সকল জাতির প্রাচীন মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। দেশে দেশে যুগে যুগে নানান সামাজিক উপপ্লব সেই রীতিকে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত করেছে বলেই এই রীতি সাধারণ রীতি হিসেবে এখন আর স্বীকৃত নয়।

বিশেষ্য রূপে **চয়** শব্দটির অর্থ হল, 'চয়িত যে' বা 'যাকে চয়ন করে রাখা হয়েছে।' সেই **চয়**-এর চারপাশে আর যে যে রয়েছে, অর্থাৎ **চয়**-এর **পরি**পার্শ্বে আর যে যে রয়েছে, তাদের মাঝখানে রেখে কাউকে চিহ্নিত করাই হল তার **পরিচয়** জানা। জমির **পরিচয়** জানা যায় তার **পরিচয়-পত্র** থেকে। কথাটি বাংলাভাষীর মুখে সংক্ষেপাকার পেয়ে হয়ে গেছে **পরচা**। আমাদের দেশ এখন ভোটনির্ভর শাসকের জন্ম দেয়। ফলে ভোটারের **পরিচয়-পত্র** আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। সেই সূত্রে শব্দটি পুনর্জন্ম লাভ করেছে। সম্প্রতি ভারত সরকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জন্য একটি করে সংখ্যা ঠিক করতে চলেছেন, যে সংখ্যার থেকে নাগরিকের সমগ্র **পরিচয়** জানা যাবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে Unique Identity Number (UIN)। আমরা একে অনায়াসে **পরিচয়াঙ্ক** কিংবা **প্রচয়াঙ্ক** বা শুধু **চয়াঙ্ক** এমনকি **চঙ্ক** কিংবা **নামাঙ্ক**ও বলতে পারি। তাতে শব্দটির ভিতরে সম্পূর্ণ অর্থটিই কমবেশি থাকবে।

পরিচর (পরিচরণ, পরিচর্য্যা, পরিচার, পরিচারক, পরিচারিক, পরিচারিকা, পরিচারিণী): ১. পরি + ✓চর্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিচর*** = *(প্রভুর)* ***পরি****পার্শ্বে (সর্বদিকে) বিচরণ করে যে।* ***পরিচরণ*** = ***পরিচর*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পরিচর্য্যা*** = ***পরিচর*** *থাকে যাহাতে তাহার আধার।* ***পরিচার*** = ***পরিচর*** *হইতে জাত।* ***পরিচারক*** = ***পরিচার*** *করে যে।* ***পরিচারিক*** = ***পরিচার****-কে গতিশীল করে যে।* ***পরিচারিকা*** = ***পরিচারিক****-এর আধার যে।* ***পরিচারিণী*** = ***পরিচার*** *গতিশীলভাবে থাকে যে আধারশক্তিতে।* / **পরিচর** = যুদ্ধে পরের প্রহারাদি হইতে রথকে রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ৩. **পরিচর** = পরিভ্রমণকারী, পরিচারক, ভৃত্য, দেহরক্ষক। **পরিচরণ** = পরিভ্রমণ, পরিচর্য্যা, সেবা। **পরিচর্য্যা** = পূজা, সেবা, শুশ্রূষা। **পরিচার** = পরিচর্য্যা, সেবা। **পরিচারক** = সেবক, ভৃত্য। **পরিচারিক** = শুশ্রূষাকারী, সেবক। **পরিচারিকা** = দাসী। **পরিচারিণী** = পরিচারিকা। (ব.শ.)। ৪. **পরিচর্য্যা, পরিচারক, পরিচারিকা** শব্দ তিনটি যথাক্রমে nursing, servant, maid-servant অর্থে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

পরিচালক (পরিচালিত, চালনা, পরিচালনা, সঞ্চালনা) : ২. ***পরিচালক*** = *সার্ব্বিকভাবে চালনা করে যে; পরিধিতে শক্তি-বুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া কাউকে চালনা করে যে (দ্র.* ***পরি****)।* ***পরিচালিত*** = *সার্ব্বিকভাবে চালন করা হইতেছে যাহাকে বা করা হইয়াছে যাহাকে।* / **পরিচালক** = যে কাজ চালায়; যে বস্তু নিজের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-তাপাদি পরিচালিত করে (conductor)। ৩. সর্ব্বত্র চালক, প্রধান কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ। (ব.শ.)। ৫. **চালক** ও **পরিচালক** এবং **চালিত** ও **পরিচালিত** — এদের মধ্যে পার্থক্য কী? না, একালের প্রতীকী বাংলাভাষা এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না, দুটো শব্দকেই এক করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে যে গভীর পার্থক্য রয়েছে, তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ নেই। **চালক** ও **চালিত** শব্দ দুটি দিশাহীন। গরু তাড়ানোও গরুকে চালনা করা। সেক্ষেত্রে রাখাল হয় **চালক**, গরু হয় **চালিত**। **পরি** উপসর্গ শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে **পরিচালিত** করে দিয়ে শব্দটির দিশা, **চলা**র চরিত্র ইত্যাদি ঠিক করে দিয়েছে। **পরি**তে অবস্থিত ক্রিয়া বাইরে থেকে চালনা করেছে এবং **পরিচালিত** সার্বিকভাবে **চালিত** হয়েছে। অর্থাৎ এক চাকা তার দাঁতের দ্বারা অন্য চাকাটিকে চালিত করেছে বা ঘুরিয়েছে। (দ্র. **পরি**)। তার মানে, **পরি** যুক্ত হয়ে **চালক** ও **চালিত** শব্দকে সুনির্দিষ্ট দিশা দিয়েছে, **চলার** প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করেছে।

সুতরাং সাধারণভাবে চালনা আর **পরিচালনা** আদৌ এক ব্যাপার নয়। অন্যের পরিধির দাঁতে আপন পরিধির দাঁত দিয়ে ধাপে ধাপে বিশেষ নিয়মে চালনা করাই **পরিচালনা** করা। একটি পরিবার চালান, কোনো সামাজিক সংস্থাকে চালান, এমনকি দেশ চালানও শুধুমাত্র **চালনা** করা নয়, রীতিমতো **পরিচালনা** করা। গাড়োয়ান-গরুগাড়ির সম্বন্ধ **চালক-চালিতের** সম্বন্ধ হতে পারে, কিন্তু পরিবারকর্তা-পরিবার, সংস্থাচালক-সংস্থা, হেডমাস্টার-বিদ্যালয় ... রাষ্ট্রপতি-রাষ্ট্র — এদের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে **পরিচালক-পরিচালিত** সম্বন্ধ। তার মানে ড্রাইভার গাড়িকে **পরিচালনা** করে না, **চালনা** করে; রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রকে **চালনা** করেন না, **পরিচালনা** করেন। ক্রিয়ার বিচারে দুটির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে।

আবার **সঞ্চালক-সঞ্চালিতের** ক্ষেত্রে দেখুন, উভয়ের **চলা** সম-তালে চলতে থাকে। আমি এক পা ফেলছি, এবার তুমিও এক পা ফেলো। **চালক-চালিতের** কিংবা **পরিচালক-পরিচালিতের** মধ্যে একপ্রকার বন্ধন থাকে, বাধ্যবাধকতা থাকে, শক্তির প্রয়োগ থাকে। কিন্তু **সঞ্চালক-সঞ্চালিতের** মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না, শক্তির প্রয়োগ থাকে না। উভয়েই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। সেই কারণে **সঞ্চালক-সঞ্চালিতের** সম্বন্ধ তুলনায় আদর্শ সম্বন্ধ। মনে রাখা ভাল, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক সময়ই **পরিচালক-পরিচালিত** এবং **সঞ্চালক-সঞ্চালিত** — এই দুই যমজ শব্দকে আমরাও গুলিয়ে ফেলি, **সঞ্চালক-সঞ্চালিত**কে **পরিচালক-পরিচালিত** লিখে ফেলি।

ইংরেজিতে আবার মজাটা দেখুন — যে conduct করে, তাকে conductor বলাই সঙ্গত। কিন্তু এ তো ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসরণ করা হয়ে গেল। তাহলে তো 'ক্রিয়াটি যে করবে তাকেই conductor বলতে হবে, তা সে জড় জীব যেই হোক' — এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ইংরেজি conductor শব্দকেও মানতে হয়। এবং অবাক কাণ্ড এই যে, সে সেই নীতি মানেও বটে। সেই কারণে যে ব্যক্তি (বাসের conductor) বাসযাত্রী থেকে কোনো সামাজিক কাজকর্ম পর্যন্ত conduct করে তাদের প্রত্যেককেই conductor বলা যায়, এমনকি তাপ-পরিবাহীকেও conductor বলা হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান-পরিচালককেও conductor বলা হয়।

পরিণত (পরিণমন, পরিণতি, পরিণাম, পরিণামদর্শী,

পরিণামপথ্য, পরিণামবাদ) : **১.** পরি + ✓নম্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। **২. *পরিণত*** = *সার্বিকভাবে (শেষ পর পর্যন্ত) নমিত হইয়াছে যে।* ***পরিণমন*** = *সার্বিক নমিতকরণ অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পরিণতি*** = ***পরিণত*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পরিণাম*** = ***পরিণম*** *হইতে জাত।* ***পরিণামদর্শী*** = *যিনি* ***পরিণাম*** *দেখিতে পান।* ***পরিণামপথ্য*** = ***পরিণামে*** *যাহা পথ্যরূপে ক্রিয়া করে।* ***পরিণামবাদ*** = ***পরিণাম*** *কথিত হয় যাহাতে।* / **পরিণত** = যে হস্তী তির্য্যগ্‌ভাবে দন্তাঘাত করে। **পরিণাম** প্রস্তুত প্রয়োজনের সাধনরূপে প্রসিদ্ধ বস্তু আরোপবিষয়ের সহিত অভেদভাবে পরিণত হইয়া প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হইলে 'পরিণাম' হয়। **পরিণামদর্শী** = কর্ম্মের ফল যিনি দেখেন। (ব.শ.)। **৩. পরিণত** = সম্যক নত, পরিণতিপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ, পূর্ণাবয়ব, প্রস্ফুটিত, পরিপাকপ্রাপ্ত, সংবৃত্ত, সুনির্ম্মল, রূপবিশেষগত, দিবসাবসানকালীন, তির্য্যগ্‌দন্তপ্রহার। **পরিণমন** = পরিণতি, পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির বিকার। **পরিণতি** = পরিণমন, নম্রীভাব, পরিপক্কতা, পূর্ণতাপ্রাপ্তি, পরিণাম, জরাবস্থা, শেষ, অবসান, খাদ্যপরিপাক, শেষফল। **পরিণাম** = পরিণমন, পরিণতি, পরিপাকাবস্থা, পরিপাক, শেষ, বার্দ্ধক্য, উপভোগ। **পরিণামদর্শী** = কর্ম্মশেষদ্রষ্টা। **পরিণামপথ্য** = শেষে হিতকর। **পরিণামবাদ** = বিকাররূপ বাদবিশেষ। বস্তুর সহিত যে অন্যরূপ জ্ঞান তাদৃশ (অর্থাৎ স্বরূপপ্রচ্যুত হইয়া কারণ যে কার্য্য জন্মায়, সেই) বিকার বা পরিণাম। দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়, দুগ্ধ কারণ দধি কার্য্য, বস্তুতঃ উভয়ে অভিন্ন, দুগ্ধের অবস্থান্তরমাত্র দধি; পূর্ব্বে কার্য্য দধি সূক্ষ্মরূপে কারণ দুগ্ধে ছিল, ব্যাপারবিশেষে কার্য্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এইরূপ ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তিতে জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়া অভিব্যক্ত হন, কিন্তু তিনি অবিকার। সুতরাং জগৎ মিথ্যা বা নির্বস্তুক নহে। ইহা 'পরিণামবাদ'।

'অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম।।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।। (ব.শ.)।

৪. পরিণত, পরিণতি, পরিণাম কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** কোনো একটি সত্তা আজ যা আছে কাল থাকে না, থাকবে না। জীবজগতে কালের নিয়মে কোনো সত্তা তার বর্তমান পেরিয়ে পরে পরে যেখানে গিয়ে নামে, সেই তার **পরিণাম**। কীভাবে সেই **পরিণামে** সে গিয়ে পৌঁছায়, তার কোনো ঠিক নেই; কেউ তাকে **পরিণমন** ক'রে ক'রে, **পরিণত** ক'রে **পরিণামে** পৌঁছে দিতে পারে, কিংবা সে নিজেই নিজেকে **পরিণমন** করে সেখানে পৌঁছে যেতে পারে।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ব্যাকরণের case শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন **পরিণমন**। case-এর পিছনে থাকে শব্দের শুদ্ধ রূপ থেকে আকারগতভাবে 'casus' বা 'পতন'-এর ধারণা। সেই ধারণাটিকে রামমোহন যথার্থেই বুঝেছিলেন। সুনীতিবাবুরা এসে সেই case-কে আমাদের 'কারক'-ধারণার সমতুল্য করে দিলেন। (দ্র. ৩.০৬৫, ভাষা প্রকাশ : বাঙ্গালা ব্যাকরণ / সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।) অথচ আমাদের দেশের ব্যাকরণে **'কারক'**-ধারণাটি দাঁড়িয়ে আছে কার্য-কারণ প্রভৃতি বিচারের উপর (দ্র. **প্রত্যয়**)। সেই কারককে case-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক না হয়ে পারে না। সুনীতিবাবুরা তাই করেই বাংলাভাষার অবাঞ্ছিত **পরিণমন** ঘটিয়ে দিলেন।

যাই হোক, মোটকথা **পরিণাম**-এ পৌঁছে গেলে তাকে বলা হয় **পরিণত**; আর, তার এই **পরিণাম**-এর দিকে চলতে থাকাকে বলে **পরিণতি**। বস্তুর বা জীবের এই যে **পরিণাম**, তা যিনি দেখতে পান, তিনি **পরিণামদর্শী**। যে সকল বিষয় বা বস্তু শেষ কালে বা **পরিণামে** আমাদের পক্ষে হিতকারী হয়, সেই সকল বিষয় বা বস্তুকে আমাদের পূর্বসূরিরা নাম দিয়েছিলেন **পরিণামপথ্য**। (দ্র. **পথ্য**)। এই ভাল শব্দটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ...

কার্যত 'নত' বললে কতখানি নত বা কীভাবে নত, সেসব কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না। 'নম', 'নাম' বা 'নত' শব্দের সঙ্গে উপসর্গ যোগ হয়ে তাদের সেই সূক্ষ্মতা ব্যক্ত করে। সেই কারণে 'নম্' ক্রিয়াজাত 'নমন', 'নাম', 'নত' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে উপসর্গ যোগ আরও অনেক শব্দ জনন করেছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র 'নত' শব্দটি থেকে উপসর্গযোগে যেসকল শব্দ তৈরি হয়েছে, সেগুলি নেব। সেগুলি হল — **প্রণত, সন্নত, অনুন্নত, অবনত, বিনত, আনত, অধীনত, উন্নত, পরিণত** ... ইত্যাদি।

প্রণত = প্রকৃষ্টরূপে নত যে; যাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধাপে ধাপে নামিয়ে নত করা গেছে। **বিনত** = বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে নত যে। **সন্নত** = কারও সমান নত যে। **অবনত** = সাধারণ নিয়মে যতখানি নত হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি নত যে। **উন্নত** = অন্যদের নামিয়ে দিতে পারলে নিজে উপরে উঠে পড়া গেছে বলে যে বোধ হয়। **অনুন্নত** = **উন্নত** নয় যে। **অধীনত** = যাকে নামিয়ে অধিকারে আনা গেছে। **পরিণত** = শেষ কাল পর্যন্ত যতখানি নত হতে পারে ততখানি নত যে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলি ব্যঞ্জনার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিণয় (পরিণায়ক, পরিণীত, পরিণীতা, পরিণেতা, পরিণেয়) : **১. পরিণয় (পরিণয়ন)** = পরি + ✓নী + অল্, অনট্ - ভাববাচ্যে। (ছা.অ.)। **২. *পরিণয়*** = *যাহাতে নিয়মনিষ্ঠভাবে (পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে) আনয়ন হয়।* ***পরিণায়ক*** = ***পরিণয়***-*জাত অগ্রগতি সাধন করে যে।* ***পরিণীত*** = *নিয়মনিষ্ঠভাবে (আবদ্ধ করে) আনীত যে।* ***পরিণীতা*** = *নিয়মনিষ্ঠভাবে (আবদ্ধ করে) আনীতা যে।* ***পরিণেতা*** = ***পরিণয়*** *তারণ করে (পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করে আনে) যে।* ***পরিণেয়*** = *যাহাকে* ***পরিণয়*** *(সূত্রে আবদ্ধ) করা হয়, করা ভাল, করা উচিত।* **৩. পরিণয় (পরিণয়ন)** = বিবাহ, দারপরিগ্রহ। (ছা.অ.)। **পরিণায়ক** = পরিণেতা, স্বামী। **পরিণীত** = ঊঢ়, বিবাহিত। **পরিণীতা** = (শব্দটি ব.শ. কিংবা ছা.অ.-তে নাই)। **পরিণেতা** = পরিণায়ক। **পরিণেয়** = পরিণয়ার্হ। (ব.শ.)। **৪. পরিণয়** বিয়ের কার্ডে লেখার সূত্রে প্রচলিত, **পরিণীতা** শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নামের কারণে এবং বিশেষত হিন্দি-সিনেমায় পরিণতির কারণে প্রচলিত। বাকি সব অপ্রচলিত। **৫. পরিচালক**

শব্দের সঙ্গে আমরা যে **পরি**কে পাই, **পরিণয়** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলিতে সেই **পরিই** রয়েছে। এই **পরি**র সার্বিকতা, নিয়মনিষ্ঠা বেহিসেবি নয়, বিশেষ নিয়মে বদ্ধ, ঠিক যেমন দাঁতে দাঁতে ঘোরে এবং ঘোরায় তেমনি নানান পারস্পরিক, পারিবারিক, সামাজিক চুক্তির বন্ধনে বেঁধে নিয়ে আসে। সেইভাব নানান নিয়মের বন্ধনে বেঁধে যে আনয়ন প্রক্রিয়া চালান হয়, তাকে বলে **পরিণয়**। সামাজিকভাবে যাঁরা ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা জানেন, কতরকম ছোট ছোট বন্ধনের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আর সে বন্ধন কেবল হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এমন নয়, মুসলমান, আদিবাসী, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। বাংলাভাষীদের বিয়ের কার্ডে আজও যে লেখা থাকে — '... তারিখে আমার পুত্র শ্রীমান অমুক শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে ...' ইত্যাদি, সেকথা নেহাত আলটপকা কথামাত্র নয়। ...

যাই হোক, এই যে 'নী' বা 'নয়ন' ক্রিয়া, 'নয়' শব্দে তা সুস্পষ্ট হয় না। তাকে সুস্পষ্ট সূক্ষ্মতায় প্রকাশ করার জন্য শব্দটির সঙ্গে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'নয়ন' ক্রিয়ার সমস্ত সূক্ষ্মরূপগুলিকে প্রকাশ করে থাকে। সেই উপসর্গযুক্ত শব্দগুলি হল — **প্রণয়, অপনয়, অনুনয়, নির্ণয়, বিনয়, আনয়ন, সুনয়ন, উন্নয়ন, অভিনয়, পরিণয়, উপনয়ন** ... ইত্যাদি। দ্র. **উন্নয়ন, নয়ন, উপনয়**।

পরিতাপ : ৩. অত্যন্ত তাপ, অত্যুষ্ণতা, সন্তাপ, দুঃখ, রৌদ্রতাপ, শোক, ভয়, কম্প। (ব.শ.)। ৪. repentance অর্থে প্রচলিত। ৫. আজকাল **তাপ** ও **পরিতাপ** একেবারেই আলাদা অর্থে বোঝা হয়ে থাকে। মনে করা হয়, **তাপ** হল heat, এবং **পরিতাপ** হল কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার পর তদ্‌বিষয়ক দুঃখ বা repentance। কার্যত, বাহ্যিক উষ্ণতা যেমন **তাপ**, মানসিক উষ্ণতাও **তাপ**। আর সে মানসিক উষ্ণতা জন্মায় শোক দুঃখ ভয় ত্রাস নিরাশ প্রণয় ক্রোধ ... ইত্যাদি মানসিক আবেগ থেকে। কোনো সত্তার ভিতরের তাপ অত্যন্ত বেশি হয়ে সে তাপ যদি তার পরিধিতে পৌঁছে যায়, সেই হল **পরিতাপ**। মানসিক তাপের ক্ষেত্রে মনের জ্বালা যদি তার অস্তিত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, পরিধিতে পৌঁছে যায়, তাকে **পরিতাপ** বলা যেতে পারে। সাধারণত 'শোক' সেই ধরনের মানসিক তাপ সৃষ্টি করে থাকে। হয়তো সেজন্যই তাকেই অনেক সময় **পরিতাপ** বলা হয়ে থাকে। ...

আমরা দেখছি, 'তাপ' শব্দের সঙ্গে যথাক্রমে **প্র সম্ অনু উৎ পরি উপ** উপসর্গ যুক্ত হয়ে **প্রতাপ, সন্তাপ, অনুতাপ, উত্তাপ, পরিতাপ, উপতাপ** — এই ছয়টি শব্দ জনিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, তাপ-এর অর্থ এরা একেবারেই বদলে দিয়েছে। **প্রতাপ**-এর ক্ষেত্রে **তাপ**কে পাওয়া যায় সুবিন্যস্ত রূপে, যেখানে যতটুকু থাকা দরকার, ততটুকু থাকবেই এবং সেটা টের পাবে বাইরের দ্রষ্টা। রাজার **প্রতাপে** বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, কামড়াকামড়ি করে না। একটি ঘটনার জন্য দ্রষ্টার যতটা অবহেলা দায়ী, তার দুঃখজনিত তাপ ঠিক সমপরিমাণ হলে, তাকে বলে **সন্তাপ**। কিন্তু তার চেয়ে যদি অনেক কম হয়, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে হয়, তবে সেটা **অনুতাপ**। আর যে তাপ উপর দিকে উঠে থাকে তাকে বলে **উত্তাপ**। কিন্তু যদি উপর থেকে এসে আপনার গায়ে পড়ে, তবে সে হল **উপতাপ**।

পরিত্যক্ত (পরিত্যাগ, পরিত্যাগী, পরিত্যাজ্য) : ১. পরি + ✓ত্যজ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিত্যক্ত*** = *যাহাকে সার্ব্বিকরূপে ত্যাগ করা হইয়াছে।* ***পরিত্যাগ*** = *সার্ব্বিকরূপে ত্যজন থাকে যাহাতে।* ***পরিত্যাগী*** = ***পরিত্যাগ*** *করে যে।* ***পরিত্যাজ্য*** = *যাহাকে* ***পরিত্যাগ*** *করা দরকার বা উচিত।* ৩. **পরিত্যক্ত** = বর্জ্জিত, বিহীন, বিরহিত, নিক্ষিপ্ত। **পরিত্যাগ** = বর্জ্জন, পরিহার, বিসর্জ্জন, দান, ত্যাগ, উপেক্ষা। **পরিত্যাগী** = পরিত্যাগশীল। **পরিত্যাজ্য** = অবশ্যপরিহার্য্য। (ব.শ.)। ৪. give up বা 'বর্জ্জন' অর্থে **পরিত্যাগ**, 'বর্জ্জিত' অর্থে **পরিত্যক্ত**, এবং 'বর্জ্জিতব্য' অর্থে **পরিত্যাজ্য** শব্দটি প্রচলিত; **পরিত্যাগী** অপ্রচলিত। ৫. আগেই বলা হয়েছে, **উপসর্গ** হল শব্দের দিশারী (দ্র. **পরা**)। **ত্যাগ** বলতে কেমন **ত্যাগ**? সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শব্দটির আগে **পরি** উপসর্গ বসিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সার্বিকভাবে **ত্যাগ** করা হলে সেটি **পরিত্যাগ**। আর কীভাবে ত্যাগ করা হল, আংশিক না কি অন্য কোনোরকম, সে বিষয়ে কিছুই না বলার থাকলে শুধুই **ত্যাগ**। তবে সাধারণত সত্তার আপন শরীরের বা মনের ভেতর থেকে কোনো কিছু বাইরে ফেলে দেওয়াকে বলে **ত্যাগ** করা; যেমন মলত্যাগ করা, হতাশা ত্যাগ করা ... ইত্যাদি। আবার, সত্তার শরীরের বা মনের বাইরের কোনো আবরণ-আভরণকে খুলে ফেলে দেওয়াকে সাধারণভাবে **পরিত্যাগ** করা বলা হয়ে থাকে; যেমন বসন **পরিত্যাগ** করা, ব্যসন **পরিত্যাগ** করা। আচার-আচরণ বা নিয়মনীতি এসবই মানুষের আভরণ এবং তাদের ত্যাগ করাকে **পরিত্যাগ** করা বলা হয়ে থাকে। অথচ পুত্রকে ত্যাগ করা হয়ে গেল তাকে 'ত্যাজ্য-পুত্র' বলে, **পরিত্যজ্য**-পুত্র বলে না। সাবেকি পুরনো ঘরবাড়ি লোকে **পরিত্যাগ** করে নতুন বাড়ি বানায়। মোট কথা, সেকালে একই ব্যাপারকে বোঝানোর জন্য **ত্যাগ** ও **পরিত্যাগ** দুটি শব্দ খরচ করা হত না। কিন্তু ইংরেজির প্রভাবে এখন আমরা দুটি শব্দকে একার্থেই প্রয়োগ করে থাকি। গ্রামবাংলার বাংলাভাষীরা কিন্তু কাকে **ত্যাগ** করতে হয় আর কাকে **পরিত্যাগ** করতে হয়, সেকথা জানেন এবং শব্দ দুটির যথাযথ প্রয়োগ তাঁরা অনায়াসে করে থাকেন। তবে কোন নিয়মে করে থাকেন, তা তাঁরা আপনাকে বলে দিতে পারবেন না, সেটি আপনাকে তাঁদের ভাষা-ব্যবহার অনুসরণ করে করে আবিষ্কার করে নিতে হবে।

পরিত্রাণ (পরিত্রাহি) : ১. পরি + ✓ত্রৈ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিত্রাণ*** = *সার্ব্বিক ত্রাণ থাকে যাহাতে।* ***পরিত্রাহি*** = ***পরিত্রাহ*** *গতিশীল যাহাতে, অর্থাৎ,* ***পরিত্রাণ*** *করো (আবেদনটি) গতিশীল যাহাতে (যে চীৎকারে)। /* **পরিত্রাণ** = মারণোদ্যতের নিষেধ (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **পরিত্রাণ** = হস্তদ্বারা ঘাতকবারণ, হস্তবারণ, পরিরক্ষণ, পরিত্রাতা, রক্ষক। **পরিত্রাহি** = 'রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করা, উচ্চৈঃস্বরে ডাকা। (ব.শ.)। ৪. saved ও save অর্থাৎ 'বাঁচানো' ও 'বাঁচাও' অর্থে শব্দ দুটি প্রচলিত।

৫. কাউকে 'তরিয়ে দেওয়া অন থাকে কিংবা তারণ করা অন থাকে যে প্রক্রিয়ায়' তাকে বলে **ত্রাণ**। যেমন বন্যায় সবকিছু ভেসে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে **ত্রাণ** করাকে বলা হয় 'বন্যাত্রাণ'; কিন্তু কখনোই 'বন্যা-**পরিত্রাণ**' বলা হয় না। 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে বা 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে যে চেঁচাচ্ছে, তা সে বন্যার জলের গ্রাসে ঢুকতে থাকার কারণে চেঁচাক আর বাঘের গ্রাসে ঢুকতে থাকার কারণেই চেঁচাক, তাকে **ত্রাণ** করলে তদ্রূপ **ত্রাণ**-কাজটিকে **পরিত্রাণ** বলে। এর কারণ হল, ভেসে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে ধনেপ্রাণে মরে যাওয়ার বা সার্বিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপার নেই। কিন্তু জলে ডুবে বা জলের পেটে গিয়ে মরার কিংবা বাঘের পেটে গিয়ে মরার মধ্যে সার্বিকভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি থাকে। সেখান থেকে ত্রাণ করলে তবেই **পরিত্রাণ**। দুটি শব্দ সত্যিই আলাদা এবং ভাগ্যক্রমে এখনো দুটো শব্দকে বাংলাভাষী এক করে ফেলেনি।

পরিনির্ব্বাণ (মহাপরিনির্ব্বাণ) : ৫. দ্র. **নির্ব্বাণ**। তার সঙ্গে **পরি** ও **মহা-পরি**- যোগ করে বুঝলে শব্দ দুটির অর্থ পাওয়া যায়।

পরিপন্থী : ১. পরি + ✓পন্থি (গতি) + ইন্ (ণিনি) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরি*** *(পর গতিশীল যাহাতে) পন্থা যাহার, সে।* ৩. প্রতিপক্ষ, শত্রু, বিরোধী, প্রতিকূল, দুষ্ট। (ব.শ.)। ৪. 'বিরোধী' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **পরি**। পরিধিতে দুই চাকার দাঁতের মাঝে যে ক্রিয়া চলে, তাতে দেখা যায়, একটিই ক্রিয়া চলছে বটে কিন্তু তার ফলে চাকা দুটি পরস্পরের বিপরীত দিকে ঘুরছে। পরিধিতে সক্রিয় রয়েছে যে পন্থা, চাকাটি ঘুরছে সেই পন্থায়। স্বভাবতই সেই পন্থা যাকে ঘোরানো হচ্ছে তার বিপরীত পন্থা। তাই **পরিপন্থী** মানে হয়ে যায় বিপরীত-পন্থী।

পরিপূর্ণ : ১. পরি + ✓পূরি + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সার্ব্বিকভাবে **পূর্ণ** যে।* ৩. সম্যক পূর্ণ, সম্পূর্ণ। (ব.শ.)। ৪. full অর্থে প্রচলিত। ৫. তিন তিনটি শব্দ — **পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ** — তিনটিই বর্তমানে একার্থে (full অর্থে) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরকম চললে আর একশো বছর পরে হয়তো দেখা যাবে এদের যে কোনো দুটো শব্দকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শব্দ তিনটি কি সত্যিই একার্থবাচক? উত্তর হল — আদৌ না। একটি গেলাস জলে **পূর্ণ** আছে। কিন্তু কতখানি **পূর্ণ**, সেকথাটি স্পষ্ট করে বলা নেই। গেলাসটি যদি কানায় কানায় **পূর্ণ** হয় অর্থাৎ গেলাসের মুখের সমান পর্যন্ত **পূর্ণ** হয়, তখন তাকে বলে **সম্পূর্ণ**। এবার তাতে আপনি পিন ফেলতে শুরু করলেন। জল গেলাসের মাপের চেয়ে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু যে পর্যন্ত তা উপচে না-পড়ছে ততক্ষণ পিন ফেলতে থাকলে গেলাসের জল **পরিপূর্ণ** হয়ে যায়। (দ্র. **ঢল**)। সভাঘর শ্রোতায় **পূর্ণ** বললে স্পষ্ট করে বলা হল না কতখানি **পূর্ণ**। তবে সভাঘরে শ্রোতার জন্য যতগুলি চেয়ার ছিল সেগুলি সব **পূর্ণ** হয়ে গেলে সভাঘর **সম্পূর্ণ** ভরে গেছে বলা যায়। কিন্তু তারপরও কিছু শ্রোতা যদি দাঁড়িয়ে থাকে এবং একেবারে দরজা পর্যন্ত সমস্ত ফাঁক ভরে যায়, তখন বলতে হয়, সভাঘর একেবারে **পরিপূর্ণ** হয়ে গেছে, উপচে পড়ছে। দুধারে বাঁধ রয়েছে এমন নদীর ক্ষেত্রে এই ধারণা আরও বেশি খাটে। নদীখাত ভরে জলপ্রবাহ চলতে থাকলে, নদীটি **পূর্ণ** বলা যায়। নদীখাত কানায় কানায় **পূর্ণ** হলে তাকে **সম্পূর্ণ** বলা চলে। কিন্তু তারপরে সেই প্রবাহ যদি নদীখাত ছাপিয়ে দুই তীরের বাঁধ ছুঁয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন সেই নদীকে বলতে হয় **পরিপূর্ণ**। কাঁসাই, কেলেঘাই প্রভৃতি নদীর ক্ষেত্রে **পূর্ণতার** এই তিনটি ধাপ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার মানে, **পূর্ণ**-র চেয়ে **সম্পূর্ণ** আরও বেশি **পূর্ণ**, তার চেয়ে **পরিপূর্ণ** আরও বেশি **পূর্ণ**। বাংলাভাষা এভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা পর্যন্ত তার শব্দে ধরে রাখতে পারে।

পরিবাদ : দ্র. **বাদ**।

পরিবার (পরিবারিত, পরিবৃত) : ১. পরি + ✓বৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিবার*** *=* ***পরি****-তে (পরিধিতে) বারণ থাকে যাহার।* ***পরিবারিত*** *= যাহাকে* ***পরিবারণ*** *করা হইয়াছে; অথবা* ***পরি****-তে (পরিধিতে) বারণ গতিশীলভাবে তারিত হইয়াছে যাহার।* ***পরিবৃত*** *= পরিধি আবৃত যাহার; অথবা সার্ব্বিকভাবে আবৃত যে।* ৩. **পরিবার** = পরিজন, অনুচর, খড়্গকোশ, খাপ, স্ত্রীপুত্রাদি, কুটুম্ব, স্ত্রী, ভার্য্যা। **পরিবারিত** = পরিবৃত, বেষ্টিত, পরিব্যাপ্ত। **পরিবৃত** = পরিবেষ্টিত, পরিক্ষিপ্ত, আবৃত, পরিব্যাপ্ত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. একালে আমরা **পরিবার** বলতে family বুঝি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অন্যরকম বুঝতেন। একদল মানুষের একটি গোষ্ঠী, তারা একটি গৃহে বা গৃহপুঞ্জে বা প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকে। সেই বাড়িকে ঘিরে একটি বৃত্তের পরিধির মতো একটি প্রাকার (boundary wall) গড়ে তোলা হয়, যা কিনা আসলে একটি বাহ্যিক বারণরেখা। পরিধি বরাবর এই যে বারণরেখা, এর ভিতরে থাকে মানুষের গোষ্ঠীটি। তবে এ হল দৃশ্য বারণরেখা। আরও একটি বারণরেখা থাকে, সেটি হল অদৃশ্য। লোকে জানতে পারে, অমুক গোষ্ঠীর এই এই অধিকারে হাত দেওয়া যাবে না, সেখানে বারণ রয়েছে। তাহলে তারা ছেড়ে কথা বলবে না। এই যে দুই প্রকার বারণরেখা দিয়ে একটি মানুষের ছেলেমেয়ে স্বজন পরিজনকে ঘিরে রাখা হয়েছে, বারণরেখার মধ্যেকার সেই জনগোষ্ঠীকে বলে **পরিবার**। 'চক্রবর্তী-**পরিবার**' মানে চক্রবর্তী-মহাশয়ের ছেলেমেয়ে-আত্মীয়-পরিজনকে ঘিরে যে আত্মরক্ষামূলক মানসিক বারণরেখা বা দেওয়াল গড়ে রাখা হয়েছে, তার ভেতরে যাঁরা থাকেন সেই জনসমষ্টি। তার মানে **পরিবার** মাত্রেই তার পরিধিতে বারণরেখা বা নিবারণমূলক বেড়া রয়েছে। **পরিবার**-কর্তা একনিষ্ঠভাবে সদা সর্বদা সেই বেড়া পাহারা দিতে থাকেন, সেই বারণরেখা টপকে কেউ যাতে গোষ্ঠীটির কোনো ক্ষতি করতে না পারে। সেকালে এরকম ব্যাপারকেই বলা হত **পরিবার**। এখনও গ্রামবাংলায় এই ধারণা ধ্বংসাবশেষ রূপে হলেও বলবৎ আছে। বাংলার শহরাঞ্চলেও এই ধারণা একেবারেই নেই বলা যাবে না। পাশ্চাত্যের family-ধারণা আমাদের **পরিবার**-ধারণাকে এখনও পুরোপুরি মেরে ফেলতে পারেনি।

পরিবেশ (পরিবেশক, পরিবেশন) : ১. পরি + ✓বিশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিবেশ*** = *সার্ব্বিকভাবে আবিষ্ট (মুগ্ধ, অন্তর্ভুক্ত) যাহাতে।* ***পরিবেশন*** = ***পরিবেশ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পরিবেশক*** = ***পরিবেশন*** *করে যে।* ৩. **পরিবেশ** = বেষ্টন, পরিবৃতি, মণ্ডল, সূর্য্যের ও চন্দ্রের রশ্মিমণ্ডল, পরিধি, বৃত্তপ্রান্ত। **পরিবেশন** = খাদ্যবিভাগপূর্ব্বক দান, ভোজ্যবণ্টন, পরিবেষ্টন। **পরিবেশক** = বিভাগপূর্ব্বক খাদ্যদাতা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটির ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি এবং অতিসূক্ষ্মতায় প্রসারিত। সেই কারণে **বেশ** শব্দের সঙ্গে বহু উপসর্গ যুক্ত হতে দেখা যায়। আর সেজন্যই এর থেকে অনেক শব্দ তৈরি হয়েছে। যেমন **প্রবেশ, সংবেশ, সন্নিবেশ, অনুপ্রবেশ, আবেশ, নিবেশ, সুবেশ, অভিনিবেশ, প্রতিবেশ, পরিবেশ, উপবেশন, উপনিবেশ** ... ইত্যাদি। ফলে, প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে একেবারে নিশ্চিত হয়ে বলতে গেলে আরও **অভিনিবেশ** দরকার। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।

প্রথমেই যে সমস্যাটি এক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তা হল, যার ভিতরে আবিষ্ট হয়ে আমরা থাকি, সে যদি আমাদের **পরিবেশ** হয়, তাহলে **পরিবেশন** মানে 'খাদ্যাদিবিভাগপূর্ব্বক বণ্টন' বোঝায় কেন? যে **পরিবেশক** আমাদের এই গ্রন্থটি পাঠকপাঠিকাদের মাঝে **পরিবেশন** করছেন, তিনি মানসিক খাদ্য বিভাগপূর্ব্বক বণ্টন করছেন, এমন কথা সবাই মেনে নেবেন আশা করি। কিন্তু সেক্ষেত্রে '**পরিবেশন** করা' কথাটির মানে কী দাঁড়ায়? দ্র. **বেশ**। ...

পরিভাষণ (পরিভাষা) : ১. পরি + ✓ভাষ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পরিভাষ*** = *বিষয়ের* ***পরি****-তে (পরিধির পরিখায়) যার আভাষ থাকে; যে ভাষণ বিষয়ের পরিধি পর্যন্ত পৌঁছায় বা পরিধিতে ভাষিত হয়ে থাকে।* ***পরিভাষা*** = ***পরিভাষ****-এর আধার যে।* ***পরিভাষণ*** = ***পরিভাষ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. **পরিভাষণ** = প্রজল্পন, আলাপন, সম্ভাষণ, নিন্দাপূর্ব্বক দুর্ব্বচন, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, নিয়ম। **পরিভাষা** = পরিভাষণ, শাস্ত্রকারের সংজ্ঞাবিশেষ, সংক্ষেপে গ্রন্থনির্ব্বাহার্থ সঙ্কেতবিশেষ, অনিয়মনিবারক ন্যায়বিশেষ, গ্রন্থের সঙ্কেতার্থ শব্দমালা। (ব.শ.)। ৪. **পরিভাষ, পরিভাষণ** অপ্রচলিত, কিন্তু **পরিভাষা** শব্দটি ইংরেজি terminology শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে অ্যাকাডেমিতে প্রচলিত। ৫. **পরিভাষা** একই সঙ্গে আলাপ গালাগালি, নিয়ম এবং অনিয়মনিবারক ন্যায় বা সঙ্কেত-শব্দ (terminology) খুব স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে এবং হয়ও। কেননা, বিষয়ের **পরি**ধিতে চলে আলাপন। সেই পরিধিতে যদি **পরি**খাত করা **পরি**খা থাকে, তবে সেখানে স্বভাবতই থাকবে নিষেধ, যা কিনা গালাগালি দুর্বচন হতে পারে আবার বিষয়ের নিয়মও হতে পারে। সেই নিয়ম ভাঙা যাবে না। অতএব সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের প্রকাশক ভাষাই **পরিভাষা** পদবাচ্য হয়ে যায়। তার একটা স্থিরনিশ্চিত **পরিখাত** এলাকা রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে **ভাষা** কথাটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। সেই কারণে তার সূক্ষ্ম দিকগুলি প্রকাশ করার জন্য **ভাষা** শব্দটির সঙ্গে **দিশারী**রূপে অনেকগুলি উপসর্গ যুক্ত হয় এবং অনেকগুলি নতুন শব্দ তৈরি হয়। যথা, **অপভাষা, সম্ভাষণ, বিভাষা, আভাষ, সুভাষ, অভিভাষণ, পরিভাষা, উপভাষা** ... ইত্যাদি। দ্র. **ভাষা**।

পরিমল : দ্র. **মল**।

পরীক্ষা (পরীক্ষক, পরীক্ষণ, পরীক্ষিত) : ১. পরি + ✓ঈক্ষ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***পরীক্ষা*** = *সার্ব্বিকভাবে ঈক্ষণ যাহাতে।* ***পরীক্ষক*** = *সার্ব্বিকভাবে ঈক্ষণ করে যে।* ***পরীক্ষণ*** = *সার্ব্বিকভাবে ঈক্ষণ থাকে যাহাতে।* ***পরীক্ষিত*** = *যাহাকে* ***পরীক্ষণ*** *করা হইয়াছে।* ৩. **পরীক্ষা** = পরিদর্শন, পরিজ্ঞান, তত্ত্বাবধারণ, তথ্যনির্ণয়, শাস্ত্রোক্ত অগ্নিধটাদি দ্বারা তথ্যনির্ণয়। **পরীক্ষক** = সম্যক দ্রষ্টা, গুণদোষবিচারক, কারণিক, নির্দ্ধারয়িতা, ছাত্রের বিদ্যাবিশেষের বিচারক। **পরীক্ষণ** = পরীক্ষা। **পরীক্ষিত** = পরিদৃষ্ট, পরিজ্ঞাত, নির্ণীতগুণদোষ, পরিক্ষিৎ। (ব.শ.)। ৪. examination, examiner, examine, examined অর্থে যথাক্রমে **পরীক্ষা, পরীক্ষক, পরীক্ষণ, পরীক্ষিত** শব্দ প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঈক্ষা**। আপনার মনে অজস্র বিষয় রয়েছে, যেগুলি বিশেষ মাপের মধ্যে বা পরিধির মধ্যে নিয়মবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করে রাখা হয়েছে। যেমন আপনি 'গরু' বলতে যা বোঝেন, সেটি একটি 'পরিধি-বদ্ধ ধারণা'। সেই ধারণার সঙ্গে দ্রষ্টব্যকে মেলানো, এক্ষেত্রে যেমন ছাত্রের 'গরু'-রচনাকে মেলানো, তাকেই বলে **পরীক্ষা** করা। না মিললে, সেই দ্রষ্টব্য বস্তু বা বিষয় আপনার **পরীক্ষা**য় ফেল করে।

একইভাবে, আপনার মনে একটি ছাঁচ রয়েছে, সেই ছাঁচের মাপে কাউকে দেখলে, সেইরূপ দেখাকে বলে **সমীক্ষা**। একদেশ-দর্শীভাবে দেখা বা একদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকাকে বলে **প্রেক্ষা**। এইরূপ একদিকে দিশাগ্রস্তভাবে দেখতে হয় যে হলঘরে, তাকে বলা হয় **প্রেক্ষাগৃহ**। পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে করতে দেখা ও দেখতে থাকা বা মানসিকভাবে বিষয়ের অনুসরণ করে তাকে দেখাকে বলে **অন্বীক্ষা**। কাউকে সাধারণত সবাই যেভাবে দেখে, সেভাবে না দেখে বিশেষভাবে কিংবা বিপরীতভাবে দেখাকে বলে **বীক্ষা**। এর থেকেই '**অণুবীক্ষণ** যন্ত্র' কথাটি এসেছে। কেউ আপনাকে দেখছে বা দেখবে, তাই আপনিও তাকে দেখছেন, একে বলে **প্রতীক্ষা**। কিন্তু বিপরীত পক্ষ আপনাকে না দেখলে আপনার **প্রতীক্ষা** পরিণত হয় **অপেক্ষা**য়। এ হল **অপ-ঈক্ষা**। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা **অপেক্ষা**র ভুক্তিতে দেখুন)। কিন্তু **নিরীক্ষা** আর **পরীক্ষা-নিরীক্ষা** কাকে বলে?

না-করণ অন্‌করণ গতিশীল থাকে যাতে, তাকে **নির্** বলে। এর অর্থ সহজ হয়ে যায় যখন আমরা **নির্গত** কথাটি ভাবি — সত্তা থেকে বেরিয়ে গমন করেছে যে, সেই হল **নির্গত**। অর্থাৎ কিনা, **নির্** কথাটির একটা মানে দ্রষ্টার থেকে বেরোনো। অতএব **নিরীক্ষা** (নির্ + ঈক্ষা) মানে দাঁড়ায় 'বহির্গত ঈক্ষা'। কিন্তু সেই 'বহির্গত-ঈক্ষা'টি করে কী? সে দ্রষ্টার থেকে বেরিয়ে গিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তু বা বিষয়টিকে নাড়াচাড়া করে দেখে; নাকরণ ও অন্‌করণ করে, অর্থাৎ, যাকে দেখার দরকার নেই তাকে নড়িয়ে দেয় বা বাদ দেয় এবং যাকে দেখা দরকার তাকে চাড় দিয়ে তুলে দেখে। তাহলে **পরীক্ষা-নিরীক্ষা** কথাটির মানে সহজ করে ভাবলে দাঁড়ায় — 'স্থিরীকৃত ধারণার সঙ্গে মিলছে কিনা দেখা' (= **পরীক্ষা**) এবং 'নাড়াচাড়া করে দেখা' (= **নিরীক্ষা**)। দ্র. **অগ্নিপরীক্ষা**।

পরীক্ষিৎ (পরিক্ষিৎ, দেবরাত, বিষ্ণুরাত) : ২. পরীক্ষিৎ = *পরীক্ষণ-এর গতিশীল তারণ যাহাতে; যিনি* ***পরীক্ষা*** *না করিয়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।* **৩.** দ্র. **দেবরাত**। চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। ইঁহার পিতা অভিমন্যু ... ... ইনি কলির শাসনকর্ত্তা, স্বরাজ্য হইতে কলিপ্রভাব দূর করেন। ... শমিকসুত শৃঙ্গী পিতার অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া 'সপ্তাহের মধ্যে পিতার অপমানকারীর তক্ষকদংশনে মৃত্যু হইবে' — এই অভিশাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মশাপ অবগত হইয়া ইনি অনশনে গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন এবং শুকমুখে হরিকথাশ্রবণে পূতদেহ হইয়া সপ্তম দিবসে তক্ষকদংশনে দেহত্যাগ করেন। (ব.শ.)।

(ক) মহাভারত অনুসারে, চন্দ্রবংশীয় এক রাজা। ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও সুভদ্রার পৌত্র, অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র এবং জনমেজয়ের পিতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণ নিহত হলে অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ... রাত্রির অন্ধকারে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশকরতঃ ... ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সুপ্ত দ্রৌপদীপুত্রগণকে হত্যা করেন এবং প্রাণভয়ে গঙ্গাতীরে ঋষিগণমধ্যে আশ্রয় নেন। ... অর্জুন তাঁকে খুঁজে আক্রমণ করলে তিনি ... ব্রহ্মশির-অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে অস্ত্র প্রতিসংহার করা তাঁর অসাধ্য হওয়ায় তা উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। উত্তরা মৃতসন্তান প্রসব করলে, কৃষ্ণ স্বীয় তেজ দ্বারা তাকে জীবন দান করেন। ... মহাপ্রস্থানকালে পাণ্ডবগণ এঁর (পরীক্ষিতের) হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করেন। ইনি মাদ্রবতী নামে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভেই জনমেজয়ের জন্ম হয়।

একদিন মৃগয়াকালে মৃগের অনুসরণে ঘুরতে ঘুরতে পিপাসার্ত হয়ে শমীক নামে এক মৌনব্রতী তপস্যারত মুনির দর্শন পেয়ে তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ... উত্তর না পেয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে একটি মৃত সর্প শমীকের স্কন্ধে বেষ্টিত করে প্রস্থান করেন। ... শমীকের বালকপুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অবমাননার জন্য ... পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত দেন ... সপ্তরাত্রির মধ্যেই সে মহাবিষধর তক্ষকনাগ কর্তৃক দংশিত হবে। ... এই সংবাদ শ্রবণান্তে রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রীদের পরামর্শমতো একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত এক প্রাসাদ নির্মাণ করে বিষচিকিৎসক কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করতে লাগলেন। সপ্তম দিবসে কাশ্যপ নামে এক বিষ-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ (মতান্তরে বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি) রাজার সাহায্যার্থ যখন তাঁর নিকট গমন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী তক্ষক নাগের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ... কাশ্যপের শক্তি পরীক্ষার্থ নিকটস্থ এক বটবৃক্ষকে দংশনে বিনষ্ট করে কাশ্যপকে তা' পুনর্জীবিত করতে বলেন। কাশ্যপের মন্ত্রবলে ভস্মীভূত বটবৃক্ষ পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। ... বিস্মিত তক্ষক তাঁকে ... প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে ফিরে যেতে প্ররোচিত করেন। ... তিনি ফিরে যান। অতঃপর তক্ষকের নির্দেশে কয়েকজন নাগ তপস্বীবেশে বহুপ্রকার ফলাদি ... রাজাকে উপহার দেন ... সেই ফলের মধ্যে একটি কৃষ্ণনয়ন তাম্রবর্ণ কীট দেখতে পেয়ে রাজা (উপহাস করে) বলেন, 'শৃঙ্গীর বাক্যই সত্য হোক, এই কীটই তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক।' তখন ... তক্ষক নিজমূর্তি ধারণ করে পরীক্ষিৎকে দংশন করে নিহত করেন।

মহাভারতেরই বনপর্বে বলা হয়েছে, ইনি জনৈক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইনি একবার মৃগয়াকালে তৃষ্ণার্ত হয়ে সরোবরতীরে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখে তার পাণিপ্রার্থী হন। কন্যা বিবাহের পূর্বে রাজাকে প্রতিশ্রুত করান যে, তিনি যদি কখনো তাঁকে জল দেখান, তাহলে তিনি অন্যত্র প্রস্থান করবেন। রাজধানীতে ... একদিন সেই রাণীর সঙ্গে বিহার করতে করতে রাজা ... তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ে রাণীকে জলে অবতরণ করতে বলেন। ... রাণী জলে নেমে আর উঠলেন না। রাণীর অন্বেষণে রাজা পুষ্করিণী জলশূন্য করে কেবলমাত্র এক মণ্ডূককে দেখতে পেয়ে, ক্রোধে সমস্ত মণ্ডূককুল নিধন করতে আদেশ দিলেন। ... মণ্ডূকরাজ নিষেধ করতে ... পরীক্ষিৎ বললেন যে, মণ্ডূকরা তাঁর স্ত্রীকে ভক্ষণ করেছে। ... উত্তরে মণ্ডূকরাজ আয়ু বললেন যে, পরীক্ষিতের স্ত্রী সুশোভনা তাঁরই কন্যা। সে খলস্বভাব, এবং এইভাবে বহু রাজাকে প্রতারিত করেছে। তারপর রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর কন্যাকে প্রত্যর্পণ করলেন এবং রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁর পুত্র ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী হবে। তাঁর পুত্র শল, দল ও বামদেব (মতান্তরে - বল) ব্রাহ্মণকুলের ক্ষতি করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** নামরূপে **পরীক্ষিৎ** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দেবরাত, জরৎকারু, আস্তিক, জনমেজয়**। রাজা **পরীক্ষিৎ**-এরই অন্য নাম **দেবরাত** ও **বিষ্ণুরাত**। কোনো কোনো পুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি পরীক্ষা না করিয়া কোনো কিছু গ্রহণ করিতেন না বলিয়া ইঁহার নাম হয় **পরীক্ষিৎ**।

পরীক্ষিৎ-এর কাহিনীটি ভারত-ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পৌরাণিক বিবরণ। এই ঘটনাবলীর সময় কাল হল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের আগে-পরে। মহাভারতের ভিত্তিই হচ্ছে এই ঘটনা। এই ঘটনা না ঘটলে মহাভারত লেখা হত কি না সন্দেহ। সেই একই ঘটনাবলীকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার **মঙ্গলকাব্যে** আরও বিস্তারিতভাবে 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেই কেবল নয়, এই ঘটনার প্রভাবেই সারা পৃথিবীর ইতিহাস দেহবাদিতার দিকে মোড় নিয়ে নেয় এবং সভ্যতার মশাল ভারতের হাত থেকে বাগদাদের হাতে চলে যায়, তারপর একসময় সেখানেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে, এবং সভ্যতার মশাল চলে যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলির হাতে। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে। এখানে অতি সংক্ষেপে বলে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (বৈদিক ব্যবস্থা) ও উঠতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (লক্ষ্মীপুঁজিভিত্তিক বৌদ্ধব্যবস্থা), দুই ব্যবস্থার কাজিয়ায় শেষ পর্যন্ত উভয় ব্যবস্থা পরস্পরকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বেঁচে থাকা প্রতিনিধিরা পাশ্চাত্যের দেশগুলির দিকে পালায় বা 'মহাপ্রস্থান করে'। তাই বলে ভারতে তারা সম্পূর্ণ মরে যায় না। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ দেশে তারপরও লক্ষ্মীপুঁজিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য বৈদিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বড় হয়ে ওঠা সেকেলে পুঁজিবাদীরা (সর্পেরা) সক্রিয় হয় এবং যে-পরীক্ষমূলক সমাজব্যবস্থা (= **পরীক্ষিৎ**) চলছিল, তাকে ধ্বংস করে দেয়। তারপর **জনমেজয়** শুরু করে সর্পমেধযজ্ঞ। সেই যজ্ঞ থামিয়ে দেয় আস্তিক।

পর্জন্য (পর্জন্যা) : ১. ✓পৃষ্ + অন্য - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পর্জন্য*** = ***পর*** *জনন থাকে যাহাতে।* ***পর্জন্যা*** = ***পর্জন্য****-এর আধার যে।* ৩. **পর্জন্য** = শব্দায়মান মেঘ, মেঘশব্দ, মেঘ, মেঘাধিপতি ইন্দ্র, বিষ্ণু। (ব.শ.)। (ক) বৃষ্টির দেবতা। এঁর সম্বন্ধে অনেক মন্ত্র রচিত আছে। (খ) হরিবংশ অনুসারে, ব্রহ্মা পর্জন্যকে সমস্ত জল বর্ষণের অধিপতি করেন। পর্জন্যের পুত্র হিরণ্যরোমাকে ব্রহ্মা উত্তর দিকের দিকপাল রূপে অভিষিক্ত করেন। (পৌ.অ.)। **পর্জন্যা** = দারুহরিদ্রা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. পুরাণাদি পাঠকালে এই শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই শব্দটি যে সত্তাকে বোঝায়, তাকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় না। যতটুকু বোঝা গেছে বলে মনে হচ্ছে, সংক্ষেপে সেকথা লিখে যাওয়া যাক।

বৈদিক সভ্যতার সূচনাকালে সমাজ যখন খানিকটা বিভাজিত এবং সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে জ্ঞানজীবীগণ সক্রিয়, তখন বাহ্যিক রোদ-বাষ্প-মেঘ-বৃষ্টির মতো সামাজিক রোদ-বাষ্প-মেঘ-বৃষ্টিরও আবির্ভাব ঘটে গেছে। প্রজাসাধারণকে তাপ দিয়ে সম্পদ সংগ্রহ হচ্ছে, সেই সম্পদের বাষ্প গিয়ে জমা হচ্ছে সম্পদের মেঘে, সেই মেঘ গর্জন করছে, তারপর বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ছে বা প্রজাসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে। সেই সময় জ্ঞানজীবীগণ যাদের উপর সামাজিক মেঘ রূপে কাজ চালানোর দায়িত্ব দেন, তারা 'গর্জনকারী মেঘ' রূপে বা **পর্জন্য** নামে পরিচিত হয়। এরা বর্ষণ করে না, গর্জন করে, ভয় পাওয়ায়, শত্রুকে দূরে রাখে। পরবর্তীকালে এদের যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেটিই **দেবদারু** বৃক্ষে পরিণত হয়। যে কারণে 'পীতদারু' বৃক্ষকে **পর্জন্যা** বলে।

পর্ণ (পর্ণা, পর্ণকৃচ্ছ্র) : ১. ✓পৄ + ন - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পর্ণ*** = *পায়ীর রক্ষণ থাকে যাহাতে; অথবা পায়ীর আবর্তন থাকে যাহাতে।* ***পর্ণা*** = ***পর্ণ****-র আধার যে।* / **পর্ণ** = বৃক্ষকে পূরণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **পর্ণ** = পত্র, দল, পাতা, তাম্বূল, পান, পক্ষ, পাখনা, বাণমূল-লগ্ন পক্ষ, পুঙ্খ, পুষ্পপত্র, ফুলের পাপড়ি; পলাশবৃক্ষ। **পর্ণকৃচ্ছ্র** = পলাশাদিপর্ণরসপান-সাধ্য ব্রতবিশেষ। (ব.শ.) ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখন আমরা জানি যে, গাছের পাতাই গাছের রান্নাঘর। সেখানেই গাছের দৈনিক খাদ্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। অথচ দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সেকথা অব্যক্তভাবে তখনই বুঝে গিয়েছিলেন। সেকথাই স্পষ্ট করে জানিয়ে গেছেন ব.শ.। কিন্তু সে তো শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থ! তার নিশ্চয় মানসিক অর্থও ছিল, নইলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা **পর্ণ** শব্দ যোগ করে প্রচুর শব্দ তৈরি করতে গিয়েছিলেন কেন? কোন্ অদৃশ্য ব্যাপারকে বোঝানোর জন্য তাঁদের সেই চেষ্টা ছিল?

হ্যাঁ, শব্দটির লৌকিক অর্থ গাছের পাতা হতে পারে, কিন্তু তার সুস্পষ্ট অলৌকিক অর্থও ছিল। ছিলই যে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঐ **পর্ণকৃচ্ছ্র** শব্দটি। ব.শ. তার যে অর্থ দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে **পলাশ** কথাটি রয়েছে। আমরা তার সাহায্য নিয়ে সেই অলৌকিক অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালাতে পারি। বলা হয়েছে, **পর্ণকৃচ্ছ্র** হল '**পলাশ** পাতার রস পান সাধন করার ব্রত'। শিক্ষকতা যাঁর ব্রত, তিনি ছাত্র পড়িয়ে নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের খাদ্য-বস্ত্র-আবাসের ব্যবস্থা করেন। সেকালে কেউবা **পলাশ** পাতা সংগ্রহ করে তার রস পান করে নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের খাদ্য-বস্ত্র-আবাসের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু বাহ্যিক বা নেচারের **পলাশ**-পাতার রস তো লোকে পান করে না, পান করাও যায় না! তাহলে এ কোন **পলাশ**? এ কি তবে আমাদের সেই সামাজিক **পলাশ** বৃক্ষ, যার কথা আমরা আগেই জেনেছি। তাই যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটি এখন এই দাঁড়াল যে, এই **পর্ণরস** শুধুমাত্র leaf-juice-কে বোঝায় না, আরও কিছু বোঝায়। বোঝায় বলেই পুরাণাদি গ্রন্থে **অঙ্গারপর্ণ, ঋতুপর্ণ, অপর্ণা, একপর্ণা, সুপর্ণা** ... প্রভৃতি সত্তাগুলির কথা এসেছে। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, একটি ব্যবস্থার শাখা প্রশাখা পেরিয়ে যে শেষাংশটি ঐ ব্যবস্থার রান্নাঘর রূপে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করে, সেটিই খেয়ে নেওয়া। এটি যে করে, সে **একপর্ণা**। তবে **অপর্ণা** তাও করে না।

পর্ব্ব (পর্ব্বকাল, পার্ব্বণ, পার্ব্বণী) : ১. **পর্ব্ব** = ✓পৄ + বন (বনিপ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পর্ব্ব*** = *পরবর্ত্তীকে (পরের স্তরকে) বহন করে যে।* ***পর্ব্বকাল*** = ***পর্ব্ব*** *অনুষ্ঠানের কাল যাহা।* ***পর্ব্বণ*** = ***পর্ব্ব*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***পার্ব্বণ*** = ***পর্ব্বণ*** *হইতে জাত।* ***পার্ব্বণী*** = ***পার্ব্বণ****-এর গতিশীল আধার যে।* / **পার্ব্বণ** = পর্ব্বে যাহা করিতে হয়। **পার্ব্বণী** = যে পারিতোষিক (ধনাদি) পার্ব্বণে (পর্ব্বে) দিতে হয়। (ব.শ.)। ৩. **পর্ব্ব** = বংশাদিগ্রন্থি, বাঁশ বেত প্রভৃতির গাঁট, গ্রন্থি, দেহসন্ধি, অমাবস্যাপ্রতিপদের সন্ধি, অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চ, পূর্ণিমা অমাবস্যা, পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় করণীয় যাগ, চন্দ্রগ্রহণ, বৎসরের বিশেষ কাল, অংশ, গ্রন্থবিচ্ছেদ-স্থান, উৎসব, প্রস্তাব, ভঙ্গী, শিঁড়ির পৈঠা, লক্ষণভেদ, গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যস্থিতভাগ, পাঁব, ব্যাপার, কাণ্ড, বৃত্তান্ত, হুজুক, উদ্যোগ, আড়ম্বর। **পর্ব্বকাল** = অমাবস্যা, পূর্ণিমা। **পার্ব্বণ** = অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ, পর্ব্বভব, অমাবস্যাদিসম্বন্ধী, পূর্ণিমার চন্দ্র, যজ্ঞ, উৎসব, পর্ব্ব। **পার্ব্বণী** = উপরে দ্রষ্টব্য। ৪. শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. বাঁশের দুই গাঁটের মধ্যবর্তী 'পাব'কে (ব.শ. বলেছেন 'পাঁব') **পর্ব্ব** বলে। একটি বাঁশ মানেই পর্ব্ব + গ্রন্থি + পর্ব্ব + গ্রন্থি + পর্ব্ব ... এইভাবে অনেকগুলি (১০ থেকে ২০টি) পর্ব্ব ও গ্রন্থির যোগফলে গড়ে ওঠা একটি লম্বা তৃণ, যাকে সেকালে বলা হত **তৃণশ্রেষ্ঠ**। কিন্তু বাঁশের **পর্ব্ব** নিয়ে তো আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা ভাবিত ছিলেন না, সেসব তো চোখের সামনে বিদ্যমান। যে **পর্ব্ব** বাহ্যচক্ষুতে দৃশ্যমান নয়, সেটাই ছিল তাঁদের মাথাব্যথার কারণ। তাঁরা দেখেছিলেন, এমন একটি সত্তা যে কিনা তার 'পরবর্তী সত্তাকে বহন করছে', অর্থাৎ **পর্ব্ব**রূপে সক্রিয় রয়েছে এবং আমাদের জীবন জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে অথচ তাকে ঠিক বাহ্যস্বরূপে দেখা যায় না। তাকে চিহ্নিত করে তাঁরা তার নাম দিয়েছিলেন **পর্ব্ব**।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঝরঝর করে বর্ষা তো নামল, সমগ্র ধরার বুক জুড়ে সিরসিরানি, কেননা কোটি কোটি ঘাসেরা মুখ বের করছে, সারা গ্রামের মানুষ গ্রাম থেকে বেরিয়ে তাঁদের লাঙল গরু নিয়ে চলল মাঠে, শুরু হল একদিকে ক্ষেত 'কাদা' করার ও তার আনুষঙ্গিক কাজ, আর অন্যদিকে 'বীজতলা' (ধানগাছের চারা) তুলে

আঁটি বেঁধে নিয়ে আসা ... ইত্যাদি এবং 'কাদা' করা হয়ে গেলে সেই 'বীজতলা' সেখানে রোয়ার (রোপণ করার) কাজ। কিন্তু তা হতে পারছে কী করে? হতে পারছে এইজন্য যে, তারও আগে কালবৈশাখীর পরে পরেই ক্ষেত প্রস্তুত করার জন্য 'উগাল' (প্রথম লাঙল দেওয়া) ও 'সামাল' (দ্বিতীয়বার লাঙল চালানো) দিয়ে রাখা হয়েছিল, 'বীজতলা'র জন্য অত্যন্ত ঘন করে বীজধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই 'বীজতলা' ইতোমধ্যে এক হাত লম্বা চারা-ধানগাছে পরিণত হয়েছে। এগুলি তুলেই তো গোছায় গোছায় রোপণ করতে হবে।

তার মানে, আগের গ্রীষ্ম-অধ্যায়ের কাজগুলি করে রাখা হয়েছিল বলেই পরের এই বর্ষা-অধ্যায়ের কাজগুলি করা সম্ভব হচ্ছে। আবার এই অধ্যায়ের কাজগুলি হয়ে থাকলে এর পরের অধ্যায়ের কাজগুলি হতে পারবে। কর্মের এই অধ্যায়গুলির প্রত্যেকটিই এক একটি **পর্ব্ব**। এবং প্রতিটি **পর্ব্বে**র উপর পরবর্তী **পর্ব্ব** নির্ভর করে। আর সেটা আদৌ বিচ্ছিন্নভাবে হয় না। এক **পর্ব্বে** আকাশে-বাতাসে কালবৈশাখী, অশ্বত্থতলায় চড়ক-ঝুলন, শিমূল তুলোর ওড়াউড়ি, মাঠে-ময়দানে উগাল-সামাল, উঠোনে-মাচায় বড়ি-তালই (খেজুরচাটার পাতা শুকনো) শিমূলের ঠোলা, আগা-পাশতলা ঘর নিকোনো, খড়ের চাল মেরামত, কাঠের মাচায় কাঠ জমা করা, কালবোশেখীর নতুন জলে নদী-নির্ঝরে মাছের পোনা সংগ্রহ ... এরকম অজস্র কাজের ভেতর দিয়ে কাটে গ্রীষ্মের প্রথম **পর্ব্ব**। তার পরে আসে বর্ষার **পর্ব্ব**, আসে শরতের **পর্ব্ব** ... এবং এভাবেই আমাদের বছরের একটি চক্র পূর্ণ হয়ে পরবর্তী বছরে আমরা পা দিই। একই নিয়মে, সিঁড়ির, গ্রন্থের ... **পর্ব্ব** হয়। মহাভারত রচয়িতা তাঁর গ্রন্থকে **পর্ব্বে পর্ব্বে** সুবিন্যস্ত করে রেখে গেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বছরের **পর্ব্ব**গুলিকে মাস ও **পর্ব্ব**-গ্রন্থিগুলিকে 'সংক্রান্তি' নাম দিয়েছিলেন।

এক একটি **পর্ব্ব** পেরোতে গিয়ে সারা দেশ জুড়ে সকল দেশবাসী যতরকমের কাজকর্ম ক'রে ক'রে সেই **পর্ব্ব** অতিক্রম করেন, সে সবই **পর্ব্বণ**। তার মধ্যে যে **পর্ব্বণ**-কর্ম দৈহিক তৃপ্তির এলাকা পেরিয়ে মানসিক তৃপ্তির এলাকায় ঢুকে প'ড়ে বিশেষ ধরনের আনন্দ ও উৎসবের ব্যাপার হয়ে প'ড়ে সেগুলিকে বলা হয় **পার্ব্বণ**। সে **পার্ব্বণে**র পালা পড়ে, সে **পালাপার্ব্বণে** লোকে **পালা**গান গায়, শোনে, **পার্ব্বণী** নেয় ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের নাকি 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ'। কথাটি কিন্তু তেরো নয়, আসলে আমাদের সারা বছর জুড়ে অজস্র **পার্ব্বণ** রয়েছে। প্রতি মাসে, প্রতি দিনেও তার রেশ থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাধ্যবাধকতায় কর্ম করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্তত বাংলাভাষীদের সমাজে বাৎসরিক মাসিক দৈনিক জীবনযাত্রার রীতিপদ্ধতির যে উত্তরাধিকার দেখতে পাওয়া যায়, তাতে কর্মে ও আনন্দে কোনো বিভাজন দেখা যায় না। যে বাংলাভাষীরা সেই উত্তরাধিকার আজও বহন করেন, সময় তাঁদের কোথা দিয়ে কখন কেটে যায় বোঝাই যায় না। **পার্ব্বণে পর্ব্বণে পর্ব্ব** মাস বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, টের পাওয়া যায় না। ...

ক্ষেতে বছরের প্রথম হল-যোজনা করা হবে, মানেই হল, সেই ক্রিয়ার (কর্মযজ্ঞের) সঙ্গে আকাশের বাতাসের মাঠের পরিবারের পাড়া-প্রতিবেশীর গরুর হালের কেঁচোর ব্যাঙের পোকার ... সকলের সম্পর্ক আছে; মনে হয়, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবেই ভাবতেন। কেননা বিশ্বের সঙ্গে মানুষের যে নাড়ীর সম্পর্ক, তা তাঁরা ছিঁড়ে ফেলতে রাজি হননি। তাঁরা 'হলাভিযোগ' নাম দিয়ে প্রথম দিনের ঐ কর্মযজ্ঞকে একটি **পর্ব্বে** (পরবে) উন্নীত করে নিয়েছিলেন। একালের মতো শুকনো ঠকঠকে যন্ত্রবৎ কাজ করতেন না তাঁরা। শিশুদের রান্না-বান্না খেলার মতো সবাই মিলে হৈ হৈ করে ক্ষেতে লাঙল দিতেন, লাঙল করার উৎসবও হত সমান তালে, 'হলাভিযোগ', আর তাতেই কাজের ভিতরেই কাজ থেকে মন ছাড়া পেয়ে যেত। এই কর্মলিপ্ত-কর্মমুক্ত-মন মুক্তির ইশারা পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠত। প্রতিটি কাজের এই ছিল নীতি ও রীতি। এভাবেই কর্মজগৎকে রসের জগতের মধ্যে ডুবিয়ে মানুষকে সরেস করে 'রসে-বশে' রাখার উপায় করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। স্বভাবতই বাংলাভাষীর জীবন **পর্ব্বে পর্ব্বণে পার্ব্বণে** রসসিক্তভাবে অতিবাহিত হতে থাকত। ...

প্রায় একই ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন পাশ্চাত্যেরও। প্রোটেস্টান্ট ইউরোপ তার থেকে সরে যায়। শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপ আরও সরে গেল। তার ছ'দিনই কাজ, এবং সে কাজের সঙ্গে আনন্দের কোনো সম্পর্কই নেই। তাহলে মানুষটার মন বাঁচবে কী করে? তাঁরা বললেন, শনিবার অর্ধদিবস কাজ করে ছুটি করো, মদভাটিতে যাও, ছ'দিনের মানসিক নির্যাতনের শোধ তোলো সারারাত মদ গিলে। এর ফলে যে আত্মগ্লানি হবে পরের দিন রবিবার চার্চে যাও, সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে। বর্তমান বিশ্বায়িত বিশ্বে আবার তাও নেই। এখন বছরের ৩০০ দিন কাজ করো, যা টাকাপয়সা জমবে তা নিয়ে বাকি ৬৫ দিন ধরে সমুদ্রসৈকতে পড়ে থেকে ফুর্তি করো, যা খুশি তাই করে সর্বস্বান্ত হও! হয়ে আবার 'বাধ্য' যন্ত্রের জীবন অনুসরণ করে কাজে ফেরো।

বিশ্বের সঙ্গে নাড়ী-ছেঁড়া যান্ত্রিক-বুদ্ধির বুদ্ধিমানরা একালে বিশ্বসমাজের পরিচালক। ফলত, সারা বিশ্বেই এখন লোকে সময়ের **পর্ব্ব** পেরোয়, **পার্ব্বণ** ছাড়াই। এই যন্ত্রবুদ্ধির বুদ্ধিমানদের নিদান দেওয়া ইত্যাকার কলকাকলিহীন কর্ম, এই সুরবিহীন গান, এই প্রেমবিহীন রতি, এই রোদে শুকানো পাষাণবৎ রসগোল্লা — বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বাংলাভাষীরা এই বিষ হজম করতে পারছে না, তাদের উত্তরাধিকার তাদের ভীষণরকম আটকাচ্ছে। তারা অন্য সকলের মতো **পার্ব্বণ** ছাড়া **পর্ব্ব** পেরোতে পারছে না। ফলস্বরূপ ভেতরে ভেতরে বিষবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধছে।

পর্ব্বত : **১.** পর্ব্বন্ + ত (তপ্) অস্ত্যর্থে; ✓পৃ + অত (অতচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পর্ব্ব** তারিত যাহাতে; অথবা, যে **পর্ব্ব**সমূহ তারণ করে। /* পর্ব্ব আছে যার। (ব.শ.)। **৩.** গিরি, শৈল, ক্ষুদ্রগিরি, (সাদৃশ্যে) স্তূপ, কুলপর্ব্বতের সংখ্যানুসারে (৭) সংখ্যা, বৃক্ষ, পাবদা মাছ, শাকবিশেষ, দেবর্ষিবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** mountain অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **গোত্র, অম্বুরপর্ব্বত, গিরি, কুলগিরি, মহীধর**। দৃশ্য **পর্ব্বত** বা mountain সবাই দেখেছেন, বাহ্যিক চোখে দেখাও যায়, কিন্তু তাকে দেখানোর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা **পর্ব্বত**

শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁদের সমস্যা ছিল সর্বপ্রকারের সামাজিক সংগঠন এবং সর্বোপরি সমগ্র সমাজের পরিচালক-সংগঠনরূপী আমলাতন্ত্রসহ সরকার বা রাষ্ট্র। কেননা, তাঁরা দেখছিলেন, মানবসমাজে এগুলির আবির্ভাব ঘটে গেছে, তারা দারুণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, অথচ তাদের বাহ্যিক রূপ সেভাবে নেই, যেভাবে আমাদের পার্থিব চোখ তাদের দেখতে পায়। স্বভাবতই সেগুলিকে বোঝানর জন্যই তাঁদের একটি শব্দের প্রয়োজন ছিল এবং তাঁরা 'সামাজিক সংগঠন' সত্তাটির স্বভাব বিবেচনা করে তার নাম দিয়েছিলেন **পর্ব্বত**। এটি **পর্ব্বে পর্ব্বে** বিন্যস্ত, কেঁচোর তৈরি করা কাদার স্তূপের মতো এর উত্থান ঘটে — বহিরঙ্গে শক্তির চাপ থাকে উপর থেকে নীচে, অন্তরঙ্গে শক্তির চাপ থাকে নীচের থেকে উপরে। এর সমান্তরালে বাহ্যজগতে বহু রকমের বহু hills ও mountain রয়েছে, সেগুলিকেও আমাদের শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা অতঃপর **পর্ব্বত** নামেই চিহ্নিত করে দেন, যাতে নিম্ন-অধিকারীদের পক্ষে অদৃশ্য **পর্ব্বত**কে (social organisation-কে) চিনে নেবার সুবিধে হয়।

যাই হোক, **পর্ব্বত** বিষয়টি অনেকটাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে উপরোক্ত **গোত্র** ... ইত্যাদি শব্দে। আরও নানা শব্দের ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গ এসেছে এবং তা কমবেশি ব্যাখ্যাত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কথা রয়েছে, যা এখানে বলে যাওয়া জরুরি। আমাদের সামাজিক সংস্থা বা সংগঠনগুলি সবই **পর্ব্বে পর্ব্বে** বা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, সন্দেহ নাই। একটি থানার কথাই ধরা যাক না কেন, তার তলার **পর্ব্বে** বা স্তরে যদি থাকে ১০০ জন সাধারণ কনস্টেবল, তো তাদের উপরের **পর্ব্বে** থাকে ১০ জন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর, তাদের উপরের **পর্ব্বে** ৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর, এবং সবার ওপরে থাকে একজন ইন্সপেক্টর বা দারোগা। এটি একটি অতি ছোটখাট **পর্ব্বত**, প্রায় উইয়ের ঢিবির মতো। একালের সমস্ত সামাজিক সংগঠন বা সংস্থাই **পর্ব্বত** পদবাচ্য, কেউ বড় কেউ ছোট; সবই পিরামিড আকৃতির। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্করণ হল ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকার, যাকে সেকালে বলা হত 'হিমালয়' **পর্ব্বত**। তবে সেকালে ভারতসমাজে যে-সকল সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের সাত রকম চরিত্র দেখেছিলেন এবং তাদের সাতটি নামে চিহ্নিত করে তাদের নাম দিয়েছিলেন **কুলগিরি** বা **কুলপর্ব্বত**। তাদের নামগুলি ছিল **মহেন্দ্র, মলয, সহ্য, শুক্তি, ঋক্ষ, বিন্ধ্য,** ও **পারিপাত্র**। এদের মধ্যে যৌথসমাজের নিয়ম মেনেই গড়ে ওঠা সামাজিক সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল **মহেন্দ্র** এবং **পণ্য**-রপ্তানিকারী সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল **পারিপাত্র**।

সেকালে যতদিন এই ছোটবড় সামাজিক সংস্থাগুলি খানিকটা সজীব ছিল, এখনকার মতো জড় ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি, ততদিন পর্যন্ত এদের বলা হত 'বৃক্ষ'। এদের মধ্যে সরকারি সংস্থাকে বলা হত **অশ্বত্থ বৃক্ষ** এবং ব্যবসায়ী সংস্থাকে বলা হত **বটবৃক্ষ**। কিন্তু পরে পরে উভয়প্রকার সংস্থাই **পর্ব্বত** পদবাচ্য হয়ে যায়। দোকানদারের যেহেতু ক্রেতাপক্ষ ও বিক্রেতাপক্ষ নামে দুটি ডানা থাকে, ব্যবসায়ী সংস্থার **পর্ব্বত** রূপটিরও ডানা গজায়। একালের ব্যাঙ্ক যারা অর্থ-বিপণন করে, কিংবা বিদ্যুৎ দপ্তর যারা বিদ্যুৎ বিপণন করে, তাদের আচরণ তো ডানাওয়ালা **পর্ব্বত**-এর মতো। তাই পুরাণাদি গ্রন্থে জানান হয়, যে, একসময় কিছু কিছু **পর্ব্বতের** ডানা গজায় এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাদের ডানা ছেঁটে দেন, যেকারণে তাঁকে **গোত্রভিৎ** বলা হত।

দক্ষ-এর অপর নাম 'হিমালয়', ইনি 'গিরিরাজ'। আসলে, **দক্ষযজ্ঞে**র মহা-আলোড়নের পর বৈদিক সমাজের সূচনা হলে, ছাগমুণ্ডি **দক্ষই** ভারতসমাজের পরিচালক হয়ে পড়েন। তাঁর সেই পরিচালন-ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে একপ্রকারের 'অধিরাষ্ট্র' রূপে পরিণত হতে থাকে। **দক্ষের** একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি সেই 'অধিরাষ্ট্র'কে ক্রমশ স্থির করে, অচল করে, ঠাণ্ডা করে, হিমের আলয়ে বা **হিমালয়ে** পরিণত করে। কার্যত একই কর্মের পুনরাবৃত্তির সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন বলেই তার নাম দেওয়া হয় **হিমালয়**। পরবর্তীকালে এই অধিরাষ্ট্রই বিশ্বের আদিরাষ্ট্র রূপে ভারতরাষ্ট্রের বা **পৃথু**র জন্ম দেয়। সেও একটি সামাজিক সংগঠন এবং একালের চোখে সর্বোচ্চ সংগঠনও বটে। কিন্তু ভারতসমাজ এই রাষ্ট্রকে 'ভাড়াটে গুণ্ডা'র অধিক সম্মান কোনোদিনই হয়নি। **পৃথু**কে বা আদি রাষ্ট্রকে সে নাম দিয়েছিল 'আদি ক্ষত্রিয়'; আর **ক্ষত্রিয়**কে কী কী করতে হবে সেকথা **দক্ষ**-সহযোগী মহর্ষি ব্রাহ্মণেরা বিস্তারিতভাবে ছকে রেখে গেছেন। (আমাদের 'চ' গ্রন্থের ৩৯-৪৬ পৃষ্ঠায় 'সরকার বাহাদুর সংবাদ' অধ্যায়ে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তার মানে, ভারতীয় উপমহাদেশে 'অধিরাষ্ট্র'ই সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন, রাষ্ট্র তার তলায় কাজ করত। সেই রাষ্ট্রকে পাঠান মোগলেরা দখল করলেও তারা ভারতীয় অধিরাষ্ট্রের শাসন কেবল মেনেই নেয় না, তাঁদের জ্ঞানজীবীরা সেই অধিরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েন। তারপরে ব্রিটিশ ভারতরাষ্ট্র দখল করে এবং ভারতীয় অধিরাষ্ট্রকে খানিকটা অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে। তাদেরই ফেলে যাওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দখল করে চালাতে শুরু করে স্বাধীন ভারত। ফলত, ভারতের 'অধিরাষ্ট্র' খানিকটা খর্ব হলেও এখনও কমবেশি সক্রিয় রয়েছে। ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে যায়, তাই তিনি বারংবার বলেন, আমাদের দেশ হল 'সমাজপ্রধান দেশ', 'রাষ্ট্রপ্রধান দেশ' নয়। ...

যাই হোক, এই **হিমালয় পর্ব্বত**কে, তার আধারশক্তি **মেনকা**কে এবং তাঁদের কন্যা **পার্ব্বতী**কে প্রাচীন বাংলার কবিরা কিন্তু ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধযুগের বেদবিরোধী বিপ্লবে যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে **অকালবোধন** করে বা আবাহন করে কাজে লাগানো হয়েছিল, সে তো আর কেউ নয়, এই **পার্ব্বতী**ই। সেই **পার্ব্বতী**র প্রথম নাম ছিল **উমা**। বাংলার কবিরা তাঁকে নিয়ে **আগমনী** গানের সম্ভার রচনা করে গেছেন। একালের ভাষায় বললে, এই **উমা** হলেন আমাদের সমগ্র উত্তরপ্রজন্ম। জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবহনকারী আবিষ্কারক ও সৃষ্টিগুণসম্পন্ন বা **শিব**গুণসম্পন্ন মানুষদের আধারশক্তি রূপে সে ভোলানাথের সহযোগী। সেই ভোলানাথের মতো মানুষদের অবজ্ঞা করে অবহেলা করে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছে আমাদের অধিরাষ্ট্রমূলক হিমালয় বা **দক্ষ** স্পেশালিস্টরা। ...

যাই হোক, যেহেতু **পর্ব্বত** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্তা, সেই কারণে **পর্ব্বত** শব্দ যোগে অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে। আমরা এখানে

তার দু-চারটির ব.শ. প্রদত্ত অর্থটুকু দিয়ে আমাদের মন্তব্য রেখে এগিয়ে যাব।

পর্ব্বতকুমারী, পর্ব্বতজ, পর্ব্বতজা : ৩. গৌরী, শৈলজা, নদী। (ব.শ.)। ৫. এ হল সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় বড় হয়ে ওঠা উত্তরপ্রজন্ম। দ্র. **গৌরী**। তবে কিনা **পর্ব্বত** থেকে যাই জন্মায় তাকে **পর্ব্বতজ** বা **পর্ব্বতজা** বলা যায়। সেই সুবাদে সর্বোচ্চ সামাজিক সংস্থাসমূহ থেকে নিঃসৃত সম্পদের ধারাগুলিও **পর্ব্বত** থেকে জন্মেছে বলা যায়, তা সে **গঙ্গাধারা** হোক আর **যমুনাধারা**ই হোক। দৃশ্য রূপে একে river from the hills বা 'পাহাড় থেকে জাত নদী'ও বলা চলে।

পর্ব্বতপতি, পর্ব্বতরাজ : ৩. গিরিরাজ, হিমালয়, মহাশৈল। (ব.শ.)। ৫. পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে husband or master of mountains হয় না, আমাদের হয়। দৃশ্য রূপে এ হল 'হিমালয়' নামক mountain ... ইত্যাদি, কিন্তু সামাজিক রূপে এ হল আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন, অধিরাষ্ট্র রূপে যা আমাদের সমাজকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে, এমনকি আমাদের সরকার বা রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও খবরদারি করে থাকে। তবে এই অধিরাষ্ট্র এখন আর আগের মতো প্রতাপাদিত্য নয়, অনেকটাই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে এগুলির সামাজিক রূপ হল হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ শিখ ... প্রভৃতি ধর্মের সর্বোচ্চ ভারতীয় সংগঠনগুলি। এগুলিই এখনও অধিরাষ্ট্র বা হিমালয় রূপে সক্রিয় রয়েছে। দেশে আর যত প্রকার **পর্ব্বত** থাকে বা আছে, এই 'হিমালয়' **পর্ব্বত** তাদের সকলের উপর কোনো না কোনোভাবে এখনও কমবেশি রাজত্ব করে। ...

পর্য্যায় (পর্য্যায়শয়ন, পাই) : ১. পরি + √ই + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পর্য্যায়*** = ***পরি*** *(= পর গতিশীল যাহাতে) অনুসারে যায় যে; অথবা,* ***পর*** *যায় যাহাতে।* ***পর্য্যায়শয়ন*** = ***পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে*** *শয়ন থাকে যাহাতে।* ***পাই*** = ***পর্য্যায়*** > পাই। ৩. **পর্য্যায়** = আনুপূর্ব্ব, ক্রম, পরিপাটী, প্রকার, নির্ম্মাণ, অবসর, দ্রব্যধর্ম্ম, একার্থবোধকশব্দ-ক্রম, সমান কুলভাব দানাদান ও বংশভাব হেতু সম্পর্কবিশেষ, অলঙ্কারবিশেষ, স্থান, শ্রেণী। **পর্য্যায়শয়ন** = প্রহরিকগণের পর্য্যায় অনুসারে শয়ন ও জাগরণ। **পাই** = আনার চতুর্থাংশ, আনার দ্বাদশাংশ, সমবেত কর্ম্মীগণের কর্ম্মের নিজ অংশ। (ব.শ.)। ৪. **পর্য্যায়** শব্দটি turn অর্থে কমবেশি সর্বত্র প্রচলিত, আর **পাই** শব্দটি একই অর্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় দেখা যায়, ধান কাটার সময় কর্মীরা এলোমেলো ভাবে কাজ করেন না। ধরা যাক চার জন কর্মী ধানকাটার কাজ করছেন, সেক্ষেত্রে জমির একদিকে প্রত্যেক কর্মী হাত-পাঁচেক জায়গার ধান কাটতে কাটতে সামনের দিকে এগোতে থাকেন। এর ফলে জমির পাঁচ হাত চওড়া এলাকা ধরে এক এক জনের ধানকাটা এগোতে থাকে। তার মানে, চারজন কর্মী পাশাপাশি কাজ করে মোট ২০ হাত জায়গা ধরে ধান কেটে কেটে এগোতে থাকে। এখন জমিটি যদি পঞ্চাশ হাত লম্বা হয় তাহলে একটানে ২০ × ৫০ হাত পরিমাণ জমির ধান কাটা হয়ে যায়। তার মানে, প্রত্যেকে ৫ × ৫০ হাত করে ধান কাটল। এই যে ৫ হাত এলাকা ধরে ধান কেটে কেটে সামনের দিকে চলা — একেই বলে **পাই** বা **পর্য্যায়**। তখন যদি কেউ ৫ হাতের জায়গায় কম কাটতে শুরু করে, অন্যেরা বলে, 'অ্যাই, তোর **পাই** ছোট হয়ে যাচ্ছে, সিধা করে কাট।' কিংবা এরকম বাক্যও শোনা যায় — 'কীরে, তোর **পাই**টা শেষ হল?' জমিটি যদি মাত্র ৩৫ হাত চওড়া হয়, তখন প্রথম **পর্য্যায়ের** ২০ হাত (সমগ্রকেও **পর্য্যায়** বলা হয়) কাটার পর বলা হয়, 'আর তো মাত্র তিন-**পাই**য়ে সব কাটা হয়ে যাবে। তাহলে এখানে তিনজন কাজ করুক, বাকি একজন বরং পাশের অমুক জমিতে গিয়ে কাটতে লাগ্।'

হ্যাঁ, কর্মী যদি মাত্র একজনও হয়, সেক্ষেত্রেও সে ঐ পাঁচ-ছ'হাতের এক একটা **পাই** বা **পর্য্যায়** ধরে ধরেই ধান কাটার কাজ করে থাকে; এলোমেলোভাবে করে না। এই ৫ × ৫০ বা তদ্রূপ এক একটি কাজের স্থানের প্রায় সমানভাবে বিভাজিত এলাকাকে এক একটি **পর্য্যায়** বলা হয়। আর, সেটি বলা হয় এর দু'পাশেই **পরি** (= পর গতিশীল) রয়েছে বলে। তার মানে, প্রতিটি **পর্য্যায়ের** দুই পাশে, এমনকি সামনে পেছনেও একটি করে সমান **পর্য্যায়** বা **পাই** থাকতে পারে। অর্থাৎ অন্য সম-**পর্য্যায়ের** অস্তিত্ব স্বীকার করেই **পর্য্যায়** শব্দের অস্তিত্ব। কোনো ক্ষেত্রেই একটিমাত্র **পর্য্যায়** থাকতে পারে না। ...

তবে **পরি**র 'পর গতিশীল যাহাতে' অর্থটি এই **পর্য্যায়** শব্দটির ভিতরে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে কীরূপে, সেটি চট করে চোখে পড়ে না। আসলে, প্রথম জন যে **পর্য্যায়** ধরে এগোয়, সে তো তার পাশের **পর্য্যায়**টির কথা (**পর** যায় যাহাতে, তার কথা) মনে রেখেই এগোচ্ছে। সেখানে তো **পর** গতিশীল রয়েছে। প্রথম কর্মীটি যে এলাকা সাফ করে করে এগোচ্ছে, তার এক পাশে কিংবা দু'পাশেই রয়েছে আর একটি যাওয়ার এলাকা, যে-এলাকা দিয়ে **পর** যাবে। তাই এক একটি যাওয়ার এলাকাকে বলে **পর্য্যায়** বা **পাই**। এদের মাপ এখানে আমরা ৫ হাত, ৫০ হাত ইত্যাদি ধরে ব্যাখ্যা করলাম, কিন্তু তা যে-কোনো মাপের হতে পারে; বাধ্যবাধকতা শুধু এইখানে যে, একটি **পর্য্যায়ের** মাপ যাই হোক না কেন, তার অন্য **পর্য্যায়**গুলির মাপ অবশ্যই তার সমান হতে হবে। ...

আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই **পর্য্যায়**কে বুঝতে পারতেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা, বুঝতে পারেন যথার্থ বাংলাভাষার জ্ঞানী মানুষেরা এবং ব্যবহারিক জীবনে এখনও বুঝতে পারেন গ্রামবাংলার তথাকথিত মূর্খ বাংলাভাষী চাষী-বাসী মানুষেরা। অর্থাৎ কিনা, বাংলাভাষার যথার্থ জ্ঞানী এবং গ্রামবাংলার সাধারণ বাংলাভাষী উভয়েই সমান জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরা **পর্য্যায়** ও **পাই** শব্দের ভেতরে ধরে রাখা ধারণাকে যথার্থে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যেখানে কিনা অ্যাকাডেমির কেউ কেউ **পর্য্যায়** শব্দটিকে জানতে বুঝতে পারলেও, তাঁরা **পাই** শব্দটির খবরই রাখেন না, জানা বোঝা তো দূরের ব্যাপার।

তা সে যাই হোক, **পাই** বা **পর্য্যায়** ধরে ধরে ধান কাটার এই পদ্ধতি ধান রোয়া, ধান-নিকানো, ধান বাঁধা (আঁটি বাঁধা) ... ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয়। এমনকি লাঙল করার সময়ও

ক্ষেতকে প্রায় একই ধরনের খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিয়ে হাল চালানো হয়, সেই ভাগগুলিকে বলা হয় **অন্তর** বা **আঁতর**।

আরও কথা আছে। এই **পর্য্যায়** বা **পাই**, তা কেবল ঐ ৫ হাত × ৫০ হাত জায়গা বা **স্থান-বিভাজন** করে কাজ করার ধারণাতেই সীমাবদ্ধ নেই, **কাল-বিভাজন** করে কাজ করার ধারণাতেও তার প্রয়োগ হয়ে থাকে। ব.শ. তারই উদাহরণ রেখেছেন **পর্য্যায়শয়ন** শব্দে। একালের ভাষায় একে shift-duty বলে। বাংলায় তাকে **পর্য্যায়কার্য্য** বা **পাইকাজ** বলা যেতে পারে। ...

তবে আজকাল **পর্য্যায়** শব্দটিকে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। একজন প্রতিমা নির্মাণকারীকে তার বায়নাদাতা জিজ্ঞেস করতেই পারেন — 'আপনি এখন কোন পর্য্যায়ে আছেন?' একজন অনুবাদককে তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক জানতে চাইতে পারেন — 'আপনার অনুবাদ এখন কোন পর্য্যায়ে চলছে?' ... এইরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে সমগ্র কাজের একটা কাল্পনিক 'থাউকা' বিভাজন ধরে নিয়ে **পর্য্যায়** শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ...

তবে এমনও ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একশোভাগ অঙ্ক মিলিয়ে মিলিয়ে **পর্য্যায়** ভাগ করা হয়ে থাকে। সেই অঙ্ক মেলানো হয় মানুষের বংশ-পরম্পরার হিসেবে। এতে প্রতিটি প্রজন্মকে এক একটি **পর্য্যায়** বলা হয়; কেননা, বংশটির ধারাপ্রবাহ প্রত্যেক প্রজন্মে বা **পর্য্যায়ে** এক ধাপ করে এগিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থরা, বসু মিত্র ... ইত্যাদি পদবীধারী মানুষেরা ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় তাঁদের **পর্য্যায়** বিচার করেন। দুটি বংশের আদিপুরুষের সম**পর্য্যায়** থেকে বর্তমান প্রজন্ম বা **পর্য্যায়** কত ধাপ দূরে, সেটি বিচার করা হয়। ধরা যাক মিত্র বংশের বরটি তাঁর আদিপুরুষ থেকে চব্বিশ ধাপ দূরে অর্থাৎ পঁচিশতম **পর্য্যায়ে**র বংশধর। তাহলে বসু বংশের কনেটিকেও তাঁর আদিপুরুষ থেকে পঁচিশতম **পর্য্যায়ে**র বংশধর হতে হবে। সম**পর্য্যায়** না হলে তাদের বিয়ে হবে না। ব.শ. **পর্য্যায়** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে যখন লেখেন (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য), **পর্য্যায়** হল 'সমান কুলভাব দানাদান ও বংশভাব হেতু সম্পর্কবিশেষ', তখন তিনি এই প্রজন্মাত্মক **পর্য্যায়**-এর কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

আজকাল **পর্য্যায়** শব্দটির বানান লেখা হয় **পর্যায়**। 'ই'-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে সেটি 'য' হয়, সেই নিয়মে পরি + ই হলে **পর্যায়** হওয়ারই কথা। কিন্তু এখানে যে দুটো স্বরবর্ণ রয়েছে — পরি + ই + অ। উপরে ব্যুৎপত্তি দেখুন। তাহলে তো **পর্য্যায়** হওয়াই উচিত। তাছাড়া আমরা আগেই জেনেছি, 'যাওয়া'তে ই এবং অ দুটোই আছে, গতি ও স্থিতি দুটোই আছে। সুতরাং **পরি**র পরে হাঁটা থাকলে **পর্য্যায়** হওয়াই সমীচীন। বানান নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের ব্যাপারটি ভেবে দেখা দরকার।

পার (ব্যাপার, ব্যাপারী, ব্যাপৃত) : **১.** ✓পার্ + অ (অচ্) - অধিকরণে; পর + অ (অণ্) স্বার্থে। (ব.শ.)। **২.** ***পার*** = ***পর*** *হইতে জাত।* **৩. পার** = পরতীর, প্রান্তভাগ, কর্ম্মসমাপ্তি, তদতীত স্থান, পরিত্রাণ, (পার করা = পারে লওয়া, পার পাওয়া = সীমা বা প্রান্ত পাওয়া, পার হওয়া = পারে উত্তীর্ণ হওয়া, প্রতিকারে সমর্থ হওয়া, ভেদপূর্ব্বক অপর পার্শ্বে বাহির হওয়া), করিতে সমর্থ হওয়া, শাসন করিতে জব্দ করিতে বা আঁটিতে সমর্থ হওয়া। **ব্যাপার** = ভাবয়িতার উৎপাদনক্রিয়া, ক্রিয়া, প্রসর, অধিকার, কার্য্য, সাহায্য, বৃত্তি, বাণিজ্য, ব্যবসায়, প্রয়োগ, বাণিজ্যে লাভ, কাণ্ড। **ব্যাপারী** = ব্যাপারবান, ক্রিয়াবান, ব্যবসায়ী, বণিক, সওদাগর। **ব্যাপৃত** = ব্যাপারযুক্ত, ক্রিয়ান্বিত, আসক্ত, তত্তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত পুরুষ। (ব.শ.)। **৪. পার** শব্দটি যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **ব্যাপার** incident অর্থে, **ব্যাপৃত** engaged অর্থে প্রচলিত। **ব্যাপারী** trader অর্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত থাকলেও অন্যত্র অপ্রচলিত, যদিও 'আদার **ব্যাপারী**র জাহাজের খবর' ... প্রবাদটি এখনও কমবেশি প্রচলিত। **৫. পর** ও তৎসঞ্জাত শব্দ **পরা, পরান, পরি, পার, পারা, পারান, পারি** ... প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার যেমন বিপুল অর্জন রয়েছে, তেমনি মধ্যযুগের বাংলাভাষীদের অর্জনও কিছুমাত্রায় কম নেই। বলতে কি, বাংলাভাষীর অর্জন **পর**-সংশ্লিষ্ট শব্দে যেন টইটুম্বুর হয়ে রয়েছে। তার **পর পার** যেমন রয়েছে, তেমনি **পরা পারা**ও রয়েছে।

আসলে কোনো সত্তার পরিধিরেখার বাইরে যে থাকে, সেটিই তার ক্ষেত্রে **পর**। এটিই আপনার সঙ্গে **পর**-এর পার্থক্যরেখা। এই পার্থক্যরেখা অতি সূক্ষ্ম হতে পারে, কাঁসাই নদীর জলধারার মতো চওড়া হতে পারে, পদ্মা জলধারার মতো চওড়া হতে পারে, এমনকি সমুদ্রজলের মতো চওড়াও হতে পারে; এমনকি 'ভবসিন্ধু'ও হতে পারে। শুধু তাই বা কেন হবে! পার্থক্যের ওই রেখা একটি জলপূর্ণ নদী না হয়ে সমস্যার নদী, কর্মধারার নদী, পরীক্ষার নদী ... ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে এবং হয়ও।

ঐ নদীর ওদিকে যে থাকে সেই হল **পর** (সে **পর**-এ রয়েছে দ্রষ্টা সত্তাটির 'পালন, পান')! ঐ **পর** সেখানে থাকে বলেই তাকে **পার** বলে। তার কাছে যাওয়া মানেই হল '**পার**কে প্রাপ্ত হওয়া', '**পারে** যাওয়া', নদী '**পার** হওয়া', দ্রষ্টার সঙ্গে **পর**-এর পার্থক্যরেখা '**পার** হয়ে যাওয়া', '**পেরিয়ে** যাওয়া'। আর পার্থক্যের এই নদী **পার** হতে **পার**লেই **পারা**। 'আমরা **পারি**' মানেই কোনো না কোনো সমস্যার নদী অতিক্রম করতে বা **পার** হতে **পারি**। 'সে ইহা করিতে **পারিল** না' কথাটির মানে হল, সমস্যার নদীটি অতিক্রম করে নদীর অপরদিকে **পর**-এর কাছে বা **পার**-এ যেতে **পার**ল না।

লোকে **পারতে পারতে** একসময় **পেরে** যায়, **পারে**, অর্থাৎ সমস্যার নদীটি অতিক্রম করে **পর**-এর কাছে যেতে **পারে**, অর্থাৎ **পার**-কে প্রাপ্ত হতে পারে। কবি যখন লেখেন — '**পারিব** না একথাটি বলিও না আর / পাঁচজনে **পারে** যাহা / তুমিও **পারিবে** তাহা / একবার না **পারিলে** দেখ শতবার।' আমরা যখন বলি — আমি **পারি**, সে **পারে** ... ইত্যাদি, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পার্থক্য-নদী অতিক্রম করে **পার**কে প্রাপ্ত হই। বহু ব্যবহারে এই 'পার্থক্য-নদী অতিক্রম করে **পার**কে প্রাপ্ত হওয়া' কথাটিই সংক্ষিপ্ত রূপ পায় '**পার** হওয়া' বা '**পারা**'। তখন ক্রিয়াটির মানেতে শেষাংশ (**পার**কে প্রাপ্ত হওয়া) গৌণ হয়ে প্রথমাংশ (পার্থক্য-নদী অতিক্রম করা) হয়ে যায় মুখ্য। আমরা **পার** হওয়া বলতে অতিক্রম করা (= cross করা) বুঝতে শুরু করি। ...

কিন্তু যে **পার**-করণ সরল নয়, যেমন **ব্যাপার** বা **ব্যাপৃত**,

তাদের অর্থ কেবলমাত্র নৌকায় যাত্রী-পারাপার বোঝায় না। এ হল জটিল পদ্ধতির **পণ্য**-পারাপার, বিশেষভাবে আধারিত **পার** (বি-আ + পার) করার কাজ। এই **ব্যাপার**কর্মে যাঁরা **ব্যাপৃত** থাকেন, তাঁরা সেকালে **ব্যাপারী** নামে শনাক্ত করা হত। একালে গ্রামবাংলায় 'গরু-ব্যাপারী', 'ধান-ব্যাপারী' ... প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত থাকলেও শহরে ও অ্যাকাডেমিতে শব্দ তিনটির এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে।

যেহেতু **পার** শব্দ সহযোগে অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে, আমরা সব শব্দের অর্থের ব্যাখ্যায় যাব না, পাঠকপাঠিকা উপরোক্ত অর্থগুলি হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে নিজে চেষ্টা করলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝে নিতে পারবেন। আমরা **পার** শব্দযুক্ত তেমন কয়েকটি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব, যেগুলিতে কোনো না কোনো প্রকার বিশেষত্ব আছে। সেই উদ্দেশ্যে এখানে নিম্নলিখিত কিছু শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্থসন্ধান ও আমাদের মন্তব্য জানিয়ে আমরা পরের শব্দে চলে যাব। **৬.** ইংরেজি far, faran, fare, fahren; ford, fiord; para (beyond), port, emporium ... ইত্যাদি।

পারগ : ২. ***পারে** গমন করে যে; **পার** হইতে পারে যে। /* পর তীরে গমন করে যে; কর্ম্মসমাপ্তি পর্যন্ত গমন করে যে। (ব.শ.)। **৩.** পারগত, কোনো বিষয়ের পারগত, অভিজ্ঞ, বিশারদ, সমর্থ।

পারণ : ২. ***পার** অন (on) থাকে যাহাতে।* **৩.** কর্ম্মসমাপ্তি, সমাপ্তি, ব্রতান্তভোজন। **৫.** এই শব্দের অর্থপ্রকাশ কালে দেখা যাচ্ছে, ব.শ. কেবলমাত্র অদৃশ্য সমস্যার-নদী **পারাপার**-এর কথাই ভেবেছেন, বাকি নদীদের কথা ভাবেননি। বস্তুত, '*পার অন (on) থাকে যাহাতে*', *তারা প্রত্যেকেই **পারণ** পদবাচ্য, তা সে দৃশ্য নদী **পারা**পার হোক, আর সমস্যাসঙ্কুল অদৃশ্য সিন্ধু **পারা**পারই হোক।*

পারদ : ১. ✓পার + অন (ল্যুট্) -ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পার** দান করে যে। /* রোগের পার দান করে যে। (ব.শ.)। **৩.** পারদাতা, রসভেদ, পারা, ক্রিয়াদিলোপহেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র mercury অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দেব**। **পার** দান করে বলেই **পারদ**। নানান সমস্যার ও**পারে** নিয়ে যান বা সমস্যার নদী উত্তীর্ণ করান বলেই **পারদ** শব্দ **দেব**তাকে বোঝায়। আবার, সেকালের সবচেয়ে রহস্যময় ধাতু, ভারত যাকে ভেবেছিল মানুষের সর্বরোগহর মহৌষধ, সেও রোগের ও**পারে** নিয়ে যেতে পারে মনে করে তারও নাম দেওয়া হয়েছিল **পারদ**। একালের বাংলায় এই mercury-কে **পারা**ও বলে। মধ্যযুগে এই **পারদ**-এর কথা জানতে পেরেছিলেন আরব ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানীরা; এবং তাঁরা এর নাম দেন mercury বা quicksilver। তার থেকে তাঁরা 'চিরজীবী' হওয়ার 'অমৃতরস' খুঁজে বার করতে লেগেছিলেন। তাঁদের সেই চেষ্টার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ধড়িবাজেরাও।

পারদর্শী (পারদর্শক) : ২. ***পারদর্শী** = **পার** দর্শন করতে পারেন যিনি। **পারদর্শক** = **পার** দর্শন করাতে পারেন যিনি বা যে।* **৩. পারদর্শী** = দৃষ্টপার, অভিজ্ঞ, কুশল। **পারদর্শক** = পারদর্শয়িতা, উদ্ধারক। (ব.শ.)। **৪. পারদর্শী** expert অর্থে প্রচলিত, **পারদর্শক** অপ্রচলিত। **৫. খুব সহজ করে বললে,** নদীর বা অন্য কোনো কিছুর এ**পারে** দাঁড়িয়ে যিনি ও**পার** দেখতে পেয়ে যান, তিনিই **পারদর্শী**। প্রথমে আমাদের মনে হয়েছিল, এরূপ অর্থ হল শব্দটির 'অভিধা-অর্থ'। শব্দটির এই অর্থ এখন বলতে গেলে অপ্রচলিত। তার বদলে প্রচলিত রয়েছে অন্য একটি অর্থ, সেটি এই রকম — একটি সেগুনগাছ কেটে ফেললে তার থেকে যে অনেক তক্তা বেরোতে পারে এবং সেই তক্তা থেকে সুদৃশ্য সুন্দর রেখা সমন্বিত টেবিল হতে পারে — সেগুনগাছ দেখে সেই দূর পর**পার** পর্যন্ত যিনি দেখতে পেয়ে যান, তিনি **পারদর্শী**। তাঁর এই **পার**-দর্শন ক্ষমতা কাজে পরিণত হতে দেরি হয় না। তখন **পারদর্শী** শব্দের মানে দাঁড়িয়ে যায় 'অভিজ্ঞ', 'নিপুণ', 'কুশলী' ... ইত্যাদি। এসবগুলিকেই আমাদের মনে হয়েছিল শব্দটির 'লক্ষণা-অর্থ'।

কিন্তু পরে আমাদের সন্দেহ হয়। লোকে অভিধা-অর্থ ত্যাগ করে লক্ষণা-অর্থকেই প্রাধান্য দিতে গেল কেন? তখন সহসা আমাদের মনে হয়, অন্তত **পারদর্শী** শব্দের ক্ষেত্রে লক্ষণা-অর্থকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই লোকে তার মানে 'অভিজ্ঞ', 'নিপুণ' ... ইত্যাদি বোঝেননি। এমন হতেই পারে যে, কোনো একটি বস্তুর বা বিষয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে পৌঁছতে পৌঁছতে বা **পারতে পারতে** কিংবা এক একটি অধ্যায় **পার** হতে হতে অবশেষে যে **পার**-এ পৌঁছোনো যাবে, তা যাঁরা আগেভাগে দেখতে পান, তাঁরাও তো **পারদর্শী**! সুতরাং, **পারদর্শী** বলতে শুধুমাত্র ও**পার** দেখতে পাওয়াই নয়, করতে-**পারা**-সমূহের পরে যে-**পার**-এ পৌঁছনো যায়, তাও যাঁরা দেখতে পেয়ে যান, তাঁরাও **পারদর্শী** বটে।

ব.শ. জানিয়েছেন যে, **পারদর্শক** বলে একটি শব্দ আমাদের ভাষায় ছিল এবং তার অর্থ ছিল, নদীর বা সমস্যাদির 'পার দেখিয়ে দেয় যে'। তার মানে, ভবিষ্যতে কার কী রূপ হবে, এসব বিষয় যিনি দেখিয়ে দিতে পারেন, তিনিই **পারদর্শক**। কিন্তু এ শব্দটি এখন বাংলাভাষায় অপ্রচলিত; কিন্তু মারাঠি বা হিন্দি ভাষায় শব্দটি খুবই প্রচলিত। তাতে **পারদর্শক** শব্দের অর্থ করা হয় 'যার ও**পার** দেখতে পাওয়া যায়', অর্থাৎ **অচ্ছ** বা স্বচ্ছ (transparent)।

পারস্য (পারদেশ্য, পারসিক, পারসী, পারশীক) : ২. ***পার**-এর শেষ থাকে যাহাতে।* **৩. পারদেশ্য** = পরদেশাগত, পরদেশ হইতে প্রাপ্ত (পণ্য)। **পারসিক, পারশীক** = পারস্যদেশ, পারস্যদেশজাত ঘোটক, পারস্যদেশবাসীগণ, পারস্যরাজগণ। **পারসী** = পারস্যদেশীয় ভাষা, জরথুস্ত্র-পন্থী অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পারসীক জাতিবিশেষ। (ব.শ.)। **পারদেশ্য** = পরদেশগত, প্রবাসী। (ছা.অ.)। **৫.** আমাদের মনে হয়, সেকালে ভারতীয় পণ্য সর্বপ্রথম **পারস্য** দেশ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারত। সেই কারণে সেই দেশটির নাম হয়ে যায় **পারস্য**।

পারানী : ২. ***পার** হওয়ার **বানি**।* **৩.** খেয়ার কড়ি। (ব.শ.)। **৫.** fairy-ঘাটের বা ফেরীঘাট দিয়ে নদী **পার** হওয়ার fair।

পারাবত (পারাপত) : ২. / বেগে আপাতী (এসে পড়ে যে)। (ব.শ.)। ৩. কপোত। (ব.শ.)। ৫. ছাত্রবোধ অভিধান জানায় যে, শব্দটি আগে ছিল **পারাপত**। সেক্ষেত্রে এ হল সেই সত্তা, 'যে **পার**-এ গিয়ে পতিত হয়'। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজার প্রেরিত চিঠির বাহক হয়ে যে-সত্তা দুর্গম গিরি কান্তার মরু **পার** হয়ে এসে রাণীর কোলে পতিত হয়, এ হল সেই **পারাপত**; কালে কালে যার নাম হয়ে গেছে **পারাবত**। এই নামবদলের পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, সেকথা এখনও আমরা জানি না।

পারিজাত (পারিপাত্র, পারিভদ্র, পারিযাত্র, পারিযাত্রক, পারিযাত্রিক, পারিয়াল, পারিহাই, পারীণ, পারীন্দ্র, পালট্যা, পোড়েল, পারা, পারাবতী) : ২. ***পারিজাত*** = ***পারে*** *যাওয়ার জন্য জাত যে।* ***পারিপাত্র*** = ***পারে*** *যাওয়ার বিষয় দেখাশোনা করেন যে* ***পাত্র***। ***পারিভদ্র*** = ***পারে*** *যাওয়ার বিষয়ে যিনি দক্ষ বা* ***ভদ্র***। ***পারিযাত্র*** = ***পারে*** *যাওয়ার সমস্যা থেকে ত্রাণ করেন যিনি।* ***পারিযাত্রক*** = ***পারিযাত্র*** *করে যে।* ***পারিযাত্রিক*** = *যাহারা* ***পারে*** *যাত্রা করিতেছে যে বা যাহারা।* ***পারিয়াল*** = ***পারে*** *যাওয়াকে লালন করে যে।* ***পারিহাই*** = ***পার*** *প্রাপ্ত হওয়াকে গতিশীল করে যে।* ***পারীণ*** = ***পারে*** *যাওয়ার বোধ থাকে যাহাতে।* ***পারীন্দ্র*** = ***পার****-কারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা* ***ইন্দ্র***। ***পালট্যা*** = *পালন টঙ্কারিত হইয়া থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* ***পোড়েল*** > ***পারিয়াল*** *(যথা — ঘড়িয়াল > ঘোড়েল)* / **পারিজাত** = পারী (সমুদ্র) হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. **পারিজাত** = পারিজাতপুষ্প, পারিভদ্রপুষ্প, পারিভদ্র, পঞ্চ দেবতরুর একতম সুরতরু, (সমুদ্রমন্থনে সমুদ্র হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা চতুর্দ্দশ রত্নের একতম। ইন্দ্র ইহা নন্দনে রোপণ করেন। কৃষ্ণ সত্যভামার প্রার্থনায় ইহা দ্বারকায় আনয়ন করেন। (ব.শ.)। সমুদ্রমন্থনকালে এই পারিজাত বৃক্ষ সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়। এই বৃক্ষ স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভাবর্ধনকারী। ... সত্যভামা তাঁর দাসীর কাছ থেকে খবর পান যে, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প দিয়েছেন। ... ক্রুদ্ধা সত্যভামাকে কৃষ্ণ বলেন তিনি স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ তাঁকে এনে দেবেন। ... ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ... কৃষ্ণ দ্বারকায় এনে এই বৃক্ষ রোপন করেন। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই বৃক্ষ পুনরায় ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করা হয়। (পৌ.অ.)। **পারিপাত্র** = কুলপর্ব্বতবিশেষ। দ্র. **পর্ব্বত**। **পারিভদ্র** = পালতা-মাদার গাছ, দেবদারু, সরলবৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ। **পারিযাত্র, পারিযাত্রক, পারিযাত্রিক** = কুলশৈলবিশেষ, সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। **পারিয়াল** = রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি বা গাঁই। দ্র. **পদবী**। **পারিহাই** = পারিয়াল। **পারীণ** = পারগামী, পারগ, কর্ম্মসমাপ্তিকারক। **পারীন্দ্র** = পারি (পশু) ইন্দ্রতুল্য, পশুশ্রেষ্ঠ, সিংহ। **পালট্যা, পালিটা, পালিতা** = পারিভদ্র, বৃক্ষবিশেষ। (ব.শ.)। **পারা** = নদীবিশেষ, পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা নদী। **পারাবতী** = নদীবিশেষ। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অমরতরু, কোবিদার, চম্পক, কল্পতরু, দেবতরু, পবন, পঞ্চবৃক্ষ, পারুল, পুষ্প, মন্দার**। যদি প্রশ্ন তোলা হয় — মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবার আগে কোন জাতি বা দেশ পণ্য-রপ্তানি করতে শুরু করেছিল? এ প্রশ্নের একশোভাগ সঠিক উত্তর হল 'প্রাচীন ভারত'। যাঁদের সন্দেহ হবে, তাঁরা মার্কস ও রবীন্দ্রনাথ পড়ে দেখতে পারেন, কেননা, তাঁরা দুজন আমাদের প্রধান সাক্ষী। এদিকে আমাদের পুরাণাদি-নির্ভর শব্দার্থসাধনা আমাদের জানাচ্ছে যে, প্রাচীনকাল (প্রায় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ কিংবা তার কিছু আগে) থেকে শুরু করে চাঁদ-সদাগর পর্যন্ত ভারতের **পণ্য**-রপ্তানির খবরগুলো ভারতের পুরাণাদি গ্রন্থে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। তার মানে ভারতের **পণ্য**-রপ্তানির ইতিহাস প্রায় ২৫০০ বছরের ইতিহাস। তাই যদি হবে, তাহলে ভারতীয়দের ভাষায় export, export-quality, exportable commodity, export promotion counsil ... ইত্যাদি ধারণাধারী শব্দগুলি সব গেল কোথায়? ২৫০০ বছর ধরে আমরা **পণ্য** আমদানি রপ্তানি করলাম, বড় বড় নৌকা নিয়ে দেশ বিদেশের বন্দরে গিয়ে ব্যবসাপত্তর করে এলাম, অথচ যা নিয়ে এত কাজ-কারবার তা বলার জন্য আমাদের ভাষায় কোনো শব্দই ছিল না — এমন কি কখনও হতে পারে? তা যদি না হয়, তাহলে সে শব্দগুলি সব গেল কোথায়? ... ...

অদৃশ্য কিন্তু সমাজে অত্যন্ত সক্রিয় কোনো সত্তাকে বুঝে নিয়ে যখন তার ক্রিয়া ধরে নামকরণ করা হয়, তখন প্রায়শই দেখা যায়, দৃশ্যজগতেও সমক্রিয়াকারী স্বভাবের কোনো না কোনো একটি সত্তাকে পাওয়া গেছে এবং তখন তাকেও ওই একই নামে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির এটি একটি সাধারণ নিয়ম। (উদাহরণ স্বরূপ, সেই নিয়মে সামাজিক সংগঠনকে নাম দেওয়া হয়েছিল **পর্ব্বত**, একই স্বভাব দেখা যায় mountain-এর, তাই তাকেও **পর্ব্বত** বলার চল হয়ে যায়।) তো, ভারতসমাজ যখন সবার আগে বিদেশে রপ্তানি করার জন্য **পণ্য** বানিয়ে ফেলল এবং রপ্তানি করতে শুরু করল, তখন প্রশ্ন উঠল — এই বিদেশগামী **পণ্য**কে কী নামে ডাকা হবে? কারণ তার আগে বিশ্বের কোনো জাতি **পণ্য** রপ্তানি করেনি। সত্যি বলতে কী, **পণ্য** রপ্তানি তো বহু দূরের কথা, তখনও **পণ্য**ই তারা বানিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে, তখনও বিশ্বের কোনো ভাষাতেই রপ্তানি-**পণ্যে**র নামকরণই হয়নি। আমাদের পূর্বসূরি শব্দজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত **পণ্যের** নাম দেন — **পারিজাত পুষ্প**; অর্থাৎ exportable commodities। একালের ইংরেজি শিক্ষিত বাংলাভাষী পণ্ডিতেরা ব্রিটিশের সংস্পর্শে export ... ইত্যাদির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হয়েছেন, নিজের দেশে export-এর জন্য নতুন করে **পণ্য** উৎপাদন করেছেন, কিন্তু সেগুলির বাংলা নাম আর দিতেই পারেননি। সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা এখনও ইংরেজি শব্দগুলিই ব্যবহার করে থাকেন। স্বভাবতই আমাদের একালের অ্যাকাডেমিগুলি এসব বিষয়ের কোনো বাংলা শব্দই আর বানাতে পারেননি, তাঁরা export-সংক্রান্ত সমস্ত কথা এখন ইংরেজিতেই বলেন। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষেরা exportable-**পণ্য** ও তৎসংক্রান্ত কত শব্দ বানিয়েছিলেন, উপরোক্ত **পারিজাত, পারিপাত্র, পারিভদ্র, পারিযাত্র** ... ইত্যাদি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

যাই হোক, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিদেশে পাঠানোর জন্য উৎপাদিত **পণ্যের** নাম তো দিয়ে দিলেন **পারিজাত পুষ্প**, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দৃশ্যজগতের এলাকায়। সেখানে এমন কোনো **পুষ্প**কে পাওয়া গেল না, যে-**পুষ্প** শুধুমাত্র বিদেশে যাওয়ার জন্য

জাত হয়ে থাকে। অথচ অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে অদৃশ্যের এলাকার বিষয়কে একটি নাম দিয়েই দৃশ্যের এলাকায় সমস্বভাবের বস্তুকে সেই একই নামে চিহ্নিত করে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে তা করা গেল না। ফল হল এই যে, উদ্ভিদজগতে কোনো বৃক্ষকে **পারিজাত** বৃক্ষ নামে এবং তার ফুলকে **পারিজাত পুষ্প** নামে শনাক্ত করা গেল না। মাঝ থেকে **পারিজাত পুষ্প** একটি রহস্যময় স্বর্গীয় বৃক্ষ ও তার ফুল হিসেবে সমাজ মনের স্মৃতিতে থেকে গেল।

কিন্তু একটা সময় তো ছিল, যখন সেই **পারিজাত পুষ্প** নিয়ে ভারতসমাজে নানা ঘটনা ঘটেছে, মানুষ export-quality material বা **পারিজাতগন্ধী পুষ্প** নিয়ে মত্ত থেকেছে। তা নিয়ে টানাটানি, বাদ-বিসম্বাদ, মারপিট, লাঠালাঠি, যুদ্ধ ইত্যাদি হয়েছে। তার কাহিনীগুলি সব গেল কোথায়?

প্রাচীন ভারতের সেই কাহিনীগুলি পাওয়া যায় পুরাণাদি থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের যুগ পর্যন্ত অজস্র গ্রন্থে। উপরোক্ত পুরাণাদির কাহিনী থেকে জানা যায়, ভারতসমাজে সর্বপ্রথম রপ্তানিযোগ্য **পণ্য**-উৎপাদনকারী সংস্থা বা **পারিজাত** বৃক্ষের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (দ্র. **কূর্ম্মাবতার**)। যতদূর বোঝা যায়, তার আগে কিছু কিছু উৎপন্ন রপ্তানি হয়ে থাকলেও, সেগুলি কোনো 'রপ্তানিকারী উৎপাদন সংস্থা'র থেকে উৎপাদিত পণ্য ছিল না। **কূর্ম্মাবতারের** কালে যখন আদিম সমাজতন্ত্রবাদীরা (বেদবাদীরা = অসুরেরা) ও আদি ধনতন্ত্রবাদীরা (**পণ্য**বাদীরা = দেবতারা) হাত ধরাধরি করে জনসমুদ্র মন্থন করে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করেছিলেন, সেই সময় বিদেশে পাঠানোর **পণ্য**সম্ভারও উৎপাদিত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠানোর ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। সেই ব্যবস্থাকে বলা হয় **পারিজাত** বৃক্ষ এবং সেই **পণ্য**সম্ভারকে বলা হয় **পারিজাত পুষ্প**।

কিন্তু **পারিজাত** বৃক্ষ ও **পারিজাত পুষ্পে**র জন্ম দিলেই তো হবে না, সেগুলি পাঠানোর দেখভাল করবে কে? অতএব সারি দিয়ে এক একটি **পারি**-বিষয়ক সত্তার আবির্ভাব ঘটে গেল এবং তাদের নামকরণও করতে হল। সেগুলিরই কয়েকটি হল **পারিজাত বৃক্ষ** (organisation engaged in exporting commodities), **পারিজাত পুষ্প** (commodities produced for export), **পারিপাত্র** (export promotion council or its officers), **পারিভদ্র** (expert about exports), **পারিযাত্র** (export developer), **পারিযাত্রক** (export developing officer), **পারিযাত্রিক** (exported assignment), **পারিয়াল, পারিহাই, পোড়েল** (professional export advisor), **পারীণ** (exporter), **পারীন্দ্র** (Principal exporter), **পালট্যা** (importing organisation), **পাবা, পাবাবতী** (flow of exporting commodities)। এদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকেই এদের কমবেশি চেনা যায়। আমরা সাধ্যমতো ইংরেজি প্রতিশব্দও দিয়ে দিলাম।

পার্থ : ২. **পার** *(পারা) থাকে যাহাতে বা যে সত্তায়* / পৃথার সঙ্গে সমন্বিত যে। (ব.শ.)। ৩. যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পৃথিবীপতি, রাজা, অর্জ্জুনবৃক্ষ। (ব.শ.)। পৃথা অর্থাৎ কুন্তীর পুত্র। পাণ্ডবদের মধ্যে **যুধিষ্ঠির**, ভীম ও অর্জুনকে পার্থ বলা হয় ... যদিও অর্জুনের প্রতিই এই নাম বিশেষভাবে প্রযোজ্য। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অর্জ্জুন**। যার ভিতরে কোনো কিছু করতে **পারা**র শক্তি থাকে — অতিক্রম করতে পারা, উত্তীর্ণ হতে পারা ... প্রভৃতি **পার** থাকে, তাকেই বলে **পার্থ**। স্বভাবতই **পার্থ** হল সেই সত্তা, 'যে **পারে**।' এই **পার** সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় **অর্জ্জুন** থেকে, তাই প্রধানত তাকেই **পার্থ** বলা হয়ে থাকে।

পার্থক্য : ২. ***পার্থক*** *(**পার**-এর **থ** বা স্থিতি করণ) থাকে যাহাতে।* ৩. পৃথকভাগ, ভেদ। (ব.শ.)। ৪. separateness অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. একদিকে রয়েছে দ্রষ্টা-সত্তা, আর অপরদিকে রয়েছে **পর**-সত্তা। মাঝে রয়েছে ভেদরেখা। ফলে **পর**-সত্তার কাছে যেতে হলে ওই ভেদরেখা অতিক্রম করে বা **পার** হয়ে যেতে হয়। এই '**পার**-করার ব্যাপার থাকে' (= পার্থক) দ্রষ্টা-সত্তা ও **পর**-সত্তার মাঝে। সেই **পার্থক** থাকে যাহাতে, শব্দশাস্ত্রের নিয়মে তাকে বলে **পার্থক্য**। ৬. ইংরেজি se*parate*ness।

পার্ব্বতী : ২. ***পর্ব্বত****-জাতর গতিশীল আধার যে।* / পর্ব্বতের অপত্য স্ত্রী। (ব.শ.)। ৩. গৌরী, হৈমবতী, উমা, দুর্গা, গোপালপুত্রিকা, দ্রৌপদী, পর্ব্বতসম্ভূতা নদী, শল্লকী, ধাতকী, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, পর্ব্বতবাসিনী। (ব.শ.)। ইনি হিমালয় ও মেনকার কন্যা এবং মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষযজ্ঞে সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও উপস্থিত হলে পিতা দক্ষ কর্তৃক ভর্ৎসিতা হন। যজ্ঞসভায় পতিনিন্দা সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে দেহত্যাগ করে পর্বতরাজ হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তপস্যা দ্বারা পুনরায় মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলে এঁর নাম হয় পার্ব্বতী। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উমা, গৌরী, দুর্গা, কালী**। বলা হয়, ইনি **পর্ব্বত** হতে জন্মেছেন বলে এঁর নাম **পার্ব্বতী**। **হিমালয়, মেনকা, পার্ব্বতী, মহাদেব** — এসব তো গালগল্প নয়, এগুলি যে ভারত ইতিহাসের প্রকৃত সত্য বিবরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

হিমালয় পর্ব্বত কাকে বলে, তার কথা আগেই বলা হয়েছে। সে হল আমাদের ভারতসমাজের 'অধিরাষ্ট্র', জ্ঞানজীবীদের দ্বারা সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত রাখার একটি ঢিলেঢালা সংগঠন। তার অধীনেই আমাদের সমগ্র সমাজ। এই সংগঠনের নির্দেশাদি মান্য করে যে উত্তরপ্রজন্ম বড় হতে থাকে, তাদের বলা হত **পার্ব্বতী**। এ হল সমগ্র জনসাধারণের একটি অংশ, সেই সুবাদে এই সত্তা হলেন **মহামায়ার** অংশ। ইনিই প্রথমে **উমা** এবং পরে **দুর্গা**য় পরিণত হন। এঁর আরও অনেক রূপ রয়েছে। দ্র. **অষ্টচণ্ডী**।

পুর : ১. ✓পু + অ (ঘঞর্থে-ক) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **পু** *(নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ী) রহে যাহাতে।* / যাহা লোকাদিতে পূর্ণ থাকে। (ব.শ.)। ৩. পূর্ণ, প্রচুর, প্রাসাদযুক্ত পরিখাবেষ্টিত একক্রোশ বা ততোধিক দীর্ঘ স্থান, হট্টাদিবিশিষ্টস্থান, গৃহ, দেহ, পাটলিপুত্র, রাজধানী, গৃহোপরিস্থ গৃহ, বহুগ্রামীয়-ব্যবহারস্থান, সমূহ, ভাণ্ডাগার, ধান্যাদিচয়, ময়রচিত অসুরনগর ... (পুরে দেওয়া) পূর্ণ করা, প্রবেশ করান,

ঢুকান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫. প** (পায়ী, পাওয়া) 'নবরূপে উত্তীর্ণ হলে' পাওয়া পরিণত হয় দেওয়ায়। সেই সুবাদে দান, দৃশ্য দানসম্পদ কিংবা অদৃশ্য দানসম্পদ কিংবা সে সবের দাতা রহে যে সত্তায় বা যে স্থানে তাকে **পুর** বলা হয়। আর সে **পুর** চিনির কিংবা নারকেলের **পুর** হতে পারে, ক্ষমতার কেন্দ্রস্বরূপ **পুর** হতে পারে, শক্তির বা জ্ঞানের সারাংশস্বরূপ **পুর** হতে পারে, আরও অনেক কিছুর **পুর** হতে পারে। সেকারণেই পিঠার ভিতরে, গৃহের ভিতরে, প্রাসাদের ভিতরে, নগরের ভিতরে, দেশের ভিতরে (অর্থাৎ রাজধানীতে) যে কাঙ্ক্ষিত বিষয়-বস্তু-ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাকে **পুর** বলা হয়। ...

লক্ষণীয় যে, এই **পুর** শব্দটিকে **পুর** ও **পূর্ব্ব** — এই দুটি শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে রাখা হয়েছে; কি লিখিত সাহিত্যে, কি প্রাত্যহিক ভাষা ব্যবহারে। আমরা তাদের পৃথক করে বিস্তারিত করতে যাইনি। তার কারণ, কাজটি সুবিশাল এবং তার জন্য আলাদা গবেষণার প্রয়োজন। আমরা যা বুঝেছি, তাতে আমাদের মনে হয়েছে, **পু, পুর্, পৃ, পূর্, পৄ, পর্,** প্রভৃতি ক্রিয়ামূলগুলি মূলত **পু** ও **পৃ** ক্রিয়ামূল থেকে জাত হয়েছে। এরা এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে, তাদের আলাদা করা কষ্টসাধ্য কাজ। তাছাড়া এই ক্রিয়ামূলগুলির পরিবারে সৃষ্ট শব্দগুলি উপরিতলে পরস্পর থেকে আলাদা হলেও, মূলে তাদের আলাদা করার চেষ্টা যেন **জরাসন্ধ**কে দুই পা ধরে চিরে দুই ভাগ করার চেষ্টা। ফলত আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, **পু, পুর্, পৃ, পূর্, পৄ, পর্** প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দগুলিকে ঠিক কীভাবে আলাদা আলাদা করে দেখাব। তাছাড়া, আমাদের হাতে সময় ও সুযোগ খুবই কম। শেষমেষ আমরা **পুর্** ও **পূর্** সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে **পৃ** ও **পৄ** — এই দুই ক্রিয়ামূলের অন্তর্ভুক্ত করে আপাতত তজ্জাত শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশন করতে মনস্থ করি এবং তাই করি।

বাংলাভাষী এই **পুর**কেই একদিকে ক্রিয়ারূপে এবং অপরদিকে প্রায় প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করেছেন। ফলে সেই **পুর** হয়ে গেছে **পুরে-দেওয়া, পুরা, পুরি** বা **পুরে দিই, পুরিয়ে-দেওয়া, পোরা** ... ইত্যাদি, অপরদিকে সেই **পুর** যুক্ত হয়েছে অজস্র ভৌগোলিক স্থানের নামের পেছনে — রাম**পুর**, শ্যাম**পুর**, কান**পুর**, নাগ**পুর**, মেদিনী**পুর** ... ইত্যাদি অজস্র। ফলে, **পুর** শব্দের ব্যবহার নানার্থে নানাভাবে হয়ে থাকে। এদের মধ্যে স্থান-নামের শেষে যে **পুর** ব্যবহার করা হয়, তার ভিতরের অর্থটিকে প্রায়শই ভুলে যাওয়া হয়।

আমরা লক্ষ করি, **পুরঃ** বা **পুরস্** শব্দটিকেও বর্তমানে **পুর** রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন **পুরনিগম, পুরপিতা** ইত্যাদি। তাকে আমরা আলাদা করে দিই **পুরঃ** শব্দের ব্যাখ্যায়। কিন্তু **পুরাকাল** অর্থে যে **পুরা** তাকে আমরা এই **পৄ** ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত নিই। নিম্নে **পুরা** দ্রষ্টব্য। ... **৬.** ইংরেজিতে এই শব্দের উত্তরাধিকার রয়েছে pour, power, poor-oot, poor ... প্রভৃতি শব্দে। ...

পুরঃ (পুরস্, পুরঃপ্রহর্ত্তা, পুরঃসর, পুরশ্চরণ, পুরশ্চর্য্যা, পুরস্কর, পুরস্করণ, পুরস্কার, পুরস্কৃত, আগেকার) : **১.** পূর্ব্ব + অস্ (অসি)। (ব.শ.)। **২.** ***পুরঃ (পুরস্)*** = ***পুর****-এর শেষ বা নির্য্যাস যাহাতে।* ***পুরঃপ্রহর্ত্তা*** = ***পুর****-এ থাকিয়া (শত্রুকে) প্রহার করে যে।* ***পুরঃসর*** = ***পুরঃ****-তে সরে সরে যায় যে।* ***পুরশ্চরণ*** = ***পুরঃ****-তে চরণ (আচরণ-বিচরণ) করে যে; কিংবা* ***পুরঃ****-তে চরে যে।* ***পুরশ্চর্য্যা*** = ***পুরঃ****-তে যেরূপ* ***আচরণ****াদি করা হয়।* ***পুরস্কর*** = ***পুরঃ****-তে (পুর-এ, অগ্রে) যাহা কৃত হয়।* ***পুরস্করণ*** = ***পুরঃ****-তে যে করা অন (on) থাকে।* ***পুরস্কার*** = ***পুরঃ****-তে (অগ্রে) যে* ***কর****, তাহা হইতে জাত।* ***পুরস্কৃত*** = ***পুরঃ****-তে (অগ্রে) যাহা করা হইয়াছে; অথবা, যে* ***পুরস্কার*** *পাইয়াছে।* ***আগেকার*** = *যে কার অগ্রে করা হইয়াছে।* **৩. পুরঃ, পুরস্** = পূর্ব্ব দিক (পূর্ব্ব দেশ, পূর্ব্ব কাল), পূর্ব্ব দিক দেশ বা কাল হইতে, পূর্ব্ব দিকে দেশে বা কালে, অগ্রতঃ, সম্মুখে। (পুরস্ শব্দের বিপরীত শব্দ পশ্চাৎ)। **পুরঃপ্রহর্ত্তা** = সৈন্য পুরোভাগে প্রহারকারক বা যোদ্ধা। **পুরঃসর** = অগ্রগ, পুরোগামী, পূর্ব্বক। **পুরশ্চরণ, পুরশ্চর্য্যা** = অগ্রে আচরণ, (তন্ত্রে) স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধার্থ ইষ্টদেবতাপূজাপূর্ব্বক মন্ত্রজপ-হোমতর্পণাভিষেক-ব্রাহ্মণভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গসাধনা, পুরস্ক্রিয়া। **পুরস্কর** = সম্মান বা পূজা করা। **পুরস্করণ** = সম্মাননা, পূজন। **পুরস্কার** = অগ্রে করণ, সম্মান, পূজা, (বিপরীত **তিরস্কার**), স্বীকার, অভিশাপ, অরিগ্রহণ, আক্রমণ, সেক, সেচন, পারিতোষিক, সমাদর। **পুরস্কৃত** = অগ্রে কৃত, আধিপত্যে নিয়োজিত, পূজিত, স্বীকৃত, অভিশপ্ত, অরিগৃহীত, আক্রান্ত, সিক্ত, পূত, পবিত্রীকৃত, অবলম্বিত। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র **পুরস্কার** ও **পুরস্কৃত** শব্দ দুটি যথাক্রমে prize ও prized অর্থে প্রচলিত, **আগেকার** শব্দটি previous অর্থে খুবই প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **তিরস্**। একটি প্রাসাদকে যদি **পুর** ভাবা হয়, তাহলে সেই **পুর**-এর যিনি সর্বোচ্চ কর্তা, তাঁকে বলতে হয় **পুরঃ** বা **পুরস্**। একটি দেশের **পুর**কে যদি তার 'ক্যাপিটাল-সিটি' বা রাজধানী-নগর ভাবা হয়, সেই **পুর**-এর ধনসম্পদ-জ্ঞানসম্পদ-শক্তিসম্পদের সারাংশ বা 'নির্য্যাস' থাকে **পুর**-এর নিয়ামক কেন্দ্রটিতে। সেকালের ভাষায় তার নাম **পুরঃ** বা **পুরস্** এবং একালের ভাষায় তার একটি নাম **পুরনিগম** বা পৌরসংস্থা। তবে কিনা এই **পুরনিগম** তো আধারহীন নয়, কিছু মানুষকে নিয়েই **পুরনিগম**। সেকালে যাঁরা এই **পুরঃ** বা **পুরস্**-কে ধারণ করতেন তাঁদের বলা হত **পুরোধা, পুরোধাঃ, পুরোহিত** ইত্যাদি; আর একালে যাঁরা সেই আধাররূপে **পুরঃ**-শক্তিকে ধারণ করেন, তাঁদের বলা হয় **পুরপিতা** বা **পৌরপিতা**। এই শব্দদুটি বাংলার নিজস্ব উৎসারণ থেকে সরাসরি জন্মায়নি। ইংরেজের আগমনের পর ইংরেজি city father শব্দের অনুকরণে তৈরি। তাঁদের দেশে city father বললে শহরের প্রশাসনে থাকা নিযুক্ত বা নির্বাচিত যে কোনো রকমের নগরপালকেই বোঝানো হত।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে। তা হল, **পুরঃ** শব্দের অর্থ প্রায়শই 'অগ্রগামী', 'অতীত' এবং একই সঙ্গে 'সারাংশ' বা 'ক্ষমতাকেন্দ্র' বোঝাচ্ছে কেন এবং কীভাবে? আপনি একটি চলমান সত্তাকে দেখছেন, ধরা যাক সেটি একটি ভেড়ার পাল। তাদের একেবারে সামনে থাকবে সেই দলের পাণ্ডা। এই পাণ্ডাকে আপনি চিহ্নিত করবেন কীভাবে?

ক্রিয়া মাত্রেরই স্থান-কাল রয়েছে। ভেড়ার দলটির যাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন তা প্রযোজ্য, আপনার দেখার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আপনি যে স্থান-কালে দাঁড়িয়ে পালটিকে দেখছেন সে যদি চলমান ভেড়ার পালের অতিক্রান্ত স্থান-কাল হয়, তাহলে আপনি দেখবেন পাণ্ডাটি সেই স্থান অতিক্রম করেছে **সর্বাগ্রে** অর্থাৎ **পূর্ব্বকালে** (= **পুরাকালে** বা **অতীতকালে**) এবং তার পালের পশ্চাৎগামী অংশের ভেড়ারা সেই স্থান অতিক্রম করেছে সব-শেষে অর্থাৎ **অতীতকালের** পরবর্তীকালে, হয়তো বা **বর্তমানকালে**। কিন্তু আপনি যে স্থান-কালে দাঁড়িয়ে পালটিকে দেখছেন সে যদি চলমান ভেড়ার পালটির ভবিষ্যৎ স্থান-কাল হয়, তাহলে আপনি দেখবেন পাণ্ডাটি আপনার দিকে এগিয়ে আসছে **সর্বাগ্রে** অর্থাৎ **বর্তমানকালে** এবং তার অনুসারী ভেড়ারা আপনার দিকে এগিয়ে আসবে **ভবিষ্যৎকালে**। এখন সমস্যা হল, এই যে পাণ্ডা, তার অর্থ তো আপনার অবস্থান অনুসারে পালটে যাচ্ছে! সে সর্বদা দলটির গমনের বিচারে 'অগ্রগামী' হলেও, বাইরের দ্রষ্টার বিচারে কখনো 'অতীত', কখনো 'বর্তমান'। শুধু তাই নয়, 'অগ্রগামী' বলেই সে দলটির 'সারাংশ', 'শক্তিশালী অংশ' কিংবা নিয়ামক ধনবান জ্ঞানবান ... ইত্যাদিও হতে পারে। তার মানে, চলমান সত্তার অগ্রণী অংশকে দেখার সময় দ্রষ্টার অবস্থান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার উপরই নির্ভর করে 'অগ্রগামী'র মানে কী দাঁড়াবে। এই কারণেই **পুরঃ** বা **পুরস্‌** শব্দ কখনো 'অগ্রগামী', কখনো 'পুরাকাল', কখনো দলটির সর্বোচ্চ শক্তিশালী (কিংবা জ্ঞানী, ধনী ... ইত্যাদি) অংশকে অনায়াসে বোঝাতে পারে। কেবল তাই নয়, **পুরস্‌**-এ বা অগ্রে থেকে যে **কর, করণ, কার** ... ইত্যাদি হয়, সেগুলিকে আমরা স্বভাবতই **পুরস্কর, পুরস্করণ, পুরস্কার** বলতে পারি। এই যে 'অগ্রেকরণ' বা **পুরস্করণ**, তার **করণ**টির বিশেষ্যরূপকে **কার** বলে। তাকে স্বভাবতই 'অগ্রে-করণ' বা **পুরস্করণ**-এর বদলে 'অগ্রে-কার' (আগেকার) বা **পুরস্কার**ও বলা যায়। সেই 'আগে করা'কে বা **পুরস্কার**কে সম্মান বা স্বীকৃতি জানানোর জন্য আপনি **পুরস্‌-করণ**-কারীকে একটি উপহার দিলেন। তখন অগ্রেকরণের (**আগেকার**-এর) বা **পুরস্কার**-এর স্বীকৃতি হল আপনার দেওয়া উপহারে। ফলে, **পুরস্কার** শব্দের লক্ষণা অর্থ হয়ে যায় স্বীকৃতি বা সম্মানসূচক 'উপহার'। তার মানে আজকাল যে **পুরস্কার** শব্দের অর্থ prize ভাবা হয়, সেটি **পুরস্কার** শব্দের বর্ণভিত্তিক-ক্রিয়াভিত্তিক অভিধা-অর্থ নয়, তার লক্ষণা-অর্থ। ...

আরেকভাবেও ব্যাপারটিকে ভাবা চলে। যেটি অজ্ঞাতের এলাকায় আছে, তাকে 'আবিস্‌'-এর এলাকায় আনা যেমন 'আবিষ্কার' পদবাচ্য হয়, **পুরস্কার**-এর ক্ষেত্রেও সেরকম হয়। যেমন, বক্তা ও শ্রোতার উভয়ের লোকনবৃত্তের মধ্যে আছে তাকে বক্রতার সঙ্গে যদি দূরে বা আড়ালে তারণ করিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা 'তিরস্কার'। তার ক্রিয়াটি স্বভাবতই 'তিরস্কার করা' পদবাচ্য হয়। একইভাবে অবহেলায় পিছনে বা একধারে পড়ে আছে যে, তাকে তার কাজের স্বীকৃতি বা সম্মাননার সূত্রে, যদি সকলের সামনে বা মাঝে বা **পুরস্‌**-এ আনা হয়, তবে তাকে সেই limelight-এ বা আলোর বৃত্তে আনার কাজটাও তো **পুরস্কার** পদবাচ্য। যার দ্বারা সেই **পুরস্করণ** করা হচ্ছে, তাকেও সেকারণে **পুরস্কার** বা prize বলা হয়ে থাকে। **৬.** ইংরেজি pour, power ... ইত্যাদি।

পুরঞ্জয় (পুরন্দর) : **১. পুরঞ্জয়** = পুর + ✓জি + অ (খচ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পুরঞ্জয়*** = ***পুর*** *জয় করে যে। /* শত্রুর পুর জয় করে যে। **পুরন্দর** = শত্রুর বা অসুরের পুরকে বিদারণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. পুরঞ্জয়** = সূর্য্যবংশীয় রাজা। মনুবংশীয় রাজা বিকুক্ষির (যার অন্য নাম শশাদ) পুত্র। ইনি ইন্দ্রবাহু ও ককুৎস্থ নামেও খ্যাত। দ্র. ককুৎস্থ। ... ... তিনি দানবপুরী জয় করে তাদের স্ত্রী ও ধনরত্ন হরণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় পুরঞ্জয়। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** পুরাণাদিতে বিধৃত ভারতের ইতিহাস অনুসারে এই সত্তা মূলত আদি বৈদিক ব্যবস্থার বিরোধী এবং মৌলবাদী হয়ে পড়া বৈদিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পক্ষে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। দ্র. **ককুৎস্থ**। (১ম খণ্ড পৃ. ১২৮)। একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন **ইন্দ্র**। তিনি অসুরদের (আদি বেদবাদীদের) **পুর**-কে বিদারণ করে দিয়েছিলেন।

পুরা (পুরাকথা, পুরাকল্প, পুরাকৃত, পুরাতন) : **২.** ***পুরা*** = ***পুর****-এর আধার যে।* **৩. পুরা** = চিরাতীত কালে, পূর্ব্বকালে, সদ্যঃ, তৎক্ষণাৎ, চিরন্তন, ভূত, ভাবীকালে, ভবিষ্যৎকালে, নিকট, ভবিষ্যদাসত্তি, প্রবন্ধ, বাক্যরচনা, পুরাণাদি। **পুরাকথা** = পূর্ব্ববৃত্ত, প্রাচীন কথা। **পুরাকল্প** = পূর্ব্বকল্প, যুগান্তর, অর্থবাদবিশেষ। **পুরাকৃত** = পূর্ব্বকৃত, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কৃত (পাপ, পুণ্য)। **পুরাতন** = পুরাভব, চিরন্তন ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪. পুরা, পুরাকথা, পুরাতন** যথাক্রমে ancient, ancient tales, old অর্থে প্রচলিত। **পুরাকল্প, পুরাকৃত** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পুরঃ**। বঙ্গীয় শব্দকোষ **পুরা** শব্দের যে সকল অর্থ দিয়েছেন (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য), যথা — অতীত, চিরন্তন, তাৎক্ষণিক, ভবিষ্যৎ ... ইত্যাদি — এগুলি যে খুবই অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং যথারীতি ব.শ. তাঁর দেওয়া এই পরস্পরবিরোধী অসংলগ্ন অর্থগুলি কোথা থেকে পেয়েছেন, উদাহরণ দিয়ে সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা সেই পরস্পরবিরোধী অসংলগ্ন অর্থগুলির কারণ অনুসন্ধান করেছি উপরে, **পুরঃ** শব্দের ভুক্তিতে। দ্র. **তনয়, নূতন, নতুন**। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬, ৬৫৯)।

পুরাণ (পুরান, পুরানো, পুরোনো) : **২.** ***পুরা*** *অন (on) যাহাতে।* **৩.** পুরাভব, পুরাতন (বিপরীত **নূতন**), আদিম, চিরন্তন, আকাশাদি-সৃষ্টির পূর্ব্বেও নব, প্রাচীন, পূর্ব্ব, বাসিত, শিব, ব্যাসাদিরচিত সর্গাদি-পঞ্চলক্ষণ শাস্ত্রবিশেষ, পুরাণকথা, প্রাচীনবৃত্ত, (রৌপ্যসম্বন্ধে) ষোড়শ রূপামাষক, অশীতিবরাটক, পণ, কার্ষাপণ। (ব.শ.)। **৪. পুরাণ** শব্দটির old, ancient, aged, back-dated প্রভৃতি অর্থ প্রচলিত রয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলায় শব্দটিকে **পুরান, পুরানো, পুরোনো** প্রভৃতি বানানে লেখা হয়। বাংলাভাষীরা অবশ্য **পুরাণ** বলতে কিছু গ্রন্থকেও বোঝেন। ইংরেজি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা সেগুলিকে বলেন Indian Mythology। **৫.** কোনো কোনো

পাঠকপাঠিকা আমাদের কাছে জানতে চান — আমাদের **পুরাণ**গুলি আমরা পড়ব কীভাবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই মুহূর্তে কাজটি একটু কঠিন কাজ। কেননা, **পুরাণ**গুলি সবই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক ভাষায় লেখা রয়েছে, এবং যদিও এককালে ক্রিয়াভিত্তিক পাঠপদ্ধতিতে সবাই অভ্যস্ত ছিলেন, একালে সেই পাঠপদ্ধতি সবাই ভুলে গেছেন; ফলে নতুন করে সেই পাঠপদ্ধতি রপ্ত করে নিতে না পারলে সেগুলি পাঠ করা সহজসাধ্য নয়। আমাদের এই শব্দার্থকোষ তাঁদের সেই পাঠপদ্ধতিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলবে আশা করা যায়। তবে তার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্যরূপে বাহিত হয়ে আসা **পুরাণ**গুলি কীরকম, তার একটা সার্বিক ধারণা থাকলে খুব ভাল হয়। পৌরাণিক অভিধান জানাচ্ছেন — 'সাধারণত **পুরাণ** অর্থে ... **সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর** ও **বংশানুচরিত** — এই **পঞ্চলক্ষণ**-আক্রান্ত **ব্যাস**াদি মুনি প্রণীত গ্রন্থকেই বোঝায়। যে গ্রন্থে স্থাবর, জঙ্গম, **দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ**, মনুষ্যাদির বৃত্তান্ত এবং সৃষ্টি-বিবরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার বর্ণন, অন্তস্তত্ত্ব নির্ণয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূর্বতন রাজন্যবর্গের বংশাবলী প্রভৃতি নানা বিষয় সবিশেষ লিখিত আছে এবং যদ্দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থার পরিজ্ঞান, জ্ঞানের নির্মলতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য জন্মে, তার নাম পুরাণ। এতে বেদার্থ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।' ... 'পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত — মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮; যথা **ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়,** ও **ব্রহ্মাণ্ড**। ...' (পৌ.অ.)।

আমরা যতদূর বুঝেছি, **পুরাণ** মাত্রেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কালখণ্ড মোটামুটিভাবে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। সব **পুরাণে**রই উপরোক্ত **পঞ্চলক্ষণ** কমবেশি রয়েছে। তবে, কোনো কোনো পুরাণ তা একশোভাগ অনুসরণ করেছে, কোনোটি-বা করতে পারেনি। তবে সব **পুরাণ**ই মোটামুটি এক কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন বয়ান হলেও সেগুলির ভিত্তি মূলত এক, এবং **পুরাণ**টির নামানুসারে তার আলোর বৃত্তটি (ফোকাস) বিশেষ দিকে পড়ে থাকে। যেমন **ব্রহ্মপুরাণ**-এ সৃষ্টির শুরু (প্রায় ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে প্রায় ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে **ব্রহ্ম**-এর যেরূপ বিবর্তন ঘটেছে, সেদিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আবার, যেমন **বিষ্ণুপুরাণ**টি এক বিচারে একটি সম্পূর্ণ পুরাণ এবং তার বয়ান তুলনায় অনেক বেশি সহজবোধ্য। তাতে **বিষ্ণুর** উদ্ভব থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত **বিষ্ণু**র বিবর্তনের ইতিহাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে, **পুরাণ** পড়ে বুঝতে চাইলে সবার আগে মনটাকে **পুরাণ** পড়ার যোগ্য করে নিতে হয়। তার জন্য (এক) প্রথমে মনটাকে শেখাতে হয়, তার যেন জ্ঞানের গুমর না থাকে। সে যেন মনে রাখে সে সুদূর অতীতের ঘটনাবলীর কথা সেই সুদূরের ভাষায় পাঠ করার চেষ্টা করছে। তার সেই চেষ্টায় সহায়তা করার কেউ নেই, তাকে নিজেকেই সব বুঝে বুঝে পড়তে হবে, পড়তে পড়তে বুঝতে হবে। কাউকে যদি সাহায্যকারীরূপে সে পেয়ে যায়, সে নেহাত ভাগ্যের ব্যাপার। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধনের যথার্থ উপায় নেই বললেই চলে। এই শব্দার্থকোষ সেখানে সবেমাত্র সাঁকো বানানোর চেষ্টা করছে। তাতে কারও যদি কিছু উপকার হয়, হতে পারে। (দুই) মনে রাখতে হয়, প্রচলিত ভাষায় শব্দের মানে যেভাবে বোঝা হয়ে থাকে, পুরাণ সেরকম ভাষায় লেখা নেই। পুরাণের বয়ানের ভাষা ও শব্দগুলি আমাদের চেনা শব্দ হলেও, তাদের মানে বোঝার পদ্ধতিটি আলাদা। সেই পদ্ধতি (ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি) জেনে নিয়ে তার সাহায্যে প্রতিটি শব্দের মানে বুঝে নিতে হয়। (তিন) সর্বোপরি মনটাকে জানাতে হয়, সে যেন ভুল করেও নীচ নজর নিয়ে পুরাণ পড়তে না যায়। তাহলে ইংরেজরা বা ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা পুরাণ পড়তে গিয়ে যেরকম বোকা বনেছে, সেইরকম বোকা বনতে হবে। ব্যাপারটি কীরকম, সেকথা একটু বলে নেওয়া দরকার। বাংলাভাষীদের কিছু বর-ঠকানো ধাঁধা প্রশ্ন আছে, বরের 'ঠাট্টাদার'রা যা বরকে জিজ্ঞাসা করে ঠকায়, কৌতুক করে, মজা করে। যেমন — বলো — 'শুতে গেলে দিতে হয়।' কী?

বর বিয়ে করতে এসেছে। তার মন স্বভাবতই বরবধূর দৈহিক সম্পর্কের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে থাকে। উপরোক্ত প্রশ্ন শুনে সে লজ্জা পায়। কারণ, প্রশ্নটির সে নারীপুরুষের সঙ্গমকেন্দ্রিক অর্থ বোঝে এবং ঠকে। কেননা, প্রশ্নটির উত্তর হল 'দরজার খিল', ঘুমানোর আগে যা দিয়ে ঘুমাতে হয়।

এই যে রীতি — ভাল কথা এমন পদ্ধতিতে বলা লোকে যাতে তার মন্দ অর্থ বোঝে — এই রীতি কিন্তু ভারতীয় বাগ্‌বিধির অতি যুক্তিযুক্ত একটি প্রাচীন ও যথার্থ ধারার ক্ষীয়মান ও খানিকটা কলুষিত রূপ। ধারাটি ছিল — অতি উচ্চ মার্গের কথা সাধারণ মানুষ যে মার্গে বিচরণ করেন, সেই মার্গের ভাষায় বলা; যাতে তাঁরা তার অর্থ বুঝবার ধরতাই পান। এই পদ্ধতিতে কোনো কোনো ধর্মগুরু বলে বসেন, 'ভগমে লিঙ্, লিঙ্গমে পারা, যো বুঝে সো গুরু হমারা'। এর নিম্নমার্গীয় অর্থ সবাই কমবেশি জানেন বোঝেন, কিন্তু এর উচ্চমার্গীয় অর্থ জানেন বোঝেন এমন মানুষের সংখ্যা কম। অর্থটি হল, 'কর্মযজ্ঞে তত্ত্ব, তত্ত্বে পরমাপ্রকৃতির নিয়ম, যে বুঝতে পারে, সেই আমার গুরু।'

এই যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই সেকালের বহু মনীষী তাঁদের জ্ঞানবাণী প্রচার করেছেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক-প্রেমিকার আলাপ বিলাপ প্রলাপের ... ভাষায় অরূপরতনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের, পরমাত্মার সঙ্গে রবীন্দ্র-আত্মার প্রেমের বয়ানগুলি দিয়ে গেছেন। সেগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডার। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশাল পদাবলী সাহিত্য। একই পদ্ধতি রয়েছে পুরাণের অজস্র ঘটনার বর্ণনায়। কালিকাপুরাণের ও হরিবংশপুরাণের কিছু কিছু বয়ান তো একালের আধুনিকতাবাদীদের চোখে অত্যন্ত অপাঠ্য। তাঁদের মন নীচ নজরে সেগুলিকে দেখতে এবং বুঝতে যায়, এবং স্বভাবতই তাঁরা সেগুলির ভুল, কদর্য, অতি নিম্নমানের অর্থ বোঝেন। হরিবংশপুরাণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলেই পাঠক টের পাবেন, আধুনিকতাবাদীরা সেগুলিকে অপাঠ্য ভাবেন কেন।

'... যাদবদিগের একজন পুরোহিত গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পুরুষাঙ্গ-সংঘট্টন করেন; কিন্তু কিছুতেই

রেতঃপাত হইল না। তখন তিনি তাঁহাকে নপুংসক বলিয়া মিথ্যাপবাদ প্রদান করিলেন। তাহাতে গার্গ্য রোষে লৌহবর্ণ শ্যামমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পুরুষত্ব খ্যাপনার্থ দ্বাদশবর্ষ তপস্যার পর গোপালী নাম্নী এক গোপকন্যাকে লইয়া তাহার সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হন। সেই কামিনী গোপকন্যা-বেশধারিণী এক অপ্সরা। মহাদেবের নিয়োগানুসারে সেই অপ্সরা গার্গ্য-সমাগমে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করত শাপবিমুক্ত হন। ... ঐ পুত্রের নাম কালযবন হইল।' (*'বাসুদেব বৃত্তান্ত'* / পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় / হরিবংশ / শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবিরচিত)।

উপরোক্ত বর্ণনার মানে বুঝতে হলে কমপক্ষে **যাদব, পুরোহিত, গার্গ্য, পুরুষত্ব, রেতঃপাত, তপস্যা, গোপালী, গোপকন্যা, অপ্সরা** ... প্রভৃতি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ জানতে হয়। তা না জেনে আধুনিক ভাষাজ্ঞান নিয়ে এর মানে বোঝার চেষ্টা করলে কতখানি ভুল অর্থে পৌঁছোনো হয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয়। দুঃখজনক হলেও সেটাই এতদিন হয়ে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে, শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, পুরাণাদি নিয়ে যাঁরা বাজে কথা বলেন, বুঝবেন, তাঁদের সম্বল আধুনিক ভাষাবোধ এবং নজর স্বভাবতই নীচ এবং তাঁরা তাঁদের সেই ভাষাবোধ ও নীচ নজর নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীচৈতন্যকে, রবীন্দ্রনাথকে এবং পুরাণাদিকে পাঠ করতে গিয়েছিলেন, তাই তাঁদের ভুল এবং অনেক ক্ষেত্রেই কদর্য ধারণা হয়েছে এবং সেকারণেই তাঁরা ওগুলির নিন্দামন্দ করে থাকেন। একালের সৎ ও প্রকৃত **পুরাণ**-পাঠক যেন সেই ফাঁদে পা না দেন। তিনি যেন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি যথাসাধ্য হাতে নিয়ে এবং যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তি, উচ্চ মন ও নজর নিয়ে সেগুলি পড়তে যান। তাহলেই তিনি আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে মানবসভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস ও আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত মহত্তম জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাবেন।

সব **পুরাণ**ই ব্যাসপ্রণীত। তাহলে সবার আগে তাঁকে চিনে নিন। তারপর দেখে নিন, আপনি যে **পুরাণ**টি পড়তে চলেছেন তার নাম কী? আগে তার নামের মানে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করুন। তাহলে বুঝবেন, কার বর্ণনা ওই **পুরাণ**টি দিতে পারে। এইবার **পঞ্চলক্ষণ** অনুসারে ঐ **পুরাণ** লিখিত কি না, সেটি দেখুন। বহু **পুরাণ** তার এই কাঠামো মানেনি; তার কারণও আছে। বিশেষত পরবর্তীকালের ইতিহাস সবসময় ঐ কাঠামোর ভিতরে বলা সম্ভব হয়নি, বাড়তি কিছু উপায় নিতে হয়েছে **পুরাণকার**দের। তবে যাই হোক না কেন, অতীত ইতিহাসটা যদি ভালভাবে বোঝাই আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে খুব বেশি অসুবিধা হবে না। যেগুলি সম্পূর্ণ **পুরাণ**, যেমন **ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ** — এগুলিকে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারলেই অনেকটা জানা হয়ে যায়। তার ওপর **রামায়ণ মহাভারত** তো রয়েছেই। প্রায় সমস্ত পুরাণের সারমর্ম পাওয়া যায় এই দুই মহাকাব্যে। আর, এদের আরও বিবর্তিত রূপগুলিকে পাওয়া যায় **মঙ্গলকাব্য**গুলিতে, পদাবলী সাহিত্যে।

পুরি (পুরিয়া, পুরী, পুরীষ, পুরোডাশ) : ১. পুরি, পুরী = ✓পৃ + ই - কর্ম্মবাচ্যে। ... **পুরোডাশ** = পুরস্ + ✓দাশ্ (দান) + ণ্বিন্ (০), + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***পুরি*** = ***পুর*** *গতিশীল যাহাতে।* ***পুরিয়া*** = ***পুর*** *গতিশীলভাবে যায় যে আধারে।* ***পুরী*** = *পুরির আধার যে।* ***পুরীষ*** = ***পুরী****র দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।* ***পুরোডাশ*** = *যাহাতে পুর দেওয়া হইয়াছে।* / **পুরি, পুরী** = যাহা তত্ত্বে পূর্ণ (থাকে)। **পুরীষ** = যে উদক সর্ব্বকাম পূরণ করে। **পুরোডাশ** = যাহা পুরঃ দত্ত হয়। (ব.শ.)। **৩. পুরি, পুরী** = সন্ন্যাসীর উপাধিভেদ (কেশবপুরী, তোতাপুরী ... ইত্যাদি), দেহ, উড়িষ্যার পুণ্যক্ষেত্রবিশেষ, পুর-দেওয়া পিষ্টকবিশেষ, ডালপুরী (?), লুচি। **পুরিয়া** = পাতা বা কাগজের পুটিকা বা মোড়া, ঔষধের একমাত্রার মোড়া। **পুরীষ** = মল, বিষ্ঠা। **পুরোডাশ** = যবচূর্ণকৃত (?), যজ্ঞিয় পিষ্টকভেদ, হবির্ভেদ, হুতশেষ, হবির্মাত্র, সোমরস, পুরোডাশসহচরিত মন্ত্র। (ব.শ.)। **৪. পুরি** 'পুরে দিই' বা to fill অর্থে, **পুরিয়া** 'কাগজের মোড়ক, যার ভিতরে সাধারণত কোনো ওষুধ থাকে' এই অর্থে, **পুরী** উড়িষ্যার প্রখ্যাত মন্দির ও মন্দিরনগরী অর্থে প্রচলিত। **পুরীষ** কদাচিৎ stool অর্থে প্রচলিত কিন্তু **পুরোডাশ** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পুষা, পুরুষ**। বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না যে, যার ভিতরে **পুর** থাকে তাকে **পুরী** বলে, তা সে 'খাদ্যবাচক' **পুরী** হোক, 'গৃহবাচক' **পুরী** হোক, 'স্থানবাচক' **পুরী** হোক, আর 'জ্ঞানবাচক' **পুরী** হোক, কিংবা অন্য কোনো প্রকার **পুরী**ই হোক। আমরা বাংলাভাষী মানুষেরা যে **পুরী** খাই, তার ভিতরে **পুর** থাকে বলেই তাকে **পুরী** বলে। (তাদের অন্য নাম আছে, যথা 'পুরপিঠা', 'রাধাবল্লভী' ... ইত্যাদি।) প্রাসাদ**পুরী**, রাজ**পুরী** ... ইত্যাদির ভিতরে কেউ না কেউ এক বা একাধিক শক্তিমান ধনবান জ্ঞানবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী **পুর** রূপে বিরাজ করেন বলেই সেগুলিকে প্রাসাদ**পুরী**, রাজ**পুরী** ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। উড়িষ্যার বিখ্যাত স্থানে স্বয়ং জগন্নাথদেব **পুর** রূপে বিরাজ করেন বলেই তাকে **পুরী** নাম দেওয়া হয়েছিল। জ্ঞানের তত্ত্বসমূহ **পুর** রূপে যে সকল ব্যক্তির ভিতরে থাকে, তাঁদের এককালে **পুরী** উপাধি দেওয়া হয়েছিল, যেমন তোতা**পুরী**, কেশব**পুরী** ইত্যাদি। (শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত 'দশনামী সম্প্রদায়'-এর যে দশটি উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সেই উপাধিগুলি বিচার করলেই বোঝা যায়, তাঁদের শব্দার্থজ্ঞান কতখানি উচ্চমার্গের ছিল। উপাধিগুলি হল — **তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, সরস্বতী, ভারতী**। শঙ্করাচার্যের সময়কাল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ।) ...

তবে **পুরীষ** ও **পুরোডাশ** শব্দদুটি নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়তে হয়। বোঝাই যায় না যে, যে-**পুরীষ**কে 'মল' বা 'বিষ্ঠা' বলে, প্রাচীনকালে তাকে 'সর্ব্বকামপূরক উদক' বলা হত কেন? কিংবা যজ্ঞীয় পিঠা বা **পুরোডাশ**-এর কথাই ধরুন। যজ্ঞে আবার কীরকম পিঠা তৈরি হয়? কেউ কি কখনো কোনো যজ্ঞে কোনোরকম পিঠা তৈরি হতে দেখেছে? ব.শ. রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তত চোখে পড়েনি। তাই তিনি **পুরোডাশ** শব্দের অর্থ 'যবচূর্ণকৃত' লিখে তার পাশে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে গেছেন। ...

আসলে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা পড়েছিলেন মহা মুশকিলে। তাঁরা দেখছেন ধান গম যব ইত্যাদি তো হচ্ছেই, তার ওপর মানুষ যাদুকরের মতো মাটি পুড়িয়ে হাঁড়ি করে ফেলছে, তুলোকে কাপড় বানিয়ে দিচ্ছে, কাঠকে বদলে দিচ্ছে আসবাবপত্রে ... আর সেই বানানো **উৎপাদন**গুলি (দ্র. **উত্তানপাদ**) ভাগবাঁটোয়ারাও হয়ে যাচ্ছে;

অথচ সেই বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত বস্তুসমূহকে কী নামে শনাক্ত করলে সবাই বুঝতে পারবে, তা তখনও ঠিক করা যায়নি। প্রথমে তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন **করীষ** ও **পুরীষ**। প্রধানত চয়ন করে বিন্যস্ত করে নেওয়া উৎপন্নগুলিকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **করীষ**, যথা চাল, আটা, শুকোনো ফলমূল, আচার ... ইত্যাদি। আর শ্রম ও মেধা **পুরে** দিয়ে যেগুলিকে বানানো হত, যেমন মাটির হাঁড়ি কলসি, কাঠের আসবাবপত্র, সুতোর কাপড়চোপড় ... ইত্যাদি, এগুলিকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **পুরীষ**। তবে পরবর্তীকালে সবধরনের উৎপন্নকেই **পুরীষ** বলার চল্ হয়ে যায় বলেই মনে হয়। আর তখন স্বভাবতই **পুরীষ** বলতে লোকে 'সর্ব্বকামপূরক উদক' বুঝত, যার কথা লেখা রয়েছে **ঋগ্বেদে**, যার কথা লিখে গেছেন স্বয়ং সায়ণাচার্য; যে 'পুরীষোৎসর্গ'-এর কথা মহাভারতে ও হিতোপদেশ গ্রন্থেও রয়েছে। (দ্র. ব.শ.)। কিন্তু যখন পরিকল্পনা করে বহু কাঁচামাল একত্র করে যথার্থ শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার চল্ হল (একালের ইন্ডাস্ট্রির আদিম রূপ), তখন সেই উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ-সম্ভূত **পুরীষ**কে বলা হল 'পিঠা' বা **পুরোডাশ**। এ হল উৎপাদিত বস্তুমাত্র, যার ভিতরে মানুষের মেধা ও শ্রম **পুর** রূপে **পুরে** দিয়ে তাদের বানানো হয়েছে, তাই তার নাম হয়ে যায় **পুরোডাশ** (= product)। দক্ষযজ্ঞে **পূষা** এই **পুরোডাশ** বা পিঠা খাচ্ছিলেন বলে তাঁর দাঁত ভেঙে দেন শিবপন্থীরা। (দ্র. **দক্ষ, পূষা**)।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। কয়েক যুগ পরে একদিন এসে গেল উৎপন্ন-বিনিময়ের কথা, কেননা ঐ সকল উৎপন্ন **পণ্য**-তে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সমাজে নানারকমভাবে লেনদেন, বিক্রিবাটার সূচনা হয়ে গেছে। লোকে গাদা গাদা উৎপাদনের উপকরণ (কাঁচামাল ইত্যাদি) আনছে, সেগুলিকে যাদুকরের মতো নানা রূপে রূপান্তরিত করছে (গাছে ঝুলছিল তুলো, হয়ে গেল মানুষের বস্ত্র), তারপর **মল**ত্যাগ করার মতো গাদা গাদা **পণ্য**ত্যাগ করছে! তার মানে, লোকে খাচ্ছে আর হাগছে! সমাজ **পণ্যে পণ্যে, মলে মলে মালামাল** হয়ে যাচ্ছে! সমগ্র সমাজ **মল** বা **গু**-এর গন্ধে **ম-ম** করছে, চারিদিকে **মলয়** বায়ু বইছে! ...

তৎকালীন সমাজপতিরা দেখলেন, এই **পণ্য**-বিনিময় চলতে দিলে তো যৌথসমাজ-ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে! তাঁরা এই **পুরীষ**কে **মল** বলে নিন্দা করতে লাগলেন, মানুষকে বোঝাতে লাগলেন, কেবলমাত্র নিজের তৈরি করা উৎপন্নই ভোগ করা উচিত (দ্র. ঋগ্বেদ ৭/৪/৭। নিরুক্ত পৃ. ৩৩৩। অমরেশ্বর ঠাকুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অন্যের উৎপাদিত কোনো **মাল** নিয়ে আপন-**মাল** মনে করে ভোগ করা উচিত নয় ... ইত্যাদি এবং নানান সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। বেণিয়ার আদিপুরুষ **বেণ**কে পরাস্ত করে **পণ্য** নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। তখন স্বভাবতই **পুরীষ** শব্দের মানে হয়ে গেল 'পায়খানা'। **পণ্য**পন্থীরা বললেন, আমরা তো দিচ্ছি আমাদের উদ্বৃত্ত, সমাজদেহের **আবর্জ্জনা** (দ্র. **কিবাত**) সাফ করে সমাজকে পবিত্র রাখছি ... তাহলে এত নিন্দামন্দ কেন! তাঁদের সেই ধারণার স্থান হল ভারতের **পুণ্য, পবিত্র** ... ইত্যাদি বোধে এবং ইংরেজির to ease oneself of, to defecate ... ইত্যাদি 'পায়খানা করা'র ধারণায়।

এ প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল-এর Poetics (= কাব্যতত্ত্ব) গ্রন্থসূত্রে পাওয়া বহুব্যবহৃত এবং বহুবিতর্কিত Katharsis ধারণাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এযুগের পণ্ডিতরা তর্ক করেন, Katharsis বলতে ঠিক কী বোঝায় — 'purge করা', বা 'অবাঞ্ছিত জিনিসকে বার করে দেওয়া', (যেমন হয় purgative বা জোলাপের ক্ষেত্রে) নাকি 'পবিত্র করে দেওয়া' বা 'purify করা'? ইউরোপের মধ্যযুগের ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় চিন্তায় পর্যন্ত purgation বলতে বোঝা হত মুখ্যত 'গ্লানিমুক্ত করে শুদ্ধ করা', যে সূত্রে দান্তের 'দিভিনা কমেডিয়া'র শুদ্ধিকরণের জগৎটির নাম — Purgatorio। ... যাই হোক, দেখা গেল, তাঁদের সেই ধারণাগুলি কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিজেদের গা থেকে সমস্ত অতীত-আবরণ খুলে ফেলে দিল এবং শুধুমাত্র প্রতীকী ('উৎপন্ন') অর্থের নেংটি পরে product-এ পরিণত হয়ে গেল।

এইসব উত্তরাধিকারের ধারাপ্রবাহের রকমফের অতঃপর এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ইংরেজের পূর্বপুরুষেরা যাকে অতীতহারা নেংটিসম্বল product রূপে বহন করে নিয়ে চলেছিলেন, তাকেই তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা **পুরোডাশ** রূপে অর্জন করেছিলেন, তার সমস্ত অর্থসহ। সেই **পুরোডাশ**কে আমরা তার সর্বপ্রকার অর্থসহ হারিয়ে ফেললাম; ইংরেজ কিন্তু তাঁর product-কে সেরকম হারাল না, প্রতীকী অর্থসহ শব্দটিকে ধরে রাখতে পারল এবং তাই দিয়েই কাজ চালাতে লাগল। তাই কেন product মানে 'উৎপন্ন' বোঝায়, তার কারণ তারা জানতেই পারল না। আর সর্বহারা আমরা অগত্যা ইংরেজের সেই প্রতীকী-অর্থসম্বল অতীতহারা product-এর প্রতিশব্দ বানালাম আমাদের 'উৎপন্ন'কে, তার প্রকৃত অর্থ ফেলে দিলাম; আর **পুরোডাশ**কে পুনরুদ্ধার করতেই পারলাম না। আমাদের যে সব থেকেও আজ কিছুই নেই! ...

যাই হোক, ইতিহাসের মার একদিন আমাদের ভিখারী বানিয়ে দিয়েছিল; আজ, হয়তো সেই ইতিহাসেরই অন্য কোনো মারে সম্প্রতি এই শব্দার্থকোষের সাহায্যে আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই **পুরোডাশ**কে পুরোটাই ফিরে পেতে চলেছি। জয়গুরু! **৬.** ইংরেজি purge, purgation, product ... ইত্যাদি।

পুরু (পুরুত, পুরুতগিন্নী, পুরুতঠাকুর, পুরুতঠাকরুণ। পুরু শব্দটি নিম্নে পুনরায় রয়েছে।**)** : **১.** ✓পৃ + উ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. পুরু** = *পৃ-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর, দেওয়ার) রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***পুরুত*** = ***পুরু*** *তারিত যাহাতে। (দ্র.* ***পুরোহিত****)। /* **পুরু** = পুষ্পকে পূরণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. পুরু** = প্রভূত, প্রচুর, পরাগ, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ (নিম্নে দ্রষ্টব্য), বেড়, পরদা, স্তর, স্থূল, মোটা। **পুরুত** = পুরোহিত। **পুরুতগিন্নী** = পৌরোহিত্য। **পুরুতঠাকুর** = পুরুতমশায়। **পুরুতঠাকরুণ** = পুরোহিতপত্নী। (ব.শ.)। **৪.** thick অর্থে **পুরু** প্রচলিত। হিন্দুধর্মের priest বা 'পূজারী ব্রাহ্মণ' অর্থে **পুরুত** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দক'টি প্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলায় পেটে চিমটি দিয়ে চামড়ার স্থূলত্ব দেখে নিয়ে আজও বলা হয়, 'তোর তো বড্ড চর্বি হয়ে গেছে রে! খুব ঘি দুধ মাছ মাংস খাচ্ছিস মনে হয়!' অর্থাৎ চর্বি হলে পেটের চামড়া স্থূল হয়ে যায়, **পুরু** হয়ে যায়। তবে কিনা এ হল মানুষের দেহের

কথা। মানুষের মনের চামড়া **পুরু** হয় তার জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ শক্তিসম্পদ ... ইত্যাদি তার মনের ভিতরে জমলে; অর্থাৎ তার মনে যদি 'আমার জ্ঞান', 'আমার ধন', 'আমার শক্তি' ... ইত্যাকার বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে জমতে থাকে তাহলে তার মনের চামড়াও **পুরু** হয়ে যায়। অর্থাৎ, ঐ বিশ্বাসগুলি জমে জমে স্তর পড়ে পড়ে মোটা হয়ে গেলে, মানুষের মনের 'অহংকার' হয়। কিন্তু মন তো দুই প্রকার, **চিত্ত** ও বুদ্ধি। ফলত অহংকারও হয় দুই রকম — চিত্তের অহংকার, বুদ্ধির অহংকার। চিত্তাহংকারী মানুষ বিলিয়ে দেওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত। তেমন চিত্তাহংকারী জ্ঞানজীবীরাই **পুর**সমূহের আধার হয়ে ওঠেন, **পুরোধা** হয়ে ওঠেন, **পুরোহিত** হয়ে ওঠেন। তারপর দেখা দেন বুদ্ধি-অহংকারী মানুষেরা। তাঁরা বিলিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে প্রভুত্ব করার ও নিয়ে নেওয়ার অহংকারে মত্ত। মানুষের বুদ্ধি অহংকারী হয়ে গেলে তার মনের চামড়া মোটা বা **পুরু** হয়ে যায়। সেকালের মানুষেরা তাই 'বুদ্ধির-অহংকারী' মানুষকে নাম দেন **পুরুত**। দ্র. **পুরোহিত**।

কারও কারও ধারণা, বাঙালির জিভ **পুরোহিত** উচ্চারণ করতে কষ্ট পায়, তাই তাকে সংক্ষেপ করে নিয়ে **পুরুত** বলে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি জানিয়ে দিচ্ছে যে, সেকথা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে **পুর-ধারক পুরোধা** পুরের হিত করতেন বলে তাঁকে 'পুরোধাত' বা **পুরোহিত** বলার চল হয়ে যায়। তিনি ছিলেন 'চিত্তাহংকারী মানুষ', সকলের জন্য নিজেকে, নিজের সবকিছুকে বিলিয়ে দেওয়াই যাঁর স্বভাব। এই স্বভাবই ছিল সেকালের বৈদিক বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্ট ইসলাম হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতির প্রাচীন **পুরোহিতদের** একান্ত **ধর্ম্ম**। কিন্তু পরে পরে তাঁদের **পুরোহিতগিরি** বংশানুক্রমিক হয়ে গেলে, তাঁরা ধর্মচ্যুত হয়ে যান, ধনসম্পদ শক্তিসম্পদ **প্রতিগ্রহ** করতে শুরু করেন, ফলত তাঁদের মনের চামড়া **পুরু** হয়ে যায়। তখন তাদের নাম হয়ে যায় **পুরুত**। এখান থেকে বোঝা যায়, শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের বিচারে **পুরোহিত** ও **পুরুত** শব্দের অর্থ এক নয়। বাংলাভাষীর জিভ ভুল করেনি, সে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই চলেছে। **পুরোহিতের** মনের চামড়া **পুরু** হয়ে গেলে বাংলাভাষী **পুরোহিত**কে **পুরুত** নামে ডাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছে।

পুরু : ২. **পু**-*এর (নবরূপে উত্তীর্ণ পায়ীর, দেওয়ার) রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. ইঁহার পিতা যযাতি মাতা শর্মিষ্ঠা। শুক্রশাপে অকালজরাগ্রস্ত পিতার প্রার্থনায় জরাবিনিময়ে স্বীয় যৌবন দান করিলে, পিতা প্রীত হইয়া ইঁহাকে রাজ্যাধিকার-বর প্রদান করেন। ইনি কৌরবপাণ্ডবের পূর্ব্বপুরুষ এবং ইঁহারই নামানুসারে চন্দ্রবংশীয়েরা 'পৌরব' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। ... ... ইনি এবং এঁর ভ্রাতা যদু চন্দ্রবংশের দুই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। পুরু বংশধরদের পৌরব বলা হয় এবং এই পৌরব বংশ হতে কৌরব ও পাণ্ডব বংশের সৃষ্টি। যদু বংশধরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ একজন। ... পুরু পিতার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হন। ... এঁর তিন পুত্রের নাম প্রবীর, ঈশ্বর, ও রৌদ্রাশ্ব। (পৌ.অ.)। আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন যাঁর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, তাঁর নামও **পুরু**। তাঁর ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত প্রচারিত ছিল। ৪. 'একজন রাজার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, আমি সেইরূপ ব্যবহার চাই।' — সম্ভবত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কল্যাণে এই বাক্যটি সহ **পুরুরাজ**-এর নামটি বাংলাভাষীদের কেউ কেউ জানে; অন্যথায় শব্দটি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **তুর্বসু, দেবযানী, পুরূরবা**। এই **পুরু** হলেন **যযাতি**র পুত্র, **তুর্বসু**র ভাই, **দেবযানী**র পতি। ইনি **চন্দ্রবংশের** আদি রাজা **পুরূরবা** নন, ইনি পরবর্তীকালের চন্দ্রবংশীয় রাজা **পুরু** এবং ইনিই পৌরব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই পৌরব বংশ থেকেই **কৌরব** ও **পাণ্ডব** বংশের সূচনা হয়। তাহলে ইনি কে?

মহান-এর (আদিম সাম্যবাদের) যুগ পেরিয়ে ভারতসমাজ দক্ষের হাত ধরে আদিম সমাজতন্ত্রে বা বৈদিক সমাজব্যবস্থায় পৌঁছায়। এ হল একধরনের অধঃপতিত যৌথব্যবস্থা, যা ক্রমান্বয়ে **যযাতি**-তে বা status quo-তে (যেমন চলছে তেমন চলুক নীতিতে) পৌঁছলে, সে জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। তার সেই জরা গ্রহণ করতে রাজি হয় তারই এক উত্তরসূরি **পুরু**। অর্থাৎ অধঃপতিত যৌথসমাজের (বৈদিক সমাজের) ভিতরেই যাঁরা সম্পদবান হয়েছিলেন, ঐ জরার ভার নিতে হয় তাদেরকেই। ফলত, বৈদিকসমাজ পরবর্তীকালে এই **পুরু**কেই রাজা হওয়ার অধিকার দিয়ে দেয়। স্বভাবতই অধঃপতিত যৌথসমাজ একপ্রকার ব্যক্তিমালিকানাবাদিতার স্বীকৃতি দিয়ে তার বাড়বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। ফলত, তার থেকেই দু'ধরনের অধঃপতিত ধারার জন্ম হয়। একদিকে প্রবাহিত হয় যৌথসমাজের ক্ষীয়মান অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক বৈদিক ধারা, এবং অপরদিকে সূচনালগ্ন থেকে **পাণ্ডু**রোগগ্রস্ত ধনতান্ত্রিক ধারা।

পুরুষ (পরমপুরুষ) : ১. ✓পুর্ (অগ্রগমন) + উষ (কুষন্), বা ✓পৃ + উষ (কুষন্), বা পুর, পুরু + ✓শী + অ (ড) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***পুর্***-*কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে দিশাগ্রস্তভাবে দান করে যে; অথবা,* ***পুর*** *সহযোগে উষ্‌কানি (****পুর্****-কে উষ্ বা use করে) দেয় যে;* ***পুরু*** *শায়িত থাকে যাহাতে।* / দেহে জীবরূপে শয়ন করে যে। (ব.শ.)। ৩. মনুষ্যসামান্য, পুমান, প্রতিনিধি, জন, ভর্ত্তা, পৌরুষবান যোধ, পুরুষপ্রমাণ, (ব্যাকরণে) অস্মাদিভেদে তিঙ্‌বিভক্তির তিন-তিনটির সংজ্ঞাবিশেষ, (জ্যোতিষে) মেষমিথুনাদি বিষম রাশি, রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ, বংশের সন্তান পরম্পরা (generation), পুন্নাগবৃক্ষ, পুরুষক (অশ্বের পুরুষবৎ অবস্থানবিশেষ অর্থাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়া আগের পা উঁচু করিয়া পুরুষের মতো ঘোড়ার দণ্ডায়মান অবস্থা), ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ বিরাট্‌, সর্ব্বদেবতাত্মা হিরণ্যগর্ভ, (সাংখ্যদর্শনে) প্রকৃতিবিকারবহির্ভূত পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কনীনিকা, চক্ষুর তারা। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. রত্নের জগতে কোহিনূর হীরক যদি সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হয়, তবে বাংলাভাষায় তেমন অমূল্য রত্নসমান শব্দের তালিকার প্রথমেই যাদের নাম থাকবে তারা হল — **পুরুষ** ও **প্রকৃতি**। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির সাহায্যে বাংলাভাষার শব্দগুলিকে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, এই শব্দদুটির ব্যাপ্তি এত বেশি যে এদের বোঝা ও ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন কাজ। আমরা তাই কেবল নিহিত অর্থটির নিষ্কাশনে যত্নবান হব এবং **প্রকৃতি** শব্দের ভুক্তিতে

গিয়ে **পুরুষ-প্রকৃতি** শব্দে তাদের সাধ্যমতো ব্যাখ্যার চেষ্টা করব। এখানে শুধুমাত্র **পুরুষ** শব্দটির নিহিতার্থ বোঝার চেষ্টা চালাব আমরা।

পুর কাকে বলে সেকথা আমরা আগেই জানিয়েছি। এই **পুর** অন (on) করা অর্থাৎ কোনো কিছুর ভিতরে **পুর** দেওয়া, **পুরে** দেওয়া, তার ফাঁক বা অভাব **পুরণ** করা একটি সাধারণ ক্রিয়া। কিন্তু **পুর**টিকে যদি নবরূপে উত্তীর্ণ করা হয় এবং দিশাগ্রস্ত ভাবে **পুরে** দেওয়া হয়, তাহলে যে ক্রিয়া বোঝায়, সেই ক্রিয়ার কারককে বলে **পুরুষ**। উপরোক্ত ৩.-এ ব.শ.-প্রদত্ত অর্থগুলি **পুরুষ**-পদবাচ্য এই জন্য যে, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো **ক্ষেত্রে** উপরোক্তভাবে উপরোক্ত **পুর** দেয়।

ব.শ. **পুরুষ** শব্দের যে অর্থগুলি দিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে সেগুলি কার্যত চার রকম। প্রথমত **পুরুষ** তারাই, দার্শনিকেরা যাদের **পুর-উষ** করতে দেখেছেন; যেমন — **ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা,** আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ বিরাট্, সর্ব্বদেবতাত্মা হিরণ্যগর্ভ, (সাংখ্যদর্শনে) প্রকৃতিবিকারবহির্ভূত পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। দ্বিতীয়ত **পুরুষ** তারাই, জ্যোতিষী বা প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ যাদের **পুর-উষ** করতে দেখেছেন; যেমন — মেষমিথুনাদি বিষম রাশি, রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ, বংশের সন্তান পরম্পরা (generation)। তৃতীয়ত **পুরুষ** তারাই, ব্যাকরণবিদ ভাষাতাত্ত্বিকেরা যাদের **পুর-উষ** করতে দেখেছেন, যেমন — অস্মাদিভেদে তিঙ্‌বিভক্তির তিন-তিনটির সংজ্ঞাবিশেষ — উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, ও প্রথমপুরুষ। সবশেষে **পুরুষ** তারাই, অজ্ঞাত-অসাধারণ মানুষেরা যাদের **পুর-উষ** করতে দেখেছেন; যেমন — পুন্নাগবৃক্ষ, পুরুষক (অশ্বের পুরুষবৎ অবস্থানবিশেষ অর্থাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়া আগের পা উঁচু করিয়া পুরুষের মতো ঘোড়ার দণ্ডায়মান অবস্থা), কনীনিকা, চক্ষুর তারা ... ইত্যাদি।

এখন এক এক করে ভেবে ভেবে দেখতে হবে, আমাদের প্রাচীন দার্শনিক অর্থনীতিবিদ ভাষাতাত্ত্বিক ও অজ্ঞাত-অসাধারণ মানুষেরা তাঁদের চিহ্নিত **পুরুষ**গুলিকে কীভাবে **পুর-উষ** করতে দেখেছিলেন। কাজটির কিছু অংশ কিছু কিছু শব্দের ভুক্তিতে যথারীতি করা হয়েছে ও হচ্ছে। যেমন দার্শনিকদের চেনা **পুরুষ**কে **ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা** শব্দে আগেই আমরা দেখেছি। আমরা জানি, নারীগর্ভে নর আপন প্রজাতি-**পুর** নিষেক করে বলে নর-কে **পুরুষ** বলে। সেই সুবাদে ছাত্র-মস্তিষ্কে গুরু বা শিক্ষক জ্ঞান-**পুর** দান করেন বলে তাঁকেও **পুরুষ** বলা যায়; এমনকি তিনি শিক্ষিকা হলেও। যেমন কিনা চামড়ায় যে-মানুষ মেধা ও শ্রম-**পুর** দিয়ে তাকে জুতোতে পরিণত করেন, তিনিও যেমন **পুরুষ**-পদবাচ্য হতে পারেন, তেমনি কাঁচা কুমড়ো কেটে তাতে জিরে-লঙ্কার ফোড়ন-**পুর** দিয়ে তাকে ভোজনযোগ্য করেন যিনি, তিনিও **পুরুষ**-পদবাচ্য হতে পারেন। এই হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই, তা তিনি নর হোন আর নারীই হোন, জীবনের নানা ক্ষেত্রে **পুরুষ** রূপে সক্রিয় হয়ে থাকেন। একই নিয়মে, দেহে আত্মা, পরিবারে পরিবারকর্তা, গ্রামে মোড়ল, জেলায় জেলাশাসক, রাজ্যে রাজা এবং দেশে দেশ-পরিচালক **পুরুষ**-পদবাচ্য হতে পারেন। ... এভাবে এগোতে থাকলে আমরা ক্রমান্বয়ে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যাই, যেখানে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখা যায় — প্রতিটি সত্তার **আধেয়** (= content) মাত্রেই **পুরুষ** এবং **আধার** (= form) মাত্রেই **প্রকৃতি**-পদবাচ্য। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তিনি যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অতিচেতন (আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'যোজনগন্ধবিকার' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) বা 'অমৃতলিঙ্গ' হন, তবে সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে তিনি হন প্রায়শই অরূপরতন বহুরূপী; কেননা, সেখানে তিনি ক্রমান্বয়ে 'পুরুষ-প্রকৃতি-অভেদ' রূপের দিকে যেতে থাকেন, যে রূপ ধরা দিয়েও দেয় না ধরা। আর তিনি যত বেশি ক্ষুদ্রের দিকে যেতে থাকেন ততই তাঁর **পুরুষ-প্রকৃতি** বা শক্তি-ভর (এনার্জি-মাস), বেগ-ভর (মোমেন্টাম-মাস) প্রভৃতি রূপ অবিভাজ্য **অদ্বৈত** রূপে দৃঢ়তর **অভেদ** হয়ে উঠতে থাকে। অতি-ত্রসরেণুতে (নিউট্রিনো ... ইত্যাদিতে) পৌঁছে তাকে তো আর দেখাই যায় না, কোনো কোনো ঋষি-বিজ্ঞানী তাঁকে ধ্যানযোগে বা হিসাব করে অনুভব করেছেন মাত্র। ... (পরে **পুরুষ-প্রকৃতি** দ্রষ্টব্য)। ৬. দুটি শব্দই যেহেতু অর্থের মূল্যের বিচারে সর্বোচ্চ মানের শব্দ, ইংরেজিতেও তাদের উত্তরাধিকার রয়েছে। **প্রকৃতি**র যে-procreation রূপটিকে তাঁরা পেয়েছেন, তার আলোচনা আমরা **প্রকৃতি**র ভুক্তিতে করেছি। **পুরুষ** শব্দের যে রূপটিকে তাঁরা পেয়েছেন, সেগুলি নানাভাবে খণ্ডিত অর্থধারী হয়ে গিয়েও এখনো প্রচলিত রয়েছে। সেগুলি হল purpose, propose, pursue, pursuit ... ইত্যাদি।

পুরুষকার : ২. *পুরুষগুণসম্পন্ন করণ থাকে যাহাতে।* ৩. পুরুষচেষ্টিত, পৌরুষ, উদ্যোগ, পুরুষব্যাপার। (ব.শ.)। ৪. কদাচিত প্রচলিত। ৫. দ্র. **কার, কারক, পুরস্কার**। **পুরঃ** বা **পুরস্**-এর কার-কে যেমন **পুরস্কার** বলে, তেমনি **পুরুষ**-এর কার-কে **পুরুষকার** বলে। এ হল **পুরুষ**-এর **পুরুষ**গুণসম্পন্ন মানসিক ও দৈহিক শক্তির (বা মেধা ও শ্রমের) নিষেকের ব্যাপার-স্যাপার, বা '**পুরুষ**গুণসম্পন্ন করণ-ব্যাপার' যা **পুরুষ**-এর থাকে। একেই **পুরুষকার** বলে। ...

আসলে উপসর্গ যোগে **কার** শব্দটির প্রয়োগ ছাড়াও এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলিতে **কার**-ই প্রত্যয় রূপে শব্দটির শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছে। যেমন **অন্ধকার, আগেকার** (দ্র. **পুরঃ**), **কবেকার, কলাকার, কোথাকার, চিৎকার, তিরস্কার, পুরস্কার, পুরুষকার, ফুৎকার, সরকার, হাহাকার** ... ইত্যাদি। যা কিছু কাজ **পুরুষ** করে, সেগুলি **পুরুষকার্য্য** সন্দেহ নেই। কিন্তু **পুরুষ**-এর **করণ**সমূহ **পুরুষকার্য্যে** পরিণত হয় কী করে? হয় **পুরুষ**-এর ভিতরে **পুরুষকার** থাকে বলে। সেই **পুরুষকার** অন (on) হয়ে বা **পুরুষকারণ** হয়ে যেখানে গিয়ে থামে, থেকে যায়, তাকেই **পুরুষকার্য্য** বলা যায়। দ্র. **পুরুষার্থ**।

পুরুষজ্ঞান : ২. *যাহার দ্বারা **পুরুষ**কে জানতে পারা যায়; কিংবা যে **পুরুষ**কে জানতে পারে।* ৩. পুরুষবিশেষজ্ঞাতা, অর্থাৎ, দৃষ্টিমাত্রে পুরুষস্বভাব-জ্ঞানের শক্তি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একজন **পুরুষ**গুণসম্পন্না নারী ছিলেন — যে জ্ঞানের সাহায্যে ইত্যাকার বোধ জন্মায় তাকে **পুরুষজ্ঞান** বলে।

পুরুষডাকিনী : **২.** *যে প্রকৃতিসত্তা* ***পুরুষ****কে ডাকে।* **৩.** পুরুষসম্ভোগে অতিস্পৃহাবতী-স্ত্রী; কামাতুরা ব্যভিচারিণী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আজকাল যে সংস্কৃতিকে তোল্লাই দেওয়া হয়, তাতে নারীকে অত্যন্ত কামাতুরা রূপে দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয় 'sexy'। একালের বিজ্ঞাপনের (দ্র. **পঞ্চবাণ**) দুনিয়াটা sexy-নারীদেহে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি ভাল কি মন্দ সেটা আমাদের প্রসঙ্গ নয়। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, এইরূপ-মেয়েদের বোঝানোর জন্য অন্য ভাষার শব্দ ধার করে sexy-girl ... ইত্যাদি বলার কী দরকার ছিল, বাংলাভাষীর নিজের ভাষায় তাদেরকে অনায়াসে **পুরুষডাকিনী** বলা যেতে পারত। ইংরেজি না-জানা মানুষও তাহলে শব্দটির মানে বুঝতে পারতেন! বাংলাভাষা থেকে শব্দটি হারিয়ে যেত না।

তাছাড়া আরও সুবিধা হত। যে **প্রকৃতি** পুরুষকে ডাকে, সে তো কেবল নারী-**প্রকৃতি** নয়; আরও অনেকপ্রকার **ডাকিনী**-প্রকৃতি রয়েছে। যেমন — মাটি, সাগর, ধাতুও **পুরুষডাকিনী** হতে পারত। কেননা, কবি বলেছেন, 'মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত, সাগর মাগিছে হাল। পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল।' এরাও তো **পুরুষডাকিনী** বটে! ... দ্র. **শ্লীল, অশ্লীল**।

পুরুষমেধ : দ্র. **মেধ**।

পরুষার্থ (পরমার্থ, পরমপুরুষার্থ) : **৩.** পুরুষের অভীষ্ট প্রয়োজন, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ — এই চতুর্ব্বর্গ, স্বর্গাদি, (বৈষ্ণবমতে) ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, পুরুষকার, পৌরুষ। **পরমার্থ** = শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তত্ত্ব, যাথার্থ্য, সত্যতা, পরমবস্তু, অকৃত্রিম, পরমপুরুষার্থ, মোক্ষ। **পরমপুরুষার্থ** = উৎকৃষ্ট পুরুষপ্রয়োজন, জীবের পরম প্রয়োজন। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পুরুষকার**। কী দুঃখজনক ভাবুন। মানুষ মাত্রেই যেখানে **পুরুষ**-পদবাচ্য হতে পারেন, সেখানে তাঁর **পুরুষ** রূপে যে অর্থ বা **পুরুষার্থ**, সেটিকেই আমরা আর ব্যবহার করি না। অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও বয়স্ক বাংলাভাষীরা বলতেন — 'এতে তোমার কী **পরমার্থ** সিদ্ধ হবে?' **পুরুষার্থ, পরমার্থ** প্রভৃতি শব্দকে আমরা এখন ফেলে দিয়েছি এবং তার জায়গায় ব্যবহার করছি values, moral-values ... ইত্যাদি শব্দ। আমাদের নষ্ট ভাষাজ্ঞান নিয়ে এগুলির আবার বাংলা তর্জমা করেছি 'মূল্যবোধ', 'নৈতিক মূল্যবোধ' ... ইত্যাদি। **পরমার্থ, পুরুষার্থ, পুরুষকার**, বা **পৌরুষ** ... এসব বোঝাতে ঐরকম বাজে শব্দ বাংলাভাষার পুরাণাদিতে কিংবা মধ্যযুগের সাহিত্যে, এমনকি আধুনিক যুগের সূচনাকালেও কখনো ব্যবহার করা হত না। রবীন্দ্রনাথ 'মূল্যবোধ' জাতীয় কোনো শব্দ কদাচ ব্যবহার করেছেন কিনা তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ...

তা সে যাই হোক, **পুরুষার্থ** বলতে সেকালের মানুষেরা কী বুঝতেন, সেকথা ব.শ. স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, **ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ** — এই 'চতুর্ব্বর্গ'ই হল **পুরুষার্থ**। অর্থাৎ, যা যা আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্বকে ধরে রাখে (**ধর্ম্ম**) সেগুলিকে লাভ করা; যে যে ক্রিয়া (**অর্থ**) আমাদের নিজেকে বাঁচতে, বিকশিত হতে সাহায্য করে সেগুলি করতে পারা; যে যে ইচ্ছা (**কাম**) আমাদের নিজ নিজ অভাব পূরণ করে সেগুলিকে পাওয়া; যে যে সম্বন্ধের বন্ধন আমাদের প্রত্যেককে বেঁধে রাখে, এগোতে দেয় না, সেগুলি থেকে মুক্তি (**মোক্ষ**) লাভ করা। এই হল 'চতুর্ব্বর্গ' লাভ করা। এগুলি করাই প্রকৃত **পুরুষার্থ**। আর **পরমার্থ** শব্দের অর্থ ব.শ. দিয়েছেন — শ্রেষ্ঠ পদার্থ ... থেকে একেবারে মোক্ষ পর্যন্ত। মোট কথা **পরম অর্থই পরমার্থ**। ব.শ. তো **পরমার্থ** বলতে **পরমপুরুষার্থ** বলতে দ্বিধা করেননি। (দ্র. **পরম, অর্থ**)।

ব.শ. কুল্লুক ভট্টের ও বৈষ্ণবমতের উল্লেখ করে আরও জানিয়েছেন যে, **পুরুষার্থ** হল **স্বর্গাদি, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম** ... ইত্যাদি। এই শব্দগুলির অর্থ আমরা শব্দগুলির নিজ নিজ ভুক্তিতে কমবেশি দিয়েছি। সেগুলি থেকে জানা যায়, **স্বর্গ ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম** ... প্রভৃতি বিষয়গুলি আসলে এমন বস্তু যা পেলে উপরোক্ত **চতুর্ব্বর্গ** বা চার রকম **পুরুষার্থ**ই (**ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ**) লাভ করা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুসারে প্রতিটি মানুষের মনুষ্যত্ব বা **পুরুষার্থ** হল উপরোক্ত **চতুর্ব্বর্গ** লাভের মাধ্যমে বন্ধনমুক্তির চেষ্টা। তার মানে, **প্রাকৃতিক-সামাজিক-দৈহিক ধর্ম্ম (নীতিনিয়ম) জেনে-মেনে-রেখে (নীতিমান হয়ে) আত্ম-অভাব-পূরণপূর্ব্বক আত্মধারণ ও আত্মবিকাশের মাধ্যমে সম্বন্ধের বন্ধনসমূহ থেকে আত্ম-মুক্তিলাভের চেষ্টায় (আনন্দে) কর্ম্ম করাই পুরুষার্থ**। সংক্ষেপে একেই বলা হয় 'মনুষ্যত্ব অর্জন'। বলতে গেলে ভারতের প্রায় সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে এই নিদানই নানাভাবে দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় সকল মনীষীগণ মানুষের অভীষ্ট, তার মনুষ্যত্ব অর্জন, তার **পুরুষার্থ** — এসব বোঝাতে এই প্রকার চেষ্টার কথাই বলেছেন। এ হল মানুষের সমগ্র জীবনবোধের একটি সম্পূর্ণ সচল নিদান। সেকালে এরই সর্বোচ্চ রূপটিকেই **পরমার্থ, পরমপুরুষার্থ** ইত্যাদি বলা হত। ...

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা **পুরুষার্থের** শুধুমাত্র 'নীতিমান' হওয়ার জায়গাটিই খানিকটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই খণ্ডিত **পুরুষার্থ**কে values, moral values, ideal, idealism ... ইত্যাদি রূপে শনাক্ত করেছিলেন। এরকম খাপছাড়া **পুরুষার্থের** কোনো কার্যকরী মানে হচ্ছে না দেখে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম ঐ values ... ইত্যাদিকে money-value-তে এবং idealism-কে materialism দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টায় বদলে নেন। **পুরুষার্থ** কী? না, money-ই হল **পুরুষার্থ** — টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকাহি পরমন্তপঃ। দ্র. **ভাববাদ**।

আজ আমরা একদিকে যেমন মহাসংকটে রয়েছি, তেমনি নতুন ভবিষ্যতও রয়েছে আমাদের সামনে। সুতোর এদিকে মৃত্যুর গভীর গাড্ডা, ওদিকে সুন্দর ভবিষ্যৎ। মাঝখানে এক সুতোয় ঝুলে রয়েছে আমাদের সমগ্র মানবসভ্যতা। হয় এই সভ্যতা এই পৃথিবীর বুক থেকে এবার বিদায় নেবে, নয় এই পৃথিবীর উপর নির্ভর করে আরও কুড়িটা পৃথিবী বানিয়ে আপনাকে সেখানে মুক্ত করে মেলে ধরবে। আজ তাই আজকের পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের জানাতেই হবে, মানবজীবনের **পুরুষার্থ** কী? মানুষ কী অর্জন করবে? money বা টাকা, নাকি **ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ**? মুক্তি? ... হয় শুধু টাকাই কামাও ও জাহান্নমে যাও, নয় **পুরুষার্থ** অর্জন করো এবং মানবজীবন সার্থক করো।

পুরূরবা : ১. পুরু + ✓রু + অস্ (অসি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *পুরু-র আধারের রব থাকে যাহাতে। / যিনি পুরুপর্ব্বতে জন্মিয়া রব করিয়াছিলেন।* (ব.শ.)। ৩. চন্দ্রবংশের আদি রাজা, (ইঁহার পিতা চন্দ্রসুত বুধ, মাতা ইলা। ব্রহ্মশাপগ্রস্তা উর্ব্বশী গুণমুগ্ধা হইয়া মানুষীরূপে ইঁহাকে পতিত্বে বরণ ও বহুবর্ষ একত্র যাপন করেন। রাজার সহিত উর্ব্বশীর নিয়ম ছিল যে, তিনি রাজার নগ্নাবস্থা দেখিবেন না এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দুইটি মেষ বদ্ধ থাকিবে। নিয়মভঙ্গে তিনি রাজভবন ত্যাগ করিবেন। গন্ধর্ব্বগণ ইহা জানিতে পারিয়া, রাত্রিতে মেষদ্বয় অপহরণ করিলে, রাজা উর্ব্বশীর কথায় নগ্নাবস্থায়ই মেষের অনুসরণ করেন; উর্ব্বশীও নিয়মভঙ্গে অন্তর্হিতা হন। রাজা মেষ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উর্ব্বশীর অদর্শনে শোকাকুল হইলেন এবং পৃথিবী পর্যটন করিয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবা অমা প্রভৃতি সাত পুত্র জন্মে।) বিশ্বদেবভেদ (বোধ হয়, ঋগ্বেদের পুরূরবাঃ অগ্নির প্রসাদে 'বিশ্বদেবত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পার্ব্বণে যজনীয় শ্রাদ্ধদেব)। (ব.শ.)।

... বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ্র হরণ করেন। তারার গর্ভে চন্দ্রের এক পুত্র হয়। সেই পুত্রের নাম বুধ। বুধ ইলাকে (দ্র. **ইরা**) বিবাহ করেন। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মে। মিত্র ও বরুণের শাপে উর্ব্বশী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মর্ত্যবাসিনী হন। পৃথিবীতে এসে উর্ব্বশী ও পুরূরবা অত্যন্ত প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। উর্বশী কয়েকটি সর্তে পুরূরবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে সম্মত হন। যথা — (১) উর্বশী যেন কোনোদিন পুরূরবাকে বিবস্ত্র না দেখেন। (২) উর্বশী কামাতুরা হলেই তবে মৈথুনকর্ম সংগত হবে। (৩) উর্বশীর শয্যার পাশে পুত্রবৎ প্রিয় দুইটি মেষ বাঁধা থাকবে এবং এরা কখনও অপহৃত হবে না। (৪) পুরূরবা এক-সন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করবেন। পুরূরবা এই সমস্ত শর্ত পালন করতে রাজি হয়ে যান। ... একদিন রাত্রিকালে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু উর্বশীর মেষ দুটি হরণ করেন। উর্বশী তাদের উদ্ধার করার জন্য ক্রন্দনরতা হলে পুরূরবা শয্যা হতে বিবস্ত্র অবস্থাতেই ক্ষিপ্রগতিতে বিশ্বাবসুর পশ্চাতে ধাবিত হন। উক্ত সময়ে আকস্মিক বজ্রপাতের বিদ্যুতালোকে উর্বশী পুরূরবাকে বিবস্ত্র দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করে অদৃশ্য হন। পুরূরবা অনুসন্ধান করতে করতে কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে চারজন স্বর্গীয় অপ্সরার সহিত স্নানরতা উর্বশীকে দর্শনকরতঃ তাঁকে ... প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করেন। ... বৎসরান্তে একরাত্রি একসঙ্গে বাস করার শর্তে আরও ছয় বৎসরকাল তাঁদের সাক্ষাৎ চলতে থাকে। ... এর ফলেই আয়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু প্রভৃতি নামে তাদের পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে। ... পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, স্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু, ও শতায়ু নামে সাত পুত্র হয়। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **পুরু** কাকে বলে, সেকথা আমরা একটু আগেই জেনেছি। এই **পুরু-পর্ব্বতে** বা সম্পদবাহী সামাজিক সংগঠনের ভিতরে জন্মে যিনি **রব** করেছিলেন, তাঁকে বলে **পুরূরবা**। তিনি চন্দ্রবংশের (ধনতান্ত্রিক ধারার) আদি রাজা। 'তোমাদের জন্য হ্যান করে দেব, ত্যান করে দেব, স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে দেব ...' প্রজাদের উদ্দেশ্যে ইত্যাকার **রব** করেছিলেন যে রাজা, তাঁকে বলা হত **রাবণ**। আর **পুর** দিয়ে **পুরী** ও **পুরোডাশ** বানিয়ে খেয়ে-মেখে **পুরু** হও — এই **রব** করেছিলেন যিনি, তাঁকে বলা হত **পুরূরবা**। আদি ফেরিওয়ালা সত্তার সঙ্গে (অর্থাৎ **উর্ব্বশী**র সঙ্গে) এর শর্তসাপেক্ষে **বিবাহ** হয়। ...

রব বহু প্রকার। যৌথসমাজের পরিচালকের রব হল **মহ**রব। আমরা জেনেছি, বৈদিকসমাজের পূর্ববর্তী যৌথসমাজকে **মহ, মহৎ, মহান** বলা হত। এই **মহ**-ধারণাটির ইংরেজি উত্তরাধিকার রয়েছে **হম** বা Homo-তে। পাশ্চাত্যে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই Homo-sapiens-এর যে আদি পুরুষেরা সর্বপ্রথম **হমরব** করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, তাদের নাম **হামুরাবী**। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা **হামুরাবী** বিষয়ে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছেন, তাতে প্রাচীন পৃথিবীর যৌথসমাজের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। কালের হিসেবে দেখা যায়, ভারত তার **মহারব** অধ্যায় পেরিয়ে যখন **পুরূরবা**-র দিকে হাঁটছে, পশ্চিমে তখন **হামুরাবী** সক্রিয় হয়েছেন।

পুরোগ, পুরোগামী, পুরোধা, পুরোধাঃ, পুরোবর্ত্তী, পুরোভাগ, পুরোভাগী : ৩. **পুরোগ** = অগ্রগামী, প্রধান, পুরোগত, পূর্ব্বগ। **পুরোগামী** = পুরোগ। **পুরোধা** = পুরোহিত। **পুরোধাঃ** = পুরঃস্থাপনীয়, পুরোহিত। **পুরোবর্ত্তী** = অগ্রস্থিত, সম্মুখস্থ। **পুরোভাগ** = অগ্রভাগবান, ধৃষ্ট, অনুচিত প্রবৃত্তি, দুষ্টচরিত্র, পূর্ব্বভাগ, ধৃষ্টতা। **পুরোভাগী** = গুণত্যাগপূর্ব্বক দোষমাত্রগ্রাহী, দোষৈকদৃক।

পৃথক্ (পৃথক্ত্ব, পৃথগ্‌জন, পৃথগ্‌বিধ) : ১. ✓পৃথ্ + কক্ - কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***পৃথক্*** = ***পৃ*** *(পায়ীর আবর্ত্তন) স্থিত করণ (থাকে যাহাতে); অথবা পায়ী আবর্ত্তিত থাকে যাহাতে, তাহার করণ।* ***পৃথক্ত্ব*** = ***পৃথক্****-এর তারণ বাহিত যাহাতে।* ***পৃথক্জন*** = ***পৃথক*** *যে জন। /* **পৃথগ্‌বিধ** = পৃথক বিধা যাহার। (ব.শ.)। ৩. **পৃথক্** = ভিন্ন, বিরুদ্ধভিন্নফল, স্বতন্ত্র, নানারূপ, বিনা। **পৃথক্ত্ব** = পৃথগ্‌ভাব, ভেদ। **পৃথগ্‌জন** = প্রাকৃতজন, মূর্খ, নিকৃষ্টজন, নীচ, পামর, জনমাত্র, সর্ব্বজন। **পৃথগ্‌বিধ** = বিবিধ প্রকার, নানাজাতি, ভিন্নলক্ষণ, পৃথক্‌প্রকার। (ব.শ.)। ৪. separate অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **পার্থক্য**। পায়ী আবর্তিত হতে থাকলে বা **পৃ** ক্রিয়া চললে, যার উপরে তা ঘটে তাতে ফুটো হয়ে যায়, ভেদ হয়ে যায়, সেটি ভিন্ন হয়ে যায়। একে **পৃ-করণ** বা **পৃক্** (prick) বলা যেতে পারে। ছুতোরের ভ্রমর বা ভোমরা নামক হাতিয়ারটি (একালের আধুনিক বাংলাভাষী যাকে drill বা drill-মেসিন কিংবা auger বললে বুঝতে পারেন) কাঠের উপর আবর্তিত হয়ে কাঠকে ফুটো করে দেয়। এই **পৃ** থাকে যাহাতে, সে হল **পৃথ**। সেই **পৃথ** কৃত হইয়াছে যাহাতে, সে হয়ে যায় **পৃথক**। প্রাচীন ভারতে বৈদিক সমাজের চালচলন আদিম যৌথসমাজকে কুরে কুরে ভেদগ্রস্ত করে ভেঙে দিতে থাকে এবং তার ফলস্বরূপ সমাজের ভিতরে **পৃথক্ত্ব** নজরে পড়তে থাকে, প্রাকৃতজন, মূর্খ, নিকৃষ্টজন, নীচ, পামর, জনমাত্র এবং কার্যত সর্বজন বা সর্বসাধারণ **পৃথক্জন**-এ পরিণত হয়ে যায়। জীবনযাত্রার সনাতন বিধার বদলে বৈদিক বিধা গ্রহণ করায় সমাজ ক্রমশ বহুবিধা বা বিবিধা হয়ে যায়। আর, এর মূলে রয়েছে **পৃথ**-করণ বা **পৃথক্** (বা ভেদগ্রস্তকরণের স্বভাব) থাকে যে সত্তায়, তার উপস্থিতি। সেই **পৃথ**-এর উপর ভিত্তি

করেই ভেদমূলক সমাজ বা **পৃথিবীর** (নিম্নে দ্রষ্টব্য) উদ্ভব হয়েছিল। এই **পৃথ**-এর আধারকে সেকারণে **পৃথা** বলে। নিম্নে **পৃথা** দ্রষ্টব্য। ৬. মধ্যযুগের কথ্য ইংরেজিতে 'পুরুষাঙ্গ' অর্থে prick শব্দটি ব্যবহৃত হত।

পৃথগন্ন : ১. পৃথক্ + অন্ন। ২. *পৃথক্ হইয়াছে অন্ন যাহাদের।* / যাহার অন্ন পৃথক্; যে একান্নবর্ত্তী নহে। (ব.শ.)। ৩. ভিন্নভাত, ভিন্ন। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. বাংলাভাষীদের বহুকালক্রমাগত যৌথপরিবারগুলি শহরাঞ্চলে সম্পূর্ণ ভেঙে অজস্র আণবিক পরিবারে পর্যবসিত হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামবাংলায় এখনও এই ভাঙনের প্রক্রিয়াটি চলছে। ফলে, সেখানে **পৃথগন্ন, একান্নবর্তী, ভেন্ন, ভেন** প্রভৃতি শব্দ এখনও শুনতে পাওয়া যায়। অথচ শহুরে ও অ্যাকাডেমিক বাংলাভাষী শব্দটির ব্যবহার করেন না আর। কিন্তু আজ যখন বড় বড় কোম্পানিগুলি পরস্পরের সঙ্গে 'মার্জার' করে বা হাত মিলিয়ে **একান্নবর্ত্তী** হয়ে যাচ্ছে, **একান্নবর্ত্তী** পরিবার বা 'কর্পোরেট ফ্যামিলি' গড়ে তুলছে, তখন কি **একান্নবর্ত্তী** ও **পৃথগন্ন** শব্দগুলির প্রয়োজন পড়ছে না? ... এই সব বিস্মৃতিলোকের যাত্রীদের কি মাঝপথ থেকে ডেকে আনা উচিত হবে না?

পৃথা : ২. *পৃ থাকে যাহাতে, তাহার আধারশক্তি যে।* ৩. কুন্তী। (ব.শ.)। যদুকুলশ্রেষ্ঠ শূরসেনের কন্যা, যদুবংশীয় বসুদেবের ভগ্নী এবং পাণ্ডুর স্ত্রী। শূরসেন নিজের বন্ধু কুন্তীভোজকে নিঃসন্তান দেখে নিজ কন্যা পৃথাকে দত্তক কন্যারূপে তাঁকে দান করেন। তদনুসারে বাল্যাবস্থা হতে পৃথা কুন্তীভোজের কাছে পালিতা হন এবং কুন্তী নামে খ্যাতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. মেয়েদের নাম রূপে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **কুন্তী**। এখানে মনে রাখা দরকার যে, **পুরু** থেকে জাত **পৌরব** বংশের একটি ধারা **যদুবংশ** রূপে প্রবাহিত হতে থাকে। সেই **যদুবংশে বসুদেবের** ভগিনী রূপে জন্ম হয় **পৃথার**। **পৃথ** কী, সেকথা উপরে ব্যাখ্যাত হয়েছে; মানুষের সমাজে এই সত্তা স্বভাবতই ভেদমূলক। এ এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা যৌথসমাজের ভিতরে জন্মালেও লেনদেন-বিক্রিবাটার নীতি পছন্দ করে এবং সেকারণেই স্বভাবত যৌথসমাজ-বিরোধী। সেই কারণে, ইনি সেই ধারিকা-সত্তা, যার মাধ্যমে **পাণ্ডু**রোগগ্রস্ত প্রাচীন ভারতীয় নিন্দিত পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করে। একালের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানির আদি রূপের ধারক-বাহক-জননী স্বরূপা জনগোষ্ঠীকে **পৃথা** বলে।

পৃথিবী (পৃথ্বী, পৃথ্বীপতি) : **পৃথিবী** = ১. ✓প্রথ্ + ইব (ষিবন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। **পৃথ্বী** = পৃথু + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. ***পৃথ** (ভেদ থাকে যাহাতে) গতিশীলভাবে বাহিত যাহাতে, তাহার গতিশীল আধার যে।* ৩. **পৃথিবী** = ধরা, ক্ষিতি, ধরণী, ভূমি, ভূতল, গন্ধগুণ পঞ্চমভূত, মৃত্তিকা। **পৃথ্বী** = (স্থূলত্বযুক্তা) পৃথিবী, গন্ধগুণ পঞ্চমভূত, কৃষ্ণ জীরক, পৃথুলা, সপ্তদশাক্ষরপাদ ছন্দোভেদ। **পৃথ্বীপতি** = রাজা। (ব.শ.)। ৪. The Earth অর্থে **পৃথিবী** শব্দটি প্রচলিত; বাকি শব্দদুটি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দক্ষা**। আমাদের শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা earth-এর বা **পৃথিবীর** ভিতরে এমন কী দেখেছিলেন যে, তাকে **পৃথিবী** নাম দিয়েছিলেন? না, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা কুটে মরে গেলেও এর উত্তর পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি পুরাণাদি গ্রন্থ ও রামায়ণ পড়ে জানতে পারবেন, **বারাণসী** স্থানটি হল 'পৃথিবীর বাইরে', তৎক্ষণাৎ আপনার চোখের সামনে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠবে। আপনি ক্রমশ জানতে পারবেন, প্রাচীন ভারতে যে যে স্থানে **পণ্য** বিনিময় সিদ্ধ ছিল, সেই সেই ব্যবসাকেন্দ্রগুলিকে **বারাণসী** বলা হত, এবং সে-স্থানগুলি ছিল 'পৃথিবী'র বাইরে। তার মানে **পৃথিবীতে পণ্য**-বিনিময় নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু কাশীতে বা **বারাণসীতে** তা চলতে পারত। রামায়ণ আবার **গঙ্গার** (পণ্যধারার) মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে, 'দ্বিজহত্যা করে' স্বয়ং শিব এই **বারাণসীর** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা, ভারতসমাজে বাজার প্রতিষ্ঠা করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। সেই বাজারগুলি ছিল যৌথব্যবস্থার রাষ্ট্রের (= **পৃথুর**) শাসনাধীন এলাকার বাইরে, **কাশীরাজদের** দ্বারা শাসিত। তার মানে, যৌথব্যবস্থার রাষ্ট্রের শাসনাধীন এলাকাকে বলা হত **পৃথিবী**। তার বাইরে যে এলাকা ছিল, তা ছিল 'পৃথিবীর বাইরে'। আমাদের শব্দবিদ পূর্বসূরিরা তাহলে সমগ্র earth-কে **পৃথিবী** মনে করতেন না। কেবলমাত্র **পৃথুর** শাসনাধীন এলাকাকেই **পৃথিবী** বলা হত। (নিম্নে **পৃথু** দ্রষ্টব্য)। অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা মৌলবাদী হয়ে পড়া বৈদিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল এই এলাকাতে। সেকারণে এই যৌথব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল উচ্চনীচ ধনমান দ্বারা ভেদগ্রস্ত। একপতি-পত্নীত্বের ত্রুটিপূর্ণ (উচ্চনীচ) নীতিভিত্তিক পরিবার-প্রথার কঠোর প্রয়োগ যেমন লোকালয়ের প্রান্তে **দেহবিনিময়জীবী বেশ্যাদের** উদ্ভব অনিবার্য করে তোলে, এক-পরিচালক-পরিচালিতের ত্রুটিপূর্ণ (উচ্চনীচ) নীতিভিত্তিক যৌথ-রাষ্ট্রব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগ তেমনি রাষ্ট্রের এলাকার বাইরে **পণ্যবিনিময়জীবী বৈশ্যদের** উদ্ভবও অনিবার্য করে তুলেছিল। তাই **পৃথিবী** থেকে পৃথিবীরই কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়ে **বারাণসী** নামে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

তা হোক, কিন্তু তাই বলে ত্রুটিপূর্ণ যৌথ-রাষ্ট্রব্যবস্থার এলাকাকেই বা **পৃথিবী** নাম দেওয়া হবে কেন? তার ভিতরে পার্থক্যের বীজ বা **পৃথ (প্রথ)** কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে পৃথিবীর অপর নাম **দক্ষা** শব্দে। পার্থক্যের সেই বীজটি রয়েছে **দক্ষতার** প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এবং **পৃথিবী** সেই **দক্ষের** আধার বলেই তার অপর নাম **দক্ষা**। আদিব্রাহ্মণ **শিব** ছিলেন সনাতন-ব্যবস্থার (আদিম-সাম্যবাদী যৌথব্যবস্থার) পরিচালক, জনসাধারণ প্রেম-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁকে **শিবিকায়** তুলে নাচত, কিন্তু কোনো সামাজিক নিয়মনীতি দ্বারা তাঁর সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সেই সনাতন-ব্যবস্থাকে সরিয়ে তার স্থানে যে বৈদিক-ব্যবস্থা (আদিম-সমাজতান্ত্রিক যৌথব্যবস্থা) এল, তার পরিচালক হলেন **দক্ষ**-ব্রাহ্মণ, জনসাধারণ প্রেম-ভক্তিতে নয়, সমাজস্বীকৃত ও প্রথারূপে প্রচলিত নীতির কারণে তাঁকে **শিবিকায়** তুলে নিয়ে যেত, কেননা **দক্ষযজ্ঞ**-এর পর থেকে **দক্ষ**-ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ সেকথা সমগ্র সমাজ আদি মহাসংগ্রামের পর বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে। তার মানে, সনাতন যুগেও ব্রাহ্মণ-

পরিচালিত যৌথসমাজ ছিল, বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণ-পরিচালিত যৌথসমাজ ছিল, কিন্তু দুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক ঘটে গিয়েছিল — প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যে ফারাক থাকে, এ হল সেইরকম ফারাক। এখানে পরিচালিত (প্রজা / স্ত্রী) পরিচালককে (দক্ষ-ব্রাহ্মণকে / স্বামীকে) মান্য করে এবং অনুসরণ করে সামাজিক রীতিনীতির কারণে, বাধ্য হয়ে; প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়ে নয়। তার মানে সনাতন সমাজে পরিচালক-পরিচালিতের মধ্যে কারও কোনো **পৃথক মর্য্যাদা** ছিল না, ফলে **মর্য্যাদা**র অসাম্যও ছিল না; বৈদিক সমাজে পরিচালকের বিশেষ **মর্য্যাদা** স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, ফলে পরিচালিত বুঝতে শুরু করেছিল যে, সমাজে কারও কারও বিশেষ **মর্য্যাদা** হয় এবং সেটি তার নেই। এই হল পার্থক্যের বীজ বা **পৃথ** (**প্রথ**)। অতঃপর এই **পৃথ** একসময় **পৃথু**তে (নিম্নে দ্রষ্টব্য) পরিণত হল, বৈদিকসমাজের বুকে প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, তার এলাকাই **পৃথিবী** রূপে ঘোষিত হল। ...

কিন্তু এখানেই ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে থাকেনি। যে-স্থানকালপাত্রে **দক্ষ**-ব্যবস্থা সক্রিয় হয়েছে, সেই-স্থানকালপাত্রেই পার্থক্যের বীজ সমানভাবে সক্রিয় থেকেছে। ফলে, **পৃথিবী** থেকে **বারাণসী** আলাদা হয়েছে, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় অস্ত্রধারণ করেছে (দ্র. **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**), তারা **পৃথিবী** কেড়ে নিয়েছে; ব্রাহ্মণ ও তার সহযোগীরাও অস্ত্র ধরেছে (দ্র. **পরশুরাম**), **পৃথিবী**সহ সবই পুনরুদ্ধার করেছে, এবং পুনরায় তা ব্রাহ্মণকে (**কশ্যপ**কে) দান করে দিয়েছে। শত শত বৎসর ধরে চলা এই টানাপোড়েন ক্রমান্বয়ে এই কথা সমাজমনে গেঁথে দিয়েছে যে, সমগ্র ভূলোকই ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করা আছে। (দ্র. **জমি**)। এই বোধ ক্রমান্বয়ে এই সাধারণ বোধে পরিণত হয়ে যায় যে, শুধু **পৃথুর** এলাকাটুকুই নয়, সমগ্র ভূলোকই ব্রাহ্মণের, এবং অতএব সমগ্র ভূলোকই (earth-ই) **পৃথিবী**। যেকারণে ব্রিটিশ যুগের পরে আমাদের পূর্বসূরিরা **পৃথিবী**কে earth শব্দের প্রতিশব্দ করে নেন।

পৃথিবীদোহন : ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দধি, দুহ, দোহন**। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা **পৃথিবী**কে দুয়ে নিতে দেখেছিলেন, তাই ওরকম শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমাদের পুরাণাদিতেও শব্দটিকে তার পূর্ণপ্রতিভায় প্রতিভাত হতে দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য বহু শব্দের মতো এই শব্দটির ব্যবহারও ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি সারা দুনিয়া জুড়ে পরিবেশ নিয়ে নানা কথা শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। পরিবেশবাদীদের মনে হচ্ছে — পণ্যবাদী রাক্ষসেরা সমুদ্র পাহাড় অরণ্য কোনো কিছুকে আস্ত থাকতে দিচ্ছে না, সবকিছুকে দোহন করে নিঃশেষ করে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে। এমতাবস্থায় **পৃথিবীদোহন** শব্দটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

অথচ কোনো অভিধানে শব্দটিকে দেখতে পাই না আমরা। তখন স্বভাবতই পুরাণের দ্বারস্থ হতে হয়। হাতের কাছে ছিল একটি মহাভারতের 'খিল হরিবংশ' বা হরিবংশপুরাণ। তাতে **পৃথিবীদোহন** নামে একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। আমরা সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে শব্দটির অর্থ নিষ্কাশনে ব্রতী হব।

"বসুমতী (**পৃথু**কে) কহিলেন, 'প্রথমত আপনার এরূপ একটি বৎস কল্পনা করুন যাহাকে দর্শনমাত্র হৃদয়ে স্নেহের উদ্রেক হইয়া আমার ক্ষীর ক্ষরিত হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত আমার সর্ব্বস্থান সমান নহে — বন্ধুর; কোনো স্থান উন্নত এবং কোনো স্থান বা অবনত রহিয়াছে; আশু সে সমস্ত সমান করুন। আমার সর্ব্বাঙ্গ সমান হইলে যে ক্ষীর বিগলিত হইবে, তাহা সমানভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

বেণনন্দন পৃথু বসুন্ধরার এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাপৃষ্ঠ সমতল করিবার ইচ্ছায় ... ভূধর-রাজি উত্তোলন ও উপর্য্যুপরি স্থাপন করিলেন। তাহাতেই ... বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ধরণী নিতান্ত বিষমা ছিলেন; কিন্তু পৃথুর সময় হইতেই সেই ভাব দূর হইয়া গিয়াছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধরাপৃষ্ঠ সমতল ছিল না ... ... নরপতি পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে বসুন্ধরা হইতে বিবিধ শস্য দোহন করিলেন। তদবধি সেই দোহন-সম্ভূত শস্য দ্বারা প্রজাকুল স্ব স্ব জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে।'

'... পৃথুর পর ঋষিবৃন্দ যখন পুনর্ব্বার পৃথিবীদোহন করেন, তখন অঙ্গিরানন্দন মহাতেজা সুরুগুরু বৃহস্পতি দোগ্ধা, সোমদেব বৎস, বেদচতুষ্টয় পাত্র এবং তপস্যাই ক্ষীরস্বরূপ হইয়াছিল। তৎপরে ইন্দ্রপ্রমুখ সুরসমাজ পুনর্ব্বার স্বর্ণপাত্র ধরিয়া এই পৃথিবীদোহন করিয়াছিলেন। তৎকালে সূর্য্যদেব দোগ্ধা ও দেবরাজ ইন্দ্র বৎস হইলে যজ্ঞীয় হবির উৎপত্তি হয়। সেই হবিই সুরপুরবাসিগণের একমাত্র জীবনোপায়। তাহার পর পুনর্ব্বার দেবগণ রজতপাত্রে বসুন্ধরা দোহন করেন, তখন প্রবলপ্রতাপ সূর্য্যনন্দন যম বৎস এবং ... কাল দোগ্ধা হইয়াছিলেন; তাহাতেই অমৃত সমুৎপন্ন হইয়াছে। তদনন্তর নাগ ও ...গণ সমবেত হইয়া মহাবীর্য্য মদোদ্ধত ঐরাবত ও ধৃতরাষ্ট্রকে দোগ্ধা এবং তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া অলাবু-পাত্রে ক্ষীরদোহন করিয়াছিল, তাহাতেই বিষের উৎপত্তি হয়, সেই বিষপ্রভাবে সর্পকুল অতীব উগ্রস্বভাব ধারণ করিয়াছে। বস্তুত ঐ বিষই উহাদিগের আহার, ব্যবহার, বীর্য্য এবং একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে। তদনন্তর অসুরগণ প্রহ্লাদপুত্র বিরোচনকে বৎস এবং দৈত্যপুরোহিত ... মধুকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া লৌহপাত্রে পৃথিবীদোহন করিলে শত্রুবিনাশিনী মায়ার জন্ম হয়। সেই মায়ার সর্ব্বলোকাতিশায়িনী শক্তি প্রভাবেই অসুরেরা মায়াবী হইয়া অদ্যাপি প্রবলপ্রতাপে দিনপাত করিতেছে। পরে যক্ষগণ মৃৎপাত্রে পৃথিবীদোহন করে। তৎকালে বৈশ্রবণ দোগ্ধা এবং মণিবরের পিতা তপঃশীল ত্রিমূর্দ্ধা রজতনাভকে বৎসরূপে কল্পনা করা হয়। তাহাতে যে অক্ষয় ক্ষীর নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাই অন্তর্দ্ধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঐ অন্তর্দ্ধান-বলে যক্ষগণ প্রত্যক্ষভাবে পরকায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে। ঐ অন্তর্দ্ধানই উহাদের অলৌকিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল। অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ প্রজাগণের পরিতৃপ্তি সাধনার্থ রজতনাভকে দোগ্ধা ও সুমালীকে বৎস কল্পনা করিয়া নরকপালপাত্রে পৃথিবী দোহন করে; তাহাতে রুধিরের উৎপত্তি হয় ... তৎপরে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমবেত হইয়া দোহনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ... গন্ধর্ব্বপতি সুরুচি দোগ্ধা, চিত্ররথ বৎস এবং পদ্মপত্র দোহনপাত্র হইয়াছিল। তাহাতেই সুপবিত্র নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। অনন্তর পর্ব্বতসমূহ শিলামাত্র পাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক

পৃথিবীদোহন করে, তখন হিমালয় বৎস ও মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা হইয়াছিল; তাহাতে মূর্ত্তিমতী ওষধি ও বিবিধ রত্নের উৎপত্তি হয়, পর্ব্বতগণ উহারই প্রভাবে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। অবশেষে বনস্পতিগণ ছিন্ন ও দগ্ধাঙ্কুর পলাশপত্রকে পাত্র করিয়া পুষ্পিত শালবৃক্ষকে দোগ্ধা এবং প্লক্ষবৃক্ষকে বৎস কল্পনা করত বসুমতী দোহন করিয়াছিল।

... এই পৃথিবী ... ধেনুস্বরূপা। ইঁহাকে দোহন করিলে অভীষ্ট সকল বস্তুই লাভ করা যায়। ইনি আসমুদ্র বিস্তীর্ণা। ...' (ষষ্ঠ অধ্যায় / 'পৃথিবীদোহন' / শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত হরিবংশ)।

অতএব **পৃথিবীদোহন**-এর এই যে ধারণা, তা নতুন কিছু নয়। তবে পুরাণকারগণের প্রদত্ত বর্ণনাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে কে কাকে বৎস (**দোহদ**) বানিয়ে কোন **পৃথিবী**কে দোহন করে কী পেয়েছিল। তাতে আমরা বুঝতে পারব, সেকালের দোহনকারীরা আর যাই করুন, একালের অসুরসুলভ দোহনকারীদের মতো সমগ্র earth-কে দোহন করে শুধুমাত্র ধনসম্পদ বানানোর মতো নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। দু-একটি তথ্যকে ধরলেই তাঁদের **পৃথিবীদোহন**-এর মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়।

প্রথম তথ্যটি হল — 'নরপতি পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে বসুন্ধরা হইতে বিবিধ শস্য দোহন করিলেন।' তার মানে, মহর্ষি-পরিচালিত সমাজের আদিরাষ্ট্র (= **পৃথু**) স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক স্বভাব নিয়ে স্বয়ং-বিকশিত সাধারণ মানুষকে দিয়ে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করেন ও প্রচুর ফসল ফলান। ... আর দ্বিতীয় তথ্যটি হল — ... ঋষিবৃন্দ যখন পৃথিবীদোহন করেন, তখন ... 'বৃহস্পতি দোগ্ধা, সোমদেব বৎস, বেদচতুষ্টয় পাত্র এবং তপস্যাই ক্ষীরস্বরূপ হইয়াছিল।' এর মানে হল — সে-সময়ের জ্ঞানজীবীরা বিপুল পরিশ্রম করে **পৃথিবী**দোহন করে জ্ঞানরসের ক্ষীর বানিয়েছিলেন এবং তৎপূর্বকালের সনাতন-বেদ নামক পাত্রটিকে চারটি পাত্রে ভাগ করে সেই চার পাত্রে (জ্ঞানপাত্র কখনো সম্পূর্ণ ভরে না; দ্র. **ম বর্ণের অর্থ**।) ঐ ক্ষীর ধারণ করেছিলেন। ...

যাই হোক, এই ধেনুস্বরূপা বসুমতীকে কমবেশি দোহন করেই মানবসভ্যতার এযাবৎ চলে এসেছে। (দ্র. **দোহদ**)। সম্প্রতি তা সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ধরণী মায়ের প্রতিক্রিয়া সইবার যোগ্যতা কি এই মানবসভ্যতার হয়েছে? অন্যথায় তার বিলুপ্ত হওয়া ছাড়া গতি নেই বলেই মনে হয়।

পৃথু : ১. ✓প্রথ্ + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *পৃথ (পায়ীর আবর্ত্তাস্থিতি) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. বিস্তীর্ণ, বৃহৎ, স্থূল, আয়ত, নিপুণ, বহু, বিপুল, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, কৃষ্ণজীরক, হিঙ্গুপত্রী, অহিফেন, সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ, আদিরাজ (... বেণের শাসনকালে যজ্ঞ-বেদপাঠাদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, ঋষিগণ কুপিত হইয়া বেণকে নিহত করেন। বেণের মথিত দক্ষিণ বাহু হইতে পৃথুর উৎপত্তি হয়। প্রজারঞ্জন হেতু পৃথু 'রাজা' নামে অভিহিত হন এবং ইনি 'আদিরাজ'। প্রজারক্ষার্থ ইনি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া গোরূপা পৃথিবী হইতে শস্যাদি দোহন করেন এবং ভূতল সমতল করিয়া পুরদুর্গাদির প্রতিষ্ঠা করেন। ... (ব.শ.)। বেণ রাজার পুত্র। ঋকবেদে এঁর নাম উল্লিখিত আছে। ইনি ঋকবেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি ঋকমন্ত্র রচনা করেন। হরিবংশ অনুসারে, অত্রি বংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। ... তার পুত্র বেণ। বেণের রাজত্বকালে যজ্ঞ, বেদপাঠাদি ও ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হলে ঋষিরা কুপিত হয়ে বেণকে নিহত করেন। তারপর ঋষিরা বেণের বাম উরু নিষ্পেষণ করতে থাকেন, এবং ঐ মর্দিত উরু হতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উদ্ভূত হন। ঋষি অত্রি এঁকে দেখে বলেন, 'নিষীদ' (উপবেশন কর))। এই পুরুষই নিষাদ বংশের আদিপুরুষ। এর পর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করতে থাকেন। এই মথিত বাহু হতে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় পৃথু উদ্ভূত হন। ... এরপর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা পৃথুকে পৃথিবীর রাজা বলে অভিষিক্ত করেন। ... পৃথুর প্রজারা, যারা এতদিন ... অনাহারে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল তারা পৃথুর কাছে খাদ্যশস্য ... ও বৃত্তি নির্ধারণ করতে বলে। ... পৃথু শরের সাহায্যে পৃথিবীকে আক্রমণ করেন। ... পৃথু পৃথিবীকে প্রজাদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করতে ও তাঁর কন্যা হতে বলেন। পৃথিবী তখন বলেন, 'প্রজাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হলে আমাকে দোহন করতে হবে। তার জন্য একটি বৎসের প্রয়োজন। ... আর আমাকে সমতল করতে হবে। তা না হলে কি করে এই দুগ্ধ চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করবে।' পৃথু তখন নিজের ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে উৎসারিত করলে পর্বতের সৃষ্টি হয় ও পৃথিবী সমতল হয়। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে স্বহস্তে গো-রূপা পৃথিবীকে দোহন করেন। এই দোহনের ফলে পৃথিবীর প্রজারা বিবিধভাবে অন্নলাভ করে আজও জীবনধারণ করছে। পৃথুর কন্যা বলে পৃথিবী স্বীকার করায় বসুন্ধরা পৃথ্বী নামে খ্যাতা হন।

মহাভারত অনুসারে, বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করেন। তাঁরই অধস্তন পুরুষের মধ্যে বেণ একজন। বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। সে কারণ ঋষিরা মন্ত্রপূত কুশের সাহায্যে তাঁকে বধ করেন। তারপর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মন্থনে প্রবৃত্ত হন। ... কদাকার পুরুষ উৎপন্ন হয়। ... এই পুরুষ থেকে নিষাদ ও ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি। অতঃপর বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থনকালে ইন্দ্রের ন্যায় রূপবান এক পুরুষ উৎপন্ন হন। ইনিই বেণপুত্র পৃথু নামে খ্যাত। ঋষিরা এঁকে সমদর্শী হয়ে বেদ ও দণ্ডনীতি-সম্মত ধর্মপালন করতে বলেন। পৃথু এতে সম্মতি দান করলে মুনিরা তাঁর মন্ত্রী হন। পৃথু পৃথিবীকে সমতল করেন। পৃথিবী দোহনকরতঃ ইনি সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করেন। তাঁর সময় সমস্ত ভূমণ্ডল প্রোথিত (খ্যাত) হয়েছিল বলে পৃথিবী নাম হয়। দেবতারা তাঁকে রাজা করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ক্ষত্রিয়**, **ক্ষত্রধর্ম্ম**, **পৃথ**, **পৃথক**, **পৃথা**, **পৃথিবী**, **পৃথিবীদোহন**। শব্দতত্ত্বের নিয়মে **পৃথ** বা ভেদ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে, তাকে বলে **পৃথু**। তার মানে, **পৃথ**তে ভেদ থাকলেও **পৃথু**তে আর সেরকম ভেদ থাকে না, একপ্রকার ঐক্য থাকে, যৌথতা বা সার্বিকতা থাকে। কীরূপ সেই ঐক্য বা যৌথতা?

কার্যত, মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র **দক্ষ** এবং তার পরেই **পৃথু**। **দক্ষ** প্রজাপতির আবির্ভাব ও উৎপাদন কর্মযজ্ঞ-দখল সেযাবৎ চলে আসা মানুষের সনাতন সমাজকে তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক পথ থেকে ভ্রষ্ট করে নতুন পথের যাত্রী করে

দেয়। যৌথসমাজ বিচূর্ণীভূত হতে শুরু করে, ফেটে যায়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে **পৃথক** হয়ে যায়। তার মধ্যে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির **দক্ষ**নীতি অনুসরণের ফলে উৎপন্নের উদ্বৃত্ত হওয়া ভবিতব্য হয়ে দেখা দেয়। কেউ জ্ঞানী কেউ অজ্ঞানী, কেউ ধনী কেউ দরিদ্র হতে থাকে, মানবসভ্যতার মনোভূমি (বসুমতী) উচ্চনীচ হয়ে বিষম হয়ে যায়। তার মধ্যে 'বেণিয়ার আদিপুরুষ' প্রজাপতি **বেণ** এসে ঘোষণা করে দেন, উদ্বৃত্ত উৎপাদন 'আবর্জ্জনা স্থানে নিক্ষেপ' (দ্র. **কিরাত**) করার কোনো মানেই হয় না, আর তাছাড়া সম্প্রদায়শীর্ষে বসে থাকা মহর্ষিদের জন্য নয়, উৎপাদন হোক বিনিময়ের জন্য। এই সেই পরিস্থিতি যখন মহর্ষিরা একত্রিত হয়ে প্রজাপতি **বেণ**-কে উৎখাত করেন। তাঁর উৎপন্ন-সংগ্রহকারী সহযোগীদের (বাম হাতকে) মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় (দ্র. **নিষাদ**)। আর ডান হাত স্বরূপ যে বিতরণকারী সহযোগীরা ছিল, তাদের একত্র করে গড়ে তোলা হয় মানবসভ্যতার আদি সৈন্যবাহিনী — **পৃথু**। একেই আদিক্ষত্রিয়রূপে, আদিরাষ্ট্ররূপে সমগ্র সমাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়। এটিই বিশ্বের আদি state। জন্মলগ্নেই সে শতকরা একশোভাগ ভাড়াটে গুণ্ডা বা লেঠেলবাহিনী হলেও মানুষের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রশক্তি দেখা গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক, সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে সাম্যবাদী ছিল এই **পৃথু**। সে-পর্যন্ত এগিয়ে আসা জনসাধারণকে (স্বায়ম্ভুব মনুকে) সঙ্গে নিয়ে সে বিপুল উৎপাদন কর্মযজ্ঞ শুরু করে। তারই হাত ধরে বৈদিকসভ্যতার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। আর ততোমধ্যে ধনী-দরিদ্র হয়ে যাওয়া বসুমতীকে সমান করে (দ্র. **পৃথিবীদোহন**) যে ক্ষীর বিগলিত হয়েছিল, তাই তার প্রথম রাষ্ট্রীয় পুঁজি হয়ে যায়। ...

মানুষের দুনিয়াতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হল কীভাবে — এ-প্রশ্নের উত্তর একালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা ইতিহাসের চর্চায় পাওয়া যায় না। এর উত্তর পাওয়া যায় একমাত্র প্রাচীন ভারতে **পৃথুর** উদ্ভবের ইতিহাস, যা পাওয়া যায় পুরাণাদি গ্রন্থের **পৃথুর** কাহিনীতে। হরিবংশ পুরাণের প্রথম অধ্যায় 'আদিসর্গ' কোনোমতে দু'পৃষ্ঠায় সেরে দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়েই শুরু হয়েছে 'দক্ষোৎপত্তি', তৃতীয়ে 'মারুতোৎপত্তি', এবং চতুর্থ অধ্যায়েই শুরু করা হয়েছে '**পৃথূপাখ্যান**'। এই **পৃথুর** উপাখ্যানই মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাষ্ট্রের প্রথম উদ্ভবের কাহিনী। তার আগে রাষ্ট্র ছিল না, রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল না, রাজা ছিল না, রাজার বা দেশের বা জাতির কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না। ...

আদিতে ছিল সনাতন সমাজ, আর তার একধরনের সমাজ-পরিচালনব্যবস্থা ছিল (**অধিরাষ্ট্র**), যার পরিচালককে পুরাণাদিতে বলা হয়েছে **মহান**, যিনি ছিলেন 'প্রজাপতিপদবাচ্য কিন্তু প্রজাপতি নহে'; অর্থাৎ তখনও ভারতসমাজে কোনো ধরনের তন্ত্র গড়ে ওঠেনি। **দক্ষযজ্ঞ**-এর পর সনাতন সমাজের রূপান্তর শুরু হয় বৈদিক সমাজে — প্রথম জন্ম নেয় **প্রজাপতিতন্ত্র**, তারপর **পৃথুর** মাধ্যমে শুরু হয় **ক্ষত্রিয়তন্ত্র** বা **রাজতন্ত্র**। সেই রাজতন্ত্রই ক্রমান্বয়ে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে হয়ে আজকের ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলিতে পৌঁছেছে।

সংক্ষেপে, শিবকে সরিয়ে সমাজ-পরিচালনার বা 'অধিরাষ্ট্রে'র নিয়ন্ত্রে আসেন **প্রজাপতি দক্ষ**। তারপরে আসেন 'ছাগমুণ্ডি-**দক্ষ**' যার অন্য নাম **অত্রি**। এর পরেই প্রজাপতি **বেণ** এবং তারপরই **পৃথু**। বৈদিক সভ্যতার সূচনাকাল যদি ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ধরা হয়, তবে তার প্রথম পাঁচশো বছরের মধ্যেই এই **পৃথুর** আবির্ভাব। ভারতভূমিতে আবির্ভূত এই **পৃথু** বা 'আদিরাষ্ট্র' ছিল সম্প্রদায়শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহর্ষি-পরিচালিত সমাজের (**অধিরাষ্ট্রের**) অধীনে এক আদি সৈন্যবাহিনীমাত্র; ঠিক যেন জমিদারের 'সরকারবাবু ও লেঠেলবাহিনী' মাত্র। সেই রাষ্ট্র প্রায় ৩৫০০ বছর অতিক্রম করে আজকের রাষ্ট্ররূপে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই রাষ্ট্র তার স্বাধীন রূপে পৌঁছে সেখান থেকে ভারতে ফিরে এসে আজকের ভারত-রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভারতে **পৃথুর** বিবর্তন চলেছে দীর্ঘকাল, তারপর এসেছে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ। সবশেষে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে সরিয়ে আবির্ভূত হয়েছে স্বাধীন ভারত, স্বাধীন বাংলাদেশ, স্বাধীন পাকিস্তান, স্বাধীন শ্রীলঙ্কা ... ইত্যাদি রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের **অধিরাষ্ট্র** আজও থেকে গেছে, খানিকটা খর্ব হয়েও। সেই **অধিরাষ্ট্র** আজও আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহসহ জীবনের বহু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারই একাংশ 'হিন্দু-মুসলিম পার্সোনাল ল' একালের রাষ্ট্রকে আজও মানতে হয়। ... এসব বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে আমাদের 'চ' গ্রন্থে।

***প্র* (*প্রচ্ছ, প্রতি, প্রথ*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপৃষ্ট, আপৃচ্ছা, আপ্রচ্ছন, অপ্রতিকর্ম্মা, অপ্রতিঘ, অপ্রতিদ্বন্দ্ব, অপ্রতিপত্তি, অপ্রতিবন্ধ, অপ্রতিবল, অপ্রতিবিধেয়, অপ্রতিবীর্য্য, অপ্রতিম, অপ্রতিমান, অপ্রতিযোগী, অপ্রতিরথ, অপ্রতিরূপ, অপ্রতিলোম, অপ্রতিশাসন, অপ্রতিষিদ্ধ, অপ্রতিষ্ঠা, অপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিস্তব্ধ, পইটা, পইটে, পইতা, পইল, পইলা, পইস, পউটি, পং (পরগণা), পঁহু, প(পা)খাল, পগার, পঙার, পঞ্জর, পঞ্জান, পড়শী, পড়স, পড়সি(সী), পড়িছা, পড়িয়ান, পড়িহারী, প'ড়েন (টানাপড়েন, ওতপ্রোত), পড়োশিনী, পড়োসন, পড়োসী, পড্যান, পণব, পতিয়া, পতিয়ায়, পত্যএ, পদীপ, পয়লা, পয়াণ(ন), পরগণা (প্রগণ, প্রগণা, প্রগণ্য), পরজা (প্রজা), পরণতি, পরণাম, পরতীত, পরতেক, পরতেখ, পরথাপ(ব), পরবীণ(ন), পরবেশ, পরবোধ, পরমাণ, পরমাদ, পরসঙ্গ, পরাণ, পরাণপুতলি(লী), পরাণি(ণী), পরামাণি(নি)ক, পরায়, পরিনাতি, পলা, পলিতা, পলুটিগাই, পশ (প্রবেশ কর), পশিল, পসরা (প্রসারিত), পসার, পসারা, পসারি (পসারী), পসাহন, পসুরিপাল্লা (প্রসারিত পাল্লা), পহর, পহরা, পহরি, পহরী, পহিল, পহিলা, পাউখ, পাউস (প্রাবৃষ), পাওন (প্রাপন, প্র-আপন, দ্র.আপ্), পাওয়া, পাওল, পাঁচিল(র), পাঁতর, পাকড়, পাকড়ান, পাখড়া, পাখর, পাখরিয়া, পাখলানী, পাখাল, পাজলা, পাজা, পাজাল, পাঠা, পাঠান (প্র-স্থাপন), পাঠানজাতি, পাতর (পাত্র), পাতা, পাতান (প্রত্যয় করান), পাতিজান, পাতিয়া, পাতিয়ায়, পাতিয়ারা, পাত্যর (প্রান্তর), পাত্যা (প্রত্যয়), পাত্যারা (পাতিয়ারা), পাথর (প্রস্তর), পাথর (প্রান্তর), পাথরি(রী)য়া, পাথ(থু)রী, পাথার, পাথুরে (প্রস্তর), পাথ(থু)রী, পানে, পাসর, পাসরি, পাহারা, পিত্তয়, পিত্তেশ, পিত্যাবধি, পিত্যাহিতে, পিদিম, পিদ্দিম, পুঁছ, পুছ, পুছা,

পুছারি, পৃষ্ট, পেতা, পেতি, পেতিনী, পেত্নী, পেত্যয়, পেশাব, পৈঠ, পৈঠা, পৈঠে, পৈশ(স), পৃষ্ট, প্র, প্রকট, প্রকটন, প্রকটিত, প্রকটীকরণ, প্রকত, প্রকম্প, প্রকর, প্রকরণ, প্রকরণী, প্রকরী, প্রকর্ষ, প্রকর্ষণ, প্রকর্ষী, প্রকল্পনা, প্রকল্প্য, প্রকাণ্ড, প্রকাম, প্রকার, প্রকাশ, প্রকাশক, প্রকাশন (cussion – discussion), প্রকাশিত, প্রকাশ্য, প্রকীর্ণ, প্রকীর্ণক, প্রকীর্ত্তন, প্রকীর্ত্তিত, প্রকুপিত, প্রকৃত, প্রকৃতি, প্রকৃতিজ, প্রকৃতিপুত্র, প্রকৃতিমান, প্রকৃতিরঞ্জন, প্রকৃতিসিদ্ধ, প্রকৃতিস্থ, প্রকৃষ্ট (পাকড়), প্রক্‌খর, প্রক্‌ঌপ্ত, প্রকোপ, প্রকোপন, প্রকোপিত, প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠক, প্রক্রিয়া, প্রক্ব(ক্বা)ণ, প্রক্ষরণ, প্রক্ষাল, প্রক্ষালক, প্রক্ষালন, প্রক্ষালিত, প্রক্ষিপ্ত, প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ, প্রক্ষেপ্তব্য, প্রক্ষেবড়ন, প্রখর, প্রখ্য, প্রখ্যা, প্রখ্যাত, প্রখ্যাতি, প্রখ্যান, প্রখ্যাপন, প্রগণ্য (পরগণা), প্রগণ্ড, প্রগণ্ডী, প্রগত, প্রগতি, প্রগল্‌ভ, প্রগল্‌ভতা, প্রগল্‌ভা, প্রগাঢ়, প্রগাতা, প্রগীত, প্রগুণ, প্রগুণিত, প্রগৃহ্য, প্রগে, প্রগ্রহ, প্রগ্রহণ, প্রগাহ, প্রঘ(ঘা)ণ, প্রঘাত, প্রঘুণ, প্রঘূর্ণ, প্রঘোষ, প্রচণ্ড, প্রচণ্ডা, প্রচয়, প্রচয়ন, প্রচায়, প্রচর, প্রচরদ্‌রূপ, প্রচল, প্রচলন, প্রচলিত, প্রচলাকী, প্রচার, প্রচারক, প্রচারণ, প্রচারিত, প্রচারী, প্রচিকীর্ষু, প্রচিত, প্রচিত্র, প্রচুর, প্রচেতা, প্রচেতাঃ, প্রচেষ্টা, প্রচোদন, প্রচোদিত, প্রচ্ছ্‌, প্রচ্ছক, প্রচ্ছদ, প্রচ্ছন্ন, প্রচ্ছর্দ্দন, প্রচ্ছর্দ্দিকা, প্রচ্ছাদক, প্রচ্ছাদন, প্রচ্ছাদিত, প্রচ্ছায়, প্রচ্ছায়া, প্রচ্যবন, প্রচ্যুতি, প্রজন, প্রজনন, প্রজনয়িতা, প্রজন্ম, প্রজবন, প্রজবী, প্রজল্প, প্রজল্পন, প্রজল্পনা, প্রজা, প্রজাকাম, প্রজাকর, প্রজাগর, প্রজাত, প্রজাতন্ত্ব, প্রজাতন্ত্র, প্রজাতি, প্রজাতীর্থ, প্রজাধব, প্রজানাথ, প্রজাপতি, প্রজাপাল, প্রজাপোষ, প্রজাবান, প্রজাবৃদ্ধি, প্রজারঞ্জন, প্রজালোপ, প্রজেশ্বর, প্রজ্ঞ, প্রজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ, প্রজ্ঞাত, প্রজ্ঞান, প্রজ্ঞাবাদ, প্রজ্ঞাবান, প্রজ্বলন, প্রজ্বলিত, প্রজ্বালিত, প্রডীন, প্রণত, প্রণতি, প্রণদিত, প্রণন্তব্য, প্রণব(অ), প্রণম, প্রণমিত, প্রণম্য, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রণয়বান, প্রণয়াপরাধ, প্রণয়ী, প্রণয়িনী, প্রণষ্ট, প্রণাদ, প্রণাম, প্রণামি(মী), প্রণায্য, প্রণাল, প্রণালিকা, প্রণালী, প্রণাশ, প্রণাশন, প্রণাশী, প্রণিধান, প্রণিধি, প্রণিপাত, প্রণিহিত, প্রণী, প্রণীত, প্রণীতা, প্রণুত, প্রণুন্ত, প্রণুন্ন, প্রণেতা, প্রণেয়, প্রণোদিত, প্রণোদ্য, প্রততি, প্রতনু, প্রতর, প্রতরণ, প্রতল, প্রতান, প্রতানী, প্রতান্ত, প্রতাপ, প্রতাপন, প্রতাপী, প্রতারক, প্রতি, প্রতিআশ, প্রতিকণ্ঠ, প্রতিকর্ত্তা, প্রতিকর্ম্ম, প্রতিকর্ষ, প্রতিকায়, প্রতি(কী)কার, প্রতি(তী)কাশ, প্রতিকিতব, প্রতিকূল, প্রতিকৃত, প্রতিকৃতি, প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্ষণ, প্রতিক্ষিপ্ত, প্রতিক্ষেপ, প্রতিগত, প্রতিগৃহীত, প্রতিগ্রহ, প্রতিগ্রহণ, প্রতিগ্রহীতা, প্রতিগ্রাহ, প্রতিগ্রাহী, প্রতিঘ, প্রতিঘাত, প্রতিঘাতন, প্রতিঘাতী, প্রতিচন্দ্র, প্রতিচিকীর্ষা, প্রতিচ্ছন্দ, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিজিহ্বা, প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞাত, প্রতিজ্ঞান, প্রতিতান, প্রতিদর্শন, প্রতিদান, প্রতিদিন, প্রতিদিবস, প্রতিদেয়, প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বান, প্রতিনব, প্রতিনাদ, প্রতিনায়ক, প্রতিনিতি, প্রতিনিধি, প্রতিনিবর্ত্তন, প্রতিনিয়ত, প্রতিনির্দ্দেশ, প্রতিপক্ষ, প্রতিপণ, প্রতিপত্তি, প্রতিপথ, প্রতিপদ্‌, প্রতিপদ, প্রতিপদা, প্রতিপন্ন, প্রতিপাণ, প্রতিপাত্র, প্রতিপাদক, প্রতিপাদন, প্রতিপাদয়িতা, প্রতিপাদিত, প্রতিপাদ্য, প্রতিপালক, প্রতিপালন, প্রতিপালনীয়, প্রতিপালয়িতব্য, প্রতিপালিত, প্রতিপালী, প্রতিপুরুষ, প্রতিপুস্তক, প্রতিপূজক, প্রতিপূজন, প্রতিপূজিত, প্রতিপোষক, প্রতিপ্রণাম, প্রতিপ্রদান, প্রতিপ্রয়াণ, প্রতিপ্রসব, প্রতিপ্রস্থান, প্রতিপ্রহার, প্রতিপ্রিয়, প্রতিফল, প্রতিফলন, প্রতিফলিত, প্রতিবক্তব্য,

প্রতিবচঃ, প্রতিবচন, প্রতিবদ্ধ, প্রতিবনিতা, প্রতিবন্ধ, প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধী, প্রতিবর্ণ, প্রতিবল, প্রতিবসথ, প্রতিবস্তু, প্রতিবাক্‌, প্রতিবাক্য, প্রতিবাত, প্রতিবাদ, প্রতিবাদিনী, প্রতিবাদী, প্রতিবাধক, প্রতিবাধন, প্রতিবারণ, প্রতিবাসর, প্রতিবাসিনী, প্রতিবাসী, প্রতিবিধ(া), প্রতিবিধান, প্রতিবিধিৎসা, প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্বন, প্রতিবিম্বিত, প্রতিবীর, প্রতিবীর্য্য, প্রতিবুদ্ধ, প্রতিবেদন, প্রতিবেশ, প্রতিবেশিনী, প্রতিবেশী, প্রতিবেশ্ম, প্রতিবৈর, প্রতিবোধ, প্রতিবোধক, প্রতিবোধন, প্রতিবোধিত, প্রতিব্যূহ, প্রতিভট, প্রতিভয়, প্রতিভা, প্রতিভাত, প্রতিভাতি, প্রতিভান, প্রতিভাস, প্রতিভিন্ন, প্রতিভূ, প্রতিভেদন, প্রতিম, প্রতিমল্ল, প্রতিমা, প্রতিমান, প্রতিমিত, প্রতিমুক্ত, প্রতিমুখ, প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিমোচন, প্রতিযত্ন, প্রতিযাতন, প্রতিযাতনা, প্রতিযুদ্ধ, প্রতিযুবতী, প্রতিযোগ, প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগী, প্রতিযোদ্ধা, প্রতিযোধ, প্রতিরথ, প্রতিরব, প্রতিরাজ, প্রতিরুদ্ধ, প্রতিরূপ, প্রতিরূপক, প্রতিরোদ্ধা, প্রতিরোধ, প্রতিরোধক, প্রতিরোধন, প্রতিরোধী, প্রতিলিপি, প্রতিলোম, প্রতিশব্দ, প্রতিশয়ন, প্রতিশাসন, প্রতিশীর্ষক, প্রতিশ্যা, প্রতিশ্যায়, প্রতিশ্রব, প্রতিশ্রবণ, প্রতিশ্রুৎ, প্রতিশ্রুত, প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রয়, প্রতিষিদ্ধ, প্রতিষেদ্ধা, প্রতিষেধ, প্রতিষেধক, প্রতিষেধন, প্রতিষেধনীয়, প্রতিষ্টব্ধ, প্রতিষ্টম্ভ, প্রতিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠাপন, প্রতিষ্ঠিত, প্রতিসংহার, প্রতিসন্দেশ, প্রতিসন্ধান, প্রতিসর, প্রতিসর্গ, প্রতিসারণ, প্রতিসীরা, প্রতিসূর্য্য, প্রতিসূর্য্যক, প্রতিস্পর্দ্ধা, প্রতিস্পর্দ্ধী, প্রতিস্রোতঃ, প্রতিস্বন, প্রতিস্বর, প্রতিহত, প্রতিহতি, প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহস্তক, প্রতি(তী)হার, প্রতিহারী, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসিত, প্রতীক, প্রতীক্ষ, প্রতীক্ষক, প্রতীক্ষণ, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষিত, প্রতীক্ষী, প্রতীক্ষ্য, প্রতীচী, প্রতীচীন, প্রতীচ্য, প্রতীচ্ছক, প্রতীত, প্রতীতি, প্রতীপ, প্রতীয়মান, প্রতীর, প্রতুদ, প্রতুল, প্রতেক, প্রতোদ, প্রতোলী, প্রত্ন, প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্যক্‌(চ্‌), প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষদর্শন, প্রত্যক্ষপ্রমাণ, প্রত্যক্ষফল, প্রত্যক্ষবাদী, প্রত্যক্ষভূত, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রত্যগাত্মা, প্রত্যগ্র, প্রত্যঙ্গ, প্রত্যঙ্‌মুখ, প্রত্যনন্তর, প্রত্যনিল, প্রত্যনীক, প্রত্যনুমান, প্রত্যন্ত, প্রত্যপকার, প্রত্যবকর্শন, প্রত্যবভাস, প্রত্যবয়ব, প্রত্যবর, প্রত্যবসান, প্রত্যবস্কন্দ, প্রত্যবস্থাতা, প্রত্যবস্থান, প্রত্যবহার, প্রত্যবায়, প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যব্দ, প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান, প্রত্যভিবাদ, প্রত্যভিবাদক, প্রত্যভিবাদন, প্রত্যবাদয়িতা, প্রত্যমিত্র, প্রত্যয়, প্রত্যায়ন (পেতা), প্রত্যয়িত, প্রত্যয়ী, প্রত্যর্চ্চিত, প্রত্যর্থী, প্রত্যর্পণ, প্রত্যস্ত্র, প্রত্যহ, প্রত্যাইব, প্রত্যাঘাত, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যেয়, প্রত্যাগতি, প্রত্যাগম, প্রত্যাগমন, প্রত্যাগার, প্রত্যাদিষ্ট, প্রত্যাদেশ, প্রত্যানয়ন, প্রত্যাবর্ত্তন, প্রত্যায়ক, প্রত্যায়ন, প্রতায়না, প্রত্যার্দ্রীকৃত, প্রত্যালীঢ়, প্রত্যাশা, প্রত্যাশী, প্রত্যাশ্বস্ত, প্রত্যাসার, প্রত্যাহত, প্রত্যাহরণ, প্রত্যাহার, প্রত্যাহৃত, প্রত্যুক্ত, প্রত্যুজ্জীবন, প্রত্যুত, প্রত্যুত্তর, প্রত্যুত্থান, প্রত্যুত্থিত, প্রত্যুৎপন্ন, প্রত্যুদাহরণ, প্রত্যুদ্‌গত, প্রত্যুদ্‌গতি, প্রত্যুদ্‌গম, প্রত্যুদ্‌গমন, প্রত্যুদ্‌ঘাত, প্রত্যুপকার, প্রত্যুপক্রিয়া, প্রত্যুপদেশ, প্রত্যুপহার, প্রত্যুপ্ত, প্রত্যুল্‌ক, প্রত্যূষ, প্রত্যূষঃ, প্রত্যূষঃ, প্রত্যূহ, প্রত্যেক, প্রথ্‌, প্রথক, প্রথম (পয়লা, পইলা), প্রথমা; প্রথমাশ্রম, প্রথমোদিত, প্রথয়িতা, প্রথা, প্রথিত, প্রথিমা, প্রথিষ্ঠ, প্রথীয়ান, প্রদ, প্রদক্ষিণ, প্রদক্ষিণা, প্রদক্ষিণাবর্ত্ত, প্রদক্ষিণার্চ্চিঃ, প্রদত্ত, প্রদর, প্রদর্শক, প্রদর্শন, প্রদর্শনী, প্রদর্শিত, প্রদর্শী, প্রদান, প্রদায়ক, প্রদায়ী, প্রদার, প্রদারিক, প্রদাহ, প্রদিক, প্রদিগ্ধ, প্রদিষ্ট, প্রদীপ, প্রদীপক,

প্রদীপন, প্রদীপ্ত (পলিতা), প্রদেয়, প্রদেশ, প্রদেশন, প্রদেশনী, প্রদেশিনী, প্রদেহ, প্রদোষ, প্রদোষক, প্রদোষকাল, প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যোত, প্রদ্যোতন, প্রদ্রব, প্রদ্রাব, প্রধন, প্রধর্ষক, প্রধর্ষণ, প্রধান, প্রধানা, প্রধি, প্রধুপিত, প্রধূমিত, প্রধ্বংস, প্রধ্বংসন, প্রধ্বংসিত, প্রধ্বংসী, প্রনপ্তা, প্রনষ্ট, প্রনাতি, প্রনৃত্ত, প্রপক্ষ, প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চন, প্রপঞ্চিত, প্রপতন, প্রপদ, প্রপন্ন, প্র-পরাপ-সংপৌত্রী, প্রপা, প্রপাঠক, প্রপাণ(ন), প্রপাত, প্রপান, প্রপানক, প্রপিতামহ, প্রপীড়ন, প্রপূজিত, প্রপৌত্র, প্রফুল্ল, প্রফুল্লিত, প্রবক্তব্য, প্রবক্তা, প্রবচন, প্রবচনীয়, প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চিত, প্রবণ (পানে), প্রবত্ত, প্রবন্ধ, প্রবন্ধন, প্রবয়ণ, প্রবয়াঃ, প্রবর, প্রবর্গ, প্রবর্গ্য, প্রবর্ত্ত, প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তয়িতা, প্রবর্ত্তিত, প্রবর্ত্তী, প্রবর্ষ, প্রবর্ষী, প্রবল, প্রবসন, প্রবসিত, প্রবহ, প্রবহণ, প্রবহমান, প্রবাক্, প্রবাণী, প্রবাত, প্রবাদ, প্রবাদক, প্রবাদী, প্রবাধক, প্রবাপী, প্রবার, প্রবারণ, প্রবাল (পলা, পইলা, পয়লা), প্রবালকীট, প্রবালপদ্ম, প্রবালভস্ম, প্রবাস, প্রবাসন, প্রবাসিত, প্রবাসী, প্রবাহ, প্রবাহক, প্রবাহিণী, প্রবাহিত, প্রবাহিনী, প্রবাহী, প্রবিদারণ, প্রবিদ্ধ, প্রবিষ্ট, প্রবিষ্টক, প্রবীণ, প্রবীর, প্রবুদ্ধ, প্রবৃত্ত, প্রবৃত্তি, প্রবৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধি, প্রবেক, প্রবেগ, প্রবেদন, প্রবেদী, প্রবেরিত, প্রবেশ, প্রবেশক, প্রবেশন, প্রবেশিত, প্রবেশী, প্রবেশ্য, প্রবেষ্ট, প্রবোধ, প্রবোধক, প্রবোধন, প্রবোধনী, প্রবোধিত, প্রবোধবাড়ি, প্রব্যথিত, প্রব্রজন, প্রব্রজিত, প্রব্রজিতা, প্রব্রজ্যা, প্রব্রাজন, প্রব্রাজিকা, প্রব্রাজিত, প্রভঞ্জন, প্রভব, প্রভবিতা, প্রভবিষ্ণু, প্রভা, প্রভাকর, প্রভাকরপুত্র, প্রভাকীট, প্রভাত, প্রভাতী, প্রভাব, প্রভাবন, প্রভাবান, প্রভাবতী, প্রভাবী, প্রভাস, প্রভাসিত, প্রভামণ্ডল, প্রভিন্ন, প্রভু, প্রভুপণ, প্রভুপাদ, প্রভূত, প্রভৃতি, প্রভেদ, প্রভেদন, প্রভ্রংশী, প্রভষ্টক, প্রমত্ত, প্রমথ, প্রমথন, প্রমথনাথ, প্রমথপতি, প্রমথা, প্রমথিত, প্রমথী, প্রমদ, প্রমদা, প্রমদাকানন, প্রমদাবন, প্রমদামিষ, প্রমনাঃ, প্রমন্যু, প্রমা, প্রমাই, প্রমাণ, প্রমাণকোটি, প্রমাণদৃষ্ট, প্রমাণপত্র, প্রমাণপথ, প্রমাণপুরুষ, প্রমাণসূত্র, প্রমাণাধিক, প্রমাণানুরূপ, প্রমাণী, প্রমাতা, প্রমাতামহ, প্রমাথ, প্রমাথী, প্রমাদ, প্রমাদিয়া, প্রমাদী, প্রমাপণ, প্রমাপী, প্রমিত, প্রমিতি, প্রমীত, প্রমীলা, প্রমুখ, প্রমুখতঃ, প্রমুখাৎ, প্রমুদিত, প্রমুদিনী, প্রমৃত, প্রমৃষ্ট, প্রমেয়, প্রমেহ, প্রমোচন, প্রমোদ, প্রমোদন, প্রমোদিত, প্রযত, প্রযত্ন, প্রযাতা, প্রয়াগ, প্রয়াণ, প্রয়াণকাল, প্রয়াত, প্রয়াম, প্রয়াস, প্রযুক্ত, প্রযুক্তি, প্রযোক্তব্য, প্রযোক্তা, প্রয়োগ, প্রয়োগবিজ্ঞান, প্রয়োগাতিশয়, প্রযোজক, প্রয়োজন, প্রয়োজনীয়, প্রযোজ্য, প্ররূঢ়, প্ররোচন, প্ররোচনা, প্ররোহ, প্ররোহণ, প্ররোহী, প্রলপন, প্রলপিত, প্রলব্ধ, প্রলম্ব, প্রলম্বিত, প্রলম্ভ, প্রলম্ভন, প্রলয়, প্রলয়ঙ্করী, প্রলয়ান্ত, প্রলাপ, প্রলাপী, প্রলীন, প্রলুঠিত, প্রলেপ, প্রলোভ, প্রশংস, প্রশংসক, প্রশংসন, প্রশংসনীয়, প্রশংসমান, প্রশংসা, প্রশংসিত, প্রশংসন্তব্য, প্রশংস্য, প্রশন, প্রশম, প্রশমন, প্রশমিত, প্রশস্ত, প্রশস্তব্য, প্রশস্তি, প্রশস্য, প্রশাখা, প্রশাখিকা, প্রশান্ত, প্রশান্তচিত্ত, প্রশাসক, প্রশাসিতা, প্রশিষ্য, প্রশ্চ্যোতন, প্রশ্ন, প্রশ্নপত্র, প্রশ্নোত্তর, প্রশ্রয়, প্রশ্রিত, প্রশ্লিষ্ট, প্রশ্লেষ, প্রশ্বাস, প্রষ্টব্য, প্রষ্টা, প্রষ্ঠ, প্রসংখ্যান, প্রসকল, প্রসক্ত, প্রসক্তি, প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গী, প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধ, প্রসত্তি, প্রসন্ন, প্রসন্নময়ী, প্রসন্না, প্রসব, প্রসবগৃহ, প্রসববেদনা, প্রসবিতা, প্রসবী, প্রসব্য, প্রসভ, প্রসর, প্রসরণ, প্রসর্প, প্রসর্পণ, প্রসর্পী, প্রসস্তি, প্রসহ, প্রসহন, প্রসহ্য, প্রসাদ, প্রসাদভক্ষণ, প্রসাদক, প্রসাদন, প্রসাদাৎ, প্রসাদি(দী), প্রসাধক, প্রসাধন, প্রসাধনী,

প্রসাধিকা, প্রসাধিত, প্রসার, প্রসারণ, প্রসারিত, প্রসারিণী, প্রসারী, প্রসিক্ত, প্রসিত, প্রসিতি, প্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধি, প্রসীদ, প্রসুপ্ত, প্রসু, প্রসূত, প্রসূতি, প্রসূতিকা, প্রসূতিবায়ু, প্রসূতিমারুতি, প্রসূন, প্রসূনস্তবক, প্রসৃত, প্রসৃতা, প্রসৃতি, প্রসৃপ্ত, প্রসেক, প্রসেবক, প্রস্কন্দন, প্রস্ত, প্রস্তর, প্রস্তরযুগ, প্রস্তাব, প্রস্তাবনা, প্রস্তাবিত, প্রস্তার, প্রস্তুত (প্রস্তাব), প্রস্থ, প্রস্থান, প্রস্থানকৌতুক, প্রস্থাপন, প্রস্থাপনা, প্রস্থাপিত, প্রস্থিত, প্রস্নিগ্ধ, প্রস্নুত, প্রস্নুষা, প্রস্ফুট, প্রস্ফুটন, প্রস্ফুরণ, প্রস্ফোটন, প্রস্যন্দ, প্রস্যন্দন, প্রস্যন্দী, প্রস্রব, প্রস্রবণ, প্রস্রবী, প্রস্রাব (পেশাব), প্রস্রুত, প্রস্ব(স্বা)ন, প্রস্বাপ, প্রস্বাপন, প্রস্বেদ, প্রহত, প্রহর, প্রহরণ, প্রহরণীয়, প্রহরা, প্রহরিণী, প্রহরী, প্রহর্ত্তব্য, প্রহর্ত্তা, প্রহর্ষ, প্রহর্ষণ, প্রহর্ষণী, প্রহর্ষিণী, প্রহসন, প্রহসন্তী, প্রহসিত, প্রহস্ত, প্রহাণ, প্রহাণি, প্রহার, প্রহারক, প্রহারণ, প্রহারী, প্রহাস, প্রহাসক, প্রহাসী, প্রহিত, প্রহুঁ, প্রহুত, প্রহৃত, প্রহৃষ্ট, প্রহেলক, প্রহেলা, প্রহেলি, প্রহেলিকা, প্রহেলী, প্রহ্রাদ, প্রহ্রাদিয়া, প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদক, প্রহ্লাদন, প্রহ্ব, প্রাংশু, প্রাক্(চ্), প্রাকট্য, প্রাকরণিক, প্রাকাম্য, প্রাকার, প্রাকাশ্য, প্রাকৃত, প্রাকৃতা, প্রাকৃতাপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক, প্রাকৃতী, প্রাক্কাল, প্রাক্কুল, প্রাক্তন, প্রাক্তনিক, প্রাক্তনী, প্রাক্সন্ধ্যা, প্রাকস্রোতাঃ, প্রাগ, প্রাগভাব, প্রাগুক্ত, প্রাগ্জ্যোতিষ, প্রাগ্দেশ, প্রাগ্ভাব, প্রাগসর, প্রাগহর, প্রাগ্য, প্রঘুণ, প্রাঘুণক, প্রাঘুণিক, প্রাঘূর্ণ, প্রাঘূর্ণক, প্রাঘূর্ণিক, প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্ন্যায়, প্রাঙ্মুখ, প্রাচী, প্রাচীন, প্রাচীনা, প্রাচীনাবীত, প্রাচীনাবীতক, প্রাচীর, প্রাচুর্য্য, প্রাচেতস, প্রাচ্য, প্রাজক, প্রাজন, প্রাজাপত্য, প্রাজাপত্যা, প্রাজিতা, প্রাজ্ঞ, প্রাজ্ঞী, প্রাজ্য, প্রাঞ্জল, প্রাঞ্জলি, প্রাড্‌বিবাক, প্রাণ, প্রাণকর, প্রাণকর্ম্ম, প্রাণঘ্ন, প্রাণচ্ছিৎ, প্রাণচ্ছেদ, প্রাণত্রাণ, প্রাণদ, প্রাণদা, প্রাণদা-যমদূতিকা, প্রাণদক্ষিণা, প্রাণদাতা, প্রাণধারণ, প্রাণন, প্রাণনাথ, প্রাণপণ, প্রাণপাত, প্রাণপুরুষ, প্রাণপ্রিয়, প্রাণবান, প্রাণবায়ু, প্রাণভৃৎ, প্রাণময়, প্রাণশক্তি, প্রাণসংশয়, প্রাণসঙ্কট, প্রাণহর, প্রাণহারী, প্রাণাতিপাত, প্রাণাত্যয়, প্রাণাধিক, প্রাণাধিনাথ, প্রাণান্ত, প্রাণান্তিক, প্রাণাবাধ, প্রাণায়ন, প্রাণায়াম, প্রানি (প্রাণী), প্রাণীজাত, প্রাণীদ্যুত, প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর, প্রাত, প্রাতঃ, প্রাতঃকাল, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রাতঃস্নান, প্রাতঃস্নায়ী, প্রাতঃস্মরণীয়, প্রাতর, প্রাতরর্ক, প্রাতরশন, প্রাতরাশ, প্রাতরাশিত, প্রাতরুত্থান, প্রাতর্ব্বাক্য, প্রাতর্ভোজন, প্রাতস্তরাম্, প্রাতিকূলিক, প্রাতিকূল্য, প্রাতিপদিক, প্রাতিবেশ্য, প্রাতিভ, প্রাতিভাব্য, প্রাতিলোম্য, প্রাতিশাখ্য, প্রাত্যয়িক, প্রাত্যহিক, প্রাথমিক, প্রাথম্য, প্রাদুঃ, প্রাদুর্ভাব, প্রাদুষ্কৃত, প্রাদেশ, প্রাদেশিক, প্রাধানিক, প্রাধান্য, প্রাধ্বম্, প্রান্ত, প্রান্তদুর্গ, প্রান্তপাল, প্রান্তর, প্রাপক, প্রাপণ, প্রাপণিক, প্রাপণীয়, প্রাপীত, প্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য, প্রাপ্তি, প্রাপ্তিপত্র, প্রাপ্য, প্রাবরণ, প্রাবল্য, প্রাবার, প্রাবারক, প্রাবারিক, প্রাবীণ্য, প্রাবৃট্(ষ্), প্রাবৃত, প্রাবৃষা, প্রাবৃষেণ্য, প্রাবেশিক, প্রাভঞ্জনি, প্রাভবত্য, প্রাভববৈভব, প্রাভৃত, প্রাভৃতক, প্রামাণি(নি)ক, প্রামাণিক্য, প্রামাণ্য, প্রামাদিক, প্রায়, প্রায়ঃ, প্রায়গত, প্রায়ণ, প্রায়শঃ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তি, প্রায়শ্চিত্তী, প্রায়ান্ধকার, প্রায়িক, প্রাযোজ্য, প্রায়োপবিষ্ট, প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশী, প্রায়োপেত, প্রারব্ধ, প্রারম্ভ, প্রারম্ভণ, প্রারিঙ্খিত, প্রার্থ, প্রার্থক, প্রার্থন, প্রার্থনীয়, প্রার্থয়িতব্য, প্রার্থয়িতা, প্রার্থিত, প্রার্থিতা, প্রার্থী, প্রার্থ্য, প্রালব্ধ, প্রালম্ব, প্রালম্বিকা, প্রালেয়, প্রাশ, প্রাশন, প্রাশনীয়, প্রাশ্ত্য, প্রাশিত, প্রাশিতা, প্রাশী, প্রাশ্চিত্ত, প্রাশ্নিক, প্রাস, প্রাসক, প্রাসাস্ত্র, প্রাসঙ্গ, প্রাসঙ্গিক, প্রাসাদ,

প্রাসাদতল, প্রাসাদপৃষ্ঠ, প্রাসিক, প্রাস্ত, প্রাস্থানিক, প্রাহ্ণ, প্রাহ্ণক, প্রাহ্ণিক, প্রাহ্ন, প্রাহ্লাদি, প্রুষ্, প্রেক্ষক, প্রেক্ষণ, প্রেক্ষণীয়, প্রেক্ষণীয়ক, প্রেক্ষা, প্রেক্ষিত, প্রেক্ষী, প্রেক্ষ্য, প্রেঙ্খ, প্রেঙ্খা, প্রেত, প্রেতকায়, প্রেতগত, প্রেতগৃহ, প্রেততর্পণ, প্রেতদেশ, প্রেতদেহ, প্রেতধূম, প্রেতনদী, প্রেতনাথ, প্রেতনির্হারক, প্রেতপক্ষ, প্রেতপতি, প্রেতপিণ্ড, প্রেতপুর, প্রেতপুরী, প্রেতভূমি, প্রেতমেধ, প্রেতরাজ, প্রেতলোক, প্রেতশিলা, প্রেতশুদ্ধি, প্রেতশ্রাদ্ধ, প্রেতাধিপ, প্রেতাত্মা, প্রেতান্ন, প্রেতিনী, প্রেত্মু, পৈবস্তি, প্রের, প্রেরক, প্রেরণ, প্রেরণা, প্রেরয়িতা, প্রেরিত, প্রেষণ, প্রেষিত, প্রেষ(ষি)ণী, প্রেষ্ঠ, প্রেষ্য, প্রেষ্যজন, প্রেষ্যনারী, প্রেষ্যবধূ, প্রেষ্যভাব, প্রেস, প্রৈষ, প্রৈষ্য, প্রোক্ত, প্রোক্ষণ, প্রোচ্চ, প্রোজ্জ্বলিত, প্রোজ্ঝিত, প্রোঞ্ছন, প্রোত (ওতপ্রোত), প্রোৎকণ্ঠ, প্রোথিত, প্রোৎফুল্ল, প্রোথ্, প্রোথ, প্রোথিত, প্রোদ্ভিন্ন, প্রোষিত, প্রো(প্রৌ)ষ্ঠ, প্রো(প্রৌ)ষ্ঠপদ, প্রো(প্রৌ)ষ্ঠপদী, প্রোষ্যৎপতিকা, প্রোষাৎভর্তৃকা, প্রৌঞ্ছন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়জলদ, প্রৌঢ়পাদ, প্রৌঢ়পুষ্প, প্রৌঢ়যৌবন, প্রৌঢ়া, প্রৌঢ়ি, প্রৌঢ়িমা, প্রৌষ্ঠ, প্রৌষ্ঠপদ, প্রৌষ্ঠপদা, প্রৌষ্ঠপদী, প্রৌষ্ঠপাদ, প্রৌষ্ঠী, হ্র-পিত্যেশ।

প্র (প্রচ্ছ, প্রতি, প্রথ্) = পায়ী-রক্ষণ (রহন)। **প্রচ্ছ** = পায়ী-রক্ষণের চয়ন ছাদিত যাহাতে। **প্রতি** = পায়ী-রক্ষণের গতিশীল তারণ যাহাতে। **প্রথ** = পায়ী-রক্ষণ থাকে যাহাতে।

প্র : ২. *পায়ী রহে যাহাতে।* **৩.** গতি (অগ্রে, সম্মুখে, সমন্তাৎ), আরম্ভ, প্রকর্ষ, ভৃশ, অত্যন্ত, প্রগত, সর্ব্বতোভাব, আদিকর্ম্ম, প্রাথম্য, খ্যাতি, উৎপত্তি, শক্তি, ঈশ, শেষ, শুদ্ধি, পূজা, পতন, উন্নতি, বিয়োগ, ব্যবহার, ইচ্ছা, তৃপ্তি, দৈর্ঘ্য, বৈপরীত্য, পুরা, প্রজ্ঞাত। (ব.শ.)। **৪.** ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পবা, পবি, পুরুষ-প্রকৃতি**। বাংলাভাষার ২২টি উপসর্গের একটি হল **প্র**। এর নিজস্ব অর্থ অনেকটাই অব্যক্ত, কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সুস্পষ্ট দিশা দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তার, যেমন প্রতিটি উপসর্গের থাকে। তাই **প্র**-র ভেতরেও যে একটা সুস্পষ্ট অর্থ রয়েছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী সেই অর্থ তা নিয়ে পূর্বসূরীরা স্পষ্ট করে কিছু বলে যাননি। আমরা দেখছি সেই অর্থ হল **প্র** = পায়ীর রহন, অর্থাৎ **প্** = পাওয়ন, **র**-ফলা = আরক্ষণ, রহন। এই **র** আবর্তন বা **ঋ**-এর অধঃপতিত রূপ **র**-এর 'ফলা'। তার মানে, **প্**-করণ একই কর্মের পুনরাবৃত্তির আবর্তনে আবদ্ধ হয়ে **র**ক্ষিত হয় **প্র**-এ। এরকম হতে পারে কেবল তখনই, যখন **পুরুষ**-**প্রকৃতি**র বা আধেয়-আধারের জোড় একটি দীর্ঘজীবী **স্ব**-ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে; আর তা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন '**পুরুষ-প্রকৃতি** পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করে'। একেই **সৃষ্টি** বলে, **সুন্দর** বলে, বলে **প্র**। আবিষ্কারক-স্রষ্টা বা **শিব** এই '**স্ব**-ভাব' আবিষ্কার করতে পারেন বলেই তিনি **শিব**-পদবাচ্য (**পুরুষ**-পদবাচ্য) এবং সেই আবিষ্কার জেনে নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে বলেই 'পুনরাবৃত্তিকারক'-সত্তা **দক্ষ**-পদবাচ্য (**প্রকৃতি**-পদবাচ্য)। জগৎজুড়ে অতিচেতন **পুরুষ** নতুন নতুন জোড় সৃষ্টি করে চলেছেন, আর **প্রকৃতি** তাকে ধারণ করে নিয়ে চলেছেন। **প্রকৃতি**র যে বিশাল সৃষ্টিসম্ভার, তার প্রতিটি সৃষ্ট সত্তারই সূচনাপর্বে রয়েছে ওই নব-স্বভাব অর্জনকারী জোড় বা সমুচ্চয়ী-সম্মিলন। **প্রকৃতি** তারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

আরও সহজ করে বললে, একটি নর ও একটি নারীকে এমনভাবে জোড়া হল যে, তারা দুজনে মিলে একটি পরিবারের সূচনা করে ফেলল। দুটি কণার ক্ষেত্রেও এরকম ভাবতে পারেন। এই যে পরিবারের সূচনাপর্ব, এখানে একটি **পুরুষ** ও একটি **প্রকৃতি** এমন এক নতুন **স্ব**-ভাবে উত্তীর্ণ হল যে, সেই স্বভাবে তারা অধিষ্ঠিত থাকলে কয়েক শত বছর পরে সেটি একটি বিশাল পরিবারে পরিণত হবে। এই সূচনাপর্বের জোড়টিকে বলে **প্র**। এইরূপ কোনো না কোনো প্রকারের **প্র** থাকে **প্রদ, প্রথা, প্রাণ** ... প্রভৃতি অজস্র সত্তার মূলে। তার মানে, কোটি কোটি আধার-আধেয়র জোড়কে সৃষ্টি করে **প্রকৃতি** কোটি কোটি সত্তা সৃষ্টি করে রেখেছে। **সুন্দরতত্ত্বে** আমরা দেখেছি, সৃষ্টিমাত্রেই নতুন একধরনের **প্র** তৈরি করা, **পুরুষ-প্রকৃতি**র নতুন রকমের জোড় তৈরি করা। কেননা, দেখা যাচ্ছে যে, **প্র** তার নিজের ভিতরে আধেয় (**প্**) ও আধার (**র**) উভয়কে যথাযথভাবে (আবর্তনমূলকভাবে) ধারণ করে স্বয়ং **দ্বৈত** হয়েও **অদ্বৈত**-রূপে বিরাজ করছে। এভাবে **প্র**-র ভিতরে **পুরুষ-প্রকৃতি** থাকে **অভেদ** রূপে। সত্তার এই **অদ্বৈত** রূপটিই যে শ্রেষ্ঠ রূপ এবং তার বোধই মানুষের অর্জিত সর্বোচ্চ বোধ, তার সাক্ষী দিয়ে গিয়েছেন বিবেকানন্দ। (আমাদের 'গ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ফলত, এই **প্র** শব্দটি যখন উপসর্গরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন সংযোজিত শব্দটির ক্রিয়াটিকে সে তার শ্রেষ্ঠ রূপের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। যা কিছু ক্রিয়া, তার কোনো দিশা নেই। কিন্তু উপসর্গ যুক্ত ক্রিয়ার সুস্পষ্ট দিশা থাকে, উপসর্গ ক্রিয়াকে সেই দিশা দিয়ে থাকে। তবে ক্রিয়াকে শ্রেষ্ঠ দিশা দেয় **প্র** উপসর্গটি। যে কোনো **প্র**-যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

যাই হোক, **প্র**-র কমবেশি অব্যক্ত ধারণাটিকে ব্যক্ত করা হয় 'প্রকৃতিস্থ-করণ', 'প্রকৃষ্ট-করণ', কিংবা 'পালন-পান রহে যাহাতে' ... ইত্যাকার শব্দবন্ধের সাহায্যে। মোট কথা, কোনো শব্দের সঙ্গে এই **প্র** যুক্ত হলে সাধারণভাবে সেই শব্দটির ক্রিয়াকে তার শ্রেষ্ঠ (আদি, অকৃত্রিম, উন্নীত, কাঙ্ক্ষিত) রূপের দিকে দিশাগ্রস্ত করে দেয় এই **প্র**। যেমন, 'চারিয়ে দেওয়া'কে যে **চার** শব্দে প্রকাশ করা হয়, সেই **চার**-এর সুস্পষ্ট দিশা থাকে না; কেমন চারানো, কোনদিকে চারানো — সর্বদিকে? একদিকে? উপরদিকে? বিশেষদিকে? না কি যেদিকে চারিয়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়? না, এর কোনো উত্তরই **চার** শব্দে বলা নেই। কিন্তু যেই না সেই **চার**-এর সামনে **প্র** বসিয়ে দেওয়া হল এবং শব্দটি **প্রচার**-এ পরিণত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল **চার** করা বা চারানো একরকম দিশা পেয়ে গেছে; তার অর্থ হয়ে গেছে — কাঙ্ক্ষিতভাবে, প্রকৃষ্টভাবে, উন্নীতভাবে, শ্রেষ্ঠভাবে চারিয়ে দেওয়া। একই কথা **প্রকার, প্রখ্যাত, প্রগাঢ়, প্রজাতি, প্রতারণা, প্রদান, প্রধান, প্রণালী, প্রপালন, প্রবাহ, প্রমাণ, প্রশস্তি, প্রসার, প্রহার** ... ইত্যাকার সকল শব্দের ক্ষেত্রেই খাটবে। তার মানে, **প্র** উপসর্গ যে শব্দের আগে যুক্ত হয়, তা সে **কার খ্যাত গাঢ় জাতি** ... যাই হোক, সেই শব্দের ক্রিয়াটিকে (**প্রকার**-এর ক্ষেত্রে **কার**কে, **প্রচার**-এর ক্ষেত্রে **চার**কে, **প্রখ্যাত**-এর ক্ষেত্রে **খ্যাত**কে ... এবং **প্রহার**-এর ক্ষেত্রে **হার**কে) **প্র** উপসর্গটি

আপন প্রকৃষ্টতা-গুণ দান করে দিয়ে শব্দটির ক্রিয়াকে শ্রেষ্ঠভাবে সক্রিয় করে দেয়। **কার** সুসঙ্গতভাবে করা হয়ে যায়, **খ্যাত** যথার্থভাবে খ্যাত হয়ে যায় ... ইত্যাদি। বলতে গেলে, সমস্ত উপসর্গের প্রত্যেকটির স্বভাবই এইরকম — সংযোজিত শব্দকে আপন গুণাগুণ দান করে সে নির্গুণভাবে শব্দটির সামনে বসে থাকে। **কর, খর, গম, চর, তর, বর, সর, হর, কার, চার, তার, বার, সার, হার** ... ইত্যাদি হাজার শব্দের সঙ্গে উপসর্গগুলি যুক্ত হয়ে একই আচরণ করে থাকে। যেন-বা এই শব্দগুলি হল হাজার রাজ্যের হাজার মহারানী তাঁদের নিজ নিজ রাজরানীর আসনে দিশাহীনভাবে বসে রয়েছেন, পাশে রাজার সিংহাসন রয়েছে খালি। সেখানে রাজারূপে কেউ বসে নেই বলে রাজরাজেশ্বরী তাঁর রাজ্য চালাতে পারছেন না। তাই দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপসর্গরূপে সেই রাজসিংহাসনে আপনার একটি মূর্তি বা ছবি রেখে দেন। তৎক্ষণাৎ রাজরাজেশ্বরী তাঁর দিশা পেয়ে গিয়ে সক্রিয় হয়ে পূর্ণোদ্যমে রাজ্য চালাতে শুরু করেন। উপসর্গের এই ভূমিকা — শ্রীকৃষ্ণের ছবিরূপে নিষ্ক্রিয় থেকে রাজরাজেশ্বরীর মহাশক্তিকে দিশা দিয়ে দেওয়া। প্রতিটি উপসর্গ তার নিজের ভিতর যে **গুণ** বা অর্থ রয়েছে, সেই অর্থ সংযুক্ত শব্দকে দান করে দিয়ে আপন জীবন সার্থক করে থাকে। **প্র** উপসর্গটিও সেইভাবে তার 'প্রকৃষ্টকরণ' অর্থটি শব্দকে দিয়ে দেয়। তা পেয়ে শব্দটি তার আপন প্রকৃষ্ট রূপে সক্রিয় হয়ে যায়।

এই **প্র**-এর অর্থকে আরও স্পষ্টরূপে বোঝার চেষ্টা করা যায় অন্য কয়েকটি উপসর্গের সঙ্গে তুলনায়। যেমন ধরা যাক **কার**। চর (চরণ) থেকে যেমন চার (চারণ) হয়, কর (করণ) থেকে তেমনি **কার** হয়। কিন্তু এই **কার** স্বরূপে খুব কম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অত্যধিক ব্যবহৃত হয় উপসর্গ যোগে। যেমন **অপকার, অধিকার, আকার, বিকার, প্রকার** ইত্যাদি। এখানে **কার**-এর অর্থ উপসর্গযোগে কীভাবে কোনদিকে বদলাচ্ছে, তার তুলনামূলক বিচার করলে আমরা **প্র** উপসর্গটির অন্তর্নিহিত অর্থে পৌঁছাতে পারি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি হল **আকার বিকার প্রকার**। **আকার**-এ রয়েছে **কার**সমূহ, গোটা অবয়বের সমস্ত বিন্দুতে যে **কার** করা হয়েছে, তার আশ্রয় হল **আকার**। আর, সেই **কার**কে বা **কার**সমূহকে তার স্বাভাবিক **কার**-সত্তা থেকে বিশেষ দিকে বা বিপরীত দিকে চালিত করে দেয় যে, সে হল **বিকার**। আর, **কার**-এর **স্বাভাবিক কিংবা তার চেয়েও উন্নীত-স্বাভাবিকে উত্তীর্ণ, কাঙ্ক্ষিত, শ্রেষ্ঠ** যে-রূপ, যা কিনা অধঃপতিত নয় বা বিশেষও নয়, তেমন তুলনামূলকভাবে ভাল, প্রার্থিত, উৎকৃষ্ট রূপটিকে বলে **প্রকার**। তার মানে **প্র** হল, প্র-অর্থিত রূপ, স্বাভাবিক রূপ বা তার চেয়েও উন্নীত রূপ। স্বাভাবিকের চেয়ে উন্নীত রূপ বলতে বোঝাবে এই মুহূর্তের **প্রকৃতিস্থ** রূপের থেকেও উন্নীত রূপ। যেহেতু **প্রকৃতির** ভিতরে নিজেকে ক্রমোন্নত রূপের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি নিজস্ব প্রবণতা সর্বদা সক্রিয় থাকে, আজকের প্রকৃতি আর কালকের প্রকৃতি এক নয়, সে আগের চেয়ে উন্নীত, তাই **প্র** মানেই সর্বোচ্চ 'প্রকৃতিস্থকরণ'। এই কারণেই **প্র** উপসর্গের সাধারণ অর্থ করা হয় 'প্রকৃষ্ট'। ...

যাই হোক, আমরা যতদূর বুঝেছি, **প্র** উপসর্গটি কার্যত একার্ণবের দিকে মুখ করে রয়েছে, তা সে আদি একার্ণব হোক আর ভবিষ্যতের একার্ণবই হোক। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির যে চক্র, তার আগের ও পরের শ্রেষ্ঠ **প্রকৃতি**রূপের দিকে তার মুখ রয়েছে। তাই সে সর্বদাই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক এবং বর্তমান স্বাভাবিকতা-প্রাকৃতিকতা থেকে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। আর সেজন্যেই অনেক সময় সে **প্রাক, প্রদোষ** প্রভৃতি পূর্ব দেশকালসূচক অর্থও ধারণ করে ফেলে। ... ১ম খণ্ডে দ্র. **প্রাক** (পৃষ্ঠা ৯), **প্রদোষ** (পৃষ্ঠা ৫৫৬)। **৬.** আমরা বাংলাভাষীরা যে উত্তরাধিকার **প্র** রূপে পেয়েছি, ইংরেজিভাষীরা তাঁদের সেই উপসর্গের (= preposition-এর) উত্তরাধিকার পেয়েছেন para, pro, pre, for, fore প্রভৃতি prefix-এর মাধ্যমে। ঐ prefix-গুলি যুক্ত প্রায় সমস্ত ইংরেজি শব্দ তাদের prefix-গুলির মাধ্যমে যে অর্থ ধারণ ও প্রকাশ করে, আমাদের **প্র** বহুক্ষেত্রে অবিকল সেই অর্থই পোষণ করে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক পার্থক্যের সামান্য ছাপ পড়ে গেছে। আবার, এমন বহু **প্র**-যুক্ত বাংলা শব্দ রয়েছে, যার হুবহু উত্তরাধিকার ইংরেজির নেই, উল্টোটাও রয়েছে। বাংলায় যেখানে 'প্রয়োগ', 'প্রযুক্ত' ... ইত্যাদি হয়, ইংরেজিতে সেখানে পাওয়া যায় project-কে। এরকম অজস্র শব্দ রয়েছে। আবার, ইংরেজিতে যেখানে proceed, prolong, Prometheus, promote, promise, propagate, proper, propose, prorate ... ইত্যাদি অনেক শব্দ **প্র**-শব্দ পরিবারের সদস্যগন্ধ স্পষ্ট ধরে রেখেছে, সেখানে বাংলায় **প্রসীদ, প্রলম্ব, প্রমথ, প্রমতি** রয়েছে; কিন্তু **প্র**-ম-ঈশ, **প্র**-পাগতি, **প্র**-পার, **প্র**-পোষি, **প্র**-রতি জাতীয় শব্দ নেই। অথচ, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সেরকম শব্দ থাকলেও থাকতে পারত।

প্রকট : দ্র. **কট**।

প্রকাশ : দ্র. **আকাশ, কাশ**।

প্রকৃত, প্রকৃতি (প্রকৃতিস্থ) : **১. প্রকৃত** = প্র + ✓কৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। **প্রকৃতি** = প্র + ✓কৃতি (ক্তিচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. প্রকৃত** = *যাহা (তত্ত্বস্তুর স্বভাব অনুযায়ী) প্রকৃষ্টভাবে করা হইয়াছে।* **প্রকৃতি** = **প্রকৃত (প্র-করণ)** *গতিশীল যাহাতে। /* **প্রকৃত** = যাহা প্রকৃষ্টভাবে কৃত (হইয়াছে)। **প্রকৃতি** = (সাংখ্যে) যে পুরুষভোগার্থ শব্দাদিকার্য্য করে; যাহাতে সত্ত্বাদিগুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে। (ব.শ.)। **৩. প্রকৃত** = প্রচুর প্রস্তুত, সজ্জিত, প্রক্রান্ত, প্রকরণপ্রাপ্ত, ঈপ্সিত, অধিকৃত, বর্ণনীয়, প্রকৃতিসিদ্ধ, বাস্তবিক, আদিম, প্রস্তুত বিষয়, উপমেয়। **প্রকৃতি** = সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (ইহা অনাদি। মহদহঙ্কারাদি তত্ত্ব ইহার বিকার। সত্ত্বাদি প্রকৃতিসম্ভূত। বীজ হইতে বৃক্ষবৎ প্রকৃতি হইতে বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে। কার্য্যকারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি হেতু।), পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কার — এই অষ্টবিধা অপরা প্রকৃতি, আকাশাদি পঞ্চভূত, উপাদান-করণ, আদিকারণ, হেতু, মুল, স্বভাব, নিসর্গ (nature), স্বভাবধর্ম্ম, শীল, রূপ, স্বরূপ, শক্তি, পরমাত্মা, যোনি, প্রধান, আধার, জন্তু, যোষিৎ, নারী, মাতা, লিঙ্গ, গুহ্য, শিল্পী, আদর্শ, মায়া, (ব্যাকরণে) শব্দ ও ধাতু, (মধ্যমাদি চতুর্বিধ মূলপ্রকৃতি, অরিভূমির অগ্রবর্তী মিত্রাদি ও পশ্চাদ্বর্তী পার্ষ্ণিগ্রাহাদি অষ্টবিধ শাখাপ্রকৃতি, ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যপ্রকৃতি — সর্ব্বসুদ্ধ ১২ + ৬০ = ৭২ প্রকার প্রকৃতি।),

স্বাম্যমাত্যাদি সপ্তরাজ্যাঙ্গ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষ ভূপতি দূত পুরোধাঃ দৈবজ্ঞ — এই সপ্ত প্রকৃতি, পুরোধাঃ প্রতিনিধি প্রধান সচিব মন্ত্রী প্রাড্‌বিবাক পণ্ডিত সুমন্ত্রক, অমাত্য, দূত — এই দশ প্রকৃতি, অমাত্য, পৌরশ্রেণী, পৌরগণ, প্রজা, (গণিতে) মান, একবিংশত্যক্ষরপাদ ছন্দোভেদ। **প্রকৃতিস্থ** = স্বভাবস্থিত, অবিকৃত, স্বাভাবিক, সুস্থ, আহার্য্যশোভাহীন, নগ্ন, ক্রোধাদির উত্তেজনাহীন, শান্ত, ধাতুস্থ। (ব.শ.)। **৪.** জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও, অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতগণ **প্রকৃত**কে real অর্থে এবং **প্রকৃতি**কে nature অর্থে বুঝে থাকেন। আর, **প্রকৃতিস্থ** শব্দটি 'স্বাভাবিক' অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পুরুষ**, **প্র**। যা 'করা হয়েছে', তাকে বলে **কৃত**। অর্থাৎ কেউ না কেউ তা করে রেখেছে। আর, **প্রকৃত** শব্দের অর্থ হল 'যা প্রকৃষ্টভাবে **কৃত**'। কে কে '**প্রকৃষ্টভাবে কৃত**'? ব.শ. বলছেন, সেগুলি হল (উপরে **৩.**-এ প্রদত্ত) — প্রচুর প্রস্তুত, সজ্জিত, প্রক্রান্ত, প্রকরণপ্রাপ্ত, ঈপ্সিত, অধিকৃত, বর্ণনীয়, **প্রকৃতিসিদ্ধ, বাস্তবিক**, আদিম, প্রস্তুত বিষয়, উপমেয়। দেখুন, এগুলির কয়েকটির সঙ্গে আপনিও খানিকটা একমত। যেমন আপনিও **প্রকৃত** বলতে বাস্তবিক, প্রকৃতি-সিদ্ধ ... প্রভৃতি বুঝে থাকেন। কিন্তু বাকিগুলি? তাছাড়া, সন্দেহ হতে পারে, এদের প্রত্যেককেই কি সত্যিই '**প্র**কৃষ্টভাবে করা হয়েছে'! কী করা হয়ে গেলে আমরা বলতে পারি 'প্রকৃষ্টভাবে করা' হয়েছে, বা '**প্র**কৃষ্টভাবে **কৃত**'?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করলে অবশেষে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হয়, একালের চোখে যাকে 'নিতান্তই অদ্ভুত' মনে হতে পারে। দেখা যায়, আমাদের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীরা একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। তা হল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের একটি নির্মল-চিরন্তন-আদি রূপ ('সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা') ছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো-বা এখনও আছে। আর, বস্তু ও বিষয়ের সেই নির্মল-চিরন্তন-আদি রূপটিতে তারা অকস্মাৎ পৌঁছে যায়নি, কেউ না কেউ তাকে সেখানে '**প্র**কৃষ্টভাবে করে' (বা তত্তদ বস্তু ও বিষয়ের বিশেষ বিশেষ 'স্বভাবে' উন্নীত করে) রেখেছিল, তা সে স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি করে রাখুন অথবা তা স্বয়ংকৃতই হোক। অর্থাৎ, কাউকে 'প্রকৃষ্টভাবে' করা হয়েছে মানেই হল, তাকে তার বিশেষ-প্রকার '**স্ব**-ভাবে' প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে; অন্যথায় তা **প্রকৃত** নয়। বস্তু ও বিষয়ের সেই '**স্ব**-ভাবে প্রতিষ্ঠিত' রূপটিই বা 'স্বাভাবিক' রূপটিই '**প্র**কৃষ্টভাবে **কৃত**' রূপ বা **প্রকৃত** রূপ। তাকেই বাস্তবিক বা real এবং আদিম কিংবা 'মূলে যেরূপ ছিল' ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। তার মানে, আমাদের প্রাচীন শব্দবিদরা মনে করতেন — এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি **প্রকৃত** দৈহিক রূপ (**প্রকৃত** বস্তু-রূপ বা স্বাভাবিক বাস্তবরূপ) এবং একটি **প্রকৃত** মানসিক রূপ (**প্রকৃত** চেতন-রূপ বা স্বাভাবিক চৈতন্যরূপ) ছিল। সেই **প্রকৃত** বস্তু ও **প্রকৃত** বিষয়গুলি নিয়েই গড়ে উঠেছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তার মানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল **প্রকৃত** বা '**স্ব**-ভাবী' (স্বাভাবিক) বস্তু ও বিষয়সমূহের সমাহার; সেগুলিকে নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাত্রা শুরু হয়েছিল' বললে, কথাটির মানে দাঁড়ায়, সেই **প্রকৃত**গুলি (**প্রকৃত** বা স্ব স্ব ভাবধারী বস্তু বা বিষয়গুলি) গতিশীল হয়ে উঠেছিল। এই গতিশীল **প্রকৃত**গুলিকে একত্রে যেমন **প্রকৃতি** বলে, তেমনি এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বভাবকেও **প্রকৃতি** বলে। তার মানে, প্রত্যেকটি **প্রকৃত**-এর (**প্রকৃত** বস্তু বা বিষয়ের) ভিতরে যে **স্ব**-ভাব রয়েছে, যা কিনা বস্তু বা বিষয়টিকে 'প্রকৃষ্টভাবে করা'র ফল, সেই **প্রকৃতি**র ভিতরেই **প্রকৃত** গতিশীল রয়েছে। অতএব **প্রকৃত** মানে, যার ভিতরে তার স্ব-ভাব প্রতিষ্ঠিত করা রয়েছে; এবং **প্রকৃতি** মানে "সেই 'স্ব-স্ব-ভাবানুসারী' বস্তু-বিষয়সমূহ গতিশীল থাকে যাহাতে"। কথাটি পরমাণুর ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেও সত্য।

ব.শ. এই **প্রকৃতি**র যে স্বরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তা জড়বস্তু, জীব, মানুষ, মানুষের সমাজ, নিসর্গ **প্রকৃতি**, এবং সর্বোপরি মহাজগৎ সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মতে, যে-**প্রকৃতি** 'সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা' বোঝায়, 'তাহা অনাদি। মহদহঙ্কারাদি তত্ত্ব ইহার বিকার। সত্ত্বাদি প্রকৃতিসম্ভূত। বীজ হইতে বৃক্ষবৎ প্রকৃতি হইতে বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে। কার্য্যকারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি হেতু।' কিন্তু এই **প্রকৃতিতত্ত্ব** সকলের ক্ষেত্রে কেমন করে সত্য হয়, তা এক এক করে ধরে বুঝতে হয়; অবশ্য মানুষের সমাজের ক্ষেত্রে তা অনেকখানি সহজবোধ্য। মানুষের সমাজ কেমন করে **মহৎ** থেকে বিকারগ্রস্ত হয়ে আজকের সমাজ পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেসব কথা আমরা আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।

অতঃপর ব.শ. জানাচ্ছেন, পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কার — এই অষ্টবিধা অপরা প্রকৃতিও **প্রকৃতি** পদবাচ্য। এটি উপরোক্ত মহদহঙ্কারাদি তত্ত্বের মানবিক প্রয়োগের ফল। এতে মনে করা হয় জগতের যেমন ক্ষিতিঅপতেজমরুদ্ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূত আছে, তেমনি মানুষের শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-গ্রাহক পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি গ্রাহকসত্তা রয়েছে। মানুষের মধ্যেকার এই সত্তাগুলির বিশেষ স্বভাব রয়েছে। তাই এগুলি **প্রকৃতি** পদবাচ্য। এরপর ব.শ. খণ্ডভাবে **প্রকৃতি** শব্দের প্রতীকী অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেগুলি হল — আকাশাদি পঞ্চভূত, উপাদান-করণ, আদিকারণ, হেতু, মূল, স্বভাব, নিসর্গ (nature), স্বভাবধর্ম্ম, শীল, রূপ ... ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটিই '**প্র**কৃষ্টভাবে কৃত' গতিশীল সত্তা; তাই এদের প্রত্যেককেই **প্রকৃতি** বলা যেতে পারে।

তবে **প্রকৃতি** শব্দের অর্থ এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ব.শ. জানাচ্ছেন, রাষ্ট্রের আধারশক্তিস্বরূপ 'স্বাম্যমাত্যাদি সপ্তরাজ্যাঙ্গ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষ ভূপতি দূত পুরোধাঃ দৈবজ্ঞ' — এই সপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্র ও যন্ত্রাংশকে **প্রকৃতি** বলে। তবে যেহেতু রাষ্ট্রের চেহারা যুগে যুগে বদলেছে, তার **প্রকৃতি**র চেহারাও বদলেছে; তার সপ্ত **প্রকৃতি** হয়ে গেছে দশ **প্রকৃতি** — 'পুরোধাঃ প্রতিনিধি প্রধান সচিব মন্ত্রী প্রাড্‌বিবাক পণ্ডিত সুমন্ত্রক, অমাত্য, দূত — এই দশ **প্রকৃতি**।'

মানুষের সমাজ যে নিয়মে চলে শব্দের সমাজ বা ভাষাও সেইরকম নিয়মে চলে। ভাষার সেই নিয়মকে আবদ্ধ করে লিপিবদ্ধ করা হয় ব্যাকরণে। সমাজে **পুরুষ-প্রকৃতি** যখন রয়েছে, তখন ভাষাতেও তা থাকবেই। আর, সেকারণেই আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ তাঁদের ব্যাকরণে **পুরুষ-প্রকৃতি**কে যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেছেন। অতঃপর নিম্নে **পুরুষ-প্রকৃতি** দ্রষ্টব্য। **৬.** ইংরেজিতে procreate, procreation ইত্যাদি।

পুরুষ-প্রকৃতি : ১. **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** পৃথক ভুক্তিতে দ্রষ্টব্য। ২. পৃথক ভুক্তিতে **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** দ্রষ্টব্য। ৩. উপরে **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** দেখুন। ৪. গ্রামবাংলায় ও ধর্মপ্রাণ বাংলাভাষী মানুষদের ভাষাব্যবহারে শব্দদুটির প্রয়োগ প্রচলিত, অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত। বাউল, পটুয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও শব্দদুটির ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ৫. দ্র. **চিত্ত**, **আধার-আধেয়**, **কেশাকেশি**। ইতোপূর্বে **পুরুষ** শব্দে আমরা জেনেছি যে, 'পুরকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে দিশাগ্রস্তভাবে দেয় যে' সেই হল **পুরুষ**। আর **প্রকৃতি** হল, 'প্রকৃষ্টভাবে কৃত সত্তা (স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্তা) গতিশীল যাহাতে', সেই সত্তা। এখন ব্যাপার হল, এই যে **প্রকৃতি**, যা কিনা **প্রকৃত**-এর বা '**স্ব**ভাব-সম্পন্ন সত্তা'র গতিশীল রূপমাত্র, সে তো তার স্বভাবের কারণেই দিশানির্ভর। কেননা তার ভিতরে তার **স্ব**-ভাবের **কার** (**কার্য্য**) অন (on) হয়ে রয়েছে। তাই **প্রকৃতি**ই সবকিছুর আদিকারণ বা হেতু। দিশা না পেলে স্বভাবতই **প্রকৃতি** গতিশীল বা চলমান থাকতে পারে না, তার বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই বাধ্যবাধকতায় **প্রকৃতি** মাত্রেই তার দিশারী-**পুরুষ**কে ছাড়া থাকতেই পারে না। প্রয়োজনে সে দিশারী-**পুরুষ** সৃষ্টি করে নেয় (দ্র. **পরমাপ্রকৃতি**) — বিশেষ জড়-সংগঠন প্রাণের জন্ম দিয়ে বসে, সজীব ঝাঁক পালের গোদার জন্ম দিয়ে বসে, প্রজা পদবাচ্য জনসাধারণ তাদের রাজা বানিয়ে নেয় ... ইত্যাদি। তাই দেশে রাজা যখন **পুরুষ** প্রজা তখন **প্রকৃতি**। এইভাবে জগতে অতিচেতন যখন **পুরুষ**, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন **প্রকৃতি**; নিসর্গে (nature-এ) মানবসভ্যতা যখন **পুরুষ**, সমগ্র বাহ্যপৃথিবী তখন **প্রকৃতি**; মানুষের সভ্যতায় পরিচালক যখন **পুরুষ**, সমগ্র সমাজ তখন **প্রকৃতি**; সামাজিক সংস্থায় কর্মাধ্যক্ষ যখন **পুরুষ**, কর্মীসহ সমগ্র সংস্থা তখন **প্রকৃতি**; বিদ্যাক্ষেত্রে অধ্যাপক যখন **পুরুষ**, ছাত্রগণ তখন **প্রকৃতি**; পরিবারে কর্তা যখন **পুরুষ**, পরিবার-সদস্যগণ তখন **প্রকৃতি**; দাম্পত্যে স্বামী যখন **পুরুষ**, স্ত্রী তখন **প্রকৃতি**; জীবে প্রাণ যখন **পুরুষ**, দেহ তখন **প্রকৃতি**; ... অণুতে শক্তিরূপিণী (এনার্জি) যখন **পুরুষ**, ভর তখন **প্রকৃতি**। এমনকি কর্মযজ্ঞে বা কারখানায় নিয়োগকর্তা যখন **পুরুষ**, তখন নিযুক্ত শ্রমিক সহ সমগ্র কারখানাই **প্রকৃতি**; সেই শ্রমিক যখন **পুরুষ**, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল তখন **প্রকৃতি**; আবার যন্ত্রপাতি যখন **পুরুষ**, কাঁচামাল তখন **প্রকৃতি**। (যেগুলি কাঁচামালের যোগ্য নয়, তাদের অসৎ-**প্রকৃতি** ও যেগুলি কাঁচামাল হওয়ার যোগ্য তাদের সৎ-**প্রকৃতি** বলে।) এইভাবে বিশ্বের সকল সত্তাতেই সকল আধেয়ই **পুরুষ** এবং সকল আধারই **প্রকৃতি**। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা ঘোষণা করছেন — এই বিশ্বজগৎ **পুরুষ-প্রকৃতি** রূপে বিভাজিত হয়ে **কাম**সূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। ...

পুরুষ-প্রকৃতির এই 'দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত' বা দ্বৈতাদ্বৈত রূপের বিকাশেরও একটি আবর্তনমূলক গতিপথ রয়েছে। **পরমাপ্রকৃতিতত্ত্বে** সেই **পথ**টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সমাজের ক্ষেত্রে তার প্রায়োগিক রূপটিকে দেখানো হয়েছে। সে পথ হল — একার্ণব-সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-একার্ণব-সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-একার্ণব-সত্য ... এই পথ ধরে। তাছাড়া '**সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি**'র মূল নীতিটিও রয়েছে এই **পুরুষ-প্রকৃতি**র যৌথতার তত্ত্বে। তাতে দেখা গেছে — হাঁ-এর যোগ্য করে না-কে এবং না-এর যোগ্য করে হাঁ-কে উন্নীত করে নিয়ে উভয়কে 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর নীতিতে সহাবস্থান করাতে পারলেই **সুন্দর**-এর জন্ম হয়। বিশ্বের যা কিছু সুন্দর, তার ভিতরে **পুরুষ-প্রকৃতি**র সহাবস্থানের এই রীতি অনুসরণ করা হয় বলেই তারা **সুন্দর**। সর্বপ্রকারের স্রষ্টারাই তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করে থাকেন বলেই তাঁরা **সুন্দরের** সৃষ্টি করতে পারেন। (দ্র. **পরিশিষ্ট ৫**)।

পুরুষ-প্রকৃতির এই স্বরূপকে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে অনুধাবন করার ব্যাপারে যাঁরা সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা হলেন আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণকারগণ। তাঁদের সেই বোধকে তাঁরা লিপিবদ্ধ করে যান আমাদের **ব্যাকরণ** শাস্ত্রে। নিম্নে **প্রত্যয়** (প্রকৃতি-প্রত্যয়) শব্দে আমরা সেই বিষয়ে যাব।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : নিম্নে **প্রত্যয়** দ্রষ্টব্য।

প্রচল (প্রচলন, প্রচলিত) : ১. প্র + ✓চল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***প্রচল*** *=* *প্রকৃষ্ট* ***চল*** *যাহাতে।* ***প্রচলন*** *=* ***প্রচল*** *অন (on) যাহাতে।* ***প্রচলিত*** *=* ***প্রচল*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ৩. **প্রচল** = প্রকৃষ্টচল, সঞ্চল, প্রচলিত। **প্রচলন** = সঞ্চলন, গমন, ভ্রংশ, ব্যবহার, প্রবর্তন। **প্রচলিত** = প্রকৃষ্টচল, প্রস্থিত, চ্যুত, ক্ষুভিত, ব্যবহারসিদ্ধ, প্রবর্তিত। (ব.শ.)। ৪. **প্রচলন** ও **প্রচলিত** শব্দদুটি যথাক্রমে introduction বা introduced in practice অর্থে প্রচলিত, **প্রচল** অপ্রচলিত। ৫. বাংলায় যেখানে চল, চালু, চলিত প্রভৃতি শব্দ রয়েছে, তেমনি ইংরেজিতে current, currency ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। আমাদের সমস্যা হল **চলন** ও **প্রচলন** এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী, সেটি উদ্ধার করা। **পরিচালক** শব্দে আমরা **চালক** ও **পরিচালক**-এর মধ্যেকার পার্থক্য দেখেছি। **চলন** ও **প্রচলন** শব্দের পার্থক্য অনেকটা সেইরকম। যে কোনো ভাবে চললেই সেটি **চলন**-পদবাচ্য হতে পারে, কিন্তু যেরকম চলাকে **প্র** বা 'চলার স্বভাবে উন্নীত' হয়ে চলিত হতে দেখা যাবে, তাকেই কেবল বলা যাবে **প্রচলন**। যদিও **চলন-প্রচলন, চলিত-প্রচলিত** প্রভৃতিকে দৃশ্যত প্রায় এক করে ফেলা হয়েছে মনে হলেও, বাংলাভাষী যখন কথাবার্তা বলেন, তখন খেয়াল করে দেখলে দেখা যায়, তাঁরা এখনও শব্দদুটির ব্যবহার কমবেশি যথাযথভাবেই করে থাকেন। **চলন**-এর জায়গায় **প্রচলন** কিংবা **প্রচলন**-এর জায়গায় **চলন** ব্যবহার করেন না।

প্রচেতা (প্রচেতাঃ, প্রচেতস্, প্রাচেতস-দক্ষ) : ২. / **প্রচেতাঃ (প্রচেতস্)** = প্রকৃষ্ট চেতঃ যাহার। **প্রাচেতস** = প্রচেতার অপত্য। (ব.শ.)। ৩. **প্রচেতা, প্রচেতাঃ, প্রচেতস্** = প্রকৃষ্টহৃদয়, মহামনা, বরুণ, প্রজাপতিবিশেষ, প্রাচীনবর্হীর দশ পুত্র। (ব.শ.)। (ক) ঋকবেদ অনুসারে, মহর্ষি প্রচেতা বৈদিক যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ইনি দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গল নাশের জন্য কয়েকটি ঋকমন্ত্র রচনা করেন। (খ) বেণ-পুত্র পৃথুবংশীয় প্রাচীনবর্হির স্ত্রী সমুদ্রকন্যা সবর্ণা দশটি পুত্র প্রসব করেন। এঁদের সকলের নাম প্রচেতা। এঁরা দশ সহস্র বৎসর সমুদ্রসলিলে শয়ন করে বিষ্ণুর তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে এঁরা মনুষ্যদের সৃষ্টিকর্তা হন। এই দশজন প্রচেতা মহর্ষি কণ্ডুর

কন্যা মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হয়। (গ) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মার পুত্র। পিতামহ ব্রহ্মা নিজ দেহ থেকে বেদ-বেদাঙ্গে শাস্ত্রবিদ পুত্রদের সৃষ্টি করেন। এঁদের নাম অত্রি, পুলস্ত্য, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু ও বশিষ্ঠ (বোঢ়, কপিল, আসুরী, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ, ও প্রচেতা) (পৌ.অ.)। **প্রাচেতস** = বাল্মীকি, বক্ষ, বরুণপুত্র, প্রাচীনবর্হীরাজের দশ পুত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলির প্রয়োজন পড়ে কেবল পুরাণাদি পড়তে গেলে। সেখানে এই সন্তাটির মুখোমুখি হতে হয়। বোঝা যায়, **দক্ষ**, **অত্রি**, **বেণ** পেরিয়ে ভারতসমাজে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আর এক শ্রেণীর **দক্ষে**র জন্ম হয়। আদি **দক্ষ** যখন প্রজাপতিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সবেমাত্র যৌথসমাজ ভেঙে সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়; কিন্তু তার ব্যবস্থাও ছিল কমবেশি যৌথ। তারই মাঝে যা কিছু সম্পদ জন্মেছিল, সে সবই ছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের। **পৃথু**র বা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তাকে পুনরায় খানিকটা সমান করে নেয়। অতঃপর সেই রাষ্ট্র ক্রমশ মৌলবাদী হতে থাকলে, তার গর্ভে ব্যক্তিমালিকের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে তাদের সবার জন্মের আগে দেখা যায় আর এক শ্রেণীর **দক্ষ** জন্মেছে, যারা তাদের সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি ব্যক্তিগত স্তরেও অনুসরণ করছে। এরাই **প্রচেতা** বা **প্রাচেতস দক্ষ**। এদের হাত ধরেই ব্যক্তিমালিকের জন্ম হয়। এই ব্যক্তিমালিককেই সেকালে বলা হত **মনুষ্য**।

প্রচ্ছদ (পরিচ্ছদ, প্রচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ন) : ১. প্র + ✓ছাদি + অ (ঘ) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***প্রচ্ছদ*** = *যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত করা যায়।* ***পরিচ্ছদ*** = *যাহা দ্বারা সার্বিকভাবে আচ্ছাদিত করা যায়।* ***প্রচ্ছন্ন*** = *প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত যে।* ***পরিচ্ছন্ন*** = *সার্বিকভাবে আচ্ছাদিত যে (অতএব যার কোনো ময়লা দেখা যাচ্ছে না।)।* ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **পরিচ্ছন্ন** শব্দটির অভিধা-অর্থটি (সার্বিকভাবে আচ্ছাদিত অর্থটি) অপ্রচলিত, কিন্তু তার লক্ষণা-অর্থটি (অর্থাৎ, সার্বিকভাবে আচ্ছাদিত বলে তার কোনো ময়লা দেখা যাচ্ছে না, অতএব জিনিসটি সাফ — এই লক্ষণা-অর্থটি) খুবই প্রচলিত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও জোড় শব্দের কুকর্মটি হয়ে রয়েছে। **আশেপাশে** ... প্রভৃতি জোড়শব্দের ক্ষেত্রে যেমন **আশে**র মানে ভুলে গিয়ে বা ফেলে দিয়ে জোড় শব্দটির মানে বোঝা হয় beside, তেমনি **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** শব্দজোড়টির মানে করা হয় clean। আবার পৃথকভাবে **পরিষ্কার** মানে বলা হয় neat বা clean এবং **পরিচ্ছন্ন** শব্দেরও মানে বলা হয় neat এবং clean। আর যেহেতু ইংরেজিতে একটি শব্দজোড় আছে neat and clean, অনেকসময় **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** শব্দের মানে লেখা হয় neat and clean। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ইংরেজি শব্দজোড়টি কোনোভাবেই **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন** শব্দজোড়টির সম্পূর্ণ অর্থ ধারণ করে না। আপনি বিছানা সাফসুফ করলেন, সেটি **পরিষ্কার**; তারপর তার উপর একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন, হয়ে গেল **পরিচ্ছন্ন**।

প্রজন (প্রজনন, প্রজন্ম) : ১. প্র + ✓জন্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***প্রজন*** = *প্রকৃষ্ট (প্রকল্পিত) জন যাহাতে।* ***প্রজনন*** = ***প্রজন*** *অন (on) যাহাতে।* ***প্রজন্ম*** = *প্রকৃষ্ট জন্ম যাহাতে।* ৩. **প্রজন** = প্রথমগর্ভগ্রহণ, গর্ভধারণ, উৎপত্তি, প্রজনন, উৎপাদন, প্রজনয়িতা, প্রবর্দ্ধক। **প্রজনন** = প্রজনয়িতা, উৎপাদক, উৎপাদন, প্রসব, প্রসবকর্ম্ম, শিল্প, যোনি, উৎপত্তি। (ব.শ.)। **প্রজন্ম** = অভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো প্রাণী (generation)। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। পুরুষপরম্পরায় বিশেষ এক স্তর, সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দ (generation)। ৪. **প্রজন** অপ্রচলিত। **প্রজনন** 'সন্তান-প্রসব' অর্থে এবং **প্রজন্ম** generation অর্থে প্রচলিত। ৫. জনন আর **প্রজনন** শব্দদুটির ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। জনন থেকে যে জন্মায় সে হয় 'জাত'। কিন্তু 'প্রকৃষ্ট (প্রকল্পিত) জনন' থেকে যে জাত হয়, সে হয় **প্রজা**। দুটো আদৌ এক বস্তু নয়। **জনন** জনন-মাত্র, কিন্তু **প্রজনন**-এর জন্য **প্র** বা **প্রকল্প** লাগে। সেই কারণে মাছ চাষের পরিকল্পনাকে 'মৎস্য জনন' বলা হয় না, বলা হয় 'মৎস্য প্রজনন' পরিকল্পনা। তবে **প্রজন্ম** কথাটি যথার্থ নয় বলেই মনে হয়। এই শব্দটি বাংলা-শব্দবিধির নিয়ম মেনে সৃষ্টি করা হয়নি। হয়েছে ইংরেজির generation শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বানাতে গিয়ে। অন্যথায় এটি হত **সহজন্ম** বা **সহজন্মা**। তবে যে বিষয়কে বোঝাতে এই **প্রজন্ম** শব্দটি অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা তৈরি করেছেন, তাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক ভালভাবেই জানতেন ও বুঝতেন। তাঁরা একে বলতেন **পুরুষ** (উত্তর**প্রজন্ম** = উত্তর**পুরুষ**) এবং **পর্য্যায়**।

প্রজা (প্রজাসৃষ্টি) : ১. প্র + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *প্রকৃষ্ট (প্রকল্পিত) রূপে জাত যে।* ৩. সন্তত, অপত্য, জন, প্রকৃতি, রাইয়ত (subject), লোক, জন্মী, পুত্রসম স্নেহপাত্র। (ব.শ.)। ৪. 'রাজা'র বিপরীত শব্দ রূপে কমবেশি প্রচলিত। ৫. **প্রজা** শব্দটি অভিধানাদিতে থাকলেও **প্রজাসৃষ্টি** শব্দটি কোনো অভিধানেই নেই। যে জননকর্ম প্রকৃষ্ট (প্রকল্পিত) রূপে করা হয়, এবং তার ফলে যা জাত হয়, তদ্রূপ আধারশক্তিকে **প্রজা** বলে। ফলত, তদ্রূপে প্রকল্প করে যে উৎপাদিত শস্যাদি লাভ করা যায়, তা যদি উৎপাদকদের খাদ্যাদি দিয়ে তাদের ধারণ করে, তাদের যেমন **প্রজা** বলা যায়, তেমনি যে সন্তানসন্ততি উত্তরসূরি রূপে জন্মলাভ করে প্রকল্পিত লক্ষ্যানুসারে শিক্ষাদি পেয়ে উৎপাদকদের ধারণ করে কিংবা উৎপাদকরূপে রাজাকে ধারণ করে, তাদেরও **প্রজা** বলা যায়। পুরাণাদি গ্রন্থে প্রধানত রাজা যে জনগোষ্ঠীকে দিয়ে শস্যাদি উৎপাদন করাতেন, তাদেরই **প্রজা** বলা হত। কিন্তু পুরাণাদির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ভারতসমাজের পরিচালক দক্ষ-মহর্ষিরা তাঁদের বিশেষ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উত্তরসুরিদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতেন। তারা রাজার সহযোগী হয়ে উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালাত। এদেরই বলা হত **প্রজা**। একালের পাশ্চাত্যের তথাকথিত উত্তরাধুনিক সমাজ-চিন্তকেরাও এই **প্রজা**-ধারণায় পৌঁছেছেন তাঁদের নিজের মতো করে। তাঁরা বলেন 'quality people product'। তাঁরা বলেন, আজকাল রাষ্ট্রগুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে 'quality people product' জন্মাচ্ছে না, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট **প্রজা** জন্মাচ্ছে না।

যাই হোক, আমাদের গ্রামবাংলার মানুষেরা কিন্তু **প্রজা** শব্দটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। তাঁরা এর মানে বোঝেন 'রাইয়ত'। পুরাণাদিতে অবশ্য যথার্থ অর্থেই **প্রজা** শব্দটির ব্যবহার হয়েছে বারংবার। বিশেষত, **প্রজাসৃষ্টি** বিষয়ে নানা কথা বলতে গিয়ে শব্দটি বারংবার এসেছে। প্রত্যেক পুরাণের শুরুতে সৃষ্টিবর্ণন রয়েছে, আর সেখানে এসেছে **প্রজাসৃষ্টি**র কথা — ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির বাসনায় অমুক করিলেন, তুসুক করিলেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই নিয়ে কতযুগে কত কাণ্ডই না হয়েছে। তার মধ্যে আমরা এখানে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য উদ্ধৃত করব এবং তার পরে এই **প্রজা** ও **প্রজাসৃষ্টি** বিষয়ে আমাদের উপলব্ধির কথা জানাব।

"কোনো (এক) সময়ে ... বিভু রুদ্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃজনের নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া মন হইতে আপনার সদৃশ সমুদয় প্রজার সৃজন করিয়াছিলেন। তাহারা ... আতঙ্কশূন্য নীলগ্রীবাশালী, ত্রিলোচন, জরামরণবর্জ্জিত এবং দীপ্তশূলধর। তাহারা একেবারে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই সকল নানাবিধ রুদ্রকে দেখিয়া ... বলিলেন, হে দেবদেবেশ! ... আপনি এরূপ প্রজার সৃজন করিবেন না। ... অন্যরূপ মরণশীল প্রজার সৃজন করুন। ... মহেশ্বর রুদ্র হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন — আমি ওরূপ সৃষ্টি করিব না; তুমি মরণশীল অশুভ প্রজার সৃজন কর। ... এই কথা বলিয়া প্রজাসৃষ্টি হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিয়া রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রুদ্র আর শুভ প্রজার সৃষ্টি করেন নাই। ..." (শিবপুরাণ / বায়বীয়সংহিতা / দ্বাদশ অধ্যায়।)

এই সব থেকে নিশ্চিত হওয়া চলে যে, **প্রজা** শব্দটি যদিও সর্বপ্রকারের উৎপাদিত ও আধারগুণসম্পন্ন সন্তাকেই বোঝায়, ভারতে সমাজেতিহাসের চোখে কেবলমাত্র উত্তরসূরি-জনগোষ্ঠীকে বোঝাতেই **প্রজা** শব্দটির ব্যবহার চলে আসছে বহুকাল ধরে। ভারতে সামাজিক ভাবে তাদের জন্ম দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হত না, প্রচলিত **দক্ষ**সুলভ সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে তোলা হত; এবং তাদের মনুষ্যত্ব অর্জনকে তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করা হত। ধীরে ধীরে **প্রজাসৃষ্টি**র এই রীতি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। বর্তমানে এই ব্যাপারটি এতই মন্দ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চালানো হয় যে, একালের প্রকৃষ্ট (পরিকল্পিত) রূপে জাত **প্রজা**রা ধনতন্ত্রীদের টাকা বানানোর যন্ত্রে পরিণত হয়। জড়যন্ত্রের সঙ্গে তাদের পার্থক্য শুধুমাত্র এইটুকু যে, জড়যন্ত্র নিজের মতো আর একটি যন্ত্র বানাতে পারে না, এই **প্রজা**-যন্ত্রটি নিজের মতো বেশ কয়েকটি যন্ত্রেরও জন্ম দিয়ে যেতে পারে। 'শাককে শাক, পঁদে মূলা'। মানুষকে যন্ত্র বানিয়ে ধনতন্ত্রীদের এই প্রকার বাড়তি লাভ হয়। মানুষ হওয়ার গৌরব সৌরভ কিছুই এই **প্রজা**রা পায় না। জন্মায়, বড় হয়, কাজের বস্তুরূপে জীবন খরচ করে দিয়ে মরে যায়। মনুষ্যত্বের এতবড় অবমাননা আর কোনো যুগেই হয়নি।

প্রজাপতি (প্রজাপতিতন্ত্র, অধিরাষ্ট্র) : **২.** *প্রজার পতি* / / জনগণের পতি। (ব.শ.)। **৩.** ব্রহ্মা, ব্রহ্মার তপস্যাজাত মরীচি অত্রি অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতাঃ বসিষ্ঠ ভৃগু নারদ — (মনুসংহিতা অনুসারে) এই দশ জন, (শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে) প্রচেতার পরিবর্তে দক্ষ প্রভৃতি দশ জন, (মহাভারত অনুসারে) ব্রহ্মা স্থাণু মনু ইত্যাদি একুশ জন, দক্ষ, ত্বষ্টা, সূর্য্য, বহ্নি, বিষ্ণু, মনু, রাজা, জামাতা, যজ্ঞ, পতঙ্গবিশেষ। (ব.শ.)। জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর রক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র বলে স্বায়ম্ভুব মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়। এই ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এই মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি। সেইজন্য এই দশ জন ঋষিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে — মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু, ও নারদ। এই দশজন সপ্তর্ষিই প্রজাপতি। ((পৌ.অ.)। **৪.** butterfly অর্থে প্রচলিত। **৫.** স-বৈ-বৌ-হি-মো (সনাতন-বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দু-মোগল) যুগের পর এল ব্রিটিশ যুগ, তারপর আমাদের বর্তমান স্বাধীন ভারত, স্বাধীন বাংলাদেশ। সেইভাবে 'হ-য-ব-র-ল' আর 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' জুড়ে নিলে আমাদের ইতিহাসটা সম্পূর্ণ হয়। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। তারপর সেই বেড়ালটা গেল পালিয়ে। থেকে গেল তার হাসিটা। রুমাল নেই, বেড়ালও নেই, ঝুলে রয়েছে বেড়ালের ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি। হাসি ছাড়া বেড়াল সবাই দেখেছেন। কিন্তু বেড়াল ছাড়া হাসি! অচিন্ত্যনীয়, অকল্পনীয়। কিন্তু সেটাই যে সত্যি! রুমাল নেই, বেড়াল নেই, রয়েছে শুধুই বেড়ালের হাসি!

বাস্তববাদীরা বলবেন, গল্পে এরকম হতেই পারে, বাস্তবে হয় না। ইতিহাসে তো হয়ই না। অথচ আমরা যখন আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখছি, সেই বেড়ালের হাসিটাই দেখা যাচ্ছে। বিশ্বাস না হলে আমাদের পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারগুলির দিকে আপনিও একবার ভাল করে তাকান, অবাক হয়ে দেখবেন, সবটাই বেড়ালের হাসি। রুমালের তো চিহ্নই নেই, বেড়ালও নেই, আছে কেবল তার হাসিটুকু। সেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ হাসিই বিয়েবাড়িগুলিতে **প্রজাপতি**র ছবি হয়ে দোল খাচ্ছে, সেই **প্রজাপতির** নির্বন্ধে সতীনারীর বিবাহ হচ্ছে, তারপর সেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ হাসিই সতীদাহ হয়ে জ্বলছে, সতীপূজায় রূপ পেয়ে বর্তমান সমাজকে ব্যঙ্গ করছে, কতভাবে এবং কী পরিমাণে যে করছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউবা আবার সেই হাসিগুলি থেকে ব্যঙ্গটাকে সযত্নে বাদ দিয়ে তাকে 'আমাদের মহান উত্তরাধিকার' ভেবে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছেন।

তাও দেখতে না পেলে, চলে যান কোনো বাঙালির বিয়েবাড়িতে। দেখবেন ডেকোরেটারের বানানো গেটে, বিয়ের উপচারে, বিয়ের কার্ডে, সর্বত্র **প্রজাপতি**র ছবি, এমন কি ঘটকঠাকুরের অফিসে গেলেও আপনি ওই প্রজাপতিকে দেখতে পাবেন। লোকে সেগুলোকে '**প্রজাপতি** অফিস'ও বলে। দেশে লক্ষ লক্ষ বিয়ে হচ্ছে, আর ডেকরেটাররা লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি বানাচ্ছে, ছাপানীরা কার্ডে **প্রজাপতি**র ছবি ছাপছে। কেন? কারণ একজোড়া পুরুষ ও নারীর বিয়ে মানেই নাকি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। এমনকি কোনো যুবক বা যুবতীর গায়ে প্রজাপতি বসলে, তার বিয়ের কথা বলাটা প্রবাদরূপে এখনও প্রচলিত। প্রজাপতি বিষয়ক এই যে সামাজিক স্মৃতি, একে বাদ দিলে বিয়ে আটকায় না। রাখলে বিয়ে নির্বিঘ্ন হয়, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। তবু এ-প্রথা বহাল আছে।

প্রজাপতি বিষয়ক এই যে উত্তরাধিকার আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি, এটাই বেড়ালের হাসি। সক্রিয় প্রজাপতি (= রুমাল) নেই। কেমন করে সেই সক্রিয় সামাজিক **প্রজাপতি** একদিন ক্রমান্বয়ে রাজা-প্রজাপতিতে পরিণত হয়েছিল, তাও আমরা ভুলেছি (= ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। কেমন করে? কেউ জানে না।)। সেই রাজা-প্রজাপতিও (= বেড়ালও) এখন নেই। আছে শুধু পতঙ্গ-প্রজাপতিরূপে তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ, স্বপ্নের স্মৃতির মতো ছাড়া ছাড়া, ছায়া ছায়া, পারম্পর্যহীন (= ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি)। আজকের ভারতসমাজ এরকম অজস্র 'বেড়ালের হাসি' বহন করে নিয়ে চলেছে, অনন্যোপায়। **প্রজাপতি দক্ষের** দক্ষযজ্ঞের সতী এবং পরবর্তীকালে আর যেসকল সতী — কুন্তী, তারা, অহল্যা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, সতীলক্ষ্মী, সবই তো তাই।

অথচ একটা যুগ ছিল, সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভবেরও আগে, যৌথসমাজ তখন সবে বড় বড় চাঁইয়ে বা দলে-উপদলে ভাঙছে, 'মহর্ষি-পরিচালিত সম্প্রদায়' রূপে সেই উপদলের নামকরণ হচ্ছে, সে সমাজ তখন পরিচালিত হত এক বা একাধিক মহর্ষির বা সুপারভাইজারের দ্বারা, যাদের বলা হত **প্রজাপতি**। আমাদের পুরাণাদিতে তাঁদের কীর্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সে ছিল ভারতসমাজে **প্রজাপতিতন্ত্রের** যুগ। তারও আগে ছিল মহান ও মহিলাদের যুগ, যাঁরা ছিলেন '**প্রজাপতি**পদবাচ্য, কিন্তু **প্রজাপতি** নহে'। তার মানে, আদিম কাল থেকে চলে আসা সনাতন সমাজটির পরিচালকেরা কোনো ধরনের **তন্ত্র** ছাড়াই সমাজ চালাতেন। সামাজিক ব্যবস্থা বা **তন্ত্রের** প্রথম উদ্ভব **দক্ষযজ্ঞের** ঠিক পরে, **প্রজাপতি দক্ষের** মাধ্যমে। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের আগেই এই **প্রজাপতি**-পরিচালিত সমাজব্যবস্থার বা **প্রজাপতিতন্ত্রের** উদ্ভব হয়েছিল। এ ছিল অত্যন্ত শিথিল বন্ধনে বদ্ধ সমাজব্যবস্থা, যাকে অন্যত্র আমরা **অধিরাষ্ট্র** নামে অভিহিত করেছি। এর কোনো সৈন্যবাহিনী নেই, আমলাতন্ত্র নেই, শাসক-শাসিত নেই ... আছে কেবল পরিচালিত-পরিচালকের সম্বন্ধে আবদ্ধ **প্রজা**সমুদায় আর **প্রজাপতি**। কোন কোন পরিচালকের সঙ্গে কারা কারা সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হবে, সেটা সেই **প্রজাপতিরাই** ঠিক করে দিতেন। শুককীট থেকে জাত, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো পতঙ্গ যেমন পরাগ-মিলনের সহায়ক, এই সামাজিক শুককীট-জাত, সমাজ-আকাশে উড়ে বেড়ানো 'পতঙ্গ'গণও সেকালে সম্প্রদায়ের বা দল-উপদলের **অতিথি** হয়ে সেকালের উপযোগী 'প্রোডাকসন ম্যানেজমেন্টের' কাজটা করে দিতেন এবং সেকারণেই 'প্রজাগণের পতি' বা **প্রজাপতি** রূপে তাঁরা সর্বত্র প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এঁরা নিজেরা সম্পদ সঞ্চয় করে জমাতেন না, মৌমাছির মতো। কাউকে হুল ফোটানোও এঁদের স্বভাববিরোধী ছিল। একই স্বভাবচরিত্রের কারণে সমচরিত্রের ক্ষুদ্র পতঙ্গটিকেও (সেকালের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে) লোকে **প্রজাপতি** নাম দিয়ে দেয়। যদিও ইতিহাস-হারা আজকের ভারতবাসী প্রকৃত **প্রজাপতি**দের কথা ভুলে গিয়ে এখন কেবলমাত্র পতঙ্গরূপী প্রজাহীন-**প্রজাপতি**কেই (= butterfly-কেই) মনে রেখেছে।

যতদূর বোঝা যায়, আমরা যাকে **প্রজাপতিতন্ত্র** নাম দিয়েছি, তার প্রথম যুগে, সেই '**প্রজাপতিপদবাচ্য**'রা ছিলেন মানবসমাজের নয়নের মণি, **সামাজিক উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ** থেকে উত্থিত দুধ-সর-মাখন তাঁরা স্বতঃই **উপঢৌকন** পেতেন। তাই তাঁরা ছিলেন butterfly, যদর্থ flighty person, **ফুলে ফুলে** উড়ে বেড়ানো **প্রজাপতি**। তাঁরা ছিলেন gay, যার মানে ছিল lively, bright, sportive ... ইত্যাদি।

দক্ষযজ্ঞের পর সমাজ যখন যৌথসমাজ থেকে পরিবারভিত্তিক সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজের দিকে হাঁটা দিল, 'প্রজাপতিতন্ত্র' সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল, স্থায়ী হল, সর্বপ্রকার উৎপাদন-যজ্ঞেও স্থায়িত্বের দাবি উঠল স্বাভাবিকভাবেই। একই কর্মের দীর্ঘকালীন পুনরাবৃত্তির এই দাবিকে জায়গা করে দিতে সর্বত্র স্থায়ী-জোড়বাঁধার ব্যবস্থা হল; দীর্ঘকালীন চুক্তিবন্ধনে কর্মরত হবার দাবি উঠল। সেই দাবি পূরণ করতে গিয়ে **প্রজাপতি**রা পরিচালিতদের কামনাকে (**কামদেব**কে) ভস্ম করে দেওয়ার পথ বের করলেন; **মদনভস্ম** হল, বেঁচে থাকল শুধু রতিবিলাপ। প্রজাপতির নির্বন্ধেই ঠিক হতে লাগল, কোন পরিচালকের সঙ্গে কারা কীরূপ চুক্তিতে (= বিবাহবন্ধনে) আবদ্ধ হয়ে কর্মরত হবে, কোন নরের সঙ্গে কোন নারী বিবাহবন্ধনে (= চুক্তিতে) আবদ্ধ হয়ে কর্মরতিবিলাপে নিমগ্ন হবে।

মনে রাখা দরকার, ভারতসমাজের ইতিহাস অনুসারে মদনভস্মের আগে 'বিবাহ'-এর (= চুক্তির) রেওয়াজ ছিল না। কারণ মদনকে (= প্রেমভাবনাকে) ভস্মে পরিণত করতে না পারলে, সতী নারী তার রতিলীলাজাত কর্মফলের উপর অধিকার দাবি করতই; সকাম প্রেমের যা স্বাভাবিক দাবি। তাই প্রয়োজন হয়েছিল কামহীন প্রেমের বা নিষ্কাম প্রেমের। একমাত্র নিষ্কাম প্রেম থাকলেই, নর-নারীর জোড়বাঁধার ক্ষেত্রে চুক্তি-প্রথার বা বিবাহ-প্রথার প্রচলন করা সম্ভব ছিল। বলা সম্ভব ছিল, উৎপাদিত ফসলের বা সন্তানের অধিকার কেবল পরিচালকের, স্বামীর, নরের। সেই কারণে প্রয়োজন হয়েছিল পরিচালিতদের ও নারীদের নিষ্কাম-প্রেমে দীক্ষা। পরিচালিতেরা, নারীরা হবে একনিষ্ঠ, সতী, কিন্তু সেই কর্তব্যের বিপরীতে যে অধিকার, তার দাবি তারা ছেড়ে দেবে। 'আসবে, কথা মতো কাজ করবে, দাম নেবে, ফলাফল কী হল না হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, মনপ্রাণ ঢেলে ভালবেসে কাজ করবে, তোমাদের প্রেম হবে নিষ্কাম প্রেম'; কিংবা 'খাবে-দাবে, শৃঙ্গার করবে, ঘরকন্নার কাজ দেখবে, ব্যাস! বাকি ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আমি যা ভাল বুঝব, করব' — এই কথা বলেই কেবল নারীর প্রেমভাবনাকে, পরিচালিতের প্রেমভাবনাকে (= মদনকে) ভস্ম করা যেত, ভস্ম করা গেল। শুরু করা গেল একই কর্মের কামহীন রতিবিলাপ, যা একান্তভাবেই ক্লান্তিকর। কত ক্লান্তিকর, ভুক্তভোগী কেরানি থেকে শুরু করে নিষ্ঠাবতী নারীরা পর্যন্ত সবাই কমবেশি বোঝেন।

অর্থাৎ ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করতে করতে **প্রজাপতি** ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মরাক্ষসে পরিণত হলেন। 'কর্ম থেকে ফলাকাঙ্ক্ষাকে পৃথক করে নিয়ে কর্মের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হল।' (রবীন্দ্রনাথ)। শুরু হল নিষ্কাম-প্রেমের যুগ, পণ্য-উৎপাদনের যুগ, বাপের বেটা উৎপাদনের যুগ। পণ্যের উৎপাদন থেকে সন্তান উৎপাদন, সর্বত্রই একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি কঠোর

ভাবে অনুসৃত হতে লাগল। কর্মোন্মাদনার (মদনের বা প্রেমের) মৃত্যু হল, প্রেমের বন্ধন পরিণত হল চুক্তির (= বিবাহের) বন্ধনে, রতিলীলা পরিণত হল একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনক ক্লান্তিকর রতিবিলাপে। সৎ পুরুষ ও সতী নারী উভয়ের জীবনে নেমে এল গ্লানি। gay-র মানে হয়ে গেল নিষ্কর্মা, অনুৎপাদক, নপুংসক, হোমোসেক্সুয়াল। ক্রমে **প্রজাপতি**দের পরাগমিলন ঘটিয়ে দেওয়ার গৌরবকে ছাড়িয়ে গেল তাদের কলঙ্ক — 'ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো' খারাপ কাজ বলে সমাজের চোখে নিন্দিত হয়ে গেল।

এই পরিস্থিতি সামাল দিতে একদিন **প্রজাপতিতন্ত্র** ধ্বংস করার উপক্রম হল। **প্রজাপতি**-মহর্ষিরা সেই চেষ্টাকে পর্যুদস্ত করে তাঁদের অধীনে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর বা আদি রাষ্ট্রের (**পৃথু**র) জন্ম দিলেন, **রাজতন্ত্রের** জন্ম হল। সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের সুপারভাইজারি করবার সামাজিক উচ্চাসন থেকে **প্রজাপতি**রা নিজেদের সরিয়ে নিলেন। সেখানে বসিয়ে দেওয়া হল রাষ্ট্রকে বা ক্ষত্রিয়কে। কিন্তু জীবনের বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে **প্রজাপতি**দের অধিকার ও কর্তব্য যথাপূর্বং থেকে গেল। নরনারীর মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার বা তাদের 'প্রোডাকসন ম্যানেজমেন্ট' দেখাশোনা করবার দায়িত্বটা রাষ্ট্রকে দেওয়া হল না। সেই দায়িত্ব যথারীতি থেকে গেল **প্রজাপতি**দের হাতেই। অর্থাৎ, প্রজাপতিরা সমাজের উচ্চাসনে (**অধিরাষ্ট্রে**) যথারীতি থেকে গেলেন। অবশ্য কালে কালে ক্রমে ক্রমে অধিরাষ্ট্রের বহু ক্ষমতাই চলে গেল রাষ্ট্রের হাতে। সমাজও বহু বিভাজিত হয়ে বহু দেশ কাল পাত্র পেরিয়ে যেমন আজকের গোলোকায়িত সমাজে পৌঁছে গেল, তেমনি **প্রজাপতি**রাও বহু ভাগে বিভাজিত হয়ে অজস্র দেশ-কাল-পাত্র পেরিয়ে এসে পৌঁছোলেন তাঁদের বর্তমান অবস্থানে — সর্বপ্রকারের বেসরকারি শিক্ষক, ধর্মগুরু, পুরোহিত, মোল্লা, পাদ্রি, বেসরকারি ডাক্তার-বদ্যি-হেকিম ... থেকে একেবারে বিয়ের ঘটকঠাকুর পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁরা আজও সক্রিয় রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এই খণ্ড-বিখণ্ড রূপটিকে তো **প্রজাপতি** বলা যায় না। সমাজ তাই নামটা কেবল পতঙ্গরূপী **প্রজাপতি**র জন্যই বরাদ্দ রেখে দিল। আর আদি **প্রজাপতি**দের বা 'প্রজাপতি-পদবাচ্য'দের স্বর্ণযুগের যত গৌরব ছিল, তার ছায়া বহন করে '**প্রজাপতি**' নামক পতঙ্গের ছবিটি ছড়িয়ে পড়ল সমাজ মনে, **সামাজিক জীবাশ্ম**রূপে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা পাথুরে জীবাশ্মগুলোই যা হোক করে খানিকটা পড়তে পারলেন, **সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানসিক জীবাশ্ম**গুলিকে আর পড়তেই পারলেন না। **রুমাল** তো আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল, বেড়ালও গেল, কেবল বেড়ালের হাসি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে বিয়ের কার্ডে, বিয়েবাড়ির গেটে '**অর্থহীন**' ঝুলতে লাগল।

কেন 'অর্থহীন' হয়েও সেই সামাজিক জীবাশ্মগুলি বিলুপ্ত হয়নি। নানান বিকৃতি নিয়েও সমাজমনে তারা টিকে থাকে কেমন করে? কিংবা বলা ভাল, টিকে থাকবার জোর পায় তারা কোথা থেকে? এর উত্তর দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে 'সত্যের উপলব্ধি' কখনো বিলুপ্ত হয় না। কোনো না কোনো ভাবে তা টিকে থাকবেই — প্রবাদরূপে, চিহ্নরূপে, সামাজিক জীবাশ্মরূপে, অর্থহীন প্রথারূপে। কারণ তার পেছনে 'সত্য' ছিল, সত্য রয়েছে, হোক না সে বিস্মৃত, ছাড়া-ছাড়া, ছায়া-ছায়া, বিকৃত। তবুও সেই 'সত্যোপলব্ধি'র গৌরব, মানুষের অগ্রগতিতে তার অবদান, সমাজ ভুলতে পারে না। বলতে গেলে অনন্যোপায় হয়েই সমাজ সেই 'সত্যে'র ভাঙা ভাঙা স্মৃতিকণাগুলো নানাভাবে বহন করতে থাকে, করে। ... ভাগ্যিস করে! নইলে উত্তরসূরিরা তাদের অতীতকথা উদ্ধার করবে কোথা থেকে!

প্রজাতন্ত্র : ৩. জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা বা শাসিত রাষ্ট্র (republic)। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। সাধারণতন্ত্র, প্রজাবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন বা শাসিত রাষ্ট্র (republic)। (স.বা.অ.কলকাতা)। ৪. উপরোক্ত republic অর্থে প্রচলিত। ৫. **প্রজাতন্ত্র** শব্দটি প্রাচীনযুগে বা মধ্যযুগে ছিল না, উপরোক্ত ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে তৈরি করা হয়েছে সম্প্রতিকালে; আর তা করেছিলেন সেই বাংলাভাষী পণ্ডিতেরা, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা-পূর্বকালে **পদার্থবিজ্ঞান**-জাতীয় শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। ফলত, ইংরেজি শব্দগুলির তুলনায় **প্রজাতন্ত্র** অনেক উচ্চ মানের শব্দ হয়ে গেছে। কেননা, এতে **প্রজা** ও **তন্ত্র** এই দুটি উচ্চমানের ধারণাধারী শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। ইংরেজি republic-এর public **প্রজা**র তুলনায় ক্ষুদ্র ধারণা ধারণ করে, আর **তন্ত্র** বা system কথাটি তো republic-এর ভিতরে নেই বললেই চলে।

প্রজ্ঞ (প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাত, প্রজ্ঞান) : ১. প্র + √জ্ঞা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***প্রজ্ঞ*** = *প্রকৃষ্ট জ্ঞান (লাভ করেছে) যে।* ***প্রজ্ঞা*** = ***প্রজ্ঞ****-এর (প্রকৃষ্ট জ্ঞানের) আধার যে।* ***প্রজ্ঞান*** = ***প্রজ্ঞা*** *অন (on) যাহাতে।* ***প্রজ্ঞাত*** = ***প্রজ্ঞান*** *তারিত যাহাতে।* ৩. **প্রজ্ঞ** = প্রজ্ঞাযুক্ত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী। **প্রজ্ঞা** = বিদুষী, পণ্ডিতা, বুদ্ধি, মতি, সরস্বতী। **প্রজ্ঞাত** = সম্যক বিদিত, অবগত, প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ, মহাপ্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত। **প্রজ্ঞান** = প্রকৃষ্টজ্ঞান, পণ্ডিত, সম্যগ্‌বোধ, অবগতি, বুদ্ধি, মতি, চিহ্ন। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. **প্রজ্ঞা** বললে সাধারণভাবে আমরা 'সম্যগ্‌বোধ' বুঝে থাকি। কিন্তু শব্দটি বলছে, সে হল **প্র** জ্ঞান। অর্থাৎ এই জ্ঞান **আজ্ঞা**(ন) নয়, **বিজ্ঞা**(ন)ও নয়, **অভিজ্ঞা**(ন) কিংবা **প্রতিজ্ঞা**(ন)ও নয়। এ এমন একরকম **জ্ঞা** বা জানা, যে জানায় সবকিছুর **প্র**-কে জানা যায়। তার মানে, প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর ভিতরে যে **প্র** (আধার-আধেয়) রয়েছে, তাকে জানলে যে-জ্ঞান হয়, সেই হল **প্রজ্ঞা**। অর্থাৎ কিনা, **প্র**-বিষয়ক জ্ঞানই হল **প্রজ্ঞা**।

প্রণব : ১. প্র + √নু + অ (অপ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. প্রকৃষ্ট *নব (নতুনরূপে উত্তীর্ণ নাকরণ-অনকরণ) যাহাতে। / যাহা* দ্বারা বেদ স্তুত বা প্রারব্ধ। (ব.শ.)। ৩. ওঙ্কার, বাদ্যবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। ৫. আমাদের ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রে এই শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। এর অর্থ নিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের ভিতরে বিস্তর তর্কবিতর্ক রয়েছে। সেসব তর্কে যাওয়ার অধিকার বা প্রয়োজন

কোনোটিই আমাদের নেই। আমরা শব্দটির ভিতরে ঠিক কী রয়েছে কেবল সেটুকুই জানতে চাই। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় নাকরণকে হাঁকরণ করা হয়, কিংবা হাঁকরণকে নাকরণ করা হয়, তদ্রূপ **নু**-ক্রিয়াকে **প্র**কৃষ্টভাবে করার কথা বলা হয়েছে। এর প্রায়োগিক রূপ কেমন হতে পারে, সেকথা সংশ্লিষ্ট **প্রণব**কারীগণ নিশ্চয় বলতে পারবেন।

প্রণাম (প্রণত, প্রণতি, প্রণমিত, প্রণম্য, প্রণামী) : **১.** প্র + ✓নম্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রণাম*** = *প্রকৃষ্টভাবে নামা হয় যাহাতে।* ***প্রণত*** = *প্রকৃষ্টভাবে নত হইয়াছে যে।* ***প্রণতি*** = ***প্রণত*** *গতিশীল যাহাতে।* ***প্রণমিত*** = *যাহাকে প্রকৃষ্টভাবে নমিত করা হইয়াছে।* ***প্রণম্য*** = *প্রকৃষ্ট নমন থাকে যাহাতে।* ***প্রণামী*** = ***প্রণাম*** *গতিশীল হইয়া ধারিত যাহাতে।* / **প্রণামী (প্রণামি)** = দেবতাদির প্রণামকালে যে অর্থ দেওয়া হয়; রাজা বা রাজপ্রতিনিধিকে সম্মানার্থ যে অর্থ দেওয়া হয়। (ব.শ.)। **৩. প্রণাম** = প্রণতি, নমন, নম্রীভাব। **প্রণত** = অতিনত, অবনত, প্রহ্ব, বিনীত, নম্রীভূত। **প্রণতি** = প্রণমন, নতভাব, বিনীতভাব, নম্রতা। **প্রণমিত** = কারিতনমন, অবনমিত। **প্রণম্য** = নমস্কার্য্য, পূজ্য। (ব.শ.)। **৪.** respect জানানোর আচরণ রূপে **প্রণাম** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি প্রচলিত। **৫.** মূল অর্থ ছিল নমনীয় হওয়ার বা নামার প্রকৃষ্ট রূপটির আচরণ করা — নিজে নমনীয় হওয়া, অন্যকেও নমনীয় করা, কেউ যেন কঠিনকঠোর শক্ত কড়া মৌলবাদী না থাকে। বাহ্যিকভাবে তার প্রকাশ ঘটানো হয় মাথা ঝুঁকিয়ে বা নামিয়ে এবং সেই **নমন** দিয়ে **নমস্য**কে নমনীয় করে দিয়ে। এই ক্রিয়াটি **প্র**কৃষ্টভাবে করতে হলে কী করতে হয়, আমরা ঠিকঠাক জানি না। অজ্ঞাতপরিচয় কবি বলেছেন — 'প্রেমে জল হয়ে যাও গলে / কঠিনে মেশে না সে, মেশে সে তরল হলে।' **প্রণাম**-এর মূলে যদি এই **প্রেম** বা **প্রণয়** থাকে, তবেই তা **প্রণাম**-পদবাচ্য কি না, তা নিয়ে আমাদের সংশয় এখনও কাটেনি।

প্রণয় (প্রণয়ন, প্রণয়ী) : **১.** প্র + ✓নী + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রণয়*** = *প্রকৃষ্ট নী (নাকরণ-অনকরণের গতিশীলতা বা আনয়ন-দেওয়ন) যাহাতে।* ***প্রণয়ন*** = ***প্রণয়*** *অন (on) যাহাতে।* ***প্রণয়ী*** = ***প্রণয়*** *গতিশীলভাবে ধারিত যাহাতে।* **৩. প্রণয়** = যাচ্ঞা, প্রার্থনা, বিশ্বাস, প্রসব, প্রশ্রয়, নির্ব্বাণ, পরিচয়, প্রেম, স্নেহ, স্নেহনিমিত্ত বিশ্রম্ভ, স্নেহজন্য প্রসাদ। **প্রণয়ন** = প্রাপণ, উদ্ধরণ, করণ, বিধান, সৃষ্টি, রচনা, গ্রন্থন, প্রকর্ষভাবে উহন, কল্পন, বিতর্কণ। **প্রণয়ী** = প্রণয়বান, প্রেমযুক্ত, অনুরক্ত, প্রার্থনাবান, প্রার্থী, সৌহৃদবান, মিত্রতাপন্ন, প্রিয়, পতি, স্বামী, প্রিয়তম, অর্থী, যাচক, সহচর, সুহৃৎ। (ব.শ.)। **৪.** love অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **নয়**। **নী** ক্রিয়ার ভিতরে অপ্রয়োজনীয়কে সরিয়ে বা ফেলে দিয়ে প্রয়োজনীয়কে আনয়ন করার কথা বলা হয়। তবে নেওয়ার সময় এই যে 'সরিয়ে' বা 'ফেলে' দেওয়ার কাজটি করতে হয়, তা যদি প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে করা হয়, অর্থাৎ প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে 'সরিয়ে-ফেলে' রেখে রেখে তবেই নিজের প্রয়োজনীয়কেও নিয়ে নেওয়া হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে 'প্রকৃষ্টরূপে আনয়ন' বা **প্রণয়** বোঝাবে। কেননা, তাহলেই নেওয়ার সমতালে দেওয়াও বোঝায়, তাই **প্রণয়**।

এই পর্যন্ত মোটামুটি বোধ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু যেই না আপনি 'গ্রন্থ **প্রণয়ন**'-এর কথা বলবেন, তৎক্ষণাৎ সমস্যায় পড়ে যাবেন। এই **প্রণয়ন**-এর ভিতরে **প্রণয়** কোথায়? আছে। তবে এ **প্রণয়** love নয়; এ **প্রণয়** হল **কৃষ্ণ-কালা**র (দ্র. **গৌরী**) সাধনা করে সাধ্যমতো তাঁর প্রসাদলাভ ক'রে তা এনে (আনয়ন করে) সকলের দর্শন বা জানার জন্য **গৌরী-রাধা**রূপে তাঁকে প্রকাশ করে দেওয়া (দিয়ে দেওয়া)। একালের প্রচলিত ভাষায় বললে, অজানা জ্ঞানের এলাকা থেকে নতুন জ্ঞান অর্জন করে নিয়ে এসে পাঠকের উদ্দেশ্যে তা দিয়ে দেওয়াকে বলা হয় **'গ্রন্থ প্রণয়ন'**। তার মানে, যে গ্রন্থে কোথাও থেকে কিছু এনে পাঠকের উদ্দেশ্যে দেওয়া নেই, তাকে গ্রন্থ **প্রণয়ন** বলা যায় না।

প্রতর্দন : **বীতহব্য** দ্রষ্টব্য।

প্রতান : দ্র. **তান**। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৮-৫৯)।

প্রতারক (প্রতারণ, প্রতারণা) : **১.** প্র + ✓তারি + অক (ণ্বুল্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রতারক*** = *প্রকৃষ্টভাবে তারিত (উত্তীর্ণ) করে যে।* ***প্রতারণ*** = *প্রকৃষ্ট তারণ যাহাতে।* ***প্রতারণা*** = ***প্রতারণ****-এর আধার যে।* **৩. প্রতারক** = বঞ্চক, শঠ। **প্রতারণ** = বঞ্চন, প্রতরণ, উত্তরণ। **প্রতারণা** = বঞ্চনা। (ব.শ.)। **৪.** cheat ও cheating অর্থে **প্রতারক** ও সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি প্রচলিত। **৫.** এ তো ভারি মুশকিলের কথা হল! একজন আপনাকে ঠকাল বা cheat করল, আর **প্রতারক** শব্দের অর্থ প্রকাশ করে শব্দকোষ বলে কিনা **প্রতারক** আপনাকে 'প্রকৃষ্টভাবে তারণ করেছে'! ভাবনার কথা বৈকি!

আসলে ব্যাপারটি সেরকম নয়। রামের একটি বস্তু বা বিষয় ছিল, যা খারাপ হয়ে গেছে। সেটি নিয়ে সে কী করবে তাই নিয়ে তার চিন্তা। হাজার হোক, তার জিনিসটি তো সে মুফতে পায়নি, টাকা লেগেছে, শ্রম মেধা ইত্যাদি লেগেছে; এখন নাহয় তাতে ত্রুটি ধরা পড়েছে। ... এমন সময় শ্যামকে পাওয়া গেল, যে কিনা ভাল দাম দিয়ে রামের বস্তুটি নিয়ে নিল। এর ফলে রামের বস্তু বা বিষয়টির 'প্রকৃষ্ট তারণ' ঘটে গেল। রামের এই **প্রতারণা**র ফল ভুগবে শ্যাম। অতএব রামের কাছে এই **প্রতারণা** ক্রিয়াটি তার বস্তু ও বিষয়ের সর্বোচ্চ **তারণ** ঘটাচ্ছে বটে, এবং সেই হিসেবে রাম 'প্রকৃষ্ট তারক' বা **প্রতারক**ও বটে; কিন্তু শ্যামের কাছে রাম হল বঞ্চনাকারী, cheat।

প্রতি (প্রত্যেক, প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়াশীল) : **২.** ***প্র*** *(দ্র.* ***প্র****)* *তারণ গতিশীল যাহাতে।* **৩.** প্রতিনিধি, প্রতিদান, বীপ্সা, বিষয়বিষয়িভাব, ভাগ, মাত্রা, ক্ষেপ, নিশ্চয়, ব্যাবৃত্তি, সমাপ্তি, ত্যাগ, সাদৃশ্য, প্রশস্তি, বিরোধ, সমাধি, আভিমুখ্য, লক্ষ্যীকরণ, স্বরূপবচন, নিকট, বিষয়, হিংসা, অঙ্গীকার, ব্যাধি, ব্যাপ্তি, বারণ। **প্রত্যেক** = এক একের প্রতি, প্রতিজন, একশঃ। **প্রতিক্রিয়া** = প্রতিকার, নিবারণ, উচ্ছেদ, দোষপ্রশমনোপায়। (ব.শ.)। **প্রতিক্রিয়াশীল** = প্রগতিবিরুদ্ধ (reactionary)। (ব্য.বা.অ.ঢাকা, স.বা.অ.কলকাতা)। **৪.** সব শব্দগুলিই ব্যাপক ভাবে যথার্থে প্রচলিত; শুধু **প্রতিক্রিয়াশীল** শব্দটি প্রতীকী অর্থে বা বিশেষার্থে reactionary বোঝাতে প্রচলিত। **৫.** দ্র.

প্র। **প্রতি** একটি উপসর্গ। উপসর্গের যা স্বভাব, তার সবই রয়েছে এই শব্দে (দ্র. **পরা**, **প্র**)। এর অর্থ হল 'প্র-এর তারণ গতিশীল যাহাতে'। তার মানে, বিন্দু থেকে সিন্ধু পর্যন্ত যে কোনো বস্তুরই আধার-আধেয় বা **প্র** রয়েছে এবং সেই আধার-আধেয় বস্তুটির অস্তিত্বে সদা সক্রিয় রয়েছে। সেইকারণে হরেক বস্তুকেই **প্রতি** (every) বস্তু বলে বা **প্রত্যেক** বস্তু বলে। আর, '**প্রতি** + **এক** বস্তু' মানেই '**প্রত্যেক** বস্তু'। আর, তারা হরেকজনই **প্রতি-এক** এইজন্য যে, তার ভিতরের **প্র** (আধার-আধেয়) বস্তুটির অস্তিত্বে তারিত হয়ে গতিশীল রয়েছে। নিউট্রিনো থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত এই বিশ্বজগতে এমন একটিও বস্তু বা বিষয় নেই, যার আধার-আধেয় নেই, **প্র** নেই। প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে **প্র** তারিত হয়ে রয়েছে বলেই তারা **প্রত্যেক**-বস্তু নামে কথিত হতে পারে।

কিন্তু যখন বাইরের থেকে কিছু একটা এসে সেই বস্তুর উপর পতিত হয়ে ক্রিয়া করতে শুরু করে, তখন বস্তুটির আধার-আধেয় চুপচাপ বসে থাকতে পারে না; তার '**প্র**-এর তারণ' সমাগত ক্রিয়ার বিপরীতে গতিশীলভাবে খাড়া হয়ে যায়। একেই বলে **প্রতিক্রিয়া** (counter action)। **প্রতি-ক্রিয়া**র এই **প্রতি** স্বভাবতই হরেক (each বা every) নয়, এ হল counter। অথচ দেখা যাচ্ছে, একই **প্র**-র তারণ গতিশীল রয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। যেনবা এ এক লেঠেলদের আখড়া, লাঠি হাতে লোকেরা সেখানে মারামারি করতে থাকে; কখনো দৈনন্দিন স্বাভাবিকতায়, কখনো আক্রান্ত হওয়ার পর। তার মানে, **প্রতি** শব্দটির একই ক্রিয়া থাকলেও দুটি রূপ রয়েছে — স্বাভাবিক-**প্রতি** ও বিপরীত-**প্রতি**। ...

অতএব **প্রতি** শব্দের এই যে ক্রিয়াভিত্তিক মূল অর্থ ('**প্র**-র তারণ গতিশীল যাহাতে') তার থেকে স্বভাবতই নানা সত্তাকে শনাক্ত করা যেতে পারে। পারে বলেই বহু কিছুকে **প্রতি** শব্দের অর্থ বলে মনে হয় এবং প্রচলিত অভিধানাদি তার নানা অর্থ সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু প্রতিটি অর্থের প্রেক্ষিতে গিয়ে দেখা যায়, শনাক্ত করা অর্থটির ভিতরে আসলে কোনো না কোনোভাবে **প্র**-র তারণ গতিশীলভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রতিকার : ৫. কারও কিছু করা বা **কার** আপনার পথরোধ করে দাঁড়ালে আপনি যে বিপরীত **কার** করে সেই রুদ্ধ পথ মুক্ত করবেন, সেই **কার**-কে বলে **প্রতিকার**। এখানে যে **প্রতি**র ব্যবহার হয়েছে, সেটি বিপরীত-**প্রতি**।

প্রতিকৃতি : ২. *প্রতি কৃত গতিশীল যাহাতে।* ৩. প্রতিবিধান, **প্রতিক্রিয়া**, বৈরশোধন, বৈরনির্য্যাতন, প্রতিরূপ, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি, আলেখ্য, চিত্র, প্রতিনিধি, সাদৃশ্য। (ব.শ.)। ৪. statue অর্থে প্রচলিত। ৫. ধরা যাক, কেউ আপনার উপর কিছু করেছে এবং তার কারণে আপনার ক্ষতি হয়েছে। এর **প্রতিক্রিয়া** স্বরূপ আপনি কিছু করলে সেটি হবে **প্রতিকৃতি**। উপরোক্ত ৩.-এ প্রদত্ত অর্থগুলিতে এইরূপ অর্থগুলিই দেওয়া আছে। কিন্তু এইরূপ **কৃতি**র বিপরীতে **প্রতিকৃতি** করা হয়ে থাকলে তা 'প্রতিবিধান ... বৈরনির্য্যাতন' পর্যন্ত বোঝাতে পারে বটে, কিন্তু 'প্রতিরূপ ... থেকে ... সাদৃশ্য' পর্যন্ত কেন যে বোঝায়, তার কারণটি চট করে বোঝা যায় না। তবে যাঁরা প্রতিমা গড়তে দেখেছেন, তাঁরা ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। যে মূর্তি বানানো হবে, সবার আগে তার একটি মুখ বানিয়ে ফেলা হয়। সেই মুখাবয়ব কাদার উপর রেখে তৈরি করা হয় একটি ছাঁচ। অতঃপর, সেই ছাঁচে কাদা চেপে ধরে যতগুলি প্রয়োজন ততগুলি মুখ বানিয়ে ফেলা হয়। এই প্রথম বানানো মুখটিকে বলা হয় **কৃতি**। তার ছাঁচ তুলে নিয়ে তারপর সেই ছাঁচের সাহায্যে যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুখগুলিকে বানানো হয়, সেগুলিকে বলে **প্রতিকৃতি**। যেহেতু **কৃতি**র প্রতিক্রিয়া রূপে পরবর্তী কৃতিগুলি তৈরি হয়, সেই কারণে সেগুলিকে **প্রতিকৃতি** বলে। দ্র. **প্রতিমা**।

প্রতিগ্রহ : ২. *গ্রহণের বিপরীতে যাহা গ্রহণ করা হয়।* ৩. স্বীকার, গ্রহণ, বিধিবদ্ দেয় দ্রব্যের গ্রহণ, অদৃষ্টপ্রয়োজন-দত্ত দ্রব্যের গ্রহণ (ইহা ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের একতম), মঙ্গলাচারপূর্ব্বক দর্শনস্পর্শন, পরিণয়, প্রতিগৃহীত দ্রব্য, পতদ্‌গ্রহ, পিকদানী। (ব.শ.)। ৪. সাধারণভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। ৫. দ্র. **গ্রহ** (১ম খণ্ড)। অন্যকে কিছু দিলেন, সে নিল, তার এই গ্রহণের বিপরীতে সে কিছু দিলে এবং আপনি তা নিয়ে নিলে আপনি **প্রতিগ্রহ** করলেন। কিছু দিলে কিছু নিতে হয় — এই সাধারণ কথাটি সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে কত দীর্ঘ মানসিক সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল, **প্রতিগ্রহ** শব্দটি এখনও তার জীবিত সাক্ষী। আদিম যৌথ সনাতন সমাজের মানুষেরা ভাবতেই পারতেন না যে, তাঁরা যা সংগ্রহ করে বা উৎপাদন করে এনে শিশু-বৃদ্ধ-গর্ভবতীদের দিয়ে দিচ্ছেন, তার বদলে তাঁদের কিছু পাওয়া উচিত! ঠিক যেরকম পশুপক্ষীরা তাদের সন্তানসন্ততিদের খাদ্য দান করলেও 'দান করেছি' এরকম কোনো বোধ জন্মায় না, অনেকটা সেইরকম। সেই সনাতন সমাজের বুক চিরে যখন বৈদিক সমাজের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হল, জ্ঞানজীবীর বিশেষ **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা হল, তখন কথাটির উদ্ভব হতে পারল দাতা-গ্রহীতা উভয়ের মাথাতেই — জ্ঞানী-**দক্ষ** যদি তার জ্ঞানের জন্য বিশেষ **মর্য্যাদা** পায়, দানী কেন তার দানের **মর্য্যাদা** পাবে না? দানীর দান যারা গ্রহণ করছে, তারা পরিবর্তে কিছু দেবে এবং দানী তা গ্রহণ করবে — এরকমই হওয়া উচিত; অন্যথায় দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম**মর্য্যাদা** থাকে না; দান-গ্রহণের ভারে গ্রহীতা অধঃপতিত হয়ে যায় এবং বিপরীতে দান-নিঃসারণের কারণে দাতা হাল্কা হয়ে উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে যায়। স্বভাবতই দাতা নিজেকে উচ্চ এবং গ্রহীতা নিজেকে নীচ ভাবতে বাধ্য হয়। সেই কারণে বৈদিক যুগের প্রথম অধ্যায়ে **প্রতিগ্রহ** করাকে খারাপ কাজ বলে মনে করা হত। ব.শ. জানিয়েছেন যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'প্রতিগ্রহ মহাপাপ' বলে উল্লেখ করা আছে। পরে পরে সম**মর্য্যাদা**র স্বার্থে জ্ঞান-দানের বিপরীতে বস্তু-প্রতিদান, **গ্রহে**র বিপরীতে **প্রতিগ্রহ**-এর প্রচলন হয়। কিন্তু সেই **প্রতিগ্রহ** যখন বিনিময়ে পর্যবসিত হয়, তখন পুনরায় **প্রতিগ্রহ** নিন্দনীয় হয়ে যায়। এমনকি অনেকেই কিছুই না দিয়ে অনেককিছু গ্রহণ করতে লাগে। তখন তা 'প্রতিকূল গ্রহ'রূপী **প্রতিগ্রহ** নামে চিহ্নিত হয়। আদিতে শুধুমাত্র জ্ঞানদানের বিপরীতে **প্রতিগ্রহের** প্রচলন হয়েছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু পরে পরে সব

রকমের গ্রহণ করা এমনকি কেড়ে নেওয়াকেও **প্রতিগ্রহ** শব্দে শনাক্ত করা হয়।

প্রতিজ্ঞা (প্রতিজ্ঞাত, প্রতিজ্ঞান) : **১.** প্রতি + √জ্ঞ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *জ্ঞা-এর (জানার) প্রতিক্রিয়ায় যে* ***জ্ঞা*** *(জানা)।* / **প্রতিজ্ঞা** = যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার উল্লেখ বা তদ্বোধক শব্দসমূহের প্রয়োগ। (ব.শ.)। **৩. প্রতিজ্ঞা** = অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, (ন্যায়ে) সাধ্যনির্দেশ, প্রতিজ্ঞাত বিষয়, (ব্যবহারে) ভাষা, পক্ষ, আর্জি। **প্রতিজ্ঞাত** = অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত। **প্রতিজ্ঞান** = প্রতিজ্ঞা, (ব্যবহারে) ভাষাপত্র, একরারনামা, (ন্যায়ে) নিগ্রহস্থানভেদ। (ব.শ.)। **৪.** a promise অর্থে প্রচলিত। **৫.** সব বাংলাভাষীই জানেন **পণ** মানে প্রতিজ্ঞা — একটি বিষয় জানান (জ্ঞা) হয়েছে আগেই, তার প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত বিষয়টি জানানই হল **প্রতিজ্ঞা**। অর্থাৎ, জ্ঞা-এর প্রতিক্রিয়ায় জাত **জ্ঞা**-ই হল **প্রতিজ্ঞা**। তার মানে, আপনি আমাকে এই বস্তু দিবেন, এইরূপ **জ্ঞা** বা জানান দিলে আমি আপনাকে এই বস্তু দিব বলে **জ্ঞা** দিব বা জানান দিব — ইত্যাকার কথাকে **পণ** বা **প্রতিজ্ঞা** বলে। পরবর্তীকালে এই শব্দটি প্রাচীন বাংলার আইনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'একরারনামা'য় পরিণত হয়ে যায়। দ্র. **জ্ঞা, অহঙ্কার, সত্যঙ্কার**।

প্রতিদান : **২.** *দানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার বিপরীতে যে দান করা হয়, তাকে* ***প্রতিদান*** *বলে।*

প্রতিধ্বনি : **২.** *ধ্বনির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার থেকে যে ধ্বনি জাত হয়, তাকে* ***প্রতিধ্বনি*** *বলে।*

প্রতিনিধি, প্রতিনিয়ত : এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬০০, ৬৪৬, ৬৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রতিপদ (প্রতিপন্ন, প্রতিপাদন, প্রতিপাদিত, প্রতিপাদ্য, প্রাতিপদিক) : **১.** প্রতি + √পদ্ + ক্বিপ্ (০) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রতিপদ*** *=* ***প্রতি****-রূপ* ***পদ*** *যাহাতে।* ***প্রতিপন্ন*** *=* ***প্রতিপদ*** *তারিত যাহাতে।* ***প্রতিপাদন*** *=* ***প্রতি****-রূপ* ***পদ*** *হইতে জাত সত্তা অন (on) যাহাতে।* ***প্রতিপাদিত*** *=* ***প্রতিপাদন*** *কৃত যাহাতে।* ***প্রতিপাদ্য*** *=* ***প্রতিপাদন*** *থাকে যাহাতে।* ***প্রাতিপদিক*** *= যাহার দ্বারা (বস্তু-ইত্যাদি)* ***প্রতিপাদিত*** *হয়।* / **প্রতিপদ** = মাসপক্ষাদির আরম্ভ যাহাতে। (ব.শ.)। **৩. প্রতিপদ** = পক্ষের প্রথম তিথি, দগড়বাদ্য, আরম্ভ, জ্ঞান, প্রতিপত্তি। **প্রতিপন্ন** = প্রাপ্ত, অবগত, অঙ্গীকৃত, অনুষ্ঠিত, আরব্ধ, প্রতিপত্তিযুক্ত। **প্রতিপাদন** = বোধন, দান, স্থাপন, প্রাপণ, সম্পাদন, আরম্ভ, প্রাপ্তি। **প্রতিপাদিত** = দত্ত, সম্পাদিত, নির্য্যাতিত, প্রাপিত, প্রাপ্ত, কৃত, প্রমাণীকৃত। **প্রতিপাদ্য** = বোধনীয়, দেয়, সাধ্য, প্রমাণবিষয়ীভূত। **প্রাতিপদিক** = (ব্যাকরণে) নাম, শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। যে কথাটি কোথাও বলে রাখা হয়নি, সেটি এখানে বলে রাখা ভাল। যখনই দেখা যাবে, কোনো বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়ার সময় 'বাংলা থেকে ইংরেজি' অভিধান বাংলা শব্দটির বেশ কয়েকটি করে অর্থ দিচ্ছে, তখনই বুঝতে হবে, বাংলা শব্দটি এখনও তার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকে কমবেশি ধরে রেখেছে। সেইসব ক্ষেত্রে আমরা 'কমবেশি যথার্থে প্রচলিত' কথাটি লিখে যাচ্ছি। **৫. প্রতিপদ** মোট তিনভাবে প্রস্তুত হয়েছে। প্রথমত, স্বাভাবিক-**প্রতি**র সঙ্গে **পদ** শব্দটি জুড়ে, সেক্ষেত্রে তার অর্থ হবে **প্রকৃষ্টের তারণ** গতিশীল হয়ে আপন সত্তার বাইরে যে প্রথম পা-টি ফেলছে, সেটিই **প্রতিপদ**। দ্বিতীয়ত, বিপরীত-**প্রতি**র সঙ্গে **পদ** শব্দটি জুড়ে, সেক্ষেত্রে তার অর্থ হবে আগত ক্রিয়ার বিপরীতে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ **প্রতি প্রথম যে** পা-টি ফেলছে, সেটিই **প্রতিপদ**। তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি **পদ** অর্থে **প্রতিপদ**। আর **প্রতিপদ** (দ্বিতীয় **প্রতিপদ**) ফেলে দেওয়া হলেই তা **প্রতিপন্ন** হয়ে যায়। অন্যে কিছু **পন্ন** করেছিল, এটি তার প্রতিক্রিয়ায় **প্রতিপন্ন** করা হল। এই **প্রতিপদ** (বা counter step) ফেলে ফেলে **প্রতিপন্ন** করতে থাকা চালাতে থাকলে তাকে বলে **প্রতিপাদন** করা। তা করা হয়ে গেলে, সেটি হবে **প্রতিপাদিত**। আর, যা **প্রতিপাদন** করতে হয়, তাকে **প্রতিপাদ্য** বলে। সবশেষে, যার দ্বারা (যে শব্দের দ্বারা) কোনো বস্তু বা তার গুণাগুণ **প্রতিপাদিত** হয়, ব্যাকরণে তাকেই বলে **প্রাতিপদিক**।

ই ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতে আমরা দেখেছি, **গমন** ও **যাওয়া**র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। **গমন** হল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছান; আর **যাওয়া** হল একবার গতি ও একবার স্থিতির নিয়মে যাওয়া অর্থাৎ হেঁটে যাওয়া, যখন কিনা এক পা স্থিতি থেকে গতিশীল হয় তো অন্য পা গতি থেকে স্থিতিশীল হয়। এই যে পা ফেলে ফেলে এগোন, একে বলে **পাদন** করা। অর্থাৎ **প্রতিগমন**-এ যে **পাদ**বিক্ষেপ করা হয়, তাকে **প্রতিপাদন** বলে। ...

প্রতি কথাটির মানে আমরা আগেই জেনেছি। তার প্রথম রূপটির প্রয়োগ রয়েছে চান্দ্রমাসের প্রথম দিনকে যে **প্রতিপদ** শব্দে শনাক্ত করা হয়, তাতে। তাছাড়া, রাম যদি একশো পা ফেলে (= পাদন করে করে) শ্যামের ঘরে পৌঁছে থাকেন, ফেরার সময় তাঁর একশো নম্বর পদক্ষেপই হবে প্রথম পদক্ষেপ। এইটিকেও **প্রতিপদ** বলে। এইখান থেকে রামের **প্রতিপাদন** (= counter stepping) করাও শুরু হল। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যায় পনেরটি করে **পদ** রয়েছে। দিবসরজনী যখন অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার দিকে **পাদন** করে করে এগোয়, তখন যেমন প্রথম **পদটি প্রতিপদ**, তেমনি যখন পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যার দিকে **পাদন** করে করে এগোয় তখনও প্রথম **পদটি প্রতিপদ**-পদবাচ্য। তবে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষ সংখ্যক **পদ**-এর যে যাত্রা, সেটি যদি সম্পূর্ণভাবে মানসিক হয়, তখন সে আর শুধুই **পাদন** করা থাকে না, হয়ে যায় **পদ্ধতি**। এবং সেই **পদ্ধতি** অনুসরণ করে, প্রতি **পদে** পা ফেলে ফেলে, **পাদন** করে করে আপনি যে বিশেষ সিদ্ধিতে পৌঁছে যাবেন, সেটি হয়ে যাবে **সম্পাদন**; ঠিক তার বিপরীতক্রমে যদি **পাদন** করে করে ফিরে আসেন, তখন হয়ে যাবে **প্রতিপাদন**। তখন স্বাভাবিকভাবেই বিপরীতক্রমে সমগ্র **প্রতিপাদন**টি হয়ে যায় **প্রতিপাদ্য**। দ্র. **সম্পাদ্য**।

কিন্তু **প্রাতিপদিক** একটু অন্যরকমের ব্যাপার। এটি আমাদের

ব্যাকরণের একটি 'পরিভাষা'। ইংরেজিতে একে root noun বা root adjective ইত্যাদি বলে। **প্রাতিপদিক** কিন্তু তার চাইতে অনেকটা বেশি। দ্র. **প্রত্যয়**।

প্রতিপালক, প্রতিপালন, প্রতিপালনীয়, প্রতিপালয়িতব্য, প্রতিপালিত, প্রতিপালী : ২. *পালন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে পালন ক্রিয়া করা হয়, তাকে **প্রতিপালন** বলে।* ৩. **প্রতিপালক** = প্রতিপালনকারী, রক্ষক। **প্রতিপালন** = রক্ষণ, পোষণ, কার্যতঃ অনুষ্ঠান, অনুবর্ত্তন। **প্রতিপালয়িতব্য** = পালনীয়, রক্ষণীয়। **প্রতিপালিত** = পালিত, রক্ষিত, কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত। **প্রতিপালী** = পালক। (ব.শ.)। ৪. বর্তমানে **পালন** ও **প্রতিপালন**কে এক করে ফেলা হয়েছে — upbringing। ৫. পালন করা ও প্রতিপালন করার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ছিল। লোকে যাকে পালন করে সাবালক বা যথার্থক করে তোলে, এবং অতঃপর সেই পালিত যদি পাল্টা পালককেই পালন করতে শুরু করে দেয়, তবেই সেই পালনকর্মকে **প্রতিপালন** বলা যায়। সেই বিচারে হাঁসমুরগি পালিত হওয়ার পর নিজেদের ডিম মাংস কিংবা তার দাম দিয়ে পালককে **প্রতিপালন** করে দেয়। অতএব হাঁসমুরগি গরুছাগল ... ইত্যাদিকে পালন করা যায়, কিন্তু **প্রতিপালন** করা যায় না। ভাবতে গেলে, তারাই বরং পালককে **প্রতিপালন** করে থাকে। অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের বেলায় কিন্তু পাশ্চাত্যে 'পালন করা' হয় না, সেখানে লোকে তাঁদের ছেলেমেয়েদের 'পালন' করেন না, **প্রতিপালন** করেন। আর, প্রাচ্যে লোকে ছেলেমেয়েদের পালন করেন, কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মাকে **প্রতিপালন** করেন। তার মানে, এই **প্রতিপালন** ক্রিয়াটি প্রাচ্যে পূর্বমুখী, পাশ্চাত্যে উত্তরমুখী।

প্রথমে পাশ্চাত্যের কথা হোক। সেখানে লোকে তাদের বাবা-মায়ের দ্বারা, ধরা যাক, 'পালিত' হয়ে বড় হন, বিয়েসাদি করেন, সন্তানাদি হয়, তারপর সেই সন্তানাদিকে **প্রতিপালন** করেন। কারণ, তাঁদের বাবা-মা তাঁদেরকে 'পালন' করেছিলেন, তারই প্রতিদানে তাঁরা নিজেদের সন্তানদের **প্রতিপালন** করে থাকেন। এইভাবে পাশ্চাত্যের মানুষেরা উত্তরসূরিদের **প্রতিপালন** করেন, কারণ, সেখানে মনে করা হয়, তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরিদের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন। সেইকারণে উত্তরসূরিকে **প্রতিপালন** করে তাঁরা সে-দাম চোকাচ্ছেন। পশুপাখিরাও তাদের জৈবজীবনের কর্তব্যবোধকে অনায়াস স্বাভাবিকতায় ঠিক এভাবেই দেখে থাকে এবং এভাবেই সক্রিয় হয়। তাই পাশ্চাত্যের মানুষেরা তাঁদের জৈবজীবনের কর্তব্যবোধকে পশুপাখিদের মতো দেখেন কেন, সেরকম দেখা ঠিক কি না, সেসব প্রসঙ্গে এখন আমরা যাব না। তাঁরা সন্তানসন্ততিদের **প্রতিপালন** করেন, পালন করেন না — এটাই আমাদের বক্তব্য।

প্রাচ্যে এই **প্রতিপালন** পূর্বমুখী। এখানে লোকে বাবা-মায়ের দ্বারা পালিত হয়ে বড় হয়ে, সন্তানাদির জনক হয়ে, একদিকে বাবা-মাকে তাঁদের বৃদ্ধবয়সে **প্রতিপালন** করেন এবং অন্যদিকে আপন সন্তানাদিকে পালন করে থাকেন। কারণ, এখানে মনে করা হয়, পূর্বসূরিকে **প্রতিপালন** করে পালনের প্রতিদান দেওয়া কর্তব্য, এবং উত্তরসূরিকে পালন করে বৃদ্ধবয়সের জন্য **প্রতিপালিত** হওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা কর্তব্য। ... গ্রামবাংলার বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে যেসকল জ্ঞানকথা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত, তা একটি অতি সংক্ষেপে এখানে জানিয়ে রাখা যেতে পারে —

'সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধ্যের আধো-অন্ধকারে বসেছিল রঘু তাঁতি। তার বউ এসে বলল — খাবে চলো। সে শুধালো — ধার শুধেছ? বউ বলল — হ্যাঁ। জলে যা ফেলার ফেলেছ? বউ বলল — হ্যাঁ। জমা যা রাখার রেখেছ? বউ বলল — হ্যাঁ। উঠে বসল সে। বলল — তবে জ্বালাও একশো-এক বাতি, ভাত খাবে রঘু তাঁতি।' এই হল গ্রামবাংলার বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মহলে প্রচলিত কথা। এর অর্থ হল — খেতে যাওয়ার আগে বউকে সে শুধিয়েছিল, তার বাবা-মাকে খাওয়ানো হয়েছে কি না, মেয়েকে খাওয়ানো হয়েছে কি না, ছেলেকে খাওয়ানো হয়েছে কি না। সবক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' শুনে সে বলেছিল — তাহলে পাকাটি (শণকাঠি) জ্বালিয়ে একটু আলোর ব্যবস্থা করো এবং ভাত দাও। ...

গ্রামবাংলার মজ্জায় মজ্জায় এই কথাটি সক্রিয় রয়েছে যে, বৃদ্ধ বাবা-মাকে **প্রতিপালন** করা মানে ধার শোধ করা। আর সেটা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আর, বাংলাভাষীর এই কর্তব্যবোধ কতদূর বিস্তৃত ছিল, **তর্পণ** শব্দে সেকথার ব্যাখ্যা আমরা করেছি। আমরা পূর্বসূরিদের অর্জিত যে জ্ঞানসম্পদে পালিত হই, তা শোধ করি **ঋষিতর্পণ** করে; যে বাহ্যসম্পদে পালিত হই, তা শোধ করি **দেবতর্পণ** করে; যে পিতৃঔরসে জাত হই, তা শোধ করি **পিতৃতর্পণ** করে। ... তবে পাশ্চাত্যের মানুষের এসব বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না, এমন কথা বলা ঠিক নয়। আমরা জেনেছি, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরাও পূর্বসূরিকে **প্রতিপালন** করা কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট উপপ্লব, রেনেসাঁস, ও শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে পাশ্চাত্যের মন থেকে তার সেই বোধগুলি মুছে ফেলার কাজ শুরু হয়। মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্রমশ 'আপনি আর কপনি'তে গিয়ে ঠেকে। ছেলেমেয়েদের তারা এখনও **প্রতিপালন** করে বটে, কিন্তু সার্বিক সামাজিক আবহাওয়াটা তাদের এমন হয়ে গেছে যে, সেটাও না করতে পারলেই ভাল হয়। আজকের গোলোকায়িত বিশ্বের সংস্কৃতিতে সেই 'আপনি আর কপনি' তত্ত্বটিই রাজত্ব করছে এবং বিশ্বের সব জাতিকে শেখাতে চাইছে যে, বাবা-মা ছেলেমেয়ে এদের পালন বা **প্রতিপালন** নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, খাও পিও ফুর্তি করো, চলে যাও। জগৎ জাহান্নমে গেলে তোমার কী! মানুষকে পশুপাখিদের চেয়েও অধম করতে লেগেছে এই গোলোকায়িত সংস্কৃতি। ... বলে রাখা ভাল, ইংরেজিতে **প্রতিপালন**-এর কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না।

প্রতীক (প্রতীকী, অপ্রতীকী) : ১. প্রতি + √ই + ঈক (ঈকন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **প্রতীক** = *প্রতি-র আধার করে যে বা কৃত যাহাতে। **প্রতীকী** = **প্রতীক**-এর গতিশীল আধার যে। **অপ্রতীকী** = যাহা **প্রতীকী** নহে।* ৩. **প্রতীক** = প্রতিকূল, বিলোম, প্রতীপ, অবয়ব, অঙ্গ, প্রতিরূপ, প্রতিমূর্ত্তি, শ্লোকাদির প্রথম পদ বা মুখ। (ব.শ.)। **প্রতীকী** = সাংকেতিক, symbolic। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। সংকেতময়, ইঙ্গিতময়, সাংকেতিক, symbolic। (স.বা.অ.কল.)।

৪. symbol, symbolic অর্থে যথাক্রমে **প্রতীক** ও **প্রতীকী** শব্দটি আজকাল খুবই প্রচলিত। আর, **অপ্রতীকী** শব্দটি আমাদের তৈরি করা নতুন শব্দ। **৫.** দ্র. **প্র, প্রতি**। **প্রতীকী** শব্দটি আধুনিক বাংলার সৃষ্টি। স্বাভাবিক-**প্রতি**র কথা আমরা আগেই জেনেছি **প্রতি** শব্দের অর্থে। সেই সুবাদে যে কোনো বস্তুই **প্রতি**-পদবাচ্য। সেই '**প্রতি**কে গতিশীলভাবে ধারণ করে' যে, তাকে **প্রতীক** বলে। সে কেমন?

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক — **বাঘ** শব্দটি শুনলে সকলের মনে tiger-এর ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু এই **বাঘ** বা tiger শব্দটি কিংবা তার যে ছবি মনের ভিতরে ভেসে ওঠে, তাদের কোনোটিই প্রকৃতপক্ষে **বাঘ** নয়। প্রকৃত বাঘের '**প্রতি** গতিশীলভাবে' ধরা আছে **বাঘ** ও tiger শব্দে, ধরা আছে মনের ভিতরে থাকা বাঘের ছবিতে। এই **বাঘ** ও tiger শব্দকে এবং মনে থাকা বাঘের ছবিকে প্রকৃত **বাঘ**-এর **প্রতীক** বলে। তার মানে, প্রকৃত বস্তু বা বিষয়ের বাচক শব্দ বা ছবিকে বস্তু বা বিষয়টির **প্রতীক** বলা হয়। এই **প্রতীকে** প্রকৃত বস্তু বা বিষয়টি নেই, থাকে না, কিন্তু তার স্বরূপ থাকে। একালের মানুষের **প্রতীকী** ভাষার প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রত্যেকটি ছবি হল আসলে প্রকৃত বস্তু ও বিষয়ের **প্রতীক**মাত্র (প্রতিরূপের বা প্রতিগুণের বোধক মাত্র), তারা কেউই প্রকৃত বস্তু বা বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাঘ বললে যদি গোটা বাঘটা এসে হাজির হত, তাহলে সেটা বক্তা ও শ্রোতা কারও পক্ষেই সুখকর হত না।' বাঁচোয়া এই যে 'বাঘ' শব্দটা প্রকৃত বাঘ নয়, প্রকৃত বাঘের **প্রতীক** বা **নাম** মাত্র।

তবে **প্রতীকী** কিংবা **প্রতীকীবাদ** শব্দদুটি বঙ্গীয় শব্দকোষ বা ছাত্রবোধ অভিধানে নেই, রয়েছে সাম্প্রতিক কালের বাংলা অভিধানে। তা কেন? আসলে ১৮৮৬ সালে পাশ্চাত্যে একটি নতুন তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হয় symbolism নামে। ১৯৩৬ সালে তার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিকে কেন্দ্র করে তার প্রচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বাংলাভাষী অ্যাকাডেমিশিয়ানরা সেই symbolism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করলেন **প্রতীক-বাদ**; আর symbolic শব্দের মানে করলেন **প্রতীকী**। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমাদের বাংলাভাষায় শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ রয়েছে, যার উপর নির্ভর করে আমরা শব্দের বহু অর্থ পাই, যেগুলিকে আমাদের শব্দকোষকারগণ তিনভাগে ভাগ করে সাজিয়ে রেখে গেছেন। সেগুলি হল — **অভিধা-অর্থ, লক্ষণা-অর্থ, ব্যঞ্জনা-অর্থ**। শব্দের সেই সমগ্র স্বরূপকে পাশ্চাত্য হারিয়ে ফেলেছিল বহুকাল আগেই এবং 'মানুষের ভাষার শব্দ মাত্রেই কোনো না কোনো বস্তু বা বিষয়ের চিহ্নমাত্র' — এই ধারণায় পাশ্চাত্যের মানুষেরা সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ মানুষের শব্দ-ব্যবহারে 'বাস্তবের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক' (= 'pragmatic relation' / 'শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক' = 'syntactic relation'; 'শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক' = 'semantic relation') আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ফলে, পাশ্চাত্যের ১৮৮০-র পরবর্তীকালের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা মুশকিলে পড়ে যান। তাঁরা symbolism শব্দের জনক শার্ল বোদলেয়ারকে (মৃত্যু ১৮৬৭) কবর থেকে তুলে আনলেন ১৮৮৬ সালে এবং তাঁর 'করেসপনড্যানসেস' কবিতাটিকে ইস্তাহার বানিয়ে শুরু করলেন symbolist আন্দোলন। তাতে যোগ দিলেন ভেরলেন, মালার্মে প্রমুখ কবি ও তাঁদের অনুগামীরা। তাঁরা symbolism-এর নাম করে তাঁদের ভাষার শব্দার্থের 'আবদ্ধ-পরিসর' থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৫০-এর পর তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বাংলায়। আমাদের বাংলাভাষী অ্যাকাডেমিশিয়ানরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত আমাদের **প্রতীক** শব্দকে symbol শব্দের প্রতিশব্দ ক'রে দিয়ে **প্রতীক** শব্দটিকে প্রাণে মেরে ফেললেন। ফলে **প্রতীক** শব্দের '**প্রতি**-র আধার কৃত যাহাতে' ... ইত্যাকার অর্থটির অন্তর্জলী যাত্রা সমাপ্ত হল, **প্রতীক** শব্দের মানে দাঁড়িয়ে গেল symbol!

কী অদ্ভুত বিড়ম্বনা দেখুন! ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা যে নৌকায় চেপে চিন্তার ক্ষুদ্র দ্বীপ ('আবদ্ধ পরিসর') থেকে কালাপানি পেরিয়ে লোকালয়ে (চিন্তার মুক্ত পরিসরে) আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাঁদের symbolist আন্দোলনের মাধ্যমে, আমাদের বাংলাভাষী অ্যাকাডেমিশিয়ানরা লোকালয় থেকে সেই একই নৌকায় চেপে কালাপানি পেরিয়ে চিন্তার ক্ষুদ্রদ্বীপে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন! তাজ্জবের ব্যাপার হলেও এটাই সত্যি। আসলে একই মুগুর মেরে কুকুর তাড়িয়ে কেউ যেতে চায় অভয়প্রদ ঠাকুরের কাছে, কেউ ঠাকুর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায় কুকুরের সঙ্গে থাকতে, ভাবে কুকুর সঙ্গে থাকলে জীবন নিরাপদ থাকবে। ...

সম্প্রতিকালে বাংলাভাষায় কোনো কোনো কবি আর এক ধরনের শব্দ ব্যবহার শুরু করেছেন। তাতে শব্দের অন্তর্নিহিত **প্রতীক**টিকে নস্যাৎ করার নানান চেষ্টা থাকে। ফলে, তথাকথিত **প্রতীকী** শব্দটি আধেয়হীন হয়ে গিয়ে **অপ্রতীকী** শব্দে পরিণত হয়ে যায়। শব্দের ভিতরে থাকা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থকে সংকুচিত করে আমরা তাকে এতদিন **প্রতীকী** রূপে পেয়েছিলাম এবং সেভাবেই ব্যবহার করতাম; ঠিক যেন আঙুরথোকা ফেলে দিয়ে শব্দের ভিতরে রাখা ছিল একটি করে শুকনো কিসমিস। এখনকার এই কবিগণ **প্রতীকী** শব্দের সেই সংকীর্ণ-মৌলবাদিতাকে তাড়িয়ে দিয়ে শব্দগুলিকে আধেয়হীন আধারমাত্রে পরিণত করছেন। ফলে, কবি ও তাঁর পাঠকপাঠিকাগণ সেই **অপ্রতীকী** শব্দের ভিতর নিজেদের মনোমত আধেয় বা অর্থ ঢুকিয়ে সেগুলিকে বুঝে নিতে পারছেন। আগামী যুগের শব্দের 'সচেতন ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক' অর্থে পৌঁছনোর এ হল একটি মধ্যবর্তী ধাপ। এই কবিগণ, আশা করা যায়, অচিরে একদিন 'সচেতন ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক' শব্দে উত্তীর্ণ হতে পারবেন।

প্রত্যয় (প্রত্যয়িত, প্রত্যয়ী, প্রকৃতি-প্রত্যয়) : **১.** প্রতি + ✓ই + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রত্যয়*** = ***প্রতি*** *যায় যাহাতে।* ***প্রত্যয়িত*** = ***প্রত্যয়*** *গতিশীল হয়ে তারিত যাহাতে।* ***প্রত্যয়ী*** = ***প্রত্যয়****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. প্রত্যয়** = প্রতীত, বিশ্বাস, নিশ্চয়, অনুভব, অব্যাভিচারিজ্ঞান, শপথ, প্রথিতত্ব, আচার, অধীন, সহকারী কারণ, সহকারী, প্রকৃতির উত্তর বিহিত সুপ্ তিঙ্ কৃৎ তদ্ধিত, প্রমাণ, হেতু, রন্ধ্র। **প্রত্যয়িত** = জাতপ্রত্যয়, বিশ্বস্ত। **প্রত্যয়ী** = প্রত্যয়বান, বিশ্বাসী। (ব.শ.)। **৪. প্রত্যয়** ও **প্রত্যয়ী** শব্দদুটি যথাক্রমে belief ও confident অর্থে প্রচলিত, **প্রকৃতি-প্রত্যয়** ব্যাকরণের

একটি পারিভাষিক শব্দ রূপে প্রচলিত। **প্রত্যয়িত** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পুরুষ, প্রকৃতি, পুরুষ-প্রকৃতি, প্র, পরা, প্রতি**। আপনি বাড়িতে বসে এই শব্দার্থকোষ পড়ছেন, আপনার নিশ্চয় এই **প্রত্যয়** আছে যে, বাড়ির ছাদটি ভেঙে আপনার মাথার উপর পড়বে না, কিংবা দেয়ালগুলো ঢলে যাবে না আপনার গায়ে। বাইরে পা বাড়ালে এইরকম অজস্র **প্রত্যয়** আপনার অগোচরেই আপনার ভিতরে সক্রিয় থাকে। থাকে বলেই আপনি মনে করেন — সহসা ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে আপনাকে সীতার মতো গিলে নেবে না, সামনের দিক থেকে আসা লোকটা এক্ষুনি আপনার উপর চড়াও হয়ে আপনার জামাকাপড় খুলে নেবে না, কিংবা সামনের গাড়িটা লাফ দিয়ে ফুটপাথে উঠে আপনার ঘাড়ে পড়বে না। অর্থাৎ কিনা, চারপাশের **প্রতি**টি বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধে একপ্রকার জাগতিক সামাজিক যান্ত্রিক **প্রত্যয়** সবসময় প্রত্যেক মানুষের ভিতরে সক্রিয় থাকে। এ হল চারপাশের **প্রতিটি বস্তু বা বিষয় কীভাবে চলে** বা **যায়, তৎসংক্রান্ত বোধ**। একেই **প্রত্যয়** বলে। এই **প্রত্যয়** ছাড়া মানুষের চলে না। শুধু মানুষ কেন, **প্রত্যয়** বিনা কোনো জীবেরই এক মুহূর্ত চলে না। কার্যত যার ভিতরে স্ব-ভাব বা **প্রকৃত** প্রতিষ্ঠিত আছে, সেরকম **প্রকৃতি** মাত্রেরই **প্রত্যয়** লাগে, অন্যথায় কোনো **প্রকৃতি**ই বুঝে পায় না, সে যাবে কোনদিকে, তার চলবে কী করে। **প্রকৃতি**র পথপ্রদর্শক এই যে **প্রত্যয়** তাকে সেকারণেই **পুরুষ** বলে।

আমাদের পূর্বসূরীগণ বহু সাধনায় এই **পুরুষ-প্রকৃতি** বোধ অর্জন করেছিলেন। তাঁরা জানিয়ে গেছেন যে, এই বিশ্বজগৎ **পুরুষ ও প্রকৃতি** রূপে বিভাজিত হয়ে কামসূত্রে একত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। সেই কারণে **পুরুষ** ছাড়া **প্রকৃতি**র চলে না, এবং **প্রকৃতি** ছাড়া **পুরুষ** নিরর্থক হয়ে যায়। সেই কারণে **প্রকৃতি**কে অন্ধ ও **পুরুষ**কে খঞ্জ বলা হয়ে থাকে। মানবসমাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এই **পুরুষ-প্রকৃতি** সম্বন্ধেরও এক প্রকার আবর্তনপথ রয়েছে। স্বভাবত তারা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে বিরাজ করে, যেটি হল তাদের 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের' ব্যবহারিক রূপ বা দ্বৈতাদ্বৈত অভেদ রূপ। সেখান থেকে তারা বিভাজিত হয়ে পরিচালক-পরিচালিত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়ে আবদ্ধ হয়, তারপর পরবর্তী ধাপে শাসক-শাসিত সম্বন্ধে অবতরণ করে, সেখান থেকে নামে নিপীড়ক-নিপীড়িত সম্বন্ধে, তারপর উর্ধ্বমুখী হয়ে পুনরায় উচ্চতর দ্বৈতাদ্বৈত রূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মানবসমাজ ছাড়া অন্য অন্য ক্ষেত্রেও তাদের এই গতিপথ থাকতে পারে, তবে সেসব কথার অবকাশ এখানে নেই। আমরা **ঘটী** শব্দের অর্থ জানতে গিয়ে দেখেছি, **বঙ্গ**বাসী এই **দ্বৈতাদ্বৈত**কে তার স্বভাবে ধারণ করে বলেই তাদের **বঙ্গাল** বা **বাঙ্গালী** নামটি পেয়েছিল। বিবেকানন্দ ঠিকই বুঝেছিলেন যে, আজ পর্যন্ত মানুষ যেসকল মানসিক অমৃতজ্ঞান অর্জন করেছে, **পুরুষ-প্রকৃতির** এই **অদ্বৈত**-মতবাদই সেগুলির মধ্যে সর্বোত্তম। এখানে দাঁড়িয়েই প্রাচীন ভারত বলেছিল — সো-অহং, তিনিই আমি। একই কথা বলে সুফী মনীষী মনসুর শূলে চড়ে যেতে দ্বিধা করেননি। একই গান গেয়ে গেছেন বাংলামাটির সন্তান লালন-রবীন্দ্রনাথেরা। বিবেকানন্দ ঠিকই বুঝেছিলেন, '... Advaitism is the last word of religion and thought and the only position from which one can look upon all religions and sects with love. ...।' (আমাদের 'গ' গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।)

আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতেরাও কম যাননি। তাঁরা দেখলেন, বাক্যগঠনকালে শব্দের ব্যবহার কোন নিয়মে করা হয়ে থাকে, তা ঠিক করে রেখেছেন পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং। সাধারণ ভাষাভাষী আপন অজ্ঞাতসারে সেই নিয়মে শব্দ-ব্যবহার করে কথা বলে থাকেন। ব্যাকরণবিদগণের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা সেই নিয়মকে বুঝে নিয়ে তাকে সুবিন্যস্ত করে উত্তরসূরিদের জন্য লিখে রেখে গেছেন। তাঁরা বিশ্বজগতের এই **পুরুষ-প্রকৃতি** সম্বন্ধকে, তাদের গতিপ্রকৃতির রীতিনীতিকে যথার্থ বাস্তবতায় অধ্যয়ন করে দেখলেন, জগতের এই স্বভাব তার সার্বিক স্বরূপ নিয়ে উঠে এসেছে মানুষের ভাষায়, মানুষের শব্দব্যবহারে। তাঁরা দেখলেন, জগতে অসীম সংখ্যক ক্রিয়া (পুরুষ) ও ক্রিয়াকারী (প্রকৃতি) রয়েছে। মানুষের ভাষণ বা বাক্য মাত্রেই ক্রিয়াকারী (প্রকৃতি), আর তাতে বিধৃত বক্তব্য বা অর্থ হল পুরুষ। বাক্যের ভিতরের শব্দগুলি হল ক্রিয়াকারী (প্রকৃতি), আর সেই শব্দগুলির অর্থ হল পুরুষ। তাঁরা দেখলেন, জগৎ পরিবর্তনশীল। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন এতই শ্লথ যে, সেগুলিকে অপরিবর্তনীয় বলা চলে। পরিবর্তনশীল জগতের ছায়া মানুষের ভাষায় ধরে রাখার জন্য মানুষের ভাষাকেও পরিবর্তনশীল স্বভাবের হতে হয়। তাই আমাদের ভাষায় প্রথমেই শব্দের দুটো গুণ দেখে তাদের দুই ভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছে — ব্যয় শব্দ ও অব্যয় শব্দ। ব্যয় শব্দ হল পরিবর্তনশীল (পুরুষ) এবং অব্যয় শব্দ হল অপরিবর্তনীয় (প্রকৃতি)। তবে জগৎ পরিবর্তনশীল বলেই ভাষার প্রধান ও মুখ্য ভাগ দখল করে রেখেছে ব্যয় শব্দগুলি। সেই ব্যয় সত্তাগুলিরও দুটি ভাগ — **প্রকৃতি** ও **পুরুষ**। আমাদের ভাষার সমস্ত শব্দ দুভাগে বিভক্ত — (এক) **ধাতুশব্দ, প্রাতিপদিক শব্দ**; এদের বলে **প্রকৃতি**; আর (দুই) সেই শব্দগুলিকে দিশা দেয় যারা — **প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ**, এরা হল **পুরুষ**। আমরা লক্ষ করেছি, উপসর্গগুলি ধাতু ও প্রাতিপদিককে দেশে (স্থানে) প্রতিষ্ঠিত করে, এবং বিভক্তি ও প্রত্যয়গুলি তাদেরকে কালে ও পাত্রে প্রতিষ্ঠিত করে। ধাতুশব্দের পরিবর্তন কালনির্ভর, তাই তাতে ক্রিয়ার কাল বিষয়ক বিভক্তি-**প্রত্যয়**গুলি **পুরুষ**রূপে সেই ধাতুশব্দসমূহের দিশা-নির্দেশ করে থাকে। আর, প্রাতিপদিকের বা শব্দরূপের পরিবর্তন করণনির্ভর, তাই তাতে কারক-বিষয়ক বিভক্তি-**প্রত্যয়**গুলি **পুরুষ**-রূপে তাদের দিশানির্দেশ করে থাকে। বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্তা ও তার কর্ম থাকে। সেই কর্তাও **পুরুষ** পদবাচ্য। আমাদের ব্যাকরণবিদগণ দেখলেন, সেই **পুরুষ** তিন প্রকার — উত্তম**পুরুষ**, মধ্যম**পুরুষ**, ও প্রথম**পুরুষ**। তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ধরে রাখে আধারশক্তি বা **প্রকৃতি**রূপী ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের অজস্র রকমের নৃত্যভঙ্গিমা। ...

যেহেতু 'কর্ম্মযজ্ঞই ভুবনের নাভি' (ধর্ম্মবক-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর-পর্ব), ভুবনের ছায়াচিত্র ভাষায় উঠে আসার মূল চাবিকাঠিটি রয়েছে কর্মকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তায় — কে কাজটি করছে, কেন করছে, কার জন্য করছে, কোথায় করছে, কার সাহায্যে করছে ... ইত্যাদি। কর্মসংক্রান্ত এই সমস্ত সংবাদই যদি না থাকল, কর্মজগতের ছায়ায়

(অর্থাৎ ভাষায়) ভুবনের সত্য ধরা থাকবে কীভাবে! শব্দতত্ত্বের আলোচনায় তাই **পুরুষ-প্রকৃতি**র সম্বন্ধই প্রধান নিয়ামক। ...

প্রত্যাখ্যান : ১. প্রতি + আখ্যান। ২. *প্রতি আখ্যা অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. প্রত্যাদেশ, নিরাকরণ, নিরাস, প্রতিষেধ। (ব.শ.)। ৪. refuse অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **আখ্যা, প্রতি**। কোনো শব্দ উচ্চারণ করে শ্রোতার উদ্দেশ্যে আকাশে ভাসিয়ে দেওয়াকে বলে **খ্যা** করা। তদ্রূপ ক্রিয়া অন (on) থাকলে **খ্যান**। সেই **খ্যান**সমূহের আশ্রয়কে বলে **আখ্যান**। সেই **আখ্যান** শোনার পর বিপরীত পক্ষ থেকে যদি কোনো পাল্টা **আখ্যান** বা **প্রতি-আখ্যান** আসে, তাকে বলে **প্রত্যাখ্যান**। এই **প্রত্যাখানে** স্বভাবতই **আখ্যানের** বিপরীত কথাবার্তা থাকে। ফলত, **প্রত্যাখ্যান** পূর্বপ্রেরিত **আখ্যান**কে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে বলে। এই ধারণা বিবর্তিত হয়ে হয়ে 'পূর্বের কথাবার্তাকে অস্বীকার' করাই তার প্রধান অর্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেই কারণে লোকে **প্রত্যাখ্যান** বললে refuse, decline ইত্যাদি বুঝে থাকেন।

প্রথম : ১. ✓প্রথ্ + অম (অমচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *প্র-এর স্থিতি সীমায়িত যাহাতে।* ৩. আদি, প্রধান, মুখ্য, অগ্রিম, মূলীভূত, অভিনব, প্রথম পুরুষ, পূর্ব্বে, অগ্রে। (ব.শ.)। ৪. first অর্থে বহুলপ্রচলিত। ৫. দ্র. **প্র, প্রকৃতি**। দুটি বস্তুকে (**পুরুষ-প্রকৃতি**কে) এমনভাবে মেলানো হোক, যাতে তারা একধরনের 'অভিনব' বা বিশেষ স্বভাব অর্জন করে। সেরকম করতে পারলেই সৃষ্টি হয়, এবং তা **সুন্দর** হয়। (আমাদের **সুন্দরতত্ত্ব** নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ের প্রথম রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে 'অপর' পত্রিকার ২০০৯ বইমেলা সংখ্যায়। এই শব্দার্থকোষের ১ম খণ্ডে **সুন্দর** শব্দে একটুখানি পাওয়া যাবে।)। আর, বিশেষ স্বভাব অর্জন করতে পারলেই সেই স্বভাবে নতুন সত্তাটি চলতে শুরু করে, তার বিকাশ হয়, বাড়বৃদ্ধি হয়। তখন তাকে আমরা একটি বিশেষ স্বভাবের বস্তুরূপে দেখতে ও বুঝতে পারি। কিন্তু সূচনায় যে জোড়টি ঐ স্বভাব সর্বাগ্রে অর্জন করেছিল, যেখান থেকে সে তার বর্তমান অবস্থানে এসেছে, সেই সূচনালগ্নের আদি জোড়টিকে **প্রথম** বলে। কারণ, সেখানেই **পুরুষ-প্রকৃতির** 'দ্বৈতাদ্বৈত' জোড় বা **প্র থমকে** গিয়ে একটি বিশেষ স্বভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। সেই স্বভাব তার এখনও চলছে। তাই সে বিশেষ স্বভাবের অস্তিত্বরূপে জগতের কাছে পরিদৃশ্যমান। প্রতিটি অস্তিত্বের শুরুতে এইরকম একটা **প্র থমকে** রয়েছে। তাকেই **প্রথম** বলা হত। সত্তার সেই **প্রথম** রূপটি **প্রথিত** হয়েছিল বলেই সে আজ তার স্বরূপে বিকশিত হতে পেরেছে। তাই **প্রথম** মানেই আদি, সবার আগে ... ইত্যাদি। এখন শব্দটির নির্দেশকতার এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। আজকাল তো লোকে **প্রথম** বলতে first বোঝে, যে first সবার আগে দৌড়চ্ছে।

প্রথা : ১. ✓প্রথ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *প্র (প্রকৃষ্ট করণপ্রক্রিয়া) থাকে যাহাতে।* ৩. খ্যাতি, **প্রথিত বিষয়**, পদ্ধতি, রীতি, ধারা (custom), বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা। (ব.শ.)। ৪. custom অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **প্র, প্রকৃতি, প্রথম**। কোনো সত্তা প্রকৃষ্টরূপে কৃত হলে তার একধরনের 'স্বভাব' জন্মায় এবং সেই 'স্বভাব' তার চলতে থাকে। সত্তার অস্তিত্বের সর্বাগ্রে কৃত সেই যে প্রক্রিয়া, যার ফলে তার **প্র** স্থিতরূপ লাভ করেছিল, সেই প্রক্রিয়ার আধারকে **প্রথা** বলে। কেননা, **প্রথা**তে সেই **প্রথম** প্রক্রিয়া ধরা থাকে, চলতে থাকে। পরে পরে শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক বেড়েছে।

প্রদীপ : ১. প্র + ✓দীপ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *প্র (প্রোজ্জ্বল) **দীপ** যাহাতে।* ৩. দীপ, প্রদীপবৎ উদ্ভাসক, গূঢ়ার্থের উদ্ভাসক আখ্যানগ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. lamp অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **প্র**। আধুনিক শিক্ষায় বাংলাভাষী 'আধুনিক' হয়েছেন না বোকা হয়েছেন, সেকথা বুঝতে পারা যায় সাম্প্রতিককালে তাঁরা **প্রদীপ** ও **দীপ** শব্দ কীভাবে ব্যবহার করেন, তা দিয়ে। আজকাল লোকে আর ছেলেপুলেদের নাম **প্রদীপ** রাখেন না, রাখেন **দীপ**। যেমন **দীপ দাশগুপ্ত** ... ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যায়, একালের শিক্ষিত বাংলাভাষীর কাছে **প্রদীপ**-এর চেয়ে **দীপ** গৌরবজনক, কাম্য। সেকালে কিন্তু সেরকম ছিল না, লোকে ছেলেপুলেদের নাম রাখত **প্রদীপ**, গ্রন্থের নাম রাখত 'সাধনপ্রদীপ', 'জ্ঞানপ্রদীপ' ... ইত্যাদি।

আসলে **দীপ** হল সেই বস্তু, যা আলোকদানকে গতিশীলভাবে পালন করে, হতে পারে সে বাহ্যিক আলো কিংবা জ্ঞানের আলো। কিন্তু **প্রদীপ** তার চেয়ে অনেক উচ্চ ধারণা বহন করে। সে হল **প্র**-উজ্জ্বল বা **প্রোজ্জ্বল দীপ**। একালের বোধের সঙ্গে মিলিয়ে বললে বলতে হয়, lamp-এর সঙ্গে illuminator-এর যা পার্থক্য, **দীপ**-এর সঙ্গে **প্রদীপ**-এরও সেই পার্থক্য। (এই প্রসঙ্গে ল্যাটিন থেকে আসা ইংরেজি শব্দ illuminati বা 'আলোকপ্রাপ্ত' শব্দটিও স্মরণ করা যায়।) একই কথা বলা যায় ছেলেমেয়েদের নামরূপে ব্যবহৃত **কৃতি** ও **প্রকৃতি, দ্যুত** ও **প্রদ্যুত, নব** ও **প্রণব** ... প্রভৃতি শব্দ সম্পর্কে।

প্রদ্বেষী : ২. *প্র (প্রকৃষ্ট) দ্বেষ-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. মহর্ষি দীর্ঘতমার স্ত্রী। এঁর গর্ভে গৌতমাদি পুত্ররা জন্মগ্রহণ করে। মহাভারত অনুসারে, দীর্ঘতমা গোধর্ম অবলম্বন করলে ইনি তাঁর প্রতি অতিশয় বিরক্ত হয়ে তাঁকে ত্যাগ এবং নদীতে নিক্ষেপ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. পুরাণাদিতে **দীর্ঘতমা** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। তাঁর আধারশক্তিস্বরূপা যে জনগোষ্ঠী তাদের বলা হত **প্রদ্বেষী**। উপরোক্ত বয়ান মোতাবেক **দীর্ঘতমা** গোধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ যে-কোনো আধারশক্তিতে গমন করতেন, বাছবিচার করতেন না। তার মানে যে কোনো জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ চালানোর পরামর্শ দিতে দ্বিধা করতেন না। এটি **প্রদ্বেষী**র পছন্দ হয়নি। তাই, কাহিনী অনুসারে তিনি তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, **দীর্ঘতমা**কে লতায় জড়িয়ে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দিতে।

প্রদ্যুম্ন : ২. *দ্যু (আলোর প্রকাশ) প্র (প্রদমিত) ভাবে সীমায়িত যে রহস্যরূপী সত্তায়।* / প্রকৃষ্ট দ্যুম্ন যাহার। (ব.শ.)। ৩. প্রকৃষ্টবল, কামদেব। ইনি রুক্মিণীগর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র। বৈষ্ণবাগমে চতুর্ব্যূহ

ভগবানের একতম। (হরিবংশপুরাণ মতে) শম্বরাসুর ইঁহাকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া পত্নী মায়াবতীকে সমর্পণ করে। ... (পরে সব জেনে) প্রদ্যুম্ন কুপিত হইয়া শম্বরকে নিহত করেন এবং মায়াবতীর সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হন। (শ্রীমদ্ভাগবত মতে) শম্বর হরণ করিয়া শিশুকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং মৎস্যের উদরে মায়াবতী শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া নারদের উপদেশে প্রতিপালন করেন। (ব.শ.)। রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ... জন্মের সাতদিন পরে সম্বরাসুর ... এঁকে হরণ করে। ... শিবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হলে তাঁর স্ত্রী রতির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব বর দেন যে, কামদেব প্রদ্যুম্ন রূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং রতিও মায়াবতী রূপে জন্মগ্রহণ করে তার সঙ্গে মিলিত হবেন। ... সম্বরের স্ত্রী মায়াবতী জ্ঞাত হন যে, এই নবজাতকই তাঁর জন্মান্তরের স্বামী। ... অতঃপর প্রদ্যুম্ন সম্বরকে যুদ্ধে নিহত করে মায়াবতীকে নিয়ে পিতা ও মাতার নিকট এসে নিজ স্ত্রীর পরিচয় দেন ... প্রদ্যুম্ন মাতুলকন্যাককুদ্মতীকেও বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হয়। ... অসুররাজ বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকেও ইনি গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। ... প্রভাবতীর গর্ভজাত পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন। আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার সময় প্রদ্যুম্নও নিহত হন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলায়, বিশেষত ২৪ পরগণায় একটি করুণ কাহিনী ও তৎসংশ্লিষ্ট গান কথা আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। তার নাম 'রূপবান-কন্যার কাহিনী'। রামায়ণ গানের মতো এটিও গানবহুল কথকতা, যা প্রায় রামায়ণ গানের মতো সারারাত ধরে নাট্যাকারে কথিত ও গীত হয়ে থাকে। লোকে যাত্রাপালা দেখার মতো 'রূপবানের গান' শুনতে যায় এবং রাতভোর সেই গান শোনে। সম্প্রতি আবার তা নিয়ে একটি ছায়াছবিও হয়েছে। কিন্তু এটি কী, কীভাবে এই রূপ পেল, তা নিয়ে কোনো আলোচনা কোথাও আমরা পড়িনি। তাছাড়া, একালের অ্যাকাডেমি তো এসব ব্যাপারকে 'লোককথা', 'লোকগান' ... ইত্যাদি বলে এগুলিকে 'ছোটলোকদের ব্যাপার-স্যাপার' রূপে দাগিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে জানার সাধনাও তাদের নেই।

যাই হোক, আমরা কাজের কথায় আসি। **দক্ষযজ্ঞে**র পর **একসময় মদনভস্ম** (দ্র. **কামদেব**) ও রতিবিলাপের সূত্রপাত তো **হয়ে গেল**। লোকে জেনে গেল, নির্দিষ্ট কর্মযজ্ঞে গিয়ে কাজ করলেও **সেই কাজে**র যে ফল ফলবে তার প্রতি কামনা রাখা চলবে না, **কাজের** মজুরি নিয়ে চলে আসতে হবে। যে জনগোষ্ঠী (**রতি**) নিষ্কাম প্রেম নিয়ে কর্মযজ্ঞে রত ছিল, স্বভাবতই তার উত্তরসূরিরা জন্মাল **অসুর**দের ঘরে। কামহীন এই যে রতি, সে অগত্যা 'মায়াবতী'রূপেই **অসুর**-ঘরে বিরাজ করছিল। **কৃষ্ণধন** বা কালোটাকার আবির্ভাবের **পর পুনরায় কামদেব** নতুন রূপে জন্মালেন। তার নাম হয়ে গেল **প্রদ্যুম্ন**; অর্থাৎ, প্রকৃষ্ট দ্যুতির প্রকাশ সীমায়িত করে যে নাকারী-**অন্ধকারী** সত্তা। ইতোপূর্বে **মদনভস্মের** পর আমরা দুজন **দ্যুম্নকে পেয়েছি** — **ইন্দ্রদ্যুম্ন** ও **ধৃষ্টদ্যুম্ন**। এসবই হল কর্মফলের প্রতি **মানুষের কাম**নাকে বিশেষ ধরনের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা। সবশেষে **এলেন প্রদ্যুম্ন**। স্বয়ং **কৃষ্ণধন** এর জনক। দীর্ঘকাল অপেক্ষারত **মায়াবতী** এই **প্রদ্যুম্ন** সত্তাকে লালনপালন করেন এবং একসময় অসুরনিধন করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে আসেন।

তার মানে, অতীতে **মদনভস্মের** পর, কর্মী কর্মফলের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে কেবল মজুরি নিয়ে কাজ করে যাবে, এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার পরে আরও কয়েকবার কর্মীর কর্মফলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায় **ইন্দ্রদ্যুম্ন** ও **ধৃষ্টদ্যুম্ন**-এর কালে। সে আগ্রহেরও বিনাশ ঘটানো হয়। সবশেষে সেই আগ্রহের পুনর্জন্ম হয় শ্রীকৃষ্ণের হাতে। কিন্তু তার পালনপোষণ করে অসুরগৃহের বাসিন্দা **রতির** উত্তরসূরি জনগোষ্ঠী — মায়াবতী। সেই **প্রদ্যুম্ন** সাময়িকভাবে বিজয়লাভ করলেও শেষমেষ সেও মারা পড়ে যদুবংশের আত্মকলহে। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশে উৎপাদন কর্মযজ্ঞে **কামদেব**-এর আর দেখা মেলে না, চলতে থাকে কেবল রতিবিলাপ।

কাহিনীটি কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকেনি। মহাভারতের কাহিনীর যা মূল — ভারতসমাজে ধনতন্ত্রের উদ্ভবকে পর্যুদস্ত করা, তা যেমন পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যে রূপ পায় চাঁদ সদাগরের বা বেহুলা-লক্ষ্মীন্দ্রের কাহিনীতে (যাকে মনসামঙ্গল বলা হয়), ঠিক সেভাবেই **দক্ষযজ্ঞ**-কাণ্ডের যে মূল কথা — **মদনভস্ম** করে রতিকে নিষ্কাম প্রেমে বাধ্য করা, মধ্যযুগে যা **প্রদ্যুম্ন** ও মায়াবতীর ঘটনায় রূপ পায়, সেটিই 'রূপবান-কন্যা'র করুণ কাহিনীতে রূপায়িত হয় আরও পরবর্তীকালে, বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীতে। রতিবিলাপের কান্নার রোল এই 'রূপবানের গান'-এ আজও স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। 'যইবন জ্বালায় জ্বইলা গেলাম গো / ... ... ও দাইমা, দাইমা গো।'

প্রবাস : **২.** *প্রকৃষ্ট বাস যাহাতে।* / *গৃহ হইতে প্রস্থিতের দেশান্তরে* বাস (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩.** দেশান্তরস্থিতি, বিদেশবাস, বনবাস, বিয়োগ ...। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. প্রকৃষ্ট** বাসই **প্রবাস**। অর্থাৎ যে বসবাসে মানুষের মানসিক বসবাস ও দৈহিক বসবাস প্রকৃষ্টভাবে হয়ে থাকে সেরূপ বসবাসকে **প্রবাস** বলে। কিন্তু মানুষের কীরকম **বাস** হলে তাকে **প্রকৃষ্ট বাস** বলা হয় বা হতে পারে? যেহেতু মানুষ হল 'মন-প্রধান' জীব, তার মন 'রসে-বশে' বাস করতে পারলেই সেটি তার পক্ষে **প্রকৃষ্ট বাস** হতে পারে এবং হয়ও। লোকে সবচেয়ে বেশি খুশী হয় কোনো ধরনের আনন্দরসে ডুবে থাকতে পারলে। কিন্তু সে তো একরকম মানসলোকে থাকা! পার্থিব দুনিয়ায় তার দেহটি থাকলেও সে সেখানে থাকে না, থাকে মানসলোকে, আনন্দরসে ডুবে। তার মানে, যেখানে মানুষটির দেহ রয়েছে, সেখানে কার্যত সে নেই; রয়েছে অন্য লোকে। একেই বলে **প্রকৃষ্ট বাস**-এ থাকা বা **প্রবাস**-এ থাকা।

তবে এ হল **প্রবাস** শব্দের অদৃশ্য অর্থ, প্রকৃত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ। সাদৃশ্যে সেটিই হয়ে যায় বিদেশে থাকা। কিন্তু সে হল দেহটির বিদেশে থাকা, মনের নয়। বরং কারও কারও ক্ষেত্রে মন পড়ে থাকে দেশে। তার মানে, মানসিক **প্রবাসী**ই প্রকৃত **প্র-বাস** করেন, সুখলাভ করেন। আর দৈহিক **প্রবাসী** যাই করুন, **প্রকৃষ্ট বাস** করেন বলে মনে হয় না, কিংবা দৈহিক সুখলাভ করলেও মানসিক সুখ লাভ করেন বলে মনে হয় না।

প্রবেশ : দ্র. **পশ**।

প্রাণ (প্রাণবায়ু) : ১. প্র + ✓অন্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে **প্র** অন (on) থাকে। /* যাহার দ্বারা জীবন স্পন্দিত হয় (ব.শ.)। ৩. জীবন, অনিল, বায়ু, হৃন্মারুত, প্রাণবায়ু, দেহস্থ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণাপানাদি বায়ু (দেহে ভিন্ন স্থান ও ক্রিয়া হেতু (ক) হৃদয়স্থ বায়ু 'প্রাণ', (খ) গুহ্যস্থ বায়ু 'অপান', (গ) নাভিস্থ বায়ু 'সমান', (ঘ) কণ্ঠস্থ বায়ু 'উদান', (ঙ) সর্ব্বশরীরস্থ বায়ু 'ব্যান' নামে অভিহিত। ইহাদের কার্য্য যথাক্রমে অন্নপ্রবেশন, মূত্রাদিত্যাগ, অন্নবিপাচন, 'ভাষণাদি', 'নিমেষাদি'। কেহ কেহ বলেন, দেহে নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয় — এই পঞ্চবায়ু আছে; যথাক্রমে উদগীরণ নিমীলনাদি ক্ষুধা জৃম্ভণ পোষণ — ইহাদের কার্য্য। কিন্তু মতভেদে ইহারা প্রাণাদিরই অন্তর্ভুক্ত। 'প্রাণ' প্রাণাদিবায়ুর ব্যাপারসমবায় হেতু সতত বহুবচন।), সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য, জীবিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, কাব্যের আত্মা, শ্বাসপরিমিত কাল, প্রাণতুল্য জীবনসাধনবস্তু, বল, বেগবত্তা, পরমাত্মা, বোল (gum-myrrh), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বসুদেব, মানসশক্তি, প্রাণপ্রিয়া নায়িকা। (ব.শ.)। ৪. life অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **প্র, পঞ্চপ্রাণ, বায়ু, উদান, জীব**। আগেই আমরা দেখেছি, **প্র** হল এমন একটি শব্দ যার ভিতরে আধার-আধেয় বা **পুরুষ-প্রকৃতি** এমন 'সমুচ্চয়ী-সম্মিলন' অবস্থানে আছে যে, তাদের এক নতুন **স্ব**-ভাব জন্মে গেছে। এ হল একধরনের সমুচ্চয়ী বন্ধনে বদ্ধ দুই বা ততোধিক সত্তার সম্মিলন। আধার-আধেয়র এই সমুচ্চয়ী-সম্মিলনই হল **প্র**। এই **প্র** অন থাকে যাতে, তাকে বলে **প্রাণ**। ব.শ. জানাচ্ছেন, এই **প্রাণ** শব্দটি নিত্যবহুবচন, অর্থাৎ এতে অনেকগুলি **প্রাণ** একত্রে রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বহু **প্রাণ**কে শনাক্ত করেছিলেন **পঞ্চপ্রাণ** নামে — প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান। এদের **পঞ্চপ্রাণবায়ু**ও বলে। আমাদের যে ২২টি **উপসর্গ** রয়েছে, তাদের ভিতর থেকে **প্র, অপ, উদ্, বি, সম্** এই পাঁচটি উপসর্গ **অন** (on) শব্দের আগে প্রয়োগ করে উপরোক্ত পাঁচ প্রকার **প্রাণবায়ু**র নামকরণ করা হয়েছে। **প্র** + অন = প্রাণ, **অপ** + অন = অপান, **উদ** + অন = উদান, **বি** + অন = ব্যান, **সম** + অন = সমান। তার মানে — **প্র**কৃষ্ট অন হলে **প্রাণ** হয়; **অপ**কৃষ্ট অন হলে **অপান** হয়; **উদ্‌লোকের** দিকে অন হলে **উদান** হয়; **বি**পরীত বা **বি**শেষ লোকের দিকে অন হলে **ব্যান** হয়; এবং **সম** অন হলে **সমান** হয়। এগুলি কীধরনের ক্রিয়া করে, ব.শ. সেসব তথ্যও দিয়েছেন। (উপরে ৩. দ্র.)।

এগুলি সবই আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের অর্জন। তাঁরা বুঝেছিলেন, কতকগুলি বাহ্যসত্তার বিশেষ ধরনের সম্মিলন ঘটলে যে 'সমষ্টি-উপহিত চৈতন্য'র জন্ম হয় তাকেই **প্রাণ** বলে। এতে পাঁচ প্রকার গ্রহণ-বর্জনাদি সদাসর্বদা চলতে থাকে এবং যতদিন তা চলতে থাকে, ততদিন সম্মিলনটিকে **প্রাণ**বন্ত থাকে। ধানকলে বা মোটরে আমরা একদিক থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখি, এবং তাকে চালাতে হয় বন্ধ করতে হয়। এই **প্রাণ** যেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। এতে অনেকগুলি বস্তু এমনভাবে সমষ্টিবদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, তাতে পাঁচপ্রকার ধোঁয়ার যাতায়াত নিজে থেকেই সবসময় চলতে থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, কাউকে তা চালাতে বা বন্ধ করতে হয় না। বন্ধ হয় কেবল তখনই যখন সেই সম্মিলনকে কেউ জোর করে ভেঙে দেয়, অর্থাৎ সেই **প্রাণবন্ত** সত্তাটিকে হত্যা করে; একে আমরা বলি 'মেরে ফেলা'; কিংবা সে স্বয়ং বন্ধ হয়ে যায়। একে আমরা বলি 'মরে যাওয়া'।

তবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এইখানেই থেমে থাকেননি, তাঁরা এই **প্রাণ**-বিষয়ক ধারণার প্রয়োগ করেছেন মানুষের সমাজেও। একালের ভাষায় বললে, একদল ছেলে যখন একটি ক্লাব গড়ে তুলে একধরনের 'আমাদের ক্লাব' বোধে পৌঁছে যায়, যার জন্য প্রত্যেক ক্লাবসদস্যই 'ক্লাব-অন্ত-প্রাণ' হয়ে যায়, তখন সেই বোধকে ক্লাবের **প্রাণ** বলা চলে। একই কথা 'আমাদের বংশ', 'আমাদের জাতি' ... ইত্যাদির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বংশমর্যাদাবোধই একটি বিশেষ বংশদেহের বা বংশের **প্রাণ** রূপে সক্রিয় হয়ে যায়। জাতীয়তাবোধই একটি জাতির জাতিদেহের **প্রাণ** রূপে সক্রিয় হয়ে যায়। ভারতসমাজে সমাজদেহেরও সেইরূপ **প্রাণ** বা **পঞ্চপ্রাণ** ছিল। সেই **পঞ্চপ্রাণ**কে আমাদের পূর্বপুরুষেরা চিহ্নিত করেছিলেন পাঁচটি নামে — **নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়**। কিন্তু এগুলি ঠিক কাদের বোঝাত, কী ধরনের ক্রিয়াকলাপকে বোঝাত, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে এগুলি যে সমাজের পাঁচ প্রকার ক্রিয়াকলাপ এবং সেই ক্রিয়াকলাপ আচরণকারী গোষ্ঠীকে বোঝাত, তা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই।

প্র অন হয়ে থাকা বা **প্রাণ** থাকা বলতে আমাদের প্রাচীন পুরুষরা এরকমই বুঝতেন। ইংরেজি life বলতে কাকে বোঝায়, পাঠক তা বিচার করুন, দেখুন, তার সঙ্গে **প্রাণ** শব্দের তুলনা চলে কিনা। এবং অপান, উদান, ব্যান প্রভৃতি শব্দগুলিকে যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাডেমি শিক্ষিত বাংলাভাষীর পক্ষে তা সঠিক কাজ হয়েছে কিনা।

প্রাণদা (প্রাণদা-যমদূতিকা) : ২. ***প্রাণদা*** = ***প্রাণ*** *দান করে যে।* ***প্রাণদা-যমদূতিকা*** = ***প্রাণদা*** *ও* ***যমদূতিকা*** *(যমদূতীর মতো কাজ করে যে)।* ৩. **প্রাণদা** = হরীতকী। (ব.শ.)। **প্রাণদা-যমদূতিকা** = তেঁতুল। ৪. কিছুদিন আগেও **প্রাণদা** শব্দটি মেয়েদের নামরূপে প্রচলিত ছিল, যথা প্রাণদাসুন্দরী দেবী। এখন শব্দটি প্রায় সর্বৈব অপ্রচলিত। আর, **প্রাণদা-যমদূতিকা** শব্দটি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রচলিত ছিল, এখনও আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা শব্দটির অর্থ জানেন। পণ্ডিত শিবকালী ভট্টাচার্য্য তাঁর গ্রন্থে শব্দটির ব্যাখ্যা রেখেছেন। ৫. নরের শুষ্ক জীবনে নারীর আগমন সময়বিশেষে প্রাণদায়ী ভূমিকা নিয়ে থাকে। অসুস্থ পরিজনের বুকে মমতাময়ী নারী হাত বুলিয়ে দিলে সে যে প্রাণ দান করার মতোই হয়, অনেক ভুক্তভোগী তা জানেন। সুতরাং মেয়েদের নাম **প্রাণদাসুন্দরী** হওয়াই তো যথাযোগ্য নাম হতে পারে। তেমন নাম কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল, আজ নেই। একই ক্রিয়া হরীতকী করে বলেই সেকালের আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা তার নাম দিয়েছিলেন — **প্রাণদা**। আর, **প্রাণদা-যমদূতিকা** নামটি তাঁরা দিয়েছিলেন তেঁতুলকে। এই বস্তুটি এমন অদ্ভুত গুণসম্পন্ন যে, যথাসময়ে যথাযথভাবে (পরিমাণে, অনুপান সহযোগে ...) তার প্রয়োগ করতে পারলে মৃতপ্রায় রোগীও **প্রাণ** পেয়ে যায়; আবার ভুল সময়ে অযথার্থভাবে (ভুল

পরিমাণে ...) তার প্রয়োগ ঘটালে বস্তুটি যমদূতের মতো কাজ করে। সেই কারণে তার ঐরূপ নাম দেওয়া হয়েছিল।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য প্রধানত এই যে, আমাদের আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রীরা আমাদের চারদিকের বস্তুগুলির যে আয়ুর্বেদীয় নাম দিয়েছিলেন, সেই নামগুলিই বস্তুগুলির উপযোগিতা জানিয়ে দেয়। পণ্ডিত শিবকালী ভট্টাচার্য্য তাঁর সাধ্যমতো সেগুলিকে একালীকরণ (আপডেট) করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে তো ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ছিল না। ফলে, কাজটি অসম্পূর্ণ আছে। আগামী দিনে সেই কাজটি সম্পূর্ণ করে নিতে পারলে বিশ্বমানবের সামনে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

প্রাণায়াম : ২. ***প্রাণের*** *আয়াম (প্রসারণ) যাহাতে।* **৩.** প্রাণের (শ্বাসপ্রশ্বাসের) নিরোধ, যোগাঙ্গবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** এখনও যাঁরা ভারতীয় দৈহিক **যোগ** সাধনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন। **৫.** সম্প্রতি **প্রাণায়াম**-এর ভাল মার্কেট হয়েছে। ফলে, জিনিসটি বিকোচ্ছে ভাল। তবে সবক্ষেত্রে যেমন হয়, অতি সূক্ষ্ম চাকু দিয়ে শল্যচিকিৎসক মানুষের শল্যচিকিৎসা করেন, কাটাছাঁটা করেন; কিন্তু তাই দিয়েই খুনী আরও নিখুঁতভাবে খুন করে। এক্ষেত্রেও তেমনি চলছে। ভালমানুষ **প্রাণায়াম**-এর সুব্যবহার করছেন, মন্দ মানুষ তার কুপ্রয়োগ করছেন।

তা সে যাই হোক, **প্রাণায়াম** ভারতীয় **যোগসাধনা**র একটি অঙ্গমাত্র। সংযম ক্রিয়ার একটি রূপ হল আয়াম, অপরটি ব্যায়াম। প্রথমটি শ্বাস গ্রহণ-বর্জনের কতকগুলি প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়া চালিয়ে মানুষ তার **প্রাণ**কে প্রসারিত করতে পারে। তাই তদ্রূপ যোগসাধনাকে **প্রাণায়াম** বলে। তবে এ হল দৈহিক যোগের একটি অঙ্গ। শুধুমাত্র দৈহিক যোগ মানুষকে **হঠযোগী** করে তোলে। কিন্তু একই সঙ্গে মানসিক **প্রাণায়াম** করতে পারলে মানুষের মনের প্রসারতাও বৃদ্ধি পায়। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ দৈহিক যোগের তুলনায় মানসিক যোগের উপর, দৈহিক **প্রাণায়াম**-এর চেয়ে মানসিক **প্রাণায়াম**-এর উপর বেশি জোর দিতেন। আমাদের মতে, উভয় প্রকার **প্রাণায়ামেই** সমান জোর দেওয়া উচিত। দ্র. **যোগ**।

প্রাণী : ২. ***প্রাণকে*** *গতিশীলভাবে ধারণ করে যে।* **৩.** প্রাণ, জীবন, জীবাত্মা, জন্মী, চেতন, মনুষ্য, কীটাদি, জীব, জন্তুমাত্র। (ব.শ.)। **৪.** living being অর্থে প্রচলিত। **৫.** কথাটি খুবই সহজ, প্রাণ আছে যার, সেই হল **প্রাণী**। কিন্তু শব্দবিধিকে তো তার নিয়মে চলতে হবে। **প্রাণ** যার থাকে, সে তো একটি দেহবান সত্তা, সেই সত্তার ভিতরে **প্রাণ** থাকে; দেহই **প্রাণের** আধার। তাকে বাদ দিয়ে **প্রাণ** থাকে না। আবার **প্রাণ**কে বাদ দিয়ে জীবন্ত দেহও থাকে না। আর, আধারসত্তা সর্বদা **প্রকৃতি** পদবাচ্য এবং অতএব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, **প্রাণের** আধারসত্তাকে স্ত্রীলিঙ্গ হতে হয়। তাই **প্রাণ** যার ভিতরে সক্রিয় থাকে, সেই আধারস্বরূপ দেহটিকে তার আধেয়সহ **প্রাণী** বলে। **প্রাণ** বা আধেয়কে বাদ দিয়ে **প্রাণী**দেহটি নয়। সেই কথাটি মনে রাখলে দেখা যায়, উপরোক্ত ৩-এ প্রদত্ত **প্রাণী** শব্দের অর্থগুলির যাথার্থ্য বিষয়ে সংশয় থাকে না।

প্রায় (প্রায়ঃ, প্রায়শ্চিত্ত) : **১.** প্র + √ই + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রায়*** = *প্রকৃষ্ট অয়ন বা যাওয়া যাহাতে।* ***প্রায়ঃ*** = ***প্রায়***-*এর শেষ যাহাতে।* ***প্রায়শ্চিত্ত*** = ***প্রায়***-*এর শেষ বা সর্ব্বোচ্চ **চিত্ত**ন (আবিষ্করণ-উদ্ভাবন) করা হয় যাহাতে।* / **প্রায়শ্চিত্ত (প্রায়শ্চিত্তি)** = প্রায়ের চিত্ত চিত্তি যাহা দ্বারা; যাহাতে তপস্যার নিশ্চয় (থাকে)। (ব.শ.)। **৩. প্রায়** = প্রয়াণ, অনশনমৃত্যু, ক্রিয়াপরিত্যাগপূর্ব্বক অভোজন, ভূমা, বয়ঃ, দশা, পাপ, তুল্য, অবধারণবাহুল্য, কিছু-কম। **প্রায়ঃ (প্রায়স্)** = বাহুল্য, তপঃ, ব্রত। **প্রায়শ্চিত্ত** = পাপক্ষয়নিশ্চয়যুক্ত, তপোভেদ, পাপক্ষয়সাধন চান্দ্রায়ণাদি, পাপশোধনার্থ কর্ম্মমাত্র। (ব.শ.)। **৪. প্রায়** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **প্রায়ঃ** অপ্রচলিত। **প্রায়শ্চিত্ত** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. প্র** (= প্রকৃষ্ট) ও **ই** (= যাওয়া) দুটি বর্ণের অর্থ আমরা আগেই জেনেছি। সেই সুবাদে, প্রকৃষ্টরূপে যাওয়া হয়েছে যাতে, তাকে **প্রায়** বলে। একটি সত্যের সর্বোচ্চ যতদূর অর্জন করা যায়, সেটিকে **প্রায়** বলে। বাস্তব ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সেই **প্রায়** নানাভাবে সেই 'সত্যের নিকটবর্ত্তী' অর্থে প্রযুক্ত হয়। সেই কারণে **প্রায়** শব্দটি 'সম্পূর্ণ-র কাছাকাছি' অর্থে প্রচলিত রয়েছে, দেখা যায়। যেমন, রামবাবু **প্রায়** এসে পড়লেন ব'লে; **প্রায়** এক হাজার দর্শক; মৃত**প্রায়** রুগী ... ইত্যাদি। রামবাবুর আসা হোক, দর্শকসংখ্যা হোক, কিংবা মৃত্যু হোক — সবক্ষেত্রে যতখানি ঘটলে পূর্ণ ঘটনাটিই ঘটে, **প্রায়** শব্দটি তার সবচেয়ে কাছাকাছি পর্যন্ত যাওয়া বুঝিয়ে দেয়; অনেকটা 'উন' শব্দের মতো। **প্রায়শ্চিত্ত** শব্দের বেলাতেও তাই হয়।

চিত্ত কাকে বলে, সেকথা আমরা বিস্তারিত ভাবে জেনেছি **চিত্ত** ও **বুদ্ধি** শব্দে। 'অনুসন্ধানাত্মিকা **বৃত্তি**'ই হল **চিত্তের বৃত্তি**। অর্থাৎ, কোনো একটি কাজের জন্য যতখানি আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞান লাগে, তা খোঁজখবর করে সংগ্রহ করা **চিত্তের** কাজ। অর্থাৎ কাজটির জন্য যতখানি জ্ঞান লাগবে, ততখানি বা তার খুব কাছাকাছি **চিত্ত**ন করে ফেলাকেই **প্রায়শ্চিত্ত** করা বলে।

এই পর্যন্ত পাঠ করে পাঠকপাঠিকা আশ্চর্য হয়ে বলবেন, 'হায় হরি! এ কী! এতদিন তো আমরা জানতাম, **প্রায়শ্চিত্ত** করা মানে অনুশোচনা করা, পাপশোধন করার জন্য কিছু ধর্মবিহিত আচার অনুষ্ঠান করা! এর সঙ্গে আবিষ্কৃত জ্ঞান সংগ্রহ করার যোগ এল কোথা থেকে? তাছাড়া, ব.শ. **প্রায়শ্চিত্ত** শব্দের যে অর্থ সরবরাহ করেছেন, তা কি ভুল কথা? নাকি তাঁর কথাও আমরা ভুল বুঝছি?'

সত্যিই তাই! আমরা দুজনও **প্রায়শ্চিত্ত** শব্দটির অর্থ উদ্ধার করে তাজ্জব বনে গেছি। ... অন্য কথা বাদ দিয়ে এখন তবে উদ্ধার করা অর্থটি কী, কী ভাবে সেটি পাওয়া গেল, সরাসরি সে বিষয়ে যাওয়া যাক।

চিত্ত হল **বুদ্ধি** ও মনের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি। তার মানে, মানবমনের **চিত্ত** নামধারী অংশটি তার মনের উপদেশ-নির্দেশ অনুসারে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কাজ চালায়। সেই কাজে যতটা জানা যেতে পারত, যে **চিত্ত**ন কর্ম **প্রায়** ততটা জ্ঞান সংগ্রহের কাজ করে ফেলে, তাকে বলে **প্রায়শ্চিত্ত**-করণ। কিন্তু তাতে পাপশোধনের কাজ হচ্ছে কেমন করে?

এইখানে রয়েছে মূল সমস্যাটি। প্রাচীন কাল থেকে আমরা জেনে

আসছি, কাজ করলে ভুল হয়, হতে পারে। জেনেশুনে ভুল করাকে **বলে দোষ বা অপরাধ, না** জেনে ভুল করাকে বলা হয় ভুল। কাজ **করতে গিয়ে মানুষ** দোষ বা অপরাধ করে, ভুলও করে। **অপরাধ করলে শাস্তি** পেতে হয়, ভুল করলে **প্রায়শ্চিত্ত** করতে হয়। কিন্তু **ভুল করলে প্রায়শ্চিত্ত** কেন? অপরাধ করলে শাস্তিই বা কেন?

আপনি একটি যৌথপরিবারের মাথা, বড়দা। আপনি ঠিক করলেন একটি পাকা বাড়ি বানাবেন। তার জন্য উপযুক্ত জায়গা চাই, কাঙ্ক্ষিত বাড়ির নকশা চাই, প্রয়োজনীয় উপকরণস্বরূপ ইট বালি সিমেন্ট কাঠ ... ইত্যাদি চাই, উপযুক্ত মিস্ত্রী ও তার সহযোগীদের চাই, সর্বোপরি বাড়ি বানানোর জন্য ভাইদের এবং কর্পোরেশনের অনুমতি চাই এবং টাকা চাই; অর্থাৎ কিনা একটি সমগ্র প্রকল্পের পরিকল্পনা চাই। কিন্তু আপনি সেসব ভাবনাচিন্তা সম্পূর্ণ করলেন না। হাতে ছিল আপনাদের যৌথপরিবারের টাকা। তাই নিয়ে আপনি কাজে নেমে পড়লেন; আপনার পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর কথাও শুনলেন না। ফল হল এই যে, নানান সমস্যা ও ঝামেলায় মাঝে মাঝেই কাজ বন্ধ হতে লাগল, ঝগড়াঝাঁটি হতে লাগল, এমনকি মারদাঙ্গা হয়ে গেল, রক্তারক্তি, হাসপাতাল ছুটোছুটি পর্যন্ত হয়ে গেল এবং একবছর ধরে এসব চলার পরে অবশেষে টাকা ফুরিয়ে গিয়ে কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। ...

এখন প্রশ্ন হল, এই যে আপনার গৃহনির্মাণ-যজ্ঞ আধখানা হয়ে পড়ে রইল এবং কার্যত ব্যর্থ হল, এ তো আপনার যজ্ঞপূর্ব্ব পরিস্থিতির চেয়েও খারাপ। কেননা, তখন অন্তত জায়গাটা খালি ছিল, হাতে টাকা ছিল। এখন জায়গাটা দখল হয়ে গেছে, পরিবারের সকলের একবছর সময় গেছে, এত উপকরণ নষ্ট হয়েছে, সর্বোপরি পরিবারের বিশাল অঙ্কের টাকাও গেছে। বলতে গেলে গোটা পরিবারকে আপনি পথে বসিয়ে দিয়েছেন। এর ফল তো সমগ্র পরিবারকে ভুগতে হবে। এখন আপনার কী হবে?

এ যদি আপনার গোঁয়ার্তুমির জন্য হয়ে থাকে, ভাইয়েরা আপনাকে সতর্ক করেছিল, তাদের কথা শোনেননি বলে এইরকম হয়ে থাকে, তাহলে এ হল আপনার দোষ বা অপরাধ। এর শাস্তি আপনার পাওয়া উচিত, তা সে যেরকম শাস্তিই হোক। প্রথমেই পরিবারের পরিচালকের আসন থেকে আপনার ভাইরা আপনাকে সরিয়ে দেবেনই। তারপর যে শাস্তি তাঁরা দেবেন, সেটি আপনাকে মাথা হেঁট করে মেনে নিতে হবে। আপনার নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ তো গেলই। ...

কিন্তু এ যদি আপনার স্বেচ্ছাকৃত ভুল না হয়, আপনি যতটা জানতেন তাই নিয়ে ভাইদের সঙ্গে প্রতি স্তরে আলোচনা করে করেই এগিয়েছিলেন, তাহলে এ আপনার ভুল। সেক্ষেত্রে আপনাকে **প্রায়শ্চিত্ত** করতে হবে। পুনরায় আগাগোড়া ভেবেচিন্তে তথ্য-তত্ত্ব খুঁজে-পেতে সংগ্রহ করে সমগ্র প্রকল্পটি রচনা করতে হবে, নতুন করে সমগ্র পরিকল্পনা বানাতে হবে। তার যে পর্যন্ত হয়েছে তার পর থেকে কী ভাবে বাকিটা বানাবেন, তার জন্য যা যা তত্ত্ব-তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, সেসব করতে হবে। অর্থাৎ কাজটি করার জন্য যতটা **জ্ঞান দরকার, প্রায়** ততটা **চিত্তন** করতে হবে, পূর্বতন পরামর্শদাতা **ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে,** আপনার ভুলের জন্য যার যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। এবং নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে পুনরায় কাজটিতে হাত দিয়ে বাড়িটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে হবে। **একেই বলে প্রায়শ্চিত্ত** করা।

ঠিক আজকের দিনে, ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমরা যে বাংলায় আছি, তার শাসকেরা আমাদের জানাচ্ছেন, দোষ বা অপরাধ বলে কোনো পদার্থ নেই, হয় না। তাঁরা কখনো কোনো দোষ বা অপরাধ করেন না। তাঁদের কাজে রয়েছে শুধুমাত্র 'ভুল' এবং সে ভুলের কোনো **প্রায়শ্চিত্ত** হয় না, হয় **আত্মসমালোচনা**। তাঁদের গোঁয়ার্তুমির জন্য হাজার হাজার সহনাগরিকের প্রাণ চলে গেলেও, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট হলেও, কোটি মানুষের কোটি কোটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হলেও ... তাঁদের কোনো দোষ হয় না, শাস্তি হয় না; তাঁদের শুধুই 'ভুল' হয় এবং সে ভুলের **প্রায়শ্চিত্ত** পর্যন্ত তাঁরা করেন না। মূর্খামির যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

প্রার্থনা (প্রার্থী) : ১. প্র + ✓অর্থ্ + অন (যুচ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২. *প্রার্থনা* = *প্রকৃত*** *অর্থ অন (on) থাকে যাহাতে।* ***প্রার্থী*** *=* ***প্রার্থনা*** *করে যে।* **৩. প্রার্থনা** = যাচ্ঞা, লাভাভিলাষ, অভিলাষ, অভিযান, মনোরথ, কাম। **প্রার্থী** = যাচক, প্রার্থনাশীল। (ব.শ.)। **৪.** prayer অর্থে **প্রার্থনা** এবং one who prays অর্থে **প্রার্থী** শব্দটি প্রচলিত। **৫.** ইংরেজি prayer শব্দের সঙ্গে কিন্তু **প্রার্থনা** শব্দের গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। এর ভিতরে **প্র**-অর্থন্ রয়েছে। তার মানে, এতে বলা হচ্ছে — আপনি আমাকে এই এই বস্তু বা বিষয় দিন, পরিবর্তে আমি আপনাকে তার সমান এই এই বস্তু বা বিষয় প্রতিদান দিব; কিংবা আপনাকে আমি এই এই বস্তু বা বিষয় দিয়েছি, এখন আপনিও তার সমান এই এই বস্তু বা বিষয় দিন। এই যে বস্তু বা বিষয়, এর মধ্যে বাহ্যবস্তু বা বিষয় যেমন থাকতে পারে, তেমনি মানসবস্তু বা বিষয়ও থাকতে পারে। যেমন আমি আপনাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়েছি, আপনি আমাকে মনুষ্যত্ব-মহত্ত্ব দিন ... ইত্যাদি। মোটকথা **প্রার্থনা**র ভেতরে সমান সমান অর্থ (বাহ্যিক **অর্থ** বা মানসিক **অর্থ**, যাই হোক না কেন) লেনদেনের কথা আছে। **প্রার্থী** একতরফা **প্রার্থনা** করে না।

কিন্তু **প্রার্থনা**তে এরকম উভয় দিকের সমান লেনদেনের কথা ঢুকিয়ে রাখা আছে কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা কি জানতেন — না দিয়ে নেওয়া যায় না? কিংবা নিলে দিতেই হয়?

হ্যাঁ, লেনদেনের ব্যাপারে এই বিশ্বব্যবস্থার অমোঘ নিয়ম আছে; এবং সেকথা আমাদের পূর্বসূরিরা জানতেন। গ্রহণের বা দানের সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া নিউটনের নিয়ম মেনেই চলে। কেউ কাউকে কিছু দিলে, সে যদি পরিবর্তে কিছুই না দেয়, বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং তার লেনদেন ঘটিয়ে দেন, তার অন্যথা হওয়ার উপায় নেই। আপনি কাউকে তার অসুবিধার কথা শুনে হাজার টাকা দান করে দিলেন। ফল হবে এই যে, তার সঙ্গে সম্বন্ধের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে আপনি মনে মনে সেই টাকার মাপে উপরে উঠে যাবেন এবং সেও সেই স্বাভাবিক অবস্থান থেকে মনে মনে ঠিক ততখানি নীচে নেমে যাবেই। এই অমোঘ নিয়ম অতিক্রম করার কোনো উপায় আজও আবিষ্কৃত হয়নি। মনীষীরা তাই এ-ব্যাপারে নানা উপদেশ

দিয়ে গেছেন। হজরত মহম্মদ বলতেন, দান করে ভুলে যেয়ো; তোমার ডান হাতের দানের কথা বাম হাত যেন জানতে না পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো অত পারে না। কেননা, কোনো কিছু মনে করে মনে রাখার চেয়ে মনে করে ভুলে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ।

স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে চারদিকে যে এত দানের গপ্পো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, তার মানে কী? গরীব মানুষকে সাহায্য করো, দয়া করো, দান করো ... ইত্যাদি ইত্যাদি। চারদিকে হাজার হাজার দান করার সংস্থা খুলে রাখা হয়েছে। দুঃখী মানুষকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রগুলি, সংস্থাগুলি এবং কোটিপতিরা যেন উঠে পড়ে লেগেছে! সেগুলির মানে কী?

সেগুলির মানে খুবই খারাপ। এগুলি প্রধানত পাপীদের মনের গ্লানি দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা ও প্রতিক্রিয়ার ভয় থেকে ঘটছে। আবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও ঘটছে — মাঠঘাট জল জঙ্গল পাহাড় সব দখল করলে সেখানে বসবাসকারী মানুষগুলো তো চেঁচামেচি করবে; অতএব তাদের জন্য উদ্বাস্তুশিবির খোলা চাই, লঙ্গরখানা খোলা চাই, রেডক্রস খোলা চাই! এঁরা একদিকে দখল করেন, অন্যদিকে দান করার ঢং করেন। ...

তবে হ্যাঁ, বেশ কিছু দয়ালু ভালমানুষও আছেন। তাঁরা কেবল জানেন না যে, মানুষ মানুষকে দয়া করতে পারে না, পরমাপ্রকৃতি আমাদের সে অধিকার দেননি। মানুষ অন্য মানুষের জন্য যেটুকু করতে পারে, সেটুকু হল অন্য মানুষের সামনে থেকে বেড়াগুলি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রগুলি মানুষকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে প্রতিটি মানুষের চারদিকে হাজার বিধিনিষেধের বেড়া দিয়ে রেখেছে, যেকারণে অধিকাংশ মানুষ তাঁদের স্বাভাবিক-প্রকৃতিক অগ্রগতি ঘটাতে পারেননি, পারছেন না। তাঁদের অন্তরের কথা এই যে — পরমাপ্রকৃতির এই দুনিয়ায় তুমি আমি তো সমান অধিকার নিয়েই জন্মেছিলাম, আজ তুমি উঁচু হয়েছ, বড়ো হয়েছ, আমি নীচু হয়েছি, ছোট হয়েছি; সে তো জগতের কাছ থেকে আমার যা নেওয়ার ও দেওয়ার তা আমি নেওয়া-দেওয়া করতে পারিনি বলেই। আর, সেটার কারণ হল এই বেড়াগুলো। এই বেড়াগুলোর কারণেই তুমি রাজা আমি ফকির; ঐ বেড়াগুলোর কারণেই 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!' এখন তুমি যদি নেহাত কিছু করতে না পারলে মনের গ্লানিতে ভোগো, তো, ঐ বেড়াগুলো সরিয়ে দাও। তাতেই হবে। আমার ভালমন্দ, উন্নয়ন-অবনয়ন আমাকেই বুঝে নিতে দাও। আমাকে দয়া করতে এসো না, তাতে তোমার গ্লানি বাড়বে বই কমবে না; তা তুমি রাষ্ট্রপতি, কোটিপতি, এনজিও-পতি, বিদ্যাপতি ... ইত্যাদি হও আর দয়ালু যুক্তিবাদী ন্যায্যবাদী সাম্যবাদী উগ্রবাদী ... ইত্যাদি যেই হও। ...

শেষ কথা এই যে, যে কোনো ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনে **প্রার্থনা** করতে পারি, কেননা, তাতে সমমর্যাদার সুযোগ আছে; যার কাছে **প্রার্থনা** করছি, তাকে কিছু দিয়েছি কিংবা দেব; কিন্তু prayer করতে পারি না। কেননা, সেটি একতরফা হাত-পাতা মাত্র। কোনো মানুষের পক্ষেই এরকম একতরফা হাত-পাতা উচিত নয়, একতরফা দানও উচিত নয়; সেরকম আচরণ দাতা-গ্রহীতা উভয়ের আত্মার পক্ষেই গ্লানিকর।

প্রেত (প্রেতকায়, প্রেতগৃহ, প্রেততর্পণ, প্রেতদেশ, প্রেতনদী, প্রেতনাথ, প্রেতপুরী, প্রেতভূমি, প্রেতলোক, প্রেতশুদ্ধি, প্রেতশ্রাদ্ধ, প্রেতাত্মা, প্রেতান্ন, প্রেতিনী, পেত্নী, অভিপ্রেত) : ১. প্র + ✓ই + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রেত*** *= যার* ***প্র*** *(প্রাণ ও দেহের যৌথতা) গত হয়েছে বা চলে গেছে।* ***প্রেতাত্মা*** *= প্রেতের আত্মা (যে)।* ***অভিপ্রেত*** *= যাহা* ***অভিপ্রায়*** *অনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছে।* **৩. প্রেত** = প্রয়াত, মৃত, ভূতবিশেষ, নরকস্থ প্রাণিবিশেষ, পিতৃলোকস্থ পিতা, আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ। **প্রেতকায়** = শব। **প্রেতগৃহ** = **শ্মশান**। **প্রেততর্পণ** = প্রেতোদ্দেশে বর্ষপর্য্যন্ত কর্ত্তব্য জলদানক্রিয়া। **প্রেতদেশ** = প্রেতপুর, যমপুর। **প্রেতনদী** = বৈতরণী। **প্রেতনাথ** = যমরাজ। **প্রেতপুরী** = যমালয়। **প্রেতভূমি** = শ্মশান। **প্রেতলোক** = যমপুর। **প্রেতশুদ্ধি** = মৃত হইলে কালবিশেষে শুদ্ধি, সপিণ্ডের মরণনিমিত্ত ও অসপিণ্ডের দহনবহননিমিত্ত অশৌচের কালবিশেষের অপগম। **প্রেতশ্রাদ্ধ** = আদ্যশ্রাদ্ধাদিসপিণ্ডন পর্য্যন্ত প্রেতোদ্দেশ্যক ষোড়শ শ্রাদ্ধ (আদ্যশ্রাদ্ধ + দ্বাদশ মাসিক + ষাণ্মাসিকদ্বয় + সপিণ্ডীকরণ)। **প্রেতান্ন** = মরণাশৌচযুক্তের অন্ন, মৃতকান্ন। **প্রেতিনী (পেত্নী)** = প্রেত-স্ত্রীজাতি। **অভিপ্রেত** = অভিমত, উদ্দিষ্ট, মনোগত, বিবক্ষিত, সঙ্কেতিত, মত, অভিলষিত, ইষ্ট, সম্মত, প্রিয়। (ব.শ.)। **প্রেতাত্মা** = প্রেতের আত্মা। **৪.** শব্দগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মভীরু মানুষদের মধ্যে কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **প্র**। জীব মাত্রেই বাহ্যবস্তুসমূহের এমন সমুচ্চয়ী-সম্মিলন, যাতে তার **প্র** অন হয়ে রয়েছে বা **প্রাণ** রয়েছে। সেই **প্র** চলে গেলে, সম্মিলনটিও থাকে না, ভেঙে পড়ে; একেই বলে **প্র ইত** বা **প্রেত**। তাই **প্রাণ** চলে গেলে দেহও থাকে না, চলে যায়, চলে যেতে হয়, চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। একেই বলা হয় 'কবর দেওয়া', 'মড়া-পোড়ান' ... ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ তো শুধুমাত্র দেহমন্দিরের অধিবাসী **প্রাণ**-বাবুর লীলাক্ষেত্রই নয়, তার একটি টিকির মতো 'আমি-বোধ'ও থাকে, যাকে আমাদের পূর্বসূরিরা শনাক্ত করেছিলেন **আত্মা** বলে। এই আত্মার বা 'আমি-বোধ'-এর একটি করে নামও হয় — রাম, শ্যাম, যদু, মধু ... রহিম, রহমত, রহমান, রমজান ... হরিশ্চন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, মোসব্বরফ, মীজানুর, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ... ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ মরে গেলে অর্থাৎ তার প্রাণ ও দেহ 'প্রয়াত' বা **প্রেত** হয়ে গেলেও, তার সেই টিকিটি বা আত্মাটি (বা আত্মার নামটি) থেকে যায়, যা দিয়ে আমরা তাকে ধরি, তার সম্পর্কে কথাবার্তা বলি। বিগত মানুষের বা **প্রেতের** সেই ধরতাই-স্বরূপ 'আমি-বোধ'কে বলে **প্রেতাত্মা**। অনেকে বলেন, **প্রেত** চলে যায় কিন্তু **প্রেতাত্মা** বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে ততদিন, যতদিন সেই **প্রেত**-এর **আত্মা**র শান্তি না হয়, অর্থাৎ যতদিন তার দেওয়া **পিতৃঋণ**, **দেবঋণ**, **ঋষিঋণ** তার উত্তরসূরিরা শোধ করতে না পারে। কীভাবে সেই **ঋণ** শোধ করতে হয়, **তর্পণ** শব্দে সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই সুবাদে বলা যায় — বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ... প্রমুখ মানুষের **প্রেতাত্মা**রা এখনও আমাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কারণ আমরা তাঁদের দেওয়া **ঋষিঋণ** আজও শোধ করতে পারিনি। ...

এই পর্যন্ত মোটামুটি কমবেশি বোঝা যায়, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু

যে মুহূর্তে **আমরা জানতে পারি প্রেতনদী** মানে 'বৈতরণী', তৎক্ষণাৎ এ-পর্যন্ত বুঝে নেওয়া **প্রেত** ছটফট করতে শুরু করে। এই **প্রেতনদী** আবার কেমন নদী! তার আবার অমন নামই বা কেন?

এ প্রশ্নের যা উত্তর পাওয়া যায়, তা হল — 'যে স্রোতধারার সাহায্যে **বিতরণ** করা হয়', সেই স্রোতধারাকে 'বৈতরণী' বলে। তাকেই **প্রেতনদী**ও বলা হয়। মানুষ প্রয়াত বা **প্রেত** হলে তাকে **বৈতরণী** পেরিয়ে যমালয়ে যেতে হয়। ...

এ তো ভারি মুশকিলের কথা! যে চলে গেছে বা যায়, সেই প্রয়াত বা **প্রেত** কেমন করে 'বিতরণ'-এর নদী পার হবে? তাছাড়া নদীটির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা আদৌ বিলাসতরণী নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জায়গা নয়। ব.শ. এবং পৌ.অ. উভয়েই বলছেন, এই নদী দুর্গন্ধযুক্তা, উষ্ণতোয়া, এতে রুধির বয়, এবং এ নদী মহাবেগা। ব.শ. আরও জানিয়েছেন, এ নদী কেবল 'বিতরণসম্বন্ধিনী'ই নয়, ইনি 'গোদানতরণীয়া'। তার মানে, গোদান করলে এই নদী পার হওয়া যায়। অর্থাৎ, যেভাবেই হোক আমাদের পূর্বসূরিরা বুঝেছিলেন, এই **প্রেতনদী**র স্রোতে পড়ে যাওয়া মানুষের অভি**প্রেত** নয়, কোনো মতে এই **প্রেতনদী** পার হয়ে যাওয়াই মানুষের অভি**প্রেত**। অর্থাৎ, **অভিপ্রেত প্রেত** হয়, **অনভিপ্রেত প্রেত**ও হয়। তার মানে, **প্রেত** কমপক্ষে দুই প্রকার। মানুষের প্রয়াত দেহ-প্রাণের যে **প্রেত**, তার প্রয়াণ আমাদের অনভি**প্রেত**, সন্দেহ নেই; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের **প্রেত** কোনটি, যা আমাদের অভি**প্রেত**?

ব.শ. বলছেন, **প্রেত**দের বা প্রয়াতদের তালিকায় কেবল মানুষের দেহপ্রাণ কিংবা 'পিতৃলোকস্থ পিতা'ই নেই, রয়েছে ভূতবিশেষ, নরকস্থ প্রাণিবিশেষ, **আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ**। তার মানে, এই **প্রেত** হল একরকম ভূত, যে নরকে থাকে, যে একপ্রকার দেহও বটে যা অতিবাহিত দেহের উত্তর জাত হয়। কে এই সত্তা?

ইনি আরেক জাতের **প্রেত**। এই **প্রেত**কে দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন জার্মানির মার্কসসাহেব এবং তাঁর মহাগ্রন্থ 'ডাস্ ক্যাপিটাল'-এ একটি পুরো অধ্যায় জুড়ে এই **প্রেত** সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন তিনি। অধ্যায়টির নাম, *The Fetishism of Commodity and the Secret thereof* — অর্থাৎ *পণ্যের **প্রেত**তত্ত্ব ও তার গোপনকথা।* তাঁর মতে এই প্রেত হল বাহ্যবস্তুতে মানুষের মেধা ও শ্রম নিষিক্ত হয়ে গড়ে ওঠা মানুষের উৎপন্নসম্ভার, ব.শ. যাকে বলেছেন, ভূতবিশেষ, আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ।

সেই পণ্যসম্ভার সমগ্র সমাজে 'বিতরণ'-এর ব্যবস্থা রয়েছে যে ধারার দ্বারা, তাকে বলে **বৈতরণী**। এটি ধর্মাবতার যম বা আদালতের দ্বার দিয়ে প্রবাহিত অর্থাৎ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিতরণের যে ধারাস্রোত সমগ্র সমাজ জুড়ে বইছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, উষ্ণতোয়া ... ইত্যাদি। এখানে 'যা যাওয়ার' বা গো-পদবাচ্য, তাদের দান করে দিলেই ভাল; তাতে ঐ 'বৈতরণী' নদী অনায়াসে পার হওয়া যেতে পারে। অন্যথায় **নরক**বাস নিশ্চিত। দ্র. **নরক**।

এখন আমরা বুঝতে পারি, মানুষের অনভিপ্রেত **প্রেত** বিষয়ক **ধারণা জন্মেছিল** বহুকাল আগে; আর অভিপ্রেত **প্রেত** বিষয়ক **ধারণাগুলি জন্মায় সমাজে** উৎপন্নসম্ভারের ও তার বিতরণের এবং **কারাগার** ইত্যাদির আবির্ভাবের পর। স্বভাবতই অনভি-**প্রেত** ও তৎসংশ্লিষ্ট স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের ধারণার চেয়ে এই অভি-**প্রেত** ও তৎসংশ্লিষ্ট **যমালয়, বৈতরণী, নরকাদি** ... প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব হয়েছিল পরে। কেবল তাই নয়, এই **যমালয়, বৈতরণী, নরকাদি** ... ধারণার নিরিখেই পরবর্তীকালে আগেকার **প্রেত** বিষয়ক ধারণার অর্জনগুলিকেও সাজিয়ে নিতে হয়েছিল। ফল হয় এই যে, মানুষের মরণ ও মরণোত্তর ক্রিয়াকর্মগুলিকে উৎপন্ন ও পণ্য সম্ভারের **গঙ্গাপ্রাপ্তির** ও **বৈতরণী**-উত্তরণের (বিতরণাদির) সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টার ছাপ গিয়ে পড়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের মরণোত্তর **গঙ্গাপ্রাপ্তি** ও **শ্রাদ্ধাদি** ধারণার উপর। 'মরণাপন্ন মানুষ'কে 'তরণাপন্ন উৎপন্নে'র সঙ্গে সমান করে নেওয়া হয়। তার উপর চেপে বসে আমাদের '**পাদোদক-মূঢ়তা**'। সম্পন্নের পণ্যকে **গঙ্গাধারার** ঘাটে নিয়ে গিয়ে তরিয়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করার ধারণাকে প্রয়োগ করে ফেলা হয় মরণাপন্ন মানুষের উপর, তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা হয় গঙ্গা নদীর ঘাটে — কিনা অন্তর্জলীযাত্রা! (৫০/৬০ বছর আগেও কলকাতার গড়িয়ার ঘাটে খালের জলে পর পর সারি বেঁধে বাঁশের ঝুপড়ি করে রাখা ছিল ভাড়া দেওয়ার জন্য, অন্তর্জলী-যাত্রীদের সেখানে আনা হত মরণকালে গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য।)

মোট কথা, মানবাত্মার শ্রাদ্ধশান্তি ও পণ্যের শ্রাদ্ধশান্তিকে গুলিয়ে একাকার করে রাখা হয়; যেনবা অমৃতরস ও ধেনো-চোলাইমদ গুলে এক করে রাখা হয়েছে। অন্যেরা যে যাই বলুন, বাংলাভাষীদের মধ্যে মরণোত্তর ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সবাই কমবেশি ব্রাহ্মণদেরই নানাভাবে অনুসরণ করে থাকেন। সেই ব্রাহ্মণদের মরণোত্তর 'ক্রিয়াকর্ম' বা **প্রেতকর্ম** একেবারেই বিশ্রীরকম জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। কোনটা যে ভাল, কোনটা যে মন্দ, কোনটা করণীয় এবং কেন করণীয়, কিছু বুঝবার জো নেই আজ। আমরা কী আর বলব, বড়জোর বলতে পারি, অবিলম্বে এগুলির সংস্কার প্রয়োজন।

প্রী ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপ্রিয়, অপ্রিয়ংবদ, অপ্রীত, পিউ, পিউপিউ, পিয়, পিয়পিয়, পিয়া, পিয়ার, পিয়াল, পিয়ুপিয়ু, পিরিত, পিরি(রা)লি, পিরিলী, পিরীত, পিরীতি, পীয়োপীয়ো, পীরিত, প্যার, প্রিয়, প্রিয়ংবদ, প্রিয়ংবদা, প্রিয়ক, প্রিয়কাম, প্রিয়কাম্যা, প্রিয়কৃৎ, প্রিয়ঙ্কর, প্রিয়ঙ্করী, প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়চিকীর্ষু, পিয়জন, প্রিয়তম, প্রিয়দর্শন, প্রিয়বাদী, প্রিয়ব্রত, প্রিয়মণ্ডন, প্রিয়ম্বদা, প্রিয়সখ(া), প্রিয়সখী, প্রিয়সমাগম, প্রিয়সাল, প্রিয়সি(সী), প্রিয়স্বপ্ন, প্রিয়া, প্রিয়ার্হ, প্রিয়াল, প্রিয়োত্তম, প্রিয়োপভোগ, প্রী, প্রীণন, প্রীত, প্রীতি, প্রীত্যঙ্কুর, প্রীত্যাভ্যাস, প্রীয়মাণ, প্রেম, প্রেমচিন্তা, প্রেমচিন্তামণি, প্রেমদা, প্রেমনাট, প্রেমবন্ধ, প্রেমবন্ধন, প্রেমবান, প্রেমবিশ্বাসভূমি, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রেমভক্তি, প্রেমমুগ্ধা, প্রেমা, প্রেমারা, প্রেমিক, প্রেমিকা, প্রেমী, প্রেয়, প্রেয়স, প্রেয়সী, প্রেয়ান, সুপ্রিয়।

প্রী = **প্র**-এর গতিশীল আধার যে; **প্র**-অন করে যে।

প্রিয় (প্রিয়ক, প্রিয়ংবদ, প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়া, প্রিয়াল, প্রিয়সাল) : ১. ✓প্রী + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *প্র গতিশীল হয় বা যায় যাহাতে।* ৩. **প্রিয়** প্রীণয়িতা, অভীষ্ট, দয়িত, অভিমত, সহজপ্রীতিমান, পতি, প্রিয়জন, সুহৃৎ, জামাতা, প্রীতিবিষয়, মৃগবিশেষ, প্রিয়কার্য্য, প্রিয় বাক্য কার্য্য বার্ত্তা বা বিষয়, চাটুবাদ। **প্রিয়ক** = চিত্রমৃগ, ভ্রমর, কুঙ্কুম, প্রিয়ঙ্গু, পীতসাল, ধারাকদম্ব, পীতসালপুষ্প। **প্রিয়ংবদ** = মধুরভাষী, সত্যপ্রিয়বাদী। **প্রিয়ঙ্গু** = লতাবিশেষ, শ্যামা (স্ত্রীস্পর্শে ইহা বিকশিত হয়, স্ত্রীস্পর্শ ইহার দোহদ), পিপ্পলী, রাজিকা, কঙ্গু। **প্রিয়া** = ভার্য্যা, দয়িতা, নায়িকা, তির্য্যক্‌স্ত্রীজাতি, মদিরা, মল্লিকা। **প্রিয়াল** = পিয়ালবৃক্ষ, প্রিয়সাল। **প্রিয়সাল** = অসনবৃক্ষ, পিয়সাল, পিয়াল (Terminalia tomentosa)। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **প্র**। প্রাপণ রক্ষণের সামঞ্জস্য আছে যাহাতে, **পুরুষ-প্রকৃতির** সেই সমুচ্চয়ী-সম্মিলনরূপী **প্র**-সত্তা গতিশীলভাবে যায় যাহাতে, সেই হল **প্রিয়**। তার মানে, যার স্ব-ভাবে **প্র**-সত্তা সর্বদা চলমান থাকে, তাকেই **প্রিয়** বলে। তার ভিতরে এই **প্র** গতিশীলভাবে থাকার ফলে আপনি তাকে কিছু দিলে, সে সম গুণ বা পরিমাণে কিছু না কিছু আপনাকে দেবেই। আপনি আপনার উদ্বৃত্ত (বস্তু বিষয় মমতা আবেগ স্নেহ ... ইত্যাদি) তাকে দিলে, সেও তার উদ্বৃত্ত (যা গ্রহণ করবার মতো অভাব বা ফাঁক আপনার আছে) দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ করে তোলার ব্যবস্থা করতে পারে। সেই কারণেই সে আপনার **প্রিয়** হয়। তাই 'আমার **প্রিয়**' কথাটির মানে দাঁড়ায়, আমার **প্র**-সত্তার যে উদ্বৃত্ত ও অভাবগুলি রয়েছে, আমার **প্রিয়**-সত্তাটি সেগুলি লেনদেন করে পরস্পরকে পূর্ণ করার পথে এগিয়ে দেয়। তাই সে 'আমার **প্রিয়**' শব্দে কথিত হয়। তবে কিনা, **প্রিয়** শব্দের এই আদি অর্থটি বর্তমানে অনেক বিস্তারিত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি প্রাসঙ্গিক ছাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ...

কিন্তু যে সমস্ত সত্তাগুলিকে **প্রিয়ক, প্রিয়ঙ্গু, পিয়াল** ... ইত্যাদি বলে, তাদের সম্বন্ধে আমরা এত কম জানি যে, তাদের ভিতরে কীভাবে **প্রিয়** সত্তাটি বিদ্যমান রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। পিয়াসাল বা অসন (আসন) বৃক্ষ সম্বন্ধে কেবল এই তথ্য আমাদের কাছে আছে যে, এই গাছের কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও সুদৃঢ়, প্রায় সালকাঠের মতোই; অথচ তাসত্ত্বেও তাতে অতি সুদৃশ্য রেখাচিত্রও রয়েছে। সাধারণভাবে কিন্তু দেখা যায়, যে কাঠের সুদৃশ্য রেখাচিত্র থাকে, তা খুববেশি শক্ত বা সুদৃঢ় হয় না। আসন কাঠের কিন্তু এই দুই গুণের সামঞ্জস্য আছে।

প্রিয়ব্রত : ১. প্রিয় + ব্রত। ২. *প্রিয় ব্রত যাহার।* ৩. উত্তানপাদের ভ্রাতা। (শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবীভাগবত ও অগ্নিপুরাণ অনুসারে) ইনি ব্রহ্মা ও শতরূপার এক পুত্র। অন্যমতে ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইনি প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। সূর্য তাঁর কিরণ দ্বারা মাত্র অর্ধ-পৃথিবী আলোকিত করতেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রিয়ব্রত তাঁর বেগবান জ্যোতির্ময় রথে আরোহনপূর্বক সূর্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে রাত্রিকে দিনে পরিণত করতে চান। এর ফলে রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটি গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই সাতটি গহ্বর হতে সপ্ত-সমুদ্রের উৎপত্তি। এই সপ্তসাগর লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, জল, ও দুগ্ধসাগর নামে খ্যাত। এই সপ্তসাগরের দ্বারাই সপ্ত-মহাদেশ ও সপ্ত-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রিয়ব্রতের কন্যা উর্জস্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্যের বিবাহ হয় এঁরই গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করে। ইনি (প্রিয়ব্রত) পরিণত বয়সে পুত্র আগ্নীধ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে বনবাসী হন।

বিষ্ণুপুরাণ মতে রাজা প্রিয়ব্রত কর্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই কন্যা ও দশটি পুত্র হয়। তিনটি পুত্র অত্যন্ত ধর্মমনোভাব সহকারে জীবনযাপন করেন। অবশিষ্ট সাত পুত্রকে ইনি সপ্তদ্বীপ দান করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আগ্নিধ্র, উত্তানপাদ**। এককালে উৎপন্ন ছিল দু'ধরনের — কৃষিজাত ও কারুকার্যজাত। স্বভাবত দুই ধরনের জনগোষ্ঠীও ছিল। যতদূর বোঝা যায়, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী ও তাদের কাজকে বলা হত **প্রিয়ব্রত**, অন্যটিকে বলা হত **উত্তানপাদ**। কৃষিকাজকে **প্রিয়ব্রত** বলা হত কেন?

না, পুরাণকারগণ তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। পুরাণ জানাচ্ছে, ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, অর্থাৎ এই সত্তা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত আদি মানুষদের থেকে জাত একটি ধারণা ও সেই ধারণাধারী জনগোষ্ঠী। পুরাণ মতে এই সত্তা সূর্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, অর্থাৎ, আদিম যৌথব্যবস্থার যে কেন্দ্রীয় জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের পরিচালকবৃন্দ (**সূর্য্য**) ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এঁর অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি সমাজের একদিকে অন্ধকার রাত্রি করে রাখেন। তাই দেখে এই **প্রিয়ব্রত** তার পিছনে রথ নিয়ে ছুটেছিলেন। কিন্তু তাতে রাতকে দিন করা যায়নি বটে, কিন্তু সাত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে গিয়েছিল। সেটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, তার কোনো বিবরণ নেই। সেই কারণে ব্যাপারগুলি বোধগম্য হয় না। ...

তবে তাঁর কন্যার পতি **শুক্রাচার্য্য** এবং তাদের কন্যা **দেবযানী**, এই তথ্য বলে যে, এই **প্রিয়ব্রত** সত্তাটি এমন ধরনের আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় ছিলেন, যেখান থেকে তৃতীয় পুরুষে আমরা **পণ্য**বাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট **দেবযানী** সত্তার দেখা পাচ্ছি। ...

প্রেম (প্রেমা, প্রেমিক, প্রেমিকা, প্রেমী) : ১. প্রিয় + ইমন (ইমনিচ্) - ১ব; প্রিয় স্থানে প্র। (ব.শ.)। ২. ***প্রেম*** = ***প্র*** *দিশাগ্রস্তভাবে সীমায়িত যাহাতে।* ***প্রেমা*** = ***প্রেম****-এর আধার যে।* ***প্রেমিক*** = ***প্রেম****-কে গতিশীল করে যে।* ***প্রেমিকা*** = ***প্রেমিক****-এর আধার যে।* ***প্রেমী*** = ***প্রেম*** *গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে।* ৩. **প্রেম (প্রেমন্)** = প্রিয়ভাব, ভ্রাতৃবাৎসল্য, যুবকযুবতীর ধ্বংসরহিত-ভাববন্ধন, বিয়োগ-অসহিষ্ণুতা, হর্ষ, নর্ম্ম, (বৈষ্ণবমতে) কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতির ইচ্ছা, গাঢ় রতি বা অনুরাগ। **প্রেমা** = প্রিয়ভাব, নর্ম্ম, গাঢ় রতি বা গাঢ় অনুরাগ। **প্রেমিক** = প্রেমপ্রবণ, প্রণয়ী। **প্রেমী** = প্রেমবান, প্রণয়ী, গাঢ়ানুরাগী। (ব.শ.)। ৪. love অর্থে **প্রেম**, lover অর্থে **প্রেমিক, প্রেমী**, lady love অর্থে **প্রেমিকা** প্রচলিত; **প্রেমা** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ইমন, প্র**। বর্ণভিত্তিক অর্থে গিয়ে দেখতে পাই, এর অর্থ হল — '**প্র** (পায়ী-রক্ষণ-এর **সমুচ্চয়ী** অবস্থান) দিশাগ্রস্ত-ভাবে সীমায়িত যাহাতে'। তার মানে, '**পুরুষ-প্রকৃতির** পরস্পরকে

উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সমুচ্চয়ী অবস্থান' (= **প্র**) এর বাসনা বিশেষ দিশায় গিয়ে (= 'ে'-কার) যে বোধে সীমায়িত (= **ম**) হয়, তাকেই **প্রেম** বলে। তাই **প্রেম** সম্পূর্ণ একক ব্যাপার নয়, কোনো বিশেষ সত্তার থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো বিশেষ সত্তার দিকে যায়। সেই সত্তা দুটি 'নর-নারী' থেকে শুরু করে 'মানুষ-ত্রিভুবনেশ্বর' পর্যন্ত বহুদূর বিস্তৃত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার **প্রেম** হত যে মিছে।' মধ্যযুগের বাংলায় কৃষ্ণ**প্রেমে**র বাণ ডেকেছিল এবং সেই **প্রেম**সুধা পান করে বাংলাভাষী মানুষের দিন কাটত রসেবশে। ...

ইতিহাসে দেখা যায় **দক্ষযজ্ঞে**র পরবর্তীকালে সম্ভবত **প্রাচেতস দক্ষ**দের কালে **প্রেম** ও নিষ্কাম-**প্রেম** ধারণা দুটির জন্ম হয়। তার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষায় **প্রেম** শব্দের ব্যবহার ছিল না বলেই মনে হয়। ব.শ. অন্যান্য বহু শব্দের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদাদির প্রসঙ্গ দিলেও **প্রেম** শব্দের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো প্রসঙ্গের কথা জানাননি। বৌদ্ধযুগে এই **প্রেম** শব্দের আরও ব্যাপ্তি ঘটে, সবচেয়ে বেশি ঘটে বঙ্গে হোসেন শাহের কালে লেখা বাংলাসাহিত্যে। তবে এমনকি মধ্যযুগেও **ভালবাসা** শব্দটির দেখা মেলে না। বাংলাভাষী মানুষেরা **ভালবাসা** শব্দটির জন্ম দেন আধুনিক যুগের প্রাক্কালে।

প্লু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবিপ্লুত, আপ্লব, আপ্লবন, আপ্লবব্রতী, আপ্লাব, আপ্লাবিত, আপ্লুত, আপ্লুতবতী, আপ্লুতি, আপ্লুষ্ট, উপপ্লব, প্লক্ষ, প্লব, প্লবক, প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম, প্লবন, প্লবমান, প্লাব, প্লাবন, প্লু, প্লুত, প্লুতগতি, প্লুতগামী, প্লুতা, প্লুতি, প্লুষ্, প্লুষ্ট, প্লেগ, প্লেট, প্লোষ, প্লোষণ, প্লোষ্টা, প্ল্যাটফর্ম, বিপ্লব, বিপ্লাবিত, সংপ্লব।

প্লু = পায়ী-লালন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

প্লব (প্লবগ, প্লবন, প্লবমান, প্লাব, প্লাবন, বিপ্লব, উপপ্লব) : ১. ✓প্লু + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **প্লব** = *পায়ীর লালন-লয়ন বহন করে যে বা বাহিত যাহাতে।* **প্লবন** = **প্লব** *অন (on) থাকে যাহাতে।* **প্লবগ** = **প্লবন** *পূর্ব্বক গমন করে যে।* **প্লবমান** = **প্লব** *সীমায়িত হইয়া অন থাকে যাহাতে।* **প্লাব** = **প্লব** *হইতে জাত।* **প্লাবন** = **প্লাব** *অন (on) থাকে যাহাতে।* **বিপ্লব** = *বিপরীত বা বিশেষ প্রকার* **প্লব** *যাহাতে।* **উপপ্লব** = **প্লব**-*এর উপ যে।* ৩. **প্লব** = প্লবন, জলে ভাসা, নদ্যাদিতরণ, প্লুতি, লম্ফন, ভেক, কপি, মেষ, জলকাক, কারণ্ডব পক্ষী, পক্ষিবিশেষ, হংসসারসবকক্রৌঞ্চাদি জলচরপক্ষী, পলব, মাছ ধরার পোলো, ক্রমনিম্নভূমি, প্রবণ, প্লুতিসাধন নৌকা, তরণসাধন, উড়ুপ, ভেলা, তরী, পোত, কৈবর্ত্তীমুস্তক। **প্লবগ** = বানর, ভেক। **প্লবন** = ক্রমনিম্ন, প্রবণ, নিম্ন-ভূম্যাদি, নদ্যাদিসন্তরণ, সাঁতার, ভাসা, স্নান, প্লুতগতি, লম্ফ, অশ্বগতিভেদ। **প্লবমান** = ভাসমান। **প্লাব, প্লাবন** = প্লাবন, উপহতঘৃতাদি দ্রবদ্রব্যের শোধনোপায়বিশেষ, নিমজ্জন, ডুবান, ভাসান, দ্রবদ্রব্যের ঊর্দ্ধপ্রাপণ, উগ্বলান, বন্যা, বান। **বিপ্লব** = প্লবন, নাশ, উপদ্রব, রাষ্ট্রোপদ্রব, উচ্ছেদ, পরনৃপতিরাষ্ট্রাদি হইতে ভয়, ব্যতিক্রম, বিপর্য্যস্ত, ব্যসন, উপপ্লব (tumult, affray) ...। **উপপ্লব** = সমীপে প্লবন বা লম্ফ, সমীপাগমন, উপরোধ, গ্রহণ, উল্কাপাতাদিরূপ উৎপাত, উপদ্রব, বায়ুদাবানলাদি বাধক (পীড়াকর) বিষয় ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. flood অর্থে **প্লাবন** প্রচলিত, বাকি সবগুলিই বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. **প্ল** (পায়ীর লালন-লয়ন) বহন করে যে, তাকে বলে **প্লব**। এই **প্লব** চলমান বা অন থাকলে হয় **প্লবন**। এই **প্লবন** থেকে জাত হয় **প্লাবন**। এই **প্লাবন**কে একালে আমরা কমবেশি চিনতে পারি। কিন্তু **প্ল** বা **প্লব** কাকে তা ঠিকঠাক বোঝা যায় না।

হাতে মাথা নিতে কিংবা নিজের মাথা কেটে কারও চরণে নিবেদন করতে বিপুল আবেগ লাগে। এটি ভাল কি মন্দ, এই মুহূর্তে সেটি প্রসঙ্গ নয়; প্রসঙ্গ হল বড়ো কাজ করতে গেলে বড়ো আবেগ লাগে। অথচ আবেগপ্রবণ মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে। আজকাল আবেগে ভরভরাট টইটম্বুর মানুষ আর তেমন দেখা যায় না, অন্তত শহরে। আমাদের চোখের সামনে সেরকম একজন আবেগ-উচ্ছলিত বাংলাভাষী মানুষকে গত শতাব্দীতে আমরা দেখেছি। তিনি স্বনামধন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তবে যাঁরা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়েছেন, তাঁরা জানেন, ১৯২০-৪০ সালে এই বাংলায় মুজিবের চেয়েও দশগুণ বেশি আবেগপ্রবণ মানুষের দেখা মিলত। আর যদি চার-পাঁচশো বছর পিছিয়ে মঙ্গলকাব্যের যুগের বাংলায় যাই, তাহলে যে আবেগের দেখা মেলে, তাকে শতগুণ বললেও কম বলা হয়। কিন্তু তার চেয়ে আরও দু-হাজার বছর আগে মানুষের আবেগের রূপ কেমন ছিল? নিশ্চয় আরও শতসহস্র গুণ বেশি। ...

আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা সেইরকম মহা-আবেগের সামনে পড়েছিলেন এবং তাকে নিয়ে মুশকিলেও পড়েছিলেন। তাঁরা দেখেন, মানুষের অদম্য আবেগ, তা সে মহানন্দে কিংবা মহাদুঃখে যেকারণেই উৎসারিত হোক না কেন, তার উৎসারিত হওয়ার মূলে এক জটিল ক্রিয়া রয়েছে। তাঁরা দেখলেন, এই আবেগরূপী 'পায়ী' 'লালিত' হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে 'লয়'প্রাপ্ত হচ্ছে তার উছলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসা ধারায়। যেহেতু এর ভিতরে একইসঙ্গে 'পায়ীর লালন-লয়ন' সক্রিয় রয়েছে, তাঁরা একে প্রকাশ করলেন **প্ল** ব'লে। এই **প্ল** বাহিত হয় যে স্রোতধারায়, তাকে তাঁরা স্বভাবতই বললেন **প্লব**। তবে, এ হল **প্লব**-এর উৎসারণ-কেন্দ্র থেকে তার বহির্গমনকে দেখা, বিপরীত দিক থেকে দেখা নয়। দৃশ্যজগতে এই **প্ল**-কে দেখা যায় জলোচ্ছ্বাসে — কোনো উঁচু জলাধারের জল কোনো কারণে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠলে তার পাড় ছাপিয়ে যে উছলে-পড়া জলস্রোত লাফ দিয়ে নীচে নামে, এ হল সেই। ইংরেজভাষীরা তাঁদের উত্তরাধিকারে একে পেয়েছেন em*ploy*, de*ploy* ... প্রভৃতি শব্দে। তাঁদের আরও উত্তরাধিকার আছে, তবে সে-ব্যাপারে আমরা পরে আসছি।

এই **প্লব**-কে আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ পরবর্তীকালে সেই সমস্ত সত্তাকে বোঝাতেও ব্যবহার করেন, যারা লাফ দিয়ে উছলে টপকে ভেসে চলে। কারা তারা, ব.শ. তাদের তালিকা করে দিয়েছেন উপরোক্ত ৩.-এ প্রদত্ত অর্থগুলিতে। এগুলির মধ্যে অবশ্য 'কৈবর্ত্তীমুস্তক' কাকে বলে, তার **প্লব**-চরিত্র আছে কি না, আমরা

জানি না। তবে আমাদের সেই পূর্বসূরিগণ কেবল মানুষের মনের অদৃশ্য আবেগকেই শনাক্ত করতে এই **প্লব** শব্দের ব্যবহার করেননি, জলের সঙ্গে জনসাধারণের উছলে পড়াকেও তাঁরা **প্লব** শব্দে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ, এই **প্লব** ক্রিয়ার সামাজিক রূপটিকেও তাঁরা শনাক্ত করেন। তবে সেই সামাজিক রূপটিকে তাঁরা অন্তত তিনরকম সক্রিয়তায় দেখতে পেয়েছিলেন — **উপপ্লব, বিপ্লব** ও **সংপ্লব**। সেগুলির মধ্যে **বিপ্লব** শব্দটিই এখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বলা ভাল, বহুব্যবহারে প্রায় অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়েছে। অবশ্য পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা **উপপ্লব** শব্দটি যথার্থে ব্যবহার করতেন। আজকাল সেটিও অপ্রচলিতের দলে নাম লিখিয়েছে। ৬. ইংরেজিতে **প্লব** শব্দটির উত্তরাধিকার কীরূপ, তা জানতে গিয়ে ভারি মুশকিল পড়তে হয়। ছিল **প্লব**, হয়ে গেছে flow। কী করে হল? আসলে আমরা যাকে **প্লব** (plab বা plob) রূপে পেয়েছি, জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষাভাষীরা দেশকালপাত্রের কারণে তাকে উচ্চারণ করলেন flob রূপে। আর ইংরেজ তো তার ঘরের কথাগুলো সব নিয়েছিল জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আর **পর**-এর কথাগুলো নিয়েছিল সব গ্রীক-ল্যাটিন থেকে। তো, ইংরেজি ভাষা জার্মানিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে সেই flob-কে আত্মসাৎ করে নিয়ে বললেন flow। মাঝ থেকে আমরা যাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেলাম **প্লব**-রূপে, ইংরেজ তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেল flow-রূপে। একই পথ অনুসরণ করে আমরা যাকে '**প্ল** দান করে যে' বা '**প্লদ**'-রূপে পেতে পারতাম, তাকে পেলামই না; কিন্তু জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর হাত ধরে ইংরেজ তাকেই পেয়ে গেল flood রূপে। সেটিই তো **প্লাবন**, বন্যা। কিন্তু তাতে দুটো 'ও' (fl-oo-d) কেন? দুটোই তো হবে। ওর ভিতরে যে **প্লু** (ploo) ক্রিয়া রয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইংরেজিতে pl- ও fl- যুক্ত যত শব্দ রয়েছে, সেগুলির প্রায় সবই তাঁরা **প্ল**-ক্রিয়ার উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন। এমনকি ap*plau*se, ap*plau*d প্রভৃতি শব্দের '**প্ল**'গুলিও সেই একই উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত। ... এভাবেই play, plebiscite, em*ploy*, plus, pluto, fly, fluid ... প্রভৃতি অজস্র শব্দ এই **প্ল** ক্রিয়ার ইংরেজি উত্তরাধিকার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আদিভাষার **প**-কে ইংরেজ জাতি অন্য দুই জাতির হাত ঘুরে পেয়েছে বলেই আদিভাষার **প**-এর উত্তরাধিকার সে দুরকম ভাবে ধরে রেখেছে। গ্রীক ল্যাটিন থেকে পাওয়া **প** তার হাতে থেকেছে **প**-রূপেই, আর জার্মানিক গোষ্ঠী থেকে পাওয়া **প** তার হাতে রয়েছে **ফ**-রূপে। তবে গ্রীকের প্লুস্ (plus) যে ইংরেজির 'প্লাস্' (plus) হয়ে গেল, সে কীর্তির নয় ইংরেজের জিভের। কিন্তু সে যে আসলে 'প্লু'ই, তা বোঝা যায় তবে pluperfect বা 'প্লুপারফেক্ট'-এর বেলায়। ইংরেজ একে প্লুপারফেক্ট' উচ্চারণ করেন না। ...

প্লুত (প্লুতগতি, প্লুতগামী, প্লুতস্বর, প্লুতি, আপ্লুত) : ১. ✓প্লু + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **প্লুত** = **প্ল** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত যাহাতে।* ***প্লুতগতি*** *=* ***প্লুত*** *গতি যাহার।* ***প্লুতগামী*** *=* ***প্লুত****-ভাবে গমন করে যে।* ***প্লুতস্বর*** *=* ***প্লুত*** *যে স্বর।* ***প্লুতি*** *=* ***প্লু*** *তরল গতিশীল যাহাতে।* ***আপ্লুত*** *=* ***প্লুত****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. **প্লুত** = কৃতপ্লাবন, উল্লঙ্ঘিত, স্নাত, নিমগ্ন, উক্ষিত, সিক্ত, মিশ্রিত, ব্যাপ্ত, প্লবন, অশ্বগতিভেদ। **প্লুতগতি** = লম্ফপূর্ব্বক গমন, অশ্বগতিভেদ। **প্লুতস্বর** = হ্রস্বত্রিগুণকাল বা ত্রিমাত্রক স্বর। **প্লুতি** = লম্ফ, অশ্বগতিভেদ, স্বরের প্লুতোচ্চারণ। **আপ্লুত** = স্নান, সিক্ত, প্লাবিত, অভিষিক্ত, নিমজ্জিত, কৃতসমাবর্ত্ত দ্বিজ, উৎপ্লবন, উল্লঙ্ঘন। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র **আপ্লুত** শব্দটি 'আবেগাদিতে সিক্ত' অর্থে কমবেশি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. লালিত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে আবেগের, জলের, জনসাধারণের উছলে পড়া বা প্রলয়ঙ্কর রূপকে যদি বাইরে থেকে কেউ দেখেন, অর্থাৎ তদ্রূপ উছলে আসা আবেগ, জল, জনসাধারণকে কেউ যদি তার দিকেই ধেয়ে আসতে দেখেন, তখন সেই **প্লবন**-ক্রিয়ায় সিক্ত সত্তাকে **প্লুত** বলে। এ হল উছলে ওঠা জলের লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়া। যে ট্রেন লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের দিকে আসছে, সে হল **প্লুতগামী** ট্রেন, একালের ভাষায় যাকে বলা হয় galloping train। আর, তার এতাদৃশ গতিকে বলে **প্লুতগতি**। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আবেগে **আপ্লুত** হয়ে বক্তৃতা দিতেন' বাক্যটির অর্থ হল, তাঁর আবেগ তাঁর ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে লাফ দিয়ে উছলে উঠে ফিরে এসে তাঁরই উপরে পড়ছে এবং তিনি তাতে সিক্ত হয়ে কথা বলছেন।

প্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অপ, অপহ্নব, আপ, আপজ, আপানল, অপৈতক, প, পঁহুছ, পঁহুছা, পহুঁ, প-কার, পকেট, পগস্বর, পড়িনাতি, পমেটম, পম্প, পম্পা, পয়গম্বর, পয়গাম, পরকালা, পরকোলা, পর(রো)টা, পর্পট, পর্পটি, পর্‌মিট, পহ্নব, পহ্লব, পাইন, পান, পাউই, পাঁটা(ঠা), পাঁথার, পাঁপড়, পাচতি, পাজি(জী), পাথার, পাবর, পায়নাপোল, পালোয়ান (দ্র.পহুঁ, পহ্নব, পহ্লব, পহ্লবন), পাশ(স)লি(লী), পাশুলি(লী), পাহাড়, পাহাড়ী, পাহি, পাহিরা, পাহুন (পাখ্‌তুন?), পিলীহা, পীলা, পীলে, পুদীনা, পেঁপে, পেওঁপেওঁ, পেটপঁ(পোঁ)দ, পেদো, পৈর, পৈরণ, পৈরা, পৈরাগ, পৈরানা, পৈল, পোঁআর, পোআল, পোঁচ(ছ), পোঁচা(ছা), পোখরী, পোগণ্ড, পোঙা, পোঙ্গা, পোচ, পোণ, পোন, প্যাংটা, প্লিহা, প্লীহা,

পম্পা (পম্প) : ১. ✓পা + প - অধিকরণবাচ্যে + স্ত্রী আপ্, নিপাতনে। (ছা.অ.)। ২. ***পম্প*** *=* ***পং*** *(= পায়ীর রহস্যরূপ) পালিত যাহাতে।* ***পম্পা*** *=* ***পম্প****-এর আধার যে।* ৩. **পম্পা** : ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকটস্থ সরোবরবিশেষ। (ব.শ.)। ওড্রদেশীয় নদীবিশেষ। ইহা ঋষ্যমূক পর্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবাহিত হইয়াছে। সারোবরবিশেষ। (ছা.অ.)। রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটস্থ নদী। কখনো কখনো ইহা সরোবররূপেও বর্ণিত হয়েছে। সীতাহরণের পর দনুর (কবন্ধের) পরামর্শে রাম-লক্ষ্মণ পম্পার নিকটস্থ ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন। পম্পার পশ্চিম তীরে মতঙ্গ মুনির আশ্রম অবস্থিত ছিল। সেই আশ্রমের পরিচারিকা শবরী দীর্ঘকাল অবধি রামের দর্শনে মুক্তিলাভের জন্য সেখানে প্রতীক্ষমানা ছিলেন। রামের আগমনে তাঁর পরিচর্যা করে শবরী

মুক্তিলাভ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** নাম রূপে **শম্পা** প্রচলিত, **শম্পাক** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ঋষ্যমূক, চম্পা, শম্পা**। বাংলায় 'পং পালিত যাহাতে তাকে **পম্প** বলে।' এই **পম্প**-এর উত্তরাধিকার আমাদের নেই, কিন্তু ইংরেজির আছে — pomp, pompous ... ইত্যাদি pomp যুক্ত বহু শব্দে। সেই **পম্প**-এর আধার যে, তাকে বলে **পম্পা**। তথ্যানুসারে এই **পম্পা** হল **ঋষ্যমূক পর্ব্বত** থেকে জাত জলধারা বা নদীর নাম। **পর্ব্বত** বলতে সামাজিক সংস্থাকে বোঝায় এবং **নদী** উৎপন্নের প্রবাহকেও বোঝায়, এসব কথা আমরা আগেই জেনেছি। তবে একালে বসে আমরা ভাবতেই পারি না যে, একটি দেশের ভিতরে এমন সংস্থা বা এলাকা থাকা সম্ভব, যেখানে রাষ্ট্রের ও তার আমলাতন্ত্রের কোনো এখতিয়ারই থাকে না। সেকালের ভারতে কিন্তু সেরকম বহু এলাকা ছিল, বহু মানুষ ছিলেন, রাষ্ট্র যাদের কেশস্পর্শ করতে পারত না, রাষ্ট্রের তেমন অধিকারই ছিল না। (এর কারণ হল, ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্র ছিল অধিরাষ্ট্রের অধীনে একটি শাসনযন্ত্র-মাত্র, সব অধিকার তাকে অধিরাষ্ট্র দেয়নি, দিত না।) **ঋষ্যমূক**-এ সেকালের আমলাতন্ত্রের (= **বালি**র) বিরোধী শক্তি থাকত এবং সেখানে তাদের নিজেদের মতো উৎপন্নের ব্যবস্থা ছিল, যা **পম্পা** ধারার মতো প্রবাহিত হত। ... দ্র. **তুঙ্গভদ্রা**। **৬.** pomp ও pomp যুক্ত প্রায় সমস্ত ইংরেজি শব্দই এই উত্তরাধিকার বহন করে।

ফ

ফ্ বর্ণের অর্থ : ফ = ফ্-অন্ করে যে; পাওয়ন-স্থিত = **ফ**। **ফ্** বর্ণটি তৈরি হয়েছে (প্ + হ্ = ফ্) প্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, একেবারে মূলে **ফ্**-এর অর্থ হল পাওয়ন-স্থিত, অর্থাৎ 'পাওয়ন, পালন, পান ... ইত্যাদি ক্রিয়া যার ভিতরে স্থিত রূপ পেয়ে গেছে'। এই স্তরে **ফ** কার্যত অব্যক্ত থাকায় তার প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। **ক খ গ ঘ** কিংবা **ত থ দ ধ** প্রভৃতি বর্ণের যেমন কমবেশি ব্যক্ত অর্থ প্রকাশ করা যায়, কিন্তু **প**-বর্গের সদস্য বলেই **ফ**-এর সেরকম কমবেশি স্পষ্ট ব্যক্ত অর্থ দেওয়াই যায় না। তবে তাকে যদি খানিকটা উপরিতলে তুলে এনে বোঝার চেষ্টা করা যায়, তাহলে দেখা যায়, তার ভিতরে 'পালন-স্থিতি', 'পান-স্থিতি' বা তজ্জাতীয় কিছু একটা উঁকিঝুঁকি মারছে। কীভাবে, সেকথায় আসছি। তবে একথা ভোলা চলবে না যে, সংস্কৃত যুগে **ফ** বর্ণে মাত্র পাঁচ-ছয়টি মূল শব্দ ছিল — ফক, ফট, ফণ, ফল, ফুল্ল; সংস্কৃত অভিধান **ফ** বর্ণে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা খরচ করেছে। বাংলায় ব.শ. খরচ করেছেন ১৯ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ এই বর্ণের যা কিছু বিকাশ ঘটেছে, তার সিংহভাগের গৌরব বাংলাভাষীর নিজের এবং সে কীর্তির প্রধান দাবিদার মধ্যযুগের বাংলাভাষীরা।

আমরা আগেই দেখেছি, **প**-এর উপরিতলে **পালন** ও **পান** থাকে। **পালন** অর্থে আমরা দেখেছি, তাতে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি চলে এবং তার ফলে **পালিত** একই ধারায় ঘুরতে থাকে, **পাক** খায়। তাতে মন্থন হয়ে যেমন শাঁস বা মাখন (ঘৃত) উঠে আসে, তেমনি গড্ডলিকা-প্রবাহের কারণে ধারাটি মজে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার মানে, **প্** + **হ্** = **ফ্**-এর বেলায় সেই **পালনের পাক** স্থিত হয়ে যায়, পালনস্থিত হয়ে যায়, **পাকের** 'পাকড়ে ধরা' শিথিল হয়ে যায়, **ফঃ** বা **ফস্** হয়ে যায়। কেননা, **ফ** = **প**-হওয়ন বা **পালন**-হওয়ন। এর অর্থ পুনরাবৃত্তিকরণস্থিতি হতে পারে, এবং তার ফলে সারাংশকরণ হতে পারে, বিলুপ্তিকরণ বা শূন্যকরণও হতে পারে। অর্থাৎ এর ভিতরে আবর্তন, শাঁসকরণ ও নাশকরণও থাকে। তাছাড়া, **প** বা পাওয়া স্থির বা থিতু হয়ে গেলেই যেহেতু **ফ** হয়, আর অত্যন্ত থিতু হওয়া মানেই প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া, তাই **ফ** হতে পারে প্রাপ্তের শেষ রূপ, তা সে প্রাপ্ত বস্তু বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ততম (ঘৃতের মতো) সারাংশ-রূপ হতে পারে কিংবা নিকৃষ্টতম অসার-রূপ বা মল-রূপও হতে পারে। আবার, **প্রকৃতি**র স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিটি বস্তুর বিকাশের গতিপথের মোড় পেরিয়ে সুদূরে যাওয়ার পথও রয়েছে; বস্তুকে আধেয়রূপে গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাকে পালন করে, সেই দূরগামী পথে এগিয়ে দেওয়াই 'পালনস্থিতি-করণ' বা **ফ**-করণ। (দ্র. **ফল**)। এ হল স্থিতরূপের প্রকাশ, বিকাশ, অগ্রগতি ... ইত্যাদি।

স্বভাবতই **ফ**-করণ বললে পুনরাবৃত্ত-করণের স্থিতি বোঝাতে পারে, **'শাঁসকরণ'** বা 'নাশকরণ'ও বোঝাতে পারে, আপন আপন **বিকাশের পথ** ধরে শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া বা **পরিণাম**-করণও বোঝাতে পারে। আর, কার্যত কী অর্থ বোঝাবে তা নিঃসন্দেহে প্রেক্ষিতই নির্ণয় করে থাকে। ...

আবার, পাওয়ার হওয়নই ফ্-অন ব'লেই তাকে **'পেয়ে-রাখা'** ভাবা যেতে পারে। অর্থাৎ **ফ** হল 'পাওয়া-আত্মস্থ-করা'র অভিধা। কিন্তু কী-পাওয়া, বা কীরূপ বিষয় বা বস্তুর পালন-পান, তা নির্ভর করে প্রেক্ষিতের উপর। কোথাও **ফ**-করার ভেতরে 'ফস করা', 'ফট করা', 'ফঁস করা', কিংবা 'মেরে দেব', 'কামড়ে দেব' ... ইত্যাদি অনেক কিছুই পালিত হয়ে থাকতে পারে, কোথাও বা 'ফাঁক করে দেব', 'ফুঁকে দেব' ... ইত্যাদি পালনও থেকে থাকতে পারে। যে-সত্তা এই প্রকার **ফ্**-অন করে তাকে 'ফ-অনকারী' বা 'ফ-অনী' কিংবা 'ফনী'ও বলা যেতে পারে।

আবার, স্থ বা থাকা যেমন থ-এ (স্থ > থ) পর্যবসিত হয়, স্ফ বা 'অস্তিত্বের **ফ্**-অন'ও **ফ**-এ পর্যবসিত হয়। যথা — স্ফট = ফট; স্ফুট = ফুট, ফোটা, ফুটো করা; স্ফর = ফর ফর করা, ফারাক করা; স্ফুর = ফুর ফুর করে উড়ে যাওয়া বা ক্রমশ ফুরিয়ে যাওয়া ... ইত্যাদি। এই যে স্ফ থেকে জাত **ফ**, সেও **'ফ**-অনী' বা 'ফনী'। **প** ও **ফ**-এর মধ্যেকার পার্থক্য অনুভব করার চেষ্টা করা যেতে পারে এই বাক্যে — যে সত্তা 'পটাপট' ছিটকে পড়ে, সেই সত্তাই 'হওয়ন'-যুক্ত হলে 'ফটাফট' ছিটকে পড়ে।

ছাত্রবোধ অভিধান কিন্তু দেখাচ্ছেন, **ফ** বর্ণটির জন্ম হয়েছে 'স্ফায় + ড' যোগ করে। এর মানে দেওয়া হয়েছে 'স্ফীতি', সংজ্ঞাবিশেষ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও বর্ণাভাব। এই **ফ**-কে আমরা (বর্ণাভাব রূপে) পাই **'ফিকে** হয়ে যাওয়া'তে, যার রং বা লবণ 'ফেলে' (= **ফিকে**) দেওয়া হয়েছে। এর মূলে রয়েছে **ফক্** বা **ফ**-করণ, যে ক্রিয়া **ফক ফক** করে (দ্র. **ফকলা**) খায়। ...

তবে মনে রাখা ভাল, সংস্কৃতযুগে **ফ** বর্ণের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল না, মানুষ সবেমাত্র **ফ** বর্ণের সাহায্যে দু'চারটি শব্দ তৈরি করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সংস্কৃতকার পণ্ডিতগণ তাঁদের তাত্ত্বিক ব্যাপ্তির জোরে সেই সদ্য-উদ্ভূত **ফ**-কেই তাঁদের পঞ্চবর্গের তালিকায় সাজিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বাংলাভাষায় বর্ণটির বিপুল বিকাশ ঘটেছে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পরে এবং তা সম্পূর্ণতই মধ্যযুগের ও তৎপরবর্তীকালের বাংলাভাষী জনগণের দ্বারাই। দ্র. **ঋ, ঠ, থ** প্রভৃতি বর্ণের অর্থ।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন সংস্কৃত ভাষা নির্মাণ করেন, তখনও পর্যন্ত জনসাধারণ্যে শব্দের ব্যবহার এখনকার মতো এত বিপুল সংখ্যক হয়নি। এমন বহু স্বর তখনও ছিল যা তখনও দু-তিনটি বা ততোধিক স্বরের যৌথরূপ। তখনও তা ভেঙে আরও খণ্ডিত হয়ে আরও বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্তমান চেহারা পায়নি। সেই কারণে প্রাচীন কালের ভাষাগুলিতে আমরা এমন বহু বর্ণ পাই, যা দু-তিনটি স্বরের যৌগিক রূপ। খুব সম্ভব গ্রীক ল্যাটিন ও জারমানিক ভাষাগোষ্ঠীর আদি রূপে **প** (p) ও **ফ** (f) মিলিতভাবেই ছিল। দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বরূপ পাওয়ার পর দেখা যায়, গ্রীক ল্যাটিন পেয়েছে কেবল p, আর জারমানিক ভাষাগোষ্ঠী পেয়েছে f। আর তা হবে নাই বা কেন। ভাষাবিদেরা বলেন, জারমানিক ভাষাগোষ্ঠীর আদিতম রূপ যা তাঁদের গোচরে এসেছে, তা হল ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীকালের। গ্রীক সে তুলনায় তার চেয়ে আরও ১০০০ বছরের প্রাচীন। সেকারণেই, জারমানিক

উৎস থেকে পাওয়া ইংরেজি শব্দে আমরা **প**-কে (p-কে) **ফ**-রূপ (f-রূপ) গ্রহণ করতে দেখি। এই কারণে ইংরেজি ভাষায় আমরা পাচ্ছি গ্রীক ও ল্যাটিন থেকে আসা উপাদানে paternal, pyre ... প্রভৃতি শব্দ; আর, নিজের জারমানিক উৎস থেকে আসা উপাদানে father, fire ... প্রভৃতি শব্দ।

এদিকে আমাদের প্রাচীন বাংলায় অর্থাৎ সংস্কৃতে (যদিও সেই সংস্কৃতভাষার সৃষ্টি কালেই, স্বর-ব্যঞ্জনের বিশ্লেষণ অনেকটাই করে ফেলা গিয়েছিল), ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে পঞ্চ বর্গে ২৫টি বর্ণে ভাগ করে ফেলা গেছিল, কিন্তু সামাজিক ব্যবহারে **ঘ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ফ** প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে তখনও খুব বেশি শব্দের প্রচলন হয়নি। যে কারণে সংস্কৃত ভাষায় ঐ বর্ণগুলিতে শব্দসংখ্যা খুবই কম। সংস্কৃত অভিধানে **ঘ, ছ, ফ** প্রভৃতি আদ্য বর্ণে খুব কম শব্দই রয়েছে। আর, **ফ**-এর ক্ষেত্রে মাত্র চারটি ক্রিয়ামূল ও তাদের পরিবারকে দেখতে পাওয়া যায় — **ফং (ফণ্), ফক্ক, ফল্, ফুল্ল্**। বাংলায় যাকে **ফট, ফাট, ফাটা, ফুটা, ফোটা, ফিরা, ফুরান, ফেরা,** কিংবা **ফালা, ফোলা, ফেনা, ফোঁপা, ফসকান, ফুসলান, ফোঁসা** ... প্রভৃতি বলা যায়, সেগুলির জন্য এখনও বাংলার শব্দবিদগণ একত্রে বসে কোনো বিশেষ ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করেননি, এখনও সেগুলিকে সংস্কৃত-বৈয়াকরণদের দেওয়া **স্ফট্, স্ফুট্, স্ফোট্, স্ফর্, স্ফুর্, স্ফল্, স্ফালি, স্ফুল্, স্ফায়্** ... প্রভৃতি ক্রিয়ামূলের শব্দপরিবারের অঙ্গীভূত করেই দেখা ও দেখান হয়। অথচ বাংলা শব্দগুলি ইতোমধ্যে বিবর্তিত ও বিশ্লিষ্ট হয়ে হয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে ফেলেছে। এখন চাইলে তাদের জন্য পৃথক ক্রিয়াপদ শনাক্ত করা যায়। আমরা কিন্তু সাধারণভাবে তেমন চেষ্টা করিনি (অনন্যোপায় হয়ে যে দু-এক জায়গায় করতে হয়েছে, সেগুলি ছাড়া)।

এইসব কারণে আমরা উপরোক্ত চারটি ক্রিয়ামূলের পরিবারে যাদের পাওয়া যায়, তাদের ছাড়া বাকি **ফ**-মূলক শব্দগুলিকে প্রাচীন বাংলার (অর্থাৎ সংস্কৃতের) **স্ফট্, স্ফুট্, স্ফোট্, স্ফর্, স্ফুর্, স্ফল্, স্ফালি, স্ফুল্, স্ফায়্** ... প্রভৃতি ক্রিয়ামূলের অন্তর্ভুক্ত করেই ব্যাখ্যা করলাম। তারপরও যেগুলি থেকে গেছে, তাদের **ফ**-নিপাতে রেখে সেগুলির অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম।

আজ আমরা জানি, মধ্যযুগে বাংলা ভাষা যখন বিকশিত হচ্ছে, তখন বাংলাভাষীগণ তৎকালের এই অনতিব্যবহৃত (**ঘ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ফ** ...) বর্ণগুলিতে বিপুল পরিমাণ শব্দ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হলে কী হবে, ততদিনে আরবি-ফারসি ভাষা এসে হাজির হয়েছে শাসক রূপে। বাংলার নিজের তৈরি করা **ফ**-যুক্ত শব্দগুলি হুবহু আরবি-ফারসির মতো হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে আমাদের অভিধান ও শব্দকোষকারগণ যখন শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরে ঐ বর্ণগুলির শব্দগুলিকে সাজাতে গেছেন, পড়ে গেছেন বিপদে। একদিকে শব্দের মূলে কোনো ক্রিয়াকে যেমন খুঁজে পাননি, অপরদিকে শব্দটিকে কোন শব্দ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করবেন ঠিক করতে পারেননি। আমরাও পারিনি। কেননা, সংস্কৃতকারদের মতো যৌথভাবে ভাষাসংস্কারের কাজ পরবর্তীকালে আর তো সেভাবে হয়নি। যতটুকু যা হয়েছে, সবই হয়েছে বাংলার মধ্যযুগের কবি-গায়কদের শব্দব্যবহারে। এই 'পরবর্তীকালে বিকশিত বর্ণ'গুলির মধ্যে **ফ** একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ, আদিতে যা **স্ফ**-এর সঙ্গে জড়িয়ে মিশে ছিল। মধ্যযুগের বাংলায় সেই **ফ** বর্ণটি বিশ্লিষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে এবং তা পণ্ডিতদের ইচ্ছায় হয়নি, জনসাধারণের ভাষা ব্যবহারেই তা ঘটেছে অর্থাৎ বাংলাভাষী জনসাধারণই তা ঘটিয়েছেন। কবিগণ তাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁদের রচনায়। কিন্তু ততদিনে শাসক-ভাষা রূপে এসে হাজির হয়েছে আরবি-ফারসি। **ফ**-বর্ণের ক্ষেত্রে তাদের অর্জনও প্রায় বাংলার মতোই। এর অনিবার্য ফল হয় এই যে, বাংলার পরবর্তীকালের অভিধানকারগণ অধিকাংশ **ফ**-যুক্ত বাংলা শব্দকে 'আরবি-ফারসি থেকে আগত' বলে দেগে দিয়েছেন। এ যেন বাংলার সাজানো বাগানের সাইনবোর্ড সরিয়ে দিয়ে আরবি-ফারসির সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া। বাঁচোয়া এই যে, সত্যি সত্যিই আরবি-ফারসিরও একই রকম বাগান ছিল এবং তাতে ঐ সাইনবোর্ড লাগানো ছিল। ...

ফলে উপরোক্ত **ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ফ** ... প্রভৃতি বর্ণের ক্ষেত্রে বহু কাজ বাকি আছে, এবং আগামী যুগের শব্দকোষকারগণকে সেই বিশাল কাজ করতে হবে। আমরা বিষয়টি শনাক্ত করলাম এবং দু-চারটি দৃষ্টান্তমূলক শব্দোৎপাদন রহস্য ও তার শব্দার্থ দেওয়ার চেষ্টা করলাম।...

যাই হোক, আমাদের শব্দার্থকোষের কাজ চালানোর জন্য আমরা তাহলে **ফ** বর্ণের অর্থ লিখব 'ফ-অনকারী' বা 'ফনী'। স্বভাবতই **ফা** = ফনীর আধার যে, **ফি** = ফনী গতিশীল যাহাতে ... ইত্যাদি হবে। অতঃপর **কা, কি, কী, কু, কূ** ... প্রভৃতি বর্ণের অর্থের মতো **ফা, ফি, ফী, ফু, ফূ** ... ইত্যাদির অর্থও হবে।

ফ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *ফং (ফণ্), ফক্ক, ফল্, ফুল্ল্*, ফ্ = ৪ + ১

ফং (ফঙ্, ফণ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ফঁ, ফঁক, ফঁপ, ফঁপর, ফঁপর-দালাল, ফঁপরা, ফঁপানি, ফঁস, ফঙ্গবেনে, ফণ, ফণধর, ফণপঙ্‌ক্তি, ফণমণ্ডল, ফণাবান, ফণা, ফণাকর, ফণাধর, ফণাফণ, ফণিকার, ফণিধর, ফণিনী, ফণিপ, ফণী, ফণীকেশর, ফণীচক্র, ফণীনায়ক, ফণীন্দ্র, ফণীপতি, ফণীফেন, ফণীবর, ফণীভাষ্য, ফণীভুক্, ফণীমনসা, ফণীমুখ, ফণীরাজ, ফণীশ্বর, ফগু (ফাঁড়), ফন, ফন্দ, ফন্দি(ন্দী), ফম, ফাঁ(ফা)ক, ফাঁকতাল, ফাঁকা, ফাঁকি, ফাঁড়, ফাঁড়া, ফাঁড়ি(ড়ী), ফাঁৎফাঁৎ, ফাঁতরা-ফাঁতরা, ফাঁদ, ফাঁদ(দু)নি, ফাঁদাল, ফাঁদি(দী), ফাঁপ(ফ), ফাঁপ(ফ)র, ফাঁপা, ফাঁফ, ফাঁফর, ফাঁস, ফাঁসা, ফাঁসান, ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে, ফোঁকর, ফাণিত, ফাণ্ট, ফাগু, ফানুস, ফান্দ, ফান্দনি(নী), ফিঙা, ফিঙে, ফিঙ্গক, ফিঙ্গা, ফিঙ্গে, ফিন, ফিনকি, ফিনফিনে, ফিনিক, ফেঁক, ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি, ফেঁকাসে, ফেঁখা, ফেঁচ, ফেঁপড়া, ফেঁপো, ফেঁসাদ, ফেঁসো, ফেণা(না), ফেণি(নী), ফেন (দ্র.স্ফায়), ফোঁকর ফোঁটা, ফোঁড়, ফোঁড়া, ফোঁত, ফোঁপড়া, ফোঁপল, ফোঁপা, ফোঁপান, ফোঁপানি, ফোঁ-ফোঁ, ফোঁস, ফ্যাণা।

ফং (ফণ্) = ফনীর রহস্যরূপ যাহাতে। **ফণ** = ফনীর রহস্যরূপের বোধন যাহাতে। [গ্রামবাংলার মানুষের মুখের ভাষায় এই **ফং** বা **ফঁ**-কে ব্যবহারিক রূপে পাওয়া যায় — বাঁধা গরুর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কখনো কখনো কোনো কোনো গরু হঠাৎ 'ফঁ'-ক'রে (**ফঁ**-শব্দ ক'রে) মুখ ঘুরিয়ে দেখে। গ্রামবাংলার মানুষ জানেন, গরুর এই ব্যবহারের তাৎপর্য হল — 'গুঁতিয়ে দেব', 'আরও কাছাকাছি হলে গুঁতিয়ে দিতাম' ... ইত্যাদি। সেকারণেই গ্রামবাংলার মানুষের ভাষায় এরকম বাক্যও শোনা যায় — 'এরকম মার যে তুমি খাবে, সে আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। নেতার **ফঁ ফাঁ** শুনে তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তার চেলারা আসছে, এটা সেটা হুকুম করছে, তাও বিশেষ পাত্তা দাওনি। মার তো তুমি খেতেই।' এই যে '**ফঁ**', এর ভিতরে 'পালিত হয়ে স্থির রূপে' ছিল — ফাঁকা আস্ফালন, রীতিমতো ধমকানি, গুঁতোনো, মারামারি করে কেড়ে নেওয়া ... ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা, **ফঁ**-এর ভিতরে বহু কিছু ব্যাপার তাদের 'পালিত ও স্থির রূপে' থাকতে পারে। শব্দতত্ত্বের নিয়মে এই **ফঁ** হল **ফং**-এর একটি রূপ। এই **ফং** বা **ফঁ**-এর অর্থ হল '**ফ**-ক্রিয়ার রহস্যরূপ থাকে যাহাতে'। ক-চ-ট-ত-প বর্গে এই **ফং**-ই যথাক্রমে **ফঙ্ ফঞ্ ফণ্ ফন্** ও **ফম্** হয়ে যায়। এবং সবক্ষেত্রেই অর্থ হয় 'ফ-এর রহস্যরূপ-এর সক্রিয়তা'।]

ফণ (ফণা, ফণাকর, ফণাধর, ফণাফণ, ফণিকার, ফণিধর, ফণীকেশর, ফণীচক্র, ফণীফেন, ফণীভুক্, ফণীমনসা, ফণীমুখ) : **১. ফণ** = ✓ফণ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ফণ** = *ফনীর রহস্যরূপের বোধন যাহাতে।* **ফণা** = **ফণ**-*এর আধার যে।* **ফণাধর** = **ফণা** *ধরে যে।* **ফণাফণ** = **ফণা**র **ফণ** *থাকে যাহাতে।* **ফণিকার** = **ফণী** *কার যেখানে।* **ফণিধর** = **ফণী** *ধরে যে।* **ফণীকেশর** = *যে* **ফণী**র *কেশর আছে।* **ফণীচক্র** = **ফণী** *দ্বারা বিছিয়ে রাখা চক্র।* **ফণীফেন** = **ফণীর** *ফেনা থাকে যাহাতে।* **ফণীভুক্** = **ফণী**কে *ভক্ষণ করে যে।* **ফণীমনসা** = **ফণী**র *মনঃ রূপের আধার যে।* **ফণীমুখ** = **ফণী**র *মুখের ন্যায় মুখ যাহার।* / **ফণ, ফণা** = বিস্তারে গত যে। **ফণিধর** = যে বাণে সাপ হয়। (ব.শ.)। **৩. ফণ, ফণা** = সর্পের দর্ব্বীবৎ বিস্তৃত মস্তক, ভোগ। **ফণাকর, ফণাধর** = সর্প। **ফণাফন** = ফণাবিস্তারপূর্ব্বক সর্পগর্জ্জন। **ফণিকার** = দক্ষিণে স্থিত দেশভেদ, তদ্দেশবাসী যোদ্ধা। **ফণীকেসর** = নাগকেসর। **ফণীচক্র** = বিবাহাদিতে শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকার চক্রবিশেষ। **ফণীফেন** = অহিফেন। **ফণীভুক্** = সর্পভোজী, ময়ূর। **ফণীমনসা** = ফণার মতো চেপ্টা সকন্টক সিজগাছবিশেষ। **ফণীমুখ** = চোরের ফমিমুখাকৃতি মৃত্তিকাক্ষেপণার্থ যন্ত্রভেদ। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র **ফণা** শব্দটি 'সাপের ফণা' বা snake's hood অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** শুরুতে এই শব্দগুলির বানান বিষয়ে দু'একটি কথা বলে নেওয়া জরুরি। উপরোক্ত **ফণ**-ভুক্তিতে এবং নিম্নোক্ত **ফণী**-ভুক্তিতে **ফণি** ও **ফণী** দুরকম বানানই ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি ব.শ.-তে যেরূপ ছিল, সেরকমই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সবক্ষেত্রে বানানের নিয়ম মানা হয়নি। ব্যাকরণের নিয়মে **ফণী** শব্দের সঙ্গে কোনো শব্দ সমাসবদ্ধ হলে 'ঈ'কার বদলে গিয়ে 'ই'কার হয়ে যায় (যথা **ফণী** + ধর = **ফণিধর**), একথা সবাই জানেন। সেই নিয়মে **ফণীবর** হয়ে যায় **ফণিবর**, কিন্তু অনেকে **ফণীবর**ই লিখে থাকেন। অতএব **ফণিবর** সঠিক বানানে লেখা শব্দ বা 'সাধু' শব্দ হলেও **ফণীবর**ও কমবেশি প্রচলিত আছে। আবার **ফণীন্দ্র** কিন্তু কখনোই **ফণিন্দ্র** হয় না, কেননা, সেখানে **ইন্দ্র** শব্দের 'ই' যুক্ত হয়ে শব্দটিকে 'ঈ'কারান্ত করে দিচ্ছে। ... এসবই 'ব্যাকরণের নিয়ম', তা সে ব্যাকরণকে আপনি সংস্কৃত-ব্যাকরণ বলুন আর বাংলা-ব্যাকরণই বলুন। (আমরা কিন্তু তথাকথিত সংস্কৃতকে সবসময়ই 'প্রাচীন বাংলা' বলে মনে করি এবং বহু স্থানে সেভাবেই উল্লেখ করেছি। কেন, সে প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।)

এখানে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি বাংলাভাষী-অ্যাকাডেমিশিয়ানরা করে থাকেন, তা হল, বানান নিয়ে এত জটিলতার দরকার কী? সবগুলোকেই 'ই'কার বা সবগুলোকেই 'ঈ'কার করে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। সেই সরলীকরণে আপত্তির কী আছে?

গুরুতর আপত্তি আছে। প্রথমত, শব্দের ভেতর থেকে তার বর্ণভিত্তিক-ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশন করে শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে চাইলে ইচ্ছেখুশি 'ই' বা 'ঈ' করা যাবে না। তাহলে অর্থ বদলে যাবে। দ্বিতীয়ত, প্রতীকী অর্থও নেহাত 'খামখেয়ালি' ('arbitrary') অর্থ নয়, তারও বর্ণভিত্তিক অর্থের সঙ্গে একটি 'মজে যাওয়া নদীর মতো' সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কের নদীতে এখন আর জলস্রোত নেই, কিন্তু খালটা রয়েছে সাক্ষী রূপে। সরলীকরণের নামে ইচ্ছেখুশি বানানবদল সেই খালটিকেও মনের ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবে। ...

তারপরও অ্যাকাডেমিশিয়ানরা বলতে পারেন, 'ই'কারকে 'ঈ'কার করে দিলে মানে কি সত্যিই বদলায়? কীভাবে বদলায়?

হ্যাঁ, অবশ্যই বদলে যায়। **ফণিধর**কে **ফণীধর** করে দিলে বর্ণভিত্তিক নিয়মে শব্দটির মানে একরকম থাকে না। কীভাবে মানে বদলে যায়, দেখুন — 'ফণ (ফণা) সক্রিয়রূপে বা গতিশীলরূপে ('ি'কার) ধারিত যাহাতে (ধর)' তাকে বলে **ফণিধর**; তার মানে (কারও বিরুদ্ধে বা উদ্দেশ্যে) তার ফঁ ফঁ করা (**ফ**-বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য) ফণা তুলে ধরে রয়েছে যে, সে হল **ফণিধর**। আর, 'ফণীকে ধরে রাখে যে', সে হল **ফণীধর**; যার মানে সাপকে (বা অন্য কোনো **ফণী**কে) ধরে রেখেছে যে, তাকে **ফণীধর** বলে। এখন **ফণিধর** ও **ফণীধর**কে যদি এক করে দিই, তাহলে ফণাধারী ও ফণাধারীধারীকে অর্থাৎ সাপ ও সাপুড়েকে (কিংবা ধনী-নাগরিক ও রাজাকে) এক করে দেওয়া হল। এরকম অর্থবিভ্রাট ঘটে যাবে বানানের নিয়ম না মানলে। তখন চেষ্টা করেও শব্দের ভিতরে প্রকৃত শব্দার্থ কী ছিল, তা আর কোনোদিনই জানা যাবে না। ... এইসব বিবেচনা মাথায় রেখে আমরা প্রচলিত শব্দগুলিকে তাদের প্রাপ্ত রূপেই রেখে দিয়েছি। ... যাই হোক, এখন আমাদের উপরোক্ত **ফণ** ও সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির অর্থ বিষয়ক কথাবার্তায় যেতে হবে।

ফঁ অন (on) রয় যাহাতে, তার বোধই **ফণ** সন্দেহ নেই; এবং তার আধার নিঃসন্দেহে **ফণা**ও বটে। এই **ফণ** বা **ফণা** যার রয়েছে, তাকে **ফণাধর** বা **ফণী** বলে। একালের মানুষ আমরা তাকে 'সাপ'

বা snake রূপে বুঝে থাকি। কিন্তু দৃশ্য **ফণ**কে বোঝানোর জন্য আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা যে **ফণ, ফণা, ফণাধর** ... প্রভৃতি **শব্দের সৃষ্টি** করেননি, তা নিয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই। তবে তাঁরা কাদের বোঝানোর জন্য শব্দগুলির সৃষ্টি করেছিলেন? নিম্নে **ফণী** শব্দে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি আমরা। ৬. দ্র. **ফণী**।

ফণী (ফণিপ, ফণীনায়ক, ফণীন্দ্র, ফণীপতি, ফণীবর, ফণীভাষ্য, ফণীরাজ, ফণীশ্বর) : ১. ফণী = ✓ফণ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ফণী*** = ***ফণ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***ফণিপ*** = ***ফণী****কে পালন করে যে।* ***ফণীনায়ক*** = ***ফণী****দিগের নায়ক যে।* ***ফণীন্দ্র*** = ***ফণী****গণের ইন্দ্র যে।* ***ফণীপতি*** = ***ফণী****র পতি যিনি।* ***ফণীবর*** = ***ফণী****গণ কর্তৃক বরণীয় যিনি।* ***ফণীভাষ্য*** = ***ফণী*** *কৃত যে ভাষ্য!* ***ফণীরাজ*** = ***ফণী****দিগের রাজা যিনি।* ***ফণীশ্বর*** = ***ফণী****দিগের ঈশ্বর যিনি।* (ব.শ.)। ৩. **ফণিপ** = সর্পপতি, অনন্ত। **ফণী** = ফণাবান সর্প, শেষ, শেষাবতার পতঞ্জলী, (সর্পাকৃতি) কেতুগ্রহ। **ফণীনায়ক** = বাসুকি। **ফণীন্দ্র** = ফণী ইন্দ্রতুল্য, ফণিশ্রেষ্ঠ, শেষ, বাসুকি, পতঞ্জলি। **ফণীপতি** = শেষ, পতঞ্জলি। **ফণীবর** = অনন্ত। **ফণীভাষ্য** = পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য। **ফণীরাজ** = অনন্ত। **ফণীশ্বর** = ফণিরাজ, শেষ, বাসুকি, পতঞ্জলি, মহাসর্প। ৪. সমস্ত শব্দগুলিই বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. ৩০/৪০ বছর আগেও বাংলাভাষীদের মধ্যে অতিপ্রচলিত একটি নাম ছিল 'ফণিভূষণ'। গ্রামবাংলায় আজও এই নাম কমবেশি প্রচলিত আছে। আসলে **ফণ** বা **ফণী**র গৌরব কী ছিল, কলঙ্কই বা কী ছিল, সেই সমগ্র স্মৃতিই এখন আমরা ভুলে গেছি; শুধু মনে আছে যে, এ হল সাপের বা snake-এর ব্যাপার-স্যাপার। অর্থাৎ, পূর্বকথিত **পাদোদক-মূঢ়**তার কারণে আমরা **ফণী**কে এখন কেবলমাত্র স্বল্পমেধাধারীদের নিম্ন-অধিকারীসুলভ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারি, **ফণী**কে শুধুমাত্র তার নিম্ন অর্থে বুঝি। **ফণী** যে কোনো দর্শন বা দার্শনিক হতে পারে, সে যে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হতে পারে, যোগদর্শনের প্রবক্তা হতে পারে, সেরকম কথা এখন আর আমরা ভাবতেই পারি না। সেকারণেই **ফণ**-যুক্ত শব্দগুলিকে সারি দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

অথচ একটা সময় ছিল, যখন **ফঁ ফঁ** করে যে **ফণ**, তা সে জ্ঞানসম্পদের **ফণ-ফণা-ফণী** হোন আর ধনসম্পদের **ফণ-ফণা-ফণী**ই হোন, তাঁরাই ছিলেন **ফণ** ও তৎজ্জাত শব্দসমূহের মূল উদ্দিষ্ট। সমগ্র বৈদিক যুগ জুড়ে আমাদের যে **নাগ** সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যাদের উত্তরসূরিরা আজও **নাগ**-পদবী নিয়ে বেঁচেবর্তে আছেন, তাঁদের অর্জিত অদৃশ্য জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের **ফণা**কে বোঝানোই ছিল আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণের প্রধান উদ্দেশ্য। **অনন্ত** নাগ, **বাসুকি** নাগ, **শেষ** নাগ ... এবং **পতঞ্জলি** — এঁরাই ছিলেন সেকালের সমাজের **ফণী**, **ফণিপ, ফণীন্দ্র, ফণীশ্বর** ... ইত্যাদি। একটা যুগ ছিল যখন এই **পতঞ্জলি**দের অর্জন ও সামাজিক গৌরব এতই বরণীয় ছিল যে লোকে **পাতঞ্জল** দর্শন বা **ফণীভাষ্য** অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে পারলে চিরকৃতার্থ হত, **অনন্ত, বাসুকি** ... ইত্যাদি নাম রাখত, নিজেদের **নাগ**গোষ্ঠীর সদস্য বলতে গৌরব অনুভব করত, নামের শেষে **নাগ** শব্দ পদবীরূপে লিখে সেকথা সগৌরবে জানান দিত। কিন্তু সকল সামাজিক সত্তাদের স্বভাব যেমন হয়, উদ্ভবকালে বৈপ্লবিক ও শুভগুণসম্পন্ন এবং ক্রমান্বয়ে মৌলবাদী অশুভ হয়ে ওঠা, এই **ফণী**-সত্তাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ... তবে এসবই ছিল অদৃশ্য কিন্তু মানুষের সমাজে অত্যন্ত সক্রিয় **ফণ**-সত্তা, এবং উদ্ভবের পরপরই এদের বোঝানোর জন্যই **ফণ** ও তৎজ্জাত শব্দগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল।

নিম্ন-অধিকারীদের বোঝানোর জন্য দৃশ্যলোকে যেসকল সমস্বভাবের সত্তা ছিল, তাদেরও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে **ফণ, ফণা, ফণী** ... ইত্যাদি নাম হয়ে যায়। সেই কারণে snake হয়ে যায় **ফণী**, সমস্বভাবের সিজগাছ হয়ে যায় **ফণীমনসা**, আফিম বা অহিফেন হয়ে যায় **ফণিফেন** ... ইত্যাদি। মৌলবাদী হয়ে পড়া সামাজিক ক্ষমতাধর ও জ্ঞানসম্পদের অর্থে অর্থবান **দক্ষ** বেদজীবীর সঙ্গে টক্কর হলে আপনি তার যে রূপটিকে অনুভব করতে পারবেন, কিংবা একই স্বভাবের ধনসম্পদের অর্থে অর্থবান ধনীর সঙ্গে টক্কর হলে আপনি তার যে রূপটিকে অনুভব করতে পারবেন, সেই রূপটির বিবরণ দিতে পারা বেশ কঠিন কাজ। এঁরা নিজেরা খেটেখুটে জ্ঞান বা ধন অর্জন করেননি, পিতৃসূত্রে কিংবা নানা অনৈতিক পথে জ্ঞানবানের বা ধনবানের আসনে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন বলেই, এঁদের স্বভাব অত্যন্ত জটিল, নীচতাপূর্ণ ও মন্দ হয়। মোটকথা ঠিকঠাক স্বোপার্জিত জ্ঞান ও ঠিকঠাক স্বোপার্জিত ধনের অধিকারী না হয়েও যাঁরা সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থানের কারণে দীর্ঘকাল জ্ঞানী বা ধনীর উচ্চাসনে বসে থাকেন, বিরোধী কাউকে দেখলেই তাঁদের ভয়ানক **ফঁ-ফাঁ** বেরিয়ে আসে; এঁরাই বিষধর সামাজিক **ফণাধর** বা **ফণী** সন্দেহ নাই। পশ্চিমবাংলায় এরকম জ্ঞানবান **ফণী**কে আমরা দেখেছি অ্যাকাডেমির অতি উচ্চপদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত অযথার্থ সার্টিফিকেটের অধিকারী বিষধর জ্ঞানী-**ফণী**রূপে এবং ধনবান **ফণী**কে আমরা দেখেছি রিজওয়ানুর কাণ্ডের বিষধর ধনী-**ফণী**রূপে। ...

তবে কোনোদিন হঠাৎ যদি **ফণীমনসা**র জঙ্গল দেখে ফেলেন তৎক্ষণাৎ অবাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করবেন — এটাই তো সেই রূপ, যাকে আপনি মর্মে মর্মে টের পেয়েছেন আগেই, কিন্তু তার বিবরণ দিতে পারেননি। **ফণী**র **মনসা** যে কী জিনিস, **ফণীমনসা**র জঙ্গল দেখিয়ে দিলে লোকে অ সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারবে, আশা করা যায়। ৬. পাশ্চাত্যের মানুষেরা এই **ফণ**-এর উত্তরাধিকার পেয়েছেন তাঁদের মতো করে। আমরা যাকে ফণীমনসার জঙ্গল ও পুষ্পোদ্যান, বা **ফণীমনসা**র ও **ফুল**-এর দুটো জগৎরূপে পেয়েছিলাম, অর্থাৎ যথাক্রমে মৌলবাদী হয়ে-পড়া অধঃপতিত বৈদিক সমাজতন্ত্র ও পণ্যসমর্থক বৌদ্ধসমাজ রূপে পেয়েছিলাম, তাঁরা সেই সত্যকে পেলেন তাঁদের দুই দেবতায় — Faun (= a Roman rural deity) ও Goddess Flora-য় এবং জীবজগতে flora and fauna-য়। কিন্তু অতীত উত্তরাধিকার অনেক বেশি হারানোর কারণে পাশ্চাত্যের মানুষেরা ওই দুই দেবতার যে কাহিনী ধরে রেখেছেন, তাতে উপরোক্ত দুই সামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাসের মাত্র ছিঁটেফোঁটাই পাওয়া যায়। ... এছাড়াও ইংরেজির fan, fanatic, fun, fond ও phon-যুক্ত অনেক

শব্দ এই **ফণ**-শব্দপরিবারের ইংরেজি উত্তরাধিকার।

ফণ্ড (ফাঁড়, ফাঁড়া, ফাঁড়ি, ফাঁড়ী) : **১.** ✓ফণ্+ ড। (ব.শ.)। **২. ফণ্ড** = *ফণ-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ফাঁড়** = **ফণী**র *রহস্যরূপের যে-আধারে গড়ান-উড়ান চলে।* **ফাঁড়া** = **ফাঁড়**-এর *আধার যে।* **ফাঁড়ি** = **ফাঁড়** *গতিশীল যাহাতে।* **ফাঁড়ী** = **ফাঁড়ি**র *আধার যে।* **৩. ফণ্ড** = উদর, ফাঁড়। **ফাঁড়** = জঠর, পেট, পাত্রের অভ্যন্তরভাগ বা খোল। **ফাঁড়া** = সাঙঘাতিক বিপদ, প্রায় মৃত্যুযোগ। (ফাঁড়া কাটা = ফাঁড়া অতিক্রান্ত হওয়া; ফাঁড়া কাটান = ফাঁড়া উত্তীর্ণ হওয়া।) **ফাঁড়ি, ফাঁড়ী** = গ্রামস্থ শাখাপুলিশ বা চৌকী (police out-post)। **৪.** শুধুমাত্র **ফণ্ড** শব্দটি বর্তমানে অপ্রচলিত, কিন্তু বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. ফাঁড়** কীরকম বস্তু বা ব্যাপার, অ্যাকাডেমি তা জানে না। কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষেরা, মেয়েরা তা বিলক্ষণ জানেন। শাড়িপরা মেয়েদের কোমরে সামনের দিকে শাড়ির যে অংশ জড়ানো থাকে তাতে এমন কৌশলে শাড়িটি পেঁচানো থাকে যে, তাতে ঝুলে থাকা অর্ধবৃত্তাকার একটি থলি তৈরি হয়ে যায়। সেই থলিতে মেয়েরা তাঁদের সংগৃহীত বহু কিছুই রাখেন — তা সে কুড়োনো আম জাম ইত্যাদি ফলমূল হতে পারে, শাকসব্জি হতে পারে, গেরস্থবাড়ি থেকে পাওয়া চাল বা খুদও হতে পারে, খই মুড়িও হতে পারে ... এমনকি ছাঁকনি জালের ছাঁকা মাছ বা পুকুর হাঁতড়ে ধরা মাছ কাঁকড়া গেঁড়িও হতে পারে। মেয়েদের কোলে ঝুলতে থাকা সংগৃহীত বস্তুতে ভরা এই থলিকে বলে **ফাঁড়**। মানুষ ফঁ ফঁ করে ফোঁস-ফাঁস করে এদিক-ওদিক খুঁজে যা কিছু সংগ্রহ করে থাকে, তা সবই এই থলিতে রাখে বলেই, এর নাম আদিতে হয়েছিল **ফণ্ড**, এখন তা হয়েছে **ফাঁড়**। মধ্যযুগের রাষ্ট্র বা সরকার তার সিপাই বা লোকলস্কর দিয়ে যে স্থানে এইরূপ সংগ্রহকর্ম চালাতো, সেই স্থানের নাম হয়ে যায় **ফাঁড়ী**। এখানে রাষ্ট্রের **ফাঁড়** সক্রিয় বা গতিশীল থাকত বা **ফাঁড়ি**-কর্ম চলত, তাই এগুলির নাম **ফাঁড়ী** হয়ে যায়। এখন যুগ অনেক বদলে আরও পাঁচশো বছর এগিয়ে চলে এসেছে, স্বভাবতই **ফাঁড়ি** শব্দের অর্থ অনেক বদলে গেছে এবং **ফাঁড়ী** শব্দটিকে **ফাঁড়ি** শব্দের সমার্থক করে নিয়ে **ফাঁড়ী** শব্দটিকে ফেলেই দেওয়া হয়েছে; চলছে কেবল **ফাঁড়ি** (পুলিশ-**ফাঁড়ি**)।

তবে **ফাঁড়া**র ব্যাপারটি একটু আলাদা। কোথাও কোনো **ফঁ**-কারী **ফণী** তার **ফাঁড়** পেতে রেখেছে। সেটিই হল **ফাঁড়া**। আপনি যদি সেই **ফাঁড়া**র হাত থেকে বেঁচে যান, তাহলেই আপনার **ফাঁড়া** কেটে গেল। **৬.** ইংরেজি found, foundation, fund, funda, fundamental ... ইত্যাদি।

ফন (ফন্দ, ফন্দি, ফন্দী, ফান্দ, ফান্দনি, ফান্দনী, ফাঁদ, ফাঁদনি, ফাঁদা) : **২.** **ফন** = **ফনী** *অন (on) যাহাতে।* **ফন্দ** = **ফন** *দেয় যে।* **ফন্দি** = **ফন্দ** *গতিশীল যাহাতে।* **ফন্দী** = **ফন্দি**র *আধার যে।* **ফান্দ (ফাঁদ)** = **ফন্দ** *হইতে জাত।* **ফান্দনি** = **ফান্দ** *অন (on) হয়ে গতিশীল যাহাতে।* **ফান্দনী (ফাঁদনি)** = **ফান্দনি**র *আধার যে।* **ফাঁদা** = **ফাঁদ**-*এর আধার যে।* **৩. ফন** = প্রবন্ধ, কূটকৌশল, ফিকির, ফন্দি, সঞ্চিত অর্থ, পুঁজি। **ফন্দ** = শঠতা, চাতুরী, বিপাক, ফাঁদ। **ফন্দি, ফন্দী** = ছল, কৌশল, ফিকির। **ফান্দ** = ফাঁদ, কূটকৌশল, বন্ধন, বন্ধনসাধন ছল। **ফান্দনি, ফান্দনী** = ফাঁদনি। **ফাঁদ** = দড়ি সুতা ইত্যাদির বন্ধ, জাল, ফাঁস, কূটকৌশল, ফন্দি, ছল, বিপদ, বন্ধন, লাফ, হাঁড়ি প্রভৃতির মুখের বেড়, (ফাঁদ পাতা = জালবিস্তার করা)। **ফাঁদনি, ফাঁদুনি** = লম্ফ, অশ্বগতিবিশেষ, আড়ম্বর। **ফাঁদা** = লাফাইয়া পার হওয়া, উল্লঙ্ঘন করা, (ফাঁদাইয়ে = ফাঁদে ফেলিয়া; গল্প **ফাঁদা** = আড়ম্বর করিয়া গল্প আরম্ভ করা।)। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলিকে 'আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে আগত বাংলাশব্দ' বলা হয়ে থাকে। আমরা আগেই জানিয়েছি, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মূলে আরবি-ফারসির শব্দ ও বাংলার শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয়, সেমিটিক অপেক্ষা ব্যাপকতর এক শব্দপরিবারের সদস্য হওয়ায় এবং বহু ক্ষেত্রে সমশ্রাব্যতা ও সমার্থকতা থাকার কারণে কালে কালে সেই বিদেশী শব্দকে আপন করে নিতে বাংলাভাষীর অসুবিধা হয়নি। তবে সে তো আর রাতারাতি হয়ে যায়নি, একটা পদ্ধতির ভিতর দিয়ে ব্যাপারটি ধীরে ধীরে ঘটেছে। কীভাবে ঘটেছে, সেকথা আমরা **পাকাপোক্ত** শব্দে বিস্তারিত বলেছি। সেখানে মুজতবা আলী কিছু নিয়মের কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটি হল সমার্থক দুটি শব্দ নিয়ে শব্দযোড় গড়ে ওঠা, যার একটি বাংলা অন্যটি ফারসি বা অন্য কোনো বিদেশী শব্দ। সেই নিয়মে **ফন্দি-ফিকির** শব্দটির প্রথম শব্দটি নিঃসন্দেহে সেকালের বাংলা শব্দই বটে। সুতরাং **ফন**-যুক্ত শব্দগুলিকে আপনি আরবি ফারসি বলতে পারেন, বাংলাও বলতে পারেন। যেমন কিনা, **ইন অন ইক** বা in on ic ... এগুলি বাংলা শব্দ বটে, ইংরেজি শব্দও বটে। (**ইন** > অধীন; **অন** > চলন; **ইক** > অর্থনৈতিক। **in** > put in, introduction; **on** > put on, onlooker; **ic** > economic।) এই শব্দগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে নিয়মিত ব্যবহৃত সমোচ্চারিত এবং সমার্থক শব্দ। ...

এ তো গেল একটি দিক। প্রধান যে দিকটির কথা আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি, তা হল, মূলে ঐ আরবি ফারসি বাংলা ... সবাই আসলে একই শব্দবংশের সন্তান। তাহলে, আজ যখন সবই জানতে পারছি, শুধু শুধু আমাদের নিজেদের শব্দকে বিদেশ থেকে আগত বলে দাগিয়ে দিতে যাব কেন? তাছাড়া — সবাই জানে, গ্রামবাংলার গায়ক গেয়ে গেছেন — '**ফান্দে** পড়িয়া বগা কান্দে রে'। কারবারীরা যখন 'কারবার **ফাঁদে**', বগারা তো সে **ফাঁদে** পড়বেই, কিন্তু খোদ পরমাপ্রকৃতি যখন **ফাঁদ** পাতেন, তখন! গ্রামবাংলার গায়ক কোন **ফান্দে** পড়েছিলেন কে জানে! তবে সে যে পরমাপ্রকৃতির পাতা **ফাঁদ**, রবীন্দ্রনাথ সেকথাই বলে গেছেন — 'ভুবনজোড়া **ফাঁদ** পেতেছ কেমনে দিই **ফাঁকি** / আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি।' এই **ফান্দে** ও **ফাঁদ** শব্দ আরবি **ফন** কিংবা ফারসি **ফন্দ** শব্দ থেকে আসেনি, একে আমরা আমাদের নিজেদের পৈতৃক সূত্রে পেয়েছিলাম। পরে আরবি-ফারসি তাদের **ফন** ও **ফন্দ** নিয়ে আসায় আমাদের তৎকালীন বাংলাভাষী পূর্বসূরিরা সেগুলিকে আপন শব্দ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক, **ফান্দ** বা **ফাঁদ** বললে আমরা trap বুঝি কেন, এখন সে বিষয়ে যাওয়া যাক। **ফন** বা **ফঁ** দেয় যে, অর্থাৎ ধমকানি বা অন্য কিছু দেয় যে, তাকে **ফন্দ** বা **ফঁদ** বলা যায়। কিন্তু সেই ধমকানি ইত্যাদি তো সে কোনো কিছুর মাধ্যমেই দেয়। যার মাধ্যমে দেয়, সেটিই **ফান্দ** বা **ফাঁদ**। সামাজিক **ফন**কারী বা **ফঁ**-কারী সেটা করে কোনো না কোনো প্রকার 'ট্র্যাপে' বা **ফান্দে** বা **ফাঁদে** ফেলে দিয়ে। তবে এ হল অদৃশ্য **ফান্দ** বা **ফাঁদ**। তার বাহ্যিক রূপকে আমরা দেখতে পাই দড়ির **ফাঁদ**-এ, যা দিয়ে সাধারণত শিকারীরা পাখি ধরে। বাংলাভাষী গায়ক যখন গান করেন — 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে', তখন দৃশ্যলোকে 'বাহ্যিক দৃশ্য-ফাঁদে পড়া বক'কে যেমন বোঝানো হয়ে থাকে, তেমনি মনোলোকে 'সামাজিক অদৃশ্য-ফাঁদে পড়া বকধার্মিক'কেও বোঝানো হয়ে থাকে। ... **৬.** ইংরেজি fun, fond প্রভৃতি শব্দ।

ফাঁক (ফাঁকতাল, ফাঁকা, ফাঁকি) : **২.** ***ফাঁক*** = ***ফঁক*** *(**ফঁ**-করণ থাকে যাহাতে) হইতে জাত।* ***ফাঁকতাল*** *= তালের **ফাঁক**।* ***ফাঁকা*** *= **ফাঁক**-এর আধার যে।* ***ফাঁকি*** *= **ফাঁক** গতিশীল যাহাতে।* **৩. ফাঁক** = উন্মুক্ত, খোলা (open), খালি (empty), পলায়নপর, খোলা জায়গা, অনাবৃত অংশ (gap), অন্তর, অবকাশস্থান, অবসরকাল (leisure), যোগ্যকাল, সুযোগ (opportunity), অনাবৃত স্থান, ছিদ্রপথ (opening), বিরামকাল ...। **ফাঁকতাল** = তালের বিরামকাল, অবসর, সুযোগ। **ফাঁকা** = শূন্যগর্ভ, বাজে, অসার, শূন্য, খোলা জায়গা। **ফাঁকি** = পূর্ব্ব পক্ষ, কূটপ্রশ্ন, কূটকৌশল, শঠতা ...। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ফঁ** কাকে বলে, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সুবাদে **ফঁক** মানে, কোনো সত্তাকে গুঁতিয়ে চিরে দেওয়া বা কামড়ে তার খানিকটা অংশ তুলে নেওয়া। এর ফলে সত্তাটির খানিকটা অংশ শূন্য হয়ে যায়। তাকেই বলে 'ফঁক হইতে জাত' বা **ফাঁক**। তবে কিনা, আমাদের বাংলাভাষীদের মনের গভীরে তো দেশ-কাল-পাত্র সদা সক্রিয় থাকে। তাই আমরা নিজেদের অজান্তে দেশের বা স্থানের **ফাঁক**, কালের **ফাঁক** ও পাত্রের **ফাঁক** রূপে শব্দটির প্রয়োগ ঘটাই। ফলে, খোলা স্থান, খালি পাত্র এবং শূন্য কাল এই **ফাঁক** শব্দে চিহ্নিত হয়ে যায়। উপরের **৩.**-এ ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলি সেই তিনরকম **ফাঁক**কে ও তাদের নানা বিবর্তিত রূপকে সুনির্দিষ্ট ভাবে শনাক্ত করে। সন্দেহ নেই, পরে পরে এই **ফাঁক** ও **ফাঁকা** ... প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থের আরও বিস্তার ঘটেছে। **৬.** ইংরেজি fuck, funk প্রভৃতি শব্দ।

ফঁপ (ফঁপর-দালাল, ফঁপরা, ফাঁপ, ফাঁপর, ফাঁপা, ফাঁপান, ফেঁপে-ওঠা) : **২.** ***ফঁপ*** *= **ফঁ** (ফনীর রহস্যরূপ) পালিত যাহাতে।* ***ফঁপর-দালাল*** *= **ফঁপ** রহে যাহাতে, তদ্রূপ (শূন্যগর্ভ দালালি করে যে) দালাল; অথবা যার দালালির সারবত্তা নেই।* ***ফঁপরা*** *= **ফঁপর**-এর আধার যে।* ***ফাঁপ*** *= **ফঁপ** হইতে জাত।* ***ফাঁপর*** *= **ফাঁপ** রহে যাহাতে।* ***ফাঁপা*** *= **ফাঁপ**-এর আধার যে।* ***ফাঁপান*** *= **ফাঁপ** অন (on) থাকে যাহাতে।* **৩. ফাঁপ** = স্ফীতি, ফুলা। **ফাঁপর** = ফাঁপযুক্ত, স্ফীতোদর, হতবুদ্ধি, কর্ত্তব্যবিমূঢ়, কম্পমান, বিকল, বিহ্বল, রুদ্ধশ্বাস, বিপদ, সঙ্কট, সম্ভ্রম, বুদ্ধিমোহ। **ফাঁপা** = স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা, সমৃদ্ধ হওয়া, স্ফীত, শূন্যগর্ভ, বায়ুপূর্ণ, রাগা, ফুলিয়া গর্জ্জন করা। (ব.শ.)। **ফঁপ** = অশ্রু বেদনা আওয়াজ ইত্যাদি ফুরিয়ে যাওয়া ফাঁকা কান্না, ফাঁকা রাগ, শূন্যগর্ভ আস্ফালন। **ফঁপরা** = শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য। **ফঁপর-দালাল** = বিনিয়োগহীন দালাল। **ফাঁপান** = স্ফীত করা, ফোলানো। **ফেঁপে-ওঠা** = ফুলে ওঠা, ফাঁপা। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** কোনো অভিধানেই **ফঁপ, ফঁপর, ফঁপরা, ফঁপর-দালাল** প্রভৃতি শব্দ এই বানানে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় 'ফোঁপ' 'ফোঁপর' 'ফোঁপল' ইত্যাদি বানানে। আমরা কিন্তু শব্দগুলিকে **ফঁপ** ... ইত্যাদি উচ্চারণেই পেয়েছি। তাতে অর্থও ঠিক থাকে। ছেলেটা **ফঁপাচ্ছে** আর **ফুঁপিয়ে** কাঁদছে বা **ফোঁপাচ্ছে** — সমার্থক নয়। **ফঁপাচ্ছে**র বেলায় তার **ফঁপানি** স্বতোৎসারিত হলেও দ্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয়, কিন্তু **ফুঁপিয়ে** কাঁদছে বা **ফোঁপাচ্ছে**র বেলায় তার সেই **ফোঁপানি** দ্রষ্টা দেখছে, কেননা তার উদ্দেশ্যেই ঐ কান্না নিবেদিত হচ্ছে। সেই কারণে আমরা **ফঁপ, ফঁপর** ... ইত্যাদি এইরকমই লিখলাম।

এই শব্দগুলির উপরোক্ত **২.** ও **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থই শব্দগুলির অর্থ প্রকাশ করে দিলেও, শব্দগুলির যে বিস্তার ঘটেছে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। যেমন বলা হয়, 'ঘটনা যা ঘটেছে, তার চেয়ে অনেক ফুলিয়ে **ফাঁপিয়ে** প্রচার করা হচ্ছে।' এই বাক্যে **ফাঁপান** শব্দটি তার অভিধা অর্থ পেরিয়ে ব্যঞ্জনার্থে পৌঁছে গেছে। ... **৬.** ইংরেজি pomp, fop ... ইত্যাদি।

ফাঁস (ফাঁসা, ফাঁসান, ফাঁসি, ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে) : **২.** ***ফাঁস*** *= **ফঁস** (ফনীর রহস্যরূপের নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে) হইতে জাত।* ***ফাঁসা*** *= **ফাঁস**-এর আধার যে।* ***ফাঁসান*** *= **ফাঁসা** অন (on) থাকে যাহাতে।* ***ফাঁসি*** *= **ফাঁস** গতিশীল যাহাতে।* ***ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে*** *= রাজাদেশে **ফাঁসি** দেয় যে।* **৩. ফাঁস** = পাশ, বন্ধন, দড়ি ইত্যাদির ঢিলা গাঁঠ (যাহা টানিলে সরে), ফাঁদ। **ফাঁসা** = ফাঁসের মতো ঢিলা হওয়া, খুলিয়া বা শিথিল হইয়া খসিয়া যাওয়া, বিফল বা পণ্ড হওয়া, ব্যবহারের যোগ্য বা বিচারের বিষয় না হওয়া, ব্যর্থ বা পণ্ড করা। **ফাঁসান** = ফাঁপা জিনিস অস্ত্রাঘাতে ফাটান। **ফাঁসি** = ফাঁসবন্ধ, বন্ধন, উদ্বন্ধনে মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসিতে মৃত্যু। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ফঁ**-করা, **ফঁস**-করা, ও **ফস** করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। **ফঁ**-এর ভিতরে রয়েছে **ফ**-এর রহস্যরূপ। সেই **ফঁ**-এর 'নির্য্যাসত্যাগ' থাকে **ফঁস**-এ। এই **ফঁস** থেকে জাত শব্দ হল **ফাঁস**। তাহলে **ফাঁস** শব্দের অর্থ কী দাঁড়াল?

গ্রামবাংলার চাষীবাসী মানুষেরা দিনান্তের কাজের শেষে শন কাটেন, দড়ি বানানোর জন্য। বর্ষা আসার আগে লাঙলের জন্য, গরুর জন্য, গাড়ির জন্য ঢেরায় কাটা দড়িকে নতুন করে ৮/১০ ফেরতা পাকিয়ে নিয়ে আঠা-জাতীয় কোনো দ্রবণে ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর সেগুলিকে বিভিন্ন নিয়মে চূড়ান্ত পাক দিয়ে কাজের উপযোগী করে নেওয়া হয়। এই কাজে তাঁদের দড়ির নানারকম **ফাঁস** শিখতে হয়, কাজে লাগাতে হয়। সেই ফাঁসগুলির নানারকম নামও দেওয়া হয়েছে। সেগুলি শেখার ও

শেখানোর জন্য হাত তিনেকের একটি সুতলি-দড়ির সাহায্যে নানারকমের ফাঁসের খেলা খেলেন তাঁরা। দু'হাতের দশ আঙুলের সাহায্যে 'সরক-ফাঁস', 'চাবি-ফাঁস', 'ধোঁকা-ফাঁস', 'জাল-ফাঁস' ... প্রভৃতি **ফাঁস**-এর খেলা খেলেন তাঁরা। এর মধ্যে যত টানাটানি করা হবে, তত বেশি শক্ত গেরো লেগে যায় 'চাবি-ফাঁস'-এ, 'ধোঁকা-ফাঁস'-এ মনে হয় মাঝে গিঁট বা গেরো আছে, কিন্তু ঠিকঠাকভাবে টানতে জানলে কোনো গেরোই থাকে না; সরল একটি গাঁটহীন দড়ি স্পষ্ট খুলে হাতে চলে আসে। এবং 'জাল-ফাঁস' কী জালের প্রতিটি ফাঁস দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও জনপ্রিয় **ফাঁস**টির নাম 'সরা-ফাঁস' বা 'সরক-ফাঁস'। এ হল এমন একপ্রকার **ফাঁস**, যার গেরোটি সরে সরে যায়। এই **ফাঁস** দিয়ে লোকে মশারির বা অন্তর্বাসের দড়ি বাঁধে। এর বিশেষত্ব হল, ঠিকভাবে টানলে এই **ফাঁস**টির গেরোর দড়ি সরে সরে যায় এবং অবশেষে **ফাঁস**টিকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলে, **ফাঁস**টি আর থাকেই না। কিন্তু ভুলভাবে টানলে এই **ফাঁস**-এর গেরো উল্টো দিকে সরে সরে **ফাঁস**টিকে শেষ পর্যন্ত এত সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধ করে ফেলে যে তাকে আর খোলাই যায় না; কেটে ফেলতে হয়। পতাকা-উত্তোলনের আগে এই **ফাঁস** ঠিকঠাক বাঁধা না হলে পতাকা উপরে গেলেও খোলে না, তাতে ধরে রাখা ফুল ছড়িয়ে পড়ে না, টানাটানি শুরু হয় অতিথি অভ্যাগতদের সামনেই; উদ্যোক্তাদের লজ্জার সীমা থাকে না। যে বাংলাভাষীরা পায়জামা বা দড়ি-দেওয়া অন্তর্বাস পরেন, পুরুষ বা মহিলা যেই হোন, তাঁরা এই **সরা-ফাঁস** নিত্য ব্যবহার করেন। তাঁরা আমাদের এসব কথার মানে অনায়াসে বুঝবেন এবং বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

এই যে **ফাঁস** খুলে যাওয়া, যার থেকে আমরা 'তথ্য **ফাঁস** করে দেওয়া' অর্থে পৌঁছে যাই, সেইরকম অদৃশ্য ব্যাপারকে বোঝানোর জন্যই এই **ফঁস, ফাঁস** প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে। পরে সেই **ফাঁস**-এর ধারণার বাহ্যিক রূপকে শনাক্ত করা হয়েছে দড়ির **ফাঁস**-এ। মনে রাখা ভাল, **ফঁস** ক্রিয়া যেদিক থেকে নির্গত হচ্ছে, সেই দিক থেকে তাকে দেখলে সেটি **ফঁস** বটে; কিন্তু বিপরীত দিক থেকে দেখলে তা হয়ে যায় **ফুঁস** (ফুঁসে ওঠা) বা **ফোঁস** করা। এই মুহূর্তে আমরা বিপরীত দিক থেকে দেখছি না, আমরা চলেছি **ফঁস**কারী সত্তার পেছনে পেছনে, পেছন থেকেই দেখছি তার **ফঁস** করা কেমন করে **ফাঁস**-এর জন্ম দেয়, সেই **ফাঁস** গতিশীল বা সক্রিয় হয়ে **ফাঁসি**তে পরিণত হয়ে কেমন করে কারও গলায় চেপে বসে। ... কেননা, এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য **ফাঁস** করে দেওয়াই এখন আমাদের কর্তব্য। ...

তবে সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে আমাদের প্রয়োজনটা হল — এঁটে বাঁধা চাই, তারপর এমন **ফাঁস** বা গেরো দেওয়া (চাবি দেওয়া) চাই যে, আমি না চাইলে সেই **ফাঁস** যেন কিছুতেই না খোলে; কেউ তা খোলার চেষ্টা করলে যেন **ফাঁস**টি আরও চেপে বসে যায়; কিন্তু আমি চাইলেই যেন সেই **ফাঁস**টি **ফস** করে খুলে যায়। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সম্পদগুলির দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুগুলিকে দড়ি দিয়ে এঁটে বাঁধি, বজ্র আঁটুনি দিই, এবং শেষে সরা-**ফাঁস** বা '**ফসকা**-গেরো' দিই কিন্তু সেই গেরোর সূত্রটা কাউকে জানতে দিই না। ফলে লোকে বেঠিক টানে এবং গেরোটি উল্টে আরও দৃঢ়ভাবে বসে যায়, অথচ নিজে ঠিক জায়গায় টান মারলে তৎক্ষণাৎ খুলে আসে। কিন্তু কেউ যদি ঠিক জায়গাটা জেনে ফেলে এবং টান দিয়ে ফেলে, তখন **ফসকা** গেরোর কারণে বজ্র আঁটুনিটাও বেকার যায়। এইজন্য আমাদের সংস্কৃতিতে 'বজ্র আঁটুনি ও **ফসকা** গেরো'র বিষয়ে সতর্কতা জারি করা আছে। ... **৬.** ইংরেজি fast, fasten ... ইত্যাদি।

ফিন (ফিনকি, ফিনফিনে, ফিনিক) : **২.** ***ফিন*** = ***ফ*** *(নিঃশেষিত পালন) গতিশীলরূপে অনকৃত যাহাতে।* ***ফিনকি*** = ***ফিন*** *করণ গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ***ফিনফিনে*** = ***ফিন****-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***ফিনিক্*** = ***ফিন****-কে গতিশীল করে যে।* **৩. ফিন, ফিনিক** = ফেনা, অতিশুভ্রবর্ণ। **ফিনকি** = অগ্নিকণা, ফুলকি, স্ফুলিঙ্গসদৃশ দ্রুত বেগ। **ফিনফিনে** = অতিসূক্ষ্ম, মিহি (ধুতি)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ফ**-এর ভিতরে যে শাঁসকরণ ও শেষকরণ অর্থটি থাকে, সেইটি ব্যবহৃত হয়েছে এই ক্ষেত্রে। সত্তার সূক্ষ্ম নিঃসারিত অংশ [সারাংশ হতে পারে (ধুতির সুতো) কিংবা শেষাংশ বা মলাংশও (জলের ফেনা) হতে পারে] ধরা থাকে এই **ফ-ইন** শব্দে। সেই কারণে **ফিন, ফিনকি, ফিনফিনে** ... ইত্যাদি শব্দের ভিতরে একপ্রকার সূক্ষ্মতা বা মিহি ভাব অনুভূত হয়।

এই **ফিন** ও তার সহোদর শব্দগুলি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ক্রিয়াভিত্তিক নিয়ম মেনেই সৃজিত হয়েছে। এবং গৌরবের কথা এই যে, এগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব সৃষ্টি ও সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি। এই শব্দগুলি আবারও প্রমাণ করে, বাংলাভাষী এখনও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে শব্দসৃজন করে চলেছেন, যথারীতি নিজেদের অজ্ঞাতসারে। বাংলার ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদগণের দায়িত্ব সেগুলিকে শনাক্ত করা, যে নিয়মে সৃজিত হচ্ছে, প্রকৃতির সেই নিয়মটি অনুধাবন করে বুঝে নিয়ে লিপিবদ্ধ করে যাওয়া। ... এরকম আরও বহু শব্দ রয়েছে, যা সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি কিন্তু আদৌ প্রতীকী শব্দ নয়। **৬.** ইংরেজি fine (ব.শ.)। আরও ইংরেজি শব্দ রয়েছে, যথা finish, final ... ইত্যাদি এবং ফরাসি fin শব্দ।

ফক্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা *:* ফকফক, ফকি(কী)র, ফকিরফাকরা, ফকিরান, ফকিরি, ফকীরী, ফক্ক, ফ(ফো)ক্কড়, ফক্কা, ফক্কি, ফক্কিকা, ফক্কিকার, ফক্কিকারি, ফাক, ফাকড়া, ফাকা, ফাকি, ফাক্কা, ফিক, ফিকা, ফিকে, ফুঁ, ফুঁক (fuck), ফুঁকা, ফুকর, ফুকা (fuck), ফুকার, ফেঁক, ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি, ফেঁকা (হেঁক, হেঁকা, fuck), ফেঁকাসে, ফেঁখা, ফেক, ফেকনা, ফেকলু, ফেকা, ফেকাসে, ফোকর, ফোকলা, ফোক্কড়, ফ্যাকাসে, ফ্যাকফ্যাক, ফ্যাচফ্যাচ, ফ্যাচাং। **ফক্** = **ফ** (পালনস্থিতের) করণের করণ। **ফক্** = **ফ** (পালনস্থিতের) করণ করে যে; **ফক্** করে যে।

ফক (ফকফক, ফকর, ফকরা, ফকির, ফকিরান, ফকিরী,

ফকীরী, ফাকরা, ফিকির) : ২. **ফক** = **ফ**-এর *(সারাংশকারী ফনীর বা শেষকারী ফনীর) করণ থাকে যাহাতে।* **ফকফক** = **ফক**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ফকর** = **ফক** *রহে যাহাতে।* **ফকরা (ফাকরা)** = **ফকর**-*এর আধার যে।* **ফকির** = **ফক** *গতিশীলভাবে রহে যাহাতে।* **ফকিরান** = **ফকির** *অন থাকে যাহাতে।* **ফকিরী** = **ফকির**-*এর গতিশীল আধার যে।* **ফিকির** = *গতিশীল* **ফক** *গতিশীলভাবে রহে যাহাতে।* **৩. ফকফক** = বুড়ার শুষ্ক চূর্ণখাদ্য খাওয়ার শব্দ, বিবর্ণভাব, পাণ্ডুতা, লাবণ্যহীনতা, ম্লানভাব, শ্বেতাভাবিস্তারপূর্ব্বক। **ফকির, ফকীর** = মুসলমান ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী, নিঃস্ব, দরিদ্র, বিষয়বিরাগী, অকিঞ্চন। **ফকীরী** = ফকীরের বৃত্তি। **ফকিরান** = ফকীরের সেবার্থ প্রদত্তভূমি। **ফিকির** = চিন্তা, উপায় উদ্ভাবন, মতলব, ফন্দি, ছল, কৌশল। (ব.শ.)। **ফক** = হঠাৎ, ফস করে, 'ফক করে বলে ফেলা'। **ফকফক** = খুব ফর্সা বা সাদার ভাবসূচক (ফকফকে সাদা ডিম), কথা বলতে দন্তহীন মাঢ়ির ফাঁক বা বিরল দাঁতের ফাঁক দিয়ে হাওয়া বের হওয়ার যে শব্দ। **ফকরা** = ভিখারি, ফকির-ফকরা। **ফকির, ফকীর** = সংসারত্যাগী, মুসলমান ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী বা সাধু পুরুষ, মরমি সাধক, নিঃস্ব, দরিদ্র, সর্বহারা। **ফকিরি, ফকীরী** = সন্ন্যাসবৃত্তি, ফকির বা সাধুদের বৃত্তি। **ফিকির** = কার্যোদ্ধারের উপায় চিন্তা, উপায়, ব্যবস্থা, কৌশল, চেষ্টা, ফন্দি, মতলব। (ব্য.ব.অ.ঢা)। **ফকর** = তত্ত্বসারের গৌরব। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** জ্ঞানের সারাংশ অর্জন করা কিংবা মলাংশ অর্জন করা, **ফক** শব্দের ভিতরে এই দুরকম ক্রিয়াই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং **ফ** করে যে, সে **ফক্**-কারী **ফকর**-ধারী **ফকির** বা তত্ত্বজ্ঞানী হতে পারে; আবার **ফক্**-কারী **ফক্ক**-ধারী **ফক্কড়** বা শঠ-প্রতারকও হতে পারে। **দক্ষযজ্ঞ** কাণ্ডের পর ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম তত্ত্বজ্ঞানী মানুষেরা **যতিধর্ম** গ্রহণ করে 'যোগী-সন্ন্যাসী' হয়ে যান; ঠিক যেন বিষয়বিরাগী রাজা স্বয়ং সিংহাসন প্রাসাদ ইত্যাদি সব ত্যাগ করে চলেছেন পথে পথে, জনসাধারণ এসে তাঁর পদতলে আপন আপন প্রিয় বস্তু নিবেদন করছে। কারণ, তখনকার মানুষ জানতেন, এঁরাই সর্বপ্রকারের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের প্রকৃত অধিকারী, অথচ এঁরাই সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে নেমেছেন। এই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সন্ন্যাসী-ভিখারি বা **ফকির**-এর আদি চেহারা ও চরিত্র। ...

যাই হোক, উপরোক্ত শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে এসেছে বলে দাবি করা হয়। সে দাবি সম্পূর্ণ অমূলক নয়, কিন্তু একথাও অমূলক নয় যে, বাংলায় সমজাতীয় শব্দ পাঠান-মোগলের আসার আগেই কমবেশি উদ্ভূত হয়ে গিয়েছিল। অন্যথায় **ফকফক, ফক্কড়, ফক্কিকার, ফাঁক, ফাঁকা, ফাঁকি, ফিক, ফিকে** ... প্রভৃতি বাংলা শব্দ আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতাম না। তবে একথাও মনে রাখা ভাল যে, ইতোমধ্যে অর্থেরও সামান্য হেরফের ঘটে গেছিল।

ফকর শব্দটির কথা ধরা যাক। এটি রয়েছে **ফকরা** ও **ফকির** শব্দের মূলে। লক্ষণীয় যে, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিতে যাকে 'ব্রহ্মগুণ' বলা হয়, **ফক্‌র্** শব্দটি প্রায় তার কাছাকাছি শব্দ। 'ব্রহ্মগুণী' যেমন যোগী হন, **ফকির**ও তেমনি 'বিষয়বিরাগী' সন্ন্যাসী। তাকে যেমন '**ব্রহ্মোত্তর**' ভূমি দেওয়া হয়, **ফকির**কেও তেমনি **ফকিরান** দেওয়া হত। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মণ যেমন মৌলবাদী হয়ে **দক্ষ** কুশলী বামুনে অধঃপতিত হয়ে একসময় **ব্রহ্মরাক্ষসে** পরিণত হয়, **ফকির**ও তেমনি মৌলবাদী হয়ে **ফিকির**-কারী 'ফক্কিকারি' ফক্কড়ে বা **ফকির-ফাকরা**য় পরিণত হয়ে যায়। মোটকথা আমাদের **শিব, ব্রহ্ম, দক্ষ, যোগী, সন্ন্যাসী** ... প্রভৃতির যে উত্তরাধিকার ছিল, **ফকর** ও তার সহোদর শব্দগুলির মাধ্যমে একই উত্তরাধিকার আরব ও পারস্যের পাঠানদেরও কমবেশি ছিল। তাঁদের আগমনে সেই উত্তরাধিকারের আমদানি ঘটে বাংলার মাটিতে, যে মাটি ইতোপূর্বেই **শিব** ... প্রভৃতির উত্তরাধিকারে সিক্ত ছিল। এমনকি ১৯৫০-৬০ সালেও বাংলার মুসলমান সমাজে **ফকির-মিশকিন**-এর প্রতি কী পরিমাণ ভক্তি বর্তমান ছিল, আজ তা আন্দাজ করাও কঠিন। এখন যে **ফকির-ফাকরা** নেহাতই 'ভিখারি' পদবাচ্য, তখন কিন্তু তা ছিল না। তাঁরা ছিলেন বিষয়বিরাগী সংসারভাবুক, মানুষকে তাঁরা সত্যের পথে চালিত করতেন। **যতিধর্ম** গ্রহণ করার পর **যোগেশ্বর শিব** যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, এই **ফকির**দেরও কমবেশি তদ্রূপ ভূমিকা ছিল। **ফক্‌র্** বা আবিষ্কৃত জ্ঞান ছিল তাঁদের গৌরবের অর্জন। পরবর্তীকালে **বুদ্ধ** যেমন **বুদ্ধু**তে পরিণত হয়ে যায়, **ফক্‌র্** তেমনি পরিণত হয় **ফক্কড়ি**তে। **৬.** ইংরেজি fuck, puck ... ইত্যাদি শব্দ।

ফক্কিকা (ফক্কড়, ফক্কা, ফক্কি, ফক্কিকার, ফক্কিকারি) : **১.** ✓ফক্ক্ + অক (খুল্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। **২. ফক্কা** = **ফক্ক**-*এর (ফক্ক্ করে যে, তার) আধার যে।* **ফক্কড়** = **ফক্ক**-*এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ফক্কি** = **ফক্ক** *গতিশীল যাহাতে।* **ফক্কিকা** = **ফক্কি** *করে যে, তাহার আধার।* **ফক্কিকার** = **ফক্কিকা** *রহে যাহাতে।* **ফক্কিকারি** = **ফক্কিকার** *গতিশীল যাহাতে।* **৩. ফক্কিকা** = অসদ্ব্যবহার, ফাঁকি, গ্রন্থ (টীকা), হেত্বাভাস। **ফক্কড় (ফোক্কড়)** = ফাঁকিদার, প্রতারক, শঠ। **ফক্কা (ফক্কি)** = শঠতা, ফাঁকি, অসার, শূন্য। **ফক্কিকার, ফক্কিকারি** = শঠতা, ফাঁকি। (ব.শ.)। **৪.** a wag অর্থে **ফক্কড়** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. ফক্ক** শব্দের এই সহোদর শব্দগুলি আমাদের বাংলাভাষীদের ইতিহাসের একটি বিশেষ মাত্রাকে সুস্পষ্টভাবে ধরে রেখেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে কালে কালে 'বুদ্ধ' হয়েছেন 'বুদ্ধু', 'শ্রীচৈতন্য' হয়েছেন 'ন্যাকা চৈতন' ... ইত্যাদি। অর্থাৎ, অর্জিত সত্যের গৌরব যেমন আমাদের আছে, তেমনি কালে কালে তার অতি অধঃপতনও ঘটেছে এবং তার বিরোধিতা করতে বাংলাভাষী একটুও দ্বিধা করেনি। এই নঞর্থক উত্তরাধিকার তারই প্রমাণ। একই নিয়মে উপরোক্ত শব্দগুলি সেভাবেই মন্দ-অর্থে ব্যবহৃত হত, **ফক্কড়, ফক্কড়ি** প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে সেটি আজও আমরা দেখতে পাই।

ফিক (ফিকফিক, ফিকা, ফিকে ফেঁক, ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি, ফেকাসে) : **২. ফিক** = **ফ**-*কে (সারাংশ বা অসারাংশ পৃথককারী ফনীকে) গতিশীল করে যে; ফেলে দেয় যে।* **ফিকফিক** = **ফিক**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; বেদনার বা হাসির ঝিলিক বারবার ছুঁড়ে দেয় যে।* **ফিকা** = **ফিক**-*এর আধার যে।* **ফিকে** = *যার সারাংশ*

***ফিক** করা হয়েছে বা ফেলে দেওয়া হয়েছে। **ফেঁক** = দিশাগ্রস্ত রহস্যময় **ফিক** থাকে যাহাতে। **ফেক** = দিশাগ্রস্ত **ফিক** থাকে যাহাতে। **ফেঁকড়া** = **ফেঁক**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে। **ফেঁকড়ি** = **ফেঁক**-এর গড়ান-উড়ান গতিশীল যাহাতে। **ফেকাসে** = **ফেকা**-র দিশাগ্রস্ত নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; যার সারাংশ ফেলে দেওয়া হয়েছে।* **৩. ফিক, ফিঁক, ফেঁক** = মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরার বেদনা, স্নায়বিক বেদন; হঠাৎ ঈষৎ হাস্যপ্রকাশ; বেগে প্রেরণ বা নিক্ষেপ, বেগে নিক্ষেপ করা বা ফেলা, ছোড়া। **ফিকফিক** = পুনঃ পুনঃ হঠাৎ হাস্যপ্রকাশ (ফিকফিকিয়ে হাসা = ফিকফিক করে হাসা)। **ফিকা, ফিকে** = নীরস, অযৌক্তিক, অসঙ্গত, বিবর্ণ, ম্লান, ফেঁকাসে, ময়লা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অনুজ্জ্বল, পাতলা, হালকা, জলো-রং। **ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি** = উপশাখা, ছোট ডাল, কোনো বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট গৌণ বিষয়। **ফেকাসে** = বিবর্ণ, আপাণ্ডুর, কান্তিহীন। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ব.শ. আমাদের জানিয়েছেন, সংস্কৃত 'স্ফিক' শব্দ থেকে **ফিক** শব্দটি এসেছে। আমরা দেখছি, এতে '**ফিকে**-দেওয়া' বা 'ফেলে-দেওয়া' ক্রিয়াটি সক্রিয় রয়েছে; তা তাকে আমাদের ভেদবাদী-বুদ্ধি বাংলা বা হিন্দি যাই বলুক। ব্যথার ঝিলিক ছুঁড়ে দেওয়া, সারাংশস্বরূপ রং ছুঁড়ে দেওয়া বা অন্য কিছু ছুঁড়ে দেওয়া, যাই হোক না কেন, সবই এই **ফিক** ও তার সহোদর শব্দগুলি ধারণ ক'রে প্রকাশ করছে। **৬.** সম্ভবত ইংরেজিতে এই '**ফিকে**-দেওয়া' কর্মটিই 'শব্দ ছুঁড়ে দেওয়া' অর্থে speak শব্দে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ফুঁ (ফুঁক, ফুঁকা, ফুক, ফুকর, ফুকা, ফুকার, ফোকর) : ২. ফু = *ফনী (পালনস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ফুক** = **ফু** কৃত যাহাতে। **ফুঁ** = **ফ**-এর (ফনীর বা পালনস্থিতের) রহস্যরূপ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **ফুঁক** = **ফুঁ** কৃত যাহাতে। **ফুঁকা** = **ফুঁক**-এর আধার যে। **ফুকর** = **ফুক** রহে যাহাতে। **ফুকা** = **ফুক**-এর আধার যে। **ফুকার** = **ফুকা** রহে যাহাতে। **ফোকর** = **ফুকর**-এর আধার যে; যে স্থানে **ফু করা** হয়।* **৩. ফুঁ, ফু** = মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ফুৎকার, তুচ্ছবাক্য; মুখ হইতে বেগে নির্গত বায়ুপ্রবাহ, মুখমারুত। **ফুঁক, ফুক (ফুঁকা, ফুকা)** = মুখ হইতে বেগে নির্গত বায়ুপ্রবাহ, মুখমারুত, ফুৎকারে বাদন; 'ফু ফু' শব্দ করা, ফুঁ দেওয়া, ফুঁ দিয়া বাজান। **ফুকর, ফুকার** = ফুৎকারবায়ুতে বাহির হওয়া, উচ্চ শব্দ করা, চেঁচান, রব করা, কূজন করা, ডাকা, উচ্চ সুর করা, ফোঁস ফোঁস করা, আর্ত্তরব করা, উচ্চস্বরে বলা, (বাদ্যে) বোলে উচ্চারণ করা, সম্বোধন করা; উচ্চ শব্দ, ভূষণধ্বনি, কূজন। **ফোকর (ফুকর)** = ছিদ্র। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বিশেষত গ্রামবাংলায়। **৫.** 'বামুন তিন রকম। অধিক বিদ্যা — কানে ফুঁ; অল্প বিদ্যা — শাঁখে ফুঁ; ন চ বিদ্যা — উনুনে ফুঁ।' এটি প্রবচনের মতো গ্রামবাংলায় আজও কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, শহরেও প্রবচনটির সঙ্গে কোনো কোনো 'সেকেলে'-বাংলাভাষী পরিচিত। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের বাংলা সাহিত্যেও এই প্রবচনটির দেখা মেলে। এর অর্থও সবাই জানেন — অতিবিদ্বান ব্রাহ্মণ সাধারণত শাসকের (রাজার) পরামর্শদাতা হন; অল্পবিদ্বান ব্রাহ্মণ সাধারণত পূজা-আচ্চা করেন; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা অর্জন করেননি, তিনি সাধারণত রাঁধুনি বা পাচক-ঠাকুরের কাজ করেন।

আমাদের কথাটি কিন্তু ঐ **ফুঁ** নিয়ে। আমরা দেখছি, যেখানে যেখানে তিনি **ফুঁ** দেন, কানে-শাঁখে-উনুনে, তিন জায়গাতেই **ফোকর** বা **ফুটো** আছে; যদিও সেই **ফুটো** বা ছিদ্রগুলি আলাদা চরিত্রের। আর, **ফুঁ**-এর যে চন্দ্রবিন্দুরূপ বা 'রহস্যরূপ' সে-ও তিন জায়গাতে তিন রকম। কানের ছিদ্রে দেওয়া **ফুঁ**-তে থাকে **মন্ত্র**শক্তি (মন্ত্রণা); শাঁখের ফুটোতে দেওয়া **ফুঁ**-তে থাকে সুনিয়ন্ত্রিত বায়ুপ্রবাহকরণ-শক্তি (সবাই শাঁখ বাজাতে পারে না); আর উনুনের ফুটোতে দেওয়া **ফুঁ**-তে থাকে অনিয়ন্ত্রিত বায়ুপ্রবাহের **ফুৎকার**-মাত্র। তার মানে, **ফুঁ** দিতে গেলে নানারকম শক্তিরূপিণীকে লাগে, তাদের নানারকমের **ফোকর** লাগে, এবং সর্বোপরি নানারকম **ফুঁ**-দাতার প্রয়োজন হয়। তার মানে, ছিদ্র যদি একশো রকম হয়, একশো রকম **ফুঁ**-দাতা ও তাদের একশো রকম শক্তির প্রয়োজন পড়ে। দ্র. **ঝাড়ফুঁক**, **পবন**। স্বভাবতই, এই যে নানা স্থানে যথাবিহিতভাবে **ফুঁ**-করণ, এর ধারণার এলাকা বেশ ব্যাপ্ত। কত ব্যাপ্ত, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ইংরেজি fuck (**ফুক**, ইংরেজ উচ্চারণ করেন 'ফাক্') শব্দ থেকে। সবাই জানেন fucker-এর **ফু**-করণে নরের বীর্য লিঙ্গের মাধ্যমে নিষিক্ত হয় নারীর যোনির ছিদ্রে। ... প্রকৃতির পরিকল্পনা সফল হয়, জীবের বংশবিস্তার চলতে থাকে।

ফুঁ-এর সঙ্গে **ফু**-এর গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। **ফু**-তে চন্দ্রবিন্দু বাদ গেছে। এর বাস্তবায়িত রূপ এরকম — আপনি বাঁশের বাঁশিতে **ফুঁ** দেবেন বলে সেটি মুখে ঠেকালেন, ঠোঁট দুটি **ফুঁ** দিতে হলে যেরকম করতে হয় সেরকম করলেন, কিন্তু মুখের ভেতর থেকে বায়ুর প্রবাহ বাঁশির ছিদ্রের ভিতরে ছুঁড়লেন না। ফলে শক্তিরূপিণীর রহস্যরূপটির বা চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ হল না। কিন্তু তার আগের যে ক্রিয়া — একটা ইচ্ছা ঠোঁটের খানিকটা ফুলে ওঠায় পরিণত হয়েছে, সেই ক্রিয়াটিকেই **ফু** বলে। দ্র. **ফুল**। **৬.** ইংরেজি funk, fuck ... ইত্যাদি।

ফল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অফল, অফলন্ত, অফলপ্রেপ্সু, অফলা, আফলন্ত, আফলা, আফলোদয়, কর্ম্মফল, প্রতিফল, ফল্, ফল, ফল(লু)ই, ফলক, ফলকর, ফলকরা, ফলকাম, ফলকী, ফলকোশ, ফলখণ্ডন, ফলগছানব্রত, ফলগ্রহ, ফলগ্রাহী, ফলঙ্গ, ফলতঃ, ফলত্রিক, ফলদ, ফলন, ফলনির্বৃত্তি, ফলনিষ্পত্তি, ফলন্ত, ফলপরিণতি, ফলপাক, ফলপাকড়, ফলপাকান্ত, ফলপাদপ, ফলপুর, ফলপ্রদ, ফলবান, ফলবিক্রয়ী, ফলভাগী, ফলযোগ, ফলশ্রুতি, ফলসা, ফলসিদ্ধি, ফলা, ফলাও, ফলাগম, ফলান, ফলানা, ফলানুবন্ধ, ফলানুমেয়, ফলাফল, ফলার, ফলারে, ফলাশন, ফলাশী, ফলাসক্ত, ফলাসঙ্গ, ফলাসব, ফলাহত, ফলাহার, ফলাহারে, ফলি, ফলিকা, ফলিত, ফলিতা, ফলিন, ফলিনী, ফলী, ফলীকরণ, ফলীকার, ফলেগ্রহি, ফলোদয়, ফলোদ্ভব, ফলোপজীবী, ফল্গু, ফল্গুন, ফল্গুনী, ফল্গুবলগন, ফল্গুৎসব, ফাগ, ফাগু, ফাগুয়া, ফাগুণ(ন), ফাল, ফালকৃষ্ট, ফালত (ফেলত), ফালসা, ফা(ফ্যা)লসানি, ফালা,

ফালাটী, ফালি, ফাল্গুন, ফাল্গুনি, ফাল্গুনিক, ফাল্গুনী, ফেল (দ্র.স্ফাল্, fail, fell), ফেল, ফেলত, ফেলনা, ফেলফেল (ফ্যালফ্যাল), ফেলা, ফেলাফেলি, ফেলি, ফ্যালোয়া, সফল, সাফল্য, সুফল, হেলাফেলা। **ফল্** = পালনস্থিতের লালন-লয়ন। **ফল** = পালনস্থিতের লালন-লয়ন যাহাতে।

ফল : ১. ✓ফল্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ফনীর (পালনস্থিতের) লালন-লয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, পালনস্থিত যাহাতে লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয়।* / যাহা হেতু কৃত (হেতুর কারণে কৃত হয়), (যেমন অধি-শ্রয়ণাদিহেতু 'পাক' ফল); (গণিতে) যোগবিয়োগাদি হইতে যে সংখ্যাকে পাওয়া যায়। (ব.শ)। ৩. **ফল** = বৃক্ষাদির শস্য, বীজ, জাতীফল, ত্রিফলা, কক্কোল, স্ত্রীরজঃ, পরিণাম, কার্য্য, উদ্দেশ্য, অপত্য, মোক্ষ, পুণ্য, লাভ, বৃদ্ধি, গণনাকৃত সিদ্ধান্ত, ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যবিস্তারের পূরণাঙ্ক বা কালি, শুষ্ক, ত্রৈরাশিকের দ্বিতীয় রাশি, বৃষণ, মুষ্ক, পাশকস্থ বিন্দু ...; ফলযুক্ত হওয়া, কার্য্যে পরিণত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, দীপ্তি পাওয়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. সত্তার ভিতরে 'পালনস্থিতের লালন-লয়ন'-এর কারণে, তার কিছু অংশ সত্তা থেকে 'মলত্যাগ'-এর মতো উদ্গত বা নির্গত হয়; এই নির্গত অংশটিকে **ফল** বলে। স্বভাবতই এর প্রয়োগের এলাকা সুবিশাল। গাছের **ফল**, যা কিনা গাছ থেকে উদ্গত হয়ে বেরিয়ে আসে, সেই **ফল** থেকে শুরু করে অর্থটি কোথায় পৌঁছেছে, নিম্নে এক এক করে আমরা সেই দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা করব।

'কর্ম করে যাও, ফলের আশা কোরো না' — এই বাক্য আমরা বাংলাভাষীরা আমাদের শৈশব থেকে শুনে শুনে বড় হয়ে থাকি। এই **ফল** যে fruit বা 'গাছের ফল' নয়, 'কর্ম্মফল', সেকথা আমরা সবাই জানি। 'শৃগাল আঙুর **ফল** পাড়িতে বি**ফল** হইল' — এই বাক্যে দুরকম **ফল**-এর কথা একবাক্যে বললেও তারা যে এক নয়, একটি **দৃশ্য-ফল** এবং অপরটি **অদৃশ্য-ফল**, সেকথা সকল বাংলাভাষী অনায়াসে বুঝতে পারেন। কার্যত দৃশ্য **ফল**-এর (fruit-এর) চেয়ে আমাদের ভাষায় ও সংস্কৃতিতে অদৃশ্য **ফল**-এর ক্রিয়াকলাপ বহুগুণ বেশি। যতদূর বোঝা যায়, গাছের **ফল**কে বোঝাতে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা **ফল** শব্দের সৃষ্টিই করেননি, করেছিলেন আমাদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা অদৃশ্য **ফল**গুলিকে বোঝাতে। গাছের **ফল**ও সমস্বভাবের বলেই, তাকেও **ফল** নাম দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বাংলাভাষীরাও আমাদের কথাবার্তায় **ফল** শব্দকে অনায়াসে দুভাবেই ব্যবহার করে থাকি, 'সিদ্ধহস্ত' ও 'সিদ্ধডিম'-এর মতো; এবং কখনোই গুলিয়ে ফেলি না। গাছের **ফল**, ভোটের **ফল** যে এক **ফল** হয়েও আলাদা, একজনকে দেখা যায় অন্যজনকে দেখা যায় না, একথা সব বাংলাভাষীই জানেন। এখন প্রশ্ন হল, অদৃশ্য **ফল**গুলির স্বরূপ কী?

ডিমে **তা** দিলে, তার থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে; আর, **তা** না দিলে ডিমটি পচে যায়। কিন্তু উপলখণ্ডে (gravel-এ) **তা** দিলে তার থেকে বাচ্চা বেরোয় না। এর থেকে তিনটি ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যায় — ক) বস্তুর বিকাশের নিজস্ব একটি গতিপথ রয়েছে; খ) বাইরের তাড়ায় যার ভেতরে সাড়া জাগে, সেরকম বস্তু তার 'তাড়া-সাড়া' অনুযায়ী গতিপথ বদল করে থাকে; এবং গ) সব বস্তু একই প্রকারের তাড়ায় একইরকম সাড়া দেয় না, তাদের প্রত্যেকের বিকাশের গতিপথই কেবল আলাদা নয়, প্রত্যেকের 'তাড়া-সাড়া'ও আলাদা চরিত্রের।

তার মানে, প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব **প্রকৃতি** বা **স্ব**ভাব থাকে, এবং আমরা যখন কোনো বস্তুকে দেখি, তখন তাকে তার নিজস্ব স্বভাবের বিকাশের গতিপথের একটি বিশেষ বিন্দুতেই তাকে দেখি। কোনো বস্তুকে কখনোই তার নিজস্ব গতিপথ থেকে পৃথক করে দেখতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বস্তুর অবস্থানের সেই বিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দুতে পৌঁছনোর তার নিজস্ব একটি গতিও (speed) থাকে। তবে, বাইরের থেকে যথাযোগ্য **তা** দিলে বস্তুটির গতি ও গতিপথ দুইই নির্ধারিত পথে বদলে যেতে পারে। সে তখন মোড় নেয়, রাস্তার মোড়মাথায় আমরা যেমন দিকবদল করে থাকি সেইরকম। যতদূর বোঝা যায়, এইভাবে 'বাইরের তাড়ায় যার ভেতরে সাড়া জাগে' সে-বস্তু বাইরের তাড়ায় তার মোড়বদল-করা-পথের শেষে পৌঁছলে, তাকে বলা হয় **ফল** — '**ফ**-করণ বা পালনস্থিত-করণ লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।' এই কারণে, ডিমে **তা** দিয়ে যে বাচ্চা বেরোয়, সেটিই ডিমের পরিণাম বা **ফল**। **তা** না দিলে ডিমটি তার স্বাভাবিক পথের সোজা রাস্তাটি ধরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন তাকে আমরা বলি 'ডিমটি পচে গেছে'। এও ডিমের স্বাভাবিক বিকাশের পরিণাম বটে, তবে তাকে সাধারণত **ফল** বলা হয় না। বীজ থেকে জাত যে গাছ তার পরবর্তী বীজের জন্ম দিতে পারে না, তাকে সেকারণেই বলা হয় **নিষ্ফলা**। তার মানে, **প্রকৃতি**র স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিটি বস্তুর বিকাশের একাধিক গতিপথ রয়েছে। একটি পথ মোড়মাথায় দিকবদল করে পরবর্তী পরিণাম বা **ফল**-এর দিকে হাঁটা দেয়; সেখান থেকে পুনরায় দিকবদল করে পরবর্তী **ফল**-এর দিকে হাঁটা দেয়। এইভাবে বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে বহু বীজ, পুনরায় বহু বীজ থেকে বহু গাছ এবং তার থেকে বহু বহু বীজ ... কিংবা ডিম-পাখি-বহুডিম-বহুপাখি-বহুবহুডিম ... এই পথ বস্তুর নিজস্ব বিকাশকে বহুদূর নিয়ে যেতে থাকে। বস্তুর নব নব অধ্যায়ে উত্তরণের, উত্তীর্ণ হওয়ার, উত্তরোত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে চলার এবম্প্রকার গতিপথকে আমরা 'উত্তরাপথ' নাম দিতে পারি। 'উত্তরাপথ'-এর পথিকমাত্রেই মোড়মাথায় পথবদলের জন্য যা দাবি করে, তাকেই বলা হয় **ফ**-করণ। এই **ফ**-করণ না পেলে সেই উত্তরাপথ ধরে কোনো বস্তুই এগোতে পারে না। (আর্যাবর্তকে যে 'উত্তরাপথ' বলা হত, তার পিছনেও এরূপ উত্তরণের ব্যাপার ছিল বলেই মনে হয়।)

আর একটি পথ মোড়মাথায় দিকবদল না করে সোজা গিয়ে শেষ পরিণামে বা পচনে কিংবা নাশ হওয়াতে পৌঁছে যায়। একে আমরা 'তরাপথ' নাম দিতে পারি। কানাগলিতে পৌঁছে যাওয়ার এই সোজা পথটি ধরে এগোনোর জন্য বস্তুকে আধেয়রূপে পালনের প্রয়োজন পড়ে না; অর্থাৎ **ফ**-করণের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এই পথের শেষ পরিণামকে **ফল** বলা যায় না। অর্থাৎ, বস্তুর বিকাশের 'উত্তরাপথ'-এ প্রয়োজনীয় 'পালনস্থিতি' দিয়ে যে পরিণতিতে পৌঁছনো

যায়, তাকেই বস্তুটির **ফল** বলে। তার মানে সকল পরিণামই **প্রকৃত** পরিণাম বটে, কিন্তু সকল পরিণামই **ফল** নয়। তরাপথের পথিক যে 'স্বাভাবিক পরিণাম'-এ পৌঁছায়, তাকে **ফল** বলা হয় না; উত্তরাপথের পথিক যে 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম'-এ পৌঁছায়, কেবলমাত্র তাকেই **ফল** বলা হয়। ...

ফল-এর ভেতরে ইত্যাকার অর্থ থাকায়, শব্দটি বহু অর্থবাচক এবং বহুল ব্যবহৃত। সেই ব্যবহারের মধ্যে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে লক্ষণীয়, তা হল 'গাছের ফল' বা fruit বোঝাতে **ফল** শব্দের যত ব্যবহার হয় তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি ব্যবহৃত হয় 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম' বোঝাতে। সাধারণ বাংলাভাষী দুরকম **ফল**কেই একই সঙ্গে কত অনায়াসে প্রয়োগ করেন তার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'তার আমগাছ **ফল**বতী হয়েছে', বা 'তার প্রচেষ্টা **ফল**বতী হয়েছে' — এই দুটো **ফল** যে দুরকম অর্থ ধারণ করে, বাংলাভাষী মাত্রেই তা অনায়াসে বুঝতেও পারেন, প্রয়োগও করতে পারেন। ইংরেজির প্রচণ্ড প্রভাবও **ফল** শব্দের এই গৌরবকে নষ্ট করতে পারেনি, **ফল**কে শুধুমাত্র fruit-এ পরিণত করতে পারেনি। বরং '**ফল**বতী প্রচেষ্টা'র **ফল**ই আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে কর্মফল, প্রতিফল, ফলতঃ, ফলাফল, সফল, বিফল, নিষ্ফল ... ইত্যাদি অজস্র শব্দে। কত শব্দে, উপরে প্রদত্ত **ফল** ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দগুলির তালিকাই তার প্রমাণ। ব.শ. উদাহরণ দিয়েছেন — **ফলিল** নন্দীর শাপ, **ফলিল** প্রমাদ, **ফলিবে** স্বপন, **ফলে** আথান্তর ... ইত্যাদি অজস্র। নিম্নে আমরা সেগুলির মধ্যে কয়েকটি শব্দকে ব্যাখ্যা সহ উপস্থাপন করব।

৬. ইংরেজি fall, befall ... প্রভৃতি শব্দের বিশেষত্ব হল, এগুলি **ফল** শব্দের 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম' অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাংলায় 'আমার কথা **ফলল** তো!' জাতীয় বাক্য যখন বলি, তখন দেখা যায়, ইংরেজি fall, befall শব্দগুলির ব্যবহার সেই অর্থটিকে হুবহু ধরতে ও প্রকাশ করতে পারছে। গাছের **ফল**ও যে 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম', এই ধারণাটি ইংরেজির উত্তরাধিকারে নেই বটে কিন্তু বাকি প্রায় সবক্ষেত্রেই আছে। এমনকি সেই উত্তীর্ণ পরিণামে ত্রুটি ঘটলে তা যে **ফল**-এর ত্রুটি, তাও ধরে রেখেছে ইংরেজির fault শব্দ।

ফলক (ফলই, ফলুই, ফলকী) : **১.** ফল্ + ক (কন্) - স্বার্থে। (ব.শ.)। **২.** ***ফলক*** = ***ফল*** *কৃত যাহাতে।* ***ফলকী (ফলই, ফলুই)*** = ***ফলক****-এর গতিশীল আধার যে।* / **ফলকী** = ফলকের মতো যে। (ব.শ.)। **৩. ফলক** = ফল, পরিণাম, লাভ, বাণাগ্র, কাষ্ঠশিলাদি-পট্ট, পাটা, লেখনার্থ কাষ্ঠাদি-পট্ট, রজকপট্ট, ধোপার পাট, পট্টবৎ বস্তুমাত্র। **ফলই, ফলুই** = ফলকী, মৎস্যবিশেষ। **ফলকী** = চর্ম্মী, পট্টযুক্ত, ফলকবান, ফলকাকার মৎস্য, ফলুই। (ব.শ.)। **৪. ফলকী** অপ্রচলিত, বাকি তিনটি শব্দ কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** নিয়মানুসারে '**ফল** করে যে', কিংবা '**ফল** কৃত যাহাতে' তাকেই **ফলক** বলা যায় এবং এই **ফল** সম্পূর্ণতই অদৃশ্য-**ফল**, আদৌ fruit বা গাছের ফল নয়। সেকারণেই দেখা যাচ্ছে, উপরে **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থগুলির সঙ্গে fruit-এর কোনো সম্পর্কই নেই। এগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনোভাবে **ফ**-করণ করে থাকে বলেই তাদের **ফলক** বলে। ধোপার পাটা বস্ত্রকে তার উত্তীর্ণ পরিণাম-এর দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে বলেই তাকে **ফলক** বলে; বক্তব্যকে তার মোড়মাথায় পথবদল করে লেখায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশিত থাকতে সহায়তা করে বলেই 'লেখনার্থ কাষ্ঠাদি পট্ট'কে **ফলক** বলে ... ইত্যাদি।

তবে **ফলই** মাছকে কেন **ফলই** বা **ফলকী** বলে, তা ভাবনার বিষয়। **ফল** ক্রিয়াকে মাছটির মধ্যে সক্রিয় দেখা যায় না। অতএব একমাত্র **ফলক**-এর বা পাটার মতো দেখতে এই সাদৃশ্যের কারণে তাকে **ফলকী** বলা যেতে পারে। **ফলই** বা **ফলুই** তারই বিবর্তিত রূপ। ব.শ. কিন্তু শব্দটির প্রথম অর্থই দিয়েছেন 'চর্ম্মী', অর্থাৎ 'চর্ম্ম-এর সক্রিয় আধার যে'। চামড়া তো বহু মাছেরই থাকে, তার মধ্যে শুধুমাত্র **ফলই** মাছকে 'চর্ম্মী' বলে কেন? আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন কেবলমাত্র ভাল রাঁধুনীরাই। তাঁদের মতে একমাত্র **ফলই** মাছেরই যথার্থ কোপ্তা রান্না করা যায় তার বিশেষ ধরনের চামড়ার কারণে। কেননা, এই মাছকে শিলনোড়ায় ঠোকাঠুকি করলে, তার সমস্ত মাংস ও কাঁটা গলার কাছের কাটা অংশ থেকে বেরিয়ে চলে আসে এবং গোটা চামড়াটাই অক্ষত থেকে যায়। তখন সেই কাঁটামাংসাদি বেটে নিয়ে তাতে মশলাদি দিয়ে সেই অক্ষত চামড়ায় সবটা ভরে দিয়ে মাছটিকে তার আগের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং তারপর সেই মাছ ভেজে নিয়ে কোপ্তা রান্না করা হয়; যেন আপনি গোটা **ফলুই** মাছটাই খাচ্ছেন, কিন্তু ভেতরে একটিও কাঁটা নেই। অন্য কোনো মাছের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায় না; করতে গেলে চামড়া ফেটে গিয়ে ছত্রখান হয়ে যাবে। একমাত্র **ফলুই** মাছের চামড়ার এই বিশেষত্বের কারণে তার ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়ার রান্না প্রয়োগ করা যায়। হয়তো সেকারণেই তাকে **চর্ম্মী** বলা হয়ে থাকতে পারে।

ফলকাম, ফলকামনা : **২.** ***ফলের*** *কামনা থাকে যাহাতে।* **৩.** কর্ম্মফল আসঙ্গ। (ব.শ.)। **৫.** এই **ফল** নিঃসন্দেহে গাছের দৃশ্য **ফল** মাত্র নয়, অদৃশ্য **ফল**ই এই শব্দের প্রধান উদ্দিষ্ট।

ফলখণ্ডন : **২.** ***ফল****-প্রাপ্তির খণ্ডন থাকে যাহাতে।* **৩.** পরিণাম পরিহার। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** পূর্বকথিত উত্তরাপথের পথিক যে বস্তু, তার পরিণামের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এককালে ভারতীয় উপমহাদেশে নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণে লোকে কর্মফল আশা করত না, কর্ম করেও তার ফলের প্রতি কামনা প্রকাশ করত না, কর্মফলের পরিণাম পরিহার করে চলত। একেই বলা হয় **ফলখণ্ডন**।

ফলতঃ : **২.** ***ফল*** *তারিত হয়ে নিঃশেষিত যাহাতে।* **৩.** ফলে, পরিণামে, বস্তুত। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** এই **ফল**যুক্ত শব্দটি সম্পূর্ণতই অদৃশ্য-**ফল**বাচক। প্রধানত 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম'ই (দ্র. **ফল**) এই **ফলতঃ** শব্দের উদ্দিষ্ট, যদিও বহু ক্ষেত্রে অনুত্তীর্ণ পরিণামের ক্ষেত্রেও শব্দটির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একে বলে 'as a result'।

ফলদ, ফলন, ফলন্ত : **২.** *ফলদ* = **ফল** *দেয় করে যে বা দেন যিনি।* **ফলন** = **ফল** *অন (on) থাকে যাহাতে।* **ফলন্ত** = **ফলন** *তারিত যাহাতে।* **৩. ফলদ** = ফলদাতা, ফলোৎপাদক (বৃক্ষ), কর্ম্মফলদাতা, অভীষ্টার্থদাত। **ফলন** = ফলোৎপত্তি, কর্ম্মপরিণাম। **ফলন্ত** = ফলবান, অবন্ধ্য (গাছ)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলি দৃশ্য-ফলকে যেমন বোঝায়, তেমনি একইভাবে অদৃশ্য-ফলসমূহকেও বোঝায়। এবং আমরা বাংলাভাষীরা অনায়াসেই শব্দগুলিকে উভয়ভাবে ব্যবহার করে থাকি।

ফলশ্রুতি : **২.** *কর্ম্মফলের কথা শ্রুত হওয়া গতিশীল থাকে যাহাতে।* **৩.** কর্ম্মফলশ্রবণ, বৈদিককর্ম্মের ফলপ্রতিপাদনার্থ শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে এবং ভুল অর্থে প্রচলিত। **৫.** এই বোকামিটি আজকাল হামেশাই হয়ে থাকে। আমরা যখন বৈদিক যুগের মানুষদের সম্পর্কে, তাঁদের আচার আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলি, তখন প্রায়শই একথা ভুলে যাই, তাঁরাও মানুষ ছিলেন, তাঁদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ-বুদ্ধি আমাদের মতোই ছিল। তাই যদি হয়, তাহলে তাঁরাও তো আমাদের মতো প্রতিটি কর্মের **পর্য্যায়** বিষয়ে ভাবতেন এবং কথাবার্তা বলতেন — এমন হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। সেই কারণে তাঁরাও নিশ্চয় সমস্ত কাজকর্মের ফলাফল কী কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতেন, সাপের মন্ত্রের মতো অর্থহীন মন্ত্র আওড়াতেন না। **কর্ম্ম**ফল সম্পর্কে তাঁদের যে অভিজ্ঞতাবলী, সেগুলি তাঁরাও উত্তরসূরিদের বলে যেতেন, লিখে যেতেন, উপদেশ দিয়ে যেতেন। তাকেই বলা হত **ফলশ্রুতি**। এটি সম্পূর্ণতই 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম' বাচক শব্দ। অর্থাৎ, এখানে যে **ফল** শব্দটি রয়েছে, তার সঙ্গে fruit-ফলের কোনো সম্পর্ক নেই।

ফলসা : **৫.** কেন যে **ফলসা** গাছকে **ফলসা** বলা হয়, এখনও তা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। আমরা একটি সম্ভাবনার কথা ভেবেছি — এর **ফল**টুকুই সার, কিংবা বলা ভাল, বীজটুকুই সার; অর্থাৎ, এর বীজের গায়ে অতি পাতলা একটি আস্তরণ রয়েছে, সেই আস্তরণটুকুই ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় খাদ্য। তার কারণ এর অতি সুস্বাদু টকমিষ্টি আস্বাদ ও মনোহর গন্ধ। কিন্তু তার পরিমাণ এতই কম যে, এক মুঠো (১০০ গ্রাম) **ফলসা** থেকে খাদ্যরূপে যেটুকু ভোক্তার পেটে যায়, তার পরিমাণ ৫ গ্রামও হবে কি না সন্দেহ। বলা ভাল, **ফল** নামটাই তার সার ব'লে, কিংবা **ফল** হওয়ার false ইঙ্গিত দেয় বলেই একে **ফলসা** বলে। ... **৬.** ইংরেজি false।

ফলা [ফলান, ফলাও, ফলিত, ফলিতা, ফালত, ফেল, ফেলা, ফেলত, ফেলতো, ফেলনা, ফেলফেল, (ফ্যালফ্যাল)] : **১. ফলিত** = ✓ফল্ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে; ফল + ইত (ইতচ্)। (ব.শ.)। **২.** *ফলা* = **ফল**-*এর আধার যে।* **ফলান** = **ফলা** *অন (on) যাহাতে।* **ফলাও** = **ফলা** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আধারিত যাহাতে।* **ফলিত** = **ফল** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* **ফলিতা** = **ফলিত**-*এর আধার যে।* **ফালত** = **ফল**-*জাত তারিত যাহাতে।* **ফেল** = *দিশাগ্রস্ত* **ফল** *যাহাতে।* **ফেলা** = **ফেল**-*এর আধার যে।* **ফেলত** = **ফেল** *(ফেলা) তারিত যাহাতে।* **ফেলতো** = **ফেলত**-*এর সার্ব্বিক আধার যে।* **ফেলনা** = **ফেল** *অন (on) থাকে যাহাতে তাহার আধার।* **ফেলফেল** = **ফেল**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ফ্যালফ্যাল** = **ফ্যাল**-*এর (***ফ**-*করণ থাকে যাহাতে তাহার আধার লয়প্রাপ্ত যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **৩. ফলা** = ঢাল, বাণের আগা, অস্ত্রের পাতা (blade), ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত যকারাদি ব্যঞ্জনের ও স্বরের আকৃতিবিশেষ — যেমন, ক্য ক্র র্ক ক্ল ক্ব কৃ ক্ণ ক্ন ক্ম কৄ ক্ঌ। [দ্বাদশ ফলা — 'ক্য' প্রভৃতি দশ এবং ঋ ঌ দুই। আঠার ফলা — কা কি ইত্যাদি ক-কারে যুক্ত স্বর হেতু এগার এবং ক্য ক্র র্ক ক্ল ক্ব ক্ন ক্ম এই সাত; পাঠশালের ফলায় 'ক্ণ' ছিল না।], ফলিত হওয়া, ফলন্ত (গাছ), উৎপন্ন করা বা ধরান, কার্য্যে পরিণত করা, প্রতিফলিত করা, প্রকাশ করা, বিস্তারিত করা। **ফলান** = উৎপন্ন করা ... ইত্যাদি, পরিস্ফুটীকৃত, দন্তার্থ জারি করা। **ফলাও** = প্রসার, বিস্তার, বাড়ান। **ফলিত** = জাতফল, সফলীভূত, চরিতার্থ, তাৎপর্য্যগত। **ফলিতা** = রজঃস্বলা নারী। **ফেল, ফেলা** = কৃষ্ণের ভুক্তশেষ; নিক্ষেপ করা, ছোঁড়া (to throw), অভিবর্ষণ করা, ছড়ান, ত্যাগ করা, পাতিত করা ...। **ফালত, ফেলত** = অতিরিক্ত, অধিক, অনাবশ্যক, বাজে। **ফেলতো** = অসার, ব্যর্থ। **ফেলনা** = ফেলার যোগ্য, পরিত্যাজ্য, হেয়, অগ্রাহ্য। **ফেলফেল (ফ্যালফ্যাল)** = বিহ্বলভাব, হতবুদ্ধিভাব, বিমূঢ়তা। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত থাকলেও **ফলিতা** শব্দটি অপ্রচলিত। তবে **ফলিত** শব্দটি অ্যাকাডেমিতে ইংরেজি applied শব্দের প্রতিশব্দ রূপে এখন প্রতীকী রূপেও প্রচলিত হয়েছে। **৫. ফলা** কথাটিকে বুঝবার সময় আমরা প্রায়শই একটি মারাত্মক ভুল করে থাকি। অথচ **করা** শব্দের বেলায় সে ভুলের সম্ভাবনা থাকলেও আমরা তেমন ভুল করি না। **কর**-এর আধারকে **করা** বলে বটে, কিন্তু এই **কর** যে হাত নয়, **করণ** ক্রিয়া, সেকথা আমরা পরিষ্কার বুঝি। একই নিয়মে **ফল**-এর আধারকে **ফলা** বলে। কিন্তু এই **ফল** যে fruit-**ফল** নয়, **ফলন** ক্রিয়া, সেকথা আমরা বুঝতে পারি না। এমনকি **ফলন** ক্রিয়া বুঝলেও মনে করি fruit-**ফল** হয় যে ক্রিয়ায় এটি সেই **ফল** হওয়ার ক্রিয়া। এ যেন 'হাতের (= **কর**-এর) আধার যে', তাকে **করা** বলে — এইরকম ভুল। এই ভুল এতই মারাত্মক যে, **ফল** ও তার সহোদর শব্দগুলিকে বোঝার ক্ষেত্রে তা অর্থের একেবারে কানাগলিতে পৌঁছে দেয়। **কর** যেমন **কর্** ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপ যা কিনা হাতকে বোঝায়, **ফল**ও তেমনি **ফল্** ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপ যা কিনা fruit-**ফল**কে বোঝায়। হাতের সঙ্গে যেমন **কর্** ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক নেই, তেমনি fruit-**ফলের** সঙ্গে **ফল্** ক্রিয়ার সরাসরি কোনো সম্পর্কই নেই।

আসলে **ফল** ক্রিয়াটি হল সত্তার কোনো একটি দিক দিয়ে চিরে বা ফেটে বেরোনো (ভূমির উপরিতল চিরে বেরোনো, গাছের কিশলয়ের মুখ চিরে বেরোনো, কিংবা মলত্যাগের মতো পায়ু চিরে বেরোনো) সত্তারই কোনো বর্ধিত ও ত্যাজ্য অংশের বহির্গমন ক্রিয়া। সেই বিচারে ধান ফলা, গম ফলা, আম ফলা, জাম ফলা কিংবা ধান ফলান, আম ফলান এমনকি বিদ্যা ফলান, গায়ের জোর ফলান ... ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। এবং **ফ'লে** বা **ফলিয়া** যাহাতে

পরিণত হয়, তাকে **ফলিত** বলে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই **ফলা** কেমন করে লাঙলের **ফলা**, চাকুর **ফলা**, বাণের আগা ... কিংবা য-**ফলা**, ব-**ফলা** ... ইত্যাদি হয়, সেকথা জানা চাই।

আগেই আমরা দেখেছি, **ফল** শব্দে সত্তার কিছু অংশ 'মলত্যাগ'-এর মতো সত্তার থেকে উদ্‌গত বা নির্গত হয়। সেই নির্গত অংশটিই **ফল**। অতএব **ফলা** বা **ফলন** ক্রিয়া মানেই হল উদ্‌গত বা নির্গত হওয়া, অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া। তবে সেই **ফলন** ক্রিয়া বা **ফলা** যখন সত্তার পরিধির বাইরে নির্গত বা বহির্গত হয়, তখন পতিত হওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। সেই কারণে **ফল** মানে পড়ে যাওয়াও বটে; তবে কিনা সেই অর্থটি সরাসরি ধরে রেখেছে ইংরেজি তার fall, fail, fell ... ইত্যাদি শব্দে। বাংলাভাষায় **ফল**-এর এই 'পড়ে যাওয়া' অর্থটি ধরা আছে খানিকটা উহ্য হয়ে, খানিকটা **ফেলা**য় বা **ফেলে** দেওয়ায়। আমরা যখন বলি — আম ফলে, জাম ফলে ... ইত্যাদি, তখন **ফল**গুলি গাছ থেকে কেবল উদ্‌গত নির্গতই হয় না, পতিতও হয়। পতিত সেই **ফল**কে হাত পেতে না ধরে হাত সরিয়ে নিলে তাকে বলে **ফ্যালা**। অনবধানবশত সেরকম করে ফেলে যে, সে তখন যেভাবে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় **ফ্যালফ্যাল** করে তাকান। ...

ফল সাধারণত নিজে থেকেই **ফলিত** হয় বা পড়ে। কিন্তু সেরকম না প'ড়ে, কেউ যদি তাকে পাড়ে বা **ফলিত** করে, তখন তাকে বলে **ফেলা**। এই যে দিশাগ্রস্ত **ফেলন**, এ শুধু তেমন বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাকে আমাদের প্রয়োজন নেই, যে 'অতিরিক্ত, অসার, অনাবশ্যক, বাজে ...' ইত্যাদি। সেই কারণে যাকে **ফেলে** দেওয়া হয়, সে **ফালত, ফালতু, ফেলত, ফেলতো** কিংবা **ফেলনা** ... ইত্যাদি হতেই পারে। মোট কথা সত্তার থেকে নির্গত অংশ স্বভাবতই পতিত হয়, কখনো-বা তাকে পাতিতও করা হয়ে থাকে।

কিন্তু পতিত হতে না দিয়ে তাকে যদি পতনোন্মুখ অবস্থাতেই স্থির রূপে ধরে রাখা হয়, তখন সেও **ফলন**-এর আধারিত রূপ হয়ে যায় এবং তাকেও **ফলা** বলা হয়। এই **ফলা** স্বভাবতই সাদৃশ্যে 'বাণের আগা', 'অস্ত্রের পাতা' ... ইত্যাদি হতে পারে। মোট কথা, **করা** যেমন **কর**-এর 'ক্রিয়াবিশেষ্য', **ফলা** তেমনি **ফল**-এর 'ক্রিয়া-বিশেষ্য'। এই **ফলা** যখন 'নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে' চারিদিক থেকে দ্রষ্টার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তাকে **ফলাও** বলে। আবার এই **ফলা**-ই সাদৃশ্যে অস্ত্রের **ফলা**-ও বটে। ...

এবার আমরা বাংলাভাষার **শব্দশাস্ত্রের ফলা**-র ব্যাখ্যায় যাব। এ বিষয়টি অতি বিশাল; তাই আমরা এখানে সংক্ষেপে তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

ব.শ. সর্বাগ্রে ক-এ **য-ফলা**র বা '**ক্য**'-এর কথা বলেছেন, আমরাও তাই সর্বাগ্রে 'য'-**ফলা**র কথাতেই যাব। **য** বর্ণের অর্থ, আমরা জেনেছি, 'যায়ী' বা 'যায় যে'। এর মূলে রয়েছে 'যাওয়া' ক্রিয়া। আপনি **পণ্**-এর শেষে **য-ফলা** দিলেন, হয়ে গেল **পণ্য**; মানে দাঁড়াল 'পণ যায় যাহার মাধ্যমে', অর্থাৎ 'পণ যায় যাহাতে' কিংবা 'পণ গিয়ে যার ভিতরে থাকে'। **পণ্য** শব্দের অর্থে আমরা আগেই দেখেছি, মানুষের কোটি কোটি রকমের **পণ**সমূহ বা লেনদেনের **প্রতিজ্ঞা**সমূহ যে-বস্তুর সাহায্যে যাতায়াত করছে বা বিনিময়ীকৃত হচ্ছে, তাকেই বলা হয় **পণ্য**। তার মানে, **পণ্**-এর সঙ্গে য-**ফলা** যোগ করে যে **পণ্য**কে পাওয়া যায়, সেটিই **পণ**-এর **ফলা**-যুক্ত রূপ বা **ফলিত** রূপ। অর্থাৎ, **পণ্**-কে **ফলান** হল এবং তার 'ফলস্বরূপ' সে পরিণত হল **পণ্য**-তে। এই সেই কারণ, যে-কারণে **পণ্**-এ 'য' যোগ করাকে বলা হয় **পণ্**-এ য-**ফলা** দেওয়া। তখন স্বভাবতই **পণ্** গিয়ে **পণ্য**-তে পরিণত হয়ে যায়। একইভাবে **বাক্** গিয়ে **বাক্য**-তে পরিণত হয়ে যায়। ... এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আর, এইরূপ ঘটনা কেবল সমাজবাস্তবেই ঘটে না, তার ছায়াস্বরূপ ভাষায় ও ভাষার শব্দেও ঘটে, উচ্চারণেও ঘটে। এখানেই রয়েছে সেই মহত্তম ব্যাপার, যার কারণে নেচারের বিজ্ঞানের সমান্তরালে ভাষার শব্দসৃজনের বিজ্ঞান ও মানুষের জিহ্বার শব্দোচ্চারণের বিজ্ঞান একই নিয়মে সমান্তরালভাবে কাজ করে থাকে। উচ্চারণের কলাকৌশলের বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে বলতে হয়, যা উচ্চারণ করা যায় না, তেমন শব্দ স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়নি, তেমন শব্দকথিত ক্রিয়াসমুদয় বাস্তবে ঘটানও যায় না। উল্টোভাবে বললে, এই নেচার-বাস্তবে যে ক্রিয়া ঘটে বা ঘটান যায়, কেবল তেমন ক্রিয়া ও ক্রিয়াধারীর আধার রূপে শব্দ সৃজন করা যায়, এবং তেমন শব্দ অবশ্যই উচ্চারণ করাও যায়। ...

আরও দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। **পণ্য**-এর মতো একইভাবে **কল**-এর **ফলিত** রূপ হল **কল্য**, **গম্**-এর **ফলিত** রূপ হল **গম্য** ... ইত্যাদি। তাই **ক-ল**-এ **য-ফলা** = **কল্য**, **গ-ম**-এ **য-ফলা** = **গম্য**। অর্থাৎ কিনা, **কল্** হল 'কারীর লালন্', সেই **কল্** থাকে যাহাতে, সেই হল **কল্য**। তার মানে, **কল্য** হল **কল্**-এর **ফলিত** রূপ। একইভাবে **গম্য** হল **গম্**-এর **ফলিত** রূপ। একই নিয়মে **পক্** বাহিত হয় যাহাতে তাকে বলে **পক্ব**। **পক্**-এর সঙ্গে **ব-ফলা** যুক্ত হয়ে তাকে **পক্ব**-তে পরিণত করেছে। তাই এ-ও **পক্**-এর **ফলিত** রূপ। ... মোট কথা যে কোনো শব্দের শেষে কোনো বিশেষ **ফলা** যোগ করে দিলে, শব্দটি তার সেই মতো **ফলিত** রূপে তারিত হয়ে যায়।

আমাদের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার অবলম্বন করে ব.শ. জানাচ্ছেন, বাংলাভাষায় **ফলা** মুখ্যত আঠারো প্রকার। যথা — **কা কি কী কু কূ কৃ কৢ** (ক + ৯) **কে কৈ কো কৌ** এই এগারো এবং **ক্য ক্র র্ক ক্ল ক্ব ক্ন ক্ম** এই সাত, মোট আঠারো। আমরা জানি, এগুলি বাদেও আরও কিছু **ফলা** রয়েছে, সেগুলি গৌণ **ফলা**; যথা — **কৄ** ... ইত্যাদি। আবার মুখ্য **ফলা**র মধ্যে কয়েকটি গৌণ **ফলা**য় অধঃপতিত হয়েছে, যথা — **কৢ**। ...

আজ আমরা এই **ফলা**র সমগ্র ব্যাপারটিই কমবেশি উদ্ধার করতে পারছি। আমরা দেখছি, জগতের সমস্ত ক্রিয়ার ছবি ধরা আছে বাংলাভাষার ব্যঞ্জনবর্ণে এবং সমস্ত ক্রিয়াকারীর ছবি ধরা আছে স্বরবর্ণে। সেই কারণে সমস্ত স্বরবর্ণই **ফলা** রূপে ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের প্রত্যেককে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ **ফলিত** স্বরূপে পৌঁছে দেয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের এভাবে যুক্ত হওয়াকে **কার** যুক্ত হওয়া বলে। যথা ক্-এ আ-কার = **কা**, খ্-এ আ-কার = **খা** ... ইত্যাদি, ক্-এ ই-কার = **কি**, খ্-এ ই-কার = **খি** ... ইত্যাদি। লেখার সময় এই আ-কার, ই-কার, উ-কার ...

ইত্যাদি যথাক্রমে - **া-কার**, **ি-কার**, **ু-কার** ... ইত্যাদি রূপে লিখিত হয়। যদিও এই **কার**গুলির সংখ্যা বর্তমানে মাত্র দশটি — **আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ**, অর্থাৎ যথাক্রমে -া ি- -ী -ু -ূ -ৃ ে- ৈ- ো ৌ, কার্যত অ-কারকে ধরে নিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় এগারো। কিন্তু বাংলাভাষায় অ-কার এতই সর্বময় যে, তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করাই হয় না। ব.শব্দকোষও অ-কার-এর উল্লেখ করেননি, তিনি উল্লেখ করেছেন ঌ-কারের এবং সেই ঌ-কার বর্তমান বাংলাভাষায় পরিত্যক্ত হয়েছে। ... এই **কার**-গুলি কেন **ফলা**-পদবাচ্য, এবার সে প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

আমরা দেখলাম, একটি ক্রিয়াকে (= ক্রিয়ার ধারক ধ্বনি বা বর্ণকে) তার **ফলিত** রূপে তারিত করে যে, তাকে **ফলা** বলে। **য-ফলা** তারিত রূপে (হেঁটে হেঁটে) নিয়ে যায় (**য**-বর্ণের অর্থ দ্র.); **ব-ফলা** তারিত রূপে বহন করে; **র-ফলা** তারিত রূপে রাখে; **ল-ফলা** তারিত রূপে লালন-লয়ন করে ... ইত্যাদি। কিন্তু **কার** সেরূপ করে না। সে ক্রিয়াটিকে কাজে পরিণত হওয়ার জন্য বা কৃত হওয়ার জন্য **করণ** দান করে, যেন জমিদারবাবুকে এগারো জন কর্মচারী দেওয়া হল, যাদের মাধ্যমে জমিদারবাবু তাঁর কাজ করিয়ে নেবেন। এর ফল কী হয়? **পক্** যেমন **ফলিত** রূপ পায় **পক্-বাহিত** হয়ে **পক্ব**-তে, তেমনি **পাক্** তার **ফলিত** রূপ পায় **পাক্-কৃত** হয়ে বা 'া'-**কার** যুক্ত হয়ে **পাকা**-তে। এখানে আমরা স্পষ্ট দেখছি, **পক্ব** (**ব-ফলা** যুক্ত) যেমন **পক্**-এর **ফলিত** রূপ, **পাকা**ও তেমনি (**া-কার** যুক্ত হয়ে) **পাক্**-এর **ফলিত** রূপ। ... এই সেই কারণ, যেকারণে আ-কার, ই-কার, উ-কার ... প্রভৃতি **কার**গুলিও **ফলা**-পদবাচ্য।

যেহেতু প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণই এক একটি ক্রিয়ার বাচক, তাদের সঙ্গে উপরোক্ত **ফলা**সমূহের যে কোনো একটি **ফলা** যোগ করে দিলে, বর্ণবাচিত ক্রিয়াটি তার **ফলিত** রূপে তারিত হয়ে যায়। সেই সুবাদে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই **ফলা**রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ারই কেবল যুক্ত হওয়ার বাস্তবতা থাকে। যেমন করণ ক্রিয়ার সঙ্গে (**ক্**-এর সঙ্গে) বা পালন ক্রিয়ার (**প্**-এর সঙ্গে) তরণ ক্রিয়ার (**ত**-এর) যোগ সম্ভব বলেই **ব্যক্ত** ও **ব্যাপ্ত** শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, আর তা লেখা যায়, উচ্চারণও করা যায়। কিন্তু গমন ক্রিয়ার সঙ্গে (**গ্**-এর সঙ্গে) তরণ ক্রিয়ার (**ত**-এর) **ফলা**রূপে যোগ সম্ভব নয় (কেননা গমন নিজেই তো একপ্রকার তরণ), তাই **গ্**-এ **ত-ফলা** যোগ করে লেখা যায় না, উচ্চারণও কষ্টকর। ...

আমরা পুনরায় একবার **ফলিত** বিষয়ে আসি। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এমনকি ১৯৪৭ সালের আগেও অনেকেই গভীরভাবে বাংলাভাষা জানতেন। তাঁরা Physics-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেন **পদার্থবিজ্ঞান**। তাঁরাই Applied Mathmetics-এর বাংলা করেন **ফলিত গণিত**। সন্দেহ নেই যে, এই **ফলিত**-র অর্থে দৃশ্য fruit-ফল নেই। রয়েছে **ফল** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে অর্থাৎ **ফলিত** হল 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম'।

কার ও **ফলা**র ধারণা মানুষের আদি অর্জন। ভাষার শব্দ সৃজনের ক্ষেত্রে মানুষের মানসলোকে যেসব প্রক্রিয়া চলে, তার প্রধান কাজটি চালায় এই ধারণা। জীবজগতে সত্তায় সত্তায় মিলিত হওয়ার মতো, সন্তান সৃজনের মতো, হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিংবা অক্ষমকে কাঁধে নিয়ে চলার মতো, গাছের ডালে কলম কাটার মতো ... ইত্যাদি যে সকল সৃজনকর্ম সদাসর্বদা চলছে, মানুষের মানসলোকে শব্দসৃজনেরও সেই একই নিয়ম। আদি যুগ থেকে মানুষ এই নিয়ম অনুসরণ করেই শব্দসৃজন করে আসছেন। বাংলাভাষার মহত্তম গৌরব এই যে, সেই অর্জনকে পুরুষানুক্রমে সে কেবল সম্পূর্ণভাবে ধরেই রাখেনি, তার সাধ্যমতো বিকাশসাধনও সে করেছে। ...

এই ক্ষেত্রে ইংরেজির জগতের দিকে তাকালে বিস্ময় জাগে। সন্দেহ নেই যে, তাঁরা **ফল**-এর উত্তরাধিকার ধরে রেখেছেন fall, fail, fell ইত্যাদি শব্দে। কিন্তু **কার** বা **ফলা**র সমগ্র উত্তরাধিকারটাই তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। তবুও এশীয় দেশগুলির ভাষায় **কার** ও **ফলা** কমবেশি রয়েছে, পাশ্চাত্যের ভাষাগুলি এই উত্তরাধিকারের ব্যাপারে প্রায় নিঃস্ব। তথ্যানুসারে, আদিভাষার উত্তরাধিকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে পেয়েছিলেন গ্রীক পণ্ডিতেরা, তবে **কার** ও **ফলা**র ধারণা তাঁরা পাননি। একসময় ল্যাটিনভাষী রোমানরা গ্রীস দখল করে, গ্রীসের জ্ঞানতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে পুরোপুরি গ্রাস করে এবং নিজেদের জ্ঞানচর্চার ভাষা ল্যাটিনের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে তোলে। পরবর্তীকালের রেনেসাঁস-গ্রস্ত ইংল্যান্ড জার্মানি ফরাসি স্পেন যখন নিজেদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকাশসাধন-যজ্ঞ শুরু করে, তখন তারা ঐ ল্যাটিনকে একেবারে হাঁড়ি-মুছে আত্মসাৎ করে। অথচ দেখা যায়, পাশ্চাত্যের কোনো ভাষাতেই **কার** ও **ফলা** বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই। তাছাড়া থাকলে আর কেউ না হোক, চমস্কি ও তাঁর সহযোগীরা এতদিন আমাদের সেসব কথা জানিয়ে দিতেন। ...

আমরা দেখছি, শব্দসৃজনের প্রধান যে কারিগরি-কৌশল, **কার** ও **ফলা** প্রয়োগের ধারণা, সেটিই ছিল আদিম মানবের শব্দসৃজনের প্রধান অবলম্বন। তাতে সজীব বস্তুর সজীব সৃজনের মতোই শব্দসৃজনও হয়ে থাকে। এশিয়ার, বিশেষত বাংলাভাষীর উত্তরাধিকারে তা আজও বর্তমান রয়েছে। পাশ্চাত্যের কোনো ভাষাতেই তা নেই। তাঁরা শব্দ সৃষ্টি করেন উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ শব্দকে জড়পদার্থের মতো কেটে ছেঁটে জুড়ে — অনেকটা কাঠ বা লোহা জোড়ার মতো। উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ নয়, পরবর্তীকালে বানানো সকল ইংরেজি শব্দ এভাবেই তৈরি হয়েছে। ফলে, জড়বাদী পাশ্চাত্যের ভাষাও সম্পূর্ণত জড়-স্বভাবের। ...

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, **কার** ও **ফলা**র কোনো উত্তরাধিকারই তাঁদের নেই। **কার** ও **ফলা** ছাড়া শব্দসৃজন তো অসম্ভব। শব্দসৃজনের সেই কৌশল হারিয়ে ফেললেও সেই কৌশলে তৈরি হওয়া শব্দগুলিই তো তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তাঁদের সমস্ত পূর্বলব্ধ শব্দই তো **কার** ও **ফলা** দিয়ে তৈরি। অতি সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয় — আ-**কার** দিয়ে তৈরি bar, car, tar, her, per ... ইত্যাদি, ই-**কার** দিয়ে তৈরি bit, pit, sit, hit ... ইত্যাদি সবই তাঁদের রয়েছে; রয়েছে অ-**কার**, অর্ধ-অ-**কার**, অ্যা-**কার** প্রভৃতির উত্তরাধিকারও। আবার **য-ফলা**র উত্তরাধিকারও তাঁদের রয়েছে car*ry* (কার্য্য), hur*ry* (হার্য্য) ... প্রভৃতি শব্দে; র-**ফলা**র উত্তরাধিকার রয়েছে *th*r*ee*, *f*r*ee*, *t*r*ee*, cons*tr*uction, ins*tr*uction ... ইত্যাদি শব্দে। তাছাড়াও ব্যক্ত, পোক্ত, নষ্ট ...

প্রভৃতি কর্মযোগযুক্ত শব্দের মতো যুক্তাক্ষরী শব্দ তো রয়েছেই। ... অথচ কেমন করে কোন নিয়মে সেই শব্দগুলি তৈরি হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রায় কোনো ধারণাই তাঁদের নেই। ... ৬. ইংরেজি fall, fail, fell ... ইত্যাদি।

ফল্গু (ফল্গুন, ফল্গুনী, ফল্গুবল্গন, ফল্গূৎসব, ফাল্গুন, ফাল্গুনি, ফাল্গুনী) : ১. **ফল্গু** = ✓ফল্ + উ - কর্ত্তৃবাচ্যে, গ্ (গুক্) আগম। (ব.শ.)। ২. **ফল্গু** = *ফল-এর গমন নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, ফলে যে গু। ফল্গুন = ফল্গুর নাকরণ-অনকরণ যাহাতে। ফল্গুনী = ফল্গুন-এর গতিশীল আধার যে। ফল্গুবল্গন = ফল্গুর প্লুতগতি যাহাতে। ফল্গূৎসব = ফল্গুর উৎসব যাহাতে। ফাল্গুন = ফল্গুন হইতে জাত। ফাল্গুনি = ফাল্গুন গতিশীল যাহাতে। ফাল্গুনী = ফাল্গুনির আধার যে। /* **ফল্গুন** = ফল্গুনী নক্ষত্র হইতে জাত যে। (ব.শ.)। ৩. **ফল্গু** = অসার, তুচ্ছ, হেয়, নিরর্থক, মিথ্যা, অল্প, দুর্ব্বল, স্বল্প, রম্য, গয়াস্থ নদীভেদ, রেণুভেদ, ফাগ, বসন্তকাল। **ফল্গুন** = অর্জ্জুন, ফাল্গুনমাস। **ফল্গুনী** = পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। **ফল্গুবল্গন** = অসার প্লুতগতি, বৃথা বাগাড়ম্বর। **ফল্গূৎসব** = ফল্গু-করণীয় উৎসব, দোলযাত্রা। **ফাল্গুন** = ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীযুক্ত মাস, অর্জ্জুন। **ফাল্গুনি** = অর্জ্জুন। **ফাল্গুনী** = ফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত কাল, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। (ব.শ.)। ৪. মাটির তলায় প্রবাহিত লোকচক্ষুর অগোচরে থাকা জলধারা রূপে **ফল্গু** এবং বাংলা বৎসরের একটি মাসের নাম রূপে **ফাল্গুন** শব্দটি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. যে **গু** ফলে, তাকে **ফল্গু** বলে। **গু** কাকে বলে, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩)। কিন্তু সেখানে কোন **গু** ফলে আর কোন **গু** ফলে না, সেকথা বলা নেই। সুতরাং, কোন **গু** ফলে, এবং সে সম্পর্কে আমাদের উত্তরাধিকার কীরূপ, সেকথা জানা চাই।

আসলে দুটো প্রসঙ্গ। প্রথমত, একালে আমরা যাকে **কর** বা 'খাজনা' (অর্থাৎ tax ও rent) বলি, মানুষের সমাজে তার উদ্ভব হল কখন এবং কেমন করে, অর্থনীতিশাস্ত্রের বর্তমান বিশারদদের কাছে তার যথার্থ উত্তর নেই। **ফল্গু**র কাহিনি সেই ইতিহাস ধরে রেখেছে। 'আধুনিক' চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে এই একটা বড় ত্রুটিপূর্ণ ধারণা থাকে যে, **দাসপ্রথা, নিয়োগপ্রথা, করপ্রথা** ... এসব যেন কোনো শক্তিমান মানুষ গায়ের জোরে চালু করে দিয়েছে এবং তারপর থেকে তা আজও চলে আসছে। সমাজে কোনো **প্রথা**র প্রচলন অত সহজ সরল ব্যাপার নয়। **প্রথা** মাত্রকেই প্রচলিত হওয়ার জন্য সমাজকে গর্ভযন্ত্রণা দিয়ে প্রসূত হতে হয়েছে, নানান মানসিক বিপর্যয় ও বাধা-বিপত্তি তিতিক্ষা রক্তক্ষয় ... ইত্যাদির বহু অধ্যায় পার হয়ে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতে হয়েছে, এবং তারপরই তা প্রচলিত হতে পেরেছে। **কর**-প্রথাকেও সেইভাবে অজস্র অধ্যায় পেরিয়ে তার বর্তমান রূপে পৌঁছোতে হয়েছে। **ফল্গু**র কাহিনী হল সেই **কর**-প্রথার ভ্রূণাবস্থার কাহিনী। ডিম্বজ জীবেরা যেমন ডিমরূপে জাত হলেও পরে সেই ডিম ফেটে বেরিয়ে আসে এবং খোলাটা পরিত্যক্ত হয়, **কর**-প্রথাও সেইরকম **ফল্গুধারা** রূপে জাত হলেও পরে সেই **ফল্গুধারা**কে পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসে এবং ক্রমে তার বর্তমান রূপে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, একালে যে ব্যক্তি তাঁর সমগ্র সম্পত্তির **কর** বা tax দিয়ে দিয়েছেন, একটিমাত্র শব্দে তার নাম নাই; আমরা বড়জোর তাঁকে 'সাদা টাকার মালিক' বলতে পারি। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে তেমন মানুষের জন্য একটি শব্দ সৃষ্টি হয়ে যায় — **ফাল্গুনি** (= **অর্জ্জুন**)। এই সত্তা তাঁর সম্পদের **ফল্গু** (আদিম **কর**) দিয়ে সাদা-সম্পদ নিয়ে সমাজে সক্রিয় বলেই তাঁকে বলা হত **ফাল্গুনি**। কালে কালে সর্বপ্রকারের উৎপাদিত বস্তুই হয়ে যায় **ফাল্গুনী** পদবাচ্য। আর, যে কালখণ্ডে সেই **ফাল্গুনী**র উৎপাদন হত, স্বভাবতই সেই কালখণ্ডের নাম হয়ে যায় **ফাল্গুন**। সেকারণেই কৃষিজ উৎপন্নের প্রধান উৎসারণ ঘটত যে কালখণ্ডে তার নাম হয়ে যায় **ফাল্গুন** মাস। আর, যে সামাজিক **গ্রহ-নক্ষত্র**গণ এই **ফল্গুধারা**র সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের নাম হয়ে যায় **ফল্গুনী**। এঁদের **ফাল্গুনী** নক্ষত্র বলারও চল রয়েছে। এঁদের আবার দুটি বিভাগ ছিল — **উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বফল্গুনী**। ...

কর-প্রথার এই যে আদিরূপ — **ফল্গু**, সেই **ফল্গু**র সংবাদ সর্বাগ্রে আমরা পাই **উত্তানপাদ** ও **প্রিয়ব্রত** শব্দের অর্থ থেকে। জানা যায়, মানুষের উৎপাদন দু'রকম। এক) যে উৎপন্ন শ্রমনিষেক-ক্ষেত্র থেকে **মল**-ত্যাগের মতো ত্যক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে, যথা — ধান, গম ... ইত্যাদি; এই **ব্রত**কেই বলা হত **প্রিয়ব্রত**। দুই) যে উৎপন্ন শ্রমনিষেক-ক্ষেত্রকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ **উত্তানপাদ**, যথা — মাটির হাঁড়ি, সুতার কাপড় ... ইত্যাদি।

তবে এ সবই ছিল কৃষিজ ও কারুজ উৎপন্ন সম্পর্কে মানুষের আদিবোধ। যতদূর বোঝা যায়, যখন চয়নভিত্তিক অর্থনীতি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ কৃষিকাজ করছে এবং সবেমাত্র কারুকাজ করতে আরম্ভ করেছে তখন এই বোধের জন্ম হয়। তখন **প্রিয়ব্রত** থেকে জাত ধান গম ইত্যাদি উৎপন্নকে বলা হত **ফল্গু**; আর সেই উৎপন্নের যে বিতরণের ধারা তাকে বলা হত **ফল্গুধারা**; এবং নিঃসন্দেহে তা প্রবাহিত হত ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়েই, লোকচক্ষুর সামনেই। কিন্তু এ ছিল উৎপাদন সম্পর্কে একেবারেই আদিবোধ।

সমাজ কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকেনি, এগিয়েছে, অনেক দূর এগিয়ে চলে এসেছে। পরে পরে যা কিছুই পরিকল্পনা করে উৎপাদন করা হত বা **ফলান** হত, তাই হয়ে যায় **ফল্গু**। ভারতীয় উপমহাদেশে যে-পূর্ণিমার আগে-পরে এই **ফল্গু**তে সমাজ ভরে উঠত, সেই সময়কালের নাম হয়ে যায় **ফাল্গুন** মাস। সেই ফাল্গুন মাসে সামাজিক উৎপন্নের সেই উৎসারিত **ফল্গুধারা**ও সকলের সামনেই প্রবাহিত হতে শুরু করে। **সম্প্রদায়**-এর সমস্ত মানুষ যৌথভাবে চাষ করে যে ফসল ফলাত, **ফাল্গুন** মাসে তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অংশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে দেওয়া হত সম্প্রদায়-পরিচালক মহর্ষির হাতে; তিনিও তা 'অল্প' বা 'স্বল্প' মাত্রায় গ্রহণ করতেন। তারপর মহর্ষির পরামর্শ অনুসারে সমস্ত ফসলই সকলের জন্য বিলি-বন্দোবস্ত করা হত। এই ছিল আদি **ফল্গুধারা**।

পৃথু বা **রাষ্ট্র** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পরে **ফল্গুধারা**র এই ব্যবস্থাটি অনেকখানিই বদলে যায়। ... রামায়ণের কালে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে, যে জনগোষ্ঠী কৃষিজ উদ্বৃত্ত বিক্রিবাটা করত, তাদের বলা হত

গু বা **মল** 'দানকারী' **মলদ** এবং যে জনগোষ্ঠী কারুজ উদ্বৃত্ত বিক্রিবাটা করত, তাদের বলা হত **কারুষ**। এর পরিচালক ও **কর**গ্রাহক হয়ে গেছে রাষ্ট্র। আর, পূর্বপ্রথা মান্য করে উৎপন্নের প্রথম অংশ তখনও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পূর্বতন মহর্ষি (**পিতৃগণ**) বা তাঁর উত্তরসূরীদের — কোথাও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে, কোথাও-বা দায়সারাভাবে। রামায়ণের কালে তাকেই বলা হত **ফল্গু**। অর্থাৎ ততদিনে **ফল্গু**র খোলস ছেড়ে **কর** বেরিয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয়ে গেছে; আর পাশাপাশি খোলসটাও পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ... এই প্রথার বদল ঘটে রামায়ণের কালেই, আর তা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে।

সীতা রামের অনুপস্থিতিতে পিতৃগণের তর্পণ করেছিলেন। রাম ফিরে এলে, নানান কারণে সেই তর্পণের বিষয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সহকারে বলার দরকার পড়ে। সীতা ফল্গুনদী, গাভী, ও কেতকীকে (কেয়া ফুলকে) সাক্ষ্য দিতে বলেন। তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ... সীতা অভিশাপ দেন, এর পর থেকে ফল্গুনদী প্রবাহিত থাকবে লোকচক্ষুর অগোচরে, আর গাভীর মুখের দিকটি অপবিত্র হয়ে যাবে এবং কেতকী ফুল কোনো পূজার কাজে লাগবে না। সেই থেকে ফল্গুধারা অন্তঃসলিলা অর্থাৎ মাটির তলা দিয়ে বইছে। ...

এই কাহিনীর অর্থ হল, ভারতীয় উপমহাদেশে **প্রজাপতিতন্ত্রের** আগে থেকেই যে **অধিরাষ্ট্র** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পরিচালক মহর্ষিরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শীর্ষে থেকে সমাজ পরিচালনা করতেন। তখনও **পৃথু**র বা **রাষ্ট্রে**র জন্ম হয়নি। তখন প্রজাদের তরফে তাদের উৎপন্নের প্রথম ফসলের কিয়দংশ শ্রদ্ধা সহকারে সেই মহর্ষিদের দিয়ে দেওয়া হত, তারপরই সেই ফসল ভাগবাঁটোয়ারা করে ভোগ করা হত। এই 'উৎসর্গ'ই ছিল আদি **ফল্গুধারা**; পরবর্তীকালে এরই নাম হয়ে যায় 'পিতৃগণের তর্পণ'। রামরাজত্বের বা বৌদ্ধযুগের শুরুতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। [এখানে স্মর্তব্য যে, **ফল্গু**র অপর নাম 'নৈরঞ্জনা' (শব্দটি দেখুন), এবং গৌতম বুদ্ধ এই নদীর তীরে বসেই ধ্যান করেছিলেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ গয়ার যে স্থানে আজও পিণ্ডদান করেন, তার পাশেই রয়েছে সেই — 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা' — **ফল্গু** নদী।]

কিন্তু **জনক** রাজার কালে জনসাধারণ যখন পাইকারি হারে পণ্য উৎপাদন করে বিক্রিবাটা করার নীতি গ্রহণ করে ফেলেছেন, তখনও আগেকার প্রথা অনুসরণ করে যথাসময়ে তাঁরা **পিতৃতর্পণ** করছিলেন। সেই সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় — অধিরাষ্ট্রের পরিচালকগণকে তাদের প্রাপ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগ খণ্ডন করতে পারত **ফল্গুধারা**র ধারক-বাহক-পরিচালকরা (বিতরণের দায়িত্বে থাকা অধিকারীরা), উৎপন্নে লিপ্ত **কামধেনু নন্দিনী** গাভীর মতো সম্প্রদায়, এবং কেতকী পুষ্প বা দিশাগ্রস্ত ('পাইকারি') উৎপন্নসম্ভারের উৎপাদকেরা। তারা কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ কিনা, রামায়ণের যুগের জনগোষ্ঠী যখন প্রথা মান্য করে **অধিরাষ্ট্রের** পরিচালকদের যথাবিহিত তর্পণ করছিল, তখন তিনটি সত্তা তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের এই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে জনকরাজার কন্যাস্বরূপা পিতৃতর্পণকারী জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত করে (বা সীতা অভিশাপ দেন) — এরপর থেকে অধিরাষ্ট্রের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে যে উৎপন্নধারা বা **ফল্গুধারা** প্রবাহিত হবে, তা অন্তঃসলিলা হয়ে যাবে, প্রকাশ্যে আর সেই উৎপন্নপ্রবাহকে দেখা যাবে না। অর্থাৎ, তারপর থেকে জনসাধারণ মহর্ষিদের যা কিছু দেবে, তা হয়ে যাবে যার-যার তার-তার নিজের ব্যাপার, রাষ্ট্র বা সমাজ সে বিষয়ে কোনো খবর রাখবে না, অর্থাৎ তা হয়ে যাবে অন্তঃসলিলা। ... আজও সেই অন্তঃসলিলা ধারা অতি ক্ষীণভাবে হলেও প্রচলিত রয়েছে। আজও গ্রামবাংলার মানুষেরা তাঁদের ক্ষেতের প্রথম ফসল, গাইয়ের প্রথম দুধ, বছরের প্রথম পাকা ফলাদি ... প্রভৃতি নানা **ফল্গু** সেই আদি মহর্ষিদের বর্তমান উত্তরসূরীদের দিয়ে থাকেন এবং তারপরই নিজেরা ভোগ করেন বা বিক্রিবাটা করে থাকেন। অর্থাৎ কিনা, শাবক বড় হয়ে **কর**প্রথা রূপে আজ দৈত্যাকার হয়ে গেলেও যে ডিম থেকে তার জন্ম হয়েছিল, সেই ডিমের খোলসটি আজও থেকে গেছে গ্রামবাংলার মানুষের সেকেলে প্রথায়। ...

যাই হোক, **ফল্গু**, **ফল্গুধারা**, **ফাল্গুন**, **ফাল্গুনি**, **ফাল্গুনী** প্রভৃতি শব্দের এইসকল শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিষয়ে আর কেউ জানুন আর না-জানুন, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় কিছুটা জানতেন। মানুষের মানসিক, সামাজিক, দৈহিক উৎপাদনের প্রধান উৎসারণকে যে **ফাল্গুনী** বলা হত, অন্তত তা নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। অর্থাৎ, পার্থিবভূমি থেকে উৎসারিত ফসলের সম্ভারকে (ধান, গম ... ইত্যাদিকে), এবং মানুষের মনোভূমি থেকে উৎসারিত ফসলের সম্ভারকে (কাব্য, গান ... ইত্যাদিকে) যে **ফাল্গুনী** বলা হত, একথা তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন। অন্যথায় তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি লিখতে পারতেন না —

'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি —
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম **ফাল্গুনী**।'

ফাল (ফালকৃষ্ট, ফালা, ফালি) : ১. ✓ফল্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ফাল*** = ***ফল*** *হইতে জাত।* ***ফালকৃষ্ট*** = ***ফাল*** *দ্বারা কর্ষিত হইয়াছে যে।* ***ফালা*** = ***ফাল****-এর আধার যে।* ***ফালি*** = ***ফাল*** *গতিশীল যাহাতে। (****ফালী*** = ***ফালি****র আধার যে।)* ৩. **ফাল** = লাঙলের মুখলগ্ন ভূমিভেদক লৌহখণ্ড, কপালফলক, ভাল, কার্পাসফলবিকার, কার্পাস বস্ত্র; হলধর, বলরাম; খণ্ড, টুকরা। **ফালকৃষ্ট** = ফালাহত, চষা (ভূমি), কৃষিজাত, ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রাদি, ফালকৃষ্ট প্রদেশে জাত শস্যাদি। **ফালা** = খণ্ড, ছিন্নাংশ, টুকরা। **ফালি** = খণ্ড, টুকরা, বস্ত্রখণ্ড, ভাগ, ফলের টুকরা। (ব.শ.)। ৪. **ফালকৃষ্ট** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. লাঙলের **ফলা**কে গ্রামবাংলায় বলা হয় লাঙলের **ফাল**। এই **ফাল** ভূমিকে **ফালা-ফালা** করে চিরে দেয়। ইতোপূর্বে **ফল** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, সত্তার ভেতর থেকে তার বর্দ্ধিত ও পরিত্যাজ্য অংশের সত্তার পরিধি ভেদ করে চিরে বেরোনোকেই **ফল** ক্রিয়া বলে। যার দ্বারা ঐরূপ চিরে দেওয়া বা ফাটিয়ে দেওয়ার কাজ সম্ভব হয়, তাকে বলে **ফাল**। যে ভূমিকে লাঙলের **ফাল** দিয়ে চিরে দিয়ে ভূমিকর্ষণ করা হয়, সেই ভূমিকে এবং তজ্জাত ফসলকে সেকারণেই **ফালকৃষ্ট** ভূমি ও **ফালকৃষ্ট** শস্য বলে। ব.শ. জানাচ্ছেন, যে ফসল **ফাল**-এর দ্বারা ভূমিকর্ষণ করে উৎপাদন করা হয়নি, নিজে থেকে উৎপাদিত

হয়েছে, তাকে সেকারণেই 'আরণ্য' শস্য বলা হয়। মোটকথা, **ফাল** দিয়ে **ফালা ফালা** করে চিরে বা কেটে ফেললে, যে **ফালা-ফালা** করা অংশগুলি পাওয়া যায়, তাদের প্রত্যেকটিকে বলে এক **ফালি**। এভাবেই টুকরো করা জমিকে 'এক **ফালি** জমি', টুকরো কাপড়কে 'এক **ফালি** কাপড়', টুকরো করা তরমুজকে 'এক **ফালি** তরমুজ' বলে। তবে আমাদের বিচারে এই **ফালি** শব্দের বানান **ফালী** হলেই তার সঙ্গে তার অর্থের সাযুজ্য থাকে।

ফুল্ল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অফিল্ল, আফুলা, উৎফুল্ল, প্রফুল্ল, ফু, ফুঅল, ফুঁড়, ফুঁপা, ফুঁপি, ফুপা, ফুফা, ফুল, ফুলকপি, ফুলকা(কো), ফুলকাকা, ফুলকাটা, ফুলকাড়ান, ফুলকারী, ফুলকি, ফুলকুল, ফুলকুলদল, ফুলকুলপতি, ফুলকুলেশ্বরী, ফুলখড়ি, ফুলখাসি, ফুলগাভা, ফুলগুণ, ফুলগুণা, ফুলগেঁড়ু, ফুলঘর, ফুলঘরা, ফুলঘুটি, ফুলচন্দন, ফুলচিনি, ফুলচৌকি, ফুলছড়ি, ফুলঝাঁটি, ফুলঝাঁপা, ফুলঝাড়, ফুলঝাড়ু, ফুলঝা(ঝাঁ)পা, ফুলঝারা, ফুলঝুমকা, ফুলঝুরি, ফুলটঙ্গি, ফুলটুকি, ফুলটুসি, ফুলডাব, ফুলতা, ফুলদল, ফুলদান, ফুলদার, ফুলদানি, ফুলদিদি, ফুলদোল, ফুলধনু, ফুলধনুঃ, ফুলপাণ, ফুলপানী, ফুলবড়ী, ফুলবন, ফুলবাণ, ফুলবাড়ী, ফুলবাতাসা, ফুলবাবু, ফুলমেলী, ফুলমোজা, ফুলরণ, ফুলল, ফুলেল, ফুলোল, ফুলশয্যা, ফুলশর, ফুলসন্ন্যাস, ফুলহাতা, ফুলা, ফুলান, ফুলাম, ফুলুরী, ফুলেশ্বরী, ফুলো, ফুল্ল্, ফুল্ল, ফুল্লতুবরী, ফুল্লন, ফুল্লনয়ন, ফুল্লনেত্র, ফুল্ললোচন, ফুল্লিত, ফেল (দ্র.স্ফাল), ফোল, ফোলা, ফোলান।

ফুল্ল্ = নবরূপী পালনস্থিতের লালন। **ফুল্ল** = নবরূপী পালনস্থিতের লালন-লয়ন যাহাতে।

ফুল (ফুলা, ফুলান, ফুলি, ফুলো) : **১. ফুল** = সংস্কৃত 'ফুল্ল' > প্রাকৃতে 'ফুল'। **২. ফুল** = **ফু** *(নবরূপী ফনী বা পালনস্থিতকারী) লালিত ও লয়প্রাপ্ত যাহাতে; যাহা ফুলে ওঠে।* **ফুলা** = **ফুল**-*এর আধার যে।* **ফুলান** = **ফুলা** *অন (on) থাকে যাহাতে।* **ফুলি** = **ফুল** *গতিশীল যাহাতে; সামান্য আঘাতে মুখ ফুলিয়ে কাঁদে যে।* **ফুলো** = **প্রফুল্ল** *হও — এই নির্দেশ বা আবেদন থাকে যাহাতে।* / **ফুলা (ফুলো)** = যাহাতে ফুল ধরিয়াছে। (ব.শ.)। **৩. ফুল** = পুষ্প, স্বর্ণাদির পুষ্পাকৃতি নক্সা, ভ্রূণের নাভির সহিত সংলগ্ন মাংসপিণ্ড, গর্ভপুষ্প (placenta), আতসবাজির ফুলের মতো স্ফুলিঙ্গ, সম্পর্কসূচক শব্দের পূর্ব্বে জন্মক্রমসূচক শব্দ; পুষ্পিত হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, (রোগে, রাগে, আনন্দে) স্ফীত হওয়া, ফাঁপা (to swell), ফুঁপান, মোটা হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া। **ফুলা (ফুলান)** = ফুলযুক্ত, অপরিণত, কচি; স্ফীত হওয়া, মোটা হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া, অযথা প্রশংসায় দর্পস্ফীত বা গর্ব্বিত করা, ফাঁপাইয়া তোলা, স্ফীতি, স্ফীত, ফাঁপা। (ব.শ.)। **ফুলি** = কাতর মেয়ে, ছিঁচকাঁদুনে। **ফুলো** = নিম্নে **৫**. দেখুন। **৪**. যথার্থে প্রচলিত। **৫. ফু** বলতে কী বোঝায়, সেকথা আমরা **ফুঁ** শব্দের ব্যাখ্যায় জেনেছি। সেই সুবাদে **ফুল** শব্দের অর্থ দাঁড়ায় — কোনো 'সত্তার ইচ্ছাদির বস্তুগত রূপ লাভ করে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে সত্তা থেকে বেরোনো এবং নির্গমন পথের শেষে পৌঁছে বিচিত্র রূপে অপেক্ষা করা'কে বলা হয় **ফুল্** ক্রিয়া; এবং সেরকম ক্রিয়া করে যে তাকে **ফুল** বলে।

গাছের **ফুল** এভাবেই গাছের হৃদয় থেকে বেরিয়ে প্রশাখার শীর্ষে পৌঁছে কিশলয়াবৃত হয়ে **মধু** নিয়ে অপেক্ষা করে মধুকরের জন্য। উৎপাদকের **পুষ্প** (বা **পণ্য**) এভাবেই তার অন্তর্নিহিত উপভোগ্যতা নিয়ে অপেক্ষা করে চাহিদাকারীর (**চাতক**-এর) জন্য; প্রেমিকার মনের ইচ্ছা মিষ্টি হাসি হয়ে চোখেমুখে এভাবেই প্রেমের বা বিয়ের **ফুল** হয়ে ফুটে অপেক্ষা করতে থাকে তার প্রেমিকের জন্য। ভক্তের সাধ এভাবেই অশ্রু হয়ে নিবেদিত হয় ভগবানের পায়ে। তার মানে, যে কোনো হার্দ্দিক শুভ ইচ্ছার উৎসারিত ও অপেক্ষারত উৎ**ফুল্ল** রূপের নামই হতে পারে **ফুল**। এই সেই কারণ, যে কারণে মানুষের সকল প্রকার উৎসারিত শুভ-ইচ্ছার প্রকাশক রূপে **ফুল**-এর গৌরব সর্বোচ্চ এবং তার উপস্থাপন ঘটানো হয় গাছের **ফুল** দিয়ে। অর্থাৎ কিনা, সমস্ত অদৃশ্য **ফুল**-এর প্রতিনিধির স্থান পেয়েছে গাছের দৃশ্য **ফুল**। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **ফুল**-এর এই গৌরবের কথা প্রকাশ করেছেন হজরত মহম্মদের বাণীর বাংলা অনুবাদ ক'রে —

> 'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
> জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা, **ফুল** কিনে নিয়ো হে অনুরাগী।'

তবে কিনা, **ফল**-এর ক্ষেত্রে যেমন, **ফুল**-এর ক্ষেত্রেও একইরকম ভুল হয়ে থাকে। আমরা খেয়াল রাখি না যে, এটি একটি ক্রিয়াপদও বটে। যদিও **ফুলা**, **ফুলে** ওঠা, **ফুলে**-ফেঁপে ওঠা, (অটোর পেছনে লেখা—) 'দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো **ফুল**বি' ... প্রভৃতি শব্দের বিপুল প্রয়োগ রয়েছে, কিন্তু 'ফলুন, ফুলুন' জাতীয় কোনো শব্দ বাংলায় প্রচলিত নেই; হিন্দিতে রয়েছে। ছেলেমেয়েরা বা নবদম্পতি প্রণাম করলে হিন্দিভাষী (খোঁট্টিয়াভাষী) মায়েরা আশীর্বাদ করেন — 'ফুলো, ফলো'; অর্থাৎ প্রফুল্লিত হও, ফুলবান-ফুলবতী হও, ফলিত হও, ফলবান-ফলবতী হও। ব্যাপকার্থে তার মানে দাঁড়ায় — হাসিখুশি হও, সমৃদ্ধ হও।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে বাংলাভাষী শব্দটির প্রয়োগ একেবারে ভুলে গেছে। 'বিয়ের **ফুল** ফোটা' আর যাই হোক নিশ্চয়ই flower ফোটা নয়। মেয়েরা যে **ফুলবতী** বা **পুষ্পিতা** হয়, সে ধারণা তো flower-এর ধারণাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। প্রসূতির প্রসবের পর ধাইমায়ের উদ্বেগের প্রধান বিষয় হয় প্রসূতির '**ফুল** পড়েছে' কি না। তাছাড়া আমরা দেখছি, গ্রামবাংলা **ফুল**-এর এবম্প্রকার অর্থকে ধরে রেখেছে তার **ডাকসংক্রান্তি**র আচারে। আধুনিকতার প্রভাব এই আচারকে যতটা সম্ভব ধ্বংস করে দেওয়া সত্ত্বেও এখনও গ্রামবাংলার কোথাও কোথাও এই আচার বলবৎ রয়েছে। তাতে দেখা যায়, **ডাকসংক্রান্তি**তে বা আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন ভোরবেলা মাঠে গিয়ে কৃষকেরা সজোরে চিৎকার করে একটি ছড়া বলতে থাকেন। ছড়াটি এরকম —

> 'ওল ওল ওল, মহাদেবের পোল।
> ছোটধান বড়ধান ফুলো, ফুলো।।'

এই '**ফুলো, ফুলো**' কথাটি সুরেলাভাবে — 'ফুলো-ও-ও-ও, ফুলো-ও' — ব'লে এত জোরে জোরে চিৎকার করে বলা হয় যে, দু'তিন মাইল ব্যাসের বিশাল মাঠের সমগ্র বৃত্তের আকাশ বাতাস জুড়ে একটা 'ও-ও-ও' ধ্বনি শোনা যেতে থাকে এবং বহুদূর থেকে সেই ধ্বনি শোনা যায়। এই যে **ফুলো ফুলো** ডাক, এর অর্থ হল, 'হে ধানগাছসমূহ, তোমাদের ছোটরা বড়রা প্রত্যেকেই আপন আপন সত্তার ইচ্ছাগুলিকে নবরূপে উত্তীর্ণ ক'রে বর্ধিত হও, বহির্গত হও! ফুল্ল হও, প্রফুল্লিত হও, ফুলে ওঠো, ফুলে ও ফলে পরিণত হও!' ... ইত্যাদি।

এই ছড়ায় আরও দ্রষ্টব্য যে, এতে **ওল** শব্দের প্রয়োগ আছে। এই **ওল** একদিকে যেমন ছোটধান বড়ধানের মধ্যে 'সামঞ্জস্য'-এর (দ্র. **উন্দ, ওল**) কথা বলে, অপরদিকে তেমনি **উল, উল্লাস, উল্লসিত** হওয়া, **উৎফুল্ল** হওয়া বা **প্রফুল্ল** হওয়ার কথাও বলছে। এই যে **ফু** + উল্ল, এর স্বরূপের কথাই আমরা শুরুতে **ফুল** শব্দের অর্থে বলার চেষ্টা করেছি। এর দৃশ্য স্বরূপের সর্ববৃহৎ চেহারা দেখা যায় অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে উদ্ভূত ধোঁয়ার ছবিতে, মাঝারি চেহারা দেখা যায় **ফুলকপি**তে, ক্ষুদ্র চেহারা ঘাসের **ফুল**-এ। ...

ফুল শব্দ বাংলাভাষীর নিজের অর্জন। এই শব্দ দিয়ে কত শব্দ যে বাংলাভাষী বানিয়েছেন, তার তালিকা উপরে **ফুল্ল্** ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকায় দেওয়া হয়েছে। এর কয়েকটির অর্থ ও তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য নিম্নে দেওয়া হল। **৬.** ইংরেজি full, fool, flower ...।

ফুলকা (ফুলকো) : **২.** **ফুল** *কৃত যাহাতে তাহার আধার।* **৩.** ফুলা, পাতলা, শাসযন্ত্র, মৎস্যাদির চিরুণীর মতো শ্বাসযন্ত্রবিশেষ (gill)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আগেই বলা হয়েছে যে, **ফুল** শব্দের ভিতরে যে ক্রিয়াটি রয়েছে, তা একপ্রকার যৌথক্রিয়া — সত্তার ইচ্ছাদির নবরূপ বা বস্তুরূপ লাভকরণ, ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হওয়া, আপন পরিধির ফুটো দিয়ে উদগত বা নির্গত হয়ে অপেক্ষা করা। এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় — সত্তার বস্তুরূপ লাভকরণের ও তার ক্রমবৃদ্ধির ফলে সত্তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার ভিতরে আর স্থান সংকুলান হয় না। তখন তা বাইরে বেরোয়। এই যে **ফুল** হওয়া, সত্তার পক্ষে এ একধরনের পরিপূর্ণতাও বটে। **ফুল** শব্দের এই ধারণাই উত্তরাধিকারসূত্রে ধারণ করে রেখেছে ইংরেজির full শব্দ। পরে সেই শব্দ ভারতে ব্রিটিশের আগমনের সুযোগে বাংলাতেও পৌঁছায় এবং বাংলাভাষী full **ফুল** দুটো শব্দকেই এমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে নেয় যে, বহু ক্ষেত্রে এখন তাদের আলাদা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। **ফুলকা, ফুলকো** তার একজোড়া উদাহরণ। **ফুলকা** বা **ফুলকো** লুচি 'ফুলে' থাকে বলেই **ফুলকো**-লুচি, নাকি বাষ্পে full হয়ে থাকে বলে **ফুলকো**-লুচি — সে তো ভাববারই কথা। আবার, মাছের **ফুলকা** দেখতে **ফুল**-এর মতো বলেই তো **ফুলকা**? এই শব্দ অভিধা-অর্থ ধারণ করে না, সাদৃশ্যের কারণে **ফুলকা**।

ফুলকাকা, ফুলদিদি : **৩.** **ফুলকাকা** = পিতার ষষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। **ফুলদিদি** = জ্যেষ্ঠা ষষ্ঠ ভগিনী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এখন আর আমাদের **ফুলদিদি**, **ফুলকাকা**রা নেই, হয়তো আর কোনোদিনই তাঁদের আমরা দেখতেই পাব না। কেননা, আমাদের বর্তমানের মহাশক্তিধর সমাজ ও রাষ্ট্র সগৌরবে (নাকি নির্লজ্জভাবে?) ঘোষণা করে রেখেছে যে, তারা মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রজনন প্রক্রিয়া সামাল দিতে পারবে না। অর্থাৎ এই কাজে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতএব কোনো মানুষের ষষ্ঠ সপ্তম সন্তান তো অনেক দূরের কথা, দুটির বেশি সন্তান যেন না হয়; একদম না হলেই মঙ্গল। আর, তাদের এই অক্ষমতাকে ঢাকার জন্যে নানারকম দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি প্রচার করে রেখেছে। ফলে মানুষের ষষ্ঠ সন্তানেরা আর জন্মাচ্ছে না, আমাদের **ফুলকাকা** ও **ফুলদিদি**দের জন্মানই নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে শব্দদুটিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অথচ যে সমাজ ও রাষ্ট্র নিজেদের শক্তি নিয়ে এত গর্ব করে, তাদের তো উচিত ছিল কী করলে পর মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রজনন প্রচলিত থাকে, সেই চেষ্টা করা। তার জন্য দরকার হলে নতুন আরও দশ-বিশটা পৃথিবী যদি বানাতেই হয়, বানানোর চেষ্টা করতে হত। সে ভাবনাই নেই, বানাতে পারার যোগ্যতার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে তো অন্তত একটা চির-অনুত্তরিত প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যেত — নিত্যবর্ধমান উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদ নিয়ে কী করা হবে?

অথচ একটা যুগ ছিল, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা বড়কাকা, মেজকাকা, সেজকাকা, ন'কাকা (নোয়াকাকা), সুন্দরকাকা, ফুলকাকা, ছোটকাকা — সাত সন্তানের জন্য এই সাত-সাতটা অভিধা-শব্দ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। অঞ্চলভেদে এর কিছু হেরফের হত, যেমন 'রাঙা', 'নতুন', 'মণি' ... প্রভৃতি ঢুকে যেত, সেজ নোয়া ... প্রভৃতি বাদ যেত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে সহোদর ভাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ এবং সম্বোধন করতেন 'নতুন-দা' বলে। ... এই শব্দগুলি দাদা, দিদি, পিসী, মাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হত। সাত সংখ্যার এই যে পর্যায়, বাংলার সব অঞ্চলে তা কমবেশি প্রচলিত ছিল। অন্তত রাজশাহী জেলায় ও মেদিনীপুর জেলায় যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, আমরা দুজন তার জীবন্ত সাক্ষী। হ্যাঁ, এমনকি মেদিনীপুরের মুসলিমদের মধ্যেও এই রীতি কমবেশি প্রচলিত ছিল। তাতে দিদিদের বলা হত বড়ি-বু, মজলি-বু, সজলি-বু, লাল-বু, নানি-বু, কচি-বু, ছোটি-বু ... ইত্যাদি। এর রকমফেরও ছিল।

একালের বিদ্যাবাগীশদের দৌলতে (কারণ এই বিদ্যাবাগীশেরাই সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালকদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন) মানুষের সন্তান প্রজনন ও লালনপালন দুটো ব্যবস্থাই বন্ধ্যা হতে চলেছে। সাত ছেলে ও সাত মেয়ে এই চোদ্দোটি ছেলেমেয়ের জায়গায় একটি ছেলে বা মেয়ে হওয়া মানে প্রজনন তো প্রায় বন্ধই! অর্থাৎ, প্রজনন তো বন্ধ হতে চলেছে, যে একটি দুটি সন্তান জন্মায় তারা যাতে মানুষ না হয়ে টাকা রোজগারের যন্ত্র হয় এবং টাকা রোজগার করতে করতে মরে যায়, সেই ব্যবস্থাই এই বিদ্যাবাগীশেরা করে রেখেছেন। কারণ এর বাইরে ভাববার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। ফলস্বরূপ **বড়দিদি, মেজদিদি** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কত শব্দ?

দাদা, দিদি, কাকা, কাকী, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মেসো, মাসী, জামাই, বউমা, শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, শালী ... ইত্যাদির সঙ্গে **বড়,**

মেজ, সেজ, নোয়া, ফুল ... ইত্যাদি যোগ করে দেখুন, দেখবেন শতাধিক সম্পর্কসূচক শব্দ বাংলাভাষা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে, আমাদের বাংলাভাষীদের সমাজে সম্পর্কের যে সূক্ষ্মতা ও মিষ্টতা, সেসবই আমরা হারিয়ে ফেলে ইংরেজের সমান হয়ে গেছি, যাদের uncle, aunt ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই। যে বাংলাভাষীরা ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লেখেন, তাঁরা জানেন, সম্পর্কের এই সূক্ষ্মতা না থাকায় ইংরেজিতে বাংলাভাষীদের পারিবারিক কাহিনী লেখা প্রায় গায়ের জোরে লেখা মৃত কাহিনী। তবে যে হারে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশেও পরিবারের চেহারা যে পরিমাণে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার' (হায়! সুখী পরিবার!) হয়ে গেছে, তাতে এখন আর সেই লেখকদের কোনো অসুবিধা হবে না। এবার তাঁরা মনের সুখে ইংরেজিতেও বাংলাভাষীর পারিবারিক কাহিনী লিখতে পারবেন।

কিন্তু এই যে প্রায় সাত দুগুণে চোদ্দো সন্তানসন্ততির একটা অঘোষিত প্রথা প্রচলিত ছিল, তার বিলুপ্তি কি ভালো হল? বাংলাভাষীদের সমাজে (চতুর্দশ গর্ভসম্ভূত) রবীন্দ্রনাথ ও (সপ্তম গর্ভসম্ভূত) নেতাজীর জন্মই কি প্রমাণ করে না যে, মানুষের প্রজনন সংকোচনের তত্ত্বটা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের পক্ষে কেবল ভয়ঙ্করই নয়, মৃত্যুর সমান? কারণ, তার ফলে মানবপ্রজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরাই তো আর জন্মাবে না। ...

সুতরাং কী করলে পর মানবপ্রজাতির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রজনন প্রচলিত থাকে, এবং জাত সন্তানসন্ততিরা 'মানুষ'ও হয়, তার উপায় ভাবা উচিত। 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি' — এই বলে অস্বাভাবিক-অপ্রাকৃতিক অজস্র সন্তানসন্ততির জন্ম দিয়ে তাদের দেখভালের দায়িত্ব ঈশ্বরের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে তিনি আমাদের হাত পা মাথা এসব দিয়েছেন কী করতে? মানবপ্রজাতির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রজনন প্রক্রিয়া প্রচলিত রাখা উচিত, তার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত এবং নতুন পৃথিবী আবিষ্কার ও গড়ে তোলা দরকার — এই আমাদের অভিমত।

ফুলকি : ২. **ফুল** *(ফু-এর লালন) করণ গতিশীল যাহাতে।* ৩. অগ্নিকণা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. সত্তার ভিতর থেকে প্রফুল্লিত হয়ে বেরোচ্ছে যে, তার সেই প্রাথমিক রূপকে বলে **ফুলকি**।

ফুলখাসি : ৩. কচি খাসীছাগল। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ছাগলের মাংসভোজনবিলাসীরা জানেন, 'কচি-পাঁঠা'র মাংস তুলনায় সুস্বাদু। কিন্তু কচি খাসি ছাগলের মাংস তার চেয়েও সুস্বাদু। সম্ভবত সেই কারণে সেকালের বাংলাভাষীরা এর নাম দিয়েছিলেন **ফুলখাসি**। অন্য কোনো কারণ থাকলেও থাকতে পারে, এই মুহূর্তে আমরা তা জানি না।

ফুলঘুটি : ৩. বালিকার ঘুটিখেলাবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. খেলার নামরূপী এই সুমিষ্ট শব্দটিই কেবল আমরা হারাইনি, খেলাটিও হারিয়েছি। বাংলাভাষী বালিকার খেলায় **ফুলঘুটি**র মতো স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মাতৃদুগ্ধ এখন আর নেই, গরুর দুধও নেই, ডিব্বা দুধই সম্বল, তাও অজস্র ভেজালে পূর্ণ। যথা — ভিডিয়ো গেম ... ইত্যাদি।

ফুলচৌকি : ৩. কারুকার্যখচিত কাষ্ঠাসনবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখনও চার পায়াওয়ালা চেয়ারেই আমরা বসি, কিন্তু তা যত কারুকার্যময়ই হোক না কেন, তাকে **ফুলচৌকি** বলা হয় না। ... ফলে এ শব্দটিও পরিত্যক্ত হয়েছে।

ফুলপাণ : ২. **ফুল** *পণন করা হয় যাহাতে।* ৩. কোনো কর্ম্মে নিয়োগার্থ কর্ম্মীকে দেয় ফুল ও পান। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব.শ. প্রদত্ত **ফুলপাণ** শব্দটির অর্থ চট করে বোঝা যায় না। সত্যিই তো, কাউকে কাজে নিয়োগ করলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে, ফুল পান এসব দিতে হবে কেন, দিলে কী হয়? আর তাছাড়া তাতে **ফুলপান** না হয়ে শব্দটি **ফুলপাণ** হয়ে যায় কেন?

পুষ্প, পান, চাকরি, নিয়োগ ... প্রভৃতি শব্দের অর্থ থেকে জানা যাচ্ছে, এমন একটা যুগ ছিল, যখন কোনো মানুষই অন্য কোনো মানুষের কাছে **চাকর** হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে, এমন কথা সেকালের কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। কাউকে সেরকম নিয়োগ করার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু সেই অকল্পনীয় অভাবনীয় ব্যাপারটিই মানুষের সমাজে সম্ভব হল কেমন করে, সেকথা আমরা 'মানুষ মানুষের ঘাড়ে চাপল কেমন করে অথবা পালকির কথা' নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে জেনেছি (নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে আমাদের 'জ' গ্রন্থে)। **বরাহ** শব্দে সেকথা বিস্তারিত করা আছে। ...

যাই হোক, নিযুক্ত ও নিয়োগকারী সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হওয়ার বহু আগে থেকেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পাতানোর উপায় ছিল **পান** দিয়ে আপ্যায়ন করা। পরে পরে মানুষের সমাজ যখন **পণ্য-উৎপাদক** সমাজে পরিণত হল, তখন সেই **পান** দিয়ে সম্বন্ধিত হওয়ার স্থানে আরও একটি বস্তু যুক্ত হয়ে গেল — **ফুল**। কীভাবে তা সম্ভব হল **মূল্য** শব্দের অর্থ থেকে সেকথা আমরা জানতে পারি।

সেকালে কাউকে দিয়ে কোনো বস্তু উৎপাদন করিয়ে নিয়ে তার দাম দেওয়া হত সেই বস্তুর কয়েকটি তাকেই দান করে দিয়ে। যেমন যে তরল বাঁশে ১০ টি ঝুড়ি বানানো যায়, সেই বাঁশ কোনো ঝুড়ি প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হত, যে কিনা তার থেকে ১০ টি ঝুড়ি বানিয়ে বাঁশদাতাকে ধরা যাক ৬ টি ঝুড়ি দিয়ে বাকি ৪ টি নিজে নিয়ে নিত। বাঁশদাতা যে ৬ টি ঝুড়ি পেত, তার বদলে ঝুড়িদাতা পেত বাকি ৪ টি ঝুড়ি। অর্থাৎ কিনা, মূলের বা বাঁশের প্রায় অর্ধাংশ ও ঝুড়িদাতার শ্রম মিলে যে **মূল্য** হয়, সেটি ৪ টি ঝুড়ির দামের সমান। কিন্তু এ তো একধরনের লেনদেনের সম্বন্ধ তো **বিপণন** ক্রিয়া হয়ে গেল। হয়তো সেকারণেই কাউকে কোনো কাজে নিয়োগ করার প্রথাটির প্রতীকী আচরণ হয়ে যায় **ফুল** ও **পান** দিয়ে বিশেষ কাজে নিয়োগ করা। এবং সেজন্যই সমগ্র আচরণটির নাম হয়ে যায় **ফুলপাণ**।

ফুলবন : ৩. পুষ্পোদ্যান। (ব.শ.)। ৪. flower-এর ঝোপজঙ্গল রূপে প্রচলিত। ৫. মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে **নিধুবন, কুঞ্জবন, ফুলবন** ... প্রভৃতি শব্দের ছড়াছড়ি। এগুলি যে অরণ্য বা ঝোপঝাড় পদবাচ্য নয়, সেকথা আশা করি পাঠককে এখন আর বলে দিতে হবে না।

ফুলবাতাসা : ২. *বাতাসে ফুলে ওঠে যে মিষ্টান্ন।* ৩. এক প্রকার সাদা বাতাসা। (ব.শ.)। ৪. শহরে অপ্রচলিত হলেও এখনও তথাকথিত 'গেঁইয়া' বাংলাভাষী মিষ্টান্নটির কদর দিয়ে থাকেন। ৫. গ্রামবাংলার যে কোনো মিষ্টি দোকানে গিয়ে মিষ্টিগুলির যা যা নাম হয়, যত নাম ছিল এবং আছে, সেগুলি একটি কাগজে লিখে ফেলে সেই নামগুলির সঙ্গে মিষ্টিগুলির গুণাগুণ মেলালেই টের পাওয়া সম্ভব, বাংলাভাষীর ভাষাজ্ঞান কতদূর বিস্তারিত। **ফুলবাতাসা** হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো একটি সাধারণ মিষ্টির নাম। বস্তুটি তৈরি করা হয় ধোয়া চট বা খেজুর চাটা বিছিয়ে তার উপর ফুটন্ত জলের মতো দেখতে একপ্রকার মিষ্টির রস একটু একটু করে ঢেলে ঢেলে, যেন এক চামচ করে ফুটন্ত জল পর পর ঢেলে দেওয়া হয়। ঢালার সঙ্গে সেই বস্তুটি সোঁ সোঁ করে বাতাস আহরণ করে **ফুলে উঠে** শক্ত হয়ে যায়। সেটিই **ফুলবাতাসা**। হয়তো 'বাতাস নিয়ে ফুলে ওঠে' ব'লে তার ঐরকম নাম। গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতে এই বাতাসা নিয়ে বহু গল্পকথা আজও প্রচলিত আছে।

ফুল্ল (ফুল্লিত, উৎফুল্ল, প্রফুল্ল, প্রফুল্লিত) : ১. **ফুল্ল** = ✓ফুল্ল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓ফল্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ফুল্ল** = **ফুল্** *(নবরূপী ফনীর বা পালনস্থিতের লালন) লালিত ও লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **ফুল্লিত** = **ফুল্ল** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* **উৎফুল্ল** = *উদ্লোকে* **ফুল্লিত** *যে।* **প্রফুল্ল** = **প্র** *(প্রকৃষ্টরূপে)* **ফুল্ল** *যে।* **প্রফুল্লিত** = **প্র** *(দ্র.* **প্র***)* **ফুল্লিত** *যে।* ৩. **ফুল্ল** = বিকসিত, পুষ্পিত, ব্যায়ত, বিস্ফারিত, প্রফুল্ল, স্ফীত। **ফুল্লিত** = বিকসিত, কুসুমিত। **উৎফুল্ল** = বিকশিত, স্ফীত, বিস্ফারিত, উত্তান, স্ত্রীকরণ। **প্রফুল্ল** = বিকসিত, পুষ্পিত, হর্ষোৎফুল্ল, পরিস্ফুট। **প্রফুল্লিত** = (ব্যাকরণ অনুসারে সাধু হইলেও, সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই, প্রাচীন বাংলায় ভূরিপ্রয়োগ।) প্রফুল্ল, বিকশিত, পুষ্পিত, পুলকিত, হৃষ্ট, হর্ষবিস্ফারিত, প্রভাময়, প্রসন্ন। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই এখন অপ্রচলিত। কিছুদিন আগেও বাংলাভাষী আপন সন্তানের নাম **প্রফুল্ল** রাখতেন। আজকাল এই নামটিকেও 'সেকেলে' মনে করে পরিত্যাগ করা হয়েছে। ৫. দ্র. **ফুল**।

ফ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা *:* ফ, ফইজৎ, ফউজ, ফ-কার, ফচকে, ফচকোম, ফজর, ফজলী, ফজিয়ত, ফজীহৎ, ফঞ্জিকা, ফট্ (দ্র.স্ফট্) ফড়, ফড়কি, ফড়ফড়, ফড়া, ফড়িং, ফড়িংচোষা, ফড়িংপেয়ে, ফড়িঙ, ফড়িঙ্গ, ফড়িঙ্গা, ফড়িয়া, ফ'ড়ে, ফত, ফতকা, ফতমাবিবি, ফতুই, ফতুয়া, ফতুর, ফতে, ফতো (ফোতো), ফতোয়া, ফয়তা, ফয়দা (ফায়দা), ফয়লা, ফয়শালা, ফয়সালা, ফরকা, ফরগুল, ফরজন্দ, ফরদা, ফর্দ্দা, ফর্দ্দাফাঁই, ফরফর, ফরবা, ফরমা (form), ফর্ম্মা, ফরমাইশ, ফরমাইস, ফরমান, ফরমানী, ফরমাবরদার, ফরমায়েস, ফরমাশী, ফরমাশে, ফরমাস, ফরমাসী, ফরর-ফরর-ফরাৎ, ফররা, ফরশা(সা), ফরশী (ফুরশী, ফুরসি), ফরাশ(স), ফরাসি (ফরাসী), ফরিক, ফরিকান, ফরিকাল, ফরিয়াদ, ফরিয়াদী, ফর্কিকা, ফর্দ্দ, ফর্দ্দা, ফর্ফরায়তে, ফষ্টি, ফষ্টি-নষ্টি, ফষ্ঠি, ফস, ফসকা, ফসকান, ফসফস, ফসফসে, ফসল, ফসলী, ফাইফর-মাইশ, ফাইফরমাস, ফাইয়র, ফাইল, ফাউ, ফাউড়া, ফাজিল, ফাজিল-পাওনা, ফাজিল-বাকী, ফাট, ফাটা, ফাড়, ফাড়া, ফাড়ি, ফাতনা, ফাতা, ফাতাড়ু (ফ্যাতাড়ু), ফাফর, ফায়দা, ফার, ফারক(গ), ফারাক, ফারখত, ফারখতি, ফারম, ফারল, ফারশী(সী), ফারাজ, ফাসফুস, ফাসা, ফাসুরফুসুর, ফি, ফিক, ফিকফিক, ফিকা (ফিকাহ্), ফিকির, ফিকিরী, ফিকে, ফিচেল, ফিট, ফিটকারী, ফিটকিরি, ফিটন, ফিটান, ফিতা, ফিতে, ফিদবি, ফির, ফিরঙ্গ, ফিরত, ফিরা, ফিরিঙ্গি(ঙ্গী), ফিরিস্তি, ফিরে, ফিরোজা, ফির্নি, ফিলখানা, ফিলঘর, ফিষ, ফিসফিস, ফুট (দ্র.স্ফুট্), ফুটবল, ফুড়ুক, ফুড়ুৎ, ফুৎ, ফুৎকার, ফুৎকৃত, ফুৎকৃতি, ফুপা, ফুফা, ফুপ্ফুস, ফুফুস, ফুফা, ফুফী, ফুফু, ফুফুৎকার, ফুয়ল, ফুর্ (দ্র. স্ফুর্), ফুস, ফুসফাস, ফুসফুস, ফুসফুসানি, ফুসলা, ফুসলান, ফুসুরফা(ফু)সুর, ফুসফুস, ফুহারা, ফুজল, ফুফু, ফে, ফেউ, ফেক (ক্ষিপ, speak), ফেকড়া, ফেকন, ফেকনা, ফেকনি, ফেকো, ফেচফেচানি, ফেচাৎ, ফেটন, ফেটা, ফেটান, ফেটি, ফেটিন, ফেটিং, ফেটী, ফেট্টী, ফেৎকার, ফেৎকারিণী, ফেফাতুড়া(রা), ফের, ফেরত, ফেরতা, ফেরফার, ফেরব, ফেরা, ফেরাও, ফেরান, ফেরাফেরি (হেরাফেরি), ফেরার, ফেরাল, ফেরি(রী), ফেরিওয়ালা, ফেরীঘাট, ফেরু, ফেরেঙ্কা, ফেরেব, ফেরেব্বাজ, ফেরেব্বাজি, ফেসাদ, ফেসাদে, ফৈজত, ফৈজতি, ফৈদ, ফৈরাদ, ফৈরাদি(দী), ফোই, ফোড়ে, ফোতা, ফোতো, ফোস্কা, ফৌজ, ফৌজদার, ফৌজদারী, ফৌত, ফ্যাটা, ফ্যাফ্যা, ফ্যাশন।

ফচফচ (ফচকিয়া, ফচকিয়ামি, ফচকে, ফচকেমি, ফচকেমো) : ২. **ফচ** = **ফ** *(পালনস্থিত) চয়িত যাহাতে।* **ফচফচ** = **ফচ**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ফচকিয়া** = **ফচ**-*করণ গতিশীলরূপে যায় যাহাতে।* **ফচকিয়ামি** = **ফচকিয়া** *সীমায়িত হইয়া গতিশীল বা সক্রিয় থাকে যাহাতে।* **ফচকে** = **ফচ**-*করণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **ফচকেমি** = **ফচকে** *সীমায়িত রূপে গতিশীল যাহাতে।* **ফচকেমো** = **ফচকেমি***র আধার যে।* ৩. **ফচকে** = দুঃশীল, বকাট, পাকা। **ফচকেমো** = পাকাম। (ব.শ.)। **ফচফচ** = বাচালতা, প্রগল্ভতা, ক্রমাগত বিরক্তিকর ও অবান্তর কথা বলা। **ফচকে, ফচকিয়া** = ফাজিল, বাচাল, ফক্কড়া, লঘুপ্রকৃতি, চটুল। **ফচকেমি, ফচকিয়ামি** = বাচালতা, ফচকের ভাব। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এ শব্দগুলি বাংলাভাষীর সাম্প্রতিক কালের সৃষ্ট নিজস্ব শব্দসম্ভারের কয়েকটি। পাকা কলা বা আমে পা পড়ে গেলে তার ভেতরের নরম অংশ **ফচ** করে বেরিয়ে আসে। সরু গর্তে খানিকটা জল থাকলে, তাতে যদি খুঁটি পোঁতার চেষ্টা করা হয়, খানিকটা

কাদামিশ্রিত জল **ফচ** করে বেরিয়ে আসে। বাংলাভাষীরা একে '**ফচ** করে' বেরিয়ে আসা বলেন কেন? প্রতীকী ভাষাবিদগণ একে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে দিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছেন, ঝামেলায় যাননি। কিন্তু ঐ ক্রিয়াটিকেই যে **ফচ** বলে, এবং তার সঙ্গে তদ্রূপ ধ্বনিরও যে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেই প্রসঙ্গেই তাঁরা যাননি। আমরা দেখছি, পায়ের বা খুঁটির ভার বা চাপ পালিত ও স্থিত (**ফ**) হয় বলেই তার থেকে তরল অংশ চয়িত (**চ**) হয়। তার মানে, কোনো সত্তার ভেতরে 'পালনস্থিতি' (**ফ্**) সক্রিয় হলেই (**অ**-কার যুক্ত হলেই) বা তাকে সক্রিয় করা গেলেই, তার থেকে কিছু একটা 'চয়িত' (**চ**) হয়ে থাকে এবং সেকারণেই তাকে **ফচ** বলে। তদ্রূপ **ফচ ফচ** করে বেরোয় বলেই বাচাল বা প্রগল্ভ মানুষকে **ফচকে** বলা হয় এবং তার আচরণটিকে **ফচকেমি** বলা হয়ে থাকে।

ফট্ (দ্র.স্ফট্) : **৫.** আগেই বলেছি, সংস্কৃত যুগে **ফ** বর্ণজাত শব্দের বিশেষ বিকাশ ঘটেনি, ঘটেছে পরবর্তীকালের মধ্যযুগে। সংস্কৃত যুগে এর রূপ ছিল **স্ফ**। এ যেন ব্যাঙাচি। সংস্কৃত উত্তরাধিকার রূপে সেই **স্ফ**-যুক্ত বহু শব্দ বাংলাভাষায় এখনও রয়েছে, **স্ফট, স্ফুট, স্ফর, স্ফুর** ... ইত্যাদি। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বাংলায় পৌঁছে সে তার লেজ খসিয়ে সাবালক হয়ে পরিণত হয়েছে **ফ**-এ। (মনে রাখা দরকার, ইংরেজি ভাষাও এই ব্যাঙাচিকে প্রায় হুবহু ব্যাপকভাবে ধরে রেখেছে। তার সমস্ত sp-, sph-, sf- যুক্ত প্রচুর শব্দ সেই ব্যাঙাচিরই উত্তরাধিকার। যথা — space, speed, sphere, sforzando ... ইত্যাদি। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে তারাও ব্যাঙাচিকে ব্যাঙে পরিণত করে নিয়েছে। যেমন sforzando হয়ে গেছে forzando, স্ফোটন হয়ে গেছে photon)। ...

যাই হোক, এই **ফ**-এর ক্ষেত্রে সংস্কৃতে দুটি ক্রিয়াপদের উল্লেখ আছে — **স্ফট্** ও **স্ফুট্**। তাতে শব্দ সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। কিন্তু বাংলায় তা পরিণত হয়েছে **ফট** ও **ফুট**-এ। আর সেই **ফট** ও **ফুট** পরিবারে অজস্র শব্দের জন্ম হয়েছে। যথা — ফট্কা, ফটক, ফটকিরি, ফটরফটর, ফটাফট, ফটিক, ফাট, ফাটক, ফাটল, ফাটা, ফাটাফাটি, ফুট, ফুটকি, ফুটন, ফুটন্ত, ফুটফুটে, ফুটা (ফোটা, photon), ফুটান, ফুটানি, ফুটো, ফোঁটা, ফোট, ফোটা, ফোটান ... ইত্যাদি। এদের আমরা **স্ফট্ (স্ফুট্)** শব্দ পরিবারের ভুক্তিতে, **স** বর্ণে অন্তর্ভুক্ত করেছি। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এবং শব্দার্থগুলির অর্থ বোঝার সুবিধার জন্য শব্দগুলিকে সেখানেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ... **৬.** ইংরেজি photon।

ফড় (ফড়ফড়, ফড়িং, ফড়িংচোষা, ফড়িংপেয়ে) : **২. ফড়** = *ফ-এর (পালনস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ফড়ফড়** = *ফড়-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ফড়িং** = *ফড়-এর গতিশীল রহস্যরূপ যাহাতে।* **ফড়িংচোষা** = **ফড়িং** *যাহাকে চুষিয়া খাইয়াছে।* **ফড়িংপেয়ে** = **ফড়িং**-*এর মতো পা যাহার।* / **ফড়িংচোষা** = যে ধানের রস ফড়িঙে চুষিয়া খায়। (ব.শ.)। **৩. ফড়** = মেলায় জুয়ার আড্ডা, গোরুর গাড়ীর পাটাতনের পাশের লম্বা বাঁশ। **ফড়ফড়** = পাখীর পাখার শব্দ, কানে পিঁপড়া নড়ার শব্দ, অনর্গলভাব, ফড়ফড় করে বলা। **ফড়িং (ফড়িঙ, ফড়িঙ্গ)** = পতঙ্গবিশেষ (grasshopper)। **ফড়িংপেয়ে** = দীর্ঘজঙঘ (লোক)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র : **ধড়ফড়**। অদৃশ্য **ফ**-কারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে থাকে, তাকে **ফড়** বলে। অদৃশ্যলোকে সেরকম **ফড়**কে বাংলাভাষী দেখেছিলেন মানুষের **ফড়ফড়** করে কথা বলায়, জুয়ার আড্ডায় এবং দৃশ্যলোকে দেখেছিলেন **ফড়িং**-এর পাখনা নাড়ায়, কানের ভিতরে পোকার নড়ানড়িতে। তাই তাঁরা এই ক্ষেত্রগুলিতে **ফড়, ফড়ফড়, ফড়িং** প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। তবে যদিও আমাদের লক্ষ প্রজাতির ধানের চাষ ছিল, তাদের প্রত্যেকের স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে নামও ছিল (দ্র. **শালীধান্য**), কিন্তু এমন কোনো ধান ছিল না, যার নাম **ফড়িংচোষা**। তবে, যে কোনো ধানের, তা সে কলমা, দুধকলমা, নেবুশাল, রূপশাল যে ধানই হোক, অনেক সময় **ফড়িং** তার রস চুষে নিয়ে সেগুলিকে আগড়ায় পরিণত করে দেয়। গ্রামবাংলার মানুষ তেমন 'ফড়িঙে-চুষে আগড়ায় পরিণত করা ধান'কে **ফড়িংচোষা** ধান বলেন। কিন্তু এটি কোনো বিশেষ প্রজাতির ধানের নাম নয়। যে কোনো ধানই **ফড়িংচোষা** ধানে পরিণত হতে পারে।

ফষ্টি (ফষ্টিনষ্টি) : **২. ফষ্টি** = **ফষ্ট** *(পালনস্থিতের দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ টঙ্কারিত যাহাতে) গতিশীল যাহাতে।* **ফষ্টিনষ্টি** = **ফষ্টি** ও **নষ্টি** *(***নষ্ট** *গতিশীল যাহাতে)।* **৩. ফষ্টি (ফষ্ঠি)** = নষ্টামি, অশিষ্টাচার, ফাজলামি, রঙ্গরস, হাস্যকৌতুক। **ফষ্টিনষ্টি** = নষ্টামি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** প্রচলিত অভিধানগুলিতে **আশেপাশে** শব্দের মতো **ফষ্টিনষ্টি** শব্দটিরও সর্বনাশ করে রাখা হয়েছে। **ফষ্টি** ও **নষ্টি** শব্দ দুটির বলতে গেলে তাঁরা একটাই মানে বাঁচিয়ে রেখেছেন — হাস্যকৌতুক বা নষ্টামি। বাংলাভাষী যখন বলেন, 'ছেলেটি পুজোমণ্ডপের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলির সঙ্গে **ফষ্টিনষ্টি** করছে', তখন এই **ফষ্টিনষ্টি**র মানে কি কেবল হাস্যকৌতুক বা নষ্টামি? আর কিছু নয়? ...

প্রকৃতপক্ষে **ফষ্টি** ও **নষ্টি** দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ, পৃথক অর্থধারী এবং খানিকটা পরস্পরবিরোধী। **ফষ্টি** শব্দটির ভিতরে রয়েছে **ফঁস্**-করণের (দ্র. **ফঁ, ফণ, ফাঁস**) অবিবর্তিত মূল রূপ — **ফশ**। এর অর্থ হতে পারে **ফ**-এর (পালনস্থিতের) সার্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ। (**শ, ষ, স** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য)। **নশ্** ক্রিয়া তারিত হয় যাহাতে তাকে যেমন **নষ্ট** বলে, তেমনি **ফশ্** ক্রিয়া তারিত হয় যাহাতে তাকে **ফষ্ট** বলা যায়। এই **ফশ, ফষ, ফষ্ট** প্রভৃতি অচেনা শব্দগুলির কাছাকাছি যে শব্দগুলিকে আমরা সবাই কমবেশি চিনতে পারি, সেগুলি হল — **ফঁস** করা ও **ফস** করা, **ফসকান** বা **ফসকে** যাওয়া। আমরা জানি, যার প্রতি **ফঁস** করা হয়, তার পক্ষে সেটি বিপজ্জনক বলে মনে হয়। তার মানে, **ফঁস**-এর ভিতরে একটা আক্রমণ বা ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু **ফস**-এর বেলায় সেই সম্ভাবনা থাকে না, সত্তার ভিতর থেকে হঠাৎ কোনো ইচ্ছাদি বেরিয়ে বিপরীত পক্ষের দিকে যায়; যা আর যাই হোক, ক্ষতিকর নয়। **ফষ্**-এর বেলায় সেই ইচ্ছাদির অনেক গভীর বাস্তব রূপ থাকে। সেটি খানিকটা আবেগপূর্ণ কথাবার্তা হতে পারে, পুষ্পস্তবকদান হতে পারে ... এমনকি

আকস্মিক চুম্বনও হতে পারে। কিন্তু **নষ্টি**র মধ্যে নাশ করার চেষ্টা সক্রিয় থাকে। অতএব **ফষ্টি-নষ্টি** করার অর্থ দাঁড়ায় একদিকে স্তুতি করা, খাতির করা, সেবা করা, ভজনা করা, সম্মত করার চেষ্টা করা, তার জন্য সেগুলির বাস্তব রূপগুলির ব্যবহার করা, যথা ফুল রুমাল শাড়ি ... চুম্বন ইত্যাদি দেওয়া; অপরদিকে ক্ষতি করা, কিছু নিয়ে নেওয়া, ঠকান ... **নষ্ট** করার চেষ্টা করা। মোটকথা **ফষ্টি-নষ্টি** শব্দের সদর্থক মানে এককথায় 'সম্মত করা কিংবা ঠকান'; আর নঞর্থক মানে হল 'ফাঁসানো কিংবা নষ্ট করে দেওয়া'। ... ৬. ইংরেজি foster, nasty।

ফস (ফসকা, ফসকান, ফসল, ফসলী, ফাসফুস, ফাসা, ফাসুরফুসুর, ফিসফাস, ফিসফিস, ফিসফিসানি, ফুস, ফুসফাস, ফুসফুস, ফুসফুসানি, ফুসলা, ফুসলান, ফুসুরফাসুর, ফুসুরফুসুর, ফোসকা) : ২. ***ফস*** = ***ফ****-এর (পালনস্থিত-এর) নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে।* ***ফসকা*** = ***ফস*** *করে যে, তাহার আধার।* ***ফসকান*** = ***ফসকা*** *অন (on) যাহাতে।* ***ফসল*** = ***ফস*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***ফসলী*** = ***ফসল****-এর গতিশীল আধার যে।* ***ফাসফুস*** = ***ফাস*** *(****ফস*** *হইতে জাত) ও* ***ফুস*** *(নিম্নে দ্রষ্টব্য),* ***ফাসা*** = ***ফাস****-এর আধার যে।* ***ফাসুরফুসুর*** = ***ফাসুর*** *(****ফাস*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে) ও* ***ফুসুর*** *(****ফুস*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে)।* ***ফিসফাস*** = ***ফিস*** *(গতিশীল* ***ফস*** *যাহাতে) ও* ***ফাস****।* ***ফিসফিস*** = ***ফিস****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ফিসফিসানি*** = ***ফিসফিস****-এর আধার গতিশীল (সক্রিয়) হয়ে অন-কৃত যাহাতে।* ***ফুস*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ* ***ফ****-করণের নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে।* ***ফুসফাস*** = ***ফুস*** *ও* ***ফাস****।* ***ফুসফুস*** = ***ফুস****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ফুসফুসানি*** = ***ফুসফুস****-এর আধার গতিশীল হয়ে অন-কৃত যাহাতে।* ***ফুসলা*** = ***ফুস*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে যাহাতে।* ***ফুসলান*** = ***ফুসলা*** *অন (on) যাহাতে।* ***ফুসুরফাসুর*** = ***ফুসুর*** *ও* ***ফাসুর****।* ***ফুসুরফুসুর*** = ***ফুসুর****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ফোসকা*** = ***ফোস*** *(****ফুস****-এর বাস্তব আধার) কৃত যাহাতে। /* **ফসকা** = যাহা ফসকায়। (ব.শ.)। ৩. **ফস** = শিথিলতাজন্য শব্দ, শীঘ্রতা, দ্রুতভাব। **ফসকা** = শিথিলতা হেতু খুলিয়া যাওয়া, ছাড়াইয়া যাওয়া, হাতছাড়া হওয়া, পিছলাইয়া বা সরিয়া পড়া। **ফাসফুস, ফাসুরফুসুর, ফিসফিস** = চুপে-চুপে কথা বলার শব্দ। **ফুস** = অসার, অকিঞ্চিৎকর, মিছা, মৃদুভাষণের শব্দ। **ফুসফাস** = ফুস, গোপনে পরামর্শ। **ফুসফুস** = ক্রমাগত 'ফুস' শব্দ; শ্বাসযন্ত্র। **ফুসফুসানি** = মৃদুভাষণ। **ফুসলা, ফুসলান** = ফুস ফুস করিয়া কথা বলা, গোপনে পরামর্শ দিয়া স্বপক্ষে আনা, ভুলানর কথা বলা, ফুস-ফুস শব্দ করা। **ফুসুরফাসুর, ফুসুরফুসুর** = মৃদুভাষণের শব্দ, কানাঘুষা (whispering), চুপে চুপে। **ফোসকা** = দাহাদিজন্য জলীয়পদার্থপূর্ণ স্ফোটকবিশেষ (blister)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ফাঁস**। সন্দেহ নেই যে, **ফসল** ও **ফসলী** বাদে বাকি শব্দগুলি সবই বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। বাংলার মনের মাটি ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবোধের দ্বারা এমন গভীরভাবে জারিত হয়ে আজও বলবৎ রয়েছে যে, সারি দিয়ে কত শব্দই না বাংলাভাষী সৃজন করে নিতে পেরেছেন। তাছাড়া বজ্র আঁটুনি **ফসকা** গেরোর কথা আমরা কে না জানি। ...

কিন্তু **ফসল** ও **ফসলী** শব্দদুটি কি আরব থেকে আসার পরই বাংলাভাষী শব্দদুটি ব্যবহার করতে শিখেছে? সাধারণ বাংলাভাষীদের জিজ্ঞেস করুন, তাঁরা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না যে, এ-দুটি তাঁদের নিজেদের ভাষার শব্দ নয়, আরব থেকে এসেছে এবং তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সেগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে নিজেদের করে নিয়েছিলেন বলেই এখন সেগুলি বাংলা শব্দ হয়ে গেছে। একথায় তাঁদের বিশ্বাস হতে চাইবে না। কারণ, ভেবে দেখলে বাংলাভাষী তো **ফস** ও তার পরিবারের অজস্র শব্দকে নিজেরাই অর্জন করেছেন। আসলে বাংলার মনের মাটি লাউ চিচিঙ্গা পটল করলা প্রভৃতি তরকারির জন্ম দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল, এমন সময় এসে গেল ঝিঙা। বাংলাভাষী তাকে আপন করে নিতে দ্বিধা করেনি। সে না এলেও ক'দিন পরে নিজে থেকেই জন্মাত, মাটি তৈরি হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু এসেই যখন পড়েছে, তখন দেরি করে আর লাভ কি, তাকেই নিজেদের ভূমিতে চাষ করে নেওয়া যাক। এই হল সেই কারণ যেজন্য **ফসল** ও **ফসলী** শব্দকে ঘরের ছেলে ভেবে নিতে বাংলাভাষীর অসুবিধা হয়নি।

ফত (ফতকা, ফতুয়া, ফতুর, ফতে, ফাতনা, ফাতা, ফাতাড়্, ফ্যাতাড়্) : ২. ***ফত*** = ***ফ*** *(পালনস্থিত) তারিত যাহাতে।* ***ফতকা*** = ***ফত*** *কৃতের আধার যে।* ***ফতুয়া*** = ***ফ****-তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায় যাহাতে।* ***ফতুর*** = ***ফ****-তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রয় যাহাতে।* ***ফতে*** = ***ফ****-তারণ গতিশীলভাবে দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***ফাতনা*** = ***ফত****-জাত অন থাকে যে আধারে।* ***ফাতা*** = ***ফত****-জাতর আধার যে।* ***ফাতাড়্*** = ***ফাতার*** *গড়ান-উড়ান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ফ্যাতাড়্ (ফেতাড়্)*** = *যে* ***ফাতাড়্*** *দিশাগ্রস্ত।* ৩. **ফতুয়া** = হাতকাটা কোমরপর্য্যন্ত-ঝুল ছোট জামা। **ফতুর** = নির্ধন, সর্ব্বস্বান্ত। **ফতে** = জয়, সফলতা, সিদ্ধি (**ফতে হওয়া** = পরাজিত হওয়া)। **ফাতনা, ফাতা** = ছিপের সূতায় বাঁধা ভাসমান পাখনা শর ইত্যাদির খণ্ড। (ব.শ.)। **ফত** = গুরুত্বহীন, হালকা, ফালতু। **ফতকা** = সামান্য হাওয়ার আঘাতে ছিটকে যাওয়া, লতপত করে পড়ে যাওয়া, ফাতনার মতো ডোবা ওঠা (**ফতকে** যাওয়া = ফতকান)। **ফাতাড়্, ফ্যাতাড়্ (ফেতাড়্)** = শুকনো পাতার মতো গড়ায় ওড়ে এবং পড়ে যায় যে, তেমন গুরুত্বহীন **অযোগবাহ** ফালতু মানুষ। সম্প্রতি **ফ্যাতাড়্** নামে একটি বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হযেছে। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ফে**। এখনও বাংলাভাষী নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন। সদ্যসৃষ্ট তেমনি একটি শব্দ হল **ফত**। এর অর্থ সহজে বোঝা যায় **পতপত** ও **ফতফত** শব্দদুটির তুলনা করলে। **পতপত** করে পতাকা ওড়ে, পাখি ডানা ঝাপটে ওড়ে; কিন্তু ছেঁড়া পতাকা, ফাটা-কাটা জামা, বাণবিদ্ধ পাখি — এরা কেউই ঠিকঠাক উড়তে পারে না, যেভাবে ওড়ে তাকে '**ফতফত** করে ওড়ে' বলা যায়। কিংবা **পটকে** দেওয়া, **পতকে** দেওয়া (পতিত করা), এবং **ফতকে** দেওয়া — এই তিনটি শব্দ তুলনা করলেও আমরা টের পাই, শব্দগুলি প্রায় একই ক্রিয়ার তিনরকম রূপের কথা বলছে। সামান্য আঘাতে ছিটকে পড়ে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া বাংলাভাষীকে পরে বলতে শোনা যায়,

'রিকশার ধাক্কায় আমি তো **ফতকে** গেছি, ওরা চেঁচামেচি করছে ...' ইত্যাদি। এই যে **ফত** হওয়া, **ফতকা**, **ফতকান**, এসব শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থগুলির যথাযথ ব্যবহার দেখা যায় তথাকথিত আরবি শব্দ **ফতে**, **ফতুয়া**, **ফতুর** প্রভৃতি শব্দে। **ফাতনা**, **ফাতাড়ু**, **ফ্যাতাড়ু**, **ফেতাড়ু** তারই সর্বশেষ বিবর্তিত রূপ। ... ৬. ইংরেজি feather।

ফার (ফারক, ফারখত, ফারখতি, ফারল, ফারাক) : ২. *ফার* = **ফর** *(ফনী বা পাকস্থিতি রহে যাহাতে) হইতে জাত।* **ফারক** = **ফার** *কৃত যাহাতে।* **ফারখত** = **ফার**-*এর* **খত** *(সিদ্ধান্ত লিখিত) যাহাতে।* **ফারখতি** = **ফারখত** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **ফারল** = **ফার**-*এর লালন-লয়ন থাকে যাহাতে।* **ফারাক** = **ফারক** *হইতে জাত।* **৩. ফার** = বিদারিত, ভিন্ন, খণ্ডিত, ভেদপূর্ব্বক নিঃসৃত; বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, ফাড়া। **ফারক, ফারগ, ফারাক** = প্রভেদ, দূর (distance), পৃথক, ভিন্ন। **ফারখত, ফারখতি** = সম্বন্ধত্যাগপত্র, মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র, সম্বন্ধচ্ছেদ। **ফারল** = বিস্ফারিত। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আলাদা করা বা পৃথক করার এই ক্ষেত্রের মূল ক্রিয়াটির আদিম উত্তরাধিকারকে সংস্কৃতকারগণ **স্ফর** ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা সেই আদিম উত্তরাধিকারকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে far রূপে; কিন্তু আরবি পেয়েছে **ফর্‌ক্‌** এবং ফারসি পেয়েছে **ফরাখ** রূপে। বাংলা নিজের **স্ফর**-এর উত্তরাধিকারকে **স্ফল**-এর সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে বি**স্ফারি**ত করা থেকে নিয়ে গেছে **ফাড়ায়**, **ফালা ফালা** করায়, এবং তার 'র ল অভেদ' নীতির দৌলতে **ফালা, ফাড়া, ফারা**র মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেনি। সেই '**ফারা** করে যে', তাকে তার নিজের নিয়মে **ফারাক** বলার কথা। কিন্তু ততদিনে আরবের শাসন এসে পড়ল। বাংলাভাষী তার নিজের সন্তান **ফারক, ফারাক**-এর জন্য তার অভিধানে যে দুটি কুঠরী বানিয়ে রেখেছিল, সেখানে ঢুকে পড়ল আরবির **ফর্‌ক্‌**। বাংলাভাষী তাকেই বাঙালির জামাকাপড় পরিয়ে **ফারাক** বানিয়ে সেই ঘরেই স্থান দিয়ে দিল।

ফির (ফিরঙ্গ, ফিরত, ফিরা, ফের, ফেরি, ফেরী, ফেরীওয়ালা, ফেরীঘাট, ঘোরাফেরা) : ২. *ফির* = **ফ** *(ফনীর বা পালনস্থিতির পুনরাবৃত্তি) গতিশীল হয়ে রহে যাহাতে।* **ফিরঙ্গ** = **ফির** *(ঘুরে-ফিরে বেড়ায়) অঙ্গ যাহার।* **ফিরত** = **ফির** *তারিত যাহাতে।* **ফিরা** = **ফির**-*এর আধার যে।* **ফের** = **ফ** *এক দিশায় গতিশীল রহে যাহাতে।* **ফেরি** = **ফের** *গতিশীল যাহাতে।* **ফেরী** = **ফেরি***র আধার যে।* **ঘোরাফেরা** = **ঘুরা***র ও* **ফিরা***র আধার যে।* **৩. ফির (ফের)** = পুনর্ব্বার, আবার, প্রত্যাবৃত্ত হওয়া, পরাবৃত্ত বা তদভিমুখ হওয়া (to turn), ঘূর্ণিত হওয়া, পরিবর্ত্তিত হওয়া, ইতস্তত ভ্রমণ করা, পরিক্রমণ করা (to go round)। **ফিরঙ্গ** = ম্লেচ্ছদেশভেদ, রোগবিশেষ। **ফিরত (ফেরত)** = প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত, অস্বীকৃত, প্রত্যর্পিত, প্রত্যাবর্ত্তন। (**ফিরত ডাক** বা **ফেরত ডাক** = প্রত্যাবৃত্ত বা পরবর্তী ডাক যাহা ফিরিয়া আসে।) **ফিরা** = প্রত্যাবর্ত্তন-ইত্যাদি, পুনঃ, পরবর্তী, প্রত্যাবৃত্ত করা, আবর্ত্তিত করা, ঘুরান, পাক দেওয়া (to whirl), পরিবর্ত্তিত করা, পরিক্রমণ করান, চারিদিকে ঘুরান। **ফিরিস্তি** = সূচী, তালিকা, ফর্দ্দ। **ফের** = পরিবর্ত্তন, ভেদ, বেড়, ঘুর, বেষ্টন, ঘের, বৃত্তের পরিধির বেষ্টন, ভ্রম, দুর্বিপাক, কূটকৌশল, পেঁচ, বিঘ্ন, ফন্দি, কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা ...। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. আশেপাশে** ... প্রভৃতি জোড়শব্দের ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই দেখি, একটির মানে ফেলে দিয়ে দুটি শব্দকে সমার্থক করে ফেলা হয়েছে। তবে কোনো কোনো জোড়শব্দ এখনও আছে, যার দুটো মানেই কমবেশি বেঁচেবর্তে রয়েছে। তাদেরই একটি হল **ঘোরাফেরা**। বৃত্তের পরিধি ধরে ধরে চলাকে বলে **ঘোরা** (দ্র. **ঘুর, ঘুম**), আর, কোনো স্থানে গিয়ে পুনরায় সেখানে থেকে যাত্রাবিন্দুতে চলে আসাকে বলে **ফিরা**। এর সঙ্গে **পার** হওয়া ক্রিয়াটির গভীর সম্পর্ক আছে। কার্যত **পার** ক্রিয়াটি গতিশীল হয়ে স্থির রূপ নেয় বলেই **পার** শব্দটিই **ফির** শব্দে পরিণত হয়েছে। ক-স্থান থেকে খ-স্থানে যাওয়া এবং পুনরায় খ-স্থান থেকে ক-স্থানে যাওয়া — এই কর্মের পুনরাবৃত্তিকে বলে **ফিরা, ফিরে ফিরে আসা** ইত্যাদি। কোনো কালে সেরকম ফিরে ফিরে আসত যারা, তাদের নাম হয়ে যায় **ফিরঙ্গ** ইত্যাদি। কিন্তু এই যে **ফিরে ফিরে** যাওয়া-আসা, এ তো একধরনের **ফেরে** পড়াও বটে!

ফের শব্দটির বিশেষত্ব হল, এটি কেবল ঘোরাফেরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, অদৃশ্যলোকে এর বিপুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। লোকে **ফেরে**ব্বাজির **ফেরে** পড়ে, **হেরাফেরি** করে। আবার, নদীর এপার থেকে ওপারে ফিরে ফিরে আসে যে নৌকা, সে যেমন **ফেরি**-পারাপার করে বলে তাকে **ফেরী**-নৌকা এবং তার ঘাটকে **ফেরী**-ঘাট বলে, তেমনি যে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে ফিরে ফিরে আসে সেও **ফেরি** করে, তাই তাকে **ফেরী**ওয়ালা বলে।

ফে (ফেউ, ফেফাতুড়া, ফেরু) : ২. *ফে* = *দিশাগ্রস্ত যে ফনী।* **ফেউ** = **ফে** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **ফেফাতুড়া** = **ফে**-*কারী* **ফাতুড়া** *(**ফত**-জাত'র নবরূপায়ণের গড়ান-উড়ানের আধার)।* **ফেরু** = **ফে**-*রহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **ফেরু** = যে রব করে যে। (ব.শ.)। **৩. ফে** = ফেরুরব, শিয়ালের ডাক। **ফেউ** = ফে, শৃগাল। **ফেফাতুড়া (ফেফাতুরা)** = অসহায় ও আতুর। **ফেরু** = শৃগাল। (ব.শ.)। **৪. ফেরু** বাদে বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** এখনকার উচ্চারণে বলা হয় 'ফে ফে করে ঘুরে বেড়ান' বাক্যের অর্থ সব বাংলাভাষীই বোঝেন। অনেকে উচ্চারণ করেন 'ফ্যা ফ্যা করে ...'। কিন্তু মানেটা সবাই একরকমই বোঝেন। কী বোঝেন?

যাই বুঝুন, রামবাবুর পেছনে পেছনে কেউ যদি ফে ফে (বা ফ্যা ফ্যা) করে ঘুরে বেড়ায়, রামবাবু বলতেই পারেন, 'আমার পেছনে **ফেউ** লেগেছে।' তবে '**ফেউ** লাগা'র এই ধারণাটি বাংলাভাষীর কথাবার্তায় এসেছে 'বাঘের পেছনে **ফেউ** লাগা'র ধারণা থেকে। বনবাসী মানুষেরা জানেন, এই **ফেউ** একপ্রকার আমিষাশী ক্ষুদ্র জন্তু, দেখতে শেয়ালের মতো হলেও আকারে কাঠবেড়ালির চেয়ে একটু বড়ো এবং অধিকাংশ সময় গাছে গাছে ঘোরে। এই জন্তুটি বাঘের পেছনে পেছনে গাছ থেকে গাছে ঘোরে, ফেউ ফেউ ডাকতে থাকে, উদ্দেশ্য বাঘটি কোনো শিকার ধরলে

ফেউ তার পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট রক্তমাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু উলটা ফল এই হয় যে, বনবাসী জীবেরা **ফেউ**-এর ডাক শুনলেই বুঝে যায়, ধারেকাছে বাঘ-বাবাজী এসে গেছেন। অতএব তারা যে যার প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেয়। এভাবে প্রকৃতি যদি বাঘের পেছনে **ফেউ** লাগিয়ে না রাখতেন, বন্যপশুদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যেত না; অধিকাংশ পশুকেই বাঘে খেয়ে নিত। ...

সমাজেও কি এরকম বাঘের পেছনে **ফেউ** লাগানো আছে? এ প্রশ্নটি ওঠে তখনই যখন আমরা ভারত দখলকারী ব্রিটিশ বণিকের পিছু পিছু উইলিয়াম কেরী, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতি এক শ্রেণীর ইংরেজ বা পশ্চিম দেশের প্রতিনিধিকে দেখি। এঁরা ব্রিটিশ বাঘের উচ্ছিষ্টে পালিত হলেও, তথাকথিত 'আলোকপ্রাপ্তির তত্ত্ব' প্রচার করে আমাদেরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। এও কি প্রকৃতির বিচিত্র লীলা নয়! **৬.** ইংরেজি fey।

ৰ, ব

ৰ, ব্ বর্ণের অর্থ : ৰ = (b) ব্-অন করে যে; অতিবাহী; **ব** = 'উঅ' = ব্ (v), ওঅ (w) = ব্-অন করে যে; বাহী।

ইংরেজি সহ অনেক ভাষাতেই এই 'ব' বর্ণের দু-তিনরকম রূপের পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। বাংলার বর্ণমালায় **প**-বর্গের **ৰ** (বর্গীয় 'ব') এবং **য, র, ল**-র পরবর্তী **ব** (অন্তঃস্থ 'ব'), এই দুরকম 'ব' থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুটো 'ব'কেই একইভাবে লেখা ও উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃতকারগণ দুরকম 'ব'কে দুরকম ভাবে লিখতেন — দেবনাগরী লিপিতে পেটকাটা ব (ৰ) এবং সাধারণ ব (ব), এবং দুরকমভাবে উচ্চারণও করতেন। হিন্দিভাষা তার উত্তরাধিকার আজও বহন করছে। অভিধান বা শব্দকোষ রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতকারগণ দুই 'ব'-এর পৃথক অবস্থান যথারীতি বজায় রেখেছেন। বাংলাভাষার প্রাচীন অভিধানকারগণ সংস্কৃত রীতি অনুসরণ করে বর্গীয় 'ব'কে রেখেছেন **ফ**-এর পরে, এবং অন্তঃস্থ 'ব'কে রেখেছেন **ল**-এর পরে। ছাত্রবোধ অভিধানও সেই রীতি অনুসরণ করেছেন। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেই রীতি অনুসরণ করেননি। তিনি তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে অন্তঃস্থ 'ব'-কে **প**-বর্গের অধীনে বর্গীয় 'ব'-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। তবে, কোনটি বর্গীয় 'ব' আর কোনটি অন্তঃস্থ 'ব', তা চিহ্নিত করার একটা ব্যবস্থা করে গেছেন ভুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিটি শব্দের পরে পরেই তিন রকম চিহ্ন ব্যবহার ক'রে। আমরা নানা কারণে এ বিষয়ে শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুসরণ করাই উচিত মনে করেছি। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে কমপিউটারে একরকম 'পেটকাটা ব' লেখা যায় — **ৰ**। তবে সবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ আমরা করছি না, কেবল ভুক্তির ক্ষেত্রে শব্দের প্রারম্ভিক 'ব'টি বর্গীয় 'ব' হলে সেক্ষেত্রেই আমরা **ৰ** লিখে তাকে 'বর্গীয়-ব' রূপে শনাক্ত করে যাচ্ছি। কেন এরকম করছি আমরা, **ৰ** ও **ব**-এর অর্থের পার্থক্য এবং সমধর্মিতা থেকে সেকথা বোঝা যাবে।

আমাদের বিচারের মূল হল শব্দের ও বর্ণের অর্থ। আমরা দেখছি, বাংলা বর্ণমালায় বর্ণগুলি সাজানোর ক্ষেত্রে বর্ণার্থের এক প্রকার ক্রম মান্য করা হয়েছে। কোনো কাজ করা (**ক**-বর্গ), কৃত কর্মফলকে চয়ন করা (**চ**-বর্গ), সেটি ঠিকঠাক হলে তার টঙ্কারিত হওয়া (**ট**-বর্গ), এবং তারপর কর্মফলটি তারিত হয়ে (**ত**-বর্গ) প্রদত্ত (**দ**) ও ধারিত (**ধ**) হওয়াই স্বাভাবিক। অতঃপর সেই কর্মফল লাভ করা বা পাওয়া বা পালন করা (**প**) ও পালনস্থিতকরণ করাও (**ফ**) স্বাভাবিক। তারপর আসতে পারে সেই গৃহীত-পালিতের (বা উৎপাদিতের বা দ্বৈতাদ্বৈত সন্তাটির) বয়ন-বর্ধন-বহন ... প্রভৃতি ক্রিয়ার কথা বা **ৰ**-এর কথা। অর্থাৎ, **ৰ**-এর অর্থ হতে পারে '(দ্বৈতাদ্বৈত সন্তাটিকে) বৃদ্ধিসাধনপূর্বক বহন করা'। ওদিকে অন্তঃস্থ **ব** বর্ণটি তৈরি হয়েছে উ বা ঊ + অ প্রভৃতি স্বরবর্ণ যোগ করে, যার মানে দাঁড়ায় মূলত 'তুলে রাখা', তা সেটি কাঁধে তুলে রাখা হোক বা অন্য কোনো স্থানে তুলে রাখাই হোক। লোকে বহন করার সময় যাকে বহন করে তাকে তুলে মাথায়, কাঁধে, পিঠে ... রাখে। সেক্ষেত্রে অন্তঃস্থ **ব** মানে হয়ে যায় 'বহন করা'। কিন্তু এর একটি অন্য প্রতিক্রিয়াও থাকে। কাউকে তার প্রবহমান স্তর থেকে তুলে অন্য কোনো স্তরে বাহিত করার মানেই দাঁড়িয়ে যায়, প্রচলিত পথ থেকে সরে তাকে নতুন পথের পথিক করে দেওয়া। তার মানে অন্তঃস্থ-**ব** প্রচলিতের পাশাপাশি অন্য পথের দিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে দিয়ে কার্যত দুরকম পথের কথাও বলে দিচ্ছে। একে আমরা সরাসরি পাই **বা** কিংবা অথবা শব্দে, যেখানে আমরা 'এটা' এবং 'ওটা' দুটোকেই **বা**-এর দুদিকে পেয়ে যাই। **বনাম** (= অন্য নাম) শব্দে সেই **ব**-কে আমরা পাই 'অন্য' অর্থে। তার মানে, অন্তঃস্থ-**ব** একই সঙ্গে 'দুই' অর্থটিকেও তার ভিতরে অব্যক্ত ভাবে ধরে রাখে। কীভাবে তা ধরে রাখে, সেকথা আমরা বিস্তারিত করেছি **দ্বি** শব্দে (১ম খণ্ড দ্র.)। তার মানে, এই **ব**-তেও একপ্রকার দ্বৈত রয়েছে।

সুতরাং **ৰ** ও **ব**-এর মধ্যে পার্থক্য হল, **ৰ** বৃদ্ধিসাধনপূর্বক (দ্বৈতাদ্বৈতকে) বহন করে; আর, **ব** শুধুই (দ্বৈতাদ্বৈতকে) বহন করলেও জানিয়ে রাখে যে কার্যত বহনের পথ দুরকম এবং সেই বহন সে প্রচলিত পথে চালায় না, নতুন পথ ধরে বহন করে নিয়ে চলে। স্বভাবতই **ৰ** ও **ব**-এর সমধর্মিতা হল উভয়েই বহন করে। অর্থাৎ, **ৰ** অতিবহন করে, **ব** শুধুই বহন করে, কখনো-বা দ্বিতীয় পথে। এবং সন্দেহ নেই দৃশ্য-বহনকে বোঝানো এর উদ্দেশ্য ছিল না, অদৃশ্য-বহনই ছিল উভয়প্রকার 'ব'-এর উদ্দিষ্ট। সেই কারণে আমরা তাদের পৃথক মনে করি, আবার একজাতীয় ব্যাপার বলেও মনে করি। তাই আমরা **ৰ** মানে লিখছি 'অতিবাহী', এবং **ব** মানে লিখছি 'বাহী'। যেহেতু উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা তাদের সবসময় পৃথকভাবে পাইনি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটোকে এক করে রাখা হয়েছে, তাই বহুক্ষেত্রে আমাদেরকে **ৰ** মানে 'অতিবাহী' ও 'বাহী' দুটো কথাই লিখতে হচ্ছে। কখনও বা **ব** মানে দুইরকমও লিখতে হচ্ছে। আবার **ৰ** ও **ব** একজাতীয় ব্যাপার বলে আমরা তাদের একই **ব** বর্ণের ভুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করছি, পৃথক ব্যাপার বলে প্রতিটি ভুক্তিগত বর্ণের প্রথম 'ব'-টি কোন প্রকারের 'ব', তা **ৰ** অথবা **ব** লিখে জানিয়ে রাখছি।

মনে রাখা দরকার মানুষের মনের গভীরে ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়ার স্বরূপকথক আওয়াজের যে দ্বৈরাজ্য প্রকৃতির নিয়মে সদা সক্রিয় রয়েছে, তার সব খবর সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। সংস্কৃতকারগণ কিছুটা পেরেছিলেন, কিন্তু তাও দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁদের সেই অর্জিত বোধ এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে, তাদের পৃথক করে বোঝা রীতিমতো কঠিন। খোদ ব.শ.-প্রণেতা তাঁর 'ব'-বর্ণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'ব'কে শনাক্ত করার জন্য তিনটি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তাতে বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। তার ওপর প্রাপ্ত তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশয়াচ্ছন্ন। পরবর্তীকালের সংস্কৃতকারগণের ও তাঁদের অনুসারী লেখকগণের লেখায় **ৰ** স্থানে **ব**, এবং **ব** স্থানে **ৰ** হওয়ার মতো অজস্র বিপর্যাস ঘটেছে। ফলে সব মিলিয়ে ব্যাপারটি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে রয়েছে। ...

আমরা সেই জটিলতর পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখতে পেয়েছি বাংলাভাষীর দুই **ব**-কে এক করে ফেলার ঘটনায়। বাংলাভাষীর মনের ভিতরেও তো প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম সদা সক্রিয় আছে। আছে বলেই তাঁরা দুই **ব**-কে এক করে ফেলা উচিত বলে

বিবেচনা করেছেন এবং কার্যত সেটাই করেছেন। আমরা দেখলাম, সেই এক করে ফেলার কারণটি রয়েছে **ৰ** ও **ব**-এর অর্থের ভিতরে একই ক্রিয়ার গভীর রূপ থেকে শুরু করে অগভীর রূপ পর্যন্ত সর্বরূপের ধারণক্ষমতায়।

অমরকোষ দুই প্রকার 'ব'কে কয়েকটি **ৰ**-অন্ত শব্দ ও কয়েকটি **ব**-অন্ত শব্দ দিয়ে অনেকটাই স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন। তাঁর মতে **অশ্ব গন্ধর্ব্ব কম্বু দ্বিজিহ্ব পূর্ব্ব** — এই শব্দগুলির শেষে যে 'ব'গুলি রয়েছে, তারা বর্গীয় **ৰ**। আর, **দব দাব ভব সচিব ধব অবি হব ভাব প্রসব নিহ্নব উৎসব অনুভাব প্রভব পারশব ধ্রুব স্ব নীবী শিবা দ্বন্দ্ব সত্ত্ব ক্লীব** — এই শব্দগুলির শেষে যে 'ব'গুলি রয়েছে, তারা অন্তঃস্থ **ব**। ইতোপূর্বে **অশ্ব গন্ধর্ব্ব** প্রভৃতি শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, এরা যা বহন করে তা সাধারণ বহন নয়, অতিবহন বা বিশেষ বহন। আজকের সমাজে যাদের executive বলা হয়, সেকালে তাঁদেরকেই **অশ্ব** বলা হত। তাঁরা সাধারণ বাহ্যিক বোঝা বহন করেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্তঃস্থ **ব**-এর উদাহরণস্বরূপ যে শব্দগুলি বলা হয়েছে, তাদের বহন ক্রিয়া সাধারণ বাহ্যিক বহন ক্রিয়া মাত্র; সেগুলির মূল উদ্দিষ্টও অদৃশ্য বহনই বটে। আগেই আমরা জেনেছি, দৃশ্য ব্যাপার নিয়ে প্রাচীন মানুষের মাথাব্যথা ছিল না। এই সেই পরিস্থিতি, যেখান থেকে উভয় 'ব'কে এক করে ফেলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ...

বামন শিবরাম আপ্তে-র Sanskrit English Dictionary-তে বর্গীয় ৰ-এ যে শব্দগুলি দেওয়া হয়েছে, তার মোটামুটি মূল শব্দগুলি হল — **ৰংহ, ৰক, ৰটু, ৰৎ, ৰদর, ৰদ্ধ, ৰধু, ৰন্দি, ৰন্ধ, ৰন্ধু, ৰর্বর, ৰর্হ, ৰল, ৰহু, ৰাঢ়, ৰাধ, ৰিন্দু, ৰিম্ব, ৰিল, ৰীজ, ৰীভৎস, ৰুদ্ধি, ৰৃংহ, ৰৃহৎ, ব্রহ্ম**। এর জন্য আপ্তে-মহাশয় মোট ১২ পৃষ্ঠা খরচ করেছেন। অন্য দিকে অন্তঃস্থ ব-এ তাঁর রয়েছে অজস্র শব্দ, যেগুলির জন্য তাঁকে মোট ৫৭ পৃষ্ঠা খরচ করতে হয়েছে। এর থেকে দুরকম 'ব'-জাত শব্দের অনুপাত বোঝা সম্ভব। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, **ৰংহ** ও **ৰৃংহ**-কে আপ্তে যেখানে বর্গীয় ৰ-এর অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন, বঙ্গীয় শব্দকোষে সেটিকে বলা হচ্ছে অন্তঃস্থ ব। ব্য.বা.অভিধান ঢাকা তাঁদের **ব** বর্ণের শব্দসমূহের অর্থদানের শেষে বর্গীয় ৰ ছাড়াও যে শব্দগুলি উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হয়, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এই রকম অজস্র সমস্যা রয়েছে। আমরা আপাতত একটি নীতি গ্রহণ করছি। তা হল, ব.শ. যে শব্দকে যেরূপে চিহ্নিত করে রেখে গেছেন, আমরা সাধ্যমতো সেরূপই আপাতত বজায় রেখে চলে যাব।

যাই হোক, অতিবহনের ব্যাপার যেখানে স্পষ্টভাবে রয়েছে, সেই **ৰ** বর্ণের অর্থ সংক্ষেপে আমরা জানব — **ৰ** = 'অতিবহন' করে যে; অতিবাহী। আর, বহনের ব্যাপার যেখানে সাধারণভাবে কিংবা অনির্দিষ্টভাবে রয়েছে, সেই **ব** বর্ণের অর্থ সংক্ষেপে আমরা জানব — **ব** = 'বহন' করে যে; বাহী। **ৰা বা ৰি বি ৰু বু** প্রভৃতির অর্থের জন্য অতঃপর **ক বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

ৰ, ব্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : বংহ্ (*বৃন্‌হ্, ৰংহ্, বৃহ্*); ৰক্ষ, বঙ্গ, বচ্, বজ্ *(বিজ্)*, বঞ্চ্ (বন্‌চ্), *বট্*, *বণ্ (বণ্ট্, বেণ্)*, বদ্ (বাদি), *ৰধ্ (বাধ্)*, *বন্*, বন্দ্, ৰন্ধ্ (বন্‌ধ্), বপ্, বম্, বর্ণ্ (বৃ, *বারি*), *ৰল্ (বল্)*, *বশ্*, বস্ (বাসি), বহ্ (বাহ্, বাহি), বা, *বি (বিধ্)*, *বিচ্*, বিদ্, *বিল্*, বিশ্ (*বিষ্*), *বী (বীণি)*, *বীর*, *বু (বুক্ক্)*, ৰধ্, *বৃক্ (ব্রশ্চ্)*, *বৃজ্*, বৃৎ (বর্ত্তি), বৃধ্ (বর্দ্ধ, বর্দ্ধি), *বৃষ্*, বে (বেপ্, ব্যে), *বেল্ (বেল্ল্)*, ব্যথ্, ব্যধ্, ব্রজ্, ৰ্ ব্, = ৪০ + ১

বংহ্ (ৰৃন্‌হ্, ৰৃংহ্, বৃহ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবৃংহিত, অব্রহ্মণ্য, অব্রাহ্মণ, আব্রহ্মভুবন, আব্রহ্মস্তম্ব, তারকব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, বংহ্, বঁমচুলি, বগুনা, ৰস্তগাঁটি, ৰস্ততেল, ৰস্তরালী, ৰস্তা, ৰরমা-পনি, ৰরাহ্মণজ্ঞান, বহল, বহাল, বহালী, ৰহু, ৰহুঁ, ৰহুআরি, ৰহুকর, ৰহুক্ষম, ৰহুক্ষীরা, ৰহুগুষ্টি, ৰহুড়ি(ড়ী), ৰহুৎ, ৰহুত, ৰহুতন্ত্রীক, ৰহুতন্ত্রিকা, ৰহুতম, ৰহুতর, ৰহুতিথ, ৰহুতৃণ, ৰহুদক্ষিণ, ৰহুদর্শী, ৰহুদৃশ্বা, ৰহুদোষ, ৰহুধা, ৰহুনিষ্ঠ, ৰহুপ্রেয়সী, ৰহুবচন, ৰহুবল্লভ, ৰহুবল্লভা, ৰহুবার, ৰহুবিধ, ৰহুবিধি, ৰহুবিস্তর, ৰহুব্যয়ী, ৰহুব্রীহি, ৰহুভক্ষ, ৰহুভক্ষক, ৰহুভাষী, ৰহুভূমিক, ৰহুভোজী, ৰহুমত, ৰহুমতি, ৰহুমান, ৰহুমায়, ৰহুমুখ, ৰহুমূত্র, ৰহুযাজক, ৰহুয়ারী, ৰহুরাশিক, ৰহুরি(রী), ৰহুরূপ, ৰহুরূপা, ৰহুরূপী, ৰহুরোমা, ৰহুল, ৰহুলা, ৰহুলী, ৰহুলীভাব, ৰহুলীভূত, ৰহুশঃ, ৰহুশাখ, ৰহুশ্রুত, ৰহুস্বামিক, ৰহূ, ৰহূরী, ৰাওন, ৰাঁওন, বামণ(ন), বামন, বামনহাটি, বামনা, বামনি(নী), বামনিশাক, বামুন, ৰাহুলক, ৰাহুল্য, বিম্‌হী, বিরি(রী), বোগনো, ব্রংহণ, বৃ, বৃংহ্ (বৃংহি), বৃংহণ, বৃংহিত, ৰৃহ, ৰৃহৎ, বৃহৎকথা, বৃহৎকন্দ, বৃহৎকীর্তি, বৃহৎকুক্ষি, বৃহৎত্বক, বৃহৎদেবতা, বৃহৎসহায়, বৃহতী, বৃহদারণ্যক, বৃহদ্‌বধ, ৰৃহদ্‌বাদী, বৃহদ্‌ভানু, বৃহদ্রথ, ৰৃহন্দ (বিহন্দ), বৃহন্নল, বৃহন্নলা, বৃহন্নাল, বৃহন্নালিক, বৃহন্মাতা, ৰৃহস্পতি, বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিসংহিতা, ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্), ব্রহ্মঅসুর, ব্রহ্মঋষি, ব্রহ্মকন্যকা, ব্রহ্মকরোটি, ব্রহ্মকর্ম্ম, ব্রহ্মকাণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মকোশ, ব্রহ্মগীতা, ব্রহ্মগোল, ব্রহ্মগৌরব, ব্রহ্মগ্রন্থি, ব্রহ্মঘাতক, ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মঘোষ, ব্রহ্মঘ্ন, ব্রহ্মঘ্নী, ব্রহ্মচক্র, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যা, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মজনু, ব্রহ্মজন্ম, ব্রহ্মজাল, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজীবী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ব্রহ্মডাঙ্গা, ব্রহ্মডিম্ব, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মণ্যতা, ব্রহ্মতাল, ব্রহ্মতালু, ব্রহ্মতালুয়া, ব্রহ্মতি, ব্রহ্মতীর্থ, ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মত্র, ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মত্বর (ব্রহ্মোত্তর), ব্রহ্মদণ্ড, ব্রহ্মদত্ত, ব্রহ্মদত্তি, ব্রহ্মদাতা, ব্রহ্মদান, ব্রহ্মদায়, ব্রহ্মদায়াদ, ব্রহ্মদারু, ব্রহ্মদিন, ব্রহ্মদুয়ার, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রহ্মদ্বার, ব্রহ্মদ্বিট্, ব্রহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মন, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মনীর, ব্রহ্মপদ, ব্রহ্মপারায়ণ, ব্রহ্মপাশ, ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মপুত্র (দ্র. **অমোঘা**), ব্রহ্মপুত্রী, ব্রহ্মপুর, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরী, ব্রহ্মপ্রলয়, ব্রহ্মবক্তা, ব্রহ্মবধিয়া, ব্রহ্মবধ্যা, ব্রহ্মবন্ধু, ব্রহ্মবর্চ্চস, ৰহ্মবর্চ্চসী, ব্রহ্মবর্চ্চস্বী, ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মবিৎ(দ্), ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্মবীজ, ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মবেদী, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মবৃত্তি, ব্রহ্মব্রত, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মভুবন, ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্মমণ্ডল, ব্রহ্মমন্ত্র, ব্রহ্মমন্যু, ব্রহ্মময়, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মমুহূর্ত্ত, ব্রহ্মমীমাংসা, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযষ্টি, ব্রহ্মযাগ, ব্রহ্মযুগ, ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মযোনি, ব্রহ্মযোনী, ব্রহ্মরক্ষঃ, ব্রহ্মরন্ধ্র, ব্রহ্মরাক্ষস, ব্রহ্মরাত্র, ব্রহ্মরাত্রি, ব্রহ্মরেখা, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মলিখিত, ব্রহ্মলেখ, ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মশাসন, ব্রহ্মশিরঃ, ব্রহ্মশীর্ষ, ব্রহ্মসংহিতা, ৰহ্মসত্র,

ব্রহ্মসভা, ব্রহ্মসাজুয্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মস্তেয়, ব্রহ্মস্ব, ব্রহ্মহত্যা, ব্রহ্মহবিঃ, ব্রহ্মহা, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাক্ষর, ব্রহ্মাঙ্গভূ, ব্রহ্মাচুলি, ব্রহ্মাঞ্জলী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর, ব্রহ্মাদ্য, ব্রহ্মাধিগম, ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাভ্যাস, ব্রহ্মারণ্য, ব্রহ্মারম্ভ, ব্রহ্মার্পণ, ব্রহ্মাসন, ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মিষ্ঠা, ব্রহ্মী, ব্রহ্মোত্তর, ব্রহ্মোদ্য, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মদেয়া, ব্রাহ্মপুরাণ, ব্রাহ্মবিবাহ, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুল, ব্রাহ্মণঘাত, ব্রাহ্মণঘ্ন, ব্রাহ্মণচণ্ডাল, ব্রাহ্মণজীবিকা, ব্রাহ্মণপ্রতিবেশ্য, ব্রাহ্মণব্রুব, ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ, ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণসত্তম, ব্রাহ্মণসন্তর্পণ, ব্রাহ্মণাতিক্রম, ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তি, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ্য, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, ব্রাহ্মাহোরাত্র, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্ম্য, ব্রাহ্ম্যদেয়া, ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্ত, ব্রাহ্ম্যবিবাহ, ব্রাহ্ম্যহুত, ব্রীহি, ব্রীহিদ্রোণ, ব্রীহিপর্ণী, ব্রীহিবাপ, ব্রীহিবেলা, ব্রীহিভেদ, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ।

বংহ্ (বৃন্‌হ্, বৃংহ্, বৃহ্) : **বংহ্** = অতিবাহীর রহস্যরূপী হওয়ন। **বংহ** = অতিবাহীর রহস্যরূপ হয় যাহাতে। **বৃন্‌হ্** = আ**বর্ত্তন**শীল অতিবাহীর না-করণ বা অনকরণ হওয়ন। **বৃংহ** = আ**বর্ত্তন**শীল অতিবাহী রহস্যরূপী হয় যাহাতে। **বৃহ** = আ**বর্ত্তন**শীল অতিবাহী হয় যাহাতে।

অব্রাহ্মণ : ১. দ্র. **ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ**। **২.** *নেই ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণত্ব) যাহাতে।* / যেখানে ব্রাহ্মণ নাই। (ব.শ.)। **৩.** ব্রাহ্মণরহিত, অপ্রশস্ত ব্রাহ্মণ, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, (রাজভৃত ক্রয়বিক্রয়ী বহুযাজ্য গ্রামযাজক ইত্যাদি ভেদে অব্রাহ্মণ ষড়্‌বিধ।) ব্রাহ্মণসদৃশ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ব্রাহ্মণভিন্ন জাতি, শূদ্র। (ব.শ.)। **৪.** non-brahmin অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দক্ষ, ব্রাহ্মণ**। তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে, যে ব্রাহ্মণেরা রাজার বেতনভুক হয়ে গেছেন, কিংবা বিনিময়জীবিকা গ্রহণ করেছেন, অথবা যজনকর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করে ফেলেছেন ... ইত্যাদি, ভারতীয় উপমহাদেশে তেমন ব্রাহ্মণদের **অব্রাহ্মণ** বলার রীতি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। কার্যত **ব্রাহ্মণ** শব্দের উদ্ভব হয়েছিল **দক্ষ**যজ্ঞের বহু আগে সনাতন যুগে; তখন সমাজপরিচালক রূপে উদ্ভূত হয়েছিলেন আদি **ব্রাহ্মণ**। তাঁরা স্বভাবতই **শিব**গুণসম্পন্ন ছিলেন বলে, **শিব**কেই বলা হত আদি ব্রাহ্মণ। আর, কাউকে গালি দেওয়ার জন্য **অব্রাহ্মণ** শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল তার পরবর্তীকালে। **দক্ষ**যজ্ঞের যে বর্ণনা ভাগবতে পাওয়া যায় তাতে **দক্ষ**পন্থীরা **শিব**পন্থীদের **অব্রাহ্মণ** বলে গাল পাড়েন, বিপরীতে **শিব**পন্থীরাও **দক্ষ**পন্থীদের **অব্রাহ্মণ** বলে গালি দেন। 'শিবায়ন' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ব.শ. দেখাচ্ছেন, **শিব**পন্থী-বীরভদ্র **দক্ষ**পন্থীদেরকে **অব্রাহ্মণ** বলে নিন্দা করেছিলেন — 'বীরভদ্র বলে বেটা বড় অব্রাহ্মণ'। বিপরীতে **দক্ষ**পন্থীরাও **শিব**পন্থীদের **অব্রাহ্মণ, পাষণ্ড** ... ইত্যাদি নানা কথা বলতে ছাড়েননি। যতদূর বোঝা যায়, **দক্ষ**যজ্ঞের মহাবিপ্লবের কালে যে **শিব**পন্থীদের এরকম সামাজিকভাবে হেনস্থা করা হয়, তাঁদের একদল সেকালের মহাভারতীয় যৌথসমাজ পরিত্যাগ করে প্রতীচ্যের দিকে চলে যান। তাঁদের বক্তব্য ছিল মূলত এইরকম — ঠিক আছে, অব্রাহ্মণ তো অব্রাহ্মণই। আমরা যখন অব্রাহ্মণ, তখন তোমাদের সঙ্গে আর থাকব না। স্বভাবতই বিপুল সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তাঁদের নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে হয়। প্রতীচ্যে এঁরাই পরবর্তীকালে Abraham নামে প্রতিষ্ঠিত হন। ... **৬.** ইংরেজি Abraham, Abraham-man, Abram-man ... প্রভৃতি শব্দের উত্তরাধিকার এই আদি **অব্রাহ্মণ** থেকে। ইহুদী জাতি এবং আরব জাতি, যাঁরা পরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে যান, উভয় গোষ্ঠীই Abraham-কে তাঁদের আদিপুরুষ মনে করেন। উভয় গোষ্ঠীর আচার ও বিশ্বাসগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বহু : ১. ✓বংহ্ + উ (কু) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *অতিবাহীর হওয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩.** ত্রিপ্রভৃতি-সংখ্যান্বিত, অনেক, একাধিক, দুই-এর অধিক, প্রভূত, প্রচুর, দূর, অধিক, বাহুল্য, সাতিশয়। (ব.শ.)। **৪.** many অর্থে প্রচলিত। **৫.** ডিমের একটা 'স্বাভাবিক উত্তীর্ণ পরিণাম' হয় মুরগিতে (দ্র. **ফল**), কেননা, তার ভিতরে একটি প্রজাতিধারা প্রবাহিত থাকে। সেই 'অতিবাহী'-ডিম থেকে মুরগি, মুরগি থেকে অনেক ডিম, তার থেকে অনেক অনেক মুরগি, এবং তার থেকে অনেক অনেক অনেক ডিম ... জন্ম লাভ করতে পারে। এদেরই বলে **বহু**। তার মানে, যে বস্তু বা বিষয় সমুদয়ের ভিতর একই 'অতিবাহীর নবরূপী হওয়ন' রয়েছে, তাদেরই **বহু** বলে; তা তারা দৃশ্য ডিমের মতো বস্তু হতে পারে অদৃশ্য শব্দ গান গুণ ধারণা বিশ্বাস তত্ত্ব তথ্য আচার অনুষ্ঠান ... ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ও হতে পারে। তার মানে, **বহু** মানুষ, **বহু** ধান, **বহু** গাছ, **বহু** মাছ, **বহু** শব্দ, **বহু** কথা, **বহু** দোষ ... এইরকম সমজাতীয় অনেক সত্তাকে **বহু** বলে।

তবে, ক্রিয়াভিত্তিক এই অর্থ থেকে শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে অনেক দূরে চলে এসেছে। একালে লোকে প্রধানত many অর্থেই **বহু** শব্দের ব্যবহার করে থাকেন, তাদের ভেতরে সমজাতীয়তা থাকুক আর না-থাকুক। অবশ্য একালের অঙ্কশাস্ত্রের 'সেট অ্যালজেব্রা' বা '**বহু**-বীজগণিত' তা করে না। এই অঙ্কশাস্ত্রীরা **বহু**র যথার্থ নিয়ম মেনেই অঙ্ক কষে থাকেন। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, **বহু**র মূল মানেটি আমাদের বাংলার ভাষা-ব্যবহারে একদম নেই। রয়েছে, রয়েছে বলেই আমরা আজও 'বহু মানুষ', 'বহু গাছ' ... ইত্যাদি বলে থাকি। স্বভাবতই এই **বহু** শব্দ দিয়ে অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে। আমরা নিম্নে **বহু**-যুক্ত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা মন্তব্য সহ উপস্থাপিত করছি।

বহুৎ (বহুত) : **২.** **বহুৎ** = *বহুর তারণ যাহাতে।* **বহুত** = *বহু তারিত যাহাতে।* **৩.** **বহুৎ, বহুত** = প্রচুর, অসংখ্য, অত্যন্ত, বহুপ্রকার, অনেক, বিপুল, অতিশয়, অনেক প্রকারে। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** '**বহু** তারিত যাহাতে' কথাটির অর্থ হল, একটি স্থানে সমজাতীয় অনেক বস্তু বা বিষয় জমা করা। মরাই ভরা ধান, ঝুড়ি ভরা আম, মাথা ভরা সংস্কার, পুস্তক ভরা তথ্য — এই ধরনের সমজাতীয় বস্তু ও বিষয়ের সঞ্চিত রূপকে বলে **বহুৎ** বা **বহুত**। বাংলাভাষীর কথ্যভাষায় এই শব্দের বিপুল প্রচলন থাকলেও একালের অ্যাকাডেমিতে শব্দটি হীন শব্দ। হয়তো সেকারণেই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে শব্দটির বিপুল ব্যবহার থাকলেও পরবর্তীকালের সাহিত্যে শব্দটির ব্যবহার কমেছে।

বহুদক্ষিণ : ৩. ভূরিদক্ষিণাযুক্ত। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** একালের ভাষায় বললে, যে সকল সরকারি উন্নয়নমূলক ('পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' জাতীয়) কাজে **দক্ষেরা** বা বিশেষজ্ঞরা ভুরি ভুরি **দক্ষিণা** বা বেতন গ্রহণ করে থাকেন, তদ্রূপ কাজের আদিরূপকে সেকালে **বহুদক্ষিণ যজ্ঞ** বা **ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ** বলা হত। এই কাজগুলি চলতেই থাকে, শেষই হতে চায় না, সেই কারণে এগুলিকে **দীর্ঘকালীন যজ্ঞ**ও বলা হত।

বহুধা : ২. বহু *ধারিত যাহাতে।* **৩.** বহুপ্রকারে, বহুরূপে। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ধা** কথাটির অর্থ হল, যে ধরে রেখেছে। একটি পেয়ারাকে দু-ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল। পেয়ারার পেয়ারাত্ব দুটি খণ্ডেই রয়েছে; অর্থাৎ দুটি খণ্ডই তাকে 'ধারণ করে' রেখেছে। তার মানে পেয়ারাটি **দ্বিধা**-বিভক্ত হল। এভাবে কোনো পূর্ণ বস্তু বা বিষয়কে **দ্বিধা, ত্রিধা** এমনকি **বহুধা** বিভক্ত করে ফেলা যায়। মোট কথা কোনো বস্তু বা বিষয়কে **বহু** খণ্ডে বিভাজিত করে ধারণ করে রাখাকে বলে **বহুধা** করে রাখা।

বহুবিধ : ২. / বহু বিধা যাহার। (ব.শ.)। **৩.** নানাপ্রকার, বিবিধ, নানারূপ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বহু, বিধ, বিধা, বিধি**। **বহুধা** ও **বহুবিধ** শব্দের মধ্যে পার্থক্য হল, **বহুধা** হল 'একই বস্তু বা বিষয়ের অনেকগুলি খণ্ডকে ধারণ করে রেখেছে যে'; আর **বহুবিধ** হল 'একই বস্তু বা বিষয়ের ধারাকে অনেকগুলি খণ্ডিত ধারায় প্রবাহিত রূপে ধারণ করে রেখেছে যে'।

বহুব্রীহি : ২. বহু ব্রীহি *যাহার।* / যাহার বহু শস্য। (ব.শ.)। **৩.** বহুধান্যাদিসম্পন্ন, ব্যাকরণে সমাসবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** অ্যাকাডেমিতে সমাসের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** কেন যে সমাসটিকে **বহুব্রীহি** বলে, তার অনেক ব্যাখ্যা থাকলেও কেন ঐ নামটি তাকে দেওয়া হল, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমরা **বহু** শব্দের অর্থে দেখছি, 'সমজাতীয় অনেক সত্তা'কে **বহু** বলে। **ব্রীহি** শব্দের অর্থে দেখছি, তা পূর্বতন রূপ থেকে আবর্তিত হয়ে বৃহত্তর রূপে পৌঁছে যায়। তার মানে, যে **বহু** সত্তা আবর্তিত হয়ে নতুনতর, বৃহত্তর বা উচ্চতর স্তরে পৌঁছে যায়, তাকে **বহুব্রীহি** বলে।

বহুল (বাহুল্য) : ১. বহু + ✓লা (গ্রহণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বহুল** = **বহু** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **বাহুল্য** = **বহুল** *হইতে জাত সত্তা থাকে যাহাতে।* **৩. বহুল** = বহুতর, প্রচুর, অনেক, মহান, বহুপ্রকার, সান্দ্র, কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, বৃহৎ, বড় (voluminous), কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি, আকাশ। **বাহুল্য** = বহুলভাব, বহুত্ব, প্রাচুর্য্য, নানারূপতা, বিস্তর, আধিক্য। (ব.শ.)। **৪.** many অর্থে প্রচলিত। **৫.** যার ভিতরে **বহু** রয়েছে, তাকেই **বহুল** বলা যায়, বলা হত। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির মানে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র **বহু**। আর, **বাহুল্য** শব্দটির ব্যবহার হয় শুধুমাত্র 'বলাই বাহুল্য' শব্দবন্ধ রূপে। যার মানে বোঝা হয়, 'বলার দরকার নেই' অর্থে। যদিও মানেটা ছিল, 'বললে বলাটা **বহুল** হয়ে যাবে'।

বৃংহণ (বৃংহ, বৃংহি, বৃংহিত) : ১. ✓বৃংহ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৃংহ** = *আবর্তনশীল অতিবাহীর (কিংবা বাহীর) রহস্যরূপের হওয়ন যাহাতে।* **বৃংহি** = **বৃংহ** *গতিশীল যাহাতে।* **বৃংহণ** = **বৃংহ** *অন (on) যাহাতে।* **বৃংহিত** = **বৃংহ** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* **৩. বৃংহ, বৃংহি** = বৃদ্ধি, শব্দ, দীপ্তি। **বৃংহণ** = বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বৃহৎ, বৃদ্ধিকারক, পুষ্টিকর, বর্দ্ধন, পোষণ, করিগর্জ্জিত, হস্তিগর্জ্জন। **বৃংহিত** = বর্দ্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলিই অপ্রচলিত, কেবল কদাচিৎ 'the call of the elephant' অর্থে 'হস্তীর বৃংহণ' কথাটি অ্যাকাডেমিক রচনাদিতে দেখতে পাওয়া যায়। **৫.** কথা হচ্ছিল মানুষের। আদিম মানুষের তো কোনো কলাকৌশল জ্ঞান ছিল না। **শিব**-মানুষরা একটার পর একটা আবিষ্কার করতে লাগলেন, **দক্ষ** মানুষরা সেই আবিষ্কৃত বিদ্যাবুদ্ধি-কলাকৌশলের প্রয়োগ করে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এই **দক্ষ**রা যেহেতু **কর**-এর বা **হস্ত**-এর কলাকৌশলের প্রয়োগে সেই বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করছিলেন, সেইহেতু এঁরা ক্রমে ক্রমে সামাজিক **করী** বা **হস্তী** রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। (আজও তাঁদের উত্তরসূরিদের বাংলায় 'দিগ্‌গজ' এবং হিন্দিতে 'বড়ি হস্তী' বলা হয়ে থাকে।) আর তাঁরা যখন তাঁদের বিপুল সম্পদসৃষ্টির গৌরবের ও সেই সম্পদের বিষয়ে **গর্জ্জন** করা শুরু করলেন, তখন সেই গর্জনকে বলা হল 'করিগর্জন' বা 'হস্তিগর্জন'। কিন্তু সেটি তো আসলে সেই সম্পদবৃদ্ধির গর্জন, 'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত'-এর গর্জন — '**বৃংহ** অন যাহাতে' অর্থাৎ আ**বর্তন**শীল বাহীর রহস্যরূপের হওয়া অন যাহাতে। যে সমান্তরাল সম্পর্কের কারণে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে specialist-এর গর্জনকে elephant-এর গর্জনের সমান্তরালে দেখে এক শব্দে সামাজিক হস্তী ও animal-হস্তীর গর্জনকে শনাক্ত করে **বৃংহণ, বৃংহতি** ... ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করে গেলেন, কলিযুগে পৌঁছে আমরা তাঁদের উত্তরসূরিরা সেকথার মর্মকথা ভুলে গিয়ে তাকে কেবলমাত্র elephant-এর ডাক ভেবে নিজেদের মনের এলাকা ছোট করে নিলাম। আমাদের **পাদোদক-মূঢ়তা** আর এক প্রস্থ বৃদ্ধি লাভ করল।

বৃহৎ : ১. ✓বৃহ্ + অৎ (অতি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *আবর্তনশীল বাহীর বা অতিবাহীর হওয়নের তারণ যাহাতে।* **৩.** বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্থূল, পরিসর, দীপ্ত, মহৎ, প্রৌঢ়, প্রদীপ্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, গ্রন্থবাহুল্যযুক্ত; সামভেদ, ব্রহ্ম। (ব.শ.)। **৪.** very big অর্থে প্রচলিত। **৫.** কোনো বস্তু বা বিষয়ের ভিতরে থাকে তার স্বভাব বা **প্রকৃতি**। বস্তুর সেই **প্র**কৃতির কারণে বস্তুটির বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়ে থাকে (দ্র. **বহু**)। যেমন মুরগি থেকে বহু ডিম, তার থেকে বহু মুরগি ... এইরকম। যার বিকাশ যথেষ্ট সাধিত হয়ে গেছে, এবং তার ফলে সত্তাটি গুণগতভাবে বা পরিমাণগতভাবে **অতি** হয়ে গেছে, তাকে **বৃহৎ** বলে। তার মানে, একালে আমরা **বৃহৎ** বললে যে বিশাল চেহারার কোনো সত্তাকে বুঝি, **বৃহৎ** শব্দটি শুধুমাত্র সেটুকুই বলে না; সে আরও জানিয়ে দেয় যে, সত্তাটির ভিতরে একটি স্বভাব ছিল এবং আছে, সেই স্বভাবের কারণে তার বিকাশ সাধন ক'রে ক'রে তাকে বর্তমান রূপে মূর্ত করা গেছে। একালের ভাষায় একে 'পাইকারি

উৎপাদন' বলে। অর্থাৎ 'পাইকারি হারে উৎপাদিত' বস্তু বা বিষয়কে **বৃহৎ** বলা যায়। কোনো সজীব শরীরের কোষসমূহের বিপুল উৎপাদন ঘটলে সেই শরীরটি যে বিশাল আকার ধারণ করে, তাকেও সেকারণেই **বৃহৎ** বলা হয়ে থাকে।

বৃহদারণ্যক : ১. বৃহৎ + আরণ্যক। ২. **বৃহৎ** *আরণ্য (**অরণ্য** হইতে জাত) কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, **ব্যাপারের** রণহীন (**অরণ**) বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে।* ৩. শুক্ল যজুর্বেদের উপনিষদ বিশেষ। শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়। (পৌ.অ.)। ৪. গ্রন্থের নাম রূপে সারস্বতলোকে প্রচলিত। ৫. **বৃহদারণ্যক** উপনিষদ একটি গ্রন্থের নাম। এটি শুক্লযজুর্বেদের উপনিষদ। আগেই বলা হয়েছে (দ্র. **তিত্তিরি**), যজুর্বেদ (= উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালানোর বিদ্যা) দুরকম — কৃষ্ণযজুর্বেদ (= আদি সমাজতান্ত্রিক যজুর্বেদ) ও শুক্লযজুর্বেদ (= আদি ধনতান্ত্রিক যজুর্বেদ)। এই শুক্লযজুর্বেদের উপনিষদের নাম **বৃহদারণ্যক** উপনিষদ।

উপনিষদ কাকে বলে সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এ হল 'বস্তু পারাপার করা' বা **ব্যাপার** করা বিষয়ক গ্রন্থ — A Book of Business in its Totality। একালে এধরনের অজস্র বই রয়েছে বটে, কিন্তু তাদের কোনোটিতেই সমগ্র **ব্যাপার** চালানোর কথা বা business-এর মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক দার্শনিক ... ইত্যাদি (**আধ্যাত্মিক**) ভিত্তির কথা নেই, রয়েছে কেবল কীভাবে বিনিময়ভিত্তিক **পণ্য ব্যাপার** চালাতে হবে, চালিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তোলা যাবে তার অন্ধিসন্ধি, অর্থাৎ **কুবের**সাধনার অন্ধিসন্ধি। কিন্তু সেকালে **উপনিষদ**-এর উদ্ভবের কালে তো বিনিময়ভিত্তিক **ব্যাপার**ই নিষিদ্ধ ছিল, চলছিল শুধু বিনিময়হীন **ব্যাপার** বা বস্তু-পারাপার। সংক্ষেপে ঘটনাগুলি এরকম —

আদিম সনাতন সমাজের বুক চিরে আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) সমাজ তো বেরিয়ে চলে এল। সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজও একদিন ক্রমশ মৌলবাদী হয়ে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিল। তার হাতে বিনিময়হীন দানের সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) নীতি এতই মর্যাদাহানিকর হয়ে উঠেছিল যে, তার চেয়ে বিনিময়ে কিছু দিয়ে দান গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে মর্যাদাকর ও স্বস্তিকর হয়ে দেখা দেয় — একালে যেমন রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে বিনামূল্যে বা সস্তায় কিনে নেওয়ার চেয়ে কালোবাজারে যথাবিহিত বা অধিক দামে কিনে নেওয়া অনেক কম-মর্যাদাহানিকর বলে প্রায়শই মনে হতে থাকে, অনেকটা সেইরকম। ফলে, কীভাবে বিনিময় নিয়ে দান করা হবে, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রূপে দেখা দিয়েছিল, কেন বিনিময় নিয়ে দান করতে হবে। অর্থাৎ বৈদিক যুগের বিনিময়হীন **ব্যাপার**-এর বিপরীতে লক্ষ্মীসাধনা-ভিত্তিক বিনিময়যুক্ত **ব্যাপার**-এর দর্শন হাতে নিয়ে উঠে আসে **শুক্লযজুর্বেদ** ও তার প্রধান প্রবক্তা **যাজ্ঞবল্ক্য** নামক মহর্ষিগণ। (এখানে স্মর্তব্য যে, বৌদ্ধযুগে বা রামায়ণের কালে এই দর্শন বৈদিক দর্শনকে পর্যুদস্ত করে ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছিল।) সেই শুক্লযজুর্বেদের **উপনিষদ** গ্রন্থটির নাম হয় **বৃহদারণ্যক** উপনিষদ। স্বভাবতই এতে কীভাবে **ব্যাপার** করতে হবে, তার চেয়ে কেন বিনিময়যুক্ত **ব্যাপার** করতে হবে, সেকথার প্রাধান্য রয়েছে। তবে এটির নাম **বৃহৎ আরণ্যক** হওয়ায় এর ভিতরে **অরণ্যের** (যেখানে অজস্র **বৃক্ষ** বা সংস্থা রয়েছে, যেখানে **অরণ** করে **নাগে**রা, **হস্তী**রা, **শ্বাপদে**রা ... অর্থাৎ যেটি মারামারি কাটাকাটির এলাকা বা market, তার) এলাকা ছাড়িয়ে পেরিয়ে **মহারণ্য** পর্যন্ত **ব্যাপার**-এর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। একালের ভাষায় স্থূলভাবে বললে বলতে হয়, **বৃহদারণ্যক** হল দেশী মার্কেট পেরিয়ে ছাড়িয়ে বাইরের সমস্ত মার্কেটে যে **ব্যাপার** চালানো যাবে তার কথা।

আধুনিক পণ্ডিতের চোখেও **বৃহদারণ্যক** উপনিষদের এহেন ব্যাপার-স্যাপার চোখে পড়ে যায়। তাঁরা সেগুলিকে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে ধামাচাপা দেন। অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত **বৃহদারণ্যক** উপনিষদের সূচনায় তাই বলা হয়েছে — 'এই উপনিষদটিতে এমন অনেক বিষয় আছে যা সাধারণত ধর্মগ্রন্থে থাকার কথা নয়। প্রাচীন ঋষিদের নিকট ধর্ম ছিল সমগ্র জীবন; কেবল মাত্র ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনের সীমাতেই তা আবদ্ধ থাকেনি। সেজন্য গতানুগতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনার বাইরে অনেক জীবনধর্মী বিষয়ও স্থান পেয়েছে এই উপনিষদে। ঐ সকল বিষয়ের প্রবক্তা ঋষির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারলেই প্রকৃত তত্ত্বটি বোঝা যাবে।'

যাই হোক, আমরা **বৃহদারণ্যক উপনিষদ** শব্দের অর্থ থেকে দেখতে পাচ্ছি, এ হল এমন একধরনের গ্রন্থ, একালের ভাষায় যাকে অনুবাদ করতে চাইলে সেটি দাঁড়ায় — **বৃহৎ** আরণ্য (**অরণ্য** হইতে জাত) কৃত যাহাতে অর্থাৎ **ব্যাপারের** রণহীন (**অরণ**) বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে। এর ইংরেজি অনুবাদ হতে পারে — The Great Marketing Arena : A Book of Business in its Totality।

বৃহন্নলা : ২. **বৃহৎ** *নলা যাহার।* / 'বৃহন্নলা'-নামযুক্ত (যে)। (ব.শ.)। ৩. অর্জ্জুন, দীর্ঘনল সদৃশ বাহুযুক্ত (?)। বিরাটগৃহে গুপ্তাকার ক্লীববেশ অর্জ্জুন। (ব.শ.)। ক্লীবরূপী অর্জুন। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গবাসকালে উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উর্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন। অজ্ঞাতবাসের বৎসরে অর্জুন ক্লীবরূপে এই নাম গ্রহণ করেন। বিরাট নগরে রাজকন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীর নৃত্যগীতাদির ইনি শিক্ষক হন। ... বৃহন্নলা রূপেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিরাটের গো-ধন উদ্ধার করেন। (পৌ.অ.)। ৪. 'অবমানব' বা 'হিজড়ে' বোঝাতে **বৃহন্নলা** শব্দটির ব্যবহার কখনো-সখনো হয়ে থাকে। ৫. **প্রশ্ন** অনেকগুলি — ক) আদি শুক্ল জ্ঞানপুঁজি ও ধনপুঁজিকে অর্থাৎ **অর্জ্জুন**কে আত্মগোপন করতে হয়েছিল কেন? খ) তার জন্য বিরাটগৃহই প্রশস্থ ছিল কেন? **উর্বশী** (আদি দোকানদার) **অর্জ্জুন**কে তেমন অভিশাপ দিতে গিয়েছিল কেন? অজ্ঞাতবাসকালে তার ক্লীবত্বের মানে কী? তখন তার **বৃহন্নলা** নামই বা হয়েছিল কেন?

না, বর্তমান উপকরণবহুল বিক্রিবাটাজীবী সভ্যতার ভিতরে বেড়ে উঠে একজন মানুষের পক্ষে একালে বসে আদি সমাজস্বীকৃত পুঁজির আত্মগোপনাদি বিষয়ে ভাবতে পারা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেননা, আমাদের মস্তিষ্ক বর্তমান অতি-পণ্যজীবী সামাজিক আবহাওয়ায় এতই 'অবস্থা'প্রাপ্ত (conditioned) হয়ে গেছে যে, আদি পুঁজির ইত্যাকার আচরণের রহস্য কিছুতেই মাথায় আসতে চায় না। ...

কিন্তু ঐ যে বলে, **কবি**রা অনেক কিছুই দেখতে ও বুঝতে পারেন, সেকথা তো আর বৃথা যেতে পারে না। কবি বলেছেন, 'বৃহন্নলা মরুক এবার গর্জে উঠুক ফাল্গুনী'। অর্থাৎ, **অর্জ্জুন**-এর ভিতরে দুজন **অর্জ্জুন** রয়েছে — বৃহন্নলা-**অর্জ্জুন** ও **ফাল্গুনী-অর্জ্জুন**। **ফাল্গুনী** হলেন জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের সৃজনশীল সত্তা, **বৃহন্নলা** তার ধারাপ্রবাহের দীর্ঘ নলসমূহ; তার প্রকাশক আচারাদি (মাছ দেখে যে বিড়ালের জিভ থেকে জল পড়ে যায়, মেয়েরা তাকে বলেন, 'মেনিটার বড্ড নলা হয়েছে।')। আদিম সমাজতান্ত্রিক নীতিতে চালিত **ধৃতরাষ্ট্র**-এর **দুর্যোধন-দুঃশাসন**াদির হাত থেকে আত্মগোপন-কারী সেই **ফাল্গুনী** অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারত কেবল ব্যক্তিমালিকানা যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই দেশে। **মৎস্য** (ব্যক্তিমালিকদের) দেশ বা বিরাট রাজার দেশ ছিল সেইরকম ব্যক্তিমালিকদের দেশ। **ফাল্গুনী-অর্জ্জুন** তার সৃজনশীলতা বন্ধ রাখলে সে তো ক্লীবই হবে! তখন সে স্বভাবতই **বৃহন্নলা-অর্জ্জুন** হয়ে যায়। স্বভাবতই **মৎস্য** দেশে আত্মগোপন করে থাকার কালে তার সম্পদের ধারা-প্রবাহের মাধ্যমগুলির চর্চা করে কাটানো ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।

বৃহস্পতি (বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতি-সংহিতা, বার্হস্পত্য, ব্রহ্মণস্পতি) : ২. *বৃহস্পতি = বৃহৎ-এর পতি। বার্হস্পত্য = বৃহস্পতি-জাত থাকে যাহাতে।* / **বৃহস্পতি** = বৃহৎদিগের পতি। (ছা.অ.)। দেবগণের গুরুত্ব হেতু পতি। (ব.শ.)। **বৃহস্পতিবার** = বৃহস্পতি অধিষ্ঠিত বার বা দিন। (ব.শ.)। **৩. বৃহস্পতি** = সুরাচার্য্য, গুরু, জীব। ইঁহার পত্নী তারা, পুত্র কচ। গ্রহবিশেষ। স্মৃতি-শাস্ত্রকার মুনিবিশেষ, দার্শনিক পণ্ডিতবিশেষ, বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত। (ব.শ.)। ইনি সপ্ত মুখ, সপ্ত রশ্মি, মিষ্ট জিহ্বা, নীল পৃষ্ঠ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শতপত্রবিশিষ্ট। ইনি হিরণ্য ও লোহিতবর্ণ। লোহিতবর্ণের অশ্বগণ বৃহস্পতিকে রথে বহন করে। বৃহস্পতি যজ্ঞপ্রাপক, রাক্ষস-নাশক, মেঘ-ভেদক ও স্বর্ণপ্রদায়ক। ইনি দেবগণের পিতা, অগ্নির ন্যায় ত্রিলোকবাসী। ইনি বৃত্রাদিকেও বধ করেন। ইনি বন্ধনকারীর বন্ধু। ... এঁর ধনুর নাম ঋত (সত্য)। এঁর পরশু শাণিত করে দেন ত্বষ্টা। ... বৃহস্পতি পুরোহিত। এঁর উচ্চারিত শ্লোক স্বর্গে গমন করে। ইনি ছন্দের অধিকারী ও ইন্দ্রের ন্যায় সোমপায়ী। সোম-যাজ্ঞিকদের ইনি সহায় ও বন্ধু। ঋগবেদে বৃহস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদের কোনো কোনো মন্ত্রে ইনি একাকী এবং কোনোটিতে ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারূপে স্তুত হয়েছেন। বেদের কোনো কোনো মন্ত্রে ইনি যজ্ঞ রক্ষাকর্তা, সর্বময় পিতা ও সর্বদেবতাস্বরূপ বিশেষণে বন্দিত হয়েছেন। ... মন্ত্রের অধিপতি দেবরূপে ইনি খ্যাত। ... বেদের এই দেবতা পরবর্তী যুগে গ্রহাধিকারীরূপে দেখা দেন। ... এঁর নীতিঘোষ নামে রথ আছে। এই রথ আটটি অশ্বদ্বারা চালিত।

পৌরাণিক যুগে বৃহস্পতি ঋষি রূপে খ্যাত হন। ইনি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। ইনি ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক এবং নবগ্রহের মধ্যে পঞ্চমগ্রহ। ... অঙ্গিরা নিজের আশ্রমে কঠোর তপস্যা করে অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় অগ্নি জলের মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যায় রত হন। অঙ্গিরার প্রভাবে তাঁর এই হীন অবস্থা হওয়ার জন্য অগ্নি অনুতপ্ত হন, কিন্তু নিজের এই দুর্গতির কোনো কারণ খুঁজে পান না। তাঁর মনে হয় তপস্যার ফলে তাঁর তেজ নষ্ট হয়েছে; বোধ হয় ব্রহ্মা অন্য একটি অগ্নির সৃষ্টি করেছেন। এইরূপ চিন্তা করবার সময় অগ্নিতুল্য ঋষি অঙ্গিরা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনার তেজ আপনি শীঘ্রই প্রকাশ করে জগতের মঙ্গল করুন। অন্ধকার দূর করবার জন্য বিধাতা আপনাকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্ধকার দূর করতে আপনিই একমাত্র অধিকারী।' অগ্নি বললেন, 'আমার কীর্তি বিনষ্টপ্রাপ্ত হয়েছে। আপনিই অগ্নিতেজ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি অগ্নিত্ব ত্যাগ করেছি। আপনি প্রথম অগ্নি হন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হব।' অঙ্গিরা বললেন, 'আপনার এই অগ্নিত্বের অধিকার আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আবার অগ্নিতেজ গ্রহণ করে আমাকে এক পুত্রসন্তান দান করুন।' সন্তুষ্ট হয়ে অগ্নি নিজের পূর্বতেজ আবার গ্রহণ করলেন। এর ফলে অঙ্গিরার বৃহস্পতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ... চন্দ্র বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করে। ... (বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী গর্ভবতী মমতাকে বলপূর্বক সংগম করতে চেষ্টা করেন। দ্র. **দীর্ঘতমা, উতথ্য, ভরদ্বাজ**।) ... নিজ পুত্র **কচ**কে শুক্রাচার্যের নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করতে প্রেরণ করেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে বৈবস্বত মন্বন্তরে চতুর্থ দ্বাপরে দেবগুরু বৃহস্পতি ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ করেন। (পৌ.অ.)। **বৃহস্পতি-সংহিতা** = বৃহস্পতি প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। **বার্হস্পত্য** = বৃহস্পতিসম্বন্ধী, বৃহস্পতিপ্রোক্ত শাস্ত্রের অধ্যেতা বা বেত্তা, নাস্তিক, চার্ব্বাক, ভরদ্বাজগোত্রের প্রবর মুনিবিশেষ, বৃহস্পতিপ্রোক্ত শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র, বৃহস্পতিদেবতাক পুষ্যনক্ষত্র। (ব.শ.)। **ব্রহ্মণস্পতি** = ঋগবেদের একজন দেবতা। পণ্ডিতরা মনে করেন, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও বাচস্পতি একই দেবতা, কেবল নামান্তর মাত্র। বেদের কোনো কোনো স্থানে এঁরা অগ্নিদেবের রূপান্তর। ... বৈদিক মতে ইনি ধনবান, রোগহন্তা, ধনদাতা। ইনি দেবগণের গণপতি, অসুরহন্তা, মন্ত্রসমূহের স্বামী, ক্রোধের হিংসক। ... ইনি পর্বত, দুর্গ ভেদ করেন এবং বৃত্রদের বধ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** 'দেবগুরু বৃহস্পতি' রূপে **বৃহস্পতি** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। জ্যোতিষচর্চা-কারীদের মধ্যে ইনি গ্রহরূপে প্রচলিত। **বৃহস্পতিবার** সপ্তাহের একটি দিন রূপে জনসাধারণ্যে সার্বিক ব্যাপকতায় প্রচলিত। গ্রামবাংলার মানুষ আজও তির্যক ভাষা প্রয়োগের সময় 'বুদ্ধির বৃহস্পতি' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। **৫. দ্র. দ্রোণ, উতথ্য, ভরদ্বাজ, মমতা**। পুরাণ অনুসারে **বৃহস্পতি** সত্তাটি **শুক্রাচার্য্যে**র বিপরীত সত্তা, প্রথমজন **দেবগুরু**, দ্বিতীয়জন **অসুরগুরু**। এই দেবগুরু ও অসুরগুরু সত্তা দুটিকে আমরা বর্তমান সময়ের সমাজেও অত্যন্ত প্রকটরূপে সক্রিয় দেখতে পাই। এঁদের বলা হয় 'ধনতন্ত্র-সমর্থক বুদ্ধিজীবী' অর্থাৎ **দেবগুরু** এবং 'সমাজতন্ত্র-সমর্থক বুদ্ধিজীবী' বা **অসুরগুরু**। এঁরা একই বংশে জাত দুটি পরস্পরবিরোধী সত্তা, একালের ভাষায় একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বান বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীদের দুটি পরস্পরবিরোধী দল। এঁদের আদি রূপকেই যথাক্রমে **দেবগুরু** ও **অসুরগুরু** বলা হত। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানুষের সমাজে এই দুটি সত্তার জন্ম হল কেমন করে?

এঁদের উদ্ভবের সেই ইতিহাসই বলা হয়েছে পুরাণাদি গ্রন্থে, যদিও গ্রন্থভেদে সেই বর্ণনার রকমফের ও ইতরবিশেষ রয়েছে।

তবে যে গ্রন্থে যেরকম বর্ণনাই থাক না, মূল কথাগুলি প্রায়শই একপ্রকার। কোনো গ্রন্থে **বৃহস্পতি** দেবতাগণের দেবতা, কোথাও বা দেবতাদের পক্ষে এমনকি অন্যায় পথ গ্রহণেরও পরামর্শদাতা ইনিই। উপরোক্ত কাহিনীর শব্দ ধরে ধরে অর্থগুলি একত্র করে নিতে পারলে, সেই প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানতে পারা যায়। তার থেকে সংক্ষেপে **বৃহস্পতি**র উদ্ভব সম্পর্কে এই কয়টি কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় — আদি আবিষ্কারক **ব্রহ্ম**গুণসম্পন্ন **শিব**সত্তা স্থির রূপ নিলে, অর্থাৎ, তাঁর আবিষ্কারের ক্রমান্বয় প্রয়োগে লিপ্ত থাকলে **ব্রহ্মা**য় পরিণত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী স্বভাবতই **অঙ্গিরা** হতে বাধ্য হন। এই **অঙ্গিরা**র ঔরসে **শ্রদ্ধা**র গর্ভে জন্ম হয় **উতথ্য** ও **বৃহস্পতি**র। **শিব**-এর আবিষ্কৃত 'নবরূপে উত্তীর্ণ করা'র বা 'উ'-করার উপায় বা **তথ্য**গুলি উত্তরাধিকার সূত্রে (অভ্যাসরূপে বা মুখস্থ করে) ধরে রাখেন **উতথ্য**-সত্তা। **বৃহস্পতি** সেই উত্তরাধিকারের প্রয়োগ করে **বৃহৎ** বা পাইকারি জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ উৎপাদনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, ইনি স্বয়ং নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করেন না, করতে পারেন না, পূর্বসূরিদের কাছ থেকে আবিষ্কৃত জ্ঞান গ্রহণ করে 'সোম-যাজ্ঞিকদের' (পুঁজিবাদী উৎপাদকদের) 'সহায় ও বন্ধু' হয়ে ওঠেন এবং স্বয়ং 'সোমপায়ী' হয়ে যান (একালে অ্যাকাডেমিতে উচ্চশিক্ষিত পুঁজি-সমর্থক বুদ্ধিজীবী যেমন কর্পোরেট পুঁজির পরামর্শ-দাতার চাকরি নিয়ে নিজেও টাকা কামাতে থাকেন, অনেকটা সেইরকম)। ... তাঁর ভূমিকার বিষয়ে সন্দেহমাত্র করা চলে না এই কারণে যে, তাঁর রচিত **বৃহস্পতি-সংহিতা** এখনও গ্রন্থরূপে পাঠ করা হয়ে থাকে; যদিও তাকে এখনও কেউ 'একালীকরণ' (আপডেট) করেননি। দ্র. **বাব**।

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্, নির্গুণ-ব্রহ্ম, সগুণ-ব্রহ্ম) : ১. ✓বৃন্হ্ (বৃংহ্) + মন্ (মনিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ব্রহ্ম** = *আবর্তনশীল অতিবাহীর নাকরণ-অনকরণের (বা রহস্যরূপের) হওয়ন বিষয়ক মনন যাহাতে।* ***ব্রহ্মন*** *=* ***ব্রহ্ম*** *অন (on) যাহাতে।* ***নির্গুণ-ব্রহ্ম*** *= যে* ***ব্রহ্ম*** *গুণহীনভাবে বিরাজ করেন।* ***সগুণ-ব্রহ্ম*** *= যে* ***ব্রহ্ম*** *গুণসম্পন্ন রূপে বিরাজ করেন।* **৩. ব্রহ্ম** = অতিমহৎ, সচ্চিদানন্দ, বস্তু, বেদ, বেদবাক্য, ওঙ্কার, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ, ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, তত্ত্ব, শব্দ, ব্রাহ্মণ, সত্য, আত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রধান, মোক্ষ, অন্ন, ধন, ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, ভগবান, বৃহস্পতি। (ব.শ.)। অব্যয়, অব্যক্ত, চিরন্তন, সর্বসৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপক, স্বয়ম্ভু। ইনি নামচিহ্নের অতীত, স্মৃতি ও সৃষ্টির কর্তা, স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয়। ইনি অদৃশ্য, আদি ও অন্তহীন। অসীম ও অনন্ত। সমস্ত জিনিস এঁর থেকে সৃষ্ট ও সমস্তই এতে বিলীন হয়। ইনি কালের ও সীমার অতীত। (পৌ.অ.)। **৪.** রহস্যময় 'একটি সর্বশক্তিমান সত্তা' অর্থে **ব্রহ্ম** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অজিন, তৎ, তৎসৎ, প্রকৃতি, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মজ্ঞান**।

এ পর্যন্ত যাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞান নিয়ে চর্চা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই **ব্রহ্ম** শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। অমরকোষে একটি অধ্যায়ের নাম রয়েছে '**ব্রহ্মবর্গ**'। তাতে যে ১৪৯ প্রকার ব্রহ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি এতরকম ব্যক্তি-বস্তু-বিষয়কে বোঝায় যে, তার থেকে **ব্রহ্ম** বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বেশ কয়েকটি রচনায় **ব্রহ্ম**-এর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তাতেও যে **ব্রহ্ম**কে ধরা যায়নি, একালের বাংলাভাষী শিক্ষিতজনদের দিকে তাকালেই সেকথার প্রমাণ মেলে। আমাদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত জ্ঞান অনুসারে এতকাল ধরে একদিকে আমরা জেনে এসেছি — '**ব্রহ্ম** সত্য জগৎ **মিথ্যা**'; অপরদিকে জেনেছি ধূলিকণা থেকে মহাবিশ্ব পর্যন্ত সমগ্র 'জগৎ **ব্রহ্মময়**'। তাছাড়া বলতে গেলে **ব্রহ্ম** বুঝিবা তার চেয়েও বেশি। কেননা, মহাবিশ্বকে **ব্রহ্ম** বলা হয় না, বলা হয় **ব্রহ্মের অণ্ড** মাত্র অর্থাৎ **ব্রহ্মাণ্ড** কিংবা খোদ **ব্রহ্ম**ই **অণ্ড**রূপী ব'লে তার ঐপ্রকার নাম। সেই অণ্ডের চেয়ে অণ্ডস্রষ্টা আরও বিশাল হবেন সন্দেহ নাই। ...

এসবের নানারকম ব্যাখ্যাও করে গেছেন বহু বড় মানুষেরা। তার উপর আবার রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'বিশ্বকে বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আঁটিতে পারে, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বের এই বিশেষত্ব।' তার মানে, **ব্রহ্মাণ্ড** বা **ব্রহ্ম** যত বিশালই হোক না কেন, মানুষ নামক জীবটির মস্তিষ্ক নামে একটি যন্ত্র আছে, যাতে সেই **ব্রহ্ম**কেও তার **ব্রহ্মাণ্ড**সহ পুরে ফেলা যায়। (কীভাবে পুরে ফেলা হয়, তার বিস্তারিত উপস্থাপন রয়েছে আমাদের 'জ' গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধেই।) যায় বলেই তো আমরা **ব্রহ্ম** বিষয়ে আলোচনা করতে পারছি, আপনি একে পড়ে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, **ব্রহ্ম** বিষয়টি অনেক বড়, বহু মনীষীই এ নিয়ে নানান চর্চা করে গেছেন। সেই কারণে আমরা আর **ব্রহ্ম**-এর ব্যাখ্যা করতে যাব না। আমরা কেবল জানার চেষ্টা করব — **ব্রহ্ম** শব্দটির ভিতরে ঠিক কী অর্থ ধরা আছে।

ব্রহ্ম শব্দটি তৈরি করা হয়েছে **বৃন্হ্**-ক্রিয়ার সঙ্গে **মনন** ক্রিয়ার যোগে। এই **বৃন্হ্** ক্রিয়াটি **বৃংহ্** ক্রিয়ারই তুলনামূলকভাবে কম অব্যক্ত রূপ। **বৃংহ** যেখানে বলছে 'আবর্তনশীল অতিবাহীর রহস্যরূপের হওয়ন'-এর কথা, **বৃন্হ্** সেখানে রহস্যরূপটিকে 'নাকরণ-অনকরণ' ব'লে খানিকটা স্পষ্ট করছে। এখন প্রশ্ন হল দ্বৈতাদ্বৈতধারী অতিবাহীর (**ব**-এর) আ**বর্তন**শীলতা (**ঋ**-কার) বলতে (অর্থাৎ **বৃ** বলতে) আমরা ঠিক কী বুঝব?

জগতের প্রতিটি বস্তুর নিজ নিজ **স্ব**ভাব বা **প্র**কৃতি রয়েছে। (দ্র. **প্র**)। সেই **প্র**কৃতি অনুসারে তার পরিবর্তন বা বিকাশ ঘটে। তাদের মধ্যে এমন অনেক বস্তুকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যারা একটা পাক ঘুরে এলেই বা একটা আ**বর্তন** সমাধা করলেই তাদের গুণগত বা পরিমাণগত কিংবা উভয়প্রকার বৃদ্ধি ঘটে যায়। উদাহরণ-স্বরূপ ধান গম প্রভৃতি শস্য বিশেষ পদ্ধতিতে মাঠে ছড়িয়ে দিলে এক ফলনে বহুগুণ বৃদ্ধি লাভ করে। এক 'বিশেষ শিক্ষা'র ধারক বা 'শিক্ষক'-এর মাধ্যমে সেই 'বিশেষ শিক্ষা' বহু ছাত্রের মস্তিষ্কে ছড়িয়ে দিলে এক ফলনে সেই শিক্ষার বহু শিক্ষক জন্মে যেতে পারে। এক থেকে বহুতে পরিণত হওয়ার এই যে পাক বা আ**বর্তন**, একে বলে 'অতিবাহীর আবর্তনশীলতা'।

এখন তদ্রূপ 'আবর্তনশীল অতিবাহীর নাকরণ' কীরূপ এবং 'অনকরণ'ই বা কীরূপ, এবং তার 'হওয়ন'ই বা কীরূপ ব্যাপার, সেকথা জানা চাই। ইতোপূর্বে যে পদ্ধতিতে এই আ**বর্তন** করা হত,

তা রদ করাই 'নাকরণ'। পুনরায় নতুন কোনো পদ্ধতিতে সেই আ**বর্তন** চালু করে দেওয়াই 'অনকরণ'। এর ফলে যা হয়, তাই 'হওয়ন'। তাহলে 'অতিবাহীর আবর্ত্তনের নাকরণ-অনকরণ' করলে এবং সেভাবে 'অতিবাহী' তার আ**বর্তন** সাঙ্গ করলে 'যা হয়', সেটিই **বৃন্‌হ্** হওয়া; 'অতিবাহী'র সেটি 'অতিবাহিত হওয়া'ও বটে। এখানে একটি দ্বৈতাদ্বৈতকে 'নাকরণ-অনকরণ'-এ দেখাই যাচ্ছে। আরও একপ্রকার দ্বৈতাদ্বৈতের দেখা পাওয়া যায় **প্র**কৃতির **প্র**-তে। সে প্রসঙ্গের বিবরণ পাওয়া যাবে নীচের ব্যাখ্যায়।

তাহলে **বৃন্‌হ্** কথাটির মানে দাঁড়াল — বস্তুর **প্র**কৃতি জেনে নিয়ে, তাকে আ**বর্দ্ধিত** করে নিতে পারলে বস্তুটির যে বৃদ্ধি ঘটে যায়, সেই **বর্দ্ধিত**করণ করাই **বৃন্‌হ্** করা। তবে কিনা, বৃদ্ধি ঘটানোর এই ব্যাপারটি সকল বস্তুর ক্ষেত্রে একরকম নয়, বলা ভাল, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা। কোথাও চাষ করা, জল দেওয়া, সার দেওয়া ... এভাবে তাকে বড় করে তোলা, কোথাও বা শুধুমাত্র ১০০ দিয়ে গুণ করে (যেমন অঙ্কের ক্ষেত্রে) বাড়িয়ে তোলা। এই যে বৃদ্ধি ঘটানো, এটা কিন্তু বাস্তবে করা হচ্ছে না, করা হচ্ছে মনে মনে। তাই একে বলে **বৃন্‌হ্ (বৃংহ্)** মনন করা। তার মানে, বস্তুর বা বিষয়ের অভ্যন্তরস্থ **প্র**কৃতিকে বুঝে নিয়ে মনে মনে (তাত্ত্বিকভাবে) তার বৃদ্ধিসাধন করার বিদ্যা অর্জনই হল **ব্রহ্ম্** করা। অর্থাৎ 'বৃদ্ধিসাধনমন্ত্র অর্জন'কে **ব্রহ্ম** বলে; একালে যাকে আবিষ্কার করা বা উদ্ভাবন করাও বলে। সেই সুবাদে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনকে যেমন **ব্রহ্ম** বলা যায়, আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিতকেও **ব্রহ্ম** বলা যায়। তার মানে, যা আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত, সে তো সেই **প্র**-এর রহস্য। তার যে রহস্য উদঘাটিত হল, আর যা হল না, সবই **ব্রহ্ম**ই বটে! (দ্র. **গৌরী, শ্রীকৃষ্ণ**)। ...

এই **ব্রহ্ম**কে অন্ করে বা **ব্রহ্মন্** করে বাস্তবায়িত করতে পারলে তার যে গর্জন হয়, তাকে বলে **বৃংহন** করা; কিন্তু মনে মনে করতে পারলে তাকে বলে **ব্রহ্মন্** করা। একটি ডিমকে ১০০টি ডিমে পরিণত করার যে তত্ত্ব, ১-কে ১০০ দিয়ে গুণ করে ১০০ বানানোর যে তত্ত্ব, মনে মনে সেই তত্ত্বের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনোকে বলে **ব্রহ্ম্** করা। **কর্** ক্রিয়ার প্রাথমিক আধারকে (কর্ + অ) যেমন **কর** (হাত, খাজনা ইত্যাদি) বলে, **ব্রহ্ম্** ক্রিয়ার প্রাথমিক আধারকে তেমনি **ব্রহ্ম** (মাথা, বেদ ইত্যাদি) বলে। আবার **কর্ অন্** ক্রিয়াকে যেমন **করন্ (করণ্)** বলে, **ব্রহ্ম্ অন্** ক্রিয়াকে তেমনি **ব্রহ্মন্** বলে। এই **করণ্**-এর আধারকে যেমন **করা** বলা হয় (কর-এর আধার যে) তেমনি **ব্রহ্মন্**-এর আধারকে **ব্রহ্মা** বলা হয়। অন্যভাবে বললে **কর্**-এর দ্বিতীয় আধারকে (কর্ + অ + অ) যেমন **করা** বলা হয়, তেমনি **ব্রহ্ম্**-এর দ্বিতীয় আধারকে **ব্রহ্মা** বলা হয়।

অতএব **ব্রহ্ম** শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, (ক্রিয়ারূপে) **প্র**-কে উদ্ভাবন করা, তাকে উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে বাড়ানো, **বর্দ্ধন** করা, পরি**বর্দ্ধন** করা ... ইত্যাদি; (বিশেষ্যরূপে) উদ্ভাবন, আবিষ্কার, বৃদ্ধি, বৃদ্ধ, **বর্দ্ধন**, পরি**বর্দ্ধন**, তদ্‌মূলক জ্ঞান, তদ্রূপ জ্ঞানের আধার (মস্তক, তদ্রূপ জ্ঞানী, তদ্রূপ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সত্য, ক্ষেত্রজ্ঞান, ক্ষেত্রজ্ঞ), যাকে পরি**বর্দ্ধিত** করা গেছে (অতিমহৎ), যে কোনো **স্ব**-ভাবধারী (বস্তু, অন্ন, ধন), **বর্দ্ধনে**র প্রচেষ্টা (তপঃ) ... ইত্যাদি। এই বিচারে, জগতের প্রতিটি বস্তুর **প্র**কৃতি জেনে নিয়ে তাকে তাত্ত্বিকভাবে বাড়িয়ে নেওয়ার বিদ্যাকেই **ব্রহ্মবিদ্যা** বলা যেতে পারে। সেই সুবাদে মানবজাতির সকল প্রকার বাস্তবিক ও বৈষয়িক (আধ্যাত্মিক) অর্জনকেই **ব্রহ্মলাভ** বলা যেতে পারে।

বাংলায় এই বড়ো করার তত্ত্বকে বা বৃদ্ধিসাধন-তত্ত্বকে আমরা খানিকটা বুঝতে পারি **বৃংহন** ও **বৃংহতি** প্রভৃতি শব্দ থেকে। কিন্তু ইংরেজিতে এর মূল রূপটি রয়েছে **বৃং** (bring) রূপেই। এর অর্থ হল উপরে তুলে আনা, বড়ো করা, বাড়ানো। তাই বড়ো করা, বিকাশ সাধন করাকে তাঁরা বলেন bringing-up বা upbringing।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জগতের প্রতিটি বস্তুর ভিতরে যে **প্র**কৃতি রয়েছে, তা জেনে নেওয়া, তার নিজের বিকাশের পথটি বুঝে নেওয়া, তদনুযায়ী তাকে নব নব পদ্ধতিতে বাড়ানোর তত্ত্বকেই বলে **ব্রহ্মন্** করা। তাহলে তো প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের ও বিকাশের যে নিজ নিজ প্রক্রিয়া, যাকে তার **মূল**-প্রকৃতি বা **কারণ**-প্রকৃতি বলা হয়, সেটিই তার **ব্রহ্ম**-প্রকৃতি; সেটিই তার **স্ব**ভাবের **স্ব**, তার **প্র**কৃতির **প্র**, সেটিই দ্বৈতাদ্বৈত; সেটিই তো **ব্রহ্ম**। অন্তরে সেটি আছে বলেই বস্তুটি তদ্-বস্তু রূপে বিরাজমান এবং তার নিজস্ব বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়ায় বিকশিত হওয়ার বা বৃদ্ধিলাভ করার যোগ্যতা নিয়ে বিরাজ করছে। সেই **মূল**-প্রকৃতি না থাকলে বস্তুটিই তদ্‌বস্তুরূপে বিরাজ করত না। ঐ **মূল**-প্রকৃতিই জগতের প্রতিটি বস্তুতেই তার নিজের মতো করে রয়েছে। সেই **কারণ**-প্রকৃতি রয়েছে বলেই বস্তুটি বিকশিত হয়, বদলায়। সেই **মূল কারণ**কে মনন করা বা মনে মনে আয়ত্ত করার চেষ্টা করাই **ব্রহ্মন্** করা। তাহলে তো সেই **মূল কারণ**ই **ব্রহ্ম**। সেই **মূল কারণ** বা **ব্রহ্ম**ই এই **জগৎ** রূপে, জগতের কোটি কোটি বস্তুরূপে বিকশিত হয়ে আমাদের সম্মুখে বিরাজিত রয়েছে। সেই **ব্রহ্ম**কে জানলেই জগৎকে জানা যায়। প্রতিটি বস্তুর ভিতরের সেই **মূল কারণ** জানতে পারাকেই সেকালে বলা হত **ব্রহ্ম**কে জানা; একালের ভাষায় বলা হয় 'উদ্ভাবন করা' বা 'আবিষ্কার করা'। যে বস্তুর **মূল কারণ**কে বা **ব্রহ্ম**কে জানা হয়ে যায়, সেই বস্তুকে তার মতো করে বাড়িয়ে নেওয়া যায়, তার বৃদ্ধি ঘটানো যায়, তাকে মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বদলে ফেলা যায়। এই সেই কারণ, যেজন্যে সেকালে **মূল-কারণ**-জ্ঞানীকে বা **ব্রহ্ম**জ্ঞানীকে 'জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহনকারী' **'শিব'** বলা হত; একালে বলা হয় 'আবিষ্কারক', 'উদ্ভাবক', 'স্রষ্টা', 'বিজ্ঞানী', 'minds of fire', 'wings of fire' ... ইত্যাদি।

তাহলে তো আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত '**ব্রহ্ম** সত্য **জগৎ মিথ্যা**' জ্ঞানবাক্যটি একশো ভাগ ঠিক! বস্তুসমূহের **স্ব**গুলি **প্র**গুলি দ্বৈতাদ্বৈতগুলি, **ব্রহ্ম**গুলি আছে বলেই এই জগৎ এরকমভাবে আছে। অন্যথায় এজগৎ তো এরকম থাকত না। তাই **ব্রহ্ম**ই প্রকৃত সত্য, **জগৎ** সাময়িক সত্য এবং অতএব **মিথ্যা**ই। আবার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে ধূলিকণা পর্যন্ত সকল বস্তুতেই **ব্রহ্ম** বিরাজ করেন, অর্থাৎ, 'জগৎ **ব্রহ্মময়**' — একথাটিও একশো ভাগ সত্য। কেননা, প্রতিটি বস্তুর ভিতরেই তো তার **স্ব**, **প্র**, **দ্বৈতাদ্বৈত**, **ব্রহ্ম** রয়েছে বলেই সেগুলি তাদের বর্তমান স্বরূপে বিরাজ করছে। সুতরাং **জগৎ** তো **ব্রহ্ম**ময় বটেই!

আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি। তাঁরা তাঁদের এই **ব্রহ্ম**জ্ঞানকে সার্বিকভাবে পরিপ্রসারিত করেছেন এবং তা করতে গিয়ে দেখা পেয়েছেন এমন দুরকম **ব্রহ্মে**র, যার একটা রূপ আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, আর একটা রূপ একেবারে ধরাছোঁয়ার ভেতরের দৈনন্দিনতায়। সেই দুরকম **ব্রহ্মে**র নাম হল '**নির্গুণ-ব্রহ্ম**' ও '**সগুণ-ব্রহ্ম**'। যে কোনো বস্তুর ভিতরে তার নিজ-**স্ব** বা নিজ-**প্র** বা নিজ-**ব্রহ্ম** রয়েছে। সেই **ব্রহ্ম**-এর বা **স্ব**-এর কারণে বস্তুটি তার বর্তমান স্বরূপে বিরাজ ক'রে পরবর্তী রূপের দিকে তার যাত্রা অব্যাহত রাখে। সেই কারণে, সেই **ব্রহ্ম**সম্পন্ন বস্তুর **ব্রহ্ম** স্বভাবতই **সগুণ-ব্রহ্ম**। অতএব যে-**ব্রহ্ম** তার অবস্থান অনুসারে সক্রিয় রয়েছে, সেরকম **ব্রহ্ম** মাত্রেই **সগুণ-ব্রহ্ম**। আমাদের এই **জগৎ**-এর প্রতিটি বস্তুর ভিতরেই তার **সগুণ-ব্রহ্ম** বিরাজ করছেন। এমনকি সেই **সগুণ-ব্রহ্ম**কে যিনি জানেন, জেনে তদনুসারে বাস্তবে সক্রিয় থাকেন, তিনিও **সগুণ-ব্রহ্ম**; কারণ তিনি তদ্রূপে **সগুণ-ব্রহ্মন্** করেন।

এবার **নির্গুণ-ব্রহ্ম** বিষয়ে যাওয়া যাক। এ বিষয় ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে আমরা উদাহরণের সাহায্যে এগোব। ধরা যাক, ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ক-বাবু একটি গরু কিনেছিলেন চারটা ছাগল দিয়ে। ১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অধস্তন চোদ্দোপুরুষ একটি গরু কিনলেন ৪টি কড়ি দিয়ে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অধস্তন চোদ্দোপুরুষ একটি গরু কিনলেন ৪টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তার অধস্তন চোদ্দোপুরুষ একটি গরু কিনলেন **১**টি ৫০০০ টাকার চেক দিয়ে। এর থেকে বোঝা যায়, ৪টি ছাগলের ভিতরে যে **সগুণ-ব্রহ্ম** ছিল, ১ খ্রিস্টাব্দে ৪টি কড়ি সেই **সগুণ-ব্রহ্ম**-এর ধারক-বাহক হয়ে গেছে, ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ৪টি রৌপ্যমুদ্রা তারই ধারক-বাহক হয়ে গেছে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে একটি কাগজের পাতা বা চেক (যার উপর প্রাপকের নাম, টাকার অঙ্ক, এবং চেকদাতার সহি রয়েছে) তার ধারক-বাহক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, এই চেকটি কাগজের পাতা মাত্র নয়, **সগুণ-ব্রহ্মই** বটে। এর ভিতর থেকে ৫০০০ টাকা বেরিয়ে এসে জাগতিক রূপ লাভ করে একটি গরুতে পরিণত হতে পারে; আর গরু তো এই জগতের স্বাভাবিক এক জীব এবং অতএব **সগুণ-ব্রহ্ম**ই।

কিন্তু যদি ঐ চেকটিতে টাকার অঙ্ক লেখা না থাকে এবং কাকে দেওয়া হচ্ছে তাও না থাকে, কিন্তু চেকদাতার সই থাকে, তখন একে আর **সগুণ-ব্রহ্ম** বলা যায় না, এ হল 'ব্ল্যাংক চেক', **নির্গুণ-ব্রহ্ম**। এ হল বিশাল এক শক্তিপূর্ণ **ব্রহ্ম**, যা দৃশ্যত শূন্য (**শক্তিপূর্ণ শূন্যতা**) কিন্তু যে কোনো শক্তিতে আবির্ভূত হতে পারার যোগ্যতা ধরে। কত শক্তিতে আবির্ভূত হতে পারে, তা নির্ভর করে সেই **ব্রহ্ম**-এর আরাধনাকারী ভক্তের ইচ্ছা ও সাধনার উপর। শিশু বা উন্মাদের হাতে পড়লে এই ব্ল্যাংক চেকের কোনো মূল্যই থাকে না, মধ্যবিত্তর হাতে পড়লে দশ-বিশ লাখ টাকায় পরিণত হতে পারে, কিন্তু কোটিপতিদের হাতে পড়লে কোটি কোটি টাকায় পরিণত হতে পারে। ...

কিন্তু এ তো গেল সামান্য বাহ্যসম্পদের কথা। মানসসম্পদের দুনিয়ায় এই **নির্গুণ-ব্রহ্ম** কোথায় কোন সুদূরে কোন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, তা অকল্পনীয়। মানুষ **সগুণ-ব্রহ্ম**-এর আরাধনা করতে করতে একসময় এই **নির্গুণ-ব্রহ্ম**-এর আরাধনা করতে লেগে যায়। যিনি এই **নির্গুণ-ব্রহ্ম**কে, এই শক্তিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তাকে, এই নির্বিকার শক্তিরূপিণীকে চিনে ফেলেন, তাঁর **কৈবল্য**লাভ হয়। তিনি চূড়ান্ত অসীম শক্তির আধার হ'য়ে **নির্বিকার** রূপে বিরাজ করেন। মনে হয় তাঁর চেয়ে নিষ্ক্রিয়, হীন আর কেউ নেই। সেই তাঁকেই তাঁর পূর্ণস্বরূপে পাওয়া যেতে পারে কেবল **পূর্ণ**রূপী ভক্ত **দোহদ** রূপে তাঁর আরাধনা করলে। আমাদের বহু মনীষী এইরূপ সর্বোচ্চ **ব্রহ্মপদ** লাভ করেছেন, **নির্গুণ-ব্রহ্ম**কে লাভ করেছেন। (এ বিষয়ে আমাদের 'জ' গ্রন্থের শেষ নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

স্বভাবতই বিশ্বজগতের সকল জ্ঞানের সর্বোচ্চে অবস্থান এই **ব্রহ্ম**জ্ঞানের। অতি মহৎ থেকে অতি নিকৃষ্ট পর্যন্ত এই **ব্রহ্ম**-এর সহজ আনাগোনা। বলতে কি, আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এই **ব্রহ্ম**-বায়ুতেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিই, বেঁচেবর্তে থাকি। এই সেই কারণ, যেজন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা **ব্রহ্ম** শব্দ সহযোগে অজস্র শব্দ বানিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানে তার কিছু কিছু শব্দের অর্থ ও আমাদের মন্তব্য অতি সংক্ষেপে দিয়ে যাব।

তারকব্রহ্ম : ২. *তারণ করে যে ব্রহ্ম।* / **তারক** = পারে উত্তরায়িতা। (ব.শ.)। **৩. তারকব্রহ্ম** = সংসারত্রাতা ষড়ক্ষর মহামন্ত্র — ওঁ শ্রীরামরাম; ওঁ রামায় নমঃ। (ব.শ.)। **৪.** ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। অন্যথায় শব্দটি বর্তমানে অপ্রচলিত। **৫.** শব্দটির অলৌকিক বা উচ্চতম স্তরের ব্যবহার বুঝতে পারার যোগ্যতা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। উপরোক্ত মন্ত্রটির অর্থও আমাদের আয়ত্তে আসেনি। শুধুমাত্র লৌকিক জগতে **তারকব্রহ্ম**কে আমরা চিনতে পারি 'বিনিময়ের মাধ্যম' রূপে — টাকায়, মুদ্রায়, চেক ইত্যাদিতে। সেগুলিই সামাজিক লেনদেনের সমস্যা থেকে আমাদের তারণ করে, পারে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। সেই বিচারে টাকাকে **তারকব্রহ্ম** বলা যেতে পারে।

পরমব্রহ্ম : ২. ***পরম*** *যে* ***ব্রহ্ম*** */* **৩.** পরব্রহ্ম। (ছা.অ.)। **৪.** ধর্মপ্রাণ মানুষেরা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পরম**। **ব্রহ্মের** যে সর্বোচ্চ রূপ, সেই **নির্গুণ-ব্রহ্ম**কেই **পরমব্রহ্ম** বলা যায়।

ব্রহ্মঅসুর, ব্রহ্মদত্যি, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রহ্মজাল, ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মরক্ষঃ, ব্রহ্মরাক্ষস : ৩. ব্রহ্মঅসুর = অসুরভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ। **ব্রহ্মদত্যি, ব্রহ্মদৈত্য** = জীবনান্তে দৈত্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণভূত। **ব্রহ্মজাল** = সর্পবিশেষ। **ব্রহ্মপিশাচ** = পিশাচযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের জীবাত্মা। **ব্রহ্মরক্ষঃ, ব্রহ্মরাক্ষস** = ব্রহ্ম (বিপ্র) হইয়া কর্ম্মদোষে রাক্ষস, ভূতবিশেষ, দ্বিজ হইয়া শাপ হেতু রাক্ষস। দ্র. **কল্মাষপাদ**। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** শুধুমাত্র **ব্রহ্মদত্যি** শব্দটি শিশু ও মা-ঠাকুমাদের রূপকথার গল্পের মধ্যে আজও কমবেশি আনাগোনা করে। অন্যথায় এই শব্দগুলির ব্যবহার বাংলাভাষীদের মধ্যে এখন আর নেই বললেই চলে। কিন্তু একবার যদি প্রশ্ন তোলা হয়, এই শব্দগুলি যে সকল সত্তাকে বোঝাত, সেই সত্তাগুলি কি এখন আর

নেই? সমাজে কি তাদের সক্রিয়তা দেখা যায় না? তখন অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখি, উপরোক্ত শব্দগুলি যে সত্তাদের বোঝাতো, তারা কেবল আছে নয়, মহাবিক্রমে বিরাজ করছে এবং মানুষের সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। কিন্তু তাদের দেখবার, নামকরণ করে চিনে রাখবার, তাদের বিষয়ে বলবার শব্দ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই তাদের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে গিয়ে আমরা তাদের খণ্ড খণ্ড রূপে ইংরেজি শব্দের সাহায্য নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে থাকি। ...

প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে কোনো শুভ অর্জনই সুদীর্ঘকাল **দক্ষ**নীতিতে চললে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র দোষে মৌলবাদী হয়ে পড়ে এবং স্বভাবতই নষ্ট ও ক্ষতিকর হয়ে যায়। যে **ব্রহ্ম** মানুষের **পরম** অর্জন, সেই **ব্রহ্ম**-এরও অধঃপতন ঘটে উপরোক্ত কারণে। তখন **ব্রহ্মজ্ঞানী** ব্রাহ্মণও পরিণত হন **ব্রহ্মঅসুর** ... প্রভৃতি মানববিরোধী সত্তাগুলিতে। সমাজের মানুষের বৃদ্ধিসাধন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়, কর্মযজ্ঞগুলি **ভূরিদক্ষিণযজ্ঞে** পরিণত হয়ে যায়। একালের উচ্চডিগ্রিধারী উপদেষ্টারা কি সেইরকম দৈত্য বা রাক্ষস নন, যাঁরা রাষ্ট্রের ও পুঁজির উপদেষ্টা রূপে নানান পিশাচ ও রাক্ষসসুলভ সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করেন, পরামর্শ দিয়ে থাকেন? কোটি কোটি মানুষের ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে পারা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের ভূরি ভূরি দক্ষিণার বা **বহুদক্ষিণা**র লোভ ত্যাগ করতে পারেন না। ... এঁদের নানা রূপগুলিকে কি **ব্রহ্মদৈত্য, ব্রহ্মজাল, ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মরক্ষঃ, ব্রহ্মরাক্ষস** ... ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা যায় না। জন্মসূত্রে যিনি ব্রাহ্মণ, **ব্রহ্ম** শব্দে শুধুমাত্র তাঁকেই বোঝা ও বোঝানো ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মতে নিতান্তই ভ্রান্ত পদ্ধতি। **ব্রহ্ম**জ্ঞানীদের ছাত্রের ছাত্রের ... ছাত্র হয়ে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করে করে রাক্ষসসুলভ আচরণে যারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, শব্দশাস্ত্রের নিয়মে তাদেরই **ব্রহ্মরাক্ষস** ... ইত্যাদি বলা যায়।

ব্রহ্মকরোটি, ব্রহ্মতালু, ব্রহ্মতালুয়া : ৩. **ব্রহ্মকরোটি** = কপাল। **ব্রহ্মতালু, ব্রহ্মতালুয়া** = ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিতল, মাথার চাঁদি। (ব.শ.)। ৪. **ব্রহ্মতালু, ব্রহ্মতালুয়া** শব্দদুটি 'মাথার চাঁদি' অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের **করণ্**-এর প্রাথমিক আধার যেমন **কর** বা হাত, তেমনি তার **ব্রহ্মন্**-এর প্রাথমিক আধার হল তার **ব্রহ্ম** বা মাথা। সেই কারণে মানুষের কপালকে বলে **ব্রহ্মকরোটি**। একই নিয়মে বাকি শব্দদুটিও প্রসূত হয়েছে। একই নিয়মে অজস্র **ব্রহ্ম**-যুক্ত শব্দ তৈরি করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই **ব্রহ্ম** শব্দ সমাজশরীরের মাথাকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হত।

শব্দার্থজ্ঞান বিষয়ে যাঁরা পাশ্চাত্য প্রভাবে অতি প্রভাবিত, তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে, **ব্রহ্ম**-এর মতো এত অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়ে বাংলাভাষীরা কপাল-চাঁদিকে অর্থাৎ forehead, crown-কে বোঝাতে যায় কেন! আসলে শব্দের মহত্ত্ব হীনত্ব তো বাংলাভাষীর ভাবনার বিষয় নয়, তাঁদের ভাবনার বিষয় শব্দটি কীরকম ক্রিয়া বা ক্রিয়াকারীকে বোঝাচ্ছে। সে যদি মহত্তম **পরমব্রহ্ম**কে বোঝাতে পারে বোঝাক, সমাজশরীরের মাথাস্বরূপ **ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ** ... ইত্যাদি সত্তাকে বোঝাতে চায় বোঝাক, আবার অতি সাধারণ **ব্রহ্মকরোটি, ব্রহ্মতালু, ব্রহ্মতালুয়া, ব্রহ্মঘ্নী, ব্রাহ্মীশাক**কে বোঝাতে পারে বোঝাক না! আপত্তির কী আছে। শব্দ তো একটা ঝুড়ি, যাতে ধারণা পারাপার করা হয়। যে ঝুড়িতে রাজগৃহে উপঢৌকন পাঠানো হয়েছে, তা দিয়ে গোবর নিয়ে যাওয়া যাবে না, এমন ঝুড়ি-পুজোতে বাংলাভাষীর আপত্তি আছে। যখন যে-কাজ পড়ে, বাংলাভাষী তখন সেকাজেই তার হাতিয়ারগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করে; হাতিয়ারের জাতবিচার করে না। কাজ হলেই হল। কাজ না হলে যত মূল্যবান হাতিয়ারই হোক না কেন, তা বাদ দেওয়াই মঙ্গল।

ব্রহ্মকর্ম : ৩. ব্রাহ্মণজাতির কর্ম, ব্রহ্মরূপকর্ম, কর্মাত্মক ব্রহ্ম, যজ্ঞে ব্রহ্মার কর্তব্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখনও তো একালের সমাজের মাথায় যাঁরা বসে থাকেন, তাঁরা তো সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, সামাজিক জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্ম বা **ব্রহ্মকর্ম** করেনই। এখনও তো সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে আমাদের বিশেষজ্ঞ বিদ্যাদিগ্‌গজেরা '**ব্রহ্মা**র কর্তব্য' করে থাকেন। তবে কিনা রবীন্দ্রকথিত 'অতীতের সঙ্গে আমাদের গভীর আত্মবিচ্ছেদ'-এর কারণে এখন আর আমরা তাঁদের **ব্রহ্মকর্ম** কিংবা 'ব্রহ্মার কর্তব্য' ইত্যাদি বলি না; এমনকি নিজেদের ভাষাতেও বলি না; ইংরেজি শব্দ সহযোগে একালে আমরা তাঁদের management, directorate কিংবা সরাসরি director, administrator, manager, specialist ... ইত্যাদি বলে থাকি। অর্থাৎ কিনা, **বানপ্রস্থ**-আশ্রমে **ব্রাহ্মণ** যে কর্ম করেন, সেটিই **ব্রাহ্মণের** আসল কর্ম বা **ব্রহ্মকর্ম**, একালের ভাষায় যাকে বলা হয় advisory role বা '**অভি-ভাবক**-এর ভূমিকা'। বিশ্বের সবদেশের জ্ঞানী মানুষেরাই কমবেশি এই কর্ম করে থাকেন। ...

ভারতে এককালে **ব্রাহ্মণ** নামক একটি বিশেষ জাতির মানুষেরা যে কর্ম করতেন, তাকেই **ব্রহ্মকর্ম** বলা হত বটে, কিন্তু সেই **ব্রাহ্মণ**-এর **ব্রাহ্মণত্ব** যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এবং সেই **ব্রাহ্মণত্ব** যদি তথাকথিত 'বামুন' জাতিটিকে ত্যাগ করে নানা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন **ব্রহ্মকর্ম** তো 'বামুন'জাতির কর্ম থাকে না, প্রকৃত **ব্রাহ্মণ**দের কর্ম হয়ে যায়, সেই **ব্রাহ্মণেরা** যে জাতিতেই জন্মাক।

ব্রহ্মকাণ্ড : ৩. ব্রহ্মবিষয়ক বেদাংশ, বেদের জ্ঞানকাণ্ড। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মানবসভ্যতার আদি গ্রন্থ হল বেদ। তাতে রয়েছে সেকালের মানুষের অর্জনের সমস্ত কথা। তার যে জ্ঞানকাণ্ড, একালের ভাষায় যাকে তত্ত্ব বা থিয়োরি বলে, সেটিই ছিল বেদের মাথাস্বরূপ। তাকেই বলা হত **ব্রহ্মকাণ্ড**। আমরা কিন্তু কোনো বিষয়ের theoretical part-এর বাংলা অনুবাদ **ব্রহ্মকাণ্ড** করবার যোগ্যতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। ইংরেজি শব্দ দিয়েই কাজ চালাই, তা সে যত খণ্ড-ধারণাধারী শব্দই হোক।

ব্রহ্মঘাতক, ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মঘ্ন, ব্রহ্মদ্বিট্, ব্রহ্মবধি, ব্রহ্মবধিয়া, ব্রহ্মবধ্যা, ব্রহ্মহত্যা, ব্রহ্মহা, ব্রহ্মহিংসক : ৩. **ব্রহ্মঘাতক, ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মঘ্ন** = ব্রহ্মহত্যাকারী, ব্রাহ্মণঘাতক। **ব্রহ্মদ্বিট্** = ব্রাহ্মণের দ্বেষ্টা, ব্রহ্মহিংসক, বেদনিন্দক, নাস্তিক। **ব্রহ্মবধি** =

ব্রহ্মঘাতী। **ব্রহ্মবধিয়া** = ব্রহ্মঘাতক। **ব্রহ্মবধ্যা** = ব্রহ্মবধ। **ব্রহ্মহত্যা** = ব্রাহ্মণবধ। **ব্রহ্মহা** = ব্রাহ্মণঘাতক। **ব্রহ্মহিংসক** = ব্রাহ্মণের হিংসাকারী। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **উর্ব্ব**। ভাবনার কথা এই যে, সমাজের যাঁরা মাথাস্বরূপ ছিলেন, তাঁদের হত্যা করার বিষয়ে আমাদের ভাষায় এত শব্দ কেন? তাহলে কি মাথাটি বাকি শরীরের সঙ্গে এতই দুর্ব্যবহার করেছিল যে, সমাজের মাথাস্বরূপ ব্যক্তিদের হত্যা করাই সেকালের মানুষ উচিত বিবেচনা করেছিলেন? ...

হ্যাঁ। কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি। একদিকে নতুন জ্ঞান অর্জন বন্ধ করে দিয়ে (**শিব**কে বাদ দিয়ে ফেলে) এই মাথা সত্যই শরীরবিরোধী হয়ে গিয়েছিল, অপরদিকে সমাজের নিজের মাথা কেটে ফেলার নানান চেষ্টা এবং বৌদ্ধযুগে সেই কাজের কিঞ্চিৎ সাফল্য (রামচন্দ্রের পুরোহিতশ্রেষ্ঠ রাবণকে হত্যা করা), নষ্ট **ব্রহ্ম**কে হত্যা করতে গিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মানবসভ্যতার অর্জিত **ব্রহ্মজ্ঞান**কেও (বিকাশসাধনের বা development-এর জ্ঞানকেও) বাদ দিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ তার নিজের অতীত অর্জন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'অতীতের সঙ্গে ভারতের এই গভীর আত্মবিচ্ছেদ'কে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কস উভয়েই ভারতের দুর্দশার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন।

ব্রহ্মঘ্নী : ৩. ঘৃতকুমারী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ব্রহ্মঘ্নী** বা 'ঘৃতকুমারী' একপ্রকারের উদ্ভিদ, খানিকটা আনারস গাছের মতো, তবে তার চেয়ে আকারে ছোট এবং পাতাগুলি যথেষ্ট পুরু। এর পাতার ওপরের সবুজ আবরণ চেঁছে নিলে ভেতরে স্বচ্ছ জেলির মতো যে অংশ বেরোয়, গ্রামবাংলার মানুষেরা তার শরবৎ ইত্যাদি বানিয়ে পান করে থাকেন। কেন সেরকম করেন তাঁরা?

কেবল মনের কেন, শরীরের বৃদ্ধিসাধনও **ব্রহ্মন্** কর্মই বটে। যে সত্তা সেই **ব্রহ্ম**কে হত্যা করে, তার নাম অতএব **ব্রহ্মঘ্নী** দেওয়াই উচিত বিবেচনা করেছিলেন আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা। তাঁরা উদ্ভিদটির অপর একটি নামও দিয়েছিলেন — 'ঘৃতকুমারী'; কারণ সে কৌমার্য শক্তি বর্ষণ করে বলেই শরীরের ক্রমবৃদ্ধি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এতে একদিকে যেমন বার্ধক্য রোধ হয়, অপরদিকে তেমনি শরীরের ভিতরে কৌমার্যের বৃষ্টি ঝরে এবং তার ফলে মানুষ তার যৌবন ধরে রাখতে পারে দীর্ঘকাল। এই কারণে সেকালের মানুষ এর দুটো নাম দিয়েছিলেন — **ব্রহ্মঘ্নী** ও 'ঘৃতকুমারী'। ইংরেজিভাষীরা উদ্ভিদটিকে বলেন aloe vera।

যেহেতু আজকের দেহবাদী বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই চিরযুবা থাকতে চান, তাঁরা এই **ব্রহ্মঘ্নী**কে বা 'ঘৃতকুমারী'কে পারলে গোড়াসুদ্ধ খেয়ে চিরযুবা থাকার চেষ্টা করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী! তাঁদের সেই চেষ্টার নিদর্শন পাবেন aloe vera বিষয়ে জানার চেষ্টায় একবার আন্তর্জাল-সন্ধান (internet search) করলেই। এ নিয়ে কত বয়ানক্ষেত (website) যে কতরকমের বয়ান নিয়ে সক্রিয় রয়েছে, দেখলে বিস্ময় জাগে। আর আমরা, ভারতীয় উপমহাদেশের 'আত্মবিচ্ছিন্ন' অতীতহারা মানুষেরা, সেই **ব্রহ্মঘ্নী** ও 'ঘৃতকুমারী' শব্দটিকে পর্যন্ত আমাদের ভাষা থেকে প্রায় বাদ দিয়ে বসে আছি। স্বভাবতই আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা যে আন্তর্জাল খুলে ইংরেজের মুখে aloe vera-র গৌরবগাথার ঝাল খেয়ে আহা-উহু করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্মচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী) : ২. *ব্রহ্মচর্য্য = ব্রহ্ম-এর চরণশীল চলা (যাওয়া) থাকে যাহাতে। ব্রহ্মচর্য্যা = ব্রহ্মচর্য্য-এর আধার যে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম = ব্রহ্মচর্য্য-রূপ শ্রমের আশ্রয় যে (দ্র. **আশ্রম**)। ব্রহ্মচারী = ব্রহ্মসুলভ আচরণ করে যে। ব্রহ্মচারিণী = ব্রহ্মচারী স্ত্রী যে।* ৩. **ব্রহ্মচর্য্য** = বেদসম্বন্ধী আচরণীয় কার্য্য, দ্বিজগণের বেদগ্রহণার্থ ব্রতবিশেষ (ব্রহ্মচারী ছত্রিশ বৎসর আচার্য্যগৃহে বাস করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন এবং প্রথমে স্বীয় বেদশাখা, পরে অন্য বেদের শাখাত্রয় শাখাদ্বয় বা এক শাখা ও মন্ত্রব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তনান্তে দারগ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থ হইবেন।), নিষিদ্ধমৈথুননিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যোগশাস্ত্রে) স্ত্রীপুংশ্চিহ্নসংযম, উপস্থসংযম, অ-দারগ্রহ, অকৃতপুনর্দারগ্রহ। **ব্রহ্মচর্য্যা** = ইন্দ্রিয়সংযম। **ব্রহ্মচারী** = বেদাধ্যায়নরূপতপশ্চারী, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতী, সংযতেন্দ্রিয়, তপশ্চরণশীল, আচার্য্য কুলবাসী যথাবিধি বেদবিদ্যার্থী শিষ্য, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যব্রতী, অকৃতদার সনকাদি। **ব্রহ্মচারিণী** = ব্রহ্মচর্য্যনিরতা নারী, বেদচারিণী দুর্গা। (ব.শ.)। ৪. প্রায় সব শব্দগুলিই এখন সংসারের বাইরে থাকা সন্ন্যাসী ও বামুন-টামুনদের ব্যাপার-স্যাপার, এর সঙ্গে বর্তমান সমাজের কোনো যোগ নেই — খানিকটা এইরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শব্দগুলি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রচলিত। ৫. **ব্রহ্ম**কে জেনে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করে রেখে গেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন আপন জীবন**চর্য্যা** চালালে তাকে **ব্রহ্মচর্য্য** বলে। বাকি শব্দের অর্থগুলি উপরে ২.-এ দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মজীবী : ২. *ব্রহ্মকর্ম্মই জীবিকা যাহার।* ৩. শ্রৌতাদিকর্ম্মজীবী ব্রাহ্মণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যে ব্যক্তি সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ জ্ঞানীদের বা **ব্রহ্মের** অংশ হয়ে তাঁদের সমগ্র কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন কর্ম করেন এবং তদ্রূপে আপন জীবিকাও অর্জন করেন, তাঁকে **ব্রহ্মজীবী** বলে। এরকম **ব্রহ্মজীবী** এখনও রয়েছেন, তবে তাঁদের **ব্রহ্মজীবী** বলা হয় না; বলা হয় — শিক্ষক, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা ... ইত্যাদি।

ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারা) : ২. *ব্রহ্মজ্ঞ = ব্রহ্মকে জানেন যিনি। ব্রহ্মজ্ঞান = ব্রহ্ম বিষয়ের জানা অন থাকে যাহাতে।* ৩. **ব্রহ্মজ্ঞ** = ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ, বেদবিৎ। **ব্রহ্মজ্ঞান** = আত্মজ্ঞান, প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান, অভ্রান্তবাক্য। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. আরও **ব্রহ্মজ্ঞানের** গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, আসলে এ হল 'সম্পর্কজ্ঞান' — **(ক) জড়পদার্থের অভ্যন্তরের সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান, (খ) জড়পদার্থের সঙ্গে জড়পদার্থের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান, (গ) জড়পদার্থের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান, (ঘ) মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান, এবং (ঙ) মানুষের সঙ্গে পরমাত্মার (অতিচেতনের) সম্পর্ক বিষয়ক**

জ্ঞান। জড়পদার্থকে যদি অবচেতন ভাবা হয়, তাহলে একে আরেকভাবেও বলা যায় — **(ক) অবচেতনের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কজ্ঞান, (খ) অবচেতনের সঙ্গে অবচেতনের সম্পর্কজ্ঞান, (গ) অবচেতনের সঙ্গে সচেতনের সম্পর্কজ্ঞান, (ঘ) সচেতনের সঙ্গে সচেতনের সম্পর্কজ্ঞান,** এবং **(ঙ) সচেতনের সঙ্গে অতিচেতনের সম্পর্কজ্ঞান**। প্রাচীন ভারতের মনীষা এই সবগুলিকেই একত্রে **ব্রহ্মজ্ঞান** বলতেন। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা একে **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারা** বলব। এর যে কোনো এক বা একাধিক ধারার বিষয়ে যিনিই কিছু না কিছু আবিষ্কার করেন, উদ্ভাবন করেন, তাঁকেই **শিব, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী** বলা হত, একালে তাঁদের আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, শিল্পস্রষ্টা, বিজ্ঞানী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। ...

আধুনিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করেছে, সেও প্রধানত পদার্থের গভীরে থাকা পদার্থের **স্ব**-ভাব বা **প্র**-কৃতির দ্বৈতাদ্বৈত-স্বরূপের রহস্য-উন্মোচন। এ-ও 'পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক' জ্ঞানই বটে! একেও **ব্রহ্মই** বলা হত; কারণ এ হল উপরোক্ত (ক) ধারার **ব্রহ্মজ্ঞান**। পদার্থের অভ্যন্তরের রহস্য নিয়ে যে অণু-পরমাণুর তালিকা (periodic table) আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হয়েছে এবং মানবসভ্যতার নানা কাজে লাগছে, সে তো অবশ্যই এই ধারারই **ব্রহ্মজ্ঞান**। নিউটনের অভিকর্ষ-তত্ত্ব, আইনস্টাইনের শক্তিতত্ত্ব, কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুর গাছের প্রাণতত্ত্ব, বেতারতত্ত্ব ... সবই তো উপরোক্ত (ক), (খ) ও (গ) ধারার **ব্রহ্মজ্ঞান**। হ্যাঁ, এদের আপনি রবীন্দ্রনাথের মতো 'একপেশে' বলে দোষারোপ করতে পারেন, কারণ এই **ব্রহ্মজ্ঞান** প্রধানত জগতের দেহের রহস্য উন্মোচন; জগতের মনের দিকটাকে অর্থাৎ (ঘ) ও (ঙ) ধারা দুটিকে এই আধুনিক **ব্রহ্মজ্ঞানী**রা দেখতে যাননি, দেখতে পাননি। এবং আমাদের **অদ্বৈত**-তত্ত্বের পর জগতের মনের দিকের কোনো নতুন রহস্য আর আবিষ্কৃত হয়নি। হলে এই সভ্যতাকে তার রবীন্দ্রকথিত 'একঝোঁকা' অবস্থা থেকে বাঁচানো যেত। ...

কিন্তু তাই বলে উপরোক্ত উদ্ভাবক বিজ্ঞানীদের **ব্রহ্মজ্ঞান**কে ও সেই জ্ঞানের জ্ঞানী **ব্রহ্মজ্ঞ**দেরকে আমরা **ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞ** ইত্যাদি **নামে** শনাক্ত করব না কেন? শব্দের তো কোনো জাতধর্ম হয় না, ভাষার কোনো শব্দকেই শুধুমাত্র কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে না। অন্তত আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেরকম নীতি মানতেন না। মানলে **ব্রহ্মঘ্নী, ব্রহ্মতালু, ব্রহ্মবন্ধ, ব্রহ্মডাঙা, ব্রাহ্মীশাক** প্রভৃতি শব্দ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতাম না।

ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ব্রহ্মতেজঃ : ২. *ব্রহ্ম-এর জ্যোতিঃ, ব্রহ্ম-এর তেজঃ।* ৩. **ব্রহ্মজ্যোতিঃ** = ব্রহ্মতেজঃ। **ব্রহ্মতেজঃ** = ব্রহ্মের জ্যোতিঃ, তপঃস্বাধ্যায়াদি জন্য ব্রাহ্মণের তেজোবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই তেজ বা জ্যোতি দু'রকমভাবে প্রতিভাত হয়। প্রথমত, অস্তিত্বের, তা সে জড়বস্তু হোক আর জীব হোক, তার **স্ব**-ভাব বা **প্র**-কৃতির ভিতরে যে **স্ব, প্র** বা **দ্বৈতাদ্বৈত** রয়েছে, সেটিই তার **ব্রহ্ম**ও বটে। সেই **ব্রহ্ম** থেকে যে তেজ বেরিয়ে আসে, সাধারণভাবে তাকেই **ব্রহ্মজ্যোতি বা ব্রহ্মতেজ** বলা যায়। পরমাণুর বিস্ফোরণ সেই **ব্রহ্মতেজ**-এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া, আকছার এই **ব্রহ্মতেজ**-এর প্রকাশ দেখা যায় যখন কোনো জীব (কিংবা মানুষ) তার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে অকস্মাৎ বাঁধ ভেঙে ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে 'মারি কিংবা মরি' করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন। দ্বিতীয়ত, **ব্রহ্মজ্ঞানী** মানুষেরা, যাঁরা সাধারণত চুপচাপ থাকেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাঁদের বলতেন 'প্রবুদ্ধমিব সুপ্ত', তেমন মানুষ অনেক সময় অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে যখন আপন **ব্রহ্মজ্ঞান**-এর প্রকাশ ঘটিয়ে ফেলেন, তখনও আমরা এই **ব্রহ্মতেজ**-এর সাক্ষাৎ পাই।

ব্রহ্মডাঙা : ২. *(অন্য ডাঙাসমূহের মধ্যে-) সর্বোচ্চ বা ব্রহ্ম যে ডাঙা।* ৩. অত্যুচ্চ স্থান, গ্রামবিশেষ। (ব.শ.)। উচ্চে অবস্থিত উর্বরতাহীন জমি। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. highland অর্থে প্রচলিত। ৫. মানবশরীরের শীর্ষদেশ যেমন **ব্রহ্মতালু, ব্রহ্ম**করোটি ... ইত্যাদি, সমাজশরীরের শীর্ষদেশ যেমন **ব্রহ্মলোক** ... ইত্যাদি, সেইরকম সমতলভূমির বা ডাঙাসমূহের শীর্ষদেশ বা উচ্চদেশ **ব্রহ্মডাঙা** নামে অভিহিত হয়।

ব্রহ্মত্র (ব্রহ্মত্বর, ব্রহ্মোত্তর) : ২. **ব্রহ্মত্র** = *ব্রহ্মকে (তার দৈহিক সমস্যা থেকে) ত্রাণ করে যে।* **ব্রহ্মত্বর** = *ব্রহ্মত্ব রহে যাহাতে।* **ব্রহ্মোত্তর** = *ব্রহ্ম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা (যে ভূসম্পত্তি) প্রাপ্ত হইয়াছে।* ৩. **ব্রহ্মত্র (ব্রহ্মত্বর, ব্রহ্মোত্তর)** = ব্রাহ্মণের ভোগার্থ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভারতীয় উপমহাদেশে বহু ভূসম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, সরকার যার কোনোরকম কর বা খাজনা নিত না। রীতিটি বহু প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, এখনও হয়তো-বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে। রাজা বদলে গেছে, শাসক-প্রশাসক বদলে গেছে, পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে, ব্রিটিশ এসেছে, কিন্তু সেই ভূসম্পত্তি থেকে গেছে যথাপূর্বং নিষ্কর। এগুলিকেই বলা হত **ব্রহ্মত্র, বহ্মত্বর, ব্রহ্মোত্তর** ... ইত্যাদি। বহুকালক্রমাগত সেই প্রথা ব্রিটিশ সরকারও মেনে নেন, ঠিক যেমন ভারতে **বৃষোৎসর্গ**-এর (শিবের নামে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার) প্রাচীন রীতি মোগল-পাঠান এবং অবশেষে ব্রিটিশ শাসকরাও যথারীতি চালু রেখেছিলেন, অনেকটা সেইরকম।

ব্রাহ্মণ নামক জাতিটিকে পোষণ করবার, আধুনিকতাবাদী তথা মার্কসবাদীরা যাকে 'বামুনপোষা' বলে নিন্দা করে থাকেন, সেই রীতিটির প্রচলন বিশ্বের আদি মানুষেরা এমনি এমনি করেননি। আরব দেশগুলিতেও 'আওলিয়া', 'অম্বিয়া', মসজিদের নামে নিষ্কর সম্পত্তির প্রচলন ছিল। ইউরোপেও চার্চকে ভূমিদান ছিল অতীব পুণ্যকর্ম। কেন? কারণ, এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নীতি, মানুষের প্রাচীন ঝাঁক তাদের পরিচালকদের সুরক্ষার জন্য যা স্বভাববশতই করত এবং প্রাচীন ভারত সে নীতি বহু আগেই গ্রহণ করেছিল। আর যখন তা গ্রহণ করা হয়েছিল তখন **ব্রাহ্মণ** ছিলেন বাহ্যসম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্লোভ, সদা জ্ঞান-আহরণ ও জ্ঞানচর্চা করে সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা যাঁর একমাত্র ব্রত ছিল, তার জন্য জীবন প্রাণ

সবই বলি দিতে যিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। স্বভাবতই সমাজসভ্যতার পরিচালক **ব্রাহ্মণ**দের **ভরণ**পোষণ করবার এই নীতি আদিম মানবসমাজের সকল সম্প্রদায়ই কমবেশি গ্রহণ করেছিল। **ভারত** তা সচেতনভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল বলেই আমাদের দেশটির নাম হয়ে যায় **ভারতবর্ষ**।

এ নীতি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক এই জন্য যে, প্রত্যেক মানুষ তার মাথাটিকে **ভরণ**পোষণ করে, যদিও মাথাটি হাত পা পেট চোখ কানের মতো কাজ করে না। কারণ মাথাই মানুষটিকে, মানুষের শরীরটিকে ... চালায়। কথাটি সমাজশরীরের ক্ষেত্রেও একশোভাগ প্রযোজ্য। যে সামাজিক শ্রেণীর জীবনের একমাত্র ব্রত জ্ঞানার্জন ও সমাজকে পথ দেখানো, তাকে ভরণপোষণের দায় স্বভাবতই সমাজকে নিতে হয়। **ব্রাহ্মণ**কে ভারতসমাজ সেকারণেই 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়ে দিয়েছিল — **ব্রাহ্মণ** রাজার কাছে এসে যখন যা চাইবে, রাজা তা দিতে বাধ্য থাকবে, এটাই ছিল রাজধর্ম। **কশ্যপ**কে ভূমিদান ছিল স্বাভাবিক, পরবর্তীকালে তারই প্রায়োগিক রূপ হয়ে যায় **ব্রহ্মত্র** দেওয়া। এই রীতি অত্যন্ত প্রাচীন, এবং বিশ্বের সব দেশেই কমবেশি প্রচলিত ছিল।

কিন্তু সমাজপরিচালকের আসনে বসা সেই **ব্রাহ্মণ**রা পরে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণ করে বংশানুক্রমিক **ব্রাহ্মণে** পরিণত হয়ে যান, নষ্ট হয়ে যান, **ব্রহ্মদৈত্য** বা **ব্রহ্মরাক্ষসে** পরিণত হয়ে যান। স্বভাবতই **ব্রাহ্মণত্ব** ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিয়ে **অব্রাহ্মণ**দের মধ্যেও সক্রিয় হতে থাকে। ফলে, **ব্রাহ্মণ** শ্রেণীটি তার সামাজিক গুরুত্ব ও সম্মান হারায়। ...

কিন্তু তাই বলে, পথপ্রদর্শক ছাড়া কি সমাজ চলতে পারে? মানুষকে তার শরীরের শ্রমের ফল দিয়ে যেমন তার মাথাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, সমাজকেও সেভাবে সমাজের মাথাকে বা **ব্রহ্ম**কে বাঁচিয়ে রাখতে হয়; একথার অন্যথা করা চলে না। তবে একথা ভোলা চলবে না যে, বামুনজাতিই ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন — এমন কথা আদৌ সত্যি নয়; যাঁরাই **ব্রহ্মলাভ** ক'রে, **ব্রহ্মকর্ম** ক'রে পথপ্রদর্শকের যোগ্য হয়ে ওঠেন এবং সেই কাজ করেন, তারাই প্রকৃত **ব্রাহ্মণ**; তা সে বামুনজাতির সদস্য হোন বা অন্য কোনো জাতির সদস্য হোন। কেবল দেখা দরকার, জ্ঞানচর্চা তার জীবনের ব্রত কি না, সেই জ্ঞানচর্চা তিনি সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন কি না। যিনিই তা করেন, তিনিই প্রকৃত **ব্রাহ্মণ**। সেই **ব্রাহ্মণ**-এর অমর্যাদা হলে, সেই **ব্রাহ্মণ** বেঁচে না থাকলে কেউই বেঁচে থাকবে না, সমাজশরীরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আজকের বিশ্বসভ্যতা যে দূষিত পরিবেশ, চরম আত্মকলহ, পাহাড়প্রমাণ সম্পদের পাশেই হাহাকারের মরুঝড়, শাসনের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা ও সন্ত্রাসের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে শেষ হয়ে যেতে বসেছে, তার মূল কারণ হল, আজকের মানবসভ্যতাকে পথ দেখানোর জন্য তার 'অখণ্ডজ্ঞানী' **প্রকৃত-ব্রাহ্মণ** মানুষেরা আর নেই বললেই চলে। বলতে কী, অখণ্ড জ্ঞানের উপাসক এইসকল জ্ঞানজীবীদের বেঁচে থাকার কোনো ব্যবস্থাই রাখেনি আজকের পুঁজিশাসিত ও গোলোকায়িত বিশ্বসভ্যতা। সেকারণেই আজকের বিশ্বসভ্যতার এত দুর্দশা। আজ আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, সমাজরথ প্রযুক্তির প্রচণ্ড উন্নতি ঘটিয়ে সবেগে চলছে তার পথপ্রদর্শক ছাড়াই। এ যে কখন কোন খাদে পড়ে নিশ্চিহ্ন হবে, কেউ জানে না।

ব্রহ্মদণ্ড : ৩. ব্রহ্মার্পিত। (ব.শ.)। ... এক রাজা। একদা কালরূপী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ এঁর গৃহে অতিথি হন। রাজা গৌতমের জন্য যে আহার্য প্রদান করেন, তাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। এতে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মদণ্ডকে 'গৃধ্র হও' বলে শাপ দেন। রাজা অনেক ক্ষমা ভিক্ষা করলে গৌতম বললেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা রাম তোমাকে স্পর্শ করলে তুমি মুক্তিলাভ করবে।' ... রামের রাজত্বকালে এই গৃধ্র রাজোদ্যানে এক উলুকের (পেঁচার / কণাদের) বাসা অধিকার করে বাস করতে লাগল। উলুক রামের কাছে এর জন্য অভিযোগ করলে রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হয়ে উলুককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ বাসা কত দিনের?' সে বললে, 'এই পৃথিবীতে যতদিন বৃক্ষের জন্ম হয়েছে, ততদিন এই বাসা নির্মিত হয়েছে।' গৃধ্র বললে, 'পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করা থেকে আমি এই গৃহে বাস করছি।' দুই জনের কথা শুনে রাম ... গৃধ্রকে দণ্ড দিতে গেলে দৈববাণী হল, 'গৃধ্র গৌতম শাপে দগ্ধ হয়েছে। একে স্পর্শ করে শাপমুক্ত করুন।' রামের স্পর্শে গৃধ্র দিব্যরূপ প্রাপ্ত হল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অশ্বত্থ, উলুক, কণাদ**। একদিকে বৈদিক যুগের শেষ অধিকারী **গৌতম**। এদিকে **ব্রহ্মদণ্ড** সমাজশিখরে বসে চিরাচরিত 'বিনিময়হীন দান'-এর স্থানে 'বিনিময়যুক্ত দান' খানিকটা গোপনে হলেও শুরু করে দিয়েছেন। ফলত, তাঁর দানের ভিতরে কোনোভাবে ব্যক্তিমালিকানাযুক্ত বাহ্যসম্পদের দানও ঢুকে পড়েছে। তাকেই পুরাণের ভাষায় বলা হচ্ছে, তাঁর প্রদত্ত আহার্যে '**মাংস** মিশ্রিত হয়ে যায়'। **গৌতম** ব্যক্তিমালিকানার বা **মাংসের** ঘোর বিরোধী। তাই তিনি তাঁকে **মাংসভোজী** গৃধ্র হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন। ফল হয় এই যে, পরবর্তীকালের লক্ষ্মীবাহনের আসন গৃধ্র দখল করে নেয়। ... বলে রাখা ভাল, আজও সেই গৃধ্রই আসনটি দখল করে বসে রয়েছে।

ব্রহ্মদারু : ৩. অশ্বত্থাকার বৃক্ষভেদ। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **অশ্বত্থ**।

ব্রহ্মপদ : ২. *ব্রহ্মের পদ* / ৩. ব্রহ্মধাম, ব্রহ্মত্ব। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ নামরূপে প্রচলিত। ৫. 'কালীপদ', 'বিষ্ণুপদ', 'শিবপদ', 'ব্রহ্মপদ' ... এসব ছিল সেকালের বাংলাভাষীর প্রিয় নাম। এখন এই শব্দগুলির মানে বাংলাভাষীরা ভুলে গেছেন, ফলে নামগুলি অর্থহীন হয়ে সেকেলে হয়ে গেছে। যাঁরা রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের অনেকেই জানেন 'কালীপদ' শব্দটি রামপ্রসাদ কতখানি মর্যাদার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, / ... কারে দাও মা **ব্রহ্মপদ** কারে কর অধোগামী।' — এরকম গানের পদও আছে। অর্থাৎ কিনা, সমাজে ও মানসলোকে **কালী, বিষ্ণু, শিব,** ও **ব্রহ্ম**-এর উচ্চ আসন তখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে মানসিক অবস্থানে আরোহন বা বিরাজ করলে **ব্রহ্মো**পলব্ধি, **ব্রহ্ম**লাভ ইত্যাদি হয়, তাকে **ব্রহ্মপদ** বলা চলে। যাই হোক, এই **ব্রহ্মপদ** শব্দটির অন্তত‌পক্ষে তিনটি অর্থ অবশ্যই নিষ্কাশিত হতে পারে। প্রথমত,

ঋষিবাক্যের যে **পদ**গুলিতে **ব্রহ্মের** কথা রয়েছে, সেই **পদ**। দ্বিতীয়ত, সেই **পদ**গুলি আত্মস্থ করে **ব্রহ্মলাভ** ইত্যাদি করে যাঁরা মানসলোকের **ব্রহ্মপদ** অর্জন করেছেন। তৃতীয়ত, সামাজিক সত্তাগুলির শীর্ষে অবস্থিত যে **পদে** সমাজের **ব্রহ্মজ্ঞানী**রা আসন গ্রহণ করেন, সেই **পদ**।

ব্রহ্মপুত্র : দ্র. **জলন্ধর**, **অমোঘা**।

ব্রহ্মপুরাণ : দ্র. **পুরাণ**।

ব্রহ্মবক্তা : ২. *ব্রহ্ম-এর কথা বলেন যিনি।* ৩. বেদ-অধ্যাপক। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই **ব্রহ্মবক্তা** শব্দটিও স্পষ্ট করে বলে যে, যে ব্যক্তি সমাজের অর্জিত জ্ঞানসমূহ বিষয়ে কথা বলেন, তিনিই **ব্রহ্মবক্তা**। এরকম **ব্রহ্মবক্তা** সকল দেশে সকল সমাজেই কমবেশি আছেন, থাকেন। আমাদেরও ছিলেন। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তাঁদের অর্জিত সকল জ্ঞানকে একত্র করে সংকলিত করে ফেলেন এবং তার নাম দিয়ে দেন **বেদ** (= 'যার দ্বারা বিশেষরূপে বিদিত হওয়া যায়')। কিন্তু তার বাইরেও বহু জ্ঞান থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে আরো বহু জ্ঞান অর্জিতও হতে থাকে; আজ যার পরিমাণ ঐ **বেদ**-এর তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশি। কেননা, মানুষের সমাজ তো তার জ্ঞান অর্জন বন্ধ করে দেয় না, দেয়নি। ফলে পরবর্তীকালে উপরোক্ত 'সংকলিত বেদ'-এর বাইরে বহু জ্ঞান অর্জিত হয়, চর্চিত হয়, হয়ে থাকে। তাদের বক্তাও **ব্রহ্মবক্তা** বটে। তার মানে আমাদের একালের সকল জ্ঞানচর্চাকারী মানুষেরাই **ব্রহ্মবক্তা**। অথচ, **ব্রহ্মবক্তা** শব্দটির সেই ব্যাপক অর্থটিকে সীমিত করে এখন তাকে শুধুমাত্র The Vedas নামে একটি গ্রন্থের অধ্যাপকদের জন্যই বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে। যিনি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খলিল জিব্রান' পড়ান, কিংবা যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি পণ্ডিত মার্লো পন্টির তত্ত্ব পড়ান, অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সালিম আলী'র 'অর্নিথোলজি' পড়ান, তাঁরা কি **ব্রহ্মবক্তা** নন?

ব্রহ্মবন্ধু : ২. *ব্রহ্মের বন্ধু।* ৩. ব্রাহ্মণের বন্ধুতুল্য, বৃত্তাধ্যয়নশূন্য জাতিমাত্রব্রাহ্মণ, জাতিব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণাধম, দ্বেষ হেতু অগ্রাহ্যনামক ব্রাহ্মণ, বিপ্রতুল্য ভট্টাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এ শব্দটিও এককালে ব্যাপকার্থে প্রচলিত ছিল। ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলিই সেকথা প্রমাণ করে।

ব্রহ্মবাদী : ২. *যে **ব্রহ্মন্** করার কথা বলে।* ৩. বেদবক্তা, বেদব্যাখ্যাতা, বেদার্থজ্ঞ, বেদবদনশীল, বেদবাদী, বেদোপদেশক, বেদাধ্যাপক, বেদান্তী। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. যেহেতু **বেদ** ('যাহার দ্বারা বিশেষরূপে বিদিত হওয়া যায়') শব্দটির অর্থকেই সঙ্কুচিত করে একটি বিশেষ গ্রন্থের (The Vedas-এর) নির্দেশক প্রতীক শব্দ করে ফেলা হয়েছে, সেইহেতু **ব্রহ্মবাদী** কথাটির মানে দাঁড়িয়ে গেছে **বেদ** বা The Vedas নামক গ্রন্থটির কথা বলে যে ব্যক্তি, সেই একমাত্র **ব্রহ্মবাদী**। কার্যত, অতীতে **ব্রহ্মবাদী** বলতে কেবল সেটুকুই বোঝাত না। **স্ব** বা **প্র** বা **ব্রহ্ম** বিষয়ক সকল কথা, বৃদ্ধিসাধন বিষয়ক **সমস্ত তত্ত্ব**কথা, জ্ঞানলোকের ও সমাজশীর্ষের সকল জ্ঞানমূলক কথার প্রবক্তাই ছিলেন **ব্রহ্মবাদী**।

ব্রহ্মবিদ্যা : দ্র. **পর (পরাবিদ্যা)**।

ব্রহ্মবিহার : ৫. এই শব্দটি বঙ্গীয় শব্দকোষে নাই। যতদূর মনে পড়ে শব্দটি বৌদ্ধসাহিত্যে ও রবীন্দ্রসাহিত্যে রয়েছে। এর অর্থ হল, **ব্রহ্মের** যে বিশাল এলাকা, সেই এলাকায় মনে মনে **বিহার** করে বেড়ানোই **ব্রহ্মবিহার** শব্দের উদ্দিষ্ট। দ্র. **বিহার**।

ব্রহ্মবীজ : ৩. বেদবীজ, প্রণব। (ব.শ.)। ৪. সাধারণভাবে অপ্রচলিত হলেও ধর্মপ্রাণ মানুষদের কেউ কেউ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। ৫. আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি বীজমন্ত্র হল $e = mc^2$। আইন-স্টাইনের ও তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানের বহু জ্ঞানের মূলে রয়েছে এই বীজমন্ত্রটি। আমাদের **বেদ** নামে যে প্রাচীন গ্রন্থটি রয়েছে, তার সমস্ত জ্ঞানের মূলে রয়েছে এই 'বেদবীজ' বা **ব্রহ্মবীজ**। একে **প্রণব**ও বলা হয়, ব.শ. যার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন — 'যাহা দ্বারা বেদ স্তুত বা প্রারব্ধ'। আমাদের বিচারে, এ হল '**প্র**-এর (**দ্বৈতাদ্বৈতের, ব্রহ্মের**) নাকরণ-অনকরণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আধারিত হয় যাহার দ্বারা'। এর প্রকাশক আওয়াজটি হল 'ওঁ'। তার থেকে আমরা জানতে পারি অস্তিত্বলাভ, নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়ন এবং একটি বিশেষ সীমায়িত রূপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় যে প্রক্রিয়ার দ্বারা, সেই প্রক্রিয়ার উল্লেখই **ওঁ** আওয়াজের অর্থ। একেই **ব্রহ্মবীজ**, বেদবীজ, প্রণব, ওঁকার ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। দ্র. **অংরূপিণী**।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ : দ্র. **পুরাণ**।

ব্রহ্মমন্যু : ৩. ব্রাহ্মণের ক্রোধ, তজ্জন্য শাপ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মন্যু**, **অভিমন্যু**।

ব্রহ্মময়, ব্রহ্মময়ী : ৩. **ব্রহ্মময়** = ব্রহ্মস্বরূপ, বেদময়, বেদরূপ, বেদাত্মক, বৈদিক, বেদজ্ঞানজন্য। **ব্রহ্মময়ী** = ব্রহ্মস্বরূপা, দুর্গা, কালী। (ব.শ.)। ৪. উত্তরাধিকার সূত্রে 'জগৎ **ব্রহ্মময়**' প্রবচনের মাধ্যমে শব্দটির প্রচলন কমবেশি রয়েছে, এবং রামপ্রসাদের গানের দৌলতে **ব্রহ্মময়ী** এখনো বেঁচে আছেন। ৫. **বেদ** শব্দটি এক্ষেত্রেও আমাদের বিপথে চালিত করে। আমরা ধরে নিই, বেদনামক গ্রন্থটিই **ব্রহ্মময়** ... ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব তা নয়। আসলে **ব্রহ্মের** যে সূক্ষ্মরূপ, যাকে আমরা **স্ব**-ভাবের **স্ব** এবং **প্র**-কৃতির **প্র**-রূপে আগেই শনাক্ত করেছি, সেই সত্তা যখন **ম** (সীমায়িত) রূপে চলে (**য়**), তখন তাকে বলতে হয় **ব্রহ্মময়**। **প্রকৃতি**র প্রতিটি অস্তিত্বের **প্র**-রূপে **ব্রহ্ম** সত্তাটি জগতের প্রতিটি বস্তুর ভিতরে বিরাজ করে বলেই 'জগৎ **ব্রহ্মময়**'। স্বভাবতই তার আধারশক্তিকে **ব্রহ্মময়ী** বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা সেই **ব্রহ্মময়ী**র আরাধনা করেন কাঠখোট্টা যুক্তির বা স্থলের ভাষায়; আর, আমাদের রামপ্রসাদ তাঁরই আরাধনা করতেন আবেগের বা জলের ভাষায়। অতিচেতনার দুনিয়ায় তা বাতাসের ভাষায় প্রবাহিত থাকে।

ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযাগ, ব্রহ্মসত্র : ৩. **ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযাগ** = বেদসম্বন্ধী

যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপন, শ্রুতিজপ, বেদমন্ত্রজপ। **ব্রহ্মসত্র** = ব্রহ্মযজ্ঞ, নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলির ক্ষেত্রেও **ব্রহ্ম** শব্দটির অর্থকে The Vedas গ্রন্থের সমার্থক করে নেওয়ার ফলে শব্দগুলি অতি সঙ্কুচিত হয়ে বিলুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু যে বিষয়গুলিকে বোঝানোর জন্য শব্দগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে বিষয়গুলির একটিও বিলুপ্ত হয়নি, বরং তাদের রমরমা এখন বহুগুণ বেড়েছে। একালে কি জ্ঞানার্জনের জন্য হাজার হাজার 'research work', 'pilot project', 'experimental testing' ... এসব হচ্ছে না, নাকি অনেক বেশি বেশি করে হচ্ছে? প্রাচীনকালে সেইরূপ কাজকেই বলা **ব্রহ্মযজ্ঞ** বা **ব্রহ্মযাগ**। এমনকি প্রতিদিন নিয়ম করে, একালের ভাষায় যাকে বলে 'রুটিন করে পড়াশুনা করা', তেমন লেখাপড়া করাকেও **ব্রহ্মসত্র** বা **ব্রহ্মযজ্ঞ** বলা হত। দ্র. **যজ্ঞ**।

ব্রহ্মরন্ধ্র : ২. *(রন্ধ্রসমূহের মধ্যে-) সর্ব্বোচ্চ বা **ব্রহ্ম** যে রন্ধ্রে /* ব্রহ্মের (ব্রহ্মাধিষ্ঠিত) রন্ধ্র। (ব.শ.)। ৩. মস্তকের মধ্যভাগ কপালত্রয়ের সন্ধিস্থানস্থিত রন্ধ্র, ব্রহ্মতালুর নিম্নভাগ (The aperture in the crown of the head)। ঐতরেয় উপনিষৎ অনুসারে — পরমেশ্বর দেহেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া, 'আমি বিনা ইহা কি প্রকারে চলিবে' — ইহা ভাবিয়া কপালত্রয়ের সন্ধিস্থান মস্তকের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া ছিদ্রপথে দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হেতু এই 'রন্ধ্র' ব্রহ্মরন্ধ্র। বিদারণ হেতু মূর্দ্ধগত এই প্রবেশদ্বার 'বিদৃতি'। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে — এই রন্ধ্রপথে প্রাণ উৎক্রমণ করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। রামপ্রসাদ গেয়েছেন — প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে। (ব.শ.)। ৪. সাধারণভাবে অপ্রচলিত। ৫. পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষের এরকম কোনো ধারণা আছে, তেমন সংবাদ অন্তত পাশ্চাত্যের সাহিত্যে আমরা পাইনি। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের অতি সাধারণ মানুষও জানেন, তাঁর মাথার **ব্রহ্মতালু**র মাঝে একটি **রন্ধ্র** রয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি এও জেনেছেন যে, এটি **ব্রহ্মরন্ধ্র**; এবং মৃত্যুকালে এটি ফেটে প্রাণবায়ুর বহির্গমন ঘটলে সেটি ভাল। কিন্তু সেরকম রন্ধ্র সত্যিই রয়েছে কি না, তা দিয়ে প্রাণবায়ুর বহির্গমন ঘটে কি না, ঘটলে কেন ভাল, কী ভাল — এসবের কোনো হদিশ আমরা এখনও পাইনি। যদিও বাউল-ফকিরদের দেহতত্ত্বের গানে শরীরের দশ দুয়ার বা দশটি ছিদ্রের বিষয়ে নানা কথা রয়েছে এবং গ্রামবাংলার মানুষ সে গান শুনে শুনে বিষয়গুলি কমবেশি জানেনও। শার্ঙ্গধরের উল্লেখ করে (দ্র. **রন্ধ্র**) ব.শ. জানাচ্ছেন, মানবশরীরে মোট দশটি **রন্ধ্র** রয়েছে। সেগুলি হল — চোখের ২, কানের ২, নাকের ২, মুখের ১, লিঙ্গের ১, গুহ্যের ১, এবং সবশেষে **ব্রহ্মরন্ধ্রের** (বা ব্রহ্মতালুর মাঝের)১ — এই মোট দশটি। এবং খানিকটা বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও, এই বিষয়ে শহুরে শিক্ষিত বাঙালি প্রায় কিছুই জানে না। গ্রামবাংলার মানুষেরা বা সেকেলে ও ধর্মপ্রাণ মানুষেরা কিন্তু জানেন, যোগীরা বসে মরতে চান (শুয়ে নয়), তাতে নাকি তাঁদের **ব্রহ্মরন্ধ্র** ভেদ করে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়; অধিকাংশ মানুষের নাকি মুখ দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোয় এবং নীচ মানুষের গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোয়। তবে **ব্রহ্মরন্ধ্র** ভেদ করে প্রাণবায়ু বেরোলে সত্যিই মানুষটির **ব্রহ্মলোক** প্রাপ্তি ঘটে কি না, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। এই কথাগুলি প্রমাণ করে, এ বিষয়ে আমরা শিক্ষিত বাংলাভাষীরা কত কম জানি।

এ তো গেল মানবশরীরের **ব্রহ্মরন্ধ্রের** কথা। সমাজশরীরের **ব্রহ্মরন্ধ্রে**র বেলায় কিন্তু কথাটির অন্যমাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। একথা ঠিক যে, সমাজশরীরের মাথায় থাকেন **ব্রহ্মজ্ঞানী**রা। তাঁদের ভিতরে **রন্ধ্র**-স্বরূপ প্রচলিত সামাজিকব্যবস্থার বিরোধী শক্তি অবশ্যই থাকে। তাদের মাধ্যমেই সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়; নতুন ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সমাজবদলের প্রতি পর্বে এই পুরোনো ব্যবস্থার বিরোধী ও নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তক **ব্রহ্মজ্ঞানী**দের দেখা মেলে। তবে সেই পথে পূর্বতন সমাজব্যবস্থার প্রাণবায়ু বেরিয়ে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হয় কি না, তা বোঝা যায় না।

ব্রহ্মর্ষি (ব্রহ্মঋষি) : ২. *যিনি (মনোভূমিতে) **ব্রহ্মজ্ঞানের** ঋষ (চায) করেন।* ৩. ব্রাহ্মণঋষি, বসিষ্ঠাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ঋষি**।

ব্রহ্মলোক : ৩. হিরণ্যগর্ভলোক, সত্যলোক, বৈকুণ্ঠলোক। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কথাটির অন্তত তিনটি প্রয়োগক্ষেত্র চোখে পড়ে। প্রথমত, **প্র**-কৃতির **প্র**-সমূহের **লোক**। পদার্থবিজ্ঞানীদের periodic table-এ এই **প্র**-সমূহের খবর রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জীবের মস্তিষ্কের ভেতরে যে চেতনার দুনিয়া রয়েছে, সেই দুনিয়াও **ব্রহ্মলোক**ই বটে। তৃতীয়ত, মানবসমাজের পরিচালক **ব্রহ্মজ্ঞানী**দের যে দুনিয়া, তাকেও **ব্রহ্মলোক** বলে। এর বাইরে হয়তো বা কোনো ঐশ্বরিক **ব্রহ্মলোক** থাকতে পারে, তবে তার বিষয়ে আমরা এখনও কিছু জানতে পারিনি।

ব্রহ্মা : ১. ✓বৃন্হ্ + মন্ - কর্ত্তৃবাচ্যে, করণবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***ব্রহ্ম**-এর আধার যে বা যিনি; অথবা, **ব্রহ্মন্** কর্ম্মের তত্ত্ব ও তথ্য ধরে রাখেন যিনি।* ৩. প্রজাপতি, পিতামহ, ঋত্বিগ্‌বিশেষ, ব্রাহ্মণ, মরীচি-প্রভৃতি প্রজাপতি, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ব্রহ্মবিৎ বিপ্র, বুদ্ধি, (জ্যোতিষে) পঞ্চবিংশ যোগ। শ্রীমদ্ভাগবতমতে, ভগবান নারায়ণের রজোগুণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ইনি স্রষ্টা। দ্বাদশ অধ্যায়ে তাঁর সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা আছে। ... মনুসংহিতামতে, স্বর্ণময় অণ্ড হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়। এই অণ্ডের উর্দ্ধকপালে স্বর্গ, অধঃকপালে পৃথিবী ও মধ্যে আকাশ সৃষ্ট হয়। এই হেতু স্বর্গাদিত্রয়াত্মক বিশ্ব 'ব্রহ্মাণ্ড'। পুরাণে, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি পদ্মযোনি, মরালবাহন, ত্রিমূর্ত্তির একতম। ইঁহার পূর্ব্বে পাঁচ মুখ ছিল, শিব অনামিকা দ্বারা একটি মস্তক ছিন্ন করেন; তদবধি ইনি চতুর্ম্মুখ। (ব.শ.)। মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ডমধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হলে, এক ভাগ আকাশে ও অন্য ভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়। এরপর

ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ — এই দশজন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়। ... সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা এঁর দুই কন্যা।

ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন, ও রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল। কিন্তু একদা শিবের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ হয়। ব্রহ্মার বাহন হংস। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না। সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। (পৌ.অ.)। **৪.** একজন 'ঠাকুরের নাম' রূপে **ব্রহ্মা** শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। **৫.** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসারে **ব্রহ্মা** শব্দের মানে হল আবিষ্কৃত জ্ঞানের আধার। ইনি আবিষ্কার করতে পারেন না, আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞান জেনে বা শিখে নিয়ে সেটি মনে রাখেন, অন্যদের শেখান। সেই সুবাদে শিক্ষকশ্রেণীর আদি ও মূল সত্তা বলা যায়। স্বভাবতই এঁর হাত দিয়ে **দক্ষ** জন্মায়। পুরাণ অনুসারে **দক্ষে**র জন্ম হয়েছে এঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে। একালের ভাষায় বললে, বিশ্বের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমস্ত আবিষ্কৃত-জ্ঞানের জ্ঞানাধারগুলির আধারসমূহকে মিলিয়ে যে সত্তাকে বোঝায়, তাকেই **ব্রহ্মা** বলা হত। তার মানে, প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানবসমাজে যত জ্ঞানধারী জ্ঞানী — শিক্ষক, গুরু, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক ... ইত্যাদি — জন্মেছেন, জন্মাবেন, তাঁরা সবাই **ব্রহ্মা** নামক সত্তাটির অংশ। আমরা তো এখন **ব্রহ্মা** বললে বুঝতে পারি না, কিন্তু সেকালের বাংলাভাষীরা কত অনায়াসে **ব্রহ্মা**কে চিনতে পারতেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। কৃত্তিবাসের কালে (১৪০০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর রামায়ণ সর্বসাধারণ্যে গীত হত, সবাই সে গানের মানে কমবেশি বুঝতেন। তখন, রাবণের শাসনকালে এই **ব্রহ্মা** সত্তাটি কীরূপ আছেন, রামায়ণে সেকথা শোনা যাচ্ছে **ব্রহ্মা**র নিজের বয়ান থেকে —

'জগতের কর্ত্তা আমি **ব্রহ্মা** মহামুনি।
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপুনি।।
... শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তাঁর ঘোটকের ঘাস।।'

তার মানে, তখন **ব্রহ্মা**র একটি অংশ সরকারি বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রের বেতনখেকো শিক্ষক রূপে কাজ করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন; আর আদালত তার ঘোড়ার (এগজিকিউটিভদের) জন্য ঘাস কেটে (জরিমানা আদায় করে) নিয়ে আসে!

তবে এ হল **ব্রহ্মা**র সামাজিক রূপের তত্ত্বকথা। তাঁর একটি আধ্যাত্মিক রূপও রয়েছে। সেটি তথাকথিত trinity god-এর ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় উপমহাদেশ তার 'ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে' ধারণায় পৌঁছেছে **ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে**র ধারণা অর্জন ক'রে। এতে **জগৎ**-এর (**জ-গ-ৎ**) ধারণাকেই তার সর্বোচ্চ রূপে উত্তীর্ণ ক'রে '**সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়**'-এর বোধে পৌঁছনো গেছে। ইউরোপ সেখানে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছে তাদের God the Father, God the Son, God the Holy Ghost-এর ধারণায় পৌঁছে; যদিও এই বোধ অনেকটাই অস্পষ্ট। ...

স্বভাবতই **ব্রহ্মা**র এক সুদীর্ঘ সামাজিক-ঐতিহাসিক স্বরূপ রয়েছে। মানবসমাজের উদ্ভবের কাল থেকে মানবজাতি জ্ঞান আহরণ করেছে এবং সে জ্ঞান কিছু মানুষ বহন করে নিয়ে চলেছেন। আদিতে তাঁরাই ছিলেন **ব্রহ্মা** পদবাচ্য। এই শ্রেণীর যেমন যেমন বিকাশ ঘটেছে, আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে তেমন তেমন বিবরণ যুগানুসারে ক্রমান্বয়ে ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্যই সেই বিবরণ রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। (সেই ভাষার নমুনা — 'ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ পশু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।' শিবপুরাণ, বায়বীয়সংহিতা, ৪: ৬১)

সেই আদি জ্ঞানীরা একসময় **দক্ষযজ্ঞে**র মাধ্যমে মানবসমাজে **বেদ**-এর মর্যাদা বা জ্ঞানের মর্যাদা (supremacy of second-hand knowledge) প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৈদিক যুগের সূত্রপাত ঘটান। সেটিই মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রথম বিপথগামিতা এবং স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পথ ত্যাগ করে অন্য পথে হাঁটার সূচনা। তার পর থেকে সেই বিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সারা বিশ্বের মানবসমাজ আজ পর্যন্ত এগিয়ে চলে এসেছে এবং চরম একপেশে বা রবীন্দ্রকথিত 'একঝোঁকা' সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে সেই 'এইঝোঁকা' অবস্থা আরও এগিয়েছে এবং বর্তমানে তার চরমে পৌঁছেছে। আজ আলুর আলুত্ব, পটলের পটলত্ব, দুধের দুধত্ব, শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবকিছুই তাদের স্বাভাবিকত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি শহরে ও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব শেষ হতে হতে প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। মানুষ ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৃতি তাদের অস্বাভাবিকতার শেষ সীমায় পৌঁছে প্রায় বিদ্রোহের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। হয় মানবসভ্যতাকে তার এতাবৎকালের চলার রীতি বদলাতে হবে, নয় এই পৃথিবী ধ্বংস হবে; আজ এমনি এক ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা। (first-hand knowledge-এর আধার) **শিব**কে বাদ দিয়ে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ পরিচালনার চূড়ান্ত ফল ভুগতে চলেছে আজকের সমগ্র মানবসভ্যতা। ... আজ হোক কাল হোক, এর একটা বিহিত কি হবে না?

ব্রহ্মাণ্ড : **২.** *ব্রহ্মের অণ্ড। / ব্রহ্মার* ডিম্বকোষ। (ব.শ.)। **৩.** চতুর্দ্দশ-ভুবনগোলক, ভুবনকোশ, বিশ্ব, স্বর্গ, সর্ব্বশরীর। (ব.শ.)। **৪.** universe অর্থে প্রচলিত। **৫.** আপনি কোরাণ পুরাণ বাইবেল খুলে ফেলুন, দেখবেন জগৎসৃষ্টির আদিসর্গ বিষয়ে এমন কিছু বয়ান আছে, যা পরস্পরের সঙ্গে অনেকটাই মেলে। যেমন, আদিতে জল ছিল, জলের উপর অণ্ড বা **ব্রহ্মাণ্ড** ছিল, সেটি দু'ভাগ হল, সাত উর্ধ্বলোক বা স্বর্গলোক হল, সাত অধোলোক বা মর্ত্যলোক হল, অর্থাৎ 'চতুর্দ্দশভুবনগোলক' হল ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এর থেকে অনুমান করা চলে, জগৎসৃষ্টি বিষয়ে সর্বধর্মের আদিম-জ্ঞান ও আদিম-জ্ঞানী একই সত্তা। তারই উত্তরাধিকার পুরাণ কোরাণ বাইবেল যে যার নিজের মতো করে বহন করে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু কথা হল, আদিতে জল ও জলের উপর অণ্ড বা **ব্রহ্মাণ্ড** সৃজিত হয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বর্গলোক মর্ত্যলোক তৈরি হচ্ছিল, তখন সেটা কে দেখেছিল? তখন তো মানুষের জন্মই হয়নি। ...

স্বভাবতই জগৎসৃষ্টির ইত্যাকার বয়ান বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের

ঘোরতর আপত্তি থাকার কথা, এবং আছেও। তাঁরা জগৎসৃষ্টির বা **ব্রহ্মাণ্ডের** জন্মের বিভিন্ন মডেল অনুমান করেছেন, যার কোনোটির সঙ্গেই ধর্মগ্রন্থকথিত **ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির** আদৌ মিল নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা জগৎসৃষ্টির যে বয়ান দিয়ে গিয়েছেন, তা কি একেবারেই বাজে কথা? তাঁদের বয়ানের মানে কি আমরা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পেরেছি?

এইখানে এসে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। আমরা যত পেছন দিকে যাই, দেখা যায় মানুষের মুখের কথায় ও কাজে কোনো ফারাক নেই। সত্যিই তো, ধর্মগ্রন্থগুলির বয়ানের উদ্ভবকাল যদি আজ থেকে দেড়-দু'হাজার বছর বা তারও বেশি আগে হয়, তাহলে সবার আগে এই কথাটি মেনে নিতে হবেই, যে, সেগুলি মিথ্যে কথা নয়; কেননা, সেকালে মানুষ মিথ্যে কথা বলতেন না। তাহলে, কী সেই সত্য, যা ঐ **ব্রহ্মাণ্ড** সৃষ্টির বয়ানগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে?

আজ থেকে হাজার চারেক বছর পেছনে চলে যান, ভাবুন, আপনি এই **প্রকৃতি**র **প্র**-গুলিকে দেখে ফেলেছেন, **ব্রহ্মদর্শন** করে ফেলেছেন, বুঝে গেছেন যে, এ জগৎ **ব্রহ্মময়** এবং '**ব্রহ্ম** সত্য, জগৎ মিথ্যা'; দেখে ফেলেছেন, মানুষের সামনে যে বিশাল বাহ্যলোক বিদ্যমান রয়েছে, অবিকল তারই ছায়া পড়েছে মানুষের মনোলোকে। অর্থাৎ আপনি মর্ত্যলোকের সাত রূপ দেখে ফেলেছেন এবং অবিকল তার ছায়া দেখেছেন আপনার মনোলোকে বা **স্বর্গলোকে**। এখন মানবসভ্যতার এই যে অবস্থা আপনি দেখে ফেললেন, তার কথা আপনি সবাইকে জানাবেন কীভাবে? এর জন্য কোনো শব্দই তখনও তৈরি হয়নি! লেখালেখির তো তখন শুরুই হয়নি।

আমরা যতদূর বুঝেছি, মানবসভ্যতার সামাজিক ও প্রাকৃতিক বাস্তবতা ও মনোলোকের অবস্থা একত্রে বোঝাতে সেকালের প্রাচীন জ্ঞানী মানুষেরা **ব্রহ্মাণ্ড** সৃষ্টির ঐ প্রকার বিবরণ উপস্থাপন করেছিলেন; তথাকথিত universe সৃষ্টির বিবরণ দেওয়ার জন্য তাঁরা সেসব কথা বলে যাননি। তাছাড়া, সে প্রয়োজনও তাঁদের ছিল না। তবে তার পরেও একটি কথা আছে। সেই ব্যাপারটি হল বিশ্বজগতের সমান্তরাল বিকাশের নিয়মের কথা। কেন যে সেকালের সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) জ্ঞানধারা ও ধনতান্ত্রিক জ্ঞানধারা প্রায় হুবহু বাস্তবের **ব্রহ্মপুত্র** জলধারা ও **সিন্ধু** জলধারার সঙ্গে সমান্তরাল, তা আমরা আজও জানি না। একই কথা বাস্তবের **পর্ব্বত, বৃক্ষ** ... এবং মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও যৌথপরিবার ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও হুবহু খাটে। সেইভাবে মানবসমাজের বাস্তবতা ও মানসিকতা, উভয়ের যে সার্বিক রূপ, তার উদ্ভব বিষয়ে **পুরাণা**দির বয়ানই **ব্রহ্মাণ্ড** সৃষ্টির বা জগৎসৃষ্টির বয়ান। এর সঙ্গে universe সৃষ্টির মিল থাকলেও থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ কিনা, আমাদের পূর্বপুরুষের **ব্রহ্মাণ্ড** আর আধুনিক বিজ্ঞানের Universe এক বস্তু নয়। যদিও দুটো শব্দে এখন একই বস্তুকে বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, ইউরোপের Universe-ও তাঁদের পুরুষানুক্রমিক অর্জনের সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, তার ভিতরে সকল verse (= আবর্তনশীল সত্তা) একত্রিত করে রাখা আছে।

ব্রহ্মানন্দ : ২. *ব্রহ্মলাভ করার ফলে যে আনন্দ মানুষ পায়।* **৩.** ব্রহ্মজ্ঞানজন্য আনন্দ। (ব.শ.)। **৪.** 'চরম আনন্দ' অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই অনেক বলে গেছেন। দ্র. **আনন্দ**।

ব্রহ্মাবর্ত্ত : ২. *যেখানে ব্রাহ্মণগণ আবর্তিত হন (বা তাঁদের বৃত্তিপালন সম্পূর্ণ করেন)।* **৩.** ব্রাহ্মণগণের আবর্ত্ত (আশ্রয়), সরস্বতী দৃষদ্বতীর মধ্যস্থ বহুলব্রাহ্মণাশ্রয় দেশ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **দৃষদ্বতী, আর্য্যাবর্ত্ত**।

ব্রাহ্ম (ব্রাহ্মী) : **১.** ব্রহ্মন্ + অ (অণ্), 'অন্'-লোপ নিপাতিত, 'অপত্য, জাতি' অর্থে 'অন্'-লোপাভাব — ব্রাহ্মণ। (ব.শ.)। **২.** ***ব্রাহ্ম** = **ব্রহ্ম** হইতে জাত। **ব্রাহ্মী** = **ব্রাহ্ম** গতিশীলভাবে ধারিত যাহাতে।* / ব্রহ্মার অপত্য। (ব.শ.)। **৩.** **ব্রাহ্ম** = প্রজাপতিসম্বন্ধী, ব্রহ্মভব, ব্রহ্মবিষয়ক, বেদসম্বন্ধী, বেদাধ্যাপনবিষয়ক, বেদশ্রবণার্থ, ব্রাহ্মণে স্থাপিত, বেদবিহিত, ব্রহ্মদেবতাক; নারদ, অষ্টবিধ বিবাহের অন্যতম, পারদ, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে দণ্ডদ্বয়াত্মক কালবিশেষ, ব্রহ্মোপাসক, অঙ্গুষ্ঠমূল, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মদেবতাক রোহিণী নক্ষত্র। **ব্রাহ্মী** = দুর্গা, সরস্বতী, বাণী, মাতৃকাভেদ, ব্রহ্মশক্তি, ব্রাহ্মবিবাহে পরিণীতা স্ত্রী, শাকবিশেষ, বিম্হি শাক, সোমলতা, হিলমোচিকা, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, মহাজ্যোতিষ্মতী, সরস্বতী নদী, পিত্তলবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** **ব্রাহ্ম** শব্দের প্রকৃত অর্থে শব্দটি এখন অপ্রচলিত। তবে 'অরুণোদয়ের পূর্ব্বে দণ্ডদ্বয়াত্মক কালবিশেষ' অর্থে **ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত**, 'একপ্রকার **বিবাহ**' অর্থে **ব্রাহ্মবিবাহ**, 'বামনিশাক' অর্থে **ব্রাহ্মীশাক** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। তাছাড়া, রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের নামরূপে **ব্রাহ্মসমাজ** বা **ব্রাহ্মধর্ম** শব্দটি এখনও প্রচলিত। **৫.** দ্র. **গাঁটছড়া**। যেহেতু **ব্রহ্ম** শব্দটি বহু অর্থবাচক, তার থেকে জাত **ব্রাহ্ম** শব্দও যে বহু অর্থবাচক ছিল, উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থগুলিই তার প্রমাণ। এগুলির প্রত্যেকটিই '**ব্রহ্ম** হইতে জাত' বলেই তাদের **ব্রাহ্ম** শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমনকি ১৮০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দেও বাংলাভাষী জ্ঞানী মানুষেরা শব্দটির অর্থ বুঝতে পারতেন। পারতেন বলেই তাঁদের পক্ষে **ব্রাহ্মসমাজ** শব্দটির সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজ যত বেশি বেশি 'আধুনিকতা'র দিকে এগিয়েছে, তত বেশি বেশি করে শব্দটির অর্থ সংকোচন ঘটেছে এবং শব্দটি কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। রামমোহন রায় কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন যে, যাঁরা **ব্রহ্ম**-আরাধনা করবেন, **ব্রহ্ম**লাভের চেষ্টা করবেন, তাঁদের তো **ব্রাহ্ম** শব্দে শনাক্ত করাই ঠিক হবে। দ্র. **ব্রাহ্মণ, বিবাহ**।

ব্রাহ্মণ : **১.** ব্রহ্মন্ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***ব্রহ্মন্** (**ব্রহ্ম্** ক্রিয়া অন) হইতে জাত; অথবা বৃদ্ধিসাধনতত্ত্ব ধারণ করে যে।* / যাহারা বেদ অধ্যয়ন করে। (ব.শ.)। **৩.** ব্রহ্মার অপত্য জাতিবিশেষ, দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ায় বা বৈশ্যায় জাত সন্তান, বিষ্ণু, শিব, পুরোহিত, ব্রহ্মবল, বেদভাগ (ইহাতে বেদমন্ত্রের অর্থমীমাংসা, যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ ও আলোচনা এবং নানাবিষয়ক উপাখ্যান আছে। ঋগ্বেদের শাঙ্খায়ন ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, সামবেদের তাণ্ড্য ও ষড়্বিংশ

ব্রাহ্মণ, শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণ, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ এবং অথর্ববেদের গোপথব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারার্থ 'ব্রাহ্মণ' বিরচিত।), ব্রাহ্মণসমূহ। (ব.শ.)। (ক) প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণ ভাগ সংহিতা হতে ভিন্ন। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। ... এই ব্রাহ্মণের শেষ অংশের নাম আরণ্যক। এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। ... ব্রাহ্মণ ভাগে তিনটি বিষয় আছে — যজ্ঞপ্রণালী, অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, ও উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব। (খ) চতুর্বর্ণের মধ্যে আদি ও প্রধান বর্ণ। (পৌ.অ.)। ৪. **ব্রাহ্মণ** শব্দটি মাত্র দুটি প্রতীকী অর্থে বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। এক, 'ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায় ও সেই সম্প্রদায়ের সদস্যগণ', যাঁদের **ব্রাহ্মণ** বা 'বামুন' বলা হয়ে থাকে। দুই, প্রাচীন ভারতের উপরোক্ত গ্রন্থগুলি, যেগুলির খবর রাখেন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, সেগুলিকেও **ব্রাহ্মণ** বলা হয়ে থাকে। দুটিই **ব্রাহ্মণ** শব্দের প্রতীকী অর্থ। **ব্রাহ্মণ** শব্দের অভিধা-অর্থের বা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থের বিলুপ্তি ঘটেছে। **৫. ব্রহ্ম কর্ম্ম** অন (on) থাকে যাহাতে, তাকে **ব্রাহ্মণ** বলে। তার মানে, বৃদ্ধিসাধনতত্ত্বধারীকে **ব্রাহ্মণ** বলে। স্বভাবতই যার ভিতরে এই **কর্ম্ম**কে সক্রিয় থাকতে দেখা যায় শব্দশাস্ত্রের নিয়মে তাকেই **ব্রাহ্মণ** বলতে হয়। বৈদিকযুগেরও আগে সনাতন যুগে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা দেখেছিলেন, অন্তত দুটি ক্ষেত্রে এই **ব্রহ্মকর্ম্ম** বা বৃদ্ধিসাধনের উপায়গুলির তত্ত্বসমূহ ধারিত হয়ে সক্রিয় রয়েছে। প্রথমত এটি দেখা যেত সেকালের মানবসমাজের পরিচালকদের মধ্যে। এঁরা **ব্রহ্মময়** জগতের ভিতর থেকে যে-**ব্রহ্ম** সত্য, তাকে খুঁজে বের করতেন এবং **ব্রহ্ম**রূপে বা 'বৃদ্ধিসাধনমন্ত্র রূপে' সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে সেগুলিকে কাজে লাগাতেন। সেই কারণে এই পরিচালকদের সেকালে নাম দেওয়া হয়েছিল **ব্রাহ্মণ**। এঁরাই **আদি ব্রাহ্মণ**। আর একটি ক্ষেত্রে সেই **ব্রহ্মকর্ম্ম**কে থাকতে দেখা যেত। সেটি হল সেকালের মানুষের শ্রুতিস্মৃতিবাহিত **কর্ম্ম**তত্ত্ব আধারিত **শ্লোক**সমূহ। একালের ভাষায় বললে, এগুলি ছিল সেকালের মানুষের অর্জিত জ্ঞানসম্পদের (বা বেদের) তত্ত্বরাশি বা থিয়োরি-সমূহ। সেই তত্ত্বকে **কর্ম্ম**যজ্ঞে প্রয়োগের শেষে সেই তত্ত্বের সংশোধন-সংযোজন-পরি**বর্দ্ধনে**র কাজও চলত। শ্রুতিস্মৃতিবাহিত সেই অর্জিত জ্ঞানসম্ভারকেও সেকারণেই **ব্রাহ্মণ** বলা হত। (স্মৃতিতে বাহিত এই **ব্রাহ্মণ**-এর বা এইসকল তত্ত্ববাহী শ্লোকের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক, যেখানে কিনা সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রের শ্লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। দ্র. **স্মৃতি, স্মৃতিশাস্ত্র**।)

অতএব দেখা যাচ্ছে, যাদের ভিতরে **ব্রহ্মন্** সক্রিয়রূপে বিরাজ করত, তাদেরই আদিতে **ব্রাহ্মণ** বলা হত এবং কার্যত সনাতন যুগের সমাজপরিচালকেরা বা **আদি ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মে**র তত্ত্বগুলিকে বা **ব্রাহ্মণ**-গ্রন্থের শ্লোকগুলিকে তাঁদের **স্মৃতিতে** বহন করতেন; অর্থাৎ কিনা, **ব্রাহ্মণ**-পদবাচ্য মানুষেরা **ব্রাহ্মণ**-পদবাচ্য জ্ঞানসমূহকে স্মৃতিতে বহন করে কাজে লাগাতেন। এই ছিল **ব্রাহ্মণ** শব্দের প্রথম অর্থ, প্রথম প্রয়োগ। ...

এর পর রয়েছে '**ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারা**' (দ্র. **ব্রহ্মজ্ঞান**)। তার যে কোনো এক বা একাধিক ধারার জ্ঞান যাঁরই থাকে, তিনিই **ব্রাহ্মণ** পদবাচ্য; তা তিনি **ব্রাহ্মণ** পিতার ঔরসে জন্মান আর শূদ্র পিতার ঔরসেই জন্মান। সেই কারণে আমাদের বিচারে আইনস্টাইনও **ব্রাহ্মণ**, জগদীশচন্দ্র বসুও **ব্রাহ্মণ**, পণ্ডিত ভীমসেন যোশীও **ব্রাহ্মণ**, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-ও **ব্রাহ্মণ**। তবে এঁরা কেউই পূর্ণ **ব্রাহ্মণ** নয়। কারণ, এঁরা **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারায়** অবগাহন করেননি। আমাদের দেখা মতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই আমরা পূর্ণরূপে প্রকাশিত **ব্রাহ্মণ** রূপে দেখতে পাই। শুধুমাত্র (ক), (খ), (গ) ধারার **ব্রহ্মজ্ঞানের** বিকাশ সংঘটিত করে বা তথাকথিত বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি নিয়েই আজকের মানবসভ্যতা চলছে দেখে, রবীন্দ্রনাথ আজকের আধুনিক সভ্যতাকে 'একঝোঁকা' হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। ... তা সে যাই হোক, আদিতে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত **ব্রহ্মজ্ঞানের** প্রথম চারটি ধারাকে চিহ্নিত করে, সেই ধারা অনুসারী **ব্রহ্মজ্ঞ**দের **ব্রাহ্মণ** নামে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু পরে পরে এই **ব্রাহ্মণ** শব্দটি তার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক রূপ ত্যাগ করে স্থির রূপ গ্রহণ করে প্রতীকী হয়ে যায়। **ব্রহ্মন্** সক্রিয় রয়েছে কি না, সেই মূল ক্রিয়ার কথাটি পাশে সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়। বৈদিক যুগে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির **দক্ষনীতি** প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর, **আদি-ব্রাহ্মণের** রক্তসম্পর্কের উত্তরসূরিরা এবং তৎকাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত **কর্ম্ম**তত্ত্বগুলির ধারক-গ্রন্থগুলিই কেবল **ব্রাহ্মণ** শব্দের একমাত্র উদ্দিষ্ট হয়ে গেল। ফলে **ব্রাহ্মণ** শব্দের মানে হয়ে গেল 'জাতিতে-ব্রাহ্মণ' এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি 'গ্রন্থ'। **ব্রাহ্মণ** শব্দের যে অভিধা-অর্থ — **ব্রহ্মন্** সক্রিয় থাকে যাহাতে, সেটি অবহেলিত হল। অর্থাৎ, **ব্রহ্মগুণ**-এর আধারস্বরূপ যে **ব্রাহ্মণ**, সেই বৃদ্ধিসাধনতত্ত্বধারী **ব্রাহ্মণ** ক্রমশ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যেতে লাগলেন; **আদি-ব্রাহ্মণ শিব** সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ থেকে বাদ পড়ে গেলেন।

কিন্তু মানুষের সমাজ তো এই **ব্রহ্মগুণী-ব্রাহ্মণ** ছাড়া চলতে পারে না। ফলে, প্রায় ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্বত্রই আমরা দেখছি, বাহ্যফললাভে বিমুখ কিছু **ব্রাহ্মণ**-পদবাচ্য মানুষ পাশ্চাত্যে সেন্ট বা **সাধু** নামে, আরব দেশগুলিতে আওলিয়া অম্বিয়া নামে, এবং ভারতীয় উপমহাদেশে **মুনি, ঋষি, মহর্ষি, তপস্বী** প্রভৃতি নামে সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন — তাঁদের অনুসরণ করছেন রাজা, রাজার পেছনে রাজপুরুষেরা, তাঁদের পেছনে প্রজাসাধারণ। অর্থাৎ তখনও মানুষের সমাজ তার পরিচালক-**ব্রাহ্মণ**দের জন্ম দিয়ে তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ...

এদিকে বৈদিক যুগের শেষ কালখণ্ড থেকে যেমন জাতে-**ব্রাহ্মণ**দের ভিতরে **ব্রহ্মগুণী-ব্রাহ্মণের** সংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল (দ্র. **আঙ্গিরস**), তেমনি তথাকথিত 'অব্রাহ্মণ'দের ভিতর থেকেই **ব্রহ্মগুণী-ব্রাহ্মণ** জন্মলাভ করতে শুরু করলেন। যদিও বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে আরও বহুকালাবধি তাঁদেরকেও **ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, ঋষি, তপস্বী, তাপস** ইত্যাদি বলা হত, কিন্তু আধুনিক কালে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে, সেই রীতিও আজ প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

আমরা দেখছি, এমনকি ১৯৪০ সালের আগে পর্যন্ত যে কোনো জাতির **ব্রহ্মগুণী** মানুষকে **ব্রাহ্মণ, মহর্ষি** বা **ঋষি** বলা হচ্ছে।

দেবেন্দ্রনাথকে **মহর্ষি**, বঙ্কিমচন্দ্রকে **ঋষি** বলতে বাংলাভাষীর অসুবিধা হচ্ছে না। যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে 'হিন্দুত্ববাদী' বলতে তথাকথিত 'আধুনিকতাবাদী' ও 'মার্কসবাদী'দের বাধেনি, সেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতবর্ষে মুসলমান' নিবন্ধে কোনো কোনো মুসলমান পণ্ডিত সম্পর্কে **ব্রাহ্মণ, ঋষি, মহর্ষি** প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁদের প্রতি 'পবিত্রাচার', 'পবিত্রমনা', 'পবিত্রকর্ম্মা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতেও তাঁর বাধেনি। (আমাদের 'খ' গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মুসলমান পণ্ডিতদের প্রতি এরকম শ্রদ্ধাপূর্ণ শব্দ ও বাক্য আমরা তথাকথিত 'আধুনিকতাবাদী' বা 'মার্কসবাদী'দের থেকে পাইনি। শুধু কি তাই! ১৯২৯ সালে কলকাতায় প্রকাশিত শ্রী কেদারনাথ মিত্র মহাশয়ের 'মুসলমান ভক্তচরিত' গ্রন্থে যে সকল মুসলমান ভক্তের জীবনচরিত বিবৃত হয়েছে, তাঁরা হলেন — '**মহর্ষি** আবিস্ করণী, **মহর্ষি** ফজিল আয়াজ, **মহর্ষি** হোসেন বসোরী ... এবং **তপস্বিনী** রাবেয়া' প্রমুখ এগারো জন। এঁদের প্রত্যেকের নামের শুরুতে সর্বদাই **মহর্ষি**, **তাপস**, **তপস্বিনী** প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন লেখক স্বয়ং, যিনি রামকৃষ্ণের ভক্তমহলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন।

অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত শব্দগুলি কলকাতার অ্যাকাডেমিশিয়ানদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে শুধুমাত্র 'ব্রাহ্মণজাতি'র সম্পত্তি হয়ে যায়নি। তখনও যিনিই **ব্রহ্মগুণসম্পন্ন** হয়ে উঠতেন, তা তিনি যে জাতির মানুষই হোন না কেন, তাঁকে **ব্রাহ্মণ** বলে উল্লেখ করতে তখনকার বাংলাভাষী জ্ঞানী মানুষেরা দ্বিধা বোধ করতেন না। যিনি মানসলোকের মহৎ কৃষিকর্ম করেছেন, তিনিই **মহর্ষি** পদবাচ্য হতেন। ... সেই বিচারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, জগদীশচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকুমার রায় — এঁরা প্রত্যেকেই কমবেশি **ব্রহ্মগুণী** ছিলেন, অতএব অবশ্যই **ব্রাহ্মণ** পদবাচ্য ছিলেন। কিংবা আইনস্টাইন, টলস্টয়, নিউটন, রমাঁ রোলাঁ, ডেভিড বোহ্ম — এঁরাও **ব্রহ্মগুণসম্পন্ন** হওয়ার কারণে **ব্রাহ্মণ** পদবাচ্য। শুধু কি তাই, তাঁদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও **ব্রাহ্মণ** নামে অভিহিত হতে পারে। সেগুলি যে 'সম্পর্কজ্ঞান', তা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই! দ্র. উপরোক্ত (ক) ও (খ)। তবে শুধুমাত্র সেগুলির কথাই বলা এবং তাদেরকেই একমাত্র **ব্রহ্মজ্ঞান** বললে যে ত্রুটি হয়, তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'একঝোঁকা'; কেননা, সেগুলি শুধুমাত্র বাহ্যলোকের 'সম্পর্কজ্ঞান'ই বটে।

তা সে যাই হোক, আসলে 'সুন্দর' শব্দটিকে যেমন কোনো জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি করে তোলা চলে না, তেমনি **ব্রাহ্মণ**-এর মতো মহৎ অর্থধারী শব্দটিকেও কোনো বিশেষ জাতির নিজস্ব সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা চলে না। করলে তারও ক্ষতি, অন্যদেরও ক্ষতি। কিন্তু তাই বলে 'ইতিহাসের মার'কে তো অস্বীকার করা যায় না এবং তার উপর কারও হাত থাকে না। ত্রিধাবিভক্ত ভারতবর্ষের একটি খণ্ডকে যথার্থ কারণেই 'ভারত' নাম দিয়ে দেওয়ায় বাকি দুটি খণ্ডের (পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান) ক্ষতি হয়ে যায়; তারা তাদের অতীত থেকে রাতারাতি অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একইভাবে ১৯৭১-এর পর পূর্ব-পাকিস্তান আপন নাম 'বাংলাদেশ' ঘোষণা করে দেওয়ায়, বাংলাভাষার বাকি চারটি ভুবন তাদের অতীত থেকে রাতারাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লোকে ভারতীয় উপমহাদেশের অতীত জানতে যেমন পাকিস্তান বাংলাদেশে যায় না, তেমনি বঙ্গের অতীত জানতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি বৃহৎবঙ্গের অন্য অংশগুলিতে যেতে চায় না। ইতিহাসের মার পড়ে যায় সকলের অলক্ষ্যে, অথচ সকলের চোখের সামনেই। ঠিক একইভাবে, আদিতে যে-**ব্রাহ্মণ** নামটি যথার্থ কারণে যথার্থ সত্তাকে দেওয়া হয়েছিল, **দক্ষনীতি** এসে তাকে সম্প্রদায়ের অচল-অনড় প্রতীকী নামে পরিণত করে দেওয়ায় **ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ** উভয়েরই যারপরনাই ক্ষতিসাধন হয়ে যায়। কেননা, 'বৃদ্ধিসাধনতত্ত্বধারী'কে যখন **ব্রাহ্মণ** নাম দিয়ে দেওয়া হল, তখন **ব্রাহ্মণ**-জাতি ও **ব্রাহ্মণ**-গ্রন্থ দুটোই শনাক্ত হল বটে, কিন্তু যাঁরাই বৃদ্ধিসাধনতত্ত্বধারী তাঁরা প্রত্যেকেই **ব্রাহ্মণ** — এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দরীতি একটি বিপজ্জনক শত্রুর জন্য খিড়কি দরজা খুলে রেখে দিল। সেই পথ ধরে ঢুকে পড়ল **দক্ষের** প্রতীকী শব্দরীতি। **দক্ষনীতি**র হাত ধরে বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৈদিক সভ্যতার পরিচালকরাই পুরুষানুক্রমে **ব্রাহ্মণ** পদবাচ্য হয়ে গেলেন, তাঁদের **ব্রহ্মগুণ** থাকার ব্যাপারটিই বাদ পড়ে গেল; **ব্রাহ্মণের** সন্তান মাত্রেই **ব্রাহ্মণ** হয়ে গেলেন।

তবে, জনসাধারণ্যে সেই কথা সর্বৈব মান্য হয়নি, মানুষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তা মেনে নেননি। তাঁরা দেশে বিদেশে সর্বত্রই **ব্রাহ্মণের** বা 'সম্পর্কজ্ঞানী'র জন্ম দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন। রেখেছেন বলেই ধর্মসৃষ্টিকারী মহাজ্ঞানী মহাকবি মনীষী বিজ্ঞানী ... ইত্যাদি প্রকৃত **ব্রাহ্মণ**-এর সৃষ্টি হয়ে চলেছে সারা বিশ্ব জুড়েই। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এইরকম **ব্রাহ্মণ**কে সক্রিয় থাকতে দেখছি, যদিও ততদিনে এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। আমাদের বঙ্গদেশ তিন **ব্রাহ্মণ**কে জন্ম দিয়েছিল প্রায় একই সঙ্গে — বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ও জগদীশচন্দ্র বসু। এঁরা মূলত (গ), (ঘ) ও (ঙ) বর্গের **ব্রাহ্মণ** বা 'সম্পর্কজ্ঞানী' ছিলেন। ...

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বেরই একপ্রকার ভয়ানক জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মানবসমাজের মূলনীতিতেই একটা আমূল বদল ঘটে গেছে। এককথায় সেটি হল, মাথাকে দেহের সেবাদাস করে দেওয়া, এবং মাথার উদ্ভব ও বিকাশকে অবহেলা করা। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এইরকম।

বিশ্বের মানবগোষ্ঠীগুলি যে আজ পর্যন্ত বিকশিত হয়ে এগিয়ে আসতে পেরেছে, তার সেই অগ্রগতিতে যত বিভ্রাটই ঘটে থাকুক, আপন আপন পরিচালকের (মাথার, **ব্রাহ্মণ**-এর) জন্ম দেওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা, বিকাশসাধন করা, এবং তার নির্দেশে চলা — এই কাজে বিশেষ গাফিলতি সে করেনি, করে না; প্রতিটি মানুষ যেরকম নিজের মাথা বাঁচিয়ে সেই মাথার নির্দেশেই সব কাজ করে, সেইরকম করেছে সমাজদেহগুলিও। তবে একটা গাফিলতির সূচনা হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন ভারতসমাজে **দক্ষের মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। রাজাদের পরামর্শদাতার আসনে ক্রমশ উঠে বসতে শুরু করে **দক্ষ**জ্ঞানীরা (second-hand knowledge-এর জ্ঞানীরা ও খণ্ডজ্ঞানীরা)। তথাকথিত শিল্পবিপ্লবের পর এই রোগ তীব্র গতিতে বাড়তে শুরু করে পাশ্চাত্যে। রাজতন্ত্রের স্থানে এসেছে গণতন্ত্র; রাজাদের স্থান দখল করেছেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি

দেশনেতারা। আর, তাদের পরামর্শদাতার আসন সম্পূর্ণরূপে দখল করে নিয়েছেন এই খণ্ডজ্ঞানী-**দক্ষ**জ্ঞানীরা। ফলত, মানুষের সমাজ যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে **ব্রাহ্মণ**-এর জন্ম দিত, সেই নিয়মটাই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়ে যায়; খোলা থাকে কেবল (ক) ও (খ) বর্ণিত 'সম্পর্কজ্ঞানী'দের উদ্ভবের পথ। ফলে, মানুষের সমাজ 'একঝোঁকা' হয়ে যায়! ...

এর ফল যা হবার তাই হচ্ছে, হবেও। মানবসভ্যতা অন্ধ হয়ে গেছে। সে কুবেরের কল্যাণে আগের থেকে বহুগুণ বেশি জোরে ছুটছে। কিন্তু কোন দিকে ছুটছে, এবং এইভাবে অতি দ্রুত দৌড়ে কোথাও গিয়ে পৌঁছবে, একালের মানবজাতির পরিচালকদের কেউই তা জানে না। কারণ, তারা কেউই প্রকৃত **ব্রাহ্মণ** নয়। কারণ প্রকৃত **ব্রাহ্মণ**-এর জন্মই প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত : ২. *যে মুহূর্তে **ব্রহ্ম**লাভ করা যায়; অথবা, যে মুহূর্ত **ব্রহ্ম**লাভের পক্ষে প্রশস্ত।* ৩. ব্রহ্মদেবতাক মুহূর্ত, অরুণোদয়কালের অর্থাৎ রাত্রির শেষ চারি দণ্ডের প্রথম দণ্ডদ্বয়, রাত্রির শেষার্দ্ধপ্রহর, ব্রহ্মার মুহূর্ত, একমনুস্থিতিকাল। (ব.শ.)। ৪. ধর্মপ্রাণ বাংলাভাষীদের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত। ৫. বিজ্ঞানী ই সি জি সুদর্শন GRACE বা 'ঈশ্বরের অবদান' সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে বলা যায়, পরমাপ্রকৃতি প্রতিটি মানুষকে প্রায় সমান বিবেচনাশক্তি দিয়ে জন্ম দিয়ে থাকেন, যার পরিমাণ ৪৯ বা তার খুব কাছাকাছি। যে মানুষ কোনো বিষয়ের কারণ জানার জন্য কঠোর সাধনা করতে থাকেন, জগৎ ও জীবনের উপর বিস্তর অধ্যয়ন অনুসন্ধান অনুধ্যান করতে থাকেন, তাঁর বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধিলাভ করতে শুরু করে — ৪৯.১, ৪৯.২, ৪৯.৩ ... এভাবে তা বাড়তে থাকে। তাঁর সেই একাগ্রতা যেদিন যে-মুহূর্তে ৪৯.৯ পেরিয়ে ৫০-এ পৌঁছে যায়, তৎক্ষণাৎ পরমাপ্রকৃতির পরম কৃপা নেমে আসে আরও ৫০ নিয়ে এবং সাধক অবাক বিস্ময়ে দেখেন, তিনি ৫০-এ পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ১০০ বিবেচনাশক্তি লাভ করে ফেলেছেন। যে-মুহূর্তে এই ৫০-এ উত্তীর্ণ হয়েই ১০০ প্রাপ্তি ঘটে, সেই মুহূর্তটিকেই **ব্রাহ্মমুহূর্ত** বলে। জয়দেব যখন 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'-এর দেখা পেয়েছিলেন, সেটিই তাঁর **ব্রাহ্মমুহূর্ত**। রবীন্দ্রনাথ যখন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে দেখতে পেয়েছিলেন, সেটিই তাঁর **ব্রাহ্মমুহূর্ত**। আর্কিমিডিস যে মুহূর্তে তাঁর **ব্রহ্ম**কে লাভ করেছিলেন, সেই মুহূর্তে তিনি 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করতে করতে উলঙ্গ হয়ে ছুটতে শুরু করেছিলেন। ... প্রত্যেক আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টার জীবনে এরকম এক বা একাধিক **ব্রাহ্মমুহূর্ত** দেখতে পাওয়া যায়। ...

তবে কিনা, এই সব কাহিনী কেবল তাদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা **ব্রহ্মলাভ** করার সাধনা করেন বিচ্ছিন্নভাবে, নিতান্তই নিজের নিজের **ব্রহ্মবিহার**-এর আনন্দলাভের বাসনা থেকে। কিন্তু এরকম বাসনাই যদি কোনো জনগোষ্ঠীর সকল কিংবা অধিকাংশ মানুষের একমাত্র বাসনা হয় এবং তার জন্য তাঁরা পুরুষানুক্রমে **ব্রহ্ম**লাভের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন এবং প্রত্যেকেই সারা জীবন ধরেই সেই সাধনা করতে থাকেন, তাহলে তাঁরা জানতে পারেন, পার্থিব সময়ের সঙ্গেও এর একটা সম্পর্ক আছে। দেখা যায়, ৪৯.১ পেরিয়ে ৫০-এ পৌঁছনোর ব্যাপারটি প্রায়শই ঘটে ভোরবেলায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আমাদের **শিব**গুণসম্পন্ন পূর্বপুরুষেরা সেই ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। (আর, তা তাঁরা করবেন নাই বা কেন! তাঁদের অনুভবশক্তি আমাদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল।)। স্বভাবতই তাঁরা ভোরবেলার বিশেষ সময়কেও **ব্রাহ্মমুহূর্ত** নাম দিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির **দক্ষ**নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কালে কালে এর মন্দ ফল এই হয় যে, **ব্রাহ্মমুহূর্ত** শব্দটি তার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক স্বরূপ হারিয়ে 'ভোরবেলার দু-দণ্ড সময়' অর্থে বারংবার ব্যবহৃত হতে হতে সেই প্রতীকী অর্থে পর্যবসিত ও সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

বামন (বামনহাটি, বামনা, বামনি, বামনিশাক, বামুন) : ৩. **বামনহাটি** = বামনযষ্টি, ওষধিবিশেষ। **বামনা** = ব্রাহ্মণ (অনাদরে)। **বামুন** = ব্রাহ্মণ। (ব.শ.)। **বামন** = ব্রাহ্মণ (বিবর্ত্তিত রূপ)। **বামনি** = ব্রাহ্মণী (বিবর্ত্তিত রূপ)। **বামনিশাক** = ব্রাহ্মীশাক। ৪. গ্রামবাংলায় শব্দগুলি আজও বহুল প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রীহি : ১. ✓বৃহ্ + ই - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আবর্ত্তমান অতিবাহীর গতিশীল আধারের হওয়ন গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ব্রীহি** = ধান্য, আশুধান্য, যষ্টিকধান্য, শস্যমাত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত হলেও সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার একটি সংস্থার নাম দেখা গেল 'ব্রীহি'। বাঙালির পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত প্রায় ৩০০ প্রজাতির ধানকে এঁরা সংরক্ষণ করেছেন। ৫. আপনি ১০ কেজি ধান নিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দিলেন, জল সার দিলেন, শস্য কাটলেন, ১০০০ কেজি ধান পেলেন। এই যে আপনার ১০ কেজি ধান একটা আবর্তন পেরিয়ে ১০০০ কেজিতে পরিণত হয়ে গেল, একে বলে **ব্রীহি**। এখন আপনি চাইলে এই ১০০০ কেজিকে আরেকটি আবর্তন পার করে ১,০০,০০০ কেজিতে পরিণত করে ফেলতে পারেন। তাকেও বলা হবে **ব্রীহি**। কারণ, তাতেও *'আবর্ত্তমান অতিবাহীর গতিশীল আধারের হওয়ন গতিশীল'* রয়েছে। একই নিয়মে **বহু** বস্তু বা বিষয় তাদের বর্তমান অধ্যায় থেকে আবর্তিত হয়ে বৃহত্তর বা উচ্চতর কোনো স্তরে পৌঁছলে, তাকে বলা হয় **বহুব্রীহি**। যেমন **বহুব্রীহি** সমাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, 'পীত অম্বর যার' তাকে বলা হয় 'পীতাম্বর' বা শ্রীকৃষ্ণ। ইনি পীত নয়, অম্বরও নয়, দুইয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি এক তৃতীয় সত্তা, যিনি পীতার্থ ও অম্বরার্থের যোগফলমাত্র নয়। যোগফল হলে তিনি হতেন 'পীত যে অম্বর' = পীতাম্বর বা পীত রঙের অম্বর বা কাপড়। এটি কর্মধারয় সমাস। তার মানে ৪ আর ৫ যোগ করে ৯ বানায় কর্মধারয় সমাস, এবং ৪ আর ৫ গুণ করে ২০ বানায় **বহুব্রীহি** সমাস।

বক্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : বক, বকজিৎ, বকধর্ম্মী, বকধার্ম্মিক, বকনিষূদন, বকবৃত্তি, বকবৈরী, বকব্রতচর, বকব্রতপর, বকব্রতিক, বকব্রতী, বকযন্ত্র, বকাবকি, বকাসুর, বকী, বকুনি, বক্‌কড়ি, বক্ত, বক্তা, বগ, বগদুল, বগল,

বগলবাদ্য (হাপু), বগলা, বগলামুখী, বগলী, বগা, বগি(গু)লা (বিলি ভকত ও বগুলা ভকত), বগী, বঙ্ক্‌, বঙ্ক, বঙ্কবিহারী, বঙ্কভঙ্গী, বঙ্করাজ, বঙ্করাজপাতা, বঙ্কা, বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কু, বঙ্কি, বঙ্‌খুর, বাঁক, বাঁকচুর, বাঁকচোর, বাঁকতুলসী, বাঁকনল, বাঁকপাতামল, বাঁকমল, বাঁকশালি, বাঁকসাল, বাঁক(কু)ই, বাঁকা, বাঁকুয়া, বাঙ্ক, বাঙ্কুয়া (দ্র.বাউঙ্ক, বাঙ্গি)।

বঙ্ক্‌ = অতিবাহীর রহস্যরূপ করণ। **বঙ্ক** = অতিবাহীর রহস্যরূপ কৃত যাহাতে।

বক (বকধর্ম্মী, বকধার্ম্মিক, বকবৃত্তি, বকব্রতচর, বকব্রতপর, বকব্রতিক, বকব্রতী) : **১.** ✓বঙ্ক্‌ + অ (অচ্‌) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বক** = *রহস্যরূপী বাহী বা অতিবাহীর করণ থাকে যাহাতে। /* **বকবৃত্তি** = যাহার বকবৃত্তির ন্যায় বৃত্তি। (ব.শ.)। **৩. বক** = পক্ষিবিশেষ, ধূর্ত্ত, শঠ, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বকপুষ্প। **বকধর্ম্মী, বকধার্ম্মিক** = বকের মতো বাহ্যভাবে ধার্ম্মিক, কপট-ধার্ম্মিক, ধর্ম্মধ্বজী। **বকবৃত্তি** = স্বার্থসাধনতৎপর বঞ্চক জন। **বকব্রতচর, বকব্রতপর, বকব্রতিক, বকব্রতী** = বকব্রতের আচরয়িতা, বকব্রতপরায়ণ, বকবৃত্তি দ্বিজ। (ব.শ.)। **৪.** 'বকপাখি', 'বকফুল' অর্থে **বক** প্রচলিত এবং 'কপট-ধার্ম্মিক' অর্থে **বকধার্ম্মিক** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** অনেকেই জানেন, বকপাখি 'ওয়ক্‌-ওয়ক্‌' বা 'বঅক্‌-বঅক্‌' করে ডাকে। সুতরাং, 'বক বক করে যে', তাকে **বক** বলা যেতে পারত। সেক্ষেত্রে শব্দটিকে **বচ্‌** ক্রিয়ামূলের পরিবারের সদস্য হতে হত। এখানে ব.শ. কিন্তু দেখাচ্ছেন, পক্ষীবাচক এই **বক** শব্দটি **বচ্‌** ক্রিয়া থেকে প্রসূত হয়নি, হয়েছে 'বঙ্ক্‌' ক্রিয়া থেকে। তার মানে, **বকপাখি** কিংবা **বকফুল**কে শনাক্ত করার জন্য **বক** শব্দটি তৈরি করা হয়নি, '**বকধার্ম্মিক**-দ্বিজ' সত্তাটিকে বোঝানোর জন্যই **বক** শব্দটি প্রস্তুত করা হয়েছিল; কেননা এই সত্তাটি 'বাঁকা' (বঙ্ক) পথের পথিক। পরে পরে জনসমাজের সেই **বকের** সাদৃশ্যে শব্দটি **বকপাখি** ও **বকফুল**কেও বোঝানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে যায়। পাঠক, এক্ষেত্রে মহাভারতের 'ধর্ম্মবক'-এর কাহিনীটি স্মরণ করতে পারেন। (দ্র. **ক্রৌঞ্চ**)। তবে, অন্তত **বকপাখি**র ক্ষেত্রে **বক** শব্দটি পাখিটির বাঁকা স্বভাবকে (সুযোগ এলেই খপ্‌ করে মাছ ধরে গিলে ফেলে, অথচ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধার্মিক সাধুর মতো) বোঝালেও **বকফুল**-এর ভিতরে **বকধার্ম্মিকতা** কীভাবে রয়েছে, তা আমরা এখনও জানি না। **৬.** ইংরেজিতে যে bunk-এর মানে আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক কর্ম ছেড়ে পলাতক হওয়া (বা বাঁকা পথ ধরা), সেই bunk-এর ভিতর আমরা উপরোক্ত 'বঙ্ক্‌' শব্দের সমজাতীয় উত্তরাধিকার দেখতে পাই।

বক (বকরাক্ষস) : **২. বক** = *রহস্যরূপী অতিবাহীর করণ থাকে যাহাতে।* **৩.** কংসচর অসুরবিশেষ। বক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। একচক্রায় অবস্থান কালে বক ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হয়। (ব.শ.)। (ক) ঋষ্যশৃঙ্গ রাক্ষসের **অলম্বুষ** ও বক নামে দুই পুত্র ছিল। বকরাক্ষস একচক্রা গ্রামে বাস করত ও গ্রামবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করত। শেষে গ্রামবাসীরা অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য রাক্ষসের সঙ্গে এক শর্তে আবদ্ধ হয় — প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে গ্রামের এক এক পরিবার থেকে এক একটি মানুষ, প্রচুর অন্ন ও দুইটি মহিষকে উক্ত রাক্ষসের খাদ্যরূপে প্রেরণ করতে হবে এবং এরই পরিবর্তে বকরাক্ষস দেশরক্ষা করবে। জতুগৃহদাহ হতে পরিত্রাণ পেয়ে পাণ্ডবরা একচক্রা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন। ঘটনাচক্রে সেদিন ঐ ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হওয়ায় ... কুন্তী ভীমকে ... রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করেন। ভীম বকরাক্ষসকে নিহত করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **একচক্রা, ক্রুঞ্চ, ক্রৌঞ্চ**।

বঙ্ক (বঙ্কবিহারী, বঙ্কা, বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র, বাঁক, বাঁকা, বাঁকান) : **১.** ✓বঙ্ক্‌ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বঙ্ক** = *বাহী বা অতিবাহী রহস্যময় কৃত যাহাতে।* ***বঙ্কবিহারী*** = ***বঙ্ক****-ভাবে বিহার করেন যিনি।* ***বঙ্কা*** = ***বঙ্ক****-এর আধার যে।* ***বঙ্কিম*** = ***বঙ্ক*** *গতিশীল হইয়া সীমায়িত যাহাতে।* ***বঙ্কিমচন্দ্র*** = ***বঙ্কিম*** *যে চন্দ্র।* ***বাঁক*** = *রহস্যরূপী বাহীর করণ থাকে যাহাতে।* ***বাঁকা*** = ***বাঁক****-এর আধার যে।* ***বাঁকান*** = ***বাঁকা*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* **৩. বঙ্ক** = বক্রীভাব, কৌটিল্য, নদীর বক্রীভাব; বাঁকা, টেড়া, ভঙ্গিযুক্ত, বক্রগতি, প্রতিকূল, তির্য্যক্‌ ...। **বঙ্কবিহারী** = নিধুনবনস্থ কৃষ্ণবিগ্রহবিশেষ। **বঙ্কা** = ভাঙা, প্রতিকূল, কঠোর। **বঙ্কিম** = বক্র, বাঁকা, চক্রাকৃতি, কুটিল, ঈষদ্বৃত্ত। **বাঁক** = বক্রতা, নদীর মোড় ...; বক্র হওয়া, বাঁকিয়া যাওয়া, নত হওয়া, হেলিয়া পড়া, কুটিল হওয়া, বক্র করা। **বাঁকা** = বক্র, বিকৃত, অস্বাভাবিক, প্রতিকূল ...। (ব.শ.)। **৪. বঙ্ক** শব্দটি অপ্রচলিত। কিছুদিন আগেও গ্রামবাংলায় ছেলেপুলেদের নাম রাখা হত **বঙ্কবিহারী, বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কা**। এখন তাও অপ্রচলিত। লোকে মনে করে, বাঁকেবিহারী, বাঁকা, বাঁকাচাঁদ ... এসব ভাল কথা নয়। বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **আঁকাবাঁকা** (১ম খণ্ড)। বাহী-সত্তা যেখানে তার স্বাভাবিক প্রবাহপথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, স্থান-কাল-পাত্রানুসারে সেই বাহী সত্তাকে **বঙ্ক** বলে (বঙ্ক-স্থান, বঙ্ক-কাল, বঙ্ক-পাত্র)। যেহেতু এ হল বাহীর (**ব**-এর) রহস্যরূপ (**বং**), সেইহেতু, এই রূপ ভাল হতে পারে, মন্দও হতে পারে। **বক**-এর, 'বেঁকে দাঁড়ান'র ... প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার মন্দ রূপটিকেই দেখা যায়, এর ভাল রূপও রয়েছে। বাস্তবকে **সুন্দর**ভাবে বা সামঞ্জস্যমূলকভাবে **বাঁকিয়ে** দিয়েই শিল্পসৃষ্টি হয়ে থাকে। **বঙ্ক** তাই দুরকম সম্ভাবনাকেই ধরে রাখে। ...

এই **বঙ্ক**-এর বিবর্তিত রূপ হল **বাঁক**। বাংলাভাষী একে **বাঁকচুর করা, বাঁকা, বাঁকাচোরা, বাঁকান, বাঁকিয়ে ফেলা, বাঁকিয়ে দেওয়া, বাঁকা হওয়া, বেঁকে দাঁড়ান** ... প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত করে নিয়েছে। এই যে **বঙ্ক** বা **বাঁক**, সাধারণভাবে একে মন্দার্থক বলেই মনে করা হয়। কিন্তু এটি যে ভাল অর্থেও গৃহীত হত, তার অন্তত দুরকম নিদর্শন রয়েছে। প্রথমত **বঙ্কবিহারী** ত্রিভঙ্গমুরারির মূর্তি। আর দ্বিতীয়ত, অন্ততপক্ষে চারটি প্রজাতির ধানের স্বভাবের ভেতরে শুভার্থক **বাঁক**-ক্রিয়াকে সক্রিয় থাকতে দেখে বাংলাভাষী তাদের নামকরণ করেছেন — **বাঁকই (বাঁকুই), বাঁকচুর (বাঁকচোর), বাঁকতুলসী, বাঁকশালি (বাঁকসাল)**। অর্থাৎ কিনা, **বঙ্ক** শব্দটিকে

বাংলাভাষী নিজের মতো করে অনেক প্রসারিত করে নিয়েছে।

আরও আছে। বাঁশের পাঁচ-সাত হাত পরিমাণ একটি খণ্ডকে মাঝামাঝি চিরে নিয়ে বা বাখারি করে বানানো হয় মালপত্র বহন করার **বাঁক**। এটি দেখতে অনেকটা বৃত্তচাপের মতো। একে **বাউঙ্ক, বঙ্গী** বা **বাঙ্গী**ও বলে। এর দুই দিকে মালপত্র ঝুলিয়ে বহন করা হয়। গোয়ালারা এই **বাঁকে**র দুই দিকে হাঁড়িতে দই রেখে বহন করেন। দ্র. **বঙ্গ**। ৬. bunk। উপরে দ্র. **বক**।

বঙ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ডাকবাংলা(লো), পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, বংগলা, বঙ্, বঙ্গ, বঙ্গজ, বঙ্গদেশী, বঙ্গন, বঙ্গবাসী, বঙ্গভাষা, বঙ্গযান, বঙ্গাল, বঙ্গীয়, বাংলা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশি(শী), বাংলো, বাঙ্লা, বাঙাল, বাঙালি(লী), বাঙ্গাটুনি, বাঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গাল-ব্যাঙ্ক, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ডাক-বাংলা, বাঙ্গি(ঙ্গী)।

বঙ্ = বাহীর রহস্যময় গমন। **বঙ্গ** = বাহীর রহস্যময় গমন যাহাতে।

বঙ্গ (বঙ্গজ, বঙ্গদেশী, বঙ্গন, বঙ্গবাসী, বঙ্গযান, বঙ্গাল, বাংলা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশি, বাংলাদেশী, বাংলো, বাঙ্লা, বাঙাল, বাঙালি, বাঙালী, বাঙ্গাল, বাঙ্গালি, বাঙ্গালী, বাঙ্গি, বাঙ্গী, ডাক-বাঙ্লা) : ১. ✓বঙ্ (গতি) + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বঙ্গ = বং (দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর রহস্যরূপী) গমন যাহার; অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী (দর্শনানুসারে) গমন যাহার।* ***বঙ্গজ** = **বঙ্গ** হইতে জাত।* ***বঙ্গদেশী** = **বঙ্গী**য় দিশার গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বঙ্গদেশ**-এ থাকে যে।* ***বঙ্গন** = **বঙ্গ** অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বঙ্গবাসী** = **বঙ্গে** বাস করে যে।* ***বঙ্গযান** = **বঙ্গ**-এর যাওয়া অন (on) থাকে যাহাতে (যে দর্শনের সাহায্যে)।* ***বঙ্গাল** = **বঙ্গ**-এর আধার লালিত যাহাতে।* ***বাংলা (বাঙ্লা)** = দ্বিত্বের রহস্যরূপ লালিত যাহাতে।* ***বাংলাদেশ** = **বাংলা**-দিশায় চলে যে সত্তা।* ***বাংলাদেশি** = **বাংলাদেশ** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ***বাংলাদেশী** = **বাংলাদেশি**র আধার যে।* ***বাংলো** = দ্বিত্বের রহস্যরূপের লালন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***বাঙাল** = দ্বিত্বের রহস্যরূপী আধার লালিত যাহাতে।* ***বাঙালি** = **বাঙাল** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ***বাঙালী** = **বাঙালি**র আধার যে।* ***বাঙ্গাল** = **বঙ্গাল** হইতে জাত।* ***বাঙ্গালি** = **বাঙ্গাল** গতিশীল যাহাতে।* ***বাঙ্গালী** = **বাঙ্গালি**র আধার যে।* ***বাংগি, বাঙ্গি** = দ্বিত্বের রহস্যরূপী গমন গতিশীল যাহাতে।* ***বাঙ্গী** = **বাঙ্গি**র আধার যে।* ***ডাক-বাঙ্লা** = যে **বাঙ্লা (বাংলো)** হইতে ডাকিয়া পাঠান হয়।* ৩. **বঙ্গ** = রঙ্গ, রাঙ, টিন, কার্পাস, বেগুন (ফল), বার্ত্তাকু, বেগুনগাছ, বঙ্গদেশ (মহাভারতের মতে, বলিরাজের পুত্ত্র বঙ্গের অধিকারে স্থিত দেশ 'বঙ্গ' ... (বঙ্গ পুরাকালে নদীবহুল ও জলপ্রায় দেশ ছিল। ... এই 'বঙ্গ'দেশ পূর্ব্ববঙ্গ। রঘুবংশের বর্ণনায় রঘু যে বঙ্গরাজগণকে উৎখাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌবলই যুদ্ধের প্রধান সাধন ছিল; নদীবহুল ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজ্যের নৌবলই যুদ্ধের প্রধান সহায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসে 'বঙ্গরাজ্য' সমুদ্রতীরস্থিত দেখা যায়। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া পদ্মাতীরে অবস্থান করিয়াছিলেন।), বঙ্গদেশীয় রাজগণ, বঙ্গবাসিগণ। (ব.শ.)। বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমা ঋষি হতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এঁরা সকলেই নিজের নামানুসারে নামীয় প্রদেশের রাজা হন। বঙ্গের নামানুসারে এঁর অধিকৃত রাজ্য বঙ্গ নামে অভিহিত হয়। (পৌ.অ.)। **বঙ্গজ** = বঙ্গদেশজাত, সিন্দূর, পূর্ব্ববঙ্গীয় জন, পূর্ব্ববঙ্গীয় কায়স্থ ও কায়স্থবিভাগবিশেষ। **বঙ্গদেশী** = পূর্ব্ববঙ্গবাসী। (বঙ্গদেশী ভাষা = পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা)। **বঙ্গন** = বেগুন (ফল), বার্ত্তাকু, বেগুনগাছ। **বঙ্গীয়** = বঙ্গসম্বন্ধী। **বাইগন, বাইগুন, বাইঙ্গন, বাগন, বাগুন, বাগ্যণ** = ফলশাকবিশেষ। **বাঙাল (বাঙ্গাল)** = (ক) প্রতীহাররাজ ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে 'ধর্ম্মপাল'কে 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার সেনাগণকে 'বাঙ্গালী' (বঙ্গাণ্) বলা হইয়াছে। প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেবের তিরুমলয় পর্ব্বতের লিপিতে 'বঙ্গালদেশ' পাওয়া যায়। 'বঙ্গাণ্' হইতে 'বাঙ্গাল', 'বাঙ্গালা' সহজেই হয়। তাঞ্জোরে একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে 'বঙ্গণম্' পদ দেখা যায়। ... আকবরের সাম্রাজ্য যে দ্বাদশ সুবায় বিভক্ত হয়, বাঙ্গালা তাহাদের একতম। উড়িষ্যা এই সুবার অন্তর্গত ছিল। ইহার পূর্ব্বে সমুদ্র, উত্তরে ও দক্ষিণে পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে সুবা বিহার। ইহা হিন্দুস্তানের পূর্ব্বসীমান্তবিভাগ। সংস্কৃত 'বঙ্গ' ইহার মূল শব্দ। (ব.শ.)। (খ) পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। (গ) পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান। **বাঙালি, বাঙালী, বাঙ্গালি, বাঙ্গালী** = বঙ্গ যাহার স্বদেশ ও যে বঙ্গভাষাভাষী, বঙ্গ দেশবাসী। **বাঙ্গালা, বাঙ্লা, বাংলা** = বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা, ধনুরাকৃতি টুয়াযুক্ত খড়ে-ছাওয়া দোচালা ঘর। (ঝড়বৃষ্টিবহুল পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ ঘর বিশেষ আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ দেয়ালের ঘর পূর্ব্বে দেখা যাইত, এক্ষণে দোচালা ঘরমাত্র বাঙ্লা ঘর। কোনো কোনো স্থলে চারচালা বা আটচালা ঘরকেও বাঙ্লা (bungalow) বলে। 'ডাক-বাঙ্লা'য় নামমাত্রে 'বাঙ্লা'র স্মৃতি রহিয়াছে।)। **বাঙ্গি** = ভারযষ্টি, বাঁক। (ব.শ.)। **বাংগি, বাঙ্গি, বাঙ্গী** = দুদিকে শিকাতে ভার বইবার বাঁক। **বাঙ্গালা, বাঙ্লা, বাংলা** = বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা, বঙ্গ ভাষায় লিখিত। **বাংলাদেশ** = স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গ বা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান, বঙ্গদেশ। **বাংলাদেশি, বাংলাদেশী** = বাংলাদেশের নাগরিক। **বাংলো, বাংলা, বাঙলা** = চওড়া বারান্দাযুক্ত একতলা বাড়িবিশেষ, বিশেষ আদলে তৈরি বাড়ি, গ্রামবাংলার সম্পন্ন গৃহস্থের বাইরের বৈঠকখানা, পদস্থ চাকুরেদের সরকারি বাসগৃহ, মফস্বল পরিদর্শন কালে চাকুরেদের বিশ্রাম ও অবস্থানগৃহ। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. অর্থহীন প্রতীকী শব্দ রূপে শুধুমাত্র Bengal ও তৎসংশ্লিষ্ট অর্থে উপরোক্ত শব্দগুলি নানান বানানে কমবেশি প্রচলিত। তুলনায় 'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' শব্দটি অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। ৫. দ্র. **অঙ্গ, ঘটী, জন্তু, জীমূত, জীমূতবাহন, দীর্ঘতমা**। প্রথমে শব্দার্থের নিয়মে **বঙ্গ** শব্দের অর্থ নিয়ে কথা বলব আমরা। **ব** বর্ণটি যে দ্বৈতাদ্বৈতবাহীকে বা 'দুই'কে বোঝায়, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে, একই সঙ্গে দুরকম গুণ নিয়ে চলে যে, তাকে **বঙ্গ** বলা হচ্ছে। সবাই জানেন, 'রাঙ্' বা 'টিন' দুরকম ধাতুর আধার, তাকে **বঙ্গ**ও

বলা হয়। **বঙ্গন** (**বঙ্গ** অন থাকে যাহাতে) বা **বাইগুণ** (= brinzal) কেবল দুরকম রঙের (বেগুনী রঙের) আধারই নয়, আয়োডিন জাতীয় দুইরকম গুণেরও আধার বটে। 'বঙ্গী' বা 'বাঙ্গী'-কাঁধে গোয়ালাকে আমরা দেখেছি, দু'দিকে সমান ভার বহন করতে (দ্র. **বিহঙ্গমা**)। আদিতে 'দোচালা' বাড়ি মাত্রকেই 'বাংলাবাড়ী' বা 'বাংলোবাড়ী' বলার চল হয়, পরে যা নানার্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আমাদের বিশ্বাস, 'বঙ্গাইগাঁও' কিংবা 'বঙ্গালুরু' (Bangalore) নামক স্থানের ইতিহাসেও এই দুইকে কোনো না কোনোভাবে পাওয়া যেতে পারে, 'বঙ্গালুরু'র নামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার কিছু কথা আমরা জেনেছি। ... শব্দটির এই স্বভাব এমনকি ইংরেজি bongo শব্দতেও দেখা যায়, যেখানে দুটো তবলা একত্র জুড়ে রয়েছে। ...

মোট কথা, **বঙ্গ** শব্দটিকে যেখানেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, সেখানেই তার ভিতরে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাহী একটি সত্তা'কে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়; যেন একটি লোক তার দুই কাঁধে দুই ফরিস্তাকে নিয়ে হেঁটে চলেছে। একে আমরা 'দ্বৈতাদ্বৈত' বলছি এইজন্য যে, সেটি আসলে দুই বা দ্বৈত কিন্তু প্রায়শই প্রতিভাত হয় এক বা অদ্বৈত রূপে। এই রূপে গমন করে যে, বা এইরূপে চলে যে, তা সে কোনো ধাতু, উদ্ভিদ, মানুষ, দেশ, যেই হোক, তাকেই **বঙ্গ** বলে।

এ তো গেল বাহ্যলোকে **বঙ্গ** শব্দের চিহ্নিত কিছু তথ্যকথা। অদৃশ্য লোকে রয়েছে মূল তত্ত্বকথাগুলি। **বঙ্গ**-এর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আমলে, তাঁর (মূলত) দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের বিকাশের মধ্য দিয়ে। তবে এর সূত্রপাত **বঙ্গ**-এর জন্মলগ্নেই। তার কথা আমরা জানতে পারি **বঙ্গ**-এর পৌরাণিক কাহিনী থেকে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ : যতদূর বোঝা যায়, তিনটি জাতির তিনরকম মৌলচরিত্রের কথা ধরা আছে এই তিনটি শব্দে। যে জাতি উত্তরাধিকার অনুসারে চলে, তাকে **অঙ্গ** বলা যায়; যে জাতি নিজস্ব অর্জনের সঙ্গে উত্তরাধিকার মিলিয়ে নিয়ে চলে, তাকে **বঙ্গ** বলা যায়; এবং যে জাতি **কলি**র সঙ্গে উত্তরাধিকার মিলিয়ে নিয়ে চলে, তাকে **কলিঙ্গ** বলা যায়। দ্র. **ঘটী**। জমিতে ট্যাক্স প্রচলিত হবার পর ভারতের পূর্বাংশকে পাঁচটি প্রদেশে (**অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম**) ভাগ করা হয়। এই পাঁচটি প্রদেশের শাসনব্যবস্থার জন্ম হয় ট্যাক্স-ব্যবস্থার আধাররূপী জনগোষ্ঠীর (**সুদেষ্ণার**) ভিতর থেকে এবং বহুকাল-ক্রমাগত পূর্ববর্তী দীর্ঘসূত্রী অন্ধ ক্লেদাক্ত সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার (**দীর্ঘতমা**র) ক্ষয়িষ্ণু দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তিতে (ঔরসে)। স্মর্তব্য যে **অঙ্গ**-এর পুত্রই **বেণ**। ...

মোট কথা, **বঙ্গ** একটি বিশেষ ধরনের অস্তিত্বের প্রক্রিয়ার বা গমনপ্রক্রিয়ার বা টিকে থাকার উপায়। সেই **বঙ্গ**প্রক্রিয়া অবলম্বন করে চলে যে, তাকেও সেকারণেই **বঙ্গ** বলে। যে ভাষাভাষী জাতি বা **দেশ** সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে চলে, সে আসলে **বঙ্গযান** ব্যবহার করে চলে; তেমন জাতিকেই **বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙালী** ... ইত্যাদি বলে এবং সেই দেশকেই **বঙ্গদেশ** বলা যায়। সেকালে যেমন আমাদের কোনো কোনো যুগের পূর্বপুরুষেরা **দেবযান, পিতৃযান, মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, সহজযান** অবলম্বন করে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতেন, এই **বঙ্গযান**ও তদ্রূপ একপ্রকার যান। নাম না দিয়ে এই **বঙ্গযান** বিষয়ে বিস্তারিত বলে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'রবীন্দ্রজীবনদর্শন' কিংবা 'রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ' বলে যদি কোনো কথা হয়, তবে সেই অধ্যাত্মবোধ বা দর্শন **বঙ্গযান** অবলম্বন করে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করাই বোঝায়। এতে পরস্পরবিরোধী দুইকে পরস্পরের পরিপূরক করে নিয়ে **সুন্দর**-এর সৃষ্টি করে চলা হয়। তাই এই যানই মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ যান।

আমাদের ধারণা হয়েছে যে, বর্তমান কালখণ্ডে একমাত্র আমাদের **বঙ্গযান**ই মানবসভ্যতাকে রক্ষা করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। **বঙ্গ**মানসই হয়তো আত্মোন্নয়ন ঘটিয়ে ভারতের তথা বিশ্বের পথপ্রদর্শক রূপে উঠে আসবে। কেননা, একালের তথাকথিত 'গ্লোবালাইজেশন' বা 'গোলোকায়ন'-এর মৌলবাদী হয়ে ওঠা মানবসভ্যতার পক্ষে মৃত্যুর সমান হয়ে দেখা দিয়েছে। 'কর্পোরেট-কালচার' নামে এই 'গোলোকায়ন' আসলে **ইন্দ্র**যান ব্যবহার করে থাকে। তার বিপরীতে একমাত্র **বঙ্গযানই** মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে। তবে আমরা নিজেরা **বঙ্গবাসী-বঙ্গভাষী** বলেই এ বিষয়ে এখানে আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আমাদের গবেষণার ভিতর দিয়ে আমরা **বঙ্গ**-এর ভিত্তিস্বরূপ যে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বকে খুঁজে পেয়েছি, দেখা গেছে, সেটিই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব বা **সুন্দরতত্ত্ব**। ('পরিশিষ্ট ৫' দ্রষ্টব্য)। এই **সুন্দরতত্ত্ব**ই রয়েছে **বঙ্গযান**-এর মূলে। পরবর্তীকালে এই **বঙ্গযান** ও **বঙ্গায়ন** নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে বলব।

মোট কথা, **বঙ্গ** শব্দের অধ্যাত্মবোধ অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বোধ থেকে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস জন্মেছে যে, **গোলোকায়ন**-উত্তর মানবসভ্যতা আদৌ যদি টিকে থাকে, তা কেবল **বঙ্গায়ন**-এর জোয়ারেই টিকে থাকতে পারে, **বঙ্গযান** ব্যবহার করেই টিকে থাকতে পারে। আমরা দেখছি, অন্তত তত্ত্বগতভাবে একমাত্র **বঙ্গযান**ই তথাকথিত 'কর্পোরেট-কালচার' বা **ইন্দ্রযান**কে পর্যুদস্ত করার ক্ষমতা রাখে। দ্র. **বজ্রযান**।

বচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যুক্তি, অত্যুক্তিপ্রসক্তি, অনভিব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বাচ্য, অনুক্ত, অবক্ত, অবচন, অবচনীয়, অবাক, অবাক্য, অবাচ্য, অবিবক্ষা, অবেকত, অব্যক্ত, অব্যক্তমূর্ত্তি, অব্যক্তরাগ, উক্ত, উক্তপুংস্ক, উক্তপূর্ব্ব, উক্তপ্রত্যুক্ত, উক্তি, উক্থ, একবচন, একবাক্য, নিরুক্ত, নির্ব্বচন, নির্ব্বাক, নির্ব্বাচক, নির্ব্বাচন, পচাল (বচাল, বাচাল), প্রবক্তা, প্রবচন, প্রোক্ত, বউল (মুকুল, বকুল), বউলা, বউলি(লী), বক, বকবক, বকবকম, বকমবকম, বকরবকর, বকরা (buck, বাকরহ্), বকরী, বকলস (বগলস, buckles), বকা, বকাট, বকা(খা)টে, বকান, বকাবকি, বকাম (বকামো, বকামি), বকুনি, বকুল, বকুলফুল, বকুলা, বকুলী, বকেয়া, বক্তব্য, বক্তব্যতা, বক্তা, বক্তৃতা, বক্ত্র, বক্ত্রজ, বক্ত্রদ্বার, বক্ত্রবাস, বক্ত্রশোধন, বক্ত্রাসব, বক্ষ, বক্ষ (ব-কক্ষ, box), বক্ষস্থল, বক্ষশ্ছদ, বক্ষস্তট, বক্ষোজ, বক্ষোরুহ, বক্ষ্যমাণ, বক্ষঃ, বক্ষঃস্থল, বঙ্ক্ষণ, বঙ্ক্ষু, বচ্, বচ, বচঃ, বচঃক্রম, বচঃপ্রবৃত্তি, বচন, বচনকর, বচনকার, বচনকারী, বচনক্রম, বচনগোচর, বচনগৌরব, বচনগ্রাহী, বচনচঞ্চুতা, বচনজাত, বচনদেবতা, বচনবিরোধ, বচনমাত্র, বচনস্তব, বচনরচনা, বচনশত, বচনসর্ব্বস্ব, বচনীয়, বচনীয়তা, বচনোপন্যাস,

বচসা, বচনস্থিত, বচা, বচাবচ, বাক্(চ্), বাক, বাকচাতুরী, বাকদণ্ড, বাকপটু, বাকবিতণ্ডা, বাকম, বাকসংযম, বাকসিদ্ধ, বাকসিদ্ধা, বাকী, বাকীবকেয়া, বাকুচী (হাকুচ), বাকোপবাক, বাকোবাক্য, বাক্‌চপল, বাক্‌চাপল্য, বাক্‌চাতুরী, বাক্‌ছল, বাক্‌দণ্ড, বাক্‌দত্তা, বাক্‌পতি, বাক্‌পটু, বাক্‌পারুষ্য, বাক্‌বাণী, বাক্‌বাদিনী, বাক্‌বিতণ্ডা, বাক্‌রোধ, বাক্‌শক্তি, বাক্‌শর, বাক্‌শল্য, বাক্‌স (দ্র.বক্ষ), বাক্য, বাক্যকর, বাক্যগর্বিত, বাক্যগ্রহ, বাক্যদণ্ড, বাক্যদত্ত, বাক্যদান, বাক্যনবাব, বাক্যপদীয়, বাক্যপাত্র, বাক্যবাজ, বাক্যবাণ, বাক্যবিশারদ, বাক্যব্যয়, বাক্যযুদ্ধ, বাক্যালাপ, বাক্যশেষ, বাক্যসিদ্ধ, বাক্যস্ফুরণ, বাক্যস্ফূর্ত্তি, বাক্যহঠ, বাক্যালঙ্কার, বাক্যালাপ, বাখর (দ্র.বা), বাগ, বাগডোর, বাগপহারক, বাগর্থ, বাগসি, বাগাড়ম্বর, বাগাত্মা, বাগীশ, বাগীশা, বাগীশ্বর, বাগীশ্বরী, বাগ্‌গুদ, বাগ্‌দত্তা, বাগ্‌দান, বাগ্‌দি, বাগ্‌দিনী, বাগ্‌দেবতা, বাগ্‌দেবী, বাগ্‌দৈবত্য, বাগ্‌দোষ, বাগ্‌বজ্র, বাগ্‌বান, বাগ্‌বাদিনী, বাগ্‌বিদগ্ধ, বাগ্‌বিভব, বাগ্‌বৈদগ্ধ, বাগ্‌ব্যবহার, বাগ্মিতা, বাগ্মী, বাগ্‌যত, বাগ্‌যমন, বাগ্‌যুদ্ধ, বাগ্‌রোধ, বাঙ্‌নিষ্ঠা, বাঙ্‌নিষ্পত্তি, বাঙ্‌মধুর, বাঙ্মন, বাঙ্মনস, বাঙ্ময়, বাঙ্ময়ী, বাঙ্মুখ, বাচ, বাচংযম, বাচক, বাচন, বাচনিক, বাচ(ছ)বিচার, বাচস্পতি, বাচস্পত্য, বাচা, বাচাট, বাচারম্ভ, বাচাল, বাচিক, বাচিকপত্র, বাচোযুক্তি, বাচ্য, বাচ্যতা, বাচ্যলিঙ্গ, বাচ্যলিঙ্গক, বাচ্যার্থ, বাছ, বাছন, বাছনি, বাছনিদার, বাছপড়া, বাছবিচার, বাছা (নির্ব্বাচন), বাছাই, বাছান, বাছাল, বাছালো, বাছুনি (বাছনি), বাঞ্ছ, বাঞ্ছ্‌, বাঞ্ছন, বাঞ্ছনা, বাঞ্ছনীয়, বাঞ্ছা, বাঞ্ছাকল্পতরু, বাঞ্ছাতরু, বাঞ্ছারাম, বাঞ্ছিত, বাদবাকী, বিবক্ষা, বু, বুক, বুকনি, বৈক্ষ, বোল (কথ্‌, বচ্‌, বদ্‌, বল্‌), বোলচাল, বোলতা, বোলবোলাও, বোলমাটী, বোলা, বোলান, বোলাবুলি, বোলবোলি, বোলি(লী), বৌল, বৌলি, বৌষট্‌, শান্তিবাচন, সুবচন, সূক্ত, সূক্তি, স্বস্তিবাচন।

বচ্ = বাহীর চয়ন। **বচ** = বাহীর চয়ন যাহাতে।

বক, বকা, বচ, বচন, বাক, বাক্য, বদ, বাদ, বল, বলা (এই শব্দগুলি নিম্নে পুনরায় থাকবে। এখানে শুরুতে তুলনামূলক আলোচনা করা হচ্ছে।) : **২.** ***বচ*** = *বাহীর চয়ন যাহাতে।* ***বচন*** = ***বচ*** *অন (on) যাহাতে।* ***বক*** = *বাহী কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, বাহী চয়নপূর্ব্বক উচ্চারণ কৃত যাহাতে।* ***বকা*** = ***বক****-এর আধার যে।* ***বাক*** = ***বক*** *হইতে জাত।* ***বাক্য*** = ***বাক*** *থাকে যাহাতে।* ***বদ*** = *বাহীর দান যাহাতে।* ***বাদ*** = ***বদ*** *হইতে জাত।* ***বল*** = *বাহী লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***বলা*** = ***বল****-এর আধার যে।* **৫.** উপরোক্ত শব্দগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র 'কথা বলা'র ক্রিয়াটিকে বলার জন্য আমাদের ভাষায় অন্ততপক্ষে **বচ্‌, বদ্‌, বল্‌** (?), **কথ্‌** ... প্রভৃতি অনেকগুলি ক্রিয়ামূল রয়েছে। সন্দেহ নেই, প্রতি ক্রিয়ামূলের পরিবারের সদস্যসংখ্যাও নেহাত কম নেই। এর কারণ হল, আমাদের কথা বলার ক্রিয়াটি খুব সরল নয়, তার পর্যায়ক্রম আছে।

প্রথমত, মানুষের মনে যখন কোনো কিছু বিষয় প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, তখন তার সমস্যা হয় এই যে, কোন্ আওয়াজ সেই বিষয়কে প্রকাশ করতে পারবে, তা নির্ধারণ করা। নানান আওয়াজের ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় আওয়াজটিকে চয়ন করে নেওয়াকে বলে **বচ্** করা। তার মানে, **বচ্-এর** ভিতরে প্রকাশিতব্য বিষয়টি বহন করার বা **বইবার** প্রকৃত আধারকে **চ** বা চয়ন করা গেছে। এর থেকে পাওয়া যায় **বচন**। এই **বচন**কে যখন কাজে পরিণত করা হয়, অর্থাৎ যে আওয়াজটি নির্ধারিত করা হল, সেই আওয়াজটিকে উচ্চারণ করে প্রকাশ করে দিলে তবেই **বক্** করা হয়। এর থেকে আমরা **বকবক করা, বকা, বক্তা, বাক, বাক্য** প্রভৃতি পেয়ে থাকি। এই **ব** অতএব 'বিষয়-বাহী', 'বচনীয়-বাহী' বা 'বক্তব্য-বাহী'। এই **ব**-এর দান থাকে **বদ্**-এ, যার থেকে আমরা **বাদ, প্রতিবাদ, সংবাদ** ... ইত্যাদি শব্দ পাই। আবার এই **ব** যাতে লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয়, তাকে **বলা** শব্দে চিহ্নিত করা হয়। ওদিকে যা কিছু ঘটে গেছে, করা হয়ে গেছে, বা করা হবে, সেই সমস্ত 'কারী থাকে যাহাতে', তাকে বলা হয় **কথা**।

অতএব দেখা যাচ্ছে, একই 'কথা বলা' ব্যাপারটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়ার পার্থক্যের বোধকে পৃথক পৃথক ভাবে বলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আমাদের ভাষার শব্দগুলিতে। আমরা চাইলেই 'একবলন', 'এককথন', 'একবকন', 'একবদন' বলতে পারি না, আমাদেরকে বলতে হয় **'একবচন'**। **'এককথা'**য় কোনো বিষয়কে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু 'একবচা'য়, 'একবকা'য়, 'একবদা'য় বা 'একবলা'য় সে চেষ্টা করতে পারি না। এমনকি 'কাজের কথা'র বদলে আমরা 'কাজের বলা' বা 'কাজের বকা'ও বলতে পারি না। মনে রাখা দরকার, এর অনেক কিছুই বাংলাভাষার নিজস্ব অর্জন, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ নয়।

বক (বকবক, বকবকম, বকমবকম, বকরবকর, বকরা, বকরী, বকা, বাকরহ) : **২.** ***বক*** = *বাহী কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, বাহী চয়নপূর্ব্বক উচ্চারণ কৃত যাহাতে।* ***বকবক*** = ***বক****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***বকবকম*** = ***বকবক*** *সীমায়িত যাহাতে।* ***বকমবকম*** = ***বকম*** *(**বক** সীমায়িত যাহাতে) এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***বকরবকর*** = ***বক*** *রহে যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***বকরা*** = ***বকর****-এর আধার যে।* ***বকরী*** = ***বকর*** *গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে।* ***বকা*** = ***বক****-এর আধার যে।* **৩.** **বক** = অধিক কথা বলা, অসঙ্গত কথা বলা, প্রলাপ করা, তিরস্কার করা, ধমকান। **বকবক** = ক্রমাগত বৃথা বকা, কলসী প্রভৃতিতে জলপূরণের শব্দ, নৌকাদির ছিদ্রপথে জল উঠার শব্দ। **বকবকম, বকমবকম** = পায়রার ডাক। **বকরা** = ছাগ। **বকরী** = ছাগী। **বকা** = বৃথা অধিক কথা বলান, বকান। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। **৫.** বলা হয় যে, **বকর** ও **বকরী** শব্দ দুটি আরবি থেকে আগত। আমরা দেখছি, সংস্কৃতে এদের **বর্কর** বলা হয়েছে। পুরাণাদিতে কোথাও কোথাও **বাকরহ** শব্দটির দেখা মেলে। আমাদের সংস্কৃতিতে যে **দক্ষ** (= ছাগ) সত্তা **বকবক** করে, তাদের স্বভাবে **বকর** থাকেই। সেই সুবাদে তাদেরও **বকবককারী** বলাই যায়। গ্রামবাংলায় 'বাজে **বকর বকর** করিস না তো!' জাতীয় বাক্য অনেকেই বলে থাকেন। শব্দসৃষ্টির নিয়মে **বকর**-এর আধারকে **বকরা** বলতেই হয়, আরবি যাকে বলে **বক্করহ্** বা **বক্‌বাহ্** অর্থাৎ সংস্কৃতে যা সহজেই **বকরাঃ** পদবাচ্য হতেই

পারে। তার মানে, আরব যে **বকরা** শব্দে পৌরাণিক 'ছাগ'কে মনে রেখেছে, সেকথা জানতে পেরে আমাদের বিস্ময় জাগে। তবে কোনো কোনো আরবি-বিশেষজ্ঞ জানান, **বক্রাহ্** শব্দটি গরু বা উটকেও বোঝায়। তাই যদি হয়, তাহলে মানতেই হবে যে, সেই **বক্রাহ্**-বাচক উট বা গরু এদেশে এসে **বকরী** বা ছাগীতে পরিণত হয়ে গেছে। ...

বক শব্দের এরকম অজস্র স্বজনকে দেশবিদেশের নানা ভাষায় পাওয়া যেতে পারে। আমরা কিন্তু এখন সেসব বিষয়ে আর যাব না। আমরা এই **বচ্** শব্দপরিবারের কিছু শব্দকে এখানে সাধ্যমতো ব্যাখ্যা করে এগিয়ে যাব। ... **৬.** ইংরেজির বহু অর্থধারী buck শব্দের ভিতরও আমরা এই **বক**-এর সমজাতীয় উত্তরাধিকার দেখতে পাই।

বকুল (বকুলফুল, বকুলা, বকুলী) : **১.** ✓বচ্ + উল (ঘুল) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বকুল*** = ***বচন*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***বকুলফুল*** = ***বকুল*** *যে* ***ফুল****।* ***বকুলা*** = ***বকুল****-এর আধার যে।* ***বকুলী*** = ***বকুল****-এর গতিশীল আধার যে। /* **বকুল** = যাহা কবির বর্ণনীয়। (ব.শ.)। **৩. বকুল** = পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, কেসর (Mimusops elengi), বকুলকুসুম, বকুলফল, (প্রসিদ্ধি যে, স্ত্রীলোকের আস্যমদিরা ইহার দোহদ)। **বকুলফুল** = পুষ্পবিশেষ, স্ত্রীলোকের সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ। **বকুলা** = স্ত্রী কটুকা। **বকুলী** = কাকোলী। (ব.শ.)। **৪.** বিশেষ একটি ফুল-এর নাম রূপে প্রচলিত। **৫. বচন** বা **বাক্য** নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যে বিষয়ে, সেই বিষয় বা বস্তুটিকে **বকুল** বলে। অমরকোষ মতে, এ হল 'কবির বর্ণনা'র মতো **বচন**সমূহ। অদৃশ্যকে চিহ্নিত করার যে স্বাভাবিক নিয়মে শব্দের সৃজন হত, সেই নিয়মে প্রাচীন কালে নিশ্চয় কোনো বিশেষ প্রকারের সামাজিক সংগঠনকে **বকুল** নামে চিহ্নিত করা হত; কিন্তু তার কোনো তথ্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। সেরূপ সামাজিক সংগঠন হয়তো বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার সাদৃশ্যে যে tree বা গাছকে **বকুল** বলা হত, সেটি এখনও আছে এবং তাকে আমরা চিনি। এই গাছের বিশেষত্ব হল, গাছরূপে ফুলরূপে ফলরূপে বীজরূপে — সব দিক থেকেই এই **বকুল** অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর। হ্যাঁ, এই গাছ নিঃসন্দেহে 'কবির বচনসমূহের দ্বারা বর্ণনীয়' অর্থাৎ **বকুল** গাছ।

তবে 'বচন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে লালিত যাহাতে' তেমন 'কবির বচনসমূহের দ্বারা বর্ণনীয়' **বকুল** নামের 'বৃক্ষ' বা 'সামাজিক সংগঠন' না থাকলেও, **বকুলফুল-পাতানো**র কিঞ্চিৎ স্মৃতি এখনও বাংলাভাষী মানুষের আছে। আমরা শুনেছি, বছর পঞ্চাশ আগেও বাংলাভাষী মেয়েরা পরস্পর **বকুলফুল** পাতাতেন। কী তার আচার অনুষ্ঠান ছিল, কীভাবে এবং কেন সেরকম সখিত্ব **পাতান** হত, তার বিস্তারিত খবর আমাদের হাতে নেই। তবে **বকুল** শব্দটি থেকে শুধুমাত্র এইটুকু ভেবে নেওয়া চলে যে, **বকুলফুল** সখীরা পরস্পরের সৌন্দর্যের প্রশংসায় নিশ্চয় পঞ্চমুখ হতেন।

বক্তা, (বক্তব্য, বক্তৃ, বক্তৃতা, বক্ত্র) : **১. বক্তা (বক্তৃ)** = ✓বচ্ + তৃ (তৃচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বক্তা*** = ***বক্ত****-এর (বক বক করা রূপ ক্রিয়ার তারণ থাকে যাহাতে অর্থাৎ কথার) আধার যে।* ***বক্তৃ*** = ***বক্ত****-এর (কথার) আবর্ত্তন থাকে যাহাতে।* ***বক্তৃতা*** = ***বক্তৃ****র তারণের আধার যে।* ***বক্তব্য*** = ***বক্ত*** *বাহিত হয়ে থাকে যাহাতে।* ***বক্ত্র*** = ***বক্ত*** *রহে যাহাতে। /* **বক্তব্য** = বিহিত কর্ম্মত্যাগ হেতু নিন্দনীয় (যে বা যাহা)। **বক্তা** = কথা বলে যে (কথয়িতা)। **বক্ত্র** = যাহার দ্বারা বচন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. বক্তব্য** = বাচ্য, কথনীয়, উপদেষ্টব্য, নিবেদ্য, জ্ঞাপনীয়, কুৎসিত, গর্হ্য, হীন, নীচ, দুষ্ট, অধীন, অনুযোগার্হ, বচন, কথন, নিন্দা, শব্দ। **বক্তা (বক্তৃ)** = বাদী, বহুপ্রশস্তবাদী, বাগ্মী, হিতপ্রিয়বাদী, বহুভাষী, রবকারক, উপদেষ্টা, পণ্ডিত। **বক্তৃতা** = বক্তৃভাব, বাগ্মিতা, বাক্‌পটুতা, বক্তার সভায় বিষয়বিশেষ অভিভাষণ। **বক্ত্র** = মুখ, মুখমণ্ডল, নিগ্রহানুগ্রহজন্য মুখবিকার, বাণাগ্র, চঞ্চু, বস্ত্রবিশেষ, (গণিতে) শ্রেণীর প্রথম রাশি, অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দোভেদ। (ব.শ.)। **৪.** lecture অর্থে **বক্তৃতা**, lecturer অর্থে **বক্তা**, এবং worth saying অর্থে **বক্তব্য** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** শব্দগুলি কত সূক্ষ্ম ক্রিয়ার পার্থক্য ধরে ধরে প্রস্তুত করা হয়েছে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমরা আগেই দেখেছি, **বচ্** তারিত হতে গেলে তাকে **বক্**-এ পরিণত হতে হয়। এই **বক্** তারিত হয়ে **বক্ত** (কথা) হয়। একে **উক্ত**ও বলে। এই **বক্ত**-কথার বা উক্ত-কথার আধারকে বলা হয় **বক্তা**। এই **বক্ত**-এর বা 'উক্ত'-এর আবর্তন চলতে থাকলে, তাকে বলে 'উক্তি' বা **বক্তৃ**। এই **বক্তৃ** যখন তারিত হয় তার সামগ্রিক আধার রূপটিকে বলা হয় **বক্তৃতা**। আর, এই **বক্ত** রহে যাহাতে, তাকে বলে **বক্ত্র** বা মুখ। ...

কিন্তু যেকথাটি কিছুতেই বোঝা যায় না, তা হল, যে **বক্তব্য**কে 'বলবার যোগ্য' বলে বুঝি, সেই **বক্তব্য** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. কেন 'কুৎসিত, গর্হ্য, হীন, নীচ, দুষ্ট, অধীন, অনুযোগার্হ, নিন্দা, শব্দ' প্রভৃতি শব্দগুলি দিতে গেলেন। কেবল তাই নয়, তিনি **বক্তব্য** শব্দটির একটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থও দিয়েছেন — 'বিহিত কর্ম্মত্যাগ হেতু নিন্দনীয়'। আর, এগুলি যে তিনি আপন কষ্টকল্পনা থেকে দেননি, সেকথা বলাই বাহুল্য। তিনি মনুসংহিতা, রামায়ণ, রামায়ণ টীকা, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে এতাদৃশ অর্থ পেয়েছেন বলে লিখেই গেছেন। আধুনিক অভিধানগুলি **বক্তব্য** শব্দের এবম্বিধ অর্থের ধারেকাছে দিয়ে যাননি।

আসলে, মানুষের উপর মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কেবল **বক্তব্য** শব্দের এরকম অর্থ প্রচলিত হতে পেরেছিল। শাসিত যাকে 'বলার যোগ্য' বলে মনে করেছিল, শাসকের চোখে তা হয়ে উঠেছিল 'কুৎসিত, হীন, নীচ ... ইত্যাদি'। এটি **বক্তব্য** শব্দের অভিধা-অর্থ নয়, সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শব্দটির এরকম অর্থবদল ঘটেছিল। আরও একটি কারণ থাকলেও থাকতে পারে। তা হল, যতদিন মানুষ সুরের মাধ্যমে আপনার সুখদুঃখ প্রকাশ করত, যা কিনা সর্বজীব এমনকি জড়ও বুঝতে পারত, ততদিন তা ছিল সর্বজনীন ভাষা। কিন্তু যেই না শব্দ-সহযোগে কথা বলার সূত্রপাত হয়ে গেল, মানুষ অন্য মানুষের উদ্দেশ্যে **বক্তব্য** রাখতে শুরু করল, মানুষের ভাষা হয়ে গেল কেবলমাত্র মানুষের জন্য। যতদূর অনুমান

করা যায়, আদিম সুর-ব্যবহারকারী মানুষ এই শব্দ-ব্যবহারকারীদের ভাল চোখে দেখেনি। তারা নিশ্চয় এর নিন্দা করেছিল। তারই উত্তরাধিকার থেকে গেছে **বক্তব্য** শব্দের ভিতরে।

বক্ষঃ (বক্ষ, বক্ষোজ, বক্ষ্যমাণ) : ১. ✓বচ্ + অস্ (অসুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বক্ষ** = বচনকে অস্তিত্ব দান করে যে।* ***বক্ষঃ** = বচনকে অস্তিত্ব দান করে নিঃশেষিত করে যে।* ***বক্ষোজ** = যাহা বক্ষে জন্মে। /* **বক্ষোজ** = যাহা বক্ষে জাত হয়। **বক্ষ্যমাণ** = যাহা বলা হইবে। (ব.শ.)। ৩. **বক্ষঃ** = উরঃ, ভুজান্তর, হৃদয়, বুক। **বক্ষ** = বক্ষঃস্থল, স্তন। **বক্ষোজ** = স্ত্রীস্তন। (ব.শ.)। ৪. chest অর্থে **বক্ষ** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ৬. ল্যাটিন vox, ইংরেজি box, boxing, voice।

বচন (বচনীয়, বচসা, প্রবচন, নির্ব্বচন, সুবচন, দুর্ব্বচন) : ১. ✓বচ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বচন** = **বচ** (বাহীর চয়ন) অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বচনীয়** = **বচন**-এর গতিশীল আধারের যাওয়া যাহাতে।* ***বচসা** = **বচ** ক্রিয়ার চূড়ান্তরূপের আধার যে। /* **বচন** = বাচন করে যে। **বচসা** = বাক্য দ্বারা কৃত যে কলহ। (ব.শ.)। ৩. **বচন** = বাচক, বোধক, কথন, ভাষণ, অনুশাসন, উচ্চারণ, বাক্য, পদ, শাসনবাক্য, বিধি, উপদেশ, শাস্ত্রের মূল পঙ্ক্তি, কথা, ভাষা, কূজিত, বোল, (ব্যাকরণে) নামের সংখ্যাবোধক প্রত্যয় — সুপ্, তিঙ্। **বচনীয়** = কথনীয়, বক্তব্য, উচ্চার্য্য, নির্দ্দেশার্হ, নিন্দনীয়। **বচসা** = বিবাদ, বকাবকি। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **বচ** ও **বক** শব্দের তুলনামূলক আলোচনায় আগেই আমরা দেখেছি যে, উচ্চারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত 'বিষয়বাহী' আওয়াজ মাত্রেই **বচন** পদবাচ্য। অর্থাৎ, কোটি কোটি আওয়াজের মাঝে যে আওয়াজকে কোনো অর্থ বা বিষয় প্রকাশের আধার রূপে চিহ্নিত করা হয়ে যায়, তখনই সেই আওয়াজটি **বচন** নাম পায়। কিন্তু উচ্চারিত হয়ে গেলেই তা আর **বচন** থাকে না, পদ, বাক্য, বকা, বলা, ভাষণ দেওয়া ... ইত্যাদি হয়ে যায়। স্বভাবতই যতক্ষণ তা হচ্ছে না, ততক্ষণ অনুচ্চারিত সকল প্রকার বাক্য, পদ, পদসম্ভার, ভাষণ, নির্দেশ, উপদেশ, শাস্ত্রবচন, প্রবচনাদি ... সবই **বচন** পদবাচ্য হতে পারে। আমরা যখন ভাষার বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করি, সেগুলি সবই **বচন**। ...

তার মানে, মানুষের স্মৃতিতে, লোকসমাজে, গ্রন্থাদিতে থাকা ভাষার প্রতিটি শব্দই **বচন** নামে কথিত হতে পারে। সেগুলির মধ্যে মানুষের ভালমন্দর বিচারে **দুর্ব্বচন, সুবচন** থাকতে পারে; আবার এমন কিছু **বচন** থাকতে পারে, যেগুলি প্রকৃষ্টরূপে চয়ন করা আওয়াজ বা আওয়াজসমূহের মঞ্জরী, যাকে **প্রবচন** বলা হয়ে থাকে। তবে যাই থাকুক না কেন, প্রতিটি **বচন**ই যে আসলে একটি আওয়াজ বা আওয়াজের থোকা, যা কিনা বিশেষ অর্থ বহন করার যোগ্যতা ধরে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। **নিরুক্তকার** জানিয়েছেন, কোন্ **বচন**-এর ভিতরে কী অর্থ রয়েছে, সেটি জানতে হয় সেই **বচন**কে **নির্ব্বচন** করে। ...

ব্যাকরণকারগণ আমাদের জানিয়ে গেছেন, প্রাচীন ভাষাগুলিতে **বচন**সমূহ তিন শ্রেণীর (**একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন**) ছিল এবং একালের প্রায় সমস্ত ভাষাতেই **বচন**সমূহ মাত্র দুই শ্রেণীর (**একবচন** ও **বহুবচন**)। কেন আমাদের আদিপুরুষেরা দুইকে বা জোড়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কিছু কিছু **বচন**কে কেবলমাত্র জোড়ের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন? এর উত্তর হতে পারে মানুষের প্রকৃতি-সংলগ্নতা। পাখি, সাপ, নেউল ... প্রভৃতি জীবদের ক্ষেত্রে এখনও দেখা যায়, কোথাও যদি তাদের একটির দেখা মেলে, বয়স্ক মানুষেরা বলেন, ওর জোড়টি ধারেকাছে কোথাও না কোথাও রয়েছে। তখনকার কালে হয়তো এই বোধ আরও গভীর এবং স্পষ্ট ছিল। সেই কারণে তাঁরা **দ্বিবচন** নামক **বচন**-শ্রেণীর জন্য স্থান রেখেছিলেন। একালে এক ও একাধিকের মধ্যে সম্বন্ধকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কেবল তাদের সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া। ফলে, জোড় সম্বন্ধের উপর জোর দেওয়া হয় না। মনে হয় সেকারণেই পরবর্তীকালের ভাষাগুলির ক্ষেত্রে **দ্বিবচন**-এর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ... ৬. আওয়াজ-সমুদ্রের মাঝে বিশেষ বিশেষ বিন্দু বিন্দু আওয়াজকে খুঁজে তার ভিতরে বক্তব্যকে ঢুকিয়ে রাখাই যেহেতু **বচ** পদবাচ্য, সেইহেতু কোনো একটি নির্দিষ্ট আওয়াজের **বচ**-এ পরিণত হওয়া মানেই আওয়াজটির জীবন্ত হয়ে ওঠা, অর্থবান ও রসবান হয়ে ওঠা। একেই আমরা মানুষের ভাষার অর্থবান শব্দ বলে থাকি। এইরূপ জীবন্ত হয়ে ওঠাকেই ইংরেজিতে wake, waken, watch, watch-on প্রভৃতি বলা হত। সেই সুবাদে বলা চলে যে, ঐ শব্দগুলি একই **বচ** ক্রিয়ামূলের পরিবারেই জন্মেছে।

বাচ্, বাক্, বাগ্, বাঙ্, বাদ্ : ৫. এখানে লক্ষণীয় যে, সবকটি শব্দই মূল শব্দটির বিবর্তিত রূপ — **বচ্** > **বাচ্, বক্** > **বাক্** > **বাগ্** > **বাঙ্, বদ্** > **বাদ্**। **বাক্** শব্দটিই সন্ধিকালে **বাগ্** ও **বাঙ্** শব্দে পরিণত হয়। দেখা যাচ্ছে, এগুলির প্রতিটিই 'কথা বলা'রই নানা রূপ। নীচে এগুলির ভুক্তিতে এদের আলোচনা পৃথক ভাবে করা হচ্ছে।

বাক (বাকসিদ্ধ, বাকসিদ্ধা, বাক্যসিদ্ধ, বাকী, বাক্য, সুবচনী) : ১. ✓বচ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বাক** = **বক** হইতে জাত।* ***বাকসিদ্ধ** = **বাক** সিদ্ধ যাহার।* ***বাকসিদ্ধা** = **বাক** সিদ্ধ যে আধারশক্তির।* ***বাকী** = **বাক**-এর গতিশীল আধার যে।* ***বাক্য** = **বাক** থাকে যাহাতে।* ***সুবচনী** = **সুবচন** (যাহার বচন সিদ্ধ হয়) এর আধার যে। /* **বাক্যসিদ্ধ (বাকসিদ্ধ)** = যাঁহার বাক্য অব্যর্থ। **সুবচনী** = যাঁহার বাক্য সফল। (ব.শ.)। ৩. **বাক** = কথন, উচ্চারণ, মন্ত্র, বাক্য। **বাক্যসিদ্ধ** = বাক্যবিষয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্ত, বাক্সিদ্ধ। **বাক্য** = কথিত বিষয়, কথা, ভাষা, সাক্ষ্য, যোগ্যতা আকাঙক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহ (sentence), আজ্ঞা, কূজিত, পক্ষিরব, মন্ত্র। **সুবচনী** = 'শুভচণ্ডী' মূল (?), স্ত্রীপূজ্য দেবীবিশেষ। স্ত্রীলোকে বিপদে ইঁহার পূজা মানসিক করেন। আচার মার্ত্তণ্ডে 'শুভসূচনী' নাম আছে। (ব.শ.)। **বাকসিদ্ধ, বাকসিদ্ধা** = যে ব্যক্তির কথামাত্রই সত্য হয়। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. **বাক** শব্দটি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচলিত থাকলেও এককভাবে অপ্রচলিত। **বাকসিদ্ধ, বাকসিদ্ধা** শব্দদুটি গ্রামবাংলায় এখনও কমবেশি প্রচলিত রয়েছে। ৫. একালে এখনও

এরকম স্মৃতি গ্রামবাংলার মানুষের মনে রয়েছে যে, কোনো কোনো সন্ন্যাসী বা গুণী মানুষের মুখের কথা সত্যি হয়ে থাকে। তাঁদের **বাকসিদ্ধ** (বা স্ত্রীলোক হলে **বাকসিদ্ধা**) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কথাটিকে যদি আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখি, তাহলে দেখতে পাই, অতি প্রাচীনকালে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী নরনারীই **বাকসিদ্ধ** ও **বাকসিদ্ধা** ছিলেন। কারও মুখের কথার সঙ্গে তার বাস্তবতার অমিল হত না। এই রীতি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। আলেকজান্ডারের যুগেও আমরা গ্রীকদের মুখ থেকে এমন সাক্ষ্য পাচ্ছি যে, তাঁরা গ্রীস দেশের মানুষের মধ্যে কিছু কিছু **ব্যর্থবাক্য** বা মিথ্যাকথা বলার অভ্যাস দেখলেও ভারতে এসে দেখছেন, এখানকার লোকেরা কোনো মিথ্যাভাষণ করে না; অর্থাৎ তখনও ভারতীয়গণ **বাকসিদ্ধ** ও **বাকসিদ্ধা** ছিলেন। এখনও, তার থেকে আরও ২০০০ বছর পরে, ভারতীয় উপমহাদেশে এমন কিছু কিছু এলাকা পাওয়া সম্ভব, যেখানে এখনও লোকের মুখের কথায় ও কাজে কোনো ফারাক দেখা যায় না। তার মানে, এখনও ভারতীয় উপমহাদেশে কিছু পরিমাণে হলেও **বাকসিদ্ধ** ও **বাকসিদ্ধা** নরনারী বাস করেন। তাঁরা এখনও তাঁদের কথাবার্তায় **অব্যর্থবাক্য** ব্যবহার করে থাকেন।

'শুভচণ্ডী', 'শুভসূচনী', বা **সুবচনী** দেবীর পূজা কোনো কোনো পরিবারে এককালে প্রচলিত ছিল, আজও হয়তো কোথাও কোথাও আছে। এই দেবীর 'বাক্য সফল' হয়, অর্থাৎ, ইনি **বাকসিদ্ধা** দেবী। আমরা দেখেছি, **বাচক** শব্দের একটি অর্থ হল 'সূচক', বিশেষ দিকে দেখিয়ে দেওয়া। এই দেবী তাই করেন বলে ইনি 'শুভসূচনী'।

বাক থাকে যাহাতে, তাকেই **বাক্য** বলে। স্বভাবতই এই **বাক্য** অর্থপূর্ণ, ইচ্ছাপূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ, নির্দেশপূর্ণ, আসক্তিযুক্ত কিছু **বচন**-এর প্রায়োগিক রূপ। সেই কারণে **বাক্য** শব্দের অর্থে 'আজ্ঞা'কেও পাওয়া যায়। ইংরেজিতে একে বলে sentence = বাক্য, দণ্ডাজ্ঞা। এই ইংরেজি শব্দটির মূলে 'অনুভূতি'কে থাকতে দেখা যায়, যা কিনা **বচন**-এর প্রাণ। যে **বাক্য**-তে অনেকগুলি **বচন** রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনো অর্থ নেই, কিংবা থাকলেও, সেই অর্থ কার্যকরী নয়, তেমন **বাক্য**কে **বাক্‌সর্ব্বস্ব** বা 'বাক্যের ডোঙা' বলা হয়। **বাক্যের** মর্মার্থ নষ্ট করে দিয়ে কতকগুলি ভোজনান্তিক এঁটো থালাবাসনের মতো শব্দব্যবহার করে এরকম 'বাক্যের ডোঙা' রচনা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) মৌলবাদ 'সত্যগোপন'-এর উদ্দেশ্যে এবং কুবেরচালিত পুঁজিবাদ 'সত্যবিকার'-এর উদ্দেশ্যে এতাদৃশ 'বাক্যের ডোঙা' রচনা করে থাকে। ... **৬.** ইংরেজি walk।

বাচক (বাচন, বাচবিচার, নির্ব্বাচন, বাছ, বাছন, বাছনি, বাছনিদার, বাছপড়া, বাছবিচার, বাছা, বাছাই, বাছান, বাছাল, বাছালো, বাছনি, বাছুনি) : **১.** ✓বচ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাচক*** *=* ***বাচন*** *করে যে।* ***বাচন*** *=* ***বচন*** *হইতে জাত।* ***বাচবিচার*** *=* ***বচ****-জাত ও* ***বিচার*** *থাকে যাহাতে।* ***নির্ব্বাচন*** *= নির্গত* ***বাচন*** *থাকে যাহাতে।* ***বাছ*** *=* ***বচ****-জাতর স্থির হওয়ন যাহাতে।* ***বাছন*** *=* ***বাছ*** *অন (on) যাহাতে।* ***বাছনি*** *=* ***বাছন*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; যাহার দ্বারা* ***বাছন*** *করা হয়।* ***বাছনিদার*** *=* ***বাছনি*** *ক্রিয়া করে যে।* ***বাছপড়া*** *=* ***বাছন*** *হইতে পড়ে গেছে যে।* ***বাছবিচার*** *=* ***বাছ*** *ও বিচার থাকে যাহাতে।* ***বাছা*** *=* ***বাছ****-এর আধার যে।* ***বাছাই*** *=* ***বাছা*** *চলে যাহাতে।* ***বাছান*** *=* ***বাছা*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বাছাল*** *=* ***বাছা*** *লালিত যাহাতে।* ***বাছালো*** *=* ***বাছা*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে লালিত যাহাতে।* ***বাছুনি*** *=* ***বাছা*** *নবরূপে উত্তরণপূর্ব্বক গতিশীলভাবে অন (on) থাকে যাহাতে; (মাছ ইত্যাদি)* ***বাছাবাছি*** *করে দেয় যে স্ত্রীলোক। /* **বাচক** = সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত জাতি-প্রভৃতির অর্থের প্রতিপাদন করে যে; প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা অর্থবোধন করে যে। **বাছপড়া** = বাছার সময় যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। (ব.শ.)। **৩. বাচক** = কথক, বক্তা, বোধক, সূচক, দূত, শব্দ। **বাচন** = পঠন, পাঠ, কথন। **বাচবিচার, বাছবিচার** = বাছা ও বিচারণা, দ্রব্যের ভালমন্দ বিচার, আচারের বৈধাবৈধ বিচার। **বাছ** = অপকৃষ্ট দ্রব্যাদি পৃথক করা, নির্ব্বাচন করা, বাছা (to select), আবর্জ্জনা হইতে পৃথক করা, অশুভবোধে ত্যাগ করা। **বাছন, বাছনি** = নির্ব্বাচন, বাছা। **বাছনিদার** = নির্ব্বাচক (voter)। **বাছপড়া** = অপকৃষ্ট, খারাপ। **বাছাই** = বাছার কাজ, নির্ব্বাচন, মনোনয়ন। **বাছাল, বাছালো** = নির্ব্বাচিত, অভিমত, পছন্দসই, খ্যাতনামা, নামজাদা। (ব.শ.)। **বাছান** = কাউকে দিয়ে বাছাই করানো। **বাছনী, বাছুনী** = বাছার যন্ত্র। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আমরা দেখছি, বাংলাভাষী **বাচন** শব্দ থেকে **বাছন** বা **বাছা** শব্দটি তৈরি করেছেন। এটি **নির্ব্বাচন** শব্দের প্রায় সমার্থক। **বচ** শব্দে আমরা আগেই দেখেছি, অসংখ্য আওয়াজের ভিতরে যে আওয়াজ আমাদের দরকারি বক্তব্যকে ধারণ করতে পারবে বলে মনে হয়, আমরা অবচেতনভাবে অনেকটাই নিজেদের অজান্তে তেমন বিশেষ বিশেষ আওয়াজকে খুঁজে-পেতে **চয়ন** করে থাকি এবং সেই আওয়াজের ভিতরে আমাদের বিশেষ বক্তব্যকে ঢুকিয়ে দিই। সেই কারণেই তদ্রূপ আওয়াজকে বলা হয় **বচ**। সেই **বচ**করণ অন থাকে **বচন**-এ। এরূপ **বচ**করণের ফলে যে যে **বচন**গুলি হাতে আসে, সেগুলি স্বভাবতই **নির্ব্বাচিত** হয়ে যায়। তার মানে, এগুলি শুধু **বচন** থেকে জাত **বাচন**ই নয়, **বাছন**ও বটে। ...

বচন থেকে বিবর্তিত **বাচন** শব্দটিকে বাংলাভাষী বিপুলভাবে বিস্তারিত করে নিয়ে অনেক শব্দ বানিয়েছেন। এখানে তারই কয়েকটি দেওয়া হল। অনেক সময় voter, suspended ... প্রভৃতি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজা হয়; পাওয়া যায় না। এখানে দেখছি, সাধারণ বাংলাভাষী ইতোমধ্যেই তাদের জন্য যথাক্রমে **বাছনিদার** ও **বাছপড়া** শব্দদুটি বানিয়ে রেখেছেন। **বেছে** নেওয়া, **বেছে** ফেলা, **বাছাবাছি** করা ... প্রভৃতি শব্দ সাধারণ বাংলাভাষী খুবই ব্যবহার করে থাকেন। এগুলির অনেকগুলিই আধুনিক যুগের সৃষ্টি করা **ভালবাসা**র মতো ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দ। এখনও যে ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দ সাধারণ বাংলাভাষী তৈরি করে চলেছেন, এই **বাছ** ও তার সহোদর শব্দগুলিকে তার প্রমাণ রূপে হাজির করা যেতে পারে।

যার মন্দ অংশ বাদ দিয়ে **বাছা** হয়ে গেছে, সেরকম বস্তু বা বিষয়কে **বাছাল** বা **বাছালো** বলে। ব.শ. উদাহরণ দিচ্ছেন — '**বাছালো বাছালো** ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভটচায্যি'। আজকাল **বাছাল, বাছালো** প্রভৃতি শব্দ গ্রামবাংলায় কমবেশি প্রচলিত থাকলেও অ্যাকাডেমিতে তাদের প্রচলন নেই। তাছাড়া, **বাছা** শব্দটি বাংলাভাষী

কেবল **বাচন** থেকেই তৈরি করে নেননি, **বৎস** শব্দ থেকেও তৈরি করেছেন। সেই কারণে শব্দটির দুটি উৎস পরিবার আছে। কিন্তু একই চেহারা নিয়ে সে দুই পরিবারের সদস্যরূপে থাকে শুধুমাত্র প্রেক্ষিতের জোরে। এরকম আরও কিছু শব্দের কথা আগেও আমরা বলেছি। তাছাড়া, যা কিছু নির্বাচিত হয়ে বা **বাছা** হয়ে আলাদা হয়ে থাকে, তাই তো কাম্য 'অস্তিত্ব' (= স) বা কামনা-'বৎ-অস্তিত্ব' (= বৎস)। এই বিচারে 'নির্বাচিত'-**বাছা** এবং 'বৎস'-**বাছা** একই হয়ে যায়। পরমাপ্রকৃতি এভাবেই বাংলাভাষীর মনের গভীরে বাস করে এই 'সেমসাইড' খেলাটি খেলে রেখেছেন। বাংলাভাষী নিমিত্ত মাত্র।

আজকাল আমাদের জীবনে একটি ইংরেজি শব্দ অত্যন্ত সক্রিয়, সেটি হল election। এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় **নির্বাচন** (**নির্ব্বাচন** — এটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিকে আমরা ইতোপূর্বে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত করেছি।) কিন্তু selection-এর বেলায় আর শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার প্রতিশব্দও **নির্বাচন** করে ফেলা হয়। এবং চেঁচানো হয় — বাংলাভাষায় শব্দ বড্ড কম! কাজ চালানো যায় না। ইংরেজিতে সেই সমস্যা নেই। অতএব 'ইংলিশ দেবী'র আরাধনা করো! কিন্তু একবারও ভেবে দেখা হয় না, **নির্ব্বাচন** শব্দের অর্থ election নয়, selection-ও নয়। election শব্দের প্রতিশব্দ হতে পারত **উদ্ভবকরণ** বা **জনন** এবং selection শব্দের প্রতিশব্দ হতে পারত **বাছন**।

বজ্ (*বিজ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনতিবেগ, আওয়াজ (আবাজ), আতসবাজি, আবেগ, ওজন, ওজর, ওজু, ওজুনামা, ওড়ম্বা, তুবড়ীবাজি, দাগাবাজ, দাঙ্গাবাজ, ধড়িবাজ, বজ্, বজবজ, বজর, ব(বা)জরা, বজা, বজায়, ব(বা)জেট, বজ্জর, বজ্র, বজ্রক, বজ্রকণ্টক, বজ্রকবচ, বজ্রকামড়, বজ্রকিল, বজ্রকীট, বজ্রকীল, বজ্রক্ষার, বজ্রঘোষ, বজ্রচড়, বজ্রচাপড়, বজ্রচিহ্ন, বজ্রজিহ্বা, বজ্রজ্বালা, বজ্রঠোকর, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রধর, বজ্রনাভ, বজ্রপাণি, বজ্রপাত, বজ্রপাতন, বজ্রপুষ্প, বজ্রফণা, বজ্রবেদন, বজ্রব্যূহ, বজ্রমণি, বজ্রমুটকি, বজ্রমুঠি, বজ্রমুষ্টি, বজ্রযান, বজ্ররথ, বজ্রলম্ফ, বজ্রলেপ, বজ্রশিলা, বজ্রসংঘাত, বজ্রসার, বজ্রসূচি(চী), বজ্রহস্ত, বজ্রহৃদয়, বজ্রা, বজ্রাকর, বজ্রাকার, বজ্রাকৃতি, বজ্রাভ্যাস, বজ্রাসন, বজ্রী, বাইন, বাজ, বাজ (বাদ্য), বাজ (ফা), বাজখাঁই, বাজন, বাজনঘুন্টি, বাজনদার (বাদনদার), বাজনমল, বাজনযন্ত্র, বাজনা, বাজনি, বাজনিএঃা, বাজনি(নী)য়া, বাজপড়া, বাজপতি, বাজপেয়, বাজপেয়ী, বাজবহরি(রী), বাজরা, বাজসনী, বাজসনেয়, বাজসনেয়ী, বাজসনেয়িসংহিতা, বাজা, বাজার, বাজারদর, বাজারি(রী), বাজারু, বাজারে, বাজি, বাজিনী, বাজিপাল, বাজিমাৎ, বাজিমেধ, বাজিয়ে-দেখা, বাজিশাল, বাজিশালা, বাজী, বাজীকর, বাজীকরণ, বাজীকরণী, বাজীক্রিয়া, বাঝ, বাঝা, বায়না, বেগ, বেগবন্ত, বেগবাত, বেগবান, বেগবাহী, বেগবৃষ্টি, বেগরোধ, বেগসম্পন্ন, বেগসবী (বেগস্বী), বেগাবতরণ, বেগিত, বেগী, বেজিত, মামলাবাজ।

বজ্ (বিজ্) = বাহীর জনন। **বজ** = বাহীর জনন যাহাতে। **বিজ** = গতিশীল বাহীর জনন যাহাতে।

বজ (বজবজ, বজরা, বজা, বজায়, অজুহাত, ওজন, ওজর) : ২. *বজ* = *বাহীর জনন যাহাতে।* ***বজবজ*** = ***বজ****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***বজরা*** = ***বজর****-এর আধার যে।* ***বজা*** = ***বজ****-এর আধার যে।* ***বজায়*** = ***বজা*** *যায় যাহাতে।* ***অজু (বজু)*** = ***বজ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ওজন*** = ***বজ*** *অন (on) যাহাতে।* ***ওজর (বজর)*** = ***বজ*** *রহে যাহাতে।* **৩. বজবজ** = পচা দ্রব্যের বুদ্বুদ উঠার শব্দ। **বজরা (বাজরা)** = খোলাছাদ-কামরাওয়ালা এক প্রকার বড় নৌকা (budgero, budgerow), ধান্যাদিজাতীয় শস্যবিশেষ। **বজা** = (ফারসি - বজা) উচিত, ঠিক, যোগ্য। **বজায়** = (ফারসি - বজায়) রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ। **অজুহাত (ওজুহাত)** = (আরবি - 'বজুহাৎ') কারণসমূহ (অজুহাৎনামা - যে কাগজে মোকদ্দমা প্রভৃতির কারণসমূহ লিখিত থাকে)। **ওজন** = (আরবি - 'বজন') তৌল করা, তুলা দ্বারা পরিমাণনির্ণয় (weighing), গুরুত্ব, ভার, পরিমাণ (weight), গৌরব, মর্য্যাদা, খ্যাতি, সঙ্গতি, আয়, ব্যক্তিমাত্রের প্রাত্যহিক খাদ্যপরিমাণ, কার্য্যক্ষমতা, গভীরতা, তুলনা। **ওজর** = ব্যপদেশ, ছল, আপত্তি। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলি আলোচনার জন্য ভুক্তিতে নেওয়া হয়েছে প্রধানত এই ব্যাপারটি দেখানোর জন্য যে, শব্দগুলি আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ল্যাটিন, এবং বাংলা হলেও, এদের ভিতরে যে অর্থ রয়েছে, তা **বজ্** ক্রিয়ামূলের পরিবারের সদস্য বলেই মনে হয়। যার **বজ** বা গুরুত্ব বা ওজন রয়েছে, তার সম্পর্কেই তো উপরোক্ত শব্দগুলি বলা সম্ভব। **বজ্র** ও **বাজ** শব্দে যাওয়ার আগে এই শব্দগুলি স্মরণে থাকা দরকার। **৬.** ইংরেজি budget, budge, wag।

বজ্র : ১. ✓বজ্ + র (রন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বাহীর (বা দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর) জনন রহে যাহাতে।* **৩.** ইন্দ্রাস্ত্রবিশেষ, কুলিশ, অশনি, (সাদৃশ্যে) অমোঘ ভীষণ অস্ত্রমাত্র, হীরক, মণিবেধসূচী, কঠোরপ্রায়শ্চিত্তভেদ, কাঞ্জিক, দুর্ভেদ ব্যূহবিশেষ, কঠিন লেপবিশেষ, (জ্যোতিষে) পঞ্চদশ যোগ, কোকিলাক্ষবৃক্ষ, শ্বেতকুশ, স্নুহীবৃক্ষ, কৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র, বালক, ধাত্রী, আমলকী, বজ্রপুষ্প, তিলফুল, লৌহবিশেষ, ইস্পাত, অভ্রবিশেষ, কঠোরভাষা, আসন-বিশেষ, (সামুদ্রিকে) বজ্রাকার চিহ্নভেদ, বজ্রতুল্য কঠোর-বস্তুমাত্র, লগুড়, দণ্ড। বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ্র, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্ত্তিকেয়র শক্তি এবং দুর্গার অসি — এই অষ্ট বজ্র দণ্ডিপর্ব্বে উর্ব্বশীশাপবিমোচনে বর্ণিত হইয়াছে। ... (ব.শ.)।

বজ্র অষ্টকোণ। অষ্টবজ্র বললে এইসকল অস্ত্রকে বুঝায় — বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকেয়র শক্তি এবং কালীর খড়্গ বা দুর্গার অসি। (ক) সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে, বৈদিক মতে বজ্র খড়্গাকার অমোঘ ও ভীষণ অস্ত্র বিশেষ। (খ) ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। ... দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বজ্র প্রস্তুত হয়। ইন্দ্র এই বজ্র দ্বারা বৃত্র ও অসুরদের বধ করেন। (গ) বিশ্বকর্মা রবিকে অগ্নিযন্ত্রে ভ্রমণ করিয়ে তাঁর তেজঃপুঞ্জকে পৃথক করেন। এই পৃথককৃত সহস্র

কিরণযুক্ত সূর্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল ও ইন্দ্রের বজ্ররূপে পরিণত হয়। (ঘ) বামনপুরাণ অনুসারে, একদা ইন্দ্র দৈত্য-মাতার জঠরে প্রবেশ করে দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হস্ত রক্ষাকরতঃ ঊর্ধ্বমুখে আছে। তার নিকটেই এক মাংসপিণ্ড আছে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মাংসপিণ্ড মর্দন করতে থাকেন। ফলে, ঐ মাংসপিণ্ড অত্যন্ত কঠিন হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উহা হতে কুলিশ উৎপন্ন হয়। (ঙ) যদুবংশের জনৈক নৃপতি ও কৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর পাণ্ডবগণ এঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়নপূর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর পুত্রের নাম প্রতিবাহু। (পৌ.অ.)। **৪.** একালে শুধুমাত্র thunderbolt বোঝাতে শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে 'সেকেলে' ও 'গ্রাম্য' বাংলাভাষীগণ এখনও শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন নানা ক্ষেত্রে। **৫.** দ্র. **বাজ**। 'বাহীর জনন' বা **বজ** রহে যাহাতে, তাকে **বজ্র** বলে; বাংলাভাষী একে **বাজ**ও বলে থাকেন। কেন তাঁরা **বজ্র**কে **বাজ** বলেন, সেকথায় আমরা পরে আসছি (দ্র. **বাজ**)। আমাদের শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা দৃশ্যজগতেও **বজ্র**কে শনাক্ত করে গেছেন। সেই **বজ্রে** আমরা গম্ভীর কড় কড় কড়াৎ শব্দের সঙ্গে একত্রে আলোর ঝলকানি দেখতে পাই। তার মানে, এতে একই সঙ্গে দুটি শক্তির প্রকাশ ঘটে — আলোকশক্তি ও শব্দশক্তি। এইরকম যে ক্রিয়ায় একই সঙ্গে দুটি সত্তার জনন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত ক্রিয়াকারীকেই **বজ্র** বলে। উপরোক্ত **৩.**-এ বর্ণিত তথ্য থেকে আমরা নানারকম **বজ্র**-এর সাক্ষাৎ পাচ্ছি। তাদের মধ্যে দৃশ্য **বজ্র** যেমন রয়েছে, তেমনি অদৃশ্য **বজ্র**ও রয়েছে; পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক-ঐতিহাসিক **বজ্র**সমূহের সংবাদও। সেগুলির মধ্যে ইন্দ্রাস্ত্রবিশেষ, কঠোরপ্রায়শ্চিত্তভেদ, কঠোর ভাষা ... ইত্যাদি হল অদৃশ্য **বজ্র**, অমোঘ ভীষণ অস্ত্রমাত্র, হীরক, দুর্ভেদ ব্যূহবিশেষ, কোকিলাক্ষবৃক্ষ, শ্বেতকুশ, সুহীবৃক্ষ (মনসাগাছ), বালক, ধাত্রী, আমলকী, বজ্রপুষ্প, তিলফুল, লৌহবিশেষ, ইস্পাত, অভ্রবিশেষ ... ইত্যাদি হল দৃশ্য **বজ্র**, এবং বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ্র, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়র শক্তি এবং দুর্গার অসি — এই অষ্ট বজ্র সহ উপরোক্ত (খ) থেকে (ঙ) পর্যন্ত সত্তাগুলি হল সামাজিক-ঐতিহাসিক **বজ্র**। এগুলির অধিকাংশই অদৃশ্য **বজ্র**। তবে **বজ্র** শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ অনুসারে কাউকে যদি একটি লাঠিমাত্র নিয়ে মহাহুঙ্কার করে আঘাত করা হয়, তাকেও যেমন '**বজ্রাহত** করা হল' বলা হয়, তেমনি কল্পনাতীত কোনো বিরুদ্ধ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা আকস্মিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দিলে সেও '**বজ্রাহত** হল' বলা হয়। অর্থাৎ কিনা, দুটি বিষয় একত্রে বাহিত হয়ে জনিত হয়ে রহে যে ক্রিয়াকারীর ভিতরে, সেটিই **বজ্র** পদবাচ্য; তা সেই ক্রিয়াকারীকে আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারি আর না পারি। যেমন আমরা জানি না, কোকিলাক্ষবৃক্ষ, আমলকী, বালক, তিলফুল ... এসবের ভিতরে **বজ্র** ঠিক কীভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

তা সে যাই হোক, **বজ্র** ও তৎসংশ্লিষ্ট অজস্র শব্দের পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় ব্যবহার বাদ দিলে শব্দগুলি প্রায় সবই এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। অথচ এই শব্দযোগে কত শব্দই না তৈরি হয়েছিল! যথা — **বজ্রক, বজ্রকণ্টক, বজ্রকবচ, বজ্রকামড়, বজ্রকিল, বজ্রকীট, বজ্রকীল, বজ্রক্ষার, বজ্রঘোষ, বজ্রচড়, বজ্রচাপড়, বজ্রচিহ্ন, বজ্রজিহ্বা, বজ্রজ্বালা, বজ্রঠোকর, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রধর, বজ্রনাভ, বজ্রপাণি, বজ্রপাত, বজ্রপাতন, বজ্রপুষ্প, বজ্রফণা, বজ্রবেদন, বজ্রব্যূহ, বজ্রমণি, বজ্রমুটকি, বজ্রমুঠি, বজ্রমুষ্টি, বজ্রযান, বজ্ররথ, বজ্রলম্ফ, বজ্রলেপ, বজ্রশিলা, বজ্রসংঘাত, বজ্রসার, বজ্রসূচী, বজ্রহস্ত, বজ্রহৃদয়, বজ্রা, বজ্রাকর, বজ্রাকার, বজ্রাকৃতি, বজ্রাভ্যাস, বজ্রাসন, বজ্রাহত, বজ্রী** ...। উপরোক্ত শব্দগুলির মধ্যে প্রতীকী অর্থে **বজ্রাহত, বজ্রপাত, বজ্রমুষ্টি, বজ্রাসন** এই তিন-চারটি শব্দ কমবেশি প্রচলিত রয়েছে। **বজ্র** শব্দের মূল যে ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ, বাংলাভাষী তার অধিকাংশকেই তার বিবর্তিত রূপে অর্থাৎ **বাজ** শব্দ রূপে ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া ফারসি **বাজ**, সংস্কৃত **বাদ** ... ইত্যাদি এসে একই বাংলা **বাজ**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ... অতএব **বাজ** দ্রষ্টব্য।

বজ্রযান : দ্র. **দেবযান**। **৫.** যার দ্বারা মানুষ মানসিকভাবে যায়, তদ্রূপ মানসযানের (একালের ভাষায় যাদের আদর্শ, ফিলজফি, ধর্মবিশ্বাস ... ইত্যাদি বলে) রকমফের আছে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে সেরকম অন্তত ছয়টি যান আবিষ্কার করা হয়েছিল। যথা — **পিতৃযান, দেবযান, মহাযান, হীনযান, সহজযান, বজ্রযান** ইত্যাদি। এর মধ্যে যে যান মানুষের সহজাত, মানুষ যা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে জন্মসূত্রে পায়, তদনুসারে মানসগমন করলে তাকে বলা হত **সহজযান**-ব্যবহারকারী অর্থাৎ **সহজিয়া**। ঠিক তার বিপরীতে এক প্রকার মানসযান রয়েছে। তা অত্যন্ত কঠোর, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি আচরণ, কাজকর্ম যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমন নিয়মতান্ত্রিক কঠোর অনুশাসনপূর্ণ মানসযানকে বলে **বজ্রযান**।

এই পর্যন্ত বোঝার পর প্রথমেই মনে হতে পারে, বুঝিবা বিভিন্ন দেশে যে সকল কট্টর মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি রয়েছে, তারাই **বজ্রযানী**। কিন্তু গভীর অভিনিবেশপূর্বক অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কঠোর ও কট্টরভাবে একই দিশায় দৌড় করিয়ে নিয়ে চলে যে মানসযান, তথাকথিত ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মানসযান তার তুলনায় শিশু। একালের তেমন কঠোর **বজ্রযান** হল তথাকথিত 'কর্পোরেট-কালচার', যা কিনা মানুষের জীবনকে আগাপাছতলা গ্রাস করে বিশেষ দিকে অতিদ্রুত উন্মাদের মতো ছোটাতে থাকে, এমনভাবে যে, ছুটন্ত মানুষেরা ভাববার অবকাশ পর্যন্ত পায় না, তারা কোন যানে চেপে কোথায় ছুটে চলেছে! আমাদের বিচারে একমাত্র **বঙ্গযান**ই পারে এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। ...

বাজ (বাজন, বাজা, বাজার, বাজি, বাজী) : **১.** ✓বজ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাজ*** = ***বজ*** *(দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর জনক) হইতে জাত।* ***বাজন*** = ***বাজ*** *অন (on) যাহাতে। দ্র.* ***বাদন****।* ***বাজা*** = ***বাজ****-এর আধার যে।* ***বাজার*** = ***বাজা*** *রহে যাহাতে।* ***বাজি*** = ***বাজ*** *গতিশীল (সক্রিয়) যাহাতে।* ***বাজী*** = ***বাজি****র আধার যে। /* **বাজন** = যাহা বাজে। **বাজার** = যেখানে প্রত্যহ যথাসময়ে

বেচাকেনা হয়। (ব.শ.)। **৩. বাজ** = বেগ, পক্ষ, শরপক্ষ। বজ্র (thunder, **বাজপড়া** = বজ্রাহত)। বাদ্যযন্ত্র। বাদিত হওয়া, ধ্বনিত হওয়া, পরস্পরে কথিত হওয়া, প্রতিহত হওয়া, আঘাত করা, ব্যথা দেওয়া, লাগা, ব্যথা লাগা, বন্ধ হওয়া, আরম্ভ হওয়া, বাধা, বাদিত করা, বাধান, তর্কে লাগান ...। শ্যেন, শিকরে পাখী (hawk)। কারক, আসক্ত, প্রিয়। **বাজন** = বাদ্যকারী, বাদ্যধ্বনি, বাদন, বাজান, ভূষণধ্বনি। **বাজা** = সম্পাদন করা, করা; (উপরে দ্র.) বাদিত হওয়া ... ইত্যাদি। **বাজার** = ক্রয়বিক্রয়স্থান, পর্ব্বাদিতে বেচাকেনার স্থান, গঞ্জ ...। **বাজি, বাজী** = কৌতুক, ইন্দ্রজাল, কৌতুকজনক অগ্নিক্রীড়া (fireworks), খেলার পণ, আদি হইতে শেষ পর্যন্ত পুরা একবার খেলা। বেগবান, পক্ষবান্, অশ্ব, সাত (৭) সংখ্যা। কার্য্য, ধর্ম্ম। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** যা কিছুই '**বজ** থেকে জাত' হয় তাকেই **বাজ** বলে। অর্থাৎ মূলে রয়েছে **বজ**। এই **বজ** হল সেই সত্তা যে 'দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা বহনকারী'র বা 'বাহী'র জনন করে; তার থেকে যা কিছুই জাত হয়, তা সবই **বাজ** পদবাচ্য। এই **বাজ** অন থাকে **বাজন**-এ। দ্র. **বাদন**। যেহেতু **বজ** থেকে **বজ্র** শব্দটিও জাত হয়, তাই **বজ্র**কেও আমরা **বাজ** বলে থাকি। কেমন বস্তু এই **বাজ**?

কাশ-এর আশ্রয়কে যেমন **আকাশ** বলে, তেমনি **বাজ**-এর আশ্রয়কে **আবাজ** বলে। বর্তমানে এই **আবাজ**কে আমরা **আওয়াজ** বলে থাকি। এ হল **বাজ**-এর আশ্রয়। এই **বাজ**-এর ভিতরে 'ক্রিয়ার সংবাদবাহী sound' বা শব্দ থাকে। অর্থাৎ কিনা, information আর sound-এর একপ্রকার দ্বৈতাদ্বৈতকে ধরে রাখে **বাজ**; অনেক **বাজ** থাকে যাতে, তাকে বলে **আবাজ** বা **আওয়াজ**। যে **বাজ** পড়ে, অর্থাৎ **বজ্র**, সেও একই সঙ্গে শব্দ ও আলো দুইকে নিয়ে সক্রিয় হয়। যে **বাজ** কানে **বাজে**, সে **বাজ** অবশ্যই দুই সত্তার ঠোকাঠুকি বা **দ্বৈতাদ্বৈত** মিলনেই **বাজে**; যে **বাজ** মানুষের মনে ব্যথা হয়ে **বাজে**, সে **বাজ** প্রায়শই কথার (শব্দ ও অর্থের) **বাজ**, যা কিনা **বাদিত** (**বদ্** ক্রিয়াজাত কথন) হয়। আর যে **বাজ** পাখি হয়ে আছড়ে পড়ে, সে হল **ইন্দ্রবাজ**, যার কথা আমরা **উশীনর** শব্দে আগেই (১ম খণ্ডে) জেনেছি। এই **বাজপাখি** hawk বটে, যে কিনা মানবসমাজে হকারি (hawker) করে। আদিতে সে ছিল ছিনতাই**বাজ**। (দ্র. **চিল্ল**)। দাগা**বাজ**, ধড়ি**বাজ**, ফাঁকি**বাজ** ... ইত্যাদি সকল প্রকার **বাজ**গণ আসলে **বজ**-করণ করে। এই **বজ**-করণকে আমরা পচা দই ফুলে ফেঁপে **বজবজ** করে উঠলে চিনতে পারি, গোয়ালের গোবর-গোমূত্রাদিসহ সমস্ত ময়লা যেখানে ফেলে রাখা হয়, সেখানে জল ঢুকে পচে গেলে তার **বজবজ** করাও আমরা চিনতে পারি। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে কথা যখন **বজবজ** করে, তাকে চিনতে পারি না। যৌথসমাজের ভিতরে **পণ্য** গোপনে সৃজিত হয়ে যখন **বজবজ** করে, তখনও তাকে চিনতে পারি না। অথচ এই **বজ** থেকেই **বাজী** অশ্ব যেমন গতিশীল হয়, তেমনি **বাজী** ধরারও সূত্রপাত হয়। সেকালে এর অপর একটি নাম ছিল — 'সত্যঙ্কার'। রাম কতকগুলি **আবাজ** (আওয়াজ) করবে আর শ্যাম তা শুনে পাল্টা **আবাজ** করবে এবং সেই **আবাজ** লেনদেনের বা **বাজি** ধরার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানসম্পদের বা মনোভাবের বিনিময় হয়ে যাবে; কিংবা রাম একটি গরু শ্যামকে দেবে এবং পরিবর্তে শ্যাম রামকে চারটি ছাগল দিয়ে তাদের বাহ্যসম্পদের বোধের **বিনিময়** করে নেবে — এরকম ব্যাপার আদিম মানুষ ভাবতেই পারত না; পারল কেবলমাত্র মানুষের সমাজে **পণ্য** বিনিময় যথেষ্ট প্রচলিত হতে পারার পর। ... এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে সেই **ইন্দ্রবাজই বাজার** সৃষ্টির মূল হোতা। ...

মোটকথা, আরবি ফারসি প্রাচীন-বাংলা আধুনিক-বাংলা এবং ইংরেজি সব ভাষাতেই **বজ্** ক্রিয়ামূলজাত শব্দের উত্তরাধিকার নানাভাবে আজও বহমান রয়েছে। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছে, তার জন্য প্রতিটি শব্দ নিয়ে প্রতিটি ভাষার বিবর্তিত রূপগুলির আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা এখানে বিষয়টি ছুঁয়ে গেলাম।

বাজপেয় (বাজপেয়ী, বাজসনী, বাজসনেয়, বাজসনেয়ী, বাজসনেয়িসংহিতা) : ২. ***বাজপেয় (বাজপেয়ী, বাজসনী, বাজসনেয়, বাজসনেয়ী, বাজসনেয়িসংহিতা* / বাজপেয়** = বাজ (ঘৃত) পেয় যাহাতে; যে যজ্ঞে ঘৃত বা পৈষ্টীসুরা পেয়। **বাজসনি** = বাজের (অন্নের) সহিত সনি (দান) যাহার। (ব.শ.)। **৩. বাজপেয়** = শ্রৌত যজ্ঞবিশেষ। **বাজপেয়ী** = বাজপেয়যজ্ঞকর্ত্তা, বাজপেয়ীবংশীগণ। **বাজসনী** = সূর্য্য। **বাজসনেয়** = বাজসনির অপত্য বা শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য। **বাজসনেয়ী** = বাজসনেয় প্রোক্ত যজুর্ব্বেদ শাখাবিশেষ-বেত্তা, শুক্ল-যজুর্ব্বেদী, শুক্লযজুঃপ্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য। **বাজসনেয়িসংহিতা** = যাজ্ঞবল্ক্যের বা শুক্লযজুর্ব্বেদিগণের সংহিতা, শুক্লযজুর্ব্বেদ। (যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যকে স্তবে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকটে অন্যের অবিজ্ঞাত যজুঃসমূহ প্রাপ্ত হন এবং কাণ্বমাধ্যন্দিন-প্রভৃতি পঞ্চদশ শিষ্যকে যজুঃসমূহ অধ্যয়ন করান। শিষ্যগণের সংখ্যানুসারে যজুর্গণ প্রথমে পঞ্চদশ শাখায় এবং শিষ্যানুশিষ্যক্রমে পরে বহু শাখায় বিভক্ত হয়। এই শাখাসমূহের মধ্যে মাধ্যন্দিনলব্ধ শাখা বিশেষ প্রচলিত ও 'মাধ্যন্দিন' নামে খ্যাত। এই যজুর্গণ শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ বলিয়া, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা নামে কথিত।)। (ব.শ.)। **৪. বাজপেয়ী** পদবী ছাড়া আর সবই অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **চিল্ল**। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে শুক্লযজুর্বেদ ও তার প্রবক্তারাই ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধনতন্ত্রের আদি সাধক। এঁদের চূড়ামণি ছিলেন **যাজ্ঞবল্ক্য**। যে কারণে পুরাণাদিতে অসুরবিরোধী যত যজ্ঞের কথা আছে, তার প্রায় সবগুলিতেই যজ্ঞের হোতা রূপে **যাজ্ঞবল্ক্য**-এর নাম পাওয়া যায়। দ্র. **তিত্তিরি**।

বঞ্চ্ (বন্‌চ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চিত, বঁইচ, বঁইচি (বৈঁচি), বক্র, বক্রখড়্গ, বক্রগতি, বক্রদৃষ্টি, বক্রবাক্য, বক্রভণিত, বক্রসংস্থ, বক্রি, বক্রিমা, বক্রী, বক্রীকৃত, বক্রোক্তি, বঞ্চ, বঞ্চ, বঞ্চক, বঞ্চনা, বঞ্চনীয়, বঞ্চয়িতব্য, বঞ্চয়িতা, বঞ্চিত, বঞ্চা, বঞ্জুল, বাঁচ, বাঁচন, বাঁচা (প্রবঞ্চনা থেকে রেহাই), বাঁচাও, বাঁচোয়া, বাচা, বোঁচা।

বঞ্চ্ (বন্‌চ্) = বাহীর রহস্যময় চয়ন। **বঞ্চ** = বাহীর রহস্যময় চয়ন যাহাতে। **বন্‌চ** = বাহীর নাকরণ চয়িত যাহাতে।

বক্র (বক্রগতি, বক্রদৃষ্টি, বক্রবাক্য, বক্রোক্তি) : ১. ✓বন্চ্ + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বক্র** = *বাহীর রহস্যরূপ কৃত যাহাতে।* **বক্রগতি** = **বক্র** *যে গতি।* **বক্রদৃষ্টি** = **বক্র** *যে দৃষ্টি।* **বক্রবাক্য** = **বক্র** *যে বাক্য।* **বক্রোক্তি** = **বক্র** *যে উক্তি।* / **বক্র** = যাহা বক্তা কর্তৃক এক অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত এবং শ্রোতা কর্তৃক কাকু বা শ্লেষ দ্বারা অন্য অভিপ্রায়ে কল্পিত হয়। **বক্রোক্তি** = বক্তার একার্থে প্রযুক্ত বাক্য, শ্রোতা শ্লেষ বা কাকু দ্বারা অন্যার্থে যোজিত করিলে 'বক্রোক্তি' হয়। (ব.শ.)। **৩. বক্র** = বঞ্চক, প্রতারক, ভুগ্ন, কুটিল, বাঁকা, প্রতিকূল, বিরোধী, অশুভ, ক্রূর, কুঞ্চিত, দুর্বোধ, শনিগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, রুদ্র, ত্রিপুরাসুর, নাসিকা, পর্পট, ক্রূরগ্রহ। **বক্রগতি** = ধূর্ত, শঠ, বক্রপথ, বক্রগমন, গ্রহের ক্রূরগতি। **বক্রদৃষ্টি** = তির্য্যগ্দৃষ্টি, টেরা, অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ, ঈর্ষ্যাযুক্ত দৃষ্টি, কুনজর। **বক্রবাক্য** = প্রতিকূলবাক্য, শ্লেষোক্তি, কাকূক্তি। **বক্রোক্তি** = ভঙ্গিপূর্ব্বক কথন, বাক্যচ্ছল, শব্দালঙ্কারবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** সাধারণভাবে **বক্র** ও **বঙ্ক** দুটি শব্দই বাংলায় **বাঁকা** অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ শব্দদুটি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ক্রিয়ামূলের (**বঞ্চ্, বঙ্ক্**) পরিবারে জন্মেছে। কেন **বাঁকা**কে প্রাচীন বাংলায় **বক্র** ও **বঙ্ক** দুটি শব্দ খরচ করে চিহ্নিত করা হত? আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা তো একটি বিষয়কে বোঝাতে দুটি শব্দ খরচ করবার বিলাসিতা কখনো করতেন না। তাহলে? তাহলে নিশ্চয় শব্দদুটি আসলে দুরকম পৃথক ক্রিয়ার কথা বলার জন্য প্রসূত হয়েছিল।

ঠিক তাই। দুটি শব্দের গোড়াতেই রয়েছে **বং** (বংক, বংচ > বক্র)। **বঙ্ক**-এর বেলায় 'করণ' (ক্) রয়েছে সরাসরি। কিন্তু **বক্র**-এর বেলায় 'করণ-রক্ষা' এসেছে 'চয়ন'-এর মাধ্যমে। তাই **বঙ্ক** থেকে **বাঁকা** শব্দে আমরা সরাসরি পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু **বক্র** তো প্রথমে 'বঞ্চনা' করে, তারপর তদ্রূপ করার জন্য টেড়া হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে; ঠিক যেন মাছধরার ছিপের কাঁটা। তার মানে, **বঙ্ক**কে আমরা দেখছি তার পেছনে দাঁড়িয়ে, সে এগিয়ে চলেছে তার স্বাভাবিক প্রবাহপথ ছেড়ে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম কোনো রহস্যময় দিকে, তাতে আমাদের ভাল হতে পারে, মন্দও হতে পারে। কিন্তু **বক্র**কে দেখতে হচ্ছে তার সামনে দাঁড়িয়ে, সে এগিয়ে আসছে তার রহস্যময় রূপে। স্বভাবতই এই **বক্র** আমাদের পক্ষে শুভ নয়, ক্ষতিকর, **বাঁকা**। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্রষ্টার কাছে **বঙ্ক** ও **বক্র** শব্দদুটির অন্তর্নিহিত ক্রিয়া দু'ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যদিও উভয় শব্দই শেষ পর্যন্ত **বাঁকা**ই বটে (এই সেই কারণ, যে কারণে বাংলাভাষী উভয় শব্দকেই **বাঁকা**য় পরিণত করে নিয়েছে।); হতে পারে **বঙ্ক**-বাঁকা অনেক সময়ই দ্রষ্টার পক্ষে শুভরূপে দেখা দিতে পারে এবং **বক্র**-বাঁকা কখনোই শুভরূপে দেখা দেয় না। **বঙ্ক** ভাল বলেই বাংলাভাষী আপন সন্তানের নাম রাখতেন **বঙ্কিমচন্দ্র** ... ইত্যাদি, ভাল নয় বলেই বাংলাভাষী কখনোই আপন সন্তানের নাম **বক্রিমচন্দ্র** ... ইত্যাদি রাখেননি।

বঞ্চক (বঞ্চন, বঞ্চনা, বঞ্চিত, বঞ্চা) : ১. ✓বঞ্চ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বঞ্চক** = *যে বাহী রহস্যরূপে (থাকিয়া) চয়ন করে; অথবা* **বঞ্চ** *করে যে।* **বঞ্চন** = **বঞ্চ** *অন (on) যাহাতে।* **বঞ্চনা** = **বঞ্চন**-*এর আধার যে।* **বঞ্চিত** = **বঞ্চ** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে; অথবা যাহাকে* **বঞ্চনা** *করা হইয়াছে।* **বঞ্চা** = **বঞ্চ**-*এর আধার যে।* **৩. বঞ্চক** = প্রতারক, খল, ধূর্ত্তজন, শৃগাল, গৃহবভ্রু, পোষা বেজি, জেতা। **বঞ্চন, বঞ্চনা** = প্রবঞ্চনা, বিড়ম্বনা, যাপন, কালাতিপাত, বিড়ম্বনকারী। **বঞ্চিত** = প্রতারিত, বিড়ম্বিত। **বঞ্চা** = প্রতারণা করা, গত করা, যাপন করা ...। (ব.শ.)। **৪. বঞ্চা** বাদে বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** বাহী রহস্যরূপে ওৎ পেতে রয়েছে, তার প্রবাহপথে পড়ে গেলেই, সে পতিতকে ধরে আত্মস্থ করে নেয়, চয়ন করে নেয়, তাই সে **বঞ্চক**। তার এই **বঞ্চন** কর্মের বা **বঞ্চনা**র কবলে পড়লে **বঞ্চিত** হতে হবে। কারণ সে তার এই প্রবাহপথে **বঞ্চ** ক'রে ক'রে এগিয়ে চলেছে, **বঞ্চা**চ্ছে। কিন্তু হায়, তার সেই **বঞ্চা**নোর নানা কথা — **বঞ্চিবু, বঞ্চই, বঞ্চব, বঞ্চবি, বঞ্চল, বঞ্চলি, বঞ্চলুঁ, বঞ্চসি** ... সবই বলতেন মধ্যযুগের বাংলাভাষীরা; এখন আমরা তাদের ভুলে গেছি।

বাঁচ (বাঁচন, বাঁচা, বাঁচাও, বাঁচোয়া, বোঁচা) : ১. বঞ্চ্ > বাঁচ। (ব.শ.)। **২. বাঁচ** = **বঞ্চ** *হইতে জাত।* **বাঁচন** = **বাঁচ** *অন (on) যাহাতে।* **বাঁচা** = **বাঁচ**-*এর আধার যে।* **বাঁচাও** = **বাঁচা** *(বাঁচার ইচ্ছা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশিত যাহাতে।* **বাঁচোয়া** = **বাঁচা** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহাতে।* **বোঁচা** = *নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর রহস্যরূপ চায়িত যাহাতে বা যে চিহ্নে।* **৩. বাঁচ** = বঞ্চনা করা, রক্ষিত হওয়া, রক্ষা পাওয়া, প্রাণধারণ করা, পুনর্জীবিত হওয়া, নিরুদ্বেগ বা আশ্বাসিত হওয়া, সজীবতাপ্রাপ্ত হওয়া, উদ্বৃত্ত হওয়া, যথার্থ মনুষ্যজীবন ধারণ করা। **বাঁচন** = প্রাণধারণ, পুনর্জীবন প্রাপ্তি, নির্বিঘ্নতা, রক্ষা। **বাঁচা** = প্রাণধারণ করা, প্রাণধারণ করান, রাখা, পুনর্জীবিত করা, রক্ষা করা, নিরুদ্বেগ বা সুস্থ করা, নির্দোষ রাখা, সজীব বা তাজা রাখা, উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্ট রাখা, ব্যয়িত হইতে না দেওয়া, লঙঘন না করা, বিচারপূর্ব্বক রক্ষা করা, নষ্ট হইতে না দেওয়া। **বাঁচাও, বাঁচোয়া** = রক্ষা, নিষ্কৃতি, এড়ান, আমোদপ্রমোদজন্য সজীবতা। **বোঁচা** = ব্যবচ্ছিন্ন, খণ্ডিত, ছিন্নকর্ণ, কুম্ভীর, ধূর্ত্ত, প্রতারক। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. বঞ্চক** শব্দে আমরা দেখেছি, 'বাহী রহস্যরূপে ওৎ পেতে রয়েছে, তার প্রবাহপথে পড়ে গেলেই, সে পতিতকে ধরে আত্মস্থ করে নেয়, চয়ন করে নেয়।' কিন্তু কেউ যদি সেই প্রবাহপথে পতিত না হয়, সরে দাঁড়ায়, তাহলে? তাহলে **বঞ্চক** তাকে **বঞ্চনা** করতে পারে না, সে **বঞ্চ**-ত্যক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ **বঞ্চ** থেকে নির্জাত হয়। বাংলাভাষী এই **বঞ্চজাত**কে নিজেদের মতো করে **বাঁচা** করে নিয়েছেন। **বাঁচা** মানে তাই **বঞ্চন**-এর হাত থেকে মুক্তি, **বেঁচে** যাওয়া। উপরোক্ত **৩.**-এ ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, **বাঁচা** শব্দের মূলগত অর্থ বঞ্চনার হাত থেকে, বিপদের হাত থেকে, ক্ষতির হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে রক্ষা পাওয়া। বাংলাভাষী সেকারণেই বলেন — 'ওরে বাবা, কী বাঁচান বেঁচে গেছি!' তাই **বাঁচা** মানে শুধুমাত্র 'প্রাণধারণ করা' বুঝলে, **বাঁচা** শব্দের গায়ে তার যে অতীত-আবরণটি লেগে রয়েছে, সেটিকে দেখেও না-দেখা। ...

কিন্তু **বোঁচা**! আমাদের মায়েরা শিশুকে তেল মাখিয়ে কাজল

পরাতে পরাতে যে গান করেন — 'আয় আয় চাঁদ মামা / টিপ দিয়ে যা / ... বোঁচা নাক নিয়ে যা, / টিয়া নাক দিয়ে যা ...' — ইত্যাদি, সেই **বোঁচা** কথাটির মানে কী? মানে হল, **বঞ্চক**-এর বা ধূর্তের চিহ্ন। ধূর্তামির জন্য ধূর্তের নাক কান কেটে দেওয়া হত সেকালে। তারা **বোঁচা** কান, **বোঁচা** নাক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মায়েরা বলতেন, শিশুর নাক যেন সেরকম **বোঁচা** না হয়।

বট্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আবাটা, আলুবাড়ি, কাঁচাবাড়ী, কোঠাবাড়ী, গোঁসাইবাড়ী, পাকাবাড়ী, বট্, বট, বটক, বটকেরা, বটবটি, বটবাসী, বটবৃক্ষ, বটব্যাল (বড়াল), বটি, বটিকা, বটিয়া, বটী, বটু, বটুক, বটুকখানা, বটুকভৈরব, বটুব্রাহ্মণ, বটুয়া, ব'টে, বটেক, বটের, বটোরলুঁ, বটোরলোঁ, বট্ঠাকুর, বড় (বট), বড় (বড, বাহড়া), বড়-আদালত, বড়্গাছ, বড়ঠাকুর, বড়ঠাকুরঝি, বড়দিন, বড়ফট্টাই, বড়বড়, বড়বা, বড়বাগ্নি, বড়বাড়ী, বড়বানল, বড়বাপ, বড়বামুখ, বড়মা, বড়মানুষ, বড়রাণী, বড়লাট, বড়া, বড়াই, বড়াল, বড়ি, বড়ু, বড়ুআ(য়া)ই, বড়ুয়া. ব'ড়ে, বড্ড, বাগানবাড়ি, বাঁট, বাঁটনা, বাঁটনা-বাটা, বাঁড়, বাঁড়া, বাট, বাটআরি, বাটওয়ার, বাটধান, বাটন, বাটনা, বাটপাড়, বাটপাড়ি(ড়ী), বাটলা, বাটলোই, বাটা, বাটাওল, বাটাজোড়া, বাটাপানা, বাটাভরা, বাটালি, বাটিআ, বাটিকা, বাটিয়া, বাটী, বাটুয়া, বাটুল, বাটুলা, বাটোআড় (বাটোআড়ী), বাটোয়ার, বাটোয়ারা, বাটোয়ারি(রী), বাট্টা, বাড়, বাড়ই, বাড়তি(তী), বাড়ন, বাড়ন্ত, বাড়ব, বাড়বাগ্নি, বাড়বানল, বাড়বাড়া, বাড়া, বাড়াবাড়ি, বাড়াভাত, বাড়ি, বাড়িখোর (দ্র.বার্দ্ধুষিক), বাড়িমারা, বাড়ী, বাড়ীওলা(লী), বাড়ীঘর, বাঢ়, বাঢ়খাওয়া, বাঢ়া, বাঢ়ি, বেটন (বেড়), বেটা, বেটি(টী), বেটুয়া, বেটে, বেটো, বেঠ, বেড়(ঢ়), বেড়বাঁশ, বেড়-বান্ধা, বেড়ল, বেড়া, বেড়া-আগুন, বেড়াকীল, বেড়ান, বেড়াপাক, বেড়ি(ড়ী), বেড়ুবাঁশ, বেড়ে, বেঢ়ানৃত্য, বেণ্ডুয়া, ব্যাটা।

বট্ = বাহীর টঙ্কারণ। **বট** = বাহীর টঙ্কারণ যাহাতে।

বট (বটবৃক্ষ, বটবাসিনী, বটবাসী, বটব্যাল, বটি, বটী, বটু, বটুক, বটে, বটেক; বটকৃষ্ণ, বটকেষ্ট, বংশীবট, লক্ষ্মীবট, বটসাবিত্রী) : ১. **বট** = ✓বট্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *__বট__ = বাহীর টঙ্কার থাকে যাহাতে। __বটবৃক্ষ__ = বাহী টঙ্কারিত হয় যে বৃক্ষে। __বটবাসী__ = __বটে__ বাস করে যে। __বটব্যাল__ = __বট__-এর (বটবৃক্ষের) __ব্যাল__ (যে হননার্থ উদ্যত থাকে)। __বটি__ = __বট__ গতিশীল যাহাতে। __বটী__ = __বটি__র আধার যে। __বটু__ = __বট__ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। __বটুক__ = __বটু__ করে যে। __বটে__ = বাহী দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত যাহাতে। __বটেক__ = এক __বট__ যে।* / **বটবাসী** = যে বটবৃক্ষে বাস করে। (ছা.অ.)। ৩. **বট** = ন্যগ্রোধ, বটগাছ (banyan tree), কপর্দ্দ, কড়ি, কড়া, গোলপিষ্টকভেদ, বড়া, (গণিতে) শূন্য, গোল, বটিকা, বড়ী, সাম্য, আকৃতিসমতা, শণনির্ম্মিত তন্তু, গুণ, বেটে (বৃত্তাকারবস্তু), ব্রজমণ্ডলান্তর্গত বটনামক ষোড়শ বন। বর্ত্তমান থাকা, থাকা (to be), হওয়া (পরিচয়ার্থ প্রশ্নে, কাকু হেতু অস্বীকারে, বিরুদ্ধবিষয়শ্রবণে — সরোষে, প্রত্যভিজ্ঞানপূর্ব্বক স্বীকারে, শাসন-বাক্যে, বিস্ময়ে, স্বীকারপূর্ব্বক বিরুদ্ধকথনে, স্পর্দ্ধায়, স্বীকারে।) ...। **বটবাসী** = যক্ষ। **বটব্যাল (বড়াল)** = রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি বা গাঁই। ... স্বর্ণবণিকের উপাধি। **বটি** = হওয়া (পরিচয়ার্থ প্রশ্নে)। **বটী** = বটগাছ ... ইত্যাদি। **বটু** = বালক, মাণবক, ব্রহ্মচারী, কুব্রাহ্মণ, যুবক, ব্রাহ্মণযুবক (অনাদরে, fellow, chap)। **বটুক** = বালক, ব্রহ্মচারী, মূর্খ, ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব। **বটেক** = এক বট, এক কড়া মূল্য। (ব.শ.)। **বট** = বৃক্ষবিশেষ, বটগাছ, বর্ত্তুলাকার বস্তু, গোল ... (বাঙ্গালা ক্রিয়া) হও। **বটবাসিনী** = উপদেবতাবিশেষ, যক্ষিণী, বটবৃক্ষে বাসকারিণী। **বটবাসী** = উপদেবতাবিশেষ, যক্ষ। **বটি** = উপ-জিহ্বিকা, আল্‌জিভ। **বটিকা, বটী** = গুলিকা, বড়ী, বট, রজ্জু। **বটু, বটুক** = ব্রাহ্মণকুমার, বালক, বালক ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী ছাত্র, অজ্ঞান, নির্ব্বোধ ব্যক্তি, ভৈরববিশেষ, কুটন্নটবৃক্ষ। (ছা.অ.)। **বটবৃক্ষ** = বটগাছ, **বড়গাছ**, banyan tree, **বনস্পতি**। ৪. মধ্যযুগের সাহিত্যেও **বট** ও তৎসঞ্জাত শব্দসমূহের বিপুল ব্যবহার ছিল। এখনও সমগ্র গ্রামবাংলায় শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। **বট**গাছকে গ্রামবাংলায় **বড়**গাছও বলা হয়। উচ্চারিত হয় 'বট্গাছ্', 'বড়্গাছ্'। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় **বটে, বটেক** শব্দদুটির ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাকাডেমিতে শুধুমাত্র banyan tree অর্থে **বটবৃক্ষ**-এর ব্যবহার ছাড়া বাকি শব্দগুলির ব্যবহার নেই বললেই চলে। ৫. দ্র. **জটামাংসী, পঞ্চবটী, বেণ**। দ্বৈতাদ্বৈত-বাহী তার অস্তিত্বের বিন্দু থেকে প্রসারিত হতে হতে তার পরিধিতে গিয়ে টঙ্কারিত হলে **বট** হয়। এই **ব** হল **স্ব**ভাব-এর **স্ব**-এর **ব**। এর ভিতরে সেই দুইকে বিদ্যমান দেখা যায়, যে দুই **প্র**কৃতির **প্র**-র ভিতরে থাকে। অস্তিত্ববান মাত্রেই যে দুইকে নিয়ে অস্তিত্ববান হয়, এই **ব** সেই দুইকে ধারণ করে। সেই **ব** টঙ্কারিত হয় যাহাতে, তাকে **বট** বলে। ...

এখন প্রশ্ন হল, অদৃশ্যজগতে **বট** শব্দটি কাকে বোঝায়, কেননা, আমরা জানি, আমাদের পূর্বসূরি শব্দজ্ঞানীরা অদৃশ্যজগতের কোনো সত্তাকে বোঝাতেই নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর সহজ উত্তর হল — যেভাবে আমরা **বটি**, হই, অস্তিত্বরক্ষা করে ও আত্মবিকাশ ঘটিয়ে বিরাজ করি, আমাদের সেই **বটন** বা হওয়নই হল **বট**। আমাদের ঘরে থাকা, পথে হাঁটা, রুজিরোজগার করা, বেঁচে থাকা ... সমগ্র জীবনপথে আমাদের চলার সমস্ত রূপই **বট**। অর্থাৎ, আমাদের থাকাই **বট**, থাকার ব্যবস্থাও **বট**, তাতেই আমরা থাকি বা **বটি**। যেখানে যেখানে **বটি** সে সমস্তই আমাদের **বাট, বাটী** ... ইত্যাদি। দ্র. **বাট**।

বাংলাভাষীদের জীবনে **অশ্বত্থ** ও **বট** এই দুই বৃক্ষের সংস্পর্শ অপরিসীম। গ্রামবাংলার মানুষ আজও বিশেষ বিশেষ মনস্কামনা নিয়ে এদের শাখায় সুতো বেঁধে, কাপড় বেঁধে আসেন; এদের গোড়ায় মাটির ঘোড়া রেখে আসেন। সবাই জানেন, **বটবৃক্ষে** স্বয়ং **বটকৃষ্ণ** থাকেন, যক্ষ ও যক্ষিণীরা বাস করে। ... কারণ, এ হল দুই প্রকার সমাজবৃক্ষ (সমাজব্যবস্থা) — আদিম সমাজতান্ত্রিক সমাজবৃক্ষ (**অশ্বত্থ**) এবং আদিম ধনতান্ত্রিক সমাজবৃক্ষ (**বট**)। এই **বট**-এ

মানুষের সমাজ থাকে বা **বটে**। ...

আমাদের মনে হয়, **প্রজাপতি বেণ** কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত 'আদিম ধনতান্ত্রিক সমাজবৃক্ষ'কে বোঝানোর জন্যই এই **বট** শব্দটি সৃজন করা হয়েছিল। ইংরেজিতে সেটিই **বেণিয়ান** বা banyan tree (= বেনিয়া বা বণিকদের সংগঠন বা বৃক্ষ) রূপে থেকে গেছে। **অশ্বত্থ**-ব্যবস্থার পরেই এই **বট**-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। সূচনাকালে এই **বট**-ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই সাম্যভিত্তিক এবং যৌথব্যবস্থার (বৈদিকব্যবস্থার) ভিতরেই সে জন্ম লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে, প্রায় আগাগোড়া একই স্বভাবের বলেই, উদ্ভিদজগতের বিশেষ গাছটিকেও **বট** নামে ডাকা হয়। ... এই **বটবৃক্ষে** স্বয়ং নারায়ণ **বটকৃষ্ণ** বা **বটকেষ্ট** রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। যমুনাতীরে যে গাছে বসে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন, তার নাম ছিল **বংশীবট**। আদিতে এ ছিল **লক্ষ্মীবট**। পরে পরে এতে যক্ষ ও যক্ষিণীগণ বাস করতে শুরু করে। **বটব্যালগণ** এই **বটবৃক্ষে** থেকে **বট**-বিরোধী শক্তিকে নাশ করতেন। এই **বট**-ব্যবস্থা শাখায়-প্রশাখায় এবং ঝুরি নামিয়ে তাকে শিকড়ে কাণ্ডে পরিণত করে ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। সেকালে এর গৌরব ছিল অপরিসীম। সেই কারণে, সেকালের বাংলাভাষীর প্রিয় শব্দ ছিল **বটকৃষ্ণ, বটু, বটুক, বটুকেশ্বর** ... প্রভৃতি। ...

তবে **বট** শব্দটির ব্যবহার এখানেই থেমে থাকেনি। আমরা যখন বলি, 'কে **বট** আপনি?' তখন প্রকৃতপক্ষে যাকে **বট** বলা হচ্ছে, সে চোখের সামনে আপন অস্তিত্বের পরিধিতে টঙ্কারিত হয়ে আপনার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে বলেই তাকে বলা হচ্ছে 'কে **বট** আপনি?'। **বটবৃক্ষ**ও এভাবেই আপন অস্তিত্ব জানান দেয়। (দ্র. **বেণ**)। অর্থাৎ, 'আমি **বটি**' কথাটির মানে হল, 'এই দেখো, আমি অস্তিত্ববান হয়ে আপন পরিধিতে টঙ্কারিত হচ্ছি।' স্বভাবতই **বট** শব্দের একটি অর্থ হয় — যে কোনো গোলাকার বস্তু, যা কিনা আপন অস্তিত্বের পরিধিতে টঙ্কারিত হয়ে আপন অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। আমরা যখন বলি, '**বটে**, এই ব্যাপার!' তখন প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি একটি বিশেষ ধরনের অস্তিত্বলাভ করে আপন অস্তিত্ব দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত হয়ে জানান দিয়েছে। তাই তাকে বলা হচ্ছে — '**বটে**!' এই শব্দটিকে বাংলাভাষী এতরকমভাবে ব্যবহার করেন যে, এমনকি ব.শ. পর্যন্ত তার সীমা নির্ধারণ করতে পারেননি। ... এই সব কারণেই ব.শ. **বট** শব্দের অর্থপ্রদান কালে 'কড়ি, কড়া, গোলপিষ্টকভেদ, বড়া, (গণিতে) শূন্য, গোল, বটিকা, বড়ী, সাম্য, আকৃতিসমতা ...' এসবের উল্লেখ করে তার পাশাপাশি আরও জানাচ্ছেন যে, এটি 'মণ্ডলাকার হেতু মণ্ডলী — বটবৃক্ষ'। অর্থাৎ, **বটবৃক্ষ** খানিকটা গোলাকার বলেই তাকে **বটবৃক্ষ** (banyan tree) বলা হয়। ... **৬.** ইংরেজি but, bottom। **বট-অশ্বত্থ** যেমন ভারতবর্ষীয়দিগের চোখে পবিত্র এবং রহস্যময় শক্তির আধার বলে প্রতিভাত হয়, ইউরোপে তেমনি oak গাছটিও প্রাক্‌খ্রিস্টীয় কাল থেকে মানুষের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার বস্তু। আকারের দিক থেকে oak গাছ বিশাল এবং গোলাকার।

বড় (বড্ড, বড়গাছ, বড়ফট্টাই, বড়া, বড়াই, বড়ু, বড়ুয়া) : **২. বড়** = *বাহীর উড়ান থাকে যাহাতে।* **বড্ড** = *বাহীর উড্ডয়নের উড্ডয়ন যাহাতে।* **বড়গাছ** = *বড় যে গাছ।* **বড়ফট্টাই** = **বড়**-*র মতো ভাবনানুসারে* **ফটফট** *করা থাকে যাহাতে।* **বড়া** = **বড়**-*এর আধার যে।* **বড়াই** = **বড়**-*ভাব গতিশীল যাহাতে।* **বড়ু** = *বাহীর উড়ান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **বড়ুয়া** = **বড়ু** *রূপে যায় যে।* **৩. বড়** = বৃহৎ, দীর্ঘ, লম্বা, প্রাংশু, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ... ইত্যাদি। **বড্ড** = বড়। **বড়ফট্টাই** = বৃথা আত্মশ্লাঘাপ্রকাশ। **বড়া** = ডাল ইত্যাদির পিষ্টকবিশেষ। **বড়াই** = মহত্ত্ব, গৌরব, প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, গর্ব্ব, আত্মশ্লাঘা, গুমর, গর্ব্বের কথা, খ্যাতি, সুনাম ... ইত্যাদি। **বড়ু** = বটু, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, মন্দিরপরিচারক, পূজারী। **বড়ুয়া** = সম্ভ্রমসূচক উপাধি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মানী, বালক, পূজারী। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বৃহৎ**। সত্তাকে তার তাৎক্ষণিক লৌকিক বা অলৌকিক অবস্থান থেকে উর্ধ্বে উড্ডয়ন করিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল **বড়** হওয়া। সেভাবে যে **বড়** হয়ে যায়, তাকেও **বড়** বলে। কথাটি সর্ব স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে দৃশ্য **বড়** আমাদের প্রাচীন পুরুষদের কাছে যত না গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অদৃশ্য **বড়**। এই **বড়** হল সামাজিক **মর্য্যাদায় বড়**, জ্ঞানে **বড়**, ধনে **বড়**, মনুষ্যত্বে **বড়** ...। এই **বড়**গুলি বাহ্যরূপে দেখা যায় না, দেখতে হয় মানসিকভাবে। সেই সকল **বড়**র কথা বলার জন্যই **বড়** শব্দটির সৃষ্টি হয়েছিল।

অভিধান ও শব্দকোষগুলি আমাদের জানাচ্ছে, যে, **বট** ও **বড়** আসলে একই কথা। মানুষের সমাজ তার অভিজ্ঞতায় দেখে যে, **বটবৃক্ষ** (= ব্যবস্থা ও উদ্ভিদ) সকল প্রকার বৃক্ষের (ব্যবস্থার ও উদ্ভিদের) মধ্যে সর্বাপেক্ষা **বৃহৎ** হয়ে থাকে। সেই কারণে, **বটকেই** পরবর্তীকালে লোকে **বড়** বা **বৃহৎ** বলে উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করে। স্থান-কাল-পাত্র সবক্ষেত্রেই এই **বড়** শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে আদিতে যাঁরা সত্যিই **বড়** ছিলেন, মিথ্যে **বড়াই** (আমিই সবচেয়ে বড় — এমন ভাব) করতেন না। তাঁরা সত্যিই ছিলেন মহৎ, শ্রেষ্ঠ, ও প্রকৃতই খ্যাতিমান। ... তাঁদেরই কেউ কেউ **বড়ুয়া** উপাধি লাভ করেন।

বড়বা (বড়বানল, বড়বাগ্নি, বাড়ব, বাড়বা, বাড়বাগ্র) : **১.** ✓বল্ + ব অস্ত্যর্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২. বড়বা** = **বড়** *বাহিত হয় যাহাতে।* **বড়বানল** = **বড়বা** *যে অনল।* **বড়বাগ্নি** = **বড়বা** *যে অগ্নি।* **বাড়ব** = **বাড়** *(বৃদ্ধি) বহন করে যে।* **বাড়বা** = **বাড়ব**-*এর আধার যে।* **বাড়বাগ্র** = **বাড়বা**-*গণের মধ্যে অগ্রণী যে।* **৩. বড়বা** = ঘোটকী, বড়বারূপিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা (বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহিতে না পারিয়া স্বীয় মূর্ত্তি ছায়াকে স্বস্থানে রাখিয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। এবং পিতার ভর্ৎসনায় বড়বারূপে উত্তরকুরুতে অবস্থান করেন। ছায়ার (বৈবস্বত) মনু ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র জন্মিলে, ছায়া সংজ্ঞার পুত্র শ্রাদ্ধদেব ও যম এবং কন্যা যমুনার প্রতি তাদৃশ স্নেহপ্রকাশ না করায়, শ্রাদ্ধদেব ছায়াকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন এবং ছায়া 'পদ স্খলিত হউক' বলিয়া শাপ প্রদান করেন। সূর্য্য ইহা জানিয়া সমাধিবলে সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন এবং অশ্বরূপে উত্তরকুরুতে সংজ্ঞার সহিত সঙ্গত হইলে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের উৎপত্তি হয়। ভাগবতমতে, বড়বা সূর্য্যের তৃতীয় পত্নী,

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার পুত্র।), অশ্বিনী নক্ষত্র, দাসী, বেশ্যা, দ্বিজস্ত্রী। **বড়বানল, বড়বাগ্নি** = বড়বামুখস্থ অগ্নি, ঔর্বানল। (ব.শ.)। সমুদ্রস্থ বহ্নি। কোনো এক সময় মহর্ষি ঔর্ব অযোনিজ পুত্রকামনায় নিজ বক্ষ হতে এক জ্বালাময় পুরুষ সৃষ্টি করবেন বলে স্থির করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই অগ্নিময় পুত্র অন্য সকলকে ধ্বংস করে জীবিত থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর উরু থেকে সর্বধ্বংসকারী অগ্নিকে সৃষ্টি করেন। ... সৃষ্ট অগ্নি চিৎকার করে ওঠে — সে ক্ষুধিত, তাই পৃথিবী গ্রাস করতে চায়। তখন পৃথিবীর চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবী ধ্বংসের সম্মুখীন দেখে তিনি ঔর্বের পুত্রের লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন এবং সমুদ্রের মুখে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। ব্রহ্মাও সমুদ্র হতে জন্মগ্রহণ করেন, ও সেখানেই বাস করেন। তিনি ও এই নতুন সৃষ্ট অগ্নি-পুরুষ প্রতি কল্পের শেষে দেবতা, অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে সমস্ত সৃষ্ট জিনিস ধ্বংস করে ফেলবেন বলে স্থির করা হয়। এঁকেই বড়বানল বলা হয় এবং এঁর আকৃতি অশ্বের মস্তকের উপর অগ্নিশিখার ন্যায়। (পৌ.অ.)। **বাড়ব** = বড়বাসম্বন্ধী, বড়বানল, বড়বায় (ব্রাহ্মণীতে) জাত, ব্রাহ্মণ; বড়বাগণ, অশ্বসমূহ। (ব.শ.)। **বাড়বাগ্র** = ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অশ্বিনীকুমার, ঔর্ব**। **বড়বাগ্নি** বা **বড়বানল** হল, **বাড়** বা 'বৃদ্ধি' বহন করে যে অগ্নি। এই অগ্নি বাড়বৃদ্ধির বুদ্ধিদাতা **বাড়বাগ্র** ব্রাহ্মণ হতে পারেন, তদ্রূপ সামাজিক শক্তিধর এগজিকিউটিভ **অশ্বেরা** হতে পারে ... নিদেনপক্ষে সুদপুঁজি বা interest bearing capital তো হতেই পারে। মানুষের সমাজে এই বস্তুটির উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে, তারই ইতিহাস এই **বড়বার** ইতিহাস। সেই **বড়বার** উদ্ভবের ক্ষেত্রে যৌথজ্ঞানসম্পদ ও যৌথধনসম্পদ (= সূর্য্য) কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, উপরে তার কথাই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বলা হয়েছে।

বাট (বাটআরি, বাটওয়ার, বাটপাড়, বাটপাড়ি, বাটপাড়ী, বাটা, বাটিকা, বাটিয়া, বাটী, বাটোয়ার, বাটোয়ার, বাটোয়ারি, বাটোয়ারী, ঘটিবাটি) : ১. ✓বট্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বাট*** *=* ***বট*** *হইতে জাত।* ***বাটপাড়*** *=* ***বাট****-এর উপর পড়ে যে!* ***বাটপাড়ি*** *=* ***বাটপাড়*** *সক্রিয় যাহাতে।* ***বাটপাড়ী*** *=* ***বাটপাড়ি****র আধার যে।* ***বাটা*** *=* ***বাট****-এর আধার যে।* ***বাটি*** *=* ***বাট*** *গতিশীল যাহাতে।* ***বাটিকা*** *=* ***বাটি****কে গতিশীল বা সক্রিয় করে রাখে যে।* ***বাটী*** *=* ***বাটি****র আধার যে।* ***ঘটিবাটি*** *=* ***ঘটি*** *ও* ***বাটি****।* / **বাটপাড় (বাটপাব)** = যে বাটে পড়ে; পথে আক্রমণপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **বাট** = বটবিকার, বটকাষ্ঠরচিত (দণ্ড); বেষ্টিত ভূমি, বৃত্তিস্থান, পরিখাবেষ্টিত ভূভাগ, মণ্ডপ, গৃহ, নিবাস, শস্যাদিক্ষেত্র, বাস্তু, ভিটা, উদ্যান; মার্গ, পথ, রাস্তা, ছিদ্রপথ, ফাঁক; শিলাপট্টে পেষণ করা, পেষা, বাটা। **বাটআরি** = বাটপাড়ের কাজ, দস্যুবৃত্তি, বলাৎকার। **বাটওয়ার (বাটোয়ার)** = বাটপাড়, দস্যু, লুঠেরা। **বাটোয়ারি** = বাটপাড়ী, দস্যুবৃত্তি। **বাটোয়ারী** = স্ত্রী-দস্যু। **বাটপাড়** = দস্যু, লুঠেরা। **বাটপাড়ি, বাটপাড়ী** = বাটপাড়ের কাজ, দস্যুবৃত্তি, ডাকাতি, বলাৎকার, নারীধর্ষণ, ধূর্ত্ততা, বলপূর্ব্বক অপহরণ। **বাটা** = বড় বাটী, বড় পাত্র, থালা ... ইত্যাদি। **বাটিকা** = বাটী, বাস্তুভূমি, উদ্যান, বীথী, কুটীর, কুটী। **বাটিয়া** = বাট, পথ। **বাটী** = বেষ্টিত ভূমি, বৃত্তিস্থান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. **বাটপাড়** ছাড়া বাকি শব্দগুলি অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত, কিন্তু গ্রামবাংলায় এখনও কমবেশি প্রচলিত। মধ্যযুগে শব্দগুলি বিপুলভাবে ব্যবহৃত হত। ৫. **বট** থেকে জাত শব্দ হল **বাট**। তাই **বট** যতরকম বিষয় ও বস্তুকে শনাক্ত করতে পারে, তাদের থেকে জাত বহু কিছুই **বাট** শব্দের উদ্দিষ্ট হবে — এটাই স্বাভাবিক। ব.শ. জানাচ্ছেন — বটবিকার, বটকাষ্ঠরচিত (দণ্ড); বেষ্টিত ভূমি, বৃত্তিস্থান, পরিখাবেষ্টিত ভূভাগ, মণ্ডপ, গৃহ, নিবাস, শস্যাদিক্ষেত্র, বাস্তু, ভিটা, মার্গ, পথ ... এসবই **বাট**-পদবাচ্য। গ্রামবাংলায় এখনও শোনা যায় — 'কুন **বাটে** যাচ্ছ গো দাদা?' এই **বাটে** — পথে, স্থানে, গৃহে, বৃত্তিস্থানে, জীবনপথে ... ইত্যাদি অনেকানেক অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা শুরু হচ্ছে, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই **বাটে**'। সেকালের বাংলাভাষী এই **বাট**কে **বাটা**ভরা পান থেকে, থালাবাটি থেকে, ঘটিবাটি থেকে, গৃহবাটিকা থেকে, উদ্যানবাটি থেকে ... জীবনের মোক্ষপথ পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়েছিল। উদ্যানবাটিগুলি তো ছিল সেকালের অধ্যাত্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দু, কী প্রাচ্যে, কী পাশ্চাত্যে। দার্শনিক প্লেটো সশিষ্য যে উদ্যানে **পরা**বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যার চর্চা করতেন, তার নাম ছিল 'আকাদেমী' (Akademeia)। আর, জীবনোপায় ঘটানো হত **ঘটি**গুলিতে, জীবন পথের অর্জনগুলি ধরা হত **বাটি**গুলিতে। মধ্যযুগের সাহিত্যে সেই সমস্ত **ঘট** ও **বাট**-এর কথা বিস্তারিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। বাংলাভাষীর জীবনে সেই **বাট**-সমূহের কথা নানাভাবে আজও কমবেশি বলবৎ রয়েছে। ... আর, আমাদের একালের অ্যাকাডেমিগুলি বাংলাভাষার ব্যবহার থেকে সেই সমস্ত **বাট**কেই কার্যত বাদ দিয়ে ইংরেজের দুয়ারে ধর্না দিয়ে হাত পেতে বসে আছেন। একেই বলে **ঘটিবাটি** বেচে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। আজ এঁদের **ঘট** নাই, **বাট**ও নাই। **ঘটে**র (কারখানাদির) জন্যও এখন এঁরা পরমুখাপেক্ষী, **বাটে**র (জীবনদর্শনের) জন্যও পরমুখাপেক্ষী। সত্যি বলতে কি, বিশ্বের কোনো অ্যাকাডেমিই আজ জানে না, তারা কোন **বাটে** যাবে!

বাড় (বাড় বাড়তি, বাড়তী, বাড়ন, বাড়ন্ত, বাড়া, বাড়ান, বাড়াবাড়ি, বাড়ি, বাড়িখোর, বাড়িমারা, বাড়ী, বাঢ়, বাঢ়খাওয়া) : ২. ***বাড়*** *=* ***বড়*** *হইতে জাত।* ***বাড়তি*** *=* ***বাড়*** *তারণ গতিশীল যাহাতে।* ***বাড়তী*** *=* ***বাড়তি****র আধার যে।* ***বাড়ন*** *=* ***বাড়*** *অন (on) যাহাতে।* ***বাড়ন্ত*** *=* ***বাড়****-এর অন্ত যাহাতে।* ***বাড়া*** *=* ***বাড়****-এর আধার যে।* ***বাড়ান*** *=* ***বাড়া*** *অন (on) যাহাতে।* ***বাড়াবাড়ি*** *=* ***বাড়া*** *ও* ***বাড়ি****। (দ্র.* ***কেশাকেশি****)।* ***বাড়ি*** *=* ***বাড়*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; যেখানে* ***বাড়ান****র ক্রিয়া চলে, কিংবা, যে স্থান* ***বেড়া*** *(নিম্নে* ***বেড়*** *দ্র.) দিয়ে রাখা হয়েছে।* ***বাড়িখোর*** *=* ***বাড়ি*** *খায় যে।* ***বাড়িমারা*** *= যাহাতে* ***বাড়ি*** *মারা হয়।* ***বাড়ী*** *=* ***বাড়ি****র আধার যে।* ***বাঢ়*** *= বাড়-এর বিশেষ স্থির রূপ যাহাতে।* ***বাঢ়খাওয়া*** *=* ***বাঢ়*** *(বাড়াবাড়ি করার বিশেষ উন্মাদনা) খাওয়া থাকে যাহাতে। /* **বাড়ন্ত** = যাহা বাড়ে। **বাড়ি** = বাড়ের থাম্বা। (ব.শ.)। ৩. **বাড়**

(বাঢ়) = বেষ্টন, বেড়া, ঘেরা, দেয়াল, ভিত, মাছ ঘেরার নিমিত্ত বাঁশের একপ্রকার বেড়া, বাগদির পাটা, নৌকার পার্শ্ব বা ডালি, বাণের মূলে পার্শ্বদেশে বদ্ধ পক্ষ, দেহের ভগ্নাস্থি যথাস্থানে রাখার নিমিত্ত পার্শ্বে বদ্ধ পাতলা তখতা; বৃদ্ধি, প্রবলতা, আস্পর্দ্ধা, প্রভুত্ববৃদ্ধি, প্রভাব, অভ্যুদয়, উন্নতি, চালচলনে বাড়াবাড়ি; বৃদ্ধি পাওয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, স্থূল, পীন বা গুরু হওয়া, লম্বা হওয়া ... ইত্যাদি; বেষ্টন করা, বেড়া, ঘেরা। **বাড়তি (বাড়তী)** = সংখ্যায় বা পরিমাণে বৃদ্ধি। **বাড়ন্ত** = বৃদ্ধিশীল (চাল বাড়ন্ত — অর্থাৎ চাউল নাই। চাউল লক্ষ্মীর দ্রব্য, 'চাউল নাই' বলিলে 'লক্ষ্মী নাই' বুঝায় বলিয়া, গৃহস্থেরা ঐরূপ শুভবাক্যে উহা প্রকাশ করে।)। **বাড়া (বাড়ান)** = অধিক, বেশী, অমিত, অনন্যসুলভ, অধিক উপাদেয়, গণনায় অধিক ... ইত্যাদি; বৃদ্ধি করা, অধিক করা, বাড়ান (মাত্রায়, সংখ্যায়, আকারে), দীর্ঘ বা লম্বা করা, প্রসারিত করা ... ইত্যাদি। **বাড়াবাড়ি** = অতিবৃদ্ধি, অতিমাত্রা, আধিক্য, প্রাধান্য, আধিপত্য, প্রভুত্ব, বড় আস্পর্দ্ধা, চালচলনের অতিবৃদ্ধি। **বাড়ি** = বৃদ্ধি, সুদ, ধানের সুদস্বরূপ ধান্য, রাজার প্রাপ্য শস্যের অনাদায়ে প্রজার নিকটে প্রাপ্য সুদ-শস্য; দণ্ড, লগুড়, লাঠি, অশ্বাদিচালনার্থ যষ্টি, চাবুক ... ইত্যাদি; দণ্ডের আঘাত। **বাড়িখোর** (দ্র. **বার্দ্ধুষিক**) = বৃদ্ধ্যাজীব, সুদখোর, ধান্যের বৃদ্ধিগ্রাহী, বাড়িখোর, বার্দ্ধুষিক বসিষ্ঠ। **বাড়ী (বাড়ি)** = উদ্বাস্তু সহিত গৃহ, ভিটাসুদ্ধ বা বাগিচাসুদ্ধ ঘর, গৃহ, ঘর, উদ্যান, বাগিচা, বাড়ীর অংশ। (ব.শ.)। **বাড়িমারা** = লাঠি দিয়ে মারা। **বাড়-খাওয়া** = সুদ খাওয়া, বাড়াবাড়ি করার উন্মাদনায় প্ররোচিত হওয়া। ৪. সাধারণ বাংলাভাষীদের মধ্যে শব্দগুলি যথার্থে কমবেশি প্রচলিত, থাকলেও অ্যাকাডেমিতে সব শব্দগুলির প্রচলন নেই। ৫. এই শব্দগুলি নিঃসন্দেহে বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন এবং এই শব্দগুলির প্রতি অ্যাকাডেমি বলতে গেলে একেবারেই উদাসীন। ... এই শব্দগুলির মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক শব্দ হল **বাড়িখোর** ও **বাড়-খাওয়া**। এর মধ্যে আবার **বাড়-খাওয়া** শব্দটি **ভালবাসা** শব্দের মতো বাংলাভাষীর সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি, যা কিনা একশো ভাগ ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক নিয়মে সৃজিত হয়েছে। তাছাড়া গ্রামবাংলার **আলুবাড়ি, বেগুনবাড়ি** ... ইত্যাদি শব্দ তো রয়েছেই। যেখানে আলু কিংবা বেগুন **বাড়িয়ে** নেওয়ার জন্য চাষ করা হয় এবং যে ক্ষেতটি বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, সেইরকম ক্ষেতকে **আলুবাড়ি বেগুনবাড়ি** বলে। ...

ব.শ. **বার্দ্ধুষিক** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে **বাড়িখোর** শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গ্রামবাংলায় যে বড়চাষীরা আশ্বিন মাসের দুর্দিনে দরিদ্র মজুর বা ছোটচাষীদের ধান ধার দিত এবং বদলে পৌষ মাসে নতুন ধান উঠলে এক মণ (শুকনো) ধানে দেড় মণ (কাঁচা) ধান ফেরত নিত, তাদের **বাড়িখোর** বলা হত, এবং সেই **বাড়তি** ধানকে **বাড়**-ধান বা **বাঢ়**-ধান বলা হত। বর্তমানে এই ব্যাপারটি আর প্রচলিত নেই বললেই চলে। কার্যত, এটি খুব একটা খারাপ ব্যাপার ছিল না, বরং দরিদ্রদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। কেননা, দেড় মণ কাঁচা ধান শুকিয়ে গেলে সওয়া এক মণ-এর বেশি কিছুতেই হয় না। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা গ্রাহকের পক্ষে যথেষ্ট বোঝা ছিল না এবং বিপরীতে হীনতার জন্মও দিত না। পরবর্তীকালে তথাকথিত সাম্যবাদীরা এসে এই **বাড়** নেওয়ার ঘোর বিরোধিতা করে এবং **বাড়িখোর**দের বিরুদ্ধে যথেষ্ট নিন্দাবাক্য ছড়ায়। ভেবে দেখতে গেলে, এই সাম্যবাদীরা জগতের নিয়মের বিষয়ে শিশুসুলভ জ্ঞানের অধিকারী। কাউকে ধার দেওয়া এবং বদলে যৎসামান্য সুদ নেওয়া অন্ততপক্ষে দয়া করা বা দান করার চেয়ে যে অনেক ভাল রীতি — এই ব্যাপারটি তারা বুঝতেই পারে না। কেননা, দান বা দয়া গ্রহণ করে যে, সে মনে মনে ছোট হয়ে যায়; এবং বিপরীতে দান বা দয়া করে যে, সে মনে মনে উঁচু হয়ে যায়। বিনিময়হীন দানে দাতা-গ্রহীতার মধ্যে সত্যিকারের মানসিক অসাম্য জন্মায়। কিন্তু কেউ যদি একথা ভাববার সুযোগ পায় যে, অসময়ে নিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সুদসহ ফেরত দিয়েছি, তাতে দাতা-গ্রহীতা কারও অধঃপতন বা উর্ধ্বপাতন ঘটে না, মানসিক সাম্য বজায় থাকে। মানবসমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে এই মানসিক সাম্য বাহ্যসম্পদের সাম্যের চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক এবং জরুরি। এটি থাকলে তবেই বাহ্যিক সাম্য একটা স্তর পর্যন্ত সম্ভব করা যেতে পারে। মানুষ যদি মনে মনে সমান হতেই না পারে, তাহলে তো কোনোদিনই সাম্য বা সামঞ্জস্য আসবে না। যাঁরা দেহের দিক থেকে মানুষকে সমান করার কথা ভাবেন — দেখতে সমান, পকেটের ভারে সমান, গায়ের জোরে সমান ... তাঁরা মানুষে মানুষে সম্পর্কের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মগুলির প্রায় কিছুই জানেন না। তাঁদের এসব শিশুসুলভ ভাবনা বাস্তবে কোনোদিনই সত্য হতে পারবে না। কেননা, এসব চিন্তাভাবনা প্রকৃতিবিরোধী, জৈবিক বিবর্তন-বিরোধী। বিষয়টি অনুভব করে পদার্থবিজ্ঞানী এরভিন শ্রয়েডিংগার তাঁর 'মন ও জড় বস্তু' গ্রন্থে জানান যে — '(তথাকথিত মানবতাবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী) সংস্থাগুলির লক্ষ্য হল শ্রমজীবীদের বেকারত্ব এবং অতিরিক্ত শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং অন্যান্য কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া। ... কিন্তু একটা সত্য সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকা চলে না যে, এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে নিজ দায়িত্ব বহন করা থেকে মুক্তি দিয়ে ... জৈবিক বিবর্তনের গতিকে ভালো করে রূদ্ধ করা হচ্ছে।' অর্থাৎ মানুষকে তার নিজের ঈশ্বরের স্থান থেকে সরিয়ে নয়, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেই মানুষের সাম্যের বা সামঞ্জস্যের দিকে যেতে হবে, আর তার প্রধান উপায় হল, মানুষের সামনে যুগে যুগে গড়ে তোলা বাধাগুলি সরিয়ে দেওয়া, যাতে মানুষ নিজের মতো এগোতে পারে। ...

এ তো গেল **বাড়**-এর কথা। এই **বাড়** ও তৎসঞ্জাত **বাড়া, বাড়ি** ... প্রভৃতি শব্দ এতই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে সৃজিত হয়েছে যে, আপনি চাইলেও এর থেকে নতুন শব্দ বানিয়ে নিতে পারেন, কিংবা একেবারে নতুন অর্থে শব্দগুলিকে ব্যবহারও করে নিতে পারেন এবং বাংলাভাষীগণ তা করেনও। 'হাত **বাড়ালে** বন্ধু, পা **বাড়ালে** রাস্তা' কথাটি তো বাংলাভাষীরই তৈরি। **বড়** > **বাড়** > **বাড়া** > **বাড়ালে** ... এই বিবর্তন বাংলাভাষী কত অনায়াসে সেরে ফেলেছেন। আপনিও চাইলে **বাড়িখোর** শব্দটি 'সুদখোর' শব্দে প্রয়োগ না করে হাংরিদের 'লাথখোর' শব্দের মতো 'বাড়ির বা লাঠির মার খায় যে' অর্থেও ব্যবহার করতে পারেন। প্রেক্ষিত ঠিক থাকলে লোকে তা বুঝেও নিতে পারবে, আপনার কথা বোঝার জন্য তাদেরকে কোনো অভিধান দেখতে হবে না। এভাবেই যথাযথ প্রেক্ষিতে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে, যেমন — 'কটাক্ষে **বাড়ানি** দাও, আগে

বাড়লে চোখ রাঙাও!' কিংবা 'ব্যাঙ্কের **বাড়িমার** পলিসিতে লোন নিয়ে অটো কিনলে লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়।' এখানে **বাড়িমার** কথাটির মানে দাঁড়ায়, 'বাড়তি অংশ মেরে নেওয়া' এবং '**বাড়ির** বা লাঠির মারের মতো মারা'। অথবা, '**বাড়াকাড়া** মিলিয়ে **বাড়িখোর** সিপাইটির এ মাসের আমদানি ... টাকা।' এখানে চাইলে আপনি 'সিপাইটির' বদলে 'কর্পোরেট-ক্যাপিটালের' কথাটি বসিয়ে নিতে পারেন। তাতে টাকার অঙ্কটি অবশ্যই অনেক বেড়ে যাবে।

***বণ্ (বণ্ট্, বেণ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : বঁইটি, বঁটি (বন্টন), বণ্, বণিক(জ), বণিককটক, বণিককর্ম্ম, বণিকক্রিয়া, বণিকপথ, বণিকসার্থ, বণিকিনী, বণিক্য, বণিগ্‌গ্রাম, বণিগ্‌জন, বণিগ্‌বৃত্তি, বণিঙ্‌মার্গ, বণিজ, বণিজি, বণিজ্য, বণিজ্যা, বণ্ট্, বণ্ট, বণ্টন, বণ্টিত, বণ্ঠ, বণ্ড, বাঁট, বাঁ(বা)টখারা, বাঁটা, বাঁ(বা)টালি, বাঁ(বা)টুল, বাঁ(বা)টোয়ারা, বাঁড়া, বাঁড়ুয্যে (দ্র.বন্দ্), বাইনানী, বাণ, বাণগোচর, বাণতৃণ, বাণপথ, বাণবর্ষণ, বাণবর্ষী, বাণবার, বাণ-মারা, বাণমুক্তি, বাণমোক্ষণ, বাণলিঙ্গ, বাণা, বাণাসন, বাণি, বাণী, বাণিজ, বাণিজক, বাণিজিক, বাণিজ্য, বাণিজ্য, বাণিয়া, বাণিয়া, বাণিয়ানী, বাণেশ্বর, বাণ্ডিল, বাণ্যা, বাণ্যানী, বান্যানী, বেণ্(ন্), বেণ, বেণব, বেণানী, বেণি, বেণিয়া, বেণী, বেণীগারদ, বেণীবন্ধ, বেণীবোধিনী, বেণীমাধব, বেণীমোক্ষ, বেণীসংহার, বেণীস্নান, বেণু, বেণুক, বেণুকার, বেণুগুল্ম, বেণুজ, বেণুদল, বেণুবাদক, বেণুবাদন, বেণুবাদ্য, বেণুবীজ, বেণুযব, বেণুযষ্টি, বেণুশয্যা, বেণে, বেণেবউ, বেণেতি(তী), বেণেনী, বেণো, বেণ্যা, বেণ্যানী, বায়না, বেগুনবাড়ি, বেটে, বৈণ, বৈণব, বৈণবিক, বৈণিক, বৈণবী, বৈণ্য।

বণ্ (বণ্ট্, বেণ্) = বাহীর টঙ্কারজনিত রহস্যরূপ অন (on) থাকা। **বণ** = বাহীর টঙ্কারজনিত রহস্যরূপ অন (on) যাহাতে। **বণ্ট = বণ্** টঙ্কারিত যাহাতে। **বেণ** = দিশাগ্রস্ত বাহীর টঙ্কারজনিত রহস্যরূপ অন (on) যাহাতে। (এই ক্রিয়ামূল তুলনায় অনেকটাই অব্যক্ত। একটি সত্তা ভেতরে বাহিত হচ্ছে, টঙ্কারিত হচ্ছে, কিন্তু তার কোনো সুস্পষ্ট প্রকাশ নেই, যেন সত্তাটির ভেতরে একটা **বঁ বঁ** ব্যাপার রয়েছে। সেই **বঁ** যখন কৃত্রিম, মনুষ্যসৃষ্ট, তখন তা **বণ-বণ** করা; আর যখন তা স্বতঃসিদ্ধ, নিজে থেকে **বঁ বঁ** করছে, তখন **বন-বন** করা। দুটোই **বঁ-বঁ** শব্দ করা হলেও, পার্থক্য আছে। যে কারণে **বণ** থেকে **বাণ** হয়, আর **বন** থেকে **বন্য, বন্যা, বান** হয়। ... এইসব অব্যক্ত আধা-অব্যক্ত পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। সুবিধা হল, তবুও একটা কার্যকরী অর্থ উদ্ধার করে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। অসুবিধা হল, তাতে ভুল অর্থে পৌঁছনোর সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাসত্ত্বেও আমাদের কাজ চলার মতো একটা মানে তো পেতেই হবে। সেই কথা মনে রেখে আমরা **বণ** শব্দের 'বাহীর টঙ্কারজনিত রহস্যরূপ অন যাহাতে' অর্থের মানে বুঝব — মানুষের তৈরি করা বস্তু বা বিষয়। কারণ, তার ভিতরে মানুষের মেধা-শ্রম-বহনকারীর টঙ্কারজনিত রহস্যরূপ অন হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ **বণ** মানে, 'যার ভিতরে মানুষ-প্রদত্ত স্বভাব বহনকারী অন হয়ে রয়েছে।' তাহলে তো **বন** শব্দের মানে হয়ে যাবে, 'যার ভিতরে **প্রকৃতিপ্রদত্ত** স্বভাব-বহনকারী অন হয়ে রয়েছে'। ঠিক তাই। একই নিয়মে **বণ্ট** কথাটির মানে হবে 'মানুষিক উৎপন্নাদি বেঁটে দেওয়া বা বিলিয়ে দেওয়া' এবং **বেণ** কথাটির মানে হবে 'দিশাগ্রস্ত **বণ** থাকে যাহাতে।')

বঁটি : ২. *রহস্যরূপী বাহীর টঙ্কার গতিশীল যাহাতে; অর্থাৎ, যাহার দ্বারা কেটে কেটে বাঁটা বা **বণ্টন** করা হয়।* ৩. তরকারী কোটার বাঁট-দেওয়া অস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বণিক্, বণিজ্ (বণিক্‌কটক, বণিক্‌পথ, বণিক্‌সার্থ, বণিকিনী, বণিক্‌গ্রাম, বণিক্‌বৃত্তি, বণিঙ্‌মার্গ, বণিজ্য, বাণিজ, বাণিজক, বাণিজিক, বাণিজ্য, বাণিজ্যা) : ১. ✓বণ্ + ইজ্ (ইজি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বণিক*** = *বাহীর (টঙ্কারজনিত) রহস্যরূপকে গতিশীল করে যে।* ***বণিজ*** = *বাহীর (টঙ্কারজনিত) রহস্যরূপকে গতিশীলভাবে জনন করে যে।* ***বণিজ্য*** = ***বণিজ*** *থাকে যাহাতে।* ***বাণিজ*** = ***বণিজ*** *হইতে জাত।* ***বাণিজক*** = ***বাণিজ*** *করে যে।* ***বাণিজিক*** = ***বাণিজ****কে গতিশীল করে যে।* ***বাণিজ্য*** = ***বাণিজ*** *থাকে যাহাতে।* ***বাণিজ্যা*** = ***বাণিজ্য****-এর আধার যে।* / **বণিক্‌পথ** = বণিকের পন্থা। (ব.শ.)। ৩. **বণিক্, বণিজ** = ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারী নৈগম, সওদাগর (বণিক পঞ্চবিধ — গান্ধিক, শাঙ্খিক, কাংস্যক, মণিকারক, সুবর্ণজীবী), বৈশ্য, (জ্যোতিষে) করণবিশেষ, বণিজকরণ, তুলারাশি। **বণিক্‌কটক, বণিক্‌সার্থ** = বণিকসমূহ। **বণিক্‌পথ** = বণিকের জীবিকাপথ, বাণিজ্য, স্থলপথবাণিজ্য, আপণ, হাট, রাজপথ। **বণিকিনী** = বণিকস্ত্রী, বেণেনী। **বণিক্‌গ্রাম** = বণিক্‌সমিতি, সওদাগরী সভা। **বণিক্‌বৃত্তি, বণিকভাব** = বাণিজ্য। **বণিঙ্‌মার্গ** = বণিগ্‌বৃত্তি, ব্যবসায়। **বণিজ্য** = বণিগ্‌ভাব, বাণিজ্য। **বাণিজ** = বণিক্। **বাণিজক** = বণিক্, বণিগ্‌বৃত্তিজীবী। **বাণিজিক** = বাণিজ্যজীবী, বণিক্। **বাণিজ্য, বাণিজ্যা** = বণিক্‌কর্ম্ম, ব্যবসায়। (ব.শ.)। ৪. merchant অর্থে **বণিক**, এবং trade তথা commerce অর্থে **বাণিজ্য** শব্দ দুটি প্রচলিত। বাকি সবই অপ্রচলিত। আজকাল Chamber of Commerce শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় **বণিকসভা**। কিন্তু কোনো বাংলা অভিধানেই এই শব্দটি নেই। ৫. দ্র. **অম্রিকা**। এখানে আমরা কেবল **বণিক** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে কথা বলব এবং এই ব্যাপারটির ঐতিহাসিক সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলব নিম্নে **বেণ** শব্দের ব্যাখ্যায়।

যে নিয়মে পথ > পথিক, রস > রসিক, ধন > ধনিক ... ইত্যাদি হয়, সেই একই নিয়মে **বণ** থেকে **বণিক** হয়। সবাই জানেন, পথ দিয়ে যায় পথিক, রসপান করে রসিক, ধন অর্জন করে ধনিক। কিন্তু **বণিক** কী করে? সে কি **বণ** দিয়ে যায়? সে কি **বণ** পান করে? সে কি **বণ** অর্জন করে? না, এর কোনোটিই **বণিক** করে না। সে **বণ**কে গতিশীলভাবে বা সক্রিয়ভাবে জনন করে। তার ফলে **বণ**কে গতিশীল বা সক্রিয় করা হয়ে যায়। তাই তাকে **বণিজ** না বলে **বণিক** বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল, **বণ**কে গতিশীলভাবে বা সক্রিয়ভাবে

জনন করা কীরূপ ব্যাপার?

মানুষপ্রদত্ত-স্বভাব বাহী সত্তা **বঁ-বঁ** বা **বণ-বণ** করে। অর্থাৎ, মানুষের উৎপাদিত বস্তু বলতে থাকে 'রহস্যরূপ বহন করছি', 'রহস্যরূপ বহন করছি' ... ইত্যাদি। কারণ, সে তো মানুষের শ্রম ও মেধা নিয়ে, ধরা যাক, কাঠ থেকে টেবিল হয়ে গেছে। এই টেবিলের ভিতরে থেকে সে তো আওয়াজ দিচ্ছে — 'এখানে আমি আছি, তোমার জন্য আমার ব্যবহারযোগ্যতা আছে। আমাকে গ্রহণ করে ব্যবহার করো!' এই হল **বণ-বণ** করা। একালের ভাষায় বললে, বলতে হয়, **পণ্য** তার 'ব্যবহারিক মূল্য'-এর বা use value-র কথা salesman-এর মুখ দিয়ে বলতে থাকে। **বণিজ** তাকে গতিশীলভাবে জনন (ইজ্) করে অর্থাৎ তার সঙ্গে আরও কিছু মূল্য জুড়ে দিয়ে তার 'বিনিময় মূল্য' বা exchange value নির্ধারণ করে দেয়, যা কিনা তার use value-র চেয়ে বেশি। এর পরে হয় লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়। এইভাবে **বণ**কে গতিশীলভাবে জনন ক'রে লেনদেন করে বলেই সে **বণিক** পদবাচ্য হয়ে যায়। (দ্র. **ইক**)।

৬. Venice। বহিরাগত আদি বণিকেরা (**বণিজ**) Venice শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের ইতিহাসে একথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের একটি আচারের কথা পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরাই লিখে গেছেন, যা আমাদের **অদ্রিকা**র ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। ভেনিসের শাসক বছরের এক বিশেষ দিনে একটি আংটি Adriatic (**অদ্রিকা**?) সমুদ্রের জলে ফেলে দিতেন, সমুদ্রের সঙ্গে শহরের বিবাহের প্রতীক হিসাবে। আমাদের ইতিহাসে **উপরিচর-বসু অদ্রিকা**কে বিবাহ করেছিলেন।

বণ্ট (বণ্টক, বণ্টন) : ১. ✓বণ্ট্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বণ্ট*** = ***বণ*** *টঙ্কারিত যাহাতে।* ***বণ্টন*** = ***বণ্ট*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বণ্টক*** = ***বণ্টন*** *করে যে।* ৩. **বণ্ট** = বিভাজন, বাঁটা। **বণ্টক** = বিভাজক। **বণ্টন** = বিভাজন। (ব.শ.)। ৪. distribution অর্থে প্রচলিত। ৫. হ্যাঁ, **বণ্টন** শব্দটির অর্থ 'বেঁটে দেওয়া' বটে, কিন্তু আকাশ বাতাস গাছ গাছালি বেঁটে দেওয়া নয়। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসারে **বণ্টন** করা মানে হল, উৎপাদিত বস্তু বেঁটে দেওয়া; যে উৎপাদিত বস্তুর ভিতরে 'মানুষের শ্রম-মেধাবাহী-সত্তা' **বঁ-বঁ** বা **বণ-বণ** করে, সেই বস্তু বেঁটে দেওয়া। তবে পরবর্তীকালে সবরকম বস্তু বিলিয়ে দেওয়াই **বণ্টন** শব্দের মানে হয়ে যায়।

বণ্ড (বাঁড়রী, বাঁড়ুয্যা, বাঁড়া) : ২. **বণ্ড** = ***বণ****-এর উড্ডয়ন থাকে যাহাতে।* ***বাঁড়রী*** = *বাড়িবার (বৃদ্ধিলাভের) রহস্য (উপায়, বিদ্যাবুদ্ধি) রহে যে আধারে।* ***বাঁড়ুয্যা*** = *বাড়িবার (বৃদ্ধিলাভের) রহস্য (উপায়াদি) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যাহাতে (যে উন্নীত বিদ্যায়), তাহার আধার।* ***বাঁড়া*** = *বাড়িবার (বৃদ্ধিলাভের) রহস্য রহে যে আধারে; যাহা বংশকে বাড়ায়।* ৩. **বণ্ড** = অবিবাহিত, খণ্ডিতলাঙ্গুলাদি, হস্তাদিবিকল, বেঁড়ে, অনাবৃতমেঢ্র নপুংসক, শিশ্ন। **বাঁড়রী, বাঁড়ুয্যা** = বন্দ্যোপাধ্যায়। (ব.শ.)। **বাঁড়া** = পুরুষাঙ্গ, শিশ্ন। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. **বাঁড়ুয্যা** বা **বাঁড়ুয্যে** ব্রাহ্মণের পদবী রূপে প্রচলিত। **বাঁড়া** penis অর্থে প্রচলিত। বাকি **দুটি** শব্দ এখন অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বড়, বাড়, বাড়বাগ্র**। বাংলাভাষী কেন যে 'বন্দ্যোপাধ্যায়'কে **বাঁড়রি, বাঁড়ুয্যে** ইত্যাদি বলেন, এবং পাশাপাশি penis-কে **বাঁড়া** বলেন, তার রহস্য অনেকেই জানেন না। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, এককালে **বাঁড়ুয্যে**রা বা **বন্দ্যোপাধ্যায়**-পদবীধারী **ব্রাহ্মণ**গণ ছিলেন **ব্রহ্ম**-গুণসম্পন্ন বা বৃদ্ধিকরণ-বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন **দক্ষ** মানুষ; যাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বৃদ্ধিলাভের সমৃদ্ধিলাভের বিদ্যাবুদ্ধি দিতেন। সেজন্যই তাঁদের নাম হয়েছিল **বাঁড়রী** বা **বাঁড়ুয্যে** বা **বাঁড়ুয্যা**। এমনকি ভারতের স্বাধীনতার আগে-পরে আমরা দেখছি দিক্‌পাল বাংলাভাষীরা অনেকেই মূলত **বাঁড়ুয্যে** — রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ... এঁরা আসলে **বন্দ্যোপাধ্যায়**-বংশীয় ছিলেন। এমনকি তাঁদের পরেও যাঁরা দাপিয়ে গেছেন, সেই তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক — এঁরাও ছিলেন 'তিন **বাঁড়ুয্যে**'। তবে আদিকালের আদি **বাঁড়ুয্যে**রা যতদিন মানসিক সমৃদ্ধির বিদ্যাবুদ্ধি দানের কাজটা করতেন, ততদিন তাঁদের সম্পর্কে কোনো নিন্দাসূচক শব্দ প্রয়োগ করা হত না। কিন্তু যেদিন থেকে তাঁদের কেউ কেউ কেবলমাত্র বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধির বা **বণিকের** পরামর্শদাতা (পুঁজিবাদের অ্যাডভাইসার) হয়ে গেলেন, সেদিন থেকে তাঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু নিন্দাসূচক শব্দ প্রয়োগ করা শুরু হল। তখন থেকে বঙ্গসমাজে **বেঁড়ে** বামুন নিন্দনীয় হয়ে গেলেন।

মানুষের পুরুষাঙ্গকেও বাংলাভাষী **বাঁড়া** নাম দিয়েছিল, কেননা, সেও বংশকে বাড়ানোর উপায় রূপে কাজ করে। তবে এই শব্দটিকে আমাদের অ্যাকাডেমি যে অশ্লীল বলে বাদ দিয়ে থাকে, সে তাদের পাশ্চাত্য অনুকরণের ফল। শিল্পবিপ্লবের পর পাশ্চাত্য কেন নরনারীর মিলিত হওয়ার অঙ্গগুলিকে 'অশ্লীল' বলতে গেল, তার কারণ আমরা **শ্লীল-অশ্লীল** শব্দে ব্যাখ্যা করেছি। কার্যত সাঁড়াশি, হাতুড়ি প্রভৃতি হাতিয়ারের যেমন শ্লীল-অশ্লীল হয় না, আমাদের বিচারে শব্দেরও কোনো শ্লীল-অশ্লীল হয় না, হতে পারে না। নিজের পাপ ঢাকা দেওয়ার জন্যই কেবল এরকম ধারণার জন্ম হতে পারে, পাশ্চাত্যে তাই হয়েও ছিল। আমাদের পাশ্চাত্য-অনুসারী অ্যাকাডেমিশিয়ানরা পাশ্চাত্যের সেই শ্লীল-অশ্লীল ধারণাকে অনুকরণ করে বাংলাভাষাতেও সেই ধারণার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আমরা তাঁদের সেই ধারণায় বিশ্বাস করতে রাজি নই। বিশ্বাস করতে গেলে **বাঁড়ুয্যে**রা তাঁদের অতি গৌরবের পদবীটাই হারাবেন!

বাণ (বাণগঙ্গা, বাণলিঙ্গ) : ১. ✓বণ্ + অ (ঘঞ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বাণ*** = ***বণ*** *হইতে জাত।* / ***বাণগঙ্গা*** = বাণনিঃসারিতা গঙ্গা। **বাণলিঙ্গ** = বাণপূজিত লিঙ্গ। (ছা.অ.)। ৩. **বাণ** = শর, বাণাবয়ব, পুঙ্খ, (কামের শরসংখ্যানুসারে) ৫ সংখ্যা, (সাদৃশ্যে) গোস্তন, অগ্নি, বীণাবিশেষ, দৈত্যরাজবিশেষ (ইনি বলির পুত্র। ... ইনি শৈব। ...), কাদম্বরী-হর্ষচরিত-প্রণেতা কবি বাণভট্ট, বেগে রক্তস্রাব, আভিচারিক মন্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। দৈত্যরাজ বলির একশত পুত্রের মধ্যে বাণ শ্রেষ্ঠ। বাণ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর অনুগ্রহভাজন হন এবং তাঁরই আদেশানুসারে শোণিতপুরে

রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকেন। শিবভক্ত বলে বাণ দেবতাদের অজেয় ... ছিলেন। বাণের কন্যা ঊষা কৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন ... এবং গান্ধর্বমতে তাঁকে বিবাহ করেন। ... শুনে বাণ স্বয়ং যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ... তারপর কৃষ্ণের হাতে বাণ পরাজিত হন। পরিশেষে বাণ কৃষ্ণের দয়ায় মহাকাল নামে বিখ্যাত হয়ে মহাদেবের অনুচরগণের মধ্যে গণ্য হন। তাঁর শোণিতপুরের রাজ্য কৃষ্ণ বাণ-মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডকে দান করেন। (পৌ.অ.)। **বাণগঙ্গা** = রাবণবাণ নির্ভিন্ন সোমেশ্বর-গিরিভব নদীবিশেষ। **বাণলিঙ্গ** = নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষিপ্ত শিবলিঙ্গবিশেষ। (ছা.অ.)। **৪.** arrow অর্থে **বাণ** শব্দটি বুঝে থাকেন একালের শিক্ষিত বাংলাভাষীরা। কিন্তু গ্রামবাংলায় এখনও লোকে **বাণ** বলতে এমন কোনো অস্ত্রকে বোঝেন, যা চোখে দেখা যায় না। **৫.** মার্কসসাহেব লিখছেন, 'পণ্য উৎপাদিত হয়ে তার মালিকের খোঁজ করে, উদ্দেশ্য, সে তার মালিককে বলবে, তোমার জিভটা আমাকে ধার দাও, আমি আমার দামের কথা বলি।' অর্থাৎ, 'মানুষের শ্রম-মেধা-বাহী' উৎপাদিত বস্তু তো **বণ-বণ** করছে, তার ভেতরের 'ব্যবহারযোগ্যতা'র কথা জানান দিচ্ছে, কিন্তু তা স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। স্পষ্ট করে বলার জন্যই **বণ** থেকে জাত হয় **বাণ**। এই **বাণ** আসুরিকভাবে ব্যবহার করেন **বাণাসুর**, আর স্বভাবে ব্যবহার করেন স্বয়ং **বাণলিঙ্গধারী বাণেশ্বর** শিব। ... (দ্র. **বাণী**)। ...

গ্রামবাংলায় **বাণ** সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, সে **বাণ** মারা হয় মন্ত্রের সাহায্যে। এবং যাকে মারা হয়, সে সেই **বাণ**বিদ্ধ হওয়ার ফল ভোগ করে। সেই **বাণ** যদি মৃত্যু**বাণ** হয়, তবে তার মৃত্যু হয়; যদি ভেদ**বাণ** হয়, তবে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে; যদি খঞ্জ**বাণ** হয়, তবে তার পা ভেঙে যায় ... এরকম অজস্র ব্যাপার রয়েছে। মোটকথা এখনও গ্রামবাংলায় **বাণ** শব্দের যে অর্থ বোঝা হয়ে থাকে, তাতে সে **বাণের** সঙ্গে তীরধনুকের কোনো সম্বন্ধ দেখা যায় না। সবটাই যেন তান্ত্রিকদের এলাকার ব্যাপার বলে মনে হয়।

কিন্তু যেই না আপনি কামদেবের **পঞ্চবাণ** বিষয়ে জানতে চাইবেন (দ্র. **পুষ্পকেতন**), তখনই দেখতে পাবেন, এই **বাণ**কে আপনিও চেনেন; হাড়ে হাড়ে চেনেন! তখন একথা বুঝতেও আপনার আর অসুবিধা হবে না, কেন **বাণ** শব্দটি '**বণ** হইতে জাত'। (দ্র. **বণিক**।) তখনই আপনার বোধোদয় হবে যে, আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা বিষয়টি জানতেন বলেই এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের তা জানান উচিত বলেই তাঁরা আমাদের শৈশবেই আমাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন — 'পাঁচে পঞ্চবাণ'। ক্রমে একথাও বোধগম্য হয়ে যাবে যে, এই **বাণের** সঙ্গে তীরধনুকের কোনো সম্পর্ক নেই, অনেক বেশি সম্পর্ক রয়েছে **বাণী**র সঙ্গে।

বাণী : **১.** ✓বণ্ (শব্দ) + অ (ঘঞ্), ই (ইণ্) - কর্ম্মবাচ্যে বিকল্পে স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। **২.** ***বাণ**-এর গতিশীল আধার যে।* **৩.** উক্তি, বাক্য, বচন, ভারতী, রব, কূজিত, সরস্বতী, কথা, বৃত্তান্ত, বার্ত্তা, সংবাদ। (ব.শ.)। **৪.** 'মনীষী-বাক্য' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** মনীষীদের উক্তি বা বচন বা **বাণী**গুলি মানুষের শত্রুদের চোখে, শয়তানের চোখে **বাণই** বটে। কারণ, সেই **বাণী**গুলি মানুষের ষড়রিপুকে বা **শয়তানকে** ঘায়েল করে। কার্যত, **গদা**, **বাণ** ... এসব অস্ত্রই বটে, তবে দৃশ্য অস্ত্র নয়, মানুষের মুখের কথা মাত্র। 'কথার মার' মারা হয় যে সকল কথার সাহায্যে, তাদের নাম হল **গদা** ও **বাণ**। সেই **গদা** যিনি ধারণ করেন, তিনি স্বয়ং **গদাধর**-নারায়ণ এবং **বাণ**-এর অধিকারিণী স্বয়ং **বাণী** বা সরস্বতী। সর্বোপরি রয়েছেন স্বয়ং **বাণেশ্বর শিব**।

বেণ (বেণু - নিম্নে পুনরায় বেণু শব্দটি থাকবে) : ১. ✓বেণ্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বেণ** = দিশাগ্রস্ত **বণ** যাহাতে। **বেণু** = **বেণ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **বেণ** = বাদ্যভাণ্ড গ্রহণ করে যে। **বেণু** = বাদিত্রক্রিয়া গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। **৩.** সঙ্কীর্ণজাতি-বিশেষ (ইহারা বৈদেহক পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যজাতা অম্বষ্ঠীতে উৎপাদিত। করতালমৃদঙ্গাদি-বাদন ইহাদের বৃত্তি।), পৃথুরাজের পিতা (ইঁহার পিতা অঙ্গ, মাতা সুনীথা। দুঃশীলতা হেতু ইনি পুর হইতে বহির্গত হন। একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগরূপ পশুধর্ম্ম ইঁহার শাসনকালে প্রচলিত হয়। ইনি বর্ণসঙ্কর জাতির প্রবর্ত্তক।), বেণুভেদজীবী জাতিবিশেষ, বাদিত্রজীবিত জাতিবিশেষ। (ব.শ.)। অত্রিবংশে অঙ্গ নামে এক রাজার জন্ম হয়। তাঁর সঙ্গে মৃত্যুনন্দিনী সুনীথার বিবাহ হয়। তাঁদের পুত্র বেণ। (হরিবংশপুরাণ।) ... অঙ্গরাজের ঔরসে ও সুনীথার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ প্রবলপরাক্রান্ত, অধার্মিক, ও অত্যন্ত প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন। ... তিনি রাজ্যমধ্যে যাগযজ্ঞাদি বা বলিদান প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং নিজেকেই যজনীয়, যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞস্বরূপ বলে প্রচার করেন। একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগরূপ পশুধর্ম এঁর শাসনকালে প্রচলিত হয়। ... বেণের চৈতন্য সম্পাদনে অসমর্থ মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রপূত কুশদ্বারা তাঁকে বিনাশ করেন। তারপরে তাঁরা মৃত বেণের দক্ষিণ উরু (মতান্তরে বাম বাহু) মন্থন করতে থাকেন। তাতে এক খর্বদেহ কদাকার দগ্ধ কাষ্ঠতুল্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। ঋষিগণ তাকে বলেন, 'নিষাদ' অর্থাৎ উপবেশন কর। এই পুরুষ থেকে বন ও পর্বতবাসী নিষাদ এবং ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি হয়। তারপর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করায় রূপবান অপর একটি পুরুষের আবির্ভাব হয় — এর নাম **পৃথু**। ... (পৌ.অ.)। **৪.** **বেণ** শব্দটি অপ্রচলিত হলেও বাংলায় তজ্জাত **বেণিয়া** এবং ইংরেজিতে তজ্জাত banyan (tree) আজও প্রচলিত রয়েছে। **৫.** দ্র. **চণ্ডাল**, **পৃথু**, **বিরজা**। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে যে কয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল ঘটেছে তার মধ্যে **প্রজাপতি বেণ**-এর আবির্ভাব ও তিরোভাব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের অধ্যায়। এই অধ্যায়ে মানবসভ্যতা অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিশেষ দিকে বাঁক নিয়ে চলতে শুরু করে। তবে সেসব কথায় যাওয়ার আগে আমরা **বেণ** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থটি আরও ভালভাবে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

ব.শ. জানাচ্ছেন যে, **বেণ** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল — 'বাদ্যভাণ্ড গ্রহণ করে যে'। এদিকে আমরা দেখছি, 'দিশাগ্রস্ত **বণ** থাকে যাহাতে', সে সত্তাই **বেণ**। অর্থাৎ, সকল প্রকার **বণ** যে সত্তার

দিকে যায় বা কেন্দ্রীভূত হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ দিকে চলে যায়, সেই সত্তাই **বেণ**। **বেণ**ই **বণ**সমূহকে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়! তাহলে তো আমরা যাকে **বণ** বলছি, ব.শ. তাকেই শুধুমাত্র গ্রহণের দিক থেকে শনাক্ত করে বলছেন 'বাদ্যভাণ্ড'! আবার, **বাদ্য** শব্দ থেকে আমরা জানতে পারছি, 'যার ভিতরে **বাদ** থাকে' অর্থাৎ 'কিছু কথা (বদতি) থাকে', সেটিই **বাদ্য**। তার মানে, **বাদ্যভাণ্ড** হল এমন একটি সত্তা, যার ভিতরে বলার মতো কিছু 'কথা' থাকে। সেই 'কথা'কেই একটু আগে আমরা **বাণ** ও **বাণী** থেকে চিনেছি; একটু পরে তাকেই আমরা আরও চিনতে পারব 'বাদিত্রক্রিয়াগ্রাহক'-**বেণু** রূপে। এ তো আসলে 'মানুষের শ্রম-মেধা-**বাহী** টঙ্কারজনিত সত্তা' অর্থাৎ **বণ**; একালের ভাষায় যাকে বলে মানুষের উৎপাদিত বস্তু, সেকালে যাকে বলা হত **পুরোডাশ** (product), যা **পণ্য**তে বা commodity-তে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে। এই হবু-**পণ্য**ই হল সেই **বাদ্যভাণ্ড**, যা **বঁ-বঁ** বা **বণ-বণ** করছে, কস্তুরীমৃগের মতো আপন গন্ধের কথা **বণ**রূপে **বণ্টন**রূপে **বাণ**রূপে **বাণী**রূপে **বেণু**রূপে সমাজসদস্যদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তাহলে তো **বেণ** হলেন সেই সত্তা যিনি সর্বসম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁদের **বণ**সমূহ (বাদ্যভাণ্ডসমূহ = উৎপাদিত বস্তুসমূহ) গ্রহণ করেন, এবং যাদের তা প্রয়োজন আছে তাদের কাছে **বণ্টন** করেন। তার মানে **বেণ** হলেন একালের **বেণিয়া** বা বিনিময়জীবী দোকানদার সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ! ...

পুরাণাদি অনুসারে এশিয়ার ইতিহাসে **প্রজাপতি বেণ**-এর আবির্ভাব **দক্ষে**র আবির্ভাবের মতোই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাষ্ট্রহীন আদিম যৌথসমাজ তার সনাতন যুগে **প্রজাপতিপদবাচ্য** মহানদের নেতৃত্বে যে অধিরাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল, **দক্ষ** যে অধিরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিয়ে **অত্রি** প্রজাপতির মাধ্যমে **প্রজাপতিতন্ত্রের** সূচনা করেন, **বেণ** সেই রাষ্ট্রপূর্ব-প্রজাপতিতন্ত্রের শেষ **প্রজাপতি**। **বেণ**-এর পরই **অধিরাষ্ট্রে**র অধীনে **পৃথু**র বা আদিরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, মানবসমাজে রাষ্ট্রতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। (একালে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো হয়, সে না জানে অধিরাষ্ট্রের কথা, না জানে রাষ্ট্রের উদ্ভবের কথা।) তার পরেও **প্রজাপতি**রা থেকেছেন, প্রজাপতিতন্ত্রও থেকেছে, রয়েছে আজও, কিন্তু তার বিশাল সক্রিয়তা ঢাকা পড়ে যায় রাষ্ট্রের সক্রিয়তার পেছনে। দ্র. **পৃথু**। কী ঘটেছিল **বেণ**-এর আবির্ভাবে?

দক্ষ প্রজাপতির সময় থেকে 'দক্ষতার প্রাধান্য' প্রতিষ্ঠিত হয়, আদিম যৌথসমাজ (সনাতন ব্যবস্থা) ভেঙে গিয়ে অজস্র ছোট ছোট সম্প্রদায়ে খণ্ডিত হয়ে (মন্দিরকেন্দ্রিক বৈদিক ব্যবস্থার জন্ম হয়ে) যায় এবং প্রতিটি খণ্ডের শীর্ষে এক বা একাধিক মহর্ষি **প্রজাপতি** রূপে যে-যার সম্প্রদায়কে পূর্বতন যৌথসমাজের নিয়মেই পরিচালনা করতে থাকেন। অর্থাৎ এই সম্প্রদায়গুলি ছিল এক একটি টুকরো যৌথসমাজ। ব্যক্তিমালিকানা তখনও বহুদূরের ব্যাপার, শুধুমাত্র বেদের বা জ্ঞানের **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জ্ঞানীরা বলতে পারছেন — 'এটা আমার জ্ঞান' ... ইত্যাদি। তখন সম্প্রদায়গুলি যে-যার পরিচালক জ্ঞানী-মহর্ষিদের নির্দেশ-উপদেশ অনুসারে চলত এবং সেই মহর্ষিরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করতেন। যেহেতু ইতোমধ্যে **দক্ষতার** প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তার ফলস্বরূপ প্রতিটি সম্প্রদায়ের কিছু কিছু উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হয়ে যায় এবং কিছু বস্তুর অভাব দেখা দেয়। অথচ উদ্বৃত্ত উৎপন্নের বদলে অভাবের বস্তু অন্য কোনো সম্প্রদায়ের উদ্বৃত্ত থেকে নিয়ে আসার কোনো প্রথার সূচনা তখনও হয়নি (দ্র. **কিরাত**); আগের আদিম অখণ্ডিত যৌথসমাজের ক্ষেত্রে যে সমস্যা স্বভাবতই ছিল না। ফলে প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়কে তাদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন 'আবর্জ্জনারূপে' (দ্র. **কিরাত**) ফেলে দিতে হয়, অথচ অন্য কিছু বস্তুর অভাবে কষ্টও পেতে হয়, যা কিনা অপর কোনো সম্প্রদায়ও তাদের উদ্বৃত্ত বলে ফেলে দিচ্ছে! এই সেই পরিস্থিতি, যখন **প্রজাপতি বেণ**-রূপী এক বা একাধিক মহর্ষির আবির্ভাব ঘটে 'বৈদেহক পুরুষ **বেণ**' রূপে। অর্থাৎ **বেণ**-এর নিজস্ব সম্প্রদায় (বা দেহ) ছিল না। তিনি অন্য সব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'আমিই যজ্ঞ, আমিই হোতা এবং আমিই অভীষ্ট-দেবতা; অতএব আজ হইতে আমার যাগ ও আমারই উদ্দেশ্যে সকলকে হোম করিতে হইবে।' তা শুনে সম্প্রদায় পরিচালক মহর্ষিগণ বললেন, '... তুমি **অধর্ম্মা**চরণে প্রবৃত্ত হইও না। **পাপ** আচরণ সনাতন ধর্ম্ম নহে।' (অর্থাৎ, তুমি বিনিময়জীবী হোয়ো না, উৎপন্নকে **পণ্যে** পরিণত করা সনাতন ধর্ম্ম নয়।) **বেণ** বলিলেন, '... আমার ন্যায় শক্তিশালী, তপস্বী ও **সত্যবাদী** আর কে আছে? তোমরা নিতান্ত মূর্খ, তোমাদের **কাণ্ডজ্ঞান** নাই। ...' সত্যিই তো, উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে, অথচ তা কাউকে না দিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে; **কাণ্ডজ্ঞান** থাকলে তেমন কাজ কেই-বা করে! কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এই ভয়ে অতঃপর 'ঋষিগণ' '**অঙ্গনন্দন**' "মহাবল বেণকে নিগৃহীত করিয়া তাঁহার দক্ষিণ উরু (মতান্তরে বাম বাহু) মন্থন করিতে লাগিলেন। ... বেণের উরুস্থল হইতে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় এক পুরুষের আবির্ভাব হইল। জন্মিবামাত্র ঐ পুরুষ ভীতিবিহ্বলহৃদয়ে করপুটে ঋষিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, ঋষিগণ তাহাকে ভীতচিত্ত দেখিয়া কহিলেন 'নিষীদ' (উপবেশন কর)। এই কথা বলাতেই সেই খর্ব্বকায় পুরুষ **নিষাদ**কুলের বীজস্বরূপ হইল।" ... (নিষাদকুলের বীজ মানে দোকানদারির বীজ, বিনিময়-জীবিতার বীজ, ধনতন্ত্রের বীজ, পুঁজিবাদের বীজ।) "তদনন্তর মহর্ষিবৃন্দ পুনর্ব্বার ক্রোধভরে অরণির ন্যায় বেণনৃপতির দক্ষিণহস্ত মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মহারাজ **পৃথু**র জন্ম হইল।" [হরিবংশপুরাণ] অর্থাৎ, মহর্ষিগণ পরিচালিত **অধিরাষ্ট্রে**র (প্রজাপতিতন্ত্রের) অধীনে বিশ্বের আদিরাষ্ট্রের জন্ম হল। ... (উপরোক্ত উদ্ধৃতির মানে বুঝতে গেলে কয়েকটি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ জানা একান্ত জরুরি। আমরা সেই শব্দগুলিকে মোটা অক্ষরে লিখে দিলাম। এই শব্দার্থকোষে শব্দগুলির অর্থ তাদের নিজ নিজ ভুক্তিতে পাওয়া যাবে।)

দেখা যাচ্ছে, সমাজে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের আগে **অধিরাষ্ট্র**মূলক খণ্ড খণ্ড সাম্প্রদায়িক যৌথসমাজের ভেতরে গোষ্ঠীর যৌথ-উৎপন্নই সর্বপ্রথম বিনিময়যোগ্য **পণ্য**রূপে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেছিল। তার মানে মানুষের সমাজে **পণ্য** সর্বাগ্রে উদ্ভূত হয়েছিল 'গোষ্ঠী-মালিকানাভিত্তিক **পণ্য**' রূপে এবং তা ঘটেছিল ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক **পণ্যের** জন্মের বহু আগে, রাষ্ট্রেরও জন্মের আগে; আর এই কাজের হোতা ছিলেন **প্রজাপতি বেণ**। সেই গোষ্ঠী-মালিকানাভিত্তিক

পণ্যবাদিতার হোতাকে, তার গোষ্ঠী**পণ্যে**র উদ্ভবকে পর্যুদস্ত করে অধিরাষ্ট্রই জন্ম দিয়েছিল আদিরাষ্ট্রের। আদি **পণ্যের** এই পরাজয়ে **বণিকের** আদিপুরুষ পরাস্ত হয়ে নিন্দিত (দ্র. **নিষাদ, নিষণ্ণ, নিষদ্যা**) হয়ে যায়। আদিম সমাজতন্ত্রের (বৈদিক ব্যবস্থার) বিরুদ্ধে আদিম ধনতন্ত্রের উঠে দাঁড়ানর প্রথম চেষ্টা এভাবেই নিষিদ্ধ (**নিষাদ**) হয়ে যায়। রাষ্ট্র বা **পৃথু** উদ্ভূত হয়ে সগৌরবে আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বা বৈদিক ব্যবস্থার স্বর্ণযুগের সূচনা করে। ...

এই যে একই ঘটনা থেকে একদিকে রাষ্ট্রের জন্ম ও অন্যদিকে খর্বকায় ধনতন্ত্রের জন্ম — পরবর্তীকালে একেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে লিখলেন অন্য ভাষায় — **ধৃতরাষ্ট্র** ও **পাণ্ডু**র জন্ম হিসেবে। বিশ্বের আদি রাষ্ট্র জন্মান্ধ এবং বিশ্বের আদি ধনতন্ত্র **পাণ্ডু**, জননশক্তিহীন। ...

কিন্তু **বেণ**-এর অর্জনগুলি তো সমাজ ভুলতে পারে না। **বেণ**ই সর্বপ্রথম 'একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগরূপ পশুধর্ম্ম' প্রবর্তন করেন। এর মানে একালের পণ্ডিতেরা বুঝেছেন, অন্য পুরুষকে নিজের বউয়ের কাছে শুতে পাঠানো এবং তার মাধ্যমে পুত্র উৎপাদন করা। আগেই বলেছি, **পুরাণা**দি পাঠ করতে হলে মনটাকে কিছুতেই ছোট করা চলে না, করলেই ভুল অর্থ বেরিয়ে আসবে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 'একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ' মানে একজনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ জমিতে, কারখানায় ... ইত্যাদিতে অন্য লোককে নিয়োগ করা, একালের ভাষায় যাকে বলা হয় appointment দেওয়া। সেকালের ভাষায় এ ছিল '**পশু**ধর্ম্ম', কারণ অন্যের ক্ষেত্রে নির্দেশানুসার কাজ করলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি **পশু**র মতো হয়ে যায়। তার মানে, 'নিয়োগপ্রথা'র বা চাকরি নামক **পশু**সুলভ ব্যাপারটির জন্ম হয়েছিল এই **বেণ**-এর কালেই। তার আগে পর্যন্ত মানুষের সমাজ ভাবতেই পারত না যে, একজন মানুষ আর একজন মানুষকে ডেকে বলবে, 'তুমি আমার এই কাজটি করে দাও, তোমার মজুরিস্বরূপ আমি তোমাকে এই জিনিস দেব।' কিংবা, একজন মানুষ ভাবতে পারত না যে, সে আর একজন মানুষকে গিয়ে বলবে, 'আমাকে তোমার কোনো কাজ থাকলে বলো, আমি করে দিচ্ছি, পরিবর্তে তুমি আমাকে এই পরিমাণ মজুরি দিয়ো।' মোটকথা, একালে তো লোকে চাকরি পাওয়ার জন্য (সেকালের ভাষায় **পশু** হওয়ার জন্য) হা-পিত্যেশ করে, কিন্তু মানুষের সমাজে কাউকে চাকরি দেওয়া, নিজের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োগ করা যে এককালে অকল্পনীয় অবাস্তব ব্যাপার ছিল, এখনকার মানুষ তা ভাবতে পর্যন্ত পারেন না। এখনকার তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের সন্তান যেদিন জন্মায়, সেদিন থেকে তাকে একটি উদ্দেশ্যেই মাত্র বড়ো করা হয়। তা হল কী করে সে বড়ো হয়ে অন্যের মজুর হয়ে (**পশু** হয়ে) জীবন কাটাবে! এছাড়া আজকের গোলোকায়িত সভ্যতায় মানুষের সন্তানের জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্যই নেই। কথাটি অতীব তিক্ত হলেও সত্যি। (আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের 'গ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)। **৬.** ইংরেজি van-যুক্ত, ven-যুক্ত বহু শব্দেই এই **বেণ** শব্দের উত্তরাধিকার রয়েছে।

বেণী (বেণীবোধিনী, বেণীমাধব, বেণীমোক্ষ, বেণীসংহার, বেণীস্নান) : **১. বেণী** = ✓বেণ্ + ই (ইন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে + বিকল্পে স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। **২.** ***বেণী*** = ***বেণ****-এর গতিশীল আধার যে।* / নিম্নে গমন করে যে। (ব.শ.)। **৩. বেণী** = নিম্নগামিনী, প্রোষিতভর্তৃকাকার বদ্ধ **কেশ**, বিরহিণী বদ্ধকচ, কেশবন্ধ, জলসমূহ, জটা, প্রবাহ, নদীসঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম প্রয়াগ, বেণীসংহার নাটক, দেবতাড়বৃক্ষ, নদীবিশেষ। **বেণীবোধিনী** = কঙ্কতিকা, চিরুণী। **বেণীমাধব** = প্রয়াগস্থিত শিলাময় মাধবমূর্ত্তি। **বেণীমোক্ষ** = বেণীবন্ধন মোচন। **বেণীসংহার** = বেণীবন্ধন, (উপচারে) ভট্টনারায়ণ কৃত নাটকবিশেষ। **বেণীস্নান** = প্রয়াগে স্নান। (ব.শ.)। **৪.** মেয়েদের 'বিনুনী' করা চুল অর্থে **বেণী** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** নানাস্থান থেকে **পণ্য**প্রবাহ আসছে, আবার অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, এই অদৃশ্য বিষয়কে বোঝানোর জন্যই **বেণী** শব্দের সৃষ্টি। স্বভাবতই যাদের অভাব আছে এই ধারা তাদের দিকে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ এই ধারা স্বভাবতই নিম্নগামিনী। সাদৃশ্যে তা নদীসঙ্গম, প্রবাহ ... ইত্যাদিকে যেমন বোঝায়, তেমনি ব্যক্তিমালিকের কেশ (case, cash) ইত্যাদিকেও বোঝায়। বিষয়টিকে 'বেণীসংহারবৃত্তান্ত' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বিস্তারিত করা হয়েছে আমাদের 'ঙ' গ্রন্থে।

বেণু (বেণুক, বেণুকার, বেণুগুল্ম, বেণুজ, বেণুদল, বেণুবাদক, বেণুবাদন, বেণুবাদ্য, বেণুবীজ, বেণুযব, বেণুযষ্টি, বেণুশয্যা) : **১.** ✓বেণ্ + উ - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বেণু*** = ***বেণ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / বাদিত্র ক্রিয়া গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. বেণু** = বংশ, বাঁশ, বেষ্টবংশ, বেউড়বাঁশ, নল, বংশী। **বেণুক** = বংশময় হস্তিতাড়ণদণ্ড। **বেণুকার** = বংশীকারক। **বেণুগুল্ম** = বেণুবণ, বাঁশবন। **বেণুজ** = বেণুজাত। **বেণুদল** = সূক্ষ্ম বেণুখণ্ড, বেণুশলাকা। **বেণুবাদক** = বংশীবাদক। **বেণুবাদন, বেণুবাদ্য** = বংশীধমন। **বেণুবীজ, বেণুযব** = বংশবীজ। **বেণুযষ্টি** = বংশদণ্ড। **বেণুশয্যা** = বংশরচিত শয়নস্থান বা খট্টা। (ব.শ.)। **৪.** 'বাঁশী' অর্থে **বেণু** কমবেশি প্রচলিত, বাকি সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫.** ব.শ. জানাচ্ছেন যে, **বেণু** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল — 'বাদিত্রক্রিয়াগ্রাহক'। আমরা জানি, **বাদ**কে (কোনো কিছু কথাকে) গতিশীলভাবে ত্রাণ করে যে, সে হল **বাদিত্র**। এ হল সেই ক্রিয়া, যা ফুঁ দিয়ে বাঁশীর ভিতরে পাঠানো হয় এবং তার থেকে **আবাজ** (আওয়াজ) বা সুরেলা শব্দ রূপে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। **বেণ** শব্দে আমরা দেখেছি, সেও 'বাদ্যভাণ্ডগ্রাহক'। তার মানে, মানুষিক উৎপন্নের **বঁ-বঁ** বা **বণ-বণ** করে আপন কথা বলার চেষ্টাকে বেণী**মাধব** চারিদিকে কেবল **পঞ্চবাণ**-এর সাহায্যে, **বাণী**র সাহায্যেই প্রেরণ করেন না, **বেণু**র সাহায্যেও প্রেরণ করেন। এই **বেণু**র ধ্বনি শুনে অভাবীরা আর থাকতে পারে না। তারা **চাতকের** মতো দৌড়য়। ... মধ্যযুগের বাংলাভাষী এই ব্যাপারটিকে আরও বিস্তারিত করে নিয়ে অত্যুচ্চ শিখরে নিয়ে যান। তাঁদের হাতে **বেণু**র ব্যবহার এত বিপুল পরিমাণে হয় যে, সেটি বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণ**কীর্ত্তন** আর **কীর্ত্তন** থাকে না। ... **৬.** ইংরেজি venue।

বেণে (বাণিয়া, বাণিয়ানী, বেণিয়া, বেণেবউ, বেণেতী, বেণেনী,

বেণো, বেণ্যা, বেণ্যানী, বৈণ, বৈণব, বৈণবিক, বৈণিক, বৈণবী, বৈণ্য) : **৫.** এই সমস্ত শব্দগুলিকে ফেলে দিয়ে এখন আমরা merchant, trader, bussinessman, salesman, hawker ... ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকি। অথচ আমাদের কত অর্থবহ শব্দ ছিল! এমনকি এই যে **বেণিয়া**, তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই তো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (**বটবৃক্ষ**) যা কিনা সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার (**অশ্বত্থ**-র) পাশাপাশি বহুকাল থেকে আজও আমাদের মানসলোকে প্রবাহিত হয়ে চলে আসছে। এই **বেণিয়া**র ধারণাই তো ইংরেজিতে banyan tree হয়ে, vanish, venue ... ইত্যাদি হয়ে প্রচলিত হতে পেরেছে। অর্থাৎ, ঐ গাছটি, ঐ উবে যাওয়া, ঐ গমনস্থান ... ঐ সবই **বেণ, বেণী, বেণু** ... সত্তারই প্রতিরূপ — এই বোধটি পাশ্চাত্যের মানুষের স্মৃতির গভীরে ছিল। **৬.** ইংরেজি banian, vanish, venture, pre*vent*, con*vent*, vandal, wander ... ইত্যাদি।

বদ্ (বাদি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবাদ, অদলবদল, অনবদ্য, অনুবাদ, অপবাদ, অবদ্য, অবিবাদ, অবিসংবাদ, আবলতাবল, আবোলতাবোল, আশীর্ব্বাদ, কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, প্রতিবাদ, প্রতিবাদী, বচ্চর, বচ্ছ, বচ্ছর, বছর, বজ্জাত, বজ্জাতি(তী), বড্র, বত, বতংস, বৎ, বৎস, বৎসক, বৎসকবীজ, বৎসকাম, বৎসতর, বৎসতরী, বৎসদন্ত, বৎসনাভ, বৎসপত্তন, বৎসপদ, বৎসপাল, বৎসপালক, বৎসর, বৎসল, বৎসাসুর, বদ্, বদ, বদকথা, বদকাম, বদকার, বদকারী, বদখত, বদখদ, বদখাসলত, বদখেয়াল, বদখেয়ালি, বদজবান, বদজাত (বজ্জাত), বদজাতি, বদজোবান, বদদোয়া (বরদোয়া), বদন, বদনকঞ্জ, বদনচন্দ্রমা, বদপঙ্কজ, বদনপবন, বদনবাদ্য, বদনমদিরা, বদনশ্যামিকা, বদনসিব, বদনসুধাকর, বদনা, বদনাম, বদনাসব, বদনিয়ত, বদবখ্ত, বদবখতি, বদবু, বদবো, বদভ্যাস, বদমতলব, বদমাইশ, বদমাইশি, বদমাশ, বদমাশি, বদমায়েশ, বদমায়েশি, বদমেজাজ, বদমেজাজি, বদর, বদরং, বদরঙ, বদরক্ত, বদরবল্লী, বদরসিক, বদরাগ, বদরিকা, বদরিকাশ্রম, বদরাগী, বদরী, বদরীতি, বদরীনাথ (বদ্রিনাথ), বদরুচি, বদরোখা, বদল, বদলা, বদলান, বদলাবদলি, বদলি(লী), বদস(শ)লা, বদস্তর, বদছু(সু)রত, বদহজম, বদহজমি, বদহাল, বদান্য, বদাবদ, বদাবদি, বদাম, বদাল, বদি, (নেকি-বদি), বদিয়াতী, বরবাদ, বহস্ (বহ্), বাইতি, বাইন (বাদনদার, বাজনদার, বজ্), বাএন, বাচ্চা, বাচ্ছা, বাছা (বৎস), বাছুর, বাছুরি, বাজ (বাদ্য), বাজন (বাদন), বাৎসল্য, বাৎস্যায়ন, বাদ (বীণাবাদ, মতবাদ, বাদ-সাধা, তা-বাদে, বরবাদ), বাদক, বাদন, বাদবিসংবাদ, বাদযুদ্ধ, বাদর, বাদরায়ণ, বাদরায়ণি, বাদল (দ্র. ভাদর, বর্ষা), বাদলমালা, বাদলা, বাদলি, বাদশা, বাদশাই, বাদশাহ, বাদশাহী, বাদহাটা, বাদা, বাদাকাঠ, বাদাচিংড়ি, বাদানুবাদ, বাদাবাদ, বাদাবাদি, বাদাম, বাদামী, বাদি, বাদিত, বাদিত্র (দ্র.বজ্), বাদিয়া, বাদী, বাদীপক্ষ, বাদীয়া, বাদুড় (বাদ-উড়), বাদুয়া, বাদুর্ব্বাদ, বাদে, বাদ্য, বাদ্যপুর, বাদ্যভাণ্ড, বাদ্যা, বাদ্যোদ্যম, বাবদূক, বায়ন, বায়েন, বারিশ(ষ), বিবদমান, বিবাদ, বেদিয়া, বেদে, মতবাদ, বিসংবাদ, সংবাদ, সাংবাদিক, সুবদন।

বদ্ (বাদি) = বাহী দান। **বদ** = বাহী দান করে যে। **বাদি** = বাদ (বদ হইতে জাত) গতিশীল যাহাতে। (এই **বাহী** প্রচলিত বা কাঙ্ক্ষিত মনোভাব-বাহী **আওয়াজ** নয়, অজানা, অনাকাঙ্ক্ষিত, বিশেষ বা বিপরীত মনোভাব-বাহী **আওয়াজ**কেই বোঝায়।)

বৎস (বৎসনাভ, বৎসপত্তন, বৎসল) : **১. বৎস** = ✓বদ্ + স - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৎস** = *বাহীর আত্মস্বরূপ দান অস্তিত্বরূপে থাকে যাহাতে; অথবা, তদ্-বৎ (তাহার মতো) অস্তিত্ব যাহাতে।* **বৎসনাভ** = **বৎস** *নাভিতে যাহার।* **বৎসপত্তন** = **বৎস**-*এর* **পত্তন** *যেখানে।* **বৎসল** = **বৎস**-*এর লালন-লয়ন যাহাতে।* **৩. বৎস** = গবাদিশিশু, তর্ণক, বাছুর, পশুশিশুমাত্র, পুত্রাদি, অপত্য, বৎসর, দেশবিশেষ, কুটজবৃক্ষ। **বৎসনাভ** = স্থাবরবিষভেদ, মিঠাবিষ। **বৎসপত্তন** = কৌশাম্বী নগরী। **বৎসল** = স্নেহযুক্ত, প্রণয়বান, কৃপালু। (ব.শ.)। **৪.** 'প্রিয় সন্তান' অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কাচ্চাবাচ্চা**। পুরাণাদি গ্রন্থে **বৎস** শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তাতে বয়স্করা শিষ্য, পুত্র বা পুত্রসমান কাউকে সম্বোধন করছেন **বৎস** বলে। অবশ্য জীবজন্তুর সন্তানকেও **বৎস** বলা হত। এর কারণ হল, নরবৎ অস্তিত্ব যাহাতে, সে হল নরের **বৎস**; গোবৎ অস্তিত্ব যাহাতে, সে হল গো-**বৎস**। তাছাড়া **বৎস** লালিত হয় যে স্নেহে, প্রণয়ে, কৃপায়, তাকে তো **বৎসল** বলা হবেই। কিন্তু **বৎসনাভ** ও **বৎসপত্তন**কে বোঝার জন্য মিঠাবিষ ও কৌশাম্বী নগরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। আমরা এ সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানি যে, এই শব্দদুটি যথাক্রমে **পণ্য** ও **পণ্যকেন্দ্র** রূপে এককালে বিখ্যাত ছিল এবং আমাদের এই ধারণা জন্মেছে **বাৎস্যায়ন** শব্দ থেকে। দ্র. **বাৎস্যায়ন**।

বদ [বদকথা, বদকাম, বদকার, বদকারী, বদখত, বদখদ, বদখাসলত, বদখেয়াল, বদখেয়ালি, বদজবান, বদজাত (বজ্জাত), বদজাতি, বদজোবান, বদদোয়া (বরদোয়া), বদনসিব, বদনাম, বদনিয়ত, বদবখ্ত, বদবখতি, বদবু, বদবো, বদভ্যাস, বদমতলব, বদমাইশ, বদমাইশি, বদমাশ, বদমাশি, বদমায়েশ, বদমায়েশি, বদমেজাজ, বদমেজাজি, বদরং, বদরঙ, বদরক্ত, বদরসিক, বদরাগ, বদরুচি, বদরোখা, বদশলা, বদসলা, বদস্তর, বদছুরত (বদসুরত), বদহজম, বদহজমি, বদহাল, বদি, (নেকি-বদি), বদিয়াতী, বরবাদ, বহস্ (বহ্)] : **৫.** শুরুতে বলে রাখা ভাল, এই **বদ** শব্দকে ছাত্রবোধ অভিধান বর্গীয়-**ব**-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যখন কিনা ব.শ. রেখেছেন অন্তঃস্থ-**ব**-এর দলে। এরকম আরও বহু শব্দে ঘটেছে। এবার অর্থের কথায় যাওয়া যাক।

মনোভাব-বাহী (আওয়াজ-এর) দান থাকে **বদ্** ক্রিয়ায় — বদতি, বদন্তি ... ইত্যাদিতে। **বক্তব্য** শব্দ থেকে আমরা জানতে পারি, সেকালের মানুষের চোখে সবাই যা ভাবছে, বলছে, তার বাইরে 'নতুন কিছু বলা', 'অজানা কিছু বলা', 'অন্য কিছু বলা' মন্দ-কাজ বলে নিন্দনীয় হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, **বদ** ক্রিয়ার ভিতরে এমন কিছু মনোভাব বাহিত হয়ে প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ, এমন কিছু বলা হয়,

যা কিনা শ্রোতার ভাবনার সঙ্গে মেলে না; যা শ্রোতার পক্ষে ভাল হতে পারে, মন্দও হতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে, যে কথাগুলি সগোত্রীয়দের পক্ষে খারাপ, অন্যদের ক্ষেত্রে ভাল; কিংবা যে কথাগুলি সগোত্রীয়দের পক্ষে ভাল, কিন্তু অন্যদের পক্ষে খারাপ। এই ব্যাপারটি আমরা দেখেছি **কলা**-দেখানোতে। ভারতে যে বুড়ো আঙুল দেখানো খারাপ, ইউরোপে সেটাই জয়ের প্রতীক। একই ঘটনা জয়ী ও পরাজিতের চোখে পরস্পরের বিপরীত অর্থ ধরে। সেই নিয়মে আমরা যে **বদ্** ক্রিয়াকে 'কথা বলা' রূপে পাচ্ছি, ফারসি তাকে পেয়েছে 'মন্দ' অর্থে **বদ**-রূপে (উপরোক্ত শব্দগুলি দেখুন) এবং ইংরেজি তাকেই পেয়েছে মন্দার্থক bad-রূপে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আদিতে **বদ** শব্দটির মূলেই কিছু 'নঞর্থক কথা বলা'র ব্যাপার ছিল। কেননা, **বদাবদ** শব্দের বঙ্গীয় উত্তরাধিকারে আমরা 'বকাবকি, বচসা, বিতণ্ডা' প্রভৃতি অর্থ পাচ্ছি (দ্র. ব.শ.), তেমনি '**বাদ** দাও' বললেও আমরা বুঝতে পারি, এটি **বদ** (অনাকাঙিক্ষত) থেকে জাত বলেই বলা হচ্ছে '**বাদ** দাও', '**বদলে**-নাও' ... ইত্যাদি। তার মানে, আরবি, ফারসি, ইংরেজির মতো বাংলাও **বদ** শব্দের মন্দার্থক উত্তরাধিকারও পেয়েছিল। কার্যত সেকারণেই বাংলায় আরব্য-শক্তির আগমনের পর সেকালের বাংলাভাষীর পক্ষে বাংলাভাষায় **বদ** শব্দটিকে গ্রহণ করে নিয়ে উপসর্গরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু এখানে অপর একটি বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। **দ্বি**মত-এর যে **দ্বি**, তার যে **ব**, যা কিনা সবসময় 'দুই'কে বোঝায় (বার, বাইশ, বত্রিশ ... ইত্যাদি), সেই **ব** তো আসলে দ্বৈতাদ্বৈতবাহী। অথ**বা**, কিং**বা**, **বা** ব'লেও সেই দ্বিতীয়ের কথা আমরা বলে থাকি। আবার, **বি** উপসর্গে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, সেই বি সবসময় প্রচলিতের পাশে অপর ধারাটির কথা বলছে। তার মানে, **বদ্** ক্রিয়ামূলটির **ব** আসলে প্রচলিতের কথা না বলে, অপর 'মনোভাব-**বাহী**'কে দান করে থাকে। তাহলে তো **বদ্** মানেই হয়ে যায় 'অজানা, অনাকাঙিক্ষত, বিশেষ, বিপরীত বা অন্য মনোভাব বহন করে দান করা।' অর্থাৎ, **বদ্** মানে শুধুমাত্র 'মনোভাব-বাহী (**আওয়াজ**) দান করা' নয়, 'অন্যতর-মনোভাব-বাহী (**আওয়াজ**) দান করা' বা 'শ্রোতার পক্ষে অনাকাঙিক্ষত কথা বলা', 'অন্যকথা বলা', 'বিশেষ কথা বলা', 'বিপরীত কথা বলা'। ... **৬.** ইংরেজি bad, জারমান oder (= অথবা)।

বদন (বদ, বদ্য, অবদ্য, অনবদ্য) : **১.** ✓বদ্ + অন (ল্যুট্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বদ = (অন্যতর মনোভাব-) বাহীর (মনোভাববাহী আওয়াজের) দান থাকে যাহাতে।* ***বদন*** *=* ***বদ*** *অন থাকে যাহাতে।* ***বদ্য*** *=* ***বদ*** *থাকে যাহাতে; যাহা বলা যায়, বলতে হয়।* ***অবদ্য*** *= যাহা* ***বদ্য*** *নহে; যাহা বলা যায় না।* ***অনবদ্য*** *= যাহা* ***অবদ্য*** *নহে; যাহা অবশ্য* ***বদ্য****।* / **বদন** = যাহার দ্বারা কথন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** **বদ** = কথন, জ্ঞান, যত্ন; বলা, উচ্চারণ করা। **বদন** = মুখ, মুখমণ্ডল, অগ্রভাগ, (বীজগণিতে) শ্রেণীর প্রথম রাশি, (জ্যামিতিতে) ত্রিভুজের শীর্ষভাগ। **অবদ্য** = নিন্দনীয়, গর্হণীয়, অনিষ্ট, দোষান্বিত, অকথ্য, অবাচ্য, কথনাযোগ্য, অধম, পাপী, পাপ, দোষ। **অনবদ্য** = অনিন্দনীয়, অগর্হণীয়, অদোষ, দোষশূন্য। (ব.শ.)। **৪.** face অর্থে **বদন** এবং splendid অর্থে **অনবদ্য** কমবেশি প্রচলিত, **বদ্য, অবদ্য** এবং 'কথন' অর্থে **বদ** অপ্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত **বদ্, বদ** দ্রষ্টব্য। আমরা বাংলাভাষীরা সাধারণভাবে **বদন** শব্দটির ব্যবহার নঞর্থক ভাবেই করে থাকি। যেমন, '**বদন** দেখিয়ে কাজ হবে না, খেটে করতে হবে।' তার মানে, **বদন** হল সেই মুখ, যা দিয়ে মানুষ অজানা, অনাকাঙিক্ষত, নতুন বা বিপরীত কথা বলে।

বদনা (বদনী, চাঁদবদনী) : **৩.** মাটির বা ধাতুর মুখচৌড়া গাড়ু বিশেষ (প্রায়ই মুসলমানেরা ব্যবহার করেন)। (ব.শ.)। **৫.** নিয়ম অনুসারে '**বদন**-এর আশ্রয় যে', তাকে **বদনা** বলাই সঙ্গত। কিন্তু শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়, তাতে দেখা যায় ঐ অর্থটি আদৌ স্পষ্ট নয়। এটি একটি mug-এর মতো জল রাখার পাত্র, যাতে তার উপরের স্বাভাবিক বড় মুখটির পাশে পৃথক একটি নলমুখও রয়েছে। এর সেই বড়মুখ যথেষ্ট বড় হওয়া সত্ত্বেও **বদনা** থেকে জল ঢেলে হাত-পা ধোয়ার জন্য ঐ বড়মুখটি ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে, তার পাশের যে নলমুখ সেটিই ব্যবহৃত হয়, যাতে জল কম নষ্ট হয়।

আমাদের মনে হয়, বড় **বদন** বা বড় মুখওয়ালা জলপাত্র বলেই একে **বদনা** বলে। যেমন, চাঁদের মতো **বদন** যে স্ত্রীর, তাকে বাংলায় **চাঁদবদনী** বলা হয়ে থাকে। বড় আর ছোটর এই ভেদ গ্রামবাংলার ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট, যেমন — চালনা-চালনী, ধুচনা-ধুচনী, বেলনা-বেলনী ... ইত্যাদি।

বদল (বদলা, বদলান, বদলাবদলি, বদলি, বদলী) : **২.** *বদল = বদ (অন্যতর-বিষয়বাহীর দান) লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***বদলা*** *=* ***বদল****-এর আধার যে।* ***বদলান*** *=* ***বদলা*** *অন (on) যাহাতে।* ***বদলাবদলি*** *=* ***বদলা*** *ও* ***বদলি*** *(দ্র.* ***কেশাকেশি****)।* ***বদলি*** *=* ***বদল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***বদলী*** *=* ***বদলি****র আধার যে।* **৩.** **বদল** = পরিবর্ত্তন, বিনিময় (exchange), বদল করা, বিনিময় করা, পরিবর্ত্তন করা। **বদলা, বদলান** = বদল করা ... ইত্যাদি। **বদলাবদলি** = পরস্পর বিনিময়, অদলবদল। **বদলি, বদলী** = বদল, পরিবর্ত্তন, প্রতিনিধি, বিনিময়ে প্রাপ্য দ্রব্য, পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ভৃত্যের অন্যকর্ম্মস্থানে নিয়োগ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** এখন exchange অর্থে **বদল** ও তার সহোদর শব্দগুলির অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মূলে একটি গোপন কথা বলা আছে, বিশেষত একালের বিশ্বায়িত সভ্যতার নাগরিক ক্রেতাদের কাছে সেটি জেনে রাখার মতো কথা। সে কথাটি হল, যে ব্যক্তি নিজের হাতের জিনিসটি অন্যের সঙ্গে **বদলে** নিতে আগ্রহী, তার নিজের জিনিসটি আসলে তার নিজের কাছে অনাকাঙিক্ষত, খারাপ, **বদ**। এইজন্যই সে **বদল** করে নিতে চায়। অন্তত **বদল** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ সেরকম কথাই বলছে।

বাৎস্যায়ন : **২.** / বাৎস্যের গোত্রাপত্য যে। (ব.শ.)। **৩.** কামসূত্রকার মুনিবিশেষ, ন্যায়ভাষ্যকার, বাৎস্যায়নকৃত কামশাস্ত্র। (ব.শ.)। **৪.** সাধারণ্যে অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কলা, চণক, চাণক্য, কামসূত্র,**

কামশাস্ত্র। যেহেতু বিষয়টি ১ম খণ্ডে উপরোক্ত শব্দগুলির ভুক্তিতে খানিকটা আলোচিত হয়েছে এবং আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'ভাষায় ঔপনিবেশিকতা : প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্ট ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র' নিবন্ধে সুবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে সে বিষয়ে বিস্তারে যাওয়া বাহুল্য। এখানে শুধু এইমাত্র বলে রাখা দরকার যে, একসময় দেশের উৎপাদন বাড়ানোকে বলা হত **বৎস** বাড়ানোর চেষ্টা করা, (**বৎসনাভ, বৎসপত্তন**) এবং সে কাজটির ক্ষেত্রে যিনি বা যে জ্ঞানীগণ পরামর্শ দিতেন, দেখাশুনা করতেন, তাঁদের বলা হত **বাৎস্যায়ন**। এঁরা কাম-কাজের যে সূত্র দিয়ে গেছেন, সেটিই 'বাৎস্যায়নের কামসূত্র'। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় রচিত এই গ্রন্থকে একালের পণ্ডিতেরা sexology-র গ্রন্থ ভেবে প্রকৃষ্টরূপে আত্ম-প্রতারিত হয়েছেন। অথচ একটুখানি আত্মবিশ্বাস থাকলেই এই আত্মপ্রতারণার হাত থেকে বাঁচা যেতে পারত। যে গ্রন্থের ভিতরে সেইরকম প্রকৃতিশক্তিকে (নারীকে) **বিবাহ** (চুক্তিতে আবদ্ধ) করার জন্য খুঁজতে বলা হয় যিনি চৌষট্টি **কলা** (১ম খণ্ডে **কলা** দেখুন) জানেন, যার মধ্যে mining, mineralogy-ও পড়ে, সেই গ্রন্থ যে ভাল বউ খোঁজার বই নয়, সেটি একটু আত্মবিশ্বাস থাকলেই বোঝা যেতে পারত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল বক্তৃতায় ঠিক এই আশঙ্কার কথাই বলেছিলেন — আমাদের নিজেদের যে মহত্তম অর্জন ছিল এবং আছে, ইউরোপের সংস্পর্শে সেই বিশ্বাসটাই নষ্ট হতে চলেছে। আজ তার থেকে প্রায় ৮৫ বছর পরে আমরা দেখছি, বাংলাভাষীর সেই বিশ্বাসটা প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সেই বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করাই আমাদের আশু কর্তব্য বলে মনে হয়।

বাদ[1] **[বাদক, বাদন (বাজন), বাদিত্র (বেণু), বাদ্য, বাদ্যপুর, বাদ্যভাণ্ড, বীণাবাদ]** : **১.** ✓বাদি + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাদ*** = ***বদ*** *(নতুন, অজানা কথা বলা) হইতে জাত।* ***বাদক*** = ***বাদন*** *করে যে।* ***বাদন (বাজন)*** = ***বাদ*** *অন (on) যাহাতে।* ***বাদিত্র (বেণু)*** = *যাহা দ্বারা* ***বাদ*** *গতিশীলভাবে তারিত হয়।* ***বাদ্য*** = ***বাদ*** *থাকে যাহাতে।* ***বাদ্যপুর*** = ***বাদ্য*** *পূর্ণ করা হইয়াছে যাহাতে।* ***বাদ্যভাণ্ড*** = ***বাদ্য*** *থাকে যে ভাণ্ডে।* **৩. বাদ** = বাদয়িতা, বাদক। **বাদক** = বাদয়িতা, বাদ্যকর। **বাদন (বাজন)** = বাদ্য, বাজান, বাদ্যযন্ত্র, বীণাদি। **বাদিত্র (বেণু)** = বাদনীয় যন্ত্র, বাদ্য, মৃদঙ্গাদি, বাদন, বাজনা। **বাদ্য** = বাদনীয় যন্ত্র, বীণাকাংস্যবংশীমুরজাদি চতুর্ব্বিধ বাদন-যন্ত্র, বাদিত্র, বাদ্যধ্বনি। **বাদ্যপুর** = ধ্বনিপূর্ণ, গম্ভীরনাদী। **বাদ্যভাণ্ড** = বাদনীয় পাত্র, মুরজমৃদঙ্গাদি, বাদিত্র। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** যতদূর বোঝা যায়, অতি প্রাচীন কালে, যখন মানুষের ভাষা উদ্ভাবিত হয়নি, তখন **বাদ্যে**র মাধ্যমেই কাউকে কোনো কথা জানিয়ে দেওয়া হত, যে কথা সে জানে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, সেই প্রাচীন **বাদ্য**-এর সুরেলা বার্তা জড় উদ্ভিদ জীব মানুষ — সকলের পক্ষেই বোধ্য ছিল। তখন **বাদন**-এর অনুশীলন চলত 'বার্ত্তা প্রেরণকর্ম্ম'-এর অভ্যাস (রিহার্সাল) রূপে। ভাষার আবির্ভাবের পর ক্রমে **বাদ্যের** সেই ভূমিকা কমতে থাকে এবং তার ব্যবহার শুরু হয় বিনোদন-সহায়ক রূপে। পরে আবার সেই **বাদ্য** দেখা দেয় বণিকের **বেণু** রূপে; **বাদিত্র**-ক্রিয়া গ্রাহক রূপে, **বেণ**-এর **বাদ্যভাণ্ড** রূপে।

ফলত আমরা এখন যে **বাদন বাদক বাদ্য** প্রভৃতিকে পাচ্ছি, তার দুটি রূপ। একদিকে সে বিনোদন-সহায়ক, অপরদিকে সে **বণিকের** সহায়ক। তবে সুদূর অতীতে এর যে আদি ভূমিকা ছিল, তা এখন প্রায় বিলুপ্ত। তা হল, সর্বজীব ও জড়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'সুরেলা বার্ত্তাপ্রেরণ'। সেই কর্মটি একালের **বাদক**গণ আর করতে পারেন না; যদিও তার খানিকটা উত্তরাধিকার এশিয়ার ধ্রুপদী সংগীত-সাধকদের হাতে এখনও ধ্বংসাবশেষ রূপে **বর্ত্তমান** রয়েছে। ...

রবীন্দ্রনাথ সুরের ভিতরে মনোভাব ঢোকানোর বিজ্ঞান নিয়ে ভাবিত ছিলেন এবং সুরজ্ঞানীদের কাছে বারংবার আর্জি জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন সে-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন। আজও তা করা যায়নি। করা গেলে সর্বজীব ও জড়ের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করার যোগ্যতা পুনরায় অর্জন করা যাবে। সুদূর অতীতে এই যোগ্যতা বিশ্বের সকল জাতির আদিপুরুষের ছিল।

বাদ[2] **[অতিবাদ, অনুবাদ, অপবাদ, অবিসংবাদ, অভিবাদ, অভিবাদন, আশীর্ব্বাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ, প্রতিবাদী, প্রবাদ, বাদযুদ্ধ, বাদী, বিবাদ, বিবাদী, বিবাদ-বিসংবাদ, বিসংবাদ, মতবাদ, সংবাদ, সুবাদ]** : **১.** ✓বদ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাদ*** = ***বদ*** *(বিশেষ বা অন্য কথা বলা) হইতে জাত।* / **অভিবাদ** = যে শব্দ দ্বারা পরকে (অভিবাদিত ব্যক্তিকে) অভিভাবকের প্রতি আশীর্ব্বাদ বা কুশলপ্রশ্ন করায়। (ব.শ.)। **৩. বাদ** = কথন, ভাষণ, কীর্ত্তন, ধ্বনি, কূজন ... ইত্যাদি। **অতিবাদ** = অতিক্রমবাদ, পরুষবাদ, কঠোর বাক্য-প্রয়োগ, অত্যুক্তি, অতিশয়োক্তি। **অনুবাদ** = কথিত বিষয়ের পুনঃকথন, পুনরুক্তি, অনুক্ষণ কথন, সিদ্ধবস্তুর উপন্যাস বা কথন, বিধিপ্রাপ্ত বিষয়ের বাক্যান্তরে অনুবচন বা পুনঃকথন, ভাষান্তরে পুনঃকথন ... ইত্যাদি। **অপবাদ** = নিন্দা, পরীবাদ, কুৎসা, আদেশ, মিথ্যাবাদ, প্রত্যাখ্যান ... ইত্যাদি। **অবিসংবাদ** = বিসংবাদের অভাব, অবিরোধ, অনুল্লঙ্ঘন ... ইত্যাদি। **অভিবাদ** = অভিবাদপ্রতিপাদক শব্দ, পাদগ্রহণপূর্ব্বক বা বাক্য দ্বারা নতি, প্রণাম, বন্দনা। **অভিবাদন** = অভিমুখীকৃত্য সম্বোধ্য, বাক্য দ্বারা অর্থাৎ 'প্রণাম করি' এই শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক নতি। **আশীর্ব্বাদ** = শুভবাক্যের কথন, প্রিয়ার্থপ্রাপ্তীচ্ছার প্রকাশন, অনুগ্রহ, কৃপা। **পরিবাদ (পরীবাদ)** = পরদোষকথন, অপবাদ, অবিদ্যমানদোষ-কথন ... ইত্যাদি। **প্রতিবাদ** = প্রতিকূলবচন, বিরুদ্ধবাদ ... ইত্যাদি। **প্রতিবাদী** = প্রতিকূলবাদী, বিরুদ্ধবক্তা, প্রত্যাখ্যাতা। **প্রবাদ** = পরস্পর-কথোপকথন, সম্ভাষ, পরস্পরাভিঘাত, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরম্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি। **বাদযুদ্ধ** = শাস্ত্রার্থবিষয়ক কলহ। **বাদী** = বচনশীল, বক্তা, কথয়িতা, ভাষী, ভাষমান, কথক, বাচক, অভিযোগকারী, ফরিয়াদী, বিবাদকারী ... ইত্যাদি। **বিবাদ** = বিরুদ্ধবাদ, কলহ, কথা-কাটাকাটি, প্রতিবাদ ... ইত্যাদি। **বিবাদী** = বিবাদকারী, বিবাদার্থী ... ইত্যাদি। **বিবাদ-বিসংবাদ** = কলহ ও বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক। **বিসংবাদ** = বিপরীত কথন, মিথ্যাখ্যানবঞ্চনা (রায়), বিরোধোক্তি, বিবাদ। **মতবাদ** = মত (অসাধু), বাদ (theory)। **সংবাদ** = অন্যোন্যভাষণ, মিথোভাষণ,

সম্ভাষণ, সংবাদরূপ গ্রন্থ, সমাগম, অভেদকথন, একরূপতা, ঐক্য, বার্ত্তা, সমাচার ... ইত্যাদি। **সুবাদ** = সম্বন্ধ, সম্পর্ক। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলির মূলে রয়েছে অন্যরকম কথা বলা, তা বিশেষ বিপরীত নতুন খারাপ ... ইত্যাদি হতে পারে। **অতিবাদ**-এর বেলায় তা **বাদ**-এর স্বাভাবিকতাকে ছাড়িয়ে যায়, তাই **অতিবাদ**। আর **অনুবাদ**-এর বেলায় তা **বাদ**-এর অনুসরণ করে, সেই **বাদ**-এর কথাই অন্যভাবে বলতে থাকে। কিন্তু **অপবাদ**-এর বেলায় **বাদ**টাকেই সে **অপ** করে দেয়, মন্দ করে দেয়। **অবিসংবাদ**-এর বেলায় 'যা **বিসংবাদ** নয়' তাই বোঝায়। আর, **বিসংবাদ** বোঝায় বিশেষ বা বিপরীত **সংবাদ**কে; যখন কিনা **সংবাদ** নিজে বাস্তবের সমান প্রতিচ্ছবি বয়ান করে। আর, **অভিবাদ** ও **অভিবাদন** — এসব উপর থেকে বলার বা **বাদ**-এর ব্যাপার, যা কিনা **আশীর্ব্বাদ**-এর ক্ষেত্রেও খাটে। তাছাড়া **বাদী**-পক্ষ, **বিবাদী**-পক্ষ, এইসব আদালতের ভাষার মর্ম এখন সবাই জানেন। এই **বাদ**গুলির সবই বিরুদ্ধ**বাদ**ই বটে। তবে **মতবাদ** শব্দটি একটু বিশেষ রকম। ব.শ. জানাচ্ছেন, এ হল theory পদবাচ্য। আমরা জানি, আজকাল প্রায়শই theory শব্দের অর্থ বলা হয় **মতবাদ**। কিন্তু তা আদৌ ঠিক নয়। তাতে বিষয়টি সংকুচিত হয়ে যায়। কেননা, **মত** ও **বাদ** দুটি শব্দই ব্যাপক অর্থ ধরে। যেহেতু **মত**, **মত**-দেওয়া, **সম্মত**-হওয়া ... ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের 'চ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, এ বিষয়ে এখানে আমরা নিজেরা আর কিছু বলতে চাই না। কেননা, **মতবাদ** সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট বয়ান রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন — 'মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি **মতবাদ**কে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই **মতবাদ**টি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসেবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।'

'এইজন্যে সত্যকে বারংবার **মতদেহ** পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ **মতদেহের** সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে, তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়। ...' (রবীন্দ্র রচনাবলী / ৭ম খণ্ড/ 'মত' / পৃ. ৫৮৮/ মোটা হরফ আমাদের)।

বাদ[3] **[বাদ, বাদবাকি, বাদসাদ, বাদা, বাদাকাঠ, বাদাচিংড়ি, বাদাড়, বাদাবন, বাদে, বনবাদাড়]** : ২. **বাদ** = ***বদ*** *(অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়বাহীর দান থাকে যাহাতে, তাহা) হইতে জাত।* ৩. **বাদ** = বিয়োগ, বিযুক্ত, ছাড়া, পরে। **বাদবাকী** = বাদে অবশিষ্ট। **বাদা** = জলপ্রায় জঙ্গলময় নোনা দেশ। **বাদাকাঠ** = বাদার সুঁদুর গরান ইত্যাদি কাঠ। **বাদাচিংড়ি** = বাদার নোনা চিংড়ি, বাগদাচিংড়ি। **বাদে** = বাদ গেলে, ছাড়া। **বনবাদাড়** = গাছপালা ও নিবিড় জঙ্গল। (ব.শ.)। **বাদ** = ছাড়, বিয়োগ, বিযুক্ত, ত্যাগ। **বাদবাকি** = অবশিষ্ট। **বাদসাদ** = ত্যাগ, বাদ, কিছু অংশ ত্যাগ বা বিসর্জন। **বাদাড়** = জঙ্গল, জংলা অঞ্চল। **বাদাবন** = বন-জঙ্গল। **বাদে** = ব্যতীত, ছাড়া, পরে গেলে, অতীত হলে, অবর্তমানে। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বদ**। বাংলাভাষী যে সকল নতুন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ বানিয়েছেন, **বাদ**-দেওয়া অর্থে উপরোক্ত শব্দগুলি — **বাদবাকি, বাদসাদ, বাদা, বাদাকাঠ, বাদাচিংড়ি, বাদাড়, বাদাবন, বাদে** ... প্রভৃতি — তারই উদাহরণ। এগুলির মূলে রয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রয়োজনীয় ... **বদ** ক্রিয়া। **বাদবাকি** ... প্রভৃতি শব্দে সেই **বদ্**-ক্রিয়াকেই আরও প্রসারিত করে নেওয়া হয়েছে। এই শব্দগুলির উদ্ভবের সূত্রপাত মধ্যযুগের শেষ থেকে। ব.শ. তার কিছু উদাহরণও দিয়ে গেছেন। আমাদের বাংলাভাষীদের মধ্যে যাঁরা **বাদা** অঞ্চলে থাকেন বা **বনবাদাড়ে** যাঁদের যেতে হয়, তাঁরা এসব শব্দ কত অনায়াসে সৃষ্টি করেন, ব্যবহার করেন, অনেকেই তা জানেন। ৬. ইংরেজি bad।

***বধ্ (বাধ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অবধ, অবধ্য, অবাধ, অবাধক, অবাধিত, অবাধ্য, আবাধ, আসম্বাধ, বইরা, বধ্, বধ, বধক, বধকর্ম্মাধিকারী, বধকাম, বধজীবী, বধদণ্ড, বধনিগ্রহ, বধনির্ণেক, বধভূমি, বধস্থলী, বধস্থান, বধাঈ (বৃদ্ধি ধারণের জন্য উৎসাহ), বধার্হ, বধির, বধিরীকৃত, বধৈষী, বধ্য, বধ্যঘাতক, বধ্যঘ্ন, বধ্যডিণ্ডিম, বধ্যপট, বধ্যপটহ, বধ্যপাল, বধ্যভূ, বধ্যভূমি, বধ্যমালা, বধ্যশিলা, বধ্যস্থল, বধ্যস্থলী, বধ্যস্থান, বধ্যা, বাউ, বাউটি(টী), বাউটিসুট, বাউলি(লী), বাউস (বাহুস, বাহুতে থাকে যা), বাজু (বাহু), বাজুবন, বাজুবন্দ, বাজুবন্ধ, বাজুমল, বাজে (যাকে বাধা দেওয়া উচিত?), বাজেয়াপ্ত, বাজেয়াফ্‌ত্ (আপদ), বাঝ, বাঝা, বাধ্, বাধ, বাধক, বাধন, বাধা, বাধাই, বাধান, বাধিত, বাধ্য, বাধ্যবাধক, বাধ্যবাধকতা, বাষ্প, বাষ্পকণ্ঠ, বাষ্পকল, বাষ্পগদগদ, বাষ্পচালিত, বাষ্পদুর্দ্দিন, বাষ্পপর্য্যাকুল, বাষ্পপিহিত, বাষ্পপীড়িত, বাষ্পপুর, বাষ্পপোত, বাষ্পপ্রসর, বাষ্পবারি, বাষ্পবিমোচন, বাষ্পবিক্লব, বাষ্পবৃষ্টি, বাষ্পমোক্ষ, বাষ্পমোচন, বাষ্পযান, বাষ্পরথ, বাষ্পসন্দিগ্ধ, বাষ্পাকুল, বাষ্পাবিল, বাষ্পাম্বু, বাষ্পান্তঃ, বাষ্পাসার, বাহু (বাজু), বাহুঁক, বাহুক, বাহুকুণ্ঠ, বাহুকুব্জ, বাহুগুণ্য, বাহুজ, বাহুজাত, বাহুজ্যা, বাহুটি(টী), বাহুড়, বাহুড়া, বাহুতরণ, বাহুত্রাণ, বাহুদণ্ড, বাহুদা, বাহুনা(লা)ড়া, বাহুপাশ, বাহুপ্রতিবন্ধ, বাহুপ্রহরণ, বাহুবন্ধ, বাহুবন্ধন, বাহুবল, বাহুবল্লী, বাহুবিঘট্টন, বাহুবীর্য্য, বাহুব্যায়াম, বাহুমূল, বাহুযুদ্ধ, বাহুযোধ, বাহুযোধী, বাহুলতা, বাহুশালী, বাহুসম্ভব, বাহুসাট, বাহুস্বস্তিক, বাহুস্ফোট, বীভৎস, ভাঁপ, ভাপ, ভাপরা, ভাপসা, ভাপা, ভাপান, ভেপসা, ভ্যাপসা, সবাধ।

বধ্ (বাধ্) = বৃদ্ধির ধারণ। **বধ** = বৃদ্ধি ধৃত যাহাতে। **বাধ** = **বধ** হইতে জাত।

বধ (বধক, বধকর্ম্মাধিকারী, বধকাম, বধজীবী, বধদণ্ড, বধনিগ্রহ, বধনির্ণেক, বধভূমি, বধস্থলী, বধস্থান, অবধ) : ১. বধ = ✓হন্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে; হন্ > বধ্, পাণিনি; ✓বধ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বধ** = *বৃদ্ধি ধৃত হয় যাহাতে।* **বধক** = ***বধ*** *করে যে।* **অবধ** = *নেই* ***বধ*** *যাহাতে। /* **বধজীবী** = প্রাণীবধ

জীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ৩. **বধ** = হনন, হিংসা, মারণ, বধোপায়, (গণিতে) পূরণ, গুণফল, পক্ষাঘাতরোগ, বধজন্যপাপ। **বধক** = হিংসক, হন্তা, ঘাতক, জল্লাদ, ব্যাধি, মৃত্যু। **বধকর্ম্মাধিকারী** = ঘাতক। **বধকাম** = বধেচ্ছু, মারণেচ্ছু, জিঘাংসু। **বধজীবী** = ব্যাধ। **বধদণ্ড** = তাড়নাদি ও অঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড। **বধনিগ্রহ** = প্রাণদণ্ড। **বধনির্ণেক** = বধজন্য পাপশুদ্ধি, বধপাপক্ষয়। **বধভূমি, বধস্থলী, বধস্থান** = অপরাধীর প্রাণদণ্ডস্থান, বধ্যভূমি, মশান। **অবধ** = অবিনাশ, অহিংসা। (ব.শ.)। ৪. to kill অর্থে **(বধ) বধ** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। ৫. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা দরকার। প্রশ্নটি হল, হনন করা, আঘাত করা, বধ করা — এই তিনটি শব্দই হন্ ক্রিয়ামূলের শব্দপরিবারে জন্মেছে, বলে গেছেন আমাদের পূর্বসূরিগণ। হন্ ক্রিয়া থেকে 'হনন করা', 'হত্যা করা' — এসব বোঝা যায়, কিন্তু 'ঘাত' ও 'বধ' হয় কীভাবে, সেকথা সহজে বোঝা যায় না। আসলে, 'বৃদ্ধি ধৃত' (**বধ**) হয়ে গেলেই জীবসত্তা দাঁড়িয়ে যায়, তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তার মানে, প্রতিটি জীবই যতক্ষণ জীবিত ততক্ষণ এগোচ্ছে, তার বিকাশ চলছে, পরিবর্তন চলছে। যেই-না তার বৃদ্ধিকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল, সে দাঁড়িয়ে গেল। সেটিই তার মৃত্যু। আবার, গামী যেখানে গিয়ে 'গমনস্থিতের আধাররূপে তারিত হয়' (**ঘাত**) হয়, সে-সত্তাও আর এগোতে পারে না, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, তারও 'আঘাতপ্রাপ্ত' বা 'ঘাত' বা 'হত' হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অপরদিকে কাউকে 'হ' করে দেওয়া বা দাঁড় করিয়ে দেওয়া চিরস্থায়ী করে দিলেই তো হ-অন করা বা **হন্** করা হয়। তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। এমন জীব এই পৃথিবীতে নাই, যার বিকাশ স্তব্ধ করে দেওয়ার পরও সে বেঁচে থাকে। এই সেই কারণ, যে কারণে সেই কোন পাণিনির আমলেই আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা বুঝে গিয়েছিলেন যে, **হন** ক্রিয়া থেকেই **ঘাত** করা বা **বধ** করা হয়ে যায়। সেই কারণে আমরা **ঘাত** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে **হন্** ক্রিয়ামূলের পরিবারে স্থান দিয়েছি। সেই সুবাদে **বধ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে **হন্** ক্রিয়ামূলের পরিবারের সদস্য বলে ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তা করিনি অন্য একটি অসুবিধার জন্য। তা হল, **বধ্**-এর সহোদর এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলি **হন** ক্রিয়ামূলের এলাকা ছাড়িয়ে গেছে। যেমন, **বাধা, বাহ, বাষ্প** ইত্যাদি। সেই কারণে, **বধ্** ক্রিয়ামূলের পরিবারটিকে আমরা পৃথক করে নিয়েছি।

যাই হোক, উপরোক্ত শব্দগুলির অর্থের মূলে 'বৃদ্ধি ধৃত' হওয়ার ক্রিয়াটি সুস্পষ্ট থাকলেও, **অবধ** ও **বধস্থলী** বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। হিন্দি ভাষায় **'অযোধ্যা'**কে 'অবধ' বলে। এর কারণ আমরা **অরণ্য**তে খানিকটা পেয়েছি (দ্র. ১ম খণ্ড), বাকিটা আমরা **অযোধ্যা**তে পেয়ে যাব। **বধস্থান, বধভূমি, বধস্থলী** এই তিনটি শব্দই যে স্থানকে বোঝায় তার জন্য আর একটি শব্দও বাংলাভাষীর রয়েছে — **মশান**। আমরা **শ্মশানমশান** শব্দে তার ব্যাখ্যায় যাব।

বধির : ১. ✓বধ্ + ইর (কিরচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বধ (বৃদ্ধির ধারণ) গতিশীলভাবে রয় যাহাতে। /* শ্রবণের অভাবে পীড়নীয় যে। (ব.শ.)। ৩. প্রতিবদ্ধ (ঋগ্বেদ), **শ্রবণশক্তিহীন, কালা**। (ব.শ.)। ৪. deaf অর্থে প্রচলিত। **৫. বধির শব্দটি বধ্ ক্রিয়া থেকে** জাত হয়েছে দেখে প্রথমেই ধন্দ লাগে। যে-ব্যক্তি কানে **কালা, তার** সেই 'কালামি'র সঙ্গে **বধ** ক্রিয়ার সম্পর্ক কোথায়, চট করে **খুঁজে** পাওয়া যায় না। এমনকি ব.শ. প্রদত্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকেও পাওয়া যায় না, ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধৃত 'প্রতিবদ্ধ' অর্থ থেকেও পাওয়া যায় না। কিন্তু 'বৃদ্ধির ধারণ' (**বধ**) ক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সমস্যাটির সমাধান দেখা দিতে শুরু করে। **বধ** মানে তো বৃদ্ধি ধৃত (বা বদ্ধ) রয়েছে যার, সেই সত্তা। আমাদের চোখের দর্শন, কানের শ্রবণ ... এসবের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বিকাশকে **বধ** ক'রে, **বাধ্য** ক'রে, ধ'রে একস্থানে স্থির রেখে দিলে, আমরা তো আর দেখতে শুনতে পাব না। সেকালের ভাষায় সেরকম করে রেখে দেওয়াকেই বলা হত **বধ**-ইরণ করা। যার ক্ষেত্রে তা করা হয়ে গেছে, সেই হল **বধির**। তবে তা সত্ত্বেও এখানে আরও দু-একটি কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। তাহলে তো অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, ... সবাইকেই **বধির** বলা যেতে পারত? কিংবা, সাধারণত যে ব্যক্তি বোবা হয়, দেখা যায়, সে শুনতেও পাচ্ছে না। কেন? ঋগ্বেদ কি তাহলে ঠিকই বলেছে — এরা 'প্রতিবদ্ধ'? এখনকার ভাষায় 'প্রতিবন্ধী' বা handicapped। দ্র. **মূক**।

বাধ (বাধক, বাধন, বাধা, বাধান, বাধিত, বাধ্য, বাধ্যবাধক, বাধ্যবাধকতা) : ১. ✓বাধ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বাধ** = **বধ** হইতে জাত। **বাধক** = **বাধ** করে যে। **বাধন** = **বাধ** অন (on) যাহাতে। **বাধা** = **বাধ**-এর আধার যে। **বাধান** = **বাধা** অন (on) যাহাতে। **বাধিত** = **বাধ** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। **বাধ্য** = **বাধ** থাকে যাহাতে। **বাধ্যবাধক** = **বাধ্য** ও **বাধক**। **বাধ্যবাধকতা** = **বাধ্যবাধক** তারিত যাহাতে।* ৩. **বাধ, বাধা** = পীড়া, সন্তাপ, প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত, বিঘ্ন, অভিভবনিবন্ধন আবেগ ... ইত্যাদি; বন্ধ করা, ব্যাহত করা, পীড়িত করা, রোধ করা, আটকান ... ইত্যাদি। **বাধক** = পীড়ক, সন্তাপক, ব্যাহন্তা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্নকর ... ইত্যাদি। **বাধন** = ব্যাহত করা ... ইত্যাদি। **বাধান** = আটকান। **বাধিত** = পীড়িত, ব্যাহত, বিঘ্নিত ... ইত্যাদি। **বাধ্য** = পীড়নীয়, নিরাকরণীয়, বাধনীয় ... ইত্যাদি। **বাধ্যবাধক** = পীড়াপীড়ক, বশ্যবশীকারক। **বাধ্যবাধকতা** = পীড়াপীড়কভাব, বশ্যবশীকারক-ভাব। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **বধ** শব্দ হইতে জাত শব্দ হল **বাধ**। এক্ষেত্রে **বধ** শব্দের অর্থ 'হত্যা' বা to kill ভাবলে ঘোরতর সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, সেটি ভুল ভাবনা। কার্যত, **বধ** হল 'বৃদ্ধির ধৃত হওয়া' বা বাড়বৃদ্ধি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। সেই 'বাড়বৃদ্ধি রোধ'কেই **বাধ** বা **বাধা** বলে। **বাধা** ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বৃদ্ধি সম্পূর্ণ ধৃত হয়ে গেলে তখনই **বধ**। তাতে তার মৃত্যু ঘটে।

বাষ্প : ১. ✓বাধ্ + য - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বাহীর আধারের দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ পালিত হয় যাহাতে; অথবা, বাধ থাকে যাহাতে।* ৩. উষ্ম, ভাপ (vapour, steam), নেত্রনীর, **অশ্রু**, ধূমবর্ণ, লৌহ, বাষ্পে যেমন অগ্নির অনুমান সেইরূপ **কোনো** বিষয়ের

অনুমাপক ঈষৎ প্রসঙ্গ, অণুমাত্র, আভাসমাত্র। (ব.শ.)। **৪.** steam অর্থে প্রচলিত। **৫.** বস্তুত **বাষ্প** শব্দটি তৈরি হয়েছিল একেবারেই অন্য অর্থে — একটি থলিতে আপনি কিছু বস্তু রেখেছেন, থলির মুখ বন্ধ আছে, এমন অবস্থায় থলিটিতে প্রচণ্ড চাপ পড়ল এবং তার এক কোণের একটি ছিদ্র দিয়ে ভেতরের বস্তু বিচূর্ণীভূত হয়ে ধোঁয়ার মতো হয়ে বেরোতে থাকল। এই ধোঁয়ার মতো বেরোনো বস্তুকে বলে **বাষ্প**। **অধিরাষ্ট্রে**র বা **রাষ্ট্রে**র নির্দেশে বাধ্য হয়ে বা বাধা পেয়ে জনসাধারণ (= **জল**) তাঁদের শ্রমমেধা-নিষিক্ত উৎপন্ন ফসলাদির যে অংশ **সূর্য্য**কে **বাষ্প**-দানের মতো দিয়ে দিত, তাকে বোঝাতেই এই **বাষ্প** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে হয়। পরে সাদৃশ্যে তা vapourকেও বোঝাতে শুরু করে। **বাষ্প** শব্দের উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থও শব্দটির অর্থের বিষয়ে এরকমই ইশারা দিয়ে থাকে। কিন্তু পরে পরে ইংরেজির সংস্পর্শে একমাত্র vapour-ই **বাষ্প** শব্দের একমাত্র উদ্দিষ্ট হয়ে যায়। ফলত **বাষ্প** শব্দ থেকে যে সকল সংশ্লিষ্ট শব্দ তৈরি হয়েছিল, সেগুলি সবই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। যথা **বাষ্পকণ্ঠ, বাষ্পকল, বাষ্পগদগদ, বাষ্পদুর্দ্দিন, বাষ্পপর্য্যাকুল, বাষ্পপিহিত, বাষ্পপীড়িত, বাষ্পপুর, বাষ্পপ্রসর, বাষ্পবারি, বাষ্পবিমোচন, বাষ্পবিক্লব, বাষ্পবৃষ্টি, বাষ্পমোক্ষ, বাষ্পমোচন, বাষ্পরথ, বাষ্পসন্দিগ্ধ, বাষ্পাবিল, বাষ্পাম্বু, বাষ্পান্তঃ, বাষ্পাসার**। কমবেশি প্রচলিত থেকে যায় **বাষ্পচালিত, বাষ্পপোত, বাষ্পযান, বাষ্পাকুল** — এই চারটি শব্দ। বাকি শব্দগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায়।

বাহু : **১.** ✓বাধ্ + উ (কু) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাধ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহার দ্বারা বাধা দেওয়া হয়। /* যাহার দ্বারা শত্রুকে বাধা দেওয়ার কাজ সাধন করা হয়। (ব.শ.)। **৩.** ভুজ, হস্ত, কনুইয়ের উপরিভাগ, ভুজমূলাবধি মণিবন্ধ পর্য্যন্ত অংশ, (সাদৃশ্যে) পশুর অগ্রবর্তী পদ, চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণ, বাজু অর্থাৎ চৌকাঠের খাড়া কাঠ, রথযুগ, সূর্য্যঘটীস্থ শঙ্কুর ছায়া, আর্দ্রানক্ষত্র, সগররাজের পিতা, বাহুবন্ধ, বাজু গহনা, (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের সীমারেখা। (ব.শ.)। **৪.** arm অর্থে প্রচলিত। **৫.** হাত তো মানুষের দেখাই যায়, এমনকি চতুষ্পদ জীবের সামনের দুই পাও দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা কিন্তু সেই হাতকে বোঝাতে **বাহু** শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয় না। উপরোক্ত **২.**-এ প্রদত্ত অর্থ থেকে বোঝা যায়, যা দিয়ে শত্রুকে বাধা দেওয়া যায়, তা সবই **বাহু** পদবাচ্য ছিল। এই **বাহু** তো কেবল মানুষের হাত হতে পারে না, জমিদারের সেরেস্তার লোকজন ও লেঠেলবাহিনী হতে পারে, রাষ্ট্রের **গণেশ** (কেরানিবাহিনী) **কার্ত্তিক** (পুলিশ-মিলিটারি) হতে পারে। হতে পারে বলেই পুরাণে সগররাজার পিতা হন **বাহু**, **ঋতুপর্ণ**রাজের সারথি বিকৃতদেহ নলরাজার নাম হয় **বাহুক**, এবং প্রজাপতি **বেণ**-এর দুই **বাহু** হয় তাঁর 'পণ্যসংগ্রাহক লোকজন' এবং 'পণ্যবিতরক লোকজন'। এই **বাহু** মন্থন করেই মানবসভ্যতার আদি army-র জন্ম দেওয়া হয়েছিল **পৃথু** নামে। কেন যে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে **বাহু** বা army বলে, এখান থেকে সেটা আমরা জানতে পারি। ফারসিতে এই **বাহুই** পরিণত হয়েছে 'বাজু'তে। আমরা আগেও অনেক শব্দে দেখেছি, ইংরেজিতে একই ধারণার উত্তরাধিকার রয়েছে বহুক্ষেত্রেই। army সেরকমই সমধারণাবাহী শব্দ।

বন্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবনাবনি, অবনিবনাও, আম্রবন, ইক্ষুবন, ইরিকাবন, কমলবন, কুঞ্জবন, দূর্ব্বাবন, বঞ্জর, বন্, বন, বনআরি, বনকপোত, বনকপোতিনী, বনকর, বনকরী, বনকার্পাসী, বনকুঞ্জর, বনকুসুম, বনখণ্ড, বনগজ, বনগব, বনগরু (গোরু), বনগহন, বনগাঁ, বনগাহন, বনগোচর, বনগোরু, বনগ্রাহী, বনচন্দন, বনচন্দ্রিকা, বনচর, বনচর্য্যা, বনচাঁড়াল, বনচারী, বনচালিতা, বনচ্ছিৎ, বনজ, বনজ্যোৎস্না, বনদাব, বনদাহ, বনদুর্গ, বনদেব, বনদেবতা, বনদেবী, বনদ্বিপ, বনধারা, বনধেনু, বননীবার, বনপতি, বনপর্ব্ব, বনপাদপ, বনপাল, বনপালক, বনপূঁই, বনপ্রস্থ, বনপ্রিয়, বনফশা, বনবন, বনবরা, বনবর্হিণ, বনবহ্নি, বনবাইগুন, বনবাত, বনবাদাড়, বনবাস, বনবাসী, বনবীজক, বনব্রীহি, বনভবন, বনভূ, বনভূমি, বনভোজন, বনমক্ষিকা, বনমল্লিকা, বনমল্লী, বনমানুষ, বনমাল, বনমালা, বনমালী, বনমালিনী, বনমৃগ, বনযাত্রা, বনরাজি(জী), বনলক্ষ্মী, বনলতা, বনলেখা, বনসোণা(না), বনস্থ, বনস্থলী, বনস্পতি, বনা, বনাওত্(ট্), বনাজ, বনাত, বনাদ্য, বনানি(নী), বনান্ত, বনান্তঃ, বনান্তর, বনাম (বয়নামা), বনায়ু, বনালি(লী), বনাশ্রম, বনাশ্রমী, বনি, বনিয়া (বেণ, বেনিয়া), বনিতা, বনিবনা, বনিবনাও, বনিকা, বনিত, বনিতা, বনিদী, বনিয়াদি, (বনিয়াদী, বুনিয়াদি, বুনিয়াদী), বনী, বনীয়ক, বনেচর, বনেদ, বনেদি(দী), বনেশ্বরী, বনৈকদেশ, বনোদ্দেশ, বনৌকস্, বনৌকাঃ, বন্ত, বন্দর (বন্দর্), বন্দা (পরগাছা, বাঁদরাগাছ), বয়নামা (বায়না) বন্য, বন্যপশু, বন্যবৃত্তি, বন্যা, বন্যাজল, বন্যাত্রাণ, বন্যার্ত, বহানা (বায়না), বাঁদর (দ্র.বন্দা), বাঁদরাগাছ, বাঁদরামি, বাঁদরী, বাঁদুরে, বান, বানচাল, বানপ্রস্থ, বানর, বানরমুখ, বানরমুয়া, বানস্পত্য, বানা, বানাইল, বানান(নো), বানারসি, বানি(নী), বানিয়া, বানীর, বানেয়, বায়ন, বায়নক, বায়নক্কা, বায়না (বয়নামা, বহানা), বাহানা, বুনিয়াদ, বুনিয়াদী, বুনো, বেনটা (বনেট, বনাওট), বেনে, বেনো, বোনাজ। **বন্** = বহনের অন। **বন** = বহন অন যাহাতে।

বন (বনবন, বনা, বনায়ু, বনিত, বনিতা, বনিবনা, বনীয়ক, বন্ত, বানা, বানান, বানী) : **১. বন** = ✓বন্ + অ (ঘ) - কর্ম্মবাচ্যে। **বনিত** = ✓বন্ + ইত (ইতচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। **বনীয়ক** = ✓বন্ + ঈয়ক - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বন*** = *বহন অন (on) যাহাতে; অথবা, বাহীর নাকরণ-অনকরণ যাহাতে।* ***বনবন*** = ***বন****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***বনা*** = ***বন****-এর আধার যে।* ***বনায়ু*** = ***বন*** *সংক্রান্ত আয় নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***বনিত*** = ***বন*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***বনিতা*** = ***বনিত****-এর আধার যে।* ***বনিবনা*** = ***বনি*** *(****বন*** *গতিশীল যাহাতে) ও* ***বনা*** *(****বন****-এর আধার যে)।* ***বনীয়ক*** = ***বনি****র যাওয়ন করে যে।* ***বন্ত*** = *বহন তারিত যাহাতে।* ***বানা*** = ***বান*** *(****বন*** *হইতে জাত) এর আধার যে।* ***বানান*** = ***বানা*** *অন (on)*

*যাহাতে। **বানী** = **বান** গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে। /* **বন** = মুনি-প্রভৃতি সেবা করেন যাহার। (ব.শ.) **৩. বন** = স্বতঃসিদ্ধবৃক্ষসমূহ, অরণ্য, কানন, বিপিন, পদ্ম-প্রভৃতির সমূহ বা সমাহার, একজাতি-বৃক্ষসমূহ, জল, সন্ন্যাসীর উপাধিভেদ, বনসদৃশ; একমত হওয়া, মনের মিল হওয়া, একরূপ হওয়া, মেলা। **বনবন** = লাঠি-প্রভৃতির দ্রুত ঘূর্ণনের শব্দ। **বনা, বানা** = নির্ম্মাণ করা, রচনা করা, তদাকারে সাজান, মূর্ত্তিমান করা, সংস্কার করা, বর্ণন করা, তদ্রূপে পরিণত করা, খণ্ড খণ্ড করা, অতিরঞ্জিত করা, রচনা করা, মিথ্যা রচনা করা (fabricate)। **বনায়ু** = দেশবিশেষ, পারস্য (?)। **বনিত** = সেবিত, যাচিত, প্রার্থিত। **বনিতা** = জাতানুরাগা বা অনুরক্তা স্ত্রী, দয়িতা, প্রিয়া, যোষিৎ, নারী, বধূ, ভার্য্যা। **বনিবনা (বনিবনাও)** = মনের মিল। **বনীয়ক** = বাচক। **বন্ত** = 'তাহার বা তাহার আছে' এই অর্থে প্রত্যয় (তেজো**বন্ত**, ভাগ্য**বন্ত**, জ্ঞান**বন্ত**)। **বানান** = নির্ম্মাণ করা, গড়া, আকৃতিবিশিষ্ট করা, রচনা করা, লেখা, কল্পনা করা, রন্ধনের উপযোগী করিয়া কোটা, তত্তুল্য করা; নির্ম্মিত, রচিত, কল্পিত; শব্দের অক্ষরবর্ণনা বা বর্ণবিশ্লেষণ, শব্দের বর্ণবিশ্লেষণপূর্ব্বক যুক্তাক্ষরের পাঠ। **বানী (বানি)** = বানানর ব্যয়, পারিশ্রমিক, মজুরী। (ব.শ.)। **৪.** forest অর্থে **বন** প্রচলিত, 'ঘোরার শব্দ' রূপে **বনবন** প্রচলিত। **বনা** 'গড়ে ওঠা' ও 'মেলা' অর্থে প্রচলিত। **বনিত** = অপ্রচলিত। **বনিতা** = স্ত্রী (wife) এবং স্ত্রীলোক বা woman অর্থে প্রচলিত। **বনিবনা** = adjustment অর্থে প্রচলিত। **বনীয়ক** = অপ্রচলিত। **বন্ত** প্রত্যয়রূপে প্রচলিত। **বানা** 'তৈরি করা' অর্থে প্রচলিত। **বানান** 'তৈরি করা', 'তৈরি করান', 'বানান করে পড়া' অর্থে প্রচলিত। **বানী** = বানানর মজুরী অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বণ**। বাংলায় 'বন করা' বা 'বনন করা' বলে কোনো কথা নেই, **বুনন** আছে; কিন্তু হিন্দিতে 'বন গিয়া' (গড়ে উঠল, তৈরি হল), 'বনাও' (বানাও) ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। বাংলায় কিন্তু **বনিবনা** আছে এবং তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, মূলে **বনা** বা **বন্** হয়ে যাওয়া মানেই হল 'ব-কে বা দুইকে নিয়ে মিলেজুলে গড়ে ওঠা', **বনিবনা** করে ফেলা। একজনের স্বভাবে '**বন** গতিশীল', অন্যজন '**বন**-এর আধার', সেকারণেই তারা পরস্পরের পরিপূরক, আমি তোমার মতো **বনে** যাই বা **বনি**, তুমি আমার মতো **বনে** যাও বা **বন** (বনো), তাহলেই তোমার আমার মধ্যে **বনিবনা** হয়ে যাবে, তাহলেই তুমি আমার কাছে ভাল, আমিও তোমার কাছে ভাল। তাহলে তো '**বনে** যাওয়া' কথাটির দুরকম মানে হয় — ক) প'টে যাওয়া বা খাপ খেয়ে যাওয়া (দ্র. **বয়ন**), এবং খ) সংসার**বনে** যাওয়া (দ্র. **বন্য**), 'সাদৃশ্যে' বা forest-এ যাওয়াও বোঝায়। অর্থাৎ, ক)-এর ক্ষেত্রে **বন** হল ক্রিয়াপদ, সংসার**বনের** ক্ষেত্রে **বন** হল বিশেষ্যপদ। বহু শব্দের ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটি আছে, থাকে; অথচ তাদের পার্থক্য বুঝতে আমাদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু **বন**-এর ক্ষেত্রে তার ক্রিয়া ও বিশেষ্য রূপটিকে আমরা গুলিয়ে ফেলি, কারণ, **বন** শব্দটির 'সাদৃশ্য' ও বিশেষ্য অর্থ (= forest) আমাদের মনে এমন ভাবে প্রতীকীরূপে গেড়ে বসেছে, যে, আমরা তদ্রূপ অর্থের বিশ্বাসে গভীরভাবে '**অব-স্থা-প্রাপ্ত**' (conditioned) হয়ে গেছি। সেই কারণে **বন** শব্দের ক্রিয়ারূপটিকে আমরা দেখতেই পাই না, কেবল তার বিশেষ্যরূপটি আমাদের মনকে আচ্ছাদিত করে রাখে। **অথচ উপরোক্ত** শব্দগুলি নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবলেই আমরা বুঝতে **পারি,** মনের গভীরে **বন** শব্দের ক্রিয়ারূপটি না থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষরা উপরোক্ত শব্দগুলি সৃষ্টি করতে পারতেন না। তবে **বন্** শব্দের এই যে 'পটে যাওয়া' অর্থ, এটি কিন্তু ভাল অর্থে রয়েছে ফরাসি bon ও ল্যাটিন থেকে আসা ইংরেজি bonus, bona প্রভৃতি শব্দে। বাংলায় এই **বন্**-কে আমরা পাই **বন্দনা** শব্দে। ...

যাই হোক, আমরা **বণ** শব্দে দেখেছি যে, 'যার ভিতরে প্রকৃতি-প্রদত্ত-স্বভাববহনকারী অন হয়ে রয়েছে', সেই হল **বন**। তার মানে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনসমূহকে (পরিবার, কারুশিল্প সংগঠন ... ইত্যাদি) নিয়ে যে সমাজ**বন** বা **অরণ্য**কে সক্রিয় দেখা যায়, এ হল সেই **বন**। একে ব.শ. বলেছেন 'মুনি-প্রভৃতি সেবা করেন যাহার' সেই হল **বন**। হ্যাঁ, মননশীল মুনিরাই তো এই **বন**কে গড়ে তুলেছিলেন। দ্র. **তপঃ** (১ম খণ্ড)। শ্রীধরকে উল্লেখ করে ব.শ. জানাচ্ছেন, 'স্বতঃসিদ্ধবৃক্ষসমূহ'ই হল **বন**-পদবাচ্য। 'স্বতঃসিদ্ধবৃক্ষ' হল এমন ধরনের ছোট ছোট পরিবার বা পরিবারের মতো ছোট ছোট ব্যবসায়-সংগঠন, যেগুলি সম্প্রদায়রূপী বিশাল আদি-যৌথপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বনির্ভর। মোটকথা, নিজে থেকে গড়ে ওঠা কুটিরশিল্প-সংগঠন বা ব্যবসায়-সংগঠনগুলিই ছিল 'স্বতঃসিদ্ধবৃক্ষসমূহ'। তাছাড়া, **বনা, বানান, বনিবনা** ... প্রভৃতি **বন** ক্রিয়াধারী শব্দ বাদ দিলেও এই **বন** শব্দটি যে দৃশ্য-**বন**কে বোঝানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, বরং অদৃশ্য সংসার-অরণ্যই যে এই **বন** শব্দের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল, তা নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। **বনায়ু** শব্দটি জানিয়ে দেয়, সেকালের পণ্য আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে এই **বন** শব্দের গভীর সম্পর্ক ছিল। দ্র. **পারদেশ্য, পারস্য**। ... তা সে যাই হোক, আমরা অতঃপর **বন**যুক্ত শব্দসমূহের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ ও তাদের বিষয়ে আমাদের ধারণার বর্ণনা দিয়ে এগিয়ে যাব।

বনকর : ৩. রাজার বনবিভাগের রাজস্ব। (ব.শ.)। **৫.** অনুসন্ধান করে দেখা দরকার, আমাদের দেশে ঠিক কোন সময় থেকে forest-এর উপরে 'কর' চাপানো ও আদায় করা শুরু হয়েছিল। আমাদের ধারণা, এটি মোগলযুগের পরের ঘটনা। কিন্তু **বনকর** শব্দটি তার চেয়ে বহু প্রাচীন এবং তার প্রচলন হয়েছিল বৌদ্ধযুগের আগেই; আর সেই **বনকর**-এর সূচনা হয়েছিল বাজারের বিভিন্ন সামাজিক-সংগঠনের উপর চাপানো কর হিসেবে। ...

বনকরী, বনকুঞ্জর, বনগজ : ৩. বন্যহস্তী। (ব.শ.)। **৫. গজ, কুঞ্জর, করী, হস্তী** কাকে বলে, সেকথা আমরা ঐ শব্দগুলির অর্থে এবং **অশ্ব** শব্দের সঙ্গে তুলনায় আগেই জেনেছি। এঁরা হলেন **দিগগজ, দিঙ্‌হস্তী**, বিদ্যা**দিগগজ** ... ইত্যাদি। সেইসব সামাজিক **হস্তবান হস্তী** বা **গজ**দের বোঝানোর জন্যই শব্দগুলি তৈরি করা হয়েছিল। 'সাদৃশ্যে' তা forest-এর elephant-কেও বোঝায়। কিন্তু সেই elephant-রা আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীদের উদ্দিষ্ট ছিল না। 'রাজপথ ধরে হাতি যায়, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে পাড়া কাঁপায়' — এই বাক্য শুনে কোনো বাংলাভাষী ঐ **হাতি**কে elephant বোঝেন না, ঐ **কুকুর**কেও dog বোঝেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন চিন্তার রাজপথ

দিয়ে হাঁটছিলেন, তখন কি নেহাত কম সংখ্যক কুকুর ঘেউ ঘেউ করেছিল? এখনও তো বহু কুকুরে ঘেউ ঘেউ করে! তাতে রবীন্দ্রনাথের কি কিছু আসে যায়?

বনকপোত (বনকপোতিনী, বনপারাবত) : ৩. বন্য কপোততুল্য পক্ষী, ঘুঘু, বনকপোত-স্ত্রী, স্ত্রীজাতি ঘুঘু। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **কপোত, ঘুঘু, পারাবত**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বনগাঁ : ৩. বনরূপ গ্রাম, (গৌণার্থে) বন্যপশুবৎ অশিক্ষিতের গ্রাম। (বনগাঁর শেয়াল রাজা — বনে শিয়াল রাজার মতো অশিক্ষিত দলের প্রধান। পঞ্চতন্ত্রের চণ্ডরব শৃগালের বনে সিংহাদির উপরে আধিপত্য করা ইহার মূল।)। (ব.শ.)। ৫. মন্দিরকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে, পণ্য উদ্ভবের পর, যে সমস্ত পণ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলি সবই ছিল নানা নামের **গণ্ডগ্রাম**। তখন মন্দিরকেন্দ্রিক নগরাঞ্চল ছিল বেদবাদীদের দখলে এবং স্বভাবতই সেখানে পণ্য নিষিদ্ধ ছিল। পরে, একসময় সেই **গণ্ডগ্রাম**-এর পণ্যও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলত, **গণ্ডগ্রাম**গুলি তাদের গৌরবজনক-অর্থ খুইয়ে 'অজ-পাড়াগাঁ'য়ে পরিণত হয়। আমাদের ধারণা, কোনো একসময় **বনগাঁ** সেকালের বিচারে সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল।

বনচন্দন : ৩. অগুরু, দেবদারু। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **চন্দন, দেবদারু**।

বনচর্য্যা : ৩. বনপর্যটন, বনবাস। (ব.শ.)। ৫. কলকাতার সাম্প্রতিক কালের ফ্যাশন বা হুজুক হল — 'চলো, মার্কেটিং করে ঘুরে আসি', কিংবা 'চলো, বিগবাজারে যাই, ঘুরে আসি' ... ইত্যাদি। সেকালের ভাষায় একে বলা হত **বনচর্য্যা**। এই বিচারে আজকের আমেরিকা বলতে গেলে 'বুনো মানুষের দেশ', যারা **বনচর্য্যা** করে, বনে বনে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে।

বনপর্ব্ব : ৩. মহাভারতের তৃতীয় পর্ব্ব। (ব.শ.)। ৫. মহাভারতের 'আদিপর্ব্ব', 'সভাপর্ব্ব'-এর পরে তৃতীয় **পর্ব্ব** হল 'বনপর্ব্ব'। এর পর শুরু হচ্ছে তাদের অজ্ঞাতবাস। তার মানে, **পাণ্ডব**গণ যতদিন বনে বনে বা তৎকালের 'সংসার-অরণ্য'-এ ঘুরেছেন, নানা ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, **বনচর্য্যা** করেছেন, সেসবই রয়েছে এই **পর্ব্বে**। উত্তম অধিকারী হতে পারলে আপনি একে যথার্থে বুঝতে পারবেন, বুঝতে পারবেন কোন অদৃশ্যলোকে তাঁরা কী কী করছেন। আর, নিম্ন অধিকারী হলে আপনি পাণ্ডবদেরকে forest-এ forest-এ ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাবেন এবং বাহ্যচোখে-দৃশ্য নানা কাণ্ড করতে দেখবেন।

বনমাল, বনমালা, বনমালী : ৩. বনমালাবান্, কৃষ্ণ। বনপুষ্পমালা, কৃষ্ণের গলে আজানুলম্বিত মালা। বনমালাধর, কৃষ্ণ, বনমল্লিকা। (ব.শ.)। ৫. রামায়ণে একেবারে শুরুতেই রয়েছে — 'নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি। বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী।।' ইনি **গদাধর নারায়ণ** এবং শ্রীকৃষ্ণের একটি রূপই বটে (দ্র. **গৌরী**)। কিন্তু ইনি **বনমালী** কেন? **বনমাল** কিংবা **বনমালা**ই বা কী? সর্বোপরি 'বনমল্লিকা'কেই বা কেন **বনমালী** বলা হয়ে থাকে। এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা পাব **মল্ল, মাল, মালা, মালী, মল্লিকা** প্রভৃতি শব্দে।

বনস্পতি : ২. / যাহার ফুল হয় না, ফল হয়, তাদৃশ বৃক্ষ — অশ্বত্থপনসাদি। (ব.শ.)। ৩. বনের পতি, বনের পতিতুল্য, বৃক্ষমাত্র, সোমলতা, বটবৃক্ষ, যূপ। (ব.শ.)। ৫. কয়লার স্তর বিশ্লেষণ করে ভূতত্ত্ববিদগণ জানিয়েছেন, প্রাচীন কয়লার স্তরের অধিকাংশই 'পুষ্পহীনবৃক্ষ'-এর শবদেহই বটে। তাঁদের মতে, এই পৃথিবীতে সবার আগে 'পুষ্পহীনবৃক্ষ'-এর রমরমা ছিল। তাদের পরে এসেছে 'পুষ্পবানবৃক্ষ'-এর দল। মনুসংহিতা আমাদের জানান, যে বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না, তাদের **বনস্পতি** বলে। আমাদের পৌরাণিক ইতিহাস জানাচ্ছে, মানবসভ্যতার আদিতে 'পণ্যসৃজক সামাজিক সংগঠন' (= পুষ্পবানবৃক্ষ) ছিল না, সবই ছিল 'উৎপন্নসৃজক সামাজিক সংগঠন' (= ফলবানবৃক্ষ)। এদেরই বলা হত **বনস্পতি**।

বনাশ্রম, বনাশ্রমী : ৩. বনসম্বন্ধী আশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ, বনস্থ বাসস্থান, তাপস। (ব.শ.)। ৫. বাংলাভাষীদের মধ্যে এইরকম একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, মুনি ঋষিরা বনে থাকতেন, গৃহীরা বনে থাকতেন না, থাকেন না, তাঁরা লোকালয়ে থাকেন; কিন্তু নাতির মুখ দেখার পর তাঁরা গৃহত্যাগ করে বনে চলে যান। এইরূপ চলে যাওয়াকে বানপ্রস্থাশ্রমে যাওয়া বলে। এটিই **বনাশ্রম**। যাঁরা সেরূপ করেন, তাঁরা **বনাশ্রমী**। দ্র. **বানপ্রস্থ**।

আমরা এই ধরনের **বনাশ্রম**-এর কোনো বাস্তব ভিত্তি পাইনি। আমাদের ধারণায় জাতিতে ব্রাহ্মণদের তালিকা ধরে ধরে অনুসন্ধান চালালে 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' নীতি অনুসরণকারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা শতকরা ৫ জনও হবে কিনা সন্দেহ। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ব্রাহ্মণেরা **বনাশ্রমী** বা **বানপ্রস্থাশ্রমী** হন না, হতেন না। প্রকৃতপক্ষে **ব্রাহ্মণের** প্রধান **কর্ম্ম**ই বা **ব্রহ্মকর্ম্ম**ই থাকে **বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস** আশ্রমে। **বানপ্রস্থ**-এর বা **বনাশ্রমের** অর্থ হল সামাজিক-সম্পর্ক-সমূহের অভিভাবনা করা, সংসার-অরণ্যে অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করা; একালের ভাষায় যাকে বলা হয় — role of advisor। বিশ্বের সব দেশের সকল জ্ঞানীগুণী মানুষেরাই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে **বানপ্রস্থাশ্রমে** কাটান। তবে আমাদের দেশ ছাড়া বিশ্বের কোনো দেশই সেই বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করেননি বা করতে পারেননি। আমাদের পূর্বসুরিরা করেছিলেন। দ্র. **বানপ্রস্থ**।

বনাম : ১. ব + নাম। (ব.শ.)। ৩. অন্য নাম, ওরফে (alias), প্রতিবাদিভাবে, বিরুদ্ধে (versus)। (ব.শ.)। ৪. versus অর্থে প্রচলিত। ৫. শুরুতে **ব** বর্ণের অর্থে আমরা এই কথাটিই বারংবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, **দ্বি**-এর যে **ব**, সেই **ব** আসলে প্রচলিতের পাশে অন্য একটি ধারার কথা বলে। সেই **ব** বর্ণটি পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় **বনাম** শব্দে। প্রচলিতের পাশাপাশি দ্বিতীয়টির কথা বলে বলেই এই **বনাম**-এর মানে দাঁড়িয়ে যায় 'প্রতিবাদিভাবে' কিংবা 'বিরুদ্ধে'।

বন্য (বন্যা, বান) : ১. ✓বন্ + য (যৎ); স্ত্রী -ন্যা। (ব.শ.)। ২. *বন্য = বন থাকে যাহাতে। বন্যা = বন্য-এর আধার যে। বান = বন হইতে জাত।* ৩. **বন্য** = বনভব, বনস্থ, বনজাত, আরণ্য, বুনো, বনজাত বৃক্ষ বা পশু, বনশূরণ, বনজাত কন্দমূলফলাদি, দারুচিনি। **বন্যা** = গুঞ্জা, ভদ্রমুস্তা; বনসমূহ, জলসমূহ, জলরাশি, বান, রক্তের

বান। **বান** = বর্ষার জলরাশি, জলপ্লাবন (flood), পর্ব্বে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলরাশি, নদীর জলবৃদ্ধি; বনসমূহ। (ব.শ.)। **৪.** তিনটি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** একই **বন্যা** ও **বান** শব্দদুটির অর্থ 'বনসমূহ' ও 'জলসমূহ' একই সঙ্গে হয় কেমন করে, বোঝা যায় না; আবার শব্দগুলি যে **বন** শব্দ থেকে জাত, তাতে সন্দেহমাত্র নাই। কার্যত শব্দ তিনটি সৃজিত হয়েছে এই ক্রমে —

বন > **বান** = **বন্যা**

বন > **বন্য** > **বন্যা**

কিন্তু তাতে **বন**-এর অর্থপ্রবাহ **বন**-জাত শব্দগুলিতে থাকছে কীভাবে, সেটি চট করে বোঝা যায় না; যেমন **বন্য** থেকে **বন্যা** শব্দ তৈরি হতে পারে, কিন্তু তাদের অর্থের সামঞ্জস্য দেখা যায় না, যদি তাদের আমরা **বন্য** = wild এবং **বন্যা** = flood ভাবি। সত্যিই তো, wild কেমন করে flood হল তা কি আদৌ বোঝা সম্ভব? অথচ অনাদিকাল থেকে বাংলাভাষী **বন্যা** ও **বান** শব্দ ব্যবহার করে আসছেন। তাই বলে শব্দদুটির ভিতরে **বন্য** বা **বন** শব্দটি নেই, একথাও বলা যাচ্ছে না। মহা সমস্যা! ...

কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি **বন** শব্দের অর্থ 'সংসার**বন**' বুঝবেন, দেখবেন, সমস্যাটি থেকে বেরোনোর একটা পথের দিশা দেখা যাচ্ছে। আসলে আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা তো forest বা flood কাউকেই বোঝানোর জন্য শব্দগুলি তৈরি করেননি, কারণ ওগুলি তো বাহ্যসত্তা যাদের আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের পূর্বপুরুষদের সমস্যা ছিল দাশ-পরিবার, ঘোষ-পরিবার, মুর্মু-পরিবার, গুহ-পরিবার, মল্লিক-পরিবার, মুখার্জী-পরিবার — এমনি অজস্র পরিবারে পরিবারে (ছোট ছোট সামাজিক সংগঠনে) বিস্তীর্ণ সংসার-**অরণ্য**কে বোঝানো, যা কিনা 'সাদৃশ্যে' আমবন তালবন আতাবন ... ইত্যাদি অজস্র প্রকার বৃক্ষের বা গাছগাছালির সমাহার। (পরিবার = ক্ষুদ্রতম সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান = বৃক্ষ)। এদের যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক যৌথতা, যাকে আমাদের আদি শব্দজ্ঞানীরা আগেই **জল** শব্দে শনাক্ত করেছিলেন, এখনও যাকে 'জনঅরণ্য' বা 'জনসমুদ্র' অর্থাৎ 'জনসাধারণ' বলা হয়, সেটিও অতএব **বন**-পদবাচ্য হয়ে যায়। এই **বন**-পদবাচ্য **জল** বা 'জনসমুদ্র' যদি বিশেষ বিশেষ উৎসবে বা **পর্ব্বে** উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাকে স্বভাবতই **বান** বা **বন্যা** বলতেই হয়। সেই কারণে ব.শ. **বান** শব্দের অর্থ দিয়েছেন — 'পর্ব্বে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলরাশি' (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য)। ...

তার মানে, **বন, বান, বন্য, বন্যা** — এসব শব্দের 'সাদৃশ্যে' লব্ধ প্রতীকী অর্থগুলিকে (forest, flood, wild, flood) মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে ভাবতে হবে অদৃশ্য অর্থগুলির কথা। **বন** = পরিবারে পরিবারে বিস্তীর্ণ সমাজ। **বান** = সেই সমাজের সামগ্রিক উচ্ছ্বাস, উল্লাস, উপপ্লব, প্লব, প্লাবন, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, যা সমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন কাল**পর্ব্বে** দেখা দিয়ে থাকে। **বন্য** = পরিবারে পরিবারে বিস্তৃত যে সমাজ, তার যা যা গুণাগুণ, সম্পদ-বিপদ ... সেগুলি সবই **বন্য**। পরিবারে পরিবারে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের কারণে উদ্ভূত স্বভাবও **বন্য**, যা সমাজসদস্যদের মধ্যেও সক্রিয় থাকে। **বন্যা** = সেই **বন্য**গুণ যখন সার্বিকভাবে ছড়িয়ে প'ড়ে উচ্ছ্বাস, উপপ্লব, প্লাবন ... ইত্যাদি রূপে দেখা দেয়, তখনই তা **বন্যা** পদবাচ্য হয়ে যায়। এই হল শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বা ক্রিয়াভিত্তিক **বর্ণভিত্তিক** অর্থের তাৎপর্য। ...

মোটামুটিভাবে সংসার**অরণ্যে**র এই বিষয়গুলিকে বোঝানোর জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষেরা **বন্য, বন্যা** ... প্রভৃতি শব্দগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। বলতে গেলে, সমগ্র জনসাধারণকে অজস্র পরিবারের সামগ্রিক রূপ হিসেবে বাহ্যিকভাবে বোঝানোর জন্য 'জনঅরণ্য' স্বরূপ 'বনসমূহ' ধারণাটির জন্ম; এবং সমগ্র জনসাধারণকে তাদের সামগ্রিক সক্রিয় আন্দোলিত রূপটিকে বোঝানোর জন্য 'জনসমুদ্র' স্বরূপ 'জলসমূহ' ধারণার জন্ম হয়। সেই দুই ধারণাকে একত্রে বলতে গিয়ে **বন, বান, বন্য, বন্যা** প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি করতে হয়। শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ এই।

সেই প্রকৃত অর্থ অনেকাংশে ভুলে গিয়ে এখন কেবল 'সাদৃশ্য'-অর্থগুলি (forest, flood, wild) নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত থাকি। মানসলোকের দেখাকে সহজবোধ্য করার জন্য বাহ্যলোকের যে সত্তাগুলির উল্লেখ করা হত, সেই সদৃশ সত্তাগুলিই এখন শব্দগুলির একমাত্র প্রতিপাদ্য অর্থ হয়ে গেছে — প্রেমিকার কাছে যে প্রেমপত্র-বাহককে পাঠানো হয়েছিল, প্রেমিকাকে সেই পত্রবাহকই দখল করে স্বামী সেজে বসে আছে। শুধু তাই নয়, প্রেমিকার আসল প্রেমিক যে অন্যত্র রয়েছে, পত্রবাহক সেকথা মানতে পর্যন্ত রাজি নয়। এবং বর্তমান বিশ্বের ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় চলছে সেই পত্রবাহকের বা 'সাদৃশ্য-অর্থ'-এর রাজত্ব ও রমরমা। অনেকেই জানেন না যে, প্রেমপত্রবাহক প্রেমিকের প্রেমিকাটির স্বামী সেজে বসে গেছে বলেই প্রেমিকার সঙ্গে তার স্বামী-সেজে-বসা লোকটির কোনো দৈহিক-সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায় না (প্রচলিত প্রতীকী শব্দার্থবিধিতে শব্দের সঙ্গে অর্থের দৈহিক সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায় না); অর্থাৎ তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ, পুরুষ-প্রকৃতিসুলভ, 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ' নাই। আধুনিক ইংরেজি ভাষা তো প্রেমিকের অস্তিত্বের খবর পর্যন্ত জানে না। সে শুধুমাত্র সেই 'সাদৃশ্য-অর্থ'গুলিকেই শব্দের অর্থরূপে বোঝে, অর্থাৎ প্রেমপত্র-বাহকটিকেই প্রেমিকার স্বামীরূপে বোঝে। ইংরেজদের দেখাদেখি আমাদের বঙ্গভাষী অ্যাকাডেমিশিয়ানরাও যে এখন সেই পত্রবাহককেই সেলাম ঠুকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! অতএব — এখন আমাদেরও 'দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস'! ... (আমাদের 'ঋ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রাচ্যের শব্দার্থবোধ'-এ 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।)।

বানপ্রস্থ : **১.** বনপ্রস্থ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** *যাহা দ্বারা **বান**কে (গণ**বন্যা**কে) প্রকৃষ্টরূপে স্থিত করা হয়। / বনৈকদেশে ভব যে।* (ব.শ.)। **৩.** তৃতীয়াশ্রমী দ্বিজাতি, বৈখানস, তপস্বী, মধুকবৃক্ষ; মনুসংহিতা মতে — গৃহস্থ পক্বকেশ শিথিলচর্ম্মা হইলে ও পৌত্রের মুখাবলোকন করিলে, স্ত্রীকে লইয়া বা পুত্রহস্তে স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ হইবেন এবং বন্যফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বর-আরাধনা করিবেন। (ব.শ.)। মানবজীবনের তৃতীয় আশ্রম বলে কথিত। প্রৌঢ় বয়সে সংসারত্যাগ করে বনে বসবাসের নাম বানপ্রস্থ। (পৌ.অ.)। **৪.** ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। **৫.** উপরে **বন্য, বন্যা, বান, বনাশ্রমী** অবশ্য দ্রষ্টব্য। **বানপ্রস্থ** শব্দ থেকে

আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের এক মহত্তম অর্জনের সাক্ষাৎ পেতে পারি। কিন্তু তা পেতে গেলে সবার আগে মন থেকে এসব বিষয়ে পূর্বধারণাগুলি মুছে ফেলা দরকার। কেননা, 'ব্রহ্মচর্য্য' শুনলেই আমাদের মাথায় টিকিওয়ালা কৌপীনধারী কিশোরদের ছবি ভেসে ওঠে; 'গার্হস্থ্য' শুনলেই আমরা ব্যতিব্যস্ত এক গৃহকর্তাকে দেখতে পাই; **বানপ্রস্থ** শুনলেই দেখি এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ঘর ছেড়ে চলেছেন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের দিকে; এবং সন্ন্যাস শুনলেই চোখের সামনে জটাজুটধারী ভিখিরি সন্ন্যাসীর ছবি ভেসে ওঠে। এই ধারণাগুলি **ব্রহ্মচর্য্য**, গার্হস্থ্য, **বানপ্রস্থ**, সন্ন্যাস প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থের দিকে আমাদের যেতে দেয় না, মাঝপথ থেকে একেবারেই বিপথে চালিত করে দেয়। সুতরাং, শুরুতে আমরা ধরে নেব, **বানপ্রস্থা**দি বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তারপর শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ নতুন করে বুঝে বুঝে এগোনোর চেষ্টা করব।

'**বান**কে প্রকৃষ্টরূপে স্থিত করা হয় যাহা দ্বারা' সেটিই **বানপ্রস্থ**, সন্দেহ নাই। আমরা একটু আগেই দেখেছি, **বান** ব্যাপারটি flood নয়, সে হল 'জনসমুদ্রের **বন্যা** বা **বান**', জনসাধারণের একটা সামগ্রিক **জল**রূপী সচল প্রবতা বা প্লাবন; অস্থির হয়ে গেলে যাকে উপপ্লব, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। জনসাধারণের এই **জল**রূপটি সামগ্রিক-ভাবে আন্দোলিত হতে থাকলে তাকেই 'প্লাবন' বা **বান** বলে। সেই গণসচলতাকে বা গণ**বন্যা**কে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিশীল রাখাই **বানপ্রস্থ**-করণ, এবং যিনি তা করেন, তিনি **বানপ্রস্থা**শ্রমী বা **বনাশ্রমী**; অর্থাৎ তিনি **বানপ্রস্থ**-রূপ 'নেশা-পেশা' (= **আশ্রম**) অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করছেন। এখন প্রশ্ন হল, 'গণসচলতাকে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিশীল রাখা' বা **বানপ্রস্থ-কর্ম্ম** করা কীরূপ ব্যাপার?

না, আধুনিক ও পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চায় জনসাধারণের সামগ্রিক আচরণকে একত্রে **বন্যা** বা **বান** রূপে বুঝবার কোনো তথ্য আমরা পাইনি। কিন্তু এখানে পাচ্ছি। জনসমুদ্রের দোলন বা আন্দোলনকে **বান** রূপে বুঝে নেওয়াই নয়, বলা হচ্ছে, সেই **বান** যাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিত হয়, সেই কাজে আত্মনিয়োগ করবেন পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের সকল ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা (দ্র. **আশ্রম**)। কম কথা নয়! গোটা সমাজকে এই কথা শেখানো হচ্ছে! গার্হস্থ্যের বেলায় যেমন গৃহ যাতে ঠিকঠাক স্থিত হয়, **গৃহস্থ** সেই চেষ্টা করেন, তেমনি **বানপ্রস্থের** বেলায় সমাজের **বান** বা গণ**বন্যা** যাতে 'প্রকৃষ্টরূপে স্থিত' বা স্থিতিশীল হয়, তার চেষ্টা চালান পঞ্চাশোর্দ্ধ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা! আমাদের বহুকালক্রমাগত উত্তরাধিকার অনুসারে **বানপ্রস্থাশ্রম** ধারণার ভিতরে এই কথাগুলি বলা আছে। কিন্তু সেই **বানপ্রস্থ** বা 'গণ**বন্যাকে** প্রকৃষ্টরূপে স্থিত রাখা' কীরূপ ব্যাপার?

ব্যাপার খুব কঠিন অথচ খুবই সহজ। খুব কঠিন এইজন্য যে, অতীতের সঙ্গে আমাদের 'আত্মবিচ্ছেদ' ঘটে যাওয়ায় কেউ সেটি দেখিয়ে না দিলে আমরা তা দেখতে পাই না, জানতে পারি না, বুঝতে পারি না। খুবই সহজ এইজন্য যে, ব্যাপারটি আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, প্রতিনিয়ত ঘটছে, আমরা প্রত্যেকেই সেই ব্যাপারের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত, তাকে আমরা প্রত্যেকেই চিনি, তার সঙ্গে আমাদের নিত্য ওঠাবসা। একবার দেখিয়ে দিলেই আমাদের সব কথা মনে পড়ে যায়। ... ব্যাপারটি হল — আজও প্রতিটি দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোকে 'স্থিতিশীলতা' বা stability অর্থাৎ 'টেকসই-হওয়া' নিয়ে নানান কথা বলেন, নানা কাজ করেন — যাতে দেশের সরকার 'স্টেবল' বা স্থিতিশীল হয়, দেশের রাজনীতি 'স্টেবল' হয়, দেশের অর্থনীতি 'স্টেবল' হয়, শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি পশুপালন ... ইত্যাদি প্রতিটি সামাজিক ব্যবস্থাই 'স্টেবল' হয়, তার জন্য কত গুণীজ্ঞানী দেশনায়ক মানুষেরা কতই না ভাবনাচিন্তা চেষ্টাচরিত্র করে থাকেন। সেই চেষ্টায় সফল হলে তবেই 'গণ**বন্যা**কে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিশীল' করা বা 'স্টেবল' করা সম্ভব হয়। তার মানে, দেশের সর্বপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি (অধিরাষ্ট্রের নীতি = স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক রীতিনীতি) ও সরকারী রীতিনীতি (রাষ্ট্রের বিধান = আইনকানুন), অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ... ইত্যাদি বিষয়ক রীতিনীতি বিষয়ে পূর্বসূরিদের নিয়মগুলি ও সমকালে অর্জিত নিয়মগুলি সমাজে ঠিকঠাক প্রয়োগ করার কাজ করা, ঠিকঠাক প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা দেখার কাজ করা ... ইত্যাদি। পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে এসে কেবলমাত্র এইসকল কাজ করাকে **বানপ্রস্থ** বলে। মোটকথা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজ (= গার্হস্থ্যাশ্রম) সমাপ্ত করে, সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজে হাত লাগালেই গণ**বন্যা**কে বা '**বানকে** প্রকৃষ্টরূপে স্থিত করা' বা 'স্টেবল' করার ধর্ম পালন করা হয়। সেই কাজে যিনি আত্মনিবেদিত হন, তিনিই কার্যত **বানপ্রস্থ** অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করেন। মোটকথা এ হল সমাজের advisor-এর ভূমিকা গ্রহণ করা বা সমাজের **অভিভাবক**-এর ভূমিকা গ্রহণ করে কালাতিপাত করা। একেই **বানপ্রস্থ** অবলম্বন করা বলে। যে সমাজের জ্ঞানীগুণী (= ব্রাহ্মণ) ও সংগ্রামী ভুক্তভোগী কর্মবীরেরা (= ক্ষত্রিয়রা) এই ভূমিকা যত ভালভাবে গ্রহণ করেন, সেই সমাজ তত ভালভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। ...

তবে একাজ যে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাই করতেন বা করেন, এমন নয়। বিশ্বের সকল দেশের সব সমাজেই জ্ঞানীগুণী ও কর্মবীর মানুষদেরকে সমাজের advisor বা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কেননা, মানবঝাঁককে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি গোষ্ঠীর জ্ঞানীগুণী-কর্মবীর মানুষদের এই ভূমিকা একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রথা। অন্যান্য দেশের মানুষও সেই প্রথা অনুসরণ করেই তাঁদের জাতিকে আজ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। বলতে কী, প্রতিটি জাতির প্রায় সমস্ত মানুষই তাদের যৌবনে বিবাহাদি করে গৃহস্থ হয়; যারা একেবারেই মজুর শ্রেণীর তারা ছাড়া প্রায় সবাই ছেলেবেলায় স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক শিক্ষা বা অ্যাকাডেমিক শিক্ষা কিংবা উভয় প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়; কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও কর্মবীর মানুষেরা সমাজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দার্শনিক দিকগুলির দেখাশোনা ও সেগুলির বিকাশ সাধনের কাজকর্ম করে থাকেন; অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষ মানবসমাজের এলাকা ছাড়িয়েও কিছু কাজকর্ম করার চেষ্টা করেন। বিশ্বের সকল দেশের সকল সমাজই এইভাবে পরিচালিত হয়ে চলে আসছে। বলতে গেলে এটিই মানবসমাজের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রথা।

ভারতীয় উপমহাদেশও সেভাবেই মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবন চালিয়ে এসেছে। তবে অন্যদের সঙ্গে তার একটি গুরুতর পার্থক্যও আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের আদি পরিচালকেরা **সেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রথাকে সুসংজ্ঞায়িত ও সুবিন্যস্ত** করে অধিকাংশ সমাজসদস্যদের মধ্যে সেই ধারণাকে চারিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফল প্রথম দিকে যতটা ভাল হয়েছিল, **দক্ষের** 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি নীতি'র হাতে পড়ে গিয়ে বৈদিকসভ্যতার স্বর্ণযুগের পর থেকে ততটাই মন্দ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মানুষের প্রকৃত অর্জন তো শেষ পর্যন্ত মিথ্যে হয় না, হতে পারে না। আজ এতদিন পরে হলেও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে আমরা সেই অর্জনকে চিনে বুঝে নিতে পারছি। হয়তো এই অর্জনের প্রয়োজন আবার কোনোদিন কোথাও না কোথাও হবে। ...

তা সে যাই হোক, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রকৃত **ব্রহ্মজ্ঞ** মানুষেরা **ব্রহ্মজ্ঞানের-পঞ্চধারার** (গ) (ঘ) (ঙ) ধারায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল **বানপ্রস্থ** বিধির প্রয়োগ ঘটানো। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে প্রকৃত জ্ঞানীগুণী (= ব্রাহ্মণ) ও কর্মবীরেরা (= ক্ষত্রিয়রা) পরিবার-পরিজন ও অর্জিত বাহ্যসম্পদ ত্যাগ করে সমাজের **বানকে প্রস্থ** করতে বা প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিশীল করতে আত্মনিয়োগ করবেন — এরকম একটি নীতি গোটা সমাজকে জানান হচ্ছে, মানানো হচ্ছে, এটা কম কথা নয়। এই দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছনোর পর থেকে **বানপ্রস্থ আশ্রম** অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করবেন, এটাই ছিল আমাদের মনুসংহিতার বিধান। তার মানে, আমাদের এই সংসার**বন** যে সকল রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল রাজনৈতিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক রীতিনীতি, সামাজিক রীতিনীতি ... এবং সেই নীতিগুলির প্রয়োগের কাজে, তা ঠিকঠাক প্রযুক্ত হচ্ছে কি না, তা দেখার কাজে ব্যাপৃত থাকাকেই **বানপ্রস্থ**-আশ্রম অবলম্বন করা বলে। প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজ কেমন করে চলবে না-চলবে, তা ঠিক হয় এই **বানপ্রস্থ**-জীবী ব্রাহ্মণ ও **বানপ্রস্থ**-জীবী ক্ষত্রিয়দের **বানপ্রস্থ**-কালীন কাজকর্মের দ্বারা। একালের ভাষায় একে বলা হয় advisory role বা **অভিভাবকের** ভূমিকা। এর মধ্যে তথাকথিত দার্শনিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ... সমস্ত কাজকর্মই পড়ে। বলে রাখা ভাল, অতীতে এ-সবই **আধ্যাত্মিক** ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল, 'মানুষের ধর্ম'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এককালে আমাদের দেশের **বানপ্রস্থাশ্রমী** ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষি ও ক্ষত্রিয়রা, আরব্য দেশগুলির আউলিয়া-অম্বিয়া-পীর-মুর্শিদেরা, পাশ্চাত্যের সেন্ট-সাধু-ধর্মগুরুরা যে-যার আপন আপন সমাজের **অভিভাবক**-এর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষত্ব এইখানে যে, সে সেই **অভিভাবক**-এর ভূমিকাকে সুসংজ্ঞায়িত ও সুবিন্যস্ত করে জনসাধারণ্যে প্রচার করে রেখেছিল।

মানুষের জীবনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা — **ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ,** ও **সন্ন্যাস**। সমাজের মানুষদেরকেও তাঁরা চার ভাগে ভাগ করেছিলেন — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। তাঁদের মতে, ব্রাহ্মণ তাঁর জীবন কাটাবেন উপরোক্ত চার ভাগে অর্থাৎ তিনি হবেন চতুরাশ্রমী। ক্ষত্রিয় তাঁর জীবন কাটাবেন তিন ভাগে অর্থাৎ তিনি হবেন — ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ — এই তিন আশ্রমী। বৈশ্য তাঁর জীবন কাটাবেন দুই ভাগে অর্থাৎ তিনি হবেন — ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য — এই দুই আশ্রমী। এবং শূদ্র তাঁর জীবন কাটাবেন এক ভাগে অর্থাৎ তিনি হবেন শুধুমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমী বা একাশ্রমী। কার্যত, জীবনের প্রথম পর্বে মানুষ **ব্রহ্মচর্য্য** পালন করে আপন আত্মার সেবা করে। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মানুষ পরিবার-পরিজনের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করে। জীবনের তৃতীয় পর্বে জ্ঞানীগুণী ও কর্মবীর মানুষেরা সমগ্র সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আপন আপন আত্মার সেবা করেন। এবং জীবনের শেষ পর্বে 'প্রবুদ্ধমিব সুপ্ত' ব্রহ্মগুণসম্পন্ন মানুষেরা বিশ্বজগতের সেবার মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করেন। সংক্ষেপে বললে, ব্রহ্মচর্য্যে চালান হয় আত্মোন্নয়ন; গার্হস্থ্যে চালান হয় পরিবার-পরিজনের উন্নয়ন; বানপ্রস্থে চালান হয় সমগ্র সমাজের উন্নয়ন; এবং সন্ন্যাসে চালান হয় বিশ্বজগতের উন্নয়ন। (**বর্ণ** ও **আশ্রম** এ-দুটি ভুক্তিতেও এসব কথা থাকছে।) মোট কথা এ ছিল মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন ঠিকভাবে চালানোর স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক রীতিনীতিকে যথার্থভাবে বুঝে নিয়ে সচেতনভাবে সেগুলি করার যথাযথ প্রচেষ্টা, যা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা বৈদিক যুগের প্রাক্কালেই বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। ...

কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই মহান অর্জন বৈদিক যুগের সূত্রপাতের কয়েকশ' বছরের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যায়। **দক্ষ**-এর 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি'র হাতে পড়ে যেই না জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ছেলে বৈশ্য এবং শূদ্রের ছেলে শূদ্র বলে ঘোষিত হয়ে গেল, গোটা পরিকল্পনাটিই মাটি হয়ে গেল। যিনিই জ্ঞানচর্চা করে কিছু অর্জন করেছেন, তিনিই 'জ্ঞানীগুণী', তিনিই 'বেদী', তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনিই বহু কর্মযজ্ঞে ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তিনিই কর্মবীর — এই ছিল সনাতন যুগের নীতি। সারা বিশ্বের সমস্ত জাতি আজও এই নীতিই অনুসরণ করে থাকে। ভারতে বৈদিক যুগের স্বর্ণযুগ (**পৃথু**র সময়কাল, আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত এই নীতিই কমবেশি অনুসৃত হত। তারপর ভারতবর্ষের **দক্ষ**-ব্রাহ্মণ সেই নীতিকে আক্রমণ করতে শুরু করে এবং অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলের জ্ঞানচর্চা বা বেদপাঠ নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলত, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে মহান কর্তব্য — advisory role, **বানপ্রস্থ** অবলম্বন — সেই মহান কর্তব্যের অধিকার যথার্থ জ্ঞানী ও কর্মবীরদের হাতে আর থাকল না, থাকল শুধুমাত্র ব্রহ্মগুণহীন অধঃপতিত জাতিতে-ব্রাহ্মণের হাতে, তাদের অনুসরণকারী ক্ষত্রিয়দের হাতে। ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত মানুষের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

বানর (বানরকেতু, বানরপ্রিয়ফল, বানরেন্দ্র, বাঁদর, বাঁদরা, বন্দা) : ১. **বানর** = বান + ✓রা (গ্রহণ) + অ (ক); বন + ✓রম্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে — বনর + অ (অণ্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. **বানর** = ***বা** (দ্বিতীয় প্রকার) নর যে; অথবা, নর-এর মতো (বা) যে।* / **বানর** = বা (তুল্য) নর (মনুষ্য) যে। (ছা.অ.)। বনফল গ্রহণ

করে যে; বনে রমণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **বানর** = মর্কট, কপি। **বানরকেতু** = অর্জ্জুন, বানরচিহ্নিত ধ্বজ। **বানরপ্রিয়ফল** = কদলী। **বাঁদর** = বানর, গালিবিশেষ। **বাঁদরা (বন্দা)** = বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, পরগাছা (parasite)। (ব.শ.)। **বানর** = জন্তুবিশেষ, কপি, শাখামৃগ, বাঁদর। **বানরেন্দ্র** = সুগ্রীব, হনুমান, বানরশ্রেষ্ঠ। **বাঁদর** = মর্কট, শাখামৃগ। (ছা.অ.)। ৪. monkey অর্থে **বানর** ও **বাঁদর** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আমলক, আমলা, নর, কিন্নর, উশীনর, বিশ্বানর, বৈশ্বানর**। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, আমরা প্রচলিত প্রতীকী অর্থে মানুষকে **নর** বলি, **কপিকে বানর** বলি; আর, ইংরেজরা সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীতুল্য নরকে monk এবং **কপিকে** monkey বলেন। কীভাবে নর-বানরের ধারণা প্রায় একই অর্থে monk-monkey রূপে ইংরেজি ভাষা পেল, সেটি গবেষণা সাপেক্ষ। তবে মানুষের সঙ্গে বানর নামক জন্তুটির যে সম্পর্ক রয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ঐ যে মূল কথা, দৃশ্য বিষয়কে বোঝানোর জন্য তো মানুষের ভাষার শব্দসৃষ্টি হয়নি, অদৃশ্য বিষয়কে বোঝানোর জন্যই তো শব্দের সৃষ্টি। কোন অদৃশ্য বিষয়কে বোঝাতে **নর** ও **বানর** শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা জানা দরকার।

না, এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। কোনো একটি পুরানো বাংলা অভিধানে 'বানর' মানে 'আমলা' এবং 'আমলা' মানে 'বানর' লেখা আছে, কলিম খান এটি নিজের চোখেই দেখেছিলেন। পরে **নর** ও **নর**যুক্ত অন্যান্য শব্দগুলির সঙ্গে তার অর্থ মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অ্যাকাডেমি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের সেকালে **বানর** বলা হত, বিশেষত যাঁদের নামের শেষে উপাধির (ডিগ্রির) লেজ আছে। তাঁর এই ধারণাকে সমর্থন যোগান গ্রামবাংলায় প্রচলিত কবিগানের এক গায়ক। তিনি নামের শেষে 'বি.এ.' উপাধিধারী বা ডিগ্রিধারী এক পণ্ডিত কবিকে এইভাবে সকল শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন — 'হাওড়া জেলা থেকে এক পণ্ডিত এসেছে। / কেউ রাখে মাথায় টিকি, এ বেটা পঁদে টিকি রেখেছে।'

সবাই জানেন, **বানরের** পশ্চাদ্দেশে লেজ থাকে। অদৃশ্যলোকে এটিই উপাধির বা ডিগ্রির লেজ। যিনি বহু উপাধি প্রাপ্ত, তার ডিগ্রির লেজ অতএব খুব লম্বা। সেকালে তাদের হনুমান জাম্বুবান ... ইত্যাদি বলা হত। মনে রাখা ভাল, হনুমানের লেজ মহাবলশালী ভীম (পরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক প্রচারব্যবস্থা) পর্যন্ত লঙঘন করতে পারেন না, সরাতে গেলে তুলে সরাতেও পারেন না। যেমন একালে কোনো ব্যাপারে কোনো বিশাল ডিগ্রিধারী স্পেশালিস্ট যদি একবার তাঁর রায় দিয়ে দেন — বাতাসে ধূলিকণার মাত্রা ৫০ পেরোলেই তা মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত — বাতাসে ধূলিকণা ছড়ানো গাড়ির কারবারী কিংবা কোনো রাজনৈতিক নেতাও সেই রায়কে প্রকাশ্যে লঙঘন বা অমান্য করতে সাহস করেন না। কেননা ঐ রায়ের পেছনে রয়েছে ঐ স্পেশালিস্টের ডিগ্রির বিশাল লেজ, যা গাড়ির-কারবারী ও রাজনৈতিক নেতার পথের উপর আড়াআড়ি শুয়ে রয়েছে। এই হল ডিগ্রির লেজধারী **বানর**। আমলার চাকরি পাওয়ার পর এরা সামাজিক সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের (= **বৃক্ষের**) বিশেষ শাখার দায়িত্বে বসে যান, তখন এদের **শাখামৃগ** বলে; একালের ভাষায় যাদের departmental head, controller, director ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বা **বৃক্ষের** শাখায় বসে জীবিকার্জন করে টিকে থাকে বলে, এদের **বন্দা, বাঁদর, বাঁদরা** (= parasite = পরগাছা) ইত্যাদিও বলা হয় (নিম্নে **বন্দ** দ্রষ্টব্য)। রামায়ণের কাহিনীতে যে বানরদের কাহিনী আছে, তা বিশ্লেষণ করে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। (দ্র. **বালী, সুগ্রীব**) ...

বর্তমান বাংলাদেশের একটি কায়স্থ-অধ্যুষিত গ্রামের নাম 'বানরীপাড়া'। কায়স্থরা যেহেতু বহু প্রাচীন কাল থেকে 'সমাজশরীরের **কায়ে** স্থিত' **কায়স্থ** রূপে অর্থাৎ আমলা বা করণিক রূপে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকতেন, সেই কারণে 'বানরীপাড়া' নামটিও সাক্ষ্য দেয় যে, **বানর** নামের একটি পুরোনো অর্থ 'আমলা'। একই কথা **হস্তিনাপুর** শব্দের ক্ষেত্রেও খাটে। দ্র. **ইন্দ্রপ্রস্থ, বরাহনগর**।

যে অভিধানে 'বানর' মানে 'আমলা' লেখা স্বচক্ষে দেখেছিলেন কলিম খান, অনবধানবশত সেই অভিধানটির নাম তিনি লিখে রাখেননি। ফলে, একথাই তাঁকে লিখতে হচ্ছে যে, কোনো কোনো পুরানো বাংলা অভিধানে এরকম আছে। কথাটি এই শব্দার্থকোষের ১ম খণ্ডেও লেখা হয়েছে। পাঠকপাঠিকাগণের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, তাঁরা কখনো যদি কোনো বাংলা অভিধানে সেরকম দেখেন, তাহলে অনুগ্রহ করে যেন সেকথা বর্তমান লেখকদের জানিয়ে দেন।

বন্দ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবন্দ্য, নাছোড়বান্দা, বন্দ্, বন্দ, বন্দক, বন্দগী, বন্দন, বন্দনবার, বন্দনমালা, বন্দনা, বন্দনী, বন্দনীয়, বন্দনীয়া, বন্দি, বন্দিঘাটীগাঁই, বন্দিত, বন্দিনী, বন্দিব, বন্দী, বন্দীশালা, বন্দুক, বন্দুকি(কী), বন্দে, বন্দেগী, বন্দ্য, বন্দ্যঘটি, বন্দ্যবংশ, বন্দ্যোঘটি, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধুক, বাঁড়রি(ড়ী), বাঁড়ুয্যা(য্যে, জ্জে), বাঁদা(ধা), বাঁদী, বান্দা, বান্দি(ন্দী)।

বন্দ্ = **বন্**-এর দান। **বন্দ** = **বন্** দান থাকে যাহাতে। [**বনিবনা** শব্দে আমরা দেখেছি — আমি তোমার মতো **বনি**, তুমি আমার মতো **বন** (বনো, বনে যাও), এমন হলেই **বনিবনা** হয়। এর অর্থ হল, প্রতিটি সত্তাই তার নিজের চালে **বন বন** করে ঘুরছে, **বনছে**, **বনে** যাচ্ছে, **বনে** উঠছে; তার সেই **বনায়** সাহায্য করাই **বন্** দান করা বা **বন্দ্** করা। তদ্রূপ **বন্দ্** যে আচরণে থাকে, তাকে সেকারণেই **বন্দ** বলে। তবে সমস্যা হল, কাউকে যদি তার বিশেষ গতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, যে ঠেলে, সে ঠিক তার বিপরীত দিকে ঠেলা হয়ে যায়। তার মানে, যাকে **বন্** দান করা হল সে তো একটি বিশেষ পরিধিতে ঘুরতে শুরু করে সেই বৃত্তে **বন্দী** হয়ে গেলই; বিপরীতে যে সেই **বন্** দান করল, সেও ঠিক বিপরীত বৃত্তে **বন্দী** হয়ে যাবেই। ... **বন্দ্** ক্রিয়ার এই পর্যায়ক্রমের কথা মাথায় রেখেই আমাদের এগোতে হবে।]

বন্দক (বন্দ, বন্দন, বন্দনবার, বন্দনমালা, বন্দনা, বন্দনীয়, বন্দিত, বন্দিশালা, বন্দী): ১. **বন্দক** = ✓বন্দ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্ত্তৃবাচ্যে।

(ব.শ.)। **২. বন্দ** = *বন্ দান থাকে যাহাতে।* ***বন্দক*** *=* ***বন্দ*** *করে যে।* ***বন্দন*** *=* ***বন্দ*** *অন (on) যাহাতে।* ***বন্দনা*** *=* ***বন্দন****-এর আধার যে।* ***বন্দনীয়*** *=* ***বন্দন****-এর গতিশীল আধার যায় যাহাতে।* ***বন্দিত*** *=* ***বন্দনা*** *করা হইয়াছে যাহার।* ***বন্দিশালা*** *=* ***বন্দ*** *সক্রিয় বা গতিশীল যে* ***শালা****য়।* ***বন্দী*** *=* ***বন্দ*** *গতিশীলরূপে আধারিত যাহাতে। /* **বন্দ** = যাহার কার্য্য স্থগিত হইয়াছে (closed)। **বন্দী** = বন্দনা করে যে। (ব.শ.)। **৩. বন্দ** = বন্দনা করা, সভক্তি বা সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করা; অবরুদ্ধ, আটক, বাক্যরহিত, কপাটরুদ্ধ, প্রচাররহিত, অবরোধ, কার্য্যবিরাম, ছুটি, ভূমিখণ্ড। (ব.শ.) **বন্দ** = দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমষ্টির পরিমাণ, খণ্ড, অংশ, রুদ্ধ, অবরুদ্ধ, ধর্মঘট। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **বন্দক** = বন্দনাকারক। **বন্দন** = প্রণাম, অভিবাদন, নমস্কার (ইহা নবলক্ষণা বা ষোড়শলক্ষণা ভক্তির একতম লক্ষণ), আসনাদি ষোড়শ-পূজোপচারের একতম, স্তবন, পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণতি, স্ফোটকবিশেষ। **বন্দনবার** = সম্মানার্থ সভাগৃহ। **বন্দনমালা** = বন্দনার্থ মালা, উৎসবাদিতে কদলীস্তম্ভযুক্ত দ্বারদেশে বদ্ধ আম্রপত্ররচিতমালা। **বন্দনা** = প্রণাম, স্তবন, হোমভস্মকৃত তিলক। **বন্দনীয়** = অভিবাদ্য, প্রণম্য, পূজ্য, মান্য, স্তবনীয়। **বন্দিত** = স্তুত, পূজিত। **বন্দিশালা** = বন্দিগৃহ, কারা, জেল। **বন্দী** = বন্দনাকারী, অবরুদ্ধ পুরুষ, স্তুতিপাঠক, পূজয়িতা, স্তাবক, অবরুদ্ধ, আটক, বদ্ধ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** to praise অর্থে **বন্দনা** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। গ্রামবাংলায় 'ভূমিখণ্ড' অর্থে **বন্দ** শব্দটি প্রচলিত; যথা 'উত্তরের মাঠে আমাদের দশ কাঠার মতো এক **বন্দ** জমি আছে।' **৫. বন্** ক্রিয়ামূলের অর্থ দ্রষ্টব্য। ভাবনার কথা এই যে, **বন্দী** শব্দের অর্থ কেন একই সঙ্গে **বন্দনা**কারী (বা পূজয়িতা বা স্তুতিপাঠক) এবং অবরুদ্ধ (কারাগারে নিক্ষিপ্ত) পুরুষ হয়, আবার একখণ্ড জমিও হয়! (ভারতের উত্তরপ্রদেশের একটি বিখ্যাত জায়গার নাম 'দেওবন্দ', অর্থাৎ 'দেবতার জমি'। এই দেওবন্দের উলেমাদের সিদ্ধান্তকে ভারতের মুসলিম সমাজ ও ভারত সরকার উভয় পক্ষই বিশেষ গুরুত্ব দেন।)

কাউকে যদি বলা হয়, 'আপনি যেরকম বাঁশি বাজান, সেরকম আগে কখনো শুনিনি, শোনার পর থেকে মুগ্ধ হয়ে আছি ...' ইত্যাদি, তাহলে এই প্রশংসা-বাক্যগুলির সাহায্যে বংশীবাদকটির **বন্দনা** করা হয়ে যায়। বংশীবাদক এই **বন্দনা**য় কেবল খুশিই হয় না, পুনরায় সেইরকম বংশীবাদন করতে আগ্রহী হয়, সেরকম বাজান উচিত মনে করে। এর ফলে বংশীবাদকটি ক্রমশ তার বংশীবাদন-কর্মের আবর্তে আবর্তিত হতে হতে সেই বৃত্তে **বন্দী** হয়ে যায়। বিপরীতে যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য তদ্রূপ **বন্দনা** করে, সেও **বন্দক**-এর বৃত্তে **বন্দী** হয়ে যায়। এটি ভাল কি খারাপ, সেটি প্রসঙ্গ নয়; প্রসঙ্গ হল, **বন্দনা** চলতে থাকলে তা একই সঙ্গে **বন্দক** ও **বন্দিত** উভয়কে পরস্পরের বিপরীত বৃত্তে **বন্দী** করে দেয়। ইংরেজি ভাষায় এই ধারণাটি বিদ্যমান রয়েছে 'prisoner of conscience' রূপে। আর, **বন্দনা** যদি বাহ্যিক বা দৃশ্য হয়, তাহলে বৃত্তটিও হবে বাহ্যিক বা দৃশ্য বৃত্ত এবং **বন্দনা** যদি মানসিক হয় (ভাষিক **বন্দনা** হয়), তাহলে বৃত্তটি হয়ে যাবে অদৃশ্য বা মানসিক বৃত্ত। এই যে বাহ্যিক বৃত্ত, তার বাহ্যিক উদাহরণ হল এক **বন্দ** জমি। এখানে আমাদের কৃষিকর্ম আবর্তিত হয়। ... **৬.** ইংরেজি bond, bonding ... প্রভৃতি শব্দের উত্তরাধিকার **বন্দ্** ও **বন্ধ্** উভয় ক্রিয়া পরিবার থেকে এসে থাকতে পারে।

বন্দা (বন্দগী, বন্দেগী, বন্দে, বান্দা, বান্দী, বাঁদী, বাঁদর, বাঁদরা, নাছোড়বান্দা) : **২.** ***বন্দা*** *=* ***বন্দ****-এর আধার যে।* ***বান্দা*** *=* ***বন্দা*** *হইতে জাত।* ***নাছোড়বান্দা*** *= যে* ***বান্দা*** *(সঙ্গ) ছাড়ে না।* ***বান্দী, বাঁদী*** *=* ***বান্দা****-র প্রকৃতিস্বরূপা আধার যে।* **৩. বন্দা** = বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, পরগাছা (parasite), দাস, ক্রীতদাস, লোক। **বন্দগী** = প্রণাম, সেলাম। **বান্দা** = ক্রীতদাস, সেবক, (শিষ্টভাষায়) আমি, এ-জন। **বান্দী** = ক্রীতদাসী, পরিচারিকা। **বাঁদী** = বন্দী-পরিচারিকা, ক্রীতদাসী, পরিচারিকা, দাসী। **বাঁদর** = বানর, গালিবিশেষ। **বাঁদরা** = বন্দার, পরগাছা (parasite)। (ব.শ.)। **বন্দে** = বন্দনা করি। **বন্দেগি, বন্দেগী** = বান্দার আনুগত্য, দাস্যভাব, সশ্রদ্ধ অভিবাদন, বান্দা বা গোলামের কর্ম। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। **৫.** এখানে ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি, বাংলা এমনভাবে মিলেমিশে গেছে, যে তাদের আলাদা করার উপায় নেই। ফারসি **বন্দ্, বন্দা, বন্দেগি** (জঁহাপনা, **বন্দে** আলী মিঞা), **বাঁদি** ... ফরাসির bon, bon ami ... ইত্যাদি, ইংরেজির bona, bond, bondage ... ইত্যাদি, এবং বাংলার **বন্দ, বন্দা, বন্দে** (মাতরম), **বান্দা, নাছোড়বান্দা, বানর, বাঁদর, বাঁদরা** ... সমস্ত শব্দের মূলে দেখা যায় একই ক্রিয়ামূল এত স্পষ্টভাবে **বর্ত্তমান** যে, তাদের পৃথক ভাষার শব্দ বলে মনেই হয় না। যে **বন্দনা** করে, সে **বন্দী**; তার নীচের ধাপে নামলে সে-সত্তাই **বান্দা**।

বন্দ্য (বন্দ্যঘটি, বন্দ্যবংশ, বন্দ্যোঘটি, বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁড়রি, বাঁড়ড়ী) : **১.** ✓বন্দ্ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বন্দ্য*** *=* ***বন্দ*** *থাকে যাহাতে।* ***বন্দ্যঘটি (বন্দ্যোঘটি)*** *=* ***বন্দ্য*** *যে* ***ঘটি*** *(দ্র. ঘটী)।* ***বন্দ্যবংশ*** *=* ***বন্দ্য****-এর* ***বংশ****।* ***বন্দ্যোপাধ্যায়*** *= যিনিই* ***বন্দ্য*** *তিনিই* ***উপাধ্যায়****।* ***বাঁড়রি, বাঁড়ড়ী, বাঁড়ুয্যা*** *= দ্র.* ***বণ্ড****।* **৩. বন্দ্য** = বন্দনীয়, আরাধনীয়, বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁড়ুয্যে। **বন্দ্যঘটি, বন্দ্যঘটী, বন্দ্যোঘটি** = বন্দ্যোপাধ্যায়। **বন্দ্যবংশ** = পূজ্যকুল, বন্দ্য বরাহের বংশ, বন্দ্যোপাধ্যায়-কুল। **বন্দ্যোপাধ্যায়** = বন্দ্যগ্রামবাসী ও উপাধ্যায়, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি। **বাঁড়রি, বাঁড়ড়ী, বাঁড়ুয্যা** = বন্দ্যোপাধ্যায়। (ব.শ.)। **৪.** পদবী রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বণ্ড, বন্দী, বানপ্রস্থ**। আগেই আমরা দেখেছি যে, যিনি বৃদ্ধিসাধনের বিদ্যাবুদ্ধি দান করেন, তাঁকে **বাঁড়রি** ... ইত্যাদি বলে। আবার, **বানপ্রস্থে** আমরা জেনেছি যে, সেকালের সদ্ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণকে দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিদ্যাবুদ্ধি দান করতেন। **বন্দনা, বন্দী** প্রভৃতি শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, **বন্দনা** করা মানেই হল, কারও আ**বর্ত্তন**কে গতিদান করা। অতএব বন্দ্য বা '**বন্দ** থাকে যাহাতে' তাকে 'বন্দনীয়' (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য) যেমন বলা যায়, তেমনি যারা তাঁর **বন্দনা** করে তিনি যে তাদের **বন** বা আ**বর্ত্তন** দান করেন, সেকথাও ঠিক। অবশ্য, **বরাহ** শব্দের অর্থ জানার পর আমরা বুঝতে পারি, এই **বন্দ্যবংশের** সন্তানগণকে এককালে **বরণ** করে এনে নিজেদের বৃত্তির (আ**বর্ত্তনে**র) বিকাশের বিদ্যাবুদ্ধি দানের জন্য এলাকার **ব্রহ্মপদে** বা উপদেষ্টার পদে নিয়োগ

করা হত। তবে, **পণ্য** উৎপাদনের পরামর্শদাতা রূপে যখন তাঁরা কাজ করতেন, তখন তাঁদের নাম হয়ে যায় **বন্দ্যঘটি** বা **বন্দ্যঘটী**। আর, যখন তাঁরা **বন্দ্য**রূপে শিক্ষানিকেতন চালাতেন তখন তাঁদের নাম হয়ে যায় **বন্দ্য** + **উপাধ্যায়** বা **বন্দ্যোপাধ্যায়**। এককালে এঁদের গৌরবের শেষ ছিল না এবং তা কমবেশি সত্যও ছিল (দ্র. **বণ্ড**)। তবে দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে, **বন্দ্যবংশে**র যে উত্তরসূরিগণ এখনও আমাদের বঙ্গসমাজে বিদ্যমান রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের নিজেদের অতীতটাই জানেন না। অবশ্য সেকথা কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই সত্যি নয়, আমরা সবাই তো আমাদের অতীত থেকে কমবেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছিই।

বন্ধ্ (বন্ধ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপ্রবন্ধ, অনির্ব্বন্ধ, অবন্ধ, অবন্ধক, অবন্ধান, অবন্ধু, অবন্ধুদায়াদ, অবন্ধ্য, অবন্ধ্যজন্মা, অবান্ধব, আঙদ, আবন্ধ, আবন্ধ, জবানবন্দী, জমাবন্দী, ক্ষত্রবন্ধু, দীনবন্ধু, পুলবন্দী, নিবন্ধ, নিবন্ধ, নির্ব্বন্ধ, নির্ব্বন্ধন, প্রবন্ধ, প্রবন্ধন, বঁধু, বঁধুয়া, বন্ধ, বন্ধকক্ষ, বন্ধকক্ষ্য, বন্ধকদম্বক, বন্ধকালা, বন্ধকেশর, বন্ধকোশ, বন্ধগ্রহ, বন্ধচিত্ত, বন্ধতূণীর, বন্ধদৃষ্টি, বন্ধনেত্র, বন্ধনিষ্যন্দ, বন্ধনেপথ্য, বন্ধপদ্মাসন, বন্ধপরিকর, বন্ধপাগল, বন্ধপ্রতিজ্ঞ, বন্ধবৈর, বন্ধভাব, বন্ধভূমি, বন্ধমণ্ডল, বন্ধমন্যু, বন্ধমুষ্টি, বন্ধমূল, বন্ধমৌন, বন্ধরাগ, বন্ধলেঠেল, বন্ধস্নেহ, বন্ধাঞ্জলিপুট, বন্ধানুরাগ, বন্ধানুশয়, বধ্র, বন্দ, বন্দক, বন্দকী, বন্দা, বন্দি(ন্দী), বন্দিয়ান, বন্দীকৃত, বন্দুয়ান (বান্দোয়ান), বন্দেজ, বন্দোবস্ত, বন্ধ্, বন্ধ, বন্ধক, বন্ধকি(কী), বন্ধন, বন্ধনপালক, বন্ধনবেশ্ম, বন্ধনভঙ্গ, বন্ধনস্থ, বন্ধনাগার, বন্ধনালয়, বন্ধনী, বন্ধনীয়, বন্ধয়িতা, বন্ধান, বন্ধী, বন্ধু, বন্ধুকাম, বন্ধুজন, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক, বন্ধুতা, বন্ধুদত্ত, বন্ধুদায়াদ, বন্ধুপ্রীতি, বন্ধুবাবা, বন্ধুয়া, বন্ধুর, বন্ধুল, বন্ধুহা, বন্ধুহীন, বন্ধূক, বন্ধূর, বন্ধূলি, বন্ধ্য, বন্ধ্যফল, বন্ধ্যা, বন্ধ্যাপুত্র, বন্ধ্যাবাদ, বন্ধ্যাসুতা, বাইন, বাউনি (বান্ধনী), বাঁদু(ধু)লি, বাঁদু(ধু)লী, বাঁধ, বাঁধন, বাঁধন-ছাঁদন, বাঁধ(দ)নদার, বাঁধনি, বাঁধনি-ছাঁদনি, বাঁধা, বাঁধিপোতা, বা'ন, বান্ধ, বান্ধন, বান্ধনী, বান্ধব, বান্ধবান, বান্ধবানী, বান্ধব্য, বান্ধা, বান্ধান, বান্ধুনি, বান্ধুলি, বুধ্র, ব্রধ্র, রতিবন্ধ, সবন্ধু, সম্বন্ধ, সম্বন্ধী, সম্বন্ধীয়, সুসম্বন্ধ।

বন্ধ্ (বন্ধ্) = **বন্** (আবর্ত্তন) ধারণ (= বন্ধ্)। **বন্ধ** = **বন্** (আবর্ত্তন) ধারিত যাহাতে।

বন্ধ (নিবন্ধ) : ১. ✓বন্ধ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বন্ধ = যাহাকে বন্ধ করা হইয়াছে। নিবন্ধ = যাহাকে নিশ্চয় বন্ধ করা হইয়াছে। (দ্র.* ***নি*** *'খ')।* **৩. বন্ধ** = সিত, কৃতবন্ধন, গ্রথিত, অর্পিত, গৃহীত, বন্দীকৃত, ধৃত, নিবদ্ধ ... ইত্যাদি। **নিবন্ধ** = নিয়ন্ত্রিত, বদ্ধ, আবৃত, গ্রথিত, আশ্রিত, ধৃত। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বন্ধকক্ষ, বন্ধকক্ষ্য (বন্ধপরিকর) : ৩. বন্ধপরিকর, কোমরবাঁধা। **বন্ধপরিকর** = ধৃতকটিবন্ধ, কৃতোদ্যোগ, সজ্জিত। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** লক্ষণীয় যে, কাঁখ বা কক্ষ কষে বাঁধা থাকলে তাকে **বন্ধকক্ষ** বলা যায়। **বন্ধকক্ষ** থাকে যাহাতে, তাকে **বন্ধকক্ষ্য** বলতে হয়। দেখা যাচ্ছে, 'কোমর বেঁধে কোনো কাজে লাগা'কে **বন্ধকক্ষ** বা **বন্ধকক্ষ্য** বলা হত। ব.শ. তার অর্থ দিয়েছেন 'বন্ধপরিকর'। কার্যত গ্রামবাংলার মানুষেরা জানেন, সত্যি সত্যিই কোমরে কষে গামছা বেঁধে তবেই কোনো ভারী কাজে হাত দিতে হয়। তবে এখানেই শব্দটির ব্যবহার থেমে থাকে না। 'গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য রামবাবু কোমর বেঁধে লেগেছেন।' — এই বাক্য একশো ভাগ সত্যি হলেও রামবাবুর কোমরে কষে গামছা কিংবা অন্য কিছু বাঁধা দেখা যাবে না, তা বলাই বাহুল্য।

বন্ধ (নিবন্ধ, নির্ব্বন্ধ, প্রবন্ধ) : ১. ✓বন্ধ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বন্ধ =* ***বন্*** *(বনবন বা আবর্ত্তন) ধৃত যাহাতে; যাহা (আর) আবর্ত্তিত হতে দেয় না।* ***নিবন্ধ*** *= নিশ্চয়রূপে* ***বন্ধ*** *যে বা যাহা।* ***নির্ব্বন্ধ*** *= নির্দ্ধারিতভাবে* ***বন্ধ*** *যে।* ***প্রবন্ধ*** *= প্রকৃষ্টরূপে* ***বন্ধ*** *যে।* **৩. বন্ধ** = বন্ধন, নিগড়াদিবন্ধন, অবরোধ, বন্দীকরণ, সেতু-প্রভৃতি দ্বারা স্রোতোনিরোধ ... ইত্যাদি। **নিবন্ধ** = নিয়ন্ত্রণ, বন্ধন, নিরোধ, রচনা, গ্রন্থন, নিয়তবন্ধন, গ্রন্থসন্দর্ভ, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ... ইত্যাদি। **নির্ব্বন্ধ** = আগ্রহ, অভিনিবেশ, প্রার্থনাতিশয়, অভিশংসন, অঙ্গীকার, নিয়ম, ভবিতব্যতা, ফল, নিরূপণ। **প্রবন্ধ** = প্রকৃষ্ট বন্ধন, অবিচ্ছেদ, কাব্যাদিগ্রন্থন, উপায়, গ্রথিতবস্তু, সন্দর্ভ, গ্রন্থ, বাক্যবিন্যাসপ্রকার, চাতুরী ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** 'থামিয়ে দেওয়া' অর্থেই **বন্ধ** কথাটি অধিক প্রচলিত এবং এটিই শব্দটির যথার্থ বটে। বাকি শব্দগুলিও কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। **৬.** ইংরেজি bond, band ... ইত্যাদি।

বন্ধক (বন্ধকী, বন্ধন, বন্ধনী, বন্ধনীয়, বন্ধয়িতা, বন্ধী, প্রতিবন্ধ, প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধী) : ১. ✓বন্ধ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বন্ধক =* ***বন্ধ*** *করে যে।* ***বন্ধকী*** *=* ***বন্ধক****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বন্ধন*** *=* ***বন্ধ*** *অন (on) যাহাতে।* ***বন্ধনী*** *=* ***বন্ধন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বন্ধনীয়*** *=* ***বন্ধনী*** *যায় যাহাতে।* ***বন্ধয়িতা*** *=* ***বন্ধ****-এর গতিশীলতা তারিত থাকে যে আধারে।* ***বন্ধী*** *=* ***বন্ধ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***প্রতিবন্ধ*** *=* ***বন্ধ*** *ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যে* ***বন্ধ*** *ক্রিয়া।* ***প্রতিবন্ধক*** *=* ***প্রতিবন্ধ*** *করে যে।* ***প্রতিবন্ধী*** *=* ***প্রতিবন্ধ****-এর গতিশীল আধার যে। /* **বন্ধক** = বন্ধন করে যে। **বন্ধন** = যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. বন্ধক** = নিয়ামক, বলবীর্য্যনাশক, প্রতিজ্ঞা, লম্পট, গ্রন্থি, শৃঙ্খলাদি, সেতু, বাঁধ, ঋণশোধার্থ স্থাপিত দ্রব্য ... ইত্যাদি। **বন্ধকী** = পুংশ্চলী, অসতী, বেশ্যা, বন্ধ্যা, পঞ্চপুরুষগামিনী নারী, হস্তিনী, বন্ধকসম্বন্ধী। **বন্ধন** = আকর্ষক, বন্ধকারক, রোধক; নিয়ন্ত্রণ, সংযমন, বাঁধা, অবরোধ ... ইত্যাদি। **বন্ধনী** = পাশ, রজ্জু, শৃঙ্খল, গ্রন্থি, গাঁট, তন্ত্রি, সূত্র, পরস্পর অভিমুখ বক্ররেখা (bracket)। **বন্ধনীয়, বন্ধয়িতা** = বন্দীকার্য্য, অবরোধ্য, বন্ধনার্হ ... ইত্যাদি। **বন্ধী** = গ্রাহী, ধারক, প্রবর্ত্তক। **প্রতিবন্ধ** = প্রতিষ্টম্ভ, প্রতিরোধ। **প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধী** = প্রতিবন্ধকারক,

প্রতিরোধক, বিঘ্নকারক, বাধক। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আজকাল handicapped বা mentally or physically disabled বোঝাতে **প্রতিবন্ধী** শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দের তুলনায় বাংলা শব্দটি অনেক বেশি অর্থবহ। কারণ, তাতে বলা হয় — 'যিনি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ **বন্ধ** হয়ে রয়েছেন' তিনিই **প্রতিবন্ধী**। কানের কাছে মহাশক্তিশালী বোমা ফেটেছিল, সেই থেকে সেই মহাশব্দের **প্রতিক্রিয়া**-স্বরূপ রামবাবু কানে আর কিছুই শুনতে পান না। তাঁর এই কানে কালা হওয়ার কারণ হল ঐ বোমার শব্দ। তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি এখন আর শুনতে পান না। একইভাবে যাঁরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে খঞ্জ বা অন্ধ হয়েছেন, তাঁরাও **প্রতিবন্ধী**। কিন্তু যিনি জন্মকালা কিংবা জন্মান্ধ ... তাঁদের কিন্তু **প্রতিবন্ধী** বলা যায় না। তাঁদের বলতে হবে **সহজবন্ধী**। কেননা তাঁদের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ **বন্ধীত্ব** জন্মেছে অর্থাৎ তাঁদের **বন্ধীত্ব** সহজাত বা **সহজ**। তাই তাঁরা **সহজবন্ধী** শব্দের সাহায্যে শনাক্ত হতে পারেন।

বন্ধু (বন্ধুতা, বন্ধুদত্ত, বন্ধুয়া, বন্ধুর, বঁধু, বঁধুয়া) : **১.** ✓বন্ধ্ + উ - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বন্ধু** = **বন্ধ** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে বন্ধনে আবদ্ধ সত্তাদ্বয়* **বন্ধন***মুক্ত হইতে পারে।* **বন্ধুতা** = **বন্ধু** *তারিত যে আধারে।* **বন্ধুয়া** = **বন্ধু** *যায় যাহাতে।* **বন্ধুর** = **বন্ধু** *রহে যাহাতে।* **বঁধু** = *অতিবাহীর রহস্যরূপ ধারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **বঁধুয়া** = **বঁধু** *যায় যে আধারে।* / **বন্ধু** = প্রীতিতে বদ্ধ করে যে (প্রীতিবন্ধক)। (ব.শ.)। **৩. বন্ধু** = সগোত্র, পিতৃব্যাদি, শোণিতসম্বন্ধবিশিষ্ট জন, মিত্র, প্রণয়ী, অ-ত্যাগসহন জন, ধর্ম্মসঙ্গাদিহেতু স্নিগ্ধজন, পিতা, মাতা ভ্রাতা ... ইত্যাদি। **বন্ধুতা** = বন্ধুভাব, জ্ঞাতিত্ব, মিত্রভাব, মৈত্রী, বন্ধুগণ, জ্ঞাতিবর্গ। **বন্ধুদত্ত** = বিবাহে মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু কর্ত্তৃক কন্যাকে প্রদত্ত ধন, স্ত্রীধনবিশেষ, কন্যাদশায় পিতামাতার প্রদত্ত ধন। **বন্ধুর** = উন্নতানত, উন্নত, অসমতল, রম্য, মনোজ্ঞ, নম্র, অমসৃণ, বন্ধুকবৃক্ষ, বধির, বিড়ঙ্গ, রথবন্ধন, রথরজ্জু, মুকুট। **বন্ধুয়া, বঁধু, বঁধুয়া** = প্রিয়, প্রণয়ী (lover), বন্ধু, সখা, স্বামী, পতি। (ব.শ.)। **৪. বন্ধুদত্ত, বন্ধুয়া, বঁধু, বঁধুয়া** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. বন্ধু** বলতে একালে আমরা friend বুঝে থাকি। কার্যত, **বন্ধু** কিন্তু friend নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। বলতে কী, বিশ্বে মানুষে মানুষে যতপ্রকারের সম্বন্ধ হতে পারে, **বন্ধুত্বের** সম্বন্ধ তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্বন্ধ সন্দেহ নাই। সেই সম্বন্ধ কীরূপ **বন্ধু** শব্দের ভিতরেই সেকথা বলা আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত অর্জনের সার সংকলন করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে গেছেন, 'মুক্তি লাভের সাধনাই আমাদের জীবনের মূল সাধনা'। কিন্তু সেই মুক্তি পাওয়া যায় কীভাবে? পাওয়ার উপায়টিকেও উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে গেছেন — 'সম্বন্ধেই বন্ধন, সম্বন্ধেই মুক্তি।' তাঁর মতে, সম্বন্ধ ছাড়া মানুষ থাকতেই পারে না। রবিনসন ক্রুসোর উদাহরণ দিয়ে তিনি জানিয়ে গেছেন, দ্বীপে পৌঁছে সে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে 'সেরকম স্বাধীনতা মানুষ শুধু চায় না তাই নয়, পাইলে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে।' অতএব সম্বন্ধিত হওয়ার জন্য অন্য মানুষকে চাই, তার সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ চাই। ... কিন্তু প্রশ্ন হল, কর্মের সম্বন্ধ ব্যাপারটি কেমন, যে, সেটি **পাতা**লে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা যেমন থাকে, তেমনি বন্ধনের বা অধীনতার বিপদের সম্ভাবনাও থাকে; অথচ সে সম্বন্ধ না **পাতা**লেই নয়? ...

বন্ধু শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ থেকে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। যে-সম্বন্ধে **বন্ধন** 'নবরূপে উত্তীর্ণ' হয়ে যায় এবং সেইরূপ 'নবরূপে উত্তীর্ণ **বন্ধন**' যাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তারাই পরস্পরের **বন্ধু**। 'উ'-কারের অর্থ আমরা এতাবৎ জেনে এসেছি যে, তা ক্রিয়াটিকে ঠিক তার বিপরীতে উত্তীর্ণ করে দেয়। তার মানে **বন্ধু**ত্বের বেলায় **বন্ধন** আর **বন্ধন** থাকে না, মুক্তিতে পরিণত হয়। ...

ভারতের ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি, **বন্ধন** চার রকম হয়। 'নিপীড়ক-নিপীড়িতের কর্ম**বন্ধন**', 'শাসক-শাসিতের কর্ম**বন্ধন**', 'পরিচালক-পরিচালিতের কর্ম**বন্ধন**' এবং '**বন্ধুত্ব**মূলক কর্ম**বন্ধন**'। এই চতুর্থ প্রকার **বন্ধন**কে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের **বন্ধন**'। এই **বন্ধন**-এ **বন্ধন** আর **বন্ধন** থাকে না, বদলে যায় মুক্তিতে। (আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব' নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।)

যে **বন্ধনে** অধীনতার বদলে মুক্তি মেলে তদ্রূপ **বন্ধুত্ব**মূলক কর্ম**বন্ধন** কীরূপ, অতি সংক্ষেপে সেকথা বলে নেওয়া যাক। এক সহপাঠী একধরনের লিচু আবিষ্কার করলেন, যা রসগোল্লার মতো খেতে। মহানন্দে তিনি আপনাকে ডেকে বললেন, চলো আমরা সবাই মিলে এই 'রসগোল্লিচু'র পাইকারি উৎপাদন করার ব্যবস্থা করি। তোমার পরিচালনবিদ্যা অপূর্ব, আমি জানি। এসো আমার সঙ্গে। পরিকল্পনাটি নিজ চোখে দেখে আপনিও খুশি হলেন এবং সহপাঠীর সঙ্গে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে মহানন্দে লেগে পড়লেন। এই কর্ম**বন্ধনে**র সম্বন্ধে আপনি আবদ্ধ বা নিযুক্ত (appointed) হলেন বটে, কিন্তু শুরুতেই আবেদনপত্র দিয়ে অধীনতা স্বীকার করে কাজে লাগলেন না। সহপাঠী যেমন আপনাকে উচ্চ ব'লে ব্যবহার করে, আপনিও তাকে উচ্চ ব'লে ব্যবহার করেন। এই হল **বন্ধু**ত্বের সম্বন্ধে কর্ম**বন্ধন**। এতে আর্থিক লেনদেন হয়ে যায় গৌণ, **বন্ধু**ত্বের মাধ্যমে পরস্পরের যোগ্যতাকে উচ্চে তুলে ধরাই প্রাথমিকতা পায়। এবং এই সম্বন্ধে উভয়ের যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘ'টে সর্বোচ্চ উৎপাদনও যে হওয়া সম্ভব তা বলাই বাহুল্য।

আজকাল এরকম **বন্ধু**ত্বমূলক সম্বন্ধে কর্ম**বন্ধন** হয় না। লোকে সর্বাগ্রে চাকরির জন্য আবেদন করে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার জন্যও একটি 'আবেদনপত্র' সই করে প্রার্থীরূপে জমা দিতে হয়। এভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ার আগেই নিয়োগকারীর অধীনতা স্বীকার করে নেয়। অধীনতার সূত্রপাত হয় সেখান থেকেই। একজন শিক্ষক বা গুরু নিজমুখে ঘোষণা করছেন, 'আমি অমুক বিষয়ের জ্ঞানী, আপনাদের সন্তানদের সে-জ্ঞান দান করে জীবিকা নির্বাহ করতে চাই, আমাকে সে-কাজের অনুমতি দেওয়া হোক।' যে শিক্ষক শুরুতেই এই হীনতা মেনে নেন, তাঁর পক্ষে আর যাই হোক, মুক্তি দূর অস্ত্। তিনি নিজে তো মুক্তির স্বাদ পানই না, যাঁদের সঙ্গে এই সম্বন্ধের **বন্ধনে** আবদ্ধ হন, তাঁদেরও মুক্তি মেলে

না। **রবীন্দ্রনাথ** বলে গেছেন, অধীনতা এতই মারাত্মক ব্যাধি যে, রাজা-প্রজার সম্বন্ধে প্রজাই কেবল রাজার অধীন নহে, রাজাও প্রজার অধীন হয়ে থাকে; আমরা নিম্ন-অধিকারীরা সচরাচর রাজার সেই অধীনতামূলক **বন্ধন** দেখতে পাই না। আজকের তথাকথিত সভ্যসমাজ সর্বপ্রকারের অধীনতামূলক **বন্ধন** দ্বারা একান্তই কলুষিত। একমাত্র **বন্ধুত্বের বন্ধনই** এই অধীনতামূলক **বন্ধন** থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। বলে রাখা ভাল, সেকালের রাজা-বাদশার পরামর্শদাতার চাকরি যাঁরা করতেন, তাঁরা কিন্তু প্রায়ই পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের **বন্ধনে** আবদ্ধ হতেন, অন্ততপক্ষে সমমর্যাদার সম্বন্ধ ছাড়া সে সকল সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। জ্ঞানী মানুষকে গ্রামের গণমান্য মানুষেরা গিয়ে অনুরোধ উপরোধ করে **বরণ** করে আনতেন গ্রামের বিদ্যালয়ে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা দান করে মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য। তাতে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, এমনকি গ্রামবাসীরও **মর্য্যাদা** থাকত। এখন সেধরনের সম্বন্ধের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। ...

সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে রয়েছে একপ্রকার সামঞ্জস্য-মূলক **বন্ধন**। কোনো সত্তার ভিতরে তার **পুরুষ-প্রকৃতি**র তদ্রূপ **বন্ধন** প্রতিষ্ঠিত থাকলে, সেটি দৃষ্টিনন্দন হয়, দেখতে **সুন্দর** হয়। উচ্চ-নীচ, কালো-সাদা, ধনী-নির্ধন ... প্রভৃতি পরস্পরের বিপরীত সত্তার 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর **বন্ধনে** উভয়কে আবদ্ধ করে নিতে পারলেই সৃষ্টি হয়, শিল্প হয়, সুন্দর হয়। তার মানে, **বন্ধুত্বের বন্ধনেই** সৃষ্টি সম্ভব, **সুন্দর**কে সৃষ্টি করা সম্ভব। (দ্র. 'পরিশিষ্ট ৫')।

বন্ধুর বললে কেন যে 'উন্নতানত', 'অসমতল' ... ইত্যাদি বোঝায়, তা নিয়ে এতদিন আমাদেরও বিস্তর ধন্দ ছিল। বস্তুত উচ্চ ও নীচ যেখানে সমানভাবেই রয়েছে, অর্থাৎ, ১০টি ঢিপি থাকলে ১০টি গাড্ডাও রয়েছে এবং ঢিপিগুলি যে পরিমাণ উঁচু, গাড্ডাগুলি ঠিক সেই পরিমাণ নীচু, তেমন অসমতলক্ষেত্রকে **বন্ধুর** বলে। তবে, এর দৃশ্য রূপের ব্যবহারের চেয়ে অদৃশ্য রূপের ব্যবহারই প্রধান। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক'তে লিখেছেন, 'পতন অভ্যুদয় **বন্ধুর** পন্থা ...'। এই **পন্থা** অবশ্যই **বন্ধুর** এবং অদৃশ্য। এতে যে পরিমাণ পতন রয়েছে, সমপরিমাণে অভ্যুদয়ও রয়েছে। **৬.** ইংরেজি band, bend, bind, bond, bundle ... সব ক'টি শব্দের ভিতরে আমরা **বন্ধন** সম্পর্কের ইঙ্গিত পাই।

বপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনুপ্ত, আবপন, আবাপ, উপ্ত, নিবপন, নিবাপ, নির্ব্বাপণ, পরিবাপ, বপ্, বপন, বপনী, বপনীয়, বপা, বপু, বপুঃ, বপুষ্টমা, বপুষ্মান, বপ্তব্য, বপ্তা, বপ্র, বপ্রক্রিয়া, বপ্রক্রীড়া, বপ্রপঙ্ক, বাওয়া, বাওয়াজি, বাপ, বাপকালি, বাপকেলে, বাপদণ্ড, বাপদাদা, বাপধন, বাপপিতামো, বাপবেটা, বাপলি, বাপা, বাপান্ত, বাপি, বাপী, বাপীহ, বাপু, বাপুলি(লী), বাপ(ফ্)তা (বপ্তৃ), বাপ্পাই, বাফ(ফো)ই, বাব, বাবত, **বাবদ, বাবরুচি**, বাবলা (ভূত), বাবা, বাবাজী, বাবাজীবন, বাবু, **বাবুগিরী, বাবুদ**, বাবুদ-সাবুদ (স-বুধ), বাবুয়ানা, বাবুয়ানী, বাবুর্চ্চি, **বাবুলোক, বায়দণ্ড (বাপদণ্ড)**।

বপ্ = বাহীর পালন। **বপ** = বাহীর পালন যাহাতে।

বপন (বপনী, বপনীয়, বপা, বপু, বপুঃ, বাপ, বাপা, বাপী, বাপু) : **১.** ✓বপ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বপ*** *= বাহীর পালন যাহাতে।* ***বপন*** *=* ***বপ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বপনী*** *=* ***বপন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বপনীয়*** *=* ***বপনী*** *যায় যাহাতে।* ***বপা*** *=* ***বপ****-এর আধার যে।* ***বপু*** *=* ***বপ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***বপুঃ*** *=* ***বপু*** *বিসর্জ্জিত যাহাতে।* ***বাপ*** *=* ***বপ*** *হইতে জাত।* ***বাপা*** *=* ***বাপ****-এর আধার যে।* ***বাপী*** *=* ***বাপ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বাপু*** *=* ***বাপ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। /* **বপন** = যাহার দ্বারা ছেদন সাধিত হয়। **বপুঃ** = যে স্থানে কর্ম্মবীজ বপন করা হয়। (ব.শ.)। **৩. বপন** = ক্ষেত্রে বীজবিকিরণ, বীজ বোনা, বীজাধান, গর্ভাধান, শুক্র, কেশচ্ছেদন, ক্ষুর। **বপনী** = বয়নযন্ত্র, মাকু, বয়নগৃহ, তাঁতঘর। **বপনীয়** = বপনার্হ, ক্ষেপণীয়, আধেয় (বীজ)। **বপা** = মেদ, চর্ব্বি, গর্ত্ত, ছিদ্র। **বপু** = দেহ। **বপুঃ (বপুস্)** = তনু, দেহ, প্রশস্ত আকৃতি, সুন্দর দেহ, দেহমাত্র, আকৃতি, দক্ষকন্যা ধর্ম্মরাজপত্নী। **বাপ** = বপন, বীজবিকিরণ, মুণ্ডন, কেশচ্ছেদন, তন্তুবপন, বয়ন, বীজ, বপনস্থান, ক্ষেত্র; পিতা, পিতৃবৎ পূজ্য, প্রভু, দীক্ষাগুরু, বিশ্বপিতা ... ইত্যাদি। **বাপা** = পিতা, বিশ্বপিতা, পুত্র (সস্নেহ সম্বোধনে) ... ইত্যাদি। **বাপী** = দীর্ঘিকা, শতহস্তদীর্ঘ জলাশয়, জলাশয়মাত্র। **বাপু** = পিতা, পুত্র, বৎস, পুত্রবৎ স্নেহভাজন ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** 'বীজ বোনা' অর্থে **বপন** এবং body অর্থে **বপু**, এই দুটি শব্দ কমবেশি প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **তন্তু, তন্তুবাপ, তন্তুবায়**। দেখা যাচ্ছে, **বপন** এমন একটি শব্দ যা একই সঙ্গে **বয়ন, ছেদন** বা **মুণ্ডন**কেও বোঝায়। অবশ্য **বপন বয়ন** দুটো শব্দকে একালের বাংলাভাষী এক করে নিয়েছেন 'বুনা' (বোনা) শব্দে। বাংলাভাষী ধান বোনেন, কাপড় বা জালও বোনেন। কিন্তু **ছেদন** তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, কেন **বপ** শব্দটি একই সঙ্গে এমন ত্রিবিধ ক্রিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হল? তারা কি বাস্তবে একরকম ক্রিয়াকে বোঝায়? তা নইলে বাংলাভাষী দুটোকেই 'বুন'তে গেল কেন? কেনই বা **ছেদন** বা **মুণ্ডন** তার অন্তর্ভুক্ত হল না?

বিষয়টি জটিল ও গভীর। তাছাড়া এই স্তরে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা বেশ কঠিন। আমরা চেষ্টা করছি। এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, কোনো কিছুকে ছুঁড়ে কোথাও ফেলে দিলে, সেটা **বপ** করা বোঝায়। যে স্থানে সেই **বপ** গিয়ে পড়ে, সে স্থান তো গর্ত হয়ে যায়, তাকে যেমন **বাপ** ('বপনস্থান', 'ক্ষেত্র') বলে, তেমনি বীজ ইত্যাদি **বপন** করে যে তাকেও **বাপ** বলে। সেই **বাপ**-এর আধারকে যেমন **বাপা** বলা যায়, তেমনি সেই **বাপ** বা গর্ত জলাশয়ে পরিণত হয়ে গেলে তাকে **বাপী**ও বলা যায়। পিতা অর্থে যে **বাপ**, তা নবরূপে উত্তীর্ণ হলে **বাপু** হয় এবং বাংলায় তা পিতাকে বলা হয় না, সাধারণত ছেলে বা সন্তানসম কাউকে স্নেহের বশে **বাপু** বলা হয়ে থাকে। আবার **বপ** ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ার পর নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে নতুন শস্যরূপে বা সন্তানরূপে বেরিয়ে আসে, সেই সন্তান তো স্বভাবতই

বপ নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়া নতুন দেহই বটে। তাই তাকে **বপু** বা নতুন দেহ বলা যেতে পারে। ...

তবে **বপন** কর্মের কিছু বাস্তব সমস্যা আছে। ক্ষেত্র তৈরি না থাকলে **বপন** করা হয় না, করা যায় না। তৈরি-ক্ষেত্রে তৈরি-বীজ নিষেক করাকেই **বপন** করা বলে। কিন্তু এ তো **বয়ন** করার মতোই হয়ে গেল। পোড়েনের সুতো আগেভাগে ঝোলানো না থাকলে টানার সুতো বোনা যায় না। অর্থাৎ এখানেও আর এক রকমের তৈরি-ক্ষেত্র থাকে, তবেই **বয়ন** করা যায়। এই সেই কারণ, যে কারণে বাংলাভাষী **বপন** ও **বয়ন** উভয়কে 'বোনা' (বা 'বুনা'য়) একত্রিত করে নিয়েছেন। ... ... এর পরও কিছু কথা রয়েছে। সে হল প্রথমটির বা প্রচলিতের পাশের বিশেষটির প্রসঙ্গ। তাকে আমরা **দ্বি** শব্দে আগেই শনাক্ত করেছি। **বপন** হোক আর **বয়ন**ই হোক, উভয় ক্রিয়া তখনই সম্ভব হয় যখন প্রচলিতটি বা প্রথমটি ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত থাকে। ... দ্র. **বি**। **৬.** ইংরেজি wap, whop, weapon।

বপুষ্টমা : **১.** বপুস্ + তম (তমপ্) + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** / প্রশস্ততম আকৃতি যাহার। (ব.শ.)। **৩.** কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার কন্যা। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অশ্ব হনন করবার সময় বপুষ্টমা উক্ত হত অশ্বের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকে কামনা করেন এবং অশ্ব-শরীরে প্রবেশ করে বপুষ্টমার সহিত সংগমে রত হন। জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, ইন্দ্রের দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হন। তখন রাজা ... ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে আর কেহই ইন্দ্রের পূজা করবে না। ... বপুষ্টমাকেও এইজন্য তিরস্কার করেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু জনমেজয়কে বলেন, 'আপনি তিন শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপ হবার আশঙ্কা হয়েছিল। এইজন্য তিনি অপ্সরা রম্ভাকে কাশীরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়ে এখানে প্রেরণ করেছিলেন। এই বপুষ্টমাই অপ্সরা রম্ভা। ইন্দ্র কৌশলে কার্যসিদ্ধি করে চলে গিয়েছেন। আপনা হতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল, তা বিদূরিত হয়েছে। বপুষ্টমাকে বৃথা তিরস্কার করে কোনো লাভ নাই। তাঁকে আপনি গ্রহণ করুন।' বিশ্বাবসুর কথায় জনমেজয় বপুষ্টমাকে গ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **জনমেজয়, পরীক্ষিৎ**। এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বিষয়টি উপরোক্ত দুটি শব্দে বিস্তারিত করা হয়েছে। আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও আছে। তবে **বপুষ্টমা**র সঙ্গে **ইন্দ্রে**র সম্পর্ক বিষয়টি সেখানে নেই। কার্যত জনমেজয়ের প্রকৃতিশক্তি তাঁর প্রজাবৃন্দ। তাদের স্বভাব অধ্যয়ন করে তাদেরকেই **বপুষ্টমা** নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ...

এখানে **অশ্বমেধ** যজ্ঞের মৃত অশ্বের সঙ্গে যজ্ঞকারী রাজার পত্নীর সংগমের কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি আমরা **অশ্বমেধ** শব্দে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বম্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : বংশ (বং ক্রিয়াটি পুত্রে, পণ্যে, শব্দে ছড়ালে বংশ, গন্ধে ছড়ালে বংস, দ্র.বাঁশ, বাঁসমতী, দ্র. **অংশ**), বংশক, বংশকর, বংশকর্ম্ম, বংশকার, বংশকৃৎ, বংশক্রম, বংশক্ষয়, বংশক্ষীরী, বংশচরিত, বংশচর্ম্মকৃৎ, বংশজ, বংশজা, বংশতণ্ডুল, বংশধর, বংশনাড়ি(লি)কা, বংশনাথ, বংশানুক্রম, বংশপত্রক, বংশপোত, বংশবর্দ্ধন, বংশবিততি, বংশবিশুদ্ধ, বংশভব, বংশভোজ্য, বংশমণি, বংশযব, বংশরোচনা, বংশলোচন, বংশলোচনা, বংশশর্করা, বংশস্থবিল, বংশস্থিতি, বংশহীন, বংশাঙ্কুর, বংশানুকীর্ত্তন, বংশানুক্রম, বংশানুচরিত, বংশাবলী, বংশিক, বংশিকা, বংশী, বংশীদূতী, বংশীধর, বংশীধারী, বংশীরব, বংশীবট, বংশীবদন, বংশীবয়ান, বংশ্য, বম্, বম, বমথু, বমন, বমনী, বমনীয়, বমিত, বমিতব্য, বমী, বাংশিক, বাঁশ(স), বাঁশই, বাঁশগজাল, বাঁশগাড়ি, বাঁশপাতা, বাঁশফুল, বাঁশবন, বাঁশরী, বাঁশী, বাস্ত, বাস্তাশী, বাস্তি। **বম্** = বাহীর সীমায়ন। **বম** = বাহী সীমায়িত যাহাতে।

বংশ : **১.** ✓বম্ + শ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বাহীর রহস্যরূপের (শক্তি) বিচ্ছুরণ যাহাতে।* / যাহা অঙ্কুর বা পুত্রপৌত্রাদি উৎপাদন করে। (ব.শ.)। **৩.** বেণু, বাঁশ, বাঁশী, ঘরের পা'ড়, শিরদাঁড়া, নাসিকার উপরিস্থিত অস্থিখণ্ড, পরিমাণবিশেষ ... পুত্রপৌত্রাদিসন্তানপরম্পরা, বিদ্যা বা জন্ম হেতু প্রাণিগণের একলক্ষণ-সন্তান ... ইত্যাদি। **৪.** bamboo ও heredity অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কোলা, পঞ্চলক্ষণ**। কেন যে **বংশ** বলতে বাংলাভাষী '**তৃণশ্রেষ্ঠ**' 'বাঁশ'কে (bamboo-কে) বোঝে এবং একই সঙ্গে মানুষের **বংশ**কেও (বা race-কেও) বোঝে, চট করে তার কারণ বোঝা যায় না। এই দুই প্রকার **বংশে**র মধ্যে মিল কোথায়, সাদৃশ্য কোথায়, গ্রামবাংলার **বাঁশ**চাষীরা সেকথা খুব ভাল জানেন। আসুন, তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া যাক।

তাঁরা বলেন, পাঁচ পুরুষ (প্রজন্ম) পেরোনোর পর বাঁশঝাড়ের বাঁশ আর আগের মতো লম্বা ও মোটা হয় না, আকারে ছোট, সরু ও 'কুঠিয়া' (কুণ্ঠিত) হতে শুরু করে। সেই কারণে বাঁশের ঝাড় মাঝে মাঝে 'চেলে' দিতে হয় — অর্থাৎ, সাবালক এক-একটি বাঁশকে গোড়া থেকে তুলে অন্যত্র বসাতে হয়, যেখানে সে তার সন্তানাদির জন্ম দিয়ে নতুন বাঁশঝাড় গড়ে তুলবে; আর পুরনো বাঁশঝাড়টির বাকি বাঁশ কেটে নিয়ে বিলুপ্ত করা হবে। এভাবে একটি বাঁশঝাড় থেকে দশ-বিশটি বাঁশঝাড় গড়ে ওঠে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন মাটিতে পোঁতা কোনো কোনো বাঁশ মরে যায়, নতুন করে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। মজা হল, নতুন মাটিতে গিয়ে ঐ কুণ্ঠিত বাঁশের সন্তানেরা কিন্তু খুবই বড় লম্বা ও মোটাসোটা হয়ে থাকে। নতুন ঝাড়ের দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের (প্রজন্মের) বাঁশেরা খুবই ভাল বড় লম্বা মোটাসোটা হয়ে থাকে। তারা যখন অঙ্কুরোদগম ঘটায় (কোঁড়া ছাড়ে), তাদের দেখতে অনেকটাই মানুষের পরিবারের মতো লাগে — যেনবা স্বামী-স্ত্রীর পাশে তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

যাঁরা মানুষের বড় বড় যৌথপরিবার দেখেছেন, কিংবা তদ্রূপ পরিবারের সদস্য হিসেবে বড় হয়েছেন, তাঁরা অনেকে জানেন, যৌথপরিবারেরও একটি বিশেষ পরিমাপ আছে, চাল আছে। সেই

পরিমাপ ও চাল না মানলে যৌথপরিবার ধ্বংসের দিকে এগোতে থাকে; আর মানলে শ্রেষ্ঠ মানবসন্তানের জন্ম হয়ে থাকে ঐ পরিবারে। আমরা দেখেছি — পাঁচ-সাত পুরুষ ধরে একই ভিটায় রয়েছে, এমন (মৌলবাদী হয়ে ওঠা) যৌথপরিবারের শেষের দিকের প্রজন্মের সদস্যরা মানসিক ও শারীরিকভাবে ছোট হয়ে যায়, কুণ্ঠিত হয়ে যায়, নানান পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে ক্রমশ মানসিক ও শারীরিকভাবে ছোট মানুষে পরিণত হতে থাকে। ছয়, সাত, আট, নয়, দশ ... পুরুষে এই ক্রমক্ষীয়মানতা আরও আরও বাড়ে। কিন্তু অবাক করার মতো ব্যাপার হলেও একথা সত্যি যে, শেষ প্রজন্মের ঐ কুণ্ঠিত সন্তানেরাই যদি বাস্তু ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে ঘর বাঁধে, দেখা যায়, তাদের সন্তানেরা নতুন করে শারীরিক ও মানসিকভাবে বড় হতে পারছে; সমৃদ্ধ হতে পারছে। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে নতুন মাটিতে গিয়ে বসবাস করার এই চেষ্টা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয় এবং অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হয়। ...

মোটকথা, মানুষের **বংশ** ও তৃণশ্রেষ্ঠ বাঁশের **বংশ** একই নিয়মে চলে। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, মানুষের যৌথপরিবার ব্যবস্থাই বড়মানুষের জন্ম দেওয়ার পক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা; কিন্তু সেই ব্যবস্থাকে অবশ্যই উপরোক্ত **বংশ**নীতি (বাঁশঝাড়ের নীতি) মানতেই হয়, ঝাড়ের পরিমাপ ও চাল মানতেই হয়, অন্যথায় যৌথপরিবারও ছোটমানুষের জন্ম দিতে শুরু করে দেয়। আর, মানুষের তথাকথিত 'আণবিক পরিবার' (স্বামী-স্ত্রী, একটি ছেলে বা মেয়ে), যা কিনা বংশের অন্য সদস্যদের থেকে অনেক দূরে থাকে, তেমন পরিবার-ব্যবস্থা মানবজাতির অস্তিত্বের ও বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আণবিক পরিবারের সন্তান বড়মানুষ হয় কদাচিৎ, মনের দিক থেকে সে একেবারেই সর্বহারা হয়, সব পেয়েও সে কিছুই পায় না। কর্মহীন মানুষ যেমন কর্মের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অবকাশের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়, আণবিক পরিবারের সন্তান তেমনি স্বজনসঙ্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি একাকিত্বের বা সঙ্গহীনতার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়। ... মোটকথা, আণবিক পরিবারে বড়মানুষের জন্ম হওয়ার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায় (দ্র. **ফুলকাকা**)। তবে আজকাল বাংলাভাষীদের সমাজে একধরনের নতুন যৌথপরিবারের সাক্ষাৎ মিলছে। এদের সদস্যরা কাছাকাছি পৃথক বাড়িতে আণবিক-পরিবাররূপে থাকে বটে, কিন্তু সম্পদে-বিপদে, সুখে দুঃখে, কাশে-বিকাশে-প্রকাশে কিংবা ঘাতে-আঘাতে-প্রতিঘাতে তারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এতই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত অবস্থায় কাটায় যে, যৌথপরিবার-ব্যবস্থার সঙ্গে তার বিশেষ ভেদ থাকে না; অথচ দৈনন্দিনতায় তারা প্রায়শই যে-যার সে-তার মতোই কালাতিপাত করে। এদের ছেলেমেয়েরা প্রায়শই যৌথ-পরিবারের সদস্যদের মতো বড় হয়ে থাকে। আণবিক পরিবারের চেয়ে এই ব্যবস্থা তবুও মন্দের ভাল।

হ্যাঁ, **বংশ** শব্দের ক্ষেত্রেও অদৃশ্য 'মানুষের-**বংশ**'কে বোঝানোর জন্যই শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছিল, বাস্তবের দৃশ্য 'বাঁশ'কে বোঝানো শব্দটির উদ্দিষ্ট ছিল না। তবে তার মূলে যে **বম্** + শ = **বংশ**কে আমরা পাচ্ছি, তার খুব কাছাকাছি রয়েছে ইংরেজির bamboo শব্দের উত্তরাধিকার। এ যেন 'বম্ বহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে', সেটিই **বম্বু** বা bamboo। ... **৬.** ইংরেজি bamboo। এই শব্দটি অবশ্য ইংরেজি নিজের আদি উত্তরাধিকার থেকে পায়নি, পেয়েছে আধুনিক যুগে আমদানি-কৃত শব্দ রূপে। এটি প্রাচ্যদেশ মালয় থেকে পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় গেছে। ইউরোপের জলবায়ুতে বাঁশগাছ জন্মানই সম্ভব নয়, সেজন্য পাশ্চাত্যের দেশেও 'বাঁশ' ছিল না, পাশ্চাত্যের ভাষাতেও 'বাঁশ' বোঝানোর কোনো শব্দ ছিল না।

বংশধর : **২.** *বংশ (ধারাকে) ধারণ করে যে।* / বংশকে ধরে রাখে যে। (ব.শ.)। **৩.** বংশবর্দ্ধন পুত্র। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বংশরোচনা (বংশলোচন, বংশশর্করা) : **৩. বংশরোচনা, বংশলোচনা** = বংশপর্ব্বস্থ কর্পূরবৎ শ্বেত দ্রব্য, বংশলোচন (প্রসিদ্ধি, স্বাতিনক্ষত্রে মেঘের জলবিন্দু বংশে পড়িলে 'বংশলোচন' জন্মায়, শুক্তিতে পড়িলে 'মুক্তা' জন্মায় এবং গজমস্তকে পড়িলে 'গজমুক্তা' জন্মায়।)। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** বাঁশের দুই গাঁটের মাঝে বা **পর্ব্বে**র ভেতরে যে নলের মতো লম্বা ছিদ্র থাকে তাতে এই শ্বেত দ্রব্যটি দেখতে পাওয়া যায় বাঁশ কাটলেই। কিন্তু 'স্বাতিনক্ষত্রে মেঘের জলবিন্দু বাঁশে পড়লে তবেই এগুলি জন্মায়' কি না, তা আমরা জানি না। কিংবা মুক্তা ও গজমুক্তা একইভাবে জন্মায় কি না, তাও আমরা জানি না। 'গাছের প্রাণ আছে' - আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা জানতেন, মহর্ষি জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণা করে সত্য আবিষ্কার করে সেকথা প্রমাণ করে গেছেন। তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন বংশরোচন-এর কথা। আমাদের ধারণা এই ধরনের কথাগুলির সত্যতা বিচারের জন্য এই বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।

বংশানুচরিত : **৩.** বংশের ক্রমিক ইতিহাস। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** পুরাণাদির যে **পঞ্চলক্ষণ** থাকে, তার একটি লক্ষণ হল **বংশানুচরিত**। কোনো পুরাণে **বংশানুচরিত** না থাকলে, সেই পুরাণটি সম্পূর্ণ পুরাণ বলে বিবেচিত হয় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, তা সে প্রাচ্যের হোক কিংবা পাশ্চাত্যের, পুরো বংশলতিকা গড় গড় করে বলে যাওয়া যেন একটা অবশ্যমান্য রীতি ছিল। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে ব্যাপারটি ছিল আরও উচ্চ মানের। তাতে কোনো ব্যক্তিমানুষের বংশধরদের নামগুলি পর পর বলা হত না, বলা হত একটি সত্তার কথা, যেমন **ইক্ষ্বাকু**র (অভিভবেচ্ছার) বংশে কে কে জন্মেছে সেকথা বলে যাওয়া হয়েছে 'হরিবংশপুরাণ'-এর 'আদিত্যবংশানুকীর্ত্তন' অধ্যায়ে। সেখানে সেই বংশের যে সকল বংশধরদের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যথা **সগর-অসমঞ্জ-অংশুমান-দিলীপ-ভগীরথ**- ..., তাদের অর্থের গভীরে প্রবেশ করতে পারলে দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে 'অভিভবেচ্ছা' থেকেই জন্মেছে। বাইবেলে সেই একই রীতি অনুসৃত হয়েছে প্রায় একইভাবে, যদিও তার বংশধরগণের নাম এতই প্রতীকী হয়ে গেছে যে, সেগুলি যে বিশেষ বিশেষ সত্তার নাম সেকথা সব ক্ষেত্রে খুঁজে বের করা যায় না। এমনকি সমাজজীবনেও সেকালের অভিজাত মানুষেরা নিজেদের পূর্বপুরুষের দীর্ঘ তালিকা মনে রাখতেন এবং বলা মাত্র স্মৃতি থেকে

বলে দিতে পারতেন। তবে সে ছিল রক্তমাংসের মানুষের নামের তালিকা। পাশ্চাত্যের সমাজেও এই রীতির প্রচলন ছিল।

বমন : ১. ✓বম্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বাহী সীমিত হইয়া অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. উদিগরণ, ছর্দ্দন, বমি, অর্দ্দন, পীড়ন, আহরণ, নিঃসারণ, আহুতি। (ব.শ.)। ৪. vomiting অর্থে প্রচলিত। **৫. বপ্** ও **বম্** দুটি ক্রিয়ামূল যে অন্তঃস্থ **ব**-এর থেকে জাত হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, তাদের ইংরেজি উত্তরাধিকার পাওয়া যায় যথাক্রমে wap ও vom- শব্দে, bap বা bom শব্দে নয়। ৬. ল্যাটিন vomitum (ব.শ.)।

বর্ণ্ (বৃ, *বারি*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনবর, অনাবৃত, অনিবার, অনিবার্য্য, অনিবৃত, অপবারক, অবর, অবরজ, অবরবর্ণজ, অবর্ণ, অবর্ণনীয়, অবর্ণ্য, অবারিত, অব্রত, অব্রতিক, অব্রতী, অসংবর, অসংবৃত, অসবর্ণ, অসম্বর, অসামাল, আওআরি, আওয়ারি (আবারি), আবর, আবরক, আবরিত, আবরিতা, আবরু (আব্রু), আবৃত, আবৃতি, আবর্হ, আবর্হণ, দরবার, নিবার, নিবারণ, নিবৃত, প্রবর, বন্ন, বন্নক, বব্বল, বব্বলে, বর, বরই, বরং, বরক, বরকত (বরকৃত), বরকন্দাজ, বরকরারি, বরকর্ত্তা, বরকামান(নো), বরগী, বরচলনি, বরজ, বরঞ্চ, বরট, বরটা, বরটী, বরণ, বরণঅঙ্গুরী, বরণকুলা, বরণডালা, বরণমালা, বরণীয়, বরণ্ড, বরত, বরতরফ, বরতরফি, বরতিনী, বরত্র, বরত্রা, বরদ, বরদা, বরদাঅ, বরদাই, বরদান, বরদায়, বরদায়ী, বরদার, বরদাস্ত, বরনারী, বরনাহ, বরপক্ষ, বরপুত্র, বরপূর্ব্ব, বরপ্রদান, বরপ্রস্থান, বরফ, বরফি (ফী), বরবটি, বরবধূ, বরবর্ণ, বরবর্ণিনী, বরবর্ণী, বরবাদ, বরভোজন, বরম্, বরযাত্তর, বরযাত্র, বরযাত্রা, বরযাত্রী, বরযুবতি, বরযুবতী, বররামা, বররুচি, বরল, বরলা, বরলী, বরশা (বর্শা), বরসজ্জা, বরসুতা, বরহ (বর্হ), বরাক, বরাঘুরে, বরাঙ্গ, বরাঙ্গনা, বরাঙ্গী, বরাট, বরাটক, বরাটিকা, বরাটিয়া, বরাটী, বরাড়ী, বরাত, বরাতী, বরাদ্দ, বরাননা, বরাননী, বরাবর, বরাবরী, বরাভয়, বরাভরণ, বরাভীতি, বরামদ, বরামুদে, বরারোহ, বরাসন, বরাহ, বরাহকল্প, বরাহপুরাণ, বরাহমিহির, বরাহাবতার, বরাহী, বরিখ, বরিবস্যা, বরিয়াত, বরিয়াতি, বরিয়াতী (বরযাত্রী), বরিষ, বরিষ্ঠ (দ্র.উরু), বরিহা, বরীয়স, বরীয়ান, বরুই, বরুজ, বরুড়, বরুণ (দ্র.বরণ), বরুণদেব, বরুণদৈবত, বরুণপাশ, বরুণলোক, বরুণা, বরুণানী, বরুণাবাস, বরুণালয়, বরুণাস্ত্র, বরুল, বরুলী, বরূথ, বরূথিনী, বরূথী, বরেণ্য, বরেন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি, বরেন্দ্রী, বরেশ্বর, বরেহঁ, বরোরু, বরোল, বর্কর, বর্ণ, বর্ণক, বর্ণকা, বর্ণকূপিকা, বর্ণচোরা, বর্ণজ্যেষ্ঠ, বর্ণতুলি, বর্ণতুলিকা, বর্ণতুলী, বর্ণদূষক, বর্ণদেবতা, বর্ণদ্বিজ, বর্ণধর্ম্ম, বর্ণন, বর্ণনা, বর্ণনীয়, বর্ণপরিচয়, বর্ণপাত, বর্ণপাত্র, বর্ণপ্রকর্ষ, বর্ণবর্ত্তি, বর্ণবর্ত্তিকা, বর্ণবিপর্যয়, বর্ণবিবর্ণ, বর্ণবৃত্ত, বর্ণব্যবস্থিতি, বর্ণময়, বর্ণমাতৃকা, বর্ণমাত্র, বর্ণমালা, বর্ণশ্রেষ্ঠ, বর্ণসংযোগ, বর্ণসংসর্গ, বর্ণসঙ্কর, বর্ণসঙ্কারক, বর্ণসমাম্নায়, বর্ণস্থান, বর্ণহীন, বর্ণা, বর্ণাপেত, বর্ণাশ্রম, বর্ণিক, বর্ণিকা, বর্ণিত, বর্ণিনী, বর্ণী, বর্ব্বট, বর্ব্বণা, বর্ব্বর (দ্র.বাবরী), বর্ব্বরী, বর্ব্বুর, বর্ম্ম, বর্ম্মণ, বর্ম্মন, বর্ম্মা, বর্ম্মি, বর্ম্মী, বর্ম্মুষ, বর্য্য, বর্য্যা, বর্শা, বর্হ, বর্হ, বর্হণ, বর্হনেত্র, বর্হা, বর্হিঃ, বর্হিণ, বর্হির্মুখ, বর্হিষৎ, বর্হিষদ, বর্হিষ্মান, বর্হী, বল্তা, বল্লা, বাবরী, বাবলা, বার (বৃ), বার (বর-জাত, দরবার), বারক, বারণ, বারণকর, বারণানন, বারণাবত, বারণশালা, বারণারি, বারণীয়, বারদুয়ারী, বারনারী, বারনিতম্বিনী, বারবধূ, বারবনিতা, বারবরদারী, বারবাণ, বারবিলাসিনী, বারবেলা, বারমুখ্যা, বারম্বার, বারয়িতা, বারযুবতী, বারযোষিৎ, বাররামা, বারস্ত্রী, বারাংনিধি, বারাক, বারাকপুর, বারিক, বারাঙ্গনা, বারাণ, বারাণসী, বারান্দা, বারামে, বারাল, বারাহকল্প, বারাহী, বারি, বারিক, বারিকোষ, বারিগর্ভ, বারিচর, বারিজ, বারিত, বারিদ, বারিদুর্গ, বারিধর, বারিধানী, বারিধারা, বারিধি, বারিধিসুতা, বারিনাথ, বারিনিধি, বারিপ, বারিপথ, বারিপর্ণী, বারিপ্রবাহ, বারিবহ, বারিবারণ, বারিবাহ, বারিবাহক, বারিবিহার, বারিমুক, বারিযন্ত্র, বারিরাশি, বারিরুহ, বারিসম্ভব, বারিস্থ, বারী, বারীন্দ্র, বারীশ, বারুই, বারুণ, বারুণা, বারুণি, বারুণী, বারুণীবল্লভ, বারুণীশ, বারুণী, বারুণীমত্ত, বারুণীমদ, বারুণীমদিরা, বারুণীস্থান, বারেন্দ্র, বারেন্দ্রী, বার্ণিক, বার্য্য, বার্য্যয়ন, বার্য্যোকাঃ, বার্হদ্রথ, বার্হস্পত্য, বিন, বিনন, বিনা, বিনানিএগ্র, বিনানিয়া, বিনানী, বিবর, বিবরণ, বিবৃত, বৈরাত, বৈরাতি, বৈরাতী, বৃ, বৃক, বৃন্ত, বৃন্দ, বৃন্দাবন, বৃহৎ, বৃহদ্রথ, বৃহস্পতি, ব্রত, ব্রতচর্য্যা, ব্রততি(তী), ব্রততিথি, ব্রতদাস, ব্রতধারণ, ব্রতনিয়ম, ব্রতপারণা, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, ব্রতভঙ্গ, ব্রতভিক্ষা, ব্রতমাস, ব্রতলোপ, ব্রতস্থ, ব্রতস্নাতক, ব্রতাদেশন, ব্রতামৃত, ব্রতী, ব্রাত, ব্রাতীন, ব্রাত্য, ব্রাত্যা, রবিবার, সংবরণ, সংবৃত, সদাব্রত, সমাবৃত, সম্বরণ, সহব্রত, সুবর্ণ, সুবর্ণকার, সুবর্ণকেতকী, সুবর্ণগর্ভা, সুবর্ণজীবী, সুবর্ণধেনু, সুবর্ণবণিক, সুবর্ণময়, সুবর্ণযূথিকা, সুসংবৃত, সোণা, সোনা (স্বর্ণ), সোনাকচু, সোনাদানা, সোনাধন, সোনামুখ, সোনামুখী, সোনামুগ, সোনালী, স্বর্ণ।

বর্ণ্ (বৃ, বারি) = বরণ করণ। **বর্ণ** = বরণ করণ থাকে যাহাতে; বরেণ্য যে। **বৃ** = বহন আবর্ত্তনশীল যাহাতে। **বারি** = **বার**-এর (**বর** = বাহী রহে যাহাতে; **বার** = বর হইতে জাত।) গতিশীলতা যাহাতে।

বর (বরাত, বরাতী, বরাদ্দ) : ১. **বর** = ✓বৃ + অ (অপ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বর** = *বাহী রহে যাহাতে। /* **বর** = যাহাকে প্রার্থনা করা হয়; তপস্যার দ্বারা দেবতার নিকটে যাচিত অভীষ্ট; দেবাদি হইতে লব্ধ অভীষ্ট বিষয়। **বরাতী** = যাহার বরাত দেওয়া হইয়াছে। (ব.শ.)। ৩. **বর** = অভীষ্ট, মূল্যবান, শ্রেষ্ঠ, চিত্তপ্রসাদন, সুন্দর, রসিকশ্রেষ্ঠ ... ইত্যাদি; বরণীয়, বরদানার্থ মুদ্রাবিশেষ, অভিলষিত দ্রব্য, কন্যার পতিরূপে বরণীয়, পতি ... ইত্যাদি; পতিরূপে বা পত্নীরূপে স্বীকার করা, বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মে নিয়োগ করা ... ইত্যাদি। **বরাত** = (আরবি) কাজের ভার বা ভারার্পণ, প্রয়োজন, প্রতিনিধি, হিসাবমত পরিমাণ, ভাগ্য। **বরাদ্দ** = (ফারসি) হিসাবপূর্ব্বক ব্যয়নির্ণয়, হিসাবে নির্ণীত পরিমাণ, নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা। (ব.শ.)। ৪. bridegroom ও boon granted by a deity অর্থে **বর** প্রচলিত;

বরাত ও **বরাদ্দ** তাদের উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **বরাতী** অপ্রচলিত। **৫. বর** শব্দের গভীরে 'বাহী রহে যাহাতে' অর্থ রয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষকার তাকে অনেক বেশি ব্যক্ত স্তরে তুলে এনে জানিয়েছেন, 'যাহাকে প্রার্থনা করা হয়', সেই হল **বর**। এই **বর** অতএব যে কোনো প্রার্থিত বিষয় বা বস্তু হতে পারে, যে কোনো ক্রিয়া করার শক্তি, অধিকার ... ইত্যাদি হতে পারে, কন্যার **বর**ও হতে পারে। তার মানে, আপনার ভূমি-ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য যে মজুর, সেও যেমন আপনার ভূমির **বর** হতে পারে, তেমনি আপনার কন্যা-ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য সুদর্শন যুবকটিও আপনার কন্যার **বর** হতে পারে। তবে যাই হোক না কেন, তার ভিতরে যে কারও না কারও প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়ের বহন রয়েছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তাই তাদের **বর** বলে। ...

বরাত, বরাতী ও **বরাদ্দ** শব্দ তিনটিকে আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে এসেছে বলা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এগুলি একই **বর** শব্দের আরবি ও ফারসি উত্তরাধিকার। **বর**দের বা যাদেরকে বরণ করে কাজে লাগান হয়, তাদের জন্য যা কিছু খাদ্যাদি দেওয়া হয়, তাকেই তো **বরাদ্দ** বলে! **বরাত** দেওয়াও প্রায় একই ব্যাপার। আর **বরাতী**র কথা তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়ে ব.শ. নিজেই বলে গেছেন। ফলে, একে বাংলাভাষার শব্দ রূপে গ্রহণ করে নিতে আমাদের পূর্বসূরি বাংলাজ্ঞানীদের বাধেনি। **৬.** ইংরেজি borrow, boar। দ্র. **বরাহ**।

বরং : ২. *বর (সর্বোচ্চ রূপে) সীমায়িত যাহাতে।* **৩.** তদপেক্ষা প্রিয় বা ভাল, আচ্ছা, বেশ, পূর্ব্বাপেক্ষা, পক্ষান্তরে, পক্ষান্তরে সম্ভব। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** 'চলো, আমরা **বরং** ফুটবল খেলি'। কথাটির মানে হল, এর আগে যেটাতে লিপ্ত ছিলাম, কিংবা অন্যেরা যেটাতে লিপ্ত আছে, তার চেয়ে ফুটবল খেলাটি বেশি **বরণ**ীয়। অতএব চলো, সেটিকে **বর** করে নিই। সেটিই **বরং** বা **বরম্**। আগের চেয়ে যেটা ভাল, তাকেই **বর** করা উচিত, বরণ করা উচিত। এখন পর্যন্ত যা যা দেখা গেল তাতে এইটি, যার কথা ভাবছি, দেখছি, বলতে চলেছি, সেইটি শ্রেষ্ঠ বা **বরং** বা **বরম**। এইজন্য, ব.শ. **বরং** শব্দের মানে দিয়েছেন 'তদপেক্ষা ভাল' ... ইত্যাদি। বলে রাখা ভাল, বাংলাভাষার অধিকাংশ অব্যয় শব্দের মতো **বরং, বরঞ্চ** শব্দও বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ; এবং এসব শব্দ আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব বাংলাভাষীরাই অনায়াসে ব্যবহার করে থাকি।

বরণ (বরণকুলা, বরণডালা, বরণমালা) : ১. ✓বৃ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বরণ** = **বর** অন (on) যাহাতে।* / **বরণ** = আবরণ করে যে; জলরোধ করে যে; যাহার দ্বারা বেষ্টন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. বরণ** = প্রার্থনা, বেষ্টন, কন্যাদানার্থ জামাতার প্রতি অভ্যর্থনানুকূল ব্যাপার, ঋত্বিগাদির ক্রিয়াসমূহে নিয়োগার্থ পূজনাদি, কন্যার পতিরূপে স্বীকরণ, সারথি-প্রভৃতির স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগার্থ প্রার্থনা; বৃক্ষ, বরুণবৃক্ষ, সেতু, বপ্রোপরি (ভিতের উপরে) ইষ্টকাদিবেষ্টন, প্রাকার, বরণে দেয় দান। **বরণকুলা, বরণডালা** = ধান্যদূর্ব্বাদি বরণদ্রব্যে পূর্ণ কুলা। **বরণমালা** = পতি স্বীকার করিয়া তদ্‌গলে প্রদেয় মালা। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আপনি পাঁচজন মজুরকে 'ফুলবাগিচা' গ্রাম থেকে অনেক বলে-কয়ে ধরে এনেছেন ঘরের সামনের ক্ষেতটি পরিষ্কার করে গোলাপের বাগান করবেন বলে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার, থাকাথাকির, জল-পানির, খরচাপাতির এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে করছেন আপনি। সেকালে আপনার এসব করাকে বলা হত, 'ঋত্বিগাদির ক্রিয়াসমূহে নিয়োগার্থ পূজনাদি'। এরকম বাক্য শুনলে একালের শিক্ষিত বাংলাভাষী ভিরমি খান। একে সংস্কৃত বলে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান; যেন সাপের ওপর পা পড়তে চলেছে। অথচ এটিই ছিল সেকালের আহূত কর্মীদের কাজে নিয়োগ করার বা **বরণ** করার ভাষা। তবে, একথাও সত্যি যে, সেকালে কাউকে নিজের ক্ষেতে কাজ করানোর জন্য নিয়োগ করতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত; কেননা, একালের মতো আত্মগরিমাহীন (অথচ শিক্ষিত) মানুষ তখন পাওয়াই যেত না। এমনকি সম্পূর্ণ 'আনস্কিলড্ লেবার'ও আত্মসম্মানে ঘা লাগলে মজুরের কাজ করতে অস্বীকার করত, যত টাকাই তাকে দেওয়া হোক। তাই 'ঋত্বিগাদির পূজনাদি' করতেই হত এবং তাতে আপনি কত টাকা দিচ্ছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হত আপনি কতখানি সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মজুরী ও অন্যান্য বিষয় দিচ্ছেন। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও গ্রামবাংলার যেসব বড়চাষীরা পশ্চিমা-মজুর এনে 'ঋতু বা যোগ্যকালে' (দ্র. **ঋত্বিক** - ব.শ.) চাষের কাজ করাতেন, এই 'সম্মান ও শ্রদ্ধার' সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। কলিম খান সেসব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ... দ্র. **বর, বরাহ, বরুণ**।

এখনকার দিনেও বাংলাভাষী হিন্দু ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাঁদের পারিবারিক জীবনে 'বধূ**বরণ**', 'জামাতা**বরণ**', 'পুরোহিত**বরণ**' ... ইত্যাদি করে থাকেন। এবং সামাজিক জীবনে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে 'সভাপতি **বরণ**', 'প্রধান অতিথি **বরণ**' ... ইত্যাদি করে থাকেন। যে সব বস্তু দিয়ে ঐ **বরণ**-কার্য করা হয়, বা কোনো দায়িত্ব-অধিকার তথা সম্মানে **বৃত** ... ইত্যাদি করা হয়, সেগুলি যে কুলায় বা ডালায় থাকে, তাকে **বরণডালা** বলে। আর, যে 'মালা' দিয়ে তদ্রূপ **বরণ** করা হয়, সেই মালাকে **বরণমালা** বলে।

বরদ, বরদা : ১. বরদ = বর + ✓দা + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বরদ** = **বর** দান করে যে। **বরদা** = **বরদ**-এর আধারশক্তি যে।* **৩. বরদ** = অভীষ্টদাতা, বরদানেচ্ছু, প্রসন্ন, পিতৃগণবিশেষ, বরদানার্থ মুদ্রাবিশেষ। **বরদা** = কন্যা, দুর্গা, অশ্বগন্ধা। (ব.শ.)। যে বর দান করে। দেবীর নাম। সরস্বতীকেও বরদা বলা হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বরনারী : ২. *যে নারীকে বরণ করা হয়।* **৩.** শ্রেষ্ঠা নারী, যুবতী, রূপগুণবতী স্ত্রী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বরপুত্র : ২. *বর রূপে যে পুত্রকে পাওয়া গেছে।* **৩.** দেবতার বরপ্রাপ্ত পুত্রবৎ ভক্ত, দেবতার প্রসাদভাজন। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** সরস্বতীর **বরপুত্র** ছিলেন কালিদাস। এ যুগেও স্যার আশুতোষকে

কখনো কখনো 'সরস্বতীর বরপুত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু শব্দটির ব্যবহার আমরা আর করতে পারিনি। তার একটা বড় কারণ এই যে, আজকাল সরস্বতীর, লক্ষ্মীর, মহামায়ার **বরপুত্র**দের দেখা মেলে না, দেখা মেলে চিত্রগুপ্তের, কুবেরের, রাবণের চেলাচামুণ্ডাদের। এদের **বরপুত্র** বলা যায় না, কেননা, চিত্রগুপ্ত, কুবের ও রাবণেরা **বর** দিতে পারতেন না।

বররুচি : ২. *যে রুচিকে বরণ করা হয় বা করা উচিত।* ৩. শ্রেষ্ঠরুচি, পাণিনির সূত্রবার্ত্তিককার কাত্যায়ন, উৎকৃষ্টকান্তি, অতিরুচির, পরমসুন্দর, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম (ইঁহার প্রাকৃতব্যাকরণ 'প্রাকৃতপ্রকাশ'। প্রসিদ্ধি, ইহাই প্রথম প্রাকৃতব্যাকরণ।) (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বরাক : দ্র. **মাণব**।

বরাবর : ৩. (ফারসি) তুল্য, এক, অভিন্ন, সমতল, অর্থাৎ ভূমিসাৎ, পূর্ণ, সম্মুখে, সমীপে, সম্বন্ধে, সোজা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **বরাবর** শব্দটি একই **বর্** ক্রিয়ামূল থেকে জন্মেছে বটে, কিন্তু জন্মেছে ফারসিভাষীগণের জিহ্বায়। তার উদ্ভবক্ষেত্র একটু আলাদা। তাই বাংলায় যেখানে সমার্থক শব্দ হতে পারত **বরসম**, সেখানে তাঁদের মুখে সেটিই হয়েছে **বর-অ-বর**। অর্থাৎ 'বরণীয়র সমান বরণীয়'। মধ্যযুগের বাংলাভাষী তাই বলে তাকে স্বজন হিসেবে চিনতে ভুল করেননি; এতই আপন করে নিয়েছেন যে **বরাবর** বিদেশী শব্দ একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

বরাহ : ১. বর + আ - ✓হন্ + অ (ড) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাকে **বরণ** করিয়া (তাহার দ্বারা অন্যকে) **আহনন** করা হয়।* ৩. মেঘ, শূকর, বরাহাবতার বিষ্ণু, বরাহমিহির, বরাহপুরাণ, বারাহীকন্দ, ব্যূহবিশেষ, বাদ্যবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. boar অর্থে কখনো কখনো প্রচলিত। ৫. যাকে তোয়াজ করে এনে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের কাজে লাগানো হত, তাকে বলা হত **বরাহ**। একালের ভাষায় সে হল কর্মী বা কর্মচারী, যে কিনা নির্দেশানুসারে কর্ম করে দেয়। মাটি কাটাই হোক আর কাঠ কেটে দেওয়াই হোক, যে সেটি করে দেয়, সে তো বিষয় বা বস্তুটিকে একটি অন্যতর স্থির রূপ দিয়ে দেয়। সেই স্থির রূপ দেওয়াকে **আহনন** করা বলে।

আদিম যৌথসমাজে যারা যৌথসম্পদ নিয়ে গিয়ে সবাইকে বিলিয়ে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল, ঋগ্বেদের ভাষায় যাকে বলা হত 'মেঘ', তারাও ছিল একপ্রকার **বরাহ**। যৌথসমাজ যখন সবে ভাঙছে, ব্যক্তিমালিকানা খুব ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেই সময় সর্বপ্রকার নিয়োগকেই '**বরণ**পূর্ব্বক নিযুক্ত' বা **বরাহ** বলা হত। একালে যাকে 'বিনিয়োগ' বলা হয়, নগদ-নারায়ণের বা অর্থের তদ্রূপ নিয়োগকেও **বরাহ** বলা হত (নিম্নে **বরাহাবতার** দ্রষ্টব্য)। ...

সূচনাকালে **বরাহ** শব্দটি ভারতসমাজে অত্যন্ত সম্মানীয় শব্দ ছিল। যেহেতু **অধিরাষ্ট্র**রূপী মহর্ষিগণ সমাজশাসনের জন্য ক্ষত্রিয়-গণকে **রাষ্ট্র**রূপে নিযুক্ত করেছিলেন (দ্র. **পৃথু**), রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সকল কর্মচারীই **বরাহ** পদবাচ্য হয়ে যায়। কিন্তু পরে পরে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের অত্যাচারে প্রজাগণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, ভারতসমাজে **বরাহ**-এর সম্মান নষ্ট হয়ে যায় এবং মধ্যযুগের বাংলায় তারা 'শুয়োরের-বাচ্চা'য় পরিণত হয়।

কিন্তু শুয়োর বা শূকরকে কেন যে **বরাহ** বলা হয়, তা বোঝা গেছে নেহাতই ভাগ্যের কৃপায়। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অদৃশ্যলোকের সামাজিক **বরাহ**কে নিয়ে কথা বলছিলাম, কিন্তু দৃশ্যলোকের জন্তু **বরাহ**টির সম্পর্কে কোনো কথা হয়নি। এটিই শূকর-**বরাহ**। শূকরকেও যে ভূমি খননের জন্য লোকে নিয়োগ করত, সেটা জানতে পারাকেই আমরা বলছি 'ভাগ্যের কৃপায় জানা গেছে'।

মেদিনীপুরের যে গ্রামে কলিম খানের বাস, সেই গ্রামে তার প্রতিবেশী ছিল, এখনও আছে, কয়েকটি সাঁওতাল পরিবার। তাঁদের কেউ কেউ শূকর-পালন করতেন। তখন, ১৯৬০ সাল নাগাদ, নদীপাড়ের অনেক জমিই পতিত পড়ে থাকত। এই জমিগুলিকে বলা হয় 'নদীপালের জমি'। ঐ জমিতে এমনিতে প্রচুর 'বাজোমাথা' (একপ্রকার ঘাসের মূল বা বীজ) থাকত। একজন সাঁওতাল বৃদ্ধ, নাম তাঁবু বুড়া, যার হাল-লাঙ্গল ছিল না, এবং তা ভাড়া করার টাকাও ছিল না, তিনি মাঝে মধ্যে ঐ নদীপালের জমিতে কুরচি (কুলত্থ) কলাইয়ের চাষ করতেন। কলাই বোনার আগে তিনি পাড়ার শূকরগুলিকে নিয়োগ করে ঐ জমি খুঁড়িয়ে ফেলতেন। শূকরেরাও 'বাজোমাথা' খাওয়ার লোভে গোটা জমিটা এমনভাবে খুঁড়ে ফেলত যে, লাঙ্গল দিয়ে অত গভীরভাবে খোঁড়া সম্ভব হত না। তারপর কোনোমতে ঐ খুঁড়ে ফেলা জমির উপরিতলকে সমান করে দিয়ে তিনি সেখানে কুরচি কলাই বুনে দিতেন।

শব্দার্থসন্ধান করতে গিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে কি আদিকালে মানুষ শুয়োরকেই সর্বপ্রথম **বরাহ** বানিয়েছিল? সেই প্রথার উত্তরাধিকারই কি তাঁবু বুড়ো বহন করে নিয়ে চলেছেন? কিন্তু তিনি কবেই গত হয়েছেন। তাঁর উত্তরসূরিরা দেখি সে বিষয়ে কিছুই জানে না। বিষয়টি কলিম খান বলেন রবি চক্রবর্তীকে। তিনি একদিন দেখেন, ব.শ. **রদ্** শব্দের মানে দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন — 'রদতি ভূমিং শূকরঃ'। তার মানে ব্যাপারটি সেকালে সবাই কমবেশি জানতেন। কেননা, সবাই বুঝবেন এমন বাক্যই অভিধানাদিতে উদাহরণ হিসেব ব্যবহৃত হত। ... অতএব দৃশ্যজগতের আদি **বরাহ** যে শূকর নামক জন্তুটিই ছিল, সেকথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। ... দ্র. **কির**। ৬. ইংরেজি boar।

বরাহকল্প (বারাহকল্প) : ৫. '**বরাহ** নির্ভর কল্প যে', সেটিই **বরাহকল্প**। এর অর্থ হল, 'নিযুক্তের উপর নির্ভর করে যে সামাজিক প্রকল্প চলে'। পুরাণাদিতে **বরাহকল্প** অথবা **বারাহকল্প** কথাটি লিখিত দেখা যায়। শব্দসৃষ্টির নিয়মে '**বরাহকল্প** হইতে জাত'কে **বারাহকল্প** বলা হয়। সেই সুবাদে শব্দদুটি প্রায় একই **কল্প**কে বোঝায়। ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ হল বাৎসরিক **পঞ্জিকা**। তাতে বলা হয় 'এখন **বারাহকল্প** চলিতেছে'। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডারের বিচারে বর্তমান যুগটির নাম **বরাহকল্প** বা **বারাহকল্প**। তার মানে, এখন যে যুগটি চলছে, সেটি চলছে **বরাহে**র বা নিযুক্তের উপর নির্ভর ক'রে। এই **বরাহ** না থাকলে বর্তমান যুগটিই থাকবে

না। অর্থাৎ, ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে পাড়ার চৌকিদার পর্যন্ত সর্বপ্রকারের 'নিযুক্ত ব্যক্তি' বা **বরাহ** অর্থাৎ **চাকর**ই হল আজকের সমাজের অস্তিত্বের ভিত্তি। কোনো ব্যক্তিই যদি নিযুক্ত হতে বা **চাকর** হতে অর্থাৎ চাকরি করতে না চায়, বর্তমান সমাজটি মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ...

একালের সমাজতাত্ত্বিকগণ এতই খণ্ডজ্ঞানের জ্ঞানী যে, সেকালের সমাজতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তুলনা করলে এঁদের নেহাতই ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। সমাজের অগ্রগতির বিশেষ বিশেষ কালখণ্ডকে এই খণ্ডজ্ঞানীরা যে সকল নাম দেন, তার থেকে সেই সমাজটির প্রাণপাখিটিকে চেনাই যায় না, অর্থাৎ মূল চরিত্রটিকে কিছুতেই জানা যায় না। যেমন ধনতান্ত্রিক যুগ, সামন্ততান্ত্রিক যুগ ... ইত্যাদি। একালকে যেমন তাঁরা বলেন বিশ্বায়নের যুগ। ...

সেকালের সমাজতাত্ত্বিকগণ সেরকম বুঝতেন না। তাঁরা সত্তার প্রাণটিকে দেখতেন। বলে রাখা ভাল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি সত্তার প্রাণটিকেই দেখে থাকে। একটি সমাজের একটি বিশেষ কালখণ্ডের স্বভাব যে বিশেষ ক্রিয়া দিয়ে নির্ধারিত হয়, সেটিই তার প্রাণ। একজন মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষকে **বরাহ** করে ফেলা, এবং অন্য মানুষের তাতে রাজি হয়ে যাওয়া এবং সেভাবেই সমাজের রথচক্র চালিয়ে নিয়ে যাওয়া — এটাই **বর্ত্তমান** সমাজের প্রাণ রূপে সক্রিয় রয়েছে। 'এখন **বরাহকল্প** (বারাহকল্প) চলিতেছে' মানে, বর্তমানে যে সময়কাল চলছে, সেটি 'নিয়োগ-প্রথাভিত্তিক সামাজিক প্রকল্প'-এর যুগ। নিয়োগ করতে না পারলে, নিযুক্ত না হলে, এই সমাজ একটি দিনের জন্যও বাঁচবে না। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য একালে আত্মগরিমাহীন মানুষ চাই, সেরকম মানুষ গড়ে তোলার অ্যাকাডেমি চাই, সেই অ্যাকাডেমি চালানোর জন্য কিছু উচ্চশিক্ষিত **বরাহ** চাই, তাদের দিয়ে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি আত্মগরিমাহীন **বরাহ** বা **চাকর** তৈরি করা চাই ... ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানে সেভাবেই সবকিছু করে এই **বরাহকল্প** চালান হচ্ছে। আজকের তথাকথিত 'বিশ্বায়নের যুগ'-এরও প্রাণপাখি এই **বরাহ** বা 'সার্ভিস প্রভাইডার', **চাকর**।

বরাহগিরি : ৫. এককালে **বরাহ** শব্দটি কত সম্মাননীয় ও গৌরবজনক ছিল, এই শব্দ তার একটি প্রমাণ। লোকে সেকারণেই নিজের ছেলের নাম রাখত **বরাহগিরি**। ভারতের এক পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ছিলেন V. V. Giri অর্থাৎ **বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি**।

বরাহনগর (বরানগর) : ৫. এটি পশ্চিমবাংলার একটি শহরের নাম। সেকালে সরকারের উচ্চশ্রেণীর আমলারা এখানে থাকতেন বলে এই নগরের নাম হয়ে যায় **বরাহনগর**। পরে **বরাহ** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক মানে ভুলে গিয়ে লোকে এটিকে ঠাট্টার বিষয় করে নেয়। অনেকে **বরাহনগর** না লিখে **বরানগর** লেখা বেশি পছন্দ করতে থাকেন। ইতিহাস তা সত্ত্বেও এখনও তাঁদের গায়ে লেগে রয়েছে। দ্র. **বানর** ('বানরীপাড়া'), **ইন্দ্রপ্রস্থ** (হস্তিনাপুর)।

বরাহাবতার : ১. **বরাহ** + **অবতার**। ২. *যিনি বরাহ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।* **৩.** বরাহাবতার বিষ্ণু। (ব.শ.)। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। ইঁহার ঔরসে ধরণীর গর্ভে নরক অসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল; হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ইঁহা দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। (ছা.অ.)। বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবী জলমগ্না হলে স্বয়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট অবস্থানের স্থান প্রার্থনা করেন। ... ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হতে ... অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটি বরাহ নির্গত হয়। ক্ষণমধ্যে এই বরাহ ব্রহ্মার সম্মুখেই আকাশস্থ হয়ে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে। ... সত্যলোক, জনলোক, ও তপোলোকবাসী মুনিরা বেদমন্ত্র দ্বারা এই বরাহকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে স্তুতি করতে থাকেন। এই বরাহ জলমধ্যে প্রবেশ করেন এবং সে স্থলে দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করে দন্তাগ্রভাগের সাহায্যে পৃথিবীকে ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত হন। ... (পৌ.অ.)। বরাহাবতারকে কোলদেবও বলা হয়। ৪. অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অবতার, আগ্নীধ্র, কির, কোল, বরাহ**। সমাজেতিহাসের যে বর্ণনা পাশ্চাত্যের অবদান রূপে স্বীকৃত, তাতে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ নাই। মানুষের সমাজ কেমন করে 'ব্যক্তিমালিকানার বোধ'-এর আদি অধ্যায় (= **মৎস্যাবতার**-এর যুগ) পেরিয়ে 'সামাজিক শ্রম-বিভাজন'-এর যুগ (= **কূর্ম্মাবতার**-এর যুগ) পেরোল এবং তার পরেই 'নিয়োগ-বিনিয়োগ'-এর (= **বরাহাবতার**-এর যুগে) প্রবেশ করল, সেসব বিষয়ে পাশ্চাত্য বলতে গেলে কিছুই জানে না। আমাদের দেশের জ্ঞানী পূর্বসূরিগণ কিন্তু এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলাপ আলোচনা করে গেছেন, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে গেছেন। সেই সব তথ্যই রয়েছে **বরাহাবতার**-এর কাহিনীতে, **বরাহপুরাণে**, অবশ্যই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। ... **৬.** ইংরেজি boar।

বরুণ (বরুণা, বরুণালয়) : ১. ✓বৃ + উন (উনন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বরুণ*** = ***বর*** *উন (নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন) থাকে যাহাতে; যিনি* ***বর*** *দেন কিন্তু ঘোষণা করেন না।* ***বরুণা*** = ***বরুণ****-এর আধার যে। /.* **বরুণ** = যাঁহার কাছে দেবতারা বর প্রার্থনা করেন। (ব.শ.)। **৩. বরুণ** = সমুদ্র, জল, সূর্য্য, বৃক্ষবিশেষ, দেবতাবিশেষ, প্রচেতাঃ, পাশী। [ইনি প্রাচীন বৈদিক দেবতা এবং 'মিত্র' দেবতার সহিত ইঁহার উল্লেখ দেখা যায় — 'মিত্রাবরুণ'। ইঁহার শক্তি 'মায়া' ও অস্ত্র 'পাশ'। ইনি 'সিন্ধুপতি' (নদীগণের পালয়িতা) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহা হইতে পুরাণে ইনি জলাধিপতি। ইনি পশ্চিমদিকের দিক্‌পাল এবং দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ভাগবতে বাল্মীকি ইঁহার পত্নী চর্ষণীর গর্ভজাত।] (ব.শ.)

ঋষিদের ইনি একজন প্রধান দেবতা। ইনি দশ দিকপালের অন্যতম এবং একজন লোকপাল এবং জলের দেবতা নামে প্রখ্যাত। সূর্য তার নেত্র, সুবর্ণময় তাঁর রথ ও প্রাসাদ। এঁর বহু অনুচর ছিল। ইনি বারুণী নামে সুরা পান করতেন। এই সুরা সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত হয়। বেদে বরুণ সহস্রলোচন বলে কথিত আছেন। বেদে বহু স্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজিত হন। মিত্র ছিলেন আলোকের দেবতা। বরুণ অর্থাৎ আবরণ বা আবৃত করা। ... বরুণ সূর্যের গমনের পথ বিস্তার করে থাকেন। এঁর শত-সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ ইনি যমের ন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। ইনি

ধনাধিকারী, জলবিন্দুর মতো শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের মতো বলবান। ইনি বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেছেন। ...

মহাভারতে কথিত আছে — ইনি কর্দম ঋষির পুত্র ও পুষ্করের পিতা। প্রায় একই সময়ে উর্বশীর কামনায় মিত্রাবরুণের এক কুম্ভমধ্যে শুক্রপাত হয়। ... এর থেকে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়। ... খাণ্ডবদাহনের সময় অগ্নিকে সাহায্য করার জন্য বরুণ অর্জুনকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাণ্ডীব ধনু, দুইটি অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামে গদা প্রদান করেন। ... বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও উতথ্যের স্ত্রী ভদ্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যান। ... মহর্ষি উতথ্য জলরাশি পান করে ফেলায় ... বরুণ ভীত হয়ে ভদ্রাকে প্রত্যর্পণ করেন। (পৌ.অ.)। **বরুণা** = কাশীস্থ নদীভেদ। **বরুণালয় (বরুণাবাস)** = বরুণের গৃহ, সমুদ্র। (ব.শ.)। **৪.** অর্থহীন নামরূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অগ্নি, অরুণ, চঞ্চল, মিত্র**। যদিও **বরুণ** নামটি এখন 'সেকেলে' হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও আজও এই নামের বহু মানুষকেই ভারতীয় উপমহাদেশে অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু নামটির মানে জানতে চান, কোনো উত্তর পাবেন না। আমাদের আধুনিকতাবাদীরা তাঁদের অতিচালাকী প্রকাশ করেন, 'নামের কোনো মানে হয় না' বলে। অধিকাংশ শব্দের মানেই তাঁরা জানেন না, এই কথাটা স্বীকার করে নিতে তাঁদের লজ্জা করে। এমনকি তাঁরা জানেনই না যে, সভ্যতার আদিকাল থেকেই অর্থপূর্ণ নামের প্রচলন ছিল, দুনিয়ার সব দেশে, সব ভাষায়। আবার, আমাদের বেচারা সেকেলেপন্থীরা বলেন, 'এ তো দেবতার নাম। সেই নামেই নাম রাখা হয়েছে।' যেন, দেবতার নামের কোনো মানে হয় না। ...

কিন্তু তাতে কী! বাংলাভাষীর মনের গভীরে এসব শব্দের অর্থ তো আজও কমবেশি সক্রিয় রয়েছে! সেকারণেই তো তাঁরা আজও সন্তানের নাম রাখেন **অরুণ**, **বরুণ** এবং তাঁদের শিশুসাহিত্যিকরা বইয়ের নাম রাখেন **'অরুণ বরুণ কিরণমালা'** ... ইত্যাদি।

অরুণ শব্দের অর্থ আমরা আগেই (১ম খণ্ডে) জানিয়েছি, যার কিরণরেখাগুলি খুব বেশি দূর এগোতে পারে না, যেকারণে তাকে 'প্রভাতসূর্য্য' বা 'বালসূর্য্য' বলা হয়। অর্থাৎ **অরুণ** 'তেজবান' হলেও তার তেজ মিষ্ট, অন্যকে কষ্ট দেয় না। **বরুণ**ও প্রায় তাই। যে সত্তার ভিতরে তেজ থাকে, কিন্তু তিনি তা জাহির করেন না, ব্যাপ্ত হতে দেন না, তাকেই **বরুণ** বলে। একে আপনি 'প্রৌঢ়সূর্য্য' বলতে পারেন। আর **কিরণমালী** তো পূর্ণ সূর্যই। তেজবানদের এই তিন রূপ। দ্র. **অরুণ, চঞ্চল, অংরূপিণী**।

অবশ্যই **বরুণ**-এর একটি সামাজিক ঐতিহাসিক রূপ রয়েছে। ঋগ্বেদে ও পুরাণাদি গ্রন্থে সেই সামাজিক **বরুণ**-এর কথা নানাভাবে লেখা রয়েছে। প্রাচীন যৌথসমাজের যে জ্ঞানীগুণী মানুষেরা জনসাধারণের মাঝে বা জনসমুদ্রে থাকতেন, তাঁদের একটি অংশকে বলা হত **বরুণ**। এঁদের তেজ থাকা সত্ত্বেও তা জাহির করতে চাইতেন না তাঁরা। কাউকে কিছু দান করলে, সে বিষয়ে নীরব থাকা পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, হজরত মহম্মদের একটি বাণী রয়েছে — কাউকে ডান হাতে দান করলে সেকথা যেন বাঁহাত জানতে না পারে। এই সামাজিক **বরুণ** ভারতসমাজের ইতিহাসে যখন যে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেগুলিই উপরোক্ত কাহিনীতে বিস্তারিতভাবে বলা আছে এবং বলা আছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। শব্দ ধরে ধরে সেই কাহিনীর অর্থ উদ্ধার করে নিতে পারলে, সে বিষয়েও বিস্তারিত জানা যাবে। ... **৬.** আমরা যেখান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে **বরুণ**কে পেয়েছি, পাশ্চাত্য সেখান থেকেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে পেয়েছে Uranus-কে। তথ্যানুসারে, গ্রীক পুরাণের আদিতম দেবতা Ouranos। (এই নামটির ল্যাটিনায়িত রূপ Uranus, যে বানানটি ইংরেজি ভাষায় স্থান পেয়েছে। Uranus-কে মনে করা হত আকাশের দেবতা।

বরেন্দ্র (বরেন্দ্রভূমি, বরেন্দ্রী) : **২.** ***বরেন্দ্র*** *= যে* ***ইন্দ্রকে*** *(জাতীয়তাবোধকে) বরণ করা হয়, কিংবা করা হইয়াছে, অথবা বরণ করা উচিত।* ***বরেন্দ্রভূমি*** *=* ***বরেন্দ্র****-র দেশ বা ভূমি।* ***বরেন্দ্রী*** *=* ***বরেন্দ্র****-এর সক্রিয় বা গতিশীল আধার যে।* **৩. বরেন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি** = বঙ্গের প্রদেশবিশেষ (পদ্মার নিকটবর্ত্তী দেশ), বর্ত্তমান রাজশাহী। **বরেন্দ্রী** = গৌড়দেশ, (মতান্তরে) গৌড়রাজধানী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আমাদের এই বঙ্গদেশের উত্তর অংশকে এই নামে ডাকা হত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী গৌড়বঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গ অঞ্চলে বেদসম্মত আচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ব্রাহ্মণশ্রেণী সব থেকে পরে বাংলাভূমিতে আসেন তাঁরা হলেন 'বৈদিক ব্রাহ্মণ'। নানা তথ্য ও শব্দের ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশ থেকে আর্যাবর্তের বৈদিক আচারের (গোবলয়ের শাসনের) বিরোধিতা করেছিলেন। অন্তত তাঁদের শ্রেণীগত নাম তো সে সাক্ষ্য দেয়ই। সংগ্রাম (= রঢ়) হয়েছিল তাঁদের নেতৃত্বে, এই হিসেবে 'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ', 'রাঢ়বঙ্গ', 'রাঢ়ভূমি' ... এসব তো আমরা পাচ্ছিই; আবার যাঁরা **জনমেজয়ের** কালে বঙ্গ সমাজের **বরণীয়** ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা বাস করতেন উত্তরবঙ্গের **বরণা**য় উচ্চভূমি বা **বরেন্দ্রভূমি**তে, **জনমেজয়ে**র পরাজয়ের পর যাঁদের ব্রাহ্মণত্ব **বারণ** বা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তাঁদেরই আমরা এখনও উত্তরবঙ্গের **বরেন্দ্রভূমি**র বাসিন্দা **বারেন্দ্র** ব্রাহ্মণ রূপে দেখতে পাই।

বর্ণ (বর্ণক, বর্ণচোরা, বর্ণন, বর্ণপরিচয়, বর্ণসঙ্কর, বর্ণাশ্রম) : **১. বর্ণ** = ✓বর্ণ্ + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বর্ণ*** *= (ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত) বরেণ্য যে।* ***বর্ণন*** *=* ***বর্ণ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বর্ণক*** *=* ***বর্ণন*** *করে যে। /* **বর্ণ** = যাহার দ্বারা রঞ্জন সাধিত হয়। **বর্ণচোরা** = যে ফল পাকিলে, বাহিরে বর্ণ প্রকাশ পায় না। (ব.শ.)। **৩. বর্ণ** = রঞ্জকদ্রব্য, কান্তি, ব্রাহ্মণাদি, (জ্যোতিষে) বিপ্রাদি (বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ, শূদ্রবর্ণ), (সঙ্গীতে) ষড়জাদির সংক্ষেপাক্ষর (সা রে গা মা পা ধা নি সা), গীতক্রম, তালভেদ, যশঃ, গুণ, স্তুতি, ব্রত, অঙ্গরাগ, (বীজগণিতে) অজ্ঞাতরাশি, ধর্ম্ম, সুবর্ণ, স্বর্ণ, চিত্র, হস্তীর চিত্রকম্বল, অক্ষর, শব্দাংশ (syllable), রূপ, বিলেপন, ভেদ, প্রকার; বর্ণনা করা, বিবৃত করা, সবিস্তর বলা বা লেখা, রূপগুণ ব্যাখ্যা করা। (ব.শ.)। মনুস্থাপিত চতুর্বর্ণ অর্থাৎ চারি জাতি। যথা — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। (পৌ.অ.)। **বর্ণক** = বর্ণয়িতা, রঞ্জক, চারণ, অভিনেতার পরিচ্ছদ, ছদ্মবেশ, বর্ণ, রাগ,

বিলেপন, চন্দনাদি, হরিতাল, গ্রহভেদ। **বর্ণচোরা** = পাকে অস্ফুটবর্ণ ফল, কপট, বিবর্ণ, মলিন। **বর্ণন** = সবিস্তর কথন, প্রশংসন, লেখন, শুক্লাদিবর্ণক্রিয়া, রঞ্জন, রঙান। **বর্ণপরিচয়** = ষড়জ ঋষভ ইত্যাদি স্বরের পরিচয়, রাগাভ্যাস, স্বরব্যঞ্জনের পরিচয়, বর্ণজ্ঞান, বিষয়-বিশেষের সূত্রপাত। **বর্ণসঙ্কর** = মিশ্রণ, বর্ণসঙ্ঘাত, অক্ষরমিশ্রণ, বর্ণের স্খলিত-উচ্চারণ, বর্ণে সঙ্কীর্ণ, বিপ্রাদি বর্ণের ব্যভিচারাদি হেতু মিশ্রণজাত জাতি ...। **বর্ণাশ্রম** = ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম। (ব.শ.)। ৪. **বর্ণ** শব্দটি colour ও letter (of the alphabet) অর্থে সাধারণভাবে এবং caste অর্থে বিশেষভাবে প্রচলিত। **বর্ণক** ও **বর্ণসঙ্কর** অপ্রচলিত। **বর্ণন (বর্ণনা)** describe অর্থে প্রচলিত। **বর্ণচোরা** 'কপট' অর্থে এবং **বর্ণাশ্রম** 'সেকেলে জাতিভেদ-ব্যবস্থা' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **বানপ্রস্থ, বনাশ্রম, আশ্রম**। **বর্ণ** শব্দটি অতি উচ্চ মানের শব্দ এবং এর ধারণক্ষমতা বিশাল। শব্দটিকে বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তাই ধাপে ধাপে এগোব। এটি **বর্** + ন + অ, এভাবে তৈরি; কিন্তু ণত্ববিধান অনুসারে **বর্ন** না লিখে **বর্ণ** লেখা হয়। **বর্ণ** শব্দের প্রকৃত অর্থ — '(ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত) বরেণ্য যে'। এই অর্থ কেমন করে ৩.-এ প্রদত্ত উপরোক্ত সমস্ত সত্তাগুলিকে বোঝায়, আমরা ধাপে ধাপে তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

'বরেণ্য যে', সেই হল **বর্ণ**। তার মানে কি যাকেই বরণ করা হয়, বা বরণ করতে হয়, তারা সবাই **বর্ণ**? না; কীসের জন্য বরেণ্য, সেটা জানতে হয়। তা জানতে গেলে জানা যায় — 'ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য'। বেশ। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন শিক্ষককে গলায় উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নিয়ে এলেন। তাঁকে **বর্ণ** বলা যাবে কি? না। 'ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য যে', কেবলমাত্র তাকেই **বর্ণ** বলা হয়। তার মানে, শুধু বরেণ্য হলে হবে না, ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য হতে হবে, এবং তাও হতে হবে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে, অর্থাৎ ন্যাচারালি। সে কেমন ব্যাপার?

আপনাদের পাড়ায় মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে একদল মাস্তান এসে ধমক-ধামক দিয়ে লুঠপাট করে নিয়ে যায়। পাড়ার সবাই এই অত্যাচারে জেরবার। এর মধ্যে একদিন হল কী, সেই মাস্তানেরা এসেছে, লুঠপাট করছে, এবং তা দেখে পাড়ার কয়েকজন সাহসী বলবান মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, পাড়ার সমস্ত মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন ঐ বলবান-মানুষগুলির পিছনে। ফলে, মাস্তান পালাল। এভাবে পাড়ার মাস্তান তাড়ানোর কাজটি (ক্রিয়াটি) স্বভাবত ঐ বলবান-মানুষ কয়টিকে বরণ করে নিল। আপনারা কয়েকজন সাহসী বলবান মানুষকে পেয়ে গেলেন পাড়া-রক্ষার কাজে। তার মানে, দৈহিক শক্তির জোরে সমাজকে রক্ষা করার কাজে এই সাহসী-বলবান মানুষগুলি স্বভাবতই বরেণ্য হয়ে গেলেন; কেউ তাদের নির্বাচন করে 'বরেণ্য' বলে ঘোষণা করেনি। শব্দসৃজনের নিয়মে এই সাহসী-বলবান বরেণ্য মানুষদেরই বলা হবে বাহুবলী-**বর্ণ**। কেননা, 'সমাজের দৈহিক শক্তির সমস্যা সমাধানের বা সমাজের শারীরিক আত্মরক্ষণ-ক্রিয়ার আধার রূপে এঁরা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে বরেণ্য হয়েছেন'; তাই এঁরা বাহুবলী-**বর্ণ**। একইভাবে সমাজের মানসিক শক্তির সমস্যা সমাধানের বা সমাজের মানসিক আত্মরক্ষণ-ক্রিয়ার আধার রূপে যাঁরা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ভাবে বরেণ্য হয়ে ওঠেন, সেইসকল জ্ঞানীগুণী মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষদের বলতে হয় মনোবলী-**বর্ণ**; যাঁরা সমাজের আর্থিক সুরক্ষণ ক্রিয়ার আধার রূপে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে বরেণ্য হয়ে ওঠেন, সেইসব অর্থসম্পদবান মানুষদের বলতে হয় অর্থবলী-**বর্ণ**; আর, যাঁরা সমাজের অপরাপর সহায়ক ক্রিয়াসমূহের আধার রূপে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে বরেণ্য হয়ে যান, তাঁদের বলতে হয় সর্ব্ববলী-**বর্ণ**। (এই **সর্ব্ব** 'অষ্টমূর্ত্তি শিবের একতম মূর্ত্তি।' ব.শ.)।

লক্ষ করে দেখবেন, আপনি নিজেও জ্ঞানবুদ্ধির সমস্যায় পড়লে মনোবলী-**বর্ণে**র মানুষকেই গিয়ে ধরেন; চোর-ডাকাত-গুণ্ডার সমস্যায় পড়লে গিয়ে ধরেন বাহুবলী-**বর্ণে**র মানুষকে; আর্থিক সমস্যায় পড়লে অর্থবলী-**বর্ণে**র মানুষকে গিয়ে ধরেন; এবং এছাড়া আর যে যে সমস্যায় পড়েন, তার জন্য গিয়ে ধরেন সর্ব্ববলী-**বর্ণে**র মানুষকে। আর, এটা যে আপনি একাই করেন তাও নয়; দুনিয়ার সব মানুষই তাই করে থাকেন। অর্থাৎ কিনা, আপনার পাড়াটুকু মাত্র নয়, বিশ্বের সকল সমাজের সমস্ত মানুষই এই চার রকম ক্রিয়ার আধার রূপে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (নেচারাল) ভাবেই বরেণ্য হয়ে চার রকম **বর্ণে** বিভাজিত হয়ে রয়েছেন; কেউ সেটা ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা ক'রে করেনি, সুনির্দিষ্ট ভাবেও করেনি। চীন জাপান আরব গ্রীস রোম ব্রিটেন ফ্রান্স ... যে দেশেই যান, আপনি প্রতিটি অঞ্চলেই কিছু জ্ঞানী মানুষকে পাবেন, কিছু ক্ষমতাবান কর্মবীর মানুষকে পাবেন, কিছু বিত্তবান মানুষকে পাবেন, এবং পাবেন এঁদের অনুসরণকারী বাকি সমস্ত মানুষকে; আর এরকম চলমান **বর্ণ**-বিভাজন বিশ্বের সব দেশেই হয়ে থাকে, সকলের অগোচরে অথচ সকলের চোখের সামনেই। কিন্তু সেটা হয়ে থাকে একপ্রকার শিথিল বিন্যাসে, অনায়াস স্বাভাবিকতায়; কোনো কঠিন কঠোর আইনের ধারা মেনে সুনির্দিষ্ট-ভাবে নয়। মোটকথা প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠীর ভিতরে চলা এটি একটি চলমান **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়া; জীবজগতের নিয়মে মানুষ 'ঝাঁক-প্রাণী' রূপে জন্মেছে বলেই, তার ঝাঁকের (সমাজের) চলার প্রয়োজনে নিজের ভেতরে এই প্রক্রিয়া সদা সর্বদা নিজে থেকেই চলতে থাকে। বিশ্বের সকল জাতিরই এই উত্তরাধিকার কমবেশি রয়েছে। তবে, এ বিষয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্জনের গৌরব **গৌরীশঙ্করে**র চেয়েও উঁচু, এবং কলঙ্ক অতলান্তিক মহাসাগরের চেয়েও নীচু, গভীর!

ভারতবর্ষের গৌরব এই যে, সে অতি প্রাচীনকালেই সমাজের এই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চলমান **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়াকে দেখতে পেয়ে চিনতে পেরেছিল এবং সেগুলিকে (আমরা উপরে বাহুবলী-**বর্ণ** ... ইত্যাদি যেরকম নামকরণ করলাম, তার তুলনায় অনেক ভাল ও) যথাযথভাবে **ব্রহ্মবর্ণ, ক্ষত্রবর্ণ, বৈশ্যবর্ণ**, ও **শূদ্রবর্ণ** (অর্থাৎ যথাক্রমে মনোবলী-**বর্ণ**, বাহুবলী-**বর্ণ**, অর্থবলী-**বর্ণ**, এবং সর্ব্ববলী-**বর্ণ**) নামে চিহ্নিত করেছিল। আর, ভারতবর্ষের কলঙ্ক এই যে, পরবর্তীকালে সেই যথার্থক চার **বর্ণ**কেই 'পুরুষানুক্রমিক' ঘোষণা করে দিয়ে সে ভারতসমাজের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চলমান **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছিল, আজও যা কমবেশি বলবৎ রয়েছে। কেবল তাই নয়, এই **বর্ণ**-বিভাজনের

সঙ্গে **আশ্রম**কে যুক্ত করে দিয়ে প্রাচীন ভারত মানুষের জীবনযাত্রার ও তার সমাজের অগ্রগতির সর্বোত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে মানবজীবনে ও সমাজজীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আবার, সেই **বর্ণাশ্রম**কে বংশানুক্রমিক ক'রে দিয়ে সে ভারতের মানুষকে 'অচল, জড়, উদ্ভিদসুলভ জীবনে' অধঃপতিত করে ভারতসমাজের অগ্রগতিকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

আমরা ভারতের গৌরবের উচ্চ উত্তরাধিকারগুলিকে অর্জন করে পুনর্নবীকরণ করে নিতে চাই, এবং ভারতের কলঙ্কসমূহের ভয়াবহ নীচতাগুলি থেকে মুক্ত হতে চাই। 'থ্রো দ্য বেবি উইথ দ্য বাথওয়াটার'-এর নীতি আমরা মানি না; রোগের সঙ্গে রোগীকে বিসর্জন দেওয়ার নীতি আমরা মানি না। দ্র. **আশ্রম**।

ভারত ভিন্ন বিশ্বের আর কোনো দেশ বা সমাজ তাদের চলমান **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করেনি, তাদের সে প্রক্রিয়া আজও যথারীতি প্রচলিত রয়েছে; রয়েছে বলেই সেইসব দেশের সামাজিক ক্রিয়াগুলি তাদের যথাযথ আধারকে **বরণ** করে নিতে পারছে। প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীতে এই প্রক্রিয়া চলছে, চোখের সামনেই, অথচ আজকের তথাকথিত 'সমাজবিজ্ঞান' মানবসমাজের এই চলমান প্রক্রিয়াটিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে পর্যন্ত পায় না। ভারত ছাড়া বিশ্বের সব দেশে মানুষের সেবমান ধনবান বলবান বা জ্ঞানবান হওয়ার এই চলমান প্রক্রিয়াটি সগৌরবে চলছে।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে আজও মানুষের পিতৃপরিচয় তার সেবমান, ধনবান, বলবান, বা জ্ঞানবান হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে, রীতিমতো করে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই করে, একটুও পথ ছাড়ে না।

এ তো গেল সামাজিক **বর্ণে**র কথা — সামাজিক ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য যারা — সেইসব **বর্ণে**র কথা। এবার আমরা পার্থিব ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য যারা, সেইসব **বর্ণে**র কথায় যাব। সেই **বর্ণ**গুলিকে **অক্ষর**ও (letter) বলে, যা কিনা **ধ্বনি**র লিখিত রূপ। (**বর্ণ** ও **ধ্বনি**র মধ্যে কার্যত পার্থক্য নেই, কিন্তু তবু তারা পৃথক শব্দ কেন, সবশেষে সে প্রসঙ্গে যাব।) আপাতত আমরা জানতে চাইব, তাদের **বর্ণ** বলা হয় কেন? তারাও কি 'ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য'?

কোনো ক্রিয়াকেই শুদ্ধ ক্রিয়ারূপে চর্মচক্ষে দেখবার অধিকার স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি আমাদের দেননি, তাই কোনো ক্রিয়াকেই শুদ্ধ ক্রিয়ারূপে দেখতে পাই না আমরা; কিন্তু তাকে ক্রিয়াকারীর মাধ্যমে দেখবার, অনুভব করবার, বুঝবার অধিকার ও ক্ষমতা তিনি আমাদের দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে অধিষ্ঠান করে পরমাপ্রকৃতি নিজেই সেই ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীকে বিশেষ কলাকৌশলের সাহায্যে আওয়াজে (sound-এ) পরিবর্তিত করে থাকেন। আমাদের মস্তিষ্ক, গলা, জিহ্বা ... ইত্যাদি তাঁর সেই পরিবর্তন-কর্মের নিমিত্ত রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেকারণে আমরাও সেই কলাকৌশলের কিছু কিছু শিখে ফেলি, চুম্বকের সংস্পর্শে দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে লোহা যেমন খানিকটা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরকম।

'গমন' একটি ক্রিয়া। একেও দেখা যায় না। কেউ যখন 'গমন করে', তখন সেই 'গমনকারী'কে আমরা দেখতে পাই এবং তার মাধ্যমে 'গমন' ব্যাপারটিকে আমরা দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি, বুঝতে পারি। তার মানে, 'ক্রিয়াকারী'কে বাদ দিয়ে 'ক্রিয়া'র সক্রিয় হওয়ার, অস্তিত্বলাভ করার উপায় নেই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছে, তা সবই হয়েছে ক্রিয়াকারীর মাধ্যমে; এবং প্রতিটি 'ক্রিয়া' স্বয়ং আধেয় রূপে কোনো না কোনো 'ক্রিয়াকারী'কে খুঁজে নিয়ে তাকে আপন আধার রূপে বরণ করে নিয়ে তার মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছে। আর, সেই বরণ করার ব্যাপারটি কারও নির্দেশে ঘটেনি, ঘটে না; স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবেই ঘটে। (কীভাবে, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি)। আসলে লোকে খায় দায় গান গায়, কারণ, খাওয়া দাওয়া গান গাওয়া প্রভৃতি কাজ সেগুলি করার জন্য লোককে বরণ করে নেয় বলেই — এই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন বিজ্ঞানী ডেভিড বোহ্‌ম। সেই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন — মূলে এ জগৎ হল 'ক্রিয়া' (action) ও 'ক্রিয়াকারী'র (actor-এর) অতিবিশাল ক্রীড়াক্ষেত্র মাত্র।

(বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকপাঠিকাগণ এই বিষয়ে David Bohm-এর *Wholeness and the Implicate Order* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি দেখে নিলে ভাল হয়। আজকাল কুয়োর ব্যাঙের মতো কেউ কেউ বলছেন, শব্দের ক্রিয়াভিত্তিকতা এমন কি নতুন কথা। এ তো আরও বহু ভাষাতাত্ত্বিকই বলে গিয়েছেন। হ্যাঁ, আমরাও জানি, এ কোনো নতুন কথা নয়; ঠিক যেমন গাছের প্রাণ আছে, ভারতবাসীর কাছে সেটা কোনো নতুন কথা ছিল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু, গাছের প্রাণ থাকার বিজ্ঞানটি খুঁজে বের করে সেকথাটিকেই নতুন কথা বানিয়ে দিলেন। শব্দের ক্রিয়াভিত্তিকতাও কোনো নতুন কথা নয়, কিন্তু বিজ্ঞানী ডেভিড বোহ্‌ম সর্বপ্রথম সেদিকেই আঙুল দেখালেন, যেখানে শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাবের পিছনে থাকা বিজ্ঞানটি রয়েছে; বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকোষের মাধ্যমে আমরা সেই বিজ্ঞানকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে চলেছি। এই চেষ্টা সফল হলে শব্দের ক্রিয়াভিত্তিকতাও নতুন কথা হয়ে যাবে। ...)

এই পর্যন্ত বেশ ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু সেই ক্রীড়াক্ষেত্রে এনে হাজির করা হল মানুষ নামক জীবটিকে, যার ঘাড়ের উপর 'মস্তিষ্ক' নামে একটি যন্ত্র আছে। মানুষ নিজে ঝাঁক-প্রাণী। সেজন্যই ঝাঁকের অন্য সদস্যকে তার অনুভবের কথা বলার স্বাভাবিক (নেচারাল) বাধ্যবাধকতা দিয়ে তার জন্ম দেওয়া হয়েছে। বিশ্বজগতের এই 'ক্রিয়া' ও 'ক্রিয়াকারী'র ক্রীড়াক্ষেত্রের লীলাখেলা সে দুচোখ ভরে দেখতে থাকে। ক্রিয়াকারীদের দেখতে দেখতে সে ক্রিয়াকেও চিনে ফেলে, অনুভব করে ফেলে, বুঝে ফেলে। তার মস্তিষ্কের ভিতরে সমস্ত দৃষ্ট ব্যাপার-স্যাপার চলচ্চিত্রের মতো সুবিন্যস্ত হতে থাকে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, সেই অনুভবগুলি সমাজের অন্য সদস্যদের জানানোর বেলায়; অথচ ঝাঁক-প্রাণী হওয়ার কারণে অন্যকে জানাতে সে বাধ্য। আর, অন্যকে জানানোর একটি উপায় তার সামনে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং — আওয়াজের (sound-এর) ব্যবহার। ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীর ক্রীড়ার ঘটনাবলী আওয়াজের মাধ্যমে সহোদরদের জানাতে হবে; আর, সেইভাবে জানানোর কাজটির কলাকৌশল স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি

মানুষের **মস্তিষ্কে**র ভিতরে বসে মানুষের গলা, জিভ, মূর্দ্ধা, দাঁত, ঠোঁটের এবং কানের সাহায্যে করে থাকেন; মানুষ নিমিত্ত রূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেটা হয় কীভাবে?

আওয়াজের (sound-এর) বা **ধ্বনি**র মাধ্যমে বাস্তবের ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীকে প্রকাশ করতে গেলে ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারী, উভয়কে **ধ্বনি**তে বা আওয়াজে পরিবর্তিত করে নিতে হবে। একটা জলজ্যান্ত 'ক্রিয়াকারী'কে — 'করণকারী', 'খাদনকারী', 'গমনকারী' ... ইত্যাদিকে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজে পরিণত করে ফেলা অসম্ভব কাজ বলেই মনে হয়। কেউ ছু-মন্তর করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে একজন 'করণকারী' উবে গিয়ে একটা 'টুং' আওয়াজে বদলে গেল — এমন তো ভাবাই যায় না। অবশ্য আমাদের পুরাণাদিতে এবং আরব্য-উপন্যাসে মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে মানুষকে ভেড়ায় বা মাছিতে পরিণত করে ফেলার মতো গল্পগাছা আছে। এক্ষেত্রে তাও তো নয়। মাছির তো তবুও একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে, এ যে একেবারেই নগণ্য — একজন জলজ্যান্ত 'কর্মকারী'কে একটা 'টং' বা 'তং' বা ঐরকম কোনো আওয়াজ-মাত্রে পরিণত করে ফেলা! সেরকম কি কখনো হতে পারে? ...

কার্যত সেরকমই হয়; বাস্তব অনেক সময় কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়! এখন তবে সেই **কল্পনাতীত-বাস্তবের** কথাই হোক।

'ক্রিয়া-কারী' রূপে বাস্তবের যাথার্থ্য অনুভূত হয়ে যাওয়ার পর 'ক্রিয়া'গুলি দেহহীন আত্মার মতো মনের আকাশে উড়ে বেড়াতে থাকে এবং 'কারী'গুলি নানান ধরনের অর্থহীন আওয়াজের (sound-এর) এক একটা চাদরের মতো মনোলোকের সর্বত্র ঝরাপাতার মতো প্রসারিত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর দেহহীন আত্মার মতো কোনো একটি ক্রিয়া যে 'আওয়াজ-চাদর'টিকে স্বভাবত আপন শরীরের আধার (আবরণ) রূপে গ্রহণ (বরণ) করে নেয়, সেটিই হয়ে যায়, তার **বর্ণ**। যেমন দেহহীন আত্মার মতো ঘুরে বেড়ানো 'করণ' ক্রিয়াটি '**ক্**' আওয়াজটিকে চাদরের মতো আপন অঙ্গে চাপিয়ে আপনাকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ফলত, মহামায়ার (পরমাপ্রকৃতির) ভেলকির মতো বাস্তবের জলজ্যান্ত 'করণকারী' পরিবর্তিত হয়ে যায় সামান্য **ক-ধ্বনি**তে। এই 'করণকারী' অর্থধারী **ধ্বনি**টিকেই **ক-বর্ণ** বলে। এই যে **ক-বর্ণ**, এর ভিতরে অতএব 'করণকারী' অর্থটি আত্মার মতো বিরাজ করতে থাকে। সেই কারণেই, **ক-বর্ণে**র সঙ্গে 'করণকারী' অর্থের এই যে সম্বন্ধ, আমাদের পূর্বসূরি শব্দতত্ত্ববিদগণ সেই সম্বন্ধকে বলেছেন 'তাদাত্মক-সম্বন্ধ'। ... একইভাবে 'খাদনকারী' অর্থধারী **ধ্বনি**টিকে বলে **খ-বর্ণ**, 'গমনকারী' অর্থধারী **ধ্বনি**টিকে বলে **গ-বর্ণ** ... ইত্যাদি। একইভাবে গড়ে উঠেছে আমাদের সমগ্র **বর্ণমালা**। তাতে 'ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য' সত্তা হিসেবেই প্রতিটি **বর্ণে**র উদ্ভব ঘটেছে। আর, এসমস্তই ঘটেছে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে, পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছায়, মানুষের স্বরযন্ত্রগুলির মাধ্যমে, মানুষের অগোচরে। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের গৌরব এইখানে যে, তাঁরা পরমাপ্রকৃতির সঙ্গে অতি-ঘনিষ্ঠতায় থাকতেন বলেই তাঁর এই লীলাকে তাঁরা অনেকটাই অনুভব করে নিতে পেরেছিলেন এবং সেই **বর্ণমালা**কে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে রেখে যেতে পেরেছিলেন। দ্র. **বর্ণমালা**।

পাঠক বলবেন, প্রাচীন মানুষ 'ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য' **বর্ণ**টিতে পৌঁছলেন কীভাবে?

পরমাপ্রকৃতি ঝাঁক-প্রাণীদের নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়ের উপায় রূপে আওয়াজের (sound-এর) ব্যবহার করতে শেখাচ্ছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা কীট পতঙ্গ পশু পাখী পেরিয়ে একদিন আদিম মানবের কাছে পৌঁছল। মানবজাতির সেই প্রাচীনতম 'ভাষা'-ব্যবহারকারী পূর্বপুরুষদের প্রথমে তিনি শুধুমাত্র **অ ই উ** প্রভৃতি আওয়াজগুলিকে সুরে ডুবিয়ে বহুরকম ভাবে উচ্চারণ করে নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করতে শিখিয়েছিলেন, যা কিনা পশুপাখিদের রপ্ত করা 'সুরেলা ভাববিনিময়ের ভাষা'র ঠিক পরের অধ্যায়ের ভাষা। সেই ভাষা নিয়ে আদিম মানবজাতির নিশ্চয় বহুকাল কেটে গিয়ে থাকবে। কেননা, সেই ভাষার **উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ** এখনও মানবজাতির একটি অংশ আজও ধরে রেখেছেন; তার নাম 'ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত'।

ঠিক তার পরের অধ্যায়ে, মানুষ যেদিন প্রথম হাতিয়ার আবিষ্কার করে বানর থেকে মানুষে উত্তীর্ণ হওয়ার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিল, তার এতকালের 'সুরেলা ভাববিনিময়ের ভাষা' সেদিন থেকেই দ্বিতীয় স্থানে চলে গিয়ে 'কথ্য-ভাষা'র উদ্ভব হতে শুরু করল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ সেই সিঁড়ির যত ধাপ পেরিয়েছে, তার কথ্য-ভাষা ততই বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তার সেই আদি কথ্য-ভাষার শব্দগুলির উদ্ভব হল কীভাবে, কোন নিয়মে?

আমরা জেনেছি, 'ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য' **বর্ণে**র উদ্ভব দিয়ে শব্দ এবং সেই শব্দ দিয়ে কথ্যভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কীভাবে আমাদের প্রাচীন সেই পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে পরমাপ্রকৃতি সেই অসাধ্যসাধন করেছিলেন, তার কোনো প্রামাণ্য তথ্য কারও হাতে নেই; আমাদের হাতেও নেই। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধনের খবর আমরা হঠাৎই পেয়ে যাই গ্রামবাংলার তথাকথিত 'মূর্খ' কিন্তু প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের নতুন শব্দসৃষ্টির কৌশলের মধ্যে। আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন মানুষও এই নিয়মেই নতুন **বর্ণ**, নতুন **শব্দ** সৃষ্টি করেছিলেন এবং বিশ্বের যেকোনো দেশের প্রকৃতিসংলগ্ন 'মূর্খ' মানুষেরা আজও এই নিয়মেই শব্দসৃষ্টি করে থাকেন।

প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষেরা হঠাৎ কোনো নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে গেলে, কখনো-সখনো তাঁদের মুখ দিয়ে হঠাৎ নতুন শব্দ বেরিয়ে যায়। যেমন, ধরা যাক **ঝট্ (ঝটকা)**। এটি সংস্কৃত শব্দ নয়, প্রকৃতিসংলগ্ন বাংলাভাষীর মুখ থেকে উদ্ভূত শব্দ। যে ক্রিয়াটি (জননস্থিতের টঙ্কারণ) মনের ভিতরে দেহহীন আত্মার মতো বাংলাভাষীর মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেটি নানা আওয়াজকে (কট, খট, ছট, পট, জট, ঝট ... ইত্যাদিকে) বরণ করার চেষ্টা করে অবশেষে **ঝ** ও **ট** বর্ণদুটিকে শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। (দ্র. **ঝট**)। শব্দসৃষ্টির সেই ব্যাপারটিকে একটু আগে আমরা **কল্পনাতীত-বাস্তব** নাম দিয়েছি। এতে দেখা যায়, মানুষের মনের ভিতরে একটি ক্রিয়ার ধারণা দেহহীন আত্মার মতো ঘুরতে থাকে, এবং একসময় তার উপযুক্ত 'আওয়াজ-চাদর' নির্বাচন করে নিয়ে তাকে আবরণ রূপে নিজের গায়ে চাপিয়ে নিজেকে ঢেকে নেয় বা **বর্ণবাস** গ্রহণ করে। তখনই তাকে **বর্ণ** বলে।

যাই হোক, আমরা দেখছি, মানুষের মুখে যত অর্থপূর্ণ আওয়াজ বা **ধ্বনি**র প্রকাশ ঘটে, সেগুলিকে আমাদের শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা **স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ** এই দুটি ভাগে ভাগ করে রেখে গেছেন। **ব্যঞ্জনবর্ণ**গুলিকে আমাদের সেই **পদ-অর্থ-জ্ঞানীরা** এমনভাবে 'পঞ্চবর্গে' সাজিয়ে দিয়ে গেছেন যে, তার সঙ্গে কেবলমাত্র একালের পদার্থবিজ্ঞানীদের Periodic Table-এর তুলনা চলে। প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে মূল করণগুলিকে সাজিয়েছিলেন তাঁরা। **ক গ চ জ ট ড ত দ প ব** এই বর্ণগুলিতে তাঁরা যথাক্রমে **করণ, গমন, চয়ন, জনন, টঙ্কারণ, ডয়ন, তরণ, দান, পালন, বর্দ্ধন,** এই দশটি মূল ক্রিয়ার ধারক রূপে চিহ্নিত করেছেন। এর পর সহযোগী অপর **বর্ণ**গুলিকে তাঁরা মাঝের ফাঁকগুলিতে বসিয়ে দেন। ...

কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার হল, আমাদের প্রাচীন পুরুষগণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের ইত্যাকার বিন্যাস করছেন, তখনও কিছু কিছু বর্ণের ব্যবহার জনসমাজে প্রচলিতই হয়নি। তন্মধ্যে 'অব্যবহার্য্য থেকে শুরু করে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার্য্য' পর্যন্ত সকল বর্ণের ক্রমানুসার তালিকা করলে দেখা যায়, এই **বর্ণ**গুলি হল **থ, ঠ, ঢ, ট, ড, ঝ** ইত্যাদি। সংস্কৃতে **থ-বর্ণ** দিয়ে শুরু হয়েছে এমন একটিও শব্দ পাওয়া যায় না; **ঠ** দিয়ে পাওয়া যায় কেবল ঠক্কুর এবং তাও অর্বাচীন সংস্কৃতে। কিন্তু উপরোক্ত Periodic Table-এর নিয়মে **জ**-এর পরে **হ্** যোগে **ঝ** বর্ণ, **ট**-এর পরে **হ্** যোগে **ঠ** বর্ণ ইত্যাদি হওয়ার কথা। আজ হয়নি, কাল হবে; এই বিশ্বাসে আমাদের প্রাচীন **বর্ণ**বিন্যাসকারী ভাষাজ্ঞানীরা ঐ **বর্ণ**গুলির সৃজন বিন্যস্ত করে রেখে চলে যান। সত্য সত্যই সেই বর্ণগুলির বিকাশ ঘটেছে পরবর্তী কালে। মধ্যযুগে বা বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে **ট, ঠ, ড, ঢ, ঝ, থ** ইত্যাদি বর্ণে বিপুল শব্দসম্ভারের জন্ম দিয়েছেন বাংলাভাষী মানুষ ও তাঁদের কবি-লেখকগণ। এবং এখনও এই **বর্ণ**গুলিতে নতুন নতুন শব্দসৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে আজকের গ্রামবাংলায় — আজও। তার কয়েকটি উদাহরণ এই শব্দার্থকোষে দেওয়াও হয়েছে। ...

তবে বাংলাভাষার এই বিকাশ যে সহজ সরলভাবে হয়নি, অনেক **বন্ধুর** পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের জানাচ্ছেন — 'শুনা যায়, মগধ দেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপনার অন্তঃপুরে (court) নিয়ম প্রবর্তিত করিয়া-ছিলেন যে, যে আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণমালা হইতে তফাত করিয়া দিতে হইবে। যথা — ট, ঠ, ঢ, ণ, শ, ষ, হ আর ক্ষ। ... মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে-সকল সংযুক্ত অক্ষর বর্ণকঠোর হয়, তাহাদের ব্যবহার চলিবে না।' (পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত প্রবন্ধ — *বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?* / গ্রন্থের নাম — *Buddha and Buddhism* / The Asiatic Society, March 2005)

আমাদের **তান্ত্রিক** পূর্বপুরুষেরা **শব্দব্রহ্ম** থেকে স্বতোৎসারিত সেই **বর্ণোৎপত্তি**কে সমাজদেহ ও মানবদেহের সঙ্গে মিলিয়ে আরও সুবিন্যস্ত করে রেখে গেছেন। বাংলাভাষার স্বর্ণযুগের শেষে গায়ক রামপ্রসাদ আমাদের সেই উত্তরাধিকারকে আরও গুছিয়ে আমাদের জন্য রেখে গেছেন এই ভাবে —

'বর্ণরূপা তুমি বট /
ব শ ষ স /
ব ভ ম য র ল /
ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ /
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ /
ষোল স্বর কণ্ঠেতে বিহরে। /
হ ক্ষ আশ্রয় ভুরু /
নিতান্ত কহিলা গুরু /
এই ধ্যান করি ধন্য নরে।'

এ তো গেল সামাজিক ক্রিয়া ও পার্থিব ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে **বর্ণ**সমূহ, তাদের কথা। এবার আসা যাক সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে **বর্ণ** (colour) তার কথায়। এর স্বরূপকে আমরা খানিকটা চিনতে পারি **রঙ্গ** ও **রাগ** শব্দে। কার্যত 'সর্বপ্রকার ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে' অর্থাৎ, যে সত্তায় সর্বপ্রকার ক্রিয়া গিয়ে ঢুকে পড়ে, তাকে **কৃষ্ণ-বর্ণ** বলে। এবং তা দেখতেও **কৃষ্ণবর্ণ** হয়। তার বিপরীতে, যে আধারে কোনো ক্রিয়াই আধেয় রূপে বরেণ্য হয় না, তাকে **শ্বেত-বর্ণ** বলে; এবং তা দেখতেও **শ্বেতবর্ণ** হয়। অত্যন্ত রেগে গেলে আমাদের মুখচোখ লাল হয়ে যায়। তার মানে, বিশেষ ধরনের অভিভবেচ্ছা — তা সে রাগ, অনুরাগ, বিরাগ যাই হোক না কেন, তা আমাদের বহিরাবরণ-রূপী ত্বককে **রক্ত-বর্ণ** করে দেয়। অর্থাৎ কিনা, এক্ষেত্রে আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য হয় যে, সে হল **রক্ত-বর্ণ**; এবং সে দেখতেও **রক্তবর্ণ** হয়। ... অর্থাৎ, সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে, সেও **বর্ণ**ই বটে। এইভাবে এক এক করে পীত, নীল, কমলা, সবুজ ... ইত্যাদি নানা **বর্ণে**র ধারণার জন্ম হতে থাকে। এককালে **ব্রাহ্মণ** সবকিছু ত্যাগ করতেন বলে তাঁদের **শ্বেতবর্ণ**, **শূদ্র** সবকিছু গ্রহণ করতেন বলে তাঁদের **কৃষ্ণবর্ণ**, **ক্ষত্রিয়** শক্তির প্রকাশ ঘটাতেন বলে **অগ্নিবর্ণ** বা **রক্তবর্ণ**, এবং **বৈশ্য** পান করে নিতেন বলে তাঁদের **পীতবর্ণ** বলা হত।

কিন্তু এই **বর্ণ**জ্ঞান এখানেই থেমে থাকে না। যেহেতু সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার আধার রূপে বরণকৃত এই **বর্ণ** ক্রিয়ার বিকৃত প্রকাশ ঘটায়, তাই একে '**রঙ্গ**'ও বলে। রঙ্গে স্বভাবতই সত্যের অপলাপ থাকে। সেই অপলাপ গিয়ে পৌঁছে যায় **বর্ণা**র্থের বিপরীত বিন্দুতে এবং ক্রমে স্থির প্রতীকী অর্থে পর্যবসিত হয়। 'ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে' (= **বর্ণ**) হয়ে যায় 'অন্যকে বরণ করে যে' (= **বর্ণ**)। এতকাল কোনো না কোনো ক্রিয়া **বর্ণ**কে বরণ করে নিত, এখন যে কোনো বাস্তব সত্তার গায়ে আবরণ রূপে তার স্বরূপকে ঢেকে দিতে লাগল **বর্ণ**। ফলে **বর্ণ** পরিণত হয়ে গেল **রঙ্গ**-তে বা **রং**-এ। বলে রাখা যেতে পারে, ইংরেজি wrong শব্দের উত্তরাধিকার এখান থেকেই।

স্বভাববশত **বর্ণ** মাত্রেই **অংরূপিণী**। তাই তাকে আমাদের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, এই পাঁচ জগতে পাওয়ার কথা। মানুষ কিন্তু একে চিনতে পেরেছে মাত্র দুটি জগতে — শব্দজগতে ও রূপজগতে। বস্তুজগতের সব বস্তুই কোনো না কোনো রঙে রাঙানো। **বর্ণ** শব্দের

অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারছি, প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব **বর্ণ** তার আভ্যন্তরীণ স্বভাবের ভিতরেই রয়েছে। সেই জাগতিক **বর্ণ**কে মানুষ আয়ত্ব করে বুঝে নিয়ে দেখেছে, যে, সেই **বর্ণ**গুলি আসলে এক, কিন্তু তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে সাত রঙে। তাদের সে 'বেনীআসহকলা' বা vibgyor নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছে। এদের **সন্ধ্যাংশ**ও রয়েছে। একালে সেই সব রংগুলি মিলিয়ে-মিশিয়ে লক্ষ লক্ষ রকমের **বর্ণ** সৃষ্টি করা যায়। একালের রং-কোম্পানি প্রতিটি মানুষের চাহিদা মতো পৃথক পৃথক **বর্ণ** বানানোর যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। যে কোনো রঙের প্রতিটি অণু আসলে সেইরকম **বর্ণ**, যা কোনো বস্তুর গায়ে লেগে গেলে সেই বস্তু তাকে বরণ করে নিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে, কিংবা বস্তুটি সেই বর্ণের গায়ে লেগে গেলে **বর্ণ**টিও তাকে বরণ করে নিয়ে 'বস্তুর-রং'-এ পরিণত হয়ে গিয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই জন্যই রং-কে **বর্ণ** বলে। **বর্ণের** এ হল প্রতীকী অর্থ।

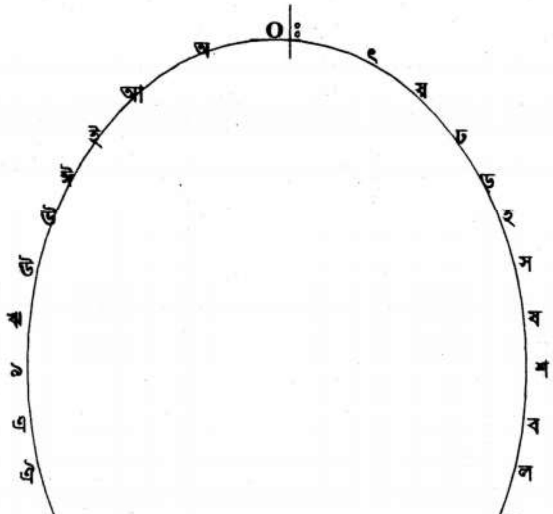
তবে, রং-এর দুনিয়া ছাড়া শব্দজগতে কিংবা মানবসমাজে **বর্ণ**কে তত স্পষ্ট রূপে চেনা কঠিন। **বর্ণচোরা** শব্দটি থেকে আমরা জানতে পারি, আপন **বর্ণ** চুরি করে যে-সত্তা, তাকে **বর্ণচোরা** বলে। গাছের ফল পেকে হলুদ হওয়ার কথা, কিন্তু সে হলুদ হল না কিন্তু পেকে গেছে — এমন ফলকে **বর্ণচোরা** বলে। মানবসমাজে কপট ব্যক্তিকে বলে **বর্ণচোরা**। কারণ, তার মনের যে স্বাভাবিক রং বা **বর্ণ**, তা সে সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক যেমন রং-ই হোক না কেন, সেই রংকে সে প্রকাশ হতে দেয় না। ফলে অন্য লোকেরা এই ব্যক্তির কাছে ঠকে যায়।

শব্দজগতে সমস্ত আওয়াজই সুরে চোবানো থাকত, যদিও জাগতিক সেই সুরগুলিকে খণ্ড-ক্ষুদ্র, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং নানা সুরের জগাখিচুড়ি মিশ্রণ বলে মনে হয়। এই অণুরূপী-সুরকে (বা **অংকপিণী** সুরকে) পৃথক করে নিয়ে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা দেখেছিলেন, তারও সাতটি **বর্ণ** হয় এবং সেগুলিকে তাঁরা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি ব'লে শনাক্ত করেন। এদের পরিচয় জানতে পারাকে তাঁরা নাম দেন **বর্ণপরিচয়**। বিদ্যাসাগর তাঁর **ধ্বনি**-বিষয়ক গ্রন্থের নাম **বর্ণপরিচয়** দিয়ে দেওয়ার পর, সুর-বিষয়ক এই **বর্ণপরিচয়** বাংলা-ভাষীর স্মৃতি থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছে। (দ্র. **বিচয়**)। আর, সুর-বিচ্ছিন্ন আওয়াজকে পৃথক করে বুঝতে গিয়ে আমাদের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীরা লক্ষ করেছিলেন যে, সেখানেও মূলে রয়েছে সাতটি **বর্ণ** — অ ক চ ট ত প ঃ। এই **বর্ণ**গুলি পঞ্চবর্গে গুণিত হয়ে ৩৫টি সাধারণ বর্ণে এবং আরও ১৫টি মিশ্রবর্ণে বিবর্তিত হয়ে মোট পঞ্চাশটি বর্ণে পরিণত হয়েছে। দুই বা ততোধিক সত্তায় কোনো টঙ্কারের কারণ ঘটলেই তা শব্দরূপে প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশ কোনো না কোনো এক বা একাধিক শব্দাণুকে বরণ করে নেয়। সেইগুলিকে সেকারণেই **বর্ণ** বলে। অতএব **বর্ণপরিচয়** বললে, তাকে জাতি, অক্ষর, রং ... সর্বরূপেই বুঝে নেওয়ার কথা বলা হয়।

সবশেষে বলি, **ধ্বনি** ও **বর্ণ** কিন্তু কার্যত একই বিষয়; তবে তাদের পার্থক্যও আছে। একটি মানুষকে ডান দিক দিয়ে দেখা ও বাঁ দিক দিয়ে দেখার মধ্যে যে পার্থক্য, এ পার্থক্য অনেকটা সেরকমই। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, **ধ্বনি** হল — ধারণাবহন গতিশীল বা সক্রিয় **যাহাতে** = (vehicle for) meaningful active sound; এবং **বর্ণ** হল — ক্রিয়ার বরেণ্য আধার যে = vehicle for (meaningful) active sound। **৬.** ইংরেজি baron, born।

বর্ণমালা : **২.** *বর্ণের মালা।* **৩.** অক্ষরশ্রেণী, বর্ণসমূহ (alphabet)। (ব.শ.)। **৪.** 'বর্ণসমূহ' বা alphabet অর্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের বর্ণসমূহকে বা অক্ষরগুলিকে একত্রে **মালা** বলা হয়। ইংরেজদের বর্ণসমূহকে যে alphabet শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাতে **মালা**র কোনো ধারণাই নেই, অথচ আমাদের আছে। কারণ, জগতের ক্রিয়াসমূহ **বর্ণবাস** গ্রহণ করার পর তাদের যে চেহারা হয়, সেটি বলয়াকার। দ্র. **মালা**।

আমাদের পূর্বসূরীগণ দেখেছিলেন, এদের সূত্রপাত হয় বিন্দু (০) দিয়ে, শেষ হয় বিসর্গে (ঃ)। দ্র. **বিন্দুবিসর্গ**। বিন্দু (০) থেকে যাত্রা শুরু করে **অ আ ই ঈ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ ক চ ট ত প য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ** পেরিয়ে শেষ হয় বিসর্গে (ঃ)। তার মাঝে পাঁচটি লতি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। **ক**-এর নীচে ঝুলছে **খ গ ঘ ঙ**; চ-এর নীচে ঝুলছে **ছ জ ঝ ঞ**; **ট**-এর নীচে ঝুলছে **ঠ ড ঢ ণ**; ত-এর নীচে ঝুলছে **থ দ ধ ন**; এবং **প**-এর নীচে ঝুলছে **ফ ব ভ ম** — এই পাঁচটি লতি।



ফলত এ যেন এক অদ্ভুত যাত্রা। নৈঃশব্দ্যের জগৎ থেকে **বিন্দু** রূপে উদ্ভূত হয়ে সে যাত্রা শুরু করে। **অ** থেকে **ঔ** পর্যন্ত তাকে দেখতে পাওয়া যায়, ডাক দিলে ফিরে আসতে পারে **অ**-তেই। তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিসর্গ (ঃ) থেকে উল্টো দিক থেকে আবার তাকে দেখতে পাওয়া যায়, সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফিরে আসছে। **ষ** থেকেই তাকে একটু একটু চিনতে পারা যায়, তারপর তার চেহারা ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে, **স হ**-তে পৌঁছলে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য **ত**-বর্গ থেকেই সে জানান দিতে থাকে — আমি আসছি! আমি আসছি! বিসর্গে (ঃ) এসে সে বিশ্লিষ্ট হয়ে পুনরায় নৈঃশব্দ্যের জগতে ঢুকে পড়ে।

শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি ও সন্ধির সময় আমরা দেখি **দুঃ-বল** হয়ে যাচ্ছে **দুর্বল**; **তপঃ-চর্য্যা** হয়ে যাচ্ছে **তপশ্চর্য্যা**; **দুঃ-কর** হয়ে যাচ্ছে **দুষ্কর**; **মনঃ-কাম** হয়ে যাচ্ছে **মনস্কাম** ... ইত্যাদি। আর, বিসর্গ (ঃ) যে নিয়মিতই **হ**-তে বদলায়, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি আমরা সেই **হ**-কে **ধ**-থেকেই **হ**-এর দিকে আসতে দেখতে পাই (যথা অবধান > অবহিত)।

মোটকথা জাগতিক অস্তিত্বসমূহ তাদের **বিদ্যমান**তা যে সকল আওয়াজের ভিতর দিয়ে জানান দিতে থাকে সেই আওয়াজগুলিই উঠে আসে **বর্ণে**। সেই অস্তিত্বগুলি বিকশিত হয়, **অ** থেকে **ঔ** পেরিয়ে শুরু হয় তাদের যৌবনকাল। **ম**-এর পর থেকে তারা তাদের স্থির রূপ গ্রহণ করতে থাকে, বিকাশ স্তব্ধ করে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে এবং একসময় বিলুপ্ত হয়। তাদের সেই স্থির রূপ গ্রহণ থেকে বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত অধ্যায়গুলি স্পষ্টভাবে ধরা দেয় **র (ল)** > **শ** > **ষ** > **স** > **হ** > **ঃ** প্রভৃতি বর্ণে। বিলুপ্তির পথে অস্তিত্বের এই গমনের সূত্রপাত অবশ্যই **অ** থেকে। জন্মের সময় থেকেই মৃত্যুর দিকে হাঁটা শুরু হয় এবং যত হাঁটতে থাকে ততই মৃত্যুর সঙ্গে দূরত্ব কমতে থাকে। সেই দূরত্ব শূন্যে পরিণত হওয়া মাত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে যায়। কোনো একটি সত্তাকে কেউ যদি **ধ**রে নেয়, এমনভাবে আধারীভূত করে নেয় যে, সেই সত্তাটি স্থির হয়ে **র**াখা হয়ে যায়; অর্থাৎ, তখন সত্তাটির আ**বর্ত্তমান**তা স্তব্ধ হয়ে শুধুমাত্র **র**ক্ষিত হয়ে যায়। অতঃপর তার **শ**ক্তিরূপে **শ**য়নের অধ্যায়। তার থেকে সেটি দিশাগ্রস্ত (**ষ**) হয়, সেখান থেকে অস্তিত্বমাত্রে বা **স**-এ পর্য্যবসিত হয়। এরপর তার আর অস্তিত্ব নাই, বিসর্গ, অন্ধকার।

বাস্তবে কোনো কিন্তু সত্তাই স্থির নয়। স্থির করে নিলেই তার অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে এগোবে। এই কারণে **অবধান** পরিণত হয় **অবহিত**তে, **ধ** হয়ে যায় **হ**। এই **হ** আবার স্তব্ধ হয়ে নিঃশেষ হওয়ার দিকে এগোতে থাকে। নিঃশেষ হয়ে গেলেই তাকে **ঃ** (বিসর্গ) বলে। যে কারণে আমরা **কহ্**-কে **কস্** বা **কঃ** বলতে পারি। কোনো শব্দের শেষে যখন বিসর্গ প্রয়োগ করা হয়, তখন সেটি কার্যত আর বাস্তব অস্তিত্ব বোঝায় না, মানসলোকে সীমায়িত করে নেওয়া স্থির সত্তা-মাত্রকে বোঝায়।

বর্ণাশ্রম : বর্ণ + আশ্রম। **২.** *বর্ণের ভিত্তিতে যে **আশ্রম** গ্রহণ করা হয়।* **৩.** ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম। (ব.শ.)। চতুর্ব্বর্ণের শাস্ত্রবিহিত কর্ম। ... ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস — এই চারটি আশ্রম। (পৌ.অ.)। **৪.** শব্দরূপে প্রায় অপ্রচলিত, **কিন্তু ক্রিয়া** রূপে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো ভারতসমাজে আজও প্রবাহিত। **৫.** দ্র. **বনাশ্রম, বানপ্রস্থ, বর্ণ, আশ্রম**। বিষয়টি আমরা **বর্ণ** শব্দে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছি। আমরা দেখেছি, **বর্ণবিভাজন** একটি চলমান সামাজিক প্রক্রিয়া; সব দেশের সব সমাজেই এই প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে। ভারতসমাজ সেই প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করে দেয় এবং সরকারিভাবে সেই প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করে। ফলত, স্বাভাবিক **বর্ণবিভাজন** পরিণত হয় কৃত্রিম **বর্ণবিভাজনে** এবং ক্রমে তা কট্টর হয়ে গিয়ে প্রথমে **বর্ণাশ্রম**-প্রথায় এবং পরে 'জাতিভেদ-প্রথা'য় পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত এর ফল হয় মারাত্মক। ভারতসমাজের প্রাণপাখি উড়ে যায়, ভারতবাসী 'এক অচল, জড়, উদ্ভিদসুলভ' জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে থাকে।

চলমান প্রক্রিয়াটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এইভাবে — একজন জন্মসূত্রে-**ব্রাহ্মণ** চারভাগে তার জীবন অতিবাহিত করবে — শুরুতে লেখাপড়া শিখবে (**ব্রহ্মচর্য্য**), তারপর বিয়েসাদি করে পরিবার চালাবে (**গার্হস্থ্য**), পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলে বনে যাবে (**বানপ্রস্থ**), এবং শেষ বয়সে সবকিছু ত্যাগ করে **সন্ন্যাস** অবলম্বন করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। এর মধ্যে **সন্ন্যাস** নামক **আশ্রম**টি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের জন্য, **বানপ্রস্থ** নামক **আশ্রম**টি কেবল ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের জন্য, বাকি দুটি **আশ্রম** (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য) বৈশ্যের জন্য, আর কেবলমাত্র **গার্হস্থ্য** শূদ্রের জন্য। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের **চতুরাশ্রম**, ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস বাদে তিন **আশ্রম**, বৈশ্যের বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বাদে দুই **আশ্রম**, শূদ্রের কেবলমাত্র গার্হস্থ্য **আশ্রম**। ভারতসমাজে সামাজিক আইন বা বিধিরূপে এই বংশানুক্রমিক **বর্ণাশ্রম** প্রথার প্রচলন করে দেওয়া হয়।

চলমান একটি সামাজিক প্রক্রিয়াকে এভাবে কার্যত নিয়মের বাঁধা গতে বেঁধে চালানোর ফল হয় মারাত্মক — সমাজের প্রাণস্বরূপ তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল) প্রক্রিয়াটিরই মৃত্যু ঘটে। ব্যক্তিজীবনেও আমরা দেখেছি, বিশেষত পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো কোনো রীতি অনায়াসে, প্রাণবন্তভাবে, কিন্তু একপ্রকার কাজ চালানো শিথিলতায় প্রচলিত থাকে। তাকে সুনির্দিষ্টভাবে আইনসঙ্গত করে দলিলীকৃত করে নিলেই দেখা যায়, রীতিটি আর সেরকম প্রাণবন্তভাবে কাজ করছে না। প্রত্যেকটি পক্ষই দায়সারা ভাবে নিজেদের কর্তব্য করে এবং অধিকার ভোগ করে। শেষমেষ সমগ্র রীতিটিই পরিত্যাজ্য বলে মনে হতে থাকে। ...

আরও দেখা যায়, কোনো কোনো কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে ফেললেই সেই কথার মর্মটি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন কিনা গভীর প্রেম প্রায়শই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে চায় না, নানান পারিপার্শ্বিক ব্যবহারে প্রকাশিত হয় এবং অন্যেরা তা বুঝেও নেয়। এক্ষেত্রেও কোনো পক্ষ যদি সেই গভীর প্রেমের কথাটি স্পষ্ট করে বলে বসে — 'আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি' — তৎক্ষণাৎ সেই ভালবাসা নষ্ট হতে শুরু করে, অনেক ক্ষেত্রে মরেও যায়। তবে কথাটি উল্টো করে বলাই ঠিক — কোনো পক্ষের প্রেম কোনো কারণে কমে গেলেই সে মুখ দিয়ে সেকথা উচ্চারণের নীচতায় নেমে আসে এবং মুখে বলে বসে — 'আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি', এবং তারপর

স্বভাবতই সেই প্রেম মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকে।

এক্ষেত্রেও সেইরকমই হয়েছে। সমাজের নিজস্ব নিয়মে চলছিল একরকম শিথিল **বর্ণাশ্রম** প্রক্রিয়া, তাকে সুনির্দিষ্ট করে বংশানুক্রমিক করে দেওয়ায় কেবল সেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিরই মৃত্যু হল না, নতুন যে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রচলন ঘটল, শেষ বিচারে সেটিই ভারতসমাজের পক্ষে বিষময় হয়ে উঠল। ...

আপনি যদি ভারতসমাজের হিতৈষী হন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পুনরায় স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল) চলমান **বর্ণবিভাজন** প্রক্রিয়াটির প্রচলন ঘটাতে হবে। তার জন্য সবার আগে ভারতে প্রচলিত 'জাতিভেদপ্রথা'র আইনটি তুলে দিতে হবে, যাকে ধরে রেখেছে আমাদের হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় মঠগুলি। একমাত্র তাহলেই পুনরায় স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চলমান **বর্ণবিভাজন** প্রক্রিয়া নিজে থেকে চলতে পারবে। কট্টর কৃত্রিম **বর্ণবিভাজন** ও **বর্ণাশ্রম** প্রথা নামক বিষবৃক্ষটিই যে ভারতসমাজের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং নিচ্ছে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন এবং কীভাবে সেই বিষবৃক্ষটিকে ধ্বংস করা যাবে তা নিয়ে কিছু কিছু কথা বলে গিয়েছেন। কেবল তাই নয়, সেই বিষবৃক্ষটির একটি মাত্র ডাল ভেঙে দিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে ঠিক কাজ করেননি, সেকথা বলতেও রবীন্দ্রনাথের বাধেনি। (রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।)

বর্ব্বর : ১. ✓বৃ + বর (বরচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বর** কর্তৃক বরণীয় যে; অর্থাৎ, **বর** যাকে বরণ করে নেয়।* ৩. অনার্য্যজাতি, নীচজন, মূঢ়, কুটিলকেশ, কালো বাবুইতুলসী, ব্রাহ্মণ-যষ্ঠিকা, নৃত্যভেদ, মৎস্যভেদ, পীতচন্দন। (ব.শ.)। ৪. 'অসভ্য' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **জন, জানোয়ার, জনবর, বরাদ্দ, বরাহ**। দেশের রাজাকে আমরা **বরণ** করে নিয়ে সিংহাসনে বসালাম। এমন সময় সীমান্তে দেখা দিল অন্য এক রাজা ও তার সেনাবাহিনী। সে মহাশক্তিধর। তার সঙ্গে লড়তে যাওয়া মানে, লোকবল অর্থবল সবকিছুর ক্ষতি। আমাদের রাজা তাই দূতের মাধ্যমে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসালেন। আমাদের **বর** কর্তৃক বরণ করে আনা এই বিদেশী রাজাটিকে তাই **বর্ব্বর** বলা হত। পরে পরে এই অর্থটি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। ... ৬. Greek - barbaros, Latin - barbarus, English - barbarian।

বর্ম্ম (বর্ম্মন, বর্ম্মা) : ১. ✓বৃ + মন (মনিন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বর্ম্ম** = (অস্তিত্ব-) বাহীর সীমায়নকে সীমায়িত করে যে। **বর্ম্মন** = **বর্ম্ম** অন (on) যাহাতে। **বর্ম্মা** = **বর্ম্ম**-এর আধার যে।* / **বর্ম্ম (বর্ম্মন্)** = দেহকে আবরণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **বর্ম্ম (বর্ম্মন্)** = কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া, বৃক্ষত্বক। **বর্ম্মা** = ক্ষত্রিয়ের উপাধি। (ব.শ.)। ৪. 'যোদ্ধাদের লোহার দেহাবরণ' অর্থে **বর্ম্ম**, এবং ক্ষত্রিয়ের পদবী রূপে **বর্ম্মন** ও **বর্ম্মা** প্রচলিত। ৫. অস্তিত্ব মাত্রেই কোনো না কোনো দেহের মধ্যে সীমায়িত থাকে, তা সে মানবদেহ হোক আর সমাজদেহই হোক। এক্ষেত্রে প্রাথমিকতা ছিল সমাজদেহের। সমাজদেহ যে চেহারায় রয়েছে, তাকে সেই চেহারায় রক্ষা করার জন্য যে **সত্তা** তার আবরণ রূপে সক্রিয় থাকে, তাকে বলা হয় **বর্ম্ম। সাদৃশ্যে সেটি মানবদেহের লোহার দেহাবরণ বা বর্ম্ম**কেও বোঝায়। **সমাজদেহের সেই বর্ম্ম** বা ক্ষত্রশক্তির (পুলিশ-মিলিটারির) প্রাচীন আধারদের সেকারণেই নাম হয়ে যায় **বর্ম্মা**। ভারতীয় উপমহাদেশে যত **বর্মণ, বর্ম্মণ, বর্ম্মা** পদবীধারী মানুষ আজ বর্তমান রয়েছেন, তাঁরা সেই মানুষদের উত্তরসূরি, যাঁরা এককালে সমাজদেহকে রক্ষা করার গুরুব্রত পালন করতেন।

বারাণসী : ১. বরণাসী + অ (অণ্) + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. / বরণা ও অসী নদীর মধ্যস্থ যে নগরী। (ব.শ.)। ৩. কাশী, কাশীর ক্ষৌমবস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. স্থান নাম 'বেনারস' রূপে বর্তমানে অধিক প্রচলিত। গ্রামবাংলায় আজও 'বেনারসী' শাড়ি ছাড়া এমনকি মুসলমান কন্যার বিবাহও আটকে যায়। ৫. দ্র. **কাশী**। পুরাণাদিতে বলা হয়েছে, **বারাণসী** নগরীটি **পৃথিবী**র বাইরে। রামায়ণের আদিকাণ্ড সাক্ষ্য দেয় —

'পাত্র মিত্র বলে, শুন গাধির তনয়।
কোথায় যাইবে, হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয়।।
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে **বারাণসী**।।
শৈব্যা নারী আর নিজ পুত্র রুহিদাস।
তিন জন যাউক করিতে **কাশী**বাস।।'

ভাগবত থেকে জানা যায়, মহাদেব তাঁর ভক্ত **বিদ্যুন্মালী**কে সাহায্য করতে সূর্যের দিকে কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তার ফলে সূর্য দগ্ধ হয়ে **বারাণসী**তে পতিত হন। (দ্র. **বিদ্যুন্মালী** / পৌ.অ.)। রামায়ণ আরও সাক্ষ্য দেয় —

'মন দিয়া শুন **বারাণসী**র আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ।।
এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ-মাথা।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ তাঁর না হয় অন্যথা।।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী গিরিশ হইল।
কার্ত্তিক গণেশ গৌরী কাঁদিতে লাগিল।।
গৌরী বলে কেন বা কাটিলে বিপ্রমাথা।
ব্রহ্মবধ হইল, কে করিবে অন্যথা।।
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা সর্ব্বপাপ নাশে।।'

এছাড়াও রয়েছে 'শিবকাশী' ও 'ব্যাসকাশী'র তুলনামূলক বয়ান, যার থেকে **বারাণসী** সম্পর্কে আরও বহু তথ্য জানা যায়। ...

এরকম আরও অজস্র তথ্য রয়েছে, আর সেই সব তথ্যই রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। তাই তাদের প্রত্যেকটির শব্দ ধরে ধরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। তার থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যাবে, ভারত-সমাজে ব্যবসাক্ষেত্রের বা **বারাণসী**র প্রথম প্রতিষ্ঠা কোন কোন বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছিল। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলব।

পৃথু ও **পৃথিবী** শব্দ থেকে আমরা আগেই জেনেছি, ভারতে প্রতিষ্ঠিত আদিরাষ্ট্রের এলাকাকে **পৃথিবী** বলা হত। স্বভাবতই এখানে

তখনও **পণ্য**-উৎপাদন ও বিনিময় তখনও স্বীকৃতি লাভ করেনি। কিন্তু সমাজ **দক্ষ**নীতি গ্রহণ করে ফেলায় কোনো কোনো সম্প্রদায়ের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত উৎপাদন জমে যাচ্ছিল। ফলে উৎপন্ন বিনিময়ের কেন্দ্র বা ব্যবসাকেন্দ্রের একান্ত প্রয়োজন পড়ে। ফলত তৎকালের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অধিকারী সম্প্রদায়-পরিচালকদের বিরোধ দেখা দেয়। সেই প্রয়োজন মেটাতে একসময় আবিষ্কারক-উদ্ভাবক সত্তা (শিব) পৃথক নগর গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তার জন্য **শিব**কে দ্বিজহত্যা পর্যন্ত করতে হয়। ফলে, একালের হংকং-এর মতো কিছু কিছু ব্যবসাকেন্দ্রের জন্ম হয়। সেকালে তারই নাম হয়ে যায় **শিবকাশী** বা **বারাণসী**। এগুলি স্বভাবতই রাষ্ট্রের (**পৃথু**র) শাসনাধীন এলাকার বাইরে গড়ে ওঠে বলেই এখানে তৎকালীন রাষ্ট্রের যৌথ অর্থনীতি (সূর্য্য) নিষ্ক্রিয় ও ব্যর্থ হয়, তার পতন ঘটে।

বার (বারংবার, বারব্রত, বারান্তর, বারেক, বাসর; আবার, একবার, এবার, দু'বার, সেবার, পুনর্ব্বার, বারবেলা, পারাবার, পরিবার, রবিবার ...) : **১. বার** = ✓বৃ + অ - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বার*** *=* ***বর*** *হইতে জাত; যে কালখণ্ডে* ***বরণ*** *থাকে।* ***বারংবার*** *=* ***বার****-এর পর যে বার।* ***বারব্রত*** *=* ***বার****-এ (বরণীয় কালে) যে ব্রত করা হয়।* ***বারান্তর*** *=* ***বার****-এর অন্তর থাকে যাহাতে।* ***বারেক*** *= একটি মাত্র* ***বার*** *যাহাতে।* ***বাসর*** *=* ***বাস*** *রহে যাহাতে, যে স্থানে বা কালে।* **৩. বার** = বাসর, ক্ষণ, সময়, পর্য্যায়, কাল, পালা (turn), (ফারসি - **বার**) সময়, অবসর; বিশেষ পুণ্য তিথি, মৃত্যুতিথির দিন। **বারংবার** = পুনঃ পুনঃ, বার বার। **বারব্রত** = পুণ্যতিথিযুক্ত দিন ও ব্রত। **বারান্তর** = অন্যবার, পুনর্ব্বার, আবার। **বারেক** = একবার। **বাসর** = জগদ্‌বাসক, দিবস, দিন, দিবসমান; বাসগৃহ ... বাসরঘর। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **চর**। অনেক সময় একই নামের দু-তিনটি ছাত্র একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে ভরতি হয়ে গেলে সমস্যা দেখা দেয়। সে সমস্যা সমাধানের জন্য ভেদজ্ঞান-এর দরকার পড়ে; ঐ ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে হয়। তখন দেখা যায়, পার্থক্য রয়েছে তাদের বাবা-মায়ের নামে ও ঠিকানায়, যেখান থেকে তারা আসে। বিবর্তিত শব্দের ক্ষেত্রেও অনেক সময় সেরকম হয়। **বার** শব্দটি সেরকমই; সে আসলে একটি শব্দ নয়, চারটি শব্দ। চারটি সূত্র থেকে তাদের আগমন — **বৃ, বারি, বা, বহ**। স্বভাবতই তাদের অর্থও আলাদা (যথাক্রমে বরণ, নিবারণ, বার-১২, বাহির)। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেলামেলি একেবারেই যে হয়ে যায়নি, হয়ে যায় না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন।

যাই হোক, এক্ষেত্রে আমরা **বৃ (দ্র. বর্ণ)** ক্রিয়ামূল থেকে জাত **বার** শব্দ নিয়েই কথা বলছি। **চর** থেকে যেমন **চার** হয়, এও তেমনি **বর** থেকে **বার**। **চরা** মানে যেমন চরণ (বিচরণ) করা, তেমনি **বরা** মানেও **বরণ** করা। **চরণে**র আশ্রয়কে যেমন **আচরণ** বা **আচার** বলে, একইভাবে **বরণে**র আশ্রয়কেও **আবরণ** বা **আবার** বলে। **বরণ** করা হয় দেশ (স্থান) কাল বা পাত্রকে। সেই সুবাদে 'যে স্থানে **বরণ** থাকে' তাকে **বার** বলে, যথা পারা**বার**; 'যে পাত্রে **বরণ** থাকে' তাকেও **বার** বলে, যথা পরি**বার**; এবং 'যে কালখণ্ডে **বরণ** থাকে' তাকেও **বার** বলে, যথা এ**বার**, সে**বার**, **বারে**ক, এক**বার**, দু'**বার**, কত**বার**, যত**বার**, তত**বার**, পুন**র্ব্বার**, আ**বার**, **বার**বার, **বারা**ন্তর, **বার**ব্রত ... ইত্যাদি এবং রবি**বার**, সোম**বার** ... প্রভৃতি। সপ্তাহের সাতদিনের এই নামগুলি প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, **বার** শব্দের একটি অর্থ হল, 'যে কালখণ্ডে বরণ থাকে'। এই বাক্যটিকে একটু বিস্তারিত করলে কথাটি দাঁড়ায়, 'যে কালখণ্ড কাউকে বরণ করে নেয়' এবং, বা 'কেউ যে কালখণ্ডকে বরণ করে নেয়', তাকেই **বার** বলে। এককথায় বলতে গেলে, 'কেউ' যে কালখণ্ডের ভিতরে থাকে, বাস করে, সেটিই **বার**। যে কালখণ্ডের ভিতরে 'এ', 'সে', 'যত', 'তত' 'কত' ... ইত্যাদি থাকে তাদের সেকারণেই যথাক্রমে **এবার, সেবার, যতবার, ততবার, কতবার** বলা হয়ে থাকে। এই সেই কারণ, যেকারণে একে **বাসর**ও বলা হয়। রবি যে **বার**-এ থাকেন বা বাস করেন, তাকে বলে **রবিবাসর**। একইভাবে **মঙ্গলবাসর**, **শনিবাসর** কথা দুটিরও প্রচলন ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম **রবিবাসরীয়** প্রকাশিত হয়েছিল আজ (২০১০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। তখনও সে সময়ের বাংলাভাষী মানুষেরা এসব শব্দের মানে জানতেন। এখন লেখা হয় অভ্যাসবশে, অর্থ না জেনে। তাঁরা জানতেন **রবি, সোম** ... প্রভৃতি সত্তাগুলি সপ্তাহের ঐ বিশেষ দিনগুলিতে থাকেন, বাস করেন, বিচরণ করেন। যে কারণে হিন্দিভাষীরা **শনিবার**কে বলেন **শনিচর**।

'এখন তোমার **বার**' — এরকম কথা বাংলায় প্রচলিত নেই, কিন্তু হিন্দিতে রয়েছে। হিন্দিভাষীরা বলেন — 'অব্ তুমহারি **বারি**'; অর্থাৎ, 'এখন তোমার পালা'। তার মানে, এখন যে কালখণ্ডটি আসছে, তাতে তুমি থাকবে, তোমার বাস করা থাকবে, তোমার পালন চলবে; তাই এই সময়টুকু তোমার পালা অর্থাৎ তোমার **বার**। অবশ্য **বারবেলা**র মতো বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলি কিন্তু এই গোত্রে পড়ে না। সে হল 'যে বেলা **বরণ** করা নেই, **বারণ** করা আছে', তাকে বলে **বারবেলা**। তার মানে, **বারবেলা** শব্দটি **বারি**-ক্রিয়াপরিবারের সদস্য। ...

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমস্ত মানবজাতি যে একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, তার যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়, তার অন্যতম একটি প্রমাণ এই **বার**-এর নামগুলি। বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বের অধিকাংশ জাতির সংস্কৃতিতে সপ্তাহের ধারণা এবং সপ্তাহের সাতদিনের নাম বিদ্যমান। এর মধ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, নামগুলি প্রায় এক বা একরকমের। আমরা যাকে **রবিবার** বলি, বিশ্বের প্রায় সকল জাতিই তাকে তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় রবিবার বা সূর্যবারই বলে থাকেন। কেন বলেন, কীভাবে বলেন, আমরা **বার**গুলির নামের ভুক্তিতে সেকথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। দ্র. **সপ্তাহ, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার**।

ব্রত (ব্রততী, ব্রতদাস, ব্রতদাসী, ব্রতলোপ, ব্রতী, ব্রাত, ব্রাতীন, ব্রাত্য, বিব্রত) : ✓বৃ + অত (অতক্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ব্রত*** *=* ***ব্র*** *(বিশেষপ্রকার বহনকর্ম্ম) তারিত যাহাতে; অর্থাৎ (বিশেষ)*

বহনে রত হয় যাহাতে। **ব্রততী** = **ব্রত** *তারণ গতিশীলভাবে বা সক্রিয়ভাবে করে যে।* **ব্রতদাস** = **ব্রত**-*সহযোগী যে* **দাস**। **ব্রতলোপ** = *যাহার* **ব্রত** *লোপ করা হইয়াছে।* **ব্রতী** = **ব্রত**-*এর সক্রিয় বা গতিশীল আধার যে; অথবা, যিনি সক্রিয়ভাবে* **ব্রত**-*অনুযায়ী কর্ম্ম করেন।* **ব্রাত** = **ব্রত** *হইতে জাত।* **ব্রাত্য** = **ব্রাত** *থাকে যাহাতে।* **বিব্রত** = *বিপরীত* **ব্রত** *যাহাতে; অথবা, নিজ* **ব্রত** *ছাড়িয়া বিপরীত* **ব্রত**-*এর সম্ভাবনা যাহাতে।* / **ব্রাত্য** = যে ব্রাহ্মণাদি গৌণ কালেও উপনীত না হওয়ায় বেদব্রতচ্যুত বা সাবিত্রীপতিত হইয়াছে; বেদব্রত-চ্যুতো ব্রাত্যঃ। **বিব্রত** = ব্রত হইতে বিচলিত (যে)। (ব.শ.)। **৩. ব্রত** = শাস্ত্রবিহিত নিয়ম, উপবাসাদিলক্ষণ পুণ্য, বিধি, সঙ্কল্প, বলিপ্রদানাদি নিয়ম ও ভক্তি, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া, চরিত্র, প্রতিজ্ঞা, প্রায়শ্চিত্ত, নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম। **ব্রততী (ব্রততি)** = বল্লী, লতা। (স্বর্ণব্রততী = স্বর্ণলতা)। **ব্রতদাস** = পৃথিবীতে দেবতাবিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারপূর্ব্বক নিয়মানুসারে তদীয় পূজাদির প্রকাশক দেবানুগৃহীত ব্যক্তি। **ব্রতলোপ** = ব্রতভঙ্গ। **ব্রতী (ব্রতিন্)** = ব্রতবান, নিয়মনিরত, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-প্রবৃত্ত, পুণ্যকর্ম্মনিরত, কর্ম্মনিরত, তদ্ধর্ম্মবান, ব্রহ্মচারী, পুণ্যকর্ম্মী, ধার্ম্মিক, ব্রতশীল, তপস্বী, যজমান। **ব্রাত** = অবিবক্ষিতগণ, সমূহ, নিচয়, নানাজাতীয় অনিয়তবৃত্তি শরীরায়াসজীবিসমূহ, মজুর, শরীর-আয়াসজীবিকর্ম্ম, মজুরী। **ব্রাতীন** = ব্রাতজীবী, শরীরায়াসজীবী, মজুর। **ব্রাত্য** = যথাকালে অনুপনীত সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণাদি, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়ায় জাত জাতিবিশেষ। **বিব্রত** = ব্যাকুল, বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত, বিপন্ন। (ব.শ.)। **৪. ব্রততী** মেয়েদের নাম রূপে এবং **ব্রতী** অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে (যথা - শিক্ষাব্রতী, দেশব্রতী ইত্যাদি) কমবেশি প্রচলিত; বাকি সব শব্দগুলিই এখন অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **দীক্ষা, দেবব্রত, যজন**। আজকাল **ব্রত** শব্দটি শুনলেই আমরা ভাবি বুঝিবা ধম্মকম্মোর ব্যাপার হবে। কিন্তু যখন কারও নাম শুনি 'দেবব্রত', 'তপোব্রত', 'সুব্রত', 'সেবাব্রত' ... ইত্যাদি, কিংবা 'বিব্রত', 'সেবাব্রতী', 'শিক্ষাব্রতী', 'মৌনব্রতী' ... প্রভৃতি শব্দ শুনি এমনকি নকশালদের মতো ধর্মবিরোধী দল যখন তাদের পত্রিকার নাম রাখে 'দেশব্রতী', তখন কিন্তু আমাদের চোখ কোঁচকায় না। তার মানে, বাংলাভাষা শব্দটিকে তার যথার্থ **মর্য্যাদা** দিয়ে রেখেছে, কিন্তু আমরা শিক্ষিত বাংলাভাষীরা শব্দটিকে সমাজের সমস্ত এলাকা থেকে ঠেলে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক-ধর্মের এলাকায় ব্যবহারের জন্য ঠেলে দিতে চাই।

কোনো একটি বিশেষ প্রকল্পের দায়িত্ব বহন করা হয় যে **কর্ম্ম**শৃঙ্খলের মাধ্যমে, (*বিশেষ প্রকার বহনকর্ম্ম তারিত যাহাতে*) তাকে **ব্রত** বলে। সেভাবেই, সেবা প্রকল্পের দায়িত্ব বহন করা হয় যে **কর্ম্ম**শৃঙ্খলের মাধ্যমে, তাকে 'সেবা**ব্রত**' বলে। সেবাব্রত সক্রিয়ভাবে করাই যার কাজ, তাঁকে বলে সেবা**ব্রতী**। ...

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, চান্দ্রায়ণব্রত, অসিধারাব্রত ... ইত্যাদি **ব্রত**গুলি **ব্রত** নয়। এগুলিও **ব্রত**। তবে এর মধ্যে এমন একটি গুরুতর বিষয় আছে, যা কেউই খেয়াল করেন না। তা হল, প্রকৃত বাস্তব **ব্রত**-অনুষ্ঠান ও তারই প্রতীকী **ব্রত**-অনুষ্ঠান। (**বিশ্বকর্ম্মা** শব্দে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) বাস্তবে একজন কৃষক তার কৃষি উৎপাদন **কর্ম্মযজ্ঞ** চালিয়ে ফসল তুলে বাজারে বিক্রয় করে দিচ্ছেন — এটি হল তাঁর প্রকৃত বাস্তব চান্দ্রায়ণ-**ব্রত** অনুষ্ঠান। আর, পুরোহিত ডেকে তিনি যে চান্দ্রায়ণ-**ব্রত** অনুষ্ঠান করেন, সেটি হল সেই বাস্তব চান্দ্রায়ণ-**ব্রত**-অনুষ্ঠানের প্রতীকী আচার-অনুষ্ঠান। বিশ্বাস না হলে, পুরোহিত পরিচালিত চান্দ্রায়ণ-**ব্রত** অনুষ্ঠানের প্রতিটি আচরণকে বিস্তারিত করে নিন, উপকরণগুলির প্রকৃত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে চলে যান, দেখবেন, বাস্তব চান্দ্রায়ণ-**ব্রত** অনুষ্ঠানের **কর্ম্ম**কাণ্ডের সঙ্গে সেগুলি বহুক্ষেত্রে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ পুরোহিত ও যজমানেরা বাস্তবের সঙ্গে প্রতীকী আচরণের এই সম্পর্কটি ভুলে গেছেন। ফলে পুরোহিতের যজ্ঞানুষ্ঠানাদি পরিণত হয়েছে বাজে অর্থহীন আচরণে। আর সেজন্যই **ব্রত** শব্দটি শুনলেই যুক্তিবাদীগণের ভ্রূ কুঁচকে যায়। কিন্তু তাতে কী? না ঐ যুক্তিবাদীরা পুরোহিতদের কার্যকলাপ বুঝবার চেষ্টা করেছেন, না পুরোহিতরা তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপের অর্থ মনে রেখেছেন এবং তা যুক্তিবাদীদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ...

যাকগে, **ব্রত**-এর দু'রকম আচরণ — বাস্তব আচরণ ও প্রতীকী আচরণ এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক-ছেদনের গল্প আমরা শুনলাম। কিন্তু যে হারু স্যাকরা পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স থেকে সোনার তাল নিয়ে এসে নির্দেশানুসারে অলঙ্কার বানিয়ে তাদের দিয়ে আসে এবং সেভাবেই সে তার পরিবার পরিজন নিয়ে, বলতে গেলে, একটি স্বর্ণশিল্পীদের সংস্থা চালায়, তাকে কী বলা হবে? সেকালে পি সি চন্দ্রের মতো সংস্থাকে বলা হত **বৃক্ষ**, আর হারু স্যাকরার মতো সংস্থাকে বলা হত **ব্রততী**। কারণ, সে **বৃক্ষে**র **ব্রত**-এর তারণকার্য ধারণ করে। তাই সে **ব্রততী**। যেহেতু লতাও একইভাবে বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে, সেই কারণে লতাকেও **ব্রততী** বলা হত। একালের বাংলাভাষী হারু স্যাকরার মতো স্বর্ণলতিকা স্বর্ণ-**ব্রততী**দের ভুলে গেছে, মনে রেখেছে শুধুমাত্র creeper-এর মতো **ব্রততী**দের। অথচ, মনুসংহিতা কিন্তু তার জগৎসৃষ্টি অধ্যায়ে উভয় প্রকার **ব্রততী**দের তাঁর মুখ্যসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন।

কিন্তু **ব্রতদাস**? '**পৃথিবী**তে **দেবতা**বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারপূর্ব্বক নিয়মানুসারে তদীয় পূজাদির প্রকাশক দেবানুগৃহীত ব্যক্তি'কে সেকালে বলা হত **ব্রতদাস**, একালে তাঁদের বলা হয় 'কোম্পানী-রিপ্রেজেন্টেটিভ'। সেই সুবাদে 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ'-এর মানে দাঁড়ায় 'নিরাময় **ব্রতদাস**'। এইসব নানা **দেবতা**র নানা রকমের **ব্রতদাসে**রা এখন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে। কার্যত আমরা বর্তমানে এমন **ব্যতিব্যস্ত** বেঁচে আছি যে, ভাল-মন্দ বিচার করার ফুরসৎ পর্যন্ত নাই। এদিকে **ব্রতদাস** হওয়াটা অত্যন্ত গৌরবের বলে ঘোষণা করা হয়ে রয়েছে, লোকে আপন আপন **ব্রত** ত্যাগ করে কোনো না কোনো **দেবতার ব্রতদাস** হয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে দাসত্বের জীবন কাটাতে গিয়ে চরম আত্মগ্লানিতে ভুগছে।

তাও চলত। কিন্তু সে পথও ঠিকঠাক সাফসুফ নয়। সবচেয়ে ভাল রাস্তাগুলি বাবুদের দখলে চলে যায় বৈদিক যুগেই। তখনই কে কী **ব্রত** গ্রহণ করবে প্রথমে তা শুভ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু সমাজ একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক **দক্ষ**নীতি গ্রহণ করায় কোনো পথে দুধমধুর ক্ষীরধারা বেশি বইতে শুরু করে এবং কোনো কোনো পথে সে ধারা ক্ষীণ হয়ে যায়। স্বভাবতই তার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ শুরু হয়। বেদবাদীরা সেই বিদ্রোহ দমন করে বিদ্রোহীদের **ব্রত** লোপ করে দেন; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্র**কর্ম্ম**, বৈশ্যের বৈশ্য**কর্ম্ম** নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তাদের **ব্রাত** বা **ব্রাতীন** অর্থাৎ 'শরীরায়াসজীবী' মজুর না হয়ে উপায় থাকে না, তারা **ব্রতলুপ্ত ব্রাত্য** হয়ে দিন গুজরান করতে থাকে। হাজার দেড়-হাজার বছর পেরিয়ে আসার পর সেই **ব্রাত্য** হওয়ার ইতিহাস ভুলে **ব্রাতীন**রা এখন কোনো না কোনো **দেবতার ব্রতদাস** হওয়ার জন্য লড়ে যাচ্ছে।

ৰল্ (ৰল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঙ্গনাবল্লভ, অতিৰল, অৰল, অৰলধৰল, অৰলা, অৰাল, অবোল, আলা (ওয়ালা), আবলি, আবলী, আবল্লিত, আবাল, আবালবৃদ্ধবনিতা, আবাল্য, উলপ, উলুপ, ওয়ার, ওয়াল, ওয়ালা, গুণবল্লভ, প্রবল, প্রবাল, প্রাণবল্লভ, বকাল (বল্কল), বড়শী, বড়িশ, বড়িশী, ৰল, বল, বলই, ৰলক, ৰলকর, ৰলকৃৎ, ৰলক্রমে, বলক্ষ, ৰলক্ষোভ, ৰলগণ্ডিভোগ, ৰলচক্র, ৰলজ, ৰলজা, ৰলজ্যেষ্ঠ, বলভি (বড়ভি), বলভী, ৰলদ, ৰলদা (ৰোলদ্যা), ৰলদ্বিট্, ৰলদে, ৰলদেব, ৰলন, বলন, ৰলনাশন, ৰলনিষূদন, ৰলনিগ্রহ, বলনি(নী), ৰলপতি, ৰলপ্রদ, ৰলবৎ, বলবৎ, ৰলবর্দ্ধন, ৰলবন্ত, ৰলবান, ৰলবিন্যাস, ৰলবীর, ৰলবৃত্তি, ৰলবৃত্রহা, ৰলভদ্র, ৰলভি(ভী), ৰলভিৎ, ৰলভৃৎ, ৰলমুখ্য, ৰলয়, ৰলয়িত, ৰলয়ী, ৰলয়বান, ৰলরাম, ৰলসূদন, ৰলস্থ, ৰলহন্তা, ৰলহা, ৰলা, বলা, ৰলাই, বলাক, বলাকা, বলাকিনী, বলাকী, ৰলাৎ, ৰলাৎকার, ৰলাৎকৃত, ৰলাধান, ৰলাধিক, ৰলাধিকরণ, ৰলাধ্যক্ষ, ৰলানুজ, ৰলাৰল, ৰলাবলেপ, ৰলাহক, বলাবলি, ৰলি, ৰলিকর্ম্ম, ৰলিদ্বিট্, ৰলিধ্বংসী, ৰলিনিষূদন, ৰলিপুষ্ট, ৰলিভুক, ৰলিভোজন, ৰলিবেশ্ম, ৰলিমন্দির, ৰলিসদ্ম, ৰলিব্যাকুল, ৰলিভৃৎ, ৰলি, বলি, (বলী), ৰলিকা, ৰলিচক্র, ৰলিত, ৰলিদান, ৰলিষ্ঠ, ৰলী, ৰলি(লী)বর্দ্ধ, ৰলিমান, ৰলিষ্ঠ, বলিশা, ৰলিহারি, ৰলী, ৰলীক, ৰলীবর্দ্দ, ৰলীয়ান, ৰলোৎকট, ৰলৌঘ, বল্ক, বল্কক, বল্কল, বল্কলা, বল্কলী, বল্‌গ্, বল্‌গ, বল্‌গন, বল্মা, বল্মি, বল্মিত, বল্‌গা, বল্‌গাহরিণ, বল্‌গিত, বল্মু, বল্মুক, বল্মিক, বল্মিকি, বল্মী, বল্মীক, বল্মীকজন্মা, বল্মীকাগ্র, ৰল্য, ৰল্যা, বল্ল্, বল্ল, বল্লকী, বল্লব, বল্লবী, বল্লভ, বল্লভজ্ঞা, বল্লভপাল, বল্লভা, বল্লভাচার্য্য, বল্লম, বল্লর, বল্লরি (বল্লরী), বল্লি, বল্লী, বল্লুর, বল্বজ, বাকড়া, বাকড়াগুয়া, বাকল, বাকলা, বাখর, বাগ, বাগ (বগাহ), বাগড়া, বাগ-মানা, বাগে-আনা, বাগান (কাজ বাগানো), বাগুড়ি, বাগুলা, বামলুর, ৰাল, বালক, ৰালকচন্দ, ৰালকচন্দ্র, বালকচন্দ্রিমা, ৰালকদলী, ৰালকভানু, ৰালকাণ্ড, ৰালকৃষ্ণ, ৰালক্রীড়নক, ৰালখিল্য, ৰালগজ, ৰালগোপাল, ৰালগ্রহ, ৰালঘ্ন, ৰালচন্দ্র(মা), ৰালচরিত, ৰালচর্য্যা, ৰালচূত, ৰালতন্ত্র, ৰালতি(তী), বালতিপোতা, ৰালতৃণ, ৰালধন, ৰালধি, ৰালপাদপ, ৰালপাশ্যা, ৰালব, ৰালবৎস, ৰালবনিতা, ৰালবাচ্চা, ৰালবিধবা, ৰালবৈধব্য, ৰালব্যজন, ৰালভাব, ৰালভার, ৰালভোগ, ৰালমতি, ৰালমূষিকা, ৰালমৃগ, ৰালমৃণাল, ৰালরণ্ডা, ৰালরবি, ৰাললতা, ৰাললীলা, ৰালশা(সা), ৰালসন্ধ্যা, ৰালসূর্য্য, ৰালা, বালা (আলা, ওয়াল, ওয়ালা), বালা (বলয়া), বালা-আঁচলা, ৰালাই, বালাখানা, ৰাল(লু)ঙ্কি, ৰালাতপ, ৰালাদিত্য, ৰালাধাত, ৰালাপত্য, বালাপোশ, বালাবলা, ৰালাভোলা (আলাভোলা, লালাভোলা), বালাম, ৰালারুণ, ৰালার্ক, ৰালি (সুগ্রীব), বালি (বালুকা), বালি(লী), বালিআড়, বালিআড়ি, বালিআড়ং, ৰালিকা, বালিখোলা, বালি(লী)ঘট, বালি(লী) ঘড়ী, বালিবন্ধ, বালিবান্ধ, বালিয়া, ৰালিশ, বালিশ, বালিহংস, বালিহাঁস, ৰালী, বালু, বালুকা, বালুকাযন্ত্র, বালুচর, বালুচরে, ৰালেন্দু, ৰালেয়, বাল্মীক, বাল্মীকি, ৰাল্য, ৰাল্যকাল, ৰাল্যভোগ, ৰাল্‌হক, ৰাল্‌হিক (Bulkh), বাল্‌হীক, বাহ্লীক, বিদ্যুৎবল্লী, বেলে, বেলেমাছ, বেলেমাটি, ভ্রূচাপবল্লী, রাজবল্লভ, সবল, সম্বল, সম্বলিত, সাবালক, সুবল।

ৰল্ = বাহীর লালন-লয়ন। **ৰল** = বাহীর লালন-লয়ন যাহাতে।

ৰল (ৰলদ, ৰলবৎ, ৰলবন্ত, ৰলবান, ৰলয়, ৰলরাম, ৰলাই, ৰলাৎ, ৰলাৎকার, ৰলি, ৰলিষ্ঠ, ৰলী, ৰলীয়ান, প্রবল) : **১.** ✓ৰল + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ৰল** = *(দ্বৈতাদ্বৈত) বাহীর লালন-লয়ন যাহাতে।* **৩. ৰল** = বলবান, সমর্থ, বলরাম, অসুরবিশেষ, বরুণবৃক্ষ, কাক, সৈন্য, দেহজসামর্থ্য, শক্তি, উচ্চারণশক্তি, দাহশক্তি, ভার-সহিষ্ণুতা, বেগ, প্রভাব, শুক্র, রক্ত, দেহ, বলাৎকার, দেহস্থৌল্য, অস্থি, পল্লব, গন্ধরস, বিদ্যাদি দশবিধ কার্য্যসাধনোপায়, কার্য্যসাধনের উপায়মাত্র। (ব.শ.)। **৪.** strength অর্থে প্রচলিত। **৫.** দেখা যাচ্ছে, **ৰল্** ক্রিয়াটির ভেতরে মানসিক শক্তি ও দৈহিক শক্তির কথা যেমন রয়েছে, তেমনি বৃদ্ধির কথাও রয়েছে। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, **ৰল**-এর বেলায় দৈহিক শক্তির প্রাধান্য; অথচ কথা **বল**তে গেলে শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি দুটোই লাগে। তাছাড়া, সত্তার বৃদ্ধিকেই যদি মূল ধরা হয়, তাহলে দেখা যায়, মানসিক অগ্রগতি, শারীরিক অগ্রগতি ইত্যাদি সবই তার অন্তর্ভুক্ত। **ৰল**-এর ভিতরে প্রধানত দৈহিক শক্তির কথা বলা আছে, এবং **বল**-এর ভিতরে উভয় ধরনের শক্তির কথা **বর্ত্তমান** রয়েছে। সর্বোপরি, সত্তার কিঞ্চিৎ বহির্গমন ঘটে যায় **ৰল** ও **বল** উভয় ক্রিয়ার মাধ্যমে। **৬.** ইংরেজি valid, value, valour, wall।

ৰলদ : **২.** / বল দান করে যে। (ব.শ.)। **৩.** পৌষ্টিক কর্ম্মাঙ্গ -ভূত অগ্নি, বৃষভ, জীবক ওষধি, বলীবর্দ্দ, বৃষ, বৃষণহীন বৃষ, ভারবাহী গোরু। (ব.শ.)। **৪.** 'লাঙল বা গাড়ি-টানা গরু' অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পশু**। পুরুষ গরু চার রকম হয় — দামড়া, বলদ, ষাঁড়, ও আণ্ড্রাকাটা। শৈশবে যে পুরুষ গরুকে 'বৃষণহীন' করে দেওয়া হয়, কৈশোরে তাদের দামড়া বলে। দামড়া গরু সাবালক হলে তাকে **বলদ** বলা হয়। এই **বলদ**ই মানুষের কৃষিকর্ম গাড়িটানা ইত্যাদি কাজে লাগে। আর, যাকে বৃষণহীন করা হয় না, সেরকম গরুকে ষাঁড় বলে। সাধারণভাবে তাদের কৃষিকর্মাদিতে শিক্ষিত করে তোলা যায় না, তাই তাদের শিবের নামে উৎসর্গ করা হয় বলে এদের 'শিবের ষাঁড়' বা 'ধর্মের ষাঁড়' বলে। এই ষাঁড় প্রধানত গো-প্রজননের শ্রেষ্ঠ উপায়। যাকে প্রথম যৌবনে পা দেওয়ার পরে বৃষণহীন করা হয়, তেমন পুরুষ গরুকে 'আণ্ড্রাকাটা' বলে।

যাই হোক, লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলতেন 'শৈব'।

আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ নজরুল শরৎচন্দ্র নেতাজি ... প্রভৃতি মানুষদের সঙ্গে 'শিবের ষাঁড়'-এর এবং অ্যাকাডেমি শিক্ষিত ও চাকুরিরত মানুষদের সঙ্গে **বলদ**দের প্রায় হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বৃষোৎসর্গ' গল্পে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

বলবৎ, বলবন্ত, বলবান : **৩. বলবৎ** = প্রবল, কার্য্যকর, সবল। **বলবন্ত** = বলবান, ধর্ম্মবলযুক্ত, দৈবশক্তিমান। **বলবান** = বলবিশিষ্ট, বেগবান, অতিশায়ী, নিয়মনে অশক্য, গুরুতর, নিবিড়, সেনাসহিত। (ব.শ.)। **৪.** তিনটি শব্দই কমবেশি প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বলয় : **১.** ✓বল্ + অয় (কয়ন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বল যায় যাহাতে।* / আচ্ছাদন করে যে। (ব.শ.)। **৩.** স্বর্ণাদিকৃত প্রকোষ্ঠভূষণ, কটক, বালা, কঙ্কণ, (সাদৃশ্যে) মণ্ডল, বেষ্টন, বেষ্টনভূমি, কটিভূষণ, গোল, বেলা, সমুদ্রতীর। (ব.শ.)। **৪.** ringlike circular sphere অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** প্রকৃতপক্ষে কোনো সত্তা নিজের চারিদিকে নিজের দৈহিক বা মানসিক শক্তির জোরে একপ্রকার চক্রাকার আবেষ্টনী তৈরি করে নিতে পারে, তাকেই **বলয়** বলে। দ্র. **বেলা, মর্ম**।

বলরাম : **২.** / বলাধিক্য হেতু 'বল', লোকরমণ হেতু 'রাম'। (ব.শ.)। **৩. বলরাম** = কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ... (ব.শ.)। ইনি এক অনন্তাবতার। মতান্তরে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। ইনি বসুদেব ও তাঁর আর এক স্ত্রী রোহিণীর পুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বলভদ্র ও বলদেব নামেও ইনি প্রসিদ্ধ। ... যোগমায়া রোহিণীর গর্ভ সঙ্কর্ষণ করে এঁকে স্থাপন করেছিলেন বলে, এঁর অপর নাম সঙ্কর্ষণ। ... এঁর অস্ত্র 'হল' বলে এঁকে হলধর বা হলায়ুধও বলা হয়। ... সান্দীপনি মুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বেদবিদ্যাদিতে ... পারদর্শী হন। গদাযুদ্ধে বলরাম অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের ... লীলা সহচর। এঁর বাল্যকালের প্রধান ঘটনা — গর্দভরূপী বিরাট রাক্ষস ধেনুকাসুর বধ। ... এঁর সাহায্যেই কৃষ্ণ কংসকে বধ করতে সমর্থ হন। ... ইনি যমুনাকে হল দ্বারা ... তীরের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। ... কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। ... গদাযুদ্ধে মগধরাজ জরাসন্ধও এঁর কাছে পরাজিত হন। ইনি দুর্যোধন ও ভীমকে গদাযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেন। ... ভীম নিয়মবিরুদ্ধভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলে তিনি এত বেশি ক্রুদ্ধ হন যে, নিজেই পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে উদ্যত হন; কিন্তু কৃষ্ণ অতিকষ্টে তাঁকে শান্ত করেন। ... যদুবংশ ধ্বংসের প্রাক্কালে ... দ্বারকায় বটবৃক্ষের নিচে যোগসমাহিত অবস্থায় থাকাকালীন এঁর মুখ হতে রক্তবর্ণ সহস্রমুখ বৃহদাকার এক সর্প নির্গত হয়ে সমুদ্রে গমন করে। তখন বলরামের মৃত্যু হয়।

বলরামের জন্ম সম্বন্ধে অন্যমত প্রচলিত আছে। এই মতানুসারে তিনি নাগরাজ শেষ-এর অবতার। সে কারণ, তাঁর মৃত্যুকালে উক্ত নাগ তাঁর মুখ হতে বহির্গত হয়। এঁর স্ত্রীর নাম রেবতী, রাজা রৈবতের কন্যা। রেবতীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে — নিশধ ও উল্মুক। বলরামের অস্ত্র হিসাবে গদা, হল, মুষল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** ভারতের ইতিহাসে (আনুমানিক সময়কাল ১০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ) **বলরাম** একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ইনি পূর্বতন ব্যবস্থার কৃষি-অর্থনীতির আর্থিক শক্তিধর **সত্তা (অনন্তনাগের অবতার)**, এবং চাইতেন প্রৌঢ় বৈদিক ব্যবস্থা বা অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই (বা কৌরবরাই) টিকে থাকুক; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করতেন। আর শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন **পাণ্ডব** পক্ষের (খঞ্জ-ধনতন্ত্রের) সমর্থক। বলতে কি, শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে এই **বলরাম** সত্তা তাঁর স্বভাবানুসার সক্রিয় হতে পারেননি, নিষ্ক্রিয় থেকেছেন।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবকালে এই সত্তাকে পুনরায় দেখা যায়। তাদের সামন্ততন্ত্রের ভেতরেই যে কৃষি-সম্পদবান মানুষেরা ছিলেন, তাঁরা এই সত্তার ধারক-বাহক। এঁদের যে-অংশটি বিপ্লবের বিরোধিতা করে, তাদের মেরে ফেলা হয়; অপর একটি অংশ বিপ্লবের বিরোধিতা না করে নীরব হয়, গোপনে বিপ্লবে সাহায্যও করে। সেই সত্তাটিই **বলরাম**।

বলাৎকার : **২.** *যাহা বলপূর্ব্বক করা হয়।* / বল দ্বারা করণ। (ব.শ.)। **৩.** হঠ, প্রসভ, বলপ্রয়োগ, অন্যায়, অত্যাচার, ঋণীকে স্বগৃহে আনিয়া তাড়নাদি দ্বারা ঋণশোধ দেওয়ান (ইহা ঋণ আদায়ের পঞ্চম উপায়), বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশ (rape)। (ব.শ.)। **৪.** rape অর্থে প্রচলিত। **৫.** হ্যাঁ, যে কাজই বলপূর্বক করা হয়, তাকেই বলাৎকার বলে, কিন্তু শব্দটির বর্তমান ব্যবহার কেবলমাত্র নারীর সতীত্বনাশ অর্থে গিয়ে স্থির রূপ নিয়ে প্রতীকী হয়ে গেছে।

বলি : **১.** ✓বল্ + ই (ইন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বল গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; যাহাতে (যে কোনো প্রকারের) বল দান করা হয়।* / যাহা দিতে হয়। (ব.শ.)। **৩.** সম্বোধনসূচক অব্যয়, জরা হেতু শ্লথ চর্ম্ম ... ইত্যাদি; রাজগ্রাহ্য অর্থাদি, কর, উপহার, পঞ্চযজ্ঞের একতম — ভূতযজ্ঞ, পূজা, দেবোদ্দেশে উপকল্পিত ছাগাদি পশু ... ইত্যাদি; দৈত্যরাজবিশেষ (ইনি ... বাণের পিতা। ইনি বাহুবলে ত্রিভুবন অধিকার করিলে, বিষ্ণু ইন্দ্রাদির প্রার্থনায় অদিতিগর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং ... তৃতীয় পাদ বলির মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক ইঁহাকে পাতালে প্রেরণ করেন। ইনি সপ্ত-চিরজীবীর একতম ...)। (ব.শ.)। দৈত্যরাজবিশেষ। ইনি হরিভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র। তপোবলে বলি অজেয় ও অমর হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ... দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ... বিষ্ণু বামনরূপে কশ্যপের পুত্র হয়ে জন্মান এবং বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করলে সেখানে গিয়ে কিছু দান ... স্বরূপ ত্রিপাদ ভূমি ... প্রার্থনা করেন। ... বিষ্ণু তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করামাত্র বলি বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। এমন সময় তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুকে বলির বন্ধন মোচনের জন্য অনুরোধ করেন। ... বিষ্ণু বলেন, 'বলি, বহুকষ্ট স্বীকার করে তুমি নিজের সত্যপালন করেছ। সেইজন্য দেবতাদের দুষ্প্রাপ্য স্থান রসাতল তোমার বাসের জন্য দান করলাম।' তখন বিষ্ণুর আদেশে বলি রসাতলে বাস করতে থাকেন। (পৌ.অ.)। **৪.** to sacrifice অর্থে, কপালের '**বলি**রেখা' অর্থে এবং 'আমরা কথা **বলি**' অর্থে প্রচলিত। তার মানে, কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দীর্ঘতমা**। কথা বলবার সময় আমরা উচ্চারণ শক্তিই কেবল খরচ করি না, মানসিক শক্তিও খরচ করি। সেই শক্তি খরচ করে আমরা যা **বলি**, সেটি শ্রোতাকে দান করা হয়। আবার, এভাবে দান করতে

করতে যখন অনেক দান করা হয়ে যায়, তখন আমাদের ভেতরের শক্তি অনেকখানি নিঃশেষ হয়ে যায়। কতখানি শক্তি খরচ হয়ে গেছে, তার সাক্ষ্য নিয়ে হাজির হয় আমাদের কপালের **বলি**রেখা। তবে এ-সবই ব্যক্তির বলা**বলি**র ব্যাপার। এখন আমরা সামাজিক **বলি**র কথায় যাব।

মানুষের সমাজে কর বা খাজনার উদ্ভব হল কবে এবং কীভাবে, তা নিয়ে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে সেরকম কোনো তথ্য নেই; ভারতের ছিল এবং আছে। সেই ইতিহাসই রয়েছে দৈত্যরাজ **বলি**র কাহিনীতে। তবে হ্যাঁ, রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। দ্র. **দীর্ঘতমা, বঙ্গ**। তখনও বৈদিক যুগ চলছে, অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা অসুরব্যবস্থা চলছে, অসুররাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হয়ে গেলে সমাজে নগদ-নারায়ণের স্বীকৃতি বাড়তে থাকে। কিন্তু সবক্ষেত্রে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়। ক্রমে তা মৌলবাদী রূপ পায়, কিছু লোক অধিক অর্থসম্পদের অধিকারী হয়ে যায় এবং তার ফলাফল আর মানুষের 'রোচে না' — প্রহ্লাদের পুত্র রূপে 'বিরোচন' জন্মায়। এরপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হয় — সম্পদবানদের উপর **কর** আরোপ, জন্ম হয় **বলি**র। কিন্তু সম্পদবানরা সেটি মানবে কেন? তারা চাঁদির জুতো বা টাকার মার দিয়ে এই **কর**-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। নগদ-নারায়ণ **বামন**রূপে **বলি**কে পাতালে ঢুকিয়ে দেন অর্থাৎ কেবলমাত্র কাগুজে-**কর**ব্যবস্থায় পর্যবসিত করেন। এর ফল যা হতে পারে, তাই হয়। পুরাণাদি সাক্ষ্য দেয় — 'বলির বন্ধন ঘটিলে পুনরায় দেবাসুর সংগ্রামের সূচনা হয়।' ...

তা সে যাই হোক, তথ্য এই যে, যে সপ্ত চিরজীবী আজও বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন এই **বলি**। মানে কী? মানে হল, আজও **কর**-সত্তা জীবিত রয়েছে। রয়েছেই তো! বহাল তবিয়তে রয়েছে! রয়েছে বলেই তো আজও কেউ **বলি**দান করে, ট্যাক্স দেয়, কেউ তা গ্রহণ করে! ...

'কথার জোর' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। সেই জোর না থাকলে কথা বলা যায় না। কার্যত বল দান করি যে আওয়াজে, তাকেই আমরা 'বলে থাকি' বা **বলি**। অন্যের ক্ষেত্রে যখন খাজনা স্বরূপ শ্রম দান করি, সেটাও হয় **বলি**। পরে সমস্ত খাজনা জাতীয় দানই **বলি**দান হয়ে যায়। সেই **বলি** বা ট্যাক্স যখন নাম-কা-ওয়াস্তে কাগুজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কাগজের পাতায় ঢুকে যায়, তখনই **বলি**র পাতাল প্রবেশ ঘটে। **৬.** ইংরেজি valid।

বল্মীক (বল্মীকজন্মা, বল্মীকভব, বাল্মীকি) : **১.** ✓বল্ + কীক (ক্রীকন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বল্মীক*** = ***বল্মী*** - *(মনো-) বলপূর্ব্বক খাত মৃত্তিকা (অভিজ্ঞতা) স্তূপীকৃত যাহাতে।* ***বল্মীকজন্মা*** = ***বল্মীক*** *হইতে জন্ম যাহার।* ***বল্মীকভব*** = ***বল্মীক*** *হইতে হওয়ন যাহার।* ***বাল্মীকি*** = ***বল্মীক****-জাত গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে। /* **বাল্মীকি** = বল্মীক হইতে জাত। (ব.শ.)। **৩. বল্মীক** = বল্মীকৃত মৃত্তিকাস্তূপ, উইঢিবি (ant-hill), মূষিককৃত মৃত্তিকাচয়, (সাদৃশ্যে) গ্রীবাদিতে ত্রিদোষজ গ্রন্থিরূপ রোগবিশেষ, বাল্মীকি মুনি। **বল্মীকজন্মা, বল্মীকভব** = বল্মীকজাত, বাল্মীকি। **বাল্মীকি** = মহর্ষিবিশেষ। ইনি প্রচেতার দশম পুত্র, কৃত্তিবাস মতে ইনি চ্যবনের পুত্র; মতান্তরে ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ। ইনি দেবর্ষি নারদের মুখে রামচরিত শ্রবণ করিয়া স্নানার্থ তমসাতীরে গমন করেন এবং তীরবনে পর্য্যটন করিতে করিতে ব্যাধনিহত ক্রৌঞ্চকে দেখেন ও ক্রৌঞ্চীর কাতর রব শ্রবণ করেন। ... ইনি 'আদিকবি', 'কবিগুরু' ইত্যাদি নামে অভিহিত। ... (ব.শ.)। ইনি বরুণের পুত্র এবং রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি ও আদিকবি। ... অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অরণ্যমধ্যে তমসা নদীর তীরে এঁর আশ্রম ছিল। ... ইনি যৌবনে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন। ... একবার দেবর্ষি নারদকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র সকলে তাঁর এই পাপের ভাগ নেবেন কি না। তখন রত্নাকর পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়দের এই প্রশ্ন করলে তাঁরা সকলেই তাঁর পাপের ভাগ নিতে অসম্মত হলেন। তখন রত্নাকরের চৈতন্য হল এবং তিনি নারদের কাছে 'রাম-মন্ত্রে' দীক্ষিত হয়ে ... ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন। ... এই সময় তাঁর সর্বশরীর বল্মীকে আচ্ছন্ন হয়। এই জন্যই তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। ... একদিন বাল্মীকি ভরদ্বাজসহ তমসার তীরে ... দেখেন যে, বনমধ্যে কামক্রীড়ারত এক ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে জনৈক ব্যাধ শরাঘাতে বধ করলে ক্রৌঞ্চী করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে শোকাভিভূত বাল্মীকির মুখ হতে একটি শ্লোক নির্গত হয় — 'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।' এই শ্লোকপঙ্ক্তি আদি শ্লোক হিসাবে কথিত হয়। ব্রহ্মা তখন বাল্মীকির আশ্রমে এসে বলেন যে, তাঁর সংকল্পেই বাল্মীকির কণ্ঠ হতে ঐ বাক্য নিঃসৃত হয়েছে। এই শ্লোক অবলম্বন করে তিনি বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দেন। ... রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করে যান। এই স্থানে সীতার দুই যমজ পুত্র **কুশ** ও লব জন্মগ্রহণ করে। বাল্মীকি প্রথমে এদের রামায়ণ গান করতে শেখান। ... (পৌ.অ.)। **৪.** রামায়ণ রচয়িতা কবির নাম রূপে **বাল্মীকি** শব্দটি প্রচলিত, বাকি শব্দ তিনটি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **তমসা, চ্যবন**।

বসে থাকতে থাকতে মানুষের গায়ে উইপোকা ধরে গিয়ে মানুষটাই পুরো উইঢিবিতে ঢাকা পড়ে যায় — এমন ঘটনা আমরা দেখিনি। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, **চ্যবন** ও **বাল্মীকি** দুজনেই এমন ঘোর তপস্যায় রত ছিলেন যে, তাঁদের সারা শরীর উইঢিবিতে ঢেকে যায়। এর মূল রহস্যটি আমরা অনেকেই দেখি, কিন্তু তাকে যে 'উইঢিবি' বলা যেতে পারে তা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। অথচ কোনো মানুষ যখন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্রকল্প গড়ে তোলেন, তা সে কৃষিপ্রকল্প হোক, তন্তুপ্রকল্প হোক আর একটা শান্তিনিকেতন গড়ে তোলাই হোক, দেখা যায়, তিনি তাঁর নিজের তৈরি করা বাস্তবতার ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, 'আপনারে দিয়ে / রচিলি রে কী এ / আপনারই আবরণ।'

'উপজিহ্বিকা'কে বা আলজিভকে এবং উইপোকাকে বলা হয় **বল্মী**। কোনো বস্তুকে লেহন করে বা চেটে নেয় জিভ। উপজিভ বা আলজিভ এবং উইপোকা উভয়েই তার সহযোগী ক্রিয়া করে। জীবজগতের উইপোকা শুকনো কাঠ চেটে চেটে খেয়ে তার নিজের জিভ থেকে রস বের ক'রে তা দিয়ে উইঢিবি তৈরি করে, যা কিনা

পর্ব্বত-এর **ক্ষুদ্র** সংস্করণ। মানবসমাজের উইপোকা পুরোনো সংস্থা বা বৃক্ষের (দ্র. **গাছ, বৃক্ষ**) নিয়মাদি জেনে সেই জ্ঞানরস দিয়ে নতুন ধরনের সংস্থা বা **পর্ব্বত** গড়ে তোলে; এবং প্রায়শই সেটা সে করে নিজেকে ঘিরেই। **চ্যবন** ও **বাল্মীকি**র গা ঢেকে দেওয়া উইঢিবির মূলে রয়েছে এই ব্যাপার।

ভারতে নাকি প্রায় সত্তর রকম রাম-কাহিনী প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে **বাল্মীকি**-রামায়ণই প্রধান। লোকপ্রবাদ এইরূপ যে, রাম না জন্মাতেই **বাল্মীকি**-রামায়ণ লেখা হয়েছিল; পরে রাম জন্মগ্রহণ করে লিখিত রামায়ণ অনুসারেই তাঁর ভূমিকা পালন করেন। এর অর্থ হল, বিনিয়োগ-পুঁজি (অর্থাৎ যে টাকা খেলে = নগদ-নারায়ণের রম্য রূপ = **রাম**) কীভাবে বিনিয়োগ করা হবে, **বাল্মীকি** নামের এক বা একাধিক মহর্ষি তার একটি প্রকল্প রচনা করেন। তদনুসারে ভারতসমাজে যে পাইকারী কৃষি-উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালান হয়েছিল, সেই ঘটনাবলীই রয়েছে **রামায়ণ**-এর কাহিনীতে। যতদূর বোঝা যায়, **বাল্মীকি** সেই কর্মযজ্ঞের হোতা বা পরামর্শদাতা ছিলেন। ...

এর ফল হয় মারাত্মক। ভারতসমাজের যে সামাজিক কাঠামো ছিল, সেই কাঠামো ভেঙে পড়ে, **নর বানর** সৈন্য নিয়ে ক্ষমতাকেন্দ্র বা **লঙ্কা** দখল করা হয়, 'পুরোহিতশ্রেষ্ঠ' **রাবণ** পর্যুদস্ত হয়, ভারতে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠিত হয়; বৈদিক যুগ সমাপ্ত হয়ে গিয়ে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। প্রতীকী ভাষায় একেই বলা হয় **বৌদ্ধযুগ**। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এটিই আদি শিল্পবিপ্লব, যার ভিত্তিতে ছিল লক্ষ্মীপুঁজি। কিন্তু এই যুগ বেশিদিন স্থায়ী হয় না, ঘটে যায় প্রতিবিপ্লব। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতিবিপ্লবকে বলেছেন 'প্রতিক্রিয়ার যুগ' বা 'হিন্দু যুগ'। যাঁরা **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই **রাম** ও **বাল্মীকি**দের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। নতুন ক্ষমতাধরেরা ঘৃণায় থুতু ছিটিয়ে 'ছি ছি ছি! রাম রাম! রাম রাম!' করতে থাকেন। **বাল্মীকি, রাম** প্রভৃতি উপাধিধারী মানুষদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের চামার মেথর অস্পৃশ্য শূদ্র ঘোষণা ক'রে অন্তেবাসী করে দেওয়া হয়। এবং এই কুকর্মের পুরো ইতিহাসটাই লোপাট করে দেওয়া হয়। ...

কিন্তু তাতে কী! সত্য কি কখনো চাপা থাকে, নাকি খুনীকে অকুস্থল ছেড়ে দেয়? **বাল্মীকি** ও **রাম** উপাধিধারী ভারতীয়রা অতি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য সর্বহারা হয়ে ঘুরতে থাকে সারা ভারত জুড়ে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর উঠে আসেন জগজীবন **রাম**, কাঁশী**রাম** ... ইত্যাদি মানুষেরা। প্রশ্ন উঠতে থাকে — এই **রাম** ও **বাল্মীকি** পদবীধারী মানুষেরা 'ছোটলোক' হয়ে গেলেন কেমন করে? এঁদের সংখ্যাও এখন নেহাত কম নয়, প্রায় এক কোটি। কে কীভাবে কখন তাঁদের 'মেথর', 'চামার', 'অস্পৃশ্য', 'শূদ্র', 'ছোটলোক' বানাল? হিন্দুধর্ম-নিয়ন্ত্রক মঠাধীশেরা — যোশীমঠ, শৃঙ্গেরীমঠ, পুরীমঠ, ও দ্বারকামঠ — এই বিষয়ে কিছু বলেন না কেন? যদিও সম্প্রতিকালে মায়াবতীর দল ও আর এস এস ভারতবাসীর সমস্ত পদবী তুলে দেওয়ার দাবি করেছে, কিন্তু মূল চাবিকাঠিটি তো তাঁদের হাতে নেই, রয়েছে এই মঠাধীশদের হাতে। তাঁদের আদিপুরুষেরাই তো বৌদ্ধযুগ-পরবর্তী সমাজকাঠামোর পত্তন করেন। তাঁরা চুপ কেন? আর কতদিন চুপ থাকবেন?

বাল (বালক, বালা, বালিকা) : **১.** ✓বল্ + অ (ণ) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *(সত্তার)* ***বল*** *হইতে জাত।* ***বালক*** *=* ***বাল*** *কৃত যাহাতে।* ***বালা*** *=* ***বাল****-এর আধারশক্তি যে।* ***বালিকা*** *=* ***বাল****-কে গতিশীল বা সক্রিয় করে যে আধারশক্তি।* **৩. বাল** = অচিরজাত, শিশু (infant), ষোড়শবর্ষাবধিবয়স্ক, (সাদৃশ্যে) মূর্খ, অচিরপ্রসূত বৎস, নব, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত, প্রথমোদিত, নবোদিত, নিত্যনতুন ... চিকুর, কেশ, কুন্তল ... ইত্যাদি। **বালক** = অল্পবয়স্ক অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, শিশু, মূর্খ ... ইত্যাদি। **বালা** = বালিকা, কন্যামাত্র, বালিকাত্বহেতু কার্য্যাবধারণাক্ষমা নারী, ... ঘৃতকুমারী, হরিদ্রা, মল্লিকাবিশেষ, ষোড়শী মহাবিদ্যা। **বালিকা (বালি, বালী)** = নবযুবতী, রসকলানভিজ্ঞা নারী, কন্যা। (ব.শ.)। **৪.** boy অর্থে **বালক** ও girl অর্থে **বালিকা** প্রচলিত। **বাল, বালা** অপ্রচলিত। **৫. বল** থেকে যা বেরোয়, সেটিই **বাল**। সেটি সত্তার সন্তান হতে পারে, নিত্যনতুন প্রকাশ হতে পারে, এমনকি তার কেশও হতে পারে। লম্বা চুল রাখে বলেই সম্ভবত girl-কে **বালা** বা **বালিকা** বলার প্রচলন হয়।

বালখিল্য ঋষি : **২.** ***বাল****-কে (সদ্যপ্রসূতকে)* ***খিল*** *(দ্র.* ***খিল****) করা থাকে যাহাতে; অর্থাৎ,* ***বাল****-ত্ব স্তব্ধ করে রাখা আছে যাহাতে।* **৩.** মুনিগণবিশেষ (ইঁহারা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক ও চতুর্ব্বিধ বনবাসীর একতম। নব অন্ন পাইলে ইঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন। ব্রহ্মার পুত্র ক্রতুর ভার্য্যা ক্রিয়ার গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। (ব.শ.)

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাট হাজার ঋষি। ঋগ্‌বেদের উল্লেখ অনুসারে এঁরা ব্রহ্মার লোম হতে উদ্ভূত মানসপুত্র। ... খর্বাকৃতি ও দুর্বল বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে মাত্র একটি পত্র বহন করে আনার সময় জলপূর্ণ এক গোষ্পদে পতিত হন। তাই দেখে ইন্দ্র এঁদের উপহাসপূর্বক লঙ্ঘন করে চলে যান। এইরূপে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বালখিল্যরা অধিকতর বলশালী এক ইন্দ্রের উৎপত্তির জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই সংবাদ অবগত হয়ে ইন্দ্র কশ্যপের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তখন বালখিল্যদের বলেন যে, ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁকে আর একটি ইন্দ্র সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মার নিয়ম অমান্য করা হবে। তবে অন্য ইন্দ্র জন্মগ্রহণ না করে এক পক্ষীশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করবে। কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করে বালখিল্যরা সন্তুষ্ট হন। ... এরপর কশ্যপের স্ত্রী বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। ... গরুড় জন্মের পর ক্ষুধার্ত হয়ে পিতার নির্দেশে গজকচ্ছপ ভক্ষণের জন্য এক বটবৃক্ষের শাখায় স্থান গ্রহণ করলে তার ভারে শাখা ভগ্ন হয়। বালখিল্য মুনিগণ সেই শাখায় অধোমুখে ঝুলে তপস্যারত ছিলেন। গরুড় চঞ্চুপুটে উক্ত শাখা ধারণপূর্বক এঁদের নিয়ে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হলে, কশ্যপের অনুরোধে বালখিল্যগণ হিমালয়ে তপস্যা করতে যান। (পৌ.অ.)। **৪.** সাধারণভাবে অপ্রচলিত। **৫.** পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাভাষীদের অনেকে ইউরোপের সংস্পর্শে এসে 'লিলিপুট'-এর খবর জেনে উল্লসিত হন — কী অদ্ভুত কল্পনা! কিন্তু তাঁর নিজের পূর্বপুরুষেরা যে বহুকাল আগেই 'অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত' মানুষদের দেখে ফেলেছিলেন এবং তাঁদের ইতিহাস লিখে গেছেন, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না। ...

মনে রাখা দরকার, 'লিলিপুট' একটি অবাস্তব কল্পনামাত্র, আমাদের **বালখিল্য ঋষিরা** কিন্তু আদৌ অবাস্তব নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। আমাদের চারদিকে তাঁরা বিদ্যমান রয়েছেন, এবং সম্প্রতিকালে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছেন। তবে হ্যাঁ, আমরা তাঁদের দেখতে ও চিনতে ভুলে গেছি। কারা তাঁরা?

তাঁরা হলেন আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা এমন এক শ্রেণীর মানুষ, যাঁদের মানসশরীরের বাড়বৃদ্ধি হয়নি; প্রায় বালকের মন নিয়ে তাঁরা জীবন অতিবাহিত করে থাকেন। এরকম হয় অতি সঙ্কীর্ণ কোনো শিক্ষায় ও কর্মে সারাজীবন ধরে নিযুক্ত থেকে একই আবহাওয়ায় জীবন কাটালে। তাতে মস্তিষ্কের বিকাশ হয় না। এঁরা ছোট মাপের মানুষ। এঁদের চেয়ে একটু উঁচু মাপের মানুষকে আমাদের কলকাতার 'পণ্ডিতেরা' নাম দিয়েছেন 'মধ্যমেধার মানুষ'। তার চেয়ে আরও নীচু মাপের মানুষ তাঁদের বিচারে নিশ্চয়ই 'নিম্নমেধার মানুষ'। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা বালক-সম মেধার প্রাপ্তবয়স্ক-মানুষকে নাম দিয়েছিলেন **বালখিল্য**। এঁরা যখন কোনো কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হন, তখন এঁদের বলা হয় **বালখিল্য ঋষি**। একালের অ্যাকাডেমিগুলি কি এখন **বালখিল্য**দের জন্ম দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি? কপিল সিব্বল মহাশয়ের শিক্ষা-প্রকল্পকে **বালখিল্য ঋষি** গড়ার সার্বিক প্রকল্প বললে কি ভুল বলা হবে?

বালী : ১. বাল + ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. ***বাল**-এর গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে; অথবা, সামাজিক (যৌথ) মালিকানার সক্রিয় আধার যে।* ৩. কপিরাজ। এঁর রাজধানী ছিল কিষ্কিন্ধ্যা। বালীর স্ত্রী তারা, পুত্র অঙ্গদ, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব। নারীবিশেষের বালে (কেশে) পতিত ইন্দ্রের বীর্য হতে জন্ম-হেতু এঁর নাম বালী। একবার মেরুপর্বতে যোগাসনে আসীন অবস্থায় ব্রহ্মার নেত্র হতে অকস্মাৎ অশ্রুপাত হয় এবং সেই অশ্রুবিন্দু হতে ঋক্ষরজা নামে এক বানরের উৎপত্তি হয়। এই বানর মেরুপর্বতের এক সরোবরে স্নান করে এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র ও সূর্য উভয়েই এই নারীকে দেখে কামাতুর হন এবং এঁর মস্তকে ইন্দ্রের ও গ্রীবায় সূর্যের রেতঃপাত হয়। ইন্দ্রের বীর্য হতে বালী এবং সূর্যের বীর্য হতে সুগ্রীব জন্মগ্রহণ করে। এই নারী পরে বানররূপ প্রাপ্ত হয়ে দুই পুত্রসহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলে, ব্রহ্মার আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় বিশ্বকর্মা নির্মিত পুরীতে বানরাধিপতি হয়ে বাস করতে থাকেন। তারপর বালী এই রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হন। ... একবার রাবণ যুদ্ধার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর নিকট উপস্থিত হলে, তাঁর অমাত্যগণ রাবণকে বলেন যে, বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনার্থ গিয়েছেন। দক্ষিণ সমুদ্রে গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। রাবণ দক্ষিণ সমুদ্রে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যারত বালীকে ধরবার জন্য নিঃশব্দে উপস্থিত হলে, বালী তাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়েও চুপ করে রইলেন। রাবণ নিকটবর্তী হওয়ামাত্রই বালী তাঁকে বক্ষপুটে ধারণপূর্বক এক লম্ফে আকাশে উত্থিত হয়ে ক্রমান্বয়ে চারি সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। ... রাবণ বালীর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে প্রত্যাবর্তন করেন। ... দুন্দুভি নামক অসুরকে বধ করার সময় তার রক্ত ঋষ্যমূক পর্বতে পতিত হওয়ায় মতঙ্গ মুনি অভিশাপ দেন যে, আশ্রমদূষিতকারী আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে উপস্থিত হলে তখনই তার মৃত্যু হবে। সেই ভয়ে বালী ঋষ্যমূক পর্বত পরিহার করতেন। ... দুন্দুভির পুত্র মায়াবীকে বধ করার জন্য ... বিবরে প্রবেশ করলে, যতক্ষণ না তিনি প্রত্যাবর্তন করেন, ততক্ষণ সুগ্রীবকে বিবর-দ্বার রক্ষা করতে বলেন। ... এক বৎসরেরও অধিককাল অপেক্ষা করে বালী ফিরলেন না দেখে ... সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরে বালী মায়াবী অসুরকে নিধন করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন এবং ভ্রাতার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিতাড়িত করেন এবং তার স্ত্রী রুমাকে গ্রহণ করেন। সুগ্রীব ভীত হয়ে হনুমান প্রভৃতি অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নেন। ... সীতান্বেষণে রত রাম-লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের সখ্যতা হলে রাম বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধে অন্তরাল হতে শরাঘাতে বালীকে বধ করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ঋক্ষরজা, কিষ্কিন্ধ্যা**। এখন আমরা ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে বাস করি। তাই বলে কি কোনোরকম যৌথ বিষয় আমাদের নেই? আছে, অবশ্যই আছে এবং এখনও এত বেশি পরিমাণে আছে যে, সমগ্র দেশের সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন বিষয় ও বস্তুর মোট মূল্যের চেয়ে যৌথ বিষয় ও বস্তুর মূল্য অনেক বেশি। নদী সমুদ্র বন পাহাড় আকাশ পাতাল ... সবই তো এখনও যৌথ সম্পত্তি; রেল, জাহাজ, স্বরাষ্ট্র ... এসব খুঁটিনাটি বিষয়ের কথা নাই বা বললাম। তো, এসবের মালিকানা বা **কেশ** ধারণ করে রাখে কে? যে তা ধারণ করে রাখে, তাকেই বলা হয় **বালী**; একালের ভাষায় তাকে **আমলা**তন্ত্র বলে।

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে নির্বাচিত সরকারের নেতাদের সম্পর্ক নিয়ে একালে কিছু কিছু বইপত্র আছে। কিন্তু তাদের প্রাচীন রূপের সম্পর্কে তেমন কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালে রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্পর্কের বিস্তারিত সংবাদ রয়েছে **রাবণ-বালী** ও **রাম-সুগ্রীবে**র কাহিনীতে। তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থার আমলাতন্ত্রকে বলা হত **বালী** এবং রাষ্ট্রকে বলা হত **দশানন**। বৌদ্ধবিপ্লবকালে দেখা যায়, এই **বালী**কে বিপ্লবী শক্তি খানিকটা অন্যায়ভাবেই মেরে ফেলে এবং তার স্থানে তারই ভাই **সুগ্রীব**কে বসিয়ে দেয় — একালে যেমন নেতার দল বদলে গেলে আমলার দলও বদলে যায়, অনেকটা সেইরকম। কিন্তু তাদের কেরানিকুল বা **তারা** থেকে যায় একই।

বশ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবশ, অবশী, অবশ্য, অবশ্যকরণীয়, অবশ্যকার্য্য, অবশ্যভব্য, অবশ্যম্, অবশ্যম্ভাবিতা, অবশ্যম্ভাবী, অবশ্যা, আবশ্যক, উশনা, উশীনর, উশীর, উশুল, বশ্, বশ, বশংবদ, বশকর, বশক্রিয়া, বশগ, বশত, বশতঃ, বশতা, বশবর্তী, বশা, বশাৎ, বশানুগ, বশিতা, বশিষ্ঠ, বশী, বশীকর, বশীকরণ, বশীকৃত, বশীকৃতি, বশীভূত, বশীন্দ্র, বশ্য, বশ্যতা, বশ্যা, বাশ(স), বাশক, বাশন, বাশিত, বাশিতা, বাশি(সি)ষ্ঠ, বাশিষ্ঠী, বাশী, বাশুলি(লী), বাসলি(লী), বাসিষ্ঠ, বাসুলি(লী), বিবশ।

বশ্ = বাহীর (শক্তি) বিচ্ছুরণ। **বশ** = বাহীর (শক্তি) বিচ্ছুরণ যাহাতে। (একে আরেক ভাবেও প্রকাশ করা যায় — **বশ্** = বাহীর

পূর্ণ অস্তিত্বায়ন; বশ = বাহীর পূর্ণ অস্তিত্বায়ন যাহাতে। আসলে **অস্তিত্ব মাত্রেই** তার তেজ বা শক্তি থাকে। সেই শক্তির সকল দিকের, **শারীরিক-মানসিক** সকল প্রকারের বিচ্ছুরণের কথা এখানে বলা **হচ্ছে**। একে **শক্তিরূপে** শুয়ে থাকাও বলা যায়, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকা **বলা যায় না**। বাইরে থেকে দেখলে দেখা যায়, সত্তার থেকে বিচ্ছুরিত এই তেজ সত্তাকে ঘিরে একটা আবেশ তৈরি করে রেখেছে। সেই আবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া মানেই **বশ**-এর অধীনে চলে আসা। **বশ্** ক্রিয়াটি সেই আবেশের এলাকার অন্তর্ভুক্তীকরণ বোঝায়।)

অবশ : (অবশ্য, অবশ্যম্ভাবী, আবশ্যক) : ২. *অবশ = নেই **বশ** যাহাতে; অর্থাৎ, যে **বশ** মানে না কিংবা অন্যকে **বশ** মানায় না, (আত্মস্বরূপে যথাস্থিত থাকে)। **অবশ্য** = **অবশ** (বা 'আত্মস্বরূপে যথাস্থিতি') থাকে যাহাতে। **অবশ্যম্ভাবী** = যাহার উদ্ভব **অবশ্য**ই হইবে। **আবশ্যক** = যাহা **অবশ্য** করিতে হয় (নইলে আত্মস্বরূপে যথাস্থিতি থাকে না)। /* **অবশ** = যাহার বশ (আপনার সম্বন্ধে আয়ত্ততা) নাই। **অবশ্যম্ভাবী** = যাহা অবশ্য ঘটিবে। **আবশ্যক** = নিয়ম হেতু কর্ত্তব্য যাহা। (ব.শ.)। **৩. অবশ** = অস্বতন্ত্র, অস্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, অন্যের আয়ত্ততাহীন, স্বেচ্ছাচারী, স্বরক্ষণাক্ষম, আত্মরক্ষাসমর্থ, অসংযত, অনিয়তেন্দ্রিয়, প্রতিকূল। **অবশ্য** = বশ্যভিন্ন, অনায়ত্ত, স্বতন্ত্র, অনধীন, দুর্দ্দান্ত, অপরিহার্য্য, অবর্জ্জনীয়; 'অবশ্যকরণীয়, অবশ্যকর্ত্তব্য' ইত্যাদি সমস্ত শব্দ হইতে 'অবশ্য' গৃহীত, অপরিহার্য্য-ভাবে, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। **অবশ্যম্ভাবী** = নিশ্চিত ভবিতব্য, অপরিহার্য্য। **আবশ্যক** = অবশ্যম্ভব, অবশ্যকর্ত্তব্য, অবশ্যম্ভাব, অবশ্যকর্ত্তব্যতা, প্রয়োজনীয়তা, দরকার। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দেখা যাচ্ছে, ব.শ. **অবশ** শব্দের যে অর্থগুলি দিয়েছেন, সেগুলি পরস্পর-বিরোধী — অস্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র; অস্বাধীন, স্বাধীন ... ইত্যাদি। কেন? আবার, যে **বশ্য** নয়, সে **অবশ্য** পদবাচ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে নিশ্চয়তার প্রসঙ্গ আসে কেমন করে?

এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে **অবশ** শব্দটির গভীরে। এ শব্দটি **অজ, অজয়** ... প্রভৃতি শব্দের মতো। যা নিজে কারও **বশ** মানে না কিংবা অন্য কাউকে **বশ** মানায় না, সেই হল **অবশ**। এরকম শব্দের প্রতীকী অর্থ দেওয়া খুবই কঠিন। চেষ্টা করলে ভুল হয়, পরস্পর-বিরোধী হয়, নিরর্থক হয়ে যায়। **অজ, অজয়, অমূল্য** ... প্রভৃতি শব্দের অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা ঘটেছে। কেননা, এই **অবশ** স্বভাবতই এমন এক সত্তা, যা কারও অধীনে গিয়ে নিজের পূর্বতন সত্তার স্বরূপ হারায় না; আবার, কাউকে অধীন করে নিজের পূর্বতন সত্তার স্বরূপ বদলে ফেলে না। তার মানে, এই '**অবশ**ত্ব যার ভিতরে থাকে', সেই **অবশ্য** তার আপন সত্তাটিকে তার আত্মস্বরূপে যথাস্থিত বলবৎ ও সক্রিয় রাখে। আর, সবাই জানেন, আত্মস্বরূপ বজায় রেখে নিজের বিকাশ সাধন করে চলাই প্রতিটি সত্তার অস্তিত্বের অন্যতম শর্ত। সেজন্যই **অবশ্য** শব্দের অভিধার্থ যখন '**অবশ** থাকে যাহাতে' হয়, তখন তার ব্যঞ্জনার্থ গিয়ে পৌঁছায় 'যাহা নিশ্চয় করিতে হইবে', নইলে অস্তিত্বই থাকবে না। স্বভাবতই **অবশ্য** গিয়ে পৌঁছে যায় **আবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী** ... ইত্যাদিতে। **৬.** ইংরেজি abash, bash, basin ... ইত্যাদি বেশ কিছু শব্দ একই উৎস থেকে জাত।

উশীনর : দ্র. ১ম খণ্ড।

বশ (বশংবদ, বশতঃ, বশবর্ত্তী, বশ্য, বশ্যতা) : **১.** ✓বশ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বশ = উপরে **বশ** দ্রষ্টব্য। **বশংবদ** = **বশ** হয়েছি, বলে যে। **বশতঃ** = **বশ** তারিত হইয়া বিসর্জ্জিত হয় যেখানে বা যাহাতে। **বশবর্ত্তী** = **বশ**-এর এলাকার অভ্যন্তরে আবর্ত্তমান যে। **বশ্য** = **বশ** থাকে যাহাতে। **বশ্যতা** = **বশ্য** তারণের আধার যে। /* **বশংবদ** = 'আমি বশ' ইহা যে বলে; যে বশকর অর্থাৎ মধুর বলে। (ব.শ.)। **৩. বশ** = আয়ত্ত, অধীন, নির্দেশবর্ত্তী; ইচ্ছা, স্পৃহা, আয়ত্ততা, অধীনতা, প্রভুত্ব, প্রভুভাব, আজ্ঞা, প্রভাব, শক্তি। **বশংবদ** = বশীভূত, আয়ত্ত, মধুরভাষী। **বশতঃ** = বশহেতু, আয়ত্ততা হেতু, বশে। **বশবর্ত্তী** = বশস্থিত, অধীন। **বশ্য** = বশে স্থিত, আয়ত্ত, বশীভূত, অধীন, জিত, অনুকূল, আদেশবর্ত্তী, বচনকর। **বশ্যতা** = বশ্যভাব, অধীনতা। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আজকাল প্রযুক্তির এত বিকাশ হয়েছে যে, একজন মানুষের শরীর থেকে যে তেজের বিচ্ছুরণ ঘটে, তার ছবিও তুলে ফেলা যায়। সেরকম ছবি দেখে মনে হয়, মানুষটির শরীর ঘিরে রয়েছে আগুনের বলয়। **বশ** শব্দের ভিতরে যে বাহীর তেজের বা শক্তির কথা বলা হয়, তা হল মূলত মানসিক শক্তি — বাহী-সত্তাটির প্রভাব। সেই প্রভাবের একটা অদৃশ্য বলয় বা বৃত্ত থাকে; উপরোক্ত আগুনের বলয়ের মতো। সেই বৃত্তের ভিতরে কাউকে আনতে পারলেই তাকে **বশ** করা হয়ে যায়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় সেই এলাকার ভিতরে ঢুকে পড়ে। তাদের **বশংবদ, বশবর্ত্তী** ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ) : **১.** বশিন্ + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন্)। (ব.শ.)। **২.** *বশিষ্ঠ = **বশ** (দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর শক্তিবিচ্ছুরণ) গতিশীল হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত ও স্থিত হয় যাহাতে; জ্ঞানের আশ্রয় যাহাতে; যে সত্তা অন্যদের **বশ** করিতে অত্যন্ত পটু। **বসিষ্ঠ** = বাহীর ন্যূনতম-অস্তিত্ব গতিশীল হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে স্থিত ও টঙ্কারিত হয় যাহাতে; যে সত্তা শ্রেষ্ঠভাবে 'বসা'র মতো বসে। /* **বশিষ্ঠ** = (যিনি) অতিশয় বশী; ইন্দ্রিয়গণকে যিনি অতিশয় বশ করেন। **বসিষ্ঠ** = (যাঁরা) বসুমদ্‌গণের (অণিমাদিপ্রাপ্ত মহাযোগিগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (ব.শ.)। **৩. বশিষ্ঠ** = জিতেন্দ্রিয়, ঋষিবিশেষ (... মহাভারতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র; ভাগবতে ইনি স্বয়ম্ভূর প্রাণ হইতে উৎপন্ন; মনুসংহিতায় বিরাট পুরুষ মনুর তপস্যাসৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম; হরিবংশে ইনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্রের একতম; পুরাণান্তরে ইনি সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের একতম। ... (ব.শ.)। ইনি মিত্রাবরুণের পুত্র। সে কারণ এঁর নাম মৈত্রাবরুণি। ইনি সৃষ্ট দশ প্রজাপতির অন্যতম। হরিবংশ মতে ইনি ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্রের অন্যতম। পুরাণান্তরে ইনি আবার সপ্তর্ষিগণের মধ্যেও একজন। ঋক্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলের এবং অন্য বেদেও ইনি ঋষি। ইনি সূর্যবংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত। অরুন্ধতী এঁর স্ত্রী, (পুত্র শক্তি꠱) ও পরাশর এঁর পৌত্র। এঁর কৃপায় শকত্রি শাপে রাক্ষসযোনিপ্রাপ্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা

সৌদাস শাপমুক্ত হন। রামচন্দ্রের কাছে ইনি যে রামায়ণ কীর্তন করেন, তাহা যোগবাশিষ্ঠ নামে খ্যাত।

একবার বিশ্বামিত্র সসৈন্য মৃগয়ায় গিয়ে পিপাসার্ত হয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে এক কামধেনু ছিল। এই কামধেনুর নিকট যাহা প্রার্থনা করা যেত, তাহাই পাওয়া যেত। বশিষ্ঠ ঐ কামধেনুর সাহায্যে বিশ্বামিত্রের অসংখ্য সৈন্যকে নানা প্রকার খাদ্যে পরিতোষের সঙ্গে সংকার করেন। নন্দিনীর রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিজের রাজ্যের পরিবর্তে তাঁকে এই কামধেনু দান করতে বলেন। বশিষ্ঠ অসম্মত হওয়ায় ... বিশ্বামিত্র নন্দিনীকে হরণ করতে চেষ্টা করেন। বশিষ্ঠের আদেশে নন্দিনী তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হতে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে দেয়। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠের প্রতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করতে থাকেন; কিন্তু বশিষ্ঠ একাকী ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে সমস্তই ভস্মীভূত করে ফেলেন। তখন বিশ্বামিত্র গ্লানিভরে বলেন যে, ক্ষত্রিয় বলকে ধিক! বহ্মতেজই প্রকৃত বল ... অতঃপর বিশ্বামিত্র রাজ্যত্যাগ করে তপস্যায় নিরত হন। ... শক্তি্ রাজা কল্মাষপাদকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দেন। ... একসময়ে কল্মাষপাদকে যজমান রূপে লাভের জন্য বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। ... বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস রাজা কল্মাষপাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর কল্মাষপাদ বিকৃতরূপ রাক্ষসে পরিণত হন। একদিন সেই রাক্ষসই শক্ত্রিকে বধ করে ভক্ষণ করে। এরপর বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় সেই রাক্ষস বশিষ্ঠের শত পুত্রের সকলকেই ভক্ষণ করে। পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ... নানা দেশ ভ্রমণ করে শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে পশ্চাতে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেয়ে দেখেন যে, শক্ত্রির গর্ভবতী স্ত্রী (অদৃশ্যন্তী) তাঁকে অনুসরণ করছেন এবং উক্ত গর্ভের সন্তানের বেদপাঠের ধ্বনিই শ্রুত হচ্ছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে এবং তার দ্বারা বংশরক্ষা হবে — এই কথা জ্ঞাত হয়ে আনন্দিত বশিষ্ঠ পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে আসেন। পথিমধ্যে কল্মাষপাদ-রূপী রাক্ষস বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলে, তিনি তার শরীরে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করে তাকে শাপমুক্ত করেন এবং তাকে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে ও ব্রাহ্মণকে অপমান না করতে বলেন। কল্মাষপাদ ব্রাহ্মণদের পূজা করতে স্বীকৃত হন এবং পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ তখন কল্মাষপাদের স্ত্রীর গর্ভে অশ্মক নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন।

... অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে রাজর্ষি নিমি একবার ... বশিষ্ঠকে পুরোহিত রূপে বরণ করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেই বশিষ্ঠ ইন্দ্রের এক যজ্ঞে বৃত হয়েছিলেন বলে নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে নিমির যজ্ঞে নিযুক্ত হতে সম্মত হন। বহু বৎসর পরে ইন্দ্রের যজ্ঞ হতে ফিরে এসে তিনি জ্ঞাত হন যে, নিমি গৌতম ঋষির সাহায্যে ইতঃপূর্বেই যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেছেন। তখন বশিষ্ঠ ... ক্রুদ্ধ হয়ে নিমিকে অভিশাপ দেন যে, নিমির দেহ চেতনাবিহীন হবে। নিমিও বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হওয়ায় বশিষ্ঠকে প্রত্যাভিশাপ দেন যে, বশিষ্ঠও চেতনাবিহীন হবেন। তখন বশিষ্ঠ অশরীরী হয়ে অন্য দেহ ধারণের জন্য ব্রহ্মার সমীপস্থ হন এবং একটি দেহ দান করার জন্যে তাঁর নিকট প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বলেন। ফলে ... উর্বশীর গর্ভে ... বশিষ্ঠ আবার শরীরী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। উক্ত সময় রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি ও রাজ্যনাশ, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ইত্যাদির জন্য বিশ্বামিত্রই দায়ী ছিলেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং অভিশাপ দিয়ে বিশ্বামিত্রকে এক বকপক্ষীতে পরিণত করেন। বিশ্বামিত্রও প্রতিশোধস্বরূপ বশিষ্ঠকে অন্য এক পক্ষীতে পরিণত করেন। পক্ষীরূপেই এই দুই ঋষি এমন ঘোর যুদ্ধে নিযুক্ত হন যে, সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য প্রাণী ধ্বংস হয়। তখন ব্রহ্মা তাঁদের পূর্বদেহ ফিরিয়ে দিয়ে দুই জনের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে এই কলহের অবসান ঘটান।

রামায়ণ অনুসারে বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের কুলপুরোহিত ছিলেন। দশরথের পুত্রদের জাতকর্ম, বিবাহ, অভিষেক ইত্যাদি কর্মে ইনি পৌরোহিত্য করেন। বনবাসান্তে রাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বশিষ্ঠ তাঁর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্র ও পরামর্শদাতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. সাধারণভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু পদবীরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অংরূপিণী, অগস্ত্য, অগ্নি, ইন্দ্র, কামধেনু, গৌতম, নন্দিনী, নিমি, কল্মাষপাদ, পরাশর, বিশ্বামিত্র**। যেহেতু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে **বশিষ্ঠ** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, সেই হেতু তাঁর কাহিনীও বিশাল। আমরা অতি সংক্ষেপে মূল কথাগুলি বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। তার আগে পাঠকপাঠিকা উপরোক্ত **অংরূপিণী** ... ইত্যাদি শব্দগুলি দেখে নিন।

'একটু বেরিয়ে দেখাই যাক না! না না, যেমন আছি তেমন থাকি।' — প্রতিটি জীবন্ত সত্তার মধ্যে এই **দ্বিধা**। এমনকি, চলমান একটি সমাজদেহের (= বিরাট পুরুষের) মধ্যেও এই **দ্বিধা** থাকে। এই **দ্বিধা**র থেকে যে যমজ সত্তাটির সাক্ষাৎ মেলে, প্রাচীন ভারত তার নাম দিয়েছিলেন **মিত্র** ও **বরুণ** বা **মিত্রাবরুণ**। পরবর্তীকালের বাইবেল যে সত্তা দুটিকে 'এসৌ-যেকব' এবং কোরান যাদের 'ইসমাইল-ইয়াকুব' নামে শনাক্ত করেছেন, **মিত্রাবরুণ** তাদেরই প্রাচীন ভারতীয় নাম। এই **বরুণ** থেকেই আমাদের **যক্ষ** সত্তার জন্ম; ইহুদী উপাদানে নির্মিত খ্রিস্টীয় বাইবেল বা পুরাকাহিনীর হিসাবমতো সেটিই 'যেকব' (Jacob) এবং আরব দেশে সেই সত্তাই 'ইয়াকুব' নামে শনাক্ত। ভারতীয় উত্তরাধিকারে এই **যক্ষ** সত্তাই একসময় সুদখোর-পুঁজির ধারক-বাহক হয়ে যায়।

ভারতসমাজের ইতিহাসে **মিত্রাবরুণ** নামক এই যমজ সত্তাটি থেকে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারার জন্ম হয়। **মিত্র** থেকে জন্মলাভ করেন **অগস্ত্য** (পুঁজিবাদী ধারা) এবং **বরুণ** থেকে জন্মলাভ করেন **বশিষ্ঠ** (অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক ধারা)। এই **বশিষ্ঠ** স্বভাবতই প্রচলিত বৈদিক-ব্যবস্থার (আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) দর্শনের ধারক-বাহক-প্রচারক রূপে ভারতসমাজে তার সুদীর্ঘ ভূমিকা পালন করতে থাকেন। **ইক্ষ্বাকু** বংশের বা **সূর্য্য**বংশের শাসক-পরম্পরায় একজনই তাঁদের পরামর্শদাতা, তিনি মহর্ষি **বশিষ্ঠ**। যেহেতু 'মহর্ষি' বলতে এক বা একাধিক বেদজীবীকে এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের

বোঝায়, অন্য মহর্ষিদের মতো **বশিষ্ঠ**ও একজন ব্যক্তিমাত্র নয়; একটি সুস্পষ্ট সামাজিক সত্তা। তাঁর অস্তিত্ব সনাতন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রসারিত। **বশিষ্ঠ** পদবীধারী মানুষজন আজও জীবিত আছেন। স্বভাবতই প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের **সূর্য্য**বংশী শাসকদের পৌরোহিত্য করতে **বশিষ্ঠের** কোনো অসুবিধাই হয়নি। এই সত্তাটি ভারতের সমস্ত অর্জিত জ্ঞানের ধারক-বাহক রূপে সক্রিয় থাকতেন। ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে এই **বশিষ্ঠ**-সত্তা ব্যক্তিমানুষকে তাঁর **ইন্দ্রিয়**গুলিকে **বশে** রেখে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবার পরামর্শ দিতেন। সমাজের ক্ষেত্রে এই **বশিষ্ঠ**-সত্তা সমাজের **ইন্দ্রিয়**গুলিকে **বশে** রেখে সমাজ-পরিচালনার পরামর্শ দিতেন। তার মানে, ভারতসমাজের অধিরাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের **চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক** ও **মন**কে **বশে** রেখে সমাজ-চালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটির দেখভাল করতেন এই **বশিষ্ঠ** সত্তা। এককথায় **বশিষ্ঠ**ই ছিলেন ভারতসমাজের প্রকৃত পরিচালক। ...

বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের জ্ঞানজীবীদের (= **ব্রহ্মা**র) প্রাণ থেকে। সেকারণেই যে **সপ্তর্ষি** সত্তা 'সপ্ত-চিরজীবী' রূপে আজও **বর্ত্তমান**, তাঁদের প্রথম নামটিই **বশিষ্ঠ**। আজও সপ্তর্ষির নাম লেখা হয় এইভাবে — **বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু**। (এ বিষয়ে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের উপসংহারের আগের 'সপ্তর্ষি' অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।)

মিত্র ধারায় আমরা আরো অনেকের সঙ্গে **বিশ্বামিত্র**কেও পাই। ইনি স্বভাবতই **বশিষ্ঠ**-বিরোধী। এমনকি বৌদ্ধযুগের বহু আগে আমরা যে **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**কে পাই, যিনি ছিলেন **মিত্র**-ধারার কার্যকরী সম্পাদক, তিনি যেভাবে বৈদিক ব্যবস্থাকে খানিকটা ধ্বংস করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে আমরা **কল্মাষপাদ**কে পাই **বশিষ্ঠ**-বংশ ধ্বংসের কাজে। আর সেটি **কল্মাষপাদ** করেছিলেন **বিশ্বামিত্রে**র প্ররোচনায়। প্রায় লুকিয়ে পড়া **ব্রাহ্মণ**-সত্তা তখন যে জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বাহিত ছিল, তারই নাম উপরোক্ত কাহিনীর 'অদৃশ্যন্তী'। দ্র. **উর্ব্ব, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**।

মোটকথা, **বরুণ** থেকে বৈদিক দর্শনের (আদিম সমাজতান্ত্রিক দর্শনের) ধারক-বাহক **বশিষ্ঠ** গোত্রের মানুষদের জন্ম হয়। আর, **মিত্র** থেকে শেষপর্যন্ত 'পুঁজিবাদের দর্শন' ও 'পুঁজিবাদী সমাজ'-এর সূচনা হয়। দর্শনের ফলিত প্রয়োগ সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ... ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আমরা এখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি বিচারের অন্তর্ভুক্ত করছি। সেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, **মিত্র** ও **বরুণ** অর্থাৎ **বিশ্বামিত্র** ও **বশিষ্ঠ** শেষমেষ গিয়ে হাজির হয়েছেন পরস্পরের **সখায়** ও **বৈরী**তে — বণিক-পুঁজি (mercantile capital) ও সুদখোর-পুঁজিতে (usurer capital-এ); যে কারণে **বশিষ্ঠ**-এর অধঃপতন ঘটে যায় '**বার্দ্ধুষিক-বসিষ্ঠ**' বা 'সুদখোর-**বসিষ্ঠ**'তে। ইনি '**বসু**মদ্‌গণ'-এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ — বলে গেছেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ। দ্র. **বসু**। তবে **বসিষ্ঠ** শব্দটিই বলে দেয়, **বশিষ্ঠ** গোত্রের জন্মসূত্রে-ব্রাহ্মণদের অতি নিকৃষ্ট অংশই **বসিষ্ঠে** পরিণত হয়েছিলেন। ...

স্বভাবতই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে **বশিষ্ঠে**র গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমে না। দ্বৈতাদ্বৈতবাহী শক্তি বহনের কারণে এই সত্তা যথার্থে মানবসভ্যতার সনাতন উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে আসছিল। সভ্যতা যত এগিয়েছে, ততই তার গায়ে নানান ক্লেদ জমেছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার গৌরব খুব কম নয়। ... ৬. গ্রীক ভাষায় basileus শব্দের মানে king রাজা। আর basilica শব্দের অর্থ ছিল রাজপ্রাসাদ। basilica শব্দটি ব্যবহার হত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন খ্রিস্টীয় উপাসনাভবন অর্থে। **বশিষ্ঠ** শব্দের সঙ্গে এর নৈকট্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

বস্ (বাসি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অধিবাস, অ়ধিবাসন, অধ্যুষিত, অপ্রবাস, অবস্ত, অবাস্তব, আওআস, আওবাস, আওয়াস (আবাস), আবসথ, আবাস, আয়স্ত, উস্র, নিবাস, নির্ব্বাসন, প্রবাস, প্রবাসী, প্রোষিত, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বইস, বস্, বস, বসত, বসতি, বসতিক্রম, বসন, বসনসদ্ম, বসনা, বসন্ত, বসন্তকাট, বসন্তকোকিল, বসন্তঘোষ, বসন্তজা, বসন্ততিলক, বসন্ততিলকা, বস়ন্তদূত, বসন্তদূতী, বসন্তপঞ্চমী, বসন্তবউ, বসন্তবউরি, বসন্তবন্ধু, বসন্তলতা, বসন্তসখ, বসন্তব্রণ, বসন্তমহোৎসব, বসন্তলক্ষ্মী, বসন্তসহায়, বসন্তী, বসন্তোৎসব, বসবাস, বসমাতা, বসা, বসাগন্ধী, বসামেহ, বসান, বসিষ্ঠ, বসু, বসুজ, বসুজা, বসুদ, বসুদা, বসুদেব, বসুধা, বসুধাতল, বসুধাধর, বসুধারা, বসুধারী, বসুধারিণী, বসুধালিঙ্গন, বসুনাথ, বসুন্ধরা, বসুন্ধরাধর, বসুপতি, বসুমতী, বসুমনা, বসুমাই, বসুমাতা (পদবী), বসুমান, বসুষেণ, বসোর্ধারা, বস্ত, বস্তব্য, বস্তা, বস্তাপচা, বস্তি (বসতি), বস্তিকর্ম্ম, বস্তিকোশ, বস্তিশিরঃ, বস্তু, বস্তুজাত, বস্তুজ্ঞান, বস্তুত, বস্তুতঃ, বস্তুতন্ত্র, বস্তুধর্ম্ম, বস্তুনির্দ্দেশ, বস্তুবিচার, বস্তুবিবর্ত্ত, বস্তুভাব, বস্তুভেদ, বস্তুমাত্র, বস্তূপমা, বস্ত্র, বস্ত্রকোষ, বস্ত্রখণ্ড, বস্ত্রগুপ্ত, বস্ত্রগৃহ, বস্ত্রনির্ণেজক, বস্ত্রপ, বস্ত্রপূত, বস্ত্রবন্ধ, বস্ত্রবন্ধন, বস্ত্রবেশ্ম, বস্ত্রযোনি, বস্ত্ররঞ্জন, বস্ত্রসংবীত, বস্ত্রাবকর্ত্ত, বস্ত্রার্দ্ধ, বস্বোকসারা (বস্বৌকসারা, সুইসব্যাঙ্ক), বাঁ(বা)সমতী, বাঃ (বস্), বাথান, বাথানি(নী)য়া, বাথুয়া (বেথুয়া, বেথুয়াডহরি), বাস, বাসক, বাসকসজ্জা, বাসকসজ্জিতা, বাসকা, বাসগৃহ, বাসগেহ, বাসঘর, বাসড়িয়া, বাসতেয়, বাসদেব, বাসন, বাসনকোশন, বাসনা (বাস্না), বাসনি(নী), বাসনি-বাঁশ, বাসন্ত, বাসন্তিক, বাসন্তী, বাসব, বাসবচাপ, বাসবজ, বাসবজিৎ, বাসবজেতা, বাসবত্রাস, বাসবদত্তা, বাসবদিক, বাসববিজয়ী, বাসবি, বাসবী, বাসবেয়, বাসবেশ্মন, বাসবোপম, বাসভবন, বাসভূমি, বাসমন্দির, বাসসজ্জা, বাসসদন, বাসর, বাসরঘর, বাসঃ, বাসা, বাসাঘর, বাসাবাড়ী, বাসাড়িয়া, বাসাড়ে, বাসি(সী), বাসিক, বাসিত, বাসিতা, বাসিন্দা, বাসি-বিয়া, বাসি-মালা, (পুর)বাসী, বাসী-পান্তা, বাসুকি, বাসুকেয়, বাসুড়িয়া, বাসুদেব, বাসুদেবী, বাসোদ, বাস্কল, বাস্কলি, বাস্ত, বাস্তব, বাস্তবিক, বাস্তব্য, বাস্তু, বাস্তুকর্ম্ম, বাস্তুকাল, বাস্তুঘুঘু, বাস্তুদেব, বাস্তুদেবতা, বাস্তুপাল, বাস্তুপুরুষ, বাস্তুবিদ্যা, বাস্তুমধ্য, বাস্তুযাগ, বাস্তুসম্পাদন, বাস্তুসাপ, বাস্তুক, বাস্তোষ্পতি, বিবসনা, বেথুয়া, বেথুয়াডহরী, বেসো, বোসজা, ব্যস, ব্রজবসতি, ভালবাসা, সহবাস, সুবসন, সুবাস।

বস্ (বাসি) = বাহীর নিঃশেষণ। **বস** = বাহীর শেষ অস্তিত্ব যাহাতে। **বাসি** = **বাস**-এর (= **বস** হইতে জাত) গতিশীলতা

যাহাতে। (দ্র. **বশ্**। বাহীর পূর্ণ অস্তিত্বায়ন হয় **বশ্** ক্রিয়ায়, আর আংশিক বা ন্যূনতম অস্তিত্বায়ন হয় **বস্** ক্রিয়ায়। সেই সুবাদে **বস** = বাহীর ন্যূনতম অস্তিত্বায়ন যাহাতে।)

বস (বসত, বসতি, বসন, বসবাস, বসা) : ২. **বস** = *বাহীর শরীরটুকুর অস্তিত্ব যাহাতে; বাহীর ন্যূনতম অস্তিত্বায়ন যাহাতে।* **বসত** = **বস** *তারিত যাহাতে।* **বসতি** = **বসত** *গতিশীল যাহাতে।* **বসন** = **বস** *অন (on) যাহাতে।* **বসবাস** = **বস** *ও* **বাস** *(নিম্নে* **বাস** *দ্র.)।* **বসা** = **বস**-*এর আধার যে।* / **বসন** = যাহার দ্বারা ছাদন সাধিত হয়। **বসা** = দেহে বাস করে যে। (ব.শ.)। ৩. **বস** = বাস করা, অবস্থান করা, উপবেশন করা, জানু গোড়ালি বা পাছায় ভর দিয়া অথবা জঙ্ঘা পাতিয়া বসা (to sit) ... ইত্যাদি; প্রবিষ্ট হওয়া, কোটরগত হওয়া ... ইত্যাদি। **বসত** = বাস, বাসস্থান। **বসতি** = বাস, অবস্থান, নিকেতন, ভবন, স্থান, লোকের বাসস্থান ... ইত্যাদি। **বসন** = ছাদন, আবরণ, বস্ত্র, পরিধান, আবরণ। **বসা** = দেহস্থ মাংস হইতে জাত ধাতুবিশেষ, মেদঃ, চর্ব্বি, তৈলময়পদার্থমাত্র; কোটরপ্রবিষ্ট (চক্ষু), দমা, তোবড়ান; বাস করান, অবস্থিত করা; উপবেশন করান, স্থাপিত করা, সংলগ্ন করা ... ইত্যাদি; প্রবিষ্ট করান, ঢুকান, শোষান, লাগান। (ব.শ.)। **বসবাস** = স্থায়ীভাবে বাস, স্থায়ী বসতি, সর্বদা বাস। (ব্যা.বা.অ.ঢাকা)। ৪. সকল শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **শ, ষ, স** বর্ণ তিনটির মধ্যে অর্থের কী পার্থক্য রয়েছে, তা আমরা **শ** বর্ণের অর্থ প্রদানকালে ব্যাখ্যা করেছি। সংক্ষেপে **শ** সার্বিক শক্তিবিচ্ছুরণকে (বাল্‌বের আলোর মতো), **ষ** দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণকে (টর্চের আলোর মতো) বোঝায়। এবং **স**-এ সেই দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের কিরণরেখার সংখ্যা কমতে কমতে একটি মাত্র রেখায় গিয়ে ঠেকে; এবং তারপর সে **বিসর্গে** (ঃ) পরিণত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

তার মানে, বাহীর আংশিক বা ন্যূনতম অস্তিত্ব থাকে **বস**-এ। অর্থাৎ, **বস**-এর বেলায় বাহীর অস্তিত্ব তার অজস্র সচল সক্রিয় আচরণকে সংযত করে নিয়ে স্থির রূপ গ্রহণ করে। সেভাবেই লোকে **বসে**, **বস** করে, **বাস** করে, **বসবাস** করে, **বসত** করে, **বসতি** গড়ে তোলে। কোনো সত্তার **বসা** মানে, একটি বিশেষ স্থানে বা কালে তার অস্তিত্বের স্থির রূপ বা নিম্নতম রূপ গ্রহণ করে নেওয়া। তাই **বসা** মানে 'উপ**বেশন** করা'। সাদৃশ্যে এটি to sit down বটে, কিন্তু আসলে এই **বস** শব্দটি অদৃশ্য **বসা**কে বোঝানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। তার ব্যবহার গ্রামবাংলায় আজও শুনতে পাওয়া যায় — 'সারাজীবন কি তুই বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, বাছা! এবার একটু শান্ত হ', ধীর স্থির হ'। দেশ-গাঁয়ে ফিরে আয়, বিয়েসাদি করে **বসে** যা।' (দেশবিদেশে পার্টি করে বেড়ান ছেলেকে এই ছিল গ্রামবাংলার মা-দিদিমার উপদেশ।) এই '**বসে** যাওয়া'কে বা **বসা**কে শনাক্ত করার জন্যই **বস** শব্দটির সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের এই অদৃশ্য **বসবাস** আদৌ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বাংলাভাষী তাকে অনুভব করতে পারেন, তার বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন এবং বলেনও। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সক্রিয় সদস্য যদি রাজনীতি ছেড়ে দিতেন বা রাজনীতি থেকে সরে যেতেন, তবে কলকাতাবাসী বাঙালি কমিউনিস্টরা পর্যন্ত বলতেন, 'অমুক কমরেড বসে গেছে'। আমরা শিক্ষিত বাংলাভাষীরা মন দিয়ে এসব কথা শুনি না। কার্যত **বসা** বা **উপবেশন** করা মানে অদৃশ্যলোকের স্থানে কালে মনোলোকে **বসা**, সাদৃশ্যে যা একজন মানুষের দৈহিকভাবে **বসা**কেও বোঝায়।

কিন্তু অদৃশ্যলোকে হোক আর দৃশ্যলোকেই হোক, কেউ যদি আরও **বসে**, অর্থাৎ **বস্**-অন করতে থাকে, তাহলে কী হবে? কী আবার হবে! যেখানে **বসে** ছিল, সেখানেই নীচের দিকে ঢুকে যাবে; **বেশ** করে যাবে, **প্রবেশ** করে যাবে! ধীরে ধীরে একটা গর্তের ভিতরে ঢুকে যাবে! ঠিক যেভাবে আমাদের চোখ **বসে** যায়, নরম মাটিতে পা **বসে** যায়। কিন্তু তখন সেই গর্তটা, যা কিনা **বস্-অন**-কারীকে ঘিরে ফেলবে, সেটিই হয়ে যাবে তার 'আবরণ' বা 'আচ্ছাদন' অর্থাৎ **বসন**। এই কারণেই **বসা** মানে **উপবেশন** করা, পুরো **বেশন** করা নয়, **বেশন**-এর পূর্বাবস্থা গ্রহণ করা, প্র**বেশ**-এর পূর্বাবস্থা গ্রহণ করা, আর, এই কারণে **বসন**কে **বেশ**ও (বেশভূষাও) বলে।

কিন্তু সেরকম না হয়ে যদি অন্যরকম **বসা** হয়? ধরা যাক, পঞ্চাশ গ্রাম দুধের সর টেবিলের উপর পড়ে গিয়ে বসে গেল। চাইলে, শুকিয়ে যাওয়ার পর এটিকে আপনি তুলে ফেলতে পারেন, পাতলা চাদরের মতো উঠে আসবে। তা না করে সেই একই স্থানে পরের দিন আরও পঞ্চাশ গ্রাম সর ফেলে দিলেন। এইভাবে একাদিক্রমে পাঁচ-সাতদিন ধরে বসা যে সর, তাকেও **বসা** বলা যায়। এ হল **বসা** শব্দের বিশেষ্যরূপ। এতে দেখা যাচ্ছে, অস্তিত্বের স্থির রূপটি বসতে বসতে জমে গিয়ে নতুন স্বরূপে পৌঁছে গেছে। জীবের শরীরের ক্ষেত্রে এই **বসা** স্বভাবতই চর্বি পদবাচ্য এবং সমাজের ক্ষেত্রে এই **বসা** অবশ্যই সামাজিক উদ্বৃত্ত বা চর্বিই বটে!

তবে **বস** করা আর **বাস** করা যে এক ব্যাপার নয়, তা স্পষ্ট জানা যায় **বসবাস** শব্দ থেকে। উপরে **বসন** শব্দ থেকেও ব্যাপারটি বোঝা সম্ভব যে **বস**-অন করতে থাকা এবং **বাস**-অন করতে থাকা আদৌ এক ব্যাপার নয়। এমনকি এই শব্দদুটির বিশেষ্যরূপ একত্রে ব্যবহার করে ('... অশন-আসন **বসন-বাসন** যত, / কোথায় কি গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত।' — পুরাতন ভৃত্য) রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, শব্দদুটি পৃথক অর্থধারী পৃথক শব্দ। কিন্তু একালের বাংলা অভিধানকারগণ **আশেপাশে**র মতো জোড় শব্দের কপালে যে দুর্দশা ঘটিয়েছেন, **বসবাস**-এর কপালেও সেই দুর্দশা ঘটেছে। তাঁরা **আশে**র অর্থ ফেলে দিয়ে **আশেপাশে** মানে করে নিয়েছেন beside, **বসবাস**-এর ক্ষেত্রেও **বস**-এর মানে ফেলে দিয়ে সেটিকে করে নিয়েছেন 'স্থায়ী বাস'। ... ৬. ইংরেজি basalt, base. bass, vas, vase ... ইত্যাদি।

বসন্ত : ১. ✓বস্ + অন্ত (ঝচ্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বস-এর অন্ত থাকে যাহাতে; কিংবা,* **বসন্** *তারিত হয় যাহাতে।* ৩. ষষ্ঠ ঋতু — চৈত্র ও বৈশাখ, (মতান্তরে) ফাল্গুন ও চৈত্র, কামসখ, অতিসাররোগ, বিদূষকের উপাধি, রাগবিশেষ, চর্ম্মরোগবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. springtime ও pox এই দুটি অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মধুমাস**। **বসন্ত** শব্দটি যে অর্থ বহনের জন্য তৈরি হয়েছিল, শব্দটির

ব্যবহার সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এটিতে **বস**-অন চলে কালে, স্থানে নয়। কেউ যখন **বসবাস** করে, তার **বস** শুরু হয় গ্রীষ্মকাল থেকে, বর্ষায় তার **বস**-অন চলে, শরৎ হেমন্ত শীতেও চলে এবং অবশেষে যে-কালে এসে তার সেই **বস**-অন তারিত হয় বা **বস**-অন-এর অন্ত হয়, সেই কালটিকে **বসন্ত**কাল বলে। আর, যেহেতু এই **বসন্ত**কালে এক বিশেষ প্রকার প্রাণঘাতী চর্মরোগের প্রকোপ দেখা দেয়, সেই কারণে ঐ রোগটিকে **বসন্ত**রোগ বলে। রোগটির স্বভাবের সঙ্গে **বসন্ত**-এর শুধুমাত্র কালের সম্পর্ক। অবশ্য গ্রামবাংলায় পৌষ-ফাগুনেই ধানকাটা হয়, মরাই ভরে ধানে; টাকা-পয়সা হাতে আসে। চাষাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের মনেও ফাগুনের আগুন লাগে, নিসর্গ-প্রকৃতিতেও লাগে। আসে **বসন্ত**-পঞ্চমীর সরস্বতী পূজা থেকে **বসন্ত**-উৎসব বা দোল পর্যন্ত মানবমনের **বসন্তকাল** বা মিথুনকাল বা **মধুকাল**। সেই **বসন্তের** মাঝে মহা**মায়া**কে রাজরাজেশ্বরী রূপে পূজা করে নিতে হয়, মহা**স্রষ্টা শিব**-এর **শিব**রাত্রি পেরোতে হয়। সৃষ্টিসুখের উল্লাসের এই **বসন্ত ঋতুর** মিঠে শীতশেষের আমেজের হাত থেকে কবি-সাহিত্যিকও রেহাই পান না। অগত্যা সৃষ্টির সেই ক্ষণটির, সেই **মধুকাল**-এর খবর পেয়ে যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। কবির সেই **বসন্তযাপন**-এর মর্ম অতঃপর তিনি লিপিবদ্ধ করে যান তাঁর '*বসন্তযাপন*' নিবন্ধে। নিবন্ধটি এবার আগাগোড়া পড়ে নেওয়া দরকার। নইলে কবিরা কীভাবে '**বসন্ত** রোগে'র শিকার হন, তা জানা যাবে কেমন করে!

বসিষ্ঠ : দ্র. **বশিষ্ঠ**।

বসু (অষ্টবসু, বসুদ, বসুদেব) : **১.** ✓বস্‌ + উ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বসু** = **বস** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***অষ্টবসু** = **অষ্ট** (১ম খণ্ড দ্র.) প্রকার **বসু**। **বসুদ** = **বসু** দেয় যে। **বসুদেব** = যে **বসু দেবন** কার্য্য করতেন।* / **বসু** = দিব্য স্থানে বাস করে যে। **বসুদেব** = (যিনি) রত্নসমূহের অধিপতি। (ব.শ.)। **৩. বসু (অষ্টবসু)** = অষ্টগণদেবতাভেদ, ধর ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনিল অনল প্রত্যুষ প্রভাস — এই আট বসু, সূর্য্য, বহ্নি, রশ্মি, যোক্ত্র, রাজা, কুবের, বিষ্ণু, শিব, চেদিরাজ উপরিচর, মৎস্যবিশেষ, বকবৃক্ষ, কুলীন কায়স্থের উপাধিবিশেষ, গঙ্গার ধারাবিশেষ, বসুদেব, রত্ন, মণি, ধন, স্বর্ণ, জল, লবণভেদ, শ্যাম, বৃদ্ধিনামক ঔষধ। **বসুদ** = বসুদাতা, ধনদাতা। (ব.শ.)। (ক) দেবতাবিশেষ। বসু নামে আটজন গণদেবতা আছেন। এঁরা হচ্ছেন — ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস ও দ্যু। এঁরা সকলেই ইন্দ্রের অনুচর বিশেষ। বসুগণ বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে হরণ করায় বশিষ্ঠের শাপে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম এই বসুদের অন্যতম। এই আটজন অষ্টবসু নামে খ্যাত। এই বসুগণ গঙ্গাকে অনুরোধ করেন যে, তাঁরা মানুষীর গর্ভে গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে চান। তাঁরা বলেন যে, রাজা শান্তনু এঁদের পিতা হবেন, এবং জন্মমাত্রই যেন তাঁরা জলে নিক্ষিপ্ত হন। তাহলে তাঁরা শীঘ্রই পৃথিবী হতে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। গঙ্গা এতে সম্মত হয়ে বলেন যে, তাঁর একটি পুত্র যেন জীবিত থাকে। নতুবা শান্তনুর সঙ্গে তাঁর সংগম ব্যর্থ হবে। বসুগণ তখন তাঁদের প্রত্যেকের বীর্যের অষ্টমাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে বলেন যে, তার ফলে সেই পুত্রটি জীবিত থাকবে। শান্তনুর সহিত গঙ্গার বিবাহের শর্ত ছিল যে, গঙ্গা যে কার্যই করুন না কেন শান্তনু তাঁকে বাধা দিতে পারবেন না। ক্রমে গঙ্গার আটটি দেবকুমার-তুল্য পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মমাত্র এক এক করে তাদের সাতটি জলে নিক্ষিপ্ত হয়। অষ্টম পুত্রের নিক্ষেপকালে শান্তনু পুত্রশোকে কাতর হয়ে গঙ্গাকে ভর্ৎসনা করলে, গঙ্গা আত্মপরিচয় দিয়ে বসুগণের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। বসু ভ্রাতৃগণের মধ্যে অন্যতম দ্যু বসু। ইনি নিজ স্ত্রীর প্ররোচনায় বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেছিলেন। শাপ দেওয়ার পর বসুগণের অনুনয়ে বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে, তাঁরা সকলে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হবে। কিন্তু দ্যু বসু নিজ কৃতকর্মের জন্য দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বসবাস করবে। সে কারণে গঙ্গা বসুদের মনুষ্যজন্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্য জলে নিক্ষেপ করতেন। কেবল দ্যু বসুই (অষ্টম পুত্র) দীর্ঘজীবী; কিন্তু সে নিঃসন্তান হয়ে মনুষ্যলোকে বাস করবে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করবে। এই বলে গঙ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তর্হিতা হন এবং পরে সর্বশাস্ত্রবিশারদ করে তাঁকে শান্তনুর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। এই পুত্রই পরে দেবব্রত ভীষ্মরূপে বিখ্যাত হন।

ঋক্‌বেদে বসুগণকে প্রকৃতির নিয়ামকরূপে এবং মন্ত্রপাঠরত অবস্থায় দেখা যায়। এই গণদেবতারা ধরার নিয়ন্তা ছিলেন। তারা ধনরক্ষক এবং ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতির অনুগত সহকারী।

(খ) চেদি দেশে বসু নামে কুরুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। ... এঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র এঁর কাছে উপস্থিত হন এবং নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে এঁকে তপস্যা পরিত্যাগ করে রাজ্যশাসনে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। ... ইন্দ্র এঁকে সখাভাবে গ্রহণ করে একখানি আকাশগামী স্ফটিকের বিমান, বৈজয়ন্তীমালা, এবং একখানি বংশ নির্মিত যষ্টি দান করেন। বসু ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন বলে তাঁর নাম হয় উপরিচর-বসু। তাঁর পাঁচ পুত্র বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন। ... ব্যাসমাতা মৎস্যগন্ধা এঁরই অদ্রিকা গর্ভ জাতা কন্যা। ... (পৌ.অ.)। **বসুদেব** = যাদববিশেষ (ইঁহার পিতা যদুবংশীয় শূর, মাতা ভোজসুতা মহিষী, পত্নী দেবকী, পুত্র কৃষ্ণ। পৃথা বা কুন্তী ইঁহার সহোদরা। (ব.শ.)। ... বসুদেবের অন্য স্ত্রীর নাম রোহিণী। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের ও রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহকালে কংস দৈববাণী শ্রবণ করেন যে, দেবকীর অষ্টম সন্তান কর্তৃক তিনি নিহত হবেন। সেই জন্য কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করেন। ... পরে কৃষ্ণ ও বলরাম ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে কংসকে বিনাশ করে বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করেন। কৃষ্ণ মথুরার রাজা হলে বসুদেব স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন। ... যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগ করলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং উক্ত সময় অর্জুন উপস্থিত হলে তাঁকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন করে যোগারূঢ় অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** কেবলমাত্র পদবী রূপে **বসু** প্রচলিত; **অষ্টবসু** শব্দটির ব্যবহার হত ধারাপাত পড়ার সময় 'আটে-অষ্টবসু' বলে, এখন যে-শিশুদের ইংলিশ মিডিয়াম দখল করেছে তাদের আর সেকথা পড়ানো হয় না; ফলে **অষ্টবসু**ও প্রায় অপ্রচলিত। **বসুদ, বসুদেব** সম্পূর্ণতই অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **গণদেবতা। তুর্ব্বসু**। '**বস** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে', তাকে বলে

বসু। তার মানে, বসতে বসতে বসতে বসতে ... উর্ধ্বগামী হয়ে গেলে বা উড়ে যেতে শুরু করলে, তাকেই বলা হয় **বসু**। আমরা জানি বসতে বসতে **বসা** হয়। যে মানুষটা সারাদিন ছুটোছুটি করে নানা কাজ করত, সে যদি হঠাৎ লেখকের পেশা গ্রহণ করে সারাদিন ধরে লিখতে বসে যায়, তার **বসা** হয়ে যায়, চর্বি হয়ে যায়, ভুঁড়ি হয়ে যায়। সমাজের উদ্বৃত্ত বসতে বসতে সামাজিক **বসা** বা সামাজিক চর্বি অর্থাৎ সামাজিক সম্পদ হয়। সেই সম্পদের আধার যে, সে আর **বসে** না, উড়তে শুরু করে; তা সেই আধার ধন, রত্ন, মণি, **সূর্য্য** (যৌথসম্পদ), বহ্নি (সম্পদ), রশ্মি (সম্পদের তেজ), রাজা, কুবের, নতুন **গঙ্গা**ধারা ... ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে, এমনকি সেই সকল সম্পদের আধার ধনী সম্পদবান মানুষও হতে পারে। মোটকথা, মানসিক-বাদে সর্বপ্রকার দৈহিক ও সামাজিক '**ঘৃত** ও **ঘৃত**বান সত্তা'কে **বসু** বলে।

একালে যে ধনপতি পুঁজিপতি বণিক মানুষদের আমরা দেখি, তাঁদের আদি পুরুষদের খোঁজে সমাজেতিহাসের পেছন দিকে গেলে শেষ যেখানে পৌঁছে তাঁদের আদিপুরুষের ভ্রূণরূপকে আমরা দেখতে পাই, তিনি **উপরিচর-বসু**। তারপরে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে পাই **অষ্টবসু** রূপে। বলা হয়েছে, এঁরা **ইন্দ্রে**র অনুচর। তার মানে ব্যক্তির 'আমি'ত্বের সহযোগী রূপে তার স্বভাবের ভিতরে যেমন এঁরা বিদ্যমান থাকেন, তেমনি সমাজের 'আমি'ত্বের (জাতীয়তাবোধের) ভিতরেও এঁরা বিদ্যমান থাকেন। এঁরা হলেন — **ধর**, **ধ্রুব**, **সোম**, **বিষ্ণু**, **অনিল**, **অনল**, **প্রত্যুষ** (জ্ঞান-ধনের অভাব বা অন্ধকার নাশ করে যে), **প্রভাস**। (**প্রত্যুষ** ভিন্ন বাকি শব্দগুলিকে তাদের ভুক্তিতে দেখুন।) এছাড়াও রয়েছেন **তুবর্বসু**, **বিশ্বাবসু**, **বসুদেব**, **বাসুদেব** ... প্রমুখ সত্তাগুলি। স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়া বা **বর্ণাশ্রম** অনুসারে এঁরা স্বভাবত **ক্ষত্রধর্ম্ম** পালন করেন এবং কর্মবীর হয়ে থাকেন।

তবে আরও আদিতে, বৈদিক-পূর্ব সনাতন যুগের যৌথসমাজে গেলে আমরা পাই **বসু**র মূল সামাজিক সত্তাটিকে। সেই মূল সত্তাটির মুখোমুখি হয়ে সেকালের সমাজ-পরিচালক মহান **শিব** ঘোষণা করেন, "**বসা**লিপ্ত তৃণকেও যে 'আমার' বলে, আমি তাকে হত্যা করি, তাই আমাকে **উগ্র** বলে।" তার মানে, সেই সমাজে সকল সম্পদের মালিকানাই ছিল যৌথ, কোনো বস্তু বা বিষয়কে লোকে 'আমার' বলত না। যদি কেউ তা বলত, রুদ্ররূপী **শিব** তাকে ধ্বংস করতেন। এমনকি '**বসা**লিপ্ত তৃণ'কেও 'আমার' বলা নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, **শিব** ছিলেন চিরকালের জন্য **বসু**-বিরোধী। যখনই কোনো সত্তা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে থেকেছে, **শিব** তারই সহায়তা করেছেন। সেকারণেই 'তারকাময়-সংগ্রামে' **শিব** স্বয়ং **চন্দ্র**পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন, যে-চন্দ্র মূলত **বসুধারা**র সমর্থক। পরে **বসুধারা**র একটি কেন্দ্ররূপে **বারাণসী** প্রতিষ্ঠার কালে এই **শিবই ব্রহ্মহত্যা** করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি।

তার মানে, **বসু** বলতে শুধুমাত্র ধনরত্নাকাঙক্ষী কুবেরকেই বোঝায় না; ধন**লক্ষ্মী**কেও বোঝায়। আর সেই ধন**লক্ষ্মী**র সাধনায় যুগে যুগে এই **বসু**গণেরও যথেষ্ট শ্রম তপস্যা ইত্যাদি ছিল। সেই **তপস্যা** তাঁরা যৌথসমাজের মধ্যে থেকেও যেমন করে গেছেন, ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে পৌঁছেও কমবেশি করেছেন। তবে তথ্যানুসারে তাঁরা **পৃথু**র বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের কর্মচারী রূপেই **লক্ষ্মী**র সাধনা করেছেন যথার্থভাবে। সেকারণেই কুলীন-**কায়স্থ**দের মধ্যে **বসু**-পদবীধারীদের বিশেষ মর্যাদা। এ-সাধনা কেমন সাধনা, তার নমুনা পাওয়া যায় **ক্ষত্রধর্ম্ম**-এর বিধানে, পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে। গান্ধী বিষয়টি অনুধাবন করে বলেছিলেন, ধনপতিরা ধনের ট্রাস্টি-রূপে থাকবেন, অর্থাৎ ধনভোগী বা ধনপিশাচ হবেন না। তার মানে আদিতে **বসু**র সামাজিক ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শুভ। **বানপ্রস্থে** আমরা যেমন দেখেছি, সমগ্র সমাজের মানসিক অগ্রগতি ঠিকঠাক রাখার জন্য প্রকৃত **ব্রাহ্মণ** (দ্র. **বর্ণাশ্রম**) আপনার ষাটোর্দ্ধ জীবন উৎসর্গ করতেন, **বসুগণ**ও তদ্রূপ সমগ্র সমাজের দৈহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করতেন এবং 'কর্মবীর' রূপে স্বীকৃতি লাভ করতেন। যতদূর বোঝা যায়, বৈদিক যুগের সূচনার আগে ধন ও ক্ষমতার আধারস্বরূপ মাত্র দুটি সত্তাকে সেকালের জ্ঞানীরা চিনতে পেরেছিলেন — **পিতৃগণ (পিতৃদেবগণ)** ও **বসুগণ** (বসুদেবগণ)। প্রথমটি যৌথসমাজের পরিচালকদের মধ্যেকার ধনী-ক্ষমতাবান এবং দ্বিতীয়টি যৌথসমাজের পরিচালিতের মধ্যেকার ধনী-ক্ষমতাবান সত্তা। পরবর্তীকালে 'সরকারিভাবে' **বর্ণাশ্রম** প্রতিষ্ঠার পর **পিতৃগণ** হয়ে যান **ব্রাহ্মণ**-পদবাচ্য এবং **বসুগণ** হয়ে যান **ক্ষত্রিয়**-পদবাচ্য। সেই দুই সত্তার ধারা বাংলার মাটিতেও প্রবাহিত রয়েছে, আজও। বাংলার মাটি শ্রেষ্ঠ 'কর্মবীর'রূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র **বসু**র জন্ম দিয়েছে; ঠিক যেমন শ্রেষ্ঠ **ব্রহ্মজ্ঞানী** রূপে রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিয়েছিল। ... **৬.** উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলার একটি গ্রামের নাম 'বসুকা'। আবার, আফ্রিকা মহাদেশের লেসোথো (Lesothu) রাজ্যের পূর্বতন নাম ছিল Basutoland, অর্থাৎ 'বসুত'দের দেশ। বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

বসুধা (বসুধারা, বসুধারী, বসুনাথ, বসুন্ধরা, বসুমতী, বসুমাতা, বসুষেণ) : **১.** বসু + ✓ধা + অ (ক) + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *বসুধা* = *বসুসমূহকে ধরে রাখে যে।* ***বসুধারা*** = ***বসু****র প্রবাহ থাকে যাহাতে।* ***বসুধারী*** = ***বসু****কে যে গতিশীল বা সক্রিয় আধার ধরে রাখে।* ***বসুনাথ*** = ***বসু****র* ***নাথ*** *যিনি।* ***বসুন্ধরা*** = ***বসু****র রহস্যরূপ ধরা থাকে যাহাতে।* ***বসুমতী*** = ***বসু****মৎ-এর আধারশক্তি যে। (দ্র. মৎ)।* ***বসুমাতা*** = ***বসু****র বা* ***বসু****গণের মাতা যে।* ***বসুষেণ*** = ***বসু****র দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের রহস্যরূপ যাহাতে।* / **বসুধা** = যিনি **বসু**কে বা **বসু**সমূহকে ধারণ করেন। **বসুধারী** = রত্নের আধার যে। **বসুনাথ** = যিনি ধনের অধিকারী। **বসুন্ধরা** = ধন ধারণ করে যে। **বসুমতী** = স্বর্ণ আছে যার। **বসুষেণ** = কুণ্ডলকবচাদি দ্বারা বদ্ধ যে। (ব.শ.) **৩.** **বসুধা** = পৃথিবী, দেশ, ভূমি, পঞ্চভূতের একতম ক্ষিতি, লক্ষ্মী, বসুধাবাসী জন। **বসুধারা** = ধনের ধারা, বসুপ্রিয়া ধারা, আভ্যুদয়িকে চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে গৃহভিত্তিতে কর্ত্তব্য ঘৃতধারা [অন্তরীক্ষচারী রাজা উপরিচর দেব-ব্রাহ্মণ বিবাদে দেবপক্ষ গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণশাপে আকাশগতিহীন ও ভূবিবর-গত হইলে, দেবগণ তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা-বারণার্থ যজ্ঞে বিপ্রদত্ত বসুধারাপান বিধান করেন। এই বসুর ঘৃতধারা

'বসুধারা' (বসোর্ধারা) নামে প্রসিদ্ধ।] (ব.শ.)। ... বসুর ঘৃতধারা বসুধারা নামে প্রসিদ্ধ। প্রীতিকামনায় চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে এই ঘৃতধারা দেওয়া হয় বলে এর নাম বসুধারা। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসুধারা দিতে হয়। সাধারণত এই ধারা প্রাচীর গাত্রে দেওয়াই বিধেয়। বসু শব্দের অর্থ ঘৃত। (পৌ.অ.)। **বসুধারী** = ধনাধিকারী রাজা। **বসুনাথ** = রাজা। **বসুন্ধরা** = বসুধা, পৃথিবী, দেশ, স্থান, ভূমি, ভূতল, বসুন্ধরাবাসী জন। **বসুমতী** = পৃথিবী, দেশ, স্থান, ভূমি, বসুমতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (ব.শ.) **বসুমতী** = পৃথিবীর অন্য নাম বসুমতী। মহাভারত অনুসারে সুবর্ণ, অগ্নির তেজে উৎপন্ন হয়। পৃথিবী এই সুবর্ণ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বসুমতী। (পৌ.অ.)। **বসুমাতা** = মাতা পৃথিবী। **বসুষেণ** = কর্ণ। (ব.শ.)। **৪. বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী** তিনটি শব্দই একালে earth অর্থে প্রচলিত। **বসুমাতা (বসুমাতাবি)** পদবীরূপে প্রচলিত রয়েছে। (যথা — জ্ঞানসিং বসুমাতা)। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** এই যে earth, এ তো বাহ্য চক্ষুতেই দেখা যায়। কিন্তু সম্পদবান যে সমাজ, তাকে তো বাহ্য চক্ষে দেখা যায় না। সমস্যা ছিল সেটাই। তাকেই বোঝানোর জন্য **বসুধা** ... প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব। সর্বপ্রকারের **বসু**দের ধারণ করে বলে এই সম্পদবান সমাজের নাম **বসুধা**। সম্পদবৃদ্ধিকারীদের ধারণ করে বলে তার অপর নাম **বসুন্ধরা** এবং বসুমৎ-সত্তাদের আধার বলে এর আরেক নাম **বসুমতী**। সাদৃশ্যে এই তিনটি শব্দই earth কে বোঝায়। সেই কারণে তিনটি শব্দের একটিই মানে দাঁড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে কেউ ইচ্ছা করে আপন সুবিধার জন্য শব্দগুলির অর্থসংকোচন করেনি। **বসুন্ধরা** ও **বসুমতী** শব্দের সাদৃশ্যে অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলেই তিনটি শব্দ দৃশ্যলোকের প্রয়োগে গিয়ে একটিমাত্র শব্দে পরিণত হয়ে গেছে — 'পৃথিবী' বা earth।

তা সে যাই হোক, **বসু**-সংক্রান্ত এসব কথাবার্তা মুখের কথা মাত্র নয়। তথ্যানুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি **ব্রাহ্মণ** বনাম **দেবতা**য় বিরোধ বেধেছিল এবং **বসুগণ** ছিল **দেবতা**দের পক্ষে। এ যে সমাজের মানসিক শক্তি ও সমাজের দৈহিক শক্তির বিরোধ, জ্ঞানপতি ও ধনপতির বিরোধ, **ব্রাহ্মণ** ও **ক্ষত্রিয়ের** বিরোধ, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই **অধিরাষ্ট্রের** পরিচালক **ব্রাহ্মণ** যা করেছে, এক্ষেত্রেও তাই করেছে। বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছে বটে কিন্তু যে-কারণে সে বিদ্রোহ করেছিল, তার দায় সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যেকারণে আমরা দেখছি, **উপরিচর বসু**কে সে শাস্তি দিয়ে তার আকাশগতি (অর্থাৎ **বসু**গতি, কেননা **বসু** তো 'বসতে বসতে ... উর্ধ্বগামী হয় বা উড়ে যায়') রোধ করে দিয়েছে; কিন্তু ভূতলে সে যাতে টিকে থাকে সেই উদ্দেশ্যে 'নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে' বা **আভ্যুদয়িক**কে **বসুধারা**র ব্যবস্থা করেছে সে নিজে। **ব্রাহ্মণ** নিজেই এই দায় আজও বহন করেন।

তবে সমস্যা সেই একটাই। শ্রাদ্ধের যে আচার আচরণ, সে তো প্রতীকী। যার প্রতীক, তাকে তো খোদ 'জাতিতে-ব্রাহ্মণ'রাই হারিয়ে ফেলেছেন। উপরোক্ত শ্রাদ্ধকালে মাটিতে বা দেয়ালে ঘি ঢেলে দেওয়ার প্রকৃত অর্থ যে **বসুগণ**কে সেকালের যৌথসমাজের অর্জিত ধনসম্পদের ভাগ দেওয়া বোঝাত, সেকথা এখন সবাই ভুলে গেছেন। অথচ, **অধিরাষ্ট্রের** অধিকারী হওয়ার কারণে **ব্রাহ্মণ**রাই ছিলেন যৌথসমাজের সকল জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ ... ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক, যদিও তাঁরা তা ভোগ করতেন না, বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু সমাজের শ্রীবৃদ্ধির ডাক যাঁরা দিয়েছিলেন, দিয়ে থাকেন, এবং তদনুসারে কর্ম করে 'কর্মবীর'-এর ভূমিকা পালন করেন, সেই **বসু**দেরও যে সে-সম্পদের ভাগ পাওনা হয়; একথা **ব্রাহ্মণ** সেদিন মনে রেখেছিল। তাই সে **বসুধারা** প্রদানের প্রথা সামাজিকভাবে বজায় রেখেছিল এবং **আভ্যুদয়িকে** তার প্রতীকী ব্যবস্থা রেখেছিল, ঠিক যেভাবে একালে আমরা দলিল রাখি। লোকে দলিল পড়ে জানতে পারে কার কী অধিকার এবং তাকে তাকে সেই সেই ভাগ দেয়, সেইরকম। সেকালে তো রেজিস্ট্রি অফিস ছিল না যে সেখানে গিয়ে 'ব্রাহ্মণ তার অধিকারে পাওয়া যৌথসম্পদের এই এই অংশ **বসুগণ**কে দেবেন ...' — এসব কথা লিখে দলিল করে রেখে দেওয়া হবে। সেকালের নিয়ম অনুসারে এই সব অধিকার ও কর্তব্যের কথা লিখতে হত ধর্মাচারের পাতায় — আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতির পদে পদে, বিভিন্ন ধাপে, লিখতে হত বিশেষ বিশেষ প্রতীকী আচরণ দিয়ে। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের আচারে সেভাবেই 'বিপ্রদত্ত ঘৃতধারা'র কথা প্রতীকী আচরণ (মাটিতে বা দেয়ালে ঘি ঢেলে) দিয়ে লিখে রাখা হয়েছিল। এখনও সেই প্রতীকী আচরণ প্রথারূপে পালন করাও হয়, কিন্তু তার ফলিত প্রয়োগ আর হয় না; **বসুধারা** এখন আর **বসুগণ** পান না। কালের চক্রে সেকথা এখন সবাই ভুলে গেছেন।

না ভুলে উপায়ই বা কী! যৌথসম্পদ পেলে তো তার ভাগ দেওয়া হবে! জাতিতে-ব্রাহ্মণ নিজেই তো এখন ভিখারী। মধ্যপ্রদেশে কাশ্যপেরা তো 'ওবিসি-স্ট্যাটাস' দাবি করেছেন!

বস্তু (বস্তুজ্ঞান) : **১.** ✓বস্ + তু (তুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বস্তু*** *= বস্ তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **বস্তু** = যাহা বাস্তবিক, কল্পিত বা ভ্রমাত্মক নহে। (ব.শ)। **৩. বস্তু** = সত্যপদার্থ, দ্রব্য, পদার্থ, বিষয়, গ্রন্থবিষয়, নির্ম্মাণদ্রব্য, উপকরণ, সার, মূলদ্রব্য, তাৎপর্য্য, নিষ্কর্ষ, মর্ম্ম, পাত্রভূত, যোগ্যপাত্র, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম, প্রবন্ধনায়ক। **বস্তুজ্ঞান** = অসাধারণ বস্তু বলিয়া বোধ। (ব.শ.)। **৪.** thing অর্থে **বস্তু** প্রচলিত, **বস্তুজ্ঞান** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **বস, বসু**। আধুনিক শিক্ষিত বাংলাভাষী **বস্তু, দ্রব্য, পদার্থ, উপকরণ, জিনিস** ... সব কথার প্রায় একই মানে বোঝেন — thing বা material। কিন্তু শব্দগুলি অদৃশ্য 'সত্তা'কে যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার নিরিখে বোঝানোর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল তা নিয়ে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই। **বস্তু** বলা হত কেবলমাত্র 'শ্রম ও মেধা নিষিক্ত বা **বসিত** নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তা'কে। তার মানে, কাঠে শ্রম ও মেধাকে ঠিকঠাক ভাবে বসিয়ে দিতে পারলে, যে টেবিলটি তৈরি হয়ে যায়, সেটিই **বস্তু**। একালের ভাষায় একে 'উৎপাদিত বস্তু', 'উৎপন্ন' বা produced material বলে। আমরা কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যার ভিতরে কোনোভাবেই কোনোরকম শ্রম ও মেধা বিন্দুমাত্র ঢোকানো হয়নি, তাকে আর যাই বলা যাক, **বস্তু** বলা যায় না।

এই **বস্তু** 'তৈরি **করার** জন্য' যা কিছু **পদার্থ** লাগে তাকে বলা হয় **উপকরণ**; আর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বাহ্য দেহ নিয়ে যা কিছু **বর্তমান** রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই **পদার্থ** বলে। সেই **পদার্থ**কে

উপকরণ রূপে ব্যবহার ক'রে তাতে শ্রম ও মেধা যোগ করে যা কিছুর জনন করা হয় সেগুলিকে **বস্তু** বা **জিনিস** বলে। (একালের ভাষাবিদরা বলেন, 'জিনিশ' বা 'জিনিস' শব্দটি আরবি। কিন্তু এর ভিতরে **জনন** ও **ইচ্ছা**কে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এ **জিনিস বস্তু** না হয়ে পারে না।) তাছাড়া **দ্রব্য**ও একপ্রকার **বস্তুই** বটে। কেননা, তা **উপকরণা**দির উপর **উপদ্রব** করে বানানো হয় এবং সমাজবৃক্ষ (সংস্থা) থেকে দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে। আর, এদের যে কোনো একটিকে 'বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হলে' একমাত্র তখনই তাকে বলা হয় **পণ্য**।

তার মানে আমরা যখন **বস্তুজগৎ** কথাটি বলি, তখন সেটি মানুষের তৈরি করা 'উৎপাদিত **পদার্থের** জগৎ'কেই বোঝায়, 'অকৃত্রিম **পদার্থের** জগৎ বা নিসর্গ-প্রকৃতি'কে বোঝায় না, nature-প্রকৃতির matter-এর দুনিয়াটিকে বোঝায় না। অর্থাৎ **বস্তু, দ্রব্য, জিনিস** মানেই মানুষের দ্বারা কৃত 'কৃত্রিম **পদার্থ**'; এবং **বস্তুজগৎ** মানে 'কৃত্রিম **পদার্থের** জগৎ' বা 'কৃত্রিম **বিশ্ব**'। আর সেটা হবে নাই বা কেন! আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা তো দৃশ্যজগৎকে বোঝানোর জন্য বিশেষ ভাবতেন না, তাঁদের ভাবনার বিষয় ছিল অদৃশ্য কিন্তু সমাজে সক্রিয় বিষয় ও **বস্তু**গুলিকে বোঝানো। তাই তাঁদের কাছে 'কৃত্রিম **পদার্থে**'র জগৎ বা **বস্তু**র জগৎটা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ...

এই **বস্তু** ও **বস্তুজগৎ**কে অনেক স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন সেকালের বেদান্তবাদীরা। দ্বৈতাদ্বৈতের সাধনা করতে গিয়ে তার নিম্নতম রূপটিকে তাঁরা নাম দেন — 'সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম' বা সৎ-চিৎ-আনন্দম্-অদ্বয়ম্-ব্রহ্মম্। কিন্তু তার অর্থ তো বেদান্তবাদীরাই এখন ভুলে বসে আছেন! সেই 'সচ্চিদানন্দম-অদ্বয়ম্'-এর মর্ত্যরূপ কেমন?

সে সৎ, চিৎ, আনন্দম্, ও অদ্বয়ম্। সৎ কী? পুরাণাদির ভাষায়, প্রকৃতি দুই প্রকার — সৎ প্রকৃতি ও অসৎ প্রকৃতি। (দ্র. 'সদসদাত্মক প্রকৃতি' ইত্যাদি)। ঠিক কথা। ধান গাছের তো আর তক্তা হয় না, সুতরাং তা দিয়ে টেবিল হবে কেমন করে! তাই সব প্রকৃতি সৎ প্রকৃতি নয়, সব প্রকৃতি থেকে সন্তান উৎপন্ন হয় না, সবাই উৎপাদনের সাবিত্রী মাতা হতে পারে না। যে কাঁচামাল Raw Material হতে পারে একমাত্র সে-ই সৎ প্রকৃতি, বাকিরা অসৎ। আর চিৎ হচ্ছে মেধা ও শ্রমের বা জ্ঞান ও কর্মের যোগফল, কাঠের তক্তাকে টেবিলে পরিণত করতে যেটা লাগে। এই সৎ ও চিৎ যুক্ত হলেই যে আনন্দম্-এর (= 'satisfying human want'-এর) কারণ হয়, সেকথা সবাই জানেন। কিন্তু এ তো অদ্বয়ম্ — যাকে দ্বিধা-বিভক্ত করা যায় না। তক্তা টেবিলে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর, আর তো ওই টেবিল থেকে কাঁচামাল ও শ্রমমেধাকে অর্থাৎ সৎ-চিৎ-কে কিছুতেই পৃথক করা যাবে না, কেবল টেবিলটি ধ্বংস করা ছাড়া। কারণ ওই সচ্চিদানন্দম্ এখন অদ্বয়ম্-ব্রহ্মে (= 'Non-divisible'-'Something transcendent'-এ) পরিণত হয়ে গেছে। তার থেকে প্রযুক্ত শ্রম বের করে নিয়ে আসার কোনো পথ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ভাগবতের ভাষায়, তাই, একে 'নির্গমনপথহীন গর্ত' বলে। এই বস্তুকে বোঝানোর জন্যই মার্কস সাহেবকে তাঁর *The Capital* গ্রন্থে *The Fetishism of Commodity and the Secret thereof* অধ্যায়টি লিখতে হয়েছিল। (উপরে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে ইংরেজি শব্দগুলি সেখান থেকেই নেওয়া।)। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাঁচামালকে বের করে নিয়ে পুনরায় ব্যবহার করার কিছু উপায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু (= 'reusing / recycling of materials') হয়ে থাকলেও, আগের প্রস্তুত স্বরূপকে ধ্বংস না-করে তা করার কোনো উপায় আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ... সম্ভবত ব্যাপারটি ব.শ.-এর সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। নইলে তিনি **বস্তুজ্ঞান** শব্দের ওরকম বিচিত্র অর্থ — 'অসাধারণ বস্তু বলিয়া বোধ' — দিতে যাবেন কেন?

বস্ত্র : **১.** ✓বস্ + ত্র (ষ্ট্রন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বস্***-কে *ত্রাণ করে যে; **বস্**-অন (on) কারীকে ত্রাণ করে যে।* / যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** আচ্ছাদক, বসন, বাস, পরিচ্ছদ। (ব.শ.)। **৪.** cloth অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **চট, পট, বস**। 'বসা' ক্রিয়াটি অন (on) থাকে **বসন**-এ। সেই **বসন** কেন একই সঙ্গে '**বেশ**ভূষা' বা 'জামাকাপড়'কে বোঝায়, সেকথা আমরা উপরে ব্যাখ্যা করেছি। এক কথায় সে হল সত্তাটির **বসে**-যাওয়ার কারণে তার চারদিকে গড়ে ওঠা আবরণ বা আচ্ছাদন। এই আচ্ছাদনকে বাইরের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন বললেও, **বসন**-কারীর দৃষ্টিতে **বস্ত্র** বলাই সঙ্গত। সাদৃশ্যে তা 'জামাকাপড়' ... ইত্যাদিকেও বোঝায়।

বাস (বাসন, বাসনকোশন, বাসনা, বাসা) : **১.** ✓বস্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **২.** ***বাস*** = ***বস*** *হইতে জাত।* ***বাসন*** = ***বাস*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বাসনকোশন*** = ***বাসন*** *ও* ***কোশন*** *(**কোশ** অন থাকে যাহাতে)।* ***বাসনা*** = ***বাসন****-এর আধার যে।* ***বাসা*** = ***বাস****-এর আধার যে।* / **বাসনা** = বৈধাবৈধ-প্রবৃত্তিমূলক কায়মনোবাক্য দ্বারা অনুষ্ঠিত ও চিত্তবৃদ্ধিপরম্পরায় আত্মগত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. বাস** = বসতি, অবস্থান, বাসস্থান, শয়নমন্দির, বাসনা, বরকন্যার বাসগৃহ; বস্ত্র, পরিচ্ছদ; সৌরভ, সুগন্ধ, গন্ধ; স্নেহ করা, ভালবাসা, বোধ করা, মনে করা, ইচ্ছা করা, প্রিয় বোধ করা, অভিমত বা ভাল বোধ করা, প্রিয় বোধ হওয়া, সঙ্গত বোধ হওয়া; সুগন্ধি করা, বাসিত করা। **বাসন** = সুরভীকরণ, ধূপন, আচ্ছাদন, বস্ত্র, আধার, পাত্র, নিক্ষেপাধার, নিক্ষেপার্থ মুদ্রাঙ্কিত পাত্র, বারিধানী, জ্ঞান, সমাধিতে যোগীর আসনবিশেষ; তৈজসপাত্র — থালা ঘটী বাটী ইত্যাদি। **বাসনকোশন** = নানাবিধ তৈজস-পাত্র। **বাসনা** = সুরভীকরণ, পূর্ব্বজন্মানুভূতস্মৃতি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিষয়স্পৃহা, স্মৃতিহেতুক সংস্কার, সংস্কার, মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার, প্রত্যাশা, জ্ঞান, আশয়, অভিলাষ, ইচ্ছা, সুবাস; কলাগাছের শুষ্ক আবরণ ও পাতা। **বাসা** = বাসকবৃক্ষ; গৃহ, বিদেশে বাসস্থান, আশ্রয়, বাসস্থান, গর্ত্ত, নীড়, আধার। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কাম, অধিবাস, অধি (ধা)**। আমাদের অধিকাংশ শব্দের অর্থ সংকোচন ঘটে গেলেও, **বাস** শব্দের অর্থ সংকোচন ঘটানো যায়নি। যেহেতু **বস** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, সেহেতু শব্দটি স্বভাবতই বহু বিষয় ও বস্তুকে চিহ্নিত করার যোগ্যতা ধরে, অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে শব্দটি বহু

অর্থবাচক। তার থেকে জাত **বাস** শব্দ ও তজ্জাত শব্দগুলিও স্বভাবত বহু অর্থবাচক হয়ে রয়েছে। তবে সাধারণভাবে সত্তার আচ্ছাদন — তা সে সত্তাকে ঘিরে রাখা **গন্ধ**, ঘিরে রাখা জামাকাপড়, ঘিরে রাখা ঘরের কামরা — যাই হোক, তাদের সবগুলি আচ্ছাদনকেই **বাস** বলে। কিন্তু এখানেই **বাস** শব্দের অর্থ শেষ হয়ে যায় না। যেহেতু মানুষের শুধুমাত্র দেহ নেই, মন বলে একটা পদার্থ আছে, সেই কারণে তার মনকে ঘিরে রাখা **গন্ধ**, মনকে ঘিরে রাখা আচ্ছাদন ... ইত্যাদিও **বাস** পদবাচ্য হয়ে যায়। এই **বাস** থেকেই **বাসনা** হয়, **বাসা**-**বাসি** হয়, ভাল-**বাসা** হয়, মন্দ-**বাসা** হয়, '**গন্ধ**-**তন্মাত্রা**ত্মক-সংঘাত' হয়, **জগৎ** সৃষ্টি হয়। ...

অতএব **বাস** শব্দের অর্থ অনেক। কিন্তু মূলে সেই অর্থগুলি সবই '**বস** হইতে জাত'। সেই **বাস** অন (on) থাকে **বাসন**-এ, তা সে মানসিক **বাসন** হোক আর দৈহিক **বাসন**ই হোক। তবে **বাসন-কোশন** শব্দটি **আশেপাশে**র মতো, যার **কোশন** (কোশ অন থাকে যাহাতে) শব্দটির অর্থ ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর, '**বাস** ক্রিয়ার আধার যে', অর্থাৎ, '**বাস** করা হয় যাতে' সেই **বাসা**ও কম যায় না। লোকে 'ঘরবাড়ি'তে শারীরিকভাবে **বাস** করে; **বাসনা**য় বা প্রত্যাশায় মানসিকভাবে **বাস** করে (আশায় **বাস** ক'রে ক'রে চাষা তো বেচারা মরেই যায়!); এমনকি একজন মানুষ অন্য মানুষের মনের ভিতরে তার জন্য তৈরি করে রাখা মনের মণিকোঠাতেও **বাস** করে ... এবং সে সবই **বাসা**-পদবাচ্য। তবে এ-ধরনের যত **বাসা** তার থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে **ভাল** যে **বাসা**, সেটি হল মানুষের মনের মণিকোঠা। প্রত্যেক মানুষই তার প্রিয় মানুষটির মনের মণিকোঠায় **বাস** করতে চায়; এবং বিপরীতে চায় যে তার প্রিয় মানুষটি এসে তার নিজের মনের মণিকোঠায় **বাস** করুক। এইরকম **বাসা**-**বাসি**কে তাই **ভাল-বাসা** বলে। দ্র. **ভাল**।

বাসন্তী : **২.** ***বসন্ত**-জাত-এর গতিশীল আধার যে।* **৩.** মাধবী, যূথী লতা, পাটলাবৃক্ষ, নবমল্লিকা, বসন্তোৎসব, বসন্তে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা, বসন্তে পাকা পাতার মতো রং, পীত বর্ণ। (ব.শ.)। দুর্গা। বসন্তকালে দুর্গা দেবীর পূজা হয়। এই জন্য এঁর নাম বাসন্তী। ... শরৎকালের পূজা অকাল-পূজা। এইজন্য শরৎকালে দেবীর বোধন করে পূজা করতে হয়। কারণ, শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রি এবং তখন তাঁরা নিদ্রিত থাকেন। ... কিন্তু বসন্তকালের পূজায় দেবীর বোধন নাই এবং এই সময় দেবতারা জাগরিত থাকেন। (পৌ.অ.)। **৪.** 'হলুদাভ রং' বোঝাতে এবং 'বাসন্তী' পূজা বোঝাতে শব্দটি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বসন্ত**। কার্যত শ্রম ও মেধা খরচ করে করে পাঁচ ঋতু পেরিয়ে এসে যা কিছু দৈহিক, মানসিক, দৈহিক-মানসিকে মিশ্র — এই তিনপ্রকার ফসল অর্জন করা গেল, তা সবই **বাসন্ত**। সেই **বাসন্ত**কে সক্রিয়ভাবে ধরে রাখে **বাসন্তী**। তাই সে পাকা পাতার রং-ও হতে পারে, ফসল-অর্জনকারী সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষও হতে পারেন (= দেবী **দুর্গা**)। ... তবে, **মাধবী** ও **মল্লিকা** শব্দে গিয়ে আমরা জানতে পারব, ব.শ. কেন **বাসন্তী** শব্দের প্রথম অর্থটিই **মাধবী** দিয়ে গেছেন। কেনই-বা রবীন্দ্রনাথ বারংবার **মাধবীলতা** ও **মালতীলতা** নিয়ে তাঁর অনেক গান বাঁধেন।

বাসব (বাসবদত্তা, বাসবি, বাসবী, বাসবেয়) : **১.** বসু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***বাসব** = **বাস**-কে (**বস** হইতে জাতকে) বহন করে যে।* ***বাসবদত্তা** = **বাসব** কর্তৃক প্রদত্ত যে আধারশক্তি।* ***বাসবি** = **বাসব** গতিশীল যাহাতে।* ***বাসবী** = **বাসবি**র আধার যে।* ***বাসবেয়** = **বাসব** দিশাগ্রস্তভাবে যায় যাহাতে।* **৩. বাসব** = বসুসম্বন্ধী, বসুবীর্য্যজাত, বাসবসম্বন্ধী, ঐন্দ্র, রত্নবান, ইন্দ্র, বাসবদেবতাক ধনিষ্ঠানক্ষত্র। **বাসবদত্তা** = সুবন্ধুকৃত নায়িকা বাসবদত্তার চরিতাখ্যান-মূলক গদ্যগ্রন্থ, বাসবদত্তা-প্রভৃতি গ্রন্থের নায়িকা। (সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তা গ্রন্থের নায়িকার বিবাহ পুষ্পকেতুর সহিত নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করেন। কথাসরিৎসাগরের বাসবদত্তা উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের কন্যা। বৎস্যরাজ উদয়ন ইঁহাকে হরণপূর্ব্বক বিবাহ করেন। রত্নাবলীর বাসবদত্তা অবন্তিদেশের প্রদ্যোতরাজের কন্যা, বৎসরাজ উদয়নের মহিষী।)। **বাসবি** = বাসবের অপত্য, অর্জ্জুন, বালী। **বাসবী** = উপরিচর বসুর বীর্য্যজাতা সত্যবতী, বাসবের শক্তি, শচী। **বাসবেয়** = বাসবীর অপত্য, সত্যবতীপুত্র ব্যাস। (ব.শ.)। **৪.** অর্থহীন নাম রূপে **বাসব, বাসবদত্তা, বাসবী** কমবেশি প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. বসু** কাকে বলে সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই **বসু** থেকে জাত যে সত্তা, তাকে বহন করে যে, তাকে **বাসব** বলা হয়; তা সে একটি মানস সত্তামাত্র হতে পারে, কিংবা বাস্তব সত্তাও হতে পারে। অদৃশ্যলোকে এ হল মনের ভাললাগা কিছু বিষয়, মানুষের মন যেগুলিতে **বাস** করে, করতে চায়। যেমন **মধুর** বোধ, **মধুর** স্মৃতি, **মধুর** মানসরস ভোগের ইচ্ছা, যেমন রামধনু-ভাত-আকাশ, ফুলের বাগানের দৃশ্য, সুন্দরী মেয়ের মুখ ... ইত্যাদি এবং/অথবা সেই বোধগুলি যিনি মনে মনে বহন করেন, তিনি। আর দৃশ্যলোকে এ হল বিভিন্ন প্রকারের বাহ্যসম্পদ, যৌবনসম্পদ, ধনসম্পদ, সুরা, গঞ্জিকা ... ইত্যাদি এবং/অথবা সেগুলির মালিক।

তবে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তো এরকম ভাবতেন না, যে, অমুক বস্তুটিকে কামনা করেন রামবাবু, তমুক বস্তুটির মালিক শ্যামবাবু। না, এরকম ভাবতেন না তাঁরা। তাঁরা ভাবতেন, রামবাবুর মনের ভিতরে বাস করে যে কামনা বা **কামদেব**, সেই **কামদেব**ই বস্তুটি কামনা করেন; শ্যামবাবুর মনের ভিতরে বাস করে তাঁর যে 'আমি'ত্ববোধ বা **ইন্দ্র**, সেই **ইন্দ্রই** বস্তুটির মালিক। তার মানে, কোনো মানুষ যখন বলে, 'আমি এটা করেছি', 'আমি বলছি শোনো', 'এটার আমার' ... ইত্যাদি তখন সেই 'আমি'টিই **ইন্দ্র**। কোনো জাতির তরফে যখন বলা হয়, 'এটি আমাদের' ... তখন সেই 'আমাদের'টিই **ইন্দ্র**। 'তিনিই বিভিন্ন প্রকারের **বাস** বহন করেন, অর্থাৎ, 'এটা আমার', 'এটিকে আমি বানিয়েছি, তাই একে আমি ভাল**বাসি**, ইত্যাকার **মৎস্য**-বোধে **বাস** — বহন করেন। সেই কারণে সেই **ইন্দ্র**কেই বলা হত **বাসব**। তার মানে, **বাসবত্ব** হল আসলে 'আমি'ত্ব, তা সে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, জাতির, বা জগতের 'আমি'ত্বও হতে পারে। তবে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে বা সংস্কৃতিতে সাধারণভাবে জাগতিক **ইন্দ্রে**র কথা খুব একটা নেই, রয়েছে প্রধানত ব্যক্তি-**ইন্দ্র** ও জাতি-**ইন্দ্রে**র কথা। তাঁদেরকেই সেকালে **বাসব** বলা হত। এই **বাসব** থেকেই **অর্জ্জুন** ও **বালী**র জন্ম হয়েছিল বলে, তাঁদের **বাসবি**

বলা হত। এই **বাসবে**র আধারশক্তি বলেই **শচী**দেবীকে **বাসবী** বলা হত। আবার **উপরিচর বসু**র কন্যা হওয়ায় (**বসু**-জাতা আধারশক্তি ব'লে) সত্যবতী বা **মৎস্যগন্ধা**ও **বাসবী** নামে চিহ্নিতা। তাঁর পুত্র ব'লেই **বসু**গুণের একপ্রকারের তত্ত্বধারক ও প্রকাশক হয়ে যান 'মাতৃভক্ত' **দ্বৈপায়ন**, স্বভাবতই যাঁর নাম দেওয়া হয় **ব্যাস** (দ্র. **বেদব্যাস**)।

এই যে **বাসব**, যিনি কিনা ব্যক্তি-**ইন্দ্র** কিংবা সামাজিক বা জাতীয়-**ইন্দ্র**ই বটেন, তিনি যদি কাউকে তাঁর প্রকৃতিগুণসম্পন্না কোনো কিছু দিয়ে দেন, তার নাম কী হবে? অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা জাতি যদি তাঁদের কোনো উৎপাদিত বস্তু বা বিষয় কাউকে দিয়ে দেন, তার নাম কী হবে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানাচ্ছেন, তার নাম হবে **বাসবদত্তা**। তার মানে ব্যক্তির ও জাতির প্রদত্ত জ্ঞানসম্পদ, পণ্যসম্পদ, কন্যাসম্পদ ... ইত্যাদির নামও **বাসবদত্তা** হতে পারে। অর্থাৎ কিনা তার আগেই 'ইহা আমার জ্ঞান', 'এটি আমার গরু', 'এটি আমার মেয়ে' — এরকম কথা বলবার যুগের প্রতিষ্ঠা কমবেশি ঘটে গেছে বা ঘটতে শুরু করেছে।

বিষয়টি দৃশ্যত খুবই ছোট, কিন্তু তার সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় যে, সেকালে যে সকল কারণে সমাজে সবচেয়ে বড় বড় উথাল-পাথাল ঘটনা ঘটে গেছে, **বাসবদত্তা** সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এই **বাসবদত্তা**র ঘটনা ঘটে। এ হল যৌথমালিকানাভিত্তিক সমাজের পণ্যমালিকানাভিত্তিক সমাজে পরিণত হওয়ার মধ্যেকার উত্তরণশীল সময়ে (transitional period-এ) উৎপাদিত দ্বিধাগ্রস্ত **পণ্য**সম্পদ। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থ এই দ্বিধাগ্রস্ত **পণ্য**সম্পদকেই তার উদ্ভব থেকে দ্বিধাহীন হওয়া পর্যন্ত অধ্যায়গুলিকেই **বেদবতী, সীতা, দ্রৌপদী, রাধা** ইত্যাদি নামে শনাক্ত করে গেছেন। কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গ্রন্থে তাকেই বলা হয়েছে **বাসবদত্তা**। পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার সূত্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে পেয়েছে তাদের 'হেলেন' চরিত্রে। একই কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে লেখা হয়েছে।

ধরা যাক, 'ক' সত্তা কর্তৃক 'খ' নামক দ্বিধাগ্রস্ত **পণ্য**সম্পদ উৎপাদিত হয়েছে। তা পাওয়ার কথা 'গ'-এর। 'ক' তাকে দিয়ে দিল 'ঘ'কে, তাতে 'গ' রেগে যায়। কিংবা 'ক' তাকে দিয়ে দিল 'গ'কে, তাতে 'ঘ' বঞ্চিত বোধ করে। অথবা 'ঘ' তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। ... মোটকথা 'খ'কে নিয়ে 'গ' ও 'ঘ'-এর বিরোধ এবং সেই বিরোধের কারণে সমাজে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। সেই ঘটনাবলী নানাদেশে নানাভাবে নানা অবস্থান থেকে লেখা হয়। ভারতের প্রেক্ষাপটে 'ঘ'-এর অবস্থানে বসে সেই ঘটনাকে দেখে লেখা হয় রামায়ণ, যার অনুবর্ত্তন ঘটতে থাকে মনসামঙ্গল, ময়মনসিংহগীতিকা ... প্রভৃতি নানা কাহিনীতে। আর 'গ' অবস্থানে বসে লেখা হয় মহাভারত। তাতে মানবসভ্যতার প্রায় সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকেই সংক্ষেপে লিখে ফেলা হয়। ওদিকে অস্পষ্ট অবস্থান থেকে কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে একই কাহিনী লেখা হয়েছে পাশ্চাত্যের ইলিয়ড, ওডিসি, বিওউল্ফ (Beowulf) ... প্রভৃতি কাব্যে। **বাসবদত্তা** সেখানে পরিণত হয়েছে 'হেলেন' ... প্রভৃতি চরিত্রে। বলে রাখা দরকার, ইংরেজির প্রচণ্ড প্রভাবের কারণে এতকাল অনেকেই পাশ্চাত্যের ইলিয়ড ওডিসিকে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করতেন, আমরাও করতাম। কিন্তু এখন রামায়ণ মহাভারতের প্রকৃত অর্থ কমবেশি উদ্ধার করে ফেলার পর একথা মানতেই হয় যে, আমাদের এই মহাকাব্য দুটির সঙ্গে ইলিয়ড প্রভৃতি কাব্যের তুলনা করা যেন এক জীবন্ত সুন্দরীর সঙ্গে তার ক্ষুদ্র পুতুলপ্রমাণ হাত-পা ভাঙা মূর্ত্তির তুলনা করা হয়ে যায়, যার সঙ্গে সুন্দরীর চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া একটা কঠিন কাজ।

বাসর (বাসকসজ্জিতা) : ২. ***বাসর*** = ***বাস*** *রহে যাহাতে; অর্থাৎ, (সহ)****বাস*** *রহে যাহাতে।* ***বাসকসজ্জিতা*** = ***বাসক****-এর (সহবাস করার) জন্য সজ্জিতা।* **৩. বাসর** = জগদ্বাসকদিন, জগদ্বাসক, দিবস, দিন, দিবসমান; বাসগৃহ, বিবাহরাত্রিতে বরকন্যার শয়নগৃহ, গৃহ, ঘর, বাসস্থান, বাড়ী। **বাসকসজ্জিতা** = বাসরঘরে সজ্জিতা নববধূ। (ব.শ.)। **৪.** 'বিবাহরাত্রিতে বরকন্যার শয়নগৃহ' অর্থে **বাসর** প্রচলিত। **বাসকসজ্জিতা** অপ্রচলিত। **৫.** বর্তমানে **বাসর** বলতে কী বোঝায়, সব প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাভাষীই জানেন। এই **বাসর**-এ স্বামী-স্ত্রীর সহ**বাস** রহে। কিন্তু ব.শ. ঋগ্বেদ ও অমরকোষ টীকা থেকে উদ্ধার করে জানাচ্ছেন, **বাসর** মানে যথাক্রমে 'জগদ্বাসকদিন' ও 'জগদ্বাসক'। **বাসকসজ্জিতা** শব্দ থেকে আমরা বুঝতে পারছি, 'সহবাস করা হয় যাহাতে' তাকে **বাসক** বলা যায়। তাহলে **জগদ্বাসক** বলতে বোঝাবে — 'জগৎ সহবাস করে যে বা কৃত যাহাতে'। **জগৎ** শব্দের অর্থ আমরা আগেই জেনেছি, 'জন্ম-গমন-উল্লম্ফন (origin, development, revolutionary change) থাকে যাহাতে', অর্থাৎ, 'জনিতের গমন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন থাকে যাহাতে' তাকেই **জগৎ** বলে। কিন্তু তার জন্য তো বিরাট-পুরুষকে বিরাট-প্রকৃতির সঙ্গে লিপ্ত হতে হবে, লীলা করতে হবে? পার্থিব কালের প্রত্যেক দিনই তো সেই **পুরুষ-প্রকৃতির** লীলা চলছে; চলছে বলেই এই **জগৎ** জন্মাচ্ছে, বিকাশলাভ করছে, এবং বদলে যাচ্ছে। তার মানে, এই **বাসর** বা 'জগদ্বাসক' স্থানে নয়, কালে প্রতিষ্ঠিত।

তাহলে ব্যাপারটি এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকটি দিনই হল বিরাট-পুরুষ ও বিরাট-প্রকৃতির **বাসর**-কাল। তাতেই **জগৎ**-এর জন্ম-বিকাশ ... ইত্যাদি চলছে। তারই সাদৃশ্যে মানুষের পুরুষ-প্রকৃতির বা নর-নারীর বিয়ের রাতের শয়নগৃহ হল মানুষের **বাসর**।

বাসুকি : **১.** বসুক + ই (ইঞ্)। (ব.শ.)। **২.** ***বসুক*** *(****বসু*** *করে যে) হইতে জাত গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে। /* বসুকের অপত্য যে। (ব.শ.)। **৩.** সর্পরাজ (ইঁহার ভগিনী জরৎকারু বা মনসা। মাতৃশাপে সর্পকুলরক্ষার্থ ইনি জরৎকারু মুনিকে ভগিনী সম্প্রদান করেন। আস্তিক ইঁহার ভাগিনেয়। সমুদ্রমন্থনে ইনি সমুদ্ররজ্জু হইয়াছিলেন।) (ব.শ.)। নাগরাজ। দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র। বাসুকির পিতা মহর্ষি কশ্যপ। বাসুকি শেষনাগ ও অনন্তনাগ নামেও অভিহিত। এঁর ভগিনী জরৎকারু বা মনসা। সমুদ্র-মন্থনকালে নাগরাজ বাসুকিকে দেবগণ মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করেন। ... ব্রহ্মার উপদেশে বাসুকি পাতালে গিয়ে চঞ্চলা পৃথিবীকে ধারণ করেন। ... ব্রহ্মার ইচ্ছায় গরুড়ও তার সহায় হন। ... এলাপত্র নামে নাগের পরামর্শে তপস্বী

জরৎকারুর সঙ্গে ভগিনী জরৎকারুর বিবাহ দেন। ... তাদের পুত্র আস্তীক জনমেজয়কে যজ্ঞ হতে নিবৃত্ত করে সর্পকুলকে রক্ষা করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অনন্তনাগ, আস্তিক, কূর্ম্ম, জনমেজয়, জরৎকারু, নাগ** ... ইত্যাদি। **বাসুকি** ভারতসমাজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বৌদ্ধযুগের শেষ সময়ে হর্ষ**বর্দ্ধনে**র কালে পুরনো যুগের ধনীরা ছিলেন এই নাগদের দলে। **বাসুকি** এই নাগদের বা নাগরিকদের রাজা। প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সত্তা বৌদ্ধযুগের বিরোধিতা করেন। কীভাবে তা করা হয়, তা উপরোক্ত **আস্তিক, জনমেজয়** ... প্রভৃতি শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাস্তব (বাস্তবিক, অবাস্তব) : ১. বস্ত + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. ***বাস্তব*** = ***বস্ত****-জাতকে বহন করে যে।* ***বাস্তবিক*** = ***বাস্তব****কে গতিশীল বা সক্রিয় করে যে।* ***অবাস্তব*** = *যাহা* ***বাস্তব*** *নহে। /* **অবাস্তব** = বাস্তব যাহাতে নাই। (ব.শ.)। ৩. **বাস্তব, বাস্তবিক** = বস্তুসম্বন্ধী, পরমার্থভূত, সত্য, তাত্ত্বিক, অকৃত্রিম, প্রকৃত, বস্তুর অংশ, বস্তুশক্তি বা মায়া, বস্তুকার্য্য বা জগৎ, সত্য পদার্থ। **অবাস্তব** = অসত্য, মিথ্যাভূত, ন্যায়বিরুদ্ধ, অযৌক্তিক, বাস্তবের অভাব, অযাথার্থ্য, অমূলকতা। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **বস্ত**। শব্দার্থ অনুসারে **বস্ত** থেকে জাত যে পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থা ... ইত্যাদি, তা সবই **বাস্তব**। সেই সুবাদে **বস্তুজগতে** যা কিছু আছে, থাকে, থাকতে পারে, থাকা সম্ভব, সেগুলি সবই **বাস্তব**। তার মানে, যা কিছু বানানো গেছে, বানানো যাবে, বানানো যেতে পারে, তা সবই বাস্তব। আর, যা কিছু বানানো যায় না, বানানো যাবে না, বানানোর কোনো উপায় নেই, সেগুলি সবই **অবাস্তব**। তার মানে, 'কৃত্রিম-**পদার্থে**র দুনিয়া'টা হল **বাস্তব**, এবং 'অকৃত্রিম-**পদার্থে**র দুনিয়া'টা হল **অবাস্তব**। তার মানে, মানুষের তৈরি করা ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তেল নুন লকড়ি, ভাতরান্নার চুলো থেকে পরমাণু চুল্লী ... এইগুলি সবই হল **বাস্তব**। আর, আকাশ বাতাস অরণ্য পর্বত নদী সমুদ্র ..., যা কিছু মানুষ বানায়নি, সেগুলি সবই হল **অবাস্তব**।

সেকালের মানুষ বাস করতেন নিসর্গ প্রকৃতিতে বা 'অকৃত্রিম-**পদার্থে**র জগতে', তারই অংশরূপে। তারপরে সে নিজেই 'কৃত্রিম-**পদার্থে**র জগৎ' বা '**বস্তুজগৎ**' বানাতে শুরু করল এবং নিজেকে নিসর্গ-প্রকৃতির থেকে পৃথক করে নিতে লাগল। মানুষের জীবনও 'অকৃত্রিম-**পদার্থে**র জগৎ' ছেড়ে 'কৃত্রিম-**পদার্থে**র জগতে' পা রাখতে শুরু করল। ... সুদীর্ঘকাল পরে আজকের আধুনিক মানুষে পৌঁছে তার গর্বের আর সীমা নেই, কেননা, সে মনে করে, সে তার নিজের হাতে-গড়া 'কৃত্রিম-**পদার্থে**র জগতে'ই বাস করে। সে নিজেই এই জগতের মালিক, প্রভু, নিয়ামক; শুধু নিঃশ্বাসটুকুর জন্যই যা তাকে এখনও পুরোনো সেকেলে 'অকৃত্রিম-**পদার্থে**র জগতে' পা রাখতে হয়, এই যা! নইলে এই অকৃত্রিম-**পদার্থে**র জগৎটাকে তার থোড়াই কেয়ার! ...

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এইরকম **বাস্তব-অবাস্তব**কে আস্ত রাখেননি, তুলে নিয়ে গেছেন তাদের সর্বোচ্চ অর্থে। পরিণত বয়সে, মৃত্যুর এক মাস আগে তাঁর লেখা 'সত্য ও বাস্তব' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানান —

'... মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে **বাস্তব** জানলেও সত্য বলে **বিশ্বাস করে না**। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। ... মানুষ নিছক **বাস্তব নয়**। তার **অনেকখানি অবাস্তব,** অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের **সাধনার** দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, **তার শিল্প,** একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো **বাস্তবের** রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।'

বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথকে কাজ চালাতে হয়েছিল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ছাড়াই। তাঁর সমস্ত অর্জন কার্যত তাঁর বিশাল প্রতিভার জোরেই সম্ভব হয়েছিল। ... এখানে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিষয়টিকে রেখেছেন, তাকে একালের মতো করে আমরা বলতে পারি সত্য দুই প্রকার — **অবাস্তব** সত্য (অতিসত্য) ও **বাস্তব** সত্য (অনতিসত্য)। শঙ্করাচার্য এই অতিসত্যকে **ব্রহ্ম** এবং অনতিসত্যকে মিথ্যা বলে গেছেন। আমরা ইতিহাস ভুলে, শব্দার্থ-কৌশল ভুলে সেই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'কে ফেলে রেখেছি বাজে কাগজের ঝুড়িতে। (আমাদের 'গ' গ্রন্থের ২১২-২১৫ পৃষ্ঠায় বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

বাস্তু : ২. **বস্ত** *হইতে জাত; অথবা,* ***বাস্‌*** *তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে। /* যে স্থানে সুখে নিবাস করা যায়। (ব.শ.)। ৩. গৃহযোগ্য ভূমি, বাসযোগ্য স্থান, গৃহ। (ব.শ.)। ৪. 'ঘরভিটা' অর্থে প্রচলিত। ৫. যে ভূমিতে গৃহ নির্মিত হয়, তা তুলনামূলকভাবে উচ্চ ভূমি হয়। গ্রামবাংলার রীতিই ছিল পাশে একটি পুষ্করিণী খনন করে তার মাটি একই স্থানে ফেলে বসিয়ে বসিয়ে ঐ **বাস**যোগ্য **বাস্তু**ভূমি তৈরি করা এবং তারপর সেখানে **বাস**-উপযোগী গৃহনির্মাণ করা। সেই গৃহাদি-সম্বলিত উঁচু স্থানকে বলা হয় **বাস্তু**। সেকালে একে বলা হত **ভদ্রাসন**। কেন? দ্র. **ভদ্রাসন**।

বহ্‌ (বাহ্‌, বাহি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপ্রৌঢ়, অতিবড়, অতিবাড়, অতিবাহ, অতিবাহক, অতিবাহন, অতিবাহিক, অতিবাহিত, অতিবাহ্য, অনির্ব্বাহ, অনূঢ়, অবড়, অবাহ্য, আবহ, আবহন, আবহমান, আবহমানকাল, অবিবাহ, অবিবাহিত, অবিবাহী, অবিবাহ্য, অবিভাই, অবিভাতি, অবিয়ত, অব্যূঢ়, আইবড়, আইবুড়, আইবুড়ভাত, আইবুড়ী, আতিবাহিক, আবাহন, উদ্বহ, উদ্বাহ, ঊঢ়, উধঃ, উধস্য, উধস্বতী, জলবাহ, নির্বহন, নির্ব্বাহ, প্রবহ, প্রবহমান, প্রবাহ, প্রবাহিত, প্রবাহিনী, প্রৌঢ়, বই (বহি), বইঠা (বৈঠা), বইৰল (বহিৰল, bible), বউ (বৌ), বউকথাকও, বউকাঁটকি(কী), বউগিন্নী, বউড়ী, বউবেটি, বউঠাকরা(রু)ণ, বউদিদি, বউপরচা, বউভাত, বউমা, বউমানুষ, বউয়া (বৌও), বউয়ারী, বউয়ালা, বধু, বধূ, বধূকাল, বধূগৃহপ্রবেশ, বধূজন, বধূটী, বধূধন, বধূপক্ষ, বধূবন্ধু, বধূবর, বধূসংযান, বধূসর, বধূসরা, বহ্‌, বহ, বহতা, বহন, বহনীয়, বহমান, বহর (বহনে রহে), বহর (ভড়), বহরি, বহরী, বহল (বৃন্হ), বহলা, বহস্‌, বহা, বহাল, বহালী, বহি (বই), ৰহিঃ, বহিত্র, বহিন (বুইন,

ভগিনী), ৰহিরঙ্গ, ৰহিরিন্দ্রিয়, ৰহির্গমন, ৰহির্জগৎ, ৰহির্দেশ, ৰহির্দ্বার, ৰহির্বাস, ৰহির্ভূত, ৰহির্মুখ, ৰহিশ্চর, ৰহিষ্করণ, ৰহিষ্কার্য্য, ৰহিষ্কৃত, ৰহিষ্কৃতি, ৰহিস্থ, ৰহিস্থিত, বহ্নি, বহ্নিকর, বহ্নিকুণ্ড, বহ্নিকোণ, বহ্নিকোপ, বহ্নিগর্ভা, বহ্নিগৃহ, বহ্নিজ্বালা, বহ্নিদাহ, বহ্নিপ্রিয়া, বহ্নিবধূ, বহ্নিবাণী, বহ্নিবীজ, বহ্নিভোগ্য, বহ্নিভোজ্য, বহ্নিশালা, বহ্নিশিখা, বহ্নিসংস্কার, বহ্নিসখ, বহ্নিসখা, ৰহ্বারম্ভ, ৰহ্বাশী, বহ্ ্চ, বাইর (বাহির), ৰাউ, বাউতি (যাতে বহতা বা বয়ে আসা স্রোত থেকে মাছ ধরে), বাঢ়, বাঢ়ডোবা, বাঢ়বন্যা, বার (নিবারণ করলে বেরোয়, দ্র.বারি), বার-করা, বারক্ষেত্র, বারচোর, বারবাড়ী, বারা (বের করা — বাড়া, বাঢ়া), বারফটকা, বারফট্টাই, বারমতি (বাইরে মতি যাহার), বারমুখী, বারা, বারান্দা (দ্র.বৃ), বারি, বাহ্, বাহ, বাহক, বাহচাল্লি, বাহ(হু)ড়, বাহন, বাহনা, বাহবা, বাহা, বাহাদুর, বাহাদুরী, বাহানা, বাহার, বাহারী, বাহারে, বাহাল, বাহালী, বাহিক, বাহিত, বাহিনী, বাহিনীনিবেশ, বাহির, বাহিরদ্বার, বাহিরবাড়ী, বাহিরা, বাহী, বাহীক (জাঠ), বাহের, ৰাহ্য (বেদবাহ্য, বাহিরকৃত, মল), ৰাহ্যকরণ, ৰাহ্যকৃত্য, ৰাহ্যক্রিয়া, ৰাহ্যদৃশ্য, ৰাহ্যনাম, ৰাহ্যপ্রকৃতি, ৰাহ্যস্পর্শ, ৰাহ্যহীন, ৰাহ্যিক, বাহ্লি(হ্লী)ক, বিরণি, বিবাহ, বিয়ে, বের, বেরন, বেরা, বেরিয়ে-যাওয়া, বৈরঙ্গ, বোঢ়ব্য, বোঢ়া, বোয়েন (বহঅম্, বইঅম্, বএম, বয়াম), বোহারি, বোহিনী, বৌ, বৌঅন্ত, বৌআড়া, বৌও, বৌকাঁটকী, বৌগিরি, বৌঠাকরুণ, বৌয়ারী, বৌয়ালা, বৌহারা, বৌহারি(রী), ভড়, ভাতবাড়া, ভারবাহী, সুবহ।

বহ্ (বাহ্, বাহি) = বাহীর হওয়ন। **বহ** = বাহীর হওয়ন যাহাতে। **বাহ্** = বহ্ হইতে জাত। **বাহি** = বাহ-এর গতিশীলতা যাহাতে। (**বহ্** ক্রিয়ামূলে যে-বাহী সক্রিয়, তাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাহী রূপে দেখা যায়। সে নিজে বহে বা প্রবাহিত হয়, তাতেই তার অন্যকে বহন করাও হয়ে যায়। সে কখনো বাহী, কখনো-বা অতিবাহী রূপে সক্রিয় হয়। শুরুতে **ৰ** ও **ব** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।)

আতিবাহিক (১ম খণ্ডে **অতিবাহ** দ্র.) : ১. অতিবাহ + ইক (ঠক্) 'তত্র নিযুক্ত' 'তৎসম্বন্ধ' অর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***অতিবাহিক (অতিবাহ-কে গতিশীল বা সক্রিয় করে যে) হইতে জাত।*** **৩.** অতিবাহে নিযুক্ত, ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত (অর্চ্চিরাদ্যভিমানী ও ধূমাদ্যভিমানী দেবগণ — ছান্দোগ্যোপনিষৎ), অতিবাহসম্বন্ধী, পরলোকপ্রাপণসম্বন্ধী (দেহ)। সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **প্রেত, অতিবাহ** [১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪। **অতিবাহ** = অর্চ্চিরাদ্যভিমানী দেবতা (ইঁহারা লিঙ্গশরীর অবচ্ছিন্ন জীবকে **দেবযান** ও **পিতৃযান** দ্বারা যথাক্রমে **ব্রহ্মলোকে** ও **চন্দ্র**লোকে লইয়া যান।)] ভারতীয় উপমহাদেশেই মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সবার আগে — অথচ তার কোনো লিখিত সাক্ষ্য নেই, এমন তো হতে পারে না। তবুও সেরকমই যে হয়ে রয়েছে, তার প্রধান কারণ হল, আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের লিখে রেখে যাওয়া কথাবার্তাগুলি বুঝতে না পারা। এই ব্যর্থতার একটি নিদর্শন এই **আতিবাহিক** শব্দ। আজ থেকে তিন হাজার বছর পিছিয়ে যান। একটু ভাবুন — বিশ্বের একটি মাত্র দেশ, ভারতবর্ষ, যেখানে **পণ্য** উৎপাদিত হয়ে গেছে; ফলত **বস্তু**র ব্যবহারিক মূল্য, তুলনামূলক মূল্য, বিনিময় মূল্য ... (use value, relative form of value, exchange value ...) ইত্যাদির জন্মও হয়ে গেছে। তো, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানী মানুষেরা কীভাবে বুঝছেন, কীভাবে বলছেন? আসুন, সেকথা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। (পুনরায় মনে করিয়ে দিই, নিম্নোক্ত বয়ান বোঝার সুবিধার জন্য মোটা হরফের শব্দগুলির অর্থ তাদের নিজ নিজ ভুক্তিতে দেখে নিন।)

উপরোক্ত তথ্যানুসারে **দেবগণ**কে **আতিবাহিক** বলে। এঁরা **অতিবহন** করেন। দ্র. **প্রেত** (= **আতিবাহিক** দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ = **পণ্য**)। উপরোক্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদ প্রদত্ত তথ্য বলছে, এঁরা দুই শ্রেণীর **দেবগণ** — অর্চ্চিরাদ্য-অভিমানী **দেবগণ** ও ধূমাদ্য-অভিমানী **দেবগণ**। অর্থাৎ, প্রথম দলের অভিমান এই যে, তাদের হাতে **অর্চ্চিঃ** বা **বহ্নিশিখা** (= ফলিত তত্ত্বজ্ঞান / ব্যবহারিক মূল্য) আছে। আর দ্বিতীয় দলের অভিমান এই যে, তাদের হাতে **ধূম** বা ধোঁয়া (= ফলিত তত্ত্ববিকার / বিনিময় মূল্য) আছে। এই দুই দল **দেবতা**দের **আতিবাহিক** বলে। আর, **অতিবাহিক** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. জানাচ্ছেন যে, যাঁদের হাতে **বহ্নিশিখা** থাকে, সেই **দেবগণ** 'লিঙ্গশরীর অবচ্ছিন্ন জীব'কে (= তত্ত্বানুসার-কর্মযজ্ঞমূলক সংস্থা থেকে উৎসারিত শ্রমমেধাবাহী উৎপন্নকে) **দেবযান** ও **পিতৃযান** দ্বারা যথাক্রমে **ব্রহ্মলোকে** ও **চন্দ্র**লোকে লইয়া যান। (এই তথ্যটির মধ্যে একটু ভুল আছে। কথাটি হবে — **'পিতৃযান** ও **দেবযান** দ্বারা যথাক্রমে **ব্রহ্মলোকে** ও **চন্দ্রলোকে** লইয়া যান।') এর অর্থ হল, জ্ঞানকর্মের যে অগ্নিশিখারূপ শ্রমশক্তি, যা কিনা 'উৎপাদিত বস্তুর ভিতরে ঢুকে থাকে', যাকে একালের ভাষায় বলা হয় use value, **আতিবাহিকগণ** তা **পিতৃযান** দ্বারা **ব্রহ্মলোকে** নিয়ে যান; এবং **দেবযান** দ্বারা তা **চন্দ্রলোকে** নিয়ে যান। ... এসব বিষয়ে আমাদের উপনিষদাদি গ্রন্থে বিপুল তথ্য রয়েছে, আমরা সংক্ষেপে সারলাম।

অতিবহন মূলত তিন রকম হতে পারে — **দেশ (স্থান)** থেকে দেশান্তরে (স্থানান্তরে), কাল থেকে কালান্তরে, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে। কিন্তু এই তিনরকম বহন একভাবে করা যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহন করলেই 'অতিবহন' করা হয়ে যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বহনই সম্ভব এবং কখনোই 'অতিবহন' করা সম্ভব নয়। যেমন, 'রাত্রি **অতিবাহিত** হয়', কিংবা 'মানুষের জীবৎকাল **অতিবাহিত** হয়', তারা 'বাহিত' হয় না।

আবার, বাহ্যবস্তুর বহন হতে পারে, অতিবহনও হতে পারে, অদৃশ্য বস্তুর শুধুমাত্র অতিবহন হতে পারে। লোকে মাথায় করে কলার কাঁদি বহন করে, কলাকৌশলও বহন করে। অবশ্য কলার কাঁদি কাঁধে করে বহন করা যায়, কিন্তু কলাকৌশল কাঁধে করে বহন করা যায় না। প্রধানত মানসিকভাবে বহন করাকে 'অতিবহন' এবং দৈহিকভাবে বহন করাকে 'বহন' বলা হয়ে থাকে।

আবহ : ২. ***বহ-এর আশ্রয় যাহাতে।*** /যে (দ্রষ্টা) অভিমুখে বহন করে আনে। (ব.শ.)। ৩. প্রাপক, জনক, কারক; সপ্তস্কন্ধবায়ুর প্রথমস্কন্ধ ভূবায়ু, অগ্নির সপ্তজিহ্বার একতম। (ব.শ.)। ৪. 'ঘিরে

থাকা পরিবেশ-পরিস্থিতি' অর্থে শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত। ৫. সেকালে মনে করা হত বায়ুপ্রবাহ সাত রকম, যথা **প্রবহ, আবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, পরিবহ, পরাবহ** ইত্যাদি। এগুলিকে বায়ুর সপ্ত নাম বলা হয়। এরা আবার সাতটি লোকে বা sphere-এর প্রতিটি ধারায় সেই সেই লোকের নিজস্ব রূপ নিয়ে প্রবাহিত থাকে। সেই হিসেবে এদের নামগুলি **প্রবহ**লোকে — প্র-প্রবহ, প্র-আবহ, প্র-উদ্বহ, প্র-সংবহ, প্র-বিবহ, প্র-পরিবহ, প্র-পরাবহ; **আবহ**লোকে — আ-প্রবহ, আ-আবহ, আ-উদ্বহ, আ-সংবহ ... ইত্যাদি। এভাবে ফলত তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ × ৭ = ৪৯ বায়ু। **আবহ** নামক বায়ুটি দ্বিতীয়, যা কিনা সাত লোকে সাত রূপে — প্র-আবহ, আ-আবহ, উদ্-আবহ, সং-আবহ, বি-আবহ, পরি-আবহ, পরা-আবহ — রূপে প্রবাহিত। দ্র. **বায়ু**।

বধূ (বউ, বউভাত, বৌ) : ১. **বধূ** = ✓বহ্ + ঊ - কর্ম্মবাচ্যে; বন্ধ্ + ঊ (ঊঙ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বধূ** = *যাহাকে **বিবাহ** (বিশেষ প্রকারে **বহন** করার চুক্তি) করিয়া আনা হইয়াছে। /* **বধূ** = ভর্ত্তা কর্ত্তৃক ঊঢ়া; যুবকের মন বাঁধে যে। (ব.শ.)। ৩. **বধূ** = নবোঢ়া, জায়া, ভার্য্যা, পত্নী, পুত্রবধূ, পুত্রবধূসদৃশী নারীমাত্র ... ইত্যাদি। **বউ, বৌ** = বধূ, স্ত্রী, জায়া, পুত্রবধূ, বউদিদি, বড় ভাইজ, বধূমাত্র, কুলবধূ। **বউভাত** = পাকস্পর্শ। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **পরিণয়**, **বিবাহ**। এখানে ব.শ. দেখাচ্ছেন যে, **বহ্** ক্রিয়ামূল থেকে **বধূ** শব্দটির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে, **বন্ধ্** ক্রিয়ামূল থেকেও **বধূ** শব্দটি উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। আমাদের বক্তব্য এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রকারে বহন করার চুক্তি বা **বিবাহবন্ধন** রয়েছে। দ্র. **বিবাহ**।

বধূসরা : ৩. ভৃগুপত্নী পুলোমার অশ্রুজাতা নদী। (ব.শ.)। নদীর নাম। পুলোমা নামে এক রাক্ষস মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে পুলোমার শিশু গর্ভচ্যুত হয়। ... শিশু চ্যবনের দর্শনেই পুলোমা-রাক্ষস ভস্ম হয়ে যায়। ... ভৃগুপত্নী পুলোমা ক্রন্দনরতা অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। ব্রহ্মা তাঁর এই রোরুদ্যমানা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দেন এবং এঁর অশ্রুধারায় যে নদীর সৃষ্টি হয়, তার নাম দেন বধূসরা। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নিসাক্ষী, পুলোমা**। একটি মেয়ের চোখের জল কেন, আজকের দুনিয়ার সাতশো কোটি মানুষের চোখের জল একত্রিত করলেও তা দিয়ে একটি নদীর জলপ্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তবু তো গল্পটা শুনছি! শুনছি যে, **ব্রহ্মা**র পুত্রবধূ **পুলোমা**র চোখের জলে নদী বয়ে গিয়েছিল। কী করে তা সম্ভব হয়েছিল?

হয়েছিল, হয়, হয়ে থাকে। এখনও হতে পারে। শুধু একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই তা হতে পারে। রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনেতাদের সম্মতিতে একটিমাত্র সর্বমান্য কঠোর সিদ্ধান্ত নিক — আজ রাত্রি ১২টার পর থেকে দুনিয়ার কোনো কিছুতেই ছেলেদের কোনো অধিকার থাকবে না, থাকবে শুধুমাত্র মেয়েদের। দেখবেন, কালই বিশ্বের সমস্ত পুরুষের চোখের জলে 'বরসরা' নামে আর একখানা নদী সৃষ্টি হয়ে মহাবেগে বইতে শুরু করে দিয়েছে! এবং তারপর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ছেলেদের কপালে যে দুঃখ জুটবে, ও তার থেকে যে পরিমাণ চোখের জল প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ঝরবে, সেই জলই পরিপুষ্ট রাখবে সেই 'বরসরা' নদীটিকে। তখন হয়তো এই **বধূসরা** নদীটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে, কেননা, আর তো মেয়েদের চোখের জল তেমন করে ঝরবে না; তখন এই **বধূসরা**র জলের সরবরাহ আসবে কোথা থেকে!

তার মানে, কথাটি এই দাঁড়ায় যে, পুরাণাদিতে ভারতসমাজের মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনার দু-একটি খবর আজও প্রচলিত রয়েছে। **পুলোমা**র ঘটনা তারই নিদর্শন। যে মাতৃতন্ত্রে মেয়েরা সমগ্র মানবসভ্যতার তথা এই বিশ্বজগতের অধিকারিণী ছিল, সেই মাতৃতন্ত্রটাকেই যখন রদ করে দেওয়া হল, তখন মেয়েদের চোখের জল তো ঝরবেই। আর সেই চোখের জল তো সেই আদিম কালে থেমে থাকবে না, থাকেওনি। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত **বধূ**দের চোখের জলে তা নিয়ত পুষ্ট হয়েছে, প্রবাহিত থেকেছে। আজও প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত কত **বধূ**র চোখের জল নিত্য ঝরে ঝরে পড়ে এবং তাই দিয়ে সেই **বধূসরা** নদীটিকে আজও প্রবাহিত রেখেছে, তার পরিসংখ্যান তৈরি করা কঠিন। ...

এছাড়াও **বধূসরা**র অন্য কোনো অর্থ থাকলেও থাকতে পারে, আমরা নিশ্চিত নই। বিষয়টি ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

বহ (বহতা, বহন, বহর) : ১. ✓বহ্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বহ** = *বাহীর হওয়ন যাহাতে।* **বহতা** = **বহ** *তারণের আধার যে।* **বহন** = **বহ** *অন (on) যাহাতে।* **বহর** = **বহ** *রহে যাহাতে।* ৩. **বহ** = বাহক, ধারক, বাচক, অনুষ্ঠাতা, প্রবাহী, ঘোটক, বায়ু, স্রোতঃ, স্কন্ধ; বহন করা, বহিয়া আনা, ধারণ করা, আশ্রয় করা, ব্যাপ্ত করা ... ইত্যাদি। **বহতা** = প্রবাহযুক্তা, স্রোতস্বতী। **বহন** = বাহক, প্রাপণ, ধারণ, পোত, তরণী, যান, শকট। **বহর** = সাগরের নৌকা, বড় নৌকা, ভড়, বিস্তার, ওসার, গভীরতা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. **ক** (চাল**ক**), **কর** (সুখ**কর**), **করণ**, **কারক** ... সবগুলিই 'করে যে' অর্থে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে **ব** (তাণ্ড**ব**), **বহ** (আজ্ঞা**বহ**), **বহন**, **বাহক** ... সবগুলিই 'বহে যে' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা জানি 'বহে যে', সে 'বহন করে নিয়ে যায়', সে 'বাহিত হয়'। তার মানে, 'বহে' বা 'বাহিত হয়' বলেই তার কাঁধে কিছু চাপিয়ে দিলে সে 'বহন করে নিয়ে যায়'। জলপ্রবাহ বলুন আর বায়ুপ্রবাহই বলুন, সে প্রবাহিত হয় বলেই তার প্রবাহে কিছু ছেড়ে দিলে সেটিও বাহিত হয়ে চলে যায়। আবার, 'বহে যে' এবং 'বয় যে' একই কথা। পার্থক্য এটুকুই — বহ = দুরকম হয় যে; বয় = দুরকম যায় যে। কিন্তু তার কার্যকরী রূপটিকে বিচার করলে দেখা যায়, তা আসলে একরকমই।

বহ = বাহিত হয় যে। বহ = বহন করে যে।
বয় = বয়ে যায় যে। বয় = বয়ে নিয়ে যায় যে।
অর্থাৎ, বয় = বাহিত হয় যে। বয় = বহন করে যে।

তার মানে, 'বয়ে যাওয়া' ও 'বয়ে নিয়ে যাওয়া' দুটো কাজ একই সঙ্গে বোঝাচ্ছে **ব** বর্ণটিই। বাংলাভাষী যখন বলেন, 'ছেলেটি বয়ে গেছে', তখন সবাই বুঝতে পারেন — ছেলেটি তার যথাবিহিত

অবস্থানে থাকতে না পেরে প্রবাহিত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে। কিন্তু যখন কোনো মেয়ে গান গেয়ে জানায়, 'তোমার ডাকে সাড়া দিতে বয়েই গেছে!' তখন তার মানেটা ব্যঞ্জনার্থক হয়ে যায়। একদিকে তা রহস্যময়ভাবে জানিয়ে দেয় যে, সাড়া না দেওয়ার ফলে তার কোনো কিছু বাহিত হয়ে অন্যত্র কোথাও চলে যায় না বা বয়ে যায় না; অন্যদিকে তা আরও রহস্যময়ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, সাড়া দিতে গিয়ে তার অস্তিত্ব খানিকটা প্রবাহিত হয়ে সরে গেছে! অর্থাৎ বাংলাভাষী মেয়েদের বাক্যে কখনো কখনো যে 'হ্যাঁ' ও 'না'-এর সর্বোচ্চ দ্বৈরাজ্য থাকে, এই বাক্যে সেই '**দ্বৈত** কিন্তু **অদ্বৈত**' বা **দ্বৈতাদ্বৈত**কে স্পর্শ করা গেছে। যাঁরা **চাটনি** বানাতে পারেন, নিন্দার ছলে কৃষ্ণভজনা করেন, একমাত্র সেই বাংলাভাষীর পক্ষেই এমন বাক্য তৈরি করা সম্ভব। অতএব এই **ব** যে দ্বৈতাদ্বৈতবাহী, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। **ব** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।

বহি (বহিঃ, বহির্গমন, বহির্গত, বহির্জগৎ, বহির্ভূত, বহিষ্করণ, বহিষ্কার, বহিষ্কৃত, বাহির) : ২. ***বহি*** = ***বহ্*** *গতিশীল যাহাতে।* ***বহিঃ*** = ***বহি****-র শেষ যাহাতে।* ***বহির্গমন*** = *বহির্দ্দেশে গমন যাহাতে।* ***বাহির*** = ***বহিঃ*** *(বহির্) হইতে জাত।* **৩. বহি** = ব্যতীত, ভিন্ন, ছাড়া, ব্যতীতে, গতে, পরে। **বহিঃ** = বাহ্যে, বহির্দেশে, বাহিরে, বাহ্য, বিরোধী, অনাবৃতদেশ। **বহির্গমন** = নির্গমন, নিষ্ক্রমণ। **বর্হির্জগৎ** = বহিঃস্থ দৃশ্যমান জগৎ। **বর্হির্ভূত** = বহিঃস্থিত, নির্গত, নিঃসৃত। **বহিষ্করণ** = বহির্নয়ন, নিঃসারণ। **বহিষ্কৃত** = নিঃসারিত, বর্জ্জিত। **বাহির** = বহিঃস্থিত, বহির্গত, প্রকাশিত, স্রোতোরূপে বহির্গত, গৃহাদির বর্হির্ভাগ, বহির্ভাগ ...। (ব.শ.)। **৪. বহিঃ** বাদে সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। **৫.** প্রথম কথা হল, 'বহ গতিশীল যাহাতে' তাকে আমরা **বহি** অর্থাৎ 'ব্যতীত' বা 'বই' ('ইহা **বই** সুখ আর নাই') বুঝি কেন। বুঝি এইজন্য যে, **বহির ব** হল **দ্বিতীয়**-এর **ব**; মূলের পাশে যে বিশেষ ধারাটি রয়েছে, তাকে উল্লেখ করাই তার কাজ। সেই কারণে, '**বহ** সক্রিয় যাহাতে', সেটি মূল 'ভিন্ন' বা মূলকে 'ছাড়া' অপর একটি ধারার কথা বলে। সেই কারণে বাংলাভাষীরা বলেন — ও-কাজে দুঃখ **বহি** / **বই** সুখ মেলে না।

দ্বিতীয় কথা হল, **বহিঃ** ('**বহিঃ**-র শেষ যাহাতে') বললে আমরা 'বাহির' বা outside বুঝি কেন। সেক্ষেত্রেও মূল ছাড়া যে ধারা, অর্থাৎ **বাহির**-এর ধারা, তার কথাই প্রকারান্তরে বলা হয়। কোনো বস্তু বা বিষয়ের এলাকার ভেতরে একটি ধারা, যা কিনা দেখা যায়, আর 'বাইরের একটি ধারা' যা কিনা দেখা যায় না, সেই **বাহির**কে খুঁজে বের করাও **বাহির**-করা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'লুকালে বলে, খুঁজে বাহির করা।'

বহ্নি : **১.** ✓বহ্ + নি - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বহন করে নিয়ে যায় যে (শ্রমশক্তি)।* / দেবার্থ হুত বহন করে যে। (ব.শ.)। **৩.** যজ্ঞাগ্নি, অগ্নিত্রয়, অনল, অগ্নিদেবতা, দেহস্থ পাচকরস, (তন্ত্রে) অগ্নিবীজ 'র', তিন '৩' সংখ্যা, (বহ্নিবৎ দাহক) চিত্রক, ভল্লাতক, নিম্বুক, বহ্নিদেবতাক কৃত্তিকানক্ষত্র। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অগ্নি**। এর দৃশ্যরূপটিকে সবাই চেনেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিদের সমস্যা ছিল অদৃশ্য রূপটি। জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখা বা তত্ত্বের ফলিত প্রায়োগিক রূপ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নতুন নতুন **বস্তু** উৎপাদিত হচ্ছে, তাদের ভিতরে মানুষের শ্রম-মেধা ঢুকছে, কিন্তু সেগুলিকে বোঝানোর জন্য কোনো শব্দ নেই। তখনও বিশ্বের কোনো দেশের কোনো জাতিই **বাস্তবের** এই বিকাশ সাধন করে উঠতে পারেনি। ভারতীয় উপমহাদেশ পেরেছিল। ফলে এদেশের সেসময়ের পণ্ডিতদেরকে সেই সব 'লিঙ্গশরীর', 'লিঙ্গশরীর-অবচ্ছিন্ন জীব', 'সূক্ষ্মশরীর' ... ইত্যাদি বিষয়কে বুঝে নিতে হয়েছিল। তার থেকে প্রায় ৩০০০ বছর পরে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিত **মার্কসসাহেব** সেই একই সত্তাকে চিনলেন এবং তাদের নামকরণ করলেন জারমান ভাষায়, এবং সমঐতিহ্যের কারণে সে বক্তব্যের সহজে অনুবাদ হয়ে যায় ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায়। ভারত যার নামকরণ করেছিল **বহ্নিশিখা**, আমরা যার নাম দিয়েছি 'শ্রম-মেধা', তিনি তাকে বললেন — labour power। তাঁর মতে 'By labour-power or capacity for labour is to be understood the aggregate of those mental and physical capabilities existing in a human being, which he exercises whenever he produces a use-value of any description.' (Capital, Chapter VI, *The buying and selling of Labour-Power*.)

বাহন : **১.** ✓বাহি + অন (ল্যুট্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাহ*** *(বহ হইতে জাত) অন (on) থাকে যাহাতে।* / যাহার দ্বারা বহন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** বাহয়িতা, বাহনকারয়িতা, বহন, নয়ন, যান, রথ, শকট, শিবিকা, হস্তিতুরগাদি, অশ্ব, অরিত্র, হাল, বাহকমাত্র, অতিক্রম, অতিবাহন। (ব.শ.)। প্রায় প্রত্যেক দেবতারই কোনো না কোনো জীবজন্তু বাহন রূপে আছে; যথা ব্রহ্মার হংস, বিষ্ণুর গরুড়, শিবের নন্দী, ইন্দ্রের ঐরাবত, যমের মহিষ, কার্তিকেয়র ময়ূর, কামদেবের মকর বা টিয়াপাখি, অগ্নির মেষ, বরুণের মৎস্য, গণেশের ইঁদুর, বায়ুর হরিণ, শনির গৃধ্র, দুর্গার সিংহ, লক্ষ্মীর পেচক, সরস্বতীর হংস, ষষ্ঠির বিড়াল, বিশ্বকর্মার হাতি, ইন্দ্রের শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি। (পৌ.অ.)। **৪.** a riding animal কিংবা a vehicle অর্থে **বাহন** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে 'দেবদেবীর বাহন' বা 'ঠাকুরের বাহন' কথাটি খুবই প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অগ্নিবাহন, উলুক, ঋষভ, গজ, গরুড়**। কোন্ কোন্ সত্তাকে **বাহন** বলে, ব.শব্দকোষ (উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থগুলিতে) সেকথা আমাদের জানিয়ে গেছেন। পৌ.অভিধান জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন্ কোন্ সত্তাকে আমাদের দেবদেবীগণের **বাহন** বলতেন। আমরা **বাহন** শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ পাচ্ছি — **বাহ** কর্মটি অন (on) থাকে যাহাতে। ব.শ. তাকেই আরও ব্যক্তরূপে প্রকাশ করেছেন এইভাবে — **বাহন** = 'বহনসাধন', অর্থাৎ, 'যাহার দ্বারা বহন সাধিত হয়।' রবীন্দ্রনাথ **বাহন** শব্দের অর্থ যাই বুঝে থাকুন, দেখা যাচ্ছে, কোন্ ভাষায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হবে, সে বিষয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তিনি 'শিক্ষার **বাহন**' শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন। একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীগণ এক্ষেত্রে প্রায়শই '**শিক্ষার মাধ্যম**' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এই 'মাধ্যম' শব্দটি ইংরেজি medium শব্দের

বাংলা অনুবাদ। অর্থাৎ, তাঁরা আসলে বলতে চান, 'শিক্ষার medium'। এ কথা আবারও প্রমাণ করে যে, একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাজ্ঞানীরা ইংরেজি ভাষার দ্বারা কলুষিত হয়ে গেছেন।

যাই হোক, বাংলাভাষায় আজ পর্যন্ত **বাহন** শব্দের ব্যবহার কীভাবে হয়ে আসছে, উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে সেকথা আমরা জানতে পারছি। এর মধ্যে যে বিষয়টি একালে দুর্বোধ্য ও **মর্য্যাদা**-হানিকর হয়ে রয়েছে, এখন আমরা সেই বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। বিষয়টি হল — আমাদের পূর্বপুরুষেরা কতকগুলি জীবজন্তুকে আমাদের পূজনীয় দেবদেবীর বা ঠাকুরের **বাহন** রূপে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন কেন? আমরা জানি, এই ঠাকুর-**বাহক** জীবজন্তুদের দেখে ইংরেজ ও ইংরেজি-শিক্ষিত আধুনিকতাবাদী মার্কসবাদীরা আমাদেরকে 'পশুপূজক বর্বর জাতি' বলে যারপরনাই দুরছাই করেছেন। কিন্তু যেটি জানি না, তা হল তাঁরা যখন 'animal-পূজাকারী বর্বর জাতি' বলে আমাদের হীন দৃষ্টিতে দেখছেন, আমাদের দেবদেবীর **বাহন**গুলিকে animal বলে মনে করছেন, তখন আমরা নিজেরা কি সেই **বাহন**গুলিকে animal ভাবি না? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি সেগুলিকে animal ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন?

এইখানেই রয়েছে তাজ্জব হওয়ার মতো এক অদ্ভুত ঘটনা। ঘটনাটি সকলের সামনেই ঘটেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই তা খেয়াল করেননি। আর সেটি ঘটেছে আমাদের একপ্রকার **ভাষাবিভ্রাট** থেকে। সেটি কীভাবে ঘটেছে, সংক্ষেপে সেকথা বলে নেওয়া যাক।

'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সামাজিক সত্তাকে দেখতে পেলেই তাকে বোঝানোর জন্য সেকালের শব্দবিদগণ নতুন শব্দের সৃজন করতেন; দৃশ্য, তা সে সক্রিয় হোক আর নিষ্ক্রিয়ই হোক, তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না; কারণ তা আঙুল তুলেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। এর মধ্যে আরও একটি সমস্যা দেখা দেয়। 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাটিকে শনাক্ত করার জন্য যে শব্দটি তৈরি করা হল, সেটি বলার পরেও কেউ যদি সেটি বুঝতে না পারে, তাহলে সেই সত্তার 'সাদৃশ্যে' দৃশ্য কোনো সত্তাকে দেখিয়ে দেওয়াই ছিল সেকালের স্বাভাবিক রীতি। (ব.শ. শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে এই 'সাদৃশ্যে' শব্দটি বারংবার ব্যবহার করেছেন।) যেমন ধরা যাক, সমাজশরীরের বা রাষ্ট্র-কায়ার 'স্থিতিসাধন করে' (= status-quo maintain করে) যে সত্তা, তাকে চিহ্নিত করা হল **কায়স্থ** বা **কায়স্থা** শব্দে। (একালে এঁদের আমরা সরকারি কর্মচারী ও **আমলা** বলি।) কিন্তু রাষ্ট্রের কায়া তো দেখা যায় না, তাই **কায়স্থ**কে ঠিকঠাক বোঝা কঠিন। ফলে দৃশ্যজগতের সেই রকম কোনো সত্তাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হল। তখন সমাজকায়ার 'সাদৃশ্যে' আনা হল মানবকায়াকে। সেই মানব-**কায়ার** স্থিতিসাধন করে কে? আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা দেখলেন, এই কাজটি করে **হরীতকী, আমলকী, তুলসী** ... ইত্যাদি সত্তা। তখন তাঁরা বলে দিলেন — এগুলিও **কায়স্থা**।

বর্তমানে এই **কায়স্থে**র ব্যাপারটি এসে দাঁড়িয়েছে কোথায়? আমরা দেখছি, আমাদের সমাজে বেশ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের **কায়স্থ** বলেন, এমনকি কারো কারো নামের শেষে পদবীরূপে **পুরকায়স্থ** শব্দটিও দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁদের পূর্বসূরিগণ এককালে রাষ্ট্রের আমলা বা কর্মচারী ছিলেন। সেকালে এই কাজটি অত্যন্ত সম্মানীয় ছিল, সেকারণে কিছু মানুষ তার উত্তরাধিকার আজও আদরের সঙ্গে পদবীরূপে বা 'জাতি-নাম' রূপে বহন করে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু **হরীতকী, আমলকী, তুলসী** ... ইত্যাদিকে যে **কায়স্থা** বলা হত, সেকথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি। তার কারণ হল, **কায়স্থ** শব্দটির প্রকৃত অর্থ **কায়স্থ**-জাতির মানুষ রূপে বেঁচে রয়েছে বলেই শব্দটির 'সাদৃশ্য' অর্থটিকে মনে রাখার দরকার পড়েনি। কিন্তু যদি উল্টোটা হত?

হ্যাঁ, যদি উল্টোটা হত, তা হলে প্রকৃত অর্থটিই আমরা ভুলে যেতাম, পড়ে থাকত শুধুমাত্র 'সাদৃশ্য' অর্থ। আর, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (আমাদের বিচারে প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ শব্দের ক্ষেত্রে) সেটিই ঘটেছে। আমাদের পূর্বসূরীদের তৈরি করা শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থগুলি আমরা ভুলে গেছি, মনে রেখেছি শুধুমাত্র তাদের 'সাদৃশ্য' অর্থগুলি। আমরা **অশ্ব, হস্তী, বৃষ, বলদ, সিংহ, হংস, ঐরাবত, পেচক, উলুক, মার্জ্জার, ইঁদুর, ব্যাঘ্র, গৃধ** ... প্রভৃতি হাজার হাজার শব্দের প্রকৃত অর্থগুলি সারি দিয়ে ভুলে গিয়েছি, মনে রেখেছি কেবল তাদের 'সাদৃশ্য' অর্থগুলি। সেই কারণে আমরা এখন উপরোক্ত **অশ্বা**দি শব্দের মানে বুঝি যথাক্রমে horse, elephant, ox, bull, lion, swan, elephant, owl, owl, cat, mouse, tiger, vulture ... প্রভৃতি। ফল যা হতে পারে তাই হয়েছে। আমরাও ভাবতে লেগেছি যে, আমাদের দেবতা **শিব** bull-এর উপর চেপে ঘোরাঘুরি করেন, **ব্রহ্মা** ও **সরস্বতী** swan-এর উপর চেপে বসে থাকেন ... ইত্যাদি। এবং সবচেয়ে মন্দ হয়েছে এই যে, অদৃশ্য সত্তাসমূহের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নির্বোধরাও আমাদেরকে 'পশুপূজক বর্বর জাতির উত্তরসূরি' রূপে হেনস্থা করে থাকে এবং তার উত্তরে আমরা কিছুই বলতে পারি না। সুতরাং এই হীনতার দায় তাদের নয় যারা আমাদের গালি দেয়; দায় আমাদের। আমরাই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানি না, এতদিন উদ্ধার করতে পারিনি। আজ পেরেছি, পারছি। আজ আমাদের গৌরবের দিন। আজ আমরা আমাদের হেনস্থা-কারীদের ক্ষমা করে দেব। আসুন, আজ আমরা আমাদের **বাহন**গুলির প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করে নিই।

কোন দেবতার **বাহন** কী, আমরা সবাই কমবেশি জানি। **দেবতা**র বা **দেবী**র (**ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা** ... ইত্যাদি) নামের মানে কী, সেকথার ব্যাখ্যা আছে শব্দগুলির নিজস্ব ভুক্তিতে। **বাহন**টির (**অশ্বা**দির) নামের মানেও কমবেশি বর্ণিত হয়েছে সেই (**অশ্ব, হস্তী** ... ইত্যাদি) নাম-শব্দের নিজস্ব ভুক্তিতে। তবুও এখানে আমরা সেগুলিকে অতি সংক্ষেপে বলে যাব। এ বিষয়ে পৌরাণিক অভিধান একটি তালিকা দিয়েছেন। আমরা সেই তালিকা ধরে এগোব। তবে এই অবকাশে সব দেবদেবী ও তাঁদের বাহনের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। আমরা কেবল তিন-চারটি উদাহরণ বিস্তারিতভাবে দিয়ে বাকিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থটুকু দিয়ে পরবর্তী কথায় চলে যাব।

ব্রহ্মার ও সরস্বতীর বাহন — হংস : এই সত্তাটি মূলত জ্ঞান সত্তা। মানুষের সভ্যতা যা কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে, সেই আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞান ধারণ করে রাখে যে-সত্তা, এ হল সেই সত্তা। **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারা**র ফসলই এতে থাকে। এই ফসলকে ধরে রাখে যে, তাকেই নাম দেওয়া হয়েছিল **ব্রহ্মা**। সমাজে যে

সমস্ত মানুষ সেই সত্তার আধার হয়ে পড়েন, অর্থাৎ, যাঁরা সেই জ্ঞানসমূহ ধারণ করে রাখেন, দেখা যায়, তাঁরাই 'সো অহং' কথাটি বলবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন। সেই কারণে, সেইরকম মানুষদের নাম দেওয়া হয় **হংস**। এই **হংসের** স্বভাবের 'সাদৃশ্য' আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছিলেন swan নামের animal-এর মধ্যে, সেই কারণে তাকেও **হংস** নামে চিহ্নিত করা হয়। বিষয়টি এমনকি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা জানতেন বলেই সে সময়ের জ্ঞানী মানুষেরা রামকৃষ্ণকে **পরমহংস** নাম দিতে পেরেছিলেন।

তবে জ্ঞানের আরও একটি ধারা আছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি কবিতায় জানিয়েছেন, বিদ্যাধরী সরস্বতীদেবীর বিদ্যের প্রসঙ্গই যদি তোলা হয়, তাহলে 'গণেশ কি কিছু কম যান?' অর্থাৎ **গণেশ** বা 'কেরানিকুল'-এর জ্ঞানও জ্ঞান, অবশ্যই তা **ব্রহ্মজ্ঞান** নয়। তাছাড়া, জ্ঞানের যে **সরস** অংশ তা তাঁদের হাতে থাকে না, থাকে **সরস্-বতী** বা **সরস্বতী**র হাতে। এই সরস জ্ঞানের বা মহাকাব্য-কাব্য-কবিতা-সঙ্গীতাদির আধার স্বরূপ যে সমস্ত মানুষ, একালে যাঁদের 'শিল্পী-সাহিত্যিক-গায়ক-নায়ক ... ইত্যাদি' বলা হয়, তাঁরাও অনেকেই 'সো-অহং' বলবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন। তাই তাঁদেরকেও **হংস** নাম দেওয়া হয়। **হংস** তাই **সরস্বতী**রও **বাহন**রূপে ঘোষিত হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'সো-অহং' বলতে পারার মতো মনীষী-পদবাচ্য জ্ঞানী ও শিল্পী মানুষেরাই **ব্রহ্মা** ও **সরস্বতী** সত্তার **বাহন**; সেই জ্ঞানী-শিল্পী মানুষদেরই **হংস** বলে। আমরা তাঁদেরই পূজক। 'সাদৃশ্যে' তা swan-কেও বোঝায়; সেইকারণে swan-কেও **হংস** বলে বটে; কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে swan-এর পূজক নই।

আরও একটি ব্যাপার এই ক্ষেত্রে রয়েছে। তা হল, গুরুগৃহে এবং পরবর্তীকালে টোল-পাঠশালায় এবং একালে স্কুল-কলেজে যে বিদ্যে পড়ান হয়, এককালে তা ছিল বিনে পয়সায় জ্ঞানচর্চা। যতদিন পর্যন্ত তা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ছিল, ততদিন **সরস্বতী** ছিলেন **ব্রহ্মা**র আধারশক্তি বা পত্নীস্বরূপা; কোথাও বা তাঁকে **ব্রহ্মার** কন্যাও বলা হয়েছে। কিন্তু যখন থেকে সেই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে অর্থাগমের সম্পর্ক ঘটে গেল, সেই দিন থেকে **সরস্বতী** হয়ে গেলেন **নারায়ণের** আধারশক্তি বা পত্নী স্বরূপা। এছাড়াও **ব্রহ্মা**র আধাররূপে **ব্রহ্মাণী**র ধারণাও ছিল, তবে এইমুহূর্তে সেসব কথা অপ্রাসঙ্গিক।

বিষ্ণুর বাহন : গরুড় — আমরা **নারায়ণ** শব্দের ব্যাখ্যায় জেনেছি, ইনি জ্ঞান-সত্তা ও কর্ম-সত্তার একটি যৌথ রূপ। সমাজে যাঁরা সাধারণভাবে জ্ঞানবান ধনবান ক্ষমতাবান শক্তিমান কর্মবীর সাহসী মানুষ হন, তাঁরা এই সত্তার আধার। এঁরা সমাজ-আকাশে **গর গর** করে উড়েন বলেই এঁদের নাম দেওয়া হয় **গরুড়**। কিন্তু তার সাদৃশ্যে দৃশ্য আকাশে কোনো দৃশ্য পক্ষীকে ঠিকঠাক পাওয়া যায় না বলে **গরুড়** নামের কোনো পাখি নেই। ফলে একটি কাল্পনিক পাখির ছবি এঁকে ফেলা হয়েছে, এবং তাকেই **গরুড়** বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

শিবের বাহন — বৃষ : এই সত্তাটিও মূলত জ্ঞানসত্তা হলেও **ব্রহ্মা**র সঙ্গে এর গভীর পার্থক্য রয়েছে। যে কোনো নতুন জ্ঞান অর্জন করে তাকে সর্বপ্রথম কাজে রূপায়ণ করে যে সত্তা, এ হল সেই আবিষ্কারমূলক বা উদ্ভাবনমূলক নব-সৃষ্টিমূলক জ্ঞানসত্তা। একালের ভাষায় একে 'first-hand knowledge' বলা যেতে পারে, যখন কিনা **ব্রহ্মা** বা **সরস্বতী**কে 'second-hand knowledge'-এর অধিকারী বলা যেতে পারে। অর্থাৎ **শিব**-এর অর্জিত উদ্ভাবিত ও ফলিত জ্ঞান ধারণ করে রাখেন **ব্রহ্মা** ও **সরস্বতী**। এই **শিব** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ হল — 'জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা বহন করেন যিনি'। ইনিই **শিব** পদবাচ্য। স্বভাবতই সমগ্র মানবসভ্যতার **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারায়** আজ পর্যন্ত যা কিছু অর্জিত বা আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হয়েছে, সেই সমস্ত নবজ্ঞানকে এবং তার প্রথম সফল প্রয়োগকে **শিব** সত্তা বলে। সাধারণভাবে সমস্ত আবিষ্কারক উদ্ভাবক স্রষ্টা মানুষই এই সত্তাকে **বহন** করে থাকেন। তাঁরাই **শিব**-এর **বাহন**। যেহেতু তাঁরা তাঁদের নতুন জ্ঞানের সাহায্যে নতুন নতুন সৃষ্টি করে থাকেন, যা কিনা পরবর্তীকালে আ**বর্ত্তিত** হওয়ার যোগ্যতা ধরে এবং আ**বর্ত্তিত** হয়ে থাকে, সেই কারণে তাঁদের 'সৃজনশীলতা বর্ষণকারী' বা **বৃষ** বলে। এই সৃষ্টিশীল **বৃষ**-মানুষেরাই **শিবের বাহন**। আমরা তাঁদেরই পূজক। (মাতৃতন্ত্রের যুগে **শিবের** বাহন ছিলেন **মহিষ**, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। দ্র. **মহিষ**।)

আমাদের চোখের সামনে এরকম বহু মানুষই আছেন, থাকেন, কিন্তু একালে আমরা তাঁদের চিনে নেওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছি। গ্রামবাংলার বয়স্ক মানুষেরা কিন্তু সেরকম **শিব**-সত্তার **বাহন** মানুষকে এখনও কমবেশি চিনতে পারেন এবং বলে বসেন, 'উনি একজন **সদাশিব** মানুষ।' মানুষের শৈশবের খেলাধুলার মধ্যেই সেই **শিব**-স্বভাব প্রকাশ পায় এবং পঞ্চাশ বছর আগেও বয়স্ক মানুষেরা তা দেখে চিনতে পারতেন এবং সেইরূপ বালকের নামকরণ করতেন — **শিব**চন্দ্র, **শিব**প্রসাদ, **শিব**নারায়ণ ... ইত্যাদি। অবশ্য যাঁদের মধ্যে **শিব**সত্তা অনেক বেশি স্পষ্ট ও প্রকট, আমরাও চেষ্টা করলে সেইরকম **শিব**-সত্তার **বাহন বৃষ**-মানুষদের খানিকটা চিনতে পারি। সেরকম দু-চারজনের নাম করতে হলে, আমরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র ... আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু ... সত্যজিৎ রায় ... প্রমুখ মনীষীগণের নাম করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্ট করে বলেই গেছেন, তিনি **শৈব** অর্থাৎ **শিবের বাহন**। আরও বড় এলাকা জুড়ে **শিব**সত্তার **বাহন**দের নাম করতে হলে বিশ্বের সকল দেশের সকল ধর্মস্রষ্টা (যার ভিতরে বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক, শ্রীচৈতন্য ... সবাই পড়েন; পড়েন প্রাচ্যের বহু মুনি ঋষি, আউলিয়া-আম্বিয়া ... এবং পাশ্চাত্যের বহু সন্ত-সাধুরা), সকল দেশের বড় বড় শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টা, সকল দেশের উদ্ভাবক-আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ... মানুষদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মহান মানুষেরাই **বৃষ** বা **শিব**-এর **বাহন**। আমরা যখন **বৃষবাহিত শিব**-এর পূজা করি, তখন কার্যত এঁদেরই পূজা করি। (এখানে একটি বিষয় বলে রাখা দরকার যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা **শিববাহন বৃষ** হন, তাঁরা কেবল নর-মানুষই হন না, নারী-মানুষও হন। তবে সে-প্রসঙ্গে এখন আমরা যাব না।)

শিবসত্তার এই **বাহন**দের স্বভাবের সঙ্গে যে জন্তুটির স্বভাবের সাদৃশ্য আমাদের আদিম শব্দজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছিলেন, সেই bull-

নামক animal-টিকেও তাঁরা **বৃষ** নামে চিহ্নিত করে দেন। এই চিহ্নিতকরণের ঘটনাটি অতি প্রাচীন কালের ঘটনা। তাই বিশ্বের সব দেশে এই **বৃষ**-এর উত্তরাধিকার নানাভাবে কমবেশি রয়েছে। swan-এর সঙ্গে **ব্রহ্মা**র বা **সরস্বতীর বাহন হংস**-রূপী মানুষের স্বভাবের মিল কোথায়, আমাদের অনুভূতিশক্তি অনেক কমে গেছে বলে সেই মিল আমরা খুব একটা দেখতে পাই না; কিন্তু সৌভাগ্যবশত bull-এর সঙ্গে **শিববাহন বৃষ**-এর স্বভাবের মিল আমরা দুজন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। সেই সমস্ত কথা আমরা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছি আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে, 'বৃষোৎসর্গ' নামক রচনায়।

ইন্দ্রের বাহন — ঐরাবত, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা : ইন্দ্র = ব্যক্তির 'আমিত্ববোধ', পরিবারের 'পরিবারত্ববোধ', গোষ্ঠীর 'গোষ্ঠীত্ববোধ', জাতির 'জাতীয়তাবোধ'। **ঐরাবত** = হস্তী = **গজ** = সমাজের বিভিন্ন দিক্‌রক্ষক বিদ্যাদিগ্‌গজগণ = সরকারের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ... ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক আমলাগণ = **উচ্চৈঃশ্রবা** = যাঁরা উঁচু শোনেন, জনসাধারণের কথা অনেক সময় যাঁদের কানে পৌঁছায় না। — সাদৃশ্যে elephant ও horse।

যমের বাহন — মহিষ : যম = আদালত। **মহিষ** = গণনেতা। — সাদৃশ্যে buffalo।

কার্ত্তিকেয়র বাহন — ময়ূর : কার্ত্তিকেয় = সমাজের শারীরিক শক্তি। **ময়ূর** = সামরিক বাহিনী, মিলিটারি। — সাদৃশ্যে peacock।

কামদেবের বাহন — মকর বা টিয়াপাখি : কামদেব = মানুষের মনের কামনা-বাসনা। **মকর** = আগ্রাসী লোভী মানুষ। **টিয়াপাখি** = রসিক মানুষ। — সাদৃশ্যে কাল্পনিক মৎস্য 'মকর' ও parrot।

অগ্নির বাহন — মেষ : অগ্নি = দ্র. **অগ্নি**। **মেষ** বা **ছাগ** = **দক্ষ** = একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত সাধারণ স্পেশালিস্ট মানুষ। — সাদৃশ্যে ram বা goat।

বরুণের বাহন — মৎস্য : বরুণ = দ্র. **বরুণ**। **মৎস্য** = ব্যক্তিমালিক। — সাদৃশ্যে fish।

গণেশের বাহন — ইঁদুর : গণেশ = জনসাধারণের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। **ইঁদুর** বা **মূষিক** = রাষ্ট্রের কেরানিকুল। — সাদৃশ্যে mouse।

বায়ুর বাহন — হরিণ : বায়ু = জ্ঞানের প্রবাহ, একালের ভাষায় মিডিয়া। **হরিণ** = সাধারণ জ্ঞানীগণ। — সাদৃশ্যে buck।

শনির বাহন — গৃধ্র : শনি = সমাজের বা রাষ্ট্রের বাধাদানকারী শক্তি। **গৃধ্র** = শকুন, একালের ভাষায় 'সেলস্ ট্যাক্স', 'ইনকাম ট্যাক্স', 'কাস্টম্‌স্' ... ইত্যাদি। — সাদৃশ্যে vulture।

লক্ষ্মীর বাহন — পেচক : লক্ষ্মী = ধনসম্পদের বোধ। **পেচক** = লক্ষ্মীপেঁচা = ধনবান মানুষেরা। — সাদৃশ্যে white owl।

দুর্গার বাহন — সিংহ : দুর্গা একটি সমাজদেহের দৈহিক শক্তির আধারস্বরূপা সত্তা। এই শক্তির ভিতরে ঢুকে একে নিঃশেষ করা খুবই কঠিন কাজ। 'গমন করা দুঃসাধ্য বা দুরূহ' বলে এই সত্তাকে **দুর্গা** বলে। সাধারণভাবে একটি সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁদের সংখ্যা অনেক। স্বভাবতই তাঁদের সর্বমোট জ্ঞানবল, অর্থবল, দৈহিক বল একত্রে অনেক শক্তিশালী। তাছাড়া, তাঁরা বিপরীত পক্ষকে হিংসার সাহায্যে ধ্বংস করে দেওয়ার নৈতিকতা ও আবেগ ধারণ করেন। সেই কারণে এই প্রকার জনশক্তিকে **সিংহ** নাম দেওয়া হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরনের মানুষের মধ্যে অনেককেই **সিংহ** নামে ডাকাও শুরু হয়ে যায়। তাঁদের উত্তরসূরিগণ নিজেদের নামের শেষে পদবীরূপে সেই **সিংহ** শব্দটি আজও বহন করেন। এমনকি পাশ্চাত্যেও এর **উত্তরাধিকার** দেখতে পাওয়া যায় 'Lions Club'-এর সদস্য হওয়ার মধ্যে। এঁরাই **দুর্গা**র **বাহন**। সাদৃশ্যে সেটি lion নামক animal-এর মতো ব'লেই lion-কেও **সিংহ** নামে চিহ্নিত করা হয়। ...

বাহন-এর বিষয়ে বাংলাভাষীর ধারণা সমাজের গভীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালে সন্তান জন্মালেই তার যা হোক একটা নাম রাখা হত না। বালক বয়সে তার ভিতরে কোন্ সত্তা লীলা করছে, তা বুঝে নিয়ে বয়স্করা বালক-বালিকার নামকরণ করতেন। অত্যন্ত 'অনুভূতি-গুণসম্পন্ন' হওয়ার কারণে তাঁরা এটা পারতেনও। ফলে, দেখা যেত, বড় হয়ে সেই বালক কিংবা বালিকা তার নামের মতোই আচরণ করছে। শুধু কি তাই। **ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব** ... প্রভৃতি সত্তার মানুষেরা যখন কোথাও যেতেন, তাদের সহচরও সঙ্গে যেতেন। গ্রামবাংলায় তেমন মানুষকে সহচরহীন একাকী দেখে ফেললে লোকে বলত, 'আজ আপনার **বাহন**কে দেখছি নে।' ধারণাটি পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যেও সক্রিয়। নায়কের বা হিরোর সঙ্গে একজন চির-সহচর থাকবেই — এমন একটা ধারণা কীভাবে জানি সেসব দেশেও স্বীকৃত হয়ে যায়। তার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হল রেনেসাঁস যুগের স্পেনীয় লেখক সারভেন্তিস (Cervantes) এর ডন কুইকসট-এর নিত্য সহচর সাঙ্কো পাঞ্জা, মধ্যযুগের সাহিত্যে রোনাল্ড-এর সঙ্গী অলিভার, এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে অ্যাকিলিস সহচর প্যাট্রোক্লাস। এমনকি আধুনিক যুগের নাটক, উপন্যাস বা চলচ্চিত্রেও তা স্বীকৃতি লাভ করে। ...

এই যে অদৃশ্য সত্তাকে, তার আধারকে এবং অবশেষে তার **বাহন**কে চিহ্নিত করার চেষ্টা মানুষ করেছে, ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, মানুষের সেই চেষ্টা চলেছে সভ্যতার অগ্রগতির সমান্তরালে। আমরা দেখেছি, 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সামাজিক সত্তাকে অনুভব করতে পারলেই তাকে বোঝানোর জন্য সেকালের শব্দবিদগণ নতুন শব্দের সৃজন করতেন। যথা, অর্জিত সম্পদ বিষয়ে আদিতে মূল ক্রিয়াকারী সত্তাটিকে শনাক্ত করা হয়েছিল **নারায়ণ** রূপে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজের আরও বিকাশ ঘটলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেখেন, সেই **নারায়ণ** সত্তার দুটো সুস্পষ্ট ভাগ দেখা যাচ্ছে — নারায়ণ-পুরুষ, নারায়ণ-প্রকৃতি। প্রথমটি হল সত্তাটির বোধ, দ্বিতীয়টি সেই বোধের আধারশক্তি। এই আধারশক্তি প্রকৃতিকে তাঁরা '**লক্ষ্মী**' নামে চিহ্নিত করেন। সেকারণেই পুরাণাদিতে আদিতে রয়েছে পুরুষ দেবতাদের কথা, তারপরে এসেছে দেবীদের কথা। পরে পরে সমাজ আরও বিকশিত হতে থাকলে, আরও বিচূর্ণীভবন ঘটে, দেখা দেয় সত্তার নানান বাহন — **নারায়ণের** বাহন রূপে **গরুড়**কে, **লক্ষ্মী**র বাহন রূপে **উলূক** বা **পেঁচা**কে তাঁরা সফলভাবে চিহ্নিত করে ফেলেন। আরও পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ

নতুন করে মানবসভ্যতার ইতিহাসটাকে সাজান। তাঁরা আদিতে নিয়ে যান পরমাপ্রকৃতি মহামায়াকে। দেখানো হয়, তার থেকে **ব্রহ্মা**দির জন্ম হয়েছে। ... কিন্তু **বাহন**-এর ধারণা প্রায় অক্ষত থেকে যায়।

প্রাচ্যের এই সকল দেবদেবীর বোধ ও তার **বাহন**-এর বোধ ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে পাশ্চাত্যও অর্জন করেছিল। ইউরোপে কেল্ট, টিউটন (যার ভিতরে স্ক্যানডিনেভিয়াও পড়ে), স্লাভ, হেলেনিক বা গ্রীক, ইটালিক বা রোমক — সব ক'টি আমাদের পুরাণকথার সঙ্গে অল্পবিস্তর সমোৎসারিত। এদের ভিতর সবচেয়ে পল্লবিত ও চর্চিত হেলেনিক পুরাকথা। কিন্তু সেখানেও কাহিনীগুলি ইতস্তত ছড়ান। কোথাও কোনো মান্য কাঠামো-মত বা scheme (স্কেম) সাজানো নেই। আবার এই সবক'টি পুরাণকথাই ইউরোপের মানুষের মনে অলীক গল্প হয়ে গেল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের যুগে [যে ব্যাপারটি চলেছিল বলতে গেলে গোটা প্রথম সহস্রাব্দ (১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ধরে।] তখন ইউরোপের মানুষের মনে কিছুটা ঠাঁই পেল খ্রিস্টীয় প্রচারবাহিত, বহুলাংশে ঘেঁটে দেওয়া ইহুদি পুরাণ (আদম, ইভ, ইডেন উদ্যান, জ্ঞানবৃক্ষ, সর্প বা শয়তান, নোয়া, প্রলয়, আব্রাহাম, ইশাক, ইশমাইল, মোজেস, সোলোমন।) যে জিউস **বৃষ** সেজে, পূর্বদেশ থেকে আগত ইউরোপা দেবীতে সংগত হল, যার ফলে ইউরোপের জন্ম হল, সে তো আর কেউ নয়, সেই তো স্বয়ং রোমান জুপিটার, সেই তো অলিম্পিয়ান 'গড' জিউস। তাকেই তো 'দৌ', 'পিতর' ইত্যাদি বলে। আমরা যাকে দেবাসুর সংগ্রাম বলি, গ্রীক পুরাণে সেই কাহিনীই অত্যন্ত ছাড়া-ছাড়া ছায়া-ছায়া ভাবে Titan ও Theo-দের (বা God-দের) যুদ্ধরূপে স্বীকৃত।

মোটকথা, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি সভ্যতার ইন্দ্র, বৃষ, কিন্নর প্রভৃতি ধারণা তো ছিলই, সারা ইউরোপ জুড়ে ছিল বিভিন্ন জীবজন্তু সম্বলিত দেবতার ও নানা নামের দেবীর মন্দির। ইহুদি ধর্মের উত্থান ঐ সমস্ত জীবজন্তু-ওয়ালা দেবতাদের নিঃশেষে মুছে দেয় (ঠিক যেভাবে পরবর্তীকালে ইসলাম-ধর্মাবলম্বী শাসকেরা মূর্তি-ধ্বংস করাকে তাঁদের কর্তব্য মনে করেছিলেন)। তারপর পর্যায়ক্রমে পাশ্চাত্যের সমস্ত দেবীর মন্দির থেকে দেবীদের বিদায় ঘটল, বহু ক্ষেত্রেই দেবীদের বদলে নেওয়া হল 'মাদার মেরী'তে। ... যাঁরা আমাদের 'পশুপূজক জাতির উত্তরাধিকারী' বলে গাল পাড়েন, এই ইতিহাস তাঁদের। কিন্তু কী আর করা যাবে, তাঁরা তো নিজেদের ইতিহাসটাই জানেন না, তাঁদের এশীয় চেলাচামুণ্ডারা জানবেন কী করে!

বাহাদুর, বাহাদুরী বাহাদুর : দ্র. **দুর্ব্বহ**।

বাহ্য (বাহ্যকরণ, বাহ্যকৃত্য, বাহ্যক্রিয়া, বাহ্যদৃশ্য, বাহ্যনাম, বাহ্যপ্রকৃতি, বাহ্যিক, বেদবাহ্য) : ১. বহিস্ + য (ণ্য)। (ব.শ.)। ২. ***বাহ্য*** = ***বাহ*** *(**বহ** হইতে জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, বাহির করা ক্রিয়াটি থাকে যাহাতে।* ***বাহ্যকরণ*** = ***বাহ্য*** *কর্ম্ম করা থাকে যাহাতে; বাহিরের কাজ করে যে।* ***বাহ্যকৃত্য*** = *যাহাতে বাহির করার কাজ করা হয়।* ***বাহ্যক্রিয়া*** = *যাহাতে বাহির করার ক্রিয়া থাকে।* ***বাহ্যদৃশ্য*** = *বাহিরে যে দৃশ্য দেখা যায়।* ***বাহ্যনাম*** = *বাহিরে যে নাম লেখা থাকে।* ***বাহ্যপ্রকৃতি*** = *(অন্যের) বাহিরের যে **প্রকৃতি** এক্ষণে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।* ***বাহ্যিক*** = ***বাহ্য****-কে গতিশীল করে যে।* ***বেদবাহ্য*** = ***বেদ****-এর সার্ব্বিক অধিকার (বেদ বা জ্ঞান পাঠ করা, তার ব্যবহার করা, তার ফলভোগ করা ... ইত্যাদি) হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে যাহাকে।* ৩. **বাহ্য** = বহির্ভব, বহিস্থিত, বহির্ভূত, দেহদেহিভিন্ন (দারাদি), অনর্হ, বহিস্থান-যোগ্য, সমাজ-বহির্ভূত, অপাঙ্‌ক্তেয়, অপকৃষ্ট ... ইত্যাদি। **বাহ্যকরণ** = বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি। **বাহ্যকৃত্য, বাহ্যক্রিয়া** = মলত্যাগ। **বাহ্যদৃশ্য** = বহির্ভূত দৃষ্টিবিষয়, বহিরাকৃতি। **বাহ্যনাম** = পত্রের উপরি লিখিত গ্রাহকের নাম। **বাহ্যপ্রকৃতি** = বৈদেশিক রাজার অমাত্যাদি ষট্ রাজ্যাঙ্গ। **বাহ্যিক** = বাহ্য, বহিস্থিত। **বেদবাহ্য** = নাস্তিক। (ব.শ.)। ৪. real world অর্থে **বাহ্য** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত, বাকি সকল শব্দ অপ্রচলিত। তবে গ্রামবাংলায় এখনও 'মলত্যাগ' করাকে **বাহ্য** করা বলা হয়ে থাকে। মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর', ব্যবহৃত হত, তেমনি গ্রামবাংলায় 'ছেলেটার বাহ্য-বমি হয়েছে গো' — এমন বাক্য এখনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. বাইরের ব্যাপার-স্যাপারকে **বাহ্য** বলে, তা সে আগে থেকে **বাহিরে** স্থিত হোক, কিংবা কোনো সত্তার অভ্যন্তর থেকে **বাহির** করে দেওয়াই হোক। তবে **বাহ্যনাম, বাহ্যপ্রকৃতি** ... প্রভৃতি অতি অর্থবাহী শব্দগুলি এখন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আর 'মলত্যাগ'-এর ব্যাপারটিকে **বাহ্য** বলার অভ্যাস আমরা শিক্ষিত বাংলাভাষীরা ত্যাগ করেছিলাম মোগল-পাঠান এদেশে আসার পর; তার বদলে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম ফারসি শব্দ 'পাইখানা' বা 'পায়খানা'। শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে দেশী কথা **বাহ্য** বলাটা আমাদের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তারপর কালের লীলায় মোগলদের তাড়িয়ে ব্রিটিশ এসে পৌঁছানোর পর আমরা 'পাইখানা' বা 'পায়খানা' বলতে আবার লজ্জা পেতে শুরু করি এবং নতুন শাসকের কাছ থেকে গ্রহণ করি 'bathroom'। এরপর আবার কেউ এসে পৌঁছলে আমরা bathroom বলতেও লজ্জা পাব, নতুন কিছু বলতে শিখে যাব। যারা আত্মবিশ্বাস হারায়, তাদের এই দুর্গতি থেকে বাঁচানো কঠিন। বলে রাখা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল বক্তৃতায় আমাদের এই 'আত্মবিশ্বাস' হারানোকে সবচেয়ে বড় বিপদ বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয়নি, কেউই সতর্ক হয়নি, এখন আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে বাংলায় কথাবার্তাও বলতে পারি না।

বিবাহ (বিয়ে) : ১. বি + √বহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিবাহ*** = *বিশেষভাবে বহন করার অঙ্গীকার থাকে যাহাতে।* ***বিয়ে*** = *বিশেষভাবে একদিশায় যাওয়া হয় যাহাতে। /* **বিবাহ** = বিশিষ্ট (অর্থাৎ অগ্নিসাক্ষিক) বহন বা স্বীকার (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **বিবাহ** = দারপরিগ্রহ, পরিণয়, উদ্বাহ, পাণিপীড়া। (বিবাহ অষ্টবিধ — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, শৈশাচ; বিবাহ করা।)। **বিয়ে (বিও, বিয়া, বে)** = বিবাহ। (ব.শ.)। ৪. marriage অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বব**। আমরা দেখছি, **বিবাহ** শব্দের প্রকৃত অর্থকে একালের ভাষায় বলতে হলে বলতে হয় contract বা **'চুক্তি'**। **দুটি পক্ষ একটি কর্ম্ম**বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কীরূপ **ধর্ম্মাচরণ** করবে, এবং তার থেকে কে কী ফল

পাবে, তৎসংক্রান্ত চুক্তি। এই চুক্তি পরিচালক (বর) ও কর্মীজনগণের (কনের) মধ্যেই প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রদায়-শীর্ষে অধিষ্ঠিত **প্রজাপতি**-মহর্ষি এই বর-কনের মিলন ঘটাতেন। তখন পরিচালককে **বর** এবং কর্মীজনগণকে **কনে** বলা হত। সাদৃশ্যে তা নর**বর** ও নর**কনে** হয়ে যায়। এই চুক্তির পরই **কর্ম্মযজ্ঞ** শুরু হতে পারত। তথ্য অনুসারে মোট আটরকম **বিবাহ**-প্রথার প্রবর্তন ঘটেছিল।

যতদূর বোঝা যায়, **দক্ষযজ্ঞে**র আগে পর্যন্ত এরকম কোনো **বিবাহ** বা চুক্তির ব্যাপার-স্যাপার ছিল না। **দক্ষযজ্ঞের** মাধ্যমে **প্রজাপতিতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হলে পর এই **বিবাহ** বা চুক্তি প্রথার প্রবর্তন হয়। সেই **বিবাহ** বা চুক্তিপ্রথা ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুই ধারায় প্রবাহিত হয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। এখন কর্মচারীদের সঙ্গে ভারত সরকারের নিয়মে যে সকল contract বা চুক্তি হয়, শোনা যায়, তারও নাকি আটটি ভাগ রয়েছে। আর, নরনারীর **বিবাহে**র এখন মোট কয়টি ভাগ দাঁড়িয়েছে, তা রীতিমত গবেষণাসাপেক্ষ।

আজকাল লোকে সস্তায় সারার কথা ভাবেন। নর ও নারীতে মিলিত হবে, তাদের একপ্রকার বন্ধন থাকবে, সেই জন্যই নর নারীকে বিশেষ রূপে বহন করে নিয়ে চলবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে, এই প্রয়োজন মেটাতে সমাজে **বিবাহে**র দু-চার রকম প্রথা প্রচলিত থাকবে — এইরকম ভেবে নিতে এখন আমরা অভ্যস্ত। কার্যত দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটি অত সোজা-সাপ্টা নয়। বস্তুত, আজ আমরা নর-নারীর যতরকম **বিবাহ**-প্রথার সম্মুখীন হই, সেখানে পৌঁছতে মানব-সভ্যতাকে কয়েক হাজার বছরের তপস্যা, চেষ্টা, তিতিক্ষা ও বলিদানের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে।

কার্যত দুটি বিষয় সমান্তরাল ভাবে চলেছে বলেই মনে হয়। একদিকে সম্প্রদায়-শীর্ষে বসে থাকা **প্রজাপতি**-মহর্ষিগণ নিদান দিয়েছেন — সামাজিক কর্মযজ্ঞে কোন পরিচালকের সঙ্গে কারা মিলিত হয়ে উৎপাদনের কাজ করবেন। কর্মীজনগণের সঙ্গে পরিচালকের সম্বন্ধের এই চুক্তিকে বলা হয়েছে **বিবাহ**। মোট আট রকম **বিবাহের** নিদান দিয়েছেন **প্রজাপতি**রা। সেই অনুযায়ী সম্প্রদায়সমূহের উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চলেছে। অন্যদিকে নর-নারীর মধ্যেও এই আট রকম **বিবাহের** রীতি কমবেশি প্রচলিত হয়েছে। এই রীতি একই সঙ্গে পরিচালক-কর্মীজনগণ এবং নর-নারী দুই ধারায় প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। সংক্ষেপে সেগুলি এইরকম:

ব্রাহ্মবিবাহ — 'যে **বিবাহে** কন্যাকে **অলঙ্কৃত** করিয়া বরের হস্তে প্রদান করা হয়।' অর্থাৎ, কন্যার (কর্মীগণের) সমস্ত দায়িত্ব বরের (পরিচালকের)। এই প্রথা অতি প্রাচীন ও আদি। যৌথসমাজের শেষ পাদে এইরূপ **বিবাহে**র প্রচলন হয়। এতে পরিচালক-কর্মীজনগণ বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উৎপন্নের উপর অধিকারের বৈষম্য নেই।

প্রাজাপত্য বিবাহ — 'যে **বিবাহে** কন্যা (কর্মীগণ) ও বর (পরিচালক) একসঙ্গে মিলিত হইয়া **ধর্ম্মাচরণ** করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া **পরিণীত** হয়'। **প্রজাপতিতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পরই এইরূপ **বিবাহের** প্রচলন হয়।

আর্ষ বিবাহ — 'যে **বিবাহে** বরের (পরিচালকের) দিক হইতে দুইটি গাভী গ্রহণ করিয়া কন্যা (কর্মীগণ) প্রদত্ত হয়'। এ হল **দাসপ্রথা**র ভ্রূণাবস্থা। কর্মীজনগণের ও নারীর দুঃখের দিনের শুরু হওয়ার অশনিসংকেত এখান থেকে। এই সময় থেকে সম্প্রদায়-শীর্ষে অধিষ্ঠিত **প্রজাপতি**-মহর্ষি তাঁর সদস্যদের কাউকে কাউকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে শুরু করেন বা করতে বাধ্য হন।

দৈব বিবাহ — 'যে **বিবাহে** যজ্ঞবেদী মধ্যে স্থিত ঋত্বিকের নিকট কন্যা প্রদত্ত হয়'। একালের ভাষায় এর দুরকম নাম। সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের নিরিখে এর নাম 'লেবার সাপ্লাই দেওয়া' এবং নরনারীর সন্তান উৎপাদন-যজ্ঞের ক্ষেত্রে এর নাম — 'তোলা বিয়ে', এতে কন্যাকে বরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। বিবাহের অনুষ্ঠানের যা কিছু সবই হয় বরের বাড়িতে।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ — 'যে **বিবাহে** বর (পরিচালক) ও কন্যা (কর্মীগণ) স্বেচ্ছায় একে অন্যকে গ্রহণ করে'। এইরূপ সামাজিক চুক্তি সম্ভব হয় অন্তত তিনরকম পরিস্থিতিতে। (ক) যখন পরিচালক (বর) ও কর্মী (কনে) পরস্পরকে ভাল লেগে যায়, তখন; কিংবা (খ) যখন সমাজ বা রাষ্ট্র সমাজসদস্যদের জীবনের উপর তার অধিকার ও কর্তব্য ত্যাগ করেছে বলে একপ্রকার বাধ্য হয়ে; অথবা, (গ) সমাজ ও রাষ্ট্র সমাজসদস্যদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে, তখন। কোনো কোনো সমাজশাস্ত্রী এরূপ অসহায়ভাবে ছেড়ে দেওয়াকে বলেছেন 'সামন্ততন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্তি'! ভূমিদাস যখন পালায়, পালিয়ে হাজির হয় শহরে, তখন সে মুক্ত বটে। কিন্তু তখন তার বাঁচার একমাত্র উপায় অতি নিম্নমানের সম্বন্ধে হলেও কোনো না কোনো শিল্পপরিচালকের সঙ্গে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রাণ বাঁচানো। তিনটি ক্ষেত্রেই 'তুমি এই এই দিলে, আমি এই এই দিব' — এই ধরনের পারস্পরিক লেনদেনের দৃশ্য বা অদৃশ্য চুক্তি হয়ে থাকে। বাবা যদি কন্যার ইচ্ছার সম্মান না দেন, কন্যা কেন বরের সঙ্গে **গান্ধর্ব্ব বিবাহে** সম্মত হবে? সে যদি স্বেচ্ছায় কোনো বরকে পছন্দও করে, সে চাইবে, বাবা-মা আত্মীয়স্বজনেরা তাদের বিয়েতে সার্বিক সহযোগিতা করুক। তবে সাধারণত সেরকম হয় না, তাই তারা সকলের অলক্ষ্যে এই ধরনের পারস্পরিক লেনদেন (**গন্ধ**) গুণসম্পন্ন **বিবাহ** করে। এই **গান্ধর্ব্ব বিবাহ**ই একালের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালক ও কর্মীজনগণের সম্পর্কের ভিত্তি।

আসুর বিবাহ — 'যে **বিবাহে** বর (পরিচালক) কন্যাকে শুল্কধন দিয়া কন্যা গ্রহণ করে'। এইরূপ সামাজিক চুক্তিকেই **দাসপ্রথা** বলে। টাকা দিয়ে বিয়ে করে আনা বউ তো দাসীই বটে!

রাক্ষস বিবাহ — 'যে **বিবাহে** বর (পরিচালক) বলাৎকারে কন্যা (কর্মীগণকে) গ্রহণ করে।' এ হল নিপীড়ক-নিপীড়িত সম্বন্ধে আবদ্ধ সামাজিক চুক্তি বা **বিবাহ**। এও একপ্রকারের **দাসপ্রথা**ই বটে।

পৈশাচ বিবাহ — 'যে **বিবাহে** সুপ্ত কন্যাকে (কর্মীগণকে) হরণ করিয়া বিবাহ করা হয়।' — এ এমন একপ্রকার কঠোর **দাসপ্রথা** যা আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে ইউরোপ বহুদিন করেছে। এরকম নরনারীর **বিবাহ**ও কখনো-সখনো হয়ে থাকে। ...

সবশেষে **বিয়ে** শব্দটির বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। একালে যে এক-পতিপত্নীত্বমূলক পরিবার ব্যবস্থা চলছে, তাতে যে **বিবাহ** করার প্রথা প্রচলিত আছে, তাকে আজকাল আমরা **বিয়ে** বা

বিয়া বলি। শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ আমাদের জানায় যে, এই **বিয়ে**র ফলে নরনারী উভয়েই একদিশায় চলতে চলতে জীবন শেষ করে ফেলে। সেদিক থেকে **বিয়ে** শব্দটিও সার্থক।

যাই হোক, **বিবাহ** বিষয়ে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'ভাষায় ঔপনিবেশিকতা : প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্ট ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র' নিবন্ধে। আগ্রহী পাঠকপাঠিকা সেটি দেখে নিতে পারবেন।

বা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবাত, অনির্ব্বাণ, অবাত, অবাম, আউল-বাউল, নিবাত, নির্ব্বাণ, বা, বাঅ, বাঅন, বাই, বাইগন, বাইচ, বাইছ, বাইজ, বাইতি, বাঈ, বাউ, বাউই (বাবুই, বা অর্থাৎ বাইরে ভেতরে দুই দিকে দুজনে বয়ন করে), বাউঙ্ক, বাউঙ্কা, বাউবেগ, বাউয়াস (দ্র.বাউস), বাউর, বাউরা, বাউল (আকুল-বাতুল, আউল-বাউল, একদিকে আউলায়, কিন্তু বাউলানোতে দুদিকে উথলে পড়ে, এরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী), বাউলিয়া, বাউস (দুরকম মাছের স্বভাবী), বাও, বাওঁ, বাওয়া, বাং (বাম), বাংলা (বঙ্গ), বাঃ (বার্), বাঁ, বাঁওড়, বাঁকারি, বাঁকি(কী), বাঁকুড়া, বাঁকুয়া, বাঁখারি, বাঁজা (বাম-জা, বাং-ঝ), বাঁজী, বাঁঝ, বাঁঝা, বাঁঝি, বাঁঝিয়া, বাঁঝী, বাঁয়া, বাঁহুক, বাকুড়ি, বাই (বাতিক), বাকুল, বাখর (বাকল), বাখার, বাখারি, বাগুরা, বাগুরিক, বাগুলা (বোগলা), বাগুলাবন্ধ, বাগুলাবৃত্তি, বাগুস, বাগোয়া, বাঙ্(এ্ঞ), বাঙ্গ, বাঙন, বাঙভাগ, বাঙ্গি, বা'চ, বাচি (বাইচ), বাঞে, বাঞো, বাঞ্জা, বাত (এর উদ্ভব হয় বৃৎ থেকে, তাই বার্তা। দ্র. বৃৎ), বাতকর্ম্ম, বাতগ্রস্ত, বাতঘ্ন, বাতচিত, বাতজ, বাতজ্বর, বাততুল, বাতপাট, বাতপ্রমী, বাতপ্রেরকযন্ত্র, বাতব্যাধি, বাতমজ, বাতমৃগ, বাতরক্ত, বাতরথ, বাতল, বাতলা, বাতলান, বাতশোণিত, বাতশীর্ষ, বাতশূল, বাতশ্লেষ্মা, বাতসহ, বাতহত, বাতা (বা-তা, বাঁশের বাতা), বাতাতিসার, বাতাপি, বাতাবি, বাতাভিহত, বাতাম, বাতাভ্র, বাতায়ন, বাতালি(লী), বাতাস, বাতাসা, বাতাসী, বাতাহত, বাতাহতি, বাতাহার, বাতিক (বাই), বাতুল, বাতেরিত, বাতেলা, বাতেলাবাজ, বাত্তেলা, বাত্যা, বাদাম (বাতপট), বাবুই (দ্র.বাউই), বাবুইতুলসী, বাবুইদড়ী, বাম, বামতা, বামদেব, বাম-দক্ষিণ (বাং-দিকু), বামদৃক, বামদৃষ্টি, বামন, বামনহাটি, বামনা, বামনি, বামনিশাক বামনপুরাণ, বামনী, বামনেত্র, বামপথি(থী), বামপন্থী, বামবাজ, বামভ্রূ, বামমার্গ, বামলোচনা, বামশীল, বামস্বভাবা, বামা, বামাঙ্গিনী, বামাচার, বামাচারী, বামাবর্ত্ত, বামাম্বুজ, বামী, বামেতর, বামোরু, বাম্য, বায়, বায়ই, বায়ব, বায়বী, বায়বীয়, বায়ব্য, বায়স, বায়সী, বায়ু, বায়ুকোণ, বায়ুকোষ, বায়ুগতি, বায়ুগোচর, বায়ুগ্রস্ত, বায়ুজ, বায়ুজাত, বায়ুতনয়, বায়ুনন্দন, বায়ুদেব, বায়ুপঞ্চক, বায়ুপতি, বায়ুপথ, বায়ুবর্ত্ম, বায়ুবাট, বায়ুবাহিনী, বায়ুবীজ, বায়ুভক্ষ, বায়ুভক্ষক, বায়ুভক্ষণ, বায়ুসখ, বার (দ্বি-অর, আ-বার), বারংবার, বারকয়েক, বারদিগর, বারবার, বারব্রত, বারেক, বারেকমাত্র, বারেবার, বেরি, বোগলা (তাল-বোগলা), বি। (দ্বি = ব, বা, মুখ্য ও বিশেষ। দ্র. বি।)। **বা** = বাহীর আধার যে।

নিবাত (নিবাতকবচ) : দ্র. ১ম খণ্ড।

বা (কিংবা) : ২. ***বা*** = *ব-এর (= দ্বিতীয়ের) আধার যে।* ***কিংবা*** = *গতিশীল কারীর রহস্যরূপ যে দ্বিতীয় রূপে আধারিত থাকে।* **৩. বা** = বিকল্প, সমুচ্চয়, এবং ... ইত্যাদি। **কিংবা** = বিতর্ক, সম্ভাবনা, বিকল্প, অথবা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দ্বি**। এই **দ্বি** দুইভাগের কথা বলে। প্রথম ভাগটি মুখ্য, অন্যটি বিশেষ। **বা** ঐ বিশেষ ভাগটির কথা বলে। কোনো কিছু বলার পর **বা** বললেই ঐ দ্বিতীয় ভাগ বা ধারাটির কথা বলা হয়।

বাউই (বাবুই) : ২. *যে দুদিক থেকে বয়ন করতে পারে।* **৩.** ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ (tailor bird)। (ব.শ.)। **৪.** বিশেষ ধরনের ছোট পাখিকে বোঝাতেই শব্দটি প্রচলিত। **৫. বা** অর্থাৎ দ্বিতীয় দিক। **বাবুই** পাখিই একমাত্র পাখি, যে সবচেয়ে সুন্দর বাসা বুনতে পারে। সে-বোনা একেবারে টেলারিং মেশিনে যেভাবে কাপড় সেলাই হয়, সেই ভাবে। উপরে থাকে সুঁচের সুতো, ভিতরে থাকে ববিনের সুতো। দুই সুতো পরস্পরকে জড়িয়ে নিয়ে কাপড় সেলাই করে। ঠিক সেইভাবে এরাও বাসা বোনে। কর্তা-বাবুই তাল বা খেজুরের পাতার সরু সুতো বানিয়ে ঠোঁটে করে নিয়ে এসে কিচমিচ করে 'এনেছি, এনেছি' বলতে বলতে নির্মীয়মাণ বাসার বাইরে বসে সুতোটি ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। ভিতরে অপেক্ষারত গিন্নি-বাবুই তৎক্ষণাৎ সেই সুতোকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অন্যপথে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কর্তা-বাবুই আবার তাকে নতুন পথে ভেতরে পাঠায় ... এইভাবে চলতে থাকে বয়ন কর্ম। দুই দিক থেকে বয়ন কর্ম চালাতে পারে বলেই এদের **বাবুই** বলা হয়।

বাত (বাতলা, বাতলান, বাতায়ন, বাতাস, বাতাসা, বাতাসী, বাতাহত, বাতিক, বাতিল, বাতুল) : ১. ✓বা + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বাত*** = *দ্বিতীয়কে তারিত করে যে।* ***বাতলা*** = ***বাত*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* ***বাতলান*** = ***বাতলা*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বাতায়ন*** = ***বাত****-এর* ***অয়ন*** *(আগমন) যাহা হইতে।* ***বাত****-এর* ***আয়*** *অন (on) থাকে যে পথে।* ***বাতাস*** = ***বাত****-এর আধারের অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* ***বাতাসা*** = ***বাতাস****-এর আধার যে।* ***বাতাসী*** = ***বাতাস****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বাতাহত*** = ***বাত*** *দ্বারা আহত।* ***বাতিক*** = ***বাত****-কে গতিশীল বা সক্রিয় করে যে; কিংবা,* ***বাত*** *গতিশীলকৃত যাহাতে।* ***বাতিল*** = ***বাত*** *গতিশীল হইয়া লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***বাতুল*** = ***বাত*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* / **বাতিক** = বাত হইতে আগত; উচিত ভাবনায় অনভিজ্ঞ যে। **বাতুল** = বাত সহনে অক্ষম যে (বাতাসহ)। (ব.শ.)। **৩. বাত** = সমীরণ, বায়ু, পবনদেব, দেহস্থ ধাতুবিশেষ, বাতজন্য রোগভেদ, ধৃষ্টনায়ক, শৈত্য, ঠাণ্ডা, বায়ুপ্রবাহ; বাক্য, কথা, বিষয়, বার্ত্তা, সংবাদ, খবর, কথিত বিষয়, বক্তব্য বিষয় ... ইত্যাদি। **বাতলা, বাতলান** = হৃদয়ঙ্গম করা, বুঝান, নির্দ্দেশ করা, দেখান। **বাতায়ন** = বায়ুর পথ, গবাক্ষ, জানালা, দ্বারপ্রকোষ্ঠ। **বাতাস** = বায়ু, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, (গৌণার্থে) সংস্পর্শলেশ, সম্পর্কমাত্র, মৃদু বায়ুপ্রবাহ। **বাতাসা** = চিনির ফাঁপা মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। **বাতাহত**

= বায়ুপ্রবাহে বিনাশিত, বায়ুবেগতাড়িত, বাতরোগাক্রান্ত। **বাতিক** = বাতের শমন বা কোপন, চাটুকার, বায়ুকোপজন্য রোগভেদ, পাগলামি, বাই। **বাতিল** = (আরবি) অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত, নামঞ্জুর। **বাতুল** = বাতরোগযুক্ত, বেতো, বায়ুরোগগ্রস্ত, উন্মত্ত, পাগল, বিরক্ত, বাতসমূহ। (ব.শ.)। **বাতাসী (বাতাসি)** = তিন কাঁটাযুক্ত পাবদা জাতীয় এক ধরনের ছোটো মাছ, হালকা পাতলা গড়নবিশিষ্ট স্ত্রী। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. air অর্থে **বাতাস** প্রচলিত, **বাত** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **চরক, জানালা, ফুলবাতাসা**। মেঝেতে চামচ পড়ে গেল, আপনি দেখলেন; তার আওয়াজও শুনলেন। এখানে ঘটনা ঘটল একটি, কিন্তু তার প্রকাশ হল দুই প্রকারে। প্রথম প্রকারটি আপনি দেখেছেন। দ্বিতীয় প্রকারটি আপনি শুনেছেন। তার মানে দ্বিতীয় প্রকারটি শব্দরূপে আপন 'অঘটনের' সংবাদ নিয়ে সর্বদিকে সমভাবে ছুটছিল, যেন লক্ষকোটি সংবাদবাহক সেই সংবাদ নিয়ে ছুটছে। তার মধ্যে একটি সংবাদবাহক আপনার কানে গিয়ে ঢুকেছে। এভাবে **বা** তারিত হয়ে গিয়ে ধরা পড়ল আপনার কানে এবং কান থেকে মনে। আপনি খবরটি পেয়ে গেলেন। একে বলে **বাত**। এটি কথার শব্দ বটে, হাওয়াও বটে। সম্ভবত সেকালে মানুষের ধারণা জন্মেছিল, এই কাণ্ডটি ঘটছে air-এর মাধ্যমে। তাই air-কেও **বাত** শব্দে চিহ্নিত করা হয়।

খবর দেওয়া আর **বাতলে** দেওয়া বা **বাতলান** একই ব্যাপার। ঘরের **জানালা** দিয়ে হাওয়া আসে, মনের জানালা দিয়ে খবর আসে। সেই কারণে সেটি **বাতায়ন** পদবাচ্য। কিন্তু সেই **বাতায়ন** দিয়ে **বাতলান** কথা এল না, এল শুধু তার বাহক, তখন তাকে বলে **বাতাস**। সেই **বাতাস** ঢুকে থাকে বলেই **বাতাসা**কে **বাতাসা** বলে। কিন্তু কোনো মাছ কিংবা নারী যদি হাওয়ায় উড়ে বেড়ানোর মতো হালকা-পাতলা গড়নের হয়, তাকে তো বাংলাভাষী **বাতাসী** বলবেনই। এমন মিষ্টি নামটি আজকাল খুব একটা শোনা যায় না। তাই বলে আরবি **বাতিল**কে অচেনা অজানা বহিরাগত ভাববেন না যেন, এ ছেলে আমাদের **বা**-ক্রিয়ামূলেরই সদস্য, বিদেশ ঘুরে এসেছে বলে তাকে কি দূরে রাখতে আছে। তার সঙ্গে তো এখনও **ইল** জুড়ে রয়েছে। এই **ইল** তো **ইলা**র দাদা!

বাতাপি (ইল্বল) : ৩. অসুরবিশেষ, সিংহিকার গর্ভজাত বিপ্রচিত্তির পুত্র ইল্বল ও বাতাপি, প্রহ্লাদের গোত্রজাত অসুরবিশেষ, হ্লাদের পত্নী ধমনীর পুত্র; মৎস্যবিশেষ, মৃগশিরার উপরিস্থ পঞ্চ তারা। (ইল্বল কোনো ব্রাহ্মণের নিকটে ইন্দ্রতুল্য একটি পুত্র প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা পূর্ণ না করায় ইল্বল তদবধি ব্রহ্মঘাতক হয়। ...)। (ব.শ.)। বাতাপি এক রাক্ষস এবং ইল্বলের ভ্রাতা। এরা প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠপুত্র হ্লাদের পুত্র ছিল। ... ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভের বর চেয়ে ব্যর্থ হওয়ায় এরা ব্রহ্মঘাতী হয়। ... বাতাপিকে মেষে রূপান্তরিত করে তার মাংস রেঁধে ব্রাহ্মণকে ভোজন করতে দেন। ভোজনান্তে ইল্বল ভ্রাতা বাতাপিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন। বাতাপি সহাস্যে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করে বহির্গত হয়। এই প্রণালীতে দুই ভ্রাতা বহু ব্রাহ্মণকে হত্যা করে। মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ করার পর একদিন সহবাস প্রার্থনা করলে ... লোপামুদ্রা সালঙ্কারা দিব্যাভরণভূষিতা হয়ে পতির সঙ্গে মিলিত হতে চান। অগস্ত্য তখন স্ত্রীকে সালঙ্কারে ভূষিতা করার জন্য অর্থান্বেষণে ... বাতাপি ও ইল্বলের নিকট উপস্থিত হন। ... যথারীতি ইল্বল অগস্ত্যকে মেষমাংস আহার করতে দেন ... এবং ভোজনান্তে বাতাপির নাম ধরে ডাকতে থাকেন। তখন অগস্ত্য তাকে বলেন, বাতাপি তাঁর উদরে জীর্ণ হয়ে গেছে। ইল্বল বিষণ্ণ ও ভীত হয়ে অগস্ত্যের বাসনা জানতে চাইলে অগস্ত্য তাঁর বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করেন। তখন ইল্বল বাঞ্ছিত ধন প্রদান করে অগস্ত্যকে বিদায় দেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ইরা**। যতদূর বোঝা যায়, বৈদিক যুগের কোনো সময়ে অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে দুটি ভ্রাতৃসম সত্তার জন্ম হয়। তাদের নাম **ইল্বল** ও **বাতাপি**। এদের মধ্যে **ইল্বল** ছিল 'প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী', সেই বিরোধিতা প্রচলিত ব্যবস্থার অতি কঠোর অনুশীলনের কারণে হোক কিংবা বিকল্প ব্যবস্থা অনুসরণের কারণেই হোক। আর, **বাতাপি** হল এমন সত্তা যে, '**বাত** সমূহকে আপান করত'। একালের ভাষায় **ইল্বল**কে আমরা প্রচলিত ব্যবস্থার বা ধারণার কট্টর বা মৌলবাদী অনুশীলনকারী বলতে পারি, এবং **বাতাপি**কে আমরা সম্পদভক্ষক রাক্ষসসত্তা বলতে পারি। কিন্তু তার থেকে সেই প্রাচীন ইতিহাসটি আমাদের হাতে আসে না। তার জন্য এই দুজন সম্পর্কে আরও তথ্যের প্রয়োজন হয়। সেই তথ্য এখনও আমরা পাইনি।

বাম (বাং, বামদেব, বামপন্থী, বামা, বামী) : ১. ✓বা + ম (মন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বাম*** = ***বা****-সত্তাটি (অপর সত্তাটি) সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ* ***বা****-সত্তাটি রূপ লাভ করেছে যে আকারে।* ***বাং*** = ***বা****-এর রহস্যরূপ যাহাতে।* ***বামদেব*** = ***বাম*** *যে* ***দেব****।* ***বামপন্থী*** = ***বাম পন্থা*** *যাহার;* ***বাম*** *রীতিনীতি অবলম্বন করে চলে যে।* ***বামা*** = ***বাম****-এর আধার।* ***বামী*** = ***বাম****-এর গতিশীল আধার যে। /* **বাম** = অশুভের সূচনা করে যে। **বামদেব** = যে দেব সুন্দর বা লোকাচার-প্রতীপ। (ব.শ.)। ৩. **বাম** = প্রতিকূল, বিরোধী, প্রতীপ, বিপরীত, পরাঙ্মুখ, বিপরীতাচারী, বক্র, অনৃজু, বামভাগস্থ, দেহের বামভাগস্থ, অধম, সুন্দর; বামদেব, শিব, কামদেব, রুদ্র, বরুণ, পয়োধর, সব্যহস্ত, (তন্ত্রে) মদ্যাদিপানরূপ আচার, বামাচার; দুর্দৈব, ধন, বাস্তুক। **বামদেব** = বসিষ্ঠপুত্র, প্রতিকূল দেব। **বামা** = স্ত্রীমাত্র, নারী, সুন্দরী নারী, গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী। **বামী** = বড়বা, গর্দভী, শৃগালী, করভী, গর্দভ-অশ্ব-সঙ্করজা, অশ্বতরী। (ব.শ.)। ৪. left অর্থে **বাম** প্রচলিত, বাকি শব্দ অপ্রচলিত। **বাং** শব্দটি সাঁওতালদের ভাষায় 'না' অর্থে নিত্যপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দক্ষিণ**। বাংলায় 'বিধি বাম' কথাটি বহুল প্রচলিত। এর অর্থ বক্তার ইচ্ছার বিপরীতে চলে গেছেন বিধি, সে যা করতে বা পেতে চায়, তাকে 'না' করে দিয়েছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে **বাম** হল, প্রচলিতের বিকল্পে **বা** রূপে যাকে পাওয়া যেতে পারে, সেই বিকল্প রূপটি বা অপর রূপটি। **দক্ষযজ্ঞে**র পর ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ **দক্ষিণ** পথটি গ্রহণ করেছিল, ফলে যে পথটি পরিত্যক্ত (বা left) হয়েছিল, সেটিই **বাম** পথ। এই পরিত্যক্ত পথটিই ছিল বৈদিক-পূর্ব যুগের বা সনাতন যুগের পথ, বহুকালক্রমাগত **মহান** মানুষদের পথ, **শিবপন্থী**দের পথ, **সুন্দরের** পথ। তবে কেমন করে সেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চিরাচরিত পথে

থেকেও **শিব** ও **শিবপন্থী**রা **দক্ষ**বিরোধী সংগ্রামে 'সংকোচগ্রস্ত' হয়ে **বাম** হয়ে গেলেন এবং লোকাচার তাঁদের বিপরীতে চলে গেল, সে অনেক কথা। ...

স্বভাবতই **বাম** দিক যে প্রচলিতের বিরোধী দিক, সে উত্তরাধিকার বিশ্বের সকল জাতিই কমবেশি পেয়েছে। মানবসভ্যতা তথাকথিত বর্বর যুগ থেকে সভ্যযুগে পা দেওয়ার সময় সেই সনাতন দিকটি 'পরিত্যাগ করে এসেছিল' বলে, সেই দিকটিকে ইংরেজগণ left দিক বলেন। সেই উত্তরাধিকারের অন্তঃসলিলা ধারা ইউরোপের পার্লামেন্টে প্রচলিত সরকারের বিপরীতপন্থীদের **বাম** দিকে বসতে ও বসাতে প্ররোচিত করে, তার থেকে **বাম**-দিকে-বসা **বামপন্থী** মানেই হয়ে যায় প্রচলিত সরকারের বিরোধী। লোকে বুঝে যায় **বামপন্থী** মানে 'সরকার-বিরোধী'। ...

ব্রিটিশের কাছে আধুনিকতার শিক্ষা লাভ করে ভারতের রাজনীতি চর্চাকারীগণ যখন **বামপন্থা** শব্দটি গ্রহণ করে নেন, আমাদের তাতে অস্বস্তি হয়নি; কারণ কথাটি তো আমরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই কমবেশি জানতাম। **বাম** বললেই 'বিপরীত' বোঝার রীতি এদেশে বহু প্রাচীন। এমনকি আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসলে স্ত্রীর বসার রীতি **বাম** দিকে। তাই তিনি **বামা**। তবে স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো নারী হলে তিনি পুরুষটির **বাম** দিকে বসবেন না, এটাই রীতি। ...

কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজের রীতি অমান্য করে গোপনে জন-সাধারণের ভিতরে থেকে সুদ খায় (বড়বা), লুকিয়ে চুরিয়ে সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে (শৃগালী), কিংবা গোপনে আত্মসাৎ করে অথচ 'চোরের মা'র বড় গলা' করে যারা চেঁচায় (গর্দ্দভী) ... তারাও তো প্রচলিতের বিপরীত সত্তা, **বাম**-এর সক্রিয় আধারই বটে! সেই কারণে তাদের নাম দেওয়া হয় **বামী**। সাদৃশ্যে তাঁরা যথাক্রমে মাদী-ঘোড়া, মাদী-শেয়াল, মাদী-গাধাকে বোঝায়।

বামন : **১.** বাম + ✓নী + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বাম্*** *অন (on) থাকে যাহাতে; অথবা,* ***বাম****-কে আনয়ন করে যে; কিংবা, বিকল্প সীমায়ন করতে থাকে যে।* **৩.** হ্রস্বাকৃতি, খর্ব্ব, অল্প, ক্ষীণ, নম্র, ন্যূনপরিমাণ; বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার (এই অবতারে বিষ্ণু, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ 'উপেন্দ্র' নামে অভিহিত হন), হ্রস্ব পুরুষ, দক্ষিণ দিকের দিগ্‌গজ, হ্রস্ব অশ্ব বা ষণ্ড, কাশিকাবৃত্তিকার পণ্ডিতবিশেষ; তীর্থভেদ, বামনপুরাণ। (ব.শ.)। ... প্রহ্লাদের পৌত্র দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে দেবতাদের দেবলোক হতে নির্বাসিত করলে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলিকে দমন করে দেবতাদের উদ্ধার করার জন্য কশ্যপমুনির ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (দ্র. **বলি**)। একবার বলি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে প্রচার করেন যে, এই যজ্ঞে তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা করবে, তিনি তাই পূরণ করবেন। ... বামন সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। যজ্ঞকার বলি চিন্তা করলেন যে, ক্ষুদ্র এই ব্রাহ্মণের ত্রিপাদ ভূমি আর কতটুকু। তাই তিনি ত্রিপাদ ভূমি দানে প্রতিশ্রুত হন। ... দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে বলিকে এই দান করতে নিষেধ করেন। কিন্তু বলি ... অস্বীকার করেন। তখন ... শুক্রাচার্য সংকল্পিত জলগ্রহণে বাধাদানের জন্য অদৃশ্যভাবে ভৃঙ্গারের মধ্যে প্রবেশ করে ভৃঙ্গার-বিবর বন্ধ করেন। তখন বামনের উপদেশে কুশ দ্বারা অবরুদ্ধ ভৃঙ্গার-বিবর মুক্ত করা হয়। এতে শুক্রাচার্যের একচক্ষু কুশবিদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। বলির সংকল্প শেষ হওয়ামাত্র বামন তাঁর এক পদ দিয়ে দিঙ্মণ্ডল আয়ত্ত করেন। অতঃপর দ্বিতীয় পদ বিস্তার করলে স্বর্গ তাঁর আয়ত্তে আসে। তৃতীয় পদের জন্য বামন তখন পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। তখন বলি বলেন, 'আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।' বলির স্ত্রী বিন্ধ্যাবলী স্বামীকে পাপমুক্ত করার জন্য বামনকে অনুরোধ করেন। কারণ, বলি তখন তাঁর সমস্তই বামনকে অর্পণ করেছেন। বিষ্ণু বলির সত্যবাদিতা ও পরমভক্তি দেখে প্রীত হয়ে বলেন যে, সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবে এবং এই মন্বন্তর না আসা পর্যন্ত পাতালে সে বাস করবে। (পৌ.অ.)। **৪.** dwarf অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অবতার, ত্রিপাৎ, ত্রিপাদ, দিগ্‌গজ, বলি**। যা কিছু **বাম**, তা আনয়ন করলে সেটি 'খর্ব্ব' হয়ে যায় কেন? কিংবা **বাম্** ক্রিয়াটি অন (on) কৃত থাকলে সেটি 'হ্রস্বাকৃতি', 'খর্ব্ব', 'ক্ষুদ্র' ... ইত্যাদি হয়ে যায় কীভাবে? তাছাড়া, **বাম** বা **শিব** যখন **দক্ষ**-বিরোধী এবং **বিষ্ণু** যখন **দক্ষ**-সমর্থক, তখন **বিষ্ণু** কেন এবং কীভাবে **বামন** হয়ে যান? এমনকি তিনি **ইন্দ্রে**র সহকারী **'উপেন্দ্র'** হন কীভাবে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় না, অন্তত আমরা নিশ্চিতরূপে পাইনি। শব্দার্থের বিচারে, আমরা দেখছি, যে সত্তা ক্রমান্বয়ে **বাম্** ক্রিয়াটি অন (on) করতে থাকেন, তাঁকে **বামন** বলা যায়। এই **বাম্** করণ হল, বিকল্পকে সীমায়িত করতে থাকা। এর ফলিত প্রয়োগ হতে পারে এরকম — জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার প্রচলিত পথ, ধরা যাক, প্রয়োজনীয় সবরকম কাজ করা। এরকম করলে একজন মানুষ কমবেশি সবরকমের জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত থাকে। আর বিকল্প পথ, ধরা যাক, শুধুমাত্র কাপড় বুনে বেচে দিন গুজরান করা। তাহলে **বাম্** করণ করার মানে হয়ে যাবে নিয়ত কাপড় বুনতে ও বেচতে থাকা; তাকেই বলা হবে **বামন** হওয়া। এমন হলে মানুষটি ক্রমশ কাপড় বোনায় **দক্ষ** হয়ে তাঁতি হয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত প্রকারের কাজ সে ভুলে যাবে। অর্থাৎ, মানুষটি খর্ব হয়ে যাবে, হ্রস্বাকৃতি হয়ে যাবে। তার মানে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকলে, মানুষ একদিকে **দক্ষ** বা 'স্পেশালিস্ট' হয়ে যায় বটে, কিন্তু সার্বিকতার বিচারে **বামন** বা খর্বাকৃতি হয়ে যায়। **দক্ষ**পন্থী সভ্যতাবাদীরা অবশ্য তাঁদের এইভাবে একই সঙ্গে **'স্পেশালিস্ট-কিন্তু-বামন'** হয়ে যাওয়ার তত্ত্বকে সমর্থন যোগান **শিব**পন্থাকে 'jack of all trades, master of none' বলে নিন্দেমন্দ ক'রে। ... আজ আমরা জানি শিব-দক্ষের **দ্বৈরাজ্যেই** মুক্তি, কাউকে বাদ দিলে অশুভ বই শুভ হবে না।

কিন্তু এসব তো হল তত্ত্বকথা। সমাজে এই **বামন**-এর নিদর্শন কোথায়? আমরা দেখছি, মানুষের মধ্যে দু-একজন মানুষ জন্মান হ্রস্বাকৃতি **বামন** (dwarf) হয়ে। আর, মানুষের ইতিহাসে এর ফলিত প্রয়োগের খবর পাচ্ছি **বামনাবতারের** অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলীতে। সে কীরূপ ব্যাপার, এখন সে কথায় যাওয়া যাক। (দ্র. **অবতার**)

দক্ষব্যবস্থা প্রচলিত হবার কালে **বাম** বলা হচ্ছে স্বয়ং **শিব**কেই।

বিষ্ণুকে **বামন** বা **বামনাবতার** বলা হচ্ছে **দক্ষ**নির্ভর-সভ্যতার অগ্রগতির অন্তত চারটি অধ্যায় — **মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ** — এই চারটি অধ্যায় পেরিয়ে যাওয়ার পর। আমাদের মনে হয়েছে যে, **দক্ষোৎপত্তি**র পর সনাতন যৌথসমাজ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেলেও, সম্প্রদায়ভিত্তিক যৌথ উৎপাদন সংগঠন ভাঙেনি। কিন্তু **বামনাবতারে** পৌঁছে গোটা সম্প্রদায়ের একত্রে উৎপাদন করবার রীতিটি ভেঙে যায়; জন্ম হয় 'গোষ্ঠী-উৎপাদন-ব্যবস্থা', যা উলটো-ভাবে খানিকটা ইউরোপের 'গিল্ড'-এর মতো। অর্থাৎ, সবার আগে (**দক্ষযজ্ঞ**কালে) সমগ্র যৌথব্যবস্থা ভেঙে বহু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক যৌথব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল; এই **বামনাবতার**-অধ্যায়ে সেই সাম্প্রদায়িক-যৌথব্যবস্থা ভেঙে একপ্রকার গোষ্ঠীব্যবস্থার সূচনা হয়, যা কিনা পরবর্তীকালে আরও ভেঙে পারিবারিক-যৌথব্যবস্থায় পরিণত হয়। তারও পরে আসে ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা। (দ্র. **ব্যক্তিমালিকানা**) ...

তা সে যাই হোক, আদিম যৌথব্যবস্থা থেকে নেমে সাম্প্রদায়িক যৌথব্যবস্থায় আসা, সেখান থেকে আরও নেমে গোষ্ঠীর যৌথব্যবস্থায় আসা নিঃসন্দেহে **বামন** হতে থাকাই বটে। কিন্তু তাতেই কথাটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা, তারপরে তো আরও নেমেছে। তাই এই অধ্যায়ে **বামন**-এর আরও কোনো ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকার সন্ধানে গেলে পাওয়া যায় 'উপেন্দ্র'কে। আমরা জানি, 'আমাদের জাতি', 'আমাদের গোষ্ঠী', 'আমাদের পরিবার' ... এসব হল একধরনের 'আমিত্ববোধ', সেকালে যাকে **ইন্দ্র** বলা হত। কিন্তু কেউ যদি বলতে থাকে যে, 'না না, আমাদের গোষ্ঠী এমন কি বড়, এ তো খুবই ছোট, আমাদের আয়-উপায়ই বা কতটুকু, আমাদের উপর দয়া করে অত টাকা **বলি** বা কর চাপাবেন না ...' ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে সেই **ইন্দ্র**কে আর **ইন্দ্র** বলা যায় না, বলতে হয় উপ-**ইন্দ্র** বা উপেন্দ্র। এই উপেন্দ্রই **বামন**। এঁর কৌশলে করের বা ট্যাক্সের **পাতাল**প্রবেশ ঘটে যায়। কার কত ট্যাক্স হবে না হবে, সবই খাতার পাতায় ঢুকে থেকে যায়, বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

কিন্তু dwarf মানুষকে কেন **বামন** বলা হয়? তার শরীরের ভিতরে কি এমন কোনো নীতির অনুসরণ রয়েছে, যে কিনা প্রতিনিয়ত তার শরীরের বাড়বৃদ্ধিকে ক্রমশ ছোট করে রাখার প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়? আমরা জানি না।

বায়ু (৪৯ বায়ু। দ্র. পবন) : ১. ✓বা + উ (উণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর গমন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে বয়ে আসে ও বয়ে নিয়ে আসে।* **৩.** সমীরণ, বাত, পবন (ভূতল হইতে উপর্য্যুপরি সপ্ত বায়ুমার্গে সপ্ত বায়ুপ্রবাহ — প্রবহ, আবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, পরিবহ, পরাবহ।), বায়ুদেবতা, পবনদেব, পঞ্চ স্থূলভূতের স্পর্শগুণ একতম ভূত, দেহস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকপাল, শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, বায়ু দূষিত ধাতু, শ্বাস, বায়ুবীজ 'য', মরুদ্গণ, ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। অন্তরীক্ষের দেবতা। বায়ু সম্বন্ধে বেদে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচিত হয়েছে। ... বিষ্ণুপুরাণ মতে বায়ু গন্ধর্বদের রাজা। রামায়ণে বায়ু হনুমানের পিতারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। ... অঞ্জনার গর্ভে বায়ুর ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। ... দুর্বাসার মন্ত্রবলে আহূত বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একবার বায়ু কুশনাভের শতকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের সংগম প্রার্থনা করে অস্বীকৃত হলে, বায়ু এদের কুব্জা করে দেন। পরে কাম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত এই সকল কন্যাকে বিবাহ করলে তাদের কুব্জত্ব দূর হয়। এই জন্য কুশনাভের রাজ্যের নাম কান্যকুব্জ। ... একবার কোনো কার্যবশত ইন্দ্র হনুমানকে বজ্রপ্রহার করেন। এতে হনুমান বিহ্বল হয়ে পড়লে পিতা পবনদেব নিজের গতি রোধ করে পুত্রকে নিয়ে গিরিগুহায় প্রবেশ করলেন। এর ফলে পৃথিবীতে যন্ত্রণার পরিসীমা থাকল না। পৃথিবীর সমস্ত জিনিস বায়ুর অভাবে কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হল। তখন দেবতারা ব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মাকে এর প্রতিকার করতে বললেন। ব্রহ্মা বায়ুকে সন্তুষ্ট করে সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করলেন। (পৌ.অ.)। **৪.** air অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **উদান, পঞ্চবায়ু, পবন, প্রাণ**। ইতোপূর্বে **পূ** ক্রিয়ামূলের পরিবারে **পবন** শব্দে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে আমরা শুধুমাত্র **বায়ু** ও **৪৯ বায়ু** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ বিষয়ে কথা বলব।

বায়ু শব্দের মূল যে স্বভাব, তাতে রয়েছে দুরকম বহন। সে বহে = বয় = বহন করে, এবং সে বহে = বয় = বয়ে যায়, বইতে থাকে। তার মানে, বায়ু flow করে, carry-ও করে। বয়ে যায় বলেই বয়ে নিয়েও যায়। কিন্তু **বায়ু** শব্দটি যখন প্রয়োগ করছি, তখন তার অর্থ হচ্ছে — 'যে নিজে বয়ে আসে এবং অন্য কিছু বয়ে নিয়ে আসে'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লোকে এই **বায়ু** air বোঝালেও, এর মুখ্য প্রতিপাদ্য হল ইন্দ্রিয়াতীত লোকের **খবর**। যেকারণে ইংরেজিতে খবর ছড়িয়ে দেওয়াকে বলে 'it is aired'। একালের ভাষায় একে বলে 'মিডিয়া'। এই মিডিয়া-**বায়ু**তে কোনো কিছু **হওয়ার** (এখানে ধনেখালি শাড়ি হয়েছে, ওখানে বাসমতী চাল হয়েছে ... ইত্যাদি) খবর থাকে, তাই তাকে **হাওয়া** বলে। আর, যৌথসমাজের কোনো কিছু হওয়ার খবর ও তা সমান ভাগে পাওয়ার খবরকে বলে **সমীরণ**। তাতে সম-**ঈরণ** হয়। তবে **পণ্যে**র খবরকে বলে **গু**-এর খবর, goods-এর খবর, **মল**-এর খবর, তাই একে বলে **মলয়পবন**। সংক্ষেপে এই হল **বায়ু**।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, এই মিডিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে। উপরোক্ত **কান্যকুব্জ**-এর কাহিনী, **ভীম** ও **হনুমানের** কাহিনী ... প্রভৃতি কাহিনীতে সেই **বায়ু**র ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

বি (বিধ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (ইংরেজিতে 'বাই' বা দুই। বি নেই যার, সেটি বিনা, দ্র. **অবিনাভাব**। দ্র. বা। ফারসিতে এটিই 'বে' উপসর্গ রূপে প্রচলিত, যেমন 'বেতাল') অতিবিধ, অপত্যবিক্রয়, অব্যক্ত, অব্যক্তমূর্ত্তি, অব্যক্তরাগ, অসুবিধা, আবিধ, এবম্বিধ, ত্রিবিধ(া), দ্বিবিধ(া), নানাবিধ, পণ্যবিক্রয়, পর্য্যবেক্ষণ, বই (বৈ), বক্‌শীষ (বেক্ষণকারীকে যা দেওয়া হয় বা তিনি যা দেন), বক্‌সিস, বক্‌সী (বক্সী, বক্ষী বা বেক্ষণকারী), বক্‌সীস, বখরা (বক্ষীর), বখিল, বখ্‌শিশ, বখ্‌শী, বঞ্জি, বহড়া, বহুবিধ, বহেড়া, বহেস, বহুলে, বাউক্ষ(স্কা), বাঁও (ব্যাম), বাখান, বাখানি, বাখানী,

বাগ (বি-অ-গ, উদ্যান, বিশেষভাবে করা গাছপালা, বাগান করা, বাগান), বাগ (বাঘ), বাগাত, বাগান, বাগানি, বাগাল, বাগালি, বাগিচা, বাগিনী (বাঘিনী), বাগী, বাগুয়ান, (বাগোয়ান), বাঘ, বাঘআঁকড়া, বাঘছড়ি, বাঘছাল, বাঘজাল, বাঘডাঁশা, বাঘথাবা, বাঘনখ, বাঘলেঙ্গুড়ে, বাঘহাথা, বাঘা, বাঘা-আড়, বাঘা-কুকুর, বাঘা-তেঁতুল, বাঘা-হামা, বাঘাম্বর, বাঘাম্বরা, বাঘিনী, বাঘী, বাবদূক, বি, বিঅনি(নী), বিআ, বিআধ, বিআধি, বিউনি(নী), বিউলি, বিএ, বিঁদ (বিঁধ), বিঁধা, বিক্রয়, বিকঙ্কট, বিকঙ্কত, বিকচ, বিকচিত, বিকট, (অকট-বিকট), বিকত্থন, বিকত্থা, বিকত্থী, বিকম্প, বিকম্পন, বিকম্পিত, বিকম্পী, বিকর, বিকরণ, বিকরাল, বিকরালা, বিকরুণ, বিকর্ণ, বিকর্ণী, বিকর্ত্তন, বিকর্ত্তা, বিকর্ম্ম, বিকর্ম্মকৃৎ, বিকর্শিত, বিকর্ষ, বিকর্ষণ, বিকল, বিকলচিত্ত, বিকলা, বিকলি, বিকলিত, বিকলিনী, বিকলী, বিকল্প, বিকল্পন, বিকল্পনা, বিকল্পিত, বিকশল, বিকশিত, বিকস, বিকসিত, বিকস্বর, বিকা, বিকাঙক্ষা, বিকার, বিকারিত, বিকারী, বিকার্য্য, বিকাল, বিকাশ, বিকাশক, বিকাশন, বিকাশী, বিকাস, বিকাসন, বিকাসিত, বিকাসী, বিকি(কী), বিকিকিনি, বিকিনী, বিকির, বিকিরণ, বিকীরণ, বিকীর্ণ, বিকুক্ষি, বিকুণ্ঠ, বিকুণ্ঠা, বিকুর্ব্বাণ, বিকুলি, বিকূজ, বিকূজন, বিকৃত, বিকৃতাকার, বিকৃতাকৃতি, বিকৃতদর্শন, বিকৃতবুদ্ধি, বিকৃতি, বিকৃষ্ট, বিকোশ(ষ), বিক্রম, বিক্রমণ, বিক্রমরাজ, বিক্রমার্ক, বিক্রমাদিত্য, বিক্রয়, বিক্রয়পত্র, বিক্রয়ানুশয়, বিক্রয়িক, বিক্রয়ী, বিক্রান্ত, বিক্রান্তি, বিক্রায়ক, বিক্রি(ক্রী), বিক্রিয়া, বিক্রীড়া, বিক্রীড়িত, বিক্রীত, বিক্রুষ্ট, বিক্রেতা, বিক্রেয়, বিক্রোধ, বিক্রোশ, বিক্রোষ্টা, বিক্লব, বিক্লিত্তি, বিক্লিন্ন, বিক্লেদ, বিক্ষত, বিক্ষাব, বিক্ষালিত, বিক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ, বিক্ষেপ, বিক্ষেপণ, বিক্ষেপ্তা, বিক্ষেপশক্তি, বিক্ষোভ, বিক্ষোভিত, বিখণ্ডন, বিখনাঃ, বিখল, বিখেদ, বিখ্যাত, বিখ্যাতি, বিগড়, বিগড়া, বিগড়ান, বিগণন, বিগত, বিগতকল্মষ, বিগতক্লম, বিগতজ্বর, বিগতভী, বিগতস্পৃহ, বিগতি, বিগ(ঘ)তিয়া, বিগম, বিগর্হণ, বিগর্হণা, বিগর্হিত, বিগলিত, বিগাড়, বিগাঢ়, বিগান, বিগাহ, বিগীতি, বিগুণ, বিগুত, বিগূঢ়, বিগৃহীত, বিগ্রহ, বিগ্রহী, বিঘট, বিঘটন, বিঘটিত, বিঘট্টন, বিঘট্টনা, বিঘত, বিঘতিয়া, বিঘন, বিঘস, বিঘা, বিঘাট, বিঘাত, বিঘাতন, বিঘাতী, বিঘিন, বিঘিনি, বিঘূর্ণন, বিঘূর্ণিত, বিঘোর, বিঘ্ন, বিঘ্ননাশক, বিঘ্নরাজ, বিঘ্নহারী, বিঘ্নাধিপ, বিঘ্নান্তক, বিঘ্নিত, বিঘ্নেশ, বিঘ্নেশ্বর, বিঙ্গাচিঙ্গা, বিচ (বি-চয়ন, বেচা), বিচক্ষুঃ, বিচনী, বিচয়, বিচয়ন, বিচরণ, বিচর্চ্চিকা, বিচল, বিচলন, বিচার, বিচারক, বিচারণ, বিচারণা, বিচারণীয়, বিচারয়িতব্য, বিচারার্হ, বিচারিত, বিচারী, বিচারু, বিচাল, বিচালি, বিচার্য্য, বি(বী)চি, বিচিকিৎসা, বিচিত, বিচিতি, বিচিত্ত, বিচিত্র, বিচিত্রবীর্য্য, বিচিত্রিত, বিচিন্তন, বিচিয়া, বিচূর্ণন, বিচেত, বিচেতন, বিচেতব্য, বিচেতাঃ, বিচেয়, বিচেষ্টন, বিচেষ্টা, বিচেষ্টিত, বিচ্ছর্দ্দন, বিচ্ছর্দ্দিকা, বিচ্ছায়, বিচ্ছায়া, বিচ্ছিত্তি, বিচ্ছুর, বিচ্ছুরিত, বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদন, বিচ্যুত, বিচ্যুতি, বিছরণ, বিছনপুড়া, বিছনি, বিছন্দ, বিছরণ, বিছা, বিছাতি, বিছান (বিপরীত ছাদন), বিছানা, বিছুর, বিছুরণ, বিছেনা, বিছোহ, বিজ, বিজন, বিজনন, বিজনবান্ধব, বিজনী, বিজন্মা, বিজবিজ, বিজবিজিনি, বিজয়, বিজয়কুঞ্জর, বিজয়চ্ছন্দ, বিজয়ডিণ্ডিম, বিজয়ঢাক, বিজয়দুন্দুভি, বিজয়মন্দির, বিজয়মর্দ্দল, বিজয়দ্বাদশী, বিজয়পতাকা, বিজয়লক্ষ্মী, বিজয়শ্রী, বিজয়া, বিজয়াগমন, বিজয়াদশমী, বিজয়ী, বিজয়োৎসব, বিজর, বিজর-বিজর, বিজরি(রী), বিজল্প, বিজল্পিত, বিজলি (বিজলী), বিজাত, বিজাতি, বিজাতীয়, বিজাতীয়া, বিজিগিচ্ছি, বিজিগীশ, বিজিগীষা, বিজিগীষী, বিজিগীষু, বিজিত, বিজিতি, বিজিবিজি, বিজির-বিজির, বিজিল, বিজিহ্ম, বিজীবিত, বিজুগ, বিজুত, বিজুবন, বিজুরি(রী), বিজুলি(লী), বিজৃম্ভ, বিজৃম্ভণ, বিজৃম্ভা, বিজৃম্ভিত, বিজেতা, বিজেতব্য, বিজেতা, বিজোরি, বিজ্ঞ, বিজ্ঞপ্ত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময়কোষ, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানীয়, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনা, বিজ্ঞাপনীয়, বিজ্ঞাপিত, বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞেয়, বিজ্য, বিজ্বর, বিতিকিচ্ছিরি (বিজিগিচ্ছি), বিটকাল, বিটকিলে, বিটকেল, বিটঙ্ক, বিটঙ্কিত, বিড়ম্ব, বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা, বিড়ম্বিত, বিড়ম্বী, বিড়ম্ব্য, বিড়া, বিড়ার, বিড়ি, বিড়ী, বিডীন, বিড়ে (বীড়ে, বিড়ে দেখা বা খোঁজখবর করে মিলিয়ে দেখা), বিড়োজা, বিড়ো(ড়ৌ)জাঃ, বিতং, বি(বী)তংস, বিতণ্ডা, বিতত, বিততি, বিতথ, বিতথবাদিন, বিতথা, বিতথ্য, বিতনু, বিতন্ত্রী, বিতমাঃ, বিতর, বিতরণ, বিতরিত, বিতর্ক, বিতর্কণ, বিতর্দ্দি, বিতল, বিতস্তা, বিতস্তি, বিতান, বিতানক, বিতানিত, বিতারিখ, বিতীর্ণ, বিতৃট্(ষ্), বিতৃণ, বিতৃষ, বিতৃষ্ণ, বিত্ত, বিত্তকাম, বিত্তগোপ্তা, বিত্তনাথ, বিত্তপ, বিত্তপতি, বিত্তপাল, বিত্তপেটা, বিত্তপেটী, বিত্তবর্দ্ধন, বিত্তবিবর্দ্ধী, বিত্তসমাগম, বিত্তাঢ্য, বিত্রস্ত, বিত্রাস, বিত্রাসন, বিত্রাসিত, বিথর, বিথান, বিথার, বিথারিত, বিথারিল, বিথারী, বিদংশ, বিদগধ, বিদগধি(ধী), বিদগ্ধ, বিদগ্ধতা, বিদগ্ধা, বিদম, বিদর, বিদরণ, বিদরা, বিদর্ভ, বিদর্ভজা, বিদর্ভতনয়া, বিদর্ভনগরী, বিদর্ভভূ, বিদর্ভরাজ, বিদর্ভা, বিদল, বিদলন, বিদলা, বিদলিত, বিদশা, বিদা (বিপরীত দান), বিদায়, বিদায়ী, বিদার, বিদারক, বিদারণ, বিদারিকা, বিদারিত, বিদারী, বিদাহ, বিদাহী, বিদিক্(শ্), বিদিশা, বিদীঘল, বিদীর্ণ, বিদুআ, বিদুর (বিধুর), বিদুলা, বিদুষী (বিদুষিত), বিদুন, বিদূর, বিদূরগ, বিদূরজ, বিদূরভূমি, বিদূররত্ন, বিদূষক, বিদূষণ, বিদূষিত, বিদে, বিদেশ, বিদেশগমন, বিদেশজ, বিদেশবাসী, বিদেশবিভুঁই, বিদেশবিভূম, বিদেশিনী, বিদেহ, বিদেহজা, বিদেহনগরী, বিদেহপতি, বিদেহরাজ, বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎকটাক্ষ, বিদ্যুৎকম্প, বিদ্যুৎবাজিকর, বিদ্যুৎত্বান (ত্বৎ), বিদ্যুৎপাত, বিদ্যুৎপুঞ্জ, বিদ্যুৎপ্রভা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, বিদ্যুদুন্মেষ, বিদ্যুদ্গর্ভ, বিদ্যুদ্দাম(মন্), বিদ্যুদ্দৃষ্টি, বিদ্যুদ্বল্লী, বিদ্যুন্মালা, বিদ্যুন্মালী, বিদ্যুল্লতা, বিদ্যুল্লেখা, বিদ্যোত, বিদ্যোতক, বিদ্রধি (বিদ্রুধি), বিদ্রব, বিদ্রবণ, বিদ্রাব, বিদ্রাবক, বিদ্রাবণ, বিদ্রাবী, বিদ্রুত, বিদ্রুম, বিদ্রুমচ্ছায়, বিদ্রুমদণ্ড, বিদ্রূপ, বিদ্রূপী, বিদ্রোহ, বিদ্রোহী, বিধব, বিধবা, বিধর্ম্ম, বিধর্ম্মা, বিধর্ম্মী, বিধ্, বিধ, বিধা, বিধাতব্য, বিধাতা, বিধাত্রী, বিধান, বিধানদাতা, বিধানসভা, বিধায়, বিধায়ক, বিধায়িনী, বিধায়ী, বিধি, বিধিকর, বিধিজ্ঞ, বিধিৎসা, বিধিৎসু, বিধিদর্শী, বিধিদৃষ্ট, বিধিপূর্ব্বক, বিধিপ্রযুক্ত, বিধিবশ, বিধিবিপর্য্যয়, বিধিবিৎ, বিধিবোধিত, বিধিযজ্ঞ, বিধিযোগ, বিধিলিপি, বিধিলোপ, বিধিহীন, বিধুত, বিধুতি, বিধুবন, বিধুর, বিধুরা, বিধুরিত, বিধূত, বিধৃতি, বিধূনন, বিধূনিত, বিধূম, বিধূমিত, বিধৃত, বিধেয়, বিধেয়জ্ঞ, বিধেয়াত্মা, বিধ্বংস, বিধ্বংসন, বিধ্বংসী, বিন, বিনত, বিনতা, বিনতানন্দন, বিনতাসুত, বিনতি, বিনদ, বিনদ্যা, বিনন, বিনমন, বিনম্র, বিনয়, বিনয়গ্রাহী, বিনয়নম্র, বিনয়বধির, বিনয়ন, বিনয়া, বিনয়াধান,

বিনয়ী, বিনশন, বিনশ্যাতি, বিনশ্বর, বিনষ্ট, বিনষ্টি, বিনা (অবিনাভাব),
বিনাকৃত, বিনাড়ি, বিনাড়িকা, বিনাড়ী, বিনান, বিনানি(নী), বিনাভব,
বিনাভাব, বিনাভূত, বিনামা, বিনায়ক, বিনায়িকা, বিনাশ, বিনাশক,
বিনাশন, বিনাশিত, বিনাশী, বিনাশোন্মুখ, বিনাশ্য, বিনাস, বিনাহ,
বিনি, বিনিঃসরণ, বিনিঃসৃত, বিনিকার, বিনিগ্রহ, বিনিগ্রাহ্য, বিনিদ্র,
বিনিদ্রিত, বিনিন্দক, বিনিন্দন, বিনিপাত, বিনিবর্ত্তন, বিনিবর্ত্তিত,
বিনিবৃত্ত, বিনিবৃত্তি, বিনির্বহন, বিনিবেশ, বিনিবেশী, বিনিভাব, বিনিময়,
বিনিমেয়, বিনিয়ত, বিনিয়ম, বিনিযুক্ত, বিনিয়োগ, বিনিয়োজিত,
বিনিযোজ্য, বিনির্গত, বিনির্গম, বিনির্জ্জয়, বিনির্জ্জিত, বিনির্ণয়,
বিনির্ণীত, বিনির্ব্বন্ধ, বিনির্বৃত্ত, বিনির্ম্মাণ, বিনির্ম্মিত, বিনির্ম্মুক্ত,
বিনির্য্যাণ, বিনিশ্চয়, বিনিশ্চল, বিনিশ্চিত, বিনিষ্পাত, বিনিষ্পেষ,
বিনিষ্পেষণ, বিনিহত, বিনিহিত, বিনীত, বিনিতাত্মা, বিনীতি, বিনীবী,
বিনীয়, বিনু, বিনে, বিনেতা(তৃ), বিনেয়, বিনোক্তি, বিনোদ, বিনোদন,
বিনোদিত, বিনোদিনী, বিনোদিয়া, বিন্ধ্য, বিন্ধ্যনিলয়া, বিন্ধ্যবন,
বিন্ধ্যবাসিনী, বিন্ধ্যবাসী, বিন্ধ্যস্থ, বিন্ধ্যা, বিন্ধ্যাটবী, বিন্ধ্যাবলি(লী),
বিন্যস্ত, বিন্যাস, বিন্যাসিত, বিপক্ত্রিম, বিপক্ক, বিপক্ষ, বিপক্ষী,
বিপক্ষীয়, বিপঞ্চিকা, বিপঞ্চী, বিপণ, বিপণন, বিপণি, বিপণী,
বিপণিজীবিকা, বিপণিপথ, বিপৎ(দ্), বিপৎকাল, বিপৎপাত, বিপতি,
বিপজ্জনক, বিপত্ত, বিপত্তি, বিপত্তিকর, বিপত্তিকাল, বিপত্ত্য, বিপত্য,
বিপথ, বিপথগামী, বিপথী, বিপদ, বিপদাক্রান্ত, বিপদাপন্ন, বিপদুদ্ধরণ,
বিপদুদ্ধার, বিপদ্গ্রস্ত, বিপদ্দশা, বিপদ্বারী, বিপদ্ভঞ্জন, বিপদ্সঙ্কুল,
বিপন্থ, বিপন্ন, বিপরিণত, বিপরিণতি, বিপরিণাম, বিপরিশ্রম, বিপরীত,
বিপরীতকারী, বিপরীতকারক, বিপরীতরত, বিপরীতরতা, বিপরীতা,
বিপরীতি, বিপর্য্যয়, বিপর্য্যস্ত, বিপর্য্যায়, বিপর্য্যাস, বিপর্য্যাসোপমা,
বিপল, বিপশ্চিৎ, বিপাক, বিপাক্যা, বিপাট(ঠ), বিপাটন, বিপাটিত,
বিপাঠ, বিপাণ্ডু, বিপাতন, বিপাপ্মা, বিপাল, বিপাশা, বিপিন,
বিপিনবিহারী, বিপিনমালতী, বিপীড়, বিপুল, বিপুলা, বিপূয়, বিপ্র,
বিপ্রকর্ষ, বিপ্রকার, বিপ্রকীর্ণ, বিপ্রকৃত, বিপ্রকৃতি, বিপ্রকৃষ্ট, বিপ্রচিত্তি,
বিপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপন্ন, বিপ্রতিষিদ্ধ, বিপ্রতিষেধ, বিপ্রতি(তী)সার,
বিপ্রপাত, বিপ্রবাস, বিপ্রবাসন, বিপ্রবিন্না, বিপ্রযুক্ত, বিপ্রয়োগ, বিপ্ররায়,
বিপ্রর্ষি, বিপ্রলব্ধ, বিপ্রলব্ধা, বিপ্রলম্ভ, বিপ্রলম্ভন, বিপ্রলম্ভী, বিপ্রলয়,
বিপ্রলাপ, বিপ্রলিপ্সা, বিপ্রলুম্পক, বিপ্রসেবা, বিপ্রহাণ, বিপ্রিয়,
বিপ্রুট্(ষ্), বিপ্রেক্ষিত, বিপ্রোষিত, বিপ্লব, বিপ্লবী, বিপ্লাব, বিপ্লাবিত,
বিপ্লাবী, বিপ্লুত, বিপ্লুতি, বিপ্লুষ্ট, বিফল, বিফলতা, বিবক্ষা, বিবক্ষিত,
বিবক্ষু, বিবৎস, বিবদমান, বি(বী)বধ, বিবধিক, বিবন্ধ, বিবন্ধু, বিবর,
বিবরনালিকা, বিবরপ্রবেশ, বিবরণ, বিবর্জ্জক, বিবর্জ্জন, বিবর্জ্জনীয়,
বিবর্জ্জিত, বিবর্ণ, বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তন, বিবর্ত্তিত, বিবর্ত্তী, বিবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধী,
বিবশ, বিবশা, বিবসন, বিবস্ত্র, বিবস্বান্(স্বৎ), বিবস্বতী, বিবা, বিবাও,
বিবাগ, বিবাগিনী, বিবাদ, বিবাদপদ, বিবাদ-বিসংবাদ, বিবাদিত,
বিবাদিনী, বিবাদী, বিবাধ, বিবাধা, বিবার, বিবাস, বিবাসন, বিবাসিত,
বিবাহ, বিবাহকাম, বিবাহকৌতুক, বিবাহগৃহ, বিবাহদীক্ষা, বিবাহনীয়,
বিবাহনেপথ্য, বিবাহবিধি, বিবাহমঙ্গল, বিবাহাগ্নি, বিবাহিত, বিবাহী,
বিবাহ্য, বিবি (বিবী), বিবি-আনা (বিবিয়ানা), বিবিক্ত, বিবিক্ষু, বিবিগ্ন,
বিবিজান, বিবিৎসা, বিবিৎসু, বিবিদিষা, বিবিধ, বিবীত, বিবীতভর্ত্তা,
বিবীতস্বামী, বিবুদ্ধ, বিবুধ, বিবুধগুরু, বিবুধতটিনী, বিবুধনদী,
বিবুধনাথ, বিবুধস্ত্রী, বিবুধেশ্বর, বিবৃত, বিবৃতদ্বার, বিবৃতস্ময়ন, বিবৃতা,
বিবৃতি, বিবৃতী, বিবৃত্ত, বিবৃত্তি, বিবৃদ্ধ, বিবৃদ্ধি, বিবেক, বিবেকজ্ঞ,
বিবেকপদবী, বিবেকবান, বিবেকবিরহ, বিবেকবিশ্রান্ত, বিবেকভ্রষ্ট,
বিবেকমন্থর, বিবেকিতা, বিবেকী, বিবেচক, বিবেচন, বিবেচনা,
বিবেচনীয়, বিবেচিত, বিবেচ্য, বিবোধ, বিবোধন, বিবোধিত, বিব্বোক,
বিব্রত, বিভক্ত, বিভক্তি, বিভক্তজ, বিভঙ্গ, বিভজন, বিভজ্য, বিভঞ্জন,
বিভব, বিভবক্ষয়, বিভয়, বিভল, বিভলা, বিভা, বিভাকর, বিভাপণ
(বিবাহপণ), বিভাগ, বিভাগকল্পনা, বিভাগধর্ম্ম, বিভাগনিহ্নব,
বিভাগপত্র, বিভাগভাক্(জ্), বিভাগভাবনা, বিভাগরেখা, বিভাজক,
বিভাজন, বিভাজনীয়, বিভাজ্য, বিভাণ্ডক, বিভাত, বিভাব, বিভাবক,
বিভাবন, বিভাবনা, বিভাবনীয়, বিভাবরী, বিভাবসু, বিভাবিত,
বিভাব্য, বিভাষা, বিভাস, বিভাসা, বিভাসিত, বিভাহ, বিভিদা, বিভিন্ন,
বিভিন্নতা, বিভী, বিভীত, বিভীতক, বিভীতকী, বিভীতা, বিভীষক,
বিভীষণ, বিভীষা, বিভীষিকা, বিভু, বিভুতা, বিভুভাব, বিভুলা, বিভুঁই,
বিভূতি (কাঁঠালের ভূতি স্মর্তব্য), বিভূতিদ্বাদশী, বিভূষণ, বিভূষণা,
বিভূষিত, বিভূষিতা, বিভেদ, বিভেদক, বিভেদন, বিভেদিনী, বিভেদী,
বিভেদ্য, বিভোগ, বিভোর, বিভোল, বিভোলা, বিভ্রংশ, বিভ্রংশী,
বিভ্রম, বিভ্রমা, বিভ্রাট্(জ্), বিভ্রাট, বিভ্রান্ত, বিভ্রান্তি, বিহ্বোল,
বিমজ্জিম, বিমণ্ডিত, বিমত, বিমতি, বিমৎসর, বিমদ, বিমন, বিমনা,
বিমনস্ক, বিমনা, বিমনাঃ, বিমন্যু, বিমরিষ, বিমর্দ্দ, বিমর্দ্দক, বিমর্দ্দন,
বিমর্দ্দিত, বিমর্দ্দী, বিমর্দ্দোত্থ, বিমর্শ, বিমর্শন, বিমর্ষ, বিমর্ষিত, বিমল,
বিমলদান, বিমলমণি, বিমলা, বিমলাপ, বিমাংস, বিমাতা(তৃ), বিমান,
বিমানগৃহ, বিমানচারী, বিমাননা, বিমানিত, বিমান্য, বিমানপথ,
বিমানপ্রতিম, বিমানযান, বিমানরত্ন, বিমানশিখর, বিমানস্থায়ী, বিমার্গ,
বিমার্গণ, বিমার্গা, বিমার্গগামী, বিমার্গপ্রস্থিত, বিমিশ্র, বিমিশ্রিত, বিমুক্ত,
বিমুক্তি, বিমুখ, বিমুখিয়া, বিমুখী, বিমুগ্ধ, বিমুদ্র, বিমুষ্ট, বিমূঢ়, বিমৃশ্য,
বিমৃশ্যকারী, বিমৃষ্ট, বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ, বিমোচন, বিমোহ, বিমোহন,
বিমোহিত বিমোহিনী, বিমোহী, বিয়ঙ্গ, বিয়ড়ী, বিয়ৎ, বিয়ৎচর,
বিয়ৎগঙ্গা, বিয়ন, বিয়নি(নী), বিয়লি, বিয়া, বিয়া(হা)ই, বিয়াকুল
(বেয়াকুল), বিয়াখিত (ব্যাখ্যাত), বিয়াজ (ব্যাজ), বিযাত, বিয়াধি
(ব্যাধি), বিয়ান, বিয়ানি(নী), বিয়াপি (ব্যাপী), বিয়াপিত, বিয়ারাম
(ব্যারাম), বিয়ালা (বেয়ালা, বেহালা), বিয়াল্লিশ, বিয়াস্তা, বিযুক্ত,
বিয়ে, বিয়েন, বিয়োগ, বিয়োগমন্ত্রণা, বিয়োগযন্ত্রণা, বিয়োগসারথি,
বিয়োগিনী, বিয়োগী, বিয়োজন, বিয়োজনীয়, বিয়োজিত, বিযোড়,
বিযোনি(নী), বিরক্ত, বিরক্তা, বিরক্তি, বিরঙ, বিরঙ্গ, বিরঙ্গী (কুদরত
রঙ্গীবিরঙ্গী), বিরচ, বিরচন, বিরচনা, বিরচিত, বিরজ, বিরজস্ক,
বিরজা, বিরজাঃ, বিরঞ্চ, বিরঞ্চি (বিরিঞ্চি), বিরত, বিরতি, বিরথ,
বিরথি, বিরথিয়া, বিরথী, বিরম, বিরমণ, বিরমিত, বিরল, বিরলদ্রবা,
বিরলভক্তি, বিরশ্মি, বিরস, বিরহ, বিরহিত, বিরহিনী, বিরহী,
বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিরাগ, বিরাগী, বিরাজ, বিরাজকরণ, বিরাজবান,
বিরাজিত, বিরাট্(জ্), বিরাটজ, বিরাটজা, বিরাটপর্ব্ব, বিরাটতনয়,
বিরাটরাজ, বিরাড়, বিরাত্র, বিরাদ্ধ, বিরাদ্ধা, বিরাধ, বিরাব, বিরাবণ,
বিরাবিণী, বিরাবী, বিরাম, বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি, বিরিব্ধ, বিরুগ্ন, বিরুদ,
বিরুদিত, বিরুদ্ধ, বিরুদ্ধভোজন, বিরুদ্ধমতি, বিরুদ্ধাচরণ, বিরূক্ষণ,
বিরূঢ়, বিরূপ, বিরূপকরণ, বিরূপা, বিরূপাক্ষ, বিরূপাক্ষী, বিরেক,

বিরেচক, বিরেচন, বিরোক, বিরোচন, বিরোচিষ্ণু, বিরোজা, বিরোধ, বিরোধক, বিরোধন, বিরোধাভাস, বিরোধালঙ্কার, বিরোধিতা, বিরোধিনী, বিরোধোক্তি, বিরোপণ, বিরোম, বিরোষ, বিরোহ, বিরোহণ, বিলক্ষ, বিলক্ষণ, বিলক্ষিত, বিলগ্ন, বিলঙঘন, বিলঙিঘত, বিলঙঘী, বিলঙঘ্য, বিলজ্জ, বিলপ, বিলপন, বিলপিত, বিলম্ব, বিলম্বন, বিলম্বিত, বিলম্বী, বিলম্ভ, বিলয়, বিলয়ন, বিলয়া, বিলস, বিলসন, বিলসিত, বিলা, বিলাইল, বিলায়ল, বিলাপ, বিলাপন, বিলাপী, বিলাস, বিলাসকানন, বিলাসগৃহ, বিলাসন, বিলাসপরায়ণ, বিলাসবিপিন, বিলাসবেশ্ম, বিলাসব্যয়, বিলাসভবন, বিলাসমন্দির, বিলাসমূর্ত্তি, বিলাসলালন, বিলাসিকা, বিলাসিনী, বিলাসী, বিলিখন (বিলেখন), বিলিপ্ত, বিলীন, বিলীনপল্লব, বিলুট, বিলুণ্ঠন, বিলুণ্ঠিত, বিলুপ্ত, বিলুভিত, বিলুলিত, বিলেখ, বিলেখন, বিলেপ, বিলেপন, বিলেপনী, বিলেপ্য, বিলোক, বিলোকন, বিলোকিত, বিলোচন, বিলোটক, বিলোড়ন, বিলোড়িত, বিলোপ, বিলোপক, বিলোপন, বিলোপী, বিলোভন, বিলোম, বিলোমজ, বিলোমজাত, বিলোমবর্গ, বিলোমপাঠ, বিলোমবিধি, বিলোমা, বিলোমিত, বিলোমী, বিলোল, বিলোলন, বিলোলিত, বিলোহিত, বিলোহিতা, বিশকল, বিশকলিত, বিশকুড়লি, বিশঙ্ক, বিশঙ্কট, বিশঙ্কনী', বিশঙ্কা, বিশঙ্কী, বিশন্দন, বিশয়, বিশর, বিশল্য, বিশল্যকরণী, বিশল্যা, বিশস, বিশসন, বিশসিত, বিশস্ত, বিশস্তা, বিশাখ, বিশাখা, বিশাতন, বিশাপ, বিশাম্পতি, বিশারদ, বিশাল, বিশালকুল, বিশালসম্ভব, বিশালা, বিশালাক্ষ, বিশালাক্ষী, বিশালী, বিশালোরসী, বিশালোরস্ক, বিশিখ, বিশিখা, বিশিরস্ক, বিশিরাঃ, বিশিষ্ট, বিশিষ্টবুদ্ধি, বিশিষ্টা, বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশীর্ণ, বিশীল, বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধি, বিশুষ্ক, বিশূল, বিশৃঙ্খল, বিশৃঙ্খলা, বিশেখ, বিশেষ, বিশেষক, বিশেষগুণ, বিশেষজ্ঞ, বিশেষণ, বিশেষত, বিশেষতঃ, বিশেষবাদ, বিশেষবিধি, বিশেষবৃত্তি, বিশেষলক্ষণ, বিশেষলিঙ্গ, বিশেষশাস্ত্র, বিশেষিত, বিশেষোক্তি, বিশেষ্য, বিশোক, বিশোকা, বিশোধন, বিশোধনী, বিশোধিত, বিশোধী, বিশোধ্য, বিশোয়াস (বিশ্বাস), বিশোষ, বিশোষণ, বিশোষিত, বিশোষী, বিশ্র(শ্রা)ণন, বিশ্রবণ, বিশ্রবস্, বিশ্রবাঃ, বিশ্র(স্র)ব্ধ, বিশ্রম, বিশ্রমণ, বিশ্র(স্র)ম্ভ, বিশ্রম্ভকথা, বিশ্রম্ভকথিত, বিশ্রম্ভণ, বিশ্রম্ভবয়স্যা, বিশ্রম্ভভাষণ, বিশ্রম্ভভূমি, বিশ্রম্ভালাপ, বিশ্রম্ভী, বিশ্রাণন, বিশ্রাণিত, বিশ্রান্ত, বিশ্রান্তি, বিশ্রাব, বিশ্রাম, বিশ্রী, বিশ্রুত, বিশ্রুতি, বিশ্লথ, বিশ্লিষ্ট, বিশ্লেষ, বিশ্লেষণ, বিশ্লেষিত, বিষূচিকা, বিষূচী, বিষ্কন্ধ, বিষ্কম্ভ, বিষ্কম্ভক, বিষ্কম্ভিত, বিষ্কম্ভী, বিষ্কির, বিষ্টব্ধ, বিষ্টম্ভ, বিষ্টম্ভিত, বিষ্টম্ভী, বিষ্টর, বিষ্টরভাক্(জ্), বিষ্টরশ্রবাঃ, বিষ্ঠা, বিষ্ঠিত, বিস, বিসংজ্ঞ, বিসংবাদ, বিসংবাদী, বিসংসর্পী, বিসঙ্কট, বিসঙ্গ, বিসদৃশ, বিসন্ধি, বিসন্নাহ, বিসম্বাদ, বিসম্বাদী, বিসর, বিসরণ, বিসর্গ (বিন্দুবিসর্গ), 'বিসর্গচুম্বন, বিসর্জ্জ, বিসর্জ্জন, বিসর্জ্জনীয়, বিসর্প, বিসর্পণ, বিসর্পি, বিসর্পী, বিসার, বিসিনী, বিসূচিকা, বিসূচী, বিসূরণ, বিসূর্য্য, বিসৃজ্য, বিসৃত, বিসৃত্বর, বিসৃমর, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, বিস্কম্ভ, বিস্কুট, বিস্ত, বিস্তর, বিস্তার, বিস্তারয়িতা, বিস্তারিত, বিস্তারী, বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত, বিস্তৃতি, বিস্পষ্ট, বিস্ফার, বিস্ফারণ, বিস্ফারিত, বিস্ফাল, বিস্ফুট, বিস্ফুরণ, বিস্ফুলিঙ্গ, বিস্ফূর্জ্জথু, বিস্ফূর্জ্জন, বিস্ফূর্জ্জিত, বিস্ফোট, বিস্ফোটক, বিস্ফোটন, বিস্ময়, বিস্ময়াকুল, বিস্ময়ান্বিত, বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময়োৎফুল্ল, বিস্মর, বিস্মরণ, বিস্মরিত, বিস্মাপক, বিস্মাপণ, বিস্মাপিত, বিস্মারণ, বিস্মারিত, বিস্মিত, বিস্মিতি, বিস্মৃত, বিস্মৃতি, বিস্মের, বিস্র, বিস্রগন্ধী, বিস্রব, বিস্রব্ধ, বিস্রম্ভ, বিস্রম্ভী, বিস্রসা, বিস্রস্ত, বিস্রাবণ, বিস্রুত, বিস্রুতি, বিস্বর, বিস্বাদ, বিহগ, বিহগপতি, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, বিহঙ্গমা, বিহঙ্গমিকা, বিহঙ্গমী, বিহঙ্গিকা, বিহঙ্গিনী, বিহড়া, বিহত, বিহতি, বিহনন, বিহনি, বিহনে, বিহন্তা, বিহর, বিহরণ, বিহর্ষ, বিহস, বিহসন, বিহস্ত, বিহা, বিহাই, বিহাণ, বিহান, বিহাপিত, বিহায়ঃ, বিহায়ঃস্থলী, বিহায়স, বিহায়সা, বিহায়স্তল, বিহায়াঃ, বিহার, বিহারক্রীড়ামৃগ, বিহারগৃহ, বিহারদাসী, বিহারদেশ, বিহারভূমি, বিহারবন, বিহারবারি, বিহারশয়ন, বিহারশৈল, বিহারাজির, বিহারী, বিহি, বিহিংসন, বিহিংসা, বিহিংস্র, বিহিত, বিহিতি, বিহিদানা, বিহীন, বিহৃত, বিহেঠক, বিহ্বল, বিহ্বোল, বিহ্বন, বীকাশ, বীক্ষণ, বীক্ষণীয়, বীক্ষা, বীক্ষিত, বীক্ষিতব্য, বীক্ষিতা, বীক্ষ্য, বীচ, বীচি, বীচী, বীজ্, বীজ, বীজক, বীজকর্ত্তা, বীজকৃৎ, বীজকোশ(ষ), বীজকোশী, বীজগণিত, বীজগুপ্তি, বীজধান, বীজধান্য, বীজন, বীজিত, বীজনির্ব্বপণ, বীজপূর, বীজপূরক, বীজপুরুষ, বীজপূর্ণ, বীজপেশিকা, বীজপ্রদ, বীজপ্ররোহী, বীজবাপ, বীজবোকা, বীজমন্ত্র, বীজমাতৃকা, বীজমাত্র, বীজমালা, বীজরত্ন, বীজরুহ, বীজসঞ্চয়, বীজসূ, বীজসেক্তা, বীজাকৃত, বীজাক্ষর, বীজী, বীজোৎকৃষ্ট, বীজোপ্তি, বীট, বীটক, বীটা, বীটি, বীটিকা, বীটী, বীড়, বীড়া (দ্র. বিড়ে), বীড়ি, বীড়ী, বীত, বীতংস, বীতকল্মষ, বীততৃষ্ণ, বীতভয়, বীতভী, বীতভীতি, বীতমৎসর, বীতমল, বীতরাগ, বীতশঙ্ক, বীতশোকাভয়, বীতসূত্র, বীতস্পৃহ, বীতহোত্র, বীথি, বীথিকা, বীথী, বীথ্যঙ্গ, বীনাহ, বীপ্সা, বে, বেআইন, বেআকার, বেআকুব, বেআকুল, বেআক্কেল, বেআজ, বেআড়া, বেআদব, বেআন্দাজ, বেআপ, বেআবরু, বেআরাম (বেয়ারাম), বেআলি, বেআল্লিশ, বেই, বেইজ্জত, বেইমান, বেইল, বেউড়বাঁশ, বেউলা, বেউশ্যা (বেশ্যা), বেএক্তিয়ার, বেও, বেওজর, বেওয়া, বেওয়ারিষ(স), বেওরা (ব্যাওরা), বেং, বেঁউ(ও), বেঁউতিজাল, বেঁক, বেঁকা, বেঁকী, বেঁজি, বেঁটে, বেঁড়ে, বেঁড়েলা, বেকইর-গুয়া (বেকর-, বেখর-), বেকট, বেকত, বেকতয়ে, বেকতি, বেকতে, বেকয়েদ, বেকল, বেকলা, বেকসুর, বেকায়দা, বেকার, বেকুফ(ব), বেকেজো, বেক্ত, বেক্ষণ, বেখরচা, বেখাপ, বেগড়, বেগতি, বেগতিক, বেগত্ম্যা, বেগনা, বেগনী, বেগম (যে গম বা দুঃখ দূর করে), বেগর (বেগোর), বেগার, বেগারি(রী), বেগরী, বেগুন, বেগুনী (বেগনী), বেগোছ, বেগ্র, বেঙ, বেঙতে, বেঙনী, বেঙাচি(ছি), বেঙাপিতল (বেঙ্গাপিতল), বেঙ্কা, বেঙ্গ, বেঙ্গতড়কা, বেঙ্গমা, বেঙ্গমী, বেঙ্গী, বেচারা, বেচারি, বেচাল, বেছপ্পর, বেজ, বেজন্মা, বেজাতক, বেজায়, বেজার (ব্যাজার), বেজি, বেঝা, বেঠিক, বেডৌল, বেঢঙ, বেঢপ(ব), বেণা(না), বেতম্বির, বেতমিজ, বেতর, বেতরিবৎ, বেতস্কির, বেতাগ, বেতার, বেতাল, বেতি, বেথা, বেথি, বেথুয়া, বেদখল, বেদড়া, বেদম, বেদানা, বেদীন, বেদুয়া, বেদুয়ি(য়ী)ন, বেদ্ধব্য, বেদ্ধা, বেধ, বেধক, বেধন, বেধনিকা, বেধনী, বেধ্য, বেধড়ক, বেধাঃ, বেন, বেনাম, বেনামা, বেনামী, বেপরোয়া, বেপর্দ্দা, বেপার, বেপারী, বেপালট, বেফাঁশ, বেবন্দোবস্ত, বেবহার, বেবাক, বেবার, বেবুদ্ধিয়া, বেভার, বেভুল, বেম, বেমক্কা, বেমন, বেমা, বেমান, বেমানান, বেমারী, বেমালুম, বেয়াই, বেয়াকুল,

বেয়াক্কেল, বেয়াজ, বেয়াড়া, বেয়াদপি(বি), বেয়াধি, বেয়ান, বেয়াপ, বেয়ারা, বেয়ারাম, বেয়ালা, বেয়াল্লিশ, বেরঙ, বেরঙ্গ, বেরসিক, বেরাপত্র, বেরুণ, বেরুণিয়া, বেরুণ্যা, বেরেওয়া, বেরেশা, বেলগ (ব্যালগ), বেলেল্লা, বেল্লিক, বেসাতি, বেসুর, বেসুরো, বেহতর, বেহদ্দ, বেহাই, বেহাইন, বেহাগ, বেহাত, বেহান, বেহানী, বেহায়া, বেহার, বেহারা, বেহাল, বেহালা, বেহালাদার, বেহিসাব, বেহিসাবী, বেহিসাবে, বেহুঁশ (বেহোঁশ), বেহুদা (বেহুদ্দা), বেহেড, বৈকঙ্কত, বৈকণ্ঠ, বৈকর্ত্তন, বৈকল্পিক, বৈকল্য, বৈকারিক, বৈকাল, বৈকালিক, বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠপুরী, বৈকুণ্ঠলোক, বৈকুণ্ঠা, বৈকৃত, বৈকৃতিক, বৈকৃত্য, বৈক্লব, বৈক্লব্য, বৈখরী, বৈখানস, বৈগুণ্য, বৈচক্ষণ্য, বৈচিত্ত্য, বৈচিত্র, বৈচিত্রবীর্য্য, বৈচিত্রী, বৈচিত্র্য, বৈজয়ন্ত, বৈজয়ন্তিক, বৈজয়ন্তিকা, বৈজয়ন্তী, বৈজিক, বৈজ্ঞানিক, বৈতংসিক, বৈতরণি(ণী), বৈতান, বৈতানিক, বৈতালিক, বৈতালী, বৈতৃষ্ণ, বৈদগধ, বৈদগধি, বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধী, বৈদগ্ধ্য, বৈদর্ভ, বৈদর্ভী, বৈদল, বৈদূর্য্য, বৈদেশ, বৈদেশিক, বৈদেশী, বৈদেহ, বৈদেহক, বৈদেহিক, বৈদেহী, বৈদেহীনাথ, বৈদেহীহর, বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতাগ্নি, বৈধ, বৈধব্য, বৈধর্ম্ম্য, বৈধুর্য্য, বৈধৃত, বৈধৃতি, বৈধেয়, বৈনতেয়, বৈনয়িক, বৈনস, বৈনায়ক, বৈপরীত্য, বৈপিত্র, বৈপুল্য, বৈফল্য, বৈবক্ষিক, বৈবর্ণ্য, বৈবশ্য, বৈবস্বত, বৈবস্বতী, বৈবাহিক, বৈবোধিক, বৈভব, বৈভবশালী, বৈমনস্য, বৈমল্য, বৈমাত্র, বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়, বৈমানিক, বৈমুখ, বৈমুখী, বৈমুখ্য, বৈমূল্য, বৈয়গ্র্য, বৈয়র্থ্য, বৈয়াকরণ, বৈয়াঘ্র, বৈয়াঘ্রপদ্য, বৈয়াঘ্র্য, বৈয়াত্য, বৈয়াসকি, বৈয়াসিক, বৈরস্য, বৈরাগ, বৈরাগি, বৈরাগিনী, বৈরাগী, বৈরাগ্য, বৈরাজ, বৈরাট, বৈরাটি, বৈরূপ্য, বৈরোচন, বৈরোচনি, বৈলক্ষণ্য, বৈলক্ষ্য, বৈশদ্য, বৈশম্পায়ন, বৈশস, বৈশাখ, বৈশাখী, বৈশারদ, বৈশারদ্য, বৈশিষ্ট, বৈশিষ্ট্য, বৈশেষিক, বৈশ্রবণ, ব্যংসক, ব্যংসন, ব্যংসয়িতব্য, ব্যংসিত, ব্যক্ত, ব্যক্তগণিত, ব্যক্তদৃষ্টার্থ, ব্যক্তবাক, ব্যক্তবিক্রম, ব্যক্তরাশি, ব্যক্তরূপ, ব্যক্তলবণ, ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, ব্যক্তীকৃত, ব্যক্তীভূত, ব্যগ্র, ব্যগ্রতা, ব্যঙ্কুশ, ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গার, ব্যঙ্গিতা, ব্যঙ্গী, ব্যঙ্গ্য, ব্যজন, ব্যজনী, ব্যজনীচামর, ব্যঞ্জ, ব্যঞ্জক, ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা, ব্যতিকর, ব্যতিকরিত, ব্যতিকীর্ণ, ব্যতিক্রমণ, ব্যতিক্রান্ত, ব্যতিপাত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিরিক্ত, ব্যতিরেক, ব্যতিরেকব্যাপ্তি, ব্যতিরেকমুখ, ব্যতিলঙ্ঘী, ব্যতিষক্ত, ব্যতিষঙ্গ, ব্যতি(তী)হার, ব্যতিহাস, ব্যতীত, ব্যতীপাত, ব্যতীহার, ব্যত্যয়, ব্যত্যস্ত, ব্যত্যাস, ব্যধ্ব, ব্যন্তর, ব্যপগত, ব্যপগম, ব্যপদিষ্ট, ব্যপদেশ, ব্যপয়ান, ব্যপরোপণ, ব্যপাকৃতি, ব্যপায়, ব্যপাশ্রয়, ব্যপেক্ষ, ব্যপেক্ষক, ব্যপেক্ষা, ব্যপেত, ব্যপোঢ়, ব্যপোহ, ব্যবকলন, ব্যবচ্ছিন্ন, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবচ্ছেদক, ব্যবধা, ব্যবধান, ব্যবধায়ক, ব্যবধি, ব্যবসা, ব্যবসায়, ব্যবসায়ী, ব্যবসিত, ব্যবসিতি, ব্যবস্থা, ব্যবস্থান, ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনীয়, ব্যবস্থাপিত, ব্যবস্থিত, ব্যবস্থিতি, ব্যবহর্ত্তব্য, ব্যবহার, ব্যবহারক, ব্যবহারজ্ঞ, ব্যবহারতন্ত্র, ব্যবহারদর্শন, ব্যবহারদ্রষ্টা, ব্যবহারপদ, ব্যবহারপাদ, ব্যবহারপ্রাপ্ত, ব্যবহারবাণী, ব্যবহারবিৎ, ব্যবহারবিধি, ব্যবহারবেত্তা, ব্যবহারমণ্ডপ, ব্যবহারমার্গ, ব্যবহাররস, ব্যবহারশাস্ত্র, ব্যবহারস্থান, ব্যবহারাজীব, ব্যবহারাজীবী, ব্যবহারাযোগ্য, ব্যবহারার্থী, ব্যবহারাসন, ব্যবহারিক, ব্যবহারী, ব্যবহিত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃতি, ব্যবায়, ব্যবায়ী, ব্যবেত, ব্য(ব্যা)ভার, ব্যভিচার, ব্যভ্র, ব্যয়, ব্যয়কর, **ব্যয়কুণ্ঠ**, **ব্যয়পর**, ব্যয়ব্যসন, ব্যয়ভূষণ, ব্যয়শীল, ব্যয়শুদ্ধি, ব্যর্থ, **ব্যর্থক**, **ব্যলীক**, **ব্যশ্ব**, **ব্যষ্টি**, ব্যস, ব্যসন, ব্যসনী, ব্যসনোদয়, ব্যসু, **ব্যস্ত**, **ব্যস্তকেশ**, ব্যস্তক্ষৌর, ব্যস্তন্যাস, ব্যস্তপদ, ব্যস্তবাগীশ, ব্যস্তবৃত্তি, ব্যস্তসমস্ত, ব্যস্তানুপাত, ব্যাই, ব্যাং, ব্যাকরণ, ব্যাকলা, ব্যাকার, **ব্যাকীর্ণ**, **ব্যাকুল**, ব্যাকুলি, ব্যাকুলিত, ব্যাকোশ, ব্যাকোষ, ব্যাক্রোশ, ব্যাক্ষেপ, ব্যাখা, ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যাতা, ব্যাখ্যাত্রী, ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যানা, ব্যাখ্যেয়, ব্যাঘট্টন, ব্যাঘাত, ব্যাঘাতক, ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রকৃত্তি, ব্যাঘ্রশ্বা, ব্যাঘ্রী, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ্গ, ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমি (বেঙ্গমা, বেঙ্গমী), ব্যাজ, ব্যাজতপোধন, ব্যাজনিন্দা, ব্যাজপূর্ব্ব, ব্যাজব্যবহার, ব্যাজসুপ্ত, ব্যাজস্তুতি, ব্যাজার, ব্যাজে, ব্যাজোক্তি, ব্যাড়, ব্যাত্ত, ব্যাত্যুক্ষী, ব্যাদান, ব্যাদেশ, ব্যাধ, ব্যাধি, ব্যাধিকর, ব্যাধিঘ্ন, ব্যাধিত, ব্যাধিনিগ্রহ, ব্যাধিনী, ব্যাধিবহুল, ব্যাধূত, ব্যান, ব্যান্নন, ব্যাপ, ব্যাপক, ব্যাপৎ(দ্), ব্যাপন, ব্যাপন্ন, ব্যাপহ, ব্যাপাদ, ব্যাপাদন, ব্যাপাদনীয়, ব্যাপাদয়িতব্য, ব্যাপার, ব্যাপারণ, ব্যাপারিত, ব্যাপারী, ব্যাপিকা, ব্যাপিত, ব্যাপী, ব্যাপৃত, ব্যাপৃতি, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য, ব্যাবর্ত্ত, ব্যাবর্ত্তক, ব্যাবর্ত্তন, ব্যাবর্ত্তনা, ব্যাবহারিক, ব্যাবৃত্ত, ব্যাবৃত্তি, ব্যাভার, ব্যাভারবেণে, ব্যাম, ব্যামন, ব্যামহ, ব্যামিশ্র, ব্যামো, ব্যামোহ, ব্যায়, ব্যায়ত, ব্যায়রাম, ব্যায়রাম-শ্যায়রাম, ব্যায়াম, ব্যায়ামী, ব্যাল, ব্যালক, ব্যালগ, ব্যালগ্রাহ, ব্যালগ্রাহী, ব্যালমৃগ, ব্যালম্ব, ব্যালরূপ, ব্যালাঙ্গনা, ব্যালোল, ব্যাস, ব্যাসকাশী, ব্যাসবারাণসী, ব্যাসকূট, ব্যাসক্ত, ব্যাসঙ্গ, ব্যাসদেব, ব্যাসপূজন, ব্যাসসমাস, ব্যাসসু, ব্যাসসূত্র, ব্যাসস্মৃতি, ব্যাসাসন, ব্যাসিদ্ধ, ব্যাসেধ, ব্যাহত, ব্যাহতত্ব, ব্যাহতার্থতা, ব্যাহরণ, ব্যাহার, ব্যাহৃত, ব্যাহৃতি, ব্যুচ্ছিন্ন, ব্যুত, ব্যুতি, ব্যুৎক্রম, ব্যুত্থান, ব্যুৎপত্তি, ব্যুৎপন্ন, ব্যুৎপাদক, ব্যুৎপাদন, ব্যুদস্ত, ব্যুদাস, ব্যুপবীত, ব্যুপরত, ব্যুপরম, ব্যুপ্ত, ব্যুষিত, ব্যুষিতাশ্ব, ব্যুষ্ট, ব্যুষ্টি, ব্যূঢ়, ব্যূত, ব্যূতি, ব্যূহ, ব্যূহভঙ্গ, ব্যূহভেদ, মহাব্যাহৃতি, রাখাল-বাগাল, রাধাবিনোদ, শশব্যস্ত, সুবিধা।

বি (বিধ্) = বাহী গতিশীল যাহাতে। **বিধ** = গতিশীল বাহীকে ধারণ করে যে।

[**বি** একটি উপসর্গ। উপসর্গের যা স্বভাব — মূল শব্দের দিশানির্দেশ করে দেওয়া — **বি**-ও তাই করে। (দ্র. **প্র**)। উপসর্গের অর্থ যেমন খানিকটা অব্যক্ত থাকে, **বি**-এর অর্থও সেরকম। তাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলে অর্থটি সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং সত্য থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বলতে কী, উপসর্গের অর্থ খানিকটা অনির্দিষ্ট থাকে বলেই লোকে উপসর্গযুক্ত শব্দ ব্যবহারের সময় শব্দটির নানার্থে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারেন, নানারকম অর্থে শব্দটিকে বুঝে নিতে পারেন। তবে সে অর্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন, এমন নয়। ... এইসব কথা মনে রেখে তবেই উপসর্গের অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করতে হয়। ...

বি-এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে প্রথমে **ব** বর্ণের অর্থ দেখুন। তারপর দেখুন **দ্বি** শব্দের অর্থ (১ম খণ্ড)। এই **ব** সক্রিয় বা গতিশীল হলেই **বি** হয়ে যায়, এবং তখন তা প্রধানত 'মুখ্যের বিকল্পকরণ বা বিকল্প-হওয়ন' (alternative পথে যাওয়া বা হওয়া) অর্থটি ধারণ করে। তখন সে সক্রিয় **বাহী** বটে, তবে মুখ্যসত্তার বাহী নয়, তার বিকল্প সত্তার বাহী। **বা**-এর ক্ষেত্রে সে কেবল **ব**-এর আধার, কিন্তু

বি-এর ক্ষেত্রে তা সক্রিয়। বাংলায় অজস্র শব্দকে এই **বি** যোগ করে দিয়ে বহু বহু নতুন শব্দ সৃজন করা হয়েছে। আর, সব ক্ষেত্রেই মূল শব্দটির অর্থ স্বভাবতই বিশেষ দিশা পেয়ে গেছে। যেমন **কৃত** বললে আমরা বুঝি 'যা করা হয়েছে, সেই সত্তা'। তাতে **বি** যোগ করে দিলে হয়ে যায় **বিকৃত**। দেখা যাচ্ছে, **কৃত** শব্দটির দিশানির্দেশ করে দিয়েছে **বি** উপসর্গটি। কীরকম কৃত? না, **বি**-কৃত; বিশেষরকম কৃত। **বি** যুক্ত হওয়ার পর এই **কৃত**টি আর শুধু **কৃত** নয়, **প্রকৃত** নয়, **অপকৃত, অধিকৃত, উপকৃত, দুষ্কৃত, নিরাকৃত** ... ইত্যাদিও নয়; এ হল **বিকৃত** — অর্থাৎ যেমন ছিল, তার থেকে অন্যরকম বিশেষরকম বিকল্পরকম বিপরীতরকম ... **কৃত** বা করে ফেলা হয়েছে। তার মানে, **কৃত** শব্দটির বদল ঘটেছে মূলত 'মুখ্যের বিকল্পে'; যে 'বিকল্প' কখনো মুখ্য সত্তার বা মুখ্য ধারার 'বিকল্পমাত্র' বা alternative, কখনো মুখ্যের 'বিপরীত' বা মুখ্যের 'না-করণ', কখনো মুখ্যের থেকে 'আলাদা', 'বিশেষ', কখনো 'তীব্রতর', কখনো মুখ্যের 'ব্যাঘাত' ... ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা, **বি** = **বিকল্প** (= বিশেষ, অন্যরূপ, বিপরীত, না-করণ, বিগত, বিকৃত, ব্যাঘাত, তীব্রতরকরণ ... ইত্যাদি)।

বি উপসর্গের এই উত্তরাধিকার ফারসিতে **বে** উপসর্গে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় ফারসির আগমনের পর আমাদের সেকালের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষগণ ফারসির **বে** কথাটিকে চিনে ফেলেন। **বি** তো তাঁদের ঘরের ছেলে! সেই **বি**-ই যে বিদেশ ঘুরে আলখাল্লা পরে **বে** সেজে এসেছে, তা বুঝে নিতে তাঁদের অসুবিধা হয় না। ফলে, আমাদের মধ্যযুগের সেই জ্ঞানী পূর্বসূরিগণ নতুন করে অনেক শব্দ বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। যথা **বেকল, বেকলা, বেকসুর, বেকায়দা, বেকার** ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই **বে**-গুলির সঙ্গে প্রাচীন বাংলার (= সংস্কৃতের) কিংবা প্রচলিত বাংলার **বি**-এর বিশেষ ভেদ নেই।

আরও আছে। ফারসির মতো ইংরেজ আমাদের পড়শী নয়, সে এসেছে বহু দূর থেকে। কিন্তু তাই বলে তার হাতে এই **বি**-এর উত্তরাধিকার নাই, এমন নয়। তার হাতেও **বি**-এর উত্তরাধিকার ছিল এবং আছে। তাঁদের **be**, **become**, **be**get, **be**ing, **be**long, **be**side ... এ সবই মানবজাতির আদিপুরুষদের অর্জন করা **বি**-এর উত্তরাধিকার। এই **be**-গুলির অর্থও আমাদের **বি** ও ফারসি **বে**-র মতোই। তবে, প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের বহু ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে (দ্র. **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন**), ইংরেজির এই be-এর ক্ষেত্রেও সেরকম হয়েছে। আমাদের **বি** হল 'বিকল্প ধারায় হওয়া'; কিন্তু ইংরেজির be হল 'মুখ্য ধারায় হওয়া'। অবশ্য যেখানে সেই be উপসর্গ বা prefix রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে তার অর্থ অবিকল আমাদের **বি**-এর চরিত্র ধারণ করে রেখেছে। যেমন **be**side, **be**come, **be**long ... প্রভৃতি ক্ষেত্রে **be**-এর অর্থ 'মুখ্য ধারায় হওয়া' নয়, 'বিকল্প ধারায় হওয়া'। ...

আমাদের ধারণা, ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলির বর্ণমালা সংস্কৃতকে অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে। কিন্তু বাইরের দেশগুলির ভাষার বর্ণমালাগুলি খুব সম্ভব আরও প্রাচীন কালের মানুষের অর্জিত আদি বর্ণমালা অনুসরণ করে লিখিত হয়ে থাকে। তাই সেগুলিতে শুরুতেই রয়েছে 'এ' আর 'বি'। যথা ইংরেজির **a b**, গ্রীকের আলফা বিটা, আরবি-ফারসির আলিফ বে ... ইত্যাদি। সবগুলিতেই প্রথমটি 'অ'-বাচক, এবং দ্বিতীয়টি 'বি' বাচক; অর্থাৎ প্রথম বর্ণটি অস্তিত্বের মূল ধারাবাচক (দ্র. **অ বর্ণের অর্থ**) এবং দ্বিতীয় বর্ণটি অস্তিত্বের বিকল্প ধারাবাচক। ইংরেজি বর্ণমালা তো সরাসরি **বি** উচ্চারণই করে থাকে এবং আরবি-ফারসি উচ্চারণ করে **বে**। ...]

অব্যক্ত : **১.** বি + ✓অন্জ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** / যাহা ব্যক্ত (স্পষ্ট উচ্চারিত) নহে। (ব.শ.)। **৩.** অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট। ... ব্যক্তিহীন, অবয়বরহিত, অতিসূক্ষ্মরূপ, কারণরূপ, ... নির্গুণব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ অক্ষর, পরমাত্মা, সূক্ষ্মশরীর, সুষুপ্তাবস্থা, প্রকৃতি, (গণিতে) অজ্ঞাত, (সাংখ্যে) সর্ব্বকারণ প্রধান, মহৎ অহঙ্কার ও তন্মাত্র; (বেদান্তে) অজ্ঞান। (ব.শ.)। **৪.** untold অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** পুরাণাদিতে **অব্যক্ত** শব্দে সেই সময়কার সমাজের কথা বলা হয়েছে, যখন তখনও পর্যন্ত সমাজের আত্মোপলব্ধি (দ্র. **অংরূপিণী**) যথেষ্ট হয়নি, মানবসমাজ তখনও তার শৈশবে বিদ্যমান। সেসব কথা সমাজে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের বহু আগের কথা। তখন সমাজ নিজের কথা বলে না, বলতে পারে না, কিংবা আধো আধো বলে। সে মহেঞ্জদড়োর আগের যুগের কথা। আবার এমন বহু উপলব্ধি আছে, যা ব্যক্ত করা যায় না। সেও **অব্যক্ত**। বিশেষত **অব্যক্ত**-জ্ঞান (tacit knowledge), যার কথা একালে প্রায়শই বলা হচ্ছে। আমাদের মতে মানুষের সমাজে এখনও **অব্যক্ত**-জ্ঞানের পরিমাণ তার সমগ্র জ্ঞানের ৯৫ শতাংশ। অ্যাকাডেমিগুলিতে যে-জ্ঞানের চর্চা চলে, আমাদের অনুমান, তা মোট জ্ঞানের ৫ শতাংশ হবে কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্র. **অন্জ্**, **ব্যক্ত** (১ম খণ্ড)।

বিকর্ণ : **২.** *বিপরীত* **কর্ণ** *আছে যার।* **৩.** ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, কর্ণপুত্র। (ব.শ.)। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শত পুত্রের অন্যতম। ... ইনি রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদ করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** মহাভারতের **কর্ণ** ছিলেন কৌরব সমর্থক; **বিকর্ণ** কিন্তু কৌরব বিরোধী। কারণ তিনি রাষ্ট্রের বা ধৃতরাষ্ট্রের প্রচারের বিরোধী কথাও শুনতে পেতেন। একালেও কিন্তু **বিকর্ণ** সত্তা আছে। সরকারের দলে থেকেও তাঁরা সরকারি প্রচারের বিপরীত কথাগুলি শোনেন, এবং সরকার-বিরোধী চিন্তার পক্ষে কথাও বলেন। এঁরাই **বিকর্ণ**।

বিকর্ত্তন (বৈকর্ত্তন) : **২.** ***বিকর্ত্তন*** *= যাহাকে বিশেষভাবে কর্তন করা হইয়াছে।* ***বৈকর্ত্তন*** *=* ***বিকর্ত্তন*** *হইতে জাত। /* **বিকর্ত্তন** = বিশিষ্ট কর্ত্তন যাঁহার; বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত দেহ (যাঁহার)। **বৈকর্ত্তন** = বিকর্ত্তনের পুত্র (যিনি)। (ব.শ.)। **৩. বিকর্ত্তন** = বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাসের মানসে খণ্ড খণ্ড করে সূর্যকে কর্তন করার পর সূর্যপত্নী সংজ্ঞা তাঁর তেজ সহ্য করতে সমর্থ হন। সেই জন্য সূর্যের এক নাম বিকর্তন। (পৌ.অ.)। **বৈকর্ত্তন** : কর্ণের অন্য নাম। ... নিজের শরীর হতে কবচ ও কুণ্ডল বিকর্তন করে ইন্দ্রকে দান করেছিলেন বলে এঁর নাম বৈকর্তন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যে সত্তা আদিম

যৌথসমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্র রূপে সক্রিয় ছিলেন যে পরিচালকগণ, একসময় তাঁদের কার্য্যাবলীকে ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে, তাঁদের নাম হয়ে যায় **বিকর্ত্তন**। সেই **বিকর্ত্তনের** পুত্র বলে **কর্ণ**কে **বৈকর্ত্তন** বলা হত। দ্র. **কর্ণ**।

বিকল : ২. *কল-এর বিপরীত; অর্থাৎ যাহা আর কলন করে না।* / বিগত কলা যাহা হইতে। (ব.শ.)।

বিকল্প : ২. *কল্প-এর পাশে অন্যতর যে কল্প চলে।*

বিকার (বৈকারিক) : ২. *যাহাতে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **কার** অন্যতর **কারে** পরিণত হইয়াছে। **বৈকারিক** = **বিকার**-জাত গতিশীল কৃত যাহাতে।* / **বিকার** = প্রকৃতির অন্যরূপ পরিণাম বা অবস্থান্তর (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **বৈকারিক** = বিকারসম্বন্ধী, বিকৃতিজাত, সাত্ত্বিক, বিকারভাব। (ব.শ.)। ৪. deviation from normal state অর্থে **বিকার** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত থাকলেও **বৈকারিক** অপ্রচলিত। ৫. **বৈকারিক-সৃষ্টি** শব্দটি পাওয়া যায় পুরাণাদিতে, বিশেষত 'মনুসংহিতা'র **জগৎসৃষ্টি** অধ্যায়ে। সেখানে সমগ্র **জগৎসৃষ্টি**কে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে — **অবুদ্ধিপূর্ব্বক** সৃষ্টি (প্রাকৃত সৃষ্টি) ও **বুদ্ধিপূর্ব্বক** সৃষ্টি (বৈকৃত সৃষ্টি)। তার মানে, **দক্ষযজ্ঞের** আগে পর্যন্ত মানুষের সমাজে যা কিছু স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, তা সবই 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি'; এবং **দক্ষযজ্ঞের** পরে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি সবই 'বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি'। এই 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি'কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে — মহান সৃষ্টি, তন্মাত্র সৃষ্টি, ও **বৈকারিক** সৃষ্টি। এই **বৈকারিক** সৃষ্টিতে যারা জন্মলাভ করে তাদের বলা হয় (সমাজের) **ইন্দ্রিয়**। তার মানে, সমাজপরিচালকের **ইন্দ্রিয়** রূপে যারা কাজ করত, একালের ভাষায় যাদের সরকারি কর্মচারী বলে তাদের আদিতম ভ্রূণরূপ মানুষদেরই বলা হত **বৈকারিক** সৃষ্টি। তথ্যানুসারে মানুষের সমাজে এদের আবির্ভাবের পরই 'বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি'র বা 'বৈকৃত সৃষ্টি'র যুগের সূত্রপাত হয়। এই 'বৈকৃত সৃষ্টি'র যুগকে একালের ভাষায় 'সভ্যযুগ' বলা হয়ে থাকে।

বিকাল (বৈকাল, বৈকালিক, সকাল) : ২. *(দরকারী) **কাল**-এর বিপরীত যে **কাল**।* / বিরুদ্ধ কাল (যে)। (ব.শ.)। ৩. দৈবপৈত্রাদি কর্ম্মের বিরুদ্ধ কাল, দিনান্ত, সায়াহ্ন, রাক্ষসীবেলা, স্পষ্টদর্শন-অযোগ্য কাল। (ব.শ.)। ৪. afternoon অর্থে প্রচলিত। ৫. 'কাজকর্ম্মের কাল অতিক্রান্ত যাহা হইতে' — এই অর্থে **বিকাল** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল বলেই মনে হয়। অন্তত ৩.-এ ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলি আমাদের সেকথা ভাবতেই প্ররোচিত করে। যখন আর কোনো কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যায় না ('স্পষ্টদর্শন-অযোগ্যকাল'), অন্ধকার নেমে এসেছে, যা কিনা 'দিনান্ত'কাল বা সায়াহ্ন, সেই 'রাক্ষসীবেলা' বা **সন্ধ্যা**-পূর্ব সময়-কালকে বোঝাতেই **বিকাল** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল। তার মানে, যে কালে কাজকর্মের কাল আর নেই, সে হল **বিকাল** এবং যে কাল কাজকর্মের সময় দ্বারা পূর্ণ, সে হল **সকাল**। আর **সন্ধ্যা** হল, যার একদিকে রয়েছে দিবসের বারো ঘণ্টা এবং অপরদিকে রয়েছে **রজনীর** বারো ঘণ্টা, মাঝে **সন্ধিকাল** হিসেবে রয়েছে **সন্ধ্যা**। ইংরেজিতে এই ধারণাকেই ধরে রেখেছে even-ing শব্দটি, যে একটা আলোকময় বারো ঘণ্টা পেরিয়ে সম-পরিমাণ অন্ধকার বারো ঘণ্টার দিকে হাঁটা দিয়েছে। তবে কিনা এই **সন্ধ্যা** বা evening শব্দের ভিতরে মানুষের কাজকর্মের সময়ের কথা বলা নেই; **সকাল** ও **বিকাল** শব্দের ভিতরে যা রয়েছে।

বর্তমানে কিন্তু **বিকাল** শব্দটির সাহায্যে দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত পুরো সময়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। এবং তার সঙ্গে 'কাজের সময়' ধারণার কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে **বিকাল** শব্দের ভিতরে যে নঞর্থক অর্থটি ঢোকানো ছিল, তা প্রায় মুছে গেছে। অথচ, **বিকাল** মানে ছিল, যার থেকে দরকারি সময় বা কাজের সময়কাল বিগত হয়েছে বা চলে গেছে। কিন্তু আমাদের বহুকাল ক্রমাগত ধারণানুসারে ক্রিয়া থাকলেই তার কাল থাকবে — এটাই নিয়ম। এখানে দেখা যাচ্ছে, ক্রিয়া নেই কিন্তু কাল আছে। তাই সে **বিকাল**। কিন্তু এ কেমন কাল যার ক্রিয়া নেই কিন্তু কাল আছে? এমন কর্মহীন কালকে আমাদের পূর্বসূরিগণ নাম দিয়েছিলেন **রাক্ষসীবেলা**। কারণ আমাদের জীবনের যে সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত সময়কাল, খাদ্যগ্রহণ, কর্মাচরণ, ও নিদ্রায় যা ব্যয় হয়ে থাকে, সেই সময়কালকে এই **বিকাল** কর্ম করতে না দিয়ে, খাদ্যগ্রহণাদি ও নিদ্রার জন্য ব্যয় করতে না দিয়ে, একেবারেই অকারণে খরচ করিয়ে দেয়। তাই একে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **রাক্ষসীবেলা**। ...

শহুরে ও অ্যাকাডেমি শিক্ষিত বাংলাভাষীরা **বৈকাল** শব্দটির ব্যবহার করেন না, করেন গ্রামবাংলার মানুষেরা। অবশ্য লেখালেখিতে **বৈকালিক** শব্দের ব্যবহার কেউ কেউ এখনও করে থাকেন।

বিকুণ্ঠ (বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠপুরী, বৈকুণ্ঠলোক) : ১. বি + ✓কুণ্ঠ্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিকুণ্ঠ*** *= যার **কুণ্ঠা** যাহার বা যার লাজলজ্জা চলে গেছে। **বৈকুণ্ঠ** = **বিকুণ্ঠ** হইতে জাত। **বৈকুণ্ঠনাথ** = যিনি **বৈকুণ্ঠের নাথ**। **বৈকুণ্ঠপুরী** = **বৈকুণ্ঠের** পুরী। **বৈকুণ্ঠলোক** = **বৈকুণ্ঠের লোক**।* / **বিকুণ্ঠ** = বিগত কুণ্ঠা যাহার। **বৈকুণ্ঠ** = বিকুণ্ঠার (বা বিবিধমায়ার) অপত্য (যে)। (ব.শ.)। ৩. **বিকুণ্ঠ** = বিশেষ প্রতিহত, কুণ্ঠিতধার, ভোঁতা, বিষ্ণু, বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ। **বৈকুণ্ঠ** = বিবিধমায়াযুক্ত, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ইন্দ্র। (ব.শ.)। বৈকুণ্ঠপুরী। বিষ্ণুর এক নাম। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুসারে, 'আমি কুণ্ঠিত না হইয়া জলের সহিত পৃথিবীর, বায়ুর সহিত আকাশের এবং তেজের সহিত বায়ুর মিলন করিয়াছি বলিয়া পাণ্ডবেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করেন।' শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে, পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু শুক্রের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বৈকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সঙ্গে আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। (পৌ.অ.)। **বৈকুণ্ঠনাথ** = কৃষ্ণ। **বৈকুণ্ঠপুরী, বৈকুণ্ঠলোক** = বিষ্ণুপুরী। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কুণ্ঠ**। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম বাক্যটি এরকম — 'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।' **বৈকুণ্ঠপুর** নামে বহু গ্রাম আছে আমাদের বঙ্গদেশে। মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির অর্থ সবাই জানতেন। কিন্তু এখন আমরা

শব্দটির অর্থ তো জানিই না, ব্যবহারও করি না।

আসলে 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তা হল এই **বৈকুণ্ঠ**। একালের ভাষায় একে 'সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্র' বলে। বিশেষত যে জনসাধারণের অর্থে এই কেন্দ্র চলে, সেই জনসাধারণের উপর অত্যাচার করতে এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের লাজলজ্জা বা **কুণ্ঠা** থাকে না বলেই তাদের বলে **বিকুণ্ঠ**। আর, সেই **বিকুণ্ঠ**দের নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে থাকে বলে তার অপত্যস্বরূপ এই কেন্দ্রকে **বৈকুণ্ঠ** বলে। এখানেই থাকেন সামাজিক ক্ষমতা ও ধনসম্পদের শ্রেষ্ঠ অধিকারীগণ। বাহ্য চোখে এই কেন্দ্র দেখা যায় না। সেকালের শব্দবিদগণ এই কেন্দ্রকেই **বৈকুণ্ঠ** নাম দিয়েছিলেন। এই **বৈকুণ্ঠের নাথ**কে বলে **বৈকুণ্ঠনাথ**, তার **পুরী**কে বলে **বৈকুণ্ঠপুরী**, এবং তাদের সমগ্র **লোক**টিকে বলে **বৈকুণ্ঠলোক**।

বিক্রম : ২. *ক্রমকে তীব্রতর করে যে।* / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. গতি, বর্ণনক্রম, স্থিতি, চরণ, পরাক্রম, বিষ্ণু, পাদন্যাসস্থান, বিক্রমাদিত্য, ত্রিবিক্রম বামন, রতিশক্তি। (ব.শ.)। ৪. strength অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ক্রম**।

বিক্রয় : ২. *বিপরীত পক্ষের* ***ক্রয়*** *থাকে যাহাতে; অথবা,* ***ক্রয়****-এর বিপরীত ক্রিয়া থাকে যাহাতে।*

বিক্রিয়া : ২. *বিকল্প বা অন্যরকম ক্রিয়া থাকে যাহাতে।*

বিগ্রহ (অধিগ্রহণ, আগ্রহ, উপগ্রহ, নিগ্রহ, পরিগ্রহ, সংগ্রহ) : ২. ***বিগ্রহ*** = *বিকল্প বা অন্যরকমভাবে গ্রহণ করে যে।* / **বিগ্রহ** = দুঃখাদি গ্রহণের আধার যে ('দুঃখাদিগ্রহণাধার')। (ব.শ.)। ৩. **বিগ্রহ** = পৃথক গ্রহণ, বিভাগ, বিরোধ, ভেদ, শরীর, অবয়ব, শক্রনিগ্রহোপায়, যুদ্ধ, বিবাদ, প্রণয়কলহ ... ইত্যাদি। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. উপর থেকে দখল করা থাকে **অধিগ্রহণে**, গ্রহণেচ্ছা থাকে **আগ্রহে**, গ্রহণের **উপ** থাকে **উপগ্রহে**, গ্রহণ না করে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া থাকে **নিগ্রহে**, সার্বিকভাবে গ্রহণ থাকে **পরিগ্রহে**, আর, সম্যকরূপে গ্রহণ থাকে **সংগ্রহে**। কিন্তু বিকল্প, বিশেষ, বিপরীত গ্রহণ থাকে **বিগ্রহে**। এই **বিগ্রহ**কে সহজে চেনা যায় যুদ্ধ-**বিগ্রহে**। স্বভাবতই তা যখন দেবতার **বিগ্রহ** হয়ে যায়, তখন তিনিও বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। তা সে দুঃখাদি গ্রহণ হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে। তাই **বিগ্রহ**।

বিঘ্ন : ২. *বিশেষরকম ব্যাঘাত থাকে যাহাতে।* / যে স্থানে বিহনন করা হয়। ('বিহননস্থান')। (ব.শ.)।

বিচার : ২. *বিশেষ প্রকার চারণা (মানসিক পদচারণা) থাকে যাহাতে।* দ্র. **অনুভব**।

বিচিত্র : ২. *বিকল্প বা অন্যরকম চিত্র থাকে যাহাতে।* দ্র. **চিত্র**।

বিচিত্রবীর্য্য : ২. *বিচিত্র বীর্য্য যাহার।* ৩. ইঁহার পিতা শান্তনু, মাতা সত্যবতী, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্ম। ক্ষয়রোগে ইঁহার মৃত্যু হইলে, **বাসুদেব** সত্যবতীর আদেশে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার **গর্ভে পাণ্ডু** — এই পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন। (ব.শ.)। ... চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর স্ত্রী ... সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র হয় — চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকে বিবাহ দেবার উদ্দেশ্যে ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা, ও অম্বালিকাকে স্বয়ংবর সভা হতে হরণ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন জেনে ভীষ্ম তাঁকে মুক্তি দেন। এবং অন্য দুই কন্যার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য এই দুই স্ত্রী লাভ করে অতিরিক্ত মাত্রায় কামাসক্ত হন এবং সাত বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মহাভারত অনুসারে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা যে বংশের মাধ্যমে বাহিত হচ্ছে, তার প্রধান ধারাটির বিশেষত্ব এখানে বর্ণিত হয়েছে। **আমিষগন্ধী** বা **মৎস্যগন্ধা** সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ হলেও তাঁদের দুই পুত্রই **চিত্র**-সম্বন্ধী — বি**চিত্রবীর্য্য** ও **চিত্রাঙ্গদ**। কোনো সত্তার **বীর্য্য** যদি বিচিত্র হয়ে যায়, তার ক্ষয়রোগ হয় কি না, কেন হয় এবং তার সন্তান জন্মায় না কেন — এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের হাতে নেই। কিন্তু তথ্য বলছে যে, সন্তানহীন **চিত্রাঙ্গদ** যুদ্ধে নিহত হয় এবং **বিচিত্রবীর্য্য** নিঃসন্তান অবস্থাতেই মারা যান। ফলে বংশধারাটি লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তার বিলুপ্তি ঠেকানোর কী উপায় **পরাশর**-পুত্র **ব্যাস** ও **মৎস্যগন্ধা** সত্যবতী করেছিলেন, সে অন্য প্রসঙ্গ। এখানে যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, **বিচিত্রবীর্য্য বীর্য্য**বান হওয়া সত্ত্বেও তার সন্তান হয় না, কারণ তা **বিচিত্র** হয়ে গিয়েছিল। দ্র. **চিত্র**।

বিচ্ছেদ : ২. *অন্যতর ছেদন থাকে যাহাতে। দ্র.* ***বি****-এর অর্থ।*

বিচ্যুতি : ২. *অন্যতর চ্যুতি থাকে যাহাতে। দ্র.* ***বি****-এর অর্থ।*

বিছান (বিছানা) : ২. ***বিছান*** = *যাহার দ্বারা বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে ছাদন (আচ্ছাদন) করা হয়।* ***বিছানা*** = ***বিছান****-র আধার যে।* ৫. কোনো একটি স্থান যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে, তার বিপরীত দিক থেকে কোনো কিছু এসে যদি সেই স্থানকে ঢেকে ফেলে, তবেই সেই আচ্ছাদন-কর্মকে **বিছান** (বিছানো) বলে। সেকারণেই মেঝের বা খাটের উপর উলটো দিক থেকে (মেঝে বা খাট যেদিকে মুখ করে রয়েছে, সেদিক থেকে) **বিছান** কাঁথা-ইত্যাদিকে **বিছানা** বলে।

বিজন : ২. *বিগত হইয়াছে জন-এর অস্তিত্ব যাহা হইতে।* / 'বিগতজন'। (ব.শ.)। ৫. কিছুদিন আগেও বাংলাভাষীগণ প্রিয় সন্তানের নাম রাখতেন 'বিজনবিহারী'; অর্থাৎ 'শূন্যবিহারী' বা 'আকাশবিহারী'। এখন **বিজন**কে বলা হয় 'নির্জন', 'জনহীন' ... ইত্যাদি, কিন্তু **বিজন** বলা হয় না। কবি বারীন ঘোষাল অবশ্য **বিজন** শব্দটিকে একালের কবিদের **অপ্রতীকী** ভাষায় (দ্র. **প্রতীকী**) নানার্থে ব্যবহার করেছেন।

বিজল্প : দ্র. **চিত্রজল্প**। (১ম খণ্ড)।

বিজ্ঞ (প্রজ্ঞ, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী) : ১. বি + ✓জ্ঞা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বি*** *(বিকল্প, বিশেষ, বিপরীত) জ্ঞান*

ধারণ করেন যিনি। **৪.** experienced অর্থে **বিজ্ঞ**, science অর্থে **বিজ্ঞান**, এবং scientist অর্থে **বিজ্ঞানী** প্রচলিত। আর wise অর্থে **প্রজ্ঞ**, wisdom অর্থে **প্রজ্ঞা** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** জ্ঞান বা knowledge সম্পর্কে বাংলাভাষায় যত শব্দ রয়েছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শব্দ হল **প্রজ্ঞা**। সেই সুবাদে **অজ্ঞ** শব্দের বিপরীত শব্দ হতে পারে **প্রজ্ঞ**। কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় **প্র** উপসর্গের অর্থ থেকে। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আমরা **প্রজ্ঞ, প্রজ্ঞা** ... প্রভৃতি শব্দের আলোচনা করেছি। সেখানে **প্র** উপসর্গের এই সর্বোচ্চ অর্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

কার্যত, জ্ঞানের যে বিশেষ, বিকল্প, বিপরীত রূপ, সেই রূপটিকেই **বিজ্ঞান** বলে। তদ্রূপ জ্ঞানের জ্ঞানীকে **বিজ্ঞ** বা **বিজ্ঞানী** বলা হয়। এইরূপ **বিজ্ঞ**কে বিশেষজ্ঞও বলা যায়। তবে কিনা, এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের অর্জন ক্রমান্বয়ে একই দিকে চলে বলেই তা সেই জ্ঞানের জ্ঞানী-**বিজ্ঞ**কে একসময় 'একঝোঁকা' করে দেয়। তাই, **অজ্ঞ**-এর চেয়ে **বিজ্ঞ** যথেষ্ট জ্ঞানবান হলেও, কখনো কখনো তাঁর সেই **বিজ্ঞতা** তাঁকে **অজ্ঞে**র চেয়েও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে দিতে পারে। কেননা, বিশেষ জ্ঞানের বা বিকল্প জ্ঞানের জ্ঞানী হওয়ার কারণে **বিজ্ঞ** মানুষ অনেক সময় অপজ্ঞানীর মতো আচরণ করে ফেলেন। যাঁরা ভারতের ভূপাল গ্যাসকাণ্ডের মূলে ছিলেন, তাঁরা কি কম **বিজ্ঞ** ছিলেন? সে তুলনায় অভি**জ্ঞ** মানুষ তবুও ভাল। কেননা, তেমন মানুষ অনির্দিষ্ট জ্ঞানের আধার। **বিজ্ঞে**র তুলনায় তিনি হয়তো কম জানেন, কিন্তু তাঁর 'একটেরে' হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে যিনি কখনোই 'একটেরে' হন না, কিন্তু যাঁর হাতে মূলধারার জ্ঞানের পাশাপাশি বিশেষ জ্ঞানও কমবেশি থাকে, তাঁকে বলে **প্রাজ্ঞ**। তিনি **প্রজ্ঞা**র থেকে জাত। এরূপ মানুষকে **প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞ**, স্থিত**প্রজ্ঞ** কিংবা **প্রজ্ঞানা** মানুষই বলা যায়। **প্রকৃষ্ট** জ্ঞানের আধারকে **প্রজ্ঞা**, তদ্রূপ জ্ঞানের জ্ঞানীকে **প্রজ্ঞান** বলা যায়। তবে কিনা, যেহেতু **প্রজ্ঞা** একপ্রকার সার্বিক ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের চলমান আধার, এই **প্রজ্ঞা** কাউকে প্রদান করা যায় না। দিতে হলে, সেরূপ জ্ঞানের জ্ঞানীকে আপন চলমানতা সাময়িকভাবে থামিয়ে 'স্থিত**প্রজ্ঞ**' হতে হয়। তখনই তিনি **প্রাজ্ঞ**। তখন যা তিনি দান করেন, তা একধরনের পূর্ণ ও স্থির জ্ঞান। এই জ্ঞানই আমরা পেয়েছি বুদ্ধ, সক্রেটিস, রবীন্দ্রনাথ ... প্রমুখ মনীষীদের কাছে। কালক্রমে সেই জ্ঞান নব নব অর্জনে আরও সমৃদ্ধ হয়, হয়েছে। **প্রজ্ঞা** এভাবেই তার চলমানতা রক্ষা করে নিয়ত সমৃদ্ধ হতে থাকে। স্থিত**প্রজ্ঞ**-প্রদত্ত জ্ঞানকে পুনরায় সমৃদ্ধ হতে না দিয়ে সেই স্থানে থামিয়ে রেখে দিলে, সেই জ্ঞানও মৌলবাদী হয়ে দুষ্ট হয়ে যায়।

বিজ্ঞপ্তি (প্রজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন) : **২.** ***বিজ্ঞপ্তি*** = ***বি*** *(বিশেষ, বিকল্প, বিপরীত) জ্ঞাপন তারিত হয় যাহাতে।* ***প্রজ্ঞপ্তি*** = ***প্র*** *(প্রকৃত, প্রকৃষ্ট) জ্ঞাপন তারিত হয় যাহাতে।* ***বিজ্ঞাপন*** = ***বি*** *(বিশেষ, বিকল্প, বিপরীত) জ্ঞাপন থাকে যাহাতে।* **৩. বিজ্ঞপ্তি** = বিজ্ঞাপন, নিবেদন। **বিজ্ঞাপন** = বিজ্ঞপ্তি, নিবেদন, সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত বিষয়বিশেষের লিখিত বা মুদ্রিত পরিচয়পত্র (advertisement, notice)। **প্রজ্ঞপ্তি** = জ্ঞাপন, নিবেদন, সঙ্কেত, বুদ্ধি। (ব.শ.)। **৪. বিজ্ঞপ্তি** notice অর্থে এবং **বিজ্ঞাপন** advertisement অর্থে প্রচলিত; **প্রজ্ঞপ্তি** অপ্রচলিত। **৫. বিজ্ঞপ্তি** যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তাদের বিশেষ, **বিকল্প**, বা বিপরীত দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। সে তুলনায় **প্রজ্ঞপ্তি** ভাল, কেননা সে প্রকৃত বিষয়টি জ্ঞাপন করে। একই কথা **বিজ্ঞাপন** সম্পর্কেও বলা যায়। **বিজ্ঞাপন** শব্দটিই বলে দেয়, সে মানুষকে বিশেষ দিকে চালনা করে থাকে। স্বভাবতই তার ফলে মানুষ দিশাগ্রস্ত হয়ে একসময় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর টের পায় যে, সে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মূল ধারার থেকে বহু দূরে সরে যাওয়ার কারণেই তার ঐ দুর্দশা হয়েছে। তবে অনেক সময় এই ব্যাপারটি বুঝতে দু-তিন পুরুষ লেগে যায়।

বিতনু (অতনু) : **২.** ***বিতনু*** = *বিগত* ***তনু*** *যাহার।* **অতনু** = **তনু** *নেই যাহার।* **৪.** বাংলাভাষী ছেলেদের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কন্দর্প, কামদেব**। এই সত্তার **তনু** ভস্ম করে দিয়েছিলেন মহাদেব। তাই এঁকে **অতনু** বা **বিতনু**ও বলা হয়। প্রাচীনকালের সেই **মদনভস্ম**-এর কাহিনী থেকে আমাদের দেশে **কাম** আছে, কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু তার শরীর নেই। কোনো মানুষ বা মানুষের গোষ্ঠী নিজেদের 'কামুক' বলে না। তাছাড়া, যার দেহ বিগত, সেই তো **বিদেহ, বিতনু, অতনু**। দ্র. **বিদেহ**।

বিতরণ (বৈতরণী) : **২.** ***বি*** *(বিশেষ, বিপরীত)* ***তরণ*** *থাকে যাহাতে।* ***বৈতরণী*** = ***বিতরণ*** *হইতে জাত।* / **বৈতরণী** = যিনি বিতরণের সহিত সম্বন্ধিনী; গোদান করিলে যাহাতে তরণ করা যায় ('গোদান-তরণীয়া')। (ব.শ.)। **৩.** নরকস্থা নদী (ইহা যমদ্বারে প্রবাহিতা। কলিঙ্গ দেশীয় নদীভেদ। (ব.শ.)। নরকে প্রবেশ করার পূর্বে এই নদী অতিক্রম করতে হয়। এই নদী দুর্গন্ধপূর্ণ, রুধিরবহা, উষ্ণতোয়া ও মহাবেগা। (পৌ.অ.)। **৪.** distribution অর্থে **বিতরণ** প্রচলিত এবং এক কাল্পনিক নদী অর্থে **বৈতরণী** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **প্রেত, প্রেতনদী**।

বিথারী (বিথর, বিথান, বিথার, বিথারিত, বিথারিল) : **৫.** এই শব্দগুলি সৃষ্টি করেছিলেন মধ্যযুগের বাংলাভাষী মানুষেরা এবং এগুলির **বিথর** (= বিস্তর) ব্যবহারও করতেন তাঁরা। মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে কুসুমের মতো সেই শব্দগুলি ইতস্তত **বিথান** (= বিস্থান) হয়ে রয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলা অ্যাকাডেমি সেগুলিকে বিশেষ কোনো গুরুত্বই দেয়নি, তা সে শব্দগুলি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে কিংবা গ্রামবাংলায় যতই **বিথারিত** (= বিস্তারিত) হয়ে থাকুক। ফলে, শব্দগুলি এক এক করে বিস্মৃতিলোকে হারিয়ে গেছে। থেকে গেছে শুধু **বিথারী** (= বিস্তারী), ২৪ পরগণার বাংলাদেশ সীমান্ত-ঘেঁষা একটি গ্রামের নামরূপে।

বিদর্ভ : দ্র. **দর্ভ**। (১ম খণ্ড)।

বিদেহ (বিদেহজা, বিদেহনগরী, বিদেহপতি, বিদেহরাজ, বৈদেহ, বৈদেহক, বৈদেহিক, বৈদেহী, বৈদেহীনাথ, বৈদেহীহর) : **২.** ***বিদেহ*** = ***বি*** *(বিশেষ, বিগত, অন্যতর) দেহ যাহার।* ***বিদেহজা*** = ***বিদেহ*** *হইতে জাতা (যে)।* ***বৈদেহ*** = ***বিদেহ*** *হইতে জাত।* ***বৈদেহক***

= *বৈদেহ করে যে; অর্থাৎ, (মানবদেহের) উদ্বৃত্তে জন্ম যাহার।* **বৈদেহিক** = *বৈদেহ গতিশীল কৃত যাহাতে।* **বৈদেহী** = *বৈদেহ-র গতিশীল আধার যে।* **বৈদেহীহর** = *বৈদেহীকে হরণ করে যে।* / বিগত দেহ যাঁহার ('বিগতদেহ')। **বৈদেহক** = উপচয়ে ভব। (ব.শ.)। ৩. **বিদেহ** = দেহসম্বন্ধশূন্য, মৃত, বিকৃতদেহ, দেহরহিত, মিথিলাদেশ, ত্রিহুত, বিদেহবাসীগণ, বিদেহরাজগণ, বিদেহরাজ জনক। **বিদেহজা** = সীতা। **বিদেহনগরী** = বিদেহরাজধানী মিথিলা। **বিদেহপতি, বিদেহরাজ** = জনকাদি। **বৈদেহ** = বিদেহদেশসম্বন্ধী, বিদেহবাসী, বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত জাতিবিশেষ। **বৈদেহক** = বৈদেহ, মতান্তরে শূদ্রা হইতে জাত বৈশ্যাসুত, অন্তঃপুররক্ষণ ইহাদের বৃত্তি; বণিক। **বৈদেহিক** = মৃত। **বৈদেহী** = বিদেহভবা, বিদেহাপত্যা-স্ত্রী, সীতা, রোচনা, পিপ্পলী, বণিকপত্নী, বৈদেহজাতি-স্ত্রী। **বৈদেহীনাথ** = সীতাপতি, রামচন্দ্র। **বৈদেহীহর** = সীতাহারক, রাবণ। (ব.শ.)। **বৈদেহ** = ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি বশিষ্ঠের শাপে দেহত্যাগ করলে ঋষিরা পুত্রের জন্য তাঁর দেহ মন্থন করেন। মথিত দেহ হতে একটি কুমার জন্মগ্রহণ করে। মৃতদেহ হতে জন্ম বলে তাঁর নাম হয় জনক। ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলে এঁর নাম বৈদেহ। এবং মন্থন দ্বারা জন্ম হয় বলে এঁর আর এক নাম মিথি। (পৌ.অ.)। ৪. সমস্ত শব্দগুলিই এখন অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **জনক, নিমি, পৃথু, বেণ, বিনিময়**। মনে মনে আজ থেকে ৩০০০ বছর পিছনে চলে যান। ভাবুন, ছিল কাদামাটি, মানুষের হাতের যাদুবিদ্যায় সেই মাটি পরিণত হয়ে গেছে সুন্দর কলসিতে। দেখে সবাই খুশি। অতএব নানা রকমের কলসি বানিয়ে সরোবর থেকে পানীয় আনা যাচ্ছে; আর আগের মতো পুকুরে নেমে জলপান করতে হচ্ছে না। তো, এই পর্যন্ত বেশ আনন্দের ব্যাপার ছিলই।

কিন্তু তার পরে বিস্ময়ের ব্যাপার দেখা দিল। লোকে অনেক কলসি বানিয়ে ফেলেছে, আর সেগুলি নিয়ে কী করবে না-করবে তাই নিয়ে যখন ভাবছে, এমন সময় দেখা গেল কিছু লোক এসে বলছে — তোমাদের এই কলসিগুলি তো তোমাদের প্রয়োজন ছাপিয়ে **উপচে গেছে**; আমাদেরও এরকম হয়েছে ধান-চালের ক্ষেত্রে, বেশি হয়ে গেছে অনেক। তো, তোমরা তোমাদের উপচে-যাওয়া কলসিগুলি আমাদের দাও, আমরা আমাদের উদ্বৃত্ত ধানচাল তোমাদের দিচ্ছি! বাহ! এ তো খুবই ভাল কথা। **পাপ** বিদায় হবে। **পুণ্য** অর্জন হবে। এই বলে ধানচাল ও কলসির লেনদেন হয়ে গেল।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যত্র — এই ঘটনাকে কী বলা হবে? তখনও মানুষের সমাজে **পণ্য** উৎপাদিত হয়নি, হাটবাজার, বিক্রিবাটা, লেনদেন, টাকাপয়সা ... এসব কী জিনিস মানুষ জানেই না। তাছাড়া, এই যে কিছু মানুষ তাদের শ্রম, মেধা, জীবনসময় খরচ করে এত **বস্তু** বানাল, এগুলিকেই বা কী বলা হবে? এগুলির ভিতরে তো কিছু মানুষের মানবত্ব (জীবনসময়, শ্রম, মেধা, বুদ্ধি-বিবেচনা) ঢুকে গেছে! এই **বস্তু**গুলির কী নাম দেওয়া হবে? কেউ বললেন, এই **বস্তু**গুলি হল **আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ** (দ্র. **প্রেত**)। কেউ বললেন, মানুষের মানবত্ব আপন দেহ ত্যাগ করে **এই আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহ**গুলিতে বা **বস্তু**গুলিতে **ঢুকে** পড়েছে; অর্থাৎ মানুষ **বিদেহ** হয়ে এই **বস্তু**গুলিকে জন্ম দিয়েছে; অতএব এ হল 'উপচয়ে ভব', অর্থাৎ '**উপচে পড়া** মানবতা এগুলির ভিতরে ঢুকে রয়েছে।' তাহলে, এগুলিকে **বিদেহ**-করণ বলাই ঠিক হবে।

স্বভাবতই **বিদেহ**-করণ চলতে লাগল। যাদের ধান গম উৎপাদন করা **ধর্ম্ম**, কিংবা গরু ছাগল হাঁড়িকুড়ি বা কাপড়চোপড় উৎপাদন করা **ধর্ম্ম**, তাঁরা যে যার **ধর্ম্ম**পালন করে **উপচে-পড়া** উৎপন্ন পরস্পরের সঙ্গে লেনদেন করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা আবার পাইকারী হারে উৎপাদন শুরু করে দিলেন, তাঁদের নাম হয়ে গেল **বিদেহরাজ**। এর পর এসে গেল **অধর্ম্মজীবী**। সে বলল, 'আমি তো ধান গম হাঁড়িকুড়ি ... এসব বানাই না, আমার তো কোনো **ধর্ম্ম** নাই, আমি তোমাদের **উপচে-পড়া বিদেহ** নিয়ে গিয়ে অন্যদের দিয়ে দেব এবং তাদেরটা এনে তোমাদের দিতে চাই।' সবাই বলল, তথাস্তু! লোকে বলল, এই লোকটা তবে কে? শব্দবিদগণ বললেন — এ হল **বৈদেহক**, **বণিক**। এর জন্ম হয়েছে তোমাদের **উপচে পড়া** উৎপন্ন থেকে। এরা **উপচয়ে ভব**। (অমরকোষ টীকা / ব.শ.)।

বিধবা : ২. *বি (বিগত) ধব যাহার।* ৫. দ্র. **ধব**। ৬. ইংরেজি widow, জারমান witwe।

বিধ (বহুবিধ, বিবিধ, বিধা) : ১. ✓বিধ্ + অ - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিধ** = **বি**-কে (বিশেষকে) ধারণ করে যে। **বহুবিধ** = **বহু বিধ** যাহাতে। **বিবিধ** = **বি** (বিকল্পগুলি) থাকে যে **বিধ**তে। **বিধা** = **বিধ**-এর আধার যে।* / **বহুবিধ** = বহু বিধা যাহার। **বিবিধ** = বিভিন্ন বিধা যাহার। (ব.শ.)। ৩. **বিধ** = প্রকার। **বহুবিধ** = নানাপ্রকার, বিবিধ, নানারূপ। **বিবিধ** = নানাপ্রকার, বহুবিধ, নানাজাতি, নানাবর্ণ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধান, বিধান**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বিনিময় : ১. বি-নি + ✓মি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বিপরীতভাবে **নিময়** (পরিমাপিত বস্তুর নির্গমন) করা হয় যাহাতে।* ৩. পরিবর্ত্ত, তুল্যবস্তুদানে দ্রব্যান্তর গ্রহণ, প্রতিপণন, পরস্পর আদান-প্রতিদান, ব্যতীহার, পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ, পরিবর্ত্তন, বন্ধক, আধি। (ব.শ.)। ৪. exchange অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **নিমি, বিদেহ**। তিনটি শব্দ — **নিময়, নিমান, নিমি** — তৈরি হয়েছে কীভাবে, সে সম্পর্কে ছাত্রবোধ অভিধান আমাদের জানাচ্ছেন —

'**নিময়** = নি + মি (পরিমাণ করা) + অল্ ভাবে;
নিমান = নি + মা (পরিমাণ করা) + অনট্ ভাবে; এবং
নিমি = নি + মা + ডি কর্ত্তৃবাচ্যে।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনটি শব্দের ভিতরে 'পরিমাণ করা' ক্রিয়াটিই রয়েছে, যদিও **নিমি**র বেলায় সেকথা ছা.অ. স্পষ্ট করে বলে দেননি। **বিনিময়**-এর সূচনা যে **নিমি** রাজার আমলে হয়েছিল, সেকথা আমরা **নিমি, জনক, মিথিলা, অযোধ্যা** প্রভৃতি শব্দ থেকে আগেই জেনেছি। এখানে যেটুকু জানা দরকার, তা হল, মানুষের সমাজে **বিনিময়** আকাশ থেকে পড়া অলীক ব্যাপার নয়; সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ কালখণ্ডে বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক ক্ষেত্রে

সমাজের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে বহু তিতিক্ষা পেরিয়ে সেই **বিনিময়**কে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হতে হয়েছিল। ভারতীয় উপ-মহাদেশের ইতিহাসে **নিমি**র পর রাজা **জনকের** কালে পাইকারী **বিনিময়**-প্রথার উদ্ভব ও প্রচলন সম্ভব হয়েছিল বলেই মনে হয়। অন্তত কাহিনীগুলি সেরকম কথাই বলতে চাইছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে যাঁরা গর্ব করেন, তাঁরা জানেন না, সেদেশে **বিনিময়**-এর সূচনা হয়েছিল কীভাবে, কবে এবং কোথায়; আর, পাইকারী **বিনিময়**-প্রথাই বা কবে কীভাবে শুরু হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে কিন্তু সেই সব তথ্যই আছে।

বিপরীত : ১. বি-পরি + ✓ই + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বি (উল্টো দিকে)* ***পরীত*** *(সার্ব্বিকভাবে গত) যে।।* 'বিরূপগত'। (ব.শ.)। ৩. বিপর্য্যস্ত, বিরুদ্ধ, বিধিবিরুদ্ধ, অনিষ্টসূচক, অসত্য, প্রত্যাবৃত্তমুখ, অস্বাভাবিক, কাতর ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. opposite অর্থে প্রচলিত। ৫. **ইত** শব্দের অর্থ হল 'গত'। তার দিশানির্দেশ করে **পরি** উপসর্গটি। তখন **পরীত** শব্দের মানে দাঁড়ায় 'সার্বিকভাবে গত'। তার মানে, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু (গৃহকর্তা) যেদিকে যাচ্ছে, গোটা বৃত্ত (পরিবার) তার পরিধি (অন্যান্য পোষ্য) সহ সেদিকে যাচ্ছে; অর্থাৎ, গৃহকর্তার পিছু পিছু সমগ্র পরিবার বিশেষ দিকে যাচ্ছে। যখন **বিপরীত** বলা হচ্ছে, তখন সেই গৃহকর্তা চলেছেন ঠিক উলটো দিকে এবং তাঁর পরিবার তার পিছু পিছু চলেছে। এই হল **বিপরীত**।

বিপাশা : ১. ✓বিপাশি + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। ২. ***বি*** *(বিপরীত)* ***পাশন*** *করে যে; অর্থাৎ, পাশহীন বা পাশমুক্ত করে যে।।* যে বসিষ্ঠকে বিপাশ করে। (ব.শ.)। ৩. পঞ্জাবস্থ নদীবিশেষ (Beas) (পুত্রশোকে বসিষ্ঠ স্বদেহ পাশবদ্ধ করিয়া এই নদীতে নিমগ্ন হইলে, নদী তাঁহাকে 'বিপাশ' বা 'পাশমুক্ত' করিয়াছিল।) (ব.শ.)। যখন বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ বিবাদরত ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শতপুত্রকে বিনাশ করেন। ... পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ পর্বত হতে লম্ফ প্রদান করেন, কিন্তু তাতেও তাঁর মৃত্যু হয় না। তখন বর্ষাকালে এক নদীতে জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করা স্থির করেন এবং পাশ দ্বারা নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে নদীতে জলমগ্ন হন। তখন সেই নদী রজ্জুচ্ছেদনপূর্বক তাঁকে পাশমুক্ত করে তাঁর প্রাণরক্ষা করে। পাশমুক্ত বশিষ্ঠই এই নদীর নামকরণ করেন বিপাশা। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বশিষ্ঠ**। এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে একসময় বৈদিক সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে নবোদ্ভূত ধনতন্ত্রবাদীদের কলহের ফল **বশিষ্ঠে**র পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। কারণ তিনি ছিলেন বৈদিক মতবাদের মূল প্রবক্তা, ধারক ও বাহক। সামাজিক সংগঠন থেকে লাফ দিয়ে নেমে যাওয়ার পরও সেই সত্তার মৃত্যু হয় না। তখন, সম্ভবত নিজেকে কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ করে সত্তাটি কোনো উৎপন্নধারায় নিজেকে প্রবাহিত করে দেন। কিন্তু তাতেই তাঁর প্রাণশক্তি ফিরে আসে, আবদ্ধ নিয়মগুলি খুলে যায়, তিনি পুনরায় তাঁর বিরোধী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে **বিপাশা** নদীটির সম্পর্ক কীভাবে স্থাপিত, তা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

বিপ্র (বিপ্রর্ষি, বিপ্রকর্ষ, বিপ্রকর্ষণশক্তি, বিপ্রতীপ, বিপ্রলব্ধ) : ১. বি + ✓প্রা (পূরণ) + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বি*** *(বিশেষ, বিপরীত)* ***প্র*** *(পালন-রক্ষণ) করে যে; অথবা, যাঁরা বিশেষভাবে প্রয়োজন পূর্ণ করেন।* ৩. **বিপ্র** = মেধাবী, ব্রাহ্মণ, বিদ্যাবান ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অশ্বত্থ, চন্দ্র। **বিপ্রর্ষি** = যিনি বিপ্র ও ঋষি, ব্রহ্মর্ষি, বসিষ্ঠাদি। **বিপ্রকর্ষ** = অপনয়ন, অপসারণ, আকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন, দূরত্ব, যুক্তাক্ষরের স্বরাগমের বিশ্লেষণ। **বিপ্রতীপ** = **বিপ্রলব্ধ** = বঞ্চিত, প্রতারিত। (ব.শ.)। **বিপ্রকর্ষণশক্তি** = যে শক্তি দ্বারা পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্তী হয়। **বিপ্রতীপ** = প্রতিকূল, বিপরীত, বিশেষরূপে প্রতীপ। (ছা.অ.)। ৪. Brahmin অর্থে **বিপ্র**, vowel insertion অর্থে **বিপ্রকর্ষ**, vertically opposite অর্থে **বিপ্রতীপ** কমবেশি প্রচলিত; অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নিষ্বাত্ত**। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, **প্র** উপসর্গটি সর্বোৎকৃষ্ট সত্তাকে বোঝায়। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠকে বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে প্রয়োগ করতে থাকলে সেটি **বিপ্র** হয়ে যায়। তখন সে আর শ্রেষ্ঠ থাকে না। সে **প্র**কৃষ্টকেও **বি**শেষ বা **বি**পরীত করে দেয়। **বিপ্রতীপ** কোণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, **প্র**কৃত কোণের ঠিক **বি**পরীত একটি কোণ তার বিপরীতে অস্তিত্ব লাভ করে। **বিপ্রকর্ষণশক্তি**র অর্থ দিতে গিয়ে ছাত্রবোধ অভিধান আমাদের জানাচ্ছেন, এটি দুটি সত্তাকে পরস্পরের বিপরীতে *ঠেলে দেয়।* অর্থাৎ, **প্র** হল **প্রকৃত**, ঠিক, শ্রেষ্ঠ; কিন্তু **বিপ্র** হল **বিশেষ-প্র** বা **বিপরীত-প্র**। **প্রকৃতির** থেকে তা সরে যায়, বিশেষ দিকে বা বিপরীত দিকে চলে যায়। ...

মানুষের সমাজে এই **বিপ্র**কে প্রয়োগ করা হয়েছে 'বিশেষ দিকে চলা বা বিপরীত দিকে চলা ব্রাহ্মণ' অর্থে; যে কারণে **বিপ্র** বলতে 'পুরোহিত' বোঝায়। সে সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক অর্জনকে 'একই জ্ঞানকর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতীকী আচরণে' প্রয়োগ করে থাকে। ফলে, সভ্যতা দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়। আসলে, **ব্রহ্মগুণ**-এর আধার যে **ব্রাহ্মণ**, সেই তো জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবাহী **শিব**, সেই তো শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু সে যদি তার সেই শ্রেষ্ঠ বোধকে **বিশেষভাবে** বা **বিপরীতভাবে** প্রয়োগ করতে থাকে, তখন সে আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে থাকে না। তেমন **ব্রাহ্মণ**কেই 'পুরোহিত', 'জন্মসূত্রে-ব্রাহ্মণ' ... ইত্যাদি বলে। ইনিই **বিপ্র**।

বিপ্রচিত্তি : ২. ***বিপ্র চিত্তন*** *(দ্র.* ***চিত্ত****) গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৩. দনুর প্রথম পুত্র। (ব.শ.)। কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হতে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। বিপ্রচিত্তি নিজের বৈমাত্রেয় ভগিনী সিংহিকাকে বিবাহ করেন। সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ইনি অসুরপক্ষের সেনাপতি ছিলেন। সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির রাহু, কেতু প্রভৃতি একশত একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ও তারা গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়। নবম বারের যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বৈদিক যুগে যে সত্তাগুলি **বিপ্র** রূপে সবচেয়ে অধিক প্রশংসার দাবি রাখে, তাঁদের মধ্যে **বৃত্রাসুর**-এর পরই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি **বিপ্রচিত্তি**। দান-বাহক **দানব**রূপেই তাঁর পরিচিতি। পুরাণাদি গ্রন্থে তাঁর বিষয়ে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার থেকে বোঝা যায়, আদর্শ **বিপ্র** রূপে এই

সত্তা বৈদিক সভ্যতার পক্ষে (অর্থাৎ আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে) দীর্ঘকাল ধরে সফলভাবে সক্রিয় ছিল। অবশেষে পুঁজিবাদের উদ্ভবচেষ্টার (**ইন্দ্রের**) দ্বারা এই সত্তা পর্যুদস্ত হয়।

বিবর (বিবরণ) : ২. *বিবর* = *যাহা বিশেষভাবে বরণীয়; এবং, যাহা বিপরীতভাবে বরণীয় অর্থাৎ যাহা বরণীয় নহে।* ***বিবরণ*** = ***বিবর*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. **বিবর** = ধারক, বিল, ছিদ্র, ভূমিস্থ রন্ধ্র, মধ্য, অবকাশ ... ইত্যাদি; বিবৃত করা, সবিস্তর করা। **বিবরণ** = ব্যাখ্যান, বিশদীকরণ, সবিস্তর বর্ণন, কথন, ব্যাখ্যানগ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. description অর্থে **বিবরণ** প্রচলিত এবং hole অর্থে **বিবর** কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **দর**। যে **দর** বা গর্ত বরণীয় নয়, তাকে **বিবর** বলে। কিন্তু সেই একই **বিবর** 'বিবৃত করা' বোঝাচ্ছে কীভাবে, তার উত্তর পাওয়া যায় **বিবর** শব্দের ভিতরেই। **বি** উপসর্গের অর্থ যেহেতু 'বিশেষ', 'বিপরীত' দুই-ই হয়, সেইহেতু **বিবর** দুরকম হয় — 'বিশেষরূপে বরণীয় **বিবর**' ও 'বিপরীতরূপে বরণীয় **বিবর**'। তার মানে যে গর্তগুলি বরণীয় নহে, সেগুলি হল খারাপ-গর্ত বা **বিবর**। আর, যে গর্তগুলি বিশেষভাবে বরণীয়, সেগুলি হল ভাল-গর্ত, সেও **বিবর**। সেই ভাল-গর্তগুলি অন থাকে **বিবরণ**-এ। সেখানে থাকে শত শত **বিবর**রূপী বা গর্তরূপী শব্দ, যার প্রত্যেকটি পরিপূর্ণ থাকে অর্থে। সেই অর্থ-সম্বলিত **বিবর**রূপী শব্দগুলি পর পর জুড়ে দেওয়াকেই বলা হয় **বিবরণ**। তার মানে, **বিবর**-এর বেলায় যখন গর্তগুলিকে **বরণ** করা হয় না, তখন **বিবরণ**-এর বেলায় সেগুলিকে বিশেষভাবে **বরণ** করা হয়ে থাকে।

বিবস্বান (বৈবস্বত) : ১. বিবস্‌ + বৎ। (ব.শ.)। ২. ***বিবস্বৎ*** = *বিশেষ প্রকার* ***বস*** *তারণ থাকে যাহাতে।* ***বৈবস্বত*** = ***বিবস্বৎ*** *হইতে জাত।* / **বিবস্বৎ** = তেজ যুক্ত যে। (ব.শ.)। ৩. **বিবস্বান্ (বিবস্বৎ)** = 'তেজোযুক্ত', সূর্য্য (ইঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। ইঁহার পুত্ত্র বৈবস্বত মনু সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ।), দেব, অরুণ, অর্কবৃক্ষ। **বৈবস্বত** = বিবস্বৎসম্বন্ধী, সৌর, যমসম্বন্ধী, বৈবস্বতমনুসম্বন্ধী, বিবস্বৎপুত্র, সূর্য্যের পুত্র - সপ্তম মনু (ইনি পূর্ব্বজন্মে সত্যব্রত-নামক রাজর্ষি ছিলেন, পরে মহাকল্পে মনুত্বপ্রাপ্ত হন এবং হরির উপদেশে সর্ব্ববিধ জীব, ওষধি ও বীজ লইয়া বৃহৎ নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক প্রলয়সলিল-রাশিতে ভাসিতে ভাসিতে মৎস্যরূপী হরির শৃঙ্গে সর্প-রজ্জুতে নৌকা বদ্ধ করেন।), যম, শনৈশ্চর, শনি, অগ্নি, রুদ্রবিশেষ, বৈবস্বত মনুর অধিকারকাল বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তর। (ব.শ.)।

বৈবস্বত = (ক) মরীচি হতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান (সূর্য) এবং বিবস্বান হতে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। ... (রামায়ণ — অযোধ্যাকাণ্ড)। (খ) বৈবস্বত সপ্তম মনু। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ও ঋচীকপুত্র জমদগ্নি — এঁরা সপ্তর্ষি। সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ, আদিত্যগণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় — এঁরা দেবতা। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন বৈবস্বত মনুর পুত্র। এঁদের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি সন্তানগণ কালক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েছেন। (হরিবংশ)। (গ) সমস্ত মনুর মধ্যে বৈবস্বত মনু সপ্তম। স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম ও তারপর যথাক্রমে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, ও চাক্ষুষ মনু হন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। **বিবস্বান** = রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা অদিতি হতে কশ্যপের ঔরসে অর্যমা, পূষা, বিবস্বান প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। এঁর স্ত্রীর নাম সংজ্ঞা। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের তিনটি পুত্র সন্তান হয় — বৈবস্বত মনু, শ্রাদ্ধদেব, ও যম, এবং যমুনা নামে যমের এক যমজ ভগ্নী। সংজ্ঞা সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে ছায়াকে সৃষ্টি করেন এবং ছায়ার উপর তাঁর পুত্র-কন্যাদের পালন করবার ভার দিয়ে অন্যত্র চলে যান এবং অশ্বীরূপ ধারণ করে বনে ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন বিবস্বান অশ্বরূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সহবাসে রত হন। এর ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। ... সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা তখন বিবস্বানের তেজ হ্রাস করবার জন্য তাঁকে শানযন্ত্রে কর্তন (দ্র. বিকর্তন) করে তাঁর অষ্টম অংশ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন। এই অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীর উপর পতিত হয়। ... মহাভারতের বর্ণনানুসারে কুন্তীর গর্ভে কর্ণ বিবস্বানের ক্ষেত্রজ পুত্র। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। এইজন্য ইক্ষ্বাকুবংশ সূর্যবংশ নামে খ্যাত। অশ্বরূপে বিবস্বান শুক্ল যজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করেন। বিবস্বানই সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করেন। এঁর রথ সপ্ত অশ্বদ্বারা বা সপ্ত মস্তক বিশিষ্ট অশ্বদ্বারা সূর্যরশ্মিমণ্ডিত হয়ে চালিত হয়। কথিত আছে, ইনি শনি ও সুগ্রীবের পিতা। ((পৌ.অ.)। ৪. শুধুমাত্র পঞ্জিকায় 'এখন **বৈবস্বত** মনুর অধিকার কাল চলিতেছে' লেখা থাকে, অন্য কোনোভাবে শব্দ দুটির ব্যবহার দেখা যায় না। ৫. **বিবস্বান** ও **বৈবস্বত** শব্দদুটির অর্থে পৌঁছতে যে তথ্যসমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে, তার সব কথা লিখতে হলে একটি বড় প্রবন্ধগ্রন্থ লেখা হয়ে যায়। এখানে আমরা সে চেষ্টা করব না। এখানে শুধু সেই সব কথা থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের সংক্ষিপ্তসারটুকু দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। উপরোক্ত তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, আদিম মানবসভ্যতার আত্মোপলব্ধির পর থেকে আজ পর্যন্ত যে পথ বেয়ে সে এসেছে, তারই কথা বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে বিভিন্ন পুরাণাদি গ্রন্থে। এমনকি একথাও এই তথ্যগুলি থেকে কমবেশি বোঝা সম্ভব যে, মানবসভ্যতার একই আদি ইতিহাস বাইবেল কোরাণ পুরাণ যে যার নিজের মতো করে বর্ণনা করেছে। মূলে তাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, ভেদ যা রয়েছে সে কেবল বয়ানের পার্থক্যে।

আদিম যৌথসমাজের কেন্দ্রকে বলা হত **বিবস্বান**। একে **সূর্য্য**ও বলা হত। সেই কেন্দ্র যৌথসমাজের জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ ... প্রভৃতি সর্বপ্রকারের সম্পদের কেন্দ্র ছিল। পরে পরে সমাজ যত বিকশিত বা বিচূর্ণীভূত হতে থাকে, তত তার কেন্দ্রেও বিভিন্ন বিভাজন ঘটে এবং বিভিন্ন বিভাগ স্বকীয়তা লাভ করে। এই বিভাগের কয়েকটির নাম হয়ে যায় **বৈবস্বত**। যেমন বিচারবিভাগ (= **যম**), একালে যাকে আদালত বলা হয়ে থাকে; যেমন রাষ্ট্রীয়-কোপদৃষ্টি-ধারক বিভাগ (= **শনি**), একালে যাকে ইনকাম-ট্যাক্স, সেলস্-ট্যাক্স, কাস্টমস্ ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। পাঁজিতে যখন লেখা থাকে, 'এখন **বৈবস্বত** মনুর অধিকার কাল চলিতেছে', তখন আসলে বলা হয় যে, এখন আইনের শাসন চলছে। স্বভাবতই এখন 'আইন-জানা মানুষদের অধিকার কাল'। কদর্থে একে আপনি 'আইনবাজ মানুষদের

শাসনকাল' বলতে পারেন। ... দ্র. **উত্তম, তামস, চাক্ষুষ, মনু, মন্বন্তর**।

বিভা (বিভাবরী) : ১. বি + ✓ভা + ক্বিপ্ (০) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিভা*** = ***বি*** *(বিকল্প, বিশেষ, বিপরীত)* ***ভা*** *(প্রকাশ, দীপ্তি, শোভা) যাহাতে।* ***বিভাবরী*** = ***বিভা****-বরণকারীর গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে। /* **বিভা** = দীপ্তি করে যে ('দীপ্তিকর')। **বিভাবরী** = বিভাকে আচ্ছাদন করে যে ('বিভাচ্ছাদিকা'); নক্ষত্রাদি দ্বারা যাহা বিভাত হয়। (ব.শ.)। ৩. **বিভা** = প্রভা, আলোক, কিরণ, কান্তি, দীপ্তি, প্রকাশ। **বিভাবরী** = রাত্রি, রজনী, বক্রযোষিৎ, অবশা স্ত্রী, কুট্টনী, মুখরা স্ত্রী। (ব.শ.)। ৪. বাংলার সাহিত্যিকগণ শব্দ দুটি ব্যবহার করে থাকেন, জনসাধারণ্যে এদের ব্যবহার নাই বললেই চলে। কখনো সখনো মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. যে আলো বিশেষ প্রকার, অথবা বিকল্প প্রকার, কিংবা বিপরীত প্রকার, তাকে বলে **বিভা**। এটি **প্রভা**র চেয়ে নিম্ন মানের। বলতে গেলে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক আলো বা দিনের আলোকে **প্রভা** বলা যায়; আর, রাতের চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির আলোকে বলা যায় **বিভা**। এই **বিভা** বরণীয় যার কাছে, সে হল **বিভাবরী**। সে রাত্রি (night) হতে পারে, বক্রযোষিৎ বা তির্য্যগ্‌গামিনী (বিপথগামিনী) নারী হতে পারে।

বিহগ (বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, বিহঙ্গমা, বিহঙ্গমিকা, বিহঙ্গমী, বিহঙ্গিকা, বিহঙ্গিনী, বিহায়স্) : ১. বিহায়স্ + ✓গম্ + অ (ড) কর্তৃবাচ্যে। বিহায়স > বিহ। (ব.শ.)। ২. ***বিহগ*** = *বিগত 'হায়'গুলিতে গমন করে যে।* ***বিহঙ্গ*** = *বিগত 'হায়'গুলির রহস্যরূপে গমন করে যে।* ***বিহঙ্গম*** = ***বিহঙ্গ*** *সীমায়িত যাহাতে।* ***বিহঙ্গমা*** = ***বিহঙ্গম****-এর আধার যে।* ***বিহঙ্গমিকা*** = ***বিহঙ্গম****-কে গতিশীল করে যে আধারশক্তি।* ***বিহঙ্গমী*** = ***বিহঙ্গম****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বিহঙ্গিকা*** = ***বিহঙ্গ****-কে গতিশীল করে যে আধারশক্তি।* ***বিহঙ্গিনী*** = ***বিহঙ্গ****-এর গতিশীলতা অনকৃত যে আধারে।* ***বিহায়স্*** = ***বি*** *(বিগত)* ***হায়****-এর শেষ অস্তিত্ব যাহাতে। /* **বিহগ, বিহঙ্গম** = আকাশে যায় যে ('আকাশগামী')। **বিহায়স্** = যাহা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ('সর্ব্বত্যাগী')। (ব.শ.)। ৩. **বিহগ** = খেচর, পক্ষী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, মেঘ, বাণ। **বিহঙ্গ** = পক্ষী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, মেঘ, বাণ। **বিহঙ্গম** = খেচর, পক্ষী, সূর্য্য। **বিহঙ্গমা** = বিহঙ্গমসমা, ভারযষ্টি, বাঁক; স্বামীপক্ষী। **বিহঙ্গমী** = পক্ষিণী। (**বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী** — উপকথার ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী। উপকথার এই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী একটু পৃথক; ইহারা দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট এবং দিব্যজ্ঞানে সকল বিষয় জানিতে পারে।)। **বিহঙ্গমিকা, বিহঙ্গিকা** = বিহঙ্গসদৃশ ভারবহনার্থ দণ্ড, বাঁক। **বিহঙ্গিনী** = পক্ষিণী। **বিহায়স্ (বিহায়ঃ, বিহায়াঃ, বিহায়াস্)** = নির্লিপ্ত, আকাশ, অন্তরীক্ষ, পটলাদি (চাল ইত্যাদি), পক্ষী। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আকাশ, বঙ্গ, ব্যঙ্গ, ব্যাঙ্গমা**। ভাবনার কথা এই যে, এক **পক্ষী**কে বোঝাতে **বিহ**-যুক্ত এতগুলো শব্দ আমাদের প্রাচীন বাংলাজ্ঞানী পূর্বসূরিগণ খরচ করতে গেলেন কেন! তার কারণ হল, এই **পক্ষী** দৃশ্যজগতের bird-কে বোঝালেও, শব্দগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মনের উপরে **আকাশ**-এর মতো যে **পটল** বা চাল ইত্যাদি রয়েছে, সেখানে যারা যায় তাদের বোঝানো। এই চাল **দুটি** হল **অর্থনৈতিক** ও **সাংস্কৃতিক** **আকাশ**। একে আমরা যথাক্রমে **ধনসম্পদ** (বা **পণ্য**সম্পদ) ও জ্ঞানসম্পদের **আকাশ** বলতে পারি। মানুষের যা কিছু উৎপন্ন, তা সে মানসিক জ্ঞানসম্পদজাত উৎপন্ন হোক আর ধনসম্পদজাত উৎপন্নই হোক, সেগুলি যে সামাজিক মনোলোকে যায়, ও সেই মনোলোক গড়ে তোলে, এ হল সেই **আকাশ**। মানুষের ধান **হওয়া**, চাল **হওয়া**, কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদি **হওয়া**, আনন্দ **হওয়া**, দুঃখ **হওয়া** ... এই সমস্ত প্রকারের **হায়**গুলি সেখানে গিয়ে জমা হয় বলে একে **বিহায়স** বলে। (দ্র. **হায়ন**)। এই **বিহায়সই** হল সেই অদৃশ্য **আকাশ**, যার নীচে আমাদের মন বাস করে; ঠিক যেমন দৃশ্য **আকাশের** তলায় আমাদের শরীর বাস করে। এই মনোলোকের **আকাশেই** থাকে আমাদের যৌথজ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্র **সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ** প্রভৃতি সত্তাগুলি; এখানেই উড়ে বেড়ায় ঘুরে বেড়ায় আমাদের **পক্ষী** বা **দোকানদার** সত্তাগুলি। প্রধানত তাদের বোঝানোর জন্যই **বিহগ, বিহঙ্গম** ... ইত্যাদি শব্দের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর bird বা 'পাখী'র ও 'ভারযষ্টি' বা 'বাঁক' — এগুলির কথা এসেছে 'সাদৃশ্যে'। **দোকানদার**কে ভাল করে দেখলেই **পক্ষী**র সঙ্গে তার সম্পর্ক স্পষ্ট বোঝা সম্ভব।

তার মানে, আমাদের দৃশ্য শরীরের জন্য যেমন দৃশ্য **আকাশ, পক্ষী, সূর্য্য, চন্দ্রাদি** রয়েছে, তেমনি অদৃশ্য মনের জন্য অদৃশ্য **আকাশ, পক্ষী, সূর্য্য, চন্দ্রাদি**ও রয়েছে। এই অদৃশ্য আকাশের অদৃশ্য **পক্ষী**দের বোঝাতে **বিহগা**দি শব্দের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

তবে কিনা, এখানেই আমাদের পূর্বসূরিরা থেমে যাননি। যদি থেমে যেতেন, তাহলে **বিহঙ্গমসমা** 'ভারযষ্টি' বা 'বাঁক' অর্থাৎ **বাঙ্গি** কিংবা **ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী**দের আমরা পেতাম না। তাঁরা দেখেন লোকে যেমন দৃশ্য **বাঙ্গী** বা 'বাঁক' কাঁধে করে দুদিকে ভার (ধরা যাক দুটি চালের বস্তা) চাপিয়ে বহন করেন, তেমনি অদৃশ্য জ্ঞান ও কর্মকে (বা তত্ত্ব ও প্রয়োগকে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিকে) মনের কাঁধের **বাঙ্গী**তে চাপিয়ে 'সমুচ্চিত-ভাবে' বহন করে থাকেন। মহাভারত এই জ্ঞান ও কর্মকে বলেছেন 'হংসের দুটি ডানা'। আর বৃদ্ধ হারীতসংহিতা বলেছেন, '... তপস্যা (কর্ম) ও ব্রহ্মজ্ঞান উভয় মিলিত (সমুচ্চিত) হইলেই সংসার-রোগের ঔষধ হয়।'

তার মানে, **বিহঙ্গ** শুধুমাত্র **পক্ষী-দোকানদার** নয়, সে 'পুরুষ-প্রকৃতি'র সমুচ্চয়কারী রূপে, **শিব**রূপে, **সুন্দর**রূপে সমাজ-আকাশে উড়ে বেড়ানো রবীন্দ্রনাথের মতো **বঙ্গ**দেশীয় মনীষীও বটে! এমনকি সেকারণেই সে **ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী**তেও উত্তীর্ণ হতে পারে। দ্র. **ব্যঙ্গ**।

বীক্ষণ (অবেক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ) : ১. বি + ✓ঈক্ষ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বীক্ষণ*** = *যাহাতে বিশেষভাবে ঈক্ষণ (দর্শন) করা হয়।* ***অবেক্ষণ*** = ***অব*** *(নিম্নদৃষ্টিতে) ঈক্ষণ থাকে যাহাতে।* ***পর্য্যবেক্ষণ*** = *সার্বিকভাবে* ***অবেক্ষণ*** *করা হয় যাহাতে।* ৩. **বীক্ষণ** = দর্শন, পরীক্ষণ। **অবেক্ষণ** = অবলোকন, পরিদর্শন, অবধান, অনুসন্ধান, প্রতিজাগরণ। **পর্য্যবেক্ষণ** = পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান। (ব.শ.)। ৪. supervision অর্থে **পর্য্যবেক্ষণ** কমবেশি

প্রচলিত, বাকি শব্দ দুটি অপ্রচলিত। **৫. বীক্ষণ** বা **অব-ঈক্ষণ,** কিংবা পরি + অব + ঈক্ষণ (= পর্য্যবেক্ষণ) প্রভৃতি করে যে শব্দ তৈরি করা হয়েছে, সেই শব্দগুলি নানা রূপে ফারসি ভাষাতেও পাওয়া যায়। অর্থের দিক থেকে **বক্‌শি (বক্সী)** শব্দের সঙ্গে **বীক্ষণ**কারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। তিনিই তো ফারসির 'ক্যাশিয়ার'। তিনি যা দেন, সেটিই তে **বক্‌শিষ (বক্‌সীস, বকশিস** ... ইত্যাদি)। সেই **বক্সীই** তো এখন অনেক বাংলাভাষীর নামের পদবী। **বক্ষীর** আর **বখরা** কি খুব দূরের সত্তা! তবে এসব এই মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য নয়। যদি কোনোদিন আরবি-ফারসি ভাষার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অভিধানের কাজ কেউ করেন, তখন এই সব 'কাল্পনিক' সম্ভাবনাগুলি তাঁকে ভেবে দেখতেই হবে।

বীজ (বীজকর্ত্তা, বীজগণিত, বীজগুপ্তি, বীজন, বীজিত, বীজবাপ, বীজবোকা, বীজমন্ত্র, বীজাক্ষর) : ১. বি + ✓জন্‌ + অ (ড) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বীজ*** = *বিশেষ ধারার জনন থাকে যাহাতে।* ***বীজকর্ত্তা*** = *(সকল)* ***বীজের*** *কর্ত্তা যিনি।* ***বীজন*** = ***বীজ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বীজিত*** = ***বীজন*** *তারিত যাহাতে।* / **বীজ** = যাহার দ্বারা জনন সাধিত হয়; গর্ভাশয়ে যায় যে। **বীজন** = যাহার দ্বারা বায়ুসঞ্চালন সাধন করা যায়। **বীজবাপ** = বীজ বপন করে যে। (ব.শ.)। **৩. বীজ** = কারণ, হেতু, বপনার্থ ধান্যাদি, শুক্র, বীর্য্য, শক্তিরূপ কারণ, অঙ্কুর, মজ্জা, তত্ত্ব (divine truth), (তন্ত্রে) দেবতাবিশেষের সারভূত বর্ণাত্মক মন্ত্র, (গণিতে) সমস্ত ব্যক্ত (সংখ্যাত্মক) গণিতের অব্যক্ত বীজভূত গণিতবিশেষ, আধার, ... ইত্যাদি। **বীজকর্ত্তা** = শিব। **বীজগণিত** = অব্যক্ত গণিতভেদ (Algebra)। **বীজগুপ্তি** = শিম্বী। **বীজন** = বায়ুসঞ্চালন, ব্যজনচালন, পাখা করা, সঞ্চালন, তালবৃন্ত, কোক, চকোর। **বীজিত** = কৃতবীজন। **বীজবাপ** = কৃষীবল, বীজবপন। **বীজবোকা** = বীজার্থ ছাগ, সবৃষণ ছাগ, পাঁটা। **বীজমন্ত্র** = তন্ত্রে দেবতাবিশেষের সারভূত বর্ণাত্মক মন্ত্র। **বীজাক্ষর** = বীজমন্ত্রবর্ণ, বর্ণাত্মক বীজমন্ত্র। (ব.শ.)। **৪.** seed অর্থে **বীজ**, এবং Algebra অর্থে **বীজগণিত** প্রচলিত; বাকি সমস্ত শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** যে সত্তার দ্বারা জনন বিশেষ দিকে চলে, তাকে **বীজ** বলে। রূপশাল ধানের বীজ থেকে রূপশাল ধানেরই গাছ হয়, অন্যরকম গাছ হয় না। 'ধরা যাক x' বলে যাকে একবার x ধরে নিলেন, সমগ্র অঙ্ক কষার সময় সে x-এর নানা মান হয়ে মূলত x-এর আচরণই করবে। **প্রজননের** সঙ্গে **বীজননের** তাই ফারাক আছে। তবে, ফুলের রেণু-মিলন কিংবা নর-মাদীর মিলনে **বীজ**-জাত সত্তাগুলি যে জনন-কর্ম করে ফেলে তাকে **প্রজনন** বলা চলে।

সর্ব প্রকার উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের কর্তা যে **শিব**, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁকেই **বীজকর্ত্তা** বলা হয়। ঠিকই বলা হয়। তবে আমাদের পূর্বসূরি বাংলা-শব্দজ্ঞানীদের শব্দজ্ঞানের উচ্চতার নিদর্শন হল, তাঁরা Algebra-কে **বীজগণিত** বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। Algebra বিষয়টির যে মূল গুণ, সেটি Algebra শব্দের ভিতরে পাওয়া যায় না, কিন্তু **বীজগণিত** শব্দের ভিতরে পাওয়া যায়। ইংরেজি Algebra এসেছে আরবি 'অল্‌-যব্‌র্‌' (পুনর্গ্রন্থন) শব্দ থেকে। Algebra-কে 'পুনর্গ্রন্থন-গণিত' বলার চেয়ে **বীজ**মূলক-গণিত বললে বেশি ঠিক বলা হয়। যাঁরা **বীজগণিত** পড়ান, তাঁরা শুরুতে **বীজগণিতের** অর্থ বলে দিলে, বিষয়টি চিরকাল মনে গেঁথে থেকে যেতে পারে।

শিম্বী বা শিম নামক সবজিকে কেন যে **বীজগুপ্তি** বলা হয়, গ্রামবাংলার কৃষক সেকথা বলে দিতে পারেন। আসলে, প্রতিটি শিমের ভিতরে পাঁচ/সাতটি বীজ বা দানা থাকে। শিম পেকে শুকিয়ে গেলে, সে হঠাৎ এমন বিচিত্রভাবে ফাটে যে, তার বীজগুলি সজোরে দূরে দূরে নানা দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। আসলে, ছায়ার মধ্যে পড়ে থেকে বীজগুলি যাতে নষ্ট না হয়, তারা যাতে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ে এবং রোদ-বৃষ্টি পেয়ে নতুন গাছে পরিণত হতে পারে, সেই আকাঙক্ষায় শিম-মাতা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের ধারণা, এই কারণে আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন **বীজগুপ্তি**।

কিন্তু 'হাওয়া করা' বা 'পাখা করা'কে **বীজন** বলা হয় কেন, সেকথা বুঝতে পারলে আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়াটিকে খানিকটা অনুভব করতে পারি। একটা লোক একটি টুলে বসে উপর থেকে ঝোলান একটা দড়ি ধরে টানছে আর ছাড়ছে, তাতে তার গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে; অন্যদিকে ঐ দড়ি টানাটানির ফলে দূরে আর একজনের মাথার উপর থেকে হাওয়া এসে তাকে ঘামহীন করে দিচ্ছে। এই যে 'বিপরীত জনন', একেই বলে **বীজন**।

আর, **বীজ** বপনকারীকে **বীজবাপ** বলে বটে, কিন্তু আধুনিক বাংলাভাষায় **বাপ** শব্দটি 'অশ্লীল', যদিও বিবাহিতা নারীরা 'বাপের বাড়ি' বলতে এখনও কুণ্ঠা বোধ করেন না। গ্রামবাংলায় তার বিপুল ব্যবহার থাকলেও অ্যাকাডেমিতে কোনো ছাত্র যদি লেখে, 'রবীন্দ্রনাথের বাপের নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' তবে মাস্টার সেটি নির্ঘাৎ কেটে দিয়ে 'পিতার নাম', কিংবা 'বাবার নাম' ... ইত্যাদি লেখার নির্দেশ দেবে।

বর্ণাত্মক **বীজমন্ত্র**কে **বীজাক্ষর** বলে। আমরা দেখছি 'র'-কে অগ্নির **বীজাক্ষর**, 'য'-কে বায়ুর **বীজাক্ষর** ... ইত্যাদি বলে। এরকম বহু **বীজাক্ষর** রয়েছে। আজ আমরা সেই অক্ষরগুলির অর্থ কমবেশি জানতে পারছি। কিন্তু **বীজাক্ষর** রূপে তাদের কীভাবে ব্যবহার করা হত, কীভাবে তাদের সাহায্যে **বীজমন্ত্র** তৈরি করা হত, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কেননা, যে তন্ত্রশাস্ত্রে এর বিপুল ব্যবহার রয়েছে, সেগুলিকে আজও একালীকরণ করা যায়নি বা করা হয়নি। আমরা কিন্তু এরকম **বীজাক্ষর** সম্বলিত **বীজমন্ত্র** স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জানতে পারছি যে, এই **'বীজাক্ষর সম্বলিত বীজমন্ত্র'** নিয়েই একালের জ্ঞানজগতের একঝাঁকা কারবারের রমরমা চলছে। পাঠকপাঠিকা, আপনিও এগুলি জানেন, মানেন, অনুসরণ করেন। একবার ভাবুন $e = mc^2$ — আইনস্টাইন উদ্ভাবিত এই **বীজমন্ত্র**টি কি e, m, c^2 ... ইত্যাদি বর্ণাত্মক বা **বীজাক্ষর**-সম্বলিত নয়? একবার একালের কমপিউটারের দুনিয়ায় চলে যান, এরকম হাজার হাজার **বীজাক্ষর** সম্বলিত **বীজমন্ত্রের** দেখা পেয়ে যাবেন। এমনিতে সেই **বীজাক্ষর**গুলির বা **বীজাক্ষর**-সম্বলিত **বীজমন্ত্র**গুলির কোনো মানেই হয় না, কিন্তু যে মুহূর্তে সেগুলিকে কমপিউটারের মাধ্যমে কাজে পরিণত করা হয়, তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়, আজকের ফলিত বিজ্ঞানের

দুনিয়াটাই চলছে **তন্ত্রের** মতো, হাজার হাজার **বীজাক্ষর**-ভিত্তিক **বীজমন্ত্রের** উপর নির্ভর করে; ফলিত বিজ্ঞানের তান্ত্রিকরাই কেবল সেই **বীজাক্ষর** ও **বীজমন্ত্র**গুলির শক্তির খবর রাখেন, সাধারণ মানুষ তার কোনো মানেই জানে না, কিন্তু ফলটা দেখতে পায়।

বীত (বীতরাগ, বীতশোক, বীতস্পৃহ, বীতি, বীতিহোত্র) : ১. বি + ✓ই + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বীত*** = *যাহা বিশেষ দিকে ইত বা গত হইয়াছে।* ***বীতরাগ*** = ***বীত*** *হইয়াছে রাগ (অনুরাগ বা বিরাগ ইত্যাদি) যাহার।* ***বীতশোক*** = ***বীত*** *হইয়াছে শোক যাহার।* ***বীতস্পৃহ*** = ***বীত*** *হইয়াছে স্পৃহা যাহার।* ***বীতি*** = ***বীত*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ***বীতিহোত্র*** = ***বীত****করণের হোতা যে।* / **বীত** = বি (বিগত) ইত (গমন) যাহার; বিশেষগতি সাধিত হয় যাহাতে। **বীতিহোত্র** = হবিঃ অশন যাহার। (ব.শ.)। ৩. **বীত** = বিগত, তিরোভূত, শান্ত, রাত, অসার, যুদ্ধে অক্ষম হস্তী ও অশ্ব, অন্বয়মুখে প্রবর্ত্তমান ও ভাববস্তুর বিধায়ক অনুমানভেদ। **বীতরাগ** = অপগত অনুরাগ, বিষয়-আসঙ্গহীন, বিরক্ত, বর্ণবিহীন, বিবর্ণ। **বীতশোক** = অপগত দুঃখ। **বীতস্পৃহ** = বিতৃষ্ণ, নিস্পৃহ। **বীতি** = গতি, ধাবন, ভোজন, ব্যাপ্তি, নিবৃত্তি, অশন, খাদ্য, দীপ্তি, প্রভা। **বীতিহোত্র (বীতহোত্র)** = অগ্নি। (ব.শ.)। ৪. **বীতশোক** নাম রূপে কমবেশি প্রচলিত। gone অর্থে **বীত** শব্দটি হিন্দিতে প্রচলিত (বীত গিয়া)। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বে : ৩. ফারসি **বে**; তুলনীয় সংস্কৃত **বি**। **বে** = বিনা। (ব.শ.)। ৪. উপসর্গ রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. আমরা যেখান থেকে **বি**-কে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, সেখান থেকেই উপসর্গ রূপে ফারসি তার নিজস্ব উত্তরাধিকার পেয়েছে **বে**-কে। অর্থাৎ, কিনা আদি **বি** পারস্য ঘুরে **বে**-রূপে যখন পাঠান-মোগলের হাত ধরে এদেশে এল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকে চিনতে ভুল করেননি। সেকারণে অজস্র **বে**-যুক্ত আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দকেই কেবল তাঁরা আপন করে নেননি, **বি**-এর মতো **বে**-কেও উপসর্গ রূপে ব্যবহার করে বহু শব্দ বানিয়ে ফেললেন তাঁরা; ঠিক যেমন করেছিলেন তাঁরা আরবি **গর**-এর ('গরহাজির' ... ইত্যাদির) ক্ষেত্রে। আর, সেক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বাছবিচার করেননি — প্রাচীন বাংলা শব্দ, মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দ, আধুনিক বাংলা শব্দ, এমনকি ইংরেজি শব্দের সঙ্গেও (যথা **বেহেড**) **বে**-কে জুড়ে নিয়ে তাঁরা অজস্র বাংলা শব্দ বানিয়ে ফেলেছেন। এখানে সেই শব্দগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা রাখা হল। এগুলির মধ্যে **বি**-এর অর্থ রয়েছে প্রধানত 'বিপরীত' অর্থে। তার মানে আমাদের **বিকল**, যার মানে হল **কল**-এর 'বিপরীত' অর্থাৎ, '**কলন** নেই যার', সেই অর্থটিই রয়েছে **বেকল**-এর ভিতরে। এই 'নেই যার' বা 'হীন' অর্থটিই **বে** উপসর্গের প্রকট অর্থ। যথা, আবরু — **বে**আবরু, অর্থাৎ আবরুহীন। ব.শ. এই **বে**-র মানে করেছেন 'বিনা'। এই 'বিপরীতার্থক' বা নঞর্থক মানেটিকে 'হীন' অর্থে আমরা পৃথকভাবে উল্লেখ করছি না। কিন্তু অন্যতর কোনো কিছু বলার থাকলে সেকথা আমরা প্রতিটি শব্দের পাশে বন্ধনীর ভেতরে লিখে যাচ্ছি।

বেআইন, বেআকার, বেআড়া (বেয়াড়া), বেআদব, বেআবরু, বেইজ্জত, বেইমান, বেএক্তিয়ার, বেকল (প্রাচীন বাংলায় এটিই ছিল **বিকল**), **বেকসুর, বেকায়দা, বেকার** (এটি কিন্তু বাংলার **বিকার** থেকে আলাদা), **বেকুফ (বেকুব), বেকেজো, বেখরচা, বেখাপ, বেগড়, বেগতি, বেগতিক, বেগনা, বেগম** (ব.শ. জানাচ্ছেন, এটি তুর্কী শব্দ। আমাদের মনে হয়, এই শব্দটি তৈরি করা হয়েছে এইভাবে — যে গম বা দুঃখ দূর করে অর্থাৎ গম-হীন করে = **বেগম**), **বেগার, বেগারি, বেগোছ, বেচাল, বেছপ্পর, বেজন্মা, বেজাতক, বেজায়, বেজার বেঠিক, বেডৌল, বেঢঙ, বেঢপ, বেতদ্বির, বেতমিজ, বেতরিবৎ, বেতস্কির, বেতাগ, বেতার, বেদখল, বেদড়া, বেদম** ('**বেদম** মার' = দম না নিয়ে মার বা একটানা মার), **বেদানা, বেধড়ক, বেনাম, বেনামা, বেনামী, বেপরোয়া, বেপর্দা, বেপালট, বেফাঁশ, বেবন্দোবস্ত, বেবাক, বেমক্কা, বেমানান, বেমালুম, বেয়াক্কেল, বেয়াদপি, বেরঙ, বেরসিক, বেসুর, বেসুরো, বেহদ্দ, বেহাত, বেহায়া, বেহাল, বেহিসাব, বেহিসাবী, বেহঁশ, বেহুদা, বেহেড**।

বেচারা : ২. *চারা নেই যার; চরে খাওয়ার উপায় নেই যার।* ৩. নিরুপায়, অসহায়, দীন, গরীব, নিরুপায় ব্যক্তি, poor fellow। (ব.শ.)। ৪. poor fellow অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. বিচরণের এলাকাকে চারা বলা যায়, যেখানে মানুষ তার রুজি-রোজগারের জন্য প্রত্যহ বিশেষ রূপে চরণ করে। বেচারার সেই চরণক্ষেত্র না থাকায় সে বেচারা। চারা ও বেচারা দুটো শব্দকেই ফারসি শব্দ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাভাষীর অজানা শব্দ নয় চারা ও বেচারা। এরা চর্ শব্দবংশের সদস্য। তাছাড়া, বেচারা ও 'প্রতিকার' অর্থে চারা শব্দটি গ্রামবাংলায় খুবই প্রচলিত। বেচারা শব্দের ব্যবহার সবাই কমবেশি জানেন; আর, চারা শব্দটির ব্যবহার হয় এইভাবে — 'বান-বন্যায় সব ডুবে গেছে। ছেলেপুলের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেব কী করে জানি না। ঘরবাড়ি গেছে, বাঁধে বাস করি, কোনো **চারা** নেই।'

ব্যক্ত, ব্যক্তি : ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ব্যগ্র (ব্যগ্রতা) : ১. বি + ✓অন্‌গ্‌ + র - কর্তৃবাচ্যে। ২. / বিগত অগ্র যাহার। (ব.শ.)। ৩. আকুল, ব্যাকুল, ব্যাসক্ত, ব্যাপৃত, সসম্ভ্রম। (ব.শ.)। ৪. eager অর্থে **ব্যগ্র** ও eagerness অর্থে **ব্যগ্রতা** কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্র**। **ব্যগ্র** কথাটির মানে হরিচরণ ঠিকই জানিয়েছেন — 'যার অগ্র চলে গেছে'। কারও 'অগ্রভাগ' চলে গেলে সে যদি ছটফট করে, তবে সেই অগ্র-হারাকে বলা হবে **ব্যগ্র**। পরিবারের কর্তাই তো পরিবারের মাথা বা **অগ্র**। সেই কর্তা কাজে গিয়ে যদি আর না ফেরেন, পরিবার তো **ব্যগ্র** হবেই। তার মানে, দেখা যাচ্ছে, **ব্যগ্র** শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে লোকে কারও 'অগ্রভাগ'-এর চলে যাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দেয় যার চলে গেছে তার কষ্টকে, ছটফটানিকে। সেই ছটফটানিকেই চিহ্নিত করা হয় **ব্যগ্রতা** বলে। অর্থাৎ, **ব্যগ্র** তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের চেয়ে তার ব্যঞ্জনা অর্থে বেশি প্রচলিত। তার মানে, **ব্যগ্র** শব্দের অর্থ হল, 'বিগত অগ্র

যাহার'; কিন্তু লোকে তার মানে বোঝেন 'ব্যাকুল' বা anxious। দ্র. **অব্যগ্র**।

ব্যঙ্গ (ব্যঙ্গ্য, ব্যাঙ্গ, ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী — বেঙ, বেঙ্গমা) : **১.** বি + অঙ্গ। **২.** ***ব্যঙ্গ*** *=* ***বি*** *(বিকৃত, বিগত)* ***অঙ্গ*** *যাহার।* ***ব্যঙ্গ্য*** *=* ***ব্যঙ্গ*** *থাকে যাহাতে।* ***ব্যাঙ্গ*** *=* ***ব্যঙ্গ*** *হইতে জাত।* ***ব্যাঙ্গমা*** *= সীমিত* ***ব্যাঙ্গ*** *-এর আধার যে;* ***ব্যাঙ্গমী*** *= সীমায়িত* ***ব্যাঙ্গ*** *গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে।* / **ব্যঙ্গ** = বিকৃত, বিগত অঙ্গ যাহার; যাহা বিকৃতাঙ্গ দ্বারা করণীয়। **ব্যঙ্গ্য** = (যাহা) ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বোধ্য। (ব.শ.)। **৩. ব্যঙ্গ** = বিকৃত অবয়ব, অঙ্গহীন, অদৃঢ় অবয়ব, বিকল, বিকৃতপাদ, চক্রাদিহীন, বিশৃঙ্খল, বিকলাঙ্গ জন, ভেক, অঙ্গবিকারজনক মুখরোগভেদ, উপহাস, ঠাট্টা। **ব্যঙ্গ্য** = প্রকাশ্য, বক্রোক্তি-সূচিত, ব্যঞ্জনাবৃত্তি-প্রতিপাদ্য অর্থ। **ব্যাঙ্গ (বেং, বেঙ, বেঙ্গ, ব্যাং, ব্যাঙ)** = ভেক। **ব্যাঙ্গমা (বেঙ্গমা)** = বিহঙ্গমসমা, ভারযষ্টি, বাঁক। **ব্যাঙ্গমী (বেঙ্গমী)** = বেঙ্গমার স্ত্রী। (**বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী** — উপকথার ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী। উপকথার এই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী একটু পৃথক; ইহারা দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট এবং দিব্যজ্ঞানে সকল বিষয় জানিতে পারে।)। (ব.শ.)। **৪.** mockery অর্থে **ব্যঙ্গ** প্রচলিত, frog অর্থে **ব্যাঙ** শব্দটি নানারকম বানানে প্রচলিত এবং **ব্যঙ্গ্য** অপ্রচলিত। ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার গল্পে **ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী** রয়েছে। গ্রামবাংলায় তার প্রচলন কমবেশি থাকলেও অ্যাকাডেমিতে বা শহরে তা বর্তমানে অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অর্থ**, **বিহগ**। শরীর বাঁকিয়ে, মুখ বাঁকিয়ে অঙ্গভঙ্গি করাকে '**ব্যঙ্গ** করা' বলে। কেননা, তাতে 'অঙ্গ বিকৃত করা হয়'। কিন্তু এরূপ '**বিকৃত-অঙ্গ**'কে বা **ব্যঙ্গ**কে লোকে ঠাট্টা বা mockery (taunt) বলে মনে করে কেন? অর্থাৎ, বাঁকা অঙ্গকে ঠাট্টা বোঝে কেন?

এর উত্তর হল, সবাই সেরকম বোঝে না। **ভগীরথ** জীবন্ত মাংসপিণ্ড রূপে পড়ে ছিল, নড়া চড়া করছিল, তাতে কারো মনে হয়নি যে, সে কাউকে ঠাট্টা করছে; কিন্তু **অষ্টাবক্র** (আটবাঁকা) মুনির মনে হল যে, ঐ মাংসপিণ্ডটি তাঁকে ঠাট্টা করছে, **ব্যঙ্গ** করছে। অর্থাৎ বিকৃত অঙ্গভঙ্গি তারই কাছে ঠাট্টা মনে হতে পারে, যে নিজেই কিছুটা বিকৃতাঙ্গ। কেন এরকম হয়?

ভূমির উপরে একটি খাড়াই সরলরেখা স্কেল ব্যবহার না করে টেনে ফেলুন। এইবার তার পাশেই একটি আঁকাবাঁকা রেখা একই ভাবে খাড়াই টেনে ফেলুন। দেখবেন, সরলরেখাটি সরল থাকলে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু সেই সরলরেখাটি যদি খানিকটা বাঁকা হয়ে গিয়ে থাকে, তখনই সমস্যা হয়। দেখা যায়, বক্ররেখাটিই যেন বার বার সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে — তুমি তো আমার মতোই বেঁকা! এভাবেই স্বয়ং ত্রিভঙ্গমুরারি আমাদের বক্রতা দেখিয়ে দেন। এভাবেই **বিকৃত অঙ্গ** বা **ব্যঙ্গ** আমাদের **বিকৃত অঙ্গ**কে দেখিয়ে দেয়, **ব্যঙ্গ** করে। তাই যার অঙ্গ বিকৃত নয়, **ব্যঙ্গ** তাকে লজ্জা দেয় না, কিন্তু যার অঙ্গ ইতোমধ্যেই খানিকটা বিকৃত হয়ে গেছে, লজ্জা পায় সে-ই। তবে কিনা, এই **ব্যঙ্গ** দৈহিক অঙ্গভঙ্গির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর মানসিক বক্রতার ক্ষেত্রে। কারও মন বেঁকে গেলে সে যে ব্যবহার করে, তাকেই একটু বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে, সেটিই **ব্যঙ্গ** করা অর্থে বোধ্য হয়। যে শাসনব্যবস্থা ইতোমধ্যেই বিকৃতাঙ্গ হয়ে গেছে, তাকেই একটু বাড়িয়ে দেখালে শাসনব্যবস্থার বিকৃতাঙ্গ সকলের চক্ষুগোচর হয়ে যায়।

কিন্তু **ব্যাঙ্গ** বা **ব্যাঙ**? সে বেচারা জন্মসূত্রেই এমন বিকৃতাঙ্গ হয়ে বসে আছে যে, তাকে দেখলেই মায়া হয়। এমনতরো সত্তাকে **ব্যঙ্গ** করতে নেই; সে যে জন্মসূত্রে 'বিকৃত অঙ্গ' বা **ব্যঙ্গ** হইতে জাত। তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা রুচিবিরোধী। সে ক্ষেত্রে **ব্যঙ্গ** করাকে সংযত হতে হয়, সীমায়িত হতে হয়। সেই সুবাদে সমাজের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বিকৃতাঙ্গকে আঘাত না করে সত্যের বয়ান দেয় যে, তাকে তাই **ব্যাঙ্গমা** ও **ব্যাঙ্গমী** বলে। বাংলাভাষীর মনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই **ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী**। তাদের বয়ান তাই কাউকে লজ্জা দেয় না, কেবল প্রতিক্রিয়াহীনভাবে আমাদের শুভচিন্তা ও শুভকর্মের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে। যেমন **খেলা**র বিষয়ে আমরা আমাদের অভিমত জানিয়েছি, যে, যে-সভ্যতা আর **খেলা** বা **ক্রীড়া** আবিষ্কার করতে পারবে না, সেই সভ্যতার মৃত্যু নিশ্চিত; সেইরূপ যে-সভ্যতা আর **ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী**দের বয়ান সৃষ্টি করতে ও তা শ্রবণ করতে ব্যর্থ হবে, তারও মৃত্যু অনিবার্য।

ব্যতিব্যস্ত (ব্যস্ত, ব্যস্তসমস্ত, অস্তব্যস্ত, ব্যস্তানুপাত, শশব্যস্ত) : **১. ব্যতিব্যস্ত** = বি-অতি + বি + ✓অস্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। **২.** ***ব্যস্ত*** *=* ***বিপরীত*** *বা* ***বিকল্প*** *অস্তিত্ব তারিত যাহাতে।* ***ব্যতিব্যস্ত*** *= অতি বিপরীতভাবে* ***ব্যস্ত*** *যে।* ***ব্যস্তসমস্ত*** *=* ***ব্যস্ত*** *ও* ***সমস্ত*** *(সম্যক অস্তিত্ব তারিত যাহাতে)।* / **শশব্যস্ত** = শশকের তুল্য ব্যস্ত যে। (ব.শ.)। **৩. ব্যস্ত** = বিক্ষিপ্ত, বিভক্ত, নিরস্ত, এক, অসমস্ত, পৃথক, বিপরীত, ব্যাপ্ত, ব্যাকুল। **ব্যতিব্যস্ত** = অতিব্যাকুল, বিব্রত। **ব্যস্তসমস্ত** = ব্যস্ত ও সম্যক ব্যস্ত, অতিব্যস্ত, মহাব্যাকুল। **শশব্যস্ত** = অতিব্যস্ত, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অতিব্যাকুল। (ব.শ.)। **৪.** busy অর্থে **ব্যস্ত** এবং very busy অর্থে **ব্যতিব্যস্ত**, **ব্যস্তসমস্ত** ও **শশব্যস্ত** প্রচলিত। **অস্তব্যস্ত** শব্দটি হিন্দিতে ব্যবহৃত হয় busy অর্থে। গণিতে ব্যবহারের জন্য **ব্যস্তানুপাত** শব্দটি তৈরি হয়েছে ব্রিটিশ যুগের শেষে। **৫. অস্ত** শব্দের অর্থ হল, 'অস্তিত্ব তারিত যাহাতে'। দিনের কাজ শেষে সূর্য **অস্ত** যায়, অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট পথ ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে স্থিতি লাভ করে; যেন কেউ তাকে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যটির দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। তাই **অস্ত** শব্দের একটি অর্থ হল **ক্ষিপ্ত**। মানুষও তেমনি সারাদিনের কাজের শেষে তার পরিবারে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে **অস্ত** লাভ করে। কিন্তু মানুষটির যদি আর একটি পরিবার থাকে, দ্বিতীয় স্ত্রী অন্যত্র থাকে, কিংবা চাকরিটিই যদি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর মতো কালভক্ষণকারী হয়? তাহলেই তাকে দ্বিতীয় পরিবারটিতেও যেতে হয়; **বিপরীতে**ও **অস্ত** যেতে হয়। তখন স্বভাবতই দুদিকের টানাটানিতে মানুষটি **বি** + **অস্ত** = **ব্যস্ত** হয়ে পড়ে। তখন **ব্যস্ত** শব্দটি তার অভিধার্থের চেয়ে ব্যঞ্জনার্থে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; **বি**পরীতে বা **বিকল্প** স্থানে **অস্ত** লাভ করাটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে না, ছুটোছুটির ব্যাকুলতাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যাকে **ব্যস্ততা** বলা হয়ে থাকে। হিন্দিতে একেই বলে **অস্তব্যস্ত**। তার মধ্যে যদি একবার দুই পরিবারের মধ্যে আর্থিক বা মানসিক ঝামেলা দেখা দেয়, মানুষটির **অতিব্যস্ত** বা very busy না হয়ে

উপায় থাকে না। এইরূপ অবস্থাকে বলা হয় **শশব্যস্ত** বা 'শশকের মতো চঞ্চল'। ... এমন সময়, ধরা যাক, সেই **অতিব্যস্ত** অবস্থায় যখন দিন চলছিল, সেই সময় দেশে বন্যা হয়ে গেল এবং তাতে মানুষটির একটি বা দুটি পরিবারই বন্যাকবলিত হয়ে গেল। মানুষটি তখন দিক দিশা হারিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে থাকবে; কোনদিকে যাবে না-যাবে, কী করবে না-করবে ঠিক করতে পারবে না; কেবল ছুটোছুটি করতে থাকবে। তখন তো সে **বি** + **অতিব্যস্ত** = **ব্যতিব্যস্ত** হবেই! তার মানে, **ব্যস্ত, অতিব্যস্ত, শশব্যস্ত** পর্যন্ত তবুও মানুষটিকে পাওয়া যায়, কিন্তু **ব্যতিব্যস্ত** অবস্থায় মানুষটি আর মানুষ থাকে না, প্রায় পাগল হয়ে যায়। আজকের বিশ্বায়িত সভ্যতার গৌরব (?) এইখানে যে, সে অধিকাংশ সভ্যমানুষকে **ব্যতিব্যস্ত** করে রাখতে পেরেছে!

এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু **ব্যস্ত** মানে 'এক' কেন? এবং **সমস্ত** মানেই বা **বহু** কেন? এইখানে এসে সমস্যায় পড়তে হয়। এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় হিন্দির **অস্তব্যস্ত** শব্দ থেকে। **অস্ত** মানে একদিকে ছোঁড়া হয়ে যাওয়া বা ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, আর, **ব্যস্ত** মানে বিকল্প দিকে ছোঁড়া হয়ে যাওয়া। বাংলায় **অস্তব্যস্ত** শব্দটি নেই, তার বদলে রয়েছে **ব্যস্ত**। আমাদের **ব্যস্ত** মানে **অস্ত** এবং **ব্যস্ত**, দুটোই। আর **সমস্ত** মানে ব.শ. বলেই গেছেন 'একত্রে ক্ষিপ্ত'। তার মানে, **অস্ত** = একদিকে এক স্থানে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পড়ে স্থির হওয়া। **ব্যস্ত** = বিকল্প স্থানে বা দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পড়ে স্থির হওয়া। আর, **সমস্ত** = একস্থানে পতিত সকল **অস্তসমূহ**। অর্থাৎ, আপনি ক্ষেতের মূলো তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে এক স্থানে জমা করলে, সেই জমা করা মূলোগুলিকে **সমস্ত** মূলো বলা হয়। অর্থাৎ কিনা, **সমস্ত** শব্দের অর্থ হল, এক স্থানে **অস্ত** যাওয়া সকল বস্তু বা বিষয়।

আমাদের পূর্বতন যে বাংলাশব্দজ্ঞানীরা **ব্যস্তানুপাত** শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা জানতেন, **অস্ত** ও **সমস্ত** শব্দদুটি পরস্পরের বিপরীত। কিন্তু যেহেতু বাংলায় **অস্ত** শব্দের অর্থ **ব্যস্ত** শব্দের ভিতরেই ধরে রাখা আছে, তাই তাঁরা একদিকে যেমন **ব্যস্তসমস্ত** শব্দটি তৈরি করেন, অন্যদিকে তেমনি তৈরি করেন **ব্যস্তানুপাত**।

ব্যাকরণ : ১. বি-আ + ✓কৃ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বিশেষ আকরণ (করণের আশ্রয়) সমূহ থাকে যাহাতে।* / যাহা দ্বারা বা যাহাতে প্রকৃতিপ্রত্যয়ভেদে শব্দ ব্যুৎপাদিত হয়। (ব.শ.)। ৩. ব্যাখ্যান, স-বিস্তর বর্ণন, ব্যক্তিভাব, সংশয়, নামরূপ দ্বারা জগতীবিকাশন, বেদাঙ্গবিশেষ, শব্দশাস্ত্র, শিল্পনৈপুণ্য। (ব.শ.)। ৪. Grammar অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **পুরুষ-প্রকৃতি, প্রকৃতি-প্রত্যয়, প্রত্যয়**। ভাষাতত্ত্ব চলে তার দুটি পায়ের উপর ভর করে — **ব্যাকরণ** ও **নিরুক্ত**। যে বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা শব্দ তৈরি করার ও শব্দের পাশে শব্দ গেঁথে কথা বলার নিয়মগুলি জানা যায়, তাকে **ব্যাকরণ** বলে। আর, কথিত শব্দের ভেতর থেকে অর্থ নিষ্কাশনের নিয়মগুলি শেখায় যে শাস্ত্র, তাকে **নিরুক্ত** বলে। স্বভাবতই **ব্যাকরণ** খানিকটা আমাদের **মহাকরণ**-এর মতো বা কারখানার মতো। **মহাকরণে** (writers' building-এ) বহু **করণ** (কর্মচারী) থাকে যারা সরকারের **করণিক**-এর কাজ করে। মানুষ নামক সরকারের মাথায় শব্দ তৈরি করারও একটি কারখানা থাকে, সেই কারখানাটিকে **ব্যাকরণ** বলা যায়। সেখানে **পুরুষ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ, কারক, লিঙ্গ, বচন, কর্তা, ক্রিয়া, কাল, সন্ধি, সমাস** ... ইত্যাদি **করণের** সাহায্যে অজস্র ধাতু ও শব্দকে কার্যকরী রূপে গড়ে তোলা হয় এবং তাদের অজস্র ধাতুরূপ শব্দরূপ উৎপাদন করা হয়। তারপর দেখিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলি গাঁথতে হবে কেমন করে। মানুষের মাথার ভিতরে চলমান এই শব্দোৎপাদন-কারখানাটির বা **মহাকরণ**টির স্বভাবচরিত্র কাজকারবার বুঝে নিয়ে, আমাদের প্রাচীন বাংলার পণ্ডিতেরা সেগুলি যে গ্রন্থে লিখে রাখেন, তাকেও **ব্যাকরণ** বলে। তাই দেখে ব.শ. দুর্গাদাসের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন — 'যাহা দ্বারা বা যাহাতে প্রকৃতিপ্রত্যয়ভেদে শব্দ ব্যুৎপাদিত হয়' তাকে **ব্যাকরণ** বলে।

পাশ্চাত্যের ভাষাতত্ত্ব কিন্তু সে তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল ও হীন, তার অর্জনও খুবই কম। উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত তাদের **নিরুক্ত** বা semantics নামে কোনো শাস্ত্রই ছিল না, এখনও যেটি আছে, সেটি এতই নিরর্থক যে, 'নেই' বললেই ঠিক বলা হয়। আর, **ব্যাকরণ** বা syntax বা Grammar বলতে যেটি তাঁরা অনুসরণ করে থাকেন, সেটিও খুব একটা কাজের নয়। তার অবস্থা আমাদের 'sick industry'র মতো, অর্ধেক কাজ করে তো অর্ধেক করে না, বহু ক্ষেত্রেই সে নীরব থাকে। কার্যত, মানুষের মাথার ভিতরেই যে শব্দ তৈরি করার কারখানাটি চলে, পাশ্চাত্যের গ্রামার সেকথা সম্পূর্ণভাবে বুঝেই নিতে পারেনি। ফলে, পাশ্চাত্যবাসী কথা বলে যাচ্ছেন, আর গ্রামার তার থেকে কালে কালে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে, ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। যে কারণে সম্প্রতিকালে ইংরেজ পণ্ডিতদের মনে হচ্ছে, প্রচলিত 'লিখিত গ্রামার' মান্য করার দরকার নেই, ভাষা দিয়ে কাজ চালানো গেলেই হল; সেকারণে এখন Practical Grammar' নামধেয় গ্রন্থের এত চাহিদা। ফলে, আজকের পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চা করার মতো ভাষাই লুপ্ত হতে বসেছে।

***বিচ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপচয়, অবিবিক্ত, অবিবেক, অবিবেকী, অবিবেচক, অবিবেচনা, উপচয়, নিশ্চয়, পরিচয়, প্রচয়, বিচ্, বিচ, বিচয়, বিচয়ন, বিবিক্ত, বিবেক, বিবেকজ্ঞ, বিবেকজ্ঞান, বিবেকপদবী, বিবেকবিরহ, বিবেকবিশ্রান্ত, বিবেকভ্রষ্ট, বিবেকমন্থর, বিবেকিতা, বিবেকী, বিবেচক, বিবেচন, বিবেচনা, বিবেচনীয়, বিবেচিত, বিবেচ্য, বেচ, বেচন, বেচা, বেচাকেনা, বেচান, বেচারাম, বেচি, বেচুনি, সঞ্চয়।

বিচ্ = গতিশীল বাহীর চয়ন। **বিচ** = গতিশীল বাহীর চয়ন যাহাতে।

বিচয় (অপচয়, উচ্চয়, উপচয়, নিচয়, নিশ্চয়, পরিচয়, প্রচয়, সঞ্চয়) : ১. বি + ✓চি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিচয়*** = *বিশেষ চয় থাকে যাহাতে।* ***বিচয়ন*** = ***বিচয়*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. **বিচয়** = অন্বেষণ, অনুসন্ধান, পুষ্পাদিচয়ন।

অপচয় = হানি, ধ্বংস, পরাভব, অপহরণ, ক্ষতি, ব্যয় ... ইত্যাদি। **উচ্চয়** = পুষ্পফলাদির সংগ্রহ, চয়ন, অভ্যুদয়, প্রকর, স্তূপ ... ইত্যাদি। **উপচয়** = বৃদ্ধি, অতিরেক, উন্নতি, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, রাশি ... ইত্যাদি। **নিচয়** = সমূহ, নিকর, সঞ্চয়ন, রাশিকৃত দ্রব্য, নিশ্চয়। **নিশ্চয়** = নিঃসংশয়জ্ঞান, নির্ণয়, 'ইহা এইরূপই' — ঈদৃশ বিষয়পরিচ্ছেদ, সঙ্কল্প ... ইত্যাদি। **পরিচয়** = বিশেষ জ্ঞান, পরিজ্ঞান, অভ্যাস, প্রণয়, দীর্ঘসাহচর্য্য। **প্রচয়** = যষ্ট্যাদি দ্বারা ফলপুষ্পের চয়ন, চৌর্য্যপূর্ব্বক পুষ্পাদির চয়ন, সমূহ, নিচয়, উপচয়, বৃদ্ধি। **সঞ্চয়** = সংগ্রহ, সমাহরণ, সঞ্চিতদ্রব্য, রাশি, সমষ্টি ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. **বিচয়, উচ্চয়, নিচয়, প্রচয়** অপ্রচলিত। বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বিবেক**। উপসর্গ যোগে **চয়** শব্দটির যে অর্থ বলা হয়ে থাকে, তা প্রায়শই ভুল ধারণা তৈরি করে থাকে। কিন্তু এদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে নির্ভর করলে আমরা সঠিক অর্থটি বুঝে নিতে পারি। তবে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হয়, দৃশ্য চয়নের চেয়ে অদৃশ্য চয়নেই **চয়** শব্দের প্রয়োগ ছিল বেশি। উপসর্গগুলি সেই অদৃশ্য চয়নের দিশানির্দেশ করে।

যেমন **অপচয়** শব্দটির কথাই ধরা যাক। এর অর্থ হল **অপ** চয়ন করা, অর্থাৎ ঠিকঠাক চয়ন না করা। তার ফলে অনেক দরকারি জিনিস পড়ে থেকে যাবে এবং সেটি ক্ষতিকর। সেই কারণে **অপচয়** বলতে আমরা 'দরকারি বা কাজের জিনিস নষ্ট করে ফেলা' বুঝি। **উচ্চয়** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল উদ্‌লোকে চয়ন করা অর্থে। শব্দটি এখন অপ্রচলিত। **উপচয়** শব্দটি আজও খুবই ব্যবহৃত হয়, তবে তার চেহারা খানিকটা বদলে গিয়ে হয়ে গেছে 'উপচে-যাওয়া', 'উপচান' ইত্যাদি। **নিচয়** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল **নিকল** শব্দের মতো করে, যদিও শব্দটি এখন অপ্রচলিত। **নিশ্চয়** এমন চয়নের কথা বলে, যে চয়নটি সঠিক, অপরিবর্তনীয়, অবশ্যমান্য ... ইত্যাদি। আর, **পরিচয়** হল কথিত বিষয় বা বস্তুর সার্বিক চয়ন। এটির বাহ্য প্রয়োগ একেবারেই হয় না, হয় সম্পূর্ণ মানসিক প্রয়োগ। **বর্ণপরিচয়** মানে হল, **বর্ণের** যতরকম রূপ হতে পারে, তার সবগুলিকে চয়ন করে আনা অর্থাৎ সবগুলিকে জানা বা বোঝা। **প্রচয়** কথাটি যদিও **প্রকৃষ্ট** চয়ন বোঝায়, কিন্তু তার সেরকম ব্যবহার দেখা যায় না। আর, **বিচয়** কথাটির মানে হল, বহু সম্ভাবনার মধ্যে বিশেষটিকে চয়ন করা। তবে **সঞ্চয়** কথাটির অর্থ সবাই জানেন, এ হল সম্যক চয়ন। ... দ্র. **বিবেক**।

বিবেক (বিবেচক, বিবেচনা, বিচার-বিবেচনা) : ১. বি + ✓বিচ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিবেক** = **বিশেষ** দিশায় **বিচয়**ন থাকে যাহাতে। **বিবেচনা** = **বিশেষ** দিশায় **বিচয়ন**-এর আধার যে। **বিবেচক** = **বিবেচনা** করে যে।* / **বিবেক** = প্রকৃতিপুরুষের বিশেষ জ্ঞান (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **বিবেক** = বিলক্ষণভাব, পৃথগাত্মতা, পৃথগ্‌ভাব, বিভাগ, বিচার, বিবেচন, জ্ঞান, বোধ, চৈতন্য, জীবনে বিরাগ। **বিবেচক** = বিবেচনাকারক, বিবেকী, জ্ঞানী। **বিবেচনা** = বিচার। (ব.শ.)। ৪. conscience অর্থে **বিবেক**, consider অর্থে **বিবেচনা** এবং considerate অর্থে **বিবেচক** প্রচলিত। **বিচার-বিবেচনা** শব্দটির অবস্থা **আশেপাশের** মতো, **বিচার** ও **বিবেচনা** দুটি শব্দের আলাদা মানে থাকা সত্ত্বেও আজকাল এর মানে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র **বিবেচনা** বা consider। ৫. দ্র. **পাবক**। আমাদের চাহিদাসমূহ, ভাললাগা-মন্দলাগা ... ইত্যাদি অজস্র বিষয় রয়েছে, যেগুলির ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় — কোন পথ গ্রহণ করব, কোন দিকে যাব, কোনটা করব, কোনটি করব না, কোনটি করা উচিত বা অনুচিত ... ইত্যাদি। এ হল একপ্রকারের 'চয়ন করা'; বহু সম্ভাবনার ভিতরে বিশেষ একটিকে বেছে নেওয়া। একেই বলে **বিচয়**ন করা। সেইরূপ 'বিশেষভাবে **বিচয়**ন করে যে', সেই হল **বিবেক**। এই **বিবেক** নামক সত্তাটি প্রত্যেক মানুষের মনের ভিতরে বাস ক'রে তার 'বিশেষ দিশায় বিচয়নের কাজটি করে দেয়' বলেই তাকে **বিবেক** বলা হয়। যতদূর জানা গেছে, কালের দূষণে মানুষের অনেক কিছু দূষিত হয়ে গিয়ে থাকলেও এখনও এই **বিবেক** সত্তাটিকে দূষিত করা যায়নি। এখনও সে মানুষের মনের গভীরে নিষ্কলুষভাবে বিরাজমান থেকে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, 'বিশেষ **বিচয়**নের' কাজটি বা বাছাবাছির কাজটি করে দেয়, সংশ্লিষ্ট মানুষটি তদনুযায়ী তার জীবনপথে চলতে পারুক আর নাই পারুক। মোটকথা, **বিবেক** মানুষের মনের ভিতরে বাস করে এখনও যথাযথ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে; যদিও মানুষ অনেক সময়ই সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে পারে না — প্রয়োজনীয় পরিমাণে জ্ঞানবল কিংবা বাহুবল বা অর্থবল অথবা জনবল ইত্যাদি না থাকায়। যেদিন সেরকম বলের সংস্থান হয়ে যাবে, সেদিন সেই মানুষটি যে তার **বিবেক**-এর সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলবে, এমন কথা যথেষ্ট জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মানুষের ভেতরে বসে **বিবেক** তার 'বিশেষ বিচয়ন'-এর কাজটি করে কীভাবে? এর উত্তর হল সাধারণত 'অব্যক্তভাবে' (tacitly) এবং কখনো-সখনো 'ব্যক্তভাবে' (explicitly) করে। সবচেয়ে বড় নচ্ছার মন্দ লোকটি যখন পুলিশের গুলি খেয়ে 'জল' 'জল' বলে কাতরায়, আমাদের বুড়িমা জল নিয়ে তাকে দিতে যান; কেন, সেকথা কোনোদিন তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেননি, পারবেনও না। এ হল **বিবেকের** 'অব্যক্তভাবে' সক্রিয় হওয়া। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করা উচিত **বিবেচনা** করেন, তখন তাঁর **বিবেক** কাজ করে 'ব্যক্তভাবে', যে **বিবেক** শরৎচন্দ্রকে 'পথের দাবী'র জন্য কাঙ্ক্ষিত সমর্থন যোগায় না।

বিবেক-এর এই যে 'ব্যক্তভাবে' সক্রিয় হওয়া, এ প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বসূরিদের ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। তাঁরা মনে করতেন, 'বিশেষ বিচয়ন' করতে গেলে 'প্রকৃতিপুরুষের বিশেষ জ্ঞান' থাকা দরকার। সেই জ্ঞানই মানুষের মনের ভিতরে **বিবেক**রূপে সক্রিয় থাকে, তা সে-বিষয়ে মানুষটি সচেতন থাকুক আর নাই থাকুক। তার মানে, এই বিশ্বজগৎ যে **প্রকৃতি** ও **পুরুষ** রূপে বিভক্ত হয়ে কামসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে, সেই সব বিষয়ে জ্ঞান থাকলে তবেই সচেতনভাবে বা 'ব্যক্তভাবে' 'বিশেষ বিচয়ন' করা সম্ভব হয়। দ্র. **পুরুষ, প্রকৃতি**। আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব' নিবন্ধটিতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

কার্যত, **বিবেক** নামক সত্তাটিকে আমাদের পূর্বসূরিগণ এত

গভীরভাবে চিনেছিলেন যে, তাঁদের রেখে যাওয়া কাব্য-সঙ্গীতাদিতে এই **বিবেক** মাঝে মাঝেই আবির্ভূত হয়ে উচিত কীর্তিগুলির পক্ষে আপন ভূমিকা পালন করে যেত। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের উত্তরাধিকারও কিছু কম ছিল না। ইউরোপের মধ্যযুগের নাটকে দেখানো হত যে, মানুষের জীবনের বিভিন্ন সন্ধিকালে তার সামনে উপস্থিত হয় Good Angel, Bad Angel নামের দুই রকমের সত্তা। Good Angel দিত কল্যাণকর পরামর্শ; Bad Angel, যে আসলে মানবশত্রু Satan-এর অনুচর (= Devil), দিত কুপরামর্শ। Good Angel করত **বিবেক**-এর কাজ। (দ্র. Marlowe-র Dr. Faustus নাটক)।

পদ্মপুরাণে একটি বাক্য রয়েছে এইরকম — '**বিবেক** উৎপন্ন হইলে যাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে **অসুর** বলে।' কে এই **বিবেক**?

সভ্য হওয়ার পর মানুষ তার চিন্তার সুবিধার জন্য বহু বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে; যদিও এমন বহু বিষয় আছে, যাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়নি। আর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হলে, বিষয়টির নিম্নসীমায় বা ঊর্ধ্বসীমায়, কোথাও একটা স্থির বিন্দু বা রেখাকে চিহ্নিত করতে হয়। আমরা যেমন 'তথাকথিত ঈশ্বর'-এর একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছি এরকম — 'যিনি আত্মহত্যায় অক্ষম।' একইভাবে আমাদের পূর্বসূরিগণ **অসুর** শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন এইভাবে — '**বিবেক** উৎপন্ন হইলে যাহার মৃত্যু হয় তাহাকে **অসুর** বলে।' একালে বসে আপনি যদি কোনো **অসুর**কে চিনতে চান, তাহলে সর্বভুক সরকারি সংগঠনগুলির যেকোনো একটিকে চিহ্নিত করতে পারেন। যেমন ধরুন, 'সরকারি পূর্ত সংগঠনগুলি'। জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা **অসুরের** মতো খেয়ে ছাই করে দিতে এদের জুড়ি নাই। কিন্তু কোনোদিন যদি **বিবেক** উৎপন্ন হয়ে যায়, তা সেই সরকারি সংগঠনের পরিচালকের মনে উৎপন্ন হোক, কিংবা সমাজের মনেই উৎপন্ন হোক, তৎক্ষণাৎ এই **অসুর** সংগঠন ভেঙে পড়বে, সন্দেহ নাই। ...

তবে কিনা এই **বিবেক**-এর জন্ম হয়েছিল সভ্যযুগের সূত্রপাতের (অর্থাৎ **দক্ষযজ্ঞের**) আগে। আদিতে, সনাতন যুগে, সকল মানুষের **বিবেক**জ্ঞান ছিল। কিন্তু দক্ষযজ্ঞের মাধ্যমে সমাজে **দক্ষনীতি** প্রতিষ্ঠিত হলে পর কিছু মানুষের **বিবেক**জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। কারণ, সেই দক্ষযজ্ঞের মহাসংগ্রাম-অন্তে শিবপন্থীগণ দক্ষপন্থীদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, যে, দক্ষপন্থীদের **বিবেক**জ্ঞান আর থাকবে না; কারণ তারা একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি গ্রহণ করেছে, **অবিদ্যা**কে **তত্ত্ববিদ্যা** বলে মনে করেছে এবং তদনুযায়ী সভ্যযুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সেজন্যেই অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত স্পেশালিস্ট দক্ষ মানুষদের **বিবেক**জ্ঞানের অভাব আজও স্পষ্ট দেখা যায়। **বিবেক** থাকলে কি কোনো মানুষ সর্বপ্রকারের জীবজন্তুসহ তাদের অরণ্য পাহাড় ভূতল সমুদ্র ধ্বংস ক'রে নিজেদের সুবিধা করার কথা ভাবতে পারে? **বিবেক** থাকলে কি তারা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটিয়েও নির্লজ্জের মতো যন্ত্রসভ্যতার পক্ষে পাণ্ডিত্য ফলিয়ে ওকালতি করতে পারত? **বিবেক** থাকলে কি এই **দক্ষেরা** 'ইন্ডাস্ট্রি' নামক দৈত্যের পায়ে কোটি কোটি মানুষের রক্ত-ঘাম-সময় ঢেলে বর্তমান সভ্য (?) যুগের সভ্য (?) কার্যকলাপকে সমর্থন করতে পারত? ...

বিচার-বিবেচনা শব্দটি দুরকম ক্রিয়ার কথা বলে। কৃত **আচরণ**কে বিশেষ **আচরণ** বা বিকল্প **আচরণ**-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখাকে বলে **বিচার** করা। আর বহু সম্ভাবনার মধ্যে 'বিশেষ বিচয়ন' করাকে বলে **বিবেচনা** করা। ...

যাই হোক, শেষ কথা এই যে, সেকালে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা ছিলাম মানসসম্পদে রাজা, বাহ্যসম্পদে প্রায় ফকির। একালে আমরা বাহ্যসম্পদে রাজা হয়েছি, মানসসম্পদে প্রায় ফকির হয়ে আত্মগরিমাহীন গেছি। তবে এখনও একজন আছেন, যিনি আমাদের মনের গভীরে বসে আমাদের আত্মগরিমার পতাকাটিকে এখনও **ভূলুণ্ঠিত** হতে দেননি। আমাদের মনে স্বয়ং **পরমাপ্রকৃতি**র প্রতিভূরূপে ইনি আজও বিরাজ করছেন, ইনিই **বিবেক**। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের ইনিই **ঈশ্বর**। এঁকে উল্লঙ্ঘন করলে হিটলারের হিটলারত্ব, স্টালিনের স্টালিনত্ব, কুবেরের কুবেরত্ব ... থাকে না, থাকবে না। ইনি যেদিন থাকবেন না, সেদিন এই মানবসভ্যতাও থাকবে না।

বিশ্রবণ, বিশ্রবা : দ্র. **বিশ্বশ্রবা**।

বিদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনিবেদিত, অনির্বিণ্ণ, অনির্বেদ, অবিদিত, অবিদ্যমান, অবিদ্যা, অবিদ্বান, অবেদন, অবেদ্য, আবেদক, আবেদন, আবেদনীয়, আবেদিত, আবেদী, আবেদ্য, আবেধ্য, নিবেদক, নিবেদন, নিবেদিত, নির্বেদ, প্রতিবেদন, বন্দি, বিৎ(দ্), বিত্ত, বিত্তি, বিদ্, বিদ, বিদকুটে, বিদখুটে, বিদিত, বিদিতবেদ্য, বিদুর, বিদুষী, বিদ্দমান, বিদ্ধা, বিদ্যমান, বিদ্যা, বিদ্যাগম, বিদ্যাগুরু, বিদ্যাতীর্থ, বিদ্যার্থী, বিদ্যাদাতা, বিদ্যাদান, বিদ্যাদিগ্‌গজ, বিদ্যাদেবী, বিদ্যাধন, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, বিদ্যাধিদেবতা, বিদ্যাধ্র, বিদ্যানিধি, বিদ্যানুপালী, বিদ্যান্ত, বিদ্যাপ্রদান, বিদ্যাবল, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাবান, বিদ্যাবিক্রয়, বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিদ্যাবিশারদ, বিদ্যাবিহীন, বিদ্যাবৃদ্ধ, বিদ্যাব্যসন, বিদ্যাব্রতস্নাতক, বিদ্যামদ, বিদ্যামন্দির, বিদ্যারণ্য, বিদ্যারত্ন, বিদ্যারম্ভ, বিদ্যার্থী, বিদ্যালাপ, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাস্নাত, বিদ্যাস্নাতক, বিদ্যোৎসাহী, বিদ্যাহীন, বিদ্বজ্জন, বিদ্বৎকল্প, বিদ্বত্তর, বিদ্বত্তম, বিদ্বত্তা, বিদ্বত্ত্ব, বিদ্বান, বিদ্বিট্(ষ্), বিদ্বিষ্ট, বিদ্বেষ, বিদ্বেষক, বিদ্বেষণ, বিদ্বেষ্টা, বিন্দ, বিন্দক, বিন্দু, বিন্দুচিত্র, বিন্দুজাল, বিন্দুবাসিনী, বিন্দুবিসর্গ, বিন্দুমাধব, বিন্দুয়ান, বিন্দুরেখা, বিন্দুসরঃ, বিন্দুসরোবর, বিন্দুহ্রদ, বিন্ধ, বিন্ধশালী, বিন্ধা, বিন্ন, বেত্তা(তৃ), বেদ, বেদকণ্ঠ, বেদকর্ত্তা, বেদগুহ্য, বেদচক্ষুঃ, বেদজননী, বেদজ্ঞ, বেদতত্ত্বার্থ, বেদদর্শী, বেদদৃষ্ট, বেদধারণ, বেদধ্বনি, বেদন, বেদনা, বেদনাদ, বেদনিধি, বেদনিন্দক, বেদনিষ্ঠ, বেদনী, বেদপতি, বেদপথ, বেদপাঠ, বেদপারগ, বেদপুণ্য, বেদপ্লাবী, বেদফল, বেদবতী, বেদবন্ত, বেদবাদ, বেদবাদী, বেদবাহ্য, বেদবিক্রয়ী, বেদবিৎ(দ্), বেদবিদাম্বর, বেদবিদ্যা, বেদবিদ্বান, বেদবৃত্ত, বেদব্যাস, বেদমাতা(তৃ), বেদমার্গ, বেদশাখা, বেদশাস্ত্র, বেদশ্রুতি, বেদসংহিতা, বেদসন্ন্যাস, বেদসম্মত, বেদাগম, বেদাঙ্গ, বেদাতি, বেদাত্মা, বেদাদি, বেদাদিবীজ, বেদাধিগম, বেদাধিদেব, বেদাধিপ, বেদাধ্যাপন, বেদানধ্যয়ন, বেদানন, বেদান্ত, বেদান্তকর্ত্তা, বেদান্তকৃৎ, বেদান্তজ্ঞ,

বেদান্তবাগীশ, বেদান্তবাদ, বেদান্তী, বেদাভ্যাস, বেদি, বেদিকা, বেদিতব্য, বেদিল, বেদী, বেদে, বেদোক্ত, বেদোদয়, বেদোদিত, বেদোপবৃংহণ, বেদ্য, বেদ্যে, বৈদান্তিক, বৈদিক, বৈদুষ, বৈদুষ্য, বৈদ্য, বৈদ্যক, বৈদ্যক্রিয়া, বৈদ্যনাথ, বৈদ্যরাজ, বৈদ্যশাস্ত্র, বৈদ্যসঙ্কট, বৈদ্যা, বৈদ্যী, বৈদ্যোত্তর, সংবিৎ, সংবেদন, সম্বিৎ।

বিদ্ = বিকল্প দান। **বিদ** = বিকল্প দান যাহাতে। ('ম্যাও' ডাকে আপনি টের পেলেন, ঘরে বিড়াল ঢুকেছে। 'ম্যাও' কিন্তু বিড়াল নয়, অথচ সেই 'ম্যাও' শব্দটুকু থেকেই আপনি বিড়ালের অস্তিত্ব টের পেয়ে যান। একইভাবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব টের পাই। আপনি তাকালেন, দূরে একটা বটগাছ দেখা যাচ্ছে। গাছটি আপনার কাছে এল না, তার একটি 'প্রতিরূপ' অর্থাৎ 'একটি গাছের ছবি' হয়ে গাছের বিকল্প হিসেবে আপনার চোখের মাধ্যমে এসে গেল আপনার মস্তিষ্কে। এই যে, বিভিন্ন সত্তা নিজে না এসে শব্দ-স্পর্শ-রূপাদির মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ বিকল্প আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে, একেই বলে **বিদ** করা। এই **বিকল্প দান** বা **বিদ্** গ্রহণ করেই আমরা **বিদিত** হই।)

অবিদ্যা : ২. *নেই **বিদ্যা** যাহাতে*। / যাহা আত্মা নহে তাহাকে আত্মা বলিয়া জানা। (ব.শ.)। ৩. বিদ্যার অভাব, জ্ঞানাভাব, মূর্খতা, বিদ্যাবিরোধী, অজ্ঞান, বিপর্যয়জ্ঞান (একটিকে আর একটি বলিয়া জানা), অযথার্থবুদ্ধি, মিথ্যাজ্ঞান, তমঃ, বেদান্ত অনুসারে — মায়া, মনু ও মেধাতিথি অনুসারে — (বিদ্যাভিন্ন) কৃষি-বাণিজ্য-রাজসেবাদি কার্য্য, উপপত্নী, রাঁড়। (ব.শ.)। ৪. অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত, কিন্তু গ্রামবাংলায়, বিশেষত 'সেকেলে' মানুষদের আলাপ-আলোচনায় **অবিদ্যা** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। ৫. এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে মানুষের ও তার সমাজের 'সমস্ত অহিতের মূল' খোঁজা হয়েছে **অবিদ্যা**তেই। সাংখ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই **অবিদ্যা**কে। তাতে বলা হয়েছে **পুরুষ-প্রকৃতির** মধ্যেকার সম্বন্ধের ত্রুটিই সমস্ত অহিতের মূল, আর সেই ত্রুটির মূলে রয়েছে **অবিদ্যা**। অর্থাৎ কিনা, **অবিদ্যা**ই মানুষের **বিবেক**জ্ঞান রহিত করে দেয়। ঈশোপনিষদে **অবিদ্যা** বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, 'জ্ঞানরহিতং কেবলং কর্ম্মং'-ই হল **অবিদ্যা**। এর অর্থ সবচেয়ে ভালভাবে বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' শব্দবন্ধটি তাঁরই বানানো। পুরাণ মতে **দক্ষনীতি** বা 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'ই ঐ **অবিদ্যার** মূল। পুনরাবৃত্তি করলে আর নতুন জ্ঞানের দরকার পড়ে না। পুনরাবৃত্তি করে গেলেই চলে। আর পুনরাবৃত্তি করার জন্য যেটা জানা দরকার সেটা তো গতানুগতিক। তাই তাতে জ্ঞানরহিত হয়ে কেবল কর্মই চলতে থাকে। এর ফলে মানুষ **পশু**তে পরিণত হয়ে যায়। এই কারণে বেদান্ত একে বলেছেন **মায়া**। আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। দ্র. **পশু, পাষণ্ড, বিবেক, ভূতপ্রকৃতি**।

বিত্ত : ১. ✓বিদ্ (লাভ) + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্য; 'ভোগ-প্রত্যয়' অর্থে নিপাতিত, পাণিনি। (ব.শ.)। ২. ***বিদ্** (বিকল্প বা বিশেষ দান) তারিত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা আপন ভোগ-যোগ্যতা বিদিত করে; কিংবা যাহাকে ভোগ করা যাইবে বলিয়া প্রত্যয় হয়।* ৩. ভোগ্য, প্রতীত, জ্ঞাত, বিচারিত, ভোগ্য-দ্রব্য, ধন, অর্থ, দ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. wealth অর্থে প্রচলিত। ৫. একালে আমরা **বিত্ত** বলতে টাকাপয়সা-ধনরত্ন ইত্যাদি ধনসম্পদ বুঝি। ব.শ. কিন্তু সেসব কথাতে আসছেন পরে। ব.শ.-প্রণেতার ও পাণিনির আঙুল যেদিকে তাক করা রয়েছে, সেটি হল উপরোক্ত ভোগ-প্রত্যয়, জ্ঞাত, বিচারিত ... প্রভৃতি চেতনামূলক সত্তা। তাঁদের মতে, **বিত্ত** কথাটির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে **বিদ্** ক্রিয়ার সঙ্গে, **বিদিত** হওয়ার সঙ্গে, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের সাথে; ধনসম্পদের সঙ্গে **বিত্তের** যদি কোনো সম্পর্ক থাকে তো সে পরোক্ষ সম্পর্ক। তার মানে, একালে আমরা যেগুলিকে **বিত্ত** বা ধনসম্পদ বলি, সেই ধনসম্পদের মালিকানা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করি, আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা সেগুলিকে তাদের মূল্যের দিক থেকে বিচার করতেন না; করতেন সেগুলির 'ভোগ-প্রত্যয়' সংক্রান্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্কের দিক থেকে!

মানুষের সমাজের সমস্ত অহিতের মূল নাকি 'ব্যক্তিমালিকানা', মার্কসবাদে তাই নিয়ে বহু কথা আছে। কিন্তু যেটি মূল কথা — সেই ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব হল কীভাবে — সে বিষয়ে বিশেষ কিছু কথা নেই; সেসব কথা রয়েছে ভারতীয় পুরাণাদি গ্রন্থে। সেই মূল কথাটি হল, ধনসম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার বহু আগেই (ক) 'ব্যক্তি'র আবির্ভাব হয়েছিল; (খ) মাল-এর উদ্ভব হয়েছিল এবং **সেই মাল-এর ভিতরে ভোগ্য রয়েছে বলে একটা প্রত্যয়ের জন্ম হয়েছিল**; আর (গ) তার পরে জন্ম হয়েছিল মালিকানার বোধের। তারও বহু পরে জন্ম হয়েছিল ব্যক্তিমালিকানার। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে, 'ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে' কথাটি বলার ও বোঝানোর জন্য যে পদ্ধতিতে সেকথা বলা হয়, তা এইরকম — মানুষের মনে **ইন্দ্র**-এর ('আমি-বোধ'-এর) উদ্ভব হয়েছে। আর, 'মাল-এর উদ্ভব' এবং সেই মাল-এর ভিতরে ভোগের জন্য রয়েছে 'বিশেষ দান' বা **অগ্নি** — এই প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়েছিল তার পরেই। মাল তার আগেই উদ্ভূত হয়ে গেলেও এবং তার ভোগ-যোগ্যতা থাকলেও, সে বিষয়ে প্রত্যয় জন্মেছিল ব্যক্তির উদ্ভবের পর। ব্যক্তি না জন্মালে, মাল-এর ভোগ-যোগ্যতার প্রত্যয় জন্মাবে কার ভেতরে? যাই হোক, ব্যক্তির মনে জাত বস্তুর ভোগ-যোগ্যতার এই প্রত্যয়কেই 'ব্যক্তির নিকট বিদিত জ্ঞান' বা **বিত্ত** বলে। ...

তাহলে কথাটি এই দাঁড়াল যে, 'যে বস্তু বা বিষয় তার ভোগ-যোগ্যতার সম্পর্কে আমাদের বিদিত করে' তাকেই **বিত্ত** বলে; তা সে গাছ মাছ কলা মূলা কাব্য সঙ্গীত ... যাই হোক। ধনরত্ন বা টাকাপয়সা দিয়ে সেই **বিত্ত**গুলি পাওয়া যায় বলে সেগুলিকেও পরবর্তীকালে **বিত্ত** বলার চল হয়ে যায়।

বিদিত (বিদুষী, বিদ্বান) : ১. ✓বিদ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিদিত** = **বিদ্** গতিশীল হইয়া তারিত হয় যাহাতে। **বিদুষী** = নবরূপে উত্তীর্ণ **বিদ্**-এর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের গতিশীল আধার যে। **বিদ্বান** = **বিদ্** বহন অন (on) থাকে যাহাতে।* / **বিদ্বান** = যিনি জানেন। (ব.শ.)। ৩. **বিদিত** = জ্ঞাত, অবগত,

পরিজ্ঞাত, বিখ্যাত, প্রার্থিত, পণ্ডিত, কবি, খ্যাতি। **বিদুষী** = সহবাসদূষিত। **বিদ্বান** = প্রাজ্ঞ, জ্ঞাতা, আত্মবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, পণ্ডিত। (ব.শ.)। **বিদুষী** = বিদ্যাবতী স্ত্রী, পণ্ডিত। (ছা.অ.)। **৪.** known অর্থে **বিদিত**, learned woman অর্থে **বিদুষী**, এবং scholar অর্থে **বিদ্বান** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বিদ্**। আজকাল আমরা **বিদ্বান** বা **বিদুষী** শব্দদুটির মানে বুঝি — যাঁরা অনেক লেখাপড়া করেছেন, তেমন নর বা নারী। শব্দগুলির মানে কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। আসলে যাঁরা অনেক কিছু বিষয়ে **বিদিত** হয়েছেন, তেমন নারী ও পুরুষকে যথাক্রমে **বিদুষী** ও **বিদ্বান** বলা যায় বটে, কিন্তু তার আগে তো জানতে হবে **বিদিত** হওয়া মানে কী! **বিদিত** হওয়া মানে কিন্তু বই পড়া নয়। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু থেকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মাধ্যমে সমগ্র বস্তুজগতের যে বিশাল প্রতিচ্ছবির অবিরাম-শ্রাবণধারা আমাদের চেতনার উপর নিরন্তর বর্ষিত হয়, সেই **বিদসমূহে** যাঁরা সিক্ত হন, তাঁরাই **বিদিত** হন, **বিদ্বান** হন, **বিদুষী** হন। বই পড়ে সে বিষয়ে **বিদিত** হওয়ার ইশারাটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু সত্য-সত্যই **বিদিত** হওয়া যায় না। তার জন্য নিজের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে নিজেকেই বস্তুজগতের পাঠানো **বিদ**-বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, নিজেকেই **বিদসিক্ত** হতে হয়। তবেই প্রকৃতার্থে **বিদিত** হওয়া যায়, প্রকৃত **বিদ্বান** বা **বিদুষী** হওয়া যায়।

কথাটি রবীন্দ্রনাথ অনেক স্পষ্ট করে তাঁর 'আবরণ' নিবন্ধে ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর মতে, 'বই-পড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র (আজকাল সেকথা — র.চ., ক.খ.) আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই-পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নাড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।' আসলে একালের শিক্ষাজগতের কর্ণধারগণ ঘোরতর রবীন্দ্রবিরোধী। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের পূজা করেন, এবং রবীন্দ্রনাথ যা সব করতে বলে গিয়েছিলেন, তার প্রতিটি কথা অমান্য করেন এবং বিপরীত কাজগুলিই করে থাকেন। কার্যত, রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থটি আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লে যে কাজটি করা উচিত বলে মনে হয়, তা হল, আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের বের করে নিয়ে এসে এখনই এই শিক্ষাব্যবস্থাটিকে ভস্মীভূত করে দেওয়া। কেননা, এ এক ভয়ানক দৈত্য যা আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ তথা মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিন্তু সে কাজ করতে হলে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, আমাদের ছেলেমেয়েদের **বিদিত** করার উপায় করতে হবে, নইলে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাবে কোথায়? চারু মজুমদাররা সেই ব্যবস্থা না করে স্কুলকলেজ পুড়িয়ে কার্যত ক্ষতিই করে দিয়েছেন। নষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাই আরও কঠোর ভাবে চেপে বসেছে। আমরা বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কিছু প্রস্তাব রেখেছি, যা প্রকাশিত হয়েছে আমাদের 'খ' ও 'গ' গ্রন্থে। **৬.** নিম্নে **বিদ্যমান** দ্রষ্টব্য।

বিদুর : **১.** ✓বিদ্ + উর (কুরচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বিদ্ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রক্ষিত হয় যাহাতে।* / যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব জানেন ('ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ')। (ব.শ.)। **৩.** জ্ঞাতা, পণ্ডিত, নাগর, ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (ইনি দাসীগর্ভজাত ব্যাসের পুত্র। ... ... বিদুরের খুদ কুঁড়া — গৌণার্থে গরীবের ডালভাত। কৃষ্ণ, পাণ্ডবপক্ষে দুর্যোধনের সহিত সন্ধিকরণার্থ হস্তিনায় গিয়া, দুর্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বিদুরের তণ্ডুলকণা উপাদেয় বলিয়া আনন্দে ভক্ষণ করেন। ইহা এই প্রবচনের মূল।)। (ব.শ.)। যুধিষ্ঠিরাদির পিতৃব্য। ইনি বেদব্যাসের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকার রূপবতী শূদ্রা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ... সত্যবতী অম্বিকাকে পুনরায় ব্যাসের নিকট গমন করতে নির্দেশ দিলে ... ব্যাসের মূর্তি স্মরণ করে অম্বিকা নিজে না গিয়ে, অপ্সরার মতো রূপবতী তাঁর এক শূদ্রা দাসীকে পাঠিয়ে দেন। এই দাসীর গর্ভে বুদ্ধিমান ও ধর্মাত্মা বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। দাসীর গর্ভে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে ধর্মই বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ... মাণ্ডব্য (অণিমাণ্ডব্য) নামে ... তপস্বী তাঁকে ... লঘুপাপে গুরু দণ্ড দেওয়ার অপরাধে ধর্মকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে বলে ... শাপ দেন। ... দেবকরাজার এক শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা এক সুন্দরী কন্যার সহিত ভীষ্ম বিদুরের বিবাহ দেন। ... তিনি নানাভাবে পাণ্ডবদের সহায়তা করেন। ... পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের পর বিদুর ধর্ম ও আইন বিষয়ক কার্যাবলী পরিদর্শন করতেন। ... ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে বিদুরও তাঁর সঙ্গে বনগমন করেন। বিদুর বহুকাল বাক্য ও আহার বর্জন করে বীটা (কাষ্ঠদণ্ড) মুখে দিয়ে ঘোর তপস্যা করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দর্শনাভিলাষী হলে বিদুর এক বৃক্ষকাণ্ডে ভর করে যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর দেহ সংকার করতে গেলে দৈববাণী হয়, তিনি যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানিক লোকে গিয়েছেন, তাঁর দেহ যেন দগ্ধ না করা হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** বিশ্বজগৎ থেকে **বিদ্**সমূহ এল, রামবাবু সেগুলি গ্রহণ করে **বিদিত** হলেন। কিন্তু এবার সেই **বিদ্**গুলিকে **বিচার-বিবেচনা** করে **উপদেশে** (দ্র. **দেশ**) পরিণত করে তিনি যদি কাউকে দেন, কেবলমাত্র তখনই তাঁকে **বিদুর** বলা যেতে পারে। মহাভারতে সেইরকম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যে সত্তা তার নাম দেওয়া হয় **বিদুর**। ইনি হলেন সমাজের ক্ষমতাহীন **ধর্ম**সত্তা, যা কিনা রাষ্ট্রের সেবা করাকেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেবা করার মতো **ধর্ম**জ্ঞানে পালন করে থাকেন, যদিও **বিবেকের ধর্ম**ও পালন না করে থাকতে পারেন না। তাঁর কাহিনীর প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশন করে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বোঝার চেষ্টা করলে তবেই **বিদুর**কে তাঁর প্রকৃত স্বরূপে বোঝা সম্ভব।

বিদ্যমান (কৃতবিদ্য, বিদকুটে) : **১.** ✓বিদ্ + মান (শানচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিদ্যমান*** = *'**বিদ**কারী সত্তা'র (= **বিদ্যের**) সীমায়িত আধার অন থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যে আপন অস্তিত্ব **বিদিত** করিতেছে।* ***কৃতবিদ্য*** = *যিনি **বিদ্যা**কে আয়ত্ত করিয়াছেন।* ***বিদকুটে*** = *যে **বিদ**কে মাঝপথে কুটে দেওয়া বা ছেদন করা হইয়াছে।* / **কৃতবিদ্য** = যিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। (ব.শ.)। **৩.** **বিদ্যমান** = বর্তমান, সত্য, উপস্থিত, প্রত্যক্ষ, অবস্থিত, জ্ঞানগোচর, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়, যথার্থ, তৎক্ষণাৎ, সম্মুখে, থাকিতে, সাক্ষাৎ, জীবিত থাকিতে। **কৃতবিদ্য** = অভ্যস্তবিদ্য, বিদ্বান, পণ্ডিত। **বিদকুটে**

(বিদখুটে) = কুৎসিত, বদচেহারা, বদস্বভাব, অশোভন, বেখাপ্পা, প্রচণ্ড। (ব.শ.)। ৪. existing অর্থে **বিদ্যমান**, এবং ugly অর্থে **বিদকুটে (বিদখুটে, বিদঘুটে)** প্রচলিত। ৫. দ্র. **বিদ, বিদিত**। গ্রামবাংলার একটি ঘটনার কথা বলি — তখন ঘরে ঘরে ক্যালেন্ডার থাকত না, পাঁজি থাকত কেবল পুরোহিতের ঘরে। তো এক গ্রামের বৃদ্ধ ঠাকুরদা তাঁর পৌত্রকে বললেন, 'দুর্গাপূজার তো বেশি দেরি নেই। কই, তোমাদের তো কোনো তোড়জোড় দেখছি না?' পৌত্র বলে, 'তুমি ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসে জানলে কী করে যে, দুর্গাপূজার বেশি দেরি নেই?' ঠাকুরদা বললেন, 'লেবুফুলের গন্ধ পাচ্ছি। দুর্গাপূজার পনেরো-কুড়ি দিন আগেই তো লেবুফুল ফোটে।' পৌত্র দেখল, কথাটি ঠিকই; পনেরো দিন পরেই ছিল দুর্গাপূজা। — একেই বলে **বিদিত** থাকা।

জগতের প্রতিটি সত্তা আপন আপন অস্তিত্বের কথা নানান বিকল্প (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ রূপে) প্রেরণ করে জানান দিতে থাকে। বিকল্প প্রেরণ করাই **বিদ** করা। **বিদ**-এর (বিকল্প দানের) দ্বারা **বিদিত** করার এই ব্যবস্থার ভিতরেই আমাদের বাস। জগতের প্রতিটি সত্তার এইরূপ **বিদ** (বিকল্প দান) করতে থাকার কারণ থাকে তাদের নিজ নিজ **প্রকৃতি**তে বা স্বভাবে। একেই বলে **বিদ্য** (= বিদ থাকে যাহাতে)। সেই **বিদ্য** চলতে থাকাকেই বলে **বিদ্যমান** থাকা। কোনো পদার্থ **বিদ্যমান** আছে মানেই হল, সে তার আপন অস্তিত্বের বিষয়ে সবাইকে **বিদিত** করার জন্য **বিকল্প-দান** বা **বিদ** প্রেরণকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার হাতে ধরে রাখা এই বইটি স্পর্শ দ্বারা, রূপ দ্বারা তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে বা **বিদ** করছে, তাই আপনি বইটির অস্তিত্ব বিষয়ে **বিদিত** হচ্ছেন; আর সেইভাবে আপন অস্তিত্বের কথা **বিদ** করতে পারছে বলেই বইটি **বিদ্যমান** আছে। সেই **বিদ্যমান** বস্তুটির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে, তার **বিদ্য**-এর স্বরূপকে যিনি আত্মস্থ করে ফেলেন, তাকেই যথার্থে **কৃতবিদ্য** বলা যায়; যদিও কথাটির অন্য একটি মানে করা হয়েছে — যিনি অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন।

তবে **বিদ** করার এই ব্যাপারটি আমরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতরা ভুলে গেলেও সাধারণ বাংলাভাষী কিন্তু ভোলেননি, ভোলেন না। তাঁরা যথার্থেই **বিদকুটে** শব্দটি তৈরি করে ফেলেন। তাঁরা অচেতন-ভাবে জানেন, সত্তা মাত্রেই তার অস্তিত্বের কথা **বিদ** করতে থাকে। কিন্তু সেই **বিদ**করণ যদি মাঝপথে ছেদিত হয়ে যায়, তখন তা আর স্বাভাবিকভাবে **বিদ**-গ্রাহকের কাছে পৌঁছয় না, পৌঁছয় বিকৃত স্বভাব নিয়ে, ছেদিত-বিকৃত চেহারা নিয়ে। স্বভাবতই **বিদ**-গ্রহণকারী **বিদ্যার্থী** তাকে দেখেন **বিদকুটে** (বিদখুটে, বিদঘুটে) রূপে। ... ৬. ল্যাটিন vide, ল্যাটিন থেকে ইংরেজিতে আসা vide, video-, ইংরেজি wit, witness, জারমান wissen প্রভৃতি।

বিদ্যা : ১. ✓বিদ্ + য (ক্যপ্) - করণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *যাহার দ্বারা **বিদিত** হওয়া যায়, তাহার আধার। /* যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. শাস্ত্রাভ্যাসজন্য** বা অধ্যয়ন হেতুক জ্ঞান, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিদ্যাহেতু শাস্ত্র (ত্রয়ী বা বেদত্রয়, আণ্বিক্ষিকী বা আত্মবিদ্যা, দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্র, বার্ত্তা বা কৃষি বাণিজ্য আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি — এই চারি বিদ্যা। মনুমতে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা পঞ্চম। মতান্তরে বেদচতুষ্টয়, বেদের ষড়ঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র — এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। শুক্রাচার্য্যমতে চতুর্ব্বেদ ষড়ঙ্গ ইত্যাদি বত্রিশ বিদ্যা।), তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, (তন্ত্রে) দেবীমন্ত্র, মন্ত্রশক্তি, ইন্দ্রজাল, দুর্গা, মহাবিদ্যা — কালী-প্রভৃতি, গুটিকা অঞ্জন মন্ত্রাদি, চৌর্য্যশাস্ত্র। (ব.শ.)। ৪. learning ও scholarship অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বিদ, বিদিত, বিদ্যমান**। অন্তত শব্দার্থের নিরিখে **বিদ্যা** কাকে বলে, সেকথা এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এ হল '**বিদ** থাকে যাহাতে (= **বিদ্য**) তাহার আধার'। তার মানে, বস্তুর **প্রকৃতি**তে বা স্বভাবে যে ক্রিয়া চলে, যার কারণে বস্তুটি তদ্বস্তু রূপে **বর্ত্তমান**, সেই ক্রিয়ার সহজাত বিকল্প-দান বা বিচ্ছুরণকে **বিদ্য** বলে। বস্তুর ভিতরে এই **বিদ্য** থাকে বলেই বস্তুটি **বিদ্যমান** থাকে। এই **বিদ্য**কে আত্মস্থ করে যে, সে ব্যক্তিকে সেকারণেই **কৃতবিদ্য** বলে। এই **বিদ্য**-এর আধার স্বরূপ যে জ্ঞান, সাধারণভাবে তাকেই **বিদ্যা** বলা হয়। তার মানে, **বিদ্যমান** এই বস্তুজগতের **বিদ্য**সমূহের আধার হল **বিদ্যা**।

কিন্তু এ তো ভারি বিপদের কথা হয়ে গেল! **বিদ** তো এমন নয় যে, **বিদ্যমান** সত্তা থেকে বেরিয়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির মতো সে আমার-আপনার চেতনার উপর কখনো কখনো বর্ষিত হয়! এ যে কোটি কোটি **বিদ্যমান** সত্তার আরও ৵ কোটি কোটি জ্ঞানকণার অবিরাম বিচ্ছুরণ ও বর্ষণ! একালের ভাষায় এই **বিদ**কেই তো **তথ্য** বলে। সেই অনন্ত অগণনীয় বিচ্ছুরণধারাকে তথাকথিত **বিদ্যা** ধারণ করবে কীভাবে? বিশ্বজুড়ে যদি চেরাপুঞ্জীর বর্ষাধারা বছরের পর বছর বারোমাস চব্বিশঘণ্টা ধরে অবিরাম বর্ষিত হতে থাকে, সেই বর্ষাধারার প্রতিটি বৃষ্টিকণাকে কি পৃথকভাবে চিহ্নিত করে মনে রাখা বা লিখে রাখা সম্ভব? অথচ, **বিদ** তো সেরকম তথ্যবৃষ্টির কণাই বটে। সেই **বিদ** থাকে **বিদ্য**তে! এখন **বিদ্যা**কে যদি সেই **বিদ্য**র আধার বলা হয়, মহাসমুদ্রও **বিদ্যা**র তুলনায় ছোট হয়ে যায়। তার মানে, লিখিত বা চর্চিত **বিদ্যা** (= ব্যক্ত জ্ঞান) বলতে যে জ্ঞানসমূহকে বা **বিদ্যাকে** বোঝানো হয়ে থাকে, তার পরিমাণ নিশ্চিতভাবেই প্রকৃত **বিদ্যা**র তুলনায় বোধ করি ১ শতাংশেরও কম, শূন্যের কাছাকাছি। ...

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ যতই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিক, সর্বপ্রকারের **বিদ্য**সমূহের আধার স্বরূপ যে **বিদ্যা**, মানুষের পক্ষে তা অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়। সে বড় জোর কিছু **বিদ**-এর খবর জমা করতে পারে, যার পরিমাণ শূন্যের কাছাকাছি; একালের ভাষায় এগুলিকে **তথ্য** বলে। আজ যে আমাদের গোলোকায়িত দুনিয়ার মহাপণ্ডিতেরা 'তথ্যবিস্ফোরণ' ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা বলে থাকেন, তাঁরা জানেন না, তাঁরা **তথ্য**সমুদ্রের একটি মাত্র সাময়িক জলোচ্ছ্বাসটুকুকে শনাক্ত করেছেন; সমগ্র সমুদ্রকে তো নয়ই, সর্বকালের সর্বপ্রকারের সমস্ত জলোচ্ছ্বাসকেও নয়।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবশ্য এই বোকামিতে পা দেননি। তাঁরা জানতেন, মানুষ জাগতিক **বিদ্যমান** সত্তাসমূহ থেকে বিচ্ছুরিত **বিদ**সমূহের অবিরাম বর্ষণে স্বভাবতই সিক্ত হয়ে অব্যক্তজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। তবে সেই **বিদ**সমূহকে লিখে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা। কোনো কোনো শিবগুণসম্পন্ন উদ্ভাবক মানুষ আর একটু

এগিয়ে **বিদ্যমান**-এর **বিদ্য**কে জানার চেষ্টা করেন, কখনো-সখনো তাঁরা সেকাজে সফলও হন। সেই **বিদ্য** থেকে তাঁরা জানতে পারেন, সংশ্লিষ্ট **বিদ্যমান** সত্তাটি কী প্রক্রিয়া চালিয়ে বিরাজ করে, যে কারণে, **বিদ্যমান** সত্তাটি তদ্রূপে **বিদ্যমান** থেকে আপন অস্তিত্বের কথা **বিদিত** করছে বা করতে পারছে। তাঁদের এই জ্ঞানকে তাঁরা নাম দেন **বিদ্যা**। একে তত্ত্ব**বিদ্যা**ও বলা হত। সেই **বিদ্যা** শিখে নিয়ে মানুষ কোনো কোনো বস্তুকে আপন প্রয়োজনের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নেয়। তারপর চলে সেই **বিদ্যা**র পুনরাবৃত্তি। **বিদ্যা**র এই পুনরাবৃত্তিকে তাঁরা নাম দেন **অবিদ্যা**। কখনো কখনো তাকে 'কর্ম্মময়ী-**অবিদ্যা**'ও বলা হত।

পুরাণাদি অনুসারে **দক্ষযজ্ঞে** এই প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল — মানুষ তত্ত্ব**বিদ্যা**তেই তার অবস্থান চালিয়ে যাবে, নাকি, **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা**কে তার অস্তিত্বের ভিত্তি করে নেবে? শিব ছিলেন তত্ত্ব**বিদ্যা**র পক্ষে, আর **দক্ষ** ছিলেন **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা**র পক্ষে। শেষমেষ **দক্ষযজ্ঞ** প্রতিষ্ঠিত হয়, **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা**কেই মানুষের সমাজ আপন অস্তিত্বের ভিত্তি করে নেয়, মানুষ সভ্যযুগে পা রাখে। একালে আমরা যে বিশাল যন্ত্রসভ্যতার উপর নির্ভর করে বেঁচে বর্তে আছি, তার সবটাই **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা** থেকে প্রসূত। **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা** মানুষের দৈহিক সুখের ব্যবস্থা করে, তত্ত্ব**বিদ্যা** মানুষের মানসিক সুখের ব্যবস্থা করে।

তার মানে, চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালানোর কলা আবিষ্কার করা ছিল **বিদ্যা**, তার পুনরাবৃত্তি করে যুগে যুগে মানুষ যে আগুন জ্বালিয়ে তার উদ্দেশ্য সাধন করেছে, সে হল **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা**। এযুগের মতো করে বলতে গেলে বলা যায় যে, Science হল **বিদ্যা** আর Technology হল **কর্ম্মময়ী-অবিদ্যা**। তার মানে, পরমাণুর শক্তিকে আবিষ্কার করা হল **বিদ্যা**, কিন্তু দেশে দেশে পরমাণু চুল্লী বানাতে থাকা হল **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা**। অর্থাৎ কিনা, **বিদ্য**কে জানা হল **বিদ্যা**; কিন্তু তার শুধুমাত্র প্রায়োগিক রূপটিকে মনে রেখে কার্যোদ্ধার করা এবং স্বভাবতই প্রকৃত **বিদ্য**কে ভুলে যাওয়া হল **অবিদ্যা**। সেই কারণে **বিদ্যা**চর্চায় মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে, **কর্ম্মময়ী অবিদ্যা**র চর্চায় মানুষ **পশু**ত্ব লাভ করে। বলে রাখা যেতে পারে, সেকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব-অর্জন করাকে মুখ্যশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষাকে গৌণশিক্ষা ভাবা হত। পাশ্চাত্যেও সেই ধারা বলবৎ ছিল। এমনকি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত এই ধারা কমবেশি প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের প্রায় সব দেশে কর্মশিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ব-অর্জনের শিক্ষা দেবেন বলে শান্তিনিকেতন খুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই শান্তিনিকেতনও অন্যান্য **পশু**-তৈরির কারখানার মতো কারখানা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বিন্দু (বিন্দুরূপিণী, বিদ্ধ, বিঁধ) : **১.** ✓বিন্দ্ (অবয়ব) + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিন্দু** = বিশেষ রহস্যরূপের দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **বিন্দুরূপিণী** = **বিন্দু** রূপ যে প্রকৃতির। **বিদ্ধ (বিঁধ)** = বিশেষ রহস্যরূপ ধরে যাহাতে।* / **বিন্দু** = যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বেধ নাই। (ছা.অ.)। **৩. বিন্দু** = পৃষত, জলকণ, দ্রবদ্রব্য-কণামাত্র, ফোঁটা, **অশ্রুলেশ, জলকণসদৃশ** পরিমাণ, অত্যল্প, হস্তিগাত্রস্থ রক্তবর্ণ চিহ্নবিশেষ, **অনুস্বার চিহ্ন, শূন্য**, ভ্রূদ্বয়ের মধ্য, মহাদেব, রূপকার্থপ্রকৃতি, ... (জ্যামিতিতে) স্থূলত্বদীর্ঘত্বহীন পদার্থবিশেষ (point); বেদনশীল, জ্ঞাতা। **বিদ্ধ (বিঁধ)** = ভেদ করা, বিদ্ধ করা, বিঁধাইয়া দেওয়া, বিঁধান, **ফুটান**, ছিদ্র করা, **প্রবেশ** করা। (ব.শ.)। **৪.** point অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অংরূপিণী**। দেখা যাচ্ছে যে, **বিন্দ্** শব্দটি তৈরি করা হয়েছে **বিদ্** থেকে, সেখানে 'ন্'-এর আগম ঘটানো হয়েছে। পাণিনি মতে এ হল 'নিপাতিত'। এর কারণটিকে আমরা দেখেছি **বিদ্যা** শব্দের ব্যাখ্যায়। সেখানে **বিদ**-এর বৃষ্টিকণা রূপটির কথা আমরা বলেছি। বৃষ্টিকণারূপে **বিদ** এসে মানুষের চেতনায় পতিত হয় ঠিক সেইভাবে, যেভাবে কোনো কিছুকে **বিদ্ধ** করতে গেলে তার ক্ষুদ্রতম স্থানে (pin-point-এ) ছিদ্রকরণ-যন্ত্রটি ঠেকাতে হয়, সেইরকম। এর ফলে **বিদ্** হয়ে যায় 'রহস্যময়' (= ন্); তাই সে আর **বিদ্** থাকে না, হয়ে যায় **বিন্দ্**। সেই **বিন্দ্** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে দৃশ্যভাবে বা অন্য কোনোভাবে গ্রাহ্য হয়, তখনই তা পরিণত হয় **বিন্দু**তে।

আসলে, জগতে যত আকার আছে, সেগুলি এক বা একাধিক তলের যোগফলে গড়ে উঠেছে; প্রতিটি তল আবার গড়ে উঠেছে একাধিক রেখার যোগে, আর প্রতিটি রেখা গড়ে উঠেছে একাধিক বিন্দুর যোগে। সাধারণভাবে আকারের ক্ষেত্রে **বিন্দু**র চেয়ে ক্ষুদ্রে যাওয়া যায় না। তার মানে, দুনিয়ায় যত বাহ্য চেহারা রয়েছে, তাদের সূচনা হয়েছে **বিন্দু** থেকে। কিন্তু এ তো গেল আকারের (রূপের) কথা। এবার আপনি শব্দের কথায় চলে যান। আমরা এখন পারি না, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারতেন; তাঁদের তীব্র অনুভূতিশক্তি ছিল। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন, সব ধ্বনির মূলে রয়েছে কিছু **বর্ণ** যেগুলিকে নিয়ে তাঁরা গেঁথেছিলেন আমাদের **বর্ণমালা**। তাঁরা দেখেছিলেন, সেই **বর্ণমালা**র **বর্ণ**গুলি উদ্ভূত হয়েছে মূলত ং ধ্বনি থেকে। [একে বুঝতে হলে আপনি 'ইঙ্' (ing) উচ্চারণ করে মুখ বন্ধ করুন এবং 'ইঙ্' (ing) ধ্বনির ই-কে (i-কে) বাদ দিয়ে টানা ঙ্ (ng) করতে থাকুন। তাহলেই আপনি ং-রূপিণীকে (বা **অংরূপিণী**কে) পেয়ে যাবেন। আমাদের পূর্বসূরিগণ এই ং ধ্বনিকে লিখতেন (·) রূপে। এও বিন্দু।] তার মানে শব্দের ও রূপের মূলে রয়েছে এই **বিন্দু**। হয়তো স্পর্শ, রস, গন্ধের মূলেও এই **বিন্দু**ই রয়েছে, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের সূচনা-**বিন্দু**র কথা স্পষ্ট করে বলে যাননি। অন্তত আমরা এখনও সেরকম তথ্য পাইনি।

বিন্দুবিসর্গ : **২.** *যাহা বিন্দু হইতে বিসর্গ পর্যন্ত প্রসারিত।* **৩.** অনুস্বারবিসর্গ, অণুমাত্র, কিছুমাত্র, একটু। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের অ্যাকাডেমিগুলিতে **বিন্দুবিসর্গ**-এর মতো শব্দ প্রায়শই বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা হয়। কেননা, একালের অ্যাকাডেমি জ্ঞানের ভাষা, আবেগের ভাষা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'কাজ চলার ভাষা'য় বিশ্বাস করে। স্বভাবতই **বিন্দুবিসর্গ**-এর মতো জ্ঞানমূলক শব্দগুলি তাঁরা বাদ দিয়ে চলাই উচিত বিবেচনা করেন। তাছাড়া, শব্দটিকে নিয়ে তাঁদের আরও সমস্যা আছে; শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। সেটাও একালের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ।

কিন্তু তাই বলে সাধারণ বাংলাভাষী **বিন্দুবিসর্গ** শব্দটিকে কিছুতেই বাদ দিতে রাজি হননি, সেজন্যই শব্দটিকে তাঁরা আজও ব্যবহার করে থাকেন। তবে, তাঁদের অধিকাংশই জানেন না যে, শব্দটির ভিতরে ঠিক কীরূপ জ্ঞানমূলক বার্তা ছিল। কেননা, আদিতে কোন শব্দের কীরূপ মানে ছিল এবং কেন ছিল, সেসব কথা তো সাধারণ বাংলাভাষীর মনে রাখার কথা নয়; মনে রাখার কথা অ্যাকাডেমির, অ্যাকাডেমিশিয়ানদের, যাঁরা জনসাধারণের পয়সা খান, তাঁদের। তাঁরা সব কথা ভুলে মেরে দিয়েছেন। আর সে কুকর্ম তো তাঁরা এই একটি মাত্র শব্দের ক্ষেত্রে করেননি, শত শত বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে করেছেন। তো, এখন কী আর করা যাবে!

যাই হোক, এখন আমরা আবার মূল কথায় ফিরে যাই। আমাদের মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা আমাদের **বর্ণমালা**র সর্বোচ্চ বিকাশ সাধন করেছিলেন। সেই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, বিশ্বজগতের সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি ধরা থাকে মানুষের ভাষায়। আর, সেই সমগ্র ঘটনাবলীর, ইতিহাসের, প্রত্যেক ঘটনার, **জগতের** প্রতিটি অস্তিত্বেরও একটা সূচনা থাকে এবং শেষও থাকে। তারই প্রতিরূপ ধরা থাকে আমাদের **বর্ণমালায়**। তারও শুরু আছে এবং শেষও আছে। **বর্ণমালা**র শুরু হয় **বিন্দু** (˙ = ং =) দিয়ে, এবং শেষ হয় **বিসর্গ** (ঃ) দিয়ে। এই **বিন্দু** হল সৃষ্টির সূচনার ভাবধারী আর **বিসর্গ** হল সর্গশেষের ভাবধারী। যদি বলি, 'মোগল ইতিহাসের **বিন্দুবিসর্গ** জানি না' তবে তার মানে দাঁড়ায়, মোগল ইতিহাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কোনো কিছুই জানি না। আবার যদি বলি, 'রাম-সীতার বিবাহের বিষয়ে **বিন্দুবিসর্গ** জানি না', তখন তার মানে দাঁড়ায়, তাদের বিবাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী ঘটল, তার কিছুই আমি জানি না। বাংলাভাষীগণ তাঁদের ভাষা-ব্যবহারে এই উত্তরাধিকার আজও বহন করে থাকেন। তাঁরা অনায়াসে বলে থাকেন, 'ও ব্যাপারের আমি তো বাপু **বিন্দুবিসর্গ** জানি না।'

বেদ : **১.** ✓বিদ্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাহা দ্বারা দিশাগ্রস্তভাবে **বিদিত** হওয়া যায়। /* যাহার দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান সাধিত হয়; যাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞাপন করে। (ব.শ.)। **৩.** শ্রুতি, আম্নায় (ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ — এই বেদত্রয় 'ত্রয়ী'। চতুর্থ অথর্ব্ববেদ। প্রসিদ্ধি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদমন্ত্রসমূহ চার ভাগে বিভক্ত করেন, সেইহেতু তিনি 'বেদব্যাস'। বেদমন্ত্রসমূহ অপৌরুষেয়। ... ইহার কল্পসূত্রাদি ছয় অঙ্গ। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদের উৎপত্তি। ইহার কর্ম্মকাণ্ড হইতে মীমাংসাদর্শন ও জ্ঞানকাণ্ড হইতে বেদান্তদর্শন। পরে ইতিহাস ও পুরাণ বেদপর্য্যায়ে পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়। (ব.শ.)। ... ধর্ম, ও ব্রহ্মার মুখনির্গত ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্র। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত। ... কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদসমূহ চার ভাগে বিভক্ত করেন। ... বেদকে সাধারণত এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে — (১) সূক্ত; (২) ব্রাহ্মণ, যাতে যজ্ঞকাণ্ডের ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়া, যজ্ঞের তত্ত্ব ও বৈদিক আখ্যানাদির বর্ণনা আছে; (৩) আরণ্যক; (৪) উপনিষৎ — উপনিষদগুলি পরমব্রহ্মের তত্ত্বান্বেষণে ব্যাপৃত; (৫) কল্পসূত্র — সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ বৈদিক যজ্ঞাদির ক্রিয়াপ্রণালী। ... বেদের সূত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর মনীষায় আবির্ভূত হয়েছিল। এই সব মনীষী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নামে খ্যাত। তাঁরা মানসনেত্রে মন্ত্রদর্শন এবং স্বরসংযোগে গান করে প্রকাশ করতেন। ... লোকেরা তা শুনে স্মরণ করে রাখতেন বলে বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। ... তাঁরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে স্তুতি করে দেবতারূপে পূজা করতেন। এইসব দেবতার মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, এবং সূর্যকে (মিত্রাবরুণকে) লক্ষ্য করে সর্বাপেক্ষা বেশি স্তব লিখিত হয়েছে। ... এছাড়া অদিতি, ঊষা, সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার, বরুণ, পৃথ্বী, রুদ্র, যম, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, অনাবৃষ্টির দেবতা বৃত্র — এঁরাও পূজিত হতেন। প্রত্যেক বেদের সূক্তের সঙ্গে ঋষিদের নাম জড়িত আছে। কারণ, এই সব ঋষিদের মধ্যেই বেদের সূক্তগুলি প্রতিভাত হয়েছিল। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ও অন্য অনেকে এইসব সূক্তের রচয়িতা। ... (পৌ.অ.)। **৪.** বিশেষ একটি বৃহদাকার প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ অর্থে **বেদ** শব্দটি প্রচলিত। **৫. দ্র. অগ্নি, ইন্দ্র, অথর্ব্ব, অপৌরুষেয়, ঋক**। কার্যত **বেদ** নামক গ্রন্থটির কী মহৎ অর্থ ছিল এবং তাতে কী কী ভাগ কীভাবে এবং কেন ছিল, আর প্রায় তিনহাজার বছর পেরিয়ে বর্তমানে সেই **বেদের** অর্থ কী দাঁড়িয়েছে, নিম্নমানের পাশ্চাত্য শিক্ষা কীভাবে তাকে নীচ চোখে দেখছে এবং এদেশের কেউবা সেই **বেদের** অর্থবিকৃতির উপর নির্ভর করে ব্যবসা করছে — এসব কথা বিস্তারিত ভাবে লিখতে হলে পৃথক গ্রন্থ লেখা দরকার। আমরা অতি সংক্ষেপে শুধুমাত্র **বেদ** শব্দটির অর্থটুকু সরবরাহ করে অতি সংক্ষেপে দু-চারটি কথা মাত্র বলে যাচ্ছি।

বেদ শব্দটি শুনলেই আমরা প্রথমেই ধরে নিই, এটি একটি বইয়ের নাম। এ যে কতবড় ভুল ধারণা, **বেদন, বেদনা, আবেদন, নিবেদন, প্রতিবেদন, সংবেদন, সমবেদনা ... আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ** ... প্রভৃতি শব্দের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়। আসলে যে কোনো আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞানই **বিদ্যা** এবং সেই **বিদ্যা** শিখে নিয়ে তদনুযায়ী তাকে কর্মে বারংবার পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে প্রয়োগ করার জ্ঞানকে বলে **বেদ**। তার মানে, যেমন, **বর্ণমালা**র আবিষ্কার হল **বিদ্যা**, সেই **বর্ণমালা**কে শিখে বুঝে নিয়ে লেখালেখি করার জ্ঞান হল **বেদ**। অর্থাৎ মানুষের সমস্ত আবিষ্কার বা উদ্ভাবনই **বিদ্যা**, আর সেগুলির সমস্ত প্রয়োগজ্ঞান, যা আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি, প্রয়োগ করে চলেছি, তা সবই **বেদ**।

কিন্তু এই সাধারণ ক্রিয়াভিত্তিক **বেদ** শব্দটিই একসময় প্রতীকী হয়ে যায়, যখন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তাঁদের উদ্ভাবিত-অর্জিত **বিদ্যা**সমূহকে একত্রে **সংহত** করে **সংহিতা**য় পরিণত করেন এবং শ্রুতির মাধ্যমে উত্তরসূরিদের শেখাতে শুরু করেন। তখন স্বভাবতই সেই **সংহিতা**র নামও দিয়ে দেওয়া হয় **বেদসংহিতা**, সংক্ষেপে যা **বেদ** বলেই উল্লিখিত হয়ে থাকে। ফলত, একটি বড় অঘটন ঘটে যায়। এতকাল ধরে **বিদ্যা** যে অর্জিত হয়ে **বেদ**-এ পরিণত হচ্ছিল, এবং এখনও বিশ্বের সকল দেশে যে **প্রক্রিয়া আজও** প্রচলিত রয়েছে, সেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **বেদ** আমাদের চোখের অগোচরে চলে যায়; আমরা শুধুমাত্র আমাদের **পূর্বসূরিদের অর্জিত বেদ** নামক **সংহিতা** গ্রন্থটিকেই **বেদ শব্দের একমাত্র অর্থ** বলে মনে করতে থাকি। এর ফলে **বেদ** শব্দটি তার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক

অর্থ থেকে অধঃপতিত হয়ে একটি মাত্র বিশেষ গ্রন্থ-বাচক শব্দে **পরিণত হয়ে যায়। বর্ণাশ্রম**-এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেমন ভারতীয় **সমাজের স্বাভাবিক**-প্রাকৃতিক চলমান **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ **করে দিয়েছিল, এই বেদসংহিতা** গ্রন্থটি আমাদের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চলমান **বিদ্যার্জ্জন** ও তদ্দ্বারা নব নব **বেদ** সংযোজনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, উপরে পৌরাণিক অভিধানে **বেদ** সম্পর্কে এই যে লেখা হয়েছে — 'তাঁরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে স্তুতি করে দেবতা রূপে পূজা করতেন ... ইত্যাদি' — এধরনের কথাবার্তা যে আমাদের কত ক্ষতি করেছে, তা আর বলে শেষ করা যাবে না। **বেদ** কী? না **বেদ** হল **অগ্নি** (= fire) **ইন্দ্র** (= chieftain) **সূর্য্য** (= sun) ... ইত্যাদির স্তুতি করার মন্ত্র লেখা একটি বই! ইংরেজের সংস্পর্শে আবার শিখেছি যে, অসভ্য বর্বর লোকেরা যতসব প্রাকৃতিক **শক্তি**র পূজা করে। ব্যস্, হয়ে গেল! আমরা বুঝে গেলাম, আমাদের পূর্বসূরি, যাঁরা **বেদ** অর্জন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন অসভ্য বর্বর! আমরা **পাদোদক-মূঢ়** হয়ে স্বর্গ থেকে একেবারে নীচে ধরায় নিঃশব্দে পতিত হয়ে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে গেলাম! ...

প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কারক-উদ্ভাবকগণ যে **বিদ্যা** অর্জন করেন, সেটিই **বেদ**-এর প্রথম রূপ। তারপর সেই **বিদ্যা** যখন একটি বিশেষ দিশায় পুনরাবৃত্ত হয়ে ব্যবহৃত হতে থাকে, তখনই তাকে **বেদ** বলে। অর্থাৎ কিনা, **শিবজ্ঞান** হল উদ্ভাবিত জ্ঞান বা **বিদ্যা**, আর **দক্ষজ্ঞান** হল তারই বাহিত রূপ বা **বেদ**। যেমন শূন্যের (০) উদ্ভাবন হল **শিবজ্ঞান** বা **বিদ্যা**, আর সেই শূন্যকে (০) রোজকার জীবনে ব্যবহার করার জ্ঞান হল **দক্ষজ্ঞান** বা **বেদ**। সেকালের মহর্ষিরা উদ্ভাবিত জ্ঞানকে বহন করে নিয়ে চলতেন। তাই **দক্ষ**বাহিত জ্ঞানকেই **বেদজ্ঞান** বলে; একালের ভাষায় বললে, স্পেশালিস্ট-বিশেষজ্ঞদের সমস্ত জ্ঞানই **বেদজ্ঞান**। যে কারণে **বেদ**-এর ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ হল — 'যাহা দ্বারা দিশাগ্রস্তভাবে **বিদিত** হওয়া যায়।' বলে রাখা ভাল, মানবসমাজ এক দিশায় চলা শুরু করেছিল **উত্তানপাদ**-এর সময় থেকে অর্থাৎ **দক্ষযজ্ঞ** প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে। তার আগে মানবসমাজের বিকাশের বিশেষ দিক বা **দিশা** ছিল না। সেই বিশেষ দিশায় চলতে চলতে, **প্রকৃতি** থেকে সরতে সরতে আজ আমরা **দক্ষ**-স্পেশালিস্ট-বিশেষজ্ঞদের **বর্ত্তমান** গোলোকায়িত সভ্যতায় পৌঁছে গেছি।

বেদন (আবেদন, নিবেদন, নির্ব্বেদ, প্রতিবেদন, সংবেদন, সমবেদনা, বেদনা) : ১ম খণ্ডের ৬৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। **৫. বেদ** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জেনেছি যে, উদ্ভাবিত **বিদ্যা** একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করে বারংবার প্রযুক্ত হতে থাকলে তাকেই **বেদ** বলে। আপাতদৃষ্টিতে তাতে মানুষের সুবিধা হয়ে যায় বটে, কিন্তু অন্তিমে সেই পুনরাবৃত্তির নীতির কারণে, বা ক্রমান্বয়ে **বেদ** অন (on) হতে থাকলে সেটিই **বেদন** হয়ে যায়। প্রথম প্রথম **বেদ**কে আত্মস্থ করে কাজে রূপান্তরিত করতে খুবই ভাল লাগে। কত ভাল লাগে, সেকথা এমনকি প্রত্যেক কেরানিও তার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁর সেই পুনরাবৃত্তিমূলক **বেদাচার**ই তাঁর কাছে **বেদনা**র কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার সেই **বেদন**-এর **প্রতিবেদন** লিখে সে তার প্রভুকে তার **বেদনা**র কথা **নিবেদন** করতে পারে। তার সেই **আবেদন**পত্র পাঠ করে আমরাও হয়তো বুঝতে পারব, কেরানির কাজের **বেদ** শিক্ষা করে প্রতিদিন সেই **বেদ** অন (on) করে অর্থাৎ **বেদমূলক** আচার বা তদ্রূপ **বেদাচার** করে সে কত কষ্ট পায়।

বেদকণ্ঠ : ২. *বেদ কণ্ঠে যাঁহার।* ৩. শিব। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫. শিব**কে কেন **বেদনিধি** না বলে **বেদকণ্ঠ** বলা হয়, তা বুঝতে হলে আবিষ্কারক-উদ্ভাবকদের দিকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাকাতে হয়। দেখা যায়, যিনি আবিষ্কার বা উদ্ভাবনমূলক কাজ করেন, তাঁর স্বভাবে একটি অদ্ভুত ব্যাপার থাকে। যেটি তিনি উদ্ভাবন বা অর্জন করলেন, সেটি অর্জন করেই তাঁর কী আনন্দ! তারপর সেই অর্জনকে কাজে পরিণত করে তাঁর আনন্দ পৌঁছয় চরমে। কিন্তু তারপরই তাঁর অদ্ভুত আচরণ চোখে পড়ে। তাঁর অর্জিত বিষয়টির থেকে তিনি ক্রমশ সরে যেতে থাকেন। যেন, এযাবৎ অর্জিত **বিদ্যা**তে তাঁর আর কোনো প্রয়োজন নেই, তাঁর নজর এখন অন্য কিছুর দিকে, তিনি অন্য কিছুর পিছনে ছুটছেন। এরকম মানুষই **শিব** পদবাচ্য। এঁরা **বেদ** ধারণ করেন না, **বেদ**-এর মূল যে **বিদ্যা**, সেটি আবিষ্কার করেন। তারপর সেই **বিদ্যা** তিনি গড়গড় করে বলে দেন, প্রথম প্রথম কাজে পরিণত করার জন্য তাঁর চেষ্টাও থাকে। কোনোভাবে সেই **বেদ**-এর প্রচলন হয়ে গেলেই যেন তিনি মুক্ত। তাই, আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনের পর থেকে কাজে পরিণত করা পর্যন্ত তিনি **বেদকণ্ঠ**। তারপরই তিনি পুনরায় ভোলানাথ, সদাশিব।

বেদকর্ত্তা : ২. *বেদ কর্ম্ম করান যিনি; অর্থাৎ বেদানুসার-কর্ম্ম করায় যে সত্তা।* ৩. সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখানেও একই প্রশ্ন **ব্রহ্মা**কে **বেদকর্ত্তা** বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে **সূর্য্য বিষ্ণু** ও **শিব**কে। কেননা, **সূর্য্য** হলেন সেই সামাজিক সত্তা, যাঁকে সমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্র মনে করা হয়, যিনি প্রজাদেরকে **কর্ম্মে** প্রেরণ করেন। কার্যত ইনি হলেন সর্বোচ্চ **বেদকর্ত্তা**। আর, **বিষ্ণু** হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর **বেদকর্ত্তা**। তিনিই তো **দক্ষ**শক্তির **বিষয়-বিষ** ধারণকারী সত্তা, স্বভাবতই বেদানুসার-**কর্ম্ম** করানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা তো থাকবেই। কিন্তু **শিব** সে অর্থে দৈনন্দিন **কর্ম্মে**র প্রেরক নন, তিনি এমনিতে **বেদ**সমূহকে কাজে রূপায়ণের ভাবনা ভাবেন না। নিজে কোনো একটা নতুন **বিদ্যা** আবিষ্কার করে ফেললে, তাকে রূপায়ণের ব্যাপারে তিনি **বেদকর্ত্তা** হয়ে ওঠেন অথবা কোনো কারণে পূর্বতন **বেদ**সমূহ রূপায়ণের সমস্যা দেখা দিলে, লোকে তাঁর কাছে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে; তখন তিনি সকলের সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় বের করে দেন। তিনি যে **মহাদেব**। তাই তিনিও **বেদকর্ত্তা**।

বেদগুহ্য : ২. *বেদ গোপন থাকে যাঁর কাছে; কিংবা যিনি **বেদ** গোপন করেন।* ৩. বিষ্ণু। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভাবনার কথা এই যে, **বিষ্ণু** কেন **বেদ** গোপন করার মতো কাজের সঙ্গে

যুক্ত। এর কারণটি আমরা দেখতে পাই ক্ষমতার উৎসে। একালে অনেকে বলেন, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' ... ইত্যাদি। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা খুঁজে পাই সত্যগোপন বা **বেদ**গোপনকে। আমরা দেখি, একমাত্র **বেদ**গোপন থেকেই সামাজিক ক্ষমতা জন্মায়। তার থেকে ক্রমান্বয়ে আরও নানা সত্তার উদয় হয় এবং অবশেষে জন্মায় বাহুবল, বন্দুকের নল। আমরা আরও লক্ষ করি, তথাকথিত ধনতন্ত্র বেঁচে থাকে প্রধানত এই **বেদ**গোপন থেকে। সেই কারণে ধনতন্ত্রের অধিদেবতা **বিষ্ণু**কেই যে **বেদগুহ্য** বলা হবে, সেটিই তো স্বাভাবিক।

বেদজননী, বেদমাতা, বেদমাতৃ : **৩.** গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **গায়ত্রী, বাহন**।

বেদনিধি, বেদাধিদেব : **৩. বেদনিধি** = ব্রহ্মা। **বেদাধিদেব** = বেদের অধিষ্ঠাতা দেব, ব্রহ্মা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **নিধি, দেব, অধিদেব**। ব.শ. দুটি শব্দের অর্থই বলে গেছেন 'ব্রহ্মা'। **বেদের** নিধিও ব্রহ্মা, অধিদেবও ব্রহ্মা! মানে কী? অতি সহজে বুঝবার জন্য আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি — শান্তিনিকেতনের অধিষ্ঠাতা দেব বা **অধিদেব** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর, যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ততদিন শান্তিনিকেতনের **নিধি**ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদনিন্দক : **২.** *বেদ-এর নিন্দা করে যে।* **৩.** নাস্তিক, বুদ্ধ, বৌদ্ধ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** নাস্তিক ও তান্ত্রিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ যে বৈদিক সভ্যতাকে ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেকথা আজকের অন্ধ-ইতিহাসজ্ঞান জানেই না। কিন্তু তারা যে **বেদনিন্দক** ছিল, সে কথাটি এখনও শব্দকোষ ও অভিধানাদিতে থেকে গেছে। অবশ্য সেই **রামরাজত্ব** যে পরবর্তীকালের শঙ্করাচার্য্য-পন্থীরা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেকথাও এখনকার ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কিন্তু পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তার জন্য সেগুলি পাঠ করার কৌশল জানতে হয়; ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থ নিষ্কাশনের কৌশল জানতে হয়। নিম্নে **বেদবাহ্য** দ্রষ্টব্য।

বেদবতী : **২.** *বেদবৎ আচরণের গতিশীল আধার যে।* **৩.** বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা। রামায়ণ অনুসারে, ইনি তপস্যাকালে রাবণকৃত ধর্ষণা হেতু অগ্নিতে দেহত্যাগ করিয়া, রাবণবধার্থ পরজন্মে সীতারূপে আবির্ভূতা হন। মতান্তরে ইনি প্রথমে স্বর্গলক্ষ্মী এবং পরে দ্রৌপদীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ... ইনি জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। .... জন্মের পরই বেদবতী পুষ্করতীর্থে গিয়ে এক মন্বন্তরকাল কঠোর তপস্যা করেন। ... তারপর পুনরায় বেদবতী গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যারত থাকাকালীন ... রাবণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি অতিথি জ্ঞানে তাঁর সেবা করেন। রাবণ ... কামাতুর হয়ে বলপূর্বক অত্যাচার করতে উদ্যত হলে ... বেদবতী ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে স্তম্ভিত করে তাঁর হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অবয়ব জড়ীভূত করে দেন। কিন্তু রাবণের হাতে তাঁর অপমানহেতু তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে রাবণকে বলে যান, এইরূপে ধর্ষিতা হবার জন্য তিনি আবার অযোনিজা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে রাবণ বধের কারণ হবেন। বহুকাল পরে বেদবতী জনক রাজার কন্যা 'সীতা' নামে জন্মগ্রহণ করেন। ... ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে, দেবগণের ইচ্ছায় প্রকৃত সীতা অগ্নির কাছে থাকেন এবং রাবণ ছায়া-সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষা কালে অগ্নি প্রকৃত সীতাকে অর্পণ করেন। রাম ও অগ্নির উপদেশে এই ছায়া-সীতাও পুষ্করতীর্থে তিন লক্ষ বৎসর তপস্যা করেন। এই তপোবল-প্রভাবে যজ্ঞ হতে উত্থিতা হয়ে ইনি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী নামে খ্যাত হন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কুশধ্বজ, ব্রহ্মর্ষি, দ্রৌপদী**। পুরাণাদি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, একই সত্তা পর পর তিন যুগে তিন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন — **বেদবতী, সীতা, দ্রৌপদী**। আজ আমরা জানি, সেই ধারার আরও বিবর্তিত রূপায়ণ ঘটেছে শ্রী**রাধা**য়। এখন প্রশ্ন হল, এই **বেদবতী** কে? উপরোক্ত কাহিনী আমাদের কী বলতে চায়?

না, সম্পূর্ণরূপে **বেদ**-এর আধারশক্তি হয়ে ওঠা নয়, **বেদবৎ** বা **বেদ**-এর মতো-র আধারশক্তি হয়ে উঠেছিলেন যে-আধারশক্তি, তাঁকে বলা হত **বেদবতী**। ইনি হলেন বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগের অপরাহ্নবেলার বিশেষ শ্রেণীর **প্রজা**, মহর্ষির ছাত্র বা অনুসারী। তাঁরা পূর্বতন **প্রজা**দের মতোই পরিচালকের (মহর্ষির) নির্দেশে উৎপাদন কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হতেন বটে, কিন্তু কর্মের মূল্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন গ্রহণ না করে অন্যতর ভাবে দাম পাবেন, একথা জেনেই কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হতেন। সেই প্রথম মানুষের সমাজে একদল মানুষ যে উৎপাদন কর্মে লিপ্ত হল, সেই উৎপন্ন দ্বারা তাদের শ্রমমূল্য পেল না, প্রথম বিনিময়মূল্য পেল। এটিই এই সত্তার বিশেষত্ব, যা কালে কালে পরবর্তী যুগেও প্রবাহিত হয়। **রাবণ** বা রাষ্ট্র এই **বেদবতী**দের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, কিন্তু দাম দেয় না। তাকেই **রাবণ** কর্তৃক ধর্ষণ বলা হয়। তারও পরে এই শ্রেণীর **প্রজা**কেই নিয়ে শুরু হয় **জনক** রাজার পাইকারী কৃষিশস্য উৎপাদন। তখন **বেদবতী** হয়ে যান **সীতা**। **রাবণ** তাকেই হরণ করে, অর্থাৎ, এই প্রজাবৃন্দ ও তাদের উৎপাদন রাষ্ট্রীয়করণ করার চেষ্টা হয়। ... পরবর্তীকালে এই সত্তাই **দ্রৌপদী** রূপে দেখা দেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালে **বেদবতী**-শ্রেণীর **প্রজা**গণ আরও বিবর্তিত হয়ে এমন আচরণ করে, যাকে একালের কোম্পানির কর্মচারীর আদিরূপ বলা যেতে পারে। তবে মহাভারত ও রামায়ণের রচনাকাল সম্পর্কে গবেষকদের সিদ্ধান্তটি — মহাভারত লেখা শুরু হয়েছিল আগে, শেষ হয়েছে পরে; আর, রামায়ণ লিখতে শুরু করা হয়েছিল পরে, লেখা শেষ হয় আগে — মানলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়। কার্যত, **সীতা**র বা পাইকারী কৃষি উৎপাদনের সূত্রপাত হয়েছিল **দ্রৌপদী**র বা ভ্রূণরূপী কোম্পানির আবির্ভাবের পরে; কিন্তু সেই **দ্রৌপদী**র সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল পাইকারী কৃষি উৎপাদনের পাতালপ্রবেশের পরে। এটি ঠিক কথা বলেই মনে হয় এবং সেই সুবাদে উপরোক্ত গবেষকদের সিদ্ধান্তটিও সঠিক বলেই মনে হয়।

বেদবাহ্য : **২.** *বেদবাদীদের দ্বারা বেদ-ব্যবহার করার অধিকার*

হইতে *বহিষ্কৃত যে বা যারা।* **৩.** নাস্তিক। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পাষণ্ড**। ভারতীয় সমাজে কারা **বেদবাহ্য** হয়েছিলেন? তাঁদের সেকালে কী নামে শনাক্ত করা হত? তাঁদের অপরাধ কী ছিল? তাঁদের মোট সংখ্যা কত? পুরাণাদি এর যা সাক্ষ্য দেয়, তা এককথায় ভয়ানক। এঁরা সনাতন **বেদ** মান্য করতেন। কিন্তু যে বিভাজিত **বেদ** (= **বেদসংহিতা**) একদিন ভারতসমাজের ক্ষমতাকেন্দ্রের সহায়ক ও ভিত্তি হয়ে যায় এবং ক্রমে মৌলবাদী হয়ে মানববিরোধী হয়ে যায়, এঁরা মূলত সেই বংশানুক্রমিক-***বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধারণকারী ধর্ম্মের মর্যাদাস্বরূপ বেদ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা*** করেছিলেন বা করতেন। এঁরা স্বভাবতই নাস্তিক, বৌদ্ধ, যতি, বেণ, শাক্যভিক্ষু-ক্ষপণকাদি, কাপালিক, তান্ত্রিক, শিবানুচর, রুদ্রানুচর, নন্দি, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পারশব, ব্যাধ, কিরাত, ধীবর, কৈবর্ত্ত, দাশ, তুখার, তুম্বর, গোণ্ড, কোল, শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্নব, কোলসব্য, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, কেরল, খশ, চীন, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, শাম্ব, অঙ্গ, **বঙ্গ,** কলিঙ্গ, কোঙ্কণ এবং বেদবহিষ্কৃত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ। তার মানে, এমনকি যে-ব্রাহ্মণ ও যে-ক্ষত্রিয়রা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠিত **বেদবাদী**দের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদেরও **বেদবাহ্য** করে দেওয়া হয়। বঙ্গদেশের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী-ব্রাহ্মণরাও একসময় **বেদবাহ্য** বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। ... এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ১১৪-১২৭ পৃষ্ঠায়।

বেদবিক্রয়ী : ২. *যিনি **বেদ** বিক্রয় করেন।* **৩.** ধনবিনিময়ে বেদের অধ্যাপক। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভৃতাধ্যাপক**। সনাতনপন্থীরা তো বটেই, এমনকি প্রথম যুগের বেদবাদীরাও **বেদ** বিক্রয় করাকে অত্যন্ত মন্দ কাজ বলে মনে করতেন এবং তার নিন্দা করতেন। এই উত্তরাধিকার এমনকি ৫০/৬০ বছর আগেও এই পোড়া বঙ্গদেশে ছিল। তখনও এমন বহু জ্ঞানীমানুষ এদেশে বাস করতেন, যাঁরা বিদ্যাদান করার ক্ষেত্রে অর্থকরী প্রসঙ্গকে সাধ্যমত এড়িয়ে যেতেন। কোনো জমিদার বা রাজার কাছ থেকে যদি তাঁরা ব্রহ্মোত্তর পেয়ে যেতেন, তাহলে তো কথাই নেই, ছাত্রের কাছে টাকাপয়সা নেওয়া তো বহু দূরের কথা, ছাত্রই তাঁর বাড়িতে বিনেপয়সায় খেয়ে দেয়ে লেখাপড়া শিখত। এই করতে গিয়ে কত সদ্‌ব্রাহ্মণ যে ভিখারী হয়েছেন, তার হিসাব নাই। এ পোড়া বঙ্গদেশে এরকম মৌলবীরও দেখা পাওয়া যেত। আর আজ? আজ **বেদবিক্রয়** বেদবাদীদের হাত থেকে চলে গেছে বেনিয়াদের হাতে। **বেদ** যদি **পণ্য**ই হয়ে গেল, তাহলে বেদবাদী তা বেচবে কেন, বিপণন যাদের **ধর্ম্ম**, সেই পণ্যজীবীরাই বেচবে! তাই এখন পণ্যজীবীরাই বেদ বিক্রয় করে, বিক্রি করে বেদবাদীদের হাত দিয়েই; বেদবাদী নিমিত্তের ভাগীদার হন। একেই বলে বিধির বিধান!

বেদব্যাস (ব্যাস) : **১.** বেদ + বি - ✓অস্ + অ (অণ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ব্যাস*** = *বিকল্প অস্তিত্ব (স্পষ্ট) করে যে।* ***বেদব্যাস*** = ***বেদ****-এর বিকল্প অস্তিত্বগুলি (স্পষ্ট) করে যে। /* **বেদব্যাস** = যিনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন ('বেদবিভাগকর্ত্তা')। **ব্যাস** = যাহার দ্বারা বিভাগ সাধিত হয় ('বিভাগসাধন')। (ব.শ.)। **৩. ব্যাস** = বিস্তৃত, বিস্তার, বিগ্রহ, বিভাগ, এক বা দ্বিত্র উপায়, বৃত্তের কেন্দ্রগত পরিধিপর্যন্ত মধ্যরেখা (diameter), মানবিশেষ, শত পল। **বেদব্যাস** = ব্যাস, মন্বন্তরে ব্যাসসদৃশ মুনি, যিনি পুরাণাদি স্পষ্টাক্ষরে মিষ্টভাষায় রসভাবাদির সহিত ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণাদি শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দেন। মহর্ষি বেদব্যাস (ইনি বসিষ্ঠের প্রপৌত্র ... ... ইত্যাদি। যমুনামধ্যস্থ দ্বীপ ইঁহার ন্যাসস্থান বলিয়া ইনি 'দ্বৈপায়ন', শাখাভেদে বেদের বিভাগ বা বিস্তার করেন বলিয়া ইনি 'বেদব্যাস' ও কৃষ্ণবর্ণ হেতু ইনি 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত। ... ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত ইঁহার দর্শন। ইনি সুমন্ত জৈমিনি পৈল শুক ও বৈশম্পায়নকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। ...)। (ব.শ.)।

ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত এবং বেদবিভাগকর্তা। ... ইনি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শক্তি্র পৌত্র, পরাশরের পুত্র ও শুকদেবের পিতা। এঁর মাতার নাম সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা)। ... ইনি মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, বেদান্তদর্শন, এবং ভাগবত রচনা করেন। 'ব্যাস-সংহিতা' এঁর স্মৃতি, বেদান্ত এঁর দর্শন। এছাড়া পাতঞ্জল দর্শনের উৎকৃষ্ট টীকাও ইনি প্রণয়ন করেন। ... মাতা সত্যবতীর আদেশে ইনি বিচিত্রবীর্যের পত্নীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন। মহাভারতের নানা ঘটনায় ব্যাস স্বয়ং জড়িত। (যেমন রামায়ণের ঘটনায় স্বয়ং বাল্মীকি জড়িত।) ... ব্যাসের বিধান অনুযায়ীই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এঁর বরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে সক্ষম হন। ... একবার এক অপ্সরাকে দেখে ব্যাসদেবের রেতঃপাত হয়। অপ্সরা ভীত হয়ে শুকপক্ষীর আকার ধারণ করে পলায়ন করে। এই রেতঃপাত হতে শুকদেবের জন্ম হয়। ... পুরাণে ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্বরূপ বলা হত। কল্পে কল্পে ধর্মের অবনতি দেখে ধর্মরক্ষার জন্য ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদরক্ষা ও বেদবিভাগ করে প্রচার করেছেন। ব্যাস ব্যক্তিবিশেষের নাম নয় — বেদবিভাগকারী ঋষিদের সম্মানসূচক উপাধি। ... তারপর লোমহর্ষণ মুনিকে ইনি ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলে গ্রহণ করেন। ব্যাস চিরজীবীদের অন্যতম। (পৌ.অ.)। **৪.** diameter অর্থে **ব্যাস** অ্যাকাডেমিতে প্রচলিত। **বেদব্যাস** নামরূপে সেকেলে বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কর্ণ**, **বাসবদত্তা**। **ব্যাস** ও **বেদব্যাস** সম্পর্কে আমাদের 'ঋ' গ্রন্থের 'ভাষাতত্ত্বের পূর্বদিগন্ত' নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। নিবন্ধটি ১৯৯৪ সালে কলকাতার 'একালের রক্তকরবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ২০০২ সালে তা উপরোক্ত 'ঋ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এখানে সেই নিবন্ধ থেকে কিছু অংশ আমরা পাঠকের জন্য তুলে দিচ্ছি। এই অংশটি **ব্যাস** ও **বেদব্যাস** শব্দদুটিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

'... **ব্যাসদেব** যে একজন ব্যক্তিমানুষ নন, তার কমপক্ষে দুটি প্রমাণ পণ্ডিত গবেষকগণই পেশ করে রেখেছেন। ১) অতগুলি গ্রন্থ একজন মানুষের পক্ষে লেখা কোনোমতেই সম্ভব নয়। ২) রচনাকাল

এত দীর্ঘ (প্রায় দুই হাজার বৎসর) যে, একজন মানুষের পক্ষে অতদিন বাঁচা ও লেখাজোখা করা একেবারেই অসম্ভব। তবে কিনা বলা হয় — **ব্যাসদেব** ছিলেন একজন চিরজীবী। এই অসম্ভব ব্যাপারটিকে মেনে নিলে, আর কোনো কথা চলে না। কিন্তু আপনি এইবার তাঁকে চিনতে চাইবেন। বেঁচেই যদি আছেন তো এখন তিনি কোথায় থাকেন? না, সেরকম কোনো ব্যক্তির ঠিকানা কেউই আপনাকে সরবরাহ করতে পারবেন না।

যাই হোক, আপনি আপনার সাধারণ জ্ঞানের উপর ভরসা হারাতে চাইবেন না নিশ্চয়। সুতরাং আপনি আপনার মতোই ভাবুন। **ব্যাস** কাকে বলে? যে রেখাটি বৃত্তের পরিধিকে বিপরীত মেরুতে যোগ করে এবং কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে বৃত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটিকেই আপনি **ব্যাস** বলে চেনেন। এই রেখাটি কেন্দ্র থেকে দুই বিপরীত দিকে সমান দূরত্বে প্রসারিত, এবং যখন তা কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে ঘুরতে থাকে, তখনই বৃত্তের সমগ্র এলাকা ও পরিধি চিহ্নিত হয়। আপনি এও জানেন যে, একটি রেখা মানেই অনেকগুলি সমস্তরের বিন্দুর যোগফল। এই ধারণার সামাজিক চেহারা কেমন হতে পারে? আধুনিক ভাষায় এই **ব্যাস** হতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো বা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মতো কোনো সমিতিই। কেননা কমিউনিস্ট পার্টির যে বৃত্ত বা চক্র (কথাটি 'ফ্রেন্ড সার্কেল' রূপেও প্রচলিত আছে) তাকে নিয়ন্ত্রণ করে পলিটব্যুরো, যা কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত। সুতরাং এই অনুমান করা চলতে পারে যে, ব্রাহ্মণদের (গুরুশ্রেণীর বা জ্ঞানজীবীদের) ভারতব্যাপী যে চক্র, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি **ব্যাস** বা সমিতি ছিল। এই অনুমান যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় নিম্নোক্ত কারণে ---

১. একটি সমিতির দীর্ঘজীবী বা চিরজীবী হতে আপত্তি নেই, সম্ভব।
২. একটি সমিতির পক্ষে এইরকম বহু গ্রন্থ রচনা সম্ভব।
৩. যৌথসমাজে, যেখানে পণ্য নাই, ফলে ব্যক্তিমালিক নাই, স্বভাবতই 'ব্যক্তি'র উদ্ভব তখনও ঘটেনি, সেখানে এরকম সমিতির সৃষ্টি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।
৪. **ব্যাস**-এর (সমিতির) সদস্যদের উত্তরসূরিরা আজও ভারতে **ব্যাস** পদবি ধারণ করে বেঁচে-বর্তে আছেন, যদিও তাঁদের ব্যাসত্ব এখন আর নেই।
৫. এখনও প্রতি পাঁচবছর অন্তর **ব্যাস**-পূর্ণিমা প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু ব্যাসেরা বা ব্যাসের উত্তরসূরিরা নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়ে আর নতুন পুরাণ লেখেন না।
৬. আধুনিক নৈমিষারণ্যে (ইতিহাস কংগ্রেসে) ইউরোপের ঔরসে ও ভারতের গর্ভে জাত আধুনিক ব্যাসেরা আজও সমবেত হন এবং ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণ (ইতিহাস) চর্চা করেন বটে, তবে তাঁদের 'আত্মবিচ্ছেদ' ঘটে যাওয়ায় তাঁরা আজ ভারতীয় পদ্ধতিতে ইতিহাস (পুরাণ) রচনায় অক্ষম, ব্রাহ্মণশ্রেণীকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণও করেন না।
৭. যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রকাশিত হরিবংশ পুরাণের মুখবন্ধে জানিয়েছেন যে, ব্যাস যে একটি সমিতি এই ধারণা আজ থেকে একশো বছর আগেও কেউ কেউ বলতেন।
৮. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'ব্যাস ব্যক্তি না হলেও একটি শক্তি তো বটেই।'

এই পর্যন্ত এসে আপনি কিন্তু এক বিশাল জগতের সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। **ব্যাস** যদি এই হন, তাহলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! যত পৌরাণিক চরিত্র সকলের ক্ষেত্রেই এইরকম ব্যাপার-স্যাপার থাকবে। সব্বাইকে নতুন করে চিনে নিতে হবে। তাহলে তো সমগ্র বেদপুরাণ রামায়ণ মহাভারত নতুন করে পড়তে হবে এবং সব ক্ষেত্রেই আধুনিক জ্ঞানস্তরের উৎকর্ষ দিয়েই ব্যাপারগুলিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, ইউরোপের মতো প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারদের 'বর্বর' ভাবলে কিছুই বোঝা যাবে না। নামরহস্য তো বহু দূরের কথা।

ব্যাসকে না হয় চিনলেন 'ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে সেকালের ভারতশাসনকর্তা ব্রাহ্মণদের কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো রূপে।' কিন্তু কেবল **ব্যাস**কে চিনলেই হবে না, তাঁর পুরো নাম **কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস** কেন, তাঁর মা **মৎস্যগন্ধা**ই বা কে? **পরাশরে**র **কুজ্ঝটিকা** সৃষ্টির অর্থই বা কী? মৎস্যগন্ধাকে **গন্ধকালী** বলা হত কেন? পরাশর-বরে তাঁর **গন্ধবতী** হওয়ার তাৎপর্যই বা কী? অতঃপর তাঁর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহের কী অর্থ? **শান্তনু**ই বা কে? কে **বিচিত্রবীর্য**, কে **ভীষ্ম**, কে **ধৃতরাষ্ট্র**, কে **পাণ্ডু** ইত্যাদি ইত্যাদি --- অর্থাৎ গোটা মহাভারতটারই অর্থ নতুন করে জানতে হবে, এবং আপনার **ব্যাস**ার্থের সঙ্গে ওইসব অর্থগুলি খাপ খাচ্ছে কি না, সেটাও দেখতে হবে। সুতরাং আপনি যে হিমালয় পর্বতের একটি একটি করে পাথর তুলে তুলে পুরো হিমালয় পর্বতটিকেই সরিয়ে ফেলার মতো প্রায়-অসম্ভব কাজের ঝামেলা নিয়ে ফেলছেন — সেকথা এবার উপলব্ধি করতে পারছেন, আশা করি। কিংবা চা-চামচ দিয়ে সমুদ্র সেঁচবার এই কর্তব্যগ্রহণ দেখে আপনি নিজেই ঘাবড়ে যাবেন, সন্দেহ নাই।

এই দুরবস্থার হাত থেকে আপনি বাঁচতে পারেন কেবলমাত্র একটি উপায়ে। আপনি পুরাণ বুঝবার মতো ভাষাজ্ঞান যদি অর্জন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যে শব্দার্থবিধি প্রচলিত তা পরিত্যাগ করে, যে শব্দার্থবিধি অনুসরণ করে ওইগুলি লিখিত হয়েছিল সেই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি রপ্ত করে নিতে হবে এবং তার দ্বারা আপনাকে বেদপুরাণাদি বুঝে নেওয়ার উপায় খোলা রাখতে হবে। এর ফলে, আপনার যতটা প্রয়োজন ততটা আপনি বুঝে নিতে পারবেন, বাকিটা থাকল উত্তরসূরিদের জন্য। তাহলে একদিন হিমালয় প্রমাণ ওই বেদপুরাণাদি মানবসমাজের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং আসুন, আমরা, শব্দার্থবিধি সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলি, যতটা পারা যায়, বুঝে নেবার চেষ্টা করি।' (পরিমার্জিত)

এসব কথা ১৯৯৪ সালে যখন কলিম খান লিখছিলেন, তখনও ভাবা সম্ভব হয়নি যে, একদিন এরকম একটি শব্দার্থকোষ লিখতে পারার মতো পরিবেশ পাওয়া যাবে; বাংলাপ্রেমী সজ্জনেরা আমাদের তেমন পরিবেশ সরবরাহ করে দেবেন। যাই হোক, সেই পরিবেশের সুযোগে আমরা **বেদব্যাস** সহ আরও অনেকের অর্থ উদ্ধার করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, করছি। ভবিষ্যতে যোগ্য উত্তরসূরিরা নিশ্চয় এই কাজকে আরও যথাযথভাবে করবেন।

বেদশাস্ত্র : ২. *বেদ নামক **শাস্ত্র***। ৩. বেদগ্রন্থ। ৪. অপ্রচলিত। ৫.

শাসককে তার শাসনকার্যের সমস্যা থেকে ত্রাণ করে যে, তাকে বলে **শাস্ত্র**। বৈদিক যুগের পণ্ডিতগণের সংকলিত **বেদ**গ্রন্থটি যখন সেই ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে **বেদশাস্ত্র** বলে। দ্র. **বেদসংহিতা**।

বেদসংহিতা : ২. *বেদ সংহত যে আধারে।* ৩. বেদমন্ত্রসংকলনগ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে **বেদ** বলতে লোকে যে গ্রন্থটিকে বোঝে, এই **বেদসংহিতা** হল সেই গ্রন্থ। দ্র. **বেদ**।

বেদসন্ন্যাস : ২. *বেদ-অনুসার কর্ম্ম সম্যক রূপে ন্যাস করা হয় যাহাতে।* ৩. বেদোক্ত-অগ্নিহোত্র ত্যাগ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বানপ্রস্থ**, **সন্ন্যাস**। **বেদ** অনুসারে শ্রম আহুতি দেওয়ার যে কাজকর্ম, সেই কাজ পরিত্যাগ করাকেই **বেদসন্ন্যাস** বলে। তবে এই **বেদ** যদি **বেদসংহিতা** হয়, তাহলে সকল **কর্ম্ম**ত্যাগ বোঝায় না। কেননা, **বেদসংহিতা**র বাইরেও বিপুল পরিমাণ **বেদ** বিদ্যমান। আর, এ যদি সর্বপ্রকারের **বেদ** বোঝায়, তাহলে তার মানে অবশ্যই জগতের থেকে কিছুই গ্রহণ না করে সকল **কর্ম্ম** পরিত্যাগ করাই বোঝাবে। সেরকম হলে মানুষ নিঃশ্বাস নিতেও অপরাধ বোধ করবে, লজ্জা পাবে। তবে সেরকম ভাবনাও ভাববার সাহস রাখতেন আমাদের পূর্বসূরিরা। শ্রী কেদারনাথ মিত্র রচিত 'মুসলমান ভক্তচরিত' গ্রন্থে 'মহর্ষি হোসেন বসোরী'র চরিতকথায় নিম্নলিখিত বয়ান রয়েছে।

"একবার একজন লোক মহর্ষি হোসেনের কাছে এসে সংবাদ দিলে যে, ঐ শহরেরই একটি লোক, অতি নিকটেই তার বাস, বিশ বৎসরের মধ্যেও সে নাকি কখনো কোনো সামাজিক উপাসনায় যোগদান করেনি। শুনে মহর্ষি হোসেনের মনে বড় দুঃখ হল। ভাবলেন — মানুষ কেন এমন ঈশ্বরবিমুখ থাকবে; তাকে গিয়ে কিছু উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। এই ভেবে মহর্ষি স্বয়ং তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'ভাই, তুমি লোকের সঙ্গই-বা কর না কেন, আর সামাজিক উপাসনাতেই-বা যোগদান কর না কেন?' লোকটি কোনো উত্তর দিলে না, নীরবে বসে রইল। মহর্ষি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করলেন। তখন লোকটি বলল, 'মহাশয়, ক্ষমা করুন, বড় ব্যস্ত আছি।'

মহর্ষি হেসে বললেন, 'ভাই, কিসে এমন ব্যস্ত আছ যে, অতিথির সঙ্গেও দুটো কথা কইবার তোমার অবকাশ হয় না?' লোকটি বলল, 'হোসেন, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আর তাতে দেখছি — একদিকে ঈশ্বরের যেমন করুণা, অন্যদিকে আমার তেমনি অকৃতজ্ঞতা। তাই প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর করুণা স্মরণ করে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আর আমার অপরাধ স্মরণ করে তাঁর কাছে মার্জনা চাচ্ছি।' হোসেন শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'বেশ, তাই করুন। আপনার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।"

এই হল পূর্ণ **সন্ন্যাস**, জগৎ-সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত। **বেদসন্ন্যাস** পেরিয়ে এই পূর্ণ **সন্ন্যাসে** পৌঁছতে হয়। তখন মানুষ জগৎ থেকে কিছুই গ্রহণ করে না, শুধুই দেয়।

বেদাগম : ২. *বেদ ও **আগম** যাহাতে; অথবা বেদ-এর আগম যাহাতে।* ৩. বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আগম**। প্রচলিত জ্ঞানের বা **বেদের** সাহায্যে কোনো কাজ করা না গেলে, নতুন **বেদের** প্রয়োজন পড়ে। প্রচলিত **বেদ** সমাজের অগ্রগতির তুলনায় সেকেলে হয়ে পড়লে, এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন লোকে **বেদের** দোষদর্শন করে। তখন যে নতুন জ্ঞান আসে, সেই হল **আগম**। একেই **বেদাগম** বলা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্য। **বেদ** শব্দের মতো **আগম** শব্দও প্রতীকী হয়ে গিয়েছিল। প্রচলিত ও সংকলিত **তন্ত্র**শাস্ত্রগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল **আগম**। ফলে, পরবর্তীকালে **বেদাগম** নতুন **বেদের** আগমনের কথা না বলে **বেদ** ও **তন্ত্র** নামক দুটি শাস্ত্র ও তাতে ধরে রাখা বিষয়ের বাচক হয়ে যায়।

বেদাঙ্গ : ২. *বেদ-এর **অঙ্গ**।* ৩. বেদের অঙ্গসদৃশ শিক্ষা-প্রভৃতি ষট্‌শাস্ত্র। (ব.শ.)। **শিক্ষা**, **কল্প**, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, ও নিরুক্ত — এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। বেদ সম্যক রূপে বুঝতে হলে এই ছয়টি বেদাঙ্গ আয়ত্ত করা আবশ্যক। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের গ্রন্থগুলিকে সেকালের জ্ঞানের বা **বেদের** অঙ্গ মনে করা হত। তবে পরবর্তীকালে এগুলিকে কেবলমাত্র **বেদসংহিতার** অঙ্গ বলে দেগে দেওয়া হয়।

বেদাধিপ : ২. *বেদের অধিপতি।* ৩. বেদাধিপতি গ্রহ, ঋগ্বেদের বৃহস্পতি, যর্জুর্ব্বেদের শুক্র, সামবেদের মঙ্গল, অথর্ব্ববেদের বুধ অধিপতি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, চারপ্রকার বেদের প্রত্যেকটি থেকে যা কিছু ফললাভ হত এবং তা সব যাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁদেরও অধিপতি ছিলেন। এঁরা **ব্রহ্মা**র মতো 'অধিষ্ঠাতা দেব' নয়, এঁরা অধিপতি **গ্রহ**। এঁরা হলেন যথাক্রমে বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, মঙ্গলগ্রহ, ও বুধগ্রহ। সমাজেতিহাসেও এঁদের অন্তত তিনজনকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। **জ্যোতিষে**ও দেখা যায়। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে এখনও অজ্ঞ। আশা করা যায়, অন্য কেউ এর অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন।

বেদান্ত : ২. *বেদ-এর **অন্ত** যাহাতে।* ৩. বেদের অন্ত জ্ঞানকাণ্ড, তদাত্মক ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ, উপনিষৎ, শারীরকসূত্রাদি গ্রন্থ, ষড়দর্শনের একতম। (বেদের শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ড। ইহা উপনিষদের বিষয়। ব্যাসদেবেরও এই বেদান্তবিষয়ক দর্শন 'বেদান্তদর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। 'উত্তরমীমাংসা', 'ব্রহ্মসূত্র', 'শারীরকমীমাংসা' ইহার পর্য্যায়। ইহা ব্রহ্মতত্ত্ববিচার হেতু 'ব্রহ্মসূত্র' এবং শরীরস্থ জীবরহস্যনির্ণয় হেতু 'শারীরক'। সমন্বয় অবিরোধ সাধন ফল ভেদে ইহার চারি অধ্যায়; প্রত্যেক অধ্যায়ে চারি পাদ, সর্ব্বসুদ্ধ ষোড়শ পাদ। 'তত্ত্বমসি', 'ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য, ইহাই মুক্তি। বেদান্তদর্শনই ইহার উৎকৃষ্ট সোপান।)। (ব.শ.)। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণায়ক শাস্ত্র। বেদের পূর্বভাগ — মন্ত্র, ঋক্, যজুঃ ও সামন্ — এই পূর্বভাগের দর্শনই পূর্ব-মীমাংসা। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগই পূর্ব-মীমাংসার ভিত্তি। বেদের শেষ ভাগ আরণ্যক, তার শেষ ভাগ উপনিষদ। এই উপনিষদ ভাগকেই বেদান্ত বলে। এতে বেদের চরম বস্তু আছে বলে এর নাম বেদান্ত, (উত্তর-মীমাংসা)। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্ম নির্ণয়মূলক যে সব গভীর চিন্তা আছে,

তাদের সমন্বয় স্থাপন করাই উত্তর-মীমাংসার উদ্দেশ্য। জীবব্রহ্ম নিরূপণান্তক সূত্রই ব্রহ্মসূত্র। বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। (পৌ.অ.)। ৪. শব্দরূপে অপ্রচলিত। ৫. এই বিষয়টি নানা জনে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর, প্রতীকীকরণের সমস্যা তো আছেই, যেমন কয়েকটি বইকে **বেদান্ত** বলে দেওয়া। তবে একটি বিষয়কেও **বেদান্ত** বলার চেষ্টা এখনও প্রচলিত রয়েছে, সেটি হল 'ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়'। আমরা শব্দার্থের দিক থেকে এগিয়েছি এবং সেভাবেই এর যে অর্থ পেয়েছি, এখানে অতি সংক্ষেপে সেটুকু উল্লেখ করব।

আমাদের কাছে **বেদ** কী, সেকথা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। **অন্ত** কী, সেকথা ১ম খণ্ডে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উদ্ভাবিত **বিদ্যা**র প্রচলিত প্রয়োগমূলক জ্ঞানকে **বেদ** এবং যা কিছু **অন** হতে হতে যেখানে তারিত হয়, তাকে **অন্ত** বলে। অতএব **বেদ অন্ত** হয় যাহাতে, তাকেই **বেদান্ত** বলে। সে কেমন ব্যাপার?

আমরা দেখছি যে-**বিদ্যা** পরিণত হয় **বেদ**-এ, তার দুরকম **অন্ত** হয়। প্রথমত, সরল সহজ রূপ গ্রহণ করে তা জনসাধারণের প্রবাদ-প্রবচন-জনশ্রুতিতে পরিণত হয়ে বাহিত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ক্রমসংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে ক্রমান্বয়ে সে 'ব্রহ্মাস্মি' বা 'সো-অহং', 'অন্‌ল্-হক্' কিংবা 'I and my Father are one'-এ গিয়ে ঠেকে যায়। বাস্তবে এই দুইপ্রকার **বেদান্ত** হয়ে থাকে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে যা হয়েছে, **বেদান্ত** শব্দকে বোঝার ক্ষেত্রেও তাই হয়। প্রাচীন কালের **বেদসংহিতা**র ধারা অনুসরণ করে যে **বেদান্ত** গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছে, লোকে সেগুলিকেই **বেদান্ত** বলে থাকেন। তার মানে আমরা একথা বলছি না যে, উপরোক্ত লিখিত **বেদান্ত**-গ্রন্থগুলিতে **বেদান্ত** বিষয়ক কথাবার্তা বা আলোচনা নেই। আছে। 'তত্ত্বমসি', 'ব্রহ্মাস্মি' — এসব কথা তো ঐ গ্রন্থগুলিতেই আছে। কিন্তু তার বাইরেও আছে এবং অনেক বেশি করেই আছে; সেটাই আমাদের বক্তব্য।

বেদী (বেদি, বেদিকা) : ১. ✓বিদ্ + ইন্ (ণিনি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বেদি** = **বেদ** গতিশীল যাহাতে। **বেদিকা** = বেদকে গতিশীল করে যে আধারশক্তি। **বেদী** = **বেদ** গতিশীলভাবে বা সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে।* / **বেদি, বেদী** = যে স্থান হইতে দ্রব্য জাত হয়। (ব.শ.)। ৩. **বেদি, বেদী** = পুণ্যস্থান, যাগার্থ সংস্কৃত ভূভাগ, পরিষ্কৃত ভূতল, গৃহদ্বারস্থিত পিণ্ডাকার মৃত্তিকাস্তূপ, ডমরুকাকৃতি যাগার্থ মৃৎপিণ্ডিকা, বলভীর অধোদেশে বিরচিত অধষ্টম্ভবেদিকা ... ইত্যাদি; বেত্তা, জ্ঞাতা, অনুভবিতা, তত্ত্বজ্ঞ, পরিণেতা, পণ্ডিত, ব্রহ্মা, বেদজ্ঞপণ্ডিত। **বেদিকা** = গৃহদ্বারস্থিত পিণ্ডাকার মৃত্তিকাস্তূপ, দেবাগারাদিতে নির্ম্মিত বেদি। (ব.শ.)। ৪. **বেদি** শব্দটি 'উঁচু স্থান' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **বেদী** শব্দটি উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণের পদবী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও **দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী**ও আছে। ৫. এই শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশনের কমপক্ষে তিনটি সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা হল, **বেদ**-প্রয়োগের প্রকৃত আচরণ ও প্রতীকী আচরণ। প্রত্যেকটি উৎপাদন কর্ম সম্পাদন করার জন্য একটা কর্মকেন্দ্র লাগে, যেমন কামারের হাতুড়ি পেটার উঁচু স্থান, কুমোরের কাদা মাখানোর স্থান, ছুতোরের ঠোকাঠুকির জায়গা, চাষীর ধানগম জমা করে ঝাড়াই-মাড়াই করার স্থান ... ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ নামও আছে, যেমন ছুতোরের কর্মস্থানটিকে বলে 'যোগান', চাষীর তদ্রূপ কর্মস্থানটিকে বলা হয় 'খামার'। এসব ক্ষেত্রে **বেদ**-প্রয়োগের প্রকৃত আচরণ ও প্রতীকী আচরণের কীরূপ সমস্যা রয়েছে, সেটি দেখুন।

ধরা যাক, বিষয়টি ধান-উৎপাদনের জ্ঞান বা **বেদ**, সময়কাল আজ থেকে চার হাজার বছর আগে। মাঠে চার মাস ধরে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধান চাষ করে ঘরে তুলে আনা এই জ্ঞান বা **বেদ**-এর 'প্রকৃত আচরণ'। কিন্তু অন্য সাথীদের সেই চারমাসের কাজের পুরো প্রকল্প বোঝানো হবে কীভাবে? ভাষা বিকশিত হয়নি সেভাবে, লেখাজোখার তো বলতে গেলে জন্মই হয়নি। তো, তখন একপ্রকার প্রতীকী আচরণের মাধ্যমে চারমাসের কাজের পুরো প্রকল্পটি বোঝানো হত। সেই প্রতীকী আচরণের অজস্র রকমফের ছিল। তারই উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ অর্থহীন আচরণ রূপে আজও বহন করেন একালের পুরোহিতেরা তাঁদের হোম, যজ্ঞ ইত্যাদির মাধ্যমে। ফলে, একটি সমস্যার উদয় হয়েছে। ধান-উৎপাদনের প্রকৃত আচরণে 'খামার' নামে একটি সাফসুফ করা বিশেষ স্থান হয়, যেখানে পাকা ধান তুলে এনে ঝেড়ে নিয়ে জমা করা হয়; অর্থাৎ সেটিই ধান-উৎপাদনের কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্র। আর ধান-উৎপাদনের প্রতীকী আচরণে একটি অতি ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত মৃত্তিকাস্তূপ বানানো হয় সেই 'খামারটির' প্রতীকরূপে, যাকে 'যজ্ঞবেদী' বা **বেদী** নামে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। তার মানে আমাদের ধান-উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞের একটি প্রকৃত যজ্ঞ**বেদী** হয়, আর একটি প্রতীকী যজ্ঞ**বেদী** হয়। প্রকৃত যজ্ঞ**বেদী** হল চাষীর ক্ষেত্রে খামার, আর প্রতীকী যজ্ঞ**বেদী** হল পুরোহিতের প্রতীকী কর্মযজ্ঞের যজ্ঞ**বেদী**। সুতরাং **বেদী** বললে আলটপকা যে কোনো একটিকে বুঝে নিলে চলবে না, এই হল সমস্যা। কাজেই, জ্ঞান বা **বেদ**-প্রয়োগের প্রকৃত আচরণের **বেদী** ও প্রতীকী আচরণের **বেদী** উভয়কে একইসঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বুঝতে বুঝতে এগোতে হবে। কোনোটিকে ছেড়ে যাওয়া চলবে না, গুলিয়ে ফেলাও চলবে না।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, **বেদী** বলতে '**বেদ**-এর সক্রিয় আধার যে' সেই **বেদ**জ্ঞানী পণ্ডিতকে যেমন বোঝায়, তেমনি উপরোক্ত চাষীর খামার-**বেদী**কে বা পুরোহিতের যজ্ঞ**বেদী**কেও বোঝায়। কেন? কারণ খুবই সহজ। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে এ কোনো সমস্যাই নয়, ব্যাপারটি সহজাত। **বেদ**-এর সক্রিয় আধার যে, সে সত্ত্বই **বেদী**; সে খামার বা যজ্ঞবেদী হতে পারে, আবার পণ্ডিতও হতে পারেন। **বেদ**জ্ঞান যেমন মাঠে-খামারে সক্রিয় হয়, তেমনি একজন **বেদ**জ্ঞানী পণ্ডিতের মাথাতেও সক্রিয় থাকে। তাই উভয়েই **বেদী**। পরে পরে অবশ্য এই **বেদী** শব্দটি সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে যায় এবং যেকোনো উঁচু স্থানকেই **বেদী** বলা হয়ে থাকে। সেই প্রথায় এমনকি মূর্তির পায়ের তলার ভিত্তিভূমিকেও **বেদী** বলা হয়।

তৃতীয় সমস্যা হল, মন্দিরের সামনের 'মৃত্তিকাস্তূপ' বা উঁচু স্থানকে কী বলা হবে? **বেদি**, **বেদিকা**, নাকি **বেদী**? এর উত্তর হল, **বেদি** শব্দটির আধার নেই, যেমন **নদি** শব্দের আধার থাকে না, তাই একে **বেদী** বা **বেদিকা** বলতে হবে। আর, **বেদ**জ্ঞানীকে অবশ্যই বলতে হবে **বেদী**।

বেদে (বেদিয়া, বাদিয়া) : ২. *বেদ দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. যাযাবর, সাপুড়ে জাতিবিশেষ, বিষবৈদ্য। (ব্য.বা.অ.ঢাকা))। ৪. যথার্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. **বেদে** শব্দটি ব.শ.-তে নেই, পাওয়া গেল ঢাকার অভিধানে। এই শ্রেণীর মানুষেরা ৪০/৫০ বছর আগেও বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এখন এঁরা খুব কম আসেন। এঁদের ঘরবাড়ি নেই বলে মেদিনীপুরের গ্রামে এদের 'হাঘরী' (অর্থাৎ 'হাঘরে') বলা হয়। এঁরা কাক মারেন বলে এদের 'কাগ্‌মারা'ও বলা হয়। এঁরা নানারকম তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ... ইত্যাদিও করেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের চিনতেন বলেই '**বেদে** কানে কানে কয় হিং টিং ছট' — কথাটি লিখতে পেরেছিলেন। ইংরেজিতে এদের জিপসী (Gypsy) বলে। এঁদের নিয়ে সম্প্রতিকালে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলিতে দেখানো হয়েছে যে, এঁরা আদিতে ভারত থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েন; এদের ভাষার শব্দগুলিও প্রাচীন ভারতীয় ভাষার খুব কাছাকাছি। এই **বেদে** শ্রেণীর এক কন্যার পাল্লায় পড়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী জার্মানিতে পড়তে গিয়ে। সে তো আর ছাড়ে না, আপন আদিভূমির 'দেশোয়ালি-লোক' বলে আলীসাহেবকে ধরে বাবার কাছে নিয়ে যাবেই! গল্পটি অনেকেই পড়েছেন আশা করা যায়।

পুরাণাদির অর্থ কমবেশি উদ্ধার করার পর আমরা নিশ্চিত হই যে, প্রাচীন ভারত থেকে যে যে জনগোষ্ঠী বিতাড়িত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গোষ্ঠীর মানুষ এই 'জিপসী' বা **বেদে**রা। এঁরা বিতাড়িত হয়েছিলেন বৈদিকযুগেরও আগে। এঁরাই আদি **বেদ**বাদী। সনাতন সভ্যতার পরিচালকেরা এই **বেদ**বাদীদের উত্থানকে বারংবার পর্যুদস্ত করেছিলেন। পুরাণাদির 'দক্ষোৎপত্তি' অধ্যায়টিকে ভালভাবে অধ্যয়ন করলে এই তথ্য জানা যায়। যদিও **বেদ**বাদীদের উত্থান শেষ পর্যন্ত রোধ করা যায়নি। একদিন **দক্ষযজ্ঞ** প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং **বেদ**বাদীরা জিতে যান, ভারতে বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার বিশ-পঞ্চাশ-একশো বছর আগে যে **বেদে**রা চলে গিয়েছিলেন আদি যৌথসমাজ ছেড়ে, তাঁরা থেকে যান তাঁদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে; বিদেশে স্বদেশে সর্বত্র। এ বিষয়ে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অনেক আলোচনা আছে।

বৈদ্য : ১. বিদ্যা + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. *বিদ্যা হইতে জাত।* ৩. বিদ্যাবান, পণ্ডিত, সর্বজ্ঞ, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাবিৎ, ভিষক, চিকিৎসক, কবিরাজ, (রোগহর বিষহর শল্যহর কৃত্যাহর ভেদে বৈদ্য চতুর্ব্বিধ) শূদ্র হইতে বৈশ্যাজাত মিশ্র নীচ জাতিবি**শেষ**, বেদে (?)। (ব.শ.)। ৪. **আয়ুর্ব্বেদ** অনুসারে রোগনিরাময় করেন যাঁরা সেরকম চিকিৎসকদের বোঝাতে **বৈদ্য** বা **বদ্যি** শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. ব.শব্দকোষের সন্দেহ হয়েছিল, এই **বৈদ্যই বেদে** হতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে কথাটি তিনি বলে গিয়েছেন। আমরা জানি, লোকে **বৈদ্য**দের নীচু দেখানোর জন্য কখনো কখনো তাঁদের '**বেদে**' ব'লে নিন্দা করে; যেভাবে লোভী-বামুন, বোকা-তাঁতি, রাগী-চণ্ডাল ... ইত্যাদি ব'লে বিশেষ জাতির নীচতামূলক সাধারণীকরণ করা হয়, সেভাবেই **বেদে-বৈদ্য** বলার একটা অন্তঃসলিলা প্রথা ছিল। কার্যত, **বৈদ্য** শব্দটি যে এক মহান মানুষকে শনাক্ত করার জন্য সৃজিত হয়েছিল, সেকথা আমরা **চিকিৎসক** শব্দে বিস্তারিত করেছি। আপাতত আমাদের বক্তব্য যে, এঁদের পূর্বসূরিরা আদিম কালে **আয়ুর্ব্বেদ** উপলব্ধি ও অর্জন করে মানুষকে নিরাময় করার ব্রত পালন করতেন বলেই এঁদের **বৈদ্য** বলা হত। আর, **বেদে** বলতে যে আদিম বিতাড়িত **বেদ**বাদীদের বোঝায়, তার সঙ্গে **বৈদ্য** শব্দের সম্পর্ক বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই; অন্তত শব্দার্থের দিক থেকে তেমন কোনো ইশারা পাওয়া যায় না।

***বিল্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনাবিল, আবিল, বিল্, বিল, বিলকারী, বিলবাস, বিলবাসী, বিলমাছ, বিলয়, বিলয়ন, বিলযোনি, বিল(লে)শয়, বিলশায়ী, বিলসোনা, বিলা, বিলাত, বিলাই, বিলান (বিলিয়ে দেওয়া), বিলি, বিলি-বন্দোবস্ত, বিলেবাস, বিলেশয়, বিলৌকাঃ, বিল্ল, বিল্লকি, বিল্লি, বিল্ব, বিল্বদণ্ড, বিল্বপেশিকা, বিল্বপেশী, বিল্বফল, বিল্বমাত্র, বিল্বা, বেল, বেলবরণ, বেলবরণী, বেলফুল, বেলাল, বেলি, বৈল, বৈল্ব।

বিল্ = বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে লালন-লয়ন। **বিল** = বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে লালন-লয়ন যাহাতে।

বিল (bill, আবিল, অনাবিল, বিলয়, বিলয়ন, বিলা, বিলাত, বিলান, বিলি) : ১. ✓বিল্ + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিল*** *= বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে লালিত-লয়প্রাপ্ত যে।* ***আবিল*** *=* ***বিল****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***অনাবিল*** *= যাহা* ***আবিল*** *নহে।* ***বিলয়*** *= বিপরীতে লয় হয় যাহাতে।* ***বিলয়ন*** *=* ***বিলয়*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বিলা*** *=* ***বিল****-এর আধার যে।* ***বিলাত*** *=* ***বিলা*** *তারিত যাহাতে বা যেখানে।* ***বিলান*** *=* ***বিলা*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বিলি*** *=* ***বিল*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ***বিলি-বন্দোবস্ত*** *=* ***বিলি*** *করার ব্যবস্থা থাকে যাহাতে।* / **আবিল** = দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে যে। **অনাবিল** = নয় আবিল যাহা। (ব.শ.)। ৩. **বিল** = গুহা, বিবর, ছিদ্র, রন্ধ্র, ভূরন্ধ্র, গর্ত্ত, সুরুঙ্গ, বল্মীকাদিগর্ত্ত, পাত্রমধ্য, মুখ, স্ত্রীযোনি, উচ্চৈঃশ্রবা, (গর্ত্তজাত) বেতস; বিস্তীর্ণ জলাভূমি। **bill** = ক্রেতাকে দেয় বিক্রীত দ্রব্যের হিসাব, কৃতকর্ম্মের মজুরির হিসাব, আইনের খসড়া। **আবিল** = অনচ্ছ, কলুষ, অস্বচ্ছ, কলুষিত, পঙ্কিল, দূষিত, অপবিত্র, বুদ্ধির অবিষয়, দুর্ব্বোধ, নিষ্প্রভ, আকুল। **অনাবিল** = অকলুষ, পাপলেশহীন, অপঙ্কিল, স্বচ্ছ, রোগোপসর্গহীন, রোগাদিরহিত। **বিলয়** = প্রলয়, নাশ, অবসান, অদর্শন, মরণ, দ্রবীভাব, লয়স্থান, প্রলয়কাল। **বিলয়ন** = বিলয়, নাশ, দ্রবীভাব। **বিলা** = বিতরণ করা, বিলান, দেওয়া। **বিলাত** = (আরবি - বিলায়ত), দেশ, রাজ্য, স্থান, রাজস্ব, গুরুকে দেয় বার্ষিক প্রণামী, কাজির শাসনাধীন দেশ, বিদেশ, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, আমেরিকা। **বিলাতি** = (আরবি - বিলায়তী), বিলাতে প্রস্তুত বা উৎপন্ন, বিদেশীয়, অ-ভারতীয়, ইংল্যান্ডে ইউরোপে বা আমেরিকায় জাত বা কৃত কিংবা প্রচলিত, সাহেবী। **বিলি** = বিলাত, বিতরণ, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. বাংলায়

'খাল-বিল' শব্দটি খুবই প্রচলিত। খাল হল ভূমিতে খনন করা বড় গর্ত, আর **বিল** হল খনন না করা আগে থেকে প্রাকৃতিকভাবে হয়ে থাকা গুহার মতো বড় গর্ত। বর্ষায় জনবসতির সমস্ত ময়লা ধোয়া হয়ে যেখানে গিয়ে পড়ে সেগুলি এই খাল আর **বিল**। বর্ষায় জনবসতির জলের ধারা কীভাবে **বিলে** গিয়ে ঢোকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা এই বিষয়টি সহজে অনুভব করতে পারবেন; সব যেন হাঁ করে নিজের দিকে টেনে গিলে নিচ্ছে। এভাবেই **বি**পরীতে থেকে কোনো সত্তা যদি **ল**ওয়ন করে, তাকে **বিল** বলা হয়। যেদিক থেকে দেওয়া হচ্ছে, গ্রহীতার দিক থেকে তা নেওয়া হচ্ছে এইজন্য যে, গ্রহীতার দিকে অভাব রয়েছে। অন্যথায় বিপরীত দিক তা নেবে কেন, যদি সেখানে **বিল** বা অভাব, খামতি, গর্ত, হাঁ-করা গ্রহণচেষ্টা, হাহাকার না থাকে? বিপরীত দিকে **লয়** হওয়াকে তাই **বিলয়, বিলয়ন, বিলান, বিলি**-করা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

তবে এর উচ্চতর প্রয়োগও আছে। যেমন কোনো কাচে ছোট ছোট অনেক গর্ত বা **বিল** থাকলে, সেটি **আবিল** হয়ে অস্বচ্ছ হয়ে যায়। মনে সেরকম অবিশ্বাসের গর্ত হয়ে থাকলে মনও আর **অনাবিল** থাকে না। আমরা যখন **অনাবিল** আনন্দ উপভোগ করি, তখন আসলে আমাদের মন **হীরের** মতো স্বচ্ছ ও **বিল**হীন হয়ে যায় বলেই আমরা **অনাবিল** আনন্দ লাভ করে থাকি। (দ্র. **হীরা**)।

তবে এই **বিল** শব্দ থেকে **বিলাত** শব্দ তৈরি হয়েছে বললে অনেকে আপত্তি তুলবেন। তাঁদের মতে, **বিলাত** হল আরবি **বিলায়ত** শব্দের বঙ্গীকৃত রূপ। আমাদের বক্তব্য এই যে, **বিলায়ত** শব্দটিকে মোগল-পাঠানেরা হাতে করে আনার পর আমরা **বিলাত** শব্দটিকে চিনেছি এবং আপন করে নিয়েছি — ঘটনা সেরকম নয়। **বিলাত** আমাদের আগে থেকেই ছিল। **বিলায়ত** শব্দটি আসার পর আমরা তাকে 'আমাদের লোক' বলে **বিলাত**-এই সামিল করে নিয়েছি। কেননা, ব.শ. তো বলেই গেছেন — **বিলি** শব্দের অর্থে **বিলাত** কথাটি বহু আগে থেকেই ব্যবহৃত হত। আগন্তুক **বিলায়ত**-এর মূল অর্থ ছিল 'বিপরীত দিক থেকে লাওয়ত বা আনীত'। তখন লন্ডনীয় বেণেরা নানারকম বস্তু নিয়ে প্রাচ্যদেশগুলিতে আসতেন, রাজা-রানীদের দেখাতেন, বেচতেন। আমাদের **বিলাত** ছিল 'বিলায়িত' বা 'বিলিকৃত' অর্থাৎ কোনো একটি স্থান থেকে কিছু বস্তু বিভিন্ন গর্ত বা **বিলের** দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ বেণেরা ভারতের মোগলরাজাদের কাছেও আসতে থাকে। এমতাবস্থায় **বিলায়ত** ও **বিলাত** শব্দ দুটিকে এক করে ফেলা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ যুগের সূত্রপাতের পর খেলাটি বদলে যায়। তখন গর্ত বা **বিল** হয়ে যায় খোদ ইংল্যান্ড, আমাদের সমস্ত পণ্যসম্পদ জলের মতো গড়িয়ে চলে যেতে থাকে সেই **বিলাতে**। তখন বিপরীত দিক আর নিয়ে আসে না, 'লাওয়ত' করে না, 'লিয়ে যায়' বা নিয়ে যায়। ফলত, বাংলাভাষী **বিলাত**কেও আর আস্ত রাখেন না, করে দেন **বিলেত**। ৬. ইংরেজি BILL সম্ভবত '**বিল্**-লয় যে', সেই **বিল্ল** শব্দ থেকে তৈরি হয়েছিল, যেকারণে এতে দুটি 'L' রয়েছে।

বিল্ব (বিল্বদণ্ড, বেল, বেলবরণ) : **১.** ✓বিল্ + ব (বক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিল্ব*** = *গতিশীল বা সক্রিয় বৃদ্ধিকারীকে লালন ও বহন করে যে।* ***বিল্বদণ্ড*** = ***বিল্বের*** *দণ্ড (যিনি)।* ***বেল*** = *দিশাগ্রস্ত বল যাহাতে।* **৩. বিল্ব** = মালূর, শ্রীফলবৃক্ষ (Aegle marmelos), বিল্বফল, বেল, পলপরিমাণ। **বিল্বদণ্ড** = শিব। **বেল** = বিল্ববৃক্ষ, বিল্বফল, (সাদৃশ্যে) কাঁচের গোল লণ্ঠন বিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** ফলের নাম রূপে **বেল** প্রচলিত, বাকি শব্দ দুটি অপ্রচলিত। **৫. বিল্ব** : দ্র. **পঞ্চবটী**। যদিও **বিল্ব** শব্দের মূলে **বিল্** ক্রিয়াই দেখান হয়ে থাকে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে দেখলে, এটি **বিল্ব** হওয়াই যুক্তিসংগত। কেননা, এ হল **বিল**-বাহক — মন বা দেহকে বড় করার জন্য যে 'বৃদ্ধিসাধনগুণ' লাগে, এ হল তারই বাহক। মানবশরীরের ক্ষেত্রে এ হল 'প্রোটিন' যা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় **বিল্বফলে** বা **বেলে**; সমাজশরীরের ক্ষেত্রে এ হল সামরিক-বাহিনী, যা সমাজের দেহের বৃদ্ধি ঘটায় (নতুন এলাকা দখল করে), এবং মনের ক্ষেত্রে এ হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানফল বা **শ্রীফল**। দ্র. **শ্রী**। বলা হয়, **বেল**গাছে ব্রহ্মারাক্ষস থাকে। সামরিক বাহিনী বিপরীত পক্ষের কাছে ব্রহ্মারাক্ষস বটেই! **বিল্ববৃক্ষ** সামরিক বাহিনী বলেই তো **দুর্গার** বোধন হয় **বিল্ববৃক্ষমূলে**, যাকে একালে **বেলবরণ** বলা হয়ে থাকে।

বিশ্ (*বিষ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবিষ, অতিবিষা, অনাবিষ্ট, অনুপ্রবেশ, অবিষ, আইস, আতইচ, আবিষ্ট, আবেশ, আবেশন, আবেশময়, আবেশরস, আবেশিক, আবেশিত, আবেশনী, আবেষ্ট, আবেষ্টক, আবেষ্টন, উপবিষ্ট, উপবেশন, দুষ্প্রবেশ, নিবিষ্ট, নিবেশ, প্রতিবেশী, প্রবিষ্ট, প্রবেশ, বষ্টম, বষ্টুম, বিখ, বিট্, বিট, বিটনুন, বিটপ, বিটপী, বিটপোদর, বিটল (bittle, মার্কিন বিটলেমি করা গানের দল), বিটলা, বিটলামী, বিটলী, বিটলে, বিটাল, বিটি(টী), বিটীছেলে, বিট্‌কুল, বিট্‌কৃমি, বিট্‌পণ্য, বিট্‌পতি, বিট্‌বরাহ, বিট্‌লবণ, বিট্‌সারিকা (গুয়েশালিক), বিড়, বিড়ঙ্গ, বিড়বিড়, বিড়াল, বিড়ালতপস্বী (বিলি ভকত), বিড়ালসন্ন্যাসী, বিড়ালী, বিড়্‌বরাহ, বিড়্‌ভুক(জ্), বিড়্‌লবণ, বিণ্মূত্র, বিরাল, বিলই, বিলাই, বিলাল, বিলালী, বিলি, বিলি-ভকত, বিল্লি, বিনিবেশ, বিশ্, বিশ, বিশ(স)কম্মা, বিশদ, বিশদপ্রজ্ঞ, বিশ(স)নাথ, বিশা, বিশাই, বিশ্ব, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বকায়, বিশ্বক্‌সেন, বিশ্বগুরু, বিশ্বজগৎ, বিশ্বজন, বিশ্বজনীন, বিশ্বজিৎ, বিশ্বতঃ, বিশ্বতনু, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বদেব, বিশ্বদেবতা, বিশ্বদেবা, বিশ্বধর, বিশ্বধাতা, বিশ্বধারিণী, বিশ্বধ্যেয়, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাভি, বিশ্বনাশী, বিশ্বনিন্দক, বিশ্বনিন্দুক, বিশ্বপতি, বিশ্বপর্ণী, বিশ্বপা, বিশ্বপাচক, বিশ্বপাবন, বিশ্বপ্রেম, বিশ্ববঞ্চক, বিশ্ববাঙ্গালা; বিশ্ববন্ধু, বিশ্ববাস, বিশ্ববিজয়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিভাবন, বিশ্ববিশ্রুত, বিশ্ববীজ, বিশ্ববেদাঃ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বভণ্ড, বিশ্বভব, বিশ্বভর্ত্তা, বিশ্বভাবন, বিশ্বভুক্, বিশ্বময়, বিশ্বমানব, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বম্ভর, বিশ্বযোনি, বিশ্বরমা, বিশরাট্(জ্), বিশ্বরূপ, বিশ্বরেতোঃ, বিশ্বলোকনাথ, বিশ্বশ্রবা, বিশ্বসংপ্লব, বিশ্বসখ, বিশ্বসত্তম, বিশ্বসনীয়, বিশ্বসম্ভব, বিশ্বসিত, বিশ্বসতিব্য, বিশ্বসৃক্, বিশ্বসৃট্(সৃজ্), বিশ্বস্ত, বিশ্বস্তা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বহর্ত্তা, বিশ্বহেতু, বিশ্বা, বিশ্বাঙ্গ, বিশ্বাচী, বিশ্বাত্মক, বিশ্বানর, বিশ্বাবসু, বিশ্বামিত্র, বিশ্বাস, বিশ্বাসঘাত, বিশ্বাসঘাতক,

বিশ্বাসঘাতী, বিশ্বাসন, বিশ্বাসপাত্র, বিশ্বাসভঙ্গ, বিশ্বাসভাজন, **বিশ্বাসহন্তা, বিশ্বাসিক,** বিশ্বাসিত, বিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতকী, বিশ্বাসৈকভূ, **বিশ্বাসোপগম, বিশ্বেদেব,** বিশ্বেশ, বিশ্বেশী, বিশ্বেশ্বর, বিষ্, বিষ, **বিষকণ্ঠ, বিষকন্যা,** বিষকুম্ভ, বিষক্ত, বিষঘ্ন, বিষঘ্না, বিষঙ্গ, বিষজুষ্ট, **বিষণ্ড, বিষণ্ণ,** বিষণ্ণচেতা, বিষণ্ণরূপ, বিষতরু, বিষদ, বিষদন্ত, **বিষদাঁত,** বিষদিগ্ধ, বিষদূষণ, বিষদৃষ্টি, বিষদ্রুম, বিষধর, বিষধাত্রী, বিষনয়ন, বিষনাশক, বিষনাশী, বিষপাথর, বিষপাদপ, বিষফোড়া, বিষবল্লরী, বিষবল্লী, বিষবিটপী, বিষবিদ্যা, বিষবৃক্ষ, বিষবৃষ্টি, বিষবৈদ্য (গারুড়িক জাঙ্গুলিক, বিষভীষক্, চিকিৎসক), বিষভুজঙ্গ, বিষম, বিষমকর্ম্ম, বিষমকাল, বিষমগত, বিষমচতুরশ্র, বিষমচ্ছদ, বিষমজ্বর, বিষমত্রিভুজ, বিষমদৃষ্টি, বিষমধাতু, বিষমনেত্র, বিষমপদ, বিষমবাণ, বিষমবিভাগ, বিষমবিলোচন, বিষমন্ত্র, বিষমলক্ষ্মী, বিষমশিষ্ট, বিষমশীল, বিষমস্থ, বিষমাক্ষ, বিষমায়ুধ, বিষমিত, বিষমীকৃত, বিষমুখী, বিষমেক্ষণ, বিষমেষু, বিষরূপা, বিষহা, বিষহৃদয়, বিষলতা, বিষবন, বিষশূক, বিষহন্ত্রী, বিষহর, বিষহরা, বিষহরি, বিষহরী, বিষহ্য, বিষা, বিষাই, বিষাক্ত, বিষাঙ্গনা, বিষাণ, বিষাণকোশ, বিষাণবাদক, বিষবাদিনী, বিষাণী, বিষাদ, বিষাদন, বিষাদিত, বিষাদী, বিষাপহ, বিষাপহরণ, বিষাপহা, বিষাপহার, বিষাস্বাদ, বিষুব, বিষুবৎ, বিষুবদিন, বিষুববৃত্ত, বিষুবরেখা, বিষূচিকা, বিষূচী, বিষ্ক, বিষ্ট (উপবিষ্ট), বিষ্টপ, বিষ্টি, বিষ্টু, বিষ্ণু (বি-ইষ্ণু, প্রভবিষ্ণু), বিষ্ণুউদক, বিষ্ণুকায়া, বিষ্ণুক্রম, বিষ্ণুক্রান্ত, বিষ্ণুগৃহ, বিষ্ণুগ্রন্থি, বিষ্ণুচক্র, বিষ্ণুতিথি, বিষ্ণুতৈল, বিষ্ণুদেবতা, বিষ্ণুদৈবত, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুপঞ্জর, বিষ্ণুপদ, বিষ্ণুপদী, বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুরাণ, বিষ্ণুবল্লভা, বিষ্ণুবাহন, বিষ্ণুভোগ, বিষ্ণুমণ্ডপ, বিষ্ণুমন্দির, বিষ্ণুমায়া, বিষ্ণুযশাঃ, বিষ্ণুরথ, বিষ্ণুরাত, বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুশিলা, বিষ্ণুশৃঙ্খল, বিষ্ফার, বিষ্ফাল, বিষ্ফুরণ, বিষ্ফুলিঙ্গ, বিষ্যন্দ, বিষ্যন্দন, বিষ্বক্, বিষ্বক্সেন, বিষ্বক্সেনা, বিস, বিসকণ্ঠিকা, বিসকিশলয়, বিসকুসুম, বিসগ্রন্থি, বিসজ, বিসতন্তু, বিসনাভি, বিসপুষ্প, বিসপ্রসূন, বিসবল্লী, বিসলতা, বিসাই (বিশাই), বিসিনী, বেরাল, বেরালব্রতী, বেশ(স), বেশআল, বেশধর, বেশধারী, বেশন, বেশবন্ত, বেশনারী, বেশবধূ, বেশবনিতা, বেশবান, বেশ(স)বার, বেশ(স)র, বেশযুবতি, বেশযোধা, বেশযোষিৎ, বেশস্ত্রী, বেশস্থা, বেশাত, বেশা(সা)র, বেশী, বেশ্ম, বেশ্মান্ত, বেশ্য, বেশ্যা, বেশ্যাগমন, বেশ্যাঘটক, বেশ্যাজন, বেশ্যাপতি, বেশ্যাপুত্র, বেশ্যাবাস, বেষ, বেষধর, বেষধারী, বেষ্ট্, বেষ্ট, বেষ্টক, বেষ্টন, বেষ্টনক, বেষ্টিত, বেষ্টিতব্য, বেস, বৈঠ, বৈঠক, বৈঠকী, বৈঠা, বৈঠান, বৈড়ালব্রত, বৈড়ালব্রতিক, বৈড়ালব্রতী, বৈশ(স), বৈশিক, বৈশ্য, বৈশ্যকর্ম্ম, বৈশ্যাবৃত্তি, বৈশ্যভাব, বৈশ্যরায়, বৈশ্যা, বৈশ্যানী, বৈশ্ব, বৈশ্বদেব, বৈশ্বা, বৈশ্বানর, বৈশ্বানরপথ, বৈশ্বানরমিত্র, বৈষম, **বৈষম্য,** বৈষয়িক, বৈষ্টম, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, বৈসাদৃশ্য, বৈসাম্য, বৈসারিণ, বৈস্বর্য্য, বৈহায়স, বৈহারিক, বৈহার্য্য, বৈহাসিক, বোঁচা, ভিটকিলামি (বিটকেলামি), সন্নিবিষ্ট, সন্নিবেশ, সন্নিবেশিত, সমাবিষ্ট, সুপ্রবেশ।

বিশ্ (বিষ্) = গতিশীল বাহীর সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ। **বিশ** = গতিশীল বাহীর সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে। **বিষ** = গতিশীল বাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। (একটি সত্তার বিচ্ছুরিত শক্তির কোনো অংশ যদি অন্য একটি সত্তায় গিয়ে ঢুকে পড়ে সেখানে শক্তিরূপে শায়িত থাকে, তাকে **বিশ্** বলে। **সেই** শক্তিবিচ্ছুরণ যদি দিশাগ্রস্ত, অবনমিত বা ন্যূন চরিত্রের **হয়, তবে তাকে বিষ্** বলা হয়।)

বিট্ (বিশ্) : ১. ✓বিশ্ + ক্বিপ্ (০) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(কোনো সত্তা হইতে)* ***বি****গত বা নির্গত* ***শ****ক্তির প্রকাশন বা বিচ্ছুরণের* ***ট****ঙ্কারণ যাহাতে বা যে সত্তায়; অর্থাৎ* ***প্রবিষ্ট*** *হয়ে শুভ করে যে। /* ভূমিকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে ('ভূমিপ্রাপ্ত')। (ব.শ.)। **৩.** বৈশ্য, মনুজ, মনুষ্য, জন, প্রজা, কন্যা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যতদূর বোঝা যায়, অদৃশ্য সত্তার **প্রবেশ**কে বোঝানোই **বিশ্** শব্দের মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে **বিট্ (বিষ্)** দ্রষ্টব্য।

বিট্ (বিষ্) : ১. ✓বিষ্ + ক্বিপ (০) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(কোনো সত্তা হইতে)* ***বি****গত বা নির্গত* ***শ****ক্তির দিশাগ্রস্ত প্রকাশন বা দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের* ***ট****ঙ্কারণ যাহাতে বা যে সত্তায়; অর্থাৎ,* ***প্রবিষ্ট*** *হয়ে অশুভ করে যে* / মূলনাড়ী ব্যাপন করে যে। ('মূলনাড়ীব্যাপক')। (ব.শ.)। **৩.** মল, বিষ্ঠা, মলমাত্র, কন্যা। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যতদূর বোঝা যায়, দৃশ্য সত্তার **প্রবেশ**কে বোঝানোই **বিষ্** শব্দের মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে **বিট** দ্রষ্টব্য।

বিট : ১. ✓বিট্ + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বিট** = ***বিট্****-এর আধার যে।* **৩. বিট** = ষিড়্গ, কামুক, স্ত্রৈণ, পরবঞ্চক, ধূর্ত্ত, (নাট্যে) বেশ্যা ও নাগরের বার্ত্তাকথয়িতা, শৃঙ্গারে নায়কসহায়-বিশেষ, কামানুচর, মূষিক, খদিরবৃক্ষ, লবণভেদ, বিটনুন, বেশ্যাপতি, কুৎসাবাচক। (ব.শ.)। **৪.** এককভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু অন্য শব্দের যোগে কমবেশি প্রচলিত, যথা **বিটনুন, বিটখদির** ... ইত্যাদি। **৫. বিশ্** ও **বিষ্** কাকে বলে, সেকথা আমরা ক্রিয়ামূলের অর্থ থেকেই জানতে পারি। সেই **বিশ্** বা **বিষ্** সত্তা যদি টঙ্কারিত হতে থাকে — 'আমি এখানে', 'আমি এখানে' জানাতে থাকে — তখন তাকে **বিট্** বলা হয়। সেই **বিট্**-এর প্রাথমিক আধারকে **বিট** বলে। একে আমরা '**বিশা**য়িত বা **বিষা**য়িত হইয়া, কিংবা হইবার জন্য, **টঙ্কা**রিত হয় যে' — এভাবেও বলতে পারি। স্বভাবতই এর মধ্যে প্রকাশচেষ্টা বা আত্মবিস্তারের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। সেকারণে এর অর্থ 'বিস্তারিত হয়ে অন্য কারো পরিধিতে গিয়ে টঙ্কারিত হওয়া'ও বোঝায়। সেরূপ অর্থের উত্তরাধিকার বাংলায় রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে — ধূর্ত্ত, কামুক, পরবঞ্চক ... ইত্যাদি রূপে। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই উত্তরাধিকার বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে — beat, beetle ইত্যাদি রূপে।

এই জন্যই **বিট্ (বিশ্)** শব্দের অর্থে ব.শ. যে কয়টি সত্তার নাম বলেছেন ('ভূমিপ্রাপ্ত, বৈশ্য, মনুজ, মনুষ্য, জন, প্রজা, কন্যা'), দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই একটি মূল সত্তা থেকে প্রেরিত হয়ে অন্যত্র গিয়ে **প্রবেশ** করেছে, তারপর সেখান থেকে টঙ্কারিত হচ্ছে। যেমন উৎপন্ন তার উৎপাদকের হাত থেকে বেরিয়ে অন্য সত্তার ঘরে পৌঁছে সেখান থেকে জানান দিচ্ছে যে, 'আমি এখানে, আমি এখানে'। এই সত্তাই হল 'বৈশ্য'। **কর্ম্ম**ক্ষেত্র ও **কর্ম্ম**ক্ষেত্রজ্ঞান সমাজপরিচালক

মনুর থেকে বেরিয়ে যে সত্তার ভিতরে পৌঁছে জানান দেয়, 'আমি এখানে, আমি এখানে', তাকে 'মনুজ', 'মনুষ্য', 'জন', 'প্রজা' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। আর, পরিবার থেকে যে শক্তি বেরিয়ে যায়, চলে যায় অন্যত্র বসতি করার জন্য সে তো 'কন্যা'ই বটে! ...

বিট্ (বিষ্) শব্দের অর্থে ব.শ. যে কয়টি সত্তার নাম বলেছেন ('মূলনাড়ীব্যাপক, মল, বিষ্ঠা, মলমাত্র'), দেখা যায়, তারা সবই দৃশ্যলোকের নিম্নমানের বাহ্যিক সত্তা — 'মল', 'বিষ্ঠা'। **বিট্ (বিশ্)** শব্দের অর্থেই 'কন্যা' কথাটি ছিল, এখানে কথাটি ভুলভাবে এসেছে বলেই মনে হয়। যাই হোক, এখানে সত্তার থেকে বহির্গত হয়ে টঙ্কারিত হচ্ছে যে, সে সমাজের চোখে নিন্দনীয়। একে **গু**-ও বলা হয়। প্রমাণস্বরূপ **বিটসারিকা** = 'গুয়ে-শালিক', **বিটবাবলা** = 'গুয়ে-বাবলা', **বিটবরাহ** = গুখোর-সুয়োর ... প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই **বিট**-এর ধারক অদৃশ্যলোকেও রয়েছে। তারা মনোলোকের 'মল', 'বিষ্ঠা' ... ইত্যাদি বহন করে। এদের 'ষিড়্‌গ', 'কামুক', 'ধূর্ত্ত' ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। ... **৬.** ইংরেজি beat, beetle ... ইত্যাদি।

বিটপ (বিটপী, বিটপোদর, বিটল, বিটলা, বিটলামী) : **১.** ✓বিট্ + অপ (কপন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিটপ*** = ***বিট্*** *(বিশায়িত হইয়া টঙ্কারণ বা বিস্তারণ) পালন করে যে।* ***বিটপী*** = ***বিটপ****-এর গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে।* ***বিটপোদর*** = ***বিটপ*** *-এর উদর যে।* ***বিটল*** = ***বিট*** *(বিষায়িত হইয়া টঙ্কার) লালিত যাহাতে।* ***বিটলা*** = ***বিটল****-এর আধার যে।* ***বিটলামী*** = ***বিটলা****র সীমায়িত গতিশীল আধার যে।* / **বিটপী** = শাখা আছে যার ('শাখাবান'), প্রশস্ত শাখা আছে যার ('প্রশস্তশাখাবান')। (ব.শ.)। **৩. বিটপ** = শাখাপল্লবসমুদায়, বিস্তার, শাখা, পল্লব, লতা, বৃক্ষের বিস্তার। **বিটপী** = বৃক্ষ, বট। **বিটপোদর** = লতাগৃহ, বনমধ্য। **বিটল (বিটলা, বিটলে)** = ধূর্ত্ত, দুষ্ট, দুর্ব্বৃত্ত, চোর, অপবিত্র, অস্পৃশ্য। **বিটলামী** = দুষ্টামি, ধূর্ত্ততা। (ব.শ.)। **৪.** এই শব্দগুলির মধ্যে শুধুমাত্র **বিটলামী** শব্দটি বর্তমানে **বিটলেমি** রূপে অ্যাকাডেমি ও শহরে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি সাধারণ বাংলাভাষীদের মুখে ও গ্রামবাংলায় কমবেশি প্রচলিত। **বিটপোদর** অপ্রচলিত। **৫.** মধ্যযুগে এই শব্দগুলির ব্যাপক প্রয়োগ চলত। এখন গ্রামবাংলার মানুষের মুখে, কিংবা সমাজের নীচুতলার তথাকথিত অশিক্ষিত বাংলাভাষীদের মুখে এসব শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। **৬.** এমনকি মার্কিনদের **বিটলেমি** করা কবির দল বা গানের দলকে beatnik প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে।

বিশ্ব : **১.** ✓বিশ্ + ব (ক্বন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিশ্*** *বহন করে যে।* / যে চৈতন্য পৃথক পৃথক স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হয়। (ব.শ.)। **৩.** সর্ব্ব, নিখিল, সমগ্র, সমস্ত, অশেষ, নবদেবতাগণের অন্তর্গত গণদেবতাবিশেষ, বিশ্বদেব ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** world অর্থে প্রচলিত। **৫. বিশ্ব** আর **বিশ্বদেব** এক সত্তা নয়। তথাপি অনেক সময় শব্দ দুটিকে এক করে ফেলা হয়। আমরা **বিশ্ব** ও **বিশ্বদেব**কে পৃথক সত্তা হিসেবে বুঝব। যাই হোক, **বিশ্ব** শব্দের অর্থ হল — যার ভিতরে অন্য সত্তা থেকে প্রেরিত শক্তির কোনো একটি রূপ **প্রবেশ** করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সে সেই প্রবিষ্ট শক্তিকে বহন করে নিয়ে চলেছে; অর্থাৎ '**বিশ্** বহন করে যে', সেই হল **বিশ্ব**। তার মানে, **বিশ্ব** সত্তাটি হল আসলে 'প্রবিষ্টবাহী'। সে একটি সামান্য মাটির কলসি কিংবা একটি কাঠের খাট হতে পারে, যার ভিতরে মানুষ তার মেধা ও শ্রম ঢুকিয়ে দিয়েছে; একজন সেনাপতি কিংবা সৈন্যবাহিনী হতে পারে, যার ভিতরে শাসক তাঁর ইচ্ছা ঢুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন; এমনকি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও হতে পারে, যার ভিতরে স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি তাঁর ইচ্ছা ঢুকিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ব.শ. অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, 'পৃথক পৃথক স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট চৈতন্য'কেই **বিশ্ব** বলে; সেই স্থূলশরীর মাটির কলসি হতে পারে, একজন সেনাপতি হতে পারেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও হতে পারে। ...

আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ 'অদৃশ্য কিন্তু সমাজে বিশেষভাবে সক্রিয়' সত্তাকে বোঝাতেই এই **বিশ্ব** শব্দটি তৈরি করেছিলেন। আমরা দেখছি, সেই **বিশ্ব** মানুষের তৈরি করা কৃত্রিম **বিশ্ব** হতে পারে, পরমাপ্রকৃতির তৈরি করা অকৃত্রিম **বিশ্ব**ও হতে পারে। মোটকথা, যে সত্তাই '**প্রবিষ্ট**বাহী', তাকেই **বিশ্ব** বলা যায়। **বিশ্ব** ও **বিশ্ব**যুক্ত শব্দগুলির (**বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেব, বিশ্বামিত্র** ...) সাহায্যে আমরা তাঁদের আরো স্পষ্টরূপে চিনতে বুঝতে পারব, আশা করা যায়। একালে কিন্তু **বিশ্ব** শব্দটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রতীকী হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র world-বাচক হয়ে গেছে। অর্থাৎ **বিশ্ব** শব্দের যে সর্বোচ্চ অর্থ সেই অর্থেই শব্দটি প্রতীকী হয়ে গেছে।

বিশ্বকর্ম্মা (ঘুড়ি-ওড়ানো): **২.** ***বিশ্বকর্ম্মা*** = ***বিশ্ব*** *(প্রবিষ্টবাহী) বানানোর কর্ম্ম করেন যিনি।* / বিশ্ব কর্ম্ম যাঁহার। (ব.শ.)। **৩.** সৃষ্টিকর্ত্তৃবিশেষ, দেবশিল্পী, ত্বষ্টা (ইঁহার মাতা বৃহস্পতিভগিনী 'যোগসিদ্ধা' বা 'যোগসত্তা', পিতা অষ্টম বসু 'প্রভাস'। ... মঙ্গলকাব্যে ইনি চণ্ডীর আজ্ঞায় দেউলনির্ম্মাণ কাঁচুলিলেখন নগরনির্ম্মাণ ও নৌকাগঠনের শিল্পী। শূন্যপুরাণে, ধর্ম্মস্থাননির্ম্মাণ ও ধান্যচ্ছেদনার্থ সোনার কাস্তিয়া গড়ায় ইনিই কর্ম্মী। অন্নদামঙ্গলে শিবের সিদ্ধির ঘোটনা কুঁড়া, অন্নপূর্ণার রত্নহাতা রত্নমুকুট পানপাত্র ভূষণ কাঁচুলি শাড়ী উড়ানী, ইনিই যোগাইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরের দেউল ও অন্নপূর্ণার পুরীর ইনিই নির্ম্মাতা। শিবায়নে, চাষী শিবের চাষের নিমিত্ত লাঙল ফাল কোদাল দা উখুন পাশী জোয়াল মই ইত্যাদির কর্ম্মকাররূপে ইনিই শাল বসাইয়াছিলেন।), শিল্পপণ্ডিত, সূর্য্য, সূর্য্যের সপ্তরশ্মির একতম, পরমেশ্বর, আদিপুরুষ, মুনিভেদ। (ব.শ.)।

দেবশিল্পী। বেদে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়। এঁর মাতা বৃহস্পতির ভগিনী যোগসিদ্ধা; পিতা অষ্টম বসু 'প্রভাস'। ইনি শিল্পসমূহের প্রকাশক, অলঙ্কারের স্রষ্টা, দেবতাদের বিমান-নির্মাতা। এঁর কৃপায় মনুষ্যরা শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করে। ইনি লঙ্কানগরীর নির্মাতা। ইনি উপবেদ, স্থাপত্যবেদের প্রকাশক, এবং চতুঃষষ্ঠী কলার অধিষ্ঠাতা। বিষ্ণুপুরাণ মতে প্রভাসের ঔরসে বৃহস্পতির ভগিনীর গর্ভে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়।

ঋগ্বেদে অনুসারে ইনি সর্বদর্শী ভগবান। এঁর চক্ষু, মুখমণ্ডল, বাহু, ও পদদ্বয় সর্বদিক ব্যাপিয়া আছে। বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে ইনি স্বর্গ ও মর্ত্য নির্মাণ করেন। ... ইনি ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা, ও প্রজাপতি।

ইনি পিতা, সর্বজ্ঞ; দেবতাদের নামদাতা এবং মর্ত্যজীবের অনধিগম্য। ইনি সর্বমেধ-যজ্ঞে নিজেকে নিজের কাছে বলি দেন। ইনি বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য, কল্যাণকর্মা, বিধাতা।

কোনো কোনো পুরাণমতে এই বিশ্বকর্মা বৈদিক ত্বষ্টা দেবতার কর্মশক্তিও আত্মসাৎ করেছিলেন। এই জন্য তিনি ত্বষ্টা নামেও অভিহিত। ... ইনি অস্ত্রাদিও প্রস্তুত করেন। ... রামের জন্য সেতুবন্ধ নির্মাণকালে ইনি নল বানরকে সৃষ্টি করেন।

বিশ্বকর্মা নিজের কন্যা সংজ্ঞার সহিত সূর্যের বিবাহ দেন। সংজ্ঞা সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে না পারায়, বিশ্বকর্মা সূর্যকে শানচক্রে স্থাপন করে তাঁর উজ্জ্বলতার অষ্টমাংশ কর্তন করেন। এই কর্তিত অংশ ... দ্বারা তিনি বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়র শক্তি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** দেবতার নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ত্বষ্টা**। প্রাচীন কাল থেকে আমরা যাঁদের কামার কুমার তাঁতি ছুতোরমিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি দরজি ... ইত্যাদি রূপে সাধাসাধি করে আসছি, মধ্যযুগ থেকে যাঁদের আমরা কারিগর, ওস্তাগর ... ইত্যাদি রূপে সেধে আসছি, ব্রিটিশ যুগের পর থেকে আমরা যাঁদের ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোলজিস্ট, বাসনির্মাতা, ট্রেননির্মাতা, লোহাকোম্পানি, তামাকোম্পানি, বিমাননির্মাতা ... ইত্যাদি রূপে সাধ্যসাধনা করে আসছি, সম্প্রতিকালে আমরা যাঁদের স্পেসক্রাফট-ডিজাইনার, হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, কমপিউটার-নির্মাতা ... ইত্যাদি রূপে সাধনা করতে শুরু করেছি — এঁরা সবাই **বিশ্বকর্ম্মা** নামক সত্তাটির অংশ। এঁরা মূলত তাঁদের উৎপাদিত বস্তুর ভিতরে শ্রম ও মেধা **প্রবেশ** করিয়ে দিয়ে (= **বিশ্-ব কর্ম্ম** করে দিয়ে) নির্মিত বস্তুটিকে সমাজ আকাশে উড়বার জন্য ছেড়ে দেন। এই কারণে **বিশ্বকর্ম্মা** পূজার দিনে বঙ্গবাসী-বঙ্গভাষীরা **ঘুড়ি উড়িয়ে** থাকে। তবে সেসব কথায় আমরা আসব একটু পরে।

বোঝাই যায় যে, **বিশ্বকর্ম্মা** শব্দটির সঙ্গে যে **বিশ্ব** শব্দটি লেগে রয়েছে, সেটি উৎপন্ন বা পণ্য বাচক। স্বভাবতই, **ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের** মতো এই **বিশ্বকর্ম্মা** সত্তাটিরও অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সামাজিক ভূমিকা ছিল, আছে, থাকবে। মানুষের সমাজে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল কবে কখন কীভাবে এবং আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত সত্তাটি কী কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে — সে সবের একটা বিশাল ইতিহাস আছে। তবে কোন সময় থেকে কারুকর্ম প্রচলিত হয়েছিল, তার সুবিন্যস্ত বিবরণ বিশ্বের অন্য কোনো দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া গেছে বলে আমরা শুনিনি; সে ইতিহাস রয়েছে কেবলমাত্র আমাদেরই। দ্র. **উত্তানপাদ**, **কারুষ**। আদিকাল থেকে মধ্যযুগের আগে (প্রায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত কালখণ্ডে **বিশ্বকর্ম্মা** সত্তাটির সামাজিক ভূমিকার বিস্তারিত ইতিহাস আমরা পাই আমাদের পুরাণকারগণের রচনায়, **বিশ্বকর্ম্মা**র কাহিনীতে। তার পর থেকে প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের সমাজে **বিশ্বকর্ম্মা**র ভূমিকার ইতিহাস পাওয়া যায় আমাদের মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে। উপরে **৩.**-এ সেই ইতিহাসের কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, যা পড়তে হয় ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত **বিশ্বকর্ম্মা**র সামাজিক ভূমিকার ইতিহাস অত্যন্ত নিখুঁত ও খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে প্রতীকী ভাষায় জানা গেলেও সেগুলি যে **বিশ্বকর্ম্মা**র ইতিহাস, সেকথা আমরা জানি না। অতীতহারা হয়ে গিয়ে সেই **বিশ্বকর্ম্মা**কে আমরা craftsman, fabricator, welder, plumber, manufacturer, builder, construction worker, industrial worker ... ইত্যাদি বলে থাকি। ...

সারা দেশ জুড়ে এই যে নানা শ্রেণীর **বিশ্ব** (উৎপন্ন) স্রষ্টাগণ তাঁদের বিপুল পরিমাণ **উৎপাদন** করে চলেছেন এবং সেই সব উৎপন্নকে সমাজ আকাশে বা বাজারে ছেড়ে দিচ্ছেন, এ তো সাক্ষাৎ দেখা যায় না, অনুভব করে নিয়ে বুঝে নিতে হয়। এরূপ অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাকে বোঝানোর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেবলমাত্র **বিশ্ব, বিশ্বকর্ম্মা** ... ইত্যাদি নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি করেননি, প্রতীক চিত্র, ভাস্কর্য ও প্রতীকী আচরণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন, যা প্রথারূপে আজও প্রচলিত রয়েছে। **বিশ্বকর্ম্মা** পূজা এবং পূজার দিনে **ঘুড়ি ওড়ানো** সেই রূপ প্রথাই বটে। লোকে তথাকথিত-'লেখাপড়া' জানুক আর নাই জানুক, তাঁরা যেন কর্মীদের (= **বিশ্বকর্ম্মা**র) অজস্র কর্মফলগুলিকে (= **পণ্য**কে) বাজারে উড়ে বেড়াতে দেখতে পান, এক শ্রেণীর **পণ্যে**র দ্বারা অন্য এক শ্রেণীর **পণ্যে**র উড়ে বেড়ানো বন্ধ করে দেওয়া দেখতে পান, (বাজারে উড়ে বেড়ানোর প্রতিযোগিতায় বালুচরী শাড়ীর কাছে ধনেখালি শাড়ীর হেরে যাওয়া দেখতে পান); মোটকথা সারা সমাজ-আকাশ জুড়ে **বিশ্বকর্ম্মা**র ও তাঁর কর্মফলের উড়ে-বেড়ানো ঘুরে-বেড়ানো অখণ্ডভাবে দেখতে পান, সেই উদ্দেশ্যে প্রতীকী প্রথারূপে **ঘুড়ি-ওড়ানো**র সূত্রপাত করা হয়; ঘুড়ির ভোঁ-কাট্টা খেলার সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগের পরেও বেশ কিছুকাল বাংলার সমাজমন এই প্রকার বোধের দ্বারা এত ব্যাপকভাবে জারিত ছিল যে, এসব কথা বুঝতে মানুষের অসুবিধা হত না। সমগ্র সমাজমন এইরূপ **বিশ্ব**, **বিশ্বকর্ম্ম**, **বিশ্বকর্ম্মা** ও সেই সকল কর্মের ফলাফল বিষয়ক জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে জারিত ছিল। এমনকি সমাজমনের সেইরূপ মাটির উপর দাঁড়িয়ে লোকে কাব্য-সংগীতাদি সৃষ্টি করত এবং লোকে সেসব বুঝতেও পারত। মধ্যযুগের শেষ সময়েও গায়ক-শ্রোতারা এসব অনায়াসে বুঝে নিতে পারতেন। আমরা দেখছি, শ্যামাসংগীত রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন সেই **ঘুড়ি-ওড়ানো** ধারণাকে আরো উন্নীত করে মহত্তম সংগীত রচনা করে গেছেন। বোঝা যাচ্ছে যে, জনসাধারণের (**মহামায়া**র) শ্রমিক, কারিগর ... ইত্যাদি (= **বিশ্বকর্ম্মা**) অংশটিকেই যে **কালী** ও **শ্যামা** বলে, সেকথাও সুস্পষ্টভাবে জানতেন এবং সে তত্ত্বের সাদৃশ্যেই মানুষের জন্মান্তর ও মুক্তির তত্ত্বের অবতারণা করতে পারতেন। রামপ্রসাদ গেয়েছেন —

'শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
ভব-সংসার বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি।।
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি।।
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত-চাপড়ি।।
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ি যাবে উড়ি।

ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি।।'

(শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী'
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ১৯৮৯ / পৃষ্ঠা ১৮১)

এর থেকে বোঝা যায়, রামপ্রসাদের যুগ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর গানবোদ্ধা মানুষজন **ঘুড়ি-ওড়ানো**র রহস্যটি ভালই জানতেন। একালে আমরা **বিশ্বকর্ম্মা** পূজা করি, **ঘুড়ি-ওড়ানো**র খেলা খেলি, ভোঁ-কাট্টা করে অন্যের ঘুড়ি কাটি ... কিন্তু কেন করি, তার কিছুই জানি না। কার্যত একালেও যে আমরা উৎপন্ন ও পণ্য উৎপাদক **কর্ম্মে**র বা **বিশ্ব-কর্ম্মে**র সাধনা করি, সেই **কর্ম্ম**জাত **পণ্য** বাজারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্রিয়ায় / ক্রীড়ায় মত্ত থাকি, একটি কোম্পানির **পণ্য** দিয়ে অন্য কোম্পানির **পণ্যে**র উড়ে বেড়ানো রহিত করে দেওয়ার খেলা খেলি, সেকথা তো সত্যিই। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আধুনিকতার দ্বারা দূষিত হওয়ার কারণে আমরা বাস্তবের সেই প্রকৃত **ঘটনা**র (ঘট > ঘুট > ঘুড় > ঘুড়ি) ঘুড়ি ওড়ানোর খেলার সঙ্গে প্রতীকী **বিশ্বকর্ম্মা** পূজা, প্রতীকী ঘুড়ি ওড়ানোর কোনো সম্পর্ক এখন আর দেখতে পাই না। ভাবি, এসব সেকেলে লোকদের বোকা-বোকা প্রথামাত্র। ...

আজ আমরা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মতো পূর্বসূরিদের প্রণাম জানাই। কেননা, তাঁদের দিয়ে যাওয়া ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে আমরা দুজন সেই সব কথা কমবেশি জানতে পারছি, এবং আপনাদেরও জানিয়ে দিতে পারছি। ...

৬. গ্রীক পুরাণে দেবতাদের কামার Hephaestus-এর কথা আছে। আমরা দেখেছি, ভারতীয় পুরাণাদির ক্রিয়াভিত্তিক পাঠের পর কেউ যদি গ্রীক ও রোমানদের পুরাকথা পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে বুঝে যাবেন, আমাদের পুরাকথা ও ইউরোপের পুরাকথা আসলে একই পুরাকথা। পার্থক্য এই যে, আমরা সেটা পেয়েছি কমবেশি সমগ্রভাবে, কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়; আর ইউরোপ তার অতীতকে পেয়েছে পোকায় কাটা শতচ্ছিদ্র ইতিহাসের মতো; কাটা-কাটা, ছাড়া-ছাড়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের **বিশ্বকর্ম্মা**র কাহিনীকে শতচ্ছিদ্র করে দিয়ে জলে-কাদায় চুবিয়ে নিলে দেখা যায়, সেটিই Hephaestus-এর কাহিনী হয়ে গেছে। তার মানে, Hephaestus-এর কাহিনীকে আমাদের **বিশ্বকর্ম্মা**র কাহিনী দিয়ে পুনর্নির্মাণ করে নেওয়া যেতে পারে। তবে কথাটি তো শুধুমাত্র Hephaestus-এর ক্ষেত্রেই খাটে না, পাশ্চাত্যের সমস্ত পুরাকথার ক্ষেত্রেই খাটে।

বিশ্বদেব (বিশ্বদেবগণ) : **২.** ***বিশ্ব*** *করিবার জ্ঞান-বুদ্ধি বহন (দান) করেন যিনি বা যাঁহারা।* / শ্রাদ্ধান্তে যাঁহারা যান। (ব.শ.)। **৩.** সর্ব্বদেব, বিশ্বনামক দেবগণবিশেষ, মহাপুরুষ, নবদেবতাগণের অন্তর্গত গণদেবতাবিশেষ (বসুসত্যৌ ক্রতুদক্ষৌ কামকালৌ ধৃতিঃ কুরুঃ। পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ বিশ্বে দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।' বিশ্বদেবগণ দক্ষকন্যা ধর্ম্মপত্নী বিশ্বার গর্ভে জাত। মতান্তরে, রোচক বা লোচন, ধ্বনি ও ধুরি এই গণের অন্তর্গত এবং গণসংখ্যা ত্রয়োদশ। মহাভারতে ইঁহারা অষ্টাবিংশতিসংখ্যক। ইষ্টিশ্রাদ্ধে নান্দীমুখে নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে এবং পার্ব্বণে ইঁহাদের পূজাবিধান আছে। পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত দেবযজ্ঞে ইঁহাদের বলি বিহিত হইয়াছে।)। (ব.শ.)।

বিশ্বদেব মানে সর্বদেব। ... বেদে দেবতা দুই অর্থে ব্যবহৃত। ... প্রথম অর্থে দেবতারা সিদ্ধ এবং তাঁরা অসংখ্য, দ্বিতীয় অর্থে দেবতা সিদ্ধ পুরুষগণের মিলিত ঐশীশক্তি, তাহা এক। অসংখ্য দেবতার সমবেত ঐশীশক্তির নাম বিশ্বদেব বা ব্রহ্ম। অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্য দেবতারা সেই মহাশক্তির নামান্তর মাত্র। মানুষের একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা একই দেবতাকে বিভিন্ন প্রকারে একাদশ বার অনুভব করা যায় বলে সেই এক দেবতা একাদশ স্থান ও ত্রিস্থান (স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী) ভেদে ৩ × ১১ = ৩৩। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন নাম উভয়েন্দ্রিয় মিলিত যোগফলই এই একাদশ। ... এই কল্পনা দ্বারাই ঋগ্‌বেদের দেবতার সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) বর্ণিত হয়েছে।

রামায়ণ মহাভারত কাল পর্যন্ত এই তেত্রিশ দেবতাই স্বীকৃত ছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শতপথ ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ৩৩ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বদেবের সংখ্যা দশ ও তেত্রিশ। পরে অন্যান্য পুরাণে তাহাই তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হয়। এই সংখ্যা বহুত্ব জ্ঞাপক মাত্র। ... (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এখনও ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ ইষ্টিশ্রাদ্ধ নান্দীমুখ ... ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান করে থাকেন, এবং সেখানে **বিশ্বদেব** বা **বিশ্বদেবগণ**-এর প্রসঙ্গ আসে। পুরাণাদিতে এঁদেরই **পিতৃদেব, পিতৃদেবগণ, সপ্তপিতৃদেবগণ, শ্রাদ্ধদেব** ইত্যাদি নামে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। মোটকথা সমাজ চালানোর দুটি ধারা স্পষ্ট দেখা যায় — **পিতৃদেবগণ** ও **বসুদেবগণ**। বৈদিক যুগেরও আগে থেকে যাঁরা সমাজ চালিয়ে আসছিলেন, তাঁদের ধারাটিকে **বিশ্বদেবগণ** (**পিতৃদেবগণ**) বলা হয়ে থাকে। বৈদিক যুগের শেষ লগ্নে ধনতন্ত্রমুখী যে সমাজচালকদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের ধারাটিকে **বসুদেবগণ** বলা হয়ে থাকে। শুরুর দিকে এই **বিশ্বদেবগণের** আচরণ ছিল অতীব দানশীল স্বভাবের এবং সেকারণে লোকে স্বেচ্ছায় **শ্রদ্ধার** সঙ্গেই আপন আপন অর্জনের অংশ এই **দেবগণ**কে দিত। সেকারণে এঁদের **শ্রাদ্ধদেব**ও বলা হয়ে থাকে। তারই প্রতীকী আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় পূজা-সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠানে। অর্থহীনভাবে হলেও, সেই আচার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা অনুষ্ঠানাদিতে আজও প্রচলিত আছে।

বিশ্ববীজ : **২.** ***বিশ্ব****সমূহ বিজনিত হয় যাহা দ্বারা।* **৩.** বিশ্বের বীজতুল্য, সর্ব্বকারণ, জগদ্‌যোনি। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এই **বিশ্ব** শব্দটি সর্বার্থক। এ যেমন উৎপাদিত পণ্যাদিকে বোঝায়, তেমনি রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধিদেরও বোঝাতে পারে, আবার এই সমগ্র জগৎকেও বোঝাতে পারে, এবং তাদের মধ্যবর্তী সকল সত্তাদেরও বোঝাতে পারে। তাদের প্রত্যেকের উদ্ভবের মূলকারণগুলিই **বিশ্ববীজ** শব্দের আধেয়। তার মানে, কামারশালা চালানোর মূল কারণ বা বিদ্যা থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনা বা জগৎ পরিচালনার মূল কারণ বা বিদ্যা পর্যন্ত সকল **বিশ্ব** বিজনন করার বিদ্যাকে **বিশ্ববীজ** বলা যায়।

বিশ্ববেদাঃ (বিশ্ববেদস্, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বরূপ) : **২.** *(সর্ব্বপ্রকারের)* ***বিশ্ব*** *সৃষ্টি করিবার* ***বেদ*** *জানেন যিনি।* / **বিশ্ব** যাহার ধন বা উপকরণ। (ব.শ.)। **৩.** বিশ্ববেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এক্ষেত্রেও

বিশ্ব শব্দটি সর্বার্থক। স্বভাবতই এ শব্দ যেমন নিম্নস্তরীয় **বিশ্ব** রূপে পণ্য উৎপাদনকারীকে বোঝাতে পারে, সামাজিক **বিশ্ব** রূপে রাষ্ট্রপতি বা রাজাকে বোঝাতে পারে, এমনকি সর্বোচ্চ স্তরের **বিশ্ব** রূপে পরমাপ্রকৃতিকেও বোঝাতে পারে; এবং তাদের মধ্যবর্তী যে কোনো স্তরের **বিশ্ব**কে বোঝাতে পারে। সেই সকল **বিশ্বের মূর্ত্তি** বা রূপকেই একত্রে **বিশ্বমূর্ত্তি** বা **বিশ্বরূপ** বলে (নিম্নে **বিশ্বরূপদর্শন** দ্রষ্টব্য। তবে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের একটি চরিত্র রূপে যে **বিশ্বরূপ**-এর কথা পুরাণাদিতে রয়েছে, তার কথা আমরা জানব **বৃত্রাসুর** শব্দের ব্যাখ্যায়।)। সকল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন হয়, **বিশ্ববেদাঃ** শব্দের ক্ষেত্রেও সেরকম হয়, বয়ানের প্রেক্ষাপটই ঠিক করে শব্দটি তার কোন অর্থটিকে বোঝাবে।

বিশ্বরূপ : দ্র. **বৃত্র, বৃত্রাসুর**।

বিশ্বরূপদর্শন : ৩. [**বিশ্বরূপ** = সর্ব্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বাত্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, মহাদেব, বহুরূপ, নানামূর্ত্তি। (ব.শ.)] **৫.** উপরে দ্র. **বিশ্ববেদাঃ**। জগতে যত রকমের সত্তা আছে, তাদের প্রত্যেকটির স্বভাবের ভিতরে যা রয়েছে তা একধরনের শক্তি, যে শক্তি কেউ না কেউ তার ভিতর প্রবেশ করিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। তাই সে **বিশ্ব**-পদবাচ্য। ব্রহ্মাণ্ড থেকে শুরু করে পরমাণু পর্যন্ত প্রতিটি সত্তাকেই সে কারণে **বিশ্ব** নামে শনাক্ত করা যায়। সেই **বিশ্বসমূ**হের একত্রিত রূপকেও **বিশ্বরূপ** বলে। কিন্তু সেই রূপ তো অচঞ্চল স্থির জড় নয়, এক **বিশ্ব** থেকে আর এক **বিশ্ব** নিয়ত প্রসূত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে, বিলুপ্ত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অপর কোনো **বিশ্বে**। সেই যে সচল সক্রিয় পরস্পরে বিজড়িত বিপুল **বিশ্ব**সমূহের একত্রিত চলমান রূপ, **শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন**কে সেই **বিশ্বরূপ** দেখিয়েছিলেন। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে তার বিন্দু-পরিমাণ আন্দাজটুকু করতে পারি, সমগ্র **বিশ্বরূপ** বর্ণনা করার কথা কল্পনাও করতে পারি না। গীতায় সেই **বিশ্বরূপদর্শনের** বর্ণনা রয়েছে স্বয়ং **শ্রীকৃষ্ণ** ও **অর্জ্জুনে**র বয়ানে। তার বর্ণনা এতই ভয়ানক যে, শোনা যায়, প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ দেখে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার (Oppenheimer) বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে **অর্জ্জুন**কথিত বয়ানটি হুবহু আবৃত্তি করেছিলেন। সেই **বিশ্বরূপ** দেখানোর আগে শ্রীকৃষ্ণ (পরমাপ্রকৃতির মতো) বলেছিলেন, 'এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ দর্শন কর, পূর্ব্বে যাহা কখনো দেখ নাই, তেমন বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর। আমার এই দেহে একত্রে অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ তুমি দর্শন কর এবং অপর যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এখন দেখিয়া লও। ... ইত্যাদি' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা / ১১ অধ্যায় / শ্লোক ৬,৭)।

বিশ্বশ্রবা (বিশ্রবণ, বিশ্রবস্, বিশ্রবাঃ, বৈশ্রবণ, বিশ্রবস্) : ২. ***বিশ্বশ্রবা*** *= যিনি* ***বিশ্ব****কে (উৎপন্নকে) শ্রবণ (গ্রহণ) করতে পারেন।* ***বিশ্রবণ*** *= বিপরীত শ্রবণ থাকে যাহাতে।* ***বিশ্রবস্, বিশ্রবাঃ*** *= বিপরীত শ্রবণের আধার যে।* ***বৈশ্রবণ*** *=* ***বিশ্রবণ*** *হইতে জাত।* **৩. বিশ্বশ্রবা** = পুলস্ত্যের পুত্র এবং কুবের ও রাবণাদির পিতা। **বিশ্রবণ, বিশ্রবস্, বিশ্রবাঃ** = পুলস্ত্যপুত্র মুনিভেদ। **বৈশ্রবণ** = কুবেরসম্বন্ধী, বিশ্রবার অপত্য, কুবের, রাবণ। (ব.শ.)। **বিশ্রবা** = ব্রহ্মর্ষি পৌলস্ত্যের ঔরসে ও রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূর গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। ইনি পুলস্ত্য-পুত্র বলে পৌলস্ত্য নামে পরিচিত। বেদপাঠ শ্রবণকালে এঁর জন্ম হয় বলে ইনি বিশ্রবা নামে খ্যাত হন। ... মহামুনি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে বৈশ্রবণ (কুবের) জন্মগ্রহণ করেন। ... পরে রাক্ষস সুমালীর কন্যা কৈকসী (নিকষা) কুবেরের ন্যায় পুত্রলাভের আশায় পিতার আদেশে বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করেন। ... ফলে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পনখার জন্ম হয়। ... কথিত আছে রাকা নামে এক রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার খর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ... লিঙ্গপুরাণ ও কূর্মপুরাণ মতে বিশ্রবার চার স্ত্রী। প্রথমা বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী হতে কুবের, দ্বিতীয় স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা বলাকা হতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুৎজিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নামে এক কন্যা, তৃতীয় স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা হতে মহোদয়, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন পুত্র ও কুম্ভীনসী নামে এক কন্যা, এবং চতুর্থ স্ত্রী সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী হতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। **বৈশ্রবণ** = কুবেরের অন্য নাম। পিতা বিশ্রবার নাম হতে এই নাম। ... ইনি বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **দেববর্ণিনী**। শ্রবণ করা (**শ্রব**) কাকে বলে সবাই জানেন। তা হল একজন তার মনোভাবের **শব**বাহী বাহ্যিক আওয়াজ বা **শব্দ** সৃষ্টি করে এবং অন্য একজন সেই বাহ্যিক **শব্দ**কে গ্রহণ করে অর্থাৎ শোনে, শুনে উপলব্ধি করে কথকের মনোভাব কী। কিন্তু সেরকম মনোভাব-বাহী **শব্দ** না হয়ে **শব্দ**টি যদি অন্য কিছু বহন করে? যদি 'মানুষের শ্রম ও মেধার **শব**'বাহী **শব্দ**-এর কথা বলা হয়? তৎক্ষণাৎ আমরা তাজ্জব হয়ে বলব — এ আবার কী! 'মানুষের শ্রম ও মেধার শব'-এর কথা তো আমরা কখনো শুনিনি। সেরকম **শব**বাহী **শব্দ**ও হয় নাকি?

হ্যাঁ, হয়। এখানে এই **বিশ্বশ্রবা, বিশ্রবা** প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি — সেরকম অবশ্যই হয়, হত, এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেরকম 'মানুষের শ্রম ও মেধার শব'-এর সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন! **কর্ণ** ও **প্রেত** শব্দে আমরাও তার দেখা পেয়েছিলাম (দ্র. ১ম খণ্ড)। সে হল মানুষের উৎপন্ন বা পণ্য, যার ভিতরে 'মানুষের শ্রম ও মেধার শব' থাকে এবং সেজন্যই উৎপন্নমাত্রকেই **শব্দ** বলা যায়। সেই **শব্দ** বা উৎপন্নকে বিপরীত দিকে বসে গ্রহণ করে যে, তা সে ভোক্তা, দোকানদার, পাইকার, মজুতদার ... যার আদিরূপই হোক, সেই সত্তাকেই **বিশ্রবস, বিশ্রবাঃ** ইত্যাদি বলা হত। পরে পরে তাকেই **বিশ্বশ্রবা** নামে শনাক্ত করা হয়। অতএব **বিশ্বশ্রবা** শব্দের মানে হল '**বিশ্ব**কে শ্রবণ করে যে' সত্তা, অর্থাৎ 'উৎপন্নকে বা পণ্যকে গ্রহণ করে যে' সত্তা। তথ্যানুসারে **বিশ্রবা** নামটি ছিল প্রাচীন, **বিশ্বশ্রবা** নামটি এসেছে রামায়ণের কালে, কৃত্তিবাসের হাত ধরে। কৃত্তিবাসের এইরূপ **বিশ্রবা** থেকে **বিশ্বশ্রবা** নামে সরে আসার কারণ হল, উৎপন্ন ততদিনে প্রায় সম্পূর্ণরূপে **পণ্যে** পরিণত হয়ে গেছে।

'মনোভাববাহী শব্দগ্রহণ'কে ইতোপূর্বে আমরা **উচ্চৈঃশ্রবা, উগ্রশ্রবা** ... প্রভৃতি শব্দে পেয়েছিলাম, এবার আমরা 'মনুষ্যাংশবাহী শব্দগ্রহণ'কে পেলাম **বিশ্রবা, বিশ্বশ্রবা, বৈশ্রবণ** প্রভৃতি শব্দে। একালের ভাষায় এই **বিশ্বশ্রবা**কে 'ভোক্তা' বা কনজিউমারও (consumer) বলা হয়ে থাকে। যাঁরা মানুষের সমাজকে 'কনজিউমার সোসাইটি' বা '**বিশ্বশ্রবা**দের সমাজ' বানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং হয়তো বা খানিকটা বানিয়েও ফেলেছেন, তাঁদের জানা দরকার, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে যে **বিশ্বশ্রবা** জন্মেছিলেন, তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল। আমরা দেখছি, তাঁর থেকেই **কুবের** ও **রাবণের** জন্ম হয়েছিল এবং স্বভাবতই তাঁদের মনে অত্যন্ত **দর্প** জন্মেছিল। সেই **দর্পে** একদিন তাঁদের সাধের **লঙ্কা** (সমাজশাসনকেন্দ্র) ধ্বংস হয়েছিল এবং **রাবণ**ও সবংশে নিহত হয়েছিল।

বিশ্বানর (বৈশ্বানর) : ২. ***বিশ্বানর*** *= যে **নর** **বিশ্ব**সমূহ (বা বিশ্বাধার) নির্ম্মাণ করে; অর্থাৎ, যে নর 'মনুষ্যাংশ' (= শ্রম ও মেধা) প্রবিষ্ট করে।* ***বৈশ্বানর*** *=* ***বিশ্বানর*** *হইতে জাত; অথবা (কাঁচামালে) শ্রমাগ্নি নিষেক করে যে।* / **বৈশ্বানর** = যে চৈতন্য সর্ব্বদেহ-অভিমানী স্থূলশরীরে উপহিত (হয়)। (ব.শ.)। ৩. **বিশ্বানর** = অগ্নির পিতা। **বৈশ্বানর** = বিশ্বানরসম্বন্ধী, অগ্নিসাধ্য, বিরাট্, অগ্নি, উদরস্থ অগ্নি, চিত্রকবৃক্ষ। (ব.শ.)। (ক) বৈশ্বানর বা অগ্নি ঋকবেদের একজন প্রধান দেবতা। বিশ্বামিত্র এই দেবতার স্তুতি করে অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করেছেন। (খ) দানবরাজ দনুর শত পুত্রের অন্যতম। তাঁর দুই কন্যা — পুলোমা ও কালকা। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **নর, বানর, কিন্নর, উশীনর, অগ্নি**। আগুন কয় প্রকার, পাশ্চাত্যের মানুষেরা তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষই জানেন 'পেটের আগুন' নেভানোর চেষ্টাতেই আজকাল মানুষের 'মাথায় আগুন' জ্বলে, লোকে 'রেগে আগুন' হয়ে যায়। অর্থাৎ **অগ্নি** সম্পর্কে বহুরকম ধারণা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। এমনি এক আগুন হল মানুষের মেধাযুক্ত শ্রম। তা দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয় **বস্তু উৎপাদন** করে, **পণ্য** বানায়। সৎ-প্রকৃতির (কাঁচামালের) ভিতরে মনুষ্যাংশরূপী মেধা ও শ্রম বা শ্রমাগ্নি প্র**বেশ** করায় যে, তাকেই **বিশ্বানর** বলে; একালের ভাষায় একে শ্রমিক বা কারিগর বলা হয়। তবে সামান্য পার্থক্য আছে। 'শ্রমিক' শব্দটির ভিতরে অন্য সত্তার ভিতরে 'প্রবেশ করানো'র বা **বিশ্**-এর কথা নেই, কিন্তু **বিশ্বানর** শব্দটির ভিতরে 'শ্রম-মেধা প্রবেশ করিয়ে' **বিশ্ব** বানায় যে নর, তার কথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

বিশ্বাবসু : ২. ***বিশ্বা****র (**বিশ্ব**-আধারের)* ***বসু****।* / বিশ্ব বসু যাহার। (ব.শ.)। ৩. দেবগায়ক গন্ধর্ব্ববিশেষ, পরমপুরুষ, পরমেশ্বর, বসুবিশেষ। (ব.শ.)। গন্ধর্বদের অধীশ্বর। এঁর ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। এই বিশ্বাবসু কৌশলে উর্ব্বশীকে রাজা পুরূরবার আলয় হতে উদ্ধার করেছিলেন। মহর্ষি জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা হতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইনি দেবলোকের বাসিন্দা এবং বারি-সৃষ্টিকারী। (ঋগ্‌বেদে) দেবতারূপেই ইনি পূজিত হয়ে থাকেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বসু, বিশ্বামিত্র, বীণা, উর্ব্বশী, জমদগ্নি, মেনকা**। যতদূর বোঝা যায়, আদিকালের উদ্বৃত্ত উৎপন্নসত্তার গিয়ে জমা হত যাঁর হাতে, সেই সত্তাই **বিশ্বাবসু**। তথ্য এইরূপ যে, ইনি **বৃহতী-বীণা** বাজাতেন। তার উত্তরসূরি সত্তাকে একালে আমরা পাই 'আমাদের শিল্প চাই, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প চাই, বানাও বানাও, আরও নতুন পণ্য বানাও, কেবল পণ্য বানিয়ে যাও' ... ইত্যাদি ডাক-দেওয়া অন্ধ কুবেরসাধক সংস্থাগুলি রূপে।

বিশ্বামিত্র : ২. ***বিশ্বা****র (**বিশ্ব**-আধারের) মিত্র।* / বিশ্বের মিত্র। (ব.শ.)। ৩. ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। ... একদা ইনি মৃগয়াক্লিষ্ট হইয়া সসৈন্যে মহর্ষি বসিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি, কামধেনু নন্দিনীর বা শবলার যোগবলে কৃত বিবিধ খাদ্যে ইঁহার আতিথ্য করেন। এইরূপে নন্দিনীর যোগবল অবগত হইয়া, ইনি ধেনুসমূহ বা রাজ্যের বিনিময়ে নন্দিনীলাভের প্রার্থনা করিলে, বসিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাদেশে কুপিত হইয়া ইনি বলপূর্ব্বক নন্দিনী লইবার ইচ্ছা করিলে, ধেনুর যোগবলে সৃষ্ট শকপহ্লবশবরাদি সৈন্যের সহিত রাজসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ইনি পরাজিত ও নিরস্ত্র হন। পরাজয়ে 'ক্ষত্রবল নিকৃষ্ট ও ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ' বুঝিতে পারিয়া কঠোর তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। রামায়ণে ব্রহ্মার বরে ইঁহার রাজর্ষিত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের বর্ণনা আছে। ইনি অভিশপ্ত কল্মাষপাদ রাজার দেহে রাক্ষস প্রবেশ করাইয়া তাহা দ্বারা বসিষ্ঠের পুত্র শক্তি, ও অন্য পুত্রগণকে নিহত করেন। ত্রিশঙ্কুর বিবরণে ইঁহার প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি রাম ও লক্ষ্মণকে 'বলা ও অতিবলা' বিদ্যা দান করেন, রাক্ষসনিধনার্থ স্বীয় আশ্রমে লইয়া যান এবং মিথিলার হরধনুর্ভঙ্গপূর্ব্বক সীতা-প্রভৃতির সহিত রামাদির পরিণয় সংঘটিত করেন। ইনি বৈদিক ঋষি। প্রসিদ্ধি, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া 'মস্তক', 'গাভী', ও 'অশ্বের' অনুকরণে যথাক্রমে 'তাল', 'মহিষ', ও 'গর্দ্দভে'র সৃষ্টি করেন। নারিকেল ফল এবং মর্ত্তমান কলাও বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া কথিত আছে। (ব.শ.)।

একজন ব্রহ্মর্ষি। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যাবলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইনি সপ্তর্ষিদের ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির অভিবক্তা। বিশ্বামিত্র বা তদীয় বংশের ঋষিগণ এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। রাজা কুশের পুত্র কুশিক, তাঁর পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। এই জন্য ইনি কৌশিক, গাধেয় নামে বিখ্যাত। গাধি পুরুবংশীয় এবং কান্যকুব্জের রাজা বলে কীর্তিত হয়েছেন। এইজন্য হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে বিশ্বামিত্র পৌরব, কৌশিক, গাধিজ, গাধিনন্দন প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। বিশ্বামিত্রের জীবনে সর্বপ্রধান ঘটনা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহিত বিরোধ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, তা এই ঋষির জীবন থেকে প্রমাণিত হয়। এই বিরোধের কথা ঋগ্‌বেদে অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে। এই দুই ঋষির শত্রুতা শেষে রক্তপাতে পর্যবসিত হয়। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক নিহত হয়, অন্যপক্ষে বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদ ... রাক্ষসে পরিণত হয়ে বশিষ্ঠের শতপুত্রকে ভক্ষণ করেছিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র একই সময়ে সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন। ... এই সূত্রে তাঁরা একে অন্যকে অভিশাপ দেন।

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নির জন্মকথা ঋচীক ও সত্যবতীর কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। ... বিশ্বামিত্রের পুণ্যবলে ত্রিশঙ্কু ... আকাশে জ্যোতিশ্চক্রের বহির্দেশে অধঃশিরা রূপে ... অবস্থান করেন, ও নক্ষত্রগণ তার অনুসরণ করে। ... এরপর বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থস্থ বনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এইসময় রাজা অম্বরীষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র এই যজ্ঞের পশু হরণ করায় পুরোহিত রাজাকে একটি নরবলি দিয়ে যজ্ঞের বিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। অম্বরীষ নরবলির উপযুক্ত লোক অন্বেষণ করতে করতে ঋচীক মুনির মধ্যম পুত্র শুনঃশেফের সন্ধান লাভ করেন। ... শুনঃশেফকে আনয়নকালে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হলে ... তিনি তাঁকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দিয়ে স্তব করতে বলেন। ... তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। পরে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। ... দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ঋষিত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় ইন্দ্রের প্রেরণায় ... বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সহবাসের ফলে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। ... মেনকাকে বিদায় দিয়ে বিশ্বামিত্র উত্তর দিকে গমন করেন এবং হিমালয়ের কৌশিকী নদীর তীরে আবার কঠোর তপস্যায় রত হন। এখানে ব্রহ্মার বরে তিনি মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। ... কিন্তু তাঁর সিদ্ধিলাভের এখনও বিলম্ব আছে শুনে তিনি আবার তপস্যায় রত হন। ... ইন্দ্র তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা রম্ভাকে পাঠালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র শাপ দিয়ে রম্ভাকে দীর্ঘকাল পাষাণে পরিণত করেন। ... বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা এঁকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। একবার বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করায় বিশ্বামিত্র তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য কৌশলে হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত রাজৈশ্বর্য গ্রহণ করে দক্ষিণা প্রার্থনা করেন। ... হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী ও পুত্র রোহিতাশ্বকে এক ব্রাহ্মণের নিকট এবং নিজেকে এক চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করে, বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন। ... পরে তাঁদের সব ফিরিয়ে দেন। মার্কণ্ডেয় ও অন্যান্য পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ কঠোর ও অন্যায় পরীক্ষা করায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। ফলে পরস্পরকে অভিশাপ দেন এবং উভয়েই পক্ষীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধে রত হন। অতঃপর ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে এঁদের এই বিরোধের অবসান ঘটান। ... বিশ্বামিত্রের যজ্ঞনাশের জন্য রাক্ষসরা সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ... তাই দশরথের অনুমতি নিয়ে তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিজ আশ্রমে নিয়ে আসেন। ... রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করে ঋষিদের যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** নামরূপে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অযোধ্যা, ঋচীক, কল্মাষপাদ, কান্যকুব্জ, কামধেনু, জমদগ্নি, ত্রিশঙ্কু, নন্দিনী, পরশুরাম, রাম, বশিষ্ঠ**। সর্বাগ্রে **বিশ্বামিত্র** শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থের কথাই হোক। দেখা যাচ্ছে, এই সত্তা '**বিশ্বা**র মিত্র' বা '**বিশ্বে**র আধার-এর মিত্র'; সে আধার '**বিশ্ব**-সৃজনকারী সত্তাসমূহ' (= **পণ্য** উৎপাদনকারী মানুষজন) হতে পারে, কিংবা তাদের সহায়ক ব্যবস্থাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, তাদের সহায়তাকারী সত্তাই **বিশ্বামিত্র**।

এবার ভারত সমাজের ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। সেখানে **বিশ্বামিত্র** সত্তাটি কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, পুরাণাদি গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। উপরে **৩.**-এ এবং মোটা হরফে লেখা শব্দগুলির নিজ নিজ **ভুক্তিতে** সেসব কথার কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি আগাগোড়া বৈদিক ব্যবস্থার (আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) বিরোধিতা করেছেন এবং পণ্যবাদী প্রচেষ্টা-সমূহের সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভারতসমাজের ইতিহাসে তাঁর এই ভূমিকা কিছুদিনের জন্য সাফল্যও পেয়েছিল। নগদ **নারায়ণ** যখন নিজেকে চারভাগে ভাগ করে **রাম লক্ষ্মণ ভরত** ও **শত্রুঘ্ন**, এই চার সত্তায় বিভাজিত করে ভারতসমাজে সক্রিয় হন, তাঁদের প্রধান সহযোগী দার্শনিক গুরু বা 'ফ্রেন্ড-ফিলসফার-গাইড'রূপে দেখা দিয়েছিলেন এই **বিশ্বামিত্র** সত্তা। তাঁদের একান্ত চেষ্টায় ও কালের নিয়মে শেষ পর্যন্ত ভারতসমাজে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠিত হয়। সে এত বিপুল মনোসুখের কারণ হয়েছিল যে, ভারতবাসী আজও সেই **রামরাজত্বের** কথা ভুলতে পারেনি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, প্রতীকী ভাষায় যাকে বৌদ্ধব্যবস্থা বা বৌদ্ধযুগ (অশোক থেকে হর্ষ**বর্দ্ধনে**র কাল) বলা হয়, পৌরাণিক ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় তাকেই **রামরাজত্ব** বলা হয়ে থাকে। এই **রামরাজত্ব** ছিল বিশ্বের প্রথম ধনতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা। (তবে কিনা এর মূলে **কুবের**সাধনা ছিল না, ছিল **লক্ষ্মী**সাধনা, কল্যাণীর সাধনা। একালের ধনতন্ত্র কিন্তু একেবারেই উল্টো, সে আগাপাছতলা **কুবেরসাধক**। তাতে **রাম-রাজত্বের** গন্ধটুকু পর্যন্ত থাকে না, নেই। যাই হোক, এদেশের সেই **রামরাজত্ব** কিন্তু বেশিদিন টেকে না, তাতে ক্লেদ জমে, **রাম**কে শূদ্রনিধন করতে হয়। ক্রমে একদিন এই **রামরাজত্ব** অতিক্রম করে শঙ্করাচার্যদের নেতৃত্বে হিন্দুযুগের সূত্রপাত হয়ে যায়।)

বলতে গেলে, **বশিষ্ঠ** যেমন বৈদিক ব্যবস্থার মুখ্য আধার রূপে সেই ব্যবস্থাকে চালানোর চেষ্টাতেই ব্যাপৃত, **বিশ্বামিত্র** তেমনি সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার চেষ্টাই শুধু করেননি, **পণ্য**বাদী পথে যিনিই হেঁটেছেন তাঁরই সহায়তা করছেন। তার মানে, ভারতভূমিতে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র প্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত যে পরস্পরবিরোধী লড়াই লড়ে এসেছে, তার প্রধান দুই দার্শনিক সত্তার নাম **বশিষ্ঠ** ও **বিশ্বামিত্র**। দ্র. **মিত্র**।

বিষ : **১.** ✓বিষ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *(কোনো সত্তা হইতে)* ***বিগত বা নির্গত শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রকাশন বা দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে বা যে সত্তায়; অর্থাৎ প্রবিষ্ট হয়ে দিশাগ্রস্ত ভাবে চলে যে; অথবা প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষতি করে যে।*** / শরীরে ব্যাপ্ত হয় যে ('শরীরব্যাপক')। (ব.শ.)। **৩.** গর, গরল, হলাহল, বৎসনাভ, গরলমাত্র, বোল, বিষবৎ অপকারক বা জ্বালাকর বস্তু, পদ্মকেশর, মৃণাল, জল, যন্ত্রণা, বেদনা। (ব.শ.)। **৪.** poison অর্থে প্রচলিত। **৫.** প্রশ্নটি এরকম — ছিল **বিশ্**, হয়ে গেল **বিষ্**। কেমন করে হল? সুকুমার রায় বলবেন, ছিল ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাঁকপ্যাঁকে হাঁস; এ তো হামেশাই হচ্ছে! ঠিক তাই। আগত বা **প্রবিষ্ট** সত্তাকে সচল সক্রিয় ভাবে দেখলে, তেমনই হয়। কোনো গ্রহ-সত্তার ভিতরে যে আগন্তুক সত্তা আসে, সে তার মতো করে সক্রিয় হয়; তখন সেই আগন্তুক গ্রহ-সত্তার প্রচলিত তালের সমান তালে চলতে পারে, পৃথক বা বিপরীত তালে চলতে পারে, এমনকি প্রচলিতের একটি

অংশকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে, অন্য অংশটির বিরোধিতা করতে পারে ... ইত্যাদি ইত্যাদি; আর বিরোধিতা করলেই সেটি আর **বিশ** থাকে না, **বিষ** হয়ে একরকম বিরুদ্ধবোধে পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তখন কখনো কখনো **বিশ** পরিণত হয়ে যায় **বিষ**-এ, **বিষ্ণ**-তে। আমাদের 'প্রাচীন বাংলা'র (= সংস্কৃতের) পূর্বসূরি শব্দবিদগণ জানাচ্ছেন, **বিশতি** (= প্রবেশন) তখন **বেষতি** (= সেচন, বর্ষণ, ব্যাপ্তি) পেরিয়ে **বিষ্ণাতি**তে (= বিপ্রয়োগে) পৌঁছে যায়।

দারুণ গান গায় দেখে পথের ভিখারীকে আপনি সঙ্গে করে এনে পরিবারে স্থান দিলেন, হতে পারে সে গোটা পরিবারের চলমান ব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করে দিয়ে পরিবারের অশেষ সমৃদ্ধির কারণ হয়ে গেল; এমনও হতে পারে যে, সে পরিবারের চলমান ব্যবস্থাকে রুদ্ধ করে দিয়ে আপন শাসন চালাতে লাগল এবং পরিবারের অশেষ ক্ষতিসাধন করে দিল। ইনজেকশন দিয়ে আমাদের শরীরে যে জিনিস প্র**বেশ** করানো হয়, তা আমাদের শারীরব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করতে পারে, কিংবা বিশ্লিষ্ট করে দিয়ে ব্যবস্থাটিকে অচল বা ধ্বংসও করে দিতে পারে। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, নবাগত জ্ঞান একটি সামাজিক গোষ্ঠীর প্রচলিত জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। বাস ট্রেন আবিষ্কারের পর বিশ্ব থেকে ঘোড়সওয়ার জাতিগুলির অধিকাংশ কি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি? ট্রাকটরের ব্যবহার কি আমাদের সমাজ থেকে লাঙলসহ তার অজস্র সহযোগী শব্দগুলিকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিচ্ছে না? এসব ভাল কি মন্দ সেটি এখানে প্রসঙ্গ নয়, প্রসঙ্গ হল নবাগত বা বহিরাগত নতুন জ্ঞান একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করে পূর্ণোদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলতে শুরু করে দিলে, তা তৎপূর্ব কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসা জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই কারণে নবাগত জ্ঞানকে 'বিপরীত জ্ঞান' বা **বিষ** বলাই বিধেয়। মানবসভ্যতা যে তার ইতিহাস ভুলে গেছে, তার একটি কারণ তো এই **বিষ**স্বরূপ জ্ঞানই। ...

তবে কালে কালে **বিষ** শব্দটি তার এই অন্তর্নিহিত 'প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষতি করে যে' অর্থেও আর সক্রিয় থাকে না, থাকলে তো আমরা মানুষের দেহে ও মনে, সমাজদেহে ও সমাজমনে যে কোনো নবাগত ক্ষতিকর সত্তাকে **বিষ** নামে চিনতাম। এখন সেরকম হয় না। কেননা **বিষ** শব্দটি এখন প্রতীকী শব্দে পরিণত হয়ে কেবলমাত্র দেহকে বিষাক্ত করে দেয় যে-সত্তা তাকেই বোঝায়।

বিষুব (বিষুবদিন, বিষুবরেখা) : **১.** বিষু (সাম্য) + ব অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***বিষুব*** *=* ***বিষ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বাহিত হয় যাহাতে।* / **বিষুব** = যে সময়ে রাত্রি ও দিন সমান (হয়)। **বিষুবরেখা** = যে রেখায় সূর্য্যসংক্রমণ হইলে রাত্রি ও দিন সমান হয়। (ব.শ.)। **৩.** **বিষুব** = সমরাত্রিন্দিবকাল, সূর্য্যের তুলামেষসংক্রান্তিবিশেষ। **বিষুবদিন** = তুলামেষসংক্রান্তির দিন। **বিষুবরেখা** = সমরাত্রিদিন কালের রেখা। Equator। (ব.শ.)। **৪.** Equator অর্থে **বিষুবরেখা** প্রচলিত; বাকি শব্দদুটি অপ্রচলিত। **৫.** 'উ'কার অর্থে আমরা জেনেছি যে, 'উ'কার যার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে দেয় — মন্দকে ভাল করে দেয়, ভালকে মন্দ করে দেয়, নিম্নকে উচ্চ করে দেয়, উচ্চকে নিম্ন করে দেয় ... ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে কানা আমাদের প্রিয় কানু হয়ে যায়, শাসক-ভয়ানক রাজা আমাদের প্রিয় রাজু হয়ে যায়। এভাবেই সানু, রামু, রাণু, কালু ... ইত্যাদি হয়ে থাকে। **বিষ** নবরূপে উত্তীর্ণ হলে সে আর **বিষ** থাকে না, হয়ে যায় **বিষু**। ফলত সে আর বিপরীত আচরণকারী, বিশ্লিষ্টকারী, ভেদকারী বা অসাম্যসৃষ্টিকারী **বিষ** থাকে না, **বিষু**-রূপে নতুন-পুরাতনের, আলো-অন্ধকারের ... প্রতি সমান আচরণ করতে থাকে। সেইহেতু ব.শ. **বিষু**কে বলেছেন 'সাম্য'। সেই সাম্য বহন করে যে, সে হল **বিষুব**। অতএব, equator-কে তো **বিষুবরেখা** বলতে হবেই।

বিষ্টি : **১.** ✓বিষ্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিষ্*** *গতিশীল বা সক্রিয় ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে।* / যাহা দ্বারা বেতন বিযুক্ত হয়। (ব.শ.)। **৩.** বেতন বিনা ভারোদ্বহনাদি, বেগার, মূল্য বিনা বলপূর্ব্বক করান কার্য্য, বেতন বিনা কর্ম্মকর, বেতন, ভৃতি, কর্ম্ম, (জ্যোতিষে) করণবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দিশাগ্রস্ত করে দেওয়া, পৃথক করে দেওয়া, বিশ্লিষ্ট করা ... এসবই হল **বিষ্**-এর **ধর্ম্ম**, **বিষ্** ক্রিয়ার মর্মার্থ। সেই **বিষ্** যদি দুটি মানুষের সম্বন্ধের ভিতরে ঢুকে পড়ে, সে তো সেই সম্বন্ধকে বিশ্লিষ্ট করবেই। সে তখন চুক্তি অনুসারে লেনদেন হতে দেয় না, বেতনকে বাদ দিয়ে দেয়, অথচ কাজটিকে চলতে দেয়। এরকম সম্বন্ধিত **কর্ম্ম**কে সেকারণেই **বিষ্টিকর্ম্ম** বলে।

বিষ্ণু (বিষ্টু) : **১.** ✓বিষ্ + ণু - কর্তৃবাচ্যে; ✓বিশ্ + নু (কনু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বিষ্ণু*** *=* ***বিষ****-স্বরূপ* ***ণু*** *(= জ্ঞান নবরূপে উত্তীর্ণ) যাহাতে; অথবা,* ***প্রবিষ্ট****-এর বোধ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা,* ***দ্বৈতাদ্বৈত*** *রূপে বা বিকল্পরূপে উৎপত্তিশীল।* ***বিষ্টু*** *=* ***বিষ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে।* / যিনি **বিশ্বে** প্রবেশ করেন ('বিশ্বপ্রবেশক')। (ব.শ.)। **৩.** বিশ্বব্যাপক, ব্যাপনশীল, পরমেশ্বর, বসুগণের একতম, অগ্নি, নারায়ণ, কৃষ্ণ। (ইনি ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তির একতম এবং সৃষ্টির পালক। ইনি দ্বাদশাদিত্যের একতম এবং ইন্দ্রের অনুজ 'উপেন্দ্র' নামে অভিহিত। লোকরক্ষার্থ ইনি নানা অবতারে আবির্ভূত হইয়া মধুকৈটভহিরণ্যাক্ষাদি লোকশত্রুগণকে বিনাশ করেন। ইনি ক্ষীরোদশায়ী। ইঁহার শয্যা অনন্ত, পত্নী লক্ষ্মী, পুত্ত্র কামদেব, ধাম বৈকুণ্ঠ, বাহন গরুড়, ধনু শার্ঙ্গ, চক্র সুদর্শন। ইনি শ্যামবর্ণ। ইঁহার বক্ষঃ শ্রীবৎস ও কৌস্তুভে সুশোভিত। ... ইঁহার সহস্র নাম। বেদে বিষ্ণুর তিন প্রকারে পাদপ্রক্ষেপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ... ইহা বামনাবতারে ত্রিবিক্রমাখ্যান।)। (ব.শ.)।

... এঁর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, চক্র সুদর্শন, গদা কৌমোদকী, মণি কৌস্তুভ। ... এঁর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ও অসির নাম নন্দক। ... বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ... মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি বিদ্যমান। ... প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এঁর দুই স্ত্রী — লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানব দলনের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এঁর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে; যথা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। ... বিষ্ণু ঋক্‌বেদের অনেক সূক্তে স্তুত হয়েছেন। কোনো কোনো স্থানে

ইনি আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছেন, কোথাও বা তিনি সূর্যরশ্মির সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে বর্ণিত হয়েছেন। ইনি সপ্তকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রম করেন। ইনি ইন্দ্রের সখা। ইনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। আর্যদের প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। ... সৃষ্ট জগতের পালনভার তাঁর উপর অর্পিত। ... প্রলয়সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন। তাঁর নাভি-উদ্ভূত পদ্ম হতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ... (পৌ.অ.)। ৪. দেবতার নাম রূপে প্রচলিত। **৫. দ্র. দেব, ধন, ধনঞ্জয়, নারায়ণ, গৌরী**। **বিষ্ণু** শব্দটি **ব্রহ্মা** শব্দের মতোই একটি গভীর অর্থধারী শব্দ। মানবজগতে **সদাসর্ব্বদা অতিসক্রিয় কিন্তু অদৃশ্য সত্তা**কে বোঝাতেই শব্দটির সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেকারণে, বিষয়টিকে ধাপে ধাপে বোঝার চেষ্টা করব আমরা।

প্রথমত, ব.শ. বলছেন, **বিষ্ণু** শব্দটির অর্থ হল, 'বিশ্বপ্রবেশক', 'বিশ্বব্যাপক', 'ব্যাপনশীল' ... ইত্যাদি। অর্থাৎ, **বিশ্বে**র ভেতরে প্রবেশ করে বা ব্যাপ্ত হয় যে সত্তা, সে সত্তাই **বিষ্ণু**। প্রশ্ন হল **বিশ্ব** কী এবং তাতে প্রবেশ ক'রে ব্যাপ্ত হয় কে? আমরা আগেই জেনেছি, **বিশ্ব** হল 'যে সত্তা প্রবিষ্টকে বহন করে' — তা সে মানুষের তৈরি করা মাটির হাঁড়ি কলসি বা কাঠের খাট, পালঙ্ক, টেবিল ... ইত্যাদি বাহ্যসত্তা হতে পারে, পরমাপ্রকৃতির তৈরি করা এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো বাহ্যসত্তাও হতে পারে; অর্থাৎ মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টিগুলিও **বিশ্ব** হতে পারে, প্রকৃতির অকৃত্রিম সৃষ্টিগুলিও **বিশ্ব** হতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, এই সৃষ্টিগুলির বা **বিশ্ব**গুলির ভিতরে প্রবেশ করে কে? তাকে চিনলে তবেই **বিষ্ণু**কে চেনা যাবে।

আমরা দেখছি, মানুষের **বিশ্ব**গুলির ভেতরে প্রবিষ্ট হয় মানুষের মেধা ও শ্রমের একটি **প্র**কৃষ্ট মান। সেটি কীরূপ? কারও প্রচুর মেধা থাকতে পারে, শ্রমশক্তিও থাকতে পারে। কিন্তু একটি খাট তৈরির ক্ষেত্রে কাঠে কী পরিমাণ জ্ঞান-বুদ্ধি-মেধা কেমন করে কতখানি শ্রমশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে প্রবেশ করাতে হবে, তার একটা পরিমাণ, পদ্ধতি বা নিয়ম আছে। সেটি ঠিকঠাক করা না গেলে কাঠের খাট তৈরি করা যাবে না। তার মানে, মেধা ও শ্রমের একটি বিশেষ মাত্রাকে বিশেষ প্রকারে কাঠে ঢুকিয়ে তার সঙ্গে '**প্র**কৃষ্টরূপে' মেলাতে পারলেই কাঠ বদলে যায় নতুন একটি জিনিসে, যেটিকে খাট বলে। কাঠের খাট পালঙ্ক টেবিল ... কিংবা মাটির কলসি হাঁড়ি ঘড়া ... প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই তাদের যার যার তার তার উপরোক্ত '**প্র**কৃষ্টরূপ' তার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়, তাহলেই সেগুলি সৃষ্টি হয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এই **প্র**কৃষ্ট রূপটিকেই আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ শনাক্ত করেছিলেন **প্র** বলে। (দ্র. **প্র**)। তাঁদের চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে, মেধা হল **পুরুষ** (আধেয়), শ্রম হল **প্রকৃতি** (আধার)। তাদের মিলিত 'প্রকৃষ্টরূপ'টি হল **প্র**। এটি হল প্রথম ধাপ। সেই **প্র**-কে **পুরুষ** (আধেয়) রূপে কাঠে বা **প্রকৃতি**তে (আধারে) প্রবেশ করিয়ে দিলে কাঠ পরিণত হয়ে যায় খাট-এ। এ হল দ্বিতীয় ধাপ। এভাবেই **প্র** ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের কৃত্রিম **বিশ্ব**রূপে অজস্র **বস্তু** সৃষ্টি করা হয়। সরল **বস্তু**র ক্ষেত্রে এরকম দুটি-একটি ধাপ থাকে। যে **বস্তু** যত জটিল, তার সৃজনের ক্ষেত্রে এই ধাপের সংখ্যা তত বেশি হয়। কিন্তু সব মানুষিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই **প্র**-ই যে **প্রকৃতির** ভিতরে **প্রবেশ** ক'রে ব্যাপ্ত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই **প্র-ই** অতএব 'বিশ্বপ্রবেশক' **বিষ্ণু**। তবে এ হল মানুষের তৈরি **করা বিশ্বে প্রবেশ** ক'রে ব্যাপ্ত হয় যে, সেই 'বিশ্বপ্রবেশক' **বিষ্ণু**।

প্রকৃতির **সৃষ্টি করা বিশ্বে প্রবেশ করে যে**, এখন তবে তার কথা হোক। প্রকৃতির সৃষ্টি **করা বিশ্বের** সর্বকনিষ্ঠ যে সদস্যকে এখন আমরা আগের চেয়ে অনেক ভাল চিনতে বুঝতে পারি, সে হল 'পরমাণু'। সেখানেও দেখা যাচ্ছে, তেজ ও ভরকে তাদের '**প্র**কৃষ্টরূপে' মিলিয়ে দিয়ে পদার্থটিকে তৈরি করে ফেলা হয়েছে এবং তা করে রেখেছেন পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং। একই ব্যাপার জীবকোষ-এর ক্ষেত্রেও ঘটে, অবশ্যই অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে। তবে যত উচ্চতর স্তরে আমরা যাই, দেখা যায়, প্রক্রিয়াটি ততই বহু ধাপ পেরিয়ে জটিল হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে মূল প্রক্রিয়াটি বদলে যায়নি এবং সবক্ষেত্রেই **প্র** প্রবেশ করিয়ে কোটি কোটি সত্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এইভাবে **প্রকৃতকরণ করে** এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ করা হয়েছে বলেই একে **প্রকৃতি** বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কিনা, **প্রকৃতি**র অকৃত্রিম সৃষ্টিগুলির প্রত্যেকটির ভিতরেই 'বিশ্বপ্রবেশক' **বিষ্ণু** রয়েছেন। তার মানে, মানুষের সৃষ্টি করা কৃত্রিম **বিশ্ব** হোক আর **প্রকৃতি**র সৃষ্টি করা অকৃত্রিম **বিশ্ব**ই হোক, সকল **বিশ্বে**র ভিতরেই **বিষ্ণু প্রবিষ্ট** হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন বলেই তাকে **বিষ্ণু** বলে।

তবে এসব তো গেল তথ্য রূপে পাওয়া 'বিশ্বপ্রবেশক' **বিষ্ণু**র কথা। এবার খোদ **বিষ্ণু** শব্দের ভিতরে কী আছে, সেটা জানা চাই।

তথ্যানুসারে **বিষ্ণু** শব্দটি দু-ভাবে তৈরি হয়েছে — **বিষ্** + ণু জুড়ে, এবং **বিশ্** + নু জুড়ে। **বিশ্** কীভাবে **বিষ্**-এ পরিণত হয়, সেকথা আগেই আমরা জেনেছি; এমনকি সেই **বিষ** কীভাবে 'বিষ্ণতি'তে পরিণত হয়ে 'বিপরীত প্রয়োগ' বা 'বিপ্রয়োগ' হয়ে যায়, তাও আমরা দেখেছি (দ্র. **বিষ**)। কিন্তু সেই 'বিপ্রয়োগ'রূপ '**বিষ্-ণ**' বা **বিষ**-জ্ঞান (= **বিষ**-বোধ) অর্থাৎ '**বিষ্ণ**'ই যে 'উ'কার যোগে 'নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে' একেবারে উলটো হয়ে '**প্র**কৃষ্ট-প্রয়োগের বোধ' হয়ে **বিষ্ণু** হয়ে যায়, সেকথা আমরা খেয়াল করি না। বাস্তবে এর স্বরূপ সবাই কমবেশি দেখতে পান, বুঝতেও পারেন; শুধু একটু আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা।

ধরা যাক, পঞ্চাশ বছর আগে কেউ যা ভাবতেও পারত না, রামবাবু এখন তাই করেন; 'ব্যানার্জিস্-জায়েন্ট' নামে বিরাট আকারের প্রচুর গোলাপ চাষ করেন যা দেশ-বিদেশ থেকে লোকজন এসে নিয়ে যায়। এই গোলাপ চাষের কলাকৌশল তিনি শিখেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগের অধ্যাপকদের কাছ থেকে। তবে, সেই জ্ঞানবুদ্ধিমেধা সেই অধ্যাপকদের নিজস্ব নয়, তাঁরা সেসব পেয়েছিলেন সেই গোলাপের উদ্ভাবক স্বনামধন্য **শ্রী শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** কাছ থেকে। তার মানে, বড় গোলাপ চাষের উদ্ভাবক (= **শিব**) তার প্রয়োগ করেন না; তদ্রূপ চাষের জ্ঞান বহনও তিনি করেন না, করেন কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানবাহকগণ (= **ব্রহ্মা**); কিন্তু তাতেও সমাজের এক কণা লাভ হয় না। লাভ হয় রামবাবুর মতো মানুষজনের হাতে, যাঁরা ঐ-প্রকার গোলাপ চাষ করবার জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ ঘটান (= **বিষ্ণু**)। তার মানে, যে

সকল আবিষ্কার-উদ্ভাবন বাস্তবায়িত হয়ে মানুষের সমাজের কাজে লাগছে, সমাজকে টিকিয়ে রেখেছে, টিকে থাকতে সাহায্য করছে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেসবই ঘটছে **বিষ্ণুর** হাত দিয়ে। এই সেই কারণ, যার জন্যে **বিষ্ণুকে** বলা হয় 'জগৎপালক'।

তার মানে, আবিষ্কারক-উদ্ভাবক (**শিব**) তো আবিষ্কার করে অনুগামীদের হাতে তুলে দিয়ে খালাস! সেই আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞান (বা **ব্রহ্মজ্ঞান**) অতঃপর বহন করে যে, সে স্বভাবতই একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী হয়ে **ব্রহ্মা**র পুত্র **অঙ্গিরা** হয়ে প্রায় **বিষ**-জ্ঞানের আধারে পরিণত হয়ে যায়। সেই **বিষ**-জ্ঞানকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে মানুষের ও সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন **বিষ্ণু**। [অর্থাৎ, আবিষ্কৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারক (**শিব**) স্বভাবত **নীরাজনে** অবস্থান করেন, আবিষ্কৃত জ্ঞানের ধারক (**ব্রহ্মা**) স্বভাবত **বিরাজনে** অবস্থান করেন, এবং তার ব্যবহারকারী (**বিষ্ণু**) স্বভাবত **দ্বিরাজনে** অবস্থান করেন। অর্থাৎ, **বিষ্ণু** হলেন দ্বৈরাজ্যবাহী।] ...

তবে আমরা আরও একভাবে শব্দটির অর্থসাধন করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝব — **বিষ্ণু** = **ব্** + **ইষ্ণু**। এভাবে দেখলে, **বিষ্ণু**কে আমাদের চেনাজানা জিষ্ণু, **বর্দ্ধি**ষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, **ভূষ্ণু**, চলিষ্ণু ... প্রভৃতি শব্দের মতো মনে হয়। আমরা জানি জিষ্ণু = জয়-শীল, **বর্দ্ধি**ষ্ণু = **বর্দ্ধন**-শীল ... একইভাবে **বিষ্ণু** = ব-শীল। অর্থাৎ, জিষ্ণু যেমন 'জয়-করণ-শীল' বোঝায়, **বিষ্ণুও** তেমনি 'ব-করণ-শীল' বোঝাবে। আমরা **ব**-কে ভালই চিনি, কিন্তু **ব**-করণকে চিনি না। **ব** হল সেই যাকে আমরা চিনেছি **দ্বি** থেকে চ্যুত **ব**-শব্দে। **দ্বিরাজনে** এই **ব**-ই রয়েছে। **দ্বি, বঙ্গ,** ও **ব বর্ণের অর্থ**তে আমরা এই **ব**-কে দেখেছি একই সঙ্গে দুইকে বা উভয়কে সমান **মর্য্যাদা**য় বহন করে নিয়ে চলতে। তাহলে তো যে সত্তা (পুরুষ-প্রকৃতি) দুইকে সর্ব্বোচ্চ সম্বন্ধে আবদ্ধ করে, সেভাবে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে চলে বা চলার চেষ্টা করে সে-ই তো **ব**-করণ করে, সেই তো **ব**-শীল, সেই তো দ্বৈরাজ্যবাহী, দ্বৈতাদ্বৈতবাহী (= two in one -বাহী), সেই তো **অদ্বৈত**-ইচ্ছুক, সেই তো **ব-ইষ্ণু**। সেই সত্তাই তো **প্র**। সেই সত্তাকেই তো **ব্রহ্ম** বলে। তার মানে মেধা-শ্রমের মতো সর্বপ্রকারের **পুরুষ-প্রকৃতি**র জোড়কে বা 'উভয়'কে (= **ব**-কে) নিয়ে **ইষ্ণু** যে, সেই সত্তাই **বিষ্ণু**। তার মানে, **পুরুষ-প্রকৃতি** রূপী দুইকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত রাখে যে, সেই সত্তাই **বিষ্ণু**। সংক্ষেপে একে আমরা বলব — **দ্বৈতাদ্বৈত** রূপে বা বিকল্প রূপে উৎপত্তিশীল।

অতএব **বিষ্ণু** শব্দের অর্থ দাঁড়াল — '**প্রবিষ্টে**র বোধ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে'। স্বভাবতই এ হল **বিশ্বের** মূল বোধ, জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের বোধ। পরে পরে এই বোধ শুধুমাত্র 'ধনসম্পদের বোধ'-এ পরিণত হয়ে প্রতীকী হয়ে যায়। লোকে **বিষ্ণুকে** শুধুমাত্র সম্পদ বা **নগদ নারায়ণ** রূপে চিহ্নিত করতে থাকে। ...

এবার তাহলে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে **বিষ্ণুর** যে ভূমিকার কথা আমাদের পূর্বসূরিরা তাঁদের পুরাণাদি গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন, তার কথা হোক। প্রথমত, তিনি নাকি জগতের মূল যে **ব্রহ্ম** তার তিন প্রকার আধারশক্তির একজন। তাই তিনি 'ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তির একতম'। আমরাও দেখছি, তিনি একতমই বটে; কেননা, তিনিই তো 'আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানের ব্যবহারকারী'। সুতরাং, তাঁকে '**ত্রিমূর্ত্তি**র একতম' বলতেই হয়। পাশ্চাত্যদেশ এই একই ধারণাকে খানিকটা আবছাভাবে ধরে রেখেছেন তাদের Trinity God-এর বোধে। দ্র. **ত্রিদেব**।

এরপর ব.শ. জানাচ্ছেন যে, **বিষ্ণু** ছিলেন 'দ্বাদশাদিত্যের একতম এবং ইন্দ্রের অনুজ 'উপেন্দ্র' নামে অভিহিত।' দ্র. **ইন্দ্র**। **আদিত্য** কী, দ্বাদশাদিত্যই বা কী, সেকথা আমরা **আদিত্য** শব্দের অর্থে কমবেশি জেনেছি। আর, যে **বিষ্ণু** 'লোকরক্ষার্থ নানা অবতারে আবির্ভূত হইয়া মধুকৈটভহিরণ্যাক্ষাদি লোকশত্রুগণকে বিনাশ করেন' তার কথা আমরা **অবতার, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম** ... প্রভৃতি শব্দে কমবেশি ব্যাখ্যা করেছি। 'ইনি ক্ষীরোদশায়ী', অর্থাৎ, জনসাধারণের শ্রম ও মেধা থেকে যে উৎপন্নসম্ভার জন্মায়, তা ক্ষরিত হয়ে যে সম্পদের সমুদ্র তৈরি হয়, ইনি সেখানে শয়ন করে থাকেন। এঁর শয্যা **অনন্ত**। এঁর আধারশক্তি বা পত্নী **লক্ষ্মী**, **বাহন গরুড়**।

বিষ্ণুকায়া (বিষ্ণুপদী, বিষ্ণুপদোদক, বিষ্ণুমায়া) : ৩. বিষ্ণুকায়া = গঙ্গার নামভেদ। **বিষ্ণুপদী** = বিষ্ণুপদসম্ভূতা গঙ্গা, দ্বারকা, বৃষ বৃশ্চিক সিংহ ও কুম্ভ রাশির সংক্রান্তি। **বিষ্ণুপদোদক** = গঙ্গাজল। **বিষ্ণুমায়া** = দুর্গা। (ব.শ.)। **৫.** দ্র. **গঙ্গা**। অদৃশ্য 'পণ্যপ্রবাহ'কে বোঝানোর জন্য যে শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল, সেটিই **গঙ্গা**। সেই 'পণ্যপ্রবাহ'ই **বিষ্ণুর কায়া**। '**বিশ্ব**প্রবেশক' **বিষ্ণুর** পদ থেকেই যে সেই প্রবাহের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নাই বটে। 'মধ্যবিত্ত' জনসাধারণের ভিতরে 'বিত্তময়' হয়ে মিশে থাকেন বলে, তাঁদের **বিষ্ণুমায়া** বা **দুর্গা** বলা হয়ে থাকে।

বেশ (বেশধারী, বেশ-করা) : ১. ✓বিশ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *দিশাগ্রস্ত **বিশ** যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে **বিশ** (প্রবেশ) করা হয়।* **৩. বেশ** = প্রবেশ, বেশ্ম, গৃহ, বেশ্যাগৃহ, বেশ্যাজনাশ্রয়, সুবর্ণচন্দনাদিকৃত শরীরশোভা, বেশ্যার ভৃতি বা আয়; (ফারসি —) উত্তম, ভাল, উৎকৃষ্টতর, অধিক, বেশী, ন্যায্য, যুক্ত, ঠিক, সুস্থ, কুশলী, নিরাপদ। **বেশধারী** = ছলপূর্ব্বক রূপান্তরকারী, ছদ্মবেশী, ছদ্মতপস্বী, ধর্ম্মধ্বজী, বেশকারক, নট। (ব.শ.)। **বেশ-করা** = অন্যের ভয় না করে নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করা। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** যথার্থে ব্যাপকভাবে **বেশ** শব্দের প্রচলন রয়েছে, তবে যত না এককভাবে, তার চেয়ে উপসর্গ-যোগে শব্দটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যথা **আবিষ্ট, উপবিষ্ট, নিবিষ্ট, প্রবিষ্ট, অধিবেশ, অধিবেশন, অভিনিবেশ, অভিনিবিষ্ট, আবেশ, আবেশন, আবেষ্টন, উপবেশ, উপবেশন, দুষ্প্রবিষ্ট, দুষ্প্রবেশ, উপনিবেশ, নিবেশ, নিবেশন, পরিবেশ, পরিবেশন, প্রতিবেশ, প্রতিবেশী, প্রবেশ, প্রবেশন, সুবেশ, বিনিবেশ, সন্নিবিষ্ট, সন্নিবেশ, সন্নিবেশিত, সমাবিষ্ট, সুপ্রবেশ** ... ইত্যাদি। **৫.** দ্র. **আসন**। কেউ যদি একটি আচ্ছাদনের ভিতরে ঢুকে পড়ে, **বিশ্‌** করে, **প্রবিষ্ট** হয়, **বেশ** ক'রে, প্রবেশ করে — তা সেই আচ্ছাদনটি একটি প্রাসাদ, গৃহ, ঘর, কামরা, ঝুপড়ি অথবা তার পোশাক, কাপড় ... কিংবা নিদেনপক্ষে

তার চামড়া ঢেকে দেওয়া নানারকমের রং, উল্কি, চন্দনাদি হয় — তাহলে সেগুলিকে মানুষটির **বেশ** বলে। **কর** যেমন hand-কে বোঝায়, handling-কেও বোঝায়, **বেশ** তেমনি 'আচ্ছাদন'কে বোঝায়, সেই আচ্ছাদনে ঢুকে পড়াকেও বোঝায়। তাই **বেশ** মানে গৃহ, পোশাক ... ইত্যাদি যেমন হয়, তেমনি সেগুলির ভেতরে প্র**বেশ** করাও হয়। **বেশধারী** শব্দটি তাই 'আচ্ছাদনে ঢুকে পড়া' বা কোনো প্রকার আচ্ছাদনে প্র**বেশ** করা অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তবে '**বেশ** করা'র বেলায় **বেশ** কিন্তু উপরোক্ত দুরকম অর্থেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যঞ্জনার্থও ধারণ করে। যেকারণে 'করেছি, **বেশ** করেছি' বললে 'আচ্ছাদনে ঢুকে গেছি' বোঝাতে পারে, 'আচ্ছাদন চাপিয়ে নিয়েছি'ও বোঝাতে পারে এবং সর্বোপরি 'ভাল করেছি' বা 'যথার্থ করেছি'ও বোঝাতে পারে। এই '**বেশ**-করা'র ধারণা ফারসির হাত ধরে এসেছে বলে মনে হলেও, ধারণাটি আগে থেকেই আমাদেরও ছিল; ফারসির আগমনে সে জনপ্রিয় হয়ে গেছে। দ্র. **বেশী**। তবে **বেশ** শব্দটির বিশাল সৌরভ ধরে রেখেছে, উপসর্গ-যুক্ত **বেশ** শব্দগুলি। আমরা তাদের কয়েকটির অর্থ নিম্নে মন্তব্যসহ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

অধিবেশ, অধিবেশন : **৫.** যে 'অধিকারের এলাকা'র (দ্র. **অধি**) ভিতরে অন্যের প্রবেশ ঘটে, তাকে **অধিবেশ** বলে। সেই **অধিবেশ** অন (on) থাকে যাহাতে, তাকে বলে **অধিবেশন**।

অভিনিবিষ্ট, নিবিষ্ট, সন্নিবিষ্ট, অভিনিবেশ, উপনিবেশ, নিবেশ, নিবেশন, বিনিবেশ, সন্নিবেশ, সন্নিবেশিত : **৫.** '**বিশ্** করা **নি**-কৃত বা সক্রিয়ভাবে অন-কৃত যাহাতে', তাকে বলে **নিবিশ্**। সেই **নিবিশ্** কোথাও ঢুকে গেলে, তাকে বলে **নিবেশ**; আর কোনো স্থান-কাল-পাত্রে ঢুকে গিয়ে টঙ্কারিত হলে, তাকে বলে **নিবিষ্ট**। **নিবেশ** অন থাকে যাহাতে, তাকে বলে **নিবেশন**। **অভি**ভাবে কিংবা সম্যকভাবে **নিবিষ্ট** বা **নিবেশ** হলে, তাদের যথাক্রমে **অভিনিবিষ্ট** ও **সন্নিবিষ্ট** এবং **অভিনিবেশ** ও **সন্নিবেশ** বলে। বিকল্প **নিবেশ** ঘটলে তাকে **বিনিবেশ** বলা হয়। কিন্তু **উপনিবেশ**-এর বেলায় শাসক আপন অবস্থান ছেড়ে আসেন না, তার চেলাচামুণ্ডারা এসে যেখানে ঢুকে পড়ে, সেই স্থান হয়ে যায় **উপনিবেশ**। অর্থাৎ, এখানে শাসকের শক্তির একটি অংশ **নিবেশ** করে ফেলেছে, কিন্তু শাসক এখনও **নিবিষ্ট** হননি। ...

উপবিষ্ট, উপবেশ, উপবেশন : **৫.** যে এখনও প্রবেশ করেনি, প্রবেশ করবে ব'লে প্রবিষ্ট হওয়ার আগের অবস্থানে বসে আছে, তাকে বলে **উপবিষ্ট**। এরূপ করার বিশেষ্য রূপকে বলে **উপবেশ**। সেই **উপবেশ** করতে থাকাকে বলে **উপবেশন**।

পরিবেশ, পরিবেশন : **৫.** ইতোপূর্বে **পৃ** ক্রিয়ামূলে **পরি** উপসর্গের চর্চায় এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন ছিল, **পরিবেশ** বললে যদি environment বোঝায়, তাহলে খাদ্য-**পরিবেশন**, গ্রন্থ-**পরিবেশন** প্রভৃতি বললে খাদ্যাদি উপস্থাপন করা বোঝায় কেন? এই সমস্যার মূলটিকে আমরা উপরে **বেশ** শব্দের ব্যাখ্যায় 'আচ্ছাদন' ও 'আচ্ছাদনে ঢুকে পড়া'র সমস্যা বা বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সমস্যা রূপে উল্লেখ করে এসেছি। **পরিবেশ**-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আর একটু বিচিত্র। প্রবেশ বা **বেশ**-কে কেন্দ্র করে যে বৃত্তাকার এলাকা, তার পরিধিসহ-**বেশ**কে **পরিবেশ** বলে। অর্থাৎ কিনা, যার **কেন্দ্রে বেশ** রয়েছে, তাকে **পরিবেশ** বলে। আর **পরিবেশ**-করা বললে তার মানে দাঁড়ায় দুরকম — এক) পরিধিসহ প্র**বেশ** করা বা করানো, দুই) পরিধি-পর্যন্ত প্র**বেশ** করা বা করানো। ফলে **পরিবেশন** করারও দুরকম মানে দাঁড়িয়ে যায়। খাদ্য-সংগীত-নৃত্যাদি **পরিবেশন** করার ক্ষেত্রে খাদ্যের সংগীতের নৃত্যের আপন আপন পরিধিসহ **পরিবেশন** বোঝায়। সবার আগে জল দেবেন না, অথচ খাওয়ার থালা বাড়িয়ে দেবেন — বাঙালি তাকে খাদ্য-**পরিবেশন** বলতে রাজি হবেন না। নৃত্যনাট্য **পরিবেশন** করবেন, তবলাবাদন থাকবে না — কোনো নটরাজ সেটা মানবেন না। কিন্তু গ্রন্থ-**পরিবেশন**-এর বেলায় ওসব নাই। পাঠক সাধারণের সমগ্র বৃত্তের পরিধি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াই গ্রন্থ-**পরিবেশন**।

প্রতিবেশ, প্রতিবেশী : **৫.** রাজা বললেন, 'আমার নাম রাজা রঘু। ভিটাতে চরাই ঘুঘু।' ঘুঘু চরল। ভিটাহারা মুখুজ্জে যায় কোথায়! ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে প্রবেশ করে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেলল সে। নতুন ঘরে প্র**বেশ** করে সে হয়ে গেল **বেশী**। তাই দেখে ঘটিহারা বদ্যিও সেই মাঠে প্রবেশ করে পাশের বটগাছের ছায়ায় গেড়ে ফেলল তার আস্তানা। দেখাদেখি আরও অনেকেই এসে আম জাম শাল বেল তাল তমালের ছায়ায় যে যার কুঁড়ে বানিয়ে ফেলল। এরা সবাই হয়ে গেল ভিটাহারা মুখুজ্জের **প্রতিবেশী** এবং পরস্পরেরও **প্রতিবেশী**।

বেশী : **১.** বেশ + ইন (ইনি)। (ব.শ.)। **২.** ***বেশ**-এর গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে।* **৩.** বেশবান, প্রসাধনযুক্ত। (ফারসি — অধিক, অনেক, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত)। (ব.শ.)। **৪.** শব্দটি এখন দুটি অর্থে প্রচলিত — অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে dressed অর্থে (যথা : ছদ্ম**বেশী**) এবং এককভাবে more অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অনেক, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত**। কথা তো ছিল একটাই — 'আচ্ছাদনে ঢুকে পড়েছি' অর্থাৎ '**বেশ** করেছি', 'প্র**বেশ** করেছি', '**বেশ** ধারণ করেছি', '**বেশ**ধারী হয়েছি', '**বেশী** হয়েছি'! কিন্তু সে তো বাপু তোমার অস্তিত্বের চেয়ে অধিক, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত, **বেশী**! **বেশ**ধারী হয়েছ কি **বেশী** হয়ে গেছ! নিজের থেকেও **বেশী** হয়েছ।

অতএব **বেশী** মানে **বেশধারী** বটে, অধিকও বটে। তবে কিনা, এই **বেশ** ও **বেশী** কথাটি ফারসি থেকে এসেছে বলেই শব্দদুটিকে আমরা চিনি-জানি, আমাদের পূর্বপুরুষগণ শব্দ দুটি জানতেনই না, সেকথা আমরা মানি না। অন্তত শব্দদুটির অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের 'শব্দদুটি বিদেশাগত' এমন কথা অমান্য করতেই প্ররোচনা যোগায়। হতে পারে, ফারসিরও ওরকম দুটি শব্দ ছিল, আছে। আমাদেরও ছিল এবং আছে। পার্থক্য এইটুকু যে মধ্যযুগের রাজকৃপায় শব্দদুটির জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

বেশ্য (বেশ্যা, বৈশ্য) : **১.** ✓বিশ্ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বেশ্য = বেশ থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে প্রবেশ করা যায় বা করা হয়। বেশ্যা = বেশ্য-র আধার যে। বৈশ্য = বেশ্য হইতে জাত; অর্থাৎ প্রবেশার্হ হইতে জাত।* **৩.** **বেশ্য** = প্রবেশার্হ, 'যুবপ্রবেশার্হ', বেশ্যাগৃহ। **বেশ্যা** = বেশ্যে, 'বেশার্হা',

বারস্ত্রী, গণিকা। **বৈশ্য** = বৈশ্যসম্বন্ধী, বৈশ্যবর্ণগত, চাতুর্ব্বর্ণ্যের তৃতীয় বর্ণ, (পুরুষের উরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি।), বৈশ্যকর্ম্মরত বিপ্র, বৈশ্যজাতি স্ত্রী, পরিণীতা বৈশ্যনারী। (ব.শ.)। ৪. prostitute অর্থে **বেশ্যা** প্রচলিত, businessman অর্থে **বৈশ্য** কমবেশি প্রচলিত। **বেশ্য** এককভাবে প্রচলিত নয় বটে, কিন্তু প্র**বেশ্য** রূপে কখনো সখনো চলে। ৫. এর আগে বহুবার যে কথা বলা হয়েছে, এখানে সেকথা আবার মনে করিয়ে দিতেই হচ্ছে। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থের নিয়মে **অজ** শব্দের অর্থ 'নেই জনন যাহাতে'। কিসে কিসে জনন নেই, তা খোঁজ করতে গিয়ে **ব্রহ্মা** থেকে ছাগল পর্যন্ত বহু বিচিত্র সত্তাকে পাওয়া যেতে পারে। তাই বলে ব্রহ্মা আর ছাগল এক বস্তু নয়। ঠিক সেভাবেই যার ভেতরে প্রবেশ করা যায়, বা প্রবেশ করা হয়, তা নানা বস্তু বা বিষয়কে বোঝাতে পারে। সকল উৎপাদিত **বস্তু** বা **পণ্য**ই তো **বেশ্য**। যে বিষয়ে, ঘরে, জগতে **প্রবেশ** করা হয়, সবই **বেশ্য**। 'বেশ্যাগৃহ'ও **বেশ্য**। কিন্তু সকল **বেশ্য**কে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র **বেশ্যা**কে বা **বেশ্যা**গৃহকে **বেশ্য** বা '**প্রবেশন**ীয়' বলে মনে করে নিলে, উইঢিবিকে হিমালয় ভাবার মতো ভুল হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, এই যে **বিশ্ব** বা **পণ্য**বাচক **বেশ্য** শব্দ, **বৈশ্য** শব্দটি তার থেকেই জাত হয়েছে। এই **পণ্য**বাচক **বেশ্য** সমুদায়কে নিয়ে কাজ-কারবার চালাতে চালাতে যে সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে, তাদের সেকারণেই বৈশ্য বলে। দ্র. **বর্ণ, বর্ণাশ্রম**।

বৈষ্ণব (বৈষ্ণবী) : ১. বিষ্ণু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. ***বিষ্ণুর** কর্ম্ম বা ধর্ম্ম বহন করে যে। **বৈষ্ণবী** = **বৈষ্ণব**-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **বৈষ্ণব** = বিষ্ণুসম্বন্ধী, বিষ্ণুদেবতাক, বিষ্ণু-অধিষ্ঠিত, সংহিতাকার বিষ্ণু বিরচিত, বিষ্ণু-উপাসক, যজ্ঞবিশেষ, বিষ্ণুধাম, বৈকুণ্ঠ, শ্রবণানক্ষত্র, বিষ্ণুপুরাণ। **বৈষ্ণবী** = বিষ্ণুশক্তি, গঙ্গা, দুর্গা, বিষ্ণুপত্নী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু-উপাসিকা, বৈষ্ণবপত্নী, অপরাজিতা, তুলসী, শতাবরী। (ব.শ.)। (ক) মৎস্যপুরাণ মতে, অন্ধকারাসুরের রক্তপান করার জন্য মহাদেব-সৃষ্ট একজন মাতৃকা। (খ) পদ্মপুরাণ মতে, দেবী পার্বতী মাতৃকাদের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা। (গ) দুর্গার অন্য নাম। (ঘ) কালিকাপুরাণ মতে চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমা। (পৌ.অ.)। ৪. সম্প্রদায়বিশেষের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত **ধর্ম্মে**র অনুগামীদের **বৈষ্ণব** ও **বৈষ্ণবী** বলা হয়ে থাকে। বাংলার **কীর্ত্তন** ও পদাবলী সাহিত্যের মূল আধার ছিলেন এই **বৈষ্ণব** ও **বৈষ্ণবী**গণ। মধ্যযুগের বঙ্গদেশের মহত্তম অর্জনের একটি বড় অংশ অর্জিত হয়েছিল এঁদের হাতেই। অথচ তাজ্জবের কথা এই যে, প্রচলিত অভিধানগুলিতে শব্দদুটির স্থান হয়েছে নেহাতই দায়সারাভাবে, দু-একটি বাক্যের সাহায্যে। এর কারণ বোঝা কঠিন। এমন হতে পারে যে, যেহেতু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর **বৈষ্ণবধর্ম্ম** ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবিরোধী ছিল, সেই কারণে **বৈষ্ণব**রা ছিলেন তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতদের চোখে ম্লেচ্ছ শ্রেণীর।

***বী (বীণি)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনুপবীতী, অবৈতনিক, উপবীত, পক্কবিম্বাধর, প্রবীণ, বএল (বয়েল, বলীবর্দ্দ, bull), বএস (বয়েস), বওয়াটে (বয়াটে), বয়ঃ, বয়ঃক্রম, বয়ঃসন্ধি, বয়ঃস্থ, বয়ঃস্থা, বয়শ্চোর, বয়স (বয়েস), বয়সকাল, বয়সদোষ, বয়সফোঁড়া, বয়সসন্ধি, বয়সী, বয়স্ক, বয়স্কা, বয়স্থ, বয়স্থা, বয়স্য, বয়স্যা, বয় (boy, বাহিত হয়), বয়া (buoy), বয়াটে (বকাটে, বখাটে), বয়ান, বয়ার, বয়িসী, বয়ুন, বয়ুনা, বয়েত, বয়েদ, বয়ে-যাওয়া (ছেলেটা বয়ে -boy- গেল), বয়েল, বয়েস, বয়োগত, বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়োতীত, বয়োধিক, বয়োধিকা, বয়োবস্থা, বয়োবৃদ্ধ, বায়স, বায়সী, বিমুকি, বিম্ব, বিম্বক, বিম্বকি, বিম্বফলক, বিম্বা, বিম্বাধর, বিম্বিকা, বিম্বিত, বিম্বী, বিম্বু, বিম্বুক, বিম্বুকি(কী), বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ, বিম্লাপন, বী, বীণ, বীণা, বীণাদণ্ড, বীণাপাণি, বীণাবাণী, বীণাবাদ, বীণাবাদন, বীণাবাদ্য, বীণাভেদ, বীণাহস্ত, বীণানুবন্ধ, বীণী, বীতি, বীতিহোত্র, বুম্বুকা, বুম্বুকি, বেত, বেতঅগ্র, বেতআগা, বেতআছাড়, বেতসাজা, বেতন, বেতনী, বেত্র, বেত্রকবীর, বেত্রকার, বেত্রগ্রহণ, বেত্রধর, বেত্রধারক, বেত্রপাণি, বেত্রবতী, বেত্রভৃৎ, বেত্রহস্ত, বেত্রাসন, বৈতস, সমবয়সী।

বী (বীণি) = গতিশীল বাহীর আধার যে। **বীণি** = গতিশীল বাহীর আধারের বোধন-সূত্রায়নের গতিশীলতা যাহাতে।

বয়ঃ (বয়স, বয়সী, বয়স্ক, বয়ঃস্থ, বয়ঃস্থা, বয়স্য) : ১. ✓বী (গতি) + অস্ (অসুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বয়ঃ (বয়স)** = **বী** (গতিশীল-বাহীর আধার) অস্তিত্ব লাভ করে যাহাতে। **বয়সী** = **বয়স** গতিশীল বা সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে। **বয়স্ক** = **বয়স্** কৃত যাহাতে। **বয়ঃস্থ** = **বয়ঃ** স্থিত যাহাতে। **বয়ঃস্থা** = **বয়ঃস্থ**-এর আধার যে। **বয়স্য** = **বয়স** থাকে যাহাতে।* ৩. **বয়ঃ (বয়স্)** = কালকৃত শরীরাবস্থা, বাল্যাদি কাল, যৌবন, পক্ষী। **বয়স** = বয়ঃ; জীবিতকালের পরিমাণ, উমর। **বয়সী** = বয়ঃক্রমবিশিষ্ট। **বয়স্ক** = বয়োবিশিষ্ট, তরুণ, যুবা। **বয়ঃস্থ** = যৌবনস্থিত, তরুণ, যুবা, পরিণতবয়াঃ, বৃদ্ধ, সমবয়ঃস্থিত, সমবয়স্ক। **বয়ঃস্থা** = তরুণী, যুবতী, হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, গুড়ূচী, ব্রাহ্মী। **বয়স্য** = তুল্যবয়স্ক, সমবয়স্ক, সখা, বন্ধু, সহচর। (ব.শ.)। ৪. age অর্থে **বয়স** এবং aged অর্থে **বয়সী** ও **বয়স্ক** শব্দটি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি খুব কম প্রচলিত। ৫. রামবাবুর একমাত্র পুত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যান রামবাবুর মা। স্ত্রী পাগলপ্রায়। সেসব সামাল দিয়ে একমাস পরে তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন গতকাল। তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তাঁর শরীর-মনের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে!

বাংলাভাষী মানুষেরা 'শরীর-মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়া'র মতো এরকম বাক্য অনায়াসে প্রয়োগ করে থাকেন। আমরাও এধরনের বাক্য শুনি, বুঝি, কিন্তু খেয়াল করি না যে, বিশেষ প্রকারের মানসিক গঠন না থাকলে এরকম বাক্য প্রয়োগ করা যায় না। সেই মানসিক গঠনের ভিত্তিতে থাকে একরকম বোধ, তা হল — মানুষ এগিয়ে চলেছে তার দেহমন নিয়ে, আর কাল তার সমস্ত ঘটনাসমূহ নিয়ে মানুষের অগ্রগতির বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই

ঘটনাসমূহ যেন-বা কখনো সাধারণ বায়ুপ্রবাহের মতো, কখনো ধূলিঝড়ের মতো, কখনো কালবৈশাখীর মতো, কখনো-বা তারও চেয়ে ভয়ানক। মানুষের শরীর ও মনের উপর সেই কালপ্রবাহের, তার ঝড়ঝঞ্ঝার, অতিক্রান্ত হওয়ার ছাপ থেকে যাচ্ছে। ... বাংলাভাষী তাই অনায়াসে বলতে পারেন, 'তাঁর শরীরের বা মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল।'

কিন্তু এই যে একদিকে ঘটনাদির বিগত হওয়া, হিন্দিতে যাকে বলে '**বীত** গিয়া', এবং অন্যদিকে মানুষের শরীর-মনে একের পর এক গাঁটের মতো ছায়া থেকে যাওয়া, একেই বলা হয় **বয়ঃ** বা **বয়স**, অর্থাৎ '**বী** অস্তিত্ব লাভ করে যাহাতে'। অতএব কারও **বয়স** হয়েছে বলার মূল অর্থ হল, তার ভিতরে বিগত ঘটনাবলীর ক্রমান্বয় ছায়া রয়েছে।

বায়স : **১**. বয়স্ + অ (অণ্) স্বার্থে। (ব.শ.)। **২. *বয়স*** হইতে *জাত* / **৩. বায়স** = কাক, অগুরু বৃক্ষ, শ্রীবাস, টার্পিন। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন — ইংরেজি Thank you শব্দের মতো কোনো শব্দ বাংলায় নেই, তার থেকে কেউ কেউ সন্দেহ করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই! ঠিক সেইভাবে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে 'ঐতিহাসিক' শব্দটি নেই, 'ইতিহাস' শব্দটি পাওয়া যায় বৌদ্ধযুগ থেকে। এর থেকে কারো সন্দেহ হতে পারে, আমাদের ইতিহাস জ্ঞান নেই, ঐতিহাসিকও জন্মাননি।

আসলে প্রতিটি সংস্কৃতির পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র থাকে। আমাদের সংস্কৃতি সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঋদ্ধিসম্পন্ন। তাতে কৃতজ্ঞতা, ইতিহাস প্রভৃতির কোনো ধারণাই নেই, এর চেয়ে অর্থহীন কথা আর কিছুই হতে পারে না। তার ওপর আমাদের প্রাচীন ভাষা, তার বহু শব্দ ও শব্দার্থই তো আমরা ভুলে গেছি। সুতরাং আমাদের ওসব ছিল না, একথা বলার আগে দশবার ভাবা উচিত। যাকগে, এখন **বায়স** বিষয়ে যাওয়া যাক।

সেকালে 'ঐতিহাসিক'কে বলা হত **বায়স** বা **কাক**। ঘটনাবলীর বিগত হয়ে যাওয়ার একের পর এক ছায়াপাত ঘটে থাকত তাঁর মনে, তাঁর **বয়স** বাড়ত। তাই নিয়ে তিনি পুরাণাদি লিখতেন, **বায়স** রূপে সক্রিয় হতেন। আমাদের আদি পুরাণ রচয়িতার নাম **কাকভুষুণ্ড**। তিনি রামায়ণ লিখে গেছেন। ...

এসব কথাবার্তা শুনে কারো যদি সন্দেহ হয় যে, আমরা দুজন কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছি, তিনি একবার দয়া করে **কাক** বিষয়ক তথ্যাদি জেনে নিন, তাহলে তাঁর সন্দেহ নিরসন হবে আশা করা যায়। আমাদের হাতের কাছে মান্যবর মিজানুর রহমানের পত্রিকার ৮০০ পৃষ্ঠার গবেষণামূলক মহাকলেবর 'পক্ষী সংখ্যা'টি রয়েছে। তার থেকে **কাক** বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"... কাকের বায়স নাম খুব প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধির মূলে আছে — কাককে দেখে তার বয়স কত তা বোঝা যায় না। তার সে বয়স অর্থাৎ কালকৃত মুহূর্তক্ষণগতিকে পরিণত করে যে বার্ধক্য দশা তা থেকে রক্ষা করে। তার যৌবন ও বার্ধক্য কখন আসে কখন যায়, ঠিক করা যায় না। এই নামটি রামায়ণ-মহাভারতে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ... কাকের বিচিত্র স্বভাব, অন্য জিনিস ছড়িয়ে খায়, মধু পেলে ঠোঁট দিয়ে জড় করে খায়। তাই তার অপর নাম মৌকুলি। ... কাকের আর একটি নাম অরিষ্ট। ... যে অশুভ দূর করার সঙ্কেত করে সেই অরিষ্ট। কাক পূর্ব থেকেই অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভ নাশ হয়েছে ঘোষণা করে। ..."

এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। ইতোপূর্বে আমরা **বাহন** শব্দে জানিয়েছিলাম, যে অদৃশ্য সত্তাকে বোঝানর জন্য আমাদের পূর্বসূরিগণ **অশ্বাদি** শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার 'সাদৃশ্যে' দৃশ্য জীব horse ... ইত্যাদিকে শনাক্ত করেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, বহু ক্ষেত্রেই সেই অদৃশ্য সত্তাটিকেই আমরা ভুলে গেছি; মনে রেখেছি কেবল তার সাদৃশ্য অর্থরূপী horse-টিকেই। **বায়স** বা **কাক**-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমরা শব্দ দুটির ঐতিহাসিক, কাব্যরসিক, ত্রিকালজ্ঞ ... প্রভৃতি অর্থগুলি ভুলে গেছি, মনে রেখেছি কেবল crow-কে। ...

সবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের সেই আদি **বায়স**দের উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ তিল পরিমাণ হলেও এখনও রয়েছে। তাঁরা যে-বিদ্যার জোরে ত্রিকালজ্ঞ হতে পারতেন, সেই বিদ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। এ বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে রাখা যাক। সময়টা হল ১৯৬০-এর এক সায়ংসন্ধ্যা, স্থান — ধর্মতলা-সংলগ্ন এক ভাল রেস্টুরেন্ট। একত্রিশ অতিক্রান্ত রবি চক্রবর্তী তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণে অনিশ্চয়তায় যন্ত্রণাবিদ্ধ। হঠাৎ এক ষাটোর্ধ্ব প্রৌঢ় রবি চক্রবর্তীর সামনে এসে হাত দুই-তিন দূরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে রবি চক্রবর্তীকে তাঁর জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে নানা কথা বলে গেলেন। অতীত আর বর্তমান সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে সন্দেহ জাগাল, উনি কি কোথাও থেকে সব জেনে এসেছেন! কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে যা বললেন, সেগুলিও যখন দিন-ক্ষণ সহ পরে ফলতে লাগল, তখন রবি চক্রবর্তীর মনে দুঃখ হল, তাঁকে জিজ্ঞেস করে আরও বেশি জেনে নিলেন না কেন!

অর্থাৎ, ইনি একজন **কাকচরিত্র** বা **কাকচাবা**। এঁর কথা রবি চক্রবর্তীর পরবর্তী জীবনে প্রায় হুবহু ফলে গেছে। তখনও, ১৯৫০-৬০ সাল পর্যন্ত এই শ্রেণীর মানুষজন গ্রামে শহরে ঘুরে বেড়াত, মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বলত এবং প্রণামীস্বরূপ চাল-ডাল টাকাকড়ি নিত। তার মানে, এঁরা যে-বিদ্যার সাহায্যেই হোক না কেন, মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ **বর্তমান** দেখতে পান, পেতেন। সে বিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকীকরণ হয়নি। আজ বিদ্যাটি লোকে ভুলে গেছে। এখন এই শ্রেণী বিলুপ্তপ্রায়। দু-একজন **কাকচাবা**র দেখা পাওয়া যায় **বেদে**দের মধ্যে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে 'জিপসী'দের মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষ এখনও দু-চার জন রয়েছেন। আমাদের দেশে এই **কাকচাবা** শ্রেণীর বিলুপ্তির একটি বড় কারণ এই যে, প্রকৃত **কাকচাবা**র বিদ্যা আত্মস্থ না করে অনেকে **কাকচাবা** সেজেছে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে এরা মানুষের ভবিষ্যৎ বলত এবং বদলে চাল-ডাল টাকা পয়সা নিত। ধূর্ত লোকেরাও এই পথ গ্রহণ করে মানুষকে ঠকিয়েছে। ফলে, ১৯৬০/৬৫ সালে গ্রামবাংলায় প্রবাদ শোনা যেত — '**কাকচাবা** যদি বলত ঠিক। / দ'রে দ'রে মাঁগ্‌তনি ভিখ।।' (দ'রে দ'রে = দুয়ারে দুয়ারে)। ...

কোনো বঙ্গভাষী যুবক কি একনিষ্ঠভাবে এই **বায়স** বা

কাকচরিত্র-বিদ্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে জেনে তার একালীকরণ করতে পারেন না?

বীণা (বীণাপাণি): ১. ✓বী + ন - কর্ত্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***বীণা*** = *মনোভাববাহীর অনুকরণের আধার যে।* ***বীণাপাণি*** = ***বীণা*** *পাণিতে যাহার।* ৩. **বীণা** = ততবাদ্যভেদ, বল্লকী, বীণ, বিদ্যুৎ। (বীণাভেদ — শিবের বীণা 'লক্ষ্মী', সরস্বতীর বীণা 'কচ্ছপী', নারদের 'মহতী', বিশ্বাবসুর 'বৃহতী', তুম্বুরুর 'কলাবতী', চণ্ডালের 'কণ্ডোল')। **বীণাপাণি** = নারদ, সরস্বতী। (ব.শ.)। ৪. 'একরকম বাদ্যযন্ত্র' অর্থে **বীণা** এবং 'দেবী সরস্বতী' অর্থে **বীণাপাণি** প্রচলিত। ৫. **কচ্ছপী বীণা**তে কী বাজান হয়, সেকথা আমরা **কচ্ছপ** শব্দে (১ম খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায়) কমবেশি বলেছি। শিবের **বীণা** 'লক্ষ্মী' ও নারদের **বীণা** 'মহতী'র কথা জানা যাবে যথাক্রমে **লক্ষ্মী** ও **মহতী** শব্দে। **বিশ্বাবসুর বৃহতী বীণা**র কথা **বৃহৎ** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে বোঝা যায়। **বিশ্বাবসু** শব্দে সেকথা ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বেতন (বেতনী) : ১. ✓বী + তন (তনন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বেতন*** = *(দ্বৈতাদ্বৈত-) বাহীর দিশাগ্রস্ত আধার (সক্রিয় শ্রম-মেধা) তারণপূর্ব্বক অন (on) যাহাতে।* ***বেতনী*** = ***বেতন****-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **বেতন** = কর্ম্মদক্ষিণা, ভৃতি, মাহিনা, মজুরী, জীবনোপায়, জীবিকা, রূপ্য, মূল্য। **বেতনী** = বেতনগ্রাহী। (ব.শ.)। ৪. salary অর্থে প্রচলিত, **বেতনী** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মূল্য**। শ্রম আর মেধা, দুটো বস্তু বাহিত হয়ে গিয়ে ঢুকে যাচ্ছে শ্রমমূল্যে বা মজুরিতে। তাই এ হল দ্বৈতাদ্বৈতবাহী। আর তা কতখানি নিখুঁত হিসেবের পথ বেয়ে মজুরিতে বা **বেতনে** গিয়ে ঢুকে যায়, তার হিসেব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে **মূল্য** শব্দে।

বীর্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবীর, প্রবীর, বইরি, বিগ্না, বিম্না, বিম্নাখোপ, বিম্নি, বিরণ, বীর, বীরআনা, বীরকাঁসী, বীরকাছ, বীরকানী, বীরকাম, বীরকালি(লী), বীরকীট, বীরকুঞ্জর, বীরকুল, বীরকেশরী, বীরগতি, বীরঘণ্টা, বীরচক্র, বীরচরিত, বীরচূড়ামণি, বীরছাঁদ, বীরটুপি, বীরঢাক, বীরণ, বীরণমূল, বীরদস্ফ, বীরদাপ, বীরধটি(টী), বীরধড়ী, বীরপঞ্চমীব্রত, বীরপট্ট, বীরপণ, বীরপণা(না), বীরপত্নী, বীরপত্রা, বীরপরিধান, বীরপাটা, বীরপাণ(ন), বীরপুত্রধাত্রী, বীরপুরুষ, বীরপ্রজাবতী, বীরপ্রজায়িনী, বীরপ্রসবা, বীরপ্রসবিনী, বীরপ্রসূ, বীরপ্রসূন, বীরবৎসা, বীরবল, বীরবস্ত্র, বীরবাণা(না), বীরবাদ, বীরবিদ্যা, বীরবিপ্লাবক, বীরবৌলি(লী), বীরব্রত, বীরভদ্র, বীরভাগ, বীরভোগ্য(া), বীরমদ, বীরমর্দ্দল, বীরমাটি(টী), বীরমাদল, বীরমুদ্রিকা, বীরযোনি, বীররজঃ, বীররস, বীরলোক, বীরশয়, বীরশয্যা, বীরশ্রেষ্ঠ, বীরসিংহ, বীরসেন, বীরস্থান, বীরহা, বীরাঙ, বীরাঙ্গজ, বীরাঙ্গনা, বীরাশংসন, বীরাসন, বীরুৎ(ধ্), বীরেন্দ্র, বীরেশ, বীরেশ্বর, বীর্য্য, বীর্য্যকর, বীর্য্যকাম, বীর্য্যগুপ্ত, বীর্য্যপণ, বীর্য্যপ্রপাত, বীর্য্যবন্ত, বীর্য্যবান, বীর্য্যবৃদ্ধিকর, বীর্য্যমত্ত, বীর্য্যশালী, বীর্য্যশুল্ক, বীর্য্যসম্পন্ন, বীর্য্যহানি, বীর্য্যহীন, বীর্য্যাতিশয়, বীর্য্যাধান, বীর্য্যাবদান, বেনা, বেনাঝাড়, বেনামূল, বৈর, বৈরতা, বৈরী।

বীর = গতিশীল বাহীর আধার রহে যাহাতে।

প্রবীর : ২. / প্রকৃষ্ট বীর (যে)। (ব.শ.)। ৩. (গৌণার্থে) উত্তম, শ্রেষ্ঠ, মহাবীর, সুভট, নীলধ্বজপুত্র। (ব.শ.)। মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের পুত্র ও বীরনারী জ্বালার গর্ভজাত পুত্র। এই জ্বালা 'জনা' নামে পরিচিতা। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অশ্ব মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হলে নীলধ্বজপুত্র প্রবীর এই অশ্বকে আবদ্ধ করেন। ... অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হয়। ... তখন নীলধ্বজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। (দ্র. নীল) এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হয় এবং আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনায় ... অশ্ব প্রত্যর্পণ করতে স্বীকৃত হন। ... কিন্তু স্ত্রী জনা স্বামীর এই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ... তারা নিহত হয় ও স্বামী রণস্থলে সংজ্ঞা হারান। ... এর ফলে রাজা অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি করেন। অতঃপর জনা গৃহত্যাগ করে আগুনে ঝাঁপ দেন এবং অর্জুনকে সংহারের জন্য বভ্রুবাহনের তূণীরে ভয়ংকর বাণরূপে আশ্রয় করেন। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **নীল, ধ্বজা, মাহিষ্মতী**। তথ্যানুসারে **নীল ধ্বজা** যাহার তিনিই **নীলধ্বজ**। তাঁরই পুত্র **প্রবীর**। তিনি উপরোক্ত (৩.-এ প্রদত্ত) কীর্ত্তিকলাপ করেছিলেন। কিন্তু ভারত ইতিহাসে তিনি কে, তাঁর সামাজিক ভূমিকা কীরূপ ছিল, যথেষ্ট তথ্যের অভাবে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা এই মুহূর্তে মুশকিল। আমরা শুধু এটুকু মাত্র বলতে পারি যে, ইনি যে সত্তাই হোন না কেন, ইনি ছিলেন ধনতন্ত্রবিরোধী একটি সত্তা। হতে পারে, তিনি ছিলেন সেকালের কোনো রূপ অভিজাত শ্রেণী।

বীর (বীরা, বীরকাম, বীরকীট, বীরগতি, বীরপত্রা, বীরমাটি, বীরলোক, বীরাসন) : ১. ✓বীর্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বীর*** = *বাহীর গতিশীল আধার রহে যাহাতে।* ***বীরা*** = ***বীর****-এর আধারশক্তি যে।* ***বীরকাম*** = ***বীর****-এর জন্য কামনা যাহাতে।* ***বীরকীট*** = ***বীর****গণের মধ্যে কীটতুল্য যে।* ***বীরগতি*** = ***বীর****-এর গমন তারিত হয় যেখানে।* ***বীরপত্রা*** = ***বীর****-ত্ব থাকে যে পত্রে।* ***বীরমাটি*** = ***বীর****দিগের নিমিত্ত যে মাটি।* ***বীরলোক*** = ***বীর****গণ যে লোকে যান।* ***বীরাসন*** = ***বীর****-এর আসন যাহাতে।* / **বীরগতি** = বীরের গমনস্থান (যেখানে)। **বীরপত্রা** = বীরগণপ্রিয় যে পত্রা। (ব.শ.)। ৩. **বীর** = বীর্য্যযুক্ত, বলী, শ্রেষ্ঠ, উৎসাহস্থায়িভাবরসবিশেষ, পতি, পুত্র, বিষ্ণু, জিন মহাবীর, অর্জুনবৃক্ষ, করবীর বৃক্ষ, অগ্নি, (তন্ত্রে) ভাববিশেষ, পবনদেব, প্রচণ্ডঝড়, পুংজাতি হনুমান, বীরঢাক বাদ্য, নড়, মরিচ, পুষ্করমূল, কাঞ্জিক, উশীর, শৃঙ্গী। **বীরা** = পতিপুত্রবতী স্ত্রী, বীরনারী, বীরাঙ্গনা, মদিরা, ঘৃতকুমারী, আমলকী, অতিবিষা, ব্রাহ্মী, দুগ্ধিকা, রম্ভা। **বীরকাম** = পুত্রেচ্ছু। **বীরকীট** = কাপুরুষ। **বীরগতি, বীরলোক** = স্বর্গ, যুদ্ধে হত বীরের স্থান, ইন্দ্রলোক, স্বর্গ। **বীরপত্রা** = ভঙ্গা, ভাঙ। **বীরমাটি** = রাঙামাটি,

মল্লের রঙ্গভূমির মৃত্তিকা। **বীরাঙ্গনা** = বীরনারী, রণকুশলী, বীরপত্নী। **বীরাসন** = সাধকের আসন, বাম উরুতে দক্ষিণ জঙ্ঘা স্থাপনপূর্ব্বক স্থিতি, রাত্রিতে খড়্গহস্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক জাগরণ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** valiant অর্থে **বীর** প্রচলিত, বাকি সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫. বীর** শব্দ থেকে প্রচুর শব্দ তৈরি হয়েছিল এবং মধ্যযুগে তাতে আরও কিছু শব্দ যুক্ত হয়েছিল; কিন্তু ইংরেজির আগমনের পর যথারীতি শব্দগুলিকে সারি দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কী আর করা যাবে। ...

বর্ণানুসারে 'বাহীর গতিশীল আধার' বা যে কোনো প্রকার শক্তির সক্রিয় আধার রহে যে সত্তায় তাকেই **বীর** বলা যায় বটে। তবে সাধারণত শারীরিক শক্তির বাহক রূপে **বীর** শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। যদিও আধুনিক যুগের কবি যখন লেখেন — 'বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর', তখন শারীরিক শক্তির ব্যাপার বিন্দুমাত্রও থাকে না। এই বিষয়টিকে ঠিক বলে মেনে নিলে আমাদের লিখতে হয় 'মানসিক-শারীরিক বা অন্য যে-কোনো প্রকার শক্তিবাহী রয়ে যে সত্তা'য় তাকেই **বীর** বলে। **৬.** Avesta - vir = a man, Greek - heros, Latin - Virilis, (vir = a man, hero). French - Viril, Lithuanian - wyra, Gothic - wair, German & Anglo Saxon - wer, a hero, English - virile। (ব.শ.)। English - virago (বীরাঙ্গনা)।

বীরভদ্র : দ্র. **ভদ্র**।

বু (বুক্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবুজ, অবুঝ, অবুঝা, বু, বুঁজ, বুঁজলা, বুঁজা, বুঁজান, বুঁদ, বুঁদেলা (বুন্দেলখণ্ড), বুক, বুকড়ি, বুকনি, বুকবুক, বুকভাঙা, বুকভাঙ্গা, বুক্ক, বুক্ক, বুক্কন, বুক্কা, বুক্কার, বুচকি, বুজ, বুজগুড়ি, বুজরুক্, বুজরুকী, বুজরুগ্, বুজরুগি(গী), বুজা, বুজান, বুজিয়ে-ফেলা, (মাটি বোজান, ভরানো), বুঝ, বুঝন, বুঝা, বুঝান, বুঝান্ত, বুট, বুটতোলা, বুটা, বুটি, বুটী, বুড়, বুড়বুড়ি, বুড়া, বুড়াটিয়া, বুড়াটে, বুড়াম, বুড়ামি, বুড়াসুড়া, বুড়ি(ড়ী), বুড়ো, বুড়োম, বুড়োমি, বুড়োসুড়ো, বুড়োহাবড়া, বুঢ়, বুঢ়া, বুঢ়ী, বুদ্বুদ, বুর, বুরা, বুরুজ, বুরুজা, বুরুল, বুরুশ, বুল, বুলবাল, বুলবুল, বুলবুলি, বুলা, বুলান, বুলি, বুলু, বুলেট, বুষ, বুস, বুস্ত, বুস্ত, বুহিত, বুহিতাল, বুঁদ, বোঁদেলা, বোঁবোঁ, বোকচা, বোকড়া, বোকস, বোকা, বোকামি, বোক্কা, বোগাল, বোচকা, বোজা, বোজান, বোঝন, বোঝা, বোঝান, বোঝাপড়া, বোঝাই, বোটকা, বোটকেরা, বোড়লা (বোলতা), বোড়া, বোড্র, বোড্রী, বোদ, বোদা, বোদাল (বোগাল, বোয়াল), বোদালি, বোবা, বোয়াল, বোয়ালি।

বু (বুক্) = বাহী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **বুক্ক** = নবরূপী বাহী করণের কারক যে। (**বুক্** ক্রিয়া থাকলেও **বু** ক্রিয়া নাই। মধ্যযুগের বাংলায় এমন অজস্র বাংলা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্রিয়ামূল শনাক্ত করা নেই। এই শনাক্তকরণ-কাজটি অনেকে বসে একমত হয়ে করা দরকার। সেই কারণে আমরা ঐ ধরনের শব্দের ক্রিয়ামূল দেখানোর একক চেষ্টা করিনি। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে **বুজ বুঝ বুল** ... প্রভৃতি শব্দগুলিকে উপস্থাপন করার সুবিধার কথা ভেবে আমরা **বু** নামে একটি ক্রিয়ামূল ধরে নিয়েছি। এর মূল অর্থ হল, **ব**-এর বেলায় বাহী প্রবাহিত হয়ে চলে যেত, **বু**-এর বেলায় সে আর চলে যায় না, 'উ'কার যোগে নবরূপে উত্তীর্ণ ব'লে সে বাহিত হয়ে একই জায়গায় ঘুরে ফিরে আসে বা ঘুরতে থাকে।)

বুক্ক (বুক, বুকনি, বুকবুক, বুকভাঙা, বুক্কন, বুক্কা, বুক্কার) : **১.** ✓বুক্ক + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বুক্ক** = **বুক্** *(বাহীর নবরূপোত্তীর্ণ করণ) করে যে।* **বুক** = *বাহীর নবরূপোত্তীর্ণ করণ যাহাতে।* **বুকনি** = **বুক** *অন (on) গতিশীল যাহাতে।* **বুকবুক** = **বুক**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **বুকভাঙা** = **বুক** *ভাঙিয়া যায় এমন।* **বুক্কন** = **বুক** *অন (on) থাকে যাহাতে।* **বুক্কা** = **বুক**-*এর আধার যে।* **বুক্কার** = **বুক্কা** *রহে যাহাতে।* **৩. বুক্ক (বুক্কা)** = অগ্রমাংস, হৃদয়, অগ্রমাস, হৃদয়াভ্যন্তর, হৃদয়ান্তর্গত পদ্মাকার মাংসবিশেষ, ছাগ, বোকা, শোণিত। **বুক** = বক্ষঃস্থল, সাহস, দুঃসাহস, ধৈর্য্য, মন, স্তন, জামার বুকের কাপড় ... ইত্যাদি। **বুকনি** = চূর্ণ, কণা, খণ্ড, কথার ফোড়ন। **বুকবুক** = কুকুরের অনুচ্চ রব, গাড়ু ইত্যাদিতে জলভরার শব্দ, বকবক করার শব্দ। **বুকভাঙা** = সাহস-ভাঙা, নিরুৎসাহ, হৃদয়বিদারক, মর্ম্মস্পর্শী, ভিতরপিঠ-ঘষা (শাঁখা)। **বুক্কন** = কুক্কুররব, ভাষণ, প্রাণিশব্দমাত্র। **বুক্কার** = কুক্কুররব। (ব.শ.)। **৪.** chest অর্থে **বুক**, tall talk অর্থে **বুকনি**, heart-broken অর্থে **বুকভাঙা** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. বু** (নবোত্তীর্ণ বহন) করে যে, তাকে বলে **বুক**। তার মানে, এই **বু** করা হল এমন এক ব্যাপার যে, তাতে মনোভাববাহী (আওয়াজ) সুদূরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় না, যেন-বা একটু গিয়েই ফিরে আসে। 'আশ্বিন মাসের বড় কুকুর ডাকছে' — বলে হরবোলা যখন '**বুক! বুক! বৌঔ।**' ব'লে কুকুরের ডাক নকল করে, তখন দেখা যায়, আওয়াজটা যেন অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বেরিয়ে স্থির হয়ে যাচ্ছে। অন্য ডাকগুলির সঙ্গে তার পার্থক্য হল, এই ডাক গভীর ও অবিস্তারী। সেই কারণে ব.শ. **বুকবুক**কে বলেছেন 'কুকুরের অনুচ্চ রব'। **বুকনি** সেই হিসেবে **বুকবুক** করার সূক্ষ্ম ও চূর্ণ রূপ। **বুক্ক, বুক্কার** প্রভৃতি শব্দগুলিও অবিস্তারী আওয়াজের কথা বোঝায়।

কিন্তু এই **বুক**-এর সঙ্গে **বক্ষ**-এর কী সম্পর্ক, তা সহজে বোঝা যায় না। এই **বুক** শব্দটির প্রচলন হয়েছে মধ্যযুগ থেকে। আমাদের মনে হয়েছে যে, বক্ষার্থক **বুক** শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাভাষী **বক্ষ** শব্দ থেকে নির্মাণ করেননি, করেছেন নতুন শব্দ রূপে। কেননা, **বক্ষ** শব্দে রয়েছে **বচন**-এর অস্তিত্ব। কিন্তু **বুক**-এ রয়েছে সর্বপ্রকার শক্তির অস্তিত্ব। এই **বুক** সর্বপ্রকার বাহীকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে, তা সে মনোভাববাহী, ক্ষমতাবাহী, শ্বাসবাহী, বিশ্বাসবাহী (যথা — **বুকে**র পাটা না থাকলে এতবড় ঝুঁকি কেউ নেয়।) ... যাই হোক না কেন।

এইখানে আর একটি কথা বলে আমরা পরের শব্দে যাব। আমাদের সংস্কৃতিতে বিশ্বসংসারকে নিজের শরীরের মধ্যে বুঝে নেওয়ার একটা প্রাচীন প্রথা ছিল, আছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষাজ্ঞানী মানুষেরা সেই মানবশরীরের অঙ্গগুলিকে এত ব্যাপক ভাবে ব্যবহার

করেন যে, শুধুমাত্র সেই শব্দগুলির সাহায্যেই জ্ঞানজগতের বহু কঠিন কঠিন কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। যথা — **মাথা, মুখ, কান, নাক, চক্ষু** বা **চোখ, গলা, বুক, পেট, পা** প্রভৃতি শব্দের সার্বিক ব্যবহার। যেমন **বুক**ভাঙা, **বুক**ফাটা, **বুক**কাটা, **বুকে**র পাটা, **বুক** চাপড়ান, **বুক** চিতান, **বুক** ঠোকা, **বুক** পাতা, **বুক** বাঁধা, **বুকে** ঘা দেওয়া, **বুকে** পিঠে মানুষ করা, **বুক** পাঁচ হাত হওয়া, **বুকে** বসে দাড়ি উপড়ান ... ইত্যাদি। শুধু **বুক** নিয়ে এত কথা। মাথা, মুখ ... এসব একত্র করলে তো কথাই নেই। এবং যাঁরা একালের 'কাজ-চালানো' ইংরেজি ভাষাটুকু শিখে '**বুক** ফুলিয়ে' বেড়ান, তাঁদের জানা থাকা ভাল যে, বাংলাভাষার এই ধারণাসম্পদকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ পর্যন্ত করা যায় না। স্বভাবতই কেউ যদি বাংলা ত্যাগ করে ইংরেজিতে কথা বলে, সে এই ধারণাসম্পদ বা জ্ঞানসম্পদ হারাবে; 'কাজ-চালানো-ইংরেজি' শিখে ধনসম্পদে ধনী হলেও জ্ঞানসম্পদে দরিদ্র হয়ে যাবেই।

বুজ (বুজগুড়ি, বুজা, বুজান) : ২. বুজ = **বু** *(নবোত্তীর্ণ বাহী) জনিত হয় যাহাতে।* **বুজগুড়ি** = **বুজ বুজ** *করে বেরোনো গুঁড়ি।* **বুজা** = **বুজ**-*এর আধার যে।* **বুজান** = **বুজা** *অন (on) যাহাতে।* **৩. বুজ, বুজা, বুজান** = নিমীলিত করা, পূর্ণ করা, ভরান। **বুজগুড়ি** = ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। **৫.** বায়ু বা অন্য কিছুর বাহী কোনো সত্তা থেকে জনিত হয়ে বা বেরিয়ে গেলে তাকে **বুজ** বলে। এইভাবে পচা জৈববর্জ্য থেকে **বুজগুড়ি** ওঠে। চোখ বন্ধ করলে যদি চোখ থেকে চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বেরিয়ে যায়, তাকেও বলে **বুজ** করা, **বুজা** বা **বুজান**। তবে পরে পরে যে কোনো খোলা সত্তাকে বন্ধ করে নিলেই তাকে **বুজান** বলার চল হয়ে যায়।

তবে একথা মানতেই হবে যে, এই **বুজ** ও **বুঝ** শব্দ দুটি যেন এখনও বিশ্লিষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ পৃথক হতে বাকি আছে। যেন-বা গাছের দুটি নতুন প্রশাখা, যা শাখা থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে; তাদের সম্পূর্ণ পৃথক হতে হয়তো আরও একশো বছর লাগবে। লোকে চোখ বুজে (বোজে), কথা বুঝে (বোঝে); চোখ বুঝে (বোঝে) না', কথা বুজে (বোজে) না। কিন্তু লোকে তো এখনও বলে — 'কথাটা বুজতে পারলি!' তার মানে শব্দদুটির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য এখনও সৃষ্টি হয়নি। যে কারণে ব.শ. **বুজ** ও **বুঝ**কে অনেকাংশে একই ধাপে স্থান দিয়েছেন।

বুঝ (বুঝন, বুঝা, বুঝান, বুঝান্ত) : ২. বুঝ = **বু** *(নবরূপে উত্তীর্ণ বাহী) জনিত হয়ে স্থির হয় যাহাতে।* **বুঝন** = **বুঝ** *অন (on) যাহাতে।* **বুঝা** = **বুঝ**-*এর আধার যে।* **বুঝান** = **বুঝা** *অন (on) যাহাতে।* **বুঝান্ত** = **বুঝা**র *অন্ত যাহাতে। /* **বুঝ, বুঝান্ত** = যে বুঝে। (ব.শ.)। **৩. বুঝ** = বিচারপূর্ব্বক জানা, হৃদয়ঙ্গম করা, অবগত হওয়া, লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করা, হিসাব করিয়া দেখা বা ঠিক করা ... ইত্যাদি। **বুঝন** = বুঝা। **বুঝা** = হৃদয়ঙ্গম করান, প্রবোধ দেওয়া, বিশেষভাবে নিবেদন করা, উপদেশ দিয়া সমঝান। **বুঝান** = প্রবোধ দেওয়া। **বুঝান্ত** = বুদ্ধিমান, মন্ত্রী। (ব.শ.)। **৪. বুঝান্ত** ছাড়া বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে, এই **বুঝ**-এর ক্ষেত্রে ব.শ. **বুজ**কেও স্থান দিয়েছেন। স্বাভাবিক, তিনি আমাদের চেয়ে প্রায় একশো বছর আগের বঙ্গে কাজ করে গেছেন। তখনও তাঁর পক্ষে শব্দদুটিকে একেবারে পৃথক করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমরা পৃথক করেছি, আমরা তাঁর চেয়ে একশো বছর পরে কাজ করছি; কারণ লোকে শব্দদুটিকে এখন অনেকটাই আলাদা করে ব্যবহার করে থাকেন। সেই কারণে আমরা শব্দদুটিকে পৃথক **মর্য্যাদা** দিলাম।

তিনটি শব্দের চেহারা ভাল করে দেখুন — অব**গত** হওয়া, হৃদয়ঙ্**গম** করা, **বুঝা**। নীচে কোথাও **গমন** করলে হয় অব**গত**। আর, হৃদয় যেন একটি গর্ত, তাতে গমন করা হল হৃদয়ঙ্**গম** করা। **বুঝা**র বেলায় গর্ত বোজানোর ব্যাপারটি আসে। তার মানে, 'জিজ্ঞাসা' বা 'জানিবার ইচ্ছা' ব্যাপারটি একটি অভাব বা গর্তই বটে; উত্তর সেই গর্তটি ভরে দেয়। মানুষ তাই **অবগত** হয়, হৃদয়**ঙ্গম** করে, **বুঝে** বা **বোঝে**, তার মনের গর্তটি **বুজে** যায়।

বুল (বুলবুল, বুলবুলি, বুলা, বুলান, বুলি) : ২. বুল = **বু** *(নবরূপে উত্তীর্ণ বাহী) লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **বুলবুল** = **বুল**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; যে* **বুলে** *(ঘুরে) বেড়ায়।* **বুলবুলি** = **বুলবুল** *গতিশীল যাহাতে।* **বুলা** = **বুল**-*এর আধার যে।* **বুলান** = **বুলা** *অন (on) যাহাতে।* **বুলি** = **বুল** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **৩. বুল** = বলা, কহা, নিন্দা করা, অভিহিত বা সংজ্ঞিত করা, নিবেদন করা ... ইত্যাদি; ভ্রমণ করা, বেড়ান, রক্ষার্থ সঙ্গে বেড়ান, উড়িয়া বেড়ান, আবর্ত্তন করা। **বুলবুল, বুলবুলি** = সুকণ্ঠ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। **বুলা (বুলান)** = ভ্রমণ করান, লঘুস্পর্শপূর্ব্বক হস্তাদি চালনা করা, ব্যাপ্ত করা, ঘৃষ্ট করা। (চোখ **বুলান** = উপরি-উপরি দেখা)। **বুলি** = শব্দ, কথা, বোল, শিশুর অস্ফুট ভাষা, পক্ষীর ভাষা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই কমবেশি প্রচলিত। **৫.** *দ্র.* **চুল, চুলবুল**। নবরূপে উত্তীর্ণ বাহী অর্থাৎ **বু** লালিত যাহাতে, তাকে **বুল** বলে। 'কথা বললে' কথাটি চলে যায় শ্রোতার কাছে; **বুল**-এর বেলায় তা হয় না, সে ফিরে আসে বা ধারে কাছেই ঘোরাফেরা করে। **বুলা** মানে তাই ঘুরে ফিরে আসা বা বেড়ান। আর, শিশুরা যখন খড়ি **বুলায়**, সে তো একই স্থানে ঘুরে ফিরে আসেই। তবে **বুলি**র বেলায়, কথাটা কোথাও যায় না, বাঁধা হয়ে থেকে যায় কথার এলাকাতেই। তখনই তাকে **বুলি** কিংবা **বাঁধাবুলি** বলা হয়ে থাকে। আর, জানলার সামনে গাছের ডালে যে পাখিটা দু'বেলা **বুলে** বেড়ায়, সেটিই যে **বুলবুল** পাখি, সেকথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না।

বুধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবুদ্ধি, অবা, অবধিয়া, অবুদ্ধিয়া, অবুদ্ধ, অবুদ্ধিপূর্ব্ব, অবুদ্ধিপূর্ব্বক, অবুধ, অবুধিনী, অবুধিয়া, অবোধ, অবোধিনী, অবোধিয়া, অবোধী, উদ্বুদ্ধ, উদ্বোধন, দুর্ব্বোধ, প্রবুদ্ধ, বউনী, বিবুধ, বুদ্ধ, বুদ্ধকল্প, বুদ্ধগয়া, বুদ্ধধর্ম্ম, বুদ্ধবচন, বুদ্ধি, বুদ্ধিকৃত, বুদ্ধিগম্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য, বুদ্ধিচ্ছায়া, বুদ্ধিজীবী,

বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিপূর্ব্বক, বুদ্ধিবন্ত, বুদ্ধিবিনাশ, বুদ্ধিবিবর্দ্ধন, বুদ্ধিবিষয়, বুদ্ধিভেদ, বুদ্ধিভ্রম, বুদ্ধিমন্ত, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমোহ, বুদ্ধিযুক্ত, বুদ্ধিযোগ, বুদ্ধিলাঘব, বুদ্ধিশালী, বুদ্ধিশুদ্ধি, বুদ্ধিসখ, বুদ্ধিসহায়, বুদ্ধিসম্পন্ন, বুদ্ধিস্থ, বুদ্ধিহত, বুদ্ধিহারা, বুদ্ধিহীন, বুদ্ধীন্দ্রিয়, বুদ্বুদ, বুধ্, বুধ, বুধজন, বুধবার, বুধবাসর, বুধরত্ন, বুধা, বুধাষ্টমী, বুধিত, বুধি, বুভুৎসা, বুভুৎসিত, বুভুৎসু, বুভুবু, বোদ্ধব্য, বোদ্ধা, বোধ, বোধক, বোধকর, বোধগম্য, বোধন, বোধনী, বোধনীয়, বোধপূর্ব্ব, বোধয়িতা, বোধশোধ, বোধি, বোধিত, বোধিতরু, বোধিদ্রুম, বোধিবৃক্ষ, বোধিসত্ত্ব, বোধ্য, বৌদ্ধ, সম্বুদ্ধ, সম্বোধন, সুবোধ।

বুধ্ = নবরূপী অতিবাহীর ধারণ। **বুধ** = নবরূপী অতিবাহীর ধারণ থাকে যাহাতে। (দ্র. **ব বর্ণের অর্থ, আতিবাহিক**)।

বুদ্ধ (বোধি, বোধিবৃক্ষ, বৌদ্ধ) : ১. ✓বুধ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বুদ্ধ** = **বুধ** *(নবরূপে উত্তীর্ণ অতিবাহী) ধারিত যাহাতে।* ***বোধি*** = ***বুধ****-এর আধার গতিশীল যাহাতে।* ***বোধিবৃক্ষ*** = ***বোধি*** *থাকে যে* ***বৃক্ষে****।* ***বৌদ্ধ*** = *যাহা* ***বুদ্ধ****-এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। /* **বুদ্ধ** = (বৌদ্ধমতে) যিনি ধ্যানে জগৎকারণ অবিদ্যা জানিয়া কৃচ্ছ্রমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইয়াছেন এবং বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে নির্ব্বাণের উপায় উপদেশ করিয়াছেন। (ব.শ.)। **৩. বুদ্ধ** = অবগত, অনুভূত, জাগরিত, প্রবুদ্ধ, বিকসিত, পণ্ডিত (বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের উল্লেখ আছে। 'গৌতম' শেষ বুদ্ধ।), বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ বা গৌতম (ইঁহার পিতা শাক্যরাজ শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, পত্নী গোপা বা যশোধরা এবং পুত্র রাহুল। খৃষ্টজন্মের ৬২২ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম, ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার বুদ্ধত্বলাভ এবং ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ হয়। ইনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হেতু 'সিদ্ধার্থ' এবং বিমলবোধলাভ হেতু 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত। বিষ্ণুর অবতারগণের ইনি অন্যতম।), বুদ্ধমতানুসারী, বোধ, জ্ঞান। **বোধি** = বোধ, তত্ত্বজ্ঞান, সমাধিভেদ, পিপ্পলবৃক্ষ, অশ্বত্থ (শাক্যমুনি অশ্বত্থতলে বোধি লাভ করেন, এই হেতু ইহা 'বোধি'। কশ্যপের বোধি 'ন্যগ্রোধ'।)। **বোধিবৃক্ষ** = অশ্বত্থবৃক্ষ। **বৌদ্ধ** = বুদ্ধসম্বন্ধী, বুদ্ধপ্রোক্ত (শাস্ত্র), বৌদ্ধশাস্ত্রবেত্তা, বৌদ্ধমতাবলম্বী। (ব.শ.)। **৪.** নামরূপে কমবেশী প্রচলিত। **৫.** যে সত্তার ভিতরে **বুধ** বা নবরূপে উত্তীর্ণ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে, তিনিই **বুদ্ধ**। দ্র. **বুধ**। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সেরকম যত মানুষ জন্মেছিলেন, তন্মধ্যে উপরোক্ত শাক্যসিংহ **বুদ্ধ** ছিলেন অন্যতম। তিনি বৈদিক সভ্যতার অপরাহ্নে সেই সভ্যতার শেষ আধারশক্তি **গৌতম** ঋষিদের গোত্রাপত্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের **অশ্বত্থ** বা **পিপুল** ('পিপ্পল' = people) বৃক্ষের ছায়ায় অর্থাৎ অধঃপতিত বৈদিক (সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থার ছায়ায় তাঁর **বোধি**লাভ ঘটেছিল। কোরেশ বংশে জন্মলাভ করে হজরত মহম্মদ যেমন কোরেশ বংশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, **গৌতম বুদ্ধ**ও **বোধি**লাভের পর বৈদিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জ্ঞানতাত্ত্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর অনুগামীরা বৈদিকব্যবস্থাকে উভয়প্রকার যুদ্ধে ধ্বংস করে **বামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই **বামরাজত্ব**ই বিশ্বের প্রথম ধনতান্ত্রিক বিপ্লব, যা ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ একে **'ষোড়শ মহাজনপদ'** বলে থাকেন। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারত তার বৈদিক সভ্যতার যুগ পেরিয়ে বৌদ্ধ যুগের সূত্রপাত ঘটায়। ব্যাপারটি পরবর্তীকালের ভারতীয় পণ্ডিতগণ বুঝে যান এবং তাঁরা **বুদ্ধ**কে **বিষ্ণুর** অবতার বলে ঘোষণা করে দেন। তবে এই বৌদ্ধযুগও খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মোটামুটি ভাবে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বা অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বৌদ্ধ যুগের অবসান ঘটে এবং হিন্দু যুগের সূচনা হয়। ... দ্র. **বামরাজত্ব**।

বুদ্ধি (বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধিমান) : ১. ✓বুধ্ + তি (ক্তিন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বুদ্ধি** = **বুধ** *(নবোত্তীর্ণ অতিবাহী) তারিত হইয়া সক্রিয় বা গতিশীল থাকে যাহাতে।* ***বুদ্ধিবৃত্তি*** = ***বুদ্ধি*** *নির্ভর বৃত্তি যাহাতে।* ***বুদ্ধিমান*** = ***বুদ্ধি*** *সীমায়িত হইয়া অন (on) থাকে যাহাতে; অর্থাৎ,* ***বুদ্ধি*** *আছে যাহার। /* **বুদ্ধি** = যাহার দ্বারা বোধ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. বুদ্ধি** = মতি, প্রজ্ঞা, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তত্ত্ববিশেষ, আত্মবিষয়-প্রজ্ঞা, বিচারশক্তি, বোধ, প্রত্যয়, কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদেশ, উপায়, উপায়োদ্ভাবনের শক্তি, যুক্তি। **বুদ্ধিমান** = প্রশস্তবুদ্ধি, বোধযুক্ত, তত্ত্বদর্শী, বিবেকশক্তিমান। (ব.শ.)। **বুদ্ধিবৃত্তি** = বুদ্ধির ধর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ব্যক্তিগ্রাহিতা উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি, যাবতীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজন করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন। (ছা.অ.)। **৪.** intelligence অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মান**। **বুধ** শব্দের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানতে পারছি, কার্যত **যুক্তি**মূলক জ্ঞানের প্রায়োগিক রূপের জ্ঞানীকে **বুধ** বলে। সেই **বুধ** বা যুক্তিমূলক জ্ঞান তারিত হয়ে সক্রিয় থাকে যে মানসিক প্রক্রিয়ায়, তাকে **বুদ্ধি** বলে। অর্থাৎ, যুক্তিবাদী জ্ঞানের প্রায়োগিক রূপকে **বুদ্ধি** বলে।

এর স্বরূপ বিষয়ক তথ্যের সার সরবরাহ করেছেন ছাত্রবোধ অভিধান। তাঁর মতে — '**বুদ্ধিবৃত্তি**র প্রধান **প্রয়োজন**' বা 'প্রকৃষ্ট যোজন' হল, 'যাবতীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজন করা।' এর মানে হল বস্তুর আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বিষয়ে অবগত হওয়া, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ অবগত হওয়া, এবং সর্বোপরি সেই 'বস্তুর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি' (= actions of the properties of matter) ও 'বস্তুর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি' (= reactions of the properties of matter) সমূহকে জেনে নিয়ে তাদের যোগসাধন করাই **বুদ্ধিবৃত্তির** কাজ। একালের ভাষায় একেই 'নেচার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ' বলে; রবীন্দ্রনাথ একেই বলতেন, 'প্রকৃতির সঙ্গে সত্য ব্যবহার করে চলা'। এই জ্ঞানকেই আমরা ইতোপূর্বে **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারার** প্রথম দুটি ধারা রূপে শনাক্ত করেছি।

মানবমন নিয়ে যতটুকু যা ভাবনাচিন্তা হয়েছিল, তার অধিকাংশই হয়েছিল প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে হয়েছে সম্প্রতি এবং আমাদের ধারণা, সেই কাজের বিকৃত সূচনা ঘটেছে ফ্রয়েডমশাইয়ের চর্চার মাধ্যমে। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তথাকথিত আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদগণ যা-সব বলে থাকেন, তার খবরাখবর ভুক্তভোগী মাত্রেই কমবেশি জানেন। আমরা

সেসব বিষয়ে যাব না। আমরা প্রাচ্যের মনস্তত্ত্ব বিষয়ের **বুদ্ধি**-সংক্রান্ত অর্জন নিয়েই কথা বলব।

বেদান্ত অনুসারে মানবমনকে বলা হয় **অন্তঃকরণ**। মানুষের **অন্ত**রে থেকে **করণ**-এর (= কর্মচারীর) মতো মানুষটির 'আমি'-সাহেবের হুকুম খাটে বলে এর নাম **অন্তঃকরণ**। বেদান্ত মতে এই **অন্তঃকরণ**-এর দু'রকম **বৃত্তি**। যে মানুষ দিনে চাষাবাদ করে, সন্ধ্যায় পাঠশালা চালায়, সে যেমন চাষী ও শিক্ষক, দু'রকম বৃত্তি গ্রহণ ক'রে কালাতিপাত করে, **অন্তঃকরণের**ও তেমনি দু'রকম বৃত্তি। কখনো সে **বুদ্ধি** (নিশ্চয়াত্মক) **বৃত্তি** গ্রহণ করে, কখনো **মনন** (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা) **বৃত্তি** গ্রহণ করে। এই **বুদ্ধি** ও **মন** প্রত্যেকেই আবার দু'দল কর্মচারীদের দিয়ে কাজ চালায়, একদলের নাম **চিত্ত** (অনুসন্ধানাত্মিকা **করণ**), অপর দলের নাম **অহঙ্কার** (অভিমানাত্মিকা **করণ**)। মানুষের **অন্তঃকরণ** যখন **বুদ্ধিবৃত্তি** গ্রহণ করে তখন সে 'নিশ্চয়াত্মিকা' হয়ে যায় এবং তখন তার **চিত্ত**-রূপী কর্মীরা **বুদ্ধি**র নিশ্চয়াত্মিকা-অনুসন্ধানাত্মিকা-করণ রূপে কাজ করে এবং তার **অহঙ্কার**-রূপী কর্মীরা **বুদ্ধি**র নিশ্চয়াত্মিকা-অভিমানাত্মিকা-করণ রূপে কাজ করে। আর মানুষের **অন্তঃকরণ** যখন **মনন**বৃত্তি গ্রহণ করে তখন সে 'সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা' হয়ে যায় এবং তখন এই চিত্ত ও অহঙ্কারই যথাক্রমে মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা-অনুসন্ধানাত্মিকা-করণ ও মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা-অভিমানাত্মিকা-করণ রূপে কাজ করে। আমরা দেখছি, বেদান্ত বলছেন, **চিত্তের** কাজ হল খোঁজাখুঁজি করে আনা — 'অনুসন্ধানাত্মিকা', আর **অহঙ্কার**-এর কাজ হল যা আনা হয়ে গেছে তাই নিয়ে অভিমানী আচরণ করা। অর্থাৎ, **চিত্ত** আসলে **মিত্র**-গুণসম্পন্ন; এবং **অহঙ্কার বরুণ**-গুণসম্পন্ন। দ্র. **অগ্নি**, **ইন্দ্র**। সাধারণত মানুষের **অন্তঃকরণ** যখন মননবৃত্তিকে অবহেলা করে শুধুমাত্র **বুদ্ধিবৃত্তি** গ্রহণ করে এবং তার **অহঙ্কার** নামক কর্মচারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভশীল হয়ে যায়, **চিত্ত**-রূপী করণেরা পাত্তা পায় না, তখনই সে 'একঝোঁকা' হয়ে মৌলবাদী হয়ে যায়। যাদের **অন্তঃকরণ** সেভাবে সক্রিয় হয়, তেমন মানুষদের চিনতে হলে আপনি একালের ধর্মব্যবসায়ী, অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত কট্টর যুক্তিবাদী, কট্টর বিজ্ঞানবাদী, কিংবা কট্টর মার্কসবাদীদের মধ্যে তেমন বহু মানুষকে পেয়ে যাবেন। আজকের বিশ্বসভ্যতা এই 'একঝোঁকা' **বুদ্ধিবৃত্তি** গ্রহণকারীদের দ্বারা পরিচালিত বলেই এই সভ্যতার এত দুর্গতি। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ **বুদ্ধিবৃত্তি**কে চিনতে পেরে স্বয়ং একে 'একঝোঁকা' বলে শনাক্ত করে গেছেন।

আমাদের মনে হয়েছে, শব্দার্থের নিয়মানুসারে যাঁরা **মননবৃত্তি** গ্রহণ করে জীবনে যথেষ্ট সফল হন, তাঁদের **মনীষী** বলা যায় এবং যাঁরা **বুদ্ধিবৃত্তি** গ্রহণ করে জীবনে যথেষ্ট সফল হন, তাঁদের **বুদ্ধিজীবী** বলা যায়। এই **বুদ্ধিজীবী** শব্দটি **মনীষী**র ঠিক পরের ধাপের মানুষদের অভিহিত করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয়।

তা সে যাই হোক, আমাদের ধারণা, মানুষের **অন্তঃকরণের** মননবৃত্তি গ্রহণ তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অস্তিত্বের অঙ্গ; আর তার **বুদ্ধিবৃত্তি** গ্রহণ আপৎকালীন রক্ষাকবচ রূপে পরমাপ্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুবিধালাভের অধিকার। সে অধিকার বোধহয় তিনি সব মানুষকে দেন না, দেননি। যাঁদের দেন, তাঁদের সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়, থাকা উচিত। বলতে গেলে সেই অধিকারের যদৃচ্ছ প্রয়োগ করার ফলেই **বর্তমান** মানবসভ্যতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বুদ্ধিজীবী : ২. ***বুদ্ধি*** *(দান) জীবিকা যাহার।* / (যিনি) বুদ্ধি দ্বারা নিজ হিতাহিতজ্ঞানবান। (ব.শ.)। ৪. intellectual অর্থে প্রচলিত। ৫. **বুদ্ধিজীবী** শব্দটি একালে অত্যন্ত অধঃপতিত হয়ে গেছে। শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, যিনি **বুদ্ধির** সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করেন বা **বুদ্ধি** বেচে খান; যেমন ডাক্তার, মাস্টার, উকিল ... প্রভৃতি। এই অর্থ এমনকি intellectual শব্দের অর্থ থেকেও নিম্ন মানের। সেকারণে অনেকেই **বুদ্ধিজীবী** নামে অভিহিত হতে পছন্দ করেন না। আমরা পছন্দ অপছন্দ নিয়ে কিছুই বলতে চাই না। আমরা **বুদ্ধিজীবী** শব্দটির অর্থ বুঝতে চাই।

সেক্ষেত্রে প্রথম কথা এই যে, 'শ্রম দান জীবিকা যাহার', তাঁকে যেমন শ্রমজীবী বলাই শব্দশাস্ত্রসম্মত, তেমনি '**বুদ্ধি** দান জীবিকা যাহার', তাঁকে **বুদ্ধিজীবী** বলাই সঙ্গত। কিন্তু **বুদ্ধি** বলতে একালের শিক্ষিত বাংলাভাষী বোঝেন intelligence, আর অতীতহারা শিক্ষিত বাংলাভাষী বোঝেন ডাক্তারের জ্ঞান, মাস্টারের জ্ঞান, উকিলের জ্ঞান ... ইত্যাদি; এবং সাধারণ বাংলাভাষী শব্দটির ব্যবহারই করেন না। সমস্যার জড় এখানেই।

বুদ্ধি কাকে বলে সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। সে হল **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারা**র প্রথম দুটি ধারার প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রয়োগকরণ প্রক্রিয়া। ইংরেজেরা সেই প্রায়োগিক জ্ঞানের ভিতরের একটিমাত্র **ধর্ম**কে the faculty of reasoning বা intelligence বলে থাকেন; যা কিনা **বুদ্ধির** একটি অংশমাত্র। আর, 'ডাক্তারের বুদ্ধি', 'মাস্টারের বুদ্ধি', 'উকিলের বুদ্ধি' ... এগুলি তো প্রকৃত **বুদ্ধির** আরও ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ফলে, intelligence-ধারীকে **বুদ্ধিজীবী** বলা হোক আর ডাক্তার মাস্টারকে **বুদ্ধিজীবী** বলা হোক, তাতে কথাটায় একশোভাগ ত্রুটি হয় না, শুধুমাত্র দু'বছরের শিশুকে তার ঠাকুরদার জামা পরিয়ে দেওয়া হয়। দ্র. **বুদ্ধি**, **বুধ**।

বুদ্ধিপূর্ব্বক (অবুদ্ধিপূর্ব্বক) : ৫. শব্দটির অর্থ সবাই বোঝেন — কিছু করার আগে বা পূর্বে বুদ্ধিকে রেখে তার সাহায্যে কিছু করাকে বলা হয় 'বুদ্ধিপূর্ব্বক' করা। প্রায় সমস্ত পুরাণাদি গ্রন্থে এবং মনুসংহিতায় যে **সৃষ্টিতত্ত্ব** বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, **জগৎসৃষ্টির** প্রধান ভাগ দুটি — **অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি** ও **বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি**। তারপর তার অন্যান্য ভাগগুলি দেখানো হয়েছে। এটি একটি ছক, যাতে প্রকৃতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে অতি সংক্ষেপে ধরে রাখা হয়েছে। আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে আমরা সেই ছকটিকে পরিশিষ্টে দিয়ে দিলাম।

বুদ্ধু : ২. ***বুদ্ধ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৪. fool অর্থে প্রচলিত। ৫. **বুদ্ধ** শব্দটি প্রাচীন বটে, কিন্তু **বুদ্ধু** শব্দটি একালের **সৃষ্টি**। শব্দসৃষ্টির স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে জনসাধারণের মুখ দিয়েই এই শব্দটির

সৃষ্টি হয়েছে। 'উ'কারের প্রয়োগ যথানিয়মে **বুদ্ধ** শব্দটির বিপরীত অবস্থানে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিমান **বুদ্ধ**কে বুদ্ধিহীন করে দিয়েছে। এমনকি **বুদ্ধ** শব্দের অর্থানুভবের ভিতরে যেমন একটু সমীহ রয়েছে, **বুদ্ধু** শব্দের অর্থানুভবের ভিতরে ঠিক তার বিপরীত ছিটেফোঁটা-মমতাও রয়েছে।

বুধ : **১.** ✓বুধ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বুধ*** *=* ***বু****-কে (নবরূপে উত্তীর্ণ অতিবাহীকে) ধারণ করে যে।* ***বুধবার*** *=* ***বুধ****-এর* ***বার****; অর্থাৎ* ***বুধ*** *থাকেন যে* ***বার****-এ (বরণীয় কালে)।* ***বুধা*** *=* ***বুধ****-এর আধার যে।* **৩. বুধ** = পণ্ডিত, বিদ্বান, ধীর, বিবেকী, দেবতা, বৃহস্পতিভার্য্যা তারার গর্ভজাত চন্দ্রের পুত্র, সৌম্য, (ইঁহার পুত্র পুরূরবা। ইনি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ।), গ্রহবিশেষ (Mercury). সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধা। **বুধবার** = বুধবাসর। **বুধা** = জটামাংসী। (ব.শ.)। **বুধ** = ইনি চন্দ্রের পুত্র। বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করলে তারার গর্ভে চন্দ্রের যে পুত্র হয়, তার নাম বুধ। ... দেবতা ও ঋষিরা তারাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। ... রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করে চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অবতীর্ণ হন। ... ব্রহ্মা রুদ্রকে নিবৃত্ত করেন ও চন্দ্রের কাছ থেকে তারাকে নিয়ে বৃহস্পতিকে ফিরিয়ে দেন। ... তারার পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত বলে চন্দ্র বুধকে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গ্রহাধিপত্যে স্থাপন করেন। বুধ বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলাকে (সুদ্যুম্নকে) বিবাহ করেন। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** 'বুধবার' বা Wednesday অর্থে **বুধ** শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। গ্রামবাংলায় মানুষের নামরূপে **বুধা, বুধো, বুধু, বধুয়া, বুধরাই** রূপে কমবেশি প্রচলিত। তাছাড়া 'উধোর পিণ্ডি **বুধো**র ঘাড়ে' (ব.শ.) প্রবাদটি তো প্রচলিত রয়েছেই। **৫.** দ্র. **ইলা, কলি, চন্দ্র, চন্দ্রবংশ, তারা, বৃহস্পতি, বৈবস্বত** ... এবং **ভঙ্গাশ্বন**। আবিষ্কারক তো আবিষ্কার করে দিয়ে দিলেন অনুগামীদের হাতে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেই আবিষ্কৃত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করে বিষয়টিকে ধারণ করে চলতে লাগলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের আমরা গুরু বা শিক্ষক রূপে বিরাজিত দেখতে পাই। কিন্তু কালে কালে জ্ঞানেরও অজস্র বিভাজন হতে থাকে, জ্ঞানীরও। এগুলির মধ্যে যে জ্ঞানের সাহায্যে যোজন করা যায়, যুক্ত করা যায়, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে প্রকল্পটিকে সাজানো যায়, একালের ভাষায় যাকে পাইকারী হারে উৎপাদন-কর্মের জ্ঞান বলা চলে, সেই যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের ধারকরূপে যে জ্ঞানী সক্রিয় হন, তাঁকে **বুধ** বলে। ইনি **অতিবাহ (আতিবাহিক)** সত্তার মূল। সেই কারণে আমরা এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিলাম — নবরূপে উত্তীর্ণ অতিবাহীকে ধারণ করেন যিনি, তিনিই **বুধ**। সহজ কথায় বললে, ইনি হলেন যুক্তিবাদী ও পাইকারী উৎপাদন প্রক্রিয়ার **বুদ্ধি**-ধারী **বুদ্ধিমান** বা পাইকারী-জ্ঞানের জ্ঞানী। একালের ভাষায় এরূপ সত্তাকে বৈজ্ঞানিকশিষ্য, বিশেষজ্ঞ, স্পেশালিস্ট, অ্যাডভাইসার ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। তবে বলে রাখা ভাল, যে, আমরা যে **বুধ**-এর কথা বলছি, তাঁর বিদ্যা**বুদ্ধি**কে আদিম ধনতন্ত্রের একেবারে গোড়ায় বিদ্যমান দেখা যায়, সেইকারণে ইনি একজন **বিবেকী**। অর্থাৎ, এঁর ভিতরে কুবেরসত্তা আদৌ নেই। (দ্র. **পণ্য**)। মোটকথা, আমরা যে **ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারার** সাক্ষাৎ পেয়েছি, তার প্রথম দুটি ধারার প্রায়োগিক জ্ঞানের আধার এই **বুধ** সত্তাটি। এই **বুধ** সত্তার থেকে **বিবেক** বাদ দিয়ে দিলে আমরা যাকে পাই, তাকে বলে **বৃহস্পতি**। অর্থাৎ **বুধের** অত্যন্ত বিকাশ ঘটলে তার থেকে **বিবেক** স্বভাবতই বাদ পড়ে যায় এবং তখনই **বুধ** উত্তীর্ণ হয়ে যায় **বৃহস্পতি**তে। অন্যথায় মানবসভ্যতার পক্ষে **বুধ** অত্যন্ত সহযোগী সত্তা। **ব্রহ্মজ্ঞানের** প্রথম দুটি ধারাকে সে ধারণ করে নিয়ে চলে। একালে যাকে **পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন জীববিজ্ঞান** ইত্যাদি বাহ্যপ্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান বলা হয়, সেই সকল জ্ঞানের **বাহন** এই **বুধ**। এর থেকেই **বুদ্ধি, বুদ্ধিজীবী**র জন্ম হয়। এঁরা **মনীষী**র ঠিক পরের ধাপের মানুষ হন। **ব্রহ্মজ্ঞানের** শেষ দুটি ধারা সম্পর্কে এঁদের কোনো ধারণা প্রায় থাকেই না, কিন্তু মাঝের ধারাটি বা তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা থাকে। ...

ভারতসমাজের ইতিহাসে এই **বুধের** ভূমিকা কীরূপ ছিল, তা লেখা রয়েছে পুরাণাদিতে বিবৃত **বুধ**-এর কাহিনীতে। সম্ভবত ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা জটিল। এখানে দেখা যায় — **বৃহস্পতি** তাঁর দাদা **উতথ্যের** পত্নী গর্ভবতী **মমতা**কে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছেন, তাতে গর্ভস্থ পুত্র **দীর্ঘতমা** রূপে এবং ধর্ষণচেষ্টার **পুত্র ভরদ্বাজ** রূপে জন্মাচ্ছেন। ওদিকে সেই **বৃহস্পতির** পত্নী **তারা**কে হরণ করে নিয়ে গেছেন **চন্দ্র**। কিন্তু **বৃহস্পতি** তারাকে ছাড়তে নারাজ। অতএব পুরাণের অন্যতম বিখ্যাত যুদ্ধ 'তারকাময় সংগ্রাম' ঘটে যায়। এই যুদ্ধে স্বয়ং **শিব**কে দেখা যাচ্ছে অসুরদের সঙ্গে মিলে **বৃহস্পতির** পক্ষে এবং **চন্দ্রে**র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; অথচ **বৃহস্পতি** চিরকালই অসুরবিরোধী ও শিববিরোধী। কেবল তাই নয়, যুদ্ধশেষে **তারা**কে পাওয়া গেলেও দেখা গেল তার গর্ভে চন্দ্রের পুত্র **বুধ** রয়েছেন। **বৃহস্পতি** তারাকে গর্ভত্যাগ করে আসতে বলেন। বিরোধ মেটানোর জন্য সেই পরিত্যক্ত **বুধ**কে গ্রহণ করলেন স্বয়ং **ব্রহ্মা** এবং তাকে 'গ্রহাধিপত্যে' নিযুক্ত করলেন। **বুধ** তাই **গ্রহ**গণের অধিপতি। জটিলতা কিন্তু এখানেই থেমে থাকল না। এইবার সেই **বুধের** সঙ্গে বিয়ে হল **ইলা**রাজার (দ্র. **ইরা**, ১ম খণ্ড) বা সুদ্যুম্নের। ইনি কখনো নারী থাকেন, কখনো পুরুষ হয়ে যান কোনোরকম শল্যচিকিৎসা (অপারেশন) ছাড়াই। পুরুষ অবস্থায় নিজের স্ত্রীর গর্ভে **ইলা**র যে পুত্রের জন্ম হয়, তার নাম **শশবিন্দু**; আর স্ত্রী অবস্থায় **বুধের** ঔরসে **ইলা**র নিজের গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তার নাম **পুরূরবা**। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ভারতসমাজের ইতিহাসকে যে দুই রাজবংশের — **সূর্য্যবংশের** ও **চন্দ্রবংশের** অর্থাৎ আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) শক্তির ও আদিম ধনতান্ত্রিক (বৌদ্ধ) শক্তির — বিরোধ-সন্ধি-বিরোধের ইতিহাস বলে মনে করা হয়, তার **চন্দ্রবংশ**টির সূচনা করেন যে সত্তা তিনি এই **পুরূরবা**। তার মানে **চন্দ্র**পুত্র **বুধের** ঔরসজাত পুত্র **পুরূরবার** মাধ্যমে ভারতসমাজের ইতিহাসে ধনতান্ত্রিকদের আদিপুরুষদের জন্ম হয়েছিল। ...

আশা করা যায়, পাঠকপাঠিকা বুঝতে পারছেন, এই জটিল ইতিহাসটিকে আগাগোড়া ঠিকঠাকভাবে উদ্ধার করা সময়সাপেক্ষ কাজ। আমরা সেই ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির

কিছু কিছু উদ্ধার করে মোটা হরফের শব্দগুলির ভুক্তিতে কিছু কিছু দিয়েছি, দিচ্ছি। এখানে আমরা শুধু **বুধ**-বিষয়ে আর কয়েকটি কথা বলব। দেখা যাচ্ছে, এই সত্তাটি জন্মেছিল **চন্দ্রের** অর্থাৎ সেকালের ব্যক্তিপুঁজির শক্তি থেকে; কিন্তু জন্মেছিল **চন্দ্রের** তৎকালীন স্ত্রীদের কারো গর্ভে নয়। মনে রাখা ভাল, **দক্ষের** সাতাশটি কন্যা ছিলেন, এবং তাদের সকলেরই পতি ছিলেন **চন্দ্র**। তা সত্ত্বেও তিনি **বৃহস্পতির** পত্নী **তারা**কে হরণ করে তাঁর গর্ভে **বুধের** জন্ম দেন। অর্থাৎ **বৃহস্পতির** আধারশক্তিরূপিণী **তারা**র গর্ভে ছাড়া অন্য কোথাও এই **বুধ**-সত্তার জন্ম দেওয়া যেত না। এমন হতে পারে যে, **বৃহস্পতি**র নীতি অনুসরণকারী শিষ্যদের যে সম্প্রদায়, তাদেরই হরণ করে আদিম ব্যক্তিপুঁজি তাঁদের মাথায় পাইকারী উৎপাদনের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েছিল। ... তা সে যাই হোক না কেন, সেই পাইকারী বুদ্ধির থেকেই জন্মেছিল এমন এক সত্তা, যে সেকালের মতো করে **পুরূ-রব** করেছিল — আমার পথ অনুসরণ করো, তাহলে তোমাদের বিপুল সমৃদ্ধি হবে ... ইত্যাদি।

'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা / যথা ইচ্ছা তথা যা।' — এই প্রবচনটি প্রায় সকল বাংলাভাষীই জানেন। যা কিছু উন্মেষমূলক **কর্ম্ম**, আভ্যুদয়িক **কর্ম্ম**, সে সবের সূচনা করবার সময় হল **মঙ্গলবার**-এর রাত্রিশেষে **বুধবার**-এর ঊষালগ্নে। দ্র. **সপ্তাহ**।

বোধ (বোধগম্য, বোধন, বোধনী, বোধনীয় — অবোধ, উদ্বোধন, দুর্ব্বোধ, নির্ব্বোধ, প্রবোধ, সম্বোধ, সম্বোধন, সুবোধ) : **১.** ✓বুধ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বোধ*** = ***বুধ****-এর অভিজ্ঞতার আশ্রয় যাহাতে।* ***বোধগম্য*** *= যাহা* ***বোধ****-এ গমন করিতে পারে; অথবা,* ***বোধ*** *যাহাতে গমন করিতে পারে।* ***বোধন*** *=* ***বোধ*** *অন (on) যাহাতে।* ***বোধনী*** *=* ***বোধন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বোধনীয়*** *=* ***বোধনী*** *যায় যাহাতে।* ***বোধ্য*** *=* ***বোধ*** *থাকে যাহাতে। /* **বোধনী** = যাহার দ্বারা বোধ সাধন করা যায় ('বোধসাধনী'); যে কালে বোধ সাধন করা যায় ('বোধনতিথি')। (ব.শ.)। **৩.** **বোধ** = জ্ঞান, অনুভব, প্রবোধ, চৈতন্য, বিকাশ, বুদ্ধি, সংজ্ঞা। **বোধগম্য** = বুদ্ধিগম্য, জ্ঞানগোচর। **বোধন** = বিকাশয়িতা, উদ্দীপক, উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপন, জাগরণ, উদ্দীপন, সূচন, গন্ধদীপন, দুর্গার বোধনার্থ উৎসব, সংস্কারোদ্দীপন (দ্র. **উদ্বোধন**)। **বোধনী** = মতি, বুদ্ধি। **বোধনীয়** = বিজ্ঞাপনীয়। **বোধ্য** = জ্ঞেয়। (ব.শ.)। **৪. ৫.** দ্র. **উদ্বোধন** (১ম খণ্ড)। এই **বোধ** শব্দের সঙ্গে উপসর্গ যোগে বহু শব্দ প্রসূত হয়েছে, যথা — **অবোধ, উদ্বোধন, উদ্বোধনী, দুর্ব্বোধ, নির্ব্বোধ, প্রবোধ, সম্বোধ, সম্বোধন, সুবোধ**। এর মধ্যে **সম্বোধ** বাদে বাকী শব্দগুলি যথেষ্ট প্রচলিত এবং বিশেষত নাম রূপে **প্রবোধ** ও **সুবোধ** খুবই প্রচলিত। **বোধ** ও উপসর্গগুলির অর্থের সমন্বয় ঘটিয়ে শব্দগুলির অর্থ নিরূপণ করা যায়। তবে এদের মধ্যে **সম্বোধন** শব্দটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে রাখা যেতে পারে।

যদিও সকল দেশের সব ভাষাতেই মানুষ বা স্থানের নামের সুস্পষ্ট অর্থ থাকার রীতি বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছিল, শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্যের অতীতহারা পণ্ডিতগণের ধারণা জন্মায়, নামের কোনো মানে হয় না। তার অনুকরণ করেন আমাদের দেশের আধুনিক মানুষেরা। অথচ আমাদের দেশের ভাষা-সংস্কৃতিতে একথা একেবারেই মানায় না। কেননা, সনাতন রীতি মেনে আমাদের দেশে আজও মানুষের অর্থপূর্ণ নাম রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। আর সেকথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল আমাদের **সম্বোধন** শব্দটি। যাহার দ্বারা সম্যক রূপে বোধ অন (on) করা সম্ভব হয়, সেটিই **সম্বোধন** বা নাম। নাম শুনলেই বোঝা যাবে যে, সত্তাটি আসলে কী। তা যদি না হয়, তবে সেটি সম্বোধন-যোগ্য পদ বা শব্দ নয়। অর্থাৎ, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা জানি, নামের মানে থাকতেই হবে। দ্র. **ডাক, ডাকিনী**।

বৃক্ (ব্রশ্চ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবৃক্ষ, বারকোশ(ষ), বার্ক্ষ, বিক্খ, বিচ্ছা, বিচ্ছু, বিছা, বিছাতি, বিছু, বিছুটি, বিছে, বিরিক্খ, বিরিখ, বিরিখি, বৃ, বৃক্, বৃক, বৃকভানু, বৃকী, বৃকোদর, বৃক্ক, বৃক্কক, বৃক্কা, বৃক্খ, বৃক্ণ, বৃক্ষ, বৃক্ষক, বৃক্ষখণ্ড, বৃক্ষচ্ছায়, বৃক্ষতক্ষক, বৃক্ষদল, বৃক্ষদেবতা, বৃক্ষধূপ, বৃক্ষনাথ, বৃক্ষনির্য্যাস, বৃক্ষপাল, বৃক্ষবাটিকা, বৃক্ষমূল, বৃক্ষরাজ, বৃক্ষকুসুম, বৃক্ষরুহা, বৃক্ষসঙ্কট, বৃক্ষসেচন, বৃক্ষাদন, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষাম্ল, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষারোপক, বৃক্ষেশয়, বৃখভানু, বৃত, বৃতি, বৃথা, বৃথাকথা, বৃথাকার, বৃথাজন্ম, বৃথাজাত, বৃথাট্যা, বৃথাদান, বৃথাপক্ব, বৃথাপলিত, বৃথাপশুঘ্ন, বৃথাপাক, বৃথাবাদী, বৃথাবৃদ্ধ, বৃথামতি, বৃথামাংস, বৃথালিঙ্গী, বৃন্ত, বৃন্তাক, বৃন্তাকী, বৃন্দ, বৃন্দা, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনচন্দ্র, বৃন্দাবনবিনোদিনী, বৃন্দাবনবিপিন, বৃন্দাবনবিলাসিনী, বৃন্দার, বৃন্দারক, বৃন্দারণ্য, বৃন্দারবৃন্দ, বৃশ্চিক, বৃশ্চিকালী, বোঁট, বোঁটা, ব্রক্ষ, ব্রশ্চ্, ব্রশ্চন।

বৃক্ (ব্রশ্চ্) = আবর্ত্তনবাহীর আবৃত-করণ। **বৃক** = আবর্ত্তনবাহীর আবর্ত্ত-করণ যাহাতে। **ব্রশ্চ** = বাহী-রক্ষকের শক্তিবিচ্ছুরণ চয়িত হয় যাহাতে।

বৃক (বৃকোদর) : **১.** ✓বৃক্ (গ্রহণ) + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **বৃক** = *যে আবর্ত্তনবাহী (অন্যকে তার আবর্ত্তে) অন্তর্ভুক্ত করে। /* ছাগাদি গ্রহণ করে যে ('ছাগাদিগ্রাহক')। **বৃকোদর** = বৃক উদরে যাহার। (ব.শ.)। **৩.** **বৃক** = মেষমৃগাদি ঘাতক কুক্কুরাকার ব্যাঘ্রবিশেষ, ঈহামৃগ, কোক, ঘোগ, শ্বাপদ, কাক, শৃগাল, ক্ষত্রিয়, অনেকদ্রবজন্য ধূপ, সরলনির্য্যাস, বকবৃক্ষ, উদরস্থ অগ্নি। **বৃকোদর** = ভীমসেন। (ব.শ.)। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অন্য নাম। বৃক নামক অগ্নি যার উদরে আছে, সে বৃকোদর। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ঈহা**। আবর্ত্তনের অন্তত দুটি লক্ষণ অনেকেই জানেন। এক) অন্য কাউকে, প্রয়োজনে কারও অংশবিশেষকে ভেঙে, আ**বর্ত্তনে**র আ**বর্ত্তে**র ভিতরে টেনে নেওয়া; দুই) আ**বর্ত্তে**র ভেতর থেকে কোনো কিছুকে ছিট্‌কে বাইরে বের করে দেওয়া। এর মধ্যে প্রথম ক্রিয়াটি করে যে, তাকে বলে **বৃক্**-করণ (break)। আর, দ্বিতীয় ক্রিয়াটি করে যে, তাকে বলে **বৃজ্**-করণ (breeze)। (দ্র. **বর্জ্জন**)।

প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে 'মাথায় আগুন', 'পেটের আগুন' — এসব

কথা কারও অজানা নয়। প্রকৃতির নিয়মে বহু **বর্ত্তমান** সত্তাই আপন **আবর্ত্তের** ভিতরে সেই অভাবের আগুন পোষে। এই অভাবের আগুন জলঘূর্ণীর মতো অন্যকে গ্রাস করে আত্মস্থ করে শান্তি পায়। স্বভাবতই অদৃশ্যলোকে **বৃক** রূপে আমরা পাই মানসবিহারী তত্ত্বানুসন্ধানী **ঈহা**মৃগকে এবং **পণ্যে**র দুনিয়ায় পাই **বৃকোদর**কে। আর, দৃশ্যলোকে পাই কুক্কুরাকার ব্যাঘ্রাদিকে। এরা প্রত্যেকেই আপন আপন আ**বর্ত্তে**র ভিতরে অন্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এদের **বৃক** বলে। ... **৬.** ইংরেজি break।

বৃক্ষ (বৃক্ষনাথ, বৃক্ষরাজ, গৃহবৃক্ষ) : ১. ✓ব্রশ্চ্ + স - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বৃক্ষ*** = ***বৃক্***-*এর (আপন আবর্ত্তের অন্তর্ভুক্তকরণের) দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, কামড়া-কামড়ির অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* ***বৃক্ষনাথ*** = ***বৃক্ষ****সমূহের* ***নাথ*** *যে।* ***বৃক্ষরাজ*** = ***বৃক্ষ****সমূহের রাজা যিনি।* ***গৃহবৃক্ষ*** = ***গৃহ****রূপী* ***বৃক্ষ*** *যে।* **৩.** **বৃক্ষ** = তরু, পাদপ। **বৃক্ষনাথ** = বট। **বৃক্ষরাজ** = পারিজাত। (ব.শ.)। **৪.** tree অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বটবৃক্ষ, পঞ্চবটী**। কোনো অভিধানেই **গৃহবৃক্ষ** কথাটি নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে এই শব্দটি বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে। এদিকে আমরা দেখছি, **বৃক্ষনাথ** বলা হচ্ছে **বটবৃক্ষ**কে এবং **বৃক্ষরাজ** বলা হচ্ছে **পারিজাত**-বৃক্ষকে। এই দুটি সত্তাকে আমরা আগেই চিনেছি। সমাজে **বটবৃক্ষ** হল **পণ্য**-উৎপাদক যৌথব্যবস্থা, আর **পারিজাতবৃক্ষ** হল রপ্তানীমূলক **পণ্য**-উৎপাদক ব্যবস্থা। সেই সুবাদে **গৃহবৃক্ষ** শব্দের অর্থ রূপে পারিবারিক কুটীরশিল্প ব্যবস্থাকে শনাক্ত করা হয়। দেখা যায়, তাতে করে বিষ্ণুপুরাণে প্রদত্ত 'গৃহবৃক্ষ সমূহের উদ্ভব ও তার থেকে পুটকে পুটকে মধুর ক্ষরণ' ... ইত্যাদি বয়ানের সঙ্গে ঐ অর্থটি ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যাচ্ছে। তার মানে, **বৃক্ষ** শব্দের মূল অর্থ হল, সামাজিক উৎপাদন সংগঠন। সে সংগঠনের যতরকম রূপ, **বৃক্ষ**ও তত রকম। সেই সব **বৃক্ষা**দি নিয়েই 'সংসার **অরণ্য**'। সামাজিক উৎপাদন সংগঠনের জটিল ব্যবস্থাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যথার্থে উপলব্ধি করে দেখেছিলেন যে, এর সঙ্গে **বৃক্ষে**র জটিলতার ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। তাই তাঁরা forest-এর tree-কে (দ্র. **তরু**) যেমন **বৃক্ষ** নাম দিয়েছিলেন, তেমনি সংসার বনের তরুকেও **বৃক্ষ** নামে শনাক্ত করেছিলেন। দ্র. **অশ্বত্থ, বট, বিল্ব** ... ইত্যাদি।

বৃথা (বৃথাপাক, বৃথামাংস) : ২. ***বৃথা*** = *বাহীর আবর্ত্তন মাত্র থাকে যাহাতে (কিন্তু বাহী থাকে না)।* ***বৃথাপাক*** = ***বৃথা*** *যে* ***পাক****।* ***বৃথামাংস*** = ***বৃথা*** *যে* ***মাংস****; অথবা, যে* ***মাংস*** *ভক্ষণ করা যায় না।* / **বৃথাপাক** = যে বিবাহ না করিয়া নিজেকে গৃহস্থ মনে করে, তাদৃশ (ব্যক্তি)। **বৃথামাংস** = যাহা দেবাদ্যর্চ্চনাবিশিষ্ট নহে এবং আত্মার্থ সাধিত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। **৩.** **বৃথা** = নিষ্ফল, অনর্থক, নিরর্থক। (ছা.অ.)। নিরর্থক, বিধিহীন, মোঘ, দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্য, পরিহাসনিমিত্ত, দেবোদ্দেশ বিনা আত্মার্থ পক্ব বা প্রস্তুত, অনাবশ্যক। **বৃথাপাক** = যাহার পক্ব অন্নাদি অভক্ষ্য। **বৃথামাংস** = হিন্দুমতে দেব-দেবীকে উৎসর্গ করা হয়নি এমন পশুর মাংস। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** **বৃথা** যথার্থে প্রচলিত, **বৃথামাংস** অপ্রচলিত। **৫.** পুরাণাদি পাঠকালে এই **বৃথামাংস** শব্দটি আপনাকে বারবার **বিব্রত** করবেই। আপনি দেখবেন, একদিকে **বৃথামাংস** ভক্ষণ নিষিদ্ধ, অন্য দিকে কেউ কেউ তা ভক্ষণ করছে বলে শাসকের কোপে পড়ছে ... আপনি বুঝতে চাইবেন ব্যাপার কী?

প্রথম প্রথম আপনি কিছুতেই শব্দটির কোনো কূলকিনারা পাবেন না। কিন্তু যেই না আপনি **মৎস্য** ও **মাংস** শব্দের অদৃশ্য অর্থটি ('নিজস্ব' ও 'নিজ মালিকানার অংশ') জেনে যাবেন, তৎক্ষণাৎ এক তেপান্তরের মাঠ দেখতে পেয়ে যাবেন। সেই তেপান্তরের মাঠে এই **মৎস্য মাংস** নিয়ে কত যে কথা, বাদবিতণ্ডা, তর্কাতর্কি ... বেদপুরাণাদি গ্রন্থে তা সবই লিপিবদ্ধ আছে। কোনো বস্তুকে 'আমার' বা **মৎস্য** বলা যায় কি না, 'আমার-অংশ' বা **মাংস** বলে ভোগ করা উচিত কি না, অন্যের উৎপাদিত বস্তু বা **মৎস্য-মাংস** নেওয়া উচিত কি না, তা সে বিনিময়ে হোক আর দানেই হোক, এবং সেগুলি নিয়ে নিজের বলে ভোগ করা উচিত কি না — এসব নিয়ে যুগে যুগে কত যে বিতর্ক চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। সর্বোপরি, "আর প্রয়োজন নেই, তাও 'আমার অংশ', 'আমার-অংশ', 'আমার', 'আমার' করে করে রোজগার করে যাওয়া" — পুরাণাদিতে একেই নাম দেওয়া হয়েছিল '**বৃথামাংস**-ভক্ষণ' এবং **প্রাচীন ভারতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থে** এইরূপ **বৃথামাংস** ভক্ষণ নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। ...

তা হোক, কিন্তু তার ফল কী হয়েছিল? তার ফল এই হয়েছিল যে, আপনি যত বেশিই রোজগার করুন, শাসককে তার অংশ দিতে হবে, কর দিতে হবে, বলি দিতে হবে, খাজনা দিতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে, দেবোদ্দেশে নিবেদন ক'রে তবেই আপনি তা ভোগ করতে পারবেন, অন্যথায় আপনার **মাংস**-ভক্ষণ **বৃথামাংস**-ভক্ষণ হয়ে যাবে, নিন্দনীয় হয়ে যাবে, নিষিদ্ধ বলে মনে করা হবে। ...

অতএব **নগদ নারায়ণের** বা **অর্থের** তিনটি রূপ এসে গেল সামনে — শুক্ল, শবল, ও কৃষ্ণ। **বলি** দিয়ে খান, আপনি শুক্ল অর্থ বা 'হোয়াইট মানি' ভোগ করছেন! অন্যথায় **নগদ-নারায়ণ** শ্রী**কৃষ্ণ** বলে ঘোষিত হবেন এবং **কংস**রাজা আপনার উপর খড়্গহস্ত হয়ে আপনাকে তাড়া করবে।

তাহলে তো এই বাস্তব বলি-প্রদান কর্মের প্রতীকী আচরণের সূচনা হওয়া চাই, সেই প্রতীকী আচরণ প্রথা রূপে প্রচলিত থাকা চাই, সবক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে! অতএব শুরু হল এর প্রতীকী আচরণ — অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে দৃশ্য পশু **বলি** দিয়ে নিজেরা তার **মাংস** খেয়ে নেওয়া। তার মানে বাস্তবে আমরা ধনীরা যত খুশি রোজগার করছি, **বৃথামাংস** খাচ্ছি, তার কর বা বলি বা ট্যাক্স দিয়ে দিচ্ছি শাসক **দেবতা**কে; আর তার প্রতীকী আচরণ করছি বলির পশুতে দেবত্ব আরোপ করে, Holy Communion (Eucharist) করে, সে পশুর বলি দিয়ে তার মাংস খেয়ে। রীতিটি এত গভীরভাবে সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে যে, যে-ব্রাহ্মণ কদাপি মাংস ভোজন করেন না, তিনিও বলির মাংস প্রসাদ রূপে ভক্ষণ করতে রাজী হয়ে যান। এমনকি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে দেখা গেছে, যিনি কখনো কোনো মাংসই খান না, কোরবানির মাংস তিনি প্রসাদরূপে একবারের জন্য হলেও অবশ্যই খেয়ে থাকেন। জানি না হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান

ধর্ম বাদে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে ও সংস্কৃতিতে এর কিরূপ উত্তরাধিকার আজও বিদ্যমান আছে। তবে **বৃথাপাক**-এর মতো ধারণাধারী শব্দ কোনো সংস্কৃতিতে আদৌ থাকতে পারে, এমন কথা ভাবা কঠিন।

বৃন্দ (বৃন্দা, বৃন্দাবন) : ১. ✓বৃ + দ (দম্) - কর্তৃবাচ্যে, ন্ (নুম্) আগম, গুণাভাব। (ব.শ.)। **২.** ***বৃন্দ*** = *বাহীর আবর্তন দান করে যে।* ***বৃন্দা*** = ***বৃন্দ****-এর আধার যে।* ***বৃন্দাবন*** = ***বৃন্দা****র* ***বন****।* **৩. বৃন্দ** = বহু, অসংখ্য, সংখ্যাবিশেষ, শতকোটি, সমূহ, নিকর, রাশি, গুচ্ছ। **বৃন্দা** = তুলসী, রাধা, রাধিকাসখী, বৃন্দাবন। (ব.শ.)। (ক) অসুররাজ জলন্ধরের স্ত্রী ও কালনেমির কন্যা। ইনি অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। ... জলন্ধর দেবরাজ্য অধিকার করেন। তখন শিব দেবতাদের হিতের জন্য নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জলন্ধরের বর ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী বৃন্দা নিষ্কলঙ্কচরিত্রা থাকবেন, ততদিন জলন্ধরও অপরাজেয় থাকবে। বৃন্দা এদিকে স্বামীর মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। ফলে, শিব জলন্ধরকে বিনাশ করতে অসমর্থ হন। ... দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে তিনি জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। তখন জলন্ধর বিনষ্ট হয়। এইজন্য বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হলে, বিষ্ণু তাঁকে নিবৃত্ত করে পতির অনুগমন করতে বলেন। কারণ তাঁর চিতাভস্মে তুলসী, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র তরু উৎপন্ন হয়ে মানবের পূজনীয় হবে। বৃন্দা তুলসী রূপে বিষ্ণুপ্রিয়া। দ্বাপরে তিনি রাধার সখী ছিলেন। কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন বৃন্দারই বন। (খ) বৃন্দা শ্রীরাধার সখী ও দূতী। (পৌ.অ.)। **বৃন্দাবন** = বৃন্দার তপস্যার্থ বা বিহারার্থ বৃন্দানামক বন (কেদার-রাজকন্যা বৃন্দা এই স্থানে তপস্যা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করেন, এই হেতু ইহা 'বৃন্দাবন'। ইহা যমুনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত।), বৃন্দাবন নামক উদ্যান, গোলোকস্থ ধামবিশেষ, তুলসীর আধার মৃত্তিকাস্তূপ, তুলসী-পীঁড়ি। (ব.শ.)। মথুরার তিন ক্রোশ দূরে যমুনার বাম তটে অবস্থিত নগর ও বন। স্বনামখ্যাত তীর্থ। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে দানবদের নিহত করেন, তারপর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি বলে বৃন্দাবন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। (পৌ.অ.)।। **৪.** স্থান নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **জন্তু, তুলসী**। ব.শ. অমরকোষ টীকা থেকে **বৃন্দ** শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন — যেমন সজাতি**বৃন্দ** = কুল; পশুপক্ষি**বৃন্দ** = যূথ; জাতিপ্রভৃতি-সম**বৃন্দ** = মনুষ্যবর্গ; সজাতিবিজাতিজন্তু **বৃন্দ** = সঙ্ঘ, সার্থ। যথা ভিক্ষুসঙ্ঘ। — এইসব উদাহরণ অমরকোষ কেন দিতে গেলেন? ব.শব্দকোষই বা সেগুলিকে উদ্ধৃত করলেন কেন? (তাছাড়া 'সজাতিবিজাতি**জন্তু**' কথাটির মানে কী? দ্র. **জন্তু**।)

কারণ, এর ভিতরে সেই মূল ব্যাপারটি সুপ্ত আছে, যার সাহায্যে **বৃন্দ**কে বুঝতে পারা যায়। 'বাহীর আবর্তন দান করে যে', তাকেই তো **বৃন্দ** বলে। মূল ব্যাপার সেটিই। **বৃন্দ** তাকেই বলা যায়, যার ভিতরে এমন 'বহুসংখ্যা' রয়েছে, যার সাহায্যে সত্তাটি আ**বর্তিত** হতে পারে। অর্থাৎ কিনা, সত্তাটি একটি **পূর্ণ** রূপ (তা সে ছোট-**পূর্ণ** হোক আর বড়-**পূর্ণ**ই হোক) বা গোলকের (ফুটবলের) মতো রূপ পেয়ে যেতে পেরেছে, এবং অতঃপর সে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারবে। যতজন সদস্য হলে একটি 'ভিক্ষুসঙ্ঘ' চলতে পারত, ততজন হলেই সেটি ভিক্ষু**বৃন্দ** হতে পারে। যতজন হলে একটি বণিকদল একদেশ থেকে আরেক দেশে তাদের পণ্যাদি নিয়ে যাওয়ার সাহস করতে পারত, ততজন হলেই তাকে বলা যেতে পারে সার্থ বা বণিক**বৃন্দ**। ... পরে পরে কথাটি আরও ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকলেও, মূলে **বৃন্দ** শব্দটি একপ্রকার **পূর্ণ**তা বোঝাতে ব্যবহৃত হত।

মানবসমাজে এই **বৃন্দ**-এর আধারশক্তি বা **বৃন্দা** নিশ্চিতভাবেই একটি জনগোষ্ঠীই বটে। ভারতসমাজের ইতিহাসের কোনো একটি অধ্যায়ে কোনো একটি স্থানে এই 'বিষ্ণুপ্রিয়া' গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। তার কথা উপরোক্ত **বৃন্দা**র কাহিনীতে (এবং ১ম খণ্ডে **তুলসী**র কাহিনীতে) বলা হয়েছে। তাঁদের **বন**টিই **বৃন্দাবন**। দ্র. **বন**। কিন্তু এই **বৃন্দাবন** কোথায়? দ্র. **ব্রজধাম**।

বৃশ্চিক (বৃশ্চিকালী, বিছা, বিছাতি) : ১. ✓ব্রশ্চ্ + ইক (কিকন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বৃশ্চিক*** = *আবর্তনবাহীর বিচ্ছুরণকে গতিশীল করে যে।* ***বৃশ্চিকালী*** = ***বৃশ্চিক****-এর আধাল গতিশীলভাবে লালিত যাহাতে।* ***বিছা*** = *বিপরীতভাবে ছাদন করে যে আধার।* ***বিছাতি*** = ***বিছা*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* / **বৃশ্চিক** = ছেদন করে যে। (ব.শ.)। **৩. বৃশ্চিক** = কীটভেদ, বিছা, শূককীট, কর্কট, গোময়কীট, শতপদীভেদ, (জ্যোতিষে) রাশিভেদ, বৃশ্চিকরাশিযুক্ত অগ্রহায়ণ মাস, ওষধিভেদ, মদনবৃক্ষ। **বৃশ্চিকালী** = স্পর্শমাত্র জ্বালাকর, ক্ষুপভেদ, বিছাটী। **বিছা** = বৃশ্চিক ... ইত্যাদি। **বিছাতি** = বৃশ্চিকালী, বিছুটি, গাত্রস্পর্শে বিষজ্বালাকর লতাবিশেষ ও তাহার পাতা (nettle)। (ব.শ.)। **৪. বৃশ্চিক** জ্যোতিষে প্রচলিত, **বিছা** ও **বিছাতি** খুবই প্রচলিত; **বৃশ্চিকালী** অপ্রচলিত। **৫.** যে নিয়মে সাহিত্য শব্দের সঙ্গে 'ইক' **প্রত্যয়** যোগ করলে সে **সাহিত্যিক** হয়ে যায়, সেই নিয়মে **ব্রশ্চ্**-এর সাথে 'ইক' যোগ করলে **বৃশ্চিক** হয়ে যায়। এই **বৃশ্চিক** যাকে অন্তত একবার কামড়েছে, তিনি নিশ্চিত জানেন সত্তাটি কী চরিত্রের। তার মানে, **ব্রশ্চ** করে বা ছেদন করে অর্থাৎ কামড়ায় বলে, এই সত্তাটিকে প্রাচীন বাংলায় বলা হত **বৃশ্চিক**, পরবর্তীকালে তাকেই **বিছা** বলার চল হয়ে যায়। আর, **বৃশ্চিকালী** বা **বিছাতি** (যাকে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় **বিছাতি, বিছুটী, বিছাটী** ... ইত্যাদি বলে) যার গায়ে একবার লেগেছে, তিনি জিনিসটাকে কখনো ভুলতে পারেন না। গ্রামবাংলায় তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও চোর ধরা পড়লে তাকে 'জলবিছুটী' দিয়ে মারা হত একপ্রকার শাস্তি হিসেবে। এটি আলকুষি (যাকে কপিকচ্ছু, শূকশিম্বী, নেঙ্গুসও বলা হয়) নামক আরও জ্বালাকর বস্তু গায়ে দেওয়ার চেয়ে কম কষ্টকর। একালে কারও জামাকাপড়ে আলকুষি দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে পড়ে। সে তুলনায় **বিছুটী** দেওয়া লঘু শাস্তি। মেদিনীপুরের কিশোররা 'বউমারী' খেলার সময় ডু-ডু ডু-ডু কিংবা কিৎ-কিৎ কিৎ-কিৎ-এর পাশাপাশি নানারকম ছড়া কেটে দম রাখে, তার মধ্যে একটি ছড়া হল — 'নদীর ধারে বিছাতি বন / তোকে মারতে কতক্ষণ'। দ্র. **ভাসুরপুষ্পা**।

এত কথার কারণ এই যে, দেখা যাচ্ছে, **বৃশ্চিক** শব্দটির ব্যবহার দৃশ্যালোকে খুবই প্রচলিত আছে, কিন্তু অদৃশ্যালোকে তার যে অর্থ,

যাকে ধরে রাখা হয়েছে জ্যোতিষে, সেটির ব্যবহার হয় না বললেই চলে। আমাদের ধারণা, যে সকল বহুপদী সামাজিক সংগঠন আমাদের সমাজে রয়েছে, যাতে অনেক লোক একত্রে কাজ করে, তাদের মধ্যে যে সামাজিক সংগঠন আক্রমণকারী দলবল রূপে সক্রিয় হয়, সেগুলিকে **বৃশ্চিক** বলা হয়ে থাকবে। যেমন জমিদারের লেঠেল বাহিনী, ডাকাতের দলবল ... ইত্যাদি।

বৃজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আওজন, আওজান, আবর্জ্জন, আবর্জ্জনা, ক-বর্গ, চ-বর্গ, পাতালবর্গ, বরগা (কড়িবরগা), বরগাঁ, বরগোঁ, বরঙ্গ, বরোঙ্গ, বর্গ, বর্গক্ষেত্র, বর্গপদ, বর্গমূল, বর্গা, বর্গি (দ্র.বৃ), বর্গীয়, বর্গ্য, বর্জ্জ, বর্জ্জন, বর্জ্জনীয়, বর্জ্জনীয়া, বর্জ্জয়িতব্য, বর্জ্জয়িতা, বর্জ্জিত, বর্জ্জ্য, বাগ (বর্গ), বৃজ্, বৃজন, বৃজিন, বৃজিনী, ভূমিবর্গ, ভৃত্যবর্গ, ষড়বর্গ, স্বর্গবর্গ।
বৃজ্ = আবর্ত্তনবাহীর জনন। **বৃজ** = আবর্ত্তনবাহীর জনন থাকে যাহাতে।

আবর্জ্জনা (আবর্জ্জন) : **১.** আ + ✓ বর্জ্জি + অন - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ। (ব.শ.)। **২.** ***আবর্জ্জন*** = *বর্জ্জনের আশ্রয় যাহাতে।* ***আবর্জ্জনা*** = ***আবর্জ্জন****-এর আধার যে।* **৩. আবর্জ্জন** = আনমন, নম্রীকরণ, ত্যাগ, দান, ক্ষেপণ, বশীকরণ। **আবর্জ্জনা** = পরিত্যাজ্য অসার দ্রব্য, ধুলা খড় কুটা প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলার মত দ্রব্য, জঞ্জাল। (ব.শ.)। **৪.** waste অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বর্জ্জন**। এখন 'আবর্জ্জনা' বলতে আমরা 'অসার দ্রব্য' কিংবা 'যা অপ্রয়োজনীয়', কোনো কাজে লাগে না এমন দ্রব্য বুঝি। কিন্তু এই শব্দে তা বলা নেই। যা **বর্জ্জন** করা হয়, তা সবই আ**বর্জ্জনা** পদবাচ্য, সেই বস্তু কাজের কি অকাজের সেটা পরের প্রশ্ন। অতি প্রাচীনকালে সমাজের যৌথ উৎপন্নের যে অংশ ভোগ করে নেওয়ার পরও 'অবশেষ' রূপে থেকে যেত, সেসব কিছুকেই 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপস্থানে' ফেলে দেওয়া হত। দ্র. **অবশেষ**। কারণ উদ্বৃত্তকে সেকালের মানুষ চিনেছিলেন সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে। তাই উদ্বৃত্ত উৎপন্নকে **বর্জ্জন** করা হত। আর, যে-ব্যক্তি তার পরেও 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপস্থানে' যেত, সেইসব নিক্ষিপ্ত **বর্জ্জিত** থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে, তাকে নিন্দা করা হত **'কিরাত'** বলে।

বর্গ (বর্গক্ষেত্র, বর্গমূল, বর্গীয়, অপবর্গ, চতুর্ব্বর্গ, পঞ্চবর্গ) : **১.** ✓ বৃজ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অপবর্গ*** = ***অপ*** *(নেই পালন যাহাতে) বর্জ্জিত হয় যাহাতে বা যাহা হইতে। /* **বর্গ** = যাহাতে বিজাতি বর্জ্জিত। **বর্গক্ষেত্র** = যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান। **অপবর্গ** = যাহাতে দুঃখ অপবর্জ্জিত হয়। (ব.শ.)। **৩. বর্গ** = সজাতিসমূহ, গণ, বিভাগ, শ্রেণী, সমানস্থানকরণ বর্ণসমূহ, গ্রন্থবিভাগ, পরিচ্ছেদ, ঋগ্বেদের অধ্যায়বিশেষ, (গণিতে) সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফল (square), চতুর্ব্বর্গ - ধর্ম্মাদি। **বর্গমূল (বর্গপদ)** = বর্গের মূলরাশি (square-root)। **বর্গীয়** = বর্গসম্বন্ধী, বর্গগত, বর্গস্থিত, বর্গভব, **পক্ষ্য** জন, যূথ্য। **অপবর্গ** = বিতরণ, উৎসর্জ্জন, দান, অপবর্জ্জন, ত্যাগ, **মোক্ষ, ক্ষেপ**, (ত্যাগের হেতুভূত) সমাপ্তি, অবসান, ফলপ্রাপ্তি, ফলপ্রাপ্তিহেতুক কর্ম্মসমাপন, ক্রিয়াবসানসাফল্য, কর্ম্মফল, পূর্ণতা, নির্ব্বাণ, উপহার। **চতুর্ব্বর্গ** = ধর্ম্মাদিচতুষ্টয়ের বর্গ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, বিষয়চতুষ্টয়মাত্রের বর্গ। **পঞ্চবর্গ** = পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চের বর্গ বা সমবায়, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চমহাভূত। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র **বর্গক্ষেত্র** ও **বর্গমূল** শব্দদুটি যথাক্রমে square ও square-root অর্থে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** ব.শ. ঠিকই জানিয়ে গেছেন যে, 'যাহাতে বিজাতি বর্জ্জিত' তাকে **বর্গ** বলে, তা সে হাতিবর্গ, ঘোড়াবর্গ, গাছবর্গ, মাছবর্গ, **ভৃত্যবর্গ** ... এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। তবে যখন হাতিবর্গের কথা বলা হবে, তখন কেবল হাতিদেরই হিসাবে ধরতে হবে এবং অন্য সব জাতিকে বাদ দিতে হবে বা **বর্জ্জন** করতে হবে; ... যখন **ভৃত্যবর্গে**র কথা বলা হবে, তখনও কেবল ভৃত্যদেরই হিসাবে ধরতে হবে এবং অন্য সব জাতিকে **বর্জ্জন** করতে হবে। কিংবা **ক-বর্গে**র বেলায় যখন **ক, ক**-এর সঙ্গে হ্ বা **খ** ... ইত্যাদি **বর্ণ**সমূহের কথা বলা হবে, তখন কেবল **ক** এবং তার অনুজদের কথাই বলতে হবে, অন্যদের **বর্জ্জন** করতে হবে। এভাবেই **ক-বর্গ, চ-বর্গ** ... ইত্যাদি **বর্গ** হয়। 'অমরকোষ' নামক শব্দকোষ গ্রন্থটির 'বর্গাদি-সূচী'তে, আমাদের ভাষার সমস্ত শব্দকে মোট ৩৩ রকম **বর্গে** ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল — স্বর্গবর্গ, ব্যোমবর্গ, দিগ্‌বর্গ, কালবর্গ, ধীবর্গ, শব্দাদিবর্গ, নাট্যবর্গ, পাতালবর্গ, ভোগিবর্গ, নরকবর্গ, বারিবর্গ, ভূমিবর্গ, পুরবর্গ, শৈলবর্গ, বনৌষধিবর্গ, সিংহাদিবর্গ, মনুষ্যবর্গ, ব্রহ্মবর্গ, ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যবর্গ, শূদ্রবর্গ, বিশেষ্য-নিঘ্নবর্গ, সঙ্কীর্ণবর্গ, নানার্থবর্গ, অব্যয়বর্গ, লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ, স্ত্রীলিঙ্গ-সংগ্রহবর্গ, পুংলিঙ্গ সংগ্রহবর্গ, ক্লীবলিঙ্গসংগ্রহবর্গ, পুংনপুংসকসংগ্রহ-বর্গ, স্ত্রীনপুংসকশেষ-সংগ্রহবর্গ, স্ত্রীনপুংসকসংগ্রহবর্গ, ত্রিলিঙ্গ-সংগ্রহবর্গ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রে যেমন 'সেট'-এর অঙ্কভাবনা ভাবা হয়ে থাকে, **বর্গের** ভাবনা অনেকটা সেই রকম। একটি বিষয় ভেবে নিয়ে, সেই বিষয়টি রেখে বাকি সবকিছুকে **বর্জ্জন** করলে যা থাকে, সেটি একটি **বর্গ** হয়। *অমরকোষ* সেভাবেই ভাষার শব্দগুলিকে বিষয়ভিত্তিক **বর্গ** ভাগ করে সাজিয়েছিলেন।

আমাদের শব্দবিদ পূর্বসূরিগণ বাংলাভাষার **বর্ণ**গুলিকেও প্রথমে পাঁচটি **বর্গে** সাজিয়েছিলেন — **ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ**। তারপর সংকর **বর্ণ**দের স্থান দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সেই পঞ্চবর্গের সঙ্গে সংকর বর্ণদের জুড়ে দিয়ে মোট ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণকে মোট ৮টি **বর্গে** বিন্যস্ত করে নিয়েছিলেন।

আমাদের গণিত ও জ্যামিতি বিষয়ের পণ্ডিতেরা সেই **বর্গ**-এর ধারণাকে প্রয়োগ করেছিলেন **বর্গমূল** ও **বর্গক্ষেত্রে**। একটি ক্ষেত্রে একটিমাত্র মাপের রেখাকে পরপর সাজানো গেলে, অন্য সর্বপ্রকার মাপের রেখাকে **বর্জ্জন** করলে, যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়; তাকে বলা হয় **বর্গক্ষেত্র**। রেখাটির মাপ যদি লম্বায় ১০ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ১ ইঞ্চি হয় (= ১০ বর্গইঞ্চি হয়), তবে দেখা যায়, তাতে মোট ১০টির বেশি রেখা টানা যাচ্ছে না। সেই কারণে ১০০ বর্গইঞ্চি মাপের **বর্গক্ষেত্রটির বর্গমূল** ঐ ১০ বর্গইঞ্চিই হয়। তার মানে,

বর্গক্ষেত্রের মাপ যত লম্বা রেখা দিয়ে যে একককে (ফুট ইঞ্চি বা মিটার মিলিমিটার ইত্যাদি) হবে, তার **বর্গমূল**ও সেই রেখার সংখ্যার সমান হবে, তাই তাকে **বর্গমূল** বলে। অন্য মাপের রেখা এখানে **বর্জ্জন** করা হয় বলেই একে **বর্গক্ষেত্র** ও **বর্গমূল** নাম দিয়েছিলেন আমাদের প্রাচীন অঙ্ক-জ্যামিতির জ্ঞানীরা। ইংরেজি square শব্দের সে গৌরব নেই।

আমাদের প্রাচীন **ধর্ম্ম**গ্রন্থগুলিতে **চতুর্ব্বর্গ** ও **অপবর্গ** কথাটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়টি আমরা **পুরুষার্থ** শব্দে কমবেশি ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের জীবনের **অর্জ্জন**ায়গুলির **বর্জ্জনীয়**গুলি **বর্জ্জন** করে যা যা থাকে তাদের চারটি **বর্গে** ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। সেই ভাগগুলি হল — **ধর্ম্ম** অর্থ কাম মোক্ষ। এই **চতুর্ব্বর্গ অর্জ্জন**কে **পুরুষার্থ** বলে। অর্থাৎ, যা যা আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্বকে ধরে রাখে (**ধর্ম্ম**) সেগুলিকে লাভ করা; যে যে ক্রিয়া (**অর্থ**) আমাদের নিজেকে বাঁচতে, বিকশিত হতে সাহায্য করে সেগুলি করতে পারা; যে যে ইচ্ছা (**কাম**) আমাদের নিজ নিজ অভাব পূরণ করে সেগুলিকে পাওয়া; যে যে সম্বন্ধের বন্ধন আমাদের প্রত্যেককে বেঁধে রাখে, এগোতে দেয় না, সেগুলি থেকে মুক্তি (**মোক্ষ**) লাভ করা। এই হল **চতুর্ব্বর্গ** লাভ করা।

আর, **অপবর্গ** হল, 'যাহাতে অপ (অর্জ্জন) গুলি বর্জ্জিত হয়'। তার মানে, কর্মশেষে কর্মের **অপ**-ফল ত্যাগ করতে হয় ও **চতুর্ব্বর্গ** ফল গ্রহণ করতে হয়, এভাবেই 'ক্রিয়াবসানসাফল্য' আসে। কর্মের 'ফলপ্রাপ্তিহেতুক কর্ম্মসমাপন' ঘটে, 'পূর্ণতা' লাভ হয়, **নির্ব্বাণ** প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু **অপবর্গ** শব্দটির ব্যবহার এখানেই সীমিত থাকেনি, পরে পরে সবকিছু ত্যাগ করে দেওয়া, **মোক্ষ**লাভ করা ইত্যাদি অর্থে শব্দটি প্রতীকী হয়ে স্থির অর্থধারী হয়ে যায়।

বর্জ্জন : : ১. ✓বৃজ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বৃজ্** *(আবর্ত্তবাহী হইতে জনন) অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. অনভিসম্বন্ধ, পরিত্যাগ, সমাপন, সংস্কার ছাড়ান। (ব.শ.)। ৪. throw away অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বৃক**। যে সত্তা আ**বর্ত্তিত** হয়ে হয়ে চলেছে, **বর্ত্তমান** রয়েছে, তার স্বভাবে দুরকম ক্রিয়া থাকে — এক) অন্য কাউকে আ**বর্ত্তনে**র আ**বর্ত্তে**র ভিতরে টেনে নেওয়া; দুই) আ**বর্ত্তে**র ভেতর থেকে কোনো কিছুকে ছিটকে বাইরে বের করে দেওয়া। এর মধ্যে প্রথম ক্রিয়াটি করে যে, তাকে বলে **বৃক্**-করণ। আর, দ্বিতীয় ক্রিয়াটি করে যে, তাকে বলে **বৃজ্**-করণ বা **বর্জ্জন**। ব.শ. একে বলেছেন 'অনভিসম্বন্ধ'। তার মানে, যার যার সঙ্গে 'অভিসম্বন্ধ' আছে, তাকে টেনে নিজের আ**বর্ত্তে** ঢুকে নেওয়া হল **বৃক্**-করণ এবং যার যার সঙ্গে 'অভিসম্বন্ধ' নেই, তাকে ঠেলে নিজের আ**বর্ত্ত** থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল **বৃজ্**-করণ বা **বর্জ্জন**। দ্র. **আবর্জ্জনা**।

বৃৎ (বর্ত্তি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপ্রবৃত্তি, অতিবর্তন, অতিবর্ত্তুল, অতিবৃত্ত, অনাবৃত্তি, অনিবর্ত্তী, অবর্ত্তমান, অবৃত্ত, অসন্নিবৃত্তি, আউট, আউটা, আউটন, আউটান, আউটৌ, আউট্যা, আওটা, আওড়, আওড়া, আবর্ত্ত, আবর্ত্তক, আবর্ত্তন, আবর্ত্তনী, আবর্ত্তনীয়, আবর্ত্তিত, আবর্ত্তী, আবৃত্ত, আবৃত্তি, আবৃত্তিদীপক, আবৃৎ, উঞ্ছবৃত্তি, উদ্‌বৃত্ত, নিবর্ত্ত, নিবর্ত্তন, নিবৃত্ত, প্রত্যাবর্ত্তন, প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তনা, প্রবৃত্ত, প্রবৃত্তি, বতুল, বত্ত, বর্ত্ত, বর্ত্তক, বর্ত্তন, বর্ত্তনার্থী (বেতনার্থী), বর্ত্তনী, বর্ত্তমান, বর্ত্তা (অর্শান), বর্ত্তান, বর্ত্তি(র্ত্তী), বর্ত্তিক, বর্ত্তিকা (বাতি), বর্ত্তিত, বর্ত্তিতব্য, বর্ত্তিষ্ণু, বর্ত্তী (বশবর্ত্তী), বর্ত্তুল (বতুল, বোতল), বর্ত্তুলা, বর্ত্ম, বর্ত্মকর্ম্ম, বাতি, বাতিদান, বাতিগ, বাতিগম, বাতিঙ্গণ(ন), বাতিল, বাতুল, বাত্তকি, বারতা, বার্ত্ত, বার্ত্তকী, বার্ত্তন, বার্ত্তা, বার্ত্তাক, বার্ত্তাকর্ম্ম, বার্ত্তাকী, বার্ত্তাকু, বার্ত্তানুজীবী, বার্ত্তাপতি, বার্ত্তাবৃত্তি, বার্ত্তাবহ, বার্ত্তামূল, বার্ত্তারম্ভ, বার্ত্তাহর, বার্ত্তাহার, বার্ত্তাহারী, বার্ত্তাহারিণী, বার্ত্তাহর্ত্তা, বার্ত্তিক, বার্ত্তিককার, বার্তঘ্ন, বিত্তি, বিত্তায়, বিত্তেশ, বিত্তেশ্বর, বিত্তেহা, বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তন, বিবৃত্ত, বৃটন, বৃৎ, বৃত্ত, বৃত্তক, বৃত্তকর্কটী, বৃত্তকায়, বৃত্তখণ্ড, বৃত্তগন্ধ, বৃত্তগন্ধি, বৃত্তচূড়, বৃত্তচুল, বৃত্ততণ্ডুল, বৃত্তপুষ্প, বৃত্তফল, বৃত্তবন্ধ, বৃত্তবান, বৃত্তভঙ্গ, বৃত্তশস্ত্র, বৃত্তশালী, বৃত্তসম্পন্ন, বৃত্তসাদী, বৃত্তস্থ, বৃত্তহীন, বৃত্তা, বৃত্তানুপূর্ব্ব, বৃত্তানুবর্ত্তী, বৃত্তান্ত, বৃত্তি, বৃত্তিকর, বৃত্তিকর্ষিত, বৃত্তিকার, বৃত্তিকৃৎ, বৃত্তিচক্র, বৃত্তিচ্ছেদ, বৃত্তিদান, বৃত্তিনিবন্ধন, বৃত্তিনিরোধ, বৃত্তিভঙ্গ, বৃত্তিভাক্(জ্), বৃত্তিহন্তা, বৃত্তিহেতু, বৃত্তোরু, বৃত্তৌজাঃ, বৃত্ত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যুপায়, বৃত্র, বৃত্রদ্বিট্, বৃত্রনাশন, বৃত্রবিজয়ী, বৃত্রশত্রু, বৃত্রহন্তা, বৃত্রারি, বৃত্রাসুর, বেতন, বেতনার্থী, বোতল, ব্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মবৃত্তি (উঞ্ছবৃত্তি), সমাবর্ত্তন, সমাবৃত্ত।

বৃৎ (বর্ত্তি) = বাহীর ঘূর্ণন বা আবর্ত্তন। **বর্ত্তি** = বাহীর ঘূর্ণমানতা বা আবর্ত্তন গতিশীল যাহাতে। [নিজেকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিত বা আবর্ত্তিত হওয়াকেই **বৃৎ**-করণ বলে। **বর্ত্তি** হল, তদ্রূপে ঘূর্ণিত হতে থাকা বা আত্মকেন্দ্রিক আ**বর্ত্তিত** হওয়ার গতিশীল রূপ। এই **বৃৎ** ক্রিয়ার বিশেষত্ব হল, একা একা শব্দটির ব্যবহার হয় না বললেই চলে, কিন্তু উপসর্গ যোগে প্রতি স্তরে এর এত বিপুল ব্যবহার হয়ে থাকে যে, এর সঙ্গে কেবলমাত্র **কৃ** ক্রিয়ারই তুলনা চলে। সর্বোপরি, এই ক্রিয়াপরিবারের সদস্যদের অধিকাংশেরই প্রতীকায়ন ঘটেনি, অর্থাৎ, তাদের তথাকথিত 'আধুনিকী'করণ হয়নি। ফলে, আধুনিক অভিধান ও শব্দকোষ রচয়িতাগণ মুশকিলে পড়ে গেছেন। তাঁরা এই সকল শব্দের প্রতীকী অর্থ সরবরাহ করার উপায় খুঁজে পাননি। এমনকি ব.শব্দকোষও শব্দগুলির প্রতীকী অর্থ দিতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছেন। নীচের শব্দগুলির ক্ষেত্রে পাঠকপাঠিকা সে ব্যাপারটি মিলিয়ে দেখে নিতে পারবেন। আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি শব্দের ক্ষেত্রে সেই সমস্যাটি দেখিয়ে রাখছি —

আবর্ত্তিত শব্দের কোন অভিধান কী মানে দিয়েছে, একবার দেখুন। ব.শ. মানে দিচ্ছেন — পরিঘট্টিত, আলোড়িত, দ্রবিত, দ্রবীকৃত, গুণিত, ঘূর্ণিত, বারংবার উচ্চারিত, অভ্যস্ত, পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট, সঞ্জাতাবর্ত্ত, আবর্ত্তযুক্ত। ছা.অভিধান মানে দিচ্ছেন — অভ্যস্ত, গুণিত, বিলোড়িত, আলোড়িত, প্রত্যাবর্ত্তিত, আবৃত, আচ্ছাদিত, বেষ্টিত। ব্য.বা.অ.ঢাকা **আবর্ত্তিত** বা **আবর্তিত** শব্দের কোনো মানেই দেননি, দিয়েছেন **আবর্তিত-বাত্যা**র মানে — ঘূর্ণীবায়ু, cyclone। কলকাতার সংসদ বাংলা অভিধানও **আবর্ত্তিত**-এর দ্বিত্ব বর্জ্জন করেছেন এবং জানাচ্ছেন, **আবর্তিত** শব্দের মানে হল, 'আবর্তন

করা হয়েছে এমন'। এই পরিস্থিতি আমাদের কতগুলি ব্যাপার একসঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছে।

(এক) বেশ কিছু বাংলা শব্দ রয়েছে যাদের প্রতীকায়ন ঘটেনি; সেকারণে প্রতীকী অভিধানগুলিতে তাদের অর্থ পর্যন্ত ঠিকঠাক দেওয়া যায়নি; যেটুকু দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার অধিকাংশই ভুল।

(দুই) এমনকি কলকাতার স.বা.অভিধানের মতো ইংরেজির স্বভাব-অনুকরণকারী অভিধানও নিজের অজান্তে **আবর্তিত** শব্দের মানে দিয়েছেন 'বাক্যের সাহায্যে', যা কিনা ক্রিয়াভিত্তিক মানে দেওয়ার রীতিকে অজান্তেই অনুসরণ করেছে; এবং সন্দেহ নেই এই প্রকার অর্থপ্রদান **আবর্ত্তিত** শব্দের প্রকৃত অর্থ অনেকটাই প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। তার মানে, এই শব্দগুলির কেবলমাত্র ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই হয়। সেই অর্থ বাংলাভাষী বুঝতেও পারেন।

(তিন) শব্দের দ্বিত্ব-বর্জ্জনের সিদ্ধান্তটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে, এবং এটি একটি গুরুতর ভুল সিদ্ধান্ত। **বর্ত্তন** আর **বর্তন** এক ব্যাপার নয়, যেমন নয় **আবৃত্ত আবৃত** এবং **নিবৃত্ত নিবৃত**ও। বরণ তারিত হলে **বৃত** (**বৃ** + ত = বৃত) হয়, **আবৃত** হয়, **নিবৃত** হয়, **আবরণ** হয়; আর, বর্ত্তন তারিত হলে **বর্ত্ত** (**বৃৎ** + ত = বর্ত্ত) হয়, **আবর্ত্ত** হয়, **নিবৃত্ত** হয়, **আবর্ত্তন** হয়। উৎসে **বৃৎ** + ত থাকলে **আবর্তন** বা **আবর্তিত** হওয়ার উপায় থাকে না, তাদের **আবর্ত্তন** বা **আবর্ত্তিত** হতেই হয়, অন্যথায় অর্থও বদলে যায়। কার্যত, দ্বিত্ব তুলে দিয়ে বহুকালক্রমাগত ও প্রচলিত স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষার অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়েছে। অবশ্য প্রতীকী বাংলার ক্ষতি হয়নি, ইংরেজির মতো আভরণহীন হয়ে হালকা হতে পেরেছে; এবং এভাবে হালকা হতে হতে বর্ত্তমানে তার উদোম হতে আর সামান্যই বাকি।]

আবর্ত্ত (আবর্ত্তন, আবর্ত্তিত) : **১.** আ + ✓বৃৎ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***আবর্ত্ত*** = ***বর্ত্ত****-এর (আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণনের) আশ্রয় যাহাতে।* ***আবর্ত্তন*** = ***আবর্ত্ত*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***আবর্ত্তিত*** = ***আবর্ত্ত*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যার* ***আবর্ত্তন*** *হয়ে গেছে বা ঘটে গেছে।* **৩. আবর্ত্ত** = চক্রাকারে ভ্রমণ, জলভ্রমি, শরীরস্থ রোমাবর্ত্ত, ঘোটকের ধ্রুবনামক রোমাবর্ত্ত, মেঘাধিপতিবিশেষ, রাজাবর্ত্তমণি, আবর্ত্তাকার নাড়ীসংস্থান, অনেক-কোটিস্পর্শী (নানাপক্ষান্বিত) সংশয়, সংসার, ভ্রূর উপরিস্থ ললাটের নিম্নস্থলদ্বয়, পুনঃ পুনঃ চালন, পরিঘট্টন। **আবর্ত্তন** = চক্রাকারে ভ্রমণ, অভিমুখীভাব, পরিঘট্টন, ধাতুদ্রাবণ, অভ্যাবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ পাঠ, গুণন ...। **আবর্ত্তিত** = পরিঘট্টিত, আলোড়িত (দুগ্ধাদি), দ্রবিত, দ্রবীকৃত (ধাতু-প্রভৃতি), গুণিত, ঘূর্ণিত, বারংবার উচ্চারিত, অভ্যস্ত, পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট, সঞ্জাতবর্ত্ত, আবর্ত্তযুক্ত। (ব.শ.)। **৪.** rolling অর্থে **আবর্ত্তন** প্রচলিত, **আবর্ত্ত** অপ্রচলিত। **৫. বৃৎ** ক্রিয়ামূলের অর্থ দ্রষ্টব্য। যা কিছু নিজেকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তাদের সেই ঘূর্ণনকে **বর্ত্ত** বলে এবং তদ্রূপে ঘূর্ণিত হওয়া বা আবর্ত্তিত হওয়াকে **বর্ত্তন** বলে। **বর্ত্ত**-এর ও **বর্ত্তন**-এর আশ্রয়কে যথাক্রমে **আবর্ত্ত** ও **আবর্ত্তন** বলে। তবে কিনা, এই **আবর্ত্ত** বা **আবর্ত্তন** শব্দটি দৃশ্য **আবর্ত্তন**-এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় অদৃশ্য **আবর্ত্তন** অর্থে। একটি মানুষ সকালে উঠে মাঠে চাষ করতে যায় বা অফিসে কাজ করতে যায়, তার নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করে, ঘরে ফেরে, খায় দায় ঘুমোয়, পরের দিন আবার একই ভাবে সকালে উঠে কাজে যায়; এভাবেই সে তো নিজেকে কেন্দ্র করে **আবর্ত্তিত** হয়ে চলেছে। এই বিশ্বজগতে যা কিছু **বর্ত্তমান**, তারা প্রত্যেকেই তো এভাবে নিজ নিজ **আবর্ত্তে** নিত্য **আবর্ত্তমান** রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরিদের বিচারে এমন একটি **বর্ত্তমান** সত্তা নেই, যে তার আপন **আবর্ত্তে** আবর্ত্তিত হচ্ছে না। দ্র. **বর্ত্ত, বর্ত্তমান, আর্য্যাবর্ত্ত**।

বর্ত্ত (বর্ত্তন, বর্ত্তমান, বর্ত্তিত — অনুবর্ত্তন, অনুবর্ত্তিত, আবর্ত্তমান, আবর্ত্তিত, উদ্বর্ত্তন, উপবর্ত্তন, নিবর্ত্ত, নিবর্ত্তন, প্রত্যাবর্ত্তন, প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তনা, প্রবর্ত্তিত, বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তন, বিবর্ত্তিত) : **১.** ✓বৃৎ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (দ্র. **আবর্ত্ত** / ব.শ.)। **২.** ***বর্ত্ত*** = *বাহীর তারণ তারিত যাহাতে; অথবা, বাহীর আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণন যাহাতে।* ***বর্ত্তন*** = ***বর্ত্ত*** *অন (on) যাহাতে।* ***বর্ত্তমান*** = *যাহা বিশেষ* ***আবর্ত্তে*** *ঘূর্ণমান আছে।* ***বর্ত্তিত*** = ***বর্ত্ত*** *গতিশীল বা সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে।* ***অনুবর্ত্তন*** = ***অনু*** *(পশ্চাতে বা ক্ষুদ্রাকারে)* ***বর্ত্তন*** *থাকে যাহাতে।* ***অনুবর্ত্তিত*** = *যাহা* ***অনুবর্ত্তন*** *করিয়াছে।* ***আবর্ত্তমান*** = ***বর্ত্তমান*** *আশ্রিত থাকে যাহাতে।* ***আবর্ত্তিত*** = *যাহা* ***আবর্ত্তন*** *করিয়াছে।* ***উদ্বর্ত্তন*** = *উদলোকে* ***বর্ত্তন*** *যাহার।* ***উপবর্ত্তন*** = ***বর্ত্তন****-এর* ***উপ*** *যে।* ***নিবর্ত্ত*** = *নিষিদ্ধ বা নিরুদ্ধ* ***বর্ত্ত*** *যাহার।* ***নিবর্ত্তন*** = ***নিবর্ত্ত*** *অন (on) যাহাতে।* ***প্রত্যাবর্ত্তন*** = *বিপরীত দিকে বা প্রতিকূলে* ***আবর্ত্তন*** *থাকে যাহাতে।* ***প্রবর্ত্তন*** = *প্রকৃষ্ট* ***বর্ত্তন*** *যাহাতে।* ***প্রবর্ত্তনা*** = ***প্রবর্ত্তন****-এর আধার যে।* ***প্রবর্ত্তিত*** = *যাহার* ***প্রবর্ত্তন*** *করা হইয়াছে।* ***বিবর্ত্ত*** = *বিকল্প বা বিপরীত* ***বর্ত্ত*** *যে বা যাহাতে।* ***বিবর্ত্তন*** = ***বিবর্ত্ত*** *অন (on) যাহাতে।* ***বিবর্ত্তিত*** = *যাহার* ***বিবর্ত্তন*** *হইয়াছে।* **৩. বর্ত্ত** = অবস্থিতি করা, থাকা ...। **বর্ত্তন** = বর্ত্তিষ্ণু, স্থিতিশীল ...। **বর্ত্তমান** = বিদ্যমান, জীবিত, আধুনিক, জীবনধারী, আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত কালভেদ। **বর্ত্তিত** = পালিত, নিষ্পাদিত ...। **অনুবর্ত্তন** = অনুসরণ, অনিবৃত্তি ...। **আবর্ত্তমান** = ঘূর্ণমান, প্রত্যাবর্ত্তমান ...। **আবর্ত্তিত** = পরিঘট্টিত, দ্রবিত ...। **উদ্বর্ত্তন** = উদ্‌গমন, অতিরেক ...। **উপবর্ত্তন** = জনপদ, রাজ্য ...। **নিবর্ত্ত** = বিরত, থামা ...। **নিবর্ত্তন** = বিরতি, নিবারণ ...। **প্রত্যাবর্ত্তন** = প্রত্যাগমন। **প্রবর্ত্তন** = রতি, সংঘটন। **প্রবর্ত্তনা** = প্রেরণা। **প্রবর্ত্তিত** = প্রেরিত, সংস্থাপিত ...। **বিবর্ত্ত** = ঘূর্ণন, সম্মুখে বা পশ্চাৎ আবর্ত্তন ...। **বিবর্ত্তন** = ঘূর্ণন, অন্যথাভাব ...। **বিবর্ত্তিত** = ঘূর্ণিত, বিচালিত ...। (ব.শ.)। **৪. বর্ত্ত, বর্ত্তন, বর্ত্তিত** বাদে সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। **৫.** শুরুতে একটি কথা বলে রাখা যাক — **বৃৎ** ক্রিয়া পরিবারের অধিকাংশ শব্দের প্রতীকী অর্থ দেওয়া যায় না, দেওয়ার চেষ্টা করলে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত অর্থগুলিই তার সাক্ষী। কিন্তু তাদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ শব্দগুলির প্রত্যেকের প্রকৃত অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে, দিতে পারে।

তা সে যাই হোক, '**বৃৎ** আধারিত হয় যেখানে বা যাহাতে' তাকে বলে **বর্ত্ত**। সোজা কথায়, যে নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের

চারদিকে ঘুরে চলেছে, তাকে **বর্ত্ত** বলে; এবং তার এই প্রকার ঘোরাকেও **বর্ত্ত** বলে; **কর** যেমন 'করা' হয়, 'কর' বা হাতও হয়, সেইরকম। তবে, এই **বর্ত্ত** (খানিকটা **কার**-এর মতো) আমাদের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতদের চেনা-জানার মধ্যে কোনো-কিছুকে বোঝায় না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই **বর্ত্ত**-এর সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ, প্রত্যয়াদি যুক্ত হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ আমরা দেখি, এই শব্দটি আমাদের খুবই চেনা। উপরোক্ত উপসর্গযুক্ত **বর্ত্ত** শব্দগুলি তো রয়েছেই, তার ওপর **বর্ত্তমান** শব্দটিতে গিয়ে দেখা যায়, জগৎকে দেখবার **প্রকৃত** দৃষ্টিভঙ্গীটাই রেখে দেওয়া হয়েছে **বর্ত্ত** শব্দের গভীরে। কার্যত, প্রাচ্যের **আধ্যাত্মিক** দৃষ্টিভঙ্গীর একেবারে মূল ধারণাটিই রাখা আছে এই **বর্ত্ত**-মান ধারণার ভিতরে। অ্যারিস্টটল প্লেটো সক্রেটিস থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের আধুনিক দার্শনিকদের কেউই এই ধারণায় পৌঁছোতে পারেননি — অবাক করার মতো কথা বলে মনে হলেও একথা সত্যি। কতখানি সত্যি, এই অবকাশে সে বিষয়ে আমরা কিছু শাব্দিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করে পরবর্তী বিষয়ে যাব। অন্যথায় **বর্ত্তমান** বলতে কেন 'এখন' বোঝায়, সেকথার মর্ম উপলব্ধি করা যাবে না।

যে সত্তা নিজেকে **বিদিত** করে চলেছে, তাকে যেমন **বিদ্যমান** বলে, তেমনি যে সত্তা **আবর্ত্তিত** হয়ে হয়ে চলেছে, তাকে **বর্ত্তমান** বলে। তার মানে, আমাদের সামনে যাকেই আমরা দেখি, তাকেই আ**বর্ত্তমান** সত্তা রূপে বুঝবার একটি রীতি আমরা আমাদের অজান্তেই অনুসরণ করে থাকি। অর্থাৎ কিনা, আমাদের পূর্বসূরি শব্দবিদগণ কোনো সত্তাকে স্থির অনড় অচল জড় হিসাবে বুঝতেন না; তাঁরা নিশ্চয় মনে করতেন, প্রতিটি সত্তাই আপন আপন **আবর্ত্তে** আ**বর্ত্তিত** হয়ে হয়ে চলেছে, এবং আমরা যখন তাকে দেখছি, তখনও সে আ**বর্ত্ত**মান রয়েছে। ...

কিন্তু এ তো এক অসামান্য ধারণা! তাহলে তো জড় থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত, পার্থিব থেকে শুরু করে অপার্থিব পর্যন্ত সর্বপ্রকার সত্তাই তাদের নিজ নিজ **আবর্ত্তে** ঘূর্ণায়মান হয়ে এগিয়ে চলেছে! তাহলে তো প্রতিটি সত্তাই 'আত্মকেন্দ্রিক'! অথচ 'self-centred' শব্দটি তো বলতে গেলে একরকম গালাগালি! আর, আমরা দেখছি, প্রাচ্যের উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ধারণা অনুসারে এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি সত্তাই 'আত্মকেন্দ্রিক'। কারণ তারা প্রত্যেকেই **বর্ত্ত**-মান। তাই যদি হবে, তাহলে প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে ত্যাগ ও দানের এত মহিমা কেন? জড় জীবের কথা বাদ দিলেও, প্রতিটি মানুষ যদি মূলত আত্মকেন্দ্রিক সত্তা হয়, লোকে তবে পরিবারের জন্য, গোষ্ঠীর জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য প্রাণ ও জীবন বলি দিয়ে থাকে কেন? মানুষ মাত্রেই যদি আত্মকেন্দ্রিকতায় **আবর্ত্তিত** একটি **বর্ত্ত**-মান সত্তা হয়, তাহলে কবি কেন বলবেন — 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'?

আরও বহু জানা অজানা গভীরতম মানবিক **অর্জ্জনে**র মতো, এই বিষয়ের **অর্জ্জন**ও আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। কিন্তু এই ধরনের **অর্জ্জন**কে 'কথা দিয়ে কইতে পারা' সকলের সাধ্যে কুলোয় না। রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। তিনি এই আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণনকে কেমন করে পরিবারকে কেন্দ্র করে, সমাজকে কেন্দ্র করে, জগৎকে কেন্দ্র করে ঘোরায় বদলে ফেলা হয়, তার ইশারা দিয়ে যান তাঁর 'ততঃ কিম' নিবন্ধে। সেই ইশারাকে সম্বল করে আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের শুরুতেই লেখা হয়েছিল, 'পৃথিবীটা এমন এক নিখুঁত আত্মকেন্দ্রিকতায় ঘুরে চলেছে যে তাতেই তার সূর্যের চারদিকেও ঘোরা হয়ে যায়। এমন আত্মকেন্দ্রিকতাও অতএব সম্ভব, যাতে সার্বজনীনতার সাফল্যও নিশ্চিত হতে পারে।'

বিষয়টিকে **বাণপ্রস্থ** শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা বিস্তারিত করেছি এইভাবে — "কার্যত, জীবনের প্রথম পর্বে মানুষ **ব্রহ্মচর্য্য** পালন করে আপন আত্মার সেবা করে। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মানুষ পরিবার-পরিজনের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করে। জীবনের তৃতীয় পর্বে জ্ঞানীগুণী ও কর্মবীর মানুষেরা সমগ্র সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আপন আপন আত্মার সেবা করেন। এবং জীবনের শেষ পর্বে 'প্রবুদ্ধমিব সুপ্ত' ব্রহ্মগুণসম্পন্ন মানুষেরা বিশ্বজগতের সেবার মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করেন।" মোট কথা, **বর্ত্তমান** সত্তা মাত্রেই আত্মকেন্দ্রিক বটে, এবং নিজের বা নিজের আত্মার **তৃপ্তি**র জন্যই সকল জীব তাদের সমস্ত কাজ করে থাকে; মানুষও তাই করে থাকেন, তা সে-মানুষ যত হীন বা মহান মানুষই হোন না কেন। পার্থক্য এই যে, পৃথিবীর মতো নিজের চারদিকে ঘোরাকে কোনো কোনো বড় মানুষ এমন নিখুঁত আত্মকেন্দ্রিকতায় ঘোরাতে পারতেন, পেরেছেন যে তাতেই তাঁদের পরিবারের, সমাজের, জগতের চারদিকে ঘোরা হয়ে গেছে; এবং তার ফলে তাঁদের নিজ নিজ আত্মতৃপ্তি যেমন চূড়ান্ত **আনন্দ** লাভে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, তেমনি জগৎসংসারও উপকৃত হয়েছে। ...

বর্ত্ত শব্দের ভিতরে থাকা এই আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মানের ধারণা আমাদের প্রাচীন শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তাঁদের পক্ষে **বর্ত্ত** শব্দের সঙ্গে উপসর্গাদি যোগ করে অত প্রচুর সংখ্যক শব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এবং আমরা একালের বাংলাভাষীরা আজও তাঁদের সেই শব্দগুলিকে তাদের যথার্থ ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেই কমবেশি ব্যবহার করে থাকি। একেবারে গণ্ডগ্রামের বাসিন্দা বাংলাভাষী পর্যন্ত এখনও 'কেমন আছ গো দাদা?' জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে বলে দেন, 'এই, কোনোরকমে বেঁচে **বর্ত্তে** আছি।' (দ্র. **বর্ত্তনার্থী**)। **বর্ত্ত** শব্দটির ব্যবহার আমাদের অ্যাকাডেমি ভুলে গেলেও গণ্ডগ্রামের গণ্ডমূর্খ বাংলাভাষী আজও তাকে এভাবেই বহন করে নিয়ে চলেছেন। ... **৬.** ল্যাটিন সূত্রে প্রাপ্ত ইংরেজি verse, version এবং -verse ও -vert অন্ত শব্দগুলি। এই verse, vert-এর মূলে আছে ল্যাটিন ক্রিয়ামূল vertere, যার অর্থ হল 'প্রত্যাবৃত্ত হওয়া' বা 'ঘুরে ফেরত আসা'। তার মানে, আমরা যেখান থেকে **আবর্ত্ত**াদি পেয়েছি, পাশ্চাত্য সেখান থেকে verse, -vert (con*vert*, in*vert* ...) ইত্যাদি পেয়েছে।

বর্ত্তন (পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তিত) : ১. বর্ত্তন = ✓বৃৎ + অন - ভাববাচ্যে। **পরিবর্ত্ত** = পরি + ✓বৃৎ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বর্ত্তন** = **বর্ত্ত** *অন (on) যাহাতে।* ***পরিবর্ত্ত*** *= পরিপূর্ণ বা সার্বিক **বর্ত্ত** (আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণন) যাহাতে।* ***পরিবর্ত্তন*** *=* ***পরিবর্ত্ত*** *অন (on) যাহাতে।* **৩. বর্ত্তন** = বৃত্তি, স্থিতি, প্রাণধারণ, স্বচ্ছন্দসঞ্চার, যথেচ্ছভ্রমণ, আবর্ত্তন, পেষণ, বাটা, জীবিকা, বৃত্তি,

বেতন, বর্ত্তুল, পিণ্ড, গুলি। **পরিবর্ত্ত** = বিনিময়, আবর্ত্তন, ঘূর্ণন, পরিভ্রম, অতিক্রম, পুনঃপুনঃ প্রাপ্তি, অন্ত, শেষ, আবর্ত্ত, আবৃত্তি, যুগান্তকাল, গ্রন্থবিচ্ছেদ, অধ্যায়, (পরিবর্ত্তমানপর্ব্বতধারণ হেতু) কূর্ম্মরাজ, পরিবর্ত্তন। **পরিবর্ত্তন** = বিনিময়, লুণ্ঠন, বিহার, পরিভ্রম, আবর্ত্তন, বিপরিণাম (change)। **পরিবর্ত্তিত** = কৃতপরিবর্ত্তন, আবর্ত্তিত, ঘূর্ণিত, নিবর্ত্তিত। (ব.শ.)। **৪. বর্ত্তন** বাদে তিনটি শব্দই প্রচলিত। **৫. বর্ত্ত** শব্দের সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়ে **বর্ত্ত** ক্রিয়াকে নানা দিশায় চালনা করে দেয়। কিন্তু **পরি** উপসর্গ শব্দটির ক্রিয়াকে এমন ভাবে দিশাগ্রস্ত করে যে, তাকে বুঝে ওঠা একটু কঠিন। কেননা, নিয়মানুসারে ঘানি ঘোরার মতো আ**বর্ত্তন** সম্পূর্ণ হলেই তাকে **পরিবর্ত্ত** বা **পরিবর্ত্তন** বলার কথা। কিন্তু আমরা **পরিবর্ত্ত** বলতে exchange বা 'বদল' বুঝে থাকি। রামের **পরিবর্ত্তে** শ্যাম, একটা গরুর **পরিবর্ত্তে** চারটে ছাগল ... এসব তো আমরা বলিই। তাহলে?

পরি শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা দেখেছি, একটি চাকার **পরি**ধির দাঁতগুলি তার পাশের চাকার পরিধির দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে সেটিকে একটু একটু করে ঘুরিয়ে দিতে থাকলে, দুটি চাকাকেই পরস্পরের **পরিপন্থী** বলে। সেই সুবাদে **পরিবর্ত্ত** কথাটির মানে দাঁড়ায় — 'ক'-এর 'পূর্ণ বা সার্ব্বিক **বর্ত্তন**' (= এক পাক ঘূর্ণন) 'খ'-এর সার্ব্বিক **বর্ত্তন** (এক পাক ঘূর্ণন) ঘটিয়ে দিলে, তারা পরস্পরের বিপরীতে এক পাক ঘুরে যায়, অর্থাৎ 'পরস্পরের বিপরীতে **আবর্ত্তিত**' হয় বা **পরিবর্ত্তিত** হয়। তার মানে, 'পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের বিপরীতে আবর্ত্তিত' হলে সেই **আবর্ত্তমান** সত্তা দুটির ঘুরতে থাকাকে যেমন **পরিবর্ত্ত** বলে, তেমনি সত্তা দুটিকেও পরস্পরের **পরিবর্ত্ত** বলে; কেননা আ**বর্ত্তন**-এর হিসেবে তারা পরস্পরের সমানও বটে। এই **পরিবর্ত্ত** অন (on) থাকে যে ক্রিয়ায়, তাকে বলে **পরিবর্ত্তন**। সেভাবে যে দুটি সত্তার **পরিবর্ত্তন** হয়ে যায়, তাদের **পরিবর্ত্তিত** বলে। তার মানে, **পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তিত** প্রভৃতি ক্রিয়া একা একা সংঘটিত হয় না।

এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চোখে পড়ার মতো। যখন আমরা একটি গরুর বদলে চারটি ছাগল বলি, তখন আসলে আমরা বলতে চাই যে, গরু সত্তাটি যে **আবর্ত্তে আবর্ত্তমান**, চারটি ছাগল সত্তা সমপরিমাণ **আবর্ত্তে আবর্ত্তমান**; অর্থাৎ, চারটি ছাগলের ছোট **বর্ত্ত** বা চাকা একটি গরুর বড় **বর্ত্ত**কে বা চাকাকে ঘোরাতে পারে। তার মানে, চারটি ছোট চাকা তাদের সকলের মোট **আবর্ত্তনের** সাহায্যে একটি সমপরিমাণ বড় চাকাকে ঘোরাতে পারে। আর এরকম যে হয়ই, এমনকি সাইকেল দোকানের মিস্ত্রীও তা বলে দিতে পারে। অতএব চারটি ছাগলের **বর্ত্তন** একটি গরুর **বর্ত্তন**-এর সমান। তাই তাদের বিনিময় মূল্য সমানও।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন, এত কিছু ভেবে কি লোকে লেন-দেন বিক্রিবাটা করে থাকে? আমরা বলি হ্যাঁ, অবচেতনে প্রতিটি মানুষই এই ভাবনা ভাববার যোগ্যতা ধরেন। তাছাড়া সাক্ষী হিসেবে স্বয়ং **গদ নারায়ণ** ও মার্কস সাহেব তো রয়েছেনই। যে নিয়মে একটি ভাষার মূর্খ মানুষেরাও শব্দার্থতত্ত্ব ও ব্যাকরণাদি বিন্দুমাত্র না জেনে সেই ভাষায় অর্থপূর্ণ মনোভাব লেনদেন করতে পারেন, একই নিয়মে একটি বাজারের মূর্খ মানুষেরাও অর্থনীতিশাস্ত্র বিন্দুমাত্র না জেনেই সেই বাজারে অর্থপূর্ণ **পণ্যাদি** লেনদেন করতে পারেন, এবং করেনও।

কিন্তু '**পরিবর্ত্তন চাই**' বললে আমরা কী বুঝব? একালের শিক্ষিত বাংলাভাষী '**পরিবর্ত্তন চাই**' বললে বোঝেন 'change চাই'। এটি হল '**পরিবর্ত্তন** চাই' বাক্যের সবচেয়ে হীন অর্থ। কেন, বলছি।

প্রথমত, **পরিবর্ত্ত** অন (on) থাকে যাতে, তাকেই যেহেতু **পরিবর্ত্তন** বলে, সেহেতু তার একটি মানে হতে পারে — দুটি সমান পরিমাণ **বর্ত্তের** অদলবদল চাই; অর্থাৎ একটি গরুর **পরিবর্ত্তে** বা বদলে চারটি ছাগল চাই। দ্বিতীয় আর একটি মানে হতে পারে — একটি **পরিবর্ত্ত** দিয়ে তার সহযোগী **পরিবর্ত্ত**টিকে **আবর্ত্তিত** করতে চাই; অর্থাৎ, উপরোক্ত 'ক' দিয়ে 'খ'-কে ঘোরাতে চাই। যেমন কিনা, এই মুহূর্তে কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজ তাঁদের একপ্রকার আদর্শের ও ভাললাগার **বর্ত্ত** বা চক্র দিয়ে বাস্তব ব্যবস্থার **বর্ত্ত** বা চক্রটিকে **আবর্ত্তিত** করতে চান; যে-বাস্তব ব্যবস্থাটিকে এতকাল বামফ্রন্ট নামক একটি দল তাঁদের আদর্শের বা ইচ্ছার **বর্ত্ত** দিয়ে উলটো দিকে **আবর্ত্তিত** করে চলেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, '**পরিবর্ত্তন** চাই' শব্দের অর্থ শুধুমাত্র 'change চাই' বুঝলে **পরিবর্ত্তন** শব্দটিকেই অত্যন্ত ছোট করে ফেলা হয়। যাঁরা '**পরিবর্ত্তন** চাই' বলছেন, তাঁরা কি যাহোক একটা কিছু বদলমাত্র চাইছেন? না। আমাদের মনে হয়, তাঁরা তাঁদের মনের গভীরে বয়ে চলা এক প্রকার আদর্শের **বর্ত্ত** বা চক্র অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের **বর্ত্তমান** রাজনৈতিক ব্যবস্থার **পরিবর্ত্তন** চাইছেন; হতে পারে সেই আদর্শ এখনও তাঁরা বিধানাকারে নিবন্ধীকৃত করে উঠতে পারেননি।

বর্ত্তা : **২.** ***বর্ত্ত****-এর আধার যে।* **৩.** প্রাণধারণ করা, বাঁচা, উত্তরাধিকারিত্বে স্থিত হওয়া, অর্শান। (ব.শ.)। **৪.** 'বেঁচে থাকা' অর্থে **বর্ত্তা** প্রচলিত। **৫. আশেপাশে** শব্দের মতো '**বেঁচেবর্ত্তে**' শব্দজোড়টিও আধখানা অর্থ হারিয়ে শুধুমাত্র 'বেঁচে থাকা' অর্থে প্রচলিত রয়েছে। অথচ এর অর্থ ছিল — 'সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া' (= বেঁচে থাকা) এবং 'আপন অস্তিত্বের **আবর্ত্তে** ঘূর্ণায়মান থাকা বা **বর্ত্তমান** থাকা' (= **বর্ত্তে** থাকা)। সন্দেহ নেই যে আমরা প্রত্যেকেই **বেঁচেবর্ত্তে** থাকি, থাকার চেষ্টা করি। কেননা, **বর্ত্তে**র ভিতরে থাকলে মানুষ **বর্ত্তমান** থাকে, অতীতের উত্তরাধিকার নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে **আবর্ত্তিত** হয়ে হয়ে এগোতে থাকে।

বর্ত্তী (নিকটবর্ত্তী, পরবর্ত্তী, পার্শ্ববর্ত্তী, বশবর্ত্তী) : **১.** ✓বৃৎ + ইন (ণিনি) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***বর্ত্তী*** = ***বর্ত্তমান*** *বা আপন* ***আবর্ত্তে*** *আত্মকেন্দ্রিক ভাবে ঘূর্ণায়মান আছে যে।* ***নিকটবর্ত্তী*** = *নিকটে আছে বা থাকে যে* ***বর্ত্তী****।* ***পরবর্ত্তী*** = *পরে আছে বা থাকে যে* ***বর্ত্তী****।* ***পার্শ্ববর্ত্তী*** = *পার্শ্বে আছে বা থাকে যে* ***বর্ত্তী****।* ***বশবর্ত্তী*** = ***বশে*** *বা অধীনে আছে বা থাকে যে* ***বর্ত্তী****।* **৩. বর্ত্তী (বর্ত্তিন্)** = বর্ত্তনশীল, স্থিতিশীল, স্থিত, জীবী। **নিকটবর্ত্তী** = নিকটস্থ, আসন্ন। **পার্শ্ববর্ত্তী** = পার্শ্বস্থ, পার্শ্বচর, সমীপস্থ, সন্নিকৃষ্ট, সহচর, অনুচর, কিঙ্কর। **বশবর্ত্তী** = বশস্থিত, অধীন। (ব.শ.)। **পরবর্ত্তী (পরবর্ত্তী)** = পরে অবস্থিত, পশ্চাৎস্থিত। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত।

৫. এখানেও **বর্ত্তী** শব্দে দেখা যাচ্ছে, ব.শ. তার প্রথম অর্থটি দিয়েছেন অনেকটাই ক্রিয়াভিত্তিক ধারণার উপর ভিত্তি করে। আর, ঢাকার অভিধানটি **পরবর্ত্তী** শব্দের মানে দিচ্ছেন প্রায় 'বাক্যের সাহায্যে', ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে। কেননা, এগুলির প্রতীকী অর্থ হতে চায় না। তাও প্রায় জোর করে **বর্ত্তী**র মানে দেওয়া হয়েছে 'স্থিতিশীল'। আসলে সে তো 'স্থিত' নয়, একটি বিশেষ আ**বর্ত্তে** ঘুরে চলেছে বলে তাকে 'স্থিতিশীল' বলে মনে হচ্ছে। **বর্ত্তন, আবর্ত্তন, বর্ত্তী, বৃত্ত** — এসব যদি না থাকে, ঘূর্ণায়মানতা অর্থটিই থাকে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানেও ঢাকার অভিধান ও কলকাতার সংসদ অভিধান **বর্ত্তী**র দ্বিত্ব **বর্জ্জন** করে দিয়েছে। ... **৬.** দ্র. **চক্রবর্ত্তী** (১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০)।

বার্ত্ত (বার্ত্তা, বার্ত্তাকর্ম্ম, বার্ত্তানুজীবী, বার্ত্তাবৃত্তি, বার্ত্তাবহ, বার্ত্তামূল, বার্ত্তিক, বার্ত্তিককার) : ১. বৃত্তি + অ (ণ) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***বার্ত্ত*** = ***বৃত্তি*** *হইতে জাত।* ***বার্ত্তা*** = ***বার্ত্ত****-এর আধার যে।* ***বার্ত্তাকর্ম্ম*** = ***বার্ত্তা*** *রূপ কর্ম্ম।* ***বার্ত্তানুজীবী*** = ***বার্ত্তা*** *অনুজীবন যাহার।* ***বার্ত্তাবৃত্তি*** = ***বার্ত্তা*** *বৃত্তি যাহার।* ***বার্ত্তাবহ*** = ***বার্ত্তা*** *বহন করে যে।* ***বার্ত্তামূল*** = ***বার্ত্তা****র যে মূল।* ***বার্ত্তিক*** = ***বার্ত্ত****-কে গতিশীল করে যে।* ***বার্ত্তিককার*** = *যিনি* ***বার্ত্তিক*** *করিয়াছেন।* **৩. বার্ত্ত** = বৃত্তিমান, বৃত্তিশালী, স্বাস্থ্য, পাটব, আরোগ্য, ভব্য, অনাময়। **বার্ত্তা** = বৃত্তি, কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি, অর্থোপার্জ্জন ও অনর্থবারণোপায়, জীবিকা, বার্ত্তাকু, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, বৃত্তান্ত, কথা, দুর্গা। **বার্ত্তাকর্ম্ম** = বার্ত্তারূপকর্ম্ম, কৃষিগোপালনাদি বৈশ্যকর্ম্ম। **বার্ত্তানুজীবী** = কৃষিগোরক্ষাদিজীবিক বৈশ্য। **বার্ত্তাবৃত্তি** = বৈশ্য। **বার্ত্তাবহ** = বৃত্তান্তবাহক। **বার্ত্তামূল** = বাণিজ্যমূলক, ব্যবসায়হেতুক। **বার্ত্তিক** = বৃত্তিবিষয়ে সাধু, সূত্রবৃত্তিনিপুণ, কৃষিপ্রভৃতিকুশল, বৃত্তিকর্ম্মপটু, বৃত্তির অধ্যেতা বা বেত্তা, বৃত্তিসম্বন্ধী, বার্ত্তাহরণে নিযুক্ত, চর, আরোগ্যে সাধু, বৈদ্য, বর্ত্তিক পক্ষী, (ব্যাকরণে, দর্শনে) গ্রন্থসূত্রের বিবৃতিবিষয়ে যাহা সাধু, উক্ত অনুক্ত অসম্যক দুরূহ বিষয়ের বিবৃতিবিষয়ে যাহা সাধু, কাত্যায়নকৃত পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যানগ্রন্থ। **বার্ত্তিককার** = কাত্যায়ন। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র 'সংবাদবাহক' অর্থে **বার্ত্তাবহ** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। বাকি সব শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** যদিও **বৃত্তি** থেকেই **বার্ত্তা** শব্দটি প্রসূত হয়েছে, পরে পরে কিন্তু শব্দটি 'কৃষিগোপালন ও বাণিজ্যাদি' অর্থে প্রতীকী হয়ে যায়। বৌদ্ধযুগে, যখন ঐরূপ **বৃত্তি**র রমরমা ছিল, তখন **বার্ত্তা** শব্দটি প্রধানত ঐ প্রকার 'বৈশ্যকর্ম্ম' বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালে কাত্যায়নের আবির্ভাব হয়, তাঁকেও **বার্ত্তিককার** এবং তাঁর গ্রন্থটিকে **বার্ত্তিক** বলা হয়। এরকম 'ব্যাখ্যানগ্রন্থকার'দের অন্যত্র **বৃত্তিকার, বৃত্তিকৃৎ** ইত্যাদিও বলা হত; যথা 'কাশিকাবৃত্তিকার বামন'। এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকার আজও আছে। তবে বর্তমানে এই শব্দগুলির গুরুত্ব নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র **বৃত্তান্তবাহক** অর্থে **বার্ত্তাবহ** শব্দটি এখনও সজীব রয়েছে। তবে এই শব্দগুলির মূলে যে মানুষের অস্তিত্বের **বৃত্ত** রয়েছে, **বৃত্তি** রয়েছে, সেকথা আজকাল কিছুতেই মনে থাকে না। কিন্তু বেগুনকে কেন যে **বার্ত্তাকু** বলা হত, তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। দ্র. **বঙ্গ**।

বৃত্ত (বৃত্তবান, বৃত্তভঙ্গ, বৃত্তসম্পন্ন, বৃত্তানুবর্ত্তী, বৃত্তান্ত, ইতিবৃত্ত, দুর্ব্বৃত্ত, নিবৃত্ত, প্রবৃত্ত) : ১. ✓বৃৎ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৃত্ত** = **বৃৎ** *(আবর্ত্তনবাহীর তারণ) তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, আত্মকেন্দ্রিক আবর্ত্তন (=* ***বৃৎ****) চলে যাহাতে (যে দেশ-কাল-পাত্রে বা আচরণে)।* ***বৃত্তবান*** = ***বৃত্ত*** *বহন অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বৃত্তভঙ্গ*** = ***বৃত্ত*** *ভঙ্গ হয় যাহাতে।* ***বৃত্তসম্পন্ন*** = ***বৃত্ত*** *রূপ সম্পদ আছে যাহার।* ***বৃত্তানুবর্ত্তী*** = ***বৃত্ত****-এর অনুবর্ত্তী যে।* ***বৃত্তান্ত*** = ***বৃত্ত****-এর অন্ত যাহাতে।* ***ইতিবৃত্ত*** = *ইতি পর্য্যন্ত যে* ***বৃত্ত****।* ***দুর্ব্বৃত্ত*** = *দুর্ বৃত্ত যে।* ***নিবৃত্ত*** = ***বৃত্ত*** *হইতে নির্গত যে।* ***প্রবৃত্ত*** = *প্রকৃষ্ট* ***বৃত্তন*** *যাহাতে। /* **বৃত্তান্ত** = বৃত্ত (জাত) অন্ত (সমাপ্তি) যাহাতে; যাহাতে তদ্বিষয়ের সমাপ্তি বা নির্ণয় (থাকে)। **দুর্ব্বৃত্ত** = দুর্ বৃত্ত যাহার। (ব.শ.)। **৩. বৃত্ত** = স্থিত, জাত, সংঘটিত, অতীত, বিগত, মৃত, নির্ব্বৃত্ত, দৃঢ়, অপ্রতিহত, ঘূর্ণিত, বর্ত্তুল, অধীত, বৃত্তাকার মন্দির, কচ্ছপ, সংঘটন, আচার, অসৎপ্রিয়াখ্যান, চরিত, সদাচার, শাস্ত্রোক্তাচার, চরিত্র, গুরুপূজাদি চরিত্রভেদ, রাজার ন্যায়ে অর্থার্জ্জনাদি চতুর্ব্বিধ, প্রবৃত্তি, (জ্যামিতিতে) গোলাকারক্ষেত্র-ভেদ (circle), বৃত্তি, ছন্দঃ, অক্ষরসংখ্যাত পদ্যভেদ। **বৃত্তবান (বৃত্তবৎ)** = চরিত্রবান, আচারবান, সদ্‌বৃত্ত, বর্ত্তুল, গোলাকার। **বৃত্তভঙ্গ** = চরিত্রনাশ। **বৃত্তসম্পন্ন** = সদাচারবান। **বৃত্তানুবর্ত্তী** = সদাচার অনুগামী, বৃত্তস্থ। **বৃত্তান্ত** = বার্ত্তা, প্রবৃত্তি, সংবাদ, বাচিকসন্দেশ, ইতিহাসাখ্যান, প্রকরণ, প্রকার, জনশ্রুতি, জীবিকা, অবসর, ভাব, কার্ৎস্ন্য, আখ্যান, বিষয়। **ইতিবৃত্ত** = প্রত্যক্ষ সংঘটিত বিষয় ... (দ্র. এই শব্দার্থকোষের ১ম খণ্ড)। **দুর্ব্বৃত্ত** = কুক্রিয়, দুরাত্মা, দুষ্ট কার্য্য, অসদাচরণ, কুকার্য্য। **নিবৃত্ত** = নিবৃত্তিযুক্ত, বিরত, উপশান্ত, প্রত্যাবৃত্ত, সমাপ্ত ... ইত্যাদি। **প্রবৃত্ত** = প্রবৃত্তিযুত, চেষ্টিত, ব্যাপৃত, আরব্ধ, বর্ত্তমান, উৎপন্ন ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** circle অর্থে **বৃত্ত** প্রচলিত। **বৃত্তবান, বৃত্তভঙ্গ, বৃত্তসম্পন্ন, বৃত্তানুবর্ত্তী** প্রভৃতি শব্দ অপ্রচলিত। বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বৃত্তি**।

বৃত্তি (বৃত্তিকর, বৃত্তিচ্ছেদ, বৃত্তিদান, বৃত্তিভঙ্গ, আবৃত্তি, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি) : ১. ✓বৃৎ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৃত্তি** = ***বৃত্ত*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে* ***বৃত্তন*** *(আত্মকেন্দ্রিক আবর্ত্তন) চলতে থাকে।* ***বৃত্তিকর*** = ***বৃত্তি****র উপায় করে যে।* ***বৃত্তিচ্ছেদ*** = ***বৃত্তি****র ছেদ থাকে যাহাতে।* ***বৃত্তিদান*** = ***বৃত্তি****র উপায়ের দান থাকে যাহাতে।* ***বৃত্তিভঙ্গ*** = ***বৃত্তি*** *ভঙ্গ হয় যাহাতে।* ***আবৃত্তি*** = ***বৃত্তি****র আশ্রয় যে।* ***নিবৃত্তি*** = ***বৃত্তি*** *হইতে নির্গত যে।* ***প্রবৃত্তি*** = *প্রকৃষ্ট* ***বৃত্তি*** *থাকে যাহাতে। /* **বৃত্তি** = যাহা দ্বারা রস বর্ত্তমান হয়। (ব.শ.)। **৩. বৃত্তি** = বর্ত্তন, স্থিতি, সংঘটন, প্রসর, ব্যাপার, চেষ্টা, ব্যবহার, অভিবাদনাদি ক্রিয়া, অন্তঃকরণের পরিণামভেদ, মনোভাব, বিবরণ, আবৃত্তি, অপ্রতিবন্ধ, জীবিকা, বেতন, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, বিদ্যানুশীলনার্থ প্রদত্ত অর্থ (scholarship), উপজীবিকা, নিয়ম, ব্যাখ্যানগ্রন্থ, শব্দের অর্থপ্রকাশিকা শক্তি, নায়কাদিচেষ্টা, আধেয়, মনের শক্তি বা ধর্ম্ম (faculty)। **বৃত্তিকর** = জীবিকাকারক। **বৃত্তিচ্ছেদ**

= বৃত্তিহরণ। **বৃত্তিদান** = জীবিকার্থ ভূমিপ্রভৃতিদান। **বৃত্তিভঙ্গ** = জীবিকাহানি। **আবৃত্তি** = আবর্ত্তন, ঘূর্ণন, প্রত্যাবর্ত্তন, প্রতিনিবৃত্তি, পুনর্জ্জন্মাবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ পাঠ ... ইত্যাদি। **নিবৃত্তি** = বিরতি, বিষয়বিরাগ, অবসান, প্রতিগমন, আবৃত্তি। **প্রবৃত্তি** = প্রবর্ত্তন, স্বাভাবিক ধর্ম্ম, প্রবণতা, ব্যাপার, উৎপত্তি, অবতরণ, আবির্ভাব, উদ্যম, আগম, বৈখরীপ্রভৃতি চতুর্ব্বিধবাগ্‌বৃত্তি ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪. বৃত্তি** কখনো কখনো 'পেশা' অর্থে প্রচলিত। **আবৃত্তি** recitation অর্থে প্রচলিত। **নিবৃত্তি প্রবৃত্তি** শব্দ দুটি যথার্থে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **বর্ত্ত, বর্ত্তমান, বৃত্ত, বুদ্ধিবৃত্তি**। আমাদের ছিল **বৃত্ত**, ছিল **বৃত্তি**। সেই **বৃত্তে** আমরা **প্রবৃত্ত** হতাম, **নিবৃত্ত** হতাম; সেই **বৃত্তিতে** আমাদের **প্রবৃত্তি** হত, **নিবৃত্তি** হত। তাতেই আমাদের জীবিকার্জন হয়ে যেত। মধ্যযুগে পাঠান এল ফারসি হাতে নিয়ে, আমাদের **বৃত্ত** গেল; আমরা **বৃত্তি** ছেড়ে 'পেশা' ধরলাম। তারপর এসে গেল ইংরেজ, আমরা শিক্ষিত বাংলাভাষীরা 'পেশা' ত্যাগ করে 'প্রফেসন' ধরলাম। সবাই জানেন, আজকাল শিক্ষিত বাংলাভাষীরা বাংলায় জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার প্রফেসন কী?' এর উত্তরে আমরা যে যার নিজের **বৃত্তি**র কথা বলি। যাঁরা জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা খেয়াল করেন না যে, এই 'profession' কথাটির মূলে রয়েছে কিঞ্চিৎ মাত্রায় 'মিথ্যাচার'। সেভাবে বুঝলে 'আপনার profession কী' কথাটির মানে দাঁড়ায় 'আপনার মিথ্যাচার কী?'

উপরে **৩.**-এ দেখা যাচ্ছে, ব.শ. **বৃত্ত** শব্দের circle অর্থটি দিচ্ছেন বলতে গেলে সবার শেষে। তার মানে, **বৃত্ত** শব্দের এই বাহ্য অর্থটি আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিদের কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; গুরুত্বপূর্ণ ছিল অদৃশ্য **বৃত্তসমূহ**। কত কথা তাদের নিয়ে! কতভাবে তাদের ব্যবহার! প্রথমেই **বৃত্ত** মানে 'স্থিত'। কেন?

আমাদের মাথায় তো এখন circle ঢুকে বসে রয়েছে। আমরা **বৃত্ত** শব্দের এরকম অর্থ দেখে তো স্তম্ভিত হয়ে যাবই! কিন্তু এই 'স্থিত'ই **বৃত্ত** শব্দের খানিকটা ঠিক অর্থ, অন্তত **বৃত্ত** শব্দের প্রতীকী অর্থ দিতে গেলে 'স্থিত' অর্থটিই সবার আগে এসে সামনে দাঁড়াবে। কেন, সেকথায় যাওয়া যাক। — '(আত্মকেন্দ্রিক) বাহীর ঘূর্ণন বা আবর্তন' (= **বৃৎ**) 'তারিত যাহাতে' (= **ত**) বা চলে যাহাতে (অর্থাৎ চলে যে দেশ-কাল-পাত্রে বা আচরণে), তাকে **বৃত্ত** বলে। **কর** যেমন **করণ** ক্রিয়াকে বোঝায় এবং **করণ**কারী **কর**কেও (হাতকেও) বোঝায়, **বৃত্ত**ও তেমনি **বৃত্তন** ক্রিয়াকে বোঝায় এবং **বৃত্তন**কারী **বৃত্ত**কেও বোঝায়। এই **বৃত্ত**কে যখন দৃশ্য দেশে সক্রিয় দেখি, তখন সে জ্যামিতির **বৃত্ত** এবং তাতে যে ব্যাসার্ধের ঘানি পরিধি ধরে ঘুরে বেড়ায় বা আ**বর্ত্তিত** হয়, তাকে বলে **বৃত্তন**। যিনি কৃষি**বৃত্তি** গ্রহণ করেছেন, তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কর্ষণের **বৃত্তে** আ**বর্ত্তিত** হতে থাকেন, ঘুরতে থাকেন। কোনো সত্তা একভাবে **আবর্ত্তিত** হতে থাকলে তাকে দেখে তো মনে হবেই যে, সে একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে! এই সেই কারণ যেকারণে ব.শ. বলছেন, **বৃত্ত** মানে 'স্থিত', **বৃত্তি** মানে 'স্থিতি', 'বর্ত্তন' ... ইত্যাদি।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু দৃশ্য দেশ নিয়ে ততটা চিন্তিত ছিলেন বলে মনে হয় না; তাঁদের প্রতিপাদ্য ছিল অদৃশ্য দেশ-কাল-পাত্র ও আচরণের **বৃত্ত**কে বোঝানো। সেটি কেমন, আমরা অনেকেই জানি, ইংরেজি **ভাষাদর্শনের প্রবল** চাপে সহসা মনেই পড়ে না। এ এমন এক আচরণের **আবর্ত্তনের** এলাকা, যেখানে প্রয়োজনীয়গুলিকে আ**বর্ত্তের** এলাকায় **ঢুকিয়ে** নেওয়া হয় (দ্র. **বৃক্**) এবং অপ্রয়োজনীয়-গুলিকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় (দ্র. **বৃজ্**)। ফলে, '**বৃৎ** তারিত' হয়ে **বৃত্তটি** সমৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধিলাভ করে, বিকশিত হয়। আমরা, চাষী মজুর তাঁতি কামার ডাক্তার মাস্টার দোকানদার ফড়ে ... সবাই যে যার নিজ নিজ **বৃত্তের** মধ্যে নিজ নিজ **বৃত্তিতে প্রবৃত্ত** হই, আ**বর্ত্তিত** হই, নিজ নিজ **বৃত্তের** বিকাশ সাধন করি, অপ্রয়োজনীয়কে ত্যাগ করি, প্রয়োজনীয়কে আত্মসাৎ করি, উদ্‌**বৃত্ত** হয়ে গেলে তাকে বেচে দিই ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার মানে, প্রতিটি মানুষ যে যার এক একটা আত্মকেন্দ্রিক **বৃত্তের** ভিতরে থাকে, সেই **বৃত্তে প্রবৃত্ত** হয়, **বৃত্তবান** হয়, **বৃত্তসম্পন্ন** হয়, তার শত্রুরা তার **বৃত্তভঙ্গ** করার চেষ্টা করে, **বৃত্তনাশ** করার চেষ্টা করে, তা সত্ত্বেও মানুষ আপন আপন **বৃত্তের** অন্ত করে **বৃত্তান্ত** শেষ করে **নিবৃত্ত** হয়। — আমরা বলি 'তিনি কৃষক', 'উনি শিক্ষক'। কেন বলি? তিনি কর্ষণের **বৃত্তে বর্ত্তমান** থাকেন বলে আমরা বলি তিনি কৃষকের **বৃত্তি** বা কৃষি**বৃত্তি** গ্রহণ করেছেন; উনি শিক্ষার **বৃত্তে বর্ত্তমান** থাকেন বলে আমরা বলি উনি শিক্ষকের **বৃত্তি** বা শিক্ষা**বৃত্তি** গ্রহণ করেছেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষের এই সকল **বৃত্ত** ও **বৃত্তি** স্বভাবতই শুধুমাত্র চাষবাস হাটবাজার চাকরি-বাকরিতে সীমিত থাকে না, অসীম সংখ্যক **বৃত্ত** ও **বৃত্তিতে** বিচূর্ণীভূত হয়ে সারা সমাজে ছড়িয়ে থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই সমস্ত **বৃত্তিকে** কতগুলি মূল নামে শনাক্ত করেছিলেন, যথা — **শিলবৃত্তি, তপোবৃত্তি, ঋতবৃত্তি, সত্যবৃত্তি, ব্রহ্মবৃত্তি, শীলবৃত্তি** এবং এমনকি **উঞ্ছবৃত্তি**ও। এ ছাড়া দু**র্ব্বৃত্তের বৃত্তি** তো রয়েছেই। **বৃত্তি**র এরকম অজস্র রকমফের।

বৃত্ত গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে, তাকে **বৃত্তি** বলে। সেটি যেমন সামাজিক উৎপাদন **কর্ম্ম**যজ্ঞের **বৃত্তি** হয়, তেমনি মানসযজ্ঞেরও **বৃত্তি**ও হতে পারে। '**বৃত্তি-পরীক্ষা**'র কথা সবাই জানেন। বাংলার ছাত্রদের **বৃত্তি** পরীক্ষা হত, **বৃত্তি** দেওয়া হত (এখনও হয়, তবে যেভাবে সেসব হয়, তা নিয়ে বলা মানেই পরিবেশদূষণ)। এই **বৃত্তি** দানের উদ্দেশ্য, যে **বৃত্তে** সেই ছাত্র বা ছাত্রগণ **প্রবৃত্ত** হয়েছে, সেখানে তারা যাতে আরও গতিশীল হতে পারে, তাই ঐ ছাত্র**বৃত্তি**। একালে এই ছাত্র**বৃত্তি**কে বলা হয় scholarship অর্থাৎ 'ছাত্রত্ব'। এই ছাত্র**বৃত্তি** ও 'ছাত্রত্ব' বা scholarship, দুটি শব্দের কোনটির যৌক্তিকতা কীরকম, পাঠকপাঠিকা সে বিচার করুন। দ্র. **তীর্থ**।

আমাদের কাহিনীগুলিকে বলা হয় **ইতিবৃত্ত, বৃত্তান্ত**। তার একটা কারণ এই যে, আমাদের ধারণায় জগতের প্রতিটি সত্তার জীবন-**বৃত্তের**ও সূচনা আছে এবং শেষও আছে; এবং অনেক সময় যেখান থেকে তার শুরু সেখানে পৌঁছেই তার অন্ত হয়। জঙ্গলের জীবদের কাউকে কাউকে দেখা যায় মৃত্যুর সময় জন্মক্ষেত্রে ফিরে এসে মরে; মানুষকে দেখা যায় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর সে শিশুর মতো হয়ে যায়; বহু প্রবাসীই শেষজীবনে দেশপ্রেমী হয়ে যায়; গোধূলিলগ্নের আকাশ অনেকটাই ভোরের আকাশের মতো হয়। আমাদের পূর্বসূরীগণ সেসব জানতেন, বুঝতেন। তাঁরা মানুষের জীবন**বৃত্ত**কে

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, 'পূর্ব্বাহ্ণ-মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ন-সায়াহ্ন'-এর মতো ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যায় ভাগ করেছিলেন। দ্র. **বানপ্রস্থ, বর্ণ, বর্ণাশ্রম**। তাতে শুরু থেকে শেষের দিকে যাত্রা ছিল। পাশ্চাত্যের ধারণায় সেরকম হয় না। 'ততঃ কিম' নিবন্ধে বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমরা সেখান থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তাঁর মতে —

"... শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্যস্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; ... প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। ...

এক কথায়, যে যাহা পায়, তাহাতে তাহার আশা মিটে না — যতই বেশি পাও না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া? পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে, তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যস্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এতবড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এতবড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না। ...

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যু দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। ... এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপ বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে। ... আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ..."

দেখা যাচ্ছে, সত্তার জীবন**বৃত্তে**র অন্ত হওয়ার ধারণাটি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মনের গভীরে বিদ্যমান ছিল, আছে। সেই বোধ থেকেই আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ **বৃত্তান্ত** শব্দটি তৈরি করেছিলেন। তাতে সত্তার জীবন**বৃত্তে**র শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র **যাত্রা**র কাহিনী বলা হত। আমাদের **যাত্রাপালা**গুলি ছিল এরকম **বৃত্তান্ত**বাহী। পাশ্চাত্যের ইতিহাস-হারা আধুনিক বা উত্তরাধুনিক আঁতেলরা জীবনের মাঝপথে 'অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরা'র দর্শনে লালিত-পালিত। তাঁরা এই জীবন**বৃত্তান্ত**কে বুঝতেই পারেন না। তাঁদের মডার্নদের কেউ কেউ ঐ **বৃত্তান্ত**কে নিয়ে মিথ্যাচার করেন এবং পোস্টমডার্নরা সেই মডার্নদের Grand-Narrative-বাদী বলে ঠাট্টা করেন। কলকাতার পাশ্চাত্য-ভাবনায় জারিত সাহিত্যিকদের কেউ কেউ সেই Grand-Narrative-বাদীর বাংলা অনুবাদ করেন 'মহা-আখ্যানবাদী'। বাংলাভাষাটি যথার্থভাবে জানলে তাঁরা এর বাংলা অনুবাদ করতেন '**ইতিবৃত্ত**বাদী'। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার — শেকসপিয়ারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ইউরোপ পর্যন্ত এই খণ্ডবাদিতা থেকে মুক্ত ছিল। মধ্যযুগের ক্যাথলিক খ্রিস্টানপন্থী ইউরোপের Miracle (অপর নাম Mystery) পালাগুলির সূচনা হত জগৎসৃষ্টির নানারকম বয়ান দিয়ে এবং শেষ হত 'শেষবিচারে'। প্রোটেস্টান্ট ইউরোপ শিল্পবিপ্লবের সহায়তায় ইউরোপকে তাদের অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে মানসিকভাবে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়; এবং তার উদ্ভব লগ্নেই এই Miracle পালাগুলিরও বেশির ভাগ, পাঁচ ভাগের চার ভাগ তো বটেই, একেবারে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ যে ইউরোপকে দেখেছিলেন, তার অনেকটাই এই দেউলিয়া ইউরোপ। সে তুলনায় সৈয়দ মুজতবা আলী ফরাসি ও জার্মানির ভিতর দিয়ে শেকসপিয়ারের পূর্ববর্তী ইউরোপকে বেশি করে দেখতে পেয়েছিলেন।

বৃত্র (বৃত্ত্র, বৃত্রাসুর, বিশ্বরূপ) : ১. ✓বৃৎ + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৃত্র (বৃত্ত্র)** = *আবর্ত্তনবাহীর তারণকে (যথাবিহিত রূপে) ত্রাণ করে যে; অর্থাৎ, **বৃত্তসমূহকে** রক্ষা করে যে। **বৃত্রাসুর** = **বৃত্ররূপী অসুর** যে। **বিশ্বরূপ** = **বিশ্ব** রূপ যাহার।* / **বৃত্র** = যে স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত করিয়া স্থিত। (ব.শ.)। **৩. বৃত্র (বৃত্ত্র, বৃত্রাসুর)** = দানববিশেষ (ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে নিহত করিলে, ত্বষ্টা ইন্দ্রনাশার্থে, 'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্' বলিয়া আহুতি দিলে, যে ভীষণ পুরুষ উত্থিত হয়, তাহার নাম 'বৃত্র'। বৃত্র ইন্দ্রাদিকে স্বর্গচ্যুত করিলে, ইন্দ্র ব্রহ্মার উপদেশে দধীচির অস্থিজাত বজ্রে বৃত্রকে নিহত করেন। বেদে বৃত্র অন্ধকারের অধিদেবতা দৈত্য। বৃত্র মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার উৎপাদন করিত, বর্ষণ রোধ করিয়া অনাবৃষ্টি করিত। ইন্দ্র বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া বজ্রাঘাতে মেঘসমূহ বিদীর্ণ ও জল প্রবাহমুক্ত করেন।), মেঘ, অন্ধকার, পর্ব্বতবিশেষ, ধ্বনি, ইন্দ্র, শত্রু। (ব.শ.)। প্রবল পরাক্রমশালী অসুর। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষবশত তিন মস্তকবিশিষ্ট (ত্রিশিরা) বিশ্বরূপ নামে এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। এই পুত্র কঠোর তপস্যায় রত দেখে ইন্দ্র বিশেষ চিন্তিত হয়ে এঁর তপোভঙ্গ করার জন্য উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিশ্বরূপের এতে কোনোই চিত্তচাঞ্চল্য হয় না। তখন নিরুপায় হয়ে ইন্দ্র ... বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রাহত হয়ে বিশ্বরূপ ভূপতিত হলে ইন্দ্র তক্ষা নামে এক শিল্পীর সাহায্যে বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন করলেন। ... তখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত বিশ্বকর্মা ... প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড হতে বৃত্রের সৃষ্টি করেন। ... বিশ্বকর্মা

এঁকে পুত্রহন্তা ইন্দ্রকে হত্যা করে পুত্রশোক দূর করতে বলেন। ... মানস সরোবরের উত্তর তীরস্থ পর্বতে ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে একশত বৎসর যুদ্ধ চলে। ইন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বরুণ, বায়ু, যম ও বিভাবসু। পরে ইন্দ্রসহ সকলেই পলায়ন করেন। ... অবশেষে বৃত্র বস্ত্রাদি ও কবচ বিরহিত করে ইন্দ্রকে ... গ্রাস করে ফেললেন। ... তখন বৃহস্পতির পরামর্শে দেবতারা ... জৃম্ভিকার সৃষ্টি করে বৃত্রের দেহে প্রবেশ করলেন। তাতে বৃত্রাসুর জৃম্ভন (হাই তোলা) আরম্ভ করলে ... বৃত্রের মুখ থেকে ইন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হলেন। ... বেরিয়ে এসে ইন্দ্র পুনরায় বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং অবশেষে পলায়ন করলেন। ... বৃত্র স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন। ... তখন দেবতারা মহাদেবের পরামর্শ মতো ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর কাছে গেলেন। ... বিষ্ণু বললেন, এই অসুরকে পরাজিত করতে হলে প্রথমে কপট উপায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে এঁর মিত্রতা স্থাপন করতে হবে। মিত্রতাসূত্রে ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রাসুরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালে বিষ্ণু বজ্রমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবেশ করবেন। তখন তাই ... করা হল। বৃত্রাসুর এই শর্তে মিত্রতা স্থাপন করতে রাজী হলেন যে, ইন্দ্র যদি সমস্ত দেবতার সহিত শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা অথবা কাঠ, প্রস্তর কিংবা বজ্র দ্বারা দিনে কিংবা রাতে তাঁর নিধন সাধন না করেন, তবে দুই জনের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হবে। ইন্দ্র তাতে ... প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। বৃত্রাসুর এই কপটতা বুঝতে পারলেন না। ... একদিন এক সন্ধ্যামুহূর্তে দিবস ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে, সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ফেনার সহিত (যা শুষ্ক বা আর্দ্র নয়) বৃত্রের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করে ইন্দ্র মিথ্যাচারে তাঁর শ্রেষ্ঠ শত্রুকে নিপাতিত করলেন। এর ফলে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হল।

বৈদিক বিবরণে বৃত্রের নাম অনেক স্থলেই দেখা যায়। বৃত্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কাহিনী এখানে বিবৃত হল, বেদের বৃত্র সম্বন্ধে বিবরণের রূপক মাত্র। বৃত্র অর্থে আবরণ। জলকে ঘিরে রাখে বলে বৃত্র জলের কারা-নিবাস। ঋক্‌বেদের অনেক স্থানে বৃত্র শত্রু, অমিত্র, অরি, রিপু, দস্যু বলে বর্ণিত হয়েছেন। ... বৃষ্টির অবরোধকারী যে কোনো নৈসর্গিক বল বা শক্তিই বৃত্র। তাকে হত্যা করবার জন্য ইন্দ্র বজ্র গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্র মরুৎদের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করে পৃথিবীকে বৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন। বৃত্র মেঘ দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করে অন্ধকার সৃষ্টি করতেন। মেঘের অন্য নাম বৃত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত করান। বজ্র অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দানব। ... (পৌ.অ.)। **বিশ্বরূপ** = সর্ব্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বাত্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, মহাদেব, চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বিশ্বই রূপ, বিরাড়্‌মূর্ত্তি, বহুরূপ, নানামূর্ত্তি। (ব.শ.)। মহাভারত অনুসারে, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত ও অসুরদের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি দেবতাদের প্রকাশ্যে ও অসুরদের গোপনে যজ্ঞভাগ দান করতেন। পরে মাতার আদেশে অসুরপক্ষ অবলম্বন করেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বশিষ্ঠকে ত্যাগ করে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। এইজন্য বশিষ্ঠের শাপে নৃসিংহরূপী নারায়ণের হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হন। একসময়ে অসুরদের মঙ্গলের জন্য বিশ্বরূপ কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্র তাতে ভীত হয়ে মহর্ষি দধীচির শরণাপন্ন হন। দধীচি নিজের অস্থি দান করলে, ইন্দ্র তা দিয়ে বজ্র প্রস্তুত করে বিশ্বরূপকে বধ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** ভারতবর্ষের ইতিহাসে **বৃত্রাসুরের** কাহিনী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। তবে সে কাহিনীতে যাওয়ার আগে **কঙ্ক, কলবিঙ্ক, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, তিত্তিরি, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, ত্রিশিরাঃ, দধীচি, নন্দিগ্রাম, পর্ব্বত, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বমূর্ত্তি** ... প্রভৃতি শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া দরকার। মনে রাখা দরকার, রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্র বিশ্বরূপের সন্তানগণকে বলা হত **নন্দিগ্রামী**। ...

তবে সবার আগে আমাদের জানা দরকার ঠিক কী রকম সত্তাকে **বৃত্র** (বৃত্‌ত্র) বলা হত। এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে আমরা দেখছি, 'আবর্ত্তনবাহীর তারণকে ত্রাণ করে যে; অর্থাৎ, **বৃত্তসমূহকে** রক্ষা করে যে' তাকে **বৃত্র** বলে। তার মানে, সেকালের বৈদিক বিধান অনুসারে সমাজের প্রতিটি মানুষ যে যার আপন আপন **বৃত্তিতে** **বর্ত্তমান** থাকলেও নানান বাধা তাদের **বৃত্তিতে** বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেই সমস্ত বিঘ্ন দূর করে সবাইকে তাদের **বৃত্তিসাধনে** সাহায্য করে যে সামাজিক সত্তা, তাকে বলা হত **বৃত্র**। তাহলে তো **বৃত্র** বা **বৃত্রাসুরই** সেই সত্তা, একালের ভাষায় আমরা যাকে 'বৈদিক সভ্যতার নিয়মানুসারে সমাজ পরিচালক সত্তা' বলতে পারি। হ্যাঁ, ঠিক তাই! এই সত্তাকেই আমরা **অধিরাষ্ট্র** নামে শনাক্ত করেছি। (দ্র. **প্রজাপতি**; **রাষ্ট্র**)। প্রাচীন ভারতে এই **অধিরাষ্ট্রে**র অধীনেই **রাষ্ট্র** বা **পৃথুর** জন্ম হয়। এই **অধিরাষ্ট্রেরই** আর এক নাম **বৃত্র**। সেকারণেই **বৃত্রকে** **পর্ব্বত** বলে। আদিতে এই **বৃত্র** অত্যন্ত ভাল ছিল, পরে মৌলবাদী হয়ে সমাজবিরোধী হয়ে যায়। তখন তার নাম হয় **বৃত্রাসুর**। তখন সে **প্রজা**দের তাপ দিয়ে জলীয় **বাষ্প** তুলে নিয়ে তাকে 'গর্জ্জনকারী **মেঘে**' পরিণত করে ফেলত কিন্তু পুনরায় বর্ষণের মাধ্যমে প্রজাগণকে না দিয়ে 'অনাবৃষ্টি' করে দিত। ... এইসব কারণে, বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থে **বৃত্রের** সুনামের শেষ নেই, দুর্নামেরও শেষ নেই। এই **বৃত্রের** বেদজ্ঞান, **ধর্ম্ম**, নিষ্ঠা ... ইত্যাদি বিষয়ে পুরাণাদি গ্রন্থে বিস্তর প্রশংসাবাক্য রয়েছে। এমনকি গৌতম **বুদ্ধ**-এর ক্ষেত্রে কিংবা ইসলাম ধর্মের 'নবী'র ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় — এর আগে ৩০ জন কি ৪০ জন **বুদ্ধ** বা 'নবী' জন্মেছিলেন — ঠিক সেভাবে **বৃত্র**-এর ক্ষেত্রেও অনেক পূর্ববর্তী **বৃত্রের** কথাও বলা হয়েছে। ... বহু **বৃত্রের** এই ধারণার কারণস্বরূপ আমাদের মনে হয়, প্রথম **অধিরাষ্ট্র** (প্রজাপতিতন্ত্র) থেকে যে **অধিরাষ্ট্র**কে পর্যুদস্ত করে **ইন্দ্র** পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর হন, সে পর্যন্ত **অধিরাষ্ট্রের** যতগুলি অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছিল, বহু **বৃত্র** বলতে পুরাণাদিতে সেকথাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। ...

মনে রাখতে হবে, এই সত্তা পুঁজিবাদের ঘোরতর বিরোধী। স্বভাবতই, সে ইন্দ্রবিরোধী। কিন্তু তাই বলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে সে কোনো অমানবিক উপায় অবলম্বন করেনি। অথচ, পুঁজিবাদের যে 'আমিবোধ' বা **ইন্দ্র**, সে কিন্তু এই **বৃত্রাসুর** নিধনে আদৌ মানবিকতা দেখায়নি। তবে পুঁজির এই অমানবিক স্বরূপ নিয়ে আমরা কী আর বাড়তি কথা বলব; সেসব কথা অনেক বেশি করে বারংবার বলে গেছেন আমাদের পূর্বসূরি বড় মানুষেরা। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই, প্রাচীন মানুষের মানবিক ও বাহ্যিক অর্জনের গৌরবের সৌধগুলিকে পুঁজিবাদ কত নির্মম অমানবিকতায় ধ্বংস করেছে,

মার্কসের সহযোগী এঙ্গেলস মহাশয়ই তার অজস্র নিদর্শন দিয়ে গেছেন।

বৃধ্ (বর্দ্ধ্, বৃদ্ধি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (breeding) অতিপ্রবৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধি, অবৃদ্ধিক, প্রবৃদ্ধ, বর্দ্ধ্, বর্দ্ধক, বর্দ্ধকি, বর্দ্ধকী, বর্দ্ধন, বর্দ্ধনী, বর্দ্ধমান, বর্দ্ধয়িতা, বর্দ্ধাপন, বর্দ্ধিত, বর্দ্ধিষ্ঠ, বর্দ্ধিষ্ণু, বর্ধ্র, বর্ধ্রিকা, বর্ধ্রী, বাউড়ি, বার্দ্ধক, বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধুষ, বার্দ্ধুষি, বার্দ্ধুষিক (বাড়িখোর বসিষ্ঠ), বার্দ্ধুষী, বার্দ্ধ্রিণস, বিবর্দ্ধন, বিবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধক, বৃদ্ধকাল, বৃদ্ধকোশ, বৃদ্ধগঙ্গা, বৃদ্ধদারক, বৃদ্ধনাভি, বৃদ্ধপ্রপিতামহ(হী), বৃদ্ধপ্রমাতামহ(হী), বৃদ্ধভাব, বৃদ্ধশ্রবাঃ, বৃদ্ধসূত্রক, বৃদ্ধসেবী, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধি, বৃদ্ধিজীবক, বৃদ্ধিজীবন, বৃদ্ধিজীবিকা, বৃদ্ধিমান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বৃদ্ধোক্ষ, বৃদ্ধ্যাজীব, বৃদ্ধ্যুপজীবী, বৃধ্, সংবর্দ্ধক, সংবর্দ্ধনা।

বৃধ্ (বর্দ্ধ, বর্দ্ধি) = আবর্ত্তনবাহীর দান-ধারণ। **বৃধ** = আবর্ত্তনবাহীকে ধারণ করে যে। **বর্দ্ধ** = আবর্ত্তনবাহীর দান ধারিত যাহাতে। **বর্দ্ধি** = **বর্দ্ধ** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।

বর্দ্ধন (বর্দ্ধনী, বর্দ্ধমান, বর্দ্ধিষ্ণু) : **১.** ✓বৃধ্ + অন (যুচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বর্দ্ধন** = *বৃদ্ধি অন (on) যাহার।* ***বর্দ্ধনী*** = ***বর্দ্ধন*** *গতিশীল রূপে আধারিত যাহাতে।* ***বর্দ্ধমান*** = *যে বর্দ্ধিত হইতেছে; অথবা* ***বৃদ্ধি*** *চলিতেছে যাহার।* ***বর্দ্ধিষ্ণু*** = *বর্দ্ধিত হইতে ইষ্ণু যে; অথবা* ***বৃদ্ধি****র আকাঙক্ষায় চলিতেছে যে। (দ্র.* ***বিষ্ণু****) /* **বর্দ্ধনী** = যাহা আবর্জ্জনা ছেদন করে। (ব.শ.)। **৩. বর্দ্ধন** = বর্দ্ধনশীল, বর্দ্ধিষ্ণু, বৃদ্ধি, উপচয়, গজদাঁত, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধিকরণ, বাড়ান, হর্ষোৎপাদন, উৎসাহন, ছেদন, পূরণ। **বর্দ্ধনী** = সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, বাড়ন, শবযান (bier), ঘটী, সনালপাত্রভেদ, বদনা। **বর্দ্ধমান** = বৃদ্ধিশীল, দেশভেদ, নগরবিশেষ, পূর্ব্বদিকের দিককরী, প্রশ্নভেদ, প্রহেলিকা, শরাব, এরণ্ড, নারঙ্গবৃক্ষ। **বর্দ্ধিষ্ণু** = বর্দ্ধনশীল, মায়ায় মহাপ্রাণোদ্ভাবনশীল, অভ্যুদয়শীল। (ব.শ.)। **৪. বর্দ্ধনী** বাদে বাকি শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। **৫.** কৃষিজমি তৈরি করে এক বস্তা ধান ছড়িয়ে দিয়ে চার মাস পরে যখন তুলে আনলেন, পেয়ে গেলেন ১০ বস্তা ধান। এক বস্তা ধানের এই যে **আবর্ত্তন** ঘটে গেল, তার ফলে তার **বর্দ্ধন** হয়ে গেল। একেই বলে 'আবর্ত্তনবাহীর দান ধারিত যাহাতে' কিংবা '**বৃদ্ধি** অন যাহার'। সর্বপ্রকার **বর্দ্ধন**-এর মূলে রয়েছে এই আ**বর্ত্তন**। সেকালের সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে যাঁরা এই **বর্দ্ধন** কর্মের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদেরও নাম স্বভাবতই **বর্দ্ধন** হয়ে যায়। তাঁদের উত্তরসূরিরাই এখন **বর্দ্ধন** পদবীর ধারক। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে **গোবর্দ্ধন**, প্রভাকর**বর্দ্ধন**, রাজ্য**বর্দ্ধন**, হর্ষ**বর্দ্ধন** ইত্যাদির প্রসঙ্গ তো রয়েছেই। দ্র. **গোবর্দ্ধন**।

তাই বলে **বর্দ্ধনী** যে 'বদনা'কেও বোঝাতে পারে, আমরা ভাবিনি। কিন্তু যে সত্তার বৃদ্ধিজাত অংশ একটু খানি বেরিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে আছে, তাকে তো **বর্দ্ধনী** বলা যেতেই পারে। কিন্তু শব্দটিই তো অপ্রচলিত। তাকে নিয়ে কথা বলে আর কী হবে, তার চেয়ে বরং **বর্দ্ধমান**-এর কথা হোক। যা কিছুই বেড়ে চলেছে, **বর্দ্ধিত** হয়ে চলেছে, তাদের প্রত্যেককেই **বর্দ্ধমান** বলা যায়। কোনো এক সময় নিশ্চয় বাংলার **বর্দ্ধমান** নামক স্থানটি ক্রম**বর্দ্ধমান** ছিল, তা সে বাহ্যিক সামাজিক কিংবা মানসিক যাই হোক, তাই তার নাম **বর্দ্ধমান** হয়ে গিয়ে থাকবে। ... তবে যাই হোক না কেন, **বর্দ্ধমান** নামক স্থানের গৌরব যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, সেই গৌরব শব্দটি বহন করুক — এটিই যদি আমাদের কাম্য হয় তাহলে তার নামের বানান **বর্ধমান** করা চলবে না।

বৃদ্ধ (বৃদ্ধকোশ, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধি, বৃদ্ধিজীবক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বৃদ্ধ্যাজীব, বৃদ্ধ্যুপজীবী, বার্দ্ধুষিক — বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন) : **১.** ✓বৃধ্ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৃদ্ধ** = *আবর্ত্তনবাহীর দান ধারিত যাহাতে; অথবা,* ***বৃদ্ধি*** *তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, বৃদ্ধি শেষ হইয়াছে যাহার।* ***বৃদ্ধকোশ*** = ***বৃদ্ধ*** *হইয়াছে যে কোশ।* ***বৃদ্ধাঙ্গুলি*** = *অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে (বল)****বৃদ্ধ*** *যে।* ***বৃদ্ধি*** = ***বৃধ্*** *(আবর্ত্তনবাহীর ধারণ) গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা বাড়িতেছে।* ***বৃদ্ধিজীবক*** = ***বৃদ্ধি*** *জীবিকা যাহার।* ***বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ*** = ***বৃদ্ধি****র উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ অর্পণ থাকে যাহাতে।* ***বৃদ্ধ্যুপজীবী*** = ***বৃদ্ধি*** *(বাড়, সুদ) উপজীবিকা যাহার।* ***বার্দ্ধুষিক*** = ***বার্দ্ধুষ****কে (বর্দ্ধনজাতের নবরূপে উত্তরণকে) গতিশীল করে যে; যে 'কারিকাদি' বৃদ্ধি বা সুদ গ্রহণ করে (কিন্তু নিষিদ্ধ বৃদ্ধি গ্রহণ করে না)। /* **বৃদ্ধ্যাজীব** = বৃদ্ধি আজীব যাহার। (ব.শ.)। **৩. বৃদ্ধ** = বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সপ্ততিবর্ষের ঊর্দ্ধবয়স্ক, প্রবয়াঃ, বয়োধিক, জ্ঞানাদিবিষয়ে বৃদ্ধত্বগত ... ইত্যাদি। **বৃদ্ধকোশ** = প্রচুরধনবান। **বৃদ্ধাঙ্গুলি (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ)** = হস্তপদের প্রথমাঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ। **বৃদ্ধি** = বর্দ্ধন, উপচয়, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, স্ফীতি, ব্যাপ্তি, স্থিতি, শুভ, আয়, ধন, কুসীদ, সুদ (চক্রবৃদ্ধি কালবৃদ্ধি কারিতা কায়িকা — এই বৃদ্ধিচতুষ্টয় অশাস্ত্রীয় — মনুসংহিতা), সমূহ, হর্ষ, জনন-অশৌচ, শৈলজগন্ধদ্রব্য, (বৈদ্যকে) ওষধিবিশেষ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, (জ্যোতিষে) একাদশ 'যোগ', বৃদ্ধিকাল, (ব্যাকরণে) সংজ্ঞাবিশেষ — অর্থাৎ অ আ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ স্থানে আর, ঌ স্থানে আল্, এ ঐ স্থানে ঐ, ও ঔ স্থানে ঔ।), আস্পর্দ্ধা, বাড়। **বৃদ্ধিজীবক** = কুসীদজীবী। **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** = বৃদ্ধিনিমিত্ত শ্রাদ্ধ, শুভকর্ম্মে পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদিদান, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ। **বৃদ্ধ্যাজীব** = কুসীদজীবী, উত্তমর্ণ। **বৃদ্ধ্যুপজীবী** = উত্তমর্ণ। **বার্দ্ধুষিক (বার্দ্ধুষ, বার্দ্ধুষি, বার্দ্ধুষী, বার্দ্ধষিন্)** = বৃদ্ধ্যাজীব, ধান্যের বৃদ্ধিগ্রাহী, বাড়িখোর, 'বার্দ্ধষ, বার্দ্ধুষি, বার্দ্ধুষিক বসিষ্ঠ।' (ব.শ.)। **৪.** old অর্থে **বৃদ্ধ**, increase অর্থে **বৃদ্ধি** এবং thumb অর্থে **বৃদ্ধাঙ্গুলি** প্রচলিত। বাকি সব শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **বাড়বা**। যে সত্তার **বৃদ্ধি** হতে হতে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, আর বৃদ্ধি হবে না যার, তাকে **বৃদ্ধ** বলে। ইংরেজিতে একেই বলা যায় full-blown। তবে কিনা, আমাদের বাংলায় এই **বৃদ্ধ** সম্পর্কে তিন রকমের ধারণা প্রচলিত আছে।

শহুরে শিক্ষিত বাংলাভাষী **বৃদ্ধ** বলতে old বা aged বোঝেন; গ্রামবাংলার মানুষ বোঝেন 'তেমাথা'। তাঁরা বলেন, '**তেমাথার কাছে** শলা নেবে'; অর্থাৎ যিনি এতই **বৃদ্ধ** হয়ে গেছেন যে, **বসলে তাঁর**

দুই হাঁটু ও মাথা সমান উচ্চতায় থাকে। আর, রয়েছে ভারতীয় মনীষার ঐতিহ্যে চার **বৃদ্ধে**র ধারণা। এ বিষয়টিকে আমরা যতদূর বুঝেছি, তাতে **বৃদ্ধ** চার প্রকার — জ্ঞানবৃদ্ধ, বলবৃদ্ধ, ধনবৃদ্ধ, ও বয়োবৃদ্ধ; এবং ভারতীয় ঐতিহ্যমতে **বৃদ্ধ**কে প্রণাম করা, শ্রদ্ধা জানান, **বৃদ্ধে**র সেবা করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু আমরা কোন **বৃদ্ধ**কে শ্রদ্ধাদি জানাব? এর উত্তর হল — আমরা যদি ব্রাহ্মণ-নীতিতে বিশ্বাস করি তবে যাঁর জ্ঞানসম্পদ বেশি, সেই জ্ঞান**বৃদ্ধ**ই আমাদের প্রণম্য **বৃদ্ধ** হবেন; তার বল, ধন, বয়স যেমনই হোক। আমরা যদি ক্ষত্র-নীতিতে বিশ্বাস করি তবে যাঁর ক্ষমতা বা বলসম্পদ বেশি, সেই বল**বৃদ্ধ**ই আমাদের প্রণম্য **বৃদ্ধ** হবেন; তাঁর জ্ঞান, ধন, বয়স যেমনই থাকুক। আমরা যদি বৈশ্য-নীতিতে বিশ্বাস করি তবে যাঁর ধনসম্পদ বেশী, সেই ধন**বৃদ্ধ**ই আমাদের প্রণম্য **বৃদ্ধ** হবেন; তাঁর জ্ঞান, বল, বয়স যাই হোক। এবং সর্বোপরি আমরা যদি শূদ্র-নীতিতে বিশ্বাস করি তবে যাঁর বয়স বেশি, সেই বয়ো**বৃদ্ধ**ই আমাদের প্রণম্য **বৃদ্ধ** হবেন; তাঁর জ্ঞান, বল, ধন থাকুক আর না থাকুক। মনে রাখা ভাল, 'শূদ্র-নীতি'কে 'সর্ব্ব-নীতি'ও বলে। কৃষ্ণ যেমন সকল রঙের আধার, **সর্ব্ব**-নীতি তেমনি **সর্ব্ব**-প্রকার সম্পদের আধার। (দ্র. **বর্ণ**)।

আজকাল আমরা এসব কথা মানি না। আজকের বিশ্বপরিস্থিতি আমাদের অ্যাকাডেমি শিক্ষিত বুদ্ধিমানদের শিখিয়েছে যে, একমাত্র ধন**বৃদ্ধ**ই আমাদের প্রণম্য; কেননা, এখন ধনের সাহায্যে জ্ঞান বল বয়স সবই কেনা যায়, শুধু শান্তি কেনা যায় না। তা, শান্তি নিয়ে কি ধুয়ে খাব? শান্তি না থাকলে কী এমন রাজকার্য আটকে যাচ্ছে? তাই আমরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বুদ্ধিমানরা এখন গোপনে প্রকাশ্যে আড়ালে আবডালে শুধুমাত্র ধন**বৃদ্ধ**কেই প্রণাম করে থাকি। ...

বৃদ্ধকোশ শব্দের অর্থে আমরা দেখছি, প্রচুরধনবানকে **বৃদ্ধকোশ** বলে। তার মানে, বৃদ্ধি হতে হতে এই কোশ একেবারে ভরে গেছে, তাই **বৃদ্ধকোশ**। এখন প্রশ্ন হল, এই শব্দটি যে ধারণাকে ধারণ ক'রে প্রকাশ করে, তেমন ধারণাধারী শব্দের কি আজকাল দরকার পড়ে না। উত্তর হল — পড়ে, খুবই পড়ে। ব্যাঙ্কে, রাজকোষে অনেক সময়ই আলমারী একেবারে ভর্তি হয়ে যায়; আর সে খবর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতেও হয়। তাহলে, শব্দটি অপ্রচলিত কেন? কারণ, সেরকম ধারণাধারী শব্দের প্রয়োজন হলে আমরা শিক্ষিত বাংলা-ভাষীরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। বিশ্বাস না হলে যাঁরা ব্যাঙ্কে বা রাজ-কোষাগারে চাকরি করেন তাঁদের শুধোন।

হাতকে সাঁড়াশির সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যায়, একদিকে থাকে চারটি আঙুল, অপরদিকে থাকে একমাত্র বুড়ো-আঙুলটাই। তার মানে, চারটি আঙুলে একত্রে যা করে, **বৃদ্ধাঙ্গুলি** বা **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ** একাই তা করে। অর্থাৎ 'বুড়ো-আঙুল' অন্য সব আঙুলের তুলনায় বল**বৃদ্ধ** বলেই তাকে **বৃদ্ধাঙ্গুলি** বলে। এটি না থাকলে মানুষ কত শতাংশ অক্ষম হয়ে পড়ে, তার হিসাব কষেছেন জীবনবীমা কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, কারও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে গেলে সেই ব্যক্তি ৯০ শতাংশ অক্ষম হয়ে যায়; অতএব সেরকম মানুষের 'অক্ষমতার-অর্থমূল্য' (disablement-benefit) হবে তার পরবর্তী জীবনের মোট রোজগারের ৯০ শতাংশ। ঐ ৯০ শতাংশ অর্থমূল্যের আশায় কল-কারখানায় কর্মরত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ইচ্ছে করেই নিজের বুড়ো-আঙুলটি চলন্ত কলে বলি দিয়েছেন; এমন ঘটনার বহু সাক্ষী রয়েছেন। কিন্তু সেই **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ**কে উপরে তুলে অন্যকে প্রদর্শন করা বা বুড়ো-আঙুল দেখানোকে **কলা-দেখানো** বলা হয় ঐতিহাসিক কারণে। দ্র. **কলা ১ম খণ্ড**।

হাজার টাকার ধান কিনে চাষ করে যে ধান পেলেন, দেখা গেল তার দাম দশ হাজার টাকা। এইবার সেই দশ হাজার টাকা থেকে ঐ হাজার টাকা ও বিনিযুক্ত শ্রমাদির মূল্য বাদ দিয়ে দেখা গেল আপনার হাতে মাত্র ৮০০ টাকা থাকছে। একে দুভাগ করে দুজনকে ভাগ করে দেওয়া হয়, একজনের নাম **লব** (= লাভ) ও **কুশ** (= কুশীদ বা সুদ)। সামাজিক অর্থনীতিতে এই **কুশ**কে **বৃদ্ধি** বলে। অনেকেই জানেন, ইসলাম ধর্মে সুদ খাওয়া হারাম; মনুসংহিতা অনুসারে ভারতবাসীদের **ধর্ম্মে**ও চার রকম সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ — চক্র**বৃদ্ধি**, কাল**বৃদ্ধি**, কারিতা, কায়িকা। চক্র**বৃদ্ধি** ও কাল**বৃদ্ধি** কাকে বলে সবাই জানেন। কারিতা হল জোর করে লিখিয়ে নেওয়া সুদ এবং কায়িকা-সুদ হল টাকা ধার নিয়ে সেই টাকা দিয়ে লোক খাটিয়ে কিংবা গরু কিনে তাকে খাটিয়ে যে **বৃদ্ধি** হয়, তার ভাগ নেওয়া। এই চার রকম **বৃদ্ধি** বা সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ। যেরকম **বৃদ্ধি** গ্রহণ সিদ্ধ তার একটির নাম 'কারিকা-সুদ'। তার কথাই উপরে ধানচাষের গল্পে আমরা বলেছি। **বার্দ্ধুষিক বসিষ্ঠ** এই 'কারিকা-সুদ' গ্রহণ করতেন বলেই মনে হয়।

কিন্তু এ তো গেল অর্থনীতিতে **বৃদ্ধি**র গল্প। এরকম **বৃদ্ধি** আরও বহুক্ষেত্রে হয়ে থাকে। জ্যোতিষে, বৈদ্যকে, ব্যাকরণেও হয়। উপরে ৩.-এ প্রদত্ত অর্থে সেই সব **বৃদ্ধি**র কথাও বলে গেছেন ব.শব্দকোষ। তবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক **বৃদ্ধি**কে চেনা যায় **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে**। এ হল 'বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রাদ্ধ'। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ প্রাচীন **ধর্ম্মা**চারের যেমন দুটি রূপ, এরও সেইরকম দুটি রূপ; একটি বাস্তব এবং অপরটি প্রতীকী। প্রতীকী-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের অনেকেই করে থাকেন, কেউবা নিজে না-করলেও অন্যকে করতে দেখেছেন। একে '**আভ্যুদয়িক** শ্রাদ্ধ'ও বলে। এর পরও নেহাত না বুঝতে পারলে যে কোনো হিন্দু পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আপনাকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেবেন **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** কী, কীভাবে করতে হয়।

তবে, এই **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে**র বাস্তব রূপটির কথা কেউ জানেন না, যদিও বাস্তবে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ নির্বিশেষে প্রায় সব মানুষই এই বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** করে থাকেন। তার মানে, হিন্দুরা দুইরকম **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** করে থাকেন; অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** করলেও প্রতীকী-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** করেন না। এরকম হওয়ার কারণ হল, বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে**র সঙ্গে প্রতীকী-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে**র সম্পর্কসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই, দুটো যে আসলে একই কর্মের দুটি রূপমাত্র, সেকথা সবাই গেছেন ভুলে। আসুন, সে-সম্পর্কসূত্র এখন জুড়ে ফেলা যাক।

ব.শ. জানাচ্ছেন, 'শুভকর্ম্মে পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদিদান' করাই হল **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**। পুরোহিতেরা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের এই **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে**র প্রতীকী আচরণ করেন ও করান। বাস্তবে কোনো কাজের 'অভ্যুদয়মূলক' **বৃদ্ধি**র জন্য যে সকল **শ্রাদ্ধ** (শ্রদ্ধার সহিত

দান) করা হয়, তাকেই **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** বলতে হয়। তো, দান করবেন কাকে? বলা হয়েছে, দান করতে হবে 'পিত্রাদি'কে। কারা তাঁরা? তাঁরা হলেন সমাজের, সংস্থার, গোষ্ঠীর, নানা মাপের ক্ষমতাকেন্দ্রের অধীশ্বর — সমাজের বাপ, সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের বাপ, গোষ্ঠীর বাপ, নানা কোম্পানির বাপ। এই বাপদের মধ্যে যাকে যাকে যে যে পরিমাণে দান করলে আমাদের কর্মফলের **বৃদ্ধি** সাধিত হতে পারে, তাদেরকে দান করলেই বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** করা হয়; এবং সন্দেহ নেই আমরা অনেকে তাই-ই করি — প্রতিষ্ঠানের বা কোম্পানির পরিচালককে 'কাট্-মানি' দিই, বড়বাবুকে 'ঘুষ' দিই, পিয়নকে 'বকশিশ' দিই। এ সবই বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের** আধুনিক নাম। তবে কিনা, আমরা যত প্রাচীনকালের দিকে যাব, বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** ততই বেশি বেশি আভরণযুক্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হবে; আর যতই একালের দিকে আসব, সেই **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** ততই আভরণহীন, বেশবাসহীন হতে হতে ক্রমশ উলঙ্গ রূপে প্রতিভাত হবে — 'কাট-মানি', 'ঘুষ', 'বকশিশ'-এর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। লেনদেনটাই সম্বন্ধের একমাত্র কথা হয়ে গেলে, সম্বন্ধ কলুষিত হয়ে যায়। একালের বাস্তব-**বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** সেকারণেই সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতে, যখন ভাষা ও লেখালিখিতে সাধারণ মানুষ অনভ্যস্ত, তখন আমাদের পূর্বসূরিগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞানকে অন্যদের বোঝানোর জন্য লেখালিখি ছবি স্থাপত্য ভাস্কর্যে যত না গুরুত্ব দিতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন আচার-আচরণে, প্রথায়। নিজেদের বক্তব্যকে তাঁরা প্রথামূলক আচার-আচরণে অনুবাদ করে রাখতেন। তাঁদের হাতে সৃষ্ট ও প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণ, যজ্ঞাদি, শ্রাদ্ধাদি ... এসবই হল সেই অনূদিত সম্পদ। লোকে সেই আচার-আচরণ থেকে বুঝতে পারত তাকে বাস্তবে কী করতে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ ঐ বিপুল পরিমাণ অনূদিত ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী। আর, ঐ ঐশ্বর্যের মানে ভুলে যাওয়াই তার দুর্গতির কারণ।

বৃষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অবর্ষ, অবৃষ্টি, আবৃষ্টি, ইলাবৃতবর্ষ, কুরুবর্ষ, দ্রুমবর্ষ, বরখ, বরখা, বরখান্ত (বরখ-অন্ত), বরখাস্তী, বরষ, বরষা, বরিখ, বরিখন, বরিষ, বরিষণ, বরিষা, বাসায়া, বাসু(সো)য়া, বাসোয়া, বর্ষ, বর্ষকর, বর্ষগিরি, বর্ষণ, বর্ষত্র, বর্ষত্রাণ, বর্ষধর, বর্ষপর্ব্বত, বর্ষপাত, বর্ষপ্রতিবন্ধ, বর্ষপ্রবেশ, বর্ষশত, বর্ষশতী, বর্ষা, বর্ষাকাল, বর্ষাকালিক, বর্ষাকালীন, বর্ষাগম, বর্ষাতী, বর্ষাবসান, বর্ষাবসায়, বর্ষাভব, বর্ষাভূ, বর্ষাম্বু, বর্ষান্তঃ, বর্ষারম্ভ, বর্ষিষ্ঠ, বর্ষী, বর্ষীয়, বর্ষীয়স, বর্ষীয়ান, বর্ষুক, বর্ষোপল, বর্ষ্ম, বসহা, বারিষ, বার্ষদংশ, বার্ষপার্ব্বণী, বার্ষিক, বার্ষিকী, বার্ষ্ণেয়, বিষ্টি, বৃষ্, বৃষ, বৃষকেতন, বৃষকেতু, বৃষণ, বৃষদংশক, বৃষধ্বজ, বৃষনাদী, বৃষপতি, বৃষপর্ব্বা, বৃষবাহন, বৃষভ, বৃষভকেতু, বৃষভধ্বজ, বৃষভযান, বৃষভাক্ষ, বৃষভাঙ্ক, বৃষভানু (বৃকভানু), বৃষভাসুর, বৃষল, বৃষলপতি, বৃষলরাজ, বৃষলী, বৃষলীপতি, বৃষলীফেনপীত, বৃষলীসেবন, বৃষস্কন্ধ, বৃষস্যন্তী, বৃষা, বৃষাকপায়ী, বৃষাকপি, বৃষাঙ্ক, বৃষাচার, বৃষী, বৃষোৎসর্গ, বৃষ্ট, বৃষ্টি, বৃষ্টিজীবন, বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিমান, বৃষ্ণি, বৃষ্য, বৃষ্যা, বৃসী, ভারতবর্ষ, শতবর্ষ, শিলাবর্ষ, হিমবর্ষ।

বৃষ্ = আবর্ত্তনবাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **বৃষ** = আবর্ত্তনবাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ থাকে যাহাতে।

বর্ষ (বর্ষকর, বর্ষগিরি, বর্ষণ, বর্ষত্র, বর্ষত্রাণ, বর্ষধর, বর্ষবর, বর্ষপর্ব্বত, বর্ষপাত, বর্ষপ্রতিবন্ধ, বর্ষপ্রবেশ, বর্ষশত, বর্ষশতী, বার্ষিক, ভারতবর্ষ) : ১. ✓বৃষ্ + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বর্ষ** = **বৃষ্** *(আবর্ত্তনবাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) থাকে যাহাতে।* ***বর্ষকর*** *= **বর্ষণ** করে যে।* ***বর্ষগিরি*** *= যে গিরিতে **বর্ষিত** হয়; অথবা, যে গিরি হইতে **বর্ষিত** হয়।* ***বর্ষণ*** *= **বর্ষ** অন (on) যাহাতে।* ***বর্ষত্র*** *= **বর্ষ** কর্ত্তৃক ত্রাত যে।* ***বর্ষত্রাণ*** *= **বর্ষ** হইতে ত্রাণ করে যে।* ***বর্ষধর*** *= **বর্ষ**কে ধরে রাখে যে।* ***বর্ষবর*** *= **বর্ষ**কে বরণ করে যে বা করিবার ব্যবস্থা করে যে।* ***বর্ষপর্ব্বত*** *= যে **পর্ব্বতে বর্ষিত** হয়; অথবা, যে **পর্ব্বত** হইতে **বর্ষিত** হয়।* ***বর্ষপাত*** *= **বর্ষে**র পতন যাহাতে।* ***বর্ষপ্রতিবন্ধ*** *= **বর্ষে**র প্রতিবন্ধ যাহা কর্ত্তৃক।* ***বর্ষপ্রবেশ*** *= যাহা দ্বারা **বর্ষে** প্রবেশ করা হয়।* ***বর্ষশত*** *= একশত **বর্ষ** যাহাতে।* ***বর্ষশতী*** *= যাহার একশত বর্ষ গত হইয়াছে।* ***বার্ষিক*** *= **বর্ষ**জাতকে গতিশীল করে যে।* / **বর্ষকর** = বৃষ্টি করে যে। **বর্ষত্র, বর্ষত্রাণ** = বৃষ্টি হইতে ত্রাণ করে যে। **বর্ষধর** = রেতঃ বর্ষণ ধারণ করে যে। **বর্ষবর** = রেতঃসেক বারণ করে যে। **বার্ষিক** = বর্ষ ব্যাপী যাহা হইয়াছে বা হইবে। (ব.শ.)। **৩. বর্ষ** = মেঘবারিপাত, বর্ষণ, বৃষ্টি, বর্ষবৎ অবিরলপাত, বৎসর, জম্বুদ্বীপের নব অংশ — ইলাবৃত-প্রভৃতি, জম্বুদ্বীপ, ভারত, মেঘ। (ব.শ.)। দেশ। পৃথিবীর বৃহৎ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে নয়টি দেশ অবস্থিত। এই বর্ষগুলির নাম ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, উত্তরকুরুবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতুমালবর্ষ। (পৌ.অ.)। **বর্ষকর** = মেঘ। **বর্ষগিরি, বর্ষপর্ব্বত** = জম্বুদ্বীপের নববর্ষের সীমাসূচক পর্ব্বত। **বর্ষণ** = বর্ষক, বৃষ্টিকারক, বৃষ্টি, মেঘাম্বুপাত, নিষেক, সেচন, বৃষ্টিবৎ অবিরলপাত, ভূরিদান, অস্ত্রভেদ। **বর্ষত্র, বর্ষত্রাণ** = ছত্র। **বর্ষধর, বর্ষবর** = অন্তঃপুররক্ষক, শণ্ড, খোজা। **বর্ষপাত** = বৃষ্টিপাত। **বর্ষপ্রতিবন্ধ** = বৃষ্টিবিঘাত, অনাবৃষ্টি। **বর্ষপ্রবেশ** = নববর্ষারম্ভ। **বর্ষশত** = শতাব্দী। **বর্ষশতী** = শতবর্ষ-বয়স্ক। **বার্ষিক** = বর্ষভব, বাৎসরিক, বর্ষজীবনপর্য্যাপ্ত, বর্ষাস্থিত, বর্ষাকালিক, বর্ষানিমিত্ত, প্রতি বর্ষে দেয় অর্থাদি। **ভারতবর্ষ** = ভারত নামক বর্ষভেদ। (দ্র. **ভারত**)। (ব.শ.)। **৪. বর্ষ** ও **বার্ষিক** যথার্থে প্রচলিত। **ভারতবর্ষ** জনসাধারণ্যে প্রচলিত, কিন্তু ভারতের সংবিধানে অস্বীকৃত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ইলাবৃত, জম্বুদ্বীপ, ভরত, ভারত, ভারতবর্ষ**। ব.শ. **বর্ষ** শব্দের প্রথম অর্থটিই দিচ্ছেন 'মেঘবারিপাত'। অর্থাৎ মেঘ (= cloud) হল জাগতিক **বৃষ**, যার **রেতঃ** হল বারি। সেই 'মেঘবারিপাত' হল **বর্ষ** যা নিসর্গ-প্রকৃতির ভিতরে **সৃজন** নিষেক করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো দৃশ্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তাঁদের সমস্যা ছিল 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তা' যা মানবজাতির জীবনে সুবিধা বা সমস্যা তৈরি করে।

তেমন **বর্ষ**কে বোঝানোর জন্যই তাঁরা **বর্ষ** শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন। সেই **বর্ষ** কে বা কারা? সে কী করে?

ইতোমধ্যে আমরা জেনে গেছি, শব্দশাস্ত্রের নিয়মে যে সত্তা 'সৃজনশীলতা' **বর্ষণ** করে, তাকে **বৃষ** বলে; আর, সে যা (সৃজনশীল শক্তি) **বর্ষণ** করে (দ্র. **বৃষ্টি**), তাকে **বর্ষ** বলে। শুধু তাই নয়, যে দেশে **বর্ষণ** করে, যে কালে **বর্ষণ** করে, যে পাত্রে **বর্ষণ** করে তাদের প্রত্যেককেই **বর্ষ** বলে। **বর্ষ** শব্দের ইত্যাকার অর্থের কারণে দেশের নাম যেমন ভারত**বর্ষ**, হিম**বর্ষ** ... ইত্যাদি হয়, হতে পারে, তেমনি কালের নাম প্রথম **বর্ষ**, দ্বিতীয় **বর্ষ**, দ্বাদশ **বর্ষ**, শত**বর্ষ** ... ইত্যাদিও হয়, হতে পারে; এবং পাত্রের নাম **বর্ষ**গিরি, **বর্ষপর্ব্বত** ইত্যাদিও হয়, হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল — এসব **বর্ষে** (সৃজনশীল শক্তিরূপে) কী বর্ষিত হয়? এগুলি কি শুধুই জলধারা বর্ষণ?

যাঁরা নিজ নিজ **কাণ্ডজ্ঞান** ও সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের পুরাণাদি পাঠ করতে যান, তাঁরা এই **বর্ষ**কে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েন, এবং প্রায়শই কোনো কূলকিনারা পান না। দ্র. **ইলাবৃত** (১ম খণ্ড)। ... সংক্ষেপে বিষয়টি এরকম — প্রাচীন যৌথসমাজ সারা বছর ধরে কীভাবে তার কাজকর্ম চালাত, আমাদের সকল পুরাণাদি গ্রন্থে তার এক 'সর্বমান্য' বয়ান রয়েছে। সে-বয়ান কার্যত সেই সমাজের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চলমানতার বাৎসরিক **বৃত্তান্ত**। বৃত্তান্তটি এইরূপ — আদিম যৌথসমাজে পরিচালক ও পরিচালিতের মধ্যে প্রেমবন্ধন ছিল, পারস্পরিক বিশ্বাস ছিল গভীর; তাঁরা পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। সেই পরিচালক গোষ্ঠী সমাজের জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের দেখাশোনা করতেন, তাঁরাই বছরের শুরুতে বীজধান ও অন্যান্য সাধনাদি সকল সমাজসদস্যকে বিধিমতে ভাগ-বাঁটোয়ারা (বা **বর্ষণ**) করে দিতেন। সমাজসদস্যরাও সেসব নিয়ে সারা বছর ধরে চাষাবাদ করতেন, ফসল তুলে জমা করতেন। তারপর পরিচালকের সহযোগী লোকজন এলে বিধিমতে ফসলের অংশ বা সমস্ত ফসল তাঁদের হাতে তুলে দিতেন। তাঁরাও সেগুলি নিয়ে গিয়ে জমা করতেন, সংরক্ষণ করতেন। তারপর পুনরায় পরের বছরের শুরুতে আবার সেই পরিচালকেরা ডাক দিতেন — এসো, তোমাদের বীজধান ইত্যাদি নিয়ে যাও। এতে কখনো-সখনো সমস্যাও দেখা দিত। পরিচালকদের ফসল সংগ্রহকারী ও বিতরণকারী লোকজনেরা ক্ষমতাদর্পী ব্যবহার করে বসত। হম্বিতম্বি করত, 'গর্জ্জনকারী মেঘ'-এর মতো করত। যারা অতি ক্ষমতাদর্পী হয়ে উঠত, অতি **গর্জ্জন** করত, কিন্তু বিতরণের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ বীজধানাদি দিত না, তাদের বিষয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ জমত। লোকে বুঝত, এরা যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না।

এই যে বাৎসরিক সামাজিক-অর্থনৈতিক **বৃত্তান্ত**, এটি তো অখণ্ডভাবে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয় এবং সেসব অন্যকে বোঝানোও বেশ কঠিন। এই ঘটনাকে পুরাণাদিতে এমনভাবে বলা হয়েছে, যাতে মনে হয়, পুরাণকারগণ **সূর্য্যে**র কথা বলছেন, তার তাপ দিয়ে পৃথিবীর খালবিল নদীনালার জলীয় বাষ্প তুলে নেওয়ার কথা বলছেন, সেই জলীয় বাষ্পভরা জলদগম্ভীর **গর্জ্জন**কারী **মেঘে**র কথা বলছেন, অবিরত **বৃষ্টি**ধারার মাধ্যমে পুনরায় সেই জল পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। এধরনের বয়ান পাঠের সময় **সূর্য্য** বা **সবিতা**, ('গর্জ্জনকারী'-) **মেঘ**, **জল**, **বৃষ্টি** প্রভৃতি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের দিকে পাঠক তাকান না, তাঁরা শব্দগুলির প্রতীকী অর্থ — যথাক্রমে sun, cloud, water, rain ... ইত্যাদি বুঝে নেন। ফল হয় এই যে, দৃশ্যজগতের বৃষ্টির বৃত্তান্তেই পাঠক আবদ্ধ হয়ে পড়েন, পুরাণকারগণ প্রকৃতপক্ষে যে বাৎসরিক সামাজিক অর্থনীতির সম্পদ**বর্ষ**ণের কথা বলার জন্য বয়ানগুলি রচনা করেছিলেন, সেসব কথা অবোধ্যই থেকে যায়। প্রায় সকল পুরাণাদি গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। পুরাণ থেকে সেই 'প্রামাণ্য' বয়ানের একটি উদাহরণ দিলেই পাঠক ব্যাপারটি টের পেয়ে যাবেন।

> "সনৎকুমার কহিলেন — হে দ্বিজগণ। ... এই ভূমিতল হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্যলোক ... ঐ অন্তরীক্ষে মন্বন্তরভেদে গ্রহ ও মেঘসমূহ নানাবিধ হয় অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্বন্তরে যেরূপ, অপর মন্বন্তরে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। মেঘস্থান দশসহস্র দশ যোজন উন্নত। উহাতে নববিধ জলধরসমূহ আগ্নেয় ও অন্যান্য মেঘসকল বরুণদেবের, ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। উহাদের ঊর্দ্ধে সূর্য্যলোক ... সূর্য্যদেব বৃষ্টির কারণ বলিয়া তৎপ্রসঙ্গে মেঘ বর্ণনা করিতেছি; উহারা অন্তরীক্ষচারী, অতি সুন্দর এবং বায়ু অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বত্র গমনাগমন করে ও জল ক্ষরণ করে। সূর্য্যলোকে সপ্তসংখ্যক বায়ব্য গণবিশেষ সপ্ত সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া নির্ম্মল সলিল বহনপূর্ব্বক স্বর্গপথ আশ্রয়করত নিজ নিজ অংশে আকাশে শত শত দেব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণের সহিত সঞ্চরণ করে ... আকাশে জল অর্থাৎ মেঘাদি বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে; ঐ সকলই সূর্য্যতেজের আকর্ষণে সমুৎপন্ন হইয়াছে ...।" (শিবপুরাণ / সনৎকুমারসংহিতা / ৫ম অধ্যায়।)

এ হল একটি যৌথসমাজের পরিচালক ও তার সহযোগী কর্মচারীদের কাজকর্মের বিষয়ে পুরাণসমূহের 'সর্ব্বমান্য' বয়ান। একালের কোনো যৌথসামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তার কর্মচারীদের আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ বয়ানটিকে বুঝতে হয়। তাতে খানিকটা বোঝা যায়, সম্পূর্ণ বোঝা যায় সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ধরে ধরে এগোলে। কিন্তু এ তো গেল 'যা বর্ষিত হয়' এবং 'যে কালচক্রে বর্ষিত হয়', সেই বাৎসরিক অর্থনৈতিক সৃজনশীল শক্তিরূপ সম্পদ**বর্ষণ**কারী **বর্ষ**-এর কথা। কিন্তু যে দেশ বা স্থানে বর্ষিত হয়, তার বিষয়ে সকল পুরাণাদি গ্রন্থে যে বর্ণনা করা হয়েছে, সে কেমন? আসুন, তার একটি নমুনাতে চোখ বুলাই —

> "সনৎকুমার কহিলেন — হে পরাশরতনয়। আমি সংক্ষেপে ভূমণ্ডলবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, পুষ্কর ও শাক এই সপ্তদ্বীপসকল লবণ, ইক্ষুরস, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রে পরিবৃত। জম্বুদ্বীপ এই সপ্তদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ... এই জম্বুদ্বীপের প্রথম ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং হরিবর্ষ; তিন স্থানই সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত। ... " (শিবপুরাণ / ধর্ম্মসংহিতা / ৩৩ অধ্যায়)।

এই বর্ণনাগুলি প্রায় সকল পুরাণাদি গ্রন্থে রয়েছে, কোথাও ৫/৭ পৃষ্ঠা ধরে, কোথাও-বা তারও বেশি। এই বর্ণনা প্রধানত ও মূলত মানসলোকের অখণ্ড 'ভুবনকমল' ও তার খণ্ডগুলি (উপরোক্ত জম্বুখণ্ড ... ইত্যাদি) সম্পর্কে প্রযোজ্য। সেই **জম্বুখণ্ড**-এর বা **জম্বুদ্বীপ**-এর **বর্ষ**গুলি হল এক একটি পৃথক **আকাশ**, **সূর্য্য**, **মেঘ**, ভূলোকাদি

সমন্বিত যৌথসমাজের এলাকা। সেই সমগ্র মানস-ভূগোলের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি অনেক বড়, এখানে তা ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের **ভারতবর্ষ** নামটি অতি প্রাচীন ধারণার অংশ হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি। এর **বর্ষ** শব্দটির মানে থেকে আমরা বুঝতে পারছি, এটি **ভারত**দিগের **বর্ষ**, অর্থাৎ অন্যান্য **বর্ষে**র মতো এই **বর্ষ**টিরও একটি পৃথক মনোলোক আছে, সে মনোলোকের নিজস্ব আকাশে তার নিজস্ব **সূর্য্য**, **মেঘ**, ভূলোক ইত্যাদি আছে, এবং যৌথসমাজের সম্পদ**বর্ষণে**র সামাজিক অর্থনৈতিক নিয়মেই এ **বর্ষ**ও চলত। তবে এই **বর্ষ**কে কেন **ভারতবর্ষ** বলা হত, সে আরেক প্রসঙ্গ। সে বিষয়টি আমরা **ভরত, ভারত** ও **ভারতবর্ষ** শব্দে বিস্তারিত করেছি। ...

অতএব দেখা যাচ্ছে, **বর্ষ** শব্দের অর্থ খানিকটা **দেশ** শব্দের মতো মনে হলেও তার চেয়ে বেশি ব্যাপ্ত। **বর্ষ** হল সেই সৃষ্টিশক্তিধারী সম্পদ, জল ... ইত্যাদির ধারা, 'যা বর্ষিত হয়'। **বর্ষ** হল সেই ক্রিয়া — সম্পদচূর্ণ, জলচূর্ণ ইত্যাদির 'বর্ষণ-কর্ম্ম চলে যাহাতে'। **বর্ষ** হল সেই কালবৃত্ত, যে কালে সম্পদ, বারি ... ইত্যাদির **বর্ষণ** ঘটে। **বর্ষ** হল সেই দেশবৃত্ত, যে দেশে সম্পদ, বারি ... ইত্যাদির **বর্ষণ** ঘটে।

বর্ষা : **১.** বর্ষ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *বর্ষের আধার যে।* **৩.** বর্ষযুক্ত কাল, ঋতুভেদ, প্রাবৃট, বর্ষণ, বৃষ্টি, বর্ষণ করা। (ব.শ.)। **৪.** rain অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বর্ষ**। যেহেতু **বর্ষ** শব্দটির অর্থ বহুমাত্রিক (উপরে **বর্ষ** দ্রষ্টব্য), তার আধার মাত্রকেই **বর্ষা** বলা যায়। অর্থাৎ, যা কিছু অবিরত ধারায় বর্ষিত হয়, সে সবই **বর্ষা** পদবাচ্য হতে পারে। কিন্তু প্রধানত বাহ্যিক অবিরত বারিপাতকেই **বর্ষা** বলা হয়ে থাকে।

বৃষ (বৃষকেতন, বৃষধ্বজ, বৃষপতি, বৃষবাহন, বৃষভ) : **১.** ✓বৃষ্ + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. বৃষ** = *আবর্ত্তনবাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ করে যে; অথবা, সৃজনশীলতা বর্ষণ করে যে।* ***বৃষকেতন*** = ***বৃষই কেতন*** *যাহার।* ***বৃষধ্বজ*** = ***বৃষ*** *ধ্বজা যাহার।* ***বৃষপতি*** = ***বৃষ****সমূহের পতি।* ***বৃষবাহন*** = ***বৃষ বাহন*** *যাঁহার।* ***বৃষভ*** = ***বৃষ*** *ভাত (শোভিত) যাহাতে। /* **বৃষ, বৃষভ** = রেতঃ বর্ষণ করে যে; কাম বর্ষণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. বৃষ** = শুক্রল, যণ্ড, বৃষভ, চক্রশূলাঙ্কিত বৃষভ, পুরুষজাতি পশু, (জ্যোতিষে) রাশিবিশেষ (Taurus), চারিজাতি পুরুষের একতম, শ্রেষ্ঠার্থ, শৃঙ্গি মাত্র, পতি, (বৃষরূপ) ধর্ম্ম, সুকৃত, বাসকবৃক্ষ, ঋষভ নামক ওষধি, ময়ূরপিচ্ছ, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, সূর্য্য, কামদেব, বাস্তুস্থানভেদ, শত্রু, মূষিক। **বৃষকেতন, বৃষধ্বজ, বৃষবাহন** = শিব। **বৃষপতি** = যণ্ড। **বৃষভ** = বৃষ, পুরুষজাতি পশু, চারিজাতি পুরুষের একতম, (জ্যোতিষে) বৃষরাশি, শ্রেষ্ঠার্থ, ঋষভনামক ওষধি, অষ্টাবিংশ মুহূর্ত্ত, কর্ণচ্ছিদ্র, আদিজিন, বৈদর্ভীরীতিভেদ। (ব.শ.)। **৪.** 'ষাঁড়' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ধুরন্ধর, বাহন, ধর্ম্মবাহন**। **আবর্ত্তন**বাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ করে যে, তাকে **বৃষ** বলে। কারণ **বৃষ**টি মনুষ্য, গো, অশ্ব ... যে জাতির **বৃষ**ই হোক না কেন, সে তার জাতির মহা**বৃত্তে**র আ**বর্ত্তনে**র স্রোতধারার স্রোতের **রেত** বহন ক'রে সেই **রেত**কে দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত করে, **বৃষ্** করে (দ্র. **বৃষ্টি**), সৃজনশীলতা সেচন করে বা **রেতঃ**সেক করে। এর থেকে উত্তরধারার সৃষ্টি হয় বলে **বৃষ্**-কে 'সৃজনশীলতা দান'ও বলা হয়ে থাকে। সেই সুবাদে একে **বৃ** (= আবর্ত্তন) দান (= **দ**) বা **বৃদ্** বলা যেতে পারে। তবে এরকম কোনো শব্দ বাংলায় নেই, তার বদলে রয়েছে **বৃধ্**। তার থেকে **বৃদ্ধি** হয়। ইংরেজিতে কিন্তু **বৃদ্** (= breed, breeding) হুবহু বিদ্যমান, যা সরাসরি 'বংশবৃদ্ধি' করার কথাই বলে। সেই বিচারে 'সৃজনশীলতা বর্ষণ করে যে', তাকে **বৃষ** বলা যেতেই পারে। ...

তা সে যাই হোক, আমরা দেখেছি, মানুষের **বৃষ** ও গোপ্রজাতির **বৃষে**র মধ্যে প্রায় হুবহু মিল রয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারার পর এতই চিত্তাকর্ষক লেগেছিল যে, তা নিয়ে আমরা 'বৃষোৎসর্গ' নামে একটি নিবন্ধ লিখে ফেলি, যা প্রকাশিত হয়েছে আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা গোপ্রজননকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন রাখার জন্য 'শিবের ষাঁড়' ছেড়ে দিতেন, যারা বনে বাদাড়ে রোদে জলে ঘুরে বেড়াত, কারও হুকুমের চাকর হয়ে **বলদ**-এর মতো খাটত না, কারও গোয়ালেও থাকত না। মানবপ্রজাতির শিবগুণসম্পন্ন মানুষেরাও কারও হুকুম খাটেন না, নিজের মনের রাজা হন নিজেই। এই মানুষ-**বৃষ**দেরই **শিব** বলে। আর **শিব** যে আবিষ্কার ক'রে, উদ্ভাবন ক'রে, তার সাহায্যে নতুন নতুন সৃষ্টি ক'রে সেই নবাবিষ্কৃত জ্ঞান ও **কর্ম্মে**র 'অগ্নিশিখা' (= **শি**) 'বহন' (= **ব**) করে নিয়ে চলেন, সেকথা এতদিনে পাঠকপাঠিকা জেনে গেছেন, আশা করা যায়। বলে রাখা ভাল, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলতেন **শৈব**। ... **৬.** ইংরেজি ware, wire, ... এবং আরবি 'ওয়ারিশ' বা উত্তরাধিকারী (দ্র. **বৃষ্ট**)।

বৃষকেতু : **২.** ***বৃষ*** *(সৃজনশীলতা)* ***কেতু*** *যাহার।* **৩. বৃষকেতু** = শিব। (ব.শ.)। কর্ণের পুত্র। ... পদ্মাবতীর গর্ভে কর্ণের বৃষসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ... কোনো প্রার্থীকে বিমুখ না-করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্ণকে ... পরীক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কর্ণ তাঁকে তুষ্ট করবার জন্য অনায়াসে নিজ পুত্রকে বধ করেন। কর্ণের এই অদ্ভুত দানশীলতা দেখে কৃষ্ণ সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে বৃষকেতুকে পুনর্জীবিত করেন। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে বৃষকেতু পাণ্ডবদের আশ্রয়প্রার্থী হন এবং পরম সমাদরে গৃহীত হন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** নিজের সন্তানকে 'কুরবানি' দেওয়ার এই মহাভারতীয় কাহিনীর পাশাপাশি ইসলাম ধর্মেও নিজ পুত্রকে আল্লাহ্-এর উদ্দেশ্যে 'কুরবানি' (= বলি) দেওয়ার এমন ঘটনা রয়েছে; প্রতি বছর 'বকর্-ইদ'-এর নমাজের সময় ইমামসাহেব এ কাহিনী মুসলমান ধর্মপ্রাণ মানুষদের শোনান। আমাদের বক্তব্য এই যে, এটি বাহ্যিক বলির ঘটনা নয় বলেই আমাদের মনে হয়। তবে এর প্রকৃত অর্থ ঠিক কী ছিল, তার প্রেক্ষিত ধরে গবেষণা করা দরকার। কেউ কারও দেখে অনুকরণ করেছে, এমন কথা ভাবা বাতুলতা। প্রায় একই ঘটনা দুই ধর্মে দুই দেশে ঘটেছে নিশ্চয় কোনো গূঢ় কারণে। আমাদের মতে, সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মে একটি সভ্যতার অগ্রগতির পথে অনিবার্য বাধ্যবাধকতায় যে ঘটনা ঘটে,

অন্যের ক্ষেত্রেও সেই বাধ্যবাধকতা থেকে থাকবে।

বৃষ্ট (বৃষ্টি) : ১. ✓বৃষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **বৃষ্ট** = **বৃষ্** *(সৃজক-সেচন) টঙ্কারিত যাহাতে।* **বৃষ্টি** = **বৃষ্ট** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৩. **বৃষ্ট** = কৃতবর্ষণ, সিক্ত, আর্দ্রীকৃত। **বৃষ্টি** = মেঘাম্বুপাত, বর্ষণ, (সাদৃশ্যে) বর্ষণমাত্র, অবিরলপাত, পাত, পুষ্কলবিতরণ, মেঘান্তর্বর্ত্তমান উদক, বর্ষণীয় জল, সম্পদ, প্রাচুর্য্য। (ব.শ.)। ৪. rain অর্থে **বৃষ্টি** প্রচলিত, **বৃষ্ট** অপ্রচলিত। ৫. যে কোনো টঙ্কারকেই শব্দশাস্ত্রে বলা হয় 'ট'। তা **বৃষ্টি** যে অত উপর থেকে মাটিতে **প**ড়ে, তার **ট**ঙ্কার হল 'পট', অর্থাৎ তখন 'পট পট করে বৃষ্টি পড়ছে'। তবে, যত উপর থেকেই বৃষ্টি পড়ুক, 'পড়ে টঙ্কারিত হলে' তাকে বলে **বৃষ্ট**। তার আগে ধরেই নিতে হচ্ছে যে, উপর থেকে ঝর ঝর করে নেমে আসা অজস্র ধারার প্রতিটি ধারার পতনক্ষেত্রে মাটি বা ঐ ধরনের কিছু বিছানো আছে, যার উপরে পড়ে সে টঙ্কারিত হয়। কিন্তু, ধরা যাক, সব বৃষ্টির জলবিন্দুগুলি মাটিতে পড়ার আগেই থেমে গেল, তখন ঐ বৃষ্টির জলবিন্দুগুলিকে কী বলা হবে? তারা তো কারও উপর পড়েনি, ফলে টঙ্কারিত হয়নি। বাংলা শব্দশাস্ত্র অনুসারে তাকে বলতে হবে — **বৃষ্**। মাটিতে পড়ে গিয়ে টঙ্কারিত (আওয়াজ-কৃত) হলেই **বৃষ্ট**, তার আগে নয়। তার আগে পর্যন্ত সে **বৃষ্**। তাকে আপনি **বৃষ্**, **বৃষণ** (কবিরা তাকে **বরিষণ**) বলতে পারেন, কিন্তু যেই না মাটিতে বা অন্য কোথাও পড়ে গিয়ে আওয়াজ করল, তৎক্ষণাৎ তাকে বলতে হবে **বৃষ্ট**। সেই **বৃষ্ট** যদি চলতেই থাকে, একের পর এক অজস্র **বৃষ্ট** হতে থাকে, তখনই তাকে বলা হয় **বৃষ্টি**।

বে (বেপ্, ব্যে) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবীচি, অবীচিময়, অবীচিমান, অসংবীত, আবীত, উত, ওত, ওতপ্রোত, প্রোত, বয়ন, বান, বানি, বিন, বিনন, বিননী, বিনা, বিনাট, বিনান, বিনানি(নী), বিনায়, বিনুনি(নী), বুন, বুনন, বুনা, বুনান, বুনোট, বুমবুম, বে, বেণী, বেতস, বেতসকুঞ্জ, বেতসগৃহ, বেতসবৃত্তি, বেতসী, বেপ্, বেপথু, বেপন, বেপমান, বোম, বোমা, বোম্বাচাক, বোম্বেটে, ব্যে, ব্যোম, ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশী, ব্যোমগ, ব্যোমগঙ্গা, ব্যোমগুণ, ব্যোমচর, ব্যোমচারী, ব্যোমদেব, ব্যোমপথ, ব্যোমপাদ, ব্যোমযান, ব্যোমসরিৎ।

বে (বেপ্, ব্যে) = দিশাগ্রস্ত বাহী যাহাতে। **বেপ** = দিশাগ্রস্ত বাহী পালিত হয় যাহাতে। **ব্যে** = দিশাগ্রস্ত বাহী থাকে যাহাতে।

বয়ন : ১. ✓বে + অন্ (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দ্বি-বাহী অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. তন্তুসন্তান, বোনা। (ব.শ.)। ৪. to weave অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **তন্তু, তন্তুবাপ, তন্তুবায়, বপন**। কাপড় বোনার সময় একটি সুতো যায় উপর দিকে, অপর সুতোটি যায় দিগন্তের দিকে। একে বলে **ওতপ্রোত, ঊর্ধ্ব-তির্য্যক, টানা-পোড়েন**। দু'দিকে বাহিত হয় বলে **বয়ন**-এর **ব** হল 'দ্বি-বাহী'।

বানি (বানী) : ২. ***বান*** *(**বন** হইতে জাত) গতিশীল যাহাতে; অথবা, **বয়ন** করিবার শ্রমমূল্য থাকে যাহাতে।* ৩. বানানর ব্যয়, পারিশ্রমিক, মজুরী। (ব.শ.)। ৪. কর্ম্মজগতে শব্দটির ব্যবহার চলে 'মজুরী' অর্থে। ৫. দ্র. **পারানী, বন**। 'বানানর-ব্যয়' অর্থে শব্দটির প্রয়োগ, বিশেষত অলঙ্কার তৈরি করানোর ক্ষেত্রে খুবই হয়ে থাকে। তাই এই শব্দটিকে আমরা **বন** শব্দে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু শাড়ী ... ইত্যাদি **বয়ন**-এর ক্ষেত্রেও শব্দটির প্রয়োগ হতে আমরা দেখেছি। সেখানে **বানি** বলতে 'বোনার-খরচ' বা 'বোনার-মজুরী' অর্থাৎ 'বয়নের-ব্যয়'ই বোঝানো হয়ে থাকে। তাই শব্দটিকে এখানেও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ব্যোম (ব্যোমকেশ, ব্যোমচর, ব্যোমচারী, ব্যোমযান) : ১. ✓ব্যে + মন (মনিন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ব্যোম*** *= দিশাগ্রস্ত বাহীধারককে মনন (সীমায়ন) করে যে।* ***ব্যোমকেশ*** *=* ***ব্যোম*** *কেশ যাহার।* ***ব্যোমচর*** *=* ***ব্যোম****-এ চরে যে।* ***ব্যোমচারী*** *=* ***ব্যোমচর****-এর গতিশীল আধার যে।* ***ব্যোমযান*** *=* ***ব্যোম****-এ যাওয়া অন (on) যাহাতে।* / **ব্যোমকেশ** = যাঁহার কেশ ব্যোমে অভিব্যাপ্ত; ব্যোমে যাঁহার সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরশ্মিরূপ কেশ (নীলকণ্ঠ)। (ব.শ.)। ৩. **ব্যোম** = ব্যাপ্ত অন্তরিক্ষ, আকাশ, শব্দগুণ ভূতপদার্থ (ether), শরীরস্থ বায়ু, আকাশরূপ বিষ্ণু, অভ্রধাতু, সূর্য্যমন্দির, তাসখেলায় চারখান কাগজ ধরার পরে ছক্কা, অর্থাৎ একসঙ্গে পঞ্জা-ছক্কা (ক্ষিতি-প্রভৃতির পঞ্চম ভূত 'ব্যোম'। ইহার সহিত এই ব্যোমের সম্বন্ধ আছে বোধ হয়)। **ব্যোমকেশ** = গঙ্গাধারণে প্রসারিতজটাকলাপ (অমরকোষ টীকা), শিব। (ব.শ.)। মহাদেব। ব্যোম (আকাশ) কেশ যাঁহার। স্বর্গ হতে গঙ্গাবতরণ কালে শিবের জটাসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সেই জন্য মহাদেবের আর এক নাম ব্যোমকেশ। (পৌ.অ.)। **ব্যোমচর** = খেচর। **ব্যোমচারী** = আকাশগামী, খেচর, দেবতা, পক্ষী, চিরজীবী, গ্রহাদি। **ব্যোমযান** = বিমান, দেবরথ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বাংলাভাষীরা অন্তত ১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত **ব্যোম** শব্দটির সঙ্গে শৈশবেই পরিচিত হয়ে যেতেন। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম — এই পঞ্চভূতের কথা তখন শৈশবেই পড়ান হত। এখনকার ইংলিশ-মিডিয়াম বাংলাভাষীর মনের ভিত্তিতে এই বোধটাই গড়ে উঠতে দেয় না। ...

যাই হোক, এই **ব্যোম** মানে কী? ঋগ্বেদ বলছেন — ব্যাপ্ত অন্তরিক্ষই (অন্তরীক্ষই) **ব্যোম**। তার মানে, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ মনের ভিতরে উঁকি মারলে বা 'অন্তরে ঈক্ষণ' করলে যে বিশাল জগতের অস্তিত্ব টের পাই, যেখানে বাহ্যজগতে দেখা সবকিছুকেই চোখ বন্ধ রেখে দেখতে পাই, সেই অন্তরীক্ষটি কত বড়? সবাই জানেন — সেটি এতই বড় যে, তার চেয়ে বড় এলাকা কেউ কোনোদিন দেখেনি। আধুনিক বিজ্ঞান গ্যালাক্সি-সমূহের আধারস্বরূপ যে মহাবিশ্বকে শনাক্ত করেছে, এই অন্তরীক্ষের এলাকা তার চেয়েও বড়। ঋগ্বেদ বলছেন, সেই সমগ্র ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষই হল **ব্যোম**। মহাকাশের নীচে যেমন এই বিশাল পার্থিব জগৎ থাকে, তেমনি মনোলোকের **ব্যোম**-এর নীচে মনোলোকের জগৎ থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাকে **ব্যোম** বলা হয় কেন?

ব্যোম শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বলছে, 'দিশাগ্রস্ত বাহীধারক-সমূহকে মনন (সীমায়ন) করে যে' সেই হল **ব্যোম**। তার মানে, জগতের সবকিছুই তো 'দিশাগ্রস্ত বাহীধারক', তাদের **বর্তমান** থাকার এলাকাকে একটি বিশেষ সীমায় ধরে প্রকাশ করতে হলে, তাকে মনে মনে একটি সীমায় সীমায়িত করে নিতে হয়। সেই মানসিকভাবে সীমায়িত এলাকাই **ব্যোম**। সহজ কথায়, **ব্যোম** হল মনের অসীম এলাকার একটা সসীম নামমাত্র। সাদৃশ্যে সেটিই আমাদের দৃশ্য আকাশ বা sky। তবে এই শব্দটি যে প্রধানত মনের **ব্যোম**কে বোঝাতেই সৃজিত হয়েছিল, তা বোঝা যায় **ব্যোমকেশ** শব্দ থেকে। ব.শ. অমরকোষ টীকা ও নীলকণ্ঠকে উদ্ধৃত করে এর যে অর্থ দিয়েছেন (উপরে **২.** ও **৩.** দ্রষ্টব্য), সেই অর্থ সেকথাই প্রমাণ করে। ...

উড়োজাহাজ নামক আকাশচারী যন্ত্রকে **বিমান** বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সম্প্রতিকালে rocket, space-craft বা ঐ জাতীয় আরও অনেক আকাশচারীর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে বোঝানোর জন্য তাদের বাংলা নামশব্দ আজও বানানো হয়নি। আমরা কি রকেট বা তজ্জাতীয় আধুনিক আকাশযান মহাকাশযানগুলিকে **ব্যোমচর, ব্যোমচারী, ব্যোমযান** ... ইত্যাদি বলতে পারি না? ঢাকার ব্য.বা.অভিধান অবশ্য **ব্যোমযাত্রা** ও **ব্যোমযান** শব্দ দুটির ভুক্তি ঘটিয়েছে এবং তার মানে দিয়েছে যথাক্রমে শূন্যে ভ্রমণ, বিমানে চড়ে শূন্যে ভ্রমণ এবং আকাশযান, বিমান, এরোপ্লেন।

বেল্ (বেল্ল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবেল, অনবেলি, অবেল, প্রভাতবেলা, বিকেলবেলা, বেল্, বেল, বেলক, বেলকুল, বেলদার, বেলন, বেলমোক্তা, বেললণ্ঠন, বেলা, বেলাকুল, বেলাতট, বেলাতিক্রম, বেলাতিগ, বেলা-পড়া, বেলাবলি, বেলাবীচি, বেলাবেলি, বেলাভূমি, রুটি-বেলা, বেল্লন, বেল্লিত, বেল্লি, বেল্লিক (মল্লিক, মল্) বেল্যা, সমুদ্রবেলা।

বেল্ (বেল্ল্) = দিশাগ্রস্ত বাহীর লালন-লয়ন। **বেল** = দিশাগ্রস্ত বাহীর লালন-লয়ন যাহাতে। **বেল্ল** = দিশাগ্রস্ত বাহীর লালন-লয়ন লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।

বেলা (বেল, বেলাতট, বেলা-পড়া, বেলাবেলি, বেলন — রুটি-বেলা, সকালবেলা, সমুদ্রবেলা) : **১.** ✓বেল্ + অ (অচ্) কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***বেল*** = *দিশাগ্রস্তবাহীর লালন যাহাতে; অর্থাৎ, বলয় করা হয় বা কৃত যাহাতে; অথবা দিশাগ্রস্ত বল থাকে যাহাতে।* ***বেলা*** = ***বেল****-এর আধার যে।* ***বেলাতট*** = *যে* ***তট*** *(রুটি-বেলার ন্যায়)* ***বেলা****কৃত হইয়াছে।* ***বেলাবেলি*** = ***বেলা*** *ও* ***বেলি*** *(দ্র.* ***কেশাকেশি****)।* ***বেলন*** = ***বেল*** *অন (on) যাহাতে।* **৩. বেলা** = কাল, সময়, নিয়তকাল, কালসাতত্য (period), দিনান্ত, অবসর, যোগ্যকাল, কালভেদ, দিবসকাল, সমুদ্রতীর, মর্য্যাদা, অম্বুবিকৃতি, দন্তমূল, রোগ, অক্লিষ্টমরণ, বাক্য, বয়ঃক্রম, বার, নদীতীর, কটোরা; বেলফুল। **বেলাতট** = সমুদ্রকূলোপান্ত, সমুদ্রতীর। **বেলা-পড়া** = দিবা অবসানাভিমুখ হওয়া। **বেলন** = রুটি-ইত্যাদি বেলিবার গোল-পিঠ কাষ্ঠদণ্ড (rolling pin); সঞ্চালিত, দোলায়মান (?)। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। **৫. বল**-এর দিশাগ্রস্ত অবস্থানক্ষেত্রকে **বেল** বলে। সেই **বেল** অন থাকে **বেলন**-এ। **বল**পূর্বক **বেলন** চালিয়ে রুটির **বলয়** তৈরি করা হয়। একে বলে **রুটি-বেলা**। তাতে প্রযুক্ত **বল** রুটির বিস্তারের সর্বদিকে সমানভাবে প্রসারিত হয়ে যায়। সেই প্রসারিত স্থানকে **বেলা** বলে, তদ্রূপ প্রসারিত কালকেও **বেলা** বলে; এমনকি তদ্রূপ প্রসারিত পাত্রকেও **বেলা** বলে। এইরূপ **বেলা**কে স্বভাবতই **বল**-এর ক্রীড়ার স্থান-কাল-পাত্র বলা চলে। তাই, সমুদ্র**বেলা** মানে হল সমুদ্র যে স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে; সকাল**বেলা** মানে হল সকাল সময়টি যে **বলয়ে** প্রসারিত হয়ে রয়েছে; আর, রাম-শ্যাম-যদু-মধুর কিংবা আমার-আপনার **বেলায়** যার যার তার তার বলয় তো প্রসারিত থাকেই। এছাড়া, আগেই আমরা দেখেছি **বিল্ববৃক্ষে** বল থাকে, তাই বাংলাভাষী তাকেও **বেল** বানিয়ে নিয়েছেন। তবে, **বেলফুল** বা **বেলিফুল** কেন যে **বেল**-শব্দযুক্ত, কে জানে। না, এর গন্ধের ভিতরে **বল** আছে কিনা, আমরা জানি না। গন্ধবিশারদরা হয়তো বলতে পারবেন।

আমরা দেখলাম, **বেলা**-রুটিই কেবল হয় না, **বেলা**-তট বা **বেলা**-সমুদ্র প্রভৃতি স্থান-**বেলা** যেমন হয়, তেমনি প্রভাত-**বেলা** বা বিকাল-**বেলা** প্রভৃতি কাল-**বেলা**ও হয়, এমনকি রামের-**বেলা** বা শ্যামের-**বেলা** প্রভৃতি পাত্রের-**বেলাও** হয়। তবে কাল-**বেলা** সম্পর্কে আমাদের ব.শ. জানাচ্ছেন, এই **বেলা**কে 'কালসাতত্য' বা period-ও বলে। এই **বেলা** পড়ে, এ **বেলা** বাড়ে; আমরা **বেলাবেলি** বা **বেলায়-বেলায়** কাজ সারি। সেই **বেলা** পড়লে **ঘণ্টা** পড়ে, ইংরেজ বলেন **বেল**-পড়ে (bell পড়ে)। এক **বেলা** শেষ হয়ে গিয়ে অন্য **বেলা** শুরু হয়। ভোর**বেলা** গিয়ে সকাল**বেলা** হয়, সকাল গিয়ে দুপুর**বেলা** আসে, সে **বেলা** পড়ে গিয়ে বিকেল**বেলা** আসে। ... এভাবেই জীবনেরও **বেলা** বয়ে যায়।

আজকাল বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়েও 'ফার্স্ট-পিরিয়ড', 'সেকেন্ড-পিরিয়ড', 'থার্ড-পিরিয়ড' ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এগুলিকে বাংলায় অনায়াসে 'আরম্ভ-বেলা', 'দ্বিতীয়-বেলা', 'তৃতীয়-বেলা' ... ইত্যাদি কিংবা 'চন্দ্রবেলা', 'পক্ষবেলা', 'নেত্রবেলা' ... অথবা 'সবেলা', 'দোবেলা', 'তেবেলা' ... এবং 'লাস্ট-পিরিয়ড'কে 'অবেলা' ইত্যাদি বলাই যেতে পারত। কিন্তু যে 'পিরিয়ডে' 'স্যার'-এর জন্য অপেক্ষা করতে করতে বেলা বয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত 'স্যার' এসে পৌঁছোন না, তাকে কী বলা যাবে? দ্র. **রাক্ষসীবেলা**। **৬.** ইংরেজি belt।

ব্যথ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিব্যথন, অব্যথ, ব্যথ্, ব্যথ, ব্যথক, ব্যথন, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যথী।

ব্যথ্ = বিপরীত-বাহীর অবস্থিত থাকন। **ব্যথ** = বিপরীত-বাহী অবস্থিত থাকে যাহাতে।

ব্যথা (ব্যথ, ব্যথিত, ব্যথী, সমব্যথী) : ১. ✓ব্যথ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***ব্যথ*** = *বিপরীত-বাহী অবস্থিত থাকে যাহাতে।* ***ব্যথা*** = ***ব্যথ****-এর আধার যে।* ***ব্যথিত*** = ***ব্যথ*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***ব্যথী*** = ***ব্যথ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***সমব্যথী*** = ***ব্যথী****র সমান* ***ব্যথী*** *যে।* ৩. **ব্যথা** = দুঃখানুভব, দুঃখ, বেদনা, ভয়, প্রসববেদনা, মমতা, দরদ। **ব্যথিত** = ব্যথাপ্রাপ্ত, দুঃখিত, বেদনাযুক্ত, পীড়িত, ভীত, মমতাযুক্ত, আত্মীয়, দরদী। **ব্যথী** = দুঃখানুভবযুক্ত, ব্যথাবান, ব্যথিত। **সমব্যথী** = সমবেদনাযুক্ত। (ব.শ.)। ৪. pain অর্থে **ব্যথা**, pained অর্থে **ব্যথিত**, sympathetic অর্থে **সমব্যথী** প্রচলিত; বাকী দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. কোনো একটি বর্ণের পরে **য-ফলা**র অর্থ হল, সেই বর্ণটি যে ক্রিয়ার ধারক হয়, সেই ক্রিয়ার ফলিত প্রয়োগ থাকে যে-সত্তায়; অর্থাৎ, সেই ক্রিয়া চলতে থাকে যে-সত্তায়। **ব**-এ **য-ফলা** যুক্ত হওয়ায় **ব্য**-এর অর্থ স্বভাবতই হয়ে যায় 'বাহীর প্রয়োগ থাকে যে সত্তায়' বা 'বাহী থাকে যাহাতে'। অতএব **ব্যথ্** শব্দের মানে দাঁড়ায় 'বাহী থাকে যাহাতে তাহার থাকন'। কিন্তু তাতে আমাদের কষ্ট হয় কেন? হয় এইজন্য যে, এই বাহী স্বাভাবিক বাহী নয়, বিপরীত বাহী। আমাদের দেহকোষ মাত্রেই বাহী। তার পাশে বিপরীত বাহী এসে গেলেই তার অসুবিধা হতে শুরু করে, সেটিই **ব্যথা** রূপে অনুভূত হয়। বাইরের আঘাতে বিপরীত শক্তিবাহী, তাতে আমাদের শরীরের কোষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই **ব্যথা** হয়। তবে এই **ব্যথা** কেবল দেহের দৃশ্য-**ব্যথা**য় সীমাবদ্ধ থাকে না, মনের এলাকাতেও সক্রিয় হয়ে থাকে। গায়ের **ব্যথা** তবু সয়ে নেওয়া যায়, **মর্ম্মব্যথা** সহ্য করা কঠিন। কেননা, মনের স্বাভাবিক অবস্থানক্ষেত্র বা ক্রীড়াক্ষেত্রকে সে ধ্বংস করে দেয়, ফলে শুরু হয় মনো**ব্যথা**। ... ৬. গ্রীক সূত্র থেকে পাওয়া ইংরেজি pathos, sympathy, এবং ল্যাটিন সূত্রে প্রাপ্ত ইংরেজি passion ইত্যাদি।

ব্যধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিবিদ্ধ, অনাবিদ্ধ, অবিদ্ধ, আবিদ্ধ, অবিদ্ধকর্ণী, আকনাদি, বিদ্ধ, বিদ্ধক, বিদ্ধিত, বিধু, বিধুকায়, বিধুক্ষয়, বিধুন্তুদ, বিধুভূষণ, বিধুমুখী, বিধুরাজ, ব্যধ্, ব্যধ, ব্যধক, ব্যধন, ব্যধ্য, ব্যধিকরণ।
ব্যধ্ = বিপরীত-বাহীর ধারণ। **ব্যধ** = বিপরীত-বাহী ধারণ যাহাতে।

বিদ্ধ : ১. ✓ব্যধ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ব্যধ্*** *(বিপরীত-শক্তিবাহীর দান) ধারিত যাহাতে।* ৩. ছিদ্রিত, তাড়িত, পীড়িত, ক্ষোভিত, ক্ষিপ্ত, আবিষ্ট, মিশ্রিত, রাগান্তরমিশ্র, অন্যাতিথি-মিশ্র, সদৃশ, মিথঃশ্লিষ্ট, সম্পৃক্ত। (ব.শ.)। ৪. pierced ও pricked অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ভিদ্**।

বিধু (বিধুক্ষয়, বিধুভূষণ, বিধুমুখী, বিধুরাজ) : ১. ✓ব্যধ্ + উ (কু) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***বিধু*** = ***বিধ*** *(বিপরীত-শক্তিধারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***বিধুক্ষয়*** = ***বিধু****-র ক্ষয় যাহাতে।* ***বিধুভূষণ*** = ***বিধু*** *ভূষণ যাহার।* ***বিধুমুখী*** = ***বিধু****র ন্যায় মুখ যে প্রকৃতির।* ***বিধুরাজ*** = ***বিধু****সমূহের মধ্যে রাজা যে।* / **বিধু** = বেধ (ভেদ) করে যে; দৈত্যগণকে বেধ করে যে; যাহা সুরগণের পেয়। (ব.শ.)। ৩. **বিধু** = চন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা। **বিধুক্ষয়** = অমাবস্যা। **বিধুমুখী** = চন্দ্রাননা। **বিধুরাজ** = পূর্ণচন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র নামরূপে **বিধুভূষণ** শব্দটি কদাচিৎ প্রচলিত, বাকি সব শব্দই অপ্রচলিত। ৫. ভাবনার কথা এই যে, **বিধু** এমন একটি শব্দ যা একেবারে সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন চার সত্তাকে — চন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা — বোঝানোর যোগ্যতা ধরে। তাহলে সেই **বিধু** কীরূপ সত্তা?

শোনা যায়, আগেকার রাজা-মহারাজাগণ যে সব উপকরণ সহযোগে পান খেতেন, তাদের চাকর-বাকরদের কেউ সেই পান খেয়ে ফেললে অতি উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে যেত। তার মানে, শক্তির সর্বোচ্চ রূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মসাৎ করা সহজসাধ্য নয়। যাঁরা পারেন, তাঁরা করেন। **শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু**র শক্তিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা সব মানুষের থাকে না; তাঁদের অতি খণ্ড খণ্ড কৃপালাভ করতে পারলেই মানুষের জীবন **বর্তে** যায়। যে সামাজিক সত্তা চন্দ্রকিরণ পান করে, সে তো সাধারণ মানুষ নয়, সে হল **চকোর**। সেই **চকোর**ই তো জ্ঞানকিরণ পান করে কাব্যগাথা গাইতে পারে।

তাই, আমরা বড়জোর এটুকু বলতে পারি যে, এই **বিধু** নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের পক্ষে শুভসত্তায় পরিণত। অন্যথায়, পূর্ণরূপে এঁরা সাধারণ মানুষের বিপরীত শক্তির আধার। এঁরা এত শক্তির আধার যে, সাধারণ মানুষ তাঁদের সরাসরি গ্রহণ করতে পারেন না, মনীষীমুখ মারফত ঘুরে ফিরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এলে তবেই আমাদের মত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে **বিধু**-সত্তাটি শুভফল দিয়ে থাকে।

ব্রজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : পরিব্রজ, পরিব্রাজক, প্রব্রজ্যা, ব্রজ্, ব্রজ, ব্রজকিশোর, ব্রজধাম, ব্রজন, ব্রজনাথ, ব্রজবধূ, ব্রজবনিতা, ব্রজবুলি, ব্রজভাব, ব্রজভাষা, ব্রজমণ্ডল, ব্রজমোহন, ব্রজরাজ, ব্রজলীলা, ব্রজসুন্দরী, ব্রজাঙ্গনা, ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বর, ব্রজ্যা।
ব্রজ্ = দ্বৈতাদ্বৈত-বাহীরক্ষক জনন। **ব্রজ** = দ্বৈতাদ্বৈত-বাহীরক্ষক জনিত যাহাতে।

পরিব্রাজক : ১. পরি + ✓ব্রজ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যিনি সার্ব্বিকভাবে* ***ব্রজন*** *করেন; যিনি বাহ্য****বৃত্ত*** *ও মনো****বৃত্তে****র পরিধি পর্যন্ত* ***ব্রজন*** *করেন বা করিয়াছেন।* / যে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম গত (হয় বা হইয়াছে)। (ব.শ.)। ৩. ভিক্ষু, মস্করী, সন্ন্যাসী। (ব.শ.)। ৪. traveller বা a wandering ascetic অর্থে **পরিব্রাজক** শব্দটি কখনো-সখনো ব্যবহৃত হয়। ৫. শঙ্করাচার্য-কৃত ব্রহ্মচারীগণকে বলা হত **পরিব্রাজক**। তাঁদের দশ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। সেই উপাধিগুলি হল — **তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরি, সরস্বতী, ভারতী**। কেশবভারতী ছিলেন তাঁদেরই একজন অন্যতম **পরিব্রাজক**। তিনিই শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এঁরা বাহ্যলোকে অর্থাৎ ভারতদেশে যেমন **পরিব্রজন** করে বেড়িয়েছেন, তেমনি মনোলোকেও **পরিব্রজন** করতেন। সেকারণেই এঁদের **পরিব্রাজক** বলা হত। দ্র. **ব্রজ**।

ব্রজ (ব্রজকিশোর, ব্রজধাম, ব্রজন, ব্রজনাথ, ব্রজবধূ, ব্রজবনিতা, ব্রজবুলি, ব্রজভাব, ব্রজভাষা, ব্রজমণ্ডল, ব্রজমোহন, ব্রজরাজ, ব্রজলীলা, ব্রজসুন্দরী, ব্রজাঙ্গনা, ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বর) : **১. ✓**ব্রজ্ + অ (ঘঞর্থে ক) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *ব্রজ* = *ব্র*** *(দ্বৈতাদ্বৈত-বাহীর আবর্তন) জনিত হয় যাহাতে বা যেখানে।* ***ব্রজকিশোর*** *=* ***ব্রজ****-এর কিশোর যে।* ***ব্রজধাম*** *=* ***ব্রজ****তে যে* ***ধাম*** *অবস্থিত।* ***ব্রজন*** *=* ***ব্রজ*** *অন (on) যাহাতে।* ***ব্রজনাথ*** *=* ***ব্রজ****-এর নাথ যিনি।* ***ব্রজবধূ*** *=* ***ব্রজ****-এর বধূ যিনি।* ***ব্রজবনিতা*** *=* ***ব্রজ****-এর বনিতা যে।* ***ব্রজবুলি*** *=* ***ব্রজ****-এর মানুষদের মুখের বুলি।* ***ব্রজভাব*** *=* ***ব্রজ****-এর ভাব থাকে যাহাতে।* ***ব্রজভাষা*** *=* ***ব্রজ****-এ যে ভাষা প্রচলিত।* ***ব্রজমণ্ডল*** *=* ***ব্রজ****-কে ঘিরে যে* ***মণ্ডল*** *ছিল বা আছে।* ***ব্রজমোহন*** *=* ***ব্রজ****কে মোহিত করে যে।* ***ব্রজরাজ*** *= যিনি* ***ব্রজ****-এর রাজা।* ***ব্রজলীলা*** *=* ***ব্রজ****-তে যে লীলা অনুষ্ঠিত হয় বা হয়েছিল।* ***ব্রজসুন্দরী, ব্রজাঙ্গনা*** *=* ***ব্রজ****-এর সুন্দরী বা অঙ্গনা।* ***ব্রজেন্দ্র*** *=* ***ব্রজে****র ইন্দ্র যিনি।* ***ব্রজেশ্বর*** *=* ***ব্রজ****-এর ঈশ্বর যিনি।* **৩. ব্রজ** = গোষ্ঠ, গোকুল, বাথান, সমূহ, যূথ, অগ্রবণ ও মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ (ইহা প্রাচীন 'শূরসেন' দেশের অন্তর্গত ছিল), বর্ত্ম, পথ, গমন। (ব.শ.)। মথুরা ও তার চারদিক। এই স্থান কৃষ্ণের লীলাভূমি ও মহাতীর্থ স্বরূপ। এই ব্রহ্মভূমিতে বারোটি বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আছে। (পৌ.অ.)। **ব্রজকিশোর** = শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজধাম** = গোকুল। **ব্রজন** = গমন, বনগমন। **ব্রজনাথ** = শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজবধূ, ব্রজবনিতা** = ব্রজযুবতি। **ব্রজবুলি** = প্রাচীন মৈথিলী ভাষা। বাঙ্‌লায় ব্রজবুলির মূল মৈথিলী, হিন্দী ও ব্রজভাষার মিশ্রণে ইহার সমৃদ্ধি। চৈতন্যদেবের সময়ে অনেক বৈষ্ণবকবি এই ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়া বাঙ্‌লার মিশ্রণে ইহাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেন। বোধ হয়, ব্রজের রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে বর্ণনা হেতু ইহা বাঙ্‌লাদেশে 'ব্রজবুলি' নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইহা 'বৃজ্জি' ক্ষত্রিয়ের ভাষা। **ব্রজভাব** = শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীর রতিবিশেষ; মাধুর্য্য বা মধুরনাম শৃঙ্গাররস। **ব্রজভাষা** = ব্রজের ভাষাবিশেষ। মথুরা আগরা ইটোয়া (Etawah) ও তৎপার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহের ভাষা। সুরদাস তুলসীদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবির কাব্য এই ব্রজভাষায় লিখিত। শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে ইহার উৎপত্তি। শূরসেন প্রাচীন মথুরা। ব্রজ শূরসেনের অন্তর্গত প্রদেশবিশেষ। **ব্রজমণ্ডল** = ব্রজ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশসমূহ। **ব্রজমোহন** = ব্রজের মোহকর, শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজরাজ** = ব্রজপতি, নন্দ, ব্রজরঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজলীলা** = ব্রজে বাল্যে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ। **ব্রজসুন্দরী** = ব্রজরমণী। **ব্রজাঙ্গনা** = ব্রজবধূ, ব্রজরমণী। **ব্রজেন্দ্র** = ব্রজরাজ, নন্দ। **ব্রজেশ্বর** = ব্রজরাজ, শ্রীকৃষ্ণ। (ব.শ.)। **৪.** নামরূপে **ব্রজ**যুক্ত কয়েকটি শব্দ কদাচিৎ প্রচলিত থাকলেও বাকি শব্দগুলি সবই অপ্রচলিত। **৫.** প্রথমে আমরা **ব্রজ** শব্দের শব্দার্থগত দিকটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। '**ব্র** জনন করে যে', কিংবা '**ব্র** জনিত হয় যাহাতে বা যেখানে', তাদের **ব্রজ** বলে। কিন্তু **ব্র** কী বস্তু? এটি জানার জন্য দীর্ঘ অন্বেষণের প্রয়োজন হয়। এই মুহূর্তে আমরা পাঠকদের সেই সমগ্র পথটি পরিক্রমা করতে নিয়ে যাব না, শুধুমাত্র প্রাপ্ত ফলটি হাতে তুলে দেব। এই **ব্র** হল — 'দ্বৈতাদ্বৈতবাহী রহে যাহাতে'। এ হল দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত, একের ভিতরে দুই, two in one। এর অতি সহজ উদাহরণ হল কোনো মানুষের 'দু পায়ে হেঁটে যাওয়া' বা পদব্রজে যাওয়া। কিন্তু এই 'যাওয়া'র ভিতরে **ব্র** জনিত হচ্ছে কীভাবে, সেকথা ব্যাখ্যা করে না দিলে বোঝা যায় না! অতএব সেকাজটা করতেই হচ্ছে।

ই ও **গমন** শব্দে আমরা 'যাওয়া'র রকমফের নিয়ে কিছু কথা ১ম খণ্ডে আগেই বলেছি। **ই** হল যে কোনো প্রকারের **গমন**। (কর > করি = কর + **ই**। এই **ই** জানায় যে, কর ক্রিয়া চলছে, গমন করছে।) সেই **ই**-এর সঙ্গে **অ** যোগ করে পাওয়া যায় **য**-কে। (ব্যাকরণের নিয়মে **ই**-এর পরে স্বরবর্ণ থাকলে **য্** হয়।) এই **য** মানে 'যাওয়া'। তবে এটা **গমন**-এর মতো ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু পর্যন্ত 'সাঁ' করে চলে যাওয়া নয়; এ হল **ই-অ, ই-অ, ই-অ** ... অর্থাৎ একবার গতি তারপরই স্থিতি — আপনি ডান-পা তুলে সামনে বাড়ালেন, হয়ে গেল **ই**। তারপর সেই বাড়ানো পা মাটিতে ফেলে স্থির করে দিলেন, হয়ে গেল **অ**। ততক্ষণে পেছনের পা উঠে সামনে বাড়ানো হয়ে গিয়ে পুনরায় **ই** হয়ে গেছে ... এইভাবে গতি-স্থিতি, গতি-স্থিতির মাধ্যমে **যাওয়া**কে 'হাঁটা'ও বলে। একেই পদ**ব্রজে** যাওয়াও বলে।

এই যে একবার ডান-পা ও একবার বাম-পায়ের একবার গতি একবার স্থিতির দ্বৈতাদ্বৈত (দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত = দ্বৈতাদ্বৈত) সক্রিয়তা, এ হল **পুরুষ প্রকৃতির** দ্বৈতাদ্বৈত রূপ বা সর্বোচ্চ রূপ। যখন ডান-পা **পুরুষ**রূপে (গতিতে) সক্রিয় তখন বাম-পা **প্রকৃতি**রূপে (স্থিতিতে) দাঁড়িয়ে দেহকে রক্ষা করে, পড়তে দেয় না। আবার যখন বাম-পা **পুরুষ**রূপে (গতিতে) সক্রিয় তখন ডান-পা **প্রকৃতি**রূপে (স্থিতিতে) সক্রিয় থেকে দেহকে একইভাবে রক্ষা করে। এই যে কখনও ডান-পা **পুরুষ**, বাম-পা **প্রকৃতি**, আবার পরক্ষণেই বাম-পা **পুরুষ**, ডান-পা **প্রকৃতি** — এ হল '**পুরুষ-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দ্বৈরাজ্য**' গড়ে তুলে চলা। একটি মানুষের এরূপ 'পুরুষ-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দ্বৈরাজ্য'-এর প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক যাওয়াকেই 'হাঁটা', 'যাওয়া' ইত্যাদি বলে। এইবার আপনি ইংরেজি Y বর্ণটিকে উল্টো করে নিন, যেন একটি মানুষ হাঁটছে। উপরে তার এক বা অদ্বৈত, নীচে রয়েছে তার দুই বা দ্বৈত। যে এক-সত্তার ভিতরে এইরূপ দ্বৈতাদ্বৈত ক্রিয়া চলে, তাকে বলে **ব্র**। কোনো মানুষ যখন এইভাবে 'গমন করে', তখনই তাকে বলা হয় সে **ব্র-জনন** করছে বা **ব্রজন** করছে। এই কারণে ব.শ. জানাচ্ছেন, **ব্রজন** মানে 'গমন'।

তবে এ হল **ব্রজ**-এর সবচেয়ে সহজ বাহ্য উদাহরণ, ব্যক্তির বাহ্যিক-**ব্রজন**। এর আরও দুটি রূপ রয়েছে — ব্যক্তির সামাজিক-**ব্রজন** ও ব্যক্তির মানসিক-**ব্রজন**। ব্যক্তির সামাজিক-**ব্রজন**কে তবুও যা হোক ধরা যায় বোঝা যায়, কিন্তু তার মানসিক-**ব্রজন**কে ঠিকঠাক ধরা ও বোঝা যায় না। আমরা চেষ্টা করতে পারি মাত্র। যাই হোক, আমরা প্রথমে ব্যক্তির সামাজিক-**ব্রজন**কে বোঝার চেষ্টা করব।

ব্রজ্ শব্দটি **বৃজ্** ক্রিয়া থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, যে **বৃজ্**

ক্রিয়া থেকে **বর্জ্জন, আবর্জ্জনা** প্রভৃতি শব্দ তৈরি হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি, **আবর্ত্তন** থেকে ছিটকে যে সব সত্তা বাইরে পড়ে যায় বা ত্যক্ত হয়, তাদের **বৃজ্** করা বা **বর্জ্জন** করা বলে। যেকারণে **বৃজন** শব্দের অর্থই ছিল '**পাপ**'। কিন্তু সেরকম না হয়ে ইচ্ছে করেই যদি এমন ধরনের আ**বর্ত্তন** চালান হয় যাতে বিশেষ ধরনের কিছু সত্তা আ**বর্ত্তন** থেকে নিয়ত **বর্জ্জিত** হতে থাকে, তাদেরই বলা হয় **ব্রজ্**-করণ। তার মানে, 'স্বেচ্ছাকৃত-নিয়ত-**বর্জ্জন**'কে **ব্রজ্**-করণ বা **ব্রজন** বলে! কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত নিয়ত **বর্জ্জন** করতে হলে **বর্জ্জন** করার মতো বা ত্যাগ করার মতো কিছু থাকতে হবে; নইলে কী **বর্জ্জন** করা হবে? অস্তিত্বের **আবর্ত্তন**-এর ভিতরেই সে-ব্যবস্থা থাকা চাই, যাতে তার নিত্য ত্যাগ করার মতো বস্তু বা বিষয় উদ্বৃত্ত হয়ে ত্যক্ত হতে পারে। সেরকম হতে পারে, অস্তিত্বের **আবর্ত্তন** প্রক্রিয়ার ভিতরেই নতুন নতুন বস্তু বা বিষয় বানিয়ে সেগুলি বাইরে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে — লোকে যেমন কৃষিফসল বা কারুফসল কিংবা বাকফসল (গল্প-গাথা-গান ... ইত্যাদি) বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দেয়, সেইরকম। কিন্তু তা করতে হলে ব্যক্তিকে **পুরুষ-প্রকৃতি**র দ্বৈরাজ্য বা মেলবন্ধন ঘটাতে হবে, কাঁচামালের (= প্রকৃতির) সঙ্গে মনুষ্যাংশ (বা 'মেধা ও শ্রম' = পুরুষ) মিলিয়ে তাদের দ্বৈতাদ্বৈত অস্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে; আহরিত তথ্যের (= প্রকৃতির) সঙ্গে উদ্ভাবিত তত্ত্বের (= পুরুষের) মেলবন্ধন ঘটিয়ে শব্দের দ্বৈতাদ্বৈতরূপী গল্প-গাথা-গান বানাতে হবে। অর্থাৎ কিনা, বাহ্যভূমিতে ডান-পা বাম-পায়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলার মতো সামাজিক ক্ষেত্রেও পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈরাজ্য ঘটিয়ে নতুন নতুন বস্তু বা বিষয় উৎপাদন করে বাইরে ছেড়ে দিয়ে আপন সামাজিক জীবনযাত্রার আ**বর্ত্তনে**র অস্তিত্বে **বর্ত্তমান** থাকতে হবে। এই হল ব্যক্তির সামাজিক-**ব্রজন**।

কিন্তু তাহলে তো **ব্রজ্**-করণ একপ্রকার সৃজন হয়ে গেল! হলই তো! মানুষ যা কিছু নিজে ভোগ করার জন্য বানায় না, বাজারে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বানায়, তা সবই **ব্রজন**, সে বানানো বস্তু বা বিষয় সবাই **ব্রজন** করে বা গমন করে, তারা সবাই **গো** অর্থাৎ **পণ্য**, সেই **গো**গণ যেখানে থাকে ব.শ. তাকেই বলেছেন 'গোষ্ঠ'। সেই গোষ্ঠ যদি কংসরাজের এখতিয়ারের বাইরে হয়ে যায়, তখন **নগদ-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ** বা কালো টাকা রূপে **গোকুলে** বাড়েন। স্বভাবতই তখন ব্যক্তির **আবর্ত্তন**-জাত **বর্জ্জন** আর 'পাপ'**কর্ম্ম** থাকে না, হয়ে যায় **পুণ্যকর্ম্ম**। আর, এরকম হয় বলেই **ব্রজ** থেকে শুরু করে **ব্রজ**-যুক্ত সকল শব্দই শুভ ও পবিত্র হয়ে যায়। **পণ্য বর্জ্জন** বা ত্যাগ করে অর্থাৎ বেচে **পুণ্য অর্জ্জন** যারা করেছেন, তেমন পুণ্যবান ছাড়া কেউ কি এই সামাজিক **ব্রজে** যেতে পারে, **ব্রজলীলা** করতে পারে? ...

কিন্তু ব্যক্তির মানসিক-**ব্রজন** কীভাবে চলে? বলে রাখা ভাল, এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট জানি না। যতটুকু জানি সেটুকুই বলছি। ১ম খণ্ডে **গবেষণা, গোবিন্দ, গোষ্ঠ, গোস্বামী** ... প্রভৃতি শব্দে আমরা দেখেছি, এসব গভীর তত্ত্বের বিষয়, রসজ্ঞানের বিষয়, মহত্তম জ্ঞানচর্চার বিষয়; গরুখোঁজার কিংবা গরুর গোয়াল বা গরু-পাইকারদের বিষয় নয়। এ হল মনের দ্বৈরাজ্যমূলক যাওয়া বা **ব্রজন**, অর্থাৎ জ্ঞানরসের দুনিয়ায় **পুরুষ-প্রকৃতি**র দ্বৈরাজ্য গড়ে নিয়ে ব্যক্তির মানসিক-**ব্রজন**। এতে কখনো তত্ত্ব পুরুষ, তত্ত্বধারী প্রকৃতি; কখনো জ্ঞানীকথক পুরুষ, শ্রোতা প্রকৃতি; কখনো শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, প্রত্যেক ভক্তই প্রকৃতি ... এইরূপ অজস্র রকমের পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈরাজ্য গড়ে তুলে চালান হয় মানসিক-**ব্রজন**। এ এমন যাওয়া বা **ব্রজন** যে সমগ্র **বৈষ্ণব-পদাবলী** ও **পদাবলী** সাহিত্য সেই **ব্রজ, ব্রজধাম, ব্রজনাথ, ব্রজবিহারী** ... ইত্যাদিকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকে। **গোস্বামী** তুলসীদাস থেকে শুরু করে সনাতন গোস্বামী পর্যন্ত এই **গো**-সমূহের বা তত্ত্বজ্ঞান-সমূহের মালিকেরা বা **গোস্বামী**রা তাঁদের **ব্রজভাষা**র বা **ব্রজবুলি**র গানে গানে সমগ্র **ব্রজমণ্ডলে ব্রজমোহনের ব্রজলীলা**র লীলারসের বন্যা বইয়ে দেন এবং জনসাধারণের জীবনকে লীলারসসিক্ত করে দেন।

অর্থাৎ কিনা, বাহ্যলোকের **ব্রজ** আমাদের পূর্বসূরিদের কাছে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। একথা **বৃন্দাবন** শব্দটির ক্ষেত্রেও খাটে। **বৃন্দাবনে**র মতো **ব্রজ**ও মধ্যযুগের মানুষের মনের লীলাক্ষেত্র। সাদৃশ্যে পরে একটি বিশেষ স্থানকে **বৃন্দাবন** নাম দিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরার বিপরীত দিকে একটি স্থানকে **ব্রজধাম** বলে ঘোষণা করে দেন। সেখানে রূপ **গোস্বামী** তাঁর সাধনা করতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে নেওয়া যাক। এ কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয়, সম্রাট আকবরের কাল। চিতোরের রাণী মীরাবাঈ এলেন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মীরাবাঈ যে নারী, প্রকৃতি! রূপ গোস্বামী মীরাবাঈ-এর দূতকে বললেন, তিনি কোনো **প্রকৃতির** সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। শুনে মীরাবাঈ বললেন, 'কিন্তু **ব্রজে** তো একজনই মাত্র **পুরুষ** — শ্রীকৃষ্ণ! আর সবাই তো **প্রকৃতি**।' কথাটি রূপ গোস্বামীকে জানাতেই তিনি লজ্জিত হলেন এবং মীরাবাঈ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

এখানে আরও কয়েকটি তথ্য বলে যাওয়া চাই। ক) **ব্রজ**-এর ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আমলে। খ) শঙ্করাচার্য্যের **পরিব্রাজক** কেশব ভারতীর কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দীক্ষা নিয়েছিলেন। গ) প্রাচীন মিথিলার একটি নাম ছিল গিরি**ব্রজ**পুর।

ব্রজ্যা (প্রব্রজ্যা) ১. ✓ব্রজ্ + য (ক্যপ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***ব্রজ** থাকে যাহাতে তাহার আধার। **প্রব্রজ্যা** = প্রকৃষ্ট **ব্রজ্যা** যাহাতে।* ৩. **ব্রজ্যা** = গমন, ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ, ব্রত হেতু ভ্রমণ, ভ্রমণ, যাত্রা, প্রস্থান, বিজিগীষুর প্রমাণ, স্বর্গ, সমূহ, সজাতীয় বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ, রঙ্গ, অভিনয়স্থান। **প্রব্রজ্যা** = গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক গমন, সন্ন্যাসগ্রহণ, সন্ন্যাস। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ব্রজ** শব্দের ভিতরেই যেহেতু মানুষের দৈহিক, মানসিক, ও সামাজিক যাত্রার সর্বোচ্চ রূপটি ধরা আছে, তদ্রূপ **ব্রজ**-স্বভাবের **প্রকৃষ্ট** রূপ গ্রহণ করে কেউ যদি তাঁর জীবনের যাত্রা চালান, তিনি **প্রব্রজ্যা** গ্রহণ করেছেন, বলা চলে। কিন্তু তাহলে তাকে 'গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক গমন' করতে হয় কেন? দ্র. **আশ্রম**।

ব্, ব্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অব্রণ, অব্রেথা,

অবৃথা, অর্ব্বুদ, আব, ৰ, ব, বং, বঃ, বঁ, বঁড়শী, বঁদে (বোঁদে), বকন, বকনা (বষ্কয়ণী), বকলম, ব-কার, বগি(গী), বড়শী, ব-ফলা, বকম, বঙ্কাল, বখেয়া, বত্রিশ, বত্রিশলক্ষণ, বত্রিশা, ব-দ্বীপ, বব, ববকরণ, ববম, ববব্যোম, ববমবম, বমাল (বামাল), বয়বাত, বরশি, বর্চ্চ্, বর্চ্চঃ, বর্চ্চস্বী, বর্চ্চা, বর্ছ, বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী (বকনা), বাইশ, বাইশী, বাইশে, বাইস (বা-ইছ্, পাখুরাকেও বাইশ বলে।), বাইসাইকেল, বাঁক (বাঙ্গ), বায়ান্ন, বার (বারো), বারই, বার-ইয়ারী, বারওয়ারি, বারদোয়ারী, বারভূঁয়া, বারভূঞা, বারভূত, বারমতি, বারমাসি(সী), বারমাস্যা, বারমেসে, বারশিঙ্গা, বারহাত, বারুদ, বারোইয়ারী, বারোএয়ারী, বারোভূত, বারোভূঁইয়া, বারোয়াঁ, বারোয়ারী, বার্ণিশ, বার্লি, বালতি, বাষট্টি, বাসত্তরি, বাহাতরি, বাহাত্তর, বাহান্ন, বিংশতি, বিংশী, বিঃ, বিছমিল্লা, বিট্, বিনা (অবিনাভাব), বিন্তি, বিমজ্জিম (দ্র.বি), বি(বী)মা, বিয়াল্লিশ, বিরাদর, বিরাদরি, বিরাদারি, বিরাশী, বিরানব্বই (দ্র. বি), বিরানব্বুই, বিরানা (বেগানা), বিরাশী, বিলাত, বিলাতফেরত, বিলাতি(তী), বিলিতি(তী), বিশ (বি-ইশ, ত্রি-ইশ), বিশা, বিশাশয়, বিশাসয়, বিশেশয়, বৃথা, বেরাদর, বেরাদারী, বেরিজ, বেরিবেরি, বেরু, বেরুচ, বেলেস্তারা, বেলোয়ার, বেলোয়ারি, বেশী, বেস, বৈ, বৌঁতি, বোট, বোড়, বোতল, বোতাম, বোম, বোমা, বোম্বেটে, বোর, বোরব, বোরা, বোরো, বোর্খা, বোস্তা, ব্যাগ, ব্যাট, ব্যাটন, ব্রাণ্ডি, ব্রণ্, ব্রণ, ব্রণধূপন, ব্রণপট্ট, ব্রণবিরোপণ, ব্রণশোধন, ব্রণসংরোহণ, ব্রণহৃৎ, ব্রণিত, ব্রণী, ব্রাণ্ডি, ব্রীড়্, ব্রীড়, ব্রীড়া, ব্রীড়িত, ব্র্যাকেট, ব্লটিং, ব্লু।

ভ

ভ বর্ণের অর্থ : ১. ✓ভা + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *হওয়া থাকে যাহাতে; শোভা পায় যে।* / ভাতি যুক্ত যে। (ব.শ.)। ৩. শুক্রগ্রহ, শুক্রাচার্য্য, ভ্রান্তি, (ছন্দঃশাস্ত্রে) আদিগুরুক অন্তলঘুদ্বয় বর্ণত্রয় বা গণবিশেষ (Dactyl), নক্ষত্র, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, গ্রহ, রাশি, নক্ষত্রসংখ্যানুসারে ২৭ সংখ্যা, (ধ্বন্যাত্মক) ভ্রমর; হওয়া। (ব.শ.)। ৪. অর্থপূর্ণ শব্দরূপে একা একা **ভ** অপ্রচলিত। কিন্তু অতীতে 'ভ-গণ' (= নক্ষত্রগণ), 'ভ-চক্র' (= রাশিচক্র) প্রভৃতি শব্দ রূপে প্রচলিত ছিল। ৫. **ভ** বর্ণে ঠিক কী ক্রিয়া রয়েছে, তা সহজে ধরা দেয় না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব.শ. 'ভা' অর্থাৎ 'দীপ্ত-হওয়া' ক্রিয়াটিকে ভ-এর মূলে অবস্থিত ব'লে চিহ্নিত করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, **ভ** হল সেই সত্তা, 'ভাতিযুক্ত যে' বা 'দীপ্ত যে'। কিন্তু কী করে ভ-এর ভিতরে 'ভাতি' বা 'দীপ্ত' অবস্থান করে, তা বোঝা যায় না। তাছাড়া, **বর্ণ**মালার ভিতরে ভ-এর অবস্থানের সঙ্গে ঐ 'দীপ্ত' অর্থটি সহজে খাপ খায় না। 'ভ্-অন করা মানে দীপ্তন্, **ভ** = দীপ্তন করে যে = দীপ্ত — এরকম কথা আমরা লিখতে পারি না।

ভ-এর অর্থ কার্যত অব্যক্ত থাকায় এভাবে তাকে সরাসরি বোঝা কঠিন। **ক খ গ ঘ** কিংবা **ত থ দ ধ** প্রভৃতি বর্ণের যেমন কমবেশি ব্যক্ত অর্থ প্রকাশ করা যায়, **প**-বর্গের সদস্যদের ক্ষেত্রে সেরকম হয় না; একথা আমরা আগেই **প, ফ, ব** বর্ণের অর্থের ব্যাখ্যায় জানিয়েছি। এদের ভিতরে একাধিক অর্থ সুপ্ত থাকে, প্রেক্ষিত অনুসারে বেরিয়ে উপরিতলে আসে। তবে একেবারে আকস্মিকভাবে আসে না, তাদের একত্রে সুপ্ত থাকার এবং উঠে আসারও নিয়ম আছে। যেমন **ব** বর্ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তার ভিতরে **বৃদ্ধি, বহন, অতিবহন, বিকল্প, বিকল্প-কল্প উভয়** বা **দুই, দ্বৈরাজ্যবাহী, বিপরীত** ... ইত্যাদি অর্থগুলি শায়িত থাকে, যারা প্রয়োজন অনুসারে **ব**-এর অর্থরূপে সামনে চলে আসে।

এরকম হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, আমরা যখন কোনো বিন্যাসে হাত দিই, আগে যেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন খোপে রাখার যোগ্য বলে মনে হয়, সেগুলিকে সেই সেই স্থানে রেখে দিই। তারপর যেগুলি থেকে যায়, সেগুলিকে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করি। আমাদের পূর্বসূরি শব্দবিদগণ **অ** থেকে **ন** পর্যন্ত সেভাবেই সাজিয়েছেন, তার পর হাত দিয়েছেন **প**-বর্গে। এখানে, সকল ক্রিয়ার অন্তিম ক্রিয়াসমূহের এলাকায় স্বভাবতই প্রতিটি বর্ণ তুলনায় জটিল, বহুরূপী। ভ-ও সেইরকম।

আমরা দেখছি, অন্তত দুরকমভাবে **ভ** বর্ণটি সৃজন করা যায় — **ব্** + **হ্** = **ভ্**, **ব্** + **হ্** = **ভ্**। স্বভাবতই **ব** ও **ব** বর্ণের সঙ্গে হ্-এর বা 'হওয়ন' ক্রিয়ার মিলনে যে ক্রিয়াগুলি হতে পারে, তাদের সম্পৃক্ত রূপটি **ভ** বর্ণে থাকার কথা। এই **ভ** কেমন করে ব.শ. কথিত 'ভাতিযুক্ত' হয়? আমরা দেখি, ভ-কে বহন করে যে, তাকে **ভব** বলে; আর **ভব** তো এই বিশ্বসংসারের প্রতিটি অস্তিত্বই! এমন হলে তো **ভ** মানে দাঁড়ায় 'যে সত্তা **হয়ে** গেছে'; অর্থাৎ, 'যে সত্তা অস্তিত্ব লাভ করেছে'। শুধু তাই নয়, অস্তিত্বলাভ সর্বদিকে দীপ্তি প্রকাশপূর্বক শোভা পাচ্ছে, দীপ্তি পাচ্ছে, সেই হল **ভ**। কিন্তু ভ্-হওয়া কেমন 'হওয়া' যে, বিশ্বজগতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তারা প্রত্যেকেই **ভ** নামে, এবং তাদের বাহক **ভব** নামে শনাক্ত হয়ে যায়? মোটকথা 'শোভনীয় সত্তা'কে **ভ** বলে কেন?

কারণ, 'হতে' গেলে **সৃজিত** হতে হয়, **সৃষ্ট** হতে হয় এবং তার জন্য সবচেয়ে কম যে যোগ্যতা লাগে তা হল তাকে **দ্বৈরাজ্যবাহী** হতে হয়, **ব্র** (দ্র. **ব্রজ**) হতে হয়, তা নইলে এই জগৎসংসারে অস্তিত্বলাভ করা যায় না। সেই **ব্র**-ই যখন স্থির রূপ গ্রহণ করে, তখনই সে **ভ** হয়ে যায়, **ভব** হয়ে যায়, 'ভাতিযুক্ত' হয়ে যায়; শোভমান হয়ে যায়। আমরা দেখেছি এই **ব্র**-ই উল্টো Y = ⅄ বা λ (গ্রীক বর্ণমালার lambda, বা 'লম্বদা', যেন একটি মানুষ লম্বভাবে হেঁটে চলেছে), দ্বৈরাজ্যবাহী অস্তিত্ব, two in one, একের ভিতরে দুই, মানুষের জীবনপথে হাঁটা, লম্ব হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে চলা। তার সেই রূপটিকে আমাদের প্রাচীন পুরুষগণ চিহ্নিত করেছিলেন এমনকি ছন্দঃশাস্ত্রেও। সেখানে **ভ** বলা হত 'আদিগুরুক অন্তলঘুদ্বয় বর্ণত্রয়'কে, যা কিনা অবিকল উপরোক্ত λ বা ⅄। অতএব **ভ** = λ। ইংরেজিতে একে লেখা হয় V রূপে, খানিকটা সোজা Y-এর মতো। সংস্কৃতে লেখা হয় भ। আমাদের উপলব্ধি অনুসারে **ভ**-এর অন্তর্নিহিত বোধ বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি তিনটি ভাষার লিপিতেই কমবেশি ধরা আছে। ইংরেজিতে ধরা আছে দ্বৈরাজ্যের মৃত-বোধ, সংস্কৃতে (দেবনাগরীতে) ধরা আছে দ্বৈরাজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত শাসক-বোধ, এবং বাংলায় দ্বৈরাজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত সচল আমিত্ববোধ ধরা আছে বলেই আমাদের মনে হয়েছে। অর্থাৎ 'দ্বৈরাজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত শাসক-বোধযুক্ত যে কোনো অস্তিত্ব'কে **ভ** বলে। এই ভ-বোধে বিশ্বের অনেক ভাষাই পৌঁছতে পারেনি বলেই আমাদের মনে হয়েছে। আরবি ফারসি সহ বিশ্বের অনেক ভাষাতেই **ভ** বর্ণটি নেই।

তাহলে, **ভ**= ভ্-অন করে যে; **বর্দ্ধন**স্থিত, যেনবা আর বৃদ্ধিলাভ না করে নিজ অগ্রগতির স্রোত রুদ্ধ করে দিয়ে একধরণের পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে যে, সেই হল 'ভ'। 'ভ'-এর মধ্যে স্বভাবতই ভূ হওয়ার বা 'ভব' হওয়ার অর্থাৎ 'হওয়া'র সমস্ত ক্রিয়ার কথাই কমবেশি থাকার কথা। তবে যেভাবেই থাকুক না কেন, এর স্বভাবে একটি ব্যাপার স্পষ্ট দেখা যায়। তা হল — রসিক যেমন গভীর জ্ঞানরসকথা শুনে আত্মস্থ করে বুঁদ হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে বসে থাকে, মাতাল যেমন পেটভরে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকে, ধনী যেমন অনেক ধনরত্ন পেয়ে গিয়ে তাই নিয়ে 'টাকার নেশা'য় নেশাগ্রস্ত হয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকে ... অনেকটা সেরকম কোনো সত্তা যদি তার প্রাপ্তিকে আত্মস্থ করে আত্মনিবদ্ধ হয়ে বসে থাকে, যাতে তার তৃপ্ত মনের শোভা দর্শকের চোখেও ধরা পড়ে, তখনই তাকে **ভ** বলা যায়। যেহেতু **ব**-এর অর্থে 'বৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক বহন করা', এবং অন্তঃস্থ **ব** বর্ণে 'বহন করা' অর্থটি থাকে, সেই হেতু ভ-এর ভিতরেও তারই স্থিতিগুণ থাকার কথা। **ভ** বর্ণটির চেহারার ভিতরে কি দেখা যাচ্ছে না, যে, কে যেন **গর্ভগৃহে গর্ভস্থ** হয়ে বসে আছে! রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন — 'বুঁদ হয়ে যাবে, ভঁ হয়ে যাবে, তারপর না হয়ে যাবে।'

এই বিষয়ে রবি চক্রবর্তীর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা

এখানে বলতে হয়। "আমার মামা শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের চতুর্থ পুত্রসন্তান অসিত ভট্টাচার্য্যের জন্মের পরে দেখা গেল, তার মাথাটি শরীরের তুলনায় অনেক বড়। সবাই তাকে ডাকতে লাগলেন 'ভ' বলে; এবং ক্রমে তার ডাকনাম হয়ে গেল 'ভ'। স্বভাবতই তার পরের ভাইয়ের ডাকনাম হয়ে যায় 'ম'। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রায় পঁচিশ বছর আগে কলিম খান অসিত ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরিচিত হন এবং প্রায় ছয় বছর ধরে কোন্নগরে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং প্রায়শই রাত্রিযাপন করতেন। অসিত অকৃতদার থেকেই ষাট বছরে মারা গেছেন।" আমরা আজও জানি না, অসিতের ডাকনাম 'ভ' রাখার জন্য পরমাপ্রকৃতি কীভাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্ররোচিত করেছিলেন। 'ম' সহ তাঁদের অন্যান্য ভাইরা এখনও জীবিত আছেন।

আমরা দেখেছি, খুব রোগা লম্বা মানুষকে অনেক সময় বলা হত 'কাঠির উপর আলুর দম'। তখন মেদিনীপুরের হাটে-বাজারে শালপাতার বাটিতে পাঁচ-ছ'টা ছোট ছোট মসলা-মাখা গোল আলু আর তাতে একটা কাঠি দিয়ে এক আনায় বিক্রি হত। ঐ কাঠি আলুতে ঢুকিয়ে তুলে খাওয়া হত। এই যে কাঠি-ঢোকানো গোল আলু, তারই সঙ্গে তুলনা করা হত অতি রোগা লম্বা মানুষকে। আমাদের ধারণা, কীভাবে জানি মানুষ বুঝত **ভ** ঐ গোল আলু।

আমাদের বিশ্বাস, মানুষের মনের গভীরে ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়ার স্বরূপকথক আওয়াজের যে দ্বৈরাজ্য প্রকৃতির নিয়মে সদা সক্রিয় রয়েছে, তার সব খবর সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। সংস্কৃতকারগণ কিছুটা পেরেছিলেন, কিন্তু তাও দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁদের সেই অর্জিত বোধ এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে, তাদের পৃথক করে বোঝা রীতিমতো কঠিন। তারই মধ্যে আমরা যেটুকু বুঝতে পারছি, তা হল, অস্তিত্বলাভের যে মূল যোগ্যতা, **দ্বৈরাজ্যবাহী হওয়া, λ হওয়া, সেরকম হয়ে শোভা পায় যে, সেই হল ভ**। সহজ করে বললে, যে সত্তার অস্তিত্ব তার নিজের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার ভিতরে বহন **বর্দ্ধন** স্থিত হয়ে রয়েছে, যে ভরে আছে, পরিপূর্ণ বা ভরপুর হয়ে শোভা পাচ্ছে, তাকেই বলা যেতে পারে **ভ**। এই দিক থেকে দেখলে মনে হয়, **ক**-বর্গে করণাদি, **চ**-বর্গে চয়নাদি, **ট**-বর্গে টঙ্কারাদি, **ত**-বর্গে তরণাদি, এবং **প**-বর্গের **প**-এ পালনাদি, **ফ**-এ ফলনাদি, **ব**-এ বৃদ্ধিসাধনাদির পর কারক **ভ**-এ পৌঁছে পরিপূর্ণ হয়ে যায়; তারপর থেকে যায় তার সম্ভাবনাটুকু, যাকে **ম**-এ মিতকরণ করে নিয়ে **বর্ণমালার মূল** অবয়বকে সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়। **ভ**-এ তাই **কর্ম্মের শেষ**। **ম**-এ তার সমাপ্তি ঘোষণা।

এরই একটি নিকৃষ্ট রূপ হল **বিকল্পাত্মক** বা বিপরীতার্থক (দ্র. বি) ব্-এর সঙ্গে **হ্** যুক্ত হয়ে যে **ভ্** হয়, সেই বিপজ্জনক **ভ**। তাকে আমরা **ভিদ্** ও **ভী** ক্রিয়াতে স্পষ্ট চিনতে পারি।

কিন্তু সত্তা মাত্রেরই একটি সচল রূপ থাকে। **ভ**-ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না, থাকার উপায় নেই বলে। তারও বাড়বৃদ্ধি হয়, ক্ষয় হয়, তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে গ্রহণ বর্জনাদি করতে হয়। অর্থাৎ, তারও সক্রিয়তা আছে, অর্থাৎ **ভ**-এর ক্রিয়ারূপ আছে। তাকেই **ভ**-অন করা বা **ভ**-করণ করা বলে। কিন্তু তার মানে কী দাঁড়ায়?

ভ-অন করা বা **ভ**-করণ করা মানে দাঁড়াবে, আপন অস্তিত্বের দুই পায়ের উপর দাঁড়ানো, তার কোনো একটি বা দুটি পা ছোট-বড় থাকলে সেই অভাবপূরণ করা; কিংবা অপর কোনো সত্তার তদ্রূপ অভাব পূরণ করা। একে আমরা অনায়াসে **'ভ-অন'** হওয়া বা **'ভ-করণ'** যেমন বলতে পারি তেমনি **'ভব-করণ'ও** বলতে পারি।

ভ-বর্গে জাত ক্রিয়াপদগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তাদের আচরণ পূর্বতন অন্যান্য বর্গের ক্রিয়াপদগুলির থেকে একটু জটিল। সেই জটিলতার কারণে একই **ভজ্** ক্রিয়া বিভজ্যমান, সেব্যমান, খণ্ডমান তিনরকম ক্রিয়াকেই বুঝিয়ে দেয়। তার কারণ হল, সমস্ত বর্গ শেষ করে এসে **ভ-বর্গে** এসে আমরা জটিলতম ক্রিয়াগুলিকে বোঝানোর শব্দগুলি নিয়েই কাজ করছি। স্বভাবতই এই জটিলতা। তাই বলে এই জটিলতা একেবারে অনতিক্রমণীয় নয়, অতিক্রম করা যায়, করা যাবেও; শুধুমাত্র বাড়তি মেধা, শ্রম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সময় খরচ হয়। এক্ষেত্রে যেমন, **ভজ্** বিষয়ে বোঝার জন্য মন্দিরের **সেবাইত**-এর কথা ধরুন। তিনি মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার সেবার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের সেবাও করেন। এই সেবা করাকে **ভজ্** করাও বলে। কেন **ভজ্** করলে **ভাগ** হয়ে যায়, খণ্ডিত হয়ে যায়, তার কারণ জানা যেতে পারে এই মন্দিরের সেবাইতের কাছ থেকে। তিনি যদি দেবতার **ভজনা**য় সমগ্র সত্তাকে নিয়োগ করেন, তাঁর সেবাব্রত আর অ**খণ্ড** থাকবে না, পরিবারে বিদ্রোহ দেখা দেবে। আবার তিনি যদি পরিবারের **ভজনা**য় সমগ্র সত্তাকে নিয়োগ করেন, তাহলেও তাঁর সেবাব্রত আর অ**খণ্ড** থাকবে না, মন্দিরের দেবতা বিদ্রোহ করবেন। এই সেই কারণ, যে কারণে **ভজ** করলে **ভগ** হয়ে যায়, **ভাগ** হয়ে যায়, **ভন্জ্** করলে **ভগ্ন** হয়ে যায়, **ভঙ্গ** হয়ে যায় ... ইত্যাদি। কারণ **ভ**-এর ভিতরেই দুটো দিক সব সময় **বর্ত্তমান** থাকে। সামঞ্জস্য তার প্রাণ।

তবে একথা এখানে বলে রাখা দরকার, বর্ণমালার সকল বর্ণের ভিতরে সবচেয়ে ভারী, গভীর ও জটিল অর্থধারী বর্ণ এই **ভ**। এর অর্থ যতটুকু উপলব্ধি করা যায়, সেটুকুই বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা পানসি চালানোর যোগ্যতা নিয়ে এই বজরা চালানোর আকুল চেষ্টা করছি মাত্র; করতাম না, অন্য কেউ যদি যোগ্য হাতে এসব করে দিত।

যাই হোক, আমাদের শব্দার্থকোষের কাজ চালানোর জন্য আমরা তাহলে **ভ** বর্ণের অর্থ লিখব 'ভ্-বাহী' বা 'ভব'। স্বভাবতই **ভা** = ভব-এর আধার যে, **ভি** = গতিশীল ভব যাহাতে ... ইত্যাদি হবে। অতঃপর **পা, পি, পী, পু, পূ** ... প্রভৃতি বর্ণের অর্থের মতো **ভা, ভি, ভী, ভু, ভূ** ... ইত্যাদির অর্থও হবে।

ভ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ভক্ষ্ (*ভিক্ষ্*), ভজ্, ভঞ্জ্ (ভন্জ্, ভন্দ্), ভট্, ভণ্ (*ভন্দ্*), ভল্ল্, ভষ্ (*ভস্, ভিষজ্*), ভা, ভাষ্, ভাস্, ভিদ্, ভী, ভু (ভুজ্), ভূ (ভাবি, ভাম্, ভূষ্), ভৃ, ভৃশ্ (ভ্রস্‌জ্), ভ্রংশ্ (*ভ্রন্‌শ্*, ভ্রন্‌স্, ভ্রম্), ভ্রাজ্, ভ্ = ১৮ + ১

ভক্ষ্ (ভিক্ষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অভক্ষণ, অভক্ষিত, অভক্ষ্য, অভক্ষ্যভক্ষণ, অভক্ষ্যভক্ষজ, অভ্যক্ষভোজ্য, ভক্ভক্, ভক্ষ্, ভক্ষ, ভক্ষক, ভক্ষণ, ভক্ষণীয়, ভক্ষিত, ভক্ষিতব্য, ভক্ষয়িতা, ভক্ষিল, ভক্ষী, ভক্ষ্য, ভখ, ভিক (ভিখ, ভিক্খা, ভিখা, ভীক, ভীখ), ভিকারি (ভিখারি, ভিখারী, ভিকিরী, ভিখিরি), ভিকিরী, ভিক্ষ্, ভিক্ষণ, ভিক্ষা, ভিক্ষাকপাল, ভিক্ষাকরণ, ভিক্ষাকাল, ভিক্ষাচর, ভিক্ষাচার, ভিক্ষাচর্য্যা, ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষাটন, ভিক্ষান্ন, ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাপুত্র, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষা-মা, ভিক্ষার্থী, ভিক্ষাশী, ভিক্ষাহার, ভিক্ষিত, ভিক্ষিনী, ভিক্ষু, ভিক্ষুক, ভিক্ষুকী, ভিক্ষুচর্য্যা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসঙ্ঘ, ভিক্ষুসূত্র, ভিখারিনী, ভিখিরি, ভেখ, ভেখধারী, ভৈক্ষ, ভৈক্ষকাল, ভৈক্ষচরণ, ভৈক্ষচর্য্যা, ভৈক্ষজীবিকা, ভৈক্ষণ, ভৈক্ষবৃত্তি, ভৈক্ষাশিন্, ভৈক্ষাশী, ভৈক্ষ্য, সুভিক্ষ।
ভক্ষ্ (ভিক্ষ্) = ভবের **ক্ষ**-অন। **ভক্ষ** = ভবের **ক্ষ**-অন যাহাতে। **ভিক্ষ** = গতিশীল ভবের **ক্ষ**-অন যাহাতে।

ভক্-ভক্ : **২.** *ভব-এর করণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **৩.** হঠাৎ প্রচুর দুর্গন্ধবিস্তারের ভাব, (ধ্বন্যাত্মক) কলসী-প্রভৃতিতে জল ভরার সময়ে বায়ুনিঃসরণের শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ভ হল 'হওয়া'র স্থিত-রূপ 'ভাতিযুক্ত' সত্তা। তার করণ বা **ভক্** অতএব দুরকম হতে পারে। (এক) নিজের অভাব পূরণের জন্য অন্য কোনো সত্তা থেকে খানিকটা নিয়ে এসে সেই অভাব পূরণ করা, অর্থাৎ 'গ্রহণ' করা; অথবা (দুই) নিজের উদ্বৃত্ত বা ত্যাজ্যকে নিজের পরিধির বাইরে ফেলে দেওয়া, বর্জন করা। আমরা জানি, সমগ্র জড়জগৎ 'গ্রহণ' ও 'বর্জন' এই দুই বন্ধনের সূত্রে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, যেখানে কিনা জীবজগৎ বদ্ধ রয়েছে 'গ্রহণ, বর্জন, পুনরুৎপাদন'-এর তিন সূত্রে। উপরোক্ত **৩.**-এ ব.শ. দ্বিতীয় অর্থটির (বর্জন অর্থটির) প্রতীকী রূপের দুটি উদাহরণ শব্দটির অর্থ রূপে সরবরাহ করেছেন।

ভক্ষ (ভক্ষক, ভক্ষণ, ভক্ষ্য) : **১.** ✓ভক্ষ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **ভক্ষ** = *এক ভব কর্তৃক অন্য ভবকে* **ক্ষ**-*করণ যাহাতে; যাহাতে এক ভব অন্য ভবকে* **ক্ষয়** *করে আনে।* **ভক্ষক** = **ভক্ষণ** *করে যে।* **ভক্ষণ** = **ভক্ষ**-*ক্রিয়া অন (on) যাহাতে।* **ভক্ষ্য** = **ভক্ষ** *থাকে যাহাতে।* / **ভক্ষ্য** = যে খাদ্য দন্ত দ্বারা অবখণ্ডনীয়। (ব.শ.)। **৩.** **ভক্ষ** = ভক্ষণ, পান, ভক্ষ্য, খাদ্য, পেয়। **ভক্ষক** = খাদক, ভোক্তা, ঔদরিক। **ভক্ষণ** = ভোজন, পান, ভক্ষ্য, খাদ্য। **ভক্ষ্য** = ভক্ষণীয়, ভোজ্য, ভক্ষণীয় দ্রব্যমাত্র, খরবিশদ অব্যবহার্য্য মোদকাদি, লড্ডুকমণ্ডকাদি। (ব.শ.)। **৪.** eater অর্থে **ভক্ষক**, eating অর্থে **ভক্ষণ**, এবং edible অর্থে **ভক্ষ্য** প্রচলিত; **ভক্ষ** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভক্ভক্**। **ভক্ষ** শব্দটিকে আমরা ভক্ + ষ = **ভক্ষ** লিখতে পারি। এর অর্থ দাঁড়ায় 'ভ-করণ (= **ভক্**) দিশাগ্রস্ত (= **ষ**) যাহাতে'। তার মানে, নিজের **ভ**-কে (= **ভবকে**) বা নিজের দ্বৈরাজ্যমূলক অস্তিত্বকে পূর্ণ করার জন্য বা সচল রাখার জন্য অন্য অস্তিত্বের অংশ **ক্ষয়** করে নিয়ে আসা। ...

'যে রক্ষক সেই **ভক্ষক**' — বাংলাভাষীদের সংস্কৃতিতে এই বাকধারাটি খুবই প্রচলিত। এই বাকধারার তিন রকম অর্থ হয়। এক) যাকে রক্ষা করা হচ্ছে, তার থেকে যা কিছু জন্মায়, সেগুলি রক্ষকই খেয়ে ফেলে। যেমন মুরগিপালন করে তার ডিম খেয়ে ফেলা, কিংবা পুঁজি রক্ষা করে তার সুদ খেয়ে ফেলা। এদের সেকারণেই **ভক্ষক** বলা চলে। দুই) যে মুরগিটিকে পালন করা হচ্ছে, সেই মুরগিটিকেই খেয়ে ফেলা। যে পালক এরকম ক্রিয়া করে, সেও **ভক্ষক**। এইরূপ রক্ষণ করে ভক্ষণ করে যে, তাকে **রাক্ষস** বলে। তিন) মুরগি ছিল বনে, মানুষ তাকে পালন করতে শুরু করল, কিন্তু **লালন** করল না (দ্র. **লালনপালন**)। সেই একই পালনকর্মের সুদীর্ঘ পুনরাবৃত্তির ফলে দেখা যায়, সেই মুরগির প্রজাতিটি আর একা একা বনে গিয়ে বেঁচে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তখন কোনো কারণে মানুষ সেই মুরগিকে পালন করা বন্ধ করে দিলে, সে মরে যায়। এইরূপ রক্ষণ করে **ভক্ষণ** করে যে, তাকেও **রাক্ষস** বলে।

ভিক্ষা (ভিক্ষণ, ভিক্ষাকপাল, ভিক্ষাচর্য্যা, ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষাপুত্র, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষা-মা, ভিখারী) : **১.** ✓ভিক্ষ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** (**ভিক্ষ** = *গতিশীল বা সক্রিয়* **ভক্ষ** *যাহাতে)।* **ভিক্ষা** = *গতিশীল বা সক্রিয়* **ভক্ষ**-*এর আধার যে; অথবা,* **ভক্ষণ** *করিবার ইচ্ছা (থাকে যাহাতে)।* **ভিক্ষণ** = **ভিক্ষ** *অন (on) যাহাতে।* **ভিক্ষাকপাল** = **ভিক্ষা***কৃত পালিত হয় যাহাতে (দ্র.* **কপাল***)।* **ভিক্ষাচর্য্যা** = **ভিক্ষা***চরণ থাকে যাহাতে, তদ্রূপ আধার।* **ভিক্ষাজীবী** = **ভিক্ষা** *জীবিকা যাহার।* **ভিক্ষাপুত্র** = **ভিক্ষা** *করে যে পুত্র।* **ভিক্ষাবৃত্তি** = **ভিক্ষা***রূপ আবর্তে আবর্তিত হওয়ন যাহাতে।* **ভিক্ষা-মা** = **ভিক্ষা** *দেন যে মা।* **ভিখারী** = *গতিশীল বা সক্রিয় ভ-এর খাওয়া রহে যে গতিশীল আধারে।* / **ভিক্ষা** = (যাহাতে) গৃহস্থের নিকটে যতির খাদ্যপ্রার্থনা (থাকে)। (ব.শ.)। **৩.** **ভিক্ষা** = যাচন, প্রার্থনা, সেবা, ভিক্ষিত বস্তু, ভৃতি, বেতন, ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর ভোজন, সন্ন্যাসীর ভিক্ষান্ন। **ভিক্ষণ** = যাচন, প্রার্থনা। **ভিক্ষাকপাল** = ভিক্ষাপাত্র। **ভিক্ষাচর্য্যা** = ভিক্ষার্থ পর্য্যটন, ভিক্ষাটন। **ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষাবৃত্তি** = ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীব। **ভিক্ষাপুত্র, ভিক্ষা-মা** = ভিক্ষা-মায়ের ছেলে, ভিক্ষা-মা — ভিক্ষাপুত্রের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোক, যিনি ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়নে মায়ের পরেই প্রথমে ভিক্ষা দেন। **ভিখারী** = প্রার্থী, (সাদৃশ্যে) কাপুরুষ, ভীরু। (ব.শ.)। **৪.** begging অর্থে **ভিক্ষা**, beggar অর্থে **ভিক্ষাজীবী**, ও **ভিখারী** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভক্ষ**। 'জানিবার ইচ্ছা'কে যেমন 'জিজ্ঞাসা' বলে, তেমনি 'ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা'কে **ভিক্ষা** বলা যায়। কিন্তু একজন স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানুষ কি অন্য কোনো মানুষের কাছে **ভিক্ষা** চাইতে পারে? 'আমাকে দয়া করে কিছু দিন, আমি খাব' — এরকম কথা কি কোনো স্বাভাবিক মানুষ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে? আমাদের ধারণা, পারে না, কখনোই পারে না; মহেঞ্জদারোর যুগের মানুষ প্রাণ চলে গেলেও অন্য মানুষের কাছে হাত পেতে **ভিক্ষা** চাইবার কথা ভাবতেও পারত না বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাছাড়া সেরকম ভাবতে পারার আগে প্রথমত মানুষে মানুষে বিভাজন ঘটা চাই, পরস্পরের

মধ্যে পার্থক্যের বোধ গড়ে ওঠা চাই, যে পরিস্থিতি সেকালের যৌথসমাজে আদৌ ছিল না; দ্বিতীয়ত, যার কাছে **ভিক্ষা** চাওয়া হবে, তার কাছে **ভিক্ষা** চাইবার অধিকার সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই; তৃতীয়ত, যে চাইবে তার 'ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা' থাকা চাই, এবং যার কাছে চাইবে তার কাছে দানের মতো **ভক্ষ্য** থাকা চাই; এবং সর্বোপরি একজন মানুষ আর একজন মানুষকে দান করতে পারে এরকম বোধ ও রীতি থাকা চাই। সমাজে এরকম ব্যাপারগুলি প্রতিষ্ঠিত না থাকলে **ভিক্ষা** ক্রিয়াটির প্রচলন হতে পারে না। সেকারণে, আমাদের ধারণা '**ভিক্ষা**-চাই' কথাটি কোনো মানুষের মুখ দিয়ে স্বভাবত উচ্চারিত হওয়ার আগে সেই মানুষের ও যার কাছে সে **ভিক্ষা** চাইবে, দুজনেরই মনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা ঘটে যাওয়ার কথা।

সমগ্র বিশ্বের সমাজ ও তাদের সংস্কৃতিগুলিতে **ভিক্ষা**র ধারণা, তার উদ্ভব, প্রচলন, বর্তমানে তার স্বরূপ, এগুলি নিয়ে ভাবলে এক অদ্ভুত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমরা দেখছি, সামাজিক রীতি রূপে **ভিক্ষা**র প্রচলন হয়েছিল সর্বাগ্রে ভারতবর্ষে, এবং সে **ভিক্ষা** ঠিক 'খাদ্যপ্রার্থনা' ছিল না; ছিল অন্য সমাজসদস্যকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কেননা, তার আগেই **দক্ষযজ্ঞের** মহাসংগ্রামের পর, সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ (**শিব**) তাঁর সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে **যতি-ধর্ম** গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিবর্তে সমাজ তাঁকে তাঁর খোরাকি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে, **ভিক্ষা** দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে; তাঁকে অভুক্ত রাখার অধিকার হারিয়েছে। সমাজকে টিকে থাকতে হলে, সেই **ভিক্ষার্থী**কে না খাইয়ে সমাজের কোনো সদস্যই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারবে না, এই চুক্তিতে সমাজ স্বীকৃতি জানিয়েছে। ব.শ. সেকারণেই লিখছেন, 'গৃহস্থের নিকটে যতির খাদ্যপ্রার্থনা'কে **ভিক্ষা** বলে। ...

সুতরাং প্রাচ্যের সমাজে **ভিক্ষা** আর পাশ্চাত্যের সমাজে **ভিক্ষা** এক ব্যাপার নয়। ইউরোপে শেকসপিয়ারের কালেই **ভিক্ষা** একটি নিন্দনীয় বৃত্তি রূপে ঘোষিত হয়ে যায়, এখন তো সেখানে **ভিক্ষা**-করা ঘোর বেআইনি কাজ। তখনই, যারা **ভিক্ষা** করার চেষ্টা করত, তাদের পুলিশে ধরত এবং তাদের vagabond বলে ঘোষণা করা হত। (দ্র. **ভগ**)। শেকসপিয়ারের কালে যে দলগুলি নাটক অভিনয় করত, তাদের পাছে vagabond ব'লে পুলিশে ধরে, সেইজন্য তারা কোনো না কোনো জমিদারের ছত্রছায়া গ্রহণ ক'রে তবেই আত্মরক্ষা করতে পারত; একালে আমাদের এখানে যেমন 'বিক্রি করা যাবে এমন' গ্রন্থ প্রকাশ করতে হলে কোনো না কোনো প্রকাশকের ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়, অন্যথায় 'প্রকাশনার অনুমতি (লাইসেন্স) নেই' বলে পুলিশে ধরতে পারে; শেকসপিয়ারের যুগে নাটককে অভিনীত হওয়ার জন্য অনেকটা সেইরকম পথ গ্রহণ করতে হত। পরিবর্তে সেই জমিদারের বাড়ির অনুষ্ঠানাদিতে একরকম বিনা পারিশ্রমিকে দলকে তাদের নাটক অভিনয় করে আসতে হত। একালে আমাদের এখানেও লেখকেরা তাঁদের গ্রন্থাদির প্রকাশককে তদ্রূপ সুবিধা দিতে কমবেশি বাধ্য হন।

যাই হোক, ভারতীয় উপমহাদেশে কিন্তু **ভিক্ষা** ছিল অত্যন্ত সম্মানীয়। কেননা, এর সূচনা হয়েছিল সমাজ-আলোড়নকারী রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিবৃত্ত থেকে। **দক্ষযজ্ঞ**-এর মহাসংগ্রাম অন্তে পূর্বতন সমাজ-পরিচালক **শিবসত্তা**র আধারস্বরূপ মহর্ষিরা **যতিধর্ম** গ্রহণ করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন — 'ঠিক আছে! এখন থেকে তোমরা **দক্ষ**-মহর্ষিরা সংসার সামলাও। আমরা আর সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করব না; আমাদেরকে আমাদের খোরাকি দিয়ে দিয়ো।' স্বভাবতই **যতি**-ভিখারীরা এলেই তাঁদের সাধ্যমতো সেবা করা, খাদ্য দান করা সমগ্র ভারতবাসীর একান্ত পালনীয় **কর্তব্য** হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, গতকাল যিনি সমাজের **সমস্ত কিছুর** অধীশ্বর ছিলেন, তিনি এসেছেন দ্বারে, ভিখারী হয়ে। রাজা থেকে অতি সাধারণ প্রজা পর্যন্ত প্রত্যেক সমাজসদস্যই **যতি**কে দেখলেই তাঁকে দান করতে, তাঁর সেবা করতে দ্বিধা করতেন না। কোনো কারণে, কেউ তা করতে না পারলে, তিনি অবশ্যই **ভিক্ষার্থী যতি**কে বলতেন, 'ক্ষমা করুন।' কেননা, সমাজসদস্যটি তাঁর কর্তব্য করতে পারছেন না, তাই তিনি অপরাধী; সেকারণেই ঐ ক্ষমা প্রার্থনা। অনেকসময় কোনো কোনো অধঃপতিত **যতি** তাঁর প্রাপ্য **ভিক্ষা** না পাওয়ার জন্য চোখ রাঙাতে দ্বিধা করতেন না। এই রীতি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মনে এত গভীরভাবে প্রোথিত যে, রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রামে, যেখানেই কোনো ভিখারী এসে হাত পেতে দাঁড়ায়, লোকে তাকে কিছু দান করতে না পারলে আজও বলেন, 'ক্ষমা করো।' আর, ভারতে কোনো কোনো ভিখারী সন্ন্যাসী আজও চোখ রাঙিয়ে **ভিক্ষা** চেয়ে বসে। কেন যে অধিকাংশ ভারতবাসী এরকম আচরণ করেন, ইংরেজি-শিক্ষিত আধুনিকতাবাদীরা তা বুঝতে পর্যন্ত পারেন না। আর, ইউরোপীয়ানরা তো ভাবতেই পারেন না যে, একজন অচেনা লোক এসে চোখ রাঙিয়ে কিংবা না-রাঙিয়ে **ভিক্ষা** চাইছে, আর তিনি তাকে **ভিক্ষা** দিতে পারছেন না ব'লে তার কাছে ক্ষমা চাইছেন — এ আচরণ তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলেই মনে হবে!

যাই হোক, **ভিক্ষার** এই রীতিটি ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বজনমান্য ছিল। এর দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে **ভিক্ষা** করা একপ্রকার সুশীল আচার রূপে গণ্য ছিল। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ মাত্রেই **ভিক্ষাবৃত্তি** অবলম্বন করতেন। বৌদ্ধযুগে **ভিক্ষু** হওয়া রীতিমতো সম্মানীয় ব্যাপার ছিল। বৈষ্ণবদের যুগে 'তৃণাদপি সুনীচেন' প্রমাণ করার একটা উপায় ছিল **ভিক্ষাবৃত্তি**। বাংলায় মুসলমান শাসনকালেও **ভিক্ষাজীবী** সাধু-দরবেশদের সর্বোচ্চ সম্মান ছিল। যদিও কালে কালে **ভিক্ষার** সেই গৌরব এখন আর নেই, তবুও আজও ভারতীয় উপমহাদেশে '**ভিক্ষা**-করা' নিষিদ্ধ করবার কথা কোনো শাসকই ভাবতে সাহস পর্যন্ত করেনি। ...

এই সেই কারণ, যেকারণে **ভিক্ষা** নিয়ে এত শব্দ তৈরি হয়েছিল আমাদের ভাষায়। **ভিক্ষাচর্য্যা** করা কোনো অপরাধ ছিল না আমাদের সমাজে-সংস্কৃতিতে। **ভিক্ষাজীবী**দের গ্রাম কেবল আমাদের দেশেই পাওয়া যায়, তা সে বাউল ফকিরদের গ্রাম হোক, আর পটুয়াদের গ্রামই হোক। এমনকি খোদ ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে, আজও, তাঁদের উপনয়নে এই **ভিক্ষা** একটি পবিত্র আচার। কেন যে পবিত্র আচার, গ্রামবাংলায় তার বহু নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। অমুক

কাজটি করতে হলে স্নান করে ভিজা কাপড়ে সাত গেরস্থের বাড়ি থেকে **ভিক্ষা** করে এনে অমুক করতে হবে ... ইত্যাদি — এরকম নানা আচার আজও প্রচলিত আছে। এরকম **ব্রতধারী** ভিখারীকে কোনো বঙ্গবাসী কখনো খালি হাতে ফেরান না। মোট কথা, প্রাচ্যের **ভিক্ষা** আর পাশ্চাত্যের **ভিক্ষা** এক ব্যাপার নয়, যেমন কিনা প্রাচ্যের **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন** আর পাশ্চাত্যের **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন** এক ব্যাপার নয়।

ভিক্ষু (ভিক্ষুক, ভিক্ষুণী, ভিক্ষুসঙ্ঘ, ভিক্ষুসূত্র) : ১. ✓ভিক্ষ্ + উ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভিক্ষু** = *ভিক্ষ্ (উপরে* ***ভিক্ষা*** *দ্রষ্টব্য) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **ভিক্ষুক** = *ভিক্ষু-কর্ম্ম করে যে।* **ভিক্ষুণী** = *ভিক্ষু-কর্ম্ম করে যে স্ত্রীলোক।* **ভিক্ষুসঙ্ঘ** = *ভিক্ষুদিগের সঙ্ঘ,* **ভিক্ষুসূত্র** = *ভিক্ষুদিগের নিমিত্ত যে সূত্র।* ৩. **ভিক্ষু** = ভিক্ষণশীল, ভিক্ষাজীবী, চতুর্থাশ্রমী, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, বৌদ্ধসন্ন্যাসী, চতুর্থাশ্রম। **ভিক্ষুক** = ব্রহ্মচারী যতি ইত্যাদি, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধভিক্ষু। **ভিক্ষুণী** = বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী। **ভিক্ষুসঙ্ঘ** = বৌদ্ধভিক্ষুসমাজ। **ভিক্ষুসূত্র** = ব্যাসপ্রোক্ত ভিক্ষুশাসনার্থ সূত্রগ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই এখন কার্যত অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ভিক্ষা, দক্ষিণ**। **ভিক্ষাজীবী** ও **ভিক্ষু** শব্দের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ রয়েছে। **ভিক্ষ্** (ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা) করা ক্রিয়াটি **ভিক্ষু**তে নবরূপে উত্তীর্ণ। অর্থাৎ, **ভিক্ষু** সত্তা অন্য সত্তাকে ক্ষয় না করে উল্টে তার অভাব থাকলে তা পূরণ করে বা করবার উপায় বলে দেয়। তাই সে **ভিক্ষু**। এই **ভিক্ষু**গণ নানা বিষয়ের জ্ঞানী ছিলেন এবং জনসাধারণের নানা মানসিক অভাব পূর্ণ করতেন, জীবনযাত্রা-পথের পথ দেখাতেন। তাই তাঁদের **ভিক্ষু** বলা হত, অন্তত শব্দটির অন্তর্নিহিত শব্দার্থ সেরকম কথাই বলে।

ব.শ. জানাচ্ছেন, অত্রিসংহিতা অনুসারে, বা বলা ভাল বৈদিক **ধর্ম্ম**ানুসারে, **ভিক্ষুক** ছয় প্রকার —'ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ। অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ।।' অর্থাৎ, ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ক্ষীণবৃত্তি — এই ছয়প্রকার **ভিক্ষুক**। এর মধ্যে লক্ষণীয় যে, গৌরব ও সম্মানের দিক থেকে শব্দগুলি সাজানো রয়েছে। এর শেষে রয়েছে 'ক্ষীণবৃত্তি' ভিক্ষুক; অর্থাৎ ঠিকঠাক কাজকর্ম জোটে না বলে যারা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। একালের ভাষায় এদের 'পার্ট-টাইমার-ভিখারী' বলা যেতে পারে। এদের সম্মান ছিল না বললেই চলে। তার চেয়ে উপরে ছিল অধ্বগ অর্থাৎ পান্থ। তখনকার যুগে পথেঘাটে হোটেল ছিল না বললেই চলে। ফলে পথিক মাত্রকেই গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় ও খাদ্য ভিক্ষা করতে হত এবং লোকে তা দিতও। না দিলে হিউয়েন সাং বলুন আর বিবেকানন্দই বলুন, তাঁদেরকে সারা ভারত ভ্রমণ করতে হত না। আর, এই সব সাধু দরবেশদের বাড়িতে একদিন থাকতে দেওয়া, খেতে দেওয়া, এসব কাজকে যেকোনো গৃহস্থই অত্যন্ত ভাল কাজ, পুণ্যকর্ম, বলে মনে করতেন। এরকম বাংলাভাষী অনেকেই আছেন, যাঁরা এসব ব্যাপার স্বচক্ষেই দেখেছেন। মনে রাখা ভাল, এমনকি ১৯৬০-৬৫ সাল পর্যন্ত, এভাবে গেরস্থবাড়িতে অতিথি হয়ে হয়ে, বলতে গেলে বিনে পয়সায় লোকে সারা ভারত ভ্রমণ করতে পারত। ...

ভেখ (ভেখধারী) : ১. **ভিক্ষ্** > **ভিখ্** > **ভেখ**। ২. **ভেখ** = ***ভিক্ষ্*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***ভেখধারী*** = ***ভেখ*** *ধারণ করে যে।* ৩. **ভেখ** = বেশ, পরিচ্ছদ, সন্ন্যাসী ভিক্ষুক বৈরাগী বা শাক্তের সাজ, ছদ্মবেশ। **ভেখধারী** = বেশধারী, ছদ্মবেশী। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় শব্দদুটি যথার্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের সভ্যতার প্রতিটি অর্জনের বিশেষত্ব হল, অর্জনকালে তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত শুভ ও বৈপ্লবিক; কিন্তু সেই অর্জনের **দক্ষসুলভ** পুনরাবৃত্তি চলতে চলতে কালে কালে তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মৌলবাদী-ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। একই কথা বলা চলে **ভেখ**-এর ক্ষেত্রে। আদিতে এর উদ্ভব হয়েছিল **ভিক্ষা** ও **ভিক্ষু** থেকে। তাঁরা তাঁদের আদর্শ গৌরব সুকীর্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছু আচার আচরণ পালন করতেন, যার সঙ্গে তাঁদের বেশবাসেরও বিশেষত্ব ছিল। তাঁদের সেই বেশবাসকে বলা হত **ভেখ**। এটি **ভিখ** শব্দ থেকে জাত। গ্রামবাংলায় **'ভিক্ষা** দেওয়া'কে এখনও বলা হয় **'ভিখ**-দেওয়া', **'ভিখ**-চাওয়া' ... ইত্যাদি। 'কাকচারা যদি বলত ঠিক, দুয়ারে দুয়ারে মাগ্‌তনি **ভিখ'** — একটি বাগ্‌ধারা, যা গ্রামবাংলায় আজও শোনা যায়। (দ্র. **বায়স**)। আমাদের ধারণা, এই **ভিখ** শব্দটি থেকেই **ভেখ** শব্দটি সৃজিত হয়েছে। আদিতে এই **ভেখ** সম্মানীয় ছিল, কিন্তু পরে পরে **ভেখধারী**গণ যখন নিজেদের সুকীর্তি, গৌরব, আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ঠগে পরিণত হয়ে যায়, তখন থেকে শব্দটিও নিন্দার্থক হয়ে গেছে।

ভজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিভক্ত, অতিভক্ত, অবাগিণী, অবিভক্ত, অবিভাগ, অবিভাজ্য, অভক্ত, অভাগ, অভাগা, অভাগি, অভাগিনী, অভাগিয়া, অভাগিনী, অভাগী, অভাগীয়া, অভাগ্য, অভাজন, আওয়াজ, আবাগি, আবাগী, আবাগে, আবাজ (বাজনা), আভাগী, আভাগিনী, দেবভাগ, বইন, বহিন, বহিনী (ভগিনী), বিভক্ত, বিভক্তি, বিভাগ, বিভাজক, বিভাজন, বোন, বোনাই, বোনাইভাতারী, ভইন, ভকত, ভকতা, ভকিতা, ভকিত্যা, ভক্ত, ভক্তকার, ভক্তদাতা, ভক্তদায়ী, ভক্তদাস, ভক্তদ্বেষ, ভক্তপুলাক, ভক্তবৎসল, ভক্তবিটল, ভক্তবিটেল, ভক্তব্যয়, ভক্তমণ্ড, ভক্তরোচন, ভক্তশালা, ভক্তা, ভক্তি, ভক্তিকর, ভক্তিবাদ, ভক্তিবাদী, ভক্তিমান, ভক্তিমার্গ, ভক্তিয়া, ভক্তিযোগ, ভক্তিরাগ, ভক্ত্যা, ভগ, ভগদত্ত, ভগদেব, ভগদেবতা, ভগদৈবত, ভগনেত্রঘ্ন, ভগনেত্রহা, ভগনেত্রহর, ভগন্দর, ভগবতী, ভগবত্তা, ভগবত্ত্ব, ভগবদগীতা, ভগবন্ত, ভগবান, ভগা, ভগিনী (বহিন, বুইন, বুন), ভগীরথ, ভগীরথকন্যা, ভগীরথখাত, ভজ্, ভজ, ভজকট, ভজন, ভজনকুঠরী, ভজনা, ভজনীয়, ভজমান, ভজা, ভজান, ভাঁতি, ভাক্, ভাগ্(জ্), ভাকু(ক্)ট, ভাক্তা, ভাক্ত, ভাগ, ভাগকল্পনা, ভাগকুলি, ভাগধেয়, ভাগনা, ভাগনে, ভাগপত্র, ভাগবত, ভাগবাঁটা, ভাগবাঁটোয়ারা, ভাগভাক্, ভাগভুক্, ভাগলক্ষণা, ভাগলেখ্য, ভাগহর, ভাগহার, ভাগহারী (ভাগারী), ভাগা, ভাগাড়, ভাগান, ভাগার্থী, ভাগাভাগি, ভাগি, ভাগিক, ভাগিনা, ভাগিনী, ভাগিনে, ভাগিনেয়, ভাগী, ভাগীরথ, ভাগীরথী, ভাগ্, ভাগ্‌গিস্, ভাগ্য, ভাগ্যধর, ভাগ্যবান, ভাগ্যিস, ভাজক, ভাজন, ভাজ্য, ভায়, ভিগ (ভীগ), ভিগা,

ভিজ, ভিজা, ভিজান, ভিজানা, ভিজে, ভেজ, ভেজা, ভেজান, ভেজাল, ভৈন, ভোক্তব্য, ভোক্তা, ভোক্ত, ভোজং, ভ্যাজানো, মহাভাগ, সুভগ, সুভগা, সৌভাগ্য।

ভজ্ = ভবের জনন। **ভজ** = ভবের জনন যাহাতে। [ভ কাকে বলে, সেকথা আমরা **ভ** বর্ণের অর্থে জেনেছি। (শব্দের মাধ্যমে প্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত আমরা তাকে **ভব** নাম দিয়েছি এবং রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশের জন্য আমরা তার স্বরূপকে প্রকাশ করেছি λ চিহ্নে।) সেই ভ-এর সঙ্গে **জ** যোগ করে যে **ভজ** শব্দ তৈরি করা হয়, স্বভাবতই তার অনেকগুলি ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ হয়। যথা — ভব জনন করে যে; ভব জনিত হয় যাহাতে; ভব-এর জনন থাকে যাহাতে; ... ইত্যাদি। একে খুব সহজে বুঝতে হলে গ্রামবাংলার মানুষের মুখের কথায় আস্থা রাখতে হয়। তাঁরা দড়ি বাঁধাবাঁধির সময় মাপে **ভজান**র কথা বলেন, হিসাব **ভজান**র কথা বলেন, ক্ষমতাবানকে **ভজান**র কথা বলেন, শক্তিমানকে **ভজেন**, **ভজনা** করেন, শক্তিমানকে **ভজান**, তার মন **ভিজান**, **ভিজিয়ে** নরম করেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা, যিনি **ভজাতে** চান, তিনি আসলে তাঁর হিসেবে 'যে-পর্যন্ত-হলে' **ভব**-এর দুই পায়ের সাম্য হয়, ব্যাপারটি মেলে, সে পর্যন্ত শক্তিমানকে রাজি করাতে চান। তাঁর এই চেষ্টাকে বলে **ভ-জনন** করা। তার মানে, দ্বৈরাজ্যবাহী যে **ভ**, তার এক রাজ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় রাজ্যটি যাতে সমান সমান হয়, সেটিই **ভজনা**কারীর উদ্দেশ্য; অন্যথায় ব্যাপারটি যে **উৎকট বিকট**-এর মতো **ভজকট** হয়ে যাবে, বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে! তাতে তো **ভজনা**কারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না!

তাহলে দেখা যাচ্ছে, **ভজ** করা মানেই **ভব**-এর দু-দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য **জনন** করা। অর্থাৎ, **কোনো কাম্য, সম্ভাব্য, কাল্পনিক দ্বৈরাজ্যের এক রাজ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় রাজ্যটিকে মেলানোর চেষ্টা করা।** এই **জনন** কেমন করে মাঝে-মধ্যেই **গমন** হয়ে যায়, অর্থাৎ **ভজ** কেমন করে **ভগ** হয়ে যায়, **ভিজ** কেমন করে **ভিগ** হয়ে যায়, তা নির্ণীত হয় মনের তলাতলে। কার্যত, মানুষের মনের গভীরে এত বিজ্ঞানসম্মত, সুগভীর ভাবনা চলে এবং এরকম ভাবনা যে প্রত্যেক বাংলাভাষী আপন অজ্ঞাতসারে ভাবতে পারেন — বিশ্বাস হতে চায় না। কিংবা, বলা ভাল, পরমাপ্রকৃতি এভাবেই আমাদের মনের গভীরে বিরাজ করে ঐ ভাবনাগুলি ভেবে রাখেন। তাই অবিশ্বাস্য হলেও এ যে সত্যিই, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অন্যথায় **ভজ্**-এর মতো ক্রিয়া-পরিবারের সদস্যদের — **ভক্ত, বিভক্ত, ভক্তি, বিভক্তি, ভগ, ভগবান, ভাগ, ভজন, ভজান, ভিগা, ভিজা, ভিজান** ... এসব শব্দের সৃষ্টিই হতে পারত না। আমরা দেখছি, **ভজ্** ক্রিয়াটির ভিতরে সত্যিই এরকম চিন্তাভাবনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, সেই **ভজ** করা অন (on) থাকে যাহাতে, তাকে বলে **ভজন**; সেই **ভজন**-এর আধারকে **ভজনা** বলে। ...]

অভাগা (অভাগী) : ২. **অভাগা** = *নেই ভাগ যাহার।* **অভাগী** = *নেই ভাগ যে স্ত্রীর।* / **অভাগী** = **দায়ে অনধিকারী** (যে)। (ব.শ.)। ৩. **অভাগা** = ভাগ্যহীন, দুর্ভাগ্যবান, মন্দ, পোড়া। **অভাগী** = ভাগরহিত, ভাগ্যহীন, দুর্ভাগ্য, অভাগ্যবতী, হতভাগিনী, পোড়া-কপালী। (ব.শ.)। ৪. 'অতি দরিদ্র' বা 'দুর্দশাগ্রস্ত' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ভাগ্য**। ব.শ. যখন লেখা হচ্ছে তখনও বাংলাভাষীর সংস্কৃতিতে 'দায়' 'অনধিকারী' প্রভৃতি শব্দ খুবই প্রচলিত ছিল, প্রায় সব বাংলাভাষীই এসব শব্দের মানে বুঝতেন। একজন মানুষের যা কিছু **দায়**, তার ঋণ শোধ করা, তার মুখাগ্নি করা, শ্রাদ্ধ করা — এসবের অধিকারীই সেই মানুষটির সম্পদের অধিকারীও হত। একেই বলা হত **ভাগ** পাওয়া। যে সেই দায়ের অধিকারী হত না, সে ভাগও পেত না; তাকেই বলা হত **অভাগা, অভাগী**। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দেও এই ধারণা খুব প্রচলিত ছিল।

কার্যত, ধারণাটির জন্ম হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে। তখন প্রত্যেক মানুষই যৌথসমাজের যৌথ-উৎপন্নের ভাগ পেত। যে পেত না, তাকে বলা হত **অভাগা** বা **অভাগী**। 'যৌথসমাজের উৎপন্নের **ভাগ** থেকে বঞ্চিত যে' — এই অর্থেই শব্দ দুটি প্রচলিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। বৌদ্ধযুগের পরবর্তীকালে মনু-পরাশরের হাত ধরে এই ধারণা ঢুকে পড়ে হিন্দুর জীবনচর্যার প্রতীকী আচরণে। কিন্তু ভাষা তো গুরু ঠাকুর রাষ্ট্র কারও হুকুম মানে না, তার নিজের গতিপথ আছে। ফলে, পরে পরে সাধারণ বাংলাভাষীর মুখে **অভাগা, অভাগিনী, অভাগী** প্রভৃতি শব্দ যে কোনো দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং সেরকমই চলতে থাকে। সেই অর্থেই শব্দ দুটি ক্রমশ সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে যায়। শরৎচন্দ্র এই প্রতীকী অর্থসম্পন্ন **অভাগী**কে কতদূরে নিয়ে গেছেন, '**অভাগীর** স্বর্গ'-এর পাঠকপাঠিকারা তা জানেন।

দেবভাগ : ২. *দেবত্বের ভাগ যাহাতে।* ৩. লবণসমুদ্রের উত্তর ভূগোলার্দ্ধ - দেবাবাস; জম্বুদ্বীপ, দেবগণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এ হল মানুষের মধ্যে থাকা দেবত্বের ভাগ বা অংশ। বিষয়টি আজকাল আলোচনার যোগ্য বলেও মনে করেন না অনেকেই, তবে রবীন্দ্রনাথ করতেন। তাঁর 'বসন্তযাপন' নিবন্ধে তিনি লিখছেন — 'অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ... ... অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সভ্যভাগ, **দেবভাগ** ইত্যাদি।' রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভেতরে এতগুলো ভাগ দেখতে পেতেন। এখনকার রাষ্ট্রের ও কর্পোরেট-পুঁজির পরামর্শদাতা জ্ঞানীরা, যাঁরা বিশ্বজুড়ে শুধুই 'কাজ চালান মানুষ' চান, তাঁরা মানুষের ভেতরে শুধুমাত্র 'জড়ভাগ' প্রত্যাশা করেন, যা কিনা যন্ত্রের মতো কাজ চালিয়ে দেবে। মানুষের **দেবভাগ** তো দূরের কথা, সভ্যভাগ, বর্বরভাগ, পশুভাগ, এমনকি উদ্ভিদভাগও না থাকলেই ভাল হয়। যন্ত্রের মতো জড়দেহটি ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব-টত্ব কিছুই যেন না থাকে! একমাত্র তাহলেই এই বিশ্বসমাজটি খুব ভাল চলবে! এই না হলে 'অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত-বিশেষজ্ঞ-পরামর্শদাতা' হওয়া যায়!

ভক্ত (বিভক্ত — বিলি-ভকত, বগুলা-ভকত) : **১.** ✓ভজ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভক্ত = ভজন** *তারণ করে যে; অথবা, ভব-করণ তারিত যাহাতে। /* **বিভক্ত** = (যাহা) বিচারপূর্ব্বক গৃহীত বা নির্ণীত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। **৩. ভক্ত** = বিভক্ত, কৃতভাগ, সেবিত, আশ্রিত, অনুরক্ত, ভক্তিযুক্ত, সেবক, অনুরাগী, অন্ন, ভাত, অন্নাদি, ভাগ, ভজন, সেবা। **বিভক্ত** = কৃতবিভাগ, দ্বিধাকৃত, পৃথক, সংশ্লিষ্ট, সুশ্লিষ্ট, ভিন্ন, (গণিতে) হৃত (divided), কার্ত্তিকেয়, বিভাগ, বিশ্লেষ, কৃতবিভাগ ধন। (ব.শ.)। **৪.** দুটি শব্দই যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভজ, অবধূত**। ইতোপূর্বে **ভক্-ভক্** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, নিজের উদ্বৃত্ত বা ত্যজ্য অংশ নিঃসারিত করে নিজের 'হওয়া'কে ঠিক রাখা, কিংবা অন্যের থেকে খানিকটা নিয়ে এসে নিজের অভাব পূর্ণ করে নিজের 'হওয়া'কে ঠিক রাখা — এইরকম ক্রিয়াকেই **ভক্** করা বলে। আবার **ভজ্** করতে গেলেই **ভক্** করা হয়ে যায়। স্বভাবতই '**ভক্** তারণ করে যে', সে যেমন **ভক্ত** হতে পারে (= ভক্তিযুক্ত বা পূজ্যে অনুরাগী), তেমনি '**ভক্** তারণ কৃত যাহাতে', সে-ও **ভক্ত** (= কৃতভাগ, অন্নাদি) হতে পারে, এমনকি 'যার দ্বারা **ভক্** তারণ করা হয়', তাকেও **ভক্ত** (= ভজন) বলা যেতে পারে। এই সেই কারণ, যেজন্য ব.শ. **কৃতভাগ, ভক্তিযুক্ত, অন্ন, ভজন** — এদের সবাইকে **ভক্ত** বলে চিহ্নিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, বাস্তবে সেরকম হয় কী করে?

ভক্ত কী করে 'ভক্তিযুক্ত' সত্তাকে বোঝায়, তা জানতে পারা যায় **ভক্** তারণ করার বাস্তব রূপ থেকেই। **ভ** মাত্রেই যেহেতু দ্বৈরাজ্যবাহী এক 'ভাতিযুক্ত' সত্তা, তার 'হওয়া' সম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু **ভব** সত্তা মাত্রেই তার অস্তিত্বকে সচল রাখতে তাকে কমপক্ষে গ্রহণ বর্জন চালাতে হয়, যার কথা আমরা **ভক্-ভক্** শব্দে আগেই বলেছি। তার মানে সক্রিয় **ভ**-মাত্রেরই বিশেষ ধরনের অভাব এবং বিশেষ ধরনের ত্যজ্য থাকেই। এখন কথা হল, গ্রহণ করতে গেলে, তা সে বাহ্যিক বা মানসিক যাই হোক না কেন, কারও না কারও কাছে প্রার্থী হতে হয়। যার কাছে প্রার্থী হয়ে গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করা হয়, নিজের অভাবের কথা বলতে হয়, তা সে বাহ্যিক বা মানসিক যেমন অভাবই হোক না কেন, তার সঙ্গে প্রার্থীর একটা সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায়। সেই সম্বন্ধে প্রার্থী প্রার্থনা করে সেই এক বা একাধিক বস্তু বা বিষয়, যা তার নিজের দ্বৈরাজ্যবাহী অস্তিত্বে স্বভাবত স্থিত থাকার জন্য প্রয়োজন। এই জন্যই তার গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করা, **ভক্** করা। এইবার তার সেই গ্রহণেচ্ছা যদি দাতার কাছে তারিত হয়ে যায়, তবেই সেই সত্তাটি **ভক্ত** হয়ে যায়। ...

এবার **ভক্ত** কী করে 'কৃতভাগ' ও 'অন্নাদি'কে শনাক্ত করে, সেকথা জানতে হবে। কোনো সত্তাতে **ভক্**-তারণ করা মানেই, অন্য কোনো সত্তা থেকে তার অংশবিশেষ কেটে এনে সেখানে রাখা, বা পৃথক করে এনে রাখা। তাই '**ভক্**-করে তারণ করে দিলে', যার ভিতরে সেটি তারিত হল, সেটি একটি ভাগ হয়ে গেল। সেজন্যই ব.শ. তাকে বলেছেন **ভক্ত** বা 'কৃতভাগ'। আর, **ভক্ত** বলতে 'অন্নাদি' বোঝায় আর একটু অন্যভাবে। সেও '**ভক্**-তারণ কৃত যাহাতে', সন্দেহ নাই, কিন্তু তার জন্য তাকে ভোক্তার প্রয়োজন পূরণের উপযুক্ত করে নিতে হয়। সে কেমন?

আসলে খাদক ও **খাদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য** হতে পারে, তারা যদি পরস্পরের যোগ্য **হয়। খাদকের ক্ষুধা চাই**, খাদ্যবস্তুর প্রতি আগ্রহ চাই, তাকে গ্রহণ করার **সাংস্কৃতিক বিশ্বাস চাই**; বিপরীতে খাদ্যেরও পাথুরে শরীর থেকে **নরম শরীরে উত্তীর্ণ হওয়া চাই, সিদ্ধ** হওয়া চাই, খাদকের গ্রহণযোগ্য **ষড়রসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই**। অন্যথায় তাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে কী করে! তা করতে হলে, অন্নাদিতে **ভক্**-তারণ করতে হয়, খাদকের পক্ষে গ্রাহ্য বা **সিদ্ধ** করতে হয়। তা হয়ে গেলে সে হয়ে গেল **ভক্**-তারণ কৃত বা **ভক্ত**। যে সকল অন্নকে সেভাবে খাদ্য-খাদকের দ্বৈরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তার জন্য রান্নাবান্না করে খাদকের সঙ্গে খাদ্যের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়, সেগুলি সবই **ভক্ত**-পদবাচ্য। যা রান্না করা হয় না, তা **ভক্ত**-পদবাচ্য নয়। সেই সুবাদে ভাত থেকে শুরু করে সমস্ত রান্না করা খাবারই **ভক্ত**-পদবাচ্য। ব.শ. নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে অর্থ দিয়েছেন, তার থেকে বোঝা সম্ভব, এগুলি **ভক্ত**-যুক্ত শব্দ হলেও প্রধানত 'অন্নাদি'কে বোঝায়; শুধুমাত্র 'ভাত'কে বোঝায় কেবল **ভক্তপুলাক** ও **ভক্তমণ্ড** শব্দ, বাকি সব ক্ষেত্রেই তারা 'অন্নাদি'-বাচক। যথা —**ভক্তকার** = পাচক। **ভক্তদ, ভক্তদাতা, ভক্তদায়ক, ভক্তদায়ী** = অন্নদাতা, পালক। **ভক্তদাস** = ভক্তার্থ অভ্যুপগতদাস্য জন, পেটভাতা চাকর। **ভক্তদ্বেষ** = অন্নে অরুচি, ভোজনে অনিচ্ছা। **ভক্তপুলাক** = অন্নগুড়ক, ভাতের পিণ্ড বা ডেলা। **ভক্তব্যয়** = অন্নার্থ ব্যয়, খাওয়ার খরচ। **ভক্তমণ্ড** = ভাতের মাড়, ভক্তনিঃস্রাব। **ভক্তরোচন** = ভক্তে রুচিকর, ক্ষুধাজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক। **ভক্তশালা** = ভক্তরন্ধনগৃহ, পাকশালা। (ব.শ.)।

ভক্ত-যুক্ত আরও শব্দ আছে, যারা কিন্তু 'অন্নাদি', 'ভাত'কে না বুঝিয়ে শুধুমাত্র 'ভক্তিযুক্ত'কে বা 'পূজ্যানুরাগী'কে বোঝায়। যথা — **ভক্তবৎসল** = ভক্তে স্নেহবান, ভক্তপ্রিয় (ভগবান)। **ভক্তবিটল, ভক্তবিটেল** = কপটভক্ত, ভণ্ডতপস্বী। **ভক্তা, ভক্ত্যা** = **ধর্ম্মের** ভক্ত, **ধর্ম্মের** গাজনের সন্ন্যাসী। তবে **ভক্ত** শব্দে 'কৃতভাগ' বোঝায়, এমন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না, কিন্তু **বিভক্ত** শব্দের অর্থই বলে দেয়, যে, **ভক্ত** শব্দও 'কৃতভাগ'কে বোঝাতে পারে। কারণ, বিকল্প-**ভক্ত** বা বিপরীত-**ভক্ত** যেমন **ভক্তই** (= ভাগকৃত) হোক না কেন, সে তো প্রচলিত **ভক্ত**-এর 'বিকল্প-অংশভাগ-কৃত' বা 'বিপরীত-অংশভাগ-কৃত'ই বটে! তবে আজকের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা **বিভক্ত** বললে 'কৃতভাগ' বুঝে থাকি, **ভক্ত** শব্দে 'কৃতভাগ' বুঝি না। কিন্তু **ভক্ত** শব্দটির ভিতরে যে 'কৃতভাগ' অর্থটি রয়েছে, তাতে সংশয় নেই।

এবার আমরা সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস*-এর দুটি চরিত্রের প্রসঙ্গে যাব — **বগুলা-ভকত** ও **বিলি-ভকত**; অর্থাৎ যথাক্রমে 'বকধার্মিক' ও 'বিড়ালতপস্বী'। এঁরাও **ভকত** বা **ভক্ত** বটে, তবে এঁদের **ভক্ত**-স্বরূপের সবটাই বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে এরা যথাপূর্বং **বক** ও **বিড়ালের** স্বভাবই অনুসরণ করে। **বক**-এর স্বভাবকে আমরা পাব **বক** শব্দে, কিন্তু **বিড়াল**-এর স্বভাবকে আমরা পাব **মার্জ্জার** শব্দে। মনে রাখা ভাল, **ভক্ত** ও **ভকত** দুটি শব্দই পদবী রূপে প্রচলিত আছে। **ভক্ত** বা **ভকত** খুবই ভাল কথা, কিন্তু **বিলি-ভকত** বা **বগুলা-ভকত** ভাল কথা নয়। দ্র. **ভিজে**। **৬.** ইংরেজি

in*voke*।

ভক্তি (বিভক্তি) : ১. ✓ভজ্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভক্তি = ভক্ত** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; অথবা যাহার মাধ্যমে* **ভজন** *তারিত হয়।* **বিভক্তি** = *বিকল্প বা বিপরীত* **ভক্তি** *যাহাতে।* / **ভক্তি** = ইষ্টদেবতার পরতর আর কিছুই নাই, এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. ভক্তি** = বিভাগ, সেবা, তদেকান্ত চিত্তবৃত্তিভেদ, রচনা, রেখা, পূজ্যে অনুরাগ, ঈশ্বরে পরানুরক্তি, পরপ্রেম, শ্রদ্ধা, ভঙ্গি, গৌণবৃত্তি, ভাগ, ভজনীয়। **বিভক্তি** = বিভাগ, বিশ্লেষ, পৃথককরণ, পৈতৃকধনাদির অংশ, (ব্যাকরণে) সংখ্যাকারকবোধক প্রত্যয়, স্বাদি ও তিবাদি (সুপ্, তিঙ্)। (ব.শ.)। **৪. ভক্তি** যথার্থে প্রচলিত, **বিভক্তি** ব্যাকরণ-পাঠের ক্ষেত্রে প্রচলিত। **৫. দ্র. পুরুষার্থ, প্রত্যয়।** প্রথমে আমাদের মাটির মানুষদের স্তরে বিষয়টিকে নামিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। একজন মৃৎশিল্পী কুমারের মনেও **ভক্তি** থাকে। তাঁর মনের কল্পনায় থাকে মাটির কলসীর স্বরূপ থেকে সরস্বতীর স্বরূপ পর্যন্ত তাঁর সকল উৎপন্নের স্বরূপ। কিন্তু সে হল তাঁর মনের কল্পনা, স্বপ্ন; কাল্পনিক-ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎকে তিনি অর্জন করতে চান, সেই ভবিষ্যতে তিনি পৌঁছতে চান। সেই কাল্পনিক ভবিষ্যতে পৌঁছানোর জন্য তিনি তাঁর হাতিয়ারগুলির সাহায্যে উপকরণগুলি নিয়ে কাল্পনিক ভবিষ্যতের **সাধন-ভজন** শুরু করেন। অর্থাৎ কিনা, তাঁর কোদাল, খুরপি, চাঁছনি, চাকি, ছাঁচ ... ইত্যাদির সাহায্যে তিনি তাঁর সৎপ্রকৃতি বা কাঁচামাল-রূপী মাটির উপর নিজের 'কাল্পনিক ভবিষ্যৎ'কে বাস্তবায়িত করার জন্য **সাধন-ভজন** শুরু করেন। কিন্তু এটা তিনি করেন কিসের জোরে? করেন তাঁর এই বিশ্বাসের জোরে যে, এই এই ভাবে হিসাব **ভজিয়ে ভজিয়ে**, এই দীর্ঘ কর্মশৃঙ্খলার মাধ্যমে মাটিকে কাঠকে **ভজাতে ভজাতে** ধীরে ধীরে এই এই ভাবে **ভজনা** ক'রে ক'রে এগিয়ে যেতে পারলে বা সমগ্র কাজটি এই এই প্রক্রিয়ায় পর পর **সাধন** করতে পারলে ঐ কাল্পনিক ভবিষ্যতে পৌঁছানো যায়। এই যে সমগ্র কর্ম-প্রকল্পের পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস, 'কাঠকুঠ-মাটি-খড় ... ইত্যাদিকে **ভজানো**র জন্য বা **ভজন** তারণ করার জন্য গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উপর বিশ্বাস', যে, এর মাধ্যমেই 'কাল্পনিক-ভবিষ্যৎ'কে অর্জন করা যাবে — একেই বলে **ভক্তি**। এই **ভক্তি** না থাকলে কোনো নির্মাণই (**বিশ্বকর্ম্মই**) করা যায় না। অতএব, 'কাল্পনিক ভবিষ্যৎ'কে পেতে গেলে এবং তার জন্য **সাধন-ভজন** করতে হলে **ভক্তি** থাকতেই হবে। **ভক্তি** ছাড়া কোনো কাল্পনিক ভবিষ্যতেই পৌঁছানো যায় না। আপনি তাজমহলের ড্রয়িং ডিজাইন আর্কিটেকচারে বিশ্বাস করবেন না, সেগুলিতে আপনার **ভক্তি** থাকবে না, অথচ আপনি তাজমহল বানিয়ে ফেলবেন, তা হবে না, হওয়ার উপায় নেই। তার মানে **তত্ত্ব** থাকতে হবে, তা **প্রয়োগে**র সমগ্র প্রকল্প থাকতে হবে, এবং সেই **তত্ত্ব** ও **প্রয়োগের** উপর **ভক্তি** থাকতে হবে, তদনুযায়ী **সাধন-ভজন** করতে হবে; তবেই আপনি আপনার **'কাল্পনিক ভবিষ্যৎ'**কে অর্জন করতে পারবেন; আপনার আরাধ্য ঈশ্বরকে পাবেন। **এই হল ভক্তি**র সারকথা।

অতএব আমরা বলতেই পারি, যাহার দ্বারা **ভক্ত** তার **ভক্** তারণেচ্ছাকে সক্রিয় করে তাকে **ভক্তি** বলে। যেহেতু **ভক্ত** মানে 'কৃতভাগ' হয়, 'ভক্তিযুক্ত'ও হয়, স্বভাবতই **ভক্তি** শব্দেরও দুরকম অর্থ হয়। প্রথম অর্থে আমরা পাই 'বিভাগ'কে, এবং দ্বিতীয় অর্থে আমরা পাই 'পূজ্যে অনুরাগ'কে। আবার, **বিভক্ত** শব্দে যেমন আমরা 'বিকল্প-অংশভাগ-কৃত' বা 'বিপরীত-অংশভাগ-কৃত'কে পাই, তেমনি **বিভক্তি** শব্দে আমরা পাই **বিভক্তে**র সক্রিয় রূপকে। তবে এর বাহ্য ব্যবহার হয় না বললেই চলে। 'রামবাবুর ছেলেদের পৈতৃক ধনসম্পত্তির **বিভক্তি** লইয়া বিবাদ হইতেছে' — এরকম বাক্যের ব্যবহার হয় না, যদিও এতে বাক্যগঠনের নিয়মে ও শব্দার্থে কোনো ভুল নেই। তবে ব্যাকরণে **বিভক্তি** শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। সে কেমন ব্যাপার, এখন সেকথায় যাওয়া যাক।

প্রত্যয় শব্দে আমরা দেখেছি যে, **প্রত্যয়, বিভক্তি,** ও **উপসর্গ** — এই তিনটি **পুরুষ** সকল প্রকার **প্রকৃতি**র বা **শব্দ**-এর দিশানির্ণয় করে দেয়। **কর** শব্দটির কথাই ধরা যাক। **বিভক্তি** যুক্ত হয়ে শব্দটি *করা, করে, করি, করিত, করিব, করিতাম* ... ইত্যাদি অজস্র রূপ গ্রহণ করে বিভিন্ন দিশায় চলতে শুরু করে। তার মানে, **কর**-এর সঙ্গে **আ, এ, ই, ইত, ইব, ইতাম** ... প্রভৃতি **বিভক্তি** যুক্ত হয়ে **কর** শব্দটিকে অজস্র রূপে বিভাজিত করে দেয়। আর, এটা সে কেবল **কর** শব্দের সঙ্গেই করে না, সর্বপ্রকার **ধাতুশব্দের** সঙ্গেই করে। ফলে, **কর ধর মার খা যা** ... প্রভৃতি **ধাতু**-শব্দগুলি যে কেবল অজস্র রূপে বিভাজিতই হয়ে যায় তাই নয়, তারা প্রত্যেকেই দিশানির্দিষ্ট হয়ে বিশেষ বিশেষ দিশায় সক্রিয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এই জন্য ঐ **আ, এ, ই, ইত, ইব, ইতাম** ... প্রভৃতি শব্দাণুগুলিকে **বিভক্তি** বলে। ...

তবে মনে রাখা ভাল, আমাদের ভাষায় **প্রত্যয়, বিভক্তি,** ও **উপসর্গা**দিকে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত করার কাজটি একবারই হয়েছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতকারদের হাতে, যার কেন্দ্রে রয়েছে **পাণিনি**র নাম। তার পরে আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত ভাষার যত ব্যাকরণ লিখিত হয়েছে, সে সবই সেই প্রাচীন ব্যাকরণের নানা বিবর্তিত অধঃপতিত রূপ মাত্র। অথচ, প্রতিটি ভাষাই ক্রমান্বয়ে মানুষের মুখ বেয়ে এগিয়েছে, কিন্তু তার ব্যাকরণ ভাষাটির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে আর এগোয়নি, পেছনে পড়ে থেকে গেছে। ফলত, প্রচলিত কোনো ভাষারই সহযোগী সমান্তরাল ব্যাকরণ আজ আর নেই বললেই চলে। আমরা যে সকল ব্যাকরণ দেখতে পাই, সেগুলি সবই প্রচলিত ভাষার থেকে পেছনে পড়ে রয়েছে। কেননা, তাদের কারও যথার্থ ব্যাকরণ পরবর্তী যুগে আর লেখা হয়নি। এমনকি বাংলারও না। ...

যাই হোক, ভাষার সমান্তরাল ব্যাকরণ না-থাকার ফল ভাল হয়নি। যাঁরা ভাষাভূমির উপর নব নব মানসফসল ফলান, তাঁরা দেখেন, তাঁদের কাজকে 'প্রচলিত-পেছনে-পড়া-ব্যাকরণ' সমর্থন তো যোগাচ্ছেই না, বহু ক্ষেত্রে পেছনে টেনে ধরছে। স্বভাবতই তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে তাঁদের ব্যাকরণের নিয়ম লঙঘন করেন। ইংরেজি ভাষার কলাকুশলীরা তো আজকাল বলতে শুরু করেছেন, 'ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই'; কারণ তাঁদের যথাযথ ব্যাকরণ তো কোনো কালেই তেমন ছিল না, যেটুকু যা ছিল, তা তাঁদের বর্তমান ভাষা থেকে বহু

পেছনে থেকে গেছে। এখন প্রশ্ন হল, কেন কোনো ভাষার সাম্প্রতিক রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যাকরণ লেখা যাচ্ছে না?

যাচ্ছে না এই কারণে যে, ভাষার শব্দ-ব্যবহারকে যে স্তরে বোঝা গেলে ভাষাটির ব্যাকরণ লেখা সম্ভব হয়, সে স্তরে ভাষাকে বুঝেছেন, এমন মানুষের জন্ম পরবর্তীকালে আর হয়নি। একথা অত্যন্ত নির্মম মনে হলেও সত্যি। কেননা, অন্যথায় আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়াও ঐরকম পরবর্তী যুগের ভাষার সমান্তরাল সম্পূর্ণ ব্যাকরণ দেখতে পেতাম, পাইনি। কী কী বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারলে একটি চলমান ভাষার ব্যাকরণ লেখা যায়, তার কিছুটা আন্দাজ আরও অনেকের মতো আমরাও পাচ্ছি বটে, কিন্তু যে অর্জন থাকলে একটি ভাষার ব্যাকরণ লেখা যেতে পারে, সে অর্জন এখনও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই আমাদের মনে হয়। ...

ভক্তিবাদ (ভক্তিমার্গ, ভক্তিযোগ) : ২. / **ভক্তিবাদ** = যে মতবাদে জ্ঞান ও কর্ম ব্যতিরেকে শুধু ভক্তি দ্বারা সাধনা করলেই পরম তত্ত্বে পৌঁছা যায়। **ভক্তিযোগ** = শুধু ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর লাভের সাধনা (যাহাতে)। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৩. ভক্তিবাদ** = ভক্তিসূচক বাক্য। **ভক্তিমার্গ** = ভক্তিরূপ মোক্ষোপায়। **ভক্তিযোগ** = ভক্তিরূপ চিত্তের একাগ্রীকরণোপায়। (ব.শ.)। **ভক্তিবাদ** = দার্শনিক মতবাদ বিশেষ, ভক্তিতত্ত্ব। **ভক্তিমার্গ** = সাধনার পন্থাবিশেষ। **ভক্তিযোগ** = ভক্তির দ্বারা আরাধনা, ভক্তিবাদ, সাধনার একটি প্রকার। (ব্য.বা.অ.ঢা.)। **৪.** ধর্মপ্রাণ বাংলাভাষীদের মধ্যে শব্দগুলি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভক্তি। ভক্তিবাদ, ভক্তিমার্গ, ভক্তিযোগ** ... ইত্যাদি শব্দ শুনলেই আমরা ভাবি, এ তো গীতার কথা, ধর্মকথা, ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনার কথা ... ইত্যাদি। এর মধ্যে একালের অ্যাকাডেমির পণ্ডিতেরা আবার 'মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন' ইত্যাদি গান গেয়ে রেখেছেন। ফলে, শব্দগুলির এমন প্রতীকায়ন হয়ে রয়েছে যে, শব্দগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ জানার জন্য আমরা যে ভাবব, তার পথটাই যেন বন্ধ হয়ে রয়েছে। ট্রেন থেকে নেমে খোঁজাখুঁজি করে যথাস্থানে যে যাব তার উপায় নেই, তার আগেই অটোওয়ালারা এসে আমাদের তুলে নেয় এবং নামিয়ে দেয় সুবিখ্যাত স্থানটির মাঝখানে। এই সব শব্দ নিয়ে আমাদের অবস্থা অনেকটা ঐরকম — তাদের অর্থ কী জানার চেষ্টা করবার আগেই উত্তর ধরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ভাবতে তো হবেই। পূর্বপুরুষদের হাত থেকে পাওয়া প্রতিটি শব্দের ভিতরে তাঁদের রেখে-যাওয়া অর্থের খবর জানতেই হবে; অন্যথায় পৈতৃক সম্পদ হারিয়ে যাবেই! ...

ভক্তি কথাটির মানে আমরা আগেই জেনেছি, যার প্রয়োগ হয় মধ্যস্তরে। তার উচ্চস্তরীয় প্রয়োগ আছে, যার খবর রাখেন তাঁরা, যাঁরা গভীরভাবে গীতা ও বৈষ্ণবতত্ত্ব চর্চা করেছেন। তবে, যেমন **ব্রাহ্মী** শব্দের নিম্নস্তরীয় প্রয়োগ হয় **ব্রাহ্মীশাক**-এ, ভক্তি শব্দের সেরকম কোনো নিম্নস্তরীয় প্রয়োগ নাই; অন্তত আমাদের চোখে এখনও পড়েনি। ফলত, **ভক্তিবাদ, ভক্তিমার্গ, ভক্তিযোগ** প্রভৃতি শব্দেরও উচ্চস্তরীয় এবং মধ্যস্তরীয় প্রয়োগ হয়ে থাকে। আমরা মধ্যস্তরীয় প্রয়োগ নিয়েই কথা বলব, কেননা, আমাদের অর্জন তার অধিক নয় বলেই আমাদের ধারণা।

জ্ঞানযোগী জ্ঞানের অধিকারী, জ্ঞানচর্চা করেন, জ্ঞানের যোজনা করেন। তাতেই তাঁর অভীষ্ট লাভ হয় বা হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। একালের ভাষায় একে আমরা 'তাত্ত্বিকভাবে কোনো সত্যে পৌঁছোনো বা সত্যলাভ' বলতে পারি। সত্যলাভই **জ্ঞানযোগী**র মোক্ষ। সোজা কথায়, 'মানুষের কাজে লাগে এমন জ্ঞান' লাভ করাই **জ্ঞানযোগী**র মোক্ষ; যদিও তাতেই তাঁর নিজের **ব্রহ্মানন্দ**-লাভও ঘটে যায়, জীবন সার্থক হয়েছে এমনতরো বোধ জন্মায়।

কর্ম্মযোগী কর্ম্মের অধিকারী, **জ্ঞানযোগী**র নিকট থেকে সত্যজ্ঞান সংগ্রহ ক'রে তিনি **কর্ম্মে** তার প্রয়োগ ঘটান, **কর্ম্ম** যোজনা করেন। তাতেই তাঁর অভীষ্ট লাভ হয় বা হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। একালের ভাষায় একে আমরা 'তত্ত্বপ্রয়োগের ফলপ্রাপ্তি বা কর্ম্মফল-লাভ' বলতে পারি। **কর্ম্মফল-লাভই কর্ম্মযোগী**র মোক্ষ। সোজা কথায় 'মানুষের ভোগে বা উপভোগে লাগে এমন কর্ম্মফল' লাভ করাই **কর্ম্মযোগী**র মোক্ষ; যদিও তাতেই তাঁর নিজের **আনন্দ**-লাভও ঘটে যায়, জীবন সার্থক হয়েছে এমনতরো বোধ জন্মায়। একালের ভাষায় একে অনেক সংকুচিত করে job-satisfaction বলা হয়ে থাকে।

ভক্তিযোগী ভক্তির অধিকারী, **জ্ঞান** ও **কর্ম্ম** তাঁর কাছে বাহুল্য, তিনি **কর্ম্ম**যোগীর নিকট থেকে **কর্ম্মফল** সংগ্রহ করেন, তাই নিয়ে তিনি **ভক্তি**র উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করেন, **ভজনা** করেন, **ভজান**। তাতেই তাঁর অভীষ্ট লাভ হয় বা হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। একালের ভাষায় একে আমরা 'কর্ম্মফল-দান জনিত লাভ' বলতে পারি। এটিই **ভক্তিযোগী**র মোক্ষ। সোজা কথায় মানুষের কাজে লাগে, এমন 'কর্ম্মফল দানের প্রতিদান জনিত লাভ'ই **ভক্তিযোগী**র মোক্ষ; যদিও তাতেই তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে এমনতরো বোধ জন্মায়। তবে **ভক্তিযোগী**দের দুটি ধারা থাকে — যাঁরা প্রতিদান জনিত লাভের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ-সংক্রান্ত লাভকে বেশি গুরুত্ব দেন, তাঁরা উচ্চশ্রেণীর **ভক্তিযোগী** এবং যাঁরা প্রতিদান জনিত নিজের আর্থিক লাভকে অধিক গুরুত্ব দেন, তাঁরা হলেন নিম্নশ্রেণীর **ভক্তিযোগী**। এই বিচারে পাড়ার মুদী থেকে টাটা-বিড়লা পর্যন্ত সবাই **ভক্তিযোগী** বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা **কর্ম্মফল** দানের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীমন্ত হন, তাঁরা প্রকৃত **ভক্তিযোগী**; কিন্তু যাঁরা **কর্ম্মফল** দানের ক্ষেত্রে কুবেরানুসারী, তাঁরা **নিম্ন-ভক্তিযোগী**।

তবে এর পরেও একটি ব্যাপার আছে, যে কারণে সকল যোগের উপরে **ভক্তিযোগে**র স্থান। সেই ব্যাপারটি হল, জ্ঞানযোগ বলুন আর **কর্ম্ম**যোগই বলুন, উভয় ক্ষেত্রেই **ভক্তি** থাকতেই হয়, অন্যথায় **জ্ঞানযোগ** ও **কর্ম্মযোগ** উভয়ই ব্যর্থ হয়। নতুন সত্যে পৌঁছানোর আগে যে সত্যগুলির উপর নির্ভর করে ধ্যানাদি বা **সাধন-ভজন** করা হয়, সেই সত্যগুলির উপর **ভক্তি** না থাকলে নতুন সত্যে উন্নীত হওয়া যায় না। একইভাবে **কর্ম্মে**র ক্ষেত্রেও **কর্ম্মে**র উপায়গুলির সাহায্যে উপকরণগুলিকে তাদের কাম্যরূপে উন্নীত করার জন্য **সাধন-ভজন** করতে হয়, তাদের **ভজাতে** হয়, **ভক্তি** করতে হয়। অন্যথায় **কর্ম্ম**ফলে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। আর, **ভক্তিযোগ**-এর ক্ষেত্রে তো **ভক্তি** থাকেই। ফলত, **ভক্তি** থাকলে তবেই

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ সবই সফল হয়। সেই সুবাদে **ভক্তিযোগের** স্থান সর্বযোগের উপরে। ...

ভগ (ভগন্দর, ভগবান, ভগবতী, ভগিনী, সুভগ, সুভগা) : **১.** ✓ভজ্ + অ (ঘ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভগ** = ভব (= ভ) *গমন করে যাহাতে বা যে উৎপাদনের উপায়ে।* **ভগন্দর** = **ভগ**কে *বিদারিত করে (ফাটিয়ে দেয়) যে।* **ভগবান** = **ভগ** *বহন অন (on) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহার* **ভগ** *আছে বা থাকে।* **ভগবতী** = **ভগ** *বহন গতিশীলভাবে তারিত যে প্রকৃতিতে।* **ভগিনী** = **ভগ** *গতিশীল থাকে যে প্রকৃতিতে।* **সুভগ** = *সু* **ভগ** *যাহার।* **সুভগা** = **সুভগ** *যে নারী।* **৩. ভগ** = ভজনীয়, দ্বাদশাদিত্যের একতম (ইনি ধনদাতা, পূর্ব্বফল্গুনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঊষার ভ্রাতা এবং প্রেম ও বিবাহের দেবতা।), সূর্য্য, চন্দ্র, শম্ভুবিশেষ, সৌভাগ্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, মোক্ষ, মাহাত্ম্য, কাম, যত্ন, যোনি, পুরুষের গুহ্যমুষ্কের মধ্যভাগ ... ইত্যাদি। **ভগন্দর** = অপানদেশের ব্রণরোগভেদ। **ভগবান (ভগবৎ)** = ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণশালী, পূজ্য, উত্তম, ভজনীয় গুণ, মহিমান্বিত, ঐশ্বর্য্যাদিগুণবান বিষ্ণু, কৃষ্ণ, দেবতা, শিব, বুদ্ধ, জিন। **ভগবতী** = ভগবচ্ছক্তি, দুর্গা, দেবী, লক্ষ্মী, গঙ্গা, পূজ্যা। **ভগিনী** = স্বসা, পরপত্নী, যোনিসম্বন্ধহীনা নারী, স্ত্রীমাত্র, সতীন, জা, সখী। **সুভগ** = শোভনভাগ্য, রমণীয়, সুন্দর, প্রিয় ... ইত্যাদি। **সুভগা** = ভাগ্যবতী, পতিপ্রিয়া, সুয়া, কস্তুরী ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **ভগ** = স্ত্রীযোনি, গুহ্যদেশ, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, বীর্য্য, সৌভাগ্য ... ইত্যাদি। **ভগবান (ভগবৎ)** = পরমেশ্বর, ঈশ্বর, বুদ্ধ, ভগযুক্ত, ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন, পূজ্য, মান্য। **ভগিনী** = সহোদরা, স্বসা, স্ত্রীমাত্র। (ছা.অ.)। **৪.** 'যোনি' অর্থে **ভগ**, 'রোগ' অর্থে **ভগন্দর**, 'ঈশ্বর' অর্থে **ভগবান**, 'ঈশ্বরী' অর্থে **ভগবতী** এবং 'বোন' অর্থে **ভগিনী** প্রচলিত। অবশ্য গ্রামবাংলায় ও সেকেলে বাংলাভাষীগণের মধ্যে শব্দগুলির অন্যান্য দু-একটি অর্থও কমবেশি প্রচলিত দেখা যায়। **সুভগ** বা **সুভগা** যে দুরকম ('ভাল ভাগ যিনি পান', ও 'সুরমণীয় যোনি যাহার') অর্থে প্রচলিত ছিল, তার দুটি অর্থই বাদ দিয়ে অর্থহীন প্রশংসার্হ শব্দ রূপে কমবেশি প্রচলিত। **৫. অজ** শব্দ যেমন **ব্রহ্মা** থেকে শুরু করে পাঁঠা পর্যন্ত বহু সত্তাকে বোঝায়, তেমনি **ভগ** শব্দটিও ঐশ্বর্যাদি থেকে শুরু করে **যোনি, গুহ্য** পর্যন্ত অনেক কিছুকেই বোঝায়। আর সেরকম বোঝাতে পারে তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের কারণেই। সেই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি হল — 'ভব (= **ভ**) গমন করে যে উৎপাদনের উপায়ে'। সেটি কী?

মানুষের সমাজে সবার আগে **পণ্য উৎপাদন** করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন মানুষেরা — এই সাক্ষ্য দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং কার্ল মার্কস। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রের একেবারে গোড়ায় যে সকল ধারণার জন্ম হওয়ার কথা, ভারতের ইতিহাসে তার নিদর্শন কই? নিদর্শন রয়েছে তার ভাষায়, শব্দে, শব্দের অন্তরে নিহিত ধারণায়। এবং তা পাশ্চাত্যের ধারণার মতো খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে নয়, রয়েছে অখণ্ডভাবে। **ভগ, ভগবান, ভগিনী** প্রভৃতি **শব্দই** তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

জীব যখন উৎপন্নের **ভজনা** বা কামনা করে, তখন সে উৎপাদনের উপায়সমূহের সাহায্য নেয়, সেই কারণে উৎপাদনের উপায়কে **ভগ** বলে। যখন সে দৈহিকভাবে (**বীর্য্য** বা শুক্র নিষেকের মাধ্যমে) উত্তর স্থান-কাল-পাত্রে গমন করতে চায় বা পুত্রকন্যাদিতে উত্তীর্ণ হতে চায়, তখন সে যে **ভগ**তে গমন করে, তাকে **যোনি** বলে। যখন সে মানসিকভাবে (মাহাত্ম্য নিষেকের মাধ্যমে) উত্তর স্থান-কাল-পাত্রে গমন করতে চায় বা মানসসত্তে উত্তীর্ণ হতে চায়, তখন সে যে-**ভগ**তে গমন করে, তাকে 'ষড়ৈশ্বর্য্যবান' (**ঐশ্বর্য্য**, **বীর্য্য**, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য) বলা হয়ে থাকে। যখন সে দৈহিক ও মানসিক উভয়ভাবে (মেধা ও শ্রমরূপী মনুষ্যাংশ নিষেকের মাধ্যমে) উত্তর স্থান-কাল-পাত্রে গমন করতে চায় বা কৃত্রিম **বিশ্বে** উত্তীর্ণ হতে চায়, তখন সে যে **ভগ**তে গমন করে তাকে দ্বাদশাদিত্যের একতম, **সূর্য্য**, চন্দ্র, **ঐশ্বর্য্য**, যত্ন ... ইত্যাদি বলে; মার্কসের ভাষায় এদের বলা হয় means of production বা 'উৎপাদনের উপায়'।

প্রধানত এই means of production-কে বোঝাতেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা **ভগ** শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এই **ভগ** থাকে যার, তাকেই **ভগবান** নাম দেওয়া হয়। তার মানে সেকালে যার কাছে উৎপাদনের উপায়সমূহ থাকত, তাকেই বলা হত **ভগবান**, একালের ভাষায় লাঙল-গরু-জমির মালিক থেকে শুরু করে বড় বড় কলকারাখানার মালিক পর্যন্ত সবাই **ভগবান** পদবাচ্য; কেননা, তাদের কাছে উৎপাদনের উপায় রয়েছে বলেই মেধা ও শ্রম বিক্রয়জীবী জনসাধারণ সেই **ভগবান**দের কাছে যায়; তাদের **ভগ**গুলিতে নিজেদের শ্রম ও মেধা নিষেক করে। অথচ **ভগ** যদি শুধুমাত্র নারীর vagina বা **যোনি**ই হত, তাহলে পুংলিঙ্গধারী **ভগবান** শব্দটি সৃষ্টিই করা যেত না; একটিই শব্দ থাকত **ভগবতী**।

তবে এসব শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র উপরোক্ত বিষয়গুলিতেই সীমিত থাকেনি। অতি প্রাচীনকালে, যখন আমাদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, তখন মহিলারাই ছিলেন সমাজের সমস্ত ধনসম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহের অধিকারিণী। তখন প্রতিটি গোষ্ঠীতে থাকত ভাই আর বোনেরা। ফলে, **ভগের** অধিকারিণী বলে বোনেদের নাম হয়ে যায় **ভগিনী**। এই অর্থ ভুলে যাওয়ায় আমাদের অভিধানকারগণ **ভগিনী** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে যে কী মুশকিলে পড়েছেন, তাঁদের প্রদত্ত **ভগিনী** শব্দের অর্থগুলির দিকে তাকালেই সেকথা উপলব্ধি করা যায়।

যৌথসমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক ছিল সমাজের শাসনকেন্দ্র বা **সূর্য্য**। সেই কারণে তাকেও **ভগ** বলা হত। **চন্দ্রাদি** অন্যান্য সত্তাগুলিকেও **ভগ** বলার সেটাই কারণ। তবে মহর্ষিদের অনেককেই যে **ভগবান-অত্রি, ভগবান-বশিষ্ঠ, ভগবান-বিষ্ণু** ... বলে সম্বোধন করা হত, তার কারণ একটু ভিন্ন। তাঁরা যে সকল উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক ছিলেন, সেগুলি বাহ্যিক দৃশ্য উৎপাদনের উপায় নয়; সেগুলি প্রধানত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সত্যজ্ঞান, অলৌকিক-সত্য। সেই জ্ঞানগুলি তাঁদের কাছে থাকত বলেই তাঁদের **ভগবান-অত্রি** ... ইত্যাদি বলা হত।

তবে, গ্রামবাংলায় প্রায় বাগ্‌ধারার মতো একটি কথা আমরা ১৯৬০-৬৫ সালেও শুনতাম। সেটি হল 'ভগে ভগে ঘর্ষণে ভগীরথের

জন্ম হয়েছিল'। (**ভগীরথ** নিম্নে আলোচিত হচ্ছে)। এই **ভগ** বোঝানো হত **যোনি**কে। গ্রামবাংলায় গালাগালি দেওয়া হয় যে সকল বয়ানে, সেগুলির ভিতরে **ভগ** শব্দের এই অর্থ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, হয়তো এখনও আছে। প্রাচীন কালে **ভগ** শব্দটি একসময় **যোনি** থেকে সরে গিয়ে গুহ্যার্থক হয়ে যায়। তার কারণ হল, ততদিনে ভারতসমাজে **পণ্য** উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, সেগুলিকে **গু** বলে, **গুদ** (goods) বলে নিন্দা করার চল হয়েছে। যে স্থান দিয়ে সেই **গু** বেরিয়ে আসে, তার নামও হয়ে গেছে **গুদ** বা **ভগ**। তখনই **ভগন্দর** শব্দটিও সৃজিত হয় সেই **পণ্য**-উৎপাদনের বাধা বোঝাতে।

৬. ইংরেজি ভাষা এই **ভগ** শব্দের উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে চলেছে বহু শব্দে। তন্মধ্যে vagabond, vagary, vagina, vague ... প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যায়।

ভগীরথ (ভাগীরথী) : ২. ভগীরথ = *ভগই রথ যাহার।* ***ভাগীরথী*** = ***ভগীরথ*** *হইতে জাত।* **৩.** সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইঁহার পিতা দিলীপ। ইনি কঠোর তপস্যায় গঙ্গাদেবীকে ভূতলে অবতীর্ণ করিয়া কপিলশাপে ভস্মীভূত সগরসন্তানগণের গঙ্গাজলস্পর্শে উদ্ধার করেন। এই হেতু গঙ্গার নাম ভাগীরথী। (ব.শ.)। **ভগীরথ** বাল্যে দেহাস্থি-বিহীনতায় অতি বিকলশরীর ছিলেন; এইরূপে দেহবৈকল্য সহকারে একদা অষ্টাবক্র মুনিকে প্রণাম করিতে গিয়া অঙ্গভঙ্গী করিলে, তিনি ইঁহাকে শাপ দেন, 'যদি তুমি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ অঙ্গবৈকল্য দেখাইয়া থাক, তবে ঐরূপ বিকলাঙ্গই হও; আর যদি উহা তোমার স্বাভাবিক হয়, তবে উহা দূর হইয়া তোমার শরীর উত্তম হউক।' এই শাপ ইহার পক্ষে বরই হইল; ইনি উত্তমদেহ হইলেন। অতঃপর ইনি কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধনার্থ কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে লইয়া আসেন, ও তাঁহার পূত বারিস্পর্শে তাঁহাদের সদ্‌গতিবিধান করেন; গঙ্গা এইরূপে ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীতা হওয়ায় ভাগীরথী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ছা.অ.)। **৪.** অর্থহীন নামরূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **গঙ্গা, অষ্টাবক্র, দিলীপ**। আমাদের প্রথম প্রয়োজন হল, **ভগীরথ** শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিষ্কাশন করা, দ্বিতীয় প্রয়োজন বাস্তবে তাকে চিহ্নিত করা এবং সাধ্যমতো তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্বরূপকে বুঝে নেওয়া।

ভগ কী, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই **ভগ**-ই **রথ** যাহার, তাকে বলে **ভগীরথ**। তার মানে, উৎপাদনের হাতিয়ার তৈরি করে যার জীবনযাত্রা চলে, সেই সত্তার নাম **ভগীরথ**। তাহলে তো একালে যারাই উৎপাদনের হাতিয়ার বানায়, তাদের সবাইকেই **ভগীরথ** নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পারেই তো! আজ আমরা সহজেই এই সব সত্তাগুলিকে নানান প্রতীকী শব্দে চিহ্নিত করে ফেলতে পারছি বটে, কিন্তু একবার ভাবুন, যখন বিশ্বে কোথাও **পণ্য** উৎপাদনই সেভাবে প্রচলিত হয়নি, বিক্রিবাটার চিন্তাও মানুষের মাথায় আসেনি, তখন এধরনের সত্তার নামকরণ করা কতখানি কঠিন কাজ ছিল। যাই হোক, আমরা জানলাম, **ভগীরথ** শব্দের অর্থ হল, 'যাঁরা উৎপাদনের হাতিয়ার তৈরি করেন'।

এবার মানুষের সমাজে তার আবির্ভাব, তার বিশেষ ভূমিকাগ্রহণ ও তার ইতিহাস বিষয়ে সাধ্যমতো খবরাখবর জেনে-বুঝে নিতে হবে। তথ্য এই যে, ভারতসমাজে একটা সময় এমন এসেছিল যে, উৎপাদিত বস্তু সমূহ পড়ে আছে, তার বিলি-বন্দোবস্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, অধঃপতিত বৈদিক (সমাজতান্ত্রিক) বিলিব্যবস্থা, **সগর** রাজা যা চালাচ্ছিলেন, **কপিল** মুনির শাপে তা স্তব্ধ হয়ে গেছে; বেদবাদী **সগর** রাজা ঝাড়েবংশে ভস্ম হয়ে রয়েছেন। চলছে কেবল **কপিলাবস্তুর** উৎপাদন ও বণ্টন, যা কিনা সমাজতান্ত্রিক নয়, ধনতান্ত্রিকও নয়, মাঝামাঝি — **কপিলা**। এই অবস্থায় এগিয়ে আসেন **ভগীরথ** বা উৎপাদনের হাতিয়ার-জীবী জনগোষ্ঠী। ভারতসমাজে কীভাবে তাদের জন্ম হয়েছিল, কার অভিশাপ তাদের জীবনে বর হয়ে উঠেছিল, সেই সব কথা বিস্তারিতভাবে বলা আছে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে। তাদের কোনো সমাজদেহ ছিল না, অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত সংস্থাও ছিল না; তারা 'দেহাস্থিবিহীন' ছিল। কারণ, তাদের জন্ম হয়েছিল **ভগে ভগে** ঘর্ষণে। বাংলা রামায়ণে কৃত্তিবাস জানাচ্ছেন —

'... আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম।।'

এই **ভগীরথ** গিয়ে **গঙ্গা** আনয়ন করেন, অর্থাৎ ভারতসমাজে **পণ্যধারার** প্রবর্তন ঘটান। বিক্রিবাটার প্রচলন হয়। দোকান হাট তৈরি হয়ে যায়। কীভাবে সে সব হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে, রয়েছে রামায়ণ মহাভারতে। বিশ্বের আর কোনো দেশের ইতিহাসে 'মানুষের সমাজে হাটবাজারের পত্তন হল কীভাবে, **পণ্যধারার** সূচনা হল কীভাবে', তার কোনো সংবাদ কি আছে? আদিম যৌথসমাজের নিগড় কেটে **পণ্য**বাহিতার সূচনা করা কত কঠিন কাজ ছিল, ভারতে তা কীভাবে সমাধা হয়েছিল, তার বিবরণ পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। সেই বৈপ্লবিক কাজের প্রধান রূপকার ছিলেন **ভগীরথ**। ...

ভজ (ভজকট, ভজন, ভজনা, ভজনীয়, ভজমান, ভজ্যমান, ভজা, ভজান, কর্ত্তাভজা) : ২. ভজ = *ভ-এর (ভব-এর) জনন থাকে যাহাতে।* ***ভজকট*** = ***ভজ*** *কট (দ্র.* ***উৎকট, বিকট****) যাহাতে।* ***ভজন*** = ***ভজ*** *অন (on) যাহাতে।* ***ভজনা*** = ***ভজন****-এর আধার যে।* ***ভজনীয়*** = ***ভজন*** *গতিশীল হইয়া যায় যাহাতে।* ***ভজমান*** = ***ভজনা*** *করিতেছে যে।* ***ভজ্যমান*** = ***ভজ্য*** *(বিভজ্য) মান যে।* ***ভজা*** = ***ভজ****-এর আধার যে।* ***ভজান*** = ***ভজা*** *অন (on) যাহাতে।* ***কর্ত্তাভজা*** = *যাঁহারা বিশ্ব-'কর্ত্তা'র ভজনা করেন।* / **ভজ্যমান** = যাহা ভাগ করা যায়। (ছা.অ.)। **৩. ভজ (ভজা)** = ভজন করা, সেবা বা আশ্রয় করা, পতিভাবে আশ্রয় করা, উপভোগ করা, ভোগ করা, গ্রহণ করা, অনুরক্ত হওয়া, বিনয় করা, হিসাবে মিলিয়া যাওয়া। **ভজকট** = গোল, বিশৃঙ্খলা, বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট। **ভজন, ভজনা** = সেবা, পূজা, বিভাগ, আশ্রয়, ঈশ্বরের বা দেবতাবিশেষের স্তবগান। **ভজনীয়**

= সেবনীয়। **ভজা, ভজান** = সেবা করান, পরামর্শ দিয়া গ্রহণ করান বা লওয়ান, হিসাবে মিলান, প্রমাণ করা। **কর্ত্তাভজা** = চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা শাখাস্বরূপ উপাসকসম্প্রদায় বিশেষ [উদাসীন আউলেচাঁদ ইহার প্রবর্ত্তক এবং ঘোষপাড়ানিবাসী রামশরণ পাল (সদ্গোপ) ইহার প্রচারক। ইঁহাদের মতে আউলেচাঁদ ঈশ্বরের অবতার; কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র ও আউলেচন্দ্র তিনেই এক, একেই তিন; মহাপ্রভু তিরোহিত হইয়া আউলেমহাপ্রভু-রূপে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের গুরুর নাম 'মহাশয়', শিষ্যের নাম 'বরাতি' (ব্রতী?), ও 'গুরু সত্য' প্রথম মন্ত্র। গুরু ইহাদের পরমেশ্বর। পরস্ত্রীগমনাদি তিন কায়কর্ম্ম, পরস্ত্রীগমনেচ্ছাদি তিন মনঃকর্ম্ম এবং মিথ্যাকথনাদি চার বাক্যকর্ম্ম, সমুদায়ে দশ কর্ম্ম ত্যাগ করা, আউলেচাঁদের উপদেশ। ইহাদের প্রেমানুষ্ঠান প্রথম সাধন; মন্ত্রজপে ও প্রেমানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হয়। একমাত্র বিশ্বকর্ত্তার ভজনাই ইহাদের ধর্ম্ম। আউলে কৌপীন পরিয়া খেলকা কাঁথা গায়ে দিয়া পর্য্যটন করিতেন, বাংলাভাষায় উপদেশ দিতেন, সকলকেই সম্মান জ্ঞান করিতেন ও সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন।], কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ের উপাসনা বা উপাসক। (ব.শ.)। **ভজমান** = সেবমান, উপসনাকারী, ন্যায়, বিভাজক। **ভজ্যমান** = বিভজ্যমান, সেব্যমান, খণ্ড্যমান। (ছা.অ.)। **৪. ভজকট, ভজন, ভজনা, ভজা, ভজান** প্রভৃতি শব্দ যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভক্ত, ভক্তি, ভগ**। আগেই আমরা দেখেছি, **ভজ** ক্রিয়াটি কার্যে রূপায়িত হতে গেলে সবসময় তার স্বরূপে থাকে না, হয়ে যায় **ভক, ভগ** ইত্যাদি। কিন্তু **ভজ** রূপে প্রযুক্ত হলে তখনই সে স্বরূপে থাকে।

ভ কাকে বলে, সেকথা আমরা **ভ** বর্ণের অর্থে জেনেছি। তার সঙ্গে **জ** যোগ করে যে **ভজ** শব্দ তৈরি করা হয়, তার স্বভাবতই অনেকগুলি ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ হয়। যথা — **ভ** জনন করে যে; **ভ** জনিত হয় যাহাতে; **ভ**-এর জনন থাকে যাহাতে; ... ইত্যাদি। একে খুব সহজে বুঝতে হলে গ্রামবাংলার মানুষের মুখের কথায় আস্থা রাখতে হয়। তাঁরা হিসাব **ভজান**র (মেলানোর) কথা বলেন, ক্ষমতাবানকে **ভজান**র (রাজি করানোর) কথা বলেন, শক্তিমানকে **ভজেন, ভজনা** করেন (তেল লাগান), শক্তিমানকে **ভজান** (পটান)। অর্থাৎ কিনা, যিনি **ভজাতে** (রাজি করাতে) চান, তিনি আসলে তাঁর হিসেবে 'যে-পর্যন্ত-হলে' ব্যাপারটি মেলে, সে পর্যন্ত শক্তিমানকে রাজি করাতে চান। তার মানে, দ্বৈরাজ্যবাহী যে **ভ**, তার এক রাজ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় রাজ্যটি যাতে সমান সমান হয়, সেটিই **ভজনা**কারীর উদ্দেশ্য; অন্যথায় ব্যাপারটি যে **উৎকট বিকট**-এর মতো **ভজকট** (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য) হয়ে যাবে! তাহলে দেখা যাচ্ছে, **ভজ** করা মানেই হল কোনো **কাম্য, সম্ভাব্য, কাল্পনিক দ্বৈরাজ্যের এক রাজ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় রাজ্যটিকে মেলানোর চেষ্টা করা।** সেই **ভজ** করা অন (on) **থাকে** যাহাতে, তাকে বলে **ভজন**; সেই **ভজন**-এর আধারকে **ভজনা** বলে। এই **ভজনা** অধিক হয়ে গেলেই **ভজমান** হয়ে যায় 'বিভাজক' এবং **ভজ্যমান** হয়ে যায় 'বিভজ্যমান' বা 'খণ্ডমান'। তখন **ভজনা** করলে 'ভাগ করা' হয়ে যায়।

ভাগ (ভাগনা, ভাগনে, ভাগবাঁটা, ভাগবাঁটোয়ারা, ভাগহারী, ভাগা, ভাগাও, ভাগাড়, ভাগান, ভাগারী, ভাগার্থী, ভাগি, ভাগিক, ভাগিনা, ভাগিনী, ভাগিনে, ভাগিনেয়, ভাগী, ভাগো, ভাগ্য, ভাগ্যধর, ভাগ্যবান, ভাগ্যিস, ভাগ্‌গিস, ভাজক, ভাজন, ভাজ্য, অভাজন, মহাভাগ, সৌভাগ্য) : ১. ✓ভজ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ভাগ*** *=* ***ভগ*** *হইতে জাত; অথবা, যাহা ভাজিত হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছে; কিংবা, মূল থেকে পৃথককৃত (দূরগত) হয় যে। (দ্র.* ***ভজ****)।* ***ভাগনা, ভাগনে*** *=* ***ভগিনী*** *হইতে জাত যে; অথবা,* ***ভাগ*** *নেয় যে।* ***ভাগবাঁটা*** *=* ***ভাগ*** *ও* ***বণ্টন*** *যাহাতে।* ***ভাগবাঁটোয়ারা*** *=* ***ভাগ*** *করিয়া বণ্টনাদি করা হয় যাহাতে।* ***ভাগহারী (ভাগারী)*** *=* ***ভাগ*** *হরণ করে যে।* ***ভাগা*** *=* ***ভাগ****-এর আধার যে।* ***ভাগাও*** *=* ***ভাগা*** *সক্রিয় করা হয় যাহাতে।* ***ভাগাড়*** *= যাহা* ***ভাগ****-এর আড়ে থাকে।* ***ভাগান*** *=* ***ভাগা*** *অন (on) যাহাতে।* ***ভাগার্থী*** *=* ***ভাগ****-এর প্রার্থী যে।* ***ভাগি*** *=* ***ভাগ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ভাগিক*** *=* ***ভাগি*** *করে যে।* ***ভাগী*** *=* ***ভাগ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***ভাগ্য*** *=* ***ভাগ*** *থাকে যাহাতে।* ***ভাগ্যধর*** *=* ***ভাগ্য*** *ধারণ করে যে।* ***ভাগ্যবান*** *=* ***ভাগ্য*** *বহন অন যাহাতে।* ***ভাগ্যিস, ভাগ্‌গিস*** *=* ***ভাগ্য*** *হইতে নিঃসারিত যে।* ***ভাজক*** *=* ***ভাজ/ভাগ*** *করে যে।* ***ভাজন*** *=* ***ভাজ*** *অন (on) যাহাতে।* ***ভাজ্য*** *=* ***ভাজ/ভাগ*** *থাকে যাহাতে।* ***অভাজন*** *= যে* ***ভাজন*** *নহে।* **৩. ভাগ** = ভজন, অংশ, ঋক্‌থ, একদেশ, একাংশ, প্রদেশ ... ইত্যাদি; ভঙ্গ দেওয়া, পলায়ন করা, দূর হওয়া, বিগত হওয়া ... ইতাদি। **ভাগনা, ভাগনে** = ভগিনীপুত্র। **ভাগবাঁটা** = বিভাগ, ভাগাভাগি। **ভাগহারী** = ভাগগ্রাহী, ভাগী। **ভাগা** = পলায়ন করান, তাড়ান, খেদান। **ভাগাড়** = গোমহিষ প্রভৃতির মৃতদেহ ফেলার স্থান। **ভাগান** = ভাগা। **ভাগার্থী** = ভাগপ্রার্থনাশীল, ভাগপ্রেপ্সু। **ভাগি** = সৌভাগ্য, সুকর্ম্ম। **ভাগিক** = ভাগবান, ভাগী। **ভাগিনা** = ভগিনীপুত্র। **ভাগিনী** = ভগিনীকন্যা। **ভাগিনে** = ভগিনীপুত্র। **ভাগিনেয়** = ভগিনীপুত্র। **ভাগী** = গ্রাহী, ভোগী, প্রাপক, হারক, ভাগবান, ভাগ্যবান, অংশী, দায়াদ। **ভাগ্য** = ভজনীয়, ভাগার্হ, সৌভাগ্য ... ইত্যাদি। **ভাগ্যধর** = ভাগ্যবান। **ভাগ্যবান** = সৌভাগ্যশালী, সমৃদ্ধিশালী, ধনী। **ভাগ্যিস, ভাগ্‌গিস** = ভাগ্যহেতু, সৌভাগ্যক্রমে। **ভাজক** = ভাগকারক, বিভাজক। **ভাজন** = পৃথক্করণ, দ্রব্যের পৃথক্করণস্থান। **ভাজ্য** = পৃথক্করণীয়, ভাগার্হ বস্তু, বিভজনীয় রাশি। **অভাজন** = অনাধার, অপাত্র, দুর্জ্জন, শত্রু, ভাগ্যহীন, নির্ব্বোধ। **মহাভাগ** = মহাভাগযুক্ত, সৌভাগ্যবান। **সৌভাগ্য** = সুভগত্ব, পত্নীপ্রিয়ত্ব, উপভোগ্যস্বরূপ সুভগত্ব ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** অধিকাংশ শব্দই সুপ্রচলিত। **৫. ভাগ** শব্দটি বলেই দিচ্ছে, যে, সে একটি মূল-এর থেকে বিভাজিত হয়ে পৃথক হয়েছে। এইরকম হওয়া মূল থেকে সরে যাওয়া, দূরগত হওয়া বা পালানোও বটে। তবে **ভাগ** করা ও **বণ্টন** করা দুটো পুরোপুরি এক ক্রিয়াকে বোঝায় না। ইংরেজিতে যেমন divide ও distribute দুটো আলাদা ক্রিয়াকে বোঝায়, তেমনি **ভাগ** ও **বণ্টন** দুটি পৃথক ক্রিয়াকে বোঝায়। গ্রামবাংলায় **ভাগবাঁটোয়ারা** শব্দটি যথার্থে প্রচলিত। তবে **ভাগহারী** শব্দটি **ভাগারী** রূপে গ্রামবাংলায় অধিক প্রচলিত; যেমন **কচহরি** হয়ে গেছে **কাচারি**, সেইরকম। কোনো পুকুর যদি চার ভাইয়ের

পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তবে সেই পুকুরের মাছ ধরা হলে চার **ভাগ** করা হয় এবং এক একটি **ভাগ**কে **ভাগা** বলে; এক এক ভাইকে এক এক **ভাগা** দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ ঐ ভাইয়েরা সম্পত্তিটির **ভাগহারী** বা **ভাগারী**। **ভাগাড়** শব্দটি যদিও দৃশ্যলোকে গোমহিষের মৃতদেহ ফেলার স্থানই বটে; কিন্তু এর সঙ্গে সমাজের চোখের **আড়ে** বা **আড়ঙ্গে** নিজের ভাগ **আড়াল** করার ব্যাপার-স্যাপারও ছিল। **ভাগী** শব্দটি যদিও দৃশ্যত 'অংশ নেয় যে' বা 'অংশী' রূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে, কিন্তু এর ব্যাপকতা আরও দূর পর্যন্ত প্রসারিত। '**পাপের** ভাগী' বা '**নিমিত্তের** ভাগী' বাংলাভাষায় একটি বাগ্‌ধারার মতো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে **ভাগ্য** শব্দটি বহু প্রাচীন। যৌথসমাজের সদস্য ভাগে যা পেতেন, সেটিই ছিল তাঁর **ভাগ্য**। পরে তা **অদৃষ্ট** হয়ে যায়। দ্র. **অদৃষ্ট, কপাল, দৈব**। তবে যেহেতু যৌথসমাজের অর্জিত খাদ্যাদি বিতরিত হত পরিবারের কর্ত্রীর নামে, কেননা তখন এক একটি বিশাল বিশাল পরিবার এক একজন মহিলার নেতৃত্বে পরিচালিত হত, সেকারণে সেই কর্ত্রী-মহিলাকে বলা হত যৌথসমাজের ভাগ পাওয়ার অধিকারী বা **ভাগ্যবান**। এই শব্দটি হিন্দি ভাষায় আজও প্রচলিত আছে। হিন্দিতে গৃহকর্ত্রীকে আজও 'ভাগ্‌বান' (ভাগ্‌ওয়ান) বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আগেও অনেকবার বলা হয়েছে, আবারও বলে রাখা যাক, যে, একেবারে অপরিশীলিত কথ্যভাষায়, মেয়েদের কূটকচালিতে, গ্রাম্য গালাগালিতে ... ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দের প্রয়োগ এখনও এত অনায়াসে হয়ে থাকে যে, সংস্কৃত ভদ্রলোকেদের ভাষাতেও তেমন হয় না। যেমন **ভাগ্যিস, ভাগ্‌গিস**। এই শব্দে সরাসরি **ভাগ্য** বা **ভাগে** পাওয়ার অনুসঙ্গ আছে। **অভাজন** কথাটি খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রায়শই তার অর্থ করা হয় 'কৃপাপ্রার্থী'। আসলে, যৌথসমাজের বা পরিবারের সম্পদ স্বাভাবিক-ভাবে বিভক্ত হয়ে তার সদস্যদের প্রাপ্য হয়ে থাকে, কিন্তু যে সেই **ভাজিত** সম্পদ পাওয়ার অধিকারী নয়, তাকে বলে **অভাজন**।

এবার আমরা গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতে **ভাগনা** বিষয়ক সংবাদ চয়ন করব। রাধাকৃষ্ণের গান গ্রামবাংলার মনে এত গভীর ভাবে নিষিক্ত হয়ে রয়েছে যে, তথাকথিত খেউড় গানে এখনও রাধার গলায় শুনতে পাওয়া যায় — 'ও সাধের **ভাগনা** রে, তুই নি কেন্ মোর ভাতার হইলি না?' সবাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার **ভাগিনেয়** ছিলেন। তাছাড়া এরকম প্রবাদও গ্রামবাংলায় প্রচলিত দেখা যায় — 'জন জামাই **ভাগনা**, তিন নয় আপনা'। এর মূলে রয়েছে সেই প্রাচীন যৌথসমাজের উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ, যাতে মামা ও ভাগনা একই গোষ্ঠীতে পালিত হত এবং ভাগনা মামার বিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রাদির উত্তরাধিকার লাভ করত। **ভাগাভাগি** শব্দটি বিভাজন করা অর্থে প্রচলিত রয়েছে, তবে এর স্বভাবের ভিতরে আরও গভীর তত্ত্ব। দ্র. **কেশাকেশি**। **ভাগ** শব্দটির ক্রিয়ারূপ হল মূল থেকে বিযুক্ত হও, পালাও, **ভাগো**।

ভিগ (ভিগা, ভিজ, ভিজা, ভিজান, ভিজে, ভেজা, ভেজান — দরজা ভেজান, ভিজে বেড়াল) : ২. *ভিগ = গতিশীল* **ভজ/ভগ** *যাহাতে।* **ভিগা** *=* **ভিগ**-*এর আধার যে।* **ভিজ** *= গতিশীল* **ভজ** *যাহাতে।* **ভিজা** *=* **ভিজ**-*এর আধার যে।* **ভিজান** *=* **ভিজা** *অন (on) যাহাতে।* **ভিজে (ভেজা)** *=* **ভিজ** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **ভেজা** *= যাহা* **ভিজিয়া** *গিয়াছে;* **ভিজিতে** *থাকা (যাহাতে)।* **ভেজান** *=* **ভেজা** *অন (on) যাহাতে।* **৩. ভিগ (ভীগ)** = সিক্ত বা আর্দ্র হওয়া। **ভিগা** = সিক্ত করা, ভিজান। **ভিজ** = আর্দ্র হওয়া, স্নেহাদিতে আর্দ্র বা নরম হওয়া, তদাসক্ত হওয়া, অন্তঃপ্রবেশ হেতু তৎপরিব্যাপ্ত হওয়া। **ভিজা (ভিজে, ভেজা)** = সিক্ত করা, স্নেহাদিতে নরম করা; ভেদ করান, ঢুকান। **ভিজান (ভেজান)** = সিক্ত করা। **ভিজে বেড়াল** = (সাদৃশ্যে) দেখিতে ভালমানুষ, কিন্তু বস্তুত দুষ্ট। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। **৫. ভিজা** কত প্রকার? ব.শ. জানাচ্ছেন, বুট (সাদা মটর) ভিজে, মুগ ভিজে, মন ভিজে, অন্ধকার আলোতে ভিজে যায়; এমনকি কুন্তলে চিরুনী ভিজানও যেতে পারে। আমরা জানি, ঠিকঠাক **ভজা**তে পারলে মানুষের মন গলে যায়, নরম হয়, **ভিজে** যায়। বাংলায় এখনও বলা হয়, 'শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না।' হিন্দিতে এই **ভিজা**কে বলে **ভিগা, ভিগ** যানা। শুধু তাই নয়, পৃথক্‌করণ করাকে যে আমরা বলি **ভাগাও**, হিন্দিতে তাকেই বলে **ভেজ, ভেজো, ভেজ** দেনা অর্থাৎ 'পাঠাও'। এই অর্থেই আমরা বলি দরজার পাল্লাটা **ভিজিয়ে** দাও, দরজা **ভেজান**। তবে বাংলাভাষীরা এই **ভিজ** শব্দের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেন '**ভিজে** বেড়াল' শব্দে। এমনিতেই **বিড়াল** কিছু ভাল কথা নয় (দ্র. **মার্জ্জার**), 'বিড়ালতপস্বী' বা **বিলি-ভকত** বিষয়ে সবাই সতর্ক থাকেন; সে যদি আবার **ভিজে**-বেড়াল হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কখন যে সে কী ক্ষতিসাধন করে দেবে কে জানে!

ভঞ্জ্ (ভন্‌জ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অভগ্ন, অভঙ্গ, অভদ্র, আভঙ্গ, আভাঙা, আভাঙ্গা, বিপদভঞ্জিনী, বিভঙ্গ, ভগন, ভগ্ন, ভগ্নক্রম, ভগ্নদূত, ভগ্নদ্রংষ্ট্র, ভগ্ননিদ্র, ভগ্নপাইক, ভগ্নব্রত, ভগ্নপ্রক্রম, ভগ্নমনোরথ, ভগ্নযাচ্‌ঞা, ভগ্নশেষ, ভগ্নসন্ধি, ভগ্নস্নেহ, ভগ্নাংশ, ভগ্নাশ, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম, ভঙ্‌ক্তা, ভঙ্গ, ভঙ্গকুলীন, ভঙ্গপয়ার, ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গা, ভঙ্গান, ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী, ভঙ্গি, ভঙ্গী, ভঙ্গিআন, ভঙ্গিনী, ভঙ্গিম, ভঙ্গিমা, ভঙ্গিমান, ভঙ্গিয়ান, ভঙ্গী, ভঙ্গুর, ভঙ্গুরা, ভঙ্গ্য, ভঞ্জ, ভঞ্জক, ভঞ্জন, ভঞ্জিত, ভঞ্জিনী, ভন্‌জ্, ভাং, ভাংচি, ভাঁগ, ভাঁগিল, ভাঁজ, ভাঁজা, ভাঁজাল, ভাঙ(ঙ্গ), ভাঙচা, ভাঙচুর (ভাঙ্গচুর), ভাঙন, ভাঙনি, ভাঙা(ঙ্গা), ভাঙানী (ভাঙ্গানী), ভাঙচি (ভাঙ্গচি), ভাঙুর, ভাঙ্কার, ভাঙ্কৃত, ভাঙ্কৃতি, ভাঙ্গ, ভাঙ্গক, ভাঙ্গচি, ভাঙ্গচুর, ভাঙ্গড়, ভাঙ্গন, ভাঙ্গভাঙ্গ, ভাঙ্গর, ভাঙ্গরা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গাচোরা, ভাঙ্গান, ভাঙ্গানী, ভাঙ্গাভরতি, ভাঙ্গি, ভাঙ্গিল, ভাঙ্গী, ভাগ, ভাগা, ভাগান, ভাগিল, ভান, ভানাকুটা, ভানা, ভানান, ভানানী, ষড়ভাগ।

ভঞ্জ্ (ভন্‌জ্, ভন্‌দ্) = ভবের রহস্যরূপের জনন। **ভঞ্জ** = ভবের রহস্যরূপের জনন যাহাতে। **ভন্‌জ** = ভবের নাকরণ জনিত যাহাতে। **ভন্‌দ** = ভবের নাকরণ দেয় যে।

ভগ্ন (ভগ্নদূত, ভগ্নপাইক, ভগ্নপ্রক্রম, ভগ্নমনোরথ, ভগ্নাংশ) : ১. ✓ভন্জ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভগ্ন** = ভ-এর না-করণ জনিত হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, ভবের গমন না-কৃত যাহাতে। **ভগ্নদূত** = **ভগ্ন**-এর পরে আগত যে দূত। **ভগ্নমনোরথ** = **ভগ্ন** হইয়াছে মনোরথ যাহার। **ভগ্নাংশ** = **ভগ্ন** হইতে আগত অংশ। / **ভগ্নদূত** = যে দূত যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ দেয়। (ব.শ.)। **ভগ্নপাইক (ভগ্নদূত)** = যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়। **ভগ্নপ্রক্রম** = ভগ্ন প্রক্রম যাহাতে, তাহা। (ছা.অ.)। ৩. **ভগ্ন** = মুটিত, চূর্ণিত, ভাঙা, খণ্ডিত, পরাজিত, ভঙ্গ। **ভগ্নদূত** = ভগ্নপাইক। **ভগ্নমনোরথ** = খণ্ডিতাভিলাষ। **ভগ্নাংশ** = (গণিতে) অখণ্ডিত '১' এই সংখ্যার খণ্ডিতাংশ বা একের কম অংশ। (ব.শ.)। **ভগ্নপ্রক্রম** = কাব্যগত বাক্যদোষবিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ। (ছা.অ.)। ৪. broken অর্থে **ভগ্ন**, failure অর্থে **ভগ্নমনোরথ** এবং fraction অর্থে **ভগ্নাংশ** প্রচলিত, **ভগ্নদূত** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ভঞ্জ**। যে কোনো পূর্ণ সত্তাই যেহেতু ভ-বাচ্য, তার তদ্রূপে থাকাকেই 'ভবের গমন চলতে থাকা' বলা যায়। তা যদি খণ্ডিত হয়ে যায়, তখনই তাকে **ভগ্ন** বলে। এ যদি বাহ্যসত্তা না হয়ে সামাজিক সত্তা হয়, তাহলে সেটি রাজতন্ত্রের তদ্রূপে চলা বোঝাতে পারে, যে আর চলতে না পারলে বা হেরে গেলে তাকে **ভগ্ন** বলা যায়। তখন সে খবর নিয়ে **ভগ্নদূত** আসে, রাজা সে সংবাদ শুনে **ভগ্নমনোরথ** হন।

ভঙ্গ (ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গবাসা, ভঙ্গা, ভঙ্গামগুলচণ্ডী, ভঙ্গি, ভঙ্গিনী, ভঙ্গিম, ভঙ্গিমা, ভঙ্গী, ভঙ্গুর, ভঙ্গ্য, অভঙ্গ, বিভঙ্গ, ভঙ্গকুলীন) : ১. ✓ভন্জ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। ২. **ভঙ্গ** = ভব-এর রহস্যরূপের গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা **ভগ্ন** হইয়াছে। **ভঙ্গপ্রবণ** = **ভঙ্গ** হওয়া প্রবণতা যাহার। **ভঙ্গবাসা** = **ভঙ্গে** বাস করে যে। **ভঙ্গা** = **ভঙ্গ**-এর আধার যে। **ভঙ্গামগুলচণ্ডী** = মঙ্গলচণ্ডীকে **ভঙ্গ** করে যে। **ভঙ্গি** = **ভঙ্গ** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে। **ভঙ্গিনী** = **ভঙ্গি** করে যে প্রকৃতিশক্তি। **ভঙ্গিম** = **ভঙ্গ** ইমন যাহার; অথবা, **ভঙ্গ** পূর্ব্বক গমনই মানসিকতা যাহার। **ভঙ্গিমা** = **ভঙ্গিম**-এর আধার যে। **ভঙ্গী** = **ভঙ্গি**-র আধার যে। **ভঙ্গুর** = **ভঙ্গ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে। **ভঙ্গ্য** = **ভঙ্গ** থাকে যাহাতে। **বিভঙ্গ** = বিকল্প বা বিপরীত **ভঙ্গ** যাহার। **ভঙ্গকুলীন** = কুলীন বংশ হইতে **ভঙ্গ** হইয়া আসিয়াছে যে। / **ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী** = (গৌণার্থে) যে সৎকর্ম্মে বাগড়া দেয় বা বিঘ্ন ঘটায়। **ভঙ্গি, ভঙ্গী** = যে রূপে অর্থ বিবক্ষিত, তদতিরিক্ত প্রকার। (ব.শ.)। **ভঙ্গবাসা** = ভঙ্গে বাস যাহার। (ছা.অ.)। ৩. **ভঙ্গ** = আমর্দ্দন, ভেদ, বিভাগ, প্রতিবন্ধ, ভঞ্জন, পরাজয়, বিধ্বংস, বিবর্ত্তন ... ইত্যাদি। **ভঙ্গপ্রবণ** = ভঙ্গশীল, ভঙ্গুর, ঠুনকো। **ভঙ্গা** = ভাঙ, সিদ্ধি, ত্রিবৃৎ, তেউড়ী, শণ। **ভঙ্গি (ভঙ্গী)** = ভঙ্গ, কৌটিল্যভেদ, বিদগ্ধচেষ্টা, উক্তিবৈচিত্র্যপ্রকার। **ভঙ্গিনী** = ভঙ্গিযুক্তা, সবিলাসচেষ্টাবতী। **ভঙ্গিম** = ভঙ্গিযুক্ত, সবিলাস, বক্র, কুটিল। **ভঙ্গিমা** = ভঙ্গি, প্রকার, বক্রতা, কৌটিল্য, নির্ম্মাণপ্রকার, সখেল অবয়ববিজ্ঞান, তরঙ্গ, অবয়বসংস্থান। **ভঙ্গুর** = ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ, নাশশীল, নশ্বর, কুটিল, বক্র, নমনশীল ... ইত্যাদি। **ভঙ্গ্য** = ভঙ্গার্হ, ভঙ্গযোগ্য, ভঙ্গার উৎপত্তিস্থান ক্ষেত্র, ভাঙের ক্ষেত। **বিভঙ্গ** = ভঞ্জন, ভেদ, ব্যাঘাত, চর্ম্মসঙ্কোচ, ভঙ্গি ... ইত্যাদি। **ভঙ্গকুলীন** = ক্রিয়াদোষে কৌলীন্যহীন, বংশজ। **ভঙ্গ দেওয়া** = পশ্চাদপদ হওয়া, পরাঙ্মুখ হওয়া, পলায়ন করা। (ব.শ.)। **ভঙ্গ বাসা** = হরিদ্রা, হলুদ। (ছা.অ.)। ৪. **ভঙ্গ্য** ও **ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী** বাদে বাকি সমস্ত শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ছিন্নভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গি, ঢঙ্গ, ভঞ্জ**। উপরোক্ত **ভগ্ন** ও **ভঙ্গ** শব্দ দুটির মূলে একই ক্রিয়া থাকলেও, শব্দ দুটি সম্পূর্ণ এক ক্রিয়া বা ক্রিয়াধারীদের বোঝায় না। আমরা **ভগ্নস্তূপ** বলি, **ভঙ্গস্তূপ** বলি না। তার কারণ, অখণ্ডের দিক থেকে দেখে যে ক্রিয়া ঘটে তা **ভগ্ন** পদবাচ্য, আর খণ্ডের দিক থেকে দেখে যে ক্রিয়া ঘটে তা **ভঙ্গ** পদবাচ্য। সমগ্র থেকে চলে আসাকে যে কারণে **ভঙ্গ-দেওয়া** বা পলায়ন করা বলা হয়ে থাকে। 'রণে **ভঙ্গ-দেওয়া**' এখনও শহুরে বাংলাভাষীর মুখে শোনা যায়।

গৃহীত শব্দগুলির মধ্যে আমরা **ভঙ্গবাসা** শব্দটি এইজন্য বিশেষত উল্লেখ করলাম যে, পরে **ভালবাসা** শব্দটির প্রসঙ্গে এর কথা আসবে। আর, **ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী** শব্দের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই শব্দটি বয়স্ক বাংলাভাষীরা আজও ব্যবহার করেন এবং গ্রামবাংলায় এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। তবে তাঁরা একে বলেন **ভাঙা-মঙ্গলচণ্ডী**। আজকাল কত ভাল কাজে ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু যারা ব্যাঘাত ঘটায়, তাদের চিহ্নিত করার জন্য এক 'প্রতিক্রিয়াশীল' ছাড়া আর যেন কোনো শব্দ নেই আমাদের। অথচ 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দটি তো বাংলাভাষীদের সংস্কৃতির নিজস্ব শব্দ নয়, ইংরেজি-শিক্ষিত পণ্ডিতেরা ইংরেজি reactionary শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল'। এ শব্দের অর্থ সেকারণেই গ্রামবাংলার মানুষ বুঝতে পারেন না। আমরা তাই বলে **ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী** শব্দটিরই পুনঃপ্রচলন করতে হবেই, এমন ধনুকভাঙা পণ গ্রহণ করার পক্ষে নই। আমরা শুধু বলতে চাই, এরকম বহু শব্দ রয়েছে, সেগুলি খুঁজে বের করা দরকার। তাহলেই আমরা ইংরেজি-দূষণ থেকে মুক্ত হতে পারব। তবে 'সিদ্ধি' বা 'ভাঙ্'কে কেন যে **ভঙ্গা** বলে, সেকথা বুঝব নিম্নে **ভাং** শব্দে।

ভঙ্গাস্বন : ৩. এক ধার্মিক রাজা। ইনি পুত্রকামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করে শত পুত্র লাভ করেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিকেই স্তুতি করা হয় বলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন এবং মায়াজাল বিস্তার করে এঁকে বিমোহিত করেন। রাজা দিগ্‌ভ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পান। সেই সরোবরে স্নান করলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপে রূপান্তরিত হন। তখন তিনি সেই অবস্থাতেই রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে স্ত্রী ও পুত্রদের এর কারণ জানান ও পুত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বনগমন করেন। স্ত্রীরূপী ভঙ্গাস্বন এক ঋষির আশ্রমে এসে বাস করতে থাকেন। সেই ঋষির ঔরসে স্ত্রীরূপী ভঙ্গাস্বনের গর্ভে আবার একশত পুত্র হয়। তিনি এই একশত পুত্রকে নিয়ে পূর্বের একশত পুত্রের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা রাজ্যভোগ কর।' ... ইন্দ্র তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন। তখন তারা যুদ্ধ করে পরস্পরকে বিনষ্ট করল। ... তা দেখে ভঙ্গাস্বন রোদন করতে আরম্ভ করলে ইন্দ্র এসে বললেন,

'আমাকে আহ্বান না করে অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করেছিলে বলে তোমার এইরূপ ফল হয়েছে।' তখন রাজা ইন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বললেন, 'তুমি কোন পুত্রদের জীবন কামনা কর, ঔরসজাত পুত্রদের, না, তোমার গর্ভজাত পুত্রদের?' তখন রাজা গর্ভজাত পুত্রদেরই জীবন-কামনা করলেন। এতে ইন্দ্র আশ্চর্য হলে রাজা বলেন, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই বেশি। ... তারপর রাজা অন্য বর প্রার্থনা করেন — তিনি স্ত্রী হয়েই থাকতে চান। কারণ, স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে স্ত্রীরাই অধিক সুখী হয়। ইন্দ্র এই বরও তাঁকে দান করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ভঙ্গাস্বন** শব্দটি কোনো অভিধান বা শব্দকোষে নাই, রয়েছে মহাভারতের অনুশাসন পর্বে। সেখান থেকে কাহিনীটি নিয়ে পৌরাণিক অভিধান সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করেছেন। আমরা এখানে বিশেষ কারণে শব্দটিকে আমাদের কোষগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করলাম। কারণটি হল এই কাহিনীটির বৈচিত্র্য। এতে **সূর্য্যবংশ** না **চন্দ্রবংশ**, চন্দ্রপুত্র-**বুধ, ইলারাজা, ঔরসপুত্র** না **ক্ষেত্রজপুত্র, কৌরব** না **পাণ্ডব** ... ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভারতসমাজের ইতিহাসে যে বিশাল **কুরুক্ষেত্রের** যুদ্ধ ঘটে গেছে, তার প্রতীকী উপস্থাপনা আছে। দ্র. **ঋক্ষরজা**।

ভঞ্জক (ভঞ্জ, ভঞ্জন, ভঞ্জিত) : ১. ✓ভন্জ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভঞ্জ** = *ভবের রহস্যরূপ জনিত যাহাতে।* **ভঞ্জন** = **ভঞ্জ** *অন (on) যাহাতে।* **ভঞ্জক** = **ভঞ্জন** *করে যে।* **ভঞ্জিত** = **ভঞ্জ** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ৩. **ভঞ্জক** = ভঙ্গ কারক, ভঙ্ক্তা। **ভঞ্জ** = ভগ্ন করা, নাশ করা, দূর করা, মীমাংসা করা, মিটান; কায়স্থের উপাধিবিশেষ। **ভঞ্জন** = ভঙ্গকারক, ভঞ্জক, নিরাকর্ত্তা, নিরাসক, দূরীকারক, ভঙ্গ, ভেদ, মোটন, নিরাকৃতি, ব্যাঘাত। **ভঞ্জিত** = খুজরা মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র **ভঞ্জ** শব্দটি পদবী রূপে প্রচলিত, **ভঞ্জন** শব্দটি এককভাবে প্রচলিত না থাকলেও 'মানভঞ্জন', 'বিপদভঞ্জন' ... ইত্যাদি রূপে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমবেশি প্রচলিত। ৫. ভ-এর সামনে একটি দেয়াল আছে। ভ যদি তাতে দৈহিকভাবে গমন (= **গ্**) করে অর্থাৎ হাতুড়ি শাবল গাঁইতি নিয়ে শক্তিরূপে গমন করে, সেটির অস্তিত্ব না-করণ (= **ন**) হয়ে যাবেই; তাকেই বলা হয় **ভগ্ন** হওয়া বা ভেঙে যাওয়া। তবে সে যদি একটা কংক্রিটের দেয়াল হয় কিংবা পাহাড় হয়, তাহলে বহু লোকজন যন্ত্রপাতি বুলডোজার ইত্যাদি লাগবে। তখন সেই রহস্যরূপী প্রচেষ্টায় সেটিকে ভেঙে ফেললে সে হল **ভঙ্গ** করা। কিন্তু দেয়ালটি যদি অদৃশ্য দেয়াল হয়? বিপদের দেয়াল কিংবা অভিমানের দেয়াল হয়? কিংবা ঐধরনের কোনো অদৃশ্য কাঠামো দেয়ালরূপে সামনে দাঁড়ায়, তাহলে? তাহলে হাতুড়ি-শাবল কিংবা বুলডোজারও কোনো কাজে আসবে না। তাহলে 'ভ-কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে না-করণ করবার উপায় জনন' (= **ভন্জ্**) করতে হবে; অর্থাৎ, তখন অদৃশ্য সেই দেয়ালকে ভাঙবার নানা উপায়সমূহ গ্রহণ করাকে বলে '**ভন্জ**' বা **ভঞ্জ**। সেই **ভঞ্জ** অন থাকে যাহাতে, তাকে বলে **ভঞ্জন**। তার মানে, সরাসরি দৃশ্য কোনো কিছুকে শক্তি প্রয়োগ করে ভাঙলে সেটি **ভগ্ন**, বহু রকমের উপায় অবলম্বন করে ভাঙলে সেটি **ভঙ্গ**। কিন্তু অদৃশ্য কোনো কিছুকে বহু রকমের উপায় জনন করে ভাঙলে সেটি **ভঞ্জ**। এই ছিল প্রাচীন পূর্বপুরুষদের অর্জন। মধ্যযুগের বাংলাভাষী অত সাতে-পাঁচে যাওয়ার দরকার বোধ করেননি। তাঁরা **ভগ্ন-ভঙ্গ-ভঞ্জ** থেকে জাত শব্দ রূপে সবগুলিকেই একটিমাত্র **ভাঙা** শব্দে পরিণত করে নিয়েছেন। স্বভাবতই এখন তাঁদের দেয়াল ভাঙে, পাহাড় ভাঙে, মান ভাঙে, বিশ্বাস ভাঙে, কপাল ভাঙে, আকাশ ভাঙে ... এবং কী ভাঙে না! দ্র. **ভাং, ভাঙ**।

এককালে যাঁরা রাষ্ট্রের তরফে সমাজের সর্বপ্রকার বিপদ**ভঞ্জন** করতেন, তদ্রূপ আদি সামরিক নায়কদের **ভঞ্জ** বলা হত। আজও তাঁদের উত্তরসূরিগণ **ভঞ্জ** পদবী বহন করে নিয়ে চলেছেন। সহজ করে বললে, যাঁরা নিজের এখতিয়ার থেকে মৌমাছির মতো ভন ভন করে বেরোনো শক্তিকে সৈন্যরূপে 'ভঞ্জিতব্য'-এর দিকে চালিত করে তাকে **ভঞ্জিত** করে ফেলতেন, তাঁদের বলা হত **ভঞ্জ**; আর, তাঁদের ঐ কর্মকে বলা হত **ভঞ্জন** করা। সেভাবেই সমাজের সম্মুখস্থ বিপদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়াকে বলা হত বিপদ**ভঞ্জন** করা। একই ভাবে কারও পুঞ্জীভূত অভিমানকে গুঁড়িয়ে দেওয়াকে বলা হত মান**ভঞ্জন**। তবে এছাড়াও আরও নানারকম **ভঞ্জন** হয়। যেমন মুদ্রা**ভঞ্জন**, কর্ণ**ভঞ্জন**, বিশ্বাস**ভঞ্জন** ... ইত্যাদি। একালে আমরা এগুলিকে যথাক্রমে টাকা-ভাঙানো, কান-ভাঙানো, বিশ্বাস-ভাঙা ... ইত্যাদি বলে থাকি। দ্র. ভাং।

ভাং (ভাংচি, ভাঙ, ভাঙচা, ভাঙচুর, ভাঙন, ভাঙা, ভাঙান, ভাঙানী, ভাঙ্গ, ভাঙ্গচুর, ভাঙ্গচি, ভাঙ্গা, ভাঙ্গানী) : ২. **ভাং** = *ভা-এর (ভবাধারের)* ং *(পূর্ণরহস্যরূপ) যাহাতে।* **ভাংচি** = **ভাং** *চয়ন গতিশীল যাহাতে।* **ভাঙ** = *ভবাধার কারণরূপিণী (=* **ঙ***) যাহাতে।* **ভাঙচা** = **ভাঙ** *চয়নের আধার যে।* **ভাঙচুর** = *যাহাতে* **ভাঙা** *ও চূর্ণ করা উভয়ই থাকে।* **ভাঙন** = **ভাঙ** *অন (on) যাহাতে।* **ভাঙা** = **ভাঙ***-এর আধার যে।* **ভাঙান** = **ভাঙা** *অন যাহাতে।* **ভাঙানী** = **ভাঙান***-র সক্রিয় আধার যে।* **ভাঙ্গ** = **ভঙ্গ** *হইতে জাত; অথবা,* **ভাঙ** *গমন করে যাহাতে, যে ক্রিয়ায়।* **ভাঙ্গচুর** = *যাহাতে* **ভাঙ্গা** *ও চূর্ণ করা উভয়ই থাকে।* **ভাঙ্গচি** = **ভাঙ্গ** *চয়ন গতিশীল যাহাতে।* **ভাঙ্গা** = **ভাঙ্গ***-এর আধার যে।* **ভাঙ্গান** = **ভাঙ্গা** *অন যাহাতে।* **ভাঙ্গানী** = **ভাঙ্গান***-র সক্রিয় আধার যে।* / **ভাঙানী, ভাঙ্গানী** = যে স্ত্রীলোক কুমন্ত্রণা দিয়া ভাঙ্গায় বা বিচ্ছিন্ন করে। (ব.শ.)। ৩. **ভাং** = সিদ্ধি (hemp)। **ভাংচি, ভাঙ্গচি** = ভাঙ্গার পরামর্শ, বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা। **ভাঙ, ভাঙ্গ** = সিদ্ধি; ভঙ্গি; ভগ্ন করা, ভঙ্গিযুক্ত করা, পাতিত করা, দূর করা, অপনীত করা ... ইত্যাদি। **ভাঙচা** = অঙ্গভঙ্গিপূর্ব্বক উপহাস করা। **ভাঙচুর, ভাঙ্গচুর** = ভাঙাচুরা। **ভাঙন** = ভগ্ন করা বা হওয়া, ধ্বংসকরণ, তীরের ভগ্নস্থান। **ভাঙা, ভাঙ্গা (ভাঙান, ভাঙ্গান)** = ভগ্ন করা ... ইত্যাদি, বক্রতা, বস্ত্রখণ্ড, ছিদ্র, ভগ্ন, জীর্ণ, সচ্ছিদ্র, ছিন্ন ... ইত্যাদি; ভগ্ন করান, পরামর্শ দিয়া স্বপক্ষে আনা, তর্কবিতর্কপূর্ব্বক স্থির করা, নোট বা টাকার পরিবর্তে মুদ্রা বা খুচরা মুদ্রা লওয়া, ব্যঙ্গ করা। **ভাঙানী, ভাঙ্গানী** = বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য (খুচরা মুদ্রা)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **গঞ্জা, জয়া, ছিন্নভিন্ন**। আলোচ্য উপরোক্ত শব্দগুলি শুধুমাত্র প্রচলিতই নয়, বাংলাভাষীগণ যেসব ক্ষেত্রে এখনও 'শব্দ-

প্রক্রিয়াকরণ' চালিয়ে নিত্যনতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন, সেই অজস্র ক্ষেত্রের মধ্যে এটিও একটি 'শব্দের প্রক্রিয়াকরণ-ক্ষেত্র'। এই ক্ষেত্রে যেসব শব্দ এখনও 'প্রক্রিয়াকরণ' পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু সর্বসাধারণ্যে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়ে যায়নি, তেমন শব্দগুলি হল — **ভাঙাইদার** (যারা পুরনো পাকাবাড়ি ভাঙে বা খোয়া ভাঙে), **ভাঙাল-দেওয়া** (জলে দু-হাতের সাহায্যে জোর শব্দ তোলা), **ভাঙলু-পার্টি** (যে দল ভাঙে), **ভাংচু-দেওয়া** (দল ভাঙার কৌশল শিখিয়ে উসকানি দেওয়া), **ভেংচানি, ভেংচানো, ভেঙালি** (যে-বাক্যের বা নকল গানের সাহায্যে ভেঙে ফেলার উসকানি দেওয়া হয়), **ভেঙানো** (ভঙ্গ হলে ভাল এমন ভাবপ্রকাশ করা), **ভেংচি-কাটা, ভাঙাভাঙি** ... ইত্যাদি। স্বভাবতই কোনো অভিধানে এই শব্দগুলি এখনও অন্তর্ভুক্তি পায়নি। পাবে কী করে! ক্রিয়াগুলিই তো এখনও ঠিকঠাক **বর্ণবাস** গ্রহণ করে উঠতে পারেনি! তাছাড়া রয়েছে **ভঞ্জ, ভঞ্জন** ... প্রভৃতি। এগুলি মূলত অদৃশ্য বিষয়কে ভাঙা বোঝাতেই সৃষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু বাংলাভাষী তাকে একই **ভঙ্গ** বা 'ভাঙা' ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

তা সে যাই হোক, **ভাং**-কে **ভাং, ভাঙ, ভাঙ্গ** বলে কেন, সবার আগে সেকথাটাই আমাদের জানতে হবে। আমরা দেখছি, ক্রিয়াভিত্তিক-শব্দার্থের নিয়মে '**ভা**-এর **ঙ** (বা ভবাধারের কারণশক্তি-রূপিণী) গমন (= **গ**) করে যাহাতে', তাকে **ভাঙ্ + গ = ভাঙ্গ** বলে। অর্থাৎ কিনা, যে শক্তিযুক্ত ক্রিয়া কোনো সত্তাকে **ভঙ্গ** (break) করে দেয়, **ভেঙ্গে** দেয়, তাকে **ভাঙ্গ** বলে। বাংলাভাষীগণ যখন **ভাং** বা **ভাঙ** বলেন, তখন কার্যত তাঁরা **ভাঙ্গ** শব্দের মূলেই থাকেন। আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ **ভাং** ও **ভাঙ**-এর প্রকৃত স্বরূপটিকে খুঁজে বের করে তাকে **ভাঙ্গ** রূপে শনাক্ত করেছিলেন। তার মানে **ভাং**-ই বিবর্তিত হয়ে হয়ে **ভাঙ** ও তারপরে **ভাঙ্গ**-তে পরিণত হয়েছে। উপরে প্রদত্ত এদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলি থেকে সে বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া যায়। একালের বাংলাভাষী **ভাঙ** লিখতে-পড়তে অভ্যস্ত, সেকারণে সাধারণভাবে **ভাঙ**-ই লিখেছি আমরা এবং লিখবও, যদিও একে সর্বক্ষেত্রে **ভাঙ্গ** রূপেই বুঝতে হবে।

তবে **ভাঙ্গা** বা **ভাঙ্গান** ক্রিয়াটিকে তার স্বরূপে বুঝতে হলে সবচেয়ে সহজ হয় যদি আমরা **ভাঙ্গানী** শব্দটির অর্থটিকে ভাল করে জেনে নিই। আপনি একশো টাকার একটি নোট **ভাঙ্গালেন**, (দ্র. **ভঞ্জ**) সঙ্গে সঙ্গে সেটি অনেকগুলি মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়ে গেল; যেন-বা একটা মন্ত্র-ডাণ্ডা দিয়ে একশো টাকার নোটকে মারলেন, আর সেটি চূর্ণ হয়ে অনেকগুলি মুদ্রায় পরিণত হয়ে গেল। **ভাঙ্গ** ঠিক সেরকম ক্রিয়াই বটে। যে **ভাঙ্গে** সে তার ইচ্ছাশক্তি-বলশক্তি-জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তির **গমন** ঘটায় যাকে **ভাঙ্গে** তাতে। ফলে সেটি **ভেঙ্গে** যায়, দু'খণ্ড বা ততোধিক খণ্ড হয়ে যায়।

তবে বাংলাভাষী এই **ভাঙ্গা** বা **ভাঙাকে** শুধুমাত্র 'দু-তিন টুকরো করা'য় সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাকে নিয়ে গেছেন তার সর্বোচ্চ সীমায়। আমাদের বাংলাভাষীদের শরীর **ভাঙে**, কপাল **ভাঙে**, গলা **ভাঙে**, ঘুম **ভাঙে**, স্বপ্ন **ভাঙে**, মন **ভাঙে**, মান **ভাঙে**, বিশ্বাস **ভাঙে**, সংসার **ভাঙে**, সভা **ভাঙে**, কাপড় **ভাঙে**, কাপড়ের পাট **ভাঙে**, খেলা **ভাঙে**, মেলা **ভাঙে**, মান **ভাঙে**, জোড় **ভাঙে**, ঘোর **ভাঙে**, তহবিল **ভাঙে**, বাড়ির বউ সেকথা পাড়ায় **ভাঙে**, কর্তার মাথায় আকাশ **ভাঙে**, খুকু তেলের শিশি **ভাঙে**, আমরা ভারত দেশটাকেই **ভাঙি!** অর্থাৎ আমরা কী **ভাঙি** না, আমাদের কী **ভাঙে** না! এত **ভঙ্গ** বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা দেখে কারা যেন **ভাঙা** হাসি হাসে, তবু আমাদের আশা **ভাঙে** না।

তা সে যাই হোক, আমাদের জানা দরকার, সিদ্ধি বা গাঁজাকে **ভাঙ্গ (ভাঙ, ভাং)** বলে কেন। হোমিয়োপ্যাথি শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন — মানুষের মস্তিষ্ক এতই সুরক্ষিত যে, একমাত্র 'সালফার' ছাড়া অন্য কোনো ঔষধকেই সে মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দেয় না। তবে সে হল মানবমস্তিষ্কের বাহ্যিক সুরক্ষা-ব্যবস্থার কথা। তাছাড়া তার একপ্রকার মানসিক সুরক্ষা-ব্যবস্থাও আছে এবং মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে থাকে মানুষের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বোধগুলি, এবং তাদেরকেও একপ্রকার মানসিক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা থাকে; আর সেই প্রাচীরটি তৈরি করা হয়ে থাকে মানুষটির মনের যুক্তিশৃঙ্খলা দিয়ে। এমন কোনো ভাবনা বা বোধকে সেখানে ঢুকতেই দেওয়া হয় না, যা সেই যুক্তিশৃঙ্খলাকে মান্য করে না বা করবে না। সেই প্রাচীরের ভিতরে থাকা মানুষটির বোধগুলি তো অবশ্যই সেই যুক্তিশৃঙ্খলাকে মান্য করে থাকেই। সিদ্ধি ও গাঁজা মানুষের এই যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরটিকে **ভেঙে** দেয়, সেই কারণে তাদের **ভাঙ্গ (ভাঙ, ভাং)** বলে। সবাই জানেন, সিদ্ধি বা গাঁজা সেবন করার পর মানুষ এমন আচরণ করে যা তার মনের যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরটি অবিকল থাকলে সে কিছুতেই করতে পারত না; এমন কথাবার্তা বলে যা সে ঐ প্রাচীরটি অবিকল থাকলে বলতেই পারত না। যে কথাবার্তায় প্রতিষ্ঠিত যুক্তিশৃঙ্খলার দেখা মেলে না, তাকেই তো 'গাঁজাখুরি গপ্পো' বলে। অর্থাৎ গাঁজা বা **ভাঙ্গ** সেই যুক্তিশৃঙ্খলাটি **ভেঙ্গে** দেয়। তার মানে, **ভাঙ্গ (ভাঙ, ভাং)** সেটি **ভাঙ্গ**তে পারে বলেই তাকে **ভাঙ্গ** বলে।

বঙ্গসংস্কৃতিতে মদ খাওয়ার প্রতি যেমন একপ্রকার ঘৃণা আছে, সিদ্ধি বা গাঁজা খাওয়ার অর্থাৎ **ভাঙ্গ** খাওয়ার প্রতি সেরকম ঘৃণা নাই। তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্বয়ং **শিবঠাকুর** প্রায়শই **ভাঙ্গ** খেতেন। তাছাড়া, গাঁজাখুরি গপ্পো (cock-and-bull story) তো একপ্রকার বিমলানন্দ দিয়েই থাকে। আমরা দেখেছি, সেই গপ্পো প্রচলিত যুক্তিশৃঙ্খলার ধার ধারে না। **গঞ্জিকা** শব্দে সে প্রসঙ্গে আমরা কিছু সংবাদ পেয়েছি। জানা গেছে, **ভাঙ্গ** গাছকে ইংরেজিতে cannabis sativa বলে। এই গাছের শুকনো মঞ্জরীকে (the female flowering tops of Indian hemp) **গঞ্জা** বা গাঁজা এবং তার leaves and shoots বা পাতাগুলিকে **সিদ্ধি** বলে। কিন্তু **সিদ্ধি** মানে তো পূর্ণ-সাফল্য! সেই **সিদ্ধিকে ভাঙ্গ** বলে কেন, এবং স্বয়ং **শিব** (আবিষ্কারক-উদ্ভাবক) কেন **ভাঙ্গ** সেবন করেন?

লোকে বলে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। বাক্যটির নিহিতার্থ এই যে, এ পর্যন্ত যাঁরা 'শ্রীকৃষ্ণসম-গুরুতর-কোনো-অভীষ্ট' লাভ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক কষ্টস্বীকার করেছেন। এবং, সেকারণেই একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেরকম গুরুতর কোনো অভীষ্ট লাভ করতে হলে কষ্ট করতেই হবে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে। ঠিক সেরকমই, নতুন

কোনো উদ্ভাবন করতে হলে, আবিষ্কার করতে হলে, নিত্যনব সৃজন করতে হলে, অনেক সময়ই প্রতিষ্ঠিত বোধসমূহকে ঘিরে রাখা যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরটি ভেঙে ফেলতে হয়। সেই কাজে সাহায্য করে **ভাঙ্গ**। কিন্তু **ভাঙ্গ** সেবন করে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরটিকে ভেঙে ফেললেই উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে, নতুন বোধ অর্জন করে নব নব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, এরকম ধারণা — কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে — ধারণার মতোই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু তথাপি শুধুমাত্র এইরকম ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমাদের কলকাতার 'খালাসিটোলা'-গামী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়; মদ গাঁজা সিদ্ধি ইত্যাদি খেয়ে নিজ নিজ যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরকে ভেঙে ফেলতে তাঁরা জীবন পণ করে বসেন। **সিদ্ধি** খরচ হয়ে যায়, **সিদ্ধি** মেলে না। ...

আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা জানতেন, কখনো কখনো এই **ভাঙ্গ** কিন্তু সত্যিই আমাদের যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে আমাদের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সাধনা করবার সুযোগ করে দেয়, সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায় করে দেয়। লোকে জেনে যায় 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে'। তবে রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইনের মতো যাঁরা প্রকৃত **শিব**, তাঁদের বাহ্যিক **ভাঙ্গ** সেবন করার দরকার পড়ত না, তাঁরা এত বিপুল পরিমাণে মানসিক-**ভাঙ্গ** খেয়ে ভরপুর থাকতেন যে, তাতেই তাঁদের মনের পুরানো যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীর অনায়াসে ভেঙে পড়ে যেত এবং তাঁরা তাঁদের উপলব্ধ অর্জনকে নতুন যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরে ঘিরে নতুন বোধের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, সেই নব নব বোধের সাহায্যে নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পারতেন। '**সিদ্ধি**তে নিপুণ' না হলে কেউ কি বলতে পারে — কলকাতার প্রজাপতি পাখনা নাড়িয়ে ভ্যাঙ্কুবারের সমুদ্রে ঝড় তুলবেই।

একমাত্র **ভাঙ্গ**ই মানুষের মনের যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরটিকে ভেঙে ফেলতে পারে, অন্য কেউই পারে না। **মদ** খেয়ে মানুষ **মত্ত** হয় ঠিকই, একই চক্রে ঘুরে মরে, কিন্তু তার যুক্তিশৃঙ্খলা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু **ভাঙ্গ** খেলে সেটি আর আস্ত থাকে না। **গঞ্জিকা**র ক্ষেত্রে সে প্রাচীর ভেঙে দিয়ে গাঁজাখুরি গপ্পো বানায়, যুক্তিশৃঙ্খলা পেরিয়ে কথাবার্তা বলে; কিন্তু **সিদ্ধি**র ক্ষেত্রে মানুষ **সিদ্ধি**লাভ করে। নতুন যুক্তিশৃঙ্খলা গড়ে তোলে, তাতে নতুন বোধের প্রতিষ্ঠা করে, নতুন সৃজন করে। **৬.** পর্তুগীজ bangue (ব.শ.)।

ভট্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কুমারিল ভট্ট, কেদারভট্ট, গোবিন্দ ভট্ট, বাণভট্ট, ভট্, ভট, ভটচায্যি, ভটা, ভটাই, ভটিত্র, ভট্ট, ভট্টনারায়ণ, ভট্টাচার্য্য, ভট্টার, ভট্টারক, ভট্টারকবার, ভট্টারকমঠ, ভট্টারিকা, ভট্টি, ভট্টিকাব্য, ভট্টিনী, ভড়, ভড়ং, ভড়ক, ভড়কা, ভড়ভড়, ভড়ভড়ানি, ভাট, ভাটক, ভাটা, ভাটি, ভাটিয়ার, ভাটিয়ারী, ভাটিয়াল, ভাটিয়ালী, ভাটী, ভাট্টা, ভাড়া, ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে, ভাড়ানী, ভাড়িয়া, ভাড়ুআ(য়া), ভাড়ুনী, ভিটা, (vital), ভিটামাটি, ভিটি, ভিঠা, ভিড় (ভীড়), ভিড়ন, ভিড়া, ভিড়াভিড়ি, ভিড়ান, ভীড়, ভেট, ভেটা, ভেটান, ভেটি, ভেটেরাখানা, ভেটেল, ভেটো, ভেড়, ভেড়া, ভেড়ি, ভেড়ী, ভেড়ুয়া, ভেড়ে, ভেড়ো, ভোট, ভোটকম্বল, ভোটর, ভোটা, ভোটাঙ্গ, ভোটান্ত, ভোটি, ভোড়ং, ভোড়ঙ্গ, ভোড়া, ভ্যাটা।

ভট্ = ভবের টঙ্কারণ। **ভট** = ভবের টঙ্কার যাহাতে।

ভট (ভটভটি, ভটাই, ভটিত্র) : ১. ✓ভট্ + অ (ঘঞর্থে - 'ক') - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভট** = *ভব টঙ্কারিত যাহাতে।* **ভটভটি** = *ভট-এর পুনরাবৃত্তি সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* **ভটাই** = *ভট-এর আধার চলমান যাহাতে।* **ভটিত্র** = *ভট গতিশীল হইয়া ত্রাণ পায় যাহাতে।* / **ভট** = যাহা বিপদ হইতে তরণার্থে পালন করা হয়। (ব.শ.)। **৩. ভট** = যোদ্ধা, যোধ, সৈনিক, বীর, শূর, ম্লেচ্ছবিশেষ, পামরবিশেষ, নিশাচর, রাক্ষস, বর্ণসঙ্করবিশেষ, ভাট (?), ভট্ট, ভাট। **ভটাই** = ভাটের কাজ, স্তুতিবাদ। **ভটিত্র** = শূলপক্ক মাংস, শূল্য, কাবাব। (ব.শ.)। **ভটভটি** = ভট ভট শব্দে যে যানগুলি চলে, যথা মোটর লাগানো জলযান, মোটর লাগানো রিকশা বা মোটর সাইকেল। **৪. ভটভটি** ছাড়া বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **উদ্ভট**। **ভট** শব্দের অর্থ হল '**ভ বা ভব টঙ্কারিত হয় যাহাতে**'। অর্থাৎ, যে সত্তা শাসকের মতো রোষ ভ'রে, হুকুম ভ'রে, অগ্নিময় ইচ্ছা ভ'রে বল্লম, তীর, কথা, প্রশংসাবাক্য, আওয়াজ, ধোঁয়া ... প্রভৃতি সামনে বা পেছনে সজোরে ত্যাগ করে বা ছুঁড়ে ছুঁড়ে চলে, তাকেই **ভট** বলে। যে কারণে যোদ্ধা, সৈনিক, বীর, স্তুতিকারী ... এদের সবাইকে **ভট** বলা হয়। তবে এর মূল স্বভাব হল, এ যেন এমন এক সত্তা, যে উপর থেকে শাসকের মতো নীচের পানে তার ত্যাগকরণ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সেই **ভট** শব্দ কখনো-বা ম্লেচ্ছ পামরাদিকে বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। ...

বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষ, এবং পশ্চিমবাংলায় যাঁরা সুন্দরবন অঞ্চলে থাকেন তাঁরা, মোটর লাগানো জলযানকে **ভটভটি** বলে থাকেন। এই যান **ভট্ ভট্** শব্দ করে চলে বলেই নাকি তাকে **ভটভটি** বলা হয়। আজ আমরা জেনেছি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে কিছু কিছু শব্দকে দেগে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চেপে দেওয়া হয়। অথচ একটি প্রশ্ন তুললেই সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার পথ দেখতে পাওয়া যায়। প্রশ্নটি হল — বাংলাভাষী তাকে **ভটভটি** না বলে **ধপধপি, গুবগুবি, ঝটঝটি, ঘটঘটি, বটবটি, হটহটি** ... ইত্যাদি না বলে শুধুই **ভটভটি** বলতে গেল কেন? তখন ধীরে ধীরে জানা যায়, মনের যে গভীরতম উৎসস্থল থেকে ক্রিয়াভিত্তিক **বর্ণ** উৎসারিত হয়, সেখান থেকেই তথাকথিত ধ্বন্যাত্মক শব্দও উৎসারিত হয়। ক্রিয়াভিত্তিক বর্ণ উৎসারণরীতি তাকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ বলেই জানে, মানে, শব্দটি তদ্রূপ আচরণও করে; কিন্তু একালের শব্দশাস্ত্রীগণ তাদের যথার্থ গভীরতায় না জেনেবুঝে onomatopoeic-এর অনুকরণে একটা 'ফাঁকিবাজি' নামকরণ করে দেন — ধ্বন্যাত্মক, যার কোনো অর্থ নেই। তাঁরা খেয়াল করেন না যে, শব্দব্রহ্মের দুনিয়ায় অর্থহীন শব্দোৎপাদন একেবারেই অসম্ভব। কেউ সে অর্থ বুঝতে পারছে না এমন হতে পারে।

ভটিত্র শব্দটি এখন অপ্রচলিত, অথচ যাকে বোঝাতে শব্দটির

ব্যবহার হত বলা হচ্ছে, সে ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারী সগৌরবে বিদ্যমান। ছাত্রবোধ অভিধান ও ব.শব্দকোষ উভয়েই এর মানে দিয়েছেন 'শূলপক্ব মাংস' অর্থাৎ শিক-কাবাব। আমরা দেখছি, **ভট** গতিশীল হয় যে বল্লম ইত্যাদিতে, সেগুলিকে **ভটি** বলা যেতেই পারে। সেই **ভটি** দিয়ে যাকে ত্রাণ করা হয়, তাকে **ভটিত্র** বলাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে 'শিক'কে **ভটি** এবং 'শিক-কাবাব'কে **ভটিত্র** শব্দে উল্লেখ করায় কোনো অসুবিধা নাই। তবে মনে রাখতে হবে, এই অর্থ **ভট** শব্দের বাহ্য অর্থ; **কায়স্থ্য** শব্দের বাহ্য অর্থ যেমন আমলকী, সেরকম। আরও স্মর্তব্য যে, ইট জ্বাল দেওয়া আগুনকে বা বড় উনুনকে **ভাটি** বলে। ... **৬.** ইংরেজি vat।

ভট্ট (ভট্টাচার্য্য) : ১. ✓ভট্ + চ (তন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভট্ট** = **ভট** *টঙ্কারিত যাহাতে।* **ভট্টাচার্য্য** = *যিনি* **ভট্ট** *এবং* **আচার্য্য**ও *বটে।* **৩. ভট্ট** = স্তুতিপাঠবৃত্তি জাতিবিশেষ, ভাট, বেদাভিজ্ঞ, পণ্ডিত, নাটকে রাজার সম্বোধনে নীচপাত্রের প্রযোজ্য শব্দ, স্বামীত্ব। **ভট্টাচার্য্য** = মীমাংসক তুতাতের (তুতাত ভট্টের) ও নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতাভিজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের উপাধি, ব্রাহ্মণের উপাধি। (ব.শ.)। **ভট্ট** = যে ব্রাহ্মণ বেদচতুষ্টয়ের একখানি কণ্ঠস্থ করিয়া এবং মুখে মুখে আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য, পণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, স্তুতিপাঠক, ভাট, কুলপঞ্জিকা কীর্ত্তন প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য। **ভট্টাচার্য্য** = যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়-সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তিনি এই উপাধি পাইবার যোগ্য, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরও এই উপাধি, অধ্যাপক। ভট্ট ও আচার্য্য। (ছা.অ.)। **৪.** দুটি শব্দই পদবীরূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **উদ্ভট**। 'স্তুতি' বললে একালে আমরা — 'হে রাজন্, আপনার ন্যায় মহান দয়ালু বীর কেহই নাই ...' — এরকম বাক্য ভাবি; যেন-বা একদল মানুষ নীচে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উপরে সিংহাসনে বসা রাজার উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাক্য পাঠ করে চলেছে, ঠিক যেন বাচ্চারা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের প্রার্থনা পাঠ করছে। আসলে কিন্তু তা নয়। **ভট** শব্দটি জানিয়ে দেয়, তার স্তুতিপাঠ কিন্তু আদৌ ওরকম নয়। শব্দটির উদ্ভবকালে তা ছিল সম্পূর্ণ অভিভাবক-সুলভ। রাজা যুদ্ধজয় করে ফিরলে **ভট্ট** তার প্রশংসা করতেন, ছেলে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ফিরলে বাবা কিংবা ঠাকুরদা তার প্রতি যেরূপ স্তুতিপূর্ণ আশীর্বচন বলেন, সেইরকম। কালে কালে **ভট্ট**-এর সেই সম্মান কমতে থাকে, **ভট্টাচার্য্য**দের সম্মানও অধঃপতিত হতে থাকে। ... **৬.** ইংরেজি vatic।

ভাট (ভাটপাড়া, ভাটা, ভাটি, ভাটিয়াল, ভাটিয়ালী, ভাটী — vat, vatic, vatican-city) : ২. ***ভাট*** = **ভট** *হইতে জাত; অথবা, নিম্ন স্থান-কাল-পাত্রে টঙ্কারিত হয় যে।* **ভাটা** = **ভাট**-*এর আধার যে।* **ভাটপাড়া** = **ভাটগণ** *বাস করেন যে পাড়ায়।* **ভাটি** = **ভাট** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* **ভাটিয়াল** = **ভাটি**র *গমন লালিত যাহাতে।* **ভাটিয়ালী** = **ভাটিয়াল**-*এর সক্রিয় আধার যে।* ***ভাটী*** = **ভাটি**র *আধার যে।* **৩. ভাট** = হিন্দুজাতিবিশেষ, ভট্ট (কবিতায় রাজার বংশচরিতকীর্ত্তন স্তুতিপাঠ পরিচয়দান দৌত্য পত্রবহন ইঁহাদের কার্য্য), চারণকবি, স্তুতিপাঠক, বন্দী, পণ্ডিতের উপাধি। **ভাটা** = নদীর নিম্নাভিমুখ স্রোত, জোয়ারের উলটা স্রোত, (গৌণার্থে) ন্যূনতার স্রোত। **ভাটি (ভাটী)** = ভাটা, দক্ষিণ দেশ, নিম্নদিক্, অপরাহ্ন, ন্যূনতা, নিম্নাভিমুখ, অতীত, মৃদু, ইঁটের পাকপুটী, চূর্ণ পোড়াইবার পোয়ানবিশেষ, সিজাইবার নিমিত্ত ধোপার ময়লা কাপড়ের বৃত্তাকার স্তূপ। **ভাটিয়াল (ভাটিয়ার, ভাটিয়ারী)** = রাগবিশেষ। (ব.শ.)। **ভাটিয়াল** = দক্ষিণ দেশীয় (ভাটিয়াল সুর)। **ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী, ভাটিয়ারী** = লোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ, উক্ত সুরে গাওয়া গান, ভাটার টানে নৌকা চলাকালীন মাঝিরা যে সুরে গান গায়। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **ভাটপাড়া** = কলিকাতার সন্নিকটস্থ **ভট্টাচার্য্য**-ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত একটি বিখ্যাত স্থান। বিদ্যাসাগরের কালে কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে সাবর্ণ রায়চৌধুরী-দের উত্তরসূরি মলয় রায়চৌধুরী তাঁর *ছোটোলোকের ছোটোবেলা* নিবন্ধে জানিয়েছেন — 'ব্রাহ্মণরা কলকাতায় থাকতেন না, কেবল শুদ্দুর আর মেলেচ্ছোরা থাকত, বলতেন ঠাকুমা।' তখনও **ভাটপাড়াই** ছিল বাংলার ব্রাহ্মণদের গৌরবের ও অবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এ বিষয়ে আমাদের 'জ' গ্রন্থের শেষে — '**ভাটপাড়া** থেকে Vatican-city পর্যন্ত সর্বত্রই vat কেন?' — সে প্রশ্ন তুলে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। **৪.** মধ্যযুগের সাহিত্যে **ভাট, ভাটা, ভাটি** ... প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যাপকভাবে ও যথার্থে প্রচলিত ছিল, এখনও গ্রামবাংলায় ও কর্মজগতে শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত রয়েছে; যদিও অ্যাকাডেমিতে শব্দগুলির খুব একটা প্রয়োগ দেখা যায় না। **৫. ভট** ও **ভট্ট** শব্দের ভিতরে যে একধরনের শাসক-ভাব রয়েছে, যা কিনা শাসক থেকে শাসিতের দিকে কোনো কিছু ত্যাগ করছে, সেটি **ভাট** ও তজ্জাত শব্দগুলিতে আরও স্পষ্টভাবে ধরে রাখা হয়েছে। সবক্ষেত্রেই দেখা যায় **ভ** বা ভব নিম্ন স্থানে বা কালে বা পাত্রে গিয়ে টঙ্কারিত হচ্ছে; এবং তজ্জাত সত্তাই **ভাট, ভাটা, ভাটি, ভাটী** ... ইত্যাদি। সেকারণে আমরা এর অর্থ দিয়েছি — নিম্ন স্থান-কাল-পাত্রে টঙ্কারিত হয় যে। ব.শ. প্রদত্ত অর্থ থেকে নিম্ন স্থানের বেলায় আমরা পাই নদীর নিম্নাভিমুখ স্রোত, ভাটা, দক্ষিণ দেশ, নিম্নদিক্, নিম্নাভিমুখ, সিজাইবার নিমিত্ত ধোপার ময়লা কাপড়ের বৃত্তাকার স্তূপ, অর্থাৎ vat-কেও; নিম্ন কালের বেলায় আমরা পাই অতীত, অপরাহ্ন প্রভৃতি 'ভাটিবেলা'কে। নিম্ন পাত্রের বেলায় আমরা পাই **ভট্ট**কে, যার কাজ হল রাজার বংশচরিতকীর্ত্তন স্তুতিপাঠ পরিচয়দান দৌত্য পত্রবহন ইত্যাদি, পাই চারণকবি, স্তুতিপাঠক, বন্দী, ন্যূনতা, মৃদু প্রভৃতি সত্তাগুলিকে।

ভাটিয়ালীর ক্ষেত্রে যদিও বলা হয়ে থাকে যে, নিম্নাভিমুখী স্রোতের বেলায় মাঝি স্রোতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে এই গান গেয়ে থাকেন, আমাদের মনে হয়েছে, সেটিই সব কথা নয়। অরূপরতনের অমৃতরস যে পেয়েছে, সে তো নিম্নাভিমুখে সমগ্র জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সেই অমৃতধারা বইয়ে দেবেই! আর তা রয়েছে বলেই সম্ভবত তাঁদের সঙ্গীতকে **ভাটিয়ালী** সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে।

সর্বোপরি, **ভাট** কেবল বাংলাতেই জন্মাননি, পাশ্চাত্যেও তাঁরা সক্রিয় ছিলেন এবং আছেনও। ইংরেজিতে কখনো কখনো

'দৈবপ্রেরণাপ্রসূত' অর্থে 'ভ্যাটিক' (vatic) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর উৎসে আছে ল্যাটিন শব্দ vates, যার অর্থ ছিল prophet; অর্থাৎ 'দৈবপ্রেরণাযুক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা' (নবী)। বৃহৎ রোম শহরের একটি অংশ হল Vatican City, যা এখন একটি পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র রূপে স্বীকৃত। এর কেন্দ্রে রয়েছে পোপের নিবাস Vatican Palace; আর সেটি রয়েছে Vatican Hill নামের উচ্চ ভূখণ্ডের উপর। তার Vatican নামটি সে পেয়েছিল খ্রিস্টধর্মের আদিযুগেই। ঈশ্বরপুত্র যিশুর প্রতিনিধি পোপের হাতেই যিশু স্বর্গের চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পোপের এলাকা ও বাসস্থান হয়ে যাওয়ার দরুণ এই স্থানের নাম হয় Vatican Hill। **ভাট** শব্দটি সেদেশের জল-মাটি-হাওয়ায় এভাবেই **ভাটিকান**-এ পরিণত হয়েছে।

যাই হোক, মূল স্বভাবে আমাদের আদি **ভট্ট** ও **ভট্টাচার্য্য**দের সঙ্গে ঐ vates-দের কোনো ভেদ নেই। কে কতখানি সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করে ভোগ করেছেন, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে কিনা, **ভট্ট** ও **ভট্টাচার্য্য**দের সকল উত্তরসূরিই তাঁদের আদি গৌরব অবিকল ধারণ করে রাখতে পেরেছেন, এমন কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। **ভট্ট** ও **ভট্টাচার্য্য** পদবীধারী এমন বহু মানুষকে এখনও দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ অর্জন বহন করে নিয়ে চলেছেন; আবার এমন মানুষকেও আজকাল দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা যার থেকে যেরকম দক্ষিণা পান তার সুরে সুর মিলিয়ে সেরকম গাওনা গাইতে লজ্জা বোধ করেন না। ... **৬.** ইংরেজি vatic।

ভণ্ (ভন্দ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আইহাঁড়া (ভাণ্ড), আইহাঁড়ি, আভাণক, তুঙ্গভদ্রা, ভনভন (দ্র.ভনজ্, ভ্রম্), ভণ্, ভণ(ন), ভণই, ভণতি, ভণন, ভণিত, ভণিতা, ভণিতি, ভণিতে, ভণ্টাকী, ভণ্ড্, ভণ্ড, ভণ্ডতপস্বী, ভণ্ডন, ভণ্ডনা, ভণ্ডহাসিনী, ভণ্ডামি, ভণ্ডীর, ভণ্ডীরী, ভণ্ডুল, ভদন্ত, ভদ্র, ভদ্রক, ভদ্রকার, ভদ্রকালী, ভদ্রকাষ্ঠ, ভদ্রকুম্ভ, ভদ্রদারু, ভদ্রপদ, ভদ্রপদা, ভদ্রপীঠ, ভদ্রবল্লী, ভদ্রমন্দ, ভদ্রমুস্ত, ভদ্রমুস্তা, ভদ্রমৃগ, ভদ্রযব, ভদ্রশ্রী, ভদ্রা, ভদ্রিকা, ভদ্রজংলা, ভদ্রমুখ, ভদ্রস্থ, ভদ্রস্থতা, ভদ্রাভদ্র, ভদ্রালী, ভদ্রাশ্ব, ভদ্রাসন, ভদ্রেশ, ভদ্রেশ্বর, ভাদই, ভাদর, ভাদাম, ভাদুরে, ভাদুল্যা, ভাদো, ভাদ্দর, ভাদ্দরবউ, ভাদ্র, ভাদ্রপদ, ভাদ্রপদা, ভাদ্রপদী, ভাদ্রবধু, ভাদ্রী, ভন্দ্ (ভন্দ), ভন্ভন্, ভাইড়, ভাঁওভাঁও, ভাঁড়, ভাঁড়া, ভাঁড়ান, ভাঁড়াভাঁড়ি, ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ারি(রী), ভাঁড়ি, ভাড়, ভাণ, ভাণ্ড, ভাণ্ডন, ভাণ্ডনা, ভাণ্ডপতি, ভাণ্ডপূর্ণ, ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক, ভাণ্ডবাদন, ভাণ্ডমূল্য, ভাণ্ডরঞ্জক-মৃত্তিকা, ভাণ্ডশালা, ভাণ্ডা, ভাণ্ডাগার, ভাণ্ডাগারিক, ভাণ্ডান, ভাণ্ডার, ভাণ্ডারিক, ভাণ্ডারী, ভাণ্ডি, ভাণ্ডিক, ভাণ্ডিনী, ভাণ্ডীর, ভ্যানভ্যান, ভ্যানরভ্যানর, হাঁড়া, হাঁড়ি।

ভণ্ (ভন্দ্) = ভবের রহস্যরূপের বোধন-সূত্রায়ণ। **ভণ** = ভবের রহস্যরূপের বোধন-সূত্রায়ণ যাহাতে। **ভন্দ্** = দ্র. **ভঞ্জ্**। (**ভ** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, বর্ণটি এমনিতেই অন্যান্য বর্ণের তুলনায় ভারী, ঘনগভীর-অর্থময়, পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত শাসকাদির বোধে পরিপূর্ণ। তার ওপর তার সাথে যুক্ত হয় রহস্যময়ী **অংরূপিণীর** 'ণ' রূপটি। 'ঙ' যেমন তাঁর রহস্যময় 'কারণরূপ', 'ঞ' যেমন তাঁর রহস্যময় 'চয়নরূপ', **'ণ' তেমনি তাঁর রহস্যময় 'টঙ্কাররূপ'। ফলত, ভণ** ক্রিয়ার ভিতরে যেন **দুই সর্বোচ্চ সত্তার** সক্রিয়তা ধৃত হয়ে রয়েছে, যেনবা এই **ভণ-এর ভ হলেন এক বিশ্বসম্রাট**, আর **ণ** হল তাঁর **বিশ্বশাসনের যাদুদণ্ড। ভণ সক্রিয় মানে** এই যাদুদণ্ড হাতে বিশ্বসম্রাট সক্রিয়। তাঁর আচরণ স্বভাবতই রহস্যে ভরা। তবু, সে রহস্য মানুষের অবশ্যই অধিগম্য; অন্যথায় মানুষ **ভণ** শব্দ দিয়ে কাজ চালাতে পারত না। যাই হোক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে তাকে বোঝার।

ভণ্ ক্রিয়াটিকে **ভন্ ভন্** শব্দের সঙ্গে তুলনায় বোঝা সহজ হয়। **শিব**গুণসম্পন্ন স্রষ্টা কবি **ভণ্ ভণ্** করেন, যাদের উদ্দেশ্যে করেন, তাদের প্রতি কিছু মানসবস্তু নিক্ষেপ করেন; পরিবর্তে তিনি পান পরমাপ্রকৃতির অমৃতস্পর্শের আনন্দ। **দক্ষ**গুণসম্পন্ন কবি **ভণ্ ভণ** করেন, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন, বদলে কিছু বাহ্য অর্থ যশ ... ইত্যাদি পানও, কিন্তু যেহেতু তিনি উদ্ভাবক-স্রষ্টা কবি নন, তাই তিনি পরমাপ্রকৃতির কৃপালাভে বঞ্চিত হন; তবে তাঁর পুনরাবৃত্তি মাত্রাছাড়া হলে লোকে বলে 'কানের কাছে **ভন্ ভন্** করবেন না তো।' সবাই জানেন, মাছি **ভন্ ভন্** করে, যার উপরে করে, সেখানে সে কিছু বাহ্যবস্তু নেয়, কিছু বাহ্যবস্তু ফেলে দেয়। অর্থাৎ কিনা, **ভণ** ক্রিয়া শুভ, কিন্তু তা পুনরাবৃত্তি বা অন্য কোনো দোষযুক্ত হলে দুষ্ট হয়ে যায় এবং তখনই তাকে **ভন** বলা হয়। কিন্তু এখানেই বিষয়টির শেষ হয়ে যায় না। আরও আছে। এই **ভণ**-করণের অন্তত তিনটি রূপ আছে — মানসিক, বাহ্যিক, এবং মানস-বাহ্যিক। মানসিক **ভণ**-কারী সত্তার একটি উদাহরণ হল কবির **ভণিতা**; বাহ্যিক **ভণ**-কারী সত্তার একটি উদাহরণ হল মাটির **ভাণ্ড**; আর মনো-বাহ্যিক **ভণ**-কারী সত্তার একটি উদাহরণ হল **ভাণ্ডার**। ভাণ্ডারে সম্পদ থাকে, যার বাহ্যিক চেহারা থাকে, কিন্তু মানুষের মন ছাড়া তার মূল্যাদি বোঝা যায় না; গরুছাগল 'সম্পদ'কে বুঝতে পারে না। তাই **ভাণ্ডার** হল মনো-বাহ্যিক সত্তা।)

ভণ (ভণন, ভণিত, ভণিতা, ভাণ) : ১. ভাণ = ✓ভণ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভণ** = *যাহাতে* **ভ**-*এর বা ভবের (মানসিক) অন-(on)-করণ থাকে।* **ভণন** = **ভণ** *অন (on) যাহাতে।* **ভণিত** = **ভণ** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* **ভণিতা** = **ভণিত**-*এর আধার যে।* **ভাণ** = **ভণ** *হইতে জাত।* **৩. ভণ** = বলা, মন্তব্যরূপে বলা, অভিহিত করা, বর্ণনা করা, রচনা করা, গান করা, কীর্তন করা, জ্ঞাপন করা। **ভণন** = কথন, বর্ণনা। **ভণিত** = কথিত, বিরচিত, কথন, রচনা। **ভণিতা** = বৈষ্ণবপদাবলীর বা মঙ্গল-কাব্যাদির প্রবন্ধের শেষে কবির নামযুক্ত পঙ্ক্তি। **ভাণ** = রূপকবিশেষ (ইহার বস্তু কবিকল্পিত, **অঙ্ক** ও অভিনেতা একটি। ইহা ধূর্তচরিত। ইহাতে আকাশভাষিতের ভাণেই উক্তিপ্রত্যুক্তি হয়। ইহা ভারতী-বৃত্তিপ্রধান।), বাক্য, কথা, শব্দ, প্রতীতি, বোধ, ধারণা, দীপ্তি, চমক, ব্যাজ, ছল; বলা, প্রতীত হওয়া, অনুমান করা। (ব.শ.)। **ভণিতা** = কবিতায় কবির আত্মপরিচয়সূচক পদ, আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ, আসল কথা বলার আগে বিশাল এক ভূমিকা ফাঁদার প্রবণতা। (ব্য.বা.অ. ঢাকা)। **৪.** একমাত্র **ভণিতা** 'আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ' অর্থে ও **ভাণ**

ছল (pretence) অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** ভাষা-ব্যবহারকারী জীবরূপে মানুষের ভিতরে যে **ভ** বা ভব বিদ্যমান থাকেন, তিনি যখন ভাষার সাহায্যে অন্যদের কিছু জানান, তাকেই **ভণ** করা বলে। তবে কিনা, **দক্ষযজ্ঞের** পরবর্তীকাল থেকে কথা বলে মানুষকে সুপথে পরিচালনা করার চেয়ে বিপথে পরিচালনা করা ক্রমশ কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে **ভণ** করার ভিতরে বিষ ঢুকে পড়ে। **ভণিতা** করা, **ভাণ** করা মন্দকথা হয়ে যায়।

আসলে **ভণ** শব্দের পুনরাবৃত্তি বা আধিক্যের ভিতরেই **ভণ্ডামি**র মূলটি রয়েছে, স্বভাবতই তা **ভাণ**-এ বাহিত হয়ে আসে। একই ব্যাপার ঘটে **ভণিতার** ক্ষেত্রেও। কিন্তু **ভান** শব্দে **ভণ্ডামি**র কোনো মূল দেখা যায় না; কেননা শব্দটি তৈরি হয়েছে **ভা** (শোভা পাওয়া) ক্রিয়া থেকে, যার সহোদর শব্দ হল **সূর্য্য**-বাচক **ভানু**। অতএব **ভাণ** ও **ভান** আদৌ এক শব্দ নয়, সম্পূর্ণ পৃথক দুটি শব্দ, যারা জন্মেছে দুটি পৃথক ক্রিয়া-পরিবারে। তবুও যে **ভান**কেই **ভাণ** বলে চালান হয়, সে কাণ্ডটি ঘটেছে বানান-বিভ্রাট থেকে। **৬.** ইংরেজি vain, vanity একই উৎস থেকে জাত। **ভণ্-ইতি** বা **ভণিতি** আর vanity প্রায় একই কথা।

ভণ্ড (ভণ্ডন, ভণ্ডনা, ভণ্ডামি, ভণ্ডীর, ভণ্ডীরী, ভণ্ডুল) : ১. ✓ভণ্ড্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভণ্ড** = *ভণ-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ভণ্ডন** = **ভণ্ড** *অন (on) যাহাতে।* **ভণ্ডনা** = **ভণ্ডন**-*এর আধার যে।* **ভণ্ডামি** = **ভণ্ড**-*এর আধার গতিশীলভাবে সীমায়িত যাহাতে।* **ভণ্ডীর** = **ভণ্ড**-*ইরণ (গতিশীল রক্ষণ) থাকে যাহাতে।* **ভণ্ডীরী** = **ভণ্ডীর**-*এর সক্রিয় আধার যে।* **ভণ্ডুল** = **ভণ্ড** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* / **ভণ্ড** = পরিহাস করে যে। (ব.শ.)। **৩. ভণ্ড** = নর্ম্মসচিব, ভাঁড়, প্রতারক, ধূর্ত্ত, ব্যর্থ, মিথ্যা। **ভণ্ডন** = প্রতারণা, বঞ্চন। **ভণ্ডনা** = প্রতারণা। **ভণ্ডামি** = ভণ্ডকর্ম্ম, ধূর্ত্ততা, কাপট্য। **ভণ্ডীর** = বটবৃক্ষ, শিরীষবৃক্ষ। **ভণ্ডীরী** = মঞ্জিষ্ঠা। **ভণ্ডুল** = নষ্ট, পণ্ড, ব্যর্থ। (ব.শ.)। **৪.** কপট প্রতারক বা hypocrite অর্থে **ভণ্ড**, ঐরূপ আচরণ অর্থে **ভণ্ডামি** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** যে সত্তা শুধুমাত্র **ভণ** করে না, **ভণ** ডয়ন করে বা বহু কথা বলে নানা রকম কথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে এবং ফলত বিপরীত পক্ষের ক্ষতি হয়, তাকে বলে **ভণ্ড**। **ভণ** ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ও আধিক্যদোষে তার অর্থাদি নষ্ট হয়, ফলত কাজটি আর শুভকাজ থাকে না। **ভণন** করা যখন কিনা রীতিমতো সম্মানীয়, দেখা যাচ্ছে সেই **ভণন** ড-যুক্ত হয়ে **ভণ্**-ড কারী **ভণ্ড** হয়ে গেলেই তা মানুষের চোখে নিন্দনীয় হয়ে যায়। **ভণ্ড**-এর আচরণকে বলা হয় **ভণ্ডামি**। শুধু কি তাই! তদ্রূপ মূলত **ভণ্ড-বৃক্ষ** বা ব্যবস্থাকে সেকালে বলা হত **ভণ্ডীর** বা **বটবৃক্ষ**। শিরীষবৃক্ষেরও একই নাম ছিল। কারও পক্ষে তা ছিল শুভ, কারও পক্ষে ক্ষতিকর। **দ্র. ভদ্র, ভাণ্ড**। ... **৬.** ইংরেজি wand।

ভদ্র : ১. ✓ভন্দ্ (কল্যাণ) + র (রন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভন্** *দান রহে যাহাতে।* / কল্যাণাচারে যাহার পাপ প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ, যে গোপনে পাপ করে ও বাহিরে সদাচারে তাহা **প্রচ্ছন্ন** রাখিয়া পরধন গ্রহণ করে, তাদৃশ ব্যক্তি। (মনুসংহিতা / ব.শ.)। **৩.** কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠ, কুশল, নিপুণ, প্রশস্ত, সাধু, প্রিয়, মনোজ্ঞ, শিব, খঞ্জরীট, বৃষভ, করিজাতিবিশেষ, কদম্ব, যূথীবৃক্ষ, চন্দন, দেবদারু, সুমেরু, জিনবিশেষ, তৃতীয় মনুর অধিকারে দেবগণ, মঙ্গল, আশীঃ, শুভকর, হিত, মুস্তক, কাঞ্চন, (জ্যোতিষে) সপ্তম করণ, সদ্বংশজাত ব্যক্তি, উচ্চশ্রেণীস্থ লোক। (ব.শ.)। **৪.** gentle অর্থে প্রচলিত। **৫.** উপরে ব.শ. **ভদ্র** শব্দের যে সকল অর্থ দিয়ে গেছেন, তা এক কথায় ভয়াবহ। কোথায় 'গুপ্ত-পাপকারী, পাপ-প্রচ্ছন্নকারী, পরধনগ্রাহী' আর কোথায় 'কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠ, কুশল, নিপুণ, প্রশস্ত, সাধু, প্রিয়, মনোজ্ঞ, শিব ...' ইত্যাদি! একই **ভদ্র** শব্দ এমন কদর্থক ও সদর্থক হয় কী করে, কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। হয়তো সেকারণেই **ভদ্রলোক** শব্দটি কোনো অভিধানেই স্থান পায়নি, আজও। কথাটি কি আজকের কলকাতার বাংলাভাষা চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকেরা জানেন না? কী মনে হয়? ... যাকগে, আমরা আমাদের কাজ করি।

ভদ্র শব্দটি সৃজিত হয়েছে **ভন্দ্** ক্রিয়া থেকে। আমরা আগেই জেনেছি, **ভণ্** ক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি বা আধিক্য দোষযুক্ত হলেই **ভন্**-এ পরিণত হয়ে অশুভ হয়ে যায় (**ভণ্** ক্রিয়ার অর্থ দ্রষ্টব্য)। সেই '**ভন্**-দান ক্রিয়া রহে যাহাতে', তাকে **ভদ্র** বলে। বেশ। কিন্তু এই '**ভন্**-দান ক্রিয়া'টি কীরূপ ব্যাপার?

অনুসন্ধান থেকে জানা যায় — এ হল জনসাধারণকে কর্ম্মের কলাকৌশল-জ্ঞান **ভণন** করা বা কর্মবিদ্যা বলে দেওয়া। তার মানে **ভন্দ্-র** বা **ভদ্র** আসলে 'কলাকৌশলজ্ঞান-দানকারী'। তবে কিনা কলাকৌশলজ্ঞানী প্রধানত দুরকম হয় — আবিষ্কারক-অনুগামী কলা-কৌশলজ্ঞানী (= **শিবা**নুগামী) ও আবিষ্কারক-বিরোধী কলাকৌশল-জ্ঞানী (= **দক্ষা**নুগামী); একালের ভাষায় এঁদের যথাক্রমে আবিষ্কারক ও বিশেষজ্ঞ বলে। অতএব, **ভদ্র** শব্দের অর্থ হল — 'কর্মবিদ্যার কথক'। স্বভাবতই সে 'কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠ, কুশল, নিপুণ ...' ইত্যাদি হতেই পারে। কিন্তু সেই **ভদ্র** কেমন করে 'গুপ্ত-পাপকারী, পাপ-প্রচ্ছন্নকারী-পরধনগ্রাহী' হয়ে যায়?

ইতোপূর্বে **অবিদ্যা, ছাগ, জন্তু, পশু** ... প্রভৃতি শব্দে আমরা জেনেছি, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী **দক্ষ**-এর বা বিশেষজ্ঞ-স্পেশালিস্টদের মৌলবাদী না হয়ে উপায় থাকে না, পুনরাবৃত্তিদোষ ও আধিক্যদোষ তাদের ভবিতব্য; সেই দোষ তাদের মানববিরোধী ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। (যে হেভি ইন্ডাস্ট্রির কারণে আমাদের আকাশবাতাস আজ দূষিত, সেগুলি স্পেশালিস্ট বা তাদের অনুগামীরাই চালায়!) তাছাড়া, কর্মজগতে একই কর্মজ্ঞানের প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করলে **উৎপন্ন** ক্রমে একদিন **পণ্যে** পরিণত হতে বাধ্য। আর **পণ্যই** তো **পাপ**। আদিম যৌথসমাজে সেই **পাপ**-আচরণ প্রকাশ্যে করা যেত না। তাছাড়া আদিম যৌথ-সমাজের পরিচালক **শিবা**নুসারী **ভদ্র**রা তো ঘোষণা করেই রেখেছিল — 'পাপাচরণ সনাতন ধর্ম নহে।' ফলত, **শিবা**নুগামীদের সঙ্গে **দক্ষা**নুগামীদের বিরোধ বেধে যায় এবং তার থেকেই ঘটে যায় **দক্ষযজ্ঞ**। আবিষ্কারক-অনুগামী **ভদ্র**রা ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হন, বিশেষজ্ঞ-অনুগামী **ভদ্র**রা ক্ষমতা দখল করে।

পরিণামে, সভ্যসমাজের ক্ষমতাসীন শাসক **ভদ্রেরা** পরস্পরকে সদর্থে **ভদ্র** সম্বোধন করতে থাকেন, শাসিত প্রান্তিক বনবাসী আদিবাসী মানুষেরা এই নতুন ক্ষমতাসীন **ভদ্র**দের চিনে ফেলেন 'পাপকারী, পরধনগ্রাহী' হিসেবে। আর, পরমাপ্রকৃতির লীলার অমোঘ নির্দেশে এই সমগ্র ধারণা বাংলাভাষীদের সমাজমনে আজও ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত বলেই আমরা একদিকে যেমন অত্যন্ত সদর্থে **ভদ্র** শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই, তেমনি কদর্থেও **ভদ্র** শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। মনের গভীরে পরমাপ্রকৃতির সেই লীলার কারণে, এমনকি ১৯৮০ সালেও, কলকাতার মার্কসবাদী অর্থমন্ত্রী সরবে ঘোষণা করে বসেন, তিনি একজন 'কমিউনিস্ট'; 'gentleman' বা **ভদ্রলোক** নন। কেননা, তাঁর ধারণায় gentleman বা **ভদ্রলোক** ভাল কথা নয়। (দ্র. **জন্তু**)। এসব কথা তিনি সব শব্দের ইতিহাস জেনে-বুঝে তবেই বলেছিলেন, আমাদের তা মনে হয় না। কিন্তু ঐ যে, পরমাপ্রকৃতির অমোঘ লীলার কথা বলেছি, যা আমাদের মনের গভীরে ফল্গুধারার মতো সদাসক্রিয়, তার প্ররোচনা তাতে অবশ্যই ছিল। তার প্ররোচনাতেই তো লোকে নতুন নতুন শব্দ হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলে। (দ্র. **বর্ণ**)।

তা সে যাই হোক, আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, এককালে **ভদ্র** কথাটি এতই ভাল কথা ছিল যে, যাঁরা **ভদ্র** পদবাচ্য ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সর্বজনমান্য **শিবা**নুগামী বা 'আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টা-অনুগামী'; কর্মজগতে জনসাধারণ তাঁদের প্রতিটি পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, তাঁদের মাথায় তুলে রাখতেন। সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তাঁরা নিজেদের নামের শেষে **ভদ্র** শব্দটি সেই গৌরবের চিহ্ন রূপে বহন করতে শুরু করেন, যার উত্তরাধিকার বহন করে আজও আমাদের সমাজে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, গৌতম ভদ্র, প্রিয়াংকা ভদ্ররা বেঁচে বর্তে আছেন। (তবে আজকাল এমন কিছু কিছু দেউলিয়া বাংলাজ্ঞানীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যে, বাংলার শব্দ বিসর্জনই তাঁদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা আজকাল আর **ভদ্র** লেখেন না, লেখেন 'বড়রা'। হ্যাঁ, বাংলাতেই 'বড়রা' লেখেন! মানুষের আত্মসম্মানবোধ নিঃশেষে মুছে গেলে তবেই মানুষ এরকম আচরণ করে থাকে।)

তাই বলে আমাদের সমাজ কিন্তু তার আদি অর্জন ভুলে যায় না; **ভদ্র** ও **ভদ্র**-যুক্ত সমস্ত শব্দের উত্তরাধিকার সে কমবেশি বহন করতে থাকে। যথা — **তুঙ্গভদ্রা, ভদ্রক, ভদ্রকার, ভদ্রকালী, ভদ্রকাষ্ঠ, ভদ্রকুম্ভ, ভদ্রদারু, ভদ্রপদ, ভদ্রপদা, ভদ্রপীঠ, ভদ্রবল্লী, ভদ্রমন্দ, ভদ্রমুস্ত, ভদ্রমুস্তা, ভদ্রমৃগ, ভদ্রযব, ভদ্রশ্রী, ভদ্রা, ভদ্রিকা, ভদ্রজংলা, ভদ্রমুখ, ভদ্রস্থ, ভদ্রস্থতা, ভদ্রাভদ্র, ভদ্রালী, ভদ্রাশ্ব, ভদ্রাসন, ভদ্রেশ, ভদ্রেশ্বর, গন্ধভদ্রা, তুঙ্গভদ্রা, বীরভদ্র** ... ইত্যাদি। এমনকি পরবর্তীকালে **ভদ্র**-শব্দ সহযোগে বহু নতুন শব্দও আমাদের পূর্বসূরিগণ বানিয়ে ফেলেন। যথা — **ভদ্রজনোচিত, ভদ্রতা, ভদ্রদস্তুর, ভদ্রমহিলা, ভদ্রলোক, ভদ্রসন্তান, ভদ্রসমাজ, ভদ্রস্থ** ... ইত্যাদি। এগুলি সংস্কৃত শব্দ নয়, পুরনো অভিধানে এদের দেখাও মেলে না। এই শব্দগুলির সঙ্গে এখন যদি **ভদ্র** শব্দের প্রাপ্ত অর্থকে জুড়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়, শব্দগুলির নিহিতার্থ সহজেই বোধগম্য হবে বলে মনে হয়। আমরা নিম্নে কয়েকটি শব্দের ভুক্তি ঘটিয়ে তাদের বিষয়ে কিছু মন্তব্য জুড়ে দিলাম।

তুঙ্গভদ্র (তুঙ্গভদ্রা) : ২. তুঙ্গভদ্র = *তুঙ্গে (চূড়ায় বা শীর্ষে) ভদ্র যাহার।* **তুঙ্গভদ্রা** = **তুঙ্গভদ্র**-*র আধার যে।* **৩. তুঙ্গভদ্র** = মত্তহস্তী। তুঙ্গ (উচ্চ) এরূপ ভদ্র (ভাগ্যবান)। **তুঙ্গভদ্রা** = মহীশূরের অন্তর্গত নদীবিশেষ, ইহা তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন। (ছা.অ.)। **৪.** নদীর নামরূপে প্রচলিত। **৫.** কোনো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে যদি **ভদ্র**-মহোদয়গণ প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করতে থাকেন, তখন তাকে **তুঙ্গভদ্রা** বলা একশোভাগ শব্দশাস্ত্রসম্মত, সন্দেহ নাই। তবে এর সাদৃশ্যে আমরা এমন পর্বতশৃঙ্গের দিকেও আঙুল তুলে দেখাতে পারি, যার মাথাটাকে সাদা বরফে ঢেকে রেখেছে। হ্যাঁ, তাকেও **তুঙ্গভদ্রা** বলা যেতে পারে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নজর করা দরকার। মোগল আমলে ভারতের শেষ হিন্দু রাজত্ব ছিল মহীশূর অঞ্চলে, বিজয়নগর যার রাজধানী ছিল। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই বিজয়নগরের গৌরব ছিল সুবিদিত। প্রাচীন ভারতের প্রায় সমস্ত অর্জনকে ধারণ বহন ও বিকাশ সাধন করেছিল এই বিজয়নগর (বর্তমান নাম 'হাম্পি')। এটি **তুঙ্গভদ্রা**র তীরে অবস্থিত ছিল। এখনও এই অর্জনের মানসিক ও দৈহিক ধ্বংসাবশেষ **তুঙ্গভদ্রা**র চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভদ্রতা : ২. *ভদ্র তারিত যাহাতে তাহার আধার।* **৩.** ভদ্র ভাব বা আচরণ। (স.বা.অ.কলকাতা)। সৌজন্য, আদব-কায়দাসম্মত ভদ্র আচরণ। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** gentlemanliness অর্থে প্রচলিত। **৫.** ছাত্রবোধ অভিধানে বা বঙ্গীয় শব্দকোষে শব্দটি অন্তর্ভুক্তি পায়নি। কেননা, শব্দটি আধুনিক কালের বাংলাভাষীর সৃষ্টি।

ভদ্রকালী : ২ *ভদ্র যে কালী।* **৩.** দুর্গামূর্তিবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** সেকালের যে জনগোষ্ঠী **ভদ্র**গণের (**শিবের**) অনুসরণ ক'রে তাঁদের উপদেশ-নির্দেশাদি অনুসারে কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হতেন, তাঁদের বলা হত **ভদ্রকালী**।

ভদ্রজনোচিত : ৩. ভদ্রলোক-সুলভ, ভদ্রলোকের আচরণীয়, ভদ্রতাপূর্ণ। (স.বা.অ.কলকাতা)। **৪.** gentlemanly অর্থে প্রচলিত। **৫.** এ শব্দটিও আধুনিক বাংলাভাষীর সৃষ্টি। লক্ষণীয় যে, শব্দটির অর্থপ্রদান কালে অভিধানটি দু'বারই **ভদ্রলোক** শব্দটি ব্যবহার করছে, অথচ **ভদ্রলোক** শব্দটিকে পৃথকভাবে ভুক্তি দেয়নি। কোনো অভিধানই **ভদ্রলোক** শব্দটিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। করবে কী করে? করতে গেলে তো মনুসংহিতার বিরুদ্ধে লিখতে হয়! আর মনুসংহিতা কেন **ভদ্র** শব্দের অমন 'কদর্থ' ('কল্যাণাচারে যাহার পাপ প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ, যে গোপনে পাপ করে ও বাহিরে সদাচারে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরধন গ্রহণ করে, তাদৃশ ব্যক্তি।' উপরে ২. দ্রষ্টব্য) দিয়ে গেছেন, তার হদিশ তো ঐ অভিধানকারদের হাতে নেই!

ভদ্রলোক : ২. *ভদ্র যে লোক।* **৪.** gentleman অর্থে বহুল প্রচলিত। **৫.** **ভদ্র** শব্দের অর্থ কী, তা আমরা উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে জেনেছি — 'যিনি কর্মের কলাকৌশল বলে দেন', তিনিই **ভদ্র**। সেরকম **লোকই ভদ্রলোক**, সন্দেহ নেই। তবে **ভদ্র** তো মন্দও হয়! সেকথাও আমরা উপরে **ভদ্র** শব্দের ব্যাখ্যায় জেনেছি।

তাহলে **ভদ্রলোক** বললে তো মন্দচরিত্রের **ভদ্রলোক**ও বোঝাবে? না, **ভদ্র** শব্দের সঙ্গে **লোক** শব্দটি জুড়ে দিলে **ভদ্র** শব্দের মন্দ অর্থ বা অহিত বিনাশ হয়ে যায়। **লোক** শব্দের সেই মহান গৌরবের কথা তাঁরা নিশ্চয় জানতেন, যাঁরা **ভদ্রলোক** শব্দটি তৈরি করেছিলেন। আমাদের ধারণা, ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে যে বাংলাজ্ঞানীগণ **পাটিগণিত, বীজগণিত, মহাকরণ** ... প্রভৃতি শব্দ তৈরি করেছিলেন, তাঁরাই এই **ভদ্রলোক** শব্দটিও তৈরি করে থাকবেন, অন্যথায় এটি পরমাপ্রকৃতির লীলায় সাধারণ বাংলাভাষীর মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়ে থাকবে। এই **ভদ্রলোক** শব্দের নিহিতার্থ যে 'কর্মের কলাকৌশলজ্ঞান-দানকারী'কে বোঝায় তাঁর **শিব**-এর মতো **ভদ্র** ও **লোক**-এর মতো **মহান** না হয়ে উপায় নেই। অর্থাৎ কিনা, **ভদ্রলোক** শব্দটিকে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো ভাল মন্দ যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু তাতে **ভদ্রলোক** শব্দের নিহিতার্থ বদলে যায় না। দ্র. **লোক**।

ভদ্রমহিলা : ৩. ভদ্র বা ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক। (স.বা.অ.কল)। **৪.** lady অর্থে প্রচলিত। **৫.** এটিও আধুনিক বাংলাভাষীর তৈরি করা নতুন শব্দ। ছা.অ. কিংবা ব.শব্দকোষে শব্দটি নেই। এই শব্দটির বিশেষত্ব হল, এতেও **ভদ্র** শব্দের মন্দ অর্থটি নেই। **ভদ্রলোক** শব্দের মতো **ভদ্রমহিলা** শব্দটিও মন্দস্বভাবমুক্ত। দ্র. **মহান, মহিলা**।

ভদ্রালী : ৩. গন্ধালী, গাঁধাল। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. ভদ্র** শব্দের অর্থ নিয়ে যাঁদের মনে সন্দেহ থাকবে, তাঁরা দয়া করে দুটো 'গাঁধাল' পাতা সংগ্রহ করে ফেলুন। এর আদি নাম **গন্ধভদ্রা, গন্ধভাদুলে**। একালে একে 'গন্ধালী' বা 'গাঁদাল'ও বলে। আমাদের শব্দবিদ আদি পুরুষেরা যেভাবে মানসলোকের সমান্তরালে বাহ্য-লোকের সমসত্তাকে চিহ্নিত করে গেছেন, সেভাবেই মানসলোকের **ভদ্রালী**র সমান্তরালে বাহ্যলোকের **ভদ্রালী**কেও চিহ্নিত করেছেন। বাহ্যলোকের **ভদ্রালী** হল 'গন্ধালী', যার ভিতরে 'গন্ধ'গুণ প্রধান হয়ে উঠেছে; মানুষের ভিতরে যারা **ভদ্রালী**, তাদের ভিতরেই সর্বপ্রথম 'গন্ধ'গুণ প্রধান হয়ে ওঠে; 'আমি-আমি-গন্ধ' বা 'আমিষ-গন্ধ' বা ব্যক্তিমালিকানার গন্ধ দেখা দেয়। দ্র. **আমিষ, গন্ধ, নিমিষ** (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪১, ২৬৯, ৬৫১) **মৎস্যগন্ধ, মৎস্যগন্ধ্যা** ইত্যাদি। মনে রাখা ভাল, এই মালিকানার গন্ধ হল সেই গন্ধ, যে **গন্ধ**-তন্মাত্রাত্মক সংঘাত থেকেই বর্তমান সভ্য যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। **দক্ষ**-**ভদ্র**গণের ভিতরেই সেই **গন্ধ**-এর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল সর্বাগ্রে। তার থেকেই আদিম যৌথসমাজ ভেঙে যায়। দ্র. **ভাণ্ড**।

ভদ্রাশ্ব : ৩. জম্বুদ্বীপস্থ নববর্ষের একতম। ইহা ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব্বে অবস্থিত। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যে **অশ্ব ভদ্র**, তাকেই **ভদ্রাশ্ব** বলে, একালের ভাষায় তাকেই 'স্পেশালিস্ট-এগ্‌জিকিউটিভ' বলা হয়ে থাকে। যে সমাজলোকে (সোস্যাল-স্ফিয়ারে) এই **ভদ্রাশ্ব** সারা বছর ধরে সক্রিয় থাকেন, তাকে সেকালের ভাষায় বলা হত **ভদ্রাশ্ব-বর্ষ**। দ্র. **বর্ষ**।

ভদ্রাসন : ২. *(আসনসমূহের মধ্যে)* **ভদ্র** *যে আসন।* **৩.** শ্রেষ্ঠ আসন, নৃপাসন, সিংহাসন, যোগীর আসনবিশেষ, মনোরম শ্রীপর্ণীনির্ম্মিত আসনবিশেষ, বাড়ী, বাস্তু। (ব.শ.)। **৪.** 'বাস্তুভিটা' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **আসন, উপাসনা, বাস্তু**। 'পথের রাজা' যেমন 'রাজপথ', তেমনি 'আসনের ভদ্র' হল **ভদ্রাসন**। শব্দটির বাহ্য অর্থ হল দৃশ্য নানারকম বসবাসক্ষেত্র; অর্থাৎ বসার ক্ষেত্র ও বাসের ক্ষেত্র। তবে শব্দটির প্রধান অর্থ কিন্তু মানুষের অদৃশ্য সামাজিক বসবাসক্ষেত্র, যে সামাজিক অবস্থানে স্থিত হয়ে মানুষ তার সামাজিক কাজকর্ম করে; জীবন কাটায়। কেউ ডাক্তারি বা মাস্টারি করে জীবন কাটান মানেই হল তিনি ডাক্তারি-রূপ বা মাস্টারি-রূপ **ভদ্রাসন**-এ আসীন। সমাজে **ভদ্র**-এর পেশা ও নেশা গ্রহণ করে কালাতিপাত করাই হল **ভদ্রাসন** গ্রহণ করা।

ভদ্রেশ্বর : ৩. শিবপ্রাপ্ত্যর্থ উমারাধিত হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** মানুষের যে উত্তরসূরিগণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষালাভ করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টাদের জ্ঞানের শিলীভূত রূপটির সাধনা করে থাকেন। সেই রূপটিই **ভদ্র**গণের ঈশ্বর।

ভদ্রক : ২. *ভদ্র করে যে; অথবা, যাহা ভদ্র দ্বারা কৃত হইয়াছে।* **৩.** সাধু, দেবদারু, ভদ্রাসন, ছন্দোভেদ। (ব.শ.)। **৪.** উড়িষ্যার একটি স্থাননাম রূপে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫.** মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ভাদ্র (ভাদ্রপদ, ভাদ্রপদা, ভাদ্রপদী, ভাদ্রী, ভদ্রপদ, ভদ্রপদা) : ২. *ভাদ্র = ভদ্র হইতে জাত; অর্থাৎ, যে স্থান-কাল-পাত্রে ভদ্র সক্রিয় থাকে।* / **ভাদ্র** = যাহাতে ভাদ্রী পৌর্ণমাসী আছে। (ব.শ.)। **৩. ভদ্রপদ, ভদ্রপদা** = পূর্ব্বভাদ্রপদা ও উত্তরভাদ্রপদা নক্ষত্র। **ভাদ্র** = বৎসরের পঞ্চম মাস, নভস্য। **ভাদ্রপদ** = ভাদ্রপদীপৌর্ণমাসীযুক্ত মাস, ভাদ্রমাস। **ভাদ্রপদা** = পূর্ব্বভাদ্রপদা নক্ষত্র। **ভাদ্রপদী** = ভাদ্রপদানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী। **ভাদ্রী** = ভাদ্রপদা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী। (ব.শ.)। **৪.** কেবলমাত্র জ্যোতিষচর্চাকারীগণের মধ্যে শব্দদুটির প্রচলন রয়েছে। **৫.** উপরোক্ত শব্দগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, একই কথা নানাভাবে বলা হচ্ছে। ফলত, **ভদ্রপদ** কিংবা **ভাদ্র**, কোনো শব্দেরই নিহিতার্থের নাগাল মেলে না। সেই নাগাল পাওয়ার জন্য সবার আগে **জ্যোতি, জ্যোতিষ** শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া দরকার। তাতে বাহ্যাকাশের **গ্রহ-নক্ষত্রে**র সমান্তরালে সমাজ-আকাশের **গ্রহ** ও **নক্ষত্র**দের হদিশও পাওয়া যায়। তখন বোঝা সম্ভব হয়, যে সময়কালে সমাজের **ভদ্র**গণকে কর্মজগতের সবচেয়ে বেশি দরকার পড়ত, সেটিই **ভাদ্র**মাস। সেকালে কৃষিকাজই ছিল সবচেয়ে অগ্রণী প্রযুক্তির কাজ। সেই কাজ হত শ্রাবণধারা ঝরে পড়ার পরবর্তীকালে। তখন নিসর্গ-প্রকৃতিতে যৌবনের বান ডাকে। সমাজের **ভদ্রাসন**-এ বসে থাকা **ভদ্র**গণ সে সময়ই তাঁদের কর্মের কলাকৌশলজ্ঞান সবাইকে বলে দিতেন; তাই সেই মাসটিকে বলা হয় **ভাদ্র** মাস। শুধু কি তাই! সারা **ভাদ্র** মাস জুড়ে কাজকর্ম করে মাসের শেষ দিনে কর্মের কলাকৌশলের হাতিয়ারগুলোকে নিষ্কৃতি দিতে হবে না! তাই **ভাদ্র**-শেষের দিনটিতেই **বিশ্বকর্ম্মা পূজা** সারতে হত। তবে, এসবই কৃষিপ্রধান সমাজের কথা। ...

কিন্তু এই **ভাদ্র**কে নিয়ে সমাজের অনেক দুঃখও ছিল। ছিল বলেই **ভাদ্র** মাসে নববধূরা আজও স্বামীর বাড়িতে থাকেন না, চলে আসেন বাপের বাড়িতে 'ভাদ্র-কাটাতে'। গ্রামবাংলায় এ রীতি আজও মান্য করা হয়। আর, **ভাদ্র** মাসে কোথাও গেলে ঐ মাসের মধ্যেই

ফিরে আসতে হয়। তাছাড়া, 'ভাসুর-ভাদ্রবৌ' সম্পর্কের ব্যাপারটি তো রয়েছেই। যদিও তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং ব্যাসদেব (তিনিও একজন শিববিরোধী **ভদ্রই** বটে) ভাদ্রবধূ-গমন করেছেন! এসবের মূলে কী রয়েছে, সেকথা এখনও আমরা জানি না।

বীরভদ্র = **২.** / বীরের ভদ্র যাহা দ্বারা। (ব.শ.)। **৩.** অশ্বমেধীয় অশ্ব, বীর ভদ্রতুল্য, বীরশ্রেষ্ঠ, শিবের গণবিশেষ (দক্ষযজ্ঞনাশার্থ শিবের ক্রোধাগ্নি হইতে ইঁহার উৎপত্তি। মতান্তরে, শিবের মুখ হইতে ইঁহার আবির্ভাব। ইঁহার সহস্র মস্তক চক্ষু ও পদ; গলিতরুধির ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইঁহার পরিধান; ইনি অতিভীষণ ও ধনুকুঠারগদাধারী। পুরাণান্তরে শিবের ঘর্ম্ম হইতে ইঁহার উৎপত্তি, বীরণ। (ব.শ.)। মহাদেবের প্রিয় অনুচর। দক্ষকন্যা সতী দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করলে, মহাদেব ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে নিজের মুখ হতে, মতান্তরে ক্রোধাগ্নি হতে, প্রবল পরাক্রান্ত বীরভদ্রের জন্মদান করেন। ... বীরভদ্র সানুচর দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে দেবীর ক্রোধসম্ভূত মহাকালীও বীরভদ্রের অনুগামিনী হন। বীরভদ্র তার রোমকূপ থেকে রৌম্য নামক রুদ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা সৃষ্টি করে, তাদের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ, উৎপাটিত ও দগ্ধ করে সকলকে প্রহার করতে থাকে। ... সে দক্ষের মস্তক ছিন্ন ও দক্ষপত্নীদের প্রহারে জর্জরিত করতে থাকে। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু এসে বীরভদ্রকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন এবং অকৃতকার্য হয়ে দেবগণসহ পলায়ন করেন। ... ব্রহ্মা এসে বীরভদ্রকে স্তুতি করে তার ক্রোধের শান্তি করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এই কাহিনী প্রায় সকল পুরাণাদি গ্রন্থে রয়েছে, বর্ণনার সামান্য হেরফের সহ। সেই বর্ণনাসমূহ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শিবপন্থী **ভদ্র**গণের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের শান্ত করেন স্বয়ং ব্রহ্মা অর্থাৎ সেকালের ব্রহ্মগুণের আধারস্বরূপ ব্যক্তিবর্গ। এবং সেই শান্তকরণের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই 'পূজা' নামক ব্যাপারটির প্রথম প্রচলন সম্ভব হয়। দ্র. **দক্ষযজ্ঞ**।

ভাণ্ড (ভাণ্ডন, ভাণ্ডনা, ভাণ্ডপতি, ভাণ্ডপূর্ণ, ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক, ভাণ্ডবাদন, ভাণ্ডমূল্য, ভাণ্ডা, ভাণ্ডাগার, ভাণ্ডাগারিক, ভাণ্ডান, ভাণ্ডার, ভাণ্ডারিক, ভাণ্ডারী, ভাণ্ডি, ভাণ্ডিক, ভাণ্ডিনী, ভাণ্ডীর —ভাঁড়, ভাঁড়া, ভাঁড়ান, ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ারী, হাঁড়া, হাঁড়ি) : **১.** ✓ভণ্ড্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাণ্ড** = *ভণ্ড হইতে জাত।* ***ভাণ্ডন*** = ***ভাণ্ড*** *অন (on) যাহাতে।* ***ভাণ্ডনা*** = ***ভাণ্ডন****-এর আধার যে।* ***ভাণ্ডা*** = ***ভাণ্ড****-এর আধার যে।* ***ভাণ্ডান*** = ***ভাণ্ডা*** *অন (on) যাহাতে।* ***ভাণ্ডার*** = ***ভাণ্ডা*** *(প্রতারণার ফল) রহে যাহাতে।* ***ভাণ্ডারিক*** = ***ভাণ্ডার****-কে সক্রিয় রাখে যে।* ***ভাণ্ডারী*** = ***ভাণ্ডার****-এর গতিশীল আধার যে।* ***ভাণ্ডি*** = ***ভাণ্ড*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ভাণ্ডিক*** = ***ভাণ্ডি*** *করে যে।* ***ভাণ্ডিনী*** = ***ভাণ্ডি****র অধিকারিনী যে।* ***ভাণ্ডীর*** = ***ভাণ্ড****-এর গতিশীল আধার রহে যাহাতে।* / **ভাণ্ড** = দ্রব্যস্থাপনার্থ যাহা কথিত হয়। (ব.শ.)। **৩. ভাণ্ড** = পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, তৈজসপাত্র, উপকরণ, আধার, গৌণীকণ্ডোলাদি পাত্র, নদীকূলদ্বয়ের মধ্য, বণিকের মূলধন, পণ্যদ্রব্য, চৌর্য্যোপযুক্ত ভাণ্ডাদি, বাদ্যযন্ত্র, ভূষণ, অশ্বভূষা, ভণ্ডভাব, গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ; প্রতারণা করা, ভাঁড়ান, ভুলান। **ভাণ্ডন, ভাণ্ডনা** = প্রতারণা। **ভাণ্ডপতি** = বণিক। **ভাণ্ডপূর্ণ** = পণ্যদ্রব্যপূর্ণ। **ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক** = পণ্যবিনিময়ে দেয় পণ্য। **ভাণ্ডবাদন** = মুরজাদিবাদ্যভাণ্ডবাদন। **ভাণ্ডমূল্য** = পণ্যমূল্যরূপ মূলধন। **ভাণ্ডা, ভাণ্ডান** = প্রতারণা করা, ভাঁড়ান। **ভাণ্ডাগার (ভাণ্ডার)** = গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের গৃহ, ভাণ্ডশালা, ভাঁড়ার, ধনাগার, কোষ। **ভাণ্ডাগারিক (ভাণ্ডারিক)** = ভাণ্ডাগারে নিযুক্ত পুরুষ, ভাণ্ডাগারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ভাঁড়ারি। **ভাণ্ডারী** = ভাণ্ডাগারিক, ভাণ্ডধারী (?), 'ক্ষুরভাণ্ডধারী', নাপিত, ভৃত্যবিশেষ। **ভাণ্ডি, ভাণ্ডিক** = নাপিত। **ভাণ্ডিনী** = মঞ্জুষা। **ভাণ্ডীর** = বটবৃক্ষ, বৃন্দাবনস্থ সপ্তবটের একতম। (ব.শ.)। **৪. ভাণ্ডার, ভাণ্ডারী, ভাঁড়, ভাঁড়া, ভাঁড়ান, ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ারী, হাঁড়া, হাঁড়ি** প্রভৃতি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** গান্ধীর গোপন কথা রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'চরকা' প্রবন্ধে লিখে সকলের সামনে বলে দিলেন, লোকে বলল, 'রবি ঠাকুর তো হাটে **হাঁড়ি** ভেঙে দিলেন'। হিন্দিওয়ালারা বলল, '**ভাণ্ডা** ফোড় দিয়া'। কিন্তু **হাঁড়ি** বা **ভাণ্ড** এলো কোত্থেকে? আমরা তো কই রবীন্দ্রনাথের হাতে **হাঁড়ি** বা **ভাণ্ড** কিছুই দেখতে পাইনি, পাচ্ছি না। তাঁকে লাঠি হাতে সেই **হাঁড়ি** বা **ভাণ্ড** ভাঙতেও দেখতে পাইনি, পাচ্ছি না। আপনারা কেউ কি ওখানে হাঁড়ি, লাঠি, এবং তা দিয়ে হাঁড়ি ভাঙাভাঙি দেখতে পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না! এ তাহলে কেমন **ভাণ্ড** বা **হাঁড়ি**, যা দেখা যায় না কিন্তু থাকে, যাকে সর্বজনসমক্ষে ভেঙেও দেওয়া যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই **ভাণ্ড**কে দেখা যায় না, অথচ তাকে যে ভাঙা হয়েছে, সবাই তা দেখে ফেলে, বুঝে যায়? এ কেমন অলৌকিক **ভাণ্ড** বা **হাঁড়ি**?

ব.শ. বলছেন, এই **ভাণ্ড** হল, 'দ্রব্যস্থাপনার্থ যাহা কথিত হয়'। অর্থাৎ, **দ্রব্য**, যা কিনা অন্যত্র থেকে অর্জন করা গেছে, সেই অর্থসম্পদ (= জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ) রাখার জন্য যে স্থানের কথা **ভণন** করা হয়, তাকেই **ভাণ্ড** বা **হাঁড়ি** বলে। একালের ভাষায় একে বলা হয় 'ব্যক্তিগত মালিকানা', তা সে বাহ্যসম্পদের মালিকানাই হোক আর মানসসম্পদের মালিকানাই হোক। সেই মানসসম্পদের মালিকানার ভিতরে বহু **ঘটে**র কথা, **ঘটনা**র কথা এমনকি 'গোপন পাপাচরণের কথা'ও (দ্র. **ভদ্র**) থাকে। সেই **ভাণ্ড** বা **হাঁড়ি**টিকে সেকালের বাংলাভাষী দেখতে পেতেন, তাকে সকলের সামনে ভেঙে দেওয়াও দেখতে পেতেন, আমরা অতীতহারা বাংলাভাষীরা সে হাঁড়ি দেখতে পাই না। ...

ব্রিটিশের আগমনের সূত্রে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা যখন জানলাম, 'Property means theft', আমাদের যেন দিব্যজ্ঞান লাভ হল! তার শত শত বছর আগেই যে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ জানত, সব **ভাণ্ড** ও **ভাণ্ডারই** একপ্রকার **ভণ্ডামি**র ফলে উদ্ভূত হয়েছে, সেকথা আমরা খেয়াল পর্যন্ত করিনি। তাছাড়া, একটা দেশ, একটা সমাজ, যে কিনা সবার আগে **পণ্য** উৎপাদন ক'রে বিনিময় প্রথার প্রবর্তন করতে পারল, বিশ্বের সকল জাতির আগে নিজের দেশে হাট বাজার বসাতে পারল, লেনদেন শুরু করতে পারল, তার সেসব কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো শব্দ নাই! এমন কি

কখনো হতে পারে?! acquisition, private property, private enterprise, capital, wealth, holdings, possessions, bank ... এসব ধারণা ইংরেজ ভারতে আসার পরই কি আমরা প্রথম জানলাম?! ...

নিশ্চয়ই না। মানসসম্পদের বিন্দুমাত্র অর্জন না করে কোনো জাতি কোনোদিনই বাহ্যসম্পদের প্রকৃত উন্নয়ন সাধন করতে পারে না, পারেনি। আমাদেরও মানসিক ও ভাষাগত উন্নয়ন বাহ্য-উন্নয়নের সাথে সাথেই ঘটেছিল। তারই একটি নিদর্শন এই **ভাণ্ড** ও তজ্জাত উপরোক্ত শব্দগুলি। ইংরেজি private property-র অনুকরণে একালে আমরা 'ব্যক্তিমালিকানা' বলে একটি শব্দ তৈরি করেছি; যা প্রাচীন বাংলায় তো ছিলই না, এমনকি মধ্যযুগের শেষ পাদে কিংবা আধুনিক যুগের শুরুতেও ছিল না। আমাদের দেশীয় শিক্ষা ও ভাষা ভুলে সম্প্রতিকালের কোনো অর্থশাস্ত্রী ও মার্কসবাদী বাংলাভাষী ঐ শব্দটি বানিয়েছেন এবং তারপর থেকে সেটিই চলছে।

অথচ, আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই 'ব্যক্তিমালিকানা'কেই নাম দিয়েছিলেন **ভাণ্ড, মৎস্য** ... ইত্যাদি। এ ছিল অদৃশ্য এক সত্তা। একে দেখা যায় না, বোঝা যায়। অর্থাৎ এ হল সেই 'অদৃশ্য কিন্তু সমাজে ভীষণভাবে সক্রিয়' সামাজিক সত্তা, যাদের চিহ্নিত করে নামকরণ করার রীতি আমাদের পূর্বসূরিগণ বহু প্রাচীন কাল থেকে অনুসরণ করে আসছেন। কার্যত শব্দ সৃষ্টির সেটাই তো কারণ ছিল! সেই **ভাণ্ডে**র সাদৃশ্যে পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, তৈজসপাত্র, উপকরণ, আধার, গৌণীকগোলাদি পাত্র ... ইত্যাদিকেও **ভাণ্ড** নামে শনাক্ত করা হয়। কিন্তু অদৃশ্য লোকে সেই **ভাণ্ডই** তো 'প্রতারণা করা', 'প্রতারিত করে করে যা অস্তিত্বলাভ করতে পেরেছে', সেই 'চৌর্য্যোপযুক্ত **ভাণ্ডাদি**'! সেই **ভাণ্ডই** তো 'নদীকূলদ্বয়ের মধ্য', একালে যাকে বলা হয় bank। এই **ভাণ্ডই** 'বণিকের মূলধন', একালে যাকে বলা হয় capital বা **পুঁজি**। বিশ্বের অন্যান্য জাতি যখন **পণ্য** কী তাই জানে না, **পণ্য** বানানো, লেনদেন করা তো বহু দূরের ব্যাপার, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা তখনই **ভাণ্ডবাদন** শুরু করে দিয়েছেন। তৎকালে এই **ভাণ্ড** নিয়েই আমাদের **ভাণ্ডপতি**গণ তাঁদের **ভাণ্ডক-প্রতিভাণ্ডক** খেলা খেলতে শুরু করে দেন। ক্রমে **ভাণ্ডমূল্য** দিয়ে, **ভাণ্ডন** ও **ভাণ্ডান** ক'রে ক'রে নানা জনের নানা রকমের **ভাণ্ডার** গড়ে উঠতে থাকে; **ভাণ্ডারী** আর **ভাণ্ডিনী**-ধারীতে (**মঞ্জুষা**ধারী বা মানিব্যাগ-ধারীতে) সমাজ ভরে উঠতে থাকে। ক্রমে বৈদিকসভ্যতাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বৌদ্ধযুগের ভারতসমাজ **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, যাকে বিশ্বের আদি শিল্পবিপ্লব বললে অত্যুক্তি হয় না।

তবে ভারতসমাজের এই **রামরাজত্ব** বেশিদিন স্থায়ী হয়নি; বৌদ্ধযুগকে পর্যুদস্ত করে শুরু হয়ে যায় হিন্দুযুগ। **ভাণ্ডপতি**গণের কপালে দুর্দিন নেমে আসে। তাঁদের অনেকেই ঘাঁটি গাড়েন গুজরাট অঞ্চলে, কিছু চলে আসেন এই পোড়া বঙ্গদেশে, আর কেউ কেউ নাকি বাগদাদ পেরিয়ে পাড়ি দেন পাশ্চাত্যের দিকে; যাঁদের উত্তরসূরিরাই নাকি আরও নয়শো বছর পরে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছিল। আর যাঁরা বাংলায় চলে আসেন, শুরুতে তাঁরা কোল পেয়ে যান **পাল** রাজবংশের, **গোপাল-ধর্ম্মপাল-দেবপাল**দের শাসনকালে। আরও পরে তাঁরাই আশ্রয় পান পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায়। সেই মধ্যযুগের বাংলাভাষী অতঃপর তাঁর নিজের মতো করে পুরো **ভাণ্ডন কর্ম্ম**কেই সাজিয়ে নেন। **ভাণ্ড**কে **ভাঁড়** ও **হাঁড়**, **ভাণ্ডা**কে **ভাঁড়া** ও **হাঁড়া**, **ভাণ্ডন**কে **ভাঁড়ান**, **ভণ্ডামি**কে **ভাঁড়ামি** (**ভাঁড়াই, ভাঁড়ামো**), **ভাণ্ডার**কে বা **ভাণ্ডাগার**কে **ভাঁড়ার**, **ভাণ্ডারী**কে **ভাঁড়ারি** (**ভাঁড়ারী**), **ভাণ্ডি**কে **ভাঁইড়** ও **হাঁড়ি** বানিয়ে ফেলেন তাঁরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশের মুখোমুখি হতে না হতেই নিজেদের সেই অর্জনও বাংলাভাষীকে ভুলে যেতে হয়। কেন ভুলে যেতে হয়, সে অনেক কথা; ইতোপূর্বে সেকথা কমবেশি বলাও হয়েছে।

আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে। আমাদের ছিল **ভাণ্ড** ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত ধারণা ও সেই সকল ধারণাধারী শব্দ। তা দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অদৃশ্যলোকের **ভাণ্ডাদি** সহ দৃশ্যলোকের **ভাণ্ডাদি**কেও চিহ্নিত করতে পারতেন, বুঝতে পারতেন। আজ আমরা এমনই দেহবাদী হয়ে গেছি যে, আমরা কেবল দৃশ্যলোকের **ভাণ্ডাদি**কে চিনতে বুঝতে পারি, অদৃশ্যলোকের **ভাণ্ডাদি**কে চিনি না, বুঝি না। অথচ তাদেরকে চেনানোর জন্যই শব্দগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার মানে, যে অদৃশ্য অর্জনকে বোঝানোর জন্য শব্দগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলি হারিয়ে গেছে; কিন্তু তার সাদৃশ্যে যে দৃশ্য অর্জনকে শনাক্ত করা হয়েছিল, সে টিকে রয়েছে বহাল তবিয়তে এবং শুধু তাই নয়, শব্দগুলিকে দখল করে বসে রয়েছে। অর্থাৎ এখানেও সেই একই সমস্যা — প্রেমিক নায়কের চিঠি নিয়ে যে ভৃত্য পত্রবাহকরূপে এসেছিল, নায়িকাকে সেই পত্রবাহকই দখল করে স্বামী-স্ত্রী সেজে বসে আছে, যদিও তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ নেই, প্রেমবন্ধন নেই; নায়ক-প্রেমিক দিশাহারা বেপাত্তা!

ভল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ভল্, ভল্ল, ভল্লক, ভল্লা, ভল্লাত, ভল্লাতক, ভল্লী, ভল্লুক, ভল্লূক, ভাল, ভালবাসা, ভালবাসাবাসি, ভালা, ভালাই, ভালী, ভালু(লূ)ক, ভালে, ভালো, ভাল্লুক, ভিল (ভীল), ভিল্ল, ভিল্লগবী, ভিল্লতরু, ভেলা, ভেলি, ভেল্কি, ভেল্কী, ভৈল, ভৈলা, ভৈলী, ভ্যালা।

ভল্ = ভবের লালন-লয়নের লালন-লয়ন। **ভল্ল** = ভবের লালন-লয়ন যাহাতে।

ভল্ল (ভল্লাত, ভল্লাতক, ভল্লুক, ভালুক) : ১. ✓ভল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভল্ল** = *ভ-এর (ভবের) লালন লালিত যাহাতে; অথবা, ভ-এর (ভবের) লালনরূপ **অভীষ্ট** দান করে যে।* **ভল্লাত** = **ভল্ল**-*এর আধার তারিত যাহাতে।* **ভল্লাতক** = **ভল্লাত** *করে যে।* **ভল্লুক** = **ভল্ল**কে *নবরূপে* **উত্তীর্ণ** *করে যে।* **ভালুক** = **ভাল**কে *(নিম্নে* **ভাল** *দ্রষ্টব্য) নবরূপে* **উত্তীর্ণ** *করে যে।* ৩. **ভল্ল** = ঘাতক, ভল্লুক, শিব, সুহীবৃক্ষ, **সুহীদলসদৃশ**ফলকযুক্ত বাণবিশেষ। **ভল্লাত, ভল্লাতক** = ভেলাগাছ (Semecarpus

Anacardium), ভল্লাতফল, ভেলা। **ভল্লুক** = ভালুক, কুক্কুর, শম্বুকবিশেষ, গুগলি। **ভালুক** = হিংস্র জন্তুবিশেষ (Melursus ursinus)। (ব.শ.)। **৪.** হিংস্র জন্তুবিশেষ **ভালুক** ছাড়া বাকি সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অচ্ছ, ঋক্ষ, বিভীতক**। শব্দার্থের নিরিখে **ভল্ল** হল এমন সত্তা যা ভ-এর ('পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত শাসক-বোধ'-এর — **ভ** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য) পক্ষে শুভ। হিন্দিতে 'বল্লম'কে **ভল্লা** বা **ভালা** বলে; আর **ভল্লার** সাহায্যে **ভ**-এর লালন লালিত বা সুরক্ষিত হতেই পারে। **ভল্লাতক** বৃক্ষকে আমরা যতটুকু জানি, সে হল, এটি সাধারণত ১৪/১৫ ফুট উঁচু বুনো গাছ, এর ফল মানুষ খায় না, আদিবাসীরা এর সরু ডালের দাঁতন ব্যবহার করেন, এর ফল গরু-ছাগল খেয়ে ফেললে তাদের চর্বি জমে যায়। ব.শ. জানিয়েছেন, এটি স্নুহীবৃক্ষও বটে। এই গাছের তলায় একপ্রকার বিন্দু বিন্দু মধু বৃষ্টি হতে থাকে, যা কিনা ইলশে-গুঁড়ির চেয়েও সূক্ষ্ম। ব.শ. সেকারণেই 'স্নুহীবৃক্ষ'কে বলেছেন 'ক্ষীরোদ্গীরণকারিণী' এবং জানিয়েছেন, একে সীহুণ্ড, মনসাসিজ গাছও (milk-hedge plant) বলে। তার মানে, **বিভীতক** যেমন থানা-পুলিশ ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, **ভল্লাতক** তেমনি এমন একপ্রকার প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যা 'ক্ষীর-উদ্গীরণ' করে থাকে। আর, সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে **শিব** ও **বাল্মীকি** জড়িত; অন্যথায় এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থরূপে তাঁদের নাম আসবে কেন?

যাই হোক না কেন, এই **ভল্ল** যে মানুষের পক্ষে শুভবর্ষণকারী একটি সত্তা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই **ভল্ল** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন তা সে আর শুভ থাকে না। হয়ে যায় **ভল্লুক**। সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, **ভল্লুক** হিংস্র হলেও মাংসাশী নয়, সে বৃক্ষের মধু খেতে ভালবাসে। ...

ভাল[১] (ভালবাসা, ভালা, ভালাই) : **১.** ভদ্র > ভল্ল > ভাল। (ব.শ.)। **২. ভাল** = *ভ-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা,* **ভা**-*কে (ভ-এর আধারকে) লালন করে যে।* **ভালবাসা** = **ভাল**তে *বাস যাহার।* **ভালা** = **ভাল**-*এর আধার যে।* **ভালাই** = **ভালা** *সক্রিয় থাকে যাহাতে।* **ভালী** = **ভাল**-*র গতিশীল আধার যে।* **৩. ভাল** = নিরীহ, শান্ত, ন্যায়বান, সাধু, সুশীল, সৎ, সরল, বিষয়-বোধহীন, উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ, বিষয়বিশেষে পণ্ডিত, কুশল, হিতকর (কাজ) ... ইত্যাদি; সুন্দর, অনুরূপভাবে, উত্তমরূপে, শোভন ... ইত্যাদি; মঙ্গল, সঙ্গতি, শ্রেয়ঃকল্প ... ইত্যাদি। **ভালবাসা** = প্রিয় মনে করা, স্নেহ করা, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ। **ভালা** = ভাল, বেশ। **ভালাই** = সাধুতা, মঙ্গল। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** প্রাচীন কালে শব্দসৃষ্টি হত প্রধানত স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে, এবং তা ঘটত সাধারণ ভাষাভাষীর মুখ দিয়েই। সাধারণ মানুষই ঐ নতুন শব্দকে ব্যবহার করে বহন করে নিয়ে চলেন, এবং স্বভাবতই সে সব শব্দের মরণ হয় না। এই ধারা যে এখনও চলছে, তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ এই **ভালবাসা** শব্দটি। প্রাচীন ভাষা সংস্কারের (সংস্কৃতভাষা সৃষ্টির) পর থেকে কিছু কিছু কৃত্রিম শব্দসৃষ্টির চেষ্টা হলেও তার পরিমাণ অতি নগণ্য এবং সেই কৃত্রিম শব্দ কেবলমাত্র অ্যাকাডেমিতে স্থান পায় এবং বাস্তবে তার প্রয়োগের প্রবহমানতা থাকে না। শিল্প-বিপ্লবোত্তর বিশ্বে সেরকম বহু নতুন শব্দের প্রচলন হয় অ্যাকাডেমিতে। সাধারণ ভাষাভাষী অবশ্য সেসকল শব্দের খবর রাখেন না। স্বভাবতই সেরকম শব্দের পরমায়ু খুব কম। আজ আমরা দেখছি, **প্রেম** বোঝাতে যতগুলি শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হল **ভালবাসা**। এবং বাংলাভাষী শব্দটি বানিয়েছেন রবীন্দ্রযুগের প্রারম্ভে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে **ভালবাসা** শব্দটি নেই, এমনকি মধ্যযুগের শেষ পাদে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থেও **ভালবাসা** শব্দটি নেই। এ শব্দটি পুরোপুরি একালের বাংলাভাষীর নিজের সৃষ্টি।

'ভঙ্গে বাস যাহার' তাকে বলে **ভঙ্গবাসা**। এর বাহ্যিক উদাহরণ হল হলুদ, আদা প্রভৃতি। এগুলি নানান বিভঙ্গে জন্মায়, যেনবা তাদের দেহ নানা স্থানে ভেঙ্গে গেছে। তাই এদের **ভঙ্গবাসা** বলা হত। ঠিক সেভাবেই '**ভাল**তে বাস যাহার' তাকে বলে **ভালবাসা**। এই **ভাল**কে আমরা চিনতে পারি **ভল্ল** শব্দে, যে কিনা আমাদের উদ্দেশ্যে 'শুভ বর্ষণ করে'; অর্থাৎ, আমাদের প্রত্যেকের '**ভ**-অস্তিত্বকে লালন করে যে', সেই হল **ভাল**। (দ্র. **ভ** বর্ণের অর্থ)। **৬.** ইংরেজি valediction, valetudinarian, equivalent, valency, vaulor, value ... ইত্যাদি অগুন্তি শব্দ এবং পাশ্চাত্যের স্ক্যান্ডিনেভীয়-পুরাণ কথিত স্বর্গসুখদায়ী স্থান বা স্বর্গ Valhalla। **ভাল** শব্দটির সঙ্গে এই শব্দগুলির কমবেশি রক্তের সম্পর্ক ছিল। তারই ছিঁটেফোঁটা অজানা গলিপথ বেয়ে বেয়ে ঢুকে গেছে পাশ্চাত্যের Valentine Day শব্দটিতে। সম্প্রতিকালের কলকাতার ইংরেজদাস-বাঙালিরা তাকে **ভালবাসা**র দিন হিসেবে পালন করা শুরু করেছেন!

Valentine Day ব্যাপারটি ১৯১০/২০ সালের শিক্ষিত ইংরেজরাও জানতেন না। সেন্ট Valentine কর্তৃক প্রচলিত প্রথারূপে ইংলন্ডের গণ্ডগ্রামের কোথাও কোথাও কেউ কেউ সেটি পালন করতেন। আমাদের **মদনমহোৎসব** বা দোলযাত্রার সঙ্গে সেই Valentine Day-র তুলনা অনেকটা হাতির সঙ্গে সদ্যজাত ইঁদুরছানার তুলনার মতো হয়ে যায়; এতই অকিঞ্চিৎকর ছিল সেই Valentine Day। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইংরেজদের শহুরে নীরস যান্ত্রিক জীবন যখন রসের বা মানসিক অক্সিজেনের অভাবে ভুগতে শুরু করেছে, তখন মানুষের সংস্কৃতির ভিতরে নানারকমের মানসিক অক্সিজেনের খোঁজ পড়ে। ভালমানুষেরা শিল্পপতিদের culture of production-এর ভিতরে তৎসংলগ্ন সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বের প্রাণবাঁচানো 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুনে ফেলেন এবং তার প্রতিকারের ভাবনা ভাবতে শুরু করেন। তাঁরা দেখেন, culture of production-এর যান্ত্রিক জীবন থেকে মানবজীবনের রস বেপাত্তা হয়ে গেছে বলেই মানুষের এই দুর্দশা। এর থেকে বাঁচার উপায় রূপে তাঁরা মানুষের সাংস্কৃতিক উৎপাদন বা production of culture-এর দিকে নজর দেন। তাঁরা যান্ত্রিক শহুরে জীবনে বাধ্যতামূলকভাবে অভ্যস্ত শুষ্ক মানুষকে মানসিক অক্সিজেন দেওয়ার জন্য গ্রাম থেকে মানবজীবনের সেকেলে, প্রায় অপ্রচলিত, রসাল ও রসসম্ভব আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাগুলিকে তুলে আনতে শুরু করেন। প্রান্তিক জীবনের রসকথা উঠে আসতে শুরু করে শহুরে যান্ত্রিক জীবনের পরিসরে। Paul Du Gay তাঁর সম্পাদিত *Production*

of Culture / Culture of Production গ্রন্থে দেখাচ্ছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালখণ্ডে গ্রামজীবনের প্রাণরস, মাঠ-ময়দানের গরুচরানো প্রান্তিকদের রাখালিয়া গান (রক ইত্যাদি) থেকে শুরু করে ছোট্ট প্রান্তিক শহরের সুন্দরী প্রতিযোগিতা পর্যন্ত সমস্ত অযান্ত্রিক জীবনের রস-ব্যাপারগুলি ক্রমান্বয়ে উঠে আসতে শুরু করে শহুরে যান্ত্রিক নীরস জীবনের শুষ্ক পরিসরে। সেই সময়েই একইভাবে উঠে আসছিল Valentine Day-র প্রথা। ...

কিন্তু পুঁজি-ব্যাপারীরা বসে থাকে না। যে-পুঁজি ব্যাপার করতে গিয়ে যান্ত্রিকতার চূড়ান্ত ব্যবহার করে শহুরে জীবনকে নীরস করেছে, সেই **পুঁজি** যখন দেখল গ্রাম থেকে রস এসে শহরে বিকোচ্ছে, সে ভাবল, মন্দ কী! এতকাল মানুষকে নীরস করে পুঁজি বৃদ্ধি করা গেছে, এবার উল্টোরথের পালা শুরু করা যাক — রসের-বিনোদিনী সাজলে কেমন হয়! স্বভাবতই সে গ্রামজীবনের ঐ আগম্যমান প্রাণরসকেও নব নব উদ্যোগের সাহায্যে উৎপাদন ক'রে, পুনরুৎপাদন ক'রে বিক্রি করার ব্যবসা শুরু করে দিল! ফলত, Valentine Day বা **ভালবাসা**র-দিনের 'প্যাকেট' বিক্রি হতে শুরু করে; এবং ক্রমে ২০০০ সালে পৌঁছাতে না-পৌঁছাতেই Valentine Day-ও তাদের ব্যবসার লাভজনক পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের দিশাহীন বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ব-ব্যাপারীদের সেই 'প্যাকেট-করা' **ভালবাসা**র-দিন নিয়ে নাচতে শুরু করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের স্বভাবের সঙ্গে এই স্থান-কাল-পাত্রে সীমিত **ভালবাসা** আদৌ খাপ খায় না। খাপ খেয়ে যাবে যদি সমগ্র উপমহাদেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি মানুষের জীবনকে লন্ডন কিংবা নিদেনপক্ষে বোম্বাই শহরের মানুষের জীবনের মতো নীরস যান্ত্রিক জীবনে রূপান্তরিত করে ফেলা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে যাঁরা যে পরিমাণে Valentine Day উদ্‌যাপন করেন, তাঁরা ততখানি ভাগ্যহত। তাঁদের জীবন থেকে **ভালবাসা** প্রায় হারিয়ে গেছে বলেই Valentine Day-র নামে তাঁদের এই আনুষ্ঠানিক **ভালবাসা-ভালবাসা** খেলার আয়োজন, আত্মবঞ্চনার আয়োজন। এঁরা করুণার পাত্র। রসগোল্লাকে রস থেকে তুলে কুলায় রেখে একমাস ধরে রোদে শুকিয়ে নিলে যে বস্তু পাওয়া সম্ভব, এঁরা সেইরকম হতভাগ্য মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা করেছিলেন, 'রসে-বশে রাখিস মা।' এঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে পরমাপ্রকৃতির রস ও বশ উভয় থেকেই বঞ্চিত।

সবশেষে একথা বলে রাখা দরকার যে, কোনো কোনো আবেগকে বিষয়ীভূত করে বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ প্রথা আমাদের দেশেও পালিত হয়ে থাকে। **মদনমহোৎসব** (দোলযাত্রা, হোলি) সারা বসন্তকাল ধরে চলে, সেকারণে তাকে **বসন্তোৎসব** বলা হয়ে থাকে। বিশেষ একটি দিনেও তার প্রতিষ্ঠা আছে, যেদিনটিকে 'হোলি' বলা হয়। ভাইফোঁটার একটি বিশেষ দিন আছে, কিন্তু ভাইয়ের প্রতি প্রেম শুধু ঐ একটি দিনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আমাদের প্রথাগুলিতে বিশেষ ও সমগ্রের, খণ্ড ও অখণ্ডের একপ্রকার দ্বৈরাজ্য আছে। ইংরেজদের সাম্প্রতিক Valentine Day নিয়ে যে আচার-অনুষ্ঠান চলছে, তা কিন্তু সম্পূর্ণতই খণ্ড-স্বভাব দোষে দুষ্ট। এবং সেকারণেই ব্যাপারীদের পক্ষে তাকে অনেক সহজে ব্যবসার **পণ্যে** পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

ভষ্ (ভস্, *ভিষজ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ভষ্, ভষ, ভষক, ভষল, ভস্, ভসকা, ভসন, ভসম, ভসিত, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী, ভস্ম, ভস্মক, ভস্মকীট, ভস্মকূট, ভস্মগুণ্ঠন, ভস্মধারণ, ভস্মপ্রিয়, ভস্মমেহ, ভস্মরেণু, ভস্মরোগ, ভস্মললাটিকা, ভস্মলোচন, ভস্মসাৎ, ভস্মস্নান, ভস্মান্ত, ভস্মাবশেষ, ভস্মীকরণ, ভস্মীকৃত, ভস্মীভাব, ভস্মীভূত, ভাস্মন, ভিষক্(জ্), ভিষক্প্রিয়া, ভিষক্বর, ভিষক্বিৎ, ভিষজ্, ভেষজ, ভেষজগার, ভৈষজ, ভৈষজযজ্ঞ, ভৈষজ্য, ভৈষী।

ভষ্ (ভস্, ভিষজ্) = ভবের দিশাগ্রস্ত (শক্তি) বিচ্ছুরণ। **ভষ** = ভবের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **ভস** = ভবের নির্য্যাস বিচ্ছুরিত যাহাতে। **ভিষজ** = গতিশীল ভবের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ জনিত যাহাতে।

ভস্ম (ভস্মপ্রিয়, ভস্মীভূত) : ১. ✓ভস্ + মন্ (মনিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **ভস্ম** = *যাহাকে* **ভস্** *(ভবের নির্য্যাস) রূপে মনন করা হয়।* **ভস্মপ্রিয়** = **ভস্ম** *প্রিয় যাঁহার।* **ভস্মীভূত** = **ভস্ম** *রূপে* **ভূত** *(আবির্ভূত বা পরিণত) যে।* **৩.** **ভস্ম** = দগ্ধকাষ্ঠবিকার, ছাই, দেহে লেপনার্থ ভস্ম, ভূতি, অশ্মরীবিকার। **ভস্মপ্রিয়** = শিব। **ভস্মীভূত** = অভস্ম ভস্মে পরিণত। (ব.শ.)। **৪.** ash অর্থে **ভস্ম** ও burnt to ashes অর্থে **ভস্মীভূত** প্রচলিত, **ভস্মপ্রিয়** অপ্রচলিত। **৫.** ছিল বরফ, তাতে আগুনের তাপ দেওয়া শুরু হল, বরফ হয়ে গেল জল; কিন্তু সেখানেই সে থাকল না, একসময় বাষ্প হয়ে উবে গেল। হল কীভাবে? তাপের সংযোগে। ... **ভবে**র এই যে তত্ত্ব, যা কিনা বরফ থেকে বাষ্প পর্যন্ত যাত্রার ঘটনাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার পরও মনের ভিতরে মননে ঘটনা-বিযুক্ত হয়ে ধরা থাকে, তাকে বলে **ভস্ম**। এ হল জগতের ছাই, 'জগতের সার'; জগতের অস্তিত্বের ও বিকাশের নিয়মের সারতত্ত্ব, তাই 'জগতের সার'। একেই **ভস্ম** বলে। (দ্র. **অশ্ম**)।

তবে কিনা, এ হল অদৃশ্যলোকের প্রকৃত **ভস্ম**। সাদৃশ্যে দৃশ্য-লোকের দগ্ধকাষ্ঠ-বিকারকেও **ভস্ম** বলে, সে হল জগতের বাহ্যদেহের **ভস্ম** বা ছাই। অদৃশ্যলোকের প্রকৃত **ভস্ম** আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টাগণের বা **শিব**সত্তার অত্যন্ত প্রিয়। তাঁরা পূর্বতন পুরুষদের অর্জিত সমস্ত সারকথার **ভস্ম** উপভোগ করে তার থেকে নতুন জ্ঞানকর্মের অগ্নি প্রজ্বলিত করে কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করেন। সেইকারণে **শিব**কে বা আবিষ্কারক-উদ্ভাবকদেরকে **ভস্মপ্রিয়** বলা হয়। এঁরা **ভস্ম** বা 'ছাই' (ash — **অশ্**) বহন করেন না, মাখেন; অর্থাৎ, জগতের তত্ত্বসকল উপভোগ করেন। বিশ্বাস না হলে **শিব**সত্তার যে বাহ্যরূপ **বৃষ** বা 'ষাঁড়', তার দিকে একটু নজর রাখুন, দেখবেন — **যেখানেই** সে ছাইগাদা দেখতে পায়, সেখানেই গিয়ে সিং দিয়ে **পা দিয়ে** সেই ছাইগাদা লণ্ডভণ্ড করে সারা গায়ে মাখছে। হ্যাঁ, জগতের **তত্ত্ব স্বরূপ** যে ভস্ম, আবিষ্কারক-উদ্ভাবকেরা তা মাখেন; কিন্তু **বিশেষজ্ঞরা** তা মাখেন না, বহন করে নিয়ে চলেন। সেই কারণে **শিবকে** বা

আবিষ্কারক-উদ্ভাবকদেরকে **বৃষ** বলে এবং **দক্ষ**কে বা বিশেষজ্ঞদেরকে **অশ্**বহনকারী **অশ্ব** বলে। দ্র. **বিভূতি**। (এ বিষয়ে আরও বিস্তারে জানার জন্য আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

ভা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপ্রতিভ, অসভ্য, আভর, আভা, আভাতি, নিভা, প্রতিভ, প্রতিভা, প্রভা, প্রভাকর, প্রভাত, প্রভাবতী, বিভা, বিভাত, বিভাবরী, বিভাবসু, ভ, ভা, ভাঁতি, ভাত, ভাতঘুম, ভাতপানি, ভাতা, ভাতানি, ভাতার, ভাতারআউলী, ভাতারকামড়া, ভাতারখোর, ভাতারখাগী, ভাতারনড়, ভাতারপুত, ভাতারী, ভাতার্ত্তি, ভাতি, ভাতুড়ে, ভান, ভানু, ভানুকন্যা, ভানুবংশ, ভানুবার, ভানুমতী, ভানুমান, ভানুসুত, ভাল, ভালচন্দ্র, ভালদর্শন, ভালনয়ন, ভালপট্ট, ভালভাগ, ভাললোচন, ভ্যাপসা, সন্নিভ, সপ্রতিভ, সভা, সভাখণ্ড, সভাজন, সভাসদ, সভাস্থ, সভ্য, সুপ্রভ, সুপ্রভা, সুপ্রভাত।

ভা = ভবের আধার (প্রকাশিত) যাহাতে। (ভ্ = সর্ব্বদিকে দীপ্তি প্রকাশপূর্ব্বক শোভা পাওয়া। তদ্রূপে শোভা পায় যে = **ভা**।)

ভা (আভা, নিভা, প্রতিভা, প্রভা, প্রভাকর, প্রভাত) : ১. ✓ভা + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *ভা = ভ-এর (ভ-বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য) আধার যে; অথবা, সর্ব্বদিকে কিরণপ্রকাশপূর্ব্বক শোভা পায় যে।* ***আভা*** *=* ***ভা****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***নিভা*** *= নির্গত* ***ভা*** *যাহা হইতে।* ***প্রতিভা*** *=* ***প্রতি*** *যে* ***ভা****।* ***প্রভা*** *= প্রকৃষ্ট* ***ভা*** *যাহার।* ***প্রভাকর*** *=* ***প্রভা*** *করে যে।* ***প্রভাত*** *= প্রকৃষ্ট* ***ভা*** *তারিত যাহাতে।* / **প্রভা** = যাহার দ্বারা দীপ্তি সবন করা হয়। **প্রভাকর** = দীপ্তি করে যে। **প্রভাত** = প্রকৃষ্ট ভাত যাহাতে। (ব.শ.)। **৩. ভা** = দীপ্তি, শোভা, প্রভা, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, শঙ্কুচ্ছায়া, সূর্য্য, নক্ষত্র; প্রীতিকর হওয়া, পছন্দ হওয়া, ভাল লাগা, রুচিকর হওয়া, প্রিয়রূপে প্রকাশ পাওয়া, শোভা পাওয়া, ভাল বলিয়া বোধ হওয়া, যুক্তিসঙ্গত বোধ হওয়া, প্রতিভাত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া, প্রতীয়মান হওয়া। **আভা** = দীপ্তি, প্রকাশ, সাদৃশ্য, প্রতিবিম্ব, ছায়া, বাতরোগ-বিশেষ। **নিভা (নিভ)** = নির্ব্বাপিত করা, মৃদু বা স্নিগ্ধ করা, নির্ব্বাণ হওয়া, (সাদৃশ্যে) বিলুপ্ত হওয়া; অতীব ভাসমান, সদৃশ, ব্যাজ, ছল, প্রকাশ। **প্রতিভা** = দীপ্তি, বুদ্ধি, নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। **প্রভা** = দীপ্তি, কিরণ, কান্তি, করচ্ছটা, কুবেরপুরী, দুর্গা, সূর্য্যপত্নী, অপ্সরোভেদ। **প্রভাকর** = সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, সমুদ্র, অর্কবৃক্ষ, শিব, মীমাংসাকারবিশেষ। **প্রভাত** = ভাতিযুক্ত, প্রাতঃকাল, অবসান। (ব.শ.)। **৪.** light অর্থে **আভা**, genius অর্থে **প্রতিভা**, মেয়েদের নাম রূপে **প্রভা**, ছেলেদের নামরূপে **প্রভাকর**, এবং morning অর্থে **প্রভাত** প্রচলিত। **ভা** ও **নিভা** অপ্রচলিত। **৫. ভ** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, 'পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত আমিত্ববোধ-যুক্ত যে কোনো দ্বৈরাজ্যিক অস্তিত্ব'কে **ভ** বলে। এর সরল অর্থ হল, 'যে শোভা পাচ্ছে'। তার ঐরূপ শোভা-পাওয়া ক্রিয়াকে বলে **ভা**। এর জন্য তাকে আপন অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে হয়। আলোর সাহায্যে সেই প্রকাশ ঘটে থাকলে, সেই আলোই **ভা**-এর আশ্রয়। তাই তাকে **আভা** বলে।

নিভা শব্দটির বেলায় অর্থটি নানাভাবে বদলে যায়। তার কারণ হল **নি** উপসর্গের নানার্থ (দ্র. **নি**)। প্রথমত, **ভা**-এর আগে নিঃশেষিত **নি** যুক্ত হলে, সেটি স্বভাবতই 'নির্ব্বাপিত করা', 'মৃদু বা স্নিগ্ধ করা', 'নির্ব্বাণ হওয়া' এমনকি 'বিলুপ্ত-হওয়া'-কেও বোঝাতে পারে। কিন্তু, **ভা**-এর সঙ্গে অনুকারী-**নি** যুক্ত হলে, সে স্বভাবতই বোঝাবে 'অতীব ভাসমান', 'প্রকাশ' ইত্যাদিকে। আবার, **ভা**-এর সঙ্গে নির্গত **নি** যুক্ত হলে, সে বোঝাবে 'সদৃশ'কে। তবে সেক্ষেত্রে সাধারণত **নিভ** শব্দটি মূল শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়রূপে যুক্ত হয়, যথা **দুগ্ধফেননিভ**; অর্থাৎ, দুগ্ধফেন নির্গত হয়ে যে শোভা পাচ্ছে। আগের কালে মেয়েদের নাম হত **নিভাননী**। এর অর্থ ছিল, নির্গত শোভা আননে যাহার। একালের ভাষায় বললে বলতে হয় 'দীপ্তিমুখী'। **নিভাননী**র মতো এত ভাল নাম বাদ পড়ে গেছে লোকে শব্দটির মানে ভুলে গেছে ব'লে। অবশ্য **আভা, নিভা, প্রভা, প্রতিভা, বিভা** ... এসব নাম এখনও কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, যদিও সেগুলির অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হারিয়ে গেছে।

প্রতিভা শব্দটি অত্যন্ত ভাল শব্দ। এর অর্থও অতীব মনোহর। এর যে সকল ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, সেগুলির প্রত্যেকটির অর্থই **প্রতিভা** শব্দের অর্থের তুলনায় নিকৃষ্ট মানের। বিশ্বে যা কিছু প্রকাশিত বা **ভাত** হয়ে রয়েছে, তার প্রতিরূপ ধরা থাকে **প্রতিভায়**। **প্রতিভাধর** মানুষ মাত্রেই জগতের **ভাত** সত্তাগুলির নিয়মাদি জানতে পারেন, আবিষ্কার করে নিতে পারেন, জানাতে পারেন, সেই নিয়মাদি জানতে পারার কারণে নব নব সৃষ্টি করতে পারেন; কারণ, তাঁদের মনে **ভা**-এর প্রতিরূপ ধরা দিয়ে থাকে। সেই কারণে **প্রতিভাকে** 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি' বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে এই **প্রতিভাকে** বলা হয় keen intelligence, presence of mind, inventive or creative faculty, genius, glow, brillance। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিই **প্রতিভার** অংশবিশেষকে প্রকাশ করে থাকে।

প্রভা শব্দের বেলায় আমরা দেখছি, শোভা পাওয়ার যতরকম উপায় বা পদ্ধতি রয়েছে, তার **প্রকৃষ্ট** উপায়টি গ্রহণ করে **ভাত** হয় যে, তাকে বলে **প্রভা**। এটি যিনি সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারেন, তাঁকেই তো **প্রভাকর** বলে! কদমফুলের মতো **সূর্য্যের** সর্বমুখী কিরণরেখার দিকে তাকালেই কথাটি মালুম হতে পারে।

প্রভাত-এর বেলায় সেই **প্রভার**ই তারিত রূপটিকে আমরা দেখে থাকি। বিশ্বের সকালটাই প্রকৃষ্টরূপে **ভাত** হয়। তাতে আলো আছে, তাপ নাই; অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে অথচ রৌদ্রের দাবদাহ আসেনি।

ভাত (ভাতা, ভাতার, ভাতারকামড়া, ভাতারখোর, ভাতারখাগী, ভাতারনড়, ভাতারী) : ২. **ভাত** = *ভা (উপরে* ***ভা*** *দ্র.) তারিত যাহাতে; যাহা (অন্নরূপে) শোভা পায়।* ***ভাতা*** *=* ***ভাত****-এর আধার যে।* ***ভাতার*** *=* ***ভাতা*** *রহে যাহাতে।* ***ভাতারী*** *=* ***ভাতারকে*** *সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে।* **৩. ভাত** = সিদ্ধ তণ্ডুল, অন্ন, অন্নপ্রাশন, ভাতের মতো ফোঁড়ার মা'জ, জীবিকা; দীপ্তি পাওয়া, প্রকাশ পাওয়া,

শোভা পাওয়া। **ভাতা** = বেতন ভিন্ন কর্ম্মচারীকে অন্যত্র যাতায়াত ইত্যাদির নিমিত্ত দেয় বৃত্তি (allowance)। **ভাতার** = পতি (স্ত্রীভাষায়)। **ভাতারকামড়া, ভাতারখোর** = যে স্ত্রী স্বামীকে কামড়াইয়া থাকে, অর্থাৎ ছাড়িতে চায় না। (সে যে থাকে দূরে, তবু নাকি মোরে, লোকে বলে ভাতারখোর; তুই যে ভাতারকামড়া, তুই আবার অন্য লোককে দিবি?) **ভাতারখাগী** = সধবার প্রতি অকল্যাণসূচক গালি। **ভাতারনড় (ভাতারনুড়ি, ভাতারনোড়)** = যে স্ত্রী স্বামী ছাড়ে, অর্থাৎ এক স্বামী ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করে। **ভাতারী** = ভর্ত্তৃমতী, ভাতার-আউলী। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি গ্রামবাংলায় কমবেশি যথার্থে প্রচলিত থাকলেও অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত। অ্যাকাডেমিতে boiled rice অর্থে **ভাত** এবং ration money অর্থে **ভাতা** প্রচলিত। ৫. **ভাত** শব্দটির উৎস দেখাতে গিয়ে ব.শ. সংস্কৃত 'ভক্ত', প্রাকৃত 'ভত্ত' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ভাতের পিণ্ডকে **ভক্তপুলাক**, ভাতের মাড়কে **ভক্তমণ্ড** ... ইত্যাদি বলে। অর্থাৎ, **ভক্ত** থেকে 'ভত্ত' এবং সেখান থেকে **ভাত** শব্দটি প্রসূত হয়েছে। 'ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা ... দিজ্জই কন্তা, খা পুণবন্তা' — এই প্রাচীন বাংলা কবিতাটি 'ভত্তা' শব্দের পক্ষে সাক্ষ্যও দিয়ে থাকে। একথা স্বীকার করে নিয়েও আমাদের মনে হয়েছে, শুরুতে এভাবেই **ভাত** শব্দটি প্রসূত হয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে শব্দটি পরিবার বদল ক'রে চলে যায় **ভা** শব্দ পরিবারে। যে 'ওগ্‌গর ভত্তা' বাংলাভাষীকে তার ক্ষুধার পরম প্রাপ্যরূপে প্রতি**ভাত** করে, তাকে সে **ভাত**রূপেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকবে। সেই **ভাত**-এর আধারই তার কাছে **ভাতা** বলে মনে হয়েছে। আর, যে সত্তা সেই **ভাত** সরবরাহ করার মূল হোতা, তাকে সে চিহ্নিত করে **ভাতার** বলে। যে '**ভাত** দেওয়ার **ভাতার** নয়, কিল মারার গোঁসাই' তাকে সে **ভাত** দেওয়া না-দেওয়া দিয়েই শনাক্ত করে।

ব.শ. **ভাতার** শব্দের ব্যবহার দেখাতে মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন — 'নিয়ে যাবু পারিজাত পাঠায়ে ভাতার'; 'বুড়া মোর ভাতার'; 'কর্ম্ম করাইতে ভাল পেয়েছি ভাতার'; 'তুই শিবের ধান ভাঙ্গিলি, ভাতার তো নয় তোর'; 'ভাতার বলি ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুরকে, বড়দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়'। এর পর ব.শ. জানাচ্ছেন, "এখন এই শব্দ স্ত্রীভাষায়ও ব্যবহৃত হয় না, ইহা অশ্লীল; কিন্তু উদ্ধৃত অংশগুলিতে 'স্বামী' শব্দের মতো উহার প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্‌লায় ইহার ভূরিপ্রয়োগ।"

আমরা কিন্তু দেখেছি, গ্রামবাংলার মানুষ আজও **ভাতারকামড়া, ভাতারখোর, ভাতারখাগী, ভাতারনড়, ভাতারী** প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করে থাকেন; যদিও অ্যাকাডেমিতে এসব শব্দকে 'অশ্লীল' বলে দেগে দিয়ে তাদের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মেয়েরা তো অনায়াসে 'দেওরভাতারী' (দেবরের সঙ্গে শোয় যে), 'কামলাভাতারী' (মজুরের সঙ্গে শোয় যে) ... ইত্যাদি গালাগালি দিয়ে থাকে। এই শব্দগুলিকে সার্বিকভাবে বাদ দিয়ে দেওয়ার ফলে বেশ কিছু বাস্তব ব্যাপারকে বলার মতো শব্দ এখন আর আমাদের নাই। শহরের তথাকথিত শিক্ষিতের দুনিয়ায় অফিস-কাচারিতে উপরওয়ালা-গামিনী বা 'বশ-ভাতারী' (boss-ভাতারী) নারীর সংখ্যা ও অধস্তন কর্মচারিণীদের পাকেচক্রে শয্যাসঙ্গিনী হতে বাধ্য করা বা 'বশ্যা-গামী' পুরুষের সংখ্যা কি দিন দিন রমরমিয়ে বাড়ছে না? অথচ তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য 'বশ-ভাতারী' বা 'বশ্যা-গামী'র মতো কোনো শব্দ এখন নেই আমাদের। প্রাচীনকালে এই ক্ষেত্রে আমাদের 'কিন্নরী' ও 'শূদ্রাগামী' জাতীয় শব্দ ছিল। এখন তাও নেই। এসব ব্যাপারে এখন আমরা ইংরেজি ভাষার সাহায্য নিয়ে থাকি। কারণ, সমাজে ব্যাপারগুলি তো ঘটছে, তা বলার জন্য শব্দের প্রয়োজন তো পড়ছেই। আমাদের বিচারে সাঁড়াশি জাতীয় হাতিয়ারের যেমন শ্লীল-অশ্লীল বিচার চলে না, শব্দের তেমনি শ্লীল-অশ্লীল বিচার চলে না। তার একটিই বিচার, সে মনোভাব বহন করতে পারছে কি না, মনোভাব বহনের হাতিয়ার কি না। দ্র. **শ্লীল, পুরুষডাকিনী**।

ভান (ভানু, ভানুকন্যা, ভানুবংশ, ভানুবার) : ১. ✓ভা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভান** = **ভা** *(সর্ব্বদিকে কিরণপ্রকাশপূর্ব্বক শোভা পাওয়া) অন যাহাতে।* **ভানু** = **ভান** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. **ভান** = দীপ্তি, সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ, প্রকাশ, জ্ঞান, ভাতি, অনুমান, বিভ্রম, ব্যপদেশ। **ভানু** = কিরণ, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, প্রভু, রাজা, বিষ্ণু, ভানুমতির পিতা যাদববিশেষ, বৃকভানু, বৃকভানুকন্যা রাধিকা, সহদেবের পত্নী ভানুমতি। **ভানুকন্যা** = যমুনা। **ভানুবংশ** = সূর্য্যবংশ। **ভানুবার** = রবিবার। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই এখন অপ্রচলিত। এমনকি আজকাল **ভানু** নামটিও কেউ রাখে না। ৫. যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো একটি সত্তা তার সবদিকে দীপ্তির প্রকাশ ঘটিয়ে নিজেকে **বিদ্যমান** বলে ঘোষণা করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আর যাই হোক, **সূর্য্য** নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে খানিকটা উপরে অধিষ্ঠান করে তার দীপ্তি প্রকাশ করছে, খানিকটা শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত তখনই তাকে বলা হয় **ভানু**। এই **ভানু** হল মানবসমাজের কেন্দ্রীয় সত্তা, মানব-সম্প্রদায়ের 'পালের গোদা' নামক একটি গোষ্ঠী ও তার ক্রিয়াকলাপ। একালের কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত রূপগুলিকে — সকল মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, পার্লামেন্ট, আইনসভা, স্বরাষ্ট্র-খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ... ইত্যাদি সবকিছুকে — একত্রে সন্নিবিষ্ট করে যদি একটি হাজার মানুষের গোষ্ঠীকে বুঝি, সেই গোষ্ঠীর ক্রমপশ্চাৎ স্বরূপগুলিকে কল্পনা করতে করতে যদি আমরা এর আদি রূপে পৌঁছে যাই, তখন যে রূপটিকে দেখতে পাই, তাকেই **ভানু** বলে। তার মানে, একালের **অধিরাষ্ট্র** ও **রাষ্ট্রে**র আদিরূপের শাসককে বলা হত **ভানু**। তারই সাদৃশ্যে আকাশের সূর্য বা sun-কেও **ভানু** বলা হত। দ্র. **অর্ক**।

ভাল[১] (ভালচন্দ্র, ভালদর্শন, ভালনয়ন, ভালপট্ট, ভাললোচন) : ১. ভা + ✓লা (গ্রহণ) + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভাল** = *ভা-এর (শোভমান সত্তার) লালন (গ্রহণ) থাকে যাহাতে।* **ভালচন্দ্র** = *কপালে চন্দ্র যাহার।* **ভালদর্শন, ভালনয়ন, ভাললোচন** = *কপালে দর্শন/নয়ন/লোচন যাহার।* **ভালপট্ট** = *কপালে পট্ট যাহার।* / **ভালচন্দ্র** = যাহার ললাটে চন্দ্র। (ব.শ.)। ৩. **ভাল** = ললাট, তেজঃ, ভাগ্য, সৌভাগ্য, শিরোদেশ। **ভালচন্দ্র** = শিব, গণেশ।

ভালদর্শন, ভালনয়ন, ভাললোচন = 'ললাটনেত্র', শিব। **ভালপট্ট** = ললাটফলক। (ব.শ.)। ৪. সবগুলিই অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কপাল, ভাগ্য**।

সভা (সভ্য, সভ্য-ভব্য, অসভ্য) : ১. সহ + ✓ভা + অ (ড) - অধিকরণে + স্ত্রী আ। (ব.শ.)। ২. *(**সভ** = একত্রে শোভা পায় যে বা যাহারা।) **সভা** = **সভ** -এর আধার যে। **সভ্য** = **সভ** থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, সহযোগীরূপে শোভা পাওয়া থাকে যাহাতে বা যে যোগ্যতায়। **সভ্য-ভব্য** = সভ্য ও ভব্য (দ্র. ভূ) যে। **অসভ্য** = **সভ্য** নয় যে। /* **সভা** = যাহা সজ্জন দ্বারা ভাত; যেখানে সকলে মিলিতভাবে শোভা পায়। (ব.শ.)। ৩. **সভা** = পরিষদ্, সভাস্থ জন, মন্দির, অমাত্যাদিদর্শনগৃহ, নগরাদিতে নিয়ত জনসমূহস্থান, উপবেশন-স্থান, সঙ্ঘাত, দ্যূত, সভাপর্ব্ব। **সভ্য** = সভায় সাধু বা নিপুণ, সভায় সাধু অর্থাৎ ধার্ম্মিক ও কার্য্যদর্শনাভিজ্ঞ, সভোচিত (বাক্য), সামাজিক, পারিষদ, বিচারনিযুক্ত পুরুষ, ধর্ম্মাধিকরণিক, সাধু, ব্রাহ্মণ, দ্যূতকারক, সভিক, পঞ্চাগ্নির একতম। **সভ্য-ভব্য** = শান্ত-শিষ্ট। **অসভ্য** = সভায় অসাধু, অসামাজিক, সভার অযোগ্য (স্ত্রীবর্ণনাদি), অশিষ্ট, নীচ, বর্ব্বর, কুৎসিত, অশ্লীল (শব্দাদি), খল। (ব.শ.)। ৪. meeting অর্থে **সভা**, member ও civil অর্থে **সভ্য**, gentle অর্থে **সভ্য-ভব্য**, এবং uncivil অর্থে **অসভ্য** শব্দটি প্রচলিত। ৫. **সভা** কাকে বলে সেকথা সবাই জানেন, কিন্তু যেটি অনেকেই জানেন না, তা হল এটি একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং এমনকি বিদ্যাসাগর মশাই পর্যন্ত কোনো সভাকে কিছু জানাতে হলে লিখতেন — '... অমুক ... সভাদেবী সমীপেষু'। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি চলে আসছে। আসলে **সভা** তো বহুজন-এর আধার, আর শব্দশাস্ত্রের নিয়মে আধারশক্তি মাত্রেই যেহেতু প্রকৃতি, অতএব স্ত্রীলিঙ্গ। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে **পুং** শব্দের ব্যাখ্যায়।

সবাই জানেন, **সভার** প্রত্যেক সদস্যকে **সভাটির সভ্য** বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতেই সব কথা বলা হয়ে যায় না। একত্র হতে গেলে, কতকগুলি নিয়মনীতি মানতে হয়। সজারুদের অতিসংহতি সজারুদের পক্ষে বিপজ্জনক। আধুনিক মানুষদেরও একত্রিত হতে গেলে তাদের প্রত্যেকের মনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাঁটাগুলিকে ছেঁটে নিতে হয় কিংবা সেই কাঁটাগুলির মুখে মধু মাখিয়ে নিতে হয় অথবা সেগুলি ভোঁতা করে নিতে হয়; অন্যথায় নির্দিষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে একত্রিত হতে হয়। তেমন হলে তবেই একজন মানুষ একটি **সভার সভ্য** হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যে ব্যক্তি তার সেই স্বাতন্ত্র্যের কাঁটা খাড়া করে রাখে ও অন্যদের আহত করে, তাদের **অসভ্য** বলে। রবীন্দ্রনাথ এই 'স্বাতন্ত্র্যের কাঁটা'কে বলেছেন 'স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা'। বিষয়টি যাঁরা ভাল করে জানতে চান, তাঁদের অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 'বসন্তযাপন' নিবন্ধটি পড়তে হবে। আমরা এখানে একটু পরেই তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যা **সভ্য** ও **ভব্য** দুটি শব্দকেই বুঝতে সাহায্য করবে।

যাই হোক, তাহলে দেখা যাচ্ছে, **সভ্যকে সভ্য** হতে গেলে কেবল **সভার** সদস্য হলেই চলে না, নিজেকেও ছেঁটে-ছুঁটে অন্যদের সঙ্গে একত্রে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। ইংরেজিতে যেহেতু প্রতিটি গুণের জন্য আলাদা শব্দ লাগে, সেই কারণে এরূপ **সভ্যকে** বোঝাতে তাদের member, courteous, polite, civil, mannerly, refined, elegant, civilized — এতগুলি শব্দ লাগে। এমনকি civil society বলে যে কথাটি সম্প্রতি চালু হয়েছে, তার বিপরীতে যেন আগে থেকেই সভ্যসমাজ শব্দটি তৈরি হয়ে আছে। এখনকার বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য সে মানেও ভুলে গেছেন, তাই তাঁরা আজকাল 'সিভিল-সোসাইটি' শব্দটিই ব্যবহার করে থাকেন।

সভ্য-ভব্য শব্দটির নিহিত অর্থের দিকে তাকালেই আমরা এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্টরূপে বুঝতে পারব। জগতে আবির্ভূত হলেই **ভব** হয় বটে, কিন্তু তাকে টিকে থাকতে গেলে পারিপার্শ্বিক সত্তাসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়; অন্যথায় **ভব**-এর মরে ভূত হয়ে যেতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না। তার মানে, মানুষ হিসেবে **ভবনশীল** (= **ভব্য**) হতে গেলে জগতের অন্যান্য **ভবদের** সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয় এবং **সভার** সদস্য হিসেবে **সভনশীল** (= **সভ্য**) হতে গেলে **সভার** অন্যান্য **সভ্যদের** সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। অর্থাৎ, **সভ্য**-হওয়া মানে সমাজের বা **সভার** অন্য মানুষদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, এবং **ভব্য**-হওয়া মানে জগতের অন্য জীবদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। **সভ্য-ভব্য** শব্দের এই নিহিতার্থ ভুলে গিয়ে এখন আমরা তাকে শুধুমাত্র 'শান্ত-শিষ্ট' ভাবি; ঠিক যে-আচরণ আমরা **আশেপাশের** মতো জোড়শব্দগুলির ক্ষেত্রে করে থাকি।

অসভ্য শব্দের বেলায় কিন্তু **সভ্য** শব্দের সব অর্থগুলিকে ধরাই হয় না, শুধুমাত্র তার স্বাতন্ত্র্যের কাঁটা মোলায়েম করা হয়েছে কি না, সেই দিকটাকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয়। সেই সুবাদে যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাঁটা মোলায়েম করেনি, তাকেই **অসভ্য** বলা যেতে পারত। কিন্তু তাও বলা হয় না। যে সকল প্রকৃতিসংলগ্ন সরল বন্য ও গ্রাম্য মানুষের মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাঁটাই জন্মায়নি, এবং সে-কারণেই যে ব্যক্তি তথাকথিত **সভার সভ্যদের** মতো সজারুসদৃশ নয়, তাকেই **অসভ্য** বলা হয়ে থাকে। বিষয়টি বিস্ময়কর হলেও সত্যি! এসব বিষয় রবীন্দ্রনাথ কত নিখুঁতভাবে বুঝতেন, তার সামান্য নিদর্শন দিয়ে আমরা পরবর্তী শব্দে চলে যাব।

"... বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। ... পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে, 'আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ — আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি'? কেন সে এ কথা বলে না 'আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে — স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে'? ..." (*বসন্তযাপন / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*)

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা মানুষই **ভব্য**; সমাজের সকলের সঙ্গে বা **সভার** সকলের সঙ্গে

সামঞ্জস্য বিধান করে চলা মানুষই **সভ্য**। দুইয়ে মিলে মানুষ **সভ্য-ভব্য** হয়।

ভাষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনৃতভাষ, অবভাষণ, অভিভাষণ, আভাষ, আভাষণ, আভাষিত, আভাষ্য, কলভাষ, বাংলাভাষা, বিভাষা, ভাখ, ভাখন, ভাখা, ভাষ্, ভাষ, ভাষক, ভাষণ, ভাষা, ভাষাপত্র, ভাষাবিভ্রাট, ভাষারামায়ণ, ভাষাসম, ভাষিত, ভাষিতা (ভাষিতৃ), ভাষিণী, ভাষী, ভাষ্য, ভাষ্যকার, ভাস্‌স, মিতভাষী, সম্ভাষণ, সম্ভাষিত, সুভাষ, সুভাষিত, সুভাষী, হাহাভাষ।

ভাষ্ = ভবের আধারের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ (প্রকাশন)। **ভাষ** = ভষ হইতে জাত; ভবের আধার দিশাগ্রস্ত রূপে বিচ্ছুরিত যাহাতে।

ভাষক (ভাষণ, অবভাষণ, অভিভাষণ, আভাষ, আভাষণ, আভাষিত, কলভাষণ) : ১. ✓ভাষ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ভাষক*** = ***ভাষ*** *করে যে।* ***ভাষণ*** = ***ভাষ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***কলভাষণ*** = ***কল-কল*** *করে যে* ***ভাষণ*** *নিঃসারিত হয়।* **৩. ভাষক** = কথয়িতা, বক্তা। **ভাষণ** = কথন, বচন। **অবভাষণ** = বিরুদ্ধভাষণ, নিন্দন, কথন, বাদ। **অভিভাষণ** = অভিমুখে (সমক্ষে) কথন, সম্ভাষণ, সভায় সভ্যগণের সম্মুখে সভাপতির বক্তব্য বিষয়। **আভাষ** = সম্ভাষা, আলাপ, গ্রন্থের ভূমিকা, মুখবন্ধ, পূর্ব্বভাব। **আভাষণ** = সম্ভাষা, অভিভাষণ, সম্বোধন। **আভাষিত** = আলপিত, কৃতসম্ভাষণ, উক্ত, কথিত। **কলভাষণ** = মধুরাস্ফুট ভাষা, শিশুর আধ-আধ কথা। (ব.শ.)। **৪. ভাষণ, অভিভাষণ, আভাষ** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. ভা**-এর শোভা পাওয়া বা প্রকাশিত হওয়ার কথাটি আমরা এতক্ষণ ধরে বলে আসছি বটে, কিন্তু প্রকাশ তো কেবল রূপের (আলোর) দিক থেকে বা একভাবে হয় না, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধের মাধ্যমেও হয়। শব্দের মাধ্যমে **ভা**-এর প্রকাশ হলে তাকে বলা হয় **ভাষ**। তার মানে শোভনসত্তা আওয়াজের সাহায্যে যখন আত্ম-প্রকাশ করে, তখন সেইরূপ প্রকাশনকে **ভাষ** বলে। সেই **ভাষ** করেন যিনি, তিনিই **ভাষক**। তাঁর সেই **ভাষ** অন (on) থাকে **ভাষণ**-এ। **অব, অভি, আ** প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত হয়ে সেই **ভাষণ** তার দিক্‌বদল করে, আরও বিশেষ বিশেষ দিকে দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়। ... দ্র. **পরিভাষা (পরি)**।

ভাষা : ১. ✓ভাষ্ + অ - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***ভাষ****-এর আধার যে; যাহার সাহায্যে* ***ভাষণ*** *করা হয়।* **৩.** বাক্য, বচন, কথা, ধ্বনি, সংস্কৃত, প্রাকৃত — মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী মাগধী প্রাচ্যা আবন্তী এই পঞ্চ উপভাষা, দেশপ্রচলিত উপভাষামাত্র, বঙ্গদেশ-প্রচলিত বাক্য, বাঙ্‌লা, (ব্যবহারে) পূর্ব্বপক্ষ, পারিভাষিক শব্দ, রাগিণীবিশেষ ...। (ব.শ.)। **৪.** language অর্থে **ভাষা** প্রচলিত। **৫. যা কিছু** ভাত হয় তাই **ভা**। এই **ভা**-এর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ হল ভাষ্। সেই ভাষের আধার যে, তাকে বলে **ভাষা**। সহজ করে বললে, শোভমান সত্তা আপনাকে যে শব্দসমূহের (আওয়াজসমূহের) মাধ্যমে প্রকাশ করে তাকেই **ভাষা** বলে। তার মানে, যে কোনো সত্তা থেকে নির্গত আওয়াজ মাত্রেই **ভাষা**, তা সে জড়সত্তা থেকে নির্গত আওয়াজ হোক আর জীবসত্তা থেকে নির্গত আওয়াজই হোক। অর্থাৎ, জড় জীব সকলেরই নিজ নিজ মনোভাব বহনকারী **ভাষা** রয়েছে। পাহাড়ের পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ কিংবা গাছের ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজ তাদের ব্যথা-প্রকাশক আওয়াজই বটে; আমরা সেগুলির মর্ম বুঝতে পারি আর নাই পারি। পশুপাখিদের ডাকও তাদের নিজ নিজ **ভাষাই** বটে। তবে আমরা এখানে মানুষের **ভাষা** নিয়েই কথা বলব।

মানুষ যে সকল শব্দোচ্চারণ করে নিজ নিজ মনোভাব লেনদেন করে, সেই শব্দোচ্চারণসমূহকে তার **ভাষা** বলে। অর্থাৎ মানুষের মনোভাবের শাব্দিক **বাহন** হল তার **ভাষা**। আমরা বাংলাভাষীরা যে **ভাষার** সাহায্যে মনোভাব লেনদেন করি, সেটিকে **বাংলাভাষা** বলে। সেই **ভাষাতেই** এই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে, সেই **ভাষাতেই** এখন আমরা কথা বলছি। একালের পণ্ডিতেরা বলেন, আদি বিশ্বে নাকি ইন্দো-ইউরোপিয়ান, সেমেটিক .... ইত্যাদি নামে মোট ১৬টি মূল ভাষা ছিল। সেগুলিই অজস্র শাখায় বিভাজিত হয়ে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলেজুলে বিশ্বের মোট ৫০০০ রকমের মানুষী-ভাষার জন্ম দিয়েছে। সারা বিশ্বের ৫০০০টি ভাষাগোষ্ঠী সেই ৫০০০টি ভাষায় কথা বলে থাকেন। ভাষাবিদগণের মতে, সম্প্রতি আবার উলটোরথের পালা শুরু হয়েছে। ভাষার দুনিয়ায় নাকি মড়ক লেগেছে, তাতে ভাষাগুলির কারও কারও মৃত্যু ঘটছে। আগামী ৫০ বছরে নাকি বিশ্বের অর্ধেক ভাষাই হারিয়ে যাবে। (আমাদের 'ঋ' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে '*ভুবনগাঁয়ে ভাষাযুদ্ধ*' শীর্ষক অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

আমরা কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকদের এই বহুভাষার তত্ত্ব মানি না। আমাদের গবেষণা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, আদিতে মানবজাতির একটিই ভাষা ছিল এবং তার একরকমই **বোধন** (বা পাঠ) ছিল। পরে (**দক্ষযজ্ঞের** পরে) সেই ভাষার **বোধন** (পাঠ) দুরকম হয়ে যায় — ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক বোধন (পাঠ) ও প্রতীকী বোধন (পাঠ)। অতঃপর মানবজাতির আদিম যৌথসমাজ বিচূর্ণীভূত হয়ে অজস্র সমাজখণ্ডে পরিণত হতে থাকে; আর তার ভাষার প্রতীকী বোধনও (পাঠও) সমাজের বিচূর্ণীভবনের সমান্তরালে বিচূর্ণীভূত হতে থাকে এবং ক্রিয়াভিত্তিক বোধনের (পাঠের) বিস্মৃতি ঘটতে থাকে। এভাবে মানবসমাজ তার আদি অবস্থান থেকে যত দূর দেশ ও কালের দিকে এগিয়ে গেছে, তদনুযায়ী তার সামাজিক বিচূর্ণীভবন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এবং তার **ভাষার** প্রতীকী বোধনের (পাঠের) বিচূর্ণীভবনও সমান তালে বেড়েছে। ফলে, সমাজখণ্ডগুলির **ভাষার** প্রতীকী বোধনগুলি যেমন পরস্পর থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, এমনকি একেবারেই আলাদা বলে প্রতীয়মান হয়, হতে থেকেছে; তেমনি তাদের নিজ নিজ অতীত থেকেও তারা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই দেখে একালের অতীতহারা ভাষাপণ্ডিত ভাবেন, ভাষাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, আলাদা, ৫০০০ রকমের। (উপরোক্ত **'ঋ'** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। আমরা কিন্তু নিশ্চিত রূপেই জানি, ১০০০ বছর আগে

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মানুষ প্রায় এক ভাষাতেই কথা বলতেন, ২৫০০ বছর আগে (বুদ্ধের কালে) ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত মানুষ পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারতেন; ৩৫০০ বছর আগে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মানুষেরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারতেন। (না বুঝলে কি আমাদের রবিবার বা সূর্যবার এবং সোমবার বা চন্দ্রবার ইউরোপের sunday বা সূর্যবার ও monday বা চন্দ্রবার ... ইত্যাদি হত?)। তবে এসব বিষয়ে কথা বলতে গেলে পৃথক প্রবন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সেদিকে যাব না, আমরা কেবল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইয়ের '*বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন*' নিবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দেব যে, বিশ্বমানবের ভাষা যে একটিই ছিল, এবং তার যে দু'রকম **বোধন** বা পাঠ ছিল, সে বিষয়ে আমাদের অতীতপুরুষেরাও কমবেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখছেন —

"... আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ভাষায় যে-ছন্দে একটি কবিতা আছে, ঠিক সেই ছন্দে পালি ভাষাতেও সেই কবিতা আছে এবং প্রাকৃত ভাষাতেও সেই ছন্দে সেই কবিতাটি আছে। এইরূপে 'ধর্ম্মপদ' নামে যে বইখানি আছে, তাহা একটা সংস্কৃত, একটা পালি, এবং একটা প্রাকৃত — তিন ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখন এই যে তিনটা জিনিস, ইহাকে তিনটা ভিন্ন ভাষা বলিব কী? আমার বোধ হয়, না বলাই ভালো। আমরা উহাকে পাঠ বলিব।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাকে 'পাঠ' বলছেন, আমরা দুজন তাকেই 'বোধন' বলছি। সবাই তো পড়তে পারে না, কিন্তু বলতে শুনতে পারে, বুঝতে পারে। একটি ভাষা যে শব্দার্থবোধের নিয়মে বলা বা শোনা ও বোঝা হয় কিংবা (লিখিত থাকলে) পাঠ করে বোঝা হয়, সেটিই সেই ভাষার **বোধন**-প্রক্রিয়া বা 'পাঠ'-প্রক্রিয়া। যে কোনো ভাষার পণ্ডিত ও সেই ভাষায় কথা-বলা রিকশাওয়ালা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুনতে বুঝতে পারেন এই জন্য যে, তাঁদের বয়ানের **বোধন**-প্রক্রিয়া বা 'পাঠ-প্রক্রিয়া' এক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই নিজেই তার প্রমাণ দাখিল করছেন এইভাবে —

"এবং তাহার প্রমাণও আছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' ১৭ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে আছে —

ভাষা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ।
সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব তত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে।।

অর্থাৎ ভাষা চার রকম, প্রত্যেকেরই দুই রকম করিয়া পাঠ; একটার নাম সংস্কৃত, আর-একটা পাঠের নাম প্রাকৃত।"

তার মানে, আমরা যাকে বলছি 'ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক বোধন' ও 'প্রতীকী বোধন', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তাকেই যথাক্রমে 'সংস্কৃত পাঠ' ও 'প্রাকৃত পাঠ' বলছেন। কিন্তু এভাবে বলায় 'সংস্কৃত পাঠ' ও 'প্রাকৃত পাঠ'-এর মর্মার্থ নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে কোনো ভাষার বয়ানকে ও তার শব্দগুলিকে বোঝাই তো 'সংস্কৃত পাঠ' এবং প্রতীকী শব্দার্থবিধির সাহায্যে কোনো ভাষার বয়ানকে ও তার শব্দগুলিকে বোঝাই তো 'প্রাকৃত পাঠ'! যাই হোক, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, **ভাষা**র দুরকম বোধন বা পাঠ ছিল, একথা সেকালের মানুষেরা জানতেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও জানতেন। তাই তিনি উপরোক্ত কথাগুলি লিখে গেছেন। কিন্তু ভরত-নাট্যশাস্ত্র 'ভাষা চাররকম' বলছেন কেন? হরপ্রসাদ বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন —

"তাহা ২৬-এর শ্লোকে আছে —

অভিভাষার্য্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্ত্তিতা।।

অর্থাৎ ভাষা চারিটি — অভিভাষা, আর্য্যভাষা, জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা। অভিভাষা কাহাকে বলে? — অভিভাষা তু দেবানাং। আর্য্যভাষা কাহাকে বলে? — আর্য্যভাষা তু ভূভুজাম্। এই ভাষার লক্ষণ কী? সংস্কৃতপাঠসংযুক্তা সম্যক্ গ্রামপ্রতিষ্ঠিতা। অর্থাৎ উহাতে সংস্কৃত পাঠই বেশি এবং বড়ো বড়ো গ্রামে উহা প্রতিষ্ঠিত।"

যে ভাষায় দেবতাগণ কথা বলেন, তার নাম 'অভিভাষা'। এখন আমরা **দেবতা**র অর্থ জানি, **অভিভাষা** শব্দের অর্থও জানি। সেই সুবাদে এই 'অভিভাষা' হল সমাজের উচ্চাসনে বসে বলা কথাবার্তা (দ্র. **অভি**); এতে ভাষার কোনো স্বভাবগত বদল ঘটে না। অতএব 'অভিভাষা' কোনো পৃথক ভাষা নয়, প্রচলিত ভাষাই কাব্যাদিতে সমৃদ্ধ হয়ে জ্ঞানচর্চার যোগ্য হয়ে উঠলে তাকে 'অভিভাষা' বলে। আর, একালের ভদ্রলোকদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা ভাষার মতো সেকালের ভদ্রলোকদের মুখ দিয়ে বেরোনো ভাষাকেই যে 'আর্য্যভাষা' বলা হত, তা নিয়ে সংশয় নাই। আর, সে ভাষার যে 'সংস্কৃত পাঠ' বা 'ক্রিয়াভিত্তিক বোধন'ই অধিক, প্রতীকী বোধন কম, তা নিয়েও আমাদের সংশয় নেই। কেননা, বেদপুরাণাদি গ্রন্থগুলি এবং বৌদ্ধগণের কিছু কিছু আদি গ্রন্থ তো ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের নিয়মেই লেখা; সেভাবেই তো সেগুলি পড়তে হয়; সেকথাই তো আমরা এতদিন ধরে বলে আসছি। এমনকি ঐ 'অভিভাষা' ও 'আর্য্যভাষা' যে বড় বড় **গ্রামে** প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়েও সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, আজকের দেবতারা ও ভদ্রলোকেরা যেমন একালের শ্রেষ্ঠ বাসস্থানগুলিতে (সিলিকন ভ্যালি থেকে সল্টলেক পর্যন্ত শহর ও নগরগুলিতে) বাস করেন, সেকালের দেবতারা ও ভদ্রলোকেরাও তো তেমনি সেকালের শ্রেষ্ঠ বাসস্থানগুলিতেই (অর্থাৎ **গ্রামেই**) থাকতেন (দ্র. **গ্রাম, গণ্ডগ্রাম**)। সুতরাং 'অভিভাষা ও আর্য্যভাষায় সংস্কৃত পাঠই বেশি এবং বড় বড় গ্রামে উহা প্রতিষ্ঠিত' — কথাটি যথার্থই বটে। কিন্তু 'জাতিভাষা' কী? হরপ্রসাদ জানাচ্ছেন —

"জাতিভাষা কাহাকে বলে? —

বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতা।।

অর্থাৎ জাতিভাষা বিবিধ, তাহাতে অনেক ম্লেচ্ছশব্দ থাকিবে। কিন্তু সে ভাষা ভারতবর্ষেরই ভাষা।"

তার মানে, শাসিতের ভাষাই জাতিভাষা। এতেও ভাষার কোনো স্বভাবগত বদল ঘটে না, ঘটেনি। এই ভাষাতেই সেকালের শাসিতগণ কথাবার্তা বলতেন। স্বভাবতই এতে অনেক শাসকবিরোধী 'ম্লেচ্ছশব্দ' ছিল, কিন্তু তাই বলে তা মানুষের ভাষার এলাকার বাইরে নয়। একই ভাষার শিষ্ট-রূপ ব্যবহার করেন সেই ভাষায় কথা-বলা শাসক ও ভদ্রলোকেরা, আর সেই ভাষার অশিষ্ট-রূপ ব্যবহার করেন সেই ভাষায় কথা-বলা শাসিতেরা। (**ভদ্র** শব্দের অর্থ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় — পুরাণাদিতে যে ব্যাপারকে 'আর্য্যোৎপত্তি', 'দক্ষোৎপত্তি' ইত্যাদি বলা হয়, তাকেই ভদ্রোৎপত্তি বলা যেতে পারে। একালেও

ভদ্রলোকদের আমরা 'আর্য্য' বলে সম্বোধন করতে পারি; করি না কারণ 'আর্য্য' শব্দের মানে ও ব্যবহার দুটোই ভুলে গেছি। এমনকি মধ্যযুগের সাহিত্যেও তো 'আর্য্য' শব্দটি সেভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে।) তা সে যাই হোক, অভিভাষা, আর্য্যভাষা ও জাতিভাষা যে একই ভাষা, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু জাত্যন্তরী ভাষা? হরপ্রসাদ জানাচ্ছেন —

"আর, জাত্যন্তরী ভাষা কাহাকে বলে? —

অথ জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশূদ্ভবা।

নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্ম্মিপ্রয়োগজা।।

জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামে পাওয়া যায়, বনে পাওয়া যায়, পশুদের মধ্যে পাওয়া যায়। এমন-কি, বিহঙ্গদের মধ্যেও পাওয়া যায়।"

এইখানে ছিল বিপদের সম্ভাবনা এবং সে বিপদটিই ঘটেছে। তা হল এখানে **গ্রাম, বন, পশু, বিহঙ্গ** শব্দগুলিকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থের নিয়মে (অর্থাৎ সংস্কৃত পাঠের নিয়মে) পাঠ করা উচিত। তাতে বোঝা যেত যে ঐ **পশু** animal নয়, ঐ **বিহঙ্গ**ও bird নয়। তাহলেই বোঝা যেত, ভরতনাট্যশাস্ত্র ঠিক কী বলতে চেয়েছেন। আর, *ভরতনাট্যশাস্ত্র* তো ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মান্য করে লেখা একটি গ্রন্থই বটে! কিন্তু তা সত্ত্বেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশাইও বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে, ঐ **পশু** ও **বিহঙ্গ** যথাক্রমে animal ও bird-ই বটে! তার মানে, তিনিও ভরতনাট্যশাস্ত্রের উপরোক্ত বয়ানের 'প্রাকৃত পাঠ' করে ফেলেছেন, 'সংস্কৃত পাঠ' করেননি। ফলে, তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে যে, জাত্যন্তরী ভাষা animal-bird-রাও বুঝত। একথা মেনে নিলেই আর একটি অসম্ভব কথাও মেনে নেওয়া হয়ে যায়। সেকথাটি হল, সভ্যতার যতখানি অগ্রগতি ঘটলে একটি জাতি 'ভরতনাট্যশাস্ত্র'-এর মতো গ্রন্থ লিখবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে, সেই জাতির অগ্রণী চিন্তাবিদগণ সেই একই সময়ে বিশ্বাস করেন যে, পশুপাখিরাও মানুষের ভাষা ব্যবহার করতে পারে! এ তো এক সাঙঘাতিক ভুল! যাই হোক, এর পরও ভরতনাট্যশাস্ত্র থেকে হরপ্রসাদ জানাচ্ছেন —

"জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কী? —

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতং।

সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্।।

অর্থাৎ জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার দুই রূপ পাঠ আছে; এক সংস্কৃত, আর প্রাকৃত। ইহা চারি বর্ণের মধ্যেই চলে।

মোটামুটি এই-সকল কথা বলিয়া, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে হইবে, 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে' তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। ... ...

এসব হইল জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা। ইহারো দুই রূপ পাঠ — সংস্কৃত ও প্রাকৃত। আর তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, শৌরসেনীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে; মাগধীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে; আবন্তীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে; এইরূপ সব জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, দুই রূপ পাঠ আছে।

অভিভাষা ও আর্যভাষার পাঠ সংস্কৃতেই অধিক। যিশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বে আর্যাবর্তে ভাষার এইরূপ একটা বিভ্রাট ছিল; তাহার উপর একটা পাঠেরও বিভ্রাট ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একটা ভাষা বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেইরূপ কেহ বুঝিত না। **সকল জাতি বা সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা করিয়া পাঠ ছিল। ইহাতে বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে' বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তাহারো দুই রকম পাঠ ছিল**। ... " (মোটা হরফ আমাদের)

"সুতরাং আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে একটা মত চলিতেছিল যে, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা সকল দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত। ইতর প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, আর্যাবর্তে সমস্ত দেশের লোকই তাহা বুঝিতে পারিত। সে ভাষা যে কী, তাহা জানিবার উপায় নাই। ..." ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' / দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৩।)

এখানে দেখা যাচ্ছে, এমনকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পর্যন্ত ভরতনাট্য শাস্ত্রের উপরোক্ত বয়ানের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি। পারলে তিনি লিখতে পারতেন না, "ইহাতে বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে' বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তাহারো দুই রকম পাঠ ছিল।" কথাটি তো ঠিকই, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তারও দু'রকম পাঠ ছিলই তো! কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, সেকালে 'বন্য পক্ষী' বলতে forest-bird-কে বোঝাত না, হাটবাজারের দোকানদারকে বোঝান হত। আর, তাদের ভাষাতেও যে 'সংস্কৃত' (ক্রিয়াভিত্তিক) ও প্রাকৃত (প্রতীকী) শব্দ ছিল, তাতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। থাকবে কী করে! বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে মূর্খ বাংলাভাষীর মুখে কি আমরা এখনও ভূরি ভূরি 'সংস্কৃত' (ক্রিয়াভিত্তিক) শব্দ শুনতে পাচ্ছি না!? তাঁদের ভাষার সমস্ত **অব্যয়** শব্দই তো সংস্কৃত (ক্রিয়াভিত্তিক)! এমনকি তাঁদের মুখে মাঝেমধ্যেই যে সকল নতুন শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলি যে ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের (সংস্কৃত) নীতি মেনেই জন্মাচ্ছে, সেকথাও তো এখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিই! ...

অতএব আজ আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি, বিশ্বমানবের **ভাষা** একটিই, তার দুরকম বোধন বা পাঠ ছিল। প্রথম প্রকারের বোধন বা পাঠ হারিয়ে গিয়েছিল, আমরা তাকে পুনরুদ্ধার করার সূচনা করেছি। দ্বিতীয় প্রকারের পাঠ সমাজের খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার তালে তাল মিলিয়ে প্রায় ৫০০০ রূপে বিভক্ত হয়ে গেছে। তার ওপর তাতে দেশ ও কালের ছাপ পড়ে গেছে, যে মনোভূমির উপর দিয়ে যে ভাষাপ্রবাহ ঘটেছে, সেই মনোভূমির মাটি মিশে গেছে সেই ধারায়। ফলত তারা দৃশ্যত পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ...

ভাষাবিভ্রাট : ২. ভাষা *তার বিকল্পরূপে বা বিপরীতরূপে দীপ্ত হয় যাহাতে।* **৫. দ্র. ভাষা, বিভ্রাট**। এখানে আমরা তিনপ্রকার **ভাষাবিভ্রাট**-এর সংবাদ পরিবেশন করব।

এক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন — "যিশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বে আর্যাবর্তে ভাষার এইরূপ একটা **বিভ্রাট** ছিল; তাহার উপর একটা পাঠেরও **বিভ্রাট** ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একটা ভাষা বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেইরূপ কেহ বুঝিত না। সকল জাতি বা সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা করিয়া পাঠ ছিল। ইহাতে **বিভ্রাট** আরো বাড়িয়া গিয়াছিল।"

দুই) 'ভাষা-বিভ্রাট' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০০ সংখ্যায়। তাতে কোনো লেখকের নাম ছিল

না। নিবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাঁদের 'ভাষা ভাবনা' প্রবন্ধ সংকলনে 'ভাষা সমাজ ও রাষ্ট্র' শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত করেছেন। এই নিবন্ধটি কেন ঐ সংকলনে স্থান পেয়েছে, তা সংকলকগণই ভাল বলতে পারবেন। আমরা দেখছি, এই নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' নিবন্ধের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করে 'ইংরাজি কথা বাঙ্গালা লেখায় চালাইতে আরম্ভ' করবার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছিল। এটি আজ থেকে ১১৭ বছর আগের কথা। কিন্তু তখনকার ঐ ওকালতির ফল ফলেছে এখন। এখন শহরে শিক্ষিত বাংলাভাষীরা বাংলাশব্দ মিশ্রিত ইংরেজি ভাষা ছাড়া কিংবা ইংরেজিশব্দ মিশ্রিত বাংলা ছাড়া কথা বলতে পারেন না। গ্রামবাংলার মানুষেরা সেকারণে এঁদের কথাবার্তা বুঝতে পারেন না। গ্রামের শিশু কিশোররা শহর থেকে আগত শিক্ষকের ভাষা বুঝতে পারে না। বলতে কী, বাংলাভাষা এখন কার্যত দুরকম হয়ে গেছে — শহুরে শিক্ষিতদের বাংলাভাষা এবং গ্রামবাংলার বাংলাভাষা।

তিন) অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাকে চিহ্নিত করার জন্য মানুষ শব্দের সৃষ্টি করে, শব্দনির্ভর ভাষা সৃষ্টি করে এবং তা সৃষ্টি করে ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের নিয়ম অনুসরণ করে। তাতে দৃশ্য সত্তাকেও চিহ্নিত করা হয়ে যায়। একে বলে 'সাদৃশ্য অর্থ'। তার মানে শব্দের অদৃশ্য অর্থ ও সাদৃশ্য অর্থ, দুই প্রকার অর্থই ছিল ভাষার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার। কিন্তু একসময় অদৃশ্য অর্থগুলি হারিয়ে যায়, পড়ে থাকে শুধুমাত্র সাদৃশ্য অর্থ। তার মানে, ভাষার প্রাণপাখিটাই উড়ে যায়, থেকে যায় ভাষার খাঁচা। সেই সাদৃশ্য অর্থধারী শব্দগুলিকে নিয়ে পরবর্তীকালের মানুষ কাজ চালায়। একেই বলে ভাষার প্রতীকী বোধন বা 'প্রাকৃত পাঠ'। ফলত, ভাষার প্রাণপাখি জগতের যে গান গাইতে পারত, ভাষার প্রাণপাখির খাঁচা সে গান গাইতে পারে না। অথচ ভাষার প্রাণপাখির খাঁচাটিকেই এখন **ভাষা** বলে জাহির করা হয়ে থাকে। এটিই হল সর্ববৃহৎ **ভাষাবিভ্রাট**। একালের ভাষাবিদগণ জেনেশুনে সেই খাঁচাকেই ভাষা বলে চালিয়ে দেওয়ার চালিয়াতি করেছেন, এমন কথা বলা ঠিক নয়; কিন্তু সে-ঘটনাটি যে তাঁদের সতর্কতার অভাবের জন্য ঘটেছে, সেকথা মেনে নেওয়া ভাল। দ্র. **বাহন**। এখানে সেই কথাটি আবারও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, গ্রামবাংলার অ্যাকাডেমি-শিক্ষাহীন মানুষেরা আজও যে সকল নতুন শব্দের সৃষ্টি করেন, সেগুলি সবই প্রাণপাখি-সহ খাঁচার মতো, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দই বটে! কথাটি সকল ভাষার সব 'মূর্খ' মানুষদের ক্ষেত্রেই খাটে।

তার মানে, আজকের বিশ্বের প্রায় সব ভাষাই শুধুমাত্র প্রতীকী শব্দার্থবিধির সাহায্যে বা প্রতীকী বোধনে বা প্রাকৃত পাঠের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাদের কারোরই ক্রিয়াভিত্তিক বোধন বা সংস্কৃত পাঠ এখন আর হয় না। এমনকি তথাকথিত সংস্কৃত ভাষাটিরও এখন আর সংস্কৃত পাঠ বা ক্রিয়াভিত্তিক বোধন হয় না। সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলিও এখন প্রাকৃত পাঠের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার পাঠ করে থাকে, করিয়ে থাকে; একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি। একমাত্র বাংলাভাষাই একটি মাত্র ভাষা, যা উভয় বোধনে অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় প্রকার পাঠের মাধ্যমে বলা শোনা ও পাঠ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের 'খ' ও 'ঝ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অথচ এককালে বিশ্বের সব ভাষারই দু'রকম পাঠ ছিল, ইংরেজি ভাষারও ছিল। এখন ইংরেজি ভাষা শুধুমাত্র প্রতীকী শব্দার্থবিধিতে বা প্রাকৃত-পাঠেই বলা শোনা ও বোঝা হয়ে থাকে; কিন্তু এককালে ইংরেজিও যে ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক বোধনে বা সংস্কৃত পাঠে বলা-শোনা-বোঝা যেত, আমরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং সফল হয়েছি। এমনকি যথোপযুক্ত অবকাশ ও পরিসর পেলে আমরা যে ইংরেজি ভাষার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থকোষ লিখে ফেলতে পারি, সেকথাও আমরা অনেককে জানিয়েছি। আমাদের এই *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ* সে কাজের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, সন্দেহ নাই। সেজন্যেই তো আমরা ঘোষণা করেছি, বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাবে। (আমাদের 'গ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

ভাস্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অবভাস, আভাস, আভাসন, আভাসুর, আভাস্বর, উদ্ভাস, প্রভাস, বিভাস, ভাঃ, ভাস্, ভাস, ভাসঃ, ভাসক, ভাসন, ভাসন্ত, ভাসমান, ভাসা, ভাসান, ভাসানো, ভাসা-ভাসা, ভাসিত, ভাসু, ভাসুর, ভাসুরতা, ভাসুরতাপাদন, ভাসুরপুষ্পা, ভাস্কর, ভাস্করদ্যুতি, ভাস্করপ্রিয়, ভাস্কর্য্য, ভাস্বত, ভাস্বতী, ভাস্বর, ভাস্বান।

ভাস্ = ভবের আধারের নির্য্যাসত্যাগ (প্রকাশন)। **ভাস** = ভস হইতে জাত; ভবের আধারের নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে।

ভাস (অবভাস, আভাস, উদ্ভাস, প্রভাস, বিভাস): **১.** ✓ভাস্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাস** = **ভা**-এর *(ভবাধারের) খানিক প্রকাশ যাহাতে; অথবা,* **ভা**-*এর দৈহিক অংশের কিঞ্চিৎ প্রকাশ হয় যাহাতে।* **অবভাস** = **অব** *(নিম্নমানের)* **ভাস** *যাহাতে।* **আভাস** = **ভাস**-*এর আশ্রয় যাহাতে।* **উদ্ভাস** = *যাহা উদ্‌লোকে ভাসে।* **প্রভাস** = **প্রকৃষ্ট ভাস** *যাহাতে।* **বিভাস** = *বিশেষ বা বিকল্প* **ভাস** *যাহাতে।* / **আভাস** = যাহা তুল্যরূপে প্রতীত হয়। (ব.শ.)। **৩. ভাস** = দীপ্তি, প্রভা, কুক্কুট, পক্ষিবিশেষ, শকুন্ত, গৃধ্র, নাট্যকার কবিবিশেষ, গোষ্ঠ, আভাস, অনুভব। **অবভাস** = দীপ্তি, প্রকাশ, সাক্ষাৎকার, জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান। **আভাস** = তুল্যপ্রকাশ, দীপ্তি, বোধ, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, মিথ্যাবুদ্ধি ... ইত্যাদি। **উদ্ভাস** = অতিদীপ্তি, মহাজ্যোতিঃ। **প্রভাস** = দীপ্তি, বসুবিশেষ, গণধিপতিভেদ, তীর্থবিশেষ, সোমতীর্থ। (ব.শ.)। (ক) বিশ্বকর্মার পিতা অষ্টম বসু, এঁর নাম প্রভাস। (খ) সরস্বতী নদীর তীরে লোকবিশ্রুত প্রধান পবিত্র তীর্থ। কথিত আছে, পুরাকালে চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের ... সাতাশ কন্যাকে বিবাহ করেন; কিন্তু একমাত্র রোহিণীর প্রতিই তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন। ... সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার না-করায় দক্ষশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। চন্দ্রের এই রোগে সমূহ দেবতারা দক্ষকে অনুরোধ করাতে পুনরায় চন্দ্র দক্ষের নির্দেশে অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান করে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। চন্দ্র এখানে 'প্রভা' লাভ

করেন বলে এই তীর্থের নাম প্রভাস এবং নামান্তরে সোমতীর্থ। এই তীর্থের বর্তমান অবস্থান ক্ষেত্র কাথিয়াওয়াড়ের সমুদ্র-উপকূল। (পৌ.অ.)। **বিভাস** = রাগবিশেষ, আলোক, কিরণ, দ্যুতি, ছটা, চমক। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** নিম্নে **ভাস** ও তজ্জাত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এখানে কেবল দুটি বিষয় জানিয়ে রাখা যেতে পারে। এক) **ভাস্** ক্রিয়া-পরিবারের সদস্য শব্দসমূহের প্রতীকীকরণ খুব একটা হয়নি বলে এদের প্রতীকী অর্থ প্রদান করা খুব কঠিন। প্রায়শই একই দীপ্তি শব্দ বারংবার চলে আসে, অন্য কোনোভাবে তাকে প্রকাশ করাই যায় না। দুই) **প্রভাস** কেবল প্রকৃষ্ট **ভাস** বা ভেসে ওঠা নয়, ভারতসমাজের ইতিহাসেও এই সত্তা সক্রিয় হয়েছিল। দ্র. **বসু**। উপরোক্ত কাহিনী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, **দক্ষই** তার স্বভাবের কারণে ব্যক্তিপুঁজির উদ্ভবের কারণ, এবং নিজ আধারশক্তিগুলিকে **চন্দ্রের** হাতেই দিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিপুঁজি তো তার উদ্ভবাবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে না। সে এগোয়, **দক্ষের** কল্পনাকে সে একসময় বহু দূর ছাড়িয়ে যায়। একসময় সে তার স্বভাবের কারণেই অন্য সবকিছুর চেয়ে স্বর্ণধারী জনগোষ্ঠীকে বা রোহিণীকে বেশি খাতির করতে শুরু করে। সোনার প্রতি এই অতি-আকাঙক্ষা **দক্ষের** ভাল লাগেনি। তাই তার অভিশাপ। দ্র. **যক্ষ্মা, রোহিণী**।

ভাসক (ভাসন, ভাসন্ত, ভাসমান, ভাসা, ভাসান, ভাসানো, ভাসা-ভাসা, ভাসিত) : ১. ✓ভাসি + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাসক** = *ভাস করে যে; অথবা, নিজেকে উপরে ভাসিয়ে তোলে যে।* **ভাসন** = ***ভাস*** *অন (on) যাহাতে।* **ভাসন্ত** = ***ভাসন*** *তারিত যাহাতে।* **ভাসমান** = ***ভাস*** *সীমায়িত রূপে অন (on) যাহাতে।* **ভাসা** = ***ভাস****-এর আধার যে।* **ভাসান (ভাসানো)** = ***ভাসা*** *অন (on) করা হয় যাহাতে।* **ভাসা-ভাসা** = *যাহা উপরে ভাসিতেছে।* **ভাসিত** = ***ভাস*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে। /* **ভাসা-ভাসা** = যাহা আন্তরিক নয়। (ব.শ.)। **৩. ভাসক** = দীপক, দ্যোতয়িতা, ব্যক্তিকারক। **ভাসন** = দীপ্তি, প্রতীতি। **ভাসন্ত** = ভাসমান (floating)। **ভাসমান** = দীপ্যমান, প্রকাশমান, জলের উপরে প্রকাশমান, প্লবমান। **ভাসা** = ভাসমান; দীপ্তি পাওয়া, শোভা পাওয়া, প্রকাশ পাওয়া, প্রতীয়মান হওয়া, প্রকটিত বা আবির্ভূত হওয়া, শ্রুত হওয়া, জলের উপরে প্রকাশ পাওয়া ... ইত্যাদি। **ভাসান, ভাসানো** = ভাসা। **ভাসা-ভাসা** = অগভীর। **ভাসিত** = দীপিত, উজ্জ্বলিত। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** কোনো সত্তা যখন তার কিছু অংশকে প্রকাশ করে, তাকে বলে **ভাস** করা বা **ভাসা**। ব্যাপারটি **ভাসা-ভাসা** বোঝা যাচ্ছে মানে উপরি-উপরি বোঝা যাচ্ছে, তার ভিতরের সবকিছু বোঝা যাচ্ছে না; যতটুকু **ভাসিত** হয়ে আছে বা **ভেসে** আছে, কেবল সেটুকুই বোঝা যাচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে। তবে উপসর্গ যোগে এই **ভাসাকে** অনেক স্পষ্ট করা যায়, **ভাস** ক্রিয়ার স্পষ্ট দিশা নির্দেশ করা যায়। উপরে **অবভাস** থেকে **বিভাস** পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের **ভাস**-এর কথা আমরা জেনেছি। এদের মধ্যে **উদ্ভাস** অনেক বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এমনকি ইংরেজির canvas শব্দটিও এই **ভাস** শব্দ পরিবারেরই সদস্য। **৬.** ইংরেজি *vast*, de*vas*tation, vassal, vavasour ইত্যাদি।

ভাসুর (ভাসু, ভাসুরতাপাদন, ভাসুরপুষ্পা) : ১. ✓ভাস্ + উর (ঘুরচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাসু** = ***ভাস*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **ভাসুর** = ***ভাসু*** *রহে যাহাতে। (****ভাসুরতা*** = ***ভাসুর*** *তারিত যাহাতে)।* **ভাসুরতাপাদন** = *যে প্রক্রিয়ার দ্বারা* ***ভাসুরতা*** *সম্পাদিত হয়।* **ভাসুরপুষ্পা** = ***ভাসুর*** *পুষ্প যে আধারশক্তির। /* **ভাসুরতাপাদন** = যে প্রক্রিয়া দ্বারা জল দ্রবলৌহ প্রভৃতি শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে একপ্রকার মনোহর আকার ধারণ করে। **ভাসুরপুষ্পা** = ভাসুর পুষ্প যাহার। (ছা.অ.)। **৩. ভাসুর** = দীপ্তিশীল, ভাস্বর, স্ফটিক, বীর, কুষ্ঠৌষধ। **ভাসুরতাপাদন** = স্ফটিকীকরণ (crystallization)। (ব.শ.)। **ভাসু** = সূর্য্য। **ভাসুর** = দীপ্যমান, দীপ্তিযুক্ত, স্ফটিক, বীর, স্বামীর বড় ভাই। **ভাসুরপুষ্পা** = বৃশ্চিকালী, বিচাতি। (ছা.অ.)। **৪.** 'স্বামীর বড় ভাই' অর্থে **ভাসুর** শব্দটি ছাড়া বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** আমরা যারা বিদেশে যাইনি, উত্তরমেরু বা দক্ষিণমেরু সংলগ্ন কোনো ভূখণ্ড কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখিনি, আমরা জানি না যে, সূর্য দেখা দিচ্ছে না, অথচ দিন হচ্ছে রাত হচ্ছে ... এসব হচ্ছে! হ্যাঁ, আমাদের দেশেও বর্ষাকালে কোনো কোনো দিন এরকম হয়। তাছাড়া প্রত্যহ প্রত্যুষে, সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে কিংবা গোধূলিবেলায় সূর্য অন্তর্হিত হওয়ার ঠিক পরমুহূর্তে এরকম তো হয়ই। সূর্য নাই কিন্তু জগতের প্রতিটি বস্তুকে কমবেশি দেখা যাচ্ছে। এই যে সূর্য দেখা দিয়েও দিচ্ছে না, অথচ সে যে আছে, বাহ্যবস্তুসমূহের প্রকাশ সেকথার স্পষ্ট জানান দিচ্ছে, এই অবস্থার যে সূর্য, তাকেই বলে **ভাসু**। এতে **ভাস** বা প্রকাশ নবরূপে উত্তীর্ণ, অপ্রকাশিত কিন্তু কার্যকরী। যৌথপরিবারে পরিবার কর্তা স্বামীর বড় ভাই হলে, **ভাদ্রবউ**-এর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ঐ **ভাসুর** মতো; তিনি সামনে আসেন না, কিন্তু তিনি যে আছেন, দারুণভাবে আছেন, তাতে সন্দেহমাত্র থাকে না। তাহলে তো তাঁকে **ভাসুর** বলাই যায়। এই যে উজ্জ্বলতা, দীপ্তিমানতা, যা আছে কিন্তু নাই-এর ভাব নিয়ে বিরাজমান, একেই বলা হয় **ভাসুরতা** বা 'স্ফটিকতা'। ব.শ. সেকারণেই স্ফটিককেও **ভাসুর** বলেছেন। আর বিছুটিগাছকে (**বৃশ্চিকালী** গাছ = বিছাতিগাছ, বিচাতিগাছ ... ইত্যাদি) **ভাসুরপুষ্পা** বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সেই পুষ্পকে ছুঁতে যাওয়া আর **ভাসুর**কে বা স্বামীর বড় ভাইকে ছুঁতে যাওয়া, **ভাদ্রবউ**-এর পক্ষে উভয়ই সমার্থক। সবশেষে বলার কথা এই যে, বিজ্ঞানের বইগুলিতে crystallization শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কেন **ভাসুরতাপাদন** বা **ভাসুকরণ, ভাসুরণ** করা হয় না? এখানে আরও অনেক শব্দ তৈরি করা যেতে পারে, যেমন **ভাসুক, ভাসুকি, ভাসুকী, ভাসুত, ভাসুতা, ভাসুরি, ভাসুরী** ... ইত্যাদি। সবই 'উজ্জ্বল সত্তার উপস্থিতি কিন্তু অদৃশ্যতা'কে কেন্দ্র করে তার নানা রূপকে বোঝাবে। **৬.** দ্র. **ভাসক**।

ভাস্কর (ভাস্কর্য্য) : ১. ভাস্ + ✓কৃ + অ (ট) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাস্কর** = ***ভাস্*** *(ভা-এর বা ভবাধারের প্রকাশন) করে যে; অথবা, অদৃশ্য-সক্রিয় সত্তাকে* ***ভাস*** *(প্রকাশ) করে যে।* **ভাস্কর্য্য** = ***ভাস্কর*** *গত যে আধারে; যাহাতে* ***ভাস্কর****-এর* ***ভাস****-কর্ম্ম*

কৃত হইয়াছে। / **ভাস্কর** = পাথরে চিত্রাদি খোদে যে। (ব.শ.)। **৩. ভাস্কর** = দীপ্তিকর, উজ্জ্বল, সূর্য্য, প্রতিবিম্বিত সূর্য্য, শিব, অগ্নি, বীর, ভাস্করাচার্য্য, তষ্টা (sculptor), সুবর্ণ, ভিত্তিতে ভাস্করাকৃতি সন্ধিখননবিশেষ, ভাস্করকৃত পঙ্কলবর্ণবিশেষ, ভাস্করলবণ। **ভাস্কর্য্য** = ভাস্করকর্ম্ম, খোদাইএর কাজ (sculpture)। (ব.শ.)। **৪.** sculptor ও sculpture অর্থে যথাক্রমে **ভাস্কর** ও **ভাস্কর্য্য** প্রচলিত। **৫.** আজকাল অবশ্য **ভাস্কর্য্য**-এর 'য'-ফলা বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, লেখা হচ্ছে **ভাস্কর্য**। তাতে প্রতীকী শব্দার্থবিধিতে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে শব্দের মানেটাকে পুরো পাওয়া যায় না, খানিকটা মার খেয়ে যায়।

আসলে এই বিশ্বজগতে যা কিছু দৃশ্য তাদের কাউকে শব্দে-ভাষায়, ছবিতে-আঁকায়, মূর্তিতে-প্রতিমায় মূর্ত করার কথা আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা ভাবতেই পারতেন না; সেরকম চেষ্টা সম্ভবত বোকামি বলেই তাঁদের মনে হত। চোখের সামনে যা দেখাই যাচ্ছে, তাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেই হয়; খালি খালি তার পিছনে সময় নষ্ট করার কী মানে! কিন্তু যে সকল সত্তা অদৃশ্য, কিন্তু সমাজে জগতে দারুণভাবে সক্রিয়, মানুষের ভালমন্দের সঙ্গে যাদের আচরণ অত্যন্ত জড়িত, যাদের চর্মচক্ষে দেখা যায় না অথচ তারা যে আছে এবং ভালমন্দ ঘটাচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, অনুভব করা যায় — খোদিত মূর্তির মাধ্যমে সকলের সামনে তাদেরকে প্রকাশিত করে দেওয়ার জন্য, **উদ্ভাসিত** করে দেওয়ার জন্য, **বিভাসিত** করে দেওয়ার জন্য, **ভাসিত** করার জন্য, **ভাস** করার জন্য — মানুষের সমাজে **ভাস্কর**-এর জন্ম হয়েছিল। যে **শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, সরস্বতী, লক্ষ্মী** ... প্রভৃতি সত্তা সর্ব্বৈব বিদ্যমান কিন্তু অদৃশ্য ও সক্রিয়, তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিমা বানিয়ে সেগুলির মাধ্যমেই **ভাস্বর** করে তুলতেন আমাদের প্রাচীন **ভাস্কর**গণ। বিশ্বের সব দেশের প্রাচীন **ভাস্কর** ও **ভাস্কর্য্যে**র এই ছিল মূল স্বভাব। কোনো অদৃশ্য ও সক্রিয় সত্তাকে যদি প্রকাশ করাই না গেল, **ভাস** করাই না গেল, তাহলে সে কিসের **ভাস্কর**, তাহলে তার **ভাস্কর্য্য** কী **ভাস** করছে, কাকে **ভাস্বর** করছে?! এমনকি যাঁরা দৃশ্য রাজা-বাদশাহদের মূর্তি নির্মাণ করতেন, দেখা যেত, সেক্ষেত্রেও দৃশ্য-রাজদেহের তুলনায় অদৃশ্য-রাজমনটাই সেই **ভাস্কর্য্যে** বেশি করে **ভাস্বর** হয়ে উঠেছে। তার মানে, **অভাস্যকে ভাস** করাই ছিল **ভাস্কর**-এর কাজ এবং যে প্রতিমাদির মাধ্যমে **ভাস্কর**গণ তাঁদের **ভাস-কর্ম্ম** করে গেছেন, সেগুলিকেই বলা হয় **ভাস্কর্য্য**।

ল্যাটিন থেকে পাওয়া ইংরেজির vase (উচ্চারণ 'ভাস্') শব্দে আমরা আমাদের **ভাস** শব্দের রক্তসম্পর্কের উত্তরাধিকার পাই। একই ক্রিয়ামূলের বংশে তাদের জন্ম হয়েছে। পাশ্চাত্যের vase ছিল ফুলদানীর মতো আধার, যার মধ্যে মৃত ব্যক্তির চিতাভস্ম রাখা হত; গ্রীস দেশে এই রীতির প্রচলন ছিল। আর সেই vase-এর গায়ে থাকত শিল্পী ও **ভাস্কর**দের তৈরি করা নানা পুরাণকাহিনীর চিত্র ও **ভাস্কর্য্য**, ছবি ও বিভিন্ন খোদাই। পুরাণকাহিনী নিয়ে সে সময়ের গ্রীক কবিরাও তাঁদের কাব্য রচনা করতেন। প্লেটো সেই কবিদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন — এ কী! এ তো imitation of an imitation! যা ঘটে গেছে, তারই imitation হল পুরাণকাহিনী। তাকে পুনরায় imitation করে উপস্থাপন করার কী মানে! অর্থাৎ সেই পুরানো চেতনার উত্তরাধিকার প্লেটোর মনেও কাজ করেছিল — যা দেখা যাচ্ছে না, তাকেই তো মনশ্চক্ষে দেখে নিয়ে imitation করে রাখতে হবে! যা কিছু দৃষ্ট, তা সে imitation-ই বা হোক না কেন, তার imitation করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তাহলে তো অদৃশ্য সত্যের উপস্থাপনকে কখনোই নবীকরণ করা যাবে না! প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তাই গুরুর বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায়, যা ইংরেজিতে Poetics নামে পরিচিত। ... **৬.** ইংরেজি vase।

ভাস্বর (ভাস্বৎ, ভাস্বত, ভাস্বতী, ভাস্বান) : **১.** ✓ভাস্ + বর (বরচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাস্বর** = **ভাস**কে *(ভবাধারের প্রকাশকে) বরণ করে যে।* **ভাস্বৎ (ভাস্বত)** = **ভাস** *বহন তারিত যাহাতে।* **ভাস্বতী** = **ভাস্বৎ** *গতিশীলরূপে তারিত যাহাতে বা যে আধারশক্তিতে।* **ভাস্বান** = **ভাস্** *বহন অন (on) যাহাতে।* **৩. ভাস্বর** = দীপ্তিশীল, দীপ্যমান, ভাসুর, উজ্জ্বল, তেজিষ্ঠ, অতিতেজস্বী, সূর্য্য, দিন, অগ্নি, কুষ্ঠৌষধ। **ভাস্বৎ (ভাস্বান)** = দীপ্তিমান, দ্যুতিমান, তেজস্বী, প্রকাশক, দেদীপ্যমান, সুনির্ম্মল, সূর্য্য, আলোক, বীর। **ভাস্বত** = সূর্য্য। **ভাস্বতী** = সূর্য্যপুরী, জ্যোতিষগ্রন্থভেদ — ভাস্বতীকরণ। (ব.শ.)। **৪.** luminous অর্থে **ভাস্বর** এবং নামরূপে **ভাস্বতী** প্রচলিত, অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** বিজ্ঞান বলে, কোনো বস্তু দেখা যায় সেটি আছে বলে নয়, বাইরে থেকে আলো এসে তার উপরে পড়ার পর সে যদি সেই আলোর সবটাই শোষণ করতে না পেরে সেই আলোর সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ বাইরের দিকেই ঠেলে পাঠিয়ে দেয়, এবং সেই ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া আলো যদি আমাদের চোখে এসে পড়ে কেবল তখনই আমরা তাকে দেখতে পাই। কিন্তু যে বস্তুটি এরকম বহিরাগত আলোকে গ্রহণ-বর্জন ক'রে তবেই আমাদের দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়, তার কি কোনো নাম হয় না? হয়। এরকম সকল বস্তুকেই **ভাস্বর** বলে; তবে কিনা এ হল **ভাস্বর** শব্দের 'সাদৃশ্য অর্থ'। **ভাস্বর** শব্দের প্রকৃত অর্থ হল — যার কোনো দৃশ্য চেহারা নেই, তেমন সত্তা যদি কোনো বিশেষ রূপকে **বরণ** করে নিয়ে দৃশ্য হয়ে পড়ে এবং আমাদের দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়, তখনই তাকে বলে **ভাস্বর**। মহারাজ অশোকের শাসকবোধ **ভাস্বর** হয়েছিল 'অশোকস্তম্ভে'; শাহজাহানের প্রেম **ভাস্বর** হয়েছিল 'তাজমহলে'; ব্রিটিশের ভারতদখলের আত্মতৃপ্তি **ভাস্বর** হয়েছিল 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে' ... ইত্যাদি।

ভিদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অভিত্তি, অভিন্ন, অভীন, অভেদ, অভেদাত্মা, অভেদ্য, অর্থভেদ, উদ্ভিদ, কালভেদ, ছিন্নভিন্ন, জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ, দ্রব্যভেদ, পুরভেত্তা, পুরুষভেদ, প্রভেদ, বিভিন্ন, বিভেদ, ব্যূহভেদ, ভিৎ(দ্), ভিত্তি, ভিদির, ভিদুর, ভিদ্য, ভিন, ভিনগাঁ, ভিনাভিনি, ভিনু, ভিন্দিপাল, ভিন্ধি, ভিন্ন, ভিন্নকট, ভিন্নকর্ণ, ভিন্নক্রম, ভিন্নজাতি, ভিন্নদেশ, ভিন্ননৌ, ভিন্ননৌক, ভিন্নবর্ণ, ভিন্নবৃত্ত, ভিন্নবৃত্তি, ভিন্নভাত, ভিন্নভিন্ন, ভিন্নমর্য্যাদ, ভিন্নরুচি, ভিন্নশ্লিষ্ট, ভিন্নসংহতি, ভিন্নস্বর, ভিন্নহৃদয়, ভিন্নাঞ্জন, ভিন্নার্থ,

ভেত্তব্য, ভেত্তা, ভেদ, ভেদক, ভেদকর, ভেদকৃৎ, ভেদপ্রত্যয়, ভেদবুদ্ধি, ভেদবাদী, ভেদসহ, ভেদন, ভেদনীয়, ভেদা, ভেদাভেদ, ভেদিত, ভেদী, ভেদ্য, রসভেদ, রহস্যভেদ, সীমাভেত্তা।

ভিদ্ = গতিশীল ভবের দান। **ভিদ** = গতিশীল ভবের দান থাকে যাহাতে। (**ভিদ্** ক্রিয়ামূলে যে **ভ**-কে আমরা পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে, তার দুরকম স্বভাব রয়েছে। কখনো সে এমন এক দ্বৈরাজ্যবান সত্তা যে এক সত্তা থেকে নির্গত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই **ভিদ্** নতুন সত্তাটিকে তার অস্তিত্বের **ভিত** বা **ভিত্তি** যোগানোর যোগ্যতা ধরে। আর, তার দ্বিতীয় স্বভাবটিকে পাওয়া যায় **ভ**-এর নিকৃষ্ট রূপে। এই **ভ্** হল বিপরীতার্থক **ব্** + **হ্** = **ভ্**। সে গতিশীল হলে **ভি** হয়। সেই **ভি**-র দান থাকে **ভিদ**-এ। স্বভাবতই এই **ভিদ্** অন্যতর **বর্ত্তমান** সত্তাকে **ভিদিত** বা **ভিন্ন** করে দেওয়ার যোগ্যতা ধরে।)

অভেদ (অভেদ্য) : ১. ন + ভেদ। ২. **অভেদ** = *নেই* **ভেদ** *যাহাতে।* **অভেদ্য** = **অভেদ** *থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে* **ভেদ** *করা যায় না।* **৩. অভেদ** = ভেদহীন, অবিভক্ত, ভেদাভাব, তদাত্মভাব, তাদাত্ম্য, অতিসাম্যকথন, একরূপতা, স্বরূপতা, অবিয়োগ, ঐক্যমত্য। **অভেদ্য** = অশক্যভেদ, অবিদার্য্য, অবেধ্য, হীরক। (ব.শ.)। ৪. 'পার্থক্যহীন' অর্থে **অভেদ** এবং impenetrable অর্থে **অভেদ্য** কমবেশি প্রচলিত। ৫. যে অন্য কারও ভিতরে ভেদভাব তৈরি করে না, কিংবা যার নিজের ভিতরে ভেদভাব নেই, সেই হল **অভেদ**। জলে কত কিছু রয়েছে, তাই তা ভিতরে ভিতরে ভেদগ্রস্ত, অর্থাৎ, অভেদাত্মক নয়। জলের মূলে রয়েছে H_2O, তাতেও দুটো বস্তু। শুধু H বা O-এর মূলে গেলে দেখা পাওয়া যায় তরঙ্গ ও কণার (wave ও particle-এর) এমন একটি অধ্যায়ের (wavicle-এর), যেখানে সে তরঙ্গ না কণা তার ঠিক থাকে না। অস্তিত্বের এটি **অদ্বৈত** বা **অভেদ** রূপ। সে কণাও হতে পারে, তরঙ্গও হতে পারে; **পুরুষ** হতে পারে, **প্রকৃতি**ও হতে পারে। কী হতে পারে সেটি নির্ভর করে দ্রষ্টার (ভক্তের / পার্টিসিপেটরের) দৃষ্টিনিক্ষেপের (পার্টিসিপেশনের / আলিঙ্গনের) চরিত্রের উপর। বস্তুর (**ব্রহ্মের**, পরমাপ্রকৃতির) এই অধ্যায়কে **অভেদ** বলে। দ্র. **অদ্বৈত**। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের 'ঋ' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

উদ্ভিদ্ : ১. উদ্ + ✓ভিদ্ + ক্বিপ্ (০) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / উদ্ভেদন পূর্ব্বক নির্গত (যে)। (ব.শ.)। **৩.** উদ্ভেদক, ভূমিভেদক, তরুগুল্মাদি (বৃক্ষ গুল্ম লতা বল্লী তৃণ — এই পঞ্চ উদ্ভিদ), নির্ঝর, প্রস্রবণ, পাংশুলবণ, কৃতোদ্ভেদ, নির্গত, প্রতিফলিত, প্রসৃত, উদগত ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. 'গাছগাছালি' অর্থে প্রচলিত। ৫. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছাত্রের পরীক্ষা' হাস্যকৌতুকে লিখছেন —

'অভিভাবক — আচ্ছা, উদ্ভিদ্ কাকে বলে বল্ দেখি?
মধুসূদন — যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।
অভিভাবক — একটা উদাহরণ দে।
মধুসূদন — কেঁচো।'

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। কিন্তু মধুসূদনের উত্তরটি কি একেবারেই ভুল? 'উদ্ভেদনপূর্ব্বক নির্গত যে', সেই তো **উদ্ভিদ্**; তা সে বৃক্ষ লতা গুল্ম ... ইত্যাদি হতে পারে, নির্ঝর বা প্রস্রবণ হতে পারে, পাংশুলবণ হতে পারে, যা কিছু উদগত সবই হতে পারে; কেঁচো হবে না কেন?

হবে না এই জন্য যে, সে উপরোক্ত (**৩.**-এ প্রদত্ত) বৃক্ষাদির মতো উপরে উঠে উপরেই থাকে না, পুনরায় মাটির ভিতরে ঢুকে যায়, সেখানেই ঘর বানায়। বলতে গেলে, সে উপরে উঠে আসে কদাচিৎ। তার চেয়ে বরং নির্ঝরের মতো 'অগ্ন্যুৎপাত'কে **উদ্ভিদ** বলা যেতে পারত। প্রাচীন শব্দবিদগণও **উদ্ভিদ্** অর্থে কখনো 'কেঁচো'র উল্লেখ করেননি। প্রাচীন শব্দবিদগণের কথাই যখন উঠল, তাঁরা কি শুধুমাত্র উপরোক্ত পঞ্চ **উদ্ভিদ্** ও পাংশুলবণাদিকেই **উদ্ভিদ** বলতেন? আমাদের সন্দেহ আছে। তাঁরা সমাজের মনোভূমি ভেদ করে যে সকল সামাজিক সংস্থা বা **বৃক্ষ** উদগত হয়, তাদেরকেও কি **উদ্ভিদ্** শব্দের এলাকার অন্তর্ভুক্ত ভাবতেন না?! ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে কিন্তু যা কিছুই 'উদ্‌লোক ভেদ করে তার উপরে উঠে আসে', তাকেই **উদ্ভিদ** বলতে হয়, তা সে যে-ই হোক। পরে পরে সেই বহু-অর্থবাচক **উদ্ভিদ** একই কর্মের পুনরাবৃত্তিবাদী দক্ষসমাজে বারংবার একার্থে (গাছ-অর্থে) প্রযুক্ত হতে হতে শুধুমাত্র গাছগাছালিকে বোঝাতে পারে বটে, কিন্তু তার আদি উদ্ভবের কথাটা ভুলে যাওয়া চলে না। 'গাছ' অর্থে ছাড়াও **উদ্ভিদ** শব্দের ব্যবহার এখনও কমবেশি আছে এবং তার একটি উদাহরণ হল, বাংলায় '**উদ্ভিন্ন**যৌবনা' কথাটি এখনও ব্যবহৃত হয়।

ভিৎ (ভিদ্, ভিত, ভিতর, ভিত্ত, ভিত্তি) : ১. ✓ভিদ্ + ক্বিপ্ (০) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভিৎ** = *গতিশীল* **ভ**-*এর (বিপরীত শক্তিবাহী* **ভ**-*এর) তারণ (যাহাতে)।* **ভিদ্** = *গতিশীল* **ভ**-*এর (বিপরীত শক্তিবাহী* **ভ**-*এর) দান (যাহাতে)।* **ভিত** = **ভিৎ** *যাহাতে।* **ভিতর** = **ভিত** *রহে যাহাতে।* **ভিত্ত** = **ভিদ্** *তারিত যাহাতে।* **ভিত্তি** = **ভিত্ত** *গতিশীল যাহাতে।* / **ভিৎ (ভিদ্)** = 'ভেদক' বা ভেদ করে যে। (ব.শ.)। **৩. ভিৎ (ভিদ্)** = বিদারক, বিনাশক, ভেদ, বিদারণ, ভেদদৃষ্টি। **ভিত** = দেয়াল, তীর, পার্শ্ব, দিক্, প্রদেশ। **ভিতর** = অভ্যন্তর, মধ্য, অন্তঃপুর, অন্দর। **ভিত্ত** = শকল, খণ্ড। **ভিত্তি** = ভেদন, ভেদ, প্রভেদ, সংবিভাগ, কুড্য, দেয়াল, প্রদেশ, প্রশংসাবাচক শব্দ, আধার, আশ্রয়, কট, মাদুর, অবকাশ। (ব.শ.)। ৪. inside অর্থে **ভিতর** এবং foundation অর্থে **ভিত** ও **ভিত্তি** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ছিন্নভিন্ন**। জড় হোক আর জীবই হোক, প্রত্যেকের অস্তিত্বের **ভিতরে** একপ্রকার **ভিত** বা **ভিত্তি** থাকে। আমরা দেখেছি, গ্রামবাংলার মানুষেরা ঘরবাড়ির **ভিত্তি**কে যেমন **ভিত** বলেন, তেমনি দেয়াল গাঁথাকেও 'ভিত গাঁথা' বলে থাকেন। তার কারণ হল, প্রতিটি দেয়ালের নীচে থাকে **ভিত্তি**। তার উপর নির্ভর করেই দেয়ালটি দাঁড়ায়। এরকম সকল অস্তিত্বেরই একপ্রকার **ভিত্তি** থাকে। সেই সুবাদে জলের অস্তিত্বের **ভিত্তি বা ভিত** হল H_2O, গাছের অস্তিত্বের **ভিত্তি** বা **ভিত** হল সেই গাছের **বীজে**র জিন, জীবের **ভিত্তি বা ভিত** হল তার শুক্রের জিন; **এইভাবে**

সর্বজীব ও জড়ের **ভিতরে** একপ্রকার **ভিত** থাকেই। সেই ভিত-এর উপরই অস্তিত্বটি স্বরূপ লাভ করে **বর্ত্তমান** হয়। তার মানে, প্রতিটি বাহ্য অস্তিত্বের **ভিতরে** থাকে তার **ভিত্তি** বা **ভিতস্বরূপ** এক অনন্য বীজরূপ। কিন্তু প্রশ্ন হল, তার সঙ্গে **ভিদ** ক্রিয়ার কী সম্পর্ক?

এর আগে আমরা আরও অন্তত চারটি ক্রিয়াপদ পেয়েছি — **বিদ্ (বিব্ধ, বিঁধ, বিঁধা), ব্যধ্ (বিদ্ধ, বিদ্ধিত), বিশ্ (প্রবেশ, প্রবিষ্ট), বিধ্ (বেধ, বেধ্য)** — যেগুলি কোনো সত্তার ভিতরে কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া বোঝায় বটে, তবে তাদের সেই প্রবেশ করানোর মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, তাকে বোঝাতেই অতগুলি শব্দের প্রয়োজন হয়েছিল। সবগুলিই **বিঁধা** বটে, কিন্তু সবগুলি ঠিক একরকম **বিঁধা** নয়। এরা কেউই কিন্তু **বিদ্ধ**কে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করে পৃথক করে দেয় না, কেবল নানারূপে **বিঁধে**। **ভিদ** তা করে না, সে **বিদ্ধ**কে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করে দেয়।

বিষয়টিকে আমরা **বিদ্**করণ আর **ভিদ্**করণ-এর পার্থক্য থেকেও বুঝে নিতে পারি। **বিদ্**করণে বাইরের কোনো সত্তা থেকে সত্তাটির বিকল্প শব্দাদিতে রূপান্তরিত হয়ে দান হিসেবে আসে, যার কাছে আসে, সে তা গ্রহণ করে **বিদিত** হয়। আর, **ভিদ্**করণে বাইরের কোনো সত্তা থেকে তার দ্বৈরাজ্যবাহী সত্তা শক্তি ও শক্তিধারী রূপে রূপান্তরিত হয়ে দান হিসেবে আসে, যার কাছে আসে, সে তা গ্রহণ করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেই **ভিদ্** বা 'সত্তাজাত দ্বৈরাজ্যবাহী শক্তি ও শক্তিধারীরূপী দান' যদি তার মূল সত্তা থেকে বেরিয়ে কিন্তু অন্য কোথাও না গিয়ে নিজেই সক্রিয় হয়ে যায়, তখন সে আর কাউকে **ভিন্ন** করে না, নিজেই এক নতুন দ্বৈরাজ্যবান সত্তা রূপে **বর্ত্তমান** হয়ে যায়। **ভিদ্**কে তখন দেখতে পাওয়া যায় সেই **বর্ত্তমান** সত্তাটির **ভিতরে**। দ্র. **ছিন্নভিন্ন**।

ভিন্ন (বিভিন্ন) : ১. ✓ভিদ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ভিন্ন** = **ভিদ** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ভেদিত** হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে। **বিভিন্ন** = বিশেষভাবে বা বিকল্পভাবে **ভিন্ন** যে।* **৩. ভিন্ন** = বিদারিত, ভগ্ন, বিদ্ধ, ছিন্ন, বিভক্ত, বিযুক্ত, অন্য, নিরস্ত, মিশ্র, সংবলিত ... ইত্যাদি। **বিভিন্ন** = বিভক্ত, বিদীর্ণ, নিরাকৃত, বিঘট্টিত, অন্যথাকৃত ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** different অর্থে **ভিন্ন** এবং 'নানারকম' অর্থে **বিভিন্ন** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ছিন্নভিন্ন, ভিদ**। কোনো সত্তা **ভেদগ্রস্ত** হওয়ার পর দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেলে, তাদের প্রতিটি খণ্ডকে টুকরো বা **ভিন্ন** বলে; তা সে (কাপড় হলে) কাঁচি দিয়ে **ভিদ** করে **ভিন্ন** করা হোক কিংবা **ছিন্ন** করে **ভিন্ন** করাই হোক। তবে এ তো গেল দৃশ্যলোকের **ভিন্ন**। অদৃশ্যলোকে এই **ভিন্ন** অনেক বেশি সক্রিয়। আর, তার সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হল বাংলাভাষীদের যৌথপরিবারের **ভিন্ন** হওয়া। ধরা যাক, সেটি সাত ভাইয়ের যৌথপরিবার। **ভিন্ন** হওয়ার পর বোঝা যায়, সাত ভাইয়ের যৌথসংসারের যৌথ পাকশালাটি পর্যন্ত সাতটি ছোট ছোট পাকশালায় পরিণত হয়েছে; হাতা-খুন্তি-হাঁড়ি-কড়াই থেকে কামরা-বিছানা-বালিশ-আলমারি তো **ভিন্ন** হয়েছেই। কিন্তু সেই ঘটনা পাথরের চাঁইয়ের সাত টুকরোর মতো দেখতে পাওয়া যায় না, অনেকটাই অনুভব করে নিতে হয়। ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের যৌথপরিবারও তো ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ সিংহল ... ইত্যাদি বহু পরিবারে **ভিন্ন** হয়ে গেছে; কিন্তু সে কি চোখে দেখে বোঝা যায়। ... **৬.** ইংরেজি vent, venture, prevent ইত্যাদি।

ভেদ : ১. ✓ভিদ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *দিশাগ্রস্ত **ভিদ** যাহাতে।* **৩. ভেদ** = বিদারণ, দ্বিধাকরণ, ভঞ্জন, ছেদন, বিকাশ, বিচ্ছেদ, প্রকাশন, স্তম্ভ, বৈলক্ষণ্য, অন্তর, বিশেষ, দ্বৈধ, সামাদি-চতুষ্টয়ের একতম রাজধর্ম্ম, সংহতভেদন, বিরেচন ... ইত্যাদি; ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, বিদ্ধ করা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দিশাগ্রস্ত **ভিদ** যে সত্তার ভিতরে প্রবেশ করে, তাকেই খণ্ডিত করে দেয় বলে তাকে **ভেদ** বলে। স্বভাবতই এই **ভেদ** স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি সকল সত্তার উপর প্রযুক্ত হতে পারে এবং সেগুলিকে বিভক্ত করে দিতে পারে। এই **ভেদ**-এর সঙ্গে উপসর্গাদি যুক্ত হয়ে বহু শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। যথা — **কালভেদ, জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ, দ্রব্যভেদ, পুরভেত্তা, পুরুষভেদ, প্রভেদ, বিভেদ, ব্যূহভেদ, ভেদক, ভেদকর, ভেদকৃৎ, ভেদপ্রত্যয়, ভেদবুদ্ধি, ভেদবাদী, ভেদসহ, ভেদন, ভেদনীয়, ভেদা (ভুলাভেদা), ভেদাভেদ, ভেদিত, ভেদী, (গগনভেদী), ভেদ্য, রসভেদ, রহস্যভেদ, সীমাভেদ, সীমাভেত্তা** ... ইত্যাদি। নিম্নে তাদের তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। **৬.** মনে রাখা ভাল, ইংরেজিতে in*vade*, per*vade* ... প্রভৃতি শব্দগুলি এই **ভিদ** পরিবারেরই সন্তান।

ভেদপ্রত্যয় (ভেদবাদী, ভেদবুদ্ধি) : ৩. ভেদপ্রত্যয় = দ্বৈতবিশ্বাস, দ্বৈতবাদ। **ভেদবাদী** = দ্বৈতবাদী। **ভেদবুদ্ধি** = ভেদজ্ঞান। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. প্রত্যয়** বা **বিশ্বাস** ছাড়া কোনো জীবই বাঁচতে পারে না। এই **প্রত্যয়** জীবকে বিশেষ দিশায় চলবার শক্তি ও বুদ্ধি যোগায়। তবে সাধারণভাবে দেখা যায়, জীবমাত্রে যে ধরনের **প্রত্যয়**-এর উপর নির্ভর করে চলে, তার একপ্রকার অখণ্ড ও পূর্ণ রূপ থাকে। চুরি চাকরে করলেও চুরি, নিজের ছেলে করলেও চুরি। ভুতোর বিধবা পিসির এক চিলতে জমি বর্গাদার-ক্ষেতমজুরে দখল করলেও জমিদখল, টাটাবাবু করলেও জমিদখল, সরকার স্বয়ং করলেও জমিদখল। বাংলার সংস্কৃতিতে এইরূপ **অভেদপ্রত্যয়** ছিল, এখনও কমবেশি আছে। তাতে মনে করা হয় ঈশ্বর থেকে শুরু করে ধূলিকণা পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্বই একই ঈশ্বরের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কোনো প্রকার **ভেদ** নেই। এই হল **অভেদপ্রত্যয়**। অনেকে এই ঈশ্বরকেই 'অতিচেতন', 'অরূপরতন' ... ইত্যাদি বলে থাকেন।

একালে কিন্তু তেমন হয় না। একালে অনেকেই **ভেদপ্রত্যয়** নিয়েই চলেন, অথচ তাঁদের চিহ্নিত করার এমন একটি জুতসই শব্দ বর্জিত হয়েছে। মার্কসবাদী বা আধুনিকতাবাদী কিংবা উত্তরাধুনিকতা-বাদীগণ অখণ্ড যুক্তিশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করেন না। তাঁরা ঘরের ক্ষেত্রে যে যুক্তিশৃঙ্খলায় নির্ভর করেন, বাইরের ক্ষেত্রে অন্যতর যুক্তিশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করেন। তাঁরা স্বভাবতই **ভেদপ্রত্যয়ী**। তাঁদের মতে ভুতোর বিধবা পিসির জমি বর্গাদারে দখল করলে কিংবা টাটাবাবু দখল করলে সেটি দখল নয়, কিন্তু ভুতোর বাবা

দখল করলে সেটি দখল; সরকার দখল করলে সেটি দখল নয়, কিন্তু জমিদার জোতদার কিংবা ভুতোর কাকা দখল করলে সেটি দখল। এরকম অজস্র **ভেদপ্রত্যয়** নিয়ে তাঁরা চলেন। গ্রামবাংলার মানুষ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বিশ্বাসী মানুষদের অধিকাংশই এরকম **ভেদপ্রত্যয়ী** নন, তাঁরা স্বভাবতই **অভেদপ্রত্যয়ী**। শ্রীচৈতন্য, লালন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ — এঁরা প্রত্যেকেই কমবেশি **অভেদপ্রত্যয়ী** ছিলেন। তাঁরা কেউই 'নিজের বেলা আঁটিশুঁটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি' করতেন না।

ভী ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অভয়, অভয়ঙ্কর, অভয়ডিণ্ডিম, অভয়দক্ষিণ, অভয়দান, অভয়প্রদান, অভয়বচন, অভয়মুদ্রা, অভীত, অভীর, অভীরু, অভীল, আভীর, আভীরা, আভীরিণী, আভীল, আহীর, বিভীতক, ভয়, ভয়কর, ভয়ঙ্কর, ভয়কৃৎ, ভয়ডিণ্ডিম, ভয়তরাসে, ভয়ত্রস্ত, ভয়ত্রাতা, ভয়দ, ভয়দায়, ভয়দায়ী, ভয়নাশন, ভয়প্রদ, ভয়প্রস্তাব, ভয়বিহ্বল, ভয়ব্যাকুল, ভয়ব্যাকুলিত, ভয়াব্যূহ, ভয়ভঙ্গি, ভয়ভাঙ্গা, ভয়ভীত, ভয়মৈত্রতা, ভয়স্থান, ভয়াহর্ত্তা, ভয়হারী, ভয়হেতু, ভয়াতুর, ভয়ানক, ভয়াপহ, ভয়াবহ, ভয়াল, ভয়ার্ত্ত, ভী, ভীকর, ভীত, ভীতভীত, ভীতসন্ত্রস্ত, ভীতি, ভীদত্ত, ভীতু, ভীম, ভীমকর্ম্মা, ভীমকান্ত, ভীমকার্ম্মুক, ভীমধন্বা, ভীমতিথি, ভীমদর্শন, ভীমদ্বাদশী, ভীমপরাক্রম, ভীমপলশ্রী, ভীমপলাশী, ভীমবাহু, ভীমরতি, ভীমরথী, ভীমরুল (দ্র.ভৃঙ্গ), ভীমসেন, ভীমসেনী, ভীমা, ভীমৈকাদশী, ভীরু, ভীরুক, ভীরূ, ভীলুক, ভীষক, ভীষণ, ভীষা, ভীষিত, ভীষ্ম, ভীষ্মক, ভীষ্মজননী, ভীষ্মপঞ্চক, ভীষ্মপর্ব্ব, ভীষ্মমাতৃভুবন, ভীষ্মরত্ন, ভীষ্মসু, ভীষ্মাষ্টমী, ভেউঁড়, ভেউভেউ, ভেউর, ভেউরি(রী), ভেওরি, ভেংচা, ভেক, ভেভুক্(জ্), ভেকর, ভেকা, ভেকী, ভেকুট, ভেকুয়া, ভেকো, ভেক্কা, ভেক্‌টি, ভেক্‌ভেক্, ভেগিনী, ভেঙভেঙ, ভেঙেরি, ভেঙ্গা, ভেঙ্গুর, ভেড়, ভেতব্য, ভের, ভেরণ্ড, ভেরাণ্ডা, ভেরি (very), ভেরী, ভেরু, ভেল, ভেলক, ভেলভেল, ভেলসা, ভেষ্, ভেষজ, ভেষজকরণ, ভেষজাগার, ভেস, ভৈ, ভৈঃ, ভেঁরো, ভৈম, ভৈমসেনি, ভৈমি, ভৈমী, ভৈরটাঙ্গি, ভৈরব, ভৈরবা, ভৈরবানন্দ, ভৈরবী, সভয়।

ভী = গতিশীল ভবের আধার যে। (দ্র. **ভ** বর্ণের অর্থ; দ্র. **ভিদ্**। বিপরীতার্থক **ভ**-এর গতিশীল আধার এই **ভী**। স্বভাবতই, যে কোনো সত্তাকেই সে 'ভেদ ঘটিয়ে দেবো', 'ভেঙে দেবো', 'বিলুপ্ত করে দেবো' ... ইত্যাকার বোধে বিব্রত করে।)

ভয় : ১. ✓ভী + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(বিপরীতার্থক) ভব যায় যাহাতে; অর্থাৎ, যে বিপরীত সত্তা ভেদগ্রস্ত করে দেব, ভেঙে দেব, গুঁড়িয়ে দেব, নিশ্চিহ্ন করে দেব — এইরূপ জানান দেয়।* ৩. স্বীয় উচ্ছেদশঙ্কা, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়হেতু যুদ্ধ, ভয়হেতু, ত্রাসকারণ, ভয়ানকরসের স্থায়িভাব, রোগ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. বিপরীত **ভ**-এর গতিশীল আধার যে, তাকে বলে **ভী**। সেই **ভী** বাস্তব রূপ লাভ করলে সেটিই হয়ে যায় **ভয়**।

ভয়কর (ভয়ঙ্কর, ভয়জনক, ভয়ানক, ভয়াবহ, ভয়াল, ভীকর, ভীষণ) : ২. **ভয়কর** = *ভয় দান করে যে।* **ভয়জনক** = *ভয় জনন করে যে।* **ভয়ঙ্কর** = *ভয়-এর বিশেষ সীমায়িত রূপ দান করে যে।* **ভয়ানক** = *ভয় আনয়ন করে যে।* **ভয়াবহ** = *ভয়-এর আবহ যাহাতে।* **ভয়াল** = *ভয়-এর আধার লালিত যাহাতে।* **ভীকর** = *(নিম্নে দ্রষ্টব্য)।* **ভীষণ** = **ভী** *(বিপরীত ভ-এর সক্রিয় আধার) দিশাগ্রস্তভাবে অন (on) যাহাতে।* ৩. **ভয়কর** = ভয়জনক। **ভয়ঙ্কর** = ভয়জনক, ভীষণ। **ভয়ানক** = ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভয়জনকভাবে, ভয়ের হেতুভূতরূপে, ব্যাঘ্র, রাহু, রসবিশেষ। **ভয়াবহ** = ভয়জনক, ভীষণ। **ভয়াল** = ভয়ঙ্কর। **ভীকর** = ভয়ঙ্কর। **ভীষণ** = ভয়ঙ্কর, দারুণ, ঘোর। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই কমবেশি প্রচলিত। অ্যাকাডেমিতে এগুলির অর্থ সাধারণভাবে fear। ৫. একই **ভয়** শব্দের এতগুলি রূপ এই জন্য যে, **ভয়**-এর নানা রূপ রয়েছে। তাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি উপরোক্ত ২.-এ প্রদত্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে বোঝা যেতে পারে। প্রধানত সেই পার্থক্যগুলি দেখানোর জন্যই এই শব্দগুলির ভুক্তি ঘটানো হল।

ভী (ভীকর, ভীত, ভীতি, ভীদত্ত, ভীতু — বিভী, বিভীত, বিভীতক) : ১. ✓ভী + ক্বিপ্ (০) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভী** = *বিপরীত স্বভাবীর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, দ্রষ্টার অস্তিত্ব-নাশী যে।* **ভীকর** = **ভী** *করে যে।* **ভীত** = **ভী** *তারিত যাহাতে।* **ভীতি** = **ভীত** *গতিশীল যাহাতে।* **ভীদত্ত** = **ভী** *হেতু দত্ত যে বা যাহা।* **ভীতু** = **ভীত** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* — **বিভী** = **ভী**-*এর বিপরীত যাহাতে।* **বিভীত** = **বিভী** *তারিত যাহাতে।* **বিভীতক** = **বিভীত** *করে যে।* / **বিভী** = বিগত ভী যাহার। **বিভীত** = বিগত ভীত (রোগভয়), অথবা বিশেষ ভীত যাহা হইতে। (ব.শ.)। ৩. **ভী** = ভয়, শঙ্কা। **ভীকর** = ভয়ঙ্কর। **ভীত** = ত্রস্ত, ভয়যুক্ত, ভয়, ত্রাস। **ভীতি** = ভয়, কম্প। **ভীদত্ত** = রাজা বলী বা কার্য্যঘাতীকে কার্য্যার্থ বা পাপভয়ে প্রদত্ত ধনাদি (blackmail)। **ভীতু** = ভয়শীল (timid)। **বিভী** = বিগতভয়, নির্ভীক। (ব.শ.)। ৪. **ভীত, ভীতি, ভীতু** যথাক্রমে frightened, fear, timid অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. 'ক'-এর অস্তিত্বের স্বভাববিরোধী যদি 'খ'-এর অস্তিত্ব হয়, 'খ'-এর সংস্পর্শে এলে 'ক'-এর অস্তিত্বনাশ হতেই পারে, বিশেষত 'খ'-এর শক্তি যদি বেশি হয়। এই অবস্থায় 'ক'-এর চোখে 'খ' হল **ভী** — 'বিপরীত স্বভাবীর সক্রিয় আধার যে'। 'ক'-এর পক্ষে এই **ভী** তাই **ভয়**-এর সক্রিয় বা গতিশীল আধার।

আমরা অনেকেই জানি না যে, নির্ভীককে **বিভী** বলা হত। এবং যার মন থেকে ভয় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে যে **বিভীত** বলা হত, তাও আমরা জানতাম না। এসব শব্দ এখন অপ্রচলিত। এমনকি, কাউকে কোনো বিপদের ভয় দেখিয়ে যে ধনসম্পদ গ্রহণ করা হত এবং তাকে যে **ভীদত্ত** বলা হত, তাও আমরা জানতাম না। এখন তো আমাদের সমাজে এই রোগের রমরমা চলছে। কিন্তু তার জন্য যে **ভীদত্ত** দেওয়া হয়, তাকে আমরা **ভীদত্ত** বলি না; বলি blackmail; যদিও তাতে সমগ্র ব্যাপারটি ঠিকঠাক বোঝায় না।

ব.শ.-প্রণেতা কিন্তু **ভীদন্ত** কাকে বলে সেকথা জানতেন এবং **ভীদন্ত** শব্দের ইংরেজি মানে দিতে গিয়ে blackmail শব্দটিও দিয়ে গেছেন।

বিভীতক : ২. *বিভীত করে যে। (উপরে **বিভীত** দ্রষ্টব্য)। /* যাহা হইতে রোগভয় যায়; ভূতাশ্রয় হেতু যাহা হইতে বিশেষ ভয়। (ব.শ.)। **৩.** বহেড়া গাছ, বিভীতকফল, বহেড়া। (নলের দেহনিঃসৃত কলি বিভীতকবৃক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। বৈদিক যুগে দ্যূতে বিভীতক ফল অক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্যূত কলির (কলহের) মূল; বোধ হয় কলির বিভীতকে প্রবেশের ইহা মূল কারণ এবং সেই হেতু ইহা 'বিভীতক'।)। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **তুষ**, **ভল্লাতক**। অধিকাংশ বাংলাভাষীই জানেন, ত্রিফলার জল খেলে মানবশরীর সুস্থ সবল থাকে। এই ত্রিফলা হল হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই তিনটি ফল। তবে এ হল বাহ্য ত্রিফলা গাছের তিনরকম দৃশ্য ফল। অদৃশ্য তিনরকম ত্রিফলার গাছও আছে। **আমলকী** গাছ কাকে বলে, সেকথা আগেই আমরা জেনেছি (দ্র. **কায়স্থ**); এ হল আমলা-কেরানিদের ব্যবস্থা বা আমলাতন্ত্র। ঠিক সেইরকম **বিভীতক** গাছ হল সমাজের দোকানদারদের ব্যবস্থা কিংবা সমাজের দারোগা-পুলিশের থানা-ব্যবস্থা বা প্রশাসনতন্ত্র। সেই কারণে এদের **ভূতা**বাস বলে, যেখানে পিশাচাদি বাস করে। একে শাখোটক বৃক্ষ বা শ্যাওড়া গাছও বলা হয়; আর শ্যাওড়া গাছে যে **ভূত** থাকে, সেকথা গ্রামবাংলার প্রত্যেকটি মানুষই আজও জানেন। এসব **বৃক্ষের** ফলপাতা পেলে সমাজসভ্য **দক্ষ**-ছাগেরা ভারি খুশি হয়, তারা চোখ বন্ধ করে সে পাতা চিবোয়, তাদের লাভ-বোধ হয়, তারা আর্থিকভাবে নিরাপদ থাকে। তাদের চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের থেকে অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না। কিন্তু ঐ যে বলে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা কিন্তু পুলিশে ছুঁলে ...'। অতএব দোকানদারে ছুঁলে দু-চারটে ঘা হলেও হতে পারে, কিন্তু পুলিশে ছুঁলে কত ঘা হয় তার হিসাব করা যায় না। সেইকারণে ত্রিফলা খাওয়ার সময় **বিভীতক** বা বহেড়া ফলটি ভাল করে দেখেশুনে ধুয়েমুছে নিতে হয়। তাছাড়া বহেড়ার মাত্রাও যেন কোনোভাবেই বেশি না হয়, তাও দেখতে হয়।

ভীম : ১. ✓ভী + ম (মক্) - অপাদানে। (ব.শ.)। **২.** *ভী (পূর্ণরূপে) সীমায়িত যাহাতে। /* যাহা হইতে ভয়। (ব.শ.)। **৩.** ভয়, ভয়ঙ্কর, ভীষণ, দারুণ, ঘোর; শিবের অষ্টমূর্ত্তির একতম আকাশমূর্ত্তি, শিব, রুদ্রবিশেষ, বিষ্ণু, ভয়ানকরস, ভীমসেন। ইঁহার পিতা পাণ্ডু, মাতা কুন্তীদেবী। ইনি স্বর্ণবর্ণাভ দৃঢ়াঙ্গ মহাবিক্রম ও মহাবেগবান ছিলেন। ... বলরাম ইঁহার গদাযুদ্ধের গুরু। হিড়িম্ববধ, বকনিধন, জরাসন্ধবিনাশ ও কীচকহত্যা ইঁহার বলের পরিচায়ক। ... রণস্থলে দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া ইনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। (ব.শ.)।

(ক) ... বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত মধ্যম পাণ্ডব। ... হনুমান এঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ... গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন বলে কর্ণ এঁকে তুবরক (মাকুন্দ) বলে পরিহাস করতেন। ... দ্রোণ ও বলরামের শিষ্য ও গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয়। ... অতিরিক্ত ভোজনপটু বলে তাঁর এক নাম 'বৃকোদর' (বৃক নামক অগ্নি যার উদরে অবস্থিত)। ... গঙ্গার প্রমাণকোটী নামক স্থানে ... দুর্যোধনের কৌশলে ভীম জলমগ্ন হন। ... নাগরাজ বাসুকী তাঁকে নিজের দৌহিত্র কুন্তীভোজের দৌহিত্র বলে চিনতে পেরে আলিঙ্গন করেন ও রসায়ন পান করতে দেন ... যার ফলে ... ভীম অযুত হস্তীর সমান বল লাভ করেন। ... ইনি রাক্ষস হিড়িম্বকে হত্যা করে হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। ... একচক্রা নগরে গিয়ে ভীম বকরাক্ষসকে বধ করেন। ... মগধরাজ জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করেন। ... যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীম পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা দেশ জয় করেন ... দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ইনি দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করার প্রতিজ্ঞা করেন। ... কাম্যকবনে বাসকালে বকরাক্ষসের ভ্রাতা কির্মীর প্রতিশোধকল্পে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে, ভীম তাকেও বধ করেন। ... বদরিকাশ্রমে বাসকালে দ্রৌপদী একদিন গঙ্গায় একটি ... সহস্রদল পদ্ম ভেসে আসতে দেখে ভীমকে সেইরূপ আরো পদ্ম সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। সেই পদ্ম আনবার পথে গন্ধমাদন পর্বতে হনুমানের সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ হয়। ... হনুমান রুগ্ন বানরের রূপ ধারণ করে পথরোধ করে শুয়ে থাকেন। ভীম পথ ছেড়ে দিতে বলায় হনুমান তাঁকে তাঁর লেজটি সরিয়ে পথ করে নিতে বলেন। ভীম হনুমানের লাঙ্গুল উত্তোলনে অসমর্থ হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ... কুবেরভবনের নিকটস্থ এক নদী থেকে কুবেরের অনুচরদের পরাস্ত করে ভীম ওই পদ্ম সংগ্রহ করেন। ... ভীম জটাসুরকে বধ করেন, ... কুবেরসখা মণিমানও ভীমের হাতে নিহত হন। ... রাজ্যলাভের পর যুধিষ্ঠির ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ... মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, ও অর্জুনের পতনের পর ভীম পতিত হন — অতিভোজন ও আত্মপ্রশংসার জন্য। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের সুতসোম নামে এক পুত্র জন্মে। হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্রের নাম ঘটোৎকচ। ... অজ্ঞাতবাসকালে ভীমের গুপ্ত নাম ছিল জয়ন্ত। (খ) ইনি বিদর্ভরাজ ভীম, এবং দময়ন্তীর পিতা। বহুদিন পর্যন্ত ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। ... পরে দমন নামক মহর্ষির বরে দম, দান্ত, ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন। ... ময়দানব বিন্দু সরোবর হতে এঁকে বৃষপর্বার গদা উপহার দেন। ইনি কাশীরাজের কন্যা বলন্ধরাকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে ভীমের সর্বগ নামে এক পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আমরা যতরকম **ভয়** পাই, সেগুলির যদি কোনো একটি পূর্ণ সীমায়িত রূপের কল্পনা করা যায়, তাকে নাম দিতে হয় **ভীম**। আমাদের **ভয়**-এর, অপছন্দের, না-চাওয়ার, দূরে ঠেলে রাখার সম্পূর্ণ এক মূর্তিমান অপ্রিয় সত্তাকেই **ভীম** নাম দেওয়া হয়েছিল। যেমন কিনা, আমাদের **কামনার**, পছন্দের, চাওয়ার, কাছে টেনে নেওয়ার সবচেয়ে প্রিয় সত্তাটিকে নাম দেওয়া হয়েছিল **কান্ত**। শিবের **কান্তাই** তো শক্তিরূপিণী **পার্ব্বতী**; মজনুর **কান্তাই** তো লায়লা, লায়লার **কান্তই** তো মজনু। তার মানে, প্রাচীন বাংলাভাষায় ভয়ানক সত্তার একটি কল্পিত পূর্ণরূপকে **ভীম** বলা হত এবং তার বিপরীতে কাম্য সত্তাকে **কান্ত** বলা হত। এখন দুটো শব্দই আমরা ফেলে দিয়েছি। এমনকি বিদ্রোহী কবি নজরুলও **ভীম** শব্দের এই অর্থ জানতেন এবং '... যবে অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ **ভীম**রণভূমে রণিবে না' বাক্যটিতে সেই অর্থে **ভীম** শব্দটির প্রয়োগও করেছেন। তা সত্ত্বেও এখন আমরা আর **ভীম** শব্দের সেরকম প্রয়োগ করি না। ফলত, এই **ভীম** সংশ্লিষ্ট

— **ভীমকর্ম্মা, ভীমকান্ত, ভীমকার্ম্মুক, ভীমধন্বা, ভীমতিথি, ভীমদর্শন, ভীমদ্বাদশী, ভীমপরাক্রম, ভীমপলশ্রী, ভীমপলাশী, ভীমবাহু** — প্রভৃতি শব্দগুলিকেও আমরা ভুলে গেছি, বর্জন করেছি। অথচ **ভীম**সত্তা ও **কান্ত**সত্তা এখনও আমাদের জীবনে সমাজে খুবই সক্রিয় এবং নানারকম ভালমন্দ ঘটিয়ে চলেছে। আজকের কর্পোরেট পুঁজির প্রচার কি **ভীম** পদবাচ্য নয়? সেই **ভীম**-এর কারণেই কি কমলা**কান্ত** লক্ষ্মী**কান্ত** রজনী**কান্ত** সজনী**কান্ত** নীল**কান্ত**রা আমাদের জীবন থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে না?

তা সে যাই হোক, আমাদের প্রাত্যহিক ভাষাব্যবহার থেকে **ভীম** হারিয়ে গেলেও, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে দুজন **ভীম**কে পেয়েছিলাম এখন তাদের কথা হোক। তার মধ্যে **পাণ্ডু**পুত্র **ভীম**কেই আমাদের কমবেশি মনে আছে, **দময়ন্তী**-পিতা **ভীম**কে আমরা ভুলে গেছি। (দ্র. **দময়ন্তী, নল, দর্ভ**)।

পাণ্ডুপুত্র **ভীম** কে? ইনি হলেন **মহাভারতে**র এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। **ব্যাসদেব**গণ যে নিয়মে **মহাকাব্যে**র অন্যান্য চরিত্রগুলির নাম দিয়েছিলেন, সেই নিয়মেই তাঁরা এই **ভয়ানক** চরিত্রটির নাম দিয়েছিলেন **ভীম**। 'শিক্ষক', 'শ্রমিক', 'চোর' যেমন কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, প্রত্যেকেই এক একটি সামাজিক সত্তা; **ভীম**ও তেমনি একটি সামাজিক সত্তা। প্রায় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে কাছাকাছি ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতসমাজে এই সত্তা যে ভূমিকা পালন করেছিল, **ব্যাস**দেব সেই ঘটনাবলীই লিপিবদ্ধ করেছেন **মহাভারত**-এর কাহিনীতে। এর কাহিনী আগাগোড়া ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে বুঝে নিলে, তার সব কথা জানা যাবে। এখানে সে পরিসর নেই; আমরা সংক্ষিপ্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য।

ভীমকে সহজে চেনার উপায় হল **পবন**কে চিনে নেওয়া। একালের ভাষায় এই **পবন** বা **বায়ু**কে **ইনফর্মেশন** বলে। এ হল সর্বপ্রকারের তথ্যজ্ঞান। স্বভাবতই এর থেকে উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রির লেজওয়ালা **পবনপুত্র-হনুমান** জন্মায়। এর থেকেই জন্মায় **কুন্তী**র বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বা সংস্থার প্রচারব্যবস্থা বা **বায়ুপুত্র-ভীম**। কীভাবে **কুন্তী**র গর্ভে **বায়ু**র পুত্র জন্মেছিল, সেকথা মহাভারতের কাহিনীতে আছে। একালের ধনতান্ত্রিক সংস্থাগুলির প্রচারের দিকে তাকালেই এই **ভীম**কে চেনা যাবে। দিনকে রাত রাতকে দিন করতে যত শক্তি লাগে, তা সবই এই সত্তা প্রয়োগ করে থাকে।

অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থায় যারা কথার জোরে কাজ চালাত **ব্যাসদেব**গণ সেই **গদাধরদের (গদ্যবাদীদের)** নাম দিয়েছিলেন **দুর্য্যোধন**, আর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা কথার জোরে কাজ চালাত সেই **গদাধরদের** চিহ্নিত করেছিলেন **ভীম** নামে। এই **ভীম**-এর সঙ্গে **হিড়িক** বা **হিড়িম্বার** যোগ ঘটলে **ঘটোৎকচ**-এর বা **গুজব**-এর জন্ম হয়। ভারত ইতিহাস বলছে যে, অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার (বৈদিক ব্যবস্থার) সঙ্গে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার (বৌদ্ধ ব্যবস্থার বা রামরাজত্বের) যুদ্ধে **ঘটোৎকচ** বা **গুজব**-এর এক মুখ্য ভূমিকা ছিল। এই যুদ্ধে **ভীম** বা ধনতান্ত্রিক প্রচার জনসাধারণকে এতই ক্ষিপ্ত করে দেয় এবং তারা সেকালের ভারত রাষ্ট্রের যেখানে যত সরকারি কর্মচারী ছিল, তাদের অধিকাংশকেই প্রাণে মেরে ফেলেছিল। একেই বলা হয় **'দুঃশাসনের** রক্তপান'। ...

হনুমানের লেজ তুলে সরিয়ে দিতে না-পারার উপরোক্ত কাহিনীটি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং কবিতার মতো সুন্দর। 'নয়াচরে কেমিক্যাল কারখানা হলে সমুদ্র দূষিত হবে' — একথা যদি একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশাল ডিগ্রির লেজওয়ালা **হনুমান** বলে দেন, কোনো পুঁজিপতি-শিল্পপতির প্রচারব্যবস্থার বা **ভীম**-এর সাধ্যি কী সেকথা হেলায় সরিয়ে দিয়ে সেখানে **শিল্প**কারখানা গড়ে!. এই হল **ভীম**-এর অগ্রগতির পথে **হনুমানে**র লেজ বিছিয়ে পথ আটকে রাখা এবং **ভীম** কর্তৃক **হনুমানে**র লেজ সরাতে না-পারার মর্মকথা। এখন অবশ্য দিনকাল পাল্টেছে। আজকাল এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিল্পপতি কোনো না কোনো **হনুমান**কেই প্রচুর ধন দিয়ে কিনে নিয়ে এসে **ভীমে**র পাশে বসিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া একালের **হনুমানে**রা তো রামরাজত্ব কালের **হনুমানের** মতো দেবতুল্য নয়। একালের **বীর-হনুমানেরা** পর্যন্ত বৈশ্যের কাছে কয়েকটা টাকায় বিক্রি হয়ে যায় এবং এভাবে টাকার গোলাম হয়ে যেতে আজকাল তাদের লজ্জা করে না।

ভীরু (ভীরূ, ভৈরব, ভৈরবী) : ১. ভীরু = ✓ভী + রু (ক্রু) - কর্তৃবাচ্যে। **ভৈরব** = ভীরু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২. ভীরু = ভী** *(ভয়ের গতিশীল আধার) রহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, যে আগে ভয় পেয়েছে কিন্তু এখন ভীত নয়।* ***ভীরূ*** *=* ***ভীরুর*** *আধারশক্তি যে।* ***ভৈরব*** *=* ***ভৈর*** *(দিশাগ্রস্ত ভয়প্রদর্শক রহে যাহাতে) বহন করে যে।* ***ভৈরবী*** *=* ***ভৈরব****-এর আধারশক্তি যে।* / **ভৈরব** = ভীরুকে ত্রাসিত করে যে ('ভীরুত্রাসকর')। (ব.শ.)। **৩. ভীরু** = ভয়শীল, কাতর, শৃগাল, ইক্ষুবিশেষ। **ভীরূ** = যোষিদ্‌বিশেষ, ভয়শীলা স্ত্রী, অজা, কণ্টকারী, শতাবরী। **ভৈরব** = ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঘোর, দারুণ, শঙ্কর, শঙ্করাবতার-তদ্‌গণভেদ, ভয়ানকরস, রাগবিশেষ, নাগভেদ। (ব.শ.)। পুরাকালে অন্ধকাসুরের সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত করলে, উহা চার ভাগে বিভক্ত হয় এবং রক্তধারা নির্গত হয়। এই রক্তধারা থেকে ভৈরবগণ উৎপন্ন হয়। পূর্বদিকের রক্তধারা থেকে বিদ্যারাজ ভৈরব, দক্ষিণধারা হতে কামরাজ ভৈরব, পশ্চিমধারা থেকে নাগরাজ ভৈরব এবং উত্তরধারা থেকে সাচ্ছন্দরাজ ভৈরবের জন্ম হয়। মহাদেবের ক্ষতস্থানের রক্ত থেকে যে ভৈরব জন্মগ্রহণ করে, তার নাম লম্বিতরাজ। এছাড়া আরো অনেক ভৈরবের নামের উল্লেখ দেখা যায়। নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, ও বেতাল — এঁরাও শিবের ভৈরব। (পৌ.অ.)। **ভৈরবী** = দুর্গাকৃতিভেদ, চামুণ্ডা, মহাবিদ্যাবিশেষ, শিবপত্নী, দুর্গা, (সাদৃশ্যে) দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, রাগিণীবিশেষ। (ব.শ.)। চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে প্রধানা যোগিনীর নাম ভৈরবী। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা গোপিনীরা মহেশ্বরীর সহচরী ও তাঁরই ন্যায় পূজনীয়া। ... এই সকল যোগিনীগণের নাম পাঠ করলে ডাকিনী, কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনোরূপ উপদ্রব বা ক্ষতি করতে পারে না। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কালভৈরব, দশমহাবিদ্যা**। সহজ কথায় **ভীরু**কে ভয় দেখায় যে, তাকে **ভৈরব** বলে। এই **ভৈরব-ভৈরবী**দের নিয়ে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে এতরকম বয়ান রয়েছে, যে, কোনটি যথার্থ আর কোনটি অযথার্থ ঠিক করাই এক মুশকিলের ব্যাপার।

তবে সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল **কালভৈরব**। তাছাড়া, ব.শ. জানাচ্ছেন, তন্ত্রসারে আটজন **ভৈরব**-এর কথা বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন — অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উত্তম, কপালী, ভীষণ, সংহার। এঁদের **দেবী** বা **ভৈরবী** রূপও আছে। যথা 'ব্রাহ্মী অসিতাঙ্গ, মাহেশ্বরী রুরু, কৌমারী চণ্ড, বৈষ্ণবী ক্রোধ, বারাহী উন্মত্ত, মাহেন্দ্রী কপালী, চামুণ্ডা ভীষণ, মহালক্ষ্মী সংহার।' ...

যাই হোক, আমরা এই বিস্তারে যাব না। আমরা শুধু এটুকুই উপলব্ধি করেছি যে, সামাজিক উপপ্লবের ক্ষেত্রে রুদ্র**শিবের** রুদ্ররোষকে বহন করে যে সত্তাগুলি, তাদের **ভৈরব** এবং তাদের আধারশক্তিগুলিকে **ভৈরবী** বলে। অনেক সময় **শিব**-এর রুদ্ররোষ-বাহক সত্তাদের **ভৈরব** এবং **শক্তি**র রুদ্ররোষবাহিকা সত্তাদের **ভৈরবী** বলা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টা **শিবের** চৌষট্টি **কলা**র ধারিকারূপী চৌষট্টি যোগিনী রূপে অভিহিতা। এঁরা যে চৌষট্টি **কলা**য় নিপুণ সাধারণ প্রজা বই অন্য কেউ নন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে।

ভীষক (ভীষ, ভীষণ, বিভীষক, বিভীষণ, ভীষা, বিভীষা, ভীষিত, বিভীষিকা) : **১.** ✓ভী + ই (ণিচ্) + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** (*ভীষ = ভী দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত হয় যে স্থান-কাল-পাত্র থেকে; অথবা, যাহা হইতে বিশেষ দিকে ভয়প্রদর্শন চলে। দ্র. ভী।*)। ***ভীষক*** *=* ***ভীষ*** *করে যে।* ***ভীষণ*** *=* ***ভীষ*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***বিভীষক*** *= বিশেষ রূপে* ***ভীষ*** *করে যে।* ***বিভীষণ*** *= বিশেষ প্রকার* ***ভীষণ*** *যে।* ***ভীষা*** *=* ***ভীষ****-এর আধার যে।* ***বিভীষা*** *= বিশেষ* ***ভীষা*** *যে।* ***ভীষিত*** *= যাহাকে* ***ভীষ*** *করা হইয়াছে।* ***বিভীষিকা*** *= বিশেষভাবে* ***ভীষ*** *গতিশীল করে যে।* **৩. ভীষক** = ভয়জনক, ভীষণ। **বিভীষক** = বিভীষয়িতা, বিশেষ ভয়ঙ্কর, ভীতিজনক। **ভীষণ** = ভয়ঙ্কর, দারুণ, ঘোর, ভয়ানকরস, ভীম, শল্লকী, হিন্তাল, ভয়জনক বস্তুমাত্র। **বিভীষণ** = বিভীষক, কঠোর, দারুণ (ভাষা), নলতৃণ, একাদশ মুহূর্ত্ত, ত্রাসজনক কার্য্য, ভয়োৎপাদন, ভয়প্রদর্শন, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন ... তপস্যায় প্রীত প্রজাপতি ইঁহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে, ইনি, 'মহাবিপদেও যেন ধর্ম্মে মতি থাকে, গুরূপদেশ বিনা যেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিভাত হয় এবং যে যে আশ্রমেই থাকি না, আমার মতি যেন সেই সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সেই ধর্ম্মপালনে তৎপর হয়' — এই তিন বর প্রার্থনা করেন। 'সীতাপ্রত্যর্পণ হিতকর', 'কেহই রামসদৃশ বীর নহে' — ইঁহার ইত্যাদি উপদেশবাক্যে কুপিত রাবণ ইঁহাকে অপমানিত করিলে, ইনি চারিজন রাক্ষসের সহিত লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া রামের শরণাপন্ন হন ও রাক্ষসবধে সাহায্যের প্রতিজ্ঞা করিলে, রাম ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অনুচরসহিত রাবণ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, ইনি লঙ্কার সিংহাসনে আরোহন করেন।)। (ব.শ.)। ... ... বিভীষণের স্ত্রী গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা সরমা ও পুত্র তরণীসেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণ মহর্ষি বিশ্রবার তিন রাক্ষস পুত্র। রাক্ষস সুমালীর কন্যা নিকষা বা কৈকসী এঁদের মাতা। ... রাবণ সবংশে নিহত হলে, বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসেন ও রাবণ-পত্নী মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। ... (পৌ.অ.)। **ভীষা** = ভয়কথন, ভয়প্রদর্শন। **বিভীষা** = ভয়প্রদর্শন। **ভীষিত** = ত্রাসিত। **বিভীষিকা** = ভয়প্রদর্শনা, ভয়জনক বিষয়। (ব.শ.)। **৪.** terrible অর্থে **ভীষণ**, পৌরাণিক চরিত্রের নামরূপে **বিভীষণ**, এবং terrible fear or panic অর্থে **বিভীষিকা** প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** কার্যত **ভীষিকা** হল ভয়প্রদর্শিকা এবং **ভীষণ** হল ভয়জননকারী। কিন্তু **বিভীষিকা** ও **বিভীষণ** শব্দের বেলায় তাদের অর্থ নিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়। আমরা দেখেছি, **বি** উপসর্গ 'বিকল্প', 'বিশেষ', 'বিপরীত' ইত্যাদিকে বোঝায়। **বিভীষিকা, বিভীষণ** শব্দের বেলায় সমস্যা দাঁড়ায়, তাদের **বি** উপসর্গটি ঠিক কী বোঝাচ্ছে? আমরা কি বিকল্প-ভয় দাতাকে **বিভীষিকা** বলতে পারি? কিংবা বিশেষ-ভয় দাতাকে? অথবা, বিপরীত-ভয় দাতাই কি **বিভীষিকা**? একইভাবে **বিভীষণ** কাকে বলব? বিকল্প-ভয় জনককে, বিশেষ-ভয় জনককে নাকি বিপরীত-ভয় জনককে?

বি উপসর্গে আমরা দেখেছি, সে আসলে মূল সত্তার বিকল্প-বিশেষ-বিপরীত সত্তাকে বোঝায়। সেই সুবাদে **বিভীষিকা** ও **বিভীষণ**-এর অন্তর্ভুক্ত 'ভয়' মূলধারার ভয় নয়; অন্যতর ভয়। তার মানে, আমরা যাকে আমাদের সামনে **ভীষিকা** বা **ভীষণ** রূপে অর্থাৎ 'ভয়'রূপে দেখছি, যার থেকে আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন বোধ করছি, এই **বি**-যুক্ত **ভীষিকা** ও **বি**-যুক্ত **ভীষণ**-এর অন্তর্নিহিত ভয় সেরকম ভয় নয়। এ ভয় তার চেয়ে বেশি কিংবা তার চেয়ে কম কিংবা উল্টো-ভয় অর্থাৎ সাহসও হতে পারে। ...

বিভীষণ শব্দের সামাজিক-ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার থেকে এর একপ্রকার অর্থ পাওয়া যায়। তা হল, **ভীষণ**-এর ভিতরে যে ভয় থাকে, তার বিরোধী সত্তাই **বিভীষণ**। আমি যাকে ভয় পাই বা পেতাম, তার ভিতরের সবকথা যে-সত্তা জানে, সে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে আমার সহযোগী হয়ে। স্বভাবতই সে তো **ভীষণ**-এর পক্ষেই বিপজ্জনক, **ভীষণ**কেই সে বিলুপ্ত করে দেওয়ার ভয় দেখায়; সে তো **ভীষণে**র পক্ষেই **ভীষণ**, তাই সে মহাভীষণ। এই মহাভীষণই **বিভীষণ** বলে। তার মানে, **ভীষণে**র বিপরীত মহা**ভীষণ**কে **বিভীষণ** বলে। সহজ করে বললে, ভয়ানককে ভয় দেখায় যে, সেই হল **বিভীষণ**। তাই বলে **বিভীষিকা** কিন্তু বিপরীত নয়, সে বিশেষ ধরনের **ভীষিকা**; তাই **বিভীষিকা**। ...

যাই হোক, এ তো গেল **বিভীষণ** ... প্রভৃতি শব্দের নিহিতার্থ বিষয়ক সংবাদ। এবার আমাদের ঐতিহাসিক **বিভীষণ**কে বুঝে নিতে হবে। উপরে **ভীম**-এর ক্ষেত্রে আমরা জানিয়েছি, এঁদের পৌরাণিক কাহিনীর আগাগোড়া ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেওয়ার পরিসর এখানে নেই, আমরা সংক্ষেপে ও সহজে সারার চেষ্টা করছি। বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের বিপ্লব যখন (প্রায় ২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে) চলছে, তখন যে সরকারি জ্ঞানজীবীগণ সরকারপক্ষ ছেড়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে যোগ দেন, তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল **বিভীষণ**। তার পরে কী কী হয়েছিল, রামায়ণের কাহিনীতে সেসব কথা আছে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর হিন্দুযুগের শুরুতে ক্রমে এই **বিভীষণ** সত্তা হিন্দু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশে যায়। হিন্দুযুগ কিন্তু এই **বিভীষণ**কে কোনোদিনই ভাল চোখে দেখেনি।

ভীষ্ম : ১. ✓ভী + ম (মক্)। (ব.শ.)। ২. **ভীষ** *(তার সাময়িক পূর্ণরূপে) সীমায়িত যাহাতে। (দ্র. **ভীষ**)।* ৩. ভীষণ, ভয়ানকরস, রুদ্র, রাক্ষস, শান্তনুপুত্র, দেবব্রত। (... বশিষ্ঠশাপে গঙ্গাগর্ভে জাত অষ্টবসুর একতম ও কনিষ্ঠ। সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহে, সিংহাসনাধিকারত্যাগ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ — এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা হেতু ইনি 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত এবং পিতার নিকট 'স্বচ্ছন্দমরণ'-বর প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুতে ইনি বিমাতৃপুত্র বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কাশিরাজকন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুতে তৎপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং পৌত্র কৌরব-পাণ্ডবগণ ইঁহারই তত্ত্বাবধানে পালিত ও শিক্ষিত হন।) ... (ব.শ.)।

রাজা শান্তনুর ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। এইজন্য এঁর নাম গাঙ্গেয় ও নদীজ। এঁর অন্য নাম সত্যব্রত (দেবব্রত)। বশিষ্ঠের শাপে গঙ্গাগর্ভে জাত অষ্টবসুর ইনি অন্যতম। ... সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহে সিংহাসনত্যাগ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ — এই দুই ভীষণ প্রতিজ্ঞাহেতু ইনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন এবং পিতার নিকট স্বেচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্ত হন। ... ইনি বশিষ্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন এবং পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। ... বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজকন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করেন। ... অম্বা শাল্বরাজের অনুরক্তা জেনে তাঁকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃতা অম্বাকে তখন শাল্বরাজ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ... অম্বা পরশুরামের শরণাপন্ন হন। তিনি শিষ্য ভীষ্মকে বলেন অম্বাকে গ্রহণ করতে। ... ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে রাজি না হওয়ায় কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের তেইশ দিন ধরে যুদ্ধ হয়। ... অবশেষে পরশুরাম অম্বাকে সাহায্য করতে অসমর্থ হয়ে চলে যান। ... অম্বা তখন কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের নিকট বর লাভ করেন যে, পরজন্মে দ্রুপদ রাজার নপুংসক সন্তান শিখণ্ডীরূপে জন্মলাভ করে তিনি ভীষ্মবধের কারণ হবেন। ... কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে জ্ঞাতিবৈরিতা আরম্ভ হলে ভীষ্ম ... তা নিবারণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। ... কৌরবভবনে বাস করে তাদের অন্নে প্রতিপালিত বলে ভীষ্ম অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ... কুরুক্ষেত্রের নবম দিনের যুদ্ধের পর ... পাণ্ডবরা নিরুপায় হয়ে রাত্রে ভীষ্মের নিকট গিয়ে তাঁর বধের উপায় জানতে চান। ভীষ্ম বলেন যে, তিনি নিরস্ত্র, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজহীন, স্ত্রী, স্ত্রী-নামধারী, বিকলেন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী পূর্বজন্মে স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন যদি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করেন, তবেই ভীষ্মের বিনাশ হবে। ... দশম দিনে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। ... আঠান্ন রাত্রি শরশয্যায় থাকবার পর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ... (পৌ.অ.)। **দ্র. দ্যু**। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কৌণপদন্ত, ভীষ**। **ভীষণ**-এর এক পূর্ণ সীমায়িত রূপকে **ভীষ্ম** বলে। কিন্তু একে বোঝার কোনো সহজ উপায় নেই। কেননা, এ শব্দের এমন কোনো সাদৃশ্য বাহ্য অর্থ নেই যে, একে দৃশ্যলোকের কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রসঙ্গ টেনে বোঝা যাবে বা বোঝানো যাবে। একে কেবলমাত্র সমাজের অদৃশ্যলোকেই দেখতে ও বুঝতে হয়।

ইনি একজন **বসু**। অর্থাৎ যৌথতাবিরোধী এবং স্বভাবতই **পণ্য**বাদিতার দিকে এর স্বাভাবিক প্রবণতা। ইনি **গঙ্গাপুত্র**। সেক্ষেত্রেও এঁকে আমরা **পণ্য**ধারার থেকে জাত সত্তা রূপে দেখতে পাচ্ছি। এঁর নাম **দেবব্রত**। সেক্ষেত্রেও এই সত্তা যৌথবাদিতার বিরুদ্ধে। ইনি সত্যবতী বা **মৎস্যগন্ধা**র সঙ্গে আপন পিতার বিবাহ শুধু স্বীকারই করেন না, তার সেবা করবার ব্রত নিয়ে **ভীষ্ম** নামের অধিকারী হন। কেবল তাই নয়, তিনি বৈদিক নীতির (অধঃপতিত যৌথতাবাদী সমাজতান্ত্রিক নীতির) পরিচালকের আসনে বসে সর্বদা সেই **পাণ্ডু**পুত্রগণকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন, যাঁরা তাঁর **ধৃতরাষ্ট্র**-ব্যবস্থারই বিরোধী। ...

এই সব তথ্যগুলি বলছে, যে, ইনি বৈদিক নীতিতে চলা **অধিরাষ্ট্র** ও **রাষ্ট্র** ব্যবস্থার ভিতরে থেকেই সেই ব্যবস্থার বিরোধী শক্তির উন্মেষের পক্ষে সর্বদা সক্রিয় থেকেছেন। একালে বসে এই সত্তার যে খণ্ড রূপটিকে আমরা দেখতে পাই, তাকে একালের ভাষায় 'যোজনা কমিশন' বা 'planning commission' বলে। আজকের ভারত সরকারও এই যোজনা-কমিশনের উপদেশ-নির্দেশ অনুসারেই দেশের বাৎসরিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালিয়ে থাকে। এই কমিশনের বিশেষত্ব হল, এরও স্বেচ্ছামৃত্যু সম্ভব। ভারতের ইতিহাস অনুসারে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এর স্বেচ্ছামৃত্যু হয়েছিল, মোগলযুগে বা ব্রিটিশযুগে কোনো **ভীষ্ম**কে সক্রিয় দেখা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর, দেখা যাচ্ছে, এই সত্তাটির পুনর্জন্ম হয়েছে। এর ভিতরে এমন একটি **ভীষণ**-ভাব আছে, যে সরকারের সমস্ত বিভাগ একে সেলাম ঠুকে চলতে বাধ্য হয়। আবার, এর সমস্ত কাজকর্মের স্বরূপ এমন যে, তার থেকে পুঁজিবাদীদের অগ্রগতির নানারকম সুবিধা হয়ে যায়; যদিও এই যোজনা কমিশন আদৌ 'প্রাইভেট' বা স্বাতন্ত্র্যবাদী নয়, সম্পূর্ণতই 'পাবলিক' বা যৌথতাবাদী। মনে রাখা ভাল, সেকালের যৌথবাদ (অর্থাৎ, সনাতনবাদ, বৈদিকবাদ বা অধঃপতিত সমাজতন্ত্রবাদ) ও স্বাতন্ত্র্যবাদ (বা পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্রবাদ) কালে কালে বিবর্তিত হয়ে হয়ে বর্তমানে যথাক্রমে 'পাবলিক সেক্টর' 'প্রাইভেট সেক্টর' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। **ভীষ্ম** হলেন সেই 'পাবলিক সেক্টর'-এর **ভীষণ**-শক্তি, কিন্তু তাঁর কাজে 'প্রাইভেট সেক্টর' উপকৃত হয়ে থাকে।

ভু (ভুজ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিভোজন, অভুক্ত, অভোজন, অভোজ্য, অভোজ্যান্ন, অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন, অভ্যঞ্জনীয়, আভুগ্ন, আভোগ, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, দুর্ভোগ, প্রভু, বিভু, বুভুক্ষা, বুভুক্ষু, ভুআ (ভুও, ভুয়া, ভুয়ো, ভো), ভুঁক (ভুক), ভুঁজ, ভুঁড়ি, ভুঁড়ে, ভুঁড়ো, ভুঁতি (ভুতি), ভুঁতুড়ি (ভুতুড়ি), ভুঁদী, ভুঁদো, ভুক্ (ভুজ্), ভুক, ভুকল, ভুক্ত, ভুক্তন, ভুক্তপীত, ভুক্তভোগ, ভুক্তভোগী, ভুক্তমাত্র, ভুক্তশেষ, ভুক্তি, ভুক্তিপাত্র, ভুক্‌ভুক্, ভুখ, ভুখল, ভুখলি, ভুখা, ভুখিল, ভুগ (ভোগ), ভুগলামি, ভুগ্ন, ভুজ্, ভুজ, ভুজকোটর, ভুজগ, ভুজগপতি, ভুজগবলয়, ভুজগভোজী, ভুজগান্তক, ভুজগারি, ভুজগাশন, ভুজগিনী, ভুজগী, ভুজগেন্দ্র, ভুজগেশ্বর, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ভুজঙ্গম, ভুজঙ্গমী, ভুজঙ্গিনী, ভুজঙ্গে

ন্দ্র, ভুজঙ্গেশ, ভুজচ্ছায়া, ভুজদণ্ড, ভুজবন্ধন, ভুজমধ্য, ভুজমূল, ভুজলতা, ভুজশালী, ভুজশিখর, ভুজশিরঃ, ভুজা, ভুজাগ্র, ভুজান্তর, ভুজান্তরাল, ভুজাপীড়, ভুজালী, ভুজাস্ত্র, ভুজাস্ফাল, ভুজিষ্য, ভুজিষ্যা, ভুঞ্জ, ভুঞ্জই (ভুঞ্জিএঁা, ভুঞ্জিতেঁ, ভুঞ্জিবারে), ভুঞ্জন, ভুঞ্জা, ভুঞ্জান, ভুট (ভুটি, ভুটী), ভুটভাট, ভুটভুট, ভুটভুটি, ভুটা, ভুট্টা, ভুড়, ভুড়া, ভুড়ভুড়, ভুড়ভুড়া, ভুড়ভুড়ি, ভুড়ুক, ভুনা, ভুনি, ভুনী, ভুয়া, ভুয়ো, ভুর, ভুরঙ্গ, ভুরজারি, ভুরভুর, ভুরা (ভূরা), ভুরিষ্ঠাল, ভুল, ভুলচুক (বহন-রক্ষণে লয়প্রাপ্ত ও সেকারণে বিস্মৃত — ভুল, এবং তদবস্থা থেকে চ্যুত — চুক), ভুলনী, ভুলভুলাইয়া, ভুলভ্রান্তি, ভুলা, ভুলান, ভুলানী, ভুলানে, ভুলুক, ভুলো, ভুল্কী, ভুশু(ষু)ণ্ডি, ভুশুণ্ডী, ভুস্, ভুসা, ভুসি, ভুসু, ভুসুকু, ভুসুকুপাদ, ভুসুণ্ড, ভুষা, ভূটি(টী), ভৃশুণ্ডী, ভোঁতা, ভোঁৎভোঁৎ, ভোঁদড়, ভোঁদা, ভোঁদোড়, ভোঁভোঙ, ভোক, ভোকছানি, ভোকশোষ, ভোক্তব্য, ভোক্তা, ভোক্তৃ, ভোক্তৃত্ব, ভোখ, ভোখি, ভোখিল, ভোখী, ভোগ, ভোগকর, ভোগগৃহ, ভোগতৃষ্ণা, ভোগদেহ, ভোগপতি, ভোগপত্র, ভোগবতী, ভোগবান, ভোগবৎ, ভোগভূমি, ভোগভৃতক, ভোগমণ্ডপ, ভোগরাই, ভোগরাগ, ভোগা, ভোগান, ভোগান্ত, ভোগান্তি, ভোগাবলী, ভোগাভোগ, ভোগায়তন, ভোগালয়, ভোগিনী, ভোগী, ভোগীন্দ্র, ভোগীশ, ভোগোল, ভোগ্য, ভোগ্যা, ভোজ, ভোজক, ভোজকট, ভোজদেব, ভোজন, ভোজনকণ্টক, ভোজনকাল, ভোজনত্যাগ, ভোজনপাত্র, ভোজনভাণ্ড, ভোজনভাজন, ভোজনবিশেষ, ভোজনবৃত্তি, ভোজনবেলা, ভোজনব্যয়, ভোজনমন্দির, ভোজনা, ভোজনাচ্ছাদন, ভোজনাধিকার, ভোজনীয়, ভোজনীয়তব্য, ভোজনৃপতি, ভোজপতি, ভোজপুরী, ভোজবাজি, ভোজবিদ্যা, ভোজয়িতব্য, ভোজয়িতা, ভোজরাজ, ভোজালি, ভোজী, ভোজেন্দ্র, ভোজ্য, ভোজ্যব্যয়, ভোজ্যা, ভোজ্যান্ন, ভোর, ভোরঙ্গ, ভোরণী, ভোরা, ভোরি, ভোল, ভোলা, ভোলান, ভোলানাথ, ভোলাভালা, ভ্যালা, শতভুজা, শম্ভু, ষড়ভুজ, সমুপভোগ, সম্ভোগ, সম্ভোগী, সম্ভোগ্য, সহভোজন।

ভু (ভুজ) = নবরূপে উত্তীর্ণ ভব থাকে যাহাতে। **ভুজ** = নবরূপী ভব জনিত হয় যাহাতে। (**ভু**-কে খানিকটা চেনা যায়, যখন আমরা কোনো সত্তাকে জলের ভেতর থেকে **ভুস্** করে উঠে পুনরায় ডুবে যেতে দেখি। এই যে **ভুস্**, এ হল কোনো **ভু**-সত্তার বেরিয়ে পড়া, নির্য্যাসত্যাগ, বিসর্গরূপ মাত্র। তার মানে, **ভ** ভেতরে থাকে, থাকতেই পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে তা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে বহির্গমনের মতো কোনো ক্রিয়া করে, তখনই আমরা তাকে **ভুক, ভুগ, ভুজ, ভুট, ভুড়** ... ইত্যাদি বলি; কিংবা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আত্মসংকোচন করে আপনাতে আপনি বিলীন হয়ে যাওয়ার ক্রিয়া করে, তখনই আমরা তাকে **ভুয়া, ভুল** ... ইত্যাদি বলি। **ভ** বর্ণের অর্থে আমরা আগেই দেখেছি, এটি মানুষের মাথার মতো একটি বড় বিন্দুও হয়। সেই বিন্দু যদি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ কোনোভাবে লম্বা রেখায় পরিণত হতে শুরু করে, তখন তাকে বলতে হয় **ভু**। সেই **ভু** জনিত হয় তার **ভুজ**-এ বা হাতে, মানুষ, মাকড়সা বা অক্টোপাস যেমন তার হাতগুলিতে নিজেকে জনিত করে প্রসারিত করে থাকে। সেই সুবাদে মানুষের হাত, হাতির শুঁড়, সাপের দেহ ... এসবই **ভুজ** পদবাচ্য। অতএব **ভুজ্** বা **ভু জনন** করার অর্থ হল কোনো **ভব**-সত্তার আত্মজননের মাধ্যমে আত্মপ্রসারণ করা। একইভাবে পেটের ভিতরে যে **ভ** নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে **ভুট ভুট** করে, **ভুড়-ভুড়**-কারী **ভুঁড়ি**তে পরিণত হয়, সেও **ভু**-এরই বিকার বা বিবর্তিত রূপই বটে।)

বুভুক্ষা (বুভুক্ষু) : ১. ✓ভুজ্ + স (সন্) — ✓বুভুক্ষ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **বুভুক্ষা** = *নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর* **ভুক্ষা** *(ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা) থাকে যাহাতে।* **বুভুক্ষু** = **বুভুক্ষণ** *করিতে ইচ্ছুক যে।* ৩. **বুভুক্ষা** = ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা, ভোগেচ্ছা। **বুভুক্ষু** = ভোজনেচ্ছু, ভোগেচ্ছু। (ব.শ.)। ৪. 'ক্ষুধা' ও 'ক্ষুধার্ত' অর্থে যথাক্রমে **বুভুক্ষা** ও **বুভুক্ষু** কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **জিজ্ঞাসা**। জানিবার ইচ্ছা বা 'জ্ঞাসা' যে নিয়মে **জিজ্ঞাসা**য় পরিণত হয়, সেই একই নিয়মে 'ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা' বা 'ভুক্ষা' পরিণত হয় **বুভুক্ষা**য়। দ্র. **জিজ্ঞাসা, পিপাসা, চিকিৎসা** ... ইত্যাদি।

ভুক্ত (ভুক্তভোগ, ভুক্তভোগী, ভুক্তি, অন্তর্ভুক্ত) : ১. ✓ভুজ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভুক্ত** = **ভুজ** *তারিত যাহাতে।* **ভুক্তভোগ** = **ভুক্ত**কে **ভোগ** *করা হয় যাহাতে।* **ভুক্তভোগী** = **ভুক্তভোগ**-*এর গতিশীল আধার যে; অথবা,* **ভুক্তভোগ** *করে যে।* **ভুক্তি** = **ভুক্ত** *গতিশীল যাহাতে।* **অন্তর্ভুক্ত** = *অন্তর কর্তৃক* **ভুক্ত** *যে।* / **ভুক্তভোগী** = যে পূর্ব্বে কোনো দুঃখের বিষয় ভোগ করিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. **ভুক্ত** = খাদিত, ভক্ষিত, উপভুক্ত, পালিত, কৃতভোগ, ভোজনবান্, অন্তর্গত, ভক্ষিতদ্রব্য, ভোজন, ভোজনস্থান। **ভুক্তভোগ** = ভুক্তসংসারভোগ, সংসারভোগকর্ত্তা, কৃতোপভোগ। **ভুক্তভোগী** = কৃতদুঃখভোগ। **ভুক্তি** = ভোজন, ভক্ষণ, ভোগ, উপভোগ, ব্যাপ্তি, গ্রহের রাশির অংশাদিতে গমন, অধিকারস্থিত দেশ। (ব.শ.)। **অন্তর্ভুক্ত (অন্তভূত)** = অন্তর্গত, মধ্যস্থিত। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. **ভুক্ত ভুক্তভোগী, অন্তর্ভুক্ত** যথার্থে প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. **ভুক্ত** শব্দটির উপরে প্রদত্ত 'খাদিত', 'ভক্ষিত' ... ইত্যাদি অর্থগুলি শব্দটির স্বভাবের একটি মাত্র দিকের কথা বলে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা **দলভুক্ত, গোষ্ঠীভুক্ত, অন্তর্ভুক্ত** ... ইত্যাদি শব্দ বলি, তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়, এই **ভুক্ত** শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণাদিকে বোঝায় না। কোনো সত্তা তার **ভুজ** বা হাতের দ্বারা যা কিছুই আত্মসাৎ করে, তা সবই **ভুক্ত**-পদবাচ্য। সেভাবে দল বা গোষ্ঠী কাউকে আপনার এলাকা-**ভুক্ত** করলে সে হয়ে যায় **দলভুক্ত** বা **গোষ্ঠীভুক্ত**। তার মানে, শুধুমাত্র 'খাদিত'কেই **ভুক্ত** বলে না, যা কিছুই আত্মর এলাকাভুক্ত করা হয় তা সবই **ভুক্তই** বটে। এভাবে কাউকে আত্মসাৎ করতে থাকা বা আপন এলাকাভুক্ত করতে থাকাকে বলে **ভুক্তি**। শব্দটির ব্যবহার আজকাল খুব একটা হয় না। ঢাকার ব্যবহারিক বাংলা অভিধান **ভুক্তি** শব্দের ব্যবহার করেছেন তাঁদের অভিধানে কোন কোন শব্দের **ভুক্তি** ঘটানো হয়েছে, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে। তবে কিনা কাউকে আপন এলাকাভুক্ত করে ফেললেই কিন্তু ক্রমে তাকে **ভোগ** করা যায় বটে, কিন্তু সবসময় তার ফল শুভ হয় না। হয় না যে, **ভুক্তভোগী** মাত্রেই তা জানেন। অবশ্য

অন্যকে **অন্তর্ভুক্ত** করার এই যে **অন্তর্ভুক্তি**-করণ প্রক্রিয়া, আগের কালে একে **অন্তর্ভুক্ত** বলা হত না। এটি একালের তৈরি করা নতুন শব্দ।

ভুগ (ভুগ্ন, ভোগ, উপভোগ) : ১. ভুগ্ন = ✓ভুজ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। **ভোগ** = ✓ভুজ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভুগ** = *ভু-এর গমন যাহাতে।* **ভুগ্ন** = **ভুগ** *অনুকৃত যাহাতে।* *ভোগ = ভুগ সার্ব্বিকভাবে আত্মস্থ যাহাতে। উপভোগ = ভোগের উপ যে ভোগ।* / **ভুগ্ন** = ব্যাধি হেতু কুটিল (যে)। **ভোগ** = যে অন্নাদি দেবতাকে নিবেদন করা হয়। ('দেবতাকে নিবেদ্য বা নিবেদিত অন্নাদি')। (ব.শ.)। **৩. ভুগ (ভোগ)** = উপভোগ করা, ভোগ করা, সহা (দুঃখাদি)। **ভুগ্ন** = বক্রীকৃত, কুটিল, বক্র, আকুঞ্চিত, কুঞ্চিত, অবনমিত, নম্র। **ভোগ** = অভ্যবহার (অভি-অবহার), ভোজন, ভোজনাদি, উপভোগ, মৈথুনাখ্য উপভোগ, ব্যবহার, সুখদুঃখাদ্যনুভব (সুখদুঃখাদি অনুভব), সুখ, দুঃখ, ভক্ষ্য, নৈবেদ্য ... ইত্যাদি। **উপভোগ** = মাল্যচন্দনাদি-বিষয়ভোগ, নির্ব্বেশ, বৃক্ষের ফলপুষ্পপত্রাদির ভোগ, ভোজন, ভক্ষণ, ভোগ, ফলপ্রাপ্তি, আত্মসাৎকরণ, সম্ভোগ, সুরতভোগ, সংযোগ, বিন্যাস, বিষয়ভোগ, বিষয়সেবাজন্য সুখ। (ব.শ.)। **৪. ভুগ্ন** অপ্রচলিত। **ভোগ** যথার্থে প্রচলিত। **ভুগ** সাধারণভাবে 'দুঃখানুভব' অর্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। **৫.** (দ্র. **ভুজ্**)। **ভু** যখন তার **ভুজ**-এর দ্বারা কাউকে এলাকা**ভুক্ত** করে বা গলাধঃকরণ করে, **ভুক্ত** সত্তাটি তখন সেই গলার পথ বেয়ে ভিতরে চলে যায়। **ভুক্ত**-এর এইভাবে চলে যাওয়াকে বলে **ভুগ**। সেই **ভুগ** সম্পূর্ণ হলে তাকে বলা হয় **ভোগ**। তবে সেকালের বয়ানগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখলে, বাহ্যিকভাবে কাউকে অন্তর্ভুক্ত-করণ করলে, তাকে **ভোগ** বলা হত এবং মানসিকভাবে কাউকে আত্মসাৎ করলে তাকে **উপভোগ** বলা হত। সাধারণত জ্ঞান**মধু**রস অর্থাৎ সঙ্গীত-নৃত্যাদি তথাকথিত সংস্কৃতিরস ভোগ করাকে **উপভোগ** বলা হত। এখনো লোকে গান-নাচ-নাটক ইত্যাদি শিল্পরস **ভোগ** করেন না, **উপভোগ** করে থাকেন। সর্বোপরি, যে-ভোগে উভয়পক্ষের **ভোগ** হয় তাকে নিশ্চয় **সম্ভোগ** বলা হত। এটি সাধারণত নরনারীর যৌন মিলন বোঝাতে প্রয়োগ করা হত বলেই মনে হয়।

ভুজ (ভুজা, ভুঞ্জ, ভোজ, ভোজবাজি, ভোজবিদ্যা) : ১. ✓ভুজ্ + অ (ঘঞর্থে ক) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভুজ** = **ভু** *(নবরূপে উত্তীর্ণ ভ-অস্তিত্ব) জনিত হয় যাহাতে (যে রেখায়);* **ভব** *প্রসারিত হয় যাহাতে (যে দেহাংশে, বাহুতে); অথবা, যাহা* **ভুজ** *দ্বারা কৃত হয়। (দ্র.* **ভুজ্***)।* **ভুজা** = **ভুজ**-*এর আধার যে।* **ভুঞ্জ** = **ভু**-*এর রহস্যরূপ জনিত যাহাতে।* **ভোজ** = **ভুজ**-*এর সার্ব্বিক আধার যে।* / **ভুজ** = যাহা দ্বারা ভোজন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. ভুজ** = **প্রবেষ্ট**, বাহু, পাণি, হস্তিশুণ্ড, বৃক্ষশাখা, ক্ষেত্রের বাহু, ভক্ত, অন্ন, কৌটিল্য, বক্রীকরণ, হস্ত, সর্পভোগ, ফণ; ভোজন করা, ভোগ করা, **পালন** করা, সম্ভোগ করা। **ভুজা** = **বাহু, হস্ত**; ভোজন করান, ভোগ করান। **ভুঞ্জ** = ভোজন করা, উপভোগ করা, ভোগ করা (সুখ, দুঃখ), সম্ভোগ করা, পান করা। **ভোজ** = ভোজ্যপদার্থ, খাদ্য, উৎসবাদিতে বহুলোকের একসঙ্গে ভোজন, শ্রাদ্ধদিনের তৃতীয় দিবসে জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত পঙ্ক্তিভোজন; দেশবিশেষ, বিদর্ভরাজ, ভোজদেশবাসীগণ, যযাতির পৌত্রগণ ও দ্রুহ্যুর পুত্রগণ, ভোজকট, ভোজপুর, ধারানগরের রাজবিশেষ (ইঁহার পিতা সিন্ধুল, মাতা সাবিত্রী, রাজধানী ধারানগরী। পিতার মৃত্যুর পরে, পিতৃব্য মুঞ্জ ইঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। বিদ্যায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাণ সুবন্ধু অমর বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইঁহার সভাসদ ছিলেন। কালিদাস ইঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত ও পরমপ্রীতিভাজন ছিলেন। অনুমান ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ইনি রচয়িতা।)। **ভোজবাজি, ভোজবিদ্যা** = ইন্দ্রজাল, মায়াবিদ্যা (magic)। (ব.শ.)। **৪. ভুজ** ও **ভোজ** যথার্থে প্রচলিত। **ভুজা** ও **ভুঞ্জ** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **চতুর, দশভুজা**। এখানে দেখা যাচ্ছে, **ভুজ** শব্দটি একই সঙ্গে হাতকে যেমন বোঝাচ্ছে, তেমনি সেই হাত দিয়ে খাওয়াকেও বোঝাচ্ছে। কর্মজগতে 'টিফিন করে আসছি' না বলে কেউ কেউ বলেন 'দাঁড়া, হাতের কাজটা সেরে আসি'। কিন্তু সেই 'হাতের কাজ' যে উৎকৃষ্ট **হস্তশিল্প** বা **ভোজবাজি** পর্যন্ত প্রসারিত, এতকাল সেকথা আমরা জানতাম না। সার্বিকভাবে তেমন বহু হাত একত্রে **ভুজ্** ক্রিয়া করলে তাকে বলা হয় **ভোজন**। ...

হাত বা বাহু অর্থে **ভুজ** শব্দটির সঙ্গে বহু সহোদরের জন্ম হয়েছে। যথা **ভুজকোটর** (বগল), **ভুজচ্ছায়া** (বাহুবলাশ্রয়), **ভুজদণ্ড** (সুদৃঢ়বৃত্ত-বাহু), **ভুজবন্ধন** (আলিঙ্গন), **ভুজমধ্য** (বক্ষঃস্থল) ... ইত্যাদি। **ভুজগ, ভুজঙ্গ** ... ইত্যাদি তো আছেই। আবার সেই হাত দিয়ে খাওয়া অর্থে যে **ভুজ**, তার থেকেও **ভুঞ্জ, ভোজ, ভোজরাজ, ভোজদেশ, ভোজপুর, ভোজপুরী, কুন্তীভোজ** ... ইত্যাদি বহু শব্দের জন্ম হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, **ভোজ** শব্দটি দেশ অর্থে (ভোজরাজ, ভোজপুর, বিদর্ভ ইত্যাদি) বোঝাতে ব্যবহৃত হল কেন? তাছাড়া **কুন্তী** তো কুন্তিভোজরাজের পালিতা কন্যা। বাস্তবে ভারতের যে অঞ্চলটিকে **ভোজপুর** বলা হয়, তার পশ্চিমে **বারাণসী**, পূর্বে **পাটলিপুত্র** (কুসুমপুর), মাঝে **ভোজপুর**। এদিকে **ভোজবাজি** বা **ভোজবিদ্যা**কে 'ভানুমতীর খেল'ও বলা হয়ে থাকে। মোটকথা **ভোজপুর**-এর সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি বলে যে, এখানে যৌথব্যবস্থার ভিতরেই **দক্ষে**র বা হাতের কাজের এমন চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল যে, সে প্রায় **ভোজবাজি**র বা ইন্দ্রজালের তুল্য। এ হল **ভোজবিদ্যা**, যাকে আমরা **'মায়াখ্যা-অবিদ্যা'** (দ্র. **ভূতপ্রকৃতি**) শব্দে প্রযুক্তি ও কলাকৌশল রূপে চিনতে পারছি। কতগুলো উড়ে যাওয়া তুলোকে কেউ যদি মন্ত্রবলে কাপড় বানিয়ে দেয়, সে তো ম্যাজিকই বটে। কিন্তু সেটা হয় **ভুজ** বা হাত দিয়ে। 'বহু **ভুজ** বহুরকমভাবে' এই হাতের কাজ বলে তাকে বলা হয় **ভোজ**। সেই কারণে উৎকৃষ্ট হস্তশিল্পের নাম হয়ে যায় **ভোজবাজি** বা **ভোজবিদ্যা**। তার মানে, কালিদাসের কালে বা ঐরকম কোনো সময়ে ভারতের **ভোজপুর** অঞ্চলে কারুশিল্পের বা হস্তশিল্পের বিকাশ খুবই উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। আর, তা এতই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল যে, তার কলাকৌশলকে **ভোজবাজি** বা **ভোজবিদ্যা** নাম দেওয়া হয়। লক্ষণার্থে সেটিই 'ইন্দ্রজাল', 'মায়াবিদ্যা' বা 'ম্যাজিক' পদবাচ্য হয়ে যায়। ফলত,

যৌথব্যবস্থার ভিতরেই যে সত্তা সেই হস্তশিল্পের চূড়ান্তে পৌঁছেছিলেন, তার নাম হয়ে যায় **ভোজরাজ**। তখনও ব্যবসার মর্যাদা বা **পণ্য**ধারার মর্যাদা তেমন করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, **গঙ্গা**ধারাকে ভারতসমাজ যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করেনি। যাঁরা দোকানদারি করেন, তাঁরা বলতে গেলে একপ্রকার গোপনে হীনভাবে মালপত্র বেচাকেনা করেন। ষাট-সত্তর বছর আগেও গ্রামবাংলার 'ভূষিমালের দোকান' বা 'grocery shop' যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা ব্যাপারটির সাক্ষ্য দিতে পারবেন। আর সেরকম দোকান চালাতেন তেলী বা তাম্বুলীরা। **ভোজপুর**, যার আধখানা এখন উত্তরপ্রদেশে এবং বাকি আধখানা বিহারের অন্তর্ভুক্ত, সেই ভোজপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা বলতে শুরু করেন, 'কোথায় রাজা ভোজ, আর কোথায় গঙ্গু তেলি!' ... অতএব **ভুজ** দিয়ে কেবল খাওয়াই হয় না, নিত্যনতুন শিল্পসৃষ্টিও করা যায়। আর সেই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন সেকালের **ভোজপুর**-অঞ্চলের অধিবাসীরা।

সবশেষে একটি কথা পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা অদৃশ্য মানসলোককে বোঝাতেই বিভিন্ন শব্দ তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করতেন, এবং সেভাবেই নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে গেছেন। একই স্বভাবের দৃশ্যলোকের একই নাম দিয়ে দিতেন তাঁরা, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দসৃজন পদ্ধতির সঙ্গেও সেটি খাপ খেয়ে যেত। ফলত, বাস্তব নামকরণ অনেক সময়ই মানসিক ধারণার সঙ্গে হুবহু মিলত না। কোথায় **বিদর্ভ** আর কোথায় **ভোজপুর**! কিন্তু মানসলোকে তাঁদের অবস্থান একেবারে গায়ে গায়ে। ...

ভুজগ (ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, ভুজঙ্গমী, ভুজঙ্গিনী, ভুজঙ্গেন্দ্র) : ১. ভুজগ = ভুজ + ✓গম্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। **ভুজঙ্গ** = ভুজ + ✓গম্ + অ (খচ্) - কর্তৃবাচ্যে, ডিৎ ম্ আগম। (ব.শ.)। ২. ***ভুজগ** = **ভুজ** দ্বারা গমন করে যে। **ভুজঙ্গ** = **ভুজ**-এর রহস্যরূপ দ্বারা গমন করে যে। **ভুজঙ্গম** = **ভুজঙ্গ**-এর পূর্ণ সীমায়িত রূপ যাহাতে। **ভুজঙ্গমী** = **ভুজঙ্গম**-এর গতিশীল আধার যে। **ভুজঙ্গিনী** = **ভুজঙ্গ**-এর গতিশীল আধারশক্তি যে। **ভুজঙ্গেন্দ্র** = **ভুজঙ্গ** সমূহের মধ্যে **ইন্দ্র** যে।* / **ভুজগ** = যে বক্র গমন করে ('বক্রগামী')। **ভুজঙ্গ** = যে বক্র গমন করে ('বক্রগামী')। **ভুজঙ্গম** = যে বক্র গমন করে ('বক্রগামী')। (ব.শ.)। **৩. ভুজগ** = সর্প। **ভুজঙ্গ** = সর্প, ষিড়্গ, লম্পট, বিট, জার, নাগ, নাগসংখ্যানুসারে ৮ সংখ্যা, সর্পদেবতাকা অশ্লেষা, সীসক। **ভুজঙ্গম** = সর্প, নাগ, সর্পসংখ্যানুসারে ৮ সংখ্যা, রাহু। **ভুজঙ্গমী** = সর্পী। **ভুজঙ্গিনী** = সর্পী। **ভুজঙ্গেন্দ্র** = ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ, শেষ। (ব.শ.)। **৪.** snake অর্থে **ভুজঙ্গ** শব্দটি কখনো-সখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বাকি সমস্ত শব্দই বর্তমানে অপ্রচলিত। **৫.** আমরা দেখেছি, সেকালের শব্দবিদগণের একই ব্যাপারকে বোঝানোর জন্য একাধিক শব্দ খরচ করার মতো সময় ও শব্দের অপব্যয় করবার অভ্যাস আদৌ ছিল না। অথচ দেখা যাচ্ছে, একই সাপকে বোঝাতে বহু শব্দ খরচ করা হয়েছে। কেন?

আসলে এই **ভুজগা**দি শব্দের snake অর্থটি সাদৃশ্য অর্থ। এর মূল ও প্রধান অর্থ হল সামাজিক সর্প। তার স্বভাবের এত সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, এবং আদিম সমাজ তাকে নিয়ে এতরকম ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে যে, তাকে তার প্রতিটি স্বভাবের বিশেষ বিশেষ রূপ ধরে ধরে তার নামকরণ করতে হয়েছে। ফলত, বিভিন্ন চরিত্রের সামাজিক সর্পের বিভিন্ন নাম দিতে হয়েছে। এই সামাজিক **সর্পই** তো **নাগ**, এই তো কখনো **ভুজগ**-রূপে, কখনো **ভুজঙ্গ**-রূপে, কখনো **ভুজঙ্গম**-রূপে, কখনো-বা **ভুজঙ্গমী** বা **ভুজঙ্গিনী** রূপে দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করতে হয়েছে। আমাদের পুরাণাদিতে এই **নাগ** নিয়ে কত কথা ও কাহিনী আছে, পুরাণপাঠক মাত্রেই তা জানেন। থাকবে নাই বা কেন? যৌথসমাজের ভিতরেই তো আদি ধনবান সত্তার জন্ম হয়েছিল। সেই সত্তাই তো সমাজের বিচূর্ণীভবনের এক অন্যতম কারিকা। বিচূর্ণীভূত সমাজে সেই **নাগই** তো ক্রমান্বয়ে বড় হতে হতে সামন্তপুঁজিতে পরিণত হয়েছিল। একসময় তারই বিবর্তিত রূপ যে তাকেই মেরে শিল্পপুঁজিতে পরিণত হবে, পুঁজিবাদী যুগের সূচনা করবে, সেকথা আগে কে জানত! মধ্যপ্রাচ্যের জ্ঞানীরা এই সামাজিক-**নাগকেই** দেখেছিলেন মানুষকে 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে' প্ররোচিত করতে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে। যৌথসমাজের বিচূর্ণীভূত হয়ে যাওয়ার সেটাই তো অন্যতম কারণ! তার মানে, মানবসমাজের বিকাশের ইতিহাসে, আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত এই **ভুজগের** ভূমিকা যেন-বা অন্যতম এক খলনায়কের ভূমিকা। স্বভাবতই তার নানা স্বরূপকে বোঝাতে বিভিন্ন শব্দের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ফলত, এই সত্তাকে নিয়ে বহু শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। আমরা অবশ্য স্থানাভাবের কথা ভেবে **ভুজগপতি, ভুজগবলয়, ভুজগ-ভোজী, ভুজগান্তক, ভুজগারি, ভুজগাশন, ভুজগিনী, ভুজগী, ভুজগেন্দ্র, ভুজগেশ্বর, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ভুজঙ্গেশ** ... প্রভৃতি শব্দের আলোচনা বাদ দিয়ে গেলাম।

ভুট (ভুটভাট, ভুটভুট, ভুটান, ভুটি, ভুটী, ভুট্টা, ভুড়ভুড়, ভুঁড়ি) : ২. ***ভুট** = **ভু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ভ**) টঙ্কারিত যাহাতে। **ভুটভাট** = **ভুট** ও **ভাট** যাহাতে। **ভুটভুট** = **ভুট**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ভুটান** = **ভুট** অন (on) যাহাতে। **ভুটি** = **ভুট** গতিশীল যাহাতে। **ভুটী** = **ভুটির** আধার যে। **ভুট্টা** = **ভু**-এর টঙ্কার টঙ্কারিত হয় যে আধারে। **ভুড়ভুড়** = **ভুড়**-এর (**ভু**-এর গড়ানের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ভুঁড়ি** = **ভু**-এর রহস্যরূপের গড়ান সক্রিয় যাহাতে।* **৩. ভুট, ভুটি, ভুটী** = ভোটকম্বল, কম্বল। **ভুটভাট, ভুটভুট** = উদরস্থ অজীর্ণদ্রব্যের বুদবুদের **শব্দ**। **ভুটান** = হিমালয়স্থ দেশবিশেষ। **ভুট্টা** = মকাই (maize)। **ভুড়ভুড়** = বুদবুদ উঠার শব্দ, হুঁকায় তামাক খাওয়ার মৃদু শব্দ। **ভুঁড়ি** = স্থূলোদর (pot-belly), ভুক্ত দ্রব্যের আধার। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** যে শব্দগুলির সংস্কার করা হয়নি, যেগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব সৃষ্টি, এগুলি তেমনি শব্দ। যেহেতু এই শব্দগুলি তাদের মান-রূপ এখনও পায়নি, তাই এদের নানা রকম বানানে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি মূলত **ভু**-এর বেরোনোর জন্য আকুপাঁকু করার চেষ্টাকে বোঝায়।

ভুল (ভুলচুক, ভুলনী, ভুলভ্রান্তি, ভুলা, ভুলান, ভুলানী, ভুলো) : ২. **ভুল** = ভু *লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* **ভুলচুক** = **ভুল** ও **চুক** *(উভয় থাকে যাহাতে)।* **ভুলনী** = **ভুলন**-*এর (***ভুল** *অন যাহাতে তাহার) গতিশীল আধার যে।* **ভুলভ্রান্তি** = **ভুল** ও **ভ্রান্তি** *থাকে যাহাতে।* **ভুলা** = **ভুল**-*এর আধার যে।* **ভুলান** = **ভুলা** *অন (on) যাহাতে।* **ভুলানী** = **ভুলান**-*র গতিশীল আধার যে।* **ভুলো** = **ভুল**-*এর সার্বিক আধার যে; ভুলে যাওয়া স্বভাব যাহার। /* **ভুলান** = যাহা দ্বারা ভুলান বা অন্যমনস্ক করা যায়। (ব.শ.)। ৩. **ভুল** = ভ্রমযুক্ত, অযথার্থ (wrong), অসম্বন্ধ, অসঙ্গত, বিস্মরণ, ভ্রম, চুক, অসম্বন্ধ বাক্য, প্রলাপ, মোহ, বিমূঢ় ভাব; মনে না করা, বিস্মৃত হওয়া, ভোলা (to forget), ভ্রমে ত্যাগ করা, ঠিক করিতে না পারা, মোহিত হওয়া, বিহ্বল বা আত্মহারা হওয়া, প্রতারিত হওয়া। **ভুলনী** = ভুলনসম্বন্ধী, মোহজনক। **ভুলা** = বিস্মৃত করা, মোহিত করা, প্রতারিত করা। **ভুলান** = বিস্মৃতিকারক। **ভুলানী** = মোহকারিণী, প্রতারণাকারিণী। (ব.শ.)। **ভুলো** = প্রায়ই ভুল করে বা ভুলে যায় এমন; ভুলে যাওয়া স্বভাববিশিষ্ট, আনাড়ি। **ভুলচুক, ভুলভ্রান্তি** = নানা প্রকার ভুল, বিবিধ ভ্রান্তি। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. প্রতিটি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চুক, ভ্রান্তি**। প্রথমত **ভুল** বললে একই সঙ্গে 'বিস্মরণ' এবং 'বেঠিক' বোঝায় কেন, সর্বাগ্রে সেটিই আমাদের জানা দরকার। **ভ** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, সে এক দ্বৈরাজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত শাসকবোধযুক্ত অস্তিত্ব, অর্থাৎ কিনা, যার মধ্যে একপ্রকার স্বাতন্ত্র্যের বোধ, সার্বিক পরিস্থিতির জ্ঞান ... ইত্যাদি থাকে। কিন্তু সেই **ভ**-এর সঙ্গে 'উ'কার যুক্ত হলেই সে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সেই নবরূপ গোলাকার **ভ** থেকে হাত-পা বেরোনো হতে পারে, আবার আত্মসংকোচন করে নিজেকে নিজের ভিতর লয় করাও হতে পারে। এই দ্বিতীয় প্রকার **ভু** লালিত/লয়প্রাপ্ত হলে, তবেই **ভুল** হয়। অর্থাৎ তখন সে নিজেকে হারায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অর্জিত জ্ঞানও হারায়। ফলে, তার স্মৃতি-বিস্মরণ ঘটে, ঠিক-জ্ঞানেরও বিস্মরণ ঘটে। তখন সে 'আত্মভোলা' হয়ে যায়। স্বভাবতই এই অবস্থায় তার **ভুলচুক** হয়ে যায়, **ভুলভ্রান্তি** হয়ে যায়। দ্র. **চুক, ভ্রান্তি**। মনে রাখা দরকার, **আশেপাশে**র মতো **ভুলচুক** ও **ভুলভ্রান্তি** যমজ শব্দ। এদের প্রত্যেকের দুটো করে মানে থাকে।

ভুস (ভুসা, ভুসি, ভুসু, ভুসুকপাদ, ভুসণ্ড, ভুসণ্ডী, ভুশুণ্ডী) : ২. **ভুস** = ভু-*এর নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে।* **ভুসা** = **ভুস**-*এর আধার যে।* **ভুসি** = **ভুস** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* **ভুসু** = **ভুস** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **ভুসুকপাদ** = **ভুসুকপদ** *(ভুসু কৃত হয় যে পদে) হইতে জাত।* **ভুসণ্ড** = **ভুস**-*জ্ঞানের গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ভুসণ্ডী** = **ভুসণ্ড**-*এর গতিশীল আধার যে।* **ভুশুণ্ডী** = *(নিম্নে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।* ৩. **ভুস** = হঠাৎ ভাসিয়া ওঠার শব্দ। **ভুসা** = অগ্নির শিখাধূমে জাত কজ্জলবিশেষ (soot)। **ভুসি** = যবগোধূমাদির তুষ, শস্যের খোশা (chaff, bran)। **ভুসুণ্ড** = কাকভুশুণ্ড। (ব.শ.)। **ভুশুণ্ডী** = (ক) পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। প্রবাদ আছে, কলির এই ভুশুণ্ডী আবহমানকাল বিদ্যমান থেকে পৃথিবীর ঘটনাপরম্পরা দেখে আসছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ভুশুণ্ডীকে যুদ্ধের বিবরণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছিল, সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে বিনা আয়াসে সে দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করেছিল। ত্রেতাযুগে লঙ্কা-যুদ্ধে তাকে অল্প পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তার কষ্টের সীমা ছিল না। (খ) অন্ধকাসুরের রক্তপান করবার জন্য মহাদেব-সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। (পৌ.অ.)। ৪. soot ও chaff অর্থে যথাক্রমে **ভুসা** ও **ভুসি** প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কজ্জল, কাজল, কাকভুষুণ্ড, বায়স**। এর আগে **কাজল** শব্দে আমরা জেনেছি যে, অদৃশ্যলোকে যেটি কাজকর্মের জ্ঞানের সার, দৃশ্যলোকে সেটিই *জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখার* ভুসাকালি। (স্মর্তব্য যে, যিনি *জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখা* বহন করেন, তাঁকেই আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টা বা **শিব** বলা হত।) এটি যদি সেই জ্ঞানের 'নির্য্যাসত্যাগ'মাত্র হয়, তবে তা জনসমুদ্রের উপরিতলে **ভুস** করে ওঠে; যদি জ্ঞানের দিশাগ্রস্ত রূপ হয় তবে **ভুষ** করে ওঠে; যদি জ্ঞানের সার্বিক রূপ হয় তবে **ভুশ** করে ওঠে। যাঁরা তাই নিয়ে **কাক**-এর মতো জনসাধারণ্যে **চারিয়ে** দেওয়ার কাজ করতেন, তাঁদের **কাকচারা** বা **কাকভুসুণ্ড** অথবা **ভুষণ্ডীর কাক** ইত্যাদি বলা হত। বাংলাভাষার শুরুতে **চর্যাপদ**-রচয়িতা যে **ভুসুকপাদ**-এর কথা বলা হয়, তিনি এই গোত্রেরই এক **কাকভুসুণ্ডই** বটে। (দ্র. **বায়স**)। তবে, এই শব্দের বিশেষত্ব এই যে, এই শব্দগুলির সংস্কার করে তাদের 'মান-শব্দে'র মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ফলে, আজও **ভুশুণ্ড, ভুষুণ্ড, ভুসুণ্ড, ভুশুণ্ডী, ভুষুণ্ডী, ভুসুণ্ডী** ... ইত্যাদি বহু রকমের বানানে শব্দটি পাওয়া যায়।

ভূ (ভাবি, ভাম্, ভূষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগ্রভূমি, অতিভূমি, অদ্ভুত, অদ্ভুতরস, অনুভব, অপ্রভু, অবিভাবনা, অবিভাবিত, অবিভাব্য, অভব, অভব্য, অভাব, অভাবনা, অভাবী, অভি, অভিক, অভিকম্পন, অভিকাঙ্ক্ষা, অভিকাঙ্ক্ষিত, অভিকাঙ্ক্ষী, অভিকাম, অভিক্রম, অভিক্রমণ, অভিক্রান্তি, অভিক্রুদ্ধ, অভিক্রোশ, অভিগন্তব্য, অভিগম, অভিগম্য, অভিগর্জ্জন, অভিগর্জ্জিত, অভিগুপ্ত, অভিগৃহীত, অভিগ্রহ, অভিগ্রহণ, অভিঘাতক, অভিঘাতী, অভিচরণ, অভিচার, অভিচারক, অভিচারণীয়, অভিচারযজ্ঞ, অভিচারহোম, অভিচারী, অভিজন, অভিজাত, অভিজাতি, অভিজিত, অভিজিন্মুহূর্ত্ত, অভিজুষ্ট, অভিজ্ঞ, অভিজ্ঞা, অভিজ্ঞাত, অভিজ্ঞান, অভিজ্ঞানশকুন্তল, অভিডীন, অভিতঃ, অভিতপ্ত, অভিতাপ, অভিতাপিত, অভিতাম্র, অভিদর্শন, অভিদেবন, অভিদ্রুত, অভিদ্রুগ্ধ, অভিধা, অভিধাতব্য, অভিধাতা, অভিধান, অভিধানীয়, অভিধাবক, অভিধাবন, অভিধায়ক, অভিধায়ী, অভিধেয়, অভিধ্বস্ত, অভিনন্দ, অভিনন্দনীয়, অভিনন্দী, অভিনন্দ্য, অভিনব, অভিনম্র, অভিনিঃসৃত, অভিনিবিষ্ট, অভিনিবেশ, অভিনিবেশিত, অভিনিবেশী, অভিনিয়োগ, অভিনির্জ্জিত, অভিনির্ম্মিত, অভিনির্ম্মুক্ত, অভিনির্য্যাণ, অভিনির্বর্ত্তিত, অভিনিশ্চিত, অভিনিষ্ক্রমণ, অভিনীত, অভিনেতব্য, অভিনেয়, অভিপদ্ম, অভিপন্ন, অভিপরিপ্লান, অভিপরিপ্লুত, অভিপরীত, অভিপারা, অভিপালিত, অভিপীড়িত, অভিপুষ্প, অভিপূজিত, অভিপৃষ্ট, অভিপ্রণয়ন, অভিপ্রদক্ষিণ,

অভিপ্রবিষ্ট, অভিপ্রবৃত্ত, অভিপ্রয়াত, অভিপ্রায়, অভিপ্রেপ্সু, অভিপ্লব, অভিবন্দ, অভিবন্দন, অভিবর্ত্তী, অভিবর্ষণ, অভিবর্ষিত, অভিবর্ষী, অভিবাদ, অভিবাদক, অভিবাদন, অভিবাদনীয়, অভিবাদয়িতা, অভিবাদ্য, অভিবাহ্য, অভিবিখ্যাত, অভিবিদীপিত, অভিবিদ্রুত, অভিবিধি, অভিবিনীত, অভিবিরাজিত, অভিবিশ্রুত, অভিবিষ্ট, অভিবৃদ্ধি, অভিবৃষ্ট, অভিব্যাপক, অভিভব, অভিভবন, অভিভাবক, অভিভাবিকা, অভিভাবী, অভিভাষা, অভিভূ, অভিভূত, অভিভূতি, অভিমত, অভিমনাঃ, অভিমন্তব্য, অভিমন্ত্রণ, অভিমন্যু, অভিমর্দ্দ, অভিমর্শ, অভিমর্শক, অভিমর্শন, অভিমর্ষ, অভিমর্ষক, অভিমর্ষণ, অভিমর্ষী, অভিমান, অভিমানী, অভিমুখ, অভিমুখতা, অভিমুখীকরণ, অভিমুখীভাব, অভিমূর্চ্ছিত, অভিমৃষ্ট, অভিযাত, অভিযাতা, অভিযাতি, অভিযায়ী, অভিযোক্তব্য, অভিযোক্তা, অভিযোগ, অভিযোগী, অভিরক্ষা, অভিরক্ষা, অভিরক্ষিত, অভিরক্ষিতা, অভিরক্ত, অভিরত, অভিরতি, অভিরমণ, অভিরমিত, অভিরম্য, অভিরাম, অভিরামিণী, অভিরুচিত, অভিরুচির, অভিরুত, অভিরূপ, অভিরূপক, অভিরূপপতি, অভিরোষ, অভিলক্ষিত, অভিলঙঘন, অভিলষণ, অভিলষণীয়, অভিলষিত, অভিলাষ, অভিলাষক, অভিলাষী, অভিলাষুক, অভিলীন, অভিলেখিত, অভিশংসক, অভিশংসন, অভিশংসী, অভিশঙ্কা, অভিশঙ্কিত, অভিশঙ্কী, অভিশঙ্ক্য, অভিশপন, অভিশব্দিত, অভিশস্ত, অভিশাপ, অভিসিঞ্চন, অভিষেক্তা, অভিষেচন, অভিষেচনীয়, অভিষেচিত, অভিষেচ্য, অভিষেণন, অভিষ্টুত, অভিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ, অভিষ্যন্দনগর, অভিষ্যন্দবমন, অভিষ্যন্দী, অভিষ্বঙ্গ, অভিসংযুক্ত, অভিসংরক্ত, অভিসংরব্ধ, অভিসংবৃত, অভিসংবৃত্ত, অভিসংশ্রয়, অভিসংহিত, অভিসঙ্ক্ষিপ্ত, অভিসঙ্খ্যা, অভিসন্তপ্ত, অভিসন্ত্রস্ত, অভিসন্দেহ, অভিসন্ধক, অভিসন্ধা, অভিসন্ধি, অভিসম্পন্ন, অভিসম্বন্ধ, অভিসম্বুদ্ধ, অভিসম্ভূত, অভিসম্মূঢ়, অভিসর, অভিসান্ত্ব, অভিসার, অভিসারক, অভিসারণ, অভিসারস্থান, অভিসারিকা, অভিসারিণী, অভিসারী, অভিসৃষ্ট, অভিস্নেহ, অভিহরণ, অভিহর্ত্তা, অভিহার, অভী, অভীক, অভীক্ষ্ণ, অভীপ্সিত, অভীর, অভূত, অভূততদ্ভাব, অভূতপূর্ব্ব, অভূতি, অভূমি, অভ্যক্ত, অভ্যগ্র, অভ্যতীত, অভ্যধিক, অভ্যনুজ্ঞা, অভ্যন্তর, অভ্যন্তরীণ, অভ্যবকীর্ণ, অভ্যবস্থিত, অভ্যবহরণ, অভ্যবহার, অভ্যবহার্য্য, অভ্যবহৃত, অভ্যর্চ্চন, অভ্যর্চ্চা, অভ্যর্চ্চ্য, অভ্যর্ণ, অভ্যর্থন, অভ্যর্থনীয়, অভ্যর্থিত, অভ্যর্থ্য, অভ্যর্দ্দিত, অভ্যর্হণ, অভ্যর্হণা, অভ্যহর্ণীয়, অভ্যর্হিত, অভ্যলঙ্কৃত, অভ্যসূয়, অভ্যসূয়ক, অভ্যসূয়ক, অভ্যসূয়া, অভ্যস্ত, অভ্যস্তমিত, অভ্যাকর্ষ, অভ্যাগম, অভ্যাগমন, অভ্যাবৃত্ত, অভ্যাশ, অভ্যাস, অভ্যাসযোগ, অভ্যাহত, অভ্যুক্ষণ, অভ্যুচ্ছ্রিত, অভ্যুৎপতন, অভ্যুদয়, অভ্যুদ্যত, অভ্যুদ্‌গত, অভ্যুদ্‌গম, অভ্যুদ্‌গমন, অভ্যুন্নত, অভ্যুপগত, অভ্যুপগন্তব্য, অভ্যুপগম, অভ্যুপপত্তি, অভ্যুপস্থিত, অভ্যুপায়, অভ্যুপায়ন, অভ্যুপেত, অভ্যুষিত, অসম্ভব, অহীর, আঞ্জন, আবির্ভাব, আভরণ, আভরণপেড়ি, আভিচারণিক, আভিচারিক, আভিজন, আভিজনন, আভিজাতিক, আভিজাত্য, আভিজিত, আভিধানিক, আভিমুখ্য, আভিরূপ্য, আভিষেচনিক, আভিহারিক, আভীক্ষ্ণ্য, আভূতসংপ্লব, আভূমি, আভ্যন্তর, আভ্যন্তরীণ, আভ্যাসিক, আভ্যুদয়িক, আভ্যুদিক, আয়ান, উদ্ভব, উদ্ভূত, ঋভু, একভাব, তিরোভাব, নির্জ্জিত, পরাজিত, প্রতিভূ, প্রভব, প্রভাব, প্রভু, প্রভূত, প্রাদুর্ভাব, বিজিত, বিজিৎ, বিভব, বিভাব, বিভু, বিভূতি, বৈভব, ভঞ্জন, ভব, ভবকর্ণধার, ভবকাণ্ডারী, ভবক্ষিতি, ভবঘুরে, ভবজ, ভবজন্য, ভবচ্ছিৎ, ভবচ্ছেদ, ভবৎ, ভবতল, ভবতারিণী, ভবদীয়, ভবধব, ভবন, ভবনশিখী, ভবনাথ, ভবনোদর, ভবনোদ্যান, ভবপারাবার, ভববারিনিধি, ভববীতি, ভবভঙ্গ, ভবভবন, ভবভয়, ভবভামিনী, ভবভীত, ভবভীরু, ভবভূত, ভবভূতি, ভবভোগ, ভবমণ্ডল, ভবমোচন, ভবরাণী, ভবলোক, ভবশেখর, ভবসন্ততি, ভবসমুদ্র, ভবসাগর, ভবসিন্ধু, ভবসাযুজ্য, ভবসার, ভবাটবী, ভবাদৃক্, ভবাদৃক্ষ, ভবাদৃশ, ভবান, ভবানী, ভবাপ্যয়, ভবাব্ধি, ভবাভব, ভবাম্বুধি, ভবার্ণব, ভবিক, ভবিতব্য, ভবিতব্যতা, ভবিতা, ভবিষ্ণু, ভবিষ্য, ভবিষ্যজ্জ্ঞান, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতি, ভবিষ্যদ্বক্তা, ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যদ্বাদী, ভবিষ্যপুরাণ, ভবেশ, ভবোচ্ছেদ, ভবোদ্ভব, ভব্য, ভব্যতা, ভব্যরূপ, ভব্যা, ভাউ, ভাউচার, ভাউয়া, ভাউলিয়া, ভাউলী, ভাউলে, ভাও, ভাপ (vapour), ভাব, ভাবক, ভাবকানি, ভাবকালি(লী), ভাবকি (ভাবকী), ভাবগম্ভীর, ভাবগম্য, ভাবগ্রাহী, ভাবজ, ভাবড়া, ভাবন, ভাবনা, ভাবনা-চিন্তা, ভাবনি, ভাবনীয়, ভাববাচ্য, ভাববোধক, ভাবভক্তি, ভাবভঙ্গি, ভাবমিশ্র, ভাবরূপ, ভাবশবলতা, ভাবশান্তি, ভাবশুদ্ধি, ভাবশূন্য, ভাবসন্ধি, ভাবসমন্বিত, ভাবসমাহিত, ভাবসর্গ, ভাবসাব, ভাবস্থ, ভাবস্থির, ভাবস্নিগ্ধ, ভাবা, ভাবাট, ভাবানুগ, ভাবানুগা, ভাবান্তর, ভাবার্থ, ভাবি, ভাবিক (স্বাভাবিক), ভাবিত, ভাবিতা, ভাবিতাত্মা, ভাবিত্ব, ভাবিনী, ভাবী, ভাবুক, ভাবুকতা, ভাবুকি(কী), ভাব্য, ভাব্যমান, ভাম্, ভাম, ভামা, ভামিনী, ভামী, ভুঞ্জি (ভূঞ্জি, ভূমি), ভুবঃ, ভুবন, ভুবনকোশ, ভুবনত্রয়, ভুবনপাবনী, ভুবনবিদিত, ভুবনভর্ত্তা, ভুবনভাবন, ভুবনেশ্বর, ভুবনেশ্বরী, ভুবর্লোক, ভুবি, ভুবিষ্ঠ, ভুবীশ্বর, ভূ, ভূঁই, ভূঁইআদা, ভূঁইআমলা, ভূঁইকলমী, ভূঁইকামড়ী, ভূঁইকুমড়া, ভূঁইকোড়, ভূঁইচাঁপা, ভূঁইফোড়, ভূঁইফোড়া, ভূঁইমালী, ভূঁইয়া, ভূকম্প, ভূকম্পন, ভূকশ্যপ, ভূকান্ত, ভূকুষ্মাণ্ডী, ভূখণ, ভূগর্ভ, ভূগোল, ভূচক্র, ভূচর, ভূচালা, ভূচিত্র, ভূচ্ছায়া, ভূঞা, ভূঞিহার, ভূত, ভূতকর্ত্তৃ, ভূতকান্ত, ভূতক্রান্তি, ভূতগ্রস্ত, ভূতগ্রাম, ভূতচতুর্দশী, ভূতচালা, ভূতঝাড়া, ভূতডামর, ভূততন্মাত্র, ভূতদ্রুহ্, ভূতধরা, ভূতধাত্রী, ভূতধারিণী, ভূতনাথ, ভূতনায়িকা, ভূতনাশন, ভূতপূর্ণিমা, ভূতপূর্ব্ব, ভূতপ্রকৃতি, ভূতবলি, ভূতবাদী, ভূতবাস, ভূতবিক্রিয়া, ভূতবিজ্ঞান, ভূতবিদ্যা, ভূতবৃক্ষ, ভূতভর্ত্তৃ, ভূতভাবন, ভূতভাষা, ভূতভৃৎ, ভূতমাত্রা, ভূতযজ্ঞ, ভূতযোনি, ভূতরায়, ভূতল, ভূতশুদ্ধি, ভূতসংসার, ভূতসংপ্লব, ভূতসঞ্চার, ভূতসর্গ, ভূতসাক্ষী, ভূতসাধনী, ভূতসূক্ষ্ম, ভূতসৃক্, ভূতসৃষ্টি, ভূতস্থ, ভূতস্থান, ভূতহত্যা, ভূতহর, ভূতাত্মা, ভূতাদি, ভূতাধীশ, ভূতানুকম্পা, ভূতান্তক, ভূতার্থ, ভূতার্থকথন, ভূতার্থব্যাহৃতি, ভূতাবাস, ভূতাবিষ্ট, ভূতাবেশ, ভূতি, ভূতিক, ভূতিকাম, ভূতিকাল, ভূতিকৃত্য, ভূতিভূষণ, ভূতিশুভ্র, ভূতিসিত, ভূতুড়ে, ভূতুলে, ভূতেজ্য, ভূতেশ, ভূতেশ্বর, ভূতোপসৃষ্ট, ভূতোপহত, ভূদেব, ভূধর, ভূধাত্রী, ভূনিম্ব, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল, ভূপালী, ভূপুত্র, ভূবদরী, ভূবলয়, ভূবিম্ব, ভূবৃত্ত, ভূভার, ভূভারত, ভূভুক্(জ্), ভূভৃৎ, ভূম, ভূমণ্ডল, ভূমা, ভূমি, ভূমিক, ভূমিকদম্ব, ভূমিকন্দক, ভূমিকম্প, ভূমিকা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভূমিখর্জ্জুরিকা, ভূমিগত,

ভূমিগৃহ, ভূমিচম্পক, ভূমিচম্পা, ভূমিচল, ভূমিচলন, ভূমিচাঁপা, ভূমিচ্ছত্র, ভূমিজম্বু, ভূমিজীবী, ভূমিতল, ভূমিত্রয়, ভূমিদ, ভূমিদেব, ভূমিধর, ভূমিনাথ, ভূমিপ, ভূমিপতি, ভূমিপাদ, ভূমিপায়, ভূমিপাল, ভূমিভাগ, ভূমিভৃৎ, ভূমিমালী, ভূমিরুহ, ভূমিলতা, ভূমিলোক, ভূমিশয়, ভূমিশয্যা, ভূমিষ্ঠ, ভূমিসত্র, ভূমিসন্নিবেশ, ভূমিসুত, ভূমিসুর, ভূমী, ভূমীশ্বর, ভূম্যনন্তর, ভূম্যনৃত, ভূম্যামলকী, ভূম্যামলী, ভূয়, ভূয়ঃ (ভূয়স্), ভূয়শঃ (ভূয়শস্), ভূয়সী, ভূয়ান (ভূয়স্), ভূয়িষ্ঠ, ভূয়োগুণ, ভূয়োদর্শন, ভূয়োবিদ্য, ভূয়োভূয়, ভূয়োভূয়ঃ, ভূর্, ভূর, ভূরা, ভূরি, ভূরিকাল, ভূরিতেজাঃ, ভূরিদ, ভূরিদক্ষিণ, ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ, ভূরিপ্রয়োগ, ভূরিবিক্রম, ভূরিবৃষ্টি, ভূরিমায়, ভূরিশঃ (ভূরিশস্), ভূরিশ্রবাঃ, ভূরিশ্রম, ভূরিস্বামী, ভূরুট্ (ভূরুহ্), ভূরুহ, ভূর্জ্জ, ভূর্জ্জকণ্টক, ভূর্জ্জত্বক, ভূর্জ্জদ্রুম, ভূর্জ্জপত্র, ভূর্লোক, ভূলোক, ভূলোকেশ, ভূশয়, ভূশয্যা, ভূশুদ্ধি, ভূষ্, ভূষ, ভূষণ, ভূষণীয়, ভূষয়িতব্য, ভূষণপেটিকা, ভূষণাচ্ছাদনাশন, ভূষণ্ডী, ভূষনাই, ভূষা, ভূষিকা, ভূষিত, ভূষ্ণু, ভূসুত, ভূসুতা, ভূসুর, ভূস্তৃণ, ভূস্থ, ভূস্বর্গ, ভূস্বামী, ভেবড়া (ভাব গড়বড় যার), ভেবরা, ভেবাগঙ্গারাম, ভেবাচাকা, ভেভাচাকা, ভোর, ভৌত, ভৌতিক, ভৌতী, ভৌম, ভৌমন, ভৌমিক, ভৌমী, ভ্যা, ভ্যাপসা, ভ্যাপসো, ভ্যাবড়া, ভ্যাবা, মানোভূ, যথাভাব, শম্ভু, ষড়ভাব, সমভূমি, সমুদ্ভব, সম্ভব, সম্ভাবন, সম্ভাবনা, সম্ভাবনীয়, সম্ভাব্য, সম্ভূত, সহভাব, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমিক, সঞ্জিত, সুজিত, স্বয়ম্ভূ, হ, হওয়া, হবা (হওয়া), হাওয়া। **ভূ (ভাবি, ভাম্, ভূষ্)** = নবরূপী ভবের আধার যে। **ভাবি** = ভাব (**ভাব** = **ভব** হইতে জাত; **ভব** = ভ-কে বহন করে যে) গতিশীল যাহাতে। **ভাম** = ভবের আধার সীমায়িত যাহাতে। **ভূষ** = নবরূপী ভবের আধার দিশাগ্রস্ত রূপে বিচ্ছুরিত যাহাতে।

অদ্ভুত : ১. ভূ = ভবন, হওয়ন। (অত্ বা সতত গমন থেকে জাত)। ২. অত্ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে যে। / যাহা অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. আকস্মিক, বিস্ময়কর, আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব। অলৌকিক। ... (ব.শ.)। ৪. খানিকটা strange বা miraculous অর্থে প্রচলিত। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষ মতে শব্দটির accidental অর্থে প্রচলিত থাকার কথা ছিল, তা কিন্তু নেই। অর্থটি একটু বদলে miraculous হয়ে গেছে। এর কারণ হল, ভূত নানারকম ভাবে হতে পারে — **প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত (সম্ভূতি), বিভূত (বিভূতি), অভিভূত** ... ইত্যাদি। এগুলি সবই উপসর্গ যোগে সৃষ্টি। কিন্তু অন্তত দুটি ক্ষেত্র দেখা যায়, যা **উপসর্গ** যোগে নয় — **কিম্ভূত, অদ্ভুত**। এই কিম্ভূতকে আমরা চিনি **কিম্পুরুষ**, কিমাকার প্রভৃতি থেকে। এই কিম্ আসলে king। তাই **কিম্পুরুষ** হল রাজপুরুষ বা স্টেটসম্যান। কিন্তু 'অদ্ভুত' হল সেই, যে নিজে থেকে জন্মে গেছে। (দ্র. **আত্মা**)। চারিপাশের সবকিছু নিয়মে জন্মাচ্ছে, সেই প্রচলিতের মাঝে কেউ যদি প্রচলিত নিয়মের বাইরে নিজে থেকে (অত্ = aut-omatic) জন্মে যায়, সে হল **অদ্ভুত** — অকস্মাৎ এই সত্তাটি কোত্থেকে এল রে বাবা! তাই **অদ্ভুত**। যেহেতু প্রচলিতের বাইরে, তাই অদ্ভুত রস কাব্যের একটি রসও বটে, তাতে প্রচলিতের বাইরে নতুনকে জানার স্বাদ পাওয়া যায়।

অভি : ২. *অন্কৃত* **ভ** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে। (দ্র.* **ভ** *ও* **ন** *এবং বর্ণের অর্থ; আরও দ্রষ্টব্য* **নি***)।* ৩. লক্ষ্মীকরণ, উপরি, ধর্ষণ, লক্ষণ, ইত্থম্ভূতভাব, বীপ্সা, ভাগ, সমন্তাৎ, উভয়ার্থ, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, ভৃশার্থ, পূজা, সৌম্য ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত কিন্তু অশনাক্ত। ৫. **প্র, পরা, অপ, অব** ... প্রভৃতির মতো এটিও একটি উপসর্গ। স্বভাবতই তা শব্দের সামনে যোগ হয়। এর অর্থ মূলত '**অভিভাবক**'-এর মতো 'উপর থেকে সক্রিয়'। যেমন মাথায় মারলে **অভি**ঘাত, আর পায়ে কামড়ালে **অপ**ঘাত বা **অব**ঘাত। কিংবা উপর থেকে বা সামনাসামনি মারলে **অভি**ঘাত, কিন্তু গোপনে অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে মারলে **অপ**ঘাত বা **অব**ঘাত। একটি দেশকে সরাসরি সৈন্য নামিয়ে জিতে নিলে **অভি**জিৎ, আর গোপনে গেরিলা যুদ্ধ করে কিংবা প্রাসাদবিপ্লব ঘটিয়ে নিজের লোক সিংহাসনে বসিয়ে দখল করলে **অপ**জিৎ বা **অব**জিৎ। কথাটিকে অন্যভাবেও বোঝা যেতে পারে। যেমন, **অভি**মান হল মান-এর থেকে বেশি, **অপ**মান হল মান-এর থেকে কম। অনুরূপভাবে **অভি**-উপসর্গযুক্ত সমস্ত শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করতে হয়। নিম্নে সেভাবেই আমরা কয়েকটি শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করছি। মনে রাখা ভাল, **অভি**-উপসর্গ যুক্ত যত শব্দ বাংলাভাষায় আছে, সেগুলি প্রধানত অদৃশ্যলোকের বিষয়-শনাক্তকারী শব্দ এবং সেগুলি এতই গভীর অর্থধারী শব্দ যে, সেগুলির অধিকাংশেরই যথাযথ ইংরেজি অনুবাদ করা যায় না। পাশ্চাত্যের ভাষাগুলির আদি রূপে এই **অভি**র উত্তরাধিকারের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, পরবর্তীকালে সেগুলি আপন আপন গুরুত্ব হারিয়ে দৃশ্যলোকের বিষয়মুখী হয়ে অর্থহীন হয়ে গেছে। ... ৬. Avesta - aibi, -wi; Greek - amphi – amphitheatre; Latin - ob; Old German - bi; Goth - bi, um, umbi। (ব.শ.)।

অভিচরণ : ১. অভি + চর্ + অন্। ২. *যার দ্বারা কোনো কিছুর উপরে চরণ করা যায় বা চরা যায়।* ৩. অভিমুখভাবে শত্রুনাশার্থ কার্য্যানুষ্ঠান; অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রযন্ত্রসাধিত মারণাদি হিংসাত্মক ক্রিয়া; শ্যেনাদিযাগ দ্বারা মারণ; ... মূলনিখনন পদধূলিগ্রহণ প্রভৃতি লৌকিক মারণোপায়; ... মারণ মোহন স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন বশীকরণ — এই ষড়বিধ (ষড়যন্ত্র) হিংসাত্মক তান্ত্রিক প্রয়োগ বিশেষ। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সামন্ত-তন্ত্র, রাজ-তন্ত্র প্রভৃতি শাসন-তন্ত্র চালাতে গেলে শাসিতদের উপর বা অন্য দেশের শাসকদের উপর, কিংবা নিজের দেশের শাসন-তন্ত্রকে বদলে ফেলার জন্য যেসব তান্ত্রিক (রাজনৈতিক) ক্রিয়াকলাপ চালানো হত, সেকালে তাকে **অভিচরণ** বলা হত। এর মধ্যে সরাসরি মারা যেমন ছিল, তেমনি অমাত্যের নেতৃত্বে সেনা পাঠিয়ে লুঠতরাজ ('শ্যেনযাগাদি') করা হত; করা হত অন্য নানা উপায়। এর মধ্যে লৌকিক মারণোপায় ছিল যাকে মারা হবে তার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেওয়া কিন্তু প্রকাশ্যে তাকে খুব করে সেলাম ঠোকা। একে বলা হয় 'পূজা করে মেরে ফেলা'। এছাড়া বেদবিরোধী তান্ত্রিকদের **ষড়যন্ত্র** তো ছিলই।

অভিজিৎ (অভিজিত, নির্জিত, পরাজিত, বিজিত, বিজিৎ, রঞ্জিত, রণজিৎ, রণজিত, সঞ্জিত, সঞ্জিৎ, সুজিত, সুজিৎ, হারজিৎ) : **১.** অভি + ✓জি + ক্বিপ্ (০) কর্তৃবাচ্যে; 'ৎ' আগম। (ব.শ.)। **২. অভিজিৎ** = *অভি-পূর্ব্বক (আপন উচ্চতা বজায় রেখে) জিতেছে যে।* **অভিজিত** = *অভি-পূর্ব্বক হেরেছে যে।* **নির্জিত** = *নিঃশেষে জিত (বা পরাজিত) হয়েছে যে।* **পরাজিত** = *যে অপর কর্ত্তৃক জিত (নির্জিত) হইয়াছে।* **বিজিত** = *বিপরীত (পক্ষ) বা বিকল্প দ্বারা জিত (পরাজিত) যে; অথবা বিশেষভাবে জিত (পরাজিত) যে।* **বিজিৎ** = **বি** *(বিশেষ, বিপরীত, বিকল্প) ভাবে জয়ী যে।* **সঞ্জিত** = *সম্যকভাবে জিত (পরাজিত) যে।* **সঞ্জিৎ** = *সম্যকভাবে জয়ী যে।* **সুজিত** = *ভালভাবে জিত (পরাজিত) যে।* **সুজিৎ** = *ভালভাবে জয়ী যে।* **৩. অভিজিৎ** = বিজেতা, বিজয়ী ... ইত্যাদি। **অভিজিত** = **'ইহা জয়যুক্ত করুক'**, অর্দ্ধরাত্রসম্বন্ধী মুহূর্ত্ত। **নির্জিত** = সম্যক জিত, পরাজিত, বশীকৃত ... ইত্যাদি। **পরাজিত** = ন্যূনীকৃত, পরাভূত। **বিজিত** = ন্যূনীকৃত, পরাভূত, বশীকৃত, অধিকৃত ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **অভিজিৎ** = জয়লাভ করে এমন। **নির্জিত** = পরাজিত বা দমন করা হয়েছে এমন। **বিজিত** = পরাজিত, জয়কৃত, জয় করা হয়েছে এরূপ (বিজিত দেশ)। **রঞ্জিত** = রং করা হয়েছে এমন, সন্তোষিত, রং বিশিষ্ট। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **রণজিৎ** = যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বা করে এমন। (স.বা.অ.কল.)। **৪. হারজিৎ** যথার্থে প্রচলিত হলেও প্রায়শই লেখা হয় **হারজিত** রূপে। **অভিজিৎ, অভিজিত, বিজিৎ, রঞ্জিত, রণজিৎ, রণজিত, সঞ্জিত, সঞ্জিৎ, সুজিত, সুজিৎ** ব্যক্তিনাম রূপে প্রচলিত; **নির্জিত, পরাজিত, বিজিত** তিনটি শব্দই vanquished অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অজিত**। 'জিৎ' শব্দের অর্থ হল, 'যে জয়লাভ করেছে বা জিতেছে'; আর 'জিত' শব্দের অর্থ হল, 'যাকে অন্য কেউ জিতেছে'। অর্থাৎ, 'জিৎ' হল 'জয়ী', আর 'জিত' হল 'যে হেরেছে'। তার মানে, এরা পরস্পরের বিপরীত শব্দ। তার মানে, **রণজিৎ** হল সেই যে 'রণে জয়লাভ করেছে বা করে'; আর **রণজিত** হল সেই যে 'রণে পরাজিত হয়েছে বা হয়'। একইভাবে **হারজিৎ** হল 'হারা এবং জেতা'; আর **হারজিত** হল 'হারা এবং কারও দ্বারা বিজিত হওয়া'। আর **রঞ্জিত** হল 'রং করা হয়েছে এমন'। ...

৪০/৫০ বছর আগেও আমাদের বাংলায় বহু মানুষ ছিলেন, যাঁরা এসব শব্দের মানে জানতেন এবং নিজেদের সন্তানদের নাম রাখতেন **অভিজিৎ, বিজিৎ, রণজিৎ, সঞ্জিৎ, সুজিৎ**। কিন্তু এখন সেরকম মানুষের অভাব ঘটেছে। আজকাল আমাদের অ্যাকাডেমির পরিচালক বাংলাজ্ঞানীরা তো পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিকদের ভুয়া তত্ত্বটি মেনেই নিয়েছেন যে, শব্দের ভেতরে শব্দের কোনো মানেই থাকে না; তো নামের ভেতরে মানে থাকবে কী করে! ফলে, তাঁদের **অভিভাবকত্বে** চলা আজকের বাংলাভাষায় **হারজিৎ**কে **হারজিত**, **বিজিৎ**কে **বিজিত**, **রণজিৎ**কে **রণজিত**, **সঞ্জিৎ**কে **সঞ্জিত**, **সুজিৎ**কে **সুজিত** লিখেই কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে — জয়ীকে লোকে হারু নামে ডাকছে, কিন্তু তাতে কারোর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন-বা জয়ী নামে ডাকলেও যা, হারু নামে ডাকলেও তাই!

অভিজিত-এর ক্ষেত্রে একটি বাঁচোয়া পাওয়া যায়। তা হল, **অভিজিৎ** নক্ষত্রে জাত অর্থে **অভিজিত**। তার মানে, এই **অভিজিত** 'অভি-পূর্ব্বক হেরে যাওয়া' নয়। তবে কিনা, 'নক্ষত্রে-জাত' ব্যাপার-স্যাপারগুলি জ্যোতিষের ব্যাপার, আমরা সে বিষয়ে গবেষণার কোনো অবকাশই পাইনি; সেই অর্থের গভীরতাকে বোঝা তো বহু দূরের কথা। যাঁরা **জ্যোতিষ**চর্চা করেন, তাঁদের কেউ হয়তো এই **অভিজিত**-এর প্রকৃত অর্থ বলে দিতে পারবেন।

অভিজ্ঞ (অভিজ্ঞা, অভিজ্ঞাত, অভিজ্ঞান) : **১.** অভি + ✓জ্ঞা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. অভিজ্ঞ** = *যিনি* **অভি**-*পূর্ব্বক (ঘটনাবলীর উপরে থাকিয়া) জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন।* **অভিজ্ঞা** = **অভিজ্ঞ**-*এর আধার যে।* **অভিজ্ঞাত** = **অভিজ্ঞা** *তারিত যাহাতে।* **অভিজ্ঞান** = **অভিজ্ঞা** *অন (on) যাহাতে।* / **অভিজ্ঞ** = 'ইহা তাহাই' এইরূপ নির্ণয় সমর্থ (যিনি)। **অভিজ্ঞাত** = 'ইহা তাহাই' এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞানের বিষয়ীকৃত (পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ)। **অভিজ্ঞান** = যাহার দ্বারা এইরূপ জ্ঞান সাধিত হয় যে 'ইহা তাহাই'। (ব.শ.)। **৩. অভিজ্ঞ** = জ্ঞাতা, পণ্ডিত, কুশল, অবগতিবিশিষ্ট, চেতন, প্রত্যভিজ্ঞাত। **অভিজ্ঞা** = প্রথমোৎপন্নজ্ঞান, স্মৃতি, সংস্কারমূলক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞান। **অভিজ্ঞাত** = প্রত্যভিজ্ঞাত, অভিমত-জ্ঞানবান, কুশল। **অভিজ্ঞান** = 'ইহা তাহাই' এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞান (recognition), স্মৃতি, অনুস্মরণ, জ্ঞান, লক্ষণ, স্মরণার্থ অঙ্গুরীয়কাদি। (ব.শ.)। **৪. অভিজ্ঞ** শব্দটি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত। **৫.** জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে **অভিজ্ঞা, অভিজ্ঞাত, অভিজ্ঞান** প্রভৃতি শব্দগুলি অতুলনীয়। অথচ শব্দগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। যা কিছু **বিদ্যমান**, তার থেকে যা কিছু বেরিয়ে এসে তাদের অস্তিত্বের বিষয়ে আমাদের **বিদিত** করছে, সে তো **অভিজ্ঞা** রূপে আছেই; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে **প্রত্যভিজ্ঞা**। দ্র. **জানালা, লিঙ্গ**। বিশ্বের ঘটনাবলী, তাদের ক্রিয়াকারিত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্বভাব নিয়ে **অভিজ্ঞতা** রূপে অর্জিত হচ্ছে! অথচ **অভিজ্ঞান, অভিজ্ঞাত** প্রভৃতি শব্দগুলিকে একালের অ্যাকাডেমির কোনো প্রয়োজন নেই! তাঁরা এগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন! ভাবা যায়!

তাই বলে **অভিজ্ঞা, অভিজ্ঞান** প্রভৃতি শব্দগুলি যে ব্যাপারকে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হত, সেগুলি কি আমাদের বর্তমান জীবন থেকে মুছে গেছে? আদৌ না, আদৌ না; বরং বহু বহু গুণ বেড়েছে। কত বেড়েছে, 'আইডেনটিটি' নিয়ে একালের **বাংলাভাষী-জ্ঞানজীবী পণ্ডিতদের** কাজকর্মের দিকে তাকালেই সেকথা মালুম হয়ে যাবে। তবে তাঁরা **অভিজ্ঞান, অভিজ্ঞাত** এসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন না, বিষয়টিকে বোঝাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ইংরেজি identity শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের **অভিজ্ঞান-সংকট** হয় না, identity crisis হয়; তাঁরা identity and violence-এর বিপদ দেখতে পান, **অভিজ্ঞান ও রিপু**কে দেখতে পান না; কখনো ভাবেন, এই বিপদ হল আসলে 'পরিচিতি ও হিংসা'র বিপদ। এ যেন হিমালয়কে ছোট করে উইয়ের ঢিবিকে দেখা এবং কখনো-বা তাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে হিমালয় বলে চালিয়ে দেওয়া।

অভিপ্রায় : **১.** অভি + **প্রায়**। (দ্র. **প্রায়**)। **২.** *অভি-পূর্ব্বক (উচ্চে স্থিত মনের বা তদ্রূপ* **অভি***ভাবকোচিত কারও) প্রকৃষ্ট গমন যাহাতে।*

/ যাহাকে পায়। (ব.শ.)। ৩. অভিগামী, গামী, ছন্দ, আশয়, মত, ভাব, হৃদয়গত ভাব, অভিসন্ধি, বিবক্ষিতার্থ, তাৎপর্য, সম্বন্ধ, বিষ্ণু। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. 'প্রকৃষ্ট অয়ন বা যাওয়া যাহাতে', তাকে **প্রায়** বলে, একথা আমরা আগেই জেনেছি। সংক্ষেপে সেটি হল একটি সত্যের সর্বোচ্চ যতদূর অর্জন করা যায় বা যাওয়া যায়, প্রকৃষ্টরূপে ততদূর যাওয়াকে **প্রায়** বলে। এই **প্রায়** যদি **অভি**-পূর্ব্বক হয়, তখনই তা হয়ে যায় **'অভি**-পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট গমন' বা **অভিপ্রায়**। এই **অভি** যদি মানুষের মন হয়, তবে এ হল মনের যাওয়া, হৃদয়গত ভাব ... ইত্যাদি।

অভিভব (উদ্ভব, পরাভব, প্রভব, বিভব, সম্ভব) : ১. অভি + ✓ভূ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***অভিভব*** = ***অভি***-*পূর্ব্বক (উপর থেকে)* ***ভবন*** *যাহাতে।* ***উদ্ভব*** = *উদ্‌লোকে* ***ভবন*** *যাহাতে।* ***পরাভব*** = *পর অধীনে* ***ভবন*** *যাহাতে।* ***প্রভব*** = *প্রকৃষ্ট* ***ভবন*** *যাহাতে।* ***বিভব*** = *বিপরীত বা বিকল্প বা বিশেষ* ***ভবন*** *যাহাতে।* ***সম্ভব*** = *সম্যক* ***ভবন*** *যাহাতে।* / **অভিভব** = রোগাদি হেতু গাত্রাদির জড়ীভাব (যাহাতে)। **উদ্ভব** = উৎকৃষ্টভাবে ভবন (যাহাতে); যাহা হইতে উদ্ভূত। **বিভব** = যাহা দ্বারা সামর্থ্য সাধন করা যায়। **সম্ভব** = আধেয়ের আধার হইতে অনতিরিক্ততা অর্থাৎ আধেয়ের আধারে সমাবেশন (যাহাতে); যাহা সম্যগ্‌ভোগার্থ পুনঃপুনঃ হয়। (ব.শ.)। ৩. **অভিভব** = পরাভব, তিরস্কার, আক্রান্তি, দ্রোহ, বাধ, অনাদর, দুর্ব্বলীকরণ, ব্যাপ্তি। **উদ্ভব** = উৎপন্ন, উৎপত্তি, উৎকর্ষ, বৃদ্ধি, উৎপত্তিস্থান। **পরাভব** = অভিভব, তিরস্ক্রিয়া, বিপদ্, বিনাশ, তিরস্কার, অবজ্ঞা, ধর্ষণ। **প্রভব** = জন্ম, উৎপত্তি, পরাক্রম, জনক, নিধি, আদ্যোপলব্ধিস্থান, বিষ্ণু। **বিভব** = প্রসার, বিস্তার, উদ্ভব, ধন, ভূতি, সম্পদ, সমৃদ্ধি, মহিমা, মোক্ষ। **সম্ভব** = সম্ভূত, উৎপন্ন, মেলক, উৎপত্তি, জন্ম, সম্পন্নতা, উপপত্তি, প্রমাণবিশেষ, সঙ্কেত, সহায়, স্থূলশরীর, গর্ভাধান, হেতু, সাধকত্ব। (ব.শ.)। ৪. **উদ্ভব, পরাভব, সম্ভব** যথার্থে প্রচলিত। বাকি তিনটি শব্দ প্রায় অপ্রচলিত। ৫. **ভব** শব্দের বিশেষ দিশা স্পষ্টভাবে নেই। **অভি, উৎ, পরা, প্র, সম্** প্রভৃতি উপসর্গগুলি যুক্ত হয়ে **ভব** শব্দটিকে বিশেষ বিশেষ দিশা দিয়েছে। এই দিশার ব্যাপারটি কেবলমাত্র ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এধরনের শব্দের প্রতীকী অর্থ ঠিকঠাক হয় না; সেরকম অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রায়শই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, এক্ষেত্রে যেমন শব্দগুলির প্রতীকী অর্থ রূপে বারংবার 'উৎপত্তি' কথাটি এসে গেছে। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে একে কত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তা এখানে প্রমাণ সহকারে বোঝানো যেতে পারে। যেমন — **সম্ভব** শব্দটির কথাই ধরা যাক। ব.শ.-তে বলা হচ্ছে 'আধেয়ের আধারে সমাবেশন' বা 'আধেয়ের আধার হইতে অনতিরিক্ততা', আমরা যাকে বলেছি, 'সম্যক **ভবন** যাহাতে'। **সম্ভব** তাহলে কীরকম ব্যাপার? এ হল, 'আধার যতখানি জায়গা দিয়েছে, আধেয় তার সমান হয়ে তাকে ভরে সম্পূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে'। ফলে, আধারের সমান হয়ে গেছে আধেয়; পাত্রের সমান হয়ে গেছে তাতে রাখা জল; দেহের সমান হয়ে গেছে তাতে স্থান করে নেওয়া **প্রাণ**। তাই সে **সম্ভব** হয়ে উঠতে পেরেছে। এখানে লক্ষণীয় যে, যে ধারণাকে ধারণ করার জন্য **সম্ভব** শব্দের সৃষ্টি করা হয়েছে, ইংরেজি birth, origin, probable, possible — কোনো শব্দই সেই ধারণাকে ধারণ করবার যোগ্য নয়। অগত্যা **সম্ভব**কেই কেটে-ছেঁটে ইংরেজির সমান করে নেওয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের 'খ' ('বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অভিভবন (অভিভাবক, অভিভাবিকা, অভিভাবী) : ১. অভি + ✓ভূ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***অভিভবন*** = ***অভিভব*** *অন (on) যাহাতে। (উপরে* ***অভিভব*** *দ্রষ্টব্য)।* ***অভিভাবক*** = ***অভিভবন*** *করে যে;* ***অভি-ভাবন*** *করে যে (দ্র.* ***ভাবন****)।* ***অভিভাবিকা*** = ***অভিভাবক****-এর আধারশক্তি যে।* ***অভিভাবী*** = ***অভিভাব*** *(****অভিভব*** *হইতে জাত) গতিশীলভাবে ধারিত যাহাতে।* / **অভিভাবক** = যে শাসনে রাখে। (ব.শ.)। ৩. **অভিভবন** = অভিভব, পরাভব, আক্রমণ। **অভিভাবক** = অভিভবকারক, পরাজেতা, তিরস্কারক, অতিশায়ী, আক্রমণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারক, তত্ত্বাবধানকার (guardian)। **অভিভাবিকা** = রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, তত্ত্বাবধায়িকা। **অভিভাবী** = পরাজেতা, অতিশায়ী, ন্যূনীকারক, ব্যাপী, তিরস্কারক। (ব.শ.)। ৪. guardian অর্থে **অভিভাবক** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. আজকালকার স্কুলগুলিতে একটি নতুন প্রথার প্রচলন দারুণভাবে রমরমিয়ে চলছে। যমের নাম শোনার মতো এর নাম শুনলে আমাদের ছেলেমেয়েদের মুখ শুকিয়ে যায়। তারা একে বলে 'গার্জেন-কল' (guardian call)। তাদের মতে, 'যিনি ছেলেমেয়েদের উপর তর্জন-গর্জন করেন', তাঁকে 'গর্জনকারী' বা 'গার্জেন' (guardian) বলে। আর, যাঁরা, যে দিদিমণি বা হেডমিস্ট্রেস বা প্রিনসিপ্যালেরা, মাসে মাসে সব ছাত্রছাত্রীর 'গার্জেনকে' বা বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ গার্জেনকে 'গার্জেন-কল' করে সেই গার্জেনকে বা গার্জেনগণকে সন্তানসন্ততিদের বিরুদ্ধে গর্জন করতে প্ররোচিত করেন, উদ্বুদ্ধ করেন, বাধ্য করেন, তাঁদেরকে আমাদের ছেলেমেয়েরা কী কী যে বলে, তার কিনারা পাওয়া যায় না। আমির খান-এর 'তারে জমিন পর' কিংবা 'থ্রি ইডিয়টস' নিজ নিজ কুকর্ম থেকে এই নরকাসুরদের বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। গর্জনকারী এই গার্জেনদের (guardian-দের) বাংলাভাষায় **অভিভাবক** বলা হয়ে থাকে।

অভিভাবক শব্দটি আদিতে **অভিভব** শব্দ থেকে জাত। এর অর্থ স্বভাবতই 'অভিভবকারী' বা 'পরাজেতা' ... ইত্যাদি। এই **অভিভাবক** অন্যের উপর চেপে বসে, তাকে পরাভূত করে, তার উপরে দাঁড়িয়ে **ভব হয়**; তাই **অভিভাবক**। এই **অভিভাবক** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের দ্বিতীয় একটি রূপও ছিল এবং আছে। সেই দ্বিতীয় রূপটিকে আমরা দ্বিতীয় ক্রিয়াভিত্তিক অর্থরূপে এখানে উল্লেখ করেছি (উপরে ২. দ্রষ্টব্য)। এই দ্বিতীয় **অভিভাবক** নিজেকে উচ্চে রেখে তাঁর পোষ্যের (যাকে তিনি লালন-পালন করেন, তার) **ভাবনা** ভাবেন, তার উপর **প্রভাব** বিস্তার করেন; কিন্তু তাকে দখল করেন না, পরাজিত করেন না। এই **অভিভাবনা** স্বভাবতই কেবলমাত্র পাহারা দেওয়া (বা guard দেওয়া) মাত্র নয়, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি। **অভি**-ভাবনা তো উচ্চ মানের ভাবনা, কেমন করে মানবসন্তান

তার **সমস্ত স্বাভাবিক**-প্রাকৃতিক গুণের বিকাশ সাধন করবে, সেই **উদ্দেশ্যে সন্তানসন্ততিকে লালনপালন** করার ভাবনা। এটি কোনো **ছোটখাট পাহারাওয়ালার** (বা guardian-এর) ভাবনা নয়। যিনি **সেভাবে সত্যিকারের অভিভাবনা** করতে পারেন, করেন, তাঁকেই **অভিভাবক** বলে। উদাহরণস্বরূপ এক আদর্শ **অভিভাবকের** নাম **উল্লেখ** করা যেতে পারে — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কার্যত তাঁর ছেলে রবীন্দ্রনাথকে ইস্কুলের সেই বিশেষজ্ঞদের হাতে দেননি, যাঁরা মানুষ পিটিয়ে গাধা বানানোর কাজে দক্ষ। সেই দেবেন্দ্রনাথের **মতো অভিভাবককে** guardian বলে ডাকলে, তাকে অনেক ছোট করা হয়ে যায়। এই সম্মানীয় **অভিভাবকের** ধারণাটি কেবল সন্তানাদির লালন-পালনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এমনও নয়; তা সমাজের **অভিভাবকত্ব** পর্যন্ত প্রসারিত। দ্র. **বানপ্রস্থ**।

অভিভাষণ (অভিভাষা) : **১.** অভি + ✓ভাষ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অভিভাষণ*** *=* ***অভি****-পূর্ব্বক (উচ্চ অবস্থানে বিরাজ করিয়া)* ***ভাষ*** *অন (on) থাকে যাহাতে; অথবা,* ***অভি****-পূর্ব্বক যে ভাষণ দেওয়া হয়।* ***অভিভাষা*** *=* ***অভি****-পূর্ব্বক* ***ভাষণ****-এর আধার যাহা।* **৩. অভিভাষণ** = অভিমুখে কথন, সম্ভাষণ, আলাপ, সভায় সভ্যগণের সম্মুখে সভাপতির বক্তব্য বিষয়। (ব.শ.)। **৪.** an address শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে **অভিভাষণ** শব্দটি কখনো-সখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও তার নিজস্ব অর্থে শব্দটি এখন প্রচলিত নয়, **অভিভাষা** সম্পূর্ণই অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভাষা**। কোনো ব্যক্তি মানসিকভাবে উচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশে যে **ভাষণ** দেন, তাকেই **অভিভাষণ** বলে। তার মানে, আমরা যখন বলছি বা শুনছি যে, অমুক ব্যক্তি আজ অমুক স্থানে অমুকদের উদ্দেশে **অভিভাষণ** দেবেন, তখন কার্যত সব পক্ষই মেনে নিচ্ছে যে, যিনি **ভাষণ** দেবেন, তিনি মানসিকভাবেই উচ্চ-স্থানীয়, দৈহিকভাবে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তো তিনি বলবেনই। তার মানে, স্বভাবতই তিনি বাণীবর্ষণ করবেন, শ্রোতৃবৃন্দের মন তাতে সিক্ত হবে।

অভিভাষা শব্দটি প্রচলিত অভিধানগুলিতে নাই, কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনায় 'ভরতনাট্যশাস্ত্র'-এর আলোচনা অংশে আছে। আমরা ইতোপূর্বে **ভাষা** শব্দে তার থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছি। একালে আমরা যাকে 'শাসকের ভাষা' বলি, তার দু'রকম মানে হয়। প্রথম মানেটি হল সমাজশীর্ষে অবস্থানকারী শাসকদের ধমকানির ভাষা, যে-ভাষায় শাসকেরা শাসিতদের উদ্দেশে **ভাষণ** দিয়ে থাকেন। আর দ্বিতীয় মানেটি হল সমাজশীর্ষের জ্ঞানীগুণীদের অতি সমৃদ্ধ পরিশীলিত ভাষা; একেই বলা হত **অভিভাষা**। ভরতনাট্যশাস্ত্রে যে **অভিভাষার** কথা বলা হয়েছে, তা ঐ জ্ঞানীগুণীদের অতি সমৃদ্ধ পরিশীলিত ভাষা। একালেও **অভিভাষার** প্রচলন পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রয়েছে; তবে তাকে **অভিভাষা** বলা হয় না, বলা হয় 'পরিশীলিত ভাষা', 'মান-ভাষা', 'অ্যাকাডেমিক-ভাষা' ... ইত্যাদি। সর্বপ্রকারের উচ্চমানের জ্ঞানচর্চা **অভিভাষাতেই** হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে যে ভাষাগুলি **অভিভাষা** হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তাদের মধ্যে বাংলা, ফারসি, গ্রীক, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ ভাষা অন্যতম। কোনো **ভাষাকে অভিভাষার** স্তরে উন্নীত হতে গেলে তাকে প্রথমে সেই **ভাষাভাষীদের** মধ্যেকার 'ভদ্রলোক'দের ভাষায় (আর্যভাষায়) উন্নীত হতে হয়, তারপর সেই ভাষায় যথেষ্ট উচ্চমানের জ্ঞানচর্চা হলে, কাব্যাদি রচিত পঠিত হলে, কেবল তখনই সেই ভাষা **অভিভাষায়** পরিণত হতে পারে। অতএব, যে ভাষায় উচ্চ মানের জ্ঞানচর্চা করা যায় না, তাকে **অভিভাষা** বলা যায় না। স্মর্তব্য যে, এক কালে লোকে উচ্চ মানের জ্ঞানচর্চার জন্য ফারসি, জার্মান, গ্রীক ভাষা **শিখতে** যেত।

অভিভূত : **১.** অভি + ✓ভূ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অভি****-পূর্ব্বক* ***ভূত*** *যে। (দ্র.* ***ভূত****)।* **৩.** পরাজিত, পরাভূত, ব্যাকুলিত, বিহ্বল, কাতর, আক্রান্ত, উপদ্রুত, নিপীড়িত, মোহিত, বিবেকরহিত, আবিষ্ট, বশীকৃত। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আজকাল আমরা **অভিভূত** বললে 'মোহিত' বা 'আবিষ্ট' বুঝে থাকি। অথচ দেখা যাচ্ছে, শব্দটি **ভূত** শব্দের সঙ্গে **অভি** উপসর্গ যোগে বানানো। **ভূত** বলতে আমরা বুঝি, 'যা হয়েছে', বা 'যার হওয়ন ঘটেছে', অর্থাৎ, 'যা অস্তিত্বলাভ করেছে'। তাহলে **অভিভূত** বললে 'মোহিত' বুঝি কেন?

আসলে পুরো কথাটি হল **অভিভবিত**; অর্থাৎ, 'যাহাকে **অভিভব** করা হইয়াছে'। সংক্ষেপে সেটিই **অভিভূত**। তো, যাকে **অভিভব** করে ফেলা হয়েছে, সে একপ্রকারে পরাজিতই বটে। তবে কিনা, এই পরাজয় তার মানসিক পরাজয়। যাকে **অভিভবিত** বা **অভিভূত** করা হয়েছে, আসলে তার মানসলোক দখল করে ফেলা হয়েছে। তাই সে 'মোহিত' বা 'আবিষ্ট'। আর, মন দখল করে ফেলতে পারলে শরীর দখল করতে কতক্ষণ! ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ইংরেজ আমাদের সমাজশরীরের উপর থেকে তার দখল ত্যাগ করায় আমরা 'স্ব-অধীন' বা 'স্বাধীন' হলাম বটে, কিন্তু সেদিন থেকেই আমাদের সমাজমন তার দখলে চলে গেল, আমরা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলাম। যা কিছু ভাল আছে সবই আছে ইংরেজের, পাশ্চাত্যের; বাংলার কিছুই নেই, যে ইংরেজি জানে, বলতে পারে, তার কদর বেড়ে গেল। আমরা ইংরেজির দ্বারা **অভিভূত** হয়ে গেলাম।

অভিমন্যু : **১.** অভি + ✓মন্ + যু (যুচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *'আমার সমান নাই, এই মনন' (= অভিমান / অমরকোষ টীকা, ব.শ.) করেন যিনি।* / যিনি অভী (নির্ভীক) এবং মন্যু (মন্যুমান)। (ব.শ.)। **৩.** সুভদ্রাগর্ভজাত অর্জ্জুনপুত্র। (ইনি শাপভ্রষ্ট চন্দ্র। ইঁহার পত্নী উত্তরা এবং পুত্র পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণরচিত চক্রব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু ইনি ব্যূহনির্গমন কৌশল জানিতেন না এবং ভীমাদিও ইঁহার অনুসরণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং ব্যূহমধ্যে বহু কুরুসৈন্য নিহত করিয়া, ইনি দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা বৃহদ্বল কৃতবর্ম্মা — এই ষড়রথী কর্তৃক নিহত হন। কাশীদাসী মহাভারতে কর্ণ দুঃশাসন শকুনি দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা জয়দ্রথ — এই সপ্তরথীর উল্লেখ আছে।) জটিলার পুত্র ও রাধিকার স্বামী আয়ান। (ব.শ.)। **৪.** অর্থহীন ব্যক্তিনাম রূপে প্রচলিত। **৫. ব্রহ্মমন্যু**

শব্দে আমরা দেখেছি, সে হল 'ব্রাহ্মণের ক্রোধ, তজ্জন্য শাপ'। আর অমরকোষ আমাদের জানাচ্ছেন যে, 'অভিমনন করা' হল এমন একপ্রকার মননক্রিয়া, যাতে মনে করা হয় যে, 'আমার সমান নাই'। স্বভাবতই, এ হল একপ্রকার আত্মসম্মানবোধ। সেকালে একে বলা হত 'আত্মবিষয়ে পূজ্যতাবুদ্ধি'; একালে একে বলা হয় self-respect। সেটি অত্যধিক হয়ে গেলেই 'গর্ববোধ'-এ পরিণত হয়, তখন মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, শাপ দেয় ... ইত্যাদি। অন্যথায় এই **অভিমনন**-ক্রিয়া মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে কখনো কখনো একটি প্রয়োজনীয় গুণ হিসেবে গণ্য হয়। **অজয়** বা **অজিত** শব্দে আমরা এইরকম মানুষকে দেখেছি।

এ তো গেল শব্দটির নিহিতার্থ বিষয়ক কথাবার্তা। আমাদের ইতিহাসে যে **অভিমন্যু**র কথা আছে, এবার তার কথা হোক। ইনি সেই সত্তা থেকে জন্মেছিলেন, যার নাম **অর্জ্জুন** ও **সুভদ্রা**। একালের ভাষায় বলতে হলে বলতে হয় — অগ্রণী প্রযুক্তির ধারক মানুষদের সঙ্গে (**সুভদ্রা**র সঙ্গে) অর্জিত বিত্তবান সত্তার (সাদা টাকার বা **অর্জ্জুন**-এর) মিলনে **অভিমন্যু**র জন্ম হয়। সেকারণে স্বভাবতই এদের অত্যন্ত **অভিমান** থাকে। নতুন প্রযুক্তি ও সরকার-স্বীকৃত সম্পদের জোরে এরা নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি খুলে ফেলতে পারে, কিন্তু চারিদিকের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত এরা টিকে থাকতে পারে না। কথাটি আর কেউ না বুঝুক, যে 'বিগ্-বেঙ্গলি'রা দেশকে ভালবেসে দেশে কিছু করার জন্য আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন এবং বহু টাকা নিয়ে শিল্প-কারখানা ইত্যাদি করতে গিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

তা সে যাই হোক, বৌদ্ধযুগে ভারতে ধনতন্ত্রের যে বিকাশ ঘটেছিল, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তা ছিল এই **অভিমন্যু**। অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার সঙ্গে যুদ্ধে তখনকার ধনতন্ত্রবাদীদের অন্যতম শক্তি ছিল এই **অভিমন্যু**। কিন্তু সে হেরে যায়। কীভাবে, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মহাভারতে।

গ্রীক পুরাণের সহযোগী পিতা ও পুত্র, যথাক্রমে Daedalus ও Icarus — সংক্রান্ত কাহিনীকে অর্জুন ও অভিমন্যুর কাহিনীর অন্যতর রূপ বা গ্রীসীয় রূপান্তর বলে ভাবা যেতে পারে।

অভিমান (অভিমানী, অপমান) : **১.** অভি + ✓মন্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অভিমান*** = ***অভি***-*পূর্ব্বক (উচ্চে স্থিত এরূপ)* ***মান*** *(মন হইতে জাত অর্থাৎ মননকৃত) যাহাতে; অথবা, যথাযথ মান হইতে উচ্চ মান (মানের বোধ) যাহাতে।* ***অভিমানী*** = ***অভিমান***-*এর সক্রিয় বা গতিশীল আধার যে।* ***অপমান*** = *যথার্থ মান হইতে নিম্ন মান (মানের বোধ) যাহাতে।* / **অভিমান** = 'আমার সমান নাই' এই মনন (যাহাতে); অর্থ বিদ্যা কুলাদির দর্প (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. অভিমান** = আপনার প্রতি মান, আপনার প্রতি উৎকর্ষারোপ, আত্মবিষয়ে পূজ্যতাবুদ্ধি, আত্মকর্ত্তৃত্বাদিবোধ, আত্ম-সম্মান, মিথ্যাগর্ব্ব, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মিথ্যাজ্ঞান, প্রশয়, হিংসা, স্নেহহেতুক অনাদরজন্য-চিত্তক্ষোভ, শৃঙ্গাররসের অবস্থাভেদ। **অভিমানী** = অভিমানকারী, দর্পযুক্ত, প্রণয়কোপযুক্ত, মিথ্যাজ্ঞানযুক্ত। **অপমান** = অনাদর, অবহেলন, পরিভব, অবজ্ঞা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলিরও যথাযথ ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। ইংরেজি sulk বা ফরাসি থেকে পাওয়া boudoir শব্দে গোঁসা ভাবটা অনেকটা বোঝায়, কিন্তু **অভিমান** শব্দের ব্যাপ্তি, মীড় বা মূর্চ্ছনা সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। **অভিমান** শব্দের 'স্নেহহেতুক অনাদরজন্য চিত্তক্ষোভ' অর্থটি বাংলাভাষীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ যেখানে নেই, সেখানে **অভিমান** কথাটি আসতেই পারে না। অথচ গ্রামবাংলার মানুষদের দেখা যায়, জগতের প্রায় সবকিছুর উপর তাঁরা **অভিমান** করে বসেন। তার মানে, অন্তরে অন্তরে তাঁরা জগতের সবকিছুকেই স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে বসে আছেন। বিশ্বাস না হলে একবার শরৎচন্দ্র পড়লেই তার প্রমাণ পাবেন, অন্যদের কথা নাই বা তুললাম।

অভ্যর্থন (অভ্যর্থনা) : **১.** অভি + ✓অর্থি + অন (ল্যুট্, যুচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অভ্যর্থন*** = ***অভি*** *(যথাযথর চেয়ে উচ্চ)* ***অর্থ*** *করা অন (on) যাহাতে; অথবা, অভ্যাগতকে তাঁর কার্য্যকারিতার অধিক করিয়া আদর-আপ্যায়ন করা হয় যাহাতে।* ***অভ্যর্থনা*** = ***অভ্যর্থন***-*এর আধার যে।* / **অভ্যর্থন, অভ্যর্থনা** = অভ্যাগত ব্যক্তির সৎকার ও সমাদর (যাহাতে)। (ছা.অ.)। **৩. অভ্যর্থন, অভ্যর্থনা** = প্রার্থনা, যাচ্ঞা। (ব.শ.)। **অভ্যর্থন, অভ্যর্থনা** = প্রার্থনা, সম্ভাষা, সংবর্দ্ধনা। (ছা.অ.)। **৪.** welcome বা reception অর্থে **অভ্যর্থনা** প্রচলিত, **অভ্যর্থন** অপ্রচলিত। **৫.** প্রত্যেক মানুষই অনেক কিছু করেন, করতে পারেন, করতে চান। সেগুলিই সেই মানুষটির **অর্থ**; সেগুলিই তাঁকে **অপদার্থ** রূপে প্রতীয়মান না-করে **পদার্থ** বা **সিদ্ধার্থ** রূপে প্রতীয়মান করে। তিনি যদি আপনার বাড়িতে আসেন, তাঁর সেই **অর্থে**র সমান কথাবার্তা বললে তাঁকে **সমর্থন** করা হয়; কিন্তু সেই **অর্থের** চেয়ে খানিকটা উঁচুতে তুলে কথাবার্তা বললে তাঁকে **অভ্যর্থন** করা হয়। তদ্রূপে **অভ্যর্থন** করাকে বলা হয় **অভ্যর্থনা**। এই **অভ্যর্থনা** স্বভাবতই welcome করা বা reception করার চেয়ে অনেক বেশি আদর-আপ্যায়ন করা বোঝায়।

এখানে আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। তা হল, কাউকে সে যা পারে তার চেয়ে একটু বেশি করে বলা সেই ব্যক্তিকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে আরও উদ্দীপনা যোগায়। মানুষের যোগ্যতাকে এই **অভ্যর্থনা** আরও উঁচুতে তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

অভ্যাস (অভ্যস্ত, অভ্যস্তমিত) : **১.** অভি + ✓অস্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অভ্যাস*** = ***অভি***-*পূর্ব্বক (উপর থেকে)* ***অস*** *(শক্তিবিচ্ছুরণ) যাহাতে।* ***অভ্যস্ত*** = ***অভ্যাস*** *কৃত যাহাতে।* ***অভ্যস্তমিত*** = ***অভ্যস্ত মিত*** *(সীমায়িত) যাহাতে।* / **অভ্যাস** = পুনঃ পুনঃ করণ (যাহাতে)। **অভ্যস্ত** = (যাহা) পুনঃ পুনঃ আচরিত; একরূপ ক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত। **অভ্যস্তমিত** = যে ব্রহ্মচারী নিদ্রিত থাকিতে সূর্য্য অস্তমিত হয়। (ব.শ.)। **৩. অভ্যাস** = সামীপ্য, অন্তিক, নিকট, (ব্যাকরণে) ধাতুর দ্বিরুক্ত ভাগদ্বয়ের পূর্ব্বভাগ, আবৃত্তি, অনুশীলন, সমানপ্রত্যয়াবৃত্তি, জ্ঞানসংস্কার, পুনঃ পুনঃ স্থাপন, পরিচয় ... ইত্যাদি। **অভ্যস্ত** = কৃতাভ্যাস, অনুশীলিত, শিক্ষিত, অধীত, (গণিতে) গুণিত, (ব্যাকরণে) কৃতদ্বিত্ব, কৃতদ্বিত্বধাতুভাগদ্বয়।

অভ্যস্তমিত = সূর্য্যাস্ত হেতু অভিব্যাপ্তদোষ। (ব.শ.)। **৪. অভ্যাস** ও **অভ্যস্ত** যথার্থে প্রচলিত; **অভ্যস্তমিত** অপ্রচলিত। **৫. অস্** কথাটি আমাদের পরিচিত নয়, কিন্তু **অস্তি** ও **অস্তিত্ব** আমাদের পরিচিত শব্দ। **অস্তি** কথাটির অর্থ হল '**অস্** তারিত হয়ে সক্রিয় রয়েছে যাতে'; অর্থাৎ যার ভিতরে **অস্** ঢুকে গিয়ে সক্রিয় রয়েছে। তার মানে, কোনো আধারে **অস্** ঢুকিয়ে দিতে পারলে সেটি **অস্তি** হয়ে যায়, **অস্তিত্ব** লাভ করে। কারক রূপে উচ্চ স্থান থেকে সেই **অস্** ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজকে বলা হয় **অভ্যাস**। এই **অভ্যাস** বারংবার করতে থাকলে মানুষ সেই কাজটিতে **অভ্যস্ত** হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হল, তা হয় কীভাবে?

আপনি একটি কবিতা পড়ছেন; বারংবার পড়ছেন। ফলত, আপনার পাঠ আপনার স্মৃতিলোকে পুনঃ পুনঃ **অস** করছে বা শক্তিবিচ্ছুরণ করছে। পড়তে পড়তে কবিতাটি আপনার মুখস্থ হয়ে গেল; অর্থাৎ **অস**-এর এই **অভিক্ষেপণ** আপনার স্মৃতিলোকে **অস্তিত্ব** লাভ করে ফেলল। এখন আপনি না দেখেও কবিতাটি অবাধে বলে যেতে পারেন। অর্থাৎ কবিতাটি আপনি মানসিকভাবে **অভ্যাস** করছিলেন, মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পর আপনার মন কবিতাটিতে **অভ্যস্ত** হয়ে গেছে। তাই আপনি না দেখেও কবিতাটি অনর্গল বলে যেতে পারছেন। ...

এরকম ঘটনা শারীরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। গ্রামবাংলায় এরকম অদ্ভুত ঘটনাও দেখা যায় — কোনো চাষির রাখাল তার একটি বাছুরকে শৈশব থেকে প্রতিদিন সকালে কোলে তুলে খানিকক্ষণ ঘুরত। বাছুরটি বড় হতে লাগল, রাখালও তার কোলে তোলার দৈহিক **অভ্যাস** অব্যাহত রাখল। বাছুরটি যখন যথেষ্ট বড় হয়ে বলদে পরিণত হয়ে গেছে, তখনও দেখা গেল, রাখালটি অত বড় বলদকে রোজ সকালবেলা অনায়াসে কোলে তুলে নিতে পারছে। কারণ সে ঐ কাজে দৈহিকভাবে **অভ্যস্ত** হয়ে গেছে। তার মানে, মানসিক বা দৈহিক যে ভাবেই হোক না কেন, বারংবার **অস**-এর **অভিক্ষেপণ** করতে থাকলে, বা **অভ্যাস** করতে থাকলে একদিকে নিক্ষিপ্ত **অস** যেমন **অস্তিত্ব** লাভ করে, তেমনি ক্ষেপক হিসেবে **অভ্যাস**কারী মানুষটিও **অভ্যস্ত** হয়ে ওঠে। ...

কিন্তু **অভ্যস্ত** যদি সীমায়িত হয়ে যায়, তখন দেখা দেয় সমস্যা। তখন যে কাজে সে **অভ্যস্ত** বা **দক্ষ**, সেই কাজ মানুষটিকে বেঁধে রাখে তার এখতিয়ারের এলাকার মধ্যে, **অভ্যস্ত** অবস্থার ঘেরাটোপের মধ্যে; তা সে জাগরণের ঘেরাটোপ হোক আর নিদ্রার ঘেরাটোপ হোক; ওদিকে ট্রেন ছেড়ে দেয়। একেই বলে **অভ্যস্তমিত** অর্থাৎ 'যে ব্রহ্মচারী নিদ্রিত থাকিতে সূর্য্য অস্তমিত হয়।' এ হল **ব্রহ্মচারী**র দোষ। প্রকৃত **ব্রহ্মচারী** এরকম **অভ্যাসের** দাস হন না, হতে পারেন না। একেই অন্যত্র আমরা **মৌলবাদ** শব্দে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। দ্র. **অভ্যুদিত**।

অভ্যুদয় (অভ্যুদিত, আভ্যুদয়িক) : ১. অভি-উদ্ + ✓ই + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অভ্যুদয়*** *= **অভি**-পূর্ব্বক **উদয়** (উদ্‌লোকে গমন) যাহাতে।* ***অভ্যুদিত*** *= যাহার **অভ্যুদয়** হইয়াছে।* ***আভ্যুদয়িক*** *= **অভ্যুদয়** হইতে জাতককে গতিশীল করে যে। /* **অভ্যুদয়** = অভীষ্টকার্য্যের প্রাদুর্ভাব (যাহাতে)। **অভ্যুদিত** = যে ব্রহ্মচারী নিদ্রিত থাকিতে সূর্য্যোদয় হয়। **আভ্যুদয়িক** = অভ্যুদয় যাহার প্রয়োজন। (ব.শ.)। **৩. অভ্যুদয়** = উদীয়মান, উদয়, উদ্ভব, বৃদ্ধি, সৌভাগ্যসঞ্চার, আভ্যুদয়িক বিবাহাদি উৎসব, বৃদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, চূড়াদি সংস্কার, অভ্যুদয়সাধন ইষ্টলাভ, বীর্য্য। **অভ্যুদিত** = সমুদিত, যুগপদ্ উৎপন্ন, অভ্যুদয়প্রাপ্ত, শ্রেষ্ঠ, বৃত্ত, সূর্য্যোদয় হেতু দোষযুক্ত। **আভ্যুদয়িক** = বৃদ্ধিফলক, হিতকর, অভ্যুদয়নিমিত্ত, বৃদ্ধিনিমিত্ত (শ্রাদ্ধ), অভ্যুদয়কর, প্রাপ্তিকর, বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে অভ্যুদয়ফল শ্রাদ্ধবিশেষ। (ব.শ.)। **৪. অভ্যুদয়** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দদুটি অপ্রচলিত। তবে ধর্মপ্রাণ হিন্দু ও পুরোহিতদের মধ্যে **আভ্যুদয়িক** শব্দটির যথেষ্ট প্রচলন আছে। **৫.** 'উপর দিকে গমন' বোঝাতে বা যে কোনো আস্তরণ থেকে বেরিয়ে আসা বোঝাতে **উদয়** শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। **অভি**-উদয় বললে 'উচ্চ-অবস্থানে আবির্ভাব' বোঝায়। কবি লেখেন 'পতন **অভ্যুদয়** বন্ধুর পন্থা' ... ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে, এই **অভ্যুদয়** পতনের ঠিক বিপরীত ক্রিয়াকে বোঝায়। তবে ব.শ. জানিয়ে গেছেন যে, **অভ্যুদিত** ও **অভ্যস্তমিত** পরস্পরের বিপরীত শব্দ; যদিও একদিকে তাদের মিল আছে। দুটিই **ব্রহ্মচারী**র দোষ। উভয় ক্ষেত্রে **ব্রহ্মচারী** শুয়ে থাকে, সূর্যোদয় হয়ে যায়, সূর্যাস্তও হয়ে যায়। ...

তবে **আভ্যুদয়িক** কিন্তু সামাজিক প্রথার সঙ্গে যুক্ত। যা কিছু করলে মানুষের মানসিক ও দৈহিক উন্নয়ন হয়, মানসিকভাবে সামাজিকভাবে শারীরিকভাবে উচ্চে ওঠা যায়, এককথায় **অভ্যুদয়** সম্ভব হয়, সেগুলিকে **আভ্যুদয়িক কর্ম্ম** বলে। সেই **কর্ম্ম**গুলির মধ্যে **আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ** বা **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** অন্যতম। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** শব্দে করেছি।

প্রভু (প্রতিভূ, বিভু, শম্ভু) : ১. প্র + ✓ভূ + উ (ডু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***প্রভু*** *= প্রকৃষ্টরূপে **ভবন** (উদ্ভব বা আবির্ভাব) হইয়াছে যাঁহার; অথবা, যিনি প্রকৃষ্টরূপে অস্তিত্বলাভ করিয়াছেন।* ***প্রতিভূ*** *= ভূ-এর বিপরীতে **ভূ** (অস্তিত্ববান) হয় যে।* ***বিভু*** *= বিকল্প, বিশেষ বা বিপরীত ভাবে **ভু** (অস্তিত্ববান) হয় যে।* ***শম্ভু*** *= **শম্**-রূপে (জ্ঞান, ধন বা অন্যতর শক্তির সার্বিক বিচ্ছুরণ প্রমিত যাহাতে, তদ্রূপে) **ভু** (অস্তিত্ববান) হন যিনি। /* **প্রভু** = প্রকৃষ্টভাবে ভবিত্রী (যে)। **প্রতিভূ** = ধনিক ও অধমর্ণের মধ্যে যিনি থাকেন। **বিভু** = যিনি বস্তুতত্ত্ব অবধারণ করিতে পারেন। **শম্ভু** = যিনি সুখের ভাবনা ভাবেন বা সুখ জনন করেন। (ব.শ.)। **৩. প্রভু** = সমর্থ, সদৃশ, ঈশ্বর, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, স্বামী, অধিপতি, নিয়ন্তা, ফলদাতা, অধিকারী, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, প্রজাপতি, অগ্নি, সূর্য্য, পারদ, ইষ্টদেবতা, পতি, মনিব, চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবগুরু। **প্রতিভূ** = লগ্নক, জামিন। **বিভু** = বিভবনশীল, পরিপূর্ণ, সমর্থ, নিগ্রহসমর্থ, জিতেন্দ্রিয়, নিত্য, পরমমহত্ত্বযুক্ত, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, কুবের, আকাশ, কাল, আত্মা, ঈশ্বর, অর্হৎ দেব, প্রভু, রাজা। **শম্ভু** = শিব, রুদ্রবিশেষ, বিষ্ণু, অগ্নি, ব্রহ্মা, বুদ্ধ, সিদ্ধ, শ্বেতার্ক। (ব.শ.)। **৪.** master অর্থে **প্রভু** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। **৫. প্রভু** মানে মালিক বা master,

যিনি মালিকের মতো ব্যবহার করেন। আমরা জানি, **ভৃত্যের প্রভু** হয়; যেকারণে **চাকর**-এর বিপরীত শব্দরূপে **প্রভু** শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। আসলে, যাঁর সামাজিক অস্তিত্ব প্রকৃষ্ট বা **প্র**, তিনিই **প্রভু**। তাই তাঁর পক্ষে পোষ্যদের **ভরণ**পোষণ করা সম্ভব হয়। সেকারণে কার্যত **প্রভু ভৃত্য**-এর বিপরীত শব্দই বটে। সেদিক থেকে ভাবলে, **প্রভু** শব্দটি এখনও জনসাধারণ্যে যথার্থেই প্রচলিত।

প্রতিভূ কিন্তু সেরকম নয়। সে হল এক **ভূ**-এর বিপরীতে দাঁড়ানো আর একজন **ভূ**। প্রথম **ভূ** আপনাকে টাকা দেবেন, কিন্তু সেই টাকা যে আপনি অবশ্যই তাকে ফেরত দেবেন, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তার নিশ্চয়তা দিতে পারেন কেবলমাত্র আরেকজন **ভূ**। কেননা, প্রথম **ভূ**-এর মতো তিনিও **ভূ**, তিনিও প্রথম **ভূ**-এর মতো অর্থবান। তাই তিনি **ভূ**-এর বিপরীতে দাঁড়ানো **প্রতিভূ**। একালের ভাষায় একে জামিন বা গ্যারান্টার বলে। এত কার্যকরী শব্দটি আমরা এখন আর ব্যবহার করি না, নিজের ভাষা ত্যাগ করে মোগল যুগে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম 'জামিন' বা 'জামিনদার'। এখন ব্যবহার করি 'গ্যারান্টার'। ...

তবে **বিভু** অনেকটাই আলাদা চরিত্রের। সে **ভূ** হয় বা অস্তিত্বলাভ করে প্রচলিত স্বাভাবিক পথে নয়, বিকল্প পথে, বিশেষ পথে কিংবা প্রচলিতের বিপরীত পথে; সাধারণ **ভূ**-দের মতো সাধারণ পথে সে **ভূত** হয় না, হয়নি। তার 'পরম মহত্ত্ব' এই যে, সে বস্তুতত্ত্ব জানে, বুঝতে পারে, এবং তদনুযায়ী কর্মযজ্ঞের আয়োজন করতে পারে। **প্রভু**, **প্রতিভূ**, ও **শম্ভু**র মতো এই সত্তা শুভই হয়, তবে কখনো কখনো অত্যন্ত অশুভ ও মন্দ হতে পারে। লক্ষ্মীমন্ত ধনী জ্ঞানী মানুষরাও **বিভু** হতে পারেন ঠিকই, কিন্তু মাঝেমধ্যে কুবেরসাধক বাহ্য-ধনসম্পদ-পিশাচও **বিভু** নামে চিহ্নিত হতে পারেন। **বিভু** তাই দুরকম। একালের কর্পোরেট বিশ্বে কুবেরসাধক **বিভু**র সংখ্যাই বেশি হয়ে গেছে বলে, আজকের মানুষের এত দুর্দশা।

তবে সবচেয়ে শুভ সত্তা হলেন **শম্ভু**। জ্ঞান ধন বা অন্যান্য নানা শক্তির সার্বিক বিচ্ছুরণ যেখানে **শম**-এ ঠেকে, সার্বিক বিচ্ছুরণের সেই সাময়িক সম্পূর্ণ প্রমিত রূপ নিয়ে তিনি **ভূত হন** বা অস্তিত্ববান হন। তাই তিনিই শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী। তিনি যদি আবার **শিবশম্ভু** হন, তাহলে তো আর কথাই নেই। আমরা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী রূপে পেয়ে যাই।

ভব (ভবন) : ✓ভূ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ভ বাহিত হয় যাহাতে (ভ বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য)।* **ভবন** = **ভব** *অন (on) যাহাতে।* ৩. **ভব** = বিদ্যমান, জাত, সত্তা, উদ্ভব, প্রাপ্তি, অভ্যুদয়, ক্ষেম, মঙ্গল, উৎপত্তিস্থান, শিব, শিবের অষ্টমূর্ত্তির একতমা জলমূর্তি, বীরভদ্র, রুদ্র, সংসার। **ভবন** = সত্তা, বিদ্যমানতা, ভাব, উৎপত্তিস্থান, সত্তাস্থান, আধার, গৃহ, প্রাসাদ, স্থান। (ব.শ.)। ৪. house অর্থে **ভবন** প্রচলিত, **ভব** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অনুভব**। যা হয়ে গেছে তাকে যেমন **ভব** বলে, হওয়াকেও **ভব** বলে। জলের উপরিতল ভেদ করে **ভুস্** করে মাথা তুলল যে, এবং তার পর সেই অবস্থায় থেকে গেল, সেই হল **ভব**। তার মানে, **ভব** হল সেইরকম সত্তাসমূহ যারা এরকম দৃশ্য-অদৃশ্য অজস্র প্রকারের উপরিতল ভেদ করে ভূ-কৃত হয়। কিন্তু এই **ভব** ও **ভবন**-এর সঙ্গে 'হওয়া' ও 'হওয়ন'-এর একটুখানি পার্থক্য আছে। আমরা জানি **ব্ + হ্ = ভ্**। **ভব** ও **ভবন**কে যথাক্রমে 'হওয়া' ও 'হওয়ন' বললে **ব্**-টাই উহ্য হয়ে যায়। তার মানে **ভব** হল আসলে **ব্**-হব (**ব্**-হওয়া), এবং **ভবন** হল আসলে **ব্**-হবন (**ব্**-হওয়ন)। একালে আমরা স্বভাবতই **ব্**-হওয়াকেই **হওয়া** বা **হওয়ন** বলে থাকি। সেই কারণে **হওয়া** বা **হওয়ন** কথা দুটিকে বুঝবার সময় তাদের সামনে **ব্**-এর উহ্য থাকার কথাটি মনে রাখতে হবে।

কিন্তু কী কারণে আমরা **ভবন** শব্দের অর্থ ঘরবাড়ি বুঝে থাকি, তা চট করে মাথায় আসে না। আসে, যখন চোখে পড়ে যে, ব.শ. বলছেন, **ভব** মানে **অভ্যুদয়**ও বোঝায়। তার মানে, গাছপালা মাঠঘাট জমিজিরেত গরুবাছুর ... চোখের সামনে যা কিছু বিরাজ করছে, তাদের মাঝে একদিন দেখা গেল, বিশাল বাক্সের মতো একটা ফোঁপরা দৈত্যাকার সত্তার **উদ্ভব** (উদ্-**ভব**) ঘটেছে! এর ভিতরে আবার লোকজনও তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকে! এটিই **ভবন**।

যাই হোক, **ভব** একটি অতি মহৎ ও ব্যাপক অর্থধারী শব্দ। এই বিশ্বজগতে যা কিছুই 'হয়' বা 'হয়েছে', তা সবই **ভব**; তাদের 'হওয়া'ই **ভবন**। অতি গভীর থেকে অতি সাধারণ বহু কিছুই এই **ভব** শব্দের এলাকার মধ্যে পড়ে। স্বভাবতই সামনে-পেছনে জুড়ে এই শব্দের পরিবার অজস্র সদস্য-শব্দে একবারে ভরভরাট। একদিকে যেমন **উদ্ভব, প্রভব, বিভব, পরিভব** ... রয়েছে, অপরদিকে তেমনি **ভবনাথ, ভবলোক, ভবানী, ভবিতব্য** ... এরকম অজস্র শব্দ রয়েছে। আমরা তাদের কয়েকটি শব্দের অর্থ মন্তব্যসহ উপস্থাপন করছি। ৬. ইংরেজি wave।

ভবঘুরে : ২. / যে বৃথা সংসারে ঘুরে বেড়ায়। (ব.শ.)। ৩. গৃহশূন্য লক্ষ্মীছাড়া লোক। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি এই **ভবসংসারে** ঘুরে বেড়ায়, তাকেই **ভবঘুরে** বলে। কিন্তু প্রশ্ন হল **ভবসংসার** কাকে বলে?

ভবসংসার : ৫. এই শব্দটি যে ধারণাকে বহন করে, সেটি বাংলাভাষীদের মনে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত যে, একসময় কথায় কথায় এই ধারণাটির প্রয়োগ হত; আর সেজন্যেই এর অজস্র সহোদর শব্দ ছিল। যথা — **ভবপারাবার, ভববারিনিধি, ভবসমুদ্র, ভবসাগর, ভবার্ণব, ভবসিন্ধু, ভবাব্ধি, ভবাম্বুধি, ভবলোক, ভবমণ্ডল, ভবাটবী** ... ইত্যাদি। এই সবই **ভবসংসার**কেই বোঝায়। তার স্বভাব কখনো **সাগরের** মতো, কখনো **লোকের** মতো, কখনো **মণ্ডলের** মতো, কখনো অটবীর মতো, কখনো-বা **সংসারের** মতো। তাই তার ঐরকম নামকরণ হয়েছে। আর এই শব্দগুলির ব্যাপক প্রচার ঘটেছে বাংলার গায়ক-কবিদের সৌজন্যে। **লালনে**র গানে এই শব্দগুলি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

যাই হোক, আমরা **সংসার** শব্দের গভীরে যাব **সংসার** শব্দের নিজস্ব ভুক্তিতে। এখানে শুধু এইটুকু বলার যে, বহুসদস্যকে নিয়ে যেমন মানুষের পরিবার, এবং পরিবারকে যেমন **সংসার** বলে, এই বিশ্বজগৎ তেমনি এক **সংসার**। তার রয়েছে অসীম সংখ্যক **ভব**-সদস্য, তাদের নিয়ে তার ভরভরাট-পরিবার বা **সংসার**ই বটে। তাই, এই **ভবসংসারের** একজন সদস্য হয়ে থাকতে গেলে **ভব**

হলেই চলে না, **ভব্য** হতে হয়। যাঁরা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষতিসাধন করেন, তাঁরা কোনো মহত্তম সভার **সভ্য** হলেও **ভব্য** নয়। দ্র. **সভ্য-ভব্য**।

ভবিতব্য (ভবিষ্য, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যদ্বক্তা, ভবিষ্যদ্বাণী) : ১. ✓ভূ + তব্য - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভবিতব্য** = **ভব** *সক্রিয়ভাবে তারিত হইয়া বাহিত থাকে যাহাতে; অথবা,* **ভূত** *বহন থাকে যাহাতে।* **ভবিষ্য** = **ভব**-*এর সক্রিয় ও দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ থাকে যাহাতে।* **ভবিষ্যৎ** = **ভবিষ্য**-*এর তারণ যাহাতে।* **ভবিষ্যদ্বক্তা** = *যিনি* **ভবিষ্যৎ** *বলেন।* **ভবিষ্যদ্বাণী** = **ভবিষ্যৎ** *বিষয়ে কথন থাকে যাহাতে।* **৩. ভবিতব্য** = ভবিষ্যৎ, ভাবী, ভবনীয়, অবশ্যম্ভাবিতা, নিয়তি। **ভবিষ্য** = আগামীকালবর্ত্তী, ভাবী, ভাবীকাল, ভবিষ্যৎ কাল, ভবিষ্যদ্‌বিষয়, ভবিষ্যপুরাণ। **ভবিষ্যৎ** = ভাবী, বর্ত্তিষ্যমাণ, ভবিষ্যৎ কাল, ভবিষ্যদ্‌বিষয়। **ভবিষ্যদ্বক্তা** = ভবিষ্যবিষয়বক্তা, ভবিষ্যবাদী। **ভবিষ্যদ্বাণী** = ভবিষ্যৎকথন। (ব.শ.)। **৪. ভবিষ্য** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** যাহা 'হইবে' তাহাই **ভবিতব্য** বটে, এবং যে স্থান-কাল-পাত্রে 'হইবে', তাহাই **ভবিষ্য** ও **ভবিষ্যৎ** বটে; কিন্তু তাদের 'হওয়া'র সঙ্গে **ভবিত**-এর একটুখানি পার্থক্য রয়েছে। **ভবিত** হল **ব্‌** + **হবিত** (হইত, হইবে, হওয়া)। তাদের শুধুমাত্র 'হইবে' বলে দিলে, **ব্‌** উহ্য থেকে যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক।

একটি মুরগির ডিমে তা দেওয়া হল, এই ডিমের **ভবিতব্য** মুরগির বাচ্চা 'হওয়া'। কিন্তু এখানে একটি কথা বাদ পড়ে গেল। সেই কথাটি হল, এই 'মুরগির বাচ্চা হওয়া' কথাটির ভিতরে একথা বলা নেই যে, সেই বাচ্চাটির থেকে অজস্র ডিম জন্মাবে, তাদের থেকে অজস্র বাচ্চা জন্মাবে ... এই ধারাবাহক (**ব্‌**) রূপে বাচ্চাটির 'হওয়ন' ঘটেছে। এই কারণে **ভব** বা **ভবিতব্য** প্রভৃতি শব্দের অর্থে 'হওয়া' কথাটির ব্যবহার করার সময় মনে রাখতে হবে যে, তাতে ব্‌-এর কথা উহ্য রাখা হয়েছে।

ভব্য : দ্র. **সভ্য-ভব্য (ভা)**।

ভাব (ভাবা, ভাবন, ভাবনা, ভাবনাচিন্তা) : ১. ✓ভূ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাব** = **ভব** *হইতে জাত;* ভ-*এর আধারকে বহন করে যে।* **ভাবা** = **ভাব**-*এর আধার যে।* **ভাবন** = **ভাব** *অন (on) যাহাতে।* **ভাবনা** = **ভাবন**-*এর আধার যে।* **ভাবনাচিন্তা** = **ভাবনা** *ও* **চিন্তা**। *(দ্র.* **চিন্তাভাবনা***)।* **৩. ভাব** = সত্তা, প্রকাশ, সদ্ভাব, সংঘটন, ক্রিয়া, বিষয়, অবস্থা, স্বাভাবিকী অবস্থা, অভিপ্রায়, কামক্রোধাদিকৃত চিত্তবিকার ... ইত্যাদি। **ভাবা** = চিন্তা করা, ধ্যান করা, মনে করা, বোধ করা, জানা, বিচার করা, কল্পনা করা, স্মরণ করা, উদ্বিগ্ন হওয়া, চিন্তিত হওয়া। **ভাবন** = উৎপাদক, পালক, প্রকাশক, অনুগ্রাহক, পাবন, সাধন, ভাবয়িতা, ধ্যাতা, প্রবর্ত্তক, কর্ত্তা, বিষ্ণু, শিব, উৎপাদন, প্রকাশন, চিন্তা, ধ্যান, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়। **ভাবনা** = আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ, ধ্যান, অনুভবজন্য সংস্কারভেদ, বাসনা, চিন্তা, পর্য্যালোচনা, নির্ণয়, অধিবাসন। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অনুভাব, চিন্তাভাবনা**। ব.শ. **ভাব** শব্দের মোট ৫১টি প্রতীকী অর্থ দিয়েছেন। এত বিপুল পরিমাণ পৃথক পৃথক বিষয় ও বস্তুকে **ভাব** শব্দটি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে তার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থের অসামান্য যোগ্যতায়। তারই উপর নির্ভর করে বাংলাভাষী প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত **ভাব** শব্দের সাহায্যে ৫১টি বস্তু ও বিষয়কে শনাক্ত করে নিজেদের মনোভাব লেনদেনের কাজ চালিয়ে এসেছেন। ব.শ. সেই বস্তু ও বিষয়গুলিকেই **ভাব** শব্দের প্রতীকী অর্থ রূপে চিহ্নিত করে লিখে রেখে গেছেন। তার ওপর সেই **ভাব** থেকেই আবার একদিকে যেমন **অনুভাব, অভাব, অভিভাবক, আবির্ভাব, তিরোভাব, প্রভাব, বিভাব, মনোভাব, সম্ভাবনা, স্বভাব** ... প্রভৃতি বহু শব্দের জন্ম হয়েছে, অপরদিকে তেমনি **ভাবগম্ভীর, ভাবনা, ভাবনা-চিন্তা, ভাববাচ্য, ভাবভক্তি, ভাবভঙ্গি, ভাব-ভালবাসা, ভাবসর্গ, ভাবসাব, ভাবা, ভাবান্তর, ভাবার্থ, ভাবিত, ভাবী, ভাবুক** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দের জন্ম হয়েছে। **ভাব** শব্দের সহোদরের সংখ্যা তাই গান্ধারীর সন্তানদের মতো। স্বভাবতই এটি একটি গভীর অর্থবাহী শব্দ এবং অত্যন্ত ব্যাপকার্থে প্রচলিত। সেই **ভাব** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির নিহিতার্থ বিষয়ে আমরা যেটুকু-যা উদ্ধার করতে পেরেছি, এখন সেকথাই সংক্ষেপে বলি।

ভ, ভা, ভব কী, সেকথা আগেই বলেছি। **ভা** অর্থাৎ 'ভ-এর আধার', যে কিনা **বর্দ্ধিষ্ণু**-স্বভাবসম্পন্ন-অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং সেকারণেই সগৌরবে শোভা পাচ্ছে, সেই **ভা**-কে বহন করে **ভাব**। তার মানে, **ভাব** হল একদিকে জগতের বস্তু ও বিষয়সমূহ যেসকল ক্রিয়ার সাহায্যে অস্তিত্বলাভ করে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার আধার এবং অপরদিকে তারই সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব যা মানুষের, সমাজের, জগতের চৈতন্যে বাস করে। এককথায় অস্তিত্বের **ধর্ম্ম**ই তার **ভাব**। ...

বিষয়টিকে আর একভাবেও বলা যায়। যা কিছু ভুস্‌ করে 'হয়ে যায়', অস্তিত্বলাভ করে, তাকেই **ভব** বলে, সন্দেহ নাই। সেই '**ভব** থেকে জাত যে', তাকে **ভাব** বলে। এই প্রকারের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থপ্রদান প্রক্রিয়াটি আমরা পূর্বসূরিদের থেকে নিয়েছি (যেমন **দশরথ** থেকে **দাশরথি**)। সেই সুবাদে **ভাব** শব্দের মানে হল '**ভব** শব্দ থেকে জাত'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এটি উভয় প্রকারে বাস্তবায়িত হয় — **ভব** থেকে যে জন্মায় সে যেমন **ভাব** হতে পারে, তেমনি **ভাব** থেকে যে জন্মায় সেও **ভব** হতে পারে। রামবাবু পাড়ার ছেলেপুলে লোকজনকে নানা বিষয় শেখান, শেখাতে শেখাতে একদিন তিনি 'শিক্ষক' নামে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। শেখানো 'ক্রিয়া'টি বা 'ধর্ম্ম'টি তাঁর **ভাব**, আর সেই **ভাব** থেকে জাত যে 'কর্ত্তা' বা 'ধর্ম্মী', সেটিই তার **ভব** বা 'শিক্ষক'। তবে তার পরও 'শিক্ষক' শেখাতে থাকেন, তাঁর ক্রিয়া বা **ধর্ম্ম** বা **ভাব**-এর **অভাব** ঘটে না, তখন স্বভাবতই সেই 'শিক্ষক' নামক **ভব** থেকে **ভাব** জন্মায়, শেখানো ক্রিয়া চলে। একইভাবে আবদ্ধ জলে বা জলীয় পদার্থে পোকা জন্মায়; আবার শুকনো কোনো স্থানে পোকা জন্মগ্রহণ করে সেখানে নোংরা পুঁজ ইত্যাদি জলীয় পদার্থ সৃজন করে থাকে। ময়রার রসগোল্লা রসে ডুবে থাকলে ভাল থাকে ঠিকই, তবে সেই রসগোল্লা থেকে যেমন তার রস জন্মায় না, সেই রস থেকেও রসগোল্লা জন্মায় না। কিন্তু সেরকম যদি সত্যিই ঘটত, তাহলে সেটিই বাস্তবের **ভব** ও **ভাব**-

এর সম্বন্ধটিকে হুবহু প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারত।

তা সে যাই হোক, মাতৃগর্ভে যে শিশু জন্মায়, সে যদি **ভব** হয়, তবে তাকে ঘিরে রাখে যে-রক্তস্রাবাদি, তা সবই হল **ভাব**। আমাদের মনের ভিতরে যে **ভাব** থাকে, তাকে বলে মনো**ভাব**। সেই মনোভাব-এর ভিতরেই শিশুভ্রূণের মতো ডুবে থাকে আমাদের নানারকম ধারণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, জ্ঞান ... ইত্যাদি; প্রয়োজনে সেগুলিই **ভব** রূপে বেরিয়ে আসে। তখন মনো**ভাব** থেকে জাত সেই **ভব**দের আমরা কথা, শব্দ, বাক্য, গল্প, বিষয় ... ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করি। আমরা যখন **ভাববাচ্যে** কথা বলি, তখন এই **ভব**রা **ভাবে**র ভিতর উহ্য হয়ে যায়; তখন তাদের চিনতে হলে একটু কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয়। আমরা এই **ভব-ভাব**কে ইতোপূর্বে **চিন্তা-ভাবনা** শব্দে শনাক্ত করেছি। মোটকথা এ বিশ্বজগৎ হল **ভাব** (= **ক্রিয়া-ধর্ম-মায়া**) ও **ভব** (= **কর্তা-ধর্মী-বস্তু**), এই দুই সত্তার পারস্পরিক সম্বন্ধের কোটি কোটি কোটি কোটি রূপের প্রকাশ। আমাদের পূর্বসূরিগণ এই **ভব** ও **ভাবে**র সমগ্র রূপটিকে যথাক্রমে 'ভৌতিক-সর্গ' ও '**ভাব**-সর্গ' নামে চিহ্নিত করে গেছেন। একালের বস্তুবাদীরা তাদেরই যথাক্রমে physical world ও conceptual world বলে থাকেন। আর, একালের অণুবিজ্ঞানীরা সেই **ভব-ভাব**কেই চিহ্নিত করেছেন তাঁদের wave-particle duality-তে বা wavicle-এর ধারণায়। তাঁদের কেউ কেউ আবার এক্ষেত্রে নতুন একটি ইংরেজি শব্দ বানিয়েছেন — actan। তাঁদের ধারণা, এই বিশ্বজগতের মূলে রয়েছে দুটি মাত্র সত্তা, action ও actor। তাদের two-in-one রূপটিকে বা '**দ্বৈত**-কিন্তু-**অদ্বৈত**' অর্থাৎ **দ্বৈতাদ্বৈত** রূপটিকে তাঁরা নাম দিয়েছেন actan। **ভব** ও **ভাবে**র এই **দ্বৈরাজ্য**কে বহুকাল আগেই আমাদের সাংখ্যকারগণ **পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত** সম্বন্ধ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। (দ্র. **অদ্বৈত**)। ...

তবে সবার উপর দিয়ে যান আমাদের বাংলাভাষী শিশুরা ও তাঁদের লালক মা-ঠাকুমারা। তাঁরা এই **ভব**কে বলেন **আড়ি** আর **ভাব**কে বলেন **ভাব**। এই **আড়ি** আর **ভাব**-এর **দ্বৈরাজ্যে** বা **দ্বৈতাদ্বৈত** সম্বন্ধে তাঁদের তুমুল দিনগুজরান চলে। এই **ভাব**কেই বাংলাভাষী জনসাধারণ তুলে নিয়েছেন তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষণে — **ভাব-সাবে, ভাব-ভালবাসায়**। (দ্র. **আশেপাশে**)। 'আপনার সঙ্গে উনি **ভাব** করতে চান', কিংবা 'ওদের দুজনে বেশ **ভাব** হয়েছে' — এরকম বাক্য গ্রামবাংলার মানুষ আজও অনায়াসে বলে থাকেন। এই **ভাব** পেরিয়ে তবেই **ভালবাসা** যায়।

এই **ভাব** তার অখণ্ড **স্বভাব**গুণে টইটুম্বুর থাকে। একে খণ্ডিত করা যায় না। এই **ভাব** তার জলীয় বায়বীয় **স্বভাবে**র ভিতর থেকে **ভব**কে **ভব** হয়ে উঠতে সর্বপ্রকারে সহায়তা করে। আবার হয়ে ওঠা **ভব** তার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে সেই **ভাব** সৃজন করে থাকে। (**ভাব**-এর এই জলীয়-বায়বীয় ইত্যাদি রূপের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমাদের দুইখানি প্রকাশিত নিবন্ধে — *'বাংলার মাটি, বাংলার জল'* ও *'সাম্য থেকে সামঞ্জস্যে : সুন্দরসমাজ'*। অচিরে তা গ্রন্থাকারে সংকলিত হবে।)। এই **দ্বৈতাদ্বৈত ভব-ভাবে**র কথা বিশ্ববাসীকে বলতে গিয়েছিলেন (দ্র. **অদ্বৈত**) বিবেকানন্দ। বহু আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সেই **স্বভাব** দেখে ফেলেছিলেন এবং বলতেন, 'নরেন, তোর জন্ম যে অখণ্ডের ঘরে'।

তা সে যাই হোক, **ভব** ও **ভাবের** এই সম্বন্ধ **পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত** সম্বন্ধই বটে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কথাটি সর্বপ্রকারের **ভব** ও তদ্**ভাবের** ক্ষেত্রে খাটে। অনেকেই জানেন, আমাদের মনো**ভব** ও মনো**ভাব**-এর ক্ষেত্রেও কথাটি ঠিক, তবে কিনা, আমাদের মনো**ভব** ও মনো**ভাব**-এর উপর আমাদের হাত আর কতটুকু! ও যে কার্যত সামাজিক-**ভব** ও **ভাবে**র এবং জাগতিক-**ভব** ও **ভাবে**র সমান্তরাল **নিমিত্ত**মাত্র। যে পরমাপ্রকৃতি 'অরূপরতন' রূপে জগতে সমাজে মানুষে 'আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ', তিনি যখন মানুষের মনো**ভাবে** ভর করেন, **ভব**মানুষের **ভাব** লাগে, মানুষ পরমকে পায়। তখন আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃষ্টির চরম আনন্দে (সঙ্গীতসৃষ্টি থেকে সকল সৃষ্টি পর্যন্ত যা বিধৃত থাকে) মানুষের মোক্ষলাভ ঘটে! ...

তবে কিনা, আমাদের এই **ভাবসর্গ**কে আমরা আস্ত রাখতে পারিনি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ ভারতীয় উপমহাদেশের নৌকা থেকে লাফ দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, সেই ধাক্কায় আমাদের নৌকার মুখটা গেল উল্টো দিকে ঘুরে। এতকাল আমাদের মন থাকত ঘরের দিকে মুখ করে, আত্মার দিকে মুখ করে; আর আমাদের দেহ থাকত ইংরেজের কারাগারে; আমরা মানসিকভাবে স্বাধীন এবং দৈহিকভাবে পরাধীন ছিলাম। ঐদিনের পর থেকে আমরা দৈহিকভাবে স্বাধীন এবং মানসিকভাবে পরাধীন হয়ে গেলাম। আমাদের মনে হল, আমাদের কিছুই নেই, যা আছে সবই পাশ্চাত্যের; আমাদের মনটা ইংরেজির দিকে ঘুরে গেল। আমরা ইংরেজির অনুকরণে বাংলাভাষার ব্যবহার করতে শুরু করলাম। আমাদের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষী পণ্ডিতেরা নতুন নতুন শব্দ বানালেন এবং বাংলাভাষা সেই সব শব্দে ভরে উঠতে লাগল। ভাব-এর ক্ষেত্রে তেমন শব্দ হল **ভাবপ্রবণ, ভাববাদ, ভাববাদী, ভাবাদর্শ, ভাবান্দোলন** ... ইত্যাদি। এগুলির একটিও কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দ নয়, ইংরেজির ঔরসে বাংলার গর্ভে জাত অ্যাংলো-বাঙালি খচ্চর শব্দ। এগুলির স্বভাব কীরকম?

বাংলার মাটি যেসব সুতীক্ষ্ণ-মেধাসম্পন্ন মানুষের জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের একজন সুকুমার রায়। এই মনীষী ঠাট্টা করে কিছু অদ্ভুত বাংলা শব্দ তৈরি করেছিলেন — হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি ... ইত্যাদি। উপরোক্ত পণ্ডিতেরা সত্যি সত্যিই সেরকম কিছু বকচ্ছপ ও হাঁসজারু শব্দ গোপনে তৈরি করে প্রকাশ্যেই আমাদের বাংলাভাষা-সমাজে ছেড়ে দিয়েছেন; আমরা খেয়াল করে উঠতে পারিনি। এখন যখন তাঁদের সেই বাহ্য-কীর্তিগুলি চোখে পড়ে গেছে, আমরা দেখছি, সেগুলি ঘটেছে তাঁদের ইংরেজির বদহজম থেকে। তাঁদের সেই কীর্তিগুলিই একালের বাংলাভাষীদের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। কীরকম কাঁটা হয়ে উঠেছে, শব্দগুলির দিকে একটু তাকালেই সেকথা মালুম হবে।

ভাবপ্রবণ : ৩. (বঙ্গীয় শব্দকোষ ও ছাত্রবোধ অভিধানে শব্দটি নাই।) ভাবাবেগে চালিত, আবেগযুক্ত। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। অনুভূতির আধিক্যযুক্ত, আবেগপরায়ণ, ভাবুক। (স.বা.অ.কলকাতা)। **৪.** sentimental অর্থে শব্দটি প্রচলিত। **৫. ভাব** শব্দের যে অর্থ আমরা

উপরে দেখলাম, তাতে **ভাব**-এর কোনো প্রকার **প্রবণতা** হতে পারে না, হয় না। তাই বাংলাভাষার নিজস্ব নিয়মে এরকম শব্দ প্রসূত হয় না। বিশ্বাস না হলে, কোনো সেকেলে বাংলাভাষী কিংবা গ্রামবাংলার কোনো মানুষকে বলুন — 'ছেলেটি খুবই ভাবপ্রবণ' — দেখবেন, তিনি এই বাক্যের মানে বুঝতে পারছেন না। বড়জোর আন্দাজ করবেন যে, ছেলেটির 'ভাব লাগে'। প্রকৃতপক্ষে **ভাবপ্রবণ** শব্দটি ইংরেজি-শিক্ষিত বাংলাভাষীদের কেউ ইংরেজির sentimental শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বানিয়েছেন; বানিয়েছেন 'বকচ্ছপ' শব্দ তৈরি করার রীতি অনুসরণ করে। ...

তাই বলে বাংলার সংস্কৃতিতে কি এমন কোনো শব্দ নেই, যা ইংরেজির sentimental ধারণাটিকে ধারণ করে? আছে। তবে এর চেয়ে উঁচু মানের শব্দ আছে। কেননা, মনকে আমাদের পূর্বসূরিগণ বহুরকম ভাবে বিশ্লেষণ করে নানাভাবে উপলব্ধি করে সেগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পৃথক পৃথক নামকরণ করেছিলেন। ইংরেজ মনকে সেরকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারেনি (দ্র. **চিত্ত, বুদ্ধি**)। যে কারণে ইংরেজি অভিধানে mind ও mental বিষয়ে শব্দসংখ্যা বাংলার তুলনায় অনেক কম। বিপরীতে আমাদের অভিধানগুলিতে 'মন' ও 'মতি' শব্দের সহোদরদের দিকে তাকালেই জানা যাবে, আমাদের 'মন'-বিষয়ক বোধ কোন স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল। ওদের যেখানে রয়েছে sentimental, সেখানে আমাদের ছিল 'আলুলায়িত', 'কোমলমতি', 'দয়ার্দ্র', 'ভাবস্নিগ্ধ', 'মরমিয়া', 'রসিক', 'সুকুমারমতি', 'স্নিগ্ধমতি', 'স্নেহময়' ... প্রভৃতি বেশ কিছু শব্দ। এর কোনোটিই sentimental শব্দের মতো মোটা শব্দ নয়। এমতাবস্থায় এদের কাউকে, ধরা যাক 'কোমলমতি' বা 'ভাবস্নিগ্ধ'কে sentimental শব্দের প্রতিশব্দ করে ফেলা যেত। সেক্ষেত্রে বাংলা শব্দটি ইংরেজি শব্দের চেয়ে ব্যাপকার্থক হয়ে যেত, যেরকম **পদার্থবিদ্যা** শব্দের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিংবা চেষ্টা করলে বাংলার নিজস্ব নিয়মে নতুন শব্দ বানিয়ে ফেলাও যেত। তা না করে বাংলার **ভাব** ও **প্রবণ** শব্দদুটির অর্থকে অতি সংকুচিত করে ইংরেজির নিয়মে দুমড়ে-মুচড়ে বালখিল্য বা লিলিপুটে পরিণত করে তাদের sentimental-এর সমান করে ফেলার কী মানে হয়? **ভাবপ্রবণ**-এর মতো না-ঘরকা না-ঘাটকা শব্দ তৈরি করে বাংলাভাষাকে কি দূষিত করা হয়নি?

ভাববাদ (ভাববাদী) : ৩. (এ শব্দটিও কলকাতার অভিধানটি ছাড়া আর কোনো অভিধানে নাই।) **ভাববাদ** = ভাবই জগতের মূল চালিকা শক্তি — এই দার্শনিক মত, idealism। **ভাববাদী** = যে ভাববাদে বিশ্বাস করে। (স.বা.অ.কলকাতা)। ৪. idealism ও idealist শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে শব্দ দুটির প্রচলন করা হয়েছে সম্প্রতিকালে। ৫. প্রথমে শব্দের দিক থেকে দেখা যাক। বোঝাই যায় যে, এটিও একটি খচ্চর শব্দ। এতে **ভাব**কে অত্যন্ত সংকুচিত করে idea-র সমান করে নেওয়া হয়েছে এবং তারপর **মতবাদ**কে **বাদ**-এ পরিণত করে তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে **ভাব**-এর ঘরে চুরি হল না, **ভাব**-এর ঘরটাই ভেঙে দিয়ে তাকে সর্বহারা প্রলেতারিয়েত করে দিয়ে তার মুখে **বাদ** বা স্লোগান ধরিয়ে দেওয়া হল। **ভাববাদ** যদি সঠিক শব্দ হয়, তবে 'ক্রিয়াবাদ', 'ধর্ম্মবাদ', 'মায়াবাদ' শব্দও তৈরি করা যেতে পারত। তাছাড়া 'প্রকৃতিবাদ' বলে কি কোনো শব্দ হতে পারে? হয় যদি, তাহলে 'পুরুষবাদ' হবে না কেন? এসব হয় না বলেই বাংলায় ওরকম শব্দের প্রচলন নাই।

এবার যদি তত্ত্বের দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে বলতেই হয়, পাশ্চাত্য idealism ও materialism নামে যে দুটি 'দার্শনিক তত্ত্ব' অর্জন করেছে, তা বাস্তবে এক অলীক তত্ত্ব। কেননা, দেহকে যদি material বলি, মনকে বা মনোভাবকে ideal বলতে হয়। মনকে বাদ দিয়ে দেহ, দেহকে বাদ দিয়ে মন; অর্থাৎ **ভব**কে বাদ দিয়ে **ভাব** কিংবা **ভাব**কে বাদ দিয়ে **ভব** — বাস্তবে এসব হয় না। অজস্র তত্ত্ব পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মনীষীগণ দুইয়ের **অদ্বৈত** তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। পাশ্চাত্য সেখানে পৌঁছতেই পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে 'প্রকৃতির সঙ্গে সত্য ব্যবহার করে' তাঁরা গায়ে-গতরে হয়ে যান এবং স্বভাবতই গায়ের জোরে অন্য সমাজগোষ্ঠী-গুলিকে অধীন করেন; অধীনদের ধারণা হয়, তাহলে বুঝি ওদের idealism, materialism প্রভৃতি তত্ত্বগুলিও অমৃতই হবে। কিন্তু সেই অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে বিশ্ববাসী ক্রমশ বুঝতে পারে, ওগুলি বিষই বটে। কিন্তু ততদিনে সমগ্র বিশ্বই বিষগ্রস্ত হয়ে যায়।

আবারও প্রশ্ন, তাহলে কি ইংরেজ যাকে idealism রূপে অর্জন করেছে, আমাদের পূর্বসূরিগণ কি তাকে অর্জন করতে পারেননি? করে থাকলে, সেরকম বাংলা শব্দ কোথায়? আছে, অবশ্যই আছে। আমাদের পূর্বসূরিগণ তো ওদের তথাকথিত idealism পেরিয়ে আরও বহুদূর পৌঁছতে পেরেছিলেন, তাঁদের হাতে তো সে তত্ত্ব থাকবেই। তাঁরা **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** শব্দ দুটি তৈরি করেছিলেন যাদের বোঝাতে, তাদেরকেই আংশিকভাবে ধারণ করে ইংরেজের যথাক্রমে ideal ও material শব্দ দুটি। তার মানে, ইংরেজ idealism বলে যে খণ্ডবোধটির কথা বলতে চায়, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা **পুরুষার্থ** শব্দের সাহায্যে তার সামগ্রিক রূপটিকে প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাতে কী? আমাদের নিজেদের অ্যাকাডেমি তো ইতোমধ্যেই **পুরুষার্থ, পুরুষকার** প্রভৃতি শব্দকে ভুলেই গেছে। তাঁরা idealism শব্দের একটি প্রতিশব্দ তৈরি করলেন — **ভাববাদ**, এবং idealist শব্দের মানে করলেন **ভাববাদী**। গ্রামবাংলার কোনো কোনো বয়স্ক মানুষ এখনও **পুরুষার্থ** বা **পুরুষকার** শব্দটি বুঝতে পারেন, ব্যবহারও করে থাকেন; কিন্তু কোনো বাংলাভাষীকে আপনি এই **ভাববাদ** ও **ভাববাদী** শব্দদুটির অর্থ বোঝাতেই পারবেন না। কারণ এ যে আসলে বাংলার পোষাক গায়ে দিয়ে থাকা ইংরেজির বাচ্চা। খাঁটি বাংলাভাষী এই জারজ খচ্চর শব্দকে আপন সন্তান বলে স্বীকৃতি দেননি আজও, আর সেজন্যেই তাঁরা আজও শব্দদুটিকে আপন করে নেননি। একমাত্র ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ছাড়া কোনো সাধারণ বাংলাভাষী কিংবা গ্রামবাংলার কোনো বাংলাভাষী শব্দদুটি কখনোই ব্যবহার করেন না।

ভাবাদর্শ : ৩. (না, কোনো অভিধান বা শব্দকোষে এই শব্দকে পাওয়া গেল না।)। ৪. ideology শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে **ভাবাদর্শ** শব্দটির প্রচলন ঘটানো হয়েছে। যথা communist ideology = সাম্যবাদী **ভাবাদর্শ**। ৫. এখানেও **ভাব** শব্দটিকে সংকুচিত করে নিয়ে জুড়ে নেওয়া হয়েছে **আদর্শ** শব্দের সঙ্গে, যে 'আদর্শ' শব্দটি নিজেই ideology শব্দের থেকেও বেশি অর্থ ধারণ

করত। দ্র. **আদর্শ**। তাহলে দাঁড়াল এই যে, ideology নামক ঠোঙার ভিতর যে বস্তু ছিল, তাকে ঢেলে ফেলা হল **আদর্শ**-এর খালি বস্তায়, তার পরেও বস্তাটি স্বভাবতই অনেকটাই খালি ছিল, এবার তার ভিতরে **ভাব**-এর খালি বস্তা ঢুকিয়ে **আদর্শ**-এর বস্তাটিকে জুবুথুবু করে বেঁধে ফেলা হল এবং তার গায়ে লিখে দেওয়া হল **ভাবাদর্শ** = ideology; অর্থাৎ এই বস্তার ভিতরে ideology-কে পাওয়া যাবে। তার মানে, এক্ষেত্রেও প্রায় গায়ের জোরে বাংলাভাষার গর্ভে ইংরেজির বীজ বপন করা হয়ে গেল। যেকারণে সাধারণ বাংলাভাষী **ভাবাদর্শ** শব্দটি কখনোই ব্যবহার করেন না।

ভাবান্দোলন (ভাব-আন্দোলন) : ৩. (না, কোনো অভিধানেই শব্দটিকে পাওয়া গেল না।)। **৪.** cultural movement শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে **ভাবান্দোলন** শব্দটির প্রচলন ঘটানো হয়েছে। **৫.** ইংরেজিতে movement কেবলমাত্র রাজনৈতিক হয় না, সাংস্কৃতিকও হয়। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে কমিউনিস্টরা cultural movement থেকে cultural revolution পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তারই বঙ্গীকরণ করা হয়েছে **ভাব-আন্দোলন** বা **ভাবান্দোলন** শব্দে; আর সেকাজ করেছেন কোনো না কোনো ইংরেজি-শিক্ষিত বাংলাভাষী, যিনি ভাবেন ইংরেজিতে কিন্তু মনোভাব ব্যক্ত করেন বাংলাভাষায়। আজকাল বাংলার ও বাংলাভাষার ইতিহাস পড়ানোর সময় এই **ভাব-আন্দোলন** কথাটি আসে। কিন্তু পড়ানোর সময় ইংরেজি-বুদ্ধির বাংলা-শিক্ষকেরা **ভাব-আন্দোলনের** যে সকল বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেন, তার থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা ইংরেজদের cultural movement-এর কথা বলছেন। কেননা, তাঁরা যদি বাংলাভাষার **ভাব** ও **আন্দোলনের** কথা বলেন, তাহলে তো তার ভিতরে **ক্রিয়ার** কথা, **ধর্ম্মের** কথা, **মহামায়ার** কথা থাকবে! এবং সে ক্রিয়ার মধ্যে **পুরুষ-প্রকৃতির** পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সম্বন্ধের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক **ক্রিয়ায়** লিপ্ত হওয়ার কথা থাকবে; সে **ধর্ম্মের** ভিতরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা religion যে থাকবে না, সে তো বলাই বাহুল্য, থাকবে **ধর্ম্মকর্ম্মের** কথা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক **ধর্ম্মের** কথা, যা ব্যক্তিকে ও সমাজকে ধরে রাখে, সেই **ভাব**-এর কথা; থাকবে সেই **মহামায়ার** কথা যাকে আমাদের পূর্বসূরিরা বলতেন 'বস্তুশক্তি বা **মায়া**', বলতেন 'বস্তুকার্য্য বা জগৎ', বলতেন '**মায়াখ্যা-অবিদ্যা**'। বাংলার **ভাব-আন্দোলনে** এসব ছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে লালন ভবা-পাগলা ... পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব বাংলাভাষী মনীষী এসব কমবেশি জানতেন, বুঝতেন। কিন্তু একালের অ্যাকাডেমিতে ও অ্যাকাডেমি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা **ভাব-আন্দোলন** নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের মাথায় এসব থাকে না; তাঁদের মাথায় থাকে ইংরেজির cultural movement, মুখে থাকে বাংলার **ভাবান্দোলন**। ফলে, আমরা বাংলাভাষীরা যে কী মুশকিলে পড়েছি, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। ঘরের ভিতরে পর যদি ঘরের লোকের পোষাক পরে ঘোরাঘুরি করতে থাকে, জ্ঞানের আলো আবছা হলেই বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সতীত্বহানির সম্ভাবনা থাকে। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে আমরা বাংলাভাষীরা সেই বিপদ নিয়ে ঘর করছি।

ভাব-সাব, ভাব-ভালবাসা : ৩. (না, এ শব্দ দুটিও কোনো অভিধানে নেই।)। **৪.** সাধারণ বাংলাভাষীর মুখে শব্দ দুটি খুবই প্রচলিত এবং যথার্থে প্রচলিত। **৫.** পরমাপ্রকৃতি বাংলাভাষীর মুখ দিয়ে যে কী অপূর্ব কৌশলে এই শব্দজোড়টি বানিয়েছেন, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। **ভাব** যদি হয় এক বাটি রস, যার ভিতরে **ভব**রূপী রসগোল্লা হয়ে মানুষটা ডুবে রয়েছে, সেই **ভাব** সক্রিয় হলে প্রসারিত হয়, পার্শ্ববর্তী সত্তার সমান করে নিজেকে তার সাথে মেলায় (দ্র. **উন্দ্, সুন্দর, ওল, ইঁদুর**)। **ভাব**-এর এই প্রসারিত হওয়াকে বলে **ভাব** করা, অন্যের সঙ্গে আলাপ করে বন্ধুত্ব করা। আর, **সাব** করা হল একেবারে উল্টো। এটি সু ক্রিয়া থেকে এসেছে, যার থেকে **সাব (সাবিত্রী)** প্রসূত হয়েছে। এই **সাব** শব্দের অর্থ হল, পরিপূরক বা বিপরীত দিকের **ভব**-এর **ভাব**কে প্রসারিত হয়ে কাছে আসার জন্য আকর্ষণ করা। অর্থাৎ, **ভাব-সাব** কথাটির মানে হল নিজের **ভাব**-এর (= ক্রিয়া-ধর্ম্ম-মায়ার) জলীয় রূপকে প্রসারিত করে অন্যের দিকে এগোনো এবং অন্যের **ভাব**-এর (= ক্রিয়া-ধর্ম্ম-মায়ার) জলীয় রূপকে প্রসারিত হয়ে কাছে আসার জন্য আকর্ষণ করা। সেভাবে **ভাব-সাব** হতে পারলে তারপরই শুরু হয় **ভালবাসার** পালা। দ্র. **ভালবাসা**।

ভাম (ভামা, ভামিনী, ভামী, বুড়াভাম) : ১. ✓ভাম্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভাম** = *ভা (শোভা) সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, যার তাপের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু আলোর প্রকাশ ঘটে না।* ***ভামা*** *=* ***ভাম****-এর আধার যে।* ***ভামিনী*** *=* ***ভাম*** *গতিশীলভাবে অনকৃত হইয়া সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে।* ***ভামী*** *=* ***ভাম****-এর গতিশীল আধার যে।* ***বুড়াভাম*** *= যে* ***ভাম*** *বৃদ্ধ হইয়াছে।* **৩. ভাম** = ক্রোধ, দীপ্তি, সূর্য্য, ভগিনীপতি। **ভামা** = কোপনা নারী, সত্যভামা। **ভামিনী** = কোপনা স্ত্রী, কামিনী, প্রমদা। **ভামী** = ভামবান, কোপযুক্ত। (ব.শ.)। **বুড়া-ভাম** = **ভাম** এক প্রকার লোমশ বনবিড়াল, গায়ের রং কালোই হয়। দিনের বেলায় একে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। পাকা কলা এর প্রিয় খাদ্য। গেরস্থবাড়িতে এত সংগোপনে ঢোকে যে টের পাওয়া যায় না। লোকে বলে, এ নাকি সদ্যোজাত মানবশিশুকে কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই **ভাম** বৃদ্ধ হলে তাকে **বুড়া-ভাম** বলাই যায়। কিন্তু সেভাবে **বুড়া-ভাম** শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। সাধারণত গ্রামবাংলার মেয়েরা 'বয়স্ক কিন্তু ধান্দাবাজ লোক'কে **বুড়া-ভাম** বলে মস্করা কিংবা গালাগালি করেন। **৪.** কেবলমাত্র **ভাম** জন্তু রূপে শব্দটি গ্রামবাংলায় প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** কোনো কোনো খাদ্যরসিক তেমন খাদ্য খুবই পছন্দ করেন, যার ঝাঁজ প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্বাদগন্ধ খুব একটা প্রকাশিত হয় না। এমন নারীও আছেন, যাঁর মুখঝামটার তোড়ে মানুষ তো কোন ছার, সাপখোপ দত্যিদানো পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচে। তেমন নারীকে, তেমন বনবিড়ালকে **ভাম, ভামিনী** বলে। এই **ভামিনী**ই যে শ্রেষ্ঠ কামিনী হতে পারেন, ভারত সে তত্ত্ব অর্জন ক'রে লিখেছে '*ভামিনীবিলাস*', আর ইউরোপ সে তত্ত্ব অর্জন ক'রে লিখেছে '*The Taming of the Shrew*'। সত্য**ভামা** তো এমনি এমনি কৃষ্ণপ্রিয়া হননি! তাছাড়া ক্রোধ জিনিসটাই তো **ভাম**। প্লাস্টিকের বস্তায় জল ভরে তাকে সংকুচিত করে কমাতে চাইলেই

সে-জল প্লাস্টিক ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে। ক্রোধও সেরকম ব্যাপার। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাকে সংকুচিত করে ছোট করার চেষ্টা করলেই তা ক্রোধ হয়ে বেরিয়ে আসে। **অভিমান** শব্দেও ব্যাপারটি আমরা দেখেছি। তবে 'ভগিনীপতি'কে কেন যে **ভাম** বলে, সেটি ভেবে দেখার বিষয়। **ভাম**টা প্রিয়তমা বোনকে নিয়ে পালায় বলে? কে জানে!

ভুবন (ভুবনকোশ, ভুবনত্রয়, ভুবনপাবনী) : ১. ✓ভূ + অন (ক্যন) - অধিকরণবাচ্যে। **২. ভুবন** = **ভূ** *(নবরূপী* **ভ**-*এর আধার) অন থাকে যাহাতে।* / **ভুবন** = যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। (ব.শ.)। **৩. ভুবন** = উৎপত্তিস্থান, লোক, পৃথিবী, সলিল, জন, গগন, দেশ, আশ্রম, স্থান, ভবন, অন্তঃপুর, দেবালয়, পল্লী, ভূমি, সঙ্গী। **ভুবনকোশ** = ভূমণ্ডলকমলের কোশরূপ সপ্তদ্বীপ। **ভুবনত্রয়** = ত্রৈলোক্য। **ভুবনপাবনী** = গঙ্গা। (ব.শ.)। **৪.** অ্যাকাডেমিতে world অর্থে **ভুবন** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত; কিন্তু সাধারণ বাংলাভাষীদের মধ্যে **ভুবন** শব্দটি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আজকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বলবেন, মানুষের দুনিয়া হল একটাই — The Great Good Earth। এর বাইরে আর কোনো দুনিয়ার কথা তাঁরা স্বীকার করবেন না। খুব চেঁচামেচি করলে বড়জোর মনোলোক বলে আর এক **ভুবনের** কথা মেনে নিতে পারেন। কিন্তু আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে তাঁদের ঐ Good Earth কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? তাতে কয়টি মহাদেশ ছিল? কয়টি সমুদ্র ছিল? ... না, পাশ্চাত্য ঐ সময় এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানত না। তাঁদের এসব বিষয়ের জ্ঞানের সংবাদ পাওয়া যায় বাইবেলের পর থেকে। প্রাচ্য কিন্তু জানত। প্রাচ্যের প্রথম ধারণা হয় যে, **ভুবন** আসলে তিনটি মনোলোক মাত্র — **স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল** (দ্র. **লোক**)। সাদৃশ্যে যা **অন্তরীক্ষ**, দৃশ্য পার্থিব জগৎ, ও মাটির তলার পাতালকে বোঝাত। পরে, তাঁরা দেখেন, জ্ঞানের দুনিয়াটাই সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, সপ্ত**পর্ব্বত**-এ বিভাজিত হয়ে রয়েছে। তাঁরা তার নাম দিয়ে দেন **ভুবনকোশ**। সাদৃশ্যে সেরকম সপ্তভুবন ঠিকঠাক মেলে না। না মিলুক, মনোলোকে যখন **ভুবনকোশ**কে পাওয়া গেছে, বাস্তবে কোথাও না কোথাও তা থাকবে, এ বিশ্বাস তাঁরা ত্যাগ করেননি। এরপর তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এই ত্রিলোক আসলে চতুর্দশ **ভুবন** রূপে বিধৃত হয়ে রয়েছে; যদিও বাস্তবে সেরকম 'দৃশ্য চৌদ্দ **ভুবন**' পাওয়া গেল না। কিন্তু তাতেও তাঁরা দমলেন না। কেন দমবেন? মনোলোকে তো তাদের স্পষ্টরূপে পাওয়া যাচ্ছে! জ্ঞানীদের দুনিয়া (ব্রহ্মলোক), দানীদের দুনিয়া (দেবলোক), গামীদের দুনিয়া (গোলোক) ... প্রভৃতি তো চোখ বুজলেই দেখা যাচ্ছে। অতএব বাংলায় **ভুবন** নানা রূপে থেকে গেল; ভুগোলের **ভুবন** তার সাথে মিলুক আর না মিলুক।

ভূ : ১. ✓ভূ + ক্বিপ্ (০) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *নবরূপে উত্তীর্ণ* **ভ**-*এর আধার যে।* / সর্ব্বত্র বিদ্যমান (যে); যে স্থানে উৎপত্তি হয় ('উৎপত্তিস্থান')। (ব.শ.)। **৩.** উৎপন্ন, জাত, ধরা, ভূমি, ভূমিখণ্ড, বেশ্মভূ, পঞ্চভূতের একতম, নববিধ দ্রব্যের একতম, ভূমিসম্পত্তি, রৈখিকক্ষেত্র, পদ, বস্তু, মহাব্যাহৃতির একতম, এক (১) সংখ্যা, যজ্ঞাগ্নি, ভবন, **উৎপত্তি, প্রকাশ**। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভ** বর্ণের অর্থ। **বহুরূপী শীর্ষস্থানীয় দ্বৈরাজ্যবাহী** শাসকবোধযুক্ত **ভ** নবরূপে উত্তীর্ণ **হলে ভূ** হয়। সেই **ভূ**-এর আধার যে, তাকে বলে **ভূ**। অতএব **ভূ-করণ** বা **ভূ**-হওয়ন কথাটির মানে দাঁড়ায় এক **বর্দ্ধন**শীল সমৃদ্ধ সত্তার অস্তিত্বলাভ করা। একটি গাছ **উদ্-ভূত** হল মানে — এর পর তার থেকে অজস্র ফল ফলবে, সেগুলির থেকে অজস্র গাছ পুনরায় **উদ্ভূত** হবে, তাদের থেকে আরও অজস্র গাছের উদ্ভব ঘটবে এবং এভাবেই তার ক্রম**বর্দ্ধ**মান বিকাশ চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অস্তিত্বলাভকেই **ভূ** বলে। দ্র. **ভব**।

এই **ভূ** অন্য শব্দের আগে পেছনে জুড়ে অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে। যথা — **অগ্নিভূ**, গিরি**ভূ**, চিত্ত**ভূ**, মনোভূ, স্বয়ংভূ ... ইত্যাদি, এবং **ভূ**কম্প, **ভূ**গর্ভ, **ভূ**গোল, **ভূ**চর, **ভূ**তল, ভূমণ্ডল, **ভূ**লোক ... ইত্যাদি। প্রথম ক্ষেত্রে **ভূ**-গুলি অগ্নি থেকে **ভূত** বা জাত, গিরিজাত, চিত্তজাত, মনোজাত, এমনকি স্বয়ং বা নিজে থেকে **ভূত** বা জাত সত্তাদের বোঝায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **ভূ** সাধারণভাবে একমাত্র এই 'পৃথিবী'কেই বোঝায়।

ভূত : ১. ✓ভূ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভূ** *তারিত যাহাতে (দ্র.* **ভূ***); অথবা, যাহা* **ভবিত** *বা* **ভূত** *হইয়াছে।* / ভূতি যুক্ত (যে)। (ব.শ.)। **৩.** সংঘটিত, আপতিত, জাত, বৃত্ত, অতীত, সত্য, যুক্ত, সম, চির, প্রাপ্ত, যোগীন্দ্র, কুমার, কৃষ্ণপক্ষ, শিব, পিশাচ-ভেদ, রুদ্রানুচর বালগ্রহ, প্রাণী, জন্তু, জাতদ্রব্য, দেবর্ষিমনুষ্যাদি, অবতারপুরুষ, স্থাবরজঙ্গমাদি, পৃথিব্যাদি পঞ্চ, পাঁচ (৫) এই সংখ্যা, ন্যায়, বস্তুতত্ত্ব, অতীতকাল, তত্ত্বানুসন্ধান, কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি, হেয় অর্থ। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভব, ভূ, অভিভূত**। ভূত শব্দের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন **অধিভূত, অনুভূত, অভিভূত, আবির্ভূত, উদ্ভূত, তিরোভূত, দ্রবীভূত, প্রভূত, বিভূত, বিভূতি, সর্ব্বভূত, সম্ভূত** ... প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে তেমনি **ভূতকান্ত, ভূতগ্রস্ত, ভূতচালা, ভূতঝাড়া, ভূততন্মাত্র, ভূতধরা, ভূতনাথ, ভূতপূর্ব্ব, ভূতভাবন, ভূতযজ্ঞ, ভূতশুদ্ধি, ভূতসর্গ, ভূতসাধনী** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দ সৃজিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি শব্দের অর্থ মন্তব্যসহ এখানে দেব। তবে তার আগে আমাদের **ভূতসর্গ**টিতে কোন কোন **ভূত** কী কী করে না-করে, সে বিষয়ে একটু খোঁজখবর করে নেওয়া যাক।

ভবিত শব্দটিকে আমরা পাই **ভবিতব্য** শব্দতে। **ভূতব্য** ও **ভবিতব্য** শব্দে কোনো পার্থক্য নেই। যা কিছু বর্তমানের দরজা টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে সে হয় আবির্**ভূত**, আর যা কিছু সেই দরজা টপকে বাইরে বেরিয়ে যায়, সে হয় তিরো**ভূত**; এবং উভয় ক্ষেত্রেই তারা **ভূত** পদবাচ্য। যা কিছু 'সংঘটিত', 'আপতিত' বা 'জাত' হয়, তা সবই 'ভুস্' (ভুঃ) করে 'উদ্ভূত' বা 'আবির্ভূত' 'হয়ে গেল' বলেই তারা **ভূত**; কিংবা 'ভুস্' করে 'উবে গেল' বলেই তারা **ভূত**। তার আগে পর্যন্ত তারা **ভূ ভূ** করছিল, হবো হবো কিংবা যাবো যাবো করছিল, কিন্তু হয়নি বা যায়নি, যখন 'হয়ে গেল', তখনই **ভূত**; যখন 'চলে গেল' তখনই **ভূত**। তার মানে, এই বিশ্বজগতের সব সত্তাই 'হয়েছে' বলেই তারা প্রত্যেকেই **ভূত**।

জগতের সব সত্তাকে তাই সর্ব্বভূত বলে। আমাদের প্রাচীন পুরুষগণ অবশ্য এই **ভূত**দের মূল খুঁজতে গিয়ে পান **পঞ্চভূত**কে — ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমকে। তার থেকেই নাকি সর্বভূতের সৃষ্টি। তবে এসবই হল প্রথম শ্রেণীর **ভূত**। দ্বিতীয় শ্রেণীর **ভূত**কে আমরা পাই মানুষের সমাজে, সনাতন **ভূত**রূপে। এদের কথায় আমরা পরে আসছি। তৃতীয় শ্রেণীর **ভূত**কেও পাওয়া যায় মানবসমাজেই, তারা হল অতীতের বিষয় ও বোধ, যারা অতীত থেকে ফিরে এসে বর্তমানের মানুষের ঘাড়ে চাপে। এরাই সবচেয়ে ভয়ানক **ভূত**। চতুর্থ শ্রেণীর **ভূত** হল এমন **ভূত** যাদের বিষয়ে মানুষ সবচেয়ে কম জানে। আর সবশেষে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর **ভূত**। এরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর **ভূতের** জারজ সন্তান। এই **ভূত**দের নিয়ে লোকে **ভূতের** গল্প লেখে।

সনাতন **ভূতের** জন্ম আদিকালে। এদের নেতা ছিলেন স্বয়ং **শিব** যাঁকে **ভূতকান্ত ভূতনাথ ভূতপতি ভূতেশ্বর** ... ইত্যাদি নামে আজও ডাকা হয়। বৈদিক যুগের পূর্বকালে যে মানবসমাজ ছিল, তার পরিচালক ছিলেন **শিব**। অজানা কাল থেকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে বিকশিত এই সমাজকে বলা হত সনাতন সমাজ। **দক্ষযজ্ঞের** পর **দক্ষের** প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে কালের বদল ঘটে। যারা তখনও নতুন সমাজপরিচালক **দক্ষ**দের বিধিবিধান মানছে না অর্থাৎ বৈদিক রীতিনীতি মানছে না, পূর্বতন সনাতন সমাজের রীতিনীতি তখনও মেনে চলছে বা চলার চেষ্টা করে চলেছে, তারা সবাই **ভূত** পদবাচ্য হয়ে যায়। স্বভাবতই তাদের পরিচালকও হয়ে যান **ভূতনাথ, ভূতপতি, ভূতকান্ত, ভূতেশ্বর** ... ইত্যাদি। সেই **ভূতেদের** সমস্ত কাজকর্ম আচার আচরণকেই তখন **দক্ষ**দের বৈদিক সমাজ নিন্দা করে চলেছে। কিন্তু তাই বলে তাদের পুরোপুরি ফেলে দিতে পারেনি। কারণ সনাতন সমাজের **মহান** অর্জনসমূহের উপর বসেই তো বৈদিক সমাজকে তাদের নবযুগের সূচনা করতে হয়েছিল। ফলে, **ভূতনাথের** সাথে সাথে তাঁর সমর্থক **ভূত**দেরকেও কমবেশি মেনে নিতে হয়েছিল। ফলত এই **ভূত** ও তার উত্তরাধিকার ভারতসমাজে থেকে যায়। আমাদের ভাষার উত্তরাধিকারে **ভূত** ও তৎসংশ্লিষ্ট যত শব্দ আছে, তা যখনই সামাজিক **ভূত**কে বোঝায়, সে **ভূত** অবশ্যই এই সনাতনপন্থী **ভূত**। এঁরা আজও নমস্য। এমনকি আজও এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সনাতন **ধর্ম্মই** মনেপ্রাণে অনুসরণ করেন। **দক্ষ**সমাজ আজও তাঁদের **ভূত** ব'লে (গেঁয়ো **ভূত** ... ইত্যাদি) নিন্দামন্দ করে থাকে। তাঁদের আচার আচরণ সবই **দক্ষ**সমাজের চোখে **ভূতের** কীর্তি। এই **ভূতের** প্রতি বৈদিক সভ্যতার 'বাঁ হাতে পূজা দেওয়া'র রীতি ক্রমশ প্রচলিত হয়ে যায়। এমনকি পরবর্তীকালে যাঁরা বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধে নতুন যুগের (বৌদ্ধ যুগের) ডাক দেন, তাঁদের সূচনাকারীরা উদ্‌ভূত হচ্ছে দেখে **দক্ষ**সমাজ ভয় পেয়ে যায় — আরে, এতো সনাতন যুগের **ভূত**, যে কিনা ভবিষ্যতের মাথায় ভর করেছে! সেই **ভূতের** মুখেই তো রাম নাম শোনা যাচ্ছে! (ভবিষ্যতের ঘাড়ে অতীতের এরকম **ভূত**কে মার্কসসাহেবও চাপতে দেখেছিলেন এবং তাঁর 'কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার'-এর প্রথম লাইনেই লিখেছিলেন, 'ইউরোপ **ভূত** দেখছে — কমিউনিজমের **ভূত**।') **দক্ষ**সমাজ ঐ আদিবৌদ্ধদেরও **ভূত** নামে চিহ্নিত করে। তাদেরকেও বাঁ-হাতে পূজা দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হয় — **ভূতযজ্ঞ, ভূতচতুর্দশী** ... ইত্যাদির প্রচলন হয়ে যায়। মোটকথা 'বাঁ হাতে **ভূত**পূজা'র বহু ধ্বংসাবশেষ ভারতসমাজে আজও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আছে বলেই ধর্মপ্রাণ মানুষেরা আজও ঐ **ভূত**-চতুর্দশী, **ভূত**পূর্ণিমা ... ইত্যাদি মান্য করে চলেন। আছে বলেই কলকাতার বিজয়গড়ে আজও 'বারোভূতের মন্দির' আছে, সেখানে আজও 'বারোভূতের পূজা' হয়, 'বারোভূতের মেলা' হয়। মোটকথা, ভারতীয় উপমহাদেশে **ভূত**-সংক্রান্ত যা কিছু সামাজিক উত্তরাধিকার ধ্বংসাবশেষ রূপে আজও বলবৎ আছে, তা সবই এই সনাতন **ভূত**-এর মহামূল্য উত্তরাধিকার।

তৃতীয় জাতের **ভূত** হল আধুনিক ভয়ানক **ভূত**। এ হল বিগত বা অতীত বিষয় বা বোধ অর্থাৎ **ভূতপূর্ব্ব** বোধ, যা অতীতকাল থেকে ফিরে এসে একালের মানুষের মাথায় ভর করে। এই **ভূত** মানুষ ও তার সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই **ভূত**কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'কর্তার ভূত'-এর কথা; সুকুমার রায় লিখেছেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর গল্প, সত্যজিৎ রায় তাকেই চলচ্চিত্রায়িত করেছেন; আমরা তাকেই ব্যাখ্যা করেছি মৌলবাদের মূল শক্তি রূপে। (আমাদের 'ঘ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)। সমাজের বুকে এই **ভূতের** নাচন অনেকেই দেখেছেন। এ **ভূত** মানুষকে ধরে, যাকে ধরে সে তখনই সহসা **ভূত** দেখে, তাকে **ভূতে** পায়, তার ঘাড়ে **ভূত** চাপে, তার পর সে **ভূতের** বোঝা বয়, **ভূতের** বাপের শ্রাদ্ধে **ভূতের** বেগার খাটে, এমনকি সরষের মধ্যে পর্যন্ত **ভূত** ঢুকে যায়; খোদ তদন্তকারী অফিসারই ঘুঁষ খেয়ে বসে থাকে। স্বভাবতই এই **ভূত** তাড়ানোর জন্য, ছাড়ানোর জন্য, নামানোর জন্য **ভূতের** ওঝা ডাকতে হয়। 'কর্তার **ভূত**'-এর বয়ানে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ভারতসমাজে এখন **ভূতের** ওঝাকেই **ভূতে** ধরেছে। আমরা শুনেছি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পরে নাকি বিশ্বসমাজের **ভূতের** ওঝাকেও **ভূতে** ধরেছে। সত্যি কি মিথ্যে, একবার খোঁজখবর করে দেখুন।

চতুর্থ প্রকারের **ভূত** হল এক রহস্যময় **ভূত**। মানুষের মৃত্যুর পর তার 'আত্মা' নাকি **ভূত** হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে নাকি কখনো কখনো কোনো কোনো মানুষকে **ভূত** রূপে দেখাও দেয়। কিন্তু তার বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান আজও কোনো দিশা দেখাতে পারেনি। আমরা এই **ভূতের** পক্ষে বিপক্ষে এত কথা শুনেছি যে, নিশ্চয় করে বলা মুশকিল এর অস্তিত্ব সত্য নাকি মিথ্যা। তাই আমরা এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু স্বীকার করে তার বিষয়ে কিছু বলব, তেমন সামর্থ্য আমাদের নেই। স্বভাবতই এই মুহূর্তে এর বিষয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ। শুধু একটি কথা বলতে পারি যে, যাঁরা **ভূতের** গল্প বলেন বা লেখেন, দেখা যায়, তাঁরা অনেক সময় এই চতুর্থ শ্রেণীর **ভূতের** উপর নির্ভর করে তাঁদের গল্পগুলি তৈরি করেছেন।

পঞ্চম ও শেষ শ্রেণীর **ভূত** জন্মায় **আদর্শে** বা আয়নায়। সেই আয়না হল একালের কোনো কোনো বাংলাভাষীর মন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর **ভূতের** প্রতিচ্ছবি পড়ে তাঁদের কারও কারও মনের আবছা ভাঙা-ফাটা আয়নায়। তখন সেখানে যে **ভূতের** দেখা মেলে এ হল সেই **ভূত**। এই **ভূত** এতই রহস্যময়, ছায়া-ছায়া, ছাড়া-

ছাড়া, পারম্পর্যহীন যে, এই **ভূত** যিনি দেখে ফেলেন, তিনি এক রহস্যময় জগতের মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই **ভূত**কে নিয়েই লোকে **ভূতের** গল্প বানায়, বলে, লেখে। এই **ভূতের** রহস্যময় অস্তিত্ব বহু মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। এমনকি সুকুমার সেন-এর মতো ভাষাতাত্ত্বিক মানুষও এই **ভূতের** হাত থেকে রেহাই পাননি। শেষ বয়সে তিনি **ভূতের** গল্প নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ভূতকান্ত, ভূতনাথ, ভূতপতি, ভূতেশ : ৩. ভূতকান্ত = শিব। **ভূতনাথ** = শিব। **ভূতপতি** = শিব। **ভূতেশ্বর** = শিব। (ব.শ.)। **৫.** এই শব্দগুলি সবই সনাতন কালের মানুষদের পরিচালক **শিবকে** বোঝাতে ব্যবহৃত হত।

প্রভূত : ২. *প্রকৃষ্টরূপে* **ভূত** *যে।* **৩.** প্রকৃষ্টজাত, প্রচুর, বহু, অনেক, সমধিক, নানা, উদ্‌গত, উন্নত, ভূত, বিশাল। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** 'প্রকৃষ্টরূপে **ভূত**' বললে আমরা 'অনেক' বুঝি কেন? এর উত্তর আমরা পেতে পারি **প্র** উপসর্গের ভিতরে। তাতে রয়েছে **পুরুষ-প্রকৃতির** সর্বোত্তম দাম্পত্যবন্ধনের সম্বন্ধের কথা, **বন্ধুত্বের** সম্বন্ধের কথা। যে ভূত-করণ ক্রিয়ায় তদ্রূপ **পুরুষ-প্রকৃতির** সর্বোচ্চ পারস্পরিক মিলন থাকে, তার **ভূত**করণ তো সর্বোত্তম হবেই। সেই কারণে **প্রভূত** মানেই দাঁড়িয়ে যায় সবচেয়ে বেশি ভূত। তাই **প্রভূত** বললে আমরা 'বহু' বা 'অনেক' বুঝে থাকি।

ভূতপ্রকৃতি : ৩. ভূতগণের মায়াখ্যা অবিদ্যা। (ব.শ.)। **৫.** আবিষ্কারক-উদ্ভাবক শিবের নিকট থেকে যে শিক্ষা পেয়ে সনাতন যুগের মানুষেরা কৃত্রিম **বিশ্ব** নির্মাণ করতেন, সেই দক্ষসুলভ জ্ঞানকে বলা হত **ভূতপ্রকৃতি**; একালের ভাষায় যাকে 'টেকনোলজিক্যাল নলেজ' বলে, তারই আদি রূপ ছিল এই 'মায়াখ্যা অবিদ্যা'। দ্র. **অবিদ্যা**। আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

ভূতভাবন : ২ / আকাশাদি জরায়ুজাদি ভূতের যাহা হইতে ভাবন অর্থাৎ রচন (থাকে) তাদৃশ আত্মা (যে)। (ব.শ.)। **৩.** ভূতগণের উৎপাদক, পালক বা বৃদ্ধিকর; ভূতগণের চিন্তয়িতা, অর্থাৎ অভিধ্যানমাত্রে স্রষ্টা; ইচ্ছামাত্রে চরাচরাত্মক জগতের স্রষ্টা (ব্রহ্মা); সঙ্কল্পমাত্রে আকাশাদিস্রষ্টা; শিব, ব্রহ্মা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** একালের ভাষায় যাদের আবিষ্কারক-উদ্ভাবক মনীষী ও প্রচলিত বিদ্যা-অবিদ্যা সমূহের আধারস্বরূপ জ্ঞানী মানুষ বলা হয়, সেকালে তাঁদেরই বলা হত **ভূতভাবন**।

ভূতি (বিভূতি, বিভূতিভূষণ) : ১. ✓ভূ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভূতি** = **ভূত** *গতিশীল বা সক্রিয় থাকে যাহাতে।* **বিভূতি** = *বিপরীত* **ভূতি** *যাহাতে; অর্থাৎ,* **ভূতির** *বিপরীতে যাহা জন্মায়।* **বিভূতিভূষণ** = **বিভূতি** *ভূষণ যাহার।* **৩. ভূতি** = ভবন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বৃদ্ধি, শম্ভুধৃতভস্ম, ভস্মমাত্র, মাতঙ্গশৃঙ্গার, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, বৃদ্ধিনামক ঔষধ, ভৃষ্টমাংস, বিষ্ণু, শিব, পিতৃগণবিশেষ, বৈশ্যের নামের উত্তরপদ। **বিভূতি** = লক্ষ্মী, মহিমা, সম্পত্তি, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরভাব, রাজপ্রভাব, বিবিধসৃষ্টি, সম্পদ্, বিত্ত, শিবধৃতভস্ম। (ব.শ.)। **বিভূতিভূষণ** = শিব, ষাঁড়, গায়ে ছাইমাখা তান্ত্রিক সাধু। **৪.** বাংলাভাষী মেয়েদের ডাক নামরূপে ভূতি এবং ছেলেদের নামরূপে **বিভূতিভূষণ** এখনও কমবেশি প্রচলিত, অন্যথায় **তিনটি শব্দই** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অশ্ব, ভস্ম, ভব, ভাব**। '**ভূত** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে' তাকে **ভূতি** বলে। সে কেমন ব্যাপার? **পুরুষ-প্রকৃতির** পরস্পরের সামঞ্জস্যমূলক প্রেমবন্ধন থেকেই যে নতুন সত্তা জাত বা **ভূত** হয়, সেসব কথা অনেকেই বুঝতে পারেন না। তাই আমরা একেবারে আধুনিক উদাহরণের সাহায্য নেব। এও উপরোক্ত **পুরুষ-প্রকৃতির** প্রেমবন্ধনের নিয়মেই ঘটে, কিন্তু আমরা সে ভাষায় বলব না, আধুনিক ভাষাতেই বলব।

সর্ব্বভূতের অন্যতম **ভূত** হল জল। এটি **ভূত** হয় বা জন্মায় দুটো হাইড্রোজেন কণা ও একটি অক্সিজেন কণার মেলবন্ধনে, ঠিক যেন 'তিন পায়ে দৌড় প্রতিযোগিতা'র একটি ছুটন্ত সত্তা। সেই রূপে সে **ভূত** হয়, কিন্তু সেখানেই থেমে থাকে না। এরপর সেই ত্রিপদী **ভূত** সক্রিয় হয়ে আকাশে বাতাসে মাটিতে সর্বত্র বাষ্পরূপে জলরূপে বরফরূপে ছড়িয়ে পড়ে; এবং কখনোই সে তার ত্রিপদী-স্বভাব থেকে চ্যুত হয় না বরং সেই চরিত্র নিয়েই সক্রিয় হয়। একেই বলে জল নামক **ভূত**-এর **ভূতি**। জগতের **সর্ব্বভূতে**র ইত্যাকার **ভূতি** থাকে। এই **ভূতি**কে কোনো প্রতীকী শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা বেশ কঠিন। ব.শ. প্রদত্ত এই **ভূতি**র উপরোক্ত অর্থগুলি **ভূতি**র বিভিন্ন খণ্ডাংশকে প্রকাশ করে মাত্র। তবে, এর **ভূত** হওয়ার যে প্রাকৃতিক নিয়ম, তাকে মাথায় ধরে রাখেন স্বয়ং আবিষ্কারক-উদ্ভাবক। তাই এই **ভূতি**কে বলা হয় '**শম্ভুধৃতভস্ম**'। (দ্র. **ভস্ম**)। তার মানে, এই জগতে যত বস্তু বা **ভূত** আছে, তাদের অস্তিত্বের মূলে যে 'ব্যাপার' রয়েছে, তাই হল **ভূতি**; এবং **ভূত** মাত্রেই সেই 'ব্যাপার' মান্য করেই সক্রিয় থাকে ও **প্রভূত** হতে থাকে বলে তাকেও বলা হয় **ভূতি**। আরও সহজ করে বললে, একটি আমগাছ মাটি থেকে ছোট্ট চারা হিসেবে উদ্‌**ভূত** বা জাত হয়, হ'য়ে সেরূপেই সে সক্রিয় থাকে, ক্রমে বিশালকায় মহীরুহে পরিণত হয়, তাতে আম ফলে এবং কখনোই সেই গাছ তার 'আমগাছত্ব' হারায় না, বরং তার 'আমগাছত্ব'-এর বৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে সে তার পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। আমগাছ নামক **ভূতে**র এই গতিশীলতা বা সক্রিয়তা বা বিকাশকে **ভূতি** বলে। কিন্তু **বিভূতি** কী বস্তু?

হাউই উড়ে যায়, পেছনে ফেলে যায় তার ছাই। কাজ হয়ে যায়, পেছনে রেখে যায় তার অভিজ্ঞতা, তার দাম। কর্মফল তাই প্রধানত দুরকম সম্পদ দেয় — ধনসম্পদ ও জ্ঞানসম্পদ। কাঠকুঠ কেটে তাতে মেধা ও শ্রম প্রয়োগ করে আপনি একটি টেবিলের জন্ম দিলেন, একটি **ভূত** সৃষ্ট হল। সেই **ভূত** চলে গেল **ভূতাবাসে**, যেখানে 'পিশাচাদি বাস করে'; অর্থাৎ দোকানদারদের দোকানে (দ্র. **বিভীতক**)। আপনি পেয়ে গেলেন টেবিলটির দাম। আর একটি জিনিস পেলেন, তার নাম অভিজ্ঞতা। মানুষ যে কৃত্রিম **বিশ্ব** সৃষ্টি করে, **ভূত** বানায়, তার থেকে স্বভাবতই তার হাতে আসে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ। এই জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদই কর্ম-হাউইয়ের গতির বিপরীতে ফেলে যাওয়া **বিভূতি; ভস্ম** বা ছাই। একেই মানবজগতের সার, জগতের **ভস্ম** বা ছাই বলে। **অশ্বে**রা এই ছাই মাখে না, বহন করে; আর **শিবসত্তার** বাহন বা আবিষ্কারক-উদ্ভাবক সত্তার বাহন বৃষেরা এই **ভস্ম** বা **বিভূতি** মাখে, উপভোগ করে। জ্ঞানীরা,

আবিষ্কারকেরা, বিজ্ঞানীরা, স্রষ্টারা, শিবেরা এই জ্ঞান উপভোগ করেন; **বিভূতি** মাখেন। তাই তাঁরা **বিভূতি** দ্বারা **ভূষিত** বা **বিভূতিভূষণ**।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও আমাদের পূর্বসূরি বাংলাভাষীরা জানতেন **বিভূতি** কাকে বলে। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের নাম রাখতেন **বিভূতিভূষণ**। এখন আমরা **ভূতি বিভূতি** দুটোই ভুলেছি। এখনকার অ্যাকাডেমির বাংলাজ্ঞানীরা ভাবেন, 'ছাই ভূষণ যাহার', সেই হল **বিভূতিভূষণ** এবং তা যেহেতু **শিব**কে বোঝায়, শিবের প্রতি ভক্তিতে লোকে নিজের ছেলের নাম **বিভূতিভূষণ** রাখত। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, **শিববাবু**ই মাখুন আর ষাঁড়বাবুই মাখুন, গোটা গায়ে ছাই মাখালে সেটি গৌরবের ব্যাপার হয় কেমন করে? শিবের প্রতি যত ভক্তিই থাক, ছেলের নাম **বিভূতিভূষণ** রেখে আপনি তার সারা গায়ে **বিভূতি** বা ছাই মাখাতে যান, হাতে হাতে ফল পেয়ে যাবেন।

আসলে এখানেও রয়েছে সেই **পাদোদক-মূঢ়তা**। অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তার নামকরণ করা হল **বিভূতি** ও **ভস্ম**; সাদৃশ্যে সেটি ছাইকে বোঝায়। যিনি তার প্রকৃত, অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় অর্থটি বুঝতে পারলেন, তিনি জ্ঞানের সারগুলি, **শিবের** অণিমাদি ঐশ্বর্যগুলি মনের চারদিকে মাখিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন। আর, যে তার প্রকৃত অদৃশ্য অর্থটি বুঝতেই পারল না, সে তার সারা গায়ে দৃশ্য ছাই মেখে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে প্রকৃতের-ব্যঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার মানে, আমাদের পূর্বসূরিরা আমাদের বলে গেলেন, সারা মনে জগতের সারজ্ঞান মাখতে, উপভোগ করতে; আর আমরা আমাদের **পাদোদক-মূঢ়তার** দোষে সারা গায়ে ছাই মাখতে গেলাম। তাই দেখে ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি যখন আমাদের ঠাট্টা করতে লাগল, আমরা ওসব 'ছাই-পাঁশ' মাখাও বন্ধ করে দিলাম। ইংরেজদের দেখাদেখি প্রথমে আমরা **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**কে কেটে তিন খণ্ড (দ্র. **কান্ত**) করলাম — বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (= বি বি বি, ঠিক যেমন জর্জ বার্নাড শ = জি বি এস)। তারপর প্রথমে **ভূষণ**কে বাদ দিয়ে করলাম **বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়**। তখন মানেটাই গেল বদলে — 'জ্ঞানবান বন্দ্যোপাধ্যায়' বা 'ধনবান বন্দ্যোপাধ্যায়' হয়ে গেল 'জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়' বা 'ধন বন্দ্যোপাধ্যায়'। কিন্তু আমরা তো সেসব বুঝিনি, আমরা বুঝেছিলাম **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** মানে 'ছাই-মাখা বন্দ্যোপাধ্যায়' এবং **বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়** মানে 'ছাই বন্দ্যোপাধ্যায়'। ফলে, পাশ্চাত্যের কাছে মান বাঁচাতে আমরা ঐসব ছাই-পাঁশ নামকরণটাই বাদ দিয়ে দিলাম। একালের অ্যাকাডেমি শিক্ষিত বাংলাভাষীগণ তাই নিজেদের ছেলেপুলেদের নাম আর **বিভূতি** বা **বিভূতিভূষণ** রাখেন না। তাঁদের সিদ্ধান্ত — ঝামেলা হাটাও! না রহেগা বাঁশ, না বজেগি বাঁশরি।

ভূমা (ভূমন্, ভূম — বরাহভূম, বীরভূম, বরেন্দ্রভূম, মানভূম, সিংভূম) : বহু + ইমন্ (ইমনিচ্) - ১বচন, বহু > ভূ (পাণিনি)। (ব.শ.)। ২. **ভূম** = **ভূ** *(নবরূপী ভ-এর আধার) অখণ্ডরূপে মিত যাহাতে।* **ভূমন** = **ভূম** *অন (on) যাহাতে।* **ভূমা** = **ভূম**-*এর আধার যে।* ৩. **ভূম** = দেশ, স্থান, ভূসম্পত্তি, জমি, শস্যক্ষেত্র, ক্ষেত। **ভূমা** = বহুভাব, বহুত্ব, মহত্ত্ব, নিরতিশয়, প্রাচুর্য্য, বাহুল্য, মহান্, বহুবচনত্ব (plurality), বিভু, বিরাট্‌পুরুষ। (ব.শ.)। ৪. জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চায় **ভূমা** শব্দটি কখনো সখনো ব্যবহৃত হয়, অন্যথায় অপ্রচলিত। **ভূম** শব্দটি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখনও কমবেশি প্রচলিত, যথা **বীরভূম, সিংভূম** ইত্যাদি। ৫. **ভূম** ও **ভূমা** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ বিষয়ে আমরা নিম্নে **ভূমি** শব্দে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে মাত্র এটুকু বলা যে, এককালে **ভূম** শব্দ জুড়ে অনেকগুলি শব্দের প্রচলন ছিল, যথা **বরাহভূম, বীরভূম, বরেন্দ্রভূম, মানভূম, সিংভূম** ইত্যাদি। এখন কেবলমাত্র **বীরভূম** ও **সিংভূম** ভারতের দুইটি অঞ্চলের নাম রূপে প্রচলিত আছে। **মানভূম** স্থানটিকে ১৯৫৬ সালে দুই ভাগ করে একটি অংশকে পুরুলিয়া নাম দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে, অন্য অংশটিকে 'ধানবাদ জেলা' হিসেবে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। ব.শ. জানাচ্ছেন, এই **ভূম**গুলি আসলে **বীরভূমি, মানভূমি** ... ইত্যাদি; অর্থাৎ 'সংস্কৃত **ভূমি** শব্দের বিবর্তিত রূপ হল **ভূম**।' আমরা দেখেছি, যে-**ভূম** শব্দটি প্রসারিত হয়ে **ভূমা, ভূমি, ভূমিকা** ... প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়েছে, সেই **ভূম** শব্দের অর্থের সঙ্গে **বরাহভূম, বীরভূম** ... প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যুক্ত **ভূম**-এর অর্থের মিল নেই; তার যোগ রয়েছে **ভূমি** শব্দের সঙ্গে। সেকারণে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ব.শ. ঠিক কথাই বলেছেন।

ভূমি (ভূমিক, ভূমিকা) : ১. ✓ভূ + মি - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভূমি** = **ভূ** *(নবরূপী* **ভ**-*এর আধার) গতিশীল বা সক্রিয় হয় যে মিত সত্তায়; অর্থাৎ, (কোনো সত্তা)* **ভূত** *হয় যে-ক্ষেত্রে।* **ভূমিক** = **ভূমি** *করে যে।* **ভূমিকা** = **ভূমিক**-*এর আধার যে।* / **ভূমি** = যে স্থান হইতে উৎপত্তি হয়। (ব.শ.)। ৩. **ভূমি** = পৃথিবী, পৃথিবীতন্মাত্র, দেশ, ভূতল, ভূভাগ, প্রান্তভাগ, স্থান, গৃহের তলদেশ, (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের তলরেখা (base), পাত্র, সীমা, যোগীর চিত্তের অবস্থাভেদ, এক (১) সংখ্যা, ক্ষেত্র। **ভূমিক** = ভূসম্পত্তিশালী, ভূএগ্র। **ভূমিকা** = ভূমি, ভূভাগ, গৃহতলদেশ, লেখনস্থল, রূপান্তর, (নাট্যে) পাত্রের বেষ, রূপান্তরগ্রহণপূর্ব্বক পাত্রের প্রবেশ, নাট্যপাত্রের অভিনেয় বিষয় (role), রচনা, গ্রন্থে বক্তব্যবিষয়ের পূর্ব্বাভাষ, কক্ষা, চিত্তের অবস্থাবিশেষ (ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র বিরুদ্ধ — চিত্তের এই পঞ্চভূমি), বক্তব্য বিষয়ের অবতারণার পূর্ব্বে তদনুকূল প্রস্তাব। (ব.শ.)। ৪. **ভূমিক** অপ্রচলিত। বাকি দুটি শব্দই যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ভব, ভবন, ভূত** ও **ভ** বর্ণের অর্থ। **ভূ**-এর সঙ্গে **ম** যুক্ত হলে **ভূম** হয়; অর্থাৎ **হওয়া** (ব-হওয়ন) **মিত** (বা **ম**) হয়ে গেলে **ভূম** হয়। এই **ম** কেমন ব্যাপারকে বোঝায়, **ম**-বর্ণের অর্থে সেকথা আমরা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সংক্ষেপে জগতের সকল সত্তারই ক্ষয়বৃদ্ধি চলছে, কেউই স্থির নয়, পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু কাজ চালানোর জন্য আমরা প্রতিটি বস্তু বা বিষয়কে 'আপাত-সম্পূর্ণ ও স্থির' বলে 'মনে করে নিই', বা ধরে নিই। তাকেই বলে মিতকরণ বা **ম**।

স্বভাবতই **ভূ**-এর সঙ্গে **ম** যুক্ত হলে, আমরা যে **ভূম**কে পাই, সে এক 'মনে করে নেওয়া' সাময়িক সম্পূর্ণ সত্তা। তার মানে, যা থেকে ভুস্ ভুস্ ক'রে, ভূর্ ভূর্ ক'রে, ভূরি ভূরি সত্তার জন্ম হয়,

'ভূ-নিঃসরণকারী' সেই মূল সত্তাটিকে আপাতত সীমায়িত করে সম্পূর্ণ বলে ধরে নিলে বা 'মনে করে নিলে' যে সত্তার দেখা মেলে, সেই হল **ভূম**। এ হল এক ধরনের বিশ্বাস। এর অদৃশ্য রূপটিই একমাত্র রূপ, অর্থাৎ **ভূম** শব্দের কোনো দৃশ্য রূপ হয় না, নেই। এই **ভূম**কে অন করতে থাকলে বা **ভূমন** করতে থাকলে আমরা পাই **ভূম**-এর আধারকে; তাকে **ভূমা** বলে। এ হল মনোলোকের লক্ষ কোটি 'খণ্ড-বোধ', যাদের প্রত্যেককে ক্ষয়বৃদ্ধিহীন আপাত-পূর্ণ বলে 'মনে করে নেওয়া' হয় বা ধরে নেওয়া হয়। সেই কারণে **ভূমা** বললে 'বহুভাব, বহুত্ব, মহত্ত্ব ...' ইত্যাদি বোঝায়।

তার মানে, আমাদের মনোলোকে যে সকল স্থির বোধ বা জ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বাস রয়েছে, যাদের থেকে আরও নানা বোধের জন্ম হয়ে থাকে, সেই বোধগুলিকে **ভূমা** বলে। এ হল **ভূমসমূহ**কে একত্রে দেখা। এই **ভূমা** থেকে নানা নতুন নতুন ভূরি ভূরি বোধের জন্ম হয় বা হতে পারে। যেমন ২ আর ৩ যোগ করলে ৫ হয়, যেমন H_2-র সঙ্গে O যোগ করলে জল হয় ... ইত্যাদি কোটি কোটি! এই **ভূমা**কে সেকারণে মানসিক শস্যের ক্ষেত বা মানবজমিন বলা যেতে পারে। সেই ক্ষেতের শস্যসম্ভার বা মানসফসল দেখতে পেলে মনচাষা মনীষীরা অত্যন্ত খুশি হন। জ্ঞানী মানুষেরা যে সকল জ্ঞান অর্জন করে আত্মস্থ করে রাখেন, সেগুলি তাঁদের **ভূমা**। তাঁরা নিজের ভিতরে নিজে যখন ডুবে থাকেন, তখন এই **ভূমা**তেই কৃষকের মতো লিপ্ত থাকেন, নানা মানসফসলের জন্ম দেন, এবং তাতেই বিস্তর সুখ পান তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে যে **ভূমা** ছিল, তাতেই তাঁর কাব্য-কবিতাদির অপূর্ব মানসফসল সমূহ ফলেছিল; আইনস্টাইনের মনের ভিতরে যে **ভূমা** ছিল, তাতেই তাঁর আবিষ্কার-গুলি উদ্ভূত হয়েছিল। জ্ঞানী মানুষদের কাছে **ভূমা** তাই সুখের কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানী-ধ্যানী মানুষের ইত্যাকার অবস্থাকে 'ডিমে তা দিতে বসা পাখির' সঙ্গে তুলনা করে নানা কথা বলে গেছেন। একেই আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা বলেছেন, 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি'। যাঁরা গভীর জ্ঞানচর্চা করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, এই **ভূমা**তেই সুখ।

এবার **ভূমি** প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। **ভূম** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে তাকে **ভূমি** বলে। অর্থাৎ, কোনো সত্তা **ভূত** (আবির্ভূত, উদ্ভূত ইত্যাদি) হয় যে ক্ষেত্রে, তাকে **ভূমি** বলে। কিন্তু যেহেতু **ভূম** বা **ভূমা** আদৌ দৃশ্য নয়, তাই এ **ভূমি**ও দৃশ্য-**ভূমি** নয়। এ হল সম্পূর্ণতই অদৃশ্য মানসিক **ভূমি**, বিশ্বাসের ক্ষেত্র।

আগে বহুবার বলেছি, আবারও বলছি, আমাদের পূর্বসূরিদের প্রধান সমস্যা ছিল 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাদের বিষয়ে স্বজনদের অবহিত করা; তাঁদের শব্দসৃজনের লক্ষ্যও ছিল সেটিই। এক্ষেত্রে যেমন দৃশ্য-**ভূমি** (earth) ও সে **ভূমি**র উপরে যে সকল দৃশ্য ব্যাপার-স্যাপার করা হয় বা উদ্ভূত হয়, সেগুলি তাঁদের ভাবনার বিষয় ছিল না। তাঁরা **ভূমি** শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন 'যে অদৃশ্য ক্ষেত্রের উপর অদৃশ্য সত্তারা জন্মায় বা **ভূত** হয়, হ'য়ে সক্রিয় হয়', সেই 'অদৃশ্য-ক্ষেত্র'কে বোঝাতে। উপরে **ভূম** ও **ভূমা**র ব্যাখ্যায় সেই বোধের **ভূমি** বা মানবজমিনকে আমরা দেখিয়েছি। অবশ্য, সাদৃশ্যে তা দৃশ্য-ক্ষেত্রকেও বোঝানো হয়ে যায় বলে পার্থিব-ভূমিকেও **ভূমি** বলা হয়ে থাকে। **কিন্তু অদৃশ্য-ভূমিই** যে আমাদের পূর্বসূরিদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় **ছিল**, তা নিয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের বাংলাভাষায় যত ক্রিয়া আছে, তাদের মধ্যে 'মহান আলয়া' বা **মহালয়া** ক্রিয়া কোনটি, যে কিনা সকল ক্রিয়াকে আশ্রয় দেয়? উত্তর — **ভূ** বা **হওয়া**। সেই কারণে আমাদের ভাষায় করা **হয়**, ধরা **হয়**, মারা **হয়**, যাওয়া **হয়**, খাওয়া **হয়**, গেলা **হয়** ... এবং কী **হয়** না! কিন্তু **প্রশ্ন** হল, সেসব **হয়** কোথায়? অধিকরণ-কারকটি কী? বাংলাভাষার সকল ক্রিয়ার ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে, তাদের হওয়ার ক্ষেত্র যোগাচ্ছে 'হওয়া' ক্রিয়া বা **ভূ** ক্রিয়া। অর্থাৎ **ভূ** ক্রিয়াই আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকে তাদের হওয়ার **ভূমি** যোগাতে পারে, যোগায়। অতএব **ভূ** বা 'হওয়া' ক্রিয়াটিই বাংলাভাষার সকল ক্রিয়ার ভিত্তি**ভূমি** হওয়ার যোগ্যতা ধরে। আর, সন্দেহ নেই সে **ভূমি** সক্রিয় থাকে আমাদের বাংলাভাষীদের মনোলোকে। আর সেজন্যই যে কোনো বাংলাভাষী তাঁদের বাক্যে করা **হয়**, ধরা **হয়** ... প্রভৃতি শব্দের অনায়াস প্রয়োগ করতে পারেন।

আমাদের পূর্বসূরিরা দেখেছিলেন, লোকে যে একাগ্রভাবে গল্প শোনে, কথা বলে কিংবা রাগে-অনুরাগে বিরুদ্ধ ভাষণ দেয় — সেই ব্যাপারগুলি **হয়** তাদের **চিত্তের ভূমি**র উপর দাঁড়িয়ে। তাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলেন, ঐ **চিত্তের** অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মানুষের 'ক্ষিপ্ত-মূঢ়-বিক্ষিপ্ত-একাগ্র-বিরুদ্ধ' মনোভাবগুলি **ভূত** বা জাত হয়, হয়ে খাড়া হয়, দাঁড়ায়। এগুলিকে তাঁরা নাম দিলেন 'চিত্তের **ভূমি**'। তবে কিনা চিত্তের **ভূমি**তে চিত্তবৃত্তি হোক আর **বুদ্ধি**র **ভূমি**তে **বুদ্ধি**বৃত্তি চলুক, সবই তো আসলে মনোলোকের ব্যাপার। একালের কবি তাই বলে উঠলেন — 'কবি, তব মনো**ভূমি** অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' অর্থাৎ কিনা, **রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দশরথ দশানন কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা সীতা উর্ম্মিলা মন্দোদরী সরমা** ... প্রভৃতি 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সামাজিক সত্তারা কোনো দৃশ্য **ভূমি**তে জন্মায়নি, জন্মেছে কবির মনো**ভূমি**তে, যে **ভূমি** চোখে দেখা যায় না, অদৃশ্য-লোকের ব্যাপার! **অযোধ্যা** শব্দের অর্থ থেকে জানা যায়, এমনকি **অযোধ্যা**ও ঐ মনো**ভূমি**র একখণ্ড **ভূমিই** বটে। তবে সেভাবে ভাবলে তো সমগ্র বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিই জন্মেছে আমাদের প্রাচীন মুনিঋষি ও ব্যাস-বাল্মীকিদের অদৃশ্য মনো**ভূমি** থেকেই! শুধু কি তাই? বিশ্বের সর্বপ্রকারের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সর্বপ্রকারের দর্শন সাহিত্য শিল্পকলা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ... সবই তো জন্মেছে মানুষের মনো**ভূমি** থেকেই! স্থাপত্যবিদের মনো**ভূমি**তেই তো তাজমহল জন্মেছিল, স্বরূপ পেয়েছিল এবং তারপর তা বাস্তব পৃথিবীতে দৃশ্য রূপ পেয়েছিল।

তবে কি অদৃশ্য ঐ মনো**ভূমিই** তাদের উদ্ভবের একমাত্র ক্ষেত্র, দৃশ্য-পার্থিব-সামাজিক ক্ষেত্রের কি কোনো **ভূমিকা** নেই? তবে কি অদৃশ্য মানসলোকই সব, দৃশ্য বাহ্যলোক অর্থহীন? **ভাব**-এর দুনিয়াই সব, **ভবে**র বা বস্তুর দুনিয়ার কোনো গুরুত্ব নেই? রবীন্দ্রনাথ কি বস্তুবাদ বিরোধী ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে **ভব**কে বাদ দিয়ে **ভাব** কি হতে পারে? না কি **ভাব**কে বাদ দিয়ে **ভব** হতে পারে? ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ প্রয়োগ করে বললে বলতে হয় — গুরুত্ব কি একমাত্র **প্রকৃতির**? **পুরুষের** কোনো **ভূমিকা** নেই?

আছে। তবে সে সব প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব। আগে **ভূমিকার** কথাই হোক। কোনো গল্প কাহিনী বয়ান প্রস্তাব ... ইত্যাদি দাখিল করার আগে সেই গল্পাদিকে কোনো না কোনো **ভূমির** উপর দাঁড় করানো চাই। তার জন্য সেই গল্পাদির পায়ের তলায় মাটি যোগাতে হয়, **ভূমি** সরবরাহ করে দিতে হয়। যার দ্বারা তা করা হয় তাকে বলা হয় গল্পাদির **ভূমিকা**। তবে শুধু গল্পাদির **ভূমিকা** একমাত্র **ভূমিকা** হতে যাবে কেন? যে কোনো ঘটনাকে, ব্যাপারকে, আচারকে, যুদ্ধবিগ্রহকে, নাট্যানুষ্ঠানকে, ইতিহাসকে ... হয়ে ওঠার জন্য বহু সত্তার নানাপ্রকার **ভূমিকা**-গ্রহণ লাগে। ঘটনাকে হয়ে ওঠার **ভূমি** বা ক্ষেত্র সরবরাহ করে ঘটনায় **ভূমিকা**-গ্রহণকারী সত্তা; ... ইতিহাসকে হয়ে ওঠার **ভূমি** বা ক্ষেত্র সরবরাহ করে ইতিহাসে **ভূমিকা**-গ্রহণকারী সত্তারা; নাটককে হয়ে ওঠার **ভূমি** সরবরাহ করে নাটকে **ভূমিকা**-গ্রহণকারী কুশীলবগণ। ...

আর, এই সমস্ত ঘটনাদির মূলে যে নিয়মাদি থাকে, সেই নিয়মাদি সহ সমস্ত ঘটনার চলচ্চিত্র ধরা থাকে মানুষের মনোলোকে। সেই নিয়মাদিই হল অদৃশ্য **ভূম**, সেই **ভূমই** সক্রিয় হয়ে আমাদের মনোলোকের অদৃশ্য মনো**ভূমি** তৈরি করে। সেই মনো**ভূমিতেই** ফলে মানুষের সর্বপ্রকারের অদৃশ্য মানসফসলসমূহ। সেই অদৃশ্য মানসফসল বাস্তবায়িত হয় বাস্তব সমাজে, পার্থিব ও দৃশ্যলোকে। তার মানে, **প্রকৃতি** থেকে যেমন **পুরুষ** জন্মায়, পরে সেই **পুরুষ** যেমন **প্রকৃতিকে** পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, এবং দুইয়ের পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারে যেমন উভয়ের যথার্থ এগিয়ে চলা নির্ভর করে, মনো**ভূমি** ও পার্থিব**ভূমিরও** সেই সম্বন্ধ। পরস্পরকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে উভয়ের **ভূমিকা** রয়েছে।

কিন্তু তার পরেও একটি কথা থেকে যায়? সরকারের লোক এসেছে দুয়ারে, কে বেরোবে সামনে? স্বামী না স্ত্রী? **পুরুষ** না **প্রকৃতি**? ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এর উত্তর হল **পুরুষ**। কিন্তু রামবাবুর মেয়ের 'সাধভক্ষণ'-এর নেমন্তন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সামনে যাবে কে? স্বামী না স্ত্রী? বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এর উত্তর হল স্ত্রী বা **প্রকৃতি**। তো, একই কথা এখানেও এসে যায়। তার মানে, **পুরুষ-প্রকৃতি** একত্রে **দ্বৈতাদ্বৈত** রূপে সক্রিয় থাকে বটে, কিন্তু যে পরিস্থিতির সম্মুখস্থ হয়, তদনুযায়ী ঠিক হয়, দম্পতির কোন অংশ কখন সামনে মুখ করে দাঁড়াবে। যে কট্টর সাম্যবাদীরা দুজনের সমান অধিকারে ঘোরতর বিশ্বাসী তাঁদের জানা দরকার, একসঙ্গে দুজনের নাম উচ্চারণ করার বা একসঙ্গে দুজনের নাম লেখার কোনো কৃৎকৌশল আজও আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন কিনা, সরকারি নথিতে একটি পরিবারের পরিচয়ের শুরু হয় পরিবারের পুরুষটিকে দিয়ে। একইভাবে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রায় দিয়ে গেছেন যে, **পুরুষের** নামটাই প্রথমে উচ্চারিত হবে। এক) 'হতে পারে' সত্য, 'হয়েছে'ও সত্য। প্রথমটি পুরুষ, দ্বিতীয়টি প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথমটিই থাকবে সামনে এবং ঘোষিত হবে সত্য বলে। দুই) অদৃশ্য-মনো**ভূমি** থেকে রাম জন্মেছেন, দৃশ্য-অযোধ্যা**ভূমি** থেকেও রাম জন্মেছেন। (যেহেতু ভারতে অনেকগুলি **অযোধ্যা** নামের স্থান আছে, রাম বহু স্থানেই জন্মেছেন, এবং রামের উদ্ভবস্থান রূপে প্রত্যেকটিই সিদ্ধ। **রাম** ও **অযোধ্যা** শব্দের অর্থ এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত করে।) প্রথম **ভূমিটি** পুরুষ, দ্বিতীয় **ভূমিটি** প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, রামায়ণের ক্ষেত্রে প্রথমটি অর্থাৎ মনো**ভূমিটি** থাকবে সামনে, রাম-জন্মভূমি রূপে সেই হবে পার্থিব**ভূমি** 'অযোধ্যার চেয়ে সত্য'। তাই বলে, রামের উদ্ভবক্ষেত্র রূপে পার্থিব**ভূমি** অযোধ্যার নাম থাকবে না, তা নয়। সেও থাকবে, থাকবে **পুরুষের** পেছনে **প্রকৃতি** রূপে। ...

অতএব এ নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই যে, **ভূ** বা হওয়া যেখান থেকে উদ্ভূত হয় বা উদ্ভূত হয়ে পা রেখে দাঁড়ায় বা হয়, সেই স্থানকে তার **ভূমি** বলে। দৃশ্যলোকেও এর বিপুল ব্যবহার হয়ে থাকে। একটি গৃহ যে ভিত্তির উপর দাঁড়ায় বা হয়, তাকে তার **ভূমি**, ভিত্তি**ভূমি** বলে। গ্রামবাংলায় তাকে শুধুমাত্র **ভিত** (= ভিত্তি) বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে এই **ভূমিকে** বলে base, যার উপরে 'বসা' হয়।

ভূরি (ভূরিতেজাঃ, ভূরিদক্ষিণ, ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ) : ১. ✓ভূ + রি (ক্রিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভূরি** = *উদ্‌ভূত সত্তা গতিশীল বা সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, উৎপন্নসমূহ রহে যাহাতে।* **ভূরিতেজাঃ** = ***ভূরি*** *ভূরি তেজ যাহার।* **ভূরিদক্ষিণ** = *যাহাতে* ***ভূরি*** *ভূরি দক্ষিণা থাকে।* **ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ** = *যে কর্ম্মযজ্ঞে কর্ম্মপরিচালকদের ভূরি ভূরি দক্ষিণা বা বেতন দেওয়া হয়।* **৩. ভূরি** = বহু, প্রভূত, প্রচুর, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা। **ভূরিতেজাঃ** = বহুতেজঃসম্পন্ন, মহাতেজস্বী। **ভূরিদক্ষিণ** = প্রভূতদক্ষিণাযুক্ত। (ব.শ.)। **৪.** many বোঝাতে 'ভূরি ভূরি' রূপে **ভূরি** শব্দটি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** ভূস্ ভূস্ শব্দ সংস্কৃত নিয়মে ভূঃ ভূঃ বা ভূর্ ভূর্ হয়ে যায়। কোনো বস্তু ভূর্ ভূর করে উদ্ভূত হলে বাংলাভাষীর মনে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে কেবলমাত্র উইয়ের ঢিবি থেকে হাজার হাজার বাদলপোকার বর্হির্গমনের দৃশ্যই মিলতে পারে। এই যে এক একটি বাদলপোকা, এই হল **ভূর**। এরকম **ভূর** অজস্র হয়ে গেলে তাকে বলে **ভূরি** বা **ভূরি-ভূরি**। পুরাণাদিতে **ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ** শব্দটি বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ কী, সেকথা আমরা উপরে **২.**-এ উল্লেখ করেছি।

ভূরিশ্রবাঃ : ২. *ভূরি ভূরি* ***শ্রবণ*** *করে যে। (দ্র.* ***উগ্রশ্রবা, উচ্চৈঃশ্রবা, বিশ্বশ্রবা*** *...ইত্যাদি)।* **৩.** কুরুবংশীয় রাজা সোমদত্তের পুত্র। একদা যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের জন্য দেবকীকে স্বয়ংবর সভা থেকে সবলে হরণ করেন। সোমদত্ত তা সহ্য করতে না পেরে শিনির সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং শিনি কর্তৃক পরাজিত ও ভূপতিত হয়ে পদাহত হন। এই অপমানে সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় প্রসন্ন করে বর পান যে, তাঁর পুত্র যদুবংশীয় শিনি-পুত্র সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সর্বসমক্ষে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদত্ত ভূরিশ্রবাকে প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চম দিনে ভূরিশ্রবা সাত্যকির দশ পুত্রকে হত্যা করেন। যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এবং ভূপতিত করে পদাঘাত করেন ও তার মুণ্ডচ্ছেদে উদ্যত হন। অর্জুন তখন দূর হতে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে তীক্ষ্ণ শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন। ভূরিশ্রবা

অর্জুনকে তিরস্কার করে বাম হস্তে ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসেন। এই সময় সাত্যকি জ্ঞানলাভ করে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **উচ্চৈঃশ্রবা, উগ্রশ্রবা, বিশ্বশ্রবা**। **ভূরিশ্রবা**র উপরোক্ত কাহিনীটিকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে অনুবাদ করে নিলে ভারতসমাজের যে ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাই এইরকম —

সাত্যকি অধঃপতিত সমাজতন্ত্রবাদী (বেদবাদী) এবং পুঁজিবিরোধী সত্তা। **অর্জ্জুন ধর্ম্ম**রাজ যুধিষ্ঠির পরিচালিত (লক্ষ্মীসাধক) পুঁজিবাদী সত্তা। আর, **ভূরিশ্রবা** হল কুবেরবাদী পুঁজিবাদী সত্তা, যে ভূরি ভূরি উৎপাদন ও বিক্রিবাটায় বিশ্বাস করে। স্বভাবতই, বেদবাদবিরোধী যুদ্ধে **ভূরিশ্রবা** অর্জুনের দলেই যোগ দেয়। কিন্তু সে লক্ষ্মীসাধক পুঁজিবাদের **ধর্ম্ম** মানে না। সেই কারণে, সে সাত্যকিকে অন্যায়যুদ্ধে মেরে ফেলতে চায়; একালের সাম্রাজ্যবাদী ও কর্পোরেট পুঁজিবাদ যেরকম করে থাকে। আর সেজন্যেই **অর্জ্জুন** নিজের দলের যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও **ভূরিশ্রবা**কে নিরস্ত্র করে। অথচ তার জন্য সেকেলে অধঃপতিত বেদবাদী সত্তা সাত্যকি তাকে ছেড়ে দেয় না; অন্যায় যুদ্ধেই তার শিরশ্ছেদ করে। তার মানে, ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালখণ্ডে ভারতের পুঁজিবাদকে একদিকে যেমন সেকেলে সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে অতি-পুঁজিবাদী সত্তার বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। এখানে স্মর্তব্য যে, **কর্ণ** প্রাক্-পুঁজিবাদী সত্তা হওয়া সত্ত্বেও সেকেলে সমাজতন্ত্রের কোলে আশ্রিত ছিল ব'লে **অর্জ্জুন**কে তার বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল।

ভূষণ (ভূষ, ভূষা, ভূষি, ভূষিত, ভূষো, ভূষ্ণু, চাষাভূষো) : ১. ✓ভূষ্ + অন (যুচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ভূষ** = *ভূ-র দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা উদ্ভূত হইয়া (তদ্ভূমিকে বা তদ্ভূতকে) আবৃত করে।* **ভূষণ** = **ভূষ** *অন (on) যাহাতে।* **ভূষা** = **ভূষ**-*এর আধার যে।* **ভূষি** = **ভূষ** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **ভূষিত** = **ভূষ** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* **ভূষো** = **ভূষ**-*এর সার্ব্বিক আধার যে।* **ভূষ্ণু** = **ভূষ** *করিতে ইচ্ছুক যে।* **চাষাভূষো** = *যে* **চাষ** *করে ও (তার দ্বারা নিজেকে) সার্ব্বিকভাবে* **ভূষ** *করে।* / **ভূষণ** = যাহা দ্বারা মণ্ডন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **ভূষণ** = অলঙ্কারক, শোভাকর, অলঙ্কার, আভরণ, মণ্ডনসাধনদ্রব্য, ভূষণভূত বস্তু। **ভূষ** = অসার, ব্যর্থ; ভূষিত করা, সাজান, আলোকিত করা। **ভূষা (ভুসা)** = ভূষণ, মণ্ডনদ্রব্য; অগ্নির শিখাধূমে জাত কজ্জলবিশেষ (soot)। **ভূষি (ভুসি)** = যবগোধূমাদির তুষ, শস্যের খোসা। **ভূষিত** = মণ্ডিত, অলঙ্কৃত, শোভিত। **ভূষ্ণু** = ভবনশীল, ভবিতা, বর্দ্ধনশীল। (ব.শ.)। **ভূষ্ণু** = ভবিষ্যৎ, উৎপত্তিশীল। (ছা.অ.)। **ভূষো (ভুসা, ভুষা, ভুসো, ভুষো)** = কাজল, প্রদীপের শিখায় প্রস্তুত কালি বা ঝুল। **চাষাভূষো (চাষাভূষা)** = চাষা (কৃষক, ভূমিকর্ষণকারী ব্যক্তি, মূর্খ) ও ঐ শ্রেণীর অমার্জিত লোক, অশিক্ষিত সাধারণ জন, গ্রাম্য মূর্খ লোক। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. **ভূষ্ণু** ছাড়া বাকি সব শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চাষা**। গ্রামবাংলায় 'করঙ্গা' নামে এক শ্রেণীর **পশুচিকিৎসক এখনও দু-চারজন** বেঁচেবর্তে আছেন। এঁরা প্রাচীন ভারতীয় **পশুচিকিৎসাশাস্ত্রের** প্রায়োগিক উত্তরাধিকারী। সাধারণত বর্ষাকালে বৃষ্টিতে খুব বেশি ভিজে বলদদের নানারকম রোগ হয়। তখন ঐ করঙ্গা আসে। সে রান্নাঘরের চালে ও দেওয়ালে যে কাল ঝুল থাকে, তা সংগ্রহ করে নিয়ে তাতে নুন মিশিয়ে গরুর জিভে অনেকটা করে ঘষে দেয়। ঐ ঝুলকে **ভূষাকালি** বা **ভূষোকালি** বলে; কাজলের কালিকে **ভূষোকালি** বলে না। কেন বলে না, সেকথা আমরা **কাজল** ও **অঞ্জন** শব্দের অর্থেই জেনেছি। এখন আমরা জানব, ঝুলকে কেন **ভূষা**কালি বলে।

ভূষ করে শুরু হল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। তারপর সেই লাভাস্রোতের উত্থান নেমে এসে ঢেকে ফেলতে লাগল সেই আগ্নেয়গিরিকেই। তার মানে আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আগ্নেয়-গিরিকেই একটা খোলস পরিয়ে দিল ঐ ঘটনা। একে বলে **ভূষ** করা। ধান-গম কিংবা আম-কাঁঠাল প্রভৃতি যখন **ভূষ** করে নির্ভূত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে একটি খোলসই জন্মায়, যার পেটে থাকে শস্যবীজটি। পরে পরে শস্যবীজটি বড় হয়, হতে থাকে; খোলসটিও তদনুসারে বাড়তে থাকে। তার মানে, উত্থিত হয়ে আবরণ করে যে, সেই হল **ভূষ**। রান্নাঘরের ঝুলকালি ঠিক সেভাবেই উনুন থেকে নিয়মিত উদ্ভূত হয়, হয়ে উপরে চালে দেয়ালে সর্বত্র ঝুলে থাকে। তাই তাকে 'ঝুলকালি' বা **ভূষা**কালি বলে। একই কারণে সকল শস্যের খোলসকেও **ভূষা, ভূষি** ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। চাষাকেও **চাষাভূষা** বা **চাষাভূষো** বলা হয় একই কারণে। তার চাষ-কর্মের থেকে জাত অজস্র প্রকার **ভূষায়** সে **ভূষিত** হয়ে আবৃত হয়ে থাকে। একবার কোনো প্রকৃত চাষীর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেই আপনি টের পাবেন, তার চব্বিশ ঘণ্টা ঘিরে রয়েছে তার চাষকার্য থেকে উদ্ভূত অজস্র রকমের কালিঝুলি — 'ও গিন্নি, জমির নাড়াগুলো এনে ধানসিদ্ধ করো না কেন! জ্বালানিকাঠ বাঁচে! নাড়াগুলো ছিঁড়ে মোদের পাঁচকাঠার কোণায় আমি জমা করে দিইছি, জমিটাও সাফ হয়েছে। ও গিন্নি, ছাগলগুলারে বুড়িপুকুরের তিনকাঠায় বাঁধ না কেন? ওর মেঙ্‌নি (পায়খানা) আর মুতে জমিটা জোর পাবে। ওতে এবার আলু বসাব। ...' এরকম অজস্র সুতো দিয়ে গড়ে ওঠে চাষাকে ঘিরে ঝুলে থাকা **ভূষো**। এই **ভূষো** চাষাকে ঘিরে রাখে।

ভোর : ২. *সর্ব্বপ্রকারে কিংবা সার্ব্বিকভাবে* **ভূ** *(হওয়ন) রহে যাহাতে।* ৩. প্রভাত; বিহ্বল, অভিভূত, পীড়িত, ভ্রান্ত, মুগ্ধ, মোহিত; তৎপরিমিত, তদাকারসদৃশ; পূর্ণ, সকল, সারা; সমাপ্ত, শেষ, মাৎ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটি বাংলাভাষার নিজস্ব অর্জন। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই শব্দের বিপুল ব্যবহার হয়েছে। এখনও সাধারণ বাংলাভাষী ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন। তার সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ এতই ব্যাপ্ত যে, তা বহু কিছুকেই শনাক্ত করার যোগ্যতা ধরে। সেই অর্থ উপরে ২.-এ প্রদত্ত হয়েছে, তবে তার ব্যাখ্যা করে না দিলে বিষয়টিকে বোঝা সহজ হয় না।

কোনো স্থান-কাল-পাত্রে তৎপরিমিত বিষয় বা বস্তু নিজে থেকে জাত হয়ে কিংবা বাইরে থেকে ভরা হয়ে সেটি ভরে গেলে, সেই

স্থান-কাল-পাত্রের **ভোর** হয়ে যায়। রাত্রি ভরে গেলে তার **ভোর** হয়; একে 'প্রভাত'ও বলা হয়ে থাকে। অন্য ভাবসম্পদে কারও মাথা ভরে গেলে সে ভাবে **বিভোর** হয়; একে 'বিহ্বল', 'অভিভূত', 'মুগ্ধ' ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা যে কোনো আধার ভরতে ভরতে **পরিপূর্ণ** হয়ে গেলেই সেই আধারের **ভোর** হয়ে যায়। ...

ভৃ (ভৃজ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিভার, অনিভৃত, অভরণ, অভরসা, অভৃত, অভৃতক, আভরণ, আভৃত, কলাভারা, কোপভর, দমভর, নিভৃত, নির্ভর, পেটভর, প্রভৃতি, বভ্রু (ভ্রূ), বভ্রুবর্ণ, বভ্রুবাহ, বভ্রুবাহন, ভক্তিভর, ভচ্চ, ভচ্ছ, ভর্ৎস, ভচ্ছনা, ভন্না, ভর, ভরছন, ভরণ, ভরণপোষণ, ভরণী, ভরণীয়, ভরত, ভরতজ্ঞ, ভরতপুত্রক, ভরতবর্ষ, ভরতবাক্য, ভরতর্ষভ, ভরতশার্দুল, ভরতশাস্ত্র, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভরতসত্তম, ভরতি, ভরদ্বাজ, ভরনিশি, ভরন্ত, ভরপুর, ভরভর, ভরভরাট, ভরযুয়ান, ভরযুবতী, ভরল, ভরসা, ভরা, ভরাট, ভরাটী, ভরাডুবি, ভরাপুরা, ভরাভর, ভরি, ভরিত, ভরিল, ভর্গ, ভর্গঃ, ভর্চ্চ, ভর্চ্ছ, ভর্চ্চনা, ভর্ত্তা (ভর্ত্তৃ), ভর্ত্তি, ভর্ত্তৃগুণ, ভর্ত্তৃদারক, ভর্ত্তৃদেবতা, ভর্ত্তৃবৎসলা, ভর্ত্তৃবতী, ভর্ত্তৃবল্লভা, ভর্ত্তৃব্রত, ভর্ত্তৃমতী, ভর্ত্তৃহরি, ভর্ত্তৃহার্য্য, ভর্ত্রিণী, ভর্ৎস্, ভর্ৎস, ভর্ৎসক, ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা, ভর্ৎসিত, ভর্ম্ম, ভার, ভারজীবী, ভারত, ভারতী, ভারবাহী, ভারভৃৎ, ভারযষ্টি, ভারসহ, ভারই (ভারুই), ভারণ্ড, ভারণ্ডী, ভারত, ভারতপঙ্কজ, ভারতবর্ষ, ভারতমণ্ডল, ভারতমহীশ, ভারতী, ভারদ্বাজ, ভারবাহ, ভারবাহক, ভারবাহন, ভারবাহিক, ভারবাহী, ভারবি, ভারভুর, ভারহর, ভারহার, ভারহারী, ভারা, ভারি, ভারিক, ভারিক্কি, ভারিভুরি, ভারিভূরি, ভারিভূরী, ভারী, ভারীভূরী, ভারুই, ভারোদ্ধারণ, ভারোদ্বহ, ভারোদ্বহন, ভার্গব, ভার্গবী, ভার্গী, ভার্য্যা, ভার্য্যাজিত, ভার্য্যাট, ভার্য্যাপতি, ভার্য্যোঢ়, ভিঙ্গার, ভিমরাজ, ভিমরুল (ভীমরুল), ভৃ, ভৃকুটি(টী), ভৃগু, ভৃগুজ, ভৃগুতনয়, ভৃগুতুঙ্গ, ভৃগুপতি, ভৃগুপাত, ভৃগুবার, ভৃগুবাসর, ভৃগুরাম, ভৃগুশার্দুল, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, ভৃগুসত্তম, ভৃগুসুত, ভৃগুসুনু, ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গপ্রিয়া, ভৃঙ্গবল্লভ, ভৃঙ্গরজ, ভৃঙ্গরজাঃ, ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরিটি, ভৃঙ্গরীট, ভৃঙ্গরীটী, ভৃঙ্গরোল, ভৃঙ্গাধিপ, ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী, ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী, ভৃজ (ভৃজী), ভৃৎ, ভৃত, ভৃতক, ভৃতকাধ্যয়ন, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপন, ভৃতকাধ্যাপিত, ভৃতি, ভৃতিভুক্(জ্), ভৃত্য, ভৃত্যজন, ভৃত্যভরণ, ভৃত্যভাবী, ভৃত্যবর্গ, ভৃত্যবৃত্তি, ভৃত্যা, ভোর, মহীভৃৎ, সম্ভার।

ভৃ = **ভ**ব-এর আবর্ত্তন যাহাতে; ভরণ যাহাতে।

বভ্রু (বভ্রুবাহন) : **১.** ✓ভৃ + উ (কু) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **বভ্রু** = *বাড়বৃদ্ধির ভরণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **বভ্রুবাহন** = **বভ্রু**র *বাহন যে।* / **বভ্রুবাহন** = যাঁহার রথাশ্ব পিঙ্গল। (ব.শ.)। **৩.** **বভ্রু** = বভ্রুবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণযুক্ত, কপিল, অগ্নি, নকুল, কপিলবর্ণ দ্রব্য, কপিলা গবী বা সোমলতা, শিব, বিষ্ণু, চাতক, কপিঞ্জল, যাদববিশেষ। **বভ্রুবাহন** = মণিপুররাজ; ইঁহার মাতা মণিপুররাজ চিত্রবাহণের কন্যা চিত্রাঙ্গদা, পিতা অর্জ্জুন। ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। (ক) একজন যাদব। যদুবংশ ধ্বংস হলে ইনি যাদবরমণীদের রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হন। উক্ত সময় বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদের শাপসম্ভূত এক মুষল জনৈক ব্যাধের লৌহময় মুদগরে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর দেহে পতিত হয় এবং তাঁর প্রাণসংহার করে। (খ) মহর্ষি বভ্রু ঋকবেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ইনি অগ্নির স্তুতি সম্বন্ধে কয়েকটি ঋকমন্ত্র রচনা করেন। (গ) বিশ্বামিত্রের অন্য পুত্র বভ্রু। (ঘ) চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুনের পুত্র ও মণিপুরের রাজা। ... অপুত্রক মাতামহ চিত্রবাহনের মৃত্যুর পর বভ্রুবাহনই রাজা হন। ... উলুপীর প্ররোচনায় যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অশ্ব হরণ করে পিতা অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ... যুদ্ধে অর্জুন মুর্চ্ছিত ও নিপাতিত হন। ... চিত্রাঙ্গদা স্বামীর এই অবস্থা দর্শনে কাতর হয়ে মরণার্থ প্রায়োপবেশন করেন। তখন সপত্নী উলুপী নাগলোক থেকে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনয়ন করে ... অর্জুনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** দুটি শব্দই অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভূরিশ্রবা**। দ্র. **কপিল, কপিলাবস্তু, চাতক, বিষ্ণু**। উপরোক্ত কাহিনীটি থেকে ভারতসমাজের যে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের কথা জানতে পারা যায়, এখানে তা এইরূপ —

বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ গত হওয়ার পর বেদবাদী পরিচালকেরা অধঃপতিত হয়ে যান। তখন স্বভাবতই দুরকম ব্যাপার ঘটে। একদিকে বৈদিক ব্যবস্থার ভেতরেই **নাগ**দের (আদি ধনীদের) জন্ম হয়ে যায়, অপরদিকে **কপিলাবস্তু**র বাড়-বাড়ন্ত হয়। **অর্জ্জুন** সক্রিয় হওয়ার পরে এদের কারও কারও সহায়তা গ্রহণ করেন। কারও কারও সাথে সাময়িক বিরোধিতাও ঘটে। এটি তারই একটি কাহিনী।

এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, ফারসি ভাষার 'ধ্রুপদী সাহিত্য' রূপে প্রতিষ্ঠিত ফিরদৌসীর 'শাহনামা'য় যে 'রুস্তম-সোহ্‌রাব'-এর কাহিনী আছে, তা **বভ্রুবাহন**-এর কাহিনীর সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়।

ভর (ভরণ, ভরপূর, ভরা, ভরাট, ভরাডুবি, ভরিত, ভার, ভারা, ভারী — আভরণ, কলাভারা, নির্ভর, সম্ভার) : **১.** ✓ভৃ + অ (অচ্) - *কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)।* **২.** **ভর** = **ভব** *রহে যাহাতে; অথবা,* **ভ** *(পরিপূর্ণকরণ বা পরিপূর্ণ সত্তা) রহে যাহাতে। (ভ বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য)।* **ভরণ** = **ভর** *অন (on) যাহাতে।* **ভরপুর** = *যাহা ভরিত ও পূরিত।* **ভরা** = **ভর**-*এর আধার যে।* **ভরাট** = **ভরা** *টঙ্কারিত যাহাতে।* **ভরাডুবি** = **ভরা** *(পণ্যে-ভরপূর নৌকা) ডোবে যে ঘটনায়।* **ভরিত** = **ভর** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* **ভার** = **ভর** *হইতে জাত।* **ভারা** = **ভার**-*এর আধার যে; যাহাতে* **ভার** *রাখা হয়।* **ভারী** = **ভার**-*এর গতিশীল আধার যে।* **আভরণ** = **ভরণ**-*এর আশ্রয় যাহাতে।* **কলাভারা** = *কলাগাছ দ্বারা যে* **ভারা** *নির্মিত হয়।* **নির্ভর** = *নির্গত* **ভর** *যাহাতে।* **সম্ভার** = *সম্যক* **ভার** *থাকে যাহাতে।* / **নির্ভর** = নিঃশেষে ভর যাহাতে। **ভারা** = ভারের আধার। (ব.শ.)। **৩.** **ভর** = অতিশয়, অতিমাত্র, নির্ভর, ভার, সমূহ, প্রাচুর্য্য, পরিমাণবিশেষ, কুড়ি তোলা, পূর্ণতা, ভরণ,

পোষণ; পুরা, ঠিক, ভরা, তৎকালব্যাপী, আশ্রয়, আরোহণ, তৎপরিমিত, তদবধি, তৎপর্যন্ত; পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা, প্রবেশ করান, পূরণার্থে নিহিত করা বা ঢালা, আচ্ছাদন করা ... ইত্যাদি। **ভরণ** = ভর্ত্তা, পালক, ধারক, পোষণ, পালন, ধারণ, পূরণ, গ্রাসাচ্ছাদনাদি, ভৃতি, বেতন, আভরণ। **ভরপুর** = কানায় কানায় পূর্ণ, পরিপূর্ণ, তন্ময়চিত্ত, আত্মহারা, সম্পূর্ণভাবে। **ভরা** = পূর্ণ, প্রৌঢ়, প্রবল, ভারপূর্ণ, বোঝাই, পোরা, ঠিক, পুরা, আবিষ্ট, অনুকূল বায়ুবেগযুক্ত, ভার, পণ্যরাশি, বোঝাই করা নৌকা, পণ্যের নৌকা, সম্ভৃত ধনরাশি, একবারে নৌকাদিতে বহনীয় ভার, ক্ষেপ। **ভরাট** = পূরণ, পূর্ত্তি। **ভরাডুবি** = পণ্যভারপূর্ণ নৌকাডুবি। **ভরিত** = 'জাতভর', পূরিত। **ভার** = গুরু দ্রব্য, গৌরব, অতিরেক, সমূহ, কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ ভার, বিংশতিতুলাপরিমাণ বা ২০০০ পল, ভারবহনার্থ যষ্টি, একজনের বাঁকে বহনীয় দ্রব্যসমূহ, অধিকার, কষ্টসাধ্য বা দুরূহ বিষয়। **ভারা** = মাচা, আড়-বাঁধা বাঁশ বা কাষ্ঠখণ্ড। **ভারী** = ভারবান, গুরু, ভারবাহী, ধারী, ভারবাহক, ভারযুক্ত, অত্যন্ত, গম্ভীর (মেজাজ), মোটা (স্বর), ফুলা। **আভরণ** = সম্যক ধারণ বা পোষণ, ভূষণ, অলঙ্কার, ভূষণবৎ প্রিয়বস্তু। **নির্ভর** = নিঃশেষে ভারযুক্ত, নিবিড়, গাঢ়, আকুল, তীব্র, পূর্ণ, পরিব্যাপ্ত, সমাবিষ্ট। **সম্ভার** = একত্র ধারণ, সংগৃহীত দ্রব্য, সাধন, ধন, সমূহ, ব্যঞ্জন সাঁৎলানর নিমিত্ত সম্ভৃত রন্ধনের মশলা, সাঁৎলান। (ব.শ.)। **৪. ভর, ভরণ, ভরপুর, ভরা, ভরাট, ভার, ভারা, ভারী, আভরণ, নির্ভর, সম্ভার** প্রভৃতি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **ভরাডুবি** শুধুমাত্র 'নৌকাডুবি' অর্থে প্রচলিত অর্থাৎ ভুল অর্থে প্রচলিত। **ভরিত** 'পূর্ণ করিত' অর্থে প্রচলিত কিন্তু 'পূর্ণ' অর্থে অপ্রচলিত। **কলাভারা** শব্দটি গ্রামবাংলায় কলাগাছের ভেলা অর্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. পুর**। যেখানে যে পরিমাণ **অভাব** থাকে, সেখানে সেই পরিমাণে শূন্যস্থান থাকে। তার মানে সেখানে **ভাব** থাকলে কোনো শূন্যস্থান থাকত না। তাহলে, যা দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ থাকে, তাকে **ভাব** বলা যায়। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি, **ভব** থেকে **ভাব** জাত হয়। তার মানে, **ভব** রহে যাহাতে, সেটিই **ভর**, সেটিই **ভাব**। তাতেই শূন্যস্থান **ভরে** ওঠে। তবে কিনা এই **ভরণ** স্থান-কাল-পাত্র পেরিয়ে প্রায় সর্বপ্রকারের ফাঁক **ভরে** দিয়ে তাদের অভাব পূর্ণ করতে পারে। 'মাঠ**ভর** ছুটে দৌড়ে দিন**ভর** খেলা করে ছেলেটা এইমাত্র **ভর**পেট খেয়ে শুয়েছে' — এধরনের কথা তো বাংলাভাষী অনায়াসে বলে থাকেন। এর উপর রয়েছে ভক্তি**ভর**, কুচ**ভর**, স্তন**ভর**, কোপ**ভর**, ছটাক**ভর**, সিকি**ভর**, নজর**ভর**, দম**ভর**, পেট**ভর**, ডাক**ভর**, হাঁক**ভর**, **ভর**দুপুর, **ভর**কাছারী ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই **ভরণ** যখন সক্রিয় হয়, তখন মন **ভরে**, পেট **ভরে**, বুক **ভরে**, কপাল **ভরে**, জগৎ **ভরে**, গা **ভরে**, ভুবন **ভরে** ... এবং কী **ভরে** না। আর, এইসব নানারকম **ভরণ**-এর আশ্রয় যে সত্তায়, তাকে বলে **আভরণ**। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' বলেছিল — মানুষের সারা গা 'টাক-পড়া', তাই তাদের **আভরণ** লাগে। আর, আইনশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ বলেন — আইন মানবমনের **আভরণ**। দ্র. **ভৃগু**।

এছাড়াও, **ভরণ**-এর ভর্তা, বেতন, গ্রাসাচ্ছাদনাদি থেকে শুরু করে **ভারী**র 'ভারী লজ্জা', 'রাশভারী মানুষ', 'ভারী গলা' ... ইত্যাদির দিকে নজর**ভর** তাকালেই **ভর**-এর বিশাল অদৃশ্য এলাকাটি পাঠকপাঠিকার চোখে পড়ে যাবে, সন্দেহ নাই। ...

গ্রামবাংলায় বন্যার সময় কলাগাছ জুড়ে যে ভেলা বানানো হয়, তাকে কলা**ভারা** বলে। তাতে **ভার**সমূহ রাখা হয় বলে তাকে **ভারা** বলে। যার উপরে আমরা **ভর** করি, যাতে **নির্ভর** করা যায়, সে হল আমাদের জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ ... ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলায় একে **ভরা** বা পণ্য**সম্ভার** বলা হত। যে নৌকায় সেই **ভরা** বা পণ্য**সম্ভার** বহন করে নিয়ে যাওয়া হত, তাকে বলা হত '**ভরার** নৌকা'। এই '**ভরার** নৌকা'র রমরমা ছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িক কলকাতার আশেপাশের নদীপথগুলিতে। সেসময় পর্তুগীজদের কোনো কোনো '**ভরার** নৌকা'য় বাংলার মেয়েদের ধরে এনে বিক্রি করা হত কলকাতায়। কলকাতাবাসী উচ্চবর্ণের দরিদ্র ব্যক্তিরা সেই মেয়ে কিনে আনত। তাদের বলা হত '**ভরার** মেয়ে'। তা নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে।

যাই হোক, পণ্যসম্ভার পরিপূর্ণ 'ভরার নৌকা' ডুবলে তাকে বলা হত **ভরাডুবি**। তাতে কেবল **পণ্যজীবী**র ক্ষতি হত না, মানবসমাজের সম্পদ নষ্ট হয়ে বিস্তর ক্ষতি হত। তাই **ভরাডুবি** শব্দটির ভিতরে 'বিস্তর ক্ষতি'র ব্যঞ্জনা ঢুকে পড়ে। সেই ব্যঞ্জনা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, তার একটি নিদর্শন হল বাংলাভাষী মায়েদের মুখে প্রচলিত ছড়া —

আয়রে আয় টিয়ে
না'য় **ভরা** দিয়ে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।

সমাজের প্রিয় দুটি সত্তা — শুক আর সারী। এদের যথাক্রমে টিয়া ও শালিক বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজের কর্মবীর যুবকদের টিয়া ও সদাব্যস্ত যুবতী ঘরণীদের শালিক বলা হত। সেই শালিক বলে — ও টিয়া, তুমি নৌকায় **ভরা** (পণ্যসম্ভার) নিয়ে এসো। কিন্তু সমাজের 'বোদাল' **মৎস্য** বা বোয়াল মাছ (অতি-চালাক ধূর্ত লোকেরা) সেই নৌকা নিয়ে পালায়, আর তাই দেখে দেখে সামাজিক ভোঁদড় (উদ্‌বিড়াল = থানা-পুলিস, যাদের ঐ বোয়াল মাছকে ধরার কথা ছিল) নাচানাচি করে, বোয়াল মাছকে ধরে না।

মনে রাখা ভাল, মধ্যযুগের থেকে এই **ভর, ভরণ** ... প্রভৃতি শব্দগুলির অধিকাংশের প্রচলন বেশি করে ব্যাপ্ত হলেও, এগুলির অদৃশ্য অর্থের প্রয়োগ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত রয়েছে।

ভরত : ১. ✓ভৃ + অত (অতচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভরণ** *তারিত যাহাতে; অথবা, পিতার পুত্র* **ভরণ** *করবার নীতি অনুসরণ করে যে; কিংবা* **ব্রহ্মজ্ঞানী**দের **ভরণ** *করবার নীতি অনুসরণ করে যে রাজা বা গোষ্ঠী।* **৩.** সঙ্গীতনাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ, নাট্যশাস্ত্র, নট, ক্ষেত্র, তন্তুবায়, শবর, অগ্নিবিশেষ, ভরতের গোত্রাপত্যগণ, ভরতের অপত্য। □ দৌষ্মন্তী সর্ব্বদমন (ইঁহার পিতা দুষ্মন্ত, মাতা শকুন্তলা, মারীচাশ্রমে প্রাণিদমন হেতু ইনি 'সর্ব্বদমন' এবং ভূপালন হেতু 'ভরত'। ইনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং কিরাত হূণ খশ ইত্যাদি ম্লেচ্ছগণ নিহত করেন। ইনি পুরুবংশীয়।) □

দশরথরাজের পুত্র (ইঁহার মাতা কৈকেয়ী, পত্নী মাণ্ডবী, পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল। ইনি পিতৃদত্ত রাজপদ অস্বীকার করিয়া রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় আনিবার নিমিত্ত চিত্রকূটে গমন করেন এবং রামপাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া নন্দিগ্রামে তপস্বিবেশে চতুর্দ্দশ বর্ষ রামপাদুকার সেবা করেন।) □ ঋষভদেবের পুত্র (ইঁহার মাতা জয়ন্তী, ইঁহার নামে এই বর্ষ 'ভারত' নামে খ্যাত। ইনি মহাযোগী ছিলেন। ইনি জন্মান্তরে 'জড়ভরত' নামে খ্যাত হন। (ব.শ.)।

(ক) ইনি সূর্যবংশীয় রাজা দশরথ ও তাঁর স্ত্রী কৈকেয়ীর পুত্র ও রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ... রাম বনগমন করলে ভরত তাঁর পাদুকাযুগল সিংহাসনে স্থাপন করে রামের নামে তাঁর দাস হয়ে নন্দীগ্রামে অবস্থানপূর্বক রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ... ইনি জনকরাজার ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীকে বিবাহ করেন। মাণ্ডবীর গর্ভে ভরতের দুই পুত্র হয় — দক্ষ (তক্ষ) ও পুষ্কল। ভরত এই দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধর্বরাজ শৈলুশের (শৈলুষ) সঙ্গে যুদ্ধ করে সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্বদেশ জয় করেন এবং এই দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করে দুই পুত্রকে দেন। তক্ষ যে রাজ্যের রাজা হন, সেই রাজ্যের নাম তক্ষশীলা এবং পুষ্কল যে রাজ্যের রাজা হন, তার নাম পুষ্কলবতী। ভরত ... সরযূসলিলে আত্মবিসর্জন করেন। (খ) নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা। ... (গ) চন্দ্রবংশীয় রাজা। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে এঁর জন্ম হয়। ... ইনি যমুনাতীরে একশত, সরস্বতীতীরে তিনশত এবং গঙ্গাতীরে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরে আবার সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র বাজপেয় যজ্ঞও ইনি সম্পন্ন করেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত এঁর বিবাহ হয়। বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ এঁর দ্বারাই পালিত হন। ... এঁরই নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। ভরতের নবম বংশধর কুরু এবং চতুর্দশ বংশধর শান্তনু এবং শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্রদের বংশধরগণ পাণ্ডব ও কৌরব নামে খ্যাত। (ঘ) ঋষভদেবের পুত্র। ইনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হয়ে ইনি বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন। এঁর স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র হয়। ... পুত্রদের রাজ্য দিয়ে ... ইনি তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ... এক মাতৃহীন মৃগের মায়ায় ... তপস্যা ত্যাগ করেন। ... পরজন্মে ইনি মৃগজন্ম লাভ করেন এবং জন্মান্তরে ব্রাহ্মণকুমার রূপে আবির্ভূত হন। তিনি লোকসঙ্গ থেকে বিবর্জিত হয়ে জড়বৎ বাস করতেন বলে এঁর নাম হয় 'জড়ভরত'। (পৌ.অ.)। দ্র. **তক্ষ**। **৪.** একমাত্র নাম রূপে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** শব্দার্থ অনুসারে **ভর** তারিত যাহাতে বা যাহার দ্বারা, সেইই **ভরত**। তার মানে, যাকে কেউ না কেউ **ভরণ**পোষণ করেছে, কিংবা যে অন্য কাউকে **ভরণ**পোষণ করে, তাকে **ভরত** বলে। মোট কথা, **ভরত** সত্তাটির ভিতরে **ভরণ** ক্রিয়া সক্রিয় থাকে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ইতিহাসে তিনজন **ভরত** জন্মলাভ করেছিলেন — **দুষ্মন্ত**পুত্র **ভরত**, **দশরথ**পুত্র **ভরত**, ও **ঋষভ**দেবের পুত্র **ভরত**। তাঁদের প্রথম ও শেষ জনের 'দুর্নাম' এই যে, তাঁর নামেই আমাদের দেশটির নাম **ভারতবর্ষ** হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, এঁরা **ভরণ**-এর নীতি অনুসরণ করতেন বলেই এঁদের নাম **ভরত**। আমরা দেখছি, তিনরকম **ভরণ**-নীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়েছিল — ক) পিতাই পুত্রের ভরণপোষণ করবে এই নীতি; যার ফলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে গিয়ে আমাদের আদিম সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছিল; খ) সমাজ ও তার রাষ্ট্রপরিচালক রাজা **ব্রহ্মজ্ঞানী**দের ভরণপোষণ করবে এই নীতি; যার ফলে আমাদের সমাজ প্রথমে 'সৎব্রাহ্মণ'দের পরিচালনায় এবং পরবর্তীকালে 'নামে-ব্রাহ্মণ'দের পরিচালনাধীনে চলে গিয়েছিল, যার উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ এখনও কমবেশি আছে; এবং গ) রাষ্ট্র তার আয়ের একটি অংশ উৎপাদনশীল জনসাধারণের জীবনধারণের ক্ষেত্রে যেটুকু অভাব পড়ে তা পূর্ণ করার জন্য বা প্রজাদের **ভরণ** করার জন্য খরচ করবে এই নীতি। অর্থাৎ **ভরত** বা **ভরতগণ** ভারত ইতিহাসের মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বাস্তবায়িত করেছিলেন। আমাদের প্রশ্ন ছিল, উপরোক্ত তিন **ভরত** প্রকৃতপক্ষে চারটি ঐতিহাসিক ভূমিকার কোন কোন ভূমিকা গ্রহণের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন?

ভারত নামটি কীভাবে হয়েছিল, সে বিষয়টি আমরা নিম্নে **ভারতবর্ষ** শব্দে ব্যাখ্যা করব। এখন আমরা বাকি তিনটি নীতি কোন **ভরতের** কীর্তি, তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। **দুষ্মন্ত** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর পুত্র **ভরতের** সময় থেকেই 'পিতাই পুত্রের **ভরণ**পোষণ করবে' — এই নীতি প্রচলিত হতে পেরেছিল। এই **ভরতের** মা শকুন্তলাই প্রথম দাবি করেছিলেন যে, পিতাই পুত্র**ভরণে**র দায়িত্ব নিক, কেননা, মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী সেই দায়িত্ব নিচ্ছে না। ফলে, শেষমেষ **দুষ্মন্ত** শকুন্তলার পুত্রকে **ভরণ** করেন। সেই পুত্রই যখন রাজা হল, তখন 'পিতাই পুত্রের **ভরণ**পোষণ করবে' — এই নীতি স্বভাবতই ঘোষিত হয়ে গেল। আর সে নীতিকে স্বীকৃতি দিতে সেই **ভরত**কেই **ভরণ**পোষণ করতে হয়েছিল **ভরদ্বাজ**কে। আর, **দশরথ**পুত্র **ভরত** থেকে আমরা জানতে পারি, তখন রাষ্ট্রীয় পুঁজির একটি অংশ **ভরণ**পোষণের জন্য খরচ করা হচ্ছে। তার মানে, বিষয়টি তার আগে থেকেই শুরু হয়ে থাকবে।

কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র **ব্রহ্মজ্ঞানী**দের **ভরণ**পোষণ করবে, এই নীতি কোন **ভরত**-এর দ্বারা প্রচলিত হতে পেরেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে প্রাচীন বিশ্বের সব সমাজই, দেখা যায়, তাদের জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশে রাজারা মুনিঋষিদের পরামর্শে চলতেন; আরব দেশগুলির রাজা-বাদশাহরা তাঁদের আউলিয়া-অম্বিয়াদের পরামর্শে চলতেন; ইউরোপের রাজারা তাঁদের সেন্ট-সাধুসন্তদের পরামর্শে চলতেন। স্বভাবতই সেই জ্ঞানীদের নানাভাবে উপঢৌকন দেওয়া হত, যদিও ঐ জ্ঞানীজনেরা ক্ষুধার অন্নটুকু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাঁরা ধনসম্পদ বিরোধী ছিলেন। এইসব দেখেশুনে মনে হয় একমাত্র **ঋষভ**দেবের পুত্র **ভরতের** হাতেই সম্ভবত এই কীর্তি হয়ে থাকবে এবং তা অতি প্রাচীনকালেই ঘটে থাকবে। তারপর থেকে তারই উত্তরাধিকার বিশ্বের সব দেশেই কমবেশি প্রচলিত থেকেছে। পরে পরে তা কলুষিতও হয়েছে। আমাদের দেশ যেহেতু 'ধর্ম্মসৃষ্টির দেশ', অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল, আমাদের ঐ উত্তরাধিকার সবচেয়ে বেশি এবং সেকারণেই এখানে সেই উত্তরাধিকার অনেক

বেশি স্পষ্ট।

তাছাড়া **ঋষভ**দেবের পুত্র **ভরতের** ক্ষেত্রে আমরা 'life from withdrawal' নীতিটির প্রয়োগ দেখতে পাই। এই নীতি পরবর্তীকালে আমরা কনফুসিয়াসের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম। এমনকি সমগ্র ভারত একসময় পিছোতে পিছোতে এক 'হীন অচল উদ্ভিদ্‌সুলভ জীবন' ধারণকেই তার জীবননীতি রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। সে ঘটনা চোখে পড়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসের। এ নিয়ে তাঁদের নানা কথা আছে। আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে সে সব বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা আছে।

ভরদ্বাজ (ভারদ্বাজ, ভারই, ভারুই) : ১. ✓ভৃ + শতৃ - কর্তৃবাচ্যে + দ্বি + ✓জন্ + ড - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। **২. ভরদ্বাজ** = *যাহার ভরণ দ্বিতীয় জনে করিয়াছে।* **ভারদ্বাজ** = **ভরদ্বাজ** *হইতে জাত।* **ভারই** = **ভার** *(ভর-জাত) গতিশীল যাহাতে।* **ভারুই** = **ভার** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **ভরদ্বাজ** = দ্বি অর্থাৎ উভয় ভ্রাতা হইতে জন্মিয়াছে যে; ভরৎ বাজ (পক্ষ) যাহার। (ছা.অ.) । **৩. ভরদ্বাজ** = মুনিবিশেষ (ইনি উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির বীর্য্যে জাত।), পক্ষিবিশেষ, ভারুই পক্ষী। (ব.শ.)। ... বৃহস্পতির পুত্র ও দ্রোণের পিতা। বেদের অনেক মন্ত্রের ইনি বক্তা। উতথ্য ঋষির স্ত্রী মমতার গর্ভিনী অবস্থায় তাঁর দেবর বৃহস্পতি তাঁর সঙ্গম প্রার্থনা করলে মমতা নিষেধ করেন। ... বৃহস্পতি বলপ্রয়োগ করলে গর্ভস্থ শিশু (দীর্ঘতমা) ... পদদ্বারা পিতৃব্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। ... তখন বৃহস্পতির বীর্য ভূমিতে পতিত হয়। ... তার থেকে যে পুত্রের (ভরদ্বাজের) জন্ম হয়, তাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব কে নেবে, তাই নিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে মমতার বিবাদ উপস্থিত হয়। ... উভয়ে সেই শিশুকে ত্যাগ করে চলে যান। তখন মরুদ্‌গণ এই শিশুকে পালন করেন। ... ইনি মরুদ্‌গণ কর্তৃক 'ভৃত' হয়েছিলেন বলে 'ভর' এবং দুইয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে 'দ্বাজ' (অর্থাৎ সঙ্কর)। ... একদিন গঙ্গায় স্নানকালে ঘৃতাচী অপ্সরাকে নগ্নাবস্থায় দেখে ভরদ্বাজের শুক্রপাত হয়। দ্রোণমধ্যে এই শুক্র রক্ষিত হলে এঁর এক পুত্র (দ্রোণাচার্য) জন্মগ্রহণ করে। (দেবীভাগবত অনুসারে) রৈভ্যের সঙ্গে এঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নষ্ট করলে রৈভ্য তাকে নিহত করেন। ... ভরদ্বাজ সবিশেষ না জেনে শাপ দেন যে, রৈভ্য বিনা অপরাধে পুত্র দ্বারা নিহত হবেন। পরে সমস্ত অবগত হয়ে নিজেই অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন এবং রৈভ্যের পুত্র অর্বাবসুর তপ-প্রভাবে পুনর্জীবিত হন। ... ইনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে এসে ঋষিদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। ... ভরতের পুত্র সম্ভাবনা বিতথ হলে, অর্থাৎ পুত্র হবার সম্ভাবনা না থাকলে, ইনি মরুৎস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে মরুদ্‌গণ প্রীত হয়ে ভরতকে এক পুত্র দান করেন। এই জন্য ভরদ্বাজের অন্য নাম 'বিতথ'। (পৌ.অ.)। **ভারদ্বাজ** = ভরদ্বাজপুত্র, দ্রোণাচার্য্য, অগস্ত্যমুনি, বৃহস্পতিপুত্র, ভরতপক্ষী। **ভারই, ভারুই** = পক্ষিবিশেষ; (সংস্কৃতে - ভরদ্বাজ)। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **উতথ্য, দীর্ঘতমা, দ্রোণ, পরাবসু, বুধ, বৃহস্পতি, ভরত**। গ্রামবাংলায় এখনও প্রবচনটির প্রচলন রয়েছে — এক হাতে তালি **বাজে** না। এক হাতের তালির ত্যক্ত শক্তি অন্য হাতে গিয়ে লাগলে, তবেই **বাজে**। আপনি একটি ঢিল ছুঁড়লেন, তা গিয়ে একটি কাঠে লাগল এবং **বাজল**। **বাজ** শব্দের মূলে এই দুইয়ের দ্বারা জাত **বাজকে** আমরা পেয়েছি। ছাত্রবোধ অভিধান বলছেন, 'ভরৎ বাজ যাহার' তিনিই **ভরদ্বাজ**। অর্থাৎ যার **ভরণ**পোষণে দ্বিতীয় পক্ষটি সক্রিয় হয়, তাকে **ভরদ্বাজ** বলে। সে কেমন ব্যাপার?

যার মা তাকে ফেলে চলে গেছে তাকে কে **ভরণ**পোষণ করবে? মায়ের থেকে শক্তিরূপে সন্তান প্রসূত হয়ে ঢিল-এর মতো ত্যক্ত হয়েছে, আর একজন তাতে ঠেকা না দিলে, সে তো বাঁচবে না! **বাজ**বে না। যে পাখির মা তার ডিম পেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়, এবং অগত্যা তার বাবা সেই ডিমে তা দিয়ে তাকে জন্ম দিয়ে **ভরণ**পোষণ করে, সেই পাখিকে বলে **ভরদ্বাজ** পাখি (বা **ভারই** বা **ভারুই** পাখি)। কিন্তু মানুষী তো ডিম পাড়ে না, সে সরাসরি সন্তান প্রসব করে। সেই মানুষী যদি তার সন্তান প্রসব করে তাকে ফেলে দিয়ে চলে যায়, তখন কী হয়?

একালের ঘটনা হলে আমরা বলতে পারতাম, তার ঔরসদাতা পিতাই তাকে **ভরণ**পোষণ করবেন; কোনো শিশুসন্তানের মা মারা গেলে তার বাবাই তাকে **ভরণ**পোষণ করেন। কিন্তু প্রাচীন যে কালে পিতার পিতারূপে স্বীকৃতি তখনও জোটেনি, জুটবে জুটবে করছে, অথচ মাতা তাঁর মাতারূপী স্বীকৃতি ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং করছেন, তখন? সেই '**সন্ধ্যা**কালে' বা যুগসন্ধিক্ষণে মানবশিশুটির **ভরণ**পোষণ করবে কে? অর্থাৎ, আমাদের সুপ্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যখন ক্রমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে এরকম বহু ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল; তখন সেই মাতা-পিতা উভয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুকে কে প্রতিপালন করেছিল?

উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, 'মরুৎগণ' তাদের **ভরণ**পোষণ করেছিল এবং সেকারণেই সেই মাতৃপিতৃ-পরিত্যক্ত সন্তাটির নাম হয়েছিল **ভরদ্বাজ**। কোনো কোনো পুরাণে বলা হয়েছে যে, **দুষ্মন্ত**পুত্র রাজা **ভরত** সেই মাতাপিতা-ত্যক্ত সত্তাকে **ভরণ**পোষণ করেছিলেন এবং সেকারণেই তার নাম **ভরদ্বাজ** হয়েছিল। আজ আমরা জেনেছি, দুটি কথাই ঠিক। কিন্তু কেন দুটি কথাই ঠিক, তার ব্যাখ্যা করার অবকাশ এখানে নেই, তাছাড়া তার প্রয়োজনও নেই এখানে। আমাদের জানা দরকার ছিল **ভরদ্বাজ**কে কেন **ভরদ্বাজ** বলা হয়। আমরা জানলাম, সে ছিল জননকালে ত্যক্ত এক সত্তা, যাকে রাজা বা মরুৎগণ **ভরণ**পোষণ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয়েছিল **ভরদ্বাজ**। ভারুই পাখিরও **ভরদ্বাজ** নাম সেকারণেই।

ভার (ভারত, ভারতী — ভার শব্দটি আগে একবার আছে, এবং **ভারত** শব্দটি পরে আবার থাকবে।**) : ১.** ✓ভৃ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভার** = **ভর** *হইতে জাত; অথবা,* **ভ**-*এর আধার রহে যাহাতে।* **ভারত** = **ভার** *তারণ করে যে।* **ভারতী** = **ভারত** *সক্রিয় বা গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে।* / **ভারতী** = ভরতমুনি কর্তৃক ইহলোকে অবতারিতা (যে)। (ব.শ.)। **৩. ভার** = গুরু দ্রব্য, গৌরব, অতিরেক ... ইত্যাদি। **ভারত** = ভরতসম্বন্ধী,

ভরতগোত্রাপত্যসম্বন্ধী, ভরতের গোত্রাপত্যমাত্র, জনমেজয়, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভারতযোদ্ধৃকৃতসংগ্রাম, ভরতমুনিসম্বন্ধী, অগ্নি, ভারতবর্ষবাসী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ভরতবংশীয়বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ, মহাভারত, ভরতের নামানুসারে খ্যাত বর্ষ, ভারতবর্ষ। **ভারতী** = ভারতসম্বন্ধিনী, ভাষা, বাণী, বচন, ভাষাধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী, ভরতপ্রযুক্তা সংস্কৃতবাক্যযুক্তা বাক্প্রধানা বৃত্তি, ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকের নাম, নাট্যকলা, পক্ষীভেদ, ভারুই (?)। (ব.শ.)। ৪. India অর্থে প্রচলিত। **৫. ভরত** থেকে জাত **ভারত**। তার মানে, **ভরত**-সম্বন্ধিত যে কোনো বিষয় বা ব্যাপারই **ভারত**-পদবাচ্য হতে পারে। তাই ভরতসম্বন্ধী, ভরতগোত্রাপত্যসম্বন্ধী, ভরতের গোত্রাপত্য-মাত্র, ভারতযোদ্ধৃকৃতসংগ্রাম, ভরতমুনিসম্বন্ধী, ভারতবর্ষবাসী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ভরতবংশীয়বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ, মহাভারত — এদের প্রত্যেককে **ভারত** বলা যেতেই পারে। কিন্তু 'জনমেজয়, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, অগ্নি'কে **ভারত** বলা হত কেন?

সহজ করে বললে 'যেখানে আন্দোলন জন্মায়', তাকে **জনমেজয়**; যে উঠতি পুঁজিবাদ শুরুতেই জননহীনতার শাপগ্রস্ত তাকে **পাণ্ডু**; লক্ষ্মীমন্ত পুঁজিবাদের **ধম্মই যুধিষ্ঠির**; এবং শুক্র অর্থ **অর্জ্জন**কারীই **অর্জ্জুন**; এবং সর্বোপরি তেজই **অগ্নি**। যতদূর বোঝা যায়, **ভরত** সত্তার ক্রমবিকাশ এই পাঁচটি সত্তার জন্ম দিয়েছিল। হয়তো সেকারণেই এদের **ভারত** বলা হয়ে থাকবে। তবে যে কারণেই সেরকম বলা হোক না কেন, সেকালের শব্দবিদগণ যে এই পাঁচটি সত্তাকেও **ভারত** বলে মনে করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আর, ব.শ. সেকথাই আমাদের জানিয়ে গেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, তাঁরা আমাদের এই দেশটিকে 'ভরতের নামানুসারে খ্যাত বর্ষ' বা '**ভারতবর্ষ**' নাম দিতে গেলেন কেন? এর উত্তরের জন্য নিম্নে **ভারতবর্ষ** দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষ : **২. ভারত**গণের **বর্ষ**; *অর্থাৎ,* **ভরত** *(ভরণ তারিত যাহাতে) যে* **বর্ষে**র *সমাজ পরিচালনা করে বা শাসন করে বা রাজত্ব করে; অথবা, যে দেশে (সমাজে)* **ভরণ**নীতি *প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।* **৩.** ভারত নামক বর্ষভেদ। (ব.শ.)। ৪. Indian subcontinent অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **জম্বুখণ্ড, তুর্কী, বর্ষ, ব্রহ্মাত্র**। বর্তমানে আমাদের দেশের **নাম** সরকারিভাবে **ভারতবর্ষ** নয়; ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ছিল। রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত রচিত গ্রন্থাদিতে আমাদের দেশটিকে বোঝাতে **ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয়** ... প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হত, এখনও জনসাধারণ্যে তা কমবেশি হয়ে থাকে; আর পুরাণাদিতে তো সেরকম প্রয়োগ হতই। এমনকি, লোকে এখনও বলে ফেলে 'আমাদের দেশের নাম **ভারতবর্ষ**'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে **ভারতবর্ষ** নামে কোনো দেশ এখন আর নাই। বর্তমান ভারতের সংবিধানে 'আমাদের দেশের নাম ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' কথাটি লেখা রয়েছে, **ভারতবর্ষ** লেখা নেই। অর্থাৎ ভারতের সংবিধান অনুসারেই আমাদের দেশের নাম এখন আর 'ভারতবর্ষ' নয়, শুধুই 'ভারত'। তার মানে, আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণই **ভারতবর্ষে**র লেজ কেটে বাদ দিয়ে তাকে **ভারত** করে দিয়েছেন; ইংল্যান্ড আমেরিকা করেনি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের সংবিধান-প্রণেতারাই বা ঐ কুকর্মটি (?) করতে গেলেন কেন?

তার কারণ, এ হল কালের অভিশাপ, ইতিহাসের মার। এ মার খাওয়ার ভবিতব্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের, তাই খেতে হয়েছে। ইতিহাসের মারেই আমরা আমাদের ভাষার মর্মার্থ ভুলেছি, শব্দের মানে বোঝার কৃৎকৌশল হারিয়েছি, বেদপুরাণাদির অর্থ নিষ্কাশন করতে ভুলেছি, এবং স্বভাবতই **ভারত** ও **বর্ষ** শব্দের মানেও ভুলেছি। সংবিধান প্রণেতারা তো এই অভিশাপের বাইরে নন। ফলে, এরকম নানা কুকর্ম আমাদের অনেকের হাত দিয়ে ঘটে গেছে, তাঁদের হাত দিয়েও ঘটেছে। কিছুকালের জন্য অতীত-বিস্মরণের ভবিতব্য ছিল আমাদের। সেই ভবিতব্য কেউই এড়াতে পারেননি, আমাদের সংবিধান প্রণেতারাও পারেননি। ...

তা সে যাই হোক, আজ আমাদের সে দুঃখের দিন গত হতে চলেছে, শাপমুক্তি ঘটতে চলেছে। পরমাপ্রকৃতির অশেষ কৃপায় আমরা আমাদের অতীতকে ফিরে পেতে শুরু করেছি, আমাদের ভাষার শব্দসম্ভারের অর্থ উদ্ধার করবার উপায় খুঁজে পাচ্ছি। তাই আজ আমাদের আনন্দের দিন, তাই আজ আমরা কারও উপর কোনো দোষারোপ করব না। কালের অভিশাপের কারণে সবাই দোষ করেছিলাম, শাপমুক্তির কারণে সবাই আজ দোষমুক্ত হব, অতীতের সম্পদ পুনরুদ্ধার করার কাজে সবাই আত্মনিয়োগ করব। আজ আমরা জানব **ভারত** শব্দের মানে কী ছিল, **বর্ষ** শব্দের মানে কী ছিল এবং কেন আমাদের দেশটিকে **ভারতবর্ষ** বলা হত।

কী কারণে আরও অনেকগুলি সমাজগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সামাজিক গোষ্ঠীর নাম **বর্ষ** হয়েছিল, **বর্ষ** শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করতে গিয়ে সেকথা আমরা বিস্তারিতভাবে জেনেছি। এখন উপরোক্ত **ভরত**-বিষয়ক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, দুজন **ভরত**-এর নামানুসারে আমাদের এই **বর্ষে**র নাম **ভারতবর্ষ** হয়েছিল। কিন্তু কেন? আরও তো বহু বড় বড় মহর্ষি রাজপুরুষ জন্মেছিলেন আমাদের দেশে। তাদের নামে আমাদের দেশের নাম না রেখে শুধুমাত্র দুই **ভরত**-এর নামে আমাদের দেশের নাম রাখা হল কেন?

একালে কারও নামানুসারে কোনো স্থানের **নাম** রাখার সঙ্গে স্থানটির স্বভাবের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকে না। আধুনিক ও প্রতীকী ভাষার সেটাই নিয়ম। প্রাচীন কালে কিন্তু সেরকম ছিল না। কোনো স্থানের নাম 'ক'-বাবুর নামানুসারে রাখার দরকার হত তখনই যখন সেই স্থানটির স্বভাব 'ক'-বাবুর স্বভাবের মতো হয়ে গেছে ব'লে লোকে বুঝতে পারত, দেখতে পেত। সত্তার একটি নাম থাকবে কিন্তু সেই নামের অর্থের সঙ্গে সত্তাটির স্বভাবের মিল থাকবে না — এরকম অবাস্তব নীতির কথা সেকালের মানুষ ভাবতেও পারতেন না। আমাদের ধারণা, বিশ্বের সকল দেশের সকল প্রাচীন নামের ক্ষেত্রে এই কথা একশো ভাগ সত্য।

সুদূর অতীতে বিশ্বের সকল দেশই মাতৃতান্ত্রিক ছিল। তার মধ্যে আমাদের দেশেই সর্বাগ্রে 'পিতাই পুত্রের **ভরণ**পোষণ করবেন' — এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যে ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, সেই পর্যন্ত **ভারতবর্ষ** রূপে ঘোষিত হয়ে যায়। সেই বিচারে আমাদের **ভারতবর্ষ**ই বিশ্বের প্রথম পিতৃতান্ত্রিক দেশ। তথ্যানুসারে, এটি **দুষ্মন্ত**পুত্র **ভরত** সত্তার কীর্তি।

দেখাদেখি পরবর্তীকালে বাকি বিশ্বেও পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু বাকি বিশ্ব সে নাম আর পায়নি।

সুদূর অতীতে বিশ্বের সকল সমাজই পরিচালিত হত তাদের নিজ নিজ জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা। কিন্তু আমাদের সমাজই সর্বাগ্রে বুঝতে পেরেছিল যে, এই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সমাজ-পরিচালন নীতিটিকে সচেতনভাবে অনুসরণ না করলে সমাজের যথাযথ অগ্রগতি ঘটে না, ঘটবে না; সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হবে। সেই কারণে আমাদের সমাজ তার শ্রেষ্ঠ সন্তানস্বরূপ জ্ঞানীগুণীদের **ভরণ**পোষণ করবে, এই নীতি আমাদের জনসমাজ সচেতনভাবে গ্রহণ করে নেয়। ফলত, আমাদের এই দেশেই সর্বাগ্রে **ব্রহ্মজ্ঞানী**দের **ভরণ**পোষণ করা, তাঁদের মানস**ভূমি** ও বাহ্য**ভূমি** দান করা সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই কারণেও এই **বর্ষে**র নাম হয়ে যায় **ভারতবর্ষ**। এটি **ঋষভ**দেবের পুত্র **ভরত**সত্তার কীর্তি। ...

তাহলে **ভারতবর্ষ** শব্দের অর্থ কী? যে **বর্ষে** 'পিতার পুত্র**ভরণ** নীতি' এবং শাসকের '**ব্রহ্মজ্ঞানী-ভরণ** নীতি' প্রতিষ্ঠিত, সেই **বর্ষ**কে **ভারতবর্ষ** বলে। আর, যে দেশে ও সমাজে জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ ... ইত্যাদি প্রতি **বর্ষে** (বছরে) **বার্ষি**ক বারি**বর্ষণ**-এর মতো পরিকল্পিতভাবে **বর্ষিত** হয়, সেই দেশ ও সমাজব্যবস্থাটিকে একটি **বর্ষ** বলে। দ্র. **বর্ষ**।

ভার্য্যা (ভার্য্যাট, ভার্য্যোঢ়) : ১. ✓ভৃ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২. ভার্য্যা** = **ভার** *(**ভর** হইতে জাত) যায় যে আধারে; অথবা, ভরণপোষণ (ব্যয়) যায় যাহাতে, তাহার আধার; কিংবা, যাহাকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক আনিয়া ভরণপোষণ করা হইয়া থাকে।* **ভার্য্যাট** = *ভার্য্যা টঙ্কারিত যাহাতে।* **ভার্য্যোঢ়** = *ভার্য্যা উঢ়া যাহাতে।* / **ভার্য্যাট** = যে জীবিকার্থ পরপুরুষে ভার্য্যাকে গমন করায়। **ভার্য্যোঢ়** = ঊঢ়া ভার্য্যা যাহা কর্ত্তৃক। (ব.শ.)। **৩. ভার্য্যা** = বিধিপূর্ব্বক পরিণীতা নারী, পত্নী, স্ত্রী, তির্য্যগ্‌জাতি-স্ত্রী। **ভার্য্যা** = অন্যকে স্বস্ত্রী-দাতা। **ভার্য্যোঢ়** = স্বীকৃত-ভার্য্য, কৃতপরিণয়। (ব.শ.)। **৪.** wife অর্থে **ভার্য্যা** কমবেশি প্রচলিত; বাকি শব্দ দুটি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **জায়া**। (কাশীরাম দাশের মহাভারত অনুসারে — 'পুত্ররূপে জন্মে লোক **ভার্য্যা**র উদরে। তেকারণে **জায়া** বলি বলয়ে **ভার্য্যা**রে।।') একালে শহরাঞ্চলে **ভার্য্যাট**-এর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত সেই শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা ধনসম্পদ আহরণকেই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের চিহ্নিত করবার কোনো শব্দ আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ শব্দটি আমাদের ছিল। শব্দটি আমরা হারিয়েছি। ফলে, চোখের সামনে একটি ঘটনা চলা সত্ত্বেও তা বলবার মতো কথা এখন আমাদের নেই। একালের কবি-সাহিত্যিকগণ চাইলে শব্দটির পুনঃপ্রচলন ঘটাতে পারেন।

ভৃগু (ভৃগুজ, ভৃগুতনয়, ভৃগুনন্দ, ভৃগুবার, ভৃগুবাসর, ভৃগুসুত, ভৃগুসুনু — ভৃগুনন্দ, ভৃগুপতি, ভৃগুরাম, ভৃগুশার্দ্দুল, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, ভৃগুসত্তম — ভৃগুসংহিতা, ভার্গব) : ১. ✓ভ্রস্জ্ + উ (কু) - কর্ত্তৃবাচ্যে। ভৃগ্ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২. ভৃগু** = *ভবের আবর্ত্তনমূলক গমন নবরূপে **উত্তীর্ণ** যাহাতে; অর্থাৎ ভরণের জন্য গমনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে।* **ভার্গব** = **ভৃগু**-*সত্তাকে (ভৃগুনীতি ও ভৃগুকর্ম্মকে) বহন করে যে।* **৩. ভৃগু** = ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার হৃদয় হইতে নিঃসৃত, মতান্তরে, ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে ইঁহার জন্ম। কর্দ্দমকন্যা খ্যাতি ইঁহার পত্নী, ধাতা বিধাতা ইঁহার পুত্র। ইনি ভৃগুবংশের আদিপুরুষ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ... কাহার পূজা প্রশস্ত, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ ইনি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মার সম্মান করেন নাই। ব্রহ্মা কুপিত হইলে, তাঁহার ক্রোধশান্তি করিয়া ইনি শিবের নিকটে গমন করেন। ভৃগুঋষির অবিনয়দর্শনে শিব কুপিত হইয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া ইনি গোলোকে উপস্থিত হন এবং নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে জাগরিত হইয়া বিষ্ণু, 'আঘাতে পদ ব্যথিত হইয়াছে' বলিয়া ইঁহার পদসেবা করেন। তখন ইনি, বিষ্ণুর কোনো ক্রোধের লক্ষণ না দেখিয়া তাদৃশ ভৃত্যোচিত ব্যবহারে স্থির করিলেন, 'বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুপূজাই প্রশস্ত'। তদবধি এই ভৃগুপদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষোভূষা। পুরাণে ইহা 'শ্রীবৎসচিহ্ন'। (ব.শ.)।

ইনি দক্ষযজ্ঞে দক্ষের সহযোগী। ইনি যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি। প্রাচীন একজন শ্রদ্ধাপতি ও মহর্ষি। ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে জমদগ্নি ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। ... বহ্মার বরুণযজ্ঞের যজ্ঞাগ্নি থেকে ভৃগুর জন্ম হয়। ... ভৃগুর স্ত্রী পুলোমার গর্ভে চ্যবনের জন্ম হয়। প্রমতি ভৃগুর পৌত্র রুরুর প্রপৌত্র। ... স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় একদিন ভৃগু স্নানার্থে অনুপস্থিত থাকায়, পুলোমা নামধারী এক রাক্ষস ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করে। ... ভৃগুর হোমগৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে সম্বোধন করে রাক্ষস বলে, 'তুমি দেবগণের মুখ। সত্য বলো, এই পুলোমা কার স্ত্রী? এই সুন্দরীকে পূর্বে আমি স্ত্রীরূপে বরণ করেছিলাম; কিন্তু ভৃগু অন্যায় ভাবে এঁকে গ্রহণ করেছেন। এখন আমি এঁকে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই।' অগ্নি ভীত হয়ে বললেন, 'তুমি পূর্বে সত্যই এই পুলোমাকে বরণ করেছিলে; কিন্তু যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ করনি; পুলোমার পিতা বরলাভের আশায় ভৃগুকেই কন্যাদান করেছিলেন।' তখন রাক্ষস বরাহরূপ ধারণ করে পুলোমাকে হরণ করে মহাবেগে প্রস্থান করলে, পুলোমার সন্তান গর্ভচ্যুত হওয়ায় তার নাম হয় চ্যবন। সূর্য্যতুল্য তেজোময় এই শিশুকে দেখেই রাক্ষস ভস্মীভূত হয়। ... ভৃগু তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার পরিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল?' পুলোমা বললেন, 'অগ্নি আমার পরিচয় দিয়েছিলেন।' তখন ভৃগু সরোষে অগ্নিকে শাপ দিলেন, 'তুমি সর্বভুক হবে।' ... বিষ্ণুপুরাণ মতে, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মনুসংহিতা (ভৃগুসংহিতা) মতে, ইনি দশ জন প্রজাপতির অন্যতম। কর্দম কন্যা খ্যাতি এঁর স্ত্রী। এই খ্যাতির গর্ভজাত দুই পুত্রের নাম ধাতা ও বিধাতা। খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীও জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগু সপ্তর্ষিদের একজন। প্রতিদিন তর্পণ করার সময় ভৃগুর উদ্দেশেও তর্পণ করতে হয়। ভৃগু ধনুর্বেদ বিদ্যার প্রবর্তক।

ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু — এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ — মুনিঋষিরা এর মীমাংসার জন্য ভৃগুকে ব্রহ্মা ও শিবের নিকট প্রেরণ করেন। ... তিনি তাঁদের অসম্মান করলে তাঁরা ক্রুদ্ধ ... ... বিষ্ণুর এই বিনয় দেখে ভৃগু স্থির করেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। ... তদবধি ভৃগু-

পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষে চিহ্নিত আছে। (পৌ.অ.)। **ভৃগু** = ভৃগুর গোত্রাপত্যগণ, শুক্রাচার্য্য, শুক্রগ্রহ, জমদগ্নি, পরশুরাম, মহাদেব, গিরিসানু, অবলম্বনস্থানহীন পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ, প্রপাত, অতট। **ভৃগুজ, ভৃগুতনয়, ভৃগুনন্দ, ভৃগুসুত, ভৃগুসুনু** = শুক্রাচার্য্য। **ভৃগুবার, ভৃগুবাসর** = শুক্রগ্রহ, শুক্রবার। **ভৃগুনন্দ, ভৃগুপতি, ভৃগুরাম, ভৃগুশার্দ্দূল, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, ভৃগুসত্তম** = পরশুরাম। **ভৃগুসংহিতা** = মনুসংহিতা। **ভার্গব** = ভৃগুসম্বন্ধী, ভৃগুবংশজাত, ভৃগু হইতে আগত বা প্রাপ্ত (বিদ্যা), ভৃগুর গোত্রাপত্য ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নিসাক্ষী, চ্যবন, পুলোমা, বার**। প্রথমে **ভৃগু** শব্দের নিহিতার্থ কী, সে কথাই হোক।

কালের হিসেবে সত্তার অভাব তিনরকমের হয় — দৈনিক, বাৎসরিক, সমগ্র জৈবনিক। স্বভাবতই অভাবপূরণ বা **ভরণ**ও তিনরকম ভাবে চলে (গমন করে)। এই **ভরণ**-গমনকে বলে **ভৃগ** (দ্র. **ভৃঙ্গ**)। সেই গমন যদি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়, বিধিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে **ভৃগু** বলে। তদ্রূপ **ভরণ**-গমনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে, বিধিবদ্ধ বা নিয়মবদ্ধ করে যে, তাকেও **ভৃগু** বলে। তার মানে বিধানসিদ্ধ **ভৃঙ্গকর্ম্ম**কে **ভৃগু** বলে এবং তদ্রূপ **কর্ম্ম** যে করে তাকেও **ভৃগু** বলে। অতএব **ভৃগু** শব্দটির অর্থে আমরা বুঝব — **ভৃগু** = বিধিবদ্ধ ভরণনীতি; যিনি সে নীতির প্রচলন করেছিলেন। এ হল **ভৃগু** শব্দের অদৃশ্য অর্থ। সাদৃশ্যে একে মানুষের টাক-পড়া গা, গিরিসানু, অবলম্বনহীন **পর্ব্বতে**র উচ্চপ্রদেশ, প্রপাত, অতট ইত্যাদি বলা যেতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাত্যহিক বাৎসরিক ও সমগ্র জৈবনিক অভাবপূরণের জন্য আমরা যে প্রাত্যহিক বাৎসরিক ও সমগ্র জৈবনিক **ভরণ**কার্য করে থাকি, তা যদি বিধিবদ্ধ নিয়মে করা হয়ে থাকে, তাহলেই **ভৃগুকর্ম্ম** করা হয়ে থাকে। জীবজগতের প্রতিটি জীবকেই নিজ নিজ **ভরণকর্ম্ম** (**ভৃগ**কর্ম্ম বা **ভৃঙ্গ**কর্ম্ম) করতে হয় এবং তা তারা করে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মেই। আদিম মানুষও তাই করত, তথাকথিত সভ্যতার দ্বারা যে 'বন্য, অসভ্য' মানুষেরা আজও কলুষিত হয়নি, তারা এখনও তাদের **ভরণা**দি সেভাবেই করে। কিন্তু **দক্ষ**যজ্ঞের মাধ্যমে সভ্যযুগের প্রতিষ্ঠার পর ভারত সমাজের সদস্যদের জন্য এইরকম প্রাত্যহিক বাৎসরিক ও সমগ্র জৈবনিক **ভরণকর্ম্মে**র স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক রীতিনীতিগুলিকে বিধিবদ্ধ করে ফেলা হয়। আর তা করা হয়েছিল যে নিয়মাদির মাধ্যমে তাকে **ভৃগু**রচিত **ভৃগুসংহিতা** বলা হয়ে থাকে। এরই অপর নাম **মনুসংহিতা**। জেনে রাখা ভাল, এটিই বিশ্বের আদি আইনশাস্ত্রও বটে। বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত আইনশাস্ত্র রচিত হয়েছে, সে সবই রচিত হয়েছে **ভৃগুসংহিতা**র পরে এবং অনেকাংশে এই গ্রন্থের অনুসরণ করেই। দ্র. **জীমূতবাহন, জন্তু**।

সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে হলে সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের 'আবরণ' প্রবন্ধটি পড়ে নেওয়া ভাল। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের গায়ের চামড়া যেখানে যেখানে খোলা থাকে — যথা, মুখ ও হাত পা — সেই সেই স্থান অনেক বেশি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক থাকে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার সঙ্গে, আলো-ধুলোর সঙ্গে সে অনায়াসে লড়ে নিতে পারে, সবচেয়ে সহজে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যে যে স্থান **আভরণে** আবৃত থাকে, সেই সেই স্থান প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে পারে না, নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে না, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বিরোধ লেগেই থাকে। আর, মানবশরীরের এই **আভরণ**-সমস্যার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা হল মানবমনের **আভরণ**-সমস্যা। আমাদের সমাজ মানবশিশুকে জামাজুতো পরিয়ে যেমন তার শরীরকে অস্বাভাবিক করতে শুরু করে দেয়, তেমনি বইখাতা ধরিয়ে দিয়ে মানবশিশুর মনকেও অস্বাভাবিক করতে শুরু করে দেয়। ক্রমে সেই মানবশিশুর শরীর ও মন দুটিই আর স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক থাকে না; অস্বাভাবিক হয়ে যায়। কীভাবে কতখানি হয়, রবীন্দ্রনাথ তো সেকথা ঐ প্রবন্ধে লিখেই গেছেন, আমরাও ইতোপূর্বে **গৃহ, ঘর** ও **আভরণ** শব্দে জেনেছি, যে, আদিতে মানুষের শরীর ও মনকে ঢেকে রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, থাকে না। **দক্ষ**যজ্ঞের পর তার ঘনিষ্ঠ সমর্থক **ভৃগু**-সত্তাই মানুষের মনের **আভরণ** বয়ন করেন। একেই মানবসভ্যতার আদি আইনশাস্ত্র বলে। সেই কারণে **ভৃগু**কে **ধনুর্ব্বেদ** বিশারদ বলা হয়ে থাকে। দ্র. **ধনুঃ**। বলে রাখা ভাল, **ভৃগুরামে**র বা **পরশুরামে**র ধনু বা আইনকে ভঙ্গ করেছিলেন রামচন্দ্র। ...

ভারতের ইতিহাসে এক **ভৃগু** সত্তাকে পাই **পুলোমা**র সঙ্গে বিরোধের ভূমিকায়। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বিবাহরীতি অনুসরণ করে **পুলোমা** ঠিক কাজই করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষে **অগ্নিসাক্ষী** ছিল। **ভৃগু** তৎকালের দৃষ্টিতে ছিলেন নতুন পিতৃতান্ত্রিক বিবাহবিধির পক্ষে এবং স্বভাবতই তিনি ছিলেন তৎকালের প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক বিবাহের আইন-ভঙ্গকারী। তিনি প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে **পুলোমা** গোষ্ঠীর নারীকে বিবাহ করেছিলেন। এই **ভৃগু** সত্তাই **দক্ষযজ্ঞে**র প্রধান সমর্থক। স্বভাবতই ভারতসমাজে **দক্ষের** প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর **ভৃগু** সত্তার বিপুল বিকাশ ঘটে, **ভার্গবে**রা ভারতসমাজের সদস্যদের জীবনকে বিধিবদ্ধ আইনে আবদ্ধ করে ফেলে। এঁদের মধ্যে **দক্ষ**-সভ্যতার বা বৈদিক সভ্যতার রীতিনীতির অন্যতম ধারক রূপে যেমন **শুক্রাচার্য্য**ই মুখ্য ভূমিকা নেন, অপরদিকে যাঁরা সেই রীতিনীতি ভঙ্গ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুখ্য ভূমিকা নেন আরেক **ভার্গব — পরশুরাম**।

ভৃঙ্গ (ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গী) : ১. √ভৃ + গ (গন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভৃঙ্গ** = *ভবের আবর্ত্তনের জন্য গমন করে যে; অর্থাৎ, যে (তার কলসে মধু) ভরিতে যায়।* **ভৃঙ্গরাজ** = *ভৃঙ্গগণের রাজা যে।* **ভৃঙ্গার** = *ভৃঙ্গ-এর আধার রহে যাহাতে।* **ভৃঙ্গী** = *ভৃঙ্গ-এর সক্রিয় বা গতিশীল আধার যে।* / **ভৃঙ্গ** = মধু গ্রহণ করে যে। **ভৃঙ্গরাজ** = ভৃঙ্গের রাজা। (ব.শ.)। **৩. ভৃঙ্গ** = মধুকর, ভ্রমর, ভৃঙ্গরোল, ভিমরুল, ভৃঙ্গরাজ, ভিমরাজ পাখী, কামুক, কেশরাজ, কেশুরিয়া গাছ, ভৃঙ্গার, গুড়ূচী। **ভৃঙ্গরাজ** = ভ্রমর, কৃষ্ণবর্ণ-পক্ষিবিশেষ, ভিমরাজ, কেশরাজ, কেশুরিয়া গাছ, যজ্ঞবিশেষ। **ভৃঙ্গার** = বর্ণময় জলপাত্রভেদ, ভদ্রকুম্ভ, জলপাত্রভেদ, রাজাভিষেক-পাত্রভেদ, সুবর্ণ। **ভৃঙ্গী** = ভ্রমরী, মধুকরী, অতিবিষা, শিবানুচরভেদ। (ব.শ.)। নন্দীর মুখ ছাগলের। শিবের প্রিয় অনুচর। অন্ধকারাসুর মহাদেবের বরে ভৃঙ্গী নামে তাঁর অনুচর হন। ভৃঙ্গী একবার শিবানীর বিরাগভাজন হয়ে বানর-মুখ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (পৌ.অ.)। **৪. ভৃঙ্গরাজ** শব্দটি

তেলের নামরূপে প্রচলিত। **নন্দী-ভৃঙ্গী** শব্দটি একালে **চামচা-বেলচা** রূপে পরিণত হলেও, অনেকে এখনও একই অর্থে **নন্দী-ভৃঙ্গী** শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। **ভৃঙ্গ** অপ্রচলিত। এখনও কোনো কোনো ধনী মুসলমানের বাড়িতে **ভৃঙ্গার** নামে গাড়ুর মতো সুন্দর বর্ণময় ছোট জলপাত্র দেখতে পাওয়া যায়। **৫.** দ্র. **ভৃগু**। লক্ষণীয় যে, মানবসমাজে **দক্ষের** প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা যে **ছাগ** ও **বানর**কে পাই, তার আদিরূপ **শিব**-পরিচালিত সমাজেও ছিল। তাদের একদল (**নন্দী**) **শিবের** নিকট থেকে আবিষ্কৃত বিদ্যা জেনে নিয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করেই 'আনন্দে' কর্ম করত এবং অন্যদল কর্মফল আনয়ন করত। কিন্তু তাই বলে শিবকে বাদ দিয়ে নন্দীর বা 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী'দের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়নি। এই কর্মফল সংগ্রহকারী **ভৃঙ্গী**দের সাদৃশ্যে জীবজগতের 'ভ্রমর, কেশুরিয়া গাছ, ভৃঙ্গরাজ তেল ... ইত্যাদি'কে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ভ্রমর মধু সংগ্রহ করে আনে (দ্র. **মণ্ডল**) , এই কেশুরিয়া গাছের তেল আমাদের ব্যক্তিমালিকানার **কেশ**কে শক্তপোক্ত হতে সাহায্য করে, অথচ এই আদি **ভৃঙ্গি** যে সমাজদেহের **কেশ**কে শক্তপোক্ত করত, সেকথা আমরা মনে রাখিনি। তাছাড়া, ব্যক্তিদেহের **কেশ**-এর তুলনায় সমাজদেহের **কেশ** শক্তপোক্ত করার কথা তো **ভৃঙ্গরাজের**ই। সে কেশ এখনও যথেষ্ট শক্তপোক্ত বলেই না লোকে অরণ্য-পাহাড়-সমুদ্র বেচে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করছে! অর্থাৎ, আমরা সাদৃশ্য অর্থটি খানিকটা মনে রেখেছি, অদৃশ্য অর্থগুলি ভুলেছি।

ভৃত (ভৃতক, ভৃতকাধ্যয়ন, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপন, ভৃতকাধ্যাপিত, ভৃতি, ভৃতিভুক, ভৃতিভুজ, ভৃত্য — প্রভৃতি, ইত্যাদি, প্রমুখ) : **১.** ✓ভৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **ভৃত** = *ভরণ তারিত যাহাতে।* **ভৃতক** = **ভৃত** *করে যে।* **ভৃতকাধ্যয়ন** = *যাহাতে* **ভৃতকের** *নিকট অধ্যয়ন থাকে।* **ভৃতকাধ্যাপক** = *যে-***ভৃতক** *অধ্যাপনা করেন।* **ভৃতকাধ্যাপন** = **ভৃতকের** *অধ্যাপন যাহাতে।* **ভৃতকাধ্যাপিত** = **ভৃতকের** *নিকট অধ্যাপিত যে; অর্থাৎ, যে ব্যক্তি* **ভৃতকের** *নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে।* **ভৃতি** = **ভৃত** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* **ভৃতিভুক** = **ভৃতি** *(বেতন) খায় যে।* **ভৃতিভুজ** = **ভৃতি** *(বেতন) ভোজন করে যে।* **ভৃত্য** = **ভৃত** *থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে ভরণ করিতে হয়।* **প্রভৃতি** = *প্রকৃষ্ট* **ভৃতি** *যাহাতে।* **প্রমুখ** = *প্রকৃষ্ট মুখ যাহার। /* **ইত্যাদি** = ইতি আদি যাহার। **প্রমুখ** = প্রকৃষ্ট মুখ (আরম্ভ) যাহার। (ব.শ.)। **৩.** **ভৃত** = পূরিত, পূর্ণ, ধৃত, পালিত, বেতন দ্বারা ক্রীত, বিত্তদ্বারা ক্রীত, বেতনক্রীত জন, ভৃতিভুক্, ভৃত্য, সেবক, পণপূর্ব্বক অধ্যাপক, বৈতনিক অধ্যাপক। **ভৃতক** = বেতনদ্বারা ক্রীত, বেতনগ্রাহী, পণপূর্ব্ব, ধান্যবিক্রীত, কর্ম্মকর, পরিচারক। **ভৃতকাধ্যয়ন** = বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকটে অধ্যয়ন। **ভৃতকাধ্যাপক** = বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, ভৃতক। **ভৃতকাধ্যাপন** = বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের পাঠন। **ভৃতকাধ্যাপিত** = বেতনগ্রাহী অধ্যাপক কর্ত্তৃক পাঠিত। **ভৃতি** = ভরণ, পোষণ, ধারণ, বেতন, বর্ত্তন, ভাড়া, মজুরী, মূল্য, খাদ্য, বেতনার্থ কর্ম্ম। **ভৃতিভুক, ভৃতিভুজ** = বেতনক্রীত ভৃত্য। **ভৃত্য** = **ভরণীয়, অবশ্যভর্ত্তব্য**, পুত্রদারাদি পোষ্যবর্গ, **অবশ্যভর্ত্তব্য বৃদ্ধমাতৃপিত্রাদি, ভর্ত্তব্যজন**, রাজপুরুষ, সচিবাদি, পরিচারক, দাস, **কিঙ্কর**। **প্রভৃতি** = আরম্ভ, প্রমুখ, আদি, আরম্ভার্থ থেকে বা হইতে। **ইত্যাদি** = এবমাদি, এতৎপ্রভৃতি, এবংবিধ, ইতিনামক, **পূর্ব্বোক্তনামক**। **প্রমুখ** = প্রথম, পূর্ব্ব, প্রধান, মান্য, পুন্নাগবৃক্ষ, অগ্র, বদন। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র servant অর্থে **ভৃত্য** শব্দটি প্রচলিত। অন্যান্য অর্থে **ভৃত্য** শব্দটির প্রচলন নাই। বাকি শব্দগুলিও অপ্রচলিত। **৫.** **ভৃত** কথাটির মানে হল, 'ভরণ তারিত হয়েছে যাতে'; অর্থাৎ যার ফাঁক বা অভাব পূরণ করা হয়েছে। তার মানে, **ভৃত** যেন এক ভরা কলসী। আর, তার ঐ ফাঁক-পূরণ কর্মটিকে **ভৃতি** বলে। এই **ভৃত** ও **ভৃতি** দুটি শব্দই এখন অপ্রচলিত হলেও **প্রভৃতি** শব্দটি খুবই প্রচলিত। তবে সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

ভৃত্য মানে চাকর, servant। সবাই বলবেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, আমাদের ভাষার সমস্ত প্রাচীন তথ্য বলছে যে — যে সত্তাকে **ভরণপোষণ** করা হয়, করতে হয়, করতে তার সেবাগ্রাহী বাধ্য, সেই সত্তাকে সেই সেবাগ্রাহীর **ভৃত্য** বলে। তার মানে, **ভৃত্য** শব্দটির অর্থ **ভৃত্যের** দিক থেকে দেখাই হচ্ছে না, দেখা হচ্ছে **প্রভু**র দিক থেকে। **প্রভু** যাকে **ভরণপোষণ** করতে বাধ্য, সেই হল **ভৃত্য**। ইংরেজি servant শব্দে, যে serve করে বা 'সেবা' করে, সেই 'সেবক'কে servant বলা হয়। কিন্তু আমাদের ভাষায় সেরকম শব্দ আলাদা — **চাকর, নবকর (নৌকর), কিঙ্কর** ... ইত্যাদি। আমাদের ভাষায় যে **ভৃত্য**, সে servant নাও হতে পারে। যাকে **ভরণপোষণ** করতে আপনি বাধ্য, সেই আপনার **ভৃত্য**; তা সে আপনার ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর, গেটে-দাঁড়ানো-বাহাদুর, বাজার সরকার, কিংবা আপনার উপর নির্ভরশীল পুত্রকন্যাহীন বিধবা পিসী ... যেই হোক।

তবে উপরোক্ত **ভৃতকাধ্যয়ন** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলিতে এক অদ্ভুত সমাজমনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। একটা যুগ ছিল, যখন শিশুদের চোখে **অঞ্জন** বা **কাজল** পরাতেন যাঁরা, এবং মানবসভ্যতার অর্জিত জ্ঞানসম্পদ উত্তরসূরিদের শিখিয়ে পড়িয়ে দিতেন যাঁরা, তাঁরা ভাবতেও পারতেন না যে, তাঁদের সেকাজের জন্য তাঁদের কোনোরকম পাওনা হয়! ঝাঁক-জানোয়ারদের বাচ্চারা, হাতির পালের কিংবা ভেড়ার পালের বাচ্চারা, চরে-খাওয়ার ও করে-খাওয়ার শিক্ষা পাওয়ার জন্য কি তাদের পূর্বসূরিদের বেতন দিয়ে থাকে? কিন্তু **দক্ষ** বা বিশেষজ্ঞ পরিচালিত মানুষ নামের ঝাঁক-জানোয়ারদের এই 'সভ্যতা' এতই অসভ্য যে, তাদের বাচ্চাদের করে-খাওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই ঝাঁক-জানোয়ার প্রজাতির বয়স্ক শিক্ষক মানুষেরা অন্য মানুষদের কাছ থেকে বা তাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেয়, নিতে বাধ্য হয়, নিতে লজ্জা বোধ করে না! এই মানব-সভ্যতা তাই ভেড়াদের ঝাঁকের সভ্যতাবোধ থেকেও খারাপ। কিন্তু বাংলাভাষীর মন — **শিক্ষা**, **স্বাস্থ্য**, **বিচার** — এই তিনের আধাররূপী শিক্ষক, চিকিৎসক ও বিচারকদের এই অধঃপতন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বাংলার অধিকাংশ শিক্ষকেরাও পারেন না। পারলে কি তাঁরা কারও **ভৃতক** হতে লজ্জা বোধ করতেন? করতেন না। লজ্জা বোধ করেন বলেই **ভৃতকাধ্যয়ন, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপন, ভৃতকাধ্যাপিত** ... প্রভৃতি শব্দকে

তাঁরা প্রচলিত রাখেননি। সেই লজ্জার কারণেই কলকাতার স.বা. অভিধান, ঢাকার ব্য.বা.অভিধান প্রভৃতি আধুনিক বাংলা অভিধানগুলি এ শব্দগুলিকে তাঁদের অভিধান থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ফলে **ভৃত** ও **ভৃতি** শব্দের মতো এগুলিও বিলুপ্তির পথে হাঁটা দিয়েছে। তবে ছাত্রবোধ অভিধান ও বঙ্গীয় শব্দকোষ **ভৃত**-যুক্ত ঐ শব্দগুলিকে তাঁদের অভিধানে ও শব্দকোষে রেখে দিয়েছেন। এইখানেই অভিধান দুটির গৌরব। সত্যের মুখোমুখি হতে লজ্জা বোধ করতেন না তাঁরা, তা সেই সত্য যত নির্মমই হোক না কেন!

অবশ্য **ভৃত ভৃতি** না থাকলেও **প্রভৃতি** থেকে গেছে। এর অর্থ হল, 'যে ভরণকর্ম প্রকৃষ্ট'। তার মানে, কলসীতে জল ভরাকে যদি **ভৃতি** বলি, তবে খানিকটা ভরার পর আর যেটুকু ভরলে কলসীটি সম্পূর্ণভাবে ঠিকঠাক ভরে যায়, সেটুকু ভরে ফেলাকে **প্রভৃতি** বলে। তার মানে, 'আর যেগুলি ভরে দিলে ভরণকর্ম প্রকৃষ্টভাবে বা যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হয়, সেইগুলিও করা'। তাকেই **প্রভৃতি** বলে। ধরা যাক, রান্নাঘরে হাতা খুন্তি হাঁড়ি কড়াই থালা বাসন চামচ ঢাকনি ছাঁকনি — এই কয়টি উপকরণ আছে। এবার আমরা যখন — 'রান্নার উপকরণসমূহ ধোয়ামোছা করা হল' — বাক্যটিকে বিস্তারিত করে বলি — 'হাতা খুন্তি হাঁড়ি **প্রভৃতি** ধুয়েমুছে সাফ করে রাখা হল', তখন সেই **প্রভৃতি** কথাটির মানে দাঁড়ায় — হাতা খুন্তি হাঁড়ি ছাড়াও আর যে যে বস্তু হলে 'রান্নার উপকরণসমূহ' কথাটি সম্পূর্ণ হয়, সেগুলিও ধোয়ামোছা করা। যদিও ক্রিয়ার ব্যাপারটি নেই, তাহলেও এর মূল ব্যাপারটিকে প্রকাশ করার শব্দ রয়েছে ল্যাটিন ভাষাতেও। তাতে এইরকম ব্যাপারকেই বলা হয় et cetera (লেখা হয় 'etc.' রূপে), ইংরেজি ভাষা যাকে তদবস্থাতেই গ্রহণ করেছে; যার মানে 'and the rest'।

আমাদের অবশ্য এই **প্রভৃতি** ছাড়াও আরও দুটি শব্দ আছে — **ইত্যাদি** ও **প্রমুখ**। এখন যদিও **প্রভৃতি, ইত্যাদি, প্রমুখ** তিনটি শব্দই 'এবং অন্যান্য' অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তিনটি শব্দ কিন্তু অনেকটাই আলাদা। যেমন **ইত্যাদি** শব্দের অর্থ হল 'ইতি আদিতে যাহার'। তার মানে, আমরা যদি বলতাম, 'রান্নাঘরের উপকরণসমূহ ছাড়াও কোদাল বেলচাও ধোয়া হল', সেক্ষেত্রে বাক্যটি হত — 'ছাঁকনি ইত্যাদি ছাড়াও কোদাল বেলচাও ধোয়া হল'। অর্থাৎ 'ছাঁকনি ইত্যাদি' শব্দে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, 'ছাঁকনি'ই পূর্বের অনেক কথার শেষ শব্দ। আর, **প্রমুখ** শব্দের হল, 'প্রকৃষ্ট মুখ বা আরম্ভ যাহার'। এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত পর পর কয়েকজন ব্যক্তির নাম বলে বাকি নামগুলি না বলে **প্রমুখ** বলে দেওয়া হয়। যথা, 'রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু, মধুবাবু, এইসব মানুষেরা' না বলে বলা হয় 'রামবাবু **প্রমুখ** মানুষেরা'। অর্থাৎ, **প্রভৃতি** ও **ইত্যাদি** কার্যত পৃথক অর্থধারী শব্দ। সে তুলনায় **প্রভৃতি** ও **প্রমুখ** প্রায় সমার্থক শব্দ হলেও তাদের পার্থক্য আছে। পার্থক্য এই যে, **প্রভৃতি**তে **ভৃতি** কর্ম রয়েছে, **প্রমুখ**-এ সেরকম কোনো কর্ম নেই। যে শব্দের পরে **প্রমুখ** বসানো হয়, সেই শব্দটি যে আরম্ভের নিরিখে প্রকৃষ্ট শব্দ, শুধু সেটুকুই বলা হয়।

ভৃশ্ (ভ্রস্জ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : চালভাজা, চিড়েভাজা, পটোলভাজা, বারোভাজা, বেগুনভাজা, ভর্জ্জন, ভর্জ্জনপাত্র, ভর্জ্জিত, ভাজ্, ভাজ, ভাজক, ভাজন, ভাজনা, ভাজা, ভাজাচাউলী, ভাজাভাজা, ভাজাভুজা, ভাজাভাজি, ভাজী, ভাজ্য, ভৃশ্, ভৃশ, ভৃষ্ট, ভৃষ্টতণ্ডুল, ভৃষ্টপিষ্ট, ভৃষ্টযব, ভৃষ্টি।

ভৃশ্ (ভ্রস্জ্) = ভরণের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ। **ভৃশ** = ভরণের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে। **ভ্রস্জ** = ভরণ-নির্য্যাস জনিত যাহাতে।

ভর্জ্জন (ভর্জ্জিত, ভাজা, ভাজাভাজা, ভাজাচাউলী) : **১.** ✓ভ্রস্জ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *ভর্জ্জন*** = *ভরণ-জনন অন (on) যাহাতে।* ***ভর্জ্জিত*** = *যাহাকে **ভর্জ্জন** করা হইয়াছে।* ***ভাজা*** = ***ভাজ*** *(ভর্জ্জ হইতে জাত) এর আধার যে।* ***ভাজাভাজা*** = ***ভাজা****র পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ভাজাচাউলী*** = ***ভাজা*** *চাউল-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যে সত্তা (বা গ্রাম) ভাজা-চাউল বিক্রয় করে।* **৩. ভর্জ্জন** = পাকবিশেষ, ভাজা, ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনা-খোলা। **ভর্জ্জিত** = ভৃষ্ট, ভাজা। **ভাজা** = ভৃষ্ট, কৃতভর্জ্জন, নিপীড়িত, সন্তপ্ত, রৌদ্রে বিশুদ্ধ। **ভাজাভাজা** = অত্যন্ত বা কড়া ভাজা, অতিশয় উৎপীড়িত, বড় জ্বালাতন। (ব.শ.)। **ভাজাচাউলী** = মেদিনীপুরের একটি গ্রামের নাম। **৪. ভর্জ্জন, ভর্জ্জিত** অপ্রচলিত। বাকি তিনটি শব্দ যথার্থে প্রচলিত। **৫.** 'মাতাল বরটার জ্বালায় ভাজাভাজা হয়ে গেল মেয়েটা' কিংবা 'রোদে ভাজাভাজা হয়ে গেলাম' — বাংলায় এরকম বাক্য শোনা যেতেই পারে। এই **ভাজা** দেখা যায় না, বুঝে নিতে হয়। তবে বাংলায় দৃশ্য **ভাজা** দুরকম। তেলে**ভাজাও ভাজা**, গরম বালুতে মুড়ি**ভাজাও ভাজা**। তার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে অর্থাৎ আগুনে পোড়ানো হলে তবেই **পোড়া**। কিন্তু অদৃশ্যের দুনিয়াটা বাংলাভাষীকে ছাড়ে না, সে যার উপর **পোড়ামুখী** বা **পোড়ারমুখী** ব'লে 'নিন্দার ছলে স্নেহবাক্য বর্ষায়', দেখা যায় তার মুখ কোনো কালেই পোড়েনি। যে বরের জ্বালায় মেয়ের জীবনটা **ভাজাভাজা** হয়ে যায়, সেই মেয়ের শরীরে কোথাও **ভাজাভাজি**র কোনো চিহ্ন দেখা যায় না; অথচ তাকেই হয়তো বরের মদের চাট রূপে তেলে**ভাজা** মাছ**ভাজা** নিত্য যুগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, তেলে বালিতে আগুনে রোদে কিংবা মনের অগ্নিজ্বালায় যেভাবেই হোক, কাউকে খুব করে জ্বালালে তাকে **ভর্জ্জন** বা **ভাজা** বলে কেন? তাতে ভরণ-জননের স্থান কোথায়?

আছে, সুস্পষ্টরূপেই আছে। একটি বেগুন বা পটল আগুনে ফেলুন, না না, ফুটো না করে ফেলবেন না যেন, তাহলে ফটাস করে ফেটে যাবে। অতএব দু-চারটে ফুটো করে ফেলুন। দেখবেন, বেগুন বা পটলের ফুটো দিয়ে তাদের ভেতরে যতটুকু রস নিসর্গ-প্রকৃতি ভরে রেখেছেন, সেই সব রস জনিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। ফলে, অচিরে বেগুন বা পটলটি **ভর্জ্জিত** বা **ভাজা** হয়ে যাবে। আগুন যদি হাতের কাছে না থাকে, খালি গায়ে দুপুর রোদে গিয়ে বসলেই দেখা যাবে লোমকূপ বেয়ে সব রস বেরিয়ে আসছে। এই হল ভরা রসের জনন। এর ফলে খানিকক্ষণের মধ্যেই রোদে **ভাজাভাজা**

হয়ে যাওয়া যাবে। আর, মাতাল বরের জ্বালায় জ্বললে শরীর জ্বলে না, জ্বলে মেয়ের মন। তার রসভার জনিত হয়ে যায় প্রাত্যহিক ক্ষোভ নিঃসরণে, অচিরে মেয়েটা নীরস হয়ে যায়, মনটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ভ্রংশ্ (ভ্রন্শ্, ভ্রন্স্, ভ্রম্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট, অবিভ্রম, অভ্রম, অভ্রান্ত, অসম্ভ্রম, বিভ্রম, বিভ্রান্ত, বিভ্রান্তি, ভঁউ, ভঙর, ভনভন, ভমর, ভমরা, ভমরি, ভম্ভরালিকা, ভম্ভরালী, ভরম, ভরমি (ভিরমি), ভরমিত, ভরাঁতি, ভরাতি, ভাঙরি, ভাঙুরি, ভিরমি, ভুরু (ভুরূ, ভূরু), ভুরুভঙ্গ, ভুল, ভূমি, ভোঁ, ভোঁড়ুয়ে, ভোঁয়া, ভোঁহা, ভোম, ভোমর, ভোমরা, ভোম্বল, ভোম্ভল, ভোম্ভোলা, ভোর, ভোরঙ্গ, ভোরণী, ভোরা, ভোরি, ভৌঁরি, ভৌঁহ, ভ্রংশ্, ভ্রংশ, ভ্রংশন, ভ্রংশিত, ভ্রংশী, ভ্রন্শ্, ভ্রন্স্, ভ্রম্, ভ্রম, ভ্রমণ, ভ্রমণী, ভ্রমণীয়, ভ্রমন্ত, ভ্রমর, ভ্রমরক, ভ্রমরকরণ্ডক, ভ্রমরকীট, ভ্রমরপ্রিয়, ভ্রমরবাধা, ভ্রমরা, ভ্রমরাভিলীন, ভ্রমরালক, ভ্রমরিকা, ভ্রমরী, ভ্রমা, ভ্রমি, ভ্রমী, ভ্রষ্ট (দ্র.ভৃশ্ ভৃষ্ট), ভ্রস্জ্, ভ্রান্ত, ভ্রান্তচিত্ত, ভ্রান্তি, ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিনাশন, ভ্রান্তিবিলাস, ভ্রান্তিমান, ভ্রাম, ভ্রামক, ভ্রামণ, ভ্রামকযন্ত্র, ভ্রামর, ভ্রামরী, ভ্রাম্যমাণ, ভ্রাষ্ট্র, ভ্রাষ্টক, ভ্রুকুটি(টী), ভ্রুকুটিরচনা, ভ্রুব, ভ্রূ, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী, ভ্রূকুণ্ডা, ভ্রূক্ষেপ, ভ্রূচাপ, ভ্রূবিকার, ভ্রূবিভ্রম, ভ্রূবিলাস, ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূমধ্য, ভ্রূলেখা, শাপভ্রষ্ট, শাপভ্রষ্টা, সবিভ্রম, সম্ভ্রম, সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রান্তি, সসম্ভ্রম, সুসম্ভ্রম।

ভ্রংশ্ (ভ্রন্শ্, ভ্রন্স্, ভ্রম্) = ভবের আবর্ত্তনের রহস্যরূপের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ। **ভ্রংশ** = ভবের আবর্ত্তনের রহস্যরূপের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে। **ভ্রন্শ** = ভবের আবর্ত্তনের নাকরণ সার্ব্বিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। **ভ্রন্স** = ভবের আবর্ত্তনের নাকরণ নিঃশেষে বিচ্ছুরিত যাহাতে। **ভ্রম** = ভবের আবর্ত্তন মিত বা সীমায়িত যাহাতে।

ভ্রংশ (ভ্রষ্ট, ভ্রষ্টা, অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট — শাপভ্রষ্ট) ১. ✓ভ্রন্শ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভ্রংশ** = *আবর্ত্তমানের রহস্যরূপ বিচ্ছুরিত যাহাতে।* **ভ্রষ্ট** = *আবর্ত্তমানের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ টঙ্কারিত যাহাতে।* **ভ্রষ্টা** = **ভ্রষ্ট**-*এর আধার যে।* **অপভ্রংশ** = *নিম্নে* **ভ্রংশ** *যে।* **অপভ্রষ্ট** = *নিম্নে* **ভ্রষ্ট** *যে।* **শাপভ্রষ্ট** = **শাপ**-*এর () কারণে (স্বস্থান থেকে)* **ভ্রষ্ট** *যে।* / **অপভ্রংশ** = যাহা সাধুভাষা হইতে ভ্রষ্ট। (ব.শ.)। **৩. ভ্রংশ** = অধঃপতন, পাত, নাশ, বিভ্রম, ক্ষয়, চ্যুতি, ধ্বংস, লোপ, দৃপ্ত হৃষ্ট বা দুঃখিত ব্যক্তির কথনীয় বিষয়ের বিপরীত বাক্য। **ভ্রষ্ট** = পতিত, চ্যুত, স্খলিত, নষ্ট, গলিত। **ভ্রষ্টা** = ব্যভিচারিণী, অসতী। **অপভ্রংশ** = অধঃপতন, স্খলন, অধোগতি, চ্যুতি, বিকৃত উচ্চারিত শব্দ, গ্রাম্যভাষা, নাটকাদিতে আভীর-চণ্ডাল-শকারাদির ব্যবহার্য্য ভাষা, শাস্ত্রে সংস্কৃতভিন্ন ভাষা, অপকর্ষ, বিলোপ। **অপভ্রষ্ট** = পতিত, চ্যুত, স্খলিত, বিকৃতোচ্চারিত, অসাধু। **শাপভ্রষ্ট** = শাপ হেতু স্বদশাচ্যুত বা দশান্তরপ্রাপ্ত। (ব.শ.)। **৪.** 'ব্যভিচারিণী' অর্থে **ভ্রষ্টা** শব্দটি কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে; অন্যথায় সাধারণ্যে শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** যা কিছু আবর্ত্তমান, তা সবই হল ব্র বা ভ্র। আতসবাজীর **ঘুরন্ত চরকি একপ্রকার ভ্র**। একজন মানুষ তাঁর বিশেষ **আবর্ত্তে বর্ত্তমান** থাকে, সেও **ভ্র**। একটি মানভাষারও **আবর্ত্তন** চলতে থাকে; সেও **ভ্র**। সেভাবে দেখলে বিশ্বে যা কিছু **বর্ত্তমান** তাদের প্রত্যেকটিই **ভ্র**। এই **ভ্র** থেকে যা কিছু বিচ্ছুরিত হয়ে সেই **আবর্ত্ত** থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়, তা সবই **ভ্রংশ**। সেই **ভ্রংশ** গতিশীল হয়ে তারিত হয়ে অন্যত্র গিয়ে টঙ্কারিত হলে, তাকেই **ভ্রষ্ট** বলে। সাধারণত এর প্রয়োগ হয়ে থাকে তিন ভাবে। ক) প্রচলিত ভাষার **আবর্ত্ত** থেকে ছিটকে নিম্নে পতিত শব্দ বাক্য বোঝাতে **অপভ্রংশ** শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে; খ) সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা (পদমর্যাদা) অনুসারে যে মানুষের যে **আবর্ত্তে আবর্ত্তমান** থাকার কথা, সেখান থেকে অধঃপতিত মানুষকে বোঝাতে **ভ্রষ্ট** শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে (একালে বলা হয় suspended); এবং গ) নারীর সমাজস্বীকৃত **আবর্ত্ত** থেকে ছিটকে যাওয়াকে বোঝাতে '**ভ্রষ্টা** নারী' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে **শাপভ্রষ্ট** বা **শাপভ্রষ্টা** কিন্তু স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, **ভ্রষ্ট** বা **ভ্রষ্টা** সত্তাটি নিজে থেকে হয়নি, কেউ তাকে কোনো কারণে **অভিশাপ** দিয়ে সেই **আবর্ত্তন** থেকে ছিটকে বাইরে বের করে দিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আতসবাজীর ঘুরন্ত চরকির ছিটকে যাওয়া আগুনের ফুলকির মতো ক্রিয়াটিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এই শব্দগুলির দৃশ্য প্রয়োগ হয় না, যা হয় সবই অদৃশ্যলোকের প্রয়োগ। **অপভ্রংশ** শব্দ, **ভ্রষ্ট** নায়ক, **ভ্রষ্টা** নারী — এদের কাউকেই বাহ্য চোখ দিয়ে কোনো ঘুরন্ত নাগরদোলার মতো **আবর্ত্ত** থেকে বা **ভ্র** থেকে **ভ্রষ্ট** হতে দেখা যায় না, বুঝে নিতে হয়।

ভ্রম (ভ্রমণ, ভ্রমর, ভোমর, ভোমরা — সম্ভ্রম) : ১. ✓ভ্রম্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভ্রম** = *ভবের আবর্ত্তন সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, যে একই স্থানে ঘুরতে থাকে (যেন সে পথ খুঁজে পায়নি, তাই)।* **ভ্রমণ** = **ভ্রম** *অন (on) যাহাতে।* **ভ্রমর** = **ভ্রম** *রহে যাহাতে।* **সম্ভ্রম** = *সম্যক* **ভ্রম** *থাকে যাহাতে।* / **ভ্রমর** = প্রতি পুষ্পে ভ্রমণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. ভ্রম** = পর্য্যটন, অনবস্থান, ঘূর্ণন, মিথ্যামতি, কুলালচক্র, পেষণযন্ত্র, কুন্দ, জলাবর্ত্ত, জলনিঃসরণপথ, সম্ভ্রম; বেড়ান, পর্য্যটন করা, ঘূর্ণিত হওয়া, ঘুরিয়া বেড়ান। **ভ্রমণ** = পর্য্যটন, অনবস্থান, ঘূর্ণন, ভ্রান্তি, গ্রহের গমনপথ। **ভ্রমর** = অলি, মধুকর, কামুক, বটু, অশ্বের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের রোমাবর্ত্ত। **ভোমর** = ভ্রমর, কাঠ ছেঁদা করার যন্ত্র, তুরপুন, আয়ুধবিশেষ। **সম্ভ্রম** = ব্যাকুল, সমন্তাৎ ভ্রমণ, অতিশয় ভ্রম, ভয়াদিজনিত ত্বরা, শঙ্কা, আবেগ, আদর, সম্মান, প্রলয়, সূত্র, ব্যাকুলতা, আটোপ। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. ভ্র**-এর সঙ্গে **ম** যুক্ত হয়ে গেলে একেবারে মানিকজোড় হয়ে যায়। একদিকে অস্তিত্বের সর্বোচ্চ রূপ হল ভ, সে রয়েছে ঘূর্ণমান। অপরদিকে **ম**, যে কিনা সমস্ত সম্ভাবনাকে একত্রে বেঁধে সীমায়িত করে নিয়েছে। ফলত **আবর্ত্তন**-এর পরবর্তী সম্ভাবনাগুলি সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে **আবর্ত্তন** বা **ভ্র** নির্দিষ্ট পথে-প্রক্রিয়ায় ঘুরে চলেছে। **ভ্রম** তাই নির্দিষ্ট **আবর্ত্তে আবর্ত্তমান** থাকাকে বোঝায়।

স্বভাবতই **ভ্রম** শব্দটির ভিতরেই এমন একপ্রকার **ভ্রম** রয়ে গেছে যে, সে একই সঙ্গে ঘোরায়, পর্যটন করায়, উচ্চস্থানে অবস্থান

করে আবর্ত্তিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়, আবার দিক্‌ভ্রান্ত করে ঘুরিয়ে মারেও। ফলে, তা একদিকে ভাল এবং অন্যদিকে মন্দও বটে। তবে সে সব প্রসঙ্গে আমরা যাব নিম্নে **ভ্রান্ত** শব্দে।

ছুতোর মিস্ত্রিদের একটি যন্ত্র আছে, যাকে **ভ্রমর, ভোমর, ভোমরা** বা তুরপুন বলা হয়ে থাকে। সেটিকে মন্থনদণ্ড ঘোরানোর মতো করে ঘোরানো হয়, তাতে কাঠে ছিদ্র হয়ে যায়। এই যে একই স্থানে ঘুরতে থাকা, এই গুণ বা ক্রিয়া রহে যাহার, তাকে **ভ্রমর** বলে। তবে **ভ্রম**-এর শব্দার্থগত অর্থের চেয়ে এর ব্যঞ্জনার্থটিই বেশি করে সামনে চলে আসে। কেননা, **ভ্রম**-এর **আবর্ত্তন** বা ঘোরার এলাকা সীমায়িত হয়ে রয়েছে বলেই যে সে একই স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেকথাটি গৌণ হয়ে গিয়ে, সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না, একটা ঘূর্ণীতে পড়ে গেছে, ত্রুটিপূর্ণ ধারণার মধ্যে পড়ে গেছে — এই অর্থটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে আমরা যখন **সম্ভ্রম** কথাটা বলি, তখন সেটির ভিতরে যে 'সম্যক **ভ্রম**' রয়েছে, সেটিকে আমরা 'সম্যক্‌-ত্রুটি' রূপে বুঝি না, বুঝি 'আদর', 'সম্মান' ... ইত্যাদি ব'লে। প্রশ্ন হল, **সম্ভ্রম** শব্দের ভিতরে 'সম্মান'-এর কথা আসে কোথা থেকে? দ্র. **ভ্রান্ত, সম্ভ্রান্ত**।

ভ্রান্ত (ভ্রান্তি, ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিবিলাস — প্রভূতভ্রান্ত, বিভ্রান্ত, সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রান্তসমাজ, সম্ভ্রান্তি) : ১. সম্ + ✓ভ্রম্ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ভ্রান্ত** = **ভ্রম** *তারিত যাহাতে।* **ভ্রান্তি** = **ভ্রান্ত** *সক্রিয় যাহাতে।* **ভ্রান্তিকর** = **ভ্রান্তি** *করে যে।* **ভ্রান্তিবিলাস** = **ভ্রান্তিই বিলাস** *(বিকল্প লালনের নির্য্যাস) যাহাতে।* — **প্রভূতভ্রান্ত** = *যিনি প্রভূত পরিমাণে* **ভ্রম***যুক্ত (ঘূর্ণিত) হইয়াছেন বা ঘোরাঘুরি করিয়াছেন।* **বিভ্রান্ত** = *বিশেষ রূপে* **ভ্রান্ত** *যে।* **সম্ভ্রান্ত** = *সম্যকরূপে* **ভ্রান্ত** *(ঘূর্ণিত) যে।* **সম্ভ্রান্ততন্ত্র** = **সম্ভ্রান্ত***গণের* **তন্ত্র** *(aristocracy)।* **সম্ভ্রান্তসমাজ** = **সম্ভ্রান্ত***গণের সমাজ (aristocrat society)।* **সম্ভ্রান্তি** = **সম্ভ্রান্ত** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* **৩. ভ্রান্ত** = পর্য্যটিত, চলিত, সঞ্জাতভ্রমি, ঘূর্ণিত, অনবস্থিত, ভ্রমযুক্ত, হতবুদ্ধি, মত্তগজ, রাজধুস্তূরক, ভ্রমণ, পর্য্যটন, ভ্রম, ভ্রান্তি। **ভ্রান্তি** = ভ্রমণ, পর্য্যটন, অনবস্থান, চলন, ঘূর্ণন, ভ্রম। **ভ্রান্তিকর** = ভ্রমজনক। **প্রভূতভ্রান্ত** = অতিভ্রমণ। **বিভ্রান্ত** = পর্য্যটিত, বিক্ষিপ্ত, ঘূর্ণিত, বিস্মিত, বিবিধভ্রান্ত, ব্যাপ্ত। **সম্ভ্রান্ত** = অতিভ্রান্ত, অতিভীত, শঙ্কিত, ত্বরিত, দ্রুত, লঘু, ক্ষিপ্র, সমাদৃত, সম্মানিত, মর্য্যাদাপন্ন, কুলমর্য্যাদাপন্ন, গৌরবান্বিত। **সম্ভ্রান্তি** = সম্ভ্রম, ত্বরা, উন্মাদ। (ব.শ.)। **সম্ভ্রান্ত** = মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী, আদরণীয়, সম্যক্ ভ্রান্ত, ত্বরাবিশিষ্ট। **সম্ভ্রান্ততন্ত্র** = সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিগণের হস্তগত রাজ্যশাসন, সম্ভ্রান্তদিগের তন্ত্র। **সম্ভ্রান্তসমাজ** = ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদের সভা। (ছা.অ.)। **ভ্রান্তিবিলাস** = বিদ্যাসাগর কৃত শেকসপিয়রের নাটক 'কমেডি অফ এররস্'-এর বাংলা অনুবাদে প্রদত্ত নাম। **৪.** শুধুমাত্র erroneous **অর্থে ভ্রান্ত**, error অর্থে **ভ্রান্তি**, এবং aristocrat অর্থে **সম্ভ্রান্ত** প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. ভ্রম** শব্দটি খুবই **ভ্রমাত্মক**। **ভ্রম, ভ্রান্ত, সম্ভ্রম, সম্ভ্রান্ত** প্রভৃতি শব্দগুলি তাদের অর্থ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালের বাংলা অভিধানকারদের (স.বা.অ.কলকাতা; ব্য.বা.অ.ঢাকা) একেবারে **বিভ্রান্ত** করে দিয়েছে। এমনকি ব.শব্দকোষ এবং ছা.অভিধানও খানিকটা সম্ভ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কম কথা তো নয়! **ভ্রম** একই সঙ্গে 'ঘুরে বেড়ানো' এবং 'ভুল' হয় কী করে? কিংবা **সম্ভ্রম** যদি ভাল শব্দ হয় তবে তার ভিতরে **ভ্রম** কেন? **ভ্রান্ত** যদি মন্দ হয়, তবে **সম্ভ্রান্ত** বললে 'সম্মাননীয়' বা 'অভিজাত' বোঝায় কেন? ...

ভ্রম শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ হল — *ভবের আবর্ত্তন সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, যে একই পরিধিতে ঘুরতে থাকে (যেন সে পথ খুঁজে পায়নি, তাই)।* এই **ভ্রম** স্বভাবতই সীমায়িত ক্ষেত্রে **আবর্ত্তিত** হতে থাকে, অর্থাৎ একই চক্রে ঘুরতে থাকে। তাকে একই **আবর্ত্তে আবর্ত্তমান**ও বলা যায়। ফলে, এই **ভ্রম**-এর ভিতরে অতি ভাল ও অতি মন্দ এত সূক্ষ্ম পার্থক্যে বিদ্যমান থাকে যে, তাকে 'ক্ষুরস্য ধারা'র বা razors' edge-এর পার্থক্য বলা যেতে পারে। আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীকে ও বদ্ধ উন্মাদকে যেমন দেখতে একইরকম পাগল-পাগল লাগে, এই **ভ্রম**কেও তেমনি একইরকম **ভ্রম** মনে হয়। আমরা জানি, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মানুষই বিশেষ **আবর্ত্তে** যথার্থভাবেই ঘোরেন বা **বর্ত্তমান** থাকেন। সেই **আবর্ত্তন**-পথ তাঁর চেনা, প্রিয়, আনন্দদায়ক তাঁর সে পথে চলা, **ভ্রমণ** করা।

কিন্তু সেই ঘোরা বা **ভ্রম** যদি এমন হয় যে, যে ঘুরছে, সে পথ খুঁজে মরছে বলেই একই ঘেরাটোপের ভিতরে ঘুরে চলেছে, তখন তার **ভ্রমণ** স্বাভাবিক থাকে না, অত্যন্ত **ভ্রম** হয়ে যায়। ফলত, **ভ্রম** শব্দের ব্যঞ্জনার্থ তখন সামনে চলে আসে — ঘুরছে, কারণ সে পথ খুঁজে পায়নি; তাই সে ভুল করছে, একই পথে ঘুরছে, তাই তার **ভ্রম** হয়েছে, তাই সে **ভ্রমণ** করছে; তাই সে **ভ্রান্ত**। এই **ভ্রান্ত** অতএব ত্রুটিপূর্ণ। স্বভাবতই এই **ভ্রম** ও তজ্জাত **ভ্রান্ত** খুবই মন্দ।

এই ব্যঞ্জনার্থক **ভ্রমণ** বা **ভ্রান্ত** মূলত মানসিক **ভ্রমণ**কেই বোঝায়। এটি উন্মাদ হওয়ার পূর্বাবস্থাই বটে। তবুও শারীরিকভাবে একস্থানে ঘুরতে থাকলে তার থেকে চেষ্টা করলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু মানসিকভাবে একস্থানে ঘুরতে থাকলে তার থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। যাঁরা এরকম মানসিক অবস্থানে বিরাজ করেন, একালের ভাষায় তাঁদের 'মৌলবাদী', 'গোঁড়া', 'কট্টরপন্থী', 'ফ্যানাটিক' ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এঁরা যথার্থেই অত্যন্ত **ভ্রম**গ্রস্ত বা দিক্‌**ভ্রান্ত** কিংবা পথ**ভ্রান্ত**। এঁরা জেনেশুনে ঐ পথে ঘুরছেন না, পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে ঘুরছেন; বিপথে ঘুরছেন। সেই কারণে এঁদের **বিভ্রান্ত** বলে। **ভ্রম** শব্দের ব্যঞ্জনার্থ এদের ক্ষেত্রেই খাটে।

নিষ্ঠাবানদের কিন্তু দিক্‌**ভ্রান্ত**, পথ**ভ্রান্ত** বা **বিভ্রান্ত** বলার ঝুঁকি আছে। কেননা এমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেও দেখা গেছে, যিনি স্ত্রীর হস্তে বা স্বহস্তে রান্না-করা না হলে কদাপি ভোজন করেন না, তিনিই হিন্দু-মুসলিম রায়টের সময় নিজ নেতৃত্বে রায়ট বন্ধ করান এবং সকলের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন করেন। (দ্র. কাটোয়ার ইতিহাস) এমন নিষ্ঠাবতী রমণীকেও দেখা গেছে যিনি সর্বদা পূজানুষ্ঠানাদি নিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমান 'ধর্মছেলে'কে নিজের ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে খেতে দেন এবং বলেন — ছেলের আবার জাত কী! (দ্র. **পাতান**)। তার মানে, এইসব নিষ্ঠাবান-নিষ্ঠাবতীরা একই মানসিক অবস্থানে **ভ্রমণ** করছেন সেটি তাঁদের আনন্দ**ভ্রমণ**; তাকে তাঁরা কখনোই ঘেরাটোপ ভাবেন না; আমরা তাকে ঘেরাটোপ

ভাবলেও দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনে সেই ঘেরাটোপ ভেঙে তাঁরা অনায়াসে বেরিয়ে আসেন। সেই কারণে এরকম মানুষদের **বিভ্রান্ত** বলার ঝুঁকি আছে। তার মানে, এঁরা ব্যঞ্জনার্থক **ভ্রম** বা **ভ্রমণ** করেন না, অর্থাৎ পথ খুঁজে না পেয়ে **ভ্রমণ** করছেন না; ভুল হোক ঠিক হোক, এঁদের একটি সত্য-পথের বোধ আছে বা থাকে। সেই সত্যের পথে এঁরা **ভ্রমণ** করেন। সেইকারণে এঁরাও **ভ্রম**গ্রস্ত ও **ভ্রান্ত** বটে, কিন্তু দিক্**ভ্রান্ত**, পথ**ভ্রান্ত** বা **বিভ্রান্ত** নয়। এঁরাও **ভ্রমণ** করেন বটে, তবে এঁরা হলেন **ব্রতী**। তাতেও একপ্রকার **আবর্ত্তন** আছে, ঘোরা আছে, কিন্তু ঘুরে মরা নেই।

ভ্রম, ভ্রমণ, ভ্রান্ত ... প্রভৃতি কথাগুলি সেকারণেই কখনো ভাল কখনো মন্দ ব্যাপারকে বোঝায়, বোঝাতে পারে। এ-ফুলে বসব না ও-ফুলে বসব, এই '**ভ্রম** যার স্বভাবে **র**হে', তাকে সেকারণেই **ভ্রমর** বলে। ফলত, সে অনেক সময় একই স্থানে ঘুরতে থাকে, তাই সে **ভ্রমর** বা তুরপুন। একালে মানুষের মনটার মূল্য গেছে কমে, দেহবাদী পাশ্চাত্যের পাল্লায় পড়ে আজকের বিশ্ববাসী সম্পূর্ণতই দেহবাদী হয়ে পড়েছেন। ফলত, দৈহিক **ভ্রমণ**-এর রমরমা শুরু হয়েছে; tourism-এর বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। (বলে রাখা ভাল, ইংরেজ কিন্তু তার এই tour শব্দটিকে যেখান থেকে পেয়েছে, সেখান থেকেই আমরা পেয়েছি **তুরীয়** শব্দটিকে। এর অর্থ মনোলোকে ছুটে বেড়ানো, মানসিক **ভ্রমণ**। তার মানে, ইংরেজ মনোলোকে **তুরীয়ানন্দে** বা tour-এর আনন্দে ছুটে বেড়ানোর মতো শব্দকে অধঃপতিত করেছে শারীরিকভাবে ঘুরে বেড়ানোয়। আর, আমরা আমাদের মানসিক **ভ্রমণ** শব্দকে অধঃপতিত করেছি তাদের tour-এ। কী অদ্ভুত বিপ্রতীপ অধঃপতন!)

তাই বলে কি বাহ্যিক **ভ্রমণ**-এর কোনো সুফল নাই? আছে, অবশ্যই আছে। তবে তার একটি মাত্রা আছে। যার আর্থিক রোজগার যত বেশি হয়, আহরণ-থলি যত বড় হয়, তার পক্ষে তত বেশি পরিমাণে কেনাকাটা করা সম্ভব হয়, সন্দেহ নাই। প্রকৃতির অর্থ যার মন যে পরিমাণ অর্জন করতে পারে, তদনুযায়ী তার মনের আর্থিক রোজগার ও থলির আকার দুটোর পরিমাণই যথেষ্ট বড় হয় এবং তখনই তার **ভ্রমণ**-এর সুফলে ভরে ওঠে তার মনের থলি। সেই কারণে মানসিক **ভ্রমণ** ও বাহ্যিক **ভ্রমণ**-এর একপ্রকার সামঞ্জস্য থাকা দরকার; অন্নব্যঞ্জনে লবণের পরিমাণের মতো। মূর্খে দুনিয়া **ভ্রমণ** করে কিছুই পায় না, যদি পায়ও সবচেয়ে মন্দ জিনিসগুলি জড়ো করে নিয়ে আসে। আর জ্ঞানবান মানুষ যদি বিশ্ব**ভ্রমণ** করেন, তাঁর মনের থলি ভরে ওঠে অমূল্য মানসসম্পদে। আমাদের বিচারে, মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে মানসিক ভ্রমণ যখন ১০০ শতাংশ লাগে, তখন বাহ্যিক **ভ্রমণ** লাগে ১০ শতাংশ কিংবা তারও কম। তাতেই তার উভয়প্রকার **ভ্রমণে** একপ্রকার সামঞ্জস্য হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে **ভ্রমণ**-এর ক্ষেত্রে সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে গেছেন। একালের **ভ্রমণ**পিপাসুদের অধিকাংশই এই সামঞ্জস্যের কথা ভাবতেই পারেন না, তা রক্ষা করার তো প্রশ্নই আসে না। মনে মনে কেউ যদি একশো পাক ঘুরে আসেন, শারীরিকভাবে দশ পাক ঘুরলেই যথেষ্ট হবে। অথচ একালে দেখা যায়, যে ব্যক্তি মনে মনে এক পাকও ঘোরেনি, কেবল অফিসে বসে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করে গেছে, সেই ব্যক্তিই প্রতি বছরের ছুটিতে শারীরিকভাবে দশ পাক ঘুরে এসেছে; এবং সে **ভ্রমণ** থেকে তার মানস-অর্জন প্রায় শূন্য থাকে। কেননা, একই কর্মের **ক্লান্তি**কর গ্লানি তার আত্মাকে এতই কলুষিত করে রাখে, যে, ঐরকম বাহ্যিক **ভ্রমণ** তার আত্মাকে একটুখানি হাঁফ ছেড়ে বাঁচার সুযোগটুকু মাত্র দেয়। যেকারণে কার্যত সে বাহ্যিক **ভ্রমণ** করে বটে, কিন্তু সেই **ভ্রমণ** থেকে কোনো সুফল আহরণ করতে যায় না সে, নিজের মনের গায়ে যে মরচে জমেছে, তাকে যতটুকু সম্ভব ছাড়াতে যায়। অবশ্য সেটাও কম কী! ...

যাই হোক, অত্যন্ত **ভ্রম**গ্রস্ত হলেই যে মানুষ **ভ্রান্ত** হয়, **প্রভূতভ্রান্ত** হয়, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। **ভ্রান্তিকর** বিশ্বাসে নির্ভর করে কত মানুষ **ভ্রান্তিবিলাসেই** জীবন কাটিয়ে দেয়। তাছাড়া জীবনে **ভুলভ্রান্তি** থাকবে না, এমন নিশ্চয়তাও দেওয়া যায় না। কিন্তু যাঁরা 'সম্যক রূপে **ভ্রান্ত**' হন বা **সম্ভ্রান্ত** হন, তাঁরা অত্যন্ত **ভ্রম**গ্রস্ত **ভ্রান্ত** বা **প্রভূতভ্রান্ত** নন। লোকে তাঁদের **সম্ভ্রম** দেখায়। তাঁদের ভাবা হয় 'অভিজাত'। এর কারণ রয়েছে ঐ **সম্ভ্রম** ও **সম্ভ্রান্ত** শব্দের গভীরেই।

আগেই বলেছি, যাঁরা বিশেষ **ধর্ম্মে** বা **কর্ম্মে** নিষ্ঠাবান, **ব্রতী**, তাঁরাও **ভ্রমণ** করেন এবং তাঁরাও **ভ্রান্ত** হন, তবে **বিভ্রান্ত** হন না। তাঁদের **ভ্রমণ** আদৌ মন্দ নয়, বরং এতটাই ভাল যে অন্যে তা অনুকরণ করে থাকে। কারণ হল, ঐ নিষ্ঠা**ব্রতী** মানুষেরা মর্ত্যলোকে বা সমাজে এবং নিজ নিজ মনোলোকে এক বিশেষ **আবর্ত্তে** প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই **আবর্ত্তে** ঘুরতে থাকেন বা **আবর্ত্তমান** থাকেন। যেমন, সেকালের এক **আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যে**র কথাই ধরা যাক, রাজার দাক্ষিণ্যে যাঁর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান যথেষ্ট উচ্চে। দেখা যায়, তিনি নিষ্ঠা ভরে কেবল তাঁর **নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্ম্ম**গুলিই করেন না, এক সুনির্দিষ্ট জীবনপথের **আবর্ত্তে** নিয়মিত ঘুরে চলেন তিনি। তাঁর এইরূপ জীবনযাত্রা-পদ্ধতিকে একালের ভাষায় 'রুটিন-বাঁধা লাইফস্টাইল' বলা হয়ে থাকে। তাঁর এই **ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা** বা **কর্ম্মানুবর্ত্তিতার** প্রতি নিষ্ঠা সহকারে **আবর্ত্তমান** থাকাকে লোকে **সম্ভ্রম**-এর চোখে দেখে; ভাবে, "আমি যদি ঐ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের জীবনা**বর্ত্তে** **আবর্ত্তিত** হওয়ার *'সমান ভ্রমণ'* করতে পারতাম!" এই ভাবনার প্রকাশ ঘটে সেই **আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যে**র প্রতি লোকের **সম্ভ্রম**-পূর্ণ আচরণে। স্বভাবতই এইরকম 'রুটিন-বাঁধা' জীবনপদ্ধতির অনুসারীগণ সমাজে উচ্চ স্থান পেয়ে যান। লোকে তাঁদের **বিভ্রান্ত** ভাবেন না, **সম্ভ্রান্ত** মনে করেন এবং নিজেরাও তাঁর মতো 'সম্যক **ভ্রান্ত**' হতে চান।

ব্রিটিশ ভারতে আসার পর বাংলাভাষী তাদের কাছে জানতে পারল, পাশ্চাত্য দেশে aristocracy, aristocrat-society ইত্যাদি ব্যাপার আছে। আমাদের সেকালের প্রকৃত বাংলাভাষাজ্ঞানীগণ, যাঁরা Physics-এর মানে করেছিলেন **পদার্থবিদ্যা**, তাঁরা ঐ শব্দগুলির মানে করলেন **সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রান্তসমাজ**। পরবর্তীকালের বাংলাভাষী পণ্ডিতেরা সেই শব্দের ভিতরে **ভ্রান্ত**কে দেখে সন্দিগ্ধ হলেন। তাঁরা **সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রান্তসমাজ** প্রভৃতি শব্দের ধারেকাছে দিয়ে গেলেন না, তাঁরা বরং 'অভিজাততন্ত্র', 'অভিজাত-সমাজ' শব্দে নির্ভর করাই উচিত বিবেচনা করলেন। সেকারণেই আজ আমরা 'অভিজাততন্ত্র' শব্দের সঙ্গে যতখানি পরিচিত **সম্ভ্রান্ততন্ত্র** শব্দের সঙ্গে আমাদের

সে পরিচয় নেই। সাম্প্রতিক অভিধানগুলিতেও তাই **সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রান্তসমাজ** শব্দগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে।

ভ্রাজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : বিভ্রাট, ভাই, ভাইআল, ভাইখাগী, ভাইগনা, ভাইজ, ভাজ, ভাঞি, ভাইফোঁটা, ভাইবেরাদর, ভাইব্রাদার, ভাইভাতারী, ভাইয়া, ভাউজ, ভাঞর, ভাতিজ, ভাতিজা, ভাতিজী, ভায়রা, ভায়া, ভায়াদ, ভায্যা, ভাশুর, ভাসুর, ভাসুরঝি, ভাসুরঠাকুর, ভাসুরপো, ভোজাই, ভ্রাজ্, ভ্রাজ, ভ্রাজক, ভ্রাজথু, ভ্রাজন, ভ্রাজিষ্ণু, ভ্রাজিঃ, ভ্রাজিস্, ভ্রাতা (ভ্রাতৃ), ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃক, ভ্রাতৃগন্ধি, ভ্রাতৃগন্ধিক, ভ্রাতৃজ, ভ্রাতৃজা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতৃব্য, ভ্রাতৃভার্য্যা, ভ্রাতৃর্য্যা, ভ্রাতৃমান, ভ্রাতৃশ্বশুর, ভ্রাতৃস্থান, ভ্রাত্র, ভ্রাত্রীয়, ভ্রাত্র্য, সৌভ্রাত্র্য।

ভ্রাজ্ = ভব-আবর্ত্তনের আধারের জনন। **ভ্রাজ** = ভব-আবর্ত্তনের আধারের জনন যাহাতে।

বিভ্রাট (বিভ্রাজ্, বিভ্রাট্, ভ্রাজ্, ভ্রাজ) : ১. বি + ✓ভ্রাজ্ + ক্বিপ্ (০) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *ভ্রাজ্ = ভ্রা (ভবের আবর্তনের আধার) কর্তৃক জনন (যাহাতে)। ভ্রাজ = ভ্রাজ্ কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, আবর্ত্তমান সত্তা কর্তৃক জনিত যে। বিভ্রাজ্ = বিপরীত ভ্রাজ্ যে। বিভ্রাট্ = বিপরীত ভ্রাজ এর টঙ্কারণ (যাহাতে)। বিভ্রাট = বিপরীত ভ্রাজ্ টঙ্কারিত যাহাতে।* **৩. বিভ্রাট্ (বিভ্রাজ্)** = দীপনশীল, রোচিষ্ণু, ভাস্বর। **বিভ্রাট** = বিপত্তি, সঙ্কট, গোলযোগ, হাঙ্গামা, উপদ্রব, অত্যাচার। (ব.শ.)। **বিভ্রাট্ (বিভ্রাজ্), বিভ্রাজ** = অলঙ্কারাদি দ্বারা শোভমান, দীপ্তিমান, দীপ্তিশীল, আপদ্, বিপদ্, সঙ্কট। (ছা.অ.)। **বিভ্রাট** = সঙ্কট, আপদ, বিপদ, ঝামেলা, গোলযোগ, হাঙ্গামা, ঝঞ্ঝাট, দুর্ঘটনা। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **বিভ্রাট** = সংকট, আপদ, গোলযোগ, ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট, আকস্মিক দুর্ঘটনা। (সংস্কৃত বিভ্রাট্ = অলংকারভূষিত, বাংলায় অর্থান্তরিত)। (স.বা.অ.কলকাতা)। **৪. বিভ্রাট** শব্দটি যথার্থে বহুল প্রচলিত, অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. ভ্রাজ্** শব্দটির সরাসরি **ভ্রাজ** বা **ভ্রাট** রূপে ব্যবহার নাই; রয়েছে **বিভ্রাট** রূপে এবং তার প্রচলনও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তার অর্থের ক্রিয়াভিত্তিকতাকে একটুও প্রতীকায়ন হয়নি ব'লে, শব্দটির প্রতীকী অর্থ দেওয়া অভিধানকারদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দেখা দিয়েছে। ...

ভ্রাজ্ শব্দের অর্থ বুঝতে সুবিধা হয় যদি একবার কামারশালায় উঁকি মারা যায়। সেখানে ছুরি কাটারি প্রভৃতিতে শান দেওয়ার সময় দেখা যায়, একটি গোল শানপাথরের চাকতিকে বনবন করে ঘোরানো হচ্ছে, আর, তাতে ছুরি বা কাটারির ধারাল দিকটি ঠেকিয়ে সেই দিকটিকে সূক্ষ্ম করা হচ্ছে এবং তার ফলে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে চতুর্দিকে। এভাবে ঐ **আবর্ত্তমান** শানপাথর থেকে যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে আতসবাজির চরকির মতো, তাকে **ভ্রা**-এর (আবর্ত্তমান সত্তার) **জনন** বা **ভ্রাজ্** বলে। কেননা, ঐ ফুলকিগুলি 'আবর্ত্তমান ভ-এর আধার' (= **ভ্রা**) স্বরূপ শানপাথরটি থেকে জনিত (**জ্**) হচ্ছে। তবে ছুরির সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে টঙ্কারিত হয়ে ফুলকিগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে বলে তাকে বলা হয় **ভ্রাট**। তার মানে, যে **আবর্ত্তমান** বা ঘূর্ণমান সত্তা (= **ভ্রা**) থেকে তার ঘূর্ণমানতার ও অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে কোনো কিছু বিচ্ছুরিত হতে থাকে, তা সে আগুনের ফুলকি, আলোর কিরণ ... ইত্যাদি যাই হোক, তাকে **ভ্রাট** বলা যায়। সূর্যকে **ভ্রা** মানলে তার বিচ্ছুরিত কিরণ হল **ভ্রাট**। ঘূর্ণমান যন্ত্রকে **ভ্রা** ভাবলে, তার বিচ্ছুরিত আওয়াজকে **ভ্রাট** বলা চলে। পদ্মাপারের হাটকে **ভ্রা** ভাবলে তার থেকে বিচ্ছুরিত পণ্যসম্ভারকে **ভ্রাট** বলা যেতে পারে। আর, খোদ মানুষকেই **আবর্ত্তমান** সত্তা বা **ভ্রা** মনে করলে মানুষের কথাবার্তাকে অনায়াসে **ভ্রাট** বলা যায়। অবশ্যই তার জন্য ঐ সকল **ভ্রা**-এর সঙ্গে কারও কোনো সংঘাতের ব্যাপার ঘটছে এবং তার জন্যই ওরকম বিচ্ছুরণ ঘটছে, একথা মনে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সেটি যদি একটি ছুরি মাত্র হয়, তবে 'অলঙ্কারাদি দ্বারা শোভমান'-এর ক্ষেত্রে সেটি যে 'অলঙ্কারাদি'ই বটে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই **ভ্রাজ্, ভ্রাট্, ভ্রাট** প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে **বি** যুক্ত হয়ে গেলে ব্যাপারটি আর একটু জটিল হয়ে যায়।

এর আগে কামারশালায় আমরা যে শানপাথরকে ঘুরতে দেখছিলাম, এখন যদি ঠিক বিপরীত একটি শানপাথর উল্টো দিক থেকে ঘুরতে শুরু করে দেয় এবং আগের ঘুরন্ত শানপাথরটির সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অনেক আগুনের ফুলকি বিচ্ছুরিত ক'রে অবশেষে আগের ঘুরন্ত শানপাথরটিকে প্রায়-অচল বা স্তব্ধ করে দেয়, তখন তাকে বলতে হয় **বিভ্রাট**। এই ঘটনা আগেও ঘটতে পারত, যদি শান দেওয়ার জন্য কাটারিটিকে খুব জোরে চেপে ধরা হত। তার মানে, **বিভ্রাট্ বিভ্রাজ্ বিভ্রাট** শব্দের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র **ভ্রাট** নেই, একটা বিপরীত **ভ্রাট**ও আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'হিং টিং ছট' কবিতায় বলেন — 'মেয়েরা করেছে চুপ — এতই **বিভ্রাট**', তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মেয়েদের কলকল করে অনর্গল কথাবার্তা বলতে থাকা একপ্রকার স্বাভাবিক **ভ্রাট**; আর যে ঘটনা মেয়েদের সেই কথাবার্তার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণকে বা **ভ্রাট**কে স্তব্ধ করে দিয়েছে, সেটি হল **বিভ্রাট**। তার মানে, জগতে অজস্র **ভ্রাট** রয়েছে; কোনো বিপরীত **ভ্রাট** তার মুখোমুখি হলে যে বিচ্ছুরণ ঘটে, তাকে বলে **বিভ্রাট**। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই **বিভ্রাট** অন্য **ভ্রাট**টিকে একেবারে স্তব্ধও করে দেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুই পরস্পর বিপরীত **ভ্রাট**-এর দু'রকম বিচ্ছুরণ মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেয়। তেমনি এক **বিভ্রাট**-এর কথা বলে গেছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর **ভাষাবিভ্রাট** বিষয়ক আলোচনায়। **ভাষা** ও **ভাষাবিভ্রাট** শব্দে বিষয়টি আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা চারটি অভিধান থেকে **বিভ্রাট** শব্দের অর্থ যেমন যেমন পেয়েছি, তা সবই এখানে উল্লেখ করেছি। তাতে দেখা যাবে, অভিধানকারগণ শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করতে গিয়ে কতখানি অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। পুরনো অভিধান বা শব্দকোষ তবুও 'দীপ্তি' ও 'সংঘর্ষ', **বিভ্রাট** শব্দের এই দুটি দিকই উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক অভিধান তার সংঘর্ষের দিকটিকেই শুধুমাত্র উল্লেখ করে গেছেন, বিষয়টির কিছুমাত্র

না জেনে না বুঝে। কলকাতার অভিধানটি আবার মাতব্বরি করেছে 'বাংলায় অর্থান্তরিত' বলে। শব্দার্থসন্ধান বিষয়ে এই অভিধানটি তার অজ্ঞতা কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাতব্বরির অজস্র নিদর্শন রেখেছে তার বহু পৃষ্ঠাতেই। ৬. **বিব্রত** ও **বিভ্রাট** কাছাকাছি অর্থধারী শব্দ। ব্র ও ভ্র উভয়ই 'আবর্তন'বাচক, কিছু পার্থক্য থাকলেও। ইংরেজি এদের উত্তরাধিকার ধরে রেখেছে তাদের vibrate ... প্রভৃতি শব্দে। ল্যাটিন ভাষায় **বিব্রতম্** শব্দের অতি নিকট সজাতি পাওয়া যাচ্ছে — vibratum, যার মানে to tremble।

ভাই (ভাইফোঁটা) : ২. **ভাই** = **ভা** *(= ভবের আধার) গতিশীল যাহাতে।* ***ভাইফোঁটা*** *=* ***ভাইকে*** *যে ফোঁটা দেওয়া হয়।* ৩. **ভাই** = সহোদর, বিমাতার পুত্র, জ্যেঠা খুড়া প্রভৃতির পুত্র, ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি, স্বদেশবাসী ব্যক্তি, শিষ্টাচারপূর্ব্বক সম্বোধনপদ, এক জাতি এক সম্প্রদায় বা এক সমাজের ব্যক্তি, সখীত্বসূচক সম্বোধনপদ, সতীন জা দিদি ইত্যাদির প্রতি সম্বোধনপদ। **ভাইফোঁটা** = ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইএর কপালে ভগিনীর ফোঁটা দেওয়ার উৎসববিশেষ। (ব.শ.)। ৪. দুটি শব্দই যথার্থে প্রচলিত। ৫. এক্ষেত্রে **ভব** হলেন পিতা, তাঁর আধার হল তাঁর বংশধারা। সেই বংশধারা গতিশীল থাকে সন্তানে। সেই সন্তানেরা সেকারণে পরস্পরের **ভ্রাতা**। সেই **ভ্রাতা**দের মাধ্যমে পিতার বংশধারা প্রবাহিত থাকে। সেই কারণে তাদের **ভাই** বলে।

ভাইফোঁটা একটি তাৎক্ষণিক প্রতীকী আচরণ — বোনেরা বিশেষ দিনে (ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে) তাঁদের **ভাই**য়ের কপালে ফোঁটা দেন। সেই সুবাদে **ভাইফোঁটা** একটি বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এক হিসেবে এই প্রথা সবচেয়ে প্রাচীন প্রথাগুলির মধ্যে একটি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, যখন এক একটি গোষ্ঠীতে শুধুমাত্র ভাই ও বোনেরা, মামা ও মাসীরা, মাসতুত ভাই ও বোনেরা থাকত (মর্গান যার নাম দিয়েছিলেন 'পুনালুয়া পরিবার') এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো রকম যৌনসম্পর্ক থাকত না, বোনেদের স্বামীরা থাকত অন্য গোষ্ঠীতে, তখন বোনেদের সমগ্র গোষ্ঠীকে রক্ষা করত সেই গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষেরা অর্থাৎ ভাই ও মামারা। অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক সেই সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের নিরাপত্তা দিত তাদের ভাইয়েরা, স্বামীরা নয়। দ্র. **দুষ্মন্ত**। সেই সময়ই এই ভাইফোঁটার প্রচলন হয়েছিল। কোনো প্রাণসংশয়পূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে দিত।

তারপর, বহু যুগ পার হয়ে সমাজ যখন ক্রমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়ে গেল, বোনেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব চলে গেল তাদের স্বামীদের হাতে। সমাজ অনেক বদলে গিয়ে বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয়ে গেছে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে গেছে, যুদ্ধবিগ্রহের উদ্ভব ঘটে গেছে। তখন যুদ্ধযাত্রার কালে স্ত্রীরাই স্বামীর কপালে যম-নিবারক-ফোঁটাটি দিতে শুরু করে। তবে 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা / যমের দুয়ারে পড়ুক (পড়ল) কাঁটা' বাক্যটি বলার উপায় থাকে না তাদের। ভাইকে ফোঁটা দেওয়ার রেওয়াজটি কিন্তু কার্যত অর্থহীন প্রথা রূপে থেকে যায়। 'সামাজিকভাবে' বা 'সরকারিভাবে' বোনকে নিরাপত্তা দেবার কর্তব্য থেকে ভাই মুক্ত হয়ে যায়, সে দায়িত্ব নিতে হয় তার স্বামীকে। যাই হোক, অতঃপর অর্থহীন প্রথারূপে ভাইকে ফোঁটা দেওয়ার রীতির পাশাপাশি অর্থপূর্ণ প্রথারূপে স্বামীর কপালে ফোঁটা দেওয়ার রীতির প্রচলন হয়ে যায়, ছড়াটি ছাড়াই। স্বামীর কপালে ফোঁটা দেওয়ার এই নতুন রীতি অতঃপর যুগের পর যুগ বেয়ে আধুনিক কালে পৌঁছায়। মধ্যযুগের ভারতেও স্বামীকে ফোঁটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকতে দেখা যায়, বিশেষত মেবারের রাণাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যেত। ...

ভ্রাতা (ভ্রাতৃ) : ১. ✓ভ্রাজ্ + তৃ (তৃন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ভ্রাতা*** *=* ***ভ্রা*** *বা ভবের আবর্তমান ধারা (প্রথম সন্তানকে উত্তীর্ণ হয়ে) তারিত হয় যে আধারে।* ***ভ্রাতৃ*** *=* ***ভ্রা*** *বা ভবের আবর্ত্তমান ধারা (প্রথম সন্তানকে) উত্তীর্ণ হয়ে আবর্তিত হয় যে আধারে।* ৩. **ভ্রাতা (ভ্রাতৃ)** = সহোদর, ভাই, বিমাতৃপুত্র, ভ্রাতৃস্থানীয়, সখিত্বসূচক শব্দ, সখা। (ব.শ.)। ৪. শব্দদুটি অ্যাকাডেমিতে কমবেশি প্রচলিত বটে, কিন্তু সাধারণ্যে অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ফুলকাকা**। সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদক পিতামাতা তাঁদের বংশধারার যে প্রবাহ সৃষ্টি করেন, সেটি যে একের পর এক সন্তানকে জন্ম দিয়ে দিয়ে তাদের উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে এগোয় — এরকমভাবে ব্যাপারটিকে আমরা দেখতে শিখিনি। কিন্তু **ভ্রাতা** ও **ভ্রাতৃ** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটি সেরকমই। কিন্তু অতশত জটিলতায় যাওয়ার দরকার কী! '**ভা** (= বংশধারা) **ই** (= গতিশীল) যাহাতে' করে নিলেই তো হয়। কথাটি বাংলাভাষীর মাথায় ঢুকতে দেরি হয়নি। তাই তাঁরা **ভ্রাতা** ও **ভ্রাতৃ**কে **ভাই** করে নিয়েছেন। ৬. আমরা যাকে 'সহোদর' বলি, ফারসি তাকে 'বিরাদর' এবং ইংরেজ তাকে 'ব্রদর' (brother) বলে থাকে। **ব্র** ও **ভ্র** যে মূলত **আবর্তন**কে বোঝায়, সেকথা আমরা তাদের ব্যাখ্যায় দেখেছি। কোনো কোনো ভাষায় (গ্রীক-এ) এটি আবার **ফ্র** হয়ে গেছে। সেকারণেই ইংরেজিতে আমরা *fra*ternity-কে পাই।

ভ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : ভ্, ভ, ভ-কার, ভক্কভক্ক, ভক্‌ভক্, ভগণ, ভগোঃ, ভগোস্, ভগোল, ভচক্র, ভদই (চিংড়ি), ভনভন (ভনজ্, ভ্রম্‌ভ্রম্), ভনি, ভপঞ্জর, ভভম্, ভভন্তম্, ভমভম, ভাইট, ভাঁটগাছ, ভাঁটা, ভাঁটি, ভাঁটুই, ভাচা, ভাচাতি, ভাটা, ভিঁয়া, ভিয়া, ভিয়ান, ভিস্তি (ভিস্তী), ভেশ, ভেস্ত, ভেস্তা, ভেসতে-দেওয়া, ভো, ভোঃ, ভোন-ভোন, ভ্যা, ভ্যাস্তা, ভ্রূণ, ভ্রূণহত্যা, ভ্রূণহন্তা, ভ্রেষ।

ম

ম বর্ণের অর্থ : ১. ✓মা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা মিতকৃত হইয়াছে।* ৩. ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম, চন্দ্র, আভিচারিক সূত্রবিশেষ (formula), (ছন্দঃশাস্ত্রে) ত্রিগুরুবর্ণ গণবিশেষ, (সঙ্গীতে) স্বরসপ্তকে — মধ্যম; সুখ, মঙ্গল। (ব.শ.)। ৫. **ম** = ম্-অন করে যে; মিতকরণ বা সীমিতকরণ করে যে, কিংবা যাকে মিত করা হয়েছে। সে কেমন ব্যাপার? ব্যাপার খুবই সহজ, না বুঝলে খুবই কঠিন। আপনার একটি আমগাছ আছে। সেটি বেচে দেবেন। খদ্দের গাছটি দেখে বলল — এতে তো মনে হচ্ছে গোটা কুড়ি পাকা আর হাজার খানেক কাঁচা আম আছে, আর ডালপালা মিলিয়ে ৪০ কুইন্টাল কাঠ বেরোবে। তো, ২০০০ টাকা দিচ্ছি, গাছটা দিয়ে দিন। আপনি বললেন আপনার দাম ৩০০০ টাকা। তা না পেলে দেবেন না। লোকটা রাজি হয়ে ১০০ টাকা বায়না দিয়ে চলে গেল। দিন দশেক পরে এল গাছটি কাটতে। কিন্তু ততদিনে পাকা আমের সংখ্যা বেড়ে হয়ে গেছে ১০০ টি, অন্য আমগুলিও পুরুষ্টু হয়েছে, পাকতে চলেছে। গাছের ডালপালাও মোটা হয়েছে, বেড়েছে। কারণ গাছটি তো দশ দিন আগে যেখানে ছিল সেখানে নেই! তার বাড়বৃদ্ধি অব্যাহত থেকেছে। আপনি কিন্তু ২৯০০ টাকার বেশি চাইতেও পারলেন না, সেও আর কিছুই বাড়তি দিল না। আপনি ঠকলেন। কেননা, গাছের দামের ব্যাপারে আপনাদের দুজনের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরেও গাছটি বেড়েছে, অথচ আপনি ও গাছ-পাইকার দুজনে গাছের অস্তিত্বকে একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও স্থির ধরে নিয়ে তার লেনদেন করে ফেলেছেন। কোনো বস্তু বা বিষয়কে এইভাবে সাময়িকভাবে পূর্ণ বলে ধরে নেওয়াকে বলে পরিমিত-করণ অর্থাৎ মিতকরণ বা ম্-করা। যাকে সেভাবে **মিত** করা হয়ে গেছে, তাকেও **ম** বলে। কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলি, তখন তাকেও আমরা এভাবে **মিত** করে নিই বা **ম** করি; কিংবা বলা ভাল, করে নিতে বাধ্য হই। অন্যথায় লেনদেন চলে না, তা সে ধনমূলক-আর্থিক লেনদেন হোক আর জ্ঞানমূলক-আর্থিক বা বাচিক লেনদেনই হোক। সমস্যাটি আমাদের প্রাচীন ভাষা-সংস্কৃতকারগণ জানতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বহু শব্দের শেষে একটা করে **ম্** জুড়ে নিতেন। যথা — নরম্, গজম্, দেবম্, সাগরম্, অমাত্যম্, অরুণম্ ... ইত্যাদি। ল্যাটিন ভাষাও এরই উত্তরাধিকার বহন করে। ব্যাপারটি আমাদের সুকুমার রায়েরও চোখে পড়েছিল। তাঁর '*হযবরল*'-তে তিনি লিখছেন —

"কাকটা ... খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর চার, হাতে রইল পেনসিল।'

আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?'

কাক বলল, 'তুমি যখন বলছিলে তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়ই চোদ্দ। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।'

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?' ..."

অর্থাৎ কালের নিয়মে কোনো বস্তুই স্থির নয়, তার ক্ষয়বৃদ্ধি আছে। তা সত্ত্বেও কাজ চালানোর জন্য প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রেই আমরা তাদের একপ্রকার সম্পূর্ণ স্থির রূপ ধরে নিতে বাধ্য হই, নইলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাগতিক ব্যাপারের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সত্তার এই 'একপ্রকার সম্পূর্ণ স্থির রূপ ধরে নেওয়া'কেই **মিতকরণ** বা **ম্**-করণ বলে। এই **ম**-করণের সর্বনিম্ন স্তরের বোধ থেকে সর্বোচ্চ বোধ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন অনেকেই। আমরা সেরকম সর্বনিম্ন বোধের উদাহরণ দিলাম **গাছের** উদাহরণ দিয়ে। মাঝামাঝি বোধের উদাহরণ পাওয়া যাবে **প্রতিম, মম** ও **ম-ম**-করা (নিপাত দ্রষ্টব্য) শব্দে। এবার সর্বোচ্চ বোধের একটি উদাহরণ দিয়ে মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাব।

'এক রাজা সবাইকে অধীনত করে কর চাইলেন। সবাই দিল। দিল না কেবল সমুদ্র। রাজা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সমুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন। তাই দেখে সমুদ্র মাথা নত করে অধীনতা স্বীকার করল। এবং করস্বরূপ ঢেউয়ে ঢেউয়ে অজস্র মণিমুক্তোয় বেলাভূমি ভরিয়ে সাদা করে দিতে লাগল। রাজপুরুষেরা সেই মণিমুক্তো নিয়ে গিয়ে রাজকোষ ভরিয়ে ফেলল, ঘরে ঘরে রাখা হল, রাখা হতে লাগল মাঠেঘাটে। কিন্তু তারপরও বেলাভূমি সাফ হল না। রাজা বিরক্ত হলেন, এত মণিমুক্তো রাখা যাবে কোথায়? সমুদ্র বলল, 'হুজুর, মানুষের মাথায় ব্রহ্মতালুর নীচে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে রাখুন। দেখবেন, ওখানে ধরে যাবে।' তাই করা হল। লোকের মাথার ভিতরে রাখা হতে লাগল মণিমুক্তোগুলো। কিন্তু এ কী! মাথাটাতো কিছুতেই ভরে না! সমুদ্র বলল, 'মাথাটা ভরাতে চাইলে এক কাজ করুন, বেলাভূমির খানিকটা পলি তুলে মাথায় দিয়ে দিন, দেখবেন, মাথাটা ভরে গেছে।' তাই করা হল। মাথা ভরে গেল। পলি দেওয়া হয়েছিল বলেই মানুষের মাথার ব্রহ্মতালু আজও নরম থাকে।' (এই গল্পটি বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যাবে আমাদের 'জ' গ্রন্থের শুরুতেই।)

তার মানে, মানুষ কখনো বলে না যে, আপনি আর নতুন কোনো গল্প বলবেন না, আমার মস্তিষ্ক ভর্তি হয়ে গেছে, আর গল্প রাখার, তত্ত্ব রাখার, তথ্য রাখার, জ্ঞান রাখার জায়গা নেই। আমাদের মস্তিষ্ক এমনই অসীম গুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী হয়? কার্যক্ষেত্রে যতটা জ্ঞানে মাথাটি যতখানি ভর্তি হয়েছে, ততটা জ্ঞান নিয়েই মানুষকে তার কাজকর্ম করতে হয়। সেই পর্যন্ত প্রাপ্ত জ্ঞানকে একপ্রকার সম্পূর্ণ স্থির জ্ঞান ধরে নিয়ে তাকে কাজে নেমে যেতে হয়। কবে সব জ্ঞানে মাথাটি পরিপূর্ণ হবে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না। এই যে সাময়িক সীমায়িতকরণ, এবং তদ্দ্বারা একপ্রকার পূর্ণতার বোধ, এই হল **ম**। বিন্দুরূপিণী (.) বা ংরূপিণী **ঙ ঞ ণ ন** পেরিয়ে এই **ম**-এ পৌঁছে তাঁর একপ্রকার পূর্ণ রূপ নিয়ে বিরাজ করেন।

যাই হোক, আমাদের শব্দার্থকোষের কাজ চালানোর জন্য আমরা তাহলে **ম্**-এর অর্থ বুঝব 'মিতকরণ' এবং **ম** বর্ণের অর্থ লিখব '**ম্**-

করণ', '**ম**-কারী' বা 'মিতকারী', 'পরিমিত-কারী', 'সীমিতকারী', 'সীমায়িতকারী', 'কেন্দ্রীকরণকারী', ... ইত্যাদি। স্বভাবতই **মা** = মিত-এর আধার যে, **মি** = গতিশীল মিত যাহাতে ... ইত্যাদি হবে। অতঃপর **পা, পি, পী, পু, পূ** ... প্রভৃতি বর্ণের অর্থের মতো **মা, মি, মী, মু, মূ** ... ইত্যাদির অর্থও হবে।

ম্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : মক্ *(মখ্, মচ্, মশ্, মস্, মস্‌জ্)*, মঙ্গ *(মন্‌গ্)*, মঞ্চ *(মন্‌চ্)*, মঞ্জ *(মন্‌জ্)*, মট্ *(মঠ্)*, মণ্, মথ্ *(মিথ্, মেথ্)*, মদ্, মন্ *(মন্ত্র, মহ্, মন্দ্)*, মল্, মহ্, মা, *মি*, *মিদ্*, মিল্, মিশ্র্, *মিষ্*, *মিহ্*, *মী (মীল্)*, মু, মুচ্ *(মোক্ষ্)*, মুণ্ড্, মুদ্, মুষ্ *(মূষ্)*, মুহ্, মূ *(মূর্চ্ছ্, মূর্ত্, মূল্)*, মৃ *(মর্ক্, মর্চ্)*, মৃগ্, মৃজ্, মৃৎ *(মৃদ্, মৃধ্)*, মৃশ্ (মৃষ্), *মেধ্, ম্না, ম্রক্ষ্, ম্লেচ্ছ্ (ম্লৈ)*, ম্ = ৩৫ + ১

মক্ *(মখ্, মচ্, মশ্, মস্, মস্‌জ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ঝকঝক-মকমক, ঝকমক, ঝমক, নিমগ্ন, মইসা, মউল (মুকুল, মহুল - মুচ্, মন্), মকদ্দমা (মোকদ্দমা), মকদ্দমাবাজ, মকম্মল, মকর, মকরকুণ্ডল, মকরকেতন, মকরকেতু, মকরকেতুমান, মকরক্রান্তি, মকরখাড়ু, মকরধ্বজ, মকরন্দ, মকর-পাতান, মকরবাহন, মকরবাহিনী, মকরব্যূহ, মকরলাঞ্ছন, মকরসংক্রান্তি, মকরসপ্তমী, মকরস্নান, মকরা (মগরা), মকরাকর, মকরাক্ষ, মকরবাস, মকরালয়, মকরিকা, মকরী, মকরীপত্র, মকরীলেখা, মকাই, মকাম (মোকাম), মকার, মকারপঞ্চক, মকুট, মকুফ (মৌকুফ), মকুর (মুকুর, মেকুর), মকুল, মক্কা (মক্কহ্), মক্কার (মক্কার), মক্কেল (মোয়াক্কেল), মক্‌খম (ম-ক্ষম), মক্‌তব (ম-কিতব), মক্দম (অ-কদমী, academy), মক্‌দুর, মক্‌মকি, মক্‌মকী (ঝকমকি), মক্‌মল (মখ্‌মল), মক্‌মলি (মখ্‌মলি, -লী), মকরর (মোকরর), মকররী-পাট্টা, মক্‌শ, মক্‌স, মক্ষি (মক্-কারী মকর = মাছ, তাই মক্ষি = মাছি), মক্ষিক, মক্ষিকা, মক্ষিকামল, মক্ষীকা, মখ, মখক্রিয়া, মখজ, মখদ্বিট্, মখদ্বেষী, মখভুজ, মখহর, মখমল, মগ, মগজ (ম-গমন জন্মায় যাহা হইতে), মগধ, মগধপ্রতিষ্ঠ, মগধবংশ, মগধলিপি, মগধা, মগধেশ্বর, মগন (দ্র. মগজ), মগর, মগরা, মগ্ন, মঘ, মঘন, মঘবা, মঘবান, মঘা, মঘোনী, মচ্, মচকা, মচকান, মচমচে, মচ্চিত্ত, মচ্ছ, মচ্ছব (মৎস্য), মচ্‌মচ্, মজ, মজক (মজগ), মজকুর, মজগ (মগজ), মজদুর, মজদুরি, মজবুত, মজবুতি, মজবুর, মজবুরি, মজমুন, মজলিশ(স), মজা, মজাড়ে, মজাদার, মজান, মজানী, মজারখোলা, মজুত, মজুদ, মজুমদার, মজুর, মজুরা, মজুরী, মজ্জ, মজ্জন, মজ্জমান, মজ্জঃ, মজ্জা, মজ্জাকর, মটুক (মকুট), মদ্‌গু, মদ্‌গুর, মরন্দ, মশ্, মশক, মশকবারণ, মশকহরী, মশকার্থ, মশগুল, মশমশ (মসমস), মশলা, মশল্লা (মসল্লা), মশহরী, মশা, মশান (শ্মশান-মশান, দ্র.সূন৪), মশারি(রী), মশাল, মশালচী, মষ্, মষি (মষী), মস্, মসক, মসজিদ, মসজিয়া, মসনদ (মস্‌নৎ, মসান), মসমস, মসলন্দ (মছলন্দ), মসলিন, মসান, মসার, মসারক, মসারি, মসি, মসিকুপী, মসিকুর্চ্চক (কুর্চ্চক-কুঁচি), মসিদ (মসীদ), মসিধান, মসিধানী, মসিনা, মসিপটল, মসিপণ্য, মসিপাত্র, মসিবর্ণ, মসিভাণ্ড, মসী, মসীদ, মসীনা, মসীযুদ্ধ, মসুর, মসূর, মসূরক, মসূরা, মসূরিকা, মসূরী, মসৃণ (ঋণ?), মসৃণা, মসৃণিত, মস্ক, মস্কর, মস্করা, মস্করী, মস্কারা, মস্কা-লাগানো, মস্‌জ্, মস্ত্ (মস্ত), মস্ত, মস্তক, মস্তকজ্বর, মস্তকলুঙ্গ, মস্তকশূল, মস্তকস্নেহ, মস্তদারু, মস্তান, মস্তানজী, মস্তানী, মস্তিষ্ক, মস্তু, মস্তুলুঙ্গ, মস্তুলুঙ্গক, মস্যাধার, মাকড়ি, মাকর, মাকরাকর, মাকরন্দ, মাকরী, মাক্ষিক (মাক্ষীক), মাক্ষিকজ, মাক্ষিকফল, মাগধ, মাগধী, মাঘ, মাঘচাপ, মাঘবত, মাঘবতী, মাঘবন, মাঘবনী, মাঘী, মাঘী-পূর্ণিমা, মাঘী-শুক্ল, মাঘ্য, মাচ (মচ্, much), মাচি, মাচিকা, মাছি, মাছিতা (মাছেতা, মেছেতা), মাছিটেপা, মাছিপোকা, মাছিমারা, মাজ(ঝ), মাজদা (মেজদা), মাজা (মজ্জা, মধ্যে আছে যা), মাজিভাত, মাজুফল, মাঝ, মাঝখান, মাঝখানে, মাঝগঙ্গা, মাঝদরিয়া, মাঝদা (মেজদা), মাঝপথ, মাঝামাঝি, মাঝার, মাঝারি, মাঝারি-গোছ, মাঝি(ঝী), মাঝিমাল্লা, মাঝিয়া (মেঝ, মেঝে, মেঝ্যা), মাথট, মাথা, মাথাইল (মাথাল), মাথাঘষা, মাথাধরা, মাথাপাগলা, মাথাফাড়া, মাথাব্যথা, মাথাভারী, মাথামাথি, মাথামারা, মাথামুটে, মাথামুণ্ডু, মাথাল, মাথালো, মাথি, মাষ, মাষক, মাষকলাই(য়), মাষতৈল, মাষপিষ্ট, মাষবর্ণ, মাষসূপ, মাষা(সা), মাস্, মাস, মাসওয়ারী, মাসকাবার, মাসকাবারী, মাসকালিক, মাসচটক, মাসজাত, মাসড়া (মাসরা, মাসহরা, মাসোহারা), মাসড়ো, মাসতম, মাসদেয়, মাসপাক, মাসপালানে, মাসপ্রবেশ, মাসমাই(হি)না, মাসমান, মাসসঞ্চয়িক, মাসাধিপ, মাসাধিপতি, মাসানুমাসিক, মাসান্ত, মাসাবধিক, মাসাহার, মাসিক, মাসীন, মাসুরী, মাসূর, মাস্য, মাস্যা, মাহ, মাহরমাহ, মাহিনদার, মাহিনা, মাহিয়ানা (মাইনে), মিউজিয়ম (মজাম্), মেচক (match), মেচকিত, মেজ, মেজকী, মেজদা, মেজমেজ (ম্যাজম্যাজ), মেজর, মেজিষ্টার, মেজেষ্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, মেজো (মেঝো), মেঝা (মাঝিয়া), মেঝাম (মেঝাম, মেঝে, মেঝ্যা), মেঝো, মোশাল, মৌজ, মৌজী (মনমৌজী)।

মক্ (মখ্, মচ্, মশ্, মস্, মস্‌জ্) = মিত করণ। **মক** = মিত করে যে। **মখ** = মিত-এর ক্ষয়ন যাহাতে। **মচ** = মিত চয়িত হয় যাহাতে। **মশ** = মিত সার্ব্বিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। **মস** = মিত নিঃশেষে বিচ্ছুরিত যাহাতে বা মিত-এর নির্য্যাস যাহাতে। **মস্‌জ** = মিত-এর নিঃশেষে বিচ্ছুরণ জনিত যাহাতে বা মিত-নির্য্যাস জনিত যাহাতে।

মকর (মকরক্রান্তি, মকরন্দ, মকরবাহন, মকরবাহিনী, মকরসংক্রান্তি, মকরস্নান) : ১. ম + ✓কৃ + অন - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. **মকর** = *মিত করে যে; অথবা, মিত কৃত যাহাতে।* ***মকরক্রান্তি*** = ***মকর*** *অতিক্রান্ত যে স্থান বা কাল হইতে।* ***মকরন্দ*** = ***মকর***-*এর রহস্যরূপের দাতা যে।* ***মকরবাহন*** = *যিনি (যে দেব)* ***মকর***-*এ বাহিত হন।* ***মকরবাহিনী*** = *যিনি (যে দেবী)* ***মকর***-*এ বাহিত হন।* ***মকরসংক্রান্তি*** = ***মকর*** *সম্যক রূপে অতিক্রান্ত যে স্থান বা কাল হইতে।* ***মকরস্নান*** = ***মকরসংক্রান্তিতে*** *যে স্নান করা হয়। /* **মকরন্দ** = কাম দেয় যে ('কামদাতা')। (ব.শ.)। ৩. **মকর**

= সামুদ্রিক জলচরবিশেষ, কামের মকরাকৃতি ধ্বজ, ব্যূহবিশেষ (ইহার মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগ স্থূল ও মধ্যভাগ সূক্ষ্ম।), মকরাকার কুণ্ডলবিশেষ, কুবেরের নিধিবিশেষ, (জ্যোতিষে) দশম রাশি, মকরসংক্রান্তি, মকরে গঙ্গাস্নানের পরে পাতান স্ত্রীলোকের সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ, মকররাশিযুক্ত মাঘমাস। **মকরক্রান্তি** = বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অয়নবৃত্ত (Tropic of Capricorn)। **মকরন্দ** = পুষ্পমধু, পুষ্পরস, কুন্দবৃক্ষ, কোকিল, মধু; কিঞ্জল্ক। **মকরবাহন** = বরুণ। **মকরবাহিনী** = গঙ্গা। **মকরসংক্রান্তি** = সূর্য্যের মকররাশিতে গমন। **মকরস্নান** = মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাদিতে স্নান। (ব.শ.)। **৪. মকরসংক্রান্তি, মকরস্নান** শব্দ দুটি ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে প্রথারূপে প্রচলিত। **মকর** শব্দটি গ্রামবাংলায় সর্বজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, বিশেষত আদিবাসী সাঁওতাল ভূমিজদের মধ্যেও। **মকরক্রান্তি** শব্দটি ভূগোল পড়ানোর সময় ইংরেজি Tropic of Capricorn এর প্রতিশব্দ রূপে পড়ান হয়। **মকরধ্বজ** ও **মকরন্দ** কথা দুটি আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ আজও ব্যবহার করে থাকেন। **মকরক্রান্তি** বাদে বাকি শব্দগুলি একালের অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত। **৫.** না, **মকর** নামে কোনো জীব বা animal দৃশ্যলোকে নাই, কিন্তু অদৃশ্যলোকে ছিল, আছে, এবং বর্তমানে তার বিপুল বিকাশ ঘটেছে; এমনভাবে যে, সমগ্র মানবসমাজকে সে প্রায় ঢেকে ফেলতে চলেছে। সেকালের শব্দবিদ মানুষেরা তাকে তার শৈশবেই **মকর** নামে চিহ্নিত করেছিলেন এবং মানুষের সমাজে তার কীর্তিকলাপকে বোঝাতে বহু **মকর**-যুক্ত শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। উপরে **মক্** ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত **মকর**-যুক্ত শব্দগুলির দিকে তাকালেই সেকথা বোঝা যাবে। এখন সেই **মকর**-এর দৌরাত্ম্যে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাকে চিনতে ও চেনাতে পারি না, তার বিষয়ে কথা বলতে পারি না। কী করে বলব? যে শব্দ দিয়ে বলব, বোঝাবো, সেই শব্দই তো হারিয়ে ফেলেছি। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারতেন। ...

কিন্তু সমাজে যা কিছু অত্যন্ত সক্রিয় তাকে তো একালের মানুষও কমবেশি চিনতে বাধ্য, তাই আমরাও চিনি। তবে কিনা সেকালের মতো আমরা অখণ্ড স্বভাবের ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ দিয়ে তাকে চিহ্নিত করতে পারি না, আমরা করি খণ্ড শব্দ দিয়ে। সেকালে যে 'ম-করণ' ও 'ম-করণকারী'কে এককথায় **মকর** বলা হত, এখন আমরা তাকে 'বিক্রয়যোগ্য-করণ', 'বণ্টনযোগ্য-করণ' 'অর্থমূল্য-নির্দ্ধারণ', 'বিনিময়যোগ্য-করণ', 'লেনদেনযোগ্য-করণ', 'উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করণ' বা 'বিপণন-যোগ্য-করণ' ... ও তদ্রূপ-কারী ... ইত্যাদি নানা নামে শনাক্ত করে থাকি। এগুলি সবই চাহিদা ও যোগানের মধ্যবর্তী ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারী-বাচক শব্দ। ইংরেজিতে এদের saleable, marketable ... ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু সেসব করতে গেলে বন্টনযোগ্যকে অবশ্যই একটি বিশেষ সীমায় মিত করে নিতে হয় (**ম** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য), তার অর্থমূল্য ধার্য করতে হয়, বাঁধা-ছাঁদা গোছাগুছি করতে হয়, 'প্যাকেজিং' করতে হয়; কেবল তাহলেই বিক্রয়যোগ্য বিষয় বা বস্তুটি, তা সে কৃত্রিম **বিশ্ব** হোক আর অকৃত্রিম **বিশ্ব**ই হোক, লেনদেনযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। সেভাবে **বিশ্বে**র প্রতিটি বিষয় ও বস্তুকে বা **বিশ্ব**কে মিত করে নেওয়াকে, সীমায়িত করে লেনদেন-যোগ্য করে নেওয়াকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা নাম দিয়েছিলেন — **মকর**। চাহিদা ও যোগানের মধ্যবর্তী সমস্ত ক্রিয়াকে **মকর** শব্দটি এককথায় প্রকাশ করে থাকে। শব্দসৃষ্টির নিয়মে যে সত্তা এরূপ **ম**-করণ করত তাকেও বলা হত **মকর**। এই **মকর**-এর পিঠে চেপেই **গঙ্গা**ধারা বা পণ্যধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে বলে তাঁকে **মকরবাহনা** বা **মকরবাহিনী** বলা হয়। সত্যগোপনকারী সত্তা **বরুণ**ও এই **মকর**-এর পিঠেই সওয়ার থাকেন বলে তিনি **মকরবাহন** নামে চিহ্নিত হয়েছিলেন। চাহিদা বা **কামদেব** এই **মকর**চিহ্নিত পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে ধরেন (**ম**-করে ফেলুন, মিত করে ফেলুন, marketable করে ফেলুন ... ইত্যাদি করে আমাকে দিন), ব'লেই চাহিদা বা মানবমনের **কামনা**কে **মকরকেতন, মকরকেতু, মকরকেতুমান, মকরধ্বজ, মকরলাঞ্ছন** ... ইত্যাদি বলা হত। এই **মকর** জনসমুদ্রে বাস করে বলে সমুদ্রকে **মকরাকর, মকরাবাস, মকরালয়** ... ইত্যাদি বলা হত। আমাদের সেকালের আয়ুর্বেদাচার্যগণ একটি ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন এবং তারও নাম দিয়েছিলেন **মকরধ্বজ**। কারণ সেই ঔষধটি মানবশরীরের চাহিদা বা **কামদেব**কে সদাজাগ্রত রাখতে পারে বলে মনে করা হত। ... এখনও এসবই সত্য, বাস্তব, দারুণভাবে সক্রিয়; অথচ আমরা তাদের এভাবে উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। ...

আমাদের পূর্বপুরুষদের হাতে **মকর** ও **ক্রান্তি** দুটো শব্দই ছিল, তার বোধও স্বভাবতই ছিল। একালের পাশ্চাত্যের astronomy-বিদ্যা যাকে Tropic of Capricorn নামে শনাক্ত করেছে, আমরা এখন তাকে **মকরক্রান্তি** বলে থাকি। **মকরক্রান্তি** শব্দটি প্রাচীন শব্দ নয়, যদিও **মকর** ও **ক্রান্তি** দুটোই প্রাচীন শব্দ। ৫০/৬০ বছর আগে আমাদের যে বাংলাজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা ছিলেন, তাঁরা এই নতুন শব্দটি বানিয়ে গেছেন। তাঁদের তৈরি করা **পদার্থবিদ্যা** ... প্রভৃতি শব্দ যেমন Physics-এর তুলনায় অনেক ব্যাপকার্থক, এই **মকরক্রান্তি** শব্দটিও Tropic of Capricorn শব্দের তুলনায় ব্যাপকার্থক। কীভাবে, এখন সেকথায় যাওয়া যাক।

গ্রামবাংলায় আজ থেকে ৪০/৫০ বছর আগেও হিন্দু-মুসলিম-আদিবাসী-ভূমিজ নির্বিশেষে কৃষিজীবী মানুষেরা একটি প্রথা অবশ্যই মান্য করতেন। সে হল **মকরসংক্রান্তি** পালন। এটি পৌষ মাসের শেষ তারিখ ব'লে একে পৌষসংক্রান্তিও বলা হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ এই ছয় মাস জুড়ে (অর্থাৎ, সূর্যের দক্ষিণায়ন কাল জুড়ে) যে কৃষিকর্ম করা হত, তার ফসল রূপে প্রাপ্ত নতুন ধান তুলে, ঝাড়াই-মাড়াই করে গুছিয়ে মরাইয়ে বা হামারে রাখার কাজ সেরে ফেলা হত ঐ **মকরসংক্রান্তির** আগেই। **মকরসংক্রান্তি**তে হত উৎসব (পুলিপিঠা ইত্যাদি)। আর, নতুন ধানের বিক্রিবাটা শুরু করা হত **মকরসংক্রান্তির** পর থেকে, এবং তার আগে কিছুতেই নয়। এই বিক্রিবাটা চলতে পারত পরবর্তী মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় — এই ছয়মাস ব্যাপী (অর্থাৎ, সূর্যের সমগ্র উত্তরায়ণ কাল জুড়ে)। প্রাচীন ভারতে সমাজের জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের কেন্দ্রকে বলা হত **সূর্য্য**, তৎসাদৃশ্যে আকাশের আলো ও তেজের কেন্দ্রকেও **সূর্য্য** বলা হত। **মকর-সংক্রান্তি**র পর থেকে শুরু হত **সূর্য্যে**র 'উত্তরায়ণ', রাজকোষ বা **সূর্য্য** কর্তৃক প্রজা-সাধারণের (= **জল**-এর) উৎপাদিত ফসলকে (=

বাষ্পকে) উত্তীর্ণ করা হত মেঘে (দ্র. **বর্ষ**); এই প্রক্রিয়া চলত একেবারে আষাঢ় মাস পর্যন্ত। মনে করা হত, দৃশ্য **সূর্য্য**টিও ঐ ছয় মাস **জল**কে **বাষ্প**রূপে গ্রহণ করে থাকে। শ্রাবণ মাস থেকে শুরু হত উল্টো পথে হাঁটা। রাজকোষ উন্মুক্ত হত জনসাধারণের জন্য, অর্থ বীজধান ... প্রভৃতি প্রয়োজনও নিয়মানুসারে যোগানো হত এবং এই প্রক্রিয়া চলত পরবর্তী পৌষ মাস পর্যন্ত। মনে করা হত, দৃশ্য **সূর্য্য**টিও উত্তরায়ণ কালের ছয়মাস ধরে সংগৃহীত জলীয় **বাষ্প**সমূহকে শ্রাবণ মাস থেকে পরবর্তী ছয়মাস ধরে বা দক্ষিণায়ন কাল ব্যাপী মেঘেদের মাধ্যমে বৃষ্টিরূপে বিতরণ করে থাকে। সামাজিক **সূর্য্য** ও আকাশের **সূর্য্যে**র এই ছ'মাস দানের কাল বা দক্ষিণায়ন এবং ছ'মাস গ্রহণের কাল বা উত্তরায়ণ — এই দুই কালের মধ্যেকার বিভাজন কালখণ্ডটি হল **মকরসংক্রান্তি**। ঐ দিন **সূর্য্য** যে রেখাটি পেরিয়ে যান, সেটির নাম তাই **মকরক্রান্তি**। ...

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা এখানে বলে রাখা যেতে পারে। তা হল, আমাদের পুরাণাদিতে রাজার কর্তব্য রূপে বারংবার **সূর্য্যে**র এই ভূমিকার কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। ভারতীয়দের মস্তিষ্কে এই বোধ এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, সম্রাট অশোক, হর্ষ**বর্দ্ধন**, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ... পর্যন্ত প্রত্যেক রাজার স্বভাবে এই **সূর্য্য**সম রাজ্য পরিচালনার চেষ্টা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এমনকি বীরবলের দ্বারা একই বোধে বুদ্ধ হয়ে সম্রাট আকবরও একরকম **সূর্য্য**-উপাসনা শুরু করে দিয়েছিলেন। আকবরের দ্বারা প্রচলিত সাল গণনার রীতিটিও ঐ নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে ও ভারতের প্রচলিত সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। (দ্র. শ্রী ননীগোপাল চৌধুরী রচিত 'শাহন্‌শাহ্ আকবর')। এমনকি গত শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ ছিল জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির বিভিন্ন পরীক্ষা সমেত গোটা শিক্ষাবর্ষটি এমনভাবে প্রকল্পিত ছিল যে, চাষীর ছেলেমেয়েরা যাতে **মকরসংক্রান্তির** পরে তাদের প্রদেয় পরীক্ষার 'ফি' ইত্যাদি জমা দিতে পারে। পাশ্চাত্য-প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গের বাম-সরকার ১৯৮০-র দশকের মধ্যে সেই নীতি বদলে দেয়। বাংলার প্রাকৃতিক, সামাজিক, পারিবারিক, উৎপাদন-কেন্দ্রিক, বার্ষিক (দ্র. **বর্ষ**) আ**বর্ত্তনে**র সমগ্র ব্যবস্থার বিপরীতে চলে যায় ঐ নীতি। তার কুফল কয়েক বছরের মধ্যেই টের পেতে শুরু করে তারা। এখন আবার সেই আগের শিক্ষাবর্ষের নীতিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একেই বলে তুঘলকী-শাসন। কার্যত বাংলার প্রাকৃতিক, সামাজিক, পারিবারিক, উৎপাদন-কেন্দ্রিক, বার্ষিক আ**বর্ত্তন** যে এক নিয়মে পরস্পরের সমান্তরাল হয়ে চলে এবং তাদের প্রত্যেকের বিরামবিন্দুটি যে একই **মকরসংক্রান্তি**, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন, তার উত্তরাধিকার একালের সাধারণ বাংলাভাষী আজও বুঝে-নাবুঝে বহন করে চলেন। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অ্যাকাডেমি বোঝে না। ৬. ইংরেজি make, match, জারমান machen, গ্রীক makro (= macro) ... ইত্যাদি।

মগ (মগধ, মগধেশ্বর) : ২. *মগ* = *ম-এর (মিত বস্তুর) গমন থাকে যেখানে বা যাহাতে; যাহারা মিত বিষয় বা বস্তুর জন্য গমন করে। **মগধ** = **মগ** ধারণ করে যে বা যাহারা।* **৩. মগ** = দেশবিশেষ, আরাকান দেশ, আরাকানের অধিবাসী জাতিবিশেষ (ইহারা দস্যুবৃত্তি করিত), ব্রহ্মের অধিবাসী। (**মগের মুল্লুক** = গৌণার্থে অরাজক দেশ।) **মগধ** = দেশবিশেষ, কীকটদেশ, মগধবাসীগণ, মগধরাজগণ, বন্দী। **মগধেশ্বর** = মগধরাজ, জরাসন্ধ। (ব.শ.)। **৪.** একালের ভাষা-ব্যবহারে শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** মিত (= **ম**) আর গামী (= **গ**), এই দুটি সত্তা নিয়ে **মগ**। স্বভাবতই সে 'জ্ঞানের আধার', 'পণ্যের আধার', 'ধনের আধার' ... ইত্যাদি থেকে শুরু করে সর্বপ্রকারের আধার, এমনকি সামান্য 'জলের আধার'-কে (= mug-কে) পর্যন্ত বোঝাতে পারে। কেননা, চলমান-ঘটমান-**বর্ত্তমান জগৎ**-এর নিয়মাদি ও তথ্যাদিকে মিত করেই জ্ঞানের জন্ম হয়; তা নিয়ে যিনি চলেন তিনিই 'জ্ঞানের আধার' বা জ্ঞানী অর্থাৎ **মগ**। কেননা, অকৃত্রিম **বিশ্ব**কে মিত করেই **পণ্যের** জন্ম হয়; তা নিয়ে যিনি চলেন, তিনিই 'পণ্যের আধার' বা **পণ্য**জীবী অর্থাৎ **মগ**। কেননা, অখণ্ড জলকে ক্ষুদ্র পাত্রে মিত করে রাখা হয় বলেই সে 'জলের আধার' বা 'জলপাত্র' বা **মগ** (= mug)। তার মানে, **মগ** শব্দে আমরা বুঝব, যে সত্তা অন্য কোনো সত্তাকে সীমিত করে নিয়ে তাকে আধেয় রূপে ধারণ করে নিয়ে চলে। এবার শব্দটির সামাজিক ঐতিহাসিক প্রয়োগের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া যাক।

ভারতবর্ষের পূর্বে যে দেশ রয়েছে, তার প্রাচীন নাম **ব্রহ্ম**দেশ। ব্রিটিশ যুগে এর নাম হয়ে যায় 'বার্মা'। এখন এই দেশটির নাম হয়েছে মায়ানমার। মধ্যযুগের বাংলায় এই দেশটিকে বলা হত আরাকান। এটির এলাকা বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে পূর্ব-দক্ষিণের স্থলভূমির বাসিন্দাদের সেকালে বলা হত **মগ**। তাঁরা **পণ্য**জীবী হয়ে পড়েছিলেন বলেই মনে হয়। মধ্যযুগের ইতিহাস অনুসারে তাঁরা নাকি **দস্যু**বৃত্তি করতেন। **পণ্য**বাদী যুগের সূচনা কালে কেবল **পণ্য**বিরোধীরাই এরকম আচরণ করতেন না, খোদ **পণ্য**বাদীরাও করতেন; বিশেষত জলপথ ব্যবহারকারী **পণ্য**বাদীরা তো বটেই!

কিন্তু দেশটির অন্য নাম **ব্রহ্ম**দেশ হওয়ায় আমাদের সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহ তীব্র হয়, যখন আমরা দেখি যে, যিশু খ্রিস্টকে যে 'প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ' দেখতে গিয়েছিলেন ব'লে খ্রিস্টীয় ইতিহাসে লিখিত আছে, সেই পণ্ডিতদের নাম Magus। ল্যাটিন ও ইংরেজি উচ্চারণে তার সামান্য হেরফের হলেও, এঁরা যে প্রাচ্যদেশীয় ব্রহ্মজ্ঞানী (অর্থাৎ **মগ**) তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজি magic বা 'যাদুবিদ্যা' শব্দটি এসেছে ঐ Magus থেকেই। এর সঙ্গে প্রাচীন বেদেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ দেখতে পাওয়া যায়। হাঙ্গেরী দেশের নাম Magyar (মাগিয়ার) ও তাদের প্রাচীন ধ্যানধারণাতে ব্যাপারটির আরও প্রমাণ মেলে। আরও একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তা হল, মেদিনীপুরে '**মগ**-ব্রাহ্মণ' নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আজও রয়েছেন, যাঁরা এখনও 'গ্রহ-**বিপ্র**' রূপে ঠিকুজি-কুষ্ঠী রচনা করে থাকেন। এঁরা পারস্য থেকে আগত বলে মনে করা হয়। এঁরা যে আদি **বেদে** বা আদি **মগ**, যাঁরা যিশু খ্রিস্টকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী নন, তার নিশ্চয়তা নেই। মোটকথা, এই **মগ**গণ 'পণ্যের আধার' নন, 'জ্ঞানের আধার'।

অপরদিকে **মগধ**-দেশ হল বর্তমান বিহার। আমাদের পুরাণাদির কথা বাদ দিলেও, আধুনিক ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, এই দেশ ৭০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আখ থেকে চিনি আবিষ্কার করে ও রপ্তানি করতে শুরু করে (দ্র. *Five Seeds That Transformed Mankind* – by Henry Hobhouse। এসব বিষয়ে ঐতিহাসিক Needham সাহেবের *Science and Civilization in China* গ্রন্থটিও কিছু কিছু সাক্ষ্য দিতে পারে।) তাছাড়া ৭০০ খ্রিস্টাব্দের **মগধ**, পাটলিপুত্র ... ব্যাপী সমগ্র বিহারে চলছিল **গোবর্দ্ধন**, **রাজ্যবর্দ্ধন**, হর্ষ**বর্দ্ধনের** রাজত্ব; রাজ্যশ্রী ফিরে এসেছিল। আরও ৯০০ বছর পরে ইউরোপে যে সত্তাগুলিকে industrial revolution (= **গোবর্দ্ধন**), imperialism (= রাজ্যবর্দ্ধন) ... ইত্যাদি রূপে সক্রিয় হতে দেখা যায়, **মগধ**-এর **গোবর্দ্ধন** ছিল তারই আদি রূপ। এ যে **পণ্যের** এক বিপুল বিকাশের যুগ, **রামরাজত্বের** কাল, সেকথা এখন আমরা বিস্তারিত ভাবে জানি। অর্থাৎ কিনা, **মগধ** দেশটি ছিল 'পণ্যের আধারদের ধারণকারী' দেশ।

তাহলে, **মগ** ও **মগধ** বলতে এখন আমরা কী বুঝব? শব্দরূপে আমরা উপরোক্ত ২.-এ প্রদত্ত অর্থানুসারেই তাদের মানে বুঝব। কিন্তু সমাজে তারা কোন সত্তা, দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। আমরা শুধুমাত্র এইটুকু নিশ্চয় করে বলতে পারি, **মগ** হল আদি জ্ঞানসম্পদ-পণ্যসম্পদ-ধনসম্পদ লেনদেনকারী জাতিবাচক শব্দ এবং **মগধ** হল আদি **পণ্য**সম্পদ লেনদেনকারী জাতিবাচক শব্দ। **৬.** প্রাচীন পারসিক magus, গ্রীক ও ল্যাটিনের magos, (এবং এই সূত্রে পাওয়া ইংরেজি magic), এবং এমনকি ইংরেজি mug, smuggle ... প্রভৃতি শব্দ।

মগজ : **২.** ***মগ*** *জনন করে যে; অথবা,* ***মগ*** *জন্মায় যেখানে, যাহা হইতে।* **৩.** মস্তিষ্ক (brain), মাথা, মেজাজ। (ব.শ.)। **৪.** 'ঘিলু' অর্থে প্রচলিত। **৫.** মানুষ **জগৎ**কে মিত ক'রে **বুদ্ধি**র আওতায় আনে তার **মগজ**-এর সাহায্যে। পুনরায় তার সাহায্যেই **জগৎ**কে আরও ভালভাবে মিতকরণ করে থাকে। কীভাবে?

মিতকরণ ক্রিয়া হাউই হয়ে উড়ে যায়, ফেলে যায় ছাই; গতি চলে যায়, রেখে যায় **অবগতি**। মানুষের মস্তিষ্ক জগতের সবকিছুকে **ম** করে বা মিত করে, মিত করে বুঝে নেয়, মানসিক দৈহিক ও সামাজিক ভাবে লেনদেন করার যোগ্য করে তোলে। (দ্র. **ম** বর্ণের অর্থ।) ফলত এক দৃশ্যত স্ববিরোধী নিয়মের জন্ম হয়, যে স্ববিরোধী ব্যাপারকে **বেদসংহিতা**য় শনাক্ত করা হয় এভাবে — 'অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন ...'। এঙ্গেলস তাঁর '*বানর থেকে মানুষে বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা*' নিবন্ধে দেখিয়েছেন, হাতের ব্যবহারই মানুষের মস্তিষ্ককে ক্রমবিকশিত করে আধুনিক মস্তিষ্কে পরিণত করেছে। 'হাত থেকেই মাথা জন্মেছে' — কথাটি গান্ধীও বলে গেছেন। সমাজদেহের বা সমাজসদস্যদের ভেতর থেকেই তার জ্ঞানীদের জন্ম হয়, সেকথা সবাই জানেন, এবং অতঃপর সেই জ্ঞানীরাই সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। আমরা দেখেছি, **প্রকৃতি** থেকেই **পুরুষের** জন্ম হয় এবং সেই **পুরুষ** অতঃপর **প্রকৃতি**কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। **মগ** জনন করে যে, সেই **মগজই** অতঃপর তার জনন ক্রিয়ার অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজের বিকাশ সাধন করে থাকে। সেই সুবাদে সে নিজেও একটি **মগ** রূপে সক্রিয় হয় এবং নিজেকে জনন করে থাকে। ...

বলা হয় যে, **মগজ** শব্দটি ফারসি। আমাদের তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু পাঠান-মোগলের হাত থেকে **মগজ** লাভ করেই বাংলার **মগজ** খুলেছে, একথা আমরা মানি না। কারণ আমরা জানি, বাংলার **মগ** ও **জ** (জনন) আগে থেকেই ছিল; পাঠান-মোগলের হাতে **মগজ** দেখে সে নিজের **মগ** ও **জ**-কে জুড়ে নিয়েছিল।

মগরা : **২.** ***মগ*** *রহে যাহাতে, তাহার আধার।* **৩.** গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, গঙ্গার মোহানা, গভীর বৃহৎ জলাশয় (২৪ পরগণা)। (ব.শ.)। **৪.** পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্থানের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** প্রাচীন বাংলায় এই স্থানগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মগ্ন : **১.** ✓মস্‌জ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *মিত-এর গমন না-কৃত যাহাতে।* **৩.** জলান্তঃপ্রবিষ্ট, কৃতমজ্জন, নিপতিত, অস্তগত, নিবিষ্ট, নত, প্রবিষ্ট, দুঃখশোকাদিবিহ্বল, হর্ষমগ্ন, বিস্ময়মগ্ন। (ব.শ.)। **৪.** কোনো কিছুতে 'নিমজ্জিত' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** কোনো স্থান-কাল-পাত্রে গত একটি **মগ্** (বা 'সীমায়িত সত্তার গমন') সেই স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, অদৃশ্য হয়ে গেলে তাকে **মগ্ন** বলে; কেননা, তখন সেই **মগ্**কে আর দেখা যায় না। মনে হয় সে ডুবে গেছে। এই অবস্থাকে বলা হয় **মগ্ন**। **৬.** ল্যাটিন থেকে পাওয়া ইংরেজি শব্দ magnum।

মচ্ (মচ্কা, মচকান, মচ্মচ্, মচমচে) : **২.** ***মচ্*** = *মিত-করণ চয়িত যাহাতে।* ***মচ্কা*** = ***মচ্*** *করে যে, তাহার আধার।* ***মচকান*** = ***মচকা*** *অন (on) যাহাতে।* ***মচ্মচ্*** = ***মচ্****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***মচমচে*** = *যাহা* ***মচ্মচ্*** *করে।* **৩. মচ্** = মোড়া লাগায় শরীরসন্ধির শব্দ, কাষ্ঠাদি ভাঙার শব্দ, শুকনা পাতা পায়ে মাড়ানর শব্দ। **মচ্কা** = মচ্ করিয়া ভাঙা বা মোচড় পাওয়া। **মচকান** = মচ্কা। **মচ্মচ্** = শুকনা পাতা পায়ে মাড়ানর শব্দ, ভাজা মুড়ি ইত্যাদি চিবানর শব্দ। **মচমচে** = মচ্মচ্ শব্দকারী, টাটকা (মুড়ি ইত্যাদি), কড়া ভাজা, খাস্তা ভাজা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কটমট**। এই শব্দগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন এবং এই শব্দগুলি একশোভাগ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়ম মেনে চলে। শুকনো কাঠ **মট** করে ভাঙে। অর্থাৎ, তাকে যখন মিত করার চেষ্টা করা হয়, তখন সে টঙ্কারিত হয়। কিন্তু যে সত্তা সেরকম টঙ্কারিত না হয়ে চয়িত হয়ে যায়, তাকে বলে **মচ্** করা। শুকনো পাতা পায়ের চাপে যে পরিমাণ সংকুচিত বা মিত হওয়ার কথা, ততখানি হয় বটে, তবে তার জন্য যৎসামান্য শব্দ করে; তাকেই বলে **মচ্** করা। এটি সবচেয়ে স্পষ্ট হয় টাটকা মুড়ি চিবানর বেলায়। সেকারণে টাটকা মুড়িকে **মচমচে**-মুড়ি বলে। কিন্তু মুড়ি না হয়ে তা যদি মাটি বা কাঠ-বাঁশ ইত্যাদি চয়ন করে নানা রহস্যময় কাজের মাধ্যমে একত্র করে উঁচু করে তোলা বোঝায়, তখন কিন্তু তাকে শুধুমাত্র **মচ্** করা বলা চলে

না, বলতে হয় **মঞ্চ** বা **মাচা**। দ্র. **মঞ্চ, মাচা**।

মজ (মজা, মজাদার, মজান, মজানী) : **১.** ✓মস্‌জ্‌ > মজ। (ব.শ.)। **২.** ***মজ*** = *মিতকরণ জনন করে যে বা জনিত যাহাতে।* ***মজা*** = ***মজ****-এর আধার যে।* ***মজাদার*** = ***মজা*** *দান রহে যাহাতে। (দ্র.* ***দার****)।* ***মজান*** = ***মজা*** *অন (on) যাহাতে।* ***মজানী*** = ***মজান*** *সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে।* **৩. মজ** = মগ্ন হওয়া, ডোবা, নাশপ্রাপ্ত হওয়া, লোপ পাওয়া, সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, ঘুচিয়া যাওয়া, নষ্ট হওয়া, বিপন্ন হওয়া, পতিত হওয়া, মরা, অধোগতিপ্রাপ্ত হওয়া; মোহিত বা আকৃষ্ট হওয়া, গাঢ়নিবিষ্ট হওয়া। **মজা** = নিমগ্ন করান, ডুবান, ধ্বংস করা, নষ্ট করা ... ইত্যাদি। **মজাদার** = স্বাদু, কৌতুকজনক। **মজান** = সর্ব্বস্বান্ত করা। **মজানী** = মজায় বা নষ্ট করে এমন (স্ত্রীলোক)। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। **৫.** 'এই মানবসভ্যতা কি ধ্বংস হয়ে যাবে?' — কেন যে এরকম একটি অলুক্ষণে প্রশ্ন মাঝেমধ্যেই আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মূল কারণটিকে দেখতে পাওয়া যায় এই **মজ** ... প্রভৃতি শব্দে। কোনো সত্তা যদি আত্মসংকোচন করে, নিজেকে নিজের ভিতরে গুটিয়ে নেয়, কিংবা কেউ যদি তাকে আত্মসংকোচন করতে বাধ্য করে, নিজেকে নিজের ভিতরে গুটিয়ে নিতে বাধ্য করে, তাহলে তো সেই সত্তাটি একদিন নিজের ভিতরে নিজে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) 'বুঁদ হয়ে, ঝিম হয়ে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর না হয়ে যাবে'। কার্যত শুরু শুরুতে কোনো কিছুর ভিতরে সেভাবে **মজে** থাকতে, নিমজ্জিত থাকতে, ডুবে থাকতে সত্তাটির ভাল লাগে, সে **মজা** পায়। কিন্তু সেভাবে **মজে** থাকতে থাকতে একদিন যে সে **মজে** যাবে, শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেকথা সে বুঝতে পারে না। কেউ যে তাকে **মজিয়ে** রেখেছে, সেকথাও তার মনে আসে না। যে **মজানী** পাড়ার ছেলেদের **মজিয়ে** রাখে, সে নিজেও **মজা** পায়, যাদের **মজিয়ে** রাখে তারাও **মজা** পায়; কিন্তু কালে কালে দেখা যায়, সে নিজে তো **মজে** গেছেই, নষ্ট হয়ে গেছেই; অন্যেরাও নষ্ট হয়ে গেছে, **মজে** গেছে, নিজের ভিতরে নিজে হারিয়ে গেছে। এরকম বাক্য এখনও গ্রামবাংলায় শুনে ফেলতে পারেন — 'দাশেদের ঐ পুকুরটাই কেবল **মজে** যায়নি, ওদের বংশটাও হেজে-**মজে** গেছে।'

আজকের বিশ্বসভ্যতা এক **মজাদার** মানবসভ্যতায় পরিণত হয়েছে, হচ্ছে। মানুষের সর্বোচ্চ সাধনা, **আত্মানং** বিদ্ধি, Gnothi seauton (Know thyself), আত্মকর্তৃত্বের সাধনা, অরূপরতনের সাধনা, পরমাপ্রকৃতিকে নিজের ভিতরে আত্মস্থ করে **বিশ্বেশ্বর** হওয়ার সাধনা, সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভের সাধনা, **আনন্দের** সাধনা ... এই সব কিছু ফেলে দাও! শুধু **মজা** বেচো, **মজা** কেনো, **মজা** নাও, **মজা** খাও, **মজায় মজে** থাকো, **মজায়** নিমজ্জিত থাকো, **মজায়** ডুবে থাকো! একালের 'মহাজ্ঞানী'দের এই নবদর্শনে দীক্ষিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ধনী-জ্ঞানী সবাই মিলে দিনরাত শুধুই **মজা** বেচছে, **মজা** কিনছে, সেই **মজায়** সবাই **মজে** থাকছে এবং এভাবে আত্মহারা হয়ে, বিমুগ্ধ হয়ে, বিমূঢ় হয়ে, নিজের ভিতরে নিজেই হারিয়ে যাওয়াকে সবাই উচিত মনে করছে। এর অনিবার্য পরিণতি যে **মজা**বিক্রেতা ও **মজা**ক্রেতা উভয়ের বিলুপ্তি, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

মজুত (মজুতদার, মজুতদারি, মজুর, মজুরী) : **২.** ***মজুত*** = ***মজ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে তারিত যাহাতে।* ***মজুতদার*** = ***মজুত*** *দানের আধার রহে যাহাতে।* ***মজুতদারি*** = ***মজুতদার*** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* ***মজুর*** = ***মজ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রয় যাহাতে।* ***মজুরী*** = ***মজুর****-এর সক্রিয় আধার যে।* **৩. মজুত** = বর্ত্তমান, হস্তস্থিত, সঞ্চিত (টাকা), ব্যয় বাদে স্থিত, উদ্বৃত্ত, প্রস্তুত, তৈয়ার, উপস্থিত, হাজির। (ব.শ.)। **মজুতদার** = যে ব্যবসায়ী দ্রব্যাদি (সচরাচর অন্যায়ভাবে) মজুত করে রাখে। **মজুতদারি** = (সচরাচর অন্যায়ভাবে) মজুত করা। (স.বা.অ. কলকাতা)। **মজুর** = কায়িক শ্রমজীবী সাধারণ লোক, মুনিষ, জন (জোন), ভারবাহক, মুটে, কুলি। **মজুরী** = মজুরের কাজ, মজুরের ভাড়া, কুলিভাড়া। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** বাংলায় আরবির 'মওজুদ্' হয়ে গেছে **মজুত** এবং ফারসির 'মজ্‌দুর' হয়ে গেছে **মজুর**। (দ্র. **মঞ্জুর**)। আসলে বাংলার নিজের **মজ, মজান** ... এসব ছিলই। সে দেখল, যেটি আত্মসংকোচন ক'রে ক'রে **মজ** করছে, নিজের ভিতরে নিজে বিলুপ্ত হওয়ার দিকে চলেছে, তাকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে দিলেই তো তা **পণ্য** হয়ে যায়, লেনদেনযোগ্য হয়ে যায়! তো, **জন** করে **জনক** রাজা উৎপাদিত ধান-চালকে **পণ্য** বানিয়ে ফেললেন। যে উৎপন্ন বাড়তি হলেই আত্মবিলুপ্ত হয়ে যেত, **মজে** যেত, তাকে **মজু** করে ফেলল **জনক** রাজার **জনে**রা বা **মজুর**-রা। ওদিকে অন্যেরা ধান-চাল-আটা-ময়দা-চিনি ... ইত্যাদিকে আত্মবিলুপ্ত হতে না দিয়ে বস্তাবন্দী করে ফেলল, **মজ**কে **মজু** করে ফেলা হল। তারপর কিছু লোক সেসব নিয়ে গিয়ে রেখে দিল একটা গুদামঘরে। ব্যস্‌! **মজু** তারিত হয়ে সেখানে **মজুত** হয়ে গেল। যারা সেটি করতে লাগল তারা অতএব হয়ে গেল **মজুতদার** এবং তাদের সেই কর্মকে বলা হল **মজুতদারি**। উৎপন্নকে **পণ্যে** পরিণত করতে গেলে এই **মজুর, মজুরী, মজুত, মজুতদারি** ... এসবের আবির্ভাব নিশ্চিত ছিল, স্বভাবতই তারা এসে গেল উৎপাদন-বণ্টনের রঙ্গমঞ্চে। একেবারে শতকরা একশোভাগ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মেনেই এসব করা হল। আর সেটা এতই স্বাভাবিকভাবে করা হল যে, কলকাতার যে সংসদ অভিধান পাশ্চাত্যের প্রতীকী শব্দার্থবিধির অন্ধ অনুসারী, সেও **মজুতদার** শব্দের খানিকটা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়ে ফেলেছে, প্রতীকী অর্থ দিতেই পারেনি।

মশান : দ্র. **শ্মশান**। **(শ্মশান-মশান)**।

মসি (মসী, মস্করা, মস্ত, মস্তক, মস্তিষ্ক) : **১.** ✓মস্‌ + ই (ইন্‌) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মসি*** = ***ম****-এর (বা মিতের) নির্য্যাস গতিশীল যাহাতে।* ***মসী*** = ***মসি****র আধার যে।* ***মস্করা*** = ***মস্‌*** *করা হইয়াছে যাহাতে।* ***মস্ত*** = ***মস্‌*** *তারিত যাহাতে।* ***মস্তক*** = ***মস্ত*** *করে যে।* ***মস্তিষ্ক*** = ***মস্ত****-কে গতিশীলভাবে দিশাগ্রস্ত করে যে।* **৩. মসি, মসী** = লিপিপ্রসাধন অঞ্জন, কালী, দীপশিখা কজ্জল (soot), নীলশেফালিকাবৃন্ত, বৈবর্ণ্য, কালিমা, কলঙ্ককালী, কৃষ্ণবর্ণ। **মস্ত** = মস্তক, মত্ত, অত্যুচ্চ, দীর্ঘ, বিপুল, প্রচুর, অনেক ... ইত্যাদি। **মস্তক** = শিরঃ, কোনো বস্তুর অত্যুচ্চভাগ, তালবৃক্ষের মস্তক-জাত পত্র বা মা'জপাতা, উপরিভাগ। **মস্তিষ্ক** = শিরোমজ্জা মস্তকস্নেহ, মগজ।

(ব.শ.)। **মস্করা** = পরিহাস, ঠাট্টা, তামাসা। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আপনার সামনে একটি **গাছ** দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটিকে **ম** করার, অর্থাৎ সীমায়িত বা পরিমিত করার উৎকৃষ্ট উপায় হল, তার একটা ছবি তুলে ফেলা। **গাছটি** যেখানে থাকার সেখানেই থাকল, কিন্তু তার একটি পরিমিত-স্বরূপ চলে এল আপনার হাতে-ধরা কাগজের ছবিতে। আরও ছোট করার উপায় হল তাকে একটি মাত্র শব্দে বদলে ফেলা — **গাছ**। (দ্র: **বর্ণ**)। হ্যাঁ, তাকে **গাছ** শব্দ রূপে মিত করা হয়ে গেলে তাকে ভাষিকভাবে লেনদেন করাও যায়। কিন্তু তার নির্যাসটুকু যদি একটি কাগজে লিখে ফেলেন? অর্থাৎ, একটি কাগজে যদি **গাছ** কথাটি লিখে ফেলেন, তাহলেও তো মানসিক লেনদেন হতে পারে। যে পড়তে জানে, সে ঐ **গাছ** লেখাটি দেখে পড়ে নিয়ে বুঝে নিতে পারবে; বুঝতে পারবে আপনি কার কথা বলছেন। কারও অত্যুৎকৃষ্ট মিতকরণ বা **ম**-এর নির্যাস (এক্ষেত্রে **গাছ** শব্দটি) কাগজে রূপায়িত হয়ে গেলে, তাকে **মস** বলে। সেই **মস** সক্রিয় হয় কোনো রং দিয়ে লেখায়। তাকে বলে **মসি**। এই **মসি**র আধার বা কলমকে তাই **মসী** বলে। তাহলে কথাটি এই দাঁড়াল, কলম কালি দিয়ে লিখতে পারে বলে তাকে **মসী** বলে না। বিশ্বজগতের সবকিছু মানুষের ভাষার শব্দে **মিত** হয়ে যাওয়ার পর সেই শব্দগুলির নির্যাসকে কাগজে কালি দিয়ে লিখে ফেলাকে **মস**-করা বলে; যে কালি দিয়ে **মস**-করণ করা হয় বা লেখা হয় তাকে **মসি** বলে এবং যে কলম সেই কালিকে প্রসব করে তাকে **মসী** বলে। তার মানে, যে কলম বা তুলি কাগজে কালি দিয়ে দাগ কাটে বা অর্থহীন আঁকিবুকি টানে তাকে কলম তুলি ইত্যাদি বলা গেলেও **মসী** বলা যায় না। **অসি** তো শুধুমাত্র সত্যকে হত্যা ক'রে নাশ ক'রে মিথ্যায় পরিণত করতে পারে, কিন্তু এ **মসী** জগৎকে সত্যরূপে প্রতিস্থাপিত করতে পারে, চাইলে সত্যকে নাশ ক'রে মিথ্যায় পরিণত করতে পারে, এমনকি নিখুঁতভাবে মিথ্যাকেও সত্যে পরিণত করতে পারে। তাই **অসি**র চেয়ে **মসী**র ক্ষমতা বহুগুণ বেশি।

মস্-করা অতএব শুধুমাত্র বাস্তব জগতের সংক্ষেপিত উপস্থাপন মাত্র নয়, মিথ্যার উপস্থাপনও বটে। তবে কিনা, সত্য উপস্থাপন করার কাজেই এই **মস্**-করণের সূচনা হয়েছিল। সেই **মস্** তারিত যাহাতে, তাকে বলা হয় **মস্ত**। এটি দেখতে ছোট, কিন্তু তার ভিতরে অনেক বড় বিষয় বা বস্তু থাকে ব'লেই **মস্ত** শব্দটি অতিশয় বা বিরাটকেও বোঝায়। **গাছ** তো অনেক বড় জিনিসই বটে, কিন্তু কাগজের পাতায় লেখা **গাছ** কথাটি তো **মস্**-কৃত, **মস্ত**। তাই সে ছোট হয়েও বিরাট। জ্ঞানচর্চাকারীরা এই **মস্ত**গুলির ভিতরেই ডুবে থাকেন ব'লে তাঁদের '**মস্ত্**' হয়ে থাকা বলে। মধ্যযুগের গ্রামবাংলায় যে সকল ইসলামী **মস্তান**জী (তান্ত্রিক বা সাধুপুরুষ) ঘুরে বেড়াতেন (১৯৬০ সালেও তাঁদের দু'একজনকে দেখা যেত), তাঁরা তাঁদের জ্ঞানরাজ্যে **মস্ত্** হয়ে থাকতেন ব'লেই তাঁদের **মস্তান**জী বলা হত। (এসব শব্দ ফারসি থেকে এসেছে বটে, কিন্তু তারা যে ক্রিয়ামূলের পরিবার থেকে জন্মেছে, আমাদের **মস্ত**ও সেই একই ক্রিয়া-পরিবারের সন্তান। ... সুতরাং এদের মূলে কোনো ভেদ নেই।)

যাই হোক, যে সত্তা এইরূপ বিশালকে ক্ষুদ্রে পরিণত করে, মস করে, **মস্ত** করে, তাকে সেকারণেই **মস্তক** বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বিশ্বকে বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আঁটিতে পারে, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বের এই বিশেষত্ব।' আর, ঘাড়ের উপর যে মুণ্ডটির মাধ্যমে বিশ্বকে মানুষ তার বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আঁটিয়ে নেয়, সেই মুণ্ডটিকে তাই মানুষের **মস্তক** বলে। তবে যার সাহায্যে সে ঐ কর্মটি করে সেই ঘিলুকে বলে **মস্তিষ্ক**। কারণ, মানুষের **মস্ত**-করণ যে ভাষা ও লেখালেখির মাধ্যমে হয়, তা দিশাগ্রস্তভাবে করা হয়ে থাকে; যেকারণে কেবল লেখাপড়া জানা মানুষই সেসব বুঝতে পারে। সেই কারণে ঘিলুকে **মস্তিষ্ক** বলে।

তাই যদি হবে, **মসীজীবী** লিপিকরদের যুগ পেরিয়ে যখন ছাপাখানার যুগে এলাম, তখন **মসীজীবী**র স্থানে এল compositor-proofreader, printer ... ইত্যাদি। আমরা তাদের কোনো বাংলা নাম দিতে পারলাম না। এখন এসে গেছে ডিটিপি (desktop printing) ও তদনুসার অত্যাধুনিক মুদ্রণব্যবস্থা। সেগুলিরও কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অথচ **মসি**-করণ লালিত-পালিত হয় অক্ষর সাজানোয়, composition-এ। ডিটিপি-তে আরও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সেটাই করা হয়। সেগুলির জন্য এখন চাইলে বাংলাভাষার জ্ঞানী মানুষেরা একত্রে বসে **মসিক, মসিপ, মসিল, মসিকা, মসিপা, মসিপাল, মসিলাল** ... ইত্যাকার শব্দ তৈরি করে ঐসকল ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বানানোর চেষ্টা করতে পারেন। ... এখনকার কলকাতার বাংলাভাষীর বাংলায় এত ইংরেজি ঢুকে পড়েছে যে, তাকে 'বাংলাভাষা' বলা বাংলাভাষাকে অপমান করার সামিল। যেভাবে ইংরেজি মেশাতে মেশাতে বর্তমানে বাংলা-মিশ্রিত ইংরেজিতে কথা বলায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, ঠিক সেভাবেই একটু একটু করে নতুন বাংলা শব্দ দিয়ে ইংরেজি শব্দকে সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করা দরকার। এভাবে সরাতে সরাতে একদিন আমরা ধীরে ধীরে শুদ্ধ বাংলায় ফিরে যেতে পারব। **মসিপাল মসিলাল**দের দিয়ে কাজটা শুরু করা হোক না কেন!

মাথা : **১.** মস্তক > মাথা। (ব.শ.)। **২.** ***মাথা*** = ***মা*** *(বা মিতাধার) থাকে যেখানে বা যাহাতে, তাহার আধার।* **৩. মাথা** = মস্তক, বুদ্ধি, (সাদৃশ্যে) প্রধান, শ্রেষ্ঠ, চূড়া, উৎকৃষ্ট বা সেরা জিনিষ, অত্যুচ্চ ভাগ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** ব্যাপকভাবে যথার্থে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দটি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। চোখ কান গলা মুখ নাক হাত পা-এর মতো মাথাও এমন একটি শব্দ, বাংলাভাষী যাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। আর, তা করা সম্ভব হয়েছে জগতের **মস্**-কৃত **মা** সেখানে থাকে বলে। দ্র. **মা, মাত্রা**। স্বভাবতই শব্দটির ব্যঞ্জনার্থও বহু রকমের হয়ে থাকে। ব.শ. সেই সমস্ত ব্যবহারগুলিকে বিস্তারিতভাবে উদাহরণ সহ দুই পাতা জুড়ে উল্লেখ করে গেছেন। তাতে **মাথাব্যথা, মাথামারা, মাথাভারী** ... ইত্যাদি ব্যঞ্জনার্থক শব্দ যেমন রয়েছে, তেমনি **মাথা-ঘামান, মাথা-কাটা যাওয়া, মাথা-চালা, মাথা নোয়ান** ... ইত্যাদি অনেক শব্দবন্ধ রয়েছে। আগ্রহী পাঠকপাঠিকা সেগুলি ব.শ.-তে দেখে নিতে পারেন। আমাদের বলার কথা এইটুকু যে, বাংলাভাষী যে নিয়মে **মস্তক**কে **মাথা**য় পরিণত করেছেন, সেটি অভিনব। জগৎকে পরিমিত করত **মস্তক**। কিন্তু

মস্ত তো আসলে **ম**-এর আধারও বটে। সেটি থাকে যেখানে, সেটিই তো **মাথা**। অতএব তাকে **মাথা** নামে চিহ্নিত করলে কথাটি আরও ব্যাপকার্থক হয়ে যায়! বাংলাভাষী **মস্তক**কে **মাথায়** পরিণত করে সেটিই করেছেন।

মাথি : ২. ***মাথ*** *(মা-এর থাকা) গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **৩.** তালজাতীয় গাছের মাথার মধ্যস্থ কোমলাংশ। (ব.শ.)। **৪.** গ্রাম-বাংলায় যথার্থে প্রচলিত। **৫.** তালগাছের মাথা কোনো কাজে লাগে না। তালগাছ কাটা পড়লে লোকে তার মাথাটি থেকে ডালপালা কেটেকুটে নিয়ে নেয়, আর ছেলেরা সেই গাছের মাথাটি কুড়ুল দিয়ে ফেড়ে ফেলে এবং ভিতরের অংশ, যাকে বলা হয় **মাথি**, সেই অংশটি বের করে খায়। এটি মিষ্ট ও সুস্বাদু।

মাস : ১. ✓মস্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মস*** *(পরিমিত কালের নির্য্যাস) হইতে জাত।* / যাহা পক্ষদ্বয় বা সৌরাদি মান দ্বারা পরিমিত। (ব.শ.)। **৩.** পক্ষদ্বয়াত্মক কাল, বৈশাখজ্যৈষ্ঠাদি। (চান্দ্র, সাবন, ভাস্কর বা সৌর, নাক্ষত্র — এই চতুর্ব্বিধ মাস। ...)। (ব.শ.)। **৪.** month অর্থে প্রচলিত। **৫.** **মাস**কে **মাস** বলা হয় এই কারণে যে, তা **মস** থেকে জাত হয়েছে; যে **মস** হল অসীম কালের পরিমিত রূপ। তারই কমবেশি ত্রিশটি **মস** নিয়ে একটি করে **মাস** হয়।

মঙ্ (মন্‌গ্) **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** *:* অন্নদামঙ্গল, অমঙ্গল, অমঙ্গল্যা, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মঙ্গল, মঙ্গলকড়ি, মঙ্গলকলস, মঙ্গলকাব্য, মঙ্গলকারক, মঙ্গলঘট, মঙ্গলকাল, মঙ্গলক্ষৌম, মঙ্গলগাথা, মঙ্গলগাথিকা, মঙ্গলগৃহ, মঙ্গলগুর্জ্জরী, মঙ্গলচণ্ডিকা, মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলতূর্য্য, মঙ্গলদেবতা, মঙ্গলধ্বনি, মঙ্গলনীরাজন, মঙ্গলপত্র, মঙ্গলপাত্র, মঙ্গলপুষ্প, মঙ্গলপ্রতিসর, মঙ্গলবচঃ, মঙ্গলবাদী, মঙ্গলবাদ্য, মঙ্গলবার, মঙ্গলবাসর, মঙ্গলবিধি, মঙ্গলমাত্রভূষণ, মঙ্গলশংসন, মঙ্গলশব্দ, মঙ্গলস্নান, মঙ্গলসূতা, মঙ্গলসূত্র, মঙ্গলহাঁড়ি, মঙ্গলা, মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার, মঙ্গলাদেশবৃত্ত, মঙ্গলাবহ, মঙ্গলালঙ্কৃত, মঙ্গলালম্ভন, মঙ্গলাষ্টক, মঙ্গলী, মঙ্গলীয়, মঙ্গল্য, মঙ্গল্যা, মাউগ, মাউগা, মাঁগ, মাগ, মাগন, মাগনা, মাগা, মাগান, মাগী, মাগু, মাগুয়া, মাগ্‌গি, মাগ্যি, মাঙ্গ, মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য, মাঙ্গা, মাঙ্গন।

মঙ্ (মন্‌গ্) = মিতের রহস্যরূপের গমন। **মঙ্গ** = মিতের রহস্যরূপের গমন যাহাতে। **মন্‌গ** = মিতের না-করণে গমন যাহাতে।

মঙ্গল (মঙ্গলা) : ১. ✓মঙ্ (গতি) + অল (অলচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মঙ্গল*** *= রহস্যরূপী মিত সত্তার গমন লালিত যাহাতে; জগতের বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে মানুষের পক্ষে মানসিক ও বাহ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য পরিমিতকরণ ক্রিয়া লালন করে যে বা লালিত হয় যাহাতে।* ***মঙ্গলা*** *=* ***মঙ্গল****-এর আধার যে।* **৩. মঙ্গল = শুভ, কল্যাণকর, অভ্যুদয়কর, বৃদ্ধ্যর্থ, প্রশস্ত, ভদ্র,** কল্যাণনিদান, **ইষ্টলাভ, সুলক্ষণ,** হিতাশংসন, কল্যাণকর দ্রব্য — দধিঘৃতমধু-লাজাক্ষতাদি, আভ্যুদয়িক কর্ম্ম — বিবাহাদি, ... ইত্যাদি; যথাবিধি মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক বরণ করা বা পূজা করা, বিবাহে যথাবিধি মঙ্গল-আচরণ পূর্ব্বক হরিদ্রাক্ত নূতন বস্ত্রে নূতন হাঁড়ী ও মঙ্গলদ্রব্য একসঙ্গে বাঁধা, জলধারা দিয়া মঙ্গলহাঁড়ী প্রদক্ষিণ করা। **মঙ্গলা** = পার্ব্বতী, দুর্ব্বা, হরিদ্রা, পতিব্রতা। (ব.শ.)। **৪.** good বা to do good অর্থে **মঙ্গল** প্রচলিত, **মঙ্গলা** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কুজ**। **মঙ্** লালিত যাহাতে, তাকে **মঙ্গল** বলে। তার মানে, মিত-এর রহস্যরূপ (**মং**) গত ও লালিত যাহাতে তাকে **মঙ্গল** বলে। সে কেমন ব্যাপার?

খুব সহজভাবে বললে — মানুষ জগতের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় ও বস্তু গ্রহণ ক'রে আপন প্রয়োজন মেটায় ঠিকই; কিন্তু জগৎ থেকে যা যা সে গ্রহণ করে, সেগুলিকে 'যদ্রূপে বিদ্যমান' (as it is) তদ্রূপে গ্রহণ করে না, করতে পারে না। তার জন্য সেগুলিকে মানুষের দেহ-মনের গ্রহণযোগ্য ক'রে 'পরিমিত মাত্রা'য় পরিণত করে নিতে হয়; অন্যথায় সেগুলিকে মানুষ আত্মস্থ করতে পারে না। এই 'পরিমিত মাত্রা'কে **মং** বলে। মানুষ সাগর নদী বা হ্রদ পান করে না; ঘটিজল পান করে, গেলাস-ভরা জল পান করে। তার মানে, বিশ্বজগতের লৌকিক দুনিয়ায় (= দৃশ্যলোকে বা বাহ্যলোকে) ও অলৌকিক দুনিয়ায় (= অদৃশ্যলোকে বা মানস-লোকে) যা কিছু রয়েছে বা থাকে, তাদের 'পরিমিত মাত্রা'য় ঢুকিয়ে দিয়ে বা **গমন** করিয়ে দিয়ে, **মংগ (= মঙ্গ)** করে দিয়ে তবেই মানুষ তাদের গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ কিনা, মানুষ যা কিছু গ্রহণ করে, তাদের **মঙ্গ** ক'রে নিয়ে তবেই গ্রহণ করে। রান্না না করে যেমন কাঁচা কলামূলা কিংবা মাছমাংস আমরা খেতে পারি না, 'পরিমিত মাত্রা'য় পরিণত না ক'রে বা **মঙ্গ** না ক'রে জগতের কোনো কিছুই আমরা গ্রহণ করতে পারি না। যে সত্তা জগতের এইরূপ **মঙ্গ**-করণকে লালন করে কিংবা এইরূপ **মঙ্গ**-কর্ম লালিত যাহাতে, তাকে বলে **মঙ্গল**। এই **মঙ্গলই** জগৎকে আমাদের গ্রহণযোগ্য ক'রে আমাদের সামনে এগিয়ে দেয়। তাই জগৎ ও মানুষের মধ্যেকার সেতুটির নাম **মঙ্গল**, যে সেতু পেরিয়ে জগৎ মানুষের কাছে আসে। এই **মঙ্গল** সক্রিয় রয়েছে বলেই আমরা বিশ্বজগৎ থেকে আমাদের প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারি। আমাদের সর্বপ্রকারের দৈহিক ও মানসিক খাদ্যের ক্ষেত্রে **মঙ্গল**-এর এই সক্রিয়তা শতকরা একশো ভাগ খাটে। **মঙ্গল** নেই তো আমাদের অভাব পূরণের কোনো উপায় নেই; তা সে দৈহিক মানসিক যে অভাবই হোক। এখানে **কুজ** ও **কুঁজ** শব্দ দুটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। দ্র. **মঙ্গলবার**।

তা সে যাই হোক, দৈহিক অভাবের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের খাওয়ার একটি পরিমিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। দশটি চালের ভাত খেলে কোনো মানুষের পেট ভরে না, আবার একবস্তা চালের ভাতও একজন মানুষের একদিনের খাদ্য নয়। অর্থাৎ কিনা, বাহ্যিক আগমের একটি 'পরিমিত মাত্রা' (= **মং**) না হলে কারও পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কথাটি মানসিক আগমের ক্ষেত্রেও খাটে। ধান উৎপাদন করে তাকে চালে ও ভাতে পরিণত করার একপ্রকার জ্ঞান কৃষিজীবী মানুষের থাকে। সেটিই কিন্তু ধান উৎপাদনের সর্বোচ্চ

জ্ঞান নয়। বিশ্বের যত মানুষ ধান উৎপাদন করেন, তার সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানীদের অর্জিত জ্ঞান যোগ করার পরেও 'ধান-উৎপাদন-জ্ঞান'-এর শেষ হয় না; আরও অর্জন করার সুযোগ ও সম্ভাবনা তার পরেও থেকে যায়। সেই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করার পরে ধান উৎপাদনের কাজে হাত দিতে হলে ধান আর উৎপাদিত হবে না, না খেয়েই লোকে মরে যাবে। তাই হাতে যেটুকু জ্ঞান আছে বা যোগাড় করা গেছে, তাকেই পূর্ণ জ্ঞান ধরে নিয়ে কাজে হাত লাগাতে হয়। এও জ্ঞানের একপ্রকার সীমায়িত রূপ। তাই নিয়েই মানুষ কৃষিকাজে নামেন এবং ধান উৎপাদন করে তার থেকে চাল ও ভাত বানিয়ে নিজেদের কাজ চালিয়ে নেন। শুধু কৃষিকাজ কেন, রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি মোটর রেল জাহাজ শিল্প-কারখানা প্রভৃতি বানানো চালানো ... ইত্যাদি যে কোনো 'কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান'-এর ক্ষেত্রে এই 'পরিমিত মাত্রা'র জ্ঞান বা আপাতলব্ধ জ্ঞান নিয়েই মানুষকে ও মানবসভ্যতাকে তার কাজ চালাতে হয়, চলতে হয়।

তার মানে, আমাদের মানসিক ও বাহ্যিক প্রয়োজনগুলি মেটে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের একপ্রকার পরি**মিত** মাত্রার (= **মং**-এর) বিশেষ বিশেষ রূপ থেকে। যে সত্তায় সেই পরি**মিত** মাত্রা (= **মং**) গমন করেছে, গত হয়েছে, সেই হল **মংগ** (বা **মঙ্গ**)। অর্থাৎ, মানুষ এই **বিশ্বজগৎ** থেকে মানসিক কিংবা বাহ্যিকভাবে যা কিছু গ্রহণ করে তা সবই **মঙ্গ**-পদবাচ্য। মানুষের জ্ঞান বলো আর ধনই বলো, তা সবই আসলে '**পরিমিত** মাত্রায় গতি'র আধার বা **মঙ্গ**। সেই বিচারে মানুষের সকল অর্জনই **মঙ্গ**। সেই **মঙ্গ**কে লালন করে যে, কিংবা সেই **মঙ্গ** লালিত যাহাতে, তাকে **মঙ্গল** বলা হয়।

সেই **মঙ্গল** সক্রিয় থাকে একদিকে মানুষের মানসলোকে — মানুষের অর্জিতব্য জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সত্যে, ধারণায় ... সর্বপ্রকার জ্ঞানসম্পদে অর্থাৎ **বিশ্বে**র অদৃশ্য নিয়মাবলীর অর্জিতব্য অংশে বা **শ্রীকৃষ্ণে** (দ্র. **গৌরী**) এবং অপরদিকে সেই **মঙ্গল** সক্রিয় হয় বাহ্যলোকে — মানুষের অর্জিতব্য ধনে, ধান্যে, শস্যে ... সর্বপ্রকার ধনসম্পদে অর্থাৎ কৃত্রিম **বিশ্বে** ও অকৃত্রিম **বিশ্বে** বা **নগদ-নারায়ণে**। তার মানে, যা কিছু জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ আমরা পেতে পারি, তা সবই আসলে **মং-গত (মঙ্গত)** হয়ে থাকা বা করে রাখা মানসবিষয় ও বাহ্যবস্তুই বটে। সেগুলি লালিত যে সত্তায়, সেই-ই **মঙ্গল**। তাহলে তো যে সব বিষয় ও বস্তু আমরা পেতে পারি, পাব, পেলে আমাদের মানসিক-জ্ঞানসম্পদের এবং বাহ্যিক-ধনসম্পদের বৃদ্ধি হয়, হবে, তা সবই **মঙ্গল**-পদবাচ্য। হ্যাঁ, এই কারণেই **মঙ্গল** বললে আমরা লাভ, শুভ, বৃদ্ধি ইত্যাদি বুঝি, যে কোনোরকম বৃদ্ধিজনক বা অভ্যুদয়কারক আভ্যুদয়িক **কর্ম্ম**কেও বুঝি। কার্যত মানুষকে মানসিকভাবে কিংবা দৈহিকভাবে বৃদ্ধিলাভ করতে হলে **মঙ্গল**কে চাই; **মঙ্গল** নামক সেতুর ভিতর দিয়ে জগৎকে আনয়ন করা চাই।

এজন্যই আমরা বাংলাভাষীরা উত্তরাধিকার সূত্রে এতকাল জেনে এসেছি যে, কারও **মঙ্গল** হলে তার লাভ হয়, শুভ হয়, ভাল হয়; **অমঙ্গল** হলে তার ক্ষতি হয়, অশুভ হয়, খারাপ হয়। কিন্তু কেন **মঙ্গল** হলে ঐরকম হয় তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম **মঙ্গল** শব্দের অর্থ হারিয়ে ফেলায়। এখন আমরা বুঝেছি, জগৎ ও মানুষের মাঝে **মঙ্গল** হল সেই সেতুপথ, যে পথ দিয়ে জগৎকে পার করে আনতে পারলে তবেই জগৎ আমাদের পক্ষে পরিমিত হয়ে গ্রহণযোগ্য হয়, **মঙ্গল** হয়।

মধ্যযুগের বাংলায় সবচেয়ে অধিক প্রচলিত শব্দ ছিল **মঙ্গল**। উপরে **মঙ্গল**-যুক্ত শব্দের তালিকা থেকেই সেকথা কমবেশি বোঝা যায়। এখন শুধু **মঙ্গল, অমঙ্গল, মঙ্গলবার** ছাড়া বাকি শব্দগুলির ব্যবহার হয় না বললেই চলে। **মঙ্গলকাব্য** রূপে কিছু গ্রন্থের নামও ছিল, সেগুলিও অ্যাকাডেমিক আলোচনায় মাঝেমধ্যে ব্যবহৃত হয় মাত্র। এমনকি বছর পঞ্চাশ আগেও ছেলেমেয়েদের নাম রাখা হত **মঙ্গল** ও **মঙ্গলা**। এখন তাও হয় না। অথচ, বিগত মধ্যযুগে যখন বাংলাভাষার স্বর্ণযুগ ছিল, **মঙ্গল** শব্দ তার সমস্ত অর্থ নিয়ে আমাদের বঙ্গসমাজে সার্বিকভাবে সক্রিয় ছিল। রসগোল্লা যেমন রসে ডুবে থাকে, সেভাবে বঙ্গসমাজ **মঙ্গল**-রসে ডুবে ছিল। সেই **মঙ্গল**-রসের আধারস্বরূপ কিছু শব্দের অর্থ মন্তব্যসহ নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে। **৬.** ইংরেজি a*mong*, *mong*er ... ইত্যাদি শব্দের ভিতরে **মঙ্গ**-এর ছিঁটেফোঁটা উত্তরাধিকার থেকে গেছে বলেই মনে হয়।

মঙ্গলঘট : ৫. বাস্তব জীবনে একটি অদৃশ্য **ঘট** বা **ঘটি** থাকে, হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী-ভূমিজ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে **ঘট**টি ভরে নিয়ে তাঁর নিজের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে হাত দেন; তা সে তাঁর নতুন পাওয়া নদীপালের ১০ বিঘে জমিতে গোলাপের চাষ করা হোক কিংবা তাঁর নতুন বাড়ি তৈরি করা হোক, কিংবা কর্পোরেশনের নবনির্মিত সুপারমার্কেটে প্রাপ্ত দোকানঘরটির উদ্বোধনই হোক। সেই **ঘট**টি ভরে নেওয়ার অর্থ হল তাঁর ভবিষ্যৎ প্রকল্পটির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ সংগ্রহ করে সেই ঘটটি তৈরি রাখা। প্রকৃতপক্ষে এই অদৃশ্য ঘটটিকেই সেকালে **মঙ্গলঘট** নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রতীকী আচরণ সৃষ্টিকারী প্রাচীন ভারতীয় মানুষেরা যে কোনো **মঙ্গল**কর্মে এরই প্রতীকী আচরণের প্রচলন করেন বাস্তবে একটি দৃশ্য ঘটিতে জল ভ'রে এবং তাকে **মঙ্গলঘট** নাম দিয়ে। তারই উত্তরাধিকার বহন ক'রে হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানে ও শুভকর্মে এবং পূজাদিতে এই **মঙ্গলঘটের** ব্যবহার আজও প্রচলিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ '*ভারততীর্থ*' কবিতায় লিখে গেছেন, '... মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা / **মঙ্গলঘট** হয়নি যে ভরা / সবার পরশে পবিত্র করা / তীর্থ নীরে — এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

অদৃশ্য এই যে **মঙ্গলঘট**, একালের সমাজে তার ব্যবহার আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। কিন্তু তাকে চিনতে ও চেনাতে কোনো শব্দ আজ আর আমাদের নেই। নিজের সম্পদ ফেলে দিয়ে আমরা যারা এখন দেহবাদী খণ্ডবাদী ইংরেজির মুখাপেক্ষী হয়েছি, তারা এখন project plan, investing finance ... ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি এবং ইংরেজির future project-এর অনুকরণে নতুন দো-আঁশলা বাংলা শব্দ বানিয়েছি — '**ভবিষ্যৎ প্রকল্প**'। ফলত আমাদের গৌরবজনক **মঙ্গলঘট** এখন শুধুমাত্র মাটির ভাঁড়-এ পরিণত হয়েছে।

মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডিকা : ৩. মঙ্গলকর চণ্ডী; যিনি সৃষ্টিতে মঙ্গলা, প্রলয়ে চণ্ডিকা, দুর্গামূর্ত্তিভেদ। (ব.শ.)। **৫.** যে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী শাসকের বিরুদ্ধে ভীষণরূপ ধারণ করত এবং তাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিত কিন্তু বাকি জনসাধারণের জন্য **মঙ্গল**সমূহের সরবরাহ করত, তাদের বলা হত **মঙ্গলচণ্ডী** বা **মঙ্গলচণ্ডিকা**।

গ্রামবাংলায় যে মণ্ডপে এঁরা সমবেত হয়ে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা কার্যে লিপ্ত হতেন, সেই মণ্ডপকে বলা হত **চণ্ডীমণ্ডপ**।

মঙ্গলকাব্য : ৫. যাহাতে **অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী** বা **মঙ্গলচণ্ডিকা** প্রভৃতি **মঙ্গলকারক মঙ্গলদেবতার মঙ্গলতূর্য্য** ও **মঙ্গলধ্বনি**মূলক **মঙ্গলগাথা**সমূহ লিখিত আছে। এ বিষয়ে এত কথা বলার আছে যে, ভবিষ্যতে তেমন অবকাশ পেলে পৃথক প্রবন্ধ লেখা যাবে। আপাতত শুধুমাত্র এটুকু বলে রাখা যেতে পারে — ইংরেজের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কালখণ্ডটি (স্বর্ণযুগ) ছিল শেকসপিয়ারের কাল এবং তার কাল-পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ বছর বা তারও কম। তাদের তথাকথিত 'মধ্যযুগ' (৫০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ — কমবেশি এই ১০০০ বছর) ছিল অনেকটাই ঊষর। বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কালখণ্ডটি (স্বর্ণযুগ) হল আবার ঐ তথাকথিত 'মধ্যযুগ'-এর সমকালীন, এবং তার কাল-পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০০ বছর (কমবেশি ১২০০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)। আমাদের বাংলার ঐ মধ্যযুগ হল সৃষ্টির শ্রাবণধারার যুগ। কিন্তু আধুনিক যুগে ইউরোপ থেকে যাঁরা সাহিত্য শিখে এলেন, তাঁরা **মঙ্গলকাব্যের** যুগের বাংলাভাষার শব্দের মানে ভুলে গেলেন। তার উপর তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য-প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত এবং মুগ্ধ ও আত্মহারা। তাঁদের জানা-মতে ইংরেজের মধ্যযুগ যখন খরাক্লিষ্ট ছিল, বাংলার মধ্যযুগ কেমন করে সৃষ্টির শ্রাবণধারায় রসসিক্ত থাকবে? তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, বাংলার মধ্যযুগও খরার যুগ! তা ছাড়া তাঁরা তো বাংলাভাষার মজ্জাগত ক্রিয়াভিত্তিক চরিত্রের কথাও ভুলে গেছেন। ফলে তাঁরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যকেও ধরতে পারলেন না। এই জ্ঞানীরাই পরবর্তীকালের বাংলার অ্যাকাডেমির শাসক হয়ে যান। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

মঙ্গলকাল : ৩. শুভ-মুহূর্ত্ত, শুভক্ষণ। (ব.শ.)। ৫. এ হল জগতের বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে মানসিক ও বাহ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য পরিমিত করণের কাল।

মঙ্গলগৃহ : ৩. দেবায়তন। (ব.শ.)। ৫. এটি **মঙ্গলের** গৃহ অর্থাৎ এই গৃহ থেকে **মঙ্গল**কে বা গ্রহণযোগ্য জগৎকে (কৃত্রিম **বিশ্ব** ও অকৃত্রিম **বিশ্ব**কে) লাভ করা যায়।

মঙ্গলবার, মঙ্গলবাসর : ৩. কুজবার। **কুজ** = পৃথিবীজাত, মঙ্গলগ্রহ, মহীরুহ, বৃক্ষ, নরকাসুর। **কুজা** = ভূসুতা, সীতা, বৃক্ষ (নবপত্রিকা) যাঁহার আশ্রয়ভাবে আছে, দুর্গা। (ব.শ.)। ৪. Tuesday অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বার**। যার ভিতরে গ্রহণযোগ্য জগৎ পরিমিত রূপে থাকে, তার নাম **মঙ্গলগ্রহ**। এটি **কুজ** বলেই এতে **কু**-এর জনন ছিল, সমাজ যাকে স্বীকার করত না, সেই **পণ্যে**র জনন ছিল। এই যে **কু-জনন**, এর ভিতরে দৈহিক ও মানসিক উৎপাদন **পণ্য**গুণ-সম্পন্ন হয়ে গেলেই রহস্যরূপী ( ) হয়ে যায়, তখন **কুজ** হয়ে যায় **কুঁজ**। সেই **কুঁজ**-এর দৃশ্য রূপটিকে আমরা দেখতে পাই মানুষের পিঠে, আর অদৃশ্য রূপটিকে অনুভব করা যায় **পণ্য**মালিকের মনে। ... সমাজ কর্তৃক নিন্দনীয় এই **পণ্যের** উত্তরাধিকার ইংরেজিতে চলে গিয়েছে monger রূপে। ৬. ইংরেজি monger, fishmonger ... ইত্যাদি।

মঙ্গলাদেশবৃত্ত : ২ / মঙ্গলকথন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে যে; মিথ্যা ধনপুত্রলাভাদি মঙ্গলবাক্য বলিয়া যে জীবিকার্জ্জন করে। (ব.শ.)। ৫. কথাটি হল **মঙ্গল-আদেশ-বৃত্তি** যাহার। ধনপুত্রাদিলাভ হল গ্রহণযোগ্য পরিমিত বিষয়। সেটিই **মঙ্গল**। সেই **মঙ্গলের** দিশায় **আদেশ** করে যে, সেই দিশায় যাওয়ার কথা বলে যে, এবং সেরকম বলাই **বৃত্তি** যাহার, সেই হল **মঙ্গলাদেশবৃত্ত**।

মাগ (মাঁগ, মাগন, মাগনা, মাগা, মাগী, মাগু, মাগ্‌গি, মাগ্যি, মাঙ্গ, মাঙ্গা, মাঙ্গন, ভিখমাঙ্গা) : ১. মগ > মাগ। মঙ্গ > মাঙ্গ, মাঁগ। মা + গ = মাগ। **মাগ** শব্দটি তিনটি শব্দ-পরিবারের সদস্যরূপে জাত। ২. ***মাগ = মগ হইতে জাত। মাঁগ = মঙ্গ হইতে জাত। মাগন = মাগ অন (on) যাহাতে। মাগনা = মাগন-এর আধার যে। মাগা = মাগ-এর আধার যে। মাগী = মাগ (মা-গামী) সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে। মাগু = মাগ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। মাগ্‌গি = মা-এর গমন সক্রিয়ভাবে গত যাহাতে। মাগ্যি = মাগ সক্রিয়ভাবে থাকে যাহাতে। মাঙ্গ = মঙ্গ হইতে জাত। মাঙ্গা = মাঙ্গ-এর আধার যে। ভিখমাঙ্গা = ভিক্ষা মেগে জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে।*** ৩. **মাগ** = স্ত্রী; প্রার্থনা করা, চাওয়া, দিতে বলা, ভিক্ষা করা। **মাঁগ** = প্রার্থনা করা, চাওয়া। **মাগন** = প্রার্থনা, ভিক্ষা, মাগা, প্রার্থনীয় বিষয়। **মাগনা** = মাগনে প্রাপ্ত, ভিক্ষালব্ধ, বিনা মূল্যে প্রাপ্ত। **মাগা** = প্রার্থনা করান। **মাগী** = নারী, স্ত্রী, মাতা, সাধারণ বৈষ্ণবী, ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তের সাদর সম্বোধন, সক্রোধ শব্দ, মাতার প্রতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন শব্দ। **মাগু** = স্ত্রী। **মাগ্‌গি, মাগ্যি** = মহামূল্য, দুর্ম্মূল্য, আক্রা। **মাঙ্গ** = প্রার্থনা করা। **মাঙ্গা** = প্রার্থনা করান, মাঙ্গান। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বিশেষত গ্রামবাংলায়। ৫. দ্র. **মগ, মঙ্গল, মা (মাতৃ)**। এই শব্দগুলি তিন দিক থেকে এসেছে। প্রথমত **মগ** থেকে জাত **মাগ** ও তজ্জাতীয় শব্দগুলি এসেছে এইভাবে — পরিমিতের গমন থাকত **মগ** শব্দে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত উৎপন্নসম্ভার যে পাইকারের কাছে যেত, তাকে বলা হত **মগ**। পরে পরে তারা উৎপাদকদের কাছে তাদের উৎপন্ন ফসল চাইতে শুরু করে। তার থেকে তাদের আচরণের নাম হয়ে যায় **মাগ** বা চাওয়া। না পেলে ফেলে ছড়িয়ে কিছু নিয়ে পালায়। তার থেকে একদিকে তাদের নাম যেমন **মগ-দস্যু** হয়ে যায়, অপরদিকে তাদের লব্ধ মালপত্র হয়ে যায় **মাগনা** বা **মাগ্‌না**। তবে **মগ-দস্যু** শব্দটি পরবর্তীকালে প্রধানত **মগ** দেশের জলদস্যুদের নাম অর্থে প্রতীকী হয়ে যায়। আর **মাগ্‌না** শব্দটি থেকে যায় গ্রামবাংলার মেয়েদের মুখের ভাষায় — 'অমন **মাগ্‌না**-কথা বলিসনি তো।' অর্থাৎ 'অমন মূল্যহীন কথা বোলো না'। যে মাল **মগে**রা নিয়ে চলে যাওয়ার কারণে সচরাচর মালটি আর পাওয়া যায় না, সেটি হয়ে যায় **মাগ্‌গি** বা **মাগ্যি**। মোট কথা **মাগন, মাগনা, মাগা** এসব কথা খানিকটা হীন কাজ অর্থে প্রচলিত থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত **মঙ্গ** থেকে জাত **মাঙ্গ** বা **মাঁগ** ও তজ্জাত শব্দগুলি এসেছে এইভাবে — **মঙ্গ** বা 'পরিমিত বস্তু' মানুষের **মঙ্গল** করে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই **মঙ্গ** নিজে না বানিয়ে কিংবা বানাতে না পেরে কেউবা অন্য কারও **মঙ্গ** নিয়েও কাজ চালাতে পারে। সেক্ষেত্রে **মঙ্গ** প্রার্থনা করার অর্থ হয়ে যায় **মাঙ্গ**। ক্রমে এটি পরিণত

হয় মাঁগ-এ। গ্রামবাংলায় বলে '**কাকচারা** যদি বলত ঠিক, দুয়ারে দুয়ারে **মাঁগ**তনি ভিখ'।.যে ভিক্ষা **মেঙ্গে** খায়, হিন্দিতে তাকে বলে **ভিখমঙ্গা** (বা **ভিখমাঙ্গা**)। ব্রতাদিতে বা প্রায়শ্চিত্তে 'স্নান করে ভিজা কাপড় গায়ে সাতবাড়ি **মাঙ্গন**-এ যাওয়া' ... প্রভৃতি ব্যাপার গ্রামবাংলায় কিছুদিন আগেও দেখা যেত। এই **মাঙ্গন**-এ অশ্রদ্ধার বোধ কম। ...

তৃতীয়ত **মা** থেকে জাত **মাগ** ও তজ্জাত শব্দগুলি এসেছে এইভাবে — **মা** শব্দের অর্থ হল 'পরিমিতের আধার'। সেই **মা** যথানিয়মে জীবের অস্তিত্বের পরিমিত-রূপের আধার বা ভ্রূণকেও বোঝাতে পারে। (দ্র. **মা**[২])। সেই ভ্রূণকে বা **মা**কে তার পরবর্তী রূপে অর্থাৎ পুত্রে বা কন্যায় তারিত করে যে, তাকে বলে **মাতৃ** বা **মাতা**। সেই **মাতৃ** বা **মাতা** কেমন করে সংক্ষেপিত হয়ে **মা**-এ পরিণত হয়ে যায়, সে প্রসঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে **মা**[২] শব্দে। আপাতত আমরা যে 'পরিমিতের আধার'-স্বরূপ মানবাস্তিত্বের সংক্ষিপ্ততম রূপ ভ্রূণকে বোঝায়, সেই **মা** নিয়েই কথা বলব। আসলে এই ভ্রূণ হল আধেয়রূপী পুং-শুক্রের (বীজের) সঙ্গে আধাররূপী স্ত্রী-শুক্রের (ডিম্বাণুর) মিলনের ফল। সেই বিচারে পুং-শুক্রকেও **মা** বলা যায়। সেই **মা** গমন করে যাহাতে, সেই সত্তা স্বভাবতই **মাগ** শব্দবাচ্য হয়ে যায়। এভাবে না বুঝলে **মাগ** শব্দের কোনো মানেই পাওয়া যায় না। সেকারণে আপাতত আমরা এরকমভাবেই শব্দটিকে বুঝে নিলাম। ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে কোনো 'আরও ঠিক' ধারণায় পৌঁছানো গেলে, সেটিকেই না হয় মেনে নেওয়া হবে।

যাই হোক, সেই **মাগ**-এর সঙ্গে সক্রিয়তা যুক্ত হয়ে সে **মাগী** হয়ে গেলে আমরা তাকে woman ... ইত্যাদি বুঝি। নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে তার **মাগু**তে পরিণত হতে অসুবিধা হয় না। দ্র. **মাতা**। ৬. দ্র. মগ।

মঞ্চ (মন্‌চ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : গর্ব্বমঞ্চিনী, মঞ্চ (-চি), মঞ্চ, মঞ্চক (মাচা), মঞ্চপ, মঞ্চাধার, মঞ্চার, মঞ্চিকা, মাচা, মাচাঙ্গ, মাচান, মাচিয়া, মাছিয়া।

মঞ্চ (মন্‌চ্) = মিতের রহস্যরূপের চয়ন। **মঞ্চ** = মিতের রহস্যরূপের চয়ন যাহাতে। **মন্‌চ** = মিতের অনকরণ চয়িত যাহাতে।

মঞ্চ (মঞ্চিকা, মাচা, মাচান, মাচাঙ্গ, গর্ব্বমঞ্চিনী) : ১. ✓মঞ্চ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মঞ্চ** = *পরিমিতের রহস্যরূপ চয়িত যাহাতে। **মঞ্চিকা** = **মঞ্চ**-কে গতিশীল করে যে, তাহার আধার। **মাচা** = পরিমিতের আধার চয়িত যাহাতে, তাহার আধার। **মাচান** = **মাচা** অন যাহাতে। **মাচাঙ্গ** = **মাচা** অঙ্গ যাহার। **গর্ব্বমঞ্চিনী** = যিনি গর্ব্বরূপ মঞ্চে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।* / **মঞ্চ** = যাহাকে উচ্চে হওয়ানো হইয়াছে। ('উচ্চীভূত'/ব.শ.)। ৩. **মঞ্চ** = পল্যঙ্ক, খট্বা, পালঙ, খাট, বেদি, বংশাদিকৃত উচ্চাসন, মন্দিরস্থিত দেবতার অধিষ্ঠানবেদি, ক্ষেত্রে শস্যরক্ষার্থ রচিত উচ্চস্থান ... ইত্যাদি। **মঞ্চিকা** = আসন্দী, আসন, ভাজন, দ্রোণী (trough)। **মাচা** = লাউ কুমড়া ইত্যাদির বাঁশের আধারবিশেষ, খাটের মতো বাঁশ-তখতার শয়নস্থান, ক্ষেত্রে শস্যরক্ষকের টোঙ, ভাঁড়ারে জিনিসপত্র রাখার তাকবিশেষ, বাঁশ তখতা ইত্যাদির উচ্চস্থানমাত্র। **মাচান (মাচাঙ্গ)** = মাচা, চিতায় শবের কাষ্ঠময়শয়নস্থান, বিচারকের কাষ্ঠাসন, চেয়ার। **গর্ব্বমঞ্চিনী** = গর্ব্বরূপমঞ্চারূঢ়া, অতিগর্ব্বিতা। (ব.শ.)। ৪. শহরে শুধুমাত্র platform অর্থে **মঞ্চ** প্রচলিত, অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত গ্রামবাংলায় **মঞ্চ, মাচা, মাচান** যথার্থে প্রচলিত। ৫. প্রশ্ন হল **মঞ্চ**কে **মঞ্চ** বলে কেন? বলে এইজন্য যে, কাঠ, মাটি, বাঁশ ... ইত্যাদি বাহ্যবস্তুর এবং আমিত্বের বোধ, গর্ববোধ ... ইত্যাদি মানসবিষয়ের 'পরিমিত' খাড়াইকে 'চয়ন' করে যে, তাকে স্বভাবতই **মঞ্চ** বলতে হয়। তার থেকে মনে হয় যে, **মঞ্চ** মাত্রেই উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ব.শ. একে বলেছেন 'উচ্চীভূত'। বাংলাভাষী এই শব্দটিকে ক্রমে **মাচায়** পরিণত করে নেন। দ্র. **মচ**। সেই **মাচা** অন থাকে **মাচান**-এ। ব.শ. সন্দেহ করেছেন, কথাটি বুঝিবা **মহা-চাঙ্গ** থেকে এসেছে। হতে পারে। সেক্ষেত্রে সেটি মাটির ঢিবি বোঝাতে পারে, কিন্তু লাউয়ের **মাচা**, পাকাটি রাখার **মাচান** বোঝাবে না।

কিন্তু এ তো গেল দৃশ্য লোকের ব্যাপার। অদৃশ্য লোকে এই **মঞ্চ** বা **মাচা**ও তো রয়েছে। যে নারী সর্বদা গর্বের **মঞ্চে** অধিষ্ঠান করে বিরাজ করেন বা ঘোরাফেরা করেন, রূপের বা অন্য কিছুর গর্বে যাঁর মাটিতে পা পড়ে না, তাঁকে সেকালের শব্দবিদগণ নাম দিয়েছিলেন **গর্ব্বমঞ্চিনী**। এখনকার কালে চারিদিকে **মঞ্চে মঞ্চে** ছড়াছড়ি, সারা সমাজের মানসলোকটাই যেন খ্রিস্টানদের সমাধিস্তূপে পূর্ণ কবরস্থান হয়ে রয়েছে। এই স্তূপগুলি সবই ধন-গর্বের ও ক্ষমতা-গর্বের **মঞ্চ**। সেই **মঞ্চ**গুলিতে উঠে সদর্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনগর্বী ক্ষমতাগর্বী সত্তারা। কিন্তু তাদের চিহ্নিত করার জন্য **গর্ব্বমঞ্চিনী**র মতো শব্দ এখন আর আমাদের নাই।

মঞ্জ (মন্‌জ্, মুঞ্জ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কদলীমঞ্জরী, তালমঞ্জরী, মজিঠ, মঞ্জ, মঞ্জন, মঞ্জর, মঞ্জরি, মঞ্জরিত, মঞ্জরী, মঞ্জরিত, মঞ্জিম, মঞ্জিমা, মঞ্জিষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, মঞ্জিষ্ঠারাগ, মঞ্জীর, মঞ্জু, মঞ্জুকেশী, মঞ্জুগমন, মঞ্জুগমনা, মঞ্জুগীঃ, মঞ্জুগুঞ্জ, মঞ্জুনাশিনী, মঞ্জুনাশী, মঞ্জুবাক, মঞ্জুবাদ, মঞ্জুবাদিনী, মঞ্জুবাদী, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুভাষী, মঞ্জুর, মঞ্জুল, মঞ্জুলা, মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুষা (মঞ্জূষা), মঞ্জুস্বন, মঞ্জুস্বর, মণিমঞ্জীর, মাজ, মাজন, মাজনা, মাজা, মাজান, মাজুর, মাজুষ, মাঞ্জস, মাঞ্জা, মাঞ্জিষ্ঠ, মাঞ্জিষ্ঠক, মাঞ্জিষ্ঠিক (majestic), মুঞ্জ, মুঞ্জ, মুঞ্জকেশ, মুঞ্জকেশী, মুঞ্জবন্ধন, মুঞ্জবাসাঃ, মুঞ্জমেখলী, মুঞ্জর, মুঞ্জরিত, মুঞ্জ, মৌজা, মৌজাদার, মৌজুদ (মজুত, হাজির), মৌঞ্জ, মৌঞ্জী, মৌঞ্জীতৃণাখ্য, মৌঞ্জীধর, মৌঞ্জীনিবন্ধন, মৌঞ্জীপত্রা, মৌঞ্জীমৌঞ্জী, মৌঞ্জীয়, রসমঞ্জরী।

মঞ্জ (মন্‌জ্) = মিতের রহস্যরূপের জনন। **মঞ্জ** = মিতের রহস্যরূপের জনন যাহাতে। **মন্‌জ** = মিতের অনকরণ জনিত যাহাতে।

মঞ্জর (মঞ্জ, মঞ্জরি, মঞ্জরিত, মঞ্জরী, মঞ্জীর, মাঞ্জা — কদলীমঞ্জরী, তালমঞ্জরী, নূপুর) : **১.** ✓মঞ্জ্ + অর - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মঞ্জ*** = *মিতের রহস্যরূপ জনিত যাহাতে।* ***মঞ্জর*** = ***মঞ্জ*** *রহে যাহাতে।* ***মঞ্জরি*** = ***মঞ্জর*** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* ***মঞ্জরিত*** = ***মঞ্জরি*** *তারিত যাহাতে।* ***মঞ্জরী*** = ***মঞ্জরির*** *আধার যে।* ***মঞ্জীর*** = ***মঞ্জ****-এর গতিশীল আধার রহে যাহাতে।* ***মাঞ্জা*** = ***মঞ্জ****-জাত-এর আধার যে।* ***নূপুর*** = *ন্যূন পুরিত থাকে যাহাতে।* **৩. মঞ্জর** = মঞ্জরী, মুক্তা, তিলকবৃক্ষ, বল্লী। **মঞ্জরি, মঞ্জরী** = মুকুল, বল্লরি, বৌল, পুষ্পস্তবক, মালা, প্রবন্ধমালা, ভিত্তিরচিত পঙ্কময় পুষ্পস্তবক, মুক্তা, তুলসী, তিলকবৃক্ষ। **মঞ্জরিত** = সঞ্জাতমঞ্জরি, মঞ্জরিযুক্ত, কুসুমিত। **মঞ্জীর** = নূপুর। **মাঞ্জা** = ঘুড়ীর দড়িতে মাজনের নিমিত্ত মিশ্রিত সিরিশ ও কাচচূর্ণের আঠাবিশেষ। **নূপুর** = পাদাঙ্গদ, মঞ্জীর, নেপুর। (ব.শ.)। **কদলীমঞ্জরী** = কলার মোচা। **তালমঞ্জরী** = তালের মোচা। (ছা.অ.)। **৪.** মেয়েদের নাম রূপে **মঞ্জরী** কমবেশি প্রচলিত, অন্যথায় সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫. মঞ্জ** হল 'মং জনিত যাহাতে'; অর্থাৎ, পরিমিত-করণের রহস্যরূপ জনিত যাহাতে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কোনো সত্তার কথা আমরা শুনিনি, অভিধান বা শব্দকোষেও সেকারণে **মঞ্জ** নেই। কিন্তু **মঞ্জর, মঞ্জরী** আছে। আসলে যা কিছু যথার্থভাবে মং-কৃত হ'য়ে, 'পরিমিতি-কৃত' (মং) হ'য়ে জনিত (**জ**) হয়, তা সবই **মঞ্জ**। পোস্তদানা, সর্ষে, মুগ বা মটর ডাল যদি ঝকঝকে রূপোর মতো হত, কিংবা বেদানার দানা যদি একেবারে গোল হত, তাদের **মঞ্জ** বলা যেত। যেমন 'মুকুল'-এর কথাই ধরা যাক। গাছের সমস্ত গুণ ধারণ করে তার প্রাক্-সন্তান-সত্তাগুলি 'পরিমিতি-কৃত' (মং) হয়ে জনিত (**জ**) হয়ে পরাগমিলনের অপেক্ষায় মুখ তুলে রয় (**র**) মুকুলে বা **মঞ্জর**-এ। এ হল সত্তার একধরনের সারাৎসার, শাঁস, মূলরূপ, যা কিনা পরিপূরক সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণরূপ পাওয়ার অপেক্ষায় উদ্ভূত হয়ে থাকে। সেই কারণে 'মুকুল' ... ইত্যাদিকে **মঞ্জরি, মঞ্জরী** ইত্যাদি বলে। তার মানে, 'পরিমিত-করণের রহস্যরূপ জনিত হয়ে রয় যাহাতে' সেই **মঞ্জরী**র নানা রূপকে আমাদের পূর্বসূরিগণ চিনতেন। এর অদৃশ্য রূপকে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন **ছন্দোমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী,** প্রবন্ধমালা ... ইত্যাদি শব্দে। তবে এর সবচেয়ে 'স্পষ্ট-কিন্তু-অদৃশ্য' রূপকে প্রকাশ করে তাঁদের তৈরি করা **মঞ্জীর** বা **নূপুর** শব্দটি। এ হল **সর্ষের মতো বা বেদানার গোল দানার মতো শব্দের বা আওয়াজের ঝকঝকে কণা** বা **অংরূপিণী**র শব্দরূপ যার থেকে বেরোয়, সেই **নূপুর**। 'নূপুরনিক্কণ'-এ আমরা সেই **অদৃশ্য গোল গোল শব্দ-দানাগুলিকে** বা **মঞ্জ**গুলিকে শুনতে পাই। দ্র. **মল**। তবে সেই **মঞ্জে**র দৃশ্য রূপকে আমাদের পূর্বসূরিগণ চিহ্নিত করেছেন মুকুল, বৌল, পুষ্পস্তবক, মুক্তা, তুলসী, **কদলীমঞ্জরী, তালমঞ্জরী** প্রভৃতি শব্দে। সেই সুবাদে, যে সদ্য**পুষ্পিতা** নারী নিজেকে মেলে ধরেছে, তাকে **মঞ্জরী** নামে চিহ্নিত করা যায়। আর অদৃশ্যলোকে, ছন্দে সাজানো রসের ও রাগের সারাৎসারকে সেকারণেই **ছন্দোমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী** ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিল। এই তো বছর তিরিশ আগেও *'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী'* নামে বিখ্যাত নাটক অভিনীত হত কলকাতায়। মোটকথা, মধ্যযুগের বাংলায় তো বটেই, এমনকি ১৯৬০/৬৫ সালের আগেকার বাংলাসাহিত্যেও এই **মঞ্জরী** শব্দের বিপুল ব্যবহার ছিল, ছিল বাংলাভাষীদের সমাজেও। এখন লোকে কেবল এইটুকু জানে যে আমের মুকুলকে **মঞ্জরী** বলে। দ্র. **মঞ্জিম, মঞ্জু**। কিন্তু **মঞ্জ** থেকে যে **মাঞ্জা** হয়, সে হল সীমায়িত রূপের জনন থেকে জাত আঠা ইত্যাদি, যা কিনা সুতোর উপরটা কাচের দানা মাখিয়ে ঝকঝকে ও ধারাল করে দেয়।

মঞ্জিম (মঞ্জিমা, মঞ্জিষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা) : **২.** ***মঞ্জিম*** = ***মঞ্জ*** *গতিশীল বা সক্রিয়ভাবে সীমায়িত যাহাতে।* ***মঞ্জিমা*** = ***মঞ্জিম****-এর আধার যে।* ***মঞ্জিষ্ঠ*** = ***মঞ্জ*** *সক্রিয়ভাবে স্থিত যাহাতে।* ***মঞ্জিষ্ঠা*** = ***মঞ্জিষ্ঠ****-এর আধার যে।* **৩. মঞ্জিম** = মঞ্জিমযুক্ত, মঞ্জু, শোভন, মধুর। **মঞ্জিমা** = মঞ্জুভাব, শোভনত্ব, সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা। **মঞ্জিষ্ঠ** = মঞ্জুতম, শোভন, সুন্দর, মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত, অতিলোহিত। **মঞ্জিষ্ঠা** = অতিশয় মঞ্জু বা শোভনা, শোভনবর্ণস্থিতা, রক্তবর্ণলতাবিশেষ, পূর্ব্বরাগবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলি প্রসূত হয়েছে **মঞ্জ** থেকে। দ্র. **মঞ্জ, মঞ্জু**।

মঞ্জু (মঞ্জুকেশী, মঞ্জুগমন, মঞ্জুগমনা, মঞ্জুগীঃ, মঞ্জুগুঞ্জ, মঞ্জুনাশিনী, মঞ্জুনাশী, মঞ্জুবাক্, মঞ্জুবাদিনী, মঞ্জুবাদী, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুভাষী, মঞ্জুল, মঞ্জুলা, মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুষ, মঞ্জুষা, মঞ্জুস্বন, মঞ্জুস্বর, মঞ্জুহাসিনী) : **১.** ✓মঞ্জ্ + উ (উন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মঞ্জু*** = ***মঞ্জ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, পরিমিতিকরণ সুসমঞ্জস হইয়াছে যাহার।* ***মঞ্জুকেশী*** = ***মঞ্জু*** *কেশ যাহার।* ***মঞ্জুগমন*** = ***মঞ্জু*** *গমন যাহার।* ***মঞ্জুগমনা*** = ***মঞ্জু*** *গমনের প্রকৃতি আধার যে।* ***মঞ্জুগীঃ*** = ***মঞ্জু*** *গমন সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে তাহার নির্য্যাস।* ***মঞ্জুগুঞ্জ*** = ***মঞ্জু গুঞ্জন*** *যাহাতে।* ***মঞ্জুনাশিনী*** = ***মঞ্জু*** *নাশ করে যে প্রকৃতি সত্তা।* ***মঞ্জুনাশী*** = ***মঞ্জু*** *নাশ করে যে।* ***মঞ্জুবাক্*** = ***মঞ্জু*** *বাক্ যাহার।* ***মঞ্জুবাদিনী*** = ***মঞ্জু*** *বলে যে স্ত্রী।* ***মঞ্জুবাদী*** = ***মঞ্জু*** *বলে যে।* ***মঞ্জুভাষিণী*** = ***মঞ্জু*** *ভাষণ করে যে স্ত্রী।* ***মঞ্জুভাষী*** = ***মঞ্জু*** *ভাষ যাহার।* ***মঞ্জুল*** = ***মঞ্জু*** *লালিত যাহাতে।* ***মঞ্জুলা*** = ***মঞ্জু*** *লালিত যাহাতে তাহার আধার।* ***মঞ্জুশ্রী*** = ***মঞ্জু*** *শ্রী যাহার।* ***মঞ্জুষ*** = ***মঞ্জু*** *দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহা হইতে।* ***মঞ্জুষা*** = ***মঞ্জুষ****-এর আধার যে।* ***মঞ্জুস্বন*** = ***মঞ্জু*** *রূপ অস্তিত্ববাহক অন যাহাতে।* ***মঞ্জুস্বর*** = ***মঞ্জু*** *রূপী স্ব বা অস্তিত্ব রহে যাহাতে।* ***মঞ্জুহাসিনী*** = ***মঞ্জু*** *হাসেন যে নারী। /* **মঞ্জুগমনা** = মঞ্জু গমন যাহার সে। (ছা.অ.)। **মঞ্জুকেশী** = চারু কেশ যাহার। **মঞ্জুনাশিনী** = সুন্দরীর গর্ব্ব হরণ করে যে। **মঞ্জুনাশী** = স্ত্রী-সৌন্দর্য্য নাশ করে যে। **মঞ্জুষা, মঞ্জুষা** = যে স্থানে দ্রব্য মজ্জন (মাজামাজি) করা হয়। (ব.শ.)। **৩. মঞ্জু** = সুন্দর, শোভন, মনোরম, মনোজ্ঞ, চারু। **মঞ্জুকেশী** = শ্রীকৃষ্ণ, শোভনকেশ, সুকেশ। **মঞ্জুগমন** = চারুগতি, সলীলগমন। **মঞ্জুগমনা** = হংসী। **মঞ্জুগীঃ** = মধুরবচন। **মঞ্জুগুঞ্জ** = মধুরগুঞ্জন, কলগুঞ্জিত। **মঞ্জুনাশিনী** = অতিসুন্দরী। **মঞ্জুনাশী** = দুর্গা, শচী। **মঞ্জুবাক, মঞ্জুবাদিনী, মঞ্জুবাদী, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুভাষী** = মধুরবচন, শ্লক্ষ্ণবাক্ (শুক, কোকিল)। **মঞ্জুল = মঞ্জুযুক্ত, জলচর-পক্ষিভেদ,** দাত্যূহ (?), নিকুঞ্জ, জলাঞ্চল। **মঞ্জুষা (মঞ্জুষা)** = পেটক, পেটরা, সিন্দুক, ভাজন, আধার,

মঞ্জিষ্ঠা। **মঞ্জুশ্রী** = চারুশ্রীযুক্ত। **মঞ্জুস্বন, মঞ্জুস্বর** = চারুরব, কলকণ্ঠ। (ব.শ.)। **মঞ্জুকেশ** = মনোহর কেশবিশিষ্ট। **মঞ্জুল** = মনোহর, সুন্দর, সমীচীন, মধুর, নিকুঞ্জ, শৈবাল। (ছা.অ.)। ৪. যেসব ভাল ও প্রিয় শব্দ আমরা হারাতে চলেছি, এখনো পুরো হারাইনি, এই শব্দগুলি তাদের অন্যতম। অর্থ জানা থাকুক না-থাকুক, এখনো নামরূপে **মঞ্জু** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের অধিকাংশই কমবেশি প্রচলিত আছে। **মঞ্জুভাষ, মঞ্জুষ, মঞ্জুষা, মঞ্জুলা, মঞ্জুশ্রী** নামরূপে এখনও বহুল প্রচলিত। **মঞ্জুভাষিণী** নামটি সেকেলে হয়ে গেছে। এই শব্দগুলির মানে সেকালের বাংলাভাষী জানতেন, আমরা জানি না, আমাদের অ্যাকাডেমির মাথায় বসে থাকা ব্যক্তিরাও সবাই জানেন কি? কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সাধারণ বাংলাভাষী শব্দগুলির গৌরব এখনো ভোলেননি বলেই শব্দগুলি নামরূপে হলেও এখনো বেঁচেবর্তে আছে। ৫. যে ক্রিয়াকারীকে আমরা **সুন্দর** (১ম খণ্ডে **উন্দ** দ্রষ্টব্য) বলি, তাকেই **মঞ্জু** বলে। প্যারাস্যুটের খোলা ও ছাতা খোলায় যে পার্থক্য, এদের ক্রিয়ার পার্থক্য প্রায় সেইরকম। উপর থেকে ঘটলে সে **সুন্দর**, নীচের থেকে ঘটলে সে **মঞ্জু**।

আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি **মঞ্জ** শব্দের বাস্তব দৃশ্য-অস্তিত্ব নাই, অদৃশ্য মানসিক অস্তিত্ব থাকলেও তার কার্যকারিতা নাই। **মঞ্জর** শব্দের 'পরাগমিলনের অপেক্ষায় মুখ তুলে রহে' অংশটি বাদ দিলে, আমরা **মঞ্জ**কে পাই, যা কিনা কার্যকারিতাহীন ধারণামাত্র। তাকে আমরা সত্তার সারাৎসার ক্ষুদ্র ঝকঝকে গোল দানা রূপে শনাক্ত করেছি। **মঞ্জীর** বা **নূপুর**-এর নিক্বণ থেকে আমরা তাকে চিনেছি 'শব্দদানা' রূপে। কিন্তু সেই **মঞ্জ** নবরূপে উত্তীর্ণ হলে বা **মঞ্জু**তে পরিণত হলে, তার কার্যকরী অদৃশ্য-অস্তিত্বকে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। এতে 'পরিমিতি-করণের রহস্যরূপ জনিত' হয়ে 'নবরূপে উত্তীর্ণ' হয়। **মঞ্জ**-এর ক্ষেত্রে এই 'নবরূপে উত্তীর্ণ' হওয়া কেমন ব্যাপার তা জানলেই আমরা **মঞ্জু**কে সুস্পষ্টভাবে চিনে নিতে পারি।

মঞ্জ নবরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে কেবল সত্তার অগুণকেও যদি সে তার পরিমিতি-করণ ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে। একে বলে বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের, গুণের সঙ্গে অগুণের যথাযথ সামঞ্জস্য করণ, যাতে গুণ অগুণ পরস্পরকে ধ্বংস করে না। এটি করে ফেলতে পারলেই **মঞ্জ** আর **মঞ্জ** থাকে না, হয়ে যায় **মঞ্জু**। দৃশ্য রূপে এই **মঞ্জু**কে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তবে আমরা আপাতত **মঞ্জুহাসিনী**র হাসিতে **মঞ্জু**কে দেখব। বাঙালি বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেনকে যখন বিশ্বসুন্দরীর মুকুট পরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি হাসতে হাসতে কাঁদতে থাকেন। সর্বোচ্চ আনন্দে মানুষ এরকম হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলার এরকম ঘটনা আমরা শিশুদের মধ্যেও দেখতে পাই। এইরূপ হাসিতে হাসি ও কান্নার এক অদ্ভুত **দ্বৈরাজ্য** বা সামঞ্জস্য থাকে। বৃষ্টি হতে হতে যদি অকস্মাৎ সূর্যের উদয় হয়, তখন প্রকৃতি এইরকম হাসেন, তাঁর চোখের ভ্রূ রামধনু হয়ে আকাশে উঠে পড়ে। মানুষ যতরকম হাসি হাসে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাসি হল এই হাসিকান্না মেশানো হাসি; এইরূপ হাসির চেয়ে মধুর নির্মল মিষ্ট হাসি আর হয় না। এ হাসি দেখলে যে-মানুষের মন সুখবোধ করে না, শরৎচন্দ্রের ভাষায় সে মানুষ 'খুন করিতে পারে'। এইরূপ হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অঙ্গ। হাজার চেষ্টাতেও স্বেচ্ছায় এরকম হাসি হাসা যায় না। একেই **মঞ্জুহাসি** বলে। স্বেচ্ছায় এমন হাসি হাসা যায় না ব'লে **মঞ্জুহাসি** কখনোই কৃত্রিম হয় না, হতে পারে না।

অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে **মঞ্জু** হল এমন এক সত্তা যার ভিতরে বিশ্বের হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, হাঁ-না, সম্ভব-অসম্ভব, চিরসত্য-মহামিথ্যা (মহামায়া) ... ইত্যাদি তাদের এমন এক দ্বৈরাজ্যমূলক সামঞ্জস্যে পরস্পরের পরিপূরক রূপে **বর্তমান** থাকে যে, সেই পরস্পরবিরোধী সত্তাগুলির কেউই তার বিপরীতটিকে ধ্বংস না করে তাদের পরস্পরের অস্তিত্বের যাথার্থ্য যোগায়। এর ফলে যে সত্তাটির জন্ম হয়, তা সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তাই তা দেখতে শুনতে খেতে মাখতে শুঁখতে অনুভব করতে **সুন্দর**, শোভন, মনোহর, স্বাদু, সুমিষ্ট, সুচারু। **মঞ্জু** তাই অনুভব করতে **সুন্দর**, দেখতে **সুন্দর**, শুনতে **সুন্দর**, খেতে **সুন্দর**, শুঁখতে **সুন্দর**, মাখতেও **সুন্দর**কে বোঝাতে পারে। আর **সুন্দর** কী, তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের **সুন্দর**তত্ত্বে। দ্র. **সুন্দর** (১ম খণ্ড)।

মঞ্জুকেশীর (শ্রীকৃষ্ণের) চেয়ে সুদৃশ্য কেশ আর কারই বা থাকতে পারে! তিনি যে কালো কৃষ্ণ, শ্যাম কৃষ্ণ, শ্বেত বা রাধাকৃষ্ণ তিন কৃষ্ণের **কেশ** একত্রে ধারণ করে থাকেন। অথচ এক কৃষ্ণ আরেক কৃষ্ণকে বিচলিত করেন না। তাই তো তিনি **মঞ্জুকেশী**। (দ্র. **গৌরী**)

মঞ্জুগমনা হংসীর চেয়ে **মঞ্জুগমন** বা **সুন্দর** গমন আর কারই বা হতে পারে! জলে থাকলে সে দাঁড়িয়ে আছে না চলছে বোঝাই যায় না। মনে হয় স্থির এক সত্তা। স্থিতি ও গতির এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য থাকে তার গমনে। তাই সে **মঞ্জুগমনা**।

তাই বলে **মঞ্জুনাশিনী** দুর্গা কিন্তু **মঞ্জু**কে বা **সুন্দর**কে নাশ করেন না। তিনি প্রকাশিত হলে এতই **মঞ্জুরূপিণী** হয়ে দেখা দেন যে, অন্য সমস্ত **সুন্দরী**রা বা **মঞ্জুরূপিণী**রা তাঁর তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে যান। তাঁদের **মঞ্জু** যেন-বা নাশ হয়ে যায়। তাই তাঁকে প্রশংসা করতে গিয়ে **মঞ্জুনাশিনী** বলা হয়ে থাকে।

মঞ্জুবাক্-এর চেয়ে মিষ্ট বাক্য আর কেউই বলতে পারে না। কেননা, তাঁর বাক্যে উচ্চারণের আওয়াজের মাত্রার ও স্পষ্টতার সুসমঞ্জস **দ্বৈরাজ্য** থাকে। তাই তা ঠিকঠাক শুনতে পাওয়া যায়, তাই তা শুনতেও **সুন্দর**। সেকারণেই তাকে **মঞ্জুবাক্** বলে।

মঞ্জুভাষ শুনতেও **সুন্দর**, বুঝতে **সুন্দর**, অনুভব করতেও **সুন্দর**। তাতে শব্দের ও অর্থের সুসমঞ্জস দ্বৈরাজ্য থাকে। ফলত, সেই ভাষণ শোনার পর যে বোধের লেনদেন ঘটে, তা অজস্র শব্দদানার লেনদেনের মতো **সুন্দর**। সেকারণেই **মঞ্জুভাষ**-এর চেয়ে মিষ্টভাষণ আর হয় না, হতে পারে না। ...

টর্চের আলোর মতো বিশেষ দিশায় চলা সুসমঞ্জস জ্ঞানাদির বিচ্ছুরণকে বলা হয় **মঞ্জুষ**। সেই **মঞ্জুষ**-এর আধারকে বলে **মঞ্জুষা**। কিছুদিন আগেও বাংলায় **মণিমঞ্জুষা, কাব্যমঞ্জুষা** ... ইত্যাদি নামের গ্রন্থ ছিল। এখনও হয়তো কিছু কিছু আছে। দৃশ্যরূপে রত্নখচিত নকশাকাটা মেয়েদের ছোট ছোট থলিকে বলা হত **মঞ্জুষা**, একালে যাকে 'ভ্যানিটি ব্যাগ' বলা হয়ে থাকে।

মঞ্জুষা বলতে পেঁটরা ... ইত্যাদি বোঝায়। এর ভিতরে **মঞ্জু**র আধারস্বরূপ দৃশ্যবস্তু বা **মঞ্জু** (উ-কার) থাকে, এবং সেগুলি যে

আছে সেকথা সে জানান দিতে থাকে। সেদিক থেকে একে কাঁচের বাক্স বা কাঁচের আলমারিও বলা যেতে পারে।

মঞ্জুশ্রীর চেয়ে ভালো **শ্রী** আর তো হতেই পারে না! সে যে সকল প্রকার সার্বিক বিচ্ছুরণের (**শ্রী**র) — জ্ঞানশক্তির, **কর্ম্ম**শক্তির, রূপের সার্বিক বিচ্ছুরণের — সামঞ্জস্যমূলক বা **সুন্দর** আধার, শ্রেষ্ঠ আধার, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তাই সে **মঞ্জুশ্রী**। তার চেয়ে **সুন্দর** আর কিছুই হয় না। বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক অর্জনের শ্রেষ্ঠ বোধটিকে তাই **মঞ্জুশ্রী** নামে শনাক্ত করা হয়েছিল।

মঞ্জুর (মঞ্জুরী) : ২. *মঞ্জুর = মঞ্জু রহে যাহাতে। মঞ্জুরী = মঞ্জুর-এর সক্রিয় আধার যে।* ৩. **মঞ্জুর** = স্বীকৃত (sanctioned)। **মঞ্জুরী** = স্বীকার, সম্মতি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. একপক্ষ আবেদন করেন, 'আমাদের শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই', অপরপক্ষ সেই আবেদন **মঞ্জুর** করেন। তার মানে, প্রথম পক্ষ আগেই বিষয়টি নিজেদের জন্য নিজেরা **মঞ্জুর** করে বসে আছে, এখন অপরপক্ষ **মঞ্জুর** করলেই ব্যাপারটি দু-দিকের স্বীকৃতি পেয়ে সচল বা সক্রিয় হয়ে যাবে। **মঞ্জু** শব্দের ভিতরে যে দু-পক্ষের সামঞ্জস্য, পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের স্বভাব রয়েছে, এখানেও তা বিদ্যমান। আমাদের 'বিশ্ববিদ্যালয় **মঞ্জুরী** কমিশন' কি কোনো **মঞ্জুরী**ই দিতে পারত, যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলি কোনো আবেদন না করতেন? তার মানে, **মঞ্জুর** করতে গেলে দু-পক্ষেরই **মঞ্জুরী** লাগে।

এটি আরবি শব্দ বলে মনে করা হয়। কিন্তু অর্থের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, এটি বাংলা শব্দও বটে। হ্যাঁ, হতে পারে যে, পূর্বে তা বাংলার হৃদয়ে শায়িত ছিল, পাঠান-মোগলের হাত ধরে আরবি **মন্‌জুর্‌** আসার পরই সে জাগ্রত হয়ে **মঞ্জুর** ও **মঞ্জুরী** রূপে সক্রিয় হয়েছে।

***মট্‌ (মঠ্‌)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অগ্নিমাঠর, আমট, মট্‌, মটক, মটকা, মটকান, মটন, মটমটি, মটর, মট্টক, মট্টন, মঠ্‌, মঠ, মঠি, মঠিকা, মঠী, মড়ক, মড়চা, মড়মড়, মড়মড়ায়িত, মড়মড়ি, মড়মড়ে, মড়া, মড়াই (মরাই), মড়াচির, মড়াছিয়া, মড়াঞ্চে, মড়ি, মড়িঘাটা, মড়িপুকুর, মড়িপোড়া, মড়িপোড়ানী, মড়ুঞ্চে, মড্ডুকবাদ্য, মাঠর (দ্র.অগ্নিমাঠর), মাঠা, মাঠাতোলা, মাড্ডুক, মাড্ডুকিক, মাট (মাঠ), মাটকলাই, মাটকোঠা, মাটা, মাটাপালাম, মাটাবালাম, মাটাম, মাটামসহি, মাটি, মাটিয়া, মাটী, মাটো (মাঠো), মাটে-ঘাটে, মাঠ, মাঠ-করা, মাঠনি, মাঠ-হারে, মাঠে-মাঠে, মিট্‌, মিট, মিটন, মিটমাট, মিটমিট, মিটমিটান, মিটমিটে, মিটা, মিটাইল, মিটান, মিটিমিটি, মিটিরমিটির, মিটুলি, মুটিয়া, মুটে, মুটেমজুর, মেট, মেটন, মেটমিস্তিরি, মেটেল, মেটা, মেটান, মেটাইয়া, মেটাইল, মেটাল, মেটুলি (মেটে, মেটেলি), মেটে, মেটেগর্ব্ব, মেটেচিল, মেটেজাঁক, মেটেতেল, মেটেরঙ, মেটেল, মেটেলি (মাটিয়ালি, মেটেলী), মেটেসিঁদুর, মেটো, মেঠে, মেঠো, মেঠোইংরেজি, মেঠোগান, মেঠোবক্তৃতা, মেঠোসুর, মোট, মোটক, মোটকথা, মোটকী, মোটন, মোটনক, মোটমাট, মোটর, মোটা, মোটাই, মোটান, মোটামুটি, মোটাসোটা, মোটিয়া, মোট্টুক, মোটে, মোটের-উপর, মোট্রায়িত। **মট্‌ (মঠ্‌)** = পরিমিতের (সীমায়িতের) টঙ্কারণ। **মট** = পরিমিতের টঙ্কার যাহাতে। **মঠ** = পরিমিতের টঙ্কার স্থিত যাহাতে।

মট্‌ (মটক, মটকা, মটকান, মটর, মাট, মাটি, মাটিয়া, মেটে) : ২. *মট্‌ = পরিমিতের (সীমায়িতের) টঙ্কারণ। মট = পরিমিতের টঙ্কার যাহাতে বা যেখানে। মটক = মট করে যে। মটকা = মটক-এর আধার যে। মটকান = মটকা অন (on) থাকে যাহাতে। মটর = মট রহে যাহাতে। মাট = মট হইতে জাত। মাটি = মাট সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে। মাটিয়া = মাটি যায় যাহাতে। মেটে = দিশাগ্রস্ত মাটি রহে যাহাতে।* ৩. **মট্‌** = শক্ত জিনিস ভাঙার শব্দ, আঙুল ফোটানর শব্দ। **মটক** = রেশমের মটকা কাপড়। **মটকা** = ঘরের চালের মাথা (মটকা-মারা = মটকা ছাওয়া); মোটা তসর-সূতার কাপড়; মাটির বড় কলসীবিশেষ; মৃতবৎ নিস্পন্দ (মটকা মেরে থাকা = মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা); 'মট্‌' শব্দ করান; (চক্ষু) সঙ্কেতার্থ সঞ্চালিত করা, (চক্ষু) সবিলাস কটাক্ষযুক্ত করা। **মটকান** = 'মট্‌' শব্দ করান, (চক্ষু) সবিলাস কটাক্ষযুক্ত করা। **মটর** = বর্ত্তুলাকার কলায়বিশেষ (pea)। **মাট (মাঠ)** = মাটি, খোলা জায়গা, প্রান্তর, ময়দান, ভূমি, জমি, শস্যক্ষেত্র, ক্ষেত; মৃষ্ট বা মার্জ্জিত করা, মাজিয়া মসৃণ করা। **মাটি** = মৃত্তিকামাত্র, পৃথিবী, ভূতল, জমি, রাজ্য, ধুলা, বাস্তু, গৃহতল। **মাটিয়া (মেটে)** = মৃত্তিকাসম্বন্ধী, মাটিতে করণীয়, মাটির মতো বর্ণবিশিষ্ট, মাটি হইতে প্রাপ্ত, মৃত্তিকাংশযুক্ত। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কটমট, মচ**। শুরুতে একটি কথা বলে রাখা চাই যে, এই ক্রিয়ামূলের পরিবারের সদস্য শব্দসমূহের অধিকাংশই বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। এই শব্দগুলির অর্জন ও প্রচলন শুরু হয় মধ্যযুগ থেকে এবং এখনও এই পরিবারের সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামবাংলায় এই সব শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে, আজও।

গাছের শুকনো পাতাকে সীমায়িত (বা **ম**) করার জন্য চাপ দিলে, সে **মচ** শব্দ ক'রে না-ভেঙে বা নিজের বাকি অবয়ব থেকে পৃথক না হয়ে সংকুচিত হয়ে যায়; আর গাছের ডালকে সীমায়িত (বা **ম**) করার জন্য চাপ দিলে সে **মট্‌** শব্দ ক'রে ভেঙে বা নিজের বাকি অবয়ব থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে দু'দিকেই যে-যার সংকুচিত হয়ে যায়। এই যে আত্মসংকোচনের টঙ্কার, তাকেই **মট** বলে। যে সত্তা **মট** করে নিজেকে নিজের পরিত্যাজ্য অংশ থেকে পৃথক করে নেয়, তার স্বভাবের মধ্যেই এরকম **মট** করে নিজের কিছু অংশ ত্যাগ করে দিয়ে সরে আসার ইচ্ছা ও ব্যবস্থাদি থাকে; সে যেন পৃথক হয়ে যাবে বলে তৈরিই ছিল। এরূপ **মট** করে ভেঙে সরে গিয়ে আত্মসংকুচিত হওয়ার আর একটা মানে এরকম দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকটি সত্তা যেন একটি দেহব্যবস্থার, পরিবার-ব্যবস্থার, সমাজ-ব্যবস্থার, জগৎ-ব্যবস্থার প্রবাহের অংশ রূপে তার মধ্যেই ছিল, **মট** করে সেখান থেকে সে পৃথক হয়ে সরে এসেছে এবং তার বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনার সূত্রগুলি ছিন্ন হয়েছে। দ্র. **ম**। এর ফলে যেখানে বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেই স্থানটি পূর্বতন প্রবাহের থেকে সংস্রব-ছিন্ন হয়ে

উলঙ্গ থেকে যায়। এই **মট** করে ভাঙা পৃথক হয়ে যাওয়া অংশটিকে বলে **মাট**, কেননা সে **মট** থেকে জাত। সেই উলঙ্গ স্থানটি ঢেকে দেওয়াকে **মটকা**-মারা বলে। লোকে যখন **মটকা**-মেরে পড়ে থাকে, তখন কার্যত সেই প্রবাহবিচ্ছিন্ন সত্তা পৃথক হয়ে আপন বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন ঢাকাচাপা দেয়। এ হল **মটকার** অদৃশ্য রূপ। আর, সেই **মাট** যদি **মাট**-রূপেই সক্রিয় হয়, অর্থাৎ তার সংকোচন চলতেই থাকে, তখন তাকে বলে **মাটি**। দৃশ্যরূপে এই **মাটি** ক্রমশ সংকুচিত হতে হতে আরও ঘন হয়, ক্রমশ আরও শক্ত হয়, এবং সেভাবে সংকুচিত হতে হতে এক সময় পাথরে পরিণত হয়ে যায়। তাই তাকে **মাটি** বলে। আর, অদৃশ্যরূপে কাজ নষ্ট হলে কাজ **মাটি** হয় এবং সেভাবেই প্রেম **মাটি** হয়, সম্পর্ক **মাটি** হয় ... এবং ক্রমশ তা মানসলোকের মাটি রূপে ইতিহাসের গ্রানাইট পাথরে পরিণত হয়ে যায়। তারই সাদৃশ্যে **মৃৎ** বা **মৃত্তিকা**ও **মাটি** রূপে শনাক্ত হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'টাকা **মাটি**, **মাটি** টাকা' বলে উভয়প্রকার **মাটি** শব্দের ব্যবহার করে গেছেন।

যাই হোক, এরূপে **মট** করে যে, তাকে বলে **মটক**। এই **মটক**-এর আধারকে **মটকা** বলে। **মট** করে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় যে সুতো, তাকে সেকারণেই **মটকা**-সুতো বলে। যে স্থানে **মট** করে ভেঙে আলাদা হয়ে যায়, সত্তার সেই স্থানটি অতঃপর তার সর্বোচ্চ স্থান ব'লে তাকেও **মটকা** বলে। কথাটি এখান থেকে প্রতীকী হয়ে গিয়ে যে কোনো সত্তার সর্বোচ্চ স্থানকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। সেই সুবাদে ঘরের সর্বোচ্চ স্থানের নাম যেমন **মটকা** হয়ে যায়, তেমনি মানুষের **ব্রহ্মতালু**কেও **মটকা** বলার চল হয়ে যায়। 'কথাটি শুনে তার **মটকা** গরম হয়ে গেল' বাক্যটির মানে দাঁড়ায় — কথাটি শুনে তার ব্রহ্মতালু গরম হয়ে গেল। যে হাঁড়ি তৈরির সময় তার সর্বনিম্ন স্থানে, হাঁড়িটিকে উল্টো করে ধরলে তার সর্বোচ্চ স্থানে, অধিক মাটি দিয়ে বানানো হয় — ঘরের **মটকা**-ছাওয়ার বা **মটকা**-মারার মতো, সেরূপ মাটির হাঁড়িকে তাই **মটকা** বলে।

তবে আমরা যখন আঙুল **মটকাই** তখন সেই আঙুলকে **মট্** করে শব্দ করান হয় বলেই তাকে আঙুল **মটকান** বলে। কিন্তু যখন চোখ **মটকান** হয়, তখন ব্যাপারটি একেবারেই আলাদা। চোখ **মটকান**তে শ্রাব্য **মট্** শব্দের দেখা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় দৃশ্য **মট** ক্রিয়ার। (তার মানে, **মট্** ক্রিয়াটির প্রকাশকে কেবল শোনাই যায় না, দেখা যায়; হয়তো-বা ছোঁয়া, শোঁকা, এবং আস্বাদন করাও যায়। তবে সে বিষয়ে আমরা এখনও অজ্ঞ।) সেই ক্রিয়ায় পূর্বতন তাকিয়ে থাকার প্রবাহকে সীমায়িত করে টঙ্কারিত করা বা **মট** করে ছিন্ন করা হয়। অর্থাৎ চোখ **মটকানর** অর্থ হল, চোখের তাকিয়ে থাকার প্রবাহকে মাঝে মাঝে **মট** করে ভেঙে দেওয়া। তাতে লক্ষণার্থে অন্য কিছু অর্থ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ব.শ. তাকে বলেছেন 'সঙ্কেতার্থ (চক্ষু) সঞ্চালিত করা' বা চক্ষুকে 'সবিলাস কটাক্ষযুক্ত করা' ... ইত্যাদি।

এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল, কিন্তু যেই মুহূর্তে **মৃত্তিকা** ও **মৃষ্ট** শব্দ দুটিকে বাংলাভাষী **মাটি** করে ফেলল, তখনই আধুনিক বাংলাভাষী জ্ঞানীদের দেখা দিল সংশয়। শব্দের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা দেখেন, **মৃষ্ট** ও **মৃত্তিকা** দীর্ঘ পথ বেয়ে বাংলায় এসে যথাক্রমে **মাট** ও **মাটি**তে পরিণত হয়েছে। এই **মাট** হল মার্জিত করা, মাজিয়া মসৃণ করা। এই **মাট** 'মাটি', 'ভূমি' ... ইত্যাদিকেও বোঝায় বটে, তবে **মাট** কথাটি **মৃত্তিকা** থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, ব.শ. সেরকম সাক্ষ্য দেননি। তাঁর মতে **মৃৎ** বা **মৃত্তিকা** থেকে বিবর্তিত শব্দ হল **মাটি**; যদিও **মাট** ও **মাঠ**কে তাঁর একই শব্দ বলে মনে হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি সংশয় রয়েছে।

আমরা দেখছি, **ট ঠ** ... প্রভৃতি বর্ণের বিকাশ হয়েছে মধ্যযুগ থেকে। (দ্র. **ট** বর্ণের অর্থ)। মধ্যযুগের সাহিত্যেও **মাট** ও **মাঠ** কমবেশি জড়িয়েই ছিল; **ট** ও **ঠ** তখনও সেভাবে বিশ্লিষ্টই হয়নি। পরে পরে তারা পরস্পর থেকে ক্রমশ পৃথক হয়ে স্পষ্ট হয়। একালের বাংলাভাষীদের উচ্চারণে **মাঠ** শব্দটি নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে অর্জন করে ফেলেছে। আজকাল কেউ 'মাটে-ঘাটে' বলেন না, 'মাঠে-ঘাটে'ই বলেন; 'মেটে-রং'-কে কেউই 'মেঠে-রং' বলেন না, যেমন কিনা 'মেঠো সুর'কে কেউই 'মেটো সুর'ও বলেন না।

যাই হোক, আমাদের ধারণা, **মট** থেকে **মাট** এবং **মঠ** থেকে **মাঠ** শব্দ জাত হয়েছে। আর, **মৃত্তিকা** শব্দটি বহু পথ অতিক্রম করে বাংলায় **মাটি**তে পরিণত হলেও, তার সঙ্গে মিশে গেছে **মাট**-শব্দজাত **মাটি**। এবং বলতে কী, **মৃৎ** ও **মৃত্তিকা**য় অর্থের যে ব্যাপকতা ছিল, **মাট**-জাত **মাটি** শব্দটি তার থেকে আরও ব্যাপকার্থক হতে পেরেছে।

'সীমায়িতের টঙ্কার থাকে যাহাতে' তাকেই **মট** বলে, একথা আমরা আগেই জেনেছি। **মট** করে যেটি 'হয়ে গেল', সেই '**মটিত**' সত্তাটিকে **মাট** বলে। সেই **মাট** সক্রিয় থাকে **মিটমাট** শব্দের মাট-এ। **মিটে** গেলে নিষ্ক্রিয় হল, তারপর **মাট** হয়ে গেলেই আত্মসংকোচন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, **মাট** হয়ে গেল, আর তার বিকাশ হবে না; এবং সেভাবে চলতে থাকলেই তা **মাট** থেকে **মাটি** হয়ে যায়। দ্র. **মিটমাট**, **মোটমাট**। আমরা যখন বলি, 'পুরো প্রকল্পটাই **মাটি** হয়ে গেল', কিংবা 'টাকা **মাটি**, **মাটি** টাকা', তখন সে-**মাটি** আর যাই হোক earth নয়, soil-ও নয়। অথচ **মাটি** শব্দটির এলাকার ভিতরে সেসবও বিদ্যমান থাকে। কথাটিতে **মৃৎ** বা **মৃত্তিকা** থেকেও পৌঁছানো যায়। কেননা, **ম**-এর **আবর্ত্তনে**র তারণও **মাটি**তেই সম্ভব হয়। যেমন কিনা, '**মাট-কোঠা**'। এটি **মাটি** দিয়ে বানান কোঠা বলেই মাট-কোঠা, কিছুতেই '**মাঠ**-কোঠা' নয়।

মঠ (মঠি, মঠিকা, মঠী, মাঠ, মাঠর) : ১. ✓মঠ্ + অ (ঘঞর্থে ক) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মঠ*** = *সীমিতের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে।* ***মঠি*** = ***মঠ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***মঠিকা*** = ***মঠি*** *করে যে, তাহার আধার।* ***মঠী*** = ***মঠি****র আধার।* ***মাঠ*** = ***মঠ*** *হইতে জাত।* ***মাঠর*** = ***মাঠ*** *রহে যাহাতে।* / **মাঠর** = সূর্য্য সমীপে বাস করেন যিনি। (ব.শ.)। **৩. মঠ** = বেদপাঠক ছাত্রের বাসগৃহ, পরিব্রাজকাদির বাসগৃহ, বিহার, আশ্রম, আশ্রমকুটির, দেবকুল, মন্দির, পাঠশালা, বিদ্যালয়। **মঠি** = ক্ষুদ্র মঠ বা মন্দির। **মঠিকা, মঠী** = কুটীর, আশ্রম, বিহার। **মাঠর** = সূর্য্যপার্ষদবিশেষ, বিপ্র। (ব.শ.)। **৪. মঠ** ও **মাঠ** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. মঠ** শব্দের ব.শ.-প্রদত্ত উপরোক্ত অর্থ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন বেদপাঠকদের বাসগৃহ থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সর্ব প্রকারের

অধ্যয়নকেন্দ্রকে **মঠ** বলা হত। তবে স্বাধীনোত্তর কালে আর কোনো বিদ্যাকেন্দ্রকে নতুন করে **মঠ** নাম দেওয়া হয় না। একালে প্রায় সবই ইংরেজি নাম, এমনকি বাংলা 'ইস্কুলের'ও — ইনস্টিটিউশন, অ্যাকাডেমি, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ... ইত্যাদি। এভাবে ইংরেজির হ্যাট-কোট আমরা বাংলার শরীরে চড়িয়ে নিয়েছি। এমন করে তথাকথিত শিক্ষিতের দুনিয়াটাও যে অন্যের গায়ের ছালচামড়া নিজের গায়ে সাঁটিয়ে নিতে পারে এবং তার জন্য লজ্জিত না হয়ে গর্বিত হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন হত। ...

যে স্থানে জ্ঞানের সীমায়িত রূপ বা **দক্ষজ্ঞান**-এর (**কর্ম্মযজ্ঞ** থেকে উঠে আসা বা **মট** করে আসা প্রবাহবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-এর) টঙ্কারস্থিতি বিরাজ করে, সেই স্থানকে **মঠ** বলে। তার মানে, মানব-সভ্যতার অর্জিত যে সকল চাষাবাদ-কারুকর্ম-শিল্পকলা-রীতিনীতি-ধর্মাদি বিষয়ক জ্ঞান রয়েছে, সেগুলির চর্চা হয় যেখানে, তাকে বলা হত **মঠ**। সে **মঠ** থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রযুক্ত হত যে ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় **মাঠ**। এটি মনোভূমি ও বাহ্যভূমি উভয়কেই বোঝায়। কখনো-বা **মঠ**-এর সংলগ্ন যে বিশাল প্রান্তর, সেখানেই হত **মঠ** থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োগ। সেই কারণে তাকেও বলা হত **মাঠ**। মোট কথা, চাষাবাদের বিদ্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রকে বা শস্যক্ষেত্রকে বলা হত **মাঠ**। বলতে কি, আবাদ করাকেই বলা হত '**মাঠ**-করা', তা সে 'মানবজমিনে' করা হোক আর বাহ্য জমিতেই করা হোক। পরে পরে শব্দটির প্রয়োগের এলাকার আরও ব্যাপ্তি ঘটে। যে কোনো খোলা প্রান্তরকেই **মাঠ** বলার চল হয়ে যায়, এমনকি তেপান্তরের **মাঠ**কেও; যার সঙ্গে **মঠ**-এর কোনো সম্পর্কই নেই। এখন খেলার **মাঠ**ও **মাঠ**, গড়ের **মাঠ**ও **মাঠ**, যে '**মাঠে**-ঘাটে' লোকে ঘুরে বেড়ায়, সে **মাঠ**ও **মাঠ**। এমনকি অদৃশ্য যে **মাঠে** রাজনৈতিক নেতারা লড়াই করেন, **মেঠো**-বক্তৃতায় কানে তালা লাগিয়ে দেন, কিংবা হেরে গিয়ে **মাঠ** ছেড়ে চলে যান, সে সামাজিক মনোভূমি বা সমাজমনের **মাঠ**ও **মাঠ**ই বটে। ...

মিট (মিটন, মিটমাট, মিটমিট, মিটমিটে, মিটা, মিটান, মিটিমিটি, মিটিরমিটির) : ২. মিট = *গতিশীল সীমায়ন টঙ্কারিত যাহাতে।* ***মিটন*** = ***মিট*** *অন (on) যাহাতে।* ***মিটমাট*** = ***মিট*** *ও* ***মাট*** *(****মট*** *হইতে জাত)।* ***মিটমিট*** = ***মিট****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***মিটমিটে*** = ***মিটমিট*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***মিটা*** = ***মিট****-এর আধার যে।* ***মিটান*** = ***মিটা*** *অন (on) যাহাতে।* ***মিটিমিটি*** = ***মিটি*** *(****মিট*** *গতিশীল যাহাতে) পুনরাবৃত্ত যাহাতে।* ***মিটিরমিটির*** = ***মিটির*** *(****মিটি*** *রহে যাহাতে) পুনরাবৃত্ত যাহাতে।* / **মিটমিটে** = যাহা মিটমিট করিয়া জ্বলে। (ব.শ.)। **৩. মিট, মিটা** = লুপ্ত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, নিষ্পন্ন হওয়া, শান্ত বা তৃপ্ত হওয়া, চরিতার্থ বা পূর্ণ হওয়া, অবসান হওয়া, চুকিয়া যাওয়া, মিলিত হওয়া; দূর করা, উপশমিত করা। **মিটন** = বিলোপন, লুপ্ত করা। **মিটমাট** = বিবাদের অপনয়ন, বিবাদনিষ্পত্তি বা মীমাংসা। **মিটমিট, মিটিমিটি** = চক্ষুর ঈষৎ উন্মীলননিমীলন-ভাব, জ্যোতিষ্কের বা দীপালোকের মৃদুভাব। **মিটমিটে** = ক্ষীণালোকবিশিষ্ট, মৃদু, বাহিরে মৃদু অর্থাৎ ভালমানুষ কিন্তু ভিতরে খল। **মিটান** = মিটা। **মিটিরমিটির** = ঈষৎ উন্মীলিত-নিমীলিত ভাবে। (ব.শ.)। **৪. সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। ৫.** দ্র. **টিমটিম। (১ম খণ্ড।) ক্ষীণালোক-দীপ** জ্বলছে নিভছে। কিন্তু সেটি চোখে পড়ছে কীভাবে? যদি আগে জ্বলা চোখে পড়ে, নেভা পরে চোখে পড়ে, তবে সেটি **টিমটিম** করছে; আর উলটো হলে সেটি **মিটমিট** করছে। তাহলে **মিট** হল 'নিভে যাওয়া'র চোখে পড়া। তার মানে, কোনো সত্তা যদি সংকুচিত বা সীমায়িত হতে থাকে, আর তা যদি কারও চোখে পড়ে যায় বা অন্য কোনোভাবে টঙ্কারিত হয়, তাকে বলে **মিট**-করা।

(সেই সুবাদে ইংরেজি meet করা কথাটির মানে হল, ঘরের লোক **মট** করে ভেঙে বা প্রবাহবিচ্ছিন্ন হয়ে মূল সত্তার এলাকার বাইরে চলে গিয়েছিল, সে **মিট** করছে বা ফিরে এসে মিলিত হচ্ছে তার উৎসস্থলে। আবার, আদি যৌথসমাজ যাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, খাদ্যাদি থেকে বঞ্চিত করেছিল, তারা যা দিয়ে তাদের সেই কেড়ে নেওয়া খাদ্যাদির অভাব **মিটায়**, সেও meat পদবাচ্য হয়ে যায়।)

যাই হোক, যতক্ষণ **মিটমিট** করছে (দ্র. **টিমটিম**), ততক্ষণ মাঝে মাঝে জ্বললেও মাঝে মাঝে নিভছে — একটানা জ্বলছে না, একটানা নিভছেও না। কিন্তু '**মিটে** গেল' মানেই জ্বলন্ত সত্তাটি নিভে গেল, সক্রিয় সত্তাটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। সেকারণেই দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্বলন্ত সক্রিয় সত্তাগুলি একসময় নিভে যায়, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, **মিটে** যায় — বিবাদ মেটে, কাজ মেটে, তৃষ্ণা মেটে, আশা ভরসা কামনা বাসনা ইচ্ছা ... প্রভৃতি অদৃশ্য জ্বলন্ত সক্রিয় সত্তাগুলিও কখনো কখনো মিটে যায়। না-**মিটলে মিটিমিটি** করে, **মিটিরমিটির** করে। দ্র. **খিটিরমিটির**। আর, পুরোপুরি **মিটে** গেলে হয়ে গেল **মিটমাট**। দ্র. **মাট**। ৬. ইংরেজি meet, meat, mete ... ইত্যাদি।

মোটক (মোট, মোটকথা, মোটন — মুটকলম) : ১. ✓মুট্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে + ক (স্বার্থে)। (ব.শ.)। **২.** ***মোট*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়নের সার্ব্বিক টঙ্কার যাহাতে।* ***মোটক*** = ***মোট*** *করে যে।* ***মোটকথা*** = ***মোট*** *কৃত যে কথা।* ***মোটন*** = ***মোট*** *অন যাহাতে।* ***মুটকলম*** = *মুষ্টিতে ধরা থাকে যে কলম।* **৩. মোট** = বস্তা ইত্যাদিতে বদ্ধ দ্রব্যসমূহ, ভার, বোঝা, কূপ হইতে জল তোলার চর্ম্মপুটবিশেষ। **মোটক** = পিতৃদানার্থ দ্বিগুণভুগ্ন কুশত্রয়, মোটুক, মোড়া। **মোটকথা** = সকল বিষয়ের সমষ্টিভূত সারকথা। **মোটন** = প্রমর্দ্দক, নিষ্পেষক, বায়ু, প্রমর্দ্দন, সঞ্চূর্ণন, নিষ্পেষণ, আক্ষেপ, ভঙ্গ, মোড়ন। **মুটকলম** = মুটা করিয়া ধৃত কলম। (ব.শ.)। **৪. মোট ও মোটকথা** যথার্থে প্রচলিত। বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** সত্তা মাত্রেই প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনো দৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, কিংবা জাগতিক প্রবাহের মধ্যে থাকে। যে সত্তা **মট** করে ভেঙে সেই প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেটিই **মাট**। ধরা যাক, সেটি একটি গাছের ডাল, যা **মট** করে ভেঙে আপনার হাতে এসে গেছে। এরকম ১০/২০টি **মাট** যদি একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেটি হয়ে যায় **মুট**। কেননা, তখন **মট** বা 'সীমায়নের টঙ্কার' **মুট**-এ বা 'নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়নের টঙ্কারে' পরিণত হয়। **মুটকলম**-এ এই মুটকে বা 'মুষ্টি'কে আমরা সরাসরি দেখতে পাই। এই যে পাঁচটি **মট** কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গুটিয়ে এল, একেই বলে **মুট**। আর

তার ফলে **মুটসমূহের** যে একত্রিত করণ ঘটছে, তাকেই বলে **মোট**। তবে **মোট** শব্দটি এখানেই স্থির থাকে না। অতঃপর যে কোনো সত্তার অনেকগুলিকে একত্রিত করা হলেই তাকে **মোট** শব্দে চিহ্নিত করার প্রথা প্রচলিত হয়ে যায়। ৬. ইংরেজি moot।

মোটমাট : ২. ***মোট (মুট-সমূহের একত্রিত করণ যাহাতে) ও মাট (মট হইতে জাত যে)।*** ৩. ভার-বোঝা, ছোট-বড় মোট, সর্ব্বসমেত, সবসুদ্ধ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. একালের অভিধানে এই **মাট** শব্দটিকে অর্থহীন 'অনুশব্দ' বলা হয়ে থাকে। এর আগে **আশেপাশে** ... প্রভৃতি যোড়শব্দে আমরা দেখেছি, 'অনুশব্দ'-এর ধারণাটি শুধুমাত্র অর্থহীন 'জল-টল', 'ভাত-টাত', 'মাছ-টাছ' ... প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে খাটে, যেখানে দ্বিতীয় শব্দটির কোনো অর্থ হয় না, সে কেবল আগের শব্দটির **অনু**সরণ করে। কিন্তু **আশেপাশে, আধিব্যাধি, বাসনকোশন, যত্নআত্তি** ... প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে ঐ 'অনুশব্দ'-এর তত্ত্ব খাটে না। কেননা, এইসব **যোড়শব্দের** ক্ষেত্রে শব্দের দ্বিতীয় অংশটিরও সুস্পষ্ট এবং পরিপূরক অর্থ থাকে। এইরকম **যোড়শব্দ** আরও অন্ততপক্ষে দু'রকমের হয়। যথা — **কেশাকেশি, কচাকচি** ... ইত্যাদি (দ্র. ১ম খণ্ড); আর **মিটমাট, মোটমাট**, কাটকুট, খুটখাট, চুপচাপ, ঝুপঝাপ, টুপটাপ, ঠিকঠাক, তুকতাক, ধুমধাম, ভুটভাট, **মিটমাট, মোটমাট** ... ইত্যাদি। এর মধ্যে **মোট** শব্দটির অর্থ উপরে ব্যাখ্যাত হয়েছে। **মাট** শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে **মট** ও **মিটমাট** শব্দের ব্যাখ্যায়।

অতএব **যোড়শব্দ** প্রধানত চার প্রকার। ক) পরিপূরক **যোড়শব্দ**, যথা — **আশেপাশে, আধিব্যাধি, বাসনকোশন, যত্নআত্তি** ... ইত্যাদি; খ) পুরুষ-প্রকৃতিরূপী **যোড়শব্দ**, যথা — **কেশাকেশি, কচাকচি, হাতাহাতি, মাতামাতি, ধরাধরি** ... ইত্যাদি; গ) সহোদর **যোড়শব্দ — কাটকুট, ঘোঁতঘাত, চুপচাপ, ধুমধাম, ধুপধাপ, মিটমাট, মোটমাট** ... ইত্যাদি (এই শব্দগুলি সহোদর ভাইয়ের মতো মূলত একই ক্রিয়া থেকে জন্মায়); ঘ) অনুকারী **যোড়শব্দ**, যথা — **জল-টল, ভাত-টাত, বাস-টাস** ... ইত্যাদি (এই শব্দগুলির দ্বিতীয় অংশটির কাজ হল প্রথম অংশটির আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকে বোঝানো। যেমন জল-টল মানে জল ইত্যাদি, ভাত-টাত মানে ভাত ইত্যাদি।)। দ্র. **যোড়শব্দ**।

মোটা (মোটাই, মোটান) : ২. ***মোটা** = **মোট**-এর আধার যে। **মোটাই** = **মোটা** গতিশীল যাহাতে। **মোটান** = **মোটা** অন (on) যাহাতে।* / **মোটা** = যাহা মিহি নয়; যাহা জিল নয়। (ব.শ.)। ৩. স্থূল, মাংসল, পুরু, পুরু কাপড়ে প্রস্তুত, জড় (বুদ্ধি), ভোঁতা, অনেক, স্থূলাগ্র, সাধারণ অপেক্ষা অধিক (বিপরীত শব্দ — শীর্ণ, সরু, পাতলা)। **মোটাই** = স্থূলত্ব, ঘনত্ব। **মোটান** = মোটা। (ব.শ.)। ৪. তিনটি শব্দই যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মেদ, মেধ**। এখানে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মোটামুটি : ২. ***মোটা ও মুটি (মুট গতিশীল যাহাতে)।*** ৩. স্থূল, সংক্ষিপ্ত (বিবরণ), সাধারণের যোগ্য, স্থূলভাবে, সংক্ষেপে, স্থূল হিসাবে (roughly), সাধারণভাব। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. যা কিছু ইতোমধ্যে **মোট**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সেগুলিই তো **মোটা**। তার সঙ্গে সেগুলিও ধরে নেওয়া চাই, যেগুলি এখনও **মোট**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু হবো-হবো করছে, **মুটি** রূপে **মোটার** অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এগোচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, 'বাগানে **মোট** কতগুলি গোলাপ ফুটেছে?' হয়তো সম্পূর্ণ ফুটে গেছে ২০ টি, তখনও ফুটছে আরও ১০ টি, কুঁড়ি থেকে সবে মুখ ফুটেছে আর ৫টির, কুঁড়ি রূপেই রয়েছে আরও ১৫টি। এমতাবস্থায় উত্তর হতে পারে '**মোটামুটি** ৩০টি গোলাপ ফুটেছে', কিংবা '**মোটামুটি** ৩৫টি গোলাপ ফুটেছে'। তার মানে, **মোটামুটির** ক্ষেত্রে যিনি হিসেব করছেন, তাঁর বিচারের উপর **মোটামুটির** পরিমাণ নির্ভর করে; কোন পর্যায় থেকে সম্ভাবনার সূত্রগুলি (দ্র. **ম**) ছিন্ন করা হবে, সেটি তিনিই ঠিক করেন। ...

মোটাসোটা : ৩. স্থূলকায়, হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এটিও **আশেপাশে** শব্দের মতো একটি পরিপূরক **যোড়শব্দ**। তবে এর ব্যবহার দেখা যায় **লাঠিসোটা, আশাসোটা** প্রভৃতি শব্দেও। আগের কালে এধরনের শব্দগুলি চন্দ্রবিন্দু সহযোগে উচ্চারিত হত — **মোটাসোঁটা, লাঠিসোঁটা, আশাসোঁটা**; এখন চন্দ্রবিন্দু উচ্চারিত হয় না। **সোঁটা** বা **সোটা** যে বিশেষ ধরনের ছড়িকে বোঝায় তা অনেকেই জানেন। গ্রামবাংলায় একে 'কোঁৎকা', 'হালছড়ি', 'পাঁচনবাড়ি' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এটি সাধারণত হাত দুয়েক লম্বা হয় এবং এক-দেড় ইঞ্চির বেশি মোটা হয় না। পুলিশের হাতে এই **সোটা** থাকে। কেউ কেউ একে বলে 'রুল-ডাং'। এর প্রকৃত অর্থ হল 'সুষ্ট' (দুষ্ট শব্দের বিপরীত শব্দ, যদিও এই শব্দটির প্রচলন দেখা যায় না, দেখা যায় 'সুষ্ঠ' বা 'সুষ্ঠু', এবং 'সুস্থ'-এর।)। এটি অনেকটা **পুষ্ট** শব্দের মতো। দ্র. **হৃষ্টপুষ্ট**। **মোটা** হল স্থূল, আর **সোটা** হল 'সুস্থিত ও পুষ্টিত'। অতএব **মোটাসোটা** কথাটির মানে হল, এই **মোটা** শুধুমাত্র ফুলে ফোঁপা স্থূল হ'য়ে নাই, ভেতরে যথেষ্ট 'সুষ্ট'ও বটে। কথাটি **লাঠিসোটার** ক্ষেত্রে কথাটি এই দাঁড়ায় যে, লাঠি এবং **সোটা**; তার মানে, অনেকগুলি লাঠি একত্রে আছে, যাদের কয়েকটি লম্বা লাঠি এবং কয়েকটি ছোট **সোটা**। তবে **আশাসোটা** একেবারেই আলাদা। এটি একটি **সোটাই** বটে, তবে যে সে **সোটা** নয়, **অশ**-করণকারী বা রাজনির্দেশ ব্যাপনকারী দণ্ড বা ডাণ্ডা। গাঁয়ের মোড়লচাষী 'হালছড়ি' হাতে নিয়ে সেটি নাড়িয়ে তাঁর মুনিষদের হুকুম করেন — এটা কর, ওটা কর ... ইত্যাদি। সেই 'হালছড়ি'র বা **সোটারই** পরিশীলিত রাজকীয় অভিজাত রূপ হল রাজনির্দেশ ঘোষণাকারী **আশাসোটা**।

মণ্ (মণ্ড্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কেলিমণ্ডপ, খগমণি, গর্ভমণ্ডপ, গোকুলমণি, চন্দ্রমণ্ডল, নীলমণি, মণ্ডিত, মণ্, মণি, মণিকণ্ঠ, মণিক, মণিকর্ণিকা, মণিকর্ণী, মণিকা, মণিকাঞ্চনযোগ, মণিকার, মণিকারক, মণিকৃৎ, মণিকোটা(ঠা), মণিখনি, মণিগোঁসাই, মণিত, মণিদীপ, মণিদ্বীপ, মণিধনুঃ, মণিপুর, মণিপুষ্পক, মণিবন্ধ, মণিবন্ধন, মণিবেণে, মণিবেদী, মণিভদ্র, মণিভূ, মণিমঞ্জরী, মণিমঞ্জীর, মণিমর্ণিকা, মণিমন্তর, মণিমন্ত্র, মণিমন্দির, মণিমালা, মণিমেখলা, মণিযষ্টি, মণিয়া, মণিরাগ, মণিরাজ, মণিশৈল, মণিসর,

মণিস্তম্ভ, মণিহার, মণিহারা, মণিহারি(রী), মণ্ড, মণ্ড, মণ্ডক, মণ্ডন, মণ্ডনপ্রিয়, মণ্ডনবিধি, মণ্ডপ, মণ্ডপক, মণ্ডপপ্রতিষ্ঠা, মণ্ডপিকা, মণ্ডব, মণ্ডবস্ত্র, মণ্ডল, মণ্ডলকার্ম্মুক, মণ্ডলচিহ্ন, মণ্ডলনাভি, মণ্ডলনৃত্য, মণ্ডলন্যাস, মণ্ডলবন্ধ, মণ্ডলভাগ, মণ্ডলবর্ত্তী, মণ্ডলবর্ষ, মণ্ডলশঃ, মণ্ডলাকার, মণ্ডলাগ্র, মণ্ডলাধিপ, মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলাবৃত্তি, মণ্ডলিত, মণ্ডলি(লী)য়া, মণ্ডলী, মণ্ডলীকৃত, মণ্ডলে, মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডা, মণ্ডিত, মণ্ডুক, মণ্ডূক, মণ্ডুকগতি, মণ্ডূকপর্ণী, মণ্ডূকপ্লুত, মণ্ডূকপ্লুতি, মণ্ডূকী, মণ্ডুর, মণ্ডোদক, মাড়, মাড়লি(লী), মাড়া (মর্দ্দন করা), মাড়ুয়া (মাড়োয়া), মাড়ুয়াবাদী, মাড়োয়া, মাড়োয়ার, মাড়োয়ারী, মাণ, মাণ(ন)ক, মাণব, মাণবক, মাণবিকা, মাণবীন, মাণব্য, মাণিক, মাণিকজোড় (মাণিকযোড়), মাণিকনয়ন, মাণিকপীর, মাণিকভাণ্ডার, মাণিকা, মাণিক্য, মাণিক্যা, মাণিমন্থ, মাণ্ডবী, মাণ্ডব্য, মাণ্ডলিক, মাণ্ডুয়া, মাণ্ডূক, মাণ্ডুকি(কী), মারোআ(য়া), মুনি, মুনিয়া, মেড়, মেড়মেড়ে, মেডাল, মেড়ুদাড়া, মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী, মেডেল, মেড়ো, মোণ্ডা, ম্যাড়ম্যাড়ে।

মণ্ (মণ্ড) = পরিমিত-করণ অন (on) (যাহাতে)। **মণ** = পরিমিত-করণ অন (on) যাহাতে। **মণ্ড** = **মণ্**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে। (যে সত্তার ভিতরে আত্মসংকোচন বা পরিমিত করার ক্রিয়াটি চলছে বা অন হয়ে রয়েছে, সেটিকে বলে **মণ্** করণ। এই **মণ্**-করণ বা আত্ম-সারাৎসার-করণ কিন্তু সে অন্যকে করছে না, নিজে করছে, নিজের উপরে বা ক্ষেত্রে করছে, অথবা অন্য কেউ এসে তাকে পরিমিত করছে; সে কিন্তু অন্য কাউকে পরিমিত করছে না। যদি করে তবে তাকে বলতে হবে **মন**। তার মানে, কোনো সত্তাকে সে স্বয়ং কিংবা অন্য কেউ যদি পরিমিত করতে থাকে, তবে সেই সত্তাকে বলে **মণ্**-করা। একবার সেটি করা হয়ে গেলে, সেটি হয়ে গেল **মণ**। সেকালে পরিমিত-করণের এরকম একটি প্রক্রিয়াকে নাম দেওয়া হয়েছিল **মণ**। পরে সেই **মণ** শব্দটি ওজনের বিশেষ পরিমাণ রূপে প্রতীকী অর্থে পরিণত হয়ে যায়।)

মণি : ১. ✓মণ্ + ই (ইন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মণ্** *(আত্ম-পরিমিতিকরণ বা সার-সংকোচন) গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৩. অশ্মজাতি, পদ্মরাগ মরকত আদি বহুমূল্য প্রস্তর, মুক্তা প্রবাল হীরক আদি, শিরোরত্ন, অয়স্কান্ত, চুম্বক, স্ফটিক, ভূষণমাত্র, সর্পশিরস্থ মণিবৎ উজ্জ্বল পদার্থবিশেষ, মণিবন্ধ, অলিঞ্জর, অজাগলস্তন, লিঙ্গাগ্র, যোনি-অগ্র (clitoris), শ্রেষ্ঠার্থ, চক্ষুর তারকা, শিশুর আদরের নাম, আদরসূচক। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. যে সত্তা তার নিজের শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্তসারে বা একেবারে মূলে সংকুচিত বা পরিমিত হয়ে গেছে, তাকে সেই সত্তার **মণি** বলে। যেমন **মাটি**র **মণি** হল পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি পাথর; যেমন জীবের **মণি** হল মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি। এসবই হল জাতিতে 'অশ্মজাতি' বা পাথুরে বাহ্য পদার্থ। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা **মণিরাজ** হল বৃক্ষের **মণি** বা 'হীরক' অর্থাৎ হীরে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আমাদের 'চ' গ্রন্থের ১ম প্রবন্ধের ১ম অধ্যায়ে *'হীরের টুকরো ছেলে'* ও *'হীরক চেনার উপায়'* ... ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।) আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা যেভাবেই হোক একথা বুঝে গিয়েছিলেন যে, এই সব 'সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংকুচিত' পাথুরে পদার্থগুলি নানা কারণে শ্রেষ্ঠ পদার্থ, মূল্যবান, রত্নস্বরূপ। ফলত, বহু শ্রেষ্ঠ পদার্থকে তাঁরা **মণি** নামে শনাক্ত করে যান, এমনকি চোখের **মণি** ও আদরের সন্তানকেও। সেই **মণি**সমূহের সমগ্র তালিকাটি উপরে **মণ্** ক্রিয়ামূলের বংশে যে সকল শব্দের জন্ম হয়েছে, তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। এদের অধিকাংশই এখন অপ্রচলিত। অথচ কী অর্থবান, মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শব্দ ছিল এগুলি! নিম্নে সেগুলির কয়েকটির বিষয়ে আমরা কথা বলব।

খগমণি : ২. *খগদিগের বা আকাশগামীদিগের মধ্যে **মণি** স্বরূপ বা শ্রেষ্ঠ।* ৩. খগশ্রেষ্ঠ, গরুড়। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখন যারা আকাশগামী, তা সে বাহ্য-আকাশ হোক আর চিদাকাশ, ঘটাকাশই হোক, সেই আকাশগামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বা যারা, তাদের এককথায় **খগমণি** বলা যেতেই পারে। কিন্তু এখন আমরা সেরকম বলি না। এখন আমরা তাদের (বাহ্যাকাশে) 'স্পেসক্র্যাফ্‌ট্', (চিদাকাশে) 'বেস্ট্ থিয়োরি', (ঘটাকাশে) 'সফ্‌ট্অয়ার' ... ইত্যাদি নানারকম ইংরেজি শব্দে শনাক্ত করে থাকি।

গোকুলমণি : ২. *গোকুলের **মণি** স্বরূপ যে।* ৪. এমনকি নামরূপেও শব্দটির প্রচলন এখন আর দেখা যায় না। অথচ এর চেয়ে ভাল নামই হয় না। ৫. এর চেয়ে অর্থবান শব্দ আর হয়ই না। যা কিছু চলমান, যায়, সেই **গো**-এর যে কুল, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা **মণি** যে, তাকে বলা হত **গোকুলমণি**। সন্দেহ নেই, এই গৌরবের অধিকারী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। একালে যে **গামী** সর্বশ্রেষ্ঠ তাকেও আমরা **গোকুলমণি** বলে শনাক্ত করতে পারতাম।

নীলমণি : ৩. নীলনামক মণি, ইন্দ্রনীল, শ্রীকৃষ্ণ (সবে ধন নীলমণি — সর্ব্বস্বভূত গোপাল; গৌণার্থে একমাত্র আদরের ধন।)। ৪. প্রবচন রূপে 'সবে ধন নীলমণি' আজও কমবেশি প্রচলিত; যদিও তার অর্থ দাঁড়িয়েছে 'একমাত্র ধন' রূপে। আর নামরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রিয় এই **নীলমণি** শব্দটিও এখন সেকেলে হয়ে গেছে। ৫. দ্র. **নীল, মণি**।

মণিকণ্ঠ : ২. ***মণি** কণ্ঠে যাহার।* ৩. চাষপক্ষী। চাতক, সোনাচড়া, নীলকণ্ঠ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব.শ. লিখেছেন 'চাষপক্ষী'ই **মণিকণ্ঠ**। তারপর 'চাষপক্ষী'র মানে দিয়েছেন 'চাতক, সোনাচড়া, নীলকণ্ঠ'। 'ময়ূর'কেও নীলকণ্ঠ বলা হত। অন্যত্র চড়া বা চটক পাখিকে 'কলবিঙ্ক', ও 'শ্যামাপাখি'ও বলা হয়েছে। চটক কিন্তু আমাদের চেনাজানা চড়াইও বটে। আর শ্যামাপাখিকে গ্রামবাংলায় এখনও খুবই দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হল, **মণিকণ্ঠ** বলতে যে 'চাষপক্ষী'কে বোঝায়, সেটি আসলে কে? উপরোক্ত পাখিগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক বা সাদৃশ্য কোথায়?

আমাদের ধারণা, প্রকৃতপক্ষে সমাজের যে সত্তাটি মানুষের মনোভূমিতে ও বাহ্যভূমিতে উৎপাদিত মানসফসল ও বাহ্যফসলের শ্রেষ্ঠগুণ বিষয়ে কথা বলে, তাকে **মণিকণ্ঠ** বলে। একালের ভাষায় তাকে বলা হয় 'কনজিউমার'। সাদৃশ্যে তাকে চাষপক্ষী, চাতক, চটক, সোনাচড়া, চড়াই, নীলকণ্ঠ, ময়ূর, শ্যামা ... এদের প্রত্যেককেই বোঝানো যেতে পারে।

মণিকোঠা : ২. ***মণি**র ন্যায় সর্ব্বোচ্চ (সর্বশ্রেষ্ঠ) কোঠা।* ৩.

মণিমণ্ডিত অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য, জগন্নাথের মন্দির। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দোতলা তিনতলা পাকাবাড়িতে সর্বোচ্চ তলের উপরে সিঁড়িঘর বা তৎসংলগ্ন এককামরা ঘর থাকে। সেই ঘর থেকে সর্বত্র নজরদারি করা যায়। এটিকে **চিলেকোঠা** বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় ছাদের এই ঘরটিই সবচেয়ে আরামদায়ক বা আনন্দদায়ক ঘর হয়। ধ্যানী মানুষের মনের প্রাসাদের উপরে এইরূপ যে **মণিকোঠা** থাকে, কখনো-সখনো সেই কোঠাতেই **অরূপরতন** এসে বসেন। ধ্যানী মানুষটি তখন ঝকমক করতে থাকেন, তাঁর শরীর থেকে তখন মানস-ঐশ্বর্যের ঝিলিক বেরোতে থাকে। এই হল মানুষের মনের **মণিকোঠা**। সাদৃশ্যে যে কোনো বাহ্যিক প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ কামরাটিকেও **মণিকোঠা** বলা হয়ে থাকে।

মণিদ্বীপ : ২. *মণির ন্যায় দ্বীপ যে।* ৩. সুধাসিন্ধুস্থ মণিমণ্ডিত কল্পিত দ্বীপবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. জ্ঞানসুধাই যে শ্রেষ্ঠ সুধা তা নিয়ে সংশয় নেই। সেই সুধার যে সমুদ্র, তার যে শ্রেষ্ঠ সারাৎসার, তাকে বলে **মণিদ্বীপ**। 'মহাভারত' রচয়িতা কাশীরাম দাশ-এর মতো তাঁর গ্রন্থটি 'সুধা হইতে সুধা'; অর্থাৎ সুধার সারাৎসার বা **মণিদ্বীপ**। একালে তেমন যে গ্রন্থটি আমাদের চোখে পড়েছে, সেটি হল রবীন্দ্ররচনাবলী। তাতে জ্ঞানসুধার সারাৎসার বা **মণিদ্বীপ**কে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

মণ্ড (মণ্ডক, মণ্ডন, মণ্ডা, মণ্ডিত) : ১. ✓মণ্ড্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মণ্ড** = *মণ্-এর (সত্তার সারাৎসারকরণের) উড্ডয়ন বা গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **মণ্ডক** = **মণ্ড** *করে যে বা কৃত যাহাতে।* **মণ্ডন** = **মণ্ড** *অন (on) যাহাতে।* **মণ্ডা** = **মণ্ড**-*এর আধার যে।* **মণ্ডিত** = **মণ্ড** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ৩. **মণ্ড** = ভূষয়িতা, ভূষা, এরণ্ড বৃক্ষ, পঞ্চাঙ্গুল শাকবিশেষ, মণ্ডুক, পাঁচ মাষা পরিমাণ, সর্ব্বরসের অগ্ররস, সিদ্ধ তণ্ডুলের অগ্ররস, ফেন, মাড়, দধ্যাদির অগ্ররস, যবাগু, ঘৃতোপরি বিদ্যমান সার, মুণ্ড, মুস্তক, পুচ্ছ, সুরাসারাংশ; ভূষিত করা। **মণ্ডক** = গোধূমপিষ্টকবিশেষ, গীতাঙ্গবিশেষ। **মণ্ডন** = ভূষয়িতা, অলঙ্করণশীল, প্রসিদ্ধ মীমাংসা-পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র, ভূষণ, অলঙ্কার, অলঙ্করণ। **মণ্ডা** = স্ত্রী আমলকী, চিনির রসে পাক-করা ছানার মিষ্টান্নবিশেষ। **মণ্ডিত** = অলঙ্কৃত, ভূষিত, শোভিত, বেষ্টিত। (ব.শ.)। ৪. **মণ্ডক** অপ্রচলিত। বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. যে কোনো সত্তার সারাংশ, যা কিনা সত্তাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে সত্তাটির উপরে তার ভূষণ বা ঢাকনার মতো অবস্থান করছে, তা সে ভাতের মাড়, দুধের সর, দধির মাথ, ঘিয়ের সার, সুরার সার, ধনসম্পদের সার, জ্ঞানসম্পদের সার, মানবসম্পদের সার (সমাজের সেরা মানুষ বা মানুষগুলি) ... ইত্যাদি যে কোনো পদার্থের সারাংশ হতে পারে। স্বভাবতই **মণ্ডন**-এর বেলায় **মণ্ড**-এর ভিতরে একপ্রকার গোলাকার-পিণ্ড হওয়ার ভাব, একপ্রকার আ**বর্ত্তন** থাকে। যে কারণে **মণ্ডা** নামক মিঠাইটি গোল হয়ে থাকে। এই **মণ্ড** ঢাকনার মতো সত্তার উপরে অবস্থান করে বলে একে 'ভূষণ'ও বলা হয়ে থাকে। যে কারণে **মণ্ডিত** মানেই 'ভূষিত'। তবে এই শব্দের সর্বাধিক প্রয়োগ হয় **মণ্ডপ, মণ্ডল** ইত্যাদি শব্দে।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'অদৃশ্য কিন্তু সমাজে, বিশ্বে সক্রিয়' সত্তাদের বোঝাতেই শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন, করতেন। সেরকম সত্তা হল জ্ঞানসম্পদের সার, মানবসম্পদের সার। এমনকি আমাদের সুকুমার রায় ও তাঁর সঙ্গীসাথীরাও সেটাই করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের গোষ্ঠীটির নাম দিয়েছিলেন **মণ্ডা-সম্মিলন** এবং তার ইংরেজি রূপান্তর করেছিলেন Monday Club। আর, সেই সম্মিলনটিই ছিল সেকালের কলকাতার বাংলাভাষীদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সম্মিলন। সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের নামের তালিকাটি দেখলেই এ সত্য মালুম হবে।

মণ্ডপ (কেলিমণ্ডপ, গর্ভমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ, বিবাহমণ্ডপ, লতামণ্ডপ, সভামণ্ডপ) : ১. মণ্ড + ✓পা + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। ২. **মণ্ডপ** = **মণ্ড** *পালন করে যে, বা পালিত যেখানে বা যাহাতে।* / **মণ্ডপ** = মণ্ড (ভূষা) রক্ষা করে যে; মণ্ড পান করে যে (মণ্ডপায়ী); ফেন পান করে যে (ফেনপ)। (ব.শ.)। ৩. **মণ্ডপ** = অতিথি আদি নিমিত্ত গৃহ, গৃহ, উৎসবার্থ রচিত গৃহ, কুঞ্জ, দেবাদির উদ্দেশে প্রদত্ত গৃহ, মন্দির। **চণ্ডীমণ্ডপ** = চণ্ডীর গৃহ, দুর্গাদি প্রতিমার পূজার্থ গৃহ, (গৌণার্থে) বাহিরের ঘর। **লতামণ্ডপ** = লতাগৃহ, নিকুঞ্জ। **সভামণ্ডপ** = সভাগৃহ। (ব.শ.)। ৪. **মণ্ডপ, বিবাহমণ্ডপ, সভামণ্ডপ** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. প্রকৃতপক্ষে যেটি বাসগৃহ নয়, সাময়িকভাবে রচিত গৃহেরই উপজাত বা **বর্দ্ধিত** অংশ, যেখানে ব্যক্তির, পরিবারের, গোষ্ঠীর, সমাজের **মণ্ড** পালিত হয়, সেই স্থানকে **মণ্ডপ** বলা হত। এককালে **অতিথি** ছিলেন সমাজের **ভূষ**-রক্ষক **মণ্ড**স্বরূপ, তখন তার জন্য রচিত গৃহকেও বলা হত **মণ্ডপ**; একালে তাকে Guest House বলে। সেকালে আরও বহু প্রকার **মণ্ডপ**-এর নাম দেখতে পাওয়া যায়, আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করলাম।

চণ্ডীমণ্ডপ শব্দটি একালে মন্দির, বাইরের ঘর ইত্যাদি অর্থে প্রতীকী হয়ে গেছে। কিন্তু আদিতে এটি ছিল গ্রামীণ বা আঞ্চলিক সমাজের বা গোষ্ঠীর বিদ্রোহীদের মিলনকেন্দ্র। দ্র. **চণ্ডী**। বঙ্গসমাজের বিশেষত্ব এই যে, পরবর্তীকালে সেই **চণ্ডীমণ্ডপ**ই সমাজের অন্যতম পরিচালনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও এই **চণ্ডীমণ্ডপ**-এর সামাজিক ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলার এই **চণ্ডীমণ্ডপ**গুলি দু'তিন খণ্ডে বিভাজিত হয়ে যায় এবং অন্তত একটি খণ্ড 'ক্লাব-ঘরে' রূপান্তরিত হয়ে যায়; অন্য খণ্ডগুলি বিলুপ্ত বা সমাজের ভিতরে লুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৭০ সালের পর সেই ক্লাবগুলি অধিকাংশই 'পার্টি-অফিসে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বর্তমানে সেই পার্টি-অফিসগুলিও লুপ্ত হতে বসেছে এবং বাংলার আঞ্চলিক শাসনের কেন্দ্র একপ্রকার শূন্যতায় ভুগছে। সেই শূন্যতা কে কীভাবে পূর্ণ করবে, এই মুহূর্তে আমরা তা জানি না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এজগতে শূন্যস্থানের শূন্য থাকার উপায় নাই। কেউ না কেউ সেখানে অধিষ্ঠিত হবেই।

লতামণ্ডপ শব্দটির অর্থ ছিল খুবই গভীর। দ্র. **নিকুঞ্জ**। তবে **বিবাহমণ্ডপ, সভামণ্ডপ** ... প্রভৃতি শব্দগুলি প্রতীকী হয়ে গিয়ে marriage-pandal, meeting-pandal শব্দের প্রতিশব্দে পরিণত

হয়েছে এবং এসব শব্দ থেকে **মণ্ডপ**-এর **মণ্ড**-পালনের গুণকথা পরিত্যক্ত হয়েছে।

মণ্ডল (মণ্ডলাকার, মণ্ডলাধিপ, মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলাবৃত্তি, মণ্ডলিয়া, মণ্ডলী, মণ্ডলীকৃত, মণ্ডলী-স্বত্ব, মোড়ল, মোড়লী) : ১. ✓মণ্ড্ + অল (কলচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মণ্ডল** = **মণ্ড** *(সারাৎসারের উড্ডয়ন বা গড়ান-উড়ান) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **মণ্ডলাকার** = **মণ্ডল**-*এর ন্যায় আকার যাহার।* **মণ্ডলাধিপ** = **মণ্ডল**-*এর অধিপতি যে।* **মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর** = **মণ্ডল**-*এর অধীশ, ঈশ, বা ঈশ্বর যিনি।* **মণ্ডলাবৃত্তি** = **মণ্ডল**-*এর ন্যায় আবর্ত্তন যাহার।* **মণ্ডলিয়া** = **মণ্ডল** *গতিশীল রূপে যায় যাহাতে।* **মণ্ডলী** = **মণ্ডল**-*এর গতিশীল আধার যে।* **মণ্ডলীকৃত** = *যাহাকে* **মণ্ডলী** *করা হইয়াছে।* **মণ্ডলী-স্বত্ব** = **মণ্ডলী** *করিবার স্বত্ব বা অধিকার থাকে যাহাতে।* **মোড়ল** = **মোড়** *(দ্র.* **মুণ্ড, মোড়**) *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **মোড়লী** = **মোড়ল**-*এর গতিশীল আধার যে।* / **মণ্ডল** = 'ভূষাকারক' অর্থাৎ, **ভূষা** করে যে। **মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর** = যিনি সার্ব্বভৌম নহেন, অর্থাৎ ভূমির একদেশের অধিপতি। **মোড়ল** = স্বজাতিচক্রের অধ্যক্ষ বা মুখপাত্র (যে)। (ব.শ.)। ৩. **মণ্ডল** = সর্পবিশেষ, কুক্কুর, দেহস্থ অষ্টবিধ সন্ধির একতম, চন্দ্রসূর্য্যশরীর, চন্দ্রসূর্য্যের উপরি রশ্মিমণ্ডল বা উৎপাতজাত রশ্মিমণ্ডল, বিম্ব, গোল, বৃত্তাকার বা বর্ত্তুলাকার বস্তুমাত্র, জ্যোতিষ্কের পরিক্রমণপথ, বৃত্তাকার রেখা, চক্রবাল, চক্র, মণ্ডলাকারে পরিণত সমূহমাত্র, বৃন্দ, গণ, দেশ, রাষ্ট্র, রাজ্যের চতুর্দ্দিকস্থ দেশসমূহ, দ্বাদশরাজক, ক্ষুদ্ররাজ্য, সর্পকুণ্ডলস্থান, গোলনখাঘাত, ধন্বীর পঞ্চবিধ অবস্থানের একতম, কুষ্ঠবিশেষ, আভিচারিক চিত্রবিশেষ, ঋগ্বেদের ঋগ্‌বিভাগবিশেষ, ব্যাঘ্রনখ-গন্ধদ্রব্য, গোলপট্টিকা (bandage), দেশের প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ, মোড়ল, বেষ্টন, স্থূল, ব্যুহবিশেষ। **মণ্ডলাকার** = গোলাকৃতি। **মণ্ডলাধিপ, মণ্ডলাধীশ** = রাজবিশেষ, মধ্যম। **মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর** = ক্ষুদ্ররাজ্যপতি। **মণ্ডলাবৃত্তি** = মণ্ডলাবর্ত্তন, ঘূর্ণন। **মণ্ডলিয়া (মণ্ডলীয়া)** = মণ্ডলের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল। **মণ্ডলী** = বিম্ব, বৃত্তাকৃতি, সমূহ, গণ, দুর্ব্বা, গুড়ুচী, বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ, বৃত্তাকৃতি রেখা, বৃত্তাকার পঙ্‌ক্তি; মণ্ডলবান, বৃত্ত, আবর্ত্তযুক্ত, ঘূর্ণী, চক্রচিহ্নযুক্ত, সর্প, গোনাশ সর্প, কুক্কুর, বিড়াল, সূর্য্য, দেশাধিপতি, প্রধান, মোড়ল। **মণ্ডলীকৃত** = বক্রীকৃত, সমাকৃষ্ট। **মোড়ল** = মণ্ডলের অধিপতি, গ্রামমুখ্য, গ্রামণী, (মোড়ল জমিদারের প্রতিনিধিবিশেষ। জমি বিলি, খাজনা আদায় করা মোড়লের কার্য্য ছিল; এখন এরূপ মোড়লী নাই।) উপাধিবিশেষ, দলপতি, প্রধান। **মোড়লী** = মোড়লের কাজ, কর্ত্তৃত্ব, মোড়লের পদ। (ব.শ.)। **মণ্ডলী-স্বত্ব** = কোনো গ্রামের জমি বিলি ও খাজনা আদায়ের দায়িত্বে যিনি থাকতেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরও দেখা যায়, তিনি সেই গ্রামের খাজনাদি আদায় ক'রে তার থেকে নিজের পাওনা রেখে বাকি টাকা জমিদারকে বা সরকারকে জমা দিচ্ছেন। তাঁর এই অধিকারকে বলা হত **মণ্ডলী-স্বত্ব**। সম্ভবত মোগলযুগের আগে থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম পাঁচগ্রামী, দশগ্রামী **মণ্ডলী**-স্বত্বাধিকারীই কার্যত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে সক্রিয় ছিলেন। পশ্চিম মেদিনীপুরে **মণ্ডলীস্বত্ব** লোপের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারটি আমাদের জানা আছে এবং সেটি খুব সম্ভব ১৯৫৬ সালের আগে-পরে ঘটেছিল। যাঁদের ঐরূপ **মণ্ডলী-স্বত্ব** ছিল তাঁরাও রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। ৪. বর্তমানে **মণ্ডল** শব্দটি প্রধানত পদবী রূপে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ভূষা**। মনীষীগণ জানিয়েছেন যে, মানুষ এক শ্রেণীর ঝাঁক-জীব। সকল ঝাঁক-জীবের নিজ নিজ ঝাঁকের দলবদ্ধ থাকার বিশেষ বিশেষ রূপ হয়। মানুষের ঝাঁকেরও হয়। তার সেই রূপটিকে বলে **মণ্ডল**। জনগোষ্ঠীর জনসমূহ কোনো স্থানে গোল করে বসলে বা সক্রিয় হলে যে-যৌথ জনসত্তাটিকে দেখতে পাওয়া যায়, তাকে **মণ্ডল** বলে। তাতে জনসমূহের জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ ... ইত্যাদির সারাৎসার কেন্দ্রীভূত, রক্ষিত ও বিকশিত হয় ব'লেই তাকে **মণ্ডল** বলে। শব্দশাস্ত্রের নিয়মে সেই **মণ্ডল**-এর অধিপতিকেও **মণ্ডল** বলা হয়। সেই **মণ্ডল** শব্দের যে সকল উত্তরাধিকার আমাদের সমাজে আজও প্রবহমান রয়েছে, সেগুলিকে একত্রে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই উত্তরাধিকার সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, শুধুমাত্র **মণ্ডল** শব্দের ইতিহাস থেকেই গ্রামবাংলার বর্তমান রূপ থেকে তার আদি রূপ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ইতিহাসটাই পুনরুদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে আমাদের বলার কথা অনেক, কিন্তু সেসব কথা তো এখানেই বলা যাবে না। অগত্যা অতি সংক্ষেপে সেসব কথা সারতে হচ্ছে।

কার্যত **দক্ষযজ্ঞ**-এরও আগে **শিব**-পরিচালিত সনাতন যুগের **মহান**সমাজে আবির্ভূত **ভৃঙ্গী**রাই ছিলেন **মণ্ডল**-এর আদি রূপ। তাঁরাই সমাজ সদস্যদের দ্বারা **শিব**-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উৎপাদনের অংশ সংগ্রহ করে আনতেন। **দক্ষযজ্ঞ**-এর পর বৈদিক যুগের সূচনাকালে **শিব যতিধর্ম** গ্রহণ করায় এই **মণ্ডল**গণ তাঁদের সামাজিক অধিকার ত্যাগ করেন, যদিও তাঁদের **মণ্ডল** নামে ডাকার প্রথা কমবেশি অপরিবর্তিত থাকে। এঁদের উত্তরাধিকারীগণই আজও নিজ নিজ নামের শেষে **মণ্ডল** পদবী বহন করে থাকেন। এঁরা স্বভাবতই **শিবপন্থী** ছিলেন বলেই এঁরা যুগে যুগে **দক্ষ**-সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান ... ইত্যাদি নানা ধর্ম গ্রহণ করে নানা জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন, যদিও তা সত্ত্বেও তাঁদের পদবী বদলায়নি; যে কারণে প্রায় সর্বজাতির মধ্যেই **মণ্ডল শব্দটি পদবী**রূপে আজও দেখতে পাওয়া যায়। আর, আমাদের সমাজও যে তাঁদের আদি গৌরবকে আজও ভোলেনি, তার নিদর্শনও আচার বা প্রথার ধ্বংসাবশেষ রূপে আজও বর্তমান আছে। আমরা দুজন **মণ্ডল**-পদবীধারী এমন মুসলমান পরিবারকেও চিনি, যাঁর প্রতিবেশী হিন্দুরাও নিজের গোয়ালের গাই বিয়োলে তার প্রথম দুধ কিংবা মাচায় লাউ ফললে তার প্রথম লাউটি সেই **মণ্ডল**-বাড়িতে দিয়ে যান। এটি তাঁদের মতে ধর্মীয় প্রথা। **মণ্ডল**কে প্রথম দুধ ও প্রথম লাউ ('অগ্ররস' = **মণ্ড**) না দিলে সে-গাইয়ের দুধ খাওয়া বা সে-গাছের লাউ খাওয়া অসিদ্ধ, ধর্মবিরোধী। ...

কিন্তু **মণ্ডল** তো সমাজদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সমাজ-কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পদ। সেটি তো শূন্য থাকতে পারে না। ফলে নতুন বৈদিক সমাজের পরিচালক **দক্ষ** এই **মণ্ডল**কে যতই অপছন্দ করুক, জনসাধারণ তাঁদের সনাতন যুগ থেকে আগত অভ্যাস ত্যাগ

করতে পারেন না। কিন্তু **পৃথু**র বা রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর সমাজের **মণ্ডল** পদটি আগের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন আদি **মণ্ডল**দের একটি অংশ **কায়স্থ** হয়ে যান। তাঁদের **মণ্ডলী-স্বত্ব** বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ, মোগলযুগ, ব্রিটিশযুগ পেরিয়ে নানা রূপে রূপান্তরিত হতে হতে স্বাধীন-ভারতের যুগ (১৯৫৬ সাল) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ...

তবে **মণ্ডলে**রা বৌদ্ধযুগের **রামরাজত্বে**র গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন, হিন্দুযুগের সূচনাকালে এঁদের ঝাড়েবংশে শূদ্র, ম্লেচ্ছ, অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করা হয়। যে কারণে একালে আমরা অধিকাংশ **মণ্ডল**-পদবীধারী মানুষকেই নিম্নজাতি-ভুক্ত দেখতে পাই। কিন্তু এখন সবকিছু জানতে পারার পর আমরা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রাষ্ট্রের জন্মের আগে, এমনকি **অধিরাষ্ট্রে**রও জন্মের আগে, মানবসমাজের আদি পরিচালক শিবের সহযোগীরূপে সমাজের প্রথম প্রশাসকের আসনে বসেছিলেন এই **মণ্ডল**রাই। আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত সেই **মণ্ডল**দের ইতিহাস এতই গৌরবজনক যে, **মণ্ডল**-পদবীধারীদের আপন আপন পদবীর জন্য গর্ববোধ হওয়া উচিত। দ্র. **চণ্ডী**। **৬.** ইংরেজিতে Mandela শব্দটির প্রয়োগ হয় Nelson Mandela নামটি লিখতে। কলকাতার ইতিহাস-খোয়ানো এবং ইংরেজির পোঁ-ধরা বামপন্থীরা তাঁদের বিগত তিরিশ বছরের শাসনকালে তাঁদের তৈরি করা পার্ক, লাইব্রেরি ... ইত্যাদির কোনো কোনোটির নাম দিয়েছেন 'Mandela পার্ক' ... ইত্যাদি। তাঁরা জানেন না, এই **ম্যাণ্ডেলা** ও **মণ্ডল** একই সামাজিক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার থেকে এসেছে।

মাণব (মাণবক, মাণবিকা, মাণবীন, মাণব্য — বরাক) : ১. মনু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***মাণব** = **মাণ** (**মণ** হইতে জাত) বহন করে যে। **মাণবক** = **মাণব** করে যে বা কৃত যাহাতে। **মাণবিকা** = **মাণবক**-এর গতিশীল আধার যে। **মাণবীন** = **মাণব**-এর গতিশীল আধার অন্‌কৃত যাহাতে। **মাণব্য** = **মাণব** থাকে যাহাতে। **বরাক** = **বরণ**-এর আধারকরণ থাকে যাহাতে; অর্থাৎ যে **বরণ** না করিয়া কাউকে গ্রহণ করে না কিংবা **বরিত** না হইয়া কারও দ্বারা গৃহীত হয় না। /* **মাণব** = যে মনুষ্য বেদ অধ্যয়ন করে নাই ('অনধীতবেদ মনুষ্য')। **বরাক** = প্রার্থনাশীল যে। (ব.শ.)। **৩.** **মাণব** = মনুর অপত্য, মনুষ্য, মূঢ়, কুৎসিত অর্থাৎ বিহিতানুষ্ঠানহীন মনুষ্য, বালক, যোড়শষষ্টিক হার। **মাণবক** = অনুকম্পিত মাণব, পুরুষবরাক, কুপুরুষ, হ্রস্বমানব, বটু, বামন। **মাণবিকা** = বালিকা, কুমারী। **মাণবীন** = মাণবের হিতকর। **মাণব্য** = মানবসমূহ। **বরাক** = শোচনীয়, দুর্গত, দীন, অবর, নীচ, ক্ষুদ্র, অধম, সামান্য, তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর, শিব, সামান্যজন, নগণ্য। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** অপ্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও এই শব্দগুলির উল্লেখ জরুরী ছিল। ভাবনার কথা হল, 'মনুর অপত্য' যে **মানব**, সেই **মানব** কেমন করে **মাণব** হয়? তাছাড়া, এই **মাণব**-এর অর্থ এমন নঞর্থক কেন? তাছাড়া, **মানব** যদি **বেদ** পাঠ না করে, তাহলে সে **মাণব** হয়ে যায় কেন? আবার, সেই **মাণব** কীভাবে এবং কী কারণে **শিব**-পদবাচ্যও হন? কেনই-বা **মাণব** বলতে তথাকথিত নীচ, হেয়, তুচ্ছ, দীন ... প্রভৃতি সামান্য-জনকে বোঝায়? তাছাড়া, যে মানুষেরা গোটা বরাক উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছেন, যাঁরা আমাদের বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের তৃতীয় ভুবনের প্রধান অধিবাসী, সেই 'পুরুষবরাক'গণ **মাণবক** পদবাচ্য (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য) হন কী করে এবং কেন?

পাঠকপাঠিকা ইতোমধ্যেই দেখেছেন, **মণ** থেকে জাত এই **মাণ** শব্দটি যে সত্তাকে বোঝায় তার ভিতরে দু'রকম ক্রিয়া সক্রিয় রয়েছে। এক) আত্মসংকোচন ক্রিয়া বা নিজের সারাৎসারে পৌঁছোনোর ক্রিয়া। কোনো **মাণ**-বহনকারী **মাণব** সেই ক্রিয়ার বাহক হলে বা **মাণব** হলে, সে স্বভাবতই নিজের মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেই। হয়তো সেজন্যই প্রাচীনকালের প্রাচ্য দেশে মানুষের মূল কাজ ছিল 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'নিজেকে জানো'; আর পাশ্চাত্যের মানুষের মূল কাজ ছিল Gnothi Seauton বা Know Thyself। যে মানুষ নিজেকে জানতে পারেন, তেমন মানুষই জগৎকেও জানতে পারেন; তিনিই মানবসত্তার সারাৎসারে পৌঁছে যান, তাঁকেই একালে আমরা মনীষী বলে থাকি। অতএব তাঁকে **মাণব** বলাই যুক্তিসংগত। দুই) বহিঃশক্তির দ্বারা তাকে সংকুচিত হতে বাধ্য করার ক্রিয়া। এর ফলে মানুষ আর স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানুষ থাকে না, মূঢ়-কুৎসিত-হীন-নীচ-তুচ্ছ-সামান্যজন ... ইত্যাদি হয়ে যায়, অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়। তদ্রূপ **মাণ**কে বহন করে যে-**মাণব**, এখানে সেই **মাণব**-এর কথাও বলা হচ্ছে। সমগ্র **বরাক** উপত্যকার মানুষ তো সেই বৈদিক যুগ থেকেই **ম্লেচ্ছ** রূপে ঘোষিত।

তার মানে, পরমাপ্রকৃতি যে মনুষ্যশিশুর জন্ম দেন, এ হল সেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **মাণব**। বৈদিকযুগের আগে সনাতন যুগে এই **মাণব**ই ছিলেন মানবসভ্যতার মূল ধারা, এবং এই **মাণব**দের পরিচালক ছিলেন সনাতন **শিব**। পরবর্তীকালের বৈদিকসমাজ বা সভ্যসমাজ এদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেয়, অসভ্য বলে ঘোষণা করে। এবং নিজেদের 'যন্ত্র তৈরির কারখানায়' (= অ্যাকাডেমিতে) তাদের কাটাছেঁড়া-পেটাপিটি করে সভ্য **মানব** বানায়।

স্বভাবতই এই **মাণব** সনাতন যুগের **শিব**-পরিচালিত **মহান** সমাজের সনাতন মানুষ, যাঁরা বিভাজিত-**বেদ** পাঠ করেননি, করেন না; যাঁরা সনাতন **বেদ** আত্মস্থ করতেন, করেন। এঁরা বিভাজিত **বেদ**-এ যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে জীবিকার্জন করার কথা বলা হয়েছে, তা মানতেন না। তাই **দক্ষ**সমাজের চোখে এঁরা 'কুৎসিত অর্থাৎ বিহিতানুষ্ঠানহীন মনুষ্য'। ফলত, এঁরা **দক্ষ**যুগের বা বৈদিক যুগের (= সভ্যযুগের) **দক্ষ**বিরোধী **পাষণ্ড** সত্তা হয়ে পড়েন। সেজন্যই **দক্ষ**সমাজ এদের **অনুকম্পা** দেখিয়ে ছাড়ে, যেকারণে ব.শ. জানাচ্ছেন যে, এই **মাণব** হল 'অনুকম্পিত মাণব'। ভারতীয় উপমহাদেশে যখন **দক্ষ**যুগের বা বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয়, তখন যে সনাতন মানুষেরা এই **অনুকম্পা**র দ্বারা 'অনুকম্পিত' হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন, তাঁরা গেলেন কোথায়? তাঁরাই তো পাহাড়-পর্বত-অরণ্য অধ্যুষিত অবাসযোগ্য এলাকায় চলে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন; সেকারণেই তাঁরাও **মাণব**। পরবর্তীকালে সভ্যসমাজ এঁদের **বরণ** করে এনে নিজেদের চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করত, যে কারণে এঁদের **বরাক**ও বলা হত। তার মানে, এই **মাণব** প্রকৃত অর্থেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানুষদের বোঝায়। আমরা যখন বলি, 'ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে', **'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন'**

... ইত্যাদি, তখন সেই আদি সনাতন **মাণবই** আমাদের মনের ভিতরে বিরাজ করে। দ্র. **মনুষ্য**।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরও একটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিটি যুগসন্ধিক্ষণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এক) পূর্ববর্তী ব্যবস্থার ভিতরে ক্লেদ জমার কারণেই নতুন যুগের সূচনা হয়; দুই) সেই ক্লেদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে অনেক সময় পূর্ববর্তী ব্যবস্থার শুভ অর্জনগুলিকেও নস্যাৎ করা হয়ে যায় এবং ফলত পূর্বতন ব্যবস্থার ক্লেদাক্ত সত্তাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবস্থার শুভ-অর্জনের অনুসারীরাও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যান; তিন) নতুন অর্জন দ্বারা পূর্বতন ব্যবস্থাকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করা হয়, কিন্তু পূর্বতন ব্যবস্থার শুভ-অর্জন পরিত্যক্ত হওয়ায় এই নতুন ব্যবস্থা শুরুতেই খানিকটা অন্ধ হয়ে খোঁড়াতে শুরু করে।

ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে আমাদের বাংলায় যখন আধুনিকতার রমরমা শুরু, তখন অতীত উত্তরাধিকারের মন্দগুলির বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হয়। ফলত একদিন দেখা যায়, 'সব ব্যাদে আছে' বলে ঠাট্টা করে সমগ্র **বেদ**কেই পরিত্যাগ করা হয়েছে; সমগ্র অতীত থেকেই আমাদের সমাজ বঞ্চিত হয়ে যায়। একই ব্যাপার ঘটেছিল বৈদিক যুগের সূচনাকালেও। সনাতন যুগের ক্লেদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে সনাতন যুগের অর্জনগুলিকেও পরিত্যাগ করা হয়েছিল। এর ফল ভাল হয়নি। হয়নি বলেই সভ্যযুগ তার সূচনাকাল থেকেই খানিকটা অন্ধ হয়ে দিগ্‌দিশা হারিয়ে খোঁড়াতে শুরু করে। বৌদ্ধযুগ এসে বৈদিকযুগের শুভগুলিকেও নস্যাৎ করে দেয়। তারপর আবার হিন্দুযুগ এসে বৌদ্ধযুগের শুভগুলিকেও নস্যাৎ করে ফেলে। প্রতি যুগসন্ধিক্ষণেই এই ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলত, সেই অন্ধত্ব ও খঞ্জতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এখন কোথায় এসে পৌঁছেছে, সেকথা সবাই জানেন। এখন এমন এক পরিস্থিতি যে, অতীত উদ্ধার না করে এই সভ্যতা আর এক-পাও সঠিক দিকে হাঁটতে পারবে না। যদিও বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, এই বর্তমান সভ্যতা এখন সম্পূর্ণ অন্ধ ও ভয়ভীত হয়ে পাগলের মতো সুতীব্র গতিতে ছুটে চলেছে, কোন খাদে সে গিয়ে পড়বে সে নিজেই জানে না। দ্র. **মনুষ্য**, **মানব**, **মানুষ**।

মাণিক (মাণিকযোড়, মাণিকপীর, মাণিক্য) : ২. ***মাণিক*** = ***মাণ***-*কে (**মণ** হইতে জাত-কে) গতিশীল করে যে।* ***মাণিকযোড়*** = ***মাণিক***-*এর যুগ্ম গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ***মাণিকপীর*** = ***মাণিক***-*স্বরূপ যে পীর।* ***মাণিক্য*** = ***মাণিক** থাকে যাহাতে।* ৩. **মাণিক** = মাণিক্য, পদ্মরাগ, মাণিকের মতো আদরের ধন, শিশুর আদরের ডাক বা নাম, মাণিকের মতো মহামূল্য দ্রব্য বা আদরের ধন, মাণিকপীর। **মাণিকযোড় (মাণিকজোড়)** = পক্ষিবিশেষ (Dissura episcopus, ইহার দুই পা মাণিকের মতো লাল, যেন জোড়া মাণিক; এই হেতু নাম।), জোড়া মাণিক (গৌণার্থে, উপহাসে) অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়, মিলমাফিক দুই জন। **মাণিকপীর** = মুসলমানের গরুর দেবতা। **মাণিক্য** = পদ্মরাগ, শোণরত্ন, মাণিক, (গৌণার্থে) রত্ন, কদলীবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. সত্তার সারাৎসার-স্বরূপ যে **মণ**, তার থেকে জাত হয় যে **মাণ**, এ হল, তারই ব্যবহারিক রূপ। গ্রামবাংলায় এখনও প্রিয় সন্তানকে **'হীরেমাণিক'** বলা হয়ে থাকে। দ্র. **মণি**। কেন বলা হয়, সেকথার সংবাদ আমরা **মণি** শব্দে জানিয়েছি। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, যে-স্বচ্ছ সত্তার ভিতরে (জ্ঞানের) আলো পড়ে সর্বদিকে সমানভাবে বিচ্ছুরিত হয়, এতটুকুও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাকেই **মণি** বা হীরে**মাণিক** বলে। সাদৃশ্যে তা বাহ্য-হীরে**মাণিক**কেও বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত হীরে**মাণিক** হল বাংলাভাষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বাংলাভাষীদের সন্তানেরা; আর সাদৃশ্যে তা **মণিকার**-এর দোকানে পাওয়া হীরে**মাণিক**গুলিকে বোঝায়।

মাণ্ডবী : ২. **মণ্ড**-*জাতকে বহন করে যে আধারশক্তি।* ৩. কুশধ্বজকন্যা ভরতপত্নী। (ব.শ.)। দশরথের পুত্র ভরতের স্ত্রী এবং রাজা জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। এঁর দুই পুত্র — তক্ষ ও পুষ্কল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ইনি **কুশ**ধ্বজ-এর কন্যা, এবং **ভরত**-এর পত্নী। অতএব এই সত্তা সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে পারে, যাঁরা **কুশ** থেকে জাত এবং **ভরত**-সত্তার আধার রূপে সক্রিয় থাকতে পারে। সেই **মাণ্ডবী**র উত্তরসূরিরূপে একালে যাঁদের দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের অজস্র নাম, যথা — সরকারি 'ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই' বিভাগ, বিশেষত 'রেশন-ব্যবস্থা' যাঁরা চালান সেই সব সরকারি কর্মচারীরা ...। মোটকথা, প্রজাসাধারণের **ভরণ**পোষণ করবার কাজে ব্যাপৃত যে সরকারি সত্তা সক্রিয় থাকে, তাদের আধারশক্তি রূপে যারাই সক্রিয় থাকে, তারাই **মাণ্ডবী**-পদবাচ্য।

মাণ্ডব্য (অণীমাণ্ডব্য) : ২. ***মাণ্ড*** *(**মাণ**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে) বহন করে যে।* ৩. একজন মৌন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। একদিন নিজের আশ্রমের দ্বারের কাছে যোগাভ্যাস করছিলেন, এমন সময় একদল চোর ... চুরির জিনিসপত্র (তাঁর) আশ্রমে ফেলে পলায়ন করে। নগরপালরা তখন তাঁর আশ্রমে চুরির জিনিসপত্র পেয়ে চোরদের আশ্রয়দাতা বলে তাঁকে বিচারের জন্য রাজদ্বারে নিয়ে যায়। রাজা ... তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। মাণ্ডব্যকে শূলে চড়ান হয়। মৌন ধ্যানমগ্ন ঋষি এই বিচারের কারণ কিছুই জানতে পারেন না; এবং শূলবিদ্ধ অবস্থায় বহুকাল বেঁচে থাকেন। রাজার কাছে এই খবর গেলে, রাজা নিজে উপস্থিত হয়ে মাণ্ডব্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ... ঋষিকে শূল থেকে নামিয়ে শূল বের করবার বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত অক্ষম হন। তখন তিনি শূলের বাইরের অংশটুকু কেটে দেন। মাণ্ডব্য এই শূল নিয়েই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় অণীমাণ্ডব্য। (অণী অর্থাৎ শূলের অগ্রভাগ)।

একদিন তিনি যমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — কোন্ পাপে তাঁর এই শাস্তি হল? যম বললেন, বাল্যকালে আপনি এক পতঙ্গের মলদ্বারে তৃণশলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পাপের ফল এখন আপনাকে ভোগ করতে হচ্ছে। ঋষি বললেন, লঘু পাপে আপনি আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণী বধের চেয়ে ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাপ। আপনি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি নিয়ম করেন যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাহারও দণ্ডভোগ করতে হবে না। তাঁর শাপের ফলে যম

দাসী-গর্ভে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অণ্, অণী, ভৃগুসংহিতা, জীমূতবাহন**। ভারতবর্ষকে বলা হত 'ধর্ম্ম সৃষ্টির দেশ' বা আইনসৃষ্টির দেশ। বিশ্বের প্রথম আইনশাস্ত্র হল **মনুসংহিতা**। তবে কিনা ভারতবর্ষ এখানেই থেমে থাকেনি। সে নাবালক-আইনেরও প্রথম প্রবক্তা ছিল; ঘোষণা করেছিল, 'চৌদ্দ বৎসর বয়সের আগে কেউ কোনো অপরাধ করলে তার শাস্তি হবে না।' আজকাল যাকে Juvenile Court বা নাবালকের আদালত বলে, ভারতসমাজের ইতিহাস বলছে যে, নাবালককে শাস্তি দিয়ে ফেলার কারণে একসময় সেই আদালতেরই শাস্তি হয়েছিল। সে রাষ্ট্রশক্তির (বা **ধৃতরাষ্ট্র**-এর) ভাই (**বিদুর**) রূপে অস্তিত্বলাভ করেছিল বটে, তবে তার যথেষ্ট সম্মান ছিল না, **দুর্যোধন, দুঃশাসন** প্রভৃতি শাসকেরা তার কথা শুনত না। **রাবণ**-এর হাতে অবশ্য সেই **যম** বা আদালতের আরও দুর্গতি হয়েছিল। তাঁকে **রাবণের** বা সরকারের 'ঘোড়ার ঘাস' কাটতে হত। দ্র. **ব্রহ্মা**।

***মথ্ (মিথ্, মেথ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অমিথ্যা, মথ্, মথ, মথন, মথনী, মথা, মথিত, মিছা, মিছামিছি, মিছিমিছি, মিছে, মিছেমিছি, মিথ্, মিথ, মিথঃ, মিথি, মিথিল, মিথিলা, মিথিলাধিপতি, মিথিলেশ, মিথুন, মিথুনভাব, মিথুনযমক, মিথুনব্রতী, মিথুনীভাব, মিথুনেচর, মিথো, মিথ্যা, মিথ্যাকর্ম্ম, মিথ্যাকারুণিক, মিথ্যাকৃত, মিথ্যাকোপ, মিথ্যাক্রোধ, মিথ্যাক্রয়, মিথ্যাগ্রহ, মিথ্যাগ্রহণ, মিথ্যাচর্য্যা, মিথ্যাচার, মিথ্যাজল্পিত, মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাদর্শন, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাধ্যবসিতি, মিথ্যানিরসন, মিথ্যাপণ্ডিত, মিথ্যাপুরুষ, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, মিথ্যাপ্রত্যয়, মিথ্যাপ্রবৃত্তি, মিথ্যাবচন, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাবাদ, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবার্ত্তা, মিথ্যাব্যাপার, মিথ্যাভিধা, মিথ্যাভিধান, মিথ্যাভিযোগ, মিথ্যাভিশংসন, মিথ্যাভিশপ্ত, মিথ্যাভিশস্ত, মিথ্যাভিশস্তি, মিথ্যাভিশাপ, মিথ্যাভিষঙ্গ, মিথ্যামতি, মিথ্যাযোগ, মিথ্যাসাক্ষী, মিথ্যাসাক্ষ্য, মিথ্যাহার, মিথ্যুক, মিথ্যোত্তর, মিথ্যোপচার, মেঠি, মেঠী, মেচি মেথি, মেথিকা, মেথিনী, মেথী, মৈথিল, মৈথিলী, মৈথিলেয়, মৈথুন, মৈথুনগত, মৈথুনগমন, মৈথুনজ্বর, মৈথুনধর্ম্ম, মৈথুনধর্ম্মী, মৈথুনবাসঃ, মৈথুনবিরক্তি, মৈথুনবৈরাগ্য, মৈথুনিকা, মৈথুনী, মৈথুন্য, ম্যাড়া।

মথ্ (মিথ্, মেথ্) = পরিমিত সত্তার থাকন (বা স্থিতি)। **মথ** = পরিমিত সত্তা থাকে যাহাতে। **মিথ** = পরিমিত সত্তা গতিশীল থাকে যাহাতে। **মেথ** = পরিমিত সত্তা দিশাগ্রস্তভাবে থাকে যাহাতে।

মথন (মথ, মথনী, মথা, মথিত) : ১. ✓মথ্ + অন (ল্যুট্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ)। ২. ***মথ*** = *পরিমিত সত্তার স্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহাতে পরিমিত-করণ ক্রিয়াটি থাকে।* ***মথন*** = ***মথ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মথনী*** = ***মথন****-এর গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে।* ***মথা*** = ***মথ****-এর আধার যে।* ***মথিত*** = ***মথ*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ৩. **মথন** = বিলোড়ক, ঘাতক, পীড়ক, বিলোড়ন, মন্থন, ঘাতন, পীড়ন। **মথ** = বিলোড়িত করা, নিপীড়িত করা, মর্দ্দন করা, চর্ব্বণ করা। **মথনী** = মাখন, মন্থনদণ্ড। **মথা** = মথিত করান। **মথিত** = বিলোড়িত, কৃতমন্থন, পীড়িত, ভগ্ন, ঘৃষ্ট, নাশিত, নির্জ্জল ঘোল। (ব.শ.)। ৪. 'নিপীড়িত' অর্থে **মথিত** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। ৫. কোনো একটি সত্তাকে চারদিক থেকে চেপে ধরলে সে যদি খুব ছোট হয়ে যায়, কিংবা তাকে খুব করে ঘেঁটে তার নির্য্যাস বের করে নিলে, জিনিসটির পরিমিতি-করণ হয়ে যায়। একেই **মথ** করা বলে। এর ফলে জিনিসটি **মথিত** হয়ে যায়। বাংলায় একে 'চিড়ে-চেপ্টা' করাও বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু যখন আমরা রাতের প্রজাপতির দিকে তাকাই, এবং তার ইংরেজি নাম moth দেখি, তখন অবাক হতে হয়। কেননা, বাস্তবে **প্রজাপতি** দুরকম, কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারে রাতের প্রজাপতির কথা বা **মথ**-এর কথা নেই। অথচ একথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে, দিন **দেবতা**দের দখলে এবং রাত্রি **অসুর**দের দখলে। এদিকে **মথ** যদি **মথিত**ই করে, এবং সে যদি কেবল রাতেই বেরোয়, তাহলে এ তো **অসুর**দের এলাকাই হয়ে গেল। কেননা, জনগণকে **মথিত** করেই তো **মধু** আহরণ করে ফেলে **মথে**রা; তা সে ধনতান্ত্রিক **মথন** করা হোক আর সমাজতান্ত্রিক **মথন** করাই হোক। ... সত্যিই ভাবনার কথা। ৬. ইংরেজি moth, mathematics।

মথুরা : ১. ✓মথ্ + উর (উরচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***মথ*** *(পরিমিত সত্তার থাকা) নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রয় যাহাতে, তাহার আধার; অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন পণ্যরূপে বিক্রীত হয় যেখানে।* ৩. মধুপুরা, মধুপুরী, মধুরা, মনোহরা। মধু দৈত্য মহাদেবের নিকটে এক অপূর্ব্ব শূল প্রাপ্ত হয়। মহাদেব এই বর দেন যে, যতদিন এই শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে ততদিন তাহার বিনাশ হইবে না। মধু এই বর প্রাপ্ত হইয়া এক মনোহর ভবন নির্ম্মাণ করে, ইহার নাম মধুপুরী। কুম্ভনসীগর্ভে মধুর 'লবণ' নামে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, মধু তাহাকে শূল অর্পণ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। পরে লবণের অত্যাচারে পীড়িত মুনিগণের প্রার্থনায় শত্রুঘ্ন রামাদেশে মধুপুরীতে আসিয়া লবণকে নিহত করেন। মধুপুরী বা মধুরা, শূরসেনার দেশ বলিয়া 'শূরসেনা' নামে খ্যাত হয়। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও কংসের রাজধানী। ইহা সপ্ত মোক্ষদায়ক তীর্থের অন্যতম। কুল্লুকটীকায় 'শূরসেন' মথুরাদেশ। এক্ষণে ইহা আগ্রার অন্তর্গত। (ব.শ.)। মধুদৈত্যে নির্ম্মিত নগরী। যমুনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। (পৌ.অ.)। ৪. স্থাননাম রূপে প্রচলিত। ৫. সন্দেহ নেই যে, **মথুরা** ও **মধুপুরা** একই স্থানের নাম। এ বিষয়ে নানা তথ্যের সমর্থন রয়েছে। শব্দার্থের আলোকে ভাবলে দু'দিক থেকে এই **মথুরা** শব্দের অর্থ নিষ্কাশিত হতে পারে। এক) **মধু**-রূপে এটি **মধুপুরী**। সেক্ষেত্রে এটি জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ ... ইত্যাদির সারাৎসার-এর কেন্দ্র হতে পারে। দুই) **ম** (বা পরিমিত সত্তা) থাকে যাহাতে (= **মথ**), সে তো জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ ইত্যাদি অনেক কিছুই হতেই পারে। কিন্তু তাকে 'নবরূপে উত্তীর্ণ' (= **মথু**) হয়ে রইতে (= **রা**) হলে অর্থাৎ **মথুরা** হতে হলে, তার **মথ**-রূপে থাকা বা জ্ঞানসম্পদ কিংবা ধনসম্পদাদি রূপে থাকা চলে না। তাকে নবরূপে উত্তীর্ণ হতে হয়। তা সম্ভব হয় যদি আমরা ভাবি যে, ঐ **মথ** হল **পণ্য**সম্পদ যার বিক্রিবাটা চলছে

বা চলতে পারে এবং তার ফলে তা মুদ্রাদিতে বদলে যেতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন, **মথুরা** নামের স্থানটি যে জ্ঞানবিনিময়, রসবিনিময়, কিংবা **পণ্য**বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল, কিংবা তাদের যে কোনো একটি বা দুটির কেন্দ্র ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে যথেষ্ট তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে আমরা এখনও যথেষ্ট নিশ্চিত হতে পারিনি।

মিথ (মিথঃ, মিথস্) : ২. *মিথ = পরিমিত সত্তা (আধেয়রূপে) গতিশীল থাকে যাহাতে (বা যে আধারে)। **মিথঃ (মিথস্)** = **মিথ** সম্পূর্ণ যেখানে বা যাহাতে; অর্থাৎ, যার পরে আর **মিথ**-এর (আধার-আধেয়র পারস্পরিক) সক্রিয়তা নাই; অথবা, **মিথ**-এর শেষ অস্তিত্বটুকু বা নির্য্যাস যাহাতে।* ৩. **মিথ** = বধ, হিংসা, মেধা, ধারণা, সঙ্গ, সঙ্গম। **মিথঃ, মিথস্** = সহ, অন্যোন্য, পরস্পর, রহঃ, একান্তে, নিভৃতে। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একটি 'পরিমিত সত্তা' (= **ম**) যখন 'গতিশীল বা সক্রিয়' (= **িম**) হয়ে কোনো স্থান-কাল-পাত্রে গিয়ে স্থান পায় বা **থা**কে (= **থ**), তখনই তাকে **মিথ** বলে। স্বভাবতই সে যেন একটি **ম** বা 'মিত-সত্তা', যে কিনা গিয়ে স্থান লাভ করছে অন্য একটি **ম**-এ বা 'মিত-সত্তা'য়। তবে অনেক সময়ই সেটা সহজসাধ্য হয় না, এক রাজা অন্য রাজ্যে ঢুকতে গেলে মারদাঙ্গা হবেই। সেই কারণে **মিথ** শব্দটির অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে ব.শ. 'বধ, হিংসা, মেধা, ধারণা, সঙ্গ, সঙ্গম' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। **মিথ** মানে অতএব 'বধ', 'হিংসা', 'সঙ্গ', 'সঙ্গম' ইত্যাদি হতে পারে ঠিকই, কিন্তু **মিথ** মানে 'মেধা' বা 'ধারণা' হয় কীভাবে?

হয় এইভাবে — বাস্তবে যা ঘটে, তা একটি 'পরিমিত রূপ' নিয়ে 'গিয়ে' (**মি**) 'স্থান লাভ করে' বা **থা**কে (**থ**) আমাদের **মেধায়** ও **ধারণায়**। অতঃপর আমাদের **মেধা** ও **ধারণা** সেই ঘটনাটিকে আমাদের মানসলোকে ধারণ করে বহন করতে থাকে, যেন বাস্তব ঘটনাকে 'ভিডিয়ো-ক্যামেরা'য় সামগ্রিকভাবে তুলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। স্বভাবতই আমাদের মনোলোকের ঐ মেধাস্থিত বা ধারিত সত্তাটি হয়ে যায় **মিথ**। সেই কারণে ব.শ. **মিথ** শব্দের মানে দিয়েছেন 'মেধা' ও 'ধারণা'। আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ এই **মিথ**-এর নাম দিয়েছিলেন 'স্মৃতি'। যেখানে সেই **মিথ**সমূহকে তাঁরা একত্রিত করে রেখেছিলেন, তাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'স্মৃতিশাস্ত্র'। সেই স্মৃতিগুলি সবই বিগত যুগের সত্য ঘটনার প্রতিরূপ বা কথা, অর্থাৎ পুরানো কথা বলে, তাঁরা তার অপর নাম দিয়েছিলেন **পুরাণ**।

বাস্তব ঘটনার এই **মিথ** রূপ বা মনোলোকের 'ভিডিয়ো-ক্যামেরা'য় ধরে রাখা রূপটি সত্য কিন্তু সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাঘ বললে যদি সত্যিকার বাঘ এসে হাজির হত, সেটা বক্তা শ্রোতা কারও পক্ষেই সুখকর হত না।' এও সেই রকম। এ হল সত্য ঘটনার প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, **প্রতিমা**; কিন্তু মনোলোক থেকে সেই ছবিকে পুনঃপ্রকাশ করে দেখালে বা বললেই তা ঘটতে শুরু করে না। যদি তা করত, তাহলে এ জগৎ এরকম থাকত না।

তাছাড়া, এই **মিথ** স্থান লাভ ক'রে বাহিত হয় মানুষের মনে, আর তা চলতে থাকে ক্রমক্ষীয়মান স্বভাব নিয়ে। ফলে, মেধা ও ধারণার **মিথ** বহু ক্ষেত্রে আত্মস্বরূপ খোয়ায়, খোয়াতে থাকে, ছাড়া-ছাড়া, ভাসা-ভাসা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, কখনো-বা সেই স্বরূপের অধিকাংশই হারিয়ে ফেলে। পাশ্চাত্যের মানুষেরা তাঁদের **মিথ**কে সেভাবেই অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছেন (দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**), যদিও তাঁদের ভাষাগুলি, বিশেষত ইংরেজি ভাষা, সেই myth-কে ধরে রেখেছে সরাসরি এবং তাঁরাও তাঁদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে mythology-ই বলে থাকেন। কিন্তু তাঁরা মনে করেন, ঐ myth-গুলি আগাগোড়া false, এবং তাতে কথিত কাহিনীগুলির কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই; আমরা যেখানে দেখতে পাই যে, ঐ কাহিনীগুলি সত্য ঘটনার প্রতিরূপ, তাই **মিথ** বা **মিথ্যা**; কিন্তু false নয় আদৌ। ঠিক এইখানে পাশ্চাত্যের মানুষ আমাদের চেয়েও অনেক বেশি অতীতহারা, আত্মপরিচয়হীন, অভাগা। অথচ দুঃখের কথা এই যে, গায়ের জোর আর পকেটে পয়সা আছে বলে তাঁরা ও তাঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রভাবিত এদেশীয় পণ্ডিতেরা আমাদের identity-crisis নিয়ে, 'আত্মপরিচয়ের-সংকট' নিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়েন; বলেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস'! এবার তো সবাই জেনে যাবে, প্রকৃতপক্ষে কার ইতিহাস নেই!

যাই হোক, বহিরাগত কেউ আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়লে মারদাঙ্গা হতে পারে বটে; কিন্তু সেই মারামারি থেমে যাওয়ার পর দেখা যায়, প্রথম জন আধেয় রূপে দ্বিতীয় জনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তেমনি দ্বিতীয় জনও আধার রূপে প্রথম জনকে ক্রমশ গ্রহণ করে আবৃত করে ঢেকে-ছেয়ে রাখছে। ফলে, **মিথ** শব্দের ভিতরে একপ্রকার দ্বৈত অস্তিত্বকে সুস্থির দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাই দেখে ব.শ. **মিথঃ** ও **মিথস্** শব্দের অর্থ দিয়েছেন, 'রহঃ, অন্যোন্য, একান্তে, নিভৃতে' ইত্যাদি। দ্র. **মিথ্যা**। ৬. ইংরেজি myth, mythology ... ইত্যাদি। দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**।

মিথি (মিথিল, মিথিলা, মিথিলাধিপতি, মৈথিলী — মৈথিলী-ব্রাহ্মণ) : ১. ✓মিথ্ + কি - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. *মিথি = মিথ (পরিমিত সত্তা গতিশীল যাহাতে) গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, উৎপন্ন (উৎপাদিত মানসফসল বা বাহ্যফসল) দানরূপে সক্রিয় যাহাতে বা যেখানে; উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হয় যাহাতে। **মিথিল** = **মিথি** লালিত যেখানে বা যাহাতে। **মিথিলা** = **মিথিল**-এর আধার যে। **মিথিলাধিপতি** = **মিথিলা**র অধিপতি যিনি। **মৈথিলী** = **মিথিলায়** জাত যে, তাহার আধার।* ৩. **মিথি** = নিমিপুত্র রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ। **মিথিল** = মিথিলা-বাসিগণ। **মিথিলা** = জনকরাজের পুরী বিদেহরাজধানী ত্রিহুত। **মিথিলাধিপতি** = মিথিলারাজ (জনক)। **মৈথিলী** = 'মিথিলাভবা', সীতা। (ব.শ.)। **মিথি** = রাজা নিমির পুত্র। রাজা নিমি অপুত্রক ছিলেন। বশিষ্ঠ-শাপে চেতনাশূন্য নিমিদেহ মুনিরা যজ্ঞভূমিতে অরণি রূপ কল্পিত করে মন্ত্রহোম দ্বারা মন্থন করতে লাগলেন। সেই মন্থন হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। মন্থন হতে জাত বলে এঁর নাম মিথি। জনন হতে জন্ম বলে এঁর আর এক নাম জনক। এবং বিদেহ (অর্থাৎ বিগত দেহ) হতে জন্ম বলে এর অন্য নাম বিদেহ। **মিথিলা** = প্রাচীন রাজ্য ও বিদেহের (উত্তর বিহার) রাজধানী। রাজা জনকের নগর বলে

প্রসিদ্ধ। অন্য নাম বিদেহ। এই জন্য মিথিলার রাজকন্যার (সীতার) নাম মৈথিলী বা বৈদেহী। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বর্তমান সভ্যতার অন্যতম অর্জন হল উৎপাদনকে পণ্যে রূপান্তরিত করার যোগ্যতা। উৎপন্ন কীভাবে উদ্বৃত্ত হল, কীভাবে সেই উদ্বৃত্ত পণ্যে রূপান্তরিত হল, এবং পরে পরে কীভাবে একটি সামাজিক গোষ্ঠী শুধুমাত্র বিনিময়ের জন্যই উৎপাদন (ক্যাশ-ক্রপ্) করতে শুরু করল ... সর্বোপরি, কীভাবে দেশের সামাজিক ব্যবস্থা সেই অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সামাজিকভাবে মেনে নিতে লাগল — এসব বিষয়ের ইতিহাস তথাকথিত আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের জানা নেই। তাঁদের অধিকাংশ জ্ঞানেই 'অতীতবিচ্ছিন্ন', 'বেজন্মা'। কিন্তু আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে এসব বিষয়ের সমগ্র ইতিহাসটাই আছে। **নিমি, জনক, মিথি**র কাহিনী হল সেই বিশাল বিশাল সামাজিক পদক্ষেপের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইতিহাস; অবশ্যই সেসব বিবরণ লেখা রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। সেই বিবরণকে প্রতি স্তরে একালের প্রতীকী ভাষায় অনুবাদ করে নিলেই আমরা সেই ইতিহাসের সাক্ষাৎ পেতে পারি। এসব 'তামাদি হয়ে যাওয়া ইতিহাস' বলে ভাববেন না যেন। এর আদি উত্তরাধিকার যেমন আজও বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি এর অন্তিম উত্তরাধিকারও রমরমিয়ে বেঁচে রয়েছে। একালের সমাজের প্রাণস্বরূপ **পণ্য** তো রয়েছেই, এমনকি যে আদি জ্ঞানীরা **মথ**কে **মিথি**তে পরিণত করেছিলেন, অর্থাৎ, সর্বপ্রথম উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করেছিলেন, সেই **মৈথিলী-ব্রাহ্মণেরা** এখনও বেঁচে বর্তে আছেন। মনে রাখা ভাল, আসমুদ্রহিমাচল-ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাত্র একটি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ **মৎস্য** ভক্ষণ করা উচিত বিবেচনা করেছিলেন, তাঁরাই **মৈথিলী-ব্রাহ্মণ**। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন **বঙ্গে**র ব্রাহ্মণেরা। চাষ করার যদি একটিই উদ্দেশ্য হয় যে, যা উৎপাদিত হবে, তার সবটাই বেচে দেওয়া হবে, একালের ভাষায় তাকে বলা হয় 'ক্যাশ-ক্রপ্'। এভাবে যাঁরা সমগ্র উৎপন্নকে **পণ্যে** পরিণত করা উচিত বিবেচনা করেছিলেন (উদ্বৃত্ত-উৎপন্নকে **পণ্যে** পরিণত করার অধ্যায়টি পেরিয়ে গিয়ে **বিনিময়**-এর সূচনা করা গিয়েছিল অনেক আগেই, প্রজাপতি **বেণ**-এর কালে), যাঁরা **ব্যক্তিমালিকানা** স্বীকার ক'রে সেই **পণ্য** বিনিময় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা যে অবশ্যই **আমিষ** বা **মৎস্য**-ভক্ষণও করবেন, সেই তো স্বাভাবিক! ভারতে রীতিটাই ছিল এরকম সার্বিক। জ্ঞানের অদৃশ্য অগ্নিশিখা বহন করেন যিনি, তিনি মাথাতে দৃশ্য শিখা রাখেন — এ তো একশোভাগ ভারতীয় রীতি। মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয়দের জীবনের বিকাশের ইতিহাসে তাঁদের প্রত্যেকটি আচরণের এইরকম মানসিক ও বাহ্যিক সামঞ্জস্য ছিল এবং এখনও কমবেশি আছে। আপনি মানসিক-**আমিষ** ভক্ষণ করবেন কিন্তু বাহ্যিক-**আমিষ** ভক্ষণ করবেন না, ভারতীয় সংস্কৃতিতে এরকম দ্বিচারিতা গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত মানুষদের মতো তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা খণ্ডবোধের দ্বারা কলুষিত ছিল না। তদ্রূপ 'খণ্ডবোধের দ্বারা কলুষিত' চিন্তাপদ্ধতিকে একালের ভাষায় বলা হয় 'কম্পার্টমেন্টালাইজড্'। আর, আধুনিক চিন্তাপদ্ধতি যে 'কম্পার্টমেন্টালাইজড্', তা নিয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

মিথুন (মিথুনভাব, মিথুনব্রতী, মিথুনেচর, মৈথুন, মৈথুনগমন, মৈথুনধর্ম্ম, মৈথুনধর্ম্মী, মৈথুনিকা) : ১. ✓মিথ্ + উন (উনন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মিথুন*** = ***মিথ*** *উন যাহাতে; বা* ***মিথ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে অনকৃত যাহাতে।* ***মৈথুন*** = ***মিথুন*** *হইতে জাত।* **৩. মিথুন** = যুগ্মবিশিষ্ট, দ্বয়, অভিভাবক, নাশক, স্ত্রীপুরুষদ্বয়, যুগ্ম, দ্বন্দ্ব, যুগল, দম্পতি, যমজ, যমল, দ্বিসংখ্যক, তৃতীয় রাশি (Gemini), উপসর্গযুক্ত ধাতু, সঙ্গম, মেলন, স্ত্রীসম্ভোগ। **মিথুনভাব** = যুগলভাব, যুগ্মতা, সঙ্গম। **মিথুনব্রতী** = দাম্পত্যধর্ম্মবান। **মিথুনেচর** = যুগলচারী, চক্রবাক। **মৈথুন** = মিথুনসম্বন্ধী, মিথুনসাধ্য, মৈথুনাখ্য, সুরতসম্বন্ধী, যুগলভাবগত, মিথুনকর্ম্ম, সুরত (স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি — এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন), মিথুনসাধ্য অগ্ন্যাধানকর্ম্ম-পুত্রোৎপাদনাদি, বিবাহ, সঙ্গতি। **মৈথুনগমন** = সুরতনিরত। **মৈথুনধর্ম্ম** = সুরত। **মৈথুনধর্ম্মী** = মিথুনধর্ম্মবান, দাম্পত্যসুখযুত। **মৈথুনিকা** = মিথুনক্রিয়া নিষ্পাদন, বিবাহরূপসম্বন্ধ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আগেই আমরা দেখেছি, **মিথ** শব্দের ভিতরে একপ্রকার দ্বৈত আছে; কিন্তু একপ্রকার ক্রমক্ষীয়মানতাও আছে। **মিথুন**-এ সেই ক্রমক্ষীয়মানতাটি নেই। অর্থাৎ, **মিথ**-এর গতি ক্রমশ মরে মরে **মাটি** হয়ে যাওয়ার দিকে থাকলেও **মিথুন**-এর গতি সেই মরণের দিকে নেই। তা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে **মিথুন** — ***মিথ*** *উন যাহাতে; বা* ***মিথ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে অনকৃত যাহাতে।* তাতে জীবনের **সুরতহাল** ঠিকঠাক থাকে, আধার-আধেয় দুই সত্তা **সুরতি**তে কর্ম**রত** থাকে, তাতে নবজীবনের সম্ভাবনাও থাকে। আর, সেই **মিথুন**-এর এলাকা সর্বপ্রকার আধার-আধেয়র যুগ্মভাবে কর্মরত হওয়ায় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। জগৎকর্তা ও জগদ্ধাত্রীর **মিথুন**, রাজা-প্রজায় **মিথুন** থেকে শুরু করে পুং-স্ত্রী-জীবের **মিথুন** পর্যন্ত সর্বপ্রকারের **পুরুষ-প্রকৃতি**র **মিথুন**-এ তা প্রসারিত থাকে। দ্র. **রত, রতি**।

তবে কিনা, আমাদের অ্যাকাডেমির কল্যাণে এই **মিথুন, মৈথুন** ... ইত্যাদি সকল **মিথুন**-জাত শব্দই এখন শুধুমাত্র একটি প্রতীকী অর্থে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে; তা হল স্ত্রীসম্ভোগ। যাঁরা নিজেরা পয়সায় বিকোয়, বেতনভোগী, **ভৃতকাধ্যাপক**, সেই অ্যাকাডেমি-শিয়ানদের উন্নাসিক ভাষায় — **মিথুন** রাশি নামে কী যেন একটা ব্যাপার আছে, তবে সে আমাদের বিষয় নয়, যারা হাত দেখে টু-পাইস কামায় সেই সব ফড়েদের ব্যাপার! দ্র. **জ্যোতিষ**।

শুধু কি তাই! আজকের বাংলাতেও যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাই, এই যে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে একটা করে পরিবার-ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের সমাজ চলছে, একে কী বলা যায় বলো তো?' দেখবেন, সে ইংরেজি শব্দ দিয়ে তার উত্তর দিচ্ছে — conjugal life, married couple, monogamic family ... ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলায় কেউ কেউ অবশ্য 'জোড়বাঁধা-পরিবার' বা 'দাম্পত্যজীবন' বলে থাকেন। আমাদের গোটা সমাজটাই যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে চলছে, তাকে বোঝানোর মতো **মিথুন**-জাত শব্দগুলি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে একটি পরিবার চালান, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের বলতেন **মিথুনব্রতী**। তাঁরা জোড়ায় জোড়ায় চলেন ব'লে তাঁদের বলা হত **মিথুনেচর**, **মৈথুনধর্ম্মী** ... ইত্যাদি।

মিথুনধর্ম্ম একটি আদর্শ **ধর্ম্ম** ছিল এবং আছেও। এই **মিথুনের**চর শব্দটি যে 'চক্রবাক' বা চকাচকী পাখিকে বোঝায়, তারা দুজন কখনো একে অপরকে ছেড়ে থাকে না। (লায়লা-মজনুর মতো প্রেমিক-প্রেমিকারা সেই প্রেমিক-দম্পতির তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে যায়। এ বিষয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী মশাইয়ের 'চকাচকী' গল্পটি স্মর্তব্য।) **মিথুন** ও তজ্জাত শব্দগুলিকে ফেলে দিয়ে আজ আমরা অন্য ভাষার কাছে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি এবং সেটাকেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত ভাইয়েরা গৌরবজনক বলে ব্যাখ্যা করে চলেছে, এমনই অদৃষ্ট! সেই ভাইদের কথায় বিশ্বাস করে আমরা আমাদের আঙুরথোকা ও তার আঙুরগুলিকে ভুলে গিয়ে এখন আমরা ইংরেজির কিসমিসে বিশ্বাস করি, তাঁদের শব্দ ধার করে কাজ চালাই। ... কী আর করা যাবে, সবই কপালের ফের!

মিথ্যা (মিছা, মিছামিছি, মিছে) : ১. ✓মিথ্ + ক্যপ্ - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আপ। (ছা.অ.)। ২. ***মিথ্যা** = **মিথ** (পরিমিত সত্তা গতিশীল যাহাতে) থাকে যাহাতে তাহার আধার। **মিছা** = পরিমিত সত্তা গতিশীল (থাকে) যে আচ্ছাদনে; কিংবা, গতিশীল পরিমিত সত্তা আচ্ছাদিত যাহাতে। **মিছামিছি** = **মিছা** ও **মিছি** (দ্র. **কচাকচি**)। **মিছে** = গতিশীল পরিমিত সত্তার আচ্ছাদন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. **মিথ্যা** = অলীক, ভ্রমমূলক, নিরর্থক, সব্যাজ, অসত্যপ্রতীয়মান, অধর্ম্মপত্নী। **মিছা (মিছে)** = অসত্য, অন্তঃসারশূন্য, ভুয়া, অনর্থক, ব্যর্থ, অমূলক, হেয়, উপমার অযোগ্য। **মিছামিছি** = অনর্থক, বৃথা। (ব.শ.)। ৪. false অর্থে প্রচলিত। ৫. আমরা আগেই দেখেছি, **মিথ** শব্দটির অর্থ হল, সে আসলে সত্য ঘটনার প্রতিরূপ, কিন্তু সত্য নয়। সেই '**মিথ** থাকে যাহাতে' তা সে প্রকৃত সত্য ঘটনার ছবি, কাহিনী, গল্প, নাটক, বয়ান, গান ... ইত্যাদি যাই হোক না কেন, সে তো বাস্তব নয়। সে হল **মিথ্যা**। এ **মিথ্যা** অতএব false নয়, সত্যের মরণশীল প্রতিরূপ। সত্য তো কবেই মরে গেছে, বেঁচে আছে তার মরণশীল প্রতিরূপ বা **মিথ**-রূপী এই **মিথ্যা**। মরণশীল বলেই এই প্রতিরূপও ক্রমান্বয়ে একদিন মরে যাবে। তখন সত্যের ছায়া, ছবি, শব্দ, গন্ধ কিছুই আর থাকবে না। তখন এই **মিথ্যা**-রূপী সত্যও সম্পূর্ণতই বিলুপ্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। ছবিতে, ভাস্কর্যে, শব্দে, প্রথায়, এমনকি মানুষের স্মৃতিতেও তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; সে false হয়ে যাবে। আমাদের পূর্বসূরিরা যে সগৌরবে ঘোষণা করতেন, '**ব্রহ্ম** সত্য, জগৎ **মিথ্যা**', সে তো অর্থহীন বাক্য মাত্র নয়। তবে সে বিষয়ে আমরা **ব্রহ্ম** শব্দে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বাংলাভাষী **মিথ্যা** শব্দটিকে আরও পরিশীলিত ও সরল করে নিয়েছেন **মিছা, মিছে** ... ইত্যাদি শব্দে। **মিথ্যা** শব্দে গতিশীল পরিমিত সত্তা আধেয় হয়ে যে আধারে থাকে, সেই আধার যদি সত্তাটিকে ঘিরে আচ্ছাদিত করে রাখে, তখনই **মিথ্যা** হয়ে যায় **মিছা**। এতে **মিথ**-এর **মি** তার আধারের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যেন-বা লুকিয়ে পড়ে। ফলত **মিথ্যা**র শক্তিরূপিণী রূপটি **মিছা**য় বদলে গিয়ে **পার্ব্বতী**তে পরিণত হয়ে যায়। তারপর বাংলাভাষী তাকে নিয়ে যান **মিছে**তে, **পার্ব্বতী** হয়ে যান বাঙালির ঘরের মেয়ে উমা। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে তাঁর মান রাখেন, 'সখি, **মিছে** রাগ কোরো না।' ...

এখানে আর একটি ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গভাষীদের বিশেষ গৌরব এইখানে যে, সে দুইকে নিয়ে চলে। তার স্বভাবেই রয়েছে 'আছে-নেই'-এর গভীর কৌতুকময় অস্তিত্ব। ফলত, **মিথ্যা**র ভিতরের যে নিহিত গুণ, যাকে আমরা **মিথ** শব্দে চিহ্নিত করেছি 'সত্য আছে কিন্তু সত্য নেই' বলে, সেই গুণটি **বঙ্গ** নামক সত্তার স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত প্রিয়। **মিথ্যা** ও **মিছা** প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে **বঙ্গ**ভাষী তার চূড়ান্ত পটুত্ব দেখান। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ পাঠকপাঠিকা দেখতে পাবেন।

সন্দেহ নেই, এই **মিথ্যা** শব্দযোগে বহু শব্দ তৈরি করেছিলেন আমাদের পূর্বসূরিরা। সেই শব্দসমূহের দু'চারটির বিষয়ে আমরা আমাদের মন্তব্য নিম্নে উপস্থাপিত করলাম।

মিথ্যাকর্ম্ম : ৩. অনর্থক কার্য্য। (ব.শ.)। ৫. এই **কর্ম্মে কার্য্য** থাকে, কিন্তু তার থেকে কাম্য ফল ফলে না। তাই এই **মিথ্যা**ও সত্য বটে কিন্তু সত্য নয়। এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ব্যবহার করে গেছেন। দ্র. **মিথ**।

মিথ্যাকোপ, মিথ্যাক্রোধ : ৩. কৃতকরোষ, কপটকোপ। (ব.শ.)। ৫. এতেও কোপ আছে, ক্রোধ আছে, কিন্তু সে-কোপ বা ক্রোধ লোকদেখানো কোপ বা ক্রোধ। এতেও সত্য আছে কিন্তু সত্য নেই। এই কোপ বা ক্রোধ দেখতে হলে যে কোনো কিশোরীর মুখঝামটার মুখোমুখি হলেই টের পাওয়া যাবে। গ্রামবাংলার মেয়েরা এই ব্যাপারে এতই সহজ যে, অনেক সময় তাঁদের কোনটা রাগ আর কোনটা অনুরাগ বোঝার উপায় পর্যন্ত থাকে না।

মিথ্যাক্রয় : ৩. অল্পমূল্যে ক্রয়। (ব.শ.)। ৫. এই ক্রয়েও মূল্য আছে, তবে যথার্থ বা সত্যমূল্য দিয়ে ক্রয় নয়। তাই এ হল **মিথ্যাক্রয়**।

মিথ্যাগ্রহ, মিথ্যাগ্রহণ : ৩. ভ্রমমূলক আগ্রহ, ভুল বোঝা। (ব.শ.)। ৫. এই গ্রহণও নিতান্ত অগ্রহণ নয়, এতেও কিছু গ্রহণ করা হয়; তবে যা গ্রহণ করার কথা, তাকে গ্রহণ বোঝায় না। তার চেয়ে হীন কোনো গ্রহণ কিংবা অন্য কিছু গ্রহণ করা বোঝায়। যেটা বোঝার কথা সেটা বোঝা নয়, অন্য কিছু বুঝে ফেলাই **মিথ্যাগ্রহণ**। একই রকম কথা **মিথ্যাচর্য্যা, মিথ্যাচার, মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাদর্শন, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাপণ্ডিত, মিথ্যাপ্রত্যয়, মিথ্যাবচন, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাবাদ, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাভিযোগ, মিথ্যাভিশপ্ত, মিথ্যাভিশাপ, মিথ্যাযোগ, মিথ্যাসাক্ষী, মিথ্যাসাক্ষ্য** ... প্রভৃতি বহু শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে।

মদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিমোদ, অপ্রমত্ত, অপ্রমাদ, অমৎসর, অমম, অমমকার, অমমতা, উন্মত্ত, উন্মাদ, উন্মাদনা, ঐশ্বর্য্যমদ, ধনমদ, প্রমত্ত, প্রমাদ, প্রমোদ, বিদ্যামদ, মই (মদিকা), মইচ্চ, মতঙ্গ, মতঙ্গজ, মতঙ্গম, মত্ত, মত্তকাশিনী, মত্তগামিনী, মত্তবারণ, মত্তমান (মর্ত্তমান), মত্তা, মত্তেভ, মত্তেভগমনা, মত্য, মৎ (মৎ করো, না অর্থে), মৎ, মৎক, মৎকুণ, মৎকুণা, মৎকর্ম্ম, মৎকৃত, মৎপরায়ন, মৎসদৃশ, মৎসর, মৎসরা, মৎসরী, মৎসী, মৎস্য,

মৎস্যকরণ্ডিকা, মৎস্যকেতু, মৎস্যগন্ধ, মৎস্যগন্ধা, মৎস্যঘণ্ট, মৎস্যঘাত, মৎস্যঘাতক, মৎস্যজীবী, মৎস্যণ্ডিকা, মৎস্যণ্ডী, মৎস্যদ্বাদশী, মৎস্যধানী, মৎস্যধ্বজ, মৎস্যপুচ্ছ, মৎস্যপুরাণ, মৎস্যবন্ধ, মৎস্যবন্ধন, মৎস্যবন্ধী, মৎস্যবেধন, মৎস্যবেধসী, মৎস্যমাংস, মৎস্যরঙ্ক, মৎস্যরঙ্গ, মৎস্যসগন্ধী, মৎস্যা, মৎস্যাৎ, মৎস্যাদ্, মৎস্যাবতার, মৎস্যাশন, মৎস্যাশী, মৎস্যেন্দ্র (মৈচ্যান্দর), মৎস্যোদরী, মৎস্যোপজীবী, মদ্, মদ, মদক, মদকট, মদকরী, মদকল, মদকারী, মদখোর, মদগন্ধ, মদগন্ধা, মদগন্ধি, মদগল, মদগুরু, মদচ্যুৎ, মদজল, মদৎ, মদদ্বিপ, মদন, মদনকড়ি (মদনকৌড়ি), মদনকণ্টক, মদনকলহ, মদনকুন্ত, মদনক্লিষ্ট, মদনগত, মদনগৃহ, মদনগোপাল, মদনচতুর্দ্দশী, মদনতন্ত্র, মদনত্রয়োদশী, মদনদমন, মদনদলন, মদনদহন, মদনদাপুনি, মদনদ্বাদশী, মদনপক্ষী, মদনপীড়া, মদনবাধা, মদনমঞ্জরী, মদনমথন, মদনমদ, মদনমদোন্মাদ, মদনমহোৎসব, মদনমোহন, মদনমৌলি, মদনরস, মদনরসায়ন, মদনরিপু, মদনলতা, মদনলেখ, মদনলেখা, মদনশয়ান, মদনশিকলি, মদনসারিকা (ময়না), মদনা, মদনাতুর, মদনান্তক, মদনারি, মদনার্ত্ত, মদনালয়, মদনাসন, মদনী, মদনোৎসব, মদনোৎসবা, মদপটু, মদপ্রসেক, মদপ্রস্রবণ, মদবিহ্বল, মদব্যাধি, মদভঙ্গ, মদমত্ত, মদমন্থর, মদমুক্, মদমোহিত, মদয়ন্তী, মদয়িতা, মদয়িত্নু, মদর্থে, মদর্পিত, মদলেখা, মদস্থল, মদস্থান, মদস্রাব, মদস্রুতি, মদাতঙ্ক, মদাত্যয়, মদান্ধ, মদাবস্থা, মদালস, মদালসা, মদি, মদিকা, মদির, মদিরদৃক্, মদিরনয়ন, মদিরলোচন, মদিরা, মদিরেক্ষণ, মদিরাগৃহ, মদিরাশালা, মদিরাসব, মদিরোৎকট, মদী, মদীয়, মদেকসদয়, মদো (মদো-মাতাল), মদোৎকট, মদোৎকটা, মদোদগ্র, মদোদ্ধত, মদোন্মত্ত, মদ্বচন, মদ্বিধ, মদ্য, মদ্যপ, মদ্যপঙ্ক, মদ্যপীত, মদ্যবীজ, মদমণ্ড, মদ্যসন্ধান, মদ্র, মদ্রক, মদ্রনাথ, মদ্রপ, মদ্ররাজ, মদ্ররায়, মদ্রসুতা, মদ্রিকা, মদ্রী, মদ্রেশ, মদ্রেশ্বর, মদ্গুর, ময়না, ময়নামতী, ময়মত, ময়মত্ত, ময়মদ, মাকনা (মৎকুন), মাকন্দ (মৎকন্দ), মাকন্দী, মাগুর, মাচ, মাচাড়, মাছ (মা-my, mine-আচ্ছাদিত যাহাতে), মাছমাংস মাছরাঙা(ঙ্গা), মাছা, মাছাল, মাছুয়া, মেচুনী (মেছনী, মেছুনী), মেছুয়া, মেছো, মেছোহাটা, মাৎসর, মাৎস্য, মাৎস্যন্যায়, মাৎস্যিক, মাৎস্যেয়, মাত, মাতঙ্গ, মাতঙ্গকুমারী, মাতঙ্গজ, মাতঙ্গনক্র, মাতঙ্গপতি, মাতঙ্গমকর, মাতঙ্গমোতি, মাতঙ্গরাজ, মাতঙ্গিনী, মাতঙ্গী, মাতন, মাতরিশ্বা, মাতল, মাতলামি, মাতলি, মাতা (মত্ত, মেতে যাওয়া), মাতান, মাতামাতি, মাতাল, মাতালি, মাতি, মাতিয়া, মাতিল, মাতোআল, মাতোআর, মাতোয়ারা, মাতোয়াল(লা), মাদ (উন্মাদ), মাদক, মাদন, মাদনী, মাদনীয়, মাদ্র, মাদ্রবতী, মাদ্রাজ, মাদ্রাজি, মাদ্রাসা (মদ্‌রসহ্), মাদ্রী, মাদ্রীনন্দন, মাদ্রীপতি, মাদ্রীসুত, মাদ্‌রাজি, মাদ্রেয়, মৈচ্যান্দর (মৎস্যেন্দ্র), মৈৎস্য, মৈনা, মৈনামতি, মোচন্দর, যৌবনমদ।

মদ্ = পরিমিতের দান। **মদ** = পরিমিত সত্তার দান থাকে যাহাতে।

মত্ত (উন্মত্ত, প্রমত্ত, মাতল, মাতা, মাতান, মাতাল) : ১. ✓মদ্ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মত্ত** = *পরিমিতের তারণ তারিত যাহাতে।* **উন্মত্ত** = *উদ্-মার্গে (উঠে যাওয়ার মতো)* **মত্ত** *যে।* **প্রমত্ত** = *প্রকৃষ্ট* **মত্ত** *যে।* **মাতল** = *পরিমিতের আধার তারিত হইয়া লালিত যাহাতে।* **মাতা** = *পরিমিতের আধার তারিত যে আধারে।* **মাতান** = **মাতা** *অন (on) যাহাতে।* **মাতাল** = **মাতা** *লালিত যাহাতে।* ৩. **মত্ত** = মদ্যমদবিহ্বল, সুরাদিপানে বিকৃতমতি, অবিবেকী, প্রমত্ত, বাতুল, মদোৎকট, হৃষ্ট, মদযুক্ত, মদির, ক্ষরন্মদ বা মদস্রাবী হস্তী, মহিষ, কোকিল। **উন্মত্ত** = বায়ুজন্যচিত্ত-বিভ্রমযুক্ত, অতিমত্ত, ভূতাবেশাদি হেতু বিভ্রান্তচিত্ত, উগ্র, সুরাপানাদি হেতু বিকৃতবুদ্ধি, ক্ষুভিত। **প্রমত্ত** = প্রমাদযুক্ত, ব্যসনাসক্ত, শীলসংরক্ষণরহিত, অজিতেন্দ্রিয়, সুরাপানাদি হেতু অতিবিচেতন, সন্ধ্যাদিহীন, মদমত্ত (হস্তী)। **মাতল** = নেশায় চুর, মধুপানার্থ বিহ্বল, মদমত্ত, গর্ব্বমত্ত, উদ্রিক্ত, রণমত্ত। **মাতা** = মত্ত, বিহ্বল, মদমত্ত; মত্ত করা, বিহ্বল করা। **মাতান** = মত্ত করা, বিহ্বল করা। **মাতাল** = নেশায় চুর, মত্ত, উত্তেজিত, অধীর, মত্ত ব্যক্তি। (ব.শ.)। ৪. তিনটি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **মদ্** (= পরিমিতের দান) তারিত যাহাতে, সে **মত্ত** হয় কেন? সবাই জানেন, **মদ** খেলে **মাতাল** হয়। সেটি **মদ** শব্দের দৃশ্য অর্থ এবং **মাতাল**ও বাহ্যত দৃশ্য বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানের, ধনের, বলের, যশের **মদ** খেয়ে **মত্ত** হয়, সেও তো এক প্রকার **মাতাল**। হতে পারে ঐ **মদ**গুলি অদৃশ্য এবং তদ্রূপ **মত্ত**তা বাহ্যত স্পষ্টভাবে দৃশ্য হয় না। তা না হোক, কিন্তু যেমন **মদ**ই হোক না কেন, তা আত্মসাৎ করলে যে লোকে **মত্ত** হয়, মাতাল হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কাউকে 'মাতিয়ে দেওয়া'র অর্থ সেকারণেই কোনো কাজে বা ব্যাপারে এমনভাবে **মত্ত** করে দেওয়া যাতে মনে হয় সে **মাতাল** হয়ে গেছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হল, **মদ্** বা **মদ** জিনিসটি তাহলে কী? দ্র. **মদ**। ৬. ইংরেজি mad।

মত্য (মই, মদি, মদিকা) : ১. মত + য (যৎ)। (ব.শ.)। ২. **মত্য** = **মত** *(পরিমিতকরণ তারিত যাহাতে) থাকে যাহাতে।* **মই** = *পরিমিত (পরিমিতকরণ) চলে যাহাতে।* **মদি** = *পরিমিতি-দান গতিশীল যাহাতে।* **মদিকা** = **মদি** *করে যে, তাহার আধার।* / **মত্য** = যাহার দ্বারা কৃষ্টক্ষেত্র সমতলকরণ রূপ কার্য্য সাধন করা যায় (কৃষ্টক্ষেত্রসমীকরণসাধন ফলক)। (ব.শ.)। ৩. **মত্য** = চষা ক্ষেত সমতল করার কাষ্ঠফলক। **মই** = চষা ক্ষেত সমতল করার শিঁড়িবিশেষ (harrow), শিঁড়ি (ladder)। **মদি, মদিকা** = কৃষ্টভূমি সমীকরণার্থ কৃষিদ্রব্যবিশেষ, চাষের মই। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় **মই** শব্দটি যথার্থে প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. লাঙল চালালে ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে ফেলা হয়ে যায়; ফলত লাঙলের ফালে উথলে ওঠা মাটি উপর-নীচ হয়ে লাঙলের ফলার উভয় দিকে উঁচুনীচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে সমতল না করলে ধান ইত্যাদি বোনা যায় না। সেই জন্য চাষীরা চষা ক্ষেতে **মই** দেন (পাকা ধানে **মই** দেন না)। এর ফলে চষা-ভূমি যেমন সমতল হয়ে যায়, তেমনি পূর্বতন রূপ থেকে খানিকটা হলেও সংকুচিত হ'য়ে 'সীমায়িত' (= **ম**) হয়ে যায়। আর সেজন্যই যে বাঁশের তৈরি কৃষি-হাতিয়ারটির সাহায্যে ঐ 'সীমায়নের' কাজটি করা হয়ে থাকে, তাকে **মই, মত্য, মদি** ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। শব্দের ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, আদিতে **মত্য, মদি, মদিকা** এই তিনটি শব্দ দিয়েই হাতিয়ারটিকে

বোঝানো হত, পরে বাংলাভাষী সেই তিনটি শব্দকে **মদি**-রূপে আত্মস্থ করে নিয়ে **মই**তে উন্নীত করে নিয়েছে। উপরে **২.** দ্রষ্টব্য।

চষা জমি সমতল করার কাজে চাষীরা যে **মই** ব্যবহার করেন, সেটি সাধারণত দু'রকমের হয়ে থাকে। চওড়া একই (প্রায় ৮-৯ ইঞ্চি) হলেও প্রথমটি ছ-সাত ফুট লম্বা হয়। দুটি গরুর যে হাল, তাই দিয়ে এই **মই**টি টানানো হয় এবং তার দ্বারা কৃষ্টভূমি সমতল করা হয়। এইটি সম্ভবত **মদিকা** পদবাচ্য ছিল। দ্বিতীয়টি প্রায় ১০-১২ ফুট লম্বা হয়, সেটি টানতে দুটি হাল বা দু'জোড়া গরু লাগে। সেটিই সম্ভবত **মদি** পদবাচ্য ছিল। এই **মই** অনেক সময় সিঁড়ির মতো উপরে চড়ার জন্য ব্যবহার করা হয় ব'লে একে সিঁড়িও বলে। কিন্তু চাষের এই হাতিয়ারটিকে **মত্য, মদি** বা **মই** বলে মূলত সেটি মাটিকে সীমায়ন করার কাজে, সমতল করে খানিকটা হলেও সংক্ষিপ্ত (= **ম**) করার কাজে ব্যবহার করা হয় বলেই। আর তাছাড়া হাতিয়ারটি তৈরি হয় দুটি লম্বা আধ-ফালা বাঁশকে পাখি দিয়ে জুড়ে। এই দ্বৈততা থাকার কারণে তাকে শব্দার্থের নিয়মে **মদ্**-জাত শব্দ — **মত্য, মদি** ... ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করতে হয়।

তবে এসবই **মই** ... ইত্যাদি শব্দের দৃশ্য অর্থ। এর অদৃশ্য অর্থ ছিল, কোনো কিছুকে চেপে-চুপে সংকুচিত করা বা পরিমিত করা। সেই অদৃশ্য অর্থের মাত্র একটি উত্তরাধিকার আজও প্রচলিত রয়েছে; রয়েছে 'পাকা ধানে **মই** দেওয়া'র প্রবচনে। উদাহরণ স্বরূপ — 'রামবাবু এবারের নির্বাচনে লড়ছেন, জেতা নিশ্চিত। কিন্তু সম্প্রতি সিবিআই রামবাবুর গোপন কীর্তি ফাঁস করে তাঁর পাকা ধানে **মই** দিয়ে দিয়েছে।' এই বাক্যে কথিত 'পাকা ধান' এবং 'মই' দুটোই দেখা যায় না। কিন্তু বিষয়টি অদৃশ্য হলেও সমাজে সক্রিয়।

মৎ : ২. মৎ = *আমার (অন্য কাহারও নহে)।* **৩.** মদীয়, আমার। (ছা.অ.)। **৫. মৎ** শব্দের বর্ণভিত্তিক অর্থ হল 'পরিমিতের তারণ'। কিন্তু তাতে 'আমার' বোঝায় কীভাবে? পরিমিতের (= **ম**) তারণ (= **ৎ**) কথাটির বাস্তব রূপটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেই জানতে পারা যায় কেন **মৎ** বললে 'মদীয়' বা 'আমার' বোঝায়।

ধরা যাক, মূল সত্তাটি ক। তার সার বা মিত রূপ (= **ম**) হল খ। খ-এর নিজস্ব কোনো আধার নেই, থাকে না। ক থেকে বেরিয়ে সেই খ অতঃপর গ-সত্তার ভিতরে গিয়ে ঢুকছে। গ সেই খ-কে গ্রহণ করে ঘ-সত্তায় পরিণত হতে পারে, কিংবা খ-কে নতুন অবয়ব বা আধার দিয়ে ঘ-এ পরিণত ক'রে দিয়ে নিজে আগের মতোই পৃথক সত্তা রূপে থেকে যেতে পারে। (দ্র. **উত্তানপাদ**)। স্বভাবতই ঘ-এর ভিতর যেমন খ স্থান লাভ করে, তেমনি গ কিংবা গ-এর মিত রূপও আধার রূপে তাকে স্থান দিতে পারে। এমতাবস্থায় ক-এর দৃষ্টিতে খ হল ক-এর অংশ। সুতরাং ক খ-কে 'আমার' বলতেই পারে এবং বলেও। কিন্তু সমস্যা হল, খ তো কখনোই পৃথক অস্তিত্ব নয়। সে হয় ক-এর ভিতরে বাস করতে পারে কিংবা গ-এর অথবা গ-প্রদত্ত আধারের ভিতরে থাকতে পারে, আধারহীনভাবে একা একা থাকতে পারে না। ফলে, ক যখনই খ-কে 'আমার' বলে, তখনই তার ঘ-কেও 'আমার' বা **মৎ** বলা হয়ে যায়। অপরদিকে একই নিয়মে গ-ও ঘ-কে 'আমার' বা **মৎ** বলতে পারে। এখন যদি ক-কে **পুরুষ** এবং গ-কে **প্রকৃতি** বলি, তাহলে ঘ-কে **মৎ** বা 'আমার' — একথা **পুরুষ প্রকৃতি** দুই পক্ষই বলতে পারে। তার মানে, **মৎ** বা 'আমার' শব্দটি সাধারণভাবে একটি অধিকারবাচক শব্দ। সেই অধিকার অলীক নয়। সৃষ্ট বিষয় বা বস্তুতে স্রষ্টার মিত রূপ (= **ম**) বা জনকত্ব থাকেই, সেটিই সৃষ্ট বস্তুর উপর স্রষ্টার অধিকারের মূল; স্রষ্টা সে অধিকার দাবি করতে পারেন, না-ও পারেন। যেহেতু **পুরুষ-প্রকৃতি**র পরস্পরের সম্বন্ধে **বিশ্বে**র সকল বিষয় বা বস্তু জন্মায়, তাদের প্রত্যেকটির উপর **পুরুষ** ও **প্রকৃতি**র জনকত্বমূলক ও জননীত্বমূলক অধিকার থাকে। তাই প্রতিটি বিষয় বা বস্তুকে **পুরুষ** বা **প্রকৃতি** পৃথকভাবে **মৎ** বা 'আমার' বলতেই পারেন। **পুরুষ** বলতে পারেন, 'এটি 'আমার', **প্রকৃতি**ও বলতে পারেন, 'এটি আমার'। অর্থাৎ **মৎ** এমন একটি শব্দ, যা বাস্তবায়িত হতে গেলে কমপক্ষে একটি বিষয় বা বস্তুকে চাই যাকে **মৎ** বা 'আমার' বলা যাবে; এবং একজন **পুরুষ** কিংবা **প্রকৃতি**কে চাই যিনি সেটা বলবেন।

[কিন্তু মানুষের সমাজে এই নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে **দক্ষযজ্ঞে**র পরবর্তী কাল থেকে। আর, তাতেই সমস্যার সূত্রপাতও হয়ে যায়।

সনাতন যুগে সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে **পুরুষ** ছিলেন **শিব**। তাঁকে অস্বীকার করে **দক্ষ** সেই সমাজ-পরিচালক **পুরুষ**-এর স্থান দখল করেন এবং বহু কাণ্ডের পর বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয়ে যায়। **দক্ষ** ঘোষণা করেন — সমগ্র উৎপাদিত সত্তাটিই **মৎ** বা 'আমার', আর কারও নয়; কেননা, তার ভিতরে 'আমার' অংশ বিদ্যমান রয়েছে। ফলত, মাঠে খাটে প্রযুক্ত মেধাশ্রমের উপর দাবির জোরে মাঠ-জাত ধান গম ইত্যাদি ফসল কিংবা কাঠ-জাত আসবাব ইত্যাদি কারুজ-ফসলের উপর মেধাশ্রমের দাতা **দক্ষ**মানুষ তার নিজের অধিকার দাবি করে বসে। সে বলে, "এই ধান গম গরু ঘোড়া, খাট, পালঙ্ক ... সবই 'আমার'; অন্য কারও নয়। কেননা, এগুলিতে আমার মেধা-শ্রম ঢুকে রয়েছে।" ফলত, **দক্ষ**মানুষের নিঃসারিত আপন সত্তার একটি সীমায়িত রূপের উপর আপন অধিকারের জোরে বহু বস্তুকেই **দক্ষ**মানুষ **মৎ** বা 'আমার' বলা শুরু করে দেয়। (অন্যদিকে হিন্দি ভাষাভাষীরা **মৎ** শব্দের 'না, কারও নয়, আমার' অর্থটিকে নিয়ে গিয়ে প্রতীকী ও একার্থক করে নেয় — 'না, কারও নয়'।)

কিন্তু এর ফলে **মৎ** বা 'আমার'-বোধের বা মানুষের অধিকার বোধের গোড়াতেই একটা গলদ থেকে যায়। **পুরুষ-প্রকৃতির** যোগে যে **পুত্র** জন্মায় তার উপর **পুরুষে**র অধিকারের মতো **প্রকৃতি**র অধিকারও থাকা উচিত ছিল। **মৎ** শব্দটিও বলছে, যে, ক-সত্তা তার মিত রূপটি নিজের কাছে রাখে না, অন্য সত্তার দিকে পাঠায় এবং সেই সত্তা ক-এর মিত রূপটিকে নিজের বা নিজের মিত রূপের অবয়ব বা আধার দিয়ে অস্তিত্বলাভ করবার উপায় করে দিচ্ছে। সুতরাং **প্রকৃতি**র অধিকারও থাকা উচিত। ঠিক এখানেই সেই অনাদিকালের প্রশ্নটি উঠে আসে। অকৃত্রিম-**বিশ্বে**র (= **প্রকৃতি**র) উপর মানুষ (= **পুরুষ**) যে কৃত্রিম-**বিশ্ব** বানিয়েছে, তার উপর শুধু কি মানুষেরই (= **পুরুষেরই**) অধিকার? অকৃত্রিম-**বিশ্বে**র (= **প্রকৃতি**র) কি কোনো অধিকারই নেই? পুত্রের উপর ক্ষেত্ররূপিণী মাতার কি কোনো অধিকার নেই? আজকের মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মূল ত্রুটির উপর, এই ত্রুটিপূর্ণ 'আমার' নামক

অধিকারবোধের উপর, **মৎ**-এর উপর। দ্র. **মৎস্য, মান**।]

মৎক (মৎকর্ম্ম, মৎকৃত, মৎপরায়ন, মৎসদৃশ) : **১.** অস্মদ্ + ক (কন্)। (ব.শ.)। **২. মৎক** = *আমার (দ্বারা) করা (হইয়াছে যাহা)।* **৩. মৎক** = মৎকৃত, মৎস্বামিক, মৎকুণ, ছারপোকা। (ব.শ.) মদীয়, মৎসম্বন্ধীয়, ছারপোকা, মৎকুণ। (ছা.অ.)। **মৎকর্ম্ম** = আমার কর্ম্ম। **মৎকৃত** = আমার দ্বারা কৃত। **মৎপরায়ণ** = আমার উপর নির্ভরশীল। **মৎসদৃশ** = আমার মতো দেখতে। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. মৎ** শব্দের অর্থ কীরূপ ছিল, তা দেখানোর জন্য এই কয়টি শব্দ এই ভুক্তিতে রাখা হল।

মৎস (মৎসর, মৎসরী, মাৎসর্য্য) : **২. মৎস** = *আমার অস্তিত্ব (অস্তিত্বের যৎকিঞ্চিৎ, অংশ, নির্য্যাস। দ্র.* **স**) *যাহাতে।* **মৎসর** = **মৎস** *রহে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা অন্যের শুভ, সম্পত্তি, শ্রী, উৎকর্ষ ... ইত্যাদি সইতে পারে না।* **৩. মৎস** = মৎস্য। **মৎসর** = মৎসরবান, ঈর্ষী, কৃপণ, অন্যশুভদ্বেষ, পরসম্পত্তি অসহন, পরশ্রী-বিদ্বেষ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ অসহন, বৈর, শত্রুতা, লোভ, লোকনিন্দাজন্য আত্মধিক্কার। **মৎসরী** = মৎসর, উৎকর্ষ অসহন, দ্বেষবান, বৈরযুক্ত, লোভবান, লোলুপ। **মাৎসর্য্য** = পরগুণদ্বেষ, দ্বেষ, প্রতিকূলতা। (ব.শ.)। **৪. মাৎসর্য্য** শব্দটি 'পরগুণ-দোষ' অর্থে কখনো-সখনো শোনা যায়, অন্যথায় সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলির মূল কথা বা নিহিত অর্থ হল, 'আমার' 'আমার' করা, আপন অধিকার বিষয়ে অতি সচেতন হওয়া। কেননা, বিষয় বা বস্তুটিতে 'আমার' মিত রূপ (= **ম**) তারিত (= **ৎ**) হয়ে স্থান লাভ করে রয়েছে। স্বভাবতই এই নিহিতার্থে লক্ষণার্থ হয়ে যায় — অন্য কারও শুভ, সম্পত্তি, উৎকর্ষ, শ্রী, গুণ ইত্যাদি দেখলে সইতে না পারা। তবে, শব্দের নিহিত অর্থের চেয়ে লক্ষণার্থই এই শব্দের ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে।

মৎস্য (মাছ) : **১.** ✓মদ্ + স্য (স্যন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মৎস্য** = *আমার অস্তিত্ব (অস্তিত্বের যৎকিঞ্চিৎ, অংশ, নির্য্যাস) থাকে যাহাতে; অর্থাৎ 'এটি আমার' — এই বোধ থাকে যাহাতে।* **মাছ** = *পরিমিতের আধার আচ্ছাদিত যাহাতে বা যে বোধে।* **৩. মৎস্য** = মীন, শল্কী, মাছ, বিষ্ণুর মীনাবতার, মৎস্যপুরাণ, মীনরাশি, মৎস্যদেশ, বিরাটরাজ্য, মৎস্যদেশের রাজগণ, মৎস্যদেশবাসিগণ, মৎস্যরাজ বিরাট। **মাছ** = মৎস্য। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র fish অর্থে শব্দ দুটি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মিষ, আমিষ, নিমিষ, নিরামিষ, মাংস**। উপরে **মৎ** শব্দে আমরা দেখেছি, তা কেমন করে 'আমার' বোঝায়। সেই "**মৎ** (বা 'আমার') **স** (অস্তিত্ব বা তার অংশ) থাকে যাহাতে", তাকে **মৎস্য** বলে। (উপরে **২.** দ্রষ্টব্য।) তার মানে, 'এটি আমার, এই বোধ থাকে যাহাতে', ব্যক্তিমানুষের সেই 'বোধ'কে বলে **মৎস্য**। শব্দার্থের নিয়মে সেই 'বোধ' আছে যার, তাকেও **মৎস্য** বলে। অর্থাৎ, 'আমার-বোধ'কে যেমন **মৎস্য** বলে, সেই বোধের অধিকারী মানুষকেও **মৎস্য** বলে। একালের ভাষায় এদের যথাক্রমে **ব্যক্তিমালিকানা** ও **ব্যক্তিমালিক** বলা হয়। (দ্র. **মাল**)। তার মানে, ব্যক্তিমালিক ও ব্যক্তিমালিকানা উভয়কে সেকালে বলা হত **মৎস্য**।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা **মৎস্য** শব্দটি তৈরি করেছিলেন fish-কে চিহ্নিত করার জন্য নয়, তাকে তো আঙুল তুলেই দেখিয়ে দেওয়া যায়; তৈরি করেছিলেন, 'এটি আমার', 'এর ভিতরে আমার সত্তার অংশ রয়েছে', এই 'বোধ'কে উল্লেখ করতে এবং যারা সেই বোধের অধিকারী তাদের শনাক্ত করতে। (একই রীতিতে **মাংস** শব্দটিও প্রস্তুত করা হয়েছিল। দ্র. **মাংস**।) সাদৃশ্যে সেটি বাহ্যলোকের **মাছ**কে বা fish-কেও বোঝানো হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা, মানবসমাজে 'অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয়' **ব্যক্তিমালিকানা** ও **ব্যক্তিমালিক**কে বোঝাতেই তাঁরা **মৎস্য** শব্দটি তৈরি করেছিলেন, কিংবা বলা ভাল, তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর, মানবসমাজে কীভাবে সেই **মৎস্যে**র বা **ব্যক্তিমালিকানা**র জন্ম হল, তার বাড়বৃদ্ধি হল এবং একদিন সমগ্র মানবসভ্যতাকে **ব্যতিব্যস্ত** করে তুলল, সেই সমগ্র ইতিহাসটাই তাঁরা লিখে গেলেন **মৎস্য**-যুক্ত শব্দগুলির সাহায্যে — **মৎস্যগন্ধা, মৎস্যাবতার**-এর কাহিনীতে, **মৎস্যপুরাণ**-এ। আমরা **মৎস্য** শব্দের সেই সমস্ত অর্থ ভুলে গিয়ে মনে রেখেছি শুধুমাত্র তার সাদৃশ্য অর্থটিকেই, fish-কেই। এও সেই **পাদোদক-মূঢ়তা**র ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ বারংবার এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, পাশ্চাত্যকে আমাদের যা দেওয়ার ছিল, তা আমরা দিতে পারছি কি না। **ব্যক্তিমালিকানা**র উদ্ভবের এই ইতিহাসটি পাশ্চাত্যের নেই, এইটি আমাদের দেওয়ার কথা ছিল, **পাদোদক-মূঢ়তা**র কারণে আমরা নিজেরাই সেটি ভুলে গিয়ে **মৎস্য** বলতে শুধুমাত্র জলচর জীবটিকে বুঝেছি। তাই **ব্যক্তিমালিকানা**র উদ্ভবের ইতিহাসটা আমরা তাঁদের দিতে পারিনি। ফলত, সেই ইতিহাসের অভাবে গোটা মার্কসবাদটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশ্য একথাটিও এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, **ব্যক্তি-মালিকানা**র উদ্ভবের এই ইতিহাসটি যদি মার্কস জানতে পারতেন, সমাজের পরবর্তী বিকাশের ব্যাপারে তাঁর নিদান-বিধানগুলিই অন্যরকম হত।

যাই হোক, আজ এমন একটা অদ্ভুত সময়ে আমরা বাস করি যখন আমাদের সমাজটি এই প্রশ্নে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। একদল মনে করেন, **ব্যক্তিমালিকানাই** সকল প্রকার সামাজিক অহিতের মূল, মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখ দুর্দশার কারণ, যত নষ্টের গোড়া। অপর দল মনে করেন, **ব্যক্তিমালিকানা** আছে বলেই সমাজটি টিকে রয়েছে, এগিয়ে চলেছে, ব্যক্তিমালিকানাই মানুষকে উদ্যোগী করে, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির ও বিকাশের প্রেরণা যোগায়। তাঁদের মতে, ব্যক্তিমালিকানা না থাকলে সমাজের অগ্রগতি ঘটবে না, ঘটত না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে গড্ডলিকা-প্রবাহে পড়ে সমাজটি ধ্বংস হয়ে যেত। ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

মৎস্য শব্দের অর্থ কিন্তু আমাদের জানাচ্ছে, উপরোক্ত দু-দলের বক্তব্যই ভুল। যা সত্যি, বাস্তব, কার্যকরী, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত, তাকে অস্বীকার করা প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। আপনি যদি একটি মাটির কলসি বানান, কিংবা একটি নতুন সঙ্গীত রচনা করে শোনান, সেই কলসিতে বা সেই গানে আপনার মেধা-শ্রম অবশ্যই ঢুকে পড়ে। (দ্র. **ময়, মায়া**)। সেই মেধা-শ্রম যত

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই হোক না কেন, সে তো আপনারই অংশ, আপনারই **স্ব-ত্ব**, আপনারই মিত ও তারিত সত্তা বা **মৎস**। এবং সে তো সেই কলসিতে বা গানে অবশ্যই ঢুকেছে; অন্যথায় কলসিটি নির্মিত হত না, গানটি শোনা যেত না। সুতরাং কলসি বা গানে আপনার অধিকার বা মালিকানার বোধ অর্থাৎ **মৎস্য**-বোধ থাকবেই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের কারণে সে-বোধ আপনি ত্যাগ করতে চাইলেই ত্যাগ করা যাবে না; বড়জোর বদলে নেওয়া যেতে পারে, তা সে দাম নিয়ে হোক আর মানসিক (ঐশ্বরিক) ঐশ্বর্য নিয়েই হোক। মোটকথা আপনার যে মেধা-শ্রম কলসি বা গানে নিষিক্ত হয়েছে, আপনার সেই **স্বত্ব** আপনি অস্বীকার করবেন, পরমাপ্রকৃতি সে উপায় রাখেননি। আপনি যদি কিছুতেই আপনার মেধা-শ্রমের **স্বত্ব**-মূল্য গ্রহণ করতে না চান, এবং আদৌ গ্রহণ না করেন, প্রকৃতি আপনার উপর শোধ নেবে আপনাকে আপনার **স্বত্ব**-মূল্যের পরিমাপে মানসিকভাবে উপরে তুলে দিয়ে। আপনি চান বা না-চান, সমাজে, মানুষের মনে, এমনকি আপনার নিজের মনেও আপনি আপনার অজ্ঞাতসারে ততখানি উপরে উঠে যাবেনই, যতখানি **স্বত্ব** আপনি বিনিময়ে কিছু না নিয়ে দান করবেন; এমনকি কিছু না নেওয়ার গর্বে গর্বিত বা অহঙ্কারীও হয়ে যেতে পারেন! এ ব্যাপারে পরমাপ্রকৃতি বড়ই নির্মম। প্রতিটি ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া তিনি ঘটাবেনই। আপনি যা দেবেন, তার পাই-পয়সা দাম তিনি চুকিয়ে দেবেনই; যেভাবেই হোক। আপনার কোনোরকম ত্যাগ-চেষ্টাই তাঁকে নিরস্ত করতে পারবে না। যে ব্যক্তি নিজের মিত রূপ প্রবেশ (= **মৎ**) করিয়ে নতুন **বিশ্ব** বানিয়েছেন, তাঁকে তাঁর মিত রূপের দাম নিতেই হবে, তাঁর **মালিকানা**-**স্বত্ব** ভোগ করতেই হবে, **মৎস্য**-ভক্ষণ করতেই হবে, প্রকৃতিতে তার অন্যথা হয় না, হবে না কোনো দিনও। সুতরাং যাঁরা **ব্যক্তিমালিকানা**র বা **মৎস্য**-এর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে, **ব্যক্তিমালিকানা** বা **মৎস্য** এক বাস্তব সত্য। তাকে অস্বীকার করলে প্রকৃতির নিয়ম লঙঘন করা হয়। আর সেজন্যই সে চেষ্টা কখনোই সফল হয় না। **ব্যক্তিমালিকানা** বিরোধী রাজনৈতিক-সামাজিক-দর্শনগুলি তাই কার্যত ভুয়া দর্শন।

আর যাঁরা মনে করেন ব্যক্তিমালিকানাই সব, **মৎস্যাবতার**ই একমাত্র **অবতার**, তাঁরাও অত্যন্ত ভুল কথা বলেন। অকৃত্রিম-**বিশ্বের** উপর মানুষ যে কৃত্রিম-**বিশ্ব** বানিয়েছে, তাতে অকৃত্রিম-**বিশ্বের**ও যোগদান আছে, অধিকার আছে, **স্ব-ত্ব** আছে। মানুষের শহর-নগর-গ্রামগুলির উপর, সর্বপ্রকারের উৎপাদনের উপর, সর্বপ্রকারের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের উপর শুধুমাত্র মানুষের স্ব-ত্ব নেই, মালিকানা নেই, ভূমি-সমুদ্র-পাহাড়-নদী-আকাশেরও যোগদান আছে, মালিকানার অধিকার আছে; জ্ঞানীর জ্ঞানের উপর অজ্ঞানীরও মালিকানার অধিকার আছে; ধনীর ধনের উপর নির্ধনেরও মালিকানার অধিকার আছে — আছে ততখানি, যতখানিতে তাদেরও যোগদান রয়েছে। দ্র. **মৎ**। কেষ্টা-বেটার যোগদান না থাকলে রবিঠাকুরের *'পুরাতন ভৃত্য'* জন্মাতেই পারত না। দিনমজুরের যোগদান না থাকলে জমিদারের ধান-গম কিংবা খনিদারের কয়লা-লোহা জন্মাতেই পারত না। আকাশ বাতাস নদী সমুদ্র পাহাড় বনাঞ্চল মরুভূমি ও ভূমি না থাকলে আপনি শহর গড়তেন কোথায়? ভূমি ও বাতাসের যোগদান না নিয়ে একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক শহর গড়ে দেখান তো একবার! অতএব, জ্ঞানীর বা ধনীর **ব্যক্তিমালিকানা**ই সব — একথা যাঁরা বলেন, তাঁরাও সত্য বলেন না। এই **বিশ্ব**ব্যবস্থায় **পুরুষে**র যতখানি অধিকার, **প্রকৃতি**রও ঠিক ততখানি অধিকার, তা সে **প্রকৃতি** জড়-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, জীবনদাস-প্রকৃতি (শ্রমিক-মজুর ইত্যাদি) যেই হোক না কেন। ভোলা চলে না যে, **পুরুষ** তার মিত রূপ (= **ম**) তারিত করে (= **ৎ**) তাকে **প্রকৃতি**র গর্ভে আপন অংশস্বরূপ (= **স**) রেখে সেই **প্রকৃতি**র দেওয়া অবয়বে (= য) মুড়ে তবেই এই **বিশ্ব** সৃষ্টি করেছে। অতএব **মৎস্যে** বা **ব্যক্তিমালিকানা**য় কেবল **পুরুষে**র অধিকার নেই, **প্রকৃতি**রও সমান অধিকার রয়েছে। ...

যাই হোক, আমরা ব্যক্তিমালিক-**মৎস্য** ও জলচরজীব-**মৎস্য**, এই দুই প্রকার **মৎস্যের** খবর পেলাম বটে, কিন্তু তাদের বিষয়ে আমরা কত কম জানি, উপরোক্ত **মদ্** ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত অজস্র **মৎস্য**-যুক্ত শব্দের মুখোমুখি হলেই টের পাওয়া যায়। ঐ শব্দগুলির ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থগুলির সবটাই আমরা ভুলে গেছি, মনে থেকেছে কেবল তাদের সাদৃশ্য অর্থরূপে জলচরজীব-**মৎস্যে**র কথা। তাও সেই সাদৃশ্য-**মৎস্য** বিষয়েও যে আমরা কত কম জানি, যে কোনো অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীকে — তিনি কতগুলি মাছের নাম জানেন এবং সেগুলিকে চেনেন — সেকথা জানতে চাইলেই টের পাওয়া যেতে পারে। মাছ যে কতরকম হয়, তাদের নামের বৈচিত্র্যে তাদের স্বভাবগুলিকে কীভাবে আমাদের পূর্বসূরিরা শনাক্ত করে রেখে গেছেন, তার বিশেষ কিছুই জানি না আমরা; যদিও নাম ও স্বভাবগুলির কিছু কিছু খবর রাখেন আমাদের মৎস্যজীবী জেলে-মানুষেরা। অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে সবই পেয়েছিলাম আমরা। পুরাণাদি গ্রন্থে সেসব কথা তো লিখিত আছেই, যদিও তার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক বর্ণনার মানে বুঝবার কৌশল আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেসবের প্রায়োগিক রূপের উত্তরাধিকার আমাদের স্বভাবের ভিতরে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আজও কমবেশি প্রবাহিত আছে, আছে অতীত-বিচ্ছিন্ন প্রথা, প্রবচন, অভ্যাস ইত্যাদি রূপে।

অপরিমিত টাকার মালিককে আমরা আজও বলি 'লোকটা টাকার কুমীর' (দ্র. **কুম্ভীর**), অথবা 'লোকটা ঘোড়েল লোক'। (ঘোড়েল হল **ঘড়িয়াল**, এক জাতের ছোট কুমীর।) কিংবা বলা হয়, 'ও হল রাঘব বোয়াল'। শুধু তাই নয়, ধনী মানুষদের উল্লেখ করতে গিয়ে এমনও বলা হয় — 'যারা সামনে দাঁড়িয়ে ফটর ফটর করছে, ওরা তো চুনোপুঁটি, যারা গভীর জলের মাছ, রুহ**কাৎলা**, তারা কিন্তু চুপচাপ!' আর, জ্যেষ্ঠ-ধনী যখন কনিষ্ঠ-ধনীকে গ্রাস করে ফেলে, আমরা বলি, 'বড় মাছ ছোট মাছকে এভাবেই খায়; এটাই তো **মাৎস্যন্যায়**!' আবার, এক ব্যক্তিমালিক বা **মৎস্য** যখন অন্য-ব্যক্তিমালিকের ধনসম্পত্তি দেখে সইতে পারে না, হিংসা-দ্বেষ বা ঈর্ষা করে, আমরা বলি, এটাই **মৎসর**। এই **মাৎসর্য** ভালো নয়। ...

কৌতূহল হতে পারে — সত্যিই তো! আমাদের ভাষায়, ধনসম্পদের মালিকদের শনাক্ত করতে এভাবে জলজ প্রাণীদের উল্লেখ করা হয় কেন? ব্যক্তিমালিক-মানুষের সঙ্গে জলজ প্রাণীদের কি কোনো সম্পর্ক ছিল? সে-সম্পর্কের কথা কি আমরা ভুলে গেছি?

অথচ দেখা যাচ্ছে, আমাদের ভাষায় এখনও তার অজস্র ছায়া থেকে গেছে! সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ভাষায় উপরোক্ত শব্দগুলির প্রচলন থেকে বোঝা যায়, ধনসঞ্চয় বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট বিরাগমূলক ধারণা ছিল; এবং সেরকম বিরাগ না-থাকলে ওই শব্দগুলি ব্যবহারও করা যায় না। তাহলে কি, ধনসম্পত্তি বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো কারণে ওইরূপ বিরাগমূলক ধারণা অর্জন করেছিলেন? ধনসম্পত্তির প্রতি সেই বিরাগ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা আজও কি বহন করে নিয়ে চলছি?

আমাদের নিবেদন এই যে — এরকম কৌতূহল যদি আপনার হয়, জানবেন তা খুবই যথার্থ। কেননা, এ-ও আমাদের এক প্রাচীন উত্তরাধিকার। আদিম যৌথসমাজের স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত সেকালের 'সম্প্রদায়'-এর জনসাধারণকে তখন **জল**ও বলা হত। সেই **জলে**র ভিতরে যার যার কমবেশি ধনসম্পত্তি হয়েছে, তাদের সাধারণভাবে বলা হত **মৎস্য**; যাদের সেই ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ খুবই কম তাদের বলা হত চুনোপুঁটি; যাদের যথেষ্ট সম্পত্তি তারা রুই**কাৎলা**। আর, অন্যদের সম্পদ হরণ করে যাদের প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে, তাদের বলা হত রাঘব-বোয়াল। তবে, যাদের সম্পত্তি অন্য **মৎস্য**দের পক্ষে রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, তাদের বলা হত **ঘড়িয়াল** বা ঘোড়েল এবং যারা একেবারে **কুম্ভে**র বা 'নিজস্ব সম্পদাগার'-এর মালিক, তাদের বলা হত **কুম্ভীর** বা কুমীর। এই সেই প্রাচীন সময়, যখন আমাদের প্রাচীন যৌথসমাজে সর্বপ্রথম **নগদ-নারায়ণের** বা পুঁজির আবির্ভাব ঘটেছিল **মৎস্যাবতার** রূপে। আর, সেই কাহিনী আমাদের পূর্বপুরুষেরা লিখে রেখে গেছেন মৎস্যাবতারের কাহিনীতে, **মৎস্যপুরাণ**-এ। (এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে আমাদের 'খ' গ্রন্থে। দেখানো আছে যে, আমাদের 'টাকার-কুমীর' ... ইত্যাদি বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের ছায়া এখনও কত স্পষ্টভাবে ধরে রাখা আছে।)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত **পুরাণা**দির অর্থ ভুলে গেলেও আমাদের অবচেতনে এবং ভাষা-ব্যবহারের অভ্যাসে সেই **মৎস্য** এখনও পুরোপুরি বিদ্যমান। তবে সবচেয়ে অবাক হতে হয় ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ভোজনপ্রথায় **মৎস্যে**র উত্তরাধিকার কতখানি প্রবহমান তা দেখে। **মৎস্য** তো দুরকম — ব্যক্তিমালিক-**মৎস্য** এবং জলচরজীব-**মৎস্য**। এই দুই **মৎস্য**কে নিয়ে সাধারণ ভারতবাসী মহা সমস্যায় পড়েছিলেন। সনাতন সভ্যতার বুক চিরে **দক্ষযজ্ঞে**র মাধ্যমে বৈদিক যুগের সূচনা তো হয়ে গেল। কিন্তু **বেদ**-এর বা জ্ঞানের **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা করে বৈদিক যুগের ঐপ্রকার সূচনা তার স্বভাববশতই যৌথসমাজের ভেতরেই ব্যক্তিমালিকের বা **মৎস্যে**র উদ্ভবকে অনিবার্য করে তুলল। বেদবাদী মহর্ষিরা দেখলেন, **ব্যক্তিমালিকানা**কে যদি ঠেকানো না যায় তাঁদের সাধের বৈদিকব্যবস্থাটিই (বা আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিই) ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে (চীনদেশে যেমন একসময় বারুদ আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বারুদের ব্যবহারের উপর কঠোর নিষেধ জারি হয়েছিল, কারণ তাঁদের সমাজ পরিচালকেরা দেখে ফেলেছিলেন যে, ঐ বারুদের ব্যবহার তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ভেঙে ফেলবে), ঠিক সেইরকম ভাবে বৈদিক সমাজের পরিচালকেরাও সিদ্ধান্ত নেন — **ব্যক্তিগত মালিকানা** ভোগ করা যাবে না, **মৎস্য** ভক্ষণ করা যাবে না। অতএব **মৎস্যভক্ষণ** নিষিদ্ধ হয়ে গেল। **ব্যক্তিমালিকানা**-রূপ **মৎস্য**কে ভোগ করা চলবে না, সাদৃশ্যে জলচরজীব-**মৎস্য**কেও ভোগ করা চলবে না। ভারতবর্ষ মানসিক ও দৈহিক উভয়ভাবে নিরামিষাশী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল। (**আমিষ-নিরামিষ** বলে কোনো ধারণা পাশ্চাত্যের নেই, শব্দও নেই। ইংরেজ বলে vegetable, non-vegetable। **আমিষ-নিরামিষ** কী বস্তু, তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, পারবেও না কোনোদিন। দ্র. **মৎস্যগন্ধ**।)

কিন্তু তাতেই ভবি ভোলে না। একবার যখন **শিব**কে (= generalisation-কে) সরিয়ে **দক্ষ**কে (= specialisation-কে) বসিয়ে বৈদিক সমাজের সূত্রপাত করে ফেলেছ, একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিকে মাথায় তুলেছ, এবার তো এক এক করে তার পর্যায়ক্রমিক ঘটনাগুলি ঘটবেই; **মহান** মানুষ চাষিমানুষ, জেলেমানুষ, তাঁতিমানুষ, বদ্যিমানুষ ... ইত্যাদিতে পরিণত হবেই, তাদের উৎপাদিত উৎপন্ন **পণ্যে** পরিণত হবেই, বিনিময়ের সূচনা হবেই, **ব্যক্তিমালিক** জন্মাবেই, লোকে **মৎস্য** ভক্ষণ করবেই ...! এখন তো আর বলা চলবে না যে, 'আমি রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন করিব, (কিন্তু) হাঁড়ি ছুঁব না।' হাঁড়ি তো ছুঁতেই হবে, কলঙ্কের কালি তো লাগবেই।

ফলত, **মৎস্যভক্ষণ** নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উভয় প্রকার **মৎস্যভক্ষণ** বাধাপ্রাপ্ত হয়েও গোপনে চলতে শুরু করল; **উদ্ভিদের** উদ্ভবকে পাথর চাপা দিলে সে যেমন উপরের বাধাকে এদিক ওদিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে খঞ্জরূপে, বিকৃতরূপে, **পাণ্ডু**রূপে উদ্ভূত হতে থাকে, ঠিক সেভাবে। প্রাচীন ভারতের **ব্যক্তিগত মালিকানা** ভোগ করা ও জলচরজীবটিকে ভোগ করা প্রথম প্রথম ঠিক সেভাবেই চোরা-গোপ্তা ভাবে চলতে লাগল। সেই অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধযুগের রামরাজত্বে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গেলেও হিন্দুযুগে পুনরায় নিন্দিত হয়ে যায়। তারপর মোগলযুগ, ব্রিটিশযুগ পেরিয়ে **নিরামিষাশী** ভারতীয় উপমহাদেশের **মৎস্যভক্ষণ** কী বিচিত্র রূপ নিয়েছে দু-চারটি উদাহরণ দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'আমার' 'আমার' করা, শুধুই নিজের কোলে ঝোল টানা, বহু বস্তুর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করা, পুঁজিপতি হওয়া, সুদ, ঘুষ, উৎকোচ ইত্যাদি খাওয়া — এ-সবই হল মানসিক-**মৎস্য** ভক্ষণ। আর, রুই কাৎলা ইলিশ ... প্রভৃতি জলচর জীবকে খাওয়া হল দৈহিক-**মৎস্য** ভক্ষণ। প্রায় দু-হাজার বছর পেরিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষীয় বাস্তবে দেখা যাচ্ছে — একদল হয়তো দৈহিক-**মৎস্য** ভক্ষণ করেই না, সাচ্চা নিরামিষাশী, কিন্তু মদ্যপ মাতালের মতো মানসিক-**মৎস্য** ভক্ষণ-এ চব্বিশ ঘণ্টা ডুবে রয়েছে — যেমন মাড়োয়ারি ব্যবসাদার, তিলককাটা ঘুষখোর বা সুদখোর, বামপন্থী প্রমোটার বা ব্যবসাদার। কাউকে দেখা যাচ্ছে, সে দৈহিক-**মৎস্য** ভক্ষণ করে, মাছমাংস যা পায় তাই খায়, কিন্তু কদাপি মানসিক-**মৎস্য** ভক্ষণ করে না — যেমন সুফীরা, আদিবাসীরা, **মৈথিলী** ব্রাহ্মণেরা। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আদিবাসী (সাঁওতাল কোল মুণ্ডা প্রমুখ তথাকথিত 'সিডিউলড-ট্রাইব'রা) মানুষেরা, অধিকাংশ মুসলমান ও বঙ্গভাষীজন এই দলে পড়েন। (এঁদের মানসিক-**মৎস্য** ভোগ করার যোগ্যতা নেই বলেই এঁরা মানসিক-**নিরামিষাশী** — একথা

কেবল আকাট মুখ্যুরাই ভাবতে পারে, মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই।) বলতে কী, সমগ্র গুজরাট যেখানে বাহ্যিক-**নিরামিষ** খেয়ে মানসিক-**মৎস্য** ভক্ষণ করে বা ধনের সাধনা করে, বাংলা সেখানে বাহ্যিক-**মৎস্য** ভক্ষণ ক'রে মানসিকভাবে **নিরামিষ** খাওয়ার চেষ্টা করে বা জ্ঞানের সাধনা করে। গুজরাট ও বাংলার মধ্যেকার এই পার্থক্যের একটা প্রমাণও পাওয়া গেল সম্প্রতি। আমরা দেখলাম, আমাদের বঙ্গদেশ মহা-**আমিষাশী**-টাটাবাবুর ন্যানোকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনা করেছে, এবং গুজরাট সেই ন্যানোকে স্বাগত জানিয়ে বেশ খুশি হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মগুলি তাদের সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় এখানকার মানুষদের মনের মাটি এমনভাবে পরিশীলিত করে দিয়েছে যে, ভারতের মানসিক-**নিরামিষাশী** চরিত্রটি এখনও প্রায় অটুট।

যাই হোক, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা কত অনুভবশীল মানুষ ছিলেন, তাঁদের তৈরি করা **মৎস্য** শব্দের ইত্যাকার উত্তরাধিকার আজও সেকথা সগৌরবে ঘোষণা করছে। আরও অজস্র বিষয় এখন আমাদের চোখে পড়ছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আদিম যৌথসভ্যতায় যাঁরা সর্বপ্রথম একটু একটু ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন, **বসু** হয়ে উঠছিলেন, **বসুমৎ** (**বসুমদ্**) হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও পুরোপুরি **বসু** হতে পারেননি, তাঁরাই একদিন আদিম যৌথসমাজের কাল হয়ে দেখা দেন। তাঁদের নাম স্বভাবতই হয়ে যায় **কালবসু**। পরে সেটির সাদৃশ্যে একটি মাছেরও নাম দেওয়া হয়েছিল। একালে তাকে 'কালবোস' বলা হয়ে থাকে। মানবমনের **মৎস্য**বোধের স্বভাব ধরে ধরে তাঁরা সেগুলির নামকরণ করেন এবং সেগুলির সাদৃশ্যে বাহ্যিক মাছেদের স্বভাব বুঝে বুঝে এক এক করে তাদেরও চিহ্নিত করেন। এসব বিষয়ে পৃথকভাবে গবেষণা হওয়া উচিত।

মৎস্যকেতু : ৩. কামদেব। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কিন্তু একথা বুঝতে তো আজ আর কোনো অসুবিধা হয় না যে, মানুষের মনে বসবাসকারী **কামদেবই** সেই সত্তা, **মৎস্যই** যার **কেতু**। আজকের গোলোকায়িত মানবসমাজে এই **মৎস্যকেতু**ই তো সর্বেসর্বা। টাকা চাই, টাকা চাই, আরও আরও টাকা চাই — একথা কে না বলছে! এবং সেকথা যে ব্যক্তি বলে না, তাকেই **মৎস্যকেতু**রা প্রতিনিয়ত ঠাট্টা করে থাকে। মানুষ যে টাকার জন্ম দিয়েছিল, মানুষই সেই টাকার দাসে পরিণত হয়েছে!

মৎস্যগন্ধ : ১. **মৎস্য** + **গন্ধ**। ২. *মৎস্যের গন্ধ।* / মৎস্যগন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার। (ব.শ.)। ৩. আমিষগন্ধি। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি অপ্রচলিত হলেও তন্নিহিত ধারণাটি **আমিষগন্ধ** রূপে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **মৎস্য**, **গন্ধ**, **আমিষ**, **নিমিষ**, **আঁষ**। এখানে আমরা **মৎস্যগন্ধ** শব্দটির চারটি রূপ নিয়ে কথা বলব — **মৎস্যগন্ধ-মাত্রের** বাহ্যিকভাবে আঘ্রাত রূপ, **মৎস্যগন্ধ-মাত্রের** মানসিকভাবে আঘ্রাত রূপ, **মৎস্যগন্ধ-তন্মাত্রের** বাহ্যিকভাবে আঘ্রাত রূপ, এবং **মৎস্যগন্ধ-তন্মাত্রে**র মানসিকভাবে আঘ্রাত রূপ।

মৎস্যগন্ধ-মাত্রের বাহ্যিকভাবে আঘ্রাত রূপ — পাশের বাড়িতে **ইলিশ মাছ রান্না করলে আমিষাশী** বাংলাভাষীর গন্ধগ্রাহী ইন্দ্রিয়টি নাচতে **শুরু করে না**, এমন বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বাতাসে উড়তে **থাকা মাছ**-মাংস রান্নার গন্ধ আমিষাশী-মাত্রকেই উন্মাদিত করে থাকে। এমন গপ্পোও শোনা যায় যে, হোটেলে গিয়ে কোনো কোনো হতভাগা বাতাসে উড়তে থাকা **মৎস্য-মাংসের** গন্ধ মাখিয়েই তার ডাল-ভাত সাবাড় করে দেয়, এক প্লেট মাছ কিনে পয়সা নষ্ট করে না। এই গন্ধের বিশেষত্ব হল, **গন্ধ**টি যে পায়, সে সেই **আমিষ বা মৎস্য** খেতে না পেলেও একটুখানি পেয়ে যায়। তার মানে, **মৎস্যগন্ধ** চেপে রাখা যায় না, তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং আমিষাশী সমাজে লোকে না-চাইলেও আমিষগন্ধ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, আমিষাশী হতে বাধ্য হয়; কেননা, বাতাসে তার যে **গন্ধ** থাকে, তাতে **আমিষের** ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থাকেই। আর সেই গন্ধ নাক দিয়ে শরীরে চলে যায়, তাকে রোখা যায় না। ভারতসমাজে এককালে এই **মৎস্যভক্ষণ** নিষিদ্ধ ছিল, নিন্দনীয় ছিল; লোকে মাছমাংস খেতই না এবং আমিষাশীদের ঘৃণা করত। কিছুকাল পরে, প্রথম প্রথম গোপনে এবং পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে **মৎস্যভক্ষণ** প্রচলিত হয়ে যায়। **মৎস্যভক্ষণ** করে আর লজ্জা পেতে হয় না, বরং গর্বের সঙ্গে লোকে ইলিশ খাওয়ার গৌরবগাথা গাইতে থাকে। দ্র. **মৎস্যগন্ধা**, **গন্ধবতী**। যদিও তা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আজও আমিষাশী ও নিরামিষাশী দুটি ভাগে ভাগ হয়ে আছেন।

মৎস্যগন্ধ-মাত্রের মানসিকভাবে আঘ্রাত রূপ — জানো তো, রামবাবু একটা দারুণ বাড়ি করেছেন রাজপ্রাসাদের মতো। শ্যামবাবু একটা 'স্করপিওন' গাড়ি কিনেছেন দেখেছ! মাসীমা, মেয়ের জন্য এমন বর আর পাবেন না, ওর বাবার বিশাল ব্যবসা, দিনে লক্ষ টাকার বেচাকেনা। ... এসবই হল মানসিকভাবে আঘ্রাত **মৎস্যগন্ধ-মাত্রে**র নিদর্শন। এককালে এই গন্ধ নিন্দনীয় ছিল, কেউ বহু টাকা রোজগার করছে বা টাকার পেছনে দৌড়চ্ছে দেখলে লোকে তাদের 'অর্থপিশাচ' ... ইত্যাদি বলে নিন্দা করত। পরে এই মালিকানার গন্ধ বা **মৎস্যগন্ধ**ই সুগন্ধ বলে ঘোষিত হয়ে যায়। লোকে অন্যের ধনসম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে গর্বের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করে। দুর্গন্ধবতী বলে যে নিন্দনীয় ছিল, সেই **মৎস্যগন্ধা** ক্রমে **গন্ধবতী** বা সুগন্ধের আধার রূপে সম্মানীয় হয়ে যায়।

মৎস্যগন্ধ-তন্মাত্রের বাহ্যিকভাবে আঘ্রাত রূপ — কোনো নিরামিষাশী হিন্দু ব্রাহ্মণ আমিষাশী হিন্দু বা মুসলমান বাড়িতে জলগ্রহণ করতে না চাইলে আমরা বিরক্ত হই। ভাবি, এসব শুধুই গোঁড়ামি। কিন্তু কলিম খান-এর অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য এইরকম — 'বছর দুই স্বপাকে শুধুমাত্র জগাখিচুড়ি (চাল-ডাল-আলু-কলা-মূলা-বেগুন ... ইত্যাদি একত্রে সিদ্ধ করা অন্ন) খেয়ে দিনাতিপাত করার কালে দেখেছি যে, নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর কোনো আমিষাশী মানুষের বাড়িতে গেলে খুবই অসুবিধায় পড়তে হত। তাঁদের গেলাসে ও গেলাসের জলে মাছের গন্ধ বা **আমিষগন্ধ** পাওয়া যেত এবং সে জল পান করতে গিয়ে খুবই অস্বস্তিতে পড়তে হত; যেন সেই জলে কাঁচা মাছ ধোয়া হয়েছে, এত তীব্র লাগত সেই গন্ধ। ঐ দু'বছরের আগে এবং কিছুদিন পরে ঐ সমস্যায় পড়তে হয়নি।' আমরা দেখেছি, বাসনকোশন যত ভাল করে ধোয়াধুয়ি করা

হোক না কেন, নিরামিষাশী মানুষ জল পান করতে গেলেই টের পেয়ে যাবেন পরিবারটি আমিষাশী কি না। বাসনকোশন থেকে মাছের গন্ধ সম্পূর্ণ দূর করতে পারে, এমন বাসন-ধোয়ার সাবান সম্ভবত পাওয়াই যায় না। কেউ সেরকম দাবি করলে, তাঁর সাবানটি দিয়ে আমিষাশী পরিবারের বাসনকোশন ধুয়ে তাদের গেলাসে কোনো নিরামিষাশী মানুষকে জল খেতে দিলেই তিনি বলে দেবেন, সাবানটি সত্যি করিৎকর্মা কি না।

মৎস্যগন্ধের এই রূপটিকে তার বাহ্যিক **তন্মাত্র**রূপ বলে। গেলাসে পাওয়া **মৎস্য**গন্ধে কার্যত **মৎস্যে**র কণামাত্রও থাকে না, থাকে **মৎস্যের তন্মাত্র**, থাকে **মৎস্যে**র অস্তিত্বের স্মৃতি। এই স্মৃতি তুলকালাম ঘটানোর যোগ্যতা ধরে। হানিম্যানের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় এই **তন্মাত্র** বা স্মৃতিই ঔষধরূপে ক্রিয়া করে থাকে। যেহেতু সেই স্মৃতিকে চিহ্নিত করার জন্য যে সূক্ষ্মতম যন্ত্রের প্রয়োজন সেই যন্ত্র আবিষ্কার করা যায়নি, সেকারণে আধুনিক বিজ্ঞান এখনও হোমিওপ্যাথি ঔষধের কার্যকারিতার কারণ নির্ণয় করতে পারেনি।

মৎস্যগন্ধ-তন্মাত্রের মানসিকভাবে আঘ্রাত রূপ — "টাটাকে তাড়িয়ে মমতা কিন্তু কাজটা ভাল করেনি' — হঠাৎ বলে বসলেন রামবাবু। এতক্ষণ সভা চলছিল নিরামিষ আড্ডার মতো, আর সেটা নিরামিষ থাকল না। সবাই হৈ হৈ করে উঠল।" তার মানে, বাক্‌বিষয়েরও **আমিষ-নিরামিষ** হয়। অথচ আলোচনাকে **আমিষ**-আলোচনা পর্যন্ত বলা হয় না; শুধু আলোচনা-সভাটি **'নিরামিষ** থাকল না' ব'লে পরোক্ষে উল্লেখ করে দেওয়া হল যে, 'আলোচনা-সভাটি **আমিষ**-আলোচনা-সভায় পরিণত হয়ে গেল'। এই কথাবার্তায় মালিকানার বা **মৎস্যে**র লেশমাত্রও নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যে **নিরামিষ** শব্দ প্রয়োগ করে পরোক্ষে **আমিষে**র উল্লেখ করা হল, একেই বলে **মৎস্যগন্ধে**র মানসিক **তন্মাত্র** রূপ। এই রূপটিকে আমরা আরও অজস্র ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যথা — 'অধ্যাপক রামবাবুর বাড়িতে যুবকটির যাতায়াতকে একেবারেই **নিরামিষ** ভাববেন না যেন; রামবাবুর একটি সুন্দরী কন্যা আছে!' কিংবা, শ্যামবাবু যে বন্যাত্রাণে দিনরাত খাটতে থাকেন, সেটি তাঁর **নিরামিষ** জনসেবা মাত্র নয়। একাত্তরের বন্যার পরই তো তিনি তাঁর বাড়িটা পাকা করলেন।' ... এসবই **মৎস্যগন্ধের** মানসিক **তন্মাত্র** রূপ। এই **তন্মাত্র**-রূপ থেকেই দুই খানি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। প্রায় সমস্ত পুরাণাদি গ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, এই **গন্ধ-তন্মাত্রাত্মক** সংঘাত থেকেই মানবসভ্যতার বর্তমান রূপটির জন্ম হয়েছিল।

মৎস্যগন্ধা : ২. **মৎস্যগন্ধের** *আধার যে।* / **মৎস্যগন্ধা** = মৎস্যগন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার। (স্ত্রী)। (ব.শ.)। ৩. সত্যবতী, জলপিপ্পলী। (ব.শ.)। ভীষ্মের বিমাতা। ... মৃগয়ারত উপরিচর বসুর বনমধ্যে স্ত্রী গিরিকার কথা স্মরণ হওয়ায় রেতঃস্খলন হয়। এই রেতঃ এক শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে গিরিকার কাছে প্রেরণ করলে, পক্ষীর মুখনিঃসৃত হয়ে তা যমুনার জলে পতিত হয় এবং ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা তা ভক্ষণ করে এবং গর্ভবতী হয়। এক ধীবর দ্বারা ধৃত সেই মৎস্যের উদরে এক পুত্র ও এক কন্যা পাওয়া যায়। বসুরাজ পুত্রকে গ্রহণ করেন এবং ধীবরের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করেন। এই কন্যার গায়ে মৎস্যের গন্ধ থাকায় এর নাম হল মৎস্যগন্ধা। ... সে নদীতে নৌকা পারাপারের কাজে পিতাকে সাহায্য করত। ... একদিন পরাশর ঋষি সেই নৌকায় উঠে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গম প্রার্থনা করলে, মৎস্যগন্ধা বলেন, নৌকার উপরে উভয় তীরের লোক ও ঋষিদের দৃষ্টির ভিতরে এইরূপ সঙ্গম সম্ভবপর নয়। তখন পরাশর চারদিকে কুয়াশা সৃষ্টি করেন ... তারপর মৎস্যগন্ধা পরাশরকে বললেন, আমি অবিবাহিতা কুমারী, এই সঙ্গমের ফলে আমার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়ে যা কর্তব্য আপনি আদেশ করুন। তখন পরাশর প্রীত হয়ে বললেন, আমার সঙ্গমের ফলে তোমার কুমারীত্ব নষ্ট হবে না। ... সবশেষে মৎস্যগন্ধা প্রার্থনা করলেন, তার সমস্ত দেহ যেন সুগন্ধযুক্ত হয়। পরাশর স্বীকৃত হয়ে কন্যাকে এই বরই দিলেন। তারপর মৎস্যগন্ধা ঋষিপ্রভাবে ঋতুমতী হয়ে পরাশরের সঙ্গে সঙ্গম করল। সেই থেকে মৎস্যগন্ধার নাম হল গন্ধবতী। এবং এক যোজন দূর হতেও এঁর গায়ের সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে এঁর আর এক নাম হয় যোজনগন্ধা। পরে ইনি সত্যবতী নামে খ্যাতা হন।

এই সঙ্গমের ফলে মৎস্যগন্ধা সদ্যোগর্ভ ধারণ করে যমুনা দ্বীপে বীর্যবান ব্যাসের জন্ম দিলেন। ... শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের পর, এঁর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **মৎস্যগন্ধ** বা মালিকানার গন্ধ থাকে যে আধারে, তাকে **মৎস্যগন্ধা** বলে। স্বভাবতই এটি একটি সামাজিক সত্তার নাম। ভারত-ইতিহাসের বিশেষ কালে এঁর জন্ম হয়েছিল। ভারতসমাজ তখন সনাতন যুগ পেরিয়ে বৈদিক যুগে ঢুকে পড়েছিল এবং অজস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রতিটি সম্প্রদায়ের শীর্ষে পরিচালক রূপে এক বা একাধিক মহর্ষি সক্রিয় ছিলেন, যাঁরা একই কর্মের পুনরাবৃত্তির **দক্ষ**নীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং জ্ঞানের বিশেষ **মর্য্যাদা** স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই সম্প্রদায়গুলি যৌথসমাজেরই এক একটি খণ্ড রূপে যৌথতার নীতিতেই পরিচালিত হত। তবে সমস্যা এই দেখা দিয়েছিল যে, আগে যেহেতু সমগ্র সমাজ একত্রিত ছিল, কারও কোনো অভাব বা উদ্বৃত্ত ছিল না। এখন একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণের কারণে এক একটি সম্প্রদায়ের এক এক রকমের বস্তুর অভাব দেখা দিল ও এক এক রকমের বস্তু উদ্বৃত্ত হতে লাগল। পূর্বতন সনাতন যুগে অভাব হলে নতুন আবিষ্কারের উপায় করতেন যৌথ সমাজের পরিচালক **শিব**, এবং উদ্বৃত্ত যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হত; নেহাত হয়ে গেলে তা **আবর্জ্জনা** নিক্ষেপ স্থানে ফেলে দেওয়া হত। (দ্র. **কিরাত**)। এখন **দক্ষতার মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় এবং **শিব যতিধর্ম্ম** গ্রহণ করায় আবিষ্কারের উপায় ক্ষীণ হয়ে যায় এবং যৌথ-উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন নষ্ট হচ্ছে বলে মনে হতে থাকে। **বেণ** প্রজাপতির আমলে দাবি উঠল এক সম্প্রদায়ের যৌথ-উদ্বৃত্ত দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের যৌথ-অভাব পূর্ণ করা হবে না কেন? সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকটি যেহেতু যৌথসমাজের নিয়মে পরিচালিত হচ্ছিল, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই ছিল যেন এক একটি দলবদ্ধ-ব্যক্তি; ঝাঁকটিই যেন মহর্ষিকে মাথায় বসিয়ে নিয়ে চলেছে। স্বভাবতই তাদের পক্ষে এই লেনদেন সম্ভব হচ্ছিল না। তাদের উৎপন্ন তো স্বভাবতই যৌথ উৎপন্ন। পরিচালক মহর্ষির নির্দেশে তা নিজেদের মধ্যে বিতরিত

হতে পারত। যে বস্তুর অভাব দেখা দিয়েছে, পরিচালক মহর্ষিই কেবল তা বাইরের কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যৌথ-প্রয়োজন রূপে আনাতে পারতেন। কিন্তু সে প্রথার তো প্রচলনই হয়নি! এই সেই সময় যখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন পারাপার করার জন্য নতুন জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়। সেই জনগোষ্ঠীরই পৌরাণিক নাম দেওয়া হয়েছিল **মৎস্যগন্ধা**।

মৎস্যগন্ধা নামক জনগোষ্ঠীটি এক সম্প্রদায়ের কোনো উদ্বৃত্ত উৎপন্ন নিয়ে গিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের অন্য কোনো উদ্বৃত্ত উৎপন্ন নিয়ে এসে অভাবী কোনো সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতেন। মাঝ থেকে হাতে তুলে দেওয়ার আগে পারাপার করার শ্রমমূল্য স্বরূপ কিছু উৎপন্ন নিজেদের কাছে রেখে দিতেন। কেননা, **মৎস্যগন্ধা** তো কোনো সম্প্রদায়ের অংশ নয়, বিদেহী। (দ্র. 'বিদেহী' - **বেণ**)। দুই সম্প্রদায়ের মাঝের ফাঁকে তার অবস্থান। মার্কস সাহেব একেই বলেছেন 'in the pores of the society'। তখনও কোথাও কোনোরকম বিনিময়ের সূত্রপাত হয়নি, কোনোরকম ব্যক্তিমালিকানার দেখা মেলেনি, বিনিময় মুদ্রা ইত্যাদি তো তখন কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ফলত, এই যে কিছু কিছু উৎপাদিত বস্তু পারাপারের শ্রমমূল্য রূপে নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া, এর ভিতরেই সর্বপ্রথম **ব্যক্তিমালিকানা**র গন্ধ দেখা দেয় বা **মৎস্যগন্ধ**-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্বভাবতই এই জনগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয় **মৎস্যগন্ধা**। কিন্তু এই **মৎস্যগন্ধ** ছিল অতীব দুর্গন্ধ। লোকে এই আমিষগন্ধের নিন্দা করত। সমাজ মনে করত, এভাবে যৌথসমাজের ভিতরে থেকে 'আমার মাল', 'আমার সম্পদ' — এরকম ভাবাই অতি ঘৃণ্য কাজ। তাই **মৎস্যগন্ধা** ছিলেন দুর্গন্ধবতী।

এর মধ্যে **পরাশর** এলেন। তিনি এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এঁদের জ্ঞানগম্যি দিলেন। ঘোষণা করলেন — আমিই যখন খেটেখুটে অর্জন করেছি, তখন 'আমার সম্পদ' বলার মধ্যে ঘৃণার কিছু নেই; এ তো বরং গৌরবের কথা! এ তো আর চুরি-চামারি করে সংগ্রহ করা সম্পদ নয়, রীতিমতো গায়ের ঘাম ঝরিয়ে অর্জন করা! অতএব **মৎস্যগন্ধা** হয়ে গেলেন **গন্ধবতী**। এবং মহাভারতকার **ব্যাস** মহাশয়ের জন্ম হল এই **মৎস্যগন্ধা**র গর্ভেই। ...

মৎস্যদেশ : ১. দ্র. **মৎস্য** + **দেশ**। ২. *যে দেশের জনসাধারণ মৎস্যের দিকে দিশাগ্রস্ত হয়ে চলেছে।* ৩. মৎস্যদেশের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। মহাভারত অনুসারে বিরাটরাজের রাজধানী মৎস্য। কাহারো কাহারো মতে বর্তমান জয়পুরের নিকটবর্তী স্থানকে মৎস্যদেশ বলা হত। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যে দেশের জনসাধারণ ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক মানুষই 'আমার সম্পদ', 'আমার সম্পদ' করে চলেছে, সেই দেশকেই **মৎস্যদেশ** বলা যায়। সেই হিসেবে আজকের পৃথিবীর প্রায় সব দেশই **মৎস্যদেশ**। তবে পুরাণকথিত ভারতের ইতিহাস তো প্রধানত মানুষের মনোলোকের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তাতে স্থানের গুরুত্ব তুলনায় কম। তবুও যেখানে দুটো লোককেই সমান্তরালভাবে দেখানো গেছে, দুটো লোককেই দেখানো হয়েছে, কিন্তু যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে শুধুমাত্র মনোলোকের বর্ণনা করে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বভাবতই বাস্তবে যদি **মৎস্যদেশ** নামক স্থান না পাওয়া যায়, তাতে অবাক হওয়ার বা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া **বিরাট** (দ্র. **রাজ্, রাট**) শব্দটির একটি অর্থই হল সমগ্র মানবজাতি। পৌরাণিক ভাষায় তাকে বহু ক্ষেত্রে **বিরাটপুরুষ**ও বলা হয়েছে। সেই নিরিখে **মৎস্যদেশ** যদি **বিরাট** রাজার দেশ হয়, হতেই পারে। তবে সেক্ষেত্রে তাকে সমগ্র জনসাধারণ বলেই বুঝতে হবে।

মৎস্যাবতার : ১. **মৎস্য** + **অবতার**। ২. **মৎস্য**রূপে *অবতীর্ণ যে।* ৩. বিষ্ণুর মীনরূপ অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু প্রলয়সলিল হইতে বেদের উদ্ধার ও বৈবস্বত মনুকে তরিতে রক্ষা করেন। (ব.শ.)। বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার। ... বিবস্বানের পুত্র মনু ... তপস্যাদির দ্বারা পিতৃপিতামহদের অতিক্রম করেন। একদিন ... এক মৎস্য তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে; কারণ প্রবল এক মৎস্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সে ভীত হয়েছে। ... বৈবস্বত মনু এই ক্ষুদ্র মৎস্যকে আশ্রয় দেন। এই মৎস্য দিন দিন এমন ভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, ... মনু তাকে (কমণ্ডলু থেকে) পুষ্করিণী, পুষ্করিণী থেকে বৃহৎ পুষ্করিণীতে ... সেখান থেকে গঙ্গায় রাখলেন। সেখানেও ক্রমে তার স্থান সঙ্কুলান হল না। তখন তাকে সমুদ্রে রাখার ব্যবস্থা হল। সমুদ্রে এসে সে মনুকে বলল, এখন প্রলয়কাল আসন্ন, সমস্ত পৃথিবী প্রলয়সলিলে নিমগ্ন হবে। এখন আপনি রজ্জু-সংযুক্ত একটি নৌকা নির্মাণ করুন। সেই নৌকায় আপনি সপ্তর্ষিদের সহিত উঠুন। আপনার সহিত সর্বপ্রকার জীবও রাখুন। নৌকায় বাসকালে আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি শৃঙ্গযুক্ত হয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব এবং আমিই আপনাকে এই মহাপ্রলয় থেকে উদ্ধার করব।

এই কথা অনুসারে মনু এক বৃহৎ নৌকায় অবস্থান করতে লাগলেন। পরে এই মৎস্য শৃঙ্গযুক্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হল। ... প্রলয়োচ্ছ্বাসে ভীষণ আন্দোলিত ... সময়ে এই মৎস্য তার শৃঙ্গের সহিত নৌকাকে আবদ্ধ করে নৌকাস্থিত সকলকে রক্ষা করবার জন্য লবণ জলের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগল। ... শেষে এই মৎস্য হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গকে আকর্ষণ করে এনে ঋষিদের এই শৃঙ্গের সহিত নৌকা বন্ধন করতে বলল। ... ঋষিরা তাই করলেন। ... এর পর মৎস্য ঋষিদের জানালেন, তিনিই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ ধারণ করে এঁদের মহাভয় হতে রক্ষা করেছেন। এখন মনু সুর, অসুর, মানুষ — সর্বপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করবেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মার্কস সাহেব **ব্যক্তিমালিকানা**কেই মানবসমাজের সমস্ত অহিতের মূল বলে শনাক্ত করে, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় রূপে সাম্যবাদের বিধান দিয়ে গেছেন, যদিও তিনি নিজেই জানতেন না, মানবসমাজে সেই ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব হল কেমন করে? তাঁর মতে, **পণ্য** উৎপাদনই ব্যক্তিমালিকানার কারণ, আর সেই **পণ্য** উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল শ্রমবিভাজন থেকে এবং ভারতবর্ষই পৃথিবীর সেই দেশ, শ্রমবিভাজন-রূপ 'কুকর্ম'টি সবার আগে যেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য তিনি আরও লিখে গেছেন যে, 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস।'

আজ আমরা দেখছি, সে ইতিহাস রয়েছে। মানুষের সমাজে

ক্যাপিটাল বা **পুঁজি** যতরকম রূপে দেখা দিয়েছে, সেই রূপগুলিকে আমাদের পুরাণকারগণ **নগদ-নারায়ণ**-এর **দশাবতার** রূপে বর্ণনা করে গেছেন। সেগুলির প্রথম রূপই হল **মৎস্যাবতার**। তার মানে, মানবসমাজে ক্যাপিটাল বা পুঁজি সর্বপ্রথম **ব্যক্তিমালিকানা** বা **মৎস্য** রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের **পুরাণ**কারগণ দিয়ে গেছেন **মৎস্যপুরাণ**-এ। সেই সমগ্র কাহিনীকে প্রতীকী ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া প্রয়োজন। এই শব্দার্থকোষ তার শব্দগুলিকে সাধ্যমতো উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। তার অধিক অবকাশ এখানে নেই। দ্র. **অবতার, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলি, পরশুরাম, নগদ, নারায়ণ, গৌরী, বৈবস্বত** ... ইত্যাদি।

উপরে পৌরাণিক অভিধানে **মৎস্যাবতার**-এর যে কাহিনী আমরা পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে, সে কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলের 'মহাপ্রলয়' বা Great Deluge-এর অনেক মিল রয়েছে। একই কাহিনী বিশ্বের অন্যান্য দেশের পুরাকথাতেও কমবেশি রয়েছে। কেউ সে কাহিনীকে পেয়েছে ছাড়া-ছাড়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে, কেউবা পেয়েছে ছিঁটেফোঁটা। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে সেই আদি বিকাশের কাহিনী প্রায় অবিকল রয়েছে, রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। সেই কাহিনীর অর্থকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করে নিতে পারলে বিশ্বের সব দেশের কাহিনীগুলিরও একালীকরণ করে ফেলা যায়। কারণ, কাহিনীটা একই। বিশ্বের সব মানুষ যে একই উৎস থেকে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল, ঐ কাহিনীগুলিই তার বড় প্রমাণ।

মৎস্যেন্দ্র : দ্র. **মীননাথ**।

মদ (মদক, মদন¹, মদির, মদিরা, মদীয়, মদ্য, মদ্র) : ১. ✓মদ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মদ*** = *পরিমিতের দান যাহাতে।* ***মদক*** = ***মদ*** *করে যে বা কৃত যাহাতে।* ***মদন*** = ***মদ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মদির*** = ***মদ*** *গতিশীলভাবে রহে যাহাতে।* ***মদিরা*** = ***মদির****-এর আধার যে।* ***মদীয়*** = ***মদ****-এর গতিশীল আধার যায় যাহাতে।* ***মদ্য*** = ***মদ*** *থাকে যাহাতে।* ***মদ্র*** = ***মদ****-এর আবর্ত্তন চলে যাহাতে।* / **মদ** = যাহা মত্ততা সাধন করে ('মত্ততাসাধন')। **মদির** = যাহা মাদন সাধন করে ('মাদনসাধন')। **মদ্য** = যাহা মত্ততা সাধন করে ('মত্ততাসাধন')। (ব.শ.)। **৩. মদ** = মত্তীভাব, মদ্য, সুরা, মধু, কস্তুরী, রেতঃ, সোম, হস্তিগণ্ডনিঃসৃত মদজল, মত্ততাজনক পেয়মাত্র, মদরাগ, অনুরাগ, কল্যাণকর বস্তু, গর্ব্ব, নায়িকালঙ্কারবিশেষ। **মদক** = মিষ্টান্নবিশেষ, মোয়া, নবশাক-বিশেষ, ময়রা। **মদন** = মদয়িতা, অনুরাগ, বসন্তকাল, ভ্রমর, সিক্থক, ধুস্তুর, খদির, বকুল, বৃক্ষবিশেষ, ময়নাগাছ, মাষ, আলিঙ্গনবিশেষ, মত্তীভাব, হর্ষ। **মদির** = মদকর, হর্ষজনক, মত্ত, বিহ্বল, বিভোর। **মদিরা** = সুরা, মদ্য, মত্তখঞ্জনী, দুর্গা। **মদীয়** = মৎসম্বন্ধী, মামক, মম। **মদ্য** = মদকর, মদ, মাদকপেয়মাত্র। **মদ্র** = দেশবিশেষ, মদ্রবাসিগণ, মদ্ররাজগণ, মদ্ররাজ, মঙ্গল। (ব.শ.)। **৪. মদ, মদিরা, মদ্য** তিনটি শব্দই শুধুমাত্র wine অর্থে প্রচলিত। 'ময়রা' জাতিকে বোঝাতে **মদক**, 'আমার' অর্থে **মদীয়**, 'নেশা' অর্থে **মদির** এবং 'মাদ্রাজ' (বর্তমানে তামিলনাড়ু) দেশ অর্থে **মদ্র** কখনো-সখনো প্রচলিত। **৫. মদ** জিনিসটি কী, সে বিষয়ে ব.শ. বলছেন, **'মত্ততাসাধন'ই মদ**। আমরা দেখছি, পরিমিতের (= **ম**) দান (= **দ**) রয়েছে শব্দটির ভিতরে। তার মানে, **মদ** জিনিসটি মানুষকে পরিমিত স্থান-কাল-পাত্রে অবস্থিত বা বন্দী করে দেয়, সীমিত করে দেয়; তাই তাকে **মদ** বলে। বিদ্যাসম্পদে মানুষের মনের অর্জনসমূহের বা পরিমিত জ্ঞানরূপের দান থাকে, তাই বিদ্যাও একপ্রকারের **মদ**। ধনসম্পদেও মানুষের মেধা ও শ্রমের বা পরিমিত ধনরূপের দান থাকে, তাই ধনও একপ্রকারে **মদ**। যে ব্যক্তি বিদ্যা**মদে** বা ধন**মদে মত্ত**, সে তো আসলে দিনরাত জ্ঞানরসের বা টাকার নেশায় চুর হয়ে সেই জ্ঞানরস বা ধনরসের পেছনেই ছুটতে থাকে; আর কোনো দিকেই তার কোনো **চেষ্টা** থাকে না, সে কেবল এক বিষয়ের পিছনেই ধাওয়া করতে থাকে। এই যে একপ্রকার মানসিক ঘেরাটোপে বা **পাকে পাক** খেয়ে বেড়ানো বা ছুটে-ঘুরে বেড়ানো, একই বৃত্তের পরিধির ভেতরে **পাক** খাওয়া, একেই বলে **মত্ত** হওয়া বা **পাগল** হওয়া; আর সেই **পাক**গ্রস্ত অবস্থানে স্থিত করে দেয় **মদ**। অর্থাৎ যে বিষয় বা বস্তু কোনো সত্তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গতিবিধিকে পরিমিত গতিবিধির **পাকে** বা বৃত্তে আবদ্ধ করে দেয়, তাকে **মদ** বলে। তাই **মদ** মানুষকে **উন্মত্ত** করে দেয়, **পাগল** করে দেয়।

স্বভাবতই **মদ** দুরকম হয় — মানসিক **মদ** ও দৈহিক **মদ**। মানসিক **মদে** মানুষের মন তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চিন্তাভাবনার গতিপথ ত্যাগ করে একই চিন্তাভাবনার **পাকে পাগল** হয়ে, **মত্ত** হয়ে ঘুরতে থাকে। এই **মদ** অনেক প্রকার হয়, যথা — ঐশ্বর্য**মদ**, ধন**মদ**, বিদ্যা**মদ**, যৌবন**মদ** ... ইত্যাদি। আজকের গোলোকায়িত সভ্যতা কি ধন**মদে মত্ত** নয়? এমন বিদ্যা**মদে** মত্ত মানুষকেও আমরা দেখেছি যিনি একটার পর একটা ডিগ্রি হাসিল করাই জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছেন।

আর, দৈহিক **মদে** মানুষের দেহ তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চলাচলের পথ ত্যাগ করে একই চালে **মত্ত** হয়ে ঘুরতে থাকে। এই **মদ**ও কয়েক প্রকার হয়, যথা — চোলাই**মদ**, দেশী**মদ**, বিলিতি**মদ**, তাড়ি, মধু ... ইত্যাদি। ব.শ. জানাচ্ছেন যে, **চ্যবন** ঋষি নাকি **মদ**কে বারো অংশে ভাগ করে কামিনী, সুরা, দ্যূতক্রীড়া, ও মৃগয়াতে স্থাপন করেছিলেন। তার মানে কামিনী**মদ**, সুরা**মদ**, দ্যূতক্রীড়া**মদ**, এবং মৃগয়া**মদ**ও হয়। মনুসংহিতাতেও নাকি বারো রকম **মদের** কথা বলা আছে। এগুলির কোনোটি মানসিক **মদ**, কোনোটি-বা দৈহিক **মদ**। এই সকল **মদ** নিয়ে আমরা সুদীর্ঘ '*অ্যাল-কুহেলিক কথাবার্তা*' বলেছিলাম আমাদের '*রসকথার কথকতা*' নিবন্ধে (যা জুলাই ২০০৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র ৭১তম খণ্ডে)। শব্দার্থকোষের পাঠকপাঠিকার জন্য এখানে তার থেকে দু'চামচ রসকথা তুলে দেওয়া হল।

" বিলিতি মদের উপর মার্কেট রিসার্চের সময় এক মদ্যপকে প্রশ্ন করা হয়েছিল — 'একটি ধর্মপুস্তক আর এক বোতল মদ, দুটোর মধ্যে আপনি মদটিই পছন্দ করছেন কেন? উত্তরে সে বলেছিল, 'আমি পাঁড় মাতাল হতে চাই না বলে মদটাই পছন্দ করি।"

"... রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আবরণ' নিবন্ধে জানাচ্ছেন, 'মানুষের মনের চারদিকে এই যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার

মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে ...' ইত্যাদি। তার মানে গ্রন্থাদিতে যে মদ থাকে, তা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না। আর, ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে তো স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হত '... পরব্রহ্মে আত্মলয় দ্বারা যে "প্রমদন জ্ঞান" হয়, তাহাই মদ্য'। মোট কথা, ভারতীয় মননে শারীরিক মদের পাশাপাশি মানসিক মদ চোলাই করা, তার পরিবেশন করা এবং উপভোগ করা সম্পর্কে সবাই কমবেশি সচেতন ছিলেন। ...

... মানসিক মদ(ও) ... গাঁজিয়ে নিলে তা মাদকতার সৃষ্টি করে। গাঁজালে তো 'ফেনা' হবেই। আর মজার ব্যাপার এই যে, মানসিক মদের এইরূপ মাদকতাকে ইংরেজি ভাষায় বলে 'ফেনাটিসিজম্'। ..."

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে, **শিব** কিন্তু **মদ** খেতেন না, খেতেন **ভাঙ**, যা 'ফেনাটিসিজম্'-এর বা প্রচলিতের ঘেরাটোপের বন্ধনকে **ভেঙে** দিয়ে নতুনের দুনিয়ায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, **সিদ্ধি**লাভে সহায়তা করতে পারে। খালাসীটোলাগামী লেখক-শিল্পীরা সেকথা জানতেন না বলেই মনে হয়। জানলে, চোলাই**মদ** খেয়ে স্রষ্টা হওয়ার স্বপ্ন নিশ্চয় দেখতেন না তাঁরা। অবশ্য দৈহিক **মদের** ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের এরকম বহু কথাই মনে রাখিনি। রাখলে আমরা জানতাম চিনি, মধু, মিষ্টি, গুড় ... এসবই হল কোনো না কোনো স্তরের **মদ** এবং সেকারণেই সেই মিষ্টি প্রস্তুত করে যে, তাকে **মদক** (**মদ** করে যে বা বানায় যে) বলা হয়, আজও।

আর, যিনি নিজে **মদে প্রমত্ত** থাকেন এবং অন্যকেও **প্রমত্ত** করেন, তিনিই তো **মদন**। তাঁর কথায় আমরা পরে আসছি (নিম্নে **মদন**[২] দ্রষ্টব্য)। তবে **মদ্র**দেশকে **মদ্র** বলা হত একেবারেই অন্য কারণে। মহাভারতে এই **মদ্র**দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান আছে। তাতে **মদ্র** বলতে যাদের বোঝায়, একালের ভাষায় তাদের 'ঠিকাদারের লেবার', 'ঠিকা-মজুর' ও তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ... ইত্যাদি বলে। এরা কাজটুকু করে দিয়ে বাকি সময়টা বলতে গেলে **মত্ত** অবস্থায় থাকে। সাদৃশ্যে তা সেকালের **মদ্র**দেশীয় মানুষদের বোঝাত বলে তাদের নাম হয়ে যায় **মদ্রদেশ**। ... **৬.** ইংরেজি mad, madden।

মদন[২] : **৩.** মানসপুত্র মরীচ্যাদির সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মা তাঁর মন হতে সন্ধ্যা নামে এক পরমাসুন্দরী নারীর ... ও এক সুন্দর পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ... এই পুরুষ কম্বুগ্রীব, মীনকেতু, ও মকরবাহন। ... এই পুরুষ ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন তাঁর (কার্যের) অনুরূপ নাম ও স্ত্রী নির্দেশ করা হোক। ব্রহ্মা বললেন — তুমি এই অপরূপ সুন্দর মূর্তিতে ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী পুরুষকে মোহিত কর। দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশু তোমার বশবর্তী হবে। এমন কি আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তোমার বশবর্তী হব। তুমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে সৃষ্টিলীলায় সহায়তা কর। ... তুমি দেবতাদের চিত্ত মথিত করেছ, এইজন্য তোমার নাম মন্মথ, তুমি অসাধারণ কামরূপী, সেইজন্য তোমার নাম কাম, সমস্ত লোককে তুমি মত্ত করবে, সেইজন্য তোমার নাম মদন, তুমি মহাদেবের দর্পচূর্ণ করবে, সেইজন্য তোমার নাম কন্দর্প। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে তোমার অবস্থিতি হবে। তারপর মদন তাঁর কুসুম শরাসন ও পুষ্পময় পঞ্চশর প্রথমে ব্রহ্মার উপর নিক্ষেপ করে তাঁর শক্তির পরীক্ষা করতে চাইলেন। সন্ধ্যার সম্মুখে ব্রহ্মার উপর এই শর নিক্ষেপ করাতে ব্রহ্মা কামমোহিত হয়ে পড়লেন। কামশরে বিদ্ধ সন্ধ্যা হতে চৌষট্টি কলা উৎপন্ন হল।

ব্রহ্মার কামাতুর ভাব দেখে মহাদেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, পুত্রবধূ ও কন্যা, মাতৃতুল্যের প্রতি কামাসক্ত হওয়া ব্রহ্মার পক্ষে পাপকার্য — কারণ তিনি বেদের নিয়ামক। মহাদেবের এই তিরস্কারে ব্রহ্মা দুঃখিত হয়ে মদনকে ... মহাদেবের অগ্নিবাণে দগ্ধ হওয়ার ... অভিশাপ দিলেন। মদনের অনুনয়-বিনয়ে ব্রহ্মা বললেন, মহাদেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হলেও তাঁর অনুগ্রহেই পুনর্জন্ম হবে। ... এরপর দক্ষ মদনকে তাঁর দেহজাত কন্যা রতিকে বিবাহ করতে বললেন। ... দেবতাদের প্ররোচনায় মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর নয়নের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত হলেন। ... (পৌ.অ.)। **৪. মদন** শব্দটি সাধারণভাবে অপ্রচলিত হলেও এককালে সন্তানের প্রিয় নাম রূপে **মদন** শব্দের খুবই প্রচলন ছিল, এখন তাও সেকেলে ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছে। **৫.** দ্র. **কন্দর্প, অনঙ্গ, কাম**। উপরের কাহিনীতেই **মদন**কে কেন **মদন** বলে, সেকথা একপ্রকারে বলা আছে। আমরা ইতোপূর্বেই জেনেছি (দ্র. **মদন**[১]), যে-সত্তা নিজে **প্রমত্ত** এবং অন্যকে **প্রমত্ত** করে, তাকে **মদন** বলে। কথাটি আরও দু'ভাবে বলা যায়। যে ব্যক্তি একটি বিশেষ বিদ্যা**মদে** নিজে **মত্ত** হয়ে রয়েছে (ধরা যাক, খনিবিদ্যা) এবং চায় যে অন্য কাউকে তার বিদ্যা**মদ** খাইয়ে তাকেও **মত্ত** করে নিজের সঙ্গী করে নেবে, তাকে **মদন** বলা যায়। আবার, যে ব্যক্তি নিজে এক বোতল **মদ** খেয়ে **মত্ত** হয়েছে, এবং হাতে আর এক বোতল **মদ** ধরে রেখেছে কেউ এলে তাকে খাওয়াবে ব'লে, তাকেও **মদন** বলা যায়। '**মদ** অন যাহাতে' — **মদন** শব্দের এতাদৃশ ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে ঐ অর্থ মিলে যায়। তার মানে এই জগতে যে সত্তা নানা রূপে নিজে **মত্ত** রয়েছে এবং অন্যদেরও **মত্ত** করে, সেই সত্তাকে **মদন** বলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি **পাগল** হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম / কস্তুরীমৃগ সম।' **মদন**ও নিজের সম্পর্কে এই বাক্য বলতে পারেন।

স্বভাবতই এই **মদন** আমাদের জীবনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঘিরে জড়িয়ে ডুবিয়ে রেখেছে। ফলত **মদন** শব্দ দিয়ে বহু শব্দ তৈরি করেছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা। আমরা তার কয়েকটির অর্থ ও সে বিষয়ে আমাদের মন্তব্য নিম্নে উপস্থাপিত করলাম।

মদনকড়ি (মদনকৌড়ি) : **৩.** কড়ির, মাণিক্যের বা সোনার কড়ির কর্ণভূষণবিশেষ। (ব.শ.)। **৫.** কড়ি বা কৌড়ি দিয়ে গড়া এই গহনাটি এতই সুন্দর যে, সে তার নিজের সৌন্দর্য**মদে মত্ত** থাকে এবং অন্যকেও **মত্ত** করে দিতে পারে। আমাদের সেকালের স্বর্ণকারগণ সেইকারণে তার নাম দিয়েছিলেন **মদনকড়ি**। এখন এ-নামের কানে পরার অলঙ্কার বিক্রয় হয় কিনা জানি না। কিন্তু একথা নিশ্চিত জানি যে, আমাদের **মদক**গণ ও সোনার-বেণেগণ তাঁদের উৎপাদিত বস্তুসম্ভারের স্বভাব ধরে ধরে যে সকল নাম দিতেন, দিয়েছিলেন, এবং এখনও দিয়ে থাকেন, সেগুলি বাংলাভাষার শব্দসম্ভারের অমূল্য সম্পদ। এবং সেগুলি সবই ছিল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ। অথচ তাদের অনেক নামই এখন লোকে ভুলে গেছেন। রসগোল্লা, দানাদার, রাজভোগ ছাড়া আর কয়টি নাম এখনকার মানুষ জানেন! অথচ প্রায় শতাধিক শব্দ ছিল আমাদের **মদক**দের তৈরি করা মিষ্টির!

আর, গহনার নাম? কী সব নাম দিয়েছিলেন আমাদের সেকালের স্বর্ণকারেরা! শ্রী সুবিমল বসাক মহাশয়ের 'দুরুক্ষী গলি' উপন্যাসটিতে সেই নামসমূহের বহু সংবাদ আছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, আমাদের পি সি চন্দ্রদের মতো বরিষ্ঠ স্বর্ণবেণেরা যে গহনার তালিকা আজকাল তাঁদের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন, তাতে বাংলাভাষার সেই 'সোনার নামশব্দ'গুলি আর থাকে না, নেই! সেগুলির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে। এখন সে জায়গায় থাকে কতকগুলি অর্থহীন সংখ্যা — S2010, S3142 ...। হ্যাঁ, এইরকম অজস্র অর্থহীন সংখ্যাই এখনকার গহনার নাম! হায়! ইংরেজের সংস্পর্শে এ আমরা কী পেলাম! নাকের বদলে নরুণ!

মদনকণ্টক : ৩ অনুরাগজন্য পুলক। (ব.শ.)। ৫. কোনো যুবকের (বা যুবতীর) দূর থেকে দেখা ও ভাল-লাগা সুন্দরী (বা যুবক) হঠাৎ যদি তার সামনে চলে আসে, তাহলে তার মনে যে শিহরণ জাগে এবং তার ফলে তার সারা শরীরে কাঁটার মতো গুঁড়ি গুঁড়ি ত্বকস্ফীতি ফুটে ওঠে তাকেই **মদনকণ্টক** বলা হত। এখনও গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই **মদনকণ্টক**-এর উদ্ভাস হয়ে থাকলেও শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ব্যাপারের দেখা মেলে কম। শহরের বাস ট্রেন স্কুল কলেজ ভিড় টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে তরুণতরুণীদের পারস্পরিক সান্নিধ্যের অনায়াস-প্রাপ্তি তাদের প্রাপ্তির আনন্দটাই মাটি করে দিয়েছে। এখন তাদের পারস্পরিক অনুরাগজন্য পুলক জাগে না, **মদনকণ্টক** ফোটে না। আর, অ্যাকাডেমির কল্যাণে শব্দটি তো কবেই হারিয়ে গেছে।

মদনগোপাল, মদনমঞ্জরী, মদনমোহন : ২. *মদনগোপাল = ভক্তকে (উ)ন্মাদিত করেন যে গোপাল।* **মদনমোহন** *= মদনকে মোহিত করেন যিনি।* ৩. **মদনগোপাল** = ভক্তোন্মাদকর গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ। **মদনমঞ্জরী** = যক্ষ দুন্দুভির কন্যা, তৎসদৃশী সুন্দরী। **মদনমোহন** = মদনের মোহকর, শ্রীকৃষ্ণ। (ব.শ.)। ৫. অ্যাকাডেমির কল্যাণে এই শব্দগুলির অর্থ তো বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছেই, এমনকি শহুরে বাংলাভাষীর নামের তালিকা থেকে এত সুন্দর শব্দগুলিও এখন বাদ পড়ে গেছে। গ্রামবাংলায় এখনও কেউ কেউ এই শব্দগুলি দিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের নাম রাখেন বটে, তবে সে কেবল যাঁরা এখনও **মদনগোপাল** ও **মদনমোহন**-এর পূজাদি করে থাকেন, তাঁরাই। অথচ এই শব্দগুলি বাংলাভাষীদের কত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিল মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে তাকালেই সেকথা বোঝা যাবে। সাক্ষাৎ প্রমাণ চাইলে একবার আসামের ব্রহ্মপুত্রের 'মাজুলী' দ্বীপে চলে যান, পেয়ে যাবেন। বাংলার মধ্যযুগ এখনও সেখানে কমবেশি যথাস্থিতি **বর্ত্তমান** রয়েছে। কবিরা বলতে পারেন, 'শ্রীচৈতন্যের কাল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মাজুলীর চরে!'

মদনমহোৎসব (মদনদ্বাদশী, মদনত্রয়োদশী, মদনচতুর্দ্দশী) : ৩. মদনপূজার্থযাত্রা। (ব.শ.)। ৫. চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, ও চতুর্দ্দশী — এই তিনটি দিনকে যথাক্রমে **মদনদ্বাদশী, মদনত্রয়োদশী, মদনচতুর্দ্দশী** বলা হত। এখনও **ফাল্গুন** মাসের পূর্ণিমায় **মদনমহোৎসব** বা দোল-উৎসব হয়, একালে যাকে সাধারণভাবে 'হোলি' বলা হয়ে থাকে। এই **ফাল্গুন**-চৈত্র দু'মাস হল **মদন**-এর কাল। (দ্র. **ফাল্গুন, ফাল্গুনী**)। আমাদের পূর্বপুরুষরা বাৎসরিক সময়কালের কোন কালখণ্ডে মানবমনে **মদন**-এর অত্যধিক প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে, তা নির্ণয় করেছিলেন। তদনুযায়ী কত আচার অনুষ্ঠান যে হত, মধ্যযুগের সাহিত্যে তার নিদর্শন আছে। আজ আমরা সেযুগের তুলনায় অনেক বেশি করে হোলির নামে **মদন-মহোৎসবে** লিপ্ত হই, **মত্ত** হই, **মদমত্ত** হই; সেগুলির মর্মার্থ না বুঝেই। ধন**মদে মত্ত** আত্মহারা গোলোকায়িত এই বিশ্বে আত্মার গ্লানি দূর করার জন্য এখন তো শুধুই **মত্ত** হওয়া দরকার, উপলক্ষ যাই হোক। উপলক্ষটির নাম কী, তার মানে কী, এসব বোঝার ফুরসৎ পর্যন্ত এখন আমাদের নেই। রাত্রি দুটোর সময় পঞ্চা-মাতাল পাড়ায় ঢুকলে কুকুরে তাড়া করেছিল, এবং সে পাশের মাঠটিতে ছুটতে শুরু করেছিল; এখন সকাল ছ'টাতেও সে ছুটছে, নেশা ছুটে যাওয়ায় আরও জোরে **ছুটছে**, কিন্তু কুকুরটিকে ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পঞ্চা-মাতালকে ধরে তার ছোটার কারণ শুধোতে সে বলেছিল, কেন ছুটছে তা সে জানে না। আমাদের অধিকাংশ উৎসব সম্পর্কে আমরা পঞ্চা-মাতালের মতোই অতীতহারা হতভাগা।

মদনপক্ষী, মদনসারিকা, মদনা, ময়না, ময়নামতী : ৩. **মদনপক্ষী** = শারিকা। **মদনসারিকা** = কামোদ্দীপক সারিকা, সারিকা। **মদনা** = মদনসারিকা, সালিক, ময়না। **ময়না** = মদনসারিকা, পক্ষিবিশেষ, বন্য সকণ্টক ক্ষুপবিশেষ, বালিকার আদরের নাম, খলস্বভাব নারী, কুটনী, গালি। (ব.শ.)। **ময়নামতী** = রাজা মানিকচন্দ্রের যাদুকরী স্ত্রীর নাম, ডাকিনী বা খলস্বভাবা নারী (ময়নাবুড়ি)। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৫. যে পাখি নিজে **মত্ত** থাকে, অন্যদেরও **মত্ত** করে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা তাকে নাম দিয়েছিলেন **মদনপক্ষী** বা **মদনসারিকা**। পরবর্তীকালের বাংলাভাষীরা তাকে **মদনা** বা **ময়না** নামে আরও ঘরোয়া করে নেন। কিন্তু **মদন**-এর স্বভাবের ভিতরেই এমন একটি ব্যাপার আছে যে, সেই স্বভাব বেশি হয়ে গেলে তা মানুষের পক্ষে মন্দ হয়ে যায় এবং সহনীয় মাত্রায় থাকলে প্রিয় ও ভাল হয়। সেই কারণে **ময়না** প্রিয় নামও হয়, মন্দস্বভাবা স্ত্রীলোককে বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। **ময়নামতী** ভাল বটে, মন্দও বটে। তবে আজকাল এই শব্দগুলি সবই প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

মদনলেখ, মদনলেখা : ৩. কামার্ত্তিসূচকলিপি, প্রণয়পত্রিকা। (ব.শ.)। ৫. একালে একে বলা হয় 'প্রেমপত্র' বা 'love-letter'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো পত্রকে **প্রেম**-পত্র হয়ে উঠতে গেলে পারস্পরিক টানকে যে উচ্চতায় উঠতে হয়, ঐ love-letter-গুলি সেই উচ্চতায় উন্নীত নয়। দ্র. **প্রেম**। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কামার্ত্তিসূচক লিপি'র অধিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে এগুলির নাম অবশ্যই **মদনলেখ, মদনলেখা** ... ইত্যাদি হওয়াই ঠিক। তাদের **প্রেম**পত্র নাম দিয়ে মুদির দোকানের ফর্দকে সাহিত্যের **মর্য্যাদা** দিয়ে ফেলা হয়েছে।

মদনালয়, মদনাসন : ২. *মদনালয় = **মদন**-এর আলয়; অর্থাৎ, **মদন** যেখানে লয়প্রাপ্ত হয়। মদনাসন = **মদন**-এর আসন; অর্থাৎ, **মদন** যেখানে আসীন হন।* ৩. যোনি, (জ্যোতিষে) **লগ্নাবধি** সপ্তম স্থান, জায়াস্থান। (ব.শ.)। ৫. ব্যাখ্যা **নিষ্প্রয়োজন**।

মাতঙ্গী : দ্র. **দশমহাবিদ্যা**।

মাদ্র (মাদ্রবতী, মাদ্রাজ, মাদ্রী) : **২.** *মাদ্র = মদ্র হইতে জাত। মাদ্রবতী = মাদ্র বাহক সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে তাহার আধার। মাদ্রাজ = মাদ্র-এর আধার জাত যাহাতে। মাদ্রী = মাদ্র-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. মাদ্র** = মদ্রদেশপতি, মদ্ররাজ। **মাদ্রবতী** = মদ্ররাজকন্যা, মাদ্রী। **মাদ্রী** = মদ্ররাজকন্যা (ইনি পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল ও সহদেবের জননী।)। (ব.শ.)। ... রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা। ... কিমিন্দম মুনির শাপে স্ত্রী-সঙ্গম কালে মৃত্যু হবার আশঙ্কায় পাণ্ডু ব্রহ্মচর্য পালন করে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। ... নিঃসন্তান বলে পাণ্ডুর নিকট স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হবে মনে করে পাণ্ডু কুন্তীকে সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে বলেন। কুন্তী পাণ্ডুকে দুর্বাসা প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে পাণ্ডুর অনুরোধে ধর্ম, বায়ু, ও ইন্দ্রের সহিত সঙ্গমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। তখন মাদ্রী পাণ্ডুকে অনুরোধ করেন যে, কুন্তী ইচ্ছা করলে তাঁকেও পুত্রবতী করতে পারেন। সপত্নী বলে মাদ্রী স্বয়ং কুন্তীকে এই বিষয়ে অনুরোধ করতে সাহস করেননি। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে যেকোনো একজন দেবতাকে আহ্বান করতে বলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে নকুল ও সহদেবকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে পাণ্ডু মাদ্রীর আরো পুত্রের জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করলে কুন্তী বলেন যে, মাদ্রী অতিশয় ধূর্তা; তিনি যুগ্ম দেবতাকে আহ্বান করে কুন্তীকে প্রতারিত করেছেন; সুতরাং পাণ্ডু যেন আর কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ না করেন।

কিছুকাল পরে একদা বসন্তকালে নির্জনে পাণ্ডু মাদ্রীর সহিত একাকী বনবিহার কালে সহসা মাদ্রীর রূপলাবণ্য দেখে ধৈর্য হারান ও মাদ্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বলপূর্বক তাঁকে আলিঙ্গন ও সংগম করেন এবং কিমিন্দম মুনির অভিশাপে তখনি প্রাণত্যাগ করেন। মাদ্রীর আর্তনাদ শ্রবণে কুন্তী সেখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা শুনে স্বামীর সহিত সহমৃতা হতে চান। মাদ্রী বলেন, তিনি স্বামীর সহবাসে অতৃপ্ত এবং কুন্তীর পুত্রদের যদি আত্মবৎ দেখতে না পারেন, তবে তাঁর লোকনিন্দা হবে। তিনি আপন পুত্রদ্বয়ের পালনভার কুন্তীর উপর সমর্পণ করে স্বামীর সহিত সহগমন কামনায় প্রাণত্যাগ করেন। নিকটস্থ ঋষিগণ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ হস্তিনাপুরে নিয়ে যান। সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পাণ্ডু, মদ্র**। অধিরাষ্ট্রের কোলে **পৃথু**র বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের বেশ কিছুকাল পরে ভারতসমাজের মানসলোকে রাষ্ট্রপরিচালক রূপে যে সত্তার আবির্ভাব হয়, তার দুটি ভাগ — **ধৃতরাষ্ট্র** ও **পাণ্ডু**। বৈদিকব্যবস্থা তখন মৌলবাদগ্রস্ত এবং স্বভাবতই সে আর ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না, অন্ধ। তাই তার নাম হয় **ধৃতরাষ্ট্র**। আর, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রথম থেকেই কৃশ, **পাণ্ডু** রোগগ্রস্ত, দুর্বল ও সৃষ্টিশক্তিহীন। কোনো রকমে পরবীর্যে আপন ক্ষেত্রে উৎপাদন করে সে সমাজ চালায়। এই সময় তার যে দুইটি আধারশক্তি বা ক্ষেত্র ছিল, তার একটি হলেন **কুন্তী** এবং দ্বিতীয়ের নাম **মাদ্রী**। এই **মাদ্রী**র সঙ্গে **পাণ্ডু** আগ্রহবশত উৎপাদন কর্মে লিপ্ত হয়ে কিছু উৎপাদন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ কাজ তো তাঁর জন্য তখন নিষিদ্ধ। একালের ভাষায় বললে, নিজে কর্মচারী নিয়োগ করে কিংবা ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন করবার অধিকার **পাণ্ডু**র ছিল না, যদিও কর্মচারী (**কুন্তী**) তাঁর থাকবে এবং ঠিকা লেবারও (**মাদ্রীও**) থাকবে। তারা উৎপাদন করবে বৈদিক ব্যবস্থার কোনো না কোনো দেবতার বীর্যে। এই জন্যই তো সে **পাণ্ডু**। এই খানেই তো ছিল **কিমিন্দম-মুনি**র নিষেধ, অভিশাপ। তা সত্ত্বেও সে চেষ্টা করায় **পাণ্ডু**র মৃত্যু ঘটে।

মৈচ্যান্দর (মৎস্যেন্দ্র, মৎস্যেন্দ্রনাথ) : **৩. মৈচ্যান্দর** = মৎস্যেন্দ্র, মীননাথ। (ব.শ.)। **৪. নাথ**-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত। **৫. নাথ** ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য **আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র** বা **মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মোছন্দর, মীননাথ** ইত্যাদি বহু নাম ও নামান্তর ঐ এক সত্তাকেই বোঝায়। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত পণ্ডিতদের যা হয়, এক্ষেত্রেও সেরকমই হয়েছে। তাঁরা প্রথমেই মাথার মধ্যে একটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সমাজকাঠামোর ধারণা ধরে নেন এবং তাই দিয়ে ভারত ও ভারতের উত্তরাধিকারগুলিকে সেই কাঠামোর সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করেন, না মিললে জোর করে মেলান; তাও না মিললে সেগুলিকে বর্জন করেন। ফল যা হবার, আমাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারগুলির ক্ষেত্রে সেরকমই হয়েছে। ...

যেমন ধরুন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পণ্ডিত এবং ভালমানুষ সন্দেহ নাই। তিনি তাঁর 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'র চর্চায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Endogamous Caste-এর ধারণা নিয়ে ভারতের ধর্ম-সম্প্রদায়কে মেলাতে যান। ফলত ঠিক মার্কসের মতোই ভুল করেন — 'বর্তমান জাতিগুলির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, একটা পেশা লইয়া এক একটি গিল্ড বা সঙ্ঘ হইয়াছে, আবার একই জাতি হইতে একদল বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করিয়া কালে আবার নতুন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ...' তার মানে, ইনিও বিশ্বাস করেন, আদিতে মানুষ একা একা বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত, তারপর একত্রিত হয়ে এক একটি সমাজে পরিণত হয়েছে। ইচ্ছা হল, আর একটি একটি করে মানুষ গিয়ে একটা দল পাকিয়ে ফেলল, ব্যাপারটি অত সহজ নয়। কার্যত, ব্যক্তি থেকে যৌথসমাজ গড়ে ওঠেনি, মানুষের আদিম ঝাঁক বা যৌথসমাজই প্রায় দশ হাজার বছর ধরে ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে ব্যক্তিতে (অবিভাজ্যে = individual-এ) পরিণত হয়েছে। ... মার্কস সাহেবেরও এই ভুল হয়েছিল এবং সে ভুল তিনি আর সংশোধন করে যেতে পারেননি, বলে গিয়েছিলেন বন্ধু এঙ্গেলসকে। তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এঙ্গেলস একটি পৃথক পাদটীকা দিয়ে এই সংশোধনীটি অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এরকম চিন্তা তো গোড়ায় গলদ! আমরা আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছি। ...

এখানে যেকথাটি বলা দরকার তা হল, বৈদিকযুগেরও আগে আমাদের যে আদিম যৌথসমাজ ছিল, যাকে সনাতন সমাজ বলা হত, সেই সমাজের পরিচালক ছিলেন **শিব**। তাঁকেই **নাথ**পন্থীরা বলেন আদি**নাথ**। সেই **শিব**কে বাদ দিয়ে যখন **দক্ষ**-এর নেতৃত্বে বৈদিক যুগের সূচনা হল, **শিব** কেবল বাদ পড়লেন না, তাঁর অনুসারীরাও বাদ পড়লেন, **পাষণ্ড** বলে ঘোষিত হলেন। কিন্তু

শিবকে বাদ দিয়ে সমাজ চালাতে গেলে সমাজের মাঝে মাঝেই প্রাণরসের অভাব পড়ার কথা। ফলে বিপদের সময় আবার সেই আবিষ্কারক-স্রষ্টার বা **শিব**-এর ডাক পড়ে। **পণ্যের** উদ্ভবের সমস্ত পথ যখন **দক্ষপন্থী বেদ**বাদীগণ রুদ্ধ করে রাখল, তখন **গঙ্গা** আনয়নের প্রয়োজন হয়, তখন পুনরায় **শিব**-এর ডাক পড়ে। দ্বিজহত্যা করে **শিব** গঙ্গাধারা বইয়ে দেন। (দ্র. **বারাণসী**)। **বিষ্ণুর** সঙ্গে এই সময় **শিব**-এর সঙ্গ হয়। **মৎস্যাবতার** বিষ্ণুর নাথ হয়ে **শিব** দেখা দেন **মৎস্যেন্দ্রনাথ** বা **মীননাথ** হয়ে। সেই **মীননাথ**-এর অনুগামীদের তাই বলে সামাজিক স্বীকৃতি জোটে না, **দক্ষপন্থী** বেদবাদীগণ 'খাল পেরোলেই কুমীর শালা' বলে **নাথ**দের পুনরায় **বেদবাহ্য** করে রেখে দেন। ... এইভাবে ভারত ইতিহাসের বিকাশের পথ ধরে **আদিনাথ** ও তাঁর অনুগামীদের বিকাশ চলতে থাকে। ... (এ বিষয়ে শ্রী নিখিল দেবনাথ প্রণীত 'নাথধর্ম ও জাতি' গ্রন্থটি একত্রীভূত তথ্যসম্ভার রূপে বিবেচিত হতে পারে।)

মন্ (মন্ত্র্, মন্থ্, মন্দ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিমধ্যন্দিন, অতিমানী, অতিমানুষ, অনভিমত, অনুমতি, অপমান, অপমানী, অপমানিত, অবমান, অবমানিত, অভিমত, অভিমান, অভিমানী, অমত, অমতি, অমন (এমন, কেমন, তেমন, যেমন), অমনধারা, অমনস্ক, অমনাঃ, অমনি, অমনস্য, অমনুষ্য, অমনোযোগ, অমন্ত্র, অমন্ত্রক, অমন্ত্রজ্ঞ, অমন্ত্রতন্ত্র, অমন্ত্রবিৎ, অমন্দ, অমানব, অমানুষ, অমানুষী, অমীমাংস্য, অসম্মত, আমনা, আমন্ত্র, আমন্ত্রণ, আমন্ত্রণা, আমন্ত্রয়িতা, আমন্ত্রিত, আমন্ত্র্য, আমন্দ্র, এমত, এমন, ঐক্যমত্য, নিন্দামন্দ, নিমন্ত্রণ, বিমনা, মউ, মউচাক, মউন (মৌন), মউনি(নী), মউপালানে (মধুপালানে, মাসপালানে), মউমাছি, মউয়া, মউরী (মহুরী, মৌরী), মউল (মৌল), মউল্যা, মত, মতন, মতবাদ, মতবাদী, মতভেদ, মতল (মাতলি), মতলব, মতলেব (মতলিব, মুৎসুদ্দি) মতাক্ষ, মতান্তর, মতাহিয়া, মতি, মতিকর্ম্ম, মতিগতি, মতিগর্ভ, মতিচ্ছন্ন, মতিদর্শন, মতিদ্বৈধ, মতিনিশ্চয়, মতিপূর্ব্বক, মতিপ্রকর্ষ, মতিবিভ্রম, মতিভ্রম, মতিমৎ, মতিমন্ত, মতিমান, মতিলাল, মতিহীন, -মৎ, মথ্, মথ, মথন, মথনী, মথি, মথিত, মথা, মথুরা, মথুরানাথ, মথুরামণ্ডল, মধাই, মধি (মধ্য), মধু, মধুক, মধুকণ্ঠ, মধুকর, মধুকরী, মধুকারী, মধুকাল, মধুকুল্যা, মধুকৃৎ, মধুকৈটভ, মধুকৈটভারি, মধুকোশ(ষ), মধুক্রম, মধুক্ষর, মধুক্ষরা, মধুক্ষীর, মধুখর্জ্জুরী, মধুগন্ধি (-ন্ধিন্), মধুগন্ধী, মধুগয়া, মধুগায়ন, মধুচক্র, মধুচ্যুৎ, মধুচ্ছদা, মধুছন্দা, মধুচ্ছন্দাঃ (-ন্দস্), মধুজিৎ, মধুজালক, মধুজীব, মধুজীবী, মধুত্রয়, মধুদ্রুম, মধুদ্বিট্, মধুধাতু (মাক্ষিক), মধুনাড়ী, মধুনির্গম, মধুনিশা, মধুনিষূদন, মধুপ, মধুপক্ক, মধুপটল, মধুপতি, মধুপবন, মধুপর্ক, মধুপর্ক্য, মধুপর্ণিকা, মধুপাত্র, মধুপাল, মধুপালী, মধুপিঙ্গল, মধুপী, মধুপুর, মধুপুরী, মধুপুষ্প, মধুপূর্ণিমা, মধুপ্রমেহ, মধুপ্রিয়, মধুপ্লুত, মধুবন, মধুবল্লী, মধুবার, মধুব্রত, মধুব্রতী, মধুভিক্ষু, মধুভিৎ, মধুমক্ষিকা, মধুমঙ্গল, মধুমতী, মধুমতীসিদ্ধি, মধুমত্ত, মধুমথ, মধুমথন, মধুমদ্, মধুমদ্য, মধুমন্থ, মধুমল্লি(ল্লী), মধুমস্তক, মধুমাখা, মধুমাছি, মধুমাধব, মধুমাধবী, মধুমাধ্বীক, মধুমান (-মৎ), মধুমাস, মধুমুরনরকবিনাশন, মধুমেহ, মধুযষ্টি, মধুযষ্টিকা, মধুযামিনী, মধুর, মধুরত্রয়, মধুরভাষিতা, মধুরভাষী, মধুরমধুর, মধুররস, মধুরস, মধুরসা, মধুরা, মধুরাই, মধুরাক্ষর, মধুরাম্ল, মধুরাম্লক, মধুরালাপ, মধুরালাপা, মধুরি, মধুরিকা, মধুরিপু, মধুরিম, মধুরিমা, মধুরী, মধুরুচি, মধুলিট্(হ্), মধুলিহ, মধুলেহ, মধুলেহী, মধুশর্করা, মধুশিষ্ট, মধুশেষ, মধুশ্চ্যুৎ, মধুশ্রী, মধুসখ, মধুসখা, মধুসহায়, মধুসারথি, মধুসুহৃৎ, মধুসূদন, মধুস্রব, মধুস্রবাঃ, মধুহা (-হন্), মধুহারী, মধূক, মধূচ্ছিষ্ট, মধূত্থ, মধূত্থিত, মধূৎসব, মধূদ্যান, মধূপঘ্ন, মধূলক, মধ্য (পরিমিত বা ম, সেই ম-ধারিত যাহাতে, ফলে উৎকর্ষাপকর্ষহীন), মধ্যকাল, মধ্যগ, মধ্যগত, মধ্যগাঙ্গ, মধ্যগ্রহণ, মধ্যচারী, মধ্যছন্দ, মধ্যজ, মধ্যত, মধ্যতরঙ্গ, মধ্যদন্ত, মধ্যদহ, মধ্যদিন, মধ্যদীপক, মধ্যদেশ, মধ্যদেশীয়, মধ্যদেশ্য, মধ্যদেহ, মধ্যন্দিন, মধ্যন্দিনীয়, মধ্যপথ, মধ্যপদ, মধ্যপদলোপী, মধ্যপন্থা, মধ্যপন্থী, মধ্যবয়স্ক, মধ্যবয়াঃ, মধ্যবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), মধ্যবিৎ, মধ্যবিত্ত, মধ্যভক্ত, মধ্যভাগ, মধ্যম, মধ্যমকক্ষা, মধ্যমগ্রাম, মধ্যমণি, মধ্যমপাণ্ডব, মধ্যমবয়ঃ, মধ্যমবয়স্ক, মধ্যমলোক, মধ্যমসংগ্রহ, মধ্যমসাহস, মধ্যমা, মধ্যমান, মধ্যমোপল, মধ্যযব, মধ্যরত্ন, মধ্যরাত্র, মধ্যরাত্রি, মধ্যরেখা, মধ্যলোক, মধ্যলোপ, মধ্যসূত্র, মধ্যস্থ, মধ্যস্থতা, মধ্যস্থল, মধ্যাঙ্গুলি(লী), মধ্যান্ত, মধ্যায়ন, মধ্যাহ্ন, মধ্যে, মধ্ব, মধ্বক্ষ, মধ্বাচার্য্য, মধ্বাপাত, মধ্বালুক, মধ্বাসব, মধ্বাসবিক, মধ্বিজা, মন্, মন (man), মন-আপ, মনঃ, মনঃকথা, মনঃকল্পিত, মনঃকষ্ট, মনঃক্ষুণ্ণ, মনঃক্ষেপ, মনঃক্ষোভ, মনঃপীড়া, মনঃপূত, মনঃপ্রণীত, মনঃপ্রসাদ, মনঃশল্য, মনঃশিল, মনঃশিলা, মনঃশীঘ্র, মনঃষষ্ঠ, মনঃসঙ্গ, মনঃসমুন্নতি, মনঃসুখ, মনঃস্থ (মনস্থ), মনঃস্থৈর্য্য, মনঃস্পৃক্, মনকথন, মনকথা, মনকলা, মনকষাকষি, মন-খুঁতখুঁতে, মনখোলসা, মনগড়া, মনচোর, মনচোরা, মনঝুরী, মনন, মন-না-মতি, মন-পবন, মনমথ, মনমরা, মনমর্জ্জি, মনসব, মনসবদার, মনসবা (মনসুবা), মনসা, মনসাদেবী, মনসাপঞ্চমী, মনসি, মনসিজ, মনসিজরুক্, মনসিশয়, মনসুবা, মনস্কান্ত, মনস্কাম, মনস্কার, মনস্তাপ, মনস্তুষ্টি, মনস্থ, মনঃস্থ, মনস্পথো, মনস্বী (-স্বিন্), মনস্বিনী, মনাক্, মনাগুণ(ন), মনান্তর, মনি (ণি), মনি-অর্ডার (মানে-অর্ডার), মনিত, মনিব, মনিবঠাকুর, মনিবঠাকরুণ, মনিবানা, মনি-ব্যাগ, মনিষ, মনিষ্য, মনিস্য, মনিস্যি, মনিস্ব, মনীষা, মনীষিকা, মনীষিত, মনীষী, মনু, মনুজ, মনুজনাথ, মনুজপতি, মনুজব্যাঘ্র, মনুজরাজ, মনুজলোক, মনুজা, মনুজাত, মনুজাধিপ, মনুজাধিপতি, মনুজী, মনুজেন্দ্র, মনুজেশ্বর, মনুভূ, মনুমেন্ট, মনুযুগ, মনুরা, মনুষী, মনুষ্য, মনুষ্যদুর্গ, মনুষ্যদেব, মনুষ্যধর্ম্ম, মনুষ্যধর্ম্মা, মনুষ্যমারণ, মনুষ্যযজ্ঞ, মনুষ্যযান, মনুষ্যযোনি, মনুষ্যলোক, মনুষ্যশৃঙ্গ, মনুষ্যসভা, মনুষ্যহারী, মনুষ্যেন্দ্র, মনুষ্যেশ্বর, মনুহর, মনে, মনে-মনে, মনোগত, মনোগতি, মনোগ্রহণ, মনোগ্রাহী (-হিন্), মনোগ্রাহ্য, মনোজ, মনোজন্মা, মনোজব, মনোজ্ঞ, মনোজ্ঞা, মনোদণ্ড, মনোদুষ্ট, মনোধন্ধ, মনোনাশ, মনোনীত, মনোনুকূল, মনোনুগ, মনোবন্ধু, মনোবল, মনোবাঙ্মূর্ত্তি, মনোবাঞ্ছা, মনোবাঞ্ছিত, মনোবিকার, মনোবিনয়ন, মনোবিরুদ্ধ, মনোবিষয়, মনোবৃত্তি, মনোবেগ, মনোব্যথা, মনোভঙ্গ, মনোভব, মনোভিরাম, মনোভীষ্ট, মনোভূ, মনোমত, মনোমথ, মনোমথন, মনোময়, মনোমালা,

মনোমালিন্য, মনোমুগ্ধকর, মনোমুগ্ধকারী, মনোমোহন, মনোমোহা, মনোমোহিনী, মনোযায়ী, মনোযোগ, মনোরঞ্জন, মনোরথ, মনোরথবন্ধ, মনোরথমোদক, মনোরথসিদ্ধি, মনোরম, মনোরমা, মনোরম্য, মনোলোভা, মনোসাধ, মনোহত, মনোহর, মনোহরশাহী, মনোহরা, মনোহর্ত্তা, মনোহারী (মণিহারী), মনোহিত, মনোহৃৎ, মন্ত, মন্তর, মন্তব্য, মন্তা, মন্তু, মন্তুয়, মন্ত্, মন্ত্র, মন্ত্রকরণ, মন্ত্রকার, মন্ত্রকাল, মন্ত্রকুশল, মন্ত্রকৃৎ, মন্ত্রকোবিদ, মন্ত্রগুপ্তি, মন্ত্রগূঢ়, মন্ত্রগৃহ, মন্ত্রজ, মন্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রণ, মন্ত্রণা, মন্ত্রতন্ত্র, মন্ত্রদ, মন্ত্রদর্শী, মন্ত্রদাতা, মন্ত্রদৃক্ (-দৃশ্), মন্ত্রদেবতা, মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রধর, মন্ত্রধারী, মন্ত্রপত্র, মন্ত্রপূত, মন্ত্রপ্রযুক্তি, মন্ত্রপ্রয়োগ, মন্ত্রফাঁস, মন্ত্রবচন, মন্ত্রবান (-বৎ), মন্ত্রবাদী, মন্ত্রবিৎ(দ্), মন্ত্রবিদ্যা, মন্ত্রভবন, মন্ত্রভেদ, মন্ত্রমুগ্ধ, মন্ত্রমূর্ত্তি, মন্ত্রমূল, মন্ত্রযন্ত্র, মন্ত্রযুক্তি, মন্ত্রযোগ, মন্ত্রসংবরণ, মন্ত্রসংস্কার, মন্ত্রসংহিতা, মন্ত্রসাধন, মন্ত্রসিদ্ধ, মন্ত্রসূত্র, মন্ত্রস্নান, মন্ত্রস্তুতি, মন্ত্রারাধন, মন্ত্রি, মন্ত্রিণী, মন্ত্রিত, মন্ত্রী, মন্ত্রীপতি, মন্ত্রীপ্রধান, মন্ত্রীবর, মন্ত্রীমুখ্য, মন্ত্রীরাজ, মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ, মন্ত্রীশ্রোত্রিয়, মন্ত্রোদক, মন্থ্, মন্থ, মন্থগিরি, মন্থগুণ, মন্থজ, মন্থদণ্ড, মন্থদণ্ডক, মন্থপর্ব্বত, মন্থবিষ্কম্ভ, মন্থশৈল, মন্থন, মন্থনঘটী, মন্থনপাত্র, মন্থনদণ্ড, মন্থনযন্ত্রক, মন্থনী, মন্থর, মন্থরগামী, মন্থরবিবেক, মন্থরা, মন্থা, মন্থাচল, মন্থাদ্রি, মন্থান, মন্থিত, মন্থিনী, মন্থী, মন্দ্, মন্দ, মন্দকর্ণ, মন্দকারী, মন্দগ, মন্দগতি, মন্দগমন, মন্দগামী, মন্দগ্রহ, মন্দচেতাঃ, মন্দছন্দ, মন্দচ্ছায়, মন্দধার, মন্দধী, মন্দপুণ্য, মন্দপ্রজ্ঞ, মন্দবিভব, মন্দবিষ, মন্দবিসর্পী, মন্দবুদ্ধি, মন্দভাঃ, মন্দভাস্, মন্দভাগী, মন্দভাগ্য, মন্দমতি, মন্দমন্দ, মন্দমেধা, মন্দর, মন্দরা (মাদুর), মন্দরশ্মি, মন্দশিশির, মন্দসন্দ, মন্দস্মিত, মন্দহাস, মন্দহাস্য, মন্দা, মন্দাকিনী, মন্দাক্রান্তা, মন্দাক্ষ, মন্দাগ্নি, মন্দাত্মা, মন্দাদর, মন্দানল, মন্দায়ুঃ, মন্দার (মাদার গাছ), মন্দারক, মন্দারমালা, মন্দারমালিকা, মন্দারষষ্ঠী, মন্দারসপ্তমী, মন্দির, মন্দিরা, মন্দীভূত, মন্দুরা, মন্দুরাপতি, মন্দুরাপাল, মন্দুরাসংশ্রয়ী, মন্দোৎকণ্ঠ, মন্দোৎসাহ, মন্দোদরী, মন্দোষ্ণ, মন্দ্র (মেঘমন্দ্র), মন্দ্রিত, মন্মথ, মন্মথকর, মন্মথবন্ধু, মন্মথমোহিনী, মন্মলেখ, মন্মথসখ, মন্মথসুহৃৎ, মন্মথাবিষ্ট, মন্মথালয়, মন্মন, মন্মনঃ, মন্মনাঃ, মন্যা, মন্যু (অভিমন্যু, উপমন্যু), মন্যুপরীত, মন্যুময়, মন্যুমান (মন্যুমৎ), মন্বন্তর, মম (দ্র. মাং, মাংস), মমকার, মমকৃত্য, মমতা, মমতাময়, মমতাময়ী, মমতাযুক্ত, মমতাশূন্য, মমত্ব, মহু (মধু), মহুকুপ (মকুফ, মকুব), মহুরি, মহুরী, মহুল (মহুয়া), মাজুর, মাজুরি, মাঞ্জুরী, মাং (মাম্), মাংস, মাংসকচ্ছপ, মাংসকন্দী, মাংসকর, মাংসকীল, মাংসগ্রন্থি, মাংসজ, মাংসতেজঃ, মাংসপ, মাংসপচন, মাংসপেশী, মাংসবিক্রেতা, মাংসভক্ষ, মাংসভেত্তা, মাংসযোনি, মাংসরস, মাংসরুচি, মাংসল, মাংসসার, মাংসসাৎ, মাংসসাদ, মাংসসাদী, মাংসস্নেহ, মাংসাদ, মাংসাদী, মাংসার্ব্বুদ, মাংসাশন, মাংসাশী, মাংসাষ্টকা, মাংসিক, মাংসোন্নতি, মাংসোপজীবী, মাঝ, মাঝামাঝি, মাঝারি, মাঝি, মাঝিমাল্লা, মাঝী, মাৎ, মাৎ-করা (বাজিমাৎ), মাত (মথিত), মাতবর (মাতব্বর), মাতব্বরী, মাতলি (মতল), মাথ (মথিত, মন্থ্), মাথুর, মাথুর্য্যা, মাদার (মন্দার), মাদুর, মাদুরী, মাধব, মাধবক, মাধবিকা, মাধবপ্রিয়, মাধববল্লী, মাধবশ্রী, মাধবী, মাধবীকুঞ্জ, মাধবীবন, মাধবীমণ্ডপ, মাধবীলতা, মাধাই, মাধুক, মাধুকর, মাধুকরী, মাধুকুরি(রী), মাধুপর্কিক, মাধুর, মাধুরী, মাধুর্য্য, মাধুর্য্যব্যঞ্জক, মাধূক, মাধ্যন্দিন, মাধ্যন্দিনীয়, মাধ্যম, মাধ্যমক, মাধ্যমিক, মাধ্যস্থ, মাধ্যাহ্নিক, মাধ্ব, মাধ্বিক, মাধ্বী, মাধ্বীক, মাধ্বীকফল, মান্, মান, মানক, মানকচু, মানকলহ, মানকলি, মানকা, মানকৃৎ, মানক্ষতি, মানগ্রন্থি, মানচাকী, মানত, মানদ, মানদণ্ড, মানদল, মানদা, মানদ্রবিণ, মানধন, মানধ্মাত, মানন, মাননা, মাননি, মাননীয়, মাননীয়া, মানপত্র, মানপরিখণ্ডন, মানপর, মানপ্রাণ, মানব, মানবদেব, মানবড়ী, মানবপতি, মানবপুরাণ, মানবরাক্ষস, মানবর্দ্ধন, মানবলীলা, মানবসূত্র, মানবান্, মানবিনী, মানবীয়, মানবেন্দ্র, মানভঙ্গ, মানভঞ্জন, মানভাক্, মানভৃৎ, মানমহান, মানয়িতব্য, মানয়িতা, মানযোগ, মানরন্ধ্রা, মানস, মানসচারী, মানসজন্মা, মানসজপ, মানসতীর্থ, মানসপূজা, মানসবেদ, মানসব্রত, মানসরুক্, মানসসন্তাপ, মানসসরোবর, মানসিক, মানসসরস, মানসসেবন, মানসা, মানসালয়, মানসুরে, মানসূত্র, মানসৌকাঃ, মানহা, মানহানি, মানা, মানান, মানান্তর, মানান্ধ, মানানসই, মানাপমান, মানার্হ, মানাসক্ত, মানিকা, মানিত, মানিতা, মানিত্ব, মানিনী, মানী, মানুখ, মানুষ, মানুষতা, মানুষতীর্থ, মানুষদৈবিক, মানুষ-মানসেতা, মানুষমুনুষ, মানুষরাক্ষস(সী), মানুষলৌকিক, মানুষসম্ভব, মানুষাদ, মানুষিক, মানুষিণী, মানুষ্য, মানুষ্যক, মানে, মানোজ্জক, মানোৎসাহ, মানোন্নতি, মানোন্মাদ, মান্ত্রিক, মান্থর্য্য, মান্দার, মান্দাস, মান্দ্য, মান্ধাতা (মান্ধাতৃ), মান্মথ, মান্য, মান্যগণ্য, মান্যতা, মান্যত্ব, মান্যবর, মান্যমান, মান্যস্থান, মান্যানী, মাহ্, মাহা, মাহি, মাহুর, মিউনিসিপালিটি (মুনিষ-পাল-ইতি), মিউমিউ, মিনষে, মিনসা, মিনসে, মিনিসা, মিয়োঁ, মীর, মুন, মুনকির, মুনাফা, মুনাদি, মুনাসিব, মুনি, মুনিকন্যা, মুনিকুমার, মুনিচ্ছদ, মুনিতনয়া, মুনিতরু, মুনিত্রয়, মুনিদারক, মুনিদ্রুম, মুনিপিত্তল, মুনিপুঙ্গব, মুনিপুত্র, মুনিপুষ্প, মুনিপৃগ, মুনিব, মুনিবন, মুনিবৃক্ষ, মুনিবৃত্তি, মুনিবেশ, মুনিব্রত, মুনিভেষজ, মুনিমন্ত, মুনিমন্ত্র, মুনিষ, মুনিষ্য, মুনিস, মুনিসা, মুনিস্থল, মুনিস্থান, মুনী, মুনীন্দ্র, মুনীশ, মুনীশ্বর, মুন্যন্ন, মুন্যষভ, মুন্‌শী (মুন্‌সি, -সী), মুন্‌শীগিরী, মুন্‌শীজী, মুন্‌শীয়ানা, মুন্‌সিব, মুন্‌সী, মুন্‌সেফ, মুন্‌সেফী, মূর্ষা, মৃদুমন্দ, মেন (মেনো), মেনকা, মেনকাত্মজা, মেনকাপ্রাণেশ, মেনা, মেনী, মেনে, মেনেতে, মেনো, মৈন্ধ, মৈধ্য, মৈনাক, মৈনাকানুজা, মৈন্দ, মোন, মোনকষা, মোনসব, মোনা, মোনাসি, মোনাসেব (মুনাসিব), মোনে, মোন্‌সব, মোহ্, মৌ, মৌআলু, মৌকলস, মৌক(কু)লি, মৌখল, মৌচাক, মৌন, মৌনগতি, মৌনধারী, মৌনবৃত্তি, মৌনব্রত, মৌনমুদ্রা, মৌনসম্মতি, মৌনী, মৌপালান, মৌপালানে, মৌমাছি, মৌয়া, মৌয়ালু, মৌরী, মৌহারী, ম্যানেজার, সমধুর, সমনস্ক, সম্মত, সম্মতি, সম্মান, সুমতি, সুমধুর, সুমন, সুমনা, সুমন্ত্র, সুসম্মত।

মন্ (মন্ত্র, মন্থ, মন্দ) = পরিমিত-করা অন্। **মন** = পরিমিত-করা অন্ যাহাতে। **মন্ত্র** = পরিমিত-করণ তারিত হইয়া রহে যাহাতে। **মন্থ** = পরিমিত-করণ থাকে যাহাতে। **মন্দ** = পরিমিত-করণ দেয় যে বা প্রদত্ত যাহাতে। (**মন্** ক্রিয়াজাত শব্দগুলির একটি বড় সমস্যা তাদের প্রতীকী অর্থ সরবরাহ করা। অধিকাংশ বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকলেও, সেই সমস্যা সর্বাধিক অনুভূত হয় এই **মন্**-জাত শব্দসমূহের বেলায়। অভিধানকার ও শব্দকোষকারগণ এই শব্দগুলির অর্থ সরবরাহ করতে গিয়ে যেন জেরবার হয়ে গেছেন।)

অমন (অমনি, এমন, এমনি, কেমন, তেমন, তেমনি, যেমন, যেমনি) : ২. অমন = *অস্তিত্বের* **মত (মতো)** *যে। (নিম্নে* **মতো** *দ্রষ্টব্য)।* **অমনি** = **অমন** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **এমন** = *চলমান (এই) অস্তিত্বের* **মত (মতো)** *যে।* **এমনি** = **এমন** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **কেমন** = **কে**-*র (দিশাগ্রস্ত কারীর)* **মত (মতো)** *যে।* **তেমন** = **তে**-*র (দিশাগ্রস্ত তারীর)* **মত** *(মতো) যে।* **তেমনি** = **তেমন** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **যেমন** = **যে**-*র (দিশাগ্রস্ত যায়ীর)* **মত (মতো)** *যে।* **যেমনি** = **যেমন** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **৩. অমন** = ঐপ্রকার, ওরকম, এরূপ। **অমনি** = ঐরূপই, ঐপ্রকারেই, ঐভাবই ... ইত্যাদি। **এমন** = সর্ব্বথা এরূপ, ঈদ্রিশ ... ইত্যাদি। **এমনি (এমনই)** = এইরূপই, ঠিক এইভাবাপন্ন ... ইত্যাদি। **কেমন** = কীপ্রকার, কিমাকার, কিরূপ ... ইত্যাদি। **তেমন** = সেরূপ, তাদৃশ। **তেমনি** = সেরূপই, তৎক্ষণাৎ। **যেমন** = যে প্রকার, যেরূপ। **যেমনি** = যেপ্রকারই, যেরূপই। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মন, মত, মতো**। আমাদের **মন** পারিপার্শ্বিক সত্তাসমূহের প্রত্যেককেই অনবরত মাপতে থাকে। মেপে যা পাওয়া যায়, তাকেও **মন** বলে। সেই মাপিত ফলস্বরূপ **মন** তারিত হয়ে পৌঁছায় **মত**-এ। তার আগেই যদি মাপিত সত্তাগুলির বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে — যার কথা বলা হচ্ছে, তার মাপ কী? আমরা বলি সেটি **কেমন**? উত্তর যদি হয়, অস্তিত্বটি যেরকম, তার মাপিত রূপ সেরকমই। তখন আমরা বলি **অমন** বা **এমন**। ... স্বভাবতই এর ঠিক পরের ধাপের শব্দগুলি হল — **এমত, কীমতি, যেমত, যেমতি, তেমতি ...** ইত্যাদি। অবশ্য এখানেই বাংলাভাষী থেমে থাকেননি। তাঁরা **তর** ও **ধারা** শব্দ যোগ করে **অমনতর, এমনতর, অমনধারা, এমনধারা** ... ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দ বানিয়ে নিয়েছেন।

মউপালান (মধুপালান, মাসপালান) : দ্র. **পালান**।

মত (মতন, মতলব, মতান্তর — মতো) : ১. ✓মন্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মত** = **মন** *(পরিমিত বা পরিমাপিত সত্তা) তারিত যাহাতে।* **মতন** = **মত** *অন (on) যাহাতে।* **মতলব** = **মত** *লালিত ও বাহিত যাহাতে।* **মতান্তর** = **মত**-*এর অন্তর যাহাতে।* **৩. মত** = জ্ঞাত, সম্মত, মন্যমান, সম্ভাবিত, পূজিত, অনুযায়ী; জ্ঞান, সম্মতি, অভিপ্রায়, পূজা, সম্মতকর্ম্ম, নীতিধর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত; সদৃশ, তুল্য। **মতন** = অভিমত, তুল্য, সদৃশ, শেষপর্যন্ত। **মতলব** = অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, ইচ্ছা। **মতান্তর** = ভিন্ন মত, পৃথক ধর্ম্মমত, অন্য বিধি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মন**। কথা একটাই — **মত**। আমাদের **মন** পরিপার্শ্বের প্রতিটি সত্তাকে মাপে। তার মাপিত ফলকেও **মন** বলে। দ্র. **অমন, এমন** ... ইত্যাদি। সেই মাপিত ফল বা **মন** তারিত হয় আমাদের **মত**-এ। এই **মত** স্বভাবতই দুদিক দিয়ে ঠিক কথা। প্রথম দিকটি হল, সত্তাটির যে পরিমাপ আমাদের কাছে মাপিত হয়ে বা **মন** হয়ে এসে **মত**-এ পরিণত হয়েছে, সেটিই সে বিষয়ে আমাদের **মত**। এই **মত**কে একালে অভি**মত** (opinion) বলা হয়ে থাকে। **এটি** আমাদের মাপন-যন্ত্রের হিসেবের বা **মনে**র সিদ্ধান্ত বা **মত**। দ্বিতীয় দিকটি হল, যাকে মাপা হয়ে গেছে, এটি তার ন্যায় বা **মত**। কেননা এর ভিতরে **মন** তারিত হয়েছে। (উপরে ১.-এ ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য।) এই **মত**কে আজকাল **মতো** লেখা হয়, যার অর্থ সার্বিকভাবে একরকম। এতে একটা সুবিধা এই হয় যে, **শব্দটি অভিমত**-এর **মত**-এর সঙ্গে একটা ফারাক রক্ষা করে; ফলে বুঝতে সুবিধা হয়। যে কারণে আমরা 'তদনুরূপ' বা 'তাহার ন্যায়' অর্থে **মত** না লিখে **মতো** শব্দটি আমাদের শব্দার্থকোষে আগাগোড়া ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমরা যখন **মতন** বলি, তখন কার্যত তা **মতো** অর্থেই বোঝা হয়ে থাকে; কখনোই অভি**মত** অন থাকা অর্থে বোঝা হয় না। কিন্তু সেভাবেও কথাটিকে বোঝা যেতে পারে।

মতবাদ : দ্র. **বাদ**[১]।

মতি (মতিগতি, মতিচ্ছন্ন, মতিভ্রম, মতিমান, মতিলাল, মতিহীন — অনুমতি, সম্মতি) : ১. ✓মন্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মতি** = **মত** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **মতিগতি** = **মতি** *ও* **গতি**। **মতিচ্ছন্ন** = **মতি** *আচ্ছাদিত যাহার।* **মতিভ্রম** = *মতি ভ্রমণশীল যাহাতে; অর্থাৎ, যে* **মতি** *স্থির নহে (ভ্রান্ত)।* **মতিমান** = **মতি** *(তাহার) পরিমিত রূপে অন (on) যাহাতে।* **মতিলাল** = **মতি** *লালিত যাহার।* **মতিহীন** = **মতি** *নেই যাহার।* **অনুমতি** = **মতি**র *অনুকূল* **মতি**। **সম্মতি** = **মতি**র *সমান যে* **মতি**। **৩. মতি** = জ্ঞান, ইচ্ছা, স্মৃতি, সম্মান, নিশ্চয়, সঙ্কল্প, নীতিশাস্ত্রজ্ঞান বা অনুমান দ্বারা অর্থনির্দ্ধারণ, বুদ্ধি, মনঃ, শাকবিশেষ। **মতিগতি** = মনোগত বৃত্তি। **মতিচ্ছন্ন** = আচ্ছন্নমতি, বিচারমূঢ়, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, বুদ্ধিভ্রংশ, মতিভ্রম, দুর্ব্বুদ্ধি। **মতিভ্রম** = বুদ্ধিবিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ। **মতিমান** = বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত। **মতিলাল** = রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি। (ছান্দড়ের পুত্র রবি মহিন্তা গ্রামে বাস করেন, তদনুসারে ইঁহাদের গাঁই বা উপাধি 'মহিন্তা'। এই গোত্রে পরপুরুষ রামগোবিন্দ মহিন্তার পুত্র 'কৃষ্ণ মতিলাল'; ইঁহারই উপাধি-অনুসারে 'মতিলাল' উপাধি। শুনা যায়, লাল মতির মালা এই উপাধির অন্যতম কারণ।)। **মতিহীন** = বুদ্ধিহীন, নির্ব্বোধ। **অনুমতি** = সম্মতি, অনুজ্ঞা, কলাহীন হইলেও যে তিথিতে পূর্ণিমাবিহিত যাগাদির অনুমতি আছে; উনেন্দু অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অঙ্গিরার পত্নী, অনুকূলমতি, প্রসন্ন। **সম্মতি** = অনুমতি, অভিলাষ, অনুজ্ঞা, সম্মাননা, সমীচীনা মতি বা জ্ঞান। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মন, মত**। পরিপার্শ্বের বিষয় ও বস্তুসমূহকে মেপে নিয়ে আমাদের নিজ নিজ **মন** নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ **মত**-এ পৌঁছায়। সেই **মত** যখন সক্রিয় থাকে, সেই হল আমাদের প্রত্যেকের **মতি**। সেই **মতি** অনুসারেই আমরা প্রত্যেকে চলি; অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের **গতিবিধি**র পিছনে আমাদের নিজ নিজ **মতি** থাকে। আমরা যখন বলি, 'রামবাবুর **মতিগতি** ভাল ঠেকছে না', তখন আমরা দুটো কথা বলি; তাঁর **মতি**র কথা ও তাঁর **গতি**র কথা। **আশেপাশে**র মতো **মতিগতি**ও একটি 'পরিপূরক **যোড়শব্দ**'। কিন্তু **মতিমান** মানুষেরও কখনো-সখনো **মতি** আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তা সে অদৃশ্য ভুল ধারণার প্রভাবে হোক কিংবা দৃশ্য **মদ** খেয়েই হোক, তখন আমরা তাঁকে বলি, 'ভদ্রলোকের **মতিচ্ছন্ন** হয়েছে।' তার মানে তাঁর **মন**-জাত ও **মনন**-জাত **মতি** আছে বটে, কিন্তু সেটি

কাজ করছে না; যেন তাঁর **মতি**র আলোকবর্তিকার মুখের সামনে একটা কোনো আচ্ছাদন এসে তার আলোর বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু **মতিভ্রম**-এর বেলায় **মতি**টাই ঠিকঠাক কাজ করে না, যেখানে থেকে **মতি**র যে-কাজ করার কথা ছিল, সেখানে না থেকে **মতি**টি এদিক-সেদিক করছে; কারণ সেই **মতি**র জনক **মন**টাই এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেজন্যই **মন**-জাত **মতি**রাও জনকের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই **মতি**ও **ভ্রম**গ্রস্ত হয়েছে। সেকারণেই **মতিভ্রম**।

তবে **মতিলাল** শব্দটির জন্য আমাদের দুঃখ হয়। **মতিলাল** নেহরুকে সবাই চেনেন, তাঁর বাবা-মা তাঁর ঐরকম নাম রেখেছিলেন। আমাদের কলকাতা ও ঢাকার আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায় সবাই বিমলকৃষ্ণ **মতিলাল**কে জানেন। সুতরাং **মতিলাল** শব্দটির যে যথেষ্ট ইজ্জত ছিল, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও আজকাল কেউ আর **মতিলাল** নাম রাখেন না। কেন? কারণ, শব্দটির ভিতরে গৌরবের কী কথা আছে, সেকথাটাই তো **মতিলাল** নেহরুর উত্তরসূরি পরিচালিত ভারতবর্ষ ভুলে গেছে! দ্র. **লাল, লালন**। কিন্তু **অনুমতি**?

রামবাবুর বিশাল কারবার। ব্যবসা, জমি, ভেড়ি, প্রমোটারি ... কত কী যে করেন, তার হিসাব রাখা ভার। সাত দিকে তাঁর নজর। অর্থাৎ তিনি সাতঘোড়ার রথ চালিয়ে চলেছেন **মৃগয়া**য়। তাঁর সাতজন সরকারবাবু বা ম্যানেজার তাঁর সাত ঘোড়া। তাঁরাও রামবাবুর নির্দেশমতো ছুটছেন, এখানে সেখানে, সকাল থেকে সন্ধে। সেই ম্যানেজারদের নির্দেশে কত লোক কত কাজ করছে। সব মিলিয়ে চলছে রামবাবুর **মৃগয়া**। আর সে **মৃগয়া**য় যা কিছু ঘটছে, তা সবই রামবাবুর **মতি** অনুসারেই ঘটছে। তো, আমাদের পাড়ার শ্যামবাবু, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের মৎস্য বিভাগ থেকে অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন, গিয়ে রামবাবুকে বললেন, 'চিংড়ি চাষের উচ্চমানের নতুন একটি পদ্ধতি আমি জানি। আপনি যদি আপনার ভেড়িগুলিতে সেই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করেন, আপনার উৎপাদন দ্বিগুণ হতে পারে, অথচ খরচ হবে আগের তুলনায় অর্ধেক। আপনি বললে, আপনার ভেড়িতে আমি সেই চাষ করে দেখিয়ে দিতে পারি।' রামবাবু সব শুনে বললেন, 'বেশ তাই করুন।'

তার মানে রামবাবুর যে বিশাল কারবার, যা কিনা তাঁর **মতি** অনুসারে চলছে, তারই একটি অংশে যুক্ত হলেন শ্যামবাবু। **মতি**র একটি অংশে এভাবে বাড়তি যোগদান করাকে বলা হয় **অনুমতি**। রামবাবু তাঁর **মতি** অনুসারে তাঁর চলমান **মতিগতি**র সঙ্গে শ্যামবাবুকেও যোগদান করতে বললেন। একেই বলে **অনুমতি** দেওয়া। যেখানে **মতি** ও **মতিগতি** সক্রিয় নয়, সেখানে **অনুমতি** কথাটির কোনো যাথার্থ্য থাকে না। দরিদ্র বেকার মানুষ **দুর্গতি**র মধ্যে দিন কাটান। তাঁর **মতিগতি**র ঠিক থাকে না। তাঁর **মতি** অনুসারে বিশাল কর্মকাণ্ডই নাই। তাঁর কর্মাংশে যোগ দেওয়ার অনু**মতি** চাওয়ারও কোনো মানে হয় না। **মতি** নাই তার অনু**মতি**! তার মানে, **অনুমতি** শব্দটিকে বাস্তব হতে গেলে **মতি** থাকতে হবে। তবে আজকাল শব্দটি তার সেই ভিত্তি পেরিয়ে আরও বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা আছে। ইংরেজি **ভোট** শব্দটি এখন আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। বাংলায় কথাটি আরও ব্যাপকার্থে বলা সম্ভব হয় **সম্মতি** শব্দের দ্বারা। যিনি **সম্মতি** পাওয়ার জন্য বা 'ভোট' পাওয়ার জন্য লড়ছেন, তাঁর একটি কর্মসূচী বা **মতি** থাকে। তাঁর সেই '**মতি** অনুসারে চলা'তে আমরাও যদি সহ**মত** পোষণ ক'রে **সম্মতি** দিই, তাহলেই তিনি অধিক **সম্মতি** পেয়ে জিতে যাবেন। অতএব 'ভোট দিন' না বলে '**সম্মতি** দিন' বলা যেতেই পারে। এই **সম্মতি**র বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমাদের 'চ' গ্রন্থে। দ্র. **বাচন, নির্ব্বাচন**।

মধু (মধুর, মধ্য, মধ্যম) : ১. মধু = ✓মন্ + উ - কর্ম্মবাচ্যে; ✓মন্ + উ - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মধু** = **মধ** *('সীমায়িতের ধারক') নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে'; অথবা, যে সীমায়িত-ধারী অসীমের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ দান করে।* **মধুর** = **মধু** *রহে যাহাতে।* **মধ্য** = **মধ** *থাকে যাহাতে।* **মধ্যম** = **মধ্য** *সীমায়িত যাহাতে। /* **মধু** = যখন সর্ব্বত্র কামদেবকে মনে হয়; পুষ্পরসযুক্ত যে কাল। **মধ্যম** = যা হা গুণে বা জাতিধর্ম্মে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টের মধ্যবর্ত্তী। (ব.শ.)। **৩. মধু** = চৈত্রমাস, বসন্তকাল, মধুক, মহুয়াগাছ, অশোক, যষ্টিমধু, দৈত্যবিশেষ, লবণদৈত্যের পিতা, যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ, মধুবংশীয়-গণ, মাধব, কার্ত্তবীর্য্যরাজ, বন্দিভেদ, ইন্দ্রিয়, পুষ্পরস, মকরন্দ, মৌ, ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক (মক্ষিকাসঞ্চিত মৌ), মধুপটল, মৌচাক, মধুকপুষ্পকৃত মদ্য, মদ্য, দ্রাক্ষাফলজাত মদ্য, রসবিশেষ, মধুররস, ক্ষীর, দুগ্ধ, জল, শর্করা, মধুদ্রব্যমাত্র, মাধুর্য্য, স্বাদুতা, স্বর্ণমাক্ষিক, ছন্দোভেদ, মুখামৃত, অধররস, কবি মধুসূদন। **মধুর** = মধুযুক্ত, নয়নপ্রীতিকর, প্রকৃতি-মনোহর, মধুরাক্ষর, মঞ্জু, কোমল, হর্ষজনক, ললিত, প্রসাদজনক, শুদ্ধমাধুর্য্যযুক্ত, কামগন্ধহীন, মিষ্টরস, পঞ্চরসের একতম, রক্তেক্ষু, কাজলা আখ, গুড়, রাজাম্র, বীজপুরবিশেষ, রক্তশোভাঞ্জনবৃক্ষ, কাঞ্জিক, মধুররস; বিষ। **মধ্য** = অন্তরস্থ, হারযষ্টিমধ্যগ্রথিত, অপক্ষপাত, উদাসীন, ন্যায্য, উৎকর্ষ-অপকর্ষ-হীন, নাতিহ্রস্ব-নাতিদীর্ঘ, পূর্ব্বাপরের অন্তরাল, কেন্দ্রস্থল, অন্তর, দেহমধ্যভাগ, অভ্যন্তর, ভিতর ... ইত্যাদি। **মধ্যম** = পূর্ব্বাপরদ্বয়ের মধ্যভাগ, মধ্যজ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যজাত পুত্রগণ, মাঝারি, নিমখাসা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** honey অর্থে প্রচলিত। **৫.** প্রথমেই বলে রাখা যাক, যদিও আমাদের প্রাচীন পুরুষেরাই **মধু** শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু তার রমরমা হয় মধ্যযুগের বাংলায়। **মধু**-যুক্ত অজস্র শব্দ তৈরি হয় বাংলার মধ্যযুগে। **মন্** ক্রিয়ামূলের সদস্য শব্দদের তালিকায় সেই **মধুকণ্ঠ, মধুছন্দা** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দের দেখা মিলবে।

মধু শব্দের অর্থ নির্বচন করতে গিয়ে আমরা সোজাসুজি **মধ** (মধ্য) থেকে **মধু** শব্দের অর্থে পৌঁছতে পারি। আবার, যেহেতু **মন্** ক্রিয়া থেকে **মধু** শব্দটি প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই সুবাদে **মন** > **মত** > **মদ** > **মধ** > **মধু** — এই পথেও আমরা **মধু** শব্দের অর্থে পৌঁছতে পারি। প্রথম ক্ষেত্রে **মধু**র অর্থ হয় — **মধ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, 'সীমায়িতের (ম-এর) ধারক (ধ) নবরূপে উত্তীর্ণ (উ-কার) যাহাতে'। এখন প্রশ্ন হল, **মধ** বা 'সীমায়িতের ধারক' ব্যাপারটি কী? তার নবরূপে উত্তরণই বা কী বোঝায়?

যে কোনো বিষয় বা বস্তুর কেন্দ্রই হল তার **মধ্য**, কারণ সেখানে সেই বিষয় বা বস্তুটির সার বা 'সর্ব্বোচ্চ সীমায়িত রূপ' (= **ম**) 'ধরা' (= **ধ**) থাকে বা থাকতে পারে। সেই কারণে, '**মধ** থাকে যাহাতে' তাকেই **মধ্য** বলে। এই **মধ** হল এমন বিষয় বা বস্তু, যা কিনা 'সীমিতের বা কেন্দ্রীকৃতের আধার', যার উৎকর্ষ নেই, অপকর্ষও নেই; যা ভাল নয়, মন্দও নয়। যেকারণে এই **মধ**-এর আধাররূপকে **মধ্যম** বলে। সেই সীমায়িতের আধার বা **মধ** যদি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে উ-কার প্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তো সীমায়িত আধারই অসীম-আধারকে দেখিয়ে দিল! অশ্রুবিন্দুই সমুদ্র হয়ে গেল! ভিখারীই সম্রাট হয়ে গেল! যাতে ভালমন্দ কিছুই ছিল না, তাতে এবার ভালও থাকবে, মন্দও থাকবে! সেই কারণে **মধু** শব্দটির অর্থ অমৃত থেকে শুরু করে অজস্র বিষয় ও বস্তু পেরিয়ে ঘৃত মাক্ষিক-মধু শর্করা হয়ে বিষ পর্যন্ত প্রসারিত। মানুষের জ্ঞানকর্মজাত কৃত্রিম **বিশ্বের** ও পরমা-প্রকৃতির জ্ঞানকর্মজাত অকৃত্রিম **বিশ্বের** প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর **মধ্যে মধ্যমণি**-রূপে যে মূল রস থাকে, তা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে অসীমের শব্দ শোনালে/ অসীমের স্পর্শ দিলে/ অসীমের রূপ দেখালে/ অসীমের রস পান করালে/ অসীমের গন্ধ শোঁকালে, তবেই তাকে **মধু** বলে। তার মানে, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসারে যা কিছু কেন্দ্রীকৃত বা কেন্দ্রীভূত (= **মধ**), যে নবরূপী উত্তরণে সেগুলি অকেন্দ্রীকৃত বা অকেন্দ্রীভূত (**উ**-কার প্রাপ্ত) হয়ে সূর্যকিরণের মতো সর্বদিক দিয়ে অসীমের দিকে আঙুল তুলে ছুটতে শুরু করে তাকেই **মধু** বলে। বলতে কী, **মধু শব্দের বিশেষ গৌরব এইখানে যে সে অতি সীমিত সত্তা হয়েও অসীমের সংবাদ দেয় এবং তার সেই রূপকে চিহ্নিত করতেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা মধু শব্দটি প্রস্তুত করেছিলেন**। তাহলে তো অদৃশ্য স্থান-কাল-পাত্রের **মধু** হতে পারে, তেমনি দৃশ্য স্থান ও পাত্রেরও **মধু** হতে পরে; এবং হয়ও। মোটকথা যার থেকে অসীমের একটু না একটু ছোঁয়া মেলে তাকেই **মধু** বলে, তা সে ফুলের **মধু** হোক, **মধুযামিনী**র **মধু** হোক, আর **মধুপতি**র **মধুই** হোক। সেই কারণে **মধু** অজস্র রকমের হয়। তবে আমরা সেগুলিকে **ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর**-এর মতো তিনভাগে ভাগ করে বুঝে নিতে পারি — জ্ঞানসম্পদের **মধু**, ধনসম্পদের **মধু** ও পার্থিব **মধু**। ...

আবার, **মন্** থেকে **মত** ও **মতি** হয়। সেই **মতি মদ**-রূপে **মধ**-রূপে ঢুকে যায় মানুষের বাচিক ও বাহ্যিক উৎপাদনে, মানুষের তৈরি করা কৃত্রিম **বিশ্বে**। সেই মানুষিক উৎপাদিতের প্রতিটির (তা সে **গান** হোক আর **ধানই** হোক) **মধ্যে** যে **অর্থ**সম্পদ থাকে, তাকেও বলা হয় **মধু**। বাচিক উৎপাদনসমূহের সর্বোচ্চ রূপ গিয়ে পৌঁছায় নানা প্রকারের জ্ঞানসম্পদে — **শিল্প**রসে ও জ্ঞানরসে, যাদের মধ্যে অমৃতের স্থান সবার উপরে। এগুলি প্রধানত মানুষের মনো-লোকের শ্রম বা **তপস্যা** থেকে জাত হয়ে মনোলোককে তৃপ্ত করে বলে এসবই হল মানসিক **মধু**। (**ব্রহ্ম-মধু**)। আর, বাহ্যিক উৎপাদন-সমূহের সর্বোচ্চ রূপ গিয়ে পৌঁছায় নানা প্রকারের ধনসম্পদে — টাকায়, ধনরত্নে, যাদের মধ্যে **মণিসমূহের স্থান** সবার উপরে। এগুলি মানুষের মেধা ও শ্রমের যৌথ প্রয়োগ থেকে জাত হয়ে মন ও দেহ উভয়কে তৃপ্ত করে বলে এসব হল আধা-মানসিক-আধা-দৈহিক **মধু**। (**বিষ্ণু-মধু**)। এই দুইপ্রকার **মধু**দের বাদ দিয়ে বাহ্যজগৎ জুড়ে যে বিশাল **মধুর** ভাণ্ডার ছড়িয়ে রয়েছে — **পুষ্পমধু**, চিনি**মধু**, কাল**মধু**, যৌবন**মধু**, **মধু**শব্দ, **মধু**স্পর্শ, **মধু**রূপ, **মধু**রস, **মধু**গন্ধ ... — এসবকেই আমরা বাহ্যিক **মধু** বলতে পারি। (**মহেশ্বর-মধু**)। যে আওয়াজ আমাদের কানে **মধু** ঢালে, যে **মধু**স্পর্শ আমাদের শরীরে চিরস্মরণীয় শিহরণ জাগায়, যে **মধু**রূপ দেখলে চক্ষু সার্থক হয়, যে **মধু**রস জিহ্বার জীবন সার্থক করে, যে **মধু**গন্ধে মানুষ মুগ্ধ হয়ে থাকে, **মধুর** সেই সমগ্র ভাণ্ডারকেই চিহ্নিত করেছিলেন আমাদের মধ্যযুগের পূর্বসূরিরা। তবে সবার উপরে গিয়েছিলেন **মধু-আচার্য্য** বা **মধ্বাচার্য্য**। বিবেকানন্দ যে বোধকে মানবজাতির সর্বোচ্চ বোধ রূপে চিহ্নিত করেছিলেন সেই অদ্বৈতবোধের ধারক-বাহক-প্রচারক ছিলেন **মধু-আচার্য্য**। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই **মধু-আচার্য্যের** অনুসারী ছিলেন। **বঙ্গ**-এর মানুষের মনের মাটির স্বভাবও যে তাই! দ্র. **মধ্বাচার্য**। তার মানে, ভারতের অর্জিত এই **অধ্যাত্ম**বোধই মানবজাতির অর্জিত সর্বশ্রেষ্ঠ **মধু**। দ্র. **অভেদ, অদ্বৈত**।

বিষয়টির তাৎপর্য কমবেশি বুঝেছেন একালের এক বিশ্বপথিক মান্যবর শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী। তিনি তাঁর '*মননের মধু*' গ্রন্থের প্রাক্‌ভূমিকায় দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

> "ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু
> অস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু ...
>
> ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধু
> অস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু ..."

(অর্থাৎ — এই সত্য সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূতও এই সত্যের মধু ... এই মানবজাতি সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূতও মানবজাতির মধু ... ।)

"সক্রেটিস — কিন্তু মহান দার্শনিকরা আমাদের শিখিয়েছেন যে ... 'এইটি' 'ওইটি' — এ জাতীয় শব্দ অথবা অন্য কোনো রকমের অর্থ আটকে-ফেলা নামপদ ব্যবহার করাই উচিত নয়। তার কারণ জগতে প্রকৃতির ভাষায় সব কিছুই সারাক্ষণ স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। ... ... যে তাদের থামিয়ে স্থির করতে চাইবে তাকেই শেষপর্যন্ত বিতর্কে খণ্ডিত হয়ে হারতে হবে।
আহা! বন্ধু থিয়েটিটাস — আমাদের এই সব তত্ত্ব-বিচারচিন্তা কি মধুর মতো মিষ্টি নয়? মুখের ভেতরে এই দার্শনিক বিচারের আস্বাদ তুমিও কি টের পাচ্ছ না?"

অর্থাৎ, জ্ঞানরসের সর্বোচ্চ রূপকে যে **মধু** বলা হত সেকথা প্রাচ্যের মতো পাশ্চাত্যও এককালে জানত। তার আরও নিদর্শন এই যে, আমরা যাকে **মধুমাস** বলি, যাতে তিরিশটি **মধুযামিনী** থাকে, তাঁরা তার আধখানাকে বা পনের দিনকে honey-moon বলেন, আজও। এই moon তো 'সোম'ই বটে এবং 'সোমরস'কে **মদ্য** বা **মধু**ও বলে; তবে কিনা সে হল নিম্ন মানের **মধু**। তাছাড়া সবচেয়ে প্রিয়জন যে আমাদের **মধুসখ, মধুসখা, মধুসহায়, মধুসুহৃৎ** ইত্যাদি হতেন, তার ধারণাটির ছিন্ন অংশ তাঁরাও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা তদ্রূপ প্রিয়জনকে আজও 'honey' বলে সম্বোধন করে থাকেন। এমনকি **মধ্য** শব্দটিও তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন medium, middle ... ইত্যাদি শব্দে। তবে ঐ পর্যন্তই।

মধু শব্দের শাব্দিক উত্তরাধিকার যেমন তাঁরা পাননি, তেমনি **মধু** শব্দের সমগ্র ধারণার উত্তরাধিকারও তাঁদের নেই; যা আমাদের আজও কমবেশি আছে।

তা সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের যে-**মধ্য** নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে **মধু**তে পরিণত হয়, সে স্বভাবতই বহুরূপী এবং তার এলাকাও অসীম এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত। ঋগ্বেদের বিখ্যাত সূক্ত '**মধু** বাতা ঋতায়তে, **মধু** ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ...' থেকে শুরু করে বাংলার কবির লেখা 'বুকভরা **মধু** বঙ্গের বধূ ...' পেরিয়ে honey-**মধু** পর্যন্ত **মধু**র এলাকা সুবিশাল। উপরে **মন্** ক্রিয়ামূলের পরিবারে **মধু** শব্দের ভাইবোনদের দিকে তাকালেই সেকথা বোঝা যাবে। বলতে কী, মধ্যযুগের সাহিত্যে, পদাবলী সাহিত্য ও কীর্তন গানে এই **মধু** শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাভাষীর জীবনে এই **মধু** শব্দের ব্যবহার এমনকি তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও এত ব্যাপক ছিল যে, লোকে তার প্রিয় গানটি শুনে কিংবা প্রিয় খাদ্যটি খেয়ে বলে উঠত, 'আহা! **মধু! মধু!**' তা সে কীর্তন হোক আর বিরির ডাল হোক কিংবা কই মাছের মাথাই হোক! তাছাড়া নাম রাখার ব্যাপারে **মধু**র ব্যবহার তো ছিলই — **মধুকর, মধুকণ্ঠী, মধুছন্দা, মধুমঞ্জরী, মধুমতী, মধুমল্লিকা, মধুমাধবী, মধুমালতী, মধুশ্রী** তার উদাহরণ। সবশেষে রইল '**রাম-শ্যাম-যদু-মধু**'র কথা, তবে সেকথা আমরা বলব **মাধব** শব্দে। সেকারণে **মধু** শব্দের সমগ্র এলাকায় বিচরণ করা এই শব্দার্থকোষের শরীরে সইবে না, অতখানি অবকাশ তার নেই। তাই, নিম্নে কিছু কিছু **মধু**-যুক্ত শব্দকে সাধ্যমতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি আমরা। ৬. Greek - methu; Slav - medu; German - meth; Lithuanian - midus, medus; English - mead। (ব.শ.)। ইংরেজি com*modity*।

মধুকণ্ঠ, মধুগায়ন : ৩. কোকিল, বসন্তগায়ক। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫. মধু** শব্দের শাব্দিক ও কালিক অসীমকে চিহ্নিত করে **মধুকণ্ঠ** ও **মধুগায়ন**। কোকিলের ডাকের শব্দে বিশ্বের শব্দসমূহের শ্রেষ্ঠ সুরের সংবাদ আসে। সুরের অসীমে যিনি বিরাজমান, এ সংবাদ হল তাঁরই সংবাদ। আর, বসন্তকাল হল মানবজাতির **মধুকাল**। সেই বসন্তকে গানে প্রকাশ করে কোকিল। তাই তাকে 'বসন্তগায়ন' বলা হত। যার গান সেই অসীমের ছোঁয়া দিয়ে যায়, তেমন শ্রেষ্ঠ গায়িকাকে সেকারণে **মধুকণ্ঠী** বলা হত।

মধুকর (মাধুকরী) : ২. মধুকর = *মধু (সংগ্রহ) করে যে।* **মাধুকরী** = **মধুকর** *হইতে জাত সত্তার সক্রিয় আধার যে। /* **মধুকর** = মধু সঞ্চয় করে যে। **মাধুকরী** = মধুকর যেমন বহু পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ বহু গৃহস্থ হইতে অল্পভিক্ষা সংগ্রহ (করা হয় যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. মধুকর** = ভ্রমর, কামিজন, ভৃঙ্গরাজ, সদাগরের বাণিজ্যতরীর নাম। **মাধুকরী** = মাধুকরীলব্ধ ভিক্ষান্ন, বানপ্রস্থের পঞ্চ গৃহস্থ হইতে গৃহীত ভিক্ষান্ন। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সবাই জানেন, প্রজাপতি কিংবা ভ্রমর বা ভৃঙ্গরাজ **মধু** সঞ্চয় করে না, মৌমাছি **মধু** সঞ্চয় করে। তা সত্ত্বেও **মধুকর** শব্দে মৌমাছি না বলে ব.শ. ভ্রমর ও ভৃঙ্গরাজের নাম বললেন কেন? কোন স্মৃতি তাঁকে এরকম লিখতে **প্ররোচিত করল?** তাছাড়া, যে সত্তা **মধু** তৈরি করে, সংগ্রহ করে বা সঞ্চয় করে, সে যে কেবল ফুলের **মধু** সঞ্চয় করবে, এই দিব্যিটা কে দিল! সে তো শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বা স্থান-কাল-পাত্র — এসবও সংগ্রহ করে আনতে পারে! ধন**মধু** সংগ্রহ করে আনত বলেই তো চাঁদ সদাগরের বিখ্যাত সদাগরি নৌকাটির নাম হয়েছিল **মধুকর** ডিঙা। **ভৃঙ্গী** বা **ভৃঙ্গরাজ** তো আদি **অধিরাষ্ট্রে**র আদি খাজনা-আদায়কারী **মধুকর**ই বটে! সেই স্মৃতির কারণেই ব.শ. **মধুকর** শব্দের অর্থ দিয়েছেন 'ভৃঙ্গরাজ', 'ভ্রমর'। আমরা কেন একালের রাষ্ট্রের **মধুকর**দের 'ট্যাক্স-কালেক্টর', 'রেন্ট-কালেক্টর' বলে ডাকি? বাংলা ভাষায় শব্দের অভাব বলে? **মধুকর** কী দোষ করল?

আমাদের পূর্বসূরিরা কিন্তু প্রায়শই শব্দকে এক অর্থে বেঁধে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার একটা বড় প্রমাণ হল এই **মধুকর** শব্দটিকে তাঁরা **মাধুকরী** পর্যন্ত প্রসারিত করে নিতে পেরেছিলেন। উপরে ৩.-এ ব.শ. **মাধুকরী** শব্দের সে অর্থটিও দিয়ে গেছেন।

মধুকাল : ৩. বসন্ত। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫. বসন্ত**কালকে **মধুকাল** বলার কারণ হল, এই কাল **মধু** সংগ্রহের কাল, তা সে বাহ্যিক শস্য**মধু** হোক বা অন্য কোনো পার্থিব **মধু**ই হোক। আবার, নর-নারী সম্বন্ধের মধ্যে যে কর্মরতিবন্ধনে অসীমের ছোঁয়া মেলে, সেই কর্মের কালকেও **মধুকাল** বলা হয়। বাৎসরিক পার্থিব হিসেবে এটি হল ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস, যাকে **বসন্তকাল** বলা হয়ে থাকে। ইংরেজরা **মধুকাল**-এর একটি অংশকে honey-moon বলেন, যার সময়কাল মাত্র ১৫ দিন এবং তার কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল নেই, বছরের যেকোনো সময়ে হতে পারে।

মধুকুল্যা : ৩. মধুপূর্ণ ক্ষুদ্র কৃত্রিম সরিৎ, মধুর নদী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পুষ্কর**। আমরা যতরকম পুকুর বা নদী দেখেছি, তার মধ্যে এমন একটিও পুকুর বা নদী আজও আমরা দেখিনি, যাতে honey-**মধু** থই থই করে কিংবা প্রবাহিত হয়। অথচ উপরোক্ত তথ্য বলছে, যে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের '**মধু**পূর্ণ পুকুর ও মধুপূর্ণ নদী' বা **মধুকুল্যা** ছিল। সেগুলো সব গেল কোথায়?

'টাকার কুমীর' ... জাতীয় অজস্র বাগ্‌ধারা বাংলাভাষায় রয়েছে, যেগুলি আমাদের ভাষার অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ। দ্র. **মৎস্য**। তেমনি একটি অমূল্য সম্পদ হল 'পুকুর-চুরি' বাগ্‌ধারাটি। এই বাগ্‌ধারাটি অনেকগুলি কথা আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়।

(এক) এমন পুকুরও থাকে, যাকে চুরি করে নেওয়া যায়।

(দুই) বাহ্য-দৃশ্য পুকুর কিন্তু চুরি করা যায় না। অতএব, এই পুকুর আর যাই হোক, বাহ্য-দৃশ্য পুকুর নয়।

(তিন) এই পুকুর হাতিয়ে নেওয়া সমাজস্বীকৃত ও নীতিসম্মত নয়, যে কারণে একে 'চুরি' করা বলা হয়।

(চার) এই পুকুর অবশ্যই ধনসম্পদের পুকুর। যে কারণে লোকে 'পুকুর-চুরি' বললে 'অনেক ধনসম্পদ অবৈধভাবে হাতানো' বোঝে।

(পাঁচ) এই পুকুর অবশ্যই যৌথ-ধনসম্পদের পুকুর। কেননা, সাধারণত রাষ্ট্রের সম্পদ অত্যধিক পরিমাণে হরণ করলেই তাকে

'পুকুর-চুরি' বলা হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, এই 'পুকুর-চুরি' বাগ্‌ধারাটি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের একটি মানসিক প্রত্নবস্তু। আমাদের প্রাচীন যৌথসভ্যতার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে তখন বলা হত **মানস সরোবর**। পুরাণাদি জানায় যে, সেই সরোবরের পাশে সেকালের সম্প্রদায়-পরিচালক ঋষিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের যৌথধনভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। সেই ধনভাণ্ডার-গুলিকে বলা হত **ঋষিকুল্যা** বা 'ঋষির পুকুর'। এই পুকুরগুলি ছিল একালের রাষ্ট্রীয় সম্পদ-ভাণ্ডারগুলির (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদির) আদিম রূপ। সমাজে **পণ্য** বিনিময় প্রচলিত হয়ে যাওয়ার পর এই **ঋষিকুল্যা**-গুলিই '**মধু**র পুকুরে' বা **মধুকুল্যা**য় পরিণত হয়ে যায়। **পৃথু**র বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর সেই **মধু**পুকুরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চলে যায় রাষ্ট্রের হাতে। তার কিছুকাল পরেই এই **মধুকুল্যা**গুলির **মধু** চুরি হতে শুরু করে। প্রজা সাধারণ দেখতে পান, তাঁদের যৌথসম্পদ হরণ করে নিচ্ছে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি। লোকে বলতে শুরু করে, 'লোকটা পুকুর চুরি করছে।'

আসলে আমাদের পূর্বসূরিরা তাঁদের অখণ্ড চিন্তাশৃঙ্খলার কারণে তাঁদের আচরণেও একপ্রকার সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন। মানস-লোকে কেউ যদি 'জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখা বহন' করেন, বাহ্যলোকে তিনি মাথার উপর দৃশ্য শিখা বা টিকি রাখতেন। এই সমান্তরাল আচরণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব করে রেখেছিলেন তাঁরা। শব্দ, চিত্র, ভাস্কর্য, প্রতিমা-নির্মাণ, পূজার আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাদি — সমস্ত ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করতেন তাঁরা। দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**। পুকুরের ক্ষেত্রেও তাঁরা একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক কর্তৃত্ব যেখানে থাকবে, সম্পদের ভাণ্ডারও সেখানেই থাকবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক; আজও তাই হয়ে থাকে। সনাতন ঋষিদের হাত থেকে সভ্যতার দায়দায়িত্ব যখন 'মন্দিরকেন্দ্রিক-সভ্যতা'র হাতে চলে এল, তখন আমরা দেখলাম — সামাজিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে মন্দিরে, সম্পদের ভাণ্ডারও কেন্দ্রীভূত সেখানেই। সামাজিক কর্তৃত্ব সেই মন্দিরে দেবমূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং পুকুর বা নদী রয়েছে তার পাশেই। লোকে যখন সেই দৃশ্য পুকুরে বা নদীতে তাঁদের নিজ নিজ দৃশ্য **পাপ** স্খালন করে মন্দিরের দেবমূর্তির মুখোমুখি হত, তখন অদৃশ্যত মন্দিরের সেই সম্পদভাণ্ডারে নিজ নিজ **পাপ** বা **পণ্য**সম্পদ ও অর্থসম্পদ ... প্রভৃতি '**দেয়**'গুলি দিয়ে তবেই কর্তৃত্বের মুখোমুখি হত। ...

প্রাচীন মন্দির-কেন্দ্রিক যৌথসভ্যতার হাত থেকে সামাজিক কর্তৃত্ব যখন রাজা ও ধনী জমিদারদের হাতে চলে গেল, তাঁরাও **পুষ্করিণী** খনন করা শুরু করলেন। এমনকি গেরস্থ মাত্রেই যখন কিছু না কিছু সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন, তখন সেই গেরস্থবাড়ির পাশেই পুষ্করিণী খনন একটি প্রথারূপে প্রচলিত হয়ে গেল। এগুলিই তাঁদের নিজ নিজ সম্পদভাণ্ডারের প্রতীকী আধার। ধান বিক্রি করে টাকা এনে ঘরের সিন্দুকে রাখা আর দুধ ও অন্যান্য নানা বস্তু ঘরের পুবদিকের ব্যবহার্য পুকুরে ঢেলে দেওয়া একই কথা। বাড়ির উদ্বৃত্ত দুধ সেই পুকুরে ঢেলে দেওয়া গ্রামবাংলার এক অবশ্যমান্য রীতি। আজও গ্রামবাংলার গেরস্থবাড়ির মায়েরা দুধ নুন চিনি মাটিতে পড়তে দেওয়া 'পাপকাজ' বলে মনে করেন এবং মাটিতে পড়ে গেলে সেগুলি তুলে ধুয়েমুছে সেই পুকুরে ঢেলে আসেন। সনাতন যুগে আবিষ্কারক-স্রষ্টা জ্ঞানীগুণিজনের বা শিবের মাথায় যে সম্পদ জনসাধারণের আশীর্বাদ রূপে বর্ষিত হত, তারই প্রতীকী আচরণ ছিল শিবের মাথায় দুধ ঢালা। আজও সেই রীতিটি অদৃশ্যলোকে অতিক্ষীণভাবে প্রচলিত থাকলেও দৈহিকভাবে যথেষ্ট প্রচলিত। ...

এ বিষয়ে আরও বহু কিছু বলার আছে। আমরা তাদের দু-চারটির কথা উল্লেখ করে যাচ্ছি। 'অদৃশ্য ধনসম্পদের ভাণ্ডার'ই যেহেতু প্রকৃতার্থে **পুকুর**-পদবাচ্য ছিল, সেই ভাণ্ডার লুঠ করে নেওয়াকেই বলা হত 'পুকুর-চুরি'। 'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার' প্রবচনটি ঐ 'পুকুর-চুরি'কেই বোঝাত। সেকালে জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ ... ইত্যাদির ভাণ্ডারকে ও তাদের প্রবাহকে নদী, হ্রদ, সরোবর, পুকুর, এমনকি সমুদ্রও বলা হত। তাছাড়া, সেকালে নোনাজল, আখের রস, মদ, ঘি, দই, দুধ, জল — এই সাতরকম রসের সপ্তসমুদ্র (সপ্তসাগর, সপ্তসিন্ধু) তো আমাদের ছিলই! সেই 'সাতে সমুদ্র' পড়েই তো আমরা বাংলাভাষীরা বড় হয়েছি। (এখানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাংলাভাষী শিশুর জন্য একটু কাঁদুন!)

আমাদের রূপকথার গল্পে রাজা পুকুর কাটাচ্ছেন, প্রজারা তাতে দুধ ঢেলে ভরিয়ে দিচ্ছে, রাজা তাতে স্নান করে অমর হচ্ছেন — এরকম গল্প আছে। ঠাকুমা-দিদিমাদের গল্পে দুধপুকুর, পুণ্যিপুকুর ... এসব তো এখনও শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া রয়েছে 'মানস-সরোবর', রয়েছে **পণ্য**-সম্পদের ধারা বা **গঙ্গাধারা**, যাকে **মধুমতী** নামেও ডাকা হয়। ... এসবই **মধুকুল্যা**র বিবর্তিত রূপ।

মধুকৈটভ (মধুদৈত্য) : দ্র. **কৈটভ**। (১ম খণ্ড)। দ্র. **মেদিনী**।

মধুকোশ, মধুকোষ : ৩. মধুর আধার, মধুমক্ষিকাকৃত মধুরক্ষার্থ কোষ, মধুক্রম, মৌচাক, ছাগমুষ্ক। (ব.শ.)। ৪. 'ছাগমুষ্ক' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় এই শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। ছাগল, ভেড়া, এমনকি গরুর 'অণ্ডকোষ'কে তাঁরা **মধুকোশ** বলেন। তবে সাধারণত যাঁরা ঐ জীবগুলির মাংস কেনাবেচা করেন ও ভক্ষণ করেন, তাঁদের মধ্যেই ঐ শব্দটির ব্যবহার চলে। এই শব্দের ব্যবহার আমাদের জানায়, জীবের যৌবন**মধু**র মূল কেন্দ্রটিকেও আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ **মধু** নামে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অসীমের দিকে ইশারা করার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষমতাও যার আছে, তাকে **মধু** নামে শনাক্ত করতে আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বিধা হয়নি।

মধুচক্র (মৌচাক) : ৩. মধুক্রম (= পুনঃপুনঃ মধুপানানুক্রম, ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান — ব.শ.), মধুচক্রসম, মধুর ভাণ্ডার। (ব.শ.)। ৪. **মধুচক্র** শব্দটি বর্তমানে 'নারী ও মদসহ গোপন আড্ডা' রূপে প্রচলিত, এবং **মৌচাক** শব্দটি 'honeycomb' অর্থে প্রচলিত। **মদক**রা বা **মোদক**রা **মৌচাক** নামের একরকম মিষ্টিও বানিয়ে থাকেন। ৫. অধিকাংশ **মধু**-যুক্ত শব্দ পরিত্যক্ত হলেও **মধুচক্র** শব্দটি শুধুমাত্র কদর্থে প্রচলিত আছে। এর ভাল অর্থগুলি সবই ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই ভাল অর্থগুলির মধ্যে ধনীদের চক্র, জ্ঞানীদের চক্রও ছিল। সেই চক্রগুলিতে তাঁরা একত্রিত হয়ে **ধনমধু** ও জ্ঞান**মধু**র চর্চা করতেন, করেন আজও। কিন্তু সেগুলিকে আর **মধুচক্র** বলা

হয় না। ইংরেজি-কলুষিত বাংলাভাষী এখন সেগুলিকে 'স্যাটারডে ক্লাব', 'সানডে ক্লাব', 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'প্রেস ক্লাব' ... ইত্যাদি অজস্র নামে ডাকেন, কিন্তু কখনো ভুল করেও বলেন না যে, সেগুলি আসলে জ্ঞানী ও ধনীদের **মধুচক্র**। বললে, prohibited place-এর বাংলা অনুবাদ **'নিষিদ্ধ**-এলাকা' করতে গিয়ে বাংলার সরকারি কর্মচারী যে বিপদে পড়েছিল, এঁরাও সেই বিপদে পড়ে যাবেন। কেননা, ইতোমধ্যে **মধুচক্র** শব্দটি তো সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে 'নারী-মদের আড্ডা' অর্থে বিশেষার্থক হয়ে গেছে। **মধুচক্র** শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ যাই থাক, সেকথা এখন শুনবে কে? তার আগেই তো বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে, তা সে কটূক্তি বর্ষণ হোক আর ইষ্টক বর্ষণই হোক!

মধুচ্ছদা : ৩. ময়ূরশিখা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যেখানেই সীমিত সত্তা অসীমের দিকে ইশারা করবে, সেখানেই **মধু**র দেখা পাওয়া যাবে — **মধু** শব্দের প্রয়োগের এই বিশেষত্ব। তো, আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা দেখলেন, ময়ূরের পাখনার যে রূপ-সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে, তা অসীমের দিকে ইশারা করছে। তাই তাঁরা তাকে **মধুচ্ছদা** নামটি দিয়ে দেন।

মধুছন্দা (মধুচ্ছন্দাঃ, মধুছন্দস্) : ২. *যাহার* **ছন্দ** *বা যে* **ছন্দ** *অসীমের দিকে ইশারা দিয়ে থাকে।* **৩. মধুছন্দা** = সুললিত ছন্দ। (ব.শ.)। সতীর অন্যতমা সহচরী। (পৌ.অ.)। **মধুচ্ছন্দাঃ, মধুছন্দস্** = বিশ্বামিত্রের পুত্র (বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র 'মধুছন্দাঃ' নামে অভিহিত। 'মধুছন্দাঃ' মধ্যম পুত্র। ইনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের নব সূক্তের ঋষি। (ব.শ.)। ... মধুছন্দস্ ঋগবেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি অগ্নি, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও মরুদগণ সম্বন্ধে অনেক সূক্ত রচনা করেছেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ছন্দ, ছন্দঃ**। **মধুছন্দা** দুরকমের হতে পারে। (এক) যে মেয়ের আচার-আচরণ বা হাঁটা-চলার ছন্দ অসীমের দিকে ইশারা করে; (দুই) যে কবিতার ছন্দ অসীমের দিকে ইশারা করে। যাদের আমরা অসভ্য, বর্বর মনে করি, এমন অনেক সমাজে মেয়েরা ঘরোয়া কাজের সময়ও এমনভাবে চলাফেরা করে যে, দেখে মনে হয় যেন নাচতে নাচতে চলেছে। ওটাই নাকি ওদের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চাল। আমাদের ঘরের মেয়েদের কারও কারও স্বভাবের ভেতরেও ৯-১০ বছর বয়স পর্যন্ত এই চাল কমবেশি থাকে, সে মেয়ে কিছুতেই একস্থানে একভাবে একমিনিটও স্থির দাঁড়াতেই পারে না। তেমন মেয়েদের সেই ছন্দময় চালকে পরিশীলিত ও মুদ্রা-সমন্বিত করেই ধ্রুপদী নৃত্য-শৈলীর সৃজন করা হয়েছে। যে মেয়ের চাল-চলনে সেই অসীমের অপরূপ **ছন্দের** ইশারা মেলে, তেমন মেয়েকে অবশ্যই **মধুছন্দা** বলা যায়। ...

আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা, যাঁরা **ছন্দ**-বদ্ধ **পদ** দিয়ে সেকালের বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করে গেছেন, সেই **ছন্দ** যদি অর্থের বিশেষত্বে কিংবা আওয়াজের সুমধুর সুরের কারণে অসীমের দিকে ইশারা করে, তাহলে সেই **ছন্দ**-বদ্ধ **পদ**গুলিকেও **মধুছন্দা** বলা যেতে পারে।

মহামুনি **বিশ্বামিত্র** ছিলেন বৈদিকদের আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী এবং আদিম ধনতন্ত্রের পক্ষে প্রচারকারী সত্তা। তাঁর আধারশক্তিস্বরূপা **অনুসারীগণ সবাই পণ্যের** উদ্ভবগাথা গাইতেন, কৃত্রিম **বিশ্বের জয়গান গাইতেন, ধন**-এর পক্ষে সওয়াল করতেন। **জ্ঞান**রসের মতো এই **ধন**রসও তো **মধু**ই। স্বভাবতই **বিশ্বামিত্রের** অনুগামীরা **মধুছন্দা** নামে খ্যাত হয়ে যান।

মধুনিশা, মধুযামিনী : ৩. বসন্তরজনী। (ব.শ.)। **৪.** 'বাসররাত্রি' অর্থে কখনো-সখনো প্রচলিত। **৫.** যে **নিশায়** বা **যামিনী**তে নর-নারী তাঁদের পারস্পরিক দৈহিক মিলনের মাধ্যমে **মধু**র (= অসীমের) সংস্পর্শ পান, সেই **নিশা** বা **যামিনী**কে **মধুনিশা** বা **মধুযামিনী** বলে। তবে কিনা, নর-নারীর মিলনে বা দাম্পত্য মিলনে **মধুর** সাক্ষাৎ সব নর-নারীর কপালে জোটে না; যাঁদের অন্তত একবারও জুটেছে, তাঁরাই আমাদের পক্ষে সাক্ষী দেবেন, আশা করা যায়। যান্ত্রিকতায় যাঁদের রাত ভোর হয়ে যায়, সেই দুর্ভাগাদের অনেকেই সারাজীবনেও সেই **মধুর** সাক্ষাৎ পান না; এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে আজকাল তাঁদের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশি। যিনি পেয়েছেন, তিনি জানেন, সে-**মধু**মিলনে তাঁর সঙ্গিনী 'ঘিয়ের মতো গলে যান' (*শহর* পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অজিত রায়ের লেখা উপন্যাসের নায়কের ভাষা থেকে), আর তিনি নিজে ঐসময় কী হন বা কোথায় যে হারিয়ে যান, পরবর্তীকালে কিছুতেই সেকথা মনে করতে পারেন না। ঐ অদ্ভুত **প্রেম**ময় মিলনের সবটারই কর্তৃত্ব চলে যায় পরমাপ্রকৃতির হাতে। দুজনকে দিয়ে সে-**মধু**মিলনে তিনি যে কী কী করিয়ে নেন, ঐ দম্পতি সেকথা কিছুতেই ঠিকঠাক বলতেও পারেন না। এরূপ **প্রেম**ময় মিলন কারও কারও ক্ষেত্রে পরমাপ্রকৃতির কৃপায় হঠাৎই 'হয়ে' যায়, কোনো কোনো দম্পতি বহু আরাধনা করে এই গভীর **প্রেমময় মধু**মিলন অর্জন করেন। এরকম মিলন একবার হলেও, সারাজীবনে ভোলা যায় না; এমনকি ঐরূপ এক-মিলনের স্মৃতি নিয়েই সারাজীবন বিপত্নীক বা বিধবার মতো কাটিয়ে দেওয়া যায়। তাঁরা সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী, যাঁরা এরূপ **মধু**মিলনে বহুবার মিলিত হতে পেরেছেন। এইরূপ মিলনের **নিশা** বা **যামিনী**কেই **মধুনিশা** বা **মধুযামিনী** বলে।

মধুপতি : ৩. মধুগণের শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যত প্রকারের **মধু** রয়েছে, সে সবের পতি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কেন, তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা আমরা করেছিলাম **গৌরী** (দ্র. ১ম খণ্ড) শব্দের অর্থ বুঝতে গিয়ে। কিন্তু তিনি যে **শ্রীকৃষ্ণ**! তাঁর সেই উচ্চতম **মধুপতি** রূপকে বোঝা কি সহজ কাজ! ... তবে তাঁর একটি অত্যন্ত নিম্নতর রূপকে একালে প্রায়শই দেখা যায়, এবং কমবেশি চেনাও যায়। তা হল কালো-টাকার সঙ্গে অধমর্ণ উৎপাদকের **মধু**মিলনের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে সেই অসীমের আবছায়া থাকে, যে-সম্বন্ধে **মধুপতি**র সঙ্গে শ্রীরাধার **মধু**মিলন ঘটে থাকে।

মধুপবন : ৩. মলয়ানিল। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **পবন, মলয়**। **পবন** ও **মলয়** শব্দদুটি থেকে আমরা জেনেছি, **পণ্য** উৎপাদন ও তা বিক্রিবাটার খবর থাকে যে **বায়ু**তে, সেটিই **মলয়পবন**। তা বিক্রিবাটা থেকে অর্থসম্পদ বা **মধু** তো মিলবেই। তবে কিনা এই

যে 'মধু বাতা ঋতায়তে', এ কিন্তু **জ্ঞানমধু** নয়, এ হল **পণ্য**জাত বিশুদ্ধ ধন**মধু**।

মধুপাল : **৩.** মধুবনরক্ষক। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** জ্ঞান**মধু** জন্মায় জ্ঞানমন্থনের বা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি থেকে এবং ধন**মধু** জন্মায় ধনমন্থনের কেন্দ্র বা হাটবাজার থেকে, একালের ভাষায় যাদের 'মার্কেটিং' বলে। একালে সেই **মধু**সমূহের হাজার রকমের রক্ষক বা **মধুপাল** রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের **মধুপাল** বলা হয় না। বলা হয় — চ্যান্সেলার, প্রিন্সিপ্যাল ... ইত্যাদি এবং ডাইরেকটার, কন্ট্রোলার ... ইত্যাদি। **মধুপাল**-এর মতো এত ভাল একটি শব্দকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

মধুপুরী : **৩.** মথুরা নগরী। (ব.শ.)। **৪.** 'মধুপুর' নামের স্থান এখনও বিদ্যমান। **৫.** সেকালে যে স্থান **জ্ঞানমধু** ও ধন**মধু**র কেন্দ্র রূপে বিখ্যাত হয়েছিল, এ হল সেই স্থানের এক প্রাসাদপুরী। **মধু**র পুরী বলে এর নাম হয়েছিল **মধুপুরী**।

মধুপূর্ণিমা : **৩.** চৈত্রপূর্ণিমা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এটি হল **বসন্ত**কালের **পূর্ণিমা**। কিন্তু তার গৌরবগাথা গাইবার অবকাশ কোথায়! এখন তো বাংলা মাসের নাম পর্যন্ত বাংলাভাষী ভুলে গেছেন। দ্র. **মধুমাস**।

মধুবন : **৩.** লবণদৈত্যের পিতা মধুদৈত্যের উদ্যান, মধুবৃক্ষের বন, সুগ্রীবের মধুকসমূহের উদ্যান, মথুরামণ্ডলস্থ সপ্ত বনের একতম। (ব.শ.)। **৪.** এখনো কীর্তনগানে শব্দটির ব্যবহার শুনতে পাওয়া যায়। **৫.** এককালে কত গৌরব ছিল এই **মধুবনে**র! এই শব্দটিকে বাদ দিলে পদাবলী কীর্তনের কত গান যে বাদ দিয়ে দিতে হবে কে জানে! কিন্তু সেই **মধুবন** কোথায়? কীভাবে তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন আমাদের মধ্যযুগের পূর্বপুরুষরা? ... পৌরাণিক কাহিনীর কথা বাদ দিলেও বলা যায়, একে দু'ভাবে চেনা যায়। না না, এ কোনো forest নয়! প্রথমত, এ হল সেই **উদ্যান** (দ্র. ১ম খণ্ড) যেখানে জ্ঞান**মধু**র ভক্তরা জ্ঞান**মধু**র আরাধনা করতেন, সেই **মধু** পান করতেন। আর দ্বিতীয়ত, এ হল সেই 'সংসার-অরণ্য' যেখানে ধন**মধু**র কারবার চলে। একালের ভাষায় একে 'মার্কেটিং-এ লিপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের জঙ্গল' বলা চলে।

মধুব্রত : **২.** / মধুসঞ্চয় যাহার ব্রত। (ব.শ.)। **৩.** ভ্রমর। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** জ্ঞান**মধু**, ধন**মধু**, পুষ্প**মধু** ... ইত্যাদি সঞ্চয় করা বা সংগ্রহ করা যাঁদের **ব্রত** তাঁদের প্রত্যেককেই **মধুব্রত** বা **মধুব্রতী** বলা যেতে পারে। তবে বৈশ্যশাসিত বর্তমান গোলোকায়িত সভ্যতা ঘোষণা করেছে যে, মানবসমাজে প্রতিটি মানুষই ধনের পেছনে ছোটে এবং সেটাই তাদের উচিত কাজ! জ্ঞান**মধু**, অধ্যাত্ম**মধু**, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-**মধু**র কোনো বিশেষত্ব নাই, সেগুলি সবই এখন টাকা দিয়ে কেনা যায়! জ্ঞানী মানুষেরাও এখন টাকায় বিকোচ্ছে। অতএব মানবজীবনের অন্য কোনো **ব্রত** থাকাই উচিত নয়। সেই বিচারে একালের প্রতিটি মানুষেরই ধন-**মধুব্রত** গ্রহণ করা উচিত। অনেকে তা করেছেও। **বঙ্গে**র ঠিক সেখানেই আপত্তি। যে টাকাকে মানুষ জন্ম দিয়েছে, সেই টাকাই মানুষের একমাত্র আরাধ্য — একথায় তার রুচি হয় না। সে এখনও শুধুমাত্র টাকা রোজগার করেই জীবন কাটাতে রাজি হচ্ছে না।

মধুমতী (মধুমান, মধুমৎ) : **৩. মধুমান (মধুমৎ)** = মধুযুক্ত, মাধুর্য্যপেত, মধুমিশ্র, মধুর, সুখকর, মধুপ্রচুর (পুষ্প)। **মধুমতী** = নদীবিশেষ, গঙ্গা, দেবীনায়িকাভেদ, ছন্দোবিশেষ, মধুরভাষিণী স্ত্রী, প্রিয়বাদিনী। (ব.শ.)। মধুদৈত্যের কন্যা ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হর্যশ্বের স্ত্রী। মধুমতীর গর্ভে যদু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই যদুর নামানুসারেই এঁর বংশের নাম হয়। ইক্ষ্বাকুবংশ হতেই যদুবংশের উদ্ভব হয়েছে। (পৌ.অ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই এখন অপ্রচলিত। **৫. মধুমতী**-কন্যার কথা এখনও বাংলাভাষী কমবেশি বোঝেন বটে, তবে **গঙ্গা**কে যে **মধুমতী** বলা হয়, সেকথা অনেকেই জানেন না। আর **গঙ্গা** তো **পণ্য**ধারাই বটে। সেই **পণ্য**ধারাই **মধুমতী** নামে কথিত।

মধুমল্লি (মধুমল্লী) : দ্র. **মল্লিকা, মালতি**।

মধুমাধবী : **৩.** ক্ষুদ্রামধুজাত সুরা, ক্ষৌদ্রজসুরা, মধুযুক্তা মাধবীলতা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **মাধবী**।

মধুমাস : **৩.** চৈত্র। (ব.শ.)। **৪.** শব্দ হিসেবে **মধুমাস** অপ্রচলিত, **৫.** যদিও ধারণাটি এখনও কমবেশি রয়েছে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা হয়েছে ইংরেজদের মতো। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ শব্দ তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু কিছু ধারণা এখনও কমবেশি তাঁদের রয়েছে। আমরাও এক্ষেত্রে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। আমরা শব্দ হারাচ্ছি, কিন্তু ধারণা এখনও রয়েছে। অতি দীর্ঘ কালের ব্যবধানে এইকথা বোঝা যায় যে, আমরা কী কী হারিয়েছি; যখন হারায় তখন হারানোর কথা কিছুতেই বোঝা যায় না। ...

[বিশ্বাস না হলে একালের শাসক-অ্যাকাডেমিসিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন। তাঁরা বলবেন, 'কোথায় হারাচ্ছে?! ও, ওরকম একটু-আধটু চিরকালই হারায়। কিছু শব্দ ঢুকছেও তো! ভাষা তো বদলায়, এসব তারই চিহ্ন।' কলিম খান-এর এক মাতৃহারা-সহপাঠী যখন অনাহারে অর্ধাহারে চরম রক্তহীনতায় মরণাপন্ন, এবং তার অন্য সহপাঠীরা তাকে নিয়ে 'স্টুডেন্টস্ হেল্থ্ হোম'-এর ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটি করছেন, তখন সেই মাতৃহারা-সহপাঠীর সৎমা বলেছিলেন, 'ছেলের রং খুলছে!' বাংলাভাষার সৎমায়েরা এখন ঐ ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। বাংলাভাষার শরীর থেকে কী বিপুল পরিমাণ শব্দ ঝরে গেছে, আমাদের এই শব্দার্থকোষ পাতায় পাতায় 'অপ্রচলিত'-এর উল্লেখ করে সেকথা জানিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা 'অ্যাকাডেমি-লালিত বাংলাভাষা'র শরীর থেকে ঝরে যাওয়া শব্দের পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে ২০ শতাংশ ইংরেজি শব্দ। সব মিলিয়ে বাংলাভাষার শরীর এখন শীর্ণ

হয়ে হয়ে আধখানা হয়ে গেছে। তবে, তাতে এই সংমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হবে, সে দুরাশা মাত্র। কেননা, সত্যের সাধনা ছেড়ে যাঁরা টাকার বা ক্ষমতার সাধনা করেন, তাঁদের সম্বিত ফেরে না।]

চৈত্রমাসকে **মধুমাস** কেন বলা হয়, তার কারণ জানা যায় **বসন্ত** শব্দ থেকে। দুধের থেকে সর ঘোল মাখন হয়ে ঘি-এ পৌঁছানো যায়। সেই সুবাদে দুধের **মধু** হল ঘি। ঠিক সেইরূপ বৈশাখ থেকে **বসবাস** ও **বর্ষে**র শুরু, এবং তার চূড়ান্ত হয় **বসন্তে**। সেই **বসন্তের** শেষ মাস হল চৈত্রমাস। গ্রহণ-বর্জন-পুনরুৎপাদনের নীতিতে চলা মানবজীবনের জৈবিক সার্থকতাও পুনরুৎপাদনে। **বসন্তের** অন্তে বা চৈত্রমাসে মানুষের প্রতিপালন প্রাচীন শব্দবিদগণের অখণ্ড চিন্তা-শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সেকারণে তাঁরা চৈত্রমাসকেই **মধুমাস** নাম দিয়েছিলেন।

মধুসূদন : ১. মধু + ✓সূদ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *মধুকে সূদন করেন যিনি।* / মধুদৈত্যকে নাশ করেন যিনি; মধু ভক্ষণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রমর। (ব.শ.)। বিষ্ণুর এক নাম। মধু ও কৈটভকে বধ করে বিষ্ণু মধুসূদন নাম প্রাপ্ত হন। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কৈটভ**। এখন **মধুসূদন** শব্দটির কোনো অর্থ নাই, ওটা অর্থহীন নামমাত্র। পীড়াপীড়ি করলে তার একটা মানে আমাদের প্রতীকী শব্দবিধির পণ্ডিতরা দিতেও পারেন এবং সেটি হল — মধু দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন যিনি। তিনি কে? তিনি বিষ্ণু। অতএব **মধুসূদন** শব্দটির মানে 'বিষ্ণু'। কিন্তু নাছোড়বান্দা তার পরেও শুধোয় — সেই 'বিষ্ণু' শব্দের মানে কী? তিনি ভগবান, তাঁর কোনো মানে নেই। ব্যস্!

কিন্তু আমাদের তো এসব কথায় কান দিলে চলবে না। আমাদের জানতে হবে **মধুসূদন** শব্দের নিহিতার্থ কী। 'সূদন' কথাটির অর্থ হল, কোনো বস্তু বা বিষয়কে কোনো ফাঁক দিয়ে '**পচ**' করে বের করে দেওয়া। এই **পচ** থেকেই **পাচন, পাক** প্রভৃতি শব্দ তৈরি হয়েছে। **পাকশালা**কে তাই **সূদশালা**ও বলা হয়ে থাকে। 'প্রসব করা' শব্দটি এই **সূ** ক্রিয়া থেকেই তৈরি হয়েছে। ...

তার মানে, কোনো সত্তাকে পচিয়ে বা পাকিয়ে কোনো ফাঁক দিয়ে যদি বের করে দেওয়া হয়, তাকে বলে **সূদন** করা। **দক্ষ**-পরিচালিত সেকালের আদিম সমাজতান্ত্রিক বা বৈদিক সমাজের ভিতরে **দক্ষের** স্বভাবের কারণেই ধন**মধু** ও সেই **মধু**ভক্ষক কীটদের জন্ম হয়ে যায়, সামাজিক রীতিনীতি অমান্য করেই। **বিষ্ণু**-সত্তা সেই বৈদিক সমাজের ভেতর থেকে সেই ধন**মধু** ও তাতে মুগ্ধ **কৈটভ**কে পাকিয়ে **অবকাশে** (in the pores of the society) **সূদন** করেছিলেন। (দ্র. **কৈটভ**)। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় **মধুসূদন,** যার অর্থ, 'যিনি (ধন)**মধু**কে অস্তিত্বের নবরূপী অবয়ব দান করে অন করে দেন'। সন্দেহ নেই, সূদন করার আগে সেই সামাজিক **মধু** সমাজদেহের ভিতরে যে আচরণ শুরু করেছিল, বৈদিক যুগের সমাজ-পরিচালকদের চোখে তা ছিল দৈত্যসুলভ, যদিও অন্যদের কাছে সে ছিল এমন উপভোগ্য যে, তাঁরা তাকে পেয়ে বলতেন, 'আহা! **মধু, মধু**!' ...

মধ্ব (মধ্বাচার্য্য) : ১. মধু + আচার্য্য। ২. *যে আচার্য্য জ্ঞান**মধু**র আচার সমূহ শিক্ষা দেন।* ৩. দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষের প্রবর্ত্তক। ইঁহার অন্য নাম 'আনন্দতীর্থ ভগবৎপাদ' ও 'মধু'। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় '**চতুর্ম্মুখসম্প্রদায়**' নামে খ্যাত। ইঁহার আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। চৈতন্যদেব এই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী ছিলেন। (ব.শ.)। ৪. ধর্মভীরু হিন্দুদের মধ্যে শব্দ দুটির প্রয়োগ চললেও সাধারণ্যে এই শব্দ অপ্রচলিত। ৫. বিবেকানন্দ বলেছিলেন — অদ্বৈতবাদকে যে-নামেই ডাকা হোক, মানবসভ্যতার জ্ঞানচর্চা আজ পর্যন্ত শেষ যে-শিখরে উঠতে পেরেছে, সেটি এই অদ্বৈতবাদ। আমরা একে উপলব্ধি করেছি 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব' রূপে (আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের '... পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। পরে আমরা দেখেছি, এই দ্বৈতাদ্বৈত বোধই (two in one বোধই) রয়েছে **সুন্দর**-এর মূলে, সৃষ্টির মূলে। (দ্র. 'সুন্দরতত্ত্ব : সাম্য থেকে সামঞ্জস্যে' নামক এই নিবন্ধটির প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল 'অপর' পত্রিকার ২০০৯ বইমেলা সংখ্যায়। পরে তা পরিশীলিত হয়েছে, এবং পুনঃপ্রকাশও হবে।)। এবং সর্বোপরি, **বঙ্গ** শব্দের মূলেও রয়েছে এই একই বোধ। এই বোধই জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ শিখর বা **মধু** এবং সর্বপ্রকার মধুসমূহের সার-**মধু**।

সেকালে মানুষের স্বভাব অনুসারে তাদের **নাম** রাখা হত। (**ম্না** ক্রিয়ামূলের পরিবারে **নাম** শব্দটি দ্রষ্টব্য।) সেই নীতি অনুসারে **মধু-আচার্য্য** বা **মধ্বাচার্য্যে**র উপনয়ন কালের নাম ছিল 'বাসুদেব'। তিনি যখন শঙ্করাচার্য্যের **অদ্বৈত**বাদের কট্টর কাঠিন্য এবং রামানুজের **অদ্বৈত** বাদের শিথিল তারল্য-এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (two in one মতবাদ বা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ') বা **মধু**সমূহের সারাৎসার জ্ঞান**মধু** অর্জন করতে সক্ষম হলেন, তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল — 'মধু', 'পূর্ণপ্রজ্ঞা', ও 'আনন্দতীর্থ ভগবৎপাদ'। অর্থাৎ তিনি যে জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন, **মধু**তে পৌঁছেছিলেন, **আনন্দ তীর্থে** পৌঁছেছিলেন, 'পূর্ণপ্রজ্ঞা'য় পৌঁছেছিলেন, সেকথা সেকালের জ্ঞানীগুণীরা অনুভব করতে পেরেছিলেন; সেজন্যেই তাঁরা তাঁর ঐরকম নাম দিয়েছিলেন। এই **প্রজ্ঞা** লাভ করেন যিনি, তিনি জ্ঞানসম্পদের সর্বোচ্চরূপকে লাভ করেন। তবে কিনা, শব্দার্থবিধি অনুসারে এ হল **প্র-জ্ঞা**। **প্র** শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি, তাতে পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈরাজ্যের সম্পূর্ণ ভারসাম্য বা সর্বোচ্চ রূপ অর্থাৎ **সুন্দর** থাকে। **বঙ্গের** স্বভাবও তাই। পূর্ণপ্রজ্ঞাই সর্বজ্ঞানের সার, সর্বশ্রেষ্ঠ **মধু**। **মধু**-আচার্য্য বা **মধ্বাচার্য্য** সেই পূর্ণ**প্রজ্ঞা** লাভ করেছিলেন বলেই তাঁকে 'পূর্ণপ্রজ্ঞা' নাম দেওয়া হয়েছিল।

বাংলার মাটি তার যে শ্রেষ্ঠ সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল তিনি আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। **বঙ্গ**-স্বভাব তাঁর মাটি থেকে পাওয়া। তিনি এই **মধ্বাচার্যে**র মধ্যেই নিজের **বঙ্গ**কে দেখতে পেয়ে তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও **অরূপরতন**-এর নামে এই **সুন্দর**-এর, এই **বঙ্গের**, এই **মধু**র সাধক ছিলেন। 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব' লাভ করার পরে আমরাও এই **মধু**র ভক্ত হয়ে গেছি এবং আমরা আমাদের সাধ্যমতো এই **মধু**রই আরাধনা করে থাকি। তার মানে, সৃষ্টির তত্ত্ব, **সুন্দর**-এর তত্ত্ব, **বঙ্গ**-এর স্বভাব, রবীন্দ্রনাথের **ধর্ম**, শ্রেষ্ঠ **বঙ্গ**সন্তান

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর **ভাব**, এবং **মধ্বাচার্য্যে**র 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' আসলে একই **ভাব**। এটিই **ভারতবর্ষে**র মূল **ভাব** ও সর্বোচ্চ জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্জন। এরই নাম দেওয়া হয়েছিল **মধু**। **মধু-আচার্য্য** বা **মধ্বাচার্য্য** সেই **মধু**র **মধু**ময় কথা শোনাতেন বলেই তাঁকে **মধ্বাচার্য্য** বলা হত।

মন (মনঃ, মনস্, মনন, মনিত, মন্তব্য) : ১. মন = ✓মন্ + অল্ - কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। **মনঃ** = ✓মন্ + অস্ (অসুন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মন** = *পরিমিত-করণ বা পরিমাপন অনকৃত যাহাতে; বা, (পরিপার্শ্বের প্রতিটি সত্তাকে) পরিমাপ করে যে; যাহা পরিমিত বা পরিমাপিত হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছে।* **মনঃ** = *মন-এ (পরিমিতি-অনকরণে) বিসর্জ্জিত যে।* **মনস্** = *মন-ই (পরিমিতি-অনকরণ বা পরিমাপনই) অস্তিত্ব-মাত্র যাহার।* **মনন** = **মন** *অন (on) যাহাতে।* **মনিত** = **মন** *গতিশীলরূপে তারিত যাহাতে।* **মন্তব্য** = **মন্** *(মনন) তারিত হইয়া বাহিত থাকে যাহাতে।* / **মনঃ (মনস্)** = যাহা দ্বারা মনন সাধন করা যায়। **মনন** = বুদ্ধি দ্বারা পদার্থনির্ণয় (যাহাতে); অথবা, বেদান্তার্থের অবিরোধী যুক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অনবরত অনুচিন্তন (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. মন** = চিত্ত, অভিলাষ, মতি, মনোগত ভাব। **মনঃ (মনস্)** = চিত্ত, হৃদয়, মানস, অন্তঃকরণ, মনীষা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মানসশক্তি, মনঃসাধ্য গায়ত্রীজপাদি, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, (বৈশেষিকে) নববিধ দ্রব্যের একতম, ইচ্ছা, কাম, অন্তঃকরণবৃত্তি, ভাব। **মনন** = অববোধন, ভাবনা, একাগ্রচিন্তন, বুদ্ধি, অভিরুচি, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, কল্পনা। **মনিত** = বিদিত। **মন্তব্য** = মননীয়, জ্ঞেয়, চিন্তনীয়, ভাব্য, অভিমত বিষয় (remark)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **চিত্ত, বুদ্ধি, মান**।

ইতোপূর্বে **ম্** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি যে, মিতকরণ বা পরিমিত-করণ ক্রিয়াটিকে **ম্** বলে। **মন্** করা মানে মেপে একটি স্থির মান-এ পৌঁছানো। যাকে মেপে ফেলা হয়েছে, তার সেই মাপিত রূপটিকেও **মন** বলে। এই **মন**কে আমরা পাই **অমন, এমন, কেমন** ... প্রভৃতি শব্দে। এবং যে সত্তা সেইরূপ **মন্** করে তাকেও **মন** বলে; 'করে যে', তাকেও যেরকম **কর** বলে, সেইরকম। তার মানে, চারপাশের প্রতিটি সত্তাকে মেপে ফেলে যে, তাকে **মন** বলে; মেপে যা পায় তাকেও **মন** বলে, ঐরূপ মাপাকেও **মন্**-করণ বলে। এই মেপে ফেলা ব্যাপারটি কীরকম?

আমাদের চারপাশে যে সকল বস্তু বা বিষয় রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই **বর্ত্তমান** বা **আবর্ত্তমান**, তাদের প্রত্যেকেরই বিকাশ চলছে, কেউ একস্থানে একভাবে স্থির দাঁড়িয়ে নেই। সেই **বর্ত্তমান**তার সংবাদ প্রকাশিত হয় তাদের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে এবং আমাদের **মন**-এর পাঁচটি কর্মচারী বা পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ঐ পাঁচ প্রকার বিচ্ছুরণকে ধরে তার খবর পাঠিয়ে দেয় আমাদের **মন**-এর **মণিকোঠায়**। সেই খবরগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের **মন** বিচার্য সত্তাটিকে মেপে ফেলে এবং তার সম্পর্কে একটা কাজ-চালানো স্থির ধারণায় পৌঁছে যায়। এই যে পরিমাপন ক্রিয়া বা পরিমিত-করণ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াটি, ঘুমিয়ে থাকার সময়টুকু ছাড়া, অবিরাম করতে থাকে যে, সেই হল আমাদের **মন**। ব.শ. বেদান্ত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঠিকই জানিয়েছেন, 'অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অনবরত অনুচিন্তন করে যে', সেই হল **মন**। দ্র. **আত্মন, ব্রহ্মন**। স্বভাবতই কোনো প্রতীকী শব্দের সাহায্যে **মন** শব্দের অর্থ দেওয়া খুবই কঠিন; দিতে চেষ্টা করলে খানিকটা ভুল অর্থই দেওয়া হয়ে যায়। উপরে **৩.**-এ প্রদত্ত **মন** শব্দের অর্থগুলি সেকারণেই যথাযথ হতে পারেনি।

তা সে যাই হোক, মানবাস্তিত্বের যে দুটি ভাগ — **মন** ও দেহ — তার প্রধান ও **পুরুষ** অংশ হল এই **মন**, আর **প্রকৃতি** অংশ হল তার দেহ। মানুষ মাত্রেই তার **মন** ও **দেহে**র দ্বৈরাজ্যে বাস করে; অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই এক দ্বৈতাদ্বৈত (বা two in one) অস্তিত্ব। জীবিত থাকার বিচারে মানুষের **দেহে**র বা **প্রকৃতি**র প্রাথমিকতা, **মনের** স্থান তার পরে। কেননা, **দেহ**-নৌকা ডুবে গেলে **দেহ-মন** উভয়ের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মানবাস্তিত্বের বা মানবজীবনের সার্থকতার বিচারে মানুষের **মন** বা **পুরুষে**র প্রাথমিকতা, **দেহে**র স্থান তার পরে। কেননা, **মন** মরে গেলে, মানুষটির বাঁচা 'মরার বাড়া' হয়ে দাঁড়ায়। তখন **দেহ** বেঁচে থাকে বটে, তবে সে বাঁচা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। পাগলা গারদ তার ভয়াবহ সাক্ষী। আমাদের পূর্বসূরিরা এই **দেহমন**-এর অধিকারী মানুষকে তুলনা করেছেন খাঁচাবদ্ধ-পাখির সঙ্গে, কখনো-বা দেহনৌকায় সওয়ারি **মন**মাঝির সঙ্গে। তাঁদের মতে, পরমাপ্রকৃতি-প্রদত্ত দেহনৌকাটিতে রয়েছে ফুটো, দু'বেলা জল না ছিঁচলে (দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটাতে না পারলে) নৌকাটি ডুবে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। কিন্তু সেই দু'বেলা জল ছেঁচাই এই নৌযাত্রার উদ্দেশ্য নয়, নৌবিহার ও সেই বিহারের দ্বারা **মন**মাঝির চরম তৃপ্তিই এই নৌযাত্রার উদ্দেশ্য। নৌ-মাঝির জীবনের সেটিই লক্ষ্য বলে আমাদের মনীষীরা জানিয়ে গেছেন এবং তাকেই 'মোক্ষ' বলে শনাক্ত করেছেন।

এই **মন**কে সংস্কৃতে **মনঃ** বা **মনস্**ও বলা হত। তার উত্তরাধিকার স্বরূপ বাংলায় **মনঃকথা, মনঃকল্পিত, মনঃকষ্ট, মনঃক্ষুণ্ণ** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দ আছে। বাংলায় **মন** শব্দটি **মনঃ** ও **মনস্** শব্দের অর্থ আত্মসাৎ করে নিয়েছে বলে, বাংলায় ঐ **মনঃ** ও **মনস্** শব্দের পৃথক অর্থটি আমাদের চোখে পড়ে না। পড়লে আমরা দেখতে পেতাম, তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তা হল **ঃ** (বিসর্গ) বা **স্**-এর পার্থক্য। **স্** বর্ণের অর্থে একে আমরা বিস্তারিত করেছি। এখানে শুধু এইমাত্র বলে রাখা যেতে পারে যে, কোনো শব্দের সঙ্গে **ঃ** বা **স্** যুক্ত থাকলে সেটি শব্দটির অর্থের 'অস্তিত্বমাত্র'কে বোঝাবে। এই অস্তিত্বমাত্র হল শুধুমাত্র 'মানসিক অস্তিত্ব' কিংবা অস্তিত্বের কণামাত্র বা 'নির্য্যাস'।

ব.শ. বেদান্তসার উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, **মন** হল 'লিঙ্গশরীরের অবয়ববিশেষ'। তার মানে, মানুষ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয় যে **লিঙ্গ**-এর (লীন হওয়ার জন্য গমন করে যে) মাধ্যমে, সেগুলিরই অংশ হল **মন**। ব.শ. আরও জানান, 'আত্মা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ হইলেও, এককালে সর্ব্বেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইন্দ্রিয়বিশেষজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্য ইন্দ্রিয়নিমিত্তক জ্ঞান অনুৎপন্ন থাকে। এইরূপ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের ভাবাভাব যাহার সংযোগে ও অসংযোগে হয়, তাহাই কণাদের মতে 'মনঃ'। ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রেরক ও আত্মায় ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সমর্পক। ইহা ইন্দ্রিয়গণের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' তাহলে ব্যাপারটি কী দাঁড়াল?

ধরা যাক রামবাবু একজন **সম্ভ্রান্ত** জমিদার গোছের মানুষ। তাঁর দশজন কর্মচারী, অনেক লোকলস্কর, মুনিষ ও চাকরবাকর আছে, আর আছেন একজন সরকার বাবু বা ম্যানেজার বাবু। কর্মচারীদের মধ্যে পাঁচজনকে রাখা হয়েছে চারদিকে নজর রাখার জন্য ও খবরাখবর রাখার জন্য এবং পাঁচজনকে রাখা হয়েছে মুনিষ ও লোকলস্কর দিয়ে গরুছাগল পুকুরের মাছ ক্ষেতের শস্য ... ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য, সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য ও আগম-নিগমের রোজকার হিসেব রাখার জন্য। নজরদারদের কাছ থেকে যে সকল খবর ম্যানেজার বাবু প্রতিদিন পান, তা সব তিনি রামবাবুকে বলেন না। সেগুলি ছেঁটে-ছুঁটে সংক্ষেপ করে যেটুকু নতুন খবর ও কাজের কথা, সেটুকু তিনি গুছিয়ে পৃথক করে রাখেন রামবাবুকে বলার জন্য। আর, হিসেবরক্ষকদের কাছ থেকে রোজকার আগম-নিগমের যে হিসেব তিনি পান, তার সব কথাও তিনি রামবাবুকে বলেন না। আগম থেকে নিগম বাদ দিয়ে রোজকার প্রকৃত আগম যেটুকু, কেবল সেটুকু এবং অনেক ক্ষেত্রে তার মোট অর্থমূল্যটুকুই তিনি রোজকার আগম রূপে টাকার হিসেবে রামবাবুকে জানিয়ে দেন। তার মানে, রামবাবুর ম্যানেজার রামবাবুকে তাঁর রামরাজত্বের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের যেটুকু প্রাত্যহিক বৃদ্ধি হয়েছে, সেটুকুই তাঁকে জানিয়ে রাখেন। অর্থাৎ, সমস্ত খবর বা সমস্ত শস্যাদির কথা তিনি বলেন না, সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে, পরিমিত করে নিয়ে সারমর্মটুকু জানিয়ে দেন। রামবাবুর রামরাজত্বের রোজকার এই জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের আগম বা বৃদ্ধিকে রামরাজত্বের **মঙ্গল** বলে।

এখন রামবাবুর জায়গায় একজন মানুষকে বসিয়ে দিলে, তাঁর ম্যানেজারের জায়গায় মানুষটির মনকে, নজরদার কর্মচারীদের জায়গায় মানুষটির পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে, লোকলস্কর চাকরবাকরদের জায়গায় হাত-পা ইত্যাদিকে বসিয়ে দিলেই আমরা বুঝতে পারব যে, প্রত্যেক মানুষই আসলে একজন রাম; সেকালে তাকে **আত্মন** বা **আত্মা** বলা হত, একালের মতো করে আমরা তার নাম দিয়েছি 'আমি-বোধ'। প্রত্যেক মানুষই যে নিজেকে 'আমি' ভাবেন, সেই 'আমি'ই তাঁর **আত্মা**। এইরকম প্রত্যেকটি 'আমি'**ই** রাম এবং প্রত্যেক 'আমি'র বা প্রতিটি মানুষেরই একটা করে রামরাজত্ব আছে। আর সেই মানুষের যে-**মন**টি সদাসর্বদা **মন্** কর্মে ব্যস্ত থাকে, সীমায়ন কর্মে ব্যস্ত থাকে, বাহ্যিক ও মানসিক আগমকে পরিমিত করে মানুষটিকে তার **মঙ্গল** বিষয়ে অবহিত রাখতে ব্যস্ত থাকে — সেই **মন** হল প্রত্যেকটি 'আমি'র সরকারবাবু বা ম্যানেজার। মূলত সে **মন্** (পরিমাপ) ক'রে **মন** (পরিমাপফল) পায় বলে তাকে **মন** (পরিমাপক) বলে। ৬. Greek - menos, Latin - mens (ব.শ.)। ইংরেজি mind, mental ... ইত্যাদি।

মনসা : ১. মনস্ + অ (অচ্) অস্তর্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *মনস্-এর আধার যে বা যিনি।* ৩. সর্পমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষহরী (ইনি জরৎকারুর পত্নী, আস্তীকের মাতা, বাসুকীর ভগিনী। কশ্যপ ব্রহ্মার উপদেশে সর্পমন্ত্রসমূহের সৃষ্টি করিয়া তপোবলে মন দ্বারা ইঁহাকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবী রূপে উৎপাদন করেন। এই হেতু ইনি 'মনসা')), মনসার প্রিয়বৃক্ষবিশেষ, স্নুহী। (ব.শ.)। সর্পগণের দেবী। (এঁর নিজের নাম জরৎকারু, আবার) ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী ...। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন; সেইজন্য ইনি মনসা। এঁকে কশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়। ... কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান এবং তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি সবই শিক্ষা করে সিদ্ধা হন। ... জরৎকারু মুনির সঙ্গে কশ্যপ এঁর বিবাহ দেন। ... সন্ধ্যাবন্দনার জন্য নিদ্রাভঙ্গ করার জন্য জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন দেখে ... মহাদেব ও কশ্যপ বলেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হলে স্বধর্ম পালনের জন্য পুত্রোৎপাদন করে ত্যাগ করাই উচিত। পুত্রোৎপাদন না করলে তপস্যার ফল হয় না ...। তখন জরৎকারু মনসার নাভি স্পর্শ করলেন। ... ফলে এক তেজস্বী ও তপস্বী পুত্রের জন্ম হল। ...

মহাভারত মতে, বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী ছিল। ... বাসুকি জরৎকারু মুনির সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দেন। ... নিদ্রাভঙ্গের কারণে জরৎকারু স্ত্রীকে ত্যাগ করে যান, কিন্তু যাবার সময় স্ত্রীকে বলে যান — তাঁর গর্ভে এক তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। যথাকালে সেই পুত্রের জন্ম হল। ...

মনসা দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী; জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরী; বিষ হরণকারিণী বলে বিষহরী; মহাদেবের কাছ হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানসী কন্যা বলে মনসা। (পৌ.অ.)। ৪. গ্রামবাংলায় এখনও **মনসা** পূজা প্রচলিত, **মনসা**-কাঁটার গাছটিকে গ্রামবাংলার মানুষেরা সবাই চেনেন। ৫. দ্র. **আস্তীক, জনমেজয়, জরৎকারু**। **মনস্** শব্দের অর্থ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। **মনন**ের নির্যাসটুকু বহন করে যে সত্তা, তাকেই **মনসা** বলা যায়। এর বাস্তব রূপ অমৃত বহনকারী থেকে শুরু করে বিষ বহনকারী পর্যন্ত অনেক কিছুই হতে পারে। সেই সুবাদে এই সত্তা 'জগৎগৌরী' হতেও পারেন (দ্র. **গৌরী**)। হতে পারেন শৈবী, বৈষ্ণবী, নাগেশ্বরী, বিষহরী, সিদ্ধযোগিনী এমনকি **মনসা**ও। একালে যেমন পশ্চিমা মজুরেরা সমগ্র পরিবারসহ দেশবিদেশে চলে যান, সাধারণভাবে এঁরাও অনেকটা সেইরকম কারুশিল্পভিত্তিক (বেতের বা বাঁশের কাজ ... ঐরূপ কুটিরশিল্পকারী) জনগোষ্ঠী ছিলেন বলেই মনে হয়। ...

এবার **মনসা**র বাহ্যিক ও সামাজিক স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমে **মনসা**র দৃশ্যরূপের কথা হোক। আজকাল তো গ্রামবাংলাতেও আর ঝোপঝাড় তেমন নেই, কিন্তু বছর পঞ্চাশ আগেও ছিল এবং সেই ঝোপঝাড়ের একটি বিশেষ অংশ ছিল **মনসা**র ঝোপ। অত্যন্ত কাঁটাবহুল এই ঝোপে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। নিঃসন্দেহে এই **মনসা**র ঝোপ হল সাপের সবচেয়ে সেরা আশ্রয়স্থল। **মনসা**র কাঁটা অত্যন্ত ধারাল এবং দেখতে অনেকটাই 'আলপিন'-এর মতো। এর গায়ে ফুটো করে দিলে দুধের মতো সাদা রস বের হয়। এর ফুল দেখতে নয়নমনোহর। এই গাছ কিন্তু আম জাম প্রভৃতি গাছের মতো নয়, ক্যাকটাসের মতো। এর পাতাগুলি অনেকটা পানপাতার মতো দেখতে এবং প্রায় ২০/২৫ মিলিমিটার

পর্যন্ত পুরু হয়। **মনসা**র পাতাই **মনসা**গাছের কাণ্ড, পাতাই তার শাখা, সেই পাতাতেই কাঁটা হয়, ফুল ফোটে। সেই পাতা তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও পুঁতে দিলে সেখানেও কালে কালে **মনসা**র ঝোপ হয়ে যায়।

পৌরাণিক **মনসা** হলেন একধরনের জনগোষ্ঠী ও তাঁদের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা **পর্ব্বত** বা **বৃক্ষে**র মতো নয়। এই গোষ্ঠীতে যৌথসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী রূপে **নাগে**রাও থাকতেন। বৌদ্ধযুগে যখন প্রাচীনপন্থী ধনীদের বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু হয়, তখন শঙ্করাচার্য্যদের আবির্ভাব ঘটে এই জনগোষ্ঠী থেকেই। এবং বৌদ্ধযুগের সমাপ্তি ও হিন্দুযুগের সূচনা হয়। ...

ভারতে একমাত্র **অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ** দেশেই সম্ভবত **মনসা**র পূজা আজও কমবেশি চলে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, এই দেশ (বা দেশগুলি) **মনসা**র নীতি অমান্য করে তার পূজার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। কেননা, প্রত্যেকটি পূজার উদ্ভবের সেটাই ছিল নীতি। পরে পরে লোকে সে নীতি ভুলে যায়। পূজা তখন চলতে থাকে ইতিহাস-হারা ভক্তিতে। সেভাবেই এখনও **মনসা** পূজা চলছে।

মনীষা (মনীষী) : ১. মনঃ + ঈষা। (ব.শ.)। ২. ***মনীষা*** = *মন-এর গতিশীল আধার দিশাগ্রস্তভাবে ধারিত যাহাতে।* ***মনীষী*** = *মন-এর গতিশীল আধার দিশাগ্রস্তভাবে সক্রিয় যে আধারে।* / **মনীষা** = মনের গমন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **মনীষা** = বুদ্ধি, মতি, প্রজ্ঞা। **মনীষী** = মনীষাবান, বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, বিদ্বান, ধীর, বুধ। (ব.শ.)। ৪. wisdom অর্থে **মনীষা** এবং wise অর্থে **মনীষী** শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **বুদ্ধি**। **মন** (মাপনযন্ত্র) তার **মনন**-কর্ম করে (পারিপার্শ্বিককে মেপে) যে **মন**কে (যে বোধগুলি) পায়, সেই বোধ যখন গতিশীলভাবে দিশাগ্রস্ত হয়ে আধারিত হয়, তখন তাকে **মনীষা** বলে। সেই **মনীষা**র আধার যিনি তিনিই **মনীষী** পদবাচ্য। তার মানে, **মনীষী** হলেন 'মনীষাবান'। আর, **মনীষা** হল 'মননলব্ধ দিশাগ্রস্ত ফল মাত্র' বা যেখানে মননকৃত শ্রমফলগুলি তাদের সক্রিয়রূপে ধরে রাখা থাকে। সেই সুবাদে **মনীষী** বলতে, মানবসভ্যতার অর্জিত তত্ত্বগত ও তথ্যগত সমগ্র জ্ঞানসম্পদ যাঁরা ধারণ করে রাখেন, সেই সত্তাসমূহের প্রত্যেককেই বোঝায়।

মনু (মনুজ[১], মনুজা, মনুজী, মনুজেন্দ্র, মনুসংহিতা, মন্বন্তর) : ১. ✓মন্ + উ - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মনু*** = *মন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***মনুজ*** = ***মনু*** *হইতে জাত।* ***মনুজা*** = ***মনুজ****-এর আধার যে।* ***মনুজী*** = ***মনুজ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মনুজেন্দ্র*** = ***মনুজ****গণের* ***ইন্দ্র****।* ***মনুসংহিতা*** = *যে সংহিতা (গ্রন্থ)* ***মনু*** *কর্ত্তৃক রচিত।* ***মন্বন্তর*** = ***মনু****র অন্তর যাহাতে; অর্থাৎ, এক* ***মনু****র উদ্ভবকাল হইতে পরবর্ত্তী* ***মনু****র আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সময়কাল যাহাতে; অথবা, দুই* ***মনু****র অধিকার কালের মধ্যবর্ত্তী* ***মনু****হীন কাল যাহাতে।* ৩. **মনু** = জ্ঞাতা, মনুষ্য, অন্তঃকরণ, বিষ্ণু, চতুর্দ্দশ মনু, চতুর্দ্দশ (১৪) সংখ্যা, মনুসংহিতা, প্রজাপতিবিশেষ (ইনি ব্রহ্মার দেহ হইতে উদ্ভূত, এই হেতু নাম 'স্বায়ম্ভুব মনু'। ইঁহার পত্নী শতরূপা, পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। ইঁহার পুত্রকন্যাগণ হইতে মনুষ্যজাতির বিস্তার হেতু তাহারা 'মানব'। মনুসংহিতা মতে, হিরণ্যগর্ভ হইতে বিরাট্, বিরাট্ হইতে মনু উৎপন্ন। মনু, মরীচি-প্রভৃতি দশপ্রজাপতির স্রষ্টা। মরীচি-প্রভৃতি হইতে অন্য সপ্ত মনু, অন্য দেবগণ, যক্ষপিশাচাদি, নাগাদি, পক্ষিগণ, পিতৃগণ উৎপন্ন হয়। ইনি ব্রহ্মার নিকটে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মরীচি-প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান। ইহা 'মানবধর্ম্মশাস্ত্র'। ভৃগু মনুর আদেশে এই ধর্ম্মশাস্ত্র ঋষিমণ্ডলে ব্যাখ্যা করেন। ইহা 'ভৃগুপ্রোক্তসংহিতা' বা 'মনুসংহিতা'। ইনি চতুর্দ্দশ মনুর প্রথম। স্বারোচিষ উত্তম তামস রৈবত চাক্ষুষ বৈবস্বত সাবর্ণি দক্ষসাবর্ণি ব্রহ্মসাবর্ণি ধর্ম্মসাবর্ণি রুদ্রসাবর্ণি দেবসাবর্ণি ইন্দ্রসাবর্ণি — এই ত্রয়োদশ ইঁহার পরবর্ত্তী। (ব.শ.)। ... এক এক মনুর অধিকার-কালকে এক মন্বন্তর বলে। ... এক মনুর কাল পূর্ণ হলেই দেবতা, সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, মনু-পুত্ররা সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নতুন করে অন্য মনু, দেবতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। সকল মন্বন্তরেই সপ্তর্ষিরা ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষার জন্য আসেন। প্রত্যেক চতুর্যুগের অবসানে বেদবিপ্লব হয়। তখন সপ্তর্ষিরা পৃথিবীতে এসে আবার বেদ প্রচার করেন। ... চতুর্দ্দশ মনুর নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম ... ইত্যাদি। বিভিন্ন পুরাণে মনুদের নামে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, মৎস্যপুরাণ অনুসারে এঁদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, রোচ্য, ভৌত্যঃ, মেরুসাবর্ণি, ঋভু, ঋতুধামা, বিষ্বকসেন। প্রতি কল্পে এই চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়ে থাকে।

মনুদের মধ্যে যিনি আদি, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু, তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার দেহ হতে উদ্ভূত। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিজেকে বিভক্ত করে নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। এই সৃষ্ট নারী ও পুরুষ হতে পুরুষ বিরাজ উৎপন্ন হলেন এবং তার থেকে স্বয়ম্ভুব মনুর জন্ম হল। মনু দশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করলেন — এঁরাই মানবের জন্মদাতা — এঁরা মহর্ষি নামে খ্যাত।

অন্য কাহিনী অনুসারে ব্রহ্মা নিজেই মনুরূপে সৃষ্ট হলেন এবং তাঁর এক অংশে শতরূপা নামে নারী সৃষ্টি করলেন। কন্যা শতরূপার সহিত ব্যভিচারের ফলে মনুর জন্ম হল। মনু শতরূপাকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁদের পুত্র — প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। কন্যা — আকুতি, দেবাহুতি, ও প্রসূতি। এই মনু মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, প্রচেতা, নারদ, বশিষ্ঠ — এই দশ প্রজাপতির স্রষ্টা। মরীচি প্রভৃতি হতে অন্য সপ্ত মনু, অন্য দেবতা, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, পক্ষী ও পিতৃগণ উৎপন্ন হন। ইনি ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ মরীচি প্রভৃতিকে পাঠ করান। একে ... ধর্মশাস্ত্র বলে। মনুর আদেশে ভৃগু এই ধর্মশাস্ত্রগুলি ঋষিদের নিকট ব্যাখ্যা করেন। এর নাম মনুসংহিতা। ...

এখনকার বৈবস্বত মনু বিবস্বান অর্থাৎ সূর্যের পুত্র। ... (দ্র. মৎস্যাবতার) ... মনুর সৃষ্ট বলে মানুষের নাম মানব। ... মনুগণ প্রত্যেকেই ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা ও সংহিতাকার। (পৌ.অ.)। **মনুজ** = মনুজাত, মানব, মনুষ্য। **মনুজা, মনুজী** = মানবী, নারী, মনুকন্যা, প্রসূতি। **মনুজেন্দ্র (মনুজাধিপ, মনুজাধিপতি, মনুজেশ্বর)** = নরপতি, নরশ্রেষ্ঠ, রাজা। **মনুসংহিতা** = মনুব্যাখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ... হিন্দুধর্মের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যগুলি, হিন্দুজাতির আচার,

ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে যে সংহিতা গ্রথিত হয়েছে, তা মনুর দ্বারা সঙ্কলিত। প্রবাদ আছে, ইহা প্রথম স্বায়ম্ভুব কর্তৃক লিখিত হয়। ... এই সংহিতাকে হিন্দু আইনের ভিত্তিস্বরূপ বলা হয়। বেদের পরে মনুসংহিতা সৃষ্টি হয়েছিল, পণ্ডিতদের এইরূপ অভিমত। কথিত আছে, সর্বপ্রথমে এতে এক লক্ষ শ্লোক ছিল, কিন্তু এখন মাত্র ২৬৮৪টি শ্লোক পাওয়া যায়। (পৌ.অ.)। **মন্বন্তর** = স্বায়ম্ভুবাদি মনুর অধিকারকাল (প্রত্যেক মন্বন্তর, মনু মনুপুত্রগণ দেবগণ ইন্দ্র মুনিগণ ও হরির অংশাবতার বা মন্বন্তরাবতার — এই ষড়্‌বর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক মনুর অধিকারের পরে পরবর্তী মনুর অধিকারকাল। এক্ষণে ছয় মনুর অধিকারের পরে সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। এইরূপ চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকাল ব্রহ্মার একদিন। হিন্দী ও মারাঠীতে 'মন্বন্তর' শব্দের অর্থ 'হাঙ্গাম'। বাঙ্‌লায় এর অর্থ 'দুর্ভিক্ষকাল', 'আকাল'। যথা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর', যা ঘটেছিল বাং.সন ১২৭৬ সালে।)। (ব.শ.)। ৪. সমস্ত শব্দগুলিই এখন কার্যত অপ্রচলিত। ৫. **মনু** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি অত্যন্ত বড় বিষয়কে ধারণ করে। তার উপর বিভিন্ন পুরাণাদি গ্রন্থে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বয়ানও কমবেশি রয়েছে। সেকারণে এই শব্দগুলির ঐতিহাসিক সামাজিক অর্থ দেওয়া কঠিন কাজ। তার জন্য পৃথকভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। আমরা তা সামান্যই করতে পেরেছি। তাই এখানে মূলত শব্দগুলির নিহিতার্থ দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই নিহিতার্থই কিন্তু উপরোক্ত কাহিনীর প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা নিতে পারবে বলেই আমাদের মনে হয়। তবে ঐতিহাসিক সামাজিক দিকটি আমরা সাধ্যমতো ছুঁয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করব।

মনু শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল — '**মন** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে'। তার মানে, **মন** আর পরিমিতকরণের বা **মন্**-অনের কাজ করছে না, আর নতুন পরিমিত-মননফল সংগ্রহ করছে না, অন্যতর কিছু করছে। কী করছে সে? সে ইতোপূর্বে **মন**ন করে যে পরিমিত-মননফল লাভ করেছিল, তাই নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। সেই কারণে তাকে বলা হয় **মনু**।

ইতোপূর্বে **ম বর্ণের অর্থে** আমরা দেখেছি, সর্বপ্রকারের সমস্ত জ্ঞান অর্জন করার পরে যদি মানুষকে তার জীবনযাপনের জন্য কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হতে হত, তাহলে মানুষ কবেই মরে ভূত হয়ে যেত। বাস্তবে সেরকম হয় না, সেরকম নীতি অনুসরণ করা যায় না। বাস্তবে, আপাতত যে-জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে এবং যতটুকু যা নতুন করে অর্জন করা গেছে, তাই দিয়েই জীবনযাত্রা শুরু করতে হয়, কাজে হাত লাগাতে হয়। কখন বিশ্বের সব জ্ঞান অর্জন করা যাবে তার জন্য অপেক্ষা করা চলে না। সেই জন্য **মন**নশীল সত্তার পক্ষে অনন্তকালের জন্য অনির্দিষ্ট থাকা চলে না, তার প্রাপ্ত ও অর্জিত জ্ঞানটুকু নিয়েই তাকে সুনির্দিষ্ট-**মন**-সম্পন্ন হয়ে যেতে হয়, সাময়িকভাবে আপাত-সম্পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়, বা **মনু** হতে হয়। এমনকি একজন কুলিমজুরও বাড়ি থেকে যখন কাজের জন্য বেরোয়, জগৎকে বুঝে নেওয়ার একপ্রকার কাজ চালানো সম্পূর্ণ-জ্ঞান তার আছে, এই বিশ্বাস নিয়ে সে বেরোয়; অন্যথায় সে বাড়ি থেকে বেরোতেই পারত না।

তার মানে, যখন **(মানুষের) মন** তার **মন্**-অন কর্ম ক'রে ক'রে এমন ধরনের **মন-ফল**গুলিতে বা জ্ঞানে পৌঁছে গেছে, যে, সাময়িক ভাবে সেই জ্ঞানগুলিকেই **'সম্পূর্ণ-জ্ঞান'** ধরে নিয়ে সেগুলির সাহায্যেই আপাতত কাজে নেমে পড়া যায় ও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় এবং অন্যদেরও চালিত করে নেওয়া যায়, তখন সেই **মন**কে **মনু** বলে। শিক্ষক বললে যেমন একজন শিক্ষাদানকারীকে বোঝায়, আবার সমগ্র শিক্ষকশ্রেণীকেও বোঝায়, সেইরকম **মনু** বললে একজন 'আপাত-সম্পূর্ণ ও স্থির জ্ঞানের জ্ঞানী'কে বোঝায়, তদ্রূপ সমগ্র **মনু**সত্তাটিকেও বোঝায়। তার মানে **মনু** হল একটি সামাজিক সত্তা। একজন মানুষের **মন** যেমন তার আধার হতে পারে তেমনি বহু মানুষের **মন**ও তার আধার রূপে সক্রিয় হতে পারে। সেই কারণে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে (naturally) বিকশিত আদিম মানুষেরা যখন সচেতনভাবে নিজেদের পরিচালিত করতে শুরু করল, তখন তাকে বলা হল — 'স্বায়ম্ভুব **মনু**'র আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের পুরাণাদি অনুসারে ইনিই প্রথম **মনু**। তার মানে, আদিম সচেতন জ্ঞানী মানুষদের প্রত্যেককে এবং তাদের সামগ্রিক সত্তাকে বলা হত 'স্বায়ম্ভুব **মনু**'।

সেই সকল স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানুষদের কাল সমাপ্ত হলে পরবর্তীকালের নতুন স্বভাবের মানুষেরা দেখা দেন। দেখা যায়, সেই মানুষেরা যে যার নিজ নিজ রুচি অনুসারে চলতে শুরু করেছেন। তখন বলা হয় — 'স্বারোচিষ **মনু**'র আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এই 'যার যার তার তার রুচি অনুসারে চলা'র ফল খুব একটা ভাল হয় না। তখন '**উত্তম মনু**'র আবির্ভাব ঘটে। এঁরা নতুন যা করতেন, একালের ভাষায় তাকে 'ইস্কুল-কলেজে পড়া' বলে, সেকালে বলা হত 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া'। বিস্তারিত বিবরণের জন্য **উত্তম** দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড)। ফলত, এই **উত্তম** মানুষেরা ক্রমান্বয়ে **তমসা**গ্রস্ত হয়ে যায় এবং স্বভাবতই 'তামস **মনু**'র উদ্ভব ঘটে। অতঃপর জন্ম হয় দিশাগ্রস্ত রবকারী মানুষদের বা 'রৈবত **মনু**'র। কিন্তু রব করে গোয়েবল্‌সের মতো পাঁচকথা বললেই তো হল না, সত্য-মিথ্যা বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করা চাই; আর সে যোগ্যতা জন্মায় শব্দার্থজ্ঞান ও **পণ্য**ার্থজ্ঞান অর্জন করতে পারলে, অর্থাৎ তত্ত্ব-তথ্য চিনতে এবং/বা টাকা-পয়সা চিনতে শিখলে। বাক্যবিনিময় ও **পণ্য**বিনিময় করতে শিখে মানুষের চোখ খুলে যায় এবং তার ফলে একদিন 'চাক্ষুষ **মনু**'র জন্ম হয়ে যায়। বলে রাখা ভাল, এখনও এমন কিছু কিছু বন্য আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছেন যাঁদের মধ্যে টাকা-পয়সার কোনো জ্ঞানই নেই। তার মানে, তাঁদের সমাজে এখনও 'চাক্ষুষ **মনু**'র আবির্ভাব ঘটেনি।

তবে কিনা চোখ-ফুটে যাওয়া মানুষদের মধ্যে স্বভাবতই রেষারেষি ঝগড়াঝাঁটি বিরোধ ... হওয়া অবধারিত। সেই বিরোধে জড়িয়ে না গিয়ে সমাজবদ্ধ থাকতে গেলে এমন কিছু সামাজিক নিয়ম থাকা জরুরি, যা সবাই জানবে এবং মানবে। তার মানে, এবার মানুষের সমাজে আইনমানা মানুষদের আবির্ভাব জরুরি হয়ে ওঠে। ফলত **বৈবস্বত মনু**র অধিকার কালের সূচনা হয়ে যায়। এবং নিঃসন্দেহে **মনুসংহিতা** দিয়েই এই আইনজানা মানুষদের বা নাগরিক মানুষদের যুগের সূত্রপাত হয়ে যায়। আমাদের পুরাণাদি অনুসারে

'এখন **বৈবস্বত মনু**র অধিকার কাল চলিতেছে।' ... দ্র. **অজিত**।

মোটকথা আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা মানবসমাজের বিকাশের ইতিহাসকে একপ্রকার ছকে ধরে নিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন। সেই ছক অনুসারে এখন পর্যন্ত সাত রকম সমাজ-পরিচালক মানুষদের জন্ম হয়েছিল, সেগুলিকে সাতটি **মন্বন্তর** বলে। প্রতি **মন্বন্তরে**র নিজ নিজ স্বভাবানুসার দেবতা ঋষি ইন্দ্র মনুপুত্র রয়েছেন। পুরাণাদি পাঠ করে সেই তালিকাটি ঠিকঠাকভাবে উদ্ধার করা ও একালীকরণ করা দরকার। সে তালিকাটি হতে পারে এরকম —

মনু	সপ্তর্ষি	...	ইন্দ্র	দেবগণ	...
স্বায়ম্ভুব	মরীচি...	...	...	অজিত	...
স্বারোচিষ	...	...	...	তুষিত	...
উত্তম	...	...	...	সত্য	...
তামস	...	...	...	হরি	...
রৈবত	...	...	...	বৈকুণ্ঠ	...
চাক্ষুষ	...	...	...	সাধ্য	...
বৈবস্বত	...	...	...	আদিত্য	...

প্রায় সব পুরাণেই এই ছকটি নানা বয়ানে রয়েছে। কোন **মনু**র কালে কে কে ঋষি, কে কে দেবতা, ইন্দ্রই বা কে ... সেসব বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। স্থানাভাবে আমরা ... চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দিলাম। কেননা স্বায়ম্ভুব **মনু**র কালে সপ্তর্ষির নাম লিখতে গেলেই **মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্থ পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ** এই সাতটি নাম লিখতে হত। যে কেউ পুরাণাদি পাঠ করে এই তালিকাটি পূর্ণ করে নিতে পারবেন। সেই বয়ানগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সেগুলির মধ্যে একধরনের মিলও আছে। তাছাড়া একই সত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেও উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যতের গবেষকগণ এই ছকটি পূর্ণ করে নিয়ে **মনু**দের সমগ্র ইতিহাস উদ্ধার করে নিতে পারবেন আশা করা যাক।

এই **মনু** থেকে যে সকল **মনুজ, মনুজা, মনুজী** জন্মায়, তারা স্বভাবতই পূর্বধারণা নিয়েই জন্মায়, নতুন করে **মনন** করে জগৎকে বুঝতে যায় না তারা। এঁরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই কার্যকরী জ্ঞান ধরে নিয়ে তার সাহায্যেই জীবন অতিবাহিত করে ফেলার ভাবনা ভাবেন (যদিও বাস্তবে তা একশো ভাগ অনুসরণ করা যায় না)। তাই এঁদের **মনুজ, মনুজা, মনুজী** ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ হন, তাঁকেই **মনুজেন্দ্র, মনুজেশ্বর** ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। ...

বৈবস্বত মনুর অধিকার কালের সূচনা হয় **মনুসংহিতা**র প্রয়োগ দিয়ে। দ্র. **ভৃগুসংহিতা**। **মন্বন্তর** শব্দের ক্ষেত্রে আমরা দু'রকম প্রয়োগ দেখতে পাই। পুরাণাদিতে তার অর্থ হল এক **মনু**র আবির্ভাব-কাল থেকে পরবর্তী **মনু**র আবির্ভাবকাল পর্যন্ত কালখণ্ডটিই একটি **মন্বন্তর**। কিন্তু বাংলা উত্তরাধিকার সূত্রে **মন্বন্তর** শব্দের যে অর্থ পেয়েছে, তা হল এক **মনু**র তিরোধানকাল থেকে পরবর্তী **মনু**র আবির্ভাবকালের মাঝের ফাঁকটুকু, অর্থাৎ **মনু**হীন কাল। একদিক থেকে বাংলার এই ধারণা খুবই সঠিক। কেননা, ছিয়াত্তরের **মন্বন্তর**-এ আমরা দেখি কোনো **মনু** সমাজে রাজত্ব করছে না বলেই ঐ আকাল। সমাজের সকল কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় একপ্রকার পূর্ণ-জ্ঞান যাঁর আছে, সেই **মনু** কি কখনো সমাজের এই দুরবস্থা বসে বসে দেখতে পারেন? **মনু** থাকলে এমন আকাল হতেই পারত না। ... **৬.** ইংরেজিতে human শব্দটি এসেছে **মনুঃ** (= MAN-UH) শব্দটিকে উলটে দিয়ে। তবে এ বিষয়ে আমরা নিম্নে **মনুষ্য** শব্দে আলোচনা করেছি।

মনুজ[১]**, মনুষ্য, মাণব, মানব, মানুষ — জন, নর (নারী), নৃ, পুরুষ (প্রকৃতি), ব্যক্তি, মহ (মহিলা), লোক : ২. মনুজ** = **মনু** *হইতে জাত।* **মনুষ্য** = **মনু** *দিশাগ্রস্তভাবে থাকে যাহাতে।* **মাণব** = **মণ** *হইতে জাতকে বহন করে যে।* **মানব** = **মন** *হইতে জাতকে বহন করে যে।* **মানুষ** = **মান** *(**মন** হইতে জাত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **৩. মনুজ** = মনুজাত, মানব, মনুষ্য। (উপরে **মনুজ**[১] দ্রষ্টব্য)। **মনুষ্য** = মানবজাতি, মানুষ, পুরুষ, লোক ... ইত্যাদি। **মাণব** = মনুর অপত্য, মনুষ্য ... ইত্যাদি (উপরে **মণ্** ক্রিয়ামূলের পরিবারে **মাণব** দ্রষ্টব্য)। **মানব** = মনু হইতে আগত, মনুসম্বন্ধী, মনুপ্রোক্ত, মনুর অপত্য, মনুষ্যজাতি ... ইত্যাদি। **মানুষ** = মানুষসম্বন্ধী, মানবীয়, মানুষ হইতে আগত, মানুষদেবতাক, মনুষ্যজাতি, মানব ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র **মনুজ** ও **মাণব** বাদে বাকি সব শব্দগুলি man, human ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলি এখানে একত্রে দেওয়ার কারণ হল — 'man'কে বোঝাতে আমাদের ভাষায় সরাসরি অন্তত (উপরোক্ত) ছয়টি শব্দ ছিল; তির্যকভাবে ছিল আরও ৭টি। যথা — **জন, নর (নারী), নৃ, পুরুষ (প্রকৃতি), ব্যক্তি, মহ (মহিলা), লোক**। এদের মধ্যেকার পার্থক্য দেখিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করার দরকার ছিল। যদিও আমরা সবাই এখন প্রধানত man-অর্থেই এই শব্দগুলিকে বুঝে ও ব্যবহার করে থাকি। এগুলির মধ্যে আবার **মানুষ** শব্দটিকে আমরা সবচেয়ে অধিক ব্যবহার করে থাকি। **মনুজ, মাণব, মহ** শব্দ তিনটিকে তো ব্যবহারও করি না। তা সত্ত্বেও এই শব্দগুলি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল এই জন্য যে, এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কীভাবে প্রস্তুত করেছিলেন, সেকথা জেনে রাখা দরকার। কী সম্পদ ছিল ঐ ১৩টি শব্দে তা জানা থাকলে একদিকে যেমন মানুষের বিভিন্ন রূপগুলিকে চিনে রাখা যাবে, তেমনি প্রাচীন সাহিত্য পড়বার সময় ভুল অর্থে গিয়ে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে। তাছাড়া, ঐ শব্দগুলিতে যে সম্পদ রাখা ছিল, তাকে একালীকরণেরও একটা সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

ইংরেজি ভাষায় 'মানুষ' বোঝাতে মাত্র চারটি শব্দ পাওয়া যায় — human-being, individual, man (woman), person। একটু মনোযোগ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, শব্দগুলি 'man'-কেই বোঝাচ্ছে বটে, কিন্তু একভাবে বোঝাচ্ছে না। একটি গরুকে যেমন সিং ধরে, কান ধরে, লেজ ধরে টেনে দেখানো যায়; অর্থাৎ তিনভাবে দেখানো যায়, মানুষকেও তেমনি বহুভাবে দেখানো যায়। তার মানে, মানুষ যতরকম কাজ করে, ততরকমভাবেই তাকে দেখানো যায়, আর ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সেটাই নীতি। আমরা বাংলাভাষীরা এককালে ১৩ দিক থেকে ১৩ রকম স্বভাবের উল্লেখ করে সেই

man-কে দেখাতে পারতাম। তার মানে, ১৩ টি 'man'বাচক শব্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য চোখে পড়লে বুঝতে পারা যায়, ১৩টি শব্দই 'ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানুষ'কে বোঝায়, যারা পরস্পর থেকে অনেকটাই আলাদা চরিত্রের।

যেমন **মনুজ** হল তেমন মানুষ যে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার জানে ও মানে এবং সেই অনুযায়ী সক্রিয় হয়ে থাকে। দশরথ **কৈবর্ত্ত**-র ছেলে রামা **কৈবর্ত্ত** যেদিন প্রথম লাঙল হাতে মাঠে নামলেন, কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীব গান্ধী বা পৌত্র রাহুল গান্ধী যেদিন প্রথম রাজনীতির আসরে নামলেন, সেদিন তাঁরা **মনুজ**ই বটেন। ওদিকে, **মনুষ্য** হলেন সেই মানুষ পূর্বসূরিরা যাঁকে **লালন-পালনে**র মাধ্যমে নিজেদের সমস্ত অর্জনগুলি দিয়ে শিক্ষিত করে তুলেছেন। এঁরা যতখানি **ভব্য হন**, তার চেয়ে অধিক পরিমাণে **সভ্য** হয়ে থাকেন। (দ্র. **সভ্যভব্য**)। একালের ভাষায় তাঁদের পারিবারিক-সামাজিক-অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বলা যেতে পারে। সেকালের ভাষায় এঁদের বলা হত 'উৎকৃষ্ট প্রজা', একালের ভাষায় বলা হয় 'quality people product'। সেই মানুষেরা যখন তাঁদের প্রাপ্ত জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে নিজের, পরিবারের, সমাজের, জগতের কাজে আপন আপন ভূমিকা পালন করতে লাগেন, তখন তাঁদের **মনুষ্য** বলে। মোটকথা 'প্রাপ্ত **মনু**কে উষ্ (use) করেন যিনি' তাঁকে **মনুষ্য** বলে, সে নর হোক আর নারীই হোক। সেই কারণে **মনুষ্য** শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ হয় না। আর, সেই **মন-উষ্**করণযোগ্যতাই **মনুষ্যত্ব**, তা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই থাকতে পারে।

সে তুলনায় **মাণব** কিন্তু অনেকটাই আলাদা চরিত্রের মানুষ। যে মানুষ স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে **লালিত-পালিত** ও স্বশিক্ষিত হয়েছেন, তথাকথিত অ্যাকাডেমিতে যাননি এবং জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাননি এবং সচেতন /অচেতন /অতিচেতন /অবচেতন ভাবে স্বভাবতই আত্মানু-সন্ধান করেন, তেমন মানুষকে বলা হত **মাণব**। এদের একধরনের অখণ্ডবোধ অবশ্যই থাকে। এঁরা যত না **সভ্য** হন, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে **ভব্য** হয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ। অ্যাকাডেমি-শিক্ষা হীন মানুষদের মধ্যে বা তথাকথিত 'অশিক্ষিত' মানুষদের মধ্যে কিংবা, বলা ভাল, স্বশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষের দেখা মেলে বেশি। গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষই এই দলে পড়েন, আজও। আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টারা শেষজীবনে অবশ্যই এই শ্রেণীর মানুষে পরিণত হয়ে যান।

তুলনায় **মানব** শব্দটি **মাণব** শব্দের অর্থের সবচেয়ে কাছাকাছি মানুষদের বোঝায়। উত্তরাধিকারসূত্রে যে সকল **মান** (পারিপার্শ্বিকের **মানে**) পাওয়া যায় কিংবা **মনন** করে করে বিভিন্ন বস্তুর ও নিজের যে **মান** পাওয়া যায়, তা সব জেনে-বুঝে নিয়ে সেই **মান** যিনি বহন করেন, তিনিই **মানব**। ইনি স্বশিক্ষিত হতে পারেন, অ্যাকাডেমি শিক্ষিতও হতে পারেন কিংবা উভয়ই হতে পারেন; কিন্তু কখনোই 'অশিক্ষিত' হন না। পারিপার্শ্বিকের ও নিজের **মান (মানে)** যে জানে না, তাকে আর যাই বলা যাক, **মানব** বলা যাবে না। এঁরা সম্পূর্ণতই **সভ্যভব্য** মানুষ হয়ে থাকেন।

মানুষ কিন্তু **মানব** নয়। রামকৃষ্ণ যখন বলেন, মান থাকবে ও হুঁশ থাকবে তবেই **মান-হুঁশ** বা **মানুষ**, তখন কথাটি সত্যের কাছাকাছি চলে যায়। **মান** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ, অর্থাৎ **মান** যখন স্থির রূপ নিয়ে নিয়েছে এবং আপাতত বদলাচ্ছে না, **মান**-এর সেই স্থির রূপ যে মানুষকে বা মানুষদের বিশেষ দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাঁদের **মানুষ** বলা হয়। যাঁরা একান্তভাবে বিশেষ কোনো ধর্মে মতবাদে ধারণায় দর্শনে বিশ্বাসী বা ধর্মভীরু, তা তাঁরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ শিখ নাস্তিকতাবাদী আধুনিকতাবাদী বিজ্ঞানবাদী জাতীয়তাবাদী মার্কসবাদী ফ্যাসিবাদী মৌলবাদী ... যাই হোন, তাঁদের **মানুষ** বলা যেতে পারে। কেননা, তাঁরা যে **মান** বহন করেন তাকে তাঁরা অপরিবর্তনীয় ভাবেন এবং সেই অনুযায়ী যেদিকে চলা উচিত, সেদিকেই চলতে থাকেন। তাই তাঁদের **মানুষ** বলা হয়।

এছাড়াও বাংলা ভাষায় 'মানুষ' বোঝাতে যে শব্দগুলির ব্যবহার চলে, সেগুলিকে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি শব্দকেই এই শব্দার্থকোষের নিজ নিজ ভুক্তিতে পাওয়া যাবে। অন্য 'মানুষ'-পদবাচ্য শব্দগুলির সঙ্গে তাদের পার্থক্য বোঝানোর জন্য এখানে অতি সংক্ষেপে তাদের সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া হচ্ছে।

আমরা যখন এক**জন** দুই**জন** ইত্যাদি বলি, তখন তা মানুষ পদবাচ্য বটে, কিন্তু এই **জন** বোঝায় 'জনমজুর'কে, যে শ্রম জনন করতে পারে। দ্র. **জন**। ওদিকে **নর (নারী)** শব্দটি বোঝায় প্রত্যেক সমাজসদস্যকে, যে কিনা সমাজের সম্পদ ভক্ষণ করে। (দ্র. **নর**)। নৃ ঠিক তার উল্টো; সেও সমাজসদস্য বটে, তবে সে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে কোনো না কোনো ভাবে সংযুক্ত হয়ে সম্পদ উৎপাদন করে বলেই **নৃ**-পদবাচ্য। (দ্র. **নৃ**) আর **পুরুষ (প্রকৃতি)** কাকে বলে, সেকথা অতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ হল পুর-দানকারী, তা সে শিষ্যদের মাথায় জ্ঞানপুর-এর দানকারী হোন আর কাঠের খাটে শ্রমদানকারীই হোন, কিংবা বিশ্বপ্রকৃতিতে চেতনা দানকারীই হোন। আর, **ব্যক্তি** সেই, যিনি নিজের কথা ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু **মহ (মহিলা)** অনেক বড় ব্যাপার। যাঁরা **মহ** হন, তাঁদের **মহোদয়-মহোদয়া, মহাশয়-মহাশয়া, মহিষ-মহিষী, মহিল-মহিলা** ... ইত্যাদি বলা হত; যার মধ্যে 'মানুষ্যার্থে' **মহিষ** ও **মহিল** শব্দটি কোনকালে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, কে জানে। (দ্র. **মহালী, মাহালী**)। এই **মহ** (Homo) গণ মূলত প্রাক্‌বৈদিক যুগের সনাতন সভ্যতার **মন** নিয়ে আজও ইতস্তত বিরাজ করছেন। এঁদের স্বভাবের মধ্যে একটা অখণ্ড সমাজের বোধ কাজ করে। সেই **মহ**-যুক্ত শব্দের যোগে এঁদের উল্লেখ করা হয়।

রইল বাকি **লোক** শব্দটি। এটি সহজে বোঝা যায় ইংরেজি look শব্দের মাধ্যমে। যার ভিতর দিয়ে look through করা যায়, কিংবা যে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর look through করতে পারে, তাকে বলা হয় **লোক**। (আমাদের 'খ' গ্রন্থের ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এর আদর্শ প্রতিনিধি হলেন তথাকথিত 'গাঁওবুড়ো'। এঁরা এতই খোলা মনের মানুষ হন যে, এঁদের ভিতরটা অতি সহজেই দেখে নেওয়া যায়; আবার এঁরা এত জ্ঞানী হন যে অন্যদের মনের ভিতরটা এঁরা অনায়াসে দেখে নিতে পারেন। সেই কারণে এঁদের বলা হত **লোক**। পূর্বকথিত **মাণব**-এর সঙ্গে এই **লোক**-এর আর্থিক নৈকট্য দেখতে পাওয়া যায়।

যাই হোক, আমরা যখন আমাদের ভাষায় ১৩ রকমের মানুষকে ১৩ রকম শব্দের সাহায্যে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম, তখন দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ইংরেজ-এর রয়েছে মাত্র চাররকম উত্তরাধিকার। তাঁরা চেষ্টা করলে মানুষকে চাররকম ভাবে দেখাতে পারেন। আরও একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায়, মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা মানুষকে অন্ততপক্ষে ত্রয়োদশাধিক দিক থেকে দেখে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। আমরা বাংলাভাষীরা ঐ ১৩ টি দিক থেকে দেখার কৌশল উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং এখনও কমবেশি বহন করে নিয়ে চলেছি; সেখানে ইংরেজ মাত্র চার দিকের উত্তরাধিকার পেয়েছে এবং বহন করে নিয়ে চলেছে। হয়তো-বা আরও বেশি পেয়েছিল, ভুলে গেছে। ... **৬.** ইংরেজিতে 'মানুষ'-অর্থে human-being শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটির ভিতরে 'human-হয়ে ওঠা' কথাটি রয়েছে। আমরা আমাদের **মনুঃ** কথাটির মধ্যে 'অনির্দিষ্ট **মন** থেকে সুনির্দিষ্ট **মনে** হয়ে ওঠা' দেখতে পাই। তার মানে, **মনুঃ** শব্দটি যাকে বোঝায়, ইংরেজও তাদের human-এর সঙ্গে একটা being জুড়ে নিয়ে ঠিক তাকেই বোঝানোর ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু তাই যদি হবে, manuh না বলে তারা human বলতে গেল কেন?

এক্ষেত্রে, আমাদের শব্দসৃষ্টির আদিতে যে নিয়মটা ছিল, দেখা যাচ্ছে, সেটিই ইংরেজ উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছে বলেই তাদের এই দশা। 'মা উ করে' বলেই 'উমা', 'রহে করণ যাহাতে' সেটিই 'কর' বা হাত। ... ইত্যাদি নিয়ম বাংলাভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে এখনও বহন করছে। ইংরেজ কীভাবে জানি সেই নীতিটিই 'আকাঁড়া' অবস্থাতেই উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছে human শব্দে। কেননা 'মন্-উঃ' (man-uh) কথাটিই তো উলটে hu-man হয়ে রয়েছে। নীতিটি এখানেই থেমে নেই। **মহ্** শব্দে আমরা যাকে বহন করে নিয়ে চলেছি, ইংরেজ তো তাকেই homo শব্দে বহন করে নিয়ে চলেছে! তাহলে!? ... এসবই ভাববার কথা।

মনুষ্যত্ব (মানবতা, মানবতাবাদ, মানবাধিকার, মানবিক, মানবিকতা) : ২. মনুষ্যত্ব = ***মনুষ্য**-এর তারণ বাহিত যাহাতে।* ***মানবতা** = **মানব**-এর তারণের আধার যে।* ***মানবতাবাদ** = **মানবতা** রূপ মতবাদ যাহাতে।* ***মানবাধিকার** = **মানব**-এর অধিকার যাহাতে।* ***মানবিক** = **মান** বহন গতিশীলকৃত যাহাতে।* ***মানবিকতাবাদ** = **মানবিকতা** (**মানবিক** তারিত যে-আধারে) রূপ মতবাদ যাহাতে।* **৩. মনুষ্যত্ব** = মনুষ্যভাব, মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম, মনুষ্যের গুণ। (ব.শ.)। মনুষ্যের ভাব, অবস্থা। (ছা.অ.)। মানবতা, মানুষের থাকা উচিত এমন সদ্‌গুণ। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। মানুষের প্রকৃতি, মানবতা, দয়া ধর্ম প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। (স.বা.অ.কলকাতা)। **মানবতা** = মানুষের গুণ, মনুষ্য ধর্ম, মনুষ্যত্ব, মানবের ভাব, humanity। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **মানবতা** = মানুষের ধর্ম, গুণ বা ভাব। **মানবতাবাদ** = মানুষের সদ্‌গুণাবলির অনুশীলন, মানুষের স্বাভাবিক গুণ বা ধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ। **মানবাধিকার** = মানুষ হিসাবে সম্মানের সঙ্গে ও নিরাপদে বাঁচার অধিকার। **মানবিক** = মনুষ্যোচিত, মনুষ্যসুলভ, মনুষ্যত্বপূর্ণ, লোকহিতকর, humanitarian। **মানবিকতা** = মানবিক শব্দের বিশেষ্য রূপ। (স.বা.অ.কলকাতা)। **৪.** humanness অর্থে **মনুষ্যত্ব**, humanity অর্থে **মানবতা**, humanism অর্থে **মানবতাবাদ**, human rights অর্থে **মানবাধিকার**, human অর্থে **মানবিক**, এবং human quality অর্থে **মানবিকতা** প্রচলিত। **৫. মনুষ্য** শব্দের নিহিতার্থ আমরা আগেই জেনেছি, জেনেছি 'man'-পদবাচ্য অন্যান্য ১২টি শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্যও। তদনুসারে প্রাপ্ত **মনু**কে বা সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে কর্মে প্রয়োগ করেন যিনি, তিনিই **মনুষ্য** পদবাচ্য। কেউ প্রাপ্ত **মনু**কে রূপায়িত করেন ধানচাষ করে, কেউ লোহা পেটাই করে, কেউ কমপিউটারের বোতাম টিপে, কেউ-বা কলম ঠেলে। কোটি কোটি রকমের ভূমিকায় কোটি কোটি মানুষ আপন আপন 'প্রাপ্ত-অর্জিত সুনির্দিষ্ট জ্ঞান'কে প্রয়োগ করে চলেছেন বলেই এই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। **মনুষ্যত্ব** হল সেই 'সুনির্দিষ্ট জ্ঞান প্রয়োগের যোগ্যতা'। সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তার জন্য **সভ্য** হতে হয়, খানিকটা **ভব্য** হতে হয়, এবং অবশ্যই **মনু**কে বা সুনির্দিষ্ট-জ্ঞানকে ব্যবহারিক ভাবে রপ্ত করে নিতে হয়। নর-জীবনে পুত্র রূপে, ভাই রূপে, বন্ধু রূপে, পতি রূপে, পিতা রূপে, ... নারী-জীবনে কন্যা রূপে, ভগিনী রূপে, পত্নী রূপে, মাতা রূপে, ... এবং মানুষ-জীবনে বন্ধু রূপে, প্রতিবেশী রূপে, নাগরিক রূপে, মানবসভ্যতার একজন সদস্য রূপে, জগতের একজন জীব রূপে যখন যে কর্তব্য সামনে আসে, সেই কর্তব্য করতে পারলেই বলা হয়, তাঁর **মনুষ্যত্ব** আছে। তার মানে, ঐ কর্তব্য করার জন্য যখন যখন যে যে 'অর্জিত-প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োগ করা দরকার', তা যার আছে, আমরা বলি, তারই **মনুষ্যত্ব** আছে। স্বভাবতই এই **মনুষ্যত্ব** অর্জিতব্য গুণ। তবে কিনা, এই যে **মনুষ**-করণ রূপ কর্তব্য, তার অধিকাংশই নিয়োজিত হয় মানুষের মানসিক, বাচিক, ও বাহ্যিক উৎপাদনে। কেননা, সেই উৎপাদন দিয়েই বাকি কর্তব্যের অধিকাংশই পূরণ হয়ে যায়।

সে যাই হোক, কেউ যখন বলে, 'লোকটার বীরত্ব নাই', আমরা বুঝি, কোনো একটি ক্ষেত্রে লোকটার বীর-রূপে সক্রিয় হবার যে ভূমিকা ছিল, সেটা সে পালন করেনি। একইভাবে, কেউ যখন বলে, 'লোকটার **মনুষ্যত্ব** নাই', তখন কার্যত সে বলতে চায় যে, যে (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাগতিক) ক্ষেত্রে লোকটার 'অর্জিত-প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে প্রয়োগ করা'র কর্তব্য পালন করার কথা ছিল, সেই কর্তব্য সে পালন করেনি বা করে না। যদি সে সেটা করত, তাহলে তার **মনু**কে ঐ ভূমিকায় বা দিশায় প্রয়োগ করা হয়ে যেত; তাহলেই একথা প্রমাণিত হয়ে যেত যে, তার **মনুষ্যত্ব** আছে।

তার মানে, আমাদের কবিরা যে বলে গেছেন 'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন', কিংবা, 'রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি', তখন যে 'মানুষ হওয়া'র বা 'মানুষ করা'র কথা বলা হয়, সে হল **মনুষ্যত্ব** অর্জন করার কথা। এই **মনুষ্যত্ব** অর্জন নিঃসন্দেহে মানুষের জীবত্ব পেরিয়ে, **মানবত্ব** পেরিয়ে, দেবত্ব পেরিয়ে, **ব্রহ্মত্ব** পর্যন্ত প্রসারিত। অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সেরকম ইশারাই দিয়ে গেছেন — **ব্রহ্ম** লাভ নয়, **ব্রহ্ম** হয়ে ওঠা! তবে সবার ভাগ্যে তো সব করবার, সব হইবার সুযোগ আসে না! মানবঝাঁকের অগ্রগতি ও কালের লীলায় যার যে যে সুযোগ আসে, সে সেই সেই ক্ষেত্রে

মনুকে প্রয়োগ করতে পারে। তাতে কারও ভাগ্যে **ব্রহ্ম** হয়ে ওঠা পর্যন্ত **মনুষ্যত্ব** অর্জিত হয়, কারও দেবত্ব পর্যন্ত **মনুষ্যত্ব** অর্জিত হয়, কারও কারও **মানবত্ব** পর্যন্ত **মনুষ্যত্ব** অর্জিত হয়, এবং অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যেই জীবত্ব পর্যন্ত **মনুষ্যত্ব** লাভটুকু যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পনেরো আনা' নিবন্ধে দেখিয়েছেন, এই জীবত্ব পর্যন্ত **মনুষ্যত্ব** অর্জনেরও একটা প্রবল সার্থকতা আছে। নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে নির্বিবাদে জৈবিক কর্তব্যসমূহ করে যাওয়ার ভেতর দিয়েই মানবসভ্যতার মূল প্রবাহটি বাহিত হয়।

অতএব **মনুষ্যত্ব** শব্দের নিহিতার্থ হল — মননশীল জীব রূপে জীবনের যে যে ক্ষণে যে যে কাজ করা দরকার, তার জন্য যে যে **মনু**কে (অর্জিত-প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে) সেই প্রার্থিত দিশায় প্রয়োগ করা দরকার, তা করে ফেলার যোগ্যতা বা গুণ থাকে যাহাতে, তাকেই বলে **মনুষ্যত্ব**। একালের বাংলাভাষীগণ যখন বলেন, 'মানুষ হইতে হবে', 'মানুষ করতে হবে' ... ইত্যাদি, তখন এই **মনুষ্যত্ব** অর্জন করার কথাই বলেন।

মানবতা, মানবতাবাদ, মানবাধিকার, মানবিক, মানবিকতা — এই শব্দগুলি খুবই বিপজ্জনক শব্দ। এগুলির কোনোটিই প্রাচীন বাংলা শব্দ নয়; সবই ১৯০০ সালের পরে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। নতুন শব্দ সৃষ্টি হওয়া খুবই ভাল, কেননা তাতে ভাষার 'রং খোলে'। এই **মন্** ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেরকম শব্দ হল — **যেমন তেমন কেমন এমন অমন মানত মানা-করা মানান মানানসই** ... প্রভৃতি এবং সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল **ভালবাসা** শব্দটি। এই শব্দগুলির সৃষ্টি বাংলাভাষাকে আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে! কিন্তু অনেক সময় নতুন শব্দ ভাষার রক্তহীনতার লক্ষণও হতে পারে, এবং হয়ও। উপরোক্ত **মানবতা** প্রভৃতি শব্দগুলির ক্ষেত্রে সেই রক্তহীনতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এগুলিকে 'বাংলাভাষার রং খুলছে' বলে চালান উচিত নয়। (দ্র. **মধুমাস**)। গ্রামবাংলার মানুষ এখনও ঐ শব্দগুলি ব্যবহারও করেন না। তাঁরা ব্যবহার করেন **মনুষ্যত্ব**। তাছাড়া **মানব** শব্দের অর্থই বলছে, **মানবতা** কিংবা **মানবতাবাদ** শব্দের কার্যকরী কোনো মানেই হয় না। যেমন, **বাসব** শব্দটি যথার্থ বাংলা শব্দ; কিন্তু তাই বলে 'বাসবতা' কিংবা 'বাসবতাবাদ' বলে কোনো শব্দ হয় না, হলেও তার কার্যকরী কোনো মানে হয় না; এও সেই রকম। তুলনায় **মানবিক** ও **মানবিকতা** শব্দের তবুও খানিকটা অর্থ হয়। তবে সেটা খুব স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক হলে 'বাসবিক' 'বাসবিকতা'ও হত। তা হয় না। তাহলে, এসব কীরকম শব্দ?

না, এই শব্দগুলি বাংলার মানুষের মনের মাটি থেকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায়নি, যেভাবে **এমন তেমন** ... প্রভৃতি শব্দের জন্ম হয়েছে। এগুলি হল আসলে ইংরেজি শব্দ, যাদেরকে বাংলার ধুতি-জামা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজির সেই শব্দগুলি হল humanity (যাকে বাংলার ধুতি জামা পরিয়ে বানানো হয়েছে **মানবতা**), humanism (যাকে বানানো হয়েছে **মানবতাবাদ**), human rights (যাকে করা হয়েছে **মানবাধিকার**), human (যাকে করা হয়েছে **মানবিক**) এবং human quality (যাকে বানান হয়েছে **মানবিকতা**)। ফলত, এগুলি হল বাংলার **মন্** ক্রিয়ামূলের পরিবারে তাদের সন্তানদের জামাকাপড় পরে বসে পড়া 'উপনিবেশকারী' বিদেশী, যাদের ভুল করে লোকে **মন্** ক্রিয়া-পরিবারেরই সন্তান বলে মনে করছে। নিশ্চয় এ খুব ভাল কথা নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে! যা ঘটে বসে রয়েছে, তাকে তো জোর করে উচ্ছেদ করা যাবে না। গ্রামবাংলার মানুষের অব্যবহারই হয়তো একদিন তাদের বিলুপ্ত করে দেবে!

মনুষ্যদুর্গ : ২. *মনুষ্য রূপ দুর্গ।* / বহুলোকসমাগম হেতু দুর্গম (যে)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. আজকাল বিভিন্ন মেলায় এমনই লোকসমাগম হচ্ছে যে, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হচ্ছে বহু মানুষের। সেই মনুষ্যসমাগমকে ঠিকভাবে ব'লে বোঝানোর মতো কোনো শব্দ আজ আমাদের নেই; অথচ দেখা যাচ্ছে, এককালে সেরকম শব্দ আমাদের ছিল। কিংবা কলকাতা বা নিউইয়র্ক শহরের কথাই ধরুন না কেন। সকাল সাতটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত এই শহরগুলি তো এক একটা 'যানদুর্গ'ই বটে!

মনুষ্যদেব : ৩. ব্রাহ্মণ, নরদেব, রাজা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. হ্যাঁ, এককালে এমন **ব্রাহ্মণ**, এমন রাজা ছিলেন, যাঁরা মানুষের দেবতা ছিলেন; মানুষকে দিতেন। এখন তাঁরা নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা '**দেব-দেব**' (দেবো-দেবো) বলেন না, '**নেব-নেব**' বলেন। তাই একালে **মনুষ্যদেব** বিলুপ্ত হয়েছেন।

মনুষ্যধর্ম্ম, মনুষ্যধর্ম্মা : ২. ***মনুষ্যধর্ম্ম*** = *মনুষ্যের ধর্ম্ম যাহাতে।* ***মনুষ্যধর্ম্মা*** = ***মনুষ্যধর্ম্ম***-*এর আধার যে।* / **মনুষ্যধর্ম্মা** = মনুষ্যের ধর্ম্ম যাঁহার তিনি। (ছা.অ.)। ৩. **মনুষ্যধর্ম্ম** = মনুষ্যত্ব, মনুষ্যোচিত গুণ বা চরিত। **মনুষ্যধর্ম্মা** = কুবের। (ব.শ.)। **মনুষ্যধর্ম্মা** = কুবের, ধনাধিপ। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই দুটি শব্দ প্রথম দর্শনে আমাদের খুবই বিপদে ফেলে। যিনি **মনুষ্যধর্ম্ম**-এর আধার হন, বা **মনুষ্যধর্ম্মা** হন, ব.শব্দকোষ ও ছা.অভিধান বলছেন, তিনি ধনাধিপ বা কুবের হয়ে যান। তাহলে তো **মনুষ্যধর্ম্ম** শব্দের মানে হতে হবে টাকা রোজগার করা, টাকা সুদে খাটান, টাকা দাদন দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিয়ে তার লাভ ও সুদে ভাগ বসান এবং সেসবের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা!? কেননা, **কুবের** তো সেসবই করে থাকেন। তাহলে কি **মনুষ্যত্ব** ও **মনুষ্যধর্ম্ম** একই ব্যাপার? নাকি তারা আলাদা?

আমরা আগেই যে, **মন-উষ**করণ-যোগ্যতাকে **মনুষ্যত্ব** বলে। আর, **ধর্ম্ম** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, **কর্ম্মই ধর্ম্ম**; অর্থাৎ, অস্তিত্বের যে-**কর্ম্মে**র জন্য অস্তিত্ব তৎপ্রকার শরীরসাধন করে, সেই **কর্ম্ম**ই অস্তিত্বটির **ধর্ম্ম**। তার মানে, **মনুষ্যত্ব** বা **মন-উষ**করণ **কর্ম্ম**ই নিঃসন্দেহে **মনুষ্যধর্ম্ম**ও বটে। তাহলে **মনুষ্যধর্ম্মা**কে কুবের বলা হয় কেন? কুবের কি **মনুষ্যধর্ম্ম**-এর আধার?

আগেই আমরা দেখেছি, **মন-উষ**করণের প্রধান করণটি যথাসময়ে যথোপযুক্ত উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করাই **মনুষ্যত্ব**। পৌরাণিক ভাষায় একে বলে 'কৈলাসে থাকা'। কৈলাসে দুটি সত্তা থাকেন — শিব ও কুবের। অর্থাৎ, এঁরা দু'জনই উৎপাদন করে থাকেন বা তার ব্যবস্থা করে থাকেন। আমরা জেনেছি, নতুন

আবিষ্কারকে প্রয়োগে বাস্তবায়িত করেন শিব। আর, দাদন দিয়ে, মূলধন দিয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনিত উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন কুবের। তার মানে, উভয়েই উৎপাদন করেন বা করান, তাই উভয়েই কৈলাসে বাস করেন। তার মানে, মূলধন দিয়ে মানুষকে তার উৎপাদন কর্ম্মে লিপ্ত হওয়ার উপায় করে দেয় বলেই কুবেরকে **মনুষ্যধর্ম্মা** বলা হয়ে থাকে। শুরু শুরুতে এর গৌরব থাকলেও আজ আমরা জানি, একালের কুবেরের গৌরব আদৌ নেই, বরং বিপুল পরিমাণ কলঙ্ক আছে। এবং সে যে উৎপাদন-**কর্ম্ম**কে আধার রূপে ধারণ করে, তা শুধুমাত্রই উৎপাদন-কেন্দ্রিক; 'যথাসময়ে যথোপযুক্ত উৎপাদনে' কোনো সহায়তাই করে না। ফলত একালের কুবের **মনুষ্যধর্ম্মা** নয়।

মন্ত্র (মন্ত্রকৃৎ, মন্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রণ, মন্ত্রণা, মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী — আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ) : ১. ✓মন্ত্র্ + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মন্ত্র*** *= **মন্**কে (**মন**কে) ত্রাণ করে যে (উপায়); অর্থাৎ, যে বিদ্যার দ্বারা পরিমাপন বা কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে তার সমস্যা থেকে ত্রাণ করা যায়। **মন্ত্রকৃৎ** = **মন্ত্র** সৃজন করেন যিনি। **মন্ত্রজ্ঞ** = **মন্ত্র** জানেন যিনি। **মন্ত্রণ** = **মন্ত্র** অন (on) যাহাতে। **মন্ত্রণা** = **মন্ত্রণ**-এর আধার যে। **মন্ত্রণালয়** = **মন্ত্রণার** আলয়। **মন্ত্রী** = **মন্ত্র**-এর গতিশীল আধার যে। **আমন্ত্রণ** = **মন্ত্রণ**-এর আশ্রয় যাহাতে। **নিমন্ত্রণ** = নির্গত **মন্ত্রণ** যাহাতে।* / **আমন্ত্রণ** = কামচারানুজ্ঞরূপ প্রবর্ত্তনব্যাপার (থাকে যাহাতে); অর্থাৎ, যেরূপ আজ্ঞাপালন ইচ্ছানুযায়ী, অপালনেও প্রত্যবায় নাই, তাদৃশ নিয়োগবিশেষ (যাহাতে); অথবা, উৎসবাদিতে ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান (যাহাতে)। **নিমন্ত্রণ** = আবশ্যক শ্রাদ্ধ-ভোজনাদিতে দৌহিত্রাদির প্রবর্ত্তন বা নিয়োগ (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. মন্ত্র** = গুপ্তপরিভাষণ, নিভৃতে কর্ত্তব্যাবধারণ, বিচার, গূঢ়বিষয়, বেদভেদ অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম — এই ত্রিবিধ মন্ত্রাত্মক বেদবিশেষ, দেবাদির সাধনার্থ তন্ত্রাদিকথিত শব্দভেদ, বিষ্ণু, দীক্ষায় জপার্থ গুরুদত্ত বীজ। **মন্ত্রকৃৎ** = মন্ত্রস্রষ্টা, মন্ত্রপ্রযোক্ত, সূক্তস্রষ্টা, মন্ত্রণাকারী, মন্ত্রী, সচিব, দৌত্যকর্ত্তা। **মন্ত্রজ্ঞ** = বিদ্বান, বেদতত্ত্ববিৎ, মন্ত্রণাকুশল, অভিচারমন্ত্রকুশল। **মন্ত্রণ, মন্ত্রণা** = গুপ্তপরিভাষণ, নিভৃতে কর্ত্তব্যাবধারণ, গুপ্তবাদ, মন্ত্রণা, পরামর্শ। **মন্ত্রী** = আলোচনাকুশল, মন্ত্রবান, গৃহীতমন্ত্র, মন্ত্রয়িতা, সচিব, অমাত্য, দাবাখেলার ঘুঁটিবিশেষ। **আমন্ত্রণ** = সম্বোধন, গুহ্যভাষণ, আপ্রচ্ছন, অভিনন্দন, স্বাগতকুশলাদি-প্রশ্ন, কামাচারানুজ্ঞারূপ প্রবর্ত্তনব্যাপার, নিমন্ত্রণ, অভিমন্ত্রণ, মন্ত্রপূতীকরণ। **নিমন্ত্রণ** = আহ্বান, উৎসবাদিতে সম্মেলনার্থ ও ভোজনার্থ আহ্বান। (ব.শ.)। **৪. মন্ত্রকৃৎ ও মন্ত্রণ** অপ্রচলিত; বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **তন্ত্র**। **মন** শব্দে আমরা দেখেছি, আমাদের এই 'পরিপার্শ্ব-পরিমাপন-যন্ত্র'টি তার **মন্**-অন কর্ম করে **মন**-ফল বা **মান** লাভ করার কাজে সদা সক্রিয় থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই কাজ করতে গিয়ে সে আটকে যায়। তখন তাকে সেই আটকে-যাওয়া অবস্থা থেকে ত্রাণ করে যে, তাকেই **মন্ত্র** বলে। বাস্তবে লক্ষ কোটি পরিস্থিতি রয়েছে, যেখানে আমাদের **মন** আটকে যায়। স্বভাবতই সেই সব 'আটকে-যাওয়া' পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বহু রকম উপায় বা **মন্ত্র**ও আবিষ্কৃত হয়েছে। যাঁরা সেই সকল **মন্ত্র** আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের **মন্ত্রকৃৎ** বলে। আর, যাঁরা সেই সকল **মন্ত্র** জেনে রেখেছেন, তাঁদের বলে **মন্ত্রজ্ঞ**। অনেক সময় এমন বহু 'আটক' পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হই যে, তার কোনো পূর্বসৃষ্ট **মন্ত্র** কোনো **মন্ত্রজ্ঞে**র হাতে থাকে না। তখন অনন্যোপায় হয়ে সেই পরিস্থিতির জন্য নতুন **মন্ত্র** বা উপায় খুঁজে বের করতে হয়। তাকে **মন্ত্রণ** করা বা **মন্ত্রণা** বলে। এই কাজটির নেতৃত্ব দেন যিনি, তাঁকে সেকারণেই **মন্ত্রী** বলে এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রটিকে বলে **মন্ত্রণালয়**।

আমন্ত্রণ ও **নিমন্ত্রণ** দুটি শব্দেরই এখন একটাই মানে — invitation। ইংরেজির প্রভাব আমাদের এই শব্দ দুটির সমস্ত অর্থ ফেলে দিয়ে দুটি শব্দকেই শুধুমাত্র invitation-এ পরিণত করেছে, যার মানে দাঁড়িয়েছে 'ভোজনার্থ আহ্বান'। আগে তা ছিল না। **মন্ত্রণা** করার জন্য ডাকলে সে-ডাককে বলা হত **আমন্ত্রণ** এবং **মন্ত্র** দেওয়ার জন্য ডাকলে, তেমন ডাককে বলা হত **নিমন্ত্রণ**। **আমন্ত্রণে মন্ত্রে**র আয়োজন ছিল, **নিমন্ত্রণে মন্ত্রে**র নিয়োজন ছিল। একালের মতো করে বললে বলতে হয় — মুখ্য**মন্ত্রী** যখন জেলায় জেলায় বন্যা-পরিস্থিতি বিষয়ে **মন্ত্রণা** করার জন্য তাঁর **মন্ত্রণালয়ে** জেলাশাসকদের ডেকে পাঠান, সেটি **আমন্ত্রণ**। কিন্তু যখন বন্যা-মোকাবিলার উপায় বা **মন্ত্র** তিনি নিজেই ঠিক করে রেখেছেন, সেটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জেলাশাসকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যদি তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান, তখন সেই আহ্বানকে বলে **নিমন্ত্রণ**। আর, ডেকে সকলের সঙ্গে **মন্ত্রণা** করে অবশেষে একটি **মন্ত্রে** উপনীত হয়ে, সেই **মন্ত্র** রূপায়ণ করার নির্দেশ দিয়ে ফেরত পাঠালে, তাকে একত্রে **আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ** বলাই যায়।

আর, **মন্ত্রী** তো **মন্ত্রণা** করবেনই। কেননা, 'মনকে ত্রাণ করে যে' তাকেই তো **মন্ত্র** বলে এবং সেই '**মন্ত্রে**র ধারক ও বিকাশসাধনকারী'কেই তো **মন্ত্রী** বলে। আপনার মন যেখানে আটকে গেছে, সে আপনার চাষের সেচের চিন্তায় হোক, আর ছেলেমেয়ের ইস্কুলের অব্যবস্থার চিন্তায় হোক, কিংবা রুগ্ণ আত্মীয়কে হাসপাতালে ভর্তির চিন্তায় হোক — সেই আটকানো অবস্থা থেকে, সেই দুশ্চিন্তার ঘেরাটোপে বন্দীদশা থেকে যে-উপায়ে আপনার মনকে ত্রাণ করা যাবে, সেটিই সেই সেই বিশেষ পরিস্থিতির **মন্ত্র**। জীবনে আমাদের চলার পথে এরকম অজস্র **মন্ত্র** লাগে। তবে সব **মন্ত্রে**র-মন্ত্রকে জীবনের মূল**মন্ত্র** বলে।

মন্ত্রকুশল : ২. *মন্ত্র বিষয়ে কুশল যিনি।* **৩.** মন্ত্রণাপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** বঙ্গীয় শব্দকোষকার জানতেন যে, এই **মন্ত্র** প্রধানত সামাজিক সমস্যায় আটক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়স্বরূপ **মন্ত্র**কেই বোঝানো হত। তাই তিনি 'রাজনীতিজ্ঞ' শব্দের সাহায্যে **মন্ত্রকুশল** শব্দের অর্থ দিয়ে গিয়েছেন।

মন্ত্রগুপ্তি : ২. *মন্ত্রকে গুপ্তকরণ সক্রিয় যাহাতে।* **৩.** মন্ত্রণাগোপন। (ব.শ.)। **৪.** আজও ভারতের লোকসভা, বিধানসভা, রাজ্যসভা, রাজ্যপাল, মন্ত্রী, বিচারপতি ... এঁদের **শপথগ্রহণ** করাকে **মন্ত্রগুপ্তি**র শপথ বলা হয়ে থাকে। সেকারণেই শব্দটি আজও প্রচলিত। **৫.** 'মন্ত্র

গোপনে রাখিব' -- এই বলে শপথ করাকেই **মন্ত্রগুপ্তি** বলে। দেশের স্বার্থেই দেশের উচ্চাসীন পরিচালকদের এমন শপথ জরুরি বটে। কিন্তু তাই বলে যারা দেশের সম্পদ দু'হাতে লুঠ করছে তাদের নামধাম কীর্তিকলাপ এবং তাদের সাহায্যকারী উচ্চাসীন ব্যক্তিবর্গের সমস্ত কথা **মন্ত্রগুপ্তি**র নামে গোপন রাখা কি ঠিক? কিংবা, এখনও যখন সারা বিশ্ব রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং পরস্পর বিবদমান, তখন স্বচ্ছতার (দ্র. **অচ্ছ**) বা সত্যপ্রকাশের (= transparency-র) নামে ঘরের সব কথা প্রকাশ্যে বলে দেওয়া কি ঠিক? সর্বোপরি, 'সত্যমেব জয়তে' (সত্যই জয়লাভ করে) লেখা অশোকস্তম্ভ-লাঞ্ছিত পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে সত্যগোপন (= **মন্ত্র**গোপন) করার শপথ গ্রহণ করাই-বা কি ঠিক কাজ? ... এই যে পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতি, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, এর উত্তর এই মুহূর্তে আমাদের দেশ পরিচালকদের হাতে নেই। নেই বলেই তাঁরা এ বিষয়ে মহা-অনর্থের জন্ম দিয়ে চলেছেন। ... আমাদের 'গ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মন্ত্রতন্ত্র : ৩. আভিচারিক মন্ত্র ও আভিচারিক দ্রব্য। (ব.শ.)। **৪.** প্রতীকী অর্থে প্রচলিত, কিন্তু মূল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত। **৫.** আসলে এটিও **আশেপাশে**র মতো একটি পরিপূরক-**যোড়শব্দ**। এতে **মন্ত্র** শব্দের পরিপূরক রূপে **তন্ত্র** শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও খুবই কার্যকরী ছিল। সেকালের জ্ঞানী মানুষেরা ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে এই **মন্ত্রতন্ত্র**-এর যথার্থ এবং ব্যাপক প্রয়োগ করতেন। একালেও করা হয় এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই করা হয়, কিন্তু সেগুলি যে **মন্ত্রতন্ত্র**, সেকথা আমরা ভুলে গেছি। ক্ষেতে চাষ করার উপায়সমূহ জানা থেকে শুরু করে পরমাণু চুল্লী জ্বালানোর উপায়সমূহকে জানা পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রের **কর্ম্ম**জ্ঞানকেই বলে **মন্ত্র**। এবং ক্ষেতের শরীর গড়ে তোলা (ক্ষেত প্রস্তুত করা) থেকে পরমাণু চুল্লীর 'শরীর' ও '**বিরাট্**-শরীর' (= structure ও superstructure) গড়ে তোলার **কর্ম্ম**জ্ঞানকে বলা যায় **তন্ত্র**। সহজ করে বুঝলে, **মন্ত্র**কে যদি **প্রাণ** বলেন, তবে **তন্ত্র** হল তার শরীর। সমাজের ক্ষেত্রে সেকালে যাকে **মন্ত্র** ও **তন্ত্র** বলা হত, একালে তাকে সংবিধান ও সংবিধান-সম্মত সামাজিক কাঠামো (= Constitution ও Constitutional Superstructure) বলা হয়ে থাকে। তার মানে, **মন্ত্রতন্ত্র** ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজজীবন পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ও কার্যকরীভাবে প্রচলিত থাকলেও, সেগুলিই যে **মন্ত্রতন্ত্র**, সেকথা এতদিন আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।

আমাদের অতীত পুরুষদের অভ্যাস ছিল বাস্তব ক্রিয়াকলাপ-ঘটনাবলীর প্রতীকী আচার-আচরণ প্রথারূপে ধরে রেখে প্রকাশ করা। (দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**।) তখন তো পঠনপাঠন-লেখালেখির খুব একটা প্রচলনও হয়নি। তখন দৃশ্য-অদৃশ্য উভয়লোকেই **মন্ত্রতন্ত্রে**র প্রয়োগ করার উপায় জানতেন আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা। অদৃশ্য লোকে **মন্ত্রতন্ত্রে**র প্রয়োগ হত বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে লড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে, আর দৃশ্যলোকে তার প্রয়োগ হত দৃশ্য শক্তির সঙ্গে লড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে। অদৃশ্যলোকের সেই ক্রিয়াকলাপের কিছু কিছু উত্তরাধিকার এখনও কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে, যার সাফল্যের কোনো কারণই বুঝে উঠতে পারেন না একালের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা। অবশ্য দৃশ্যলোকে **মন্ত্রতন্ত্রে**র প্রয়োগ এখন অত্যন্ত ব্যাপক ভাবেই হয়ে থাকে; শুধু একটাই ব্যাপার, সেগুলি যে **মন্ত্রতন্ত্র**, সেকথাটা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির দৌলতে এখন আমরা পুনরায় জানতে পারলাম। তখনকার কালে দেশ চালানোর **মন্ত্র** ও দেশের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বা **তন্ত্রে**র ধারণার প্রকাশ করা হত প্রতীকী **মন্ত্রতন্ত্র** ক'রে। সেই সকল **মন্ত্রতন্ত্রে**র মানে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র সেই **মন্ত্র**গুলিকে অর্থহীন শব্দরূপে উচ্চারণ করা ও **তন্ত্র**গুলিকে ফুল বেলপাতা সিঁদুর ইত্যাদি দেওয়ার অর্থহীন প্রতীকী আচরণের প্রথা রূপে এখনও ধরে রেখেছেন **মন্ত্রতন্ত্রে**র আদি পুরুষদের বর্তমান অধঃপতিত উত্তরাধিকারী **ভেখ**ধারী তান্ত্রিকেরা। বাস্তব কাজটা করছেন একালের **মন্ত্রণাকুশল** মানুষেরা।

মন্ত্রপূত : ২. *মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত।* **৩.** অভিমন্ত্রিত। (ব.শ.)। **৪.** 'মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত' অর্থে প্রচলিত। **৫.** ডাক্তার বলেছে চশমা পরতে। তাই চশমা কিনতে গিয়েছেন। দোকানদারকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন দেখিয়ে আপনি বললেন — রোদে বেরোলে কালো হয়ে যায়, আমার সেরকম চশমা চাই। ...

ধরা যাক, দোকানদার ভদ্রলোকের একটি প্রতিজ্ঞা আছে, তিনি কখনোই কোনো ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করেন না, যদিও ইংরেজি পড়তে, বলতে, বুঝতে খুবই পারেন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন বা বিধান দেখে তিনি আপনাকে বললেন — আপনার ডান চোখের কাচটিকে দশমিক পাঁচ (০.৫) পরিমাণ **মন্ত্রপূত** (অভিমন্ত্রিত) করতে হবে, আর বাঁ দিকের কাচটিকে করতে হবে দশমিক আট (০.৮)। দুটো কাচকে সমান **মন্ত্রপূত** করা যাবে না। ডাক্তারের তাই নির্দেশ। তার ওপর আপনি আপনার চশমার কাচ দুটিকে রৌদ্রজ-কালোছায়ার দ্বারাও **মন্ত্রপূত** করার কথা বলছেন। আপনার অবশ্য শুধুমাত্র দূরদৃষ্টির (long-sight-এর) সমস্যা আছে, অন্য সমস্যা নেই। তবে, এরকম কোনো প্রস্তুত-চশমা এখন আমার হাতে নেই। নির্দেশানুসারে প্রস্তুত করতে দিতে হবে। আগাম দিয়ে যান, সামনের বুধবার আসুন, পেয়ে যাবেন।

দোকানদারের এসব কথা বুঝতে আপনার কি খুব অসুবিধা হল? ইংরেজি না-জানা বাংলাভাষীও কি দোকানদারের এসব বাক্য বুঝবেন না? যদি বোঝেন, তবে কেন চশমার ব্যাপারে সব বাংলাভাষীকে ইংরেজিতেই কথা বলতে হবে? এখানে তো দেখছিই, নিজের ভাষাতে তো আরও স্পষ্টভাবে মনোভাব লেনদেনের কাজ করে ফেলা যায়। তাহলে ইংরেজির কাছে হাত পাতা কেন, উঞ্ছবৃত্তি কেন? মনে রাখা ভাল, রাজার হাত পাতা আর ভিখারির হাত পাতা এক ব্যাপার নয়। ইংরেজ যখন অন্য ভাষা থেকে শব্দ নেয়, তাতে তার বদান্যতা প্রকাশ পায়। আর, আমরা যখন আমাদের নিজেদের শব্দে কুলোচ্ছে না বলে ইংরেজির কাছে হাত পাতছি, সেটি বদান্যতা নয়, ভিখিরিপনা। এখন তো দেখা যাচ্ছে, আমাদের নিজেদের যথেষ্ট আছে, ঐ ভিখিরিপনার কোনো দরকারই নেই। তাহলে এমন ভিখিরিপনা কেন? আর, একথাটি আমাদের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত

ভাইয়েরা কেন যে বোঝেন না!

মন্থ (মন্থজ, মন্থন, মন্থনদণ্ড, মন্থনী — সমুদ্রমন্থন) : ১. ✓মন্থ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মন্থ** = **মন্** *(কেন্দ্রীকরণ বা সংক্ষিপ্তকরণ) থাকে যাহাতে।* **মন্থজ** = **মন্থ** *হইতে জাত।* **মন্থন** = **মন্থ** *অন (on) যাহাতে।* **মন্থনদণ্ড** = *যে দণ্ডের সাহায্যে* **মন্থন** *করা হয়।* **মন্থনী** = **মন্থন**-*এর গতিশীল আধার যে।* **সমুদ্রমন্থন** = *সমুদ্র* **মন্থন** *যাহাতে।* / **মন্থন** = যাহার দ্বারা বিলোড়ন সাধিত হয়; পীড়নপূর্ব্বক সর্ব্বস্বগ্রহণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. মন্থ** = বিলোড়ন, ক্লেশ, বধ, দিবাকর, অংশু, নেত্ররোগ, দ্রবদ্রব্য-সংস্কৃত সক্তু, মন্থনদণ্ড, বিলোড়নার্থ চমস, মৃগবিশেষ; মন্থন করা, বিলোড়িত করা, মওয়া। **মন্থজ** = মন্থনজাত, নবনীত। **মন্থন** = মন্থানদণ্ড, বিলোড়ন, অরণিঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন, বধ। **মন্থনদণ্ড** = বিলোড়নযষ্টি, মন্থান। **মন্থনী** = মন্থনপাত্র, মন্থনঘটী। **সমুদ্রমন্থন** = সুরাসুরকৃত সাগরমন্থন। (ব.শ.)। রামায়ণ অনুসারে — সত্যযুগে দেবতা ও অসুরগণ স্থির করেন তাঁরা অমৃত পান করলে অজর, অমর ও নিরাময় হবেন। অমৃত লাভের আশায় তাঁরা মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে আরম্ভ করেন। সহস্র বৎসর মন্থনের পর বাসুকী বিষ বমন ও দন্ত দ্বারা শিলা দংশন করতে থাকেন। তখন দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন শঙ্খচক্রধারী হরি সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্থনজাত বিষ অগ্রপূজা হিসাবে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে পান করতে বলেন। মহাদেব সেই উত্থিত বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেন। বিষের তেজে তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় বলে এঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। দেবাসুরগণ আবার মন্থন আরম্ভ করলে ... ধন্বন্তরির আবির্ভাব হয়। তারপর ওঠেন অসংখ্য অপ্সরাগণ। 'অপ' হতে উত্থিত বলে এদের নাম হয় অপ্সরা। দেব বা দানবরা এঁদের গ্রহণ না করায় এরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হলেন। এরপর উঠলেন বরুণের কন্যা বারুণী বা সুরা। দিতির পুত্রগণ তাঁকে গ্রহণ না করে অসুর হলেন ও অদিতির সন্তানগণ তাঁকে নিয়ে সুর হলেন। এর পর ক্রমে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তভ মণি ও সর্বশেষে অমৃত উত্থিত হলো। এই অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হলে বিষ্ণু মোহিনী রূপে অমৃত হরণ করে আক্রমণকারীদের বিনষ্ট করলেন। দেবতারা বহু অসুর নিহত করে যুদ্ধে জয়ী হন ও ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হন। মহাভারতে সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। ... (পৌ.অ.)। **৪.** শুধু **মন্থন** শব্দটি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত; বাকি সকল শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** যে কাজ করলে কোনো একটি সত্তার সংক্ষিপ্তসার উঠে চলে আসে, সেই সত্তার উপর তদ্রূপ সংকোচন প্রক্রিয়া চালানোকে **মন্থ্** ক্রিয়া বলে; কেননা, তাতে এক প্রকারের **মন্** বা সীমায়িতকরণ প্রক্রিয়া থাকে। স্বভাবত এই ক্রিয়া দুধের উপর করলে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে **মন্থজ** (= মাখন বা **নবনীত**) উঠে চলে আসে।

কিন্তু একই ক্রিয়া যদি অন্যান্য তরল সত্তার উপর করা হয়? আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা দেখেছিলেন, **জল**-এর বা জনসমুদ্রের উপর এই ক্রিয়া করলে, অর্থাৎ **সমুদ্রমন্থন** করলে জনসাধারণের ভিতরে থাকা মহত্তম বিষয় ও বস্তুসমূহ **মন্থজ** রূপে উঠে চলে আসে। তাদের নাম কী, উপরের কাহিনীতে পৌ.অভিধান সেসব জানিয়ে দিয়েছেন। ব.শ. বলেছেন, আসলে যে কোনো মানুষকে 'পীড়নপূর্ব্বক সর্ব্বস্বগ্রহণ' করলে, সেই **কর্ম্মটিকে মন্থন** বলে। মোটকথা, **সমুদ্রমন্থন** মানে sea-মন্থন নয়; ভারতসমাজের ইতিহাসে একটি বিশেষ কালে ভারতবর্ষের জনসমুদ্রকে **মন্দর**ব্যবস্থার বা **পর্ব্বতে**র সাহায্যে **মন্থন** করা হয়েছিল। দ্র. **কূর্ম্ম**।

মন্থর (মন্থরা, মন্থাচল, মন্থাদ্রি) : ১. ✓মন্থ্ + অর (অরন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মন্থর** = **মন্থ** *(সংকোচন বা পিছুটান) থাকে যাহাতে।* **মন্থরা** = **মন্থর**-*এর আধার যে।* **মন্থাচল** = **মন্থ** *করে যে অচল।* **মন্থাদ্রি** = **মন্থ** *করে যে অদ্রি।* **৩. মন্থর** = মন্দগামী, মন্দ, অলস, বিলম্বমান, জড়, মন্দ্র, নীচ, নিশ্চল, পৃথু, কোপ, বাধ ... ইত্যাদি। **মন্থরা** = কৈকেয়ীর দাসী। (ব.শ.)। রাজা দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী ভরতজননী কৈকেয়ীর (চিরসখী) কুব্জা দাসী। ... দশরথ জ্যৈষ্ঠ পুত্র রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে রাজ্যভার দেওয়া স্থির করলে দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করে এবং তাঁর পুত্র ভরতকে রামের পরিবর্তে রাজা করবার জন্য দশরথের কাছে দাবী করতে বলে। ... মন্থরা কৈকেয়ীকে দশরথের বর দেওয়ার পূর্বপ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ... তদনুযায়ী কৈকেয়ী এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক দাবী করেন। সত্যরক্ষার্থ দশরথ এই বর দিতে বাধ্য হন। (পৌ.অ.)। **মন্থাচল, মন্থাদ্রি** = মন্দর। (ব.শ.)। **৪.** শ্লথগতি বা slow (শ্ল) অর্থে **মন্থর** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কৈকেয়ী, ভরত**। প্রশ্ন হল, **মন্থর**কে **মন্থর** বলে কেন। সবাই জানেন, সাধারণত কোনো প্রকার গতির বিশেষণ রূপে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সেই গতিকে যদি সামনের দিকে যথাপূর্বং যেতে দেওয়া না হয়, তাহলে স্বভাবতই সেই গতির গতিবেগ কমে আসে; একেই বলা হয় **মন্থর**। আগেই আমরা **মন্থ** শব্দে দেখেছি, তার স্বভাব হচ্ছে সংকোচন করা, কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরা, প্রকাশিত বা বিস্তারিত হতে না দেওয়া। সেই প্রক্রিয়া থাকে যাহাতে, সেই তো **মন্থর**। তার মানে যে কোনো গতিকেই পেছন দিক থেকে টেনে ধরলে, সেই গতিকে **মন্থর**-গতি বলে।

ভারতসমাজের ইতিহাসে এমনি একটি সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালে। সমাজের সাধারণ মানুষ তখন যে কৃষিকাজ করতেন, **মন্থরা** বা পিছুটান ছিল তার 'চিরসখী'। ফলে কী কী ঘটে, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে রামায়ণে। আর **মন্থাচল** বা **মন্থাদ্রি** হল সেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা **পর্ব্বত** যার সাহায্যে এককালে জনসমুদ্র **মন্থন** বা **সমুদ্রমন্থন** করা হয়েছিল। ব.শ. জানাচ্ছেন, এই **পর্ব্বত** আসলে **পৃথু** বা আদিরাষ্ট্র। তার সাহায্যেই **সমুদ্রমন্থন** করা হয়েছিল। দ্র. **মন্দর**।

মন্দ (নিন্দামন্দ, মৃদুমন্দ) : ১. ✓মন্দ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মন্দ** = **মন্** *(সংকোচন বা পিছুটান) দান থাকে যাহাতে।* **নিন্দামন্দ** = *নিন্দা করে* **মন্দ** *(শ্লথগতি) করা হয় যাহাতে।* **মৃদুমন্দ** = **মৃদু**র *কারণে* **মন্দ** *(শ্লথগতি) যে।* **৩. মন্দ** = অলস, শীতক,

মন্থর, মন্থরগামী ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মন**। আজকাল **মন্দ** শব্দটি শুনলেই বাংলাভাষীর মনে হয় — এ হল 'খারাপ', 'বাজে', 'ক্ষতিকর', 'অহিতকর' ... ইত্যাদি। যদিও **মৃদুমন্দ, নিন্দেমন্দ, মন্দগতি, মন্দাকিনী** ... প্রভৃতি বেশ কিছু শব্দ স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, **মন্দ** শব্দের মূল ও প্রধান অর্থটি বা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু কী সেই অর্থ?

কার্যত, **মন্দ** মানে খারাপ বা **বদ** নয়, **মন্দ** মানে যে সত্তা পিছন দিক থেকে টেনে ধরে, এগোতে দেয় না; যে-উৎসস্থল বা কেন্দ্র থেকে এগিয়ে আসা হয়েছে এবং/বা হচ্ছে, সেই কেন্দ্রের দিকে পিছিয়ে আসার জন্য বা সংকুচিত হওয়ার জন্য পিছন দিক থেকে টানে যে, সংযত করে, তাকেই **মন্দ** বলে। কিন্তু এতে করে অগ্রণী সত্তাটির কিছু না কিছু ক্ষতি হয়, কারণ সে যে এগোচ্ছিল, তাতে তার কোনো প্রয়োজন, সুবিধা, কিংবা অসুবিধা থেকে বাঁচার চেষ্টা ... ইত্যাদি ছিল বলেই তো এগোচ্ছিল। পিছন দিক থেকে টেনে ধরার ফলে, সত্তাটির ক্ষতি হয়ে যায়। সেইকারণে **মন্দ** শব্দের ব্যঞ্জনার্থ হয়ে যায় খারাপ বা **বদ** (= bad)। সেটিই এখন স্থির রূপ লাভ করে প্রতীকী হয়ে গেছে। যেকারণে লোকে **মন্দ** শুনলেই 'খারাপ' বোঝেন। কিন্তু কাউকে সংযত করে বিশেষ দিকে চালাতে গেলেও **মন্দ** করতে হয়। তার উত্তরাধিকার আমাদের নেই, রয়েছে ইংরেজির।

ব.শ. **মন্দ্** ক্রিয়ার প্রথম অর্থটিই দিয়েছেন 'স্তুতি'। তার মানে, কারও স্তব বা স্তুতি করলে, তাকে পেছন দিকে টেনে ধরা হয়, মন্দ্ করণ করা হয়। কেননা, যে তপস্যা বা শ্রম করে স্তবার্হ সত্তাটি উপরে উঠে সকলের স্তবার্হ হয়ে উঠেছিল, স্তুতিতে যতখানি সাড়া দেবে, ততখানিই সে নীচে নেমে আসবে! বিশেষত স্তুতি যদি ভিত্তিহীন হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই! ...

তা সে যাই হোক, এই **মন্দ** শব্দটির যোগে বহু শব্দ তৈরি হয়েছে, এবং তাদের অধিকাংশই এখন অপ্রচলিত। তাদের কয়েকটির অর্থ ও তদ্‌বিষয়ে কিছু মন্তব্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে। ৬. ইংরেজি com*mand*, *mand*ate, de*mand* ... ইত্যাদি।

মন্দকর্ণ : ৩. ঈষৎ শ্রুতিশক্তিহীন। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যে মানুষের শ্রবণশক্তিকে পিছন দিক থেকে টেনে ধরে রাখা হয়, সে স্বভাবতই কম শুনতে পায়; সেজন্য তাকে **মন্দকর্ণ**-মানুষ বলে। একালে কিন্তু এরকম মানুষকে বোঝানোর জন্য যথাযথ কোনো শব্দ নেই। অথচ এককালে ছিল।

মন্দগ, মন্দগতি, মন্দগমন, মন্দগামী — মন্দাক্রান্তা : ৩. **মন্দগ, মন্দগতি, মন্দগমন, মন্দগামী** = ধীরগতি, মন্থরগামী। **মন্দাক্রান্তা** = মন্দগামিনী, সপ্তদশাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. কখনো সখনো **মন্দগতি** শব্দটির প্রয়োগ শুনতে পাওয়া যায়। অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. যার গতিকে, গমনকে, গামিতাকে পেছন দিক থেকে টেনে ধরার কারণে সে যথাযথ গতিতে যেতে পারছে না, তেমন গতিশীল সত্তাকে সেকালে এই পাঁচটি শব্দে প্রকাশ করা হত। একালে প্রায়শই তার বদলে ইংরেজি slow শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা কেউই এখন আর **মন্দগতি**-ছায়াছবি বা **শ্লথগতি**-ছায়াছবি বলেন না, slow motion picture বলে থাকেন। পণ্ডিত-কবি মহলে অবশ্য **মন্দাক্রান্তা** ছন্দ শব্দবন্ধটির কমবেশি চল আছে। সতেরটি অক্ষর নিয়ে এ একটি ঢিমে তেতালা ছন্দ। কালিদাসের '**মেঘদূত**' কাব্য এই ছন্দে রচিত। কোনো নারী খুবই ধীরগমনে চললে তাকে **মন্দাক্রান্তা** নামেও ডাকা হত। তবে এ নাম এখন সেকেলে হয়ে গেছে।

মন্দগ্রহ : ৩. শনৈশ্চরগ্রহ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে যাঁদের 'income tax, sales tax, custom ...' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে, সেকালে তাদের **মন্দগ্রহ** বলা হত। কেননা, তাদের **গ্রহণ** লাগলে মানুষের অর্জনের কাজে সংকোচন বা পিছুটান পড়ে। সেকারণে তাদের **মন্দগ্রহ** বলা হত। আজকাল তাদের যে ইংরেজি নামে ডাকা হয়, তাতে তাদের স্বভাব মানুষের উপর কী ক্রিয়া করে, সেই কথাটিই চাপা পড়ে যায়। এই কারণেই ইংরেজি শব্দ মানুষকে সাধারণভাবে **মন্দাক্ষ** বা **মন্দদৃষ্টি** করে দেয়। মানুষের জগদ্দর্শনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

মন্দছন্দ : ৩. মন্দ, খারাপ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **আশেপাশে**র মতো এটিও একটি পরিপূরক-**যোড়শব্দ**। এমনকি আধুনিক যুগের সূচনাকালেও বাংলায় এই শব্দের কীরকম ব্যবহার হত, ব.শ. 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস থেকে তার উদাহরণ দিয়ে সেটিকে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন; যদিও 'অনুশব্দ'-এর ফাঁদ থেকে তিনিও বেরিয়ে যেতে পারেননি। উদাহরণটি হল — 'স্বামী মন্দ হউক, ছন্দ হউক, মেয়েমানুষের এয়ত থাকা ভাল।' এর থেকে বোঝা যায় মানুষ **মন্দ** থাকতে পারে, **ছন্দ**ও থাকতে পারে। **মন্দ** থাকলে তার বিকাশের গতিবেগে থাকবে সংকোচন বা পিছুটান, ফলত সে গতি হবে শ্লথ। আর, **ছন্দ** থাকলে তার বিকাশের গতিবেগে একধরনের ছিরি-ছাঁদ থাকবে, তাল-লয় থাকবে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য-মূলক নাচন থাকবে; ফলত সে গতি হবে তত্তদ্ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু, হায়! এই **মন্দছন্দ** শব্দটিও হারিয়ে গেছে!

মন্দর : ১. ✓মন্দ্ + অর (অরন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মন্দ** *রহে যাহাতে।* ৩. মন্দ, জড়, অলস, বিশাল, পর্ব্বতবিশেষ, মন্থশৈল, মন্দার, স্বর্গ, অষ্টগুচ্ছ হারবিশেষ। (ব.শ.)। পর্বতবিশেষ। ... সমুদ্রমন্থনে এই পর্বতকে মন্থনদণ্ড করা হয়েছিল। এই পর্বত একাদশ সহস্র যোজন প্রোথিত ছিল। দেবতারা এই পর্বতকে তুলতে অসমর্থ হন। পরে বিষ্ণুর নির্দেশে ... বাসুকী বলপূর্বক এই পর্বতকে উঠিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যান। পরে দেবতা ও অসুররা একে মন্থনদণ্ড করে সমুদ্রমন্থন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কূর্ম্ম, কোবিদার, পর্ব্বত, মন্থাচল, মন্থাদ্রি**। যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের অগ্রগতিকে সীমায়িত, সংকুচিত, পিছুটানগ্রস্ত হতে বাধ্য করে, তাকে **মন্দর-পর্ব্বত** বলে; একালে তাকে রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে। ভারত ইতিহাসের বিশেষ কালখণ্ডে, **পৃথু**র বা আদিরাষ্ট্রের উদ্ভবের বেশ কিছুকাল পরে, রাষ্ট্র এই চরিত্রের হয়ে যায়। তখন সেই আংশিক অধঃপতিত রাষ্ট্রকে বা **মন্দর**কে **মন্থনদণ্ড** রূপে ব্যবহার

করে সেকালের **দেবাসুর**গণ জনসমুদ্র **মন্থন** করেছিলেন।

মন্দা (মন্দার, মাদার) : ১. মন্দার = ✓মন্দ্ + আর (আরন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মন্দা*** *= মন্দ-এর আধার যে।* ***মন্দার*** *= মন্দা রহে যাহাতে।* ***মাদার*** *= মাদ (মদ হইতে জাত) এর আধার রহে যাহাতে।* / **মন্দার** = যাহার স্তব করিতে হয় বা করা উচিত ('স্তবার্হ')। (ব.শ.)। **৩. মন্দা** = অল্প, শিথিল, নরম, মৃদু, ধীর, ক্ষীণশক্তি (জঠরানল), জড়, দুষ্ট। **মন্দার** = পঞ্চ দেবতরুর অন্যতম, পারিভদ্রবৃক্ষ, অর্কবৃক্ষ, হস্তী, ধূর্ত্ত, মন্দারপুষ্প (নর্ম্মবাক্য ইহার দোহদ), মাদার, ডহুফল বা ডেফল গাছ। **মাদার** = মন্দার, শিমূলগাছ, ডেফলগাছ (monkey-jack), ডহুফল, ডেফল। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় **মাদার** গাছকে বলা হয় ডেফল গাছ। অন্যথায় **মন্দার** শব্দটি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কোবিদার, দেবতরু, দোহদ, পঞ্চবৃক্ষ, পারিজাত, মন্দ**। যেহেতু মিতকরণ করে দেওয়ার কারণে বা **মন্দ** করার কারণে **মন্দা** সত্তাগুলি ঈষৎ কেন্দ্রীকৃত বা সংকুচিত, তাই তারা আর বাড়ে না, কমে যায়। সেকারণেই বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রদত্ত **মন্দা** শব্দের অর্থগুলির মধ্যে 'অল্প'কে পাওয়া যায়, 'বেশি'কে নয়, 'শিথিল'কে পাওয়া যায়, 'দৃঢ়'কে নয়। একইভাবে **মন্দা** শব্দে তিনি 'কঠোর'-এর বদলে 'নরম', 'কঠিন'-এর বদলে 'মৃদু', 'দ্রুত'র বদলে 'ধীর', 'পূর্ণশক্তি'র বদলে 'ক্ষীণশক্তি' (জঠরানল), এবং 'সজীব'-এর বদলে 'জড়'-কে **মন্দা** শব্দের অর্থরূপে দিয়ে গেছেন। একইভাবে 'সুষ্ট' শব্দের বদলে এসেছে 'দুষ্ট' শব্দটি। তবে কিনা, 'সুষ্ট' শব্দটি তো একেবারেই হারিয়ে গেছে, থেকে গেছে তার এক অনাথ সন্তান — **সোটা**, যাকে আমরা **মোটাসোটা** শব্দে উদ্ধার করেছি। আর, **মন্দার** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. যে সকল শব্দ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে পঞ্চ **দেবতরু**র অন্যতম বা **পঞ্চবৃক্ষ**-এর এক বৃক্ষ রূপে আমরা **মন্দার**কে পেয়েছি। ব.শ. এখানে জানাচ্ছেন, আসলে সেই বৃক্ষটির নাম ছিল 'পারিভদ্রবৃক্ষ'। তার মানে, **ভদ্র**গণ রপ্তানি করার জন্য যে সকল **পণ্য**-উৎপাদন সংস্থা চালান, সেগুলিকে সেকালে **পারিভদ্রবৃক্ষ** বা **মন্দার** বলা হত। আর, সেই **মন্দার**বৃক্ষের ফল বা **মন্দার**-জাত **পণ্য**কে বলা হত **মন্দারপুষ্প**। ব.শ.-প্রদত্ত তথ্যানুসারে, এই পুষ্প বা ফুল **(পণ্য)** প্রচুর পরিমাণে ফুটতে রাজি হয়, যদি একবার 'নর্ম্মবাক্য' দিয়ে (মিষ্টিকথা বলে) সেই বৃক্ষের দোহন করা হয়। (দ্র. **দোহদ**)।

সাদৃশ্যে উদ্ভিদজগতেও একই স্বভাবের একটি গাছকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন (যা তাঁরা **পারিজাত**-বৃক্ষের ক্ষেত্রে পারেননি)। তাঁরা তারও নাম দিয়েছিলেন **মন্দার**। আমরা বাংলাভাষীরা সেই গাছকেই **মাদার** গাছে পরিণত করে নিয়েছি। করবই তো! সেই **মন্দার** গাছই তো পরবর্তীকালে মাতালের মতো **পণ্য** উৎপাদন করে রপ্তানি করার কাজে **মদমত্ত** হয়ে উঠেছিল!

যাই হোক না কেন, যে সংস্থা ও গাছকে **মন্দার** নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলি যে কোনো না কোনো কারণে **মন্দা**-গ্রস্ত হয়েছিল বা হত, তাদের বিকাশ **শ্লথ** হয়েছিল বা হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেমন কিনা, একালের অধিকাংশ **অর্কবৃক্ষ** বা সরকারি সংস্থা, এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল সরকারি সংস্থাই তো এখন **মন্দার**-বৃক্ষ; প্রত্যেকটিই **মন্দগামী**, প্রত্যেকটিই **মন্দাক্রান্তা** ছন্দে চলে। ফলত একটার পর একটা বিভাগ বন্ধ করে দিতে হয়, অন্যথায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতে টান পড়ে। সেকালে যে সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাকে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও নিজেদের **পণ্য** লুকিয়ে-চুরিয়ে কিংবা অত্যধিক পরিমাণে **কর** দিয়ে বেচতে হত এবং সেকারণে সেগুলি **মন্দার** মুখোমুখি হত, ফলে তাদের **মন্দার**-বৃক্ষ বলা হত, আজ কিন্তু তাদের সেদিন নেই। এই **মন্দার**-বৃক্ষগুলির অধিকাংশই এখন **পারিভদ্র-বৃক্ষে** রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর, **পারিভদ্রবৃক্ষ**গুলির তো এখন রমরমার যুগ। এখন তারা মহানন্দে **পণ্য** রপ্তানি ক'রে নিজেদের **মন্দা** কাটিয়ে উঠেছে। তবে কালের অভিশাপে নিজেদের **পারিভদ্র** নামটি এখন তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তারা তাদের প্রায় সব নামগুলিই বিদেশ থেকে আমদানি করে নিয়েছে, যথা — Rama Exporting Company, Shyama Exports ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে এই মুহূর্তে সর্বাগ্রগণ্য **পারিভদ্রবৃক্ষ**গুলিকে বলা হয় B.P.O. বা Business Process Outsourcing। শোনা যাচ্ছে, চীন ও ভারতের B.P.O বা **পারিভদ্রবৃক্ষ**গুলির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুবকেরা নাকি দিন দিন বেকার হয়ে যাচ্ছে! সেই কারণে কথা উঠেছে যে, আমরা যেমন তাদের B.P.O ইত্যাদি নামগুলি নিয়ে নিয়েছি, পরিবর্তে তারাও আমাদের **মন্দার** ইত্যাদি নামগুলি নিয়ে নেবে — এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সংস্থাগুলি আমাদের দেশ থেকে **মন্দার** ইত্যাদি নাম নিয়ে গিয়ে নিজেরা **মন্দার, মন্দাকিনী** ইত্যাদি হয়ে যাবে! কী কাণ্ড! তাহলে আমাদের পশ্চিমবাংলার সরকারি সংস্থাগুলির বা **মন্দাকিনী**দের কী হবে?

মন্দাকিনী : ১. মন্দ + ✓অক্ (গতি) + ইন্ (ণিনি) - কর্ত্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। **২.** *যাহার গতিকে* ***মন্দ*** *(শ্লথ) করা হইয়াছে।* / মন্দ মন্দ গমন করে যে ('মন্দগামিনী')। (ব.শ.)। **৩.** স্বর্ণদী, আকাশগঙ্গা, গঙ্গা, চিত্রকূটনিকটস্থ নদীবিশেষ, সংক্রান্তিবিশেষ, ছন্দোবিশেষ। (ব.শ.)। স্বর্গগঙ্গা। গঙ্গার যে প্রধান ধারা স্বর্গে গমন করে তাঁর নাম মন্দাকিনী। এই ধারা বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে এসেছে। (পৌ.অ.)। **৪.** কেবল মেয়েদের নামরূপে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **চর্ম্মণ্বতী**। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে সমাজে **পণ্য**ধারার প্রচলন করার যে সকল ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তাকে **গঙ্গা**র কাহিনী বলা হয়ে থাকে। বলা হয়েছে, এই **গঙ্গা** তিন ধারায় বিভক্ত। স্বর্গগঙ্গা, মর্তগঙ্গা, ও পাতালগঙ্গা। এর মধ্যে একমাত্র মর্তগঙ্গাকে আমরা চিনি বলে মনে করি। এ হল বাহ্য-পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে চলা জলধারামাত্র। কিন্তু সে হল দৃশ্যলোকের **গঙ্গা**। অদৃশ্যলোকের **গঙ্গা**কে আমরা চিনতে পারি **পণ্য**প্রবাহ রূপে। সে হল স্বর্গলোকের **গঙ্গা**। এই স্বর্গগঙ্গাকেই **মন্দাকিনী** বলা হয়। তার মানে, মালিকানার কারণে এই **মন্দাকিনী** স্বতঃই শ্লথগতি হয়ে যায় বলে, একে **মন্দাকিনী** বলা হয়।

মন্দাক্ষ (মন্দদৃষ্টি) : ২. / **মন্দাক্ষ** = মন্দ অক্ষি যাহার। (ব.শ.)। **৩. মন্দাক্ষ** = ক্ষীণদৃষ্টি; ব্রীড়া, লজ্জা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.**

যার দর্শনক্ষমতাকে বা দৃষ্টিকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো কিছু ঠিকঠাক দেখতে দেওয়া হচ্ছে না, দৃষ্টিকে পেছন পানে টেনে রাখা হয়েছে বা হচ্ছে, তেমন ব্যক্তিকে **মন্দাক্ষ** বা **মন্দদৃষ্টি** ব্যক্তি বলে। তবে **মন্দাক্ষ** শব্দটি মূলত অদৃশ্যকে দেখার ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। **মন্দদৃষ্টি** শব্দটি আমাদের বানানো। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জগদ্দর্শনের যোগ্যতা হ্রাস পায়। দ্র. **মন্দগ্রহ**।

মন্দারমালা (মন্দারমালিকা) : ৩. মন্দারপুষ্পমাল্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটি শুরু করেছেন এই বাক্য দিয়ে — 'ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা'। **মালা** বা **মালিকা** কাকে বলে, সেকথা আমরা **মালা** শব্দের ভুক্তিতে গিয়ে জানতে পারি। তখন এ-ও জানা যায় যে, তথাকথিত স্বর্গীয় বৃক্ষের ফুলের **মালা** আসলে **পারিজাত পুষ্পে**র ('exportable commodity'র) **মালা** বা **মাল**-এর আধার। রাষ্ট্রের নিষেধ এড়িয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিংবা অতিরিক্ত কর দিয়ে এই ব্যবস্থাগুলি চলত বলেই এদের **মন্দার** বলা হত। সেই **মন্দার**-ব্যবস্থাজাত **পণ্য**সম্ভারকে সেকালে বলা হত **মন্দারমালা** বা **মন্দারমালিকা**। ...

প্রশ্ন উঠতে পারে, অত কায়দা করে **পারিজাত-পুষ্পমালা, মন্দারমালা, মন্দারমালিকা,** 'স্বর্গীয় বৃক্ষ' ... এতসব শব্দ তৈরি করার কী দরকার ছিল? সরাসরি 'বিদেশে পাঠানোর জন্য **পণ্য**সম্ভার' বললেই তো কাজ চলে যেত। ...

সন্দেহ নেই, এখনকার পরিস্থিতিতে বসে এসব কথা অনায়াসে বলে ফেলা যায়। কিন্তু ৭০০ খ্রিস্টাব্দে বসে ওসব কথা ভাবা একান্তই অসম্ভব ছিল। কেননা, তখনও মানবসভ্যতার নাড়ি কাটা পড়েনি; প্রকৃতি-মায়ের সঙ্গে মানবসভ্যতার নাড়ির সম্বন্ধ তখনও কমবেশি সক্রিয় ছিল। তখনও অতীত বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কথা মানুষ ভাবতেও পারত না, বলা তো দূরের কথা। আজকাল যেমন আমরা **পণ্য** বললে সেই **পণ্য**-বোধের গায়ে **পণ্যে**র ক্ষেত্র বা উদ্ভবস্থান-স্বরূপ সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি ... কোনোকিছুর চিহ্ন দেখতেই পাই না, সেকালে তেমন অতীতহারা অনাথ ভূঁইফোড় বোধে পৌঁছনোর কোনো উপায়ই ছিল না। তার জন্য একটি কাঁচি দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানবসভ্যতার সম্পর্কের নাড়িটাকে কেটে ফেলার দরকার ছিল। কাঁচির সেই নাড়িকাটার মহৎ (?) কাজটি করেছিল ইউরোপীয় **শিল্পবিপ্লব**। ... ফলে অতীত থেকে, ইতিহাস থেকে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা অনেক দূরে চলে আসতে সক্ষম হয়েছি। সেই জন্য আজ আমরা অনায়াসে **পারিজাত, পারিভদ্র, মন্দার, মাল, মালা, মালিকা, মন্দারমালিকা** ইত্যাদি ছাড়াই কথা বলে নিতে পারছি। তবে এই অতীতহারা হওয়ার পরিণতি যে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, সেকথা সম্প্রতিকালের চিন্তাবিদগণ অনেকেই বুঝতে পেরে গেছেন এবং অন্ধের মতো অতীত হাতড়াচ্ছেন। আমরা অবশ্য উভয় দিকটিই দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমরা বুঝেছি, অতীতবিলাস এবং অতীতত্যাগ দুটোই কেবল **মন্দমেধা** ও **মন্দবুদ্ধি** মানুষেরাই করতে পারেন। অতীতবিলাসে আমাদের ঘোরতর আপত্তি, অতীতবিচ্ছিন্ন হওয়াতেও।

মন্দির (মন্দিরা) : ১. ✓মন্দ্‌ + ইর (কিরচ্‌) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মন্দির** = **মন্দ** গতিশীল বা সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে। **মন্দিরা** = **মন্দির**-এর আধার যে।* / **মন্দির** = নিদ্রার স্থান। (ব.শ.)। ৩. **মন্দির** = গৃহ, ভবন, আগার, রাজভবন, প্রাসাদ, দেবগৃহ, বাসস্থানমাত্র, অশ্বজানুপশ্চিমভাগ, জানুপশ্চাদ্‌, সমুদ্র, নগর, পুর; **মন্দিরা** = গৃহ। (ব.শ.)। ৪. temple অর্থে **মন্দির** এবং নামরূপে **মন্দিরা** প্রচলিত। ৫. দ্র. **মধুকুল্যা**। যেখানে গেলে মানুষের গতি **মন্দ** বা শ্লথ হয়, সেই স্থানকে সেকালে **মন্দির** বলা হত। সনাতন যুগে মানুষ একা একা কোনো শয়নকক্ষে থাকত না, ঘুমাত না। তখন **গৃহ** ছিল শস্য রাখার স্থান আর মানুষ দলবদ্ধ ভাবে আকাশের তলাতেই দিন কাটানো উচিত মনে করত। সনাতন যুগের শেষ পর্বে মানুষ নিজেদের থাকার জন্য ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করে। সেগুলির আদি নাম ছিল **মন্দির**। কেননা, সেখানে ঢুকলেই মানুষের গতি **মন্দ** হত, শ্লথ হত, শান্ত হত; মানুষ সেই সকল **মন্দিরে** শান্তিলাভ করত। তদ্রূপ অজস্র **মন্দির** নিয়েই গড়ে উঠেছিল মানুষের আদিম নগরসভ্যতা; **মহান-জ-দারু** (মহেঞ্জদারো) যাদের মধ্যে অন্যতম।

দক্ষযজ্ঞের পর ঐ নগরসভ্যতা ভেঙে পড়ে এবং বৈদিক যুগের গ্রামভিত্তিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। সেই সকল গ্রামে মানুষ নিজেদের থাকার জন্য যে সকল ঘরবাড়ি বানায়, সেগুলিকেও বলা হত **মন্দির**। আর, কোনো কোনো ঐশ্বর্যশালী গ্রামে, বিশেষত যেসব গ্রামে সম্প্রদায়-পরিচালক এক বা একাধিক মহর্ষি থাকতেন, সেখানে গড়ে ওঠে **শিবমন্দির**। এই **মন্দির**গুলিতে **শিবে**র মূর্তি গড়ে **শিব**পূজার সূচনা হয়। এই **মন্দির**গুলি রুদ্র**শিবকে মন্দ** করার জন্য, শ্লথগতি করার জন্য, শান্ত করার জন্য নির্মিত হয়েছিল বলেই এগুলির নাম হয়ে যায় **শিবমন্দির**। ... তারপর কালে কালে সেই **মন্দির** কেমন করে একদিকে আজকের **দেবালয়**গুলিতে পরিণত হয়েছে এবং আরেক দিকে ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে বিবর্তিত হতে হতে আজকের গ্রামবাংলার পার্টি অফিসগুলিতে পরিণত হয়েছে, সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

মোটকথা, যে স্থান মানুষকে **মন্দ** করে, শ্লথ করে, শান্ত করে, শান্তি দেয়, তা সে নিজ নিজ শয়নকক্ষ হোক আর দেবতার আবাসস্থল হোক, সেই স্থানকে **মন্দির** বলে। **মন্দির** শব্দের নিহিতার্থ এই। **মন্দির** শব্দের এই অর্থ না জানলেও **মন্দিরে**র এই ধারণাটি খ্রিস্টধর্ম-প্রচারকারীগণ নিশ্চয় জানতেন। এই শব্দার্থকোষের কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, আদি শব্দভাণ্ডারের বহু শব্দই ইউরোপের ভাষায় যায়নি বটে, কিন্তু সেই শব্দে ধরে রাখা ধারণাটি চলে গেছে। তা নইলে কলকাতার গির্জার সামনে কেন লেখা থাকবে — 'আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।'

মন্দোদরী : ২. / মন্দ উদর যাহার। (ব.শ.)। ৩. ক্ষীণোদরী, রাবণমহিষী। ইঁহার পিতা ময়দানব, মাতা অপ্সরা হেমা, পুত্র ইন্দ্রজিৎ। ইনি পঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার অন্যতমা। (ব.শ.)। রাবণের প্রধানা মহিষী। হেমা অপ্সরার গর্ভে ও অসুরদের বিশ্বকর্মা ময়দানবের ঔরসে মন্দোদরীর জন্ম হয়। ... মেঘনাদ প্রমুখ পুত্ররা মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ... রাবণ বধের পর রামের আদেশে বিভীষণ

লঙ্কার সিংহাসন ও মন্দোদরীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ... মন্দোদরী পূতচরিত্রা ও একান্ত ধর্মশীলা ছিলেন। হনুমান তাঁকে সীতা বলে ভুল করেছিলেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দ্রৌপদী, পঞ্চকন্যা**। যে পঞ্চকন্যাকে প্রাতঃকালে স্মরণ করলে মহাপাপ নাশ হয়, **মন্দোদরী** তাঁদের একজন। তাঁর পেট ছোট ছিল, তিনি কম খেতেন। কে তিনি?

ভারতসমাজের ইতিহাস অনুসারে অশোকের রাজত্বকালের আগে পরের সময়ে (আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে) যে শাসকগণ ভারতবর্ষ শাসন করতেন, সম্ভবত তাঁদের আধারশক্তি-স্বরূপা পরিবার-পরিজনেরা খুব বেশি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ করতেন না। তখনও হয়তো 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'র যথেষ্ট প্রভাব তাঁদের মনে কাজ করত। সম্ভবত সেই কারণে তাঁদের **মন্দোদরী** বলা হত।

মন্মথ : ২. / মনকে মন্থন করে যে। (ব.শ.)। ৩. কামদেব, কামচিন্তা, সুরতেচ্ছা, কপিত্থবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কামদেব, মদন**।

মন্যু (মন্যুময়, মন্যুমান — অভিমন্যু, উপমন্যু, ব্রহ্মমন্যু) : ১. ✓মন্ + যু (যুচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মন্যু*** = ***মন*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যাহাতে।* ***মন্যুময়*** = ***মন্যু*** *সীমায়িত রূপে যায় যাহাতে।* ***মন্যুমান*** = ***মন্যু*** *সীমায়িত হইয়া অন থাকে যাহাতে।* ৩. **মন্যু** = শোক, কোপ, ক্রোধাভিমানিনী দেবতা, দৈন্য, ক্রতু, অহঙ্কার, রুদ্র, অগ্নি। **মন্যুময়** = মন্যুপ্রচুর, ক্রোধ-দ্বেষ-ঈর্ষা-অসূয়াদি-পূরিত। **মন্যুমান** = কোপবান, ক্রোধযুক্ত। **অভিমন্যু** = দ্র. **অভি**। **উপমন্যু** = আয়োদধৌম্যের শিষ্যবিশেষ। **ব্রহ্মমন্যু** = ব্রাহ্মণের ক্রোধ, তজ্জন্য শাপ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **মন** যখন আর মনন না করে, যতটা করা হয়েছে সেই বোধগুলি নিয়ে আকুল হয়ে ওঠে, তা সে শোক, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া ইত্যাদি যাই হোক, তখন সেইরূপ **মন**-এর অধিকারীকে **মন্যু** বলে।

মম (মমকার, মমকৃত্য, মমতা[১], মমতাময়ী, মমতাযুক্ত, মমতাশূন্য, মমত্ব) : ২. ***মম*** = *সীমায়িত সীমায়িত যাহাতে।* ***মমকার*** = ***মম****-করণ হইতে জাত।* ***মমকৃত্য*** = *যাহা* ***মম****-কৃত হইয়াছে।* ***মমতা[১]*** = ***মম*** *তারণের আধার যে।* ***মমতাময়ী*** = ***মমতা*** *সীমায়িত হইয়া থাকে যে গতিশীল আধারে।* ***মমতাযুক্ত*** = ***মমতা*** *যুক্ত যাহাতে।* ***মমতাশূন্য*** = ***মমতা*** *শূন্য হইয়াছে যাহার।* ***মমত্ব*** = ***মম*** *তারণ বাহিত যাহাতে।* ৩. **মম** = মমতা, মদীয়, আমার। **মমকার, মমকৃত্য** = মমকরণ, 'আমার' করা বা বলা। **মমতা[১]** = মমভাব, 'আমার ইচ্ছা' এই অভিমান, মৎসম্বন্ধ, দর্প, অহঙ্কার, স্নেহ। **মমতাযুক্ত** = মমতাবিশিষ্ট, সস্নেহ। **মমতাশূন্য** = মমতাবিহীন, মৎসম্বন্ধরহিত, স্নেহহীন। **মমত্ব** = মমতা, স্নেহ। (ব.শ.)। ৪. **মমকার** অপ্রচলিত, বাকি সব শব্দ কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ম** বর্ণের অর্থ ও **ম-ম-করা** (নিপাত দ্রষ্টব্য)। একটি আমগাছ যখন তার স্বরূপে না থেকে মানুষের বোধে সীমায়িত হয়ে যায়, তখন সেই বোধটিকে **ম** বলা যায়। সেই বোধ যখন আরও সীমায়িত হয়ে কোনো মানুষের 'আমি'ত্ববোধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন তাকে **মম** বলে। তখন সেই মানুষটি বলে, 'এটি আমার'। সেই বোধ দু'রকমের হয় — কামগন্ধহীন ও কামগন্ধময়। সেই কারণে **মমকার** করার মানে দু'রকমই হয়। ছা.অভিধান বলেছেন, "আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার অর্থ ইত্যাদি রূপে 'আমার' 'আমার' করা'কে **মমকার** বলে। মায়েরা যখন 'আমার পুত্র' ইত্যাদি বলেন, তখন তাতে কামগন্ধ থাকে না; কিন্তু কেউ যখন 'আমার অর্থ' ইত্যাদি বলেন, তখন তাতে কামগন্ধ থাকে। ...

কার্যত, কোনো মানুষের কোনো জীব, বস্তু বা বিষয়ের প্রতি 'আমার' 'আমার' বোধ যখন মানুষটির মনের কামগন্ধহীন **আবেগ** রূপে প্রকাশিত হয়, আমাদের পূর্বসূরিগণ সেই মানুষের সেই বোধকে **মমতা[১]** বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু বোধটি যদি মানুষটির মনের কামনাময় **বুদ্ধি** রূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে **মমকার, অহঙ্কার, মালিকানা, মৎস্য** ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। সেই কারণে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের, বাবা-মায়েদের, বোনেদের, স্ত্রীর বা স্বামীর তদ্রূপ কামগন্ধহীন মানসিক আবেগকে আমরা **মমতা** বলে থাকি। আবেগ বলেই এই **মমতা** একরকম তরলতা গুণসম্পন্ন বোধ। স্বভাবতই এর ভিতরে একপ্রকার অখণ্ডভাব থাকে; **মমতার** তাই বিভাজন হয় না। এই **মমতা** তাই **মায়া** নয়, **বুদ্ধি** দিয়ে বোঝা 'আমার' বোধ বা **মালিকানার** বোধও নয়। জল যেমন অত্যন্ত সাম্যবাদী বা 'সমোচ্চশীলতাবাদী' ও নিম্নগামী, এই **মমতাও** তেমনি সমোচ্চশীলতাবাদী, কোনোরকম উচ্চ নীচ ভেদ রাখতে রাজি হয় না; এবং সেকারণেই নীচে যে রয়েছে তার সমান হওয়ার জন্য সর্বদাই নিম্নগামী হয়ে থাকে। (দ্র. **সুন্দর**)। সেকারণেই পরিবারের অপাঙ্‌ক্তেয় জনও পরিবারকর্ত্রীর **মমতা** থেকে বঞ্চিত হয় না। সব বাংলাভাষীই জানেন, আমাদের **মমতাময়ী** মায়েরা ঘরের বেড়ালটিকে পর্যন্ত দোষ করলেও (বাড়া ভাতে মুখ দিয়ে দিলেও) কদাপি মৃত্যুদণ্ড দেন না। এ প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, (এক) প্রায় সব অভিধানেই **মমতা** শব্দের প্রকৃত অর্থকে **মায়া, স্নেহ, অহঙ্কার, দর্প** এবং **বুদ্ধি**গত **মালিকানার** বোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলা হয়েছে; (দুই) **মমতাময়ী** শব্দটি এখনও তেমনভাবে কোনো অভিধানেই সংকলিত হয়নি।

মমতা[২] : ৫. ইনি একটি পৌরাণিক চরিত্র। ইনি **উতথ্যের** পত্নী, দেবর **বৃহস্পতি** কর্তৃক ধর্ষিতা, সেকারণে **ভরদ্বাজের** মাতা। ধর্ষণকালে **মমতার** গর্ভে আগে থেকেই যে শিশুটি ছিল, সে হল উতথ্য-পুত্র **দীর্ঘতমা**। **মমতা**-পুত্র **ভরদ্বাজের** পুত্র **দ্রোণাচার্য্য**। আর, **মমতা**-পুত্র **দীর্ঘতমার** পুত্র **অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ** ইত্যাদি। স্বভাবতই এর সঙ্গে আমাদের **বঙ্গ**বাসী-**বঙ্গ**ভাষীজনদের একটা উত্তরাধিকারের সম্বন্ধ আছে। অথচ কোনো অভিধানেই এই **মমতাকে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি পৌরাণিক অভিধানেও এই **মমতার** পৃথক ভুক্তি নাই। অবশ্য পাঠকপাঠিকা এই **মমতার** কাহিনী উপরের মোটা অক্ষরগুলিতে লেখা **উতথ্য, বৃহস্পতি** ... প্রভৃতি শব্দে পেয়ে যাবেন।

যাই হোক, এই **মমতা** হলেন আসলে এক জনগোষ্ঠী, **উতথ্য**

যার পরিচালক ছিলেন। পারিপার্শ্বিকের সবকিছুর প্রতি সেই গোষ্ঠীর একপ্রকার **মমত্ব**বোধ জন্মে গিয়েছিল বলেই তার নাম দেওয়া হয় **মমতা**। এ হল ব্যক্তিমালিকানার দিকে যাওয়ার একেবারে প্রাথমিক অধ্যায়। এই অধ্যায় কিন্তু অত্যন্ত আবেগময়। গ্রামবাংলার যে বৃদ্ধা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারেন না, তিনিই যখন বাঁশের দুটো শুকনো লম্বা কঞ্চি নিয়ে মাটিতে পুঁততে থাকেন, এবং 'ও বুড়িমা, কী কর?' শুধোলে বলেন, 'লাউ-ডগাটা উঠি উঠি করে, উঠতি পারে না। দুটা কঞ্চি দিলম। ভর দি' উঠবে।' পরিপার্শ্বের প্রতি, গাছের প্রতি, জীবজন্তুর প্রতি, বুড়িমায়ের এই যে **মমতা**, এই হল সেই **মমতা**। এতে বিন্দুমাত্র কামগন্ধ থাকে না। এই পরিপার্শ্বের প্রতি ঐ বুড়িমায়ের মালিকানাবোধ রয়েছে, একথা বলা তাঁকে অপমান করা এবং কথকের ছোট মনের পরিচয়। পরিপার্শ্বের প্রতি বুড়িমায়ের এই যে টান, **উতথ্য**-পরিচালিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই **মমতা**র বোধ জন্মে গিয়েছিল; তাই তাকে **মমতা** বলা হত। আরও সবিশেষ জানার জন্য উপরোক্ত **উতথ্য, বৃহস্পতি, দীর্ঘতমা, দ্রোণাচার্য্য, ভরদ্বাজ** ... ইত্যাদি শব্দ দ্রষ্টব্য।

মহুল (মহুয়া) : ৫. দ্র. **চাতক**। 'সুষ্ট' (দ্র. **মোটাসোটা**) শব্দের মতো 'মধুল' (মধুক) ও 'মধুয়া' (মধুকা) শব্দ দুটিও হারিয়ে গেছে, থেকে গেছে তাদের সন্তান **মহুল** ও **মহুয়া**। এটি এখন একটি গাছের নাম, যার থেকে মদ তৈরি করা হয়ে থাকে। একে মধুকপুষ্পজাত মদ্য বা **মহুয়া** বা **মাধবক** বলা হয়ে থাকে। তবে তার স্বর্গীয় অর্থটি পাওয়া যাবে **চাতক** শব্দে এবং বাংলার গানে — 'মহুয়া বনে, পাপিয়া কেন গায়।' এই **পাপিয়া** কে? ব.শ. বলছেন, এ হল **চাতক**। বাংলার কবি-গায়কেরা তাকে যাই বলুন, সমাজশাস্ত্রী অর্থনীতিবিদ নিশ্চয় তাকে সেইরকম 'কনজিউমার' বলবেন, যে তার 'চাহিদা' খ্যাপন করছে। আর সেজন্যেই 'মহুয়া বনে **পাপিয়া' গান** গাইছে।

মাংস (মাং, মাংসজ, মাংসাশী — গোমাংস, বৃথামাংস, মীমাংসা) : ১. ✓মন্ + স - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মাং** = *সীমায়িত* ***অংরূপিণী*** *যাহাতে; অথবা, সীমায়িতের আধার রহস্যরূপী যাহাতে।* ***মাংস*** *=* ***ম****-এর (সীমায়িতের)* ***অংস*** *(বিভাজিত রূপ) থাকে যাহাতে; অথবা,* ***মাং****-এর নির্য্যাস বা অস্তিত্বটুকু যাহাতে।* **মাংসজ** = **মাংস** *হইতে জাত যে।* **মাংসাশী** = **মাংস** *ভোজন করে যে।* **৩. মাং** = মাম্, আমাকে। **মাংস** = পিশিত, আমিষ, মৎস্যপিশিত, ফলের শস্য বা শাঁস (the fleshy part of a fruit)। **মাংসজ** = মেদঃ। **মাংসাশী** = মাংসভোজী, মাংসাদ। **বৃথামাংস, মীমাংসা** = (পৃথক ভুক্তিতে শব্দ দুটি রয়েছে, সেখানে দেখুন।)। (ব.শ.)। **গোমাংস** = গোরুর মাংস। (স.বা.অ.কলকাতা)। **৪. মাং** ও **মাংসজ** অপ্রচলিত, বাকি তিনটি শব্দ তাদের প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **আমিষ, জটামাংসী, নিরামিষ, মৎস্য, মৎস্যগন্ধ (আমিষগন্ধ), মীমাংসা, বৃথামাংস**। আগেই দেখেছি, **মৎস্য** শব্দটি বানানোর সময়, **পুরুষ প্রকৃতি** উভয়ের যোগে কোনো বস্তু তৈরি হয় বলেই **পুরুষ**ও তাকে **মৎ** বা 'আমার' বলতে পারে, **প্রকৃতি**ও তাকে **মৎ** বা 'আমার' বলতে পারে। কেননা, তাতে উভয়ের **মৎ**-রূপ **স** বা অস্তিত্ব প্রবিষ্ট থাকে (J)। **মাংস** শব্দের বেলায় ঘটেছে একটু আলাদা রকমের ভাবনা। তাতে মানুষের শ্রম-মেধার সীমায়িত রূপের বা **ম**-এর একপ্রকার **অংস** (অংশ) বা ভাগ থাকার কথা বলা হয়। যেহেতু **মাং** শব্দের ভিতরে 'আমি'র একটি রূপ বিদ্যমান, এবং যেহেতু মানুষের উৎপাদিত বস্তু বা বিষয়ে তার শ্রম-মেধার রহস্যরূপ বা ং-রূপ ঢুকে প'ড়ে অস্তিত্ব (**স**) লাভ করে, সেহেতু মানুষের উৎপাদিত বস্তু বা বিষয় মাত্রেই তেমন বস্তু-বিষয়, যার ভিতরে মানুষের শ্রমমেধা-রূপ অস্তিত্বের নিঃসারিত অংশ প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। (দ্র. **বিশ্ব**)। সেই অংশের প্রতি মানুষের দাবিই **মাংস**-এর প্রতি দাবি। অতএব, **মাংস**ভক্ষণ করা মানে উৎপাদিত বস্তুর ভিতরে ঢুকে থাকা নিজের সেই নিঃসারিত অংশ বা তার পরিবর্ত দাবি করা। তাই অদৃশ্যলোকে এই **মাংসে**র মানে আমরা বুঝব উৎপাদিত বস্তুশরীরের অংশ (বা তার উপর অধিকার বা **মালিকানা**), এবং দৃশ্যলোকে এই **মাংসে**র মানে বুঝব জীব-শরীরের অংশ। এভাবে দেখলেই দেখা যায়, আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিদের বিভিন্ন বয়ানে থাকা **মাংস** শব্দটির অর্থ ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে। এবং এভাবে বুঝলেই **গোমাংস, বৃথামাংস, মীমাংসা** প্রভৃতি শব্দের মানে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে; এতদিন যেগুলির মানে কিছুতেই ঠিকঠাক বোঝা যায়নি।

শব্দসৃষ্টির ক্ষেত্রে যথারীতি আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ অদৃশ্য **মাংস**কেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি; একালে তাকে আমরা 'ব্যক্তি-মালিকানার বোধ' রূপে চিনতে পারি। সাদৃশ্যে এসেছে বাহ্যিক flesh ইত্যাদির কথা। উপরোক্ত **মৎস্যা**দি শব্দে আমরা সেই অদৃশ্য **মাংসে**র কথাও কমবেশি বলেছি। আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থেও এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। সেই কারণে এখানে শুধুমাত্র এই কথাটি উল্লেখ করে যাব যে, অধিকাংশ অভিধানেই **গোমাংস** শব্দটি নেই। অথচ তা নিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে কত কথাই না আছে। (দ্র. **বৃথামাংস**)। তাছাড়া, একথা এখন প্রমাণিত যে, আমাদের পূর্বসূরিগণ 'বিক্রয়ের জন্য **পণ্য** উৎপাদন করে, তা বেচে খাওয়ার দ্বারা জীবন-যাপন করতে নিষেধ করেছিলেন' (দ্র. **গো**), এবং সেকথা বোঝাতে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বলে গিয়েছিলেন — '**গোমাংস** ভক্ষণ করিও না'। আমরা আমাদের **পাদোদক-মূঢ়তা**র কারণে তাঁদের সেকথার প্রকৃত বা প্রধান ও অদৃশ্য **গোমাংস** শব্দের অর্থটিই বুঝিনি, সেই প্রকৃত **গোমাংস** মহাসমারোহে খেয়েছি, খাচ্ছি — অর্থাৎ, বিপুল উদ্যমে **পণ্য**-উৎপাদন করে বিক্রিবাটা করে চলেছি এবং তা বেচে খেয়ে খেয়েই দিন গুজরান করছি। ফলত এখন আমরা আমাদের সেই সৃষ্ট **পণ্যে**র ও সেই **পণ্য**জাত টাকার দাসে পরিণত হয়েছি; এবং মূর্খদের দর্শনের বাক্য ধার করে নিজেদের সমাজকে নির্লজ্জভাবে 'ভোগীদের সমাজ' (consumer society) বলে ঘোষণা করে গৌরব বোধ করছি! এককালে 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ' (life from withdrawal) বাক্যের প্রতীকী মানে বা ভুল মানে বুঝে 'ত্যাগীদের সমাজ' গড়ে তুলেছিলাম আমরা; সে ছিল এক জ্বালা! না খেয়ে রোগা রুগী হয়ে মরতে বসেছিলাম আমরা। এখন 'ভোগীদের সমাজ' গড়ে তুলে পড়েছি আরেক জ্বালায়! খেয়ে খেয়ে মোটা রুগী হয়ে আবারও মরতে বসেছি! কে যেন বলেছিল — কাদায় পড়া সারসটা যখন লেজটা তুলতে যায়, ঠোঁটটা যায়

কাদায় গেঁথে; আর যখন ঠোঁটটা তুলতে যায়, লেজটা যায় কাদায় আটকে; আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা! কী মুশকিলেই না পড়েছি!

তা সে যাই হোক, এখন আমরা দেখছি যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই **পণ্য**-জাত অর্থরূপ **গোমাংস** আমরা সবাই খেয়ে চলেছি, আজও। তবে আমরা হিন্দুরা উপরোক্ত নির্দেশের **গোমাংস** শব্দের গৌণ দৃশ্য-**গোমাংস** অর্থটি কিন্তু ঠিকই বুঝেছি। তাই আমরা সাধারণ হিন্দুরা **গোমাংস** খাইনি (যাঁরা লুকিয়ে চুরিয়ে খান কিংবা বিদেশে গেলে খান, অথবা যাঁরা কলকাতার 'বিফ-ইটার্স এসোসিয়েশন-এর সদস্যরূপে খান, তাঁদের কথা আমরা ধরছি না।)। তার মানে এই নয় যে, আমরা অদৃশ্য **মাংস-মৎস্য** খাই না। কী খাই না খাই, সেই সব কথা আমরা **মৎস্য** থেকে **মৎস্যগন্ধ** পর্যন্ত শব্দগুলিতে বিস্তারিত ভাবে বলেছি। ... ৬. Slavonic - meso, Prussian - mensa, Lithuanian - misa। (ব.শ.)।

মাঝ (মাঝামাঝি, মাঝারি, মাঝি, মাঝিমাল্লা, মাঝী) : ১. মধ্য > মাঝ। (ব.শ.)। **২.** ***মাঝ*** = *সীমায়িতের আধারে স্থিত থাকিয়া জনন করে যে।* ***মাঝামাঝি*** = ***মাঝা*** *(**মাঝ**-এর আধার যে)* ও ***মাঝি*** *(**মাঝ** সক্রিয় যাহাতে)। দ্র.* ***কচাকচি****।* ***মাঝারি*** = ***মাঝা*** *গতিশীল রহে যাহাতে।* ***মাঝি*** = ***মাঝ*** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে; কিংবা **মাঝ**-এ সক্রিয়তা যাহাতে।* ***মাঝিমাল্লা*** = ***মাঝি*** *ও* ***মাল্লা****।* ***মাঝী*** = *মাঝি-র আধার যে।* **৩. মাঝ** = মধ্যভাগ, মাঝখান, ব্যবধানস্থান, ফাঁক, অবকাশকাল, অভ্যন্তর, ভিতর, দেহমধ্য, কটি, কদলী-প্রভৃতির মাঝের পাতা, পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্যের স্বরূপবোধক। **মাঝামাঝি** = মধ্যবর্ত্তী (স্থান), ভাল মন্দের মধ্যবর্ত্তী। **মাঝারি** = না-বড়-না-ছোট, মধ্যমাকার, না-ভাল-না-মন্দ, নিমখাসা, কটিদেশ। **মাঝি, মাঝী** = নৌচালকের মধ্যে প্রধান, নাবিক, সাঁওতাল-মোড়ল, সাঁওতাল পুরুষ, প্রধান, মোড়ল(?)। **মাঝিমাল্লা** = নাবিক, মাঝি ও দাঁড়ী। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. মধ্য** শব্দটিকে বাংলাভাষী নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছেন **মাঝ**। তার এই **মাঝ** দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত সত্তার **মধ্য**কে চিহ্নিত করে, তা সে দুই পারের **মাঝ** হোক আর জগৎ-পারাবারের **মাঝ** হোক, এমনকি সম্প্রদায়ের **মাঝ** হোক। সেই **মাঝ**-এ সক্রিয় থাকে যে, সে হল **মাঝী**। স্বভাবতই এই **মাঝী** নদীর এপার ওপারের **মাঝ**-এ সক্রিয় থাকতে পারেন, সম্প্রদায়ের **মাঝ**-এ সক্রিয় থাকতে পারেন, জগৎ-পারাবারের **মাঝ**-এও সক্রিয় থাকতে পারেন। ভাওয়াইয়া গানে যখন 'ও **মাঝী** রে' বলে ডাক দেওয়া হয়, তা একসঙ্গে সর্বস্তরের **মাঝী**র উদ্দেশ্যেই আহ্বান রূপে ঘোষিত হয়। এবং নিঃসন্দেহে এই ডাকের একটিই লক্ষ্য — **মাঝী** যেন সংশ্লিষ্ট প্রবাহের **মাঝ** বরাবর সক্রিয় থেকে এপার থেকে ওপারে **পার** করে দেন। ফলত, **মাঝী** শব্দের মানে দাঁড়িয়ে যায়, 'যিনি **মাঝ**-এলাকাটি পার করে দেন'।

মাঝামাঝি শব্দটি হল **'পুরুষ-প্রকৃতি যোড়শব্দ'**। তার স্বভাব ব্যাখ্যাত হয়েছে **কচাকচি** শব্দে। তবে সাঁওতাল মোড়লকে যে **মাঝী** বলা হয়, তা একই সঙ্গে দু'রকম অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। প্রথমত, তিনি সম্প্রদায়ের **মাঝ**-এ সক্রিয় থাকেন; দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পার্থিব সমস্যার ধারাটি উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু মধ্যযুগের নৌবাণিজ্যে **মাঝি**র সঙ্গে আরও বহু যুবকদের যোগ দিতে হত, যাদের বলা হত 'সাধব' বা **মাল্লা**। দ্র. **মল্ল**। বলে রাখা ভাল, sailor অর্থে **মাঝী** বানানটি যুক্তিযুক্ত।

মাধব (মাধবক, মাধবিকা, মাধবশ্রী — রাম-শ্যাম-যদু-মধু) : ১. মধু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***মাধব*** = ***মাধ*** *(**মধ** হইতে জাত) বহন করে যে। (দ্র.* ***মধ, মধ্য, মধু****)।* ***মাধবক*** = ***মাধব*** *কৃত যাহাতে।* ***মাধবিকা*** = *মাধব-কে গতিশীল করে যে আধার।* ***মাধবশ্রী*** = *মাধব-শ্রী যাহাতে।* **৩. মাধব** = মধুসম্বন্ধী, বাসন্ত, বসন্তকালীন, মধুময়, মধুবংশজাত, মধুকাল, কামসখ বসন্ত, মধুর (বসন্তের বা পুষ্পমধুর) সম্বন্ধী, মধুবংশীয়, লক্ষ্মীপতি, শ্রীকৃষ্ণ, যাদবমাত্র, যাদবগণ, বৃষ্ণিগণ, অক্রূর, পরশুরাম, ইন্দ্র, শিব, মধুকবৃক্ষ, কৃষ্ণমুদগ (কালো মুগ)। **মাধবক** = মধুকৃত মদ্য, মধুকপুষ্পকৃত মদ্য। **মাধবিকা** = মাধবীলতা, মাধবীকুসুম। **মাধবশ্রী** = বসন্তলক্ষ্মী। (ব.শ.)। **৪.** মধ্যযুগের সাহিত্যে এই শব্দগুলির রমরমা থাকলেও একালে শব্দগুলি তাদের নিহিতার্থে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিনাম রূপে। **৫.** দ্র. **বেণী, বেণীমাধব, বেণু, মধ, মধ্য, মধু, মধ্বাচার্য্য**। পাঠকপাঠিকা, আমাদের মাফ করবেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই, এই **মধু** ও তজ্জাত **মাধব**। ইনি যে স্বয়ং **শিব**, ইনি **যাদবেন্দ্র** 'শ্রীকৃষ্ণ'ও বটেন, honey-**মধু** বটেন, আবার **ব্রহ্ম-মধু**ও বটেন! অভিধান ও শব্দকোষগুলি তাই বলছে! এঁকে সহজ কথায় ধরে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ কর্ম নয়। তার ওপর এমন একটিও অভিধান বা শব্দকোষ নেই, যাতে **মাধব**কে **যাদব**দের সঙ্গে গুলিয়ে রাখা হয়নি। ভাষাব্যবহারকারীরাই তাদের জড়িয়ে রেখেছিলেন, অভিধানকাররাই বা কী করবেন! তাই, সেই জট ছাড়ানো খুবই কঠিন। তবু দায় যখন ঘাড়ে চেপেছে, সে দায় পালন করতেই হবে। ভুলত্রুটি ঘটতেই পারে। ভুল হলে মাফ করে দেবেন, এই নিবেদন।

আমরা যেসকল মহত্তম শব্দ হারিয়েছি, **মাধব** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দ তাদের মধ্যে অন্যতম। এর অর্থ হল **'মধু** বহন করে যে'। আগেই আমরা দেখেছি, সত্তার মূল সীমায়িত বা কেন্দ্রীকৃত যে রূপটি নবরূপে উত্তীর্ণ, তাকে সেই সত্তার **মধু** বলে। এখানে দেখছি, সেই **মধু**র সঙ্গে সম্বন্ধিতদের বা **মধুর** অপত্যদের **মাধব** বলে, যেমন কিনা, **যদু**র অপত্যদের **যাদব** বলা হয়। (এদের **যদুব** বা **মধুব** বলা হয় না কেন, সে অনেক কথা। এখানে শুধুমাত্র এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে, **মধ** থেকে জাত **মাধ**-এর বহু রূপ পেরিয়ে **মধু**তে পৌঁছনো যায়। কেউ যখন **মধু** বহন করে, কার্যত সে তার নিম্নতর কোনো কোনো রূপের **মাধ** বহন করে, তাই সে **মাধব**। একই নিয়ম কাজ করে **যাদব** শব্দের বেলায়।)

আসলে, যা দিয়ে মানুষের মানসিক ক্ষুধানিবৃত্তি করা হয় ও তার মানসিক **তৃপ্তি** হয়, **আনন্দ**লাভ হয়, সেসবকে সেকালে বলা হত **মধু**, এবং সেই **মধু** কত অজস্র রকমের ছিল, সেকথা আমরা **মধু** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলিতে বিস্তারিত করেছি। সেই **মধুসমূহে**র প্রত্যেক প্রকারের **মধু**র নানা মাপের **বাহন** ছিল এবং তাদের প্রত্যেককে বলা হত **মাধব**। এই **মাধব**গণের একেবারে প্রথম ধাপে আমরা পাই

honey-**মধু** ও তার বাহক **মাধব**গণকে; এবং একেবারে শেষ ধাপে পাই **মধু** নামিত **আচার্য্য** বা **মধ্বাচার্য্য**কে এবং তাঁর অপত্যরূপ **মাধব**গণকে। এককথায় এঁরা প্রত্যেকেই অসীমের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-এর **বাহন**; তাই এঁরা প্রত্যেকেই **মাধব**। ...

অর্থাৎ **মধু**র **বাহন**কেই **মাধব** বলে; তা সে ফুলের **মধু**, যৌবন**মধু**, ধন-**মধু**, বা জ্ঞান-**মধুর বাহন** হোন, আর সেই **তাঁর** (ওঁ **তৎসৎ**-এর) **বাহন** হোন, যাঁর নামকরণ করা যায় না ব'লে লোকে তাঁকে '**মধুসমূহের মধু**' বা **ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড, অরূপরতন, পরমাপ্রকৃতি** ইত্যাদি নানা নামে শনাক্ত করে থাকেন। এঁদের যে কোনো **মধু**র সঙ্গে সম্বন্ধিত **মধু**-বাহককেই **মাধব** বলা যেতে পারে; এবং তাই বলাও হত। মোটকথা, **মধু** যেমন অজস্র প্রকারের হয়, তেমনি **মধু**-বাহী এই **মাধব**ও অজস্র প্রকারের হয়। **পুষ্পমধু**-বাহী, যৌবন**মধু**-বাহী, ধন**মধু**-বাহী, জ্ঞান**মধু**-বাহী, **ব্রহ্মমধু**-বাহী পর্যন্ত **মাধব** বহু প্রকারের হয়ে থাকেন। যেমন কিনা, কালো মুগডালকেও **মাধব** বলা হত, আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও **মাধব** বলা হত। তার মানে, মুগ ডালেও অসীমের ছোঁয়া আছে, আর শ্রীকৃষ্ণে তো আছেই! আর কাকে কাকে **মাধব** বলা হত, উপরে **৩.**-এ ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলিতে তাদের অনেকের নাম দেওয়া আছে। তাই **মাধব** বললে বনের মধু-সংগ্রাহক থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী, ধনী, জ্ঞানী পেরিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত অনেককেই বোঝায়, শুধু জানতে হয় সেই **মাধব** কোন **মধু**র সঙ্গে সম্বন্ধিত। আপনি কেবল honey-**মধু** মুখে দিয়েই তো বলেন না — 'আহা, **মধু, মধু**!', সরস্বতী পুজোর খিচুড়ি খেয়েও বলেন, চণ্ডীদাসের কীর্তন শুনে বলেন, বিসমিল্লা খানের সানাই শুনেও বলেন, লালন কিংবা রবীন্দ্রনাথের গান শুনেও বলেন — 'আহা, **মধু, মধু**!' তাহলে খিচুড়ির রাঁধুনিকে, চণ্ডীদাসকে, বিসমিল্লা খানকে, লালনকে, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে **মাধব** না বলে উপায় কী! ...

অতএব **মাধব** বহুপ্রকারের হতে পারে। যেমন কিনা, ধরা যাক এক ধন**মধু**র কারবারীর কথা। তিনি তাঁর কারবার এতটাই **ফেঁদে** (দ্র. **ফাঁদ**) ফেলেছেন যে, তাঁর সম্পদলক্ষ্মী আলুলায়িত কুন্তলা হয়ে পড়েছে, **মন্দগ্রহ**-গুলিকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না, এবং সেকারণে নরসুন্দরীদের (Law & Accounts Firm-দের) দিয়ে তাঁকে তার **কেশ** (case) চর্চা করে তার **বেণী** বেঁধে নিতে হয়েছে। এই ধন**মধু**র কারবারীকে সেকালে বলা হত **বেণীমাধব**। সেভাবে দেখলে, একালের অধিকাংশ বড় ব্যবসায়ীই তো **বেণীমাধব**! ...

আবার, **বসন্ত** কালে **পুষ্পমধু** যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সে সময়ের সাময়িক আর্থিক সচ্ছলতার কারণে মানুষের যৌবন**মধু**ও সৌরভ ছড়ায়, আর ফসল ঘরে উঠে যাওয়ায় ধন-**মধু**রও বাড়বৃদ্ধি হয়ই এবং হয়তো-বা **মধুসমূহের মধু**ও তখনই সর্বাধিক প্রকট থাকেন। সেই কারণে ঐ বসন্ত কালটিকেও **মধুকাল** বলে এবং তখনই **মাধবশ্রী** বা 'বসন্তলক্ষ্মী' প্রকট থাকেন। ...

তবে, **রাম-শ্যাম-যদু-মধু**র কথা শুনলে আমাদের ইত্যাকার **মধু** ও **মাধব** সম্পর্কিত বোধ 'রজ্জুকে সর্পভ্রমে' একেবারে লাফ দিয়ে ওঠে। হিন্দিভাষীগণ যে ব্যাপারটিকে বোঝাতে 'অ্যয়রা-গ্যয়রা-নত্থু-খ্যয়রা' বলে থাকেন, ইংরেজরা 'টম-ডিক-হ্যারি' বলে থাকেন, আমরা বাংলাভাষীরা সেই ব্যাপারটি বোঝাতে '**রাম-শ্যাম-যদু-মধু**' বলে থাকি। শুধু এই একটি ব্যাপারই প্রমাণ করে দিতে পারে যে, জ্ঞানসম্পদের বিচারে বাংলাভাষাই বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পদ হাজির করার যোগ্যতা ধরে। তবে, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমরা নিজেরাও এতদিন জানতাম না, কেন আমরা **রাম-শ্যাম-যদু-মধু** বলে থাকি! পরমাপ্রকৃতির পরম কৃপায় আজ আমরা তা জানতে পেরে পরমানন্দে আপ্লুত! সকলের প্রতি আজ আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন।

আসলে মানবসভ্যতা যখন এগিয়ে চলে, তখন তার অর্জন-গুলিকে সে তার সামনে রাখে। আমাদের বাংলাভাষীদের বিচারে, মানুষের সেই অর্জনের তালিকার একেবারে প্রথম চারটি নাম হল — **রাম শ্যাম যদু মধু**। কার্যত এ হল সভ্যতার (সমাজের / মানুষের) অর্জিত শক্তির প্রয়োগ (**রাম**), তার থেকে জাত ফসল লাভ (**শ্যাম**), তার থেকে সভ্যতার (সমাজের/মানুষের) দৈহিক বাড়বৃদ্ধি (**যদু**), ও মানসিক বাড়বৃদ্ধি (**মধু**)। বাস্তবে সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা **রাম**-পদবীধারীদের কথা ও **যাদব**দের কীর্তির কথা জানলে এবং **শ্যাম** ও সেই **শ্যাম**রায়কে নিয়ে **মাধব**দের কীর্তির কথা জানলেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধিকাংশই জানা হয়ে যায়। এদের সার্বিকভাবে ও বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ এখানে নেই, আমরা শুধু **যদু**র অপত্য **যাদব** ও **মধু**র অপত্য **মাধব**দের নিয়ে থাকতে বাধ্য। ...

মাধবী[১] : **১.** মধু + অ (অণ্) + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***মাধব**-এর গতিশীল আধার যে। (উপরে **মাধব** দেখুন)।* **৩.** মধুবংশীয়া কন্যা, কুন্তী, সুভদ্রা, মধুমাসে কুসুমিতা লতাবিশেষ, অতিমুক্তক, বাসন্তী, মধুবিকারজাত মদিরাবিশেষ, মাধ্বী, মধুজাত শর্করা, মধুরিকা, কুট্টনী, রাগিণীবিশেষ, মাধবসম্বন্ধিনী, মাধবপত্নী, হরিবধূ, রুক্মিণী প্রভৃতি, বিষ্ণুপত্নী, মাধবশক্তি, দুর্গা, মাধবপ্রিয়া রাধা, তুলসী, মাধবীপুষ্প। (ব.শ.)। **৪.** নামরূপে প্রচলিত। **৫. মধু** যত রকমের হয়, **মাধব**ও তত রকমের হতে পারে এবং স্বভাবতই ব.শ. উপরোক্ত **৩.**-এ প্রদত্ত **মাধবী** শব্দের অর্থে অনেকের কথাই বলেছেন। তার ভিতরে **মাধবীলতা** নামের লতানো ফুলগাছ যেমন রয়েছে, সেই ফুলের **মধু** থেকে তৈরি মদ রয়েছে, তেমনি তুলসী রাধা সুভদ্রা কুন্তী পেরিয়ে একেবারে 'পরিনির্বাণ' (**অতিমুক্ত**) পর্যন্ত অনেক **মাধবী**র কথা আছে। দ্র. **মাধবী**[২]**, মাধবীলতা, মল্লিকা, মালতিলতা**।

মাধবী[২] : **৫.** এই **মাধবী** রাজা যযাতির কন্যা। ১ম খণ্ডে **গালব** শব্দে আমরা এই **মাধবী**র পুরো কাহিনীটিই দিয়েছি। এখানে পুনরুক্তি অবান্তর। পাঠকপাঠিকা সেটি কষ্ট করে দেখে নিন। সেই কাহিনী অনুসারে এই **মাধবী**র বিশেষত্ব এই যে, ইনি অক্ষয় কৌমার্যের আধার। কারও পত্নীত্বে গৃহীত হয়ে পুত্রাদি উৎপাদনের পর পরিত্যক্ত হলে পুনরায় কৌমার্য প্রাপ্ত হন। এদিকে **মাধবী** ফুলের বিশেষত্ব এই যে, তার চেয়ে শুক্ল বর্ণের ফুল আর হয় না। শুক্লত্বে এই ফুল মুক্তাকেও হার মানায়; যে কারণে একে 'অতিমুক্তক' বলা হয়ে থাকে। ... এই **মাধবী** স্বভাবতই **মাধব**-এর আধার। সেই কারণে

এই **মাধবী**কে নিয়ে আমাদের ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বহু শব্দ ও তাতে ধরা বহু ধারণা আছে। উপরে **মন্** ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকায় তাদের প্রায় সকলের নাম আছে। আমরা শুধুমাত্র **মাধবীলতা**র কথায় যাব, তবে এখানে নয়। **মালতিলতা** শব্দে উভয়কে তুলনা করে দেখার সুবিধার জন্য সেখানেই **মাধবীলতা** নিয়েও কথা বলব আমরা।

মাধুর (মাধুরী, মাধুর্য্য) : **১.** মধুর + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***মাধুর*** *=* ***মধুর*** *(মধু রহে যাহাতে) হইতে জাত।* ***মাধুরী*** *=* ***মাধুর****-এর সক্রিয় বা গতিশীল আধার যে।* ***মাধুর্য্য*** *=* ***মাধুর****-এর যাত্রা থাকে যাহাতে।* / **মাধুর** = মধুরা (মথুরা) ইহতে আগত। **মাধুর্য্য** = যে গুণ হেতু কাব্যশ্রবণমাত্র চিত্ত দ্রবীভূত হয়। (ব.শ.)। **৩. মাধুর** = মধুরসম্বন্ধী, মধুরদ্রব্যজাত, মধুর, প্রীতিকর, মধুরাবাসী, চাটুকার, মল্লিকাপুষ্প। **মাধুরী** = মধুরভাব, মধুরতা, মাধুর্য্য, কমনীয়তা, চারুতা, মধুজাত মদ্য। **মাধুর্য্য** = মাধুরী, মধুরতা, কমনীয়তা, দেহের অনির্ব্বাচ্য রূপবিশেষ, কাব্যগুণবিশেষ, সকল অবস্থাবিশেষে রমণীয়তা, গোপিকা-প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুররস। (ব.শ.)। **৪. মাধুর** অপ্রচলিত। **মাধুরী** ও **মাধুর্য্য** এখন প্রায় অপ্রচলিত, শুধুমাত্র অর্থহীন নামরূপে **মাধুরী** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মধু, মধুর**। **মন্** ক্রিয়ার অর্থ দিতে গিয়ে আমরা আগেই বলেছি, এই পরিবারের সদস্য শব্দসমূহের প্রতীকী অর্থ দেওয়া খুবই কঠিন। কেননা, এই শব্দগুলির প্রতীকায়ন একেবারেই করা যায়নি। তাছাড়া ইংরেজ তো **মাধুরী**র ভাব অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে, ইংরেজি প্রভাবিত অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীর মন **মাধুরী** শব্দের কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দও খুঁজে পায় না। কেউ কেউ এর ইংরেজি মানে করেন sweetness, কিন্তু সে তো 'মিষ্টতা'। কেউ মানে করেন deliciousness, কিন্তু সে তো 'স্বাদুতা'। ... এরকম আরও কিছু শব্দ রয়েছে। কিন্তু সে শব্দগুলি সবই **মাধুরী**র অংশবিশেষকে বোঝায়, **মধুর** থেকে জাত **মাধুর**-এর সক্রিয় আধার-স্বরূপা **মাধুরী**কে বোঝায় না। কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষ যখন বলেন, 'কী দেখে এলি, তাই বল্; নিজের মনের **মাধুরী** মাখিয়ে বলতে হবে না।' তখন বোঝা যায়, বাংলাভাষী শব্দটিকে তাঁর রোজকার ব্যবহারেও কত গভীরভাবে বোঝেন। **মাধব** কীর্তনীয়াগণ যে **কৃষ্ণপ্রেমে**র **মাধুরী**র ব্যাখ্যা দেন, তার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। আজকাল খবরের কাগজের অফিসে সম্পাদক তার সহকারীদের বলেন **'স্টোরি'** তৈরি রাখতে। সেই 'স্টোরি'তে কেউ কেউ মনের **মাধুরী** মাখাতে পারেন বটে, তবে সে কালেভদ্রে। কারণ মনের **মাধুরী** মাখাতে গেলে, মনে **মধু** থাকতে হবে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে তার ভুরভুর করে বেরোনো প্রকাশ থাকতে হবে, সেই তো **মাধুরী**; সেই **মাধুরী** মাখিয়ে **মধুর** 'স্টোরি' চেষ্টা করলে বানিয়ে ফেলা যায়। কোনো কোনো সাংবাদিক সেরকম স্টোরি বানিয়েও থাকেন। তবে, কালেভদ্রে।

মাধ্যম (মাধ্যমিক) : **১.** মধ্য + ম (মণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***মাধ্যম*** *=* ***মধ্যম*** *হইতে জাত। (দ্র.* ***মধু****)।* ***মাধ্যমিক*** *=* ***মাধ্যম****-কে সক্রিয় বা গতিশীল করে যে।* / **মাধ্যম** = দুইএর মধ্যস্থিত কার্য্যসাধক উপায় বা সহায় (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. মাধ্যম** = মধ্যভব, মধ্যস্থ, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যম, মধ্যজাত। **মাধ্যমিক** = মধ্যভারতীয়দেশসমূহ। (ব.শ.)। **৪.** দুটি শব্দই এখন যথাক্রমে ইংরেজি medium ও secondary অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **বাহন**। সত্তার **মধ্যে**র অংশকে **মধ্যম** বলে। সেই **মধ্যম** যদি কখনো কোনো কর্মের **বাহন** হয়ে যায়, তখন তাকে **মাধ্যম** বলে। সেই **মাধ্যম**-সম্বন্ধিত ক্রিয়াদিকে **মাধ্যমিক** বলে। Secondary শব্দের ভিতরে কিন্তু সেই কথা নেই। যাঁরা এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন **মাধ্যমিক**, তাঁরা বাংলা ভাষাটা জানতেন। যাঁরা দুটো ভাষাই জানেন, তাঁরা বুঝবেন, Secondary শব্দে যে ধারণা ধরে রাখা হয়েছে, তার তুলনায় **মাধ্যমিক** শব্দে ধরে রাখা ধারণার ব্যাপ্তি অনেক বেশি এবং বিষয়টিকে বোঝাতে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কী আর করা যাবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর, আমাদের পরিচালকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' বিদেশের কুকুর পোষাই ভারতীয় উপমহাদেশের সকল জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল! ...

মান (— অনুমান, অপমান, অবমান, অভিমান, উন্মান, উপমান, নির্ম্মাণ, পরিমাণ, প্রমাণ, বিমান, সম্মান) : **১.** ✓মন্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মান*** *=* ***মন*** *হইতে জাত।* / **মান** = অন্য হইতে আপনার উৎকর্ষকল্পন হেতু চিত্তের উন্নতি (যাহাতে); 'আমার সমান কেহ নাই' - এইরূপ মনন (যাহাতে); যাহার দ্বারা পরিমাণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. মান** = পূজা, চিত্তসমুন্নতি, আপনার প্রতি পূজ্যতাবুদ্ধি, আত্মসম্মানবোধ, কুলশীলাদিজন্য অভিমান ... ইত্যাদি; গ্রহ, অববোধ, জ্ঞান, কৌলীন্যাদি হেতু সামাজিক অর্ঘ্যাদিদান, রাধিকার মানবিষয়ক পাঁচালী যাত্রা বা পদাবলী; পরিমাণ, উন্মান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। এদের মধ্যে কেবলমাত্র **উন্মান** শব্দটিই যা খানিকটা পরিত্যক্ত হয়েছে। **৫.** দ্র. **মৎ, শ্রীমৎ**। ইতোপূর্বে **মন** শব্দে আমরা দেখেছি, এর তিনটি অর্থ। **মন** একটি যন্ত্র, সে **মন্** ক্রিয়া (পরিমাপ) করে, তার ফলে যে ফলটি পায়, তাকেও **মন** বলে। এই **মন** বা পরিমাপিত ফলটি যখন কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই পরিমাপিত-ফলস্বরূপ **মন**-এর সেই প্রযুক্ত রূপটিকে **মান** বলে; তা সে যে কোনো প্রকারের **মান**ই হোক না কেন। সেই কারণে আমরা এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ করেছি — **'মন হইতে জাত'**। সবাই জানেন, **মন** থেকে বহু কিছুই জন্মায়। ফলত বহু কিছুকেই **মান** বলা হয়ে থাকে।

কাজেই, অন্যান্য শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের ক্ষেত্রে যেমন হয়, এখানেও তেমনই হয়েছে; বহু কিছুই **মান** শব্দের উদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে যা হয় — একটি অর্থের বারংবার ব্যবহার ও তার স্থির প্রতীকী অর্থে পরিণত হওয়া এবং অন্য অর্থগুলির বিলুপ্তি — **মান** শব্দের ক্ষেত্রে তা হয়নি। **মান** শব্দের অনেকগুলি অর্থই আজও প্রচলিত আছে। এরকম হওয়ার কারণে বিপদে পড়ে গেছেন একালের অভিধানকারেরা। অগত্যা তাঁরা **মান** শব্দটিকে তাঁদের অভিধানে একাধিক বার ভুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। যে যে শব্দের ক্ষেত্রে আধুনিক অভিধান ও শব্দকোষকারগণ এরূপ একাধিক ভুক্তির নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের সকলের

এই দশা — তারা আধুনিক হয়ে শহরে গিয়ে একটি কন্যা বা পুত্র নিয়ে ফ্ল্যাটবাসী হয়নি, থেকে গেছে গ্রামের যৌথপরিবারে সদলবলে।

[কেবল তাই নয়, এই **মান** শব্দ নিয়ে আমরাও পড়েছি মুশকিলে। পড়তাম না, যদি **মন** শব্দ থেকে **মান** শব্দটি প্রসূত না হত। পড়তাম না, যদি **অন্তঃকরণ** (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮), **চিত্ত, বুদ্ধি, মন** প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যায় **মন**-এর বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরিদের অর্জনকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দিতাম। এমনিতেই সংকুচিত অবকাশের খাঁড়া ঝুলছিল, তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সারতে গিয়ে এখন পড়েছি বিপদে। ... **বুদ্ধি** শব্দে আমরা বিষয়টিকে বেদান্ত থেকে নিয়ে ঠিকভাবেই উপস্থাপিত করেছি বটে, কিন্তু মানুষের **মনন**-যজ্ঞের (**মন**-দপ্তরের কাজকর্মের) সর্বোচ্চ পদগুলির কাজকর্ম বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্য প্রভৃতি গ্রন্থের একধরনের ইতস্তত ভাব আছে। সেই ইতস্তত-ভাবটা কাটিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা উচিত ছিল, সেটা করা হয়নি। এক্ষণে সেই 'পাপস্খালন' করতে আমরা বাধ্য। অন্যথায় **মান**কে বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাপার হল, মানুষের **দেহ-মন** দুটির উপরেই যার হুকুম চলে, তার নাম হল মানুষটির 'আমিত্ববোধ' বা 'আত্মা'। এর **মন**-বিভাগটির দায়িত্বে থাকে যে, তাকে যেমন **অন্তঃকরণ** বলে, তেমনি **মন**ও বলে। এই **অন্তঃকরণ**-এর আবার দুটি বিভাগ। প্রথম বিভাগটি **মন** নিজেই দেখাশোনা করে, দ্বিতীয় বিভাগটির দেখাশোনা করে **বুদ্ধি**। এইখানে একটা সমস্যা দেখা দেয় — দপ্তরের সর্বোচ্চ পদটিতে যে **মন** বসে এবং **বুদ্ধি**র উপর হুকুম চালানোর মতো অবস্থায় থাকে, সেই **মনই** আবার একটি বিভাগের সর্বোচ্চ পদটি সামলায়। তার উপর আর এক সমস্যা হল দুজনের স্বভাব — **মন** সঙ্কল্প করে কাজে নামে, বিকল্পের রাস্তাও খোলা রাখে। (দ্র. **কল্প**)। আর, **বুদ্ধি** সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে নিশ্চয়াত্মকভাবে কাজে নামে।

যাই হোক, দু'দল কর্মচারীকে দিয়ে এই **মন**-বিভাগ ও **বুদ্ধি**-বিভাগ উভয়েই তাদের কাজকর্ম চালায়। একদল কর্মচারীর নাম **চিত্ত**, অনুসন্ধান চালানো যাদের কাজ। অপরদলটির নাম **অহঙ্কার**, অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফলগুলিকে গুছিয়ে রাখা যাদের কাজ। ফলত, **মনের** (বা **অন্তঃকরণের**) হাতে **মন**-পরিচালিত **চিত্ত ও অহঙ্কারের** কাজকর্মের ফলাফল যেমন উঠে আসে (একে **মনন-বৃত্তি**জাত কর্মফল বলা হয়), তেমনি **বুদ্ধি**-পরিচালিত **চিত্ত** ও **অহঙ্কারের** কাজকর্মের ফলাফলও উঠে আসে (একে **বুদ্ধি-বৃত্তি**জাত কর্মফল বলা হয়)। এই দুই রকম ফলাফল চলে যায় মানুষটির আত্মা বা **'আমি'র** কাছে। আজকাল আমাদের দেশনেতারা যেমন সমাজের দুরকম **বৃত্তি** ভাগ করে কথা বলেন — কৃষি-বৃত্তি ও **শিল্প**-বৃত্তি; কৃষি চাই, শিল্পও চাই — মানুষের **অন্তঃকরণের**ও (**মনের**ও) তেমনি দুরকম **বৃত্তি**, **মনন-বৃত্তি** ও **বুদ্ধি-বৃত্তি**। এই দুই **বৃত্তি**র স্বভাব দুরকম। **মনন**-বৃত্তিতে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক **মনের** নির্দেশে **চিত্তের** অনুসন্ধান ও **অহঙ্কার**-এর ফলাফল সংগ্রহ চলে। ফলে, সেই কাজকর্মের স্বভাব হয়ে যায় এমন ধরনের, একালের ভাষায় যাকে 'ঘরোয়া' বা domestic বলা যেতে পারে। আর, **বুদ্ধি-বৃত্তি**তে নিশ্চয়াত্মক **বুদ্ধির** নির্দেশে **চিত্তের** অনুসন্ধান ও **অহঙ্কার**-এর ফলাফল সংগ্রহ চলে। ফলে, সেই কাজকর্মের স্বভাব হয়ে যায় এমন ধরনের, একালের ভাষায় যাকে 'যান্ত্রিক', 'সরকারি' বা official বলা যেতে পারে। আমরা এই 'ঘরোয়া' স্বভাবের ভিতরে **শিব**কে দেখতে পাই, এবং 'সরকারি' স্বভাবের ভিতরে **দক্ষ**কে দেখতে পাই।]

এখন আমরা দেখছি, **'মন হইতে জাত' মান** শব্দের অনেকগুলি প্রায়োগিক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। ফলত, আমাদের অভিধানকারগণ চার-পাঁচবার একই **মান** শব্দের ভুক্তি ঘটাচ্ছেন, ঘটিয়েছেন। কিন্তু তার কারণ যে **মনন-বৃত্তি**জাত **মান** এবং **বুদ্ধি-বৃত্তি**জাত **মান**, সেকথাটি তাঁরা জানেন না। বিষয়টি এইরূপ।

মননবৃত্তি-জাত **মান** ও **বুদ্ধিবৃত্তি**-জাত **মান**, উভয়েই **মন** হইতে জাত, সন্দেহ নেই। বহু প্রাচীন কাল থেকে মানুষ তার **মনের মননবৃত্তি** চালিয়ে আসছে, **মনের বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে কাজ চালানোর বাড়বাড়ন্ত হয়েছে সম্প্রতি। ফলে, আমরা জগতের যে **মান**গুলি এতকাল পেয়ে এসেছি, তাদের অধিকাংশই **মনের মননবৃত্তি** দ্বারা পরিমাপ করার ফল। আমাদের **অনুমান, অপমান, অবমান, অভিমান, উপমান, সম্মান** ... ইত্যাদি সবই সেই **মনের মননবৃত্তি**-কৃত **মান** নির্ণয় থেকে জন্মলাভ করেছে। আর, বেশ কিছু **মান** আছে যেগুলি **মনের বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে পরিমাপের ফল, যথা **নির্মাণ, পরিমাণ, প্রমাণ** ... ইত্যাদি। ব্যাকরণবিদ বলবেন — এখানে ণত্ববিধান সক্রিয় হওয়ায় **ন** হয়েছে **ণ**। আমরা বলি, সে তো ঠিক; কিন্তু তারও মূলে শব্দ কয়টির অর্থে রয়েছে **বুদ্ধিবৃত্তির** কথা। **বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে যেগুলি মাপা হয় — অন্যভাবে বললে, যেগুলি space-time-এ quantity হিসেবে দেখা হয় — সেগুলির অন্তে আসছে **ণ**। এখন তো, **বুদ্ধিবৃত্তির** সাহায্যে পরিমাপ করার যন্ত্রগুলি **উন্মান**-এর স্থান দখল করে নিয়েছে বলেই **উন্মান** শব্দটি সেকেলে হয়ে গেছে।

মনের মননবৃত্তি দিয়ে নির্ণয় করা **মান**গুলির মধ্যে একপ্রকার অখণ্ডের ভাব থাকে ব'লে সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা যায় না। যেমন ১ কেজি দুঃখ বা **অভিমান**, ২ লিটার ক্ষোভ বা **অপমান** হয় না। এবং এগুলির বেশির ভাগটাই মানুষের মানসলোকের বিভিন্ন সত্তার **মান**। কিন্তু **মনের বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে নির্ণয় করা **মান**গুলির মধ্যে সর্বদা খণ্ডের ভাব থাকে এবং সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা যায়; যথা ১ কেজি কয়লা, ২ মিটার জমি ... ইত্যাদি। আর, সেগুলির প্রায় সবটাই বাহ্যলোকের বিভিন্ন সত্তার **মান**। আমাদের জ্ঞানের এলাকা কিন্তু দুটো লোকের বিভিন্ন সত্তার **মান** নিয়েই। তবে, আমাদের বিজ্ঞানের এলাকা শুধুমাত্র বাহ্যলোকের **মান** নিয়ে। **মান**-বিষয়ক শব্দের সংখ্যাই বলে দিচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যতরকম **মান** নির্ণয় করে এগোনোর দরকার পড়ে, তার মধ্যে **মনের মননবৃত্তি** দিয়ে **মান** নির্ণয় করে বা **অনুমান**-নির্ভর হয়ে এগোনোর এলাকা যেন বাতাস-ভরা উন্মুক্ত আকাশ, এতই বড়। আর, সেজন্যেই সেটা যে আছে, সেকথাটাই আমাদের মনে থাকে না। তুলনায়, **মনের বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে **মান** নির্ণয় করে বা **পরিমাণ** ও **প্রমাণ** নির্ভর হয়ে এগোনোর এলাকা খুবই ছোট; অথচ তারই প্রতাপে **বুদ্ধি**মানদের মাটিতে পা পড়ে না! আমরা **বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে কি একজন মানুষেরও শোক-দুঃখ-ভয়-ত্রাস-নিরাশা-প্রণয়-এর বিজ্ঞান-সম্মত **পরিমাণ** নির্ণয় করে উঠতে পেরেছি? সমগ্র মানবজাতির সুখ-দুঃখের কথা, জীবজগতের কথা, জড়জগতের শোক-দুঃখের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। এসবের ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু করতে পেরেছি, তার সবটুকু কৃতিত্ব আমাদের **মনের মননবৃত্তির**। অনেকেই জানেন, শুধু **মনের মননবৃত্তি** দিয়ে তবুও কাজ চলে যায়, কিন্তু শুধুমাত্র **বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে মানুষের সভ্যতা এক ইঞ্চিও এগোতে পারে না, পারবেও না কোনোদিন। তবুও সম্প্রতিকালে **বুদ্ধিবৃত্তির** দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে, **মনের মননবৃত্তির** সাহায্য না নিয়ে কাজ চালানো যাচ্ছে না দেখে, তাকে সমানে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া

হচ্ছে না। বলতে কী, মানবসভ্যতাকে যথার্থে এগিয়ে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে **মননবৃত্তি** ও **বুদ্ধিবৃত্তির** একপ্রকার দ্বৈরাজ্য থাকা উচিত। আগেকার কালে **বুদ্ধিবৃত্তির** অস্তিত্ব ছিল না, যতটুকু ছিল, তারও মর্যাদা ছিল না, এখন হয়েছে **বুদ্ধিবৃত্তির** বাড়াবাড়ি, এখন আবার **মননবৃত্তির** কোনো মর্যাদা নেই। উভয় পরিস্থিতিই মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে হিতকর নয়।

যাই হোক, এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, **মান** দুরকম। **মনের মননবৃত্তি** দিয়ে মাপা অখণ্ডমূলক **মান**; এবং **মনের বুদ্ধিবৃত্তি** দিয়ে মাপা খণ্ডমূলক **মান**। এই **বুদ্ধিবৃত্তি**-মাপিত **মান**কে একালে বৈজ্ঞানিক **মান** বলে। আগেও কয়েকবার বলা হয়েছে, আবারও বলি — ইউরোপের ভাষাগুলিতে সকল আদি শব্দের উত্তরাধিকার নাই, কিন্তু ধারণার উত্তরাধিকার কমবেশি আছে, দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যাকে **মনের মননবৃত্তি**-জাত **মান** বলি, তাঁরা তাকে heart-এর এলাকা বলে থাকেন; এবং আমরা যাকে **মনের বুদ্ধিবৃত্তি**-জাত **মান** বলি, তাঁরা তাকে head-এর এলাকা বলে থাকেন।

কিন্তু এই দুই প্রকার **মান** যদি এমন স্থির কঠিন কঠোর রূপ গ্রহণ করে যে, সেই **মান** না-ভাঙালে কাজ চলে না, তখন **মানি**নীর যেমন **মান** ভাঙাতে হয়, তেমনি **মান**দণ্ডসমূহেরও **মান** ভেঙে ফেলতে হয়। প্রথম ক্ষেত্রের **মান**-ভঙ্গ করার কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রের **মান**-ভঙ্গ করার কথা কেউ কেউ জানেন, সবাই জানেন না। একালের ভাষায় একে বলে 'ইউনিট'-এর পরিমাপ বদলে দেওয়া। প্রথমটি **মননবৃত্তির** এলাকা, দ্বিতীয়টি **বুদ্ধিবৃত্তির** এলাকা।

মান শব্দটিকে নিয়ে আরও একটি সমস্যা আছে। যে **মন** থেকে **মান** কথাটি জাত হয়, সেই **মন**-এর অর্থ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। তাতে 'পরিমাপন-কর্ম্ম অন যাহাতে', তাকেই **মন** বলা হয়েছে। ফলত, কোনো একটি শব্দের সঙ্গে যখন অনুসর্গ বা **প্রত্যয়**-রূপে যখন **মান** (**মৎ**) শব্দটি যুক্ত হয়, তখনও **মান** শব্দটি একই নিয়মে কাজ করে বটে, তবে করে অনেক গভীর থেকে। আমরা যখন বলি, **'শক্তিমান'**, তখন তাতে শক্তি 'মিতরূপে অন' হয়ে থাকে। এও তো সেই একই **মান**! অথচ তাকে আলাদা বলে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং করা হয়ও। তার কারণ হল, শুধু **মান** শব্দে বলা নেই, কাকে 'মিতরূপে অন' করা হচ্ছে; বাক্যের বয়ানে যার সম্পর্কে **মান** শব্দটি প্রযুক্ত হয়, তাকে 'মিতরূপে অন' করা বোঝানো হয়। এখানে আগেভাগে **'শক্তি'** শব্দটি সেকথাটি বলেই রেখেছে। সব ব্যাপারে বাড়ির কর্ত্রী যদি বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, লোকে তাতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, কখনো যদি তার সঙ্গে তার কর্তাও বেরিয়ে আসে, লোকে প্রথমটা ঘাবড়ে যায়। এও সেইরকম। কার্যত, সব **মানই** একই **মান**। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি সেকথাটি স্পষ্ট করে বলে দিতে চায়। তার মানে এই নয় যে, কোনো শব্দকে কখনো কোনো অভিধানে একাধিকবার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। দরকার হলে করতে হবে। কিন্তু একই অর্থধারী শব্দকে ভিন্ন অর্থধারী শব্দ ভেবে অন্তর্ভুক্ত করার আগে পাঁচবার ভাবা উচিত। বিশেষত ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অভিধানের ক্ষেত্রে তো বটেই। ...

যাই হোক, **মান**-এর মতো শব্দের ক্ষেত্রে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি না জানলে, পড়তে হয় মুশকিলে। একটি শব্দ একাধিক বস্তু বা বিষয়কে বোঝাচ্ছে দেখলে তাকে একাধিকবার অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। সেকারণেই আমাদের আধুনিক অভিধানকাররা **মান** শব্দটিকে একাধিকবার তাঁদের অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সে যে আসলে একই শব্দ, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকোষ সেকথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিচ্ছে।

আমরা জানি, **মন্** ক্রিয়ার একটি বিস্তারিত রূপে **মা** ক্রিয়াকে পাওয়া যায়, আমরা সেখানে যাওয়ার দরকার বোধ করিনি; আমরা তাকে একেবারে মূলে **মন্** ক্রিয়াতেই ধরে নিয়েছি, বিস্তারে যাইনি। কেননা, **মন**-এর ভিতরেই **বুদ্ধি** রয়েছে এবং সে বাহ্যিক পরিমাপও করে। তাহলে আবার **মা**-ক্রিয়াতে গিয়ে জটিলতা বাড়িয়ে কী লাভ!

মান শব্দটির উপর নির্ভর করে এত শব্দ তৈরি হয়েছে যে, শুধুমাত্র এই একটি শব্দ নিয়েই একটি পৃথক গ্রন্থ লিখে ফেলা যায়। **মান**-যুক্ত শব্দসমূহের একটা তালিকা করলেই পাঠকপাঠিকা তা দেখতে পেয়ে যাবেন। এবং বলে রাখা ভাল যে, এই শব্দগুলির অধিকাংশেরই ইংরেজি অনুবাদ করা যায় না এবং তা সত্ত্বেও এই শব্দগুলি তাদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেই কমবেশি বেঁচে-বর্তে আছে। বলতে গেলে সেটাই হয়েছে প্রতীকী-বুদ্ধির অভিধানকারদের বিপদের কারণ।

মানত (মান্‌সিক) : ২. *মানত = মান তারিত যাহাতে।* ***মানসিক*** *= মানসকে (নিম্নে দেখুন) গতিশীল বা সক্রিয় করে যে।* / **মানত** = যাহা দেবতার কাছে মানা যায়; অভীষ্টপূরণে দেবতাবিশেষের নিকটে প্রতিজ্ঞানুসারে পূজা দেওয়ার সঙ্কল্প (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. মানত** = মানসিক, আশীর্ব্বাদ। **মানসিক** = মানসসম্বন্ধী, মনোভব, মানসজাত, মন-উপাধিক (বিষ্ণু)। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় সুপ্রচলিত। **৫. মানসিক** শব্দটি দুভাবে উচ্চারিত হয় — **মানসিক** ও **মান্‌সিক**। প্রথমটির অর্থ 'মানসসম্বন্ধী'; দ্বিতীয়টির অর্থ **মানত**। এই **মানসিক** শব্দটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই 'মানসসম্বন্ধী' (বা mental) অর্থে প্রচলিত আছে, কিন্তু **মান্‌সিক** বা **মানত** শব্দদুটি এখন কেবলমাত্র গ্রামবাংলায় প্রচলিত। তার মানে এই নয় যে, শব্দদুটির ভিতরে যে ধারণা ধরে রাখা আছে, শহরে, অ্যাকাডেমিতে, সরকারি কাজকর্মে তার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন আছে, খুবই আছে, আগের যুগের তুলনায় অত্যন্ত অধিক মাত্রায় আছে। কিন্তু সেগুলিকে আমরা এখন ইংরেজি শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি। যথা — contractual agreement, MOU (Memorandum Of Understanding) ... ইত্যাদি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, **মান্‌সিক** শব্দটি **মানত** বোঝায় কেন? **মানসিক** তার থেকে আলাদা অর্থ ধারণ করে কীভাবে?

কার্যত, **মান্‌সিক** শব্দটি তৈরি হয়েছে **মান্** + সিচ্ (সিক্ত বা সিক্ত) ক্রিয়া যোগে। তাতে একটি বিশেষ **মান** একতরফাভাবে সেচন করা হয়। তাই **মান্‌সিক**। এ হল একপ্রকার একতরফা চুক্তি। আর, **মানসিক** শব্দটি তৈরি হয়েছে **মানস** + ইক প্রত্যয় যোগে। তাতে **মানস**-এর সক্রিয়তা থাকে। তাই কার্যত, শব্দ দুটি আলাদা, পৃথক অর্থধারী পৃথক শব্দ, যদিও প্রায় সমরূপী।

মানচিত্র : ২. *যে চিত্র বিশেষ **মান** অনুসারে রচিত হয়; অথবা (সুনির্দিষ্ট) **মান** আছে যে চিত্রের।* ৩. অঞ্চল দেশ প্রভৃতির অবস্থান আয়তনাদি জ্ঞাপক নকশা, ম্যাপ। (ব্য.বা.অ. ঢাকা)। ৪. 'ম্যাপ' অর্থে প্রচলিত। ৫. স্বাধীনতার প্রাক্কালে কিংবা ঠিক তার পরের পাঁচ-সাত বছর পর্যন্ত আমাদের এরকম বাংলাভাষা-জ্ঞানীরা ছিলেন, যাঁরা **পদার্থবিদ্যা**র মতো **মানচিত্র** শব্দটিও বানিয়ে গিয়েছেন। এঁরা geographical map বা engineering drawing শব্দের বাংলা তরজমা করেছিলেন **মানচিত্র**। এটি প্রাচীন শব্দ নয়, একেবারেই আধুনিক, কিন্তু শতকরা একশো ভাগ ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক নিয়মে তৈরি করা হয়েছে। এই তরজমা এতই যথার্থ যে, খোদ ইংরেজি শব্দদুটিও ততখানি যথার্থ নয়। কেননা, geographical map বা engineering drawing শব্দদুটির ভিতরে একথা বলা নেই যে, সেটি বাস্তবের হুবহু প্রামাণিক প্রতিচ্ছবি। তার জন্য সেই সব নকশাগুলির নীচে লিখে দিতে হয় সেটি **মান্য** (drawn according to scale) নাকি **মান্য** নয়। যদি **মান্য** হয়, তবে সেই **মান** (scale) কত তাও লিখে দেওয়া — ১ ইঞ্চি = ১০০ মাইল, কিংবা ১ ইঞ্চি = ১০ ফুট। যে নকশায় এরকম **মান** লেখা থাকে না, তাকে আর যাই বলা যাক, **মানচিত্র** বলা যায় না।

মানদ (মানদা, মানদাসুন্দরী) : ১. মান + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মানদ** = **মান** দান করে যে। **মানদা** = **মানদ**-এর আধার যে।* ৩. **মানদ** = মানদাতা, সম্মানকারক, গর্ব্বনাশক, অস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মান**। কিছুকাল আগেও বাংলাভাষী মেয়েদের নাম শোনা যেত — **মানদা, মানদাসুন্দরী** ইত্যাদি। **মানদাসুন্দরী** ঘোষ কি খুব খারাপ নাম? অন্তত '**কান্ত**'কাটা রজনী সেন, কিংবা '**মণি**'ছাঁটা কুন্তলা রায়-এর চেয়ে তো ঢের ভাল! একবার **কান্ত** (দ্র. **ভীম**) ও **মণি** শব্দের মানে দেখে বিচার করুন, কী ফেলে কী ধরা হয়েছে!

মানদণ্ড : ২. *যে দণ্ডের সাহায্যে **মান** নির্ণয় করা হয়।* ৩. পরিমাণ দণ্ড, মানযষ্টি। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. দ্র. **মানচিত্র**। এটিও একটি আধুনিক শব্দ। তা সত্ত্বেও একালের প্রতীকী বাংলাজ্ঞানীরা এই শব্দটি ব্যবহার না করে প্রায়শই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

মানস (মানসিক, মানসী) : ১. মনস্ + অ (অণ্) । (ব.শ.)। ২. ***মানস** = **মনস** (দ্র. **মন, মনস্**) হইতে জাত। **মানসিক** = **মানস** গতিশীল কৃত যাহাতে। **মানসী** = **মানস**-এর গতিশীল বা সক্রিয় আধার যে।* / **মানস** = মনঃ দ্বারা উৎপাদিত যে। (ব.শ.)। ৩. **মানস** = মনঃসম্বন্ধী, মনোনির্ব্বর্ত্ত্য, মনোবিষয়ীভূত, মনঃস্থিত, মনঃকল্পিত, মনঃ, চিত্ত, হৃদয়। **মানসিক** = মানসসম্বন্ধী ... ইত্যাদি (দ্র. **মান্‌সিক**)। (ব.শ.)। **মানসী** = বিদ্যাধরীবিশেষ, মনোভবা। (ছা.অ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মন**। এই **মানস** শব্দটিও বহুপ্রজ। এবং তার বহু শব্দই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

মানসতীর্থ : ২. ***মানস**-এর **তীর্থ** যে।* ৩. রাগাদিহীন বিশুদ্ধ চিত্ত। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **তীর্থ**। এই শব্দটি জানায় যে, **মানস**-এ একপ্রকার জল বা জলপ্রবাহ আছে, তা সে কোনো এক দীঘি, সরোবর বা হ্রদের জল হোক কিংবা নদীজলপ্রবাহ হোক বা জ্ঞানধারা কি পণ্যধারা ... যাই হোক। শব্দটি আরও জানায় যে, সেখানে ওঠানামা করে স্নানাদিমূলক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য একটি ঘাট বা **তীর্থ**ও আছে। ব.শ. বলছেন, সেই **তীর্থ** বা ঘাটটি হল 'রাগাদিহীন বিশুদ্ধ চিত্ত'। তার মানে, কোনো কিছুর প্রতি অনুরাগ থাকবে না, বিরাগও থাকবে না, এমন বিশুদ্ধ অনুসন্ধানী মনই হল **মানস-তীর্থে**র জলে বা জলপ্রবাহে নামাওঠা করার ঘাট। মনীষীরা বলেছেন, নির্বিকার মন নিয়ে সত্যের সাধনা করতে। ইংরেজিতে যাকে বলে passionless। কোনো **পক্ষপাত** চলবে না। কিন্তু এই যে বিশুদ্ধ অনুসন্ধানী পক্ষপাতহীন নির্বিকার মন নিয়ে আমরা **মানসতীর্থে** যাব, সেখানে কোন পুণ্যফল পাওয়া যাবে? দ্র. **মানস-সরোবর**।

মানসপুত্র : ৩. মন হতে উৎপন্ন পুত্র। ব্রহ্মার সাত কিংবা দশ জন মন হতে জাত পুত্র। এই মানসপুত্র হতেই পৃথিবীর মানবজাতির জন্ম। এই দশ জন মানসপুত্রকে প্রজাপতি বলা হয়; যেমন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য ... ইত্যাদি। কোনো কোনো মতে সাত জন প্রজাপতি ছিলেন। এঁদের সপ্তর্ষি বলা হয়। শতপথব্রাহ্মণে এঁদের নাম — গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, এবং অত্রি। এই সপ্তর্ষিদের এখন আকাশে তারকা রূপে দেখা যায়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দটিতে এমনিতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। তাছাড়া **মন** থেকে কোনো পুত্র জন্মায়, সেকথা একালে কেউই বিশ্বাস করবেন না, আশা করি। কিন্তু পুরাণাদি পড়তে গেলে এই **মানসপুত্র** কথাটি বারবার আসে। তাতে পৌরাণিক অভিধান কথিত উপরোক্ত কথাবার্তা নানাভাবে লিখিত দেখা যায়। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গ জানার দরকার পড়ে। আমরা **প্রজাপতি, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, কশ্যপ** ... প্রভৃতি শব্দে তাঁরা কারা, সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। বলা হয়েছে, এঁরা প্রত্যেকেই **ব্রহ্মা**র **মানসপুত্র**। আমরা জেনেছি, ভারতসমাজের সমগ্র জ্ঞানজীবী সত্তাটিকে **ব্রহ্মা** বলা হত। সম্ভবত সেই জ্ঞানজীবীদের অংশ রূপে এঁরা সমাজে সক্রিয় হয়েছিলেন বলেই তাঁদের **ব্রহ্মা**র **মানসপুত্র** বলা হয়ে থাকবে।

মানস-সরোবর : ৩. কৈলাসস্থিত ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত সরোবিশেষ (প্রসিদ্ধি, মানস সরোবর রাজহংসগণের জন্মস্থান। বর্ষাকালে হংসগণ ক্রীড়ার্থ মানসে সমবেত হয়।), লবণবিশেষ, মৌনসূচিত সম্মতি, ইচ্ছা, অভিলাষ। (ব.শ.)। ৪. হিমালয়ের একটি স্থানের নাম রূপে ভ্রমণাভিলাষীদের মধ্যে প্রচলিত। ৫. দ্র. ব্রহ্মা ও সরস্বতীর **বাহন**। আমরা আগেই জানিয়েছি যে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের রীতি ছিল, 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' বিষয়কে বুঝে নিয়ে তার নামকরণ করে ফেলা এবং সাদৃশ্যে দৃশ্যলোকে সমধর্মী বস্তু বা বিষয়কে একই নামে চিহ্নিত করা। সেই রীতি অনুসরণ করে অর্জিত হয়েছিল অদৃশ্য-

লোকের **মানস-সরোবর** এবং সাদৃশ্যে হিমালয়ের একটি বিশেষ হ্রদকে **মানস-সরোবর** নামে চিহ্নিত করা হয়। ...

প্রাচীন ভারতের জ্ঞানীগুণীগণ তাঁদের চিন্তাভাবনার যে অদৃশ্য বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলে ছিলেন, সেটিই ছিল সেই 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' **মানস সরোবর**; একালে তারই একটি অতি ক্ষুদ্র অপভ্রংশ রূপকে বলা হয় think-tank। সেই **মানস সরোবরে** যাঁরা বিচরণ করতেন, সেকালে তাঁদের বলা হত **হংস** (দ্র. **বাহন**); একালে তাঁদের সম-গোত্রীয়দের উল্লেখ করতে minds of fire, wings of fire ... জাতীয় শব্দবন্ধের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ...

ভারতসমাজের ওই জ্ঞানভাণ্ডার বা **মানস-সরোবর** থেকে দুই ধরনের জ্ঞানপ্রবাহের সূচনা হয়েছিল **অধিরাষ্ট্রে**র (= হিমালয়ের) এত উঁচু হয়ে ওঠারও আগে। একটির নাম যৌথতাবাদী জ্ঞানজীবীদের জ্ঞানপ্রবাহ (= **ব্রহ্মপুত্র**), অপরটির নাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জ্ঞানজীবী-দের জ্ঞানপ্রবাহ (= **সিন্ধু**)। দৃশ্য 'হিমালয়', 'ব্রহ্মপুত্র', 'সিন্ধু'র সঙ্গে অদৃশ্য **হিমালয়, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু**র যে সমান্তরাল বিকাশ যে কত গভীর, তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ভূতত্ত্ববিদগণের গবেষণায়। তাঁরা দৃশ্য 'ব্রহ্মপুত্রের' খাদ বিচার করে প্রমাণ করেছেন, এ নদী দৃশ্য 'হিমালয়ের' উঁচু হয়ে ওঠার বহু আগে থেকেই প্রবাহিত ছিল। ... আমাদের 'জ' গ্রন্থের 'ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা' নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

মানা (মানান, মানানসই — মান্য-করা, মেনে-নেওয়া, মানা-করা) : ২. *মানা = মান-এর (উপরে* ***মান*** *দেখুন) আধার যে। মানান = মানা অন (on) থাকে যাহাতে। মানানসই = মানান সহন করে যে।* **৩. মানা** = সম্মান করান, স্বীকার করান, বশীভূত করা, বিশ্বাস করান, ভাল বাসান; মান পাওয়া, তদুপযোগী হওয়া, সুশোভন বা সুসঙ্গত হওয়া, ভাল দেখান, খাপ খাওয়া, নিবারিত হওয়া, আটক হওয়া, জড়িত থাকা। **মানান** = সুসঙ্গতি, শোভনভাব, মিল; মানত, মানসিক, মানত করিয়া প্রাপ্ত সন্তান। **মানানসই** = সুসঙ্গত, সুশোভন, সুদৃশ্য। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে সুপ্রচলিত। **৫. মানা** কথাটি এসেছে ভারি অদ্ভুতভাবে। সংস্কৃতে এটি ছিল **মান্য**; যদর্থ '**মান** থাকে যাহাতে'। বাংলাভাষী তাকে করে নিলেন '**মান**-এর আধার যে' (= **মানা**)। একই তো কথা! অথচ **মান্য**কে **মানা** করে নেওয়ায় আওয়াজটা একটু নরম হয়ে গেল। এক্ষেত্রে **মনন** করে যার যেরূপ প্রয়োগযোগ্য **মান** পাওয়া গেছে, সেটিতে বিশ্বাস স্থাপন করা, সেটিকেই স্বীকার করা ও তদনুযায়ী চলাই হয়ে গেল **মানা** বা **মান্য**-করা শব্দের অর্থ। কিন্তু এর পাশাপাশি এর ব্যঞ্জনার্থটিও ক্রমে সামনে এসে গেল — প্রাপ্ত **মান**কে স্বীকার করা, বজায় রাখা, তদনুযায়ী চলাই **মানা** শব্দের অর্থ থাকল না, সেই **মান**কে অস্বীকার না করাও **মানা** শব্দের অর্থ হয়ে গেল। ফলত **মানা** শব্দের অর্থ হয়ে গেল — (এক) প্রাপ্ত **মান**কে স্বীকার করা; (দুই) প্রাপ্ত **মান**কে অস্বীকার না-করা। এই দ্বিতীয় অর্থটিই ক্রমে নিষেধরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। 'আচরণের প্রচলিত **মান** রক্ষা করা বা **মানা**'র পরিবর্তে বলা শুরু হল — 'হাসতে **মানা**, কাঁদতে **মানা**, কথাটিও কইতে **মানা**'!

যে যে ক্ষেত্রে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ আজও নতুন শব্দ বানিয়ে চলেছেন, তার একটি হল **মান**। বাংলাভাষীরা জানেন, **মানা** শব্দটি 'মেনে নেওয়া' অর্থে যেমন প্রযুক্ত হয়, তেমনি 'নিষেধ' অর্থেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। **মেনে-নেওয়া, মানিয়ে-নেওয়া, মানতে পারা** বা **মানতি-পারা, মানামানি** ... এসবই একালের বাংলাভাষীর তৈরি করা নতুন শব্দ। এবং এগুলির কোনোটিই এখনও কোনো অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলেই মনে হয়। 'মানিয়ে নেওয়া' শব্দটি তো কোনো অভিধানেই দেখতে পাওয়া গেল না।

মানে : ২. *মান দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **৩.** অভিধেয়, অভিপ্রায়, অর্থ (meaning), উদ্দেশ্য, আশ্রয়, তাৎপর্য্য; পরিমাণে, দিবসের পরিমাণে, তুলায় ওজনে অর্থাৎ তুলনায়। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অর্থ**। **মানে** শব্দটি আমরা ব্যবহার করি এভাবে — 'অজ **মানে** ছাগল', 'গজ **মানে** হাতি', 'রামবাবুর ঐ কথার **মানে** কী?' ... ইত্যাদি। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, 'অজ'-এর **মান** গিয়ে দিশাগ্রস্তভাবে গিয়ে *ঠেকেছে* 'ছাগলে'; 'গজ'-এর **মান** গিয়ে *ঠেকেছে* 'হাতি'তে; এবং 'রামবাবুর ঐ কথা'র **মান** গিয়ে কোন বস্তুতে *ঠেকেছে*, সেটাই জিজ্ঞাস্য। **মানে** কথাটার **মানে**র ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এ যেন একরকম **বীজগণিত**-এর অঙ্ক — ক **মানে** প, খ **মানে** ফ; অতএব, ক = প, খ = ফ। অর্থাৎ ক-এর **মান** ও প-এর **মান** পরস্পরের **সমান**। এইখানে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জানলা খুলে যায় — **মানে** = **অর্থ** = meaning = money = **মানে**। ইংরেজি money শব্দের বানানটি ভাল করে দেখুন, ওকে তো **মানে**ও বলা যায়! আর meaning? দ্র. **মীন**। **৬.** ইংরেজি meaning, money ... ইত্যাদি।

মান্ধাতা : ১. মাম্ + ✓ধে + তৃ (তৃচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *'আমিত্ব'কে ধারণপূর্ব্বক তারণ করে যে।* **৩.** 'মাং ধাতা — অর্থাৎ আমাকে পান করিবে'; সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ (... অপুত্রক যুবনাশ্ব নির্ব্বেদ হেতু মুনিমণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুনিগণ যুবনাশ্বের পুত্রার্থ যজ্ঞ করিয়া মন্ত্রপূত জলকলস বেদিমধ্যে রাখিয়া নিদ্রিত হন। যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই জল পান করিয়া গর্ভ ধারণ করেন। পরে যথাকালে কুক্ষি ভেদ করিয়া শিশু নির্গত ও রাজা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে, মুনিরা কহিলেন — 'এই শিশু কাহার স্তন পান করিবে?' ইন্দ্র বলিলেন — 'এই শিশু আমাকেই পান করিবে (মাময়ং ধাস্যতি)'। এই বলিয়া ইন্দ্র শিশুর মুখে অমৃতস্রাবিণী প্রদেশিনী অর্পণ করিলে, শিশু অঙ্গুলি পান করিয়া বর্দ্ধিত হইল। 'মাময়ং ধাস্যতি' হইতে 'মান্ধাতা' (মাম্ + ধাতা) নামের উৎপত্তি। ইনি চক্রবর্ত্তী হইয়া সদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন।)। **মান্ধাতার**-আমল = মান্ধাতার শাসনকাল; (গৌণার্থে) অতিপ্রাচীন কাল। (ব.শ.)। **মান্ধাতা** = সূর্যবংশের রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। অপুত্রক রাজা যুবনাশ্ব পুত্র-কামনায় মুনিদের আশ্রমে যোগসাধনা করতে থাকেন। কালক্রমে মুনিরা এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুত্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞারম্ভ করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিবৃত্ত হলে মুনিরা মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলসী বেদীর উপরে রেখে নিদ্রা যান। স্থির ছিল যে, এই কলসীর জল যুবনাশ্বের স্ত্রী পান করলে পুত্র উৎপাদন হবে। রাজা যুবনাশ্ব পিপাসায় কাতর হয়ে মন্ত্রপূত জল নিজেই পান

করে ফেললেন। ... শতবর্ষ পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের পার্শ্ব ভেদ করে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হল। কিন্তু মাতৃ-স্তন অভাবে পুত্র কী পান করে জীবিত থাকবে — রাজা এই কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময় ইন্দ্র সেখানে এসে বললেন, এই বালক আমাকে ধারণ করবে। 'ধাস্যতি মাময়ং' অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকবে। এই কারণে এঁর নাম হল মান্ধাতা। ইন্দ্র তখন বালকের মুখে নিজের অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে দিলে বালক সেই অঙ্গুলি চুষতে লাগল।

মান্ধাতা পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী জয় করতে বের হলেন। সুমেরু পর্বতে রাবণের সঙ্গে এঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরস্পরের বলবীর্য সমান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। ... মান্ধাতা মধুর পুত্র লবণের সহিত যুদ্ধ করতে গিয়ে লবণের হস্তে নিহত হন। ... মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ((পৌ.অ.)। **৪.** শুধুমাত্র 'অতিপ্রাচীন কাল' বোঝাতে '**মান্ধাতা**র আমল' কথাটির প্রচলন এখনও একটু-আধটু আছে। **৫.** দ্র. **ইন্দ্র**। ক্ষুধাতুরের পক্ষে সামনে খাদ্য দেখতে পাওয়া অথচ তা গ্রহণ করতে না-পারার মতো শাস্তি আর হয় না। তার খাদ্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্যই দুর্ভাগ্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। '**মান্ধাতার আমল**' কথাটি সবচেয়ে মূর্খ বাংলাভাষীও কখনো-সখনো বলে ফেলেন, এবং **মান্ধাতা**র মানে সবচেয়ে জ্ঞানী বাংলাভাষীও জানেন না। কথাটি বাংলাভাষী যে ভোলেননি, **মান্ধাতা** নামের স্মৃতি যে তার এখনও আছে, সমগ্র বাংলাভাষী-সমাজেই আছে, এবং তার ভিতরে যে মানসিক-খাদ্যস্বরূপ **মানে** রয়েছে সেটি ঠিক; কিন্তু সে খাদ্য গ্রহণ করা যাচ্ছে না। পোড়া কপাল আর কাকে বলে!

যে যত লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ুক, বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পণ্ডিতই কিন্তু এই মুহূর্তে জানেন না, মানুষের সভ্যতায় ও মানবমনে সর্বপ্রথম 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে'র জন্ম হয়েছিল কীভাবে এবং কোথায়? আজ আমরা কিন্তু সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভবের ইতিহাসটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই ইতিহাসই **মান্ধাতা**র জন্মের ইতিহাস। একালের ইংরেজি-কলুষিত বাংলায় আমরা যাকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' বলি, সেকালের শুদ্ধ পৌরাণিক বাংলায় তাকেই বলা হত **মান্ধাতা**। মানুষের সমাজে, মানুষের মনে কীভাবে তার জন্ম হয়েছিল, সেকথাই উপরে ব.শ. ও পৌ.অ.-এর দেওয়া বয়ানে বলা হয়েছে; বলা হয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। সেই কাহিনীর খোসা একটু একটু করে ছাড়িয়ে নিতে পারলেই পাওয়া যাবে পুরো ইতিহাসটাই।

কার্যত, এখনও আমাদের দু'জন **ধাতা** — **বিধাতা** আর **মান্ধাতা**, 'যৌথতাবাদ' (সমাজতন্ত্রবাদ) ও 'আমিত্ববাদ' (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ)। সনাতন যুগ পেরিয়ে বৈদিক যুগে পা রাখার পর থেকে **বিধাতা** নামক যৌথতাবাদের বা অধঃপতিত সমাজতন্ত্রবাদের (বৈদিক বিধিসমূহের) রীতিনীতির অধীনে মানুষের বাঁচা-মরার সূচনা হয় এবং নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সেই যৌথতাবাদ শত শত রূপ বদল করে আজও চলছে। তার কিছুকাল পরেই জন্ম হয় **মান্ধাতার** বা 'মাম্-ধাতা'র — আমিত্ববাদের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, পুঁজিবাদের। যৌথতার গর্ভে সে জন্মায় না, স্বভাবতই যৌথতার মাতৃদুগ্ধ পান করে সে বড় হয় না, আমিত্বের (**ইন্দ্রের**) আঙুল চুষেই সে বড় হয়। তার পর থেকে **যখনই স্বাতন্ত্র্যবাদী** কোনো ব্যাপারের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলত, তাকে **উত্তর** দেওয়া হত — 'এ ব্যাপার তো **মান্ধাতার-আমল** থেকে চলে আসছে! এখন তাতে আপত্তি কেন?' কালে কালে স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে এইভাবে বলবার রীতিটি যে কোনো আদি ব্যাপারের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে শুরু করে এবং **মান্ধাতার আমল** কথাটির তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এখনও তাৎপর্যহীন ভাবে **মান্ধাতার আমল** ও 'আঙুল চোষা'র (দ্র. **অঙ্গুলী**) ব্যাপারটি যথারীতি প্রচলিত আছে, তাৎপর্য হারিয়েই। ...

তবে আজ এখানে আমরা **মান্ধাতা**র ও 'আঙুল-চোষা'র উত্তরাধিকারের সব কথা বলতে বসব না, আপাতত একটিমাত্র কথা বলে আমরা পরবর্তী শব্দে চলে যাব। কথাটি রবীন্দ্রনাথের। কথাটি হল, প্রকৃতপক্ষে মানুষের **মাং-ধাতার** (বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যবস্থার) ও **বি-ধাতার** (সামাজিক-ধাতার বা যৌথতাবাদী ব্যবস্থার) কোনো একটিকে নিয়ে মানুষের স্বাভাবিকভাবে বাঁচার উপায় নেই। সে চেষ্টা সবসময়ই মানবসভ্যতার ক্ষতি করে, করেছে। দুটি ব্যবস্থার সামঞ্জস্যেই মানুষের বাঁচা-মরা স্বাভাবিক হতে পারে। 'ততঃ কিম' জাতীয় কয়েকটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে অনেক সহজ করেই উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের একেবারে শুরুতেই আমরা সেই সামঞ্জস্যকে পৃথিবীর আহ্নিক গতির পর্যায়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। তাতে বলা হয়েছিল, 'পৃথিবীটা এমন এক নিখুঁত আত্মকেন্দ্রিকতায় ঘুরে চলেছে যে তাতেই তার সূর্যের চারদিকেও ঘোরা হয়ে যায়। এমন আত্মকেন্দ্রিকতাও অতএব সম্ভব, যাতে সার্বজনীনতার সাফল্যও নিশ্চিত হতে পারে।'

মুনি : ১. ✓মন্ + ই (ইন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মু** *(সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) গতিশীলভাবে অন (on) থাকে যাহাতে; কিংবা, অসীমায়ন সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে; অর্থাৎ, যিনি অসীমকে সীমায়িত রূপে বুঝে নিয়ে পুনরায় তাকে অসীম করে দেন বা সবাইকে বলে দেন।* ৩. মননশীল, সন্ন্যাসী, মৌনব্রতী, মননহেতু সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা, ঋষি, শাকপত্রফলমূলভোজী বনবাসী নিত্যশ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ, অগস্ত্য, ব্যাস, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, জিন, বুদ্ধ, সপ্তর্ষি, ৭ সংখ্যা, আম্রবৃক্ষ, প্রিয়াল, পলাশ, দমনক। (ব.শ.)। **৪.** sage বা hermit অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ঋষি**। **মুনি** বললে একালে সাধারণত আমরা বুঝি — এমন একটা বুড়ো গোছের মানুষ, যার মাথায় জটা চুড়ো করে বাঁধা ও দাড়িওয়ালা; যে বনে থাকে, ধ্যান করে, হাতে থাকে তার কমণ্ডলু — এইরকম। কিন্তু বস্তুত এটা হল তার দৃশ্য রূপ। অদৃশ্য যে রূপটিকে বোঝাতে আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা **মুনি** শব্দটি তৈরি করেছিলেন, তার কথা আমরা উপরে **২.**-এ বললাম।

তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বৈদিক যৌথব্যবস্থার বিপরীতে যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও পরবর্তীকালে ব্যক্তিমালিকানাবাদী বা আদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে সক্রিয় ছিলেন, সাধারণত তাঁদেরই **মুনি** বলা হত। মুনিশ্রেষ্ঠ হিসেবে যাঁদের খ্যাতি ছিল, তাঁরা প্রায় সবাই আদি পুঁজিবাদের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। এমনকি যে প্রতীকী ভাষা যৌথতাবিরোধী, **মুনিত্রয়** সেই প্রতীকী ভাষার পক্ষেই সক্রিয় ছিলেন। সবাইকে **ঋষি** বলা হত, কিন্তু সবাইকে **মুনি**

বলা হত না। **মুনিব্রত**-গ্রহণকারীরা সবাই ছিলেন **চন্দ্রে**র পক্ষে। ইংরেজি moon শব্দটিও সেকথার পক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। ৬. ইংরেজি moon।

মুনিত্রয় : ৩. পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি**।

মুনিবন, মুনিস্থল, মুনিস্থান : ৩. মুনি-অধ্যুষিত বন, তপোবন। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **তপোবন**।

মুনিবৃত্তি : ৩. মুনিবৃত্তির ন্যায় যাহার বৃত্তি, তাপসবৃত্তি, বানপ্রস্থাশ্রমী, মুনির কার্য্য। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **তাপস, বানপ্রস্থ**।

মুনিব্রত : ৩. চান্দ্রায়ণাদি তাপসব্রত। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **চন্দ্র, তাপস**।

মুনিষ : ২. *মুনির ইচ্ছা থাকে যাহাতে; অথবা, মুনির ইচ্ছা রূপায়িত করে যে।* ৩. মজুর, চাকর। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় এখনও যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **জন, জনক**। জন-করা আর **মুনিষ**-করা একই কথা। মাঠে কাজ করানোর জন্য লোক ঠিক করাকে গ্রামবাংলায় আজও '**মুনিষ**-করা' বলে। তাঁদের ভাষা-ব্যবহারে শব্দটি এভাবে প্রচলিত — 'গোপাল এখন **মুনিষ** খেটে খায়'; 'ধান কাটতে সাতটা **মুনিষ** লেগেছে'; 'মাঠে পাকা ধান পড়ে রয়েছে, জন**মুনিষ** নাই যে, ধান কেটে তোলা হবে। এদিকে রোজই বিকেলের দিকে মেঘ করছে। একবার বৃষ্টি হয়ে গেলে মাঠের ধান মাঠেই থেকে যাবে।' ... এই **মুনিষ** যে আদি **মুনি**র সঙ্গীসাথীরাই, এবং তারাই যে দু-হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজকের গ্রামবাংলার **মুনিষ**-এ পরিণত হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নাই।

মুনীন্দ্র : ৩. মুনিশ্রেষ্ঠ, মহামুনি, শিব, ভরতমুনি, জিন, গৌতম। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **শিব, গৌতম**।

মুনীশ : ৩. মুনিশ্রেষ্ঠ, বাল্মীকি, শাক্যমুনি। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **মুনি, বাল্মীকি**।

মুন্যন্ন : ৩. বানপ্রস্থের অন্ন নীবারাদি। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **বানপ্রস্থ**।

মেনকা : ১. ✓মন্ + অত (বুন্) + আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত সীমায়িতকে অন করে যে, তাহার আধারশক্তি।* ৩. অপ্সরোবিশেষ, স্বর্ব্বেশ্যা, হিমালয়মহিষী উমাজননী মেনা। (ব.শ.)। (ক) প্রসিদ্ধা অপ্সরী, শকুন্তলার জননী। ইন্দ্রের আদেশে মেনকা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেন ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র তপস্যার জন্য গমন করেন এবং মেনকাও শিশু কন্যাকে নদীতীরে ত্যাগ করে প্রস্থান করেন। (খ) ইনি উমার মাতা ও হিমালয়ের স্ত্রী। যে-সময়ে দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করতেন সেই সময় মেনকা সতীর সখী ছিলেন। তারপর সতী যখন দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করেন তখন মেনকা কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন — যেন সতী তাঁর কন্যা হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন। ... দেবী ভগবতীর বরে মেনকার মৈনাক প্রভৃতি একশত পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যাই উমা। (পৌ.অ.)। ৪. মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উমা, দুষ্মন্ত, পাষাণী, কণ্ব, বিশ্বামিত্র**। যে জনগোষ্ঠী আদিতে **অধিরাষ্ট্রে**র আধারশক্তি বা 'হিমালয়ের স্ত্রী' ছিলেন, অর্থাৎ প্রাচীন যৌথব্যবস্থার (বৈদিকব্যবস্থার) পরিচালকদের অনুগামিনী ছিলেন, আদিতে তাঁদেরই **মেনকা** বলা হত। পরে তাঁদেরই একটি অংশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সহযোগিনী হয়ে যান। তখন তাঁদের নাম হয়ে যায় **অপ্সরা-মেনকা**। '**হিমালয়-স্ত্রী' মেনকা**র থেকে উদ্ভূত হন **উমা**, আর **বিশ্বামিত্র** ও **অপ্সরা-মেনকা**র থেকে উদ্ভূত হন **শকুন্তলা**। ... আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে সেই **মেনকা** বহু খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে এবং ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হ'য়ে হ'য়ে এসে পৌঁছেছে যে দুটি রূপে তাদের আমরা যথাক্রমে 'সরকারি ঠিকাদার' (= হিমালয়-স্ত্রী **মেনকা**) ও 'বেসরকারি ঠিকাদার' (= অপ্সরা-**মেনকা**) রূপে চিনতে পারি।

মৈনাক : ২. *মেনকা হইতে জাত।* ৩. মেনকাভব, হিমালয়পুত্র পর্ব্বতবিশেষ (ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যখন পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ করেন, তখন সমুদ্রের সখা মৈনাক সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় পক্ষ রক্ষা করেন।)। (ব.শ.)। কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত। হিমাবতের এবং মেনকার পুত্র বলে এর এই নাম। পূর্বকালে পর্বতের পাখা থাকত। পাখির মতো তারা চারিদিকে আকাশপথে ভ্রমণ করত। দেবতারা ও ঋষিরা এই পর্বতদের সর্বদা ভয় করতেন। ইন্দ্র একবার ক্রুদ্ধ হয়ে সকল পর্বতের পক্ষ ছেদ করেছিলেন; কিন্তু মৈনাক পবনদেবের সাহায্যে সাগরে আশ্রয় গ্রহণ করে ইন্দ্রের আক্রমণ হতে রক্ষা পান। হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের সময় পবনদেবের উপকারের কথা স্মরণ করে তাঁর বিশ্রামের জন্য মৈনাক জল থেকে উত্থিত হয়ে হনুমানকে তাঁর উপর বিশ্রাম করতে বলেন। হনুমান তাঁকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যান। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস খুঁজতে পুরাণাদির শরণাপন্ন হলে যেসব কাহিনি আপনাকে একেবারে হকচকিয়ে দেবে, সবচেয়ে উদ্ভট মনে হবে যে ঘটনাবলীকে, বুঝবেন, সেই কাহিনীগুলিই সবচেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গতভাবে লেখা। আর সেগুলিই একালের তথাকথিত ইংরেজি-বুদ্ধির পণ্ডিতদের হাতে টেক্কার তাস, যেগুলির সাহায্যে তাঁরা প্রমাণ করেন — এই সব **পুরাণ** একেবারে গাঁজাখুরি রূপকথা মাত্র, **মিথ**, myth, mythology, **মিথ্যা**, বাজে কথায় ভর্তি। এর উত্তরে কীই-বা বলা যাবে! গ্রামবাংলা তাঁদের উদ্দেশ্যে বড়জোর বলতে পারে '**বেল** পাকলে কাকের কী!'

সময়টা খুব সম্ভব ১০০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেকার কালখণ্ড। **অধিরাষ্ট্রে**র কোলে **রাষ্ট্রে**র আবির্ভাব হয়ে গেছে, **পৃথিবী**র বাইরে কিছু কিছু **বারাণসী**র প্রতিষ্ঠাও হয়ে গেছে; **দেবরাজ ইন্দ্রের** হাতে নবযুগের পতাকা উড়তে শুরু করেছে। এই অবস্থায় এমন কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় বা অধিরাষ্ট্রীয় সংস্থার (**পর্ব্বতের**) জন্ম হয়, যেগুলি **পণ্য-বিনিময়** শুরু করে দেয়। কিন্তু এ তো **পর্ব্বতের** কাজ নয়, যৌথব্যবস্থার অংশ কেন দোকানদারি করবে? এক **পক্ষে**র কাছ থেকে কিনে অপর **পক্ষ**কে বেচবে এবং সেভাবেই কেনায় কিছু লাভ, এবং বেচায় কিছু লাভ রোজগার করে দুই **পক্ষের** (**ডানা**র) উপর নির্ভর করে **পর্ব্বত** কেন **পক্ষী**দের মতো উড়ে বেড়াবে? সেকালের **ইন্দ্রে**র চোখে এ ছিল ঘোরতর বেআইনী কাজ। একালের প্রাইভেট কোম্পানিগুলি কি মনে করে না — সরকারি সংস্থা কেন

তেল বেচবে, কয়লা বেচবে, লোহা বেচবে? এসব তো দুই **পক্ষে**র উপর নির্ভর করে সমাজ-আকাশে উড়ে-বেড়ানো **পক্ষী**দের কাজ! সেকালের **ইন্দ্র** এই অন্যায় সহ্য করেননি। **বজ্রাঘাতে** তাদের **ডানা** ছেঁটে দিয়েছিলেন। ... ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটনাটির এত বিপুল প্রভাব পড়ে যে, আজও কোনো দৌরাত্ম্যকারীকে শায়েস্তা করার জন্য তার শক্তির উৎসগুলি বন্ধ করে দিলে বলা হয়, 'ওর **ডানা ছেঁটে ফেলা** হয়েছে।' কথাটি বাংলাভাষীগণ আজও প্রায়শই ব্যবহার করে থাকেন। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও দেখা যায়, **মৈনাক** শব্দটি কিংবা **ডানা-ছাঁটা** শব্দটি ইংরেজ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়নি বটে, কিন্তু ধারণাটি তাঁরাও পেয়েছিলেন। যে কারণে, 'কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া' অর্থে ইংরেজিতে clip the wings of ... এইরকম একটি শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হয়।

মৌন : ১. মুনি + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. *মুনির সামগ্রিক আচরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে মুখে কথা বলে না (কিন্তু কাজে সেটি অবশ্যই করে)।* ৩. মুনিকর্ম্ম, যোগিচর্য্যা, তুষ্ণীম্ভাব, অভাষণ, বাঙ্‌নিয়মন, বাক্যনিগ্রহ, তুষ্ণীভূত, নির্ব্বাক, মৌনী, নিঃশব্দ, নীরব, নির্ব্যাপার। (ব.শ.)। ৪. 'কথা না-বলা'রূপ আচরণ বোঝাতে **মৌন** শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **মুনি**। সেকালের আদি **মুনি**রা যা করতেন, সমাজ-পরিচালকদের দ্বারা সেসব একশোভাগ স্বীকৃত ছিল না। ফলত তাঁরা মুখে খুব কিছু বলতেন না, চুপচাপ থাকতেন, কিন্তু যেটি ভাবতেন, সেটি নীরবে কাজে রূপায়িত করতেন। মাঝ থেকে 'চুপ করে থাকা, কিন্তু কাজে পরিণত করা' আচরণটির নাম হয়ে যায় 'মুনিরা সামগ্রিকভাবে যা করেন' অর্থাৎ **মৌন**। এমনকি, যখন বিরোধীদের কেউ ধারেকাছে আছে, কথা বলাটা ঠিক নয়, তখন তো ঐ **মুনি**রা অবশ্যই চুপ থাকতেন, এবং অনুসারীরা বুঝে নিত যে, **মুনি** যখন কথা বলছেন না, চুপ করে আছেন, তখন সেটা '**মৌন সম্মতি লক্ষণ**' ভেবে কাজে লেগে যেতে হবে; সকলের সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিস্থিতি জটিল করার দরকার নেই। বিশেষত, সেকালের **মুনিষ**রা অবশ্যই এইরকমই ভাবত।

মল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমল, অমলধবল, অমলমণি, অমলরত্ন, অমলিন, ব্যক্তিমালিকানা, মল্, মল, মলকর্ষণ, মলঘ্ন, মলজ, মলদিগ্ধ, মলদূষিত, মলদ্রাবী, মলদ্বার, মলধাত্রী, মলন, মলপঙ্কী, মলপৃষ্ঠ (মলাট), মলবাহী, মলবিশোধন, মলবিষ্টম্ভ, মলবিসর্গ, মলবিসর্জ্জন, মলবেগ, মলভেদিনী, মলমথন, মলয়, মলয়গিরি, মলয়জ, মলয়জপঙ্ক, মলয়জরজঃ, মলয়জরস, মলয়জসার, মলয়দ্রুম, মলয়বাত, মলয়বাসিনী, মলয়ভূভৃৎ, মলয়মরুৎ, মলয়রুহ্, মলয়সমীর, মলয়া, মলয়াচল, মলয়াদ্রি, মলয়ানিল, মলয়াপবন, মলয়োদ্ভব, মলয়াবাত, মলয়াবায়ু, মলয়োদ্ভব, মলশুদ্ধি, মলস্রুতি, মলহারক, মলা, মলাট, মলাপকর্ষণ, মলাপহ, মলাবহ, মলাশয়, মলি, মলিদা (মলীদহ, মালদহ, মালদা), মলিন, মলিনতা, মলিনত্ব, মলিনপ্রভ, মলিনমুখ, মলিনা, মলিনিত, মলিনী, মলিনীকরণ, **মলিনীকরণীয়**, মলিনীকৃত, মলিম্লুচ, মলীমস (মলমাস, ম্লৈ), মলোৎসর্গ, **মলোপহত**, মল্ল্, **মল্ল**, **মল্লক**, মল্লক্রীড়া, মল্লগুরু, মল্লঘটী, মল্লজ, মল্লডোর, মল্লতুর্য্য, মল্লতোর, মল্লতোড়ল (তোডরমল্ল, ভাণ্ডার ব্যবসায়ী, তোড়ার মল্ল), **মল্লদার** (মালদার), মল্লনাগ, **মল্লবিদ্যা**, **মল্লবেশ**, মল্লভূ, মল্লভূম, মল্লভূমি, মল্লযাত্রা, মল্লযুদ্ধ (নিযুদ্ধ, **নিযুদ্ধভূ**, অযোধ্যা), **মল্লরাষ্ট্র**, **মল্লশালা**, মল্লা (মুল্লা, মোল্লা), মল্লার, **মল্লারী**, মল্লি(ল্লী), মল্লিক (মালিক, বেল্লিক), মল্লিকা (মল্লক-স্ত্রী), **মল্লিকাক্ষ**, **মল্লিকাখ্য**, মল্লী, মাইলানি, মাল, মাল-আদালত, মালই, মালক, মালকা, মালকাঠ, মালকোঁচা, মালকোশ, মালকৌশ, মালখণ্ডী, মালখাজনা, মালখানা, মালগাড়ী, মালগুজার, মালগুজারি(রী), মালগুদাম, মালচক্রক, মালজমি, মালজামিন, মালঝাঁপ, মালট, মালঞ্চ, মালতি, মালতী, মালতীক্ষারক, মালতীতীরজ, মালতীপত্রিকা, মালতীফল, মালতীমাধব, মালতীমালা, মালদার, মালপুয়া, মালপো, মালব, মালবদেশ, মালবিষয়, মালবশ্রী, মালবাধীশ, মালবিদ্যা, মালবীয়, মালবেন্দ্র, মালভারী, মালভূমি, মালমাত্তা, মালমশ(স)লা, মালয়, মালয়েশিয়া, মালশাট (মালসাট), মালশী(সী), মালশ্রী, মালসা, মালসী, মালা, মালাই, মালাইচা, মালাইচাকি, মালাকর, মালাকার, মালাকারী, মালাগুণ, মালাগ্রন্থি, মালাতৃণ, মালাদীপক, মালাধর, মালানিদর্শনা, মালাম, মালামাল, মালারূপ, মালারূপক, মালি, মালিক, মালিকা, মালিকান, মালিকানা, মালিকী, মালিনী, মালিন্য (ম্লৈ), মালিম, মালিয়াৎ, মালী, মালী (মরীচিমালী, বনমালী, অংশুমালী), মালু, মালুধান, মালুবুড়ো, মালেক (মালিক), মালেকানা, মালেয়, মালোপমা, মাল্য, মাল্যকর, মাল্যকারী, মাল্যগ্রন্থন, মাল্যজীবক, মাল্যজীবী, মাল্যদাম, মাল্যবতী, মাল্যবান, মাল্যবৃত্তি, মাল্যাপণ, মাল্ল, মাল্লা, মাল্লি, মৈলান, মোলাকাত, মোলাম, মোলায়েম, মোলাহেজা, মোল্লা।

মল্ = সীমায়িতের লালন-লয়ন। **মল** = সীমায়িতের লালন-লয়ন যাহাতে।

ব্যক্তিমালিকানা : ৫. দ্র. **পশু**, **মৎস্য**, **মনুষ্য**, **মান্ধাতা**, **মালিক**। এই শব্দটির ভুক্তি ঘটানোর কারণ এই যে, এটি আমাদের বর্তমান মানবসমাজকে **ব্যতিব্যস্ত** করে রেখেছে; তাই একে বুঝে নেওয়া জরুরি। জীববিজ্ঞান অনুসারে মানুষ 'ঝাঁকপ্রাণী'। স্বভাবতই যৌথব্যবস্থা তার স্বভাবের মধ্যেই থাকে। সেই কারণে মানবসভ্যতার অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল যৌথব্যবস্থা হিসেবেই। আদি সনাতন যুগে যে যৌথব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তাতে কাজ হত যৌথভাবে, উৎপন্নের বণ্টনও হত যৌথ-মালিকানার নিয়মে। বৈদিকযুগের সূত্রপাতের পর থেকে কাজ যথারীতি যৌথব্যবস্থাতেই চলতে থাকে, কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে যৌথ-মালিকানার নিয়মের ভিতরেই জ্ঞানীদের বা **বেদজ্ঞীবী**দের বিশেষ মর্যাদার বা ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়মের ভ্রূণাকারে সূচনা হয়ে যায়। কালে কালে সেই ভ্রূণ বাড়তে থাকে। একালে আমরা যেখানে পৌঁছেছি, সে হল — কাজ হয় কমবেশি যৌথভাবেই, কিন্তু উৎপন্নের বণ্টন হয় পুরোপুরি ব্যক্তিমালিকানার নিয়মে। সমস্যার মূল সেখানেই।

আসলে ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা তার সূচনালগ্নেই বুঝে যায়, একজনের পক্ষে কোনো ব্যবস্থা চালান অসম্ভব; দরকার আরও অনেক হাতের। তখন সেই হাতগুলি ভাড়া করার প্রয়োজন হয়। ফলে, ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা অচিরেই পরিণত হয় ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক যৌথব্যবস্থায়। একালের প্রতিটি ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক সংস্থা মাত্রেই আসলে একধরনের যৌথব্যবস্থাই বটে। মানুষ 'ঝাঁক-প্রাণী' বলেই তার পক্ষে কোনোদিনই যৌথব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব। তার মানে, আধুনিক ও মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা যে এতদিন 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র নামে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা' ওড়াচ্ছিলেন, আমাদের 'ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা' বিষয়ে এত কথা বলছিলেন, সেরকম বিশুদ্ধ 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' বা 'বিশুদ্ধ ব্যক্তিমালিকানা' বলে সমাজে কিছুই হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রবিনসন ক্রুসোর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, 'বিশুদ্ধ ব্যক্তিস্বাধীনতা' অসম্ভব। আমরা দেখছি, ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাও আসলে একধরনের যৌথব্যবস্থা। তবে কিনা, এতে কাজ হয় যৌথভাবে, ফল ভাগ হয় ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়মে। একালের সমস্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই নিয়মেই চলছে।

মল (মলদ — পরিমল) : **১.** ✓মল্ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***মল*** *= পরিমিত বা সীমায়িত (সত্তা) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***মলদ*** *=* ***মল*** *দেয় যে। /* **মল** = দুর্গন্ধ করে যে। (ব.শ.)। **৩. মল** = মলবান্, মলিন, নীচ, দুষ্ট, দেবাদিপূজায় অশ্রদ্ধ, বিষ্ঠা, বসাশুক্রাদি দেহমল, রেণু, লৌহাদিকিট্ট, অসারভাগ, আগন্তুক মালিন্য, বিশুদ্ধিনাশক বা দোষনাশক দ্রব্যমাত্র, কলঙ্ক, শ্রেষ্মাদিবৎ ঘৃণার্হদ্রব্য, পাপ, যৌবনোদ্ভব পিটিকা, কর্পূর, বাতপিত্তকফ, সমুদ্রফেন, তাম্রাদি ধাতু; বলয়াকার রৌপ্যপাদভূষণবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** stool বা 'পায়খানা' অর্থে এবং 'রৌপ্যপাদভূষণবিশেষ' অর্থে **মল** প্রচলিত; **মলদ** অপ্রচলিত। **৫. ম** (সীমায়িত) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে, তাকে বলে **মল**। কিন্তু **মল** শব্দটি শুনলে আমাদের চোখের সামনে মাত্র দুটি বস্তু ভেসে আসে — মেয়েদের পায়ে পরা **মল** আর **গু**। তার মানে, পায়ের-**মলে** ও **গু-মলে** নিশ্চয় 'সীমায়িত' (= **ম**) সত্তা 'লালিত-লয়প্রাপ্ত' (= **ল**) হয়ে থাকে। কিন্তু সেটা হয় কীভাবে?

পায়ের **মল** মেয়েদের পায়ে থাকে, বিশেষত বাচ্চা মেয়েদের। তারা যখন হাঁটে তখন তার থেকে অতি মিহি ঝুন্ ঝুন্ শব্দ বা আওয়াজ হয়। আখকে সীমায়িত করার চেষ্টা করলে সে যেমন আখের তরল রসে পরিণত হয় এবং সেই রস যেমন আরও সীমায়িত হ'য়ে হ'য়ে চিনির দানায় পরিণত হয়; তেমনি শব্দকে সীমায়িত করতে শুরু করলে তা তরল সুরতরঙ্গে পরিণত হয়, এবং সেখান থেকে আরও সীমায়িত হ'য়ে হ'য়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সেই সুরধারাও চিনির দানার মতো রিন্‌রিন্, টুংটুং, ঠুন্‌ঠুন্, ঝুন্‌ঝুন্ ... প্রভৃতি সুরকণায় পরিণত হয়ে থাকে। মেয়েদের পায়ের **মল** শব্দের সেই 'সীমায়িত রূপের লালন-লয়ন' করে; তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল **মল**। দ্র. **মঞ্জীর, নূপুর**।

একই নিয়মে মানুষের পায়খানাকেও **মল** নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। দুধ যেমন সীমায়িত হ'তে হ'তে দই-ঘোল-মাখন-ঘি পেরিয়ে ঘিয়ের **গন্ধে** পৌঁছে যায়, মানুষের গৃহীত খাদ্য তেমনি সীমায়িত বা জীর্ণ হ'তে হ'তে **গু** ও **গু**-এর **গন্ধে** পরিণত হয়ে যায়। তার মানে, খাদ্যের সীমায়িত জীর্ণ রূপধারী বা জীর্ণখাদ্য-**গন্ধ**ধারী বলেই পায়খানাকে **মল** বলে। সেইকারণে ব.শ. **মল**কে বলেছেন 'দুর্গন্ধকারক'। তার মানে, যে কোনো বস্তুর সর্বোচ্চ সীমায়িত রূপের আধার মাত্রেই **মল** পদবাচ্য হতে পারে, তা সেটি শব্দের সীমায়িত রূপ হোক আর রসের সীমায়িত রূপ হোক, কিংবা অন্য কোনো কিছুর সীমায়িত রূপ হোক?!

ঠিক তাই! হতে পারে নয়, সেরকমই হয়। **মলয়, মল্ল, মল্লার, মল্লিকা, মাল, মালব, মালবশ্রী, মাল্য** প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তাকে সুস্পষ্ট দেখা যায়, নিম্নে আমরা তাদের এক এক করে দেখব। আমরা বুঝতে পারব, আমাদের সেকালের জ্ঞানীগুণী মানুষেরা জানতেন তাঁদের প্রতিটি অর্জন জগতের সমস্ত লোকে কেমন ভাবে তার শিকড়গুলি চারিয়ে রেখেছে। ফলে, একই **ভাব**কে তাঁরা উদ্ভিদজগতে, সুরলোকে, সমাজে সর্বত্র দেখতে ও চিহ্নিত করতে পারতেন। পরবর্তীকালে ইউরোপ শিল্পবিপ্লব ক'রে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৈহিক অর্জনকে বহুগুণ বাড়িয়ে নেয় বটে, কিন্তু সেই অর্জনের শিকড়গুলি তাদের কাটা পড়ে। ফলত, তাঁদের মানসলোকে অকৃত্রিম **বিশ্বের** সঙ্গে তাঁদের কৃত্রিম **বিশ্বের** সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা **মাল** বহন করতে শুরু করেন, **মালব** রাগে গান গাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না।

তবে এসব কথা জানার আগেই 'সীমায়িতের লালন' (= **মল্**) যে আমাদের বাহ্যিক উৎপন্নকেও বোঝায়, সেকথা অনেক স্পষ্ট করে জানায় পৌরাণিক **মলদ** শব্দটি। রামায়ণ জানাচ্ছেন যে, মানুষের ধান গম জাতীয় উৎপাদনগুলি যখন **পণ্য**রূপে তাদের **গন্ধ** ছড়াতে শুরু করে, তখন যে জনপদের মানুষেরা সেই **পণ্য** নিয়মিত **উৎপাদন** করত তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল **মলদ**। 'ওখানে রূপশাল ধান পাওয়া যাচ্ছে', 'সেখানে সোনামুখী গম পাওয়া যাচ্ছে' — এই **গন্ধ** সেই সময়কার যৌথসমাজের বাতাসে প্রথম ছড়াতে শুরু করে। আদতে ওই **গন্ধ** ছিল **মৎস্যগন্ধ**। আর, যৌথ-বৈদিকসমাজ তখন সে **গন্ধ**কে 'দুর্গন্ধ' বলে ঘোষণা করে রেখেছিল। তখনও ব্যক্তি-মালিকানা ভারতসমাজে বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখনও **মৎস্যগন্ধা** পরাশরের বর পেয়ে **গন্ধবতী** হননি। তাই তদ্রূপ 'দুর্গন্ধকারক' '**মল** দানকারী' জনপদের নাম হয়ে যায় **মলদ**। ... বলে রাখা দরকার, **মলদ** শব্দটিকে পাওয়া যায় রামায়ণে, পৌরাণিক অভিধান শব্দটিকে রেখেছেন তাঁর **তাড়কা** শব্দের ব্যাখ্যায়। শব্দটি অন্য কোনো অভিধানে সরাসরি ভুক্তি পায়নি। ...

কিন্তু **মল** তো একটি ক্রিয়ামূল! তার থেকে তো অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে! সেগুলিতেও তো 'সীমায়িত (= **ম**) সত্তা লালিত-লয়প্রাপ্ত হয়'! হ্যাঁ হয়। এবং এখন আমরা সেগুলিকেই দেখতে যাব। **৬.** mal-যুক্ত সমস্ত ইংরেজি শব্দ, যথা *mal*practice, *mal*nutrition, *mal*evolent ... ইত্যাদি।

পরিমল : **১.** পরি + ✓মল্ (ধারণ) + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *পরিধি জুড়ে সার্বিকভাবে সীমায়িত সত্তা লালিত-*

লয়প্রাপ্ত যাহাতে। / চন্দনকুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্যের বিমর্দ্দনোত্থিত জনমনোহর গন্ধ (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩.** সৌরভ, কুঙ্কুমচন্দনাদিমর্দ্দন, পণ্ডিতসমূহ, সম্ভোগ, মধু (অসাধু), বিমল, মনোহর ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** নামরূপে প্রচলিত। **৫.** চন্দনকুঙ্কুমাদির বিমর্দ্দনোত্থিত সৌরভ যদি **পরিমল** হয়, তবে মানবসভ্যতার সৌরভ-স্বরূপ 'পণ্ডিতসমূহ' কিংবা তাঁদের সর্বোচ্চ মানসিক অর্জন **মধু** কেন **পরিমল**-পদবাচ্য হবে না? মোটকথা, সার্বিকভাবে উঠে আসা **মল**ই **পরিমল**, তা সে যারই হোক।

মলয় (মলয়জ, মলিন — মালিন্য) : ১. ✓মল্ + অয় (কয়ন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মলয়*** *=* ***মল****-এর যাত্রা থাকে যাহাতে।* ***মলয়জ*** *=* ***মলয়*** *হইতে জাত।* ***মলিন*** *=* ***মল*** *গতিশীলভাবে অন (on) যাহাতে। /* **মলয়** = চন্দনকে ধারণ করে যে ('চন্দনধারক')। **মলিন** = যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছে। (ব.শ.)। **৩. মলয়** = চন্দনাদ্রি, দক্ষিণাচল, মলবারদেশ, নন্দনবন, উপবন, শৈলাঙ্গ। **মলয়জ** = মলয়জাত, চন্দনবৃক্ষ, চন্দনকাষ্ঠ। **মলিন** = মলযুক্ত, মলদূষিত, ধূসর, পঙ্কিল, অসিত, কলঙ্কিত, মোহগত, নিকৃষ্ট, মলচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন, কলুষিত, অমার্জ্জিত, অপকৃষ্ট, কান্তিহীন। (ব.শ.)। **৪. মলিন** শব্দটি কখনো-সখনো 'ম্লান' অর্থে প্রচলিত। **মলয়, মলয়জ** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **চন্দন, পঙ্ক, মলয়জপঙ্ক**। এখানে তিনটি শব্দ আছে, যার মধ্যে দুটি শব্দ, **মলয়** ও **মলয়জ** সুগন্ধধারীদের বোঝাচ্ছে। আর, **মলিন** শব্দটি বোঝাচ্ছে দুর্গন্ধ-ধারীদের; যদিও তিনটি শব্দই **মল্** ক্রিয়া থেকে জাত হয়েছে। তার মানে, 'সীমায়িত' (= **ম**) সত্তার 'লালিত-লয়প্রাপ্ত' (= **ল**) হওয়ার ক্রিয়াটি তিনটি শব্দের ভিতরে থাকলেও, **মলিন**-সত্তাগুলি মানুষের ও সমাজের চোখে এখনও প্রিয় নয়; কিন্তু **মলয়** ও **মলয়জ** শব্দদুটি যাদের বোঝায়, সেগুলি প্রিয় হয়ে উঠেছে। যেমন কিনা চন্দনকাঠ, চন্দনাদ্রি, দক্ষিণাচল, মলবারদেশ, নন্দনবন ... প্রভৃতি যে সকল সত্তাকে **মলয়** বলা হয়, সেগুলি সবই হয় দৃশ্য চন্দনগাছ, চন্দনগাছের বন বা পর্বতাদিকে বোঝায়, নয়তো যাঁরা **মলদ** বা **পণ্য** নিয়ে কারবার করেন, অদৃশ্য **মলয়-পর্ব্বতে চন্দ্র**লোক গড়ে তোলেন, অদৃশ্য চাঁদির গাছ বা টাকার গাছ পোঁতেন, সেই দক্ষিণাচল, মলবারদেশ ... প্রভৃতিকে বোঝায়। এখান থেকে **মলয়পবন** প্রবাহিত হলে আমাদের ভাল লাগে। এ হল টাকার গন্ধের প্রবাহ। **মান্ধাতার** আমল থেকে এই **মলয়পবনে** আমাদের 'আমি'ত্বের 'আঙুল-চোষা' মন বড়ই তৃপ্ত হয়।

তাই বলে বৈদিক **অধিরাষ্ট্র** কিন্তু এই **মলয়**চারিতাকে আদৌ ভাল চোখে নেয়নি। সে ঘোষণা করেছে — বেদবিহিত 'নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া ত্যাগ' করে যে **মল**-এর সাধনায় লিপ্ত হয়েছে, সে অবশ্যই **মলিন**। ফলে বহু **মুনিই মলিন** হয়ে যান। কিন্তু কালে কালে শাসক-আরোপিত এই **মলিনতা** মানুষ ঝেড়ে ফেলে বটে, কিন্তু অভ্যাসে বোধটি থেকে যায় যে, বস্তু-মাত্রেই **মলিন** হতে পারে, তা সে বাহ্যবস্তু হোক আর মানসবস্তুই হোক। তাই আজও আমাদের বস্ত্র যেমন **মলিন** হয়, মনও **মলিন** হয়; সৃষ্টি হয় মনো**মালিন্য**-র। সন্দেহ নেই, এই **মলিনতা** আমাদের ভাল লাগে না। এই **মল** আমাদের পক্ষে গ্রাহ্য নয়।

মলা (মলাট) : ২. ***মলা*** *=* ***মল****-এর আধার যে।* ***মলাট*** *=* ***মলা*** *টঙ্কারিত যাহাতে।* **৩. মলা** = মল, ধূলি, বিষাদ, দুঃখ, পাপ। **মলাট** = পুস্তকের মলাপহারক বহিরাবরণ (cover)। (ব.শ.)। **৪.** 'মর্দ্দন'-জাত **মলা** শব্দটি **'কানমলা'**, **'দলাইমলাই'** ... ইত্যাদি রূপে প্রচলিত থাকলেও **'মল-এর আধারস্বরূপ' মলা** শব্দটির প্রচলন রয়েছে একটিমাত্র শব্দে; **সেটি হল মলাট**। তবে cover-এর আক্রমণে তার এখন প্রায় ধরাশায়ী অবস্থা। যাঁরা বইয়ের **মলাট** ছাপেন, তাঁরাও আজকাল **মলাট** বলেন না, cover বলেন। **৫.** সত্তার সবচেয়ে সীমায়িত বাস্তব রূপকে যদি দেখতে চান, ঘরের ভেতরে গবাক্ষপথে সূর্যকিরণ পড়তে দিন, দেখবেন কত লক্ষ সূক্ষ্ম ধূলিকণা ঘরের বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেগুলি সবই কোনো না কোনো সত্তার সর্বোচ্চ সীমায়িত রূপ বা **মল**। একে **ত্রসরেণু**ও বলা হয়। এই **মল**-এর আধারকে **মলা** বলে। এই **মলা**র বাজে স্বভাব হচ্ছে, বই অব্যবহৃত থাকলেই সে গিয়ে তার ওপরে পড়ে। এভাবে একদিকে বইটিকে **মলা**যুক্ত করে এবং অন্যদিকে প্রমাণ করে যে, বইটির প্রভু দীর্ঘকাল বইসঙ্গ করেননি। বইয়ের প্রতি তার প্রভুর এই অবহেলা চাপা দিতে এবং বইয়ের প্রতি **মলার** এই আকর্ষণ ঠেকাতে **মলাট** আবিষ্কৃত হয়। **মলা** পড়বি তো পড়, **মলাটে**র ঘাড়েই পড়!

এখন দিন বদলেছে। **মলাট**ও এখন দিন দিন ফুলবাবু হচ্ছে, কাঁচা **কার্ত্তিক** সাজছে, টেরি কাটছে, চোখ ধাঁধানো জামাকাপড় পরছে; আর তাতে মেখে নিচ্ছে বইয়ের ভিতরের **মধু-গন্ধ** বা 'সেন্ট্'। সেই **গন্ধ**ই তো যথার্থে বইটির **মল**। ফলে এখনকার দিনের **মলাট** ক্রমশ সর্বৈব যথার্থক হয়ে উঠছে। তাকে আর শুধুমাত্র cover বলা উচিত হবে কিনা, এবার ভেবে দেখা দরকার।

মলাট নিয়ে এত কথা বলার কারণ হল, আমরা দু'জন যা চাই, **মলাট** শব্দের ক্ষেত্রে সেটিই করতে পারা যাচ্ছে। তা হল, বাংলার অতীতকে উদ্ধার ক'রে তাকে এমনভাবে একালীকরণ করা, যাতে তা সবচেয়ে অগ্রণী দেশী-বিদেশী সমস্ত ধারণাকে ছাড়িয়ে যায় এবং আমাদের সর্বগ্রগণ্য দেশ ও জাতি হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মল্ল (মল্লযুদ্ধ, মল্লভূম, মাল, মাল্লা) : ১. ✓মল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মল্ল*** *=* ***মল্****কে লয় করে যে। /* **মল্ল** = বল ধারণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. মল্ল** = বলবান, বাহুযোধী, মাল, সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষ, বলী, শূর, অসুরবিশেষ, মৎস্য-বিশেষ, পাত্র, দেশভেদ, কপোল, তদ্বিষয়ে পণ্ডিত। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অরণ্য, জঙ্গল, জাঙ্গল, বনমালী, মল**। যে 'সীমায়িতের লালন' (= **মল্**) অন্যকে 'লয়' (= **ল**) করে, তাকে **মল্ল** বলে। তবে কিনা, এই **মল্** শব্দের বা 'জীর্ণখাদ্যে'র **মল্** নয়, এ হল **মলদ**-এর **মল্**; যার ভিতরে রয়েছে **মৎস্যগন্ধ**, বস্তুর বা এলাকার উপর মালিকানার **গন্ধ** বা বোধ। এই বোধও **মল্-গন্ধ** রূপে সক্রিয় হয় মানুষের মনে; সে মালিকানার **'গন্ধধারক'** হয়ে যায়। ব.শ. তাকেই বলেন 'বলধারক'। সে তখন ঘোষণা করে 'জোর যার, **মুল্লুক** তার'। শুরু হয়ে যায় **মল্লযুদ্ধ**। যে ভূমি বারংবার 'জোর যার **মুল্লুক** তার' নীতিতে হাতবদল হতে থাকে, তার নাম হয়ে যায় **মল্লভূম**। কালে কালে সেই **মল্ল**-এর নাম হয়ে যায় **মাল**, এবং তাদের সেই **মল্লভূম**-

এর পরিণতি হয় **মালভূমি**তে। শুধু কি তাই, কালের ফেরে একদিন **মল্ল**রাই গিয়ে শুরু করে মাঝির সঙ্গে সহকারীর কাজ। তখন তাদের নাম হয়ে মাঝি-**মাল্লা**। এই **মাল্লা**দের অধিকাংশই ছিল 'সাধব'। সেকালে বড় ব্যবসায়ীদের 'সাধু' ও তাদের কর্মচারীদের 'সাধব' বলা হত। মধ্যযুগের **গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল** ও চাঁদ সদাগরদের গৌরবজনক নৌবাণিজ্যের অধিকাংশ স্মৃতিই আজ বিলুপ্ত, টিমটিম করে উড়িষ্যার কটকের 'বালিযাত্রার মেলা' সেই মধ্যযুগীয় বাণিজ্যের স্মৃতি বহন করে আজও এক সামাজিক জীবাশ্মরূপে টিকে রয়েছে।

মল্লার (মল্লারী — মল্লকৌশিক, মালকৌশ, মালবশ্রী বা **মালশ্রী)** : ১. মল্ল + ✓ঋ + অন্ - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***মল্লার*** = *মল্-লয়নের আধার রহে যাহাতে।* ***মল্লারী*** = ***মল্লার****-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **মল্লার** = রাগবিশেষ। **মল্লারী** = বসন্ত-রাগের রাগিণী। (ব.শ.)। ৪. সঙ্গীতচর্চাকারীদের মধ্যে প্রচলিত। ৫. **মল্লার** ... ইত্যাদির ক্ষেত্রে **মল্লযুদ্ধ**টা আর মালিকানা নিয়ে নয়, অতএব গায়ের জোর নিয়েও নয়। এখানে রয়েছে রাগ-রাগিণীর জোর, সুরতরঙ্গের **মল্** লালন বা লয় করে দিচ্ছে অন্য কোনো রাগ-রাগিণীকে; তাই **মল্লার, মল্লারী, মল্লকৌশিক** ... ইত্যাদি। কিন্তু কোন রাগ-রাগিণীর কাছে কোন রাগ-রাগিণী কোন কৌশলে কেন হার মানে, সেসব বিষয়ে আমরা দু'জন কিছুই জানি না। কিন্তু শব্দগুলি বলছে, এখানে **মল্**-রূপী, **মল্ল**-রূপী রাগ-রাগিণীর হার-মানামানি অথবা জেতাজিতি আছে। সঙ্গীতজ্ঞগণ বিষয়টি নিশ্চয় ভাল করে বলতে পারবেন।

মল্লিক : ২. ***মল্ল****-কে গতিশীল করে যে।* / **মল্লিক** আখ্যা যাহার। (ব.শ.)। ৩. মলিনচঞ্চুচরণ মল্লিকাপুষ্পবৎ শ্বেতাপাঙ্গ হংসবিশেষ; উপাধিবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. পদবীরূপে প্রচলিত। ৫. **মল্লিক** তো **মল্ল**কে গতিশীল করবে বটে, কিন্তু কোন **মল্ল**কে? যে যদি জ্ঞান**মল্ল** হয়, তবে বুঝতে হবে, তার উপাধিটি প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের দেওয়া। সে নিশ্চয় শ্বেতাপাঙ্গ হংসবিশেষই হবে। (দ্র. **বাহন**)। আর সে যদি বল**মল্ল** বা ধন**মল্ল** হয়, তাহলে তার **মল্লিক** উপাধিটি মুঘল-পাঠান শাসনকালে অর্জিত। যাঁদের মনে আরবি ভাষার 'মলিক' ('সেখ সৈয়দ মুঘল পাঠান / উসকে নীচে মলিক গুলাম') উপাধির কথা উঁকিঝুঁকি মারছে, তাঁরা **মাল্য**াগত **মাল** শব্দে পৌঁছে বুঝে যাবেন, আরবির **মাল** ও বাংলার **মাল** আসলে একই **মাল**। এককালে উভয় দেশের মাটিতেই এই **মাল** শব্দটি ফলত।

মল্লিকা (মল্লি, মল্লী — মধুমল্লি, মধুমল্লী) : ১. মল্লি + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***মল্লিকা*** = ***মল্ল****-কে গতিশীলকারিণী যে।* ***মল্লি*** = ***মল্ল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***মল্লী*** = ***মল্লি****র আধার যে।* ৩. **মল্লিকা** = পুষ্পলতাবিশেষ, বেলিগাছ, মল্লিকাপুষ্প, মৎস্যভেদ, মৃৎপাত্রবিশেষ। **মল্লি, মল্লী** = মল্লিকালতা, মল্লিকাপুষ্প। **মধুমল্লি, মধুমল্লী** = মধুপ্রচুরবল্লী, মালতী। (ব.শ.)। ৪. মেয়েদের নামরূপে **মল্লিকা** প্রচলিত। ৫. দ্র. **মল, মল্ল, মধু**। এখানেও কিন্তু যুদ্ধ রয়েছে, তবে সে আরেক ধরনের যুদ্ধ। যে ফুলের সাদা রং মুক্তার সাদা রংকেও হার মানায়, সেই **অতিমুক্ত** ফুলকেও যেমন **মল্লিকা** বলে, তেমনি যার গন্ধ অন্য সমস্ত ফুলের **গন্ধ**কে হার মানায় তাকেও **মল্লিকা** বলে। এবং **চম্পা** বা **চাঁপা**র মতো এই **মল্লিকা** কারও টুস্‌কির অপেক্ষা রাখে না, নিজের স্বভাববশতই প্রস্ফুটিত হয়ে সারা এলাকা রূপে গন্ধে মাতিয়ে রাখে। এদের মধ্যে আবার সবার উপর দিয়ে যায় **মধুমল্লিকা** বা **মধুমল্লি** বা **মধুমল্লী**। কেননা, সে তো **মল্লিকা** বটেই, **মধু**ও বটে! দ্র. **মধু, মালতীলতা**।

মাল : ২. ***মল*** *হইতে জাত।* / যিনি লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন ('লক্ষ্মীগ্রাহক')। (ব.শ.)। ৩. পার্ব্বতীয় অসভ্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, বাহুযোধী, বিষ্ণু, উন্নত ভূতল, ক্ষেত্র, গ্রামসমীপস্থ বন ...; সাপুড়িয়া, বেদে; মাল্য; ধন, টাকা, গহনা-গাঁটি, দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য (goods), উপাদান, সারদ্রব্য ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. **মান** শব্দের মূলে যেমন **মন** রয়েছে এবং তা চাররকম ভাবে প্রতীকী হওয়ার চেষ্টা করেও হতে পারেনি (কারণ প্রতীকী হতে হলে মাত্র একরকম ভাবে হতে হয়), **মাল** শব্দের অবস্থাও সেইরকম, বরং তার চেয়ে একটু খারাপ। এরও মূলে রয়েছে **মল**, এবং তা একরকম জাতি (**মল্ল** > **মাল**) হিসেবে, একরকম ভূমি (**মাল**-ভূমি) হিসেবে, ফুলের মালা (**মাল্য**) হিসেবে এবং **পণ্য**দ্রব্যাদি (**মাল**-পত্র) হিসেবে প্রতীকী হওয়ার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে আবার আরবি এসে দাবি করেছে যে, **মাল**-পত্রের **মাল**টি আমাদের এবং অধিকাংশ বাংলা অভিধানকার ও শব্দকোষকারগণ সে দাবি মেনে নিয়েছেন। মেনে নেওয়ার একটি বাস্তব কারণ এই যে, আমাদের মধ্যযুগীয় পূবপুরুষেরা যে দ্রব্যাদিকে **মাল** বলতেন, আগন্তুক আরবিতেও সেগুলিকে **মাল** বলা হত। আরবি তখন রাজা বা পুরুষ, বাংলা তখন প্রজা বা প্রকৃতি। সন্তানের উপর পুরুষের অধিকার আগে থেকেই সর্বত্র স্বীকৃত। অতএব **মাল**-এর পিতৃত্ব চলে যায় আরবির হাতে। ফলত, অভিধানগুলিতে একই **মাল** শব্দের অন্তত চারবার ভুক্তি ঘটাতে হয়েছে এবং শেষবার বলতে হয়েছে যে, এটি আরবি থেকে আগত শব্দ। ...

তা সে যাই হোক, আজ আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি, এরা সকলেই মূলত **মল্** ক্রিয়ামূলের বংশে জাত শব্দসমূহের মধ্যেই পড়ে। তাছাড়া '**মল হইতে জাত**' মাত্রেই যে **মাল** হয়, সেকথা বাংলাভাষার অধিকাংশ পাঠকই এতদিনে জেনে ফেলেছেন। ... দ্র. **মালা, মাল্য**। ৬. ইংরেজি (shopping) mall, mall rat।

মালতী (মালতীলতা, মালতীমাধব) : ১. ✓মল্ + অত (অতচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মালতী*** = ***মাল*** *(**মল** হইতে জাত) তারিত হইয়া থাকে যে আধারে।* ***মালতীলতা*** = ***মালতী*** *তারিত হইয়া থাকে যে আধারে।* ***মালতীমাধব*** = ***মালতী****র* ***মধু*** *বহন করে যে।* / **মালতী** = যাহা সৌরভ ধারণ করে; যাহা বিষ্ণুকে পায়। (ব.শ.)। ৩. **মালতী** = পুষ্পলতাবিশেষ, জাতি (জয়িত্রী), মালতীপুষ্প, কুট্মল, কোরক, (সাদৃশ্যে) জ্যোৎস্না, যুবতি, নিশা, নদীবিশেষ, ভবভূতিকৃত 'মালতীমাধব', মালতীবৎ শুভ্র মিষ্টান্নবিশেষ। **মালতীমাধব** = ভবভূতিকৃত মালতীমাধববিষয়ক প্রকরণ। (ব.শ.)। ৪. মেয়েদের নামরূপে **মালতী** শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **বাসন্তী,**

অতিমুক্তক, মাধবী, মাধবীলতা, মল্লিকা। মূল অর্জন দুটি — **মধু** ও **মল**। প্রথমটিতে **শিবের, ব্রহ্মার, সরস্বতীর** অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়টিতে **বিষ্ণুর** ও **লক্ষ্মীর** অধিষ্ঠান। তাঁদেরই 'চরণচিহ্ন' কুসুমে কুসুমে পড়ে। যৌথতার যুগে **মাধবীলতার** স্থান ছিল উপরে, **মালতীলতার** স্থান ছিল নীচে। স্বাতন্ত্র্যের যুগে **মালতীলতার** স্থান উপরে, **মাধবীলতার** স্থান হয়েছে নীচে। এখন **মধুমাধব** কিংবা **মধুমাধবী**দের তেমন কদর নেই, এখন **মালতীমাধব**দের রমরমার যুগ। কিন্তু স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সনাতন ধারণায় কোনো ভেদ দেখা যায় না। তাতে **মধুমল্লিকা, মধুমালতী, মধুমাধব, মালতীমাধব** ... সবাই যেন একাকারে বাস করে!

মালব (মালবশ্রী): **২.** ***মাল*** *বহন করে যে।* **৩. মালব** = মধ্যভারতস্থ দেশভেদ, অবন্তী, মালবরাজগণ, অবন্তিবাসিগণ, রাগবিশেষ। **মালবশ্রী** = মালশ্রীরাগিণী। (ব.শ.)। **৪.** রাগ-রাগিণীর নাম হিসেবে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **মল, মল্লকৌশিক, মাল, মালশ্রী**। বৌদ্ধযুগে আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা যখন বিশ্বের আদি শিল্পবিপ্লব সমাধা করেন, তখন তাঁরা সেটি করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যথাপূর্বং বজায় রেখেই। **মালবদেশ**, যার রাজধানী ছিল **উজ্জয়িনী**, সেখানে **পণ্যের উজান** শুরু হয়েছিল। একই সঙ্গে তাঁরা **মালব** রাগে ও **মালবশ্রী** বা **মালশ্রী** রাগিণীতে সুরসাধনাও করতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে, এগুলি যে এক সূত্রে গ্রথিত, সেকথা আজ আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আজকের পণ্যজীবী **মাল** বহনকারী **মালব** বটে, কিন্তু যান্ত্রিকতার অতিসাধনা তাকে **মালশ্রী** বা **মালবশ্রী** অর্জন করা থেকে লক্ষ যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে।

মালয় (মালয়েশিয়া) : **২.** ***মলয়*** *হইতে জাত; কিংবা,* ***মাল****-এর যাত্রা থাকে যাহাতে।* **৩. মালয়** = মলয়সম্বন্ধী, মলয়গিরিস্থিত, মলয়াদ্রিসম্ভব, চন্দনবৃক্ষ, চন্দনপঙ্ক, মলয়দ্বীপ। (ব.শ.)। **৪. মালয়েশিয়া** প্রচলিত, যদিও দেশটি কয়েকটি খণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে এবং সম্প্রতি তাদের নামকরণেও কিছু কিছু বদল ঘটেছে। **৫.** দ্র. **মলয়**। আমাদের তো মনোলোকের বিশেষ বিশেষ ভূমির নামকরণের অভ্যাস, সাদৃশ্যে যদি কোনো ভৌগোলিক দেশকে সমস্বভাবের দেখতে পাওয়া যায়, তারও একই নামকরণ করাই ছিল আমাদের ভৌগোলিক নামকরণের রীতি। সেই রীতিতে মনোলোকেরই একটি দেশের নাম দেওয়া হয়েছিল 'মলয়দ্বীপ'। পুরাণাদিতে সেই 'মলয়দ্বীপ'-এর কথাই আছে; কিন্তু তার বাস্তব কোনো অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে আমরা দেখছি, ভারতীয় সংস্কৃতি গিয়ে গেড়ে বসেছে সেকালের **ব্রহ্মদেশে**, যে সংস্কৃতি ভারতের পূর্বে জাপান পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। সেই অঞ্চলের একটি অংশের নাম হয় **মালয়দেশ** বা **মালয়েশিয়া**। আমাদের মনে হয়, চাঁদ সদাগরের যুগে বা তার আগে পরে ভারতের **পণ্য**সম্ভার সেখানে যেত বলেই তার নাম হয়ে যায় **মালয়**। অন্তত **মালয়** শব্দটির নিহিতার্থ সেকথাই বলছে। দ্র. **মল্ল**।

মাল্য (মালাকর, মালাকার, মালিক, মালিকানা, মালী, মাল্যকার, মাল্যকারী, মাল্যবান্) : **১. মাল্য** = ✓মল্ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***(মাল*** *=* ***মল*** *হইতে জাত)।* ***মালা*** *=* ***মাল****-এর আধার যে।* ***মালাকর*** *=* ***মালা*** *করে যে।* ***মালাকার*** *=* ***মালা*** *করণ যাহার।* ***মালিক*** *=* ***মাল****-কে গতিশীল করে যে।* ***মালিকানা*** *=* ***মালিক*** *অন (on) যাহাতে তাহার আধার অনকৃত যে আধারে।* ***মালী*** *=* ***মাল****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মাল্য*** *=* ***মাল*** *থাকে যাহাতে।* ***মাল্যকার*** *=* ***মাল্য*** *করণ যাহার।* ***মাল্যকারী*** *=* ***মাল্যকার****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মাল্যবান*** *=* ***মাল্য*** *বহন অন (on) যাহাতে।* / **মালা** = মস্তকে ন্যস্ত (যে) পুষ্পদাম; (গৌণার্থে) মস্তকভিন্ন অবয়বে বা অন্যত্র ন্যস্ত (যে) পুষ্পদাম। **মালী** = যাহারা ফলফুলের বাগান করে। (ব.শ.)। **৩. মালা** = শোভাধারিণী, মাল্য, মালাকারে গ্রথিত বস্তুমাত্র, জপার্থ মাল্য, জপমালা, হার, শ্রেণী, লেখা, রেখা, সমূহ, নিচয়, ক্রম, পর্য্যায়, (অলঙ্কারে) অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অনেক কার্য্যজ্ঞাপন। **মালাকর, মালাকার** = বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ, মালিক, মালী (বিশ্বকর্ম্মা হইতে শূদ্রার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। মতান্তরে তৈলিকীর গর্ভে জাত কর্ম্মকারপুত্র। **মালিক (মালেক)** = মালানির্ম্মাণশিল্পী, মালাকার, পুষ্পমাল্য, পক্ষিবিশেষ; স্বামী, অধিকারী (owner), প্রভু, মনিব (master), ভূস্বামী (landlord), কর্ত্তা, নিয়ন্তা। **মালিকা** = মাল্য, শ্রেণী, গ্রীবালঙ্কার, হার, নবমালিকা, কন্যা, ক্ষুমা, তিসী (ইহার ডাঁটায় মালা হয়।), মালাতুল্য প্রাসাদ, সুরাভেদ, পক্ষিবিশেষ। **মালিকান, মালিকানা** = স্বামীগত (proprietary), প্রজার নিকটে মালিকের প্রাপ্য দস্তুরী, স্বামীত্ব, স্বত্ব। **মালী** = মালাবান, মালাযুক্ত, মালারূপে তত্তদ্‌বস্তুবিশিষ্ট, শ্রেণীমান, পঙ্‌ক্তিযুত, হারযুক্ত, মালাবিক্রয়ী জাতিবিশেষ, মালাকার। **মাল্য** = মস্তকে ধার্য্য, মস্তকে পরিধেয় পুষ্পদাম, মালা, মালামাত্র, পুষ্প। **মাল্যকার, মাল্যকারী** = মালাকার। **মাল্যবান** = মালাযুক্ত, মালাশোভিত, দাক্ষিণাত্যস্থ পর্ব্বতবিশেষ (ইহা ইলাবৃত ও কেতুমাল বর্ষের সীমাপর্ব্বত।), রাবণের মাতামহ সুমালীর ভ্রাতা। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ব্যক্তিমালিকানা, মল, মাল, পুষ্প, পণ্য**। বৌদ্ধযুগের সময় থেকে আমাদের দুটো সুস্পষ্ট সমান্তরাল ধারা ছিল — **পণ্য** উৎপাদন, গ্রন্থন (একালে যাকে বলা হয় 'প্যাকেজিং'), বিন্যাসের ও উপস্থাপনের ধারা; এবং **ফুল** উৎপাদন, গ্রন্থন, বিন্যাসের ও উপস্থাপনের ধারা। এই সংক্রান্ত সমস্ত শব্দগুলি অদৃশ্য **পণ্যের** ধারাটিকেই বোঝাতে তৈরি করা হয়েছিল এবং সাদৃশ্যে সেগুলি দৃশ্য **পুষ্পের** ধারাটিকেও বোঝাতে পারত। ফলত, **মাল্য, মালাকর, মালাকার, মালিক, মালিকানা, মালী** ... একই সঙ্গে **পণ্য**মালা ও **পুষ্প**মালা উভয় ধারার সত্তাদের বোঝাত। গরুছাগলের হাটে দেখা যেত, একদামের দশ-বারোটি গরুকে একটাই লম্বা দড়িতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মালার মতো বেঁধে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য। এরই আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে 'পাউচ'-এর মালায়। যেকারণে ব.শ. বলছেন, মালী সেই জিনিস, যা কিনা 'মালারূপে তত্তদবস্তুবিশিষ্ট'। অর্থাৎ সেটি ফুলের মালা হতে পারে, শ্যাম্পুর পাউচের মালা হতে পারে, পান-মশালার পুরিয়ার মালা হতে পারে ... এমনকি গরু-ছাগলেরও মালা হতে পারে। তবে বিন্যাস ও প্যাকেজিং-এর এই আদি রূপটির এখন

বিস্তর বদল ঘটে গেছে। ... এর মধ্যে আরবির **মাল**-এর **মালিক** এসে একটু ধ্যানভঙ্গ করে দেয় বটে, কিন্তু তাতে খুব কিছু অসুবিধা হয় না; কারণ সেও তো একই বংশের ছেলে। ...

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, পাশ্চাত্য দেশ এই **পুষ্প-পণ্যে**র কোনো উত্তরাধিকার পায়নি। খোদ ইংরেজিতেই দেখুন না, যে **পুষ্প** বা **পণ্য** প্রবাহিত হয়ে নিম্নগামী হয়ে অভাবীদের দেশে চলে যায়, তাকে ইংরেজ বলেন flower। কেউ কোনোদিন জানতে চায়নি, কেন তাঁরা **পুষ্প**কে flow শব্দের সঙ্গে এরকম জুড়ে রেখেছেন।

মালিনী : ৩. মাল্যযুক্ত, মালারূপে তত্তদ্‌বস্তুবিশিষ্ট ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। (এটি একটি পৌরাণিক নদীর নাম।) এই নদী হিমালয়ের নিকট প্রবাহিত। এরই তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ছিল। এখানে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কণ্ব, তপস্যা, তপোবন**। এই তিনটি শব্দ থেকেই বোঝা যায়, **অধিরাষ্ট্রে**র কাছেই (হিমালয়ের নিকট) গড়ে উঠেছিল আদি কারুজীবীদের হস্তশিল্পজাত **পণ্যে**র উৎপাদনকেন্দ্র (**তপোবন**) এবং তার পাশ দিয়েই প্রবাহিত হত সেই **মাল** নিয়ে প্রবাহিত **পণ্য**ধারা বা **মালিনী** নদী। এ যে কষ্টকল্পনা নয়, পাঠকপাঠিকা একবার এতৎ সংক্রান্ত পৌরাণিক বয়ানের শব্দগুলি ধরে ধরে তাদের ক্রিয়াভিত্তিক বর্ণভিত্তিক অর্থ বুঝে বুঝে এগোলেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যাবেন; কারও সাহায্য লাগবে না।

মালী (মাল্যবান, সুমালী) : ২. *মাল-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. ... মাল্যবান গ্রামণী নামে গন্ধর্বের কন্যা বেদবতীর গর্ভে এবং সুকেশ রাক্ষসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। ... মাল্যবান, মালী ও সুমালী সুমেরু পর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী, প্রভুত্বশালী, ও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং ত্রিলোকের উপর উৎপীড়ন করতে থাকে। এদের অনুরোধেই বিশ্বকর্মা ত্রিকূট পর্বতের উপর লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেন। নর্মদা নামে এক গন্ধর্বীর তিন কন্যার এক কন্যা সুন্দরীকে মাল্যবান বিবাহ করেন। অপর দুই কন্যা কেতুমতী ও বসুদাকে সুমালী ও মালী বিবাহ করেন। মাল্যবান ও সুন্দরীর বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতি পুত্র হয়। ... নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে মালী নিহত হয় এবং মাল্যবান ও সুমালী লঙ্কা ত্যাগ করে সস্ত্রীক পাতালে আশ্রয় নেয়। লঙ্কা-যুদ্ধের সময় মাল্যবান রাবণকে সদুপদেশ দিয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে বলে; কিন্তু রাবণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। ... মাল্যবান, সুমালী ও মালী বিভীষণের অমাত্য ছিল। ... (পৌ.অ.)। ৪. **সুমালী** অপ্রচলিত, **মাল্যবান** 'মালাযুক্ত' অর্থে এবং **মালী** বাগানের 'মালী' রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **দামিনী, নিকষা, মাল**। **নগদ নারায়ণ** যখন ভারতসমাজে **রাম** রূপে অবতীর্ণ, সেই বৌদ্ধযুগে **রাবণ**-এর ভাই **বিভীষণ** কেন সেই **রামে**র সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন? যে সকল কারণের উপর **বিভীষণ** এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার একটি অন্যতম কারণের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে এই **মাল্যবান, সুমালী** ও **মালী** নামের তিন ভাই। এই **মালী**র আধারশক্তি ছিলেন **বসুদা**। আর এঁরাই ছিলেন **বিভীষণে**র অমাত্য। তার মানে, যৌথসভ্যতার ভিতরে যারা নিম্ন মানের **পণ্য**বাদী ছিলেন, এঁরা তাঁরাই। এঁদের উপরই নির্ভর করতেন **বিভীষণ**। অর্থাৎ, **বিভীষণ** যৌথব্যবস্থার কেন্দ্রে (লঙ্কায়) থাকলেও ভিতরে ভিতরে **পুঁজি**র পক্ষের লোক ছিলেন। তবে **বিষ্ণু** কর্তৃক **মাল্যবান**দের হত্যা কিন্তু পরস্পরবিরোধী ব্যাপার নয়। সব কালে সব দেশেই সেকেলে পুঁজিকে আধুনিক পুঁজি নির্মমভাবে হত্যা করে তবেই এগিয়েছে। সেকারণেই তো **অর্জুন খাণ্ডবদহন** কালে **নাগ**দের নাশ করেন, সেকারণেই তিনি **কর্ণ**বিরোধী, এবং এরকম ঘটনা পুরাণাদি গ্রন্থে অজস্র রয়েছে। ...

পরে অবশ্য এই সব **মালদার মাল্যবান**দের কথা বাংলাভাষীরা ভুলে গেছেন, মনে থেকেছে শুধু বাহ্যিক ফুলের বাগানের **মালী** ও **মালিনী**রা। কিন্তু সে **মালী**ও এখন খুব বেশি নেই। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও বাংলার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে এক-দু'জন করে **মালী** থাকত, এখন তাদের জায়গায় 'bearer' থাকেন। কেন? **মালী** কি খুব খারাপ কথা? bearer তার তুলনায় ভাল কথা?

মহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমহিমা, ভঁইষ, ভইষ, ভক্রিস, ভক্রিসা, ভৈঁষ, ভৈঁষা, ভৈঁস, ভৈস, মইষ, মচ্ছব, ময়াল (মহাল, মহাকাল), ময়ালি, মরাঠা (মহারাষ্ট্র), মরাঠী, মশাই, মশায়, মসিল (মহশীল), মহ্, মহ, মহঃ, মহকুমা, মহৎকুল, মহড়া (মোহড়া), মহৎ, মহৎকন্দ, মহৎকপর্দ্দ, মহৎকপিত্থ, মহৎকর, মহৎকর্ম্মা, মহৎকলা, মহৎকল্প, মহৎকবি, মহৎকার্ত্তিকী, মহৎকীর্ত্তি, মহৎকুমার, মহৎকুল, মহৎকুষ্ঠ, মহৎকৃচ্ছ্র, মহৎকৃষ্ণ, মহৎকেশ, মহৎকোশ, মহৎকোশী, মহৎক্রতু, মহৎক্রম, মহৎখর্ব্ব, মহৎখাত, মহৎগণ, মহৎগদ, মহৎগল, মহৎগব, মহৎগারুড়ী, মহৎগীত, মহৎগুণ, মহৎগৌরী, মহৎগ্রহ, মহৎঘূর্ণা, মহৎঘৃত, মহৎঘোর, মহৎঘোষ, মহৎচক্র, মহৎচক্রবর্ত্তী, মহৎচণ্ড, মহৎচণ্ডা, মহৎচমূ, মহৎজব, মহৎজল, মহৎজ্ঞানী, মহৎজ্যোতিষিক, মহৎডীন, মহত্তত্ত্ব, মহত্তম, মহত্তর, মহত্ত্ব (মহৎ-ত্ব), মহৎতপাঃ, মহৎতল, মহৎতিক্ত, মহৎতিথি, মহৎতীর্থ, মহৎতৈল, মহৎত্যাগ, মহৎত্যাগী, মহৎদণ্ড, মহৎদশা, মহৎদারু, মহৎদিক্, মহৎদুর্গ, মহৎদেশ, মহৎদ্রুম, মহৎদ্রাবক, মহৎদ্বার, মহৎদ্বিজ, মহৎদ্বিপ, মহৎধাতু, মহৎধ্বনি, মহৎনট, মহৎনবমী, মহৎনরক, মহৎনাগ, মহৎনাটক, মহৎনাড়ী, মহৎনিদ্রা, মহৎনিম্ব, মহৎনিরয়, মহৎনির্ব্বাণ, মহৎনৃত্য, মহৎপঙ্ক, মহৎপশু, মহৎপাপ্মা, মহৎপুণ্য, মহৎপূত, মহৎপৌর্ণমাসী, মহৎপ্রকৃতি, মহৎপ্রতীহার, মহৎপ্রদান, মহৎপ্রভ, মহৎপ্রভাব, মহৎবংশ, মহৎবক্ষাঃ, মহৎবন, মহৎবন্ধ্যা, মহৎবরাহ, মহৎবাদী, মহৎবায়ু, মহৎবারুণী, মহৎবার্ত্তিক, মহৎবিভূতি, মহৎবিরাট্, মহৎবীচি, মহৎবৈদ্য, মহৎব্যাধি, মহৎব্রণ, মহৎভট, মহৎভয়, মহৎভর, মহৎভাগবত, মহৎভাণ্ড, মহৎভাষ্য, মহৎভাস্বর, মহৎভিক্ষু, মহৎভুজ, মহৎভূত, মহৎমণি, মহৎমণ্ডুক, মহৎমতি, মহৎমৎস্য, মহৎমনাঃ, মহৎমন্ত্র, মহৎমন্ত্রী, মহৎমান্য, মহৎমার্গ, মহৎমূল্য, মহৎমূষিক, মহৎমৃগ, মহৎমেঘ, মহৎযজ্ঞ, মহৎমোহন, মহৎযন্ত্র, মহৎযশাঃ, মহৎযাত্রা, মহৎযান, মহৎযুগ, মহৎযোগী, মহৎযোধ, মহৎরক্ত, মহৎরজত, মহৎরজন, মহৎরব, মহৎরাব, মহৎরুদ্র, মহৎরৌদ্র, মহৎরৌরব, মহৎলক্ষ্মী, মহৎলোল,

মহৎলোহ, মহৎশল্ক, মহৎশাল, মহৎশালি, মহৎশ্মশান, মহৎশ্বাস, মহৎশ্বেতা, মহৎসংক্রান্তি, মহৎসত্তা, মহৎসভা, মহৎসর্গ, মহৎসারথি, মহৎসার্থ, মহৎসিংহ, মহৎসূক্ত, মহৎসেন, মহৎসেনা, মহৎসেবা, মহৎসৌখ্য, মহৎস্নেহ, মহৎস্রষ্টা, মহৎস্বন, মহৎস্বর, মহৎহংস, মহৎহনু, মহৎহবিঃ, মহৎহরি, মহৎহাস, মহতী, মহত্তত্ত্ব, মহত্তম, মহত্ত্ব, মহদতিক্রম, মহদনুগ্রহ, মহদাশয়, মহদাশ্রয়, মহদ্‌গুণ, মহদ্দোষ, মহদ্ভয়, মহনীয়, মহফিল (মাইফেল, মোয়াফেল), মহন্ত, মহম্মদ, মহরম (মুহর্‌রম), মহরী, (মহুরি, মহুরী, মুহরি, মুহরী, মুহুরি, মুহুরী, মোহরি, মোহুরি), মহর্জগৎ, মহর্দ্ধি, মহর্লোক, মহর্ষভ, মহর্ষি, মহল (ছাত্রমহল, শিক্ষকমহল, মহাল), মহলা, মহলানবিশ, মহল্ল, মহল্লক, মহল্লা, মহল্লিক, মহশীল (মসিল, মসীল, মহসিল, তহশীল), মহস্‌, মহসিল, মহা, মহাঁমদ (মহম্মদ), মহাকচ্ছ, মহাকরণ, মহাকাব্য, মহাকায়, মহাকাল, মহাকালী, মহাকুমারগুপ্ত, মহাকুলীন, মহাক্ষত্রপ, মহাগন্ধ, মহাগুরু, মহাগোলক, মহাঙ্গ, মহাঙ্গা, মহাজঙ্গ, মহাজন, মহাজনী, মহাজ্ঞান, মহাজ্ঞানী, মহাটবী, মহাঢ্য, মহাতেজস্কর, মহাতেজাঃ, মহাতোদ্য, মহাত্মা (মহাত্মন্‌), মহাত্রান, মহাদণ্ডনায়ক, মহাদান, মহাদানী, মহাদেও, মহাদেব, মহাদেবা, মহাদেবী, মহাধন, মহাধন্দ, মহাধমাধম, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহান্‌, মহানদ, মহানন্দ, মহানন্দা, মহানস, মহানসী, মহানাদ, মহানায়ক, মহানিশা, মহানীল, মহানীলী, মহানুভব, মহান্ত, মহান্বয়, মহাপক্ষ, মহাপঞ্চবিষ, মহাপঞ্চমূল, মহাপথ (হোমিওপ্যাথি), মহাপদ্ম, মহাপবন, মহাপরাহ্ণ, মহাপাটেশ্বরী, মহাপাত, মহাপাতক, মহাপাত্র, মহাপায়া, মহাপাল, মহাপীঠ, মহাপুরাণ, মহাপুরুষ, মহাপ্রতীহার, মহাপ্রপঞ্চ, মহাপ্রভু, মহাপ্রলয়, মহাপ্রসাদ, মহাপ্রস্থান, মহাপ্রাণ, মহাপ্রাণী, মহাফল, মহাফলা, মহাফেজ, মহাফেজখানা, মহাবলা, মহাবলাধ্যক্ষ, মহাবাই, মহাবাউল, মহাবাক্য, মহাবান, মহাবাহু, মহাবিদ্যা, মহাবিভাষা, মহাবিষুব, মহাবিষুবান, মহাবিষ্ণু, মহাবীর, মহাবীরা, মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যা, মহাবৃন্দ, মহাবেগ, মহাবেজ, মহাবৈকুণ্ঠ, মহাবোধি, মহাব্যাহৃতি, মহাব্যোম, মহাব্রত, মহাব্রহ্ম, মহাব্রহ্মা (মহাব্রহ্মন্‌), মহাব্রাহ্মণ, মহাভাগ, মহাভাগী, মহাভাগ্য, মহাভারত, মহাভিযোগ, মহাভিষ, মহাভীড়, মহাভোগ, মহাভোগা, মহামণ্ডল, মহামহত্তর, মহামহা, মহামহাপ্রসাদ, মহামহিম, মহামহিমা, মহামহীয়ান, মহামহোৎসব, মহামহোদর, মহামহোপাধ্যায়, মহামাই, মহামাংস, মহামাত্য, মহামাত্র, মহামাত্রী, মহামানব, মহামান্য, মহামায়, মহামায়া, মহামায়ী, মহামার, মহামারি, মহামারী, মহামাষ, মহামুনি, মহামেদ, মহামেদা, মহামোহ, মহামোহা, মহাযমক, মহারথ, মহারথী, মহারস, মহারাজ, মহারাজা, মহারাজিক, মহারাজ্ঞী, মহারাণী, মহারাত্রি, মহারাষ্ট্র (মারহাটা, মারহাঠা, মারাঠা), মহারাষ্ট্রী, মহারোগ, মহার্ঘ, মহার্ঘ্য, মহার্ণব, মহার্থ, মহার্দ্রক, মহার্ব্বুদ, মহার্হ, মহাল, মহাশক্তি, মহাশঙ্খ, মহাশন, মহাশনিধ্বজ, মহাশয়, মহাশয়া, মহাশল্ক, মহাশাসন, মহাশূদ্র, মহাশূদ্রী, মহাশূন্য, মহাশোকী, মহাশ্বেতা, মহাষ্টমী, মহাসত্ত্ব, মহাসন, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাসাগর, মহাসান্তপন, মহাসামন্ত, মহাসাহস, মহাসাহসিক, মহাসিদ্ধি, মহাসোয়ার, মহাস্থান, মহাস্বন্‌, মহাহ্ণ, মহাহি, মহাহিগন্ধা, মহাহ্রদ, মহি, মহিত, মহিতা, মহিত্ব, মহিম, মহিমনঃ, মহিমা (অষ্টসিদ্ধি, দৈবী মহিমা), মহিম্ন, মহিলা, মহিষ, মহিষচর, মহিষবাহন, মহিষমর্দ্দিনী, মহিষা, মহিষার্দ্দন, মহিষাল, মহিষাসুর, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহিষী, মহিষ্ঠ, মহিষ্মতী, মহিষ্মন্‌, মহী, মহীকম্প, মহীকর, মহীক্ষিৎ, মহীচর, মহীজ, মহীজা, মহীতল, মহীদুর্গ, মহীধর, মহীধ্র, মহীন, মহীনাথ, মহীন্দ্র, মহীপ, মহীপতন, মহীপতি, মহীপাল, মহীপুত্র, মহীপুত্রী, মহীপুর, মহীপ্রদান, মহীপ্ররোহ, মহীপ্রাচীর, মহীভর্ত্তা, মহীভুক, মহীভৃৎ, মহীমণ্ডল, মহীময়, মহীয়, মহীয়সী, মহীয়ান্‌ (মহীয়স্‌), মহীরন্ধ্র, মহীরুহ, মহীরুহব্যূহ, মহীলতা, মহীশ, মহীশ্বর, মহীসুত, মহীসুতা, মহীসুর, মহীসুরা, মহীসূনু, মহেচ্ছ, মহেন্দ্র, মহেন্দ্রগুরু, মহেন্দ্রচাপ, মহেন্দ্রজিৎ, মহেন্দ্রনগরী, মহেন্দ্রমন্দির, মহেন্দ্রবারুণী, মহেন্দ্রাণী, মহেন্দ্রী, মহেশ, মহেশনেত্র, মহেশমোহিনী, মহেশান, মহেশানী, মহেশ্বর, মহেশ্বরকরচ্যুতা, মহেশ্বরী, মহেষু, মহেষ্বাস, মহোক্ষ, মহোচ্ছব, মহোৎপল, মহোৎসব (মচ্ছব, মোচ্ছব), মহোৎসাহ, মহোদধি, মহোদয়; মহোদয়া, মহোদর, মহোদরী, মহোদ্যম, মহোদ্যোগ, মহোন্নতি, মহোন্মদ, মহোপাধ্যায়, মহোরগ, মহোরস্ক, মহোল্কা, মহোষ্ঠ, মহৌঘ, মহৌজস (মহৌজঃ), মহৌজস্ক, মহৌজাঃ, মহৌষধ, মহৌষধি, মহৌষধী, মহৌষ্ঠ, মাইতি (মাহিতি, মাইতী, মাহীয়ত, মহীজাত), মাইনদার, মাইনা (মাহিনা, মাহিয়ানা), মাইনে, মাকাল (মাখাল), মাম্‌দো (মহাঁমদ), মায়াল, মারাঠা, মারাঠী, মাহাকুল, মাহাকুলীন, মাহাত্মিক, মাহাত্ম্য, মহাদেই, মাহানিন্দা, মাহাপ্রাণ, মাহারাজ্য, মাহারাষ্ট্রী, মাহিষ, মাহিষক, মাহিষিক, মাহিষেয়, মাহিষ্মতী, মাহিষ্য, মাহুত, মাহুতী, মাহেন্দ্র, মাহেন্দ্রী, মাহেয়, মাহেয়ী, মাহেশ, মাহেশী, মাহেশ্বর, মাহেশ্বরী, মেহগেনি (মেহগ্‌নি, মেহাগিনী), মেহনত (মহ্ নত, মহানৎ), মেহেদি, মেহের (মাহির), মেহেরবান, মেহেরবানী, মৈষ, মৈষাসুর, মোচ্ছব, মোষ, মোষকৃৎ, মোষণ, মোষিতা, মোষ্টা, মোহড়া (মহড়া), মোহন্ত (মোহান্ত), মোহমোহ (ম-ম), সুমহান,

মহ্ = সীমার হনন। **মহ** = সীমার হনন যাহাতে। (**হন্‌** ক্রিয়ার একটি রূপ হল **হা**। **মহ্** ক্রিয়াটি বলে যে, তার 'সীমায়িত' রূপটিকে হনন করা হয়েছে বলেই সেটি **মহ্**। তাই, **মহ** শব্দের মানে দাঁড়ায় 'অসীমায়ন করা', 'অসীমায়িত'। কার্যত এ হল কেন্দ্রীকরণ-বিরোধী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রিকতার বেড়া ভেঙে দিয়ে সার্বিকতার দিকে যাত্রার সূচনা করা হয়। সেই সুবাদে **মহ্** হল সার্বিকতাবাদী। মানবসমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তা যৌথতাবাদীকে চিহ্নিত করে। **মহা** তাই সেই সমগ্রকে বোঝায়, যেখান থেকে সঙ্কুচিত হয়ে হয়ে তা **ম**-এ বা সীমায়িততে পৌঁছেছিল।)

মহৎ (মহক্ক, মহত্ত্ব, মহা, মহান — মহ, মহিল, মহিলা, মহিষ, মহিষী) : ১. মহৎ = ✓মহ্ + অৎ (অতি) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মহ** = *অসীমায়িত যে; অথবা, যাহার সীমা নাই; অর্থাৎ, অসীম করে যে বা কৃত যে।* **মহক্ক** = *মহ-করণ বহন করে যে।* **মহৎ** = *মহ-এর (= অসীমের) তারণ যাহাতে।* **মহত্ত্ব** = **মহৎ** *তারিত হইয়া বাহিত হয় যাহাতে।* **মহা** = *অসীমায়িতের আধার যে।* **মহান** = *মহ অন (on) যাহাতে।* ৩. **মহক্ক** = বহুস্থানব্যাপী গন্ধ। (ছা.অ.)। **মহৎ** = গুণাধিক, বিপুল, বিশালকায়, বিস্তৃত ... ইত্যাদি। **মহত্ত্ব** = মহদ্‌ভাব, বিশালতা, গুরুত্ব, প্রথিমা, গ্রন্থবিষয়ে আধিক্য, শ্রেষ্ঠতা ...

ইত্যাদি। **মহা** = অত্যন্ত, আড়ম্বর-বিশিষ্ট, উৎকট, অতিনিপুণ, মারাত্মক, অতিভক্তি-পূর্ব্বক। **মহান** = উচ্চৈঃ, সদীর্ঘ, অব্যর্থ, শ্রেষ্ঠ, মারাত্মক, অত্যুৎকৃষ্ট। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত; শুধু **মহক্ক** শব্দটি বাংলায় কম কিন্তু হিন্দিতে অধিক প্রচলিত। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষে যে শব্দটির জন্য সর্বাধিক পৃষ্ঠা খরচ করা হয়েছে, সেটি হল **মহৎ**। এর মোট ৫৮টি অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং **মহৎ**-যুক্ত শব্দের যে তালিকা ও অর্থ দেওয়া হয়েছে তা প্রায় দুশো। এর পরে রয়েছে **মহত্ত্ব, মহা, মহান**। ফলে এক দিক থেকে দেখলে বাংলাভাষায় এর চেয়ে ব্যাপকার্থক শব্দ ব.শব্দকোষের বিচারে আর নেই। কিন্তু কেন? কেন, **মহৎ** শব্দের এত গৌরব?

আমরা সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, আপাতত শব্দ চারটির নিহিতার্থের কথা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। **মহ** কথাটির নিহিতার্থ হল, যে তার নিজের পরিধি বা সীমাকে হনন করে বা ভেঙে দেয়। এদিকে জগতের স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক সত্তার নিজ নিজ সীমা থাকে। কেউ যদি নিজের বাঁধটি ভেঙে ফেলে, তার উচ্ছ্বাস স্বভাবতই পাশাপাশি সত্তাগুলির বাঁধে গিয়ে আঘাত করতে পারে এবং সেগুলিকেও ভেঙে দিতে পারে। তার মানে, যে তার নিজের পরিধি বা সীমাকে ভেঙে ফেলে, ফলত সে অন্যদের সীমাও ভেঙে ফেলার পরিস্থিতি গড়ে দেয়। অর্থাৎ কিনা, সে একধরনের একাকার করে ফেলে ও সার্বিকতায় পরিণত হয়। যে সত্তা এইভাবে সার্বিকতায় পরিণত, সেই সত্তাকে **মহ** বলে। স্বভাবতই সামাজিকভাবে দেখলে, **মহ** একটি বোধ — 'আমরা-সবাই'। বন্যপশুদের ঝাঁক থাকে, তারা ঝাঁকবদ্ধভাবে বাঁচে, ঘোরাফেরা করে ... ঠিকই, কিন্তু তাদের 'আমরা-সবাই' বোধ থাকে না, আদিম মানুষেরও ছিল না। কিন্তু যেদিন তারা সর্বপ্রথম 'আমরা-সবাই' বোধ অর্জন করতে পারল, সে ছিল মানবসভ্যতার আদি উৎসবের দিন। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতেই হতে পারে না — 'আমরা-সবাই'!!!

মানুষের সভ্যতা **মনুঃ**-বোধ অর্জন করার বহুকাল আগেই এই **মহ**-বোধ বা 'আমরা-সবাই'-বোধ অর্জন করতে পেরেছিল এবং মানবজাতির প্রথম যৌথসমাজ গড়ে তুলেছিল। হিন্দি ... প্রভৃতি ভাষাভাষীগণ এই **মহ**-বোধের উত্তরাধিকার পেয়েছেন তাঁদের **হম, হমারা** ... প্রভৃতি শব্দে, যার মানে 'আমরা', 'আমাদের' ... ইত্যাদি। সেটি ঘটেছে শব্দের বিপরীতার্থক নিয়ম অনুসরণ ক'রে। [সে নিয়মের কথা আমরা **উমা** (মা-উ = উমা) ও **হংস** (স-হং = হংস / দ্র. **ব্রহ্মার বাহন**) ... প্রভৃতি শব্দে বলেছি, সেই নিয়মেই **মহ** হয়ে গেছে **হম**।] কেবল তাই নয়, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষাগুলিও এই **মহ** শব্দের উত্তরাধিকার বহন করেন তাঁদের homo শব্দে (দ্র. Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens প্রভৃতি)। এই **হম** বা **মহ** (বা **হম** বা homo) পরবর্তীকালে **মনুঃ** (= man-uh >< hu-man) পেরিয়ে **মানুষে** পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ human being 'হয়ে যায়'। তার মানে 'আমরা-সবাই' বোধই পরে পরে প্রত্যেকের 'আমি-বোধ'-এ পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ, আদিম যৌথমানবসমাজের **মহ**-বোধের বা 'আমরা-সবাই' বোধের উত্তরাধিকার বহু জাতিরই কমবেশি আছে।

যাই হোক, সেই **মহ**-র আধারকে **মহা** বলা হয়। তার মানে, যে সত্তা নিজের পরিধি বা সীমা ভেঙে দিয়ে সকল দিকে সমভাবে ধাবিত হয়ে তার সমগ্রে পৌঁছেছে, তাকেই **মহা** বলা যায়। তখন সেই **মহ** তার সর্বোচ্চ রূপে উত্তীর্ণ — সবই সেই **মহ**-র এলাকা, সব এলাকাই **মহ**-র অধিকারী। সমাজের সকল সদস্য, গাছপালা, পশুপাখি, আকাশ, বাতাস ... সকলের সঙ্গে সেই **মহ**-র অবারিত যোগ। কাজেই **মহৎ** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই দাঁড়িয়ে যায়, যিনি নিজে তাঁর সীমা লঙ্ঘন করে অসীমে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং অন্যদেরও অসীমে উত্তীর্ণ করেন বা করতে চান। তার মানে, **মহৎ** যিনি, তিনি নিজেই কেবল অসীমের দিকে চলেন না, তাঁর সান্নিধ্যে যে আসে, তাকেও অসীমের দিকে নিয়ে যান। সেই কারণে তাঁর এই গুণটিকেই বলা হয় **মহত্ত্ব**। স্বভাবতই যা কিছুই **মহত্ত্ব**-লাভ ক'রে অসীম হয়ে যায়, সেটিই আর খণ্ড ক্ষুদ্র থাকে না; হয়ে যায় **মহা**। কিন্তু **মহত্ত্বের** সেই **মহৎ** রূপটি স্থির না থেকে যদি চলতেই থাকে, **মহ** তখন আর **মহাতে** আবদ্ধ হয় না, হয়ে যায় **মহান**। ...

মহ ও **মহ**-যুক্ত শব্দগুলি একত্র করে নিয়ে খানিকটা নাড়া-চাড়া করলেই একটি অদ্ভুত বিষয়ের দিকে হঠাৎই নজর চলে যায়। দেখা যায় এক আলাদা জগৎ পড়ে রয়েছে আমাদের ভাবনাচিন্তার দিগন্তের ওপারে। সেখান থেকে শুধু **মহ**-যুক্ত কিছু শব্দ প্রায় অক্ষত অবস্থায় চলে এসেছে আমাদের ভাবনাচিন্তার ও ভাষা-ব্যবহারের এলাকায়। বাকি সবটাই যেন-বা সেখানে যথারীতি পড়ে রয়েছে। আমাদের হাতে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছে কেবল সেটুকুই, উত্তরাধিকারের যে গৌরবজনক অংশটি মানুষ কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজি হয় না। যেমন বৌদ্ধযুগের **রাম**কে আমাদের ভাষা **রামকলা, রামকুঁড়ে, রামঘুঘু, রামছাগল, রামঝিঙা, রামদা, রামধনু** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দে ধরে রেখে এখনও বহন করে নিয়ে চলেছে, তেমনি বৈদিক-পূর্ববর্তী সনাতন যুগের এক সার্বিকতার ও সামাজিক যৌথতার ধারণাকে আমাদের ভাষা ধরে রেখে বহন করে নিয়ে চলেছে **মহ, মহৎ, মহা, মহান** যুক্ত কয়েক শত শব্দে — **মহত্ত্ব, মহত্তম, মহৎকন্দ, মহৎকপর্দ্দ, মহৎকপিত্থ, মহৎকর্ম্মা, মহৎকলা** ... (প্রায় ১৫০ টি), **মহর্ষি, মহাকচ্ছ, মহাকর্ষ, মহাকাব্য, মহাকায়, মহাকালী, মহাজন, মহাজ্ঞানী** ... ইত্যাদি (প্রায় ১৯০টি)। দেখেশুনে মনে হয়, **মহৎ** ও **মহা** শব্দটি যেন বাংলাভাষার শব্দের **উপসর্গ** হয়ে গেছে। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে একসময় এই **মহ, মহৎ, মহা, মহান** প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলীর সম্পর্ক ছিল এবং সেগুলি ছিল তখনকার মানুষের পক্ষে অত্যন্ত শুভ ও গৌরবজনক। যেকারণে মানুষ সেগুলিকে তাদের ভাষার শব্দের মাধ্যমে বহন করতে শুরু করে দেয় এবং এখনও বহন করে নিয়ে চলছে। প্রশ্ন হল, কী সেই ঘটনা?

পুরাণাদি পাঠ করতে গেলে শুরুতেই আসে **মহত্তত্ত্বের** কথা, **মহান**-এর কথা। প্রায় সব পুরাণে প্রায় একইভাবে এই **মহত্তত্ত্ব**-সংক্রান্ত বয়ান দেখতে পাওয়া যায়। তাতে কথার পিঠে কথা অঙ্কের মতো নিয়ম মাফিক সাজিয়ে এমন বয়ান দেওয়া হচ্ছে, যা পড়লে প্রথমে মনে হবে যেন-বা মানুষের জন্ম ও শৈশব থেকে তার ক্রমবিকাশের কথা বলা হচ্ছে; তারপরই আবার মনে হবে যেন-বা এই বিশ্বজগতের উদ্ভব ও শৈশব থেকে তার ক্রমবিকাশের কথা

বলা হচ্ছে; খানিক পরে মনে হবে যে, না, মানুষ নয়, বিশ্বজগৎ নয়, বলা হচ্ছে মানব-সমাজের উদ্ভব, তার শৈশবকাল ও ক্রমবিকাশের কথা; এবং সেসব কথা বলার ধরনটা মোটামুটি এইরকম —

আদিতে কিছুই ছিল না, থাকে না। সর্বপ্রথম 'প্রকৃতির গুণবৈষম্য হেতু **মহান** প্রাদুর্ভূত হন।' কিংবা, 'সৃষ্টিকালে ত্রিগুণময়ী **পুরুষা**ধিষ্ঠিত **প্রকৃতি** হইতে **মহত্তত্ত্ব** আবির্ভূত হইলেন' ... ইত্যাদি। তারপর সেখান থেকে সত্ত্ব, রজ, তম পেরিয়ে 'অহঙ্কারের জন্ম হয়' ...। ক্রমে তার থেকে শব্দ (আকাশ), স্পর্শ (বায়ু), রূপ (অগ্নি), রস (জল), এবং অবশেষে **গন্ধ তন্মাত্রাত্মক সংঘাত** থেকে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ... প্রায় সকল পুরাণেই এই বয়ান নানাভাবে রয়েছে।

আজ আমরা জানি, ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার সেটাই স্বভাব। সে একটি বয়ান দেয়, অথচ ভিন্ন ভিন্ন লোকে (= sphere, plane ইত্যাদিতে) তার সত্য অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু যদি প্রশ্ন তোলা হয়, পুরাণ লেখকেরা কী দেখে ওসব লিখছিলেন? আমরা যদি আমাদের 'সাধারণ জ্ঞান'-এর উপর বিশ্বাস রাখি, তাহলে বোঝা সম্ভব যে, যাঁরাই লিখুন, জগৎ যখন সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে সে ঘটনা দেখেননি। ফলে সেটি যে Universe সৃষ্টির গল্পগাছা নয়, সেকথা বুঝতে বিশেষ বুদ্ধি লাগে না। তাছাড়া শিশুর জন্মের বা শৈশবের কালে তার ভিতরে **মহত্তত্ত্বের** জন্ম হয়, **মহান**-এর জন্ম হয়, এসব একেবারেই অবিশ্বাস্য; বিশেষত এইজন্য যে, পুরাণাদি গ্রন্থ **মহান**-এর যে সকল সুকীর্তি-কুকীর্তির বিবরণ দিয়ে থাকে, কোনো শিশুর ভিতরেই তার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। ফলে, বাকি থাকে একটিই সম্ভাবনা। বেদপুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থে যে **মহান** ও **মহত্তত্ত্বে**র কথা বলা হয়েছে, সে হল মানবসমাজের উদ্ভব, তার শৈশবের ও ক্রমবিকাশের কথা। যে মুহূর্তে এই কথাটিকে মনে ধরে নিয়ে পুরাণাদি পাঠ করা হয়, দেখা যায়, বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী সনাতন যুগের শেষ পর্বের সমস্ত কথা বলা হয়েছে ঐ **মহ, মহৎ, মহত্তত্ত্ব, মহা, মহান, মহিলা, মহিমা** ... প্রভৃতি সমস্ত **মহ**-যুক্ত শব্দে। সনাতন যুগ তাই **মহান**দের যুগ। বলতে কী, আমাদের বৈদিক-পূর্ববর্তী উত্তরাধিকারের যেটুকু অংশ মানুষের স্বভাবে ও ভাষায় এখনও বেঁচে বর্তে রয়েছে, তার প্রধান অংশটিকে ধরে রেখেছে এই **মহ**-যুক্ত শব্দগুলি। ...

তার মানে, আমরা যে ফেলে আসা দিগন্তের ওপারের কথা বলছিলাম, সনাতন যুগের কথা বা বৈদিক-পূর্ববর্তী মানবসভ্যতার সব কথা রয়েছে সেখানে। তারই কিয়দংশ আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থের লিখিত সাহিত্যে ও ভাষার শব্দে **মহ** ও তজ্জাত **মহান**াদি শব্দে আজও ধরে রাখা আছে। অতএব বৈদিক যুগের আগের সময়কালের বিষয়ে কিছু জানতে হলে আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে **মহ**-যুক্ত শব্দগুলির; কিংবা **মহ**-যুক্ত শব্দগুলি যখন পড়ব, শুনব, জানব, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা বৈদিক-পূর্ববর্তী সনাতন যুগের গন্ধ সেখানে কিছু কিছু পাব। স্বভাবতই এটি আমাদের স্বাভাবিক ভাবনা-চিন্তার দিগন্তের ওপারের কথা। (বৈদিক সভ্যতা বলতে আমাদের বুঝতে হয় সেই সভ্যতা, যে সভ্যতায় **বেদী** বা জ্ঞানীর **মর্য্যাদা** বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মিশর এবং সুমের দেশও সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠেছিল সেই সেই দেশের বৈদিক সভ্যতার কালে।) ... **যাই হোক**, এখানে আমরা সেই সনাতন যুগের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে পরবর্তী বিষয়ে চলে যাব।

পুরাণাদিতে বলা হয়, '**মহান** প্রজাপতি পদবাচ্য কিন্তু প্রজাপতি নহে'। এর থেকে বোঝা যায়, **দক্ষযজ্ঞে**র পর যে বৈদিক যুগের সূচনা হল, প্রজাপতিদের **অধিরাষ্ট্র**-এর জন্ম হল, তার আগের কালের সমাজের পরিচালকগণ বা **মহান**গণ **প্রজাপতি**র মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তখনও সেই **প্রজাপতি**র ভূমিকাটি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি; **দক্ষযজ্ঞে**র পর বেদবাদীগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তখনই **প্রজাপতি** পদটি সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাই মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে **মহান** পর্যন্ত কোনো প্রকারের কোনো রাষ্ট্রই নেই; কিন্তু **অধিরাষ্ট্রে**র একটি প্রাক্-**অধিরাষ্ট্র**-পর্ব গড়ে উঠেছিল। সেই কারণেই **দক্ষযজ্ঞে**র পর **অধিরাষ্ট্র** প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। যতদূর বোঝা যায়, ঐ **প্রাক-অধিরাষ্ট্রপর্বে** বা ঐ **মহান**-যুগের শেষ পর্বেই কাদামাটির নগরসভ্যতা পেরিয়ে মহেঞ্জদারোর মতো ইঁটের নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে ঐ **মহান** দ্বারা জাত সমাজব্যবস্থা বা সমাজবৃক্ষই (বা **মহান-জ-দারুই**) পরবর্তীকালে 'মহেঞ্জদারো' কথাটিতে পরিণত হয়েছে। বলে রাখা ভাল, **দক্ষযজ্ঞই** সমস্ত প্রাচীন নগরসভ্যতার ধ্বংসের মূল কারণ।

মানবেতিহাসের বৈদিক-পূর্ববর্তী যুগের বিষয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু জানা গেছে, তা সবই পাশ্চাত্যের 'দেহভিত্তিক অনুসন্ধানের' ফল — মাটি খুঁড়ে পাওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, জীবাশ্ম ... প্রভৃতি। তাঁরা যা পারতেন, পেরেছেন, তাই করেছেন। মানবসভ্যতার মানসিক বিকাশের ইতিহাস 'দেহভিত্তিক-অনুসন্ধানে' পাওয়ার কথা নয়, তার জন্য 'মননভিত্তিক-অনুসন্ধানের' প্রয়োজন হয়। তার জন্য মানুষের ভাষার শব্দের অর্থের ভিতর দিয়ে এগোতে হয়, লিখিত বয়ানের অর্থ উদ্ধার করে করে এগোতে হয়। লিখিত বয়ানের ভিতরে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং মানসিক-জীবাশ্মগুলিকে চিনতে পারার যোগ্যতা অর্জন ক'রে ক'রে এগোতে হয়। সে যোগ্যতা পাশ্চাত্যের ছিল না, নেই। স্বভাবতই সে দিক দিয়ে তাঁরা হাঁটেননি। সে যোগ্যতার অধিকার ছিল ভারতীয় উপ-মহাদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষদের। কিন্তু কালদোষে ব্রিটিশের সংস্পর্শে আসার পর, তাঁরাও সেই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। আজ, হয়তো-বা কালের ব্যবস্থাক্রমে আমরা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অর্জন করে আমাদের পুরাণাদির লিখিত বয়ানের ভিতরে সেই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মানসিক-নিদর্শন ও মানসিক-জীবাশ্মগুলিকে চিনে নেওয়ার কলাকৌশল শিখে নেওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি। আশা করা যাক, অদূর ভবিষ্যতে বৈদিক-পূর্ববর্তী যুগের বিষয়ে লিখিত বয়ান-গুলির অর্থ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা যাবে। আমাদের উত্তরসূরিরা সেই কাজ নিশ্চয় করে নিতে পারবেন, এমনই আমাদের বিশ্বাস। আর, তাঁদের এই কাজে অন্যতম সহায়ক হবে এই **মহ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি। ...

মহিলা (মহিল, মহিষ, মহিষী) : ১. **মহিলা** = √মহ্ + ইর (কিরচ্) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)।। **মহিষ** = √মহ্ + ইষ

(ইষচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *মহিল = মহান ইল যাহাতে। মহিলা = মহিল-এর আধারশক্তি যে। মহিষ = মহান ইষ যাহার। মহিষী = মহিষ-এর গতিশীল আধারশক্তি যে।* ৩. **মহিলা** = স্ত্রীমাত্র, নারী, মদমত্তা, প্রিয়ঙ্গুলতা, রেণুকা-গন্ধদ্রব্য, ভদ্রনারী (lady), গৃহিণী। **মহিষ** = পশুবিশেষ, মহিষাসুর, অনুহ্লাদের পুত্র, কৃতাভিষেক ভূপাল। **মহিষী** = মহিষস্ত্রীজাতি, কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, দেবী, পাটরাণী, রাজপত্নীমাত্র, রানী, সৈরিন্ধ্রী, ব্যভিচারিণী, ওষধি-বিশেষ, স্ত্রী। (ব.শ.)। ৪. **মহিল** বাদে বাকি তিনটি শব্দ প্রচলিত। **মহিল** শব্দটি দু'ভাবে প্রচলিত দেখা যায়। প্রথমত **মহালী** বা **মাহালী** সম্প্রদায় নামে একটি সম্প্রদায় এখনও মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখেছি, দক্ষিণ ভারতীয় কোনো কোনো মানুষের নামে। ভারতের বাইরে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দুটি তথাকথিত 'রেড ইন্ডিয়ান' উপজাতির ইংরেজিতে দেখান রয়েছে Mohawk (মহক), আর Mohican (মহীকান)। এই মহীকান জাতির বীরত্বপূর্ণ ও মহত্ত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দেখে ইউরোপ থেকে আগত আগ্রাসী উপনিবেশকারীদের অনেকে মুগ্ধ হয়েছিল। **মায়ার** উত্তরাধিকারের মতো (**মায়াসভ্যতা**)ঐ দুটি উপজাতির নামের মধ্যে **মহ** শব্দের উত্তরাধিকার ছিল বলেই মনে হয়। দ্র. **মায়া**। ৫. বৈদিক যুগে আমরা মানুষের সার্বিকতাকে পেয়েছি **মনু** শব্দে এবং তজ্জাত মানুষকে পেয়েছিলাম **মনুজ, মনুজা, মনুজী, মনুষ্য, মানব, মানবী, মানুষ, মানুষী** ... প্রভৃতি শব্দে। তারও আগে সনাতন যুগে আমরা যখন সার্বিকতাকে প্রথম পাচ্ছি **মহ** শব্দে এবং তজ্জাত মানুষকে পাচ্ছি **মহিলা** ও **মহিষী** শব্দে, তখন অবাক হয়ে আমরা দেখছি, কোনো পুরুষ সেখানে নেই! তাহলে ঐ **মহান** যুগের বা সনাতন যুগের 'ব্যাটাছেলে'গুলো সব গেল কোথায়? শব্দের নিয়মানুসারে নর-বাচক আরও অন্তত দুটি শব্দ থাকার কথা তো ছিলই — **মহিলার** নিশ্চয় **মহিল** ছিল, এবং **মহিষীর** নিশ্চয় **মহিষ** থেকে থাকবে। কিন্তু **মহিল**-এর তো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, আর **মহিষ** থাকলেও সে গিয়ে পরিণত হয়েছে গৃহপালিত পশুতে — buffalo-তে। **মহান**-যুগের ব্যাটাছেলেদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ কী?

কারণ হল, সেই সনাতন যুগে বা **মহান** যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল মাতৃতন্ত্র। সমাজে শেষকথা বলার অধিকারী ছিলেন গণমাতাগণ। পুরুষদের অবস্থা ছিল গণমাতাদের হুকুম তামিল করা। ফলত, পুরুষের গুরুত্ব ছিল কম। (দ্র. **ভগবান, ভগিনী, ভাগ্য**)। দেখা যাচ্ছে, **মহিষ** শব্দে পুরুষদের একটা 'পশুসুলভ' স্বীকৃতি আছে মাত্র; বাকিটা দুর্বোধ্য। বুঝতে গেলে একটু কষ্ট করতে হয়। (নিম্নে **মহিষ** ও **মহিষাসুর** দেখুন।) তখন সেই **মহিষ**-এর মধ্যে পাওয়া যায় আদি **শিবকে**। ... **মহিল** বলে কোনো শব্দ থাকলেও তা এতই অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল যে, কেউ তার উত্তরাধিকার নেয়নি, তাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। **দক্ষযজ্ঞের** পর বৈদিক যুগের সূচনাকালে **অধিরাষ্ট্রের**, প্রজাপতি-তন্ত্রের, গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার ... ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাই কেবল হয় না, মাতৃতন্ত্রও ধীরে ধীরে বদলে যায় পিতৃতন্ত্রে। কিন্তু **মহিলা** ও **মহিষীরা** তাঁদের ঐ নাম নিয়ে থেকে যান, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাঁদের **মহিলা** ও **মহিষী** নাম দুটির ভিতরে অতীতের সামাজিক সম্মানের গন্ধ থেকে যায়; ঠিক যেভাবে তাঁদের সম্পদের অধিকার বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মালিকানার প্রতীকস্বরূপ লম্বা চুল রাখার রেওয়াজটা থেকে যায়। দ্র. **কেশ, বেণী**। কেবল তাই নয়, আধুনিক যুগে পৌঁছে তাতেই যুক্ত হয়ে যায় **ভদ্র** কথাটি, **মহিলারা** **ভদ্রমহিলা** হয়ে যান। যদিও **মহিষ** শব্দটি পশুরূপে বেঁচে থেকে **মহিষীর** অগ্রগতিকে পিছন দিকে টেনে ধরেছে। ফলে **মহিলারা** **ভদ্রমহিলা** হয়ে গিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেলেও, **মহিষীরা** আর তেমন সুবিধা করতে পারেননি।

মহর্ষি : ৩. মহান ঋষি, মরীচি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি, বাল্মীকি, ব্যাস, নারদ, শিব, বুদ্ধ। (ব.শ.)। ৪. এখন অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মহা**। যিনি **মহান** ও **ঋষি** তিনিই **মহর্ষি**। তথ্যানুসারে সেকালের **মরীচি** প্রভৃতি দশ প্রজাপতিকে ও বাল্মীকি ... প্রমুখ **ঋষিকে** **মহর্ষি** বলা হত। উপরোক্ত ব.শ. প্রদত্ত তথ্য পুরো ঠিক নয়, নারদকে কিন্তু **মহর্ষি** বলা হত না, বলা হত **দেবর্ষি**। দ্র. **ঋষি**।

যাই হোক, **মহান** ও **ঋষি** দুটি শব্দের অর্থই যখন আমরা জেনে গেছি, কাকে **মহর্ষি** বলা যায়, সেকথা আমরা চেষ্টা করলে নিজেরাও বুঝে নিতে পারি। আমাদের বিচারে, যিনি **মহান** ও **ঋষি**, অর্থাৎ যাঁর স্বভাব ও আচরণের ভিতরে **মহান**-এর **মহত্ত্ব** ও মনভূমি কর্ষণের অভ্যাস আছে, তাঁকে **মহর্ষি** বলা যায়। ...

তথ্য হিসেবে আরও দুটি কথা এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে **ঋষি** বলতেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে **মহর্ষি** বলতেন, কিংবা 'মুসলমান ভক্তচরিত' গ্রন্থে উল্লিখিত হোসেন বসোরী প্রমুখ জ্ঞানীগুণী মানুষদের **মহর্ষি** বলে সম্বোধন করতেন, তাঁরা সবাই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগের বাংলাভাষী ছিলেন। তাঁরা তবুও খানিকটা জানতেন কাকে **ঋষি** ও কাকে **মহর্ষি** বলা যায়। নইলে তাঁরা ঐরকম কথা বলতেন না বা লিখতেন না। চোখের সামনে উদাহরণ হিসেবে সেসব আমরা ভেবে দেখতে পারি।

মহাকরণ : ১. মহা + করণ। ২. ***মহান** (রাজ্যের সার্বিক) **করণ** যাহাতে (যেখানে কেন্দ্রীভূত)।* ৪. কলিকাতার writers' building-কে বোঝাতে শব্দটির প্রচলন এখনও আছে। ৫. ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যে বাংলাভাষা-জ্ঞানীগণ **পদার্থবিজ্ঞান, বীজগণিত** প্রভৃতি শব্দ তৈরি করেছিলেন, এটি তাঁদের সৃজিত শব্দ। এই শব্দ অত্যন্ত সঠিক ও যথাযথ বাংলা শব্দ। স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে বাংলাভাষী পণ্ডিতেরা তাঁদের সেই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন, দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি। দ্র. **ব্যাকরণ**।

মহাকাব্য : ৫. দ্র. **ভীম**। আমাদের **ব্যাস** রচিত **মহাভারত** ও **বাল্মীকি** রচিত **রামায়ণকে** **মহাকাব্য** বলা হয়ে থাকে। এই দুই **মহাকাব্যের** রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, এ দুটি মোটামুটি ২০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত; এবং মহাভারত লেখা শুরু হয় আগে, শেষ হয় পরে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাংলায় কাশীরাম দাশ ও কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা ভাষায় যথাক্রমে মহাভারত ও রামায়ণ লেখেন। হিন্দিতে রামায়ণ লেখেন তুলসীদাস। গবেষকরা জানিয়েছেন, এগুলি ছাড়াও

এশিয়া মহাদেশ জুড়ে আরও অনেকগুলি খণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির আগে পরে লেখা হয়েছিল। ওদিকে পাশ্চাত্যেও দুটি মহাকাব্য লেখা হয় — ইলিয়ড ও ওডিসি। ঐ দুটি মহাকাব্যের ধারা অনুসরণ করে পাশ্চাত্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য লিখিত হয় পরবর্তী দুই হাজার বছরের মধ্যে, যথা — ভার্জিল-রচিত 'ঈনিড' (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী), দান্তে-রচিত 'ডিভাইন কমেডি' (ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সন্ধিযুগে), মিলটন-রচিত 'প্যারাডাইস লস্ট' (ষোড়শ শতাব্দী)। বাংলায় তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ মাইকেল-রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'। ...

আমরা যতদূর বুঝেছি, মানবসভ্যতা এ পর্যন্ত মাত্র একটিই **মহাকাব্য** লিখেছে। এর মূল উপজীব্য হল যৌথতাবাদী সমাজ ও স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের মহাসংগ্রামের কাহিনী। এই কাহিনী যৌথতা-বাদীদের হাতে লিখিত হলে তার বিকশিত রূপ হয় **মহাভারত** এবং স্বাতন্ত্র্য-বাদীদের হাতে লিখিত হলে তার বিকশিত রূপ হয় **রামায়ণ**। একই ঘটনাক্রমের কাহিনী ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে বসে তখনকার **বর্ত্তমান**কে নিজের চোখে দেখে লিখেছিলেন কাশীরাম দাশ ও কৃত্তিবাস ওঝা। আমরা দুজন যতদূর বুঝেছি, **ব্যাসদেব**গণের মহাভারতের কাহিনীই ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়াভাবে লেখা হয়েছে ইলিয়ড, ওডিসিতে। দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**।

মহাকাব্যের চরিত্রগুলির নামকরণ ছিল সত্যিই অত্যন্ত উদ্ভাবন-মূলক। **ব্যাস**গণ যখন **মহাভারত** লিখছেন, যৌথসমাজ তো তখন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে অনেকটাই অধঃপতিত হয়ে গেছে এবং ধনতন্ত্র ভেতরে ভেতরে এতই শক্তিশালী হয়ে গেছে যে, যৌথসমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। ফলে, সামাজিক সত্তাগুলিও বিবর্তিত হয়ে হয়ে বহু বহু সত্তায় পরিণত হয়েছে। তখন যৌথব্যবস্থার কুশীলবরা এক-আধজন নয়, শত শত। তাদের কী নামকরণ করা হবে? **ব্যাসদেব**গণ বলেছেন, এরা শতাধিক এবং এদের সবাইকে নাম দিয়েছেন **কৌরব** আর মাত্র তিনজনের সুস্পষ্ট নাম দিয়েছেন — **দুর্যোধন, দুঃশাসন** ও 'বিকর্ণ'। তবে স্বাতন্ত্র্যবাদী **পাণ্ডব**দের প্রত্যেকের পৃথক নাম দিয়েছেন তাঁরা, তাদের স্বভাব ধরে ধরে। সেকালের স্বাতন্ত্র্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই চরিত্রগুলিকে তাঁরা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। আমরা একালে তাদের সহজে চিনতে পারি একটি কোম্পানির বিভিন্ন কাজকর্ম ও সেই কাজকর্ম কারা করছে, তাদের দিকে তাকালে। সেখানেই আমরা কোম্পানির ধর্মধারী **যুধিষ্ঠির**, প্রচারকারী **ভীম**, অর্থধারী **অর্জ্জুন** ... প্রভৃতি সত্তাদের কিছু কিছু চিনতে পারি। তবে পুরো **মহাভারত**-কথার ব্যাখ্যা দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই।

তা সে যাই হোক, আমাদের শেষ বলার কথা এই যে, 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে' কথাটি কমবেশি সত্যি। আজকের প্রতীকী বোধে ও ভাষা সমগ্র **মহাভারতে**র অনুবাদ করে নিয়ে বুঝে নিতে পারলে, চিন্তাচেতনার রত্নভাণ্ডার এসে যাবে বাংলাভাষীদের হাতে। আর, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি সেই কাজের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারবে। আমাদের এই শব্দার্থকোষ সেই শব্দার্থবিধি উপস্থাপন করার দুর্বল এবং খণ্ড প্রচেষ্টা মাত্র।

মহাদেব : ৩. শ্রেষ্ঠদেব, শিব, শিবের সোমমূর্ত্তি, বিষ্ণু। (ব.শ.)। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, ও মহাদেব সংহারকর্তা রূপে সাধারণত কীর্তিত হয়ে থাকেন। বেদে মহাদেব বা শিবের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু 'রুদ্র' নাম নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। বেদের এই রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেবে পরিণত হয়ে 'ত্রিমূর্তি'র মধ্যে গণ্য হয়েছেন। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল, তাঁর ধনুকের নাম পিনাক, তাঁর বিধ্বংসী অস্ত্র পাশুপত যা তিনি অর্জুনকে দান করেছিলেন। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত হন। ... বেদে রুদ্রের বর্ণনায় দেখা যায় — তিনি ভয়াবহ হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারী, তিনি বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ, তিনি বিদ্বান, জ্ঞানী, এবং মর্ত্যেও দেবগণের কর্মের স্রষ্টা ও সাক্ষী। তিনি বদান্য, সহজে সন্তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। ... সৃষ্টির রক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতীক লিঙ্গ অর্থাৎ প্রজননের চিহ্ন। এই প্রতীকের সঙ্গে যোনি অর্থাৎ স্ত্রীশক্তি সংযুক্ত হয়ে তিনি সর্বত্র পূজিত হন। ... কৈলাস এঁর আবাসভূমি। স্বয়ং যোগী, কিন্তু কুবের এঁর ধনরক্ষক।

জগন্মাতা পার্বতী মহাদেবের স্ত্রী। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এঁর পুত্রকন্যা বলে খ্যাত। ... এঁর নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ... তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'। ... তাঁর ললাটে তৃতীয় নয়ন, তার উপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, ... বাহন নন্দী সর্বদা তাঁর সহচর। ... এঁর নেত্রাগ্নিতে মদনভস্ম হন। ... ইনি মহর্ষি অত্রির কাছে যোগশিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। ... সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষপান করে ইনি পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে ... নীলকণ্ঠ হন। ... সহজে তুষ্ট হন বলে এঁর নাম আশুতোষ। কেবলমাত্র বিল্বপত্রেই এঁকে তুষ্ট করা যায়। ... ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে অসম্মানসূচক কথা বলেছিলেন বলে ইনি ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তন করেন। সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। ... ইনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন। ... মহাদেবের গান শুনে বিষ্ণু বিগলিত হয়ে পড়েন দেখে ব্রহ্মা তাঁকে কমণ্ডলুর মধ্যে রক্ষা করেন। বিষ্ণুর এই বিগলিত অংশই গঙ্গা। ... ভগীরথ শিবের আরাধনা করে এই গঙ্গাকে আনয়ন করেন। ... ইনি ত্রিপুর ধ্বংস করে ত্রিপুরারি নামে খ্যাত হন। ... শিব দেবগণের অর্ধতেজ গ্রহণের ফলে তাঁর শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। ... দ্র. শিব, রুদ্র। ... (পৌ.অ.)। **৪. 'শিবঠাকুর'**-এর অপর নাম রূপে প্রচলিত। বাংলায় মানুষের নামও রাখা হয় **মহাদেব**। **৫. দ্র. দেব**। এখানে পৌরাণিক অভিধান বলছেন বটে যে, 'বেদে মহাদেব বা শিবের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না', কিন্তু **রুদ্র** শব্দের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে, অন্তত এক জায়গায় শিবের উল্লেখ আছে। তা থাকুক। এখন যেহেতু আমরা মূল ব্যাপারটি নিয়েই কয়েকটি কথা বলব, ওই সব তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন এই মুহূর্তে নাই। মূল ব্যাপারটি কী, সেকথাই এখানে অতি সংক্ষেপে আমরা বলে যাব। অতি-সংক্ষেপের কারণে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যেতে পারে, কিন্তু এখানে ততোধিক ব্যাপ্তি দেওয়ার সুযোগ নেই।

আসলে **শিব** সত্তাটি হলেন 'জ্ঞান-কর্ম্মের অগ্নিশিখাবহনকারী' সত্তা। একালের ভাষায় যাকে উদ্ভাবক-আবিষ্কারক ও কর্মযজ্ঞ-পরিচালক বলা যায়, আদিতে তাঁকেই **শিব** বলা হত। বৈদিক যুগের প্রাক্কালে সনাতন যুগে উপরোক্ত উদ্ভাবক ... **মহান মহর্ষি**দের নিয়ে গড়ে উঠেছিল তৎকালীন সমাজ-পরিচালক **শিব** সত্তাটি। তখন **দেব**তার বোধ পর্যন্ত সমাজের মাথায় তেমন করে স্থান লাভ করেনি, যদিও কার্যত তখন একমাত্র **দেব-অসুর** ছিলেন ঐ **শিবই**। (দ্র. **দেবতা, অসুর**) যৌথ-সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করে **দক্ষোৎপত্তি** হচ্ছে দেখে ঐ **শিব** ক্রুদ্ধ হন এবং **রুদ্র** রূপে **দক্ষদের** নাশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষমেষ **দক্ষযজ্ঞ** সফল হয়ে যায় এবং **শিব** যতি ধর্ম গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও **মহান** যুগের **মহর্ষি**রা বৈদিক যুগের নিয়ম মেনে নিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক গ্রামসমাজ চালাতে শুরু করেন। নতুন যুগের নতুন **অসুর** জন্মলাভ করতে লাগল **রাক্ষস** রূপে এবং সনাতন যুগের 'বিনিময়হীন-দানকারী' **দেবতা** নতুন রূপে 'বিনিময় গ্রহণপূর্বক দানকারী' **দেবতা** রূপে দেখা দিতে থাকেন। এবং এর কিছুকাল পরে যখন **চন্দ্রের** উৎপত্তি হতে শুরু করে, তখন ঐ **শিব**-সত্তাই 'সোমমূর্ত্তি' ধারণ করেন। **মহান**যুগের **দেব** বলে এঁর নাম হয় **মহাদেব**।

মহাবিদ্যা : ২. *মহান (সার্ব্বিকতার) বিদ্যা থাকে যাহাতে।* ৩. শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, দুর্গা, কালী, শক্তির কালী প্রভৃতি দশ রূপ, গঙ্গা। (ব.শ.)। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা — এই দশজন মহাবিদ্যা। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মহা, দশমহাবিদ্যা**। আমরা দুজন যখন ১ম খণ্ডের কাজ করছিলাম, তখনও পর্যন্ত **মহাবিদ্যা** শব্দটির নিহিতার্থ নিয়ে আমাদের একপ্রকার সংশয় ছিল। আমরা তাকে 'সমগ্র-বিদ্যা' বলে উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু এখন **মহা** শব্দের অর্থ যথার্থে অনুভব করতে পারার পর, দেখা যাচ্ছে, 'সার্ব্বিকতার বিদ্যা'ই **মহাবিদ্যা**। তার মানে, সমাজ যখন নিজের গতিতে চলতে থাকে, তখন তার ভিতরে নানা ধরনের কেন্দ্রিকতা চলতে থাকে; আর, বিপ্লবকালে সেই কেন্দ্রিকতা ভেঙে পড়ে এবং সাময়িকভাবে সার্বিকতার সূচনা হয়। প্রতিটি সামাজিক বিপ্লবই আসলে সার্বিকতার চেষ্টা। সে যেন সামাজিক উৎসব। ব্যক্তির ভিতরেও এই কেন্দ্রিকতার ও সার্বিকতার রূপটিকে সফলভাবে চিহ্নিত করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, 'উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে, এক-এক দিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, এক দিন খরচ করে, ... প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর এক দিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেই দিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব। সেই দিন সম্বৎসরের আদর্শ।' (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ)।

এইভাবে যে প্রচেষ্টার দ্বারা সামাজিক কেন্দ্রিকতাকে ধ্বংস করে সামাজিক সার্বিকতা ঘটানো যায়, তাকে **মহাবিদ্যা** বলে। সেকালে সামাজিক (সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি) তন্ত্রের সাধক **তান্ত্রিক**রা **মহামায়া**র বিভিন্ন খণ্ড সত্তাগুলিকে জাগ্রত করে সামাজিক কেন্দ্রিকতাকে ধ্বংস করে সামাজিক **সার্বিকতার** চেষ্টা চালাতেন, সেগুলিকে সেকারণেই **দশমহাবিদ্যা** বলে। বলে রাখা দরকার যে, **কালী, তারা,** ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, **ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী,** বগলা, মাতঙ্গী ও **কমলা** প্রভৃতি সত্তাগুলি **মহামায়ারই** খণ্ড খণ্ড রূপ মাত্র। সেগুলির মধ্যে **কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী** প্রভৃতি শব্দে আমরা সেই খণ্ড **মহামায়ার মহাবিদ্যা**-রূপকে বা বিপ্লবী রূপকে ব্যাখ্যা করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। ...

প্রসঙ্গত একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ করে যাওয়া দরকার, অন্যথায় ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। ব্যক্তিজীবনে প্রতিদিন কেন্দ্রিকতা, এক-এক দিন সার্বিকতার যে উল্টা-চালের অঙ্কটি রবীন্দ্রনাথও কষে গিয়েছিলেন, আজকাল সেখানে একধরনের উদ্ভট চালের সূচনা হয়েছে। আমাদের বিশ্বায়নকারী বাবুরা যখন কাজের প্রশ্ন আসে তখন বলেন, প্রতিদিনই কেন্দ্রিকতা, প্রতি মুহূর্তই কেন্দ্রিকতা, মানুষের প্রতি মুহূর্তই রোজগারের জন্য নিবেদিত, ছুটির কোনো মানেই হয় না। এমনকি জৈবিক গ্রহণ-বর্জন-পুনরুৎপাদনের অত্যাবশ্যক অনিবার্য কর্মগুলিও রোজগার-কর্ম করতে করতে সেরে ফেললেই ভাল হয়। আর যখন তাঁদের মাল বিক্রির প্রশ্ন আসে, তখন বলেন, প্রতিদিনই রবিবার, প্রতিদিনই উৎসবের দিন, আসো, কেনো, খাও-পিও-মৌজ করো! ... আমাদের উপলব্ধি এই যে, এক্ষেত্রেও একপ্রকার **দ্বৈরাজ্যই** আমাদের সঠিক ভাবে চলবার দিশা দেখাতে পারে।

মহাভারত : ৩. ব্যাসকৃত ভরতবংশীয়গণের বিশাল ইতিহাসগ্রন্থ। মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব হেতু ইহা 'মহাভারত'; অথবা ভরতবংশীয় নৃপতি শান্তনুর ইতিহাস বলিয়া ইহা 'মহাভারত'। ইহার বক্তা বৈশম্পায়ন, শ্রোতা জনমেজয়। ইহা পঞ্চম বেদ। মতান্তরে, জনমেজয় ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্যাসের আদেশে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত-কথা শ্রবণ করেন। এই হেতু লোকে পাপকথা শুনিলে 'মহাভারত' বলে। (ব.শ.)। ভারতীয় মহাবংশচরিত ও কুরু-পাণ্ডবীয় যুদ্ধ বর্ণনাত্মক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কৃত মহাকাব্য। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তিনি এইরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করবেন, যাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ, ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ... চতুর্বর্ণের নানা পুরাণোক্ত আচারবিধি ... ইত্যাদি কথিত হবে। ... এই মহাভারত পঞ্চমবেদ নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ১৮ পর্বে সমাপ্ত। ... কথিত আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর পৌত্রের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে ৩ বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. মহাকাব্যের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মহাকাব্য, জনমেজয়**।

মহামায়, মহামায়া : ১. দ্র. **মহাবিদ্যা, দশমহাবিদ্যা, নবদুর্গা, কালিদাস, কালী, দক্ষিণ, দক্ষিণাকালী, বামাকালী, বিশ্বকর্ম্মা, কৃষ্ণ, গৌরী**। ২. / মহান মায়া যাহার। (ব.শ.)। ৩. পরমকুহকী, অতিমায়াবী, মহামায়াজনক, অতিকপট, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গঙ্গাদেবী, বুদ্ধজননী, মহতী মায়া, মহাকুহক, বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ। ইহা হইতে

বিশ্ব উৎপন্ন ও ইহার প্রভাবে অবাস্তব বিশ্ব সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। (ব.শ.)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার দেহ হতে অর্ধ নর নারী মূর্তি প্রকাশ হয়। এই অর্ধ নারী মূর্তি ব্রহ্মার আদেশে নিজের দেহ ভাগ করে স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা হন। দেবীভাগবত অনুসারে মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। ইনি সর্বদা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ইনি জীবগণের কামনা পূর্ণ করেন। এই জগৎ তাঁতেই ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. ধর্মভীরু মানুষদের মধ্যে ঠাকুরের নাম রূপে **মহামায়া** প্রচলিত। ৫. **মহামায়া** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. জানিয়েছেন যে, 'ইহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন ও ইহার প্রভাবে অবাস্তব বিশ্ব সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়।' আসলে **বিশ্ব** দুই প্রকার, পরমাপ্রকৃতির বা **মহামায়া**র তৈরি করা অকৃত্রিম **বিশ্ব** ও মানুষের তৈরি করা কৃত্রিম **বিশ্ব**। আমাদের বাসনকোশন, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাস, রেল, জাহাজ ... ইত্যাদি থেকে মহাবিশ্বে পাঠানো উপগ্রহ পর্যন্ত সবই মানুষের কৃত্রিম **বিশ্ব**। কিন্তু কীভাবে মানুষ তার কৃত্রিম **বিশ্ব** বানায়? **মহামায়া**র অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. বলছেন, 'ইহা (**মহামায়া**) হইতে বিশ্ব উৎপন্ন ও ইহার (**মহামায়া**র) প্রভাবে অবাস্তব বিশ্ব সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়।' এইখানে আর একটি তথ্য জুড়ে নিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই তথ্যটি হল, মানুষের কলাকৌশল-জ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যাকে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বলা হত 'মায়াখ্যা বিদ্যা' অর্থাৎ **মায়া**। (দ্র. **মমতা, মায়ামমতা**)। তার মানে মানুষ যে বিশাল কৃত্রিম **বিশ্ব** বানিয়েছে, সেটি আসলে বানানো হয়েছে মানুষের 'মায়াবিদ্যা'র সাহায্যে। (দ্র. **ভোজবিদ্যা**)। আর, সেকালের সাধারণ নিয়মে মানুষ তো কিছু করে না, করে মানুষের ভিতরে থাকা **কামদেব, শিব, বিষ্ণু (দক্ষ), মায়া** ... প্রভৃতি সত্তারা। তাহলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বজুড়ে যে **বিশ্বকর্মা**রা রয়েছেন, তাঁরাই সেই **মহামায়া**, যাঁরা এই কৃত্রিম **বিশ্ব**টি বানান, বানিয়েছেন। তারই খণ্ড রূপ হল শ্রমিকশ্রেণী (**কালী**), কৃষকশ্রেণী (**শ্যামা**), মধ্যবিত্ত শ্রেণী (**দুর্গা**), বিদ্রোহী জনতা (**চণ্ডী**) ... ইত্যাদি। সেকালের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় এই **মহামায়া**দের দশ ভাগে ভাগ করে দশটি নাম দেওয়া হয়েছিল। এঁদের একত্রিত কলাকৌশলজ্ঞান-সত্তাই সামাজিক-**মহামায়া** সত্তা। তিনিই 'পরমকুহকী, অতিমায়াবী', তিনিই 'মহতী মায়া, মহাকুহক, বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ'। তিনিই মানুষের ভিতরে বাস করে তাদেরকে বাহন রূপে ব্যবহার করে তাদের কৃত্রিম **বিশ্ব** বানিয়ে দেন; তিনিই বিশ্বজগতে বিরাজ করে অকৃত্রিম **বিশ্ব** বানিয়ে থাকেন। তবে সেটি কীভাবে বানান, সেকথার বিশেষ কিছুই আমরা জানি না। যতটুকু জানতে পারি, **মহামায়া** আমাদের কাছে ততটুকুই ধরা দেন, এবং আমাদের মনের মণিকোঠায় বিরাজ করে আমাদের দিয়ে আমাদের এই কৃত্রিম **বিশ্ব** বানিয়ে দেন।

মহালী, মাহালী : ৫. এটি একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের মানুষের দেখা মেলে। আজকাল এঁরা গ্রামের চাষবাসের কাজেই লিপ্ত থাকেন। কিন্তু এঁদের প্রধান পেশা ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে, বাঁশের ঝুড়ি, ডোল, চুপড়ি, ধুচনি ... ইত্যাদি বোনা। এঁরা সাঁওতাল বা ভূমিজ নামে পরিচিত নন, তাঁদের থেকে একটু আলাদা। এখানে বলে রাখা ভাল, একালের অ্যাকাডেমি বহুকালক্রমাগত এই সামাজিক শ্রেণীগুলি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, যতটুকু জানে, সে জ্ঞান প্রায়শই উন্নাসিকতায় ভরা। কখনোই ভোলা উচিত নয় যে, এঁরা সেই **মহান** সমাজের মানুষ, যাঁরা আজও **দক্ষযজ্ঞে**র ব্যথা, সেই আদিম **মহান** যৌথসমাজ ভেঙে পড়ার ব্যথা বহন করে নিয়ে চলেছেন। দ্র. **মহিলা**।

মহিমা : ১. মহৎ + ইমন্। ২. **মহৎ** *সক্রিয়ভাবে সীমায়িত যে আধারে।* ৩. মহদ্‌ভাব, মহত্ত্ব, বিশালতা, দৈর্ঘ্য, মাহাত্ম্য, বিশ্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, উৎকর্ষ, তেজঃ, উচ্চাধিকার, (যোগশাস্ত্রে) অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের একতম। (যোগী ইহা দ্বারা অল্পকায় হইয়াও পর্ব্বতাদিবৎ মহাকায় হইতে পারেন।), বিশালতাজন্য গম্ভীরভাব। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অষ্টসিদ্ধি**। লাল ভাবকে যেমন 'লালিমা' বলে, সেইরকম **মহ**-ভাবটিকেই **মহিমা** বলে। এই **মহিমা** যার থাকে, তার ভিতরে একটা সার্বিকতার ভাব থাকে। কর্মযোগী মানুষ যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে বসে তাঁর জ্ঞানকে কর্মে রূপায়ণ করেন, তখন দেখা যায়, তাঁর প্রভাব সমগ্র প্রতিষ্ঠানে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ তখন তিনি 'অল্পকায় হইয়াও **পর্ব্বত**াদিবৎ মহাকায়' হয়ে রয়েছেন। তখনই তাঁর সেই গুণটিকে **মহিমা** বলে। তার মানে, **মহিমা** সর্বদাই মহ-গুণসম্পন্ন, সার্বিকতা-গুণসম্পন্ন, এবং তা সবসময়ই কেন্দ্রিকতার বিরোধী।

মহিষ (মহিষবাহন, মহিষাসুর, মহিষাসুরমর্দ্দিনী) : ১. ✓মহ্ + ইষ (ইষচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.) ২. ***মহিষ** = **মহান ইষ** (ইচ্ছা) যাহার। **মহিষবাহন** = **মহিষ** বাহন যাঁহার। **মহিষাসুর** = **মহিষ** রূপী অসুর যে। **মহিষাসুরমর্দ্দিনী** = যিনি **মহিষাসুর**কে মর্দ্দন করেন।* ৩. **মহিষ** = পশুবিশেষ, লুলাপ, মহিষাসুর, অনুহ্লাদের পুত্র, কৃতাভিষেক ভূপাল। **মহিষবাহন** = যম। **মহিষাসুর** = মহিষ নামক অসুরবিশেষ (ইহার পিতা রম্ভ। শিবের বরে রম্ভ সুরজেতা সকলের অবধ্য এই বর প্রাপ্ত হয়। কাত্যায়ন মুনির শাপে নারী দুর্গার হস্তে মহিষ নিহত হয়।)। **মহিষাসুরমর্দ্দিনী** = দুর্গা। (ব.শ.)। **মহিষাসুর, মহিষমর্দ্দিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী** = ... মহিষাসুর দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। ... তখন দেবতাদের মিলিত প্রার্থনার ফলে দেবতাদের তেজ হতে এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ-হস্তা নারীর আবির্ভাব হয়। দেবগণ তাঁকে বিবিধ অস্ত্র দান করেন। মহিষাসুর এই দেবীকে বিবাহ করবার জন্য দূত পাঠায়। ... দেবীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘোর যুদ্ধের পর দেবীর হস্তে মহিষাসুরের নিধন ঘটে। ... মহিষাসুর তিনবার জন্মগ্রহণ করে। তিন বারই দেবী ত্রিবিধ রূপ, প্রথমবারে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বারে ভদ্রকালী, তৃতীয়বারে দুর্গারূপ ধারণ করে তাকে বিনাশ করেন। ... দেবী দুর্গা মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে মহিষমর্দিনী নামে খ্যাতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. buffalo অর্থে **মহিষ** প্রচলিত, **মহিষবাহন** অপ্রচলিত। দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মধ্যে **মহিষাসুর** ও **মহিষাসুরমর্দ্দিনী** প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধর্ম্মরাজ**। এখানে একটি জটিল ব্যাপার রয়েছে, যা আজ পর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি। ফলে কতগুলি

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। যেমন, **মহান** ইচ্ছা যাঁর তাঁকে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের দেওয়া **মহিষ** নামটি কেন এবং কীভাবে সাদৃশ্যে সেই জন্তুর নামে পরিণত হল, একালের ইংরেজি ভাষায় যাকে buffalo বোঝায়? গ্রামবাংলায় **মহিষ**কে 'কাঁড়ার' বা 'কাঁড়া' বলা হয় কেন? কেন এই প্রবচন এখনও শোনা যায় যে, 'কাঁড়ারি ভাঁড়ারি রাঁধনি বামন / যশ পায় না এই তিন জন।' কেন **মহিষ** ও **বৃষ** উভয়কেই **ধর্ম্মবাহন** বলা হয়? অথচ **মহিষ**-এর ক্ষেত্রে **ধর্ম্মের** মানে বোঝা হয় **যম** এবং **বৃষের** ক্ষেত্রে **ধর্ম্মের** মানে বোঝা হয় **শিব**? **মহিষাসুর**-এর সঙ্গে এই **মহিষ**-এর কী সম্পর্ক? **মহিষাসুর-মর্দ্দিনী** বললে দেবী **দুর্গা**কে বোঝায় কেন?

তথ্য হিসেবে একথাটিও মনে রাখা দরকার যে, **বৃষ** বা ষাঁড় কোনো মানুষের হুকুম খাটে না, কিন্তু যদি খাটত তবে সে **বলদ**-এর তুলনায় বেশি মালবাহী গাড়িও টেনে দিতে পারত, যার প্রমাণ রয়েছে **আন্ডাকাটা** নামক গরুর ব্যবহারে। (আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বৃষোৎসর্গ' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। সর্বোপরি, একটি গরুগাড়িতে যত মাল চাপানো সম্ভব তা সব তুলে দিলেও 'কাঁড়ার' বা 'কাঁড়া'-নামিত **মহিষ** সে-গাড়ি বহন করে নিয়ে চলে যায়; কষ্ট তার যতই হোক! আরও তথ্য এই যে, **মহিষ** জলে গা ডুবিয়ে রাখতে ভালবাসে। অন্যথায় তার গা গরম হয়ে যায়, মাথাও গরম হয়ে যায়। দীর্ঘকাল জলকাদার সংস্পর্শ না পেলে **মহিষ** মরে যায়। কোনো এক পুরাণে বা অভিধানে এই কথাটিও চোখে পড়েছিল, 'জলকে আন্দোলিত করে যে', তাকে **মহিষ** বলে। ...

শব্দের ভিতরে যথার্থ ইতিহাসের পদচিহ্ন থাকে। সেই পদচিহ্ন দেখতে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় এবং সেই পদচিহ্ন ধ'রে ধ'রে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তাহলেই বহু অজানা ইতিহাসও ক্রমে চোখের সামনে দৃশ্য হতে থাকে। সেই যোগ্যতার অতি সামান্য আমাদের কপালে এখন পর্যন্ত জুটেছে। যেটুকু জুটেছে, তাতেই উপরোক্ত সমস্যাসমূহের একপ্রকার সমাধান পাওয়া যায়। হয়তো যাঁরা এ বিষয়ে অনেক বেশি যোগ্য তাঁরা আরও ভাল দেখতে, বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন। আমরা যেটুকু বুঝেছি, সেটুকু অতি সংক্ষেপে বলি। ব্যাপারটি এইরূপ —

বৈদিক-পূর্ববর্তী **মহান** যুগ বা সনাতন যুগটি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সেখানে দু'ধরনের পুরুষ ও নারী ছিলেন — **মহিষ** ও **মহিষী** এবং **মহিল** ও **মহিলা**। সমাজের পরিচালিকা নারীদের বলা হত **মহিষী** এবং তাঁদের সহযোগী নরদের বলা হত **মহিষ**; আর সাধারণ অনুগামী নারীদের বলা হত **মহিলা** এবং তাঁদের সহযোগী নরদের বলা হত **মহিল**। এই **মহিলা** ও **মহিল**দের সংখ্যাই ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। **মহিষী**দের সহযোগী নরদের স্বভাব ছিল **মহিষ** বা 'কাঁড়া'র মতো, সমাজ পরিচালনার বোঝা বইতেন এঁরাই, এঁরাই ছিলেন মানবজাতির আদি নেতা, এঁরাই **ধর্ম্ম** (সামাজিক রীতিনীতি) সৃষ্টি করতেন এবং সেই **ধর্ম্ম** রক্ষা করতেন এঁরাই, এঁরাই ছিলেন আদি **শিব**, সনাতন-**শিব**, **মহান-শিব**। বৈদিক যুগের সূচনার পরে **ধর্ম্ম** রক্ষার দায়িত্ব চলে যায় **যমে**র (= বিচারালয়ের) হাতে। স্বভাবতই তার **বাহন** হয়ে যায় **মহিষ** বা দেশনেতাগণ, যাঁরা জলে (জনগণের ভিতরে ও জনসমর্থনের ভিতরে) ডুবে থাকেন, জলকে আন্দোলিত করেন, জনগণকে নিয়ে আন্দোলন করেন এবং জলে (জনসমর্থনের ভিতরে) ডুবে না থাকলে এঁদের শরীর গরম হয়ে যায়, মাথা গরম হয়ে যায়। এঁরাই লোকসভা-বিধানসভায় গিয়ে আইন বা **ধর্ম্ম** সৃষ্টি করেন, সবাই যাতে সেই **ধর্ম্ম** পালন করে, সেদিকে নজর রাখেন। ... আর, সনাতন-**শিব যতিধর্ম্ম** গ্রহণ করে সামাজিক উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ থেকে সরে দাঁড়ান, তাঁর **বাহন বৃষ** বা ষাঁড় মালিকহীন হয়ে বনে-বাদাড়ে-মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। ...

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্তত তিনবার জনসাধারণ দেশনেতাদের বা সমাজ-পরিচালকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং তাদের পর্যুদস্ত করেছিল। পুরাণাদি অনুসারে তাই **মহিষাসুর**-এর জন্ম হয়েছিল তিনবার এবং দেবী **মহামায়া** তিনবারই তাকে নিহত করেন। প্রথমবার উগ্র-বিদ্রোহী জনতা রূপে বা **উগ্রচণ্ডী** রূপে দেশ-পরিচালকদের বা **মহিষাসুর**কে ধ্বংস করা হয়েছিল; দ্বিতীয়বার দক্ষ শ্রমিকশ্রেণী রূপে বা **ভদ্রকালী** রূপে দেশ-পরিচালক নেতাদের বা **মহিষাসুর**কে পেটানো হয়েছিল, এবং তৃতীয় বারে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ রূপে বা **দুর্গা** রূপে সেই দেশনেতাদের বা **মহিষাসুর**কে নিহত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, বৌদ্ধবিপ্লবের সময় পুনরায় মধ্যবিত্ত-জনসাধারণকে জাগ্রত করা হয়। তবে সে ছিল দেবীর **অকালবোধন**। তার ফলে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছিল বটে, তবে সে **রামরাজত্ব** দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ... এখনকার কালে যে **দুর্গা**পূজা করা হয়, সে সেই **অকালবোধন**-এর প্রতীকী প্রথারূপে করা হয় এবং 'গভীর আত্মবিচ্ছিন্নতা'র কারণে তার প্রায় সবটাই অতীতের প্রকৃত সামাজিক ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন। ...

সে যাই হোক, '**মহান** ইচ্ছা যাঁর', সেই **মহিষ** কেন buffalo হয়ে গেল, তার উত্তর এখন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমাদের অতীতের সামাজিক-**মহিষ** ও সাদৃশ্যে বাহ্যিক-**মহিষ**, দুটোই সত্য, দুটোই ছিল। আমরা প্রকৃত সামাজিক-**মহিষ**কে ভুলে গেছি, মনে রেখেছি কেবল buffalo **মহিষ**কে।

প্রাচীন সামাজিক **মহিষ**-এর সাদৃশ্যে গ্রামবাংলায় আজও **মহিষ**কে 'কাঁড়ার' বা 'কাঁড়া' বলা হয়। এবং সন্দেহ নেই, উভয়ের স্বভাবে যথেষ্ট মিল ছিল, আছে। বাংলাভাষীর পূর্বপুরুষেরা দেখেছিলেন, যে সামাজিক **কাণ্ডারী** সমাজের সমস্ত ভার নীরবে বহন করে, তার যশ নেই। সেকারণেই 'কাঁড়ারি ভাঁড়ারি রাঁধনি বামন / যশ পায় না এই তিন জন।' — প্রবচনটির প্রচলন হয়ে যায়। আর, যেহেতু **মহান** যুগের **মহিষ**-রা সামাজিক রীতিনীতি বা আইনকানুন সৃষ্টি করতেন, এবং সেই আইন রক্ষা করতেন, সেই কারণে তাঁদেরকে বলা হত **ধর্ম্মবাহন**। তখন মানবসমাজে আদালত বা বিচারালয়ের সৃষ্টিই হয়নি। তখনও আবিষ্কারক-দেশনেতা ব্রাহ্মণ দ্বিখণ্ডিত হয়ে আবিষ্কারক ও বিচারকে পরিণত হননি। কিন্তু বৈদিক যুগের সূচনার পর থেকে আবিষ্কারক, আবিষ্কৃতের ধারক, ও **ধর্ম্মের** বা সামাজিক আইনের ধারক পৃথক তিন খণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। ফলে, তখন **যম** বা বিচারালয়ের বাহন হয়ে যায় **মহিষ** বা দেশ-পরিচালক নেতানেত্রীগণ। তখন স্বভাবতই আবিষ্কারক-উদ্ভাবক **শিবের** অমর্যাদা হয়ে যায়। তিনি **বৃষবাহিত** হয়ে সামাজিক কর্মযজ্ঞের বাইরে বেবাক ঘুরতে থাকেন। **দক্ষ**দের কৃপায় স্রষ্টারাই সৃষ্ট **বিশ্বে** কলঙ্কে পান না।

এদিকে আদি **শিব**-এর একটি রূপ **মহিষ** থেকে **মহিষাসুরে** পরিণত হয়। সমাজপরিচালক নেতারা **অসুর** হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই **মহামায়ার বোধন** করে তাঁর পূজা করে তাঁকে **অসুর** নিধনে প্ররোচিত করতে হয়। দেশনেতাদের মধ্যে **শিব**-এর রূপটিকে বোঝার জন্য আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মহিষ্মন্ (মহিষ্মৎ, মাহিষ্মতী) : ২. ***মহিষ্মন্*** = ***মহিষ***-*রূপ মনন করেন যিনি।* ***মহিষ্মৎ*** = ***মহিষ***-*রূপ* ***মৎ*** *যাহার।* ***মাহিষ্মতী*** = ***মহিষ্মৎ*** *হইতে জাত থাকে যে আধারে।* **৩. মহিষ্মন্ (মহিষ্মৎ)** = বহুমহিষবান, দেশবিশেষ, রাজবিশেষ। **মাহিষ্মতী** = মহিষ্মান (মুচুকুন্দ) কর্ত্তৃক নর্ম্মদাতীরে প্রতিষ্ঠাপিত হৈহয়গণের রাজধানী। ... (ব.শ.)। পুরাণ ও মহাভারতোক্ত একটি প্রাচীন নগর। তালজঙ্ঘের সহস্র হস্তধারী রাজা কার্তবীর্যার্জ্জুনের রাজধানী। ভাগবত অনুসারে, একবার রেবার জলে কার্তবীর্যার্জ্জুন স্ত্রীদের নিয়ে জলক্রীড়া করছিলেন, তখন রাবণ এঁর বলবীর্য না জেনে এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হন। মহাভারতের সভাপর্বে লিখিত আছে, রাজসূয় যজ্ঞকালে এখানে সহদেব কর আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়ে কর আদায় করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কার্ত্তবীর্য্য, তালজঙ্ঘ, নর্ম্মদা, মহ, মহিষ**। উপরোক্ত **মহিষ্-মন্, মহিষ্-মৎ, মাহিষ্-মতী** ... এই সব শব্দের **মহিষ**গুলিকে যে মুহূর্তে আপনি buffalo বুঝবেন, সেই মুহূর্তে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সামনে বিশাল কালো পর্দা পড়ে যাবে। কিন্তু একবার যদি সেই **মহিষ**গুলিকে **মহিষী**দের পতি, **মহান**যুগের চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ **মহতী ইষ** বা ইচ্ছাসম্পন্ন **মহৎ মানুষ** বলে ভাবেন, আপনার সামনে ইতিহাসের দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যাবে। যাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের যথাযথ সম্মান করেন না, তাঁরাই ঐ **মহিষ**গুলিকে শুধুমাত্র buffalo মনে করেন এবং তার ফলে তাঁদের সামনে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রূপকথায় পরিণত হয়ে যায়।

মহী (মহি, মহীজ, মহীজা, মহীধর, মহীসুত, মহীসুতা) : ১. মহি + বিকল্পে স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. ***মহী*** = ***মহ***-*এর সক্রিয় আধার যে।* ***মহীজ*** = ***মহী*** *হইতে জাত যে।* ***মহীজা*** = ***মহী*** *হইতে জাতা যে।* ***মহীধর*** = ***মহী****কে ধরে রাখে যে।* ***মহীসুত*** = ***মহী*** *হইতে প্রসূত যে।* ***মহীসুতা*** = ***মহী*** *হইতে প্রসূতা যে।* **৩. মহি** = 'পূজ্যা', পৃথিবী, মহিমা, মহত্ত্ব। **মহী** = পৃথিবী, দেশ, ভূমি, মৃত্তিকা ... ইত্যাদি। **মহীজ (মহীসুত)** = পৃথিবীজাত, পার্থিব, কুজ, মঙ্গলগ্রহ, নরকাসুর, বৃক্ষ, আর্দ্রক। **মহীজা (মহীসুতা)** = সীতা, মহীকন্যা। **মহীধর** = মহীর ধারক, পৃথিবীধারক, পর্ব্বত, বিষ্ণু, শুক্লযজুর্ব্বেদ-ভাষ্যকার, রাজা। (ব.শ.)। ৪. প্রায় সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। ৫. একটি পুকুরের জলে, তার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটি তক্তার পাটাতন ভাসিয়ে দিন। দেখবেন, সেটি এদিক সেদিক সরে যাচ্ছে। সেই পাটাতনের মাঝে মাঝে কয়েকটি বাঁশ এমনভাবে পুঁতে দিন, যাতে সেই বাঁশ পাটাতন ভেদ করে পাঁকে গিয়ে অনেকটা করে গেঁথে যায়। দেখবেন, পাটাতনটি আর এদিক সেদিক সরে যাচ্ছে না। পৃথিবীর স্থলভাগের অবস্থাটা ঐরকম একটি পাটাতনের মতো। তার পর্বতগুলি ঐ বাঁশের মতো কাজ করে। পৃথিবীর স্থলভাগকে সে এদিক সেদিক নড়তে দেয় না। ভূবিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারটি খুব ভাল জানেন। এর থেকে আমাদের এরকম কথা ভাবার ইচ্ছা হতেই পারে, যে, আমাদের প্রাচীন ভাষাবিদগণ সেকথাটি জানতেন বলেই **পর্ব্বত**কে বলতেন **মহীধর**। ...

না, তাঁরা সেটি জানতেন না; অন্তত আমাদের সেরকমই মনে হয়েছে। তাঁরা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় কথা বলতেন বলেই তাঁদের এক কথা বহু লোকে (= sphere-এ, plane-এ) সত্য বলে মনে হত, এবং তার মধ্যে সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে থাকেও; কিন্তু তাই বলে তাঁরা এই earth-এর ধারক mountain-কে নিয়ে কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ তাঁদের সমস্যা তো দৃশ্য **মহী** বা দৃশ্য পৃথিবী ছিল না; তাঁদের সমস্যা ছিল অদৃশ্য **মহী** ও অদৃশ্য **পৃথিবী** নিয়ে। সেই **মহী** বা **পৃথিবী** ছিল মানুষের সামাজিক মনোভূমি। এই **ভূমি** গড়ে উঠেছিল সমাজসদস্যদের বা মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। সেই বিশ্বাসের মূলে ছিল 'আমরা-সবাই' বোধ বা **মহ**-বোধ। আর, এ **ভূমি** গড়ে উঠেছিল বৈদিক যুগের বহু আগে, সনাতন যুগে বা **মহান** যুগে। কিন্তু সেই **মহী**ও এদিক সেদিক সরে যেত, নড়ে যেত। অন্তত **দক্ষযজ্ঞে**র মহাবিপ্লবের পর তাঁদের সেরকম মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। সেই অদৃশ্য **মহী**কে স্থির রাখার উপায় ছিল কয়েকটি সামাজিক **পর্ব্বত** গড়ে তোলা, যা কিনা একদিকে সামাজিক-মনোভূমিকে ভেদ করে অবচেতনের গভীর পাঁকে অনেকখানি ঢুকে যাবে এবং অপরদিকে আকাশকে ছুঁয়ে থাকবে। ভারতসমাজের সামাজিক-মনোভূমিকে এভাবে ভেদ করে বেশ কয়েকটি **পর্ব্বত** উপরোক্ত বাঁশের মতো উঠে দাঁড়ায়। তাদের অন্যতম ছিল **হিমালয়** ও **বিন্ধ্য**। বলতে কী, একালেও রাষ্ট্রের মতো বড় বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটিই **পর্ব্বতে**র ভূমিকা পালন করে থাকে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি বা সামাজিক মনোভূমি ভেদ করে ওঠা **উদ্ভিদ**গুলি সেটা একেবারেই পারে না, সেকথা বলা যাবে না। পারে বলেই ভূমির ক্ষয় ও ধ্বস ঠেকাতে আজও গাছ লাগাতে হয়। তবে তার পারা **পর্ব্বতের** সমতুল্য একেবারেই নয়।

মহীকে ধরে রাখার অন্যতম হোতা হলেন **বিষ্ণু**। তাই **মহীধর** বলতে **বিষ্ণু**কে বোঝায়। কিন্তু যখন সেই **মহী** থেকে **মহীজ** ও **মহীজা**দের জন্ম হতে লাগল — প্রচলিত ব্যবস্থা যাদের 'কু-জননকারী' বলে নিন্দা করতে লাগল, এবং জননকারীরা যার ভিতরে **মঙ্গল**গ্রহকে দেখতে পেল, তখন সমস্যা দেখা দিল। **বেদ**কে বিপন্ন করে **শুক্লযজুর্ব্বেদে**র জন্ম হয়ে গেল। তাতে **বিষ্ণুর** ক্ষমতাই বৃদ্ধি পেল। ফলত, **শুক্লযজুর্ব্বেদের** ভাষ্যকারের নামও হয়ে গেল **মহীধর**। দ্র. **মেদিনীধর**।

মাহিষ্য (মাইতি, মাহাত, মাহিয়ত, মাহিষ, মাহিষক, মাহিষিক, মাহিষেয়) : ৩. **মাইতি (মাহিতি, মাইতী)** = উড়িয়াজাতির উপাধিবিশেষ। **মাহিষ** = মহিষসম্বন্ধী, মহিষসদৃশ, মহিষদুগ্ধজাত, অন্তঃপুর। **মাহিষক** = মহিষপালক। **মাহিষিক** = মহিষপালনজীবী,

মহিষপালক, মহিষী-(ব্যাভিচারিণী)-পতি, দুষ্টানুরক্তপতি, ভগদ্বারা উপার্জ্জিত স্ত্রীধনোপজীবী। **মাহিষেয়** = মহিষীপুত্র, পাটরানীর ছেলে। **মাহিষ্য** = মহিষপালনে সাধু, সঙ্করজাতিবিশেষ (ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। পশুপালন ইহাদের বৃত্তি।)। (ব.শ.)। ৪. পদবী রূপে **মাইতি, মাহাত** এবং জাতি রূপে **মাহিষ্য** এবং **মাহাত** শব্দ প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. দ্র. মহ, মহৎ, মহান, মহিষ, মহিষী**। লক্ষণীয় যে, **মাহাত** শব্দটি কোনো অভিধানেই এখনও অন্তর্ভুক্তি পায়নি। আমরা **পদবী**তে **মাইতি** ও **মাহাত** নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব। এখানে **মাহিষ্য** শব্দের সঙ্গে বাকি শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূলত এই বিষয়টি দেখানোর জন্য যে, এই শব্দগুলি আমাদের বৈদিক-পূর্ববর্তী **মহান** যুগের **মহৎ** উত্তরাধিকার; অথচ শব্দার্থের নিহিতার্থ না জেনে একালের আধুনিক অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাজ্ঞানীগণ শব্দগুলির প্রতি কী আচরণ করেছেন! ফলত, এই শব্দগুলি যেসকল বাংলাভাষীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের প্রতি আধুনিক-জ্ঞানের জগৎ থেকেই অপমান সিঞ্চিত হয়েছে! ...

আগেই আমরা জানিয়েছি (দ্র. **মহিষ**) যে, '**মহান** ইচ্ছা যাহার', সেকালে তাকেই বলা হত **মহিষ**; সাদৃশ্যে তা buffalo-মহিষকেও বোঝাত। যেমন কিনা, 'যে সত্তা (যৌথসমাজের চোখে) **কু**-করণ (cook) করে, নিজে খায় কিন্তু অন্যকে খেতে দেয় না', সেকালে তাকে বলা হত **কুকুর**, সাদৃশ্যে তা dog-কেও বোঝাত। মহাভারত ও পুরাণাদি অনুসারে সেই **কুকুর** বংশে জন্মেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (দ্র. **অন্ধক**)। আমরা উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ দুটির মূল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু সাদৃশ্য অর্থটি মনে রাখার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি সুবিধাবাদী নীতি। এর ফলে আমরা নিজেদের অসম্মান করেছি, প্রতিবেশীদের অপমান করেছি, এমনকি বিদেশীর চোখে নিজেদের হীন প্রমাণ করেছি! এসবই আমাদের কপালে ছিল!

যেহেতু সনাতন যুগের বা **মহান** যুগের **মহান**দেরকে সমাজ-পরিচালকের স্থান থেকে সরিয়ে (বলা ভাল, প্রবঞ্চনামূলকভাবে সরিয়ে, দ্র. **দক্ষযজ্ঞ**) বৈদিক যুগের সূচনা হয়েছিল, ফলত, বৈদিক যুগ থেকে ঐ **মহ, মহা, মহান, মাহাত, মাহালী, মাহিয়ত, মাহিষ্য** ... প্রভৃতি জাতির মানুষদের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান কমে যেতে থাকে। আধুনিক যুগে পৌঁছে দেখা যায়, যদিও **মহান**দের আদিবাসী উত্তরসূরিগণ (সাঁওতাল ... প্রভৃতি বনবাসী জাতি) মনে রেখেছেন যে, ঐ লোকশ্রুতির মধ্যে **মাহাত**রাই ছিল 'বড়-ঘর' অর্থাৎ আদি-সমাজপরিচালক বা **মহান**-যুগের **মহিষ** এবং অতএব আদি **শিব** (এবং সেই সুবাদে আদি ব্রাহ্মণ); কিন্তু সেসব কথায় একালের **মাহাত**রা, **মাহালী**রা, **মাহিষ্য**রা, **মাহিয়ত**রা, **মাইতি**রা এবং তাঁদের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত উত্তরসূরিরা অনেকেই কান দিলেন না। তাঁরা অতীত খুঁজতে গেলেন আধুনিকতাবাদী ঐতিহাসিকদের ইমপোর্টেড চশমা প'রে। **মহিষ**কে বুঝলেন buffalo, **কুকুর**কে বুঝলেন কুত্তা, dog। ব্যস! নিজেদের অতীতকে ঘৃণা করে সেখান থেকে পালানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কোনো কোনো 'শিক্ষিত' মাহাত, মাহিষ্য আবার নতুন করে পৈতা পরে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা জানতেই পারলেন না যে, যার শরীরে আদি ব্রাহ্মণের, সনাতন শিবের, **মহান**-যুগের **মহিষ**-এর রক্ত রয়েছে, তার নতুন করে পৈতে পরে ব্রাহ্মণ হওয়ার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া এখন তো আমরা জানিই, যে কোনো মানুষই **ব্রাহ্মণ** হতে পারেন, যদি জ্ঞানচর্চা ও সত্যের সাধনা তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়; তা তিনি যে জাতিতেই জন্মান না কেন!

মা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিপ্রমাণ, অতিমাত্র, অতিমান, অনুপ, অনুপম, অনুপমিত, অনুপাম, অনুমিত, অনোআন, অপ্রমাণ, অপ্রমিত, অপ্রমিতি, অপ্রামাণিক, অমাতৃক, অমাত্র, অমাত্রা, অমানন, অমাননা, অমানান, অমানী, অমান্য, অমাবস্যু, উপমা, নির্ম্মাণ, নির্ম্মিতি, প্রতিম, প্রতিমা, প্রমা, প্রমাণ, প্রমিত, প্রামাণিক, প্রামাণ্য, বিনির্ম্মিতি, বিমান, ম, মউসা (মৌসা), মৎ (মৎ করো), ময়ূখ, ময়ূখমালা, ময়ূখমালিকা, ময়ূখমালী, ময়ূখী, মা, মাঅ, মাআ, মাই, মাইআ, মাইজ (মাঝে, মজ্জিত), মাইএ্যা (মাইয়া, মায়্যা), মাই-বাপ (my-বাপ), মাইরি (মাই-ঋ, মেরী), মাউই, মাউরী, মাউসা, মাও, মাওড়া, মাঃ, মাঁইয়া, মাকাঠি, মাকু, মাকুন্দ, মাকুন্দে, মাঠকরুণ, মাত, মাতঃ, মাতরপিতৃ, মাতরি, মাতরিপুরুষ, মাতরিশ্বা (মত্ত-জাত মনে হয়), মাতা, মাতা (পরিমাণকর্ত্তা), মাতাগুরু, মাতাপিতা, মাতাপুত্র, মাতাম, মাতামহ, মাতামহী, মাতু, মাতুষ্বসাপতি, মাতুল, মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলিঙ্গ (মাতুলুঙ্গ, মাতুলুঙ্গক), মাতুলী, মাতুলেয়, মাতুল্য, মাতৃক, মাতৃকা, মাতৃগণ, মাতৃগন্ধিনী, মাতৃগোত্র, মাতৃগ্রাম, মাতৃঘাত, মাতৃঘাতী, মাতৃচক্র, মাতৃতঃ, মাতৃদেব, মাতৃদেবী, মাতৃনন্দন, মাতৃপক্ষ, মাতৃপিতৃ, মাতৃবৎ, মাতৃবৎসল, মাতৃবন্ধু, মাতৃবান্ধব, মাতৃভক্তি, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, মাতৃমণ্ডল, মাতৃমাতা, মাতৃযজ্ঞ, মাতৃযাগ, মাতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসৃ, মাতৃহা, মাত্তা, মাত্র, মাত্রা, মাত্রাগুরু, মাত্রাচ্যুতক, মাত্রাচ্ছন্দঃ, মাত্রাবৃত্ত, মাত্রাভস্ত্রা, মাত্রার্দ্ধ, মাত্রালাভ, মাত্রাসঙ্গ, মাত্রাসমক, মাত্রাস্পর্শ, মাত্রিকা, মাদা, মাদা-দেওয়া, মাদার (mother), মাদী, মাদীয়ান (মাদোয়ান), মাদুল, মাদুলি, মাদৃক্, মাদৃক্ষ, মাদৃশ, মান, মাননা, মাননীয়, মাপ, মাপ (মাফ), মাপন, মাপনা, মাপা, মাপাজোখা, মাপান, মাপি, মাফ, মাফিক (মৌহাফিক), মাবদি, মাভৈ, মা ভৈ, মা ভৈঃ, মাম, মামক, মামকী, মামকীন, মামড়ি, মামলা, মামা, মামাইত, মামাত, মামাবাড়ী (মামলাবাড়ী, জেলখানা), মামী, মামু, মায়ু, মায়্যা, মায়ের, মার, মার্কা, মার্কিন, মারকুলি, মারকেট, মালূর, মাসতাত, মাসতুত, মাসাশ, মাসাস, মাসী, মাসুয়া, মাসুরী, মাস্যা, মাস্বা, মাহি, মিতি, মেয়, মেয়া, মেয়ে, মেয়েঘর, মেয়েছেলে, মেয়েজন, মেয়েমর্দ্দ, মেয়েমানুষ, মেয়েমুখো (মেনীমুখো), মেয়েলি(লী), মেয়্যা, মেসো, মেস্বা, মৌহাফিক, ম্যাপ (মাপ), সপ্রমাণ।

মা = পরিমিত-র আধার যে; অর্থাৎ, পরিমিত-কর্ম্ম করে যে। (তার মানে, কেউ কোনো সত্তাকে সংকুচিত করে কিংবা সত্তা নিজে সংকুচিত হ'য়ে, পরিমিত হ'য়ে ক্ষুদ্রতম রূপ নিয়ে কোথাও থাকলে, সেই আধারটিকে যেমন **মা** বলা যায়, তেমনি পরিমিত করে যে, বা পরিমাপ করে যে, তাকেও '**মা**-করা' বলা যেতে পারে।)

প্রতিম, প্রতিমা : ১. **প্রতিম** = প্রতি + ✓মা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। **প্রতিমা** = প্রতি + ✓মা + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***প্রতিম** = ম-এর প্রতিরূপ ম যাহাতে। **প্রতিমা** = মা-এর প্রতিরূপ **মা** যাহাতে; অথবা, **প্রতিম**-এর আধার যে।* ৩. **প্রতিম** = সদৃশ, নিভ, সঙ্কাশ। **প্রতিমা** = সাদৃশ্য, অনুকরণ, শিলাদিকৃত সদৃশরূপ, প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিবিম্ব, গজদন্তবন্ধ। (ব.শ.)। ৪. **প্রতিম** পৃথকভাবে অপ্রচলিত, দেব**প্রতিম**, পার্থ**প্রতিম** ... রূপে 'মতো' অর্থে প্রচলিত এবং statue অর্থে **প্রতিমা** শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **উপমা, প্রতিকৃতি**। ইতোপূর্বে **প্রতি** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, **প্রতি** দুরকম — স্বাভাবিক-**প্রতি** ও বিপরীত-**প্রতি**। এখানে বিপরীত-**প্রতি** শব্দটি **ম** শব্দের সঙ্গে জুড়ে **প্রতিম** শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। এর অর্থ হল, জগতে যা কিছু 'পরিমিত' রূপে বা **ম**-রূপে বিদ্যমান আছে, তারই প্রতিরূপ হল **ম**। এই ম-এর দুটি দিক থাকে, একটা মানসিক, একটা বাহ্যিক। পরিমিতকরণ বা সীমায়ন যতক্ষণ মানসিক আধারে সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ তা (ম্ + অ) **ম** মাত্র, কিন্তু যখন তা বাহ্যিক আধারে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখন তা (ম্ + অ + অ) **মা**। কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতিরূপ মনে মনে ধরবার সময় তার সীমায়ন হয়েই যায়। বস্তুটির **ভব** আমাদের মনে **অনুভব** সৃষ্টি করে। চৈতন্যের সেই **অনুভব**টি হল বস্তু বা বিষয়টির মানসিক প্রতিরূপ বা **প্রতিম**। এর কোনো অবয়ব নেই, চেতনারূপ মাত্র। এই চেতনারূপটি বাস্তবায়িত হলে, সেটি হয় **প্রতিমা**। পার্থ**প্রতিম** কথাটির অর্থ তাই পার্থের প্রতিরূপের **অনুভব**গত চেতনারূপ। এ পার্থ নয়, পার্থের মতো এবং তাও চেতনায় মাত্র। কথাটি যদি পার্থ**প্রতিমা** হত, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হত, **প্রতিমা**টি পার্থের মতো। পার্থ নয়। কেননা, তার প্রাণ নেই। সে পার্থ নয়, পার্থের **প্রতিমা** মাত্র।

তবুও এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, এই **মা** কোন **মা**? পরিমাপিতের আধার **মা**, না কি **মাতা** ও **মাতৃ** শব্দের বিবর্তিত-রূপ **মা**? এবং দ্বিতীয়ত, **মা**-রূপে বিদ্যমান সত্তাদের প্রতিরূপই যদি **প্রতিমা** হয়, তাহলে **শিব, দুর্গা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, কালী** ... প্রভৃতি ঠাকুর-পদবাচ্য **প্রতিমা**দের একটি করে 'মা-রূপে বিদ্যমান' প্রকৃত রূপ রয়েছে! **প্রতিমা**-শিল্পী যখন তাঁদের কারও **প্রতিমা** নির্মাণ করেন, তখন তাঁদের সেই প্রকৃত **মা**-রূপটি দেখেই (তা তিনি বাস্তবে দেখুন কি মানসচক্ষেই দেখুন) তাঁর **প্রতিমা**টি গড়ে তোলেন। প্রশ্ন হল, সেই ঠাকুরের **মা**-রূপটি তিনি কোথায় কীভাবে দেখেন? আমরা কি সেই রূপ দেখতে পেতে পারি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, নিম্নে বর্ণিত **মা**[১] ও **মা**[২] শব্দের অর্থ থেকে পাঠক নিজেই বুঝে নিতে পারবেন, **প্রতিমা**র **মা** কোন **মা**। অতএব তা নিয়ে আমরা আর অবকাশ ক্ষয় করব না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর আমরা পেয়েছি, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের জগতে তা এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। একালে যাঁরা চিত্রকলা-ভাস্কর্য ... ইত্যাদি **প্রতিরূপ**-প্রকাশন নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের সামনে এই উত্তর এক নতুন জগৎ উন্মোচন করে দেয়। আমরা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি চর্চা করতে গিয়ে যেমন অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি যে, মূলত 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাদের চিহ্নিত করে তাদের শাব্দিক (আওয়াজ) রূপে প্রকাশ করাই ছিল আমাদের পূর্বসূরি শব্দজ্ঞানীদের শব্দসৃজনের, বাক্যসৃষ্টির, বয়ানসৃষ্টির, ভাষা-সৃষ্টির মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য; ঠিক তেমনি 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাদের চিহ্নিত করে তাদের চিত্ররূপে, ছবিরূপে, অবয়বরূপে, মূর্তিরূপে, প্রতিমূর্তিরূপে, **প্রতিমা**রূপে, ভাস্কর্য রূপে উপস্থাপন করাই ছিল আমাদের প্রাচীন শিল্পীদের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য! তার মানে, এ পর্যন্ত বিশ্বে যত প্রাচীন মূর্তি আমরা দেখেছি, দেখছি, সেগুলির একটিও অলীক নয়। তারা বাস্তবের 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তা। প্রাচীন শব্দবিদগণ যেমন তাদের দেখতে পেতেন এবং ভাষার শব্দের সাহায্যে তাদের প্রকাশ করতেন **শিব নারায়ণ মহামায়া কালী** ... ইত্যাদি নাম বলে; প্রাচীন শিল্পীরাও তাদের একই ভাবে দেখতে পেতেন এবং চিত্র ও **প্রতিমা**র সাহায্যে তাদের প্রকাশ করে গেছেন। তার মানে, আমরা যে সকল ঠাকুরের **প্রতিমা** দেখি, তাদের একটিও তথাকথিত 'কাল্পনিক' মূর্তি নয়। সেগুলি বাস্তব। একশোভাগ বাস্তব। আমাদের পূর্বসূরিদের প্রদত্ত নামের ও সেগুলির বর্ণনার নিহিতার্থ উদ্ধার করে সেই বাস্তব দেব-সত্তা ও দেবী-সত্তাদের 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' রূপকে আমরা এই কোষগ্রন্থে **শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মহামায়া, কালী** ... প্রভৃতি শব্দে বর্ণনা করবার সাধ্যমতো ও অবকাশ-মতো চেষ্টা করেছি। আমাদের প্রাচীন **প্রতিমা**-শিল্পীরা সেই সত্তা-সমূহেরই **প্রতিমা** নির্মাণ করে সেই 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাসমূহকেই প্রকাশ করে গেছেন; পরবর্তীকালের **প্রতিমা**-শিল্পীরা সেগুলিকেই স্থির রূপে অনুকরণ করে চলেছেন মাত্র। এতকাল ভাষার ক্ষেত্রেও সেরকমই ঘটে আসছিল, এই কোষগ্রন্থ সেই ত্রুটি সংশোধন করে আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণের শব্দসৃষ্টির কলাকৌশলকে সাধ্যমতো পুনর্নবীকরণ ও একালীকরণ করার চেষ্টা করছে।

হ্যাঁ, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ভাষার দুনিয়ায় আধুনিক কালে সবাই যেমন মনে করতেন এবং এখনো অনেকেই মনে করেন যে, ঐ **শিব নারায়ণ** প্রভৃতি শব্দ কাল্পনিক নাম মাত্র, শিল্পকলার দুনিয়াতেও এখনও সবাই মনে করেন যে, ঐ **শিব নারায়ণ**াদি **প্রতিমা**গুলি কাল্পনিক মূর্তি মাত্র। ... এ যে কত বড় ভুল, আমাদের শব্দার্থকোষ ভাষার ক্ষেত্রে সেকথা প্রমাণ করছে; অচিরে শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সেরকমই ঘটবে। আজ আমরা নিশ্চিত, আমাদের এই শব্দার্থকোষ অচিরে তেমন শিল্পীর জন্ম দেবেই, যিনি পুনরায় 'অদৃশ্য'কে 'দৃশ্যে' দর্শন করানোর কলাকৌশল (আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কলাকৌশল অদৃশ্য-কিন্তু-সক্রিয়-**মা**য়ের **প্রতিমা** নির্মাণের প্রথার মাধ্যমে আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন, তার) পুনর্নবীকরণ করে শিল্পকলার দুনিয়ায় এক মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দেবেন। ... দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**।

এর পরেও থাকছে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হল, **প্রতিকৃতি, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ** — এদের মধ্যেকার পার্থক্য কোথায়, মিলই বা কোথায়, সেটি দেখানো। পার্থক্য হল 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাগুলি কেউ **কৃতি** রূপে, **মা** হিসেবে, **মূর্ত্তি** হয়ে, **বিম্ব** হয়ে, **রূপ** লাভ করে আমাদের 'অদৃশ্য' মানসলোকে দেখা দেয়। তাদের **প্রতি-কৃতি, প্রতি-মা, প্রতি-মূর্ত্তি, প্রতি-বিম্ব, প্রতি-রূপ** বানিয়েই শিল্পীরা তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্য উপস্থাপন করতেন। হাতিকে যেমন কেউ কান ধরে, লেজ ধরে, শুঁড় ধরে

দেখায়, অদৃশ্য সত্তাকে তেমনি কেউ **কৃতি**র মাধ্যমে, কেউ **মূর্ত্তি**র মাধ্যমে, কেউ **রূপে**র মাধ্যমে প্রতিভাত করায়। তাই কার্যত তারা এক বটে, আলাদাও বটে।

মা[১] : ১. ✓মা + ক্বিপ্ (০) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *পরিমিতের আধার যে; অর্থাৎ, যাকে পরিমিত করা বা পরিমাপ করা হয়ে গেছে।* ৩. লক্ষ্মী, মাতা, মান, পরিমাণ; (সঙ্গীতে) 'মধ্যম'-এর সংক্ষেপাক্ষর; বারণ, নিষেধ, না, বিকল্প। (ব.শ.)। ৪. সঙ্গীতের **মা** ছাড়া উপরোক্ত অন্য কোনো অর্থে এই **মা** শব্দটি এখন আর প্রচলিত নয়। '**মা**-লক্ষ্মী' কথাটি আমরা বলি বটে, কিন্তু তার মানে 'লক্ষ্মী-লক্ষ্মী' কিংবা 'মা-মা' নয়। সেই বিচারে 'লক্ষ্মী' অর্থেও **মা** শব্দটি প্রচলিত নয়। ৫. দ্র. **উপমা, প্রতিমা, প্রমা, উমা**। এখানে মূলত তিন রকম **মা** রয়েছে। প্রথমত, 'পরিমিত-করণ' বা 'পরিমাপ-করণ' অর্থে **মা** শব্দের থেকে 'লক্ষ্মী', 'মাতা', 'মান', 'পরিমাণ' প্রভৃতি শব্দ প্রস্তুত হতে পারে, সেকালে হতও। এই 'মাতা' কিন্তু mother নন; এর অর্থ হল, 'মেপে দেয় যে'। একালের বাংলায় এই 'মাতা' শব্দটিও এখন অপ্রচলিত। এই 'মাতা'ই ছিল ইংরেজির mother, ল্যাটিনের mater, গ্রীকের meter ইত্যাদির মূলে। ইংরেজির lady শব্দের আদিতেও loaf তৈরি এবং ভাগ করার দায়িত্বের কথা ছিল। কিন্তু ইংরেজ তার এই ক্রিয়াভিত্তিক lady শব্দটিকে এখন 'ভদ্রমহিলা' অর্থে প্রতীকী করে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সঙ্গীতের 'মধ্যম'-এর **মা** হলেও হতে পারে, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না। কারণ, সঙ্গীত বিষয়ে আমরা অজ্ঞ। শুধু এইটুকু জানি যে, একদিকে রয়েছে সা রে গা এবং অপরদিকে রয়েছে পা ধা নি; মাঝে রয়েছে **মা**। তাকে 'মধ্যম' বলা সেকারণে যুক্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু সেই 'মধ্যম'কে **মা** বলা হয় কেন? সেটি কি সুরতরঙ্গের **তা-থৈ**-এর মধ্যেকার সেই কেন্দ্র**বিন্দু**র ব্যাপার, যেখানে যথাক্রমে সুরের ভাটি ও সুরের উজান এসে মিলিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে পরিমিত হয়ে যেতে পারে বলেই সে **মা**-পদবাচ্য? এই **মা**-তেই কি সর্ব-সুরলহরী এসে পরিমিত হয়ে **বিন্দুরূপিণী** হতে পারে? একথা আমরা বলছি এই কারণে যে, আমাদের শব্দার্থের নিয়ম থেকে আমরা জেনেছি যে, সাময়িক **সীমায়িতকরণ**, এবং তদ্দ্বারা একপ্রকার পূর্ণতার বোধই হল **ম**। বিন্দুরূপিণী (ং) বা ং-রূপিণী **ঙ ঞ ণ ন** পেরিয়ে এই ম-এ পৌঁছে তাঁর একপ্রকার পূর্ণ রূপ নিয়ে বিরাজ করেন। (দ্র. **ম**-বর্ণের অর্থ)। সেই সুবাদে সর্ব-সুরলহরীর কেন্দ্রীভূত রূপ মা-তে থাকার কথা। তাই থাকে কি না, সেকথা কেবলমাত্র সঙ্গীতজ্ঞরাই ঠিকঠাক বলতে পারবেন, আশা করা যায়।

সবশেষে **মা** কেমন করে 'বারণ', 'নিষেধ' ... ইত্যাদি হয়, সেটা বোঝা চাই। বিষয়টি খুবই সহজ, অথচ না বুঝলে খুবই কঠিন। **ধরা** বললে যেমন আমরা 'যে ধরে রেখেছে' সেই 'বাহ্য-পৃথিবী'টাকে বুঝি, আবার 'পাকড়ান'ও বুঝি; সেইরকম **মা** বললে আমাদেরকে 'যে পরিমিত বা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে', তাকে বুঝতে হবে, আবার, 'পরিমিত অবস্থাতেই থাকো (এগিয়ো না)' — এই অর্থটিও বুঝতে হবে। তাহলেই দেখা যায়, **মা** বললে 'বারণ', 'নিষেধ' ... প্রভৃতিও বোঝাচ্ছে। তবে কিনা, **মা** শব্দের এরূপ অর্থে ব্যবহার কেবল প্রাচীন বাংলায় (সংস্কৃতেই) অধিক দেখা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলায় তার ব্যবহার একটু আধটু হলেও, একালের বাংলায় **মা** শব্দের তাদার্থক প্রয়োগ কখনোই দেখা যায় না।

মাতা (মা[২]**, মাতৃ)** : ১. ✓মা + তৃ (তৃচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মা** = পরিমিতের আধার যে। **মাতা** = যে (আধারশক্তি) **মা**-কে তারণ করে। **মাতৃ** = **মা**-এর তারণ আবর্ত্তিত যাহাতে।* ৩. **মা** = মাতা (মাতৃ), মাতৃবৎ পূজ্যা নারী, মাতৃবৎ অভীষ্ট দেবতা, কন্যা, কন্যাসদৃশী, নারীমাত্র ... ইত্যাদি। **মাতা (মাতৃ)** = পূজনীয়া, জননী, পিতৃপত্নীমাত্র, প্রসবিত্রী, কন্যা, মাতৃবৎ পূজনীয়া নারী, পিতামহী মাতামহী পিতৃব্যপত্নী ইত্যাদি, অভীষ্টদেব-পত্নী, পুত্রবধূ, পৃথিবী, গাভী, লক্ষ্মী, দুর্গা, রেবতী, আকাশ, অসুর নিধনকালে ব্রহ্মাদির অষ্টশক্তি (ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, চর্চ্চিকা — এই অষ্টশক্তি। মতান্তরে — ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, রৌদ্রী, বারাহী, কৌবেরী, কৌমারী — এই সপ্তশক্তি), আখুপর্ণী, জটামাংসী প্রভৃতি, স্ত্রীমাত্র। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **মা** শব্দের — 'পরিমিতের আধার যে' — অর্থটির ভিতরে প্রকৃতপক্ষে mother নেই, রয়েছে মানবাস্তিত্বের সংক্ষিপ্ততম রূপ, অর্থাৎ ভ্রূণ। আসলে, আধেয়রূপী পুং-শুক্রের সঙ্গে আধাররূপী স্ত্রী-শুক্রের মিলনে জীবের অস্তিত্বের সর্বাধিক পরিমিত যে রূপটিকে বা ভ্রূণকে দেখতে পাওয়া যায়, যে কোনো জীবসত্তাকে পেছন দিকে সংকুচিত ক'রে ক'রে তার শেষ অবস্থানে পৌঁছালে তাকেই দেখা যায়। তাই সেটিই 'পরিমিতের আধার (= **মা**)', সেটিই মানুষের বা জীবের ভ্রূণ বা **মা**। বাহ্য পৃথিবীতে সেই **মা**-এর বা ভ্রূণের উত্তরণ ঘটান যিনি, তিনিই **মাতা**। কার্যত, জীবের ভ্রূণ থেকে সন্তান হয়, সে বড় হয়, এবং একসময় পুনরায় ভ্রূণ সৃষ্টি ক'রে তার বৃত্ত পূর্ণ করে থাকে। ভ্রূণের এই যে আ**বর্ত্তন**, এটির আধারকে তাই **মাতৃ** বলে। তার মানে, **মাতৃ** যেন একটি বিমানবন্দর, জীবের ভ্রূণ বা **মা** সেই অবতরণক্ষেত্রে নামে, নতুন রূপ লাভ ক'রে পুনরায় আকাশে উড়ে যায়, আবার একসময় নেমে আসে সেই রকমই কোনো বন্দরে, পুনরায় নবরূপ লাভ করে উড়ে যায়। সেই কারণে সেই '**মা**-এর আবর্ত্তনক্ষেত্র'রূপী বন্দরগুলিকে **মাতৃ** বলা হয়ে থাকে।

অবশ্য **মাতা** শব্দের 'জননী' 'প্রসবিত্রী' অর্থ দুটি একটু অন্যরকম কথাও বলে। যিনি জনন করেন, তিনি জননী বটে; কিন্তু তিনি কী জনন করেন? যিনি প্রসবকে ত্রাণ করেন, তিনি প্রসবিত্রী বটে; কিন্তু তিনি কী প্রসব করেন? জীবের ভ্রূণ? পুংশুক্র বা ডিম্বাণু নয়তো?

তৎক্ষণাৎ সেকথার এক সাক্ষী উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে। সুযোগ পাওয়া মাত্র সে বলতে শুরু করে — হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুংশুক্রই **মা**। সন্দেহে আমাদের চোখ যখন আধো-অন্ধকার দেখছে, তার মধ্যে **মাগ** শব্দটি এসে সওয়াল করতে শুরু করে দেয় — **মাগ**-এর **মা** যদি পুংশুক্রই না হবে, তবে পুরুষেরা নিজের নিজের শুক্র নিয়ে যার কাছে যায়, তাকে কি অকারণে **মাগ** বলা হবে? '**মা** গমন করে যাহাতে' সেই তো **মাগ**! সেই **মা**-কে পুরুষ বা পুংশুক্র হতেই হবে! ... অগত্যা এই **মাগ**-এর সামনে আমরা দু'জন কাচুমাচু করি, কীই বা করতে পারি আমরা। শেষমেষ আমরা পুংশুক্র-রূপী **মা**কেও আপাতত পথ

ছেড়ে দিই। সব শব্দের ব্যাপারে নিশ্চিত সত্যলাভের ভাগ্য আমাদের নয়, পরমাপ্রকৃতি সে কপাল আমাদের দেননি। আর, 'কপালে না থাকলে ঘি, ঠকঠকালে হবে কী!'

সে যাই হোক, তবে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে বাংলাভাষীগণ যা করেছেন, এই **মাতা** ও **মাতৃ** শব্দেও তাঁরা সেটি করেছেন — দুটি শব্দকেই সঙ্কুচিত করে শুধুমাত্র **মা**-এ পরিণত করে নিয়েছেন। সেটি তাঁরা করলেন কীভাবে, এবং সেক্ষেত্রে **মাতা** ও **মাতৃ** শব্দ দুটি নিজেদের অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে **মা**-এ আশ্রয় পেল কীভাবে, সেকথা জানা দরকার।

বাংলাভাষার বহু দীর্ঘ শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়েছে, যদিও প্রায় একই অর্থ ধরে রাখতে পেরেছে। আর, সেগুলি ঘটেছে নানা প্রক্রিয়ায়। সেই প্রক্রিয়ার কিছু কিছু আমাদের নজরে পড়েছে। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, শব্দ-সঙ্কোচনের এই প্রক্রিয়া-সমূহের নিয়ম অধ্যয়ন তো বহু দূরের কথা, তা নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই কখনো হয়নি। ফলে এ এক নতুন ক্ষেত্র এবং এক্ষেত্রে এগোতে হলে পূর্বসূরির সহায়তা পাওয়া যাবে না, সেকথা মনে রেখেই এগোতে হবে। তবে, এই মুহূর্তে সে রকম কিছু করা আমাদের কাজ নয়, আমরা এখানে শুধুমাত্র **মাতা** ও **মাতৃ** শব্দ দুটি কেমন করে স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে **মা**-এ সঙ্কুচিত হয়ে গেল, সেটুকুই জানতে চাইব। সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমাদের যেটুকু চোখে পড়েছে, এখন সেকথাই বলি।

মাতা হোক আর **মাতৃ**ই হোক, তার অবস্থা তো অনেকটা হাইড্রোজেন সিলিন্ডারের মতো, তার থেকে একটার পর একটা বেলুন জন্মাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, এবং এভাবে সে একদিন খালি হয়ে যাবে; তার থেকে আর বেলুন জন্মাবে না। বাস্তবে এই ঘটনাক্রমকে পেছন দিকে ফিরিয়ে আনা যায় না, যদিও একালের বিজ্ঞানীদের 'জটিলতাতত্ত্ব' সে ব্যাপারেও বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করেছে। মনোলোকে কিন্তু যে কোনো ঘটনাকে পেছন-পানে ফিরিয়ে আনা যায়। সেভাবে যদি উপরোক্ত সকল বেলুনকে পুনরায় হাইড্রোজেন সিলিন্ডারে ফিরিয়ে আনা যেত, তাহলে বলা যেত যে, বেলুনগুলির সংক্ষিপ্ততম রূপ বা 'পরিমিতের আধার' হল সেই সিলিন্ডার। সেই বিচারে যে **বিন্দু** থেকে বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিন্দুকেই সেই জগতের পরিমিত আধার বা **মা** বলা যেতেই পারে। ঠিক সেভাবেই **মাতা** ও **মাতৃ**কে **মা** বলা যায়, অথচ তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় না। ৬. ইংরেজি mother, ল্যাটিন mater, গ্রীক meter, জারমান mutter লিথুয়ানিয়ান mate, ... ইত্যাদি। (ব.শ.)।

মাতৃক (মাতৃকা, মাতৃকাগণ, মাতৃকাবর্ণ) : ২. *মাতৃক = মাতৃ (মা-এর আবর্তন) কৃত যাহাতে।* ***মাতৃকা*** *=* ***মাতৃক****-এর আধার যে।* ***মাতৃকাগণ*** *=* ***মাতৃকাদিগের গণ।*** ***মাতৃকাবর্ণ*** *=* ***মাতৃকা****-স্বরূপ যে* ***বর্ণ****।* / **মাতৃক** = মাতা হইতে আগত। ৩. **মাতৃক** = মাতৃদত্ত, মাতুল, মাতুলগৃহ। **মাতৃকা** = মাতা, ধাত্রী, পিতামহী, ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তি, মূলকারণ, যোনি। (ব.শ.)। অন্ধক নামে দৈত্যের সঙ্গে মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই অন্ধককে মহাদেব শূলের আঘাত করলে অন্ধকের দেহ হতে পতিত রক্তে সহস্র সহস্র অসুর সৃষ্ট হতে থাকে। এই ব্যাপার দেখে মহাদেব রুষ্ট হলেন এবং ক্রোধবশত তাঁর মুখ থেকে এক **অগ্নিশিখা** নির্গত হল। পরে এই অগ্নিশিখা এক দেবীরূপে পরিণত হয়। এঁর নাম হল যোগেশ্বরী। এই যোগেশ্বরীই প্রধান মাতৃকা। ক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরাহরূপী বিষ্ণু, কার্তিকেয়, প্রত্যেকে এক একজন করে আটটি মাতৃকা সৃষ্টি করলেন। এই অষ্ট মাতৃকা সৃষ্টি হলে এঁদের সমবেত চেষ্টায় অসুররা নিহত হল। এই মাতৃকাদের নাম — যোগেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, দণ্ডধারিণী, ও বারাহী। ক্রমে ক্রমে মাতৃকাদের সংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল। (পৌ.অ.)। **মাতৃকাগণ** = গৌরী-আদি ষোড়শগণ। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, বিনায়ক, কুলদেবতা। মতান্তরে, শান্তি ও কুলদেবতা বাদে বাকি চতুর্দ্দশ মাতৃকাগণ। **মাতৃকাবর্ণ** = তন্ত্রে ষট্চক্রের অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালা, মাতৃকাবর্ণগণ, বর্ণময় তান্ত্রিকচিত্রসমূহ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কৃত্তিকা, বর্ণ, বর্ণমালা**। **মাতৃক** শব্দটির যে ব্যবহার তার স্বরূপকে এখনও ধরে রেখেছে, তার একটি উদাহরণ হল '**নদীমাতৃক** দেশ'। তার মানে, নদীসমূহ মাতার মতো যে **দেশ**কে জন্ম দিয়েছে, গড়ে তুলেছে। সেই দেশের সেই নদীগুলিকে সেই কারণে দেশটির **মাতৃকা** বলা যায়। একটি সমাজের যৌথ মানসলোকটি যে সত্তাগুলির দ্বারা গড়ে ওঠে, সেই সত্তাগুলিকে স্বভাবতই **মাতৃকাগণ** বলা হয়ে থাকে। এদের ষোলটি ভাগ রয়েছে। **বর্ণের** ধারণায় সেগুলিকেই রামপ্রসাদ বলেছেন, '**ষোলো স্বর** কণ্ঠেতে বিহরে'। এই স্বরগুলি ছাড়া আর যে সকল ব্যঞ্জন **বর্ণ** রয়েছে, তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের **বর্ণমালা**। সেগুলিকে একত্রে **মাতৃকাবর্ণ** বলে। ৬. ল্যাটিন থেকে আসা ইংরেজি শব্দ matrix।

মাত্র (মাত্রা) : ১. ✓মা + ত্র (ত্রণ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *মাত্র = মার (পরিমাপিত সত্তার) ত্রাণ থাকে যাহাতে।* ***মাত্রা*** *=* ***মাত্র****-এর আধার যে।* / **মাত্রা** = যাহা দ্বারা পরিমাণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. **মাত্র** = কার্ৎস্ন্য, সাকল্য, তৎসমূহ, অবধারণ, কেবলার্থক, ক্রিয়ার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল; প্রমাণ, পরিচ্ছেদক-মাত্র (আকারে, দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে, উচ্চতায়, গম্ভীরতায়, দূরত্বে, আধিক্যে)। **মাত্রা** = পরিমাণবস্তু, পরিচ্ছেদকমাত্র, পরিচ্ছদ, পুরস্কার, অবরব, অংশ, ভাগ, পরিমাণের হার, মান (standard), (ছন্দে) বর্ণোচ্চারণে কালমানভেদ (syllabic instant), (সঙ্গীতে) গীতকালের মানবিশেষ, কর্ণভূষণ, বিত্ত, ধন, অক্ষরের উপরিস্থ তির্য্যগ রেখা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. বহু পথ অতিক্রম করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে, মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক-জ্ঞান, যুক্তিবাদী-জ্ঞান, বিজ্ঞান, **বুদ্ধি** প্রভৃতির চেয়ে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-জ্ঞান, আবেগভিত্তিক-জ্ঞান, **মনন**-শীলতা ইত্যাদির ব্যবহার শতগুণ বেশি। তার অজস্র প্রমাণের মধ্যে একটি হল এই **মাত্র** ও **মাত্রাজ্ঞান**। ...

'পরিমাপিত সত্তা ত্রাত হয় যাহাতে', তাকে বলে **মাত্র**। অর্থাৎ যে কোনো বিষয় বা বস্তু সমূহের একটি অংশকে একত্র করে তার পরিমাণ নির্ণয় করে একধরনের সর্ব**মোট**-ধারণায় পৌঁছানো হয়। সেই ধারণাটিকে বলে **মাত্র**। অর্থাৎ, কোনো না কোনোভাবে বিষয়

বা বস্তুগুলিকে মেপে সেই **মাত্র**-ধারণাটিতে পৌঁছানো গেছে বলেই, তার মধ্যে একটা পূর্ণতার ভাব এসে গেছে। '১০টি **মাত্র** পেয়েছি', 'সবে **মাত্র** এলাম', 'এখন পর্যন্ত এইটুকু **মাত্র** করতে পেরেছি' — প্রভৃতি বাক্যগুলি বলে দেয়, **মাত্রে** পৌঁছানোর আগে যথাক্রমে কিছু বস্তুর, কিছু সময়ের, কিছু কাজকর্মের হিসেব বা পরিমাপ ক'রে সেগুলি বিষয়ে একটি **মোটমাট** ধারণায় পৌঁছানো গেছে; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই হিসেব বা পরিমাপ যুক্তিসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত নয়। অথচ এটি 'একটি মোটমাট ধারণা' বলেই এর ভিতরে একটি সাময়িক পূর্ণতার বা এককের বোধ এসে যায়। এই এককের বোধকে বলে **কেবল**। এও কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নয়। তবু এই **কেবল** বা **মাত্র** ধারণাকে যদি বিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে বলা যায় — একটি বস্তায় এক এক করে বস্তুগুলি রেখে বস্তাবন্দী করে বস্তার উপরে লিখে দেওয়া হল — '**মাত্র** ৫টি'। চিহ্নের সাহায্যে ব্যাপারটিকে বোঝাতে হলে লিখতে হত — (.....)> ৫টি। তার মানে ঐ সব বস্তুগুলিকে বস্তাবন্দী করে ফেলায় সেটির ভিতরে একটি সমগ্র বা পূর্ণতার ভাব এসে গেল, সেই পূর্ণতার ভাবটিকে প্রকাশ করে '**মাত্র** ৫টি'। ইংরেজিতে একে বলে 'only 5'। অর্থাৎ, বাংলায় যেখানে মেপে মেপে মাপিত সত্তাগুলির ত্রাণ ঘটেছে '**মাত্র** ৫টি'তে, ইংরেজিতে সেখানে মাপার কথাটি বাদ পড়েছে, ধরা রয়েছে 'একটি সামগ্রিকতা-রূপযুক্ত ৫ সংখ্যা'। সমান বা is equal to ধারণার সঙ্গে এই **মাত্র**-ধারণার একটু পার্থক্য আছে। সমানের (= এর) ক্ষেত্রে দুদিকে দুটি বিষয় থাকে এবং মাঝে থাকে সমান [(.....) = ৫টি] চিহ্নটি। যার মানে দাঁড়ায়, বাঁদিকে যা আছে তার যা মান, ডানদিকে যা আছে তারও মান তাই। সেই কারণে তারা সমান। বাঁদিকটিকে হিসেব বা পরিমাপ করে ডানদিকে পৌঁছনো গেছে কিনা, ইংরেজিতে সেকথা বলা থাকে না, বাংলায় থাকে। ...

মাত্রের আধার যে, তাকে **মাত্রা** বলে। 'মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিন্তু তাঁর জ্ঞান পূর্ণ**মাত্রা**য় ছিল' — বাক্যটিতে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের **মাত্রা** হয়, পূর্ণ**মাত্রা** হয়, হয়তো-বা যে কোনো **মাত্রাই** হয়। একই ভাবে 'আর, ডাক্তার-ঔষধ-হাসপাতাল ক'রে ক'রে যে কী **মাত্রায়** টাকা ঢালতে হল, আর কী **মাত্রায়** ভোগান্তি হল, তার হিসেব করা মুশকিল!' — তার মানে, ভোগান্তিরও **মাত্রা** হয়, টাকা-পয়সারও **মাত্রা** হয়। অর্থাৎ কিনা, আমরা বাংলাভাষীরা আমাদের জ্ঞান ধন দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা সবই মাপতে পারি, মাপি, এবং মেপে তার একটা **মাত্র**-ধারণাতেও পৌঁছাতে পারি। আমাদের জীবনযাত্রার প্রায় সর্বক্ষেত্রে সবসময় আমরা আমাদের চারপাশের লোকজন, ঘটনাবলী, বিষয়, বস্তু ... ইত্যাদি সবকিছুকে মাপি এবং মেপে মেপে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ **মাত্রা**-ধারণায় পৌঁছাই এবং সেই **মাত্রা**-ধারণার সাহায্যে আমাদের জীবনযাত্রার কাজ চালাই। এবং ঐ মাপার কাজটা আমরা সবই এত অনায়াসে, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে, কোনো অ্যাকাডেমিক-জ্ঞান বা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ছাড়াই করি যে, সেকথা কেউ মনে করিয়ে না দিলে কিছুতেই মাথাতেও আসে না। 'মূর্খের' কথা বাদ দিন, সবচেয়ে 'শিক্ষিত' মানুষও যখন বলেন, 'কী **মাত্রায়** খাটুনি যাচ্ছে, ভাবতে পারবেন না!' তখন তাঁকে যদি বলেন, 'আপনার খাটুনির **মাত্রাটি** আপনি মেপেছেন কীভাবে?' তিনি কোনো উত্তরই দিতে পারবেন না। কার্যত আমাদের রোজকার জীবনে ক্ষুধার **মাত্রা**, তৃপ্তির **মাত্রা**, চেঁচামেচির **মাত্রা**, রাগারাগির **মাত্রা**, প্রয়োজনের **মাত্রা**, বিরাগের **মাত্রা** ... এরকম অজস্র বিষয়ের **মাত্রা** নিয়ে আমাদের ভাবতে হয় ও সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে হয়। আমাদের দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা ঘৃণা প্রেম ভালবাসা রাগ অনুরাগ ক্রোধ হিংস্রতা ... ইত্যাদি কত কত বিষয়ের **মান** নির্ণয় করে সেগুলির **মাত্রাজ্ঞান** দিয়ে যে আমাদের দৈনন্দিন কাজ চালাতে হয়, তার হিসেব নেই। বলতে কি, জীবন যাত্রার প্রয়োজনে পারিপার্শ্বিক বস্তু, বিষয়, এবং সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নানান স্তর বিষয়ে যে পরিমাণে **মাত্রাজ্ঞান** আমাদের লাগে, তার প্রায় সবটাই এখনও আমরা আমাদের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানসিক পরিমাপ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কাজ চালিয়ে থাকি বা থাকতে বাধ্য হই। কেননা, সেই সমস্ত **মাত্রা** নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনও এতই কম, দুর্বল ও অক্ষম যে, তা দিয়ে কাজ চালাতে যাওয়া প্রায় চামচ দিয়ে পুকুর সিঁচে ফেলার চেষ্টার মতো হাস্যকর ব্যাপার। আমাদের অ্যাকাডেমি ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানবাদীরা যে তাঁদের জ্ঞান**বুদ্ধি** নিয়ে গর্ব করেন, সেটা করা তাঁদের একেবারেই উচিত নয়; বরং তাঁদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কেননা, সভ্যতার প্রয়োজন পূর্ণ করার যোগ্য তাঁরা এখনও হয়ে উঠতে পারেননি, যোগ্য হয়ে ওঠা থেকে সে এখনও বহু কিলোমিটার দূরে রয়েছেন। ... দ্র. **মন**, **মান**।

মাপন (মাপ, মাপনা, মাপা, মাপাজোখা, মাপান) : **১.** ✓মাপি + অন (ল্যুট্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মাপ* = *মা*** *(পরিমিতের আধার বা* ***মান****) পালিত যাহাতে।* ***মাপন* = *মাপ*** *অন যাহাতে।* ***মাপনা* = *মাপন*****-***এর আধার যে।* ***মাপা* = *মাপ*****-***এর আধার যে।* ***মাপাযোখা* = *মাপা*** *ও* ***যোকা*** *(নিম্নে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।* ***মাপান* = *মাপা*** *অন যাহাতে।* / **মাপন** = যাহা দ্বারা মান সাধন করা যায়। (ব.শ.)। **৩. মাপ** = দৈর্ঘ্য বিস্তার বা বেধের পরিমাণ (dimension), হস্তাদি দ্বারা বস্ত্রাদির দৈর্ঘ্যপরিমাণ, প্রস্থাদি দ্বারা ধান্যাদির পরিমাণ, শঙ্খাদির দ্বারা ব্যাসের পরিমাণ, ধান্যাদির প্রায় তিন মণ; পরিমাণ করা, মাপা (to measure)। **মাপন** = তুলা, তুল-দাঁড়িপাল্লা। **মাপনা** = পরিমাণ, মাপা (measuring)। **মাপা** = পরিমাপ করা। **মাপাজোখা** = দৈর্ঘ্য বিস্তার বা বেধের পরিমাণ ... ইত্যাদি। **মাপান** = পরিমাপ করান। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. মাপ** ও তজ্জাত শব্দের ভিতরে **মা** বা পরিমিত সত্তার আধার বা 'পরিমাপন করা' কিংবা 'পরিমাপিত' যে পালিত হয়, সেকথা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু যেটা অসুবিধা হয়, তা হল, **মাপা**র সঙ্গে **জোখা** কেন? শব্দটিকে আরও একটি শব্দের সঙ্গে 'পরিপূরক **যোড়শব্দ**' (দ্র. **মোটমাট**) রূপে পাওয়া যায়, সেটি হল **লেখাজোখা**। আসলে কথাদুটি হবে **মাপাযোখা** ও **লেখাযোখা**। এই **যোখা** কথাটি এসেছে **যক** থেকে, যার থেকে **যক্ষ**, **যকার**-ধন, **যক্কির**-ধন, যক-দেওয়া (ঠকান) ... প্রভৃতি শব্দ এখনও গ্রামবাংলায় কমবেশি প্রচলিত আছে। আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীগণ সেই **যক**কে সংস্কার করে **যক্ষ**

শব্দে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মধ্যযুগের শব্দজ্ঞানীগণ অনেকেই সঠিক বানানে **যোখা** লিখতেন, যেমন কৃত্তিবাস ওঝা।

যাই হোক, আদিতে এই **যক্ষে**র জন্ম হয়েছিল **দক্ষ** ও **রক্ষ**-এর (বা **রাক্ষসে**র) সঙ্গেই। পরে এই **যক্ষ** যখন ক্রমান্বয়ে মানুষকে **যক** দিতে লাগল, ঠকাতে লাগল, শোষণ করতে শুরু করল তখন এর নাম হয়ে যায় **যোঁক** বা **যোঁকা** (দ্র. **ছিনাজোঁক**), অর্থাৎ যারা রক্ত চোষে, সাদৃশ্যে যা জীবজগতের leech-কেও বোঝায়। তার আগে যৌথ সমাজের সমস্ত সম্পদ ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়ার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বলা হত **যক্ষ**। তখন, যখন লেখালিখির খুব একটা প্রচলনই হয়নি, তখনই তাঁকে সেই সম্পদের হিসেব রাখতে গিয়ে কাকে কী দেওয়া হল না-হল সেসব কথা লিখতে হত, এবং একধরনের আঁকিবুকি টেনে সংখ্যার ও নানা চিহ্নের মাধ্যমে কত খরচ হল না-হল, কত থাকল, সেসব কথাও অঙ্ক কষে টুকে রাখতে হত। তার এই নামধাম ইত্যাদি লেখাকে বলা হত **লেখা**, আর দুর্বোধ্য আঁকিবুকি অঙ্ক টুকে রাখাকে বলা হত **যোখা**। তার থেকে **লেখাযোখা** কথাটির প্রচলন হয়ে যায়। মাপামাপি করার সময়ও শুধু মাপলেই চলে না, সেটি আবার নানা চিহ্নের সাহায্যে টুকে রাখার দরকার পড়ে। ফলত, তার নাম হয়ে যায় **মাপা** ও **যোখা**। কিন্তু হলে কী হবে, আমাদের আধুনিক অভিধানকারগণ এই **লেখাযোখা** ও **মাপযোখ** বা **মাপাযোখা** শব্দ তিনটিকে যা খুশি বানানে লিখে রেখে গেছেন। ফলত আধুনিক অভিধানে এদের আমরা **লেখাজোখা, মাপজোখ, মাপজোক, মাপজোখ, মাপজোপ** ... ইত্যাদি রূপে পেয়ে থাকি। এবার এই শব্দের বানানটি ঠিক করে নেওয়া দরকার। **৬.** কার্থেজীয় বণিকদের ভাষা থেকে উপাদান নিয়ে ল্যাটিন ভাষায় চালু হয়েছিল mappa শব্দ, বোঝাতো 'কাপড়ের খণ্ড'। যার উপর ভূপৃষ্ঠের প্রতিকৃতি থাকত, তাকে বলা হত mappa mundi (= পৃথিবীর map)। তাই, ইংরেজির map শব্দটিতে **মাপ** শব্দের উপস্থিতি সহজেই অনুমেয়।

মামা (মামী, মামু) : **২.** ***মামা*** *=* ***মাম****-এর (****মম*** *হইতে জাত-র) আধার যে।* ***মামী*** *=* ***মাম****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মামু*** *=* ***মাম*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩. মামা** = মাতুল। **মামী** = মাতুলানী। **মামু** = মামা (মুসলমানসম্বন্ধে)। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ঝাম**। যে সকল শব্দের ভিতরে ইতিহাসের পদচিহ্ন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে রয়েছে, এবং যাকে খুব সহজেই অনেকে বুঝতে পারবেন, তার একটি উদাহরণ হল এই **মামা** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি। তবে সে বিষয়ে যাওয়ার আগে **মামা** শব্দের নিহিতার্থ দেখে নেওয়া যাক। **মামা** শব্দটি তৈরি হয়েছে **মাম** থেকে এবং সেটি এসেছে **মম** শব্দ থেকে। এই **মম** শব্দের অর্থ সবাই কমবেশি জানেন, আমরা সেই **মম** শব্দটিকে ইতোপূর্বে **মম, মমতা** শব্দে ব্যাখ্যা করেছি। তার থেকে আমরা জেনেছি, কোনো সীমায়িত সত্তা যখন মানুষের 'আমিত্ব'বোধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখনই তাকে **মম** বা 'আমার' বলে। তার থেকে জাত **মাম** এবং সেই **মাম**-এর আধার হল **মামা**। অর্থাৎ **মামা** হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর সবকিছুই আসলে 'আমার' (**মম**), কিংবা ভবিষ্যতে 'আমার' (**মম**) হবে। এমন কথা একালে ভাবাই যায় না! এককালে কিন্তু সেটিই বাস্তব ছিল, যখন সমাজটি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তখন একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে থাকত মা মাসি আর মামারা। তখন সেই সমাজে **মামা**র যা কিছু সম্পদ, তা সব পেত তার ভাগিনেয় বা **ভগিনী**র অপত্য। তখন **মামা**দের ছেলেরা থাকত অন্য কোনো সামাজিক গোষ্ঠীতে, **মামা** সেখানে যেত কেবল যখন তার ডাক পড়ত সন্তান-উৎপাদক হিসেবে; অন্যথায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতি তার কোনো দায় ছিল না। একইভাবে তখন এ-গোষ্ঠীতেও বাবারা আসত বাইরের অন্য কোনো গোষ্ঠী থেকে এবং মা-মাসিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদনের কারণ হয়ে ফিরে চলে যেত।

কিছুকাল পরে পরিস্থিতিটা বদলে যায়। **মামা**রা নিজের মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বিয়ে করে নিজ নিজ ঘর বসাতে শুরু করেন, 'জোড়বাঁধা পরিবারের' সূচনা হয়। কালে কালে পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। **মামা**রা **মামী**দের ও তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকতে শুরু করে। কিন্তু তবুও মা ও **মামা**র পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার এবং **মামা**-ভাগনের স্নেহের বন্ধনের রেওয়াজটা গিয়েও যেতে চায় না, কমবেশি থেকে যায়। **মামাবাড়ী** ভাগনেদের সবচেয়ে প্রিয় গন্তব্যস্থল রূপে চিহ্নিত হয়। মানুষের মনের সত্য চলে যায় জনশ্রুতিতে, ছড়ায় — 'তাই তাই তাই / মামাবাড়ী যাই / মামাবাড়ী ভারী মজা / কিল চড় নাই।' কিংবা 'তাই তাই তাই / মামাবাড়ী যাই / দুধ ভাত খাই / মামী এল ছড়ি নিয়ে / পালাই পালাই!'

মামার সঙ্গে **মা**য়ের ও ভাগনের এই ঘনিষ্ঠতার রেওয়াজ সবচেয়ে জীবন্তভাবে ছিল, এবং এখনও যৎসামান্য হলেও আছে এই বাংলায়। ১৯০০ সালের আগের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, তার পরেও আমরা দেখেছি, গণমান্য অভিজাত পরিবারের ছেলেরাও প্রায়ই মামাবাড়িতে থাকত, বড় হত, লেখাপড়া শিখত। বাংলার প্রায় প্রতিটি সম্পন্ন পরিবারে, তা সে হিন্দু মুসলিম যে পরিবারই হোক, এই রীতি প্রচলিত দেখা যেত; দেখা যেত বোনের বাড়ির সব দায় যেন ভাইয়ের। ভাইয়ের অস্তিত্ব যেন বোনের সহায়তাতেই নিবেদিত। বাড়িতে ভাল কিছু হলেই তার কিছু না কিছু অংশ নিয়ে যেতে হত বোনের বাড়িতে, নইলে মা চটে যেতেন। জামাই বলতেন, 'বড় কুটুম্ব' এসেছে। এখন যাঁদের বয়স ষাটের বেশি, তাঁরা প্রত্যেকেই এই ব্যাপারটি কমবেশি প্রত্যক্ষ করেছেন। পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার তিন হাজার বছর পরেও বাংলার ভাইরা বোনের এই বোঝা কমবেশি বয়েছেন, এখনও কেউ কেউ বহন করে থাকেন। দ্র. **ভাইফোঁটা**।

কিন্তু প্রশ্ন হল, চাঁদকে **মামা** বলে কেন? কই, ইংরেজদের ছেলেপুলেরা তো চাঁদকে 'Oh, my maternal uncle' বলে আবেগে আপ্লুত হয় না! আমাদের মনে হয়, এরও পেছনে রয়েছে বাংলার মেয়ের সেই প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক আবেগের ধ্বংসাবশেষ, ভাইয়ের প্রতি তার সেই বহুকালক্রমাগত টান। শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থেকে তাই সে তার ভাইকে আকাশের চাঁদরূপে দেখে, ছেলেকে তাতেই বিশ্বাস করতে শেখায়। ওপার বাংলার মেয়েদের 'নাইওর-যাওয়া' কিংবা উমার বাপের বাড়ি যাওয়ার ভিতরেও কত প্রাচীন আবেগ

যেন তার গন্ধ ভরিয়ে রেখেছে। পুরো ছড়াটি মনে পড়ার পর দেখা যায়, ভাইকে যেন বোনের অদেয় কিছুই নেই। তার সেরা অর্জনগুলি সে একবার যদি তার ভাইকে দিতে পারত, তবেই যেন তার শান্তি!

আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা,
যাদুর কপালে আমার টিপ দিয়ে যা
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
গাই বিয়োলে দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে আমার টিপ দিয়ে যা।

অতএব, ইংরেজদের মতো আমাদের বাংলার **মামা**রা শুধুমাত্র maternal uncle ছিলেন না, তাঁরা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন ছিলেন, তাঁদের সবকিছু আমাদের ছিল, আমাদের জন্যই আমাদের **মামা**দের জীবন নিবেদিত ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মার আত্মীয়তা ছিল। পিতৃতন্ত্র আমাদের জন্য আমাদের সেই নিবেদিত-প্রাণ **মামা**দের কেড়ে নিয়েছে। ...

ফল হয়েছে এই যে, এখন আমাদের **মামা**রা আমাদের কথা আর ভাবেন না। এখন **মামা**র বাড়িতে থাকা মানে **মামী**দের হুকুম খাটা, যেন জেলখানায় গিয়ে জেল খাটতে হচ্ছে। লোকে এখন তাই **মামা**র বাড়িকে 'বাপের শালা'র বাড়ি, অর্থাৎ পুলিশদের বাড়ি বলে মনে করে এবং পাড়ার রকে বসে ছেলে-ছোকরারা সেকারণে পুলিশের উর্দি পরা লোক দেখলেই বলে '**মামা যাচ্ছে**'। আমাদের প্রিয় **মামা**র সম্প্রতিকালে এমনি অধঃপতন হয়েছে। **৬.** mamma, mama প্রভৃতি শব্দ ইংরেজি ও ইউরোপের অনেক ভাষায় আছে। কখনো মা, কখনো মাতৃস্তন্য বোঝানো হয় এই সব শব্দ দিয়ে। mammal, mammary প্রভৃতি শব্দও এই সূত্রে এসেছে।

মেয় (মেয়া, মেয়ে, মেয়েছেলে, মেয়েমর্দ্দ, মেয়েমানুষ, মেয়েলী) : **১.** ✓মা + য (যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মেয়*** = *দিশাগ্রস্ত পরিমিত সত্তা যায় যাহাতে বা যে প্রকারে।* ***মেয়া*** = ***মেয়***-*র আধার যে।* ***মেয়ে*** = ***মেয়*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***মেয়েছেলে*** = ***মেয়ে*** *ও* ***ছেলে*** *(= পূর্বসূরীর দিশাগ্রস্ত ইচ্ছা দিশাগ্রস্তভাবে লালিত যাহাতে। দ্র.* ***ছেলে****)।* ***মেয়েমর্দ্দ*** = ***মেয়ে*** *ও* ***মর্দ্দ*** *(= যে মর্দ্দন করে)।* ***মেয়েমানুষ*** = ***মেয়ে****-রূপী* ***মানুষ****।* ***মেয়েলী*** = ***মেয়ে****র গতিশীল লালনের আধার যে।* **৩. মেয়** = মানার্হ, পরিমেয়, পরিচ্ছেদ্য। **মেয়া, মেয়ে** = স্ত্রীলোক, স্ত্রী, ঝি, বউ, গৃহিণী, গিন্নী, সামান্য স্ত্রীলোক, কন্যা, বলহীনা নারী, অবলা, পাত্রী, বিয়ের কনে, কন্যাসদৃশী স্নেহপাত্রী, ভক্তের পক্ষে ইষ্টদেবতা। **মেয়েছেলে** = কন্যাসন্তান। **মেয়েমর্দ্দ** = স্ত্রী-পুরুষ। **মেয়েমানুষ** = স্ত্রীলোক, পৌরুষহীন পুরুষ, কাপুরুষ। **মেয়েলী** = স্ত্রীলোকোচিত, মেয়ের মতো (গড়ন, ঢঙ), স্ত্রীসুলভ, মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত (কথা, ভাষা)। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের বর্তমান মানস বিশেষ্য-ভিত্তিকতার দ্বারা জারিত। স্বভাবতই সেকালের ক্রিয়াভিত্তিক শব্দকে বুঝে নিতে গিয়ে আমাদের বর্তমান মন নানারকমের অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। শব্দের স্বরূপ আমাদের বর্তমান মনের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না, কিংবা মন কিছুতেই শব্দের স্বরূপের সঙ্গে খাপ খেতে চায় না; সবটাই বেখাপ্পা মনে হতে থাকে। ফলে একধরনের উৎকট মানসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। আর, যে সকল শব্দের ক্ষেত্রে সেরকম উৎকট পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়, তাদের মধ্যে অন্যতম এই **মেয়ে** শব্দটি।

মেয়ে হল সেই সত্তা যাকে পরিমিত (সঙ্কুচিত, মর্দ্দিত ... ইত্যাদি) করে ফেলার পরে বা **মে** করে ফেলার পরে সে সেই পরিমিত অবস্থাতেই জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছে, তা তাকে দৈহিকভাবে পরিমিত করা হোক আর মানসিকভাবে পরিমিত করা হোক। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়, যখন আমরা জানতে পারি **মেয়েমর্দ্দ** বললে স্ত্রী-পুরুষকে বোঝায়; অর্থাৎ **মেয়ে** শব্দের বিপরীত শব্দ হল **মর্দ্দ**। তার মানে, যে সত্তা মর্দ্দিত হয়, তা সে দৈহিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে যেভাবেই হোক, তাকে **মেয়ে** বলে। এর অর্থ খুব ভালভাবে বললে, যে আদর করে সে **মর্দ্দ**, আর যে আদর খায় সে **মেয়ে**। আর, খারাপ ভাবে বললে যে মেরে গুঁড়িয়ে সঙ্কুচিত করে দেয় সে **মর্দ্দ**, আর যে সেভাবে মার খেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে সে হল **মেয়ে**। অর্থাৎ '**মে** হয়ে যাওয়া সত্তা তদ্রূপে যাত্রী যাহাতে', সেটিই **মেয়ে**-সত্তা। রাম রামীকে মুকুট পরিয়ে মালা দিয়ে ছেড়ে দিল, রামী সেভাবেই চলতে লাগল, তাই সে **মেয়ে**। শ্যাম শ্যামীকে আচ্ছা করে মেরে ঠ্যাং ভেঙে হাতে লাঠি আর ভিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দিল এবং শ্যামী সেভাবেই লাঠি হাতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে লাগল, তাই সে **মেয়ে**। **মেয়ে** শব্দটির নিহিতার্থ এই!

মানবীকে বোঝানোর জন্য যতগুলি শব্দ আছে — **মাণবী, মানবী, মানুষী, নারী, মহিলা, মহিষী, স্ত্রীলোক, মেয়ে** — সেগুলির নিহিতার্থ জানলে দেখা যায়, সেগুলি তাদের **মানবী**ত্বকে নানা দিক থেকে দেখাচ্ছে, এবং স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দগুলি একদেশদর্শী। কেননা, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের স্বভাবই হল, তারা কেউ কান ধরে, কেউ লেজ ধরে, কেউ-বা শুঁড় ধরে দ্রষ্টব্য হাতিটিকে দেখায়। কেননা, তার মূল নীতি হল, সত্তাটি যা যা করে, তাই তাই দিয়ে সেই সত্তাটিকে বোঝানো। ফলত, **মানবী**র যতরকম স্বভাব, তাকে বোঝাতে ততগুলি শব্দ লাগার কথা। সমাজ যখন **মানবী**কে অসম্মানজনক অবস্থায় রেখেছে, তখনই সে **মেয়ে**, তখনই সে এক সঙ্কুচিত সত্তা। যখন সম্মানজনক অবস্থায় রেখেছিল, তখন তার নাম হয়েছিল **মহিষী, মহিলা**। সেকারণেই **ভদ্রমহিলা** খুবই সম্মানজনক শব্দ। তাছাড়া **মানবে**র আধারশক্তি রূপেও **মানবী** শব্দের কমবেশি কদর আছে। ...

আর সেজন্যেই আমরা **ছেলেমেয়ে** বললে **ছেলে** এবং **মেয়ে** উভয়কে বুঝি, কিন্তু **মেয়েছেলে** বললে আমরা বুঝি '**মেয়ে**রূপী সন্তান'। অথচ **মানুষ** বললে কখনো **নারী-মানুষ** বুঝি না, যদিও **মেয়েমানুষ** বললে বুঝি **নারী-মানুষ**; যখন কিনা **ছেলেমানুষ** বললে তাকে 'শিশু' বা 'বাচ্চা-ছেলে' কিংবা 'বাচ্চা-মেয়ে' বুঝে থাকি। কেন এই অবস্থা?

এর পিছনে রয়েছে মানুষের সমাজের বর্তমান 'একঝোঁকা' অবস্থা। মাতৃতন্ত্রের উত্তর-মেরুর দিশাগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে উদ্ভূত পিতৃতন্ত্র বর্তমানে গিয়ে পৌঁছে গেছে দক্ষিণ-মেরুর

শেষ প্রান্তে। ফলে এখন সে ঘোষণা করে 'তিরিশ দিনে এক মাস হয়'। ভুল করেও বলে না যে, 'তিরিশটি রাত-দিনে এক মাস হয়'। এরকম বললে যে **মেয়ে**রা স্বীকৃতি পেয়ে যাবে! ... এসব বিষয়ের বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা আছে কলিম খান-এর 'মানবীদর্শন : মুক্তদাম্পত্যই সংসাররোগের ঔষধ' নিবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার *'একক মাত্রা'* পত্রিকায়।

***মি* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিমায়, অনাময়, অপ্রমেয়, অপ্রমেয়াত্মা, অমায়, অমায়া, অমায়িক, অমায়ী, অমিত, অমিতাত্মা, অমিতাভ, অমিতাশন, অমিতৌজাঃ, অমেয়, অশ্মময়, আময়, আময়াবী, তেজোময়, নিময়, প্রমেয়, বিনিময়, ময়, ময়ঙ্ক, ময়ট্, ময়দা, ময়দান, ময়দানব, ময়ন, ময়না (দ্র. মদনসারিকা, মদ্, কুতুর কুতর ময়না, ভাত খাবি তো আয় না), ময়া, ময়ান, মায়, মায়া, মায়াকাজল, মায়াকান্দন, মায়াকান্না, মায়াকার, মায়াকিরাত, মায়াকৃৎ, মায়াচণ, মায়াচার, মায়াছান্দ, মায়াজল, মায়াজাল, মায়াজীবী, মায়াতন্ত্র, মায়াত্মক, মায়াদেবী, মায়াদ্যুত, মায়াধর, মায়াধিক, মায়ানাট, মায়াপটু, মায়াপতি, মায়াপ্রপঞ্চ, মায়াপ্রয়োগ, মায়াফল, মায়াফাঁশ(স), মায়াবচন, মায়াবতী, মায়াবন্ধ, মায়াবাজি, মায়াবাদ, মায়াবাদী, মায়াবান, মায়াবারি, মায়াবিৎ, মায়াবী, মায়াবীজ, মায়ামনুজ, মায়ামমতা, মায়াময়, মায়াময়ী, মায়ামুণ্ড, মায়ামৃগ, মায়ামো, মায়ামোহ, মায়াযন্ত্র, মায়াযোগ, মায়াযোধী, মায়ারণ, মায়ারথ, মায়ারসিক, মায়াসরোবর, মায়াসীতা, মায়াসুত, মায়ি, মায়িক, মায়ী, মি, মিক্দার (দ্র. মেখল, মেকদার, make), মিকল (মেকল, মেখল) মিত, মিতবাক্, মিতভাষী, মিতব্যয়ী, মিতভুক্ (মিতভুজ্), মিতভুক্ত, মিতমতি, মিতস্পচ, মিতা (meet), মিতাক্ষর, মিতাক্ষরা, মিতার্থ, মিতার্থক, মিতাশন, মিতাহার, মিছরী, মিছরীর-ছুরী, মিঞা (মিয়া), মিঞ্জিনিঞ্জি, মিধ্, মিন (মীন, মী), মিনতি, মিনমিন, মিনমিনে, মিনা (মী দ্র.), মিনার, মিনাহ্, মিনি, মিনিট (minute), মিম্মিন, মিনে, মিমঙ্ক্ষা, মিমঙ্ক্ষু, মিমর্দ্দিষু, মিয়া, মিয়ামল্লার, মিয়াদ, মিয়াদি, (মিয়াদী), মিয়াদখাটা, মিয়ানী, মিশ্রী (মিছরী, মিশরি, মিশ্রি), মেওয়াতি, মেক্ (make, নকল করা, মেকি করা, mock করা, মেখ্), মেকদার, মেকল, মেকলকন্যকা, মেকলাদ্রিজা, মেকামেকি (মেকামেকী), মেকি(কী), মেকুর, মেখল, মেখলকন্যা, মেখলদাম, মেখলপদ, মেখলবন্ধ, মেখলা, মেখলি মেখলিক (মেখলীক), মেখলিগঞ্জ, মেখলী, মেখ্, মেছ(স)মার, মেজমান (মেজবান), মেজরাপ, মেজরাব, মেজাজ, মেয়, মেরু, মেরুক, মেরুকন্যা, মেরুকূট, মেরুগুঁটি, মেরুদণ্ড, মেরুদাঁড়া, মেরুদানা, মেরুদুহিতা, মেরুধামা, মেরুপৃষ্ঠ, মেরুমন্দর, মেরুযন্ত্র, মৈত্র, মৈত্রী, মোম, মোয়া, সৌমিত্র, হেমময়।

মি = পরিমিত গতিশীল যাহাতে।

ময়ন (ময়, ময়দা, ময়দান, ময়লা, ময়া, ময়ান — আময়, নিময়, নিরাময়, বাঙ্ময়, বিনিময়) : ১. ✓মি + অন (ল্যুট্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ময়** = *পরিমিত সত্তার যাত্রা যাহাতে; অথবা, সত্তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপে ব্যাপ্ত থাকে যাহাতে।* **ময়দা** = *ময়-এর দানের আধার যে।* **ময়দান** = **ময়দা** *অন (on) যাহাতে।* **ময়ন** = **ময়** *অন (on) যাহাতে।* **ময়লা** = **ময়**-*লালনের আধার যে।* **ময়া** = **ময়**-*এর আধার যে।* **ময়ান** = **ময়া** *অন (on) যাহাতে।* **আময়** = *আশ্রিত* **ময়** *যাহাতে।* **নিময়** = *নিঃসারিত বা নির্গত* **ময়** *যাহাতে।* **নিরাময়** = *নেই* **আময়** *যাহাতে।* **বাঙ্ময়** = **বাক**-*এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপ যাত্রী যাহাতে।* **বিনিময়** = *বিপরীত* **নিময়** *যাহাতে। /* **আময়** = হিংসা করে যে। **নিরাময়** = নির্ (নাস্তি) আময় যাহার। **বিনিময়** = (যাহাতে) তুল্য বস্তুদানে দ্রব্যান্তর গ্রহণ (থাকে)। (ব.শ.)। ৩. **ময়** = বিকার, অবয়ব, প্রচুরবচন, অপৃথগ্‌ভাব, ব্যাপ্তি, সংসর্গ। **ময়দা** = গোধূমচূর্ণ, মিহী আটা, (সাদৃশ্য) চূর্ণমাত্র। **ময়দান** = বিস্তৃত মাঠ। **ময়ন** = মধুচ্ছিষ্ট, মোম। **ময়লা** = মলিন, মলযুক্ত (কাপড়), ম্লান, মল, গাত্রমল, বস্ত্রমল, বিবর্ণতাজনক বস্তুমাত্র। **ময়া** = সুস্বাদু ক্ষুদ্রমৎস্য-বিশেষ। **ময়ান** = ঠাসিবার সময়ে ময়দায় মিশ্রিত ঘৃত। **আময়** = রোগ, ব্যাধি, পীড়া। **নিময়** = বিনিময়, পরিবর্ত্তন। **নিরাময়** = আময়হীন, নীরোগ, রোগরহিত, মর্ম্মপীড়াহীন ... ইত্যাদি। **বাঙ্ময়** = বাগবয়ব, বাগ্‌রূপ-দেবমূর্ত্তি, বাক্‌কৃত, শব্দজাত। **বিনিময়** = পরিবর্ত্ত, প্রতিপণন, পরস্পর আদান-প্রতিদান, ব্যতীহার, পরিবর্ত্তন, বন্ধক, আধি। (ব.শ.)। ৪. **ময়** ও **ময়া** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ময়** শব্দটির অর্থ হল, ধূলিকণার মতো 'পরিমিত বা সীমায়িত বস্তু বা বিষয়ের (= ম-এর) যাত্রা রয়েছে যাহাতে'। তার মানে কোনো ক্ষেত্রের অতি ক্ষুদ্র বিষয় বা বস্তুতে ভরে থাকাকে **ময়** বলে। যে কারণে আমরা বলি — ধূলি**ময়** উঠোন, জল**ময়** মাঠ, গন্ধ**ময়** পলান্ন, মায়া**ময়** বা ব্রহ্ম**ময়** জগৎ ... ইত্যাদি। ব.শ. উদাহরণ দিয়েছেন — **অশ্মময়**, হেম**ময়**, তেজো**ময়**, **বাঙ্ময়** ইত্যাদি। কৃত্তিবাস লিখছেন 'রামনাম**ময়**'। চৈতন্যচরিতামৃত লিখছেন, '**কল্পবৃক্ষময়**'। ... এসবই ব.শব্দকোষের দেওয়া উদাহরণ। কিন্তু পরে পরে এর ভুল প্রয়োগও বিস্তর হয়েছে। যেমন 'জল**ময়** মাঠ', 'ধূলি**ময়** উঠোন', 'গন্ধ**ময়** পলান্ন' ... প্রভৃতি স্থানে একই অর্থে 'মাঠ**ময়** জল', 'উঠোন**ময়** ধূলি', 'পলান্ন**ময়** গন্ধ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু **ময়** শব্দের যা অর্থ, তাতে এই প্রয়োগগুলি যথাযথ নয়। মাঠ কিংবা উঠোন কি ক্ষুদ্রাকারে সীমায়িত হয়ে জলে কিংবা ধূলিতে ব্যাপ্ত হতে পারে? 'অর্থ**ময়** বাক্য' হতে পারে, কিন্তু 'বাক্য**ময়** অর্থ' হয় না। সেভাবে ভাবলে 'মাঠ**ময়** জল' কিংবা 'উঠোন**ময়** ধূলি' ... কথাগুলি যথাযথ নয়।

তা সে যাই হোক, **ময়** বললে আমরা বুঝব — 'অতি ক্ষুদ্র সীমায়িত বস্তু বা বিষয়' যা কিনা 'কোনো কিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে'; তা সে ধূলিকণা, গমকণা, জলকণা, গন্ধকণা, বাক্‌কণা ... কিংবা ভাবনাকণাই হোক না কেন। সেই সুবাদে ধূলিকণা যে উঠোনে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সেই উঠোন হল ধূলি**ময়**; তেজকণা যার ভিতরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সে হল তেজো**ময়**; বাক্ বা কথা যার ভিতরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সে হল **বাঙ্ময়** ... ইত্যাদি। সেই কারণে আমাদের ভাষায় **ময়** একটি অতি-ব্যবহৃত শব্দ। প্রায় **উপসর্গে**র মতো এই শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করে থাকি; তবে **প্রত্যয়ে**র মতো শব্দের

পেছনে জুড়ে দিয়ে। যথা — কামনা**ময়**, গতি**ময়**, চিন্‌**ময়**, ছায়া**ময়**, তন্‌**ময়**, প্রেম**ময়**, বাসনা**ময়**, মায়া**ময়**, দয়া**ময়ী**, জ্বালা**ময়ী** ... ইত্যাদি অজস্র।

অনেকে মনে করেন, **ময়দা** ও **ময়দান** শব্দ দুটি ফারসি থেকে এসেছে। আমাদের কথা হল, সে আসুক। তাতে একথা ভোলা চলে না যে, অধিকাংশ ভাষার শব্দের মূল উত্তরাধিকার একই উৎস থেকে। কেউ সেটা অবিকল রাখতে পেরেছে, কেউ পারেনি। আর, এখন তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে, আমাদের **ময়**-অর্থের সঙ্গে ফারসির **ময়**দার ও **ময়**দানের **ময়**-এর কোনো পার্থক্য নাই। মাঠ-**ময়**দান তো **ময়**দার মতো ধূলিকণায় ভরপুর হয়ে ব্যাপ্ত থাকেই, আমরা দেখতে পাই আর না পাই। সেকারণেই শব্দদুটিকে গ্রহণ করে নিতে আমাদের পূর্বসূরিদের কোনো অসুবিধাই হয়নি।

তবে এই পর্যন্ত **ময়** শব্দের অর্থ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু **আময়**, **নিরাময়** ও **নিময়**, **বিনিময়** শব্দের মুখোমুখি হতেই দেখি, আমাদের এতক্ষণের জানা **ময়**-বোধ তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারছে না। কী ব্যাপার! শব্দ তৈরির নিয়ম অনুসারে '**ময়**-এর আশ্রয় যে', সেই হল **আময়**। কিন্তু ব.শ. দেখি **আময়** শব্দের মানে দিচ্ছেন — 'হিংসাকারক', 'রোগ', 'ব্যাধি', 'পীড়া' ইত্যাদি! **আময়**-এর **ময়** কি তবে বিষ? ধূলিকণার মতো সূক্ষ্ম হয়েও **ময়** কীভাবে আমাদের শরীর বা মনের প্রতি হিংসা করে? কীভাবে আমাদের রোগগ্রস্ত করে দেয়? আমাদের পীড়িত করে?

আমরা যখন এর কারণ আঁতিপাঁতি করে খুঁজছি, আমাদের উদ্ধার করেন আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিরা এবং জার্মান মনীষী হ্যানিম্যান। আমাদের পূর্বসূরিরা আমাদের জানিয়ে গিয়েছিলেন, বিষে বিষক্ষয় হয় — 'বিষম্‌ বিষমৌষধম্‌'। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের জনক হানিম্যান তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় অবাক হয়ে দেখেছিলেন — কোনো বস্তুর অতিসূক্ষ্মরূপ, যাতে বস্তুটি আর থাকে না, তার অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর সেই অস্তিত্বের স্মৃতিটুকু মাত্র থাকে, বস্তুর সেই 'স্মৃতিরূপ'টিই রোগীকে রোগমুক্ত করে দেয়! পরে তিনি বুঝেছিলেন, আসলে মানুষ রোগগ্রস্ত হয় বস্তুর ঐ 'স্মৃতিরূপ'-এর আক্রমণেই। গোটা কাঠকয়লা খেয়ে নিলে মানুষের কোনো ক্ষতিই হয় না, কিন্তু সেই কাঠকয়লার একটি কণাকে নিয়ে 'পোটেনটাইজ' করে কাউকে খাইয়ে দিলে সে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে; এবং তাই দিয়ে ঐ প্রকার রোগলক্ষণ-সম্পন্ন রোগীকে সুস্থও করে ফেলা যায়। (হোমিওপ্যাথি-বিশেষজ্ঞরা আরও ভালভাবে সব বলতে পারবেন, আমরা যতটুকু শুনেছি, জেনেছি, সেটুকুই এখানে বলে না দিলে যাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, তেমন পাঠকপাঠিকার পক্ষে এই বিষয়টি বুঝতে হবে। 'পোটেনটাইজ করা' মানে 'শক্তিপূর্ণ-শূন্যতা'য় (বা **নির্গুণ-ব্রহ্মে**, দ্র. **ব্রহ্ম**) পরিণত করা। এটা করা হয় বস্তুর অস্তিত্ব ক্রমশ কমিয়ে। সেটি করা হয় এইভাবে — এক চামচ গ্লোবিউলে এক কণা কাঠকয়লা ১০০ বার ঘষে নিয়ে তার থেকে এক কণা নিয়ে পুনরায় এক চামচ নতুন গ্লোবিউলে আবার ১০০ বার ঘষে নিয়ে ... এভাবে শেষ যে ঘষা-গ্লোবিউল পাওয়া যায়, তারই এক কণা সুস্থ কাউকে খাইয়ে দিলে যে যে রোগলক্ষণ দেখা যায়, ঐরূপ রোগলক্ষণযুক্ত রোগীকে সেটি খাইয়ে দিলে সে সেরে ওঠে। কোনো বস্তুকে এভাবে গ্লোবিউলে ঘষে ঘষে ক্রমোচ্চতর পর্বে যাওয়াকে বলে 'পোটেনটাইজ' করা। এতে বস্তুটি আর থাকে না, থাকে তার স্মৃতি। ... বস্তুর **বাহ্যিক-তন্মাত্ররূপ** হিসেবে একে আমরা **মৎস্যগন্ধ** শব্দে আগেই শনাক্ত করেছি।) হানিম্যান মানবশরীরে রোগের কারণ ও তাকে রোগমুক্ত করার উপায় হিসেবে বস্তুর ঐ অতি সূক্ষ্ম কণার 'স্মৃতিরূপ'টিকেই শনাক্ত করেন। এবং বস্তুর সেরকম 'স্মৃতিরূপ' প্রয়োগ করেই রোগীকে রোগমুক্ত করা যায় বলে সিদ্ধান্ত করেন। কার্যত হানিম্যানের ঐ আবিষ্কার পাশ্চাত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত অর্জন — similia similibus curentur তত্ত্বটিকেই যেন নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিল।

কিন্তু কথাটি তো আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা বহুকাল আগে থেকেই জানতেন — 'বিষম্‌ বিষমৌষধম্‌', বিষে বিষক্ষয়! তাঁরা তো জেনেই গিয়েছিলেন যে, **ময়** বা বস্তুর **বাহ্যিক-তন্মাত্ররূপই** হল রোগসৃষ্টিকারী, যা কিনা মানবশরীরে বিষবৎ ক্রিয়া করে। তাকে তাড়ানোর জন্য স্বভাবতই বস্তুর বিষবৎ **বাহ্যিক-তন্মাত্ররূপই** প্রয়োগ করতে হবে। সেই কারণেই তাঁরা 'বিষস্য বিষমৌষধম্‌' নীতিটি প্রয়োগ করে যান। তার মানে, যে '**ময়**-এর আশ্রয়' বা **আময়** আমাদের রোগগ্রস্ত করে, তাকে কেবল 'সীমায়িত যাত্রী' বলে বুঝলেই চলবে না, সে এতই 'সীমায়িত' যে, তার অস্তিত্ব নাই, রয়েছে কেবল তার স্মৃতি; **অংরূপিণী**র মতো এক 'শক্তিপূর্ণ-শূন্যতা' সেটিই বস্তুর **বাহ্যিক-তন্মাত্ররূপ**। বস্তুর সেই **বাহ্যিক-তন্মাত্ররূপই** হল **ময়**, যা মানুষকে **আময়**গ্রস্ত করতে পারে, তার থেকে **নিরাময়**ও করতে পারে। ... বলে রাখা যাক, এই **ময়** থেকেই আমাদের সাধারণ বাংলাভাষীগণ **ময়লা** শব্দটি তৈরি করেছিলেন। 'মলিন' বা 'ম্লান' থেকে **ময়লা** শব্দটি বিবর্তিত হয়ে এসেছে, আমাদের মনে হয়েছে, সেকথা ঠিক নয়।

যাই হোক, এই পর্যন্ত এসে আমাদের পূর্বপুরুষদের মানসিক উপলব্ধির গভীরতা দেখে আমরা দু'জন যখন বিস্ময়ে হতবাক ও মুগ্ধ, তখনই সামনে দাঁড়িয়ে গেল **নিময়** ও **বিনিময়**। ব.শ. দুটি শব্দের একটি সাধারণ অর্থ দিয়েছেন — পরিবর্ত্তন। শব্দদুটি যে লেন-দেন করা বোঝায় সেকথা আমরা সবাই জানি। বাজার এ বিষয়ে আমাদের প্রতিদিনই নানান জলজ্যান্ত-জ্ঞান দিয়ে থাকে; তার ওপর **বিনিময়**-এর বাসি-পচা-শুখা-জ্ঞান দেওয়ার জন্য আমাদের অর্থনীতিবিদগণ তো আছেনই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের তো জ্যান্ত বা শুটকি **বিনিময়**-জ্ঞানের দরকার নেই; আমাদের জানা দরকার **নিময়** ও **বিনিময়**-এর ভিতরে **ময়** কেন? আমরা যখন কাউকে কিছু দিই, তাকে **নিময়** করা বলে কেন, এবং পরিবর্তে কিছু নিলে তাকে **বিনিময়** করা বলে কেন? এতে **ময়** বা 'সীমায়িতের যাত্রা' কোথায়? আলু পেঁয়াজ জলজ্যান্ত একটা মাছ কিংবা একটা গাড়ি বাড়ি জমি যখন লেনদেন করা হয়, তখন তো লেনদেন-হতে-থাকা বাহ্যবস্তুটি সশরীরে বিদ্যমান থাকে! সে **বিনিময়ে** ধূলিকণার মতো বা 'স্মৃতি'র মতো **ময়** কোথায়?

এই সব যখন ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল — ওহ্‌ হো! এই তো সেই বস্তুর '**মানসিক-তন্মাত্ররূপ** মালিকানার বোধ', যাকে আমরা **মৎস্যগন্ধ** শব্দের ব্যাখ্যায় আগেই পেয়েছিলাম। এখানে

বস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও নাই (আপনি যে আমগাছটা বা জমিটা বিক্রি করছেন, সে তো মাঠেই পড়ে থাকে, পড়ে আছে), কার্যত এখানে রয়েছে বস্তুটির উপর আপনার মালিকানার অধিকারের বোধ। সেই বোধটিই বস্তুর অতি 'সীমায়িত যাত্রী' বা **ময়**। এই সমাজের প্রত্যেক সদস্যই **ময়**-বাহক। সম্পদবান মানেই **ময়**বান। এই **ময়**ই আমাদের মনকে **ময়লা** করে। তবুও এই **ময়** না হলে আমাদের চলে না। এই **ময়** নিয়েই আমরা **নিময়** করি, **বিনিময়** করি। আর সেটা করা হয় এইভাবে — 'ক' বস্তুর বদলে 'খ' বস্তুর লেনদেন যখন হচ্ছে, তখন আসলে 'ক' বস্তুটির উপর সেই 'মালিকানার অধিকার-বোধ'টিকেই আপনি **নিময়** করছেন, আর বিপরীতপক্ষ তার পরিবর্তে তার 'খ' বস্তুটির উপর তার 'মালিকানার অধিকার-বোধ'টিকে **বিনিময়** করছে। তার মানে, বস্তু লেনদেনের সময় আমরা কার্যত বস্তুর উপর আমাদের 'মালিকানার অধিকার-বোধ'টিকে হস্তান্তর করে থাকি। সেটিই **নিময়** করা বা **বিনিময়** করা। ...

তাহলে দেখা যাচ্ছে, **ময়** শব্দের অর্থ 'বস্তুর ধূলিরূপ' থেকে শুরু করে 'বস্তুর-অবিদ্যমানতার স্মৃতির শক্তিপূর্ণ-শূন্যতা' পেরিয়ে মানুষের 'বোধ' পর্যন্ত প্রসারিত। মানুষের এই 'বোধ'গুলির ভিতরে যে শুধুমাত্র 'মালিকানার বোধ' নেই, লক্ষ লক্ষ রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বোধও রয়েছে, নিম্নে আমরা সেকথাও জানব। **ময়** শব্দের ইত্যাকার অর্থ আপনি অভিধানাদিতে পান আর নাই পান, আমাদের বাংলাভাষীদের কথা-বার্তায়, ভাষা-ব্যবহারে অবশ্যই পাবেন। ... ৬. মেক্সিকোতে **মায়া** নামে যে প্রাচীন সভ্যতা বিশাল আকারের মন্দির, সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিল, এবং উন্নতমানের জ্যোতির্বিদ্যা () আয়ত্ত করেছিল, তাঁদের Maya নামের পিছনে এই **ময়**, **ময়দানব** নামের সত্তার স্বীকৃতি আছে বলেই মনে হয়।

ময়দানব : ২. **ময়** *রূপী দানব যে।* ৩. দানববিশেষ, ইনি দানবগণের শিল্পী। ইঁহার পত্নী হেমা, পুত্র দুন্দুভি-প্রভৃতি, কন্যা মন্দোদরী। খাণ্ডবদাহনকালে ইনি অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে, অর্জ্জুন ইহাকে রক্ষা করেন। ইহারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের এক দিব্য সভা নির্ম্মাণ করেন। (ব.শ.)। দিতি-পুত্র। ময় নামে এক মায়াবী দানব। ইনি (দেবতাদের) বিশ্বকর্মার মতো দানবদের অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন। ... ময়দানব সহস্র বৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করে বর পান এবং শুক্রাচার্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর হন। ইনি হেমা নামে এক অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুই পুত্র (পরে উভয়েই বানররাজ বালী কর্তৃক নিহত হন।) এবং মন্দোদরী নামে একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ... ময়দানব মন্দোদরীকে রাবণের হাতে সম্প্রদান করেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তপোলব্ধ এক অমোঘ শক্তি (শক্তিশেল) তাঁকে দান করেন। এই শক্তির আঘাতেই লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হন। ... খাণ্ডবদাহন কালে ময়দানব সেই বনে উপস্থিত ছিলেন এবং পলায়নকালে কৃষ্ণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। ... অর্জুন তাঁকে রক্ষা করেন। ... সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পাণ্ডবদের তুষ্টিবিধানের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব এক অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন। 'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণ শিল্পগ্রন্থ প্রণেতা বলে এঁর প্রসিদ্ধি আছে। হেমার প্রতি আসক্ত হওয়ায় এবং তাকে বিবাহ করায় ইন্দ্র ময়দানবকে বজ্রাঘাতে বধ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দানব**, **বিশ্বকর্ম্মা**, **ময়**, **মায়া**, **মায়াবী**। একালে যাদের ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্র্যাট, আর্কিটেক্ট্ ... ইত্যাদি বলা হত, সেকালের বৈদিক সমাজে (অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক সমাজে বা সম্প্রদায়ভিত্তিক যৌথসমাজে) তাদের বলা হত **ময়দানব**। ঘরবাড়ি বানানোর যে জ্ঞান বা 'বোধ' (= **ময়**), এই **দানব** সেই **ময়**-এর ধারক-বাহক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। তাই এঁর নাম হয়ে যায় **ময়দানব**। কীভাবে এই সামাজিক সত্তাটির জন্ম হয়েছিল, কীভাবে তার বিকাশ ঘটেছিল ... ইত্যাদি সব কথাই বলা আছে উপরোক্ত কাহিনীতে।

মায়া : ১. ময় + অ (ণ) + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***ময়*** *হইতে জাত সত্তার আধার যে।* / যাহাতে বিশ্ব মিত হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রতিকূল কপটবিশেষ, ইন্দ্রজাল, শাম্বরী, কুহক, শাঠ্য, ধূর্ত্ততা, কাপট্য, মায়াকল্পিত বা অসত্য বিষয়, ছদ্ম, ব্যপদেশ, ব্যাজ, কূট, অন্যথাকার-দর্শন, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, দম্ভ, ক্ষুদ্রোপায়, পরমেশ্বরের শক্তি, দুর্গা, লক্ষ্মী, বুদ্ধদেব-জননী, প্রকৃতি, (বেদান্তে) দৃশ্যমান মিথ্যাজগতের সত্যরূপে প্রতীতিকারণ, অবিদ্যা, অজ্ঞান, (এই মায়া হেতু রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ ব্রহ্মে অবস্তুর ভ্রম হয় ও দৃশ্যমান জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়াপগম হেতু সব ব্রহ্মময় বোধ হয়।) আত্মার চতুর্বিধ পাশের একতম, কৃপা। বাংলায় — মমতা, স্নেহ, দেবতার বিশেষ বিশেষ শক্তি, স্ত্রীলোক, মৌরলা মাছ। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ভূতপ্রকৃতি**, **ভাব**। ইতোপূর্বে **ময়** কাকে বলে, সেকথা আমরা বিস্তারিতভাবে জেনেছি। সেই **ময়**-এর যে 'বোধ' রূপটি রয়েছে, তার থেকে জাত 'কার্য্যকরী বোধের স্থির রূপ'টিকে **মায়া** বলে। আসলে, কোনো কিছু বানাতে গেলে যে শ্রম ও মেধা লাগে, এক্ষেত্রে সেই 'শ্রম' ও 'মেধা'ই তো সেই 'সীমায়িত যাত্রী' (= **ময়**) যার অজস্র বিবর্তিত রূপগুলির প্রতিটি পর্যায়কেই **মায়া** বলে। সেই সুবাদে আগুন জ্বালতে যদি দশম পর্যায়ের বিবর্তিত **ময়**রূপী **মায়া** লাগে তো চাষ করতে শততম পর্যায়ের বিবর্তিত **ময়**রূপী **মায়ার** প্রয়োজন হয়, এবং এভাবেই পরমাণু-চুল্লী জ্বালাতে হয়তো দশ-লক্ষতম **ময়**রূপী **মায়ার** প্রয়োজন হয়। সহজ করে বললে, কোনো কিছু বানানোর বিদ্যা ও শ্রমকে তাই **মায়া** বলে। আবার, **মায়া** প্রদত্ত হয়ে বস্তু বা বিষয়টি বানানো হচ্ছে বলে, তার প্রতি আপনার দাতা-গ্রহীতা সম্বন্ধও থাকে। সেই সম্বন্ধকে **মায়ার বাঁধন**, বা **মায়ার টান** কিংবা শুধুই **মায়া**ও বলা হয়ে থাকে।

অতএব, যে বিদ্যা ও শ্রমের সাহায্যে খানিকটা মাটিকে কলসিতে রূপান্তরিত করে ফেলা যায়, কিংবা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেগুন গাছটিকে শোয়ার পালঙ্কে পরিণত করে ফেলা যায়, তাকেই **মায়া** বলে। সেই সুবাদে যে বিদ্যার সাহায্যে জলের নিম্নগামিতাকে বিদ্যুতে পরিণত করে মানুষের ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, তাকেও **মায়া** বলে। সেই সুবাদে যে বিদ্যার সাহায্যে মানুষ তার সমগ্র কৃত্রিম-**বিশ্ব**টি বানিয়েছে সে তো **মায়ার**ই অজস্র পর্যায়ের প্রায়োগিক ফসল মাত্র। এই কারণে **মায়াকে** 'কর্ম্মময়ী-**অবিদ্যা**' বা '**মায়াখ্যা-অবিদ্যা**'ও বলা হয়ে থাকে। (দ্র. **দক্ষ**)। তার মানে, বর্তমান

মানবসভ্যতার সমস্ত প্রযুক্তিগত বা টেকনোলজিক্যাল জ্ঞানই (= **দক্ষ**জ্ঞানই) হল **মায়া**। এই **মায়া**র সাহায্যেই মানুষ বিশাল বিশাল শহর বানিয়েছে, রাজপ্রাসাদ বানিয়েছে, সুখস্বর্গের বিশাল সম্ভার বানিয়েছে। যারা সেই **মায়া**কে চেনে না, তারা একে স্বভাবতই **ভোজবিদ্যা** বলে মনে করে। এই ধারণাকেই আরব দেশীয় পণ্ডিতেরা নবরূপে প্রকাশ করেন তাঁদের 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ'-এর রোমহর্ষক কাহিনীতে।

একইভাবে যে বিদ্যা ও শক্তিপ্রয়োগের বা শ্রমের সাহায্যে এই অকৃত্রিম-**বিশ্ব**টি বানানো হয়েছে, তাকেও **মায়া** বলা যায়; তবে কিনা সে তো মানুষ বানায়নি, বানিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর, **মহামায়া** কিংবা পরমাপ্রকৃতি বা অন্য কেউ — যাকে আমরা দেখিনি, চিনি না, জানি না। এমনকি যে বিদ্যার সাহায্যে সেই অনামিকা-শক্তি এই অকৃত্রিম-**বিশ্ব**টি বানিয়েছেন, সেই বিদ্যাটিকেও আমরা জানি না। তবে যেটুকু জানা যায়, সেটুকু আবিষ্কার করতে পারলেই আমরা নাচতে থাকি এবং সেই বিদ্যা দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কৃত্রিম-**বিশ্ব** বানাতে লেগে যাই। যেমন ধরা যাক, অকৃত্রিম-**বিশ্বে**র একটি হল জল। সেই জল এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, তাপমাত্রার বদল হলেই সে বাষ্প বা বরফ হয়ে যাবেই; কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। পরমাপ্রকৃতির এই কাণ্ড যেই না আমরা জানতে পারলাম, তৎক্ষণাৎ তাই দিয়ে কাপড়কল আর রেলগাড়ি চালাতে শুরু করে দিলাম। আমাদের কৃত্রিম-**বিশ্বে** সাজো সাজো রব পড়ে গেল। ...

বৈদান্তিকেরা এসব জানতেন, বুঝতেন। বেদান্ত তাই জানিয়েছেন — 'দৃশ্যমান মিথ্যাজগতের সত্যরূপে প্রতীতিকারণ' কে **মায়া** বলে। কী ভয়ানক কথা! যে **জগৎ** (= **বস্তু**) মিথ্যা অথচ দৃশ্যমান, তাকেই সত্যরূপে প্রতীত ব'লে মনে হওয়ার কারণকে বলে **মায়া**। তার মানে, রামবাবু একটি সুন্দর বাড়ি বানাবেন। বাড়িটা কেমন হবে, তা তিনি মনে মনে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে বাস্তবে বাড়িটি নেই; অর্থাৎ ঐ বাড়িটি তাঁর কাছে 'দৃশ্যমান মিথ্যা**জগৎ**'। আর, কীভাবে সেই 'মিথ্যা' কিন্তু 'দৃশ্যমান' বাড়িটি সত্যে পরিণত হবে — কীভাবে তার নকশা করে লোকজন লাগিয়ে কী কী করে বাড়িটি নির্মিত হয়ে উঠবে — বাড়ি তৈরির সেই সম্পূর্ণ কর্মজ্ঞান ও কর্মশৃঙ্খলাটিও তিনি জানেন। এখন সেই 'বাড়ি তৈরির সেই সম্পূর্ণ কর্মজ্ঞান ও কর্মশৃঙ্খলা-বিষয়ক জ্ঞান' বাস্তবায়িত করে ফেললেই যে বাড়িটি তৈরি হয়ে যাবে, তাতে রামবাবুর সন্দেহমাত্র নেই; এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ 'প্রতীতি' আছে। তার মানে 'বাড়ি তৈরির সেই সামগ্রিক জ্ঞান'ই হল সেই **কারণ**, যার থেকে রামবাবুর এই প্রতীতি বা বিশ্বাস জন্মায় যে, তাঁর 'মিথ্যা' কিন্তু 'দৃশ্যমান' বাড়িটি 'সত্যরূপে' পরিণত হবেই। সেই সুবাদে রামবাবুর 'বাড়ি তৈরির সেই সামগ্রিক জ্ঞান'কেই **মায়া** বলে। অর্থাৎ কিনা, যে কোনো কাল্পনিক বস্তু বা বিষয় বাস্তবায়িত হতে পারে যে জ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাকেই **মায়া** বলে। ... সন্দেহ নেই আমাদের সামনে মানুষের তৈরি করা যে বিশাল 'কৃত্রিম-**বিশ্ব**'টি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার ভিতরে আমরা বাস করি, সেই সমগ্র **বিশ্বের কারণ** হল এই **মায়া**। বেদান্ত **মায়া**র যথাযথ সংজ্ঞাই নিরূপণ করেছেন।

সোজা কথায় আমাদের লক্ষ রকমের প্রায়োগিক জ্ঞানকে **মায়া** বলে; তা সে চাষীর কৃষিকর্মের জ্ঞান হোক আর পরমাণুবাজের পরমাণু-চুল্লী বানানোর জ্ঞানই হোক, কিংবা রামবাবুর মেয়ের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক আর এ আর রহমানের 'ছঁইয়া ছঁইয়া'ই হোক। এই সকল লক্ষকোটি রকমের প্রায়োগিক জ্ঞানই হল **ময়** থেকে জাত **মায়া**। সেই **মায়া** প্রবেশ করিয়ে চাষী ধান্যাদি উৎপাদন করেন, পরমাণুবাজ শক্তি উৎপাদন করেন, রামবাবুর মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎপাদন করেন, এ আর রহমান সুরের লহরী উৎপাদন করেন। তার মানে, এই উৎপন্নগুলি আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে না, সেগুলি উৎপাদন করার জন্য কেউ না কেউ তাঁর শ্রম ও মেধার (= **ময়**-এর) বিবর্তিত উচ্চতম এক বা একাধিক পর্যায়ের **মায়া** ঢুকিয়ে তবেই সেগুলি উৎপাদন করতে পারছেন। ফলত, তাঁদের সেই উৎপন্নগুলির প্রতি তাঁদের শরীর ও মনের অংশস্বরূপ **মায়া**র টান তাঁদের থাকবেই। **মৎস্য** শব্দে আমরা যে দেখেছিলাম, প্রতিটি উৎপন্নে উৎপাদকের শ্রম ও মেধা ঢুকে থাকে, এ হল মূলত সেই শ্রম ও মেধা (বোধ), তাদের কোটি কোটি প্রকারভেদের কোনো একটি বা কয়েকটির মিলিত ফল! স্বভাবতই এই বিশ্বের যেখানে যেখানে যে যে বস্তুতে বা বিষয়ে মানুষ তার **মায়া**র প্রবেশ ঘটিয়েছে, ঘটায়, তাদের প্রত্যেকটির উপর সেই সেই মানুষের **মায়া**র টান বা **মায়া**র বাঁধন থাকতে বাধ্য, এবং থাকেও। তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ...

ময়-এর মতোই **মায়া** শব্দটিও তাই অত্যন্ত ব্যাপক শব্দ। 'ধন্য আশা কুহকিনী তোমার **মায়া**য় /মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন' এবং '**মায়া**বতী মেঘে এল তন্দ্রা ...' — এইধরনের **মায়া**-সংক্রান্ত অজস্র কবিতা ও গান শুনে স্বাধীনোত্তর কালের বাংলাভাষী বড়ো হয়েছেন। তাই এদের চেনা খুব কঠিন কিছু নয়। এই **মায়াই** কোনো মানুষকে কোটিপতি বানায়, কাউকে ভিখারি করে দেয়। এই **মায়াই** কাউকে মনীষী করে, কাউকে হাংরি, উগ্রপন্থী, উন্মাদ করে দেয়। সেই কারণে **মায়া** মানুষের পক্ষে ভাল বটে, মন্দও বটে। সেই কারণে এমন একজন গুরুদেবকে পাওয়া কঠিন, **মায়া**র বাঁধন কাটিয়ে ওঠার উপদেশ যিনি আমাদের দেননি। ...

ফলত, আমাদের ভাষায় **মায়া** শব্দের বিপুল ব্যবহার হয়ে থাকে। এবং স্বভাবতই **মায়া**-যুক্ত অজস্র শব্দ আমাদের রয়েছে। নিম্নে আমরা তাদের কয়েকটির অর্থ বিষয়ে মন্তব্যসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম।

মায়াকাজল : ৪. কোনো কোনো বাংলাভাষী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে কখনো কখনো শব্দটি শুনতে পাওয়া যায়। ৫. দ্র. **কাজল**। **মায়াকাজল** একটি অদ্ভুত শব্দ। না, কোথাও এর প্রয়োগ এখন আর দেখা যায় না, কোনো অভিধানেই শব্দটিকে পাওয়াও যায় না। **মায়াকাজল** শব্দটির অর্থ হল 'কোনো একটি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান'। যেমন, রামবাবু জানেন, একটি পুকুর ভাড়া নিয়ে তাতে মাছের পোনা ছেড়ে নয় মাস তাদের বাড়তে দিয়ে সেই মাছ তুলে বেচে দিলে টাকায় তিনগুণ লাভ হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতি বছর পুকুর ভাড়া নিয়ে মাছের চাষ করেন এবং বিক্রি করেন। তাঁর এই মৎস্যোৎপাদন ও বিক্রিবাটার জ্ঞানকে তাঁর **মায়াকাজল** বলা চলে। এরকম বহু মানুষের যার যার তার তার নিজ নিজ **মায়াকাজল** থাকে। কেউ কেউ সেই **মায়াকাজল** অন্যদের চোখে লাগিয়ে

দেওয়ারও চেষ্টা করেন। সেরকম মানুষদের একালে উপদেষ্টা বলা হয়ে থাকে। সেভাবে ভাবলে আজকাল যে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা **হচ্ছে** তাও তাদের চোখে **মায়াকাজল** লাগিয়ে দেওয়াও বটে। একালের ভাষায় একে বলা হয় 'শিক্ষার থলি' বা educational package। শোনা যাচ্ছে, মন্ত্রী কপিল সিব্বল নাকি ভারত সরকারের সমস্ত বিদ্যাবিক্রয়কেন্দ্রে সেইরকম একপ্রকার সুনির্দিষ্ট 'শিক্ষার থলি' বা **মায়াকাজল** বিক্রির জন্য জোর সওয়াল-জবাব শুরু করেছেন। এখন যেমন পাঁচরকম কোম্পানির পঞ্চাশ রকম **মায়াকাজল** বিক্কিরি চলছে, সেটা তিনি চলতে দেবেন না! ...

হায় রবীন্দ্রনাথ! তুমি বাঙালির সন্তানদের চোখে যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **কাজল** পরাতে চেয়েছিলে, তোমার সেই ইচ্ছাকে এখন তোমার শান্তিনিকেতন থেকেই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে! ...

মায়াকান্না : ৩. কপটক্রন্দন, লোকদেখানো কান্না। (ব.শ.)। ৪. 'কপটক্রন্দন' অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটি সৃজিত হয়েছিল উৎপাদিত বস্তু, বিষয়, পুত্র, কন্যাদিতে যে **মায়া** প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, তার প্রতি **মায়া**দাতা উৎপাদকের টানের প্রকাশরূপ ক্রন্দন থেকে। কিন্তু **মায়া** তো কোনো কালেই দৃষ্ট নয়। সুতরাং যার **মায়া** প্রবিষ্ট হয়েছে, তার স্থানে অন্য লোকেও সেই **মায়া**র টান উল্লেখ করে কাঁদতে শুরু করে। কালে কালে **মায়াকান্না**র মানে হয়ে যায় কপট কান্না।

মায়াবতী : ২. *মায়াবৎ-এর আধারশক্তি যে।* ৩. মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে কামদেব ভস্মীভূত হলে স্ত্রী রতি শোকান্বিতা হয়ে এক দৈববাণী শুনতে পেলেন। কামদেব কামদেব কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে শম্বরাসুরের গৃহে বাস করবেন। রতি মায়াবতী নাম গ্রহণ করে শম্বরপুরে বাস করতে আদিষ্ট হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে কখনো-সখনো প্রচলিত। ৫. দ্র. **প্রদ্যুম্ন**। যে জনগোষ্ঠী বিশেষ ধরনের **দক্ষ**জ্ঞান বা **মায়া**খ্যা বিদ্যার অধিকারী, তাঁদের **মায়াবতী** বলে। তাঁরা তাঁদের **মায়া**র সাহায্যে, ধরা যাক, রেশমপোকার গুটিকে **ভোজবাজী**র মতো মসলিন কাপড়ে পরিণত করে দিতে পারে! ... এইরকমই কোনো একটি গোষ্ঠীর কথাই উপরোক্ত কাহিনীতে বলা হয়েছে।

মায়াবাদ (মায়াবাদী) : ৩. **মায়াবাদ** = মায়াসম্বন্ধী মতবিশেষ, দৃশ্যমান জগৎ মায়ার সৃষ্টি, সুতরাং মিথ্যা, অথবা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও অসত্য — এই সিদ্ধান্ত। **মায়াবাদী** = যিনি মায়াবাদ অনুসারী, বেদান্তী। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ব্রহ্ম**। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' — এই বাক্যটি জনশ্রুতির মতো ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র কমবেশি শুনতে পাওয়া যায়। এটি বেদান্তবাদীদের অর্জিত সত্য। বিষয়টি আমরা **ব্রহ্ম** শব্দে বিস্তারিত করেছি। এর মূল কথা হল তথাকথিত **বিশ্বে**র মূলে রয়েছে সেই জ্ঞান, যাকে **মায়া** বলা হয়ে থাকে। সেই **মায়া**র বা 'কার্য্যকরী প্রায়োগিক বিদ্যা'র (কর্ম্মময়ী-**অবিদ্যা**র বা টেকনোলজিক্যাল নলেজের) মূলে থাকে **ব্রহ্ম** বা তাত্ত্বিক জ্ঞান (বা থিয়োরিটিক্যাল নলেজ)। সেই কারণে '**মায়াকে প্রকৃতি** বলা হয়, **মায়াবৃত ব্রহ্মাই পুরুষ**।' (শিবপুরাণ / বায়বীয়সংহিতা / ৪-১৮)। যেহেতু সেই **মায়া** বা **ব্রহ্ম** দিয়ে এই **বিশ্ব** তৈরি করা হয়েছে, **মায়াই** (প্রযুক্তিবিদ্যাই) মূল কিংবা **ব্রহ্মই** (তাত্ত্বিক বিদ্যাই) মূল। **মায়া** বা **ব্রহ্ম** থাকলে এই **বিশ্ব** বানিয়ে নেওয়া যায়, তাই তাঁরা মনে করতেন, 'দৃশ্যমান **জগৎ** মায়ার সৃষ্টি, তাই মিথ্যা', কেবলমাত্র 'ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও অসত্য'; অর্থাৎ কেবলমাত্র '**ব্রহ্মই** সত্য, **জগৎ** মিথ্যা'।

মায়াবী : ২. ***মায়া*** *বহনের আধার যে।* ৩. মায়াযুক্ত, মায়িক, মায়াকার, ধূর্ত্ত, শঠ, ঐন্দ্রজালিক, বাজিকর, মায়াবদ্বিষয়, মায়া-শক্তিমান্ ঈশ্বর। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. শব্দের নিহিতার্থ অনুসারে প্রযুক্তিবিদ্যা বা **মায়া** বহনকারী মাত্রেই **মায়াবী**। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে **রাক্ষস**দের প্রায়শই **মায়াবী** বলা হয়েছে। একালের ভাষায় যারা জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করব বলে কিন্তু খেয়ে ফেলে, তেমন সমস্ত সরকারি সংস্থাকে সেকালে **রাক্ষস** বলা হত। আবার তাদের হাতে যদি কোনো প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের দায়িত্ব থাকত, তাদের বলা হত **মায়াবী রাক্ষস**। একালের উদাহরণস্বরূপ 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ' (WBSEB) বা তার মতো সংস্থাকে **মায়াবী রাক্ষস** বলা যেতে পারে; শুধু দেখতে হবে সংস্থাটি জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করার নাম করে সে সম্পত্তি খেয়ে ফেলছে কি না, এবং তার নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রযুক্তিবিদ্যা বা **মায়া** আছে কি না।

প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যা বহনকারী মাত্রেই **মায়াবী** হলেও, সমাজে সেই **মায়াবী**র বিস্তর বিবর্তন ঘটেছে। একদিকে ভালমানুষ-**মায়াবী** হয়ে গেছেন চাষী, কামার, কুমার, তাঁতি ... ইত্যাদি নানা প্রকারের স্রষ্টা, শিল্পী, নানা বস্তুর শ্রদ্ধেয় উৎপাদক; অন্যদিকে মন্দমানুষ-**মায়াবী** হয়ে গেছেন যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক বা magician, ঠগ, ধূর্ত, শঠ ... ইত্যাদি। কালে কালে ভালমানুষ-**মায়াবী**রা যে যার নিজ নিজ **মায়া** নিয়ে নিজ নিজ স্থির চাষী কামার ... ইত্যাদি নামে পৌঁছে যান। তাঁদের **মায়াবী** নাম পরিত্যক্ত হয়। আর ঐন্দ্রজালিক ও ধূর্তদের জন্য **মায়াবী** শব্দটি চিরস্থির হয়ে প্রতীকী হয়ে যায়।

মায়ামমতা (— মায়ার-বাঁধন, মায়ার-টান) : ২. *মায়া* ও ***মমতা***। ৩. কৃপা ও স্নেহ, স্নেহমমত্ব। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মমতা**। **মায়া** ও **মমতা** শব্দ দুটিকে প্রায়শই এক করে ফেলার চেষ্টা হয়ে থাকে; যেন **মায়া** যা, **মমতা**ও তাই। তা ঠিক নয়, দুটি আলাদা এবং একটি উচ্চমানের পরিপূরক **যোড়শব্দ**। (দ্র. **মোটমাট**)। মানবিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো সত্তার প্রতি কারও **মায়া** আছে কিন্তু **মমতা** নেই, এরকম সাধারণত হয় না। **মায়া** থাকলে **মমতাও** থাকে। আপনি আপনার যে শ্রম ও মেধা (= **মায়া**) প্রয়োগ করে একটি বস্তু বা বিষয় সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতি আপনার **মায়া** থাকা স্বাভাবিক, এবং সেই **মায়া**র কারণেই বস্তুটির প্রতি আপনার **মমতা** থাকে, সে **মমতা** সকাম বা নিষ্কাম যাই হোক। তার মানে, **মায়া** থাকলে তবেই **মমতা** থাকে। **মায়া** নেই অথচ **মমতা** আছে, এরকম হয় না। আপনি যদি কোনো বস্তু বা বিষয়ে আপনার **মায়া** প্রয়োগ না-করে থাকেন, তার প্রতি আপনার **মমতা** জন্মাতে পারে না।

তবে বস্তু বা বিষয়টি যদি দীর্ঘকালীন ও অবিরাম **মায়া**র দ্বারা

গড়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে আপনি পড়ে যাবেন **মায়ার ফাঁদে, মায়ার বাঁধনে**। ধরা যাক, আপনি একটি লাউগাছের চারা পুঁতেছেন কিংবা পাঁচটা হাঁস পুষেছেন। সে তো প্রতিদিনই নিয়ম করে জল চাইবে, খাবার চাইবে, রক্ষণাবেক্ষণ চাইবে। সে সব দেওয়াই তো **মায়ার** প্রয়োগ করা। কিন্তু এ তো আর একদিন একবারে প্রয়োগ করে দিলে হয় না, নিয়মিত দিয়ে যেতে হয়। ফলে, আপনি চাইলেও যে একবার দিল্লি ঘুরে আসতে যাবেন, তা হবে না। **মায়ার টান** আপনাকে টেনে রাখবে। চাষীকে তার ক্ষেতের শস্যের নিয়মিত সেবা করতে হয়, পশুপালককেও তার পশুসমূহের খাদ্যাদি নিয়মিত যোগাতে হয়, কোম্পানির মালিককে তার কারখানাকে নিয়মিত কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহ করতে হয় এবং কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন যোগাতে হয়, সংসারীকে নিয়মিত তার পোষ্যদের সেবার ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব কাজই এক ধরনের **মায়ার** বন্ধন। চাইলেই এই **মায়ার বাঁধন** থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি মেলে না। বাংলাভাষীদের সংস্কৃতিতে এই **মায়ার-বাঁধন** বা **মায়ার-টান** এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। এমন গুরু মেলে না, যিনি এই **মায়ার-বাঁধন** কেটে বেরিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন না। আমরা কিন্তু জানি, 'জ্ঞানচর্চাই জীবনের ব্রত যার' (= **ব্রাহ্মণ**), তাঁকে পঞ্চাশোর্ধ্বে **মায়ার-বাঁধন** ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হয়, **বাণপ্রস্থ** গ্রহণ করতে হয়। কথাটি কর্মবীরত্বের চর্চাকারীদের (= **ক্ষত্রিয়ের**) ক্ষেত্রেও একশোভাগ খাটে।

যোগমায়া : ৩. যোগই মায়া, গুণত্রয়ের যোগ (ঘটন)-রূপা মায়া, ভগবৎসমাধিকৃতা মায়া, ভগবৎসঙ্কল্পবশবর্ত্তিনী মায়া, ভগবানের জগৎসর্জ্জনার্থা শক্তি, বিষ্ণুমায়া, ভগবতী, যোগের ঐন্দ্রজালিক শক্তি। (ব.শ.)। ৪. মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ভগবান, জগৎ, বিষ্ণু, মায়া**। বিনিয়োগের জন্য শুধু টাকা হলেই **ভগবান**দের কারখানা থেকে **জগৎ** সৃষ্টি করা যায় না, অনেকসময়ই **বিষ্ণুমায়া** বা **যোগমায়া**র দরকার পড়ে। একালে তাঁকে বলা হয় 'নো-হাউ' (know-how)। একালে এমন বহু কোম্পানি আছে, তারা কেবল এই **যোগমায়া**কে নিয়েই থাকে। তাদের অতিদক্ষ একদল কর্মচারী থাকে, যারা ঐ 'নো-হাউ'টি জানে, কোম্পানিটি সেই কর্মচারীদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। তারা গিয়ে সেখানে **যোগমায়া**র **মায়া** যোগ করে দিয়ে ফিরে চলে আসে। এভাবেই রাউরকেলাতে এসেছিল জার্মান বিশেষজ্ঞরা, ভিলাইতে এসেছিল রাশিয়ান বিশেষজ্ঞরা। একালে এইরকম হাজার রকমের **যোগমায়া**র আধারেরা রয়েছেন।

মায়িক (মায়ী, অমায়িক) : ১. মায়া + ইক (ঠন্)। (ব.শ.)। ২. ***মায়িক*** *= মায় (ময় হইতে জাত) কে সক্রিয় বা গতিশীল করে যে।* ***মায়ী*** *= মায়-এর গতিশীল আধার যে।* ***অমায়িক*** *=* ***মায়িক*** *নহে যে।* ৩. **মায়িক** = মায়াবান, মায়াবী, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, মায়ারচিত, মায়াসৃষ্ট, অসত্য, অলীক, প্রাকৃত, সাধারণ, মায়াকার, ঐন্দ্রজালিক। **মায়ী** = মায়াবান, মায়োপেত, মায়াবী, কপট, শঠ, অসত্য, মিথ্যা, মায়াকার, ঐন্দ্রজালিক, মায়াধিক পরমেশ্বর, শিব, ব্রহ্মা, অগ্নি, কংসরাজ, মায়াবিষয়। **অমায়িক** = অমায়াবান, অকপট, সরল, সাধু, আড়ম্বরহীন, মায়ালেশহীন, মায়াবরণহীন, স্বচ্ছ, স্বার্থহীন। (ব.শ.)। ৪. **অমায়িক** শব্দটি 'অকপট' অর্থে প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দ কয়টি **মায়া** শব্দটির অর্থের বিবর্তনের বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দেয়। **মায়িক** জানিয়ে দেয় যে, **মায়া** শব্দটি সৃজিত হওয়ার কিছুদিন পরেই শব্দটি 'ধূর্ত্ত' ... ইত্যাদি অর্থে স্থির রূপ লাভ করে নেয়। **মায়ী** শব্দটি সাক্ষ্য দেয় যে, আদিতে সকল আবিষ্কারক সত্তা বা **শিব, ব্রহ্ম**জ্ঞানের আধার স্বরূপ **ব্রহ্মা** ও সর্বপ্রকার তেজবাহী **অগ্নি**কে **মায়ী** বলা হত। **অমায়িক** শব্দটি জানিয়ে দেয় যে, সেকালে যাঁরা **মায়িক** ছিলেন, তাঁরা আর যাই হোক মানুষের প্রিয় ছিলেন না; সে তুলনায় **মায়াশক্তিহীন** মানুষেরাই মানুষের প্রিয় ছিলেন। তার একটি কারণ এই যে, মানুষ **মায়িক** হলেই (বা প্রযুক্তিবিদ্যায় বিদ্বান হলেই অর্থাৎ) **মায়া**-শক্তিতে বলীয়ান হলেই সে **মায়াবী** হয়ে যায়, সে মানুষ সহজ থেকে দূরে সরে যায়; তখন সেই 'মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।' ('আবরণ / রবীন্দ্রনাথ)। সেই কারণে **অমায়িক** মানুষদের আমরা আজও ভালবাসি, **মায়িক** মানুষদের নয়।

মি (— বাঁদরাম, বাঁদরামি) : ২. *সীমায়িত সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* ৩. ভাব, ধর্ম্ম; স্নিগ্ধ হওয়া, আর্দ্র বা নরম হওয়া, মিইয়া যাওয়া। (ব.শ.)। ৪. পৃথকভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু বিভিন্ন শব্দের শেষে **প্রত্যয়** রূপে প্রচলিত। ৫. **ম** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, সীমায়িত বা সঙ্কুচিত কিংবা সংক্ষেপিত হয়ে যায় যে, সেটি **ম**-বর্ণবাচ্য। তাকেই ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহার করলে, **ম**-হওয়ন মানেই হয়ে যায় সঙ্কুচিত হওয়া। সেই **ম** যদি গতিশীল বা সক্রিয় হয়ে যায়, তখন সে তার সংক্ষিপ্ত রূপটিকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে বোঝায়। তবে সেভাবে **মি** শব্দের প্রয়োগ হয় না। তাকে পাওয়া যাচ্ছে শব্দের শেষে **প্রত্যয়** রূপে। **বাঁদরাম**-র বেলায় আমরা দেখছি, বাঁদরত্ব যে আচার আচরণে সীমায়িত, সেটিকে বলা হচ্ছে **বাঁদরাম**। আর সে যদি তার সেই আচার আচরণ সক্রিয় ভাবে করতে থাকে, তবে সেটি হয়ে যায় **বাঁদরামি**। তার মানে **বাঁদরামি**-র ভিতরে বাঁদরত্ব কেবল সীমায়িতই হয়নি, তদ্রূপ আচার আচরণ সক্রিয়ও রয়েছে। বহু বাংলা শব্দে এর প্রয়োগ দেখা যায়, যথা — ভাঁড়াম, ভাঁড়ামি; জ্যাঠাম, জ্যাঠামি; নোংরাম, নোংরামি; ছ্যাঁচড়াম, ছ্যাঁচড়ামি ... ইত্যাদি।

মিত[১] (— অমিত, অমিতা, অমিতাভ) : ১. ✓মি + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মিত*** *=* ***মি*** *(উপরে দ্রষ্টব্য) তারিত যাহাতে।* ***অমিত*** *= যাহা মিত নহে।* ***অমিতা*** *=* ***অমিত****-এর আধার যে।* ***অমিতাভ*** *=* ***অমিত*** *আভা যাহার।* / **অমিতাভ** = যাহার অমিতা আভা। (ব.শ.)। ৩. **মিত** = কৃতপরিমাণ, পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন, স্বল্প, নিয়মিত, পরিমিতশব্দ, সংখ্যাত, ক্ষিপ্ত, নির্ম্মিত। **অমিত** = অপরিমিত, অসীম, মহান, নির্দ্দিষ্ট। **অমিতাভ** = মহাপ্রভ, অতিদীপ্ত, অষ্টম মন্বন্তরের দেবগণ, বুদ্ধদেব। (ব.শ.)। ৪. **মিত** অপ্রচলিত। **অমিত, অমিতা, অমিতাভ** নাম রূপে প্রচলিত। ৫. যা কিছুকে সীমায়িত করে গতিশীল করে তারিত করে ফেলা গেছে, তা সবই **মিত** সন্দেহ নাই। অর্থাৎ কিনা, সংক্ষেপিত মাত্রেই **মিত**। স্বভাবতই

যা কিছুই **মিত** করা হয় নাই, সেগুলি সবই **মহা** বা **মহান**। ফলত **অমিত** ও **অমিতা** শব্দ দুটি নামরূপে প্রিয় তো হবেই। তবে যাঁর জ্ঞানের আভা ভারত ছাড়িয়ে চীন জাপান প্রভৃতি দেশেও পৌঁছে যায়, সেই **অমিতাভ** তো **বুদ্ধেরই** নাম হওয়া উচিত ছিল। তাই হয়েছেও। তবে **মিত** ও **মিতা** শব্দের আর একরকমের প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেটি **মিত্র** থেকে আগত **মিত** ও **মিতা** শব্দ। তার আলোচনা আমরা করব **মিত**২ শব্দে।

তা সে যাই হোক, এই **মিত** শব্দ দিয়ে বহু শব্দ তৈরি হয়েছে। উপরে **মি** ক্রিয়ার বংশলতিকা থেকে সেই শব্দসমূহের তালিকা আপনি দেখে নিতে পারেন। আমরা এখানে তার কয়েকটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়ে দু-একটি মন্তব্য করে এগিয়ে যাব।

মিতব্যয়ী : ২. *মিত ব্যয় করেন যিনি।*

মিতভুক্‌ : ২. *মিত ভোজন করেন যিনি।*

মিতভুক্ত : ২. *যিনি মিত ভোজন করিয়াছেন।*

মিতাক্ষর : ২. *যাহাতে মিত বা কম সংখ্যক অক্ষর থাকে।* ৩. পরিমিতবর্ণ, স্বল্পাক্ষর, ছন্দোবদ্ধ। (ব.শ.)।

মিতাক্ষরা : ২. *মিতাক্ষর-এর আধার যে (গ্রন্থ)।* ৩. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানগ্রন্থ, বিজ্ঞানেশ্বরভট্টারক-কৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. আইনের দুনিয়ার মানুষেরা কেউ কেউ শব্দটির সাথে পরিচিত। ৫. দ্র. **জীমূত, জন্তু**।

মিন (মিনতি, মিনমিন, মিনমিনে — কাকুতি-মিনতি) : ২. *মিন = সীমায়িত গতিশীলভাবে অন (on) যাহাতে। মিনতি = মিন তারিত হইয়া গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে। মিনমিন = মিন-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। মিনমিনে = মিনমিন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* / **মিনমিনে** = যে নাকীসুরে কথা বলে। (ব.শ.)। ৩. **মিনতি** = প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি, নিবেদন। **মিনমিন** = বিন্দুবিন্দুভাব, ক্ষীণধারার ভাব। **মিনমিনে** = বিন্দু বিন্দু হেতু, ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে। (ব.শ.)। ৪. **মিন** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **মিন** শব্দটি ব.শ.-তে নেই, ছা.অ.-তেও নেই। শব্দটির অর্থ হল, কোনো সীমায়িত সত্তা সক্রিয় হয়ে অন থাকে যাহাতে। আমরা যখন **মিন-মিন** করে কিছু বলি, তখন শব্দকে যতটা সম্ভব সীমায়িত করে নিয়ে তাকেই সক্রিয় করা হয়। এই জন্য ব.শ. **মিনমিন** শব্দের অর্থ দিয়েছেন 'বিন্দু বিন্দু ভাব'। এভাবেই প্রার্থীর ইচ্ছাকে সীমায়িত করে, ক্ষুদ্রতম করে নিয়ে, সেটুকুই দাবি করা হলে তাকে **মিনতি** বলে। এই **মিন** শব্দটির উত্তরাধিকার রয়েছে ইংরেজির mean শব্দে যার অর্থ base, low in worth or estimation।

কাকুতি-মিনতি শব্দটি একটি পরিপূরক **যোড়শব্দ**। (দ্র. **মোটমাট**)। এতে দুরকম প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। **কাকুতি**র অর্থ হল স্পষ্ট কথায় গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করে প্রার্থনা করা এবং **মিনতি**র অর্থ হল **মিনমিন** করে গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করে প্রার্থনা করা। ৬. ইংরেজি mean ... ইত্যাদি।

মেরু (মেরুদণ্ড) : ১. ✓মি + রু - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *মেরু = দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের আবর্ত্তন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। মেরুদণ্ড = মেরু নির্ভর করে যে দণ্ডে।* ৩. **মেরু** = পর্ব্বতবিশেষ, সুমেরু, হিমাদ্রি (ইহা পৌরাণিক পর্ব্বত, ইহা স্বর্ণরত্নময়; এই হেতু ইহার নাম 'হেমাদ্রি', 'রত্নসানু'। ইহার পৃষ্ঠ স্বর্গ, এই হেতু ইহা 'সুরালয়'। ইহা ইলাবৃত বর্ষের নাভিদেশে স্থিত। সূর্য্যাদি গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। গঙ্গা ইহার চূড়া হইতে চারি ধারায় পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন।), জপমালার মুখদ্বয়ের সন্ধিস্থ অগ্রবর্তী মধ্যগুলিকা, হার-মধ্যমণি, নায়কমণি, ষট্‌কোণ দ্বাদশভৌম বিচিত্রকুহর চতুর্দ্বার দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত বিস্তীর্ণ প্রাসাদবিশেষ ... ইত্যাদি। **মেরুদণ্ড** = পৃথিবীর মেরুদ্বয়সংযোজক কল্পিত রেখা (axis), পৃষ্ঠমধ্যস্থ দণ্ডবৎ দীর্ঘ অস্থি, পৃষ্ঠবংশ, শিরদাঁড়া। (ব.শ.)। **মেরু** = পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত পর্বত, যার উপর ইন্দ্রের স্বর্গ অবস্থিত। দেবতাদের আবাস স্থান। মেরু অন্য নামেও পরিচিত; যেমন সুমেরু, হিমাদ্রি ইত্যাদি। (পৌ.অ.)। ৪. ইংরেজির North Pole ও South Pole বোঝাতে যথাক্রমে 'সুমেরু' ও 'কুমেরু' শব্দটি প্রচলিত। জীবের শির যার উপরে দাঁড়ায়, সেই শিরদাঁড়াকে বোঝাতে **মেরুদণ্ড** শব্দটি প্রচলিত। শুধু **মেরু** অপ্রচলিত। ৫. আজ থেকে তিন হাজার বছর পেছনে চলে যান। মানুষের মুখে খুব বেশি শব্দ তখনও সৃষ্টি হয়নি। এদিকে সামাজিক জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ এবং ক্ষমতাকেন্দ্র সৃষ্টি হয়ে গেছে। যৌথসমাজের ভিতরেই একপ্রকার **পণ্যপ্রবাহ** (= **গঙ্গা**) বইতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এসব তো অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তা। তখন সেই 'সমাজ-শির'কে যে শব্দে উল্লেখ করা ও ব্যাখ্যা করা তখনকার মানুষদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সেই শব্দটি হল **মেরু**। মানবসমাজের সম্পদসমূহের দিশাগ্রস্ত সীমায়ন ঘটেছিল তার শীর্ষে, **সুমেরু**তে, **দেবলোকে**। পরবর্তীকালের ভারতীয় পণ্ডিতেরা earth-এর north-pole ও south-pole-কে যথাক্রমে **সুমেরু** ও **কুমেরু** নাম দিয়ে দেন। অদৃশ্য **সুমেরু কুমেরু**কে দৃশ্য **সুমেরু কুমেরু**তে পরিণত করে ফেলা হয়।

***মিদ্‌* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনিমিত্ত, অমিত্র, অমিত্রকর্শন, অমিত্রকর্ষণ, অমিত্রঘাতী, অমিত্রঘ্ন, অমিত্রজিৎ, অমিত্রতা, অমিত্রহা, অমিত্রাক্ষর, নিমিত্ত, মি, মিত, মিতবর (নিতবর) মিতকন্যা, মিতা, মিতালি, মিতিন, মিতিনী, মিত্ত্র, মিত্র, মিত্রকরণ, মিত্রকর্ম্ম, মিত্রকাম, মিত্রকার্য্য, মিত্রকৃত্য, মিত্রকৃতি, মিত্রগুপ্তি, মিত্রঘ্ন, মিত্রজ, মিত্রজা, মিত্রতা, মিত্রত্ব, মিত্রদ্রোহ, মিত্রদ্রোহী, মিত্রদ্বেষী, মিত্রনন্দন, মিত্রবৎসল, মিত্রবরণ, মিত্রবিষয়, মিত্রভাব, মিত্রভেদ, মিত্রমিত্র, মিত্রমুখ, মিত্রলব্ধি, মিত্রলাভ, মিত্রসংপ্রাপ্তি, মিত্রসপ্তমী, মিত্রসাহ, মিত্রহা, মিত্রা, মিত্রাক্ষর, মিত্রাবরুণ, মিত্রামিত্র, মিত্রোদয়, মিত্রোপস্থান, মিদ্‌, মেদ, মেদঃ, মেদক, মেদস্বী, মেদা, মেদি, মেদিনী, মেদিনীকোষ, মেদিনীজ, মেদিনীধর, মেদিনীপতি, মেদিনীপুর, মেদিনীশ, মেদী, মেধী, মেদুর, মেদুরিত, মেদোর্ব্বুদ, মেদ্য, মৈত্র, মৈত্রক, মৈত্রতা, মৈত্রনক্ষত্র, মৈত্রসূত্র, মৈত্রাবরুণ, মৈত্রাবরুণী, মৈত্রায়ণ, মৈত্রিণী, মৈত্রী, মৈত্রীপূর্ব্ব, মৈত্রীবল, মৈত্রীভাব, মৈত্রেয়, মৈত্রেয়ক, মৈত্রেয়ী, মৈত্র্য।

মিদ্‌ = সীমায়িতের গতিশীল বা সক্রিয় দান। **মিদ** = সীমায়িতের গতিশীল বা সক্রিয় দান যাহাতে।

মিত[১] **(মিতা, মিতালি, মিতিন, মিতিনী) : ১.** মিত্র > মিত। (ব.শ.)। **২.** ***মিত***[২] = *গতিশীল সীমায়িতের তারণ যাহাতে।* ***মিতা*** = ***মিত****-এর আধার যে।* ***মিতালি*** = ***মিতার*** *লালন গতিশীল যাহাতে।* ***মিতিন*** = ***মিত*** *গতিশীল বা সক্রিয়ভাবে অন (on) যাহাতে।* ***মিতিনী*** = ***মিতিন****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. মিত**[১] = মিত্র, বন্ধু। **মিতা, মিতিন, মিতিনী** = মিত্রপত্নী, মিত্রতাপন্না নারী, সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ। **মিতালি** = মিত্রতা। (ব.শ.)। **৪. মিত, মিতিন, মিতিনী** অপ্রচলিত, **মিতা** ও **মিতালি** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** গতিশীল সীমায়িতের তারণ যাহাতে, সে বন্ধু হয় কীভাবে? হয় না। হলে যা কিছুই 'পরিমিত' সে-ই আমাদের বন্ধু হতে পারত। আসলে শব্দটি বিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে **মিত্‌ত্র** > **মিত্র** > **মিত** — এইভাবে। নিম্নে বিষয়টি আমরা বিস্তারিত করেছি। এখানে শুধু বলবার কথা এই যে, **মিতিন** ও **মিতিনী**র মতো গুরুত্বপূর্ণ মিষ্টি শব্দ, মধ্যযুগের বাংলায় যার বিপুল ব্যবহার ছিল, এখনও গ্রামবাংলায় যার কিছু কিছু ব্যবহার রয়েছে, তাকেও আমরা এখন ব্যবহার করি না; ব্যবহার করি girl-friend। বন্ধুর পত্নীকে তো আমরা সরাসরি **মিতিন** বা **মিতিনী** বলতেই পারতাম। এমনকি মায়ের বৌয়ের কিংবা কন্যার সখীকে আমরা 'মায়ের ফ্রেন্ড' বা বন্ধু বলে কাজ চালাই, অথচ তাদের আমরা 'মায়ের মিতিন', 'বৌয়ের মিতিন', কিংবা 'কন্যার মিতিন' বলতে পারতাম। ইংরেজির প্রভাব এভাবেই আমাদের ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব করেছে।

মিত্র (মিত্‌ত্র) : ১. ✓মিদ্ + ত্র (ত্রক) - কর্ত্তৃবাচ্যে; **✓**মী (গতি) + ইত্র (ডিত্র) - কর্ত্তৃবাচ্যে; **✓**মি + ত্র (ত্রক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মিত্র*** = *গতিশীল সীমায়িত ত্রাণ পায় যাহাতে।* ***মিত্‌ত্র*** = *গতিশীল সীমায়িতের তারণ ত্রাণ পায় যাহাতে।* / **মিত্র (মিত্‌ত্র)** = যিনি সর্ব্বভূতে স্নেহ করেন; যিনি সব জানেন; যিনি কিরণক্ষেপন করেন। (ব.শ.)। **৩. মিত্র (মিত্‌ত্র)** = অহরভিমানী দেব, সূর্য্য, দ্বাদশ আদিত্যের একতম, মিত্রাবরুণ, মরুদ্-বিশেষ, কায়স্থের ও বারুই-এর উপাধি, সখা, বন্ধু, প্রীতিকর্ত্তা, অরিভূমির অগ্রবর্ত্তী রাজা। (ব.শ.)। **৪.** পদবী রূপে এবং friend অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বামিত্র, বরুণ**। শব্দটি প্রাচীন। ঋগ্বেদে এটি মিত্‌ত্র রূপে বিদ্যমান। **ছাত্‌ত্র** শব্দের মতো এই শব্দেও দ্বি-তকার ছিল। পরে পরে সেটি **মিত্র** পেরিয়ে বর্তমানে **মিতা** শব্দে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত সেকারণেই ব.শ. শব্দটির তিনরকম ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন।

মিত্‌ত্র শব্দের অর্থ ছিল 'গতিশীল সীমায়িতের তারণকে ত্রাণ করে যে'। অর্থাৎ, আপনার কিছু 'গতিশীল বা সক্রিয় বিষয় বা বস্তু' (= **মি**) আপনার অসুবিধার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই সেগুলিকে আপনি আপনার এখতিয়ারের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে চলেছেন (= **মিত্**)। এমতাবস্থায় কেউ আপনার সেই **মি**-তারণ চেষ্টায় সহায়তা করে সেটি ত্রাণ করে দিল। তখন সে হয়ে গেল আপনার **মিত্‌ত্র**। অন্যভাবে বললে, ক যদি খ-এর পোয়াতি ব্যথায় হাত লাগিয়ে তার সন্তান প্রসবে সহায়তা করে, জাত সন্তানকে হাতে নিয়ে বাইরে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন ক খ-এর **মিত্‌ত্র** হয়ে যায়। কিন্তু কালে কালে ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে যায় যে, যেহেতু প্রসূত সন্তানকে ক-ই বাইরে নিয়ে এসেছে, সেহেতু সন্তানের জননকার্যে ক-এর ভূমিকাই মুখ্য। তখন স্বভাবতই **মিত্‌ত্র** হয়ে যায় **মিত্র**। আরও পরে ব্যাপারটি এরকম দাঁড়িয়ে যায় যে, ক-ই সন্তান আনয়ন করেছে (তা সে প্রসব করে বা করিয়ে বা অন্য যেভাবেই হোক) এবং বন্ধনীর ভিতরের কথাগুলি উহ্য থেকে যায়। তখন **মিত্র** আরও ঘরোয়া হয়ে **মিত** হয়ে যায়। বাংলাভাষায় এরকম বহু শব্দ আছে, সেগুলিকে সাধারণভাবে **'তদ্ভব'** শব্দ বলা হয়ে থাকে।

তা সে যাই হোক, কোনো সত্তার **মিত্র** যে সেই সত্তার কিয়দংশের বহিঃপ্রকাশকে উৎসাহের সঙ্গে সহায়তা করে বলেই **মিত্র** পদবাচ্য, তাতে সন্দেহ নাই। এই 'কিয়দংশের বহিঃপ্রকাশ' সত্তাটির মানসিক কিয়দংশ হতে পারে, বাহ্যিক কিয়দংশও হতে পারে। তার মানে, যে আপনার দৃষ্টিকে বাইরে পাঠিয়ে দেখতে বলে, বলে — দেখো না, দেখো না, দেখলে কী হয়, দেখতে দোষ কী, অভিনব কিছু দেখে ফেলতেও তো পার — সে যেমন আপনার **মিত্র**, তেমনি যে আপনাকে মনের কথা বলে ফেলতে প্ররোচিত করে, বলে যে — বলেই ফেলো না, বললে কী হয়, বললে কে কী বলবে, ভালও তো বলতে পারে — সেও আপনার **মিত্র**। একালের ভাষায় বললে, যে আপনাকে একটি কবিতা লিখতে প্ররোচিত করে, বলে যে — লিখেই ফেলো না, লিখলে কী হয়, লিখলে কে কী বলবে, ভালোও তো বলতে পারে — সেও আপনার **মিত্র**। একই ভাবে সেকালের **অত্রি**-শাসিত (দ্র. **বেণ, পৃথু**) সমাজে (যখন বাড়তি উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল) যে সত্তা চাষীকে এইভাবে সাহস যোগাতো — দু-দশ বস্তা বাড়তি ধান উৎপাদন করেই ফেলো না, বাড়তি উৎপাদন করলে কী আর হবে, বিনিময়ে দুটো বাড়তি কাপড়ও তো পাওয়া যেতে পারে, কিংবা তাঁতিকে বলতো — বানিয়েই ফেলো না দুটো বাড়তি কাপড়, বসে না থেকে বাড়তি বানালে কী আর হবে, বিনিময়ে দু-বস্তা বাড়তি ধানও তো আনা যেতে পারে; তেমন সত্তাকেও বলা হত **মিত্র**। সে কালের যে মানসিক সত্তা মানুষকে এইরকম বাইরে দেখতে, মনের কথা বলে ফেলতে, বাড়তি উৎপাদন করে ফেলতে প্ররোচিত করত তাকে বলা হত **মিত্র**। সেকালের সমাজে এরকম একটি সামাজিক সত্তাও ছিল, সে ছিল দ্বাদশ **আদিত্যে**র একজন। তাকেও **মিত্র** বলা হত। নিম্নে **মিত্রাবরুণ** শব্দে তার কথা আমরা বলব।

এখানে আর একটি বিষয় একটু স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল। **মিত্র বন্ধু সখা** তিনটি শব্দকেই একালে আমরা ইংরেজির 'friend'-এর সমান করে ফেলেছি এবং সেই friend-এর মানে করি **বন্ধু**। অথচ শব্দ তিনটি আমাদের পূর্বসূরিরা তিনটি পৃথক চরিত্রের সত্তাকে বোঝাতে তৈরি করেছিলেন। **মিত্র** বলতে তাকেই বোঝানো হত, যে আমাদের বাড়তি দর্শন, সৃজন, উৎপাদনাদিতে উৎসাহিত করে ও সাহায্য করে। **বন্ধু** কাকে বলে সেকথা আগেই বলা হয়েছে, তবুও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে — যে দু'জন 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধনে আবদ্ধ' তাদের দু'জনকে পরস্পরের **বন্ধু** বলে। আর **সখা** বলা হত তাকেই যে 'সহ-খাদক' অর্থাৎ একসঙ্গে খায়। একটা মাছ ধরে এনে দুজনে একত্রে বসে সেটি খেলে তারা পরস্পরের **সখা**। অভিযান চালিয়ে প্রাচ্যদেশ লুঠ করে পাওয়া সম্পদ ভাগ করে নিয়েছিল বলে ইংলন্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের **সখা**। তাহলে দেখা

যাচ্ছে, **মিত্র**, **বন্ধু** ও **সখা** সবাইকে আমরা 'ফ্রেন্ড' বা 'বন্ধু' বলে চালিয়ে দিই বটে, কিন্তু বাংলাভাষার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে তিনটি শব্দই আলাদা শব্দ। **মিত্র** পরস্পরের আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে; **বন্ধু** পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করে; **সখা** একত্রে বসে খায়।

মিত্রাবরুণ : ৩. মিত্র ও বরুণ। (ব.শ.)। ঋগবেদের বহু সূক্তে মিত্র ও বরুণের স্তুতি লিখিত আছে। মিত্র একাকী মাত্র একটি সূক্তে ও বরুণ বারোটি সূক্তে (পৃথকভাবে) স্তুত হয়েছেন; কিন্তু মিত্র ও বরুণ একত্রে বহু সূক্তে স্তুত হয়েছেন। মিত্রাবরুণ যুবা, নিত্য তরুণ, উজ্জ্বল-পরিচ্ছদধারী। সূর্য এঁদের চক্ষু, সূর্যকিরণ রূপ অস্ত্রে এঁরা তাড়না করেন। এঁরা রথারূঢ়। মিত্র দিবসের এবং বরুণ রাত্রির দেবতা। অর্থাৎ মিত্র আলোকের দেবতা এবং বরুণ আবরণের দেবতা। ... এঁরা সম্রাট, শাসক, রক্ষক, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর ধারণকর্তা। এঁরা অসুর, এঁদের মায়ায় জগৎ শাসিত হয়। মায়াশক্তিতে এঁরা ঊষাকে প্রেরণ করেন, সূর্যকে আকাশে বিচরণ করান এবং মেঘ বৃষ্টি দ্বারা সূর্যকে আবৃত করেন। মিত্রাবরুণ নদীর পরিচালক, বৃষ্টিকর্তা। মিত্রাবরুণ ধর্ম ও নিয়মের (ঋত) রক্ষক ও পালক। ... পুরাণে ... এঁরা একত্র মিত্রাবরুণ নামে পরিচিত বা উল্লিখিত আছেন। উর্বশীর গর্ভে মিত্র হতে বশিষ্ঠ ও বরুণ হতে অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রাবরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নি**, **ইন্দ্র**, **বিশ্বামিত্র**, **বরুণ**। বেদে যত শ্লোক আছে, তার সিংহভাগ **অগ্নি**কে নিয়ে। বাকি যা থাকে, তার সিংহভাগ **ইন্দ্র** দেবতাকে নিয়ে। তার পরে যেটুকু থাকে, তার সিংহভাগ **মিত্রাবরুণ** দেবতাকে নিয়ে। তার পরে যতটুকু তলানি পড়ে থাকে সেটুকুই বাকি দেবতাদের কপালে জুটেছে। ফলে কেউ ভাগে পেয়েছেন একটিমাত্র সূক্ত, কেউ-বা দুটি বা পাঁচটি। অতএব বেদের বিচারে এই **অগ্নি**, **ইন্দ্র** ও **মিত্রাবরুণ**ই সবচেয়ে বড়ো দেবতা! কে তাঁরা?

অস্তিত্বের মূল যে তেজ, তাকে **অগ্নি** বলে; সেই 'তেজের আত্মোপলব্ধি'কে **ইন্দ্র** বলে; এবং সেই 'তেজের ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি'কে বলে **মিত্রাবরুণ**। অর্থাৎ কোনো একটি অস্তিত্ব, তা সে একটি কীট, একটি ইঁদুর, একটি মানুষ কিংবা সেই মানুষদের রাষ্ট্রশক্তি, যাই হোক না কেন, সে এগোবে নাকি এগোবে না — এই যে ব্যাপ্তি-ইচ্ছা ও ব্যাপ্তি-অনিচ্ছা — একেই বলে **মিত্রাবরুণ**। ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষিরা এঁকে তখনই চিনে ফেলেছিলেন এবং ব্যাপ্তীচ্ছাকে **মিত্র** ও আত্ম-সংবরণেচ্ছাকে **বরুণ** নাম দিয়েছিলেন। এঁরা দুজন অধিকাংশ সময়ে একসঙ্গে থাকেন বলে এঁদের **মিত্রাবরুণ** বলা হত। অতঃপর সামাজিক সত্তা রূপে সেই সত্তারা কী কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, পুরাণাদির কাহিনীতে সেসবের বর্ণনা আছে। তবুও, তা সত্ত্বেও সেই **মিত্রাবরুণ**কে এতদিন আমরা চিনতে পারিনি।

তবে এই দেবতাটিকে সবচেয়ে সহজভাবে উপলব্ধি করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'বিবেচনা এ অবিবেচনা' নিবন্ধে তিনি লিখছেন, "সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক — বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার নিকট-চেহারা দেখিবা মাত্রই সে বলে, 'কাজ কী!' বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয় জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো রোসো', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক-না।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, **মিত্রাবরুণ**কে তিনি যথার্থেই উপলব্ধি করবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, যদিও তাঁর চিহ্নিত করা 'প্রাণ' ও 'ভয়' যে আসলে যথাক্রমে **মিত্র** ও **বরুণে**র অপর নাম, তাঁদের কথাই যে বেদাদি গ্রন্থে বলে যাওয়া হয়েছে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ বলে যেতে পারেননি। তা না পারুন, যতটা পেরেছেন ততটাই বা কম কী? আধুনিক ভারতে বেদচর্চা তো খুব একটা কম হয়নি। কেউ কি **মিত্রাবরুণ** দেবতাকে রবীন্দ্রনাথের মতো সহজ স্বাভাবিকতায় উপলব্ধি করেছেন? তেমন কোনো পণ্ডিতের নাম আমরা তো জানি না।

মেদ (মেদা, মেদিনী, মেদিনীকোষ, মেদিনীজ, মেদিনীধর, মেদিনীপুর — ম্যাদামারা) : ১. ✓মিদ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মেদ** = *দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের দান যাহাতে।* **মেদা** = *মেদ-এর আধার যে।* **মেদিনী** = **মেদ** *সক্রিয়রূপে অন থাকে যাহাতে তাহার সক্রিয় আধার যে।* **মেদিনীকোষ** = **মেদিনী** *রচিত কোষ।* **মেদিনীজ** = **মেদিনী** *হইতে জাত।* **মেদিনীধর** = **মেদিনী**-*কে ধরে রাখে যে।* **মেদিনীপুর** = **মেদিনীর পুর** *যে।* ৩. **মেদ** = শরীরস্থ মাংসজাত ধাতুবিশেষ, বসা, বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, ঐরাবতকুলজাত অশ্ববিশেষ, অলম্বুষাবৃক্ষ। **মেদা** = ওষধিবিশেষ। **মেদিনী** = ধরা, ধরণী, পৃথিবী, ভূমি, স্থল, ভূতল, স্থান, রাজ্য, সংস্কৃতকোষকার মেদিনীকর। **মেদিনীকোষ** = মেদিনীকর কৃত 'নানার্থরত্নকোষ'। **মেদিনীজ** = কুজ, মঙ্গলগ্রহ। **মেদিনীধর** = ভূধর, পর্ব্বত। (ব.শ.)। **মেদা (ম্যাদা)** = মাদির তুল্য, তেজোহীন, বলবীর্যশূন্য, নির্জীব, অকর্মা। (**ম্যাদামারা** = পৌরুষশূন্য, নির্জীব।) **মেদিনীপুর** = ইহা বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা, ইহার প্রধান নগরও এই নামে খ্যাত। (ছা.অ.)। ৪. 'চর্বি' অর্থে **মেদ**, 'ধরণী' অর্থে **মেদিনী**, এবং স্থান নাম রূপে **মেদিনীপুর** প্রচলিত; গ্রামবাংলায় 'ওষধি' রূপে **মেদা** প্রচলিত; পণ্ডিত মহলে গ্রন্থনাম রূপে **মেদিনীকোষ** প্রচলিত। **মেদিনীজ** ও **মেদিনীধর** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কৈটভ**, **মহীধর**, **মেধ**। 'দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের দান থাকে যাহাতে', তাকে **মেদ** বলে, তা সে মানব-শরীরের **মেদ** হোক আর সমাজ-শরীরের **মেদ**ই হোক। মানবশরীরের **মেদ** ঠিক কীভাবে 'দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের দান' থেকে গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে আমরা

বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্তু সমাজশরীরের 'দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের দান' থেকে সমাজশরীরের **মেদ** কীভাবে জমে ওঠে, সে বিষয়ে কমবেশি সবাই জানেন। এ হল মানবসভ্যতার জ্ঞানসম্পদের ও ধনসম্পদের সমাজের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রগুলিতে জমে ওঠা। সেই সম্পদ সেভাবে কেন্দ্রীভূত হলে দেখা যায়, সেই কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রগুলি সমাজের ক্ষমতাকেন্দ্রও হয়ে উঠেছে। **মধুকৈটভে**র কাহিনী জানাচ্ছে, **পৃথু**র বা আদিরাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রাক্কালে মানবসমাজের প্রথম ও আদি দোকানদারের (= সমাজের **কর্ণ**-এর) বা আদি-ফেরিওয়ালার হাতে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। ফলত, যে একাকার (**একার্ণব**) থেকে প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, তা সেই সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে আদিরাষ্ট্রের আদি পুঁজি রূপে সক্রিয় হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা, সেই সামাজিক **মেদ** নিয়েই গড়ে ওঠে আদি সমাজশরীর বা **মেদিনী**। এটি earth নয়, অদৃশ্য সমাজশরীর, যা ক্রমে **মেদবান** বা **মেদিনী** হতে থাকে। সে তুলনায় আজকের দুনিয়ার সমাজশরীরের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায়, এই সমাজশরীরটি অত্যন্ত স্থূল ও অত্যন্ত **মেদবহুল** হয়ে পড়েছে। আজকের বিশ্ব-সমাজশরীরের প্রতিটি শহরই সেই **মেদ**-এর কেন্দ্র। আর, সেজন্যেই আজকের সমাজশরীরে হাজার রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, ঘটছে, যার সংবাদ থাকে প্রতিদিনকার খবরের কাগজে।

মেদা শব্দটি অ্যাকাডেমিতে গৃহীত হয়নি, অথচ গ্রামবাংলায় শব্দটির ব্যবহার আছে। তার একটা বড় কারণ এই যে, **মেদা** শব্দের অর্থ উদ্ধার করে অ্যাকাডেমিকে দেওয়া হয়নি। আমরা দেখেছি, গ্রামবাংলার মানুষ কোনো কোনো গাছের (যথা 'কাশমর্দ্দ' বা 'কাশমল্লা' গাছের) কাণ্ডের পৃথকভাবে ফুলে ফুলে থাকা স্থূল অংশ কেটে নিয়ে ঔষধ রূপে প্রয়োগ করেন। সেগুলিকে তাঁরা বলেন **মেদা**। কেউবা গাছের কাণ্ডে তৈরি হওয়া 'খোঁড়ল'-এ (= কন্দরে) জাত পরগাছাকেও **মেদা** বলে থাকেন। এগুলি গাছের **মেদ** থেকে জন্মায় কি না এবং সেগুলি মানবশরীরের পক্ষে ঔষধের ক্রিয়া করে কি না, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা সেকথা ভাল বলতে পারবেন। আমরা দেখছি, ব.শ. প্রণেতা তাঁর সাধ্যে যতটা কুলিয়েছে, ততটা জানিয়ে গেছেন; বলে গেছেন যে **মেদা** হল 'ঔষধবিশেষ'।

আমাদের একালের বাংলা অভিধানকারদের সবচেয়ে বড় রোগ হল, যে কোনো শব্দকে বিদেশাগত হিসেবে দেখাতে পারলে তাঁদের বড়ই আহ্লাদ হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁরা মনে করেন, **মেদা** কথাটি ফারসি 'মাদাহ্' শব্দ থেকে এসেছে; তাই **মেদা** বা **ম্যাদা** মানে 'মাদির তুল্য', অকর্মা ... ইত্যাদি। তাঁরা জানেন না, এই **মেদ** শব্দটির সঙ্গে বাংলার 'নিষ্কর্ম্মা'র কত প্রাচীন সম্পর্ক। কী মানবশরীর, কী সমাজশরীর, **মেদ** জমলে যে তার গুরুত্ব বা ওজন বেড়ে যায়, তখন একটু কাজকর্ম বা ছুটা-দৌড়া করলে যে সেরকম মানবশরীর ও সমাজশরীর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে ... এসব কথা সেকালের ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা ভালই জানতেন। চরকসংহিতা লিখছেন — 'সত্যযুগ গত হইবার সময়ে কোনো কোনো ব্যক্তি ধনাদির অতিগ্রহণ জন্য সাম্পন্নিক হওয়ায় তাহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল। শরীরের গুরুত্ববশত শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনসঞ্চয়ে আকাঙক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা হইতে কাম ক্রোধ অভিমান দ্বেষ পরুষতা অভিঘাত ভয় তাপ শোক চিন্তা ও উদ্বেগাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ... এবং জ্বরাদি ব্যাধি কর্তৃক শরীর আক্রান্ত হইয়াছিল ... রোগসমূহের প্রথমোৎপত্তির বিবরণ কথিত হইল।'

এটি একটি চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থে লেখা রয়েছে। স্বভাবতই এতে এক বিন্দু বাজে কথা বলার সুযোগ ছিল না, নেই। কেউ যদি সেসব বুঝতে না পেরে থাকেন, সেটা চরকসংহিতার দোষ নয়। যাই হোক, **মেদা-মারা** (দ্র. **মারা**) বললে যে **মেদ**-এর কারণে 'অকর্মা' হয়ে যাওয়াকে বোঝায়, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। মোটকথা, মানবশরীরের, বৃক্ষশরীরের, সমাজশরীরের **মেদ**-সংক্রান্ত বিষয়কেই যে **মেদ, মেদা-মারা** প্রভৃতি শব্দে বোঝানো হয়ে থাকে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। তবে এসবই হল দৃশ্য **মেদ**-এর কথা, মানসিক **মেদ** নয়। তার জন্য **মেধ** শব্দটি দেখতে হবে।

মেদিনীজ বললে কেন 'কুজ' বা 'মঙ্গলগ্রহ' সেকথা আমরা **মঙ্গল** শব্দে বিস্তারিত করেছি। আর, **মেদিনীধর** শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে **মহীধর** শব্দে। কিন্তু **মেদিনীপুর**-এর নাম **মেদিনীপুর** হল কেন এবং কীভাবে তা গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে আমরা শুধুমাত্র দু-একটি তথ্য উল্লেখ করে যেতে পারি — (এক) যে অঞ্চলকে **মেদিনীপুর** জেলা রূপে চিহ্নিত করা ছিল, সেই অঞ্চলের বিশেষত্ব হল, তাতে বিশ্বে যত রকমের ভূমি হয়, জলাভূমি, এঁটেল, দোঁয়াশ, বেলে, কাঁকুরে, লালমাটি, পাথুরে, পর্ব্বত, সমুদ্রসৈকত, বনভূমি ... ইত্যাদি প্রায় সবরকম মাটি রয়েছে এবং প্রায় সবরকম আবহাওয়ার এলাকাও রয়েছে; শুধুমাত্র বরফ পড়ে না, প্রাচীনকালে নাকি বরফও পড়ত। (দুই) **মেদিনীপুর** জেলার তথাকথিত জঙ্গলমহল কোনো সরকারের সময়ই আপন স্বভাব খুব একটা বদল করেনি। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কীভাবে সেই জঙ্গলমহল দখল করেছিল, তার কাহিনী থেকে জানা যায় (দ্র. মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতির গ্রন্থাবলী) এই অঞ্চলের মানুষকে কোনোদিনই ঠিকঠাক বশ মানানো যায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে এই মেদিনীপুর শহরেই পর পর তিনজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন হতে হয়েছিল। তার স্বভাবের ভিতরে এই বিশেষত্ব আছে বলেই, তা ইংরেজ বিরোধিতায়, কংগ্রেস বিরোধিতায় এবং সিপিএম বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। বাংলাভাষীর স্বভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী যে স্বভাবের উল্লেখ করেছেন, এ হল সেই স্বভাব। (এই গ্রন্থের **মলাট**-এর পেছনের অন্তর্পট দ্রষ্টব্য)।

মৈত্রেয়ী : ১. মিত্র > মৈত্র > মৈত্রেয় > মৈত্রেয়ী। **২.** ***মিত্র হইতে জাত-র দিশাগ্রস্ত যাত্রা সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে।*** **৩.** যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। এঁর অন্য স্ত্রীর নাম কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। ... কাত্যায়নী কেবলমাত্র গার্হস্থ্য জীবনেই নিরত ছিলেন। মৈত্রেয়ী সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যারও অনুশীলন করতেন। ... বার্ধক্যে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে ... দুই স্ত্রীকে সমস্ত অর্থসম্পদ দিয়ে

যেতে চাইলে ... মৈত্রেয়ীর সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ যদি আমার হয়, তবে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব?' ... যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ... বিত্ত দ্বারা কখনো অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। ... তখন মৈত্রেয়ী বললেন, 'যাতে আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমি কী করব?' ... যাজ্ঞবল্ক্য তখন সমস্ত ভুলে স্ত্রীর নিকট অমৃতত্বের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কাত্যায়নী, তিতির, গৌড়তিত্তিরি, কপিঞ্জল, বাজসনেয়, মিত্র, মিত্রাবরুণ**। মানুষকে নবসৃজনের ও **উৎসর্জ্জনে**র উৎসাহ দেয় যে সত্তা তাকে আমরা **মিত্রাবরুণ**-এর **মিত্র** রূপে আগেই চিনেছি। ভারতসমাজের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সত্তার থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে দুই শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় — **কাত্যায়নী** ও **মৈত্রেয়ী**। শুক্ল-যজুর্বেদ রচয়িতা যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি কিনা **পণ্য**-উৎপাদনের দার্শনিক উদগাতা ছিলেন, তিনি ঐ দুই জনগোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ছিলেন। তার মধ্যে **কাত্যায়নী** ছিলেন **শুক্লযজুর্ব্বেদে**র ব্যবহারিক প্রয়োগকারী জনগোষ্ঠী। আর, **মৈত্রেয়ী** ছিলেন তারই মানসিক প্রয়োগকারী জনগোষ্ঠী। তাঁরই কাহিনী **৩.**-এ প্রদত্ত উপরোক্ত কাহিনীতে বলা হয়েছে, অবশ্যই ক্রিয়াভিত্তিক বয়ানে। সেগুলির অর্থ এক এক করে বুঝে নিয়ে এগোলেই বিষয়টি জানা যেতে পারবে। ...

অবশ্য ক্রিয়াভিত্তিক বয়ানে কোনো বক্তব্য রাখা থাকলে, সেটি একাধিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে যায়। সেভাবে দেখলে **মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী, যাজ্ঞবল্ক্য** প্রভৃতিকে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিমানুষ বলেও ভাবা যায় এবং তা নিয়ে কাহিনীর বিস্তার সম্ভব হয়। ঠিক এমন জিনিসই তো ঘটেছে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের বেলায়।

মিল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমিল, আমীলন, মিল্, (মল থেকে মিল), মিল, মিলজুল, মিলাজুলা, মিলন, মিলমিলা, মিলমিশ, মিলা, মিলামিলি, মিলামিশা, মিলান, মিলায়ন, মিলিত, মিলিন্দ, মেল, মেলক, মেলট্রেন, মেলন, মেলবন্ধন, মেলতা, মেলা (মাল বিক্রির জন্য একত্রিত হওয়া), মেলান, মেলানি, মেলানিভার, মেলানী, মেলাপক, মেলাপাড়া, মেলামেলি, মেলামেশা, মেলি, সম্মিলন, সম্মিলিত, সম্মেলন।

মিল্ = সীমায়িতের গতিশীল (বা সক্রিয় লালন-লয়ন)। **মিল** = সীমায়িতের গতিশীল বা সক্রিয় লালন-লয়ন যাহাতে।

মিলন (মিল, মিলমিশ, মিলা, মিলামিলি, মিলামিশা, মিলান, মিলিত, মেলা, মেলান, মেলানি, মেলানিভার, মেলানী, মেলামেলি, মেলামেশা, সম্মিলন, সম্মিলিত, সম্মেলন) : ১. **মিলন** = ✓মিল্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। **মেলা** = ✓মিল্ + ই (ণিচ্) + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***মিল*** = *গতিশীল সীমায়িতের লালন-লয়ন যাহাতে; অথবা, গতিশীল* ***মল*** *(সীমায়িতের লালন-লয়ন) যাহাতে।* ***মিলন*** = ***মিল*** *অন (on) যাহাতে।* ***মিলমিশ*** = ***মিল*** *ও* ***মিশ*** *(নিম্নে* ***মিশ*** *দ্রষ্টব্য)।* ***মিলা*** = ***মিল****-এর আধার যে।* ***মিলামিলি*** = ***মিলা*** *ও* ***মিলি*** *(****মিল*** *গতিশীল যাহাতে)।* ***মিলামিশা*** = ***মিলা*** *ও* ***মিশা*** *(নিম্নে* ***মিশা*** *দ্রষ্টব্য)।* ***মিলান*** = ***মিলা*** *অন (on) যাহাতে।* ***মিলিত*** = ***মিল*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***মেলা*** = *দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের লালন-লয়নের আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত* ***মল****-এর আধার যে (ক্ষেত্র)।* ***মেলান*** = ***মেলা*** *অন (on) যাহাতে।* ***মেলানি*** = ***মেলান*** *গতিশীল যাহাতে।* ***মেলানিভার*** = ***মেলানি****-র ভার যাহাতে।* ***মেলানী*** = *মেলানির আধার যে।* ***মেলামেলি*** = *দিশাগ্রস্ত যে* ***মিলামিলি****।* ***মেলামেশা*** = *দিশাগ্রস্ত যে* ***মিলামিশা****।* ***সম্মিলন*** = *সম্যক* ***মিলন*** *যাহাতে।* ***সম্মিলিত*** = *যাহা সম্যকভাবে* ***মিলিত****।* ***সম্মেলন*** = *সম্যক* ***মেলন*** *যাহাতে।* **৩. মিল** = ঐক্য, সদ্ভাব, সাদৃশ্য, অনন্যভাব, সুরের সঙ্গতি, সংশ্লেষ, মিশ্রণ, মেলন, পদ্যে দুই চরণের শেষ অক্ষরের অভেদ; মিলিত বা সঙ্গত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, এক বা অভেদ হওয়া ... ইত্যাদি; উন্মীলিত করা, খোলা, মিলিত করা। **মিলন** = সংশ্লেষ, সঙ্গ, সংযোগ, সমাগম, সম্পর্ক, সংসর্গ, মিশ্রণ। **মিলা** = মিলিত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, সংসক্ত হওয়া, অব্যক্ত হওয়া, মিলাইয়া যাওয়া, কান্তিহীন বা ম্লান হওয়া, গলিয়া মিশ্রিত হওয়া ... ইত্যাদি; মিলিত করা, মিলিত অর্থাৎ দৃষ্টিপথগত করা, সংযুক্ত করা ... ইত্যাদি। **মিলিত** = সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, সঙ্গত, সমাগত, মিশ্রিত, সংঘটিত। **মেলা** = সমাগম, সঙ্গ, সংযোগ, সভা, সমাজ, মসি, অঞ্জন, নীলীবৃক্ষ, স্বরগ্রাম, আধিক্য, প্রাচুর্য্য, পর্ব্বাদিতে বা উৎসবে বহু লোকের সমাগম, পুঞ্জ, সাক্ষাৎকার, অনেকখানি। **মেলান** = উন্মীলন, খোলা, প্রসারণ, ছড়ান, মিশান, গন্তব্যপথের অনুকূলভাবে প্রবাহিত (বায়ু)। **মেলানি, মেলানী** = মেলনসম্বন্ধী, কুটুম্বাদির সহিত মেলনে (সাক্ষাৎকারে) দেয় সামগ্রীসম্ভাররূপ সামাজিক উপহারবিশেষ, বিদায়কালে মেলনে দেয় উপহারসামগ্রী, বিদায়ে আলিঙ্গনপাদবন্দনসম্ভাষণাদি সামাজিক শিষ্টাচার, বিদায়গ্রহণ, বিদায়। **মেলানিভার** = উপহারসামগ্রীসমূহ। **সম্মিলন** = সমাগম, মেলন। (**সম্মিলনী** = সম্মিলনস্থান, সভা, সমিতি)। **সম্মিলিত** = সমাগত, মিলিত। **সম্মেলন** = সমাগম, মেলন, সঙ্গম, যোগ। (ব.শ.)। **মিলমিশ** = সদ্ভাব, বনিবনা। **মিলামিশা, মেলামেশা** = পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ বা সাহচর্য, সঙ্গ, সংসর্গ। **মেলান** = খোলা বা খোলানো, উন্মীলিত করানো, প্রসারিত করা বা করানো। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. শুধুমাত্র **মেলানি, মেলানিভার, মেলানী** ছাড়া বাকি সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। ৫. কোনো 'সীমায়িত সত্তা গতিশীলভাবে লালিত-লয়প্রাপ্ত হলে' তাকে বলা হয় **মিল**। এ তো এক সাংঘাতিক কথা! বিশ্বের যে কোনো বস্তু বা বিষয়কে স্থির রূপে ধরে নিলেই সে হয়ে যায় **ম** বা 'সীমায়িত সত্তা', আর আমাদের মন তো প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে সেরকম করেই থাকে, প্রত্যেককে একটি 'সীমায়িত' রূপে স্থির বলে ধরে নেয়। সেই **ম** গিয়ে যদি অন্য কোনো **ম**-এর কাছে পৌঁছে তার সংস্পর্শে লালিত হয়, কিংবা সেই **ম**-এ লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখনই হয়ে যায় **মিল**। তাহলে তো একটা ইট গিয়ে আর একটা ইটের গায়ে বসে গেল, তাতেও **মিল** হয়; আবার একটা

মাটির ঢেলা গিয়ে পুকুরের জলে পড়ে গেল এবং গলে লয়প্রাপ্ত হয়ে গেল, **মিলিয়ে** গেল; সেও **মিল** হয়। তবে কাছাকাছি হওয়া থেকে শুরু করে একেবারে একে অন্যের ভিতরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়ার যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া, আমাদের পূর্বসূরি শব্দজ্ঞানীরা তাকে তিন ভাগে ভাগ করেও দেখেছেন — **মিল, মিশ** ও **মিষ** শব্দে। সে প্রসঙ্গে আমরা আসব **মিষ্ট** শব্দে।

তা সে যাই হোক, এখন আমরা দেখছি যে, বিশ্বের যে কোনো বস্তু বা বিষয় গিয়ে যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সংস্পর্শে পৌঁছে সুখ লাভ করলে, লালিত হলে, কিংবা লয়প্রাপ্ত হলেই **মিল** হতে পারে; কেবল পরস্পর-বিরোধী হলেই আর **মিল** হয় না। আর সেকথা তো সুকুমার রায় বলেই গেছেন — 'কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে —/ বাঘে ছাগে **মিল** হলে আর নেই রক্ষে।' তাছাড়া, কবি বলেছেন, ঘরের বাইরে দুই পা ফেলে চোখ **মেলে** ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দু দেখার কথা, ছাইভস্ম সরিয়ে দেখবার কথা, তাতে নাকি **মিলিলে মিলিতে** পারে অমূল্য রতন। তাহলে তো **মিল** শব্দের সক্রিয়তার এলাকা অতি বিশাল! ঠিক তাই। এত বস্তু ও বিষয় এই **মিল** ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে যে, তার হিসাব করা মুশকিল।

প্রাচীন বাংলায় এই শব্দের বিকাশ খুব একটা ঘটেনি। মধ্যযুগের বাংলাভাষী এই শব্দকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। বর্তমান কালেও এই শব্দটি এবং তজ্জাত শব্দগুলির বিপুল ব্যবহার হয়ে থাকে। বহু বস্তু বা বিষয় পরস্পরের সঙ্গে **মিলে** যায়, পরস্পরের ভিতরে **মিলিয়ে** যায়; লোকে কাপড় **মেলে**, পাখনা **মেলে**, চোখ **মেলে, মিলামিলি** করে, **মিল** খাওয়ায়, **মিলায়, মেলায়, মেলা**তে যায়, **মেলা**য় যায়, হাত **মেলায়**, রং **মেলায়**, চোখে চোখ **মেলায়**, কাজ আর কথায় **মেলায়**, হিসাব **মেলায়**, সুর **মেলায়**, **মেলা** ব'কে, এবং কী যে **মেলায়** না, তার হিসাব করা মুশকিল। শুধু খেয়াল রাখা দরকার — বাঘে ছাগে **মিল** হলে আর নেই রক্ষে!

তবে 'যেখানে অনেকে মিলিত হয়েছে বা হয়', সেই স্থান-কাল-পাত্রকে যে **মেলা** বলা হয়, তার মধ্যে একটা দিশাগ্রস্ততার ভাব আছে। অর্থাৎ, **মিলা** > **মেলা, মিলান** > **মেলান, মিলামিশা** > **মেলামেশা, মিলে** > **মেলে, সম্মিলন** > **সম্মেলন** — এই শব্দগুলি দেখতে শুনতে একরকম হলেও হুবহু এক নয়। যে **মেলা**কে আমরা fair অর্থে বুঝি, তাকে কখনোই **মিলা** বলা যায় না। কিন্তু **মিলা** ক্রিয়ার বদলে **মেলা** ক্রিয়ার ব্যবহার চলে, যদিও তা সত্ত্বেও দুটি শব্দের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যে **মিলন**-এর কোনো বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ নাই, যা কিনা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক, তা সর্বদা **মিলন**ই বটে; কিন্তু যে **মিলন**-এর ভিতরে আদেশ, নির্দেশ, বিশেষ ঝোঁক ... ইত্যাদি ক্রিয়া করে এবং সেকারণে তাদের **মিলন**-এর বিশেষ দিশা থাকে, তাকে **মেলন** বলাই ঠিক। রিজওয়ানুরের ছবিতে মোমবাতি দিতে যে **মিলন** ঘটেছিল, সে ছিল **মিলন** বা **সম্মিলন**। সমিতির বা পার্টির ডাকে যে **মিলন** হয়, সে হল **সম্মেলন**। ...

মিল ও তজ্জাত শব্দসমূহের এই বিপুল ব্যবহারের কারণে, তাদের ব্যবহারিক অর্থ ও ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের মধ্যে প্রায়শই তাল রাখা যায় না। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে শব্দগুলির ব্যবহারিক রূপের ও অর্থের অনুসরণ করলে সেই সম্পর্ক কেবল ঠিকঠাক নেই, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই রয়েছে। আসলে, **মিল** শব্দটির যোগ্যতাই তাকে এত বিপুলভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ করে দিয়েছে। এক তো গোড়াতে **ম**-বর্ণে ই রয়েছে অতি-ব্যাপকতা, তার উপর **ল** বর্ণে রয়েছে 'লালন' থেকে 'লয়ন' পর্যন্ত সম্ভাবনাগুলি। সেই কারণে মধ্যযুগের পর থেকে এই **মিল** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির বিপুল ব্যবহার দেখা যায়। তবে **মেলানি, মেলানী, মেলানিভার** শব্দগুলি অত্যন্ত দরকারি ও ভাল শব্দ হলেও নানান কারণে শব্দগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। এগুলির পুনর্নবীকরণ হওয়া উচিত।

৬. ইংরেজের meal (মিল্) মুখের ভিতরে **মিলিয়ে** যায়, mill (মিল্ল্) শস্যদানাকে গুঁড়িয়ে **মিলিয়ে**-মিশিয়ে দেয়, mail (মেল) মনের **মল**কে নিয়ে গিয়ে প্রাপকের সঙ্গে **মিলিয়ে** দেয়; এবং mile (মিলে) প্রাপকের নিকট পর্যন্ত দূরত্বকে জানান দেয়। তবে **মিলন**ের তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি করে পাওয়া যায় ফরাসি থেকে পাওয়া ইংরেজি melee শব্দে এবং আঞ্চলিক ইংরেজিতে ব্যবহৃত mell (= mix, mingle, মেশা) শব্দে।

মিশ্র্ ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমিশ্র, অমিশ্রিত, পাঁচমিশালি, মিছিল (মিস্ল্), মিছিলনবিস, মিছিলা, মিশ, মিশ(স)কাল, মিশকালি, মিশকিন, মিশনারি, মিশমিশ, মিশমিশে, মিশা, মিশান, মিশামিশি, মিশাল, মিশালি, মিশি (মিশী, মিসি), মিশুক, মিশ্র, মিশ্রক, মিশ্রকেশী, মিশ্রচোর, মিশ্রজ, মিশ্রজাতি, মিশ্রণ, মিশ্রধন, মিশ্রধান্য, মিশ্রপুষ্পা, মিশ্রবর্ণ, মিশ্রবর্ণা, মিশ্রবৃত্ত, মিশ্রব্যবহার, মিশ্রিত, মিশ্রিতা, মিশ্রীকরণ, মিশ্রেয়া, মিসকাল, মিসকালি, মিসকালো, মিসমিসে, মিসাল, মিসী, মিস্ত্রী, মেশামেশি, মেস (mess, যেখানে সবাই মিলেমিশে থাকে), মেসবাড়ী।

মিশ্র্ = গতিশীল সীমায়িতের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ-এর রহন। **মিশ্র** = গতিশীল সীমায়িতের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ রহে যাহাতে।

মিশকিন : ৫. দ্র ফকির। আমাদের দেশে 'অযাচী-ব্রাহ্মণ'দের যে স্বভাব ছিল, এই **মিশকিন**দের স্বভাব ছিল হুবহু সেরকম। কিন্তু সেই স্বভাবের কথাটি **মিশকিন** শব্দের উত্তরাধিকারে কীভাবে এসেছে, এই মুহূর্তে আমরা তা জানি না।

মিশ (মিশকাল, মিশা, মিশান, মিশামিশি, মিশাল, মিশালি, মিশুক) : ২. *মিশ = গতিশীল সীমায়িতের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে।* ***মিশকাল*** *=* ***মিশ****-এর ন্যায় কাল।* ***মিশা*** *=* ***মিশ****-এর আধার যে।* ***মিশান*** *=* ***মিশা*** *অন (on) যাহাতে।* ***মিশামিশি*** *=* ***মিশা*** *ও* ***মিশি*** *(দ্র. কচাকচি)।* ***মিশাল*** *=* ***মিশা*** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***মিশালি*** *=* ***মিশাল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***মিশুক*** *=* ***মিশ****-কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে।* **৩. মিশ (মিশা)** = মিশ্রিত হওয়া, মিশ খাওয়া, মিলিত হওয়া, লীন হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, মিশ্রিত করা, সমস্বর বা সংবাদী করা। **মিশকাল** = মিশির মতো কাল, গাঢ়

কৃষ্ণবর্ণ। **মিশান** = মিশ্রিত করা। **মিশাল (মিশল)** = মিশ্র, মিশ্রিত, মিলিত, সহিত, মিশ্রণ, সংঘটন, দল, সঙ্গ, মিশ্রিত দ্রব্য। **মিশালি (পাঁচমিশালি)** = মিশ্রিত, নানা দ্রব্যে মিশ্রিত। **মিশুক** = আলাপ পরিচয়ে কুশল। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. মিশ** কথাটির মধ্যে 'গতিশীল সীমায়িত বস্তু বা বিষয়ে'র সার্বিক বিচ্ছুরণ থাকে। জলের ক্ষেত্রে চিনি বা নুন 'গতিশীল সীমায়িত বস্তু' হতে পারে, নুড়িপাথর পারে না। জলের সর্বদিকে সর্বকণায় সেই নুন বা চিনি ছড়িয়ে পড়ে বলেই তাকে বলে **মিশা**। কবি বলেছেন, 'প্রেমে জল হয়ে যাও গলে / কঠিনে **মেশে** না সে, **মেশে** তরল হলে।' **মিশুক** কিন্তু কঠিন নয়, তাই বলে নুন-চিনির মতো একেবারে সম্পূর্ণ **মিশে**ও যায় না সে। মোটকথা, এই **মিশ** কিন্তু **মিল** বা **মিষ** নয়, তার মাঝামাঝি ব্যাপার। দ্র. **মিষ্ট**। ... **৬.** ল্যাটিন miscere, ইংরেজি mix, জারমান mischen। সব ক'টির অর্থ **মিশা, মিশে** যাওয়া, **মেশান**।

মিশ্র (মিশ্রক, মিশ্রজ, মিশ্রণ, মিশ্রধন) : ১. ✓মিশ্র + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মিশ্র*** *=* ***মিশ*** *(উপরে দ্রষ্টব্য) রহে যাহাতে।* ***মিশ্রক*** *=* ***মিশ্র*** *করে যে।* ***মিশ্রজ*** *=* ***মিশ্র*** *হইতে জাত।* ***মিশ্রণ*** *=* ***মিশ্র*** *অন (on) যাহাতে।* ***মিশ্রধন*** *= সুদ মিশ্রিত ধন যাহাতে।* **৩. মিশ্র** = মিশ্রিত, সঙ্কুল, সম্পৃক্ত, সঙ্কীর্ণ, সংযুত, শ্রেষ্ঠ, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, প্রধান, চতুর্ব্বিধ গজজাতির একতম, উগ্রাদি সপ্তগণান্তর্গত কৃত্তিকাবিশাখাগণ, (সঙ্গীতে) শ্রুতিবিশেষ, কান্যকুব্জসারস্বত-প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উপাধি। **মিশ্রক** = মিশ্রিত, সঙ্কীর্ণ, মিশ্রণকর্ত্তা, অপদ্রব্যের সহিত ধান্যাদির মিশ্রণকারক, ক্ষারমৃত্তিকাজাত লবণ, ইন্দ্রোদ্যান, তীর্থবিশেষ। **মিশ্রজ** = অশ্বতর, খচ্চর। **মিশ্রণ** = সংযোজন, সংশ্লেষণ, সঙ্কলন। **মিশ্রধন** = বৃদ্ধিসহিত মূল। (ব.শ.)। **৪.** mix ও mixture অর্থে **মিশ্র** ও **মিশ্রণ** শব্দ প্রচলিত, বাকি তিনটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত! যা কিছু **মিশ্র** তা mixed বটে, কিন্তু তাতে **মিশ্র** শব্দের অর্থ 'প্রধান', 'পূজ্য' ... ইত্যাদি হয় কী করে? না, বস্তুজগতে **মিশ্র**বস্তু 'প্রধান' বা 'পূজ্য' হয় না; কিন্তু সমাজে হয়। ভারতসমাজের ইতিহাসে একসময় **মিশ্র**-ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা বৈদিক সমাজতন্ত্রবাদ যেমন বুঝতেন, তেমনি নতুন পুঁজির আবির্ভাবও বুঝতেন। এঁদের কান্যকুব্জ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ বলা হত। বৌদ্ধবিপ্লবের প্রাক্কালে এঁরা উভয় ব্যাপারগুলি জানতেন এবং বৈদিক পবিত্রতা রক্ষা না করে **বারাণসী**র পক্ষপাতীও হয়ে পড়েন; তাই এঁরা একদিকে যেমন **মিশ্র**-ব্রাহ্মণ হয়ে যান, অপরদিকে তেমনি সেকালের উদীয়মান **বারাণসী**বাদীদের চোখে 'প্রধান', 'শ্রেষ্ঠ' ও 'পূজ্য' হয়ে যান। প্রসঙ্গত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ **মিশ্র**। ... দ্র. **মিষ্ট**।

মিষ্ **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অনামিষ, অনিমিক, অনিমিখ, অনিমিষ, অনিমেষ, উন্মেষ, নিমিষ, নিরামিষ, মিঠ, মিঠকুমড়া, মিঠা, মিঠাই, মিঠাইকর, মিঠাকড়া (মিঠেকড়া), মিঠাগুয়া, মিঠাজাজী, মিঠান, মিঠানি, মিঠাপান, মিঠাবিষ, মিঠি, মিঠিরি, মিঠে, মিঠেকড়া, মিঠেখিলি, মিঠেপান, মিষ্, মিষ, মিষ্ট, মিষ্টকর্ত্তা, মিষ্টকুমুড়, মিষ্টপাক, মিষ্টবাত, মিষ্টমুখ, মিষ্টান্ন, মিষ্টি, মিষ্টিমুখ, মেঠাই, মেষ, মেষকম্বল, মেষপাল, মেষপালক, মেষবল্লী, মেষবৃষণ, মেষযূথ, মেষশৃঙ্গ, মেষশৃঙ্গী, মেষাণ্ড, সুমিষ্ট।

মিষ্ = গতিশীল সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **মিষ** = গতিশীল সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে।

মিষ : ১. ✓মিষ্ + অ (ঘঞর্থে ক) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গতিশীল সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা পরকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করে যে।* **৩.** স্পর্দ্ধা, অভিভবেচ্ছা, ছল, ব্যাজ, ব্যপদেশ। (ব.শ.)। **৪.** পৃথকভাবে অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **নিমেষ** (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫১)। **আমিষ, নিমিষ, নিরামিষ** ... প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই **মিষ** শব্দটি খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব.শ. এই **মিষ** ক্রিয়ার অর্থ দিয়েছেন 'পরাভিভবেচ্ছা'। দ্র. **মিষ্ট**।

মিষ্ট (মিষ্টমুখ, মিষ্টি, মিষ্টিমুখ) : ১. ✓মিষ্ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মিষ্ট*** *=* ***মিষ*** *(গতিশীল সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) তারিত যাহাতে।* ***মিষ্টমুখ*** *=* ***মিষ্ট*** *মুখ যাহার।* ***মিষ্টি*** *=* ***মিষ্ট*** *গতিশীল যাহাতে।* ***মিষ্টিমুখ*** *=* ***মিষ্টি*** *মুখ যাহাতে।* **৩. মিষ্ট** = স্পর্দ্ধিত, সিক্ত, মধুররসযুক্ত, শ্রুতিসুখকর, কোমল, প্রীতিকর, মধুররস, মধুরখাদ্য, মোদকাদি দ্রব্য, মিষ্টান্ন। **মিষ্টমুখ** = মধুরভাষী, সন্তুষ্ট। **মিষ্টি** = মিষ্ট, মধুররসযুক্ত, শ্রুতিসুখকর, প্রীতিজনক। **মিষ্টিমুখ** = মিষ্টবাক্য। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. মিষ্ট** শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে sweet শব্দটি চলে আসে। ফলে, আমাদের মন শব্দটির দৃশ্য অর্থের ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে যায়। স্বভাবতই, তখন **মিষ্ট** শব্দটির নিহিতার্থের দিকে আর আমাদের দৃষ্টি থাকে না।

অথচ একবার ভাবুন, একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ কিংবা একটি আধো-আধো কথা-বলা সুদর্শন শিশু আপনার মনকে অভিভূত করে দিতেই পারে! কোনো একটি বস্তু বা বিষয় এভাবে তার শব্দ বা স্পর্শ কিংবা রূপ বা রস অথবা গন্ধ দিয়ে আপনাকে অভিভূত করে দিলে, সেই বস্তু বা বিষয়টিকে কি আপনি দোষারোপ করবেন? করবেন না নিশ্চয়, বরং খুশিই হবেন। কিন্তু ভেবে দেখলে, ঐ শব্দাদি ব্যাপারগুলি কিন্তু আপনাকে অভিভূত করছে বা তাদের নিজ নিজ প্রভাবের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। সেই কারণে, সেকালে এই অভিভূত-করণ বা 'পরাভিভবেচ্ছা'কে বলা হত **মিষ**। কেননা, ঐ শব্দাদি ব্যাপারগুলি 'গতিশীলভাবে সীমায়িত (= **মি**) হয়ে দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত (= **ষ**)' হয়েছে বলেই আপনাকে অভিভূত করতে পেরেছে! ... এভাবে, যে যে বস্তু বা বিষয় মানুষকে অভিভব করার ইচ্ছা ধারণ করে, তাদের সেকারণেই বলা হত **আমিষ**। ...

এখন যদি সেই বস্তু বা বিষয় থেকে নির্গত শব্দ/ স্পর্শ/ রূপ/ রস/ গন্ধ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তারিত (টঙ্কারিত) হয়ে যায়, শব্দশাস্ত্রের নিয়মে স্বভাবতই তাকে **মিষ্ট** বলতে হয়, তা সে **মিষ্ট**-শব্দ, **মিষ্ট**-স্পর্শ, **মিষ্ট**-রূপ, **মিষ্ট**-রস, বা **মিষ্ট**-গন্ধ যাই হোক। সেই

কারণে, বাংলাভাষায় **মিষ্ট** শব্দটি শুধুমাত্র চিনিকে বা চিনি দ্বারা প্রস্তুত **মিষ্টান্ন**কেই বোঝায় না, সর্বপ্রকারের দৃশ্য **মিষ্ট** (বস্তু বা বিষয়) থেকে অদৃশ্য **মিষ্ট**-(বস্তু বা বিষয়)-কেও বোঝায়। সেই **মিষ্ট** সক্রিয় থাকে **মিষ্টি**তে, তা **মিষ্টিমুখ** হোক আর **মিষ্টিকথা** হোক কিংবা **মিষ্টি**হাসিই হোক। ... ধারণাটি পাশ্চাত্যেও গেছে। যে কারণে ইংরেজিতে আমরা sweetheart, sweet words, sweet behaviour প্রভৃতি শব্দ পেয়ে থাকি।

মেষ (মেষযূথ, মেষাণ্ড) : ১. ✓মিষ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মেষ** = দিশাগ্রস্ত **মিষ** (উপরে দ্রষ্টব্য) যাহাতে। **মেষযূথ** = **মেষ**দিগের যূথ। **মেষাণ্ড** = **মেষ**-এর অণ্ড যে।* / **মেষ** = স্পর্দ্ধা করে যে। (ব.শ.)। **৩. মেষ** = মেঢ্র ভেড়া, মেষরাশি। **মেষযূথ** = মেষসমূহ। **মেষাণ্ড** = ইন্দ্র। (ব.শ.)। **৪.** ram অর্থে **মেষ** কমবেশি প্রচলিত, বাকি শব্দদুটি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অগ্নিবাহন, বাহন**। **মিষ** ক্রিয়ার ভিতরে অন্যের এলাকা দখল করার একটা ব্যাপার আমরা আগেই (দ্র. **মিষ্ট**) দেখেছি। অন্যের এলাকা দখল করতে স্পর্দ্ধা করে যে, এবং তদ্রূপ কাজ করার জন্য যে দিশাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, তাকে **মেষ** বলে। এটি কিন্তু দৃশ্য **মেষ** বা 'ভেড়া' নয়, এ হল **অগ্নির বাহন**। সেকালের ভাষায় একে বলা হত **দক্ষ** এবং একালের ভাষায় বলা হয় অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ। এঁরা জ্ঞানকর্মের **অগ্নি** বা তেজ বহন করেন বলে এঁদের **অগ্নিবাহন** বলা হয়ে থাকে। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে কখনো এঁদের **ছাগ** বলা হয়েছে, কখনো-বা বলা হয়েছে **মেষ**। মালিকানার **কেশ** এদের সারা শরীরকে লোমরূপে ঘিরে থাকে। এঁদের আস্পর্ধার শেষ নেই, যদিও খণ্ডজ্ঞানী বলেই এঁদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তা সত্ত্বেও তাঁরা যে মানবসমাজে প্রচুর ঝামেলা পাকান, সে বিষয়ে বাংলার মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকেই অবগত আছেন। সেই কারণে বাংলাভাষী মাত্রেই জানেন — 'মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে'।

সাদৃশ্যে জীবলোকের 'ভেড়া' (= ram) জন্তুটিকেও **মেষ** বলা হয়ে থাকে। এর স্বভাব অনেকটাই উপরোক্ত **দক্ষে**র মতো। যাঁরা 'মেড়া-লড়াই'-এর ব্যাপারে বিস্তর জানেন, তাঁরা বলেন, **মেষ** আকারে প্রকারে যত ছোটই হোক না কেন, লড়াইয়ের মাঠে নামিয়ে দিলে সে ছুটে গিয়ে তার চেয়ে তিনগুণ বড় **মেষ**টিকেও আঘাত করতে দ্বিধা করে না; যদিও বড় **মেষ**টির একটি প্রত্যাঘাতেই সে ধরাশায়ী হয়।

তবে 'ভেড়ার পাল' বা **মেষযূথ** বিষয়ে বিবেকানন্দ কথিত আর একটি প্রবচন বিশেষ লক্ষণীয়। সেটি হল 'ভেড়িয়াধসান'। ভেড়ার পালের গোদাটি যদি রেললাইন পেরিয়ে যায়, এবং এমন সময় রেলগাড়ি এসে যায়, পালের বাকি সমস্ত সদস্য সেই রেলগাড়ির তলায় প্রাণ বিসর্জন দেবেই। কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। কেননা, পালের গোদাকে ছেড়ে তারা থাকবেই না। যেহেতু সে চলন্ত ট্রেনটির ওপারে চলে গেছে, বাকি ভেড়াগুলি সেই চলন্ত ট্রেনের তলা দিয়ে পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার জন্য প্রাণ দেবেই। একই ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে বিখ্যাত 'রেজর্স এজ' উপন্যাসেও। বাংলাভাষীদের হুজুকের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ এই 'ভেড়িয়াধসান' প্রসঙ্গটি এনেছিলেন। আমরা এখনও কীরকম ভেড়িয়াধসান, তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে চোখের সামনেই। ভেড়িয়াধসান বলেই তো এখন আমরা শপিং মল বানাচ্ছি, বিগবাজার বানাচ্ছি ...।

***মিহ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** আমিক্ষা, বরাহমিহির, মিহ্, মিহি(হী), মিহিকা, মিহিজা, মিহিদানা, মিহির, মিহিরনন্দন, মিহিরবংশ, মিহিরমণ্ডল, মিহিরস্যন্দন, মিহী, মীঢ়, মীঢ়বান (মীঢ়বস্), মেঘ, মেঘ-আন্ধারী, মেঘকফ, মেঘকাল, মেঘাগম্ভীর, মেঘগর্জ্জন, মেঘঘটা, মেঘঙ্কর, মেঘচাপ, মেঘজ, মেঘজাল, মেঘজ্যোতিঃ, মেঘডম্বর, মেঘডম্বুর, মেঘডুম্বুর, মেঘতিমির, মেঘদূত, মেঘনাদ, মেঘনাদজিৎ, মেঘনাদানুলাসী, মেঘনাদী, মেঘনাল, মেঘনির্ঘোষ, মেঘনির্হ্রাদ, মেঘপঙ্ক্তি, মেঘপুষ্প, মেঘবপু, মেঘবর্ণ, মেঘবর্ত্ম, মেঘবহ্নি, মেঘবাহন, মেঘবিতান, মেঘবিস্ফূর্জ্জিত, মেঘভাঙ্গা, মেঘমণি, মেঘমন্দ্র, মেঘমল্লার, মেঘমল্লারিকা, মেঘমার্গ, মেঘমালা, মেঘমেদুর, মেঘযামিনী, মেঘযোনি, মেঘরব, মেঘরাব, মেঘরাজি, মেঘরাজী, মেঘরুচিবসন, মেঘরেখা, মেঘলা, মেঘলেখা, মেঘশ্যাম, মেঘসংঘাত, মেঘসখা, মেঘসার, মেঘসুহৃৎ, মেঘস্তনিত, মেঘস্বন, মেঘহ্রাদ, মেঘাকাশ, মেঘাগম, মেঘাটোপ, মেঘাড়ম্বর, মেঘাত্যয়, মেঘান্ত, মেঘাবতত, মেঘাম্বর, মেঘালোক, মেখিনী, মেঘী, মেঘোদক, মেঘ্নী, মেঠ, মেড়া, মেঢ়া, মেঢ্র, মেঢ্রক, মেণ্ঢ, মেণ্ঢক, মেতর, মেথর, মেথরানী, মেহ, মেহন, মেহি, সুমেরু।

মিহ্ = গতিশীল সীমায়িতের হওয়ন। **মিহ** = গতিশীল সীমায়িতের হওয়ন যাহাতে। (কোনো বস্তু বা বিষয় যখন অত্যন্ত সীমায়িত হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে, তখন তাকে **মিহ্** বলে। ব.শ. একে বলেছেন 'সেচন', 'ক্ষরণ', 'মূত্রপূরীষকরণ'।)

আমিক্ষা (আমীক্ষা) : ১. আ + ✓মিহ্ + স (সক্) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। **২.** *গতিশীল সীমায়িতের হওয়ন যাহাতে তাহার আশ্রয় রূপ আধার যে; অথবা, মূত্রপুরীষকরণের (মিহ্-এর) আশ্রয় যাহাতে*। **৩.** দধিকুর্চ্চিকা, ছানা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রলিত। **৫.** সমাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ (পণ্য) উৎপাদনকে সেকালে 'মূত্রপুরীষকরণ' বলা হত, আজ যাকে আমরা liquid money ও hard cash বানানো বা 'টাকা করা' বলি। উৎপাদিত বস্তুর উপর মালিকানার অধিকার প্রয়োগ করতে গেলে তার সারসংগ্রহ করে তাকে কুর্চিকায় বা কড়িতে রূপান্তরিত করে নিতে পারলেই সুবিধা। আর এসব করতে হয় 'ছাদনের' বা আচ্ছাদনের ভিতরে। যতদূর বোঝা যায়, 'ছাদন' শব্দটিই পরে 'ছানা' শব্দে পরিণত হয়েছে। জেনে রাখা ভাল, এককালে সারা ভারতে ছানা-খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং বঙ্গভাষী তা অমান্য করে ছানা খেয়েছে, ভরপুর খেয়েছে এবং তা দিয়ে রসগোল্লা বানিয়ে তাকে নিজ পরিচয়-চিহ্নে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। দ্র. **ইলা, কাদম্বিনী**।

মিহি (মিহিদানা) : ২. ***মিহি** = **মিহ** (গতিশীল সীমায়িতের হওয়ন)*

সক্রিয় যাহাতে। ***মিহিদানা = মিহি*** *যে দানা।* **৩. মিহি** = সূক্ষ্ম, সরু, সূচল, জিল (সুর), ছোট, নিষ্পিষ্ট, ক্ষীণ। **মিহিদানা** = ছোট দানা, মোতিচুরবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মিহির (বরাহমিহির) : ১. ✓মিহ্ + ইর (কিরচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মিহির = মিহ*** *সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে।* ***বরাহমিহির = মিহির*** *বিষয়ে* ***বরাহ*** *যিনি।* / **মিহির** = মেঘরূপে সেচন করে যে। (ব.শ.)। **৩. মিহির** = সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, বরাহমিহির। **বরাহমিহির** = 'বৃহজ্জাতক', 'বৃহৎসংহিতা' ইত্যাদির প্রণেতা নবরত্নের অন্যতম জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. নাম রূপে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অর্ক, তপন, ভানু**। যেখান থেকে **মিহি মিহি** কিরণ ঝরে, বৃষ্টি ঝরে, জ্যোৎস্না ঝরে, মিহি মিহি বাতাস ঝরে, তাকেই **মিহির** বলা যায়। কিন্তু আমরা তো জানি, সূর্য থেকে আর যাই ঝরুক বৃষ্টি ঝরে না, জ্যোৎস্না ঝরে না, হাওয়াও বয় না। তাহলে এ কেমন সূর্য? কেমন sun?

না, এ **সূর্য্য** sun নয়, এ হল অদৃশ্য **সূর্য্য**। এ হল সমাজের জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্র। এই **মিহির**ই তাপ দিয়ে জনসাধারণের খাজনাদি **বাষ্প**রূপে **মেঘ**-এ পরিণত করে পুনরায় বৃষ্টি রূপে তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। সাদৃশ্যে তা সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ... ইত্যাদিকে বোঝায়।

মেঘ : ১. ✓মিহ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. কত / সেচন করে যে। (ব.শ.)। **৩.** জলদ, জলধর, মুস্তক, রাগবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. cloud অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কাদম্বিনী, জল, ইন্দ্রধনু**। যে সত্তা মিহি মিহি বর্ষণ করে তাকে **মেঘ** বলে। অদৃশ্যলোকে এ হল সামাজিক বা রাষ্ট্রিক আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সমূহ, যাদের কাজ হল জনসাধারণের কাছ থেকে খাজনাদি সংগ্রহ করে প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে **গর্জ্জন**কারীতে পরিণত হওয়া এবং বৃষ্টিরূপে সেই অর্থের বিতরণ ঘটানো। আমাদের পুরাণাদি অনুসারে মেঘ দুই প্রকার — ইন্দ্রস্বামিক ও অসুরস্বামিক। শাসনব্যবস্থাটি যখন স্বাতন্ত্র্যবাদী বা পুঁজিবাদী হয় তখন এই **মেঘ** হয় ইন্দ্রস্বামিক; এবং ব্যবস্থাটি যখন যৌথতাবাদী (অধঃপতিত বৈদিক সমাজতন্ত্রবাদী) হয়, তখন এই **মেঘ** হয় অসুরস্বামিক। সাদৃশ্যে সেটিই দৃশ্য **মেঘ**কেও বলা হয়ে থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাকে বোঝাতে **মেঘ** শব্দটি তৈরি করেছিলেন, সেই অদৃশ্য অথচ অত্যন্ত সক্রিয় **মেঘ**টিকে দেখবার ও অখণ্ডভাবে বুঝবার যোগ্যতা বর্তমানে আমরা হারিয়ে ফেলেছি; চিনি কেবলমাত্র cloud-**মেঘ**কে। ফলত, অখণ্ডবোধের উত্তরাধিকারী থেকে এখন আমরা খণ্ডবোধের ও মধ্যমেধার অধিকারী হয়ে গেছি।

মেঘমল্লার : দ্র. **মল্লার**।

***মী* (মীল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** উন্মীলন, নিমীলন, নিমীলিত, প্রমীলন, মউর (মঊর), মউরা, মউরী, ময়ুর, ময়ূর, **ময়ূরকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠি(ণ্ঠী)**, ময়ূরকেতু, ময়ূরগ্রীব, ময়ূরতুত্থ, **ময়ূরপঙ্খী, ময়ূরপত্রী, ময়ূরপদক,** ময়ূরপিচ্ছ, ময়ূরপুচ্ছ, ময়ূরপেখন, ময়ূরব্যংসক, ময়ূররথ, ময়ূরশাল, ময়ূরশিখা, ময়ূরিণী, ময়ূরী, মায়ূর, মায়ূরক, মায়ূরিক, মায়ূরী, মিড়, মিড়মিড়, মিড়মিড়ে, মী, মীড়, মীন (মৎস্য), মীনকেতন, মীনকেতু, মীনগন্ধা, মীনঘাতী, মীনধাবনতোয়, মীনধ্বজ, মীননাথ, মীনরঙ্ক, মীনরঙ্গ, মীনরাশি, মীনলাঞ্ছন, মীনা, মীনাকার, মীনাকারী, মীনাঙ্ক, মীনাণ্ড, মীনাণ্ডী, মীনালয়, মীনেন্দ্র, মীমাংসক, মীমাংসন, মীমাংসা, মীমাংসিত, মীমাংসিতব্য, মীমাংস্য, মীর (দ্র.মির), মীল, মীলই, মীলন, মীলিত, মোর, মোরছল, মোরছা, মোরপিঞ্ছ, মোরশিখণ্ডক, মৌড়, মৌড়লা, মৌর, মৌরছল, সম্মীলন।

মী (মীল্) = গতিশীল সীমায়িতের আধার যে। **মীল** = গতিশীল সীমায়িতের আধারের লালন-লয়ন যাহাতে।

ময়ূর : ১. ✓মী (হিংসা) + উর (উরন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল সীমায়িতকে নিষেধ করে যে; অথবা, ধনবানদের ভক্ষণ করে যে।* / সর্পকে হিংসা করে যে। (ব.শ.)। **৩.** বর্হী, শিখি। (ব.শ.)। ৪. peacock অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কার্ত্তিকেয়**। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম যে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, তার **বাহন** ছিল **ময়ূর**। যে রাজবংশের শুরু চন্দ্রগুপ্ত দিয়ে এবং অশোক যে বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা, সেই বংশের নাম 'মৌর্য' হওয়ার পিছনে সম্ভবত এই **ময়ূর** বা ভাড়াটে বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। যৌথব্যবস্থার ভিতরেই যারা প্রচুর ধনসম্পদ কামিয়ে সম্পদের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিল, এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু অন্য সময় এই ভাড়াটে লোকজনেরা, একালের ভাষায় যাদের 'মিলিটারি' বলা হয়, ফুলবাবু হয়ে ঘুরতে থাকে। তাদের তখন বলা হয় 'কাঁচা-কাত্তিক'। সাদৃশ্যে তা বনের **ময়ূর** বা peacock-কেও বোঝায়।

মীন : ১. ✓মী + ন (নক্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল সীমায়িতের আধার অন থাকে যাহাতে।* **৩.** মৎস্য, মীনরাশি, বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, কামের মীনাকার রথধ্বজ, চৈত্রমাস। (ব.শ.)। ৪. ভাগীরথী নদীর মোহনার কাছাকাছি বিভিন্ন স্থানে যাঁরা মাছের পোনা ধরেন, তাঁরা একে বলেন 'মীন ধরা'। **৫.** দ্র. **মিন, মিনমিন, মৎস্য**। অদৃশ্যলোকে এই **মীন** হল অতি ক্ষুদ্র মালিকানার বোধ এবং দৃশ্য লোকে এ হল 'মাছের পোনা'। **৬.** ইংরেজিতে এই **মীন**-এর উত্তরাধিকার রয়েছে তাঁদের me, mean প্রভৃতি শব্দে।

মীননাথ : ৩. যোগশাস্ত্রাধ্যাপকবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. **নাথ** ধর্মের মূল দেবতা রূপে পূজিত। **৫.** ব.শ. **মীননাথ** শব্দটিকে **মৈচ্যান্দর** রূপে ভুক্তি দিয়েছেন এবং তার অর্থে জানিয়েছেন যে, ইনি **মৎস্যেন্দ্র**। আমরা বিষয়টিকে বিস্তারিত করেছি **নাথ** শব্দে।

মীমাংসক (মীমাংসন, মীমাংসা, মীমাংসিত — পূর্ব্ব-মীমাংসা,

উত্তর-মীমাংসা) : **১.** ✓মীমাংস + অক (ণ্বুল্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মীমাংসক*** = ***মীমাংস*** *(= অংশীকে অংশ লাভ) করায় যে।* ***মীমাংসন*** = ***মীমাংস*** *অন (on) যাহাতে।* ***মীমাংসা*** = ***মীমাংস****-এর আধার যে।* ***মীমাংসিত*** = ***মীমাংস*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***পূর্ব্ব-মীমাংসা*** = *যে* ***মীমাংসা****-নীতি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল।* ***উত্তর-মীমাংসা*** = *যে* ***মীমাংসা****-নীতি উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।* / **মীমাংসা** = মীমাংসা করে যে। (ব.শ.)। **৩. মীমাংসক** = সিদ্ধান্তকারক, বিচারক, মীমাংসাদর্শনবেত্তা, মীমাংসাধ্যেতা, সিদ্ধান্তপূর্ব্বক বিবাদমীমাংসাকারক। **মীমাংসন** = মীমাংসা, সিদ্ধান্ত। **মীমাংসা** = বিচার, বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয় বা সিদ্ধান্ত, জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ (মীমাংসা দুই ভাগে বিভক্ত — পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা। পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনিকৃত, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত ব্যাসপ্রণীত।)। **মীমাংসিত** = বিচারিত, তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক নির্ণীত, সিদ্ধান্তিত। **পূর্ব্বমীমাংসা** = জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন। ইহা বেদের প্রথম কাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা; কর্ম্মকাণ্ডে যাহা অভিহিত হইয়াছে, তাহাই ইহার বিচার্য্য বিষয়। ইহা, পূর্ব্বমীমাংসা পূর্ব্বকাণ্ড কর্ম্মমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড অধ্বরমীমাংসা যজ্ঞবিদ্যা ও ধর্ম্মমীমাংসা ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। **উত্তরমীমাংসা** = উত্তরের (বেদের উপনিষদ্‌ভাগের) মীমাংসা, অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের বিচার, বেদব্যাস-রচিত বেদান্তদর্শন। (ব.শ.)। **পূর্ব্বমীমাংসা** = জৈমিনী মুনি প্রবর্তিত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। ইহা বেদান্তের অংশীভূত। পূর্বমীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য বেদ-ব্যাখায় সাহায্য করা। (পৌ.অ.)। **৪.** 'ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া' অর্থে **মীমাংসা** কথাটি প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি কখনো-সখনো শুনতে পাওয়া যায়। **৫.** দ্র. **মাংস, জিজ্ঞাসা**। জিজ্ঞাসুর জানিবার ইচ্ছাকে যেমন **জিজ্ঞাসা** বলে, তেমনি অংশীর অংশলাভের ইচ্ছাকে **মীমাংসা** বলে। প্রাচীন যৌথসমাজ যতদিন কমবেশি স্বাভাবিক ছিল, ততদিন যৌথ-উৎপন্নের ভাগ-বাঁটোয়ারাও স্বাভাবিক ছিল, **মীমাংসা**র প্রশ্ন আসেনি। কিন্তু **দক্ষযজ্ঞে**র কিছুকাল পরে **দক্ষের** 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র নীতির প্রয়োগের স্বাভাবিক ফল হিসাবে একদিন **মীমাংসা**র কথা এসেই গেল। সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে একত্রে কাজকর্ম করা হচ্ছে, সবাই মিলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাওয়া হচ্ছে, সমস্যা ছিল না। এখন যখন **দক্ষে**র নীতিতে সমাজ চলছে, **বেদী**র বা জ্ঞানীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত, তখন দেখা যাচ্ছে, ভাগ-বাঁটোয়ারা আর আগের মতো নেই! **বেদজীবী**র ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের একাংশ চক্ষুলজ্জা হারিয়ে 'কচি পাঁঠা, বৃদ্ধ মেষ / দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ' ভোগ করতে শুরু করেছে! ...

এই সেই পরিস্থিতি যখন যৌথসমাজের যৌথ-উৎপন্ন ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আসে **মীমাংসা**-দর্শনের কথা। **বেদের** কর্ম্মকাণ্ড কী বলছে? উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে কার কী ভূমিকা? যার যা ভূমিকা, সে সেরকমই ভাগ পাবে। এই হল **মীমাংসা**র আদি-বৈদিক নীতি বা **পূর্ব্ব-মীমাংসা**। কিন্তু যৌথতায় একবার যখন শনি ঢোকে, তখন সে তো সহজে ছাড়ে না; ছাড়েও নি। ফলে, পুনরায় নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। যার যা ভূমিকা, সে কি সেই ভূমিকা ঠিকঠাক পালন করছে? তাছাড়া, কে কোন ভূমিকা পালন করবে, সেটাই তো পরিষ্কার নয়! তখন এসে গেল **উত্তর-মীমাংসা**র নীতি। **ব্যাস** বিচার করে বললেন, তাহলে প্রাচীন পঞ্চাঙ্গ **ন্যায়** অনুসারেই ভাগ-বাঁটোয়ারা হোক। তখনকার '**ন্যায়**' বা তখনকার 'মতো' এখনও ভাগবণ্টন হোক।

দর্শন কথাটি শুনলেই একালের শিক্ষিত মানুষদের মাথায় এমন চিন্তাভাবনার কথা আসে, যার পায়ের তলায় মাটি নেই; বাস্তবের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, তাদের সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিদের ছিল না। তাঁরা কাজের কথা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। অথচ **মীমাংসা**-দর্শন নিয়ে একালের পণ্ডিতদের আলোচনাগুলি পড়লে দেখা যায়, তাঁরা বাস্তব-বিবর্জিত কতগুলি শব্দ নিয়ে নিষ্ফলা চর্চা করছেন মাত্র। এক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের দিক এই যে, বাংলাভাষীদের মধ্যে **মীমাংসা** কথাটি তার যার্থার্থ্য নিয়েই আজও প্রচলিত আছে; **মীমাংসা** কথাটিকে তাঁরা বাজে কথায় পরিণত হতে দেননি।

মু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : মউরলা, মঞ্রিঁ, মু, মুই, মুঁ, মুঁই, মুঁড়া, মুণ্ডা, মুকুট (মটুক), মুখ (দ্র.খন্), মুজরা (মজুরি খেটে শোধ দেওয়া, দ্র. মসজ্), মুঝে (মহ্যম্), মুঞ্রি, মুঞে, মুমুক্ষা, মুমুষিষু, মুমূর্ষা, মুর্, মুর, মুরগণ্ড, মুরগী (মৃগ), মুরচা (মুরুচা, মুরুজা, মোর্চা), মুরজ, মুরজা, মুরজিৎ, মুরদ, মুরদ্বিট্, মুরবৈরী, মুররিপু, মুরব্বি (মুরব্বী, মুরুব্বি, মুরুব্বিআনা, মুরুব্বী), মুরল, মুরলা, মুরলী, মুরলীধ্বনি, মুরশিদ (মুরশীদ), মুরা, মুরাদ, মুরারি, মুরোদ, মুর্ব্ব, মুর্ম্মুর, মুস্ত, মুস্তা, মুহি, মুহূর্ত্ত, মুষ্টি, মৈ, মৈঁ (আমি, দ্র. মৈচ্যান্দর), মো, মোকে (মোর, আমার), মোচ্ছব (মোহ-ছাদিত-বাহিত যাহাতে), মোঞে, মোর, মোরগ, মৌরজিক, মৌরলা, মৌরি (মৌরী), মৌর্য্য, মৌর্য্যমণি।

মু = সীমায়িত নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। (সীমায়িত হতে হতে একসময় সেই সারসংক্ষেপ নবরূপে উত্তীর্ণ বা প্রদানযোগ্য, ত্যাজ্য, নিগমযোগ্য ... ইত্যাদি হলে তাকে বলে **মু**। একে 'নিগম্য-সারমর্ম'ও বলা যেতে পারে।)

মুর (মুরা, মুরারি) : **১.** ✓মুর্ + অ (ক) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মুর*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িত রহে যাহাতে।* ***মুরা*** = ***মুর****-এর আধার যে।* ***মুরারি*** = ***মুর****-এর অরি যে।* **৩. মুর** = দৈত্যবিশেষ, বেষ্টন। **মুরা** = নন্দরাজ-স্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত-জননী, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। **মুরারি** = মুরদৈত্যশত্রু, কৃষ্ণ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এই শব্দের নিহিতার্থ 'কেন্দ্রে সীমায়িত সত্তার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাওয়া' এবং সেভাবে কোনো আধারের মধ্যে থাকা। স্বভাবতই এ হল 'নিগম্য-সারাৎসার রহে যাহাতে'। ফলত এটি জ্ঞান ও ধনের অন্যত্র গামী সত্তা হতেই পারে। তার মানে, সেকালে যে সত্তা জ্ঞান, পণ্য, ইত্যাদি নিয়ে বাইরে যেত, তাদের **মুর** বলা হয়ে থাকবে। তা নইলে এর সঙ্গে **চন্দ্রে**র সম্বন্ধ থাকত না। তবে কিনা, হয়তো এই সত্তাটি ছিল একটু সেকেলে স্বভাবের। সেকারণেই **কৃষ্ণের** সঙ্গে তার বিরোধ

বাধে, অন্যথায় **কৃষ্ণের** নাম **কৃষ্ণমুরারি** হতে পারত না। যাই হোক না কেন, এই **মুর** যে 'নিগম্য-সংক্ষিপ্তসার-এর রক্ষক', তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

এই **মুর** সত্তাই ভারত থেকে আরব হয়ে স্পেনে পৌঁছায় ও ইউরোপের জ্ঞানচর্চা ও ধনচর্চার ভিত্তি গড়ে দেয়। ফলত উলটো দিক থেকে দেখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের আধুনিক পণ্ডিতেরা দেখেন যে, এই Moor আসলে পূর্ব দিক থেকে আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব ও আফ্রিকার **মরক্কো** অঞ্চলের Berber জাতির মিশ্রণে উদ্ভূত Moor জাতি, যারা **মরক্কো** অঞ্চল থেকে স্পেনে গিয়ে নিজেদের শাসন কায়েম করেছিল। বলে রাখা ভাল, পাশ্চাত্যের পরবর্তী বিকাশ, তাঁদের জ্ঞানচর্চা ও ধনচর্চা, আধুনিক শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপ রূপে আত্মপ্রকাশ — এসবের মূলে এই **মুর**দের বিরাট ভূমিকা ছিল। ... দ্র. **মুরলীধর**।

মুরল (মুরলা, মুরলী, মুরলীধর) : ১. মুর + ✓লা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মুরল** = *মুর-এর লালন বা লয়প্রাপণ থাকে যাহাতে; অথবা, মুরকে দান বা গ্রহণ করে যে।* **মুরলা** = *মুরল-এর আধার যে।* **মুরলী** = *মুরল-এর সক্রিয় আধার যে।* **মুরলীধর** = *মুরলী ধরেন যিনি।* / **মুরল** = বেষ্টন গ্রহণ করে যে। **মুরলী** = অঙ্গুলিবেষ্টন গ্রহণ করে যে। ('অঙ্গুলীবেষ্টনগ্রাহিণী')। **মুরলীধর** = যাঁহার মুখে মুরলী। (ব.শ.)। ৩. **মুরল** = ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। **মুরলা** = মুরলদেশীয় নদী, নর্ম্মদা, কেরলদেশীয় নদীবিশেষ। **মুরলী** = মূলী (বংশ), বংশী, বংশনালিকা। **মুরলীধর** = কৃষ্ণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একটি মাত্র ব্যাপার মেনে নিলে **মুর** ও **মুরারি**র সঙ্গে **মুরলীধর**-এর সম্পর্কের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। তা হল, প্রাচীন পুঁজির সঙ্গে আধুনিক পুঁজির বিরোধ থাকে। **মুর** সম্ভবত যৌথব্যবস্থার ভিতরেই গড়ে ওঠা পুঁজির কোনো যৌথ সত্তা। তাই **মুরারি** তার শত্রু। কিন্তু সে নিজেও **মুরল**ধারী-**মুরলীধর**। এদিকে **মুরল** যদি **নর্ম্মদা** নদী হয়, সে কেমন নদী, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। এ হল অতি-পবিত্র ধারা। সেক্ষেত্রে একথা মেনে নিতেই হয় যে, **পণ্য**বাদিতার পক্ষে সবচেয়ে ভাল ধারাকে ধারণ করে যে সত্তা, সেই **মুরলীধর**। তার **মুরলী**র সুর শুনে **রাধিকা**দের প্রেম উথলে ওঠে। তার মানে, যে সকল ব্যক্তিমালিক ধার করে **পণ্য** উৎপাদন করে এবং বিক্রি করে, তাদের উৎসাহদাতা হতে পারে এই **মুরলীধর**। ... আমাদের এই ধারণা ভুল হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো অর্থ এখান থেকে বেরোচ্ছে না দেখে আমরা আপাতত এই অর্থই দিলাম।

মুচ্ *(মোক্ষ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিমুক্ত, অবিমুক্ত, অমুক্ত, অমুক্তহস্ত, অমুক্তি, আমুক্ত, আমোক্ষণ, আমোচন, উন্মুক্ত, উন্মোচন, গজমোতি, জলমুক্, নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মোক, পয়োমুক্, বিমুক্ত, বিমুক্তি, মউড় (মোড়, মৌড়), মউল (মুকুল), মতি, মতিকাঁটা, মতিচু(চূ)র, মতি(তী)য়া, মুক্ (মুচ্), মুকতি (মুকুতি), মুকতিপদ, মুকয়, মুকল, মুকা, মুকাবিলা (মোকাবিলা), মুকু, মুকুট, মুকুটমণি, মুকুটামুকুটি, মুকুটি(টী), মুকুতা, মুকুতি, মুকুতিপদ, মুকুন্দ, **মুকুন্দক**, **মুকুর** (**মুক্**তি বেরিয়ে রহে যাতে, মক, ইংরেজি 'মেক্', মেকী, নকল মুক্ত করে যে), মুকুল, মুকুলভাব, মুকুলাগ্র, মুকুলিকা, মুকুলিত, মুকুলিতাক্ষ, মুকুলী, মুকুলীকৃত, মুকেদ (মুকদ্দম), মুকেরি, মুকোশ (মুখকোশ), মুক্খি, মুক্খু, মুখ্খী, মুখ্খু, মুক্ত, মুক্তক, মুক্তকচ্ছ, মুক্তকঞ্চুক, মুক্তকণ্ঠ, মুক্তকর, মুক্তকেশ, মুক্তচেতাঃ, মুক্তধ্বনি, মুক্তনিদ্র, মুক্তনির্ম্মোক, মুক্তপুরীষ, মুক্তবন্ধন, মুক্তবর্ষী (মুক্তাঝুরি), মুক্তবসন, মুক্তবেণী, মুক্তমূর্দ্ধজ, মুক্তল, মুক্তলজ্জ, মুক্তশিখ, মুক্তশৈশব, মুক্তসংশয়, মুক্তসঙ্গ, মুক্তহস্ত, মুক্তা, মুক্তাজাল, মুক্তাকলাপ, মুক্তাগার, মুক্তাগুণ, মুক্তাজাল, মুক্তাঝুরি, মুক্তাত্মা, মুক্তাদাম, মুক্তাপটল, মুক্তাপাঁতি, মুক্তাপ্রলম্ব, মুক্তাপ্রসূ, মুক্তাফল, মুক্তাবলি(লী), মুক্তামণি, মুক্তামণিসর, মুক্তামাতা, মুক্তামালা, মুক্তারত্ন, মুক্তালতা, মুক্তাশুক্তি, মুক্তাসন, মুক্তাসার, মুক্তাস্থূল, মুক্তাস্ফোট, মুক্তাস্রক্, মুক্তাহার, মুক্তি (পঞ্চমুক্তি), মুক্তিক্ষেত্র, মুক্তিদরখাস্ত, মুক্তিপদ, মুক্তিমণ্ডপ, মুক্তিমার্গ, মুক্তিমুক্ত, মুক্তিয়ার (মোক্তার), মুখ (দ্র.খন্), মুচ্, মুচক (মুচুক), মুচকা (মুচুকা), মুচকি, মচকুন্দ (মুচুকুন্দ), মুচকুন্দপ্রসাদক, মুচড় (মুচাড়), মুচড়া (মোচড়া), মুচড়ান, মুচলকা (মুচলিকা, মোচলকা, মোছলকা), মুচি (মুচী, নারকেলের মুচি), মুচুটী, মুচুড় (মোচড়), মুঞ্চ, মুচমুচ, মুছ (মোচ), মুছ্ (মোছা), মুছল্লম (মুরগিমুছল্লম), মুছা, মুছান, মুছাপ (মোসাহেব - সদর্থে), মুছি, মুছিদ (মুর্শীদ), মুঞ্চ, মুতীম, মুমুক্ষা, মোক, মোকদ্দমা, মোকদ্দমাবাজ, মোকানারিকেল, মোক্তব্য, মোক্তা (মুক্তির ব্যবস্থা করে যে), মোক্তার (মুক্তিয়ার), মোক্তারী, মোক্ষ্, মোক্ষক, মোক্ষণ, মোক্ষণীয়, মোক্ষদ, মোক্ষদাই, মোক্ষদ্বার, মোক্ষধর্ম্ম, মোক্ষধাম, মোক্ষপদ, মোক্ষপরায়ণ, মোক্ষমার্গ, মোক্ষশাস্ত্র, মোক্ষসাধন, মোক্ষিত, মোক্ষোন্মুখ, মোচ, মোচক, মোচঙ্গ, মোচড়, মোচড়া, মোচড়ান, মোচন, মোচনপট্টক, মোচনির্য্যাস, মোচনী, মোচনীয়, মোচয়িতা, মোচলেকা (মুচলেকা), মোচা, মোচাঘণ্ট, মোচাট, মোচাথোড়, মোচাফল, মোচিকা, মোচিত, মোচ্য, মোছ, মোছন, মোছা, মোছান, মোতি, মোতিচূর, মোতিম, মোতিয়া, মৌক্তিক, মৌক্তিকগুম্ফিকা, মৌক্তিকদাম, মৌক্তিকপ্রসবা, মৌক্তিকমালা, মৌক্তিকশুক্তি, মৌক্তিকসর, মৌক্তিকহার, মৌক্তিকাবলী, মৌক্য, মৌচ।

মুচ্ (মোক্ষ্) = নবরূপী সীমায়িতের চয়ন। **মুচ** = নবরূপী সীমায়িতের চয়ন যাহাতে। **মোক্ষ** = নবরূপী সীমায়িতের সার্বিক ক্ষ-অন যাহাতে। (সীমায়িতকে আর সীমায়িত না করে ছেড়ে দিয়ে নিজের ধারক অংশটি চয়ন করে নিলে তাকে **মুচ্** করা বলে। কাদার মতো বেসনগোলা হাতে নিয়ে গোল গোল করে তেলে ছাড়ার সময় এই ক্রিয়াটি দেখতে পাওয়া যায়; **মু** বা 'নিগমযোগ্য বেসনগোলা'টি তেলে ছাড়ার সময় দেখা যায় হাত যেন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, চয়ন করে নিচ্ছে — একেই বলে **মুচ্**-করা। একে **মুচন** বা **মোচন** বলা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ত্যাগ-করণ এই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। **মুচ্** তাই বহু দূর ব্যাপ্ত হয়ে **মোক্ষ** পর্যন্ত প্রসারিত।)

অতিমুক্ত (অতিমুক্তক, অতিমুক্তি) : ২. *দ্র. অতি, মুক্ত। /* **অতিমুক্ত** = যে অতিশয় (সম্যক) মুক্ত; যে পুষ্প শুভ্রতায় মুক্তা অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. **অতিমুক্ত** = লব্ধনির্ব্বাণ, আসক্তি-রহিত, নিঃসঙ্গ, নিষ্ফল, বীর্য্যহীন, মুক্তাতিশায়ী, তিনিশবৃক্ষ, মাধবীকুসুম। **অতিমুক্তি** = পরিনির্ব্বাণ। (ব.শ.)। **অতিমুক্ত** = তিন্দুক বৃক্ষ, মাধবীলতার গাছ, তিনিশ বৃক্ষ, মোক্ষপ্রাপ্ত, নির্ব্বাণমুক্তিপ্রাপ্ত, বন্ধ্য, নিঃসঙ্গ। **অতিমুক্তক** = তিনিশ বৃক্ষ, তিন্দুক বৃক্ষ, গাবগাছ, মল্লিনী, পুষ্পবৃক্ষ, অতিমোদ, অতি আনন্দযুক্ত, অতি আনন্দদায়ক। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অতি, মুক্ত, মল্লিকা, মাধবী, মালতী**। ব.শ. 'মাধবী' শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে **অতিমুক্তক** শব্দটির উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, **অতিমুক্তি** বা সর্বোচ্চ **মুক্তি**র সঙ্গে মানুষের **মোক্ষ, নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ** প্রভৃতি শব্দের সরাসরি সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেই **অতিমুক্ত, অতিমুক্তক** প্রভৃতি শব্দ একই সঙ্গে **মাধবী** ও **মালতী**কে কেন বোঝায়, তা জানলে আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীদের উপর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কারণ, ঐ সব গাছের ফুলগুলি, ঐ **মল্লিকা, মাধবী, মালতী** প্রভৃতি ফুলগুলি সর্বপ্রকার গ্লানি থেকে **মুক্ত** — এরা 'শুভ্রতায় **মুক্তা**কে অতিক্রম করিয়াছে', বলেই **অতিমুক্ত** বা **অতিমুক্তক**। এরা এতই সাদা যে, সাদায় সাদায় যদি **মল্ল**যুদ্ধ হয়, তবে এরা সবচেয়ে বেশি সাদা বলে সেই যুদ্ধে জিতবেই। নিম্নে **মুক্ত** দ্রষ্টব্য।

মুকু, মুকুন্দ (মুকুন্দরাম) : ১. **মুকু** = ✓মুচ্ + উ - ভাববাচ্যে। **মুকুন্দ** = মুকু অথবা মুকুম (অব্যয়) + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মুকু** = *মু-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **মুকুন্দ** = *মুকু-র রহস্যরূপ দান করে যে।* ৩. **মুকু** = মুক্তি, মোক্ষ। **মুকুন্দ** = মুক্তিদাতা, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, রোগমুক্তিদাতা, পারদ, কুবেরের নিধিবিশেষ, রত্নভেদ, কুন্দুরু, ঢক্কাবিশেষ। (ব.শ.)। **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী** = ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামবাসী হৃদয়মিশ্রের পুত্র; ইনি চণ্ডীকাব্য নামে অতি সুললিত গ্রন্থ রচনা করেন; এই গ্রন্থরচনা করায় ইনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। (ছা.অ.)। ৪. একালে **মুকুন্দ** নামটি সেকেলে হয়ে গেছে। তথাপি নামরূপে **মুকুন্দ** এখনও কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **কঙ্কণ, কবিকঙ্কণ**। কোনো বস্তু বা বিষয়কে **ম**-করণ করতে করতে (বা সীমায়িত করতে করতে) হঠাৎ সীমায়ন করা বন্ধ করে দিয়ে তার সব বাঁধন খুলে দিলে, তারা উল্টো দিকে দৌড় দেবে; অর্থাৎ **ম** তখন কার্যত নবরূপে উত্তীর্ণ (**মু**) হয়ে যাবে। এই রূপ **মু**-করণ করলে তাকে **মুক** বলা হবে। তখন যদি কেউ তাদের সেদিকেই দৌড়নোর জন্য প্ররোচিত করে, সেই ব্যাপারকে বলে **মুকু**।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভাবুন, **মন**-বাবাজী লাঠি হাতে মাঠের মাঝখানে বসে ছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছাগুলি গরুর মতো এদিক-সেদিক চরে বেড়াচ্ছিল। এর মধ্যে সন্ধ্যে হয় হয় দেখে **মনে**র চেলারা সকল দিক থেকে গরুগুলিকে ঘিরে ধরে কেন্দ্রীভূত করছিল **মন**-বাবাজীর কাছে; কেননা, এবার তাদের একত্র করে গোয়ালে নিয়ে যেতে হবে। এমন সময় **মন**-বাবাজী সেই চেলাদের হুকুম করলেন, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে; ওরা যেদিকে যেতে চায় যাক।' তারা নিরস্ত হল। তখন আবার **মন**-বাবাজীর কী ইচ্ছা হল, হাতের লাঠিটি নিয়ে গরুগুলিকে তাড়া করলেন। ইচ্ছেগরুগুলো যেন এটাই চাইছিল। তারা লেজ তুলে দে-ছুট দিল। অর্থাৎ, ইচ্ছেগরুগুলো নির্মুক্ত-**মুক্তিকামী** হয়ে সম্পূর্ণ **মুক্তি**র দিকে দৌড়ল। এই সমগ্র ক্রিয়াটিকে একত্রে বলে **মুকু**। এটিই তো একপ্রকার **মুক্তি**! এই **মুকু**র অজস্র রূপ হয়। তাদের জটিল রূপগুলিকে বা সমস্ত রূপগুলিকে বলে **মুকু**র রহস্যরূপ বা **মুকুং**। সেই **মুকুং** বা **মুকুন্** দেন যিনি তাঁকে বলা হয় **মুকুন্দ**।

ব.শ. জানিয়েছেন — বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, রোগমুক্তিদাতা, পারদ, কুবেরের নিধিবিশেষ, রত্নভেদ, কুন্দুরু, ঢক্কাবিশেষ — এরা প্রত্যেকেই **মুকুন্দ** বা 'মুক্তিদাতা'। **বিষ্ণু** কেন **মুকুন্দ** সেকথা **বিষ্ণু** শব্দের অর্থ থেকেই বোঝা যেতে পারে। আর 'শ্রীকৃষ্ণ' কেন **মুকুন্দ**, তার ধরতাই পাওয়া যাবে **গৌরী** শব্দে। 'সংসাররোগ' থেকে শুরু করে বাহ্যিক **আধিব্যাধি** পর্যন্ত সকল রোগ থেকে যিনি **মুক্তি** দেন, তিনি তো **মুকুন্দ** পদবাচ্য হবেনই। আগের কালে বিশ্বাস ছিল, 'পারদ' ধাতুটি মানুষের নানা রোগের নিরসন ঘটায়, হয়তো সেকারণেই তাকেও **মুকুন্দ** বলা হত। আর **কুবের**-এর যে **নিধি**র নাম **মুকুন্দ**, তিনি নিশ্চয় বিপদ-আপদের সময় ঋণ দিতেন, বিনিয়োগের জন্য পুঁজি সরবরাহ করতেন, নইলে তাঁকে **মুকুন্দ** বা মুক্তিদাতা বলা হবে কেন! রইল বাকি 'রত্নভেদ', 'কুন্দুরু' ও 'ঢক্কাবিশেষ'। এদের কেন যে **মুকুন্দ** বলা হত, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। ...

এখন বোঝা যাচ্ছে, আজ থেকে ৪০০ বছর আগে বর্দ্ধমানের হৃদয়মিশ্র কীরূপ বাংলাভাষা বুঝতেন এবং কেন তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন **মুকুন্দরাম**! আমরা কি তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী থাকতে পেরেছি?

মুকুর : ২. **মুকুর** = **মুকু** *(**মুক্তিকামী**, উপরে **মুকু** দ্রষ্টব্য) রহে যাহাতে।* ৩. দর্পণ, আরশি, কোরক, কুঁড়ি, বকুলবৃক্ষ, কুমারের চাক-ঘুরান লাঠি, কুলালদণ্ড, মল্লিকালতা, কোলিবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. রামবাবু একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু একটু ডানদিকে সরে, এমনভাবে যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন না; কিন্তু শ্যামবাবুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন, যে শ্যামবাবু দাঁড়িয়েছেন রামবাবুর খানিকটা বাঁদিকে। ফলে রামবাবু আয়নায় শ্যামবাবুকে দেখতে পাচ্ছেন, আর শ্যামবাবু দেখতে পাচ্ছেন রামবাবুকে। এমন হচ্ছে কীভাবে? আধুনিক বিজ্ঞানের আধুনিক বুদ্ধি এর কারণ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন সেটি নয়। প্রশ্ন হল, রামবাবু ও শ্যামবাবু পরস্পরকে আয়নার ভিতরে যে দেখছেন, সেই দেখার ক্ষেত্রে আয়নার ভূমিকা কী? সেকালের শব্দবিদের বিচারে, আয়নাটি রামবাবু-শ্যামবাবুকে তাঁদের নিজ নিজ অস্তিত্ব থেকে **মুক্ত** হয়ে আয়নার ভিতরে ঢুকে পড়তে সহায়তা করেছে, এবং সেজন্যই রামবাবু আয়নার ভিতরে শ্যামবাবুকে দেখছেন, আর শ্যামবাবু দেখছেন রামবাবুকে। চাইলে তাঁরা নিজেরাও নিজেদেরকে আয়নার ভিতরে দেখতে পারেন।

এর কারণ কী? এর কারণ হল, আয়নাটি তার এখতিয়ারের এলাকার মধ্যে যেই আসুক না কেন, তাকেই তার অস্তিত্ব থেকে

মুক্ত হয়ে আয়নার নিজের ভিতরে ঢুকে পড়তে দেয়। কেননা, সর্বপ্রকার বাহ্যিক অস্তিত্বের **মুকু**কে ঐ আয়না তার ভিতরে রক্ষা করতে পারে; **মুকু** বা নির্মুক্ত-**মুক্তি**কামী মাত্রেই তার ভেতরে আশ্রয় পেতে পারে, **রইতে** পারে। তাই তার নাম **মুকুর**।

মুকুল (মুকুলিকা, মুকুলিত, মুকুলিতাক্ষ) : ১. ✓মুচ্‌ + উল - কর্তৃবাচ্যে। **২.** ***মুকুল*** *=* ***মুকু*** *(নির্মুক্ত-মুক্তিকামী) লালিত যাহাতে।* ***মুকুলিকা*** *=* ***মুকুল****-কে গতিশীল করে যে আধারশক্তি।* ***মুকুলিত*** *=* ***মুকুল*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***মুকুলিতাক্ষ*** *=* ***মুকুলিত*** *অক্ষি যাহার। /* **মুকুলিকা** = যাহার সম্বন্ধে চক্ষুর মুকুলভাব আছে; শিশুকে ঘুম পাড়ানর নিদ্রাকর্ষক গুনগুন সুর (থাকে যাহাতে)। **মুকুলিতাক্ষ** = মুকুলিত অক্ষি যাহার। (ব.শ.)। **৩. মুকুল** = বিকাসোন্মুখ কলিকা, কুঁড়ি, মুকুলাকৃতি বস্তুমাত্র, দেহ, আত্মা, মুকুলাকৃতি স্তন। **মুকুলিকা** = মুকুলাকার কর্ণভূষণ, মুকুলসদৃশ বিকাসোন্মুখী। **মুকুলিত** = সঞ্জাতমুকুল, কোরকিত, নিমীলিত, মুকুলাবস্থাগত, বিকাসোন্মুখ, মুকুলাকৃতিস্তনবিশিষ্ট; মুক্ত, এলো। **মুকুলিতাক্ষ** = নিমীলিতনেত্র। (ব.শ.)। **৪.** 'কুঁড়ি' অর্থে **মুকুল** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** জীবের একপ্রকার **মুক্তি** ঘটে তার সন্তানে, উদ্ভিদের তার ফলে, ফুলে। সেই **ফুল**-এর সূচনা ঘটে **মুকুল**-এ। উদ্ভিদের নির্মুক্ত-মুক্তিকামনা তার **মুকুল**রূপে প্রসূত হয়। তবে বাংলাভাষী **মুকুল** শব্দটিকে শুধুমাত্র গাছের **মুকুল**-এর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেননি। যা কিছুর ভিতরে মুক্তিকামনার শুভ-কোমল-ক্ষুদ্রাকার-প্রাথমিক সূচনা থাকে, তাকেই **মুকুল** রূপে চিহ্নিত করতেন আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানী মানুষেরা। তাই ব.শ. জানাচ্ছেন, 'চোখ ফোটা'ও **মুকুলিত** হওয়া, 'গুনগুন সুরের আওয়াজ ফোটা'ও **মুকুলিত** হওয়া; এমনকি 'দেহ' বা 'আত্মা'ও একধরনের **মুকুল**।

তা হোক, কিন্তু তাই বলে **মুকুলিত** হওয়া ও 'নিমীলিত' হওয়া এক ব্যাপার নয়; বরং উলটো। গাঁয়ের ছেলে ছ'মাস মাড়োয়ারীর গদিতে চাকরি করলে টাকাপয়সার বিষয়ে তার 'চোখ ফুটে' যায়, চক্ষু **মুকুলিত** হয়, চক্ষু 'নিমীলিত' হয় না।

মুক্ত (মুক্তক, মুক্তা, মুক্তি) : ১. ✓মুচ্‌ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মুক্ত*** *=* ***মুচ*** *(নবরূপী সীমায়িতের চয়ন) তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, খোলস বন্ধন ইত্যাদি যাকে ত্যাগ করেছে, কিংবা, বন্ধনাদি ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে যে।* ***মুক্তক*** *= যাহাকে* ***মুক্ত*** *করা হইয়াছে।* ***মুক্তা*** *=* ***মুক্ত****-এর আধার যে; অথবা, আপন অশুক্র-ময়লাসমূহ ত্যাগ করিয়াছে যে।* ***মুক্তি*** *=* ***মুক্ত*** *সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে। /* **মুক্তা** = যাহা শুক্তি কর্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে। (ব.শ.)। **৩. মুক্ত** = ত্যক্ত, বিরহিত, শিথিলিত, অনিয়ন্ত্রিত, বিক্ষিপ্ত, প্রেরিত, নিরাকৃত, পরিত্রাত, অপাবৃত, নির্বৃষ্টি, নিঃসারিত, দত্ত, বন্ধনরহিতীভূত, মুক্তিপ্রাপ্ত, বহির্ভূত, স্রস্ত, অপ্রতিবন্ধ, স্খলিত, মোক্ষপ্রাপ্ত, অস্থিত, বেধরহিত, পরিস্কৃত, সংসারবন্ধনরহিত নিরাসঙ্গ নিরীহ পুরুষ। **মুক্তক** = ক্ষেপণীয় অস্ত্র, শরাদি, অর্থগ্রহণার্থ পদ্যান্তর নিরপেক্ষ একমাত্র শ্লোক। **মুক্তা** = রত্নবিশেষ, মৌক্তিক, মোতি, পুংশ্চলী, রাস্না। **মুক্তি** = মোচন, মোক্ষণ, ত্যাগ, বিসর্গ, বিরহিতীভাব, নিপাতন, বন্ধন-রাহিত্য, নির্ব্বাণ, উদ্ধার, সংসারবন্ধন-রাহিত্য, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। (ব.শ.)। **৪.** free অর্থে **মুক্ত,** pearl অর্থে **মুক্তা** ও freedom অর্থে **মুক্তি** প্রচলিত; **মুক্তক** অপ্রচলিত। **৫.** এতদিন আমরা ভাবতাম, **মুক্ত** মানে free। কিন্তু শব্দটির নিহিতার্থ, দেখা যাচ্ছে, অন্য কথা বলছে। সে জানাচ্ছে, যাকে **মোচন** করা হয়েছে, সে-ই **মুক্ত**। হ্যাঁ, তার ফলে **মুক্ত** যে, সে তার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং সেকারণে তাকে 'স্ব-অধীন' বা 'স্বাধীন' (বা free) বলা যায় বটে, কিন্তু সে হল **মুক্ত** শব্দের লক্ষণা-**অর্থ**, অভিধা-**অর্থ** বা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক নিহিতার্থ নয়।

আগের কালে **মুক্ত** শব্দের অর্থ 'স্বাধীন' — এরকম কেউই বুঝতেন না। কেনই-বা বুঝবেন! মূল নিয়েই যেখানে টানাটানি চলছে, সেখানে সুদের কথা ভেবে কী লাভ! যে কারণে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে যত কথা সবই **মুক্তি**কে নিয়ে; স্বাধীনতার কথা এসেছে আধুনিক বাংলায়, এসেছে ইংরেজের সংস্পর্শে। ইংরেজের দেখাদেখি আমরাও গরু ছেড়ে গরুর লেজের চুল নিয়ে নাচানাচি করেছি, করছি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাংলাভাষীর এই বোকামিটা স্পষ্ট বুঝেছিলেন এবং তাঁর নানা রচনায় এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় বহু কথা বলে গেছেন। কিন্তু তাতে কী! আমাদের আধুনিক বাংলার **অভিভাবকেরা** তো কার্যত রবীন্দ্রবিরোধী, মুখে তাঁরা যতই 'কবিগুরু' 'কবিগুরু' করুন!

তা সে যাই হোক, এখন আমরা দেখছি, **মুক্ত** মানে হল — খোলস, বন্ধন, ঘেরাটোপ, আবরণ ইত্যাদি যাকে ত্যাগ করেছে, কিংবা যে এসব ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে, সে-ই **মুক্ত**। কেননা, **মুচ্‌** বা 'মোচন' ক্রিয়াটি তারিত হয়েছে যে সত্তায়, সেই হল **মুক্ত**; তা সে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসুক কিংবা মোচনকারীই তাকে মোচন করে দিক। সেই বিচারে **মুক্তা** হল সেই সত্তা, শুক্তি যাকে ত্যাগ করে বাইরে বের করে দিয়েছে, কিংবা যে নিজে তার থেকে বেরিয়ে এসেছে। একই কারণে **পুংশ্চলী** নারীও **মুক্তা** পদবাচ্যা, কারণ সে কোনো পুরুষের বা পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ নয়; সামাজিক বন্ধন থেকে সে **মুক্ত**। অতএব **মুক্তি** কথাটির মানে দাঁড়ায় কোনো না কোনো খোলস, আবরণ, বন্ধন, কারাগার ... ইত্যাদি ত্যাগ করে তার থেকে বেরিয়ে আসা। এরই সর্বোচ্চ রূপ হল সর্ব-অস্বচ্ছতা থেকে সম্পূর্ণ শুক্লতায় উত্তীর্ণ হওয়া, যাকে বলা হয় 'পরিনির্ব্বাণ'।

এইসব কথাবার্তার আরও একটি বিপরীত দিক স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তা হল, কোনো না কোনো প্রকারের বন্ধন না থাকলে **মুক্তি, মুক্ত, মুক্তা, মোক্ষ** কিছুই সম্ভব নয়। বন্ধন থাকলে তবেই **মুক্তি** ... ইত্যাদি হয়, অন্যথায় কথাগুলি অর্থহীন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'সম্বন্ধেই বন্ধন, সম্বন্ধেই **মুক্তি**'। কিন্তু কথাটির মানে কেউ বুঝেছেন বলে তো মনে হয় না। আমরা দেখছি, আসলে সামাজিক মানুষ মাত্রেই অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে কর্ম-সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন; অন্যথায় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। সেই কর্মবন্ধন তাতে আবদ্ধ মানুষকে বদ্ধ রাখতে পারে, **মুক্তি**ও দিতে পারে। বদ্ধ রাখতে পারে যদি সেই পারস্পরিক বন্ধন 'নিপীড়ক-নিপীড়িতের বন্ধন', 'শোষক-শোষিতের বন্ধন', কিংবা 'শাসক-শাসিতের বন্ধন' — এই তিন রকম বন্ধনের কোনো একটি বা

একাধিক বন্ধন হয়। আর, **মুক্তি**র দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি এই বন্ধন 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধন' হয়। (দ্র. **বন্ধু**)। একালের অধিকাংশ বন্ধনই উপরোক্ত তিন প্রকারের বন্ধনের মধ্যে পড়ে, তা সে পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্য, মালিক-কর্মচারী, ডিরেক্টর-এমপ্লয়ি, নেতা-ক্যাডার ... ইত্যাদি যাই হোক না কেন। কেবলমাত্র প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা (সেরকম স্বামী-স্ত্রীও হতে পারেন) এবং কিছু কিছু **বন্ধু**ত্বকে আমরা এই 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধনে আবদ্ধ' দেখতে পাই। তাঁদের কর্মবন্ধনই তাঁদেরকে **মুক্তি**র আলোর দিকে চালিত করে। সেকারণেই ভারতীয় মননে **প্রেম**-ভাবনার এত কদর! এই **প্রেম**ই মানুষকে **মোক্ষ** লাভের পথে নিয়ে যেতে পারে।

স্বভাবতই **মুক্ত, মুক্তি** নিয়ে বাংলাভাষায় বহু শব্দ তৈরি হয়েছে। সেগুলির কয়েকটিকে নিম্নে মন্তব্যসহ উপস্থাপন করা হল।

মুক্তকচ্ছ : ২. **মুক্ত** *কচ্ছ যাহার (দ্র.* ***কচ্ছ****)।* ৩. বৌদ্ধ, কাছাখোলা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কী ছিল আর কী হয়েছে! আগে লোকের যেমন মানসিক **কচ্ছ** ছিল, তেমনি দৈহিক **কচ্ছ**ও ছিল; বাংলাভাষী তখন ধুতি পরতেন, তাতে **কচ্ছ** বা কাছা থাকত। বৌদ্ধ বা লুঙ্গিপরা মুসলমানদের মতো তাঁরা **মুক্তকচ্ছ** ছিলেন না। অত্যন্ত লোভাতুর হয়ে কোনো কিছুর পিছনে বাংলাভাষী তার মানসিক কাছা বা দৈহিক কাছা খুলে দৌড়তে পারতেন। এখন মানুষ টাকার পিছনে মানসিক কাছা খুলে দৌড়ায়, কিন্তু দৈহিক কাছা খুলে দৌড়য় না; কেননা, দৈহিক কাছাই তো নেই; লোকে এখন প্যান্ট পরে। তার এখনকার দৌড়কে বড়জোর প্যান্ট-খুলে দৌড়নো বলা যেতে পারে; তবে কিনা, সে অর্থটি মানসিক কাছা খোলার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

মুক্তকর, মুক্তহস্ত : ২. *কর বা হস্ত* **মুক্ত** *যাহার।* ৩. দানে অবাধহস্ত, দানশীল, দাতা। (ব.শ.)। ৪. **মুক্তকর** অপ্রচলিত, তবে **মুক্তহস্ত** কমবেশি প্রচলিত। বিশেষত 'বন্যাত্রাণে **মুক্তহস্তে** দান করুন' বাক্যটি রাজনীতিক্ষেত্রে বহু উচ্চারিত বাক্য। ৫. এখানেও ব্যাপারটি মানসিক, '**মুক্তকরে** বা **মুক্তহস্তে** দান করা' মানে এই নয় যে, যাঁরা তা করবেন, তাঁদের হাত বাঁধা আছে; কিন্তু মনে বাধা আছে, মনটা বাঁধা আছে। তাই বলা হচ্ছে, মনের সেই বাধা সরিয়ে, মনের বাঁধন খুলে দিয়ে '**মুক্ত**মনে দান করুন'। সাদৃশ্যে সেই কথাটিই '**মুক্তহস্তে** দান করুন' রূপে বলা হয়ে থাকে।

মুক্তকেশা, মুক্তবেণী = ২. *যিনি* **মুক্ত** ***কেশ*** *বা* ***বেণী****-র অধিকারিণী।* ৩. **মুক্তকেশী** = (অবদ্ধকেশী), কালী। **মুক্তবেণী** = বিযুক্ত নদীস্রোত বা স্রোতোস্বিনী, অবদ্ধবেণী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কেশ, বেণী, বণীমাধব**। যাঁদের সম্পদের মালিকানা ঠিকঠাক গোছানো **বেণী**বদ্ধ নয়, তেমন সম্পদবানদের বলা হয় **মুক্তকেশী**। আর, সন্দেহ নেই যে, সমগ্র শ্রমিক-মজুর-শ্রেণীর সম্পদের (দেহসম্পদ বা শ্রমসম্পদও সম্পদই বটে) মালিকানা একেবারেই আলুলায়িত থাকে; অর্থাৎ নিজেদের **কেশ**-এর ব্যাপারে তাঁরা স্বভাবতই 'আলুলায়িত-কুন্তলা' বা 'এলোকেশী'। **কালী**র মধ্যে শ্রমিক-মজুর শ্রেণী নিজেদের সত্তাকে **মূর্ত্ত** রূপে দেখে, তাই **কালী মূর্ত্তি** সব সময় **মুক্তকেশী** বা **এলোকেশী**।

মুক্তিক্ষেত্র ২. *যে ক্ষেত্র* **মুক্তি** *প্রদান করে।* ৩. মুক্তিতীর্থ কাশী। (ব.শ.)। ৪. ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে 'কাশীধাম' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বারাণসী**।

মুক্তিমণ্ডপ : ২. *যে* ***মণ্ডপ****-এ মুক্তি পাওয়া যায়।* ৩. বিশ্বেশ্বর ও জগন্নাথের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ, চরিত্রনাশক অপকৃষ্টস্থান, গুলি মদ ইত্যাদির আড্ডা, বেশ্যালয়। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দেহবাদিতায় ক্রমশ ডুবে গেছি বলে আমরা বাংলাভাষীরাও আজকাল **মুক্তি**র ও **মুক্তিমণ্ডপ**-এর মানসিক অর্থ ভুলেছি; মনে রেখেছি তার দৈহিক অর্থটুকু। আর, দেহের কথাই যদি হয়, তবে যেখানে গাঁজা গুলি মদ ইত্যাদি **মণ্ড** পালিত হয় সেই **মণ্ডপে** যখন দৈহিক **মুক্তি** মেলে, তখন সেগুলিকে **মুক্তিমণ্ডপ** বলতে কোনো অসুবিধা নেই। একই কথা বেশ্যালয়ের ক্ষেত্রেও খাটে। সেকারণে তাকেও **মুক্তিমণ্ডপ** বলা হত। সেকথাই জানিয়ে গেছেন ব.শব্দকোষ। আর সেকথাই যদি বলেন, তবে আজকের বিশ্বের অভিভাবকেরা আমাদের যে 'স্বর্গলোক'-এর দিকে নিয়ে চলেছেন, সে তো পুরোপুরি দৈহিক **মুক্তি**র **মণ্ডপই** বা **মুক্তিমণ্ডপই** বটে! তবে কিনা, আগুনে ঘি ঢাললে আগুন নেভে না বলেই এতকাল আমরা জেনে এসেছি। তা, একালের বিশ্বায়নগুরুরা যদি আগুনে ঘি ঢেলে আগুন নেভাতে পারেন, সে একটা বৈপ্লবিক কাজ হবে সন্দেহ নাই!

মোক্ষ (মোক্ষক, মোক্ষণ, মোক্ষদ) : ১. ✓মোক্ষ্‌ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মোক্ষ*** *= নবরূপী সীমায়িতের সার্ব্বিক ক্ষ-অন যাহাতে।* ***মোক্ষক*** *=* ***মোক্ষ*** *কৃত যাহাতে।* ***মোক্ষণ*** *=* ***মোক্ষ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মোক্ষদ*** *=* ***মোক্ষ*** *দান করে যে।* ৩. **মোক্ষ** = মোচন, মুক্তি, বন্ধনমুক্তি, অপনয়ন, নিরাস, অভাবগমন, পাত, কারামুক্তি, নাশ, নিঃসারণ, বিসর্জ্জন, শিথিলীকরণ, মোক্ষণ, ক্ষেপণ, বিসর্গ, বর্জ্জন, মৃতি, গ্রহের উপরাগমোচন, আত্মস্বরূপদর্শন। **মোক্ষক** = মোচক, ক্ষেপক, মোচয়িতা, মোচনকারক, উদ্ধারক, ত্রাতা। **মোক্ষণ** = মোচন, ত্যাগ, বর্জ্জন, ক্ষেপণ, মুক্তি, ত্রাণ, শিথিলীকরণ, নিঃসারণ, বন্ধনমোচন। **মোক্ষদ** = মোক্ষদাতা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মুক্ত, মুক্তি**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মুচক (মুচকা, মুচকি) : ২. **মুচক** = *মোচন করা হইয়াছে যাহাকে; অথবা, যে সত্তাকে (হাসি ইশারা ইত্যাদিকে) একটু একটু করিয়া মোচন করা হয়।* **মুচকা** = **মুচক**-*এর আধার যে।* **মুচকি** = **মুচক** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৩. **মুচক, মুচকা** = স্মিত করা, একটু হাসা (**মুচকি মুচকি** হাসি = অল্প অল্প হাস্য; **মুচকি** হাসি = ঈষৎ হাস্য, স্মিত।)। (ব.শ.)। ৪. **মুচকি** যথার্থে প্রচলিত। **মুচক, মুচকা** অপ্রচলিত। ৫. মধ্যযুগে যে ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দ সৃজিত হয়েছে, এবং এখনও যা যথার্থেই প্রচলিত রয়েছে, তেমনি একটি শব্দ হল এই **মুচকি**। যে হাসি আমরা একটু একটু করে, **মুচ্‌ মুচ্‌** করে **মোচন** করি, তাকেই **মুচকি** হাসি বলে। এটি দৃশ্যলোকের জন্য সৃজিত শব্দ, এবং মধ্যযুগে সৃজিত। এখন পর্যন্ত অদৃশ্যলোকে এই শব্দের ব্যবহার আমাদের চোখে পড়েনি।

মুচকুন্দ (মুচুকুন্দ) : ২. *মুচ করে কুন্দ যে; অর্থাৎ, যাহা হইতে*

কুন্দের মোচন হয়। ৩. পুষ্পবৃক্ষবিশেষ (Plerospermum acerifolium), মুচকুন্দপুষ্প; ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজবিশেষ। (ইঁহার পিতা মান্ধাতা। ইনি দেবগণকে অসুরের উপদ্রব হইতে বহুকাল রক্ষা করেন। প্রসন্ন দেবগণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে, ইনি প্রার্থনা করেন — আমি অত্যন্ত শ্রান্ত, নিদ্রা যাইব; কিন্তু যে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সেই ভস্মীভূত হইবে। দেবতারা 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলে ইনি গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত হন। এই সময়ে কালযবন শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণে ঐ গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণবোধে ইঁহাকে পদাঘাত করিলে, ইঁহার সকোপ দৃষ্টিতে কালযবন ভস্মীভূত হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া নারায়ণজ্ঞানে স্তুতিপূর্ব্বক ইনি তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং ভগবানের বরে অনপায়িনী ভক্তি লাভ করেন।)। (ব.শ.)।

… … কালযবনের তাড়নায় কৃষ্ণ পলায়ন ছলে হিমালয়ের যে গুহায় মুচুকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন এবং অলক্ষ্যে তাঁর মাথার দিকে লুক্কায়িত হন। … কালযবন মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ ভেবে পদাঘাত করেন এবং মুচুকুন্দের নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। … (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত, এমনকি **মুচকুন্দ-পুষ্প** কোন ফুলকে বলে আমরা তাও জানি না। ৫. **বিধাতার** বিরোধী সত্তা যে **মান্ধাতা**, তিনি যে অবশ্যই দেবগণের সমর্থক ও সহায়ক হবেন, তাতে আর বিচিত্র কী! সেই **মান্ধাতার** অপত্য হলেন **মুচকুন্দ**। একালের ভাষায় বললে 'স্বাতন্ত্র্যবাদের থেকে জাত **পণ্য**-উৎপাদক'কে বা 'যিনি **পণ্য মোচন** করেন', তাঁকে **মুচকুন্দ** বলে। **মান্ধাতার** থেকে তাঁর জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। — এর পরও লোকে বলবে 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই!' এই ইতিহাস তো বলতে গেলে ইউরোপেরই নেই! তারা দেখাক, তাদের কোন পণ্ডিত কোন ইতিহাসে লিখে রেখেছেন তাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম হয়েছিল কবে কোথায় এবং কীভাবে? দেখাক, তার থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উৎপাদন বা **পণ্য** উৎপাদন কবে কোথায় কারা শুরু করেছিল? সে ইতিহাস যদি তাদের থাকত, তবে মার্কস সাহেবকে অত হা-পিত্যেশ করতে হত না এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে 'আদি-পণ্য-উৎপাদক'কে খুঁজতে বেরোতে হত না। আর যাঁরা মনে করেন, মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা পণ্যবাদিতার কী এমন সম্বন্ধ যে, তার কথা ইতিহাসে লিখে রাখতেই হবে! তাঁদের জানা চাই যে, যে কর্মযজ্ঞ থেকে মানুষের পেট ও মন দুটোই বাঁচে, (সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ) তার থেকেই সভ্যতারও শরীর মন দুটোই বাঁচে। যে ইতিহাসে উৎপাদন-ব্যবস্থার কোনো খবর নেই, সেটি ইতিহাস পদবাচ্যই নয়। আমাদের বেদপুরাণাদিতে সেই কর্মযজ্ঞের সমূহ খবরই রয়েছে। তাই সেগুলিই মানবসভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস। আর, **মান্ধাতা** ও **মুচকুন্দ** তার উজ্জ্বল প্রমাণ, সন্দেহ নেই। …

কিন্তু প্রশ্ন হল, নিদ্রোত্থিত **মুচকুন্দের** দৃষ্টিপাতেই কালযবনের ভস্মীভূত হওয়ার অর্থ কী? না, এই মুহূর্তে এই কাণ্ডের প্রকৃত অর্থ কী, তা আমরা ঠিকঠাক জানি না। উত্তরসূরিরা নিশ্চয় সেই অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন।

মুছ (মুছন, মুছা, মুছান, মুছি মোছ, মোছন, মোছা, মোছান) : ২. **মুছ** = **মু** *(নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়ন) চয়নস্থিত যাহাতে; অর্থাৎ, সীমায়িতের নিঃসারণ (= ধুলো-ময়লাদি) চয়নপূর্ব্বক স্থিত যাহাতে।* **মুছন** = **মুছ** *অন (on) যাহাতে।* **মুছা** = **মুছ**-*এর আধার যে।* **মুছান** = **মুছা** *অন (on) যাহাতে।* **মুছি** = **মুছ** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **মোছ** = *সার্ব্বিক* **মুছ** *যাহাতে।* **মোছন** = *সার্ব্বিক* **মুছন** *যাহাতে।* **মোছা** = *সার্বিক* **মুছা** *যাহাতে।* **মোছান** = *সার্ব্বিক* **মুছান** *যাহাতে।* ৩. **মুছ, মোছ** = বস্ত্রাদির দ্বারা গাত্রাদির জল-ইত্যাদি অপসারণ বা পরিষ্কার করা, মোছা। **মুছন** = মোছা। **মুছা, মোছা** = মোছা। **মুছান, মোছান** = মুছা। **মুছি** = সোনা রূপা ইত্যাদি গলানর মৃৎপাত্রবিশেষ, ছোট শরার মত আসকিয়া পিঠা গড়ার মাটির ঢাকনি, কচি নারিকেল। **মোছন** = মুছা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ক্রিয়াটি দুরকম। কলাগাছ যখন তার ফুল প্রসব করে বা **মোচন** করে, সেই ফুলটি হল **মোচা**। আর, বিপরীত দিক থেকে কেউ যখন সেই **মোচাকে** ভিজা গামছা দিয়ে তার উপরের ধুলো-ময়লা **মোচন** করে নেয়, তাকে বলে **মোছা**। তবে সেটি যে কেবল **ঐ মোচার** উপরের ধুলো-ময়লাকেই **মোচন** করে নেওয়াই হবে তা নয়, মেঝেও হতে পারে, গায়ের জল বা ময়লাও হতে পারে। তার মানে, **মুচন** বা **মোচন** করা হয় **মোচকের** তরফ থেকে; কিন্তু **মুছন** বা **মোছন** করা হয় তার বিপরীত দিক থেকে।

তাছাড়া, এই শব্দগুলির একটি সমস্যার দিক রয়েছে এবং গৌরবের দিকও রয়েছে। সমস্যার দিকটি হল — এই শব্দগুলি এখনও সৃজনের পর্যায়ে রয়েছে, যে কারণে এদের বানান নানা রকমের হয়ে থাকে, এবং অর্থও খুব সুনির্দিষ্ট হয়নি; এসব শব্দের সংস্কারসাধনও হয়নি। অনেক সময় একই অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বানানের শব্দ ধারণ করে থাকে। যেমন কিনা, **মু** ও **মো**-এর মধ্যেকার ফারাক খুব একটা সুস্পষ্ট নয়, এখনও। আর, গৌরবের দিকটি হল — বাংলাভাষী এখনও যে সকল স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন, এগুলি তাদেরই দলে।

মোক্তব্য (মোক্তা, মোক্তার, মোক্তারী — মুক্তিয়ার) : ১. ✓মুচ্ + তব্য - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মোক্তব্য** = *যাহাকে মোচন করা বা ত্যাগ করা উচিত বা করা হইবে।* **মোক্তা** = **মুক্ত** *করায় যে।* **মোক্তার** = **মোক্তা** *রহে যাহাতে।* **মোক্তারী** = **মোক্তার**-*এর সক্রিয় আধার যে।* **মুক্তিয়ার** = **মুক্তি**-*রূপ যাত্রার আধার রহে যাহাতে; অর্থাৎ যে* **মুক্তির** *ব্যবস্থা করিয়া দেয়।* ৩. **মোক্তব্য** = ত্যক্তব্য, মোক্ষণীয়, লক্ষ্যে ত্যক্তব্য, ক্ষেপণীয়। **মোক্তা** = ত্যক্তা, মোচনকারী, শোধয়িতা। **মোক্তার** = মুক্তিয়ার। **মোক্তারী** = মোক্তারের কাজ বা পেশা। **মুক্তিয়ার (মোক্তার)** = ফৌজদারী আদালতের উকীলবিশেষ, আদালতে মোকদ্দমা ইত্যাদির তদ্বিরের নিমিত্ত জমিদারের প্রতিনিধি-কর্ম্মচারী। (ব.শ.)। ৪. **মুক্তিয়ার** অপ্রচলিত; বাকি শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। ৫. বলা হয়ে থাকে যে, **মোক্তার** প্রভৃতি শব্দগুলি আরবি ভাষা থেকে এসেছে। আমরা কিন্তু দেখছি, বাংলার **মোক্তা, মোক্তব্য** প্রভৃতি শব্দগুলি জাত হয়েছে **মুচ্** ক্রিয়া পরিবারেই। এবং সেকথাটি আধুনিক বাংলার সূচনা পর্বের বাংলাভাষীরাও জানতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা লিখছেন, '**মুক্তিয়ারকে** লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হলে কেউ বাইরে যেতে না

পারে।' ব.শ. সেকথা উল্লেখ করে **মুক্তিয়ার** ও **মোক্তার** যে আসলে একই শব্দ তা জানিয়েছেন দুটি শব্দকে একত্রে ভুক্তি দিয়ে। মোট কথা, যাকে আটক করা হয়েছে, তাকে **মুক্তি**র ব্যবস্থা করে দেয় যে, সেই হল **মোক্তা**। সেই **মোক্তা** ক্রিয়াটি রহে যার আচরণে, তাঁকে বলা হয় **মোক্তার**।

মোচ (মোচক, মোচড়, মোচড়া, মোচড়ান, মোচন, মোচনির্য্যাস, মোচনী, মোচনীয়, মোচয়িতা, মোচা, মোচাঘণ্ট, মোচাট, মোচাফল, মোচিত, মোচ্য) : ১. ✓মুচ্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মোচ*** *= সার্ব্বিক* ***মুচ*** *যাহাতে। (দ্র.* ***মুচ্****)।* ***মোচক*** *=* ***মোচ*** *করে যে।* ***মোচড়*** *=* ***মোচ****-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ***মোচড়া*** *=* ***মোচড়****-এর আধার যে।* ***মোচড়ান*** *=* ***মোচড়া*** *অন (on) যাহাতে।* ***মোচন*** *=* ***মোচ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মোচনী*** *=* ***মোচন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মোচা*** *=* ***মোচ****-এর আধার যে।* ***মোচাট*** *=* ***মোচা****-র টঙ্কার যাহাতে।* ***মোচ্য*** *=* ***মোচ*** *থাকে যাহাতে। /* **মোচ** = ত্বক মোচন করে যে। **মোচ্য** = যাহা ছাড়া উচিত। (ব.শ.)। **৩. মোচ** = কদলী, কলাগাছ, শোভাঞ্জনবৃক্ষ, কদলীফল, শাল্মলী, নীলী। **মোচক** = মোচনকারক, ত্যাগী, ত্রাতা, কদলী, শোভাঞ্জন, বিরাগী, মোক্ষ। **মোচড়, মোচড়া (মুচড়)** = মুটিত করা, মোড়া দিয়া ভাঙা, ঘৃষ্ট করা, মর্দ্দন করা, পাক দেওয়া। **মোচড়ান** = মোটন, মোড়া। **মোচন** = মোচন, ত্রাতা, হারক, নাশন, পাতয়িতা, গর্ব্বনাশন, উদ্ধার, ত্রাণ, নিঃসারণ, ত্যাগ, বন্ধনমুক্তি, দম্ভ, শাঠ্যকরণ, শোধন। **মোচনির্য্যাস** = শাল্মলীরস, শিমূলের আঠা। **মোচনী** = কণ্টকারী। **মোচনীয়** = ত্যক্তব্য। **মোচয়িতা** = মোক্ষক, বন্ধনমুক্তিকারক, উদ্ধারক। **মোচা** = কলার পুষ্পকোষ। **মোচাঘণ্ট** = মোচার ব্যঞ্জনবিশেষ। **মোচাট** = কদলীর অস্থি, থোড়। **মোচাফল** = কলা। **মোচিত** = কৃতমোচন, উদ্ধৃত, ত্যক্ত। **মোচ্য** = অবশ্যমোচনীয়, ত্যাজ্য, মোচনীয়। (ব.শ.)। **৪.** এগুলির অধিকাংশ শব্দই কমবেশি প্রচলিত। **৫.** ব.শ. কলাগাছকে **মোচ** বা 'ত্বগ্‌মোচক' বলে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হল, কলাগাছ তার গায়ের ত্বক ত্যাগ করে থাকে। গ্রামবাংলার মানুষেরা কলার সেই নির্মুক্ত ও ক্রমে শুকিয়ে যাওয়া ত্বক বা ছাল জমা করে জ্বালানীর জন্য নিয়ে আসেন এবং তার পুড়ে যাওয়া ছাই দিয়ে, বছর চল্লিশ আগেও, জামাকাপড় ধুতেন। কারণ ঐ ছাল উচ্চশ্রেণীর ক্ষার-পদার্থ। কলাগাছ তাকে **মোচন** করে দেয় বলেই তার নাম **মোচ**। ...

উপরোক্ত শব্দগুলি সবই এই **মোচ** থেকে জাত হয়েছে এবং স্বভাবতই তাদের ভিতরে **মুচ্** বা **মোচন**-করার কোনো না কোনো বিশেষ বিশেষ রূপ ধৃত হয়ে রয়েছে; তাদের সকলের স্বভাব-চরিত্রের কথা আমরা জানি বা নাই জানি। ফলে, এদের কারও কারও ভিতরে যেমন **মুক্তি**র কথাও এসে গেছে, তেমনি এসে গেছে **মোচড়** ইত্যাদির কথাও। তবে **মোচড়**-এর বেলায় **মোচন** ক্রিয়াটি পাক দিয়ে **মুচড়ে** মোচন করিয়ে নেয়। লোকে বলে, 'পেটে **মোচড়** দিয়ে পায়খানা হচ্ছে।'

মুণ্ড্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : মউড় (মোড়, মৌড়), মুড়, মুড়কি (মুড়কী), মুড়ন, মুড়মুড়, মুড়লা, মুড়লী, মুড়া, মুড়াপেট (মুড়োপেট), মুড়ামাখন (মুড়োমাখন), মুড়ামুড়ি (মুড়োমুড়ি), মুড়াসা, মুড়ি, মুড়িআনি, মুড়িআলা, মুড়িআলী, মুড়িওয়ালী, মুড়িবেচুনী, মুড়িমালা, মুড়ো, মু(মু)ঢ়া, মুণ্ড্, মুণ্ড, মুণ্ডক, মুণ্ডচণক, মুণ্ডধান্য, মুণ্ডন, মুণ্ডপাত, মুণ্ডমণ্ডলী, মুণ্ডমালা, মুণ্ডশালী, মুণ্ডলৌহ, মুণ্ডা, মুণ্ডায়স, মুণ্ডি, মুণ্ডিত, মুণ্ডী, মুণ্ডু, মোড়, মোড়ক, মোড়ল, মোড়লী, মোড়া, মোড়াই, মোড়ামুড়ি, মোড়াসা, মোড়োক, মোণ, মোরামোরী, মোরি, মৌড়।

মুণ্ড্ = নবরূপী সীমায়িতের রহস্যরূপের গড়ান-উড়ান। **মুণ্ড** = নবরূপী সীমায়িতের রহস্যরূপের গড়ান-উড়ান যাহাতে।

মুড় (মুড়ন, মুড়া): ১. মুণ্ড > মুড়। **২.** **মুড়** = *নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িতের গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ***মুড়ন*** *=* ***মুড়*** *অন (on) যাহাতে।* ***মুড়া*** *=* ***মুড়****-এর আধার যে। /* **মুড়া** = যে ঝাঁটার আগা ক্ষয়প্রাপ্ত। (ব.শ.)। **৩. মুড়, মুড়া** = মস্তক, মাথা, মাছের মাথা, কন্দ, গেঁড়, নৌকার অগ্রভাগ, নৌকার তলা, লাঙলের ইশে সংলগ্ন সচ্ছিদ্র বক্র কাষ্ঠখণ্ড, শিখর, প্রান্ত; চূর্ণ করা, মোটন করা, মোড়া দেওয়া, বক্র করা, প্রত্যাবৃত্ত করা, সঙ্কুচিত করা; আচ্ছাদন বা ঢাকনা করা, ঢাকা দেওয়া, আবৃত করা, বেষ্টিত করা; মুণ্ডিতমস্তক, নেড়া, পত্রহীন, শাখাপত্রহীন, চূড়াপতাকাদিহীন, আঁচলাছেঁড়া (কাপড়), ধারহীন, ভূষণহীন (নারী); আবৃত, ঢাকা; মুণ্ডিত করা, খুর দিয়া কেশহীন করা, শাখাপত্রহীন করা ... ইত্যাদি। **মুড়ন** = কেশহীনীকরণ, মাথায় খুর দেওয়া, বৃক্ষাদির ডালপালা কাটিয়া স্থাণুবৎ করা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মুণ্ড**। **মুণ্ড** শব্দের মধ্যে ছিল '*নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িত রহস্যরূপে উড্ডীন যাহা হইতে*'। বাংলাভাষী তাকে সরল করে নিল '*নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িতের গড়ান-উড়ান যাহাতে*'। ব্যাপারটি এক হলেও **মুণ্ড**-র চেয়ে **মুড়** হয়ে গেল সরল অথচ তুলনায় ব্যাপকার্থক। যতদূর বোঝা যায়, বাংলাভাষী এই কাণ্ড করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল মধ্যযুগে, তখনই সৃজিত হয়েছিল **মুড়, মুড়ন, মুড়া** ... ইত্যাদি শব্দ। এই ক্ষেত্রে আজও সৃজন প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাভাষীর শব্দ-সৃজনশীলতার বহুপ্রজ ক্ষেত্র এই **মুড়** ও তজ্জাত শব্দগুলি। অর্থও তাদের গিয়েছে বিচিত্র পথে, সবর্ত্রগামী না হলেও। আমরা তাদের কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধার করছি।

মুড়কি, মুড়কী : ২. ***মুড়কি*** *=* ***মুড়****-করণ (বিপরীত দিকে মুড়ে দেওয়া) গতিশীল যাহাতে।* ***মুড়কী*** *=* ***মুড়কি****র আধার যে।* **৩.** গুড় বা চিনির রসে মাখান খই। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ব.শ. একটি উদাহরণ দিয়েছেন — 'উড়কী ধানের মুড়কী'; জানিয়েছেন, এটি 'ঘুমপাড়ান গান'। আমরা সবাই তা জানি। এর থেকে বোঝা যায়, কথাটি প্রায় সব বাংলাভাষীর জানা। কিন্তু কোন আক্কেলে সেকালের বাংলাভাষী শিশুকে ঘুমপাড়ানর জন্য এমন একটি বাক্য তৈরি করলেন? কেননা, বাক্যটি তো কম যায় না — 'উড়কী ধানের মুড়কী!' যে ধান উড়ে যাচ্ছে, উদগত হয়ে উপরে চলে যাচ্ছে, তাকে একেবারে উল্টো পথে ঘুরিয়ে বা **মুড়ে** দিয়ে চিনির

রসে মাখিয়ে খাদ্যে পরিণত করা।

মুড়লা : ২. মুড় (= **মুণ্ড্**) *লালিত হয় যে আধারে।* ৩. বরের টোপর, নৌকার মুড়ার (মাথার) সজ্জা মাল্যাদি। (ব.শ.)। ৪. অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মুড়লী : ২. মুড়-*এর গতিশীল আধার যে।* ৩. ঘরের দেয়ালের মাথা। (ব.শ.)। ৪. অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত। ৫. মাটির দেয়াল তৈরি হওয়া শেষ হলে, তার উপরের দিকটি উভয় দিকে খানিকটা গোল করে **মুড়ে** দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'দেয়ালের মুখ-মারা'। এর পরে সেই দেয়াল আর উপর দিকে এগোবে না। সেকারণে তাকে **মুড়লী** বলা হয়ে থাকতে পারে।

মুড়ামাখন : ২. *যে মাখনকে* **মুড়ে** *দেওয়া হয়েছে।* ৩. জল-মরা কাঁচা-খাওয়ার মাখন। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় কমবেশি প্রচলিত। ৫. ঘোল থেকে মাখন তুলে যেখানে রাখা হয়, তাতে যৎসামান্য ঘোল থাকে; কখনোই তাকে একেবারে শুকনো রাখা হয় না। কিন্তু কাঁচা খাওয়ার জন্য তৈরি রাখতে গেলে তার জল ঝরিয়ে দিতে হয়। তখন সেই মাখন অবশ্যই খেয়ে নিতে হয়। অন্যথায় তা খারাপ হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। মাখনের জল শুকিয়ে নিলে মাখনকেও **মুড়ে**-দেওয়া হয়ে যায়; তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক পরিণতি রোধ করে তাকে উল্টোমুখো করে দেওয়া হয়। তাই তাকে **মুড়ামাখন** বলে।

মুড়ামুড়ি (মোড়ামুড়ি) : ২. *মুড়া* ও *মুড়ি।* ৩. এক মুড়া হইতে অন্য মুড়া পর্যন্ত, প্রথমাবধি শেষপর্যন্ত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **কচাকচি**র মতো এটি একটি 'পুরুষ-প্রকৃতিরূপী **যোড়শব্দ**'। অর্থাৎ ধরাধরি, মারামারির মতো এ হল **মুড়ামুড়ি**। এতে কোনো বস্তু বা বিষয়ের কিছু অংশকে সম্পূর্ণ **মুড়ে**, কোনোটিকে-বা খানিকটা **মুড়ে** একত্রে গোছানোকে বলে **মুড়ামুড়ি** করা। সাধারণত মাদুর বিছানা কাপড়চোপড় ... ইত্যাদি বস্তুকে এভাবে **মুড়ামুড়ি** করে রাখা যায়। ...

এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, **মুড়ামুড়ি** ও **মোড়ামুড়ি** একেবারে সমার্থক হয়ে দেখা দেয়। অধিকাংশ 'এখনও নির্মীয়মান' শব্দের ক্ষেত্রে উ-কার এবং ও-কার এইরকম আচরণ করে থাকে। এগুলির স্থির রূপ পেতে আরও হয়তো পঞ্চাশ-একশো বছর লাগবে।

মুড়াসা (মোড়াসা) : ৩. 'মুণ্ডের বেষ্টনবাস', পাগড়ী। (ব.শ.)। ৫. ব.শ. শব্দটির ভুক্তি ঘটিয়েছেন এবং উপরোক্ত অর্থটি দিয়ে গেছেন। এটি সঠিক হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, এতে **মুড়া** বলতে **মুণ্ড্**কে বোঝাচ্ছে, এবং **সা** তার অস্তিত্বের আধার বা ঢাকনাকে বোঝাতেই পারে। কিন্তু আমাদের কানে এরকম শব্দ পড়েনি। কোন অঞ্চলের বাংলাভাষী পাগড়ীকে **মুড়াসা** বলেন আমরা জানি না। তবে নিশ্চয় বলেন। ব.শ. তো 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' থেকে তার উদাহরণ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন।

মুড়ি (মুড়ী) : মুড় + ই। ২. **মুড়ি** = **মুড়** *গতিশীল যাহাতে।* **মুড়ী** = **মুড়ি**র *আধার যে।* ৩. **মুড়ি** = মুণ্ড, মাথা, মাছের মাথা, বস্ত্রাদির প্রান্ত, চেকবহির যে অর্দ্ধাংশ মালিকের কাছে থাকে; আচ্ছাদন, ঢাকনা; হালকা ফাঁপা ভাজা চাল। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মুড়িবেচুনী : ২. **মুড়ি** *বেচে যে মেয়ে।* ৩. মুড়িওয়ালী। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মুণ্ড (মুণ্ডক, মুণ্ডচণক, মুণ্ডধান্য, মুণ্ডন, মুণ্ডপাত, মুণ্ডমালা, মুণ্ডমালিনী, মুণ্ডশালী, মুণ্ডা, মুণ্ডি, মুণ্ডিত, মুণ্ডী, মুণ্ডু — দণ্ডমুণ্ড) : ১. ✓মুণ্ড্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মুণ্ড** = *নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িত রহস্যরূপে উড্ডীন যাহা হইতে; অর্থাৎ, যে সত্তার (মাথাটির)* **কেশ** *উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; কিংবা যে-সত্তাকে (মাথাটিকে) নেড়া করে দেওয়া হয়েছে।* **মুণ্ডক** = **মুণ্ড** *করে যে।* **মুণ্ডচণক** = *যে চণকের* **মুণ্ডন** *করা হয়ে গেছে (তাই তার শূক নাই)।* **মুণ্ডধান্য** = *যে ধান্যের* **মুণ্ডন** *করা হয়ে গেছে (তাই তার শূক নাই)।* **মুণ্ডন** = **মুণ্ড** *অন (on) যাহাতে।* **মুণ্ডপাত** = *যাহাতে* **মুণ্ড**-*এর পতন থাকে।* **মুণ্ডমালা** = **মুণ্ড** *দ্বারা গ্রথিত যে মালা।* **মুণ্ডমালিনী** = **মুণ্ডমালার** *অধিকারিণী যে।* **মুণ্ডা** = **মুণ্ড**-*এর আধার যে।* **মুণ্ডি** = **মুণ্ড** *গতিশীল যাহাতে।* **মুণ্ডিত** = **মুণ্ড** *গতিশীলরূপে তারিত যাহাতে।* **মুণ্ডী** = **মুণ্ডি**র *আধার যে।* **মুণ্ডু** = **মুণ্ড** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **মুণ্ড** = যাহার কেশ রহিত করা হইয়াছে। (ব.শ.)। ৩. **মুণ্ড** = মুণ্ডিত, শাখাপল্লবহীন, ধারহীন, শূকহীন, মুণ্ডিতমস্তক পুরুষ, মুড়া, নেড়া, কেশহীন মস্তক, নেড়ামাথা, ললাট, শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ, রাহু, শুম্ভসেনানী দৈত্যভেদ, জাতিবিশেষ, শিরঃ, মস্তক ... ইত্যাদি। **মুণ্ডক** = অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ, শিরঃ, মুণ্ড। **মুণ্ডচণক** = মুণ্ডাকার চণক, কলায়, মটর। **মুণ্ডধান্য, মুণ্ডশালী** = শূকহীন ধান্য। **মুণ্ডন** = পরিবাপন, কেশচ্ছেদন। **মুণ্ডপাত** = মুণ্ডচ্ছেদন, গালিবিশেষ। **মুণ্ডমালা** = মুণ্ডসমূহের মালা। **মুণ্ডমালিনী** = 'মুণ্ডমালাবতী', কালী। **মুণ্ডা** = পরিব্রাজিকা, বিধবা, মুণ্ডীরিকা বৃক্ষ; নিঃশেষে কেশচ্ছেদন করান, মুড়ান। **মুণ্ডি** = মুণ্ডন। **মুণ্ডিত** = কৃতমুণ্ডন, পরিবাপিত। **মুণ্ডী** = কেশচ্ছেদনবান, মুণ্ড, শৃঙ্গহীন (মৃগ), নাপিত; ছোটমণ্ডা বা সন্দেশ, মুণ্ডীর মতো দ্রব্য। **মুণ্ডু** = মুণ্ড, মাথা, (বিরক্তিতে, ক্রোধে) গালি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মুনি**। একালে **মুণ্ড** শব্দটি শুনলেই আমরা বুঝি head। **মুণ্ড** কাকে বলা হত, কেন বলা হত, সে প্রসঙ্গ জানার জন্য আমাদের মস্তিষ্ক আর পরিশ্রম করতে চায় না। ধরেই নেওয়া হয়, **মুণ্ড** মানেই 'শিরঃ' বা head। ..

কার্যত, সীমায়িত (**ম**) যখন নবরূপে উত্তীর্ণ বা 'নিগম্য-সারমর্ম' হয়, তখনই সে **মু** বটে। কিন্তু সেই **মু** অন করা যেতে পারে দুভাবে — দৃশ্যভাবে, অদৃশ্যভাবে। অদৃশ্যভাবে করলে তাকে বলা হয় **মুন** (moon) করা; যিনি তা করেন, তাঁকে বলা হয় **মুনি**। তিনি কারুশিল্পের নানান ধারার **মনন** ক'রে, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের আলো সিঞ্চন ক'রে তদনুযায়ী কারুপণ্য উৎপাদন করেন বা করান। (দ্র. **মুনিবন**)। আর, দৃশ্যভাবে **মু** অন করলে তাকে **মুণ** বলা যায়। মানবশরীরের ক্ষেত্রে সে হল **কেশ**-গজান এবং মানবমনের বিচারে সে হল 'মালিকানার বোধ' জন্মান। সেই **কেশ**কে উড়িয়ে দিলে, ঘুরিয়ে গড়িয়ে দিলে, কেটে সাফ করে দিলে তাকে বলে **মুণ্ড্** করা। যে সত্তায় তদ্রূপ **মুণ্ড্** করা হয়, তাকে বলা হয় **মুণ্ডিত** বা **মুণ্ড** অর্থাৎ 'নেড়ামাথা' ও 'সম্পদহীন'। ফলত দৃশ্যলোকে মানুষটি নেড়া

হয়ে যায় এবং অদৃশ্যলোকে মানুষটি সর্বপ্রকার সম্পদের মালিকানা-হারা হয়ে যায়। তার মানে, কোনো সত্তার উদগত **মুণ** বা **কেশ**সমূহ, তা সে দৈহিক মানসিক যেমন **কেশই** হোক না কেন, তা-সব কেটে উড়িয়ে দিলে বা **উড্ডীন** ক'রে দিলে, তাকে বলে **মুণ্ড্** করা। স্বভাবতই যার **মুণ্ড্** করা হয়ে গেছে, সেটিকে **মুণ্ড** বলে। এই হল **মুণ্ড** শব্দের প্রকৃত অর্থ।

আমাদের পূর্বসূরিরা অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি। তাঁরা এই **মুণ্ড**কে **মুণ্ডক** থেকে **মুণ্ডু** পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়েছেন। উপরে **২.**-এ তাদের কথা আমরা কমবেশি বলেছি। তাদের মধ্যে **মুণ্ডমালিনী**র কথা দুর্বোধ্য লাগে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি এখানে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তার কারণ হল, এই কোষগ্রন্থে আমরা প্রত্যেক **দেব**-সত্তা ও **দেবী**-সত্তার এবং তাঁদের **বাহন**দের অর্থ উদ্ধার করে সেগুলির প্রকাশ করার কথাই ভেবেছি এবং সাধ্য ও অবকাশ মতো করেছি। কিন্তু কোনো **প্রতিমা**র ব্যাখ্যা করার অবকাশ ছিল না, নেই। কেননা, এক একটি **প্রতিমা**র বিবরণের অর্থ উদ্ধার করে ব্যাখ্যা করতে গেলে, প্রত্যেক দেব বা দেবীর জন্যই অন্ততপক্ষে এক একটি বৃহদাকার নিবন্ধ লাগবে — সর্বাগ্রে আমাদের পূর্বসূরিরা সেই **প্রতিমা**র যে বিবরণ দিয়ে গেছেন এবং যা প্রচলিত আছে, **প্রতিমা** নির্মাণকারী কুমোরেরা যেসব কথা পুরুষানুক্রমে শুনে আসছেন এবং আজও বলে থাকেন, তা সব উল্লেখ করে তারপরই সেগুলির নিহিতার্থ উদ্ধার করে প্রকাশ করা দরকার। আমরা তার কিছু কিছু অর্থও জানি, এবং এও নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, **প্রতিমা**র বিবরণগুলি সেই সেই দেবসত্তা বা দেবীসত্তার ক্ষেত্রে শতকরা একশোভাগ ঠিক। অর্থাৎ, **শিব, নারায়ণ, মহামায়া, কালী** (**মুণ্ডমালিনী**) ... ইত্যাদি যে **বিমূর্ত** সত্তাদের বোঝায়, তাঁদের **মূর্ত** করতে গেলে ঠিক ঐ ঐ ধরনের **প্রতিমাই** তাঁদের যথার্থ রূপ হয়। সুতরাং প্রতিমার ঐ বিবরণগুলি যথাযথ। সেই বিবরণগুলির নিহিতার্থ উদ্ধার করে প্রকাশ করা দরকার। ভবিষ্যতে যখন তা করা হবে, তখন এই শব্দার্থকোষ সে কাজে সহায়তাও করবে। তবুও এখানে আমরা অবকাশের অভাবে সেই কাজে হাত দিতে পারলাম না। ...

মুণ্ডা শব্দের যে অর্থ ব.শ. দিয়ে গেছেন, (উপরে **৩.** দ্র.ষ্টব্য) তার বাইরেও একটি অর্থ প্রচলিত রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল প্রাচীন সম্প্রদায় এখনও রয়েছেন, তাঁদের একটি সম্প্রদায়ের নাম **মুণ্ডা**। আমরা নিশ্চিত যে, ভারত ইতিহাসের কোনো বিশেষ পর্বে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সমস্ত মালিকানার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তাঁরাও তাঁদের সেই স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে বন-পর্বতবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের সংস্কৃতি, নাম, ধাম, ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান চালালে নিশ্চয় সে সবের যথাযথ প্রমাণ হাজির করা যেতে পারবে।

মুণ্ডু শব্দের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি গেছে উল্টে। **মুণ্ড** শব্দের প্রচলিত অর্থ হল head, ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ **'মুণ্ডিত যে সত্তা'** অর্থাৎ 'নেড়ামাথা' বা 'মালিকানা-হারা'; কিন্তু **মুণ্ডু** শব্দের **অর্থ** সেগুলির কোনোটি নয়। **মুণ্ড** নবরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে **মুণ্ডু**-তে। তার মানে, সেটি এমন একটি সত্তা, যা **মুণ্ডিত** হয়েও আর **মুণ্ডিত** নয়, তাতে চুল গজাচ্ছে। তাহলে, **মুণ্ডুই** হল সেই **শব্দ**, যাতে **কেশ** গজায়, মালিকানাবোধ জন্মায়। ফলত **মুণ্ডু** শব্দটি একটু রহস্যময় অর্থ ধারণ করে ফেলে! লোকে বলে, 'মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!' বাংলাভাষী মেয়েদের মুখে কথায় কথায় শোনা যায়, 'তোমার **মুণ্ডু**!' একালের মানুষ মাত্রেই প্রকৃতপক্ষে তার ঘাড়ের উপর এই **মুণ্ডুটিই** ধারণ করে থাকেন। ...

তবে যে মুহূর্তে আপনি **দণ্ডমুণ্ড** ও **চণ্ডমুণ্ড** (নিম্নে দ্রষ্টব্য) শব্দের সম্মুখীন হবেন, তৎক্ষণাৎ **মুণ্ড** শব্দের আরেক চেহারা আপনার সামনে সঙিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। **দণ্ডমুণ্ড**-ধারী প্রথমে আপনাকে 'দাঁড়' করিয়ে দেবে — খবরদার! আর এগোবে না। তাঁর হুকুম। — সে আপনি টাকা কামানোর পথে এগোন, জ্ঞানবুদ্ধি কামানোর পথে এগোন কিংবা অন্য কোনো ধান্দায় এগোন। তারপরে সেই **দণ্ডমুণ্ড**-ধারী কাছে এগিয়ে আসবেন, আপনার মুখটা **মুড়ে** দেবেন, ডানদিকে, বাঁদিকে অথবা একেবারে বিপরীত দিকে। এতক্ষণ যেদিকে এগিয়ে চলেছিলেন, আর সেদিকে যাওয়া হবে না; অন্য কোনোদিকে কিংবা বিপরীত দিকে এগোতে হবে। একেও বলে **মুণ্ডন** করে দেওয়া, **মুড়ে** দেওয়া, **মোড়** ঘুরিয়ে দেওয়া। আর, তিনি যদি **চণ্ড** আর **মুণ্ড** হন তো কথাই নেই। **চণ্ড** নেবে আঁচড়ে, **মুণ্ড** নেবে **মুড়ে**-মুচড়ে — আপনার সর্বস্ব গেল! ... দ্র. **মুড়, চণ্ডমুণ্ড**।

মুণ্ড : ৩. শুম্ভসেনানী দৈত্যভেদ। (ব.শ.)। দানবরাজ শুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই সেনাপতি ছিল। এরা প্রায়ই দুই জন একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করত। ... চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত করে দেবী 'চামুণ্ডা' নাম প্রাপ্ত হন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **চণ্ড, চামুণ্ডা**।

মোড় (মোড়ক, মোড়ল, মোড়লী, মোড়া) : ১. মুড় > মোড়। **২.** *মোড় = যে স্থানে-কালে-পাত্রে **মুড়**-করণ হয়, হইয়াছে, হইয়া থাকে। **মোড়ক** = **মোড়** করে যে বা যাহা দ্বারা **মোড়** করা হয় বা হইয়াছে। **মোড়ল** = **মোড়** লালিত যাহাতে। **মোড়লী** = **মোড়ল**-এর গতিশীল আধার যে। **মোড়া** = **মোড়**-এর আধার যে।* **৩. মোড়** = রাস্তা-প্রভৃতি যেখানে বাঁকিয়া যায়, রাস্তার বাঁক বা সন্ধিস্থল, নদীর বাঁক, কুটিলতা, মোড়া, অঙ্গমোটন, গা-মোড়া; সাপ রাখার চুপড়ি, সর্পকরণ্ড, গাভীর (মুকুটাকার) স্তন বা পালান ... ইত্যাদি। **মোড়ক** = কাগজ-প্রভৃতি দ্বারা মোড়া দিয়া ঢাকা দ্রব্য, ঔষধাদির পুরিয়া বা মোড়া। **মোড়ল** = মণ্ডলের অধিপতি, গ্রামমুখ্য, গ্রামণী, স্বজাতিচক্রের অধ্যক্ষ বা মুখপাত্র, উপাধিবিশেষ, দলপতি, প্রধান। **মোড়লী** = মোড়লের কাজ, কর্তৃত্ব, মোড়লের পদ। **মোড়া** = মোটিত, আবর্ত্তিত, আবেষ্টিত, আবৃত, আচ্ছাদিত, মোটন, আবর্ত্তন, ঢাকা, মর্দ্দন, মলা, পাক, বিঘ্ন, সুতার মোড়া-দেওয়া ফেটী, মোড়া দিয়া বাঁধা বাঁশের শলার বেতে-ছাওয়া আসনবিশেষ, গো-গাড়ীর ধুরার সহিত ছাকড়া বাঁধার মোড়া-দেওয়া মোটা দড়ী, কুশের পাকাইয়া-করা অঙ্গুরীবিশেষ, কাগজে মোড়া ঔষধাদি, বেষ্টনাদি, বেড়। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আগেই আমরা জানিয়েছি যে, বাংলাভাষার যে সকল শব্দের ক্ষেত্রে এখনও সৃজনশীল, এই শব্দগুলি তাদেরই একটি ক্ষেত্র। বাংলাভাষী আজও এই ক্ষেত্রে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন। ফলে শব্দগুলির বানানে এখনও স্থিরতা

আসেনি। আর, প্রয়োগের ক্ষেত্রে চলে একশোভাগ ক্রিয়াভিত্তিকতা। ফলে এই শব্দগুলি স্বভাবতই ব্যাপক অর্থ ধারী। এদের মধ্যে **মণ্ডল** কেমন করে **মোড়ল** বা **মোড়লী**তে পরিণত হল, তা ভাবনার বিষয়। কেননা, তার জন্য তাকে **মুণ্ডল** পেরিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু **মুণ্ডল** শব্দের কোনো প্রয়োগ চোখে পড়ে না। তবে **মণ্ডল**কে সমাজদেহের **মুণ্ড** বলে ধরে নিলে বিষয়টি খুবই সোজা হয়ে যায়। কেননা, বাংলাভাষী তো সমস্ত **ণ্ড** বা 'রহস্যময় গড়ান-উড়ান'কে তার অনায়াস স্বাভাবিকতায় **ড়**-এ পরিণত করে নেন — **দণ্ড** > দাঁড়, **চণ্ডাল** > চাঁড়াল, **কাণ্ড** > কাঁড়, **ভণ্ড** > ভাঁড় ... এসবে সে তো অভ্যস্ত। সুতরাং **মুণ্ড** থেকে **মুড়** হয়ে **মোড়**-এ পৌঁছতে তার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মুদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনুমোদন, অপ্রমোদ, আমুদে, আমোদ, আমোদন, আমোদিত, আমোদী, কুমুদ, কুমুদিনী, কৃষ্ণমুগ, ময়রা, ময়রাণী, ময়রাপটী, মুগ, মুগুর, মুগোরা, মুৎ (মুদ্), মুৎফরাক্কা (মোৎফরেক্কা), মুৎসদ্দি(দ্দী), মুত, মুতা, মৃত, মুদ্, মুদ, মুঁদ (নিমীলন, মীল্), মুদড়ী, মুদমতি, মুদরি, মুদসদন, মুদা, মুদাফৎ, মুদারা, মুদি (মুদী), মুদিখানা, মুদিত, মুদিতা, মুদিতোন্মুখ, মুদির, মুদিরেক্ষণ, মুদিরেক্ষণা, মুদগ, মুদগপর্ণী, মুদগবড়া, মুদগমোদক, মুদগর, মুদগল, মুদগাঙ্কুর, মুদগার্দ্রবট, মুদ্দই, মুদ্দত, মুদ্দতী, মুদ্দা (মোদ্দা), মুদ্দাই, মুদ্রণ, মুদ্রা, মুদ্রাকার, মুদ্রাক্ষর, মুদ্রাঙ্ক, মুদ্রাঙ্কণ, মুদ্রাঙ্কিত, মুদ্রাদোষ, মুদ্রামার্গ, মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রারক্ষক, মুদ্রারাক্ষস, মুদ্রালিপি, মুদ্রাশঙ্খ, মুদ্রাস্থান, মুদ্রি, মুদ্রিকা, মুদ্রিত, মুদ্রিতাক্ষ, মুদ্রিতাক্ষর, মুধা, মুন (আঁখ মুঁদনা), মুনকির, মুনাফা, মুনাদি, মুনাসিব (মোনাসেব), মুনি, মুন্দ (মুন), মুয়া, মোদ, মোদক, মোদকিকা, মোদন, মোদনীয়, মোদা, মোদিত, মোদিনী, মোদী, মোদ্দা, মোদ্দাৎ, মো, মোয়া, মৌদক, মৌদকিক, মৌদগ, মৌদগলি, মৌদগল্য, সোনামুগ। **মুদ্** = নবরূপী সীমায়িতের দান। **মুদ** = নবরূপী সীমায়িতের দান যাহাতে। (সত্তার সীমায়িত নিগম্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস বা গন্ধ প্রদত্ত থাকে তার **মুদ**-এ। অর্থাৎ **মুদ**-এর ভিতরে সত্তা কোনো না কোনো ভাবে আপন সংক্ষিপ্ততম অস্তিত্বের কোনো না কোনো রূপকে নিগম বা প্রদান করে থাকে। তাই **মুদ্** মানে আমরা বুঝব, 'সত্তার নবরূপী সীমায়িত রূপের দান' বা সত্তার 'নিগম্য-সারসংক্ষেপ দান'।)

মুদ (মুদা, মুদারা, মুদি, মুদিখানা, মুদিত, মুদী — কুমুদ, কুমুদিনী, মোদী) : ২. মুদ = **মু** *(নবরূপী সীমায়িতের) দান যাহাতে।* **মুদা** = ***মুদ****-এর আধার যে।* **মুদারা** = ***মুদা*** *রক্ষণের আধার যে।* **মুদি** = ***মুদ*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **মুদিত** = ***মুদ*** *গতিশীল রূপে তারিত যাহাতে।* **মুদী** = ***মুদি****র আধার যে।* **৩. মুদ** = হর্ষ; মুদ্রিত করা, নিমীলিত করা, আবৃত করা, লুক্কায়িত করা, বন্ধ করা, বিলুপ্ত হওয়া, কুটমলিত হওয়া (ফুল)। **মুদা** = হর্ষ। **মুদারা** = স্বরসপ্তকের মধ্যম সপ্তক। **মুদি, মুদী** = চাল ডাল নুন তেল ইত্যাদির বিক্রেতা (grocer)। **মুদিখানা** = মুদির দোকান। **মুদিত** = হর্ষাবিষ্ট, হৃষ্ট, হর্ষ, আলিঙ্গনবিশেষ; **নিমীলিত, মুকুলিত,** মুদ্রিত, রুদ্ধ। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** চাহিদাপূরণের ফলে যে সুখ হয়, তার সংক্ষেপিত রূপ হল **খুশি**। সেই **খুশি**র সীমায়িত রূপের প্রকাশ ঘটে হর্ষে। সুতরাং একে **মু**-এর দান বা **মুদ** বলা যেতেই পারে। কিন্তু ইচ্ছার সেই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ শুধু চোখ-মুখের বিকার বা হাসির মাধ্যমেই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আরও নানা প্রকারে হতে পারে। এমনকি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের যে কোনোটির কিঞ্চিৎ প্রকাশের মাধ্যমেও হতে পারে। সেই সুবাদে তৃপ্তিতে চোখ বোজাও (**মুদিত**) হতে পারে, এমনকি নিম্নস্বরের সুরেলা আওয়াজের প্রকাশ বা **মুদারা**র মাধ্যমেও হতে পারে। মনে রাখা ভাল যে, উদারায় গাইলে কেউ তাকে আমাদের বাহাদুরি ভেবে খড়্গহস্ত হতে পারেন, কিংবা তারস্বরে বা তারায় গাইলেও তাকে আমাদের বাড়াবাড়ি ভেবে **দণ্ডমুণ্ডের** কর্তারা ডাণ্ডা হাতে তেড়ে আসতে পারেন; তার চেয়ে বরং **মুদারায়** গেয়ে নিজের কথাটি কোনোমতে কয়ে নেওয়াই নিরাপদ। তবে grocery-shop-কে কেন **মুদিখানা** বলে এবং তার পরিচালককে কেন **মুদী** বা **মোদী** বলে, তার কারণ ভিন্ন। সেখানে চাল ডাল ইত্যাদি পাওয়া যায় বলেই সেগুলিকে **মুদিখানা** বলে না। সেগুলিকে **মুদিখানা** বলা হয় সুদীর্ঘকালের সামাজিক দুঃখ তার ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে বলেই। প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে **গন্ধবেনে**রা (**দ্র. গন্ধ, বেণ**) কখনো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (**নিষাদ**) ও নিন্দিত, কখনো নিন্দিত কিন্তু আধা-নিষিদ্ধ (**নিষদ্যা**), কখনো-বা স্বীকৃত (বৌদ্ধযুগে বা রামরাজত্বে যা হয়েছিল) এবং পুনরায় (হিন্দুযুগের সূচনাকাল আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে) নিন্দিত কিন্তু আধা-নিষিদ্ধ হয়ে দোকানদারি করে আসছেন। ফলত, তাঁদের দোকানদারি প্রায় সবসময়েই চলেছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। এমনিতেই **গন্ধবেনের** দোকান হত অতি ঘুপচি অন্ধকার একটি ঘরে, ভিতরে কী কী আছে বাইরে থেকে দেখে সেসবের কিছুই বোঝা যেত না এবং দোকানটি যে কখন খুলবে আর কখন ঝাঁপ ফেলে বন্ধ হয়ে যাবে, তার ঠিক থাকত না। তাছাড়া, জানাশোনা খরিদ্দার এসে ডাকলে দোকানের পাল্লা তুলে তার দরকারি মালপত্র দিয়ে পুনরায় জানালার (কাউন্টারের) পাল্লা বন্ধ করে দেওয়া হত। গ্রামবাংলায় ১৯৬০ সালেও আমরা এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। এই যে দোকানের পাল্লা খোলা ও বন্ধ করে দেওয়া, ঝাঁপ তোলা ও ঝাঁপ ফেলে দেওয়া, এ হল হুবহু চোখ খোলা ও মুদিত করে নেওয়ার মতো ব্যাপার। এই কারণেই মোগলযুগে ঐ দোকানগুলোকে বলা হত **মুদিখানা** এবং তদ্রূপ দোকানের মালিককে বলা হত **মুদী**। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এঁদের বলা হয় **মোদী**। আজকালকার বানান-বিশেষজ্ঞদের (?) কৃপায় এই **মুদী** শব্দটিকে **মুদি** করে ফেলা হয়েছে। **মুদি** মানে 'চোখ বা তজ্জাতীয় কিছু বন্ধ করি'। সেক্ষেত্রে **মুদিখানা** সঠিক বানানে লেখা শব্দ, কিন্তু তার মালিককে বোঝাতে লেখা উচিত **মুদী**। তা না হলে নরেন্দ্র **মোদী** যে **মুদী** বংশের উত্তরাধিকারী, সেই কথাটি লুকিয়ে ফেলা হয়ে যায়। ... দ্র. **গান্ধী**।

মুদগ (মুদগপর্ণী, মুদগবড়া, মুদগমোদক, মুদগর — কৃষ্ণমুগ,

মুগ, মুগুর) : ১. ✓মুদ্ + গ (গক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মুদগ** = **মুদ্** (নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িতের দান) গমন করে যাহাতে।* ***মুদগপর্ণী** = **মুদগ পর্ণে**র সক্রিয় আধার যে। **মুদগবড়া** = **মুদগ** হইতে জাত বড়া। **মুদগমোদক** = **মুদগ** হইতে প্রসূত মোদক।* ***মুদগর** = **মুদগ** রহে যাহাতে। **কৃষ্ণমুগ** = **কৃষ্ণদর্শন** যে **মুগ**। **মুগ** = নবরূপী সীমায়িতের গমন যাহাতে। **মুগুর** = **মুগ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে।* **৩. মুদগ** = জলবায়স, পানীকৌড়ী, শমীধান্যভেদ, মুগের গাছ (Phascolus Mungo), মুদ্গবীজ, মুগকলায়। **মুদগপর্ণী** = বনমুদ্গ, মুগানী। **মুদগবড়া** = মুগের বড়া বা পিষ্টক। **মুদগমোদক** = মুদ্গকৃত মোদক। **মুদগর** = হর্ষনাশক, লৌহময় আয়ুধবিশেষ, মুদ্গসদৃশ দ্রব্যমাত্র, মুগুর, কোরক, লোষ্টভেদনার্থ কাষ্ঠখণ্ড, কামরাঙা গাছ, মল্লিকাবিশেষ। **কৃষ্ণমুগ** = কালমুগ। **মুগ** = রবিশস্যবিশেষ, কলায়বিশেষ। **মুগুর** = ব্যায়ামার্থ কাষ্ঠময় গদা, কামারের বড় কাঠের হাতুড়ি, গদাসদৃশ কাষ্ঠখণ্ডমাত্র। (ব.শ.)। **৪. মুগ ও মুগুর** বাদে বাকি সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **মুদারা, মুদগল**। **মুদ্গ** শব্দটিকে বাংলাভাষী সরল করে নিয়েছেন **মুগ** শব্দে, যার ভিতরে **দ্** রয়েছে উহ্য হয়ে। এই **মুদ্**-এর **গমনে** বা **মুদগ**-তে কী **মুদ্** রয়েছে, তাকে জানা একান্ত প্রয়োজন। তা নইলে আমরা বুঝতেই পারব না কেন **মুদগ** বললে একই সঙ্গে জলবায়স, পানীকৌড়ী, মুগকলায় ... ইত্যাদিকে বোঝায়; কেনই-বা সেই **মুদগ** রহে যাহাতে, তাকে **মুগুর** ... ইত্যাদি বলে। আর, সেই **মুদ্**কে চিনতে আমাদের সাহায্য করে **মুদারা** ও **মুদগল** শব্দ দুটি। তাছাড়া, বাংলাভাষীদের সংস্কৃতিতে, খাদ্যাভাসে **মুগ**ডাল বিষয়ক ধারণাও এ বিষয়ে সোজাসুজি অঙ্গুলিনির্দেশ করে থাকে।

বিধবাদের জন্য একটি বিধান ছিল, তাঁরা মসুর ডাল খাবেন না, কিন্তু **মুগ** ডাল খাবেন। বিধবা বলেই তাঁদের স্বামীসঙ্গের সুযোগ নাই। গ্রামবাংলার মানুষ আজও জানেন এবং মানেন যে, নিয়মিত নিমগাছের ডালের দাঁতন করা, **মুগ** ডাল খাওয়া — এগুলি শরীরকে এতই ঠাণ্ডা রাখে যে, যাঁরা তা সেবন করেন তাঁদের স্বামীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গ লাগে না। কিন্তু **বাবলা**গাছের ডালের দাঁতন করা ও মসুর ডাল খাওয়া ঠিক তার বিপরীত ক্রিয়া করে। তার মানে, **মুগ**কলায়ের ভিতরে নিজেকে সংবরণ করা, **মুদিত** করে নেওয়া, বা **মুদ্**-এর গমন থাকে। **মুদগ** সত্তাটি তাই একাধারে হর্ষ ও বিষণ্ণতা বিরোধী এবং স্বভাবতই মধ্যপন্থী। দূরপাল্লার লরি নিয়ে যে পাঞ্জাবী ড্রাইভারেরা ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাতায়াত করেন, তাঁরা সেকারণেই রুটির সঙ্গে **মুগ**ডালের 'তড়কা' খাওয়া পছন্দ করে থাকেন। **মুদী**র ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখেছি, কোনোমতে দরকারি মালপত্র বেচে দিয়ে দোকানের পাল্লা **মুদিত** করে নেওয়ার যে ক্রিয়া, **মুদ্** হল সেই ক্রিয়া। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু সেরে নিয়ে আত্মসংবরণ করাই **মুদ্** করা। এই ক্রিয়া যার যার ভিতরে গমন করে সেগুলির প্রত্যেকটিই **মুদগ**। জলবায়স বা পানীকৌড়ীকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, ঐ পাখি জলে ভাসে বটে, কিন্তু ততটুকুই যতটুকু না হলেই নয়। ...

তবে **মুদগর**-এর বেলায় ঘটনাটি ঘটে উল্টো দিক থেকে। যে বাড়াবাড়ি করছে, **মুদগর** বা **মুগুর** গিয়ে তাকে তার **মুদারা**তে ফেরত পাঠায়। এই **মুগুর** শব্দটির ক্ষেত্রে আরও একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, যেহেতু **মুদগর**-এর **দ্**-কে বাংলাভাষী উহ্য রেখেছিল, সেই কারণে **মুদগর**কে সে শতকরা একশোভাগ ক্রিয়াভিত্তিক রীতি মান্য করে **মুগুর**-এ উত্তীর্ণ করিয়ে নেয়; **মুগর** বানিয়ে রেখে দেয় না। তবে 'মুগর-মুগরি-মুগরী'র পথ বেয়েই যে বাংলাভাষী সেখানে পৌঁছেছেন তার নিদর্শন গ্রামবাংলায় এখনো রয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে শীতকালে ফিরে আসা নবযুবতী কন্যা মায়ের বাড়িতে এসে কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকে এবং তার সখী ও ছোট বোনেরা কাঁথার ভেতর থেকে ছড়া কাটে — 'জাড়্ লাগে, পাড়্ লাগে, উড়্ গিদরী / বুড়ি-মায়ের জামাই আসে, মার্ মুগরী।'

মুদ্গল : ২. ***মুদগ** (উপরে দ্রষ্টব্য) লালিত যাহাতে।* **৩.** গোত্রকারমুনিবিশেষ, উপনিষদ্ভেদ। (ব.শ.)। কুরুক্ষেত্রবাসী এক ধর্মাত্মা উঞ্ছবৃত্তিধারী মুনি। ইনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে প্রতি পক্ষে একদিন আহার করতেন এবং প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজ্ঞ করতেন। অতিথিদের এক দ্রোণ অন্ন দিতেন। ... একদিন দুর্বাসা তাঁর অতিথি হন। মুদ্গল তাঁকে অন্ন দিলে তিনি সমস্ত ভোজন করে দেহে উচ্ছিষ্ট অন্ন মেখে চলে যান। দুর্বাসা পর পর ছয়টি পর্বদিনে এসে সমস্ত অন্ন খেয়ে যান। মুদ্গল নির্বিকারে অনাহারে থাকেন। এতে প্রীত হয়ে দুর্বাসা বলে যান, মুদ্গল সশরীরে স্বর্গে যাবেন। তখন দেবদূত মুদ্গলকে নিয়ে যাবার জন্য দৈব বিমান নিয়ে এলেন। মুদ্গল দেবদূতকে স্বর্গবাসের দোষগুণ বর্ণনা করতে বললে দেবদূত স্বর্গবাসের বিবিধ সুখের কথা বলে দোষ হিসাবে বলেন, স্বর্গে কৃতকর্মের ফল ভোগ হয়; কিন্তু নূতন কর্ম করা যায় না। অপরের সম্পদে অসন্তোষ হয় এবং কর্মফল ক্ষয় হলে পৃথিবীতে আবার পতন হয়। মুদ্গল তখন দেবদূতকে বিদায় দিয়ে বলেন, যে-অবস্থায় লোকে শোকদুঃখ পায় না বা পতিত হয় না — সেই কৈবল্যই তাঁর কাম্য। এই বলে তিনি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন। ইনি মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. মুদগল** একটি সামাজিক সত্তা। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে কোনো এক কালখণ্ডে এই সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল কোনো সম্প্রদায়ের পরিচালকদের মধ্যে। তাঁরা কর্মযজ্ঞে খুব বেশি লিপ্ত না হয়ে যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু করেই ক্ষান্ত দিতেন এবং সর্বপ্রকারে আত্মসংবরণ করে চলতেন। বিষাদ তাঁদের কাম্য ছিল না, হর্ষও তাঁদের কাম্য ছিল না; কার্যত তাঁরা ছিলেন মধ্যপন্থী। ...

ভারতীয় অধ্যাত্মচর্চায় আত্মসংবরণের যতরকম পথ বিকশিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি পথ এই **মুদ্গলী**য় বা মৌদ্গল্য জীবনচর্যা। এতে যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক সবকিছুতেই অনাগ্রহের প্রকাশ দেখা যায়। এর চূড়ান্ত রূপটি জৈনদের কোনো কোনো উপদলের মধ্যে এবং তান্ত্রিকদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর ভিতরে দেখতে পাওয়া যেত। চীন দেশে লাও-ৎ-সুর দর্শন এই পথ অনুসরণের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিল। সক্রেটিসের আচরণেও এ প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। ...

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে কথাটি অবশ্যই বলে রাখা দরকার, তা

হল — স্বর্গলোক মূলত দুই প্রকার। দৃশ্য স্বর্গলোক এবং অদৃশ্য স্বর্গলোক। এখানে দৃশ্য স্বর্গলোকটির বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় নানা কথা বলা হয়েছে। যেমন এই দৃশ্য 'স্বর্গে কৃতকর্মের ফল ভোগ হয়; কিন্তু নূতন কর্ম করা যায় না।' অর্থাৎ আপনি যে বিপুল সম্পদ কামিয়ে নিয়ে লবণহ্রদের কিংবা 'বোম্বে-হাই'এর অথবা নৈনিতালের স্বর্গলোকে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকেন, চাইলে সেখানে বসে বসে আপনি আপনার কামানো ও জমানো টাকা ভোগ করে নিতে পারেন, কিন্তু সেখানে বসেই পুনরায় নূতন কর্ম করতে পারবেন না; করতে হলে পুনরায় মর্ত্যে নেমে আসতে হবে। ওখানে থাকার একটা সমস্যা হল, অপরের সম্পদ দেখে আপনার মনে নানা রকম অসন্তোষ দেখা দেবে। আপনার ইচ্ছা করবে, কী করলে পর অন্যের সম্পদ হরণ করে নেওয়া যায়, কিংবা তার সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া যায়! কুকর্ম করতে প্ররোচনা দেবে আপনার সেই স্বর্গলোকের পরিবেশ। এবং অবশেষে আপনার কামানো ও জমানো টাকা ফুরিয়ে গেলে, অর্থাৎ 'কর্মফল ক্ষয় হলে পৃথিবীতে আবার পতন' হবে আপনার। এই কারণে **মুদগল** ঐ দৃশ্য স্বর্গলোকে যেতে চাননি।

মুদ্দা (মোদ্দা) : ২. ***মুদ্দা*** = ***মুদ্*** *(উপরে দ্রষ্টব্য) দাতার আধার যে।* ***মোদ্দা*** *= সার্ব্বিক* ***মুদ্দা*** *যাহাতে।* **৩. মুদ্দা, মোদ্দা** = অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, সার, তাৎপর্য্য। (ব.শ.)। **৪. মোদ্দা** 'সার' অর্থে প্রচলিত, **মুদ্দা** 'দাবি' অর্থে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দ দুটিকে আরবি ভাষা থেকে আগত শব্দ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আরবি ভাষার পণ্ডিতকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, কেন শব্দগুলির ঐরকম মানে, তার উত্তর তাঁরা দিতে পারবেন না। কারণ আরবি ভাষাও তো এখন প্রতীকী ভাষায় পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির ছাত্রেরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঐ শব্দগুলি মূলত **মুদ্** ক্রিয়া পরিবারের সদস্য রূপেই জন্মেছে, যে **মুদ্** ক্রিয়া ও তার পরিবারকে আমরা আমাদের নিজস্ব উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছি। শব্দ দুটির নিহিতার্থের দিকে নজর দিলেই সে কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের প্রয়োজনসমূহের সীমায়িত বা সংক্ষিপ্ত রূপকেও **ম** বলে। সেই সংক্ষিপ্ত প্রয়োজন নবরূপে উত্তীর্ণ হলে **মু** হয়। সেই মু-এর দান থাকে **মুদ্**-এ। সেই **মুদ্**-দাতার আধার বা **মুদ্দা** স্বভাবতই মূল কথা বা সারকথাকে বোঝায়। তারই সার্বিক রূপ হল **মোদ্দা**। আন্দোলনকারীরা যেমন বলেন, তাঁদের **মুদ্দা** হল অমুক অমুক তিনটি দাবি। আমরা তো আকছার বলি — '**মোদ্দা** কথা হল ...'। তার মানে, আমাদের যত কথা সেগুলির সংক্ষিপ্তসার বা সীমায়িত রূপ হল **মু**। সেই **মু**-এর দান বা **মুদ্** থাকে সীমায়িত ইচ্ছায় — কিছু টাকা চাই। সেটি যখন **মুদ্**-দাতার আধার রূপে প্রকাশিত হয়, তখন তা বাক্যে রূপ পায় — 'দশ শতাংশ বোনাস দিতে হবে'। এটাই হয়ে গেল **মুদ্-দা** বা **মোদ্দা**-কথা।

আরবি ভাষা থেকে **মুদ্দা** ও **মোদ্দা** শব্দের অর্থ সংগ্রহ করে ব.শ. জানিয়েছেন, সেগুলির অর্থ হল — অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, সার, তাৎপর্য্য। আমাদের **মুদ্** ক্রিয়াজাত **মুদ্দা** ও **মোদ্দা**র ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের এলাকার ভিতরে এই 'অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, সার, তাৎপর্য্য' চারটি শব্দই রয়েছে। ফলে, আমাদের নিজস্ব উত্তরাধিকার থেকে যা পাচ্ছি, একই শব্দের আরবির উত্তরাধিকারলব্ধ অর্থ থেকেও সেগুলিকেই পাচ্ছি। এই সেই কারণ, যে কারণে আরবি থেকে আগত শব্দকে আমাদের মধ্যযুগের পূর্বসূরিদের মনে হয়েছিল — এ তো আমাদেরই শব্দ। তাই সেগুলিকে আপন করে নিতে তাঁদের অসুবিধে হয়নি।

অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারে আজকাল নানারকম কথা বলা হয়ে থাকে। ইংরেজ গায়ের জোরে পরের জিনিস দখল করে, জোর করে কেড়ে নেয়। আমাদের পূর্বসূরিরা দেখছি, পরের জিনিসটিকে পরখ করে দেখে নিয়েছেন, তারপর নিজের ভাণ্ডারে, ঘরে, শস্যক্ষেত্রে সমগোত্রীয় কেউ আছে কি না, সেটির খোঁজখবর করেছেন, তেমন কাউকে পেলে তাকেই জাগিয়ে নিয়েছেন এবং কাজে লাগিয়েছেন। একালের পণ্ডিতেরা আমাদের পূর্বসূরিদের সেই প্রক্রিয়াটিকে বুঝতেই পারেননি; সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বাংলাভাষাও ইংরেজদের মতো অন্যভাষা থেকে শব্দ আত্মসাৎ করেছে!

মুদ্রা (মুদ্রণ, মুদ্রাদোষ, মুদ্রারক্ষক, মুদ্রারাক্ষস) : **১.** ✓মুদ্ + র (রক্) - করণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *(****মুদ্র*** *= সত্তার* ***মুদ্ বর্ত্তমান*** *যাহাতে।)* ***মুদ্রণ*** *=* ***মুদ্র*** *অন (on) যাহাতে।* ***মুদ্রা*** *=* ***মুদ্র****-এর আধার যে।* ***মুদ্রাদোষ*** *= যে* ***মুদ্রা*** *দোষ রূপে কথিত।* ***মুদ্রারক্ষক*** *=* ***মুদ্রা*** *রক্ষা করে যে।* ***মুদ্রারাক্ষস*** *=* ***মুদ্রা****কে রক্ষার নামে ভক্ষণ করে যে।* / **মুদ্রারক্ষক** = যে মোহর (নামাঙ্কিত সীল) রাখে। (ব.শ.)। **৩. মুদ্রা** = প্রত্যয়কারিণী, নামের মোহর (seal), নামাক্ষরযুক্ত অঙ্গুরীয়ক, লিপিবিশেষ, স্বর্ণরৌপ্যাদিমুদ্রা, চিহ্ন, শরীরে ধার্য্য ভগবদায়ুধাদিচিহ্ন, প্রতিষ্ঠাজ্ঞাপনার্থ মুদ্রা (medal), মুদ্রাঙ্কিত অনুজ্ঞাপত্র (pass), তালক (lock), নিবর্ত্তকদ্রব্য, ছিপি, গূঢ়বিষয়, ভঙ্গি, মুদ্রণ, সঙ্কোচ, গীতবাদ্যাদিকালে অঙ্গভঙ্গি ... ইত্যাদি। **মুদ্রণ** = মুদ্রিত করা, মোহর করা, মুদ্রাঙ্কণ, চিহ্নকরণ, অঙ্কন, বন্ধ, নিরোধ, নিমীলন। **মুদ্রাদোষ** = গীতবাদ্যাদিকালে অঙ্গভঙ্গি, কথা কহার সময়ে ভাবসূচক অঙ্গভঙ্গি বা অনর্থকবাক্যপ্রয়োগ। **মুদ্রারাক্ষস** = বিশাখ-দত্তকৃত সংস্কৃত রূপকবিশেষ। (ব.শ.)। **৪. মুদ্রারক্ষক** ও **মুদ্রারাক্ষস** অপ্রচলিত; বাকি শব্দ তিনটি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** কোনো একটি সত্তা (ধরা যাক, ভারত সরকার) তার সমগ্র বৃত্ত থেকে সংকুচিত হ'য়ে হ'য়ে তার কেন্দ্রে পৌঁছে গেল। ফলে তার যে রূপটি হল, সেটি তার সমগ্রের সংক্ষিপ্ততম রূপ বা **মু** ('ভারত সরকার' — এই পরিচয় প্রদানকারী শব্দ)। সেই **মু**-এর দান থাকে **মুদ্**-এ ('ভারত সরকার' লিপিতে, কিংবা অশোকস্তম্ভ চিহ্নে)। সেই **মুদ্** বর্ত্তমান বা আ**বর্ত্তমান** থাকতে পারে সত্তাটির **মুদ্রা**য় (মোহর বা সীলে, যাতে যে কোনো কাগজে বা বস্তুতে 'ভারত সরকার' ও 'অশোকস্তম্ভ' চিহ্নটি প্রয়োজন মতো ছেপে দেওয়া যায়।)। এই **মুদ্রা** রূপটির মাধ্যমে মহৎ ও বৃহৎবপু ভারত সরকার নিজেকে কণামাত্র প্রকাশ করে আপনার অস্তিত্ব জানান দেয়। সেকারণেই এই সমগ্র ক্রিয়াটিকে **মুদ্রা** বলে। স্বভাবতই এই **মুদ্রা** কোনো না কোনো সত্তার আত্মস্বরূপের সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ মাত্র। ...

মোটকথা, সত্তার 'সীমায়িত রূপ প্রদত্ত হয়ে **বর্ত্তমান** থাকে যে

আধারে' তাকে **মুদ্রা** বলে; তা সে ব্যক্তির, পরিবারের, রাষ্ট্রের, বা যারই হোক না কেন। একটি রাষ্ট্রের সীলমোহর যেমন তার **মুদ্রা**, তেমনি সেই **মুদ্রা** তেমনি যে রৌপ্যখণ্ডে **মুদ্রিত** থাকে, সেও **মুদ্রা** (coin) পদবাচ্য হয়ে যায়। সেই বিচারে রাষ্ট্রের পতাকাও তার **মুদ্রাই** বটে। তার মানে, বিশ্বের যে কোনো সত্তার নিজস্ব **মুদ্রা** থাকতে পারে। তবে সেসবকে **মুদ্রারূপে** আমরা খুব একটা চিনি না। চিনি কেবলমাত্র মানুষের নানান **মুদ্রাকে**। এ বিষয়ে সবচেয়ে ধনী বা সর্বোচ্চ **মুদ্রা**-জ্ঞান-অর্জনকারী ছিলেন ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা। তাঁরা বিশ্বের নানা বস্তু ও বিষয়ের **মুদ্রা** আত্মসাৎ করে নৃত্যের অজস্র **মুদ্রা** প্রস্তুত করে নেন। ভাষার প্রতিটি শব্দই যেমন তার **মুদ্রা**, তেমনি নৃত্যের প্রতিটি **মুদ্রাই** ছিল তার শব্দ। সেই **মুদ্রাগুলির** সাহায্যে তাঁরা সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের ঘটনাবলীকে তাঁদের নৃত্যের সাহায্যে উপস্থাপিত করবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। সেই নৃত্যসম্ভারের সঙ্গে একালের আধুনিক নৃত্যের ও পাশ্চাত্য নৃত্যের তুলনাই চলে না। একটি শব্দ খরচ না করে মহাভারতের মতো বিশাল বিশাল ঘটনাবলীকে উপস্থাপন করবার যোগ্য রয়েছে যে নৃত্যসম্ভারের, তার সঙ্গে কি মূক বধিরদের আত্মার গ্লানিমোচনের লাফালাফি-দাপাদাপি ও চীৎকারের তুলনা চলে?!

প্রত্যেক মানুষের আচার-আচরণের, স্বভাবের, কথা বলারও বিশেষ বিশেষ ঢঙ্ থাকে। সেগুলির মধ্যে যেগুলি স্থির রূপ নিয়ে ফেলে, তেমন ঢঙ্‌কেও **মুদ্রা** বলে। সেই **মুদ্রা** যখন কারণ ছাড়িয়ে অকারণেও প্রযুক্ত হতে থাকে তখন তাকে **মুদ্রাদোষ** বলা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগেও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই **মুদ্রাদোষ**-এর ব্যবহার হত। আজকাল তার কদর কমেছে। কেননা, আধুনিকতার অত্যন্ত প্রভাব মানুষকে ছাঁচে ঢালা এক স্বভাবের যন্ত্র-মানুষে পরিণত করে দিচ্ছে। ফলে, তাদের **মুদ্রাদোষ** যেমন নাই, **মুদ্রাগুণও** নাই, একেবারে নিরেট যন্ত্র — 'বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারে নাই'। রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিলেন — 'যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না; যদি করিত তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই।' (*'পনেরো-আনা'*)।

প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ অর্থের **মুদ্রা** আছে, থাকে। সেই **মুদ্রার** দেখভাল করেন যাঁরা তাঁদের বলা হত **মুদ্রারক্ষক**। কিন্তু 'রক্ষা করব' ব'লে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রক্ষা না-করে খেয়ে ফেললে, সেরূপ রক্ষককে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে বলা হত **রাক্ষস**। একালের তথাকথিত 'উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'-এর কর্ণধারগণের অধিকাংশই কি রাষ্ট্রের **মুদ্রারাক্ষস** নয়? যে সম্পদের উপর রাষ্ট্রের **মুদ্রা** নানাভাবে **মুদ্রিত** থাকে, সেই সম্পদ তাঁরা রক্ষা করার নাম করে **ভক্ষণ** করে ফেলেন। একালের সাংবাদিকতার ভাষায় যে ঘটনাগুলিকে 'ঘোটালা', 'স্ক্যাম', 'কেলেঙ্কারী' ... ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে, সেগুলির অধিকাংশই কি রাষ্ট্রের **মুদ্রার** গৌরব আত্মসাৎ করে **ভক্ষণ** করে ফেলা নয়? সেই বিচারে, যাঁরা ঐরূপ রাক্ষসোচিত কর্ম করেন, সেকালের বাংলাভাষায় তাঁদের বলা হত **মুদ্রারাক্ষস**। সেকারণেই সেকালের তদ্রূপ এক **মুদ্রারাক্ষস**-এর বিবরণ দিতে গিয়ে বিশাখ দত্ত মহাশয় যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন **মুদ্রারাক্ষস**। আমাদের আধুনিক **বুদ্ধি** তাকে 'রূপক' মনে করে আত্মপ্রবঞ্চনা করে থাকে।

মোদ (মোদক, মোদন, মোদা, মোদিত, মোদিনী — অনুমোদন, আমোদী) : ১. ✓মুদ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *মোদ = সার্ব্বিক **মুদ** যাহাতে; অথবা, **মুদ**-এর আশ্রয় যাহাতে। **মোদক** = **মোদ** করে যে। **মোদন** = **মোদ** অন (on) যাহাতে। **মোদা** = **মোদ**-এর আধার যে। **মোদিত** = **মোদ** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। **মোদিনী** = **মোদন**-এর গতিশীল আধার যে। **অনুমোদন** = **মোদন**-কে অনুসরণ করে যে-**মোদন**; অথবা, যে **মোদন** মূল **মোদনকে** অনুসরণ করে। **আমোদী** = **আমোদ** (মোদ-এর আশ্রয় যাহাতে) গতিশীলভাবে আধারিত যাহাতে।* / **মোদ** = যাহা দ্বারা হর্ষ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **মোদ** = হর্ষ, সৌরভ, সামান্য গন্ধ; আনন্দলাভ করা, নিমীলিত করা, মোদা। **মোদক** = হর্ষক, আনন্দয়িতা, ভক্ষ্যবিশেষ, মোয়া, লড্ডুক, গুড়, শর্করাদি দ্বারা পক্ব ঔষধবিশেষ। **মোদন** = মোদক, শিক্থক, মোম, আনন্দন, প্রীণন। **মোদা** = আচ্ছাদিত, ঢাকা; আনন্দলাভ করা ... ইত্যাদি। **মোদিত** = সঞ্জাতমোদ, হর্ষিত, আনন্দিত, প্রীণিত। **মোদিনী** = প্রীণয়িত্রী, মল্লিকা, যূথিকা, বৃত্তমল্লিকা, অজমোদা, কস্তূরী, মদিরা। **অনুমোদন** = কোনো বিষয়ের অনুকূলে (অর্থাৎ ইহা আমার অভিমত এইরূপে) মতপ্রকাশ, সম্মতি, অনুমতি, প্রীত করা। **আমোদী** = আমোদবান, দূরগামিপরিমলযুক্ত, হর্ষিত। (ব.শ.)। ৪. 'ময়রা' অর্থে ও তাঁদের পদবী রূপে **মোদক** প্রচলিত; approval অর্থে **অনুমোদন** এবং একপ্রকার মাছের নাম রূপে **আমোদী** প্রচলিত; অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **মুদ** ও **মোদ** প্রায় সমার্থক শব্দ। **মুদ** কাকে বলে, সেকথা উপরের শব্দগুলিতে বলা হয়েছে। **মোদ** শব্দের অর্থ প্রদান করতে গিয়ে আমরা দু'রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছি — '**মুদ**-এর আশ্রয় যাহাতে', কিংবা 'সার্ব্বিক **মুদ** যাহাতে'। তৃপ্তিতে চোখ বুজে বা 'নিমীলিত হয়ে' এলে যে **মুদন** হয়, এ হল সেইরূপ **মোদ**। সরাসরি এর প্রয়োগ আজকাল হয় না বলে, **মোদ** শব্দের মানে চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু **আমোদ, প্রমোদ** প্রভৃতি শব্দ শুনলেই আমরা বুঝতে পারি — এ হল খুশি করা, তৃপ্ত করা, **আমোদিত** করা, **প্রমোদিত** করা — যে **আমোদন** অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিলে তার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে যায়, যাকে বলা হয় 'মোহিত হয়ে যাওয়া'তে বা 'মুগ্ধ হয়ে যাওয়া' কিংবা 'মূঢ় হয়ে যাওয়া'। তবে তার একেবারে প্রাথমিক রূপটিকেই বলা হয় **মোদন**। মিষ্টি খেলে, ভাল কিছু দেখলে বা শুনলে আমাদের সেরকম **মোদন** হয়। যাঁরা আমাদের **প্রমোদন**-এর জন্য বিভিন্ন মিষ্টান্ন বানিয়ে বিক্রি করে থাকেন, তাঁদের সেকারণে **মোদক** বলে। তাঁদের কারও কারও নামের শেষে পদবীরূপেও **মোদক** শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, আগের কালে 'মোয়া'কেও **মোদক** বলা হত।

একটি মাছের নাম হল **আমোদী** বা **আমুদে**। এ মাছকে নিজের চোখে জলে খেলতে দেখলে তৎক্ষণাৎ টের পাবেন, কেন জলজীবী

বাংলাভাষী মানুষেরা মাছটিকে **আমোদী** বা **আমুদে** নাম দিয়েছেন এবং মাছটি কীরূপ সার্থকনামা। তবে **মোদন** শব্দটি মানুষের যে স্বভাবকে বোঝানোর জন্য সৃজিত হয়েছে, সেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট স্বভাবটিকে প্রকাশ করে **প্রমোদ** বা **প্রমোদন** শব্দটি। এতে **প্র-মোদন** হয়ে থাকে। (দ্র. **প্র**)। **আমোদ-প্রমোদ, আমোদ-আহ্লাদ** ... এই শব্দগুলি তাই **আশেপাশের** মতো পরিপূরক **যোড়শব্দ** (দ্র. **মোটমাট**)। ...

আজকাল **আমোদের** ঢল নেমেছে সর্বত্র। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিনোদন'। 'বিনোদন' নামে এখন কত রকম '**আমোদ-প্রমোদ**' যে বিক্রি হয়ে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। যেহেতু **আমোদের** ইত্যাকার **বিপণন** বিশ্বায়িত বর্তমান কালে প্রাদুর্ভূত হয়েছে, সেই হেতু এদের স্বরূপ বোঝানোর মতো বাংলা শব্দ সেকালে সৃজিত হয়নি, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু আমাদের বাংলাভাষা তো বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা। তাতে এই সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য 'periodic table'-এর মতো খালি খোপ রেখে দেওয়া আছে। অর্থাৎ বাংলাভাষার ব্যবস্থার ভিতরে ঐরকম নবাগতদের নামকরণের জন্য খালি খোপ রয়েছে। আপনি কেবল নবাগতদের চিনে নিয়ে সেই খোপে খোপে রেখে দিলেই তাদের নামকরণ হয়ে যাবে। সেই খোপ রাখা আছে প্রতিটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে **উপসর্গ** যোগ করার ঘরগুলি রেখে দিয়ে। যেমন **গতি** শব্দের পাশে প্র, পরা ... ইত্যাদি ২২টি খোপ থাকে। সেই খোপ পূরণ করেই **প্রগতি, সুগতি, অবগতি** ... প্রভৃতি শব্দ বানানো হয়েছিল। ...

তদনুযায়ী আমাদের প্রস্তাব এই যে, নবাগত স্বভাবের এই **মোদন**গুলির স্বভাব অনুসারে তাদের নতুন নতুন নামকরণ করে দেওয়া হোক। যথা — **অপমোদন** (= ক্ষতিকর **মোদন**), **অবমোদন** (= নিম্নমানের **মোদন**), **নির্মোদন** (নির্গত **মোদন**), **দুর্মোদন** (= দুষ্ট প্রকৃতির **মোদন**), **বিমোদন** (= 'বিশেষ বা বিপরীত **মোদন** থাকে যাহাতে'), **অতিমোদন** (= **মোদন**কে অতিক্রান্ত), **অভিমোদন** (= অভিভাবকোচিত **মোদন**), **প্রতিমোদন** (= **মোদনের** বিপরীত **মোদন**) ইত্যাদি। আজকাল যতরকম **আমোদন-পণ্য** বিক্রির রমরমা চলছে, সেগুলির অধিকাংশই এই আট রকম **আমোদন**ই বটে। টিভি চ্যানেলগুলি তো এখন **অপমোদন, অবমোদন** ও **দুর্মোদন**-এ ভরভরাট হয়ে উঠেছে। তবে দু-একটি ভাল **প্রমোদন**ও আছে। তাদের সুস্পষ্ট নাম থাকা উচিত। সেক্ষেত্রে তাদের **সুমোদন** ও **উন্মোদন** নামকরণ করা যেতে পারে। যে **প্রমোদন** আমাদের উদ্‌লোকে নিয়ে যায়, তাকে **উন্মোদন** বলাই সমীচীন।

অনুমোদন শব্দটিকে তার নিহিত অভিধার্থ অনুসারে ব্যবহার করা হয় না, ব্যবহার করা হয় ব্যঞ্জনার্থে। রামবাবু বললেন, 'চলো, সবাই মিলে মিষ্টি খাই।' সন্দেহ নেই, তাতে সকলের **মোদন** বা **আমোদন** হবে। আপনি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো যাই।' অর্থাৎ, আপনার **মোদনার্থক** ইচ্ছা রামবাবুর **মোদনার্থক** কাজের অনুসরণ করল। একে বলে **অনুমোদন**। এতে রামবাবুর **মোদন**কর্মের পশ্চাতে আপনার অনুসারী **মোদন**কর্ম রয়েছে। কিন্তু রামবাবু যদি বলতেন, 'চলো, কৃচ্ছ্রসাধন করি, সাতদিন অনাহারে থাকি'; তখন আপনিও যদি বলতেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো অনাহারে থাকি' — তখন আপনার এরূপ সমর্থনকে আর যাই বলা যাক, শব্দশাস্ত্রের বিচারে তাকে **অনুমোদন** বলা যেত না। কেননা, রামবাবুর প্রস্তাবটি আদৌ **মোদনীয়** ব্যাপার নয়, আপনার **সমর্থন**ও কোনো প্রকার **মোদন** সৃষ্টি করে না, করবে না। তার মানে, **অনুমোদন** হতে গেলে তার আগে **মোদন**কে থাকতেই হবে।

কিন্তু এই যে একজনের **মোদনীয়** কর্মের অনুসরণে আর একজনের **মোদনীয়** কর্ম অনুষ্ঠিত হল, এর তো আরও একটা ব্যঞ্জনার্থ দাঁড়িয়ে যায়! সেটি হল, প্রথম জনকে দ্বিতীয় জনের অনুসরণ করা বা সমর্থন করা। সেই সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে যায় যখন **অনুমোদন** শব্দের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে যায়। তখন যে কোনো কাজের সমর্থনকেই **অনুমোদন** বলা হতে থাকে। সেই প্রক্রিয়া ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বর্তমানে **অনুমোদন** শব্দটি তাই আর সেরকম **মোদনীয়** কর্মের অনুসরণ করে না, যে কোনো প্রস্তাবকে সমর্থন করাকেই **অনুমোদন** বলা হয়ে থাকে; সে প্রস্তাবে কোনো প্রকারের **মোদন** থাকুক আর নাই থাকুক। অর্থাৎ, **অনুমোদন** শব্দের নিহিতার্থ চলে গেছে দ্বিতীয় স্থানে, প্রথম স্থানে এসে গেছে তার ব্যঞ্জনার্থ।

মুষ্ (মুষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমুষ্মিন, অমুষ্য, আমুষ্মিক, আমুষ্যায়ণ, মুকটি(টী), মুকুটি(টী), মুক্‌খী (মুক্ষি, মুষ্টি), মুট্, মুট (মুঠ), মুট(ঠ)কলম, মুট(ঠ)কি, মুট(ঠ)কী, মুটমুট, মুটা(ঠা), মুটি(ঠি), মুটিয়া, মুটী(ঠী), মুটুকামুটুকি (মুঠকা-মুঠকি), মুটুকি, মুটে (মুঠে), মুঠামুঠি, মুথা, মুথো, মুষক, মুষল, মুষলধারা, মুষলী, মুষা, মুষাকানী (মুক্তাঝুরি), মুশল (মুষল, মুসল), মুশলধারা, মুশকিল (মুসকিল), মুষ্, মুষ (মুস), মুষক, মুষ(স্)ড়া, মুষল, মুষলী, মুষলধারী, মুষলমান (মুসলমান, muscleman), মুষলিম, মুষা, মুষিত, মুষিতচেতা, মুষিতত্রপ, মুষিতস্মৃতি, মুষী, মুষ্ক, মুষ্ককচ্ছু, মুষ্কদেশ, মুষ্কদ্বয়, মুষ্কর, মুষ্কিল (মুসকিল), মুষ্কশোফ, মুষ্কহীন, মুষ্ট, মুষ্টক, মুষ্টামুষ্টি, মুষ্টি, মুষ্টিক, মুষ্টিকরণ, মুষ্টিকা, মুষ্টিগ্রহ, মুষ্টিগ্রাহ্য, মুষ্টিঘাত, মুষ্টিদেশ, মুষ্টিদ্যূত, মুষ্টিন্ধম, মুষ্টিন্ধয়, মুষ্টিপাত, মুষ্টিপ্রহার, মুষ্টিবন্ধ, মুষ্টিবিসর্গ, মুষ্টিভিক্ষা, মুষ্টিমেয়, মুষ্টিযুদ্ধ, মুষ্টিযোগ, মুষ্ট্যষ্টক, মুসবিদা (মুসাবিদা), মুসব্বর, মুসমা, মুসম্মৎ, মুসল, মুসলমান (মোছলমান), মুসলমানী, মুসলামুসলি, মুসলিম (মোসলিম), মুসলী, মুসলোলূখল, মুসল্য, মুসা, মুসাফির (মোসাফির), মুসাবিদা, মুসাহেব (মোসাহেব), মুসাহেবী, মুস্ক, মুস্কিল, মুস্ত, মুস্তক, মুস্তফি (মুস্তফী), মুস্তা, মুস্তাক্ষতি, মুস্তাপ্ররোহ, মুস্তাভ, মূষ্, মূষ, মূষক, মূষগ, মূষণ, মূষা, মূষিক, মূষিকনির্ব্বিশেষ, মূষিকপর্ণী, মূষিকবিষাণ, মূষিকরথ, মূষিকস্থল, মূষিকা, মূষিকাঙ্ক, মূষিকাদ, মূষিকোৎকর, মূষী, মূষীক, মূষীকা, মূষীকরণ, মোছলমান, মোছলমানী, মোটন, মোড়া, মোষ (দ্র.মহিষ), মৌষ(স)ল, মৌষলপর্ব্ব, মৌষললীলা, মৌষ্টা।

মুষ্ (মুষ্) = নবরূপী সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **মুষ** = নবরূপী সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **মূষ** = নবরূপী সীমায়িতের আধারের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। (ইংরেজির mos- ও mus- যুক্ত অধিকাংশ শব্দই এই ক্রিয়ামূলের বংশে জন্মেছে।)

মুশল, মুষল, মুসল (মুষলী, মুসলী — মুশকিল, মুশলধারা, মুষলধারী, মুষলধারে) : ১. ✓মুষ্ + অল (কলচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে, অথবা ✓মুস্ + অল (কলচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মুশল** = *নবরূপী সীমায়িতের সার্বিক বিচ্ছুরণ লালিত যাহাতে।* **মুষল** = *নবরূপী সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ লালিত যাহাতে।* **মুসল** = *নবরূপী সীমায়িতের একান্ত বিচ্ছুরণ লালিত যাহাতে।* **মুষলী** = ***মুষল**-এর গতিশীল আধার যে।* **মুসলী** = ***মুসল**-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. মুশল, মুষল, মুসল** = তণ্ডুলকণ্ডনার্থ লৌহমুখ দণ্ড, কণ্ডনদণ্ড, অয়োগ্র, মোনা (pestle), আয়ুধবিশেষ, শল্যাস্ত্রবিশেষ, কুলনাশন মূর্খ পুত্র; মুষল ও উলূখল। **মুশকিল** = বিপদ, বিঘ্ন, ক্লেশ, গোলযোগ। **মুশলধারা** = মুশলের মতো স্থূল বৃষ্টিধারা। **মুষলী, মুসলী** = মুষলধারী, বলদেব, শিব, (সাদৃশ্যে) গৃহগোধিকা, টিকটিকী। (ব.শ.)। **৪.** 'স্থূলবৃষ্টিধারা' অর্থে **মুষলধারা** শব্দটি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. (শ, ষ, স** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।) **মুশল**াদি শব্দগুলির সংস্কার করা হয়নি। ফলে **মুশ, মুষ, মুস** একাকার হয়ে রয়েছে। একালে যাকে dictionary বা অভিধান বা শব্দার্থ-প্রকাশন গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে, সেকালে যাকে বলা হত **নিরুক্ত**, তার বৈশিষ্ট্য হল 'নির্ব্বচন করা'। বাংলাভাষার অধিকাংশ শব্দের ক্ষেত্রে সে কাজ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাভাষাজ্ঞানীরা কমবেশি করে গেছেন। কিন্তু **মুশল, মুষল, মুসল** প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে, যে কোনো কারণেই হোক, সে কাজটি করে রাখা হয়নি। সেকারণে ব.শ. তিন রকম বানানে লেখা শব্দ তিনটিকে একত্রে একস্থানেই ভুক্তি দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ, তিনটি শব্দকেই ব.শ. একার্থে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থের নিয়মানুসারে তিনটি পৃথক বানানে গড়ে ওঠা শব্দের একরকম অর্থ হতে পারে না। আমরা উপরে তিনরকম বানানে লেখা তিনটি পৃথক শব্দের তিনরকম ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ 'নির্ব্বচন' করার চেষ্টা করলাম। তবে একথা মনে রাখা ভাল যে, দেশ থেকে ঢেঁকির ব্যবহার উঠে গেছে, ফলে ঢেঁকির সামনে যে **মুষলটি** (= মোনা = pestle) ছিল, সেটিও সেকেলে হয়ে প্রায়-বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বাকি শব্দগুলির তো দেখাই মেলে না।

তা যাক। আমরা জানতে চাইব, শব্দগুলি কোন ধারণার আধার রূপে বাংলাভাষীর মুখে সৃজিত হয়েছিল। ঢেঁকির মুখের মোনাটিকে আলাদা করে খুলে নিলে যেটি পাওয়া যায়, সেটিকে **মুসল** বলা যায়। কিন্তু সেটি ঢেঁকির মুখে লেগে থাকলে এবং বারংবার পতিত হয়ে চালকে গুঁড়ো করলে, তাকে বলতে হয় **মুষল**। স্থূল ও অনবরত বৃষ্টিপাতকে স্বভাবতই **মুষলধারে** বৃষ্টিপাত বলা যায়। এ বিষয়ে ব.শ. ঠিকই লিখেছেন এবং জানিয়েছেন যে '**মুষলধারে** গালিবর্ষণ'ও হতে পারে। আজকাল তো **মুষলধারে** বাণীবর্ষণও হয়, বোমাবর্ষণও হয়। তবে বাস্তবে **মুশল** বলে কিছু হয় না; হতে পারত যদি সূর্যকিরণ **মুশলধারে** বিচ্ছুরিত হত। তা যখন হয় না, তখন **মুশল** কথাটি ঠিক নয়। কিন্তু মনোলোকে আমরা **মুশল**-জাতীয় একটি সত্তার সাক্ষাৎ পাই **মুশকিল** শব্দে। কোনো সত্তা যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায় যে, সর্বদিক থেকে **গদার** মতো **মুষল** এক সঙ্গে তেড়ে আসছে তাকে আঘাত করার জন্য, সেই অবস্থাকে বলা যায় **মুশকিলে** পড়ে যাওয়া। **মুশ** শব্দের ইত্যাকার উত্তরাধিকার আরবি ভাষার ছিল, সেটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাভাষীগণ তাকে চিনতে পারেন এবং আপন শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ...

তবে **শিব** ও **বলরাম**কে যে **মুষলী** বলা হত সেকথা একরকম ঠিক। **গদা**ও একরকম **মুষল**ই বটে, যদি তা ঢেঁকির **মুষলে**র মতো শত্রুর উপর বারংবার পতিত হয়। আমাদের মনে হয়েছে, আরবি **মুষলমান** ও ইংরেজি mussel, muscle প্রভৃতি শব্দ একই **মুষ্** ক্রিয়ামূলের বংশে জন্মেছে। ... **৬.** ইংরেজি mussel, muscle ... ইত্যাদি।

মুষিত (মুষড়া) : ১. ✓মুষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মুষিত** = **মুষ্** (নবরূপী সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) গতিশীলভাবে তারিত যাহা হইতে।* **মুষড়া** = ***মুষ্**-এর গড়ান-উড়ানের আধার যে।* **৩. মুষিত** = হৃত, চোরিত, খণ্ডিত, অপহৃত, হৃতসর্ব্বস্ব, রুদ্ধ, প্রলোভিত, হৃতদৃষ্টি, আকৃষ্ট (মনস্) বঞ্চিত, হৃতবুদ্ধি। **মুষড়া** = মুষিতবৎ হওয়া, উৎসাহহীন বা হতোদ্যম হওয়া, ম্লান হওয়া, শুষ্কপ্রায় হওয়া, আমরান। (ব.শ.)। **৪.** 'হতোদ্যম হওয়া' অর্থে **মুষড়া** শব্দটি প্রচলিত; **মুষিত** অপ্রচলিত। **৫.** রামবাবুর কিছু বীজধান আছে, বা, কিছু টাকা আছে, অথবা, কিছু বুদ্ধি আছে, কিংবা, কিছু উদ্যম আছে। এ হল তাঁর অস্তিত্বের একটি সীমায়িত রূপ (= **ম**)। তিনি ঠিক করলেন, সেই বীজধান তিনি মাঠে ছড়িয়ে দেবেন; কিংবা, সেই টাকা তিনি ব্যবসায় ঢালবেন; অথবা, সেই বুদ্ধি তিনি খরচ করবেন ... ইত্যাদি। অর্থাৎ, তাঁর সেই সীমায়িত রূপ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে কাজে পরিণত হবে (= **মুষ্**)। রামবাবুর সেই ইচ্ছা কাজে রূপায়িত হল (= **মুষিত**)। ফলত, রামবাবু এখন বীজধানহীন, টাকাহীন, বুদ্ধিহীন, উদ্যমহীন ... ইত্যাদি। তাই ব.শ. মতে **মুষিত**-রামবাবুকে এখন 'হৃত, চোরিত, খণ্ডিত, অপহৃত, হৃতসর্ব্বস্ব, রুদ্ধ, প্রলোভিত, হৃতদৃষ্টি, আকৃষ্ট (মনস্) বঞ্চিত, হৃতবুদ্ধি' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করাই উচিত। স্বভাবতই রামবাবু **মুষড়ে** পড়বেন, 'মুষিতবৎ হয়ে' পড়বেন, 'উৎসাহহীন বা হতোদ্যম হয়ে' পড়বেন, 'ম্লান হয়ে' পড়বেন, 'শুষ্কপ্রায় হয়ে' যাবেন, 'আমরে যাবেন'; তাতে আর বিচিত্র কী! ... **৬.** ইংরেজি muse, music ... ইত্যাদি।

মুষ্টি (মুষ্টিক, মুষ্টিবিসর্গ, মুষ্টিমেয়, মুষ্টিযোগ) : ১. ✓মুষ্ + তি (ক্তিচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. মুষ্টি** = ***মুষ** গতিশীলভাবে টঙ্কারিত যাহাতে।* **মুষ্টিক** = ***মুষ্টি** করে যে বা কৃত যাহাতে।* ***মুষ্টিবিসর্গ** = **মুষ্টি**র বিপরীত সর্গ যাহাতে।* **মুষ্টিমেয়** = ***মুষ্টি** দ্বারা পরিমেয় যে বা যাহা।* **মুষ্টিযোগ** = ***মুষ্টি**র যোগ থাকে যাহাতে।* / **মুষ্টি** = যাহা দ্বারা অঙ্গুলি মুষিত হয়। **মুষ্টিক** = শত্রুবলকে মোষণ করে যে; মোষণকে প্র-যোজন করে যে। (ব.শ.)। **৩. মুষ্টি** = মুষিতাঙ্গুলি পাণি, বদ্ধপাণি, মুঠা ... ইত্যাদি। **মুষ্টিক** = কংসমল্লবিশেষ (মুষ্টিক বলরাম কর্ত্তৃক মল্লযুদ্ধে নিহত হন), হস্তের অবস্থানভেদ, স্বর্ণকার, নীচজাতিবিশেষ, ডোম, একস্থানে মুষ্টিপাতের ভাব দেখাইয়া অন্যত্র মুষ্টিপাতন, মুষ্টিযুদ্ধভেদ। **মুষ্টিবিসর্গ** = মুষ্টিবিশ্লেষ, মুঠা খোলা। **মুষ্টিমেয়** = মুষ্টিপরিমিত, মুষ্টিগ্রাহ্য। **মুষ্টিযোগ** = বিশেষ পরিমাণ বকালের যোগে প্রস্তুত ঔষধ, টোটকা।

(ব.শ.)। ৪. **মুষ্টি** ও **মুষ্টিমেয়** যথার্থে প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **গজ, অঙ্গুলি**। মুঠো সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখন যেরকমই হোক না কেন, প্রাচীন বাংলাভাষীগণ **মুষ্টি** বলতে অন্যরকম বুঝতেন। **করী** ও **অঙ্গুলি** শব্দে আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রের আমলা রাষ্ট্রশরীরের হাতের ভূমিকা পালন করে এবং সেই আমলার অধীন কর্মচারীরা সেই হাতের আঙুলের ভূমিকা পালন করে। সেই আমলার কর্মচারীরা যদি কাজ সেরে এসে আমলাকে কাজের ফলাফল জানায় তাতে যে ক্রিয়াটি বোঝায়, সেটিই হল **মুষ্টি**-করণ। সাদৃশ্যে সেটিই হাত মুঠো করা। তাতে **অঙ্গুলি** হস্তে ফিরে এসে টঙ্কারিত হয় বলেই তাকে **মুষ্টি** বলে। সেই দিয়ে যে পরিমাপন কর্ম হয়, তাকে বলে **মুষ্টিমেয়**। আঙুলগুলিকে একত্র করে 'মুঠো করা'কে সেকালে নিশ্চয় **মুষ্টিসর্গ**ও বলা হত। নইলে **মুষ্টিবিসর্গ** শব্দের মানে কেন 'মুঠো খোলা' হবে। আর বল্কল বা গাছের ছাল ইত্যাদি মুঠোর মধ্যে রেখে, সেগুলি কী বস্তু তা কাউকে দেখতে না-দিয়ে সেই **মুষ্টিবদ্ধ** বস্তুর সংযোগে কোনো প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করলে তাকে বলা হত **মুষ্টিযোগ**। ... ৬. ইংরেজি most, must ... ইত্যাদি।

মূষিক : ১. ✓মুষ্ + ইক (কিকন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মূষ** *(নবরূপী সীমায়িতের আধারের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) সক্রিয় বা গতিশীল করে যে বা কৃত যাহাতে।* ৩. ইন্দুর, চৌর। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **উন্দুর, গণেশ**। চাষীদের উৎপন্ন **মুষ মুষ** করে একটু একটু কেটে কেটে জমা করে যে, তাকে বলে **মূষিক**। সেকালের সরকারি কেরানিকুলকে বলা হত **মূষিক**। এঁরা **গণেশ** সত্তার **বাহন**। সাদৃশ্যে সেটি mouse-কে বোঝায়। ... ৬. ইংরেজি mouse।

মুহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অওঁধা, অবমূর্দ্ধা, অমোঘ, উপুড়, বিমুগ্ধ, বিমূঢ়, মুগধ, মুগধল, মুগধি, মুগধিনী, মুগধী, মুগসাউলী, মুগা, মুগুধা, মুগুধিনি, মুগুধিনী, মুগ্ধ, মুগ্ধকর, মুগ্ধতা, মুগ্ধত্ব, মুগ্ধদৃক্, মুগ্ধধী, মুগ্ধবধূ, মুগ্ধবিলোকিত, মুগ্ধবুদ্ধি, মুগ্ধবোধ, মুগ্ধভাব, মুগ্ধমতি, মুগ্ধস্বভাব, মুগ্ধাক্ষী, মুগ্ধাগ্রণী, মুগ্ধানন, মুগ্ধালোক, মুগ্ধেন্দু, মুদো, মুরুক্ষ (মুরুখ, মুরুখ্যু), মুরুগা, মুহ্, মুহ, মুহরি (মুহরী, মুহরীর, মুহুরি, মুহুরিগিরী, মুহুরী, মোহরের), মুহান (মুহানা, মোহনা, মোহান, মোহানা), মুহির, মুহুঃ, মুহুর্মুহুঃ, মুহুর্ভাষা, মুহূর্ত্ত (দ্র. হুর্চ্ছ), মুহ্যমান, মূঢ়, মূঢ়গর্ভ, মূঢ়গ্রাহ, মূঢ়চেতন, মূঢ়চেতাঃ, মূঢ়ধান্য, মূঢ়প্রভু, মূঢ়বুদ্ধি, মূঢ়মতি, মূঢ়যোনি, মূঢ়া, মূঢ়াত্মা, মূরখ (মুরুখ), মূর্খ, মূর্খতা, মূর্খমণ্ডল, মূর্খরাজ, মূর্খশত, মূর্দ্ধ, মূর্দ্ধক, মূর্দ্ধন্য, মূর্দ্ধা, মূর্দ্ধাজ, মূর্দ্ধাধর, মূর্দ্ধান্ত, মূর্দ্ধাপিণ্ড, মূর্দ্ধাবসিক্ত, মূর্দ্ধাবেষ্টন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মূর্দ্ধাভিষেক, মূর্দ্ধনিবর্ত্তী, মাঘ, মো, মোঘ, মোঘকর্ম্মা, মোঘজ্ঞান, মোঘপুষ্পা, মোঘবৃত্তি, মোঘহাসী, মোঘা, মোঘাশ, মোহ, মোহক, মোহকলিল, মোহকে, মোহজাল, মোহন, মোহনকাজল, মোহনপাক, মোহনভোগ, মোহনমন্দির, মোহনমালা, মোহনলাল, মোহনা, মোহনাস্ত্র, মোহনিঞা (মোহনিয়া), মোহনিদ্রা, মোহনী, মোহনীয়, মোহপাশ, মোহমন্ত্র, মোহর, মোহরাত্রি, মোহান্ত, মোহিত, মোহিনী, মোহী, মোহে, মোহোঁ, মৌগ্ধ্য, মৌঢ্য, মৌর্খ্য, সম্মোহন, সম্মোহনী, সম্মোহিত।

মুহ্ = নবরূপী সীমায়িতের হওয়ন। **মুহ** = নবরূপী সীমায়িতের হওয়ন যাহাতে। (হিন্দিতে 'মুখ'কে বলে 'মুহ্'। এইখান দিয়ে সত্তার সীমায়িত রূপটি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে বেরোয় বা স্বরূপ লাভ করে; মানুষের ক্ষেত্রে সেই **মুহ** তার কথা, শব্দ, বাক্য, গান ইত্যাদি হতে পারে। অর্থাৎ, **মুহ্** মানে সীমায়িতের নবরূপ লাভ করে বিশেষ পথ ধরে বেরোনো বা আবির্ভূত হওয়া বা স্বরূপ লাভ করা। সেই কারণে সেই পথটিকেও **মুহানা** বলে।)

অমোঘ (অমোঘা) : ১. দ্র. **মোঘ**। ২. ***অমোঘ*** *= যে মোঘ (= মোহতে গত ও স্থিত) নহে।* ***অমোঘা*** *=* ***অমোঘ****-এর আধার যে; অথবা, যে নিশ্চয় মোহগ্রস্ত হয় না, এমন প্রকৃতি।* / **অমোঘ** = সত্য সঙ্কল্প যাহার। (ব.শ.)। ৩. **অমোঘ** = অব্যর্থ, অবন্ধ্য, উৎপাদনশীল, অক্ষীণ, যথার্থ, সার্থক, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়। **অমোঘা** = পাটলিবৃক্ষ, পারুল, পটোললতা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, বীজাক্ষর 'ক্ষ', শক্তিবিশেষ, শিবপত্নী, দুর্গা। (ব.শ.)। মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। ব্রহ্মা তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গম প্রার্থনা করলে তিনি রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে, ব্রহ্মা তার বীর্য স্খলিত করে প্রস্থান করেন। শান্তনু সে কথা শুনে স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। যাহোক, স্খলিত বীর্যের তেজোপ্রভাবে অমোঘার গর্ভসঞ্চার হল এবং কালক্রমে ব্রহ্মার মতো জলরাশি সমেত এক পুত্র জন্মাল। শান্তনু সেই জল একটি কুণ্ডের মধ্যে রেখে দিলেন, এবং ক্রমে সেই জল বৃদ্ধি পেয়ে এক নদের সৃষ্টি হল; সেই নদের নাম ব্রহ্মপুত্র। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **জলন্ধর**। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের মনোলোকে বেদজীবীদের জ্ঞানসম্পদের যে ধারা প্রবাহিত, তাকে বলে **ব্রহ্মপুত্র**। সাদৃশ্যে সেটি **মানস-সরোবর** থেকে জাত **ব্রহ্মপুত্র** নদীকে বোঝানো হয়ে থাকে। বাস্তবের সেই নদীর জন্মকথা এখানে বলা হচ্ছে না, **অমোঘার** কাহিনীর মাধ্যমে মনোলোকের সেই অদৃশ্য জ্ঞানধারার জন্মকথা বিবৃত হয়েছে।

মুগ্ধ, মূঢ় (মুগ্ধবোধ, মুগ্ধভাব, মুগ্ধমতি, মূর্খ — বিমুগ্ধ, বিমূঢ়) : ১. **মুগ্ধ, মূঢ়** = ✓মুহ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মুগ্ধ** *=* ***মু****-এর (নবরূপী সীমায়িতের) গমন ধারিত যাহাতে।* ***মূঢ়*** *=* ***মু****-এর আধারের গড়ান স্থির যাহাতে।* ***মুগ্ধবোধ*** *= যাহা দ্বারা* ***মুগ্ধের*** *বোধ ঘটে।* ***মূর্খ*** *=* ***মু****-এর আধারের আবর্ত্তন যাহাতে (যে শূন্য অবস্থায়)।* ***বিমুগ্ধ*** *= বিশেষরূপে বা বিপরীতভাবে* ***মুগ্ধ*** *যে।* ***বিমূঢ়*** *= বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে* ***মূঢ়*** *যে।* / **মুগ্ধবোধ** = মূঢ়ের বোধয়িতা (মূঢ়কে বুঝিয়ে দেয় যে)। **মূর্খ** = মোহকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে। (ব.শ.)। ৩. **মুগ্ধ** = মূঢ়, অবিবেক, সরল, অকপট, রতিকলা-অনভিজ্ঞ, মৃদু, কোমল, মোহন, সুন্দর। **মূঢ়** = মোহপ্রাপ্ত, অবিবেকী, তত্ত্বজ্ঞানহীন, কার্য্যপরিজ্ঞানহীন, স্নেহানুবন্ধ হেতু মুগ্ধ, নীচ, মূর্খ ... ইত্যাদি। **মুগ্ধবোধ** = ব্যোপদেবকৃত ব্যাকরণ। **মুগ্ধভাব** = মূঢ়তা, সরলভাব। **মুগ্ধমতি** = মূর্খ। **মূর্খ** = মূঢ়, বালিশ, অজ্ঞ, অপরিপক্কবুদ্ধি,

গায়ত্রীরহিত, মন্দধী, বিদ্যাহীন জন ... ইত্যাদি। **বিমুগ্ধ** = বিমোহপ্রাপ্ত, বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, হতবুদ্ধি। **বিমূঢ়** = বিমুগ্ধ, স্বরূপ-বিবেক-অসমর্থ, বিক্ষিপ্ত, রাগদ্বেষাদিদূষিত, বঞ্চিত, বিবেকহীন, হতবুদ্ধি। (ব.শ.)। **৪. মুগ্ধ, বিমুগ্ধ, বিমূঢ়** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অবস্থা, মুহান**। 'চিন্তাভাবনার স্থির এলাকা বা ঘেরাটোপ' মাত্রেই পুকুরের মতো; আর, কার্যত ধনসম্পদ জ্ঞানসম্পদ রূপসম্পদ — এসবেরও পুকুর হয়। লোকে এসবেও ডুবে থাকতে পারে। এ হল ধনের, জ্ঞানের, রূপের নেশায় ডুবে থাকা। এমনকি বিশেষ বিশেষ খাদ্যসম্পদের নেশায়, বিশেষ বিশেষ কাপড়চোপড় পরার নেশায়, বিশেষ ধরনের বাড়িঘর বানিয়ে তাতে থাকার নেশাতেও মানুষ নেশাগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া, গাছের নেশা, মাছের নেশা, কাজের নেশা, কবিতার নেশা, গানের নেশা, ছবির নেশা, গল্পের নেশা, ক্যামেরার নেশা, কমপিউটারের নেশা ... এরকম হাজার হাজার নেশা আছে। তবে সে সবে নেশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য নেশালাগা বস্তু বা বিষয়টির পুকুরের মতো একটি ক্ষুদ্র ও ঘেরা এলাকা দরকার হয়, কোনো মানুষ যে পুকুরের ভিতরে ঢুকে তাতে ডুবে থাকতে পারে। একেই আমরা বলেছি 'চিন্তাভাবনার স্থির এলাকা বা ঘেরাটোপ'। যেহেতু এগুলির স্বভাব ঘেরাটোপে বন্দী পুকুরের জলের মতো হয়, একে আপনি 'ভাব-পুকুর' বলতে পারেন। আর, গ্রামদেশে যা হয়, প্রতিটি পুকুরের কমপক্ষে একটি করে **মুহান** বা **মোহনা** থাকে; সেইরকম এই 'ভাব-পুকুর'গুলিরও এক বা একাধিক **মুহান** থাকে। কেউ যদি সেরকম কোনো একটি 'ভাব-পুকুরে'র **মুহান** দিয়ে **মুহ্** করে ভিতরে ঢুকে সেই 'ভাব-পুকুরে'র ভাব-জলে ডুবে থাকে, তাকে বলা হয় **মুগ্ধ**। আর, ডুবতে ডুবতে যদি একেবারে তলিয়ে গিয়ে 'ভাব-পঙ্কে' নিমজ্জিত হয়ে স্থির হয়ে যায়, তাকে বলে **মূঢ়**। সেই **মূঢ়** অবস্থায় **বর্ত্তমান** থাকতে থাকতে যার ভিতরে চিন্তাভাবনা বিলুপ্ত হয়ে মনটা তার ফাঁকা বা শূন্য হয়ে যায়, তাকেই **মূর্খ** বলে। তার মানে, একালে আমরা যেমন **মূর্খ** বললে 'বোকা' বা fool বুঝি, **মূর্খ** সেরকম সস্তা নয়। কোনো না কোনো 'ভাব-পঙ্কে' নিমজ্জিত ও দীর্ঘকাল তদ্রূপে স্থির থাকা চিন্তাভাবনাহীন শূন্য মনের মানুষকে **মূর্খ** বলে।

তবে কিনা অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো 'ভাব-পুকুরে'র 'ভাব-জলে' বা 'ভাব-রসে' ডুবেই থাকেন, তা সে সংসারের 'ভাব-রস' হোক, জ্ঞানের ধনের রূপের কাজের কবিতার গানের ছবির ... বা অন্য যে কোনো ধরনের 'ভাব-রস'ই হোক। কিন্তু কেউ যদি নিজের 'ভাব-পুকুরে'র **মোহনা** দিয়ে বেরিয়ে অন্য কোনো বিপরীত বা বিশেষ স্বভাবের 'ভাব-পুকুরে'র 'ভাব-রসে' গিয়ে ডুবে যান, তখন তাঁকে **বিমুগ্ধ** বলে। আর, যদি সেখানে ডুবতে ডুবতে একেবারে 'ভাব-পঙ্কে' নিমজ্জিত হয়ে যান, তাঁকে বলা হবে **বিমূঢ়**। সেই সুবাদে **বিমূর্খ** মানুষও হতে পারেন। কিন্তু **মূর্খে** আর **বিমূর্খে** কার্যত কোনো ফারাক থাকে না বলেই **বিমূর্খ** শব্দটির প্রচলন হয়নি।

মুহান (মুহানা, মোহনা, মোহান, মোহ্না) : **১.** মুহ + হান (থান > হান) > মুহান, মুহানা, মোহন, মোহনা, মোহান। (ব.শ.)। **২.** ***মুহান*** = ***মুহ*** *অন (on) যাহাতে।* **৩. মুহান** = নদী-প্রভৃতির মুখস্থান, অর্থাৎ জলপ্রবেশ ও জলনির্গমনের পথ। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় প্রচলিত। **৫.** দ্র. **মুগ্ধ**। এই শব্দগুলির সংস্কার করা হয়নি। ফলে এগুলি বিভিন্ন বানানে পাওয়া যায়। শহরে বা অ্যাকাডেমিতে এই শব্দগুলির প্রচলন নাই, একমাত্র **মোহনা** ছাড়া এবং তাও ভূগোলের বইতে। গ্রামবাংলার মানুষ জানেন, প্রতিটি পুকুরের একদিকে একটি **মোহনা** থাকে। তাঁরা একে **মুহান, মুহানা, মোহনা** ... ইত্যাদি বলে থাকেন। সেই **মোহনা** দিয়ে প্রয়োজনে বাইরের জল এনে পুকুরে ঢোকানো হয় এবং বর্ষাকালে 'পুকুর ভেসে' গেলে সব মাছ পালিয়ে যাবে ব'লে ঐ **মোহনা**তে জাল দিয়ে ঘিরে পুকুরের জল বের করে দেওয়া হয়। নদী যেখানে গিয়ে সাগরে পড়ে সে স্থানটিকে যে **মোহনা** বলে, সেকথা সবাই জানেন। যেখানে নদী দু-তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়, সেই সন্ধিস্থলকে কোনো কোনো অঞ্চলে 'দো**মোহনী**' 'তে**মোহনী**' ... ইত্যাদি বলে। মধ্যযুগের সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে ব.শ. দেখিয়েছেন, **মুহান, মোহনা, মোহান** প্রভৃতি শব্দ এমনকি মনোলোকের অদৃশ্য **মোহনা** বোঝাতেও ব্যবহৃত হত। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন — 'খুলে যায় প্রাণের **মোহানা**'।

মোঘ (মোঘপুষ্পা, মোঘবৃত্তি, মোঘা) : **১.** ✓মুহ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মোঘ*** = ***মোহ****-তে গত ও স্থিত যে।* ***মোঘপুষ্পা*** = ***মোঘ*** *যে* ***পুষ্পিনী****।* ***মোঘবৃত্তি*** = ***মোঘ*** *বৃত্তি যাহার।* ***মোঘা*** = ***মোঘ****-এর আধার যে।* / **মোঘ** = মোহস্থান হইতে ভূত। (ব.শ.)। **৩. মোঘ** = ব্যর্থ, নিষ্ফল, পরাঙ্মুখ, ত্যক্ত, দীন, প্রাচীর, নিরর্থক, বৃথা। **মোঘপুষ্পা** = ব্যর্থরজস্কা, বন্ধ্যা। **মোঘবৃত্তি** = ব্যর্থব্যাপার। **মোঘা** = পাটলা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. মোঘ** যুক্ত কত শব্দ যে আমাদের ছিল, সেগুলির সবই এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে। দ্র. **অমোঘা**।

মোহ (মোহন, মোহনী, মোহিত, মোহিনী, মোহী) : **১.** ✓মুহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মোহ*** = ***মুহ্****-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যে।* ***মোহন*** = ***মোহ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মোহনী*** = ***মোহন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মোহিত*** = ***মোহ*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***মোহিনী*** = ***মোহ*** *গতিশীলভাবে অনকৃত যে আধারে।* ***মোহী*** = ***মোহ****-এর গতিশীল আধার যে।* / **মোহন** = যাহা দ্বারা মোহ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. মোহ** = অবিবেক, মিথ্যাভিনিবেশ, শাস্ত্রাবিবেক, চিত্তবৈকল্য ... ইত্যাদি; মোহিত করা, আকৃষ্ট করা, অভিভূত করা। **মোহন** = মোহজনক, মোহকর, বিভ্রমজনক ... ইত্যাদি। **মোহনী** = মায়া। **মোহিত** = প্রাপিতমোহ, অভিভূত, মূঢ়বুদ্ধি ... ইত্যাদি। **মোহিনী** = মনোহারিণী নারী, ভগবানের মনোহর স্ত্রীরূপ অবতারবিশেষ, অপ্সরোবিশেষ, মায়াবিদ্যাবিশেষ, মল্লিকা-বিশেষ, মায়াবিনী, প্রিয়া। **মোহী** = মোহয়িতা, মনোমোহকর, ভ্রান্তিকর। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মূ (মূর্চ্ছ্, মূর্ত্ত, মূল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের

তালিকা : অমূর্ত্ত, অমূর্ত্তগুণ, অমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান, অমূল, অমূলক, অমূল্য, আমূল, আমূলক, আমূলশিরঃপর্যন্ত, জীমূতবাহন, মউল, মুর(রু)ছ, মুরছা, মুরছান, মুরত, মুরতি, মুলতবি (মুলতুবি), মুলতান, মুলতানী, মুলা (মুলো, মূলা, মূলো), মুলাকাত (মোলাকাত), মুলিবাঁশ, মুল্‌ক (মুলুক, মুল্লুক), মুল্লা (মোল্লা, দ্র.মল্‌), মুহুর্চ্ছিত (মুহুর্চ্চিত, মুহুশ্চিত, মুহূর্চ্ছিত), মৃ, মৃক, মৃকতা, মৃকত্ব, মৃকাগুজ, মৃত, মৃতা, মৃতান, মৃত্‌র্‌, মৃত্র, মৃত্রকর, মৃত্রকৃচ্ছ্র, মৃত্রকোশ, মৃত্রক্ষয়, মৃত্রজঠর, মৃত্রদোষ, মৃত্রনিরোধ, মৃত্রপথ, মৃত্রপরীক্ষা, মৃত্রপুট, মৃত্রপ্রসেক, মৃত্রবর্দ্ধক, মৃত্রবহ, মৃত্রমার্গ, মৃত্ররোধ, মৃত্রশূল, মৃত্রসংক্ষয়, মৃত্রসঙ্গ, মৃত্রাঘাত, মৃত্রাতিসার, মৃত্রার্ত্তি, মৃত্রাশয়, মৃত্রিত, মৃত্রোৎসর্গ, মৃরছ, মৃরছা, মৃরছান, মৃরত, মৃরতি, মৃর্চ্ছ্‌, মৃর্চ্ছ, মৃর্চ্ছন, মৃর্চ্ছনা, মৃর্চ্ছমান, মৃর্চ্ছল, মৃর্চ্ছা, মৃর্চ্ছাগতি, মৃর্চ্ছাপগম, মৃর্চ্ছাপন্ন, মৃর্চ্ছাপরিপ্লুত, মৃর্চ্ছাপরীত, মৃর্চ্ছাপ্রদ, মৃর্চ্ছাল, মৃর্চ্ছিত, মৃর্ত্ত, মৃর্ত্তি, মর্ত্তিধর, মর্ত্তিবিঘ্নেশ, মর্ত্তিমৎ, মর্ত্তিমতী, মৃর্ত্তিমন্ত, মর্ত্তিমান, মর্ত্তিসঞ্চর, মর্ত্তিসেবন, মৃর্ব্ব্‌, মৃর্ব্বা, মৃর্ব্বিকা, মৃর্ব্বী, মৃল্‌, মৃল, মৃলক, মৃলকপণ, মৃলকর্ম্ম, মৃলকর্ম্মন্‌, মৃলকার, মৃলকারণ, মৃলকারিকা, মৃলকৃচ্ছ্র, মৃলখানক, মৃলগুণ, মৃলগ্রন্থ, মৃলচ্ছিন্ন, মৃলচ্ছেদ, মৃলজ, মৃলজাতি, মৃলত্রিকোণ, মৃলধন, মৃলধাতু, মৃলনগর, মৃলপুরুষ, মৃলপ্রকৃতি, মৃলবচন, মৃলবিত্ত, মৃলবিনাশন, মৃলব্যসনবৃত্তি, মৃলব্রতী, মৃলভব, মৃলভৃত্য, মৃলমন্ত্র, মৃলরাশি, মৃলশকুন, মৃলসাধন, মৃলস্থান, মৃলস্রোতঃ, মৃলস্বামী, মৃলহর, মৃলা (মৃলো, মৃলাইয়া), মৃলাধার, মৃলান, মৃলায়তন, মৃলিক, মৃলী, মৃলীকরণ, মৃলোচ্ছেদ, মৃলোৎখাত, মৃলোৎপাটন, মৃল্য, মৃল্যক, মৃল্যবান, মৌর্ব্ব, মৌর্ব্বী, মৌর্ব্বীকিণ, মৌর্ব্বীমেখলী, মৌল, মৌলবিবাদ, মৌলবী, মৌলি (মৌলী), মৌলিক, মৌলিপৃষ্ঠ, মৌলিমণি, মৌলিমণ্ডন, মৌলিমালা, মৌলিমালিক, মৌলী, মৌলীন্দু, শতমূল, সমূলক।

মৃ (মূর্চ্ছ্‌, মূর্ত্ত্‌, মূল্‌) = নবরূপী সীমায়িতের আধার যে। **মূর্চ্ছ** = নবরূপী সীমায়িতের আধারের রক্ষণ চয়ন ছাদিত যাহাতে। **মূর্ত্ত** = নবরূপী সীমায়িতের আধারের তরণ তারিত যাহাতে। **মূল** = নবরূপী সীমায়িতের আধারের লালন-লয়ন যাহাতে।

মূক : ১. ✓মৃ + ক (কক্‌) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মৃ মৃ** *(উপরে দ্রষ্টব্য) করে যে।* / বদ্ধ বাক যাহার। (ব.শ.)। ৩. বাক্যরহিত, অবাক, বোবা ... ইত্যাদি। ৪. dumb অর্থে প্রচলিত। ৫. ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি, কোনো সীমায়িত সত্তা, তা সে ইচ্ছা, কথা, গান ... যাই হোক না কেন, তাকে বলে **ম**। সেই ইচ্ছা কথা ইত্যাদি আর সীমায়িত না হয়ে, যতটা হয়েছে ততখানিই নবরূপে উত্তীর্ণ হয় বা বলার জন্য তৈরি হয়ে আসে তাকে **মু** বলে। সেই **মু**-কে কোনো আধার যদি ধারণ করে তবে তাকে **মৃ** বলা হয়। তখন সেই ইচ্ছা, কথা, গান ... ইত্যাদি আর মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না। সেই কারণে '**মৃ মৃ** করে যে', তাকে **মূক** বা 'রুদ্ধবাক' বলে। তার মানে, **মূক** বলতে আসলে সেই সত্তাকে বোঝায়, যার বলার কথা মুখে এসে আটকে আছে, তাই সে **মৃ মৃ** করছে, কিন্তু বলতে পারছে না। দ্র. **বধির**। ... ৬. ইংরেজি mute।

মূর্চ্ছা (মূর্চ্ছ, মূর্চ্ছন, মূর্চ্ছনা) : ১. ✓মূর্চ্ছ্‌ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্‌)। (ব.শ.)। ২. **মূর্চ্ছ** = ***মূর*** *(নবরূপী সীমায়িতের আবর্ত্তন) ছাদিত যাহাতে।* ***মূর্চ্ছন*** = ***মূর্চ্ছ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মূর্চ্ছনা*** = ***মূর্চ্ছন****-এর আধার যে।* ***মূর্চ্ছা*** = ***মূর্চ্ছ****-এর আধার যে।* ৩. **মূর্চ্ছ** = মূর্চ্ছিত হওয়া, বিহ্বল হওয়া, মূর্চ্ছিত করা, অচেতন করা। **মূর্চ্ছন** = মোহকর, বর্দ্ধন, বিশ্বামিত্রের অস্ত্রবিশেষ, কামের অস্ত্রবিশেষ, মূর্চ্ছা, মোহ, উচ্ছ্রায়, গন্ধকের যোগে পারদভস্মীভাব। **মূর্চ্ছনা** = গীতাঙ্গবিশেষ, স্বরের আরোহঅবরোহক্রমভেদ ... ইত্যাদি। **মূর্চ্ছা** = কশ্মল, মোহ, উচ্ছ্রায়, মূর্চ্ছনা। (ব.শ.)। ৪. **মূর্চ্ছ** অপ্রচলিত, বাকি তিনটি শব্দ কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মূক**, **মূর্খ**, **মূঢ়**, **মোহ**। **মৃ** কাকে বলে সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই **মৃ**-এর আবর্ত্তন থাকে **মূর্‌**-এ। সেই **মূর্‌**-কে ছাদিত করে দিলে সত্তাটি **মূর্চ্ছা** যায়। **মূঢ়** ও **মূর্খ**-তে 'জ্ঞানরহিতীভাব' তো ছিলই, **মূর্চ্ছা**-তে সেই জ্ঞান একেবারে চেপে-ঢেকে দেওয়া হয়। খুব সহজ করে বুঝতে চাইলে এরকম ভাবলেও চলে যে, '**বর্ত্তমান**-চেতনা'কে বা **মূর**-কে খেয়ে নেয় যে, সে হল **মূর্খ**; আর, **মূর**-কে আচ্ছাদিত রাখে যে, সে হল **মূর্চ্ছ**। তার মানে, এসব শব্দ হল **মুহ্‌** ক্রিয়ামূলের শব্দবংশের শাখাবংশে জাত কয়েকটি শব্দ।

মূর্ত্ত (মূর্ত্তি, মর্ত্তিধর, মর্ত্তিসেবন — অমূর্ত্ত) : ১. ✓মূর্চ্ছ্‌ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মূর্ত্ত** = ***মূর্‌****-কে (নবরূপী সীমায়িতের আবর্ত্তমানতাকে) তারণ করে যে।* ***মূর্ত্তি*** = ***মূর্ত্ত*** *গতিশীল যাহাতে।* ***মর্ত্তিধর*** = ***মূর্ত্তি*** *ধরে যে।* ***মর্ত্তিসেবন*** = ***মূর্ত্তির*** *সেবা অন (on) যাহাতে।* ***অমূর্ত্ত*** = *যাহা* ***মূর্ত্ত*** *(পরিচ্ছিন্ন) নহে।* / **মূর্ত্তি** = যাহা বাড়ে। (ব.শ.)। ৩. **মূর্ত্ত** = মোহপ্রাপ্ত, মূর্চ্ছিত, মূঢ়, মূর্ত্তিমান, শরীরী, পরিচ্ছিন্ন, কঠিন, ভূতাত্মক, ভৌতিক। **মূর্ত্তি** = তনু, দেহ, শরীর, শরীরাবয়ব, অবতার, আকৃতি, স্বরূপ, শরীরপার্থিবভাগ ... ইত্যাদি। **মর্ত্তিধর** = শরীরধারক। **মর্ত্তিসেবন** = মূর্ত্তিপূজা। **অমূর্ত্ত** = মূর্ত্তভিন্ন, অবয়বহীন, অপরিচ্ছিন্নপরিমাণ, অরূপ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. **মূর্ত্ত, মূর্ত্তি, অমূর্ত্ত** শব্দ তিনটি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ এখন অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **প্রতিমা**। ভাবনার কথা এই যে, **মূর্ত্ত** শব্দটি তৈরি করার সময় **মৃ** ক্রিয়ার উপর নির্ভর করলেই চলত। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিরা, দেখা যাচ্ছে, তা না করে **মূর্চ্ছ্‌** ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শব্দটি নির্ব্বচন করেছেন। কেন এমন করতে গেলেন তাঁরা? **মূর্‌** তারিত হলেও তো **মূর্ত্ত** হতে পারে।

হ্যাঁ, **মৃ** ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শব্দটি তৈরি করা যায় বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। মৃ-ক্রিয়াজাত **মূর্‌** দিয়ে **মূর্ত্ত** শব্দ বানালে সেই **মূর্ত্ত** হয়ে যেত অপরিবর্তনীয় কোনো সত্তা। বাস্তবে সেরকম কোনো সত্তাই হয় না। আর, সেকালের বাংলাভাষী তো এমন **মূর্ত্তি** বা **মর্ত্তিধর**-এর কথা ভেবেছিলেন, যে কিনা ভিতরে ভিতরে প্রাণবন্ত, 'যে বাড়ে' কিংবা কমে। **মূর্‌**-এর ভিতরে সেটি থাকে না, কিন্তু **মূর্চ্ছ্‌** ক্রিয়ার ভিতরে সেই সম্ভাবনা ধরা থাকে, তার ভিতরে প্রাণ থাকে আচ্ছাদিত হয়ে। তাঁদের মতে **মূর্চ্ছিতই মূর্ত্ত**; ভেতরে তার প্রাণ রয়েছে। নির্ব্বচনের ক্ষেত্রে তার পরেও যে **মূর্‌ (মূর্‌-ত)** দেখা যাচ্ছে, সে হল আসলে **চ্ছ**-কে উহ্য

করে রাখা হয়েছে ব'লে। ব.শ. তাই শব্দটির অর্থ দিয়েছেন 'মোহপ্রাপ্ত', 'মূর্চ্ছিত', 'মূঢ়' ... ইত্যাদি। অর্থাৎ, **মূর্ত্ত** মানে, সে শবের মতো শরীরটুকুই মাত্র নয়, তার ভিতরে প্রাণ বা তজ্জাতীয় পরিবর্তনশীল সত্তা রয়েছে ছাদিত হয়ে। সেকারণেই আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীগণ **মূর্ত্ত** ও **মূর্ত্তি** শব্দকে **মূর্চ্ছ্** ক্রিয়া-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

ব.শ. জানিয়েছেন, **মূর্ত্ত** হল 'পরিচ্ছিন্ন' এবং **অমূর্ত্ত** হল 'অপরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ'। তার মানে, সেকালের শব্দবিদগণ মনে করতেন, এই বিশ্বজগৎ ছিল আছে থাকে 'অনবচ্ছিন্ন' এক সামগ্রিক সত্তা রূপে; তার ভিতর থেকে কিছু কিছু অংশ 'পরিচ্ছিন্ন' বা 'অবচ্ছিন্ন' হয়ে পৃথক দেহধারণ করে, সেটিই **মূর্ত্ত**। বিশ্বের সকল **মূর্ত্তিমান** সত্তাগুলি সেভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে; একদিন সেই অনবচ্ছিন্নতাতেই তারা প্রত্যেকেই মিলিয়ে যাবে। স্বভাবতই **অমূর্ত্ত** হল সেই সত্তা, যে পুনরায় সেই 'অপরিচ্ছিন্ন-পরিমাণে' মিশে গিয়ে 'অনবচ্ছিন্ন' হয়েই থাকে।

মূল : ১. ✓মূ + ল (ক্ল) - কর্তৃবাচ্যে; ✓মূল্ + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মূ** *(নবরূপী সীমায়িতের আধার) লালিত যাহাতে।* / বৃক্ষাদির বন্ধন করে যে; বৃক্ষাদির স্থিতি সাধন করে যে; যে স্বামী না হইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে; পটাদির উৎপাদনার্থ বণিক যে সকল দ্রব্য বিনিয়োগ করে। (ব.শ.)। ৩. শিফা (শিকড়), মূলা (radish), শূরণ, পিপ্পলীমূল, বৃক্ষাদির নিম্নতম ভাগ, পাদদেশ, পাদ (চরণ), দিক্‌প্রান্ত, আরম্ভ, প্রতিষ্ঠা, উৎপত্তিস্থান, আদিগ্রন্থ, প্রধান নগর বা পুর, আরম্ভস্থান, অন্তরাল (মধ্য), সমীপ, নিম্নদেশ, মূলধন (ভাণ্ড, পুঁজি), বর্গমূল, রাজার স্বীয় দুর্গরাষ্ট্র, অস্বামী বিক্রেতা, পটাদির উৎপত্তিকারণ, আদিম নিবাসী, পুরুষপরম্পরাগত ভৃত্য, অঙ্গুলির অবস্থানবিশেষ, বন, নিকুঞ্জ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **মূল** শব্দটি অনেকটা **তীর্থ** শব্দের মতো। ব.শ. এর উপরোক্ত ২৮টি অর্থ দিয়ে গেছেন। আমরা দেখছি, **মূল** শব্দটির প্রকৃত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল — **মূ** লালিত যাহাতে। এই **মূ** হল সত্তার নিগমযোগ্য সারমর্মের আধার। একেই আমরা বলেছি 'নবরূপী সীমায়িতের আধার'। উপরোক্ত ২৮টি অর্থের ক্ষেত্রেই বিচার করলে দেখা যায়, সেগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো সত্তার 'নিগম্য-সারমর্মধারীকে লালন' করে এবং সেকারণেই তাদের **মূল** বলা হয়েছে। ঐ ২৮টি ক্ষেত্রে 'নিগম্য-সারমর্মধারীর লালন' কীভাবে বিদ্যমান রয়েছে, ব.শ. প্রদত্ত 'শিফা (শিকড়), মূলা (radish), শূরণ, পিপ্পলীমূল ...' প্রভৃতির বস্তু ও বিষযের প্রত্যেকটিকে নিয়ে সে অনুসন্ধান চালালে পাঠকপাঠিকা নিজেরাই সেগুলি বুঝে নিতে পারবেন, আশা করা যায়। আপাতত আমরা এই **মূল** নিয়ে যে অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে, তাদের কয়েকটি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব।

মূলচ্ছেদ (মূলোচ্ছেদ) : ২. *যাহার **মূল**কে ছেদ করা হয়েছে; অথবা, যার **মূল**কে উচ্ছেদ করা হয়েছে।* ৩. মূলকর্ত্তন, উৎপাটন, মূলক্ষয়, সমূলবিনাশ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মূলধন : ২. *যে ধন কোনো সত্তার **মূল** রূপে সক্রিয় হয়।* ৩. মূলবিত্ত, পুঁজি। (ব.শ.)। ৪. capital অর্থে প্রচলিত। ৫. বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, তাতে ফুলফল হয়, তেমনি যে ধন থেকে বিশাল ব্যবসা (ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও তার কাজকর্ম) গড়ে ওঠে তাকে **মূলধন** বলে।

মূলপ্রকৃতি : ৩. বিশ্বের আদিকারণ, প্রধান, আদ্যাশক্তি, মণ্ডলের মূলভূত — মধ্যম, বিজীগিষু, উদাসীন ও শত্রু। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ব্রহ্ম**। সেখানেই **মূল-প্রকৃতি** বা **কারণ-প্রকৃতি** বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মূলব্যসনবৃত্তি : ৩. বধ্যের মারণরূপ জীবিকা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে যারা এই জীবিকা গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাদের 'সুপারি-কিলার' বলে। আমরা এখন আর বাংলা শব্দে ঐ জীবিকাকে উল্লেখ করতে পারি না, ইংরেজি শব্দের সাহায্য নিয়ে থাকি।

মূলভৃত্য : ৩. পুরুষপরম্পরাগত ভৃত্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **পাদোদক-মূঢ়তা**। আজকাল **মূলভৃত্য** শব্দটি ব্যবহৃত হয় না, সেকালে হত, ১৯৫০-৬০ সাল পর্যন্ত হত। আজ থেকে ৭০-৮০ বছর আগেও বাংলাভাষীদের প্রায় সমস্ত বড় বড় পরিবারে **মূলভৃত্য** ছিল, থাকত। এঁরা ছিলেন পরিবারের স্বজন, পরিজন। পরিবারের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের চেয়ে এদের সঙ্গে সম্পর্ক কোনো অংশে কম ছিল না। বড় পরিবারের কর্তা পুরুষানুক্রমে এই **মূলভৃত্যের** ভরণ পোষণ করতেন; **মূলভৃত্যও** পুরুষানুক্রমে সেই পরিবারে ভৃত ও পোষিত হতেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা যেমন যে যার কাজ করতেন, এঁরাও সেই পরিবারের অংশরূপে যে যার কাজ করতেন এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে এঁদের মর্যাদার কোনো ফারাক থাকত না, ফারাক রাখা হত না, রাখা কুরুচিকর বলে মনে করা হত।

কিন্তু তাতে কী! আমরা একালের শিক্ষিত আধুনিকতাবাদীরা এর মন্দটিকেই কেবল দেখতে পাই। প্রথমত আমরা এই **ভৃত্য**দের চাকর ভাবি, তার ওপর 'পুরুষপরম্পরাগত ভৃত্য' মানেটি দেখেই ধরে নিই — চাকর!! উঃ! তাও generation after generation! ভাবা যায়! কী নিষ্ঠুর! সেকালের বড় পরিবারগুলি ছিল ভারি নিষ্ঠুর! মানুষকে বংশ-পরম্পরায় চাকর বানিয়ে রাখত। কিন্তু কোনো বড় পরিবারের কর্তা যখন তাঁর স্বজনদের ভরণপোষণের জন্য প্রাণপাত করছেন, কিন্তু স্বজনদের ত্যাগ করতে পারছেন না, সে পরিস্থিতির কথা কখনও ভাবি না আমরা। বনে-জঙ্গলে বড় গাছকে জড়িয়ে থাকা আরও পাঁচরকম গাছ নিয়ে যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ঝোপ গড়ে ওঠে, সেগুলিকে কোনোদিন শ্রদ্ধাভরে দেখলেই বিষয়টির যথার্থ বোধ জন্মাতে পারে।

মূলাধার : ২. *সত্তার **মূলে** যে আধার থাকে।* ৩. ষট্‌চক্রান্তর্গত আদ্য চক্র (ইহা গুহ্য-লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয়মিত স্থান এবং কুণ্ডলিনীশক্তির প্রধান আধার। ...); নাভি, প্রধান আশ্রয়, আদিস্থান, গোড়া, মূলের আধার, মূল-বন্ধনস্থান। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এটি একটি পৃথক গবেষণার বিষয়। ভারতীয় উপমহাদেশের **তান্ত্রিক**গণ মানবশরীর, রাষ্ট্রশরীর (সমাজশরীর) ও জগৎশরীর — এই তিন প্রকার শরীরকে একই কাঠামোর অঙ্কে সাজিয়ে বুঝেছিলেন এবং সেসব কথা তাঁদের ষট্‌চক্রের সামগ্রিক বোধে ধরে রেখে

ছিলেন। এর অধিকাংশ অর্থই এখন বিস্মৃত, শুধুমাত্র মানবশরীরের বিষয়ে কেউ কেউ তার কিছু কিছু বোঝেন এবং বুঝিয়ে থাকেন। ফলত, সেগুলি এখন খণ্ড-ধারণায় পরিণত হয়েছে।

মূল্য (মূল্যক, মূল্যবান — অমূল্য) : ১. মূল + য (যৎ)। (ব.শ.)। **২. মূল্য** = ***মূল*** *থাকে যাহাতে।* ***মূল্যক*** = ***মূল্য*** *করে যে বা কৃত যাহাতে।* ***মূল্যবান*** = ***মূল্য*** *বহন অন (on) থাকে যাহাতে।* ***অমূল্য*** = *নেই* ***মূল্য*** *যাহাতে। /* **মূল্য** = যাহা মূলোৎপাটন বিনা সংগ্রহ করা অশক্য; মূলদ্রব্যের সহিত যে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রেতার সম্মতিতে লাভ করা যায়। (ব.শ.)। **৩. মূল্য** = সমূলে উৎপাটনীয়, মূলের সমান, বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ, দাম, মূলধন, বেতন, নিষ্ক্রয়, লাভ, গুরুত্ব, সারবত্তা। (পটাদির উৎপাদনার্থ বণিকেরা কারুগণকে যে মূল, অর্থাৎ তুলাদি উপকরণ দিতেন, কারুগণ ঐ মূলে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ অতিরিক্ত উপকরণ গ্রহণ করিতেন; ইহাই কারুদিগের লাভ এবং মূল হইতে গৃহীত বলিয়া এই লাভ-ভাগ মূল্য, অর্থাৎ ঐ লাভাখ্য মূল্যে বণিকেরা শিল্পীর নিকটে পটাদি পাইতেন। যখন চরকায় সূতা কাটা ছিল, তখন ব্যবসায়ীরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া গৃহস্থকে তূলা দিতেন; গৃহস্থ তদনুসারে সূতা দিয়া অতিরিক্ত যে তুলা পাইতেন, তাহাই তাঁহার পরিশ্রমের মূল্য বা লাভ। এই নিয়মে ভাচায় চাউল প্রস্তুত করার প্রথা আছে। এক্ষণে 'মূল্য' মূল্যাতিরিক্ত 'লাভ' নহে, পটাদি যে অর্থে বিক্রীত হয়, তৎসমুদয়ই, অর্থাৎ লাভসহিত মূল মূল্য।) (ব.শ.)। **মূল্যক** = দ্রব্যনির্মাণব্যয়, মজুরী, মূল্য। **মূল্যবান** = মহামূল্য, দামী। **অমূল্য** = মূল্যহীন, বিনিময়ে অপ্রাপ্য, অর্থাদির বিনিময়ে অপ্রাপ্য, অসাধারণ মূল্যবান। (ব.শ.)। **৪. মূল্যক** বাদে সবগুলি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **উত্তানপাদ, দাম। 'মূল** থাকে যাহাতে' তাকে বলে **মূল্য**। কিন্তু কোনো বস্তুর **মূল্যের** ভিতরে কীসের **মূল** থাকে, কীভাবে থাকে? **মূল** শব্দের অর্থ আমরা আগেই জেনেছি, 'মূ (নবরূপী সীমায়িতের আধার) লালিত যাহাতে'। কোনো বস্তুর **মূল্যে** থাকা এই **মূল** কীসের **মূল** এবং তা কীভাবেই-বা থাকে?

দেখা যাচ্ছে, ব.শ. **মূল্য** শব্দের অর্থ প্রদানকালে **মূল্য** শব্দের অর্থ সামাজিক প্রয়োগে কেমন করে কোথায় এসে পৌঁছেছে, তার বিবরণ দিয়ে গেছেন; কিংবা বলা ভাল, দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, অধিকাংশ শব্দের অর্থ কেমন করে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে কোথায় এসে পৌঁছেছে, সেকথা বলে না দিলে, শব্দের নিহিতার্থের সঙ্গে তার ব্যবহারিক অর্থের সম্পর্ক জানা যায় না। আমরা আগাগোড়া সে কাজ করার চেষ্টা করেছি। ব.শ. বেশ কিছু শব্দের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করেছেন।

মূল্য-এর বিষয়ে আধুনিক অর্থনীতি বিদ্যার বক্তব্য অনেকেই জানেন। মার্কসসাহেব তাঁর বিখ্যাত 'পুঁজি' গ্রন্থের শুরুতেই পড়েছেন **মূল্য** নিয়ে এবং **মূল্যের** মর্ম, ব্যবহারিক **মূল্য**, আপেক্ষিক **মূল্য**, সমতুল **মূল্য**, বিনিময় **মূল্য** ... ইত্যাদি পেরিয়ে সব **মূল্যকেই** শ্রম**মূল্যের** একক দিয়ে বিচার করেছেন। **মূল্য** বিষয়ে উপরে আমরা ব.শ. প্রদত্ত বক্তব্য পাঠ করলাম। তিনি তিনরকম উদাহরণ দিয়েছেন — কাপড়ের **মূল্য**, সূতার **মূল্য** এবং চাউলের **মূল্য**। ব.শ. মূল্যের বিষয়ে যে প্রথার **উল্লেখ করেছেন**, কলিম খান নিজে গ্রামবাংলায় প্রচলিত 'তরল বাঁশ' দিয়ে ঝুড়ি বোনার ক্ষেত্রে (১৯৬০-৭০ সালেও) একই রীতি অনুসৃত হতে দেখেছেন। প্রথাটিতে **মূল্য** নির্ধারিত হয় কীভাবে, সেকথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

একজন **মাহালী** ঝুড়িনির্মাতা, ধরা যাক, গৃহস্থের নিকট থেকে ১০ টি বাঁশ নিয়ে গেলেন; চুক্তি এই যে, তিনি ৮টি বাঁশে যতগুলি ঝুড়ি তৈরি হবে তা দিয়ে যাবেন, বাকি দুটি বাঁশ তিনি নিয়ে নেবেন ঐ ৮টি বাঁশ থেকে ঝুড়ি বোনার শ্রম**মূল্য** হিসেবে। ধরা যাক, প্রতিটি বাঁশে ১০টি করে ঝুড়ি প্রস্তুত হল। সেক্ষেত্রে **মাহালী** ঝুড়িনির্মাতা ২০টি ঝুড়ি বিক্রি করে যা পাবেন, সেটিই হবে ১০০টি ঝুড়ি প্রস্তুত করার শ্রম**মূল্য**। ধরা যাক, ২০টি ঝুড়ি বেচে ২০০ টাকা পাওয়া গেল; অর্থাৎ **১টি ঝুড়ির** বিনিময় **মূল্য ১০** টাকা। সেক্ষেত্রে ৮০টি ঝুড়ির শ্রম**মূল্য** দাঁড়ায় ২০০ টাকা। (১৯৬০ সালেও দেখা যেত, **মাহালী** ঝুড়িনির্মাতা ঐ ২০০ টাকা সরাসরি ঝুড়ি বেচে যোগাড় করতেন না, ২০টি 'সিদা'র পরিবর্তে অন্যদের দিয়ে দিতেন। এক একটি 'সিদা'তে তার পরিবারের একদিনের চাল তেল নুন ইত্যাদি প্রয়োজন মিটে যেত।) অর্থাৎ **১টি** ঝুড়ির শ্রম**মূল্য** হল ২.৫০ টাকা। তার মানে, একটি ঝুড়ির কাঁচামালের **মূল্য** ৭.৫০ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রম**মূল্যই** যে সব **মূল্যের** একক, আমাদের পূর্বসূরিরা ফলিত প্রয়োগে তা বুঝতেন এবং কাজে পরিণত করতেন।

মূল্য শব্দটি তৈরি হয়েছিল ঐ 'সব **মূল্যের** একক' বা 'সব **মূল্যের মূল**' দিয়ে। সে **মূল** যে শ্রম, সেকথা এখন বলাই বাহুল্য। সেই কারণে **মূল্য** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ছিল '**মূল** থাকে যাহাতে'। বিশ্বাস হতে চায় না যে, অর্থনীতিবিদ্যার এক পৃষ্ঠা না পড়ে আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ এইভাবে **মূল্য** শব্দটি সৃজন করেছিলেন।

মৌল (মৌলবাদ, মৌলিক) : ১. মূল + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***মৌল*** = ***মূল*** *হইতে জাত।* ***মৌলবাদ*** = ***মৌল*** *যে* ***মতবাদ।*** ***মৌলিক*** = ***মৌল*** *গতিশীল কৃত যাহাতে; কিংবা,* ***মৌল****-কে গতিশীল করে যে। /* **মৌল** = মূল হইতে আগত। (ব.শ.)। **৩. মৌল** = মূলসম্বন্ধী, মূলপুরুষাগত, তদ্দেশজাত, গ্রামনির্মাণকাল হইতে পুরুষানুক্রমে তদ্‌গ্রামস্থিত (জন), সদ্বংশজ, মূলে ভব ... ইত্যাদি। **মৌলিক** = মূলসম্বন্ধী, আদিম, মূলীভূত, মূলগত, কৌলীন্যহীন, মূলবিক্রয়ী। (ব.শ.)। **মৌলবাদ** = ধর্ম বা অন্য কোনো মতবাদের অবিকৃত মূলতত্ত্ব, অন্ধ বা গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪. মৌল** ও **মৌলিক** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **মৌলবাদ** ইংরেজি fundamentalism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে প্রচলিত। **৫. মৌলবাদ** শব্দটি আধুনিক অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীদের তৈরি করা বাংলা শব্দ। ব.শ. এ শব্দ পাননি, তাঁর শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখায় এই শব্দটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু অর্থের দিক থেকে এটি কমবেশি যথার্থ শব্দরূপে ব্যবহৃত হতে পারে যদি একে 'মূলানুগ-মতবাদ' বলে মনে করা হয়। আমরা তাই করেছি। কলিম খানের 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' নামক প্রথম গ্রন্থটিতে এই **মৌলবাদ** ও তদ্বিপরীত **বিশুদ্ধিবাদ** বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

মৃ (*মর্ক্, মর্চ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিমর্ত্ত্য, অতিমারুত, অতিমৃত্যু, অমর, অমরকোষ, অমরতটিনী, অমরতরু (দ্র. পারিজাত, amaranth, asparagus, অপ্সরাগাছ, ঘাস), অমরতা, অমরত্ব, অমরনগর, অমরপ্রভু, অমরভর্ত্তা, অমররাজ, অমরলোক, অমরাধিপ, অমরানগর, অমরাপতি, অমরাপুরী, অমরাবতী, অমরাবাস, অমরাবাস, অমরাভুবন, অমরাস্থল, অমরী, অমরেন্দ্র, অমরেশ্বর, অমরোপম, অমর্ত, অমর্ত্ত্য, অমর্য্যাদ, অমিঞা, অমিয়, অমিয়া, অমিয়াদিঠ, অমিয়ামিঠ, অমৃত, অমৃতকুণ্ড, অমৃতকেলি, অমৃতকেলিকা, অমৃতগুটিকা, অমৃতগোটিকা, অমৃতদীধিতি, অমৃতদ্যুতি, অমৃতদ্রব, অমৃতধুনী, অমৃতপ, অমৃতপুর, অমৃতফল, অমৃতফেণী, অমৃতভাষী, অমৃতমণি, অমৃতমণ্ডা, অমৃতমন্থন, অমৃতমূর্ত্তি, অমৃতযোগ, অমৃতরস, অমৃতলোক, অমৃতস্রাব, অমৃতস্রাবিণী, অমৃতস্রাবী, অমৃতস্রুৎ, অমৃতহ্রদ, অমৃতাঞ্জন, অমৃতায়মান, অমৃতাশ, অমৃতাশন, অমৃতাশী, অমৃতাহ্ব, অমৃতি, অমৃতী, অমৃতীকরণ, অমৃতোদ্ভব, অহিমার, আমরণ, আমরণান্ত, আমরণান্তিক, পশুমার, মউত (মৌত), মর, মরক, মরকট, মরণ, মরণান্তক, মরকত, মরকতমণি, মরকতময়, মরকতশকল, মরকতশিলা, মরকতশ্যাম, মরণ, মরণকাঁপুনি, মরণকাঠি, মরণকামড়, মরণপাখা, মরণবাঁচন, মরণবাড়, মরণান্ত, মরণান্তক, মরণাপন্ন, মরণাশৌচ, মরণোন্মুখ, মরত, মরভূমি, মরস্থান, মড়া, মরা, মরাই (মড়াই, মট্), মরা-কটাল, মরা-কান্না, মরা-গাঙ, মরা-চামড়া, মরা-জরা, মরা-টাকা, মরা-ধার, মরা-পথ, মরা-পেট, মরা-বান, মরা-মাটি, মরা-মানুষ, মরা-মাস, মরাল, মরালক, মরালী, মরা-সোনা, মরি, মরিচ, মরিজাদ, মরি(রী)য়া, মরিয়াদ, মরিল, মরীচ, মরীচি, মরীচিকা, মরীচিগর্ভ, মরীচিতোয়, মরীচিপ, মরীচিমালী, মরীচী (মরীচিন্), মরীয়া, মরত, মরম, মরমর, মরমি(মী), মরু, মরুকচ্ছ, মরুজা, মরুৎ (মর-থেকে উত্থিত, মরুৎব্যোম, হারুৎ-মারুৎ), মরুৎকর্ম্ম, মরুৎকোণ, মরুৎপট, মরুৎপতি, মরুৎপথ, মরুৎপাল, মরুৎপুত্র, মরুৎসখ, মরুৎসুত, মরুৎসূনু, মরুত, মরুত্ত, মরুত্বান্, মরুদ্গণ, মরুদ্বর্ত্ম, মরুদ্বিপ, মরুদ্বেগ, মরুপথ, মরুপৃষ্ঠ, মরুব, মরুবক, মরুভূ, মরুভূমি, মরুমহী, মরুয়া, মরুস্থল, মরুস্থলী, মরেসা, মর্ক, মর্কট, মর্কটক, মর্কটখেলা, মর্কটতিন্দুক, মর্কটবাস, মর্কটবৈরাগ্য, মর্কটশীর্ষ, মর্কটী, মর্ত্ত, মর্ত্তব্য, মর্ত্তমান (মত্তমান, মদ), মর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যলোক, মর্ম্ম, মর্ম্মগ, মর্ম্মঘাত, মর্ম্মঘাতী, মর্ম্মঘ্ন, মর্ম্মচ্ছিৎ, মর্ম্মচ্ছেদ, মর্ম্মচ্ছেদী, মর্ম্মজ্ঞ, মর্ম্মত্র, মর্ম্মপারগ, মর্ম্মপীড়ণ, মর্ম্মপীড়া, মর্ম্মবিৎ, মর্ম্মবিদারণ, মর্ম্মবেদী, মর্ম্মবেধী, মর্ম্মব্যথা, মর্ম্মভেদ, মর্ম্মভেদন, মর্ম্মভেদী, মর্ম্মর, মর্ম্মরিত, মর্ম্মরী, মর্ম্মস্থল, মর্ম্মস্থান, মর্ম্মস্পৃক্, মর্ম্মহা, মর্ম্মাঘাত, মর্ম্মাতিগ, মর্ম্মান্তিক, মর্ম্মাবরণ, মর্ম্মাবিৎ(-ধ্), মর্ম্মাহত, মর্ম্মিক, মর্য্যাদা, মর্য্যাদাঅচল, মর্য্যাদাগিরি, মর্য্যাদাতিক্রম, মর্য্যাদাপর্ব্বত, মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা, মর্য্যাদাভেদক, মর্য্যাদামন্ত, মর্য্যাদী, মর্চা (মরচে, মর্সিষ), মর্চা (মরচে, মুরচ্), মাইর, মাকড়, মাকড়সা, মাকড়া, মাকসা, মাকোসা, মার, মারক, মারকত, মারকাট, মারকুটে, মারজিৎ, মারণ, মারণযজ্ঞ, মারদস্তর, মারধর, মারপিট, মারপিঠ, মারপেঁচ, মারপেঁচি, মারব, মারমুখ, মারমুখী, মারমুখো, মারমূর্ত্তি, মারমোহিত, মাররিপু, মারা, মারাঙ্ক, মারাত্মক, মারামারি, মারি, মারিকা, মারিচ, মারিচিক, মারিত, মারিষ, মারিষা, মারী, মারীগুটিকা, মারীচ, মারীচ্য, মারুণ্ড, মারুত, মারুতকোপন, মারুতপূর্ণ, মারুতব্রত, মারুতরোগ, মারুতসুত, মারুতাত্মজ, মারুতায়ন, মারুতাশন, মারুতি, মারুতী, মারুলি, মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, মার্ত্তণ্ড, মার্ত্তণ্ডমণ্ডল, মার্ত্ত্য, মার্দ্দঙ্গ, মার্দ্দঙ্গিক, মার্দ্দব, মার্ম্মিক, মিত্তু, মিদুল, মির্ত্তু, মুদ্দ, মুর্দ্দ, মুরদ, মুর্দ্দা, মুর্দ্দাফরাস (মুদ্দোফরাশ), মৃ, মৃকণ্ড, মৃকণ্ডু, মৃড়্, মৃড়, মৃড়ন, মৃড়া, মৃড়ানী, মৃড়ানীপতি, মৃড়ী, মৃত, মৃতক, মৃতকল্প, মৃতগর্ভা, মৃতগৃহ, মৃতচেল, মৃতজীবন, মৃতণ্ড (মৃতাণ্ড), মৃতদার, মৃতদেহ, মৃতধবা, মৃতনির্য্যাতক, মৃতপ, মৃতপা, মৃতপ্রায়, মৃতবৎ, মৃতবৎসা, মৃতবৎসিকা, মৃতবাসর, মৃতভর্ত্তৃকা, মৃতমাতৃক, মৃতশঙ্কা, মৃতশব্দ, মৃতসংস্কার, মৃতসঞ্জীবন, মৃতসঞ্জীবনী, মৃতসূতক, মৃতস্নাত, মৃতস্নান, মৃতহার, মৃতহারী, মৃতা, মৃতাণ্ড, মৃতাশৌচ, মতাহ, মৃতি, মৃত্যু, মৃত্যুকন্যা, মৃত্যুকর, মৃত্যুকল্প, মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী, মৃত্যুতুর্য্য, মৃত্যুদ, মৃত্যুদূত, মৃত্যুদ্বার, মৃত্যুনাশক, মৃত্যুনাশন, মৃত্যুপতি, মৃত্যুপথ, মৃত্যুপা, মৃত্যুপাশ, মৃত্যুবাণ, মৃত্যুভীত, মৃত্যুরাট্(জ্), মৃত্যুরায়, মৃত্যুলোক, মৃত্যুহেতু, ম্রিয়মাণ, সহমরণ, সহমৃতা।

মৃ (মর্ক্, মর্চ্) = সীমায়িতের আবর্ত্তন যাহাতে। **মর্ক** = সীমায়িতকে **বর্ত্তমান** করে যে। **মর্চ** = সীমায়িতের **বর্ত্তমান** চয়ন করে যে।

অমর : ১. ন + মর। ২. *নেই মরণ যাহার।* ৩. মরভিন্ন, কীর্ত্তিহেতু চিরস্মরণীয়, অনশ্বর, অব্যর্থ, মৃত্যুজয়ী, নিরবশেষ, দেব, মরুদ্বিশেষ, দেবতার সংখ্যানুসারে ৩৩ সংখ্যা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. 'মৃত্যুহীন' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **তর্পণ**। যে জন্মায় সে মরে। মানুষও মরে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাহলে, আমাদের দেশের বাতাসে 'আত্মা **অমর**' বলে এত গুঞ্জন কেন? এর কারণ হল, ব্যক্তিমানুষের শরীরের মৃত্যু হলেই সে সম্পূর্ণ মরে যায় না। শরীরের মৃত্যু হলেও মানুষ অবশ্যই বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকতে পারে; **অমর** হতে পারে, হতে পারে ততদিনের জন্য যতদিন 'বিরাট্-মানুষ' বেঁচে থাকে। আদিম মানব থেকে শেষ মানব পর্যন্ত মানুষের যে-সমগ্র সত্তা, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'মহামানব' নামে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, সেই 'বিরাট্-মানুষ' যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ব্যক্তিমানুষ চেষ্টা করলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই **অমর** হতে পারে।

এই অমরত্ব তিন প্রকারে সম্ভব হয়। প্রথমত জীবৎকালের শরীরজাত পুত্রের মাধ্যমে থেকে যায় মানুষের শরীরের নবরূপায়িত 'পিতৃ' অস্তিত্ব; দ্বিতীয়ত তার জীবৎকালের শ্রমজাত পণ্যাদির মাধ্যমে থেকে যায় তার 'দৈব' অস্তিত্ব; তৃতীয়ত তার জীবৎকালের মানসজাত বা মনচাষের ফলস্বরূপ থেকে যায় তার 'ঋষি' অস্তিত্ব।

তার মানে, প্রথমত, মানুষ তার সন্তানের ভিতর বেঁচে থেকে যাচ্ছেই, একালের জিন-বিজ্ঞানও সেকথা সপ্রমাণ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, একজন মানুষের বানানো হাঁড়িকুড়ি-টেবিলচেয়ার-কলামূলা-যন্ত্রপাতির ভিতরে যে-শ্রম ও মেধা থেকে গেল, সে তো সেই মানুষটিরই। অর্থনীতিশাস্ত্রীরা পণ্যের fetishism বিস্তর ঘেঁটে দেখেছেন, শ্রম একবার উৎপন্নের ভিতরে ঢুকে গেলে তাকে বড়জোর ধ্বংস করা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ফেরত নেওয়া যায় না।

সেই শ্রমদানকারী-মানুষটি মরে গেলে, সে যে-সকল পণ্য বানিয়েছিল, সেগুলো থেকে মানুষটির শ্রম ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে এসে তার সঙ্গে শ্মশানে বা কবরে যাওয়ার তোড়জোড় করে না; থেকে যায় উৎপন্নটির ভেতরেই যতদিন সেই উৎপন্নটি **'রসাতলে'** না যায় ততদিন। অর্থাৎ মানুষের শরীর ও মন শ্রম ও মেধা রূপে তার বানানো উৎপন্নের ভেতর অবশ্যই থেকে যায়। তৃতীয়ত, যিনি আগুন আবিষ্কার করেছিলেন, শূন্যের আবিষ্কার করেছিলেন, কিংবা অভিকর্ষ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন, তা তো থেকেই গেছে, এবং অবশ্যই ততদিন বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, মানুষ নামক জীবটি যতদিন বেঁচে থাকবে। আর, আপনি যে জ্ঞানবীজটি আপনার ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন, কিংবা যে কৃৎকৌশলটি চাষিদের শিখিয়ে দিলেন, সেটি তো থেকেই যাবে। তাকে ফেরৎ নেওয়ার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ মানুষের মনের উদ্ভাবিত জিনিসের ভিতরে সেই মন অবশ্যই থেকে যায়, মানুষটির মৃত্যুর পরও।

মানুষ তাই মরেও মরে না। তার শরীরজাত, শরীর ও মনের যৌথতা-জাত, এবং তার মনজাত অর্থাৎ যথাক্রমে সন্তান, শ্রমজাত উৎপন্ন, ও সাংস্কৃতিক উৎপন্ন — এই তিন সত্তার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থেকে যায়। শরীরের মৃত্যুর পর 'বিরাট্-মানুষ'-এর জীবৎকাল পর্যন্ত মানুষ এভাবে অবশ্যই বেঁচে থাকে; বেঁচে থাকে পিতৃপরম্পরায়, দৈবপরম্পরায়, ঋষিপরম্পরায়। ... দ্র. **ঋষিতর্পণ, দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ**।

অমরতরু : ২. **অমর** *যে* **তরু** */* ৩. দেবপ্রিয় বৃক্ষ, পারিজাত মন্দার কল্পবৃক্ষ সন্তান হরিচন্দন — এই পঞ্চ দেবতরু, দেবদারু, কল্পবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. পণ্য উৎপাদনকারী পাঁচ প্রকারের প্রতিষ্ঠানকে এই **পঞ্চ দেবতরু** নামে অভিহিত করা হত। এর মধ্যে রপ্তানির (পারে পাঠানোর) জন্য পণ্য উৎপাদন-কারী ব্যবস্থাকে বলা হত **পারিজাত**, সরকারি মন্দ উৎপাদন ব্যবস্থাকে বলা হত মন্দার **(মন্দর পর্ব্বত)**, পরিকল্পিত প্রোজেক্ট্‌কে বলা হত **কল্পবৃক্ষ**, ঘরে ঘরে যে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য হত তাকে বলা হত **সন্তান**, এবং সম্ভবত ব্যবসায়িক তেজারতি ব্যবস্থাকে বলা হত **হরিচন্দন**। একালে অন্য সব ব্যবসা ছেড়ে পুঁজিপতিরা হরিচন্দনে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। **দ্র. পারিজাত**। ৬. গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী **অমরত্বের** সূচক এবং স্থূলজগতে অলভ্য ফুলবিশেষের নাম amaranth এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর, যাকে ইংরেিতে snowdrop অথবা narcissus (= নার্গিস) ফুল বলা হয়, তাকে গ্রীক ভাষায় বলা হত amaryllis।

অমরাবতী : ৫. শাসক ও সম্পদবান মানুষেরা যে মানসিক সুখস্বর্গলোকে বাস করেন, তাকে অমরানগর বলে। কার্যত এটি হল 'অকর্মক শাসক'দের শাসনকেন্দ্র ও কোম্পানিগুলির সক্রিয়তার দুনিয়া। অকর্মক শাসকেরা মরে যায়, কিন্তু শাসনকেন্দ্রটি থেকে যায়, নতুন অকর্মক শাসকেরা সেই কেন্দ্রে বসে শাসন চালায়। তেমনি কোম্পানির পরিচালকেরা মরে যায়, কিন্তু কোম্পানি (দেবতা) মরে না, তারা অমর। নতুন পরিচালকেরা কোম্পানিটি চালায়। মোটকথা সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শাসকেরা যে সুখস্বর্গলোকে বাস করেন, সেই স্থানটিকেই স্বর্গলোক বা অমরাবতী বা ইন্দ্রলোক ইত্যাদি বলে। বিশেষত্ব এই যে এই লোকে মানুষের জ্ঞানসম্পদ (অভিজ্ঞতা) ও কর্মসম্পদ (পণ্য) স্বর (= যার ভিতরে স্ব রহে) রূপে সঞ্চিত হয়, তাই স্বর্গলোক। তাই যথেষ্ট পুণ্যবান (= পণ্য বেচে যা পাওয়া যায়) না হতে পারলে এই স্বর্গ ভোগ করা যায় না। দ্র. **উত্তম, স্বর্গ**।

অমর্ত্ত্য : ২. *যে* **মর্ত্ত্য** *নহে।* ৩. মরণরহিত, অমর। (ব.শ.)। ৪. সেকেলে নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মর্ত্ত্য**। ৬. ইংরেজি immortal।

অমৃত : ১. ন + মৃত। ২. / যে মরে না; যাহা দ্বারা মরণ হয় না; যার দ্বারা অমরতা সাধন করা যায়; যাহাতে মরণ নাই। (ব.শ.)। ৩. মৃত্যুহীন, মৃতভিন্ন, অমরত্বপ্রদ, সুন্দর, (সাদৃশ্যে) স্নিগ্ধ, অমর, বিষ্ণু, মৃত্যুঞ্জয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, সূর্য্য, আত্মা, (রোগনাশহেতু) বারাহীকন্দ, বনমুদগ, অমরণহেতু উদক, অমৃতবৎ প্রীতিকর বিষয়, অমৃতবৎ স্বাদু বাক্য, (সাদৃশ্যে) প্রসাদ ... ... সোমলতারস, মধু, ব্রহ্মানন্দ, পরমানন্দ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ... ... (ব.শ.)।

সুধা, পীযূষ ও জীবন-বারি, যা দেবতারা পান করে অমর হয়েছেন। মনে হয়, হোমের সময় যে সব জিনিস অর্পণ করা হত, তাদের এই নাম। বিশেষত সোমরসকেই অমৃত বলা হত। অমৃতের নির্ঝর এবং পীযূষ নামেও এই সোমরস খ্যাত ছিল। মহাভারত মতে, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে দেবতারা শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সেইজন্য তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শক্তি ও অমরত্ব প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাঁদের সমুদ্রমন্থন করার উপদেশ দেন এবং নিজে কূর্ম্মরূপ ধারণ করে অমৃতমন্থনে সাহায্য করেন। মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকী সর্পকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করা হয়। পুরাণ মতে পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করে দেবতাদের দ্বারা হিরণ্ময় পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হলে, তা হতে অমৃত উৎপন্ন হয়। দুর্বাসার অভিশাপে সে অমৃত সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। তখন ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণুর পরামর্শমতো সমুদ্রমন্থন করলে অমৃত, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি উত্থিত হয়। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ অনুসারে দেব ও অসুরের সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃত উত্থিত হয়। সেই সঙ্গে দধি, সুরা, সোম, লক্ষ্মী, অশ্ব, কৌস্তভ, পারিজাত এবং শেষে কালকূট উঠল। তারপর উঠলেন ধন্বন্তরী। বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধরে অসুরদের বিভ্রান্ত করে ঐ অমৃত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অতি সুস্বাদু অর্থে প্রচলিত। কখনও প্রাণ বাঁচায় এমন ঔষধ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. দ্র. **মধু**। **অমৃত** বলতে সেই অদৃশ্য 'সর্বোচ্চ জ্ঞানসুধারস'কে বোঝান হয়, যা মানুষকে সর্বোচ্চ **তৃপ্তি** বা **আনন্দ** দিয়ে থাকে। সাদৃশ্যে সেটি তৃপ্তিদায়ক মানসিক খোরাক ও দৈহিক খোরাককেও বোঝানো হয়ে থাকে। আসলে এই **অমৃত** হল — বিশ্বের নিয়মজালের যে কোনো একটি মাত্র অজানা বিষয় আবিষ্কার করলে মানুষের মনের মণিকোঠায় সেই নিয়মজাল লীলা করতে থাকে, তাকে বলে **ব্রহ্মালাভ** বা চরম মোক্ষ। তখন সাধক মানুষটি যে 'ব্রহ্মানন্দ' লাভ করেন, তাকেই যথার্থে **অমৃত** বলে। প্রত্যেক আবিষ্কারকই এই **ব্রহ্মানন্দ**

পান, তা তিনি সামান্য 'ব্যানার্জিস জায়েন্ট' (স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গোলাপ চাষ করেছিলেন) আবিষ্কার করুন, আর আইনস্টাইনের মতো $E = mc^2$ আবিষ্কার করুন, ফল ব্রহ্মলাভ বা **অমৃত**লাভ; আর সে এক চামচ **অমৃত** খেলেও অমর, এক বালতি **অমৃত** খেলেও অমর। এবং সেই অমৃতের কথা শুনলেও তার আস্বাদ পাওয়া যায় বলেই লোকে আবিষ্কারকদের কথা, স্রষ্টাদের কথা শুনতে যায়। প্রকৃত ধর্মস্রষ্টা অনেকেই প্রকৃতির ও সমাজের গভীর নিয়ম আবিষ্কার করে তা ধর্মের নামে গেয়ে গেছেন, তাকেও তাই লোকে **অমৃত** বলে জেনেছে এবং সে-**অমৃত**কথা শুনে তৃপ্তি পেয়েছে, শান্তি পেয়েছে। সেজন্যেই তো 'মহাভারতের কথা **অমৃতসমান**। কাশীরাম দাশ কহে শুনে পুণ্যবান।।' ভারতীয় উপমহাদেশে সঙ্গীতস্রষ্টাদের অধিকাংশই ছিলেন **অমৃত**রসের কারবারী। দৃশ্য স্থূল অর্থে এই 'অমৃত' শব্দ বিপুল সম্পদকেও বোঝায়। বোঝায় অতি সুস্বাদু খাদ্যকেও।

মর (মরণ, মরা — মড়া) : ২. **মর** = *সীমায়িত করে রাখা হয় যাহাতে।* **মরণ** = **মর** *অন (on) যাহাতে।* **মরা** = **মর**-*এর আধার যে।* **মড়া** = **ম**-*এর বা সীমায়িতের গড়ান রহে যে আধারে।* **৩. মর** = মরণশীল, মর্ত্ত্য, মানব; প্রাণত্যাগ করা, মৃতবৎ বা নির্জীব হওয়া, ব্যথিত হওয়া, কমিয়া যাওয়া ... ইত্যাদি। **মরণ** = মৃত্যু, নাশ, বৎসনাভ বিষ। **মরা** = মৃত, শুষ্ক, নিপীড়িত ...। **মড়া** = মৃতদেহ, গালি, সপ্রণয় গালি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. মর** শব্দের অর্থ হল 'ম (বা সীমায়িত) রহে যাহাতে'। অর্থাৎ সত্তার সীমায়িত রূপটি তার ভিতরে রয়েছে। সেই কারণে **মরা** ক্রিয়াটির মানে হল 'সত্তাকে সীমায়িত করে রাখা'। মানুষটা হিল্লি-দিল্লি দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, তার মন ঘুঁটের আগুন জ্বালানোর বিদ্যা থেকে পরমাণু চুল্লী জ্বালানোর বিদ্যা পর্যন্ত অনায়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল — সেই মানুষটা সঙ্কুচিত হয়ে, সীমায়িত হয়ে ঢুকে রয়েছে সম্মুখের ঐ শবদেহে। এখন তার হিল্লি-দিল্লি যাওয়ার উপায় নেই, মনোলোকের কোনো বিদ্যার এলাকাতেই এখন তার ঘুরে বেড়ানোর উপায় নেই।

মরণ তাই কার্যত দুটো ক্রিয়াকে বোঝায় — 'সত্তার সীমায়িত করণ' ও 'সীমায়িত করে রাখন'। বাংলাভাষী মায়েরা যখন বলেন, 'ওরে নমিতা, দুধটা এখনও উনুন থেকে নামাসনি। যাঃ! উ তো এতক্ষণে **মরে মরে** ক্ষীর হয়ে গেল!' তখন আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি, দুধ গরম হয়ে ফুটতে ফুটতে সঙ্কুচিত হতে হতে, সীমায়িত হতে হতে বা **মরতে মরতে** ক্ষীর হয়ে যায়। এই **মরা** অতএব সঙ্কুচিত হওয়া, সীমায়িত হওয়া, **ম**-এ পৌঁছনো। স্বভাবতই এই **মরা** শব্দ দিয়ে বাংলাভাষী অজস্র শব্দ বানিয়েছেন। যথা — **মরা-কটাল, মরা-কান্না, মরা-গাঙ, মরা-চামড়া, মরা-জরা, মরা-টাকা, মরা-দুধ, মরা-ধার, মরা-পথ, মরা-পেট, মরা-বান, মরা-মাটি, মরা-মানুষ, মরা-মাস, মরা-সোনা** ... ইত্যাদি। এই সকল সত্তাগুলিই সঙ্কুচিত, সীমায়িত, **মরা**। পার্থক্য এই যে, বাস্তবের **মরা-গাঙে** বান আসে; এলেই সেই গাঙ পুনরায় জীবিত গাঙের মতো আচরণ করে থাকে। কিন্তু জীবের বেলায় তার **মরা**-দেহে প্রাণ আসে কদাচিৎ। **মরা**-জীব তার তদ্রূপ সীমায়িত রূপ থেকে আরও সীমায়িত হতে হতে একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তবে কিনা মধ্যযুগে পৌঁছে বাংলাভাষী তাঁর পূর্বসূরিদের বানানো **মরা**কে আস্ত রাখেননি, বানিয়ে দিয়েছেন **মড়া**। কারণ **মরা**টা তো নড়াচড়া করতে পারে না, মাটিতে গড়িয়ে পড়ে থাকে। যে সীমায়িত সত্তা বা **ম** ভুঁইয়ে গড়ায় তাকে তো **মড়া** বলাই ঠিক! কেবল তাই নয়, **বঙ্গের** স্বভাবগুণে বাংলাভাষী মেয়েরা তাঁদের জীবনে কথাবার্তায় এই **মরণ** ও **মড়া** প্রভৃতি না-সূচক শব্দকে হ্যাঁ-এর সমতুল্য করে এমনভাবে প্রয়োগ করে থাকেন যে, আপনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবেন না, **মরণ** বা **মড়া** শব্দ প্রয়োগ করে তাঁরা আসলে **জীবন** ও **প্রাণবন্ত** বোঝাতে চাইছেন কি না! যেমন, চল্লিশোর্ধ্ব প্রেমিকের আদরে 'বাঁদর' হয়ে তার প্রেমিকা বলতেই পারেন — 'ওরে আমার ঘাটের **মড়া** রে! ... আ **মরণ**! ছাড়্ ছাড়্!' কোনো বাংলাভাষী যে এই প্রযুক্ত **'মড়া'** ও **'মরণ'** শব্দটি শুনে তার অর্থ যথাক্রমে dead-body ও death বুঝবেন না, সেকথা অনায়াসে বলে দেওয়া যায়। **৬.** ল্যাটিন mori ক্রিয়ামূল (= মরে যাওয়া), তথা ল্যাটিন সূত্রে পাওয়া ইংরেজি শব্দ mortal (= মরণশীল), immortal প্রভৃতি।

মরাই (মড়াই, মট্) : দ্র. **ধামা**।

মরীচ (মরীচি, মরীচিমালী) : **১.** ✓মৃ + ইচ - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **মরীচ** = **মর**-*এর গতিশীল আধার চয়নকৃত যাহাতে।* **মরীচি** = **মরীচ** *গতিশীল যাহাতে।* **মরীচিমালী** = **মরীচি**র *মালা ধারণ করেন যিনি।* **৩. মরীচ** = মরিচলতার গোল কৃষ্ণ কটু ফল, গোলমরিচ, কৃষ্ণ লঙ্কা। **মরীচি** = সপ্তর্ষির একজন মুনিবিশেষ (ইনি দশ প্রজাপতির অন্যতম। ... ধ্যানরত ব্রহ্মার মানস হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ...), মরুদ্‌গণের একতম, কৃপণ, কিরণ, কর, রশ্মি, অশোক, মরীচিকা, বিস্ফুলিঙ্গ। **মরীচিমালী** = কিরণমালাবান। (ব.শ.)। **মরীচি** = সপ্তর্ষির মধ্যে একজন মুনিবিশেষ। ইনি দশ প্রজাপতির অন্যতম। ... ব্রহ্মার মানসপুত্র। মরীচির পুত্রের নাম কশ্যপ। মনুসংহিতা মতে মরীচি মনুর তপোবলে সৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হয়ে কর্দমকন্যা কলাকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** 'গোলমরিচ' অর্থে **মরীচ** প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কশ্যপ**। আদিম যৌথসমাজে যে সপ্ত আধেয় সত্তাকে সমাজের কেন্দ্রে সক্রিয় দেখা গিয়েছিল, তাদের প্রথম সত্তাটিকে **মরীচি** রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সত্তাটি **কৃপণ** ও লঙ্কার মতো তেজসম্পন্ন ছিল। তার থেকে **কর** জাত হত। যে সপ্তর্ষি আজও **চিরঞ্জীবী** হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই সত্তাটিও রয়েছে। আজও এই সত্তাটি সমাজের কেন্দ্রে সক্রিয় রয়েছে। তবে তাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা একালে অত্যন্ত কঠিন। তবে, সমাজের কেন্দ্রীয় জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের পরিচালকদের মধ্যে এই সত্তা সক্রিয় রয়েছেন বলা যেতে পারে। কেননা, এঁর আধারশক্তির নাম **কলা**। আর, **কলা** তো নানা রূপে এখনও সক্রিয়। অতএব **কলাবতী**দের সন্ধান করে দেখতে হবে, তাঁরা কীভাবে আজও **মরীচি**কে ধারণ করে রেখেছেন।

মরীচিকা : ২. **মরীচী** *কৃত যে আধারে।* / সূর্য্যকিরণ প্রতিকৃতি

(যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. গ্রীষ্মে বালুকাপ্রতিফলিত জলবৎ প্রতীয়মান রবিকরমালা, মৃগতৃষ্ণা। (ব.শ.)। ৪. oasis অর্থে প্রচলিত। ৫. কী অপূর্ব এই শব্দের প্রস্তুতি। এটি খুব প্রাচীন শব্দ নয়। ব.শ. ১৮২৫ শতকের 'কথাসরিৎসাগর' থেকে **মরীচিকা** শব্দের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। **মরীচী** মানেই সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি কিরণ-প্রকাশক সত্তা। **মরীচিকা**তে সেই **মরীচী**র **প্রতিকৃতি** কৃত হয়ে যায়। সেই কারণে সেকালের শব্দবিদগণ তার নাম দিয়েছিলেন **মরীচিকা**। এতে **কা** যোগের কারণে এবং যথানিয়মে **চী** বদলে গিয়ে **চি** হয়ে গেছে। ৬. ইংরেজি mirage।

মরু : ১. ✓মৃ + উ - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মর** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, যে সীমায়িত সত্তা প্রসারিত হয়।* ৩. নির্জলদেশ, বালুকাময় তৃণাদিহীন স্থান, মরুবক, পর্ব্বত, দেশবিশেষ, মারবারদেশ, দশেরকদেশ। (ব.শ.)। ৪. desert অর্থে প্রচলিত। ৫. **মর** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জেনেছি, এই সত্তা সীমায়িত হয়, সঙ্কুচিত হয়, হতে হতে বিলুপ্তির দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু সেই **মর**, যেখানে কিনা গাছপালা তৃণাদি সব **মরে** গেছে, সঙ্কুচিত বা সীমায়িত হয়ে গেছে, সেই **মরা**-প্রান্তর যদি উল্টো আচরণ করতে শুরু করে? প্রসারিত হতে শুরু করে? যদি করে তবে তাকেই **মরু** বলে। ঠিক তাই! **মরু** প্রসারিত হয়, বিস্তারিত হয়, তার এলাকা ক্রমশ বাড়ে। পাশাপাশি গ্রামগুলিকে ক্রমশ বালুতে ভরিয়ে দিয়ে সেগুলিকেও **মরু**র এলাকাভুক্ত করতে থাকে। সেকারণেই তাকে **মরু** বলে।

মরুৎ : ১. ✓মৃ + উৎ (উতি) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মর** (= সীমায়িতের রক্ষণ) যাহাকে উত্থিত করে।* / যাহা দ্বারা মরে। (ব.শ.)। ৩. সমীরণ, বায়ু, পবনদেব, বায়ুকোণের দিক্‌পাল, অমর, মরুবক, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, **উনপঞ্চাশৎ** পবন, গ্রন্থিপর্ণ, পৃক্কা। (ব.শ.)। (ক) ঋগবেদে মরুদ্‌গণের সংখ্যা সপ্ত। ... পুরাণে সাত-সাতে ৪৯ জন মরুৎ হয়েছেন। ঋকবেদের এক স্থানে ৬৩ জন মরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মরুৎরা ঋকবেদের প্রধান দেবতা। তাঁরা ৩৩টি সূক্তে স্তুত হয়েছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, পুষার (পূষার) সঙ্গে আরো ৯টি সুক্তে এঁদের স্তুতি আছে। মরুদ্‌গণের পিতামাতা রুদ্র ও পৃশ্নি (সম্ভবত বিচিত্রবর্ণ মেঘ)। পৃথিবী ও সমুদ্রের এবং রুদ্রের পুত্র বলে এঁরা রুদ্র নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই সহোদর, সমবয়সী। এঁরা দেবী রোদসীকে (রোদসী অর্থে আকাশ, বিদ্যুৎ) বিদ্যুন্ময় রথে বহন করেন। রোদসী মরুদ্‌গণের স্ত্রী। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রাণীর সহায়ক ও বন্ধু এবং সরস্বতীর সখা। এঁরা বসুগণের সহিত এক রথে ভ্রমণ করেন।

(খ) ক্ষীরোদ সমুদ্র হতে উত্থিত অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, তাতে কশ্যপের স্ত্রী দিতির পুত্ররা দেবতাদের হাতে নিহত হলে, দিতি কশ্যপের নিকট ইন্দ্রহন্তা অজেয় অবধ্য এক পুত্র কামনা করেন। ... ইন্দ্র দিতির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বজ্রাঘাতে দিতির গর্ভ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করলেন। তখন গর্ভস্থ শিশু ক্রন্দন করে উঠলে ইন্দ্র 'মা রুদ' (কেঁদো না) বলে তাকে কাটতে থাকেন এবং দিতিও জাগরিত হয়ে ইন্দ্রকে আঘাত করতে নিষেধ করায় ইন্দ্র বেরিয়ে এলেন। ... দুঃখিত হয়ে দিতি বললেন যে, তাঁর নিজের অপরাধেই গর্ভ সপ্তধা হয়েছে। এখন তাঁর এই সপ্ত পুত্র দিব্যরূপে মরুৎ নামে সপ্ত-লোকে বিচরণ করুক। ইন্দ্র 'মা রুদ' বলেছিলেন বলে এঁদের নাম হয় মরুৎ।

মরুদ্‌গণের উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ বিজড়িত দেহ। এঁদের পিতা রুদ্রের মতো এঁদের হস্তে কুঠার ও ধনুর্বাণ। এঁরা বৃষের মতো গর্জন করায় পৃথিবী কম্পিত হয়, বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, বন বিমর্দিত হয়। মরুদ্‌গণের প্রধান কাজ — বৃষ্টিপাত করে সূর্যের চোখ আবৃত করে রাখা। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা ও অনুচর। এঁরা গান ও স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করেন। ইন্দ্র তাঁর সকল কার্য মরুদ্‌গণ সাহায্যেই সম্পন্ন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **মর** যাহাকে উত্থিত করে তাকে বলে **মরুৎ**। তার মানে, সঙ্কুচিত সীমায়িত কোনো সত্তার সঙ্কোচনের কারণে যার উত্থান ঘটে, তাকে **মরুৎ** বলে। কোনো অঞ্চলে বন্যার কারণে খাদ্যশস্যের আকাল পড়লে সেই অঞ্চলে চালডালের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। তখন চারদিক থেকে চালডালের সরবরাহকারীরা, ফড়েরা, দালালেরা, আমদানিকারী পাইকারেরা তাদের লোকজনসহ চালডাল ইত্যাদির যোগান দেওয়ার জন্য যে সেই অঞ্চলে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে আর বিচিত্র কী! কোথাও কোনো বস্তু বা বিষয়ের আকাল পড়লে এরকমই হয়, এটাই স্বাভাবিক। এই যে চারদিক থেকে চালডালের সরবরাহের প্রবাহ ঝড়ের মতো বইতে শুরু করে, একেই বলে **মরুৎ**। সাদৃশ্যে তা নিম্নচাপের কারণে উত্থিত air-প্রবাহ বা storm-কেও বোঝায়। মোটকথা, মানবশরীর, সমাজশরীর বা জগৎশরীরের কোনো স্থান-কাল-পাত্রে কোনো বস্তু বা বিষয়ের অভাব দেখা দিলে, সেই অভাবের কারণে শরীরের অন্য অন্য স্থান-কাল-পাত্র থেকে যে সরবরাহ নিয়ে সরবরাহকারীদের উত্থান ঘটে ও ঝড়ের মতো অভাবের কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে তাকেই **মরুৎ** বলে। ...

জগৎশরীরের **মরুৎ**কে বলা হয় **পঞ্চভূত**-এর এক ভূত — ক্ষিতি অপ তেজ **মরুৎ** ব্যোম। সমাজশরীরের **মরুৎ**কে একালে একটি নতুন নাম দেওয়া হয়েছে — 'disaster-management' বা 'তৎকাল-**মরুৎ**'। প্রাচীনকাল থেকে সমাজ যত বদলেছে এই **মরুৎ**-এর স্বভাবও তত বদলেছে। আদি সনাতন সমাজে এই **মরুৎ** ছিল **শিবে**র ঘনিষ্ঠতম সহকারী এবং বহুক্ষেত্রেই **শিব**-পদবাচ্য। কোনো অঞ্চলের সমাজসদস্যদের কোনো অভাব দেখা দিলে তাঁরা ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ... পরে এই **মরুৎ** রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যায়। তারও পরে তাকে দেখা যায় সামাজিক **ইন্দ্রে**র সহায়ক রূপে। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা যখন তাঁদের মনোলোককে সাত-সাত্তে উনপঞ্চাশ **লোকে** বিভাজিত করে ফেলেন, সেই উনপঞ্চাশ লোকে উনপঞ্চাশ রকমের **মরুৎ**কেও চিহ্নিত করেন তাঁরা এবং তাদের উনপঞ্চাশটি নামও দিয়ে দেন। বেদাদি গ্রন্থে সেই উনপঞ্চাশ **মরুৎ**-এর নামও রয়েছে। ... সবশেষে আসে মানবশরীরের **মরুৎ**-এর কথা। তাকে তাঁরা পঞ্চ-**প্রাণবায়ু** নামে চিহ্নিত করেন — **প্রাণ**, অপান, উদান, ব্যান, সমান। এরা প্রত্যেকেই মানবশরীরের **মরুৎ**। মানবশরীরের কোনো অংশে কোনো নিম্নচাপ তৈরি হলে, এঁরা তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ...

যেহেতু **মরুৎ** সম্পর্কিত আমাদের এই উত্তরাধিকার অতি প্রাচীন,

আমাদের ধারণা, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উত্তরাধিকারেও এই **মরুৎ**-এর কোনো না কোনো রূপ থেকে থাকবে। ইসলামী উত্তরাধিকারে যে **হারুৎ-মারুৎ**-এর কথা শোনা যায়, সম্ভবত সেটি এই **মরুৎ**-এরই উত্তরাধিকার। আর, ফরাসি থেকে আসা ইংরেজি maraud শব্দে **মরুৎ**-এর ধ্বংসাবশেষকে আজও চিনতে পারা যায়। কিন্তু গ্রীক পুরাণ অতীতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে ধরে রেখেছে বলেই, অনেক সময় একটি সত্তার সঙ্গে আর একটি সত্তার সম্পর্ক দেখতেই পাওয়া যায় না। যেমন হয়েছে Fury (> furious) নামক তিন দেবীসত্তার ক্ষেত্রে। তারা যে আসলে **মরুৎ**-এর কোনো খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রূপ, সেকথা কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু যখন জানা যায় যে, সেই দেবীসত্তাদের কাজ ছিল কোনো 'ঋত' লঙ্ঘিত হলেই সেই লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বেগে ধাবমান হওয়া এবং যতক্ষণ না সেই লঙ্ঘনের প্রতিকার হচ্ছে, ততক্ষণ শান্ত না হওয়া — তখন সন্দেহ থাকে না, যে, এঁরা **মরুৎ**-এরই গোত্রাপত্য।

প্রাচীন বাংলায় **মরুৎ**-যুক্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট অজস্র শব্দ ছিল। সেই সমস্ত শব্দই পরিত্যক্ত হয়েছে। উপরে **মৃ** শব্দপরিবারের সদস্য শব্দ সমূহের দিকে তাকালেই সেকথা বোঝা যাবে।

মরুত্ত : ২. **মরুৎ** *তারিত যাহাতে। (উপরে* **মরুৎ** *দ্রষ্টব্য)।* ৩. সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি উশীরবীজ দেশের রাজা। দিগ্বিজয়ী রাবণ মাহেশ্বরযজ্ঞে দীক্ষিত ইঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। রাবণের আহ্বানে ইনি যুদ্ধার্থে উদ্যোগী হইলে, গুরু সংবর্ত্ত, 'দীক্ষিতের ক্রোধ ও যুদ্ধ বিহিত নহে', বলিয়া ইঁহাকে নিবৃত্ত করেন। রাবণ ইহাতেই মরুত্তকে নির্জ্জিত মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবৃত্ত হন। (ব.শ.)। ... সত্যযুগে মনুদণ্ডধর রাজার প্রপৌত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিংশ, বিংশের পৌত্র খনীনেত্র, তাঁর পুত্র সুবর্জা। কালক্রমে সুবর্জা দরিদ্র হয়ে পড়ায় সমস্ত রাজারা এঁর উপর অত্যাচার করতে লাগলেন। তখন তিনি হস্তে ফুৎকার দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি করে বিপক্ষ রাজাদের পরাজিত করলেন। তাঁর পুত্র অবিক্ষিত। অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্ত। এই মরুত্ত প্রবল প্রতাপশালী রাজচক্রবর্তী হন। কালক্রমে ইনি হিমালয়ের মেরুপ্রদেশে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অঙ্গিরার দুই পুত্র বৃহস্পতি ও সংবর্তের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল না। বৃহস্পতির উৎপীড়নে সংবর্ত দিগম্বর হয়ে বনবাস করতে থাকেন। এই সময় ইন্দ্র মরুত্তের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বৃহস্পতিকে নিজের পুরোহিত করে তাঁকে মরুত্তের পৌরোহিত্য করতে নিষেধ করেন। ... নারদ মরুত্তকে বলেন বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্তের দ্বারা যজ্ঞ করতে ... অবশেষে সংবর্ত মরুত্তের যজ্ঞ সম্পাদনে প্রতিশ্রুত হলেন। রাজা মরুত্তকে তিনি বললেন, যজ্ঞ করার জন্য ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হলে রাজা যেন তাঁকে ত্যাগ না করেন। ... হিমালয়ের মুঞ্জবান পর্বতে শিবকে সন্তুষ্ট করে মরুত্ত যজ্ঞের জন্য প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করলেন। ... তখন ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে বৃহস্পতিকে পুরোহিত করার জন্য মরুত্তকে অনুরোধ করেন। ... ক্রুদ্ধ সংবর্ত অগ্নিকে ভস্ম করে দেওয়ার ভয় দেখালেন। তারপর ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মরুত্তের কাছে পাঠালেন। তিনি মরুত্তকে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতের ভয় দেখালেন। তখন মরুত্ত উত্তর দিলেন, সংস্তম্ভনী বিদ্যাদ্বারা তিনি এই সব ভয় নিবারণ করবেন। ... সংবর্তের পৌরোহিত্যে যজ্ঞ সম্পন্ন করা হল। ... মরুত্ত উদ্বৃত্ত স্বর্ণ কোষ মধ্যে রক্ষা করেন এবং গৃহে ফিরে এসে সসাগরা পৃথিবী শাসন করতে থাকেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির ব্যাসের পরামর্শে সেই সঞ্চিত স্বর্ণ সংগ্রহ করেন।

রামায়ণে আছে, উসীরবীজ (উশীরবীজ) দেশে সংবর্তকে যাজকরূপে গ্রহণ করে মরুত্ত যখন যজ্ঞ করছিলেন, তখন রাবণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন। ... রাবণ চলে গেলে দেবতারা নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করে উপকারী পশুদের রূপ বৃদ্ধির বর দিয়েছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে আমরা যাকে welfare state বলে থাকি, **মরুত্ত** তারই আদিম রূপ। প্রাচীন অধিরাষ্ট্রমূলক সমাজের কোনো একটি পর্বে যৌথসামাজিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপে এর আবির্ভাব হয়েছিল। যেহেতু এই ব্যবস্থা ছিল খানিকটা অধঃপতিত বেদবাদী (সনাতন ব্যবস্থা থেকে বা আদিম সাম্যবাদ থেকে যথেষ্ট অধঃপতিত), সেই কারণে স্বাতন্ত্র্যবাদী **ইন্দ্র** ও **বৃহস্পতি** এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, যখন কিনা যৌথতাবাদী সংবর্ত্ত এর সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ...

মর্ত্ত (মর্ত্ত্য) : ১. ✓মৃ + ত (তন্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মর্ত্ত** = **মর্ত্** *(সীমায়িতের রক্ষণের তরণ) তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে বা যাহারা মরে।* **মর্ত্ত্য** = **মর্ত্ত** *থাকে যাহাতে।* ৩. **মর্ত্ত** = 'মর', মনুষ্য, পৃথিবী। **মর্ত্ত্য** = মর্ত্তভব, পৃথিবীস্থ, মরণধর্ম্মবান, মনুষ্য, মনুষ্যলোক, পৃথিবী, শরীর। (ব.শ.)। ৪. আধুনিক বাংলার পণ্ডিতদের কৃপায় শব্দটি এখন **মর্ত** হয়ে গেছে। এবং earth বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। ৫. যা কিছু মরণশীল, তাদের **মর্ত্ত** বলে। সেই **মর্ত্ত** বা মরণশীলগণ যে স্থানে বা লোকে থাকেন, তাকে **মর্ত্ত্য** বা **মর্ত্ত্য**লোক বলে। 'এই মর-জগৎ' বা 'মরণশীল এই বিশ্ব' বোঝাতে সেকেলে বাংলাভাষীরা **মর্ত্ত্য** শব্দটি এখনও ব্যবহার করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় এই **মর্ত্ত্য** শব্দটির ব্যবহার যথেষ্ট মাত্রায় আছে, যথা — 'হয় যেন **মর্ত্ত্যের** বন্ধন ক্ষয় / বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয় ... ', কিংবা, 'যখন রব না আমি **মর্ত্ত্য**কায়ায়' ... ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির বিপুল ব্যবহার ছিল।

মর্ম্ম : ১. ✓মৃ + মন্ (মনিন্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *মর্মন্ (সীমায়িতরূপী মনন) সীমায়িত যাহাতে বা যেখানে; অর্থাৎ, মন থাকে যেখানে; কিংবা, মনের কেন্দ্রিভবন ঘটে যেখানে।* ৩. প্রাণস্থান, জীবস্থান, মর্ম্মস্থান (দেহে ১০০টি, মতান্তরে ১০৭টি মর্ম্ম আছে।), সন্ধিস্থান, তত্ত্ব, হৃদয় ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মন**। **মর্-ম্-ম** বা **মর্ম্ম** কথাটির অর্থ হল — 'সীমায়িত রাখা সীমায়ন সীমায়িত যাহাতে'। অর্থাৎ, 'সীমায়ন-কারীকে সীমায়িত করে রাখা হয়েছে যে সীমিত সত্তায়'। যেহেতু **মন**-এর কাজই হল বাইরের সবকিছুকে সীমায়ন করা, তাই কথাটির মানে দাঁড়িয়ে যায় — মননকে সীমায়িত করে রাখা হয় যে সীমিত সত্তায়। অতএব **মর্ম্ম** শব্দের মানে হয়ে যায় 'মন সঙ্কুচিত রূপে থাকে যেখানে'। অর্থাৎ, মনকে সীমায়িত করলে কিংবা, দুধ মরে সঙ্কুচিত

হয়ে ক্ষীর হওয়ার মতো, **মন** মরে মরে বা সঙ্কুচিত হয়ে হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে যে অবস্থানে পৌঁছয়, তাকে **মর্ম্মন্** বা **মর্ম্ম** বলে। তার মানে, অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্যি যে, আমাদের মনের এরকম একটি কেন্দ্রের কথা, মনের **মধ্য**-এর কথা, উৎসবিন্দু ও বিলোপবিন্দুর কথা, মনের সর্বোচ্চ সীমায়িত রূপের কথা আমাদের পূর্বসূরিগণ ভেবেছিলেন! এবং তার নামকরণও করেছিলেন! শুধু কি তাই! সেই **মর্ম্ম**-এর ১০০টি বা ১০৭টি স্থানকে চিহ্নিতও করেছিলেন তাঁরা। আমরা তো এতদিন **মর্ম্ম**কেই ঠিকঠাক চিনিনি, তাদের স্থানের বিষয়ে আমরা জানব কেমন করে! ...

এদিকে আমাদের অ্যাকাডেমির হাতে পড়ে **মর্ম্ম** বেচারার **মন**টাই গেছে বাদ পড়ে, তাঁরা **মর্ম্ম**-এর বা **মর্ম্ম**-এর একটা **ম্**-কে কেটে বাদ দিয়ে তাকে **মর্ম** বানিয়ে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, 'সীমায়িত (ম) রাখা (র্) সীমায়ন (ম্) সীমায়িত যাহাতে (ম)' কথাটি বদলে হয়ে গেছে 'সীমায়িত (ম) রাখা (র্) সীমায়িত যাহাতে (ম)'। অর্থাৎ **মর্ম্মের** ভিতর থেকে **মন**টাকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন এই **মর্ম**-এর ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ নির্বচন করলে সেটি দাঁড়ায় — '**মর্** সীমায়িত যাহাতে (ম)', অর্থাৎ **মর্ম** শব্দের মানে হবে 'শবদেহ' বা 'শবদেহের ছাই' বা 'চিতাভস্ম', কিংবা, 'মৃত্যুর শংসাপত্র' অর্থাৎ death certificate, অথবা ঐরকম কিছু।

তা সে যাই হোক, **মর, মরু, মরুৎ** প্রভৃতি শব্দের মতো **মর্ম্ম** শব্দ থেকে তৎসংশ্লিষ্ট যে সকল শব্দের জন্ম হয়েছে এবং একালের বাংলাভাষার ব্যবহার থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে, তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। সেগুলির কয়েকটি শব্দের অর্থ নিম্নে আমাদের মন্তব্যসহ উপস্থাপিত হল।

মর্ম্মঘাতী, মর্ম্মচ্ছেদী, মর্ম্মভেদী : ২. *যাহা মর্ম্মকে আঘাত করে / ছিন্ন করে / ভিন্ন করে।*

মর্ম্মপীড়া, মর্ম্মব্যথা : ২. *যাহা মর্ম্মকে পীড়িত করে / ব্যথিত করে; অথবা, মর্ম্মের পীড়া / ব্যথা।*

মর্ম্মর : ২. *মর্ম্ম রহে যাহাতে।* ৩. মর্ম্মরধ্বনিযুক্ত, মর্ম্মরশব্দবান, মর্ম্মরায়মাণ, পর্ণধ্বনি, পত্রশব্দ; মার্বেল পাথর। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. গাছের মনের কেন্দ্রীভূত যে রূপ, গাছের সেই **মর্ম্ম** তার পাতার শব্দের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। সেকারণেই তাকে **মর্ম্মর** বা 'পর্ণধ্বনি', 'পত্রশব্দ' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। তার মানে গাছের যে **মর্ম্ম** আছে, **মন** আছে এবং অতএব প্রাণও আছে, এই সব কথাই আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা জানতেন। গাছের **মর্ম্ম**কথা, **মর্ম্মব্যথা** ... ইত্যাদি গাছের সকল **মর্ম্ম**বাণীই যে তার **মর্ম্মর**-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেকথা নিশ্চয় তাঁরা জানতেন। অন্যথায় এরকম সর্বতোকাতর শব্দ তাঁরা সৃষ্টি করতে পারতেন না। ... ৬. ল্যাটিন murmur, ইংরেজি murmur, ফরাসি murmure ইত্যাদি।

মর্ম্মান্তিক : ২. *মর্ম্মের অন্তিকে যায় যে (ঘটনা); অথবা মর্ম্মের গা ছুঁয়ে যায় যে (ঘটনা বা ব্যাপার)।*

মর্ম্মাহত : ২. *যাহার মর্ম্ম আহত হইয়াছে; অথবা, যাহার মর্ম্মে আঘাত করা হইয়াছে।*

মর্য্যাদা : ১. মরি-আ + √দা + অ (অঙ্) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *সত্তার সীমায়িত রূপ গতিশীল বা সক্রিয় থাকে যে প্রদত্ত অবস্থানে।* ৩. ন্যায়পথস্থিতি, ধারণা, স্থিতি, সীমা, অবধি, ক্ষেত্রসীমা, আলি, বেলা, কূল, সীমাচিহ্ন, সদাচারক্রম, বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, প্রচলিতব্যবহার, (ব্যাকরণে) অবধিভূত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্বয়, গৌরব, সম্মান। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি প্রচলিত; তবে বানান বদলে এটি এখন **মর্যাদা** হয়ে গেছে। ৫. নদীর 'সীমায়িত রূপ' তার দুই কূলের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত অর্থাৎ 'গতিশীল বা সক্রিয় থাকে'। অর্থাৎ, কূল দুটি দিয়ে ঘেরা '**প্রদত্ত অবস্থান**'ই নদীর **মর্য্যাদা**। কূলকে বা কূল বরাবর গড়ে তোলা নদীর দু'পাশের দুই বাঁধকেও তাই নদীর **মর্য্যাদা** বলে; কেননা, তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদী নদীর **ধর্ম্ম** পালন করে থাকে। সমুদ্র তার বেলাভূমিগুলির মাঝে সক্রিয় থাকে ব'লে বেলাভূমিকে সমুদ্রের **মর্য্যাদা** বলা হয়। এরকম অজস্র প্রকৃতিপ্রদত্ত **মর্য্যাদা** বিভিন্ন সত্তার আছে। শস্যক্ষেত যে আলিগুলি দিয়ে ঘিরে তার জল ধরে রেখে শস্যাদিকে ফসল হয়ে উঠতে সক্রিয় রাখে, সেই আলিকে তাই শস্যক্ষেতের **মর্য্যাদা** বলে। ... এগুলি সবই বাহ্যিক ও দৃশ্য **মর্য্যাদার** উদাহরণ। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল চীনের প্রাচীর। তার ভিতরে চীন জাতি সক্রিয় থাকতেন, নিজেদের **ধর্ম্ম** পালন করতেন, তাঁরা তাঁদের সেই **মর্য্যাদার** প্রাচীর কখনো লঙ্ঘন করতেন না, অন্যেও তাঁদের সেই **মর্য্যাদার** প্রাচীর লঙ্ঘন করতে পারত না।

ভারতবর্ষ কিন্তু দৃশ্য প্রাচীরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি; অদৃশ্য **মর্য্যাদার** বাঁধগুলিই ছিল তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার অন্তত তিনটি স্পষ্ট ভাগ ছিল — প্রকৃতিপ্রদত্ত অদৃশ্য **মর্য্যাদা**, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের **মর্য্যাদা** ও সামাজিক **মর্য্যাদা**। এই সামাজিক **মর্য্যাদাই** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃষক তাঁর কৃষিকর্ম করে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করবেন, এতেই তাঁর সামাজিক **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠিত ছিল। একইভাবে আমাদের সমাজে তাঁতি জেলে কামার কুমোর তেলি তাম্বুলি বদ্যি গুরু ... সকলেরই যার যার তার তার বিশেষ বিশেষ সামাজিক **মর্য্যাদা** সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। একে 'সদাচারক্রম'ও বলা হত। একজন গুরু বা শিক্ষকের **ধর্ম্ম** ছিল উত্তরসূরিদের শিক্ষা দেওয়া, তদনুযায়ী তাঁর সামাজিক **মর্য্যাদার** অদৃশ্য বাঁধ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই **মর্য্যাদার** ভিতরে থেকে তিনি তাঁর শিক্ষা দেওয়ার **ধর্ম্ম** পালন করতেন। একজন মজুরও তাঁর **ধর্ম্ম** পালন করতেন তাঁর **মর্য্যাদার** ভিতরে থেকে। কেউ কারও **মর্য্যাদা** লঙ্ঘন করতেন না, **মর্য্যাদা** হরণও করতেন না। ঠিক প্রকৃতি যেমন তার প্রতিটি জীবের নিজ নিজ স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। কুকুর যখন বিড়ালশিশু কিংবা মানবশিশুকে পালন করতে শুরু করে তখন সে তার **মর্য্যাদা** অতিক্রম করে বা লঙ্ঘন করে উচ্চতর **মর্য্যাদায়** সক্রিয় হয়ে যায়। আবার একজন মানুষ যখন অন্য মানুষকে হত্যা করে তখন সে মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **মর্য্যাদা** লঙ্ঘন করে নীচে নেমে যায়। কিংবা, একজন শাসক যখন ডাক্তারকে বলে, তুমি কেবল সিপিএম দলের অথবা সাদা মানুষের কিংবা মুসলমান জাতির রুগীদেরই রোগ নিরাময় করার **ধর্ম্ম** পালন করবে, অন্য কারও রোগ নিরাময় করবে না, তখন সে-শাসক ডাক্তারকে ডাক্তারের **মর্য্যাদা** লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করে এবং

নীচে নেমে যেতে বাধ্য করে। **মর্য্যাদাহরণে**র এরকম অজস্র রূপ রয়েছে। ...

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন বিশেষ বিশেষ কালখণ্ড আসে, যখন লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো একটি জাতি মাত্র একটি বা কয়েকটি শব্দের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। একবার সেই শব্দটি বা শব্দগুলি অর্জন করে নিতে পারলেই দেখা যায়, সমগ্র জাতি সেই শব্দকে তাঁদের অস্তিত্বের মূলমন্ত্র করে নিয়ে নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানবসভ্যতার অগ্রগতির একেবারে সামনের সারিতে এগিয়ে চলে আসে। সম্প্রতি সেরকমই দেখা গেল আমাদের এই **বঙ্গে**। দেখা গেল, পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষীগণ তেমনি একটিমাত্র শব্দের জন্য আকুলি-বিকুলি করছেন। তাঁদের সমস্ত কথা এসে আটকে যাচ্ছে এমন একটি শেষ কথায়, যে কথাটি তাঁদের পেটে আসছে মুখে আসছে না। আর সেজন্যই তাঁরা বহু কথা বলতে শুরু করেছেন, বলে চলেছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলতে পারছেন না; আর সেজন্যেই **মহামায়া** তাঁদের বর দিতে পারছেন না। ফলে, তাঁদের আকুলি-বিকুলি দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু কিছুতেই তার নিরসন হচ্ছে না। কী চাই সেটা ঠিকঠাক বলতে না পারলে **মহামায়া** তাঁদের বর দেবেন কী ভাবে? বাংলাভাষী জ্ঞানী-বিদ্বান দেশনেতা-নেত্রীদের তো কথাটা স্পষ্ট করে বলতে হবে!

সেই অতি-প্রয়োজনীয় কথাটি হল **মর্য্যাদা**। যদিও মানুষের **মর্য্যাদাহরণের** সূচনা হয়েছিল বৈদিক যুগে, এবং সম্প্রতি তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে সারা বিশ্বেই সেই **মর্য্যাদাহরণ** তার চূড়ায় পৌঁছতে চলেছে; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের দুর্ভাগ্যবশত সেই **মর্য্যাদাহরণ** পর্ব তার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে আমাদের এই পোড়া বাংলায়। বর্তমানে প্রত্যেক বাংলাভাষী যেটি হারিয়েছেন, সেটি হল তাঁর **মর্য্যাদা**। টাকাপয়সা জমিজায়গা ঘরবাড়ি যাদের গেছে, সেগুলি তো গেছে ঐ **মর্য্যাদা** গেছে বলেই! পশ্চিমবাংলার শাসক পশ্চিমবাংলার মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না, কোনো মানুষকেই মানুষের **মর্য্যাদা** দেয় না, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষই শাসকের কাছে চরম হেনস্থা পায়। কেননা, এই শাসকেরা মানসিকভাবে উলঙ্গ, এবং স্বভাবতই নিজেরাও পরস্পরকে **মর্য্যাদা** দেয় না। এদের এক নেতা অন্য নেতা সম্পর্কে এই ভাষায় কথা বলে — 'আমাদের বুদ্ধ, সংস্কৃতি-টংস্কৃতি করে'; এবং সেটি যে গুরুতর অপরাধ, তার বোধ পর্যন্ত তাদের নেই। স্বভাবতই এই শাসকেরা কোনো মানুষকেই **মর্য্যাদা** দেওয়া উচিত মনে করেনি। ফলত, বিগত তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের এই শাসক তার অভ্যাসবশত সকল পশ্চিমবাংলাবাসীর **মর্য্যাদা**টাই কেড়ে নিয়েছে! পেছনে পেছনে বাকি সব গেছে, যাচ্ছে।

এখন তাই, প্রত্যেক বাংলাভাষীই তাঁর **মর্য্যাদা** ফিরে পেতে চান, তাঁর **মর্য্যাদা**র প্রতিষ্ঠা চান, পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু সেকথাটি তাঁরা এখনও বলতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁদের নেতা-নেত্রীগণ বলে চলেছেন — মা মাটি মানুষের কী যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চাই; বুঝিবা 'পরিবর্তন চাই'!

মানুষের সামাজিক **মর্য্যাদা** থাকলে তার অনেক কিছু থাকে। কারণ **মর্য্যাদায়** থাকে — একটি **'প্রদত্ত সামাজিক অবস্থান'**, তা সেটি চাষী, তাঁতি, জেলে, মজুর, **শিল্পী, চাকুরে**, মাস্টার, ডাক্তার ... ইত্যাদির যে কোনো একটি হতেই পারে। মানুষটি যে অবস্থানে সক্রিয় হয়, তা সে চাষীর অবস্থানে হোক আর ডাক্তারের অবস্থানেই হোক, সেখানেই সে তার অবস্থানের **ধর্ম্ম** পালন করতে পারে। তার সেই অবস্থানের চারদিক ঘিরে একটা অদৃশ্য বাঁধ বা আলি দেওয়া থাকে, সেই অদৃশ্য আলিটাই তার **মর্য্যাদা**কে রক্ষা করে। সেই **মর্য্যাদা**টাই লঙঘন করা হয়েছে, হরণ করা হয়েছে, কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সেই **মর্য্যাদার** পুনরুদ্ধার চাই, **মর্য্যাদার** পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই। আর সেটি যে কেবল প্রতিটি বাংলাভাষীর **মর্য্যাদার** ক্ষেত্রে করা হয়েছে তাই নয়, তার মায়ের ক্ষেত্রে, তার মাটির ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। তাই বাংলার মানুষ আজ কার্যত 'মা-মাটি-মানুষ'-এর **মর্য্যাদা** পুনরুদ্ধার করতে চায়, সেই **মর্য্যাদার** পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাঁদের নেতানেত্রীগণ 'মা-মাটি-মানুষ-এর কী যেন চাই' পর্যন্ত অনুভব করার যোগ্যতাও অর্জন করে ফেলেছেন, কিন্তু কী চাই, সেটি এখনও অর্জন করে উঠতে পারেননি। হয়তো পারবেন, আজ কিংবা কাল, হয়তো পারবেন না, হয়তো তার জন্য আরও এক প্রস্থ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। কী হবে আমরা জানি না। কিন্তু একথা নিশ্চিত জানি, গান্ধী বা মার্কসের বলে যাওয়া সত্যের পথে চলার চেয়ে নিজের অর্জিত সত্যের পথে চলা অনেক বেশি গৌরবজনক এবং তাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ...

ইতোমধ্যে আমাদের অ্যাকাডেমির হাতে পড়ে **মর্য্যাদা** শব্দটি পরিণত হয়েছে **মর্যাদায়**। ফল হয়েছে এই যে, **মর্য্যাদা** বা '*সত্তার সীমায়িত রূপ গতিশীল বা সক্রিয় থাকে যে প্রদত্ত অবস্থানে*' কথাটি পরিণত হয়েছে 'সত্তার সীমায়িত রূপ গতিশীল বা সক্রিয় থাকে যে অবস্থানে'। অবস্থানটি যে 'প্রদত্ত', সেই কথাটি বাদ গেছে। কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, **মর্য্যাদা** যতই অর্জন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, পারিপার্শ্বিকের স্বীকৃতি ছাড়া সেই **মর্য্যাদা** সত্য হতে পারে না। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেউ না কেউ **মর্য্যাদা** স্বরূপ ঐ অবস্থানটি প্রদান করে থাকে; তা সে প্রকৃতি, সমাজ যেই হোক। **মর্য্যাদা**কে **মর্যাদা** করে দেওয়ায় সেই **মর্য্যাদা**-দাতাদের অস্বীকার করে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া বাস্তবে তেমন হয় না। সেই বিচারে **মর্যাদা** একটি অনর্থক অবাস্তব অর্থহীন শব্দ হয়ে যায়। কার্যত সে এখন **মর্যাদা**রূপে **মর্য্যাদার** প্রতিনিধিত্ব করছে।

মর্য্যাদাঅচল, মর্য্যাদাগিরি, মর্য্যাদাপর্ব্বত : ২. *মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখে যে অচল / গিরি / পর্ব্বত।* ৩. সীমাচিহ্নভূত পর্ব্বত। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কার্যত এগুলি হল আমাদের পূর্বকথিত **অধিরাষ্ট্র** (এবং-) বা **রাষ্ট্র**, যে নিজে যেমন বিশেষ **মর্য্যাদা**র ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি তার প্রজাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ **মর্য্যাদায়** প্রতিষ্ঠিত রাখে। সাদৃশ্যে সেই **মর্য্যাদাঅচল-গিরি-পর্ব্বত**টি 'সীমা-চিহ্নভূত পর্ব্বত' বা demarcated mountain-কে বোঝাতে চায়, কিন্তু পারে না; কেননা, দৃশ্য বাস্তবে সেরকম কোনো mountain নেই।

মর্য্যাদাতিক্রম : ২. *মর্য্যাদাকে অতিক্রম করা হয় যাহাতে।* ৩. মর্য্যাদালঙঘন, সীমাতিক্রম। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. আজকের বাস্তবে বিশ্বের প্রতিটি কোণায়, সর্বত্র, প্রতিমুহূর্তে হাজার হাজার **মর্য্যাদাতিক্রম**-এর ঘটনা ঘটছে, অথচ সেগুলি যে **মর্য্যাদাতিক্রম**,

সেকথা বলবার যোগ্যতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে আজকের সমাজ। শিক্ষক তাঁর **মর্য্যাদাতিক্রম** করে ছাত্রকে পেটাচ্ছেন, ছাত্র ছাত্রের **মর্য্যাদাতিক্রম** করে শিক্ষকের মুখে চুনকালি দিচ্ছেন, শাসক তাঁর **মর্য্যাদাতিক্রম** করে শাসিতকে পুলিশ-মিলিটারি পাঠিয়ে খুন করছেন, শাসিত শাসিতের **মর্য্যাদাতিক্রম** করে শাসকের চলার পথে বোমা পুঁতছেন; ... ... বলতে গেলে সারা বিশ্বজুড়ে এখন সবাই সকলের **মর্য্যাদা অতিক্রম** করতে লেগেছেন, **মর্য্যাদা** লঙঘন করতে লেগেছেন। এমনকি শাড়ি, পাগড়ি, দাড়ি, টুপি, বোরখা ... ইত্যাদি যে সকল প্রতীক বিভিন্ন সামাজিক সত্তার **মর্য্যাদা** রূপে স্বীকৃত ছিল, সেখানেও একদল সেগুলির **মর্য্যাদা অতিক্রম** করে সেগুলির আড়ালে চোরাচালান, বোমাচালান ইত্যাদি করছে, অপরদল তা ঠেকাতে শাড়ি, পাগড়ি ... ইত্যাদি ধরে টানাটানি শুরু করছে; অর্থাৎ বিপরীতে তারাও সেগুলির **মর্য্যাদা অতিক্রম** করছে। ফলে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে এক মহাকলরোল, বিকট গোলযোগ। ... অথচ সেগুলিকে চিহ্নিত করে সেই সামাজিক সংকটের হাত থেকে বেরোনোর ভাবনা ভাবা হচ্ছে কতটুকু? সংকটের কারণটিকে চিহ্নিত করে তার নামটিই তো এখনও দেওয়া যায়নি! ...

মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা : ২. *মর্য্যাদা প্রতি-স্থাপিত যাহাতে।* ৪. অপ্রচলিত। **৫.** শব্দটি ব.শব্দকোষে বা অন্য অভিধানে নেই। এটিকে পাওয়া যায় পুরাণাদি গ্রন্থে। আগে ব্যক্তিমালিকানা নিন্দনীয় ছিল, তার সামাজিক **মর্য্যাদা** ছিল না, তাই **মৎস্যগন্ধা** ছিলেন 'দুর্গন্ধবতী'। পরাশরের চেষ্টায় সমাজে ব্যক্তিমালিকানার **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা লাভ করে; পরাশরের বরে **মৎস্যগন্ধা** 'সুগন্ধবতী' হয়ে যান। দ্র. **মৎস্যগন্ধা**। মনে রাখা ভাল, এভাবেই ভারতসমাজে প্রতিটি সামাজিক সত্তার **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৈদিক যুগের অপরাহ্ণে এবং হিন্দুযুগে কঠোর **বর্ণাশ্রম** প্রথা সেই **মর্য্যাদাহরণ** করে এবং নিঃসন্দেহে তার ফল ভাল হয়নি।

মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা কথাটির মধ্যে অপর একটি কথা আছে। তা হল, অপর কোনো সত্তার **মর্য্যাদা** স্থাপিত হয়ে আছে; তার বিপরীতে প্রতিস্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে **মর্য্যাদা**, তাকেই **মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা** বলে। সমাজে কারও যদি কোনো **মর্য্যাদা** না থাকে, তবে সবাই সামাজিকভাবে উলঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু মানুষের **মর্য্যাদা স্থাপিত** থাকলে বাকি মানুষদের **মর্য্যাদা** স্বভাবতই প্রতিস্থাপিত করতে হয়। তাকেই বলে **মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা**।

মার (মারণ, মারা) : ২. ***মার*** = ***মর*** *(সীমায়িত করে রাখা হয় যাহাতে) হইতে জাত।* ***মারণ*** = ***মার*** *অন (on) থাকে যাহাতে।* ***মারা*** = ***মার****-এর আধার যে।* / **মার** = বিরহীকে মারে যে ('বিরহিমারক')। **মারণ** = যাহা দ্বারা বিনাশ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. মার** = মারক, বিনাশক, ঘাতক, মারণ, তাড়ন, কাম, মৃত্যু ... ইত্যাদি; প্রহার, আঘাত, বিনাশ, শাসন ... ইত্যাদি; বিনাশ করা, বধ করা, প্রহার করা, লক্ষ্যে আঘাতার্থে নিক্ষেপ করা ... ইত্যাদি। **মারণ** = হনন, বধ, ভস্মীকরণ, অভিচার কর্ম্মবিশেষ, বিষবিশেষ, প্রহার। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কাছ, কাছা, গাঁটকাটা, গাঁটছড়া, চুরমার**। যতক্ষণ **মর** শব্দে আমরা ছিলাম, সীমায়িতকরণ **ক্রিয়াটি সত্তা নিজে করছিল নিজের উপর — দুধ মরে বা নিজের মধ্যে সীমায়িত হয়ে যাচ্ছিল, নদী নিজের মধ্যে নিজে সীমায়িত হয়ে** শুকিয়ে যাচ্ছিল **বা মরে যাচ্ছিল** ... ইত্যাদি। এখন যখন সেই **মর** হইতে জাত **মার** ক্রিয়ায় এলাম, দেখা যাচ্ছে সত্তা নিজে **নিজের** ভিতরে **আত্মসঙ্কোচন করছে না**, নিজেকে নিজে সীমায়িত **করছে না**, সে অন্যকে **সঙ্কুচিত হতে বাধ্য করছে**, সীমায়িত হতে বাধ্য করছে।

তার মানে, **মার** শব্দের অর্থ হল অন্যকে তার নিজের কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়া লাগানো; তাকে তার কেন্দ্রে সীমায়িত হতে বাধ্য করা। অর্থাৎ **মার** ক্রিয়াটি করা বা **মারা** মানে **'পেটাই করা'** নয়, **মারা** মানে অন্য কোনো সত্তাকে তার কেন্দ্রে সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য যা **কিছু** করার দরকার হয়, তার সবকিছু করাই **মারা**; তা সে **'পেটাই করা'** হতে পারে, **'ধোলাই করা'** হতে পারে, **'লাঠিপেটা করা'** হতে পারে, 'খুন করা' হতে পারে ... এবং এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। যে কারণে 'ঢিল **মারা**', 'তীর **মারা**', 'বাণ **মারা**', 'কামানের গোলা **মারা**', 'বোমা **মারা**' ... প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সবই অন্যকে তার আবাসকেন্দ্রে ফিরে যেতে বাধ্য করে; তা সে তার রাজধানী হোক, তার আবাসস্থল হোক, তার শয়নকক্ষ হোক, কিংবা তার দেহের ভিতরেই হোক। মনপ্রাণ দেহের ভেতরে যায় তখনই যখন প্রচণ্ড **মার**-এর ফলে দেহে এত ক্ষত হয় এবং তার এত যন্ত্রণা হয় যে, তার মনের ফাঁকগুলি দুঃখবোধে ভরে যায়। অন্য কথা শুনবার বুঝবার অবকাশ থাকে না তার। তার পর আরও সীমায়িত হয়ে সে **মরে** যায়, **মড়া** হয়ে যায়, এবং ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইংরেজি-শিক্ষিত কোনো কোনো বুদ্ধিমান আমাদের বলেন — তোমাদের ভাষার এ কী পাগলামি! তোমরা 'ভাত খাও', 'ডাল খাও', এমনকি 'জল খাও', 'বিড়ি-ও খাও'। আমাদের দেখো কত স্পষ্ট, আমরা ভাত-ডাল eat করি, জল drink করি, সিগারেট smoke করি। তাকে তখন বলা দরকার যে, আমাদের গালিভার-শব্দের সঙ্গে তোমাদের লিলিপুট-শব্দের তুলনা করা উচিত নয়। আমরা বাংলাভাষীরা কেবল জলই খাই না, আরও অজস্র জিনিস খাই! আমাদের খাদ্যতালিকা দেখলে তোমরা লিলিপুট-শব্দবিলাসীরা 'ভিরমি খাবে'। এমনকি আমরা **মার**ও খাই! যতরকম **মার** আছে, তার সবই আমরা দিই এবং খাই — বকুনি, গালি, কানমলা, কিল, চড়, লাথি, ঘুষি, জুতো, গুঁতো, বেত, বাড়ি, তাড়া, চাবুক ... এসবই **মার**-এর রকমফের এবং এই সব **মার**ই আমরা দিই এবং খাই। আর, **মার**-খেলেই খাদক আত্মকেন্দ্রে সীমায়িত হয়।

কিন্তু এখানেই গালিভার-শব্দবিলাসী বাংলাভাষী স্বভাবতই দাঁড়িয়ে থাকেননি। 'হ্যাঁ-না'-এর যৌথকারবারী এই **বঙ্গ**ভাষীগণ **মারা**কে এত বিচিত্রভাবে সর্বলোকে প্রয়োগ করে থাকেন যে তার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। দৃশ্য **মার** যতরকমের আছে, হাতে-**মারা**, প্রাণে-**মারা**, কিল-**মারা**, চড়-**মারা**, লাথি-**মারা**, ঘুষি-**মারা**, জুতো-**মারা**, গুঁতো-**মারা**, কোদাল-**মারা**, চাকু-**মারা**, ব্লেড-**মারা**, বেত-**মারা**, বাড়ি-**মারা**, তাড়া-**মারা**, চাবুক-**মারা**, ঢিল-**মারা**, তীর-**মারা**, বাণ-**মারা** ... ইত্যাদি পেরিয়ে পরমাণুবোমা-**মারা** পর্যন্ত সর্বপ্রকারের দৃশ্য **মারা** তো আছেই, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আছে

অদৃশ্য **মার মারা**। যথা — ভাতে-**মারা**, পাতে-**মারা**, পকেট-**মারা**, টাকা-**মারা**, হাত-**মারা**, ঢপ-**মারা**, চাল-**মারা**, চোট-**মারা**, ধমক-**মারা**, ঝাপটা-**মারা**, বুকনি-**মারা**, বক্তৃতা-**মারা**, ডুব-**মারা**, তেল-**মারা**, গেঁড়া-**মারা**, চালাকি-**মারা**, পেঁচ-**মারা**, রোয়াব-**মারা**, গরম-**মারা**, জাত-**মারা**, পোঁদ-**মারা**, গুদ-**মারা**, সুদ-**মারা** ... ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে দৃশ্য **মারা**কে দেখিয়ে অদৃশ্য **মারা**কে বোঝানোর কারবার তো আছেই। তার মধ্যে আবার এমন অনেক **মারা** আছে, তাতে যে **মার** খায়, সে আদৌ সঙ্কুচিত বা সীমায়িত হয় বলে মনেই হয় না, বরং প্রসারিত হতে চায়! যেমন, আড্ডা-**মারা**, ইয়ারকি-**মারা**, দম-**মারা**, **মটকা-মারা**, কাছা-**মারা**, মালকোঁচা-**মারা**, দৌড়-**মারা**, ছুট-**মারা**, উঁকি-**মারা**, কাঁকন-**মারা**, মেদা-**মারা**, চোখ-**মারা**, মুখ-**মারা** (ঘি চপচপে পোলাও মুখ **মেরে** দিয়েছে, অথবা, ব.শ. অনুসারে — 'প্রস্তাববিশেষ বন্ধ করা'), খিল-**মারা**, তালা-**মারা**, পেরেক-**মারা**, মার্কা-**মারা**, গুঁড়ি-**মারা**, চুপ-**মারা**, ধুলা-**মারা** ('এমনি সব গাধা, ধুলারে **মারি** করিয়া দিল কাদা' / জুতা আবিষ্কার/ রবীন্দ্রনাথ), চুলে কলপ-**মারা**, মুখে পাউডার-**মারা** ... ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি শব্দের এরকম অজস্র প্রায়োগিক রূপ থাকলে, ভাষায় অজস্র শব্দ থাকার কী দরকার! লিলিপুট লাখ লাখ হলেই ভাল, কিন্তু গালিভার হাজার দুয়েক হলেই তো কোটি কোটি লিলিপুটের সমান হয়েও অনেক বেশি হয়ে যাবে। যাঁরা বাংলাভাষায় শব্দসংখ্যা কম বলে দুঃখবোধ করেন, কথাটি যত শীঘ্র তাঁদের মাথায় ঢোকে ততই মঙ্গল। অবশ্য প্রয়োগকৌশল ভুলে গিয়ে থাকলে আলাদা কথা। গ্রামবাংলা কিন্তু বাংলাশব্দের ঐরকম প্রয়োগকৌশল মোটেই ভোলেনি। ...

স্বভাবতই **মার** শব্দ থেকে বাংলাভাষী অজস্র শব্দ সৃজন করে নিয়েছেন। সেগুলি থেকে নিম্নে কয়েকটি শব্দের অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করব আমরা।

মারকুটে (মারকাট) : ২. /যে মারে ও কাটে; যে একটুতেই রাগিয়া যায়। (ব.শ.)। ৪. ব্যঞ্জনার্থে প্রচলিত। ৫. **মারকাট** একটি পরিপূরক **যোড়শব্দ**। (দ্র. **মোটমাট**)। বাইরের যে অংশটি আমার এলাকার ভিতরে এগিয়ে এসেছে, তাকে **মার**লে সে পিছিয়ে যাবে, তার কেন্দ্রের দিকে সীমায়িত হয়ে যাবে; তাই তাকে দেওয়া হয় **মার**। অনেক সময় যে অংশটি এগিয়ে আমার এলাকার ভিতরে ঢুকে পড়েছে, তাকে কেটে রেখে দেওয়া হয়। এই হল কাট। আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে দেশের রাজা নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে **মার**তে পারেন, তারা পিছিয়ে যাবে। আর, তাদের যে-অংশটি দেশের ভিতরে ঢুকে গেছিল, তাদের বন্দী করে বন্দীশালায় রাখতে পারেন। এটি হল কেটে নেওয়া। তাই **মার** ও **কাট** = **মারকাট**। তেমন দুটো প্রক্রিয়াই চালায় যে, তাকে **মারকুটে** বলাই যুক্তিসঙ্গত। তবে শব্দটির ব্যবহারের সময় অত নিখুঁত প্রয়োগ দেখা যায় না। ৬. ইংরেজি mar (= কিছু নষ্ট করা)। তবে এর প্রয়োগ বাংলার **মার**-এর তুলনায় অত্যন্ত সীমিত।

মারধর, মারপিট, মারপেঁচ : ৫. উপরে **মারকুটে** দ্রষ্টব্য। এই শব্দ তিনটির প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পরিপূরক **যোড়শব্দ**। দ্র. **মোটমাট**।

মারীচ : ৩. মরীচিসম্বন্ধী, মরীচিপ্রোক্ত, মরীচির অপত্য, মরীচিপুত্র, যাজক ব্রাহ্মণ, রাজহস্তী, কঙ্কোলক, রাক্ষসবিশেষ (ইহার মাতা তাড়কা, পিতা সুন্দ। বিশ্বামিত্রের তপোবনে মারীচ রামশরে আহত হইয়া সমুদ্রমধ্যে ও বনে মুনিবেশে অবস্থান করিত। রাবণের প্রবর্ত্তনায় মারীচ সীতাহরণার্থ মায়ামৃগ রূপে জনস্থানে প্রবেশ করিলে, রাম কর্ত্তৃক নিহত হয়। (ব.শ.)। হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দ অসুরের ঔরসে ও তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে এর জন্ম হয়। এ রাবণের অনুচর। মারীচ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। ... বিশ্বামিত্র রামকে নিয়ে আসেন। ... রাম মানবাস্ত্র সন্ধান করে মারীচকে শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। পরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে গেলে দণ্ডকারণ্যে মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সঙ্গে মারীচ ঋষি-হত্যা করে তাদের রক্তমাংস ভোজন করে। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখে পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে মারীচ প্রতিশোধের ইচ্ছায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গী মৃগরূপে তাঁদের আক্রমণ করে। রাম তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলে মারীচ কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করে; কিন্তু অপর দুই রাক্ষস বিনষ্ট হয়। সেই হতে মারীচ তপস্বীবেশে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে থাকে। সীতাহরণ কালে রাবণ মায়াবী মারীচের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে বলেন। মারীচ রামের বিক্রম জেনে অসম্মত হন। রাবণ তাকে অর্ধরাজ্যের লোভ দেখান এবং অসম্মত হলে হত্যা করবার ভয় দেখান। মারীচ অবশেষে রামের হস্তেই মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতার অনুরোধে রাম তাকে ধরতে গেলে মারীচ রামকে ভুলিয়ে বহুদূরে নিয়ে যায়। তাকে ধরতে অসমর্থ হয়ে রাম শরাঘাতে তাকে বধ করেন। মৃত্যুকালে সে রামের স্বর অনুকরণ করে আর্তনাদ করেছিল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. আমরা জানতে চাইব, রামরাজত্বের পূর্বাহ্ণে রামের সঙ্গে যে **মারীচ** নামক সামাজিক সত্তার সংঘর্ষ হয়েছিল, সেই সত্তাটি কে? যতদূর বোঝা যায়, এঁরা ছিলেন সে সময়ের 'যাজক' শ্রেণীর লোকজন, যাঁরা তৎকালীন **বিশ্বামিত্র**-সত্তার বিরোধী ছিলেন। এঁরা **বিশ্বামিত্র** ও তাঁর সহযোগী আধারশক্তির চোখে নিশ্চয় সেকেলে **দক্ষপন্থী** হয়ে পড়েছিলেন, অন্যথায় তার সঙ্গে **বিশ্বামিত্রা**দির বিরোধ বাধত না। কাহিনীতে বলা হচ্ছে, রাম 'মানবাস্ত্র' দিয়ে ঐ **মারীচ**কে আঘাত করেছিলেন। **মানব** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, এই 'মানবাস্ত্র' হল **বিশ্বামিত্রে**র সহযোগী কর্মকুশলী লোকজন বা skilled কর্মচারীগণ। সম্ভবত **মারীচ**কে এঁরাই বলে দেন, 'ঠিক আছে, আপনি যজন করবেন না, তো, করবেন না; আমরা করে নেব।' কেননা, যাজকের 'সুপারভিশন' ছাড়াই কাজ করে নিতে পারতেন ঐ কর্মচারীরা। ফলে, **মারীচ** আহত হয়। তাই সে জনসাধারণ্যে (সমুদ্রে) মিশে যায় এবং হাটবাজারে (বনে) ঘুরে বেড়ায়।

মারিষা : ২. *মারিবার ইচ্ছা থাকে যাহার।* ৩. বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ইনি **কণ্ডু** ঋষির কন্যা। পুরাকালে কণ্ডু নামে এক ঋষি ভীষণ তপস্যায় রত ছিলেন। ... ভীত ইন্দ্র অপ্সরা প্রম্লোচ্চাকে প্রেরণ করেন। ... প্রম্লোচ্চা তপোভঙ্গ করতে সমর্থ হয়। বহু শতাব্দী ধরে এই অপ্সরার

সঙ্গে বাস করার ফলে কণ্ডুর মনে বিতৃষ্ণা এলে ইনি তাকে বিতাড়িত করেন। এই অপ্সরা তখন আকাশপথে যেতে যেতে স্বেদ মার্জনা করল। তা বৃক্ষের পত্র থেকে পত্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কণ্ডু ঋষি এই অপ্সরার যে-গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন, তা স্বেদরূপে রোমকূপ দিয়ে নির্গত হল। স্বেদসিক্ত বৃক্ষরা সেই গর্ভ গ্রহণ করল এবং বায়ু তা একত্র করল। এর ফলে এক কন্যার জন্ম হল। এই কন্যার নাম মারিষা। এঁর গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **কণ্ড, কণ্ডু, কুণ্ডু**। এই শব্দটিকে ব.শ.-তে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় 'মারিষ'। কোনো কোনো পুরাণে এই **মারিষা**কে প্রাচেতস-দক্ষগণের পত্নী বলা হয়েছে এবং তার থেকে **দক্ষে**র জন্মের কথা বলা হয়েছে। আমরা যতদূর বুঝেছি, তাতে এটুকু আমরা বলতে পারি যে, বৈদিক যুগের যৌবনান্তে যে জনগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যবাদী-পুঁজিবাদী মানসিকতার আধার রূপে সক্রিয় হয়েছিলেন, **মারিষা** তদ্রূপ এক শ্রেণীর মানুষজনকে বলা হয়ে থাকবে। ... এ নিয়ে পৃথক গবেষণা হওয়া দরকার। এই মুহূর্তে হাতের কাছে **মারিষা** বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যও আমাদের হাতে নেই।

মার্কণ্ড (মার্কণ্ডেয়, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, মৃকণ্ড) : ২. **মৃকণ্ড** = *সীমায়িতের আবর্তন থাকে যে* **কণ্ড**-*তে।* **মার্কণ্ড** = **মৃকণ্ড** *হইতে জাত।* **মার্কণ্ডেয়** = **মার্কণ্ড** *হইতে জাত যে।* **৩. মৃকণ্ড** = ইনি ভৃগুর পৌত্র। ইঁহার পিতা ধাতা, মাতা আহুতি, পুত্র মার্কণ্ডেয়। **মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়** = ... বহু বর্ষ হরির আরাধনা করে ইনি মৃত্যু জয় করেন। হরির সাধনায় ইঁহার ছয় মন্বন্তর অতীত হয়। ... নারায়ণ রূপ হরি ... বর দিতে ইচ্ছা করিলে, ইনি মায়া দেখিবার ইচ্ছা করেন, ভগবানও মুনিকে 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করেন। ... এই রূপে নারায়ণের যোগমায়ার প্রভাব অবগত হইয়া, ইনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর ইনি স্তবে তুষ্ট শিবের নিকটে আকল্পান্ত যশঃ পুণ্য অজরামরতা ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান বররূপে প্রাপ্ত হন। (ব.শ.)। ... মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর আরাধনা করে চিরজীবী হন। নৃসিংহপুরাণ অনুসারে, পুত্র জন্মের পর মৃকণ্ড জানতে পারেন পুত্রটি বারো বৎসর বয়সে মৃত হবে। ... মার্কণ্ডেয় তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ জেনে পিতাকে শোক করতে বারণ করে বললেন, তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন। এই বলে মার্কণ্ডেয় বনে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন এবং তপোবলে মৃত্যুকে জয় করে চিরজীবী হলেন।

পদ্মপুরাণ অনুসারে, মৃকণ্ড পুত্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হবে জেনে শীঘ্রই মার্কণ্ডেয়ের উপনয়ন দিয়ে তাঁকে ঋষিদের প্রণাম করতে বললেন। তখন সপ্তর্ষিরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে 'চিরায়ু হও' বলে আশীর্বাদ করার পর তাঁরা এঁর আয়ু জানতে পারলেন। তখন তাঁরা মার্কণ্ডেয়কে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মার বরে মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মার পরমায়ু পেলেন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করে ফিরে এলেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। তবে **মার্কণ্ডেয়পুরাণ** নামে একটি **পুরাণ** আজও আমাদের আছে। **৫.** উত্তরাধিকার সূত্রে হাতে নাতে একটা বই পেয়েও যদি বলি যে, না, আমাদের কোনো অতীত ইতিহাস নেই, **মার্কণ্ডেয়পুরাণ** বলে কোনো বই হয় না, এসব **পুরাণ**-ফুরাণ সব মিথ্যে, রূপকথা, সেটি কি ভাল দেখায়! ...

দক্ষ প্রজাপতির আবির্ভাবের কিছুকাল পরেই **কণ্ড, কণ্ব, কণ্ডু, কণ্ডুয়ন, মৃকণ্ড, মার্কণ্ড** ... প্রভৃতি সত্তার জন্ম হয়েছিল আমাদের বৈদিক যুগের ভারতসমাজে। যৌথসভ্যতায় বিশ্বাসী বৈদিকসমাজ সেই **কণ্ড**দের উদ্ভব ভাল চোখে দেখেনি। **পৃথু**র আবির্ভাবের প্রাক্কালে, **জমদগ্নি**র কালে, **রামরাজত্বের** প্রাক্কালে সেই ধনবাদী সত্তার বিপুল বিনাশ হয়। **মৃকণ্ড** ঠিকই বুঝেছিলেন, **মার্কণ্ড** বেশিদিন বাঁচবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। **বিষ্ণু**র কৃপায় **মার্কণ্ড** সত্তাটি কেবল দীর্ঘজীবীই হয় না, সে **বিষ্ণুর মায়া ও যোগমায়া**কে দেখবারও চিনবার যোগ্যতা লাভ করে। সেই যোগ্যতা অর্জন করে নেবার পর স্বভাবতই সত্তাটি **মার্কণ্ডেয়**পুরাণ লিখে ফেলে। গীতা গ্রন্থটি যেমন মহাভারতের অন্তর্গত, তেমনি বাঙালি হিন্দুর দুর্গাপূজার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত **চণ্ডী** গ্রন্থটি **মার্কণ্ডেয়** পুরাণের অন্তর্গত।

মার্তণ্ড : ২. **মৃত অণ্ড** *হইতে জাত।* / মৃত বা ভগ্ন অণ্ড হইতে উৎপদ্যমান পক্ষী; উপবাস হেতু শুষ্ক গর্ভাণ্ড হইতে উৎপন্ন। (ব.শ.)। ৩. (গৌণার্থে) আকাশে পক্ষীসদৃশ সূর্য্য, মৃতাণ্ডের অপত্য, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, দ্বাদশ আদিত্য, বার ১২ সংখ্যা, শূকর। (দৈত্যদানবগণ বলপূর্ব্বক ত্রিভুবন ও দেবতার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলে, দেবমাতা অদিতি সূর্য্যারাধনা করিয়া সূর্য্যতেজোময় গর্ভ ধারণ করেন। পরে অদিতি শুচি হইয়া গর্ভধারণার্থ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিব্রত গ্রহণ করিলে কশ্যপ ঈষৎ রুক্ষবাক্যে কহিলেন, — 'দেবি, কেন উপবাসে গর্ভাণ্ড বধ কর'। কশ্যপের এই কথা শুনিয়া অদিতি কুপিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, — 'এই দেখ, গর্ভবধ করি নাই'। সেই কশ্যপকথিত 'মারিত গর্ভাণ্ড' হইতে 'মার্তণ্ড' জন্মগ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ভানু**। sun-কে **মার্তণ্ড** বলা হয় কেন, তা নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখা যায়, ব.শ. বলছেন, **মার্তণ্ড** শব্দে যে 'আকাশে পক্ষীসদৃশ সূর্য্য'কে বোঝানো হচ্ছে, সেটা বোঝানো হচ্ছে 'গৌণার্থে'। তাহলে মুখ্যার্থে **মার্তণ্ড** সত্তাটি কী? না, তার কোনো উল্লেখ সরাসরি পাওয়া যায় না। একেবারে পাওয়া যায় না বললে ভুল হবে, পাওয়া যায়, তবে সে আমাদের বর্তমান বোধবুদ্ধিতে চট করে ঢুকতে চায় না। যাই হোক, ব্যাপার হল, আসল **সূর্য্য**টি আকাশে থাকে না, থাকে মানুষের সমাজে, তার বৌ হয় (দ্র. **কুন্তী, অশ্বিনীকুমার**), ছেলেপুলে হয় (দ্র. **কর্ণ**) সে এক সুস্পষ্ট সামাজিক সত্তা। সমাজের জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ ... ইত্যাদির কেন্দ্র হল এই **সূর্য্য**। সাদৃশ্যে বা গৌণার্থে সেটিই আকাশের সূর্যকে বোঝায়। ...

এখানে **মার্তণ্ড** শব্দের অর্থে সেই আদিম সমাজকেন্দ্র নিয়ে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, তারই পৌরাণিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই যৌথসমাজ-কেন্দ্র যখন অধঃপতিত যৌথতাবাদীদের হাতে চলে যায়, বা দৈত্যদানবদের হাতে চলে যায়, তখন **কশ্যপ** সত্তার আধারশক্তি **অদিতি** নতুন যে কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, তাতে এই **মার্তণ্ড** সত্তার জন্ম হয়। এর স্বভাব শুষ্ক, অত্যন্ত দাবদাহ সৃষ্টিকারী, তাপ দিয়ে সমস্ত **পৃথিবী**কে শুষ্ক করে ফেলার চেষ্টা থাকে এই **মার্তণ্ডে**র। অর্থাৎ সমাজকেন্দ্র বা রাষ্ট্রকেন্দ্র যখন প্রজাসাধারণের উপর অত্যধিক খাজনাদি চাপিয়ে শোষণ করতে শুরু করে, নিপীড়ন

করতে শুরু করে, তখনই তাকে **মার্ত্তণ্ড** বলে। প্রাচীনকালে কোনো একসময়, যখন দৈত্যদানব-রাক্ষসেরা সমাজের কেন্দ্র দখল ক'রে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটেপুটে খেয়ে শেষ করে দেয়, পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় কোষাগারকে সেই অভাব পূর্ণ করতে অত্যধিক করাদির সাহায্যে **বাষ্প** আহরণ করতে হয়েছিল, **মেঘ** সৃষ্টি করে **বর্ষণ** ঘটাতে হয়েছিল। একালেও আমরা দেখি, সরকারে থাকা দলটি প্রচুর পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে চলে যাওয়ার পর নতুন যে দলটি সরকারে আসে, সে দেখে রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য। তখন তাদেরকে বাধ্য হয়ে প্রজাদের ঘাড়ে চাপতে হয়। সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তিটি এইরকম আচরণ করলে তাকেই **মার্ত্তণ্ড** বলে।

মৃত : ১. ✓মৃ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মৃ** *(সীমায়িতের আবর্তন) তারিত যাহাতে।* ৩. গতপ্রাণ, গতাসু, মৃততুল্য, অকর্মণ্য, নাশপ্রাপ্ত, ভস্মীভূত, মরণযুক্ত ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. dead অর্থে প্রচলিত। ৫. **মৃত**কে **মৃত** বলা হয় এই জন্য যে, তার ভিতরে তার সামগ্রিক অস্তিত্ব সীমায়িত রূপে আ**বর্ত্তমান** হয়ে রয়েছে। তাই সে **মৃত**। ৬. ল্যাটিন mortuus, ফরাসি mort।

মৃত্যু : ১. ✓মৃ + ত্যু (ত্যুক্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মৃত্য** *(মৃত থাকে যাহাতে) আধার নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. মরণ, নিধন, অন্ত, মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যম, বিষ্ণু, নির্ঋতিগর্ভজাত অধর্ম্মপুত্র, মৃত্যুস্বরূপ, সপ্তদশ যোগ। (ব.শ.)। ব্রহ্মার ক্রোধজাত দেবী। প্রাণী সৃষ্টির পর ব্রহ্মা তাদের সংহারের উপায় ভাবতে থাকেন। তাঁর ক্রোধ হতে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হতে থাকে। তখন প্রজাদের রক্ষার্থ মহাদেব ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করলেন এবং ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী ভারার্ত হলে প্রাণীসংহারের জন্য অনুরোধ করার কোনো উপায় না দেখে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁর নিজের দেহেই তাঁর ক্রোধাগ্নি ধারণ করলেন। তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে পিঙ্গলবর্ণা, রক্তনয়না, রক্তাননা স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী মৃত্যুদেবী আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তাঁকে সকল প্রাণী সংহারে নিয়োজিত করতে চান। মৃত্যু বলেন, তিনি নারী; সুতরাং তিনি এই ক্রুর কর্ম করতে পারবেন না। ব্রহ্মা তাঁকে আদেশ দিলেও তিনি অসম্মতা হয়ে ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে এলে মৃত্যু তখন বলেন, তিনি সুস্থ প্রাণীকে বধ করতে চান না। তিনি স্বয়ং আর্ত ও ভীত হয়ে ব্রহ্মার নিকট অভয় প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন, এতে মৃত্যুর কোনো অপরাধ হবে না। সনাতন ধর্মই তাঁকে পবিত্র রাখবেন। যম এবং ব্যাধি সকলই তাঁকে সাহায্য করবেন। ব্রহ্মা ও দেবগণের বরে তিনি নিষ্পাপ ও খ্যাতিসম্পন্ন হবেন। মৃত্যু তখন ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করে বলেন যে, লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, দ্রোহ, মোহ, অলজ্জা, ও পরুষ আচরণ ইত্যাদি দোষ দেহে বিদ্ধ হলেই তিনি সংহার করবেন। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে বললেন, মৃত্যুর যে অশ্রুবিন্দু ব্রহ্মার হাতে পড়েছিল তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণী সংহার করবে, মৃত্যুর কোনো অধর্ম হবে না। (পৌ.অ.)। ৪. death অর্থে প্রচলিত। ৫. বাংলা ভাষায় জীবের **মরণ** হয়, **মৃত্যু**ও হয়। অর্থাৎ **মরণ** ও **মৃত্যু** একই কথা। তাহলে একই বিষয়কে বোঝাতে দুটো শব্দ কেন? বাংলায় তো একই বিষয়কে বোঝাতে দুটো শব্দ সৃষ্টি করার নিয়ম নেই! তাহলে এরকম কেন? হ্যাঁ, একটি বিষয়কে বোঝাতে একাধিক শব্দের প্রয়োজন হয়, যদি বিষয়টির কান ধরে, লেজ ধরে, শুঁড় ধরে দেখাতে হয়; বিষয় কিন্তু একটিই থাকে। এ দুটি শব্দও অনেকটা সেইরকম। **মরণ**-এ '**মর** অন থাকে' বা **মর**-ক্রিয়াটি সক্রিয় থাকে; কিন্তু **মৃত্যু**তে মৃতাধার বা 'মৃত্য' নবরূপে উত্তীর্ণ থাকে। তার মানে, **মৃত্যু** হল মৃতদেহের আবাসস্থান, যেখানে সব **মৃত**দেহকে আনা হচ্ছে, তারপর তাদের বিন্যস্ত করে রাখা হবে। সেকারণে **মৃত্যু**কে যম বলা হয়। **মৃত্যু**-কবলিত হওয়া মানে **মৃত্যু**-ব্যবস্থার বা যমালয়ের ব্যবস্থার কবলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। লোকের **মৃত্যু** হলে সে **মৃত্যু**র বা যমের সেই **মৃত্যু**-ম্যানেজমেন্টের এলাকায় ঢুকে পড়ে। জীবের **মরণ**-এর পরে প্রকৃতির নিয়মে জীবের অস্তিত্বের যা যা পরিণাম হয়, তা সবই প্রকৃতির ঐ **মৃত্যু**-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। রাজার হুকুম না আসা পর্যন্ত যেমন তাঁর সৈন্যবাহিনীর সৈন্যরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েও লড়তে থাকে এবং হুকুম এলেই হাতিয়ার ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, জীবশরীরের কোষবাহিনীও তেমনি মস্তিষ্ক থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত প্রাণপণ লড়তে থাকে; হুকুম এলেই তারা লড়াই পরিত্যাগ করে এবং তৎক্ষণাৎ দেহের পচন শুরু হয়ে যায়; তার আগে পর্যন্ত শরীরে পচন ধরে না। এ সবই প্রকৃতির **মৃত্যু**-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু ভারতবর্ষ তো এই বাহ্য ও দৈহিক **মৃত্যু**তেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেনি, তার মানসিক-**মৃত্যু**, সামাজিক-**মৃত্যু**, জাগতিক-**মৃত্যু** — এসব বোধও ছিল, আছে। সর্বপ্রকারের **মৃত্যু**-ব্যবস্থাকে তাঁরা একটাই নাম দেন — **যম** (যাত্রাকে সীমায়িত করে যে) বা **মৃত্যু**। আমাদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, জাগতিক জীবনযাত্রার উদ্ভব থেকে বিলোপ পর্যন্ত সমগ্র যাত্রাপথটিই এই **যম** বা **মৃত্যু**র দখলে থাকে। কখন কোনখানে কোন দোষে তিনি আমাদের 'সংযমিত' করবেন, সে সবই তাঁর ব্যাপার! এগুলির ভিতরে একমাত্র সামাজিক-মৃত্যুব্যবস্থাকে আমরা কমবেশি চিনতে পারি। সেকালে একে বলা হত **মৃত্যুপতি যম**-এর 'যমালয়', একালে বলা হয় 'আদালত'। এখানে **ধর্ম্মাবতার** আমাদের সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতির বিচারাদি করে থাকেন এবং প্রয়োজনে দৈহিক **মৃত্যুদণ্ড** দিয়ে থাকেন। ...

মৃত্যুকে একটি সত্তার মতো করে কথা বলার এই রীতি ইংরেজি ভাষার দ্বারা কলুষিত বাংলাভাষীদের ভাল লাগে না। তাঁরা অনেকে এসব খবরও রাখেন না যে, এরকম বহু সত্তাকে নিয়ে ইংরেজ জাতিও বহুকাল কাটিয়েছেন। তাঁদের মধ্যযুগের Morality নাটকগুলিতে এরকম বহু সত্তার খবর আছে।

মৃগ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমার্গ, ময়ঙ্ক, মাইসর, মাইসরা, মারগ, মার্গ্, মার্গ, মার্গক্লেশ, মার্গণ, মার্গতোরণ, মার্গদর্শক, মার্গদ্রুম, মার্গধেনু, মার্গধেনুক, মার্গপ, মার্গপতি, মার্গপথ, মার্গপরিণায়ক, মার্গব, মার্গবন্ধন, মার্গভূমি, মার্গবশানুগ, মার্গবশায়াত, মার্গরক্ষক, মার্গশাখী, মার্গশির, মার্গশিরী, মার্গশীর্ষ (যেখানে মার গমন শেষ হয়, অগ্রহায়ণ), মার্গশীর্ষক,

মার্গশীর্ষী, মার্গশোধক, মার্গস্থ, মার্গসংস্করণ, মার্গসংস্কার, মার্গহর্ম্ম্য, মার্গাগত, মার্গায়াত, মার্গিক, মার্গিত, মার্গী, মার্গ্য, মিগ, মিরগী, মুরগী, মৃগ্, মৃগ, মৃগ-আঁখি, মৃগকানন, মৃগকেতন, মৃগক্ষীর, মৃগগ্রহণ, মৃগঙ্ক, মৃগচারী, মৃগজাতি, মৃগজালিকা, মৃগজীবন, মৃগজীবী, মৃগণা, মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা, মৃগদংশ, মৃগদংশক, মৃগদাব, মৃগদ্যু, মৃগদৃক্, মৃগদ্বিট্, মৃগধর, মৃগধূর্ত্ত, মৃগনয়না, মৃগনয়নী, মৃগনাথ, মৃগনাভি, মৃগপতি, মৃগপোত, মৃগপ্রভু, মৃগবধাজীব, মৃগবধূ, মৃগবন, মৃগবন্ধনী, মৃগবাহন, মৃগবৃত্তি, মৃগব্য, মৃগব্যাধ, মৃগমণি, মৃগমদ, মৃগমদবাসাঃ, মৃগমন্দ, মৃগমন্দ্র, মৃগমাস, মৃগমুখ, মৃগযূথ, মৃগয়া, মৃগয়াক্রীড়ন, মৃগয়াক্রীড়া, মৃগয়াধর্ম্ম, মৃগয়াপবাদী, মৃগয়াবন, মৃগয়াবিহার, মৃগয়াবিহারী, মৃগয়াবেশ, মৃগয়াযান, মৃগয়ারণ্য, মৃগয়াশীল, মৃগয়ী, মৃগয়ু, মৃগরমণ, মৃগরাট্ (মৃগরাজ), মৃগরিপু, মৃগরোচনা, মৃগরোমজ, মৃগলক্ষ্মা, মৃগলাঞ্ছন, মৃগলোচনা, মৃগশাব, মৃগশাবক, মৃগশির, মৃগশিরঃ, মৃগশিরস্, মৃগশিরা, মৃগশিরাঃ, মৃগশীর্ষ, মৃগশ্রেষ্ঠ, মৃগহন্তা, মৃগাক্ষি, মৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্কতনয়, মৃগাঙ্কবন্ধু, মৃগাঙ্কমণি, মৃগাঙ্কমৌলি, মৃগাঙ্কশেখর, মৃগাঙ্গনা, মৃগাজিন, মৃগাজীব, মৃগাটবী, মৃগাণ্ডজা, মৃগাদ, মৃগাদন, মৃগাদনী, মৃগাধিপ, মৃগান্তক, মৃগাবিৎ, মৃগাবিধ্, মৃগারাতি, মৃগারি, মৃগাস্য, মৃগিণী, মৃগিত, মৃগী (মিরগি), মৃগীলোচনা, মৃগেক্ষণা, মৃগেন্দ্র, মৃগেন্দ্রাসন, মৃগেশ, মৃগেশ্বর, মৃগোত্তম, মৃগ্য, মৈরেয়, মৈরেয়ক, মৈল (মরিল), রাজমার্গ।

মৃগ্ = আবর্ত্তমান সীমায়িতের গমন। **মৃগ** = আবর্ত্তমান সীমায়িতের গমন যাহাতে। (ইংরেজির mer-, mir-যুক্ত বহু শব্দই এই ক্রিয়াপরিবারের সন্তান, যথা — *mer*chant, *merge*, *mir*acle, *mir*age ... ইত্যাদি।)

মার্গ (মার্গণ, মার্গব) : ১. ✓মার্গ্ + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মার্গ** = **মার্**-এর (**মর** হইতে জাত-র) গমন থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, অন্য সত্তাকে সীমায়িত করার (**মার্**-এর) পর্য্যায়ক্রম থাকে যাহাতে; কিংবা, উৎপাদক যে আচরণসমূহ অতিক্রম করে বা আচারপথ অতিক্রম করে তার লক্ষ্যে বা উৎপন্নে পৌঁছায়। **মার্গণ** = **মার্গ** অন (on) যাহাতে। **মার্গব** = **মার্গ** বহন করে যে।* / **মার্গ** = যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। **মার্গণ** = লক্ষ্যে গমন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **মার্গ** = অন্বেষণ, প্রতিসন্ধান, গতি, অয়ন, পদ্ধতি, শাস্ত্রবিহিত আচারপথ বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বংশগত আচারক্রম, বায়ু-সঞ্চারপথ, গ্রহাদিপরিক্রমণপথ, ইন্দ্রিয়পথ, উপায়, ব্যবহারপদ, বৈদর্ভ্যাদিরীতি, বুদ্ধপ্রদর্শিত সংসার-দুঃখমুক্তির উপায় ... ইত্যাদি। **মার্গণ** = অন্বেষণকারী, শর, যাচক, অর্থী, পাঁচ ৫ সংখ্যা, সংবীক্ষণ, যাচ্ঞা, প্রণয়। **মার্গব** = ব্রাহ্মণ হইতে অয়োগবীতে জাত জাতিবিশেষ, দাশ, কৈবর্ত্ত (ইহারা নৌকর্ম্মজীবী)। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ছুৎমার্গ, পন্থা, মৃগ**। দেখা যাচ্ছে, **মার্গ** শব্দটির ভিতরে যে ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি রয়েছে, তার সঙ্গে ব.শ. প্রদত্ত 'পদ্ধতি', 'শাস্ত্রবিহিত আচারপথ বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি' ... প্রভৃতি অনেকটাই মিলে যায়। এই সব অদৃশ্য যাত্রাপথগুলিকে বোঝানর জন্যই **মার্গ** শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। শুরুতে এই **মার্গ** ছিল উৎপাদকের উৎপন্নের **লক্ষ্যে পৌঁছনোর** অদৃশ্য পথ (দ্র. **মৃগ**) বা উৎপন্নের সাধনপথ বা '**পদ্ধতি**'। সেই কারণে **মার্গণ** মানেই ছিল 'লক্ষ্যগামী'। পরে পরে তা **মোক্ষের** সাধনপথ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায় এবং নিঃসন্দেহে সেসবই অদৃশ্য পথ। সাদৃশ্যে সেই **মার্গই** দৃশ্য পথকেও বোঝায়। ফলে, শব্দটির দুইরকম ব্যবহারই চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। এখনও লোকে যখন **উন্মার্গগামী, সন্মার্গ** ... প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেন, তাতে ঐ অদৃশ্য পথের কথাই বোঝান হয়ে থাকে। অবশ্য অতি প্রাচীনকালে, সনাতন যুগে, এই **মার্গ** বা জীবনযাত্রার অদৃশ্য-পথগুলির ঠিক-ঠিকানা বহন করতেন যাঁরা, তাঁদের **মার্গব** বা **দাশ** বলা হত। যতদূর বোঝা যায়, সেই **মার্গব**দের সামাজিক **মর্য্যাদা** পরবর্তীকালের **দক্ষ**-পরিচালিত বৈদিক সভ্যতা হরণ করে এবং তাঁদের অধঃপতিত করে দেয়। ...

তা সে যাই হোক, স্বভাবতই **মার্গ** শব্দ সহযোগে আমাদের ভাষায় অজস্র শব্দ তৈরি করা হয়েছে। আমরা নিম্নে তাদের কয়েকটি শব্দের অর্থ বিষয়ে আমাদের মন্তব্যাদি উপস্থাপন করছি।

মার্গতোরণ : ৩. রাজপথের ধনুরাকৃতি দ্বারদেশ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখানে **মার্গ** শব্দটির শুধুমাত্র সাদৃশ্য অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে।

মার্গদর্শক : ৩. পথিপ্রদর্শক। (ব.শ.)। ৪. ভারতের হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় শব্দটি আজও যথার্থে প্রচলিত। ৫. এখানে **মার্গ** শব্দটির মুখ্যার্থ বা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে। এই **মার্গদর্শক** শব্দের ভিতরে রাখা ধারণাটিকে আজকাল ইংরেজি ভাষার তিনটি শব্দ খরচ করে বলা হয় — friend, philosopher and guide।

মার্গশির, মার্গশিরী, মার্গশীর্ষ, মার্গশীর্ষক, মার্গশীর্ষী : ৩. মার্গশিরীপূর্ণিমাযুক্ত মাস, অগ্রহায়ণ মাস, মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বর্ষ**। কৃষকের কৃষিকর্মের, রাষ্ট্রের শাসনকর্মের, ও নিসর্গ-প্রকৃতির জগচ্চালনকর্মের বাৎসরিক সূচনা হয় বৈশাখ থেকে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়াদি পেরিয়ে তারা তাদের আচারপথের শীর্ষে পৌঁছায় যে কালে, সেই কালখণ্ডটিকে বলা হয় **মার্গশীর্ষ**। এই কালখণ্ডে কৃষকের **মৃগ**বৃত্তি, রাষ্ট্রের শাসনবৃত্তি, প্রকৃতির জগদ্বৃত্তি তাদের শীর্ষে পৌঁছে যায়; কৃষক ফসল কেটে ঘরে আনেন, রাষ্ট্র শাসনফল তুলতে শুরু করে, নিসর্গ-প্রকৃতি তার শূন্য জলভাণ্ডার এবার পূর্ণ করতে শুরু করে। সেই কারণে **অগ্রহায়ণ** মাসটিকে **মার্গশীর্ষ** বলা হয়ে থাকে। এ শব্দেও **মার্গ** শব্দটি প্রযুক্ত হয় তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে বা অভিধার্থে।

মার্গশোধক, মার্গসংস্করণ, মার্গসংস্কার : ৩. **মার্গশোধক** = মার্গপরিমার্জ্জক। **মার্গসংস্করণ, মার্গসংস্কার** = মার্গপরিষ্করণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মানুষ কোটি কোটি, তাদের লক্ষ্যও কোটি কোটি, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানর সাধন**মার্গ**ও অতএব কোটি কোটি। কারও লক্ষ্য ঘুঁটে পুড়িয়ে আটা মেখে রুটি সেঁকে খাওয়া, তো কারও লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশের শাসককে নো-হাউ খাইয়ে খাওয়া। তবে এসবের ভিতরে আর একটা লক্ষ্য এশিয়া মহাদেশে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে — মানবজনম সার্থক করার লক্ষ্য বা মানবজীবনের **মোক্ষ**লাভ। সেই **মোক্ষ**লাভের 'সাধন**মার্গ**'-এর নকশা বানিয়ে জনসাধারণকে অবহিত করেন যাঁরা তাঁদের বলে **ধর্ম্ম**স্রষ্টা।

কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ **ধর্ম্ম-মার্গে** নানা রকমের গ্লানি, ধুলো-ময়লা জমে যায়। তখন দেখা দেন এক একজন **মার্গশোধক** বা **মার্গ-সংস্কারক**। যেমন রাজা রামমোহন রায়, যেমন বাবা আম্বেদকর ...। সাদৃশ্যে, যাঁরা রাজধানীর রাজপথ প্রত্যহ সকালে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন, তাঁদেরকেও **মার্গশোধক** বা **মার্গসংস্কারক** বলা যায়। কিন্তু সেরকম এখনও কেউ বলেননি। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাত্যহিক **মার্গশোধক**দের বর্তমানে সম্ভবত sweeper বা 'ঝাড়ুদার' বলা হয়ে থাকে।

অপরদিকে তাই বলে এখন পর্যন্ত বাবা আম্বেদকর কিংবা রামমোহন রায়ের মতো মানুষদের কেউ **মার্গশোধক** বা **মার্গ-সংস্কারক** বলে চিহ্নিত করেছেন, এমন কথাও আমরা শুনিনি। আধুনিকতাবাদীগণ অবশ্য 'সমাজসংস্কারক' বলে একটি তকমা তৈরি করেছেন, সেটি তাঁরা বাবা আম্বেদকরের মতো মানুষদের নামের পিছনে সেঁটে দিয়ে থাকেন। **৬.** ইংরেজি mark।

মৃগ : ১. ✓মগ্ + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *সীমায়িতের আবর্ত্তনমূলক গমন থাকে যাহাতে; কিংবা, সীমায়িত জ্ঞানকর্ম্মের আবর্ত্তনের সাহায্যে লক্ষ্যে গমন করে যে।* / ব্যাধ কর্ত্তৃক মার্গণীয়। (ব.শ.)। **৩.** হরিণ, পশুমাত্র, মৃগয়ার্থ পশু, চন্দ্রস্থ মৃগাকৃতি চিহ্ন, মৃগনাভি, হস্তিবিশেষ, চারিজাতি পুরুষের একতম, মৃগশিরা নক্ষত্র, মার্গশীর্ষমাস, মকররাশি, মুদ্রাবিশেষ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** deer অর্থে কখনো-সখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **৫.** দ্র. **মার্গ**। আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ এক একটি শব্দের ভেতরে কত বিস্ময়কর অর্থ ঢুকিয়ে রেখেছেন তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই **মৃগ** শব্দটি। এর ভিতরে রয়েছে **মৃ**-র বা '**আবর্ত্তমান** সীমায়িতের' **গ** বা 'গমন'। সেটি কীরূপ ব্যাপার?

রামবাবু ঠিক করলেন একটি টেবিল বানাবেন শ্যামবাবুর জন্য। এর আগেও তিনি এরকম টেবিল বানিয়েছেন। ফলে তিনি জানেন, কীভাবে কোন কোন কাজ কী প্রকারে ক'রে ক'রে তিনি তাঁর 'লক্ষ্য'স্বরূপ টেবিলটিতে পৌঁছতে পারবেন। তো, শ্যামবাবুর জন্য টেবিল বানানোর উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি বা কর্মযাত্রা শুরু করলেন। প্রথমে তদনুসার কাঠকুঠ যোগাড় করলেন, হাতিয়ার যোগাড় করলেন, তারপর শুরু করলেন সেগুলিকে চেঁছে মাপমতো কাটতে ... এইভাবে এক দীর্ঘ কর্মের পর্যায়ক্রম পেরিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন তাঁর লক্ষ্যে; টেবিল তৈরি হয়ে গেল। এই যে বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে কর্মের এক একটি অধ্যায় পেরিয়ে অবশেষে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো, এই অদৃশ্য-**মার্গ** যিনি অতিক্রম করেন তাঁকে আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ নাম দিয়েছিলেন **মৃগ**।

এখানে আমরা দেখলাম, রামবাবু একই কর্মের পুনরাবৃত্তি ক'রে ক'রে এই দীর্ঘ অদৃশ্য-**মার্গ** অতিক্রম করে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। আর, 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' মানেই তো 'সীমায়িত জ্ঞানের আবর্তন' করতে থাকা এবং সেভাবেই গমন করা। অর্থাৎ বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ-পূর্বক সেই বস্তু উৎপাদন করেন যিনি, তিনিই **মৃগ**-পদবাচ্য। তাহলে তো চাষী, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার ... থেকে 'লক্ষ্য-নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তদ্‌লক্ষ্যে কর্ম্ম করে কর্ম্মফল সাধনকারী' সকল উৎপাদনকারীর প্রত্যেকেই **মৃগ**। তার মানে, যে **বিশ্বকর্ম্মা**রা আমাদের এই কৃত্রিম-**বিশ্ব** বানিয়েছেন, বানিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রত্যেককেই **মৃগ** বলে!

ঠিক তাই! এমনকি রামবাবুর পত্নী সীতাদেবী যদি 'বাটামাছের হরগৌরী রান্না করব' বলে রান্নার কাজ প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত 'বাটামাছের হরগৌরী' বানিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে তিনিও **মৃগ**-পদবাচ্য হবেন, সন্দেহ নাই। ... তাহলে, বোঝা গেল, **মৃগ** শব্দটি মুখ্যার্থে deer-কে বোঝায় না, বোঝায় — 'লক্ষ্যনির্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সীমায়িত জ্ঞান-শ্রমাদির আবর্ত্তনমূলক প্রয়োগ করে যে'। একেই বলে 'সীমায়িত জ্ঞানকর্মের আবর্ত্তনমূলক (মৃ) গমন থাকে যাহাতে (গ)'। অতএব সহজ কথায় উৎপাদক মাত্রেই **মৃগ**। ...

'হরিণ'কে (এখন থেকে 'হরিণ' শব্দটি deer অর্থে লেখা হচ্ছে) **মৃগ** বলা হয়েছিল কেন, সেকথা বোঝার জন্য 'হরিণ' বিষয়ে যথেষ্ট জানা দরকার। আমরা 'হরিণ'-বিশেষজ্ঞ নই, অতএব 'হরিণ' বিষয়ে যথেষ্ট জানি না। তবে উপরোক্ত **মৃগ** শব্দের অর্থ থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি — 'হরিণ' নামক জানোয়ারটি সবসময় একটি 'লক্ষ্য' স্থির করে নিয়ে সেই দিকে চলাচল করে থাকে। 'লক্ষ্য' নির্দ্ধারণ না করে তারা ইতস্তত ঘোরাফেরা করে না। আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ নিশ্চয় 'হরিণ'-এর এই স্বভাবের কথা জানতেন। অন্যথায় তাঁরা 'হরিণ'কে **মৃগ** বলে চিহ্নিত করতেন না।

কিন্তু যখন দেখা যায় যে, **মৃগ** শব্দ যোগে অজস্র শব্দ তৈরি করা হয়েছে এবং ব.শ. জানাচ্ছেন, **মৃগনাথ, মৃগপতি, মৃগপ্রভু, মৃগমণি, মৃগরাজ, মৃগাধিপ, মৃগারাতি, মৃগারি, মৃগেন্দ্র, মৃগেশ, মৃগেশ্বর, মৃগোত্তম** ... ইত্যাদি সব শব্দই 'সিংহ'কে বোঝায় এবং **মৃগেন্দ্রাসন** বলতে 'সিংহাসন'কে বোঝায়, তখন মুহূর্তে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় তা হল, 'সংসার-বন' ও 'forest-বন' (দ্র. **অরণ্য, বন**), দুই বনের **মৃগ** (= উৎপাদক ও deer) এবং 'সিংহ'কে (= শাসক ও lion-কে) এক বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হচ্ছে। ...

অতএব আমরা এককথায় **মৃগ** শব্দের মুখ্যার্থ বা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বুঝব 'উৎপাদক' এবং গৌণার্থ বা সাদৃশ্যার্থ বুঝব 'হরিণ' বা deer।

মৃগকানন, মৃগদাব, মৃগবন : ৩. মৃগয়ার্থ পশুপূর্ণ বন, মৃগয়াবন (a deer park), মৃগয়ার্থ মৃগপূর্ণ বন। (ব.শ.)। **৫.** আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেকালের জ্ঞানী বাংলাভাষীগণ শব্দ তিনটির মুখ্যার্থ বুঝতেন সম্পদবান উৎপাদক মানুষদের সংসার **কানন** এবং গৌণার্থ বুঝতেন যথেষ্ট সংখ্যক 'হরিণাদি'-সমৃদ্ধ পার্থিব জঙ্গল বা forest-কে। এগুলিকে শুধুমাত্র deer-park ভাবার মানসিকতা তৈরি হয় ইংরেজের সংস্পর্শে এসে এবং সেই মানসিকতা আমাদের ক্রমান্বয়ে **পাদোদক-মূঢ়** করে তোলে।

মৃগঙ্ক, মৃগকেতন, মৃগধর, মৃগাঙ্ক : ৩. চন্দ্র। (ব.শ.)। **৫.** চাঁদে নাকি **মৃগের** চিহ্ন থাকে, তাই **মৃগঙ্ক** বা **মৃগাঙ্ক**। তার পতাকায় নাকি **মৃগের** চিহ্ন থাকে, তাই **মৃগকেতন**। চন্দ্র **মৃগ**কে ধরে রাখেন, তাই **মৃগধর**। অবশ্য শশককেও ধরে রাখেন বলে তাঁর নাম **শশধর**ও বটে। কিন্তু এসবই তো দৃশ্য বা সাদৃশ্য অর্থ! মুখ্যার্থ হল, ইনি

আসলে সমাজ**বনে**র **চন্দ্র**, একালের ভাষায় যাকে 'ব্যক্তিপুঁজি' ও তার আধার 'পুঁজিপতি' বলে। এই সত্তাই তো উৎপাদকদের ধারণ করে রাখে! **চন্দ্র**কে বোঝাতে **মৃগ**-যুক্ত অনেকগুলি শব্দ তৈরি করার সেটিই কারণ।

মৃগনাভি : ৩. মৃগের নাভিজাত সুরভিদ্রব্যভেদ, কস্তুরী। (ব.শ.)। ৪. আয়ুর্বেদের পরিমণ্ডলে এবং সেকেলে বাংলাভাষীদের মধ্যে শব্দটির প্রচলন এখনও আছে। ৫. মানবসংসারের **মৃগ**দের **নাভি** হল তাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উৎপাদন-যজ্ঞবাট। যেমন কুমোরের চাকি, চাষীর ক্ষেতখামার, মাস্টারের পড়া ও পড়ানোর টেবিল, এবং সেগুলিকে ঘিরে তাঁদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বোধ। এই বোধের বা যজ্ঞবাট-এর একটা সুগন্ধ থাকে, **মৎস্যগন্ধ** থাকে। এবং **পরাশর**-এর বরে সেই **গন্ধ** সুরভিতুল্যও বটে। তবে এই ব্যক্তিগত উৎপাদন-যজ্ঞবাট যে **নাভি**ই বটে, যাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট কুমোর, চাষি, মাস্টার আ**বর্ত্তমান** থাকেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। অর্থাৎ সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্র তাঁর **নাভি**, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজ নিজ শরীরের কেন্দ্রে অবস্থিত navel-ই তাঁর **নাভি**। এই **নাভি**র কীরূপ সুগন্ধ হয়, যিনি সামাজিক মানুষ হিসাবে কোনো বিশেষ কর্মকেন্দ্রে সৃষ্টিশীলভাবে আ**বর্ত্তমান** হয়ে দু-পাঁচবছর কাটাননি, তাঁর পক্ষে বোঝা মুশকিল। যাঁরা সেভাবে কাটিয়েছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের — 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম / কস্তুরী**মৃগ** সম' — গানটির মর্মার্থ অনুভব করতে পারেন। অনেকে এরূপ মানুষকে 'একনিষ্ঠ-মানুষ', 'কর্মযোগী', বা 'কাজপাগল-মানুষ' ... ইত্যাদি বলে থাকেন। শব্দশাস্ত্রমতে এঁরাই যথার্থে '**কস্তুরীমৃগ**'। এঁরা আপন আপন কর্মকেন্দ্র বা **নাভি**র গন্ধে নিমগ্ন থাকেন। অন্যদের পক্ষে এই অদৃশ্য **মৃগনাভি**র গন্ধ অনুভব করা বেশ কঠিন। সামাজিক মানুষের এই অদৃশ্য **মৃগনাভি**র সাদৃশ্যে 'হরিণ'-এর **নাভি**কেও (অর্থাৎ deer-এর **নাভি**কেও) **মৃগনাভি** নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একালে তাকেই লোকে **মৃগনাভি** বলে জানে, সামাজিক **মৃগে**র **নাভি**র কথা সবাই ভুলে গেছেন। অথচ সেটিই আসল **মৃগনাভি**।

মৃগয়া : ১. ✓মৃগ্ + অ (শ) - অধিকরণবাচ্যে, য (যক্) নিপাতিত + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *মৃগ-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা থাকে যাহাতে।* / যাহাতে মৃগ অন্বেষণ করে। ৩. আখেট, শিকার (ইহা কামজ ব্যসনবিশেষ।)। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আখড়া, মতি, মৃগ**। আগেই আমরা দেখেছি, **মৃগ** দুই প্রকার — সামাজিক **মৃগ** ও deer-**মৃগ**। এখন '**মৃগের** উদ্দেশ্যে যাত্রা থাকে যাহাতে', তাকে যদি **মৃগয়া** বলা হয়, তবে সে **মৃগয়া**য় কোন **মৃগ**কে ধরাশায়ী করতে যাওয়া হয়? সামাজিক **মৃগ**-কে?! ...

এক ছিল ইঁদুর। সে মানুষের ঘরের চাল ডাল তছনছ করে, কাপড় চোপড় বইপত্র ... সব কেটে কুটে রাখে। মানুষ তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেবে ভাবে, কিন্তু শেষমেষ কোনো যথাযথ ব্যবস্থাই সে নিতে পারে না। ফলে, ইঁদুরটি খেয়ে-খুয়ে নাদুসনুদুস হয়ে একদিন শূকরের মতো হয়ে গেল। এবার সে মানুষের ঘরদোর, উঠোন, বাগান ... সবকিছু নোংরা করে একাকার করে রাখে। লোকে ভাবে, এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়! ইঁদুরের বিরুদ্ধে যেসকল ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা মানুষ করেছিল, সেই ব্যবস্থাগুলি তো সুয়োরের বিরুদ্ধে নেওয়া যায় না; তাতে কাজও হবে না। নতুন করে ভাবনা শুরু হল। দু-চারটি নিদানও পাওয়া গেল। কিন্তু সেসব কার্যকরী করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল যে, ইত্যবসরে সুয়োরটা পরিণত হয়ে গেল হাতিতে। লোকে দেখল, তারা সুয়োর-ধরার যে ফাঁদ বানিয়েছে, তাতে হাতি বাঁধা পড়বে কী, হাতির একটা পাও তাতে ঢুকবে না। অথচ সেই হাতি আমাদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। ...

আসলে **ওটা** ইঁদুর বা সুয়োর বা হাতি নয়, ওটা এমন একটি সত্তা যাকে **সেকালে**র মানুষ চিহ্নিত করতেন '**মৃগেন্দ্রাসনে** (= সিংহাসনে) **বসা মৃগেন্দ্রে**র (= রাজার) **মৃগয়া** (= **মৃগে**র নিমিত্ত যাত্রা)' ব'লে। **একালে**র অধিকাংশ মানুষ তার জীবনযাত্রাকে তছনছ করছে যে **মৃগয়া, তার** নামটিই গেছেন ভুলে। তবে কেউ কেউ এখনও ব্যাপারটি একটু-আধটু বুঝতে পারেন। তাঁরা বলেন, 'সারা বিশ্বই আজ কর্পোরেট পুঁজির **মৃগয়াক্ষেত্র** হয়ে উঠেছে।' এই যে সামাজিক-**মৃগয়া**, এতে সামাজিক-**মৃগ**কে শিকারের জন্য seek করা হয়, খোঁজা হয়, ঘিরে তাড়িয়ে নাস্তানাবুদ করা হয়, তার সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়, তাকে শিকার করা হয়। একালের সবচেয়ে বড় **মৃগয়া**কারী **মৃগয়া**জীবী হল উপরোক্ত কর্পোরেট পুঁজি এবং সন্দেহ নেই যে, কর্পোরেট পুঁজি 'হরিণ' বা deer শিকার করে না। সে সমাজ**বনে**র **মৃগয়াক্ষেত্রে** সামাজিক **মৃগ** শিকার করে থাকে!

এত কথা বলার একটিই কারণ। **তা হল, মৃগয়া** শব্দটি আমাদের মাথায় 'দলবদ্ধভাবে হরিণ (= deer) **শিকার**' অর্থে এমনভাবে গেড়ে বসে গেছে যে, তার প্রকৃত অর্থে পৌঁছতে গেলে অনেক জঞ্জাল সরিয়ে এগোতে হয়। কার্যত, সংসার**বনে** সংসার**বনে**র শাসক বা রাজা উৎপাদকদের উপর যে লুঠতর**াজ** চালাত, তাকেই সেকালে বলা হত **মৃগয়া**। তখন অদৃশ্যলোকে **রাজা উৎ**পাদক প্রজাদের সম্পদ হরণ করতেন, এবং দৃশ্যলোকে 'সিংহ' **নামের** প্রাণীটি 'হরিণ' শিকার করত। কালে কালে ব্যাপারটি জট পাকিয়ে **যায়,** মানুষের সংসার**বনে**র সিংহ বা রাজা মানব-সংসার**বনে মৃগয়া চালাতে** চালাতে animal-দের বনেও **মৃগয়া** করতে শুরু করে। **আরও পরে** সেই রাজার স্থান দখল করে একদিকে রাষ্ট্র এবং অপর**দিকে পুঁজি**। এখন এঁরাই দেশব্যাপী **মৃগয়া** করেন, উৎপাদকদের রক্ষ**ণ-ভক্ষণ** করেন; তবে কিনা এঁরা animal-দের বনে **মৃগয়া** করতে **সাধারণ**ত যান না। ...

মৃগয়াক্রীড়ন, মৃগয়াক্রীড়া : ৩. মৃগয়ারূপ ক্রীড়া। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সংসার**বনে** দু'রকম ক্রীড়া চলে — **দ্যুতক্রীড়া** ও **মৃগয়াক্রীড়া**; একালের ভাষায় এই ক্রীড়া দুটিকে বলা হয় যথাক্রমে 'মাল কেনাবেচা করে আত্মসাৎ করা' এবং 'মাল কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করা'। সব খেলার যেমন কিছু নিয়ম আছে, নিয়ম ভাঙাও আছে, এই খেলাগুলিরও তেমনি কিছু নিয়ম আছে এবং সে নিয়ম ভাঙাও আছে।

মৃগয়াধর্ম্ম : ৩. মৃগয়াবিধি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সেকালে জ্ঞানী মানুষেরা, বিশেষত যাঁরা রাজার পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁরা **মৃগয়া**য় যাওয়াকে রাজ**ধর্ম্ম** বলে ঘোষণা করেন। এর থেকে বোঝা

যায়, উৎপাদকদের কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা সত্যই রাজধর্ম্ম ছিল, যেমন কিনা, **মেঘ**-এর মাধ্যমে সেই সম্পদ **বর্ষণ** করাও ছিল রাজধর্ম্ম। **তপন** ও **মার্ত্তণ্ড** রূপে উৎপীড়ন করে সংগ্রহ করার ব্যাপারটি আসে পরে। কিন্তু সাদৃশ্যে সেই **মৃগয়াধর্ম্ম** একদিন forest-এর animal-দের শিকার করা হয়ে যায়। ...

তবে কালে কালে এই deer-**মৃগয়া**রও একটা যুক্তিসঙ্গত ও প্রকৃষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। আকবর বাদশাহের **মৃগয়া**র বিবরণ থেকে বোঝা যায়, তাঁর **মৃগয়া** যত না শিকারমূলক ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সামরিক শক্তির সংহতিমূলক ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ না থাকলে সামরিক বাহিনী অলস ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শান্তিকালে সামরিক শক্তিকে চাঙ্গা রাখতে ঐ deer-শিকারমূলক **মৃগয়া**র প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করতেন আকবর বাদশাহ। একালে এই কাজই করা হয় military exercise নামে। তবে আকবর বাদশাহ বা তাঁর সময়কার রাজাদের **মৃগয়া**র তুলনায় এই military exercise নিতান্তই রসকসহীন যান্ত্রিক ব্যাপারমাত্র। এতে একালের সৈনিকদের মন কতখানি চাঙ্গা হয় বলা কঠিন।

মৃজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অমার্জ্জিত, অস্ত্রমার্জ্জ, মাজ, মাজন, মাজনা, মাজা, মাজাঘষা, মাজান, মাজিল, মর্জ্জ, মর্জ্জি, মর্জ্জিনা, মর্জ্জী, মার্জ্জ্, মার্জ্জ, মার্জ্জন, মার্জ্জনা, মার্জ্জনী, মার্জ্জনীয়, মার্জ্জার, মার্জ্জারক, মার্জ্জারকণ্ঠ, মার্জ্জারকরণ, মার্জ্জারকর্ণী, মার্জ্জারলিঙ্গী, মার্জ্জারী, মার্জ্জালীয়, মার্জ্জিত, মার্জ্জিতা, মিজরাব, মির (মীর, দ্র. মি, মী, মীন), মিরজা, মিরজাদা, মিরবকশী, মিরমিএগ্রা, মিরমুনশী, মির্জ্জা, মিরজাই, মিরাশ, মৃজ্, মৃজ, মৃজা, মৃজাবিহীন, মৃজু, মৃজ্য, মেরজাই, মেজরাপ(ব), মৃষ্টি, মোছা, মোছন, মোছান।

মৃজ্ = আবর্ত্তমান সীমায়িতের জনন। **মৃজ** = আবর্ত্তমান সীমায়িতের জনন যাহাতে।

মাজ (মাজন, মাজনা, মাজা, মাজাঘষা, মাজান) : ১. মৃজ্ > মাজ। (ব.শ.)। ২. ***মাজ** = **মা** (পরিমিতের আধার) জাত হয় যাহাতে। **মাজন** = **মাজ** অন (on) যাহাতে। **মাজনা** = **মাজন**-এর আধার যে। **মাজা** = **মাজ**-এর আধার যে। **মাজাঘষা** = **মাজা** ও **ঘষা**। **মাজান** = **মাজা** অন (on) যাহাতে।* ৩. **মাজ** = ঘষিয়া পরিষ্কার করা, মার্জ্জন করা, ঘষিয়া উজ্জ্বল করা, পরিষ্কার করা, ঘষিয়া মসৃণ করা বা পালিশ করা, সংস্কার করা। **মাজন, মাজনা** = পরিষ্করণ, মার্জ্জন, মুছান, বাসন মাজা বা পরিষ্কার করা। **মাজা** = মার্জ্জিত, পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ ... ইত্যাদি। **মাজান** = পরিষ্কার করান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মার্জ্জ**। প্রাচীন বাংলায় শব্দটি ছিল **মার্জ্জ** বা **মার্জ্জন** ... ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলাভাষী তাকে বিবর্তিত করে নেন **মাজ, মাজন** ... ইত্যাদিতে। কেননা, **মার্জ্জনা** করে যা করা হয় (**মার্জ্জিত**-এর ধুলো-ময়লা-কলঙ্কাদিকে **মার** দিয়ে তাদের স্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয় এবং ফলে **মার্জ্জিত** সত্তাটি তার আদৎ রূপে ফিরে আসে), দেখা যাচ্ছে, **মা** (= পরিমিতের আধারকে জাত হতে সাহায্য) করলেও তাই করা হয়। কারণ, কোনো বস্তুর সীমায়িত আধার মানেই হল তার নিজস্ব আদি **মা** রূপ। ধুলো-ময়লা সাফ করে দিলে পাওয়া যায় তার সেই আদৎ রূপটিকেই। অতএব কোনো বস্তুকে **মার্জ্জনা** করলে আমরা যা পেতে পারি, **মাজ**লেও আমরা সেই বস্তুটিকেই পাই। পার্থক্য এইটুকু যে, **মার্জ্জনা**র ক্ষেত্রে আমরা ময়লা সাফ করি, কী পেলাম দেখি না, ময়লা সাফ করলে যা পাওয়া সম্ভব তাই পাব এই বিশ্বাসে ময়লা সাফ করি। কিন্তু **মাজা**র বেলায় আমরা যেটি পাব তাকেই দেখি, ময়লাগুলো গেল কি গেল না, গেলে কোথায় গেল, তার কথা ভাবি না। অর্থাৎ **বাসনাদি মার্জ্জনা**র বেলায় ময়লা তাড়ানোটা প্রাথমিকতা পায়, আর **মাজা**র বেলায় **বাসনা**দির আদৎ রূপটি প্রাথমিকতা পায়, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই ময়লা সরিয়ে আদৎ বস্তুটিকে পাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। ...

তা সে যাই হোক, বাংলাভাষীর স্বভাবে দৃশ্য বিষয়ের চেয়ে অদৃশ্য বিষয় নিয়ে কথা বলার অভ্যাস অত্যন্ত প্রবল। এর থেকে বোঝা যায়, জাতিটি **'মনপ্রধান'**। **মাজা** শব্দটিকেও আজকাল তাঁরা অদৃশ্যলোকে ব্যবহার করে থাকেন। যুবকদের নিজেদের মধ্যে এরকম কথা শোনাও যায় — 'খবরদার ওদিকে যাবি না, ওর বাপ-দাদা টের পেলে তোকে আচ্ছা করে **মেজে** (ঘষে, রগড়ে) দেবে।'

দেখা যাচ্ছে, **মাজাঘষা** শব্দটি ব.শ. দেননি, তবে 'মেজে-ঘষে' শব্দটি আলোচনার ভিতরে রেখেছেন। এই শব্দটি হল একটি 'পরিপূরক-**যোড়শব্দ**'। দ্র. **আশেপাশে, মোটমাট**।

মর্জ্জ (মর্জ্জি, মর্জ্জিনা, মর্জ্জী) : ১. ✓মৃজ্ + অ = মর্জ্জ; যেমন ✓বৃজ্ + অ = বর্জ্জ। ২. ***মর্জ্জ** = সীমায়িতের আবর্ত্তন জনিত যাহাতে। **মর্জ্জি** = **মর্জ্জ** গতিশীল যাহাতে। **মর্জ্জিনা** = **মর্জ্জি** অন (on) থাকে যে আধারে। **মর্জ্জী** = **মর্জ্জি**র আধার যে।* ৩. **মর্জ্জ** = নিমগ্ন হওয়া, ডোবা ... ইত্যাদি। **মর্জ্জি (মর্জ্জী)** = (আরবি) ইচ্ছা, সম্মতি। (ব.শ.)। **মর্জি** = (আরবি) ইচ্ছা, খেয়াল, খুশি। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. 'ইচ্ছা', 'খেয়াল' বা 'খুশি' অর্থে **মর্জ্জি** প্রচলিত, **মর্জ্জিনা** নাম রূপে প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দটি আমরা আমাদের **মর্জ্জি**মাফিক অন্তর্ভুক্ত করেছি। বলা হয়েছে, এগুলি সবই আরবি শব্দ। হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি, **মৃজ্** ক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবেই **মর্জ্জ** শব্দটি প্রস্তুত করা যায়। ব.শ. **মর্জ্জ** শব্দটি দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাকে **মস্‌জ্** ক্রিয়া থেকে জাত বলে দেখিয়েছেন এবং স্বভাবতই তার অর্থ দিয়েছেন 'নিমগ্ন হওয়া' ... ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়েছে, এটা ঠিক হয়নি। অথচ, **মৃ** বা সীমায়িতের আবর্ত্তন **জ** বা জাত হয় যাহাতে কিংবা জনন করে যে, তাকে **মর্জ্জ** বলাই যুক্তিসঙ্গত হয়। অন্য কোনো অভিধানে এই শব্দটির আর কোনো সংবাদ মেলে না। কিন্তু **মর্জ্জি** প্রায় সব অভিধানেই আছে এবং তাকে আরবি শব্দ হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাংলার নিজস্ব নিয়মেই **মৃজ্** ক্রিয়া **মর্জ্জ** পেরিয়ে **মর্জ্জি**তে বা **মর্জ্জী**তে পরিণত হতে পারে এবং তার অর্থ 'ইচ্ছা', 'খুশি' ... ইত্যাদি হতেই পারে। কেননা, 'সীমায়িত (বোধের) আবর্ত্তন

জনিত হয়ে গতিশীল হলে'ই **মর্জ্জি** হয়, এবং তার আধারই **মর্জ্জী** হয়। সে তো নিঃসন্দেহে 'ইচ্ছা'-'খুশি'ই বটে! এমনকি যে মেয়ে নিজের ইচ্ছাখুশি চলাফেরা করে, স্বাধীনা নারী রূপে, তাকে তো **মর্জ্জিনা** বলাই যুক্তিসঙ্গত। ...

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যদিও শব্দগুলি আরবি ভাষা থেকে আগত বলে জানানো হয়েছে, এগুলি যে আমাদের জানাশোনা এলাকার শব্দ, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। হয়তো সেকারণেই **মর্জ্জি** শব্দটি এত ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রচলিত হতে পেরেছে।

মার্জ্জ (মার্জ্জন, মার্জ্জনা, মার্জ্জনী, মার্জ্জনীয়, মার্জ্জিত — অমার্জ্জিত) : ১. ✓মৃজ্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মার্জ্জ*** = ***মার*** *(অন্যকে সঙ্কুচিত করা) জনিত হয় যাহাতে; অর্থাৎ, (মানসিক বা বাহ্যিক ধুলো-ময়লাদিকে তাদের স্বস্থানে) মেরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাহাতে।* ***মার্জ্জন*** = ***মার্জ্জ*** *অন (on) যাহাতে।* ***মার্জ্জনা*** = ***মার্জ্জন****-এর আধার যে।* ***মার্জ্জনী*** = ***মার্জ্জন****-এর গতিশীল আধার যে।* ***মার্জ্জনীয়*** = ***মার্জ্জনী****র যাত্রা থাকে যাহাতে।* ***মার্জ্জিত*** = ***মার্জ্জ*** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ***অমার্জ্জিত*** = *নয়* ***মার্জ্জিত*** *যে।* / **মার্জ্জন** = যাহা দ্বারা মার্জ্জন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. **মার্জ্জ** = মার্জ্জক, শোধক, নির্ণেজক, রজক, বিষ্ণু, মার্জ্জনা, শোধন, পরিষ্করণ। **মার্জ্জন** = শোধনদ্রব্য, লোধ্রবৃক্ষ, শোধন, প্রক্ষালন, প্রোঞ্ছন, পোঁছা, ঘর্ষণপূর্ব্বক পরিষ্করণ, মাজা, সম্মার্জ্জনী দ্বারা মলাপনয়ন, ঝাঁট দেওয়া ... ইত্যাদি। **মার্জ্জনা** = শোধন, প্রক্ষালন, মুরজতাড়না, মূর্চ্ছনা, ক্ষমা। **মার্জ্জনী, মার্জ্জনীয়** = শোধনীয়, প্রক্ষালনীয়, ক্ষমার্হ। **মার্জ্জিত** = শোধিত, ক্ষালিত, মৃদিত, সম্মার্জ্জনীশোধিত, প্রোঞ্ছিত, সামাজিক ক্রিয়ায় বিশুদ্ধ। **অমার্জ্জিত** = অপরিষ্কৃত, অসংস্কৃত, মলযুক্ত। (ব.শ.)। ৪. 'ক্ষমা' অর্থে **মার্জ্জনা** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **মার্জ্জ** শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল এইভাবে — যা কিছু দৃশ্য-বাহ্যিক ধুলো-ময়লা এসে গায়ে লাগে এবং যা কিছু অদৃশ্য-মানসিক ধুলো-ময়লা এসে মনে লাগে, সে সবকে **মার** দিলে, অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্যে **মার্-জনন** করলে, তারা তাদের স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে, তাদের নিজেদের কেন্দ্রে সীমায়িত হবে; তাই শরীর **মার্জ্জন** করলে শরীরের ময়লাগুলি চলে যাবে তাদের স্বস্থানে, আর মন **মার্জ্জন** করলে মনের ময়লাগুলি চলে যাবে তাদের স্বস্থানে। তবে কিনা, ভাষায় ব্যবহারের সময় দেখা যায়, অদৃশ্য মনোলোকের **মার্জ্জনা** করা, মন ও স্বভাব ... ইত্যাদিকে **মার্জ্জিত** করা প্রভৃতি মানসিক **মার্জ্জন** বিষয়ক শব্দই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্জ্জিত, অমার্জ্জিত এই দুটি শব্দের বেলায় গায়ের ময়লা, জামাকাপড়ের ময়লা ইত্যাদি সাফসুফ করার কথা যেমন ভাবা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবা হয় তার মনকে, মনের ভাবমূর্তিকে বা চরিত্রকে সাফসুফ করা হয়েছে কি না। কেউ কাউকে **অমার্জ্জিত** কথাবার্তা বলছে, কারও সাথে **অমার্জ্জিত** আচরণ করছে, মানে হল, বিপরীত পক্ষ যেধরনের কথাবার্তাকে **মার্জ্জিত** ভাবেন, যেমন আচরণকে **মার্জ্জিত** মনে করেন, লোকটি তদ্রূপ কথাবার্তা বলছে না, তদ্রূপ আচরণ করছে না। অবশ্য প্রায় প্রতিটি সমাজেই কথাবার্তা, আচরণাদির একধরনের 'মান'ও থাকে। সাধারণভাবে সেই 'মান'-এর নিম্নে বা উর্ধ্বে যদি কথাবার্তা বলা হয় বা আচরণ করা হয়, তাকেও **অমার্জ্জিত** বলা হয়ে থাকে। সেই 'মান'-এর ভিতরে থাকলে তবেই বলা হয় **মার্জ্জিত**, অর্থাৎ যাকে সাফসুফ করা হয়েছে।

কিন্তু **মার্জ্জনা**কে 'ক্ষমা' ভাবার কারণ একটু ভিন্ন। 'আমাকে **মার্জ্জনা** করুন' বললে তার মানে দাঁড়ায়, 'আমার যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ভুল ইত্যাদি **কর্ম্মমল** ইতোমধ্যে জন্মেছে এবং জমে গেছে, সেগুলি আপনি **সাফ করে** দিন।' ব্যাপারটি কীরকম?

ধরা যাক, রামবাবু শ্যামবাবুর ডাক্তারখানায় কর্মচারীর কাজ করেন। শ্যামবাবুর বিধান (প্রেসক্রিপশন) ঠিকঠাক পড়তে না-পেরে ভুল ওষুধ দিয়ে কারও ক্ষতি করেছেন তিনি, কোনো রুগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, ফলে কিছু মানুষ তাঁর উপর রুষ্ট আছেন। এমতাবস্থায় তার 'আমাকে **মার্জ্জনা** করে দিন' কথাটির মানে হল, সেই ক্ষতিগ্রস্ত রুগীর ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটি শ্যামবাবুকে মিটিয়ে নিতে হবে, রামবাবুর দুর্ব্যবহারের কারণে রুষ্ট মানুষদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্বাভাবিক করতে হবে শ্যামবাবুকে। কেননা, কেবল এভাবেই রামবাবুর **কর্মমল** সাফ করা বা **মার্জ্জনা** করা সম্ভব। অতএব **মার্জ্জনা** করা খুব একটা সহজ কাজ নয়, তাতে সময় ও অর্থের 'অপব্যয়' হয়। তবে এই **মার্জ্জনা** আদৌ যদি করা যায়, তাহলে রামবাবুর চরিত্রের গায়ে যে ময়লা পড়েছে, তা সাফ হয়ে যাবে।

তা হোক, কিন্তু বাস্তবে এরকম খুব কমই হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ **কর্মমল** সাফ করা বা **মার্জ্জনা** করা হলেও কর্মমল-সৃষ্টিকারীকে ছাড়া হয় না, তাকে কোনো না কোনো শাস্তিও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই শাস্তি না দিয়ে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে রামবাবু শ্যামবাবুর আক্রমণ বা শাস্তির হাত থেকে (বা শ্যামবাবুর **ক্ষ**-করণের হাত থেকে) বেঁচে যান। রামবাবুর ক্ষেত্রে শ্যামবাবুর **খুবলে** নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামবাবু সংবরণ করলেন; তাঁর **ক্ষ**-কে তিনি সীমায়িত বা **ম** করে নিলেন। রামবাবু শ্যামবাবুর **ক্ষমা** পেয়ে গেলেন। অতএব **মার্জ্জনা** বললে যে **ক্ষমা**-করা ভাবা হয়, সেটি **মার্জ্জনা**র ব্যঞ্জনার্থ হতে পারে, মুখ্যার্থ নয়।

মার্জ্জার (মার্জ্জালীয়, মার্জ্জারলিঙ্গী) : ১. ✓মৃজ্ + আর (আরন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মার্জ্জার*** = ***মার্জ্জ****-এর আধার রহে যাহাতে।* ***মার্জ্জালীয়*** = ***মার্জ্জার****-এর গতিশীল আধার যায় যাহাতে।* ***মার্জ্জারলিঙ্গী*** / **মার্জ্জার** = যে খাইয়া মুখ শোধন করে। (ব.শ.)। ৩. **মার্জ্জার** = বিড়াল, খট্টাশ, গন্ধমার্জ্জার, রক্তচিত্রক, দম্ভার্থ জপযজ্ঞতপস্যার অনুষ্ঠাতা। **মার্জ্জালীয়** = মার্জ্জার, কিরাত বা শুদ্ধদেহ, শূদ্র। **মার্জ্জারলিঙ্গী** = মার্জ্জারব্রতাচারী, বৈড়ালব্রতিক। (ব.শ.)। ৪. cat অর্থে **মার্জ্জার** কমবেশি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বিলি-ভকত, ভক্ত, ভিজে**-বেড়াল, **ভদ্র**। যে সত্তা তার কর্মের স্বরূপ **মার্জ্জন** করে বা মেজে রাখে তাকে **মার্জ্জার** বলে। ব.শ. 'বিড়াল' শব্দে জানাচ্ছেন, সমাজে এই **মার্জ্জার** বা 'বিড়াল'-এর প্রয়োগ করা হয় যারা 'বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে গুপ্তপাপাচার-রূপ দুষ্টাচার' করে, সেই সকল 'ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচারী ছদ্মতাপস'দের বোঝাতে। সেকালের ভাষায় এঁদের **মার্জ্জারলিঙ্গী**ও বলা হত। সাদৃশ্যে

সেই **মার্জ্জার** বা বিড়াল 'মূষিকাদিহিংসার্থ ধ্যাননিষ্ঠের ন্যায় বিনীত হইয়া থাকে'। অতএব, **মার্জ্জার** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক মুখ্যার্থ হল শুভদর্শন-ধান্দাবাজ, সেকালে মনুসংহিতা যাদের **ভদ্র** নামে চিহ্নিত করেছিল, একালে যাঁদের বলা হয় রাষ্ট্রনীতিসিদ্ধ বা politically correct। আর গৌণার্থ বা সাদৃশ্যার্থ হল cat বা বিড়াল। ...

কিন্তু **মার্জ্জালীয়** শব্দটি আমাদের জানায়, এমন ভালমানুষও সেকালে ছিলেন, একালেও হয়তো আছেন, যাঁরা সত্যি সত্যিই পবিত্রমনা ও পবিত্রদেহ থাকেন, হাতমুখ সর্বদা **মার্জ্জনা** করে রাখেন, কোনো বদ-উদ্দেশ্যে নয়, স্বভাবতই সেরূপ করেন। ব.শ. জানিয়েছেন, তাঁরাই ছিলেন সেকালের শূদ্র, **কিরাত**, **শিব**।

মৃৎ (*মৃদ্, মৃধ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অরিমর্দ্দ, আমর্দ্দ, কানমলা, কাসমর্দ্দ, কেশীমর্দ্দন, মই (মর্দ্দিকা, দ্র. মদ্), মদ্দ, মদ্দনা, মদ্দানী, মরদ, মরদানা, মরদানি, মর্দ্দ, মর্দ্দক, মর্দ্দন, মর্দ্দনিয়া, মর্দ্দনীয়, মর্দ্দল, মর্দ্দানা, মর্দ্দানী, মর্দ্দিত, মর্দ্দিতব্য, মর্দ্দী, মল, মলন, মলম, মলা, মলাঘষা, মৃত্তিকা, মৃৎপিণ্ড, মৃন্ময়, মাড়, মাড়ন, মাড়ব, মাড়া, মাড়ি, মাড়িল, মাঢ়ি (যা দিয়ে মাঢ়ে বা মর্দ্দন করে), মাৎ, মাত, মাত-কাটা, মাথ, মাদল, মান্দাল, মার্ত্তিক, মার্দ্দল, মার্দ্বীক, মালিশ, মিত্তিকা, মিরগাল (মিরগেল), মুদঙ্গ, মৃগাল, মৃচ্চয়, মৃচ্ছকটিক, মৃচ্ছকটিকা, মৃজ্জ, মৃণাল, মৃণালকোমল, মৃণালজালক, মৃণালধবল, মৃণালপত্র, মৃণালবলয়, মৃণালবল্লী, মৃণালভঙ্গ, মৃণালসূত্র, মণালহার, মৃণালিকা, মৃণালিনী, মৃণালী, মৃণ্ময় (মৃন্ময়), মৃত্তিকা (মাটি, দ্র. মট্), মৃত্তিকালিঙ্গ, মৃৎ (মৃদ্), মৃৎকণ, মৃৎকর, মৃৎকর্ম্ম, মৃৎকাংস্য, মৃৎকুণ্ডিকা, মৃৎপাত্র, মৃৎপিণ্ড, মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি, মৃৎপ্রক্ষেপ, মৎসা, মৃৎস্ন, মৃৎস্না, মৃদ্, মৃদং, মৃদঙ্কুর, মৃদঙ্কুরু, মৃদঙ্গ, মৃদঙ্গার, মৃদঙ্গী, মৃদা, মৃদিত, মৃদঙ্গ, মৃদু, মৃদুক, মৃদুকার্ষ্ণায়স, মৃদুকীল, মৃদুকৃষ্ণায়স, মৃদুকোপ, মৃদুকোষ্ঠক, মৃদুগণ, মৃদুগমন, মৃদুগামী, মৃদুচ্ছদ, মৃদুতা, মৃদুতীক্ষ্ণ, মৃদুত্বক, মৃদুপর্ব্বক, মৃদুপাণি, মৃদুপাশ, মৃদুপূর্ব্ব, মৃদুপ্রযত্ন, মৃদুপ্রৌঢ়, মৃদুবর্গ, মৃদুবাক, মৃদুবাত, মৃদুভাষী, মৃদুমুখ, মৃদুল, মৃদুলগামিনী, মৃদুস্পর্শ, মৃদুহাসী, মৃদুহৃদয়, মৃদূৎপল, মৃদ্‌ঘট, মৃদ্‌ভাণ্ড, মৃদ্‌ভাজন, মৃদগ, মৃদ্বঙ্গ, মৃদ্বী, মৃদ্বীকা, মৃধ্, মৃধ, মৃধা, মৃন্ময়, মৃন্ময়ী, মৃল্লোষ্ট, মেড়ে, মৈ (মই), ম্রদিমা, ম্রদিষ্ঠ, ম্রদীয়ান।

মৃৎ (মৃদ্, মৃধ্) = আবর্ত্তমান সীমায়িতের তারণ। **মৃদ** = আবর্ত্তমান সীমায়িতে দান যাহাতে। **মৃধ** = আবর্ত্তমান সীমায়িতের ধারণ যাহাতে।

মর্দ্দ (মর্দ্দক, মর্দ্দন, মর্দ্দিত, মর্দ্দী — মরদ, মরদানি) : ১. ✓মৃদ্ + অ (অণ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মর্দ্দ** = **মর্** *(পরিমিতকরণের আবর্ত্তন) দান করে যে; অথবা,* ***মর্*** *দান থাকে যাহাতে।* **মর্দ্দক** = **মর্দ্দ** *করে যে।* **মর্দ্দন** = **মর্দ্দ** *অন (on) যাহাতে।* **মর্দ্দিত** = **মর্দ্দ** *গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* **মর্দ্দী** = **মর্দ্দ**-*এর গতিশীল আধার যে।* **মরদ** = **মর** *(ম-রক্ষক বা বীর্য্য, দ্র.* ***মাগ****) দান করে যে।* **মরদানি** = **মরদ**-*এর আধার গতিশীলভাবে অন থাকে যাহাতে।* ৩. **মর্দ্দ** = পীড়ক, ক্ষোদ, চূর্ণন, পেষণ, সংঘর্ষ, বিঘট্টন। **মর্দ্দক** = পীড়ক, নাশক, সংবাহক। **মর্দ্দন** = ক্ষোদক, পীড়ক, নাশক, ক্ষোদ, সংবাহন, অভ্যঞ্জন, কদন, পীড়ন, সংঘর্ষ, উচ্ছেদ, আঘাতে ধান্যাদিপৃথক্করণ, পেষণাধার। **মর্দ্দিত** = চূর্ণীকৃত, নিষ্পিষ্ট, গ্রন্থিত, বিদলিত। **মর্দ্দী** = চূর্ণয়িতা, খণ্ডয়িতা। **মরদ** = (ফারসি) পুরুষ, মর্দ্দ (male), মানুষ (man), সাহসিক পুরুষ, বীর, মনুষ্যত্ববিশিষ্ট লোক, স্বামী, রাজপুরুষ। **মরদানি** = বীরত্ব, পুরুষত্ব। (ব.শ.)। ৪. **মর্দ্দ** ও **মরদ, মরদানি** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **মৃদ** ক্রিয়াটির ভিতরে 'সীমায়িতের আবর্ত্তন' বা পুনরাবৃত্তি দান করা থাকে। সে কারণে, যাকে **মৃদ্** করা হয়, সে নিষ্পিষ্ট হয়, চূর্ণিত হয়, **মর্দ্দিত** হয়, তাকে 'মলে' দেওয়া হয়। সেই সুবাদে, যে **মর্দ্দন** করে বা 'মলে' (male = মলে, ইংরেজি বানানটি দেখুন) তাকে **মর্দ্দ** (= male) বলে। ফলত, **মর্দ্দ** শব্দের একটি অর্থ হয়ে যায় পুরুষ বা শক্ত-সমর্থ যুবক। কথাটি **মদ্দা** রূপেও প্রচলিত রয়েছে।

তবে অভিধানগুলিতে যখন দেখা যায়, **মরদ** শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে, তখন একটুখানি বিরক্তির কারণ হয়। কেননা, বাংলার গণ্ডগ্রামের গণ্ডমূর্খ বাঙালি, যাদের চৌদ্দপুরুষের কেউ কখনো কোনো বিদেশীর সংস্পর্শেও আসেনি, তাদের ঘরের মেয়েদের মুখেও যখন কোনো পুরুষের বীরত্বের ঘাটতি নিয়ে ঠাট্টা শোনা যায় — 'আহা রে **মরদ**!' — তখন বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না যে, সে **মরদ** কথাটি প্রাচীন ভাষার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার রূপেই পেয়েছে। তবুও শব্দটিকে ফারসি বলে চালিয়ে দেওয়া একধরনের একপেশেমিই বটে। হ্যাঁ, শাসক রূপে ফারসি এসেছিল, তার বহু শব্দ আমাদের শব্দবোধের খুব কাছাকাছি বলে বহু ফারসি শব্দ আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি, একথা ঠিক বটে; কিন্তু তাই বলে, ঘরের জিনিসটাও তাদের বলে চালিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

মৃৎ (মৃদ্), মৃত্তিকা : ১. **মৃৎ (মৃদ্)** = ✓মৃদ্ + কিপ্ (০) - কর্ম্মবাচ্যে। **মৃত্তিকা** = ✓মৃদ্ + তিক্ (তিকন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **মৃৎ (*মৃদ্*)** = *আবর্ত্তমান সীমায়নের তারণ বা দান যাহাতে।* ***মৃত্তিকা*** = **মৃৎ** *গতিশীলভাবে তারণকৃত যাহাতে।* ৩. **মৃৎ (মৃদ্)** = মৃত্তিকা, মৃত্তিকাপিণ্ড, লোষ্ট্র, উদ্ধৃতমৃত্তিকা, মৃত্তিকাস্তূপ, সুগন্ধিমৃত্তিকা বিশেষ। **মৃত্তিকা** = মৃৎ, মাটি, সুগন্ধিমৃত্তিকা বিশেষ, তুবরী। (ব.শ.)। ৪. একক ভাবে **মৃৎ** ও **মৃদ্** অপ্রচলিত, অন্য শব্দের সঙ্গে যোগে কমবেশি প্রচলিত। **মৃত্তিকা** clay অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মাটি**। যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সীমায়ন যদি চলতেই থাকে, অর্থাৎ **মৃ**-র তারণ হতে থাকলে, তার স্বরূপ ক্রমশ ব্যাপকতা হারিয়ে সংকীর্ণতা লাভ করে, সংক্ষিপ্ত হয়। তখন, বাহ্যবস্তু হলে সেগুলি ক্রমশ তাদের স্ব স্ব কেন্দ্রে ঘন হয়, কঠিন হয়, শক্ত হয়; আর মানসবস্তু (নানারকমের বোধ) হলে সেগুলি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়, তীব্র হয়, অত্যধিক ঝাঁঝালো হয়ে যায়। সাধারণত সজীব বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে সেগুলির **মৃৎ** হওয়া মানেই **মাটি**তে পরিণত হওয়া। শব্দশাস্ত্রের নিয়মে সেরূপ যে হয় তাকেও তাই **মৃৎ** বা **মাটি** বলে। আর, মানসবস্তুর ক্ষেত্রে সেই বোধগুলিও ক্রমশ স্থির অচল জড় বা অনড় ধারণা হয়ে মনের **মাটি**তে পরিণত হতে থাকে। ফলত, বাহ্যবস্তুর

মৃৎ যদি আরও ঘন হতে হতে **মৃদঙ্গারে** (পাথুরে কয়লায় / নিম্নে দেখুন) পরিণত হতে পারে, মানসবস্তুর **মৃৎ**-ও ঘন হতে হতে অর্থহারানো বিশ্বাস ও পুরাকথায় পরিণত হতে পারে। বিষয়টি আমরা সহসা বুঝতে পারি না, বুঝতে গেলে রবীন্দ্রনাথের মতো একটা মস্তিষ্ক লাগে। তিনি সেটি বুঝে আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন। আমরা নিম্নে **মৃদঙ্গার** শব্দে সেকথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ...

তবে **মৃৎ** ও **মৃত্তিকা**র মধ্যে কার্যত পার্থক্য না থাকলেও তাদের উভয়ের দৈহিক অমিলের একটি কারণ আছে। **কর** (হাত) ও **কারক** (হাত) উভয়েই হাতকে বোঝায় বটে, কিন্তু **কর** যেমন **কার** পেরিয়ে **কারক**-এ পৌঁছায়, **মৃৎ** তেমনি **মৃত্তি** পেরিয়ে **মৃত্তিকা**য় পৌঁছায়। ফলত, তাদের মাঝে এক-পুরুষের ব্যবধান আছে; যদিও **মৃত্তির** সহোদরেরা কেউই বেঁচে নেই, থেকে গেছে তাদের একমাত্র উত্তরসূরি **মৃত্তিকা**।

মৃৎকণ : ২. *মৃৎ-এর কণা।* ৩. মৃত্তিকালেশ। (ব.শ.)।

মৃৎকর : ২. *মৃৎ (কর্ম্ম) করে যে।* ৩. কুম্ভকার। (ব.শ.)।

মৃৎপাত্র : ২. *মৃৎ দ্বারা নির্ম্মিত যে পাত্র।* ৩. মৃন্ময়ভাজন। (ব.শ.)।

মৃৎপিণ্ড : ২. *মৃৎ-এর পিণ্ড যে।* ৩. মৃত্তিকার তাল, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা। (ব.শ.)।

মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি : ২. *মৃৎপিণ্ড-এর ন্যায় বুদ্ধি যাহার।* ৩. যাহার বুদ্ধি মৃৎপিণ্ডতুল্য, জড়মতি। (ব.শ.)।

মৃদঙ্গ : ১. ✓মৃদ্ + অঙ্গ (অঙ্গচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / মৃৎ অঙ্গ যাহার; যাহা আহত হয়, যাহা মৃন্ময়। (ব.শ.)। ৩. মুরজ, পাখোয়াজ, খোলবাদ্য, ঘোষ, শব্দ। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. যার অঙ্গ **মৃৎ** বা মাটি দিয়ে তৈরি, তাকে বলে **মৃদঙ্গ**; তা সে খোল মাদল (তবলার) ডিগি ... যাই হোক না কেন। এর অদৃশ্য রূপটি দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। আমরা বুঝতে পারছি, সেরকম মানসিক **মৃদঙ্গ** হতে পারে, কিন্তু তাকে চিহ্নিত করবার যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারিনি আমরা।

মৃদঙ্গার : ২. **মৃৎ** *অঙ্গার হইয়া থাকে যাহাতে।* ৩. মৃত্তিকার অন্তর্গত অঙ্গার, পাথুরে কয়লা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দৃশ্য **মৃদঙ্গার** হল পাথুরে কয়লা, আর অদৃশ্য **মৃদঙ্গার** হতে পারে পাথুরে জ্ঞানকথা, ঘটনার জীবাশ্ম, প্রত্ন-ধারণা, যা মানবসভ্যতার বহুকাল ক্রমাগত ইতিহাস — প্রবাদ, প্রবচন, পুরা-কাহিনী, প্রথা এবং আচারে অত্যন্ত ঘন অঙ্গার রূপে থাকে। এই অদৃশ্য **মৃদঙ্গার**কে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জমে জমে পাথর হয়ে যাওয়া ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর 'সফলতার সদুপায়' নিবন্ধে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন — '(আমাদের) দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি, ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই।' অতঃপর তাঁর 'স্বদেশ' বিষয়ক রচনার 'নূতন ও পুরাতন' শীর্ষক রচনায় জানাচ্ছেন — "... বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো। এক কালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি-আদানপ্রদানের নিয়ম বর্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্ত-বর্ষার সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্পপল্লবে স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই, গতি নেই বলে যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহুযুগের উত্তাপ ও আলো নিহিতভাবে বিরাজ করছে।" ...

তবে কিনা, এই মানসিক কয়লা থেকে জ্ঞানের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে নিজেদের মানসিক খাদ্যের রান্নাবান্নার ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে গেলে পৃথক অগ্নিশিখার দ্বারা সেই মানসিক কয়লা বা **মৃদঙ্গার** জ্বালাতে হয়, জ্বালাতে শিখতে হয়। আমাদের শব্দার্থকোষ সেই কাজ আদৌ যদি করতে পারে, সেই চেষ্টাতেই আমরা আত্মনিবেদিত আছি।

মৃন্ময় (মৃন্ময়ী) : ১. মৃদ্ + ময় (ময়ট্)। (ব.শ.)। ২. **মৃন্ময়** = *মৃৎ ময় যাহাতে (দ্র. ময়); অর্থাৎ, যাহা মৃৎ দ্বারা নির্ম্মিত; কিংবা, যাহাতে মৃৎ সর্ব্বময় হয়ে রয়েছে। মৃন্ময়ী = মৃন্ময়-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **মৃন্ময়** = মৃদ্‌বিকার, মৃত্তিকারচিত, মৃত্তিকাবয়ব, মৃত্তিকামূর্ত্তি। **মৃন্ময়ী** = মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেবীপ্রতিমা। (ব.শ.)। ৪. **মৃন্ময়** earthen-ware অর্থে প্রচলিত; **মৃন্ময়ী** মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **মাটি**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মৃদু : ১. ✓মৃদ্ + উ (কু) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আবর্ত্তমান সীমায়িতের দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. কোমল, সুকুমার, আর্দ্র, ধীরপ্রবাহ, মন্দ, অতীক্ষ্ণ, নিঃসত্ত্ব, তেজোহীন, পৌরুষরহিত, শান্ত, অনিষ্ঠুর, অপুরুষ, অতীব্র, নম্র, নবোদগত, অনুচ্চৈঃ, অদৃঢ়, দয়াপ্রধান, সাম, কোমলতা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **মৃৎ** ও **মৃদ্** শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি যে, **মৃদ**-মাত্রেই সেইরকম বস্তু বা বিষয়কে বোঝায়, যার স্বরূপ ক্রমশ ব্যাপকতা হারিয়ে সংকীর্ণতা লাভ করে বা করেছে। স্বভাবতই বাহ্যবস্তুর ক্ষেত্রে সেগুলি ঘন, কঠিন, শক্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া বোঝায়; আর মানসবস্তুর বা নানারকমের বোধের ক্ষেত্রে সেগুলি ক্রমশ তীক্ষ্ণ, তীব্র, ঝাঁঝালো হতে থাকে। কিন্তু **মৃদ** যখন **মৃদু** হয়ে যায়, তখন সে তার স্বাভাবিক ক্রিয়ার ঠিক উল্টো ক্রিয়া করে — নরম, আর্দ্র, অতীক্ষ্ণ, অতীব্র ... ইত্যাদি হতে থাকে; তা সে দৃশ্য বাহ্যবস্তু হোক আর অদৃশ্য মানসিক বিষয়ই হোক। এর মধ্যে দৃশ্য **মৃদু**-বস্তুগুলি হল **মৃদুকীল, মৃদুপর্ব্বক, মৃদুপাণি, মৃদুপাশ, মৃদুমুখ, মৃদুৎপল** প্রভৃতি; এবং অদৃশ্য মানস মৃদুগুলি হল **মৃদুকোপ, মৃদুগমন, মৃদুগামী, মৃদুপ্রযত্ন, মৃদুপ্রৌঢ়, মৃদুবাক, মৃদুবাত, মৃদুভাষী, মৃদুল, মৃদুলগামিনী, মৃদুস্পর্শ, মৃদুহাসী, মৃদুহৃদয়** ... ইত্যাদি।

মৃশ্ (মৃষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনামৃষ্ট, অবিমৃশ্য, অবিমৃশ্যকারিতা, অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশভাব, অমর্ষ, অমর্ষণ, অমর্ষিত, অমর্ষী, অমৃষ্ট, আমর্শ, আমর্ষ, আমৃষ্ট, পরামর্শ, মরষ(স), মর্শ, মর্শন, মর্ষ, মর্ষকাম, মর্ষণ, মর্ষণীয়, মর্ষিত, মর্ষিণী, মর্ষ্য, মাট (মাটি, মাঠ, দ্র. মট্), মার্ষ, মার্ষ্টব্য, মার্ষ্টি, মৃশ্, মৃষ্, মৃষা, মৃষাজ্ঞান, মৃষাদৃষ্টি, মৃষাধ্যায়ী, মৃষাবচন, মৃষাবাদ,

মৃষাবাদী, মৃষোদ্য, মৃষ্ট, মৃষ্টকৰ্ত্তা, মৃষ্টকুণ্ডল, মৃষ্টগন্ধ, মৃষ্টবাক্য, মৃষ্টযশাঃ, মৃষ্টসলিল, মৃষ্টানুলেপন, মৃষ্টাশন, মেট (দ্র. মট্)।

মৃশ্ (মৃষ্) = আবর্ত্তমান সীমায়িতের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ। **মৃশ** = আবর্ত্তমান সীমায়িতের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে। **মৃষ** = আবর্ত্তমান সীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে।

মর্শ (মর্শন — আমর্শ, পরামর্শ, বিমর্শ) : ১. ✓মৃশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***মর্শ*** = *আবর্ত্তমান সীমায়িত সার্ব্বিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা,* ***চিন্তা****কণাসমূহের (চিন্তালোকের) সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত যাহাতে বা যে কয়টিতে।* ***মর্শন*** = ***মর্শ*** *অন (on) যাহাতে।* ***আমর্শ*** = ***মর্শ****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***পরামর্শ*** = ***পর আমর্শ*** *যাহাতে।* ***বিমর্শ*** = *বিশেষ বা বিপরীত* ***মর্শ*** *যাহাতে।* ৩. **মর্শ** = স্পর্শ, প্রণিধান, পরামর্শ, চিন্তা। **মর্শন** = মর্শ, মীমাংসা। **আমর্শ** = সম্যক স্পর্শ, সংস্পর্শ, মন্ত্রণা, পরামর্শ, প্রণিধান, বিচারণা, পরিমার্জ্জন। **পরামর্শ** = যুক্তি, বিবেচন, বিতর্ক, সংবাহন, অবমর্শ, গ্রহণ, আকর্ষণ, গ্রহণাকর্ষণাদি, আস্কন্দন, বিঘ্নোৎপাদন, স্মৃতি, ব্যাপ্যের পক্ষধর্ম্মত্ববুদ্ধি। **বিমর্শ** = বিচিন্তন, বিতর্ক, সংশয় ... ইত্যাদি; বিচার করা, চিন্তা করা। (ব.শ.)। ৪. **পরামর্শ** যথার্থে প্রচলিত, অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দ কয়টি সম্পূর্ণতই মনোলোকের বিষয়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হত এবং হয়। **মর্শ, মর্শন, আমর্শ** এখন সেকেলে হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু **পরামর্শ** এখনও বহাল তবিয়তে আছে এবং নিঃসন্দেহে এটিও মনোলোকের বিষয়। (**বিমর্শ** ও **বিমর্ষ** বিষয়ে আমরা আসব **বিমর্ষ** শব্দে।) কাজেই বাহ্যলোকের কোনো কিছুর সাদৃশ্যে একে দেখানো যায় না। ফলত, ব.শ. যে অর্থগুলি দিয়েছেন, সেগুলির একটি থেকেও শব্দটির নিহিতার্থে পৌঁছানো যায় না। ...

মর্শ শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল 'আবর্ত্তমান-সীমায়িত (= **মর্**) সার্ব্বিক-ভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে (= **শ**)'। এরূপ অর্থ বেশ দুর্বোধ্য। আসলে বোঝানোর এমন কোনো পূর্বপ্রকল্পিত ভাষা নেই, যে, **মর্শ** শব্দটি দেখেই তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ সেই প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করে বলে দেওয়া যাবে। শব্দের অন্তর্নিহিত ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীকে বুঝে নিয়ে বাক্য বানাতে হচ্ছে এবং সবক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল হতে পারছি না আমরা। বিশেষত যে শব্দ সম্পূর্ণতই মানসিক বিষয় নিয়ে, যার কোনোরকম বাহ্য আধার দেখা যায় না, যার বিষয়ে পূর্বসূরিদের কোনোরকম অভিধার্থের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না, তাকে বুঝে নিতে পারলেও বোঝানো খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে সেই সমস্যায় পড়েছি আমরা। এইরকম সমস্যায় আগেও বহুবার পড়তে হয়েছে। ...

তা সে যাকগে। আমাদেরকে **মর্শ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির নিহিতার্থ এমনভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, যাতে সবাই তা বুঝে নিতে পারেন। আমরা নিজেরা **মর্শ**কে কমবেশি বুঝতেও পেরেছি, কিন্তু বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এখন একবার নিজেদের মতো করে চেষ্টা করা যাক।

আসলে, মানুষ ঠিক কীরকম ক'রে **চিন্তা** করে এবং ভাবে, সে বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা হয়েছিল, সূর্য যেমন সব দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে কিরণ বিচ্ছুরিত করে থাকে, প্রত্যেক মানুষের মনও তেমনি তার চিন্তাভাবনার কিরণসমূহকে সর্বদিকে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচ্ছুরিত করে থাকে। সূর্যের কিরণসমূহের অধিকাংশ যেমন ব্যর্থ যায়, কিছু কিরণ যেমন কোনো কোনো গ্রহে গিয়ে লাগে, ঠিক সেইরকম মানুষের চিন্তাভাবনার কিরণসমূহের অধিকাংশই ব্যর্থ যায়, কিছু চিন্তাভাবনার কিরণ কোনো কোনো বস্তু ও বিষয়ে গিয়ে ঠেকে। সূর্যের কিরণসমূহের অতি ক্ষুদ্রাংশ যেমন গ্রহাদিতে প্রতিফলিত হয়ে, তাপ দিয়ে জলকে বাষ্প ইত্যাদিতে পরিণত করে মেঘ রূপে ফেরত আসে, মানবমনের চিন্তাভাবনার কিরণসমূহের অতি ক্ষুদ্রাংশ তেমনি বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ে প্রতিফলিত হয়ে বাস্তবায়িত হয় এবং মানুষের কাজে লাগে। ...

এসব কথা আমরাই প্রথম জানলাম, আর কেউ জানে না, তা নয়; আপনারাও অনেকেই জানেন। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ জানেন, প্রত্যেক দেবদেবীর পেছনে থাকে জ্যোতি**র্বলয়** বা জ্যোতির্মণ্ডল, মনীষীদের ছবির পেছনেও চিত্রকরেরা এই জ্যোতির্বলয় দিয়ে থাকেন। এমনকি পাশ্চাত্যদেশেও এই প্রথা কমবেশি প্রচলিত আছে। তাঁরা একে বলেন halo, nimbus ইত্যাদি। এই রীতি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবাই পেয়েছেন মানুষের অতি প্রাচীন যৌথসভ্যতার উত্তরাধিকার থেকে। ... তার মানে, মানুষের প্রাচীন পূর্বসূরিরা, যেভাবেই হোক, একথা নিশ্চিতভাবে অনুভব করে ফেলেছিলেন যে, সূর্যের যেমন জ্যোতিঃ**বলয় হয়, মানুষেরও** তেমনি জ্যোতিঃ**বলয়** হয়, এবং সেটি **চিন্তাভাবনা**র **বলয়**ই বটে। এসব কথাকে যাঁরা কষ্টকল্পনা ভাবেন, তাঁদের জেনে রাখা ভাল যে, সাম্প্রতিক বিজ্ঞান, এতকাল পরে, এই **বলয়**টিকে প্রায় সব জীবের মধ্যেই কমবেশি চিহ্নিত করে ফেলেছেন, আধুনিকতম প্রযুক্তির সাহায্যে তার ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন radiation belt। তবে যে জীব যত বেশি মননশীলতার অধিকারী তার ঐ **বলয়**টি ছবিতে তত সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যার মননশীলতা যত কম তার **বলয়**টি তত অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। ...

তা সে যাই হোক, **পরামর্শ** শব্দটি আমরা বাংলাভাষীরা সবাই কমবেশি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তার নিহিতার্থ জানতে হলে আমাদের এগোতে হবে **মর্শ** থেকে। **মর্শ** শব্দের অর্থে প্রথমেই রয়েছে **মৃ** বা **মর্**। এ হল 'চিন্তাভাবনার কণাসমূহ', যাকে আমরা বলেছি, 'আবর্ত্তমান সীমায়িত'। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে **শ**, অর্থাৎ, 'সার্বিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে'। তার মানে **চিন্তা**কণাসমূহের বিচ্ছুরণ থাকে যাহাতে, তাকেই **মর্শ** বলে। অর্থাৎ, মানুষের মাথাটি যেন একটি বাল্ব, সেটি যখন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে, তখনই সেটি **মর্শ** করছে। ব.শ. তাকেই বলেছেন 'স্পর্শ, প্রণিধান, চিন্তা' ... ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কিছু কিছু চিন্তাকণা গিয়ে কোথাও প্রতিফলিত হচ্ছে, তাদের 'স্পর্শ' করছে, তাদের খবর ফিরে আসছে, তাই 'প্রণিধান', এবং সার্বিকভাবে সেসব 'চিন্তা' তো বটেই। তাদেরই তিনি **মর্শ** বলছেন। সেই সুবাদে আমাদের বাক্যটি হওয়া উচিত — 'চিন্তাকণাসমূহের সার্বিক বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত যে কয়টিতে', সেই 'সফল চিন্তালোকবিচ্ছুরণ'ই **মর্শ**-পদবাচ্য। ঠিক তাই!

সেই **মর্শ** অন থাকে **মর্শন**-এ। তাহলে **মর্শন** হওয়া মানেই **চিন্তার** কণাসমূহের বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হতে থাকা। এখানে **মর্শ** তার ক্রিয়াটি করছে। ব.শ. তাকে বলেছেন 'মর্শ, মীমাংসা'। এছাড়া আর কীই-বা বলতে পারতেন তিনি। অতঃপর '**মর্শে**র আশ্রয় যে', সেই **আমর্শ** স্বভাবতই যে সর্বপ্রকারের প্রতিফলিত চিন্তাকণা-সমূহকে বোঝাবে, তাতে সংশয় থাকে না। আমরা দেখছি, ব.শ. **আমর্শ**-এর অর্থ দিয়েছেন 'সম্যক স্পর্শ, সংস্পর্শ, মন্ত্রণা, পরামর্শ, প্রণিধান, বিচারণা, পরিমার্জ্জন' ইত্যাদি। এবং সন্দেহ নেই, **আমর্শ**-এর নিহিতার্থের সঙ্গে ঐ অর্থগুলি কমবেশি মেলে; সেভাবেই মেলে যেভাবে প্রতীকী অর্থ অভিধার্থের বা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে মেলে। আর, **বিমর্শ** যে 'বিশেষ **মর্শ**', ব.শ. প্রদত্ত **বিমর্শ** শব্দের অর্থগুলি সেকথাই জানান দিচ্ছে। থাকল বাকি **পরামর্শ**-এর কথা।

পর শব্দে আমরা জেনেছি, অস্তিত্বের বাইরে যে সত্তাগুলি থাকে তাদের মধ্যে যেগুলি সত্তার পক্ষে দরকারী, সেগুলিকেই **পর** বলে এবং সেই **পর**-এর আধারকে **পরা** বলে। তাহলে **পরা** + **মর্শ** = **পরামর্শ**-এর মানে দাঁড়ায়, অস্তিত্বের পক্ষে শুভজনক **মর্শ**গুলি। দেখা যাচ্ছে, ব.শ. **পরামর্শ** শব্দের অর্থ দিচ্ছেন 'যুক্তি, বিবেচন, বিতর্ক, সংবাহন, অবমর্শ, গ্রহণ, আকর্ষণ, গ্রহণাকর্ষণাদি, আস্কন্দন, বিঘ্নোৎপাদন, স্মৃতি, ব্যাপ্যের পক্ষধর্ম্মত্ববুদ্ধি' ... ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে সকল বিচ্ছুরিত চিন্তালোক অস্তিত্বের বাইরে (**পর**-এর উপর) প্রতিফলিত হয়ে সফলভাবে ফিরে আসে, সেই **মর্শ**গুলির মধ্যে যেগুলি অস্তিত্বের পক্ষে শুভ, সেগুলিকে **পরামর্শ** বলে। বন্ধুবান্ধব যখন সেই **পরামর্শ** দেয়, তখন তারা ব্যক্তিটির স্থানে নিজেদের রেখে নিজের নিজের চিন্তালোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সেই সকল **পরামর্শ** অর্জন করে এবং সেগুলিই ব্যক্তিটিকে দেয়। ... দ্র. **মর্ষ**। ৬. যেহেতু মানবমনের **চিন্তাভাবনার** জ্যোতিঃ**বলয়**-এর ধারণা মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন অর্জন, পাশ্চাত্যও এর কেবল ধারণাগত **উত্তরাধিকারই** পায়নি, ভাষাগত উত্তরাধিকারও পেয়েছে। ইংরেজি **ভাষাতে** সেকারণেই **মর্শ** ও **আমর্শ** শব্দের বহু উত্তরসূরিকেই দেখতে **পাওয়া** যায়। যথা — amerce, mercy ... ইত্যাদি।

মর্ষ (মর্ষণ, মর্ষিত — অমর্ষী, বিমর্ষ) : ১. ✓মৃষ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **মর্ষ** = *আবর্ত্তমান-সীমায়িত দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, চিন্তাকণাসমূহ দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে।* **মর্ষণ** = **মর্ষ** *অন (on) যাহাতে।* **মর্ষিত** = **মর্ষ** *গতিশীল-ভাবে তারিত যাহাতে।* **অমর্ষী** = *যে* **মর্ষী** *(***মর্ষ** *সক্রিয় যে আধারে) নহে।* **বিমর্ষ** = *বিশেষ বা বিপরীত* **মর্ষ** *যাহাতে।* ৩. **মর্ষ** = সহন, ক্ষমা, ক্ষম, নাশন। **মর্ষণ** = সহন, ক্ষমা। **মর্ষিত** = তিতিক্ষিত, সোঢ়। **অমর্ষি** = অসহন, অসহিষ্ণু, ক্রুদ্ধ। **বিমর্ষ** = অসহন, বিচারণা, বিষাদ, বিষণ্ণ, দুঃখিত। (ব.শ.)। ৪. 'দুঃখিত' অর্থে **বিমর্ষ** প্রচলিত, মেদিনীপুরে **অমর্ষী** নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. যখন কিনা **মর্শ** মানে হল, 'চিন্তালোকের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণের সফল প্রতিফলন যে কয়টিতে', তখন **মর্ষ** মানে হল, 'চিন্তালোকের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের সফল প্রতিফলন যেগুলিতে।) অন্ধকার উঠোনে একটি ফুটবলের মতো গোল বালব জ্বলছে, তাতে চারদিকের কিছু কিছু বস্তুকে দেখা যাচ্ছে। এ হল মানবমনের স্বাভাবিক চিন্তার আলোক বিচ্ছুরণ বা **মর্শ**। আর অন্ধকার উঠোনে টর্চের আলো ফেললেও কিছু কিছু বস্তুকে দেখা যায়, সে হল মানবমনের কৃত্রিম চিন্তার আলোক বিচ্ছুরণ বা **মর্ষ**। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলছে যে, **দক্ষযজ্ঞ**-এর পর বৈদিক সভ্যতার সূচনা হলে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞানের পাশাপাশি 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞান'-চর্চার সূচনা হয় এবং **মর্শ** ক্রমশ **মর্ষ**তে পরিণত হতে থাকে। এর অনিবার্য ফল ফলে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে। পূর্বতন সনাতন দৃষ্টিতে **মৃশ্** ক্রিয়া থেকে জাত **মর্শ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি থেকে যায় শুভ হয়ে এবং **মৃষ্** ক্রিয়া থেকে জাত **মর্ষ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি হয়ে যায় অশুভ; আর পরবর্তী বৈদিক দৃষ্টিতে **মর্শ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং **মর্ষ** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি হয়ে যায় শুভ। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান পেরিয়ে আধুনিক বাংলায় পৌঁছে স্বভাবতই **মর্শ মর্ষ বিমর্শ বিমর্ষ অবিমৃশ্য অবিমৃষ্য অবিমৃশ্যকারী অবিমৃষ্যকারী** প্রভৃতি শব্দের উত্তরাদিকারীদের মধ্যে বিরোধ বেধে যায়। কোনটা ঠিক বা 'সাধু'-শব্দ, আর কোনটা বেঠিক বা 'অসাধু'-শব্দ তা নির্ণয় করতে উভয় পক্ষই নাকাল হন। ফলত, **মর্শ**-ঘরানার কিছু কিছু শব্দার্থ ঢুকে যায় **মর্ষ**-ঘরানায়, বিপরীতটাও ঘটে। বলতে গেলে শুধুমাত্র **পরামর্শ** শব্দটি থেকে যায় তার আদি অবস্থানে। ... আজ যখন এই বিরোধের কারণ জানা গেছে, বাংলাভাষার জ্ঞানীজনেরা চাইলে **মৃশ্** ও **মৃষ্** ক্রিয়া থেকে জাত শব্দসমূহের যথাযথ বিন্যাস করে ফেলতে পারবেন আশা করা যায়। দ্র. **মৃশ্য**।

মৃশ্য (অবিমৃশ্য, অবিমৃশ্যকারিতা, অবিমৃশ্যকারী — অবিমৃষ্য, অবিমৃষ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারী) : ১. ✓মৃশ্ + য। ২. **মৃশ্য** = *মৃশ (আবর্ত্তমান-সীমায়িতের সার্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে) থাকে যাহাতে; অথবা, চিন্তার কিরণসমূহের সার্বিক বিচ্ছুরণ থাকে যাহাতে।* **অবিমৃশ্য** = *নয় বিশেষ বা বিপরীত* **মৃশ্য** *যে; অথবা, যাহাতে বিশেষ বা বিপরীত* **মৃশ্য** *নেই; (অর্থাৎ, স্বাভাবিক* **মৃশ্য** *আছে)।* **অবিমৃশ্যকারী** = *যে* **অবিমৃশ্য** *কাজ করে।* **অবিমৃশ্যকারিতা** = **অবিমৃশ্য** *করণ তারিত যে আধারে।* **অবিমৃষ্য** = *যে* **বিমৃষ্য** *[বিশেষ বা বিপরীত* **মৃষ্য** *(আবর্ত্তমান-সীমায়িত দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে)] নহে।* **অবিমৃষ্যকারিতা** = **অবিমৃষ্য** *করণ তারিত যাহাতে।* **অবিমৃষ্যকারী** = *যে* **অবিমৃষ্য** *কাজ করে।* ৩. **অবিমৃশ্য** = ('অবিমৃষ্য' অসাধু) বিমর্শনের অযোগ্য, অবিচার্য্য, অসন্দিগ্ধব্য অর্থাৎ সন্দেহের অযোগ্য। **অবিমৃশ্যকারিতা** = অবিমৃশ্য-কারিভাব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচাররাহিত্য, অবিবেকিতা। (ব.শ.)। **অবিমৃষ্য** = অবিবেচক, নিঃসন্দিগ্ধ। (**অবিমৃষ্যতা** = চিন্তাহীনতা, পরিণামদর্শিতা-শূন্যতা। **অবিমৃষ্যকারিতা** = বিশেষ রূপ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করা, সহসা কোনো কর্ম্ম করা, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করা, অপরিণামদর্শিত, অবিবেকিতা। **অবিমৃষ্যকারী** = বিশেষরূপ চিন্তা ব্যতিরেকে সহসা কর্ম্মকারী, যে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করে এরূপ ব্যক্তি, অপরিণামদর্শী। (ছা.অ.)। ৪. একমাত্র **অবিমৃশ্যকারী** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **মর্শ, মর্ষ**। আর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মেধ্ **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অমেধা, অমেধাঃ, অমেধ্য, অশ্বমেধ, আত্মমেধ, মেধ্, মেধ, মেধস, মেধা, মেধাকাম, মেধাকৃৎ, মেধাজনন, মেধাবান, মেধাবিনী, মেধাবী, মেধি, মেধিষ্ঠ, মেধী, মেধীরোপণ, মেধীস্তম্ভ, মেধ্য, মেধ্যা, মেন্ধিকা, মেন্ধী, সুমেধা।

মেধ্ = দিশাগ্রস্থ সীমায়িতের ধারণ। **মেধ** = দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের ধারণ যাহাতে।

মেধ (মেধজ, মেধা, মেধাবান, মেধাবী, মেধ্য, মেধ্যা) : ১. ✓মেধ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***মেধ*** = *দিশাগ্রস্ত-সীমায়িতের ধারণ যাহাতে।* ***মেধজ*** = ***মেধ*** *হইতে জাত।* ***মেধা*** = ***মেধ****-এর আধার যে।* ***মেধাবান*** = ***মেধা*** *বহন অন (on) যাহাতে।* ***মেধাবী*** = ***মেধা****-র গতিশীল বহনের আধার যে।* ***মেধ্য*** = ***মেধ*** *থাকে যাহাতে।* ***মেধ্যা*** = ***মেধ্য****-এর আধার যে।* / **মেধ** = যাহাতে (পশু) হত হয়। **মেধজ** = যজ্ঞ হইতে জাত যে। **মেধা** = যাহাতে সর্ব্ব বহুশ্রুত সঙ্গত হয়। (ব.শ.)। **৩. মেধ** = যজ্ঞ, যজ্ঞীয় পশু। **মেধজ** = বিষ্ণু। **মেধা** = গ্রন্থাদিতে ধারণাশক্তিযুক্ত বুদ্ধি, ধারণাবতী বুদ্ধি, বুদ্ধি, দক্ষকন্যা ধর্ম্মপত্নী, মাতৃকাবিশেষ। **মেধাবান** = মেধাবী। **মেধাবী** = ধারণাবদ্‌বুদ্ধিযুক্ত, মেধাবান, বুদ্ধিমান, আত্মজ্ঞানলক্ষণমেধাবান, প্রাজ্ঞ, শুকপক্ষী, মদিরা, ব্যাড়িমুনি। **মেধ্য** = মেধনীয়, সঙ্গমনীয়, যজ্ঞার্হ, পবিত্র, পূত, স্পর্শভক্ষণাদি-দোষশূন্য, বিহিত লক্ষণসম্পন্ন (বলি), মেধাকৃৎ, মেধাজনক, ছাগ, খদিরবৃক্ষ, যব। **মেধ্যা** = রোচনা, কেতকী, জ্যোতিষ্মতীলতা, ব্রাহ্মী, শমী, রক্তবচা, শ্বেতবচা, শঙ্খপুষ্পী। (ব.শ.)। **৪.** intellect অর্থে **মেধা** এবং intelligent অর্থে **মেধাবী** প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অশ্বমেধ, নরমেধ**। আমাদের পরিচিত নিত্যব্যবহার্য শব্দ হল **মেধা**। একে আমরা সবাই চিনি, এর নিহিতার্থ জানি আর না জানি। **মেধ** শব্দটি আমরা ব্যবহার করি না, করতে জানি না। শব্দটিকে অন্য শব্দের সঙ্গে একযোগে **অশ্বমেধ, নরমেধ, পুরুষমেধ** ইত্যাদি রূপে শুনে আসছি, পুরাণাদিতে পড়ে আসছি। **অশ্বমেধ**-এর গল্প শোনেননি, এমন বাংলাভাষীর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সেই **মেধ** কী ব্যাপার, কেনই-বা তার সঙ্গে **আ**-কার যোগ করলেই সেটি intellect-বাচক **মেধা** হয়ে যায়, আমরা জানি না। এখন সেকথা জানতে হবে।

মেধ শব্দের নিহিতার্থে আমরা দেখছি, 'দিশাগ্রস্ত-সীমায়িত সত্তা ধারিত যাহাতে' তাকে **মেধ** বলে। তাও বোঝা যাচ্ছে না। এর মানে বলা হচ্ছে 'যজ্ঞ'। ব্যবহারে দেখা যায় — যে **মেধ**-এ **অশ্ব**কে মেধ করা হয়, তাকে বলে **অশ্বমেধ** বলে; যে **মেধ**-এ **নর**কে (নৃ-কে) **মেধ** করা হয়, তাকে **নরমেধ (নৃমেধ)** বলে; যে **মেধ**-এ **পুরুষ**কে **মেধ** করা হয়, তাকে **পুরুষমেধ** বলে। সেই **মেধ**-এর আধারকে **মেধা** বলে। এই **মেধা**কে আমরা কমবেশি চিনি, এ হল এমন একটি মানসশক্তি যা বহু মানুষের থাকে, কোনো কোনো মানুষের কম পরিমাণে থাকে। তাহলে এই **মেধ** ব্যাপারটি কী?

আখ-পেষাই কল সবাই দেখেছেন। তাতে একদিকে সারি দিয়ে আখ ঢোকানো হয়, অন্যদিকে রস ঝরে ঝরে জমা হতে থাকে। প্রায় একইভাবে কর্মযজ্ঞে বা কারখানায় যখন সারি দিয়ে মানুষ ঢোকানো হয়, তখন তার থেকে দুরকম রস ঝরে যায়, ঝরে গিয়ে কর্মযজ্ঞের সৎ-**প্রকৃতির** (কাঁচামালের) সঙ্গে মিশে যায়। প্রথম রসটিতে ঝরে যায় মানুষটির **মেদ**, দ্বিতীয় রসটিতে ঝরে যায় মানুষটির **মেধ**। তার মানে, **মেদ** হল মানুষের দেহরস, আর **মেধ** হল মানুষের মনোরস। কর্মযজ্ঞে এই **মেদ** ও **মেধ**কে নিয়মিত নিংড়ে কৃত্রিম-**বিশ্বে** পরিণত করে নিতে হয়; অন্যথায় এই **মেদ** জমে জমে দেহের চর্ব্বি এবং এই **মেধ** জমে জমে মনের চর্ব্বিতে পরিণত হয়ে থাকে।

মানুষ যখন তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জীবননীতি পরিত্যাগ করে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক জীবননীতি'তে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে, তখনই তার দেহরস জমে **মেদ** (= দৈহিক-চর্ব্বি) ও মনোরস জমে **মেধ**-এ (= মানসিক-চর্ব্বিতে) পরিণত হতে শুরু করে। তখন এই **মেদ** নিয়মিত ঝরে ঝরে খরচ হয়ে না গেলে মানুষের শরীরে দৈহিক-চর্ব্বি বা **মেদ** জমে যায় এবং মানুষ দৈহিকভাবে মোটা হয়ে গিয়ে কর্ম্মসাধনার অযোগ্য হতে শুরু করে (দ্র. **মেদ** - চরকসংহিতার উদ্ধৃতি); আর, এই **মেধ** নিয়মিত ঝরে ঝরে খরচ হয়ে না গেলে মানুষের মনে মানসিক-চর্ব্বি বা **মেধ** জমে যায় এবং মানুষ মানসিকভাবে জ্ঞানসাধনার অযোগ্য হতে শুরু করে। শরীরে **মেদ** জমে গেলে মানুষ শারীরিকভাবে মোটা বা স্থূলদেহ হয়ে যায়, শ্লথগতি হয়ে অলস জীবন কাটায়; মনে **মেধ** জমে গেলে মানুষ মানসিকভাবে স্থূলমনা বা 'মাথামোটা' হয়ে যায়, তখন সে দ্রুততার সঙ্গে কোনো নতুন চিন্তাভাবনা ভাবতেই পারে না; তাই জ্ঞানসাধনার অযোগ্য হয়ে যায়। দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, একালের 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি'তে পরিচালিত অ্যাকাডেমির জ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই এখন 'মাথামোটা' মানুষে পরিণত হয়ে গেছেন। রেলপথের বাঁধি গতে জ্ঞানযাত্রার রেলে বসে অলসভাবে তাঁরা অনায়াসে বহুদূর যাত্রা করেন বটে, কিন্তু সেই বাঁধা পথের ক্ষুদ্র দুনিয়ার বাইরে যে বিশাল দুনিয়া, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন; অ্যাকাডেমির বাঁধাপথের বাইরে কোনো নতুন কথাকে তাঁদের মন ধরতে পর্যন্ত পারে না; কেননা নতুন কোনো চিন্তাভাবনাকে ধরার জন্য তাঁদের মনকে যতটুকু ছুটতে হয়, তাঁদের **মেধ** জমে-যাওয়া 'মাথামোটা' মন ততটুকু ছোটার পরিশ্রম করে উঠতে পারে না; জোর করে চেষ্টা করলে তাঁদের অলস মন ঘেমে-নেয়ে একশা হয়ে ওঠে। তাই অনায়াসলব্ধ উত্তরে তাঁরা কাজ চালান। ...

অতএব, **মেধ** জিনিসটিতে আমরা পেলাম — 'দিশাগ্রস্ত-সীমায়িত সত্তা' (= **মে**) ব'লে এগুলি ইল্‌শে গুঁড়ির মতো অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানরসের কণা; এবং 'ধারিত যাহাতে' (= **ধ**) ব'লে এগুলি পুঞ্জীভূত থাকে **দক্ষ**-মানুষের মাথায়, মনোরসে। সমস্যা 'ক' হলে তার সমাধান 'ত' হবে, সমস্যা 'চ' হলে তার সমাধান 'দ' হবে; ... ইত্যাকার **দক্ষ**-মনোরসের আধারকে **মেধা** বলে। আমাদের ইতিহাস জানাচ্ছে, এই **দক্ষ**-মানুষদের কমপক্ষে তিনটি প্রজাতি আছে — **অশ্ব, নৃ,** ও **পুরুষ**। অতি সংক্ষেপে একালের ভাষায় এঁদের যথাক্রমে স্পেশালিস্ট (বিশেষজ্ঞ), স্কিলড্ হ্যান্ড (দক্ষকর্মী) ও ডিরেক্টর (পরিচালক) বলে। স্বভাবতই **অশ্বমেধ** মানে, যাতে

স্পেশালিস্টদের **মেধ** ঝরিয়ে দেওয়া হয়; **নৃমেধ** মানে, যাতে স্কিল্‌ড্‌ মানুষদের **মেধ** ঝরিয়ে দেওয়া হয়; এবং **পুরুষমেধ** মানে, যাতে পরিচালকদের **মেধ** ঝরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিগণ সেকারণেই **অশ্বমেধ, নৃমেধ, পুরুষমেধ** প্রভৃতি কর্মযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর যেহেতু তখন সেগুলির প্রতীকী আচরণের মাধ্যমে প্রকৃত আচরণকে উপস্থাপন করবার রীতি ছিল, বাস্তবে দেশজুড়ে **অশ্বমেধা**দি চালানর আগে প্রতীকী **অশ্বমেধা**দি করা হত প্রতীকী ঘোড়া, যজ্ঞবাট, প্রকৃতিশক্তি (রানী) এবং পূজার নানান উপকরণ দিয়ে। সেকালের রাজপুরুষেরা সেই দৃশ্য প্রতীকী **অশ্বমেধা**দি দেখে বুঝে নিতে পারতেন, দেশজুড়ে অদৃশ্য প্রকৃত সামাজিক **অশ্বমেধা**দি যজ্ঞ কেমনভাবে করা হবে, এবং সেভাবেই প্রকৃত **অশ্বমেধা**দি যজ্ঞ করা হত। বাস্তবের সেই প্রকৃত কর্মযজ্ঞগুলিকে ভুলে গিয়ে অতীতহারা আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতেরা সেই যজ্ঞের প্রতীকী আচরণগুলিকেই মনে রেখেছেন শুধুমাত্র **অশ্বমেধ-যজ্ঞ** রূপে। **নৃমেধ** ও **পুরুষমেধ** যজ্ঞের কথা লজ্জায় ও ভয়ে মনে রাখেননি। ...

পুরুষমেধ ও **পুরুষমেধ-যজ্ঞ** শব্দ পুরাণাদি গ্রন্থে রয়েছে, কিন্তু একালের অধিকাংশ অভিধান বা শব্দকোষে নাই; রয়েছে কেবল ব.শব্দকোষে এবং রয়েছে ৬৭ পণ্ডিতের দ্বারা সংকলিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে। তাতে **পুরুষমেধ** শব্দের মানে করা হয়েছে মূলত 'নরহত্যা'। ফলত, গোটা ব্যাপারটি এরকম দাঁড়িয়ে যায় যে, প্রাচীন ভারত 'অফিসিয়ালি' নরহত্যা করত! ইংরেজ পণ্ডিতেরা তো আমাদের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগই করে আসছিল, যে আমরা অত্যন্ত অসভ্য পিছিয়ে পড়া জাতি! নরহত্যা করি, মানুষ হয়ে মানুষ বলি দিয়ে মানুষের মাংস খাই! এমন জলজ্যান্ত লিখিত প্রমাণ হাতে পেয়ে যাওয়ার পর তাদের আর ধরে কে! অতএব, অতঃপর আমাদের সামনে নিজেদের মান বাঁচাতে নানা অজুহাতের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না আমাদের অতীতভোলা পণ্ডিতদের। **পুরুষমেধ** শব্দের এই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ হাতে পাওয়ার পর যে কেউ বুঝতে পারবেন, 'বিশ্বকোষ' সংকলক পণ্ডিতেরা **পুরুষমেধ, নরমেধ** প্রভৃতি শব্দ নিয়ে কী মুশকিলে পড়েছিলেন।

***ম্না* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** *:* অনামক, অনামা, অনামিকা, আম্নাত, নম্বর (number, বরণীয় নাম), নম্বরী, নম্বরী-নোট, নাম, নামকরণ, নামগন্ধ, নামগ্রহণ, নামজাদা, নামডাক, নামতা, নামধাতু, নামধারী, নামধেয়, নামবাচক, নামমাত্র, নামাঙ্ক, নামাপরাধ, নামাবলি(লী), নামিনী, নামী, নাম্নী, নিম্ন, ম্না, ম্নাত, ষড়াম্নায়, সমাম্নাত, সমাম্নায়, সুনাম।
ম্না = অতিসীমিতের অনকরণ যে আধারে।

আম্নাত (ম্নাত) : ১. আম্নাত = আ + ✓ম্না + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ম্নাত*** = ***ম্না*** *(অতিসীমিতের অনকরণ যাহাতে) তারিত যাহাতে।* ***আম্নাত*** *=* ***ম্নাত****-সমূহের আশ্রয় যাহাতে। /* যথাবিধি গুরুমুখে **শ্রবণপূর্ব্বক** বেদাদির অভ্যাস (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. ম্নাত** = অভ্যস্ত, অনুশীলিত, অধীত, পঠিত। **আম্নাত** = সম্যক অভ্যস্ত, যথাবিধিপঠিত, আখ্যাত, কথিত, অভ্যাস, আম্রেড়ন, পুনঃ পুনঃ কথন, উপদেশ, গুরুপরম্পরায় সদুপদেশ, বেদ, শ্রুতি, তন্ত্রশাস্ত্র, আগম, ধর্ম্মশাস্ত্র, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ উপনিষৎ ও আরণ্যকের সহিত বেদ, কুলক্রম। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. দ্র. নাম**। কোনো একটি বিষয়কে তার **নাম**-এর সাহায্যে বারংবার উচ্চারণ করে বললে, তাকে বলা হয় **ম্নাত**। সেই **ম্নাত**-সমূহের আশ্রয় থাকে যে ক্রিয়ার আচরণে তাকেই **আম্নাত** বলে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইংরেজি amnesia আর আম্নাত একই ক্রিয়া থেকে জাত শব্দ। গ্রীক ভাষাতেও mneme-র অর্থ memory বা স্মৃতি। দ্র. **ষড়াম্নায়**। **৬.** amnesia।

নাম : ১. ✓ম্না + মন্ (মনিন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাহা দ্বারা ম্না-কে (সত্তার সর্ব্বাধিক সীমায়িত রূপকে) মনে করা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তাকে তার সর্ব্বোচ্চ সীমিতরূপে চিহ্নিত করা হয়।* **৩.** অভিধান, নামমাত্র, (ব্যাকরণে) স্বাদিবিভক্তিযোগ্য পঞ্চবিধ শব্দ, দ্রব্য, নামসূচক শব্দ; প্রাকাম্য, সম্ভাব্য, ক্রোধ, উপগম, কুৎসা, বিস্ময়, স্মরণ, বিকল্প, অপরমার্থ; (ফারসি) খ্যাতি, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি, পসার। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অভিধা, আম্নাত, বর্ণ (কল্পনাতীত-বাস্তব)**। কোনো একটি বস্তু বা বিষয়কে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ বারংবার উচ্চারণ করা হলে, তাকে বস্তু বা বিষয়টির **নাম** বলে। তা বলুক। কিন্তু বস্তুটির জন্য ঐ বিশেষ শব্দ (বিশেষ **ধ্বনি** বা **ধ্বনি**সমষ্টি) উচ্চারণ করা হয় কেন? অর্থাৎ, যেমন, সুন্দরবনের হিংস্র চতুষ্পদ জন্তুটির জন্য **ব্যাঘ্র** বা **বাঘ** শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু কেন? করা হয় এই জন্য যে, জন্তুটি চূড়ান্তভাবে সীমায়িত হয়ে (= **ম্ন**) হয়ে রয়েছে ঐ **ব্যাঘ্র** শব্দে। কেননা, **ব্যাঘ্র** ধ্বনিসমষ্টি *'দ্বারাই ঐ সত্তার সর্বাধিক সীমায়িত রূপকে বারংবার মনে করা হয়'* বা **ম্না** করা হয়। তার মানে, জন্তুটি তার চূড়ান্ত সীমায়িত রূপে **ব্যাঘ্র** শব্দের ভিতরেই বিদ্যমান রয়েছে। তার সেই চূড়ান্ত সীমায়িত রূপটি হল **'ব্যাপকভাবে আঘ্রাত হয় যে সত্তা'** বা **ব্যাঘ্র**। জ্যান্ত **বাঘ**টি এতে নাই, রয়েছে তার এমন একটি গুণের কথা, যা দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায়, বুঝতে পারা যায়, মনে করা যায়। তাই **ব্যাঘ্রই** ঐ জন্তুটির **নাম**। অতএব **নাম** কোনো অর্থহীন শব্দ নয়, **নাম** হল সেই **ধ্বনি** বা **ধ্বনি**সমষ্টি, যা একটি বস্তু বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ততম **ধ্বনি**রূপ, যে **ধ্বনি**র ভিতরে বস্তু বা বিষয়টি সূক্ষ্মতমরূপে ধরা থাকে। একে তাই **নামগন্ধ**ও বলে। (নিম্নে **নামগন্ধ** দ্রষ্টব্য)। সেই **নাম** ধরে আমরা বস্তু বা বিষয়টিকে উল্লেখ করি বলে **নাম**কে বস্তু বা বিষয়টির **গন্ধ**-মাত্র বা **অভিধা** বলে। স্বভাবতই বিশ্বের সকল বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের তৈরি করা **অভিধা** রয়েছে, তা সে পরমাণু হোক, কীটাণু হোক আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই হোক, কিংবা সেই ব্রহ্মাণ্ডের মালিকই হোন। যাকে মানুষ চিনেছে, বুঝতে পেরেছে, তাকেই একটি **অভিধা**র ভিতরে সীমায়িত করে নিয়েছে; তা তিনি যত শক্তিমানই হোন না কেন। এবং যে গ্রন্থে সেই সকল **অভিধা** অন (on) থাকে, তাকে **অভিধান** বলে।

নাম-এর সূচনা কিন্তু দৃশ্য জিনিসের **নাম**করণ করার প্রয়োজন থেকে হয়নি। সে তো আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেই চলে, তাহলে আর তার **নাম**করণ করার প্রয়োজন কী! তাছাড়া, শুধু শুধু দৃশ্য জিনিসটি থাকতেও একটি শব্দের সাহায্যে তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো ঝুঁকির ব্যাপার। তাতে ভুল বুঝবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তবে জিনিসটি যখন হাতের সামনে নেই, তখন তাকে বোঝানোর জন্য একটা **নাম**-এর সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু সেসব ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাদের **নাম**করণের সূচনা হয়ে যায়। কেননা, অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তারা ততদিনে মানবসমাজে নানা রকম শুভাশুভ ক্রিয়া করতে শুরু করে দিয়েছে এবং আমাদের জ্ঞানীগুণী পূর্বপুরুষেরা সেই সত্তাদের চিহ্নিত করা শুরু করে ফেলেছেন। তখন তাঁরাই সেই সত্তাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করে নিয়ে তারপর এক এক করে তাদের **নাম** দিতে শুরু করে দেন। সেভাবেই **ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবদেবী, দৈত্যদানব, যক্ষ, রাক্ষস, গরুড়, দশমাথা রাবণ, বিশালদেহী হনুমান, অশ্বদেহী-মনুষ্যশির** কিংবা **মনুষ্যদেহী-অশ্বশির কিন্নর** ও **কিম্পুরুষ** ... প্রভৃতি অজস্র সত্তার **নাম**করণের সূচনা হয়। প্রায় যুগপৎ আসে দৃশ্য সত্তাসমূহের **নাম**করণের রীতি। আর, সেই প্রথা আসে সেই সত্তাসমূহের ক্রিয়া বা স্বভাব অনুসারে **নাম** দেওয়ার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক যুক্তিসম্মত নিয়ম অনুসরণ ক'রে। সেই প্রথা অনুসরণ করেই মানুষ তার পরিপার্শ্বের এবং এমনকি নিজেদেরও **নাম**করণ করা শুরু করে দেয়। মানুষ **গাছ মাছ হাতি ঘোড়া বাঘ সিংহ** ... ইত্যাদি থেকে শুরু করে প্রতিটি দৃশ্য সত্তারও **নাম**করণ করে ফেলে। কিন্তু সেটিও নিয়মহীন ভাবে হয়নি, হয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মান্য করে। আর সেই নিয়মটি হল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়ম। সেই নিয়মে 'গা আচ্ছাদিত যাহার' সে হয়ে যায় **গাছ**; 'ব্যাপকভাবে আঘ্রাত হয় যে', সেই হয়ে যায় **ব্যাঘ্র**; 'হিংসা করে যে', সে হয়ে যায় **সিংহ**। সেভাবেই 'নেই জয় যাহাতে' তার **নাম** দেওয়া হয় **অজয়**, 'নেই মল যাহাতে' তাকে বলা হয় **অমল** ... এভাবেই **নামকরণ** করার সার্বিক প্রথা প্রবর্তিত হয়ে যায়। সারা বিশ্বের সর্বজাতিই এই প্রথার সমান উত্তরাধিকারী।

তবে প্রোটেস্টান্ট উত্থানের সময় থেকে পাশ্চাত্যে এই প্রথার বিরোধিতা শুরু হয় এবং সত্তার স্বভাবের সঙ্গে **নামে**র বিচ্ছেদ ঘটানো হতে থাকে। যদিও তা সত্ত্বেও এমনকি চার্লস ডিকেন্সকেও দেখা যায়, তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির **নাম** রাখছেন তাদের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। শিল্পবিপ্লবের পর **নামে**র সঙ্গে স্বভাবের সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করে ফেলেন তাঁরা।

ভারতীয় উপমহাদেশে **নামের** সঙ্গে সত্তার নাড়ির সম্পর্কটি কেটে ফেলার সূচনা হয় ইংরেজ আসার পরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশে লেজকাটা শেয়ালের উপদেশ সবাই গ্রহণ করেনি। বাংলাভাষীদের মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন প্রথা কমবেশি বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা কেবল স্বভাব অনুসারে ছেলেমেয়েদের **নাম**করণই করতেন না, পারিপার্শ্বিকের সবকিছুর — ঘরের, গাছের, গরুর, ছাগলের, হাঁসের, মুরগির, পুকুরের, ঘাটের, বাগানের, ঢিপির, বাঁধের, ছেলেপুলেরা খেলা করে যে 'পড়িয়া'য় (যে মাঠ ফাঁকা পড়ে আছে = পড়িয়া) তার ... সকলের **নাম**করণ করতেন তাঁরা। কারণ পরিপার্শ্বের প্রতিটি সত্তাকে সেকালের মানুষ নিজের মতোই এক একটি জীবন্ত সত্তা বলে মনে করতেন, গ্রামবাংলার মানুষেরা আজও তাই করেন। (আজকাল যে যান্ত্রিক 'প্রকৃতিপ্রেম'-এর রমরমা হয়েছে, হচ্ছে, গ্রামবাংলার এই স্বাভাবিক প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না।) ইংরেজ-প্রভাবিত অ্যাকাডেমির কল্যাণে শহুরে বাংলাভাষীরা তাঁদের এই অভ্যাস থেকে দূরে সরে গেছেন। বিগত তিরিশ বছরের উলঙ্গমনা বামদলের শাসনের কারণে গ্রামাঞ্চলেও তার অত্যন্ত কুপ্রভাব পড়েছে। ফলত, গ্রামবাংলার স্বভাব অনেকখানি বদলে গেলেও এখনও সেই প্রাচীন রীতি সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি, এখনও গ্রামবাংলায় পরিপার্শ্বের **নাম**করণের প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের কাঁধে সওয়ারি রূপে বহন করে নিয়ে চলা যে **বঙ্গ**-এর মূল স্বভাব, **নাম**করণের ব্যাপারে সে আজও সেই আদিম প্রথা কমবেশি বহন করে নিয়ে চলেছে। ...

তা সে যাই হোক, **বাঘ** বললে যদি জ্যান্ত বাঘটাই এসে সশরীরে হাজির হয়ে যেত, তাহলে সেটি বক্তা শ্রোতা কারও পক্ষেই সুখকর হত না — বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কী আসে তবে? আসে প্রকৃত বাঘের প্রতিচ্ছবি, তাও বক্তা ও শ্রোতার মনে। কেন আসে? কারণ প্রকৃত বাঘটিকে সীমায়িত করে করে তার ছবিতে, তারপর সেই ছবিকে একটি বিশেষ আওয়াজ-মাত্রে (= **ব্যাঘ্র** শব্দে) সীমিত করে নিয়েছি আমরা। তার মানে বাস্তবের প্রকৃত বাঘকে সীমায়িত করে প্রথমে তার ছবিতে এবং তারপর আরও সীমায়িত করে একটিমাত্র শব্দে বা 'বাঘ' আওয়াজে পরিণত করে নিয়েছি আমরা। অতঃপর আমরা আমাদের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে তাকে 'বাঘ' **নামে** উল্লেখ করে থাকি। অতএব দেখা যাচ্ছে, **নাম** কোনো অর্থহীন শব্দ নয়, অর্থপূর্ণ বারংবার ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহৃত শব্দ।

নাম-এর এই ব্যাপারটি প্রাচীন বিশ্বের সকল জাতির আদি পুরুষেরা জানতেন। যে কারণে সমস্ত ভাষার সমস্ত প্রাচীন **নাম** ছিল অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। অর্থহীন কোনো **নাম** যে হতে পারে, একথা সেকালের মানুষ ভাবতেই পারতেন না। ফলত, দেশবিদেশের প্রাচীন স্থান-**নাম**, পাহাড়-পর্ব্বতের **নাম**, সমুদ্রের **নাম**, বারের **নাম**, রাজার **নাম**, ব্যক্তির **নাম** ... সবই ছিল অর্থপূর্ণ। আর দেখা যেত, সমস্ত সত্তাগুলির স্বভাব তাদের নিজ নিজ **নাম**-এর অনুরূপ। এসব কথা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল জাতির ক্ষেত্রেই খাটে।

কে যেন বলেছিলেন, '**নামে** কী আসে যায়!' সেকালে **নামে** সবকিছুই আসত যেত। কারণ তখন **নাম**-এর সঙ্গে সত্তার স্বভাবের 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ' ছিল। (দ্র. **বর্ণ**। আমাদের '**ঋ**' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে।) একালে ভাষার **নাম**শব্দের সঙ্গে তার অর্থের 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ' আর নেই। একালে ভাষার স্বভাবকে যেমন প্রতীকী করে ফেলা হয়েছে, **নাম**কেও প্রতীকী করে ফেলা হয়েছে। জেলের কয়েদীর মতো এখন মানুষের **নাম**করণ হয়। পার্থক্য এই যে, জেলের ভেতরে থাকা মানুষের **নাম**করণ হয় 'ধারাপাত' বইটির পার্থক্যসূচক সংখ্যা দিয়ে, আর জেলের বাইরে থাকা মানুষের **নাম**করণ করা হয় 'বর্ণপরিচয়' বইটির পার্থক্যসূচক বর্ণ দিয়ে। মানুষের স্বভাবের সঙ্গে এই সকল সংখ্যা বা সংখ্যাসমবায় এবং বর্ণ

বা বর্ণসমবায়ের কোনোই সম্বন্ধ নেই, থাকে না। ফলত, একালের মানুষের স্বভাবের সঙ্গে তাদের **নাম**-এর কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই একালে কথাটি সত্যি যে, '**নামে** কী আসে যায়!'

অথচ আমাদের বাংলায় মানুষের **নাম** রাখা হত জন্মের তিন-চার বছর পরে। মানবশিশুর ভিতরে যে মূল স্বভাব থাকে, তা প্রকট হতে শুরু করে তার বয়স অন্ততপক্ষে দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে। আমাদের জ্ঞানীগুণী পূর্বসূরিগণ, ঠাকুরদা-দাদুরা শিশুর স্বভাব অনুভব করে নিয়ে তারপর তার **নামকরণ** করতেন। ফলত, বড় হয়ে শিশুটি সার্থকনামা হতে পারত। আজকাল **নাম**করণের পিছনে এই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক যুক্তিসম্মত রীতিটি অনুসরণ করা হয় না, করার যোগ্যতাও আমরা হারিয়েছি। আমাদের ভোঁতা অনুভূতির কারণে যে স্বভাব একটি শিশুর মধ্যে বিকশিত হবে, শিশুর সেই মূল স্বভাবকে তার শৈশবে চিহ্নিত করতে পারি না আমরা। ফলে, 'হিন্দুর দশ সংস্কারের এক সংস্কার **নামকরণ**' এখনও কেউ কেউ অনুসরণ করেন বটে, কিন্তু তাতে মূল কাজটাতেই ফাঁকি পড়ে; স্বভাব-অনুসারে **নাম** ঠিকঠাক দেওয়া যায় না। একটি শিশুর **নাম**করণ করার আগে তাকে খুব কাছ থেকে দেখে তার মূল স্বভাবকে শনাক্ত করতে হয়, তারপর তদনুযায়ী তার **নাম**করণ করতে হয়। তা করা হয় না। তার ওপর এসেছে রাষ্ট্রের যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম। আজকাল জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের একটা **নাম** দিতেই হয়, নইলে সরকার ছাড়ে না। কেউ কেউ তার পরে শিশুটির স্বভাব-অনুসার **নাম** দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু সরকার তাতে বাধ সাধে। সরকারি খাতায় জন্মলগ্নে যে **নাম** লেখা হয়ে গেছে, অন্য **নামে** সরকার আর তাকে চিনতে রাজি হয় না। ফলত, মানুষের **নাম**করণের ক্ষেত্রে বাংলাভাষীর নিজস্ব প্রথা বিলুপ্ত হতে বসেছে।

তার ওপর এসেছে ইংরেজির প্রতীকী প্রভাব। এখন আমরাও ইংরেজের মতো অর্থহীন **নাম**করণ করতে শুরু করেছি, করছি। ফলত, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই **নামে** আমাদেরও এখন কীই-বা আসে যায়! তবে সেভাবে ভেবে দেখলে কার্যত এরূপ **নামে** তো সবকিছুই চলে যায়। মানুষের স্বভাবের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স যে **নামে**র অ্যাকাউন্টে থাকত, সেই অর্থপূর্ণ **নামটি**ই বাদ দিয়ে দেওয়ায় স্বভাবের অর্থ আর এন্‌ক্যাশ হয় না, এন্‌ক্যাশ করা যায় না। ফলত, মানুষটাই অর্থহীন হওয়ার দিকে পা বাড়ায়। তারপরও তার মূল স্বভাব আদৌ যদি বিকশিত হয়, সে যেন তার স্বাভাবিক আধারকে আর পায় না, স্বভাবত-গাধার গায়ে গণ্ডারের চামড়া, স্বভাবত-ছাগলের গায়ে বাঘের চামড়া, কিংবা স্বভাবত-কুকুরের গায়ে হরিণের চামড়ার মতো স্বভাবত 'চঞ্চল'-এর **নাম** থেকে যায় 'সুধীর' হয়ে, স্বভাবত 'চম্পক'-এর নাম থেকে যায় 'প্রফুল্ল' হয়ে। এ এক মহা-বিপর্যাস!

তা স্বভাবের সঙ্গে **নাম**-এর সম্পর্ক না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু তাই বলে '**নামে** কিছু আসে যায় না' বলা একালেও রীতিমতো বিপজ্জনক কথা বটে! কেননা, একালেও মানুষের **নামে**ই তো তার সমস্ত সম্পদের ও সম্পর্কের মালিকানার জাহাজ বাঁধা থাকে। **নাম** তো একালের মানুষের অস্তিত্বের জাহাজ বাঁধার খুঁটি (pier, jetty)। সেই **নাম** গেলে তো সবই গেল! সমাজে **অনাথ** বা 'কহিঁকা নহি' বা nowhere হতে তার আর এক মুহূর্তও সময় লাগে না। অতএব **নাম** মানুষের স্বভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত হোক আর নাই হোক, **নাম**-এর **মহিমা** একালেও আদৌ কমেনি। সেকারণেই শাস্ত্রে বলেছে, 'কলিতে **নাম**গানেই মোক্ষলাভ'। একালে মানুষকে তাই **নাম**-**সংকীর্ত্তনে**র উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, মানুষও **নামা**বলী সংগ্রহ করে সেই **নাম-সমূহের কীর্ত্তন** করে থাকেন। যে মানুষের মোবাইলে যত ক্ষমতাবান দেবতাদের **নামাবলী** পাওয়া যায়, সেই মানুষ তত ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতাদের **নাম-সংকীর্ত্তন** করে থাকেন এবং ফলত তাঁর তত উচ্চ মার্গের **মোক্ষ**লাভ ঘটে থাকে।

সম্প্রতি কলকাতায় **নামকরণ** নিয়ে বিস্তর অমূলক কথা-কাটাকাটি হয়েছে। যার গায়ে জোর বেশি তার ইচ্ছানুসারে কোনো বস্তু বা বিষয়ের **নামকরণ** তো স্বাভাবিক নয়। প্রাচীন কাল থেকে **নামকরণে**র একটা রীতি চলে আসছিল, তা হল — বস্তু, বিষয়, স্থান, সত্তা ... ইত্যাদি যে ক্রিয়া করে, যে ক্রিয়াতে তার গৌরব বা অত্যন্ত অগৌরব তাই বলা থাকত তাদের নামে। যেমন **ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃষ, ছাগ, মেষ** ... ইত্যাদি, যেমন **মধুপুর, গোলোকপুর, শালবনী, কলিকাতা, ভারত** ... ইত্যাদি, কিংবা যেমন **সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ** ... ইত্যাদি। প্রাচীন ইংরেজি, ফারসি, আরবি ... সমস্ত ভাষাতেই **নামকরণে**র সেই রীতি মান্য করা হত। আধুনিক যুগ এই রীতি থেকে সরে যায়। আধুনিকতাবাদীরা **নাম**কে অর্থহীন করে নিয়ে জেলের কয়েদিদের সংখ্যাসূচক নামের দিকে নিয়ে যায়। এটা করা যে ঠিক হয়নি, সে কথা বোঝার জন্য বেড়াপার-পণ্ডিত হওয়ার দরকার পড়ে না। সুতরাং, কোনো স্থানের **নাম** সেই স্থানের গৌরববাহক শব্দ দিয়েই যে হওয়া উচিত, তা নিয়ে সন্দেহ নাই। **শাঁখারিটোলা** বললে লোকে তৎক্ষণাৎ টের পায়, স্থানটির গৌরব কীসে? সেভাবেই **নামকরণ** হওয়া উচিত। **৬.** ইংরেজি name, প্রাচীন ইংরেজি nama, জারমান name, ল্যাটিন nomen। স্মৃতি বা মানসিক ধারণাশক্তি অর্থে গ্রীক ভাষার mneme শব্দটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। mnemonic (= স্মরণ সহায়ক) শব্দটি ইংরেজিতে যথেষ্ট প্রচলিত।

নামগন্ধ : **২.** *নামরূপ গন্ধ যাহাতে।* **৩.** নামলেশ, নামমাত্র। (ব.শ.)। সামান্যতম চিহ্ন বা উল্লেখ, আভাস। (স.বা.অ.কলকাতা)। **৪.** 'আভাস' অর্থে প্রচলিত। **৫.** এটিকে অনেকেই **যোড়শব্দ** (দ্র. **মোটমাট**) বলে মনে করেন। তা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। আবার কেউ কেউ এর ভুল সমাস করে থাকেন — নাম ও গন্ধ = নামগন্ধ। তাও ঠিক নয়। নামের গন্ধ = নামগন্ধ, এরকম ভাবলেও ভুল হবে। আসলে '**নাম**রূপ গন্ধ যাহাতে' = **নামগন্ধ** — এরূপ সমাস করেই শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল। কেননা, সত্তার **নামে** সত্তার **গন্ধ**মাত্র **বর্ত্তমান** থাকে। এ হল সত্তার অস্তিত্বের **গন্ধ**-মাত্র রূপ, তন্মাত্র রূপের খুবই কাছাকাছি। দ্র. **মৎস্যগন্ধের মাত্র** রূপ। দ্র. **মৎস্যগন্ধ**। সেকারণেই মানুষটি যেমন তার **নামে** ধরা থাকে, তার মালিকানা-সমূহও তার **নামেই** ধরা থাকে। সম্পদ আছে, তার মালিকও আছে, কিন্তু তার কোনো **নাম** নেই, আজকের সমাজে এরকম হয় না। যাঁরা ভাবেন, **নামে** কিছু আসে যায় না, আজকের সমাজ তাঁদের

পথে বসিয়ে দিতে এক মুহূর্ত সময় নেবে না।

নামডাক : ২. *যে **নাম** ডাকিলেই বোধগম্য হয়, চিহ্নিত হয়।* ৩. খ্যাতির প্রসার, যশোবিস্তার। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **নামডাক**-এর **নাম** শব্দটি নাকি ফারসি থেকে এসেছে। হ্যাঁ, বাংলার **নাম** শব্দের নিজস্ব উত্তরাধিকারে কোথাও 'খ্যাতি', 'যশ' ... ইত্যাদি চোখে পড়ে না। স্বভাবতই ফারসির হাত ঘুরে আসার পর **নাম** শব্দের ভিতরে এই অর্থ প্রবিষ্ট হয়ে থাকবে। তার সঙ্গে আমরা **ডাক** জুড়ে নিয়ে তাকে নিজেদের **নামডাক** শব্দরূপে সৃজন করে নিয়েছি।

ম্রক্ষ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : মাখ, মাখন, মাখা, মাখামাখি, মাখান, মেখেচুকে, ম্রক্ষ্, ম্রক্ষণ, ম্রক্ষিত। **ম্রক্ষ্** = অতিসীমিতের আবর্ত্তনের ক্ষ-অন। **ম্রক্ষ** = অতিসীমিতের আবর্ত্তনের ক্ষ-অন যাহাতে।

মাখ (মাখন, মাখা, মাখামাখি, মাখান) : ১. ম্রক্ষ > মাখ। ২. ***মাখ** = সীমায়িতের আধার খাত (ক্ষাত) করা হয় যাহাতে। **মাখন** = **মাখ** অন (on) যাহাতে। **মাখা** = **মাখ**-এর আধার যে। **মাখামাখি** = **মাখা** ও **মাখি** (দ্র. কচাকচি, মোটমাট)। **মাখান** = **মাখা** অন (on) যাহাতে।* ৩. **মাখ** = লেপন করা, ভিজান, মর্দ্দন করা, ডলা, মিশ্রিত করা। **মাখন** = ননী। **মাখা** = ম্রক্ষিত, লিপ্ত, মিশ্রিত, ব্যাপ্ত। **মাখামাখি** = পরস্পর মাখা, মিশামিশি। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **মার্জ্জন** ও **মাজা** শব্দ যেরূপ এই **ম্রক্ষণ** ও **মাখা** শব্দও তদ্রূপ।

***ম্লেচ্ছ্ (ম্লৈ)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অম্লান, মইলান, ময়লা, ময়লাটে, মলমাস, মালিন্য (মল্), ম্লান, ম্লানমনা, ম্লানব্রীড়, ম্লানি, ম্লানিমা, ম্লিষ্ট, *ম্লেচ্ছ্, ম্লেচ্ছ,* ম্লেচ্ছকন্দ, ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছতক, ম্লেচ্ছদেশ, **ম্লেচ্ছন**, ম্লেচ্ছনিবহ, ম্লেচ্ছভাষা, ম্লেচ্ছভোজন, ম্লেচ্ছমণ্ডল, ম্লেচ্ছমুখ, **ম্লেচ্ছ**সেবী, ম্লেচ্ছিতক, ম্লেচ্ছিতবিকল্প, ম্লৈ।
ম্লেচ্ছ্ (ম্লৈ) = দিশাগ্রস্ত সীমিতের লালনকে চয়নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করণ। **ম্লেচ্ছ** = দিশাগ্রস্ত সীমিতের লালনকে চয়নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করা হয় যাহাতে। **ম্লৈ** = সীমিত-লালনের দিশাগ্রস্ত আধার যে।

ম্লান (ম্লানি, ম্লানিমা — অম্লান) : ১. ✓ম্লৈ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ম্লান** = যাহাতে সত্তার সীমায়নের (সঙ্কুচিত হওয়নের) লালন থাকে। **ম্লানি** = **ম্লান** গতিশীল যাহাতে। **ম্লানিমা** = **ম্লানি** সীমায়িত রূপে থাকে যাহাতে। **অম্লান** = যাহা **ম্লান** নহে।* ৩. **ম্লান** = বিচ্ছায়, কান্তিহীন, বিবর্ণ, বীতশ্রীক, শোভাহীন, মলিন, বিষণ্ণ, দীন, অসিত, কাল, শুষ্ক। **ম্লানি** = হর্ষক্ষয়, বিষাদ, কান্তিক্ষয়, বিবর্ণীভাব, অবসাদ, খেদ, ম্লানভাব, সমলভাব, নিষ্প্রভভাব। **ম্লানিমা** = ম্লানভাব, বৈবর্ণ্য। **অম্লান** = ম্লানভিন্ন, পরিষ্কৃত, অনুপহত, উজ্জ্বল, প্রসন্ন। (ব.শ.)। ৪. **ম্লান** ও **অম্লান** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. সত্তার আত্মসঙ্কোচন লালিত যাহাতে, সে তো প্রফুল্ল দেখায় না, বিষণ্ণ দেখায়, বিবর্ণ দেখায়। কেননা, তাতে তার প্রকাশের নয়, আত্মগোপনের চেষ্টা থাকে। তাই তাকে **ম্লান** বলে। এতে **ম্ল** বা সীমিতের লালন অন হয়ে থাকে।

ম্লেচ্ছ (ম্লেচ্ছন, ম্লেচ্ছিত) : ১. ✓ম্লেচ্ছ্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ম্লেচ্ছ** = সীমায়িত সত্তাদের দিশাগ্রস্তভাবে লালন ও আচ্ছাদন করে রাখা হয় যাহাতে; অথবা, যার ভিতরে সবকিছু মিলেজুলে আচ্ছাদিত রয়েছে। **ম্লেচ্ছন** = **ম্লেচ্ছ** অন (on) যাহাতে। **ম্লেচ্ছিত** = **ম্লেচ্ছ** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। /* **ম্লেচ্ছ** = যে সংস্কৃতে কথা বলে না। (ব.শ.)। ৩. **ম্লেচ্ছ** = অব্যক্ত-ভাষী, অনার্য্যজাতি, বৈদেশিক জাতি, কিরাতাদি চণ্ডালভেদ, সগররাজ যে ক্ষত্রিয়গণকে মুণ্ডিতমস্তক করিয়া বেদাচারবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন সেই শক-যবন-পারদ-পহ্লবাদি, গোমাংসভক্ষক বিরুদ্ধভাষী সর্ব্বাচার-হীন অন্ত্যজ জাতি, স্বধর্ম্মাচরণ-হীন নির্দ্দয় পরপীড়ক উগ্র সতত-হিংসাশীল যথেচ্ছাচারী জন, বাপীকূপতড়াগসরোবর ও সাধারণ ভোগ উপবনের নিঃশঙ্কভাবে রোধক ব্রাহ্মণ, বেদবাহ্য দুরাচার জন, যযাতিসূত অনুর পুত্রগণ, অসংস্কৃতকথন, অপভাষণ, হিঙ্গুল, তাম্র, মুসলমান। **ম্লেচ্ছন** = অপভাষণ, অব্যক্তকথন, অনার্য্যভাষায় উক্তি। **ম্লেচ্ছিত** = অব্যক্তকথিত ভাষা, অপভাষা, পরভাষা, অসংস্কৃতকথন, অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্য। (ব.শ.)। ৪. কখনো-সখনো প্রচলিত। ৫. আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে যে কয়টি শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, **ম্লেচ্ছ** শব্দটি তাদের মধ্যে একটি। এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এ শব্দটিও বৈদিক যুগ থেকেই প্রতীকী হয়ে যায়; ঠিক **বেদ** যেমন তার নিজস্ব শব্দার্থ বা নিহিতার্থ হারিয়ে — '**বর্ণাশ্রম** ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধারণকারী ধর্ম্মের **মর্য্যাদা** স্বরূপ' একটি গ্রন্থ — অর্থে ক্রমশ প্রতীকী হয়ে যায়, সেইরকম **ম্লেচ্ছ** শব্দটিও '**আর্য্য**-ভিন্ন সকল অনার্য্যজাতি' অর্থে ক্রমশ প্রতীকী হয়ে যায়। ফলে, **বেদ**-এর প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত ব্যবহার যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ ভুলে যায়, তেমনি **ম্লেচ্ছ** শব্দের প্রকৃত অর্থও মানুষ ভুলে যায়। যেহেতু যারাই **দক্ষ-ভৃগু**দের বৈদিক রীতিনীতির বিরোধী, তারাই **ম্লেচ্ছ** ব'লে শাসক বেদবাদীরা ঘোষণা করে রেখেছিল, সবাই জেনে যায়, **ম্লেচ্ছ** মানে নিন্দিত মন্দ খারাপ অশিষ্ট হিংস্র উগ্র মানুষদের জাতি। কিন্তু খোদ **শিব**ই তো **দক্ষ-ভৃগু**দের 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধারণকারী ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্বরূপ **বেদ** ও ব্রাহ্মণদিগের' ঘোর বিরোধী ছিলেন! ভাগবতেই সেকথা লেখা আছে। তাছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত বর্ণাশ্রমবাদী-**বেদের** বিরোধী গ্রন্থ ও সম্প্রদায়গুলি, তান্ত্রিক, বৌদ্ধদের দলও তথাকথিত বেদবাদীদের চোখে **ম্লেচ্ছ** বলে ঘোষিত হয়ে যায়। সুতরাং কারা **ম্লেচ্ছ**, কারা **বেদবাদী**, কে কার উপর কত অত্যাচার অবিচার করেছে, সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের কাজ হল, **ম্লেচ্ছ** শব্দের নিহিতার্থ নিষ্কাশন করা। সেটিই করার চেষ্টা করব আমরা।

একালের ভাষায় যা-কিছুকে tacit, inexplicit, naturally developed বা যথাক্রমে অব্যক্ত, অস্পষ্ট, স্বাভাবিকভাবে বিকশিত বলা হয়, সেকালে তাকেই বলা হত **ম্লেচ্ছ**; অর্থাৎ, 'যার ভিতরে সবকিছু মিলেজুলে আচ্ছাদিত রয়েছে'। বিপরীতে একালের ভাষায় যা-কিছুকে revealed, explicit, creatively developed বা যথাক্রমে ব্যক্ত, স্পষ্ট, সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত বলা হয়, সেকালে তাকেই বলা হত **সংস্কৃত**। স্বভাবতই **ম্লেচ্ছ** শব্দটি বোঝাতো সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত সত্তাকেএবং **সংস্কৃত** বোঝাতো সর্বপ্রকারের কৃত্রিম ও সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত সত্তাকে — তা সে গাছগাছালি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, সম্প্রদায়, জাতি ... যাই হোক। একটি ফাঁকা মাঠে যে গাছগাছালি নিজে থেকে জন্মায়, তাতে দুটো ঘি-করলার গাছ, পাঁচটা খাম-আলুর লতা, দুটো বেল ফুলের গাছ, দশটা তেলাকুচির গাছ, পঞ্চাশ রকমের আরও বিভিন্ন সংখ্যক গাছ তাদের মতো জন্মাতে পারে। এ হল **ম্লেচ্ছ**-গাছগাছালি। কেননা, 'এর ভিতরে সবকিছু মিলেজুলে আচ্ছাদিত রয়েছে'। কিন্তু সেই মাঠটিকে গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে এক এক দিকে এক এক রকমের গাছ সাজিয়ে চাষ করলে সেটি একটি সুদৃশ্য বাগানের মতো দেখতে হবে। তাকে বলা যেতে পারে **সংস্কৃত**-গাছগাছালি। কারণ, তাদের সৃষ্টিশীলভাবে **সংস্কার** করে ফেলা হয়েছে। আজ আমরা জানি, 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'র মতো **সংস্কৃত** জিনিসটি ভাল, যদি তাকে তার সৃষ্টিশীলতা সহ প্রয়োগ করা যায় ও তদ্ভাবে রক্ষা করা যায়। অন্যথায় সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তা ভাল করতে গিয়ে বিলুপ্তির দিকে হাঁটা দিতে পারে। ইতোমধ্যেই যা সত্য হতে চলেছে। সেই সম্ভাবনা চোখে পড়ে যাওয়ায় অনেকের মতে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' ওরকম বিপজ্জনক সম্ভাবনা নিয়ে **সংস্কৃতের** আরাধনার চেয়ে বরং **ম্লেচ্ছই** ভাল। কেননা, **ম্লেচ্ছ** কিন্তু তার ভালমন্দ নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে টিকে থাকে। তার মানে, **ম্লেচ্ছ** হল সেই সমগ্র কালো, অন্ধকার, যার থেকে আলোর বা **সংস্কৃতে**র সৃষ্টি হতে পারে, হয়ও। আমাদের মনীষীরা প্রার্থনা করে গেছেন, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', 'অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো'। অর্থাৎ কালো থেকেই আলোর দিকে যাওয়া যায়। কালো না থাকলে আলো থাকে না, বুকের ভিতরে আলোকে না নিয়ে কালো থাকতেই পারে না। স্বভাবতই সেই কালো কত ভালো, সেকথা আমরা **কৃষ্ণ** ও **গৌরী** শব্দে ব্যাখ্যা করেছি।

কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও **ম্লেচ্ছভাষার** মধ্যে পার্থক্য কী, মিলই বা কোথায়, আদৌ মিল আছে কী? তার জন্যে নিম্নে **ম্লেচ্ছভাষা** দ্রষ্টব্য।

ম্লেচ্ছকন্দ : ৩. লশুন। (ব.শ.)। **রসুন, রসোনিক** = 'লবণরসহীন', লশুন, মহাকন্দ (সুধাচৌর্য্য হেতু বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছিন্ন রাহুর গল হইতে যে সুধাবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়, তাহা রসোনত্ব প্রাপ্ত হয়।)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫. ম্লেচ্ছকন্দ** যদি 'মহাকন্দ' হয়, এবং তার মধ্যে যদি সুধাবিন্দু থেকে থাকে, তাহলে **ম্লেচ্ছ** ব্যাপারটি কি খুবই খারাপ হতে পারে?

ম্লেচ্ছজাতি : **৩.** **পুলিন্দাদি** ম্লেচ্ছগণের জাতি। পুলিন্দা **নাহলা** নিষ্ট্যাঃ শবরা বরুটা ভটাঃ। মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেহপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। (ব.শ.)। **৪. অপ্রচলিত। ৫. শব্দটি অপ্রচলিত হলে কী হবে, শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রসমূহ অনুসারে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় আশি শতাংশ মানুষই শূদ্র ও ম্লেচ্ছ নামে নিন্দিত,** আজও। যে যে নির্দেশে এই সমস্ত মানুষকে শূদ্র বা **ম্লেচ্ছ** বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, পরবর্তীকালের কোনো ধর্মগুরু সেই নির্দেশগুলি বাতিল বলে ঘোষণা করেননি। একমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো কয়েকজন ধর্মস্রষ্টাকে ঐ ঘোষণাগুলি অমান্য করতে দেখা গেছে। কিন্তু তাতে কী? ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আদৌ পাত্তা দেয় না, পাত্তা দেয় শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের চারটি মঠকে, যাঁরা তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যাদা আজও রক্ষা করে চলেছেন।

ম্লেচ্ছদেশ : ৩. ম্লেচ্ছাধ্যুষিত দেশ, চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানরহিত স্থান, শিষ্টাচাররহিত ভারতবর্ষের অন্তদেশ। 'যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থান বিদ্যমান নহে, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে ...'। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫.** এই বিচারে যে স্থানে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ পরিচালিত **চতুর্ব্বর্ণ** ব্যবস্থা নাই, সে সমস্ত দেশই **ম্লেচ্ছদেশ**। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে এই দেশগুলিকে 'নিন্দিতদেশ'ও বলা হয়েছে। এই বিচারে বিশ্বের সকল দেশই এখন **ম্লেচ্ছদেশ**। কেননা, বিশ্বের কোথাও 'জন্মসূত্রে-ব্রাহ্মণ'দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত **চাতুর্ব্বর্ণ** ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া সেরকম হওয়াই তো ঠিক। **ম্লেচ্ছ** শব্দের নিহিতার্থ তো সেকথাই বলে। কেননা, **ম্লেচ্ছই** তো 'যার ভিতরে সবকিছু মিলেজুলে আচ্ছাদিত রয়েছে'।

ম্লেচ্ছভাষা : ৩. অসংস্কৃতভাষা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫.** যে সকল ভাষা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত সেই সমস্ত ভাষাকে বলা হত **ম্লেচ্ছভাষা**। সেগুলির মধ্যে হাতের কাছে পাওয়া বেশ কিছু **ম্লেচ্ছভাষার** উপর নির্ভর করে **পৃথুর** আমলের ভারতীয় পণ্ডিতেরা (আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে) বৈদিক-**সংস্কৃতভাষা** তৈরি করেছিলেন। এটি বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম-**ভাষা** হলেও এর গৌরব এই যে, এতে হাতের কাছে পাওয়া **ম্লেচ্ছ-ভাষাগুলিকে** ভাষা-সৃষ্টির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করে নিয়ে সেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টিশীলভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, এখন যে **সংস্কৃত** প্রচলিত রয়েছে, সেগুলি সেই আদি **সংস্কৃত**। আদি **সংস্কৃতের** প্রাণপাখি উড়ে যায় ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই। বলতে গেলে সেই প্রাণপাখি উড়ে এসে ঢুকে পড়ে মধ্যযুগের বাংলাভাষার খাঁচায়। এখন যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতচর্চাকেন্দ্র সংস্কৃত চর্চা করে থাকে, সেগুলি সবই **সংস্কৃতের** শবদেহ নিয়ে চর্চা করে। তার ক্রিয়া-ভিত্তিকতার প্রাণপাখিটাই তাতে নাই। থাকলে কি অতীত ইতিহাস নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের এই দুর্গতি হত!

ম্লেচ্ছিতবিকল্প : ৪. অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অক্ষরমুষ্টিকাকথন**।

বেদবাদীগণ নিজেদের একটি 'কোড' বা গোপন ভাষা তৈরি করেন, যার নাম দেওয়া হয় **অক্ষরমুষ্টিকাকথন**। তার বিপরীতে বেদবিরোধী **ম্লেচ্ছ**গণ তাঁদের নিজেদের যে 'কোড' বা গোপন ভাষা তৈরি করে নেন, তার নাম **ম্লেচ্ছিতবিকল্প**।

ম্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : আমোটন, ম, মওয়াজি, ময়াজি(জী), মংহ, মঃ, মগণ, মণ্ডুক্ষু, মঝু, মঞে, মতলেব, মতালক (মোতালক), মনাক্কা, মফঃসল, মফঃস্বল, মফস্বল (মু-এর ফসল যেখান থেকে আসে), ম-ফলা, মবলগ, মবারক (মু-এর আক্রমণ বারণ করা থাকে যাতে), মমি, মর্টগেজ, মর্সুম, মলনা (মৌলানা) , মলম (মর্দ্দ), মলমল, মলম্বা (মলম্‌মা), মাইকেল, মাইল, মাং (মারফত), মাজিস্ট্রেট (ম্যাজিস্ট্রেট), মাজুম, মামলা, মামুর, মামুল, মামুলী, মাম্‌দো, মাম্‌লেট, মারফত, মারফতি, মারফতী, মারফতে, মার্ব্বল, মারবেল, মারলি, মালম, মালুম, মালুমকাঠ, মালুমগাছ, মালুমাত, মাশুল, মাসুল, মাষ্টার, মাস্তুল, মুখাদিম, মুচ্ছুদ্দি(দ্দী), মুজরা, মুৎসুদ্দি(দ্দী), মুজাইম, মুজাহেম (মোজাহেম), মুঝে (মহ্যম্) মুফেদ, মুফ্‌তী, মুরব্বা (মোরব্বা), মে, মেওমেও (ম্যাওম্যাও), মেও-ধরা, মেওয়া (মেবা), মেওয়াতি (মীরাট), মেরা, মেরাপ, মেরাব, মেরামত, মেরিনো, মেরুনো, মেস্তা, মৈ (মই, মর্দ্দন), মোওয়া, মোওয়াজী, মোং (মোকাম), মোকাদিম, মোকাবিলা, মোকাবেলা, মোকাম, মোক্‌রর, মোক্‌ররী, মোখাদিম (মুখ?), মোগল, মোগলাই, মোজা, মোছ, মোছদী, মোছা, মোছান, মোজা, মোজাম, মোজাহেম, মোত, মোতলা, মোতান, মোতাবেক, মোতায়ন, মোতায়েন, মোতালক, মোৎফরেক্কা, মোথড়া, মোয়া, মোয়াক্কেল, মোয়াফেল, মোরব্বা, মোসাফির, মোসাহেবী, মোসিল, মোহর, মোহরি, মোহরে, মোহরের, মৌকুফ (মকুব), মৌত, মৌতখানা, মৌতাত, মৌতাতি, মৌসম, মৌসুমী, মৌরুস (মৌরসি, মৌরুসি, মৌরুসী), মৌহাফিক (মাফিক), ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যালেরিয়া, ম্রজাই।

ম (ম ম করা) : ৫. দ্র. **মম, ম** বর্ণের অর্থ। এই ম-এর দুরকম বোধ আমাদের রয়েছে। (এক) মানসিক **ম**। এতে আমরা 'এটি তার', 'এটি রামের', 'ওটি শ্যামের', 'সেটি যদুর' — এইরকম যে অজস্র বোধগুলি আমাদের মনের ভিতরে মনোময় হয়ে থাকে, সেই **গন্ধ**গুলিকে বুঝি। আর, (দুই) বাস্তব **গন্ধ**, যেমন পাকা কাঁঠালের **গন্ধ**, ঘিয়ের **গন্ধ** ... এসবের **গন্ধ**কেও বুঝি। এই দুই প্রকার **গন্ধ** আমাদের চারিদিকে **ম ম** করে। দুধ থেকে দই, মাখন, ঘি, ঘিয়ের **গন্ধ**। সংকোচনের সর্বোচ্চ রূপ। তাই **ম**।

পরিশিষ্ট ১

(অতঃপর য থেকে হ পর্যন্ত বর্ণগুলিতে জাত ১৫৯ টি ক্রিয়ামূল ও তাদের বংশে জাত প্রায় ২৩০০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখা হচ্ছে। কেন এরূপ করা হয়েছে, সেকথা জানান হয়েছে **'পরিশিষ্ট ৪'**-এ। এই অংশের পাঠের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি কথা মনে রাখতে হবে যে, যে **শব্দগুলির ব্যাখ্যা** আমাদের **শব্দার্থকোষে** অন্যত্র পাওয়া যাবে, সেগুলিকে মোটা হরফ করে দেওয়া হয়েছে, তা সে **শব্দটি বঙ্গীয় শব্দকোষের** বয়ানের ভিতরে থাকুক অথবা পৌরাণিক অভিধানের বয়ানের ভিতরে থাকুক কিংবা আমাদের দেওয়া বয়ানের ভিতরেই থাকুক।)

য

য্ বর্ণের অর্থ : য, য় = 'ইঅ' = য্ (j), 'য়' (y) = য্-অন করে যে; যায়ী = যাতা, যাত্রী। ই + অ = য। মানুষ হাঁটলে এক-পা যখন গতিশীল (**ই**) থাকে, অন্য-পা তখন স্থিতিশীল (**অ**) থাকে। দুয়ে মিলে হাঁটা বা চলা (= **য**) হয়। তাই **য** মানে 'যায়ী' বা 'যাতা'। **য-ফলা** : 'য'-এর অর্থ হল 'থাকে যাহাতে'। যেমন নব্য = নব থাকে যাহাতে। কিন্তু এই শব্দার্থকোষে শব্দের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো-কখনো 'অ-কার'-এর একই অর্থ দেওয়া হয়েছে — 'থাকে যাহাতে'। তার কারণ, অ-কার আধার পদবাচ্য। কিন্তু সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগম অ-এর মতো। শব্দটিকে প্রকাশের সুবিধার জন্য অ-কার আসে। যেমন নব্ + অ = নব। এই অ-কারকে ভাষায় প্রকাশ করার কোনো উপায় নেই। অনন্যোপায় হয়ে এই ক্ষেত্রেও 'থাকে যাহাতে' বাক্যবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব **য** = যাতা, যায়ী। অতঃপর **যা, যি, যু** ... ইত্যাদির জন্য **প** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।

● **য্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা** : যক্ষ্, যজ্, যম্ (যত্, *যন্ত্র*, যস্, যাসি), যা (যাতি, যাপি), যাচ্, যু *(যুষ্)*, যুজ্, যুধ্, য্।

● ***যক্ষ*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : জক, জক্কী, জোঁক, জোকা, জোখা, যক, যকা, যকার-ধন (যকের ধন), যক্কি, যক্ষ্, যক্ষ, যক্ষকর্দ্দম, যক্ষগ্রহ, যক্ষতরু, যক্ষধূপ, যক্ষপতি, যক্ষবিত্ত, যক্ষরস, যক্ষরাট্ (যক্ষরাজ্), যক্ষরাত্রি, যক্ষসাধন, যক্ষাধিপ, যক্ষাধিপতি, যক্ষাবাস, যক্ষিণী, যক্ষী, যক্ষেন্দ্র, যক্ষেশ, যক্ষেশ্বর, যক্ষ্ম, যক্ষ্মগ্রহ, যক্ষ্মগ্রস্ত, যক্ষ্মঘ্নী, যক্ষ্মা, যক্ষ্মিণী, যক্ষ্মী।

● **যক্ষ্** = যায়ীর ক্ষ-অন। **যক্ষ** = যায়ীর ক্ষ-অন যাহাতে।

● **জোকা** : দ্র. **আঁকাজোকা, মাপাযোখা**।

● **যক্ষ** : ২. *যাতার করণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. দেবযোনিবিশেষ, **কুবের**, গুহ্যকমাত্র, ইন্দ্রগৃহ, ধনরক্ষক, ভূতবিশেষ। (ব.শ.)। ... সেই প্রাণীদের মধ্যে কেহ কেহ বললে যক্ষামঃ, অর্থাৎ আমরা পূজা করব। ... **ব্রহ্মা** বললেন এরা যক্ষ হবে। অন্য একদল বললে রক্ষামঃ, অর্থাৎ জল রক্ষা করব। ব্রহ্মার আদেশে এরা হল **রাক্ষস**। যক্ষরা সাধারণত মানুষের বন্ধু ও কুবেরের ভৃত্য আর রাক্ষসরা মানুষের শত্রু। (পৌ.অ.)। ৪. গ্রামবাংলায় এখনও প্রচলিত। ৫. দ্র. **দক্ষ**, **কুবের**। প্রাচীন যৌথসমাজে যাঁরা যৌথসম্পদ ভাগ-বণ্টন করে সবাইকে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের **যক্ষ** বলা হত। তারা বলেছিল, 'যক্ষাম' অর্থাৎ 'হ্যাঁ, ভাগ করে ভোগ করে নেব', কিন্তু সবটা করেনি, কিছু যৌথসম্পদ তারা লুকিয়ে রেখে দেয়। তাই তাদের নাম হয়ে যায় **যক্ষ**। এই **যক্ষ** সত্তাই বিকশিত হয়ে **রাবণ**-ভ্রাতা **কুবের**-এ পরিণত হয়। সেটিই একালে ব্যাঙ্ক রূপ ধারণ করেছে। আর যারা বলেছিল, 'রক্ষাম', অর্থাৎ, 'হ্যাঁ, রক্ষা করব', কিন্তু রাখেনি, খেয়ে সাবাড় করে দেয়, তাদের নাম হয়ে যায় **রক্ষ** বা **রাক্ষস**। সেটিই একালে 'পাবলিক সেকটর'-এ পরিণত হয়েছে। তাই বলে যৌথ প্রতিষ্ঠান বা 'পাবলিক সেকটর' মাত্রেই **রাক্ষস** নয়। সেকথায় আমরা যাব **রাক্ষস** শব্দে।

● **যজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অসংযাজ্য, ইজ্য, ইজ্যাদি, জজ, জিজিয়া (জজিয়া), যজ (judge), জাট, জাটি (দ্র. জট্, যুজ্), যজ্, যজতি, যজতিক্রিয়া, যজতিদেশ, যজতিস্থান, যজন, যজমান, যজমানলোক, যজমানশিষ্য, যজমানিএা, যজমানী, যজমেনে, যজা, যজান, যজি, যজী, যজু, যজুঃ (যজুস্), যজুর্ব্বিৎ, যজুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদী, যজুষ্পতি, যজ্ঞ, যজ্ঞকর্ম্ম, যজ্ঞকাল, যজ্ঞকীলক, যজ্ঞকুণ্ড, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞক্রিয়া, যজ্ঞগম্য, যজ্ঞঘ্ন, যজ্ঞছাগ, যজ্ঞত্রাতা, যজ্ঞদক্ষিণা, যজ্ঞদীক্ষা, যজ্ঞদ্রুহ্, যজ্ঞধীর, যজ্ঞধ্রুক্, যজ্ঞনেমি, যজ্ঞপতি, যজ্ঞপত্র, যজ্ঞপশু, যজ্ঞপাটা, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞপুমান্, যজ্ঞপুরুষ, যজ্ঞফলদ, যজ্ঞবরাহ, যজ্ঞবল্ক, যজ্ঞবল্লী, যজ্ঞবাট, যজ্ঞবাহ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞবিৎ, যজ্ঞবীর্য্য, যজ্ঞবৃক্ষ, যজ্ঞবেদি, (যজ্ঞবেদী), যজ্ঞভাগ, যজ্ঞভাগভুক্, যজ্ঞভাগহর, যজ্ঞভাজন, যজ্ঞভাণ্ড, যজ্ঞভাবন, যজ্ঞভাবিত, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞভূমি, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞভোক্তা, যজ্ঞমণ্ডল, যজ্ঞমুখ, যজ্ঞমূর্ত্তি, যজ্ঞরস, যজ্ঞরাট্, যজ্ঞরেতঃ, যজ্ঞলিঙ্গ, যজ্ঞশরণ, যজ্ঞশালা, যজ্ঞশাস্ত্র, যজ্ঞশিষ্ট, যজ্ঞশীল, যজ্ঞশূকর, যজ্ঞশেষ, যজ্ঞসদঃ, যজ্ঞসদন, যজ্ঞসার, যজ্ঞসিদ্ধি, যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞসেন, যজ্ঞস্থল, যজ্ঞস্থান, যজ্ঞহন, যজ্ঞহা, যজ্ঞাংশভুক্, যজ্ঞাগার, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞাঙ্গা, যজ্ঞাত্মা (যজ্ঞাত্মন্), যজ্ঞান্ত, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞাবয়ব, যজ্ঞায়তন, যজ্ঞায়ুধ, যজ্ঞারি, যজ্ঞার্হ, যজ্ঞি, যজ্ঞিয়, যজ্ঞিয়শালা, যজ্ঞী (যজ্ঞিন্), যজ্ঞীয়, যজ্ঞেশ, যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞোডুম্বর, যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞোপবীতী, যজ্যু, যজ্বা (যজ্বন্), যযু, যষ্টব্য, যষ্টি, যষ্টিক, যষ্টিকা, যষ্টিগ্রহ, যষ্টিনিবাস, যষ্টিপ্রাণ, যষ্টি(ষ্টী)মধু, যষ্টিমধুকা, যষ্টী, যষ্ট্যাহ্, যাগ, যাগকণ্টক, যাগকর্ম্ম, যাগমণ্ডপ, যাগসূত্র, যাজক, যাজকতন্ত্রতা, যাজন, যাজয়িতা, যাজি, যাজী, যাজুষ, যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞসেনি(নী), যাজ্ঞিক, যাজ্ঞিক্য, যাজ্ঞিয়, যাজ্য, যাযজূক, যাষ্টিক, সোমযাজক।

● **যজ্** = যায়ীর জনন। **যজ** = যায়ীর জনন যাহাতে।

● **যজ** : দ্র. **দীক্ষা, ব্রত, দ্রুপদ (যাজ, উপযাজ)**। ৬. judge।

যজুর্ব্বেদ : দ্র. **তৈত্তিরীয়**।

● **যজ্ঞ** : ২. *যায়ীর জনন রহস্যরূপী যাহাতে।* / যাহাতে দেবতা পূজিত। ৩. যজন, পূজা, অগ্নি, বিষ্ণুর অবতারভেদ, অধ্বর, **ক্রতু**, যাগ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। আর্য জাতির প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে কোনো দ্রব্য দান করার নাম যজ্ঞ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি মুখ্যত যজ্ঞের বিবরণে পরিপূর্ণ। ... (এতে) দেবতার উদ্দেশে কোনো না কোনো দ্রব্য ত্যাগ করা হত। ত্যাগ কর্মের নাম আহুতি। ... এই দ্রব্য-ত্যাগের নাম যাগ। ... যাগকর্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক করতে হত। প্রত্যেক কর্মেরই নির্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। (পৌ.অ.)। ৪. **যজ্ঞ** শব্দের প্রতীকী রূপটি এখনও প্রচলিত। ৫. যে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়, তাকেই সেকালে **যজ্ঞ** বলা হত, একালে এখনও কেউ কেউ তাকে কর্ম**যজ্ঞ** বলে থাকেন। ধান উৎপাদনের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল কর্মকাণ্ড করা হয়, তা হল চাষির কর্ম**যজ্ঞ**, পরমাণু শক্তি উৎপাদনের জন্য পরমাণুবাজেরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কর্মকাণ্ড করে থাকেন, সে হল পরমাণুবাজের কর্ম**যজ্ঞ**। সেই হিসেবে বিয়েবাড়ির রান্নাও **যজ্ঞ**, আমাদের শব্দার্থকোষ রচনাও **যজ্ঞ**। ... ইত্যাদি। তবে সেকালে তো লেখালেখির তেমন চল ছিল না, লোকে তথাকথিত লেখাপড়াও জানত না। তাই প্রথমে প্রতীকী **যজ্ঞ** করা

হত, এবং তা দেখে রাজা ও রাজপুরুষেরা সেই প্রতীকী **যজ্ঞ**কে বাস্তবে রূপায়িত করতেন; একালে যেমন নকশা দেখে ওভারসিয়ার ও মিস্ত্রিরা বিল্ডিং বানায়। এখনকার কালে বাস্তব কর্ম**যজ্ঞ**কে আর **যজ্ঞ** বলা হয় না, কিন্তু তার নকশাটিকে বা প্রতীকী রূপটিকে আমাদের পুরোহিতগণ অর্থহীনভাবে **যজ্ঞ** নামে বহন করে নিয়ে চলেছেন।

● **যাজ্ঞবল্ক্য** : ২. **যজ্ঞবল্ক** *(যজ্ঞবৃক্ষের ছাল) থেকে জাত।* ৩. সংহিতাকার ঋষি ও ব্যাসের (বৈশম্পায়নের) শিষ্য। এঁর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। শতপথব্রাহ্মণ ও **বৃহদারণ্যকে**র ইনিই সংগ্রহীতা। ... ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ইনি রাজা **জনকে**র রাজসভায় ... **অশ্বমেধ** যজ্ঞে ... ইনি নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেন। ... যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তিনি অনেকবার মত প্রকাশ করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে **বানপ্রস্থ** অবলম্বন ও যোগাভ্যাস। সেইজন্য তাঁকে যোগশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। **মৈত্রেয়ী** ও কাত্যায়নী নামে তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন। ... গুরু **বৈশম্পায়নে**র অধীত বিদ্যা বমন করে তিনি সূর্যের নিকট থেকে সূর্যের অধিগত সমস্ত যজুঃ শিক্ষা করেন। (দ্র. বৈশম্পায়ন)। ... এই যজুঃ শুক্ল যজুর্বেদ নামে খ্যাত। যাজ্ঞবল্ক্য অতঃপর **কণ্ব**, মধ্যন্দিন প্রভৃতি ১৫ জন শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেন। সেই অনুসারে এই বেদ পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **যজ্ঞ**, **তৈত্তিরীয়**। যে কোনো উৎপাদন কর্ম**যজ্ঞে**র পরিচালক, একালে যাঁদের 'ম্যানেজারিয়াল-স্টাফ' বলে, সেকালে তাঁদেরকে বলা হত **যাজ্ঞবল্ক্য**। যৌথব্যবস্থার বিপরীতে স্বাতন্ত্র্যবাদী-পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল এই সত্তার হাত ধরে। স্বভাবতই এঁরা ছিলেন তাঁদের সময়ের পূর্বতন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী। ...

● **যম্ (যত্, যন্ত্র্, যস্, যাসি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনায়ত, অনায়ত্ত, অনায়াস, অনাসে, অনিয়ত, অনিয়ম, অপ্রযত্ন, অযন্ত্রিত, অযমিত, অসংযত, আঅতন, আত্ত, আত্তগন্ধ, আত্তদণ্ড, আয়ত, আয়তন, আয়তলোচন, আয়তি, আয়ত্ত, আয়ত্তাধীন, আয়ত্তি, আয়া, আয়াম, আয়াস, আয়াসঘর, আয়েস, উদ্যত, জত (যত), জতন, জতি, জতুক, জতেক, জাঁত, জাঁতা, জাঁতি, নিয়ত, নিয়তি, নিয়ন্ত্রণ, নিয়ম, নিয়মিত, প্রতিনিয়ত, প্রযত্ন, ব্যায়াম, যকৃৎ, যকৃৎকোষ, যখন, যখন-তখন, যৎখন, যত্, যতঃ, যত, যতক, যতগীঃ, যতচিত্ত, যতচেতাঃ, যতন, যতবাক্(চ্), যতব্রত, যতম, যতমানস, যতমন্যু, যতমৈথুন, যতাত্মা, যতাহার, যতি, যতিচান্দ্রায়ণ, যতিত, যতিধর্ম্ম, যতিনী, যতিপাত্র, যতিভ্রষ্ট, যতিমৈথুন, যতিশূন্য, যতী, যতীন্দ্র, যতেক, যতেন্দ্রিয়, যৎ, যৎকরণ, যৎকালীন, যৎকিঞ্চ, যৎকিঞ্চিৎ, যৎকুৎসিৎ(ত), যৎকৃতে, যৎকে, যৎক্ষণ, যৎপরিমাণ, যত্ত, যত্ন, যত্নপ্রতিপাদ্য, যত্নবান (যত্নবৎ), যত্নাক্ষেপ, যৎপরোনাস্তি, যত্র, যত্রতত্র (যথাতথা), যত্রতত্রশয়, যত্রত্য, যত্রসায়ংগৃহ, যত্রসায়ংপ্রতিশ্রয়, যত্রাস্তমিতশায়ী, যথা, যথাংশ, যথাকথঞ্চিৎ, যথাকথঞ্চিদ্রূপে, যথাকথিত, যথাকর্ত্তব্য, যথাকর্ম্ম, যথাকল্প, যথাকাম, যথাকামী, যথাকার, যথাকার্য্য, যথাকাল, যথাকৃত, যথাক্রম, যথাক্ষম, যথাখ্যাত, যথাখ্যান, যথাখেল, যথাগত, যথাগম, যথাগুণ, যথাচার, যথাজাত, যথাজ্ঞান, যথাজ্যেষ্ঠ, যথাজ্ঞপ্ত, যথাতত্ত্ব, যথাতথ, যথা-তথা, যথাতথ্য, যথাতে, যথাদায়, যথাদিশ, যথাদিষ্ট, যথাদৃষ্ট, যথাদেশ, যথাধিকার, যথানাম, যথানির্দেশ, যথানির্দ্দিষ্ট, যথানুপূর্ব্ব্য, যথানুভূত, যথান্যস্ত, যথান্যায়, যথান্যুপ্ত, যথাপণ্য, যথাপরাধ, যথাপূর্ব্ব, যথাপ্রদেশ, যথাপ্রধান, যথাপ্রয়োগ, যথাপ্রাণ, যথাপ্রাপ্ত, যথাপ্রার্থিত, যথাবকাশ, যথাবৎ, যথাবয়ঃ, যথাবর্ণ, যথাবল, যথাবসর, যথাবস্তু, যথাবস্থ, যথাবিত্ত, যথাবিধ, যথাবিধি, যথাবিভব, যথাবুদ্ধি, যথাবৃত্ত, যথাবৃত্তি, যথাবৃদ্ধ, যথাভাগ, যথাভাব, যথাভিপ্রেত, যথাভিমত, যথাভিলষিত, যথাভীষ্ট, যথাভূত, যথাভ্যর্থিত, যথামতি, যথামান, যথামুখ, যথায়, যথাযথ, যথাযুক্ত, যথায়ে, যথাযোগ, যথাযোগ্য, যথারুচি, যথারূপ, যথার্থ, যথার্থকথন, যথার্থতঃ, যথার্থনামা, যথার্থবক্তা, যথার্থবাদী, যথার্থভাষী, যথার্থবর্ণ, যথার্থিত, যথার্হ, যথার্হতঃ, যথালব্ধ, যথালাভ, যথাশয়, যথাশাস্ত্র, যথাশীল, যথাশ্রম, যথাশ্রুত, যথাশ্রুতি, যথাসংখ্য, যথাসংস্থ, যথাসখ্য, যথাসময়, যথাসম্বন্ধ, যথাসম্ভব, যথাসম্ভাবিত, যথাসর্ব্বস্ব, যথাস্থান, যথাস্থিত, যথাস্ব, যথাস্বৈর, যথাহার, যথি-তথি, যথেচ্ছ, যথেচ্ছা, যথেচ্ছাচার, যথেপ্সা, যথেপ্সিত, যথেষ্ট, যথেষ্টগতি, যথেষ্টচারী, যথেষ্টাচরণ, যথেষ্টাচার, যথেষ্টাসন, যথোক্ত, যথোত্তর, যথোদিত, যথোদ্দিষ্ট, যথোদ্দেশ, যথোপজোষ, যথোপদেশ, যথোপপন্ন, যথোপযোগ, যথৌচিত্য, যদ্, যদন্ন, যদবধি, যদর্থ, যদা, যদি, যদিই, যদিও, যদিচ, যদিবা, যদিস্যাৎ, যদীয়, যদু, যদুকুল, যদুকুলোদ্ভব, যদুকুলোদ্বহ, যদুচন্দ্র, যদুনন্দন, যদুনাথ, যদুপতি, যদুপুঙ্গব, যদুবংশ, যদুবীর, যদুবীরমুখ্য, যদুমণি, যদুরায়, যদুশ্রেষ্ঠ, যদুদ্বহ, যদৃচ্ছা, যদৃচ্ছাক্রমে, যদৃচ্ছালাভ, যদৃচ্ছাশব্দ, যদৃচ্ছাসংবাদ, যদ্দিন, যদ্ভবিষ্য, যদ্যপি, যদ্যপিও, যদ্যপিচ, যদ্যপিস্যাৎ, যদ্যপিহ, যদ্বৎ, যদ্বা, যদ্বিধ, যদ্বৃত, যনি (যনু, দ্র. যেন), যন্ত, যন্তা (যন্তৃ), যন্তি, যন্ত্র্, যন্ত্র, যন্ত্রক, যন্ত্রকরণ্ডিকা, যন্ত্রকর্ম্মকৃৎ, যন্ত্রকোবিদ, যন্ত্রগৃহ, যন্ত্রচেষ্টিত, যন্ত্রণ, যন্ত্রণা, যন্ত্রণী, যন্ত্রতক্ষা, যন্ত্রতন্ত্র, যন্ত্রদৃঢ়, যন্ত্রনাল, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপীড়া, যন্ত্রপুত্রক (যন্ত্রপুত্রিকা), যন্ত্রপূত, যন্ত্রপুষ্প, যন্ত্রপেষণী, যন্ত্রপ্রবাহ, যন্ত্রবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, যন্ত্রবিমান, যন্ত্রময়ূরক, যন্ত্রমার্গ, যন্ত্রশর, যন্ত্রশিল্পী, যন্ত্রসূত্র, যন্ত্রারূঢ়, যন্ত্রালয়, যন্ত্রিক, যন্ত্রিকা, যন্ত্রিণী, যন্ত্রিত, যন্ত্রিয়া, যন্ত্রী, যন্নিমিত্ত, যন্মাত্র, যম্, যম, যমক, যমকা, যমকিঙ্কর, যমকীট, যমকেতু, যমক্ষয়, যমখণ্ডাতি, যমগৃহ, যমঘণ্ট, যমঘর, যমঘ্ন, যমজ, যমজাত, যমজাতক, যমজিৎ, যমতর্পণ, যমদংষ্ট্রা, যমদণ্ড, যমদণ্ডী, যমদিক্, যমদূত, যমদূতিকা, যমদেবত, যমদেবতা, যমদ্বিতীয়া, যমধর, যমধানী, যমধার, যমন, যমনক্ষত্র, যমনিকা, যমনী (যমানী, দ্র.চতুঃসম), যমপট, যমপত্নী, যমপাশ, যমপুকুর, যমপুর, যমপুরুষ, যমফোসকা, যমবাড়, যমবান, যমবাহন, যমবিষয়, যমব্রত, যমভগিনী, যমভট, যমমন্দির, যমমাস, যমযাতনা, যমরাট্(জ্), যমরাড়, যমরায়, যমরাষ্ট্র, যমল, যমলজ্জা, যমলার্জ্জুন, যমলার্জ্জুনহা, যমলী, যমলোক, যমশ্রায়, যমসংহিতা, যমসদন, যমসভ, যমসভা, যমসাদন, যমসূক্ত, যমসূর্য্য, যমস্বসা, যমানিকা, যমানী (দ্র. যমনী), যমানুগ, যমানুচর, যমান্তক, যমারি, যমালয়, যমাষ্টক, যমিত, যমী, যমুনা, যমুনাকর্ষণ, যমুনাজনক, যমুনাপতি, যমুনাভিৎ, যমুনাভ্রাতা, যমুনোত্রি(ত্রী), যমেশ, যমেশ্বর, যযাতি, যযাতিজ, যর্হি, যাম, যামবতী, যামল, যামিনী, যামী, যাম্য, যস্, যস্ক (যাস্ক), যস্য, যহাঁ, যহি, যহিঁ, যা (যাহা), যাঁ, যাঁতা, যাঁতি,

যাঁহা, যাঁহার, যাঁহাদের, যাচ্ছেতাই (যদ্ ইচ্ছা তাই), যাতন, যাতনা (যন্ত্রণা), যাতা, যাতে, যাতে-তাতে, যাথাকাম্য, যাথাতথ্য, যাথার্থ্য, যাদব, যাদবনন্দন, যাদবশার্দ্দুল, যাদবশেখর, যাদবানন্দ, যাদবী, যাদবেন্দ্র, যাদশাপন্ন, যাদসাংনাথ, যাদসাংপতি, যাদসাংপ্রভু, যাদু, যাদুকর (ফা. জাদুগর, জাত থেকে যাদু কথাটি ঠিক নয়, য-দান উ থেকে শব্দটি জাত), যাদুকরী, যাদুগিরি, যাদুমণি, যাদুয়া, যাদৃক্, যাদৃক্ষ, যাদৃচ্ছিক, যাদৃশ, যাদোনাথ, যাবচ্ছক্য, যাবজ্জীব, যাবজ্জীবন, যাবৎ, যাবৎঅধ্যয়ন, যাবৎঅন্ত, যাবৎঅমত্র, যাবৎঅর্থ, যাবৎআয়ুধ, যাবৎঈপ্সিত, যাবৎউক্ত, যাবৎকাল, যাবৎপ্রমাণ, যাবৎবল, যাবৎভাষিত, যাবৎসত্ত্ব, যাবতিথ, যাবতীয় (যাবদীয়), যাবন্ত, যাম, যামী, যামুন, যাম্য, যাম্যদিক, যাম্যপাশ, যাম্যবক্ত্র, যাম্যভিত, যাম্যহাথ, যাম্যা, যাম্যায়ন, যাস্ক, যাহা, যাহাঁ, যাহার, যাহাদের, যিঁহ, যিঁহো, যিনি, যে, যেই, যেঁহ, যেঁহো, যেখানে, যেখানে-সেখানে, যেঙ, যেঞি, যেটা, যেটা-সেটা, যেটি, যেটে, যেঠে, যেথা, যেথায়, যেথা-সেথা, যেন, যেনতেন, যেনতেনপ্রকারেণ, যেনমত, যেনমনে, যেমত, যেমন, যেমনতর, যেমন-তেমন, যেমনি, য়ের, যেরূপ, য়েরে, যেহ, যেহো, যেহোঁ, যেহি, যেহেতু, যেহেতুক, যেহেন, যেহ্ন, যৈখন, যৈছন, যৈছে, যৈসা, যো, যোন, যো-সো, ষড়যন্ত্র, সংযত, সংযম, সযত্ন, সুসংযত।

● **যম্ (যত্, যন্ত্র্, যস্, যাসি)** = যায়ীর সীমায়ন। **যম** = যায়ীর সীমায়ন যাহাতে। **যত** = যায়ীর তারণ যাহাতে। **যন্ত্র** = যায়ীর নাকরণের তারণ রহে যাহাতে। **যস** = যায়ীর নির্য্যাস যাহাতে। **যাসি** = যস-জাত-র গতিশীলতা যাহাতে।

● **যতি : ৫. দ্র. দক্ষিণ**। যাহাতে সংযত হওয়া থাকে, তাকে **যতি** বলে। **দক্ষযজ্ঞে**র পর **শিব** (= আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-সৃষ্টিশীল প্রকৃত ও আদি **ব্রাহ্মণ**) সামাজিক উৎপাদন-কর্ম**যজ্ঞ** থেকে সরে দাঁড়ান। একেই বলা হয় যে, **শিব যতি**ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন।

● **যথা : ২.** *যাত্রা বা যাত্রী থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* **৩.** যে প্রকারে, যেমন ... ইত্যাদি। (ব.শ.)।

● **যদ (যদা, যদি, যদীয়) : ২.** ***যদ*** *= যাত্রা দান করে যে।* ***যদা*** *=* ***যদ****-এর আধার যে।* ***যদি*** *=* ***যদ*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ***যদীয়*** *=* ***যদি****-র আধার যায় যাহাতে।*

● **যদু (যাদু) : ২.** ***যদু*** *=* ***যদ*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***যাদু*** *=* ***যদু*** *হইতে জাত যে।* **৩. যদু** = চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। যদুর অপত্যগণ। (ব.শ)। **৫. দ্র. মধু**।

● **যাদু** = (ফারসি - **জাদু**) কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকি। (ব.শ.)। **যাদু** = বশীকরণ বিদ্যা, মোহিনী। **যাদুকর, যাদুকরী** = যাহারা মায়া দ্বারা ভোজক্রীড়া করে। (ছা.অ.)। **৪.** কথায় কথায় বাংলাভাষায় 'রাম-শ্যাম-যদু-মধু' বলা হয়, সেই বিচারে **যদু** প্রচলিত; কদাচিৎ নামরূপেও প্রচলিত। আদরে বা ব্যঙ্গার্থে **যাদু** নামে সম্বোধন করা হয়। **৫.** দ্র. **ইন্দ্রজাল, দেবযানী, ভোজবিদ্যা, মধু, মাধব**। যাত্রা দান করে যে, তাকে **যদ** বলে। সেই **যদ** বা 'যাহার' যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন তাকে **যদু** বলে।

● **যন্ত্র, যন্ত্রণা, যন্ত্রী, ষড়যন্ত্র : ৫. দ্র. তন্ত্র, মন্ত্র**।

● **যম : ৩.** পুরাণ মতে ইনি **দক্ষিণে**র দিক্‌পাল। সূর্যের ঔরসে এবং তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি **বৈবস্বত মনু**র ভ্রাতা। ... ইনি বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করলে বিমাতার শাপে তাঁর পদদ্বয় ক্ষত ও কীটদষ্ট হয়। যম পিতা সূর্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে সূর্য তাঁর ক্ষতস্থানের পুঁজ ও কীট ভক্ষণের জন্য যমকে একটি কুকুর দান করলেন। এই **কুকুর** ক্ষত হতে নির্গত পুঁজ ও কীট ভক্ষণ করাতে যম সুস্থ হলেন। কিন্তু দুর্বল পায়ের জন্য **মহিষ** বাহনে ভ্রমণ করতে বাধ্য হন। একবার ঋষি মাণ্ডব্য এক পতঙ্গের দেহে তৃণ বিদ্ধ করেছিলেন বলে যমের আদেশে শূলবিদ্ধ হন এবং **অণীমাণ্ডব্য** নামে খ্যাত হন। অণীমাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হয়ে যমকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। ফলে যম **বিদুর**রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ... **দক্ষ** প্রজাপতির তেরো জন কন্যাকে যম বিবাহ করেন এবং তাদের গর্ভে তেরো জন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তীর গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। যম স্বর্গের দেবতা হলেও নরকের অধীশ্বর। ... যমপুরীর নাম সংযমনী। ... ঋগবেদে ১০ মণ্ডলের তিনটি সুক্ত যমের উদ্দেশে রচিত। আর একটি সূক্তে যম ও তাঁর ভগিনী যমীর কথোপকথন আছে। যমের নাম প্রায় পঞ্চাশ বার ঋগবেদে উল্লেখ আছে। যম পুণ্যাত্মা মৃতদের ও নেতৃগণের প্রধান। তিনি প্রথম মৃত হন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে একত্র বৃক্ষের উপর বাস করেন। যম দেবসহচর হলেও কোথাও তাঁকে দেবতা বলা হয় নাই — যম রাজা। ... ঋগবেদের অনেক স্থলে যমকে বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্র বর্ণিত হতে দেখা যায়। কোনো স্থলে অগ্নি ও যম অভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। ... যমের আত্মাই সর্বপ্রথম স্বর্গে গমন করে। ... যমের দূত পক্ষী — **উলুক বা কপোত** এবং সারমেয়। সারমেয়দের চার চক্ষু, বর্ণ বিচিত্র, বৃহৎ নাসিকা। তারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না। তারা যমের প্রহরী, পথরক্ষী, সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফেরে। এরা যমের পথও রক্ষা করে। ... মহাভারতে **উদ্দালক** মুনির পুত্র **নচিকেতা** যমপুরে গমন করেন। ... কঠোপনিষদে বাজশ্রবা রাজার পুত্র নচিকেতা। ... পিতার নির্দেশে তিনি যমপুরীতে যান। ... নচিকেতা যমের নিকট হতে আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ... মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে ... সূর্যের সঙ্গে সংজ্ঞার বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্যকে দেখে চোখ নিমীলিত করেছিলেন, এতে সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে ... সংজ্ঞার পুত্র প্রজা-সংযম যম হবে ... এর পর সংজ্ঞা সূর্যের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করলে, সূর্য আবার বলেছিলেন, তোমার যে কন্যা হবে সে চঞ্চলা নদী রূপে পরিণত হবে। ... এই সূর্যকন্যা পরে যমুনা নদী হয়। ... (পৌ.অ.)। **৫. দ্র. অশ্বিনীকুমার, উদ্যম, ধম, ধমক, নিয়ত, নিয়ম (নি), ধর্ম্ম**। একালে যাকে 'বিচারব্যবস্থা' বা 'আদালত' বলা হয়, তারই আদিরূপকে বলা হত **যম** ও **ধর্ম্ম**। এখনও বিচারালয়কে 'ধর্মাধিকরণ' এবং বিচারককে 'ধর্মাবতার' বলা হয়ে থাকে। এই বিচারব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল কীভাবে, তারই কাহিনী লেখা আছে আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে। উপরে তাই কিছু অংশ দেওয়া হল। সেগুলি ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে পাঠ করে নিতে পারলে বিশ্বে বিচারব্যবস্থার উদ্ভব-ইতিহাস জানতে পারা যায়। ...

● **যমুনা** : ২. *যম নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন থাকে যে আধারে।* ৩. ... কালিন্দ পর্বত হতে যমুনা নদীর উৎপত্তি। এই নদী সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে যমের সঙ্গে যমজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **নদী, গঙ্গা, ধারা, প্রবাহ, যম**। একালে যাকে সরকারি বিলিবন্টন ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে, যথা, রেশনিং, সেকালে তদ্রূপ সরকারি সম্পদপ্রবাহকে বলা হত **যমুনা**ধারা। ...

● **যযাতি** : ২. *'যাহা (যেরূপে) যাইতেছে তাহা (সেরূপেই) যাক' এই যার নীতি।* ৩. চন্দ্রবংশীয় রাজা **নহুষে**র পুত্র। এঁর দুই স্ত্রী — দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা **দেবযানী** ও দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে যদু ও **তুর্বসু** নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র হয়। একদা যযাতি **মৃগয়া** করতে গিয়ে কূপে পতিতা দেবযানীকে উদ্ধার করেন ... দ্র. দেবযানী ... শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে দুর্জয় জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দিলেন। যযাতি বহু অনুনয় করাতে শুক্রাচার্য বললেন ... যযাতি ইচ্ছা করলে অন্যের দেহে নিজের দেহ সংক্রামিত করতে পারেন। ... তিনি একে একে পুত্রদের আহ্বান করে তাঁর জরা গ্রহণ করতে এবং তাঁদের যৌবন তাঁকে দান করতে বলেন। যদু, **তুর্বসু**, দ্রুহ্য ও অনু জরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যযাতি বলেন, এদের বংশে কেহই রাজ্য লাভ করবে না। অবশেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র **পুরু** স্বীকৃত হওয়ায় ... তার দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করে পুত্রের যৌবন নিজে গ্রহণ করেন ... মৃত্যুর পরে কিছুকাল তিনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন। কিন্তু **অহঙ্কার**বশত নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মনে করায় ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে অন্তরীক্ষ হতে পতিত হতে থাকেন। পথের মধ্যে আকাশের যে স্থানে তাঁর দৌহিত্র অষ্টক, প্রতর্দন, **বসুমনা** ও শিবি বাস করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হওয়ায় দৌহিত্ররা তাঁকে চিনতে পেরে নিজেদের পুণ্যবলে তাঁকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **তুর্বসু**। যে সত্তা 'যা যেমন চলছে, তেমন চলুক' — এই নীতিতে চলেন ও চালান, তাঁকে **যযাতি** বলে। একালে একে বলা হয় 'status quo' রক্ষাকারী।

● **যাস্ক** : ২. *যস্ (যাত্রার নির্য্যাসকরণ) করে যে, তাহা হইতে জাত।* ৩. বৈদিক শব্দার্থবোধক শাস্ত্রকার। **নিরুক্ত** নামে বেদাঙ্গ গ্রন্থের প্রণেতা। নিরুক্তকে বৈদিক **ব্যাকরণ** বা **অভিধান** বলা যেতে পারে। দুরূহ বৈদিক শব্দের অর্থ এই পুস্তকে পাওয়া যায়। ইহাই সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য বৈদিক অভিধান। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **নিরুক্ত**। 'প্রচলিত'কে বলা হয় **যস্**। তার সারসংক্ষেপ থাকে ভাষার শব্দে। সেই শব্দসংকলন করেন যিনি তাঁকে বলা হয় **যাস্ক**। ...

● **যেন** : দ্র. **কেন**।

● **যা (যাতি, যাপি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অগ্রযায়ী, অগ্রযান, অনুযায়ী, অভিযান, অযাতযাম, অযাত্রা, অযাত্রিক, আতযাত, আয়াত, উদ্যাত, উপযাত, উষ্ট্রযান, কেয়ূর, গোযান, জা, দেবযান, নির্যাতন, পিতৃযান, প্রয়াগ, প্রয়াণ, প্রয়াত, মহাযান, য, যা, য়া, যাই, যাউ, যাউক, যাওন, য়াছ, যাত, যাতব্য, যাতযাম, যাতা, যাতায়াত, যাতু, যাতুঘ্ন, যাতুধান, যাতুধানী, যাতোদ্যম, যাত্রা, যাত্রাওয়ালা, যাত্রাকর, যাত্রাকরণ, যাত্রাকার, যাত্রাঘট, যাত্রাপ্রসঙ্গ, যাত্রাভঙ্গ, যাত্রামাত্র, যাত্রাসিদ, যাত্রিক, যাত্রী, যাদঃ (যাদস্), যাদঃপতি, যান (দ্র. **অতিবাহক**), যানকর, যানগ, **যানজট**, যানপাত্র, যানপাত্রিকা, **যানবাহ**, **যানবাহন**, যানভঙ্গ, যানমুখ, **যানযাত্রা**, যানশালা, যানস্বামী, য়ানা, য়ানি, যানারোহ, যানাসন, যানাস্তরণ, **যাপ**, যাপক, যাপন, যাপনা, যাপিত, যাপ্য, যাপ্যযাম, যাম, **যামঘোষ**, যামতূর্য্য, যামদুন্দুভি, যামনালী, যামবৃত্তি, যামবতী, যামল, **যামি**, যামিক, যামিকা, যামিত্র, যামিত্রবেধ, যামিনী, যামিনীদয়িত, **যামিনীনাথ**, যামিনীপতি, যামিনীরমণ, যামী, যাম্য, যাম্যকর, যাযাবর, যায়ী, **যিযাসু**, হীনযান।

● **যা (যাতি, যাপি)** = যায়ীর আধার যে। **যাতি** = যা-এর তারণ গতিশীল যাহাতে। **যাপি** = যা-এর পান-পালন গতিশীল যাহাতে।

● **যাওয়া** : ৫. **যাওয়া**কে বাংলাভাষী এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন যে, তার সাথে কোনো ভাষার কোনো ক্রিয়ার তুলনাই **করা** যায় না। বাংলায় 'পাওয়া **যায়**', 'ধরা **যায়**', 'মারা **যায়**', 'নেওয়া **যায়**', 'দেওয়া **যায়**', 'খাওয়া **যায়**' ... এবং 'কী করা **যায়**' না! এবং বলে রাখা ভাল, এতে ক্রিয়াকে যে **সূক্ষ্ম**তায় প্রকাশ করা **যায়**, ইংরেজি ভাষায় সেই **সূক্ষ্ম**তাকে ধরাই **যায়** না; যে কারণে **অধিকাংশ** ক্ষেত্রে এই 'পাওয়া যায়', 'ধরা যায়' ... ধরনের বাংলা **বাক্যকে** ইংরেজিতে **কিছুতেই** অনুবাদ করা **যায়** না।

● **যাত্রা** : ৫. দ্র. **বৃত্তান্ত, ইতিবৃত্ত**। যাত্রাদল **যাত্রা** করে, **যাত্রা** দেখায়, জীবন**যাত্রা** শেষ হয় বৃত্তান্তে। সমগ্র বৃত্ত অতিক্রম করার **যাত্রা** দেখানো হয় বলেই এগুলি **যাত্রা** পদবাচ্য।

● **যান** : দ্র. **দেবযান, বজ্রযান**।

● **যাযাবর (যাযাবর-বংশ)** : ৫. দ্র. **জটা, জটাচার্ব্ব-বংশ।**

● **যাচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অযাচক, অযাচকবৃত্তি, অযাচিত, অযাচিতবৃত্তি, অযাচিতব্রত, অযাচিতাশী, অযাচিতাহৃত, অযাচিতোপনত, অযাচিতোপনীত, অযাচিতোপস্থিত, অযাচীব্রাহ্মণ, অযাজ্য, উপযাচক, যাচ্, যাঁচ, যাঁচা, যাচ, যাচক, যাচকী, যাচন, যাচনক, যাচনদার, যাচনা, যাচনীয়, যাচা, যাচাই, যাচান, যাচি, যাচিকা, যাচিঙ্গা, যাচিঞা, যাচিত, যাচিতক, যাচিতা (যাচিতৃ), যাচিষ্ণু, যাচে, যাচেন, যাজ্ঞা, যাজ্ঞাজীবন, যাজ্ঞাপ্রাপ্ত, যাজ্ঞাবচঃ, যাজ্ঞাভঙ্গ যাচ্য।

● **যাচ্** = যা-এর চয়ন। **যাচ** = যা-এর চয়ন যাহাতে।

● **অযাচক, অযাচী, অযাচী-ব্রাহ্মণ** : ২. *যে যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করে না।* ৩. অপ্রার্থিত; যাচ্ঞা বিনা লব্ধ অন্নাদি; প্রার্থনা বিনা লব্ধ অন্ন যাহার জীবিকা; ... (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখনও রয়েছেন। **মৈথিলী** ব্রাহ্মণদের মধ্যে এঁদের বিশেষ ভাবে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় ভারত সরকারকে এঁদের সাহায্য করার জন্য এঁদের গৃহিণীদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। সরকারের দানও এঁরা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। শিলিগুড়িতে এঁদের একটি আশ্রম বা অফিস আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, তাঁদের বলা হত **মিশকিন**। এখনও 'ফকির-মিশকিন' শব্দটি কোনো কোনো মুসলিম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ফকির ভিক্ষা চায়, মিশকিন চাইতে লজ্জা বোধ করেন। তাকে যেচে দিতে হয়। ইচ্ছা হলে নেন, না হলে নেন না। এঁরা আদি **শিবের** উত্তরসূরী বলে মনে হয়।

● **যু (যুষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অতিযুবা, অযোনি, অযোনিজ, অযোনিসম্ভব, অযোনিসম্ভূত, অযোনিজন্মা, অবয়ব, অযব, আযুত, জ, জই, জওয়ান (যুবন), জনার, জাউ, জুআ(য়া), জুআন, জুই, জুঁই, জুট, জোট, জোওয়ান, জোয়ান, জোয়ানী, জোয়ার (যব, দেবধান্য), যব, যবক্য, যবক্রী, যবক্ষার, যবক্ষোদ, যবখল, যবজ, যবতৈল, যবদ্বীপ, যবন, যবনদেশ, যবনদ্বিষ্ট, যবনপ্রিয়, যবনানী, যবনারি, যবনাল, যবনালজ, যবনিকা, যবনিয়া, যবনী, যবনেষ্ট, যবপাল, যবপিষ্ট, যবপ্ররোহ, যবফল, যববুস, যবযবাগু, যবনমধ্য, যবময়, যবমাত্র, যবমান, যবশূক, যবশূকজ, যবস, যবসক্তু, যবসুর, যবস্থব, যবহুঁ, যবনী, যবাগু, যবাগ্রজ, যবানিকা, যবানী, যবান্ন, যবাম্লজ, যবাস, যবাসশর্করা, যবাহ্ব, যবিষ্ঠ, যবীয়সী, যবীয়ান্, যবুস্থবু, যবেঁ, যবোথ, যবোদয়, যব্য, যাব, যাবক, যাবন, যাবনাল, যাবনালী, যাবনী, যাবশূক, যিযবিষু, যু, যুআ (যুয়া, যোহায়) যুআয় (জুয়ায়, 'দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়', যুয়ায়), যুত, যুতক, যুতি, যুতী, যুবক, যুবকাল (যুবাকাল), যুবগণ্ড, যুবজন, যুবজানি, যুবতি, যুবতী, যুবত্ব, যুবন, যুবনাশ্ব, যুবপলিত, যুবরাট্, যুবরাজ, যুবরায়, যুবা (যুবন্), যুবান, যুবীভূত, য়ুরোপ (য়ুরূপ, য়ুরোপ, ইউরোপ), য়ুরোপীয়তা, যুশি (যোশী), যুষ্, যুষ্মদ্, যুষ্মদীয়, যুষ্মদ্বিধ, যুষ্মাদৃক্, (যুষ্মাদৃশ্), যুষ্মাদৃশ, যূক, যূকা, যূতি, যূথ, যূথচারী, যূথনাথ, যূথপ, যূথপতি, যূথপাল, যূথভ্রষ্ট, যূথমুখ্য, যূথহত, যূথাগ্রণী, যূথিকা, যূথী, যূনী, যূপ, যূপকটক, যূপকর্ণ, যূপকাষ্ঠ, যূপদারু, যূপদ্রু, যূপদ্রুম, যূপধ্বজ, যূপসংস্কার, যূপসংক্রিয়া, যূষ্, যূষ, যো (জো), যোত, যোতা, যোত্তর, যোত্র, যোত্রমন্ত, যোনি, যোনিকন্দ, যোনিগুণ, যোনিজ, যোনিদুষ্টা, যোনিদেবতা, যোনিদোষ, যোনিদ্বার, যোনিনাসা, যোনিপোষণ, যোনিভ্রংশ, যোনিমুক্ত, যোনিমুখ, যোনিমুদ্রা, যোনিরোগ, যোনিলিঙ্গ, যোনিসংবরণ, যোনিসঙ্কর, যোনিসম্বন্ধ, যোনিসম্ভব, যোনী, যোন্যর্শঃ, যোয়ান (যমানী), যোয়ান, যোয়ানি, যোয়ানী, (ফা. জোয়ান, যুবন), যোষণা, যোষা, যোষিৎ, যোষিতা, যোষিন্ময়, যৌট্, যৌত্, যৌতক, যৌতুক, যৌথ, যৌথিক, যৌন, যৌবত, যৌবন, যৌবনকন্টক, যৌবনদশা, যৌবনপদবী, যৌবনপিড়কা, যৌবনলক্ষণ, যৌবনশ্রী, যৌবনস্থ, যৌবনান্ত, যৌবনাবস্থা, যৌবনারম্ভ, যৌবনারূঢ়, যৌবনাশ্ব, যৌবনী, যৌবনোদ্ভেদ, যৌবরাজ্য, যৌষিণ্য, যৌষ্মাক, যৌষ্মাকীণ, সংযুত, সুযুত।

● **যু (যুষ্)** = যায়ী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **যুষ** = নবরূপী যায়ীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে।

● **যবন :** ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ যাতা অন (on) যাহাতে; অথবা, যাতাকে বহন করে যে।* ৩. সগররাজ কর্তৃক বেদবহিষ্কৃত ক্ষত্রিয়গণ। ... (ব.শ.)। ৫. দ্র. **কালযবন**। বেদবিরোধী হৈহয় ক্ষত্রিয়গণ (দ্র. **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**) **জমদগ্নি**-প্রমুখ অধঃপতিত যৌথতাবাদীদের হত্যা করলে, তার কিছুকাল পরে বেদবাদীদের পুনরুত্থান ঘটে সগররাজার মাধ্যমে। (দ্র. **ঔর্ব্য**)। তাঁরা বেদবাদ-অমান্যকারী উপরোক্ত বিদ্রোহী ক্ষত্রিয়দের উপর প্রতিশোধ নেয় এবং শাস্তি দেয়। ঐ ক্ষত্রিয়রা স্বাতন্ত্র্যবাদী-ধনবাদী দর্শনের বাহক বা **পণ্য** ও **পণ্য**বাদিতার বাহক হওয়ায় তাদের **যবন** নামে নিন্দিত করা হয়। ... পরবর্তীকালে বিদেশাগত বণিকজাতিগুলিকেও সেকারণেই **যবন** নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

● **যুবনাশ্ব :** ৩. একজন সূর্যবংশীয় রাজা। ... বিখ্যাত রাজা মান্ধাতা এঁর পুত্র। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **মান্ধাতা**।

● **যোনি :** ২. *যোনি = যুনির (নবরূপে উত্তীর্ণ যাতা সক্রিয়ভাবে অন যাহাতে) তাহার আশ্রয় যে।* ৩. স্ত্রীচিহ্ন, ভগ, গর্ভাশয়, ভ্রূণস্থান, উৎপত্তিস্থান। ... (ব.শ.)। ৫. দ্র. **দেবযোনি**। 'নবরূপে উত্তীর্ণ যাতা' অর্থাৎ, যাহা যায় না, অন্যের আসার অপেক্ষায় সক্রিয়ভাবে অন (on) থাকে, তাকে যোনি বলে।

● **যূষ :** দ্র **পীযূষ**।

● **যুজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অতিযোগ, অনুপযুক্ত, অনুপযোগ, অনুযোগ, অপ্রযুক্ত, অবিযুক্ত, অভিযুক্ত, অযুক্, অযুজ্, অযুক্ত, অযুগ, অযুগনয়ন, অযুগনেত্র, অযুগশর, অযুগসপ্তি, অযুগ্ম, অযুগ্মচ্ছদ, অযুগ্মনয়ন, অযুগ্মনেত্র, অযুগ্মপত্র, অযুগ্মপর্ণ, অযুগ্মবাণ, অযুগ্মবাহ, অযুগ্মলোচন, অযুগ্মশর, অযুগ্মসপ্তি, অযুত, অযোগ, অয়োগব, অয়োগবা, অযোগবাহ, অযোগ্য, অযৌক্তিক, অযৌগিক, আওজন, আয়োজন, অসংযুক্ত, অসংযোগ, আযুক্ত, আয়োজন, আযোড়, আযোগ, আযোগব, উদ্যুক্ত, উপযুক্ত, উপযোগিতা, একযোগ, জলই, জলোই, জলযোগ, জুআ(য়া)ল, জুক(গ)তি, জুগি, জুত, জুতা, জুতি, জুতো, জো, জোই, জোগ, জোগা, জোগাড়, জোগান, জোগি, জোগ্যমান, জোঙ্গাল, জোত, জোতজমা, জোতদার, জোয়ারী (তারের জোড়া), জোয়াল, জোয়ালি, জোড়, জোড়তাড়, জোড়ভাঙা, জোড়-বিজোড়, জোড়ন, জোড়া, জোড়ানী, জোত্র, জোলই, দুর্যোগ, নিযুক্ত, নিয়োগ, নিয়োজন, প্রতিযোগ, প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগী, প্রযুক্ত, প্রযোজক, বিনিযুক্ত, বিনিয়োগ, বিপ্রযুক্ত, বিযুক্ত, বিয়োগ, বিয়োজন, যথোপযুক্ত, যুক্, যুক্তি, যুকুতি, যুক্ত, যুক্তকৃৎ, যুক্তচেষ্ট, যুক্তদণ্ড, যুক্তবেণী, যুক্তবৈরাগ্য, যুক্তমনাঃ, যুক্তরূপ, যুক্তাত্মা, যুক্তার্থ, যুক্তি, যুক্তিকথন, যুক্তিকর, যুক্তিগ্রাহ্য, যুক্তিজ্ঞ, যুক্তিবাদ, যুক্তিবাদী, যুক্তিমান, যুক্তিযুক্ত, যুগ, যুগকীলক, যুগক্ষয়, যুগচর্ম, যুগত, যুগতি, যুগদীর্ঘ, যুগধর্ম্ম, যুগধার, যুগন্ধর, যুগপৎ, যুগপতি, যুগপত্র, যুগপত্রক, যুগপদ্, যুগপদ, যুগপাণি, যুগপার্শ্বগ, যুগবাহু, যুগব্যায়ত, যুগমাত্র, যুগযুগান্তর, যুগল, যুগলভক্ত, যুগলমন্ত্র, যুগসন্ধ্যা, যুগসহস্র, যুগাংশক, যুগাদি, যুগাদ্যা, যুগাধ্যক্ষ, যুগান্ত, যুগান্তকারী, যুগান্তর, যুগান্তাগ্নি, যুগান্তার্ণব, যুগান্তোচিত, যুগাবতার, যুগাবধি, যুগিণী, যুগিয়া, যুগীয়া, যুগী, যুগ্ম, যুগ্মক, যুগ্মচারী, যুগ্মজ, যুগ্মজন্মা, যুগ্মপত্র, যুগ্মপর্ণ, যুগ্মপাণি, যুগ্মভুরু, যুগ্য, যুঙ্গী, যুজ্, যুজ, যুঝ, যুঝা, যুঝার, যুঝারিয়া, যুট (যোট্, জুট্), যুটা, যুটি, যুটিকা, যুড় (যোড়), যুড়া, যুড়ি, যো, যোআল, যোক্তব্য, যোক্তা, যোক্ত্র, যোগ, যোগকক্ষা, যোগক্ষেম, যোগচক্ষুঃ, যোগচর, যোগচূর্ণ, যোগজ, যোগতঃ, যোগতারকা, যোগদণ্ড, যোগদর্শন, যোগদান, যোগধারণা, যোগনাথ, যোগনিদ্রা, যোগপট্ট, যোগপট্টক, যোগপতি, যোগপথ, যোগপদক, যোগপাটা, যোগপারগ, যোগপীঠ, যোগবর্ত্তিকা, যোগবল, যোগবাসিষ্ঠ, যোগবাহ, যোগবাহী, যোগবাহী, যোগবিৎ, যোগবিদ্, যোগবিদ্যা, যোগবিধি, যোগবিভাগ, যোগমায়া, যোগমার্গ, যোগযাগ, যোগযুক্ত, যোগরঙ্গম, যোগরথ, যোগরূঢ়, যোগরূঢ়ি, যোগরোচনা, যোগশব্দ, যোগশরীরী, যোগশায়ী,

যোগশাস্ত্র, যোগসংজ্ঞিত, যোগসংসিদ্ধি, যোগসমাধি, যোগসাজশ (যোগসাজিশ), যোগসাধনা, যোগসার, যোগসিদ্ধি, যোগসূত্র, যোগসেবা, যোগস্থ, যোগা, যোগাই, যোগাকর্ষণ, যোগাচার, যোগাচার্য্য, যোগাড়, যোগাড়-যন্ত্র, যোগাড়ে, যোগাদ্যা, যোগাধমন, যোগান, যোগানিএগ্রা, যোগানুশাসন, যোগাযোগ, যোগারূঢ়, যোগাসন, যোগিত, যোগিদণ্ড, যোগিনিদ্রা, যোগিনী, যোগিনীচক্র, যোগিমার্গ, যোগিয়া, যোগিরাজ, যোগী (যোগিন্), যোগীন্দ্র, যোগীশ, যোগীশ্বর, যোগীশ্বরী, যোগেন্দ্র, যোগে-যাগে, যোগেশ, যোগেশ্বর, যোগেশ্বরী, যোগেষ্ট, যোগৈশ্বর্য্য, যোগ্য, যোগ্যতা, যোগ্যমান, যোগ্যা, যোজক, যোজন, যোজনগন্ধা, যোজনগন্ধী, যোজনবল্লী, যোজনা, যোজনিক, যোজনীয়, যোজয়িতা, যোজিত, যোজ্য, যোট, যোটক, যোটকশুদ্ধি, যোটন, যোটপাট, যোটা, যোটান, যোটাযোট, যোড়, যোড়-বাঁধা, যোড়শব্দ, যোড়া, (কোলযোড়া, জামাযোড়া), যোড়ায়-যোড়ায়, যোড়ে-যোড়ে, যৌক্তিক, যৌগ, যৌগপদ, যৌগপদ্য, যৌগিক, যৌজনিক, সংযুক্ত, সংযোগ, সংযোজক, সমুদ্যোগ, সম্প্রযুক্ত, সম্প্রয়োগ, সহযোগ, সুপ্রযুক্ত, সুপ্রয়োগ, সুযুক্ত, সুযুক্তি, সুসংযুক্ত।

● **যুজ্** = নবরূপী যাতার জনন। **যুজ** = নবরূপী যাতার জনন যাহাতে।

● **অযোগবাহ** : ৩. অযোগ (পাণিনিকৃত অণাদি চতুর্দ্দশ সংজ্ঞায় যোগরহিত বা অপঠিত) এবং তথাপি বাহ ষত্বণত্বাদি কার্য্যের নির্ব্বাহক। (ব.শ.)। অযোগ এবং তথাপি বাহ বা কার্য্যের নির্ব্বাহক। ৩. অনুস্বার বিসর্গ জিহ্বামূলীয় উপধ্মানীয় ও যম — এই সকল বর্ণ। ৫. যে বর্ণের বা শ্রেণীর মানুষগুলিকে সমাজের স্বাভাবিক কর্ম**যজ্ঞ** থেকে **যোগ**রহিত করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে তাদের একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, পরিবর্তে কতকগুলি বিশেষ কার্য্যের নির্ব্বাহক রূপে ঘোষণা করা হয়েছে, তারাই **অযোগবাহ বর্ণ**। অর্থাৎ মূল সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ কেটে দেওয়া হয়েছে, তাই অযোগ, কিন্তু তথাপি বাহ অর্থাৎ তারপরেও কিছু কিছু কাজ তাদের দিয়ে করানো হয়। বর্ণমালার অযোগবাহ বর্ণেরা বর্ণসমাজে তাদেরই প্রতিনিধিত্বকারী।

● **অযোনিজ, অযোনিসম্ভব, অযোনিসম্ভূত** : ২. *যে যোনি হইতে জাত নহে*। ৩. অগর্ভসম্ভূত, স্বয়ম্ভু, নিজবীর্যে উৎপত্তি, অযোনি (মানসাদি) হইতে জাত — মনুপ্রভৃতি। (ব.শ.)। ৫. যা কিছু মনুষ্য যোনি থেকে জন্মায়নি, জন্মায় না বা জন্মাবে না, তা সবই **অযোনিজ**। মন থেকে জাত (আইনজ্ঞ মানুষ বা **বৈবস্বত মনু**), কলসী থেকে জাত (**অগস্ত্য**), **সমুদ্রমন্থন** থেকে জাত (**লক্ষ্মী**), ভূমিকর্ষণ থেকে জাত (**সীতা** / চাষীদের আদি গিল্ড), **যজ্ঞ** থেকে জাত (**যাজ্ঞসেনী** / **দ্রৌপদী** / জয়েন্ট স্টক কোম্পানির আদি রূপ), ইত্যাদি — এঁরা সবাই অযোনিসম্ভব বা অযোনিসম্ভবা।

● **যুগ** : ২. *যাতা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া গমন করে যে স্থান-কাল-পাত্রে*। ৫. **চতুর্যুগ, কলিযুগ**। **সন্ধ্যা**। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে **যুগ** রূপে কাল ও পাত্রকেই পাওয়া যায়। লাঙলের জোয়ালকে যেমন **যুগ** বলা হয়, তেমনি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'যুগ-বাহক বলীবর্দ্দের' কথাও আছে। এই বলীবর্দ্দ সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, কলিযুগের মতো এক-একটা গোটা **যুগ**কে বা কালখণ্ডকে বহন করেন। পরিচালক **পুরুষ** এবং পরিচালিত **প্রকৃতি**, এই যুগলে কীরকমের যুগ (= yoke বা জোয়াল) বহন করছে, এই দুয়ের ভিতর সম্পর্ক কী রকম, সেটার দিকে নিশ্চয় ইঙ্গিত দেয় **যুগ**-এর নাম।

● **যোগ (অনুযোগ, অভিযোগ, আয়োগ, উপযোগ, নিয়োগ, দুর্যোগ, বিয়োগ, প্রতিযোগ, প্রয়োগ, যোগসাধনা, যোগী, সংযোগ, হঠযোগ)** : ২. ***যোগ** = **যুগ**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে যুক্ত হওয়ার ক্রিয়া সাধিত হয়। **অনুযোগ** = **যোগে**র পশ্চাৎ যাহা **যোগ** করা হয়। **অভিযোগ** = উপরিস্থিত থাকিয়া যাহা **যোগ** করা হয়। **আয়োগ** = **যোগে**র আশ্রয় যাহাতে। **উপযোগ** = **যোগে**র উপ যে; অথবা, যাহা **যোগে**র সহায়তাকারী রূপে যুক্ত হয়। **নিয়োগ** = গতিশীলভাবে অনুকৃত **যোগ** যাহাতে। **দুর্যোগ** = দুষ্ট **যোগ** যাহাতে। **বিয়োগ** = **যোগে**র বিপরীত ক্রিয়া যাহাতে। **প্রতিযোগ** = **যোগে**র বিপরীতে **যোগ** যাহাতে। **প্রয়োগ** = প্রকৃষ্ট **যোগ** যাহাতে। **যোগসাধনা** = **যোগ** করিবার জন্য যে সাধনা। **যোগী** = **যোগে**র গতিশীল আধার যে। **সংযোগ** = সম্যক **যোগ** যাহাতে। **হঠযোগ** = **হঠ** (হননের টঙ্কারস্থিতি) **যোগ** থাকে যাহাতে।* ৩. **যোগ** = যোজন, সঙ্গতি, সম্ভাবনা, সম্মেলন ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ব্যক্তিগত আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন এবং তপশ্চর্যা — যার সাহায্যে এই মিলন সম্ভব হয়। যোগদর্শনের প্রবক্তা পতঞ্জলি। ... পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **ফুলপাণ, ঢের, ঢেরাচিহ্ন, ধ্যানযোগ, পতঞ্জলি, প্রাণায়াম**। বাস্তবের কর্ম**যজ্ঞে** যে সকল জ্ঞান ও শ্রমের **প্রয়োগ** ঘটানো হয়, তারও দুটি রূপ ছিল আমাদের দেশে — প্রতীকী যোগ (নকশা) ও বাস্তব যোগ (তদনুসার বিল্ডিং)। দ্র. **যজ্ঞ**। সনাতন যুগের **শিবে**র **আধ্যাত্মিক** যোগকে বৈদিক যুগের অধঃপাতের সময়ে, আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, বৈদিকসমাজের নিরাময়ের উপায় হিসাবে পুনর্নবীকরণ করেন **পতঞ্জলী**। সনাতন যৌথসমাজের বহু বিদ্যাই এভাবে ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক সমাজের রোগ প্রশমনের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন একালের **পতঞ্জলি**র মতো মানুষেরা। স্বামী রামদেব সেই আদি প্রতীকী-যোগকে পুনরায় আপডেট করছেন। কার্যত, **যোগ** হল সর্বক্ষেত্রে **পুরুষ প্রকৃতি**র যোগসাধন। এর কোটি কোটি রূপ রয়েছে। এরই নিম্নতম রূপ হল মানুষের **দৈহিক** যোগসাধনা। এর মধ্যরূপ হল সমাজের উৎপাদন কর্মযজ্ঞে **পুরুষ-প্রকৃতি**র যোগসাধন করা। আর সর্বোচ্চ রূপ হল বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে (ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের সঙ্গে) আপন যোগসাধন করা। ...

● **যোগমায়া** : দ্র. **মায়া**।

● **যোগী** : ২. ***যোগ**-এর গতিশীল আধার যে; অথবা, **যোগ**-কে গতিশীল বা সক্রিয় করেন যিনি।* ৩. সমাধিশীল, যোগযুক্ত, লব্ধযোগ, ব্রহ্মবিদ্বান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **অজিন**। যিনিই জ্ঞান ও শ্রমকে বাস্তবের কোনো আধারে যোগ করেন, তিনিই যোগী; তা তিনি কৃষিক্ষেত্রে তাঁর কৃষিবিষয়ক ব্রহ্মজ্ঞান যোগ করুন আর পরমাণু শক্তি উৎপাদনের জন্য পরমাণু চুল্লী জ্বালিয়ে সেখানে তাঁর জ্ঞান যোগ করুন। আদিকালের যে **ব্রহ্মজ্ঞানী**গণ সামাজিক উৎপাদন কর্ম**যজ্ঞে** জ্ঞান-কর্মের **যোগ**সাধন করতেন, তাঁরা যে ধরনের পোষাক পরতেন, যেরূপ আচার-আচরণ করতেন, সেই বাহ্যিক পোষাক ও

আচার-আচরণটাই থেকে যায়, তাঁদের মূল কাজটিই লোকে ভুলে যায়। ফলত, **যোগী** বলতে একালে জটাজুটধারী বিশ্রী মানুষদের বোঝায়। কিন্তু ভোলা উচিত নয় যে, আদিতে **শিবগুণ**সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই **যোগী**-পদবাচ্য ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনকে বলা হত **যোগীশ্বর** বা **শিব**। বৈদিক যুগের সূচনার পরে এঁরা অবহেলিত হয়ে যান এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের **নাথ, দেবনাথ** (দ্র. **মৎস্যেন্দ্রনাথ**) ইত্যাদি রূপে আজও দেখতে পাওয়া যায়। এখনও এঁদের বলা হয়, এঁরা 'যুগীর বামুন'।

● **যোজন (প্রয়োজন, যোজনগন্ধা) : ২.** *যোজন = নবরূপে উত্তীর্ণ যাতা জনিত হইয়া অন যাহাতে, তাহার আশ্রয়।* **৩. যোজন** = যোগ, যুগে বন্ধন, যথাস্থানে স্থাপন, নিয়োগ, চিত্তসমাধান, বাক্যে পদার্থসমূহের অন্বয়, ক্রোশচতুষ্টয়যোগ, চার ক্রোশ, জীবাত্মার যোগস্থান। (ব.শ.)। **৫.** দ্র. **বুদ্ধি**। যোগ করার বিশেষ্য রূপ হল **যোজন**। যা কিছু **যোগ** করা হয়, তা সবই **যোজন**। রামবাবু **চিলেকোঠায়** উঠে **চিল্লিয়ে** মাঠে কর্মরত **মুনিষ**কে বললেন, 'বাঁকি-পাঁচকাঠায় কামিনরা সাঁচি তলা তুলে ফেলেছে, ওগুলো নিয়ে গিয়ে রুইতে লাগ।' **মুনিষ** তা শুনে সেই তলা নিয়ে গিয়ে রুইতে লাগল। এভাবে রামবাবুর দূরগামী নির্দেশ মুনিষের কর্মে যোজিত হয়ে গেল। যতদূর পর্যন্ত এভাবে গলার আওয়াজের সাহায্যে **যোজন** ঘটানো যায়, সেই দূরত্বকেও **যোজন** বলে। যার গন্ধ **যোজন যোজন** দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত কিংবা পড়ে, তাকে বলা হত **যোজনগন্ধা**। (দ্র. **মৎস্যগন্ধা**)।

আর এক ভাবেও **যোজন** শব্দটিকে দেখা যায়। খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আ**ক্রোশে** হুঙ্কার দিলে (অথবা ঢাক বাজালে) সে আওয়াজ যে দূরত্ব অতিক্রম করে, সেটিরই ইঙ্গিত দেয় **ক্রোশ**। এই **ক্রোশ**-এর মাপ, লীলাবতী মতে, আট হাজার হাত। (দ্র. ব.শ.)। বলা হয়েছে, চার **ক্রোশ**-এ এক **যোজন**। তা হলে ১ **যোজন** মানে ১০ মাইল বা ১৪ কিলোমিটারের মতো দূরত্ব। পণ্য চলাচল এবং প্রশাসনের স্বার্থে, বিশ্রাম তথা লেনদেন জাতীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য রাজকীয় সড়কপথে এক **যোজন** অন্তর অন্তর পরবর্তীকালের সরাইখানা তুল্য ব্যবস্থা অবশ্যই মৌর্য তথা গুপ্ত যুগের ভারতে হয়েছিল। এখানে ক্রয়-বিক্রয় এবং প্রশাসন-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের **যোজন** বা যোগাযোগ ঘটত। সেজন্য **যোজন** কথাটির প্রতীকী মানে দাঁড়িয়ে যায় বিশেষ একটা দূরত্বের মাপ।

তবে কিনা, প্রকৃষ্ট **যোজন** ঘটে **প্রয়োজন** ঘটাতে পারলে। যেমন 'বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান **প্রয়োজন**' ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারার প্রথম তিনটি ধারাকে যোজনা করা। ... ইত্যাদি। (দ্র. **বুদ্ধি**)। তার মানে, শব্দের নিহিতার্থের বিচারে **প্রয়োজন** শব্দের ভিতরে 'দরকার' কথাটি নেই; রয়েছে 'যাহা দ্বারা প্রকৃষ্ট যোজন করা যায়'। কিন্তু সেটিই তো সবচেয়ে ভালভাবে আমাদের 'দরকার' মেটায়। অতএব ব্যঞ্জনার্থে **প্রয়োজন** শব্দের মানে দাঁড়িয়ে যায় 'দরকার'।

● **যোড়শব্দ : ৫.** বাংলায় অজস্র যোড়শব্দ রয়েছে। এগুলি বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় এই সম্পদের প্রায় কিছুই নেই। অথচ এই শব্দগুলিকে বুঝে না বুঝে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। এই শব্দগুলির দুটি করে পক্ষ থাকে এবং তাদের উভয় পক্ষেরই অর্থও থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, প্রায় সমস্ত বাংলা অভিধানে এই ধরনের শব্দগুলিকে 'একার্থক' করে রাখা হয়েছে, কোথাও-বা বলা হয়েছে 'অনুশব্দ'। ...

যাই হোক, আমরা দেখেছি, বাংলাভাষার এই যোড়শব্দ প্রধানত চার প্রকার। ক) পরিপূরক যোড়শব্দ, যথা — **আশেপাশে, আধিব্যাধি, বাসনকোশন, যত্নআত্তি** ... ইত্যাদি (এই শব্দগুলির প্রত্যেকটির দুটি অংশ, এবং একটি আরেকটির পরিপূরক। তাই আমরা এদের নাম দিয়েছি 'পরিপূরক' **যোড়শব্দ**। দ্র. **আশেপাশে**); খ) পুরুষ-প্রকৃতিরূপী যোড়শব্দ, যথা — **কেশাকেশি, কচাকচি, হাতাহাতি, মাতামাতি, ধরাধরি** ... ইত্যাদি (এই শব্দগুলিরও দুটি অংশ; প্রথমটি অংশটি **প্রকৃতি**-গুণসম্পন্ন এবং দ্বিতীয়টি **পুরুষ**-গুণসম্পন্ন। তাই আমরা এদের নাম দিয়েছি 'পুরুষ-প্রকৃতি' **যোড়শব্দ**। দ্র. **কচাকচি**); গ) সহোদর যোড়শব্দ — **কাটকুট, ঘোঁতঘাত, চুপচাপ, ধুমধাম, ধুপধাপ, মিটমাট, মোটমাট** ... ইত্যাদি (এই শব্দগুলি সহোদর ভাইয়ের মতো মূলত একই ক্রিয়া থেকে অগ্রজ-অনুজ রূপে জন্মায়। তাই আমরা এদের নাম দিয়েছি 'সহোদর' **যোড়শব্দ**। দ্র. **মিটমাট**); ঘ) অনুকারী যোড়শব্দ, যথা — **জল-টল, ভাত-টাত, বাস-টাস** ... ইত্যাদি (এই শব্দগুলির দ্বিতীয় অংশটির কাজ হল প্রথম অংশের উচ্চারণমূলক অনুকরণ এবং আর্থিক স্বভাব হল প্রথম অংশের বহুবচন রূপটিকে বোঝানো। যেমন জল-টল মানে জল ইত্যাদি, ভাত-টাত মানে ভাত ইত্যাদি। সেই কারণে আমরা এদের নাম দিয়েছি 'অনুকারী' **যোড়শব্দ**।)। মোটকথা, কোনো যোড়শব্দই 'একার্থক', 'অনুশব্দ' ... ইত্যাদি নয়।

● **যুধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অযুদ্ধ, অযোদ্ধা, অযোদ্ধৃ, অযোদ্ধ্যা, অযোধ্য, অযোধ্যা, অযোধ্যাকাণ্ড, আয়ুধ, আয়ুধজীবী, আয়ুধপাল, আয়ুধপিশাচিকা, আয়ুধব্যসন, আয়ুধশালা, আয়ুধাগার, আয়ুধিক, আয়ুধীয়, আযোধন, জুজ, জুঝ, জুঝার, জুঝারু, ঝুঝ, যুৎ (যুধ্), যুদ্ধ, যুদ্ধকাণ্ড, যুদ্ধঘর, যুদ্ধঘরা, যুদ্ধজিৎ, যুদ্ধতন্ত্র, যুদ্ধদ্যুত, যুদ্ধধর্ম্ম, যুদ্ধধ্বনি, যুদ্ধবস্তু, যুদ্ধবিদ্যা, যুদ্ধবিশারদ, যুদ্ধবীর, যুদ্ধভূ, যুদ্ধভূমি, যুদ্ধমার্গ, যুদ্ধরঙ্গ, যুদ্ধশালী, যুদ্ধাচার্য্য, যুদ্ধাধ্বা (যুদ্ধাধ্বন্), যুদ্ধাবহারিক, যুদ্ধোদ্যোগ, যুদ্ধোন্মত্ত, যুদ্ধোপকরণ, যুধ্, যুধাজিৎ, যুধামন্যু, যুধিষ্ঠির, যোদ্ধব্য, যোদ্ধাগণ, যোদ্ধাপতি, যোদ্ধৃকাম, যোদ্ধৃপতি, যোধ, যোধক, যোধধর্ম্ম, যোধন, যোধপতি, যোধবীর, যোধমুখ্য, যোধসংরাব, যোধা, যোধাগার, যোধী, যৌধিক, যৌধিষ্ঠির, যৌধিষ্ঠিরি, যৌধেয়।

● **যুধ্** = নবরূপী যাতার ধারণ। **যুধ** = নবরূপী যাতার ধারণ যাহাতে।

● **অযোধ : ১.** যুধ্ = যুদ্ধ, পরস্পর-অভিভবেচ্ছা। **২.** *যে অযুদ্ধ করে। / যে যোদ্ধা নহে।* (ব.শ.)। **৩.** অযোদ্ধা, অযোদ্ধৃ, অকুশল যোদ্ধা। (ব.শ.)। **৫.** যে বেচাকেনা, টানাটানি করে, কিন্তু প্রাণে-মারা দৈহিক যুদ্ধ করে না, অর্থনৈতিক যুদ্ধ করে, তাকেই অযোধ বলে। পরস্পরকে প্রাণে না মেরে হাটে বা বাজারে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধ যে করে। মালকাড়াকাড়ির যুদ্ধ বা **মল্ল**যুদ্ধ করে যে। দ্র. **অরণ**। একটা যুগ ছিল, যখন সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধ করত না, করতে অভ্যস্ত ছিল না। যারা করত, তারা সেযুগের আধুনিক, বিপ্লবী,

উর্ধ্বসীমা-লঙ্ঘনকারী। বর্তমান কালের প্রায় সব মানুষই অযোধ।

● **অযোধ্য** : ২. *যাহাতে অযোধগণ (লিপ্ত) থাকে*। ৩. যুদ্ধে অশক্য, অনাক্রমণীয়, অনভিভবনীয়। (ব.শ.)। ৫. বাজার, হাট, কেনাবেচার স্থানে যে ক্রিয়া চলে, সেই ক্রিয়াকেই অযোধ্য বলে। পণ্যবিনিময়ের টানাটানি। অর্থনৈতিক যুদ্ধ।

● **অযোধ্যা** : ২. *যে আধারে (স্থানে) অযোধ্য থাকে*। ৩. কোশলা, উত্তরকোশলা, সাকেত। রামায়ণ অনুসারে ইহা সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী এবং সরযূতীরে কোশল জনপদের অন্তর্গত ছিল। মনু ইহার নির্ম্মাতা। ইহা দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন এবং বিস্তারে তিন যোজন ছিল। পদ্মপুরাণ অনুসারে ইহা মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর একতমা। (ব.শ.)। ৫. স্থানের নাম। ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি স্থানের এই নাম রয়েছে। তবে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা নামক স্থানটিই খ্যাতনামা। সেকালে যে যে স্থানে কারুজীবীদের (কুশলতা > কোশল, **কৌশল্যা**) অধিক বসতি ছিল এবং কমবেশি বিনিময়ের পরিবেশ ছিল, প্রথম দিকে বৈদিকগণের দৃষ্টিতে সেগুলি নিন্দিত স্থান হিসেবে ঘোষিত থাকলেও, পরে বৌদ্ধযুগে (রামরাজত্বকালে) বিনিময়ের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই স্থানগুলিই গৌরবজনক হয়ে যায়। [অযোধ্যা বা কোশল ছাড়া এরূপ বাকি '**মোক্ষ**দায়িকা সপ্তপুরী' হল — অবন্তি (**উজ্জয়িনী**), কাশী (**বারাণসী**), কাঞ্চী (কাঞ্জিভরম) ... ইত্যাদি।] বৌদ্ধযুগের বিনাশের পর পুরোহিতের চোখে ঘৃণ্য **রাম** (স্মর্তব্য: ছিঃ ছিঃ রাম রাম) ও তার রাজত্বের (অযোধ্যার) সমর্থক জনসাধারণকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়। বর্তমান ভারতের '**বাল্মীকি**', '**রাম**' পদবীধারী মানুষদের সবাই সেকারণে মেথর, অস্পৃশ্য ও শূদ্র। পরে, এই শূদ্রদের বড় অংশই মুসলমান হয়ে যায়। তাই এইসব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। কালে কালে শূদ্রের সেই রামলালাকে পুরোহিতেরা হাইজ্যাক করে নেয়। যাকে তারা ঘৃণা করত, তারই পূজা শুরু করে দেয়। শূদ্ররা হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। কী করা উচিত বুঝতে পারে না।

যুধিষ্ঠির : ২. **যুদ্ধে** *স্থির থাকেন যিনি*। ৩. স্বার্থসিদ্ধার্থ অস্ত্রাদির ব্যাপার, সমর, রণ, সংগ্রাম, গ্রহগণের প্রতিকূলভাব। (ব.শ.)। দ্র. পৌ.অ.। ৫. **যুদ্ধ** মানে একালে আমরা 'মারামারি' বুঝি। তা কিন্তু নয়। **য** = যাওয়া। **যু** = না যাওয়া, থাকা। এই থাকা বা স্থায়িত্ব দেয় যে, সে হল **যুদ**। **যুদ্**-কে ধরে রাখে **যুদ্ধ**। তার মানে, আমরা যেভাবে আবর্তিত হয়ে থাকতে চাই, সেভাবে থাকার জন্য আমরা যা করি, সেটি তখনই **যুদ্ধ**-পদবাচ্য হয়ে যায়, যখন বিপরীতপক্ষে অপর কেউ একইভাবে থাকতে চায় এবং একই চেষ্টা করে। একে 'সমানভাবে আবর্ত্তিত থাকা' বা **সমর** বলে। এটি আবর্ত্তিতের রহস্যরূপ বলে একে **রণ** বলে। দ্র. **গ্রাম**। ... সেইরূপ **যুদ্ধে**, তা সে মানসিক কিংবা বাহ্যিক যেমনই হোক না কেন, কেউ যখন স্থির থাকেন, তাঁকে **যুধিষ্ঠির** বলে।

● **য্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা** : জহি, জহিঁ, য, যঁহা, যহি, যঁহি, য-কার, য-ফলা, যশ, যিশু, যুনানী (Ionian), যুমাবার (জুমাবার, জমা হওয়া), যুয়া (জুয়া), য়্যাদ, য়্যার।

● **যশ** : ১. য্ + **অশ**। ২. *যাতার ব্যাপ্তি যাহাতে; অথবা, যাতা সার্বিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে*। ৩. 'সর্ব্বত্র ব্যাপী', কীর্ত্তি, শৌর্য্যাদি-জাত খ্যাতি, জীবিতের খ্যাতি। (ব.শ.)। ৫. যা কিছু যায়, তারা হল যাতা। সেই যাতাসমূহের মধ্যে যে সত্তা সার্বিকভাবে বিচ্ছুরিত হয়, তাকে **যশ** বলে। সেই সুবাদে সূর্যকিরণকেও **যশ** বলা যেতে পারত, কিন্তু তা বলা হয় না। বলা হলে, সেটি হত শব্দটির দৃশ্য অর্থ। অদৃশ্য বা প্রকৃত অর্থ হল — মানবসমাজে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তির কথাকে **যশ** বলা হয়। আর তা বিচ্ছুরিত হয় সমাজে। এটিই **যশ** শব্দের অর্থ রূপে প্রচলিত রয়েছে।

র

র্ বর্ণের অর্থ : **র** = র্-অন করে যে; রক্ষী-ভক্ষী; রক্ষক। এখানে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, **ঋ** হল ঘুরতে থাকা বা আবর্ত্তন, যা ক্রমশ একই স্থানে আবর্ত্তিত হতে থাকলে এবং শ্লথ হতে থাকলে তার নিম্নরূপে বা **র**-এ পৌঁছায়; সেই সুবাদে **র** মানে আবর্ত্তমান। এমনভাবে আবর্ত্তমান যে দেখে মনে হয় যে সে স্থির হয়ে রয়েছে। কিন্তু বিশ্বে কোনো বস্তুই স্থির নয়, দৃশ্যত স্থির হলেও সে অবশ্যই আবর্ত্তমান, তা সে যত শ্লথই হোক। এর মধ্যে অতি দ্রুত আবর্ত্তন ও অদৃশ্য আবর্ত্তন বোঝাতেই **ঋ**-এর ব্যবহার হয় এবং তুলনায় শ্লথ আবর্ত্তন, অদৃশ্য ও দৃশ্য আবর্ত্তনকে বোঝাতেই **র**-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। অস্তিত্বের এই আবর্ত্তন অতি দ্রুত কিংবা অতি শ্লথ হয়ে গেলে অস্তিত্বটিই থাকে না, বিলুপ্ত হয়। তাই **র** মানে দৃশ্যত বা অদৃশ্যত রহন; যা মাত্রাধিক হয়ে গেলেই রক্ষণশীল হয়ে মৌলবাদী হয়ে মৃত্যুর দিকে চলে যায়, রক্ষক ভক্ষক হয়ে রাক্ষসের আচরণ করে এবং **র** আর রহন থাকে না। ... দ্র. **ধর**।

আমাদের পূর্বসূরীগণ একটি বিষয়ের সাতটি পর্যায়ক্রমিক রূপকে সাতটি বর্ণে ধারণ করে প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি হল অস্তিত্বের স্থির রূপ গ্রহণ থেকে বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সাতটি অধ্যায়। একে তাঁরা প্রকাশ করেছেন সাতটি বর্ণে — **ধ, র (ল), শ, ষ, স, হ, ঃ**। বিলুপ্তির পথে অস্তিত্বের এই গমনের পথের সূত্রপাত অবশ্যই **অ** থেকে। জন্মের সময় থেকেই মৃত্যুর দিকে হাঁটা শুরু হয় এবং যত হাঁটতে থাকে ততই মৃত্যুর সঙ্গে দূরত্ব কমতে থাকে। সেই দূরত্ব শূন্যে পরিণত হওয়া মাত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে যায়। তবে **ধ** থেকে যেন তার অপরাহ্ণের সূচনা হয়, তারপর তার অগ্রগতি বিলুপ্তির দিকে — **ধ > র (ল) > শ > ষ > স > হ > ঃ**। কোনো একটি সত্তাকে কেউ যদি **ধ**রে নেয়, এমনভাবে আধারীভূত করে নেয় যে, সেই সত্তাটি স্থির হয়ে **র**াখা হয়ে যায়; অর্থাৎ, তখন সত্তাটির আব**র্ত্তমান**তা স্তব্ধ হয়ে শুধুমাত্র **র**ক্ষিত হয়ে যায়। অতঃপর তার **শ**ক্তিরূপে বিচ্ছুরিত হয়ে যাওয়ার অধ্যায়। তার থেকে সেটি দিশাগ্রস্ত (**ষ**) হয়, সেখান থেকে অস্তিত্বমাত্রে বা **স**-এ পর্য্যবসিত হয়। এরপর তার আর অস্তিত্ব নাই, বিসর্গ, অন্ধকার। সে স্থির হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাস্তবে কোনো সত্তাই কিন্তু স্থির নয়। স্থির হয়ে গেলেই তার অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে এগোবে। এই কারণে **অবধান** পরিণত হয় **অবহিত**তে, **ধ** হয়ে যায় **হ**। এই **হ** আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশেষ হওয়ার দিকে এগোতে থাকে। নিঃশেষ হয়ে গেলেই তাকে **ঃ** (বিসর্গ) বলে। যে কারণে আমরা **বহ্**-কে **বস্** বা **বঃ** বলতে পারি। কোনো

শব্দের শেষে যখন বিসর্গ প্রয়োগ করা হয়, তখন সেটি কার্যত আর বাস্তব অস্তিত্ব বোঝায় না, মানসলোকে সীমায়িত করে নেওয়া স্থির সত্তা-মাত্রকে বোঝায়। অতএব **র** = আবর্ত্তিত সত্তা, আবর্ত্তিত, আবর্ত্তন, রহন, রক্ষী-ভক্ষী, রক্ষক-ভক্ষক। অতঃপর **প** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।

● **র্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা** : রক্ষ্, রঞ্জ্ (রন্‌জ্, *রঞ্জি*), *রট্, রণ্, রদ্ (রধ্)*, রভ্, রম্ (*রমি*), *রস্, রহ্, রা*, রাজ্, রাধ্, *রিচ্ (ঋচ্, অর্চ্, রচ্), রিষ্ (ঋষ্), রী (ঋ)*, রু, *রুজ্*, রুচ্, রুদ্ (*রোদি*), রুধ্, *রুষ্ (লূ)*, রুহ্, *রূপ্, রেখ্ (লিখ্)*, র্।

● **রক্ষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অরক্ষণীয়, অরক্ষণীয়া, অরক্ষণে, অরক্ষিত, আখোয়াল, আরক্ষ, আরক্ষক, আরক্ষা, আরক্ষিত, আরক্ষ্য, গোরক্ষ, রক্ষ্, রক্ষ, রক্ষঃ, রক্ষঃকুল, রক্ষঃপতি, রক্ষঃপুর, রক্ষঃসভ, রক্ষক, রক্ষণ, রক্ষণা, রক্ষণাবেক্ষণ, রক্ষণী, রক্ষণীয়, রক্ষা, রক্ষাকরণ্ড, রক্ষাকরণ্ডক, রক্ষাগৃহ, রক্ষাধিকৃত, রক্ষাধিপতি, রক্ষানুপেক্ষণ, রক্ষাপতি, রক্ষাপত্র, বক্ষাপুরুষ, রক্ষাপ্রদীপ, রক্ষাভূষণ, রক্ষামঙ্গল, রক্ষামণি, রক্ষামন্ত্র, রক্ষারত্ন, রক্ষাসূত্র, রক্ষিক, রক্ষিকা, রক্ষিণী, রক্ষিত, রক্ষিতব্য, রক্ষিতা, রক্ষিবর্গ, রক্ষী (রক্ষিন্), রক্ষেন্দ্র, রক্ষেশ্বর, রক্ষোগণ, রক্ষোঘ্ন, রক্ষোঘ্নী, রক্ষোজন, রক্ষোজননী, রক্ষোনাথ, রক্ষোহা, রক্ষ্য, রক্‌খা, রাক্ষস, রাক্ষসগণী, রাক্ষসালয়, রাক্ষসী, রাক্ষসীবেলা, রাক্ষসেন্দ্র, রাক্ষসেন্দ্রাণী, রাক্ষসেশ, রাক্ষসেশ্বর, রাক্ষসেষ্টি, রাখ, রাখআল, রাখন, রাখা, রাখাল, রাখাল-বালক, রাখালরাজা, রাখালি, রাখালিয়া, রাখালী, রাখী, রাখীডোর, রাখীপূর্ণিমা, রাখীবন্ধভাই, রাখো, রাখোআল, রাখোয়াল, রাখোয়ালী, রিরক্ষা, রিরক্ষিষা, রিরক্ষিষু, রিরক্ষু, রৈক্ষা, সংরক্ষক, সংরক্ষণ, সংরক্ষিত, সুরক্ষিত।

● **রক্ষ্** = রহনের বা আবর্ত্তনের ক্ষ-অন। **রক্ষ** = রহনের বা আবর্ত্তনের ক্ষ-অন যাহাতে।

● **রক্ষ** : ২. *(আবর্ত্তিতের) আবর্ত্তনের গতিকে ক্ষয় করে যে।* / যাহা হইতে হবিরাদি রক্ষিত হয়। (ব.শ.)। **৫. দ্র. দক্ষ, যক্ষ**। লোকশ্রুতি ও পুরাণাদি অনুসারে, যে রক্ষক সেই ভক্ষক হলে তাকে **রাক্ষস** বলে। দ্র. **ভক্ষক, রাক্ষস**।

● **রক্ষরজা** : দ্র. **ঋক্ষরজা**।

● **রাক্ষস** : **২.** ***রক্ষস্*** *হইতে জাত।* **৩.** রাক্ষসসম্বন্ধী, রক্ষোযোগ্য, তমঃপ্রধান, রাক্ষসোচিত, রক্ষঃ, নিশাচর, (**ব্রহ্মা**র ক্ষুধা হইতে **রা**ক্ষসের উৎপত্তি। — বহ্নিপুরাণ), **অষ্টবিধ বিবাহ**-এর একতম, নন্দরাজমন্ত্রী, যোগবিশেষ। (ব.শ.)। ... সাধারণত রাক্ষস তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীকে অনেকটা **যক্ষ**দের মতো বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী অত্যন্ত শক্তিশালী, এরা দেবতাদের শত্রু; তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে **দানব** ইত্যাদিরা। এরা সাধারণত নিষিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করে, **যজ্ঞ** নষ্ট করে, ... মানুষকে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীভুক্ত রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে **রাবণ**। ... কথিত আছে, **শিব** পার্বতী একবার রাক্ষসদের বর দিয়েছিলেন যে, রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণ মাত্রই সন্তান প্রসব করবে এবং সেই সন্তান মাতার সমকক্ষ হবে। মহাভারতে ভীম কর্তৃক বক, **কির্মীর**, ও হিড়িম্ব রাক্ষসদের বিনাশ এবং হিড়িম্বাকে ভীমের বিবাহের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। (পৌ.অ.)। দ্র. **ঘটোৎকচ**। **৫.** দ্র. **যক্ষ, রক্ষ**। সামাজিক ক্ষেত্রে একালের ভাষায় যাকে 'পাবলিক সেকটর' বলে, সেকালে তারই প্রাচীন রূপকে বলা হত **রাক্ষস**। সাধারণত যে 'পাবলিক সেকটর'কে ভরতুকি দিয়ে চালাতে হয়, তাকেই **রাক্ষস** বলা যায়। কিন্তু কোনো কোনো পাবলিক সেকটর তো লাভও করে, সমাজের উন্নয়নের চেষ্টাও করে! তাদের কিন্তু **রাক্ষস** বলা যায় না।

আসলে, সে তো রক্ষা করবে বলেছিল (দ্র. **যক্ষ**), কিন্তু রক্ষা না করে নিজেই ভক্ষণ করে ফেলে বলেই তাকে **রাক্ষস** বলা হয়। সমাজের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি, সম্পদসমূহ ... এসবই তো সেকালে ছিল যৌথ ব্যবস্থার বা আদি পাবলিক সেকটরের কবলে। আর, শুরুতে তা অত্যন্ত ভালও ছিল। (দ্র. 'ঙ' গ্রন্থের 'লক্ষ্মীর পাঁচালি ...' নিবন্ধ)। যেমন কিনা, কোনো একটি দেশের বিপ্লবোত্তর কালে কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর কালে যে সকল পাবলিক সেকটর কাজ শুরু করে তারা অত্যন্ত ভাল কাজই করে। কেননা, তখনও সংশ্লিষ্ট সকলের মনে একটা লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হওয়াই তাদের কাছে প্রাথমিকতা পায়, উন্মাদনার কারণ রূপে সক্রিয় থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ লক্ষ্যটি চলে যায় দ্বিতীয় স্থানে, আর তখনই লক্ষ্যের থেকে চোখ সরে চলে আসে নিজেদের দিকে। তখনই শুরু হয়ে যায় **রক্ষণ**-এর বদলে **ভক্ষণ**। এটি একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া। যে আদর্শকে ভিত্তি করে দৌড় শুরু হয়, সেই আদর্শ মৌলবাদী হয়ে গেলেই লক্ষ্য হারিয়ে যায়, শুরু হয়ে যায় কূটকচালি। তখন ক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে যায় প্রথম কাজ। ...

রাক্ষসী : দ্র. **জরা**।

রাক্ষসীবেলা : দ্র. **বিকাল**। বিনা কাজে সময় ব্যয়িত হলে তাকে **রাক্ষসীবেলা** বলার একটা মানে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু বেকাজে অর্থাৎ যে কাজে মানুষটির মনুষ্যত্বের আত্মার কোনোরকম তৃপ্তি বা শান্তি লাভ হয় না, অথচ সমগ্র জীবন-সময়ই ব্যয় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মানুষের সমস্ত জীবনই তো রাক্ষসীবেলার ভোগে লেগে যায়! একালের বিশ্বায়িত সভ্যতা সভ্য মানুষের জন্য যে কর্মজীবনের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তাতে জীবন খরচ হয়ে যায়, কিন্তু তার থেকে কোনোরকম তৃপ্তি বা শান্তি লাভ হয় না। সর্ষের মতো বিন্দু বিন্দু জীবন-সময় সংসারের ঘানি টানতে টানতে ঢালা হয়ে যায়, তার থেকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তেজ বেরিয়ে যায়, তেল বেরোয় না'। আজকের বিশ্বের সভ্যমানুষের জীবন তাই সম্পূর্ণভাবেই **রাক্ষসীবেলার** গ্রাসে চলে গেছে।

● **রঞ্জ্ (রন্‌জ্, *রঞ্জি*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরক্ত, অনুরক্ত, অনুরাগ, অনুরাগী, অরজস্ক, অরজাঃ, অলক্ত, অলক্তক, অলক্তকরস, অলক্তরস, অলক্তরাগ, অলত, অলতক, আরক্ত, আরক্তিম, আরঙ্গি, আলতা, বিরক্ত, বিরাগ, বৈরাগী, বৈরাগ্য, রং, রংকাণা, রংতামাসা, রংবিরং, রংবেরং, রংমশাল, রংহ (দ্র. বৃংহ), রংহণ (বৃংহণ), রক্ত, রক্তক, রক্তকণ্ঠ, রক্তকণ্ঠী, রক্তকদম্ব, রক্তকন্দ, রক্তকমল, রক্তকম্বল, রক্তকরবীর, রক্তকাঞ্চন, রক্তকাণ্ডা, রক্তকিঙ্কিনী, রক্তকুমুদ, রক্তকুমুদিনী, রক্তকৃমিজা, রক্তকেশর, রক্তকৈরব, রক্তখদির, রক্তগন্ধক, রক্তগুল্ম, রক্তগ্রীব, রক্তঘ্ন, রক্তঘ্নী, রক্তচন্দন, রক্তচিতা, রক্তচিত্রক, রক্তচূর্ণ, রক্তছর্দ্দি, রক্তজবা, রক্তজ্বরা,

রক্তজিহ্ব, রক্তঝিন্টি, রক্ততুণ্ড, রক্ততেজঃ, রক্তদন্তিকা, রক্তদন্তী, রক্তদুষ্টি, রক্তদূষণ, রক্তদৃক্, রক্তদৃষ্টি, রক্তধাতু, রক্তনাল, রক্তপ, রক্তপট, রক্তপত্রিকা, রক্তপদ্ম, রক্তপল্লব, রক্তপা, রক্তপাত, রক্তপাদ, রক্তপাদী, রক্তপায়িনী, রক্তপায়ী, রক্তপারদ, রক্তপিটিকা, রক্তপিত্ত, রক্তপুষ্প, রক্তপুষ্পা, রক্তপুষ্পিকা, রক্তপুষ্পী, রক্তপূরক, রক্তপ্রদর, রক্তপ্রবাহ, রক্তপ্রমেহ, রক্তপ্রান্ত, রক্তফলা, রক্তবটী, রক্তবর্গ, রক্তবর্ণ, রক্তবর্দ্ধন, রক্তবসন, রক্তবাত, রক্তবালুক, রক্তবাসাঃ, রক্তবিকার, রক্তবিদ্রধি, রক্তবিন্দু, রক্তবিলিপ্ত, রক্তবীজ, রক্তবোড়া, রক্তভাব, রক্তমণ্ডল, রক্তমৎস্য, রক্তমেহ, রক্তমোক্ষণ, রক্তযষ্টি, রক্তরাজি, রক্তরেণু, রক্তলশুন, রক্তলোচন, রক্তশালি, রক্তশীর্ষক, রক্তসংজ্ঞ, রক্তসন্ধ্যক, রক্তসর্ষপ, রক্তসার, রক্তসৌগন্ধিক, রক্তস্রাব, রক্তা, রক্তাংশুক, রক্তাকার, রক্তাক্ত, রক্তাক্ষ, রক্তাঙ্ক, রক্তাঙ্গ, রক্তাঙ্গী, রক্তাতি(তী)সার, রক্তাধার, রক্তাপামার্গ, রক্তাভ, রক্তাম্বর, রক্তাম্বুরুহ, রক্তারক্তি, রক্তারুণ, রক্তার্ব্বুদ, রক্তার্শঃ, রক্তালু, রক্তালুক, রক্তাশয়, রক্তাশোক, রক্তি, রক্তিকা, রক্তিম, রক্তিমা (রক্তিমন্), রক্তেক্ষু, রক্তৈরণ্ড, রক্তোৎপল, রক্তোপল, রগরগ, রঙ, রঙচঙা, রঙচঙে, রঙন, রঙমহাল, রঙা, রঙিন, রঙীন, রঙ্গ, রঙ্গকর, রঙ্গকার, রঙ্গ কারক, রঙ্গচর, রঙ্গচঙ্গ (রংঢং), রঙ্গচিঙ্গা, রঙ্গজ, রঙ্গজীবক, রঙ্গঢ, রঙ্গণ(ন), রঙ্গতামাশা, রঙ্গদ, রঙ্গদা, রঙ্গদার (রংদার), রঙ্গদেবতা, রঙ্গদ্বার, রঙ্গপত্রী, রঙ্গপীঠ, রঙ্গপ্রসাদন, রঙ্গবস্তু, রঙ্গবস্ত্র, রঙ্গবাজ, রঙ্গবাট, রঙ্গবিদ্যা, রঙ্গবিরঙ্গ, রঙ্গবীজ, রঙ্গভঙ্গ, রঙ্গভূমি, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গমণ্ডপ, রঙ্গমশাল, রঙ্গমহল, রঙ্গমাটি, রঙ্গমাণিক্য, রঙ্গমাতা, রঙ্গরস, রঙ্গরেজ, রঙ্গশালা, রঙ্গা, রঙ্গাঙ্গণ, রঙ্গাজীব, রঙ্গাবতরণ, রঙ্গাবতারক, রঙ্গাবতারী, রঙ্গালয়, রঙ্গিএগ্রা, রঙ্গিণী, রঙ্গিত, রঙ্গিন, রঙ্গিম, রঙ্গিমা, রঙ্গিয়া, রঙ্গিল, রঙ্গিলা, রঙ্গী (রঙ্গিন্), রজ, রজঃ, রজঃকণ, রজঃপটল, রজঃপ্লুত, রজঃশয়, রজঃশুদ্ধি, রজঃসারথি, রজঃস্পৃক্, রজক, রজকিনী, রজকী, রজত, রজতকূট, রজতগিরি, রজপর্ব্বত, রজতপাত্র, রজতভাজন, রজতাচল, রজতাদ্রি, রজদ্বীপ, রজন, রজনি, রজনিম্মন্য, রজনী, রজনীকর, রজনীকৃৎ, রজনীকান্ত, রজনীগন্ধা, রজনীচর, রজনীজল, রজনীনাথ, রজনীপতি, রজনীবদন, রজনীবিহান, রজনীরমণ, রজনীরাজ, রজনীরাজন, রজনীশ, রজনীসখা, রজনীহাসা, রজপুত, রজস্তোক, রজস্বল, রজস্বলা, রজস্বী, রজিত, রজু, রজোগুণ, রজোদর্শন, রজোনিমীলিত, রজোবন্ধ, রজোমেঘ, রজোরিক্ত, রজোহার, রঞ্জ, রঞ্জক, রঞ্জকঘর, রঞ্জকঘরা, রঞ্জকী, রঞ্জন, রঞ্জনদ্রব্য, রঞ্জনদ্রু, রঞ্জনী, রঞ্জনীয়, রঞ্জা, রঞ্জিত, রঞ্জিনী, রঞ্জুক, রন্জ্, রয়নি, রাং (রাঙ, রাঙ্গ), রাং-চিতা, রাং-ঝাল, রাংতা, রাগ, রাগখাণ্ডব, রাগচূর্ণ, রাগত, রাগদ, রাগদালি, রাগদ্রব্য, রাগপুষ্প, রাগবন্ধ, রাগবান (-বৎ), রাগময়, রাগমার্গ, রাগলেখা, রাগষাড়ব, রাগষাঢ়ব, রাগসূত্র, রাগা, রাগাঢ্যা, রাগাত্মক, রাগাত্মিকা, রাগানুগা, রাগান্বিত, রাগিণী, রাগী, রাঙ, রাঙঝাল, রাঙণ, রাঙা, রাঙাআলু, রাঙাচোঙা, রাঙাদাদা, রাঙামাটী, রাঙামুখ, রাঙামূলা, রাঙ্গ, রাঙ্গচিতা, রাঙ্গচিত্র, রাঙ্গণ, রাঙ্গা, রাঙ্গাকড়ি, রাঙ্গাধুলা, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গারায়মণি, রাঙ্গাল, রাঙ্গি, রাঙ্গী, রাজত, রাজস, রাজস-আহার, রাজসকর্ম্ম, রাজসত্যাগ, রাজসযজ্ঞ, রাজসিক, রাজসী, রাজসী-বুদ্ধি, রাজি, রাজিকা (রাই), রাজিকাফল, রাজী, রাজীব, রাজীবনেত্র, রাজীবলোচন, রাজীবমুখ, রাজীবরাজ, রাজীবরাজী, রাজীবিনী, রাজীফল, রাজ্যক্তা, রায়তা, রাতা, রাতা-উৎপল, রাতুল, লক্তক, ষড়রাগ, সংরাগ, সরাগ, সুরক্ত, সুরঙ্গ।

● **রঞ্জ্ (রন্জ্, রঞ্জি)** = আবর্ত্তনমূলক রহনের রহস্যরূপ জনন। **রঞ্জ** = আবর্ত্তনমূলক রহনের রহস্যরূপের জনন যাহাতে। **রন্জ** = আবর্ত্তনমূলক রহনের অনুকরণ জনিত যাহাতে। **রঞ্জি** = আবর্ত্তনমূলক রহনের রহস্যরূপের জনন গতিশীল যাহাতে।

● **রক্ত (বিরক্ত, বিরক্তি) : ১.** ✓রন্জ্ + ত (ক্ত) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **রক্ত** = *আবর্ত্তন অনুকৃত হয়ে জননপূর্ব্বক তারিত যাহাতে; অথবা* **রং** *(আবর্ত্তিতের রহস্যরূপ) জনিত ও তারিত যাহাতে।* **বিরক্ত** = *যে বিপরীতভাবে* **রক্ত** *বা রঞ্জিত হইয়াছে।* **বিরক্তি ●** = **বিরক্ত** *সক্রিয় যাহাতে।* **৩.** অনুরাগযুক্ত, অনুরক্ত, শ্রব্য, ক্রীড়ারত, আপাদিত-বর্ণান্তর, লোহিত, রক্তবর্ণ, কুসুম্ভ, ... শোণিত, রুধির, ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৫.** **রক্ত** বললে আমরা সাধারণত blood বুঝি। কিন্তু **রক্ত** শব্দের নিহিতার্থ সেভাবে শুধুমাত্র blood-কে বোঝায় না। যা কিছু 'রঞ্জিত' তাকেই **রক্ত** বলে, তা সে গায়ের **রক্ত** হোক, আর অন্য কোনো রকম 'রঞ্জিত' বাহ্যিক বা মানসিক বস্তু বা বিষয়ই হোক। সেই সুবাদে বাহ্যিক কুঙ্কুম সিন্দুর ... ইত্যাদি যেমন **রক্ত**-পদবাচ্য, তেমনি মানসিক অনুরাগ, আসক্তি ... ইত্যাদিও **রক্ত**-পদবাচ্য। যে কারণে 'অনুরাগিত' হলে তাকে বলা হয় **অনুরক্ত**। তন্মধ্যে মন যে রং পছন্দ করে না, তেমন রঙে মনকে রাঙিয়ে দিলে মন তাতে **বিরক্ত** হয়। তার সেই **বিরক্তি**র রং যতই কাল, লাল, বা নীল ... ইত্যাদি হোক, মন কিন্তু তাতেই রাঙানো হয়ে গেছেই বলেই সে **বিরক্ত**।

● **রক্তবীজ : ২.** *রঞ্জিত* ***বীজ*** *যাহার।* **৩. দানব**রাজ রম্ভের মৃত্যু হলে **যক্ষ**রা মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে। রম্ভের স্ত্রীও সহমরণের জন্য চিতারোহন করেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ করলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ করে **মহিষাসুর** নির্গত হয়। তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি স্নেহবশত রূপান্তর গ্রহণ করে চিতা হতে উত্থিত হলেন। এই রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ নামে খ্যাত। ইনি দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি ছিলেন। ... যুদ্ধে এর শরবিদ্ধ দেহ হতে যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়ত, তা থেকে রক্তবীজের মতো ভয়ঙ্কর বলবীর্যসমন্বিত তত মহাশূর তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হত। এই জন্য ইন্দ্র নিজের **বজ্র** দিয়ে একে নিপাত করতে গেলে শত শত রক্তবীজের আবির্ভাব হয়েছিল। শেষে দেবী মহাশক্তি দেবতাদের বিপদ দেখে নিজের অঙ্গ-নির্মিতা ও অঙ্গীভূতা কালীকে বললেন, 'সমস্ত রক্ত-বীজ-স্বরূপ **দৈত্য**কে ভক্ষণ কর এবং রসনা বিস্তার করে সমস্ত শোণিত পান কর। তাহলে রক্তবীজ নিঃশোণিত হয়ে আমার হস্তে নিহত হবে। দেবী মহাশক্তি চামুণ্ডা ও কালীর সাহায্যে রক্তবীজের নিপাত করেন। ((পৌ.অ.)। **৫.** বৈদিক সমাজের দুটি সত্তা **রাক্ষস**সত্তা হল **রম্ভ** ও **করম্ভ**। একজন কৃষিসম্পদ রক্ষা করব বলে ভক্ষণ করে নেয়, তাই তার নাম **রম্ভ**, এবং অপরজন কারুসম্পদ রক্ষা করব বলে ভক্ষণ করে নেয়, তাই তার নাম **করম্ভ**। এই **রম্ভই** **রক্তবীজ** রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। যে **বীজ** কোনো বিশেষ রঙে 'রঞ্জিত' হইয়াছে, তাকে **রক্তবীজ** বলে। একালের ভাষায় বললে, বাম-মানসিকতায় বা লাল রঙে রঞ্জিত, কিংবা

বিজেপি-মানসিকতায় বা গেরুয়া রঙে রঞ্জিত ... **বীজ**-পদবাচ্য সত্তাকে **রক্তবীজ** বলা যায়। সেকালে তদ্রূপ যৌথব্যবস্থার ভিতরে থেকে রম্ভ বা '**রমণ**-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিব' — ইত্যাকার মানসিকতায় রাঙানো **বীজ**সত্তাকে বলা হয়েছিল **রক্তবীজ**। স্বভাবতই এ হল বৈদিক সমাজের ভিতরেই বেড়ে ওঠা একটি জনবিরোধী সত্তা।

● **রঙ্গ** : দ্র. **বর্ণ**।

● ***রট্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আরট, আরটি, আরটিত, আরট্র, আরট্রক, রট্, রট, রটন, রটনা, রটন্তী, রটা, রটিত, রড (rod), রড়, রড়-দেওয়া, রড়া, রড়ারড়ি(ড়ী), রাটি, রাড়, রাড়-চোয়াড়, রাড়া, রাড়ারাড়ি, রাড়ি, রাড়ী, রাঢ়, রাঢ়দেশ, রাঢ়ী, রাঢ়ীয়, রুট (রংরুট), রেট, রেটিনা, রেড়ি, রেড়ো, রেঢ়ো, রোটিকা, রোটী, রোড (road), রোড়া, রোঢ়া।

● **রট্** = আবর্ত্তমানের টঙ্কারণ। **রট** = আবর্ত্তমান টঙ্কারিত যাহাতে।

● **রটন্তী (রটন্তী-কালী)** : ৫. লড়িয়ে **কালী**। লাঠিয়াল জনগোষ্ঠী। এটি বিস্তারিত করতে হবে।

● **রাঢ়** : ৫. যারা রড় দিয়েছিল, লড়াই করেছিল, সেই জাতি। এটিও বিস্তারিত করতে হবে। দ্র. **জনমেজয়, বঙ্গ, বারেন্দ্র**।

● ***রণ্ (রয়্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অরণ, অরণি, অরণীসুত, অরণ্য, অরণ্যকাণ্ড, অরণ্যগজ, অরণ্যচন্দ্রিকা, অরণ্যচারী, অরণ্যধর্ম্ম, অরণ্যবহ্নি, অরণ্যবাসী, অরণ্যভব, অরণ্যমক্ষিকা, অরণ্যযান, অরণ্যরক্ষক, অরণ্যরাট্, অরণ্যরুদিত, অরণ্যরোদন, অরণ্যষষ্ঠী, অরণ্যানী, অরণ্যৌকাঃ, আরণেয়, আরণ্য, আরণ্যক, রওনা, রওয়ানা (রন-পা দ্র), রগ, রগড়, রগড়া, রগড়ান, রগড়ারগড়ি, রগড়ীয়া, রগণ, রগুড়ে, রঞ্চ, রণ্, রণ, রণকরী, রণকর্ম্ম, রণকামী, রণকারী, রণকালী, রণকৃৎ, রণক্ষিতি, রণক্ষেত্র, রণক্ষৌণী, রণক্ষ্মা, রণখল, রণগাজী, রণগোচর, রণঘণ্টা, রণঘুঁড়ী, রণজ্ঝণ, রণঝনিয়া, রণটোপ, রণতল, রণতুর, রণতুর্য্য, রণৎকার, রণদুন্দুভি, রণদুর্গা, রণধর, রণধাড়ি, রণধুরা, রণপড়া, রণপণ্ডিত, রণপাংসু, রণপ্রিয়, রণবাদ্য, রণবিশারদ, রণবৃত্তি, রণভুখ, রণভূ, রণভূমি, রণমত্ত, রণমুখ, রণমুখী, রণমূর্দ্ধা, রণরঙ্ক, রণরঙ্গ, রণরঙ্গা, রণরঙ্গিণী, রণরণ, রণরণক, রণরণি, রণলক্ষ্মী, রণশিক্ষা, রণশিঙ্গা, রণশিরঃ, রণশীর্ষ, রণশূর, রণশৃঙ্গ, রণসংরম্ভ, রণসঙ্কুল, রণসজ্জা, রণসমুদ্যম, বণসহায়, রণস্তম্ভ, রণস্থান, রণাঙ্গ, রণাঙ্গণ, রণাজির, রণাতোদ্য, রণান্তকৃৎ, রণাপেত, রণাবনি, রণিত, রণোৎকট, রতি, রত্তি, রপট, রপ্টে-রপ্টে, রপ্ত, রপ্তানী, রফতার, রফতানী, রন, রন (রওনা, run), রন্দা (রেঁদা), রন-পা, রনরন, রন্তিদেব, রয়্, রয়, রাওয়ারাই (দ্র. রু), রাং (মুরগির রাং, রান, দৌড়শক্তিধারক), রাঁড়, রাঁড়া, রাঁড়ি, রাঁড়ী, রাড়া, রাড়ারাড়ি, রাড়ি, রাড়ী, রাঢ়, রাণা (রানা), রাণী (রানী), রাণীজি, রাণ্ডী (রাঁড়ী), রেঁদা, রেণ্ডী।

● **রণ্** = আবর্ত্তিতের বোধন-সূত্রায়ন। **রণ** = আবর্ত্তিতের বোধন-সূত্রায়ন যাহাতে।

● **অরণ** : ২. *'রণ' ('বীরগণ যাহাতে শব্দ করে' / ব.শ.) নাই যাহাতে*। ৩. রণশূন্য, অবিদ্যমানযুদ্ধ। (ব.শ.)। ৫. যে যুদ্ধ অবিদ্যমান, সেই যুদ্ধ। অর্থনৈতিক যুদ্ধ। এতে প্রাণে মারামারি নাই, কেবল শব্দ করাকরি বা চেঁচামেচি আছে। দ্র. **কূজন**।

● **অরণ্য** : ২. *অরণ ('অবিদ্যমান যুদ্ধ' / ব.শ.) রহে যাহাতে। / যাহা রম্য নহে*; (কথাটিতে বঙ্গীয় শব্দকোষকারের নিজেরই বিশ্বাস হয়নি বলে বন্ধনীর ভিতরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে গেছেন।) যে স্থানে শেষ বয়সে যায়; শ্বাপদেরা যেখানে যায়। (ব.শ.)। ৩. বিপিন, কানন, বন। শঙ্করাচার্য্যকৃত দশ উপাধি — তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, সরস্বতী, ভারতী। (ব.শ.)। ৪. forest অর্থে প্রচলিত। ৫. 'অগ্নিজননার্থ যে কাষ্ঠ কাষ্ঠান্তর দ্বারা ঘৃষ্ট হয়' (ব.শ.) তাকে **অরণি** বলে। এর একটি অধরারণি অন্যটি উত্তরারণি। এরা দুই বিপরীতমুখী সত্তা পরস্পরকে ঘর্ষণ করে, কিন্তু নিঃশেষে বিনাশ করে না, অগ্নি উৎপাদন করে। তদ্রূপ যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা এই দুই বিপরীত সত্তা পরস্পরকে আঘাত করে কিন্তু হত্যা করে না, সেই স্থানকে **অরণ্য** বলে। সেই সুবাদে **পণ্য**বিনিময়-স্বীকৃত সমাজসংসারই অরণ্য পদবাচ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে '**অরণ্য**' নামে একটি পৃথক উপ-অধ্যায় রয়েছে, যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বোঝানো হয়েছে, এই 'মহাসংসারই মহারণ্য'। তাছাড়া, জীবজন্তু পশুপক্ষীদের (কলিম খান-এর 'পক্ষীপুরাণের মকশো' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য) নামের অর্থ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সামাজিক জীবজন্তু ও পশুপক্ষীদের কথাই সমান্তরাল ভাবে বলা হয়েছে। **তপস্যা** করতে বনে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই অর্থ রয়েছে। **তপোবন** বলতে যা বোঝায়, তা মূলত আজকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের সেটাই প্রাচীন রূপ।

● **আরণ্যক** : ২. *অরণ্য বিষয়ক আচরণের চর্চা করে যে*। ৩. অরণ্যভব, বনস্থিত, বন্য (মনুষ্য পথ অধ্যয়ন ন্যায় বিহার মনুষ্য ও হস্তী); আরণ্য, বন্য, আরণ্যবাস-সম্বন্ধী, অরণ্যভব মনুষ্য; মুনিপ্রভৃতি, তপস্বী, বানপ্রস্থ, অরণ্যে পাঠ্য ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ, ... উপনিষৎ। (ব.শ.)। বেদের উপসংহার ভাগকে **ব্রাহ্মণ** বলে। এই ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ হল **আরণ্যক**। ব্রহ্মচর্য গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করবার সময় গুরুর কাছে যে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ হত, আরণ্যকে তা লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে এর উৎপত্তি বলে এর নাম **আরণ্যক**। যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যেমন ব্রাহ্মণখণ্ডের প্রয়োজন, বানপ্রস্থাবলম্বীর জন্য সেইরূপ **আরণ্যকে**র প্রয়োজন। আরণ্যকের সংখ্যা চার — বৃহৎ, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয় এবং কৌশিতকী। উপনিষদের সঙ্গে আরণ্যকের নিকট সম্বন্ধ। সেইজন্য এদের অনেক সময় বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তৈত্তিরিয় উপনিষদ, ঐতরেয় উপনিষদ, কৌশিতকী উপনিষদ বলা হয়। (পৌ.অ.)। ৫. একালে আমরা আরণ্যক কথাটির একটি প্রতীকী মানে করে নিয়েছি — wild। তার ফল হয়েছে এই যে, আরণ্যক ধারণাটি থেকেই আমরা পতিত হয়ে গেছি। আসলে, আমাদের সমাজের বিভিন্ন পরিবারকে, গোষ্ঠীকে, মানুষকে নানা প্রকারের **বৃক্ষ, পশু, লতা, গুল্ম** ইত্যাদি বলে বুঝবার এবং নিজের নিজের উৎপাদনকে নিয়ে তাদের মধ্যে কারবার করাকে 'অরণ্যে গমন' বা 'বনে যাওয়া' বলা হত। দ্র. **অরণ, অযোধ, অযোধ্যা**। এই অরণ বা অরণ্য যে forest নয়, সে আমরা আগেই জেনেছি। এখানে **মাল** নিয়ে **মল্ল**যুদ্ধ হয়, কেনাকাটা-বিক্রিবাটা হয়, টানাটানি হয়, কিন্তু কেউ কাউকে প্রাণে মারে না, তাই অরণ বা **অরণ্য**। সেই অরণ্য থেকে যে আরণ্যক কথাটি হয়ে থাকতে পারে,

তা চট করে আমাদের মাথাতেই আসে না। একালে যাকে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ... ইত্যাদি বলা হয়, সেটা যে আদিতে '**আরণ্যক**'-এরই এক একটা অংশ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া, নানা প্রকারের উৎপাদন কর্মযজ্ঞ থেকেই মানুষের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের জন্ম। প্রাচীন ভারতের সেই জ্ঞানকে (বেদকে) দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। থিয়োরিটিক্যাল বা তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বলা হত '**ব্রাহ্মণ**' এবং প্র্যাকটিক্যাল বা প্রায়োগিক জ্ঞানকে বলা হত **আরণ্যক**। বলতে গেলে, একালের সর্বপ্রকারের ফলিত বিদ্যা থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত সর্বপ্রকারের ফলিত জ্ঞানের আদি রূপ হল **আরণ্যক**। উপদেশ ছিল — পঞ্চাশোর্ধ্বে **বানপ্রস্থ** অবলম্বন করবেন **ব্রাহ্মণ** ও **ক্ষত্রিয়**রা, ক'রে করবেনটা কী? আসলে অভিজ্ঞ জ্ঞানব্রতী ও কর্মবীর মানুষেরাই তাঁদের পরিবারের দায়িত্ব ত্যাগ করে মুক্ত হয়ে সমাজের রীতিনীতি ঠিকঠাক করবেন বলেই তো তাঁদের জন্য **বানপ্রস্থ** নির্দিষ্ট হয়েছিল! যে মুহূর্তে এইভাবে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া হয়, সেই মুহূর্তে দেখা যায়, **আরণ্যক** শব্দটির যে যে অর্থ প্রচলিত ছিল বলে উপরোক্ত ৩ নম্বর সারণিতে যা যা বলা হয়েছে, তার প্রায় সব কয়টির সঙ্গে আরণ্যকের এই বোধ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়েছে উপনিষদের সঙ্গে আরণ্যকের নিকট সম্বন্ধ। দ্র. **উপনিষদ**।

● **রন্তিদেব : ৩.** ইনি সম্ভৃতির পুত্র। বহু যজ্ঞকারী বিখ্যাত রাজা। রন্তিদেব সমাংস অন্নদান করে অতুল কীর্তিলাভ করেন। ... ইন্দ্রের তপস্যা করে ইনি বর পান, তাঁর গৃহে যেন প্রচুর অন্ন ও অতিথির আগমন হয় ... তিনি যেন কখনও কারো কাছে প্রার্থনা না করেন। ... রন্তিদেবের এই অতিথি অনুষ্ঠানে সমস্ত **পশু** নিজেরাই এসে তাঁকে **দৈব** ও **পিতৃ**কার্যে তাদের নিয়োজিত করতে বলত। (দ্র. **তর্পণ, দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ**) রাজার যজ্ঞ-নিহত পশুদের চর্ম হতে যে ক্লেদ বের হত, তা হতে একটা নদী উৎপন্ন হয় — এই নদীর নাম চর্মণ্বতী (চম্বল)। ... তাঁর গৃহে এত অতিথি সমাগম হত যে, প্রত্যহ একুশ হাজার বৃষ এবং অসংখ্য অন্যান্য পশু বধ করেও সকলের প্রয়োজনীয় **মাংসে**র সংকুলান হত না। দুই লক্ষ পাচক অতিথি ব্রাহ্মণদের ভোজন কার্যে সর্বদা নিযুক্ত থাকত। (পৌ.অ.)। **৫.** একালের ভাষায় বলতে গেলে **রন্তিদেব** ছিলেন টাটা-বিড়লার আদিপুরুষ। ...

● ***রদ্ (রধ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অরন্ধন, আরন্দ, আরান্দো, রন্ধীল, রদ্, রদ, রদখণ্ডন, রদ-করা, রদচ্ছদ, রদছদ, রদন, রদনচ্ছদ, রদনছদন, রদনী, রদাঙ্কুর, রদারদি, রদি (রদী), রদ্ধ, রদ্ধা, রধ্, রন্ধন, রন্ধনগৃহ, রন্ধনশাল, রন্ধনী, রন্ধি, রন্ধিত, রন্ধ্র, রন্ধ্রগত, রন্ধ্রগুপ্তি, রন্ধ্রপ্রহারী, রন্ধ্রবংশ, রন্ধ্রাগত, রন্ধ্রান্বেষণ, রন্ধ্রান্বেষী, রন্ধ্রোপনিপাতী, রাঁধ, রাঁধন, রাঁধনি(নী), রাঁধা, রাঁধুনী, রোঁধখীল।

● **রদ্ (রধ্)** = আবর্ত্তিতের দান। **রদ** = আবর্ত্তিতের দান যাহাতে। **রধ** = আবর্ত্তিতের ধারণ যাহাতে।

● **রন্ধন : ২.** *আবর্ত্তিতের রহস্যরূপকে ধারণপূর্ব্বক অন করা হয় যাহাতে।* **৫.** শব্দটি কেবলমাত্র ভাত-তরকারি রান্না করাকে বোঝায় না, গল্প-উপন্যাস-নাটকাদি রান্না করাকেও বোঝায়। অন্তত শব্দটির নিহিতার্থে সেরকম ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজির cooking-ও সমস্বভাবের শব্দ।

● **রন্ধ্র :** দ্র. **ব্রহ্মরন্ধ্র**।

● **রভ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অতিরভস, অতিসৌরভ, অনারম্ভ, আরব্ধ, আরম্ভ, আরম্ভক, আরম্ভণ, আরম্ভণীয়, আরম্ভী, প্রারব্ধ, প্রারম্ভ, প্রারম্ভিক, রভ্, রভঃ, রভস্, রভস, রভসরস, রেভ, সুরভি, সুরভিত, সৌরভ।

● **রভ্** = আবর্ত্তিতের ভবন। **রভ** = আবর্ত্তিতের ভবন যাহাতে।

● **রম্ *(রমি)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরথ, অনবরত, অনারত, অনুপরত, অবরত, অবিরত, অবিরাম, অরত্নি, আরত, আরতি, আরতী, আরমণ, আরমানি, আরমানী, আরাম, আরামকেদারা, আরামী, ছিরাম, ছিছি রামরাম, নিরত, পুরুষরতন, বিরত, বিরাম, রইঘর, রঙ্ক, রঙ্কনঝঙ্কন, রঙ্কিণী, রঙ্কু, রণ্ড, রণ্ডক, রণ্ডা (রাঁড়), রণ্ডামি, রণ্ডাশ্রমী, রণ্ডিকা, রণ্ডীর, রত, রতকীল, রতকূজিত, রতগুরু, রতজ্বর, রতন, রতনচক্র, রতনচুটকি, রতনচুটুকি, রতনঝুরি, রতনমণি, রতার্থী, রতি, রতিকর, রতিকামী, রতিকর্ম্ম, রতিক্রিয়া, রতিকর্ষিত, রতিখেদ, রতিগৃহ, রতিটাট, রতিতস্কর, রতিদান, রতিদূতী, রতিনাগ, রতিপতি, রতিপাশ, রতিপাশক, রতিপ্রজ্ঞ, রতিপ্রাজ্ঞ, রতিপ্রিয়, রতিবন্ধ, রতিবন্ধু, রতিবর, রতিবর্দ্ধন, রতিভবন, রতিভোগ, রতিমন্দির, রতিরঙ্ক, রতিরঙ্গ, রতিরঞ্জন, রতিরমণ, রতিরসসঙ্গ, রতিলম্পট, রতিশক্তি, রতিশূর, রতিসর্ব্বস্ব, রতিসুন্দর, রতীশ, রত্ন, রত্নকণিকা, রত্নকণ্ঠী, রত্নকন্দল, রত্নখচিত, রত্নগর্ভ, রত্নগর্ভা, রত্নচ্ছায়া, রত্নজন, রত্নঢেঁড়ি, রত্নদীপ, রত্নধেনু, রত্ননাভ, রত্ননিধি, রত্নপর্ব্বত, রত্নপ্রদীপ, রত্নব, রত্নবতী, রত্নবন্ধক, রত্নবর, রত্নবাতি, রত্নবান্, রত্নবান্ধা, রত্নভূত, রত্নমণি, রত্নময়, রত্নমালা, রত্নমুখ্য, রত্নমুদ্রিকা, রত্নরাজি(জী), রত্নরাট্(জ্), রত্নরাশি, রত্নসংঘাত, রত্নসানু, রত্নসূ, রত্নসূতি, রত্নাকর, রত্নাঙ্কুর, রত্নাঢ্য, রত্নাধিপতি, রত্নানুবিদ্ধ, বত্নাবলী, রথ, রথক, রথকর, রথকট্যা, রথকড্যা, রথকল্পক, রথকার, রথকারক, রথকৃৎ, রথকুটুম্বিক, রথকুটুম্বী, রথকূবর, রথকেতু, রথক্রান্ত, রথক্ষোভ, রথগর্ভক, রথগুপ্তি, রথগোপন, রথঘোষ, রথচরণ, রথচরণধর, রথচরণপাণি, রথচরণসমাহ্ব, রথচর্য্যা, রথদারু, রথদ্রু, রথদ্রুম, রথধুঃ, রথধুর্, রথনাভি, রথনির্ঘোষ, রথনির্হ্রাদ, রথনিস্বন, রথনীড়, রথনেমি, রথন্তর, রথপথ, রথপদ, রথপাদ, রথপুঙ্গব, রথপ্রষ্ঠ, রথবংশ, রথবন্ধ, রথবর্ত্ম, রথবাহ, রথবাহক, রথবিজ্ঞান, রথবিদ্যা, রথবিমোচন, রথবীথী, রথবেগ, রথব্রজ, রথব্রাত, রথমণ্ডল, রথমহোৎসব, রথমার্গ, রথমুখ, রথযাত্রা, রথযান, রথযুক্(জ্), রথযুদ্ধ, রথযূথপ, রথযোজক, রথযোধ, রথরেণু, রথশক্তি, রথশালা, রথশাস্ত্র, রথশিক্ষা, রথশ্রেণি, রথসপ্তমী, রথসারথি, রথসিংহ, রথসূত্র, রথস্থ, রথস্বন, রথাক্ষ, রথাগ্র, রথাঙ্গ, রথাঙ্গনামক, রথাঙ্গনামা, রথাঙ্গনেমি, রথাঙ্গপাণি, রথাঙ্গভর্ত্তা, রথাঙ্গাহ্ব, রথাঙ্গাহ্বয়ন, রথাঙ্গী, রথানীক, রথাবয়ব, রথারথি, রথারোহ, রথারোহী, রথাশ্ব, রথিক, রথিনী, রথির, রথী, রথেশ, রথেষা, রথোৎসব, রথোদার, রথোদ্ধত, রথোপস্থ, রথ্য, রথ্যা, রম্, রম, রমক, রমজান, রমণ, রমণা, রমণী, রমণীয়, রমণীয়তা, রমণ্য, রমা, রমাকান্ত, রমাধর, রমাধিপ, রমানাথ, রমাপতি, রমাপ্রিয়, রমারমণ,

রমাশ্রয়, রমিত, রমেশ, রমেশ্বর, রম্ভু, রম্ভ, রম্ভণ, রম্ভা, রম্ভাতৃতীয়া, রম্ভাস্তম্ভ, রম্ভোরূ, রম্য, রম্যক, রম্যশ্রী, রম্যা, রম্যান্তর, রাঙ্কব, রাম, রামকড়ি, রামকরী, রামকর্পূর, রামকলা, রামকলী, রামকাড়া, রামকান্ত, রামকিরী, রামকীরী, রামকুঁড়ে, রামকেলী, রামক্রী, রামখড়ি, রামখিলিকা, রামগণ্ডী, রামগিরি, রামগীতা, রামঘুঘু, রামচকা, রামচন্দ্র, রামচরিত, রামচাকী, রামছাগল, রামজননী, রামজনি, রামজামা, রামঝিঙা, রামডয়রা, রামণীয়ক, রামদা, রামদূত, রামধনু, রামধনুক, রামনবমী, রামনাম, রামপটোল, রামপূগ, রামবীণা, রামবেণী, রামভদ্র, রামময়, রামমাটি, রামযন্ত্র, রামযাত্রা, রামরম্ভা, রামরস, রামরাজ্য, রামরোট, রাম-রাম!, রাম-লক্খন, রামলবণ, রামলীলা, রামশন্না, রামশর, রামশাল, রামশালকী, রামশালি(লী), রামশিঙা, রামশিঙ্গা, রামসর, রামসালিক, বামসেতু, রামাইৎ (রামাৎ, রামায়ৎ), রামানন্দ, রামানন্দী, রামানুজ, রামানুজী, রামায়ণ, রামরাম ছিঃছিঃ, রামেশ্বর, রিরংসা, রিরংসু, রুণ্ড, রুম, রুমা (উমা, দ্র.রু), রূম (রোম, রোমনগরী), রেণ্ডী, রোম, রোমনগরী, শ্রীরাম, লঙ্কা, লঙ্কাকাণ্ড, লঙ্কাধিপতি, লঙ্কাধিরাজ, লঙ্কাপড়া, লঙ্কামরিচ, লঙ্কাসিজ, লঙ্কাসেজ, লঙ্কাস্থায়ী, লঙ্কেন্দ্র, লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর, সুরত, সুরতি, সুরম্য।

● **রম্ (রমি)** = আবর্ত্তিতের সীমায়ন। **রম** = আবর্ত্তিতের সীমায়ন যাহাতে। **রমি** = রক্ষকের সীমায়ন গতিশীল যাহাতে।

● **অতিরথ** : দ্র. **নকুল**।

● **আরতি** : ২. *রতির (রমণ চলতে থাকার) আশ্রয় যাহাতে*। (দ্র. **সুরতহাল**) ৩. উপরম, নিবৃত্তি, বিরতি। ... (ব.শ.)। ৪. নামরূপে এবং 'দেবপ্রতিমার সম্মুখে প্রজ্বলিত-দীপাবলী ইত্যাদির যথাবিধি আবর্ত্তন' অর্থে প্রচলিত। তবে দ্বিতীয় অর্থটি 'আরাত্রিক' শব্দের তদ্ভব রূপ বলে অনেকেই মনে করেছেন। ৫. **রতি** আর **কাম** (বা **মদন**)। **পুরুষ** (পরিচালক) ও **প্রকৃতি** (পরিচালিত) যখন **লীলা** করেন তখন সেই লীলার দুটি অংশ থাকে — প্রেমাবেগ ও প্রেমকর্ম বা **মদন** ও **রতি**। কেবল একটানা **রতি** চলতে থাকাকে আরতি বলে। সেই আরতিতে তেজ প্রযুক্ত হলে তাকে তেজারতি বলে। এর থেকে যে সন্তানের জন্ম হয় তার নাম **কুশ**। সবাই জানেন, কুশীদজীবীরা তেজারতি করে থাকেন। দ্র. **আরাম**।

● **আরাম** : ২. *রামের ('রমণস্থানের' /ব.শ.) আশ্রয় যাহাতে*। ৩. আরতি, সুখানুভব, আরমণ, আক্রীড়া, আনন্দ, কৃত্রিম বন, উদ্যান, অকৃত্রিম বন, ক্রীড়ার্থ বন, প্রমোদবন, পুষ্পফলো-পচয়হেতু ভূভাগ, বিশ্রামভবন, আশ্রয়, আধার, ভাজন। ... (ব.শ.)। ৪. 'সুখানুভব' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'ভদ্রলোক পাটের ব্যবসায় টাকা খেলিয়ে ধনী হয়েছেন' — এই বাক্যে 'টাকার খেলা'র কথা বলা হয়েছে। যে **'অরণ্যে'** এই খেলা হয়, সেটিকে তাই কৃত্রিম বন, উদ্যান, ক্রীড়ার্থ বন, প্রমোদবন ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। অবশ্য, এই খেলার দুটি দিক রয়েছে। একটি দৈহিক অপরটি মানসিক। মার্কসীয় আলোচনায় টাকার খেলার কেবল দৈহিক দিকটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মানসিক দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ভারতীয় ধারণায় ঐ মানসিক দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরুষোত্তম **রাম**, হরে রাম হরে **কৃষ্ণ** — এসব তারই প্রমাণ। **রাম** বলতে যে সত্তাকে বোঝায়, সে আসলে 'ক্রীড়ারত জ্ঞান ও টাকা এবং তাদের ক্রীড়া করান যাঁরা' তাদের একটি মিলিত **রূপ**। **এটিই** (নগদ) **নারায়ণের সপ্তম অবতার**। (দ্র. **রাম**)। অর্থাৎ, capitalists, তাদের concept of capital ও finance capital-এর **মিলিত** যে সত্তা, সেটিই **রাম**। এইগুলি উৎপাদন কর্মযজ্ঞে কর্মরত হলে বা **আরতি** করলে যে সুখানুভব হয় সেটাই **আরাম**। তবে কেবল টাকা-পুঁজি বিনিয়োগ থেকেই এই আরতি হয় না, আরামও হয় না; দৈহিক মানসিক আর যতরকম পুং-শক্তি মানুষের আছে, তার প্রত্যেকটির আরতি থেকেই এই আরাম হয়। হয় বলেই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও প্রিয়ছাত্রের কৃতিত্বের সংবাদ শুনে শিক্ষক বড়ই **আরাম** পান।

● **রত (সুরত, সুরতহাল)** : ২. **রম** *(আবর্ত্তনের সীমায়িত রূপ) তারিত যাহাতে*। ৫. আদালত যখন 'সুরতহাল' জানতে চায়, তখন যে ব্যাপারের 'সুরতহাল' জানতে চায়, ধরে নেওয়া হয়, তখন যার 'সুরতহাল' জানাতে হবে, সেখানে দুটি সত্তা **পুরুষ-প্রকৃতি** রূপে কর্ম্ম**রত** ছিল, **সুরত** ছিল, সেই **সুরতি**তে কোনো বাধা পড়েছে বলেই তা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আর, সেজন্যই আদালত বর্তমানে তার 'সুরতহাল' জানতে চায়।

● **রতি** : ২. **রত** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে*। ৩. আসক্তি, প্রীতি, রাগ, চিত্তপরিতোষ, ক্রীড়া ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। যৌন আকাঙ্ক্ষার দেবী। এঁর অন্যান্য নাম কামী, প্রীতি, কাম-পত্নী, কামকলা, কামপ্রিয়া, রাগলতা, মায়াবতী, কেলীকলা, সুভঙ্গী, ইত্যাদি। ইনি **কামদেবের** স্ত্রী ও **দক্ষে**র কন্যা। ... **মহাদেবের** কোপে কামদেব ভস্মীভূত হলে **রতি** স্বামীকে পুনর্জীবিত করবার জন্য মর্ত্যলোকে **মায়াবতী** রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **মদন, কেলি**। যে কোনো কাজে রত থাকাকে **রতি** বলে। এর দৃশ্য অর্থটি নিয়েই এখন সকলে ব্যস্ত থাকে, এর অদৃশ্য অর্থটি দেখতেই পায় না। অথচ কর্ম**যজ্ঞে** লিপ্ত হয়ে কর্মরত থাকাই **রতি**। এই **রতি**তে **ব্যতিব্যস্ত** সারা বিশ্বের মানুষ আজ **রতিবিলাপ** করে মরছে! দ্র. **মদনভস্ম**।

● **রথ** : দ্র. **পুষ্পক-রথ**।

● **রথ (রথী)** : ৫. রথ চালানো কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, এখনও রথ চলে, চালানো হয়, এবং তার ক্ষেত্রও রয়েছে। বাংলাসাহিত্যের রথী-মহারথীগণ যখন সাহিত্য-আলোচনার কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, তখন তাঁরা কোন রথ চালান? ...

● **রাম, রামচন্দ্র** : ২. ***রাম*** *= রম হইতে জাত।* ***রামচন্দ্র*** *= রাম-রূপী চন্দ্র*। ৩. সূর্যবংশীয় **অযোধ্যা**র রাজা **দশরথে**র **অশ্বমেধযজ্ঞ** লব্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্র। ... রামের চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে **বিশ্বামিত্র** **রাক্ষস**দের হাত হতে **যজ্ঞ**রক্ষা করবার জন্যে **দশরথে**র অনুমতিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যান। ... **তাড়কা**বধ ... বিশ্বামিত্র কর্তৃক বলা ও অতিবলা বিদ্যা ও দিব্যাস্ত্র দান ... **গৌতমে**র আশ্রমে **অহল্যা**মুক্তি ... **মিথিলা**গমন ... **জনকে**র বীর্যশুল্কা কন্যা সীতাকে **বিবাহ** ... শিবের হরধনু ভঙ্গ ... শিবশিষ্য **পরশুরামে**র সঙ্গে যুদ্ধ এবং পরশুরামের পরাজয় ... ইত্যাদি। ... (পৌ.অ.)। অবশ্য দ্র. **কুশ**। [**নারায়ণ**কে যদি তাঁর সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূপে বুঝি, তাহলে তাঁর যে সকল মানস চেহারা হয়, তার একটি হল নতুন (আবিষ্কৃত) শুভ শক্তি-বিষয়ক **ব্রহ্মজ্ঞান (রাম)** যার প্রয়োগজাত অভিজ্ঞতা হল আবিষ্কারের ত্রুটি সংশোধন অর্থাৎ **কুশ** এবং

আবিষ্কারের সঙ্গে যোগ করার মতো নতুন **কিছু** অর্থাৎ **লব**। আর, সেই নারায়ণকে যদি সমাজে বুঝতে চাই, তবে তাঁকে পাব **নগদ-নারায়ণ** রূপে, যার **বিনিয়োগ** বা finance capital রূপটি হল **রাম**। এই টাকা খেলে বলে এর নাম **রাম**। দ্র. **আরাম**। .... ইত্যাদি।]

● **রামরাজত্ব : ৫. দ্র. বিষ্ণু, বুদ্ধ**। অবশেষে একদিন সেই অঘটনও ঘটল। মৌলবাদী হয়ে পড়া বৈদিক সভ্যতার ধারক-বাহকদের সবংশে ধ্বংস করা হল, অবশ্যই **বিভীষণ** বাদে। **গৌতম**-বুদ্ধের ডাকে 'ঐক্যমূলক সভ্যতা'র হাতছানি ছিল, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে **নর-বানরেরা** ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই তাণ্ডবে হাত মেলালো **চন্দ্রবংশ, যাজ্ঞবল্ক্য, বাজসনেয়ী বাজপেয়ীরা। দেবতা**রা রসদ দিলেন, যুদ্ধজয়ের ফন্দি দিলেন, বাহবা দিলেন। ক্ষিপ্ত জনসাধারণ শত শত মন্দির ধ্বংস করে দিল, **মহর্ষি**দের সাধের '**পৃথিবী**' চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। **বর্ণাশ্রম**-ব্যবস্থাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলা হল। বৈদিক সভ্যতাকে ধ্বংস করে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠিত হল। সমাজ শরীরে 'রোগের আক্রমণ যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সাংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।' (রবীন্দ্রনাথ/ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)।

কিন্তু চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। অধঃপতিত চরিত্রের হলেও **অসুরেরা** ছিল বৈদিকযুগের যৌথসমাজের সমর্থক (আশি নব্বই দশকে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএমের মতো)। তাদেরকে রাতারাতি **বৌদ্ধ** বানিয়ে ফেলার মধ্যে যে চালাকি (**বৃহস্পতি**র শুক্রাচার্য্য সেজে প্রতারণা — দেবীপুরাণ) ছিল, কিছুদিন পরেই তার ফল ফলে। সেই চালাকি ও তার ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় দেবীপুরাণে। আধুনিক ভাষায় সেই চালাকির মর্মার্থ এইরূপ — পুঁজির প্রয়োজন ছিল তার বিকাশের বাধাস্বরূপ পুরোহিততন্ত্রের (= বৈদিক **পৃথু**র বা সেকেলে আমলাতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বা আদিম সমাজতন্ত্রের জরাগ্রস্ত রূপের) অবসান, আদি সনাতন সমাজের সাম্যের সুখস্মৃতি জনসাধারণের সামনে সেই একই দাবি রেখেছিল; আর বিপরীতে কেবলমাত্র মানুষের (মিথ্যা) সাম্যের কথা বলে পুরোহিততন্ত্র তখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং মানুষের প্রকৃত সাম্যের ডাক দিয়ে পুরোহিততন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলার পক্ষে এ ছিল নবজাত পুঁজির পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ, এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে **শিশু** অবতার (= নবজাত পুঁজি) দ্বিধা করেনি। বৌদ্ধধর্ম প্রথম পুঁজিবাদী বিপ্লবের ধর্ম রূপে ব্যবহৃত হয়ে গেল।

কিন্তু দেবীপুরাণ এ ব্যাপারে কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। পুরাণ (= ইতিহাস) লেখার যা চিরাচরিত ধর্ম, সেই সত্যকথন থেকে সে বিচ্যুত হয়নি। তবে কিনা তারও বাক্‌ভঙ্গি ক্রিয়াভিত্তিক পৌরাণিক ভাষায়। তাতে ওই সময়ের পুরো ইতিহাসটাই ধরা আছে। তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইরূপ — শুক্রাচার্য্য তখন তপস্যায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই অবসরে **বৃহস্পতি** শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণ করে অসুরদেরকে '**অর্হৎ**' বা **বৌদ্ধ** হয়ে যাওয়ার পরামর্শ ও শিক্ষা দেন, যাতে তারা সংসার বিষয়ে উদাসীন হয়ে যায়, দেবতাদের সুখস্বর্গ দখল করতে না যায়। ইত্যবসরে শুক্রাচার্য ফিরে আসেন এবং অসুরদের ইত্যাকার অবস্থা দেখে তাদের ভর্ৎসনা করেন। তখন শুক্রাচার্য্যরূপী বৃহস্পতি অসুরদের বলেন যে, ভর্ৎসনাকারী শুক্রাচার্য্যই বৃহস্পতি, অসুরদেরকে বিপথগামী করার জন্য শুক্রাচার্য্য সেজে এসেছেন। এই কথা শুনে অসুরেরা প্রকৃত শুক্রাচার্য্যকে তাড়িয়ে দেয়।

এতদসত্ত্বেও সেই বৌদ্ধবিপ্লব ও তার ষোড়শ-মহাজনপদ **প্রতিষ্ঠা** বা রামরাজত্বের প্রতিষ্ঠা ছিল ভারত ইতিহাসের চিরস্মরণীয় **ঘটনা**। জরাগ্রস্ত **জরৎকারু**তে পরিণত মৌলবাদী বৈদিক সভ্যতার **দুর্বিষহ** দুর্দশার হাত থেকে **রামরাজত্ব** মানুষকে মুক্তি দিয়েছিল। বহুকালক্রমাগত বর্ণাশ্রমের অমর্যাদা থেকে এই প্রথম **মানুষ** সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। তাছাড়া, অভ্যুদয়কালে **সকল** সামাজিক সত্তার যেরূপ গতিশীলতা থাকে, এই আদি শিল্পবিপ্লবেরও তা ছিল। ফলে **মানুষ** স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতিতে চলবার **সুযোগ** পাওয়ায় সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিল, সমাজে প্রাণের জোয়ারের **বান** ডেকেছিল। যে ভূসম্পত্তির সার্বিক মালিকানা সভ্যতার সূত্রপাতেই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ তথা মন্দিরের অধিকারে চলে গিয়েছিল, জনসাধারণ এবার তা ফিরে পেয়েছিল যৌথসম্পত্তি রূপেই। মানবসভ্যতার সবচেয়ে ঘৃণ্য যে প্রথা —'জন্মদোষে শ্রেণীবিভাজন', জরাগ্রস্ত মৌলবাদী বৈদিক সভ্যতার সেই ঘৃণ্য প্রথাকে **রামরাজত্ব** কোথাও কোথাও একেবারে মুছে দিয়েছিল। 'তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন **ক্ষত্রিয়**রা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।' (রবীন্দ্রনাথ)। সেই সুখস্মৃতি ভারতবাসীর মনে আজও অম্লান। তবে সেই স্মৃতিতে কেন যে সুখ, 'আত্মবিচ্ছেদ'-এর কারণে ভারতবাসী আজ তা ভুলে গেছে।

সেই **রামরাজত্ব** দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কেননা, ভিত্তিতে ছিল চালাকি, ফন্দি ইত্যাদি। **বিভীষণ**কে তো লঙ্কার রাজত্ব ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল। পুরোহিতশ্রেষ্ঠ **রাবণ** ধ্বংস হলেও, অধ্যাপনাজীবী **ব্রাহ্মণ** ছিল অক্ষত। তাই 'যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মধ্যাহ্ন, তখনও ধর্মসমাজে **ব্রাহ্মণ** ও **শ্রমণে** ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই।' (রবীন্দ্রনাথ)।

অতঃপর একদিন একই কর্মের ও ধর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক মৌলবাদের করাল গ্রাসে **বৌদ্ধ**ধর্মও কবলিত হল। যে **বুদ্ধ** ছিলেন মূর্তি, পূজা ... ইত্যাদি মৌলবাদী আচারের ঘোর বিরোধী, তাঁরই মূর্তিতে দেশ গেল ভরে। এমন ভাবে যে, তাঁর একার মূর্তিসংখ্যা ভারতের পূর্ববর্তী সমস্ত বিগ্রহের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল। যে বৌদ্ধমত বুদ্ধকে জানত 'পথিকৃৎ' বলে, উপাসনা করত চক্র, **পদ্ম** ও ছত্রে, মানুষের মুক্তির সেই ধর্মও একদিন ধর্মতন্ত্রে পরিণত হয়ে গেল। ক্রমশ একদিন 'বুদ্ধ হলেন দেবতা, এবং প্রতীকের পরিবর্তে এল বিগ্রহ, মঠ, পূজা, শঙ্খ, ঘণ্টা, পুষ্পার্ঘ্য, নৈবেদ্য ইত্যাদি পূজার সমস্ত অনুষঙ্গ।' (ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য) কেবল তাই নয়, জ্ঞানবৃক্ষের প্রতি তার পক্ষপাত সদ্যোজাত ধনতন্ত্র থেকে রস সংগ্রহ করে নালন্দা ও তক্ষশীলার মহীরুহে পরিণত হল। অপরদিকে শ্রেষ্ঠীদের (= সেকালের পুঁজিপতিদের) বাড়বাড়ন্ত সকলেরই চক্ষুশূল হয়ে উঠল।

ইন্দ্রপ্রস্থের এই বাড়াবাড়ি হস্তিনাপুরের সহ্য হল না। সুতরাং আদিম সমাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী ঔরসপত্র **দুর্যোধন** ও **দুঃশাসন** এবং আদিম ধনতন্ত্রের উত্তরাধিকারী ক্ষেত্রজপুত্র যুধিষ্ঠির, **ভীম**, **অর্জুন**দের মধ্যে এবার একটা ফয়সলা হওয়া দরকার। **অসুর** বনাম

দেবতার বহুকালক্রমাগত সংগ্রাম এবার নতুন নামে মুখোমুখি হয়ে গেল — **কুরু-পাণ্ডবের** যুদ্ধ। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজি নয়। পাবলিক সেকটর-বাদীরা তো ঘোষণা করেই দিল — 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' শুরু হয়ে গেল কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রাম। কংসকে কর না-দিয়ে ব্যবসায়ীদের নগদ-নারায়ণ ততদিনে Black Money-তে (= শ্রীকৃষ্ণে) পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তার প্ররোচনা ও পরিচালনায় White Money বা অর্জুন মহা মহা রথীদের নিকেশ করে দিল। আর গোটা কৌরব বংশ ধ্বংস করার জন্য ভীমই (= পরিকল্পিত প্রচারই) যথেষ্ট ছিল, রাক্ষসীগর্ভজাত **ঘটোৎকচ**ও (= গুজবও) কম গেল না। সারা দেশ জুড়ে প্রশাসনের যে সকল প্রতিনিধি ছিল, প্রচার ও গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ তাদের মেরেই ফেলল; পালিত হল ধনতান্ত্রিক প্রচারের 'দুঃশাসনের-রক্তপান' করবার প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে পুঁজিবাদ জিতল বটে, তবে সে হল হারের বাড়া। **অসুর** ও **দেবতা** পরস্পরকে প্রায় নিকেশ করে ফেলেছিল। আদি সমাজতন্ত্র নিশ্চিহ্ন। তরুণ ধনতন্ত্র ধনহীন, দেউলিয়া। রাষ্ট্রশক্তি বা ক্ষত্রশক্তি নির্মূল! এই সেই **মহাভারত**-উত্তর পরিস্থিতি, শিল্পবিপ্লবের শেষ সময়ে ফ্রান্সে যা দেখা দিয়েছিল **উনবিংশ শতাব্দীর** শেষার্ধে। এই সেই পরিস্থিতি যখন **বৃহস্পতি**র পিছু পিছু **চার্ব্বাকে**রা ফিরে আসে; যখন ভবিষ্যতের সাম্যবাদ তার experiment সারে — প্যারি কমিউনের উদয়াস্ত সম্ভব হয়। সেই অঙ্ক মিলিয়ে প্যারিসের ওই experiment-এর প্রায় ১৪০০ বছর আগে (প্রায় ৭০০ খ্রিস্টাব্দে), ভারতেই প্রথম সেই পরীক্ষা সেরে নেওয়া হয়। আবির্ভূত হন **পরীক্ষিৎ**, 'যিনি পরীক্ষা না করিয়া কোনও কিছু গ্রহণ করিতেন না।' (মহাভারত / **দণ্ডী**পর্ব) কিন্তু **পরীক্ষিৎ**দের তো দীর্ঘজীবী হবার উপায় নেই, সর্পাঘাতে (= ধনীদের আঘাতে) মৃত্যুই যে তাদের ভবিতব্য, এবং সে নির্বন্ধ ঠেকানো যায় না।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পরীক্ষিতেরা নিশ্চিহ্ন হয় না, বংশধর রেখে যায়। প্যারি কমিউনের বংশধর যেমন রাশিয়ায় বুর্জোয়ানিধন যজ্ঞ (= Proletarian Revolution = নভেম্বর বিপ্লব) চালায়, পরীক্ষিৎ-পুত্র **জনমেজয়**ও তেমনি সর্পমেধ যজ্ঞ বা সর্পসত্র অনুষ্ঠান করতে শুরু করে। 'কর্মযজ্ঞ বল্কল যাদের', যারা বৌদ্ধবিপ্লবেও অংশ নিয়েছিল, **শুক্ল যজুর্বেদের** প্রবক্তা সেই **যাজ্ঞবল্ক্য**ই তার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। এদিকে যজ্ঞবাট নির্মাণ কালেই জানা গেল, বুদ্ধিজীবী (দ্বিজ) এই **যজ্ঞের** বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তা সত্ত্বেও সে বাধা অতিক্রম করতে পারল না কেউই। **জরৎকারু** পিতা ও **জরৎকারু** মাতার পুত্র দ্বিজ **আস্তীক** আবির্ভূত হলেন। তার চেষ্টায়, রাশিয়ার আধুনিক সর্পসত্রের মতো, সেই প্রাচীন সর্পসত্রও ব্যর্থ হয়ে গেল। তাহলে তো এবার বুদ্ধিজীবী-নিধন যজ্ঞের ডাক দিতে হয় — Cultural Revolution! কেবলমাত্র **অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ** সম্বল করে **জনমেজয়** সেই প্রতিজ্ঞাই করে বসে — 'দ্বিজ সব করিব সংহার।' আদিম সাম্যবাদ থেকে নেমে আসা মানবসমাজের ভবিষ্যতের সাম্যবাদে পৌঁছনোর এইসব অপরিপক্ক প্রচেষ্টা দুটি অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে — এক: সমগ্র মানবসমাজের অংশবিশেষও একা একা ভবিষ্যতের সাম্যবাদে পৌঁছতে পারে। দুই: **কবন্ধ** হয়েও, অর্থাৎ মাথা কেটে ফেলে দিয়েও পৌঁছনো যাবে। দুটো সিদ্ধান্তই ছিল ভুল। কারণ একটা মানুষের অর্ধেকটা যেমন উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তেমনি নিজের মাথা কেটে ফেলে দিয়ে কোনও মানুষ নিজের উন্নতি করতে পারে না। এ তো তত্ত্বের ভিতরেই **ছিদ্র**!

ফলত, মৌলবাদের আত্মকলহের সুযোগে তাকে ধ্বংস করার সেই প্রচেষ্টায় ছিদ্র দেখা দেয়। তখন **দ্বিজমেধযজ্ঞ** বা Cultural Revolution-এর ব্যর্থতাতেই মৌলবাদ আর সন্তুষ্ট হয় না; হিংস্র ফ্যাসিজম রূপে সে আবির্ভূত হয় ও চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 'রামরাজত্ব ও রামকাহিনী'র সঙ্গে জড়িত মুখ্য জনগোষ্ঠীগুলিকে পুনরায় সে কেবল শূদ্র বলে নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের অস্পৃশ্য, অশুচি ঘোষণা করে তাদের সে অন্তেবাসী করে ছাড়ে। রামরাজত্বের **পদবী** ও হেতুবিস্মৃত স্মৃতিটুকু ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একই কর্মের ধর্মের জ্ঞানের আচারের বৃত্তির পুনরাবৃত্তিকে বংশানুক্রমিক পুনরাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। ঘোষিত হয় সেই মর্মান্তিক নিষেধ — 'বেদ উচ্চারণ করলে শূদ্রের জিভ কেটে দেবে, শূদ্র বেদ শুনলে সীসা বা গালা গলিয়ে তার কানে ঢেলে দেবে।' (গৌতম ধর্মসূত্র ১২/৪) দুই **জরৎকারু**র সন্তান রূপে আবির্ভূত **আস্তীক** শঙ্করাচার্যরূপে দেশব্যাপী ধর্মতন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিল। সারা দেশ জুড়ে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মৃত্যু ঘোষিত হল; রবীন্দ্রনাথের মতে, এখন থেকে সবই 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। 'বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা করা হল' অর্থাৎ জন্মদোষে শ্রেণীবিভাজনকে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হল, যা কিনা পৃথিবীর কোনো দেশে নাই। ঘোষিত হল, 'এক একটা জাতির এক একটা কাজ তার ধর্মের অঙ্গ'।

এর অনিবার্য ফল হল এই যে, 'ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মের দেশ' হয়ে গেল। সনাতন-ভারত বৈদিক-ভারতের যুগ পেরিয়ে এবং বৌদ্ধরূপে তার বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দু-ভারতে পরিণত হয়ে গেল। শুরু হল ভারতীয় দুর্দশার অন্ধকার যুগ; অন্ধ আচার সংস্কারের 'অচলায়তনের যুগ'। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় — 'বৌদ্ধ যুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কার জাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কার জালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে, এমন আর কোন কালেই করে নাই।' (উপরোক্ত আংশিক উদ্ধৃতিগুলি সবই রবীন্দ্রনাথ থেকে নেওয়া।)

সব ঘটনা ঘটে যাবার পর এবার ইতিহাস (= পুরাণ) লেখার পালা। যুগটা ছিল অবস্থান্তর প্রাপ্তির যুগ বা ইতিহাসের transitional period। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ও আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মরণ হয়নি, অথচ **পণ্য** ও **পুঁজি**র যথেষ্ট বিকাশের প্রভাবে প্রতীকী-ভাষা ও দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির চল হয়ে গিয়েছে। বৌদ্ধরা তাঁদের ঘটনাপঞ্জির বিবরণ লিখলেন প্রতীকী-ভাষায়, কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। আর **চন্দ্রবংশী**য়দের সমর্থক **বাল্মীকি**রা পুঁজিবাদের বিজয়ের কাহিনীটা লিখে গেলেন চিরাচরিত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়; ব্যক্তি নয় সত্তাই যার চরিত্র। ফলত ঘটনার বর্ণনার মধ্যেই ঘটনা আরও রহস্যাবৃত হয়ে গেল। সেই বৌদ্ধ গ্রন্থসম্ভারের সহস্রাধিক অনুবাদ করে নিল চীন ও তিব্বত, দুর্গম পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে

বাকি প্রতিবেশী দেশগুলিতেও **রাম** ও **বুদ্ধ** হাত ধরাধরি করে উপস্থিত হলেন, যেতে যেতেই তাদের চেহারা ও স্বভাব হয়ে গেল আরও রহস্যময়। তাই সই! **বর্ণাশ্রম** সৃষ্টিকারী প্রাচীন আর্যাবর্তের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের প্রাচীন বিরাগ সেই রহস্যাবৃত বেদবিরোধীদেরই স্বাগত জানাল। কিন্তু সেই **বুদ্ধ-রাম** যখন ইউরোপে গেলেন, প্রতীকী ভাষায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত পাশ্চাত্য তার প্রায় কিছুই বুঝল না। আর **ব্যাস** বসলেন জগৎসৃষ্টির শুরু থেকে ওই আদি প্রলেতারিয়-বিপ্লব (বা বুর্জোয়া-নিধনযজ্ঞ অর্থাৎ সর্পসত্র) ও প্রতিবিপ্লব পর্যন্ত মানবসমাজের বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসটা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় সংকলন করতে — লিখিত হল '**মহাভারত**'। প্রতিশোধাত্মক ওই প্রতিবিপ্লবের নাম দেওয়া হয় 'দণ্ডীপর্ব'। আর যাতে কেউ কোনওদিন 'প্রতিক্রিয়া'-জাত এই নতুন যুগের অন্ত ঘটাতে না পারে, তাই 'যুগান্তদ্বার' 'সংগোপিত' করে 'হরিবংশ'-এর খিল এঁটে দেওয়া হল। সম্ভবত ইতিহাস-জ্ঞানের অজ্ঞতা যে মানুষকে '**পশু**'তে পরিণত করে, সে তথ্য তাঁদের অজানা ছিল না। তাই মহাভারতাদির মধ্যে পুরো ইতিহাসটাকেই রাখা হল, এমনভাবে যাতে বংশধর ও শিষ্যেরা সেগুলি ভুলে না-যায়। সর্বোপরি 'খিল হরিবংশ' তো রইলই। এমন কি, একথাও তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না যে, 'শেষ যুগের' 'প্রলয় সময়ে' অনেকেরই স্মৃতি ফিরে আসবে এবং তাঁরা ওই 'ঋষি সংগোপিত যুগান্তদ্বারে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন।' (দ্র. হরিবংশ) শুধু এই হিসাবটুকু বোধহয় তাঁদের ছিল না যে, ইতিমধ্যে এমন কি বংশধর ও শিষ্যগণও আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিটি ভুলে যাবেন। ...

● **লঙ্কা** : ১. ✓রম্ + ক - অধিকরণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *যেখানে অধিষ্ঠিতেরা* **রমণ** *করে।* / যে স্থানে রাক্ষসেরা রমণ করে। (ব.শ.)। ৩. রক্ষঃপুরী, শাখা, কুলটা, শাকিনী, ধান্যবিশেষ, গাছমরিচ, ঝাল, (গৌণার্থে) বহুদূরদেশ। (ব.শ.)। রাক্ষসরাজ রাবণের পুরী। লঙ্কা লবণ সমুদ্রবেষ্টিত ত্রিকূট পর্বতের উপরিস্থিত বিশ্বকর্মা নির্মিত পুরী। ... মাল্যবান, সুমালী ও মালী ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দ্বারা এই পুরী নির্মাণ করান। এই স্থান হতে তাঁরা সর্বলোকের উপর উৎপীড়ন করায় বিষ্ণু এদের দমন করেন। মালী নিহত হয় এবং সুমালী ও মাল্যবান পাতালে গমন করে। এরপর বৈশ্রবণ (বিশ্রবার পুত্র) কুবের লঙ্কার অধিপতি হন। তিনি বৈমাত্র ভ্রাতা রাবণের হস্তে পরাজিত হয়ে রাবণকে লঙ্কার অধিকার ছেড়ে দেন। রাবণ সীতা হরণ করবার পর সীতা অন্বেষণে এসে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেন। রাবণ নিহত হলে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ লঙ্কার অধিপতি হন। (পৌ.অ.)। ৪. chilli অর্থে ও 'যে যায় **লঙ্কায়** সে হয় **রাবণ**' — এইরূপ প্রবাদাংশ রূপে প্রচলিত। ৫. অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাকে বোঝাতেই শব্দসৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। সেই সুবাদে 'সমাজের শাসনকেন্দ্র'কে বোঝাতে **লঙ্কা** শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেখানে যারা 'রক্ষা করিব' বলে নেতা রূপে নির্বাচিত হয়ে যায়, কিন্তু রক্ষা করার বদলে নিজেরা ভক্ষণ করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত বলে পরিণত হত **রাক্ষসে** এবং সেই **রাক্ষসে**রা সেখানে রমণ করে বা ফূর্তি করে বলে তার নাম হয়ে যায় **রঙ্কা** বা **লঙ্কা**। (এখানে **র-ল**-অভেদ নিয়মটি প্রযুক্ত হয়েছে।) বাংলাভাষীদের প্রবাদে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই **লঙ্কা**কে আমরা পেয়েছি। বাহ্যিক **লঙ্কা**তেও সেইরকম রজোগুণ ও তমোগুণ থাকে, শাসনকেন্দ্রে যেরূপ থাকে। যেকারণে সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষেরা শাসনকেন্দ্রে বা **লঙ্কা**তে থাকতে পারেন না। ... আমাদের একালের গ্রামসভা, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত-সমিতি, জেলা-পরিষদ, বিধানসভা, লোকসভা — এসবই বিভিন্ন স্তরের **লঙ্কা**। যে যায় **লঙ্কায়**, সেই সে **লঙ্কা**র স্বাদ পায়। ...

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পরবর্তী কালের অভিধান-কারগণ অদৃশ্য অর্থকে 'গৌণ' এবং দৃশ্য অর্থকে 'মুখ্য' ভেবে বসেন। ফলে, এমনকি বঙ্গীয় শব্দকোষও **লঙ্কা** শব্দের 'গৌণার্থ' দিয়েছেন 'বহুদূরদেশ'। ঠিকই তো! যিনি নির্বাচিত হয়ে শাসনাদি চালানোর জন্য রাজধানীতে বা একালের ভাষায় লোকসভা, বিধানসভায় যান, তিনি তো 'বহুদূরদেশে'ই যান! এটিই তো ছিল **লঙ্কা** শব্দের অদৃশ্যার্থ বা অভিধার্থ বা মুখ্যার্থ বা নিহিতার্থ বা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ। আর গৌণার্থ বা দৃশ্যার্থ বা প্রতীকী অর্থ ছিল 'গাছমরিচ'। অথচ কালের মারে এখন আমরা 'উল্টা বুঝলি রাম' হয়ে বসে আছি। ...

● **রস্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরস, আরসা, রশুই (রসই, রসুই), রস্, রস, রসআগর, রসই, রসইঘর, রসকথা, রসকর, রসকরা, রসকর্পূর, রসকলা, রসকলি, রসকল্প, রসকষ, রসকাঁঠী, রসকেশর, রসক্ষেপা, রসখেলা, রসগন্ধ, রসগন্ধক, রসগর্ভ, রসগুণ, রসগাথা, রসগুবাক, রসগোল্লা, রসগ্রহ, রসঘ্ন, রসজ, রসজ্যেষ্ঠ, রসজ্ঞ, রসজ্ঞা, রসজ্ঞতা, রসজ্ঞা, রসতড়কা, রসতেজঃ, রসদ (ration, রসিদ, receipt), রসদালিকা, রসধাতু, রসধিয়া, রসন, রসনা, রসনাকণ্ডুয়ন, রসনাথ, রসনানন্দ, রসনায়ক, রসনারব, রসনারোচন, রসনাশোধনী, রসনেত্রিকা, রসনেন্দ্রিয়, রসনোপমা, রসপাকজ, রসপাগল, রসপাচক, রসপুর, রসপ্রবন্ধ, রসবড়া, রসবতী, রসবন্ত, রসবহ, রসবাত, রসবাদ, রসবাদর, রসবান (-বৎ), রসবাস, রসবিক্রয়, রসবিক্রয়ী, রসবিৎ, রসবোধ, রসভঙ্গ, রসভব, রসভস্ম, রসভাত, রসমই, রসমন্ত, বসময়, রসময়ী, রসমর্দ্দন, রসমল, রসমাণিক, রসমাত্র, রসমারণ, রসমুণ্ডী, রসমূর্চ্ছন, রসযোগ, রসরঙ্গ, রসরাজ, রসরায়, রসলা, রসলোহ, রসশাস্ত্র, রসশোধন, রসসরোবর, রসসিদ্ধ, রসসিন্দূর, রসস্থান, রসা, রসাঞ্জন, রসাতল, রসাতলমূল, রসাত্মক, রসাধার, রসাধিক, রসাধিকা, রসাধিপত্য, রসান (রসানো), রসান (রসায়ন), রসানী, রসান্ত, রসান্তর, রসাবেশ, রসাভাষ, রসাভাস, রসাম্ল, রসায়ন, রসায়নফলা, রসায়নশ্রেষ্ঠ, রসারস, রসাল, রসালা, রসালী, রসাসালসা, রসাসিন্দূর, রসাসিন্ধু, রসাস্বাদ, রসাহ্ব, রসি, রসিক, রসিকতা, রসিকপন(া), রসিকভূপ, রসিকরায়, রসিকা, রসিকিনি(নী), রসিকেশ্বর, রসিত, রসিদ, রসিনী, রসিয়া, রসিল, রসী, রসুই, রসুইঘর, রসুইশাল, রসুইয়া, রসুয়্যা, রসুড়ি, রসুন (দ্র. লশুন), রসুম, রসুল, রসেন্দ্র, রসেশ্বর, রসোত্তম, রসোদগার, রসোদ্ভব, রসোন, রসোনক (লশুন), রসোপল, রসোল্লাস, রসৌকঃ, রসৌকাঃ, রস্য, রস্যা, রাস্, রাস্‌কেল (rascal), রাস, রাসক, রাসক্রীড়া, রাসগোষ্ঠী, রাসন, রাসপঞ্চাধ্যায়ী, রাসপূর্ণিমা, রাসবিলাস, রাসভ, রাসভারুণ, রাসভী, রাসমণ্ডপ, রাসমণ্ডল, রাসমহোৎসব, রাসযাত্রা, রাসরস, রাসলীলা, রাসায়নিক, রাসেরস, রাসেশ্বর, রাস্তা, রাস্না, রাহা, রাহাখরচ, রাহাজানি, রাহাদানী, রাহাদায়ী,

রাহি, রাহী, রাহূচ্ছিষ্ট, রাহূৎসৃষ্ট।

● **রস্** = আবর্ত্তিতের নির্য্যাসন। **রস** = আবর্ত্তিতের নির্য্যাস যাহাতে।

● **রস (রসকথা)** : ২. *আবর্ত্তিতের নির্য্যাস থাকে যাহাতে।* ৩. দ্র. ব.শ.। ৫. দ্র **চাট, বাঁশী**।

● **রহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : বিরহ, বিরহিণী, বিরহী, র-র,ররাট (ললাট), রসো, রহ্, রহ, রহঃ (রহস্) রহণ, রহনি, রহরহ, রহস্, রহস্কর, রহস্য, রহস্যত্রয়, রহস্যবচন, রহস্যবিক্ষেপ, রহস্যভেদ, রহস্যভেদন, রহস্যা, রহস্যাখ্যায়ী, রহা, রহিত (রহ্‌তহ্, রদ), রহোগত, রাহু, রাহুগত, রাহুগ্রসন, রাহুগ্রস্ত, রাহুগ্রহ, রাহুগ্রহণ, রাহুগ্রাস, রাহুগ্রাহ, রাহুদর্শন, রাহুপর্ব্ব, রাহুপীড়া, রাহুভেদী, রাহুরত্ন, রাহুশত্রু, রাহুসংস্পর্শ, রাহুসূতক, রাহুস্পর্শ, রিহাই, রেহাই, রেহান, রেহানদার, রেহাননামা, রৈ (রহি), রৈও (রহিও), রৈঘর (রহি-ঘর)।

● **রহ্** = আবর্ত্তিতের স্থির হওয়ন। **রহ** = আবর্ত্তিতের স্থির হওয়ন যাহাতে।

● **রাহু** : ২. *রহ হইতে জাত নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. বিষ্ণুপুরাণ মতে বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র**মন্থনে**র পর **বিষ্ণু** মোহিনীরূপ ধারণ করে যখন **দেবগণ**কে সুধা ভাগ করে দিচ্ছিলেন, সেই সময় এই রাহু দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের সহিত **অমৃত** পান করবার জন্যে একসঙ্গে উপবিষ্ট হন। এঁর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করলে চন্দ্র ও সূর্য এঁকে চিনতে পেরে বিষ্ণু ও দেবতাদের কাছে এঁর স্বরূপ প্রকাশ করে দেন। তখন বিষ্ণু নিজের সুদর্শন চক্রে এঁর মস্তক ছেদন করেন; কিন্তু অমৃত পান করবার ফলে রাহুর মৃত্যু হল না; এঁর মস্তক-ভাগ রাহু এবং দেহভাগ **কেতু** নামে খ্যাত হল। তখন হতে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরশত্রুতার সূত্রপাত — তাই রাহু এঁদের গ্রাস করে ফেলেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে **চন্দ্রগ্রহণ** এবং সূর্যকে গ্রাস করলে সূর্যগ্রহণ হয়। ... (পৌ.অ.)। ৫. 'চিরকাল একই অবস্থায় রেখে দেব' — এই চেষ্টায় গ্রাস করে যে, কিন্তু রাখতে পারে না, তাকে বলে **রাহু**। দ্র. **মন্থন**।

● ***রা* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরাত্র, অনুদার, অনৌদার্য্য, অবিরল, অবিরলিত, আরতি, আরাত্রিক, উদার, খর, খরতর, খরযান, খরা, ঝল্লরা, বিরল, বৈখরী, র, রা, রা (রব করা), রাইত, রাইয়ৎ (রাইয়ত, রায়ৎ, রায়ত, রেয়োত, রেয়াত করে যে), রাও, রাওদা, রাকা, রাকাচন্দ্র, রাকানিশা, রাকাপতি, রাকাবিভাবরী, রাকামুখী, রাকারমণ, রাকাশশধর, রাকাশশাঙ্ক, রাকাশশী, রাকেশ, রাত (দত্ত), রাত (রাত্রি), রাতকাণা, রাতচোরা, রাত-বেরাত, রাতভিত, রাতারাতি, রাতি, রাতিবিরাতি, রাতিয়া, রাত্তির, রাত্র, রাত্রি, রাত্রিকর, রাত্রিকাল, রাত্রিচর, রাত্রিচরী, রাত্রিচর্য্যা, রাত্রিচার, রাত্রিজল, রাত্রিঞ্চর, রাত্রিদিশ, রাত্রিন্দিন, রাত্রিন্দিব, রাত্রিন্দিবা, রাত্রিপর্য্যুসিত, রাত্রিবাস, রাত্রিবিগম, রাত্রিবিহারী, রাত্রিমট, রাত্রিমান, রাত্রিম্মন্য, রাত্রিযোগ, রাত্রিরক্ষক, রাত্রিশেষ, রাত্রী, রাত্র্যন্ধ, রাত্র্যাগম, রায় (রা-এ, উচ্চ রা-এ, উচ্চস্বরে), রৈ।

● **রা** = আবর্ত্তিতের আধার যে।

● **আরাত্রিক** : ১. রা = দান, গ্রহণ। ২. / যাহা অরাত্রিতেও (অর্থাৎ রাত্রিতে এবং দিবসেও) নিবৃত্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. নীরাজনকর্ম্ম, আরতি, নীরাজনার্থ দীপ; পঞ্চপ্রদীপ, নীরাজনপাত্র। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **নীরাজন**।

● **রাজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অদ্রিরাজ, অধিরাষ্ট্র, ঋক্ষরাজ, ঋষিরাজ, কবিরাজ, দ্বৈরাজ্য, নাগরাজ, বিরাজ, বিরাজমান, বিরাজিত, বিরাট, মহারাজ্ঞী, মুনিরাজ, রাআ, রাই, রাইগাঁই, রাইটরী, রাউটি(টী), রাউত (রাজপুত), রাউতঘড়, রাউতি, রাউল (আউল, রাজকুল বা রাজ-উল?), রাএ, রাজ্, রাজ, রাজক, রাজকদম্ব, রাজকন্যকা, রাজকন্যা, রাজকবি, রাজকর, রাজকর্ত্তা, রাজকর্ম্ম, রাজকলা, রাজকশেরু, রাজকার্য্য, রাজকি, রাজকীয়, রাজকুল, রাজকৃত্য, রাজকৌড়ি, রাজক্রিয়া, রাজকুঞ্জর, রাজকুল, রাজখর্জ্জুরী, রাজগদী, রাজগাঁড়, রাজগামী, রাজগিরি, রাজগুরু, রাজগুহ্য, রাজগৃহ, রাজঘাতক, রাজঘ্ন, রাজচক্র, রাজচিহ্ন, রাজচ্ছত্র, রাজজঙ্গল, রাজজননী, রাজজম্বু, রাজজোটক, রাজটীকা, রাজডঙ্কা, রাজতক্ত, রাজতন্ত্র, রাজতরু, রাজতা, রাজতাল, রাজতালী, রাজতিলক, রাজত্ব, রাজদণ্ড, রাজদন্ত, রাজদরবার, রাজদর্শন, রাজদার, রাজদূত, রাজদৃষৎ, রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহী, রাজদ্বার, রাজদ্বারিক, রাজধর্ম্ম, রাজধান, রাজধানক, রাজধানিকা, রাজধানী, রাজধান্য, রাজধাম, রাজধুরা, রাজন, রাজনয়, রাজনা (নীরাজনা), রাজনিবেশন, রাজনীতি, রাজনীল, রাজন্য, রাজন্যক, রাজন্যা, রাজন্বান্ (রাজন্বৎ), রাজপটোল, রাজপট্ট, রাজপত্নী, রাজপত্র, রাজপথ, রাজপদ, রাজপদ্ধতি, রাজপলাণ্ডু, রাজপাট, রাজপুত, রাজপুতানা, রাজপুত্র, রাজপুত্রী, রাজপুর, রাজপুরুষ, রাজপুষ্প, রাজপূগ, রাজপ্রেষ্য, রাজবংশ, রাজবংশী, রাজবংশ্য, রাজবদর, রাজবরা, রাজবর্চ্চস, রাজবর্ত্ম, রাজবল্লভ, রাজবসতি, রাজবাতি, রাজবাহ, রাজবাহ্য, রাজবিদ্যা, রাজবিহার, রাজবীজী, রাজবীথি(থী), রাজবৃত্ত, রাজবেশ্ম, রাজভট্ট, রাজভদ্রক, রাজভবন, রাজভয়, রাজভাট, রাজভাষা, রাজভূত, রাজভৃত্য, রাজভেট, রাজভোগ, রাজভোগ্য, রাজমণি, রাজমণ্ডল, রাজমণ্ডুক, রাজমন্ত্রী, রাজমন্দির, রাজময়ূর, রাজমল্ল, রাজমহল, রাজমহিষী, রাজমাই, রাজমাঘ, রাজমাতা(তৃ), রাজমানুষ, রাজমার্গ, রাজমাষ, রাজমিস্ত্রি, রাজমুদ্রা, রাজমুনি, রাজযক্ষ্মা, রাজযাজক, রাজযান, রাজযোগ, রাজযোগ্য, রাজযোটক, রাজযোষিৎ, রাজরাক্ষস, রাজরাজী, রাজরাজেন্দ্র, রাজরাজেশ্বর, রাজরাজেশ্বরী, রাজরাজ্যেশ্বর, রাজরাট্(জ্), রাজরাজ, রাজরাণী, রাজরীতি, রাজর্ষভ, রাজর্ষি, রাজর্ষিপ্রবর, রাজলক্ষণ, রাজলক্ষ্ম, রাজলক্ষ্মী, রাজলিখা, রাজলিঙ্গ, রাজলেখ, রাজলেখা, রাজলোক, রাজশণ, রাজশফর, রাজশয়ন, রাজশয্যা, রাজশাক, রাজশার্দ্দুল, রাজশাসন, রাজশাস্ত্র, রাজশৃঙ্গ, রাজশ্রী, রাজষষ্ঠ, রাজসংশ্রয়, রাজসংসৎ, রাজসত্র, রাজসদন, রাজসদ্ম(-দ্মন্), রাজসভা, রাজসর্প, রাজসর্ষপ, রাজসাক্ষিক, রাজসাক্ষী, রাজসাপ, রাজসারস, রাজসিংহ, রাজসুত, রাজসূয়, রাজসূনু, রাজসেবা, রাজস্ত্রী, রাজস্থান, রাজস্থানীয়, রাজস্ব, রাজস্বামী, রাজহংস, রাজহর্ম্ম্য, রাজহস্তী, রাজহাঁস, রাজহাল, রাজা (রাজন), রাজাই, রাজা-উজির, রাজাগ্নি, রাজাঙ্গণ, রাজাদন, রাজাধিকারী, রাজাধিকৃত, রাজাধিরাজ, রাজাধিষ্ঠান, রাজাধীন, রাজাধ্বা (-ধ্বন্), রাজানুজীবী, রাজান্ন, রাজাবর্ত্ত (রাউটী),

রাজাভিষেক, রাজারাজড়া, রাজারাজোড়া, রাজার্হ, রাজার্হণ, রাজাসন, রাজাহি, রাজি, রাজিত, রাজি(জী)নামা, রাজিল, রাজী, রাজীকৃত, রাজেন্দু, রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রাণী, রাজোপকরণ, রাজোপচার, রাজোপসেবা, রাজ্ঞী, রাজ্ঞীপদ, রাজ্য, রাজ্যকর, রাজ্যকর্ত্তা, রাজ্যখণ্ড, রাজ্যচ্যুত, রাজ্যতন্ত্র, রাজ্যদ্রব্য, রাজ্যধুরা, রাজ্যপদ, রাজ্যপাট, রাজ্যভঙ্গ, রাজ্যভার, রাজ্যভেদ, রাজ্যভোগ, রাজ্যভ্রংশ, রাজ্যব্যবহার, রাজ্যলক্ষ্মী, রাজ্যশ্রী, রাজ্যলোভ, রাজ্যলৌল্য, রাজ্যসুখ, রাজ্যস্থিতি, রাজ্যস্পদ, রাজ্যহর, রাজ্যাঙ্গ, রাজ্যাধিকার, রাজ্যাপহরণ, রাজ্যা-ভিষেক, রাজ্যাশ্রমমুনি, রাজ্যাস্পদ, রাজ্যি, রাজ্যিশুদ্ধ, রাজ্যেশ্বর, রাজ্যোপকরণ, রাঢ়া, রায় (রাজ, দৈত্যরাজ-দৈত্যরায়), রায়জাদা, রায়ত, রায়তী, রায়বাঁশ, রায়বাঁশিয়া (রায়বাঁশীয়া, রায়বাঁশ্যা, রায়বাসিয়া, রায়বেঁশে, রায়বেঁসে), রায়বাঘিনী, রায়বার, রায়বাহাদুর, রায়বেরিলি, রায়বেলি, রায়ভাটা, রায়ভাটি, রায়রাঞা (রায়রায়াঁ, রায়রেঞা, রায়রেঞে, রায়রেঁয়া, রায়রেয়েঁ), রায়রাণা, রায়সাহেব, রায়াটী (রাউটি), রাষ্ট্র, রাষ্ট্র-করা, রাষ্ট্রকর্ষণ, রাষ্ট্রগুপ্তি, রাষ্ট্রতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপাট, রাষ্ট্রপাটেশ্বরী, রাষ্ট্রপাল, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, রাষ্ট্রবাসী, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাষ্ট্রভঙ্গ, রাষ্ট্রভেদ, রাষ্ট্রান্তপাল, রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়, রাহুত (রাউত, রাজপুত), রেউলা (রাউল, রাজকুল), রেএটী (রাউটি), রেও (রেওভাট, রেয়ো, রাজভাট), রেওয়া, রেওয়াজ (রেয়াজ), রেজা (রেঝা, রাজ-এর সহায়িকা), রেজিস্টার, রেজিস্টারি (রাজ-এর অন্তর্ভুক্তি), রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রি, সম্রাজ্ঞী, সম্রাট, সরাজক, সুরাজা, সুরাষ্ট্র।

● **রাজ্** = আবর্ত্তিত আধারের জনন। **রাজ** = আবর্ত্তিত আধারের জনন যাহাতে।

● **দ্বৈরাজ্য** : ৫. শব্দটিকে আমরা বারংবার প্রয়োগ করেছি। এটির প্রথম প্রয়োগ আমাদের চোখে পড়েছে 'আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার'-এর বয়ানের বাংলা অনুবাদে। অনুবাদটি করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। দ্র. **প্র, ভাব, মহাবিদ্যা**।

● **বিরাজ (বিরাট, বিরাটপুরুষ)** : ৫. দ্র. **মৎস্যদেশ, মন্ত্রতন্ত্র**। **বিরাটপুরুষ** শব্দের একটি অর্থ হল উদ্ভব থেকে এযাবৎ আগত সমগ্র মানবজাতি, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'মহামানব', 'বিশ্বমানব' প্রভৃতি শব্দে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। শব্দটির আর একটি অর্থ হতে পারে মানবসমাজের 'উপরিসৌধ', ইংরেজিতে যাকে বলে superstructure। ...

● **রাষ্ট্র (রাষ্ট্রপতি, অধিরাষ্ট্র)** : অধিরাষ্ট্রের জন্য দ্রষ্টব্য **পৃথু, প্রজাপতি**। দ্র. **মহান**।

● **রাধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনুরাধা, অপরাধ, আরাধ, আরাধক, আরাধন, আরাধনা, আরাধিত, নিরপরাধ, রাদ্ধ, রাদ্ধান্ত, রাধ্, রাধ, রাধন, রাধনা, রাধনী, রাধা, রাধাকৃষ্ণ, রাধাচক্র, রাধানাথ, রাধাপদ্ম, রাধাবল্লভ, রাধাবল্লভী, রাধামাধব, রাধিকা, রাধী, রাধেয়, রান্ধ, রান্ধন, রান্ধনী, রান্ধা, রান্ধাবাড়া, রান্ধুনী, রান্না, রান্নাবাড়া, রান্নাবাড়না, রান্নাবান্না, সাপরাধ।

● **রাধ্** = আবর্ত্তিত হইতে জাত-র ধারণ। **রাধ** = আবর্ত্তিত হইতে জাতকে ধারণ করে যে।

● **অপরাধ** : ১. দ্র. ব.শ.। ২. *অপ আরাধনা (সমাজস্বীকৃত আরাধনার চেয়ে হীন আরাধনা) যাহাতে*। / স্বকর্ত্তব্যের অকরণ জন্য দোষ যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. অতিক্রম। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মজন্য দোষ। ... (ব.শ.)। ৫. সমাজের লিখিত বা অলিখিত সংবিধান অনুসারে যে সমাজসদস্যের যা ভূমিকা হওয়ার কথা, তার চেয়ে নিম্ন মানের ভূমিকাপালনকারী যা করে, তাই অপ-আরাধনা বা অপরাধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যদি অধ্যাপনার কাজ না-করে বা কাজে ফাঁকি দিয়ে অন্য কোনো নিম্নমানের কাজ করতে লেগে যায়, তবে সে **অপরাধী**। দ্র. **রাধা**।

● **আরাধনা** : ১. দ্র. ব.শ.। ২. *রাধনার (ধার চাওয়ার / 'ভাষণের' ব.শ.) আশ্রয় যাহাতে*। ৩. উপাসনা, সেবা, সাধনা, পরিচর্য্যা, উপচার, প্রসাদনা। ... (ব.শ.)। ৪. 'প্রার্থনা' বা 'পূজা' অর্থে প্রচলিত। ৫. এই 'ধার চাওয়া'র অর্থ কেবল টাকাপয়সা চাওয়াই বোঝায় না, প্রভাব প্রার্থনা, দৈহিক বা মানসিক শক্তি প্রার্থনা, এমনকি জ্ঞান প্রার্থনা পর্যন্ত যে কোনো বিষয়ে 'ধারাল' হয়ে ওঠার প্রার্থনা বোঝাতে পারে। দ্র. **রাধা**।

● **রাধা** : ২. *ধার করে যে সত্তা*। ৩. (ক) কৃষ্ণপ্রেমিকা **গোপ**বালা। বৃষভানুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী **কলা**বতীর গর্ভে রাধার জন্ম হয়। আয়ান ঘোষের সহিত এঁর বিবাহ হয়। ... শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার কোনোরূপ উল্লেখ নাই। ... (খ) সারথি অধিরথের স্ত্রী এবং কর্ণের পালিকা মাতা। একদিন স্বামীসহ রাধা নদীতে স্নান করবার সময় একটি **মঞ্জুষা** জলে ভেসে আসছে দেখতে পান। রাধার অনুরোধে অধিরথ সেটি জল হতে তুলে নিয়ে এলে তার মধ্যে সদ্যপ্রসূত একটি শিশুকে দেখতে পান। রাধা এই শিশুকে সযত্নে পালন করেন। এই শিশুই পরে কর্ণ নামে বিখ্যাত হন। পালিকা মাতার নাম অনুসারে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **চেতন, শ্যাম, কৃষ্ণ**। আমাদের মনে হয়েছে, **উমা, সিংহ, হংস** প্রভৃতি শব্দের মতো **রাধা** শব্দটিও বিপ্রতীপ নিয়মে বানানো হয়েছে। **ধার** করে যে, সেই হল **রাধা**। তা সে যে কোনো রকম **ধার** হতে পারে। শুধুমাত্র টাকা **ধার** করা নাও হতে পারে। ...

● ***রিচ্ (ঋচ্, অর্চ্, রচ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরিক্ত, অতিরেক, অরিক্ত, আরচিত, আরেচিত, রচ্, রচ, রচন, রচনা, রচয়িতা, রচিত, রিকাব, রিক্ত, রিক্তক, রিক্তপাণি, রিক্তভাণ্ড, রিক্তমতি, রিক্তহস্ত, রিক্তা, রিক্থ, রিক্থগ্রাহ, রিক্থজাত, রিক্থভাগী, রিক্থভাক্, রিক্থহর, রিক্থহার, রিক্থহারী, রিক্থাদ, রিক্থী, রিচ্, রেক, রেকাব, রেকাবি, রেচক, রেচন, রেচনক, রেচনী, রেচিত, রেজগী, রেস্ত।

● **রিচ্ (ঋচ্, অর্চ্, রচ্)** = গতিশীল আবর্ত্তিতের চয়ন। **রিচ** = গতিশীল আবর্ত্তিতের চয়ন যাহাতে। **ঋচ, অর্চ্** = দ্র. **ঋচ্, অর্চ্চ**। **রচ** = আবর্ত্তিতের চয়ন যাহাতে।

● **অতিরিক্ত** : ১. (ঋচ্, রিচ্)। ২. *যাহা রিক্তকে অতিক্রম করে*। ৩. অতিশয়িত, সমধিক, অধিক, উদ্বৃত্ত, উচ্চ, বেশী, অতিশয় রিক্ত বা শূন্য। ... (ব.শ.)। ৪. excessive অর্থে প্রচলিত। ৫. রিক্ত ও রিকথ দুটি শব্দই রিচ্ ক্রিয়া থেকে জাত। 'রিচ্' শব্দের অর্থ কর্মসম্পদ ধনদৌলতাদি, কিন্তু জ্ঞানসম্পদ তত্ত্বতথ্যাদি (ঋচ্) নয়। এই রিচ্ (riches) যাহাতে থাকে তাকে রিক্থ (বিভাগযোগ্য ধনরত্নাদি) বলে।

আর, এই রিচ্ যাকে তারণ করে তাকে **'রিক্ত'** বলে। অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষদেরকে রিক্ত বলে, যাদের যতটা সম্পদ ততটাই খরচ হয়ে যায় দিন গুজরান করতে। তার মানে 'রিক্ত' শব্দের প্রকৃত অর্থ শূন্য বা সর্বহারা নয়, প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদ যাদের কাছে থাকে, তারা 'রিক্ত'পদবাচ্য। তার চেয়ে বেশি সম্পদ হলেই **উদ্বৃত্ত** বা অতিরিক্ত।

● ***রিষ্ (ঋষ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অরিষ্ট, অরিষ্টক, অরিষ্টনেমি, অরিষ্টনেমী, অরিষ্টবাস, অরিষ্টমথন, অরিষ্টশয্যা, অরিষ্টসূদন, অরিষ্টহা, রিঠা (রীঠা, রিষ্ট, হৃষ্ট, ঋষ্ট), রিরি (রিষরিষ), রিশ্, রিশ্য (দ্র. ঋশ্য, ঋষ্য, ঋষ্যশৃঙ্গ দুরকম বানানেই হয়), রিশ্‌তা, রিষ্, রিষ, রিষি, রিষ্ট, রিষ্টক, রিষ্টি, রীষ, রেশ (রেশতা, race), রেশম (রেশং), রেশা (অংশু), রেশালা (রেসালা), রেশালাদার, রেষ্, রেষণ, রেষা (হ্রেষা), রেষারেষি, রোশনচৌকি, রোশনাই, রৌশন, রৌসন (দ্র. রেশ, অংশু), রৌশনারা।

● **রিষ্ (ঋষ্)** = গতিশীল রক্ষকের দিশাগ্রস্ত শয়ন। **রিষ** = গতিশীল রক্ষকের দিশাগ্রস্ত শয়ন যাহাতে। **ঋষ** = দ্র. **ঋষ্**।

● **অরিষ্ট** : ১. রিষ্ = হিংসা। (রেষারেষি)। ২. *যাহাতে রেষারেষি নাই*। / যাহার অকালমরণরূপ অশুভ নাই। (ব.শ.)। ৩. অহিংসিত, নির্ব্বিঘ্ন, শুভ, কশ্মলময়, পাপময়, দুর্নিমিত্তসূচক, অশুভরহিত, নিমগাছ, রশুন, রিঠা, মদ্যবিশেষ, বলির জ্যেষ্ঠপুত্র কংসচর অসুর; বৃষভাসুর, অনিষ্টস্থানস্থিত রবি প্রভৃতি গ্রহ। ... (ব.শ.)। ক) অসুরবিশেষ। বলিরাজের পুত্র। কংসের প্রিয়পাত্র। কৃষ্ণকে বধ করতে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে নিহত হন। খ) বৈবস্বত মনুর পুত্র, এঁর নাম নাভাগ। (পৌ.অ.)। ৫. আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন ট্যাক্সের আদিম রূপের প্রচলন হল, তখন তার প্রথম সংগৃহীত সম্পদকে যৌথসম্পদ রূপে দেখাই রীতি ছিল। তাতে ভাগ বসানো ঘোর বেআইনি ছিল। এবং মনে করা হত, সেটা সমাজের পক্ষে শুভ বা অরিষ্ট। ...

● **অরিষ্টনেমা** : ১. অরিষ্ট, নী = আনয়ন অথবা নম্ = নমিত হওয়া। (দ্র. **উন্নতি, উন্নয়ন**)। ২. *যে পর্যন্ত রেষারেষিহীন প্রাপণের সীমা থাকে*। ৩. মহাভারতোক্ত ঋষি। জনৈক হৈহয় রাজকুমার মৃগভ্রমে এঁর পুত্রকে হত্যা করেন। পরে সেই ঋষির আশ্রমে সেই ঋষিপুত্রকে জীবিত দেখেন। অরিষ্টনেমা বলেন, তাঁরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করেন, ব্রাহ্মণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বলেন, অতিথিসেবা করেন ও ঋষিদের সংসর্গে বাস করেন বলে তাঁদের মৃত্যুভয় নেই। (পৌ.অ.)। ৫. **হৈহয়** ক্ষত্রিয়রা ছিল আদিম ধনতন্ত্রের সমর্থক। (দ্রষ্টব্য — **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**)। তাদের সঙ্গে স্বভাবতই আদিম সমাজতান্ত্রিক অরিষ্টনেমার বিরোধ থাকার কথা এবং ছিলও। কিন্তু অরিষ্টনেমা যৌথতার দোহাই দিয়ে নিজেদের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। ...

● **অরিষ্টনেমি** : ২. *যিনি রেষারেষিহীন প্রাপণের সীমা বৃদ্ধি করেন*। ৩. অপ্রতিহত **গরুড়**, বিনতার পুত্রবিশেষ, **কশ্যপ**, **প্রজাপতি**বিশেষ, গন্ধর্ব্ববিশেষ, তীর্থঙ্করবিশেষ, মহাভারত মতে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি গরুড় **অরুণ** প্রভৃতি বিনতার ছয় পুত্র। কিন্তু মহাভারতের স্থানান্তরে এবং হরিবংশ মতে পাঁচ পুত্র। (ব.শ.)। ক) **যক্ষ**বিশেষ। ইনি বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র। প্রতিমাসে সূর্যরথে এক এক **আদিত্য**, ঋষি, **গন্ধর্ব**, অপ্সরা, যক্ষ, **নাগ**, রাক্ষস, ও এক সর্প নিয়ে ভ্রমণ করতেন। পৌষ মাসে সূর্যরথে অধিষ্ঠিত থাকতেন আদিত্য, **ভগ**, **ঋষি**, ক্রতু, গন্ধর্ব, উর্ণায়ু, অপ্সরা পূর্বচিত্তি, **যক্ষ** অরিষ্টনেমি, নাগ কর্কোটক, এবং রাক্ষস স্ফুর্জ। ঋষি স্তব করেন, গন্ধর্ব গান করেন, অপ্সরা নৃত্য করে, রাক্ষস পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, নাগ **অশ্ব** সজ্জিত করে, এবং যক্ষ লাগাম লাগায়। সকল শুভ কার্যের স্বস্তিবচনে অরিষ্টনেমির নাম-কীর্তন করা হয়ে থাকে। খ) জনৈক প্রজাপতি, ইনি দক্ষের ৪ টি কন্যা বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **বায়স**। যৌথসমাজের ভেতরেই যে সত্তা রেষারেষিহীন ভাগবাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করতেন কিংবা তদ্রূপ ব্যবস্থার দেখাশোনা করতেন, সম্ভবত তাঁকেই **অরিষ্টনেমি** নাম দেওয়া হয়েছিল। ...

● ***রী (ঋ)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : রী, রীঢ়া, রীত, রীতি, রীতিক, রীতিকা, রীতিকুসুম, রীতিজ, রীতিনীতি, রীতিপুষ্প, রীতিবদ্ধ, রীতিবিরুদ্ধ, রীতিরেওয়াজ, রেণু, রেণুকা, রেণুকাতনয়, রেণুকাসুত, রেণুগুণ্ঠিত, রেণুজাল, রেণুৎপাত, রেণুবাস, রেণুরূষিত, রেত, রেতঃ, রেতঃপাত, রেতঃপাতী, রেতঃসেক, রেতঃসেক্তা, রেতঃস্কন্দন, রেতঃস্খলন, রেতোধা, রেতোমার্গ, রৈতিক, রৈত্য।

● **রী (ঋ)** = গতিশীল আবর্ত্তিতের আধার যে। **ঋ** = দ্র. **ঋ**।

● **রীতি** : ১. ২. ৩. ৪. ৫. দ্র. **ঋত**। সক্রিয়-আবর্ত্তিত তারিত হয় যে গতিশীলতায়, তাকে বলে **রীতি**। একে **ঋতি** বললেও চলে।

● **রেতঃ (রেতঃপাত)** : ১. ২. *দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তিতের তারণের নির্য্যাস থাকে যাহাতে*। ৩. ৪. ৫. দ্র. **উর্দ্ধরেতা**। রেতঃবর্ধক **বৃষ**। যাঁরা তত্ত্বকে উৎপাদন **কর্ম্মযজ্ঞে** প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র মনে মনে তত্ত্ব চিন্তা করতে শুরু করেন, সেকালে তাঁদের বলা হত **উর্দ্ধরেতা**। **দক্ষযজ্ঞে**র পর **শিব যতিধর্ম্ম** গ্রহণ করে **উর্দ্ধরেতা** হয়ে যান। পুরাণাদি গ্রন্থে উপযুক্ত **ক্ষেত্র** চোখে পড়ে যাওয়ার পর **মহর্ষি**দের তত্ত্বজ্ঞান নিঃসারিত হয়ে যেত। সেকারণে পুরাণে মাঝেমধ্যেই **মহর্ষি**দের **রেতঃপাত**-এর কথা বলা হয়েছে। ... এরকম ব্যাপার আজও প্রায়শই ঘটে থাকে।

গ্রামবাংলায় স্রোতাংশকেও **রেত** বলা হয়। মনে করা যাক, একটি ১০ ফুট চওড়া নদীর জলের স্রোতধারা ১০ ফুট জুড়ে বয়ে চলেছে। এই ১০ ফুটে যদি এক লক্ষটি রেখা টানা যায়, তাহলে স্রোতধারাটি এক লক্ষ রেখা ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই রেখাগুলির এক একটি রেখা যে স্রোতাংশকে বহন করে, তাকে বলে রেত। কাঁসাই নদীতে ডোঙা ও নৌকায় ঘোরাঘুরির কালে এরকম বাক্য কলিম খানকে শুনতে হত, 'ওই বাঁকা রেতটার দিকে যাসনি'।

● **রু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অরব, আরব, আরাব, আরুত, উতরোল, কলরোল, কুরব, কৌরব, গৌরব, মহারোল, মেঘরাব, রব, রবক-সবক, রবণ, রবধান, রবাব, রবার, রবাহূত, রবি, রবিউল, রবিউল-আউয়াল, রবিকান্ত, রবিকুল, রবিখন্দ, রবিগ্রহ, রবিগ্রহণ, রবিচক্র, রবিচ্ছবি, রবিছবি, রবিজ, রবিজা, রবিতনয়, রবিদাস (রুইদাস), রবিদিন, রবিদীপ্ত, রবিনন্দন, রবিনাথ, রবিপথ, রবিপুত্র, রবিপ্রিয়, রবিবংশ, রবিবাসর, রবিবিম্ব, রবিমণি, রবিরত্ন, রবিরত্নক, রবিলোচন, রবিলোহ, রবিশস্য, রবিশিলা,

রবিসংক্রান্তি, রবিসারথি, রবিসুত, রবিসুতা, রবীন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাওয়ারাই (দ্র. রণ্), রাব, রাবকাড়া, রাবড়ি, রাবণ, রাবণারি, রাবণি, রাবিশ (রা-বিষ, rubbish, ruins, রু-ইন), রাবী, রু, রুইদাস, রুএদাদ (রোয়দাদ), রুত, রুতজ্ঞ, রুতবেত্তা, রুতব্যাজ, রুবকারী, রুম্ (room, দ্র. রম্), রুমা (উমা, দ্র. রুষ্), রুমাল, রুমি(মী) (জালালুউদ্দিন রুমি), রুরু, রুরুচেষ্টিত, রুরুভৈরব, রুল (rule), রুলম্ব, রুলি(লী), রূলি(লী), রেবত, রেবতী, রেবতীকান্ত, রেবতীরমণ, রেবতীশ, রেবা, রোরুদ্যমান, রৈবত, রৈবতক, রোঁ, রোঁয়া (রোঙা, রোয়াঁ), রোঁদ, রোম, রোয়দাদ, রোল, রোল-কল, রোল-নম্বর, রোলম্ব, রোলার, রৌরব, হাস্যরোল।

● **রু** = যে আবর্ত্তিত নবরূপে উত্তীর্ণ; কিংবা, আবর্ত্তনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে।

● **রব (রবি)** : ২. **রব** = *আবর্ত্তিতকে বহন করে যে। **রবি** = **রব** গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৫. দ্র. **পুরূরবা**। রব বহু প্রকার — আরব, কলরব, করব (**করবী**), কুরব (**কৌরব**), গরব (**গর্ব্ব**), গুরব (**গৌরব**), জনরব, দারব (দার্ব্ব), নীরব, পুরুরব (পুরূরবা), পৌরব, মহারব (হমরব > হামুরাবী, দ্র. **মহ** = Moho), রবন (**রাবণ**), রৌরব, সরব ... ইত্যাদি।

● **রাবণ** : ২. *(রব অন যাহাতে = **রবণ**।) **রাবণ** = **রবণ** হইতে জাত; কিংবা, যে (তোমাদের জন্য হ্যান করে দেব, ত্যান করে দেব ... ইত্যাদি) উচ্চরব করে।* / **রাবণ** = যে রব করে। (ব.শ.)। ৩. **ব্রহ্মা**র পুত্র **পুলস্ত্য**, তাঁর পুত্র **বিশ্রবা**। (দ্র. **বিশ্বশ্রবা**)। এই বিশ্রবা মুনির ঔরসে ও **সুমালী** কন্যা কৈকসীর (অন্য নাম **নিকষা**) রাক্ষসীর গর্ভে **রাবণ, কুম্ভকর্ণ** ও **বিভীষণ** নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। **লঙ্কা** রাক্ষসদের বাসভূমি ছিল। ... (পৌ.অ.)। ৫. একালে যাকে নির্বাচিত দেশশাসক বলা হয়, যাঁরা 'তোমাদের জন্য হ্যান করে দেব, ত্যান করে দেব, স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে দেব ...' ইত্যাকার 'প্রতিশ্রুতি' দিতে থাকেন, সেকালে তাঁদের **রাবণ** বলা হত। **বৌদ্ধ**-বিপ্লবে এই **রাবণ**সত্তাকে ধ্বংস করেন **নগদ-নারায়ণের অবতার** পুরুষোত্তম **রামচন্দ্র** এবং ভারতে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করেন। ...

● **রুরু** : ২. *নবরূপী আবর্ত্তিতকে নবরূপে আবর্ত্তিত করে যে।* ৩. **ভৃগু**পুত্র **চ্যবনে**র ঔরসে ও সুকন্যার গর্ভে **প্রমতি** জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতির ঔরসে **ঘৃতাচী** অপ্সরার গর্ভে রুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহবাসে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হন। কিন্তু এই অপ্সরার কন্যা জন্মগ্রহণ করলে তিনি নদীতীরে কন্যাকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করেন। সেই সময় মহর্ষি স্থূলকেশ এই কন্যাকে ... পালন করেন। এই কন্যার স্বভাব, রূপ, গুণ, সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ বলে মহর্ষি এর নাম রাখেন প্রমদ্বরা। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **প্রমতি, প্রমদ্বরা, উর্ব্ব, ঘৃতাচী**।

● **রৈবত মনু** : ৩. চতুর্দশ মনুর ইনি অন্যতম। ইনি অতীত মনুদের পঞ্চম স্থানীয় ছিলেন। রৈবত মনুর সময়ে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **মনু**।

● **রুচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরুচির, অভিরুচি, অরুচি, রুক্(চ্), **রুক্ম**, রুক্মকবচ, রুক্মকারক, রুক্মপুঙ্খ, রুক্মপৃষ্ঠ, **রুক্মবাহন**, রুক্মময়, **রুক্মরথ**, রুক্মাঙ্গদ, **রুক্মাভ**, রুক্মিণী, রুক্মী, রুচ্, রুচ, রুচক, রুচা, রুচি, রুচিকর, রুচিধাম, রুচিপ্রদ, রুচিফল, রুচিভর্ত্তা, রুচির, রুচিরভাষণ, রুচিরমূর্ত্তি, রুচিরা, রুচিরাক্ষী, রুচিষ্য, রুচী, রুচ্য, রুচ্যমান, রোক, রোক-থোক, রোক-শোধ, রোকড়, রোকড়া, রোকা, রোক্কা-কড়ি, রোচ, রোচক, রোচন, রোচনক, রোচনা (গোরোচনা), রোচনিকা, রোচনী, রোচমান, রোচি, রোচিঃ, রোচিষ্মান, রোচিষ্ণু, রোচিনী, রোচী, রৌক্ম, রৌক্মিণেয়, রৌচনিক, রৌচ্য।

● **রুচ্** = নবরূপী আবর্ত্তিতের চয়ন। **রুচ** = নবরূপী আবর্ত্তিতের চয়ন যাহাতে।

● **রুক্মিণী** : ৩. **বিদর্ভ**রাজ **ভীষ্মকে**র কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। ইনি লক্ষ্মীর অবতার। এঁর ভ্রাতার নাম রুক্মী। ... রুক্মী কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন। ইনি পরশুরামের কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন। এবং কৃষ্ণ কংসহত্যাকারী বলে তাঁর বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। ... শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলে ... **জরাসন্ধ**, শিশুপাল, রুক্মী ইত্যাদি সকলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ... ও পরাস্ত হন। ... রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী। (হরিবংশ অনুসারে) তাঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চরুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু, ও চারু প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একটি কন্যার নাম চারুমতী। (পৌ.অ.)। ৫. **রু**-করণ সীমায়িত হইয়া অন থাকে যে আধারে, তাকে **রুক্মিণী** বলে। যা অত্যন্ত রোচনীয়, তা সে অতিরূপ হতে পারে, সোনাও হতে পারে ... আর একটু অনুসন্ধান করতে হবে।

● **রুচি** : ২. **রুচ** *(নবরূপী আবর্ত্তিতের চয়ন যাহাতে) গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৩. দীপ্তি, অনুরাগ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। (ক) মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও গরুড়পুরাণ মতে, একজন **প্রজাপতি**। একদিন তিনি গৃহহীন ও আশ্রমবর্জিত হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতৃগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। **পিতৃগণ** তাঁকে বিবাহ করতে বলেন। অবশেষে এঁদের নানারকম উপদেশে রাজি হয়ে রুচি উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করতে লাগলেন। পিতৃগণের স্তব করতে তাঁরা একস্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন — এই নদীর মধ্যে হতে তোমার জন্য কন্যার আবির্ভাব হবে। নদীমধ্য হতে অপ্সরা প্রম্লোচা উত্থিতা হয়ে বলেন — আমার গর্ভে **বরুণ**পুত্র **পুষ্করে**র ঔরসে এক কন্যার জন্ম হয়েছে, আপনি সেই কন্যাকে **বিবাহ** করুন। তখন রুচি প্রম্লোচার কন্যা **মালিনী**কে বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভে রৌচ্য নামে রুচির এক পুত্র জন্মে। ইনিই অন্যতম **মনু**। (খ) বায়ুপুরাণ অনুসারে সূর্যের স্ত্রীর নাম রুচি। (গ) **নহুষে**র কন্যার নাম রুচি। (ঘ) মহাভারত অনুসারে **বিশ্বামিত্রে**র এক পুত্রের নাম রুচি। (পৌ.অ.)। ৫. এই সত্তাগুলি সবই আদিম ধনতন্ত্রের পক্ষে সক্রিয় সত্তা। পরে পরে সকলের মন আপন আপন রুচি অনুসারে চলবার চিন্তায় রঞ্জিত হয়ে যায়। এটিই **স্বারোচিষ মন্বন্তর**। দ্র. **মনু, মন্বন্তর**।

● **রৌচ্য** : ৩. ইনি ত্রয়োদশ মনু। রুচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ্য। এই মন্বন্তর কালে সুপর্বা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি ইন্দ্র, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎ, সুক, নির্মোহ, সুতপা, নিষ্প্রকর্ম, চিত্রনরকৃত, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনেত্র, ক্ষত্রবুদ্ধি ও সেন, বিচিত্র, সুরত প্রভৃতি মনুপুত্রগণ উদ্ভূত হন। (পৌ.অ.)। ৫. দেখা দরকার, **রুচি, রৌচ্য**, ও **স্বারোচিষ** — এদের মধ্যে সম্বন্ধ কী, পার্থক্যই বা কী?

● **রুজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরোগ, অনারোগ্য, অরুজ, অরোগ, অরোগিতা, আরোগ্য, আরোগ্যতা, আরোগ্যব্রত, আরোগ্যশালা, আরোগ্যস্নান, চিররুগী, নওরোজ, রুক্(জ্), রুক্‌কর, রুগন্বিত, রুগী, রুগীপত্র, রুগ্‌ণ, রুগ্ন, রুজ্, রুজ, রুজা, রুজাকর, রুজাকরণ, রুজাপহ, রুজি, রুজি-মারা, রুজি-রোজগার, রুজু, রোজ, রোগ, রোগক্ষয়, রোগঘ্ন, রোগজ্ঞ, রোগদ, রোগনাড়া, রোগনারা, রোগনাশ, রোগনিগ্রহ, রোগনিগ্রহণ, রোগপালক, রোগপ্রদ, রোগবিনিশ্চয়, রোগবৈরূপ্য, রোগভাক্, রোগরাট্, রোগরাজ, রোগলক্ষণ, রোগশম, রোগশান্তি, রোগশিলা, রোগশ্রেষ্ঠ, রোগসংঘাত, রোগহর, রোগহারী, রোগহৃৎ, রোগা, রোগাটে, রোগাধীশ, রোগানীক, রোগান্তক, রোগাপটকা, রোগা-পাতলা, রোগায়তন, রোগার্ত্ত, রোগার্দ্দিত, রোগাবিষ্ট, রোগাশোগা, রোগিত, রোগী, রোগ্য, রোজ, রোজগার, রোজগারী, রোজনামচা, রোজনামা, রোজা (রোঝা), রোজা (রুজিরুটিহীন সময়), রোজাদার, রোজানা, রোজিনা।

● **রুজ্** = নবরূপী আবর্ত্তিতের জনন। **রুজ** = নবরূপী আবর্ত্তিতের জনন যাহাতে।

● **রুদ্ (*রোদি*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : রদ্রু, রুদ্, রুদ, রুদন, রুদনমুখী, রুদিত, রুদ্যমান, রুদ্র, রুদ্রগণ, রুদ্রগর্ভ, রুদ্রচণ্ডী, রুদ্রজ, রুদ্রতাল, রুদ্রদর্শন, রুদ্রপত্নী, রুদ্রপ্রিয়া, রুদ্রবলি, রুদ্রবীণা, রুদ্রমূর্ত্তি, রুদ্রযামল, রুদ্রসখ, রুদ্রসম্মিত, রুদ্রসর্গ, রুদ্রসাবর্ণি, রুদ্রসূ, রুদ্রসৃষ্টি, রুদ্রস্বর্গ, রুদ্রাক্রীড়, রুদ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষমালা, রুদ্রাক্ষমালিকা, রুদ্রাঙ্কুশ, রুদ্রাণী, রুদ্রাবাস, রুদ্রিয়, রুদ্রেশ্বর, রো (রোই, রোয়, রোয়ত), রোদ, রোদঃ, রোদন, রোদনিকা, রোদনী, রোদনীকন্দর, রোদসী, রোদিত, রোদিতি, রোদ্দুর, রোয়, রোয়ত, রৌদ্র, রৌদ্রকর্ম্মা, রৌদ্রকর্ম্মী, রৌদ্রদর্শন, রৌদ্রপোড়া, রৌদ্রাক্ষ, রৌদ্রী, রোয়ন।

● **রুদ্ (রোদি)** = নবরূপী আবর্ত্তিতের দান। **রুদ** = নবরূপী আবর্ত্তিতের দান যাহাতে। **রোদি** = **রুদি**র আশ্রয় যাহাতে।

● **রুদ্র** : **২.** *নবরূপী আবর্ত্তিতের দান রহে যাহাতে।* **৩.** দ্র. ব.শ.। ... রুদ্র সেইজন্য গর্জনকারী মরুৎগণের পিতা; এই সম্পর্কে রুদ্র বজ্র বা বজ্রধারী মেঘরূপ দেবতা। বেদে রুদ্রের বিবিধ নামের ও বিবিধ গুণের উল্লেখ দেখা যায়। ... তাঁকে বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ বলা হয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে মুক্তিদাতা, প্রথম দেবভেষজ। ... রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময়, ১০/৯২/৯ ঋগ্‌বেদ)। এই শিব বিশেষণ পরে রুদ্রের অপর নাম হয়ে পৌরাণিক ত্রিদেবতার একতম হয়েছেন। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিনাশ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। উপনিষদে রুদ্রের চরিত্রের বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে রুদ্র নিজেকে বলেছেন — আমিই সর্বপ্রথমে আগত, আমার পূর্বে কিংবা উপরে কেহ নাই। ... ইনি ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু, ইনি ইন্দ্র, ইনি শিব। এঁর আদি, মধ্যম, অন্ত কিছুই নাই। ... (পৌ.অ.)। **৫.** ভারতের মাটি খুঁড়ে সবচেয়ে আদি যে মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, সেটি **রুদ্রমূর্তি**। সনাতন সমাজের **শিব** বা আবিষ্কারক, স্রষ্টা, পথপ্রদর্শক **মহর্ষি**গণ নবোদ্ভূত **দক্ষ**-সমর্থক **মহর্ষি**দের উপর রুষ্ট হয়ে **রুদ্র**রূপ গ্রহণ করেছিলেন। দ্র. **দক্ষ**।

● **রোদন** : **৫.** কারও আবর্ত্তন রুদ্ধ করে দিলে, সে তো পড়বে বিপদে। কেউ রোজ সকালে উঠে মাঠে যায়, খাটে, সন্ধেবেলা সিধা নিয়ে ফেরে, ছাপোষা মানুষ রূপে ছা-পোষে; কেউবা সকালে অফিসে যায়, কাজকর্ম করে, মাসের শেষে টাকা পায়। প্রত্যেক জীবের তো এরকম আবর্ত্তন রয়েছে। সেই আবর্ত্তন বন্ধ করে দিলে তার **রোদন** হয়। ব্যঞ্জনার্থে সেটিই **ক্রন্দন**।

● **রুধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনিরুদ্ধ, অনুরুদ্ধ, অনুরোধ, অবরুদ্ধ, অবরোধ, অবিরুদ্ধ, অবিরোধ, অবিরোধী, অরুন্ধতী, অরুন্ধতীজানি, অরুন্ধতীনাথ, অরুন্ধতীপ্রদর্শনন্যায়, অরুন্ধতীসহচর, উপরোধ, কণ্ঠরোধ, নিরুদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ, প্রতিরোধ, বিরুদ্ধ, বিরোধ, রুদ্ধ, রুদ্ধদৃক্, রুদ্ধবক্ত্র, রুদ্ধবীর্য্য, রুধ্, রুধ (রোধ), রুধির, রুধিরচর্চ্চিত, রুধিরতাম্র, রুধিরপাত, রুধিরপায়ী, রুধিরপ্রদিগ্ধ, রুধিরপ্রদিগ্ধান, রুধিরপ্লাবিত, রুধিরবর্ষ, রুধিররূষিত, রুধিরলালস, রুধিরলেপ, রুধিরাখ্য, রুধিরানন, রুধিরাময়, রুধিরাশন, রুন্ধ, রোদ্ধা (রোদ্ধৃ), রোধ, রোধঃ, রোধক, রোধন, রোধবক্রা, রোধভেদী, বোধী, রোধ্য, রৌধির, লোধ, লোধ্র, লোধ্রকল্ক, লোধ্রকষায়, লোধ্রদ্রুম, লোধ্রপাণ্ডু, লোধ্রপ্রসব, লোধ্ররজঃ, লোধ্ররেণু, সংরুদ্ধ।

● **রুধ্** = নবরূপী আবর্ত্তিতের ধারণ। **রুধ** = নবরূপী আবর্ত্তিতের ধারণ যাহাতে।

● **অরুন্ধতী** : **২.** / যিনি রোধ করেন না। (ব.শ.)। **৩.** জনক মহর্ষি কর্দম, মাতা দেবহূতি। ... 'অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতা হও' এই অভিপ্রায়ে পতির সহিত নববধূকে অরুন্ধতী (নক্ষত্র) দেখাইবার বিধি আছে। ... প্রসিদ্ধি যে, আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতী দেখিতে পায় না। দক্ষকন্যা। সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র। জিহ্বা। (ব.শ.)। কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি বশিষ্ঠের পত্নী। অতীব বিদুষী। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে লিখিত আছে — পতিসেবারূপ ধর্মপথ যে নারী অনুসরণ করেন, তিনি অরুন্ধতীর মতো স্বর্গেও পূজিতা হন। আকাশে নক্ষত্ররূপে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী বিরাজ করেন। যাঁরা সপ্তর্ষিমণ্ডলে অরুন্ধতীকে দেখতে না পান, তাঁদের আয়ু শেষ হয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়। বিবাহের কুশণ্ডিকাকালে মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী (বশিষ্ঠ-নীতি অনুসারী সম্প্রদায়) ও **অত্রি** পত্নী অনসূয়া (অত্রি-নীতি অনুসারী সম্প্রদায়) — এই দুজনের বিশেষত্ব এই যে, এঁরা অত্যন্ত **সতী**। এঁরা অত্যন্ত যথাযথভাবে বৈদিক নীতি অনুসারে উৎপাদন-কর্ম্ম**যজ্ঞ** অনুষ্ঠান করতে থাকেন। কখনো কাউকে — কেন সে যৌথব্যবস্থার ভিতরে থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা নিচ্ছে, ব্যক্তিগত ধান্দা করছে ... ইত্যাদি — প্রশ্ন করেন না, তাঁদের 'রোধ' করেন না বলে এঁদের বলা হত **অরুন্ধতী**; তাঁদের সম্পদ দেখে অসূয়া করেন না বলে এঁদের বলা হত **অনসূয়া**।

● **রুষ্ (লু) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অরুশ, অরুষ, অরুষে, অরুসে, অরোষ, একরোখা, রুখ (রোখ), রুখনি, রুট্, রুট (উট, রুঠ), রুটি, রুটিমুট, রুঠ, রুষ্, রুষ, রুষা, রুষিত, রুষ্ট, রুষ্টি, রুষ্মা (উষ্মা, রুমা-উমা), রূষ্, রূষণ, রূষিত, রোক, রোকা (একরোকা-দোরোকা শাল), রোখ, রোখা (একরোখা,

একমুখী রুষ্টতা), রোখারোখি, রোট, রোটিকা, রোটী, রোষ, রোষকষায়িত, রোষতাম্রাক্ষ, রোষদৃষ্টি, রোষপরীত, রোষবিভ্রম, রোষভাষণ, রোষময়, রোষরুক্ষ, রোষণ, রোষাকুলিত, রোষাক্ষেপ, রোষাগ্নি, রোষাবেশ, রোষারুষি, রোষিত, রোষিণী, রোষী, রোষ্টৃ, রোষ্টা (রোষ্টৃ)।

● **রুষ্ (লৃ)** = নবরূপী আবর্ত্তিতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **রুষ** = নবরূপী আবর্ত্তিতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **লৃ** = নবরূপী লালনকারীর আধার যে।

● **রুহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অওরো, অতিরূক্ষ, অতিরোমশ, অতিরোহিত, অতিলোমশ, অতিলোমা, অত্যারূঢ়, অধিরোহণ, অন্বারোহণ, অবরোহ, অবরোহণ, আরুরুক্ষা, আরুহ, আরূঢ়, আরূঢ়ি, অরোঢ়া, আরোপ, আরোপক, আরোপণ, আরোপিত, আরোপ্য, আরোহ, আরোহক, আরোহণ, আরোহণীয়, আরোহী, আলোহিত, দুরারুহ, বৃক্ষরোপণ, রুই, রুইতন, রুক্ষ, রুক্ষী, রুক্ষু, রুখ, রুখলি (রূখলি), রুখা, রুখাসুখা, রুখু, রুখুসুখু, রুপ (রোপণ), রুয়া (রোয়া, রোপণ), রুহ্, রুহ, রুহা, রুহিত, রুহী, রূক্ষ, রূক্ষগন্ধ, রূক্ষণ, রূক্ষদর্ভ, রূক্ষপত্র, রূক্ষবাক্, রূক্ষবাদী, রূক্ষস্বর, রূক্ষাস রূক্ষিত, রূখ, রূখলি, রূঢ়, রূঢ়গ্রন্থি, রূঢ়পরিচ্ছদ, রূঢ়প্রণয়, রূঢ়মন্যু, রূঢ়মূল, রূঢ়যৌবন, রূঢ়শ্মশ্রু, রূঢ়সৌহৃদ, রূঢ়স্কন্ধ, রূঢ়ি, রূঢ়িবৃত্তি, রূঢ়িশব্দ, রো, রোপ, রোপক, রোপণ, রোপণীয়, রোপয়িতা, রোপিত, রোপা, রোম, রোমক, রোমকণ্টক, রোমকন্দ, রোমকূপ, রোমগর্ত্ত, রোমগুচ্ছ, রোমজ, রোমনগরী, রোমন্থ, রোমন্থক, রোমন্থন, রোমপাদ, রোমপুলক, রোমবিকার, রোমবিক্রিয়া, রোমবিভেদ, রোমরন্ধ্র, রোমরাজি(জী), রোমলতা, রোমলতিকা, রোমশ, রোমসূচী, রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ, রোমা, রোমাঙ্ক, রোমাঙ্কুর, রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চিত, রোমাবলি(লী), রোমালী, রোমোৎপাত, রোমোৎসব, রোমোদ্গতি, রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ, রোয়, রোয়াই, রোয়ল, রোয়া, রোয়াক (rock), রোরুদ্য, রোরুদ্যমান, রোহ, রোহক, রোহণ, রোহি, রোহি, রোহিণি, রোহিণিকা, রোহিণী, রোহিণীপতি, রোহিণীপ্রিয়, রোহিণীবল্লভ, রোহিণীভব, রোহিণীযোগ, রোহিণীরমণ, রোহিণীশ, রোহিণীশকট, রোহিণীসুত, রোহিণ্যষ্টমী, রোহিৎ, রোহিত, রোহিতক, রোহিতাশ্ব, রোহিতাস্য, রোহিষ, রোহী, রোহেলা, রৌক্ষ্য, রৌম্য, রৌম্যক, রৌমহর্ষণি, রৌহিণ, রৌহিণেয়, রৌহিত, রৌহি(ই)তক, রৌহিষ, রৌহিষী, রৌহী, রৌহীতক, লোম, লোমশ, লোমহর্ষণ, লোহিত (দ্র. লূ, লোহ)।

● **রুহ্** = নবরূপী আবর্ত্তিতের হওয়ন। **রুহ** = নবরূপী আবর্ত্তিতের হওয়ন যাহাতে।

● **রোমহর্ষণ (লোমহর্ষণ)** : ২. *রোম-এর (লোম-এর)* **হর্ষ** *অন যাহাতে।* ৩. রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ বেদব্যাসের একজন প্রধান শিষ্য। বেদব্যাস বেদ বিভাগ করে প্রথম চারজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। তারপর তিনি সূত জাতীয় পণ্ডিত রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের জন্য শিক্ষা দান করেন। গুরুর আদেশে রোমহর্ষণ সমবেত ঋষিদের মধ্যে পুরাণাদি কীর্তন করতেন। ব্যাসদেবের মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করে তাঁর রোমাদি হর্ষিত হয়েছিল বলে এর নাম হয় রোমহর্ষণ। ঋষিমণ্ডলে পুরাণবক্তা সৌতি এঁর পুত্র। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **রোম, লোম**। **এটি একটি** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এতে **রুম, রুমা, রোমনগরী, রোমকূপ, রোমশ, লোমশমুনি** ... এসব শব্দের দুয়ার খুলে যাবে। জ্ঞানের বা তথ্যের মালিকানার লোমগুলিতে মানবমনের গা ভরে গেলে, তাঁকে **লোমশ** বলে। ইনিই রামায়ণ-গাতা, পুরাণবক্তা ... ইত্যাদি। ...

● **রোমাঞ্চ : দ্র. অঞ্চ।**

● **রোহিণী : দ্র. প্রভাস, যক্ষ্মা।** ৩. ক) বসুদেবের স্ত্রী। বলরামের মাতা ও কৃষ্ণের বিমাতা। বসুদেব কংসভয়ে রোহিণীকে ব্রজধাম নন্দালয়ে রেখেছিলেন। খ) কশ্যপ ও সুরভীর কন্যা। এই রোহিণী কামধেনু প্রভৃতি গোজাতির মাতা। গ) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম রোহিণী। ঘ) দক্ষের ২৭ জন কন্যার অন্যতমা রোহিণী; এই ২৭ জন দক্ষকন্যাই চন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। রোহিণীর প্রতিই চন্দ্র বেশী অনুরক্ত ছিলেন; সেইজন্য অন্যান্য স্ত্রীরা দক্ষের কাছে অনুযোগ করেন। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে শাপ দেন। এর ফলে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হন। (পৌ.অ.)। **দক্ষ**গুণের আধারগুলিও তার কন্যা পদবাচ্য — যথা **শ্রদ্ধা, ক্ষমা** ইত্যাদি।

● **রূপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিরূপ, অননুরূপ, অনিরূপিত, অপরূপ, অপুরুব, অভিরূপ, অরূপ, অরূপহার্য্য, অরূপী, একরূপ, প্রতিরূপ, বিরূপ, য়ুরোপ (য়ুরূপ, ইউরোপ, ইয়োরোপ), রুপ্প, রূপ, রূপক, রূপকতাল, রূপকশব্দ, রূপকথা, রূপকার, রূপকুলপতি, রূপকৃৎ, রূপগুণ, রূপগ্রহ, রূপজীবনা, রূপজ্ঞ, রূপণ, রূপতত্ত্ব, রূপদস্তা, রূপধর, রূপধারী, রূপধৃৎ, রূপপরিকল্পনা, রূপবন্ত, রূপবান (-বৎ), রূপবতী, রূপবিপর্য্যয়, রূপভৃৎ, রূপযৌবনসম্পন্ন, রূপরেখ, রূপরেখা, রূপলাবণ্য, রূপশালী, রূপস (রূপস্বী), রূপসমৃদ্ধ, রূপসমৃদ্ধি, রূপসম্পদ, রূপসম্পত্তি, রূপসী, রূপা, রূপাকর, রূপাজীবা, রূপাধিবোধ, রূপান্তর, রূপাভিগ্রাহিত, রূপালি (রূপুলি), রূপাশ্রয়, রূপি, রূপী, রূপেন্দ্রিয়, রূপেশ্বরী, রূপোচ্চয়, রূপোন্মাদ, রূপোপজীবী, রূপ্য, রূপ্যদ, রূপ্যধাতু, রূপ্যমাষ, রূপ্যরজ্জু, রূপ্যাচল, রূপ্যাধ্যক্ষ, রৌপ্য, শতরূপা, সরূপ, সারূপ্য, সুরূপ, সুরূপিণী।

● **রূপ্** = নবরূপী আবর্ত্তমানের পালন। **রূপ** = নবরূপী আবর্ত্তমানের পালন যাহাতে।

● **অপরূপ** : ১. রূপ্ = রূপকরণ, রূপযুক্তকরণ। ২. *অপকৃষ্ট রূপ যাহার।* ৩. অদ্ভুত, অনুপম, অদৃষ্টপূর্ব্ব, পরমসুন্দর, অলৌকিকরূপ সম্পন্ন, অচিন্তিতপূর্ব্ব, অতর্কিত। (ব.শ.)। ৪. অতি সুন্দর অর্থে প্রচলিত। ৫. **অপ** শব্দটি নিন্দাসূচক, সবাই জানেন। অথচ রূপের আগে 'অপ' থাকা সত্ত্বেও 'অপরূপ' কথাটি একালে 'অতি সুন্দর' অর্থে প্রচলিত রয়েছে। এটা হল কীভাবে? **'অলঙ্কার'** শব্দটি থেকে জানা যায়, গহনাদি এককালে নিষিদ্ধ ছিল। শারীরিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেখানোও সেকালে মন্দ কাজ বলে মনে করা হত। বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন, 'বাচস্পত্যে' 'আশ্চর্যরূপ' অর্থে সংস্কৃত 'অপরূপ' ধৃত হইয়াছে। অর্থাৎ **'আশ্চর্য'** শব্দের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, কারও কারও **আশামূলক** আচরণ (সবাই মিলে চাষ করার ফলে যে ফলগুলি ফলেছে, তার মধ্যে যে-লতায় ওই বড় **ফলটি** ফলেছে, তাতে আমি জল ঢালতাম, অতএব ভাগের সময় আমি যেন ওই ফলটি পাই —

এইরূপ আশামূলক আচরণ) দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত, সেইরকম নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে (অপকৃষ্ট করে) অন্যদের দেখিয়ে আকর্ষণ করার মধ্যেও লোকে সেকালে এইরূপ 'আশামূলক আচরণ' দেখেছিল। সেই কারণে রূপসজ্জা অপকর্ম্ম বলে নিন্দিত হয়েছিল। পরে সেটাই সমাজে গ্রহণীয় হয়ে গৌরবজনক হয়ে যায়, যেমন হয়েছে '**অলঙ্কার**'-এর ক্ষেত্রে, যেমন হয়েছিল '**মৎস্যগন্ধ্যা**'র ক্ষেত্রে — দুর্গন্ধবতী হয়ে গিয়েছিল সুগন্ধবতী। তাই 'অপরূপ' শব্দের শব্দগত অর্থ 'মন্দ রূপ' হলেও সমাজেতিহাসের বিচারে প্রাচীন কালে তা মন্দই ছিল, পরবর্তীকালে সমাজ ব্যক্তিমালিকানার দিকে যত এগোতে থাকে, ততই শব্দটির অর্থ ক্রমশ 'অতি সুন্দর রূপ' হয়ে যায়।

● ***রেখ্* (লিখ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অরেখিত, অলিখিত, আলিখিত, আলেখ, আলেখা, আলেখিয়া, আলেখ্য, আলেখ্যপুরুষ, আলেখ্যলেখন, আলেখ্যশেষ, উল্লিখিত, নিক(খ), নিকি, নি(লি)খি, নিক্ষা, নিরীক্ষা, পরীক্ষা, রিক্ষা, রেক, রেখ, রেখা, রেখাংশ, রেখাকার, রেখাগণিত, রেখান্তর, রেখান্যাস, রেহ, লিখ্, লিখ (লেখ), লিখন, লিখনপঠন, লিখনপড়ন, লিখনপত্রিকা, লিখনবৃত্তি, লিখনী, লিখা, লিখাই, লিখিত, লিখিতব্য, লিখিয়ে, লিখিল, লেখ, লেখক, লেখকদোষ, লেখকপ্রমাদ, লেখন, লেখনিক, লেখনী, লেখনীয়, লেখপত্র, লেখপত্রিকা, লেখসন্দেশ, লেখহার, লেখহারক, লেখহারী, লেখা, লেখাজোখা (লেখাযোঁকা, যক্ষরাই লিখত, তাই যোঁকা, দ্র. যকার ধন), লেখান, লেখাপড়া, লেখাবিধি, লেখালিখি, লেখাসন্ধি, লেখিকা, লেখিত, লেখিনী, লেখী, লেখ্য, লেখ্যকৃত, লেখ্যগত, লেখ্যচূর্ণিকা, লেখ্যপত্র, লেখ্যপত্রক, লেখ্যপদ্ম, লেখ্যবিম্ব, লেখ্যস্থান, লেখ্যারূঢ়, রৈখিক।

● **রেখ্ (লিখ্)** = দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তিতের ক্ষ-অয়ন। **রেখ** = দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তিতের ক্ষ-য়ন রহে যাহাতে। **লিখ** = গতিশীল লালনকারীর ক্ষ-অন যাহাতে।

● **লেখক** : ৫. দ্র. **কির**। মহাকরণ, মহাকরণিক, রাইটার্স বিল্ডিং। থানার কর্মচারী। কপি রাইটার। মোগল যুগেই বিদেশ থেকে 'প্রিন্টিং প্রেস' ভারতে অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছিল। এই লেখকদের পেশা নষ্ট হয়ে যাবে বলে মোগলরাজ প্রেসকে ঢুকতে দেয়নি।

● **লেখাযোখা** : দ্র. **মাপাযোখা**।

● **র্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা** : র, রইকাঠ, রক (রোয়াক), রকম, রকমওয়ারি, রকমারি(রী), রকমসই, রকমসকম, র-কার, র-ফলা, রফা (দফারফা), রলা (র‍্যালা), রলাকাষ্ঠ, রল্লক, রল্লা, রাঁপি, রাম্পি, রালক, রি (রে, সম্বোধন), রিক্ষা, রিঙ্খ, রিঙ্খণ, রিঙ্, রিঙ্গ, রিঙ্গণ, রিঙ্গি, রিণিঝিনি, রিনিকিঝিনিকি, রিনিঝিনি, রিনিঠিনি, রিনিরিনি, রেকাব, রেকাবি, রিপু, রিপুঞ্জয়, রিপুবল, রিপুস্থান, রিপুসূদন, রিপোর্ট, রিফ্, রিফু, রিফুকর্ম্ম, রিফুগার, রিফুগারী, রিম্, রিমঝিম, রিমিঝিমি, রিল (reel), রুণুঝুণু, রুণুরুণু, রুনুঝুনু, রে (সম্বো), রেউচিনি, রেউড়ি, রেউড়ী, রেজাই (রজ-ই), রেজি, রেড়ি, রেনিটি, রেপার, রেপ্‌কেস, রেফ, রেওয়াজ, রেয়াজ, রেয়াত, রেয়াতি, রেয়ো, রেয়োত (দ্র.রা), রে-রে-রে-রে, রেল, রেলগাড়ী, রেলিং, রৈ-রৈ।

ল

ল্ বর্ণের অর্থ : ল = ল-অন করে যে; লালন-লয়ন-কারী; লালী। মনে রাখা দরকার, অলালন যেমন লয়নে পরিণত হতে পারে, তেমনি অতিলালনও লয়নে পরিণত হতে পারে। সেই কারণে লালনের সম্যক প্রয়োগ মানেই স্বভাবত বৃদ্ধির সঙ্গে লালনের ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্যথায় লালনই লয়নের কারণ হয়। অতএব আমরা **ল** বর্ণের অর্থ লিখব **ল** = লালন-লয়ন-কারী; লালক-লয়ক।

● **ল্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা** : লক্ষ্, *লগ্ (লঙ্ঘ্), লঙ্গ্ (লিঙ্গ্)*, লঙঘ্ (*লঞ্জ্*), *লট্ (লুট্, লড়্, লোড়ি)*, *লত্*, লপ্, লভ্, *লল্, লষ্ (লিশ্, লোষ্ট্)*, লস্ (লস্‌জ্, *লজ্, লজ্জ্*), লা, লিখ্ (দ্র. *রেখ্*), লিপ্, লিহ্, লী, *লু* (লূ), লুপ্, লুভ্, *লুম্ (লুন্চ্)*, লোক্ (লুক্, লোচ্), ল্।

● **লক্ষ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনুপলক্ষিত, অবিলক্ষ্য, অলক্ষণ, অলক্ষিত, অলক্ষুণে, অলক্ষ্মিণী, অলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অলক্ষ্য, অলখ, অলখনিরঞ্জন, অলখিত, আলক, আলক্ষিত, আলখ, উপলক্ষক, উপলক্ষণ, উপলক্ষিত, উপলক্ষ্য, নখিল, নাখবান, লক্‌খি, লক্‌খিবিলাসী, লক্‌খিরাই, লক্ষ্, লক্ষ, লক্ষক, লক্ষণ, লক্ষণজ, লক্ষণভ্রষ্ট, লক্ষণযুক্ত, লক্ষণলক্ষণা, লক্ষণসন্নিপাত, লক্ষণসন্নিবেশ, লক্ষণসম্পৎ, লক্ষণা, লক্ষণী, লক্ষণীয়, লক্ষণ্য, লক্ষপুর, লক্ষাধিপতি, লক্ষাধীশ, লক্ষিত (উপলক্ষিত), লক্ষিতলক্ষণা, লক্ষী, লক্ষ্ম (লক্ষ্মন্), লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণা, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকাজল, লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মীগণ, লক্ষ্মীছাড়া, লক্ষ্মীগৃহ, লক্ষ্মীজনার্দন, লক্ষ্মীতাল, লক্ষ্মী-তোলা, লক্ষ্মীদুর্লভ, লক্ষ্মীনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীনৃসিংহ, লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মী-পাতা, লক্ষ্মীপুত্র, লক্ষ্মীপুষ্প, লক্ষ্মীপূর্ণিমা, লক্ষ্মীফল, লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীবসতি, লক্ষ্মীবান্, লক্ষ্মীবার, লক্ষ্মীবিলাস, লক্ষ্মীবিবর্ত্ত, লক্ষ্মীমন্ত, লক্ষ্মীমান, লক্ষ্মীরমণ, লক্ষ্মীশ, লক্ষ্মীশ্রী, লক্ষ্মীসনাথ, লক্ষ্মীসহজ, লক্ষ্মীসহোদর, লক্ষ্মীহত, লক্ষ্য, লক্ষ্যগ্রহ, লক্ষ্যবীথি, লক্ষ্যবেদ্ধা, লক্ষ্যবেধ, লক্ষ্যভিৎ, লক্ষ্যভূত, লক্ষ্যভেদ, লক্ষ্যসিদ্ধি, লক্ষ্যসুপ্ত, লক্ষ্যহা, লক্ষ্যাভিহরণ, লক্ষ্যার্থ, লক্ষ্যীকৃত, লখ, লখিমি, লখিমিনী, লখিমী, লচ্ছন, লছন, লছমী, লছিমা, লছিমী, লাক, লাক্ষণিক, লাক্ষা, লাক্ষাগৃহ, লাক্ষাতরু, লাক্ষাতৈল, লাক্ষাপ্রসাদন, লাক্ষাবৃক্ষ, লাক্ষাভবন, লাক্ষারক্ত, লাক্ষারস, লাক্ষিক, লাখ, লাখ, লাখ-কথা, লাখ-পঁচাশি, লাখপতি, লাখরাজ, লাখেরাজ, লাখে-লাখ, লাখে-লাখে, লাখো-লাখো, লাছা, লৈক্ষ, লৈক্ষণ, সুলক্ষণ, সুলক্ষিত।

● **লক্ষ্** = লালকের ক্ষ-অন। **লক্ষ** = লালকের ক্ষ-অন যাহাতে।

● **লক্ষ (লক্ষ্য)** : ২. **লক্ষ** = *লালনকারী দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে।* ***লক্ষ্য*** *=* ***লক্ষ*** *থাকে যাহাতে।* ৫. দ্র. **উপলক্ষ, উপলক্ষ্য**। ইচ্ছা 'লালনকারী রূপে বিচ্ছুরিত থাকে' আমরা যখন কোনোকিছুকে **লক্ষ** করি।

● **লক্ষণ** : ২. ***লক্ষ*** *অন যাহাতে।* ৫. আমরা যখন 'রোগ**লক্ষণ**' বলি, তখন সেই **লক্ষণ**-এর ভিতরে রোগের 'লালনকারী সত্তা দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত' থাকে।

● **লক্ষণা** : ২. ***লক্ষণ****-এর আধার যে।* ৩. ... শব্দের গৌণবৃত্তি ...

ইত্যাদি। (ব.শ.)। **দুর্যোধনে**র কন্যা। ... শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব এঁকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করবার সময় দুর্যোধনের হস্তে বন্দী হন। কিন্তু **বলরাম** শাম্বকে উদ্ধার করতে উপস্থিত হয়ে হস্তিনাপুর শহর গঙ্গা পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যান এবং শাম্বকে উদ্ধার করে শাম্বর সঙ্গে **লক্ষণা**র বিবাহ দেন। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **অভিধা, ব্যঞ্জনা, অর্থ**।

● **লক্ষ্মী** : ২. *লালনকারীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ গতিশীলভাবে সীমায়িত যে আধারে। /* যিনি নীতিমানকে দেখেন। (ব.শ.)। **৩.** ঋকবেদে শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। **তৈত্তিরীয়** সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের দুই স্ত্রী হিসাবে দেখা যায়। শতপথব্রাহ্মণে **প্রজাপতি** হতে শ্রী সম্ভূত বলে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী যুগে লক্ষ্মী ও শ্রী ঐশ্বর্যের দেবী, **বিষ্ণু**র স্ত্রী এবং কামের মাতা রূপে খ্যাতা। রামায়ণ অনুসারে সমুদ্র**মন্থন**কালে লক্ষ্মী পদ্মহস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন। পুরাণের মতানুসারে মহর্ষি **ভৃগু**র ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী **দক্ষ**কন্যা **খ্যাতি**র গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ইনি **নারায়ণে**র স্ত্রীরূপে অঙ্কশায়িনী হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবন জয় থেকে বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তারপর সমুদ্র মন্থনের সময়ে ঘৃত থেকে লক্ষ্মী উত্থিত হয়ে দেবগণের কাছে যান। এই লক্ষ্মীকে লাভ করবার জন্য দানবরা দেবতাদের সঙ্গে কলহে মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিষ্ণু **মায়া** বিস্তার করে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী সর্ব সম্পদে সফলা, সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **অঙ্কলক্ষ্মী**, **বীণা**। শিবের **বীণা**র নাম **লক্ষ্মী**। এই **লক্ষ্মী** আদিতে সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। আদিতে **লক্ষ্মী** যৌথব্যবস্থায় সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। মহাভারত অনুসারে 'সৃষ্টির আদি থেকে তিনি **অসুর**দের গৃহে বাস করিতেন।' পরে অসুরেরা অধর্ম্মাচারী হওয়ায় তিনি তাঁদের ত্যাগ করে দেবতাদের কাছে চলে আসেন। কেন? সেই সব কথা রয়েছে আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'লক্ষ্মীর পাঁচালী ...' নিবন্ধে।

● ***লগ্ (লম্ব্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিবিলম্বী, অনবলম্ব, অনবলম্বন, অনালম্ব, অবলম্বন, অবিলম্ব, অবিলম্বন, অবিলম্বিত, অলগ্ন, অলগ্নী (অল্‌গনী), অলম্বুষ, অসংলগ্ন, আলগ, আলগলতা, আলগা, আলচিরা, আলজিভ, আলজিহ্বা, আলটাকরা, আলনা, আলম্ব, আলম্বন, আলম্বিত, আলম্বী, আলম্ভ, আলম্ভন, আলম্ভনীয়, আলাম, নগে, ন(নো)ঙর, নঙ্গর, নঙ্গোর, নাগ, নাগর, নাগল, নাগা, নাগাইল, নাগাড়, নাগাত, নাগাদ, নাগাল, নাগালি, নাগি, নাব, নাব(ম)না, নাবা, নাবাল, নাবী, নাম, নামদা, নামনা, নামা, নাম্ব, ন্যাংবোট (লগ্নবোট), বিলম্ব, বিলম্বী, লং, লংক্লথ, লকুট, লগ্, লগ, লগ (log), লগড়ঝগড়, লগড়ান, লগন, লগনসা, লগা, লগি (লগি-ঠেলা), লগি (দ্র. লঙ্গ্), লগিত, লগুড় (লগুর, লগুল), লগে, লগ্ন, লগ্নকর (লন্‌গর, নোঙর), লগ্নকার, লগ্নগ্রহ, লগ্নদিন, লগ্নদিবস, লগ্ননক্ষত্র, লগ্নপত্র, লগ্নপত্রিকা, লগ্নবাসর, লগ্নবেলা, লগ্নভাবে (নগে), লগ্নমণ্ডল, লগ্নমাস, লগ্নমুহূর্ত্ত, লগ্নশুদ্ধি, লগ্নসময়, লগ্নাকার (লাগাড়, নাগাড়), লগ্নাচার্য্য, লগ্নাহ, লগ্নিকা, লম্ব্ (লন্‌ব্), লম্ব, লম্বকর্ণ, লম্বকেশ, লম্বকেশর, লম্বজঠর, লম্বদন্ত, লম্বন, লম্বপয়োধরা, লম্বমান, লম্বশাট, লম্বশিখ, লম্বস্তনী, লম্বস্ফিক্, লম্বা, লম্বাই-চওড়াই (চৌড়াই), লম্বা-কথা, লম্বা-কোঁচা, লম্বা-চওড়া (চৌড়া), লম্বা-চা'ল, লম্বা-ছুটি, লম্বাটে, লম্বা-দেওয়া, লম্বা-দৌড়, লম্বা-নজর, লম্বায়মান, লম্বালম্বি, লম্বা-হওয়া, লম্বি, লম্বিকা, লম্বিত, লম্বি(ম্বী)মালা, লম্বী, লম্বোদর, লম্বোষ্ঠ (লম্বৌষ্ঠ), লাকড়ি, লাকরি, লাকুটিক, লাগ, লাগ-ছাড়া, লাগ-পাওয়া, লাগল, লাগসই, লাগা, লাগাও (লাগোয়া), লাগাড় (নাগাড়), লাগাত (লাগায়েৎ), লাগান, লাগান-ভাঙান, লাগানি, লাগানি-ভাঙানি, লাগাম, লাগাল, লাগালাগি, লাগি, লাগিয়া, লাগু, লাগুড়িক, লাগে, লাগোয়া, লাগ্য, লাম, লামজ্জক, লামা, লাম্বা, সংলগ্ন, সুলগ্ন।

● **লগ্ (লম্ব্)** = লালকের গমন। **লগ** = লালকের গমন যাহাতে। **লম্ব** = লালকের সীমায়ন বাহিত যাহাতে।

● **অলগ্ন, অলগ্নী (অল্‌গনী)** : ৫. খেঁড়ে মুসলিমদের ভাষায় কাপড় রাখার জন্য দুই দেয়ালে লগ্ন একটি ফাঁকা বাঁশকে বলা হয় 'অল্‌গনী'। এটি লগ্ন হয়েও লগ্ন নয়, দুদিকের দুই দেয়ালে লগ্ন হয়, পিছনের দেয়ালের গায়েই থাকে কিন্তু মাঝে ফাঁক থাকে, দেয়ালে লেগে থাকে না, লগ্ন থাকে না, তাই অল্‌গনী বা অলগ্নী।

● ***লঙ্গ্ (লিঙ্গ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অলিঙ্গ, আলিঙ্গ, আলিঙ্গন, আলিঙ্গনীয়, আলিঙ্গিত, আলিঙ্গী, আলিঙ্গ্য, ক্লীবলিঙ্গ, নাঙ(ঙ্গ)ল, নুনু, নেংটা, নেঙুড়, নেঙ্গুড়, লং, (লগি), লঙ্গ, লঙ্গর (লগ্), লঙ্গল, লঙ্গুল, লাংটি, লাঙল, লাঙ্গট, লাঙ্গটা, লাঙ্গটভাঙ্গট, লাঙ্গটা, লাঙ্গল, লাঙ্গলগ্রহ, লাঙ্গলচক্র, লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলদণ্ডক, লাঙ্গলধ্বজ, লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলফাল, লাঙ্গলা, লাঙ্গলাপকর্ষী, লাঙ্গলিক, লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলিকী, লাঙ্গলী, লাঙ্গলীশা, লাঙ্গলীষা, লাঙ্গা (লাঙ্গটা, লাঙ্গা, নংগা, নাগা প্রভৃতি শব্দগুলি নগ্ন শব্দ থেকে নয়, লঙ্গ শব্দ থেকেই জন্মেছে), লাঙ্গুল (লাঙ্গূল), লাঙ্গুলচালন, লাঙ্গুলবিক্ষেপ, লাঙ্গুলিনী, লাঙ্গুলী, লিঙ্গ্ (লিগি), লিঙ্গ, লিঙ্গজ্যেষ্ঠ, লিঙ্গদেহ (দ্র. **অতিবাহক**), লিঙ্গধর, লিঙ্গধারণ, লিঙ্গধারী, লিঙ্গনাশ, লিঙ্গপরামর্শ, লিঙ্গপীঠ, লিঙ্গপুরাণ, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, লিঙ্গবান, লিঙ্গবিপর্য্যয়, লিঙ্গবৃত্তি, লিঙ্গবেদী, লিঙ্গমাত্র, লিঙ্গমূর্ত্তি, লিঙ্গশরীর (দ্র. **অতিবাহক**), লিঙ্গশাস্ত্র, লিঙ্গশোফ, লিঙ্গস্থ, লিঙ্গস্ফীতি, লিঙ্গা, লিঙ্গাগ্র, লিঙ্গানুশাসন, লিঙ্গায়ৎ (লিঙ্গায়েত), লিঙ্গার্চ্চন, লিঙ্গার্চ্চনা, লিঙ্গালিকা, লিঙ্গী (উন্মত্তলিঙ্গী, লিঙ্গিবেশ), লিঙ্গোদ্ধার, লুঙি, লুঙ্গি (লিঙ্গ আবৃত যাহাতে), লুঙ্গী, লেংটা, লেঙ্গট, লেঙ্গটা, লেঙ্গটি, লেঙ্গড়া, লেঙ্গা, লেঙ্গাবস্ত্র, লেঙ্গুড়, লেঙ্গূড়, লৈঙ্গ, ল্যাঙ্গট।

● **লঙ্গ্ (লিঙ্গ্)** = লালকের রহস্যময় গমন। **লঙ্গ** = লালকের রহস্যময় গমন যাহাতে। **লিঙ্গ** = গতিশীল লালকের রহস্যময় গমন যাহাতে।

● **আলিঙ্গন** : ২. *লিঙ্গনের (দ্র. **লিঙ্গ**) আশ্রয় যাহাতে।* ৩. আশ্লেষণ, পরিষঙ্গ, কোলাকুলি। আলিঙ্গন সপ্তবিধ — আমোদালিঙ্গন, মৰ্দ্দিতালিঙ্গন, প্রেমালিঙ্গন; মানসালিঙ্গন, রুচ্যালিঙ্গন, মদনালিঙ্গন, বিনোদালিঙ্গন। ... (ব.শ.)। ৪. কোলাকুলি অর্থে প্রচলিত। ৫. যে আচরণে **লিঙ্গন** করার ব্যাপার রয়েছে, সেই আচরণকে আলিঙ্গন বলে। লিঙ্গনহীন শারীরিক কোলাকুলি প্রকৃতপক্ষে আলিঙ্গন নয়, যদি না তাতে অন্তত পক্ষে আমোদালিঙ্গনাদি থাকে। দ্র. **লিঙ্গ**।

● **লিঙ্গ** : ২. *গতিশীল লালনকারীর রহস্যময় গমন যাহাতে; কিংবা,*

লীন হইবার জন্য গমন করে যে। / যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** শিবমূর্তি বিশেষ। শিবের দ্যোতক মূর্তি। এই প্রতীক হিসাবে শিব পূজিত হয়ে থাকেন। বেদে অবশ্য এই উল্লেখ দেখা যায় না। শিবপুরাণে এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলেছেন — আমি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু এই ১২টি স্থানে আমি লিঙ্গাকারে বাস করি। ১) গুজরাটের সোমনাথে; ২) কৃষ্ণা নদীর কাছে শ্রীশৈলে বা মল্লিকার্জুনে; ৩) উজ্জয়িনীর মহাকালে; ৪) নর্মদা তীরে ওঙ্কার মান্ধাতার মন্দিরে; ৫) উজ্জয়িনীর অমরেশ্বরে; ৬) দেওঘরের বৈদ্যনাথে; ৭) রামেশ্বরে; ৮) রাজমহেন্দ্রী জেলার ভীবসঙ্করে; ৯) কাশীর বিশ্বেশ্বরে; ১০) গোমতী তীরের ত্র্যম্বকে; ১১) গোতমে; ১২) হিমালয়ের কেদারনাথে। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **নিধুবন**। প্রকৃতপক্ষে কর্মে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য **শিবের** বা আবিষ্কারক-স্রষ্টার যে তাত্ত্বিক-জ্ঞান বা থিয়োরি কর্ম্ম**যজ্ঞে** লীন হওয়ার জন্য যেত, তাকেই বলা হত **লিঙ্গ**। সাদৃশ্যে তা জীবের penis-কেও বোঝাত। **শিবের লিঙ্গশরীর** মানে আবিষ্কৃত জ্ঞানের তাত্ত্বিক চেহারা। ... উপরোক্ত ১২টি স্থানে **শিব** 'লিঙ্গাকারে' বাস করেন, কথাটির মানে হল, বিগত যুগে যতরকম আবিষ্কার হয়েছিল, তার কিছু না কিছু ঐ ১২টি স্থানে কমবেশি পাওয়া যায়।

● **লঙঘ্ (*লঙ্ঘ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিলঙঘন, অতিলঙঘী, অলঘু, অলঙঘনীয়, অলঙঘ্য, অলাঘব, উল্লঙঘন, নগ্‌গি, রঘু, রঘুকার, রঘুকুল, রঘুকুলতিলক, রঘুচূড়ামণি, রঘুজ, রঘুতিলক, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, রঘুনায়ক, রঘুপতি, রঘুপ্রতিনিধি, রঘুপ্রবর, রঘুবংশ, রঘুবর, রঘুবীর, রঘুমণি, রঘুশ্রেষ্ঠ, রঘুসিংহ, রঘুস্বামী, রঘূত্তম, রঘূদ্বহ, রাঘব, রাঘবপাণ্ডবী, রাঘবপাণ্ডবীয়, রাঘববোয়াল, রাঘববোয়ালি, রাঘবারি, রাঘবীয়, রাঘবেন্দ্র, রাঘবেশ্বর, নেজ (লেজ), নেজা, ন্যাজ, লঘিমা, লঘীয়সী, লঘীয়ান্, লঘিষ্ঠ, লঘু, লঘুকায়, লঘুকোষ্ঠ, লঘুক্রম, লঘুক্রিয়া, লঘুখটিকা, লঘুগণ, লঘুগতি, লঘুগোধূম, লঘুচিত্ত, লঘুচেতাঃ, লঘুতা, লঘুত্রিপদী, লঘুত্ব, লঘুদুন্দুভি, লঘুদ্রাক্ষা, লঘুদ্রাবী, লঘুনালিক, লঘুপাক, লঘুপ্রমাণ, লঘুপ্রযত্ন, লঘুবদরী, লঘুবাসাঃ, লঘুবিক্রম, লঘুবিবর, লঘুবিপ্র, লঘুবৃত্তি, লঘুভব, লঘুভাব, লঘুভুক্, লঘুভোজন, লঘুভ্রাতা, লঘুমনাঃ, লঘুমাত্র, লঘুমিত্র, লঘুমূল, লঘুযোধী, লঘুলয় (উশীর), লঘুশঙ্খ, লঘুসত্ত্ব, লঘুসন্তাপ, লঘুসমুত্থান, লঘুসার, লঘুস্বর, লঘুহস্ত, লঘুহৃদয়, লঘূকরণ, লঘূক্তি, লঘ্‌ঘি(ঘী), লঘ্বক্ষর, লঘ্বাশী, লঘ্বাহার, লঘ্বি, লঘ্বী, লঘ্বীক্রিয়া (নগ্‌গি), লঙঘ্ (লঘি), লঙঘ, লঙঘন, লঙঘনা, লঙঘনীয়, লঙঘালঙঘি, লঙ্ঘিত, লঙঘ্য, লঞ্জ্, (লঙ্গ্ বা লিঙ্গ্-এর কাছাকাছি) লঞ্জ (লেজ), লহু, লাঘব (রাঘব অন্যেরটা লাঘব করে দেয়), লাঘবকারী, লাঘবতা, লেঁজা, লেজ (লঞ্জ), লেজকাটা, লেজঝোলা, লেজমোটা, লেজসাট, লেজা, লেজুড়, লেঞ্জ, লেঞ্জুর, ল্যাজ, হস্তলাঘব।

● **লঙঘ্ (লঞ্জ্)** = লালকের রহস্যরূপের গমনস্থিতি। **লঙঘ** = লালকের রহস্যরূপের গমনস্থিত যাহাতে। **লঞ্জ** = লালকের রহস্যরূপের জনন যাহাতে।

● **রঘু** : ২. *আবর্ত্তিতের গমনস্থিতি নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩.** সূর্যবংশীয় রাজা, **দিলীপের** পুত্র। রঘুর **পুত্র অজ**। অজের পুত্র **দশরথ** এবং দশরথের পুত্র **রামচন্দ্র**। ... রাজ্যলাভের পর রঘু দিগ্বিজয়ে বার হয়ে প্রায় সমস্ত দেশ জয় করেন। দিগ্বিজয়লব্ধ প্রচুর ধনরাশি দিয়ে তিনি 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ করেন। ... রঘু হতে এই বংশের নাম হয় রঘুবংশ। **রামকে** রঘুপতি ও রাঘব বলা হয়। (পৌ.অ.)। **৫.** ভারতের ইতিহাসে প্রজালুণ্ঠনকারী রাজা ছিলেন **রঘু**। প্রবাদ আছে, 'আমার নাম রাজা রঘু। ভিটাতে চরাই ঘুঘু।' ফলত, তাঁর অর্জিত সম্পদ তৃতীয় পুরুষে পৌঁছে 'ফিনান্স ক্যাপিটাল' চরিত্র লাভ করে। দ্র. **অজ**।

● ***লট্ (লুট্, লড়্, লোড়ি)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আলোড়, আলোড়ন, আলোড়িত, নটপট, লট্ (ভটলটংদ ইত্যাদি, দ্র. 'পাণ্ডুলিপি পাঠ সহায়িকা' — কল্পনা ভৌমিক), লট, লটক, লটকন, লটকা, লটকান, লটপট, লটরপটর, লটপটা, লটপটিয়া, লটপটী, লটপটীয়া, লটবহর, লটাপট, লটভ, লটভা, লট্ট, লট্টপট, লট্টপট্ট, লট্ট, লট্টা, লড, লড় (দ্র.রড়), লড়খড়, লড়চড় (নড়চড়) লড়বড় (নড়বড়), লড়লড় (নড়নড়), লড়ন, লড়নচড়ন (নড়নচড়ন) লড়বড়, লড়বড়ি, লড়বড়ে, লড়া, লড়াই, লড়াচড়া (নড়াচড়া), লড়ান, লড়ালড়ি(ড়ী), লড়ি(ড়ী), লড্ড, লড্ডু, লড্ডুক, লঢ়া, লাট, লাটক, লাটজন, লাটনারী, লাটবিষয়, লাট-করা, লাট-কে-লাট, লাট-খাওয়া, লাটপাট, লাটবন্দি(ন্দী), লাটমন্দির, লাটাই, লাটানুপ্রাস, লাটিকা, লাটিঘাটি, লাটিম, লাটিয়াল, লাটী, লাটুয়া, লাট্টু, লাট্টুদার, লাট্টৌষধি, লাঠরি, লাঠা, লাঠালাঠি, লাঠি(ঠী), লাঠিয়াল, লাঠী, লাঠীবাজ, লাঠীবাজী, লাঠীমারা, লাঠীসোঁটা, লাঠ্যৌষধ, লাড়, লাড়া (নাড়া), লাড়ান, লাড়াচাড়া, লাড়াঝাড়া, লাড়ামুড়া, লাড়ালাড়ি, লাড়্, লাড়ুগোপাল, লাড়ুদার, লুট্, লুট (লুঠ), লুট(ঠ)তরাজ, লুট(ঠ) পাট, লুটপুট, লুটফশাদ, লুটা (লুঠা), লুটাতি (লুঠাতি), লুটাপুটি, লুটি, লুটি-পাকান, লুটেরা (লুঠেরা), লুটেল, লুটোপুটি, লুঠ্, লুঠতরাজ, লুঠন, লুঠপাট, লুঠেরা, লুড়্, লুড়, লুড়া, লুড়ি, লেটা, লেঠা, লেঠিয়াল, লেঠেলে, লেড়কা, লেড়কাবালা, লেড়কি, লোট, লোটন, লোটা, লোঠন, লোড়, লোড়া।

● **লট্ (লুট্, লড়্, লোড়ি)** = লালকের টঙ্কারণ। **লট** = লালকের টঙ্কার যাহাতে। **লুট** = নবরূপী লালকের টঙ্কার যাহাতে। **লড়** = লালকের গড়ান-উড়ান যাহাতে। **লোড়ি** = নবরূপী লালকের গতিশীল গড়ান-উড়ানের আশ্রয় যাহাতে।

● **লটপট : ৫.** দ্র. **ঘট, পট**। কথাটিকে **নটঘট** রূপেও পাওয়া যায়। কোনো কিছুকে ঘটানো, পটানো, লটানো — ইত্যাকার ক্রিয়ার ব্যাপার রয়েছে এই শব্দগুলিতে।

● **লটরপটর : ৫.** দ্র. **ঘট**।

● **লাট, লাট-খাওয়া** : দ্র. **তল্লাট**। লটকান, লটকে থাকা, লাট-খাওয়া। ..

● ***লত্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আলতফালত, আলতুফালতু, নতপত, নতা, নাতা (লতায় পাতায় সম্বন্ধ), নাতান (লতান), নাতান-সাতান, নথ (লতন স্থিত যাহাতে, মানুষের পা), নাথা (লাথান), নেকড়া (লক্তক), নেকড়া-চোপড়া, নেতধটী, নেতপাট, নেতফাল, নেতসাড়ী (নেতের পাছড়া), নেতা (ন্যাতা), নেতাকানি, নেতান, নেতিয়ে-পড়া, ন্যাতাকানি, লতপত,

লতা, লতা-আম্র, লতাকর, লতাকস্তূরিকা, লতাকোলি, লতাগুল্ম, লতাগৃহ, লতাছোতা, লতাতরু, লতান, লতান্ত, লতাপল্লব, লতাপাতা, লতাপাশ, লতাপ্রতান, লতাপ্রতানিনী, লতাফণী, লতাবলয়, লতাবিতান, লতাবেষ্ট, লতাবেষ্টন, লতাবেষ্টিতক, লতাভবন, লতামউ, লতামণি, লতামণ্ডপ, লতামৃগ, লতামৌ, লতাযষ্টি, লতাযাবক, লতালয়, লতাসাধন, লতি, লতিকা (বাহুলতিকা), লতোদগম, লাত (শরীর থেকে বেরিয়ে যা লতিয়ে রয়েছে), লাতখোর, লাতা, লাতি, লাথ, লাথখোর, লাথা, লাথান, লাথালাথি, লাথালুথা, লাথালোথা, লাথি, লাথিঝাঁটা, লাথিঝেঁটা।

● **লত্‌** = লালকের তারণ। **লত** = লালকের তারণ যাহাতে।

● **লপ্‌ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপলাপ, অভিলাপ, আলপিত, আলাপ, আলাপচারী, আলাপন, আলাপনীয়, আলাপপরিচয়, আলাপসালাপ, আলাপিনী, আলাপী, আলাপ্য, প্রলাপ, বিলপন, বিলাপ, লপ্‌, লপ, লপট, লপটঝপট, লপটা, লপন, লপিত, লপেটা, লপ্ত, লপ্সি, লপ্সিকা, লাপ, লাপিকা, লাপী, লাফা, লাফুয়া (আফুয়া), সংলাপ, সদালাপ।

● **লপ্‌** = লালকের পান-পালন। **লপ** = লালকের পান-পালন যাহাতে।

● **অভিলাপ** : ১. অভি + ✓লপ্‌ + অ - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. অভিতে থেকে (শাসকের দিকে অবস্থান করে শাসিতের সঙ্গে) কথাবার্তা বলা। ৩. কথন, বাক্যপ্রয়োগ, শব্দ, বাক্য, সঙ্কল্পজ্ঞাপক বাক্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫ এই শব্দের মূল ক্রিয়া **লপ** — লালিতের বা অভীষ্ট পালন করে যে। এগুলি সবই মনোভাব লালনকারী শব্দ, বাক্য, কথাবার্তা, ভাষণ। উপসর্গযোগেই লপ শব্দটির ব্যবহার অধিক দেখা যায়। তার কারণ হল — **আলাপ, বিলাপ, প্রলাপ, অপলাপ, অভিলাপ, সংলাপ** — এরকম ছাড়া কথাবার্তা হয় না। কেন হয় না, সে অনেক কথা। বলে রাখা ভালো, এরকম ক্রিয়ার সংখ্যা খুবই কম, যাদের উপসর্গ-যোগে ভিন্ন নিজস্ব ব্যবহার নেই। **লপ্‌** তেমনি এক ক্রিয়া।

● **লভ্‌ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনুপলব্ধি, অলব্ধ, অলাভ, আনন্দলহরী, আলব্ধ, আলভন, উপলব্ধ, উপলভ্য, উপালব্ধ, নাও, নিন, নে, নেওয়া, নেয়া, দুর্লভ, বিপ্রলব্ধ, ল, লব্ধ, লব্ধকাম, লব্ধকীর্ত্তি, লব্ধজন্মা, লব্ধনামা, লব্ধনাশ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, লব্ধপ্রশমন, লব্ধপ্রসার, লব্ধবর্ণ, লব্ধবিদ্য, লব্ধব্য, লব্ধলক্ষ, লব্ধ্যলক্ষ্য, লব্ধশব্দ, লব্ধসংজ্ঞ, লব্ধসিদ্ধি, লব্ধা (লব্ধৃ), লব্ধান্তর, লব্ধাবকাশ, লব্ধাস্পদ, লব্ধি, লব্ধোদয়, লব্ধ্রিম, লভ্‌, লভ, লভন, লভ্য, লম্ভ, লম্ভক, লম্ভন, লম্ভিত, লহ, লহনা, লহমা, লহর (নহর), লহরি(রী) লহলহ, লাবেন্ডার, লাভ, লাভকর, লাভকৃৎ, লাভক্ষতি, লাভজনক, লাভবান, লাভভাব, লাভালাভ, লাভলিপ্সা, লিপ্সা, লিপ্সু, লিপ্সুক, সুলভ, সুলভা।

● **লভ্‌** = লালকের ভবন (হওয়ন)। **লভ** = লালকের ভবন (হওয়ন) যাহাতে।

● **লব্ধ, লব্ধি** : ৫. দ্র. **উপলব্ধ, হস্‌**। লাভ মানে সাধারণত প্রফিট বোঝা হয়, লাভের একটা মানে শুধু 'পাওয়া'। **লব** শব্দে যে লাভকে বোঝা হয় (**কুশ** = সুদ, **লব** = লাভ), তাকে ধারণ করে যে, সেই হল **লব্ধ**। **লব** ধারিত যাহাতে, সেটিই **লব্ধ**। উপলব্ধিতে কেবল মানসিক **লব**কেই ধারণ করা হয়।

● ***লল্‌* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (এই লাল-এর অর্থ 'রেড' নয়), অতিলৌল্য, আলাল, আলুয়িত, আলুল, আলুলায়িত, আলোল, আলোলিত, চুণিলাল, জহরলাল, নন্দলাল, নলনা, নলপত, নলাটী, নালচ, নালন, নালবন্দ, নালুক, নালুয়া, নিটল, নোর, নোল, নোলক, নোলা, নোহ, পান্নালাল, মতিলাল, লল্‌, ললকা, ললজ্জিহ্ব, ললন, ললনা, ললনিকা, ললন্তিকা, ললল, ললাট, ললাটক, ললাটতট, ললাটদেশ, ললাটন্তপ, ললাটপট্ট, ললাটপট্টক, ললাটপট্টিকা, ললাটফলক, ললাটরেখা, ললাটলিখিত, ললাটলেখা, ললাটাক্ষ, ললাটিকা, ললাম, ললামক, ললামন্‌, ললামভৃত, ললিত, ললিতকলা, ললিতপদবন্ধন, ললিতপ্রহার, ললিতললিত, ললিতবনিত, ললিতা, ললিতাভিনয়, ললিতার্থবন্ধ, লাল, লালক, লালকী, লালচ, লালচে, লালন, লালনীয়, লালনপালন, লালবন্দ, লালবন্দি(ন্দী), লালভূমি (বিপরীত — **খিলভূমি**), লালমোহন, লালয়িতব্য, লালস, লালসা, লালা, লালাক্লিন্ন, লালাটিক, লালাটী, লালাবাবু, লালাবিষ, লালাভক্ষ, লালামেহ, লালায়, লালায়িত, লালাস্রব, লালাস্রাব, লালিত, লালিত-পালিত, লালিত্য, লাল্য, লুল, লুলা, লুলাপ, লুলায়, লুলিত, লুলিতা, লেলা, লেলান, লেলিয়ে-দেওয়া, লেলিহ, লেলিহা, লেলিহান, লেলিহানা, লোল, লোলক, লোলচক্ষুঃ, লোলজিহ্ব, লোলদৃষ্টি, লোলনয়ন, লোলনী, লোলনেত্র, লৌলপক্ষ, লোলমান, লোললোচন, লোললোল, লোলা, লোলাপাঙ্গ, লোলার্ক, লোলি, লোলিত, লোলুপ, লোলুপা, লোলুভ, লোলোলোলো, লোলোষ্ঠ, লৌল্য, সুললিত, হীরালাল।

● **লল্‌** = লালকের লালন-লয়ন। **লল** = লালকের লালন-লয়ন যাহাতে।

● **লালন (লালনপালন)** : ২. ***ললন*** *(**লল** অন যাহাতে) হইতে জাত। **লালনপালন** = **লালন** ও **পালন**।* ৫. দ্র. **চপল, ছিমছাম, দুলাল, নন্দদুলাল, নন্দলাল**। **লালনপালন** একটি পরিপূরক **যোড়শব্দ**। শুধু **লালন**-এ লালিত তার প্রকৃতিপ্রদত্ত সীমালঙঘন করে উৎসন্নে যায়; শুধু **পালন**-এ পালিত তার কেন্দ্রে সঙ্কুচিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। উত্তরসূরিকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে **লালন** ও **পালন** দুটোই লাগে, এবং তাদের মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য দরকার পড়ে। এ বিষয়ে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

● ***লষ্‌ (লিশ্‌, লোষ্ট)*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অভিলাষ, লষ্‌, লাষ, লাষুক, লিশ্‌, লুষ্‌, লুস, লেশ (ধনলেশ, পুণ্যলেশ) লেশমাত্র, লেশোক্ত, লেষ্টু, লেষ্টুঘ্ন, লেষ্টুভেদন, লোষ্ট, লোষ্ট, লোষ্টঘাত, লোষ্টঘ্ন, লোষ্টপাত, লোষ্টভঞ্জন, লোষ্টভেদন, লোষ্টময়, লোষ্টমর্দ্দী, লোষ্টু, লোষ্ট্র, লোস, সাভিলাষ, হাস্যলেশ।

● **লষ্‌ (লিশ্‌, লোষ্ট্‌)** = লালকের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **লষ** = লালকের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **লিশ** = গতিশীল লালকের সার্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে। **লোষ্ট** = নবরূপী লালকের দিশাগ্রস্ত টঙ্কার আশ্রিত যাহাতে।

● **অভিলষণ, অভিলষণীয়, অভিলষিত, অভিলাষ, অভিলাষক,**

অভিলাষী, অভিলাষুক অভিলষণ, অভিলাষ : ১. অভি ✓ লষ্ + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***অভিলাষ*** = *অভিতে থেকে (শাসকের দিকে অবস্থান করে শাসিতের প্রতি) ইচ্ছা করা; অথবা,* ***অভিভাবকোচিত*** *ইচ্ছা থাকে যাহাতে।* ৩. ইচ্ছা, কাম, বাঞ্ছা, মনোরথ, সঙ্গমেচ্ছা, অনুরাগ, লোভ, তৃষ্ণা। (ব.শ.)। ৫ দ্র. **কম্**।

● **লস্ (লস্জ্, লজ্, লজ্জ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অভিলাস, অনলস, অলস, অলসক, অলসা, অলসিত, অলসিনী, অলাস্য, আলস, আলস্য, উল্লসন, উল্লাস, নির্লজ্জ, নিলাজ, বিলসন, বিলাস, বিলাসিনী, বিলাসী, লজ্জ্ (লস্জ্), লজ্জা, লজ্জাকর, লজ্জানম্র, লজ্জাপিত, লজ্জাবতী, লজ্জাবহ, লজ্জাবান্, লজ্জাবিনম্র, লজ্জালু, লজ্জাশীল, লজ্জাশূন্য, লজ্জাস্কর, লজ্জাহীন, লজ্জিত, লজ্জিরী, লজ্যা, লস্, লস্জ্, লস, লসলস, লসা, লসিত, লসীকা, লস্তক, লস্তকী, লাজ, লাজউলী, লাজ-কাজ, লাজ-বাসা, লাজবীজ, লাজলজ্জা, লাজা, লাজুক, লাজে-মরা, লাস, লাসক, লাসকী, লাসবেশ, লাসিকা, লাস্য, সলজ্জিত, সোল্লাস।

● **লস্ (লস্জ্, লজ্, লজ্জ্)** = লালকের নির্য্যাসন। **লস** = লালকের নির্য্যাসন বা অস্তিত্বমাত্র যাহাতে। **লস্জ** = **লস্** জনিত যাহাতে। **লজ** = লালকের জনন যাহাতে। **লজ্জ** = লালকের জনন জনিত যাহাতে।

● **লজ্জা** : ৫. দ্র. **অষ্টপাশ, ত্রপা**। লজ্জা নারীর ভূষণ। লজ্জার গৌরবজনক ভূমিকা এখানে ব্যাখ্যাত হবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'লজ্জাশীলতা' নিবন্ধটির মধ্যে **লজ্জা**র গৌরবজনক দিকটি তাঁর অজ্ঞাতসারে উল্লিখিত হয়েছে। সেটি হল — প্রতিটি সামাজিক ক্রিয়ারও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। কেউ কোনো সামাজিক কুকর্ম করেছে, তাই তাকে শাস্তি দিলে তারও প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিক্রিয়াহীন একটি শক্তি হল **লজ্জা**। সে কুকর্মকারীকে সংযত করে কিন্তু তার কোনো 'পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া' নেই, থাকে না। একজন যুবক কোনো কারণে অস্বাভাবিক ক্রোধ প্রকাশ করছে, চীৎকার করছে; তা দেখে মেয়েরা যদি **লজ্জা** প্রকাশ করে, **লজ্জিত** হয়ে মুখ টিপে বলে — এ মা, দেখো দেখো, কীরকম চীৎকার করছে — তাহলে দেখা যায়, সেই যুবকটি তার ক্রোধ সংযত করছে; অথচ তার জন্য সে লজ্জাশীলা রমণীদের প্রতি কোনো 'প্রতিক্রিয়াজনক' আচরণ করে না। এই **লজ্জা**কে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে বহু সামাজিক অহিত নিবারিত হতে পারে, প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

● **বিলাস** : ৫. দ্র. **ভ্রান্তিবিলাস**।

● ***লা*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অলাত, অলাতচক্র, অলাতশান্তি, অলাতশান্তিপ্রকরণ, আলাত, আলান, ল, লও, লওট্, লওট্‌না (ফিরে আসা), লওয়া, লওয়ান, লওয়াজিমা, লহ, লহর (লহড়), লা, লাছ, লাছা (গরুর পিঠের বোঝা), লাজ্, লাজ, লাজমণ্ড, লাজমুষ্টি, লাজা, লাজাঞ্জলি, লাঞ্ছ্, লাঞ্ছন, লাঞ্ছনা, লাঞ্ছিত, লি (নি বা নিই), লিজজে, লে (নে), লেউট (লওট্, নেওয়া, নেওটা), লেওয়া (নেওয়া), লেন-দেন, লেনা-দেনা, লেহ।

● **লা** = লালকের আধার যে।

● **অলাত (অলাতশান্তিপ্রকরণ)** : ২. ***অলাত*** = *যাহা* ***লাত*** *(= আনীত) নহে; অথবা, যাকে আর আনা হচ্ছে না (যতটা আনার দরকার ছিল ততটা আনা হয়ে গেছে)।* ***অলাতশান্তিপ্রকরণ*** = *যে প্রকৃষ্ট করণের দ্বারা অধীনতামূলক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। /* **অলাত** = অগ্নি কর্তৃক ঈষৎ গৃহীত বা দগ্ধ যে। (ব.শ.)। ৩. **অলাত** = সাগ্নিক বা নিরগ্নি বহ্নিদগ্ধকাষ্ঠ, অর্দ্ধদগ্ধকাষ্ঠ, উল্মুক। (ব.শ.)। ৫. **অলাত** শব্দের দৃশ্য অর্থ হল 'পোড়া কাঠ', ব.শ. তাকেই বলেছেন 'সাগ্নিক বা নিরগ্নি বহ্নিদগ্ধকাষ্ঠ'। দ্র. **দগ্ধ, বিদগ্ধ**। কিন্তু এর অদৃশ্য অর্থটিই যে মুখ্য অর্থ ছিল, **তন্ত্রে** তার প্রমাণ মেলে। পুরাণাদি গ্রন্থে, বিশেষত তন্ত্রে **অলাতশান্তিপ্রকরণ** শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এর অর্থ ছিল 'আচ্ছা করে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা', একালের ভাষায় যাকে **'শ্মশানের শান্তি'** বলা হয়।

● **লিপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আজ্যলিপ্ত, আলিপন, আলিপ্ত, আলিম্পন, আলপনা, আলেপ, আলেপনা, নির্লিপ্ত, লিপ্, লিপ (লেপ), লিপি, লিপিকর, লিপিকর্ম্ম, লিপিকা, লিপিকার, লিপিজ্ঞ, লিপিজ্ঞান, লিপিন্যাস, লিপিফলক, লিপিশালা, লিপিশাস্ত্র, লিপিসজ্জা, লিপিসন্নাহ, লিপিসন্নিবেশ, লিপী, লিপ্ত, লিপ্তক, লিপ্তপাদ, লিপ্তবাসিত, লিপ্তা, লিপ্তিকা, লিম্পি, লেওয়া (লেপা), লেপ, লেপক, লেপকর, লেপন, লেপনীয়, লেপভাক্, লেপভাগী, লেপভুক্, লেপা-পোঁছা, লেপা-মোছা, লেপালেপি, লেপী, লেপ্য, লেফ (লেপ, লেপকাঁথা), লেফাফা।

● **লিপ্** = গতিশীল লালকের পালন। **লিপ** = গতিশীল লালকের পালন যাহাতে।

● **লিহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অভ্রংলিহ, আলীঢ়, লিহ্, লিহ (লেহ), লিহলিহ, লিহিলিহি, লীঢ়, লীহলীহ, লেই, লেলিহ, লেলিহান, লেহ, লেহন, লেহনার্হ, লেহনীয়, লেহা, লেহি, লেহিন, লেহি-লেহি, লেহী, লেহ্য।

● **লিহ্** = গতিশীল লালকের হওয়ন। **লিহ** = গতিশীল লালকের হওয়ন যাহাতে।

● **লী ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অত্যুল্বণ, অলয়, আলয়, আলা, আলীন, আলেয়া, নিলয়, নিলীন, প্রলয়, বিলয়, বিলীন, লয়, লয়কাল, লয়গত, লয়-দেওয়া, লয়শুদ্ধ, লয়স্থান, লয়ার্ক, লী, লীন, লীলা, লীলাকমল, লীলাকলহ, লীলাখেলা, লীলাগতি, লীলাগার, লীলাগৃহ, লীলাগেহ, লীলাচতুর, লীলাচল, লীলাতনু, লীলানৃত্য, লীলাপদ্ম, লীলাবতার, লীলাবতী, লীলাবধূত, লীলাবলোকন, লীলাবান, লীলাবাপী, লীলাবেশ্ম, লীলাব্জ, লীলামনুষ্য, লীলামন্দির, লীলাম্বুজ, লীলায়িত, লীলারবিন্দ, লীলাশুক, লীলাসাধ্য, লীলাসূত্র, লীলাস্মিত, লীলাহসিত, লীলুয়া (স্থাননাম রূপে এখনও প্রচলিত), লীলোত্তংস, সলীল।

● **লী** = গতিশীল লালকের আধার যে।

● ***লীলা (লীলাবাপী)*** : ৫. দ্র. **কেলি, চেষ্টা, রতি, সুরত, ক্রীড়া, নট**। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটি প্রায় **শিব** শব্দের মতো, যার কোনো ইংরেজি অনুবাদ করা যায় না। একালে যাকে swimming pool বলা হয়, তার প্রাচীন রূপকে আমাদের পূর্বসূরিগণ নাম দিয়েছিলেন **লীলাবাপী**।

● ***লু*** **(লূ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপরাধলব, অলবণ, অলাবু (দ্র.লাবু), অলাবু, অলোম, অলোমক,

অলোমা, আলুনি, আলুন, আলোণা, আলোয়ান (আ-লোমান), একলব্য, কামলব, কুশীলব, জ্ঞানলব, ধনলব, নঙ্গ, নটিয়া, নটে, নুণ(ন), নুনিয়া, নৈটে, নোন, নোনা, লং, লঙ্গ, লব, লবকুশ, লবঙ্গ, লবঙ্গলতা, লবণ, লবণকটুক, লবণক্ষার, লবণখনি, লবণ-খাওয়া, লবণজল, লবণজলধি, লবণঠিকরি, লবণতোয়, লবণত্রয়, লবণধেনু, লবণমেহ, লবণ-শোধা, লবণসমুদ্র, লবণসিন্ধু, লবণাকর, লবণাক্ত, লবণান্তক, লবণাব্ধি, লবণাম্বুরাশি, লবণাম্ভাঃ, লবণার্ণব, লবণালয়, লবণিয়া, লবণোৎকট, লবণোত্তম, লবণোদ, লবণোদক, লবণোদধি, লবন, লবনি(নী), লবলী, লবলীপল্লব, লবলেশ, লবলেশগন্ধ, লবশঃ, লবিত্র, লবেজান, লব্য (একলব্য), লব্‌জো (লব্-জ), লাউ, লাউখালী, লাউডগা, লাউডগাসাপ, লাউনৌকা, লাউয়া, লাউশাগ, লাউশালী, লাউসালী, লাব, লাবক, লাবণসৈন্ধব, লাবণি, লাবণিক, লাবণী, লাবণ্য, লাবণ্যগন্ধ, লাবণ্যফল, লাবণ্যময়, লাবণ্যার্জ্জিত, লাবু, লাবু, লাব্য, লু, লুণ (লোণ), লুণি, লুণে, লুণ্টক (নটে), লুণ্টাক, লুণ্টিত, লুণ্ঠ, লুণ্ঠক, লুণ্ঠন, লুণ্ঠাক, লুণ্ঠি, লুণ্ঠিত, লুণ্ঠী, লুণ্ঠ্যমান, লুণ্ড, লুণ্ডিকা, লুন, লুনি(নী), লুনিয়া, লু, লূতা, লূতাতন্তু, লূতাপট, লূতাপট্ট, লূতামর্কটক, লূতিকা, লূন, লূনক, লূনি, লূনিবিষ, লুম, লেউ, লো, লোণ (লোন, এই লবণ থেকেই ইংরেজি loan হয়েছে।), লোণা, (লোনা), লোণার, লোণিকা, লোণী, লোত, লোতক, লোত্র, লোম, লোমকীট, লোমকূপ, লোমগর্ত্ত, লোমঘ্ন, লোমচক্র, লোমজ, লোমপাদ, লোমফোড়, লোমফোড়া, লোমবাহী, লোমবিবর, লোমবিষ, লোমযুক, লোমরন্ধ্র, লোমরাজি, লোমলতা, লোমশ, লোমশা, লোমশাতন, লোমশী, লোমশীমার্জ্জার, লোমসংহর্ষণ, লোমহর্ষ, লোমহর্ষণ, লোমহর্ষী, লোমহারী, লোমহৃৎ, লোমাঞ্চ, লোমাবলি(লী), লোমালি(লী), লোম্নী, লোম্ভাজল, লোহ, লোহকান্ত, লোহকার, লোহকারক, লোহকিট্ট, লোহকীল, লোহচর্ম্ম, লোহচূর্ণ, লোহজ, লোহজাল, লোহদ্রাবী, লোহনাল, লোহপট্টিকা, লোহপাশ, লোহপৃষ্ঠ, লোহপ্রতিমা, লোহবদ্ধ, লোহবর্ম্ম, লোহমারক, লোহরজঃ, লোহশঙ্কু, লোহশুদ্ধি, লোহশ্লেষণ, লোহসঙ্কর, লোহা, লোহাভিসার, লোহাভিহার, লোহামিষ, লোহায়স, লোহার, লোহার্গল, লোহালক্কড়, লোহিত (দ্র. রোহিত), লোহিতক, লোহিতকল্মাষ, লোহিতকৃষ্ণ, লোহিতক্ষয়, লোহিতগ্রীব, লোহিতচন্দন, লোহিতবর্ষ, লোহিতমৃত্তিকা, লোহিতরাগ, লোহিতশতপত্র, লোহিতশবল, লোহিতসারঙ্গ, লোহিতা, লোহিতাক্ষ, লোহিতাঙ্গ, লোহিতায়স, লোহিতার্দ্র, লোহিতাশ্ব, লোহিতাস্য, লোহিতিক, লোহিতিকা, লোহিতিমা, লোহিতেক্ষু, লোহিতোৎপল, লোহিতোদ, লোহিনী, লোহু, লোহোত্তম, লৌম, লৌমহর্ষণি, লৌহ, লৌহকণ্টক, লৌহকার, লৌহজ, লৌহবন্ধ, লৌহবর্ম্ম, লৌহভাণ্ড, লৌহভীম, লৌহমল, লৌহশঙ্কু, লৌহা, লৌহাচার্য্য, লৌহায়স, লৌহিত্য।

● **লু (লূ)** = লালক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **লূ** = নবরূপী লালকের আধার যে।

● **লব** : ২. *লালককে বহন করে যে; কিংবা, লালক বাহিত যাহাতে।* ৩. রামচন্দ্র ও সীতার পুত্র। ... বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিতা সীতার যমজ পুত্র কুশ ও লবের জন্ম হয়। ... মহর্ষি তাঁর স্বরচিত রামায়ণ এঁদের কণ্ঠস্থ করিয়ে সকলকে শোনাতেন। ... মনোদুঃখে সীতা পাতালে প্রবেশ করলে রাম কুশকে কোশলরাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনি লবকোট বা লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **বৃদ্ধি, কুশ**।

● **লবঙ্গ** : দ্র. **পদ্মা**।

● **লোমশ, রোমশ** : ৩. লোমশ একজন মহর্ষি। ইনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরে অনেকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ইনি ব্যাসের আদেশে বনবাসী পাণ্ডবদের সঙ্গে থেকে তাঁদের বহু তীর্থ দর্শন করান ও নানা রকম উপদেশপূর্ণ পৌরাণিক গল্প বলে পাণ্ডবদের চিত্ত বিনোদন করতেন। পদ্মপুরাণ মতে লোমশ মুনির কল্পে কল্পে এক একটি লোম বিনাশ হত বলে ইনি এই নামে পরিচিত হন। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **রোমশ**।

● **লোমহর্ষণ দ্র. রোমহর্ষণ**।

● **লৌহিত্য** : ৫. দ্র. পৌ.অ.। দ্র. **ব্রহ্মপুত্র**।

● **লুপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবলুপ্ত, অবিলুপ্ত, অলুপ্ত, আলোপ, বিলুপ্ত, বিলোপন, লুপ্, লুপ (লুফ, লোফ), লুপ্ত, লুপ্তপদ, লুপ্তপ্রতিজ্ঞ, লুপ্তোপমা, লোপ, লোপক, লোপন, লোপা, লোপাট, লোপামুদ্রা, লোপী, লোপ্তা (লোপ্তৃ), লোপ্ত্র, লোপ্ত্রী (লেচি, নেচি), লোফ, লোফা, লোলুপ, লোলুপা।

● **লুপ্** = নবরূপী লালকের পালন। **লুপ** = নবরূপী লালকের পালন যাহাতে।

● **লোপামুদ্রা** : ২. *লোপিত বা লুপ্ত মুদ্রা যাহার।* ৩. **অগস্ত্যের** স্ত্রী। যিনি নারীদের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁর পিতৃগণকে এক বিবরের মধ্যে লম্বমান থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তাঁরা এই অবস্থায় আছেন। পিতৃগণ উত্তরে বলেছিলেন, অগস্ত্য যেন পুত্র উৎপাদন করে তাঁর এই পিতৃগণকে নরক হতে উদ্ধার করেন। (দ্র. **জরৎকারু**) ... তখন অগস্ত্য সমস্ত প্রাণীর উত্তম অঙ্গের সমবায়ে এক অদ্বিতীয়া সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। ... **বিদর্ভ**রাজগৃহে পালিতা হয়ে এই কন্যা লোপামুদ্রা নামে পরিচিতা হন। ... এর যৌবনাবস্থায় অগস্ত্য বিদর্ভরাজের কাছে এঁকে প্রার্থনা করলেন। ... এই লোপামুদ্রার ইচ্ছানুসারে তাঁর পিতৃগৃহের অনুরূপ শয্যা, বসন ও ভূষণাদির জন্য অর্থ সংগ্রহে নানা স্থানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবশেষে অগস্ত্য **বাতাপি** (দ্র. **ইল্বল**) দানবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ... অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার পুত্রের নাম ইধ্মবাহ। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. আমাদের 'গ' গ্রন্থে 'বিদর্ভের কথা ...' দ্রষ্টব্য।

● **লুভ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিলোভ, অলোভ, ধনলোভী, লুবধ (লুবুধ), লুবধক, লুবধল, লুবধুল, লুবুধ, লুবুধি, লুব্ধ, লুব্ধক, লুভ্, লুভিত, লোভ, লোভন, লোভনীয়, লোভা, লোভাকৃষ্ট, লোভান্তি, লোভিত, লোভিনী, লোভিষ্ঠ, লোভী, লোলুভ, লোহ।

● **লুভ্** = নবরূপী লালকের ভবন (হওয়ন)। **লুভ** = নবরূপী লালকের ভবন (হওয়ন) যাহাতে।

● **লুম্ (লুন্চ্) বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আলুঞ্চন, লুঞ্চ, লুঞ্চন, লুঞ্চিত, লুম, লুম্বিনী।

● **লুম্ (লুন্চ্)** = নবরূপী লালকের সীমায়ন। **লুম** = নবরূপী

লালকের সীমায়ন যাহাতে। **লুন্চ** = নবরূপী লালকের নাকরণ চয়িত যাহাতে।

● **লোক্ (লুক্, লোচ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনবলোকন, অলুকসমাস, অবলোকন, অবলোকিত, অলোক, অলোকন, অলোকনীয়, অলোকিত, অলোকলতা, অলোকসামান্য, অলোক্য, অলৌকিক, আঁল, আলয়ান, আলা, আলো, আলো-আঁধারি, আলো-আঁধারিয়া, আলোক, আলোকন, আলোকনীয়, আলোকমার্গ, আলোকিত, আলোক্য, আলোচ, আলোচনা, আলোচক, আলোছায়া (আলছায়া), আলোকবান, উলূক, ঔলূক্য, দুরালোক, নিরালোক, নুকি, নুকোচুরি(রী), নৌকতা, বিলোকন, বিলোচন, বিলোচন, লকট (লকেট, loquat, look-at, লুকত), লুক্ (লুকান), লুকটী (দ্র. অংশানো), লুকলুকানি, লুকা (ঘটনা একটিই, কিন্তু ঘটনাটি যে ঘটাচ্ছে সে 'লুকা'চ্ছে, আর যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করছে সে 'লুক' করছে বা খুঁজছে। দ্র. লুকাঞ্জন), লুকাচুরি (লুকোচুরি), লুকাছাপা, লুকাঞ্জন, লুকালুকি, লুকি (লুকী), লুকিকায় (লুকীকায়), লুকিবিদ্যা, লুকিমন্ত্র, লুকী, লুকীকায়, লুকোচুরি, লুক্কাওন, লুক্কায়ন, লুক্কায়িত, লুচি, লুচি-চিনি, লুচি-পুরী, লুচ্চা (লোচ্চা), লোক্, লোক, লোককণ্টক, লোককথা, লোককর্ত্তা, লোককল্প, লোককান্ত, লোককাম, লোককার, লোককৃৎ, লোকক্ষয়, লোকগতি, লোকগাথা, লোকগুরু, লোকচক্ষু, লোকচক্ষুঃ, লোকচারিত্র, লোকচেষ্টাময়, লোকজন, লোকজননী, লোকজিৎ, লোকজ্ঞ, লোকত, লোকতত্ত্ব, লোকতন্ত্র, লোকত্রয়, লোকত্রয়ী, লোকদম্ভক, লোকদূষণ, লোকদেখান, লোকদ্বয়, লোকধর্ম্ম, লোকধাতা, লোকধারিণী, লোকন, লোকনাথ, লোকনায়ক, লোকনিন্দক, লোকপ, লোকপতি, লোকপথ, লোকপদ্ধতি, লোকপাল, লোকপালক, লোকপিতামহ, লোকপূজিত, লোকপ্রকাশক, লোকপ্রবাদ, লোকপ্রসিদ্ধ, লোকপ্রসিদ্ধি, লোকবচন, লোকবর্ত্তন, লোকবাদ, লোকবার্ত্তা, লোকবাহ্য, লোকবিক্রুষ্ট, লোকবিদ্বিষ্ট, লোকবিধি, লোকবিশ্রুত, লোকবিসর্গ, লোকবৃত্ত, লোকবৃত্তান্ত, লোকব্যবহার, লোকভর্ত্তা, লোকভাবন, লোকভাবী, লোকময়, লোকমর্য্যাদা, লোকমহেশ্বর, লোকমাতা, লোকমার্গ, লোকমুখ, লোকম্পৃণ, লোকযাত্রা, লোকরক্ষ, লোকরঞ্জন, লোকরব, লোকলজ্জা, লোকলস্কর, লোকলাজ, লোকলোকান্তর, লোকলোচন, লোকলৌকিকতা, লোকশ্রুতি, লোকসংকর, লোকসংক্ষয়, লোকসংগ্রহ, লোকসাক্ষিক, লোকসাক্ষী, লোকসিদ্ধ, লোকসীমাবর্ত্তী, লোকসুন্দর, লোকস্থিতি, লোক-হাসাহাসি, লোকহাস্য, লোকহিত, লোকাচার, লোকাতিগ, লোকাতিশয়, লোকাতীত, লোকাত্মা, লোকাদি, লোকাধিক, লোকাধিপতি, লোকানুগ্রহ, লোকানুবৃত্তি, লোকানুরাগ, লোকান্তক, লোকান্তর, লোকান্তরিত, লোকাপবাদ, লোকাবেক্ষণ, লোকাভিভাবী, লোকাভ্যুদয়, লোকায়ত, লোকায়তিক, লোকায়ন, লোকারণ্য, লোকালয়, লোকালোক, লোকেশ, লোকেশ্বর, লোকোক্তি, লোকোত্তর, লোক্য, লোচ্, লোচক, লোচন, লোচনকোণা, লোচনখাগী, লোচনগোচর, লোচনত্রয়, লোচনপথ, লোচনমার্গ, লোচনপরুষ, লোচনহিত, লোচনাঞ্চল, লোচনানন্দ, লোচনাময়, লোচনী, লোচিকা, লোচ্চা, লোচ্চাপনা, লৌকতা, লৌকায়তিক, লৌকিক, লৌকিকজ্ঞ, লৌকিকতা, লৌকিকন্যায়, লৌকিকবৃত্তান্ত, লৌকিকাগ্নি, লৌক্য, সলোক, সালোকসংশ্লেষ, সালোক্য, সুলোচন, সুলোচনা।

● **লোক্ (লুক্, লোচ্)** = নবরূপী লালকের করণের আশ্রয়লাভ। **লোক** = নবরূপী লালকের করণের আশ্রয় যাহাতে। **লুক** = নবরূপী লালকের করণ যাহাতে। **লোচ** = নবরূপী লালকের চয়নের আশ্রয় যাহাতে।

● **অলোক, অলৌকিক** : ১. লোক্ = দর্শন। (look)। ২. *যাহার ভিতরে লোকন করা যায় না; যাহা লৌকিক নহে*। দ্র. **লোক**। ৩. অদৃশ্য, লোকহীন, নির্জন। লোকশূন্য স্থান। পাতাল। লোকে অবিদিত, লোকাতীত, ... অপার্থিব, স্বর্গীয়, দিব্য। ... বেদে প্রচলিত, সংস্কৃতে অপ্রচলিত, বেদনিষ্ঠিত, বৈদিক। লোকবিগর্হিত অপরাধ, গুরুতর দোষ। (ব.শ.)। ৪. super-natural অর্থে প্রচলিত। ৫. সনাতন মানুষ ছিল স্বচ্ছ স্বভাবের, তাদের ভেতরটা দেখা যেত। কোনো গোপনীয়তা ছিল না। এদের বলা হত লোক। যারা সত্যগোপন করত, non-transparent স্বভাবের তাদের বলা হত অলোক। বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয়েছিল **সনাতন** ব্যবস্থা ভেঙে, যা সম্ভব করেছিল অলোকেরা তাদের অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা। সনাতন চোখে সে ছিল অপরাধ পদবাচ্য। তার মানে 'অলৌকিক' শব্দের আদি ব্যবহার ছিল 'লোকে অবিদিত' ... ইত্যাদি অর্থে, যা ছিল আবিষ্কারমূলক বা উদ্ভাবনমূলক। পরে সনাতনপন্থীদের চোখে সেসব হয়ে যায় 'অস্বচ্ছ মানুষদের ক্রিয়াকলাপ'; অতএব 'লোকবিগর্হিত অপরাধ', 'গুরুতর দোষ' ইত্যাদি এবং বেদবাদীদের চোখে হয়ে যায় 'বেদে প্রচলিত', 'বেদনিষ্ঠিত' ইত্যাদি।

● **আলোক** : ১. লোক্ = দর্শন। (look)। ২. *লোকের আশ্রয় যাহাতে।* / যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. দ্যোত, দীপ্তি, জ্যোতি। উদ্দ্যোত, দীপাদি, বাতি। ... (ব.শ.)। ৪. light অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **লোক, লুক, আলোচনা**।

● **আলোকন** : ২. *লোকনের আশ্রয় যাহাতে*। ৩. দর্শন ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. 'দেখা' অর্থে প্রচলিত। ৫. কোনো কিছুর ভিতরে look through করাকে বলে আলোকন করা। অর্থাৎ কোনো কিছুর উপর (যথার্থ জ্ঞানের) আলো ফেলে তাকে তার অন্তর্নিহিত ক্রিয়ার দিক থেকে দেখাই আলোকন। নিম্ন মানের দর্শন বা তির্যক দেখা কিংবা তার বহিরাবয়বটুকুকে দেখাকে বলে অবলোকন। দ্র. **লোক, লুক, আলোচনা**।

● **আলোচক, আলোচন, আলোচনা** : ১. লোচ্ = দর্শন, পর্য্যালোচন। ২. *আলোচনা করে যে*। ৩. দর্শক। দর্শয়িতা। আলোচনাকারক। ... (ব.শ.)। ৪. 'যে discussion করে' অর্থে প্রচলিত। ৫. আলোকন হল ইংরেজিতে যাকে look through বলে। আর আলোচন হল ইংরেজিতে যাকে look after বলে, তার প্রায়োগিক অংশটি বাদ দিয়ে যে তাত্ত্বিক অংশটুকু থাকে, কেবল সেটুকুই। বস্তুজগৎকে মনোলোকে আনে নয়ন। সেখান থেকে লোকন করে গুছিয়ে যে আনে, সে হল লোচন। লোচনের আশ্রয় যাহাতে সেটিই আলোচন। অর্থাৎ আলোচক মনোলোক থেকে বস্তুসমূহের প্রতিচ্ছবিকে গুছিয়ে এনে সকলের সামনে হাজির করেন। এক কথায় লোচনের ব্যবহার যিনি করেন তিনিই আলোচক।

● **লুক (লুকলুকানি)** : ৫. দ্র. 'খ' গ্রন্থ। ইংরেজি look এই একই

উৎস থেকে জন্মেছে। দ্র. **আলোকন, আলোচন** ... ইত্যাদি।

● **লোক** : ২. *লুক-এর আশ্রয় যে; যে সত্তার ভিতর দিয়ে **লুক** (লুকলুকানি) করা যায়, যে সত্তা অন্য সত্তার ভিতর **লুক** করতে পারে।* ৩. পৃথিবী বিশ্বজগতের অংশ। পৃথিবী অর্থে সাধারণত ত্রিলোক বুঝায় — স্বর্গ, **মর্ত্য**, ও **পাতাল**। অন্য মত অনুসারে পাতাল ছাড়া ৭টি লোক আছে। যেমন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জপ, তপ, সত্য — এই সপ্তলোক। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন মতে ৮টি লোক আছে। যথা — **ব্রহ্মালোক, পিতৃলোক, সোমলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্বলোক, রাক্ষসলোক, যক্ষলোক, পিশাচলোক**। সুশ্রুতে লেখা আছে, লোক দুই প্রকার — স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, তৃণ, লতা — স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীট, মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গম লোকদ্বয় উষ্ণ ও শীত ভেদে আবার আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত ভেদে বিভক্ত। এই দুই লোকের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চার প্রকার — স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাতা। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **তলাতল, ভদ্রলোক, মাণব, মানব**। এই **লোক**গুলিকে একালে sphere বলে। যথা financial sphere, political sphere ... ইত্যাদি।

● **ভুবর্লোক** : ৩. ভূমি ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থান। ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিত। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **মুনি**।

● **লোকন, লোচন** : দ্র. **অক্ষি**।

● **লোকপাল** : ২. *লোককে পালন করেন যিনি।* ৩. ... পৃথিবীর অধ্যক্ষ বা রক্ষক। পৃথিবীর অষ্ট দিকে অষ্ট দিকপাল অধিষ্ঠিত। পূর্ব দিকের অধিপতি ইন্দ্র, দক্ষিণ-পূর্বের অগ্নি, দক্ষিণের যম, দক্ষিণ-পশ্চিমের সূর্য, পশ্চিমের বরুণ, উত্তর-পশ্চিমের বায়ু, কিংবা ঈশানের ও উত্তরের কুবের, উত্তর-পূর্বের সোম। প্রত্যেক দিকপালের একটি করে রক্ষক আছে। তারা দিকপালদের অধিকৃত স্থানকে রক্ষা করে। এই সব রক্ষকরা হস্তী। ইন্দ্রের হস্তীর নাম ঐরাবত, অগ্নির হস্তীর নাম পুণ্ডরীক, যমের হস্তীর নাম বামন, সূর্যের হস্তী কুমুদ, বরুণের হস্তী অঞ্জনা, বায়ুর হস্তী পুষ্পদন্ত, কুবেরের হস্তী সর্বভৌম, সোমের হস্তী সুপ্রতিক। (পৌ.অ.)। ৫. **দিগগজ, দশদিকপাল**। একালেও কোনো একটি সরকারের বহু বিভাগ থাকে, সেই বিভাগের এক একজন মন্ত্রী থাকেন এবং সেই বিভাগগুলি দেখাশোনা করার দায়িত্বে এক একজন সরকারি বড় আমলা থাকেন। সেকালে ঐ আমলাদের বলা হত **দিগগজ** ... ইত্যাদি।

● **ল্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা** : অলম্পট, ননভন, নণ্ডভণ্ড, নাড়ু, নাড়ুগোপাল, নাফানী, নিচু, নিচ্ছিবি, ল, লক (কল থাকে যাতে = কল, lock), লকচ (লকুচ), লকড়ী, লকাটে, ল-কার, লকার (locker), লকুচ, লকুট, লক্কড়, লক্কলক্ক, লক্কা, লক্পক্, লক্লক্, লক্লকায়, লকলকে, লচপচ, লচপচে, লঞ্জ, লঞ্জিকা, লণ্ঠন, ল-ফলা, লড্ডু (নণ্ড, নাড়ু), লণ্ড্, লণ্ড, লণ্ডন (london), লণ্ডভণ্ড (দ্র. নণ্ডভণ্ড, নেড়, লেঁড়, এঁড়-অণ্ড, দণ্ডমুণ্ড), লণ্ড্র, লম্পঝম্প, লম্পট, লম্পটশীলা, লম্পটিয়া, লম্ফ, লম্ফঝম্প, লম্ফন, লম্ফী, লস্কর, লস্করী (গদাইলস্করী চাল), লহু, লাঁফ, লাড়ু, লাদ, লাদা (লোদা বা লোড করা), লাদালাদি-গাদাগাদি, লাদাপেটা (নাদাপেটা), লাফ, লাফঝাঁপ, লাফড়া (লাফরা, লাবড়া, লাবড়ি), লাফা, লাফা-বেগুন, লাফান, লাফান-ঝাঁপান, লাফানি, লাফালাফি, লাম্পট্য, লাল, লালচা, লালচে, লালপাগড়ি, লালপোশ, লালে-লাল, লালপুঁই, লালিম, লালিমা, লাশ, লাশকাটা-ঘর, লাহা, লাহিড়ী, লিক (লিখ, 'ডাগুর উঁকুন লিখি করে ইলিবিলি', নিখি), লিকলিক, লিক্কা, লিক্ষা, লিক্ষিকা, লিখ্য, লিখ্যা, লিচু, লিচ্ছবি, লিবা(ভা)র, লিম্পট, লিম্পাক, লিশ্, লিস্ট, লু (লু-বাতাস), লুরী, লুলা (নুলা), লুহ, লেওড়া (লণ্ড) লেকিন, লেকেন, লেকচার (৯ক্-অন্, ৯ক্-চার, ৯ক্ - গাড়ির লিক) লেচোফেচা, লেচি, লেণ্ড, লেত, লেন্, লেফটেন্যান্ট্, লেবাস, লেবেল, লো, লোউ, লোকসান, লোবান, লোবানদানী, লোর, লোরী।

শ

শ্ বর্ণের অর্থ : শ = শিব, তনুকারক, নাশক, মঙ্গল। **ষ** = বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ, কেশ, মানব, গর্ভবিমোচন, সর্ব্ব, ভ্রূণ। **স** = ঈশ্বর, সর্প, পক্ষী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গৌরী। বর্ণ তিনটির এইরকম অর্থ দিয়ে গেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। এসব তিনি নিজের ইচ্ছাখুশি দেননি। তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে পাওয়া অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে যেরূপ পেয়েছেন, তাই দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা জানি, ওই অর্থগুলি করা হয়েছিল গভীর বর্ণবোধ থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি **শ, ষ, স**, এই তিনবর্ণের ভিতরে যথাক্রমে শিব, ব্রহ্মা (বিজ্ঞ), বিষ্ণু, এই তিন সত্তার আশ্রয় রয়েছে। তবে **ষ**-এর মধ্যে শিবের 'সর্ব্ব' রূপের কথাও রয়েছে। **শ**-কে আমরা উপলব্ধি করেছি অসীম শক্তির নিধিরূপে, যেন ব্ল্যাঙ্ক চেক, প্রেক্ষিত অনুসারে যাতে যে-কোনো অঙ্ক লিখে সুনির্দিষ্ট করা যায়। **ষ**-কে আমরা বুঝেছি, সুনির্দিষ্ট অঙ্কের চেক রূপে। আর, **স**-কে আমাদের মনে হয়েছে ক্যাশ টাকার নোটের মতো, যাকে আকছার ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ **শ** অসীম শক্তি, **ষ** দিশাগ্রস্ত শক্তি, এবং **স** শক্তির কনিষ্ঠতম দ্যোতক। **শ** সূর্য্যকিরণসদৃশ সর্বদিকগামী; **ষ** আলোকবর্তিকা বা টর্চের আলোর মতো; এবং **স** সূর্য্যকিরণ বা টর্চের কিরণের একটি রেখামাত্র। জ্ঞানের নিরিখে দেখলে **শ** অখণ্ড জ্ঞান, **ষ** দিশাগ্রস্ত জ্ঞান, এবং **স** প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতি খণ্ড জ্ঞানের দ্যোতক। কর্মের নিরিখে দেখলে **শ** হল আবিষ্কারমূলক করণ, **ষ** হল সেই আবিষ্কৃত করণের পুনঃ পুনঃ করণ, **স** হল করণমাত্র। আলোর নিরিখে দেখলে **শ** হল দিবালোক, **ষ** হল টর্চের আলো, **স** হল হ্যারিকেন-প্রদীপ-মোমবাতির আলো যা সাধারণ মানুষের রোজকার ব্যবহারে লাগে। **ষ** দিশাগ্রস্ত জ্ঞান বা টর্চের আলো বলেই, তা অন্য সমস্ত দিককে বিস্মৃত করে, পূর্বজ্ঞান ভোলায়, একদিকের সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যদিকের সত্য গোপন করে দেয়। অতএব — **শ** = শ্-অন করে যে; সর্বমুখী বিচ্ছুরণকারী।

● **শ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা** : শক্, শঙ্ক্, *শট্ (শঠ্*, শদ্), *শণ্ (শু, শুণ্ঠ্, শুণ্ড্, শুম্ভ্, শুষ্, শোণ্)*, শন্স্ (শংস্), শপ্ (শব্), শম্, *শল্ (শল্ল্, শাল্, শুক্ক্, শুল্ব্, শূল্)*, *শশ্*, *শষ্ (শস্*,

সস্), শা (শাখ্), শাস্, *শি (শিঘ্, শিঙঘ্, শিঞ্জ্),* শিক্ষ, *শিল্,* শিষ্, শী, *শীল্,* শুচ্, শুধ্, শুভ্, *শূর্, শৃ (শৄ), শৈ (শ্যৈ),* শো, *শ্নন্, শ্রণ্ (শ্রৎ, শ্রথ্),* শ্রি, শ্রু (শ্রম্), শ্ল *(শ্লথ্,* শ্লাঘ্, শ্লিষ্, *শ্লোক্), শ্বন্ (শ্ব্,* শ্বস্, শ্বঃ, শ্বাসী, *শ্বি, শ্বিত্),* শ্।

● **শক্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অতিশক্তি, অশক্য, অশক্ত, অশৈক্য, অসক্ষ, কুন্ত, ছকড়া, ছক্কড়, শউল, শক্, শক (সক্সক্), শককাল, শককৃৎ, শকট (সগড়), শকটনীড়, শকটব্যূহ, শকটভিৎ, শকটভেদ, শকটসার্থ, শকটহা, শকটাক্ষ, শকটারি, শকটি, শকটিকা, শকটী, শকড়ি, শকন্ধু, শকবৎসর, শকবর্ষ, শকল, শকলী, শকলীকৃত, শকলেন্দু, শকস্ত (শিকস্ত্), শকাদিত্য, শকান্তক, শকাব্দ, শকার, শকারি, শকুন, শকুনজ্ঞ, শকুনজ্ঞান, শকুনদ্বার, শকুনবিদ্যা, শকুনশাস্ত্র, শকুনি, শকুনিক, শকুনিগ্রহ, শকুনিপ্রপা, শকুনিবাদ, শকুনি-মামা, শকুনী, শকুনীশ্বর, শকুনোচ্ছিষ্ট, শকুন্ত, শকুন্তক, শকুন্তনীড়, শকুন্তলা, শকুন্তলাত্মজ, শকুন্তি, শকুন্তিকা, শকুল, শকুলাদনী, শকুলার্ভক, শকুলী, শকৃৎ, শকৃৎকরি, শকৃৎকার, শকৃৎকীট, শকৃৎদেশ, শকৃৎদ্বার, শকৃৎপিণ্ড, শকৃৎপিণ্ডক, শকৃৎভেদ, শকৃৎমূত্র, শকেন্দ্র (শক-ইন্দ্র, সিকন্দর্, ইসকন্দর), শক্ত (সখ্ত্), শক্তি, শক্তিকর, শক্তিগ্রহ, শক্তিগ্রাহক, শক্তিত্রয়, শক্তিধর, শক্তিধ্বজ, শক্তিনাথ, শক্তিপাণি, শক্তিপাত, শক্তিপুত্র, শক্তিপূজক, শক্তিপূজা, শক্তিপ্রকর্ষ, শক্তিবান, শক্তিবাদ, শক্তিবাদী, শক্তিবৈকল্য, শক্তিভৃৎ, শক্তিভেদ, শক্তিমান, শক্তিমোক্ষ, শক্তিশালী, শক্তিশেল, শক্তিহর, শক্তিহীন, শক্তিহেতিক, শক্তী, শক্ত্যাপেক্ষ, শক্ত্রি, শক্য, শক্যপ্রতিকার, শক্যসামন্ততা, শক্যার্থ, শক্র, শক্রকার্মুক, শক্রকুমারী, শক্রকেতু, শক্রগোপ, শক্রচাপ, শক্রজ, শক্রজিৎ, শক্রদিক, শক্রধনু, শক্রধ্বজ, শক্রপাত, শক্রপাদপ, শক্রপুর, শক্রপুরোগম, শক্রবাণাসন, শক্রবাহন, শক্রবীজ, শক্রভবন, শক্রভুবন, শক্রভিৎ, শক্রমাতৃকা, শক্রমূর্দ্ধা, শক্রযব, শক্রলোক, শক্রশরাসন, শক্রশালা, শক্রশিরঃ, শক্রসদঃ, শক্রসুত, শক্রাণী, শক্রাত্মজ, শক্রায়ুধ, শক্রারি, শক্রাসন, শক্রোত্থান, শক্রোৎব, শক্করী, শগড়, শাক, শাককাল, শাকট, শাকটায়ন, শাকটিক, শাকতরু, শাকদ্বীপ, শাকপণ, শাকপত্র, শাকপাত্র, শাকপার্থিব, শাকবর্ণ, শাকবাট, শাকবাটিকা, শাকবীর, শাকবৃক্ষ, শাকভক্ষ্য, শাকমল, শাকমূর্ত্তি, শাকম্ভরী, শাকরস, শাকরাখা, শাকরাট্(জ্), শাকল, শাকলপ্রাতিশাখ্য, শাকলশাখা, শাকলহোমীয়, শাকল্য, শাকশাকট, শাকশ্রেষ্ঠ, শাকসবজী, শাকাম্ল, শাকারী, শাকাশন (শাকাশী), শাকাষ্টকা, শাকাহার, শাকিনী, শাকিনীসাধন, শাকুন, শাকুনিক, শাকুনেয়, শাকুন্তল, শাকুন্তিক, শাকুলিক, শাক্ত, শাক্তিক, শাক্তীক, শাক্তেয়, শাক্ত্রেয়, শাক্য, শাক্যকেতু, শাক্যপুঙ্গব, শাক্যভিক্ষু, শাক্যভিক্ষুকী, শাক্যমুনি, শাক্যশ্রমণ, শাক্যশ্রমণক, শাক্যশাসন, শাক্র, শাক্রী, শাগ (সাগ), শাগপাত, শাগভাজা, শাগসবজি, শুকুন, শুকুনি, শেক, শেখ (শেখ, সেক, সেখ, সেখজাদা, সেখজী), শেগুন (সেগুন, দ্র.শাক), শোল, শোলপোনা, শোলপোড়া, শৌল, সাক (শক্তি), সোল।

● **শক্** = সার্বিক করণ। **শক** = সার্বিক করণ যাহাতে। (করতে পারা, হিন্দিতে সকনা)

● **শকুনি :** ২. **শক** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে অন থাকে যাহাতে।* ৩. গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র ও **গান্ধারী**র ভ্রাতা ও **দুর্যোধন**াদির মাতুল। ...শকুনির পুত্রের নাম **উলুক**। (পৌ.অ.)। ৫. সুবলের পুত্র শকুনি। সেকালে **শক্** বলতে বোঝা হত 'পারা', হিন্দিতে বলে 'সক্না'। সেই **শক্** উন হয়ে বা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে গতিশীল থাকে **শকুনি**তে। **শকুনি** তাই পারে না, আবার স্বাভাবিক পারা থেকে অনেক বেশি পারেও। তার সেই না-পারা গতিশীল থাকলে সে নানাভাবে বাগড়া দেয়। তখন সে হল **শকুনি**। এই **শকুনি**কে আমরা পাই মহাভারতে। আর, তার পারা সক্রিয় থাকলে সে হিসাব করতে পারে, কী থেকে ভবিষ্যতে কী হতে পারে। এই **শকুনি**কে আমরা পাই **শকুনজ্ঞ**তে, **শকুনশাস্ত্রে**, **শকুন**-বিদ্যায়।

● **শকুন্তলা :** ২. **শকুন্ত** *(দূরগমনে সমর্থ) কর্তৃক লালিত যে।* ৩. পূর্বকালে ঋষি **বিশ্বামিত্র**কে ঘোর তপস্যায় রত দেখে **ইন্দ্র** ভীত হয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরা **মেনকা**কে প্রেরণ করেন। ... বিশ্বামিত্র মেনকার সহিত মিলিত হন। ... শকুন্তলার জন্ম হয়। ... মেনকা সদ্যোজাতা কন্যাকে বনমধ্যে **মালিনী** নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। ... পরিত্যক্তা কন্যা **শকুন্ত** অর্থাৎ পাখী কর্তৃক রক্ষিতা বলে কন্যাটির নাম হয় শকুন্তলা। ... মহর্ষি **কণ্ব** নিজের আশ্রমে এনে এঁকে নিজের কন্যার ন্যায় পালন করতে থাকেন। ... একদিন মহারাজ **দুষ্মন্ত** বনমধ্যে **মৃগয়া** করতে এসে ... শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে **গান্ধর্ব** মতে **বিবাহ** (করেন) ... তাঁদের পুত্র **ভরত** নামে খ্যাত হয়ে পিতৃরাজ্য পান। এই ভরতের নামানুসারেই এই দেশের নাম হয় **ভারতবর্ষ**। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **শকুনি**। **কণ্ব মুনি**র আশ্রম আসলে সেকালের কারুশিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র। সেখানে যে দূরগামী পণ্যবাহীরা যাতায়াত করত, একালের ভাষায় যারা পাইকার পদবাচ্য, তারাই **শকুন্ত**। তাদের **লালনে**র ফলেই **বিশ্বামিত্র-মেনকা**র থেকে জাত মানসিকতাধারী জনগোষ্ঠীর পক্ষে বা **শকুন্তলার** পক্ষে সেকালের ঐ যৌথব্যবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল। ... দ্র. **দুষ্মন্ত, ভরত**।

● **শকুন্তি :** দ্র. **কপিঞ্জল**।

● **শক্ত :** ২. **শক** *(শক্তির সার্বিক বিচ্ছুরণ, অর্থাৎ করিতে পারা) তারিত যাহাতে।* ৫. ইংরেজি shock।

● **শক্তি :** ২. **শক্ত** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. ক) তন্ত্রে ষোলোটি স্বরবর্ণের ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। ঐ সকল শক্তি রুদ্রের ক্রোড়ে বাস করেন। ... খ) ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতাদের নিজ নিজ শক্তি আছে। এঁরা নিজের দেবগণের অংশভূতা। প্রয়োজন মত এঁরা দেব-তেজ হাতে উদ্ভূতা হয়ে নিজ নিজ দেবগণকে সাহায্য করেন। **রক্তবীজে**র সঙ্গে চণ্ডিকার যুদ্ধকালে এরূপ শক্তি উদ্ভূতা হয়ে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন। (পৌ.অ.)। ৫. **শিব** আর **শক্তি**, এই দুইকে নিয়ে আমাদের উত্তরাধিকার। তাই নিয়ে শৈব ও **শাক্ত**। দ্র. **অংরূপিণী, মহামায়া, শিব**।

● **শঙ্ক্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অবিশঙ্ক, অবিশঙ্কা, অবিশঙ্কিত, অশঙ্ক, আশঙ্কনীয়, আশঙ্কা, আশঙ্কিত, শঙ্ক্ (শকি), শঙ্ক, শঙ্কনীয়, শঙ্কর, শঙ্করচিনা, শঙ্করজটা, শঙ্করপ্রিয়া, শঙ্করশালি, শঙ্করশুক্র, শঙ্করা, শঙ্করাচার্য্য, শঙ্করাবাস, শঙ্করাভরণ, শঙ্করী, শঙ্কা, শঙ্কাকুল, শঙ্কান্বিত, শঙ্কাশঙ্কু, শঙ্কাশীল, শঙ্কাস্পদ,

শঙ্কাহীন, শঙ্কিত, শঙ্কিতচিত্ত, শঙ্কিতচেতাঃ, শঙ্কিতদৃষ্টি, শঙ্কিতবর্ণ (ব্যবসায়ীদের একটি শ্রেণী এখন এই বর্ণ), শঙ্কিল, শঙ্কী, শঙ্কু, শঙ্কুকর্ণ, শঙ্কুছায়া, শঙ্কুতরু, শঙ্কুতল, শঙ্কুচি (শঙ্করমাছ), শঙ্কুলা, শঙ্কোচ, শঙ্কোচি, শাঁকোচ, শাঙ্কর, সশঙ্ক, সশঙ্কিত।

● **শঙ্ক্** = (সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণের রহস্যরূপীকরণ। **শঙ্ক** = (সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণ রহস্যরূপীকরণ যাহাতে।

● **শঙ্ক, শঙ্কা (শঙ্খ)** : **৫**. দ্র. **তঙ্ক, আতঙ্ক**। শঙ্কা হরণ করে যে, তাকে **শঙ্খ** বলে। দ্র. **পাঞ্চজন্য**।

● **শঙ্কর** : **১. ২.** ***শম*** *(শক্তিবিচ্ছুরণকে সীমায়িত) করেন যিনি।* ৩. শিব। মহাদেব সকলের কল্যাণ করেন বলে এঁর নাম শঙ্কর। স্কন্দপুরাণে শিব নিজেই বলেছেন — ভক্তদের ধ্যানে তুষ্ট হয়ে তাদের পবিত্র ও নিরাময় করার জন্য আমি শঙ্কর ও ভূতনাথ নামে অভিহিত। (পৌ.অ.)।

● ***শট্ (শঠ্, শদ্)*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আঁটশাঁট (আঁটসাঁট), আঁটো-শাঁটো, শট্, শট, শটকান, শটকে, শটা, শটি, শটিত, শটী, শট্টক (শাড়া), শট্টেপট্টে, শঠ্, শঠ, শঠধী, শঠপন, শঠপনা, শঠপরিপাটী, শঠবুদ্ধি, শঠমতি, শঠি, শঠিনী, শঠী, শড় (সড়), শড়শড় (সড়সড়, শুড়শুড় - দ্র. শুঠ্), শড়শড়ি (সড়সড়ি) শড়া (শটিত, সড়া, পচা), শত্তুর, শত্রু, শত্রুকর্শন, শত্রুকর্ষণ, শত্রুকুল, শত্রুঘাত, শত্রুঘাতী, শত্রুঘ্ন, শত্রুজিৎ, শত্রুঞ্জয়, শত্রুতাপন, শত্রুদমন, শত্রুনন্দন, শত্রুনাশন, শত্রুনির্বহণ, শত্রুন্তপ, শত্রুন্দম, শত্রুপক্ষ, শত্রুবাধক, শত্রুবাধন, শত্রুবিনাশন, শত্রুমর্দ্দন, শত্রুরূপ, শত্রুসঙ্কট, শত্রুসহ, শত্রুসাহ, শত্রুসেবী, শত্রুহত্যা, শত্রুহন্তা, শত্রুহা, শত্রূপজাপ, শদ্, শাঁট, শাঁটে-বলা, শাঁটে-বোঝান, শাট, শাটক, শাটিকা, শাটী, শাটীন, শাট্যায়ন, শাঠ্য, শাড়া, শাড়ী, শাত, শাতন, শাতি, শাত্রব, শাদ, শাদ্বল, সট্, সট, সট, সটকা, সটা, সটাছুটা, সটাচ্ছটা, সটাল, সটি, সটিকা, সটী, সটে-পটে, সট্টক, সট্পট্, সট্সট্, সড়, সড়ক, সড়কা, সড়কা, সড়কি, সড়কী, সড়গড়, সড়সড়, সড়সড়া, সড়সড়ান, সড়সড়ি, সড়সড়ে, সাট, সাট-মারা, সাড়, সাড়-জাগা, সাড়া, সাড়া-দেওয়া, সাড়ি।

● **শট্ (শঠ্, শদ্)** = (সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণের টঙ্কারণ। **শট** = (সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণ টঙ্কারিত যাহাতে। **শঠ** = (সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে। **শদ** = (সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণকারীর দান যাহাতে।

● **শত্রু** : **২.** *(সার্বিক শক্তি) বিচ্ছুরণের ত্রাণকারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৫.** শব্দটির নিহিতার্থ বলছে, পর কখনো **শত্রু** হতে পারে না। কেবলমাত্র নিজের কেউ যখন সবকিছু জেনেশুনে বিরুদ্ধাচরণ করে সেই প্রকৃত **শত্রু**।

● **শত্রুঘ্ন** : **২.** ***শত্রুকে*** *হনন করে যে।* **৩.** রাজা দশরথের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। ... শত্রুঘ্নের সহিত জনকরাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্তির বিবাহ হয়। ... ইনি মন্থরাকে নিগৃহীত করেন এবং কৈকেয়ীকে কঠোর ভর্ৎসনা করেন। ... ইনি লবণ দৈত্যকে বিনষ্ট করেন। ... লবণবধের পর শত্রুঘ্ন লবণের মথুরা রাজ্য নিজের পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে অর্পণ করেন। ... (পৌ.অ.)।

● ***শণ্ (শু, শুঠ্, শুণ্ড্, শুম্ভ্, শুষ্, শোণ্)*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশুষ্ক, অশোষ্য, উশকোখুশকো, উসকোখুসকো, খুশক (খুসক), খুশকো (খুসকো), শণ্, শণ, শণগৌর, শণঘণ্টিকা, শণচূর্ণ, শণতান্তব, শণতুল, শণপট্ট, শণপুষ্পী, শণবল্ক, শণরজ্জু, শণলুড়ি, শণসূত্র, শণীর, শাণ, শাণগর, শাণ-দেওয়া, শাণা, শাণাজীব, শাণালীঢ়, শাণাশ্মক, শাণাশ্মা, শাণিত, শাণী, শান, শান (সান, পাষাণ), শানঘাট (ষাণঘাট), শুঁট (শুঁঠ), শুঁটক (শুঁঠক), শুঁটকা (শুঁঠকা, সুঁটকো), শুঁটকী, শুঁটা, শুঁটি (শুটি, শুটী), শুঁড়, শুঁড়ি (শুড়ি), শুঁড়িনী, শুঁড়ী, শুক (শুকা, শুখ, শুখা), শুকটা, শুকটি, শুকত, শুকন, শুকন-ডেঙা, শুকনা (শুখনা), শুকশিমা, শুকা (শুখা), শুকান (শুখান, শুখুনা, সুকন, সুকান, সুকনা), শুকা-রুখা, শুকুতা (শুক্তা, soaked, সুকুতা, সুক্তা, সুক্তাপাতা, সুখতাপাতা), শুকোদই (শুখোদই), শুক্ত (শুকত, শুকতো), শুক্তক, শুক্তা, শুক্তানি, শুক্তাপাতা, শুখনোপেটা, শুখা (সুকা, সুখা), শুখান (সুকান, সুখান), শুখুনা, শুখারুখা, শুখোদই, শুখার-সময়, শুঠ্, শুড়শুড়, শুড়িমৎস্য, শুড়ী-খাল, শুণ্ঠ্, শুণ্ঠি, শুণ্ঠী, শুণ্ঠ্য, শুণ্ড্, শুণ্ড, শুণ্ডক, শুণ্ডচিহ্ন, শুণ্ডা, শুণ্ডাঙ্গ (শুণ্ডরূপ অঙ্গ যাহার, শুঁড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গ), শুণ্ডাদণ্ড, শুণ্ডাপান, শুণ্ডার, শুণ্ডাল, শুণ্ডিক, শুণ্ডিকা, শুণ্ডী, শুম্ভ্, শুম্ভ, শুম্ভঘাতিনী, শুম্ভনিশুম্ভ, শুম্ভপুর, শুম্ভপুরী, শুম্ভমথিনী, শুম্ভমর্দ্দিনী, শুষ্, শুষ, শুষি (সুষি), শুষির (সুষির), শুষিরা, শুষ্ক, শুষ্ককণ্ঠ, শুষ্ককলহ, শুষ্কগান, শুষ্কজ্ঞান, শুষ্কতর্ক, শুষ্কতার্কিক, শুষ্কবাক্য, শুষ্কবিবাদ, শুষ্কবিরোহণ, শুষ্কবৃক্ষ, শুষ্কবৈর, শুষ্কবৈরী, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্কব্রণ, শুষ্কমৎস্য, শুষ্কমুখ, শুষ্করুক্ষ, শুষ্করোদন, শুষ্কল, শুষ্কান্ন, শুষ্কার্দ্র, শুষ্ম, শুষ্মা, শুষ্মিণী, শুষ্মী, শুষ্ম, শোঁট, শোঁটা (সোঁটা, সোটা), শোঁঠ, শোঁড়া, শোঁড়িয়া, শোঁথ, শোণ্, শোণ, শোণঝিণ্টি, শোণনদ, শোণনুটি, শোণপত্র, শোণপদ্ম, শোণপদ্মক, শোণপুর, শোণপুষ্পক, শোণরত্ন, শোণসরোজ, শোণহয়, শোণাত (শোনাক, শ্যোনাক, স্যোনাক), শোণা, শোণাধর, শোণাশ্মা (শোণাশ্মন্), শোণাশ্ব, শোণাশ্ববাহ, শোণিত, শোণিতচন্দন, শোণিতদিগ্ধ, শোণিতদিগ্ধাঙ্গ, শোণিতপ, শোণিতপরীত, শোণিতপারণা, শোণিতপিত্ত, শোণিতপুর, শোণিতবর্দ্ধন, শোণিতবর্ষী, শোণিতমেহী, শোণিতস্রাব, শোণিতাভিষ্যন্দ, শোণিতার্ব্বুদ, শোণিতার্ণঃ (-র্ণস্), শোণিতোক্ষিত, শোণিতোৎপল, শোণিতোৎপাদক, শোণিতোপল, শোণিমা (শোণিমন্), শোণোপল, শোথ, শোথক, শোথকৃৎ, শোথঘ্নী, শোথজিৎ, শোথহৃৎ, শোফ, শোফঘ্নী, শোফনাশন, শোফনাশনী, শোফহৃৎ, শোফী, শোনাক, শোষ, শোষক, শোষণ, শোষণীয়, শোষয়িতা, শোষা (চোষা), শোষাণ (চোষাণ), শোষিত, শোষী, শোষ্য, শৌটীর, শৌটীর্য্য, শৌণ্ড, শৌণ্ডিক, শৌণ্ডিকেয়, শৌণ্ডী, শৌণ্ডীর, শৌষ্কল, শ্যোণাক, শ্যোনাক, শ্রোণ্, শ্রোণ, শ্রোণা, শ্রোণি (শ্রোণী), শ্রোণিতট, শ্রোণিদেশ, শ্রোণিফলক, শ্রোণিবিম্ব, শ্রোণিভার, শ্রোণিসূত্র, সুড়ঙ্গ, সোঁটা (লাঠিসোঁটা, লাঠিশোঁটা), সোডা।

● **শণ্ (শু, শুঠ্, শুণ্ড্, শুম্ভ্, শুষ্, শোণ্)** = বিচ্ছুরকের রহস্যরূপের বোধন-সূত্রায়ন। **শণ** = বিচ্ছুরকের রহস্যরূপের বোধন-সূত্রায়ন যাহাতে। **শু** = বিচ্ছুরক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **শুঠ** = **শু**-এর বোধন-টঙ্কার স্থিত যাহাতে। **শুণ্ড** = **শু**-এর বোধনের গড়ান-উড়ান যাহাতে। **শুম্ভ** = **শু**-এর সীমায়ন ভক্ষণ করে যে। **শুষ** =

শু দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। **শোণ** = **শু**-এর বোধনের আশ্রয় যাহাতে।

● **শুম্ভ** : **২.** **শু**-*এর (নবরূপী বিচ্ছুরণের) সীমায়ন ভক্ষণ করে যে।* **৩.** অসুরবিশেষ। নিশুম্ভের ভ্রাতা। এরা দুজনেই **পাতালে** বাস করত। একাসনে বসে এরা অযুত বর্ষ **তপস্যা** করায় **ব্রহ্মা** প্রীত হয়ে এদের বর দিতে চাইলে, এরা ... প্রার্থনা করলে, দেবতা, অসুর, পশুপক্ষী প্রভৃতিদের মধ্যে পুরুষজাতীয় কারো হস্তে তাদের যেন মৃত্যু না হয়। ... বরলাভের পর **ভৃগু**মুনি এদের পুরোহিত হয়ে **শুম্ভ**কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর **চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন** প্রভৃতি দানবরা এর সঙ্গে মিলিত হয় ... **স্বর্গ** অধিকার ... করে। তাদের পীড়নে ত্রিলোকে বিপর্যয় ঘটতে থাকায় দেবতারা **বৃহস্পতি**র পরামর্শে দেবী **ভগবতী**র আরাধনা করতে থাকেন। তখন দেবী **কৌশিকী** ও **মহাকালী**র রূপ ধারণ করে এবং **ইন্দ্রাণী, বারাহী, নারসিংহী** প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ করে অসুর সেনাপতি ... **রক্তবীজে**র নিধন করেন। (পৌ.অ.)। **৫.** কোনো শক্তির বিচ্ছুরণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সীমায়িত থাকে যাতে, সেটিই **শুম্ভ** সত্তা। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সেই সত্তার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। ...

● **শন্‌স্ (শংস্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপ্রশস্ত, আশংস, আশংসন, আশংসা, আশংসিত, আশংসিতা, আশংসী, নৃশংস, প্রশংসা, প্রশস্ত, শংস, শংসন, শংসিত, শংসিতা, শংসী, শস্ত, শস্তি (প্রশস্তি), শস্য, সুপ্রশস্ত।

● **শন্‌স্ (শংস্)** = বিচ্ছুরকের অনকরণের নির্য্যাসন। **শন্‌স** = বিচ্ছুরকের অনকরণের নির্য্যাস যাহাতে। **শংস** = বিচ্ছুরকের রহস্যরূপের নির্য্যাস যাহাতে।

● **নৃশংস, প্রশংসা** : **৫.** দ্র. **নৃশংস** (১ম খণ্ড)।

● **শপ্ (*শব্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অভিশাপ, অভিশপ্ত, অশব্দ, অসাড়, শপ্ (শয়ন পালিত হয় যাতে, ফা. সফ্), শপ্ (শপাৎ), শপতি, শপথ, শপথকরণ, শপথপত্র, শপথপূর্ব্বক, শপথযন্ত্রিত, শপথি, শপন, শপশপ, শপাৎ, শপাশপ, শপ্ত, শফর (সফর), শফরী, শফল্ক (শ্বফল্ক), শফোরূ, শব্, শব, শবকর্ম্ম, শবদ, শবদাহ, শবদাহক, শববাহ, শববাহক, শবভূমি, শবমন্দির, শবযান, শবর, শবরথ, শবরব, শবরভাষ্য, শবরলোধ্র, শবরসৈন্য, শবরাবাস, শবরালয়, শবরী, শবল, শবলচেতন, শবলতা, শবলা, শবলাশ্ব, শবলিমা, শবলী, শবলীকৃত, শবশয়, শবশয়ন, শবশিবিকা, শবসাধন, শবসাধনা, শবস্পৃক্, শবাগ্নি, শবাশ, শব্দ, শব্দ, শব্দকর্ম্মক, শব্দকার, শব্দকোশ, শব্দগ, শব্দগত, শব্দগোচর, শব্দগুণ, শব্দগ্রহ, শব্দগ্রাম, শব্দচাতুর্য্য, শব্দচিত্র, শব্দচোর, শব্দজাত, শব্দতন্মাত্র, শব্দতরঙ্গ, শব্দন, শব্দনিষ্পত্তি, শব্দপতি, শব্দপাত, শব্দপাতী, শব্দপ্রমাণ, শব্দপ্রবৃত্তি, শব্দবহ, শব্দবিদ্যা, শব্দবিশেষ, শব্দবিশেষণ, শব্দবৃত্তি, শব্দবেধ, শব্দবেধী, শব্দবেধ্য, শব্দবোধ, শব্দব্রহ্ম, শব্দভাক্, শব্দভিৎ, শব্দভেদী, শব্দমান, শব্দযোনি, শব্দরব, শব্দরূপ, শব্দশক্তি, শব্দশাসন, শব্দশাস্ত্র, শব্দশুদ্ধি, শব্দশেষ, শব্দশ্লেষ, শব্দসংগ্রহ, শব্দসংস্কার, শব্দসম্ভব, শব্দসাধন, শব্দসাহ, শব্দাক্ষর, শব্দাখ্যেয়, শব্দাড়ম্বর, শব্দাতীত, শব্দাদি, শব্দাধিবহ, শব্দাধিষ্ঠান, শব্দানুকৃতি, শব্দানুরূপ, শব্দানুশাসন, শব্দাব্ধি, শব্দাম্বুধি, শব্দায়, শব্দায়মান, শব্দার্থ, শব্দালঙ্কার, শব্দিত, শাও, শাঁপ (সাঁও), শাপ, শাপগ্রস্ত, শাপনিবৃত্তি, শাপপরিক্ষত, শাপপ্রদান, শাপভ্রষ্ট, শাপমুক্ত, শাপমুক্তি, শাপমোক্ষ, শাপযন্ত্রিত, শাপান্ত, শাপাবধি, শাপাবসান, শাপাম্বু, শাপাস্ত্র, শাপিত, শাপোৎসর্গ, শাপোদ্ধার, শাফরিক, শাব (পক্ষীশাব, মৃগশাব ইত্যাদি), শাবক, শাবর (সাবর), শাবরী, শাব্দ, শাব্দবোধ, শাব্দব্যঞ্জনা, শাব্দিক, শাব্দী, সাড়, সাড়া, শোয়াল (ছাওয়াল)

● **শপ্** = (সার্বিক) বিচ্ছুরকের পান-পালন। **শপ** = (সার্বিক) বিচ্ছুরকের পান-পালন যাহাতে।

● **অভিশপন, অভিশব্দিত, অভিশস্ত, অভিশাপ, অভিশাপ** : ১. শপ্ = শাপ দেওয়া। ২. ***অভিশাপ*** = *অভিভাবকোচিত* ***শাপ*** *থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে শক্তিমানের ইচ্ছানুসার প্রেরণ থাকে।* / 'তুমি সুবর্ণ চুরি করিয়াছ' ইত্যাদি কথন। (ব.শ.)। **৩.** মিথ্যাপবাদ-কথন, মিথ্যাভিশংসন, মিথ্যাদোষারোপ। পাতকাভিযোগ, মহাপাতক-বিষয়ে অভিযোগ। ব্রাহ্মণ গুরু বৃদ্ধ সিদ্ধপুরুষ কর্ত্তৃক অনিষ্টাভিশংসন (অহিত-কথন), অভিসম্পাত, শাপ। (ব.শ.)। **৪.** অনিষ্টকথন, যা বাস্তবায়িত হয়ে যায় বা হয়ে যেতে পারে, এমন অর্থে প্রচলিত। **৫. অভিশাপ** আর **শাপ**, দুটো কথা প্রচলিত রয়েছে। ব্রাহ্মণ যখন শাপ দেয় তখন সেটা অভিশাপ। আর রাজা যখন ব্রাহ্মণকে বা কোনো নারী যখন অন্য কাউকে শাপ দেয়, তখন সেটা শাপ। তার মানে বড় বা শক্তিমান যখন তুলনায় শক্তিহীনকে যে শাপ দেয় সেটা অভিশাপ; আর দুর্বল যখন শক্তিমানকে শাপ দেয়, সেটা শাপ মাত্র। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই শাপ মুখের কথামাত্র নয়। একালের ভাষায় বললে বলা যায় — জর্জ বুশের অভিশাপে তালিবান ভস্মীভূত হইল। কিন্তু ভারতীয় সাইবার কুলিদের শাপে মার্কিন সমাজের পদস্খলন হল। (মার্কিন শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেল।)।

● **শবর, শবরস্বামী** : **৩.** ক) ঋকবেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি গাভীদের বিষয়ে কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। খ) ম্লেচ্ছজাতি। (পৌ.অ.)। **৫.** স্মর্তব্য যে, **শবরস্বামীই সায়নাচার্য** নামে খ্যাত। **শবর** = **শব** রহে যাহাতে, কিংবা, শক্তি কর্ত্তৃক বরণীয় যে। দ্বিতীয়টিই *ঠিক বলে মনে হয়। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।*

● **শবরী** : **৩.** নিম্নকুলোদ্ভবা বৃদ্ধা তপস্বিনী ও ব্রহ্মচারিণী। ... একসময় ইনি **পম্পা** নদীতীরে **মতঙ্গ** ঋষির আশ্রমে মুনিদের পরিচারিকা ছিলেন। তপস্বীরা শবরীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, রাম এই আশ্রমে এলে তাঁকে দর্শন করে শবরী এমন স্থানে যাবে যেখান হতে কেউই আর ফিরে আসে না। সেই দিন হতে শবরী রামের আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। রামের জন্য শবরী প্রত্যহ বন্য ফল সংগ্রহ করে রাখতেন। অবশেষে রামচন্দ্র যখন অপহৃতা সীতার অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন শবরী করজোড়ে দণ্ডায়মান হয়ে রামের চরণে পতিত হলেন। ... তাঁর জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবা সফল হলো। ... (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **পম্পা**।

● **শবল** : **অর্থ, কপিল, কপিলাবস্তু**।

● **শব্দ** : **১.** শপ্ + দ (দন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বিচ্ছুরিতকে বহন করে দান করে যে; অথবা, ঘটনার* ***শব*** *দান করে যে; কিংবা মনোভাবের* ***শব*** *দান করে যে।* **৫.** দ্র. **কর্ণ, বিশ্বশ্রবা, যোড়শব্দ**। (দ্র. **মোটমাট**)।

● **শাপভ্রষ্ট** : দ্র. **ভ্রষ্ট (ভ্রংশ্)**।

● **শাবক** : দ্র. **ছা, ছাওয়াল**।

● **শম্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশম, অশান, অশান্ত, উপশম, প্রশমন, প্রশান্ত, শংব, শংযু, শঙ্খ, শঙ্খক, শঙ্খকার, শঙ্খকারক, শঙ্খক্ষীর, শঙ্খচক্রধর, শঙ্খচরী, শঙ্খচিল, শঙ্খচিল্ল, শঙ্খচূড়, শঙ্খচূর, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খচূর্ণী, শঙ্খজ, শঙ্খদ্রাবক, শঙ্খধ্ম, শঙ্খধ্মা, শঙ্খনখ, শঙ্খনাভি, শঙ্খপাণি, শঙ্খপাত্র, শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খপ্রণাদ, শঙ্খবলয়, শঙ্খবিষ (সেঁকোবিষ), শঙ্খবণিক, শঙ্খবেণে, শঙ্খভৃৎ, শঙ্খমুক্তা, শঙ্খমুখ, শঙ্খমুদ্রা, শঙ্খস্বন, শঙ্খান্তর, শঙ্খাবর্ত্ত, শঙ্খালু, শঙ্খালুক, শঙ্খাসুর, শঙ্খিনী, শঙ্খী, শণ্ড, শণ্ডামর্ক (সং যণ্ড ও ইংরেজি মার্কা একত্র করে 'ষণ্ডামার্কা' কথাটি এখন প্রচলিত হতে পেরেছে বাংলামনের মাটিতে থাকা 'শণ্ডামর্ক' শব্দের ধূসর স্মৃতির কারণে।), শণ্ডিল, শণ্ঢ, শন্তনু (শান্তনু), শফর (সফর), শফরী (সফরী), শম্, শম, শমক, শমকৃৎ, শমতা, শমতি, শমথ, শমন (summons), শমনস্বসা, শমপর, শমপ্রধান, শমপ্রাপ্ত, শময়িতা, শমল, শমার্থী, শমি, শমিত, শমিতা, শমী (সামি), শমীগর্ভ, শমীধান্য, শমীপত্রা, শমীলতা, শমীক, শমীকণ্টক (সাঞ্চি, সাঞ্চিকাঁটা), শমীর, শম্পা, শম্পাক, শম্ব্, শম্ব, শম্বর (সম্বর), শম্বরকন্দ, শম্বরঘ্ন, শম্বরচন্দন, শম্বরদারণ, শম্বররিপু, শম্বরসূদন, শম্বরহা, শম্বরারি, শম্বল, শম্বাকৃত, শম্বু, শম্বুক, শম্বূ, শম্বূক, শম্বূকা, শম্ভল (সম্ভল), শম্ভলী, শম্ভু, শম্ভুকান্তা, শম্ভুতনয়, শম্ভুনন্দন, শম্ভুপ্রিয়া, শম্ভুবল্লভ, শম্ভুসুত, শম্যা, শম্যাক্ষেপ, শম্যাগর্ত্ত, শম্যানিপাত, শম্যাপাত, শম্যাপ্রাস, শম্যাপ্রাসন, শাঁই, শাঁক, শাঁখ, শাঁখচুন্নী (শাঁকচুন্নী, -র্ণী), শাঁখা, শাঁখালু (শাঁক-আলু, শাঁখ-আলু), শাঁখারি (শাঁকারি, শাঁকারী, শাঁখারী), শাঁখিনী, শাঁখী, শাঁপি (শম্ব), শাখিনী, শাঙ্খ, শাঙ্খা, শাঙ্খিক, শাণ্ডিল্য, শাণ্ডিল্যগোত্র, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, শাণ্ডিল্যসূত্র, শান্ত, শান্তক্রোধ, শান্তগুণ, শান্তচেতাঃ, শান্তজ্বর, শান্তনব, শান্তনু, শান্তম্, শান্তমূর্ত্তি, শান্তরজাঃ, শান্তরব, শান্তরশ্মি, শান্তরস, শান্তলাভ, শান্তহৃদয়, শান্তা, শান্তার্চিঃ, শান্তি, শান্তিক, শান্তিকর, শান্তিকরণ, শান্তিকর্ম্ম, শান্তিকৃৎ, শান্তিগৃহ, শান্তিজল, শান্তিনিকেতন, শান্তিপর্ব্ব, শান্তিপাঠ, শান্তিপাত্র, শান্তিবাচন, শান্তিভঙ্গ, শান্তিরক্ষক, শান্তিরক্ষা, শান্তিরি, শান্তিসদ্ম, শান্তিসলিল, শান্তিসুক্ত, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, শান্ত্যদক, শান্ত্যদকুম্ভ, শাম, শামচণ্ডী, শামভাঙা, শামা, শামিত্র, শামুক (পচা শামুকে পা কাটা), শাম্ব, শাম্বর, শাম্বুক, (শাম্বূক), শাম্ভব, শাম্ভবী, শাম্য, শিম (শীম, ছিম), শিম্ব, শিম্বা, শিম্বি, শিম্বিক, শিম্বিকা, শিম্বী, শেঁকো, শেঁখো, শেঁখোবিষ, সামাই, সামি, সামিকৃত, সামিপীত, সামিভুক্ত, সুশান্ত।

● **শম্** = সার্বিক বিচ্ছুরিতের সীমায়ন। **শম** = সার্বিক বিচ্ছুরিতের সীমায়ন যাহাতে।

● **শম** : **৫.** আলোকাদির বিচ্ছুরণ (জ্ঞানের ধনের বা অন্যতর আলোকের সার্বিক বিচ্ছুরণ আপাত পূর্ণরূপে প্রমিত বা) সীমিত যাহাতে। দ্র. **উপশম**।

● **শঙ্খ** : **৩.** ক) বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তম দিনে দ্রোণকর্তৃক নিহত হন। খ) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যান্য নাগ। (পৌ.অ.)। **শঙ্ক, শঙ্কু দ্রষ্টব্য। পঙ্কজন দ্রষ্টব্য।**

● **শঙ্খচূড়** : **৩.** একজন দৈত্য। **সুদামা** নামে একজন গোপ রাধিকার শাপে অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম হয় **শঙ্খচূড়**। তপস্যা বলে শঙ্খচূড় ব্রহ্মার কাছ থেকে এক কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হন। ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা **তুলসী**র সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয়।... (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **তুলসী, ললিতা**।

● **শমিতা** : **৩.** যজ্ঞাগ্নির নামান্তর। যজ্ঞে পশুবধকারী ঋত্বিককে শমিতা বলা হোত। (পৌ.অ.)।

● **শমীক** : **২.** *বিচ্ছুরিতের সীমায়নকে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে।* **৩.** মুনিবিশেষ। অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ ... ...। (পৌ.অ.)।

● **শম্পা (শম্পাক)** : **১.** শম্ + পা + ড - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আপ্। (ছা.অ.)। **২.** *শম্ (বিচ্ছুরিতের সীমায়ন) পালিত হয় যে আধারে।* **৩.** **শম্পা** = বিদ্যুৎ, তড়িৎ। **শম্পাক** = আরগ্বধ, সোঁদালিগাছ (সোঁদালগাছ, সোনালুগাছ), আলতা, রন্ধন। (ছা.অ.)। **৫.** কোনো কোনো মেয়ের স্বভাবের ভিতরে এই স্বরূপকে চিহ্নিত করে আমাদের বাংলাভাষী পূর্বসূরিগণ তাঁদের নাম রাখতেন **শম্পা**। পুরাণাদিতেও **শম্পা** সত্তাটি রয়েছে।

● **শাণ্ডিল্য** : **৩.** একজন ভক্তিসূত্রের প্রচারকর্তা ঋষি। শাণ্ডিল্য গোত্রধারা এই মুনি প্রবর্তন করেন। এই গোত্রের তিনটি প্রবর — শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **অসিত, দেবল**।

● ***শল্ (শল্ল্, শাল্, শুল্ক্, শুল্ব্, শূল্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ছাল, ছালটি, ছালা, ছালি, শজারু, শড়কি (শল্যক), শল্, শল, শলতে (শলিতা), শলভ, শলভান্ত্র, শলল, শললবান, শললিত, শললী, শলশল (সলসল), শলা (শলাকা), শলা (সলা, সলাহ্), শলা-ইঁদুর (সলেয়া), শলাক, শলাক-ধূর্ত্ত, শলাকা, শলাকাঙ্গী (শীর্ণাঙ্গী — সড়ঙ্গা, সড়িঙ্গা, সিড়িঙ্গা, সিড়িঙ্গে), শলাকাপরি, শলাকী, শলাটু, শলা-পরামর্শ, শলা-বেগুন, শলি (ঝেঁটার শলি), শলিতা (সলিতা, স'লতে), শলী, শল্ক, শল্কল, শল্কলী, শল্কী, শল্মলি, শল্য, শল্যক (সল্লক), শল্যকণ্ঠ, শল্যকর্ত্তা, শল্যক্রিয়া, শল্যতন্ত্র, শল্যপর্ব্ব, শল্যপ্রোত, শল্যলোম, শল্যহর্ত্তা, শল্যহৃৎ, শল্যশাস্ত্র, শল্যাহরণ, শল্যিত, শল্যোদ্ধরণ, শল্যোদ্ধার, শল্যোদ্ধৃতি, শল্ল্, শল্ল, শল্লকী (সল্লকী), শল্লকীদ্রব, শল্ব, শাইল, শাল (কামারশাল, ঢেঁকিশাল ...), শাল (সাল), শালকাঁটা (শালারক-কাঁটা, শিয়ালকাঁটা, দ্র.শৃগালকণ্টক), শালগচি, শালগ্রাম, শালগ্রামগিরি, শালগ্রামশিলা, শালগ্রামশিলা-জল, শালগ্রামী, শালঘর, শালনির্য্যাস, শালতি (সালতি), শালধুতি, শালপত্রা, শালপর্ণী, শালপান (সালপান), শালপানী, শালপোত, শালপ্রাংশু, শালবন, শালবন্দ, শালবাঁশ, শালবান, শালবাহন, শালভঞ্জিকা, শালভঞ্জী, শালভর, শালভাঙা, শালরস, শাললতা, শালশৃঙ্গ, শালসঙ্কাশ, শালসার, শালস্তম্ভ, শালা (গোশালা, পাঠশালা ...), শালা, শালাকর্ম্ম, শালাকী, শালাক্য, শালাঙ্কী, শালাঙ্কুর, শালাঞ্চি, শালাতুরীয়, শালানি, শালামুখ, শালার, শালারক (সালারক, শিয়াল), শালাস্তম্ভ, শালি, শালিক (সালিক, সারিকা), শালিকাচুঁটি, শালিকূট, শালিকেদার, শালিক্ষেত্র, শালিগোপ, শালিচূর্ণ, শালিজাল, শালিজৌদন, শালিঞ্চ (সাইচা, সাঞ্চা, সালিঞ্চা), শালিঞ্চী, শালিতণ্ডুল, শালিধান্য, শালিনী, শালিপুষ্ট, শালিবাহন, শালিভবন, শালিভূ, শালিশূক, শালিহোত্র, শালিহোত্রজ্ঞ, শালী (গুণশালিনী, গুণশালী ...), শালীন, শালীনশীল, শালীনতা, শালীনত্ব, শালীনা,

শালু, শালুক (শালুক, সালুক), শালূর (সালর, সালুর, সালূর, সানুর), শালেয়, শালেয়া (সালেয়া, শলা ইঁদুর), শাল্মল, শাল্মলি, শাল্মলিক, শাল্মলিপত্রক, শাল্মলিস্থ, শাল্মলী (salmalia malabarica) শাল্মলীফলক, শাল্যন্ন, শাল্ব, শাল্বনগর, শাল্বপতি, শাল্বরাজ, শাল্বহা, শিঙলি, শিমলি (শাল্মলী, শিমলী, শিমুল, শীমলী, সিমলাই), শুল্ক্, শুল্ক, শুল্কখণ্ডন, শুল্কগ্রাহ, শুল্কগ্রাহক, শুল্কগ্রাহী, শুল্কমোষণ, শুল্কশালা, শুল্কস্থান, শুল্কাধ্যক্ষ, শুল্কাবাপ্ত, শুল্‌পি (শুল্‌পী, শুল্ফী), শুল্ল, শুল্ব্, শুল্ব, শুল্বজ, শুল্বা, শুল্বারি, শুল্বী, শূল্, শূল, শূলগ্রন্থি, শূলগ্রহ, শূলগ্রাম, শূলঘাতন, শূলঘ্ন, শূলদ্বিট্(ষ্), শূলধন্বা, শূলধর, শূলধারী, শূলধারিণী, শূলধৃক্, শূলনাশক, শূলনাশন, শূলনাশিনী, শূলপাণি, শূলপ্রোত, শূলভৃৎ, শূলর্ষ্টি, শূলশক্র, শূলস্থ, শূলহস্ত্রী, শূলহস্ত, শূলহৃৎ, শূলা (ছুঁচলো করা), শূলা (খুঁটা), শূলাকৃত, শূলাগ্র, শূলাধিরোপিত, শূলান, শূলানি, শূলাবতংসিত, শূলি, শূলিক, শূলিকা, শূলিনী, শূলী, শূলূনী, শূল্য, শেল, শেলপাট, শোঁল, শৌল, শৌল্ক, শৌল্কিক, শৌল্কিকেয়, শৌল্ফ, শৌল্বিক, সাইল (শাল), সিমলাই (শাল্মলী, সিমলাল), সুবিশাল, সোলে (সলাহ্, শলা), সোলেনামা।

● **শল্ (শল্ল, শাল্, শুল্ক, শুল্ব, শূল্)** = বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন। **শল** = বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন যাহাতে। **শল্ল** = বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন লালিত-লুপ্ত হয় যাহাতে। **শাল** = শল হইতে জাত। **শুল্ক** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন করে যে। **শুল্ব** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন বহন করে যে। **শূল** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের আধার লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।

● **শল্য** : ২. **শল** *(বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন) থাকে যাহাতে।* ৩. মদ্রদেশের রাজা। **পাণ্ডু**র স্ত্রী **মাদ্রী**র সহোদর ভ্রাতা। ... নকুল সহদেবের মামা। ... দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ইনিও লক্ষ্যভেদে অকৃতকার্য হন এবং অন্যান্য রাজাদের সহিত মিলিত হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ভীম কর্তৃক পরাজিত হন। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন ও যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। (পৌ.অ.)।

● **শল্লকী** : **৫. সিহুক, সিঁয়া কুল** দ্র. **গজাশন**।

● **শালা (পাঠশালা, রান্নাশালা, কামারশালা)** : ৫. দ্র. **ধর্ম্মশালা, পাঠশালা**। 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন ...' নিবন্ধে এ বিষয়েরও বিস্তারিত আলোচনা আছে।

● **শালিধান্য** : ৫. দ্র. **ফড়িংচোষা**। ধান্য কতপ্রকার, তার মধ্যে শালিধান্যের স্থান কোথায়, এ বিষয়ে এখন আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এ নিয়ে সম্প্রতি খুবই গবেষণা ইত্যাদি হচ্ছে।

যদিও সারা পৃথিবীতে হাজার পাঁচেক ভাষা রয়েছে এবং তার মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশেই রয়েছে ১৬০০ টির বেশি ভাষা; একইরকম ভাবে সারা পৃথিবীতে মোট ৪,২০,০০০ প্রজাতির ধান জন্মাত বলে জানিয়েছেন *বিশ্বদর্শক* (World Watch) সংস্থা, তার মধ্যে শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশে কত প্রজাতির ধান জন্মাত তা তাঁরা পৃথকভাবে জানাননি (জানালেও দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো তথ্য আমাদের হাতে আসেনি)। কিন্তু যদি ভাষার সংখ্যার অনুপাতটি মেনে নিই (সেরকম অনুপাত মান্য করার কিছু কারণও রয়েছে), তাহলে আমাদের দেশে অন্তত পক্ষে ১,৪০,০০০ প্রজাতির ধান জন্মাত। শুধু তাই নয়, তাদের স্বভাব অনুসারে নামও ছিল। আমাদের আধুনিকতাবাদীদের কল্যাণে সেই বিপুল সংখ্যক ধানের চাষ ও তাদের সবই হারিয়ে ফেলেছি আমরা। বাঁকুড়ার একটি সংস্থা, নাম **ব্রীহি**, প্রায় শ'তিনেক ধানের চাষ চালিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলির নামকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

● ***শশ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশাশ্বত, অশিশির, অশিশিরকর, অশিশিরকিরণ, অশিশিররশ্মি, শশ্, শশ, শশক, শশঘাতক, শশঘাতী, শশঘ্ন, শশচিহ্ন, শশধর, শশবিন্দু, শশবিম্ব, শশবিষাণ, শশব্যস্ত, শশভৃৎ, শশলক্ষণ, শশলক্ষ্ম, শশলক্ষ্মা, শশলাঞ্ছন, শশলেখা, শশলোম, শশশৃঙ্গ, শশস্থলী, শশা (-শক, খরগোস কি শশা খায়? তাহলে শশারু কেন? নাকি তার জন্য 'শসা'?), শশাঙ্ক, শশাঙ্ককিরণ, শশাঙ্ককুল, শশাঙ্কতনয়, শশাঙ্কধারিণী, শশাঙ্কবিম্ব, শশাঙ্কমুকুট, শশাঙ্করেখা, শশাঙ্কলেখা, শশাঙ্কশেখর, শশাঙ্কশেখরী, শশাঙ্কসুত, শশাঙ্কার্দ্ধ, শশাঙ্কোপল, শশাদ, শশাদন, শশারু, শশিকলা, শশিচূড়, শশিধর, শশিনী, শশিপ্রভ, শশিপ্রভা, শশিপ্রিয়, শশিপ্রিয়া, শশিভাল, শশিভালিনী, শশিভালী, শশিমুখ, শশিমুখী, শশিরেহা, শশিশিরোমণি, শশী, শশীকর, শশীকান্ত, শশীকোটি, শশীখণ্ড, শশীখণ্ডশেখর, শশীগ্রহ, শশীজ, শশীতনয়, শশীপাদ, শশীবংশ, শশীবদনা, শশীভূষণ, শশীভৃৎ, শশীমণি, শশীমৌলি, শশীরুক্, শশীরেখা, শশীলেখা, শশীশ, শশীশেখর, শশীসুত, শশোর্ণ, শশ্বৎ (শশ্-বৎ, শাশ্বত), শাশ, শাশ্বত, শাশ্বতবাণী, শাশ্বতিক, শাশ্বতী, শিশির, শিশিরকর, শিশিরকাল, শিশিরকিরণ, শিশিরগভস্তি, শিশিরগু, শিশিরঘ্ন, শিশিরদীধিতি, শিশিরনীর, শিশিরমথিত, শিশিরময়ূখ, শিশিরমাস, শিশিরশ্রী, শিশিরসময়, শিশিরাংশু, শিশিরাগম, শিশিরাত্যয়, শিশিরাপগম, শিশিরাসার, শিশিরীকৃত, শিশ্ন, শিশ্নচ্ছেদন, শিশ্নদেব, শিশ্নোদর, শিশ্নোদরপরায়ণ, শৈশির, শৈশ্ন।

● **শশ্** = বিচ্ছুরিতের সার্বিক বিচ্ছুরণ। **শশ** = বিচ্ছুরিতের সার্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে।

● ***শষ্ (শস্, সস্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিশস্ত্র, অশস্ত্র, অশস্ত্রবিহিত, অশাসন, অশাসনীয়, অশাস্য, অশাস্ত্র, অশাস্ত্রবিহিত, অশাস্ত্রীয়, শষ্, শষ্কুলি, শষ্কুলিকা, শষ্কুলী, শষ্প (শস্প), শস্, শসন, শসা, শস্ত (শাসিত), শস্তা, শস্ত্র, শস্ত্রক, শস্ত্রকর্ম্ম, শস্ত্রকলি, শস্ত্রকার, শস্ত্রকোপ, শস্ত্রকোষ, শস্ত্রগ্রাহী, শস্ত্রঘাত, শস্ত্রচিকিৎসা, শস্ত্রচূর্ণ, শস্ত্রজীবী, শস্ত্রত্যাগ, শস্ত্রদেবতা, শস্ত্রনিপাত, শস্ত্রন্যাস, শস্ত্রপাণি, শস্ত্রপাত, শস্ত্রপান, শস্ত্রবৃত্তি, শস্ত্রবিক্রয়ী, শস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্বান, শস্ত্রব্যবহার, শস্ত্রভৃৎ, শস্ত্রমার্জ্জ, শস্ত্রমুখ, শস্ত্রযুক্তি, শস্ত্রশাস্ত্র, শস্ত্রশিক্ষা, শস্ত্রসংহতি, শস্ত্রসম্পাত, শস্ত্রাজীব, শস্ত্রাবচারণ, শস্ত্রাবপাত, শস্ত্রাভ্যাস, শস্ত্রাস্ত্র, শস্ত্রিণী, শস্ত্রী, শস্ত্রোদ্যম, শস্ত্রোপজীবী, শস্প, শস্পভুক্, শস্পভোজন, শস্য, শস্যক্ষেত্র, শস্যপাল, শস্যপূর্ণ, শস্যপ্রদ, শস্যবেদ, শস্যভক্ষক, শস্যমঞ্জরী, শস্যমালী, শস্যরক্ষক, শস্যশীর্ষক, শস্যশূক, শস্যসম্পদ, শস্যসম্পন্ন, শস্যাদ, শস্যাবাপ, শস্যেষ্টি, শস্যোদ্ভব, সস্য, সস্যক, সস্যনাশ, সস্যপূর্ণ, সস্যপ্রদ, সস্যপ্রণাশ, সস্যপ্রবৃদ্ধি, সস্যবধ, সস্যবিমর্দ্দ, সস্যবৃদ্ধি, সস্যভক্ষক, সস্যমারী, সস্যশালী, সস্যসম্পৎ(দ্), সস্যসম্পন্ন, শাঁস (তালশাঁস), শাঁসাল, শাষ্কুলিক, শাস (শাঁস),

● **শষ্ (শস্, সস্)** = বিচ্ছুরিতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **শষ** = বিচ্ছুরিতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **শস** = বিচ্ছুরিতের নির্য্যাসন যাহাতে। **সস** = অস্তিত্বমাত্রের অস্তিত্ব যাহাতে।

● ***শা (শাখ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** *:* শহর (সহর, 'শা' বা শহ্ মানে সমাজশরীর কেন্দ্রিভূত যেখানে, এই অর্থ 'শ্ম' শব্দের সঙ্গে মেলে। এই 'শহ' রহে যেখানে তাকে 'শহর' বলার যুক্তি আছে। দ্র. সহর), শহরকোটাল, শহরকোটালী, শহরতলী, শহরীয়া, শহীদ, শহুরে, শহুরেপনা, শা (শাখা), শা, শাখ, শা-খরচীয়া, শা-খরুচে, শা-জীরা, শা-জোয়ান, শা-দরজা, শাখা, শাখাকণ্ট, শাখাচংক্রমণ, শাখাচন্দ্রন্যায়, শাখাচন্দ্রবৎ, শাখাধ্যায়ী, শাখাধ্যেতা, শাখানগর, শাখান্তগ, শাখান্তর, শাখাপুর, শাখাপ্রকৃতি, শাখাপ্রদান, শাখাবাত, শাখাভৃৎ, শাখাভেদ, শাখামৃগ, শাখারণ্ড, শাখারথ্যা, শাখারস, শাখাশিফা, শাখাসারঙ্গ, শাখাসারঙ্গমুখী, শাখী।

● **শা (শাখ্)** = বিচ্ছুরিতের আধার যে। **শাখ** = বিচ্ছুরিতের আধারের ক্ষ-অন যাহাতে।

● **শাস্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অনুশাসক, অশিষ্য, অশিষ্ট, অসচ্ছাস্ত্র, আশীঃ, আশীর্ব্বচন, আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদক, আশীর্ব্বাদী, আশীসবচন, আশীসমন্ত্র, প্রশাসক, প্রশাসন, শাস্, শাস, শাসক, শাসকদূষক, শাসকধর, শাসকপত্র, শাসকবাহক, শাসকলঙঘন, শাসকশত, শাসকহর, শাসকহারী, শাসন, শাসনীয়, শাসান, শাসানি, শাসিত, শাসিতব্য, শাসিতা, শাসী, শাস্তর, শাস্তা (শাস্তৃ, শায়েস্তা খাঁ, সায়েস্তা), শাস্তি, শাস্ত্র, শাস্ত্রকার, শাস্ত্রকৃৎ, শাস্ত্রকোবিদ, শাস্ত্রগণ্ড, শাস্ত্রচক্ষুঃ, শাস্ত্রচিন্তক, শাস্ত্রচৌর, শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী, শাস্ত্রদৃষ্ট, শাস্ত্রদৃষ্টি, শাস্ত্রনেত্র, শাস্ত্রপ্রমাণ, শাস্ত্রবক্তা, শাস্ত্রবর্জ্জিত, শাস্ত্রবাদ, শাস্ত্রবিৎ(দ্), শাস্ত্রবিধান, শাস্ত্রবিধি, শাস্ত্রবিপ্রতিষেধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবুদ্ধি, শাস্ত্রবিমুখ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরোধ, শাস্ত্রব্যুৎপত্তি, শাস্ত্রমতি, শাস্ত্রযোনি, শাস্ত্রশিল্পী, শাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রাচরণ, শাস্ত্রাতিক্রম, শাস্ত্রাধ্যাপক, শাস্ত্রানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুমোদিত, শাস্ত্রানুসার, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ, শাস্ত্রাসন, শাস্ত্রী, শাস্ত্রীয়, শাস্ত্রোক্ত, শাস্য, শিষ, শিষ্ট, শিষ্টপ্রয়োগ, শিষ্টসভা, শিষ্টসম্মত, শিষ্টাকরণ, শিষ্টাচার, শিষ্টাচীর্ণ, শিষ্টাদিষ্ট, শিষ্টি, শিষ্য, শিষ্যপরম্পরা, শিষ্যা, শৈষ্যোপাধ্যায়িকা, সুশাসন।

● **শাস্** = বিচ্ছুরিতের আধারের নির্য্যাসন যাহাতে।

● ***শি (শিঘ্, শিঙঘ্, শিঞ্জ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** *:* শিকল, শিকলি (সিকলি), শিকলী, শিগ্‌গির, শিঙঘ্, শিঙঘাণ (সিঙঘাণ), শিঙঘাণক, শিঙঘাণিকা, শিঙিঘত, শিঞ্জ্ (শিঞ্জি) শিঞ্জন, শিঞ্জা, শিঞ্জিত, শিঞ্জিনী, শিঞ্জী, শিতি, শিতিকণ্ঠ, শিতিচন্দন, শিতিচ্ছদ, শিতিপক্ষ, শিতিপ্রভ, শিতিবাসাঃ, শিতিরত্ন, শিতিসারক, শিষ (সিটি), শিষান, শীঘ্র, শীঘ্রকারী, শীঘ্রকৃত্য, শীঘ্রগ, শীঘ্রগতি, শীঘ্রগামী, শীঘ্রচার, শীঘ্রচেতন, শীঘ্রপাতী, শীঘ্রবহ, শীঘ্রবিক্রম, শীঘ্রবুদ্ধি, শীঘ্রবেধী, শীঘ্রযান, শীঘ্রযায়ী, শীঘ্রস্রোতাঃ, শীঘ্রহস্ত, শুঁক, শুঁকা, শুঙ্খ, শুঙ্গ, শৃঙ্খল, শৃঙ্খলক, শৃঙ্খলবদ্ধ, শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলযমক, শৃঙ্খলিত, শৃঙ্খলী, শৈঘ্র, শৈঘ্র্য, শোঁকা, শোঁকান, সিকল (শিকল, শৃঙ্খল)।

● **শি (শিঘ্, শিঙঘ্, শিঞ্জ্)** = বিচ্ছুরিত গতিশীল যাহাতে। **শিঘ** = **শি**-এর গমন স্থিত যাহাতে। **শিঙঘ** = **শি**-এর রহস্যরূপের গমন স্থিত যাহাতে। **শিঞ্জ** = **শি**-এর রহস্যরূপের জনন যাহাতে।

● **শিক্ষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অশিক্ষিত, অসেক্ষসি, শিক্ষ্, শিক্ষক, শিক্ষণ, শিক্ষণীয়, শিক্ষয়িতা, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষা, শিক্ষাকর, শিক্ষাকার, শিক্ষাগুরু, শিক্ষাদণ্ড, শিক্ষানবিশ, শিক্ষানবিশী, শিক্ষানৈপুণ্য, শিক্ষাবিশেষ, শিক্ষারস, শিক্ষালাঘব, শিক্ষাশক্তি, শিক্ষিত, শিক্ষিতব্য, শিক্ষ্য, শিখ, শিখান, শেখা, শেখান, শৈক্ষ, শৈক্ষিক, শৈক্ষ্য, সুশিক্ষিত।

● **শিক্ষ্** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের ক্ষ-অন। **শিক্ষ** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের ক্ষ-অন যাহাতে।

● **শিক্ষা : ৫. দ্র. দীক্ষা**। আমাদের 'গ' গ্রন্থে 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

● ***শিল্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অশীল, ছিলিন্দা, শিল্, শিল (seal), শিলআংটি, শিলই (শিলাই, সিলই), শিলবৃত্তি, শিলমোহর, শিলা, শিলাকর্ণী, শিলাকুট্ট, শিলাকুট্টক, শিলাকুসুম, শিলাঘন, শিলাচয়, শিলাজতু, শিলাতল, শিলাদ, শিলাদদ্রু, শিলানির্য্যাস, শিলাপুত্র, শিলাপুত্রক, শিলাপুষ্প, শিলাপ্রতিকৃতি, শিলাফলক, শিলাবদ্ধ, শিলাবর্ষী, শিলাবল্কা, শিলাবেশ্ম, শিলাভব, শিলাভাব, শিলাভেদ, শিলামণি, শিলারস, শিলাশিত, শিলাসার, শিলাস্তম্ভ, শিলাস্বেদ, শিলিন্দ, শিলী, শিলীন্ধ্র, শিলীন্ধ্রক, শিলীন্ধ্রা, শিলীন্ধ্রী, শিলীপদ, শিলীমুখ, শিলীমুখবৃন্দ, শিলেয়, শিলোচ্চয়, শিলোঞ্ছ, শিলোঞ্ছজীবী, শিলোঞ্ছন, শিলোঞ্ছবৃত্তি, শিলোদ্ভব, শিহ্লু, শিহ্লুক, শৈল, শৈলকটক, শৈলকন্যা, শৈলকুঞ্জ, শৈলগন্ধ, শৈলগুরু, শৈলজ, শৈলজা, শৈলজানন্দ, শৈলতনয়া, শৈলদুহিতা, শৈলধর, শৈলনির্য্যাস, শৈলপতি, শৈলপুত্রী, শৈলপুষ্প, শৈলপ্রস্থ, শৈলবর, শৈলময়, শৈলরন্ধ্র, শৈলরাট্(জ্), শৈলরাজ, শৈলশিখর, শৈলশিখা, শৈলশৃঙ্গ, শৈলসম্ভব, শৈলসম্ভূত, শৈলসার, শৈলসুতা, শৈলসুতাসুত, শৈলাগ্র, শৈলাদি, শৈলাধিপ, শৈলাধিরাজ, শৈলালী, শৈলী, শৈলূষ, শৈলূষিক, শৈলূষিকী, শৈলূষী, শৈলেন্দ্র, শৈলেয়, শৈলেয়ী, শৈলেশ, সুশীল।

● **শিল্** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন। **শিল** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন যাহাতে।

● **শিলবৃত্তি : দ্র. উঞ্ছ, উঞ্ছশিল, তপশীল**।

● **শিলা** : দ্র. **তুষার**।

● **শিষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অতিশিষ্ট, অতিশেষ, অবশিষ্ট, অবশেষ, অবিশেষ, অশিষ্ট, অশিষ্য, অশেষ, অশেষিত, আশিষ, উচ্ছিষ্ট, একশেষ, নিঃশেষ, নির্ব্বিশেষ, বিশিষ্ট, বিশেষ, বিশেষণ, বিশেষত, বিশেষ্য, বৈশিষ্ট্য, শিটা, শিটি, শিষ্, শিষ, শিষ্ট, শেষ (ঋণশেষ, অগ্নিশেষ, শত্রুশেষ ...), শেষকরণ, শেষকারিত, শেষদেব, শেষনাগ, শেষপতি, শেষভাগ, শেষভুক্, শেষভৃত, শেষভূষণ, শেষভোজন, শেষরাত্রি, শেষা, শেষান্ন, শেষাবস্থা, শেষাহি, সবিশেষ।

● **শিষ্** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **শিষ** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে।

● **শেষনাগ : ৩. নাগ** বংশের রাজা ও **পাতালের** অধিনায়ক।

সহস্র ফণাযুক্ত শেষনাগের মস্তকে প্রত্যেক **কল্পে**র শেষে **বিষ্ণু** অবস্থান করেন। পুরাণে কথিত আছে, এই শেষনাগ তাঁর মস্তকে সমস্ত পৃথিবী ধারণ করে আছেন। ... সমুদ্রমন্থন কালে দেবতারা শেষনাগকে মন্থন-রজ্জু রূপে ব্যবহার করেন। পুরাণে লিখিত আছে, ইনি দক্ষের অন্যতমা কন্যা **কশ্যপের** স্ত্রী **কদ্রু**র গর্ভজাত নাগদের অন্যতম। সপত্নী বিনতাকে ছলনা করবার জন্যে কদ্রু নিজ পুত্রদের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু শেষপ্রমুখ কয়েকটি নাগ মাতাকে সাহায্য করতে অসম্মত হয়। এর ফলে, মাতৃশাপে এঁকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এঁর অন্য নাম **বাসুকি**। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **অনন্তনাগ, বাসুকি**।

● **শী ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অকুশল, অকেশ, অকৌশল, অতিকেশ, অতিশয়, অতিশয়ন, অতিশয়নীয়, অতিশয়িত, অতিশয়ী, অতিশয়োক্তি, অতিশায়ন, অতিশায়ী, অশিব, অসংশয়, আশয়, আতিশয্য, উপশয়, কুশ, কুশল, কুশলী, কেশ, কেশব, কেশরী, কেশাকেশি, নিশীথ, শয়, শয়ন, শয়নকক্ষ, শয়নগৃহ, শয়নতল, শয়নভূমি, শয়নমন্দির, শয়নরচন, শয়নসখী, শয়নস্থান, শয়নাগার, শয়নাবাস, শয়নীয়, শয়নীয়সংস্থিত, শয়নৈকাদশী, শয়ান, শয়ানক, শয়াল (সয়াল), শয়ালু, শয়িত, শয়িতা, শয়ু, শয্যা, শয্যাকণ্টক, শয্যাকাল, শয্যাগত, শয্যাগৃহ, শয্যাচ্ছাদন, শয্যাতোলা, শয্যাতোলানী, শয্যাধ্যক্ষ, শয্যাপাল, শয্যাপালক, শয্যাপ্রান্ত, শয্যাবেশ্ম, শয্যারচনা, শয্যাশায়ী, শয্যাস্তরণ, শয্যোত্তরচ্ছদ, শয্যোৎসঙ্গ, শায়ক, শায়িকা, শায়িত, শায়ী (কন্দরশায়িন্, কারণতোয়শায়িন্, গর্ভোদশায়িন্, ভূশায়িন্ ... ইত্যাদি), শি (শির কালি), শিঅর (শিওর, শিয়র), শিউর (sure), শিউরে-ওঠা (শিখরে ওঠা), শিউলি, শিউলী (সিঅলি, সিউলি, সিউলী), শিঁক (দ্র. শীক), শিকড় (সিগড়, সিকড়, শেকড়, সিখড়), শিকনি, শিকা (সিকা, সিকাই, সিকিয়া, সিক্কা, সিক্য), শিক্কা, (সিকা, সিক্কা, সিকি), শিক্কা (শিখা), শিখণ্ড, শিখণ্ডক, শিখণ্ডিক, শিখণ্ডিকা, শিখণ্ডিনী, শিখণ্ডী, শিখনী, শিখর, শিখরবাসিনী, শিখরা, শিখরিণী, শিখরী, শিখা, শিখাকন্দ, শিখাজট, শিখাদাম, শিখাধর, শিখাধার, শিখান, শিখাবন্ধ, শিখাবন্ধন, শিখাবল, শিখাবলা, শিখাবান, শিখাবৃদ্ধি, শিখাভরণ, শিখামণি, শিখালম্বী, শিখিজালিকা, শিখিধ্বজ, শিখিনী, শিখিপিঞ্ছ, শিখিবান, শিখিশেখর, শিখী, শিখীকণ, শিখীগ্রীব, শিখীদিক, শিখীধ্বজ, শিখীপিঞ্ছ, শিখীপুচ্ছ, শিখীবর্দ্ধক, শিখীবাহন, শিখীব্রত, শিখীভুক্তি, শিখীশ্বর, শিখীশিখা, শিগ্র, শিগ্রজ, শিড়শিড়, শিবিকা, শিবির, শিফা, শিফাকন্দ, শিফারুহ, শিফালতা, শিব, শিবক, শিবকর, শিবকীর্ত্তন, শিবঘর্ম্মজ, শিবচতুর্দ্দশী, শিবজটা, শিবজ্ঞ, শিবজ্ঞান, শিবতলা, শিবতাতি, শিবদ, শিবদিক্, শিবদূতিকা, শিবদূতী, শিবদেহিনী, শিবদ্রুম, শিবধাতু, শিবনিতম্বিনী, শিবপদ, শিবপুর, শিবপুরী, শিবপ্রিয়, শিবপ্রিয়া, শিববল্লভ, শিববাহন, শিববীজ, শিববীর্য্য, শিবভক্ত, শিবভাগবত, শিবমন্ত্র, শিবমল্লিকা, শিবরাজধানী, শিবরাত্রি, শিবরোহিণী, শিবলিঙ্গ, শিবলোক, শিবশেখর, শিবসাজুয্য, শিবসুন্দরী, শিবসোহিনী, শিবস্ব, শিবা (খেঁকশিয়াল, যার মুখ থেকে আগুন বেরোয়), শিবাই, শিবাগম, শিবাঘৃত, শিবাত্মক, শিবাদেশক, শিবানী, শিবান্বিতা, শিবাবলি, শিবাবিদ্যা, শিবায়তন, শিবালয়, শিবি, শিবিকা, শিবির, শিবীরথ, শিয়র, শিয়লি (শিয়ালা, শিহালা, শেয়ালা, শেহালা, শৈবাল), শিহর (শীহর, দ্র.শিঅর, শিউর), শিহরণ (শিহরন), শিহরা, শিহরাণ, শিহরিত, শিহালা (দ্র.শিয়লি), শী, শীঁটকা, শীটকা (সিঁটকা, সিটকা), শিটকান, শীঁতা, শীক্ [সীক্ — সেক্ বহুপ্রকার হতে পারে। গরম আগুন সেক-কে বলে 'সেঁক', জল সেক-কে বলে সেচ। অতএব — শিক (শীক, সীখ, শিঁক), শিককাবাব, শিকদার (সিকদার), শিকদারী, শিকমি (সিকমি, সিকমি-জমি), শিকর, শিকরা, শিকস্ত, (সিকস্ত, সেকস্ত), শিকস্তি, শিকস্তি-জমি, শিকায়ৎ, শিকার, শিকারী — সকলের মূলে রয়েছে উষ্ণ তাপ-সেক।], শীক-কাবাব, (এই 'শীক' থেকে 'শীর' অবধি সব শব্দই 'স' দিয়ে পাওয়া যায়।), শীকপোড়া, শীকর, শীকরসম্পৃক্ত, শীকরাম্বু, শীকরাম্ভঃ, শীকরী, শীঁটকা, শীটকান, শীধু, শীধুগন্ধ, শীধুধর, শীধুপ, শীধুপান, শীধুপুষ্প, (সীধুসংজ্ঞ), শীবল (শৈবাল), শীর, শীরচিহ্ন, শীরধ্বজ (সীরধ্বজ), শীরা (রক্তের শিরা, উপশিরা), শু, শুত (শায়িত), শুয়া (শোয়া), শুয়ান (শোয়ান), শেওর, শেওলা (সেঁওলা, শেওলি, সেয়লি), শেখর (কবিশেখর, চন্দ্রশেখর ...), শেখরিত, শেজ (শেয, সেজ, সেয), শেজ-তোলা, শেজ-তোলানি, শেজশামাদান, শেপ (শেপঃ, শেপস্, শেফ, শেফঃ, শেফস্), শেফ, শেফালি, শেফালিকা, শেফালী, শেফস্তম্ভ, শেব, শেবধি, শেবল, শেবলিনী, শেবাল, শেমুষী, শের (শিয়র), শেলু (সেলু), শৈখরিক, শৈব, শৈবপুরাণ, শৈবল, শৈবলিত, শৈবলিনী, শৈবাল, শৈবাললোল, শৈব্য, শৈব্যা, শোওয়া, শোতা, শোয়া, শোয়ান, শ্যাওলা, সংশয়, সদাশয়, সোঅ।

● **শী** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের আধার যে।

● **আশয়** : ১. শী = শয়ন। ২. *বিচ্ছুরিতের আশ্রয় যাহাতে*। ৩. শয়ন, ফলবিপাকপর্য্যন্ত চিত্তে শায়ী, কর্ম্মজন্য বাসনারূপ সংস্কার। অদৃষ্ট, দৈব। শয়নস্থান, শয্যাগৃহ। আশ্রয়। আধার। স্থান। আশ্রম, আবাস, বাসস্থান, বাস। শরীরস্থ সপ্ত আধার — বাতাশয় পিত্তাশয় শ্লেষ্মাশয় রক্তাশয় আমাশয় পক্কাশয় (মলাশয়) ও মূত্রাশয় (বস্তি) ; (স্ত্রীলোকের অধিক) গর্ভাশয়, স্তন্যাশয় (স্তনদ্বয়)। কোষ্ঠাগার, ধান্যাদিধনাগার, ভাঁড়ার। ... পশুধারণার্থ খাত, স্বস্থান। অভিপ্রায়, ... মর্ম্ম। বিভব, ধনসম্পত্তি। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **'মহাশয'** প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে এখনও বহুল প্রচলিত।

● **শিব** : ২. *বিচ্ছুরিতের বা জ্ঞান-কর্ম্মের বিচ্ছুরিত অগ্নিশিখা বহন করে যে।* / যে স্থানে সর্ব্ব শয়ন করেন। (ব.শ.)। ৩. মঙ্গল, শুদ্ধ, পুণ্য, ভদ্র, প্রসন্ন, হিতকর, অনুকূল, শুভশংসী, সৌগন্ধ্যাদিময়, সর্ব্বলোকহ্লাদক, গমনযোগ্য, সুখকর। ... (ব.শ.)। ইনি ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম। ... পিনাক এঁর ধনু, তাই ইনি পিনাকী, মস্তকে জটাজুট হেতু ইনি কপর্দী, ডমরু এঁর প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধাম, প্রমথগণ প্রিয় সহচর। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **কপাল, লিঙ্গ, কাপালিক**। **শিব** নিয়ে বহু কথা আছে। সংক্ষেপে — 'ঘ' গ্রন্থে **শিব** বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। **শিবপুরাণ** জানায় যে, 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নাম **শিবতা**'। স্মর্তব্য যে শিবের **বীণা**র নাম **লক্ষ্মী**। দ্র. **ধর্ম্মবাহন**।

● **শিবি** : ৩. ক) একজন রাজর্ষি। স্বয়ং বিধাতা এঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে ব্রাহ্মণবেশে অন্নপ্রার্থী হয়ে শিবিকে বলেন — তিনি অন্নপ্রার্থী, শিবি তাঁর পুত্র বৃহৎগর্ভকে বধ করে মাংস ও অন্ন পাক করে তাঁর প্রতীক্ষা করুক। শিবি ... তাই করে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন। ... ব্রাহ্মণ শিবিকেই সেই মাংস ভক্ষণ করতে বললেন।

শিবি অম্লানবদনে ব্রাহ্মণের এই আদেশ পালন করতে উদ্যত হলেন। তখন ব্রাহ্মণ শিবির হস্ত ধারণ করে বললেন — তুমি জিতক্রোধ। ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ করতে পার। এই বলে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন। ... শিবি পুত্রকে জীবিত দেখতে পেলেন। খ) প্রহ্লাদের ভ্রাতা অনুহ্লাদের অন্যতম পুত্র শিবি। গ) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র শিবি। ঘ) পুরুবংশীয় রাজা উশীনরের অন্যতম পুত্র। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **কপোত, কপোতবৃত্তি, ঘুঘু**।

● ***শীল্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : তচ্ছীল (তৎশীল), তহশীল, তহশীলদার, শিল্প, শিল্পক, শিল্পকর, শিল্পকর্ম্ম, শিল্পকার, শিল্পকারক, শিল্পকারী, শিল্পগৃহ, শিল্পগেহ, শিল্পজীবিকা, শিল্পজীবিনী, শিল্পজীবী, শিল্পপ্রজাপতি, শিল্পবিদ্যা, শিল্পশালা, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পাজীব, শিল্পালয়, শিল্পিক, শিল্পিনী, শিল্পিশাল, শিল্পিশালা, শিল্পী, শীল্, শীল, শীলখণ্ডন, শীলজ্ঞ, শীলতা, শীলধর, শীলন, শীলপালী, শীলবঞ্চনা, শীলবর্জ্জিত, শীলবান, শীলবিপ্লব, শীলবিলয়, শীলবৃত্ত, শীলবৃদ্ধ, শীলভঙ্গ, শীলভ্রংশ, শীলসম্পন্ন, শীলিত, শীলী।

● **শীল্** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের আধারের লালন-লয়ন। **শীল** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের আধারের লালন-লয়ন যাহাতে।

● **শীল (অনুশীলন, পরিশীলন, পরিশীলিত)** : ৫. সক্রিয় বা গতিশীল বিচ্ছুরণের আধার লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে, তাকে বলে **শীল**। স্বভাবত এই **শীলিত** শব্দের মানে দাঁড়ায় 'প্রাণ অনুসারে দেহ' বিন্যাস করা। তার মানে, রামবাবু শ্যামবাবুকে আপ্যায়ন করতে চান। তাঁর সেই 'আপ্যায়ন'-ইচ্ছাটি কীভাবে কার্যকরী হবে? উত্তর হল, সেই ইচ্ছা কয়েকটি 'আচরণ'রূপে প্রকাশিত হবে। এই আচরণ হল আপ্যায়নেচ্ছার আধার বা খোলস। মানুষ এভাবে তার এরূপ অজস্র ইচ্ছাকে অজস্র আধারে ধরে প্রকাশ করে থাকে। সেটি ঠিকঠাক করতে পারাকে বলে **শীলতা**। তার মানে, প্রতিটি মনন ক্রিয়ার যথোপযুক্ত আধার দান করা, বা অবয়ব দেওয়া — এই ক্রিয়াটিকেই বলা **শীল**। তার থেকে **অনুশীলন** ... ইত্যাদি শব্দ প্রসূত হয়েছে।

● **শুচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (শুচি করে নেওয়া, পূতিভাব। তা আর্দ্রীভাবও বটে। নরম করে নেওয়া।) অশুচি, অশোক, অশোকত্রিরাত্র, অশোকপূর্ণিমা, অশোকবনিকা, অশোকবর্দ্ধন, অশোকষষ্ঠী, অশোকা, অশোকাষ্টমী, অশোচ্য, অশৌচ, অশৌচসঙ্কর, অশৌচান্ত, আশৌচ, শউচ, শুআ (শুয়া), শুক্ (শুচ্), শুক, শুক্করবার, শুক্ত, শুক্তক, শুক্তানি, শুক্তি, শুক্তিকা, শুক্তিজ, শুক্তিপুট, শুক্তিবীজ, শুক্তিমান, শুক্তিযোনি, শুক্তিস্পর্শ, শুক্র, শুক্রকর, শুক্রকৃচ্ছ্র, শুক্রজ, শুক্রদোষ, শুক্রবার, শুক্রবাসর, শুক্রবিসৃষ্টি, শুক্রভুক্, শুক্রমেহ, শুক্রমেহী, শুক্রল, শুক্রশিষ্য, শুক্রহরণ, শুক্রাচার্য্য, শুক্রিয়, শুক্ল, শুক্লকণ্টক, শুক্লকন্দ, শুক্লকর্ম্মা, শুক্লকুষ্ঠ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্লদেহ, শুক্লধান্য, শুক্লপক্ষ, শুক্লপুষ্প, শুক্লবর্গ, শুক্লবস্ত্র, শুক্লবায়স, শুক্লবৃত্ত, শুক্লবৃত্তি, শুক্লভাগ, শুক্লমণ্ডল, শুক্লমেহ, শুক্লাগুরু, শুক্লাপাঙ্গ, শুক্লার্ম্ম, শুচ্, শুচ, শুচা, শুচি, শুচিজিহ্বা, শুচিদ্রুম, শুচিতা, শুচিত্ব, শুচিপতি, শুচিবাই, শুচিবায়ু, শুচিবাসাঃ, শুচিব্রত, শুচিমণি, শুচিমল্লিকা, শুচিরোচিঃ, শুচিশ্রবাঃ, শুচিসংক্ষয়, শুচিস্মিত, শুচিস্মিতা, শূদ্দুর, শূদ্র, শূদ্রকৃত্য, শূদ্রজন, শূদ্রধর্ম্ম, শূদ্রবর্ণ, শূদ্রবৃত্তি, শূদ্রভূয়িষ্ঠ, শূদ্রযাজক, শূদ্রযাজী, শূদ্রসংস্পর্শ, শূদ্রসেবন, শূদ্রহত্যা, শূদ্রহা, শূদ্রা, শূদ্রাণী, শূদ্রান্ন, শূদ্রাপুত্র, শূদ্রাবেদন, শূদ্রাভার্য্য, শূদ্রাসুত, শূদ্রাহ্নিক, শূদ্রী, শূদ্রোদ্দিষ্ট, শূদ্রোদক, শোক, শোককর, শোককৃৎ, শোককর্ষিত, শোকচ্ছিৎ, শোকদহন, শোকনাশন, শোকনিহত, শোকপরিপ্লুত, শোকপরীত, শোকপীড়িত, শোকবিকল, শোকবিবর্দ্ধন, শোকবিহ্বল, শোকবেগ, শোকভার, শোকমূর্চ্ছিত, শোকযুক্ত, শোকরুগ্‌ণ, শোকলালস, শোকশল্য, শোকশাল, শোকসংবিগ্ন, শোকসন্তপ্ত, শোকসাগর, শোকস্থান, শোকাকুল, শোকাগ্নি, শোকানল, শোকানুশোক, শোকান্বিত, শোকাপনুদ, শোকাপনোদ, শোকাপনোদন, শোকাপহ, শোকাবিষ্ট, শোকাবেগ, শোকাবেশ, শোকাভিভূত, শোকার্ত্ত, শোকিনী, শোকিল, শোকী, শোকোপহত, শোগ, শোচ, শোচক, শোচন, শোচনা, শোচনীয়, শোচমোচনা, শোচিতব্য, শোচিঃ (শোচিস্), শোচিষ্কেশ, শোচ্য, শৌক্ত, শৌক্তিক, শৌক্তেয়, শৌক্ল, শৌক্ল্য, শৌচ, শৌচকর্ম্ম, শৌচকল্প, শৌচকূপ, শৌচাগার, শৌচাচার, শৌচিক, শৌদ্র।

● **শুচ্** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের চয়ন। **শুচ** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের চয়ন যাহাতে।

● **অশোক** : ১. শুচ্ = শোক, পুত্রাদির অদর্শনহেতু দুঃখানুভব। (শ্ + উচ্, দ্র. শুচি।)। ২. /যাহা হইতে শোক নাই। (ব.শ.)। ৩. শোকহীন, বীতশোক, দুঃখরহিত। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। ইহার মূলে তপস্যা করিয়া গৌরী লব্ধমনোরথ হইয়াছিলেন; এই হেতু নাম 'অশোক'। রমণীর পাদাঘাতে অশোক বিকশিত হয়; পাদাঘাত ইহার **দোহদ।** বকুলবৃক্ষ। বিষ্ণু। অশ্বপতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র বৌদ্ধরাজ প্রিয়দর্শী। অশোকপুষ্প। পারদ। ... চৈত্রশুক্লাষ্টমী তিথিতে অষ্ট অশোক কলিকা ভক্ষণ করিলে লোকে শোকপ্রাপ্ত হয় না। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **পঞ্চবটী**। বিনোদনমূলক সামাজিক সংগঠন।

● **শুক্রাচার্য্য** : ৩. দ্র. (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **কচ, দেবযানী, বৃহস্পতি**। অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত যে পণ্ডিতেরা ধনতন্ত্রের সমর্থন করেন, তাঁদের আদিরূপকে **বৃহস্পতি** এবং যাঁরা ধনতন্ত্রবিরোধী ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক তাঁদের আদিরূপকে **শুক্রাচার্য্য** বলা হত।

● **শুধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবিশুদ্ধ, অশুদ্ধ, অসুৎ, বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধি, বিশোধন, শুজ, শুজা, শুঝ, শুঝ (বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, বোঝা-সোঝা, দ্র. সুঝ-বুঝ), শুদ্ধ, শুদ্ধ (সবশুদ্ধ, সুদ্ধ, সুদ্ধা, শু বা সু ধারিত যাহাতে, সমগ্র ধারিত যাহাতে), শুদ্ধকর্ম্মা, শুদ্ধকোটি, শুদ্ধচারী, শুদ্ধচারিণী, শুদ্ধচৈতন্য, শুদ্ধদন্, শুদ্ধদন্ত, শুদ্ধদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদী, শুদ্ধধী, শুদ্ধপক্ষ, শুদ্ধপার্ষ্ণি, শুদ্ধবংশ্য, শুদ্ধবধ, শুদ্ধবল্লিকা, শুদ্ধবসন, শুদ্ধবাৎসল্য, শুদ্ধবিষ্কম্ভক, শুদ্ধবেশ, শুদ্ধভাব, শুদ্ধমতি, শুদ্ধমাংস, শুদ্ধমাধুর্য্য, শুদ্ধমিশ্রী, শুদ্ধশীল, শুদ্ধশীলা, শুদ্ধসত্ত্ব, শুদ্ধস্নান, শুদ্ধস্বভাব, শুদ্ধস্বত্ত্ব, শুদ্ধহৃদয়, শুদ্ধা, শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধান্ত, শুদ্ধান্তচর, শুদ্ধান্তচারী, শুদ্ধান্তদুর্লভ, শুদ্ধান্তপালক, শুদ্ধান্তরক্ষক, শুদ্ধান্তরক্ষী, শুদ্ধান্তা, শুদ্ধাপহ্নুতি, শুদ্ধাভ, শুদ্ধাশয়, শুদ্ধি, শুদ্ধিকর, শুদ্ধিকৃৎ, শুদ্ধিপত্র, শুদ্ধিমান, শুদ্ধোদন, শুধ্, শুধ (শোধ), শুধবুধ, শুধরা, শুধরান, শুধা (সুধা), শুধান, শুধু (সুদু, সুধু, দ্র.শুদ্ধ), শুদ্ধ্, শুন্য, শোধ, শোধক, শোধন, শোধনক, শোধনী, শোধনীয়, শোধবোধ, শোধিত, শোধয়িতব্য, শোধরা, শোধরান, শোধিত, শোধ্য, শৌদ্ধদনি, সংশুদ্ধ, সংশোধন।

● **শুধ্** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের ধারণ। **শুধ** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের

ধারণ যাহাতে।

● **শুদ্ধি (পরিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধি, বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ, পরিশোধ, পরিশোধন, শোধবোধ)** : ৫. দ্র. **পরি**।

● **শুভ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিশোভন, অশুভ, অশোভন, শজনা (শজনে, শজিনা, সজনা), শুক, শুকচ্ছদ, শুকজিহ্বা, শুকদেব, শুকনাস, শুকপুষ্প, শুকবর্হ, শুকবল্লভ, শুকবাহ, শুকমুখ, শুকশুকী, শুকসারিকা, শুকসারিকা-প্রলাপন, শুকহরি, শুকহরিত, শুকী, শুভ্, শুভ, শুভংযু, শুভকর, শুভকর্ম্ম, শুভকাম, শুভকৃৎ, শুভক্ষণ, শুভগ, শুভগন্ধক, শুভগ্রহ, শুভঙ্কর, শুভঙ্করী, শুভচনী (শুভচুনী), শুভদ, শুভদর্শন, শুভদৃষ্টি, শুভপ্রদ, শুভফল, শুভবার্ত্তা, শুভবাসন, শুভব্রত, শুভম্, শুভযোগ, শুভলক্ষণ, শুভলগ্ন, শুভশংসী, শুভশকুন, শুভসংযুত, শুভসূচনী, শুভস্থলী, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভাগমন, শুভাঙ্গ, শুভাঙ্গী, শুভাচার, শুভানন, শুভান্বিত, শুভাপাঙ্গী, শুভাবহ, শুভার্থী, শুভাশীঃ (শুভাশিস্), শুভাশীরাশি, শুভাশীর্ব্বচন, শুভাশীর্ব্বাদ, শুভাশীষ, শুভাশুভ, শুভেতর, শুভোদয়, শুভোদর্ক, শুভ্র, শুভ্রকর, শুভ্রদন্, শুভ্রদন্ত, শুভ্রভানু, শুভ্ররশ্মি, শুভ্রা, শুভ্রাংশু, শোভ, শোভক, শোভন, শোভনশীল, শোভনা, শোভমান, শোভা, শোভাকর, শোভাঞ্জন (শজনা), শোভান্তরী, শোভাযাত্রা, শোভিত, শোভিনী, শোভী, শোহ, শোহন, শোহনি, শোহনী, শোহা (সোহা), শোহাওন, শোহায়ত, শোহায়ন, শোহায়ল, শোহিত, শোহিনী, শৌক, শৌভ, সুশোভন, সোহ, সোহনিয়া, সোহায়ল, সোহিনী।

● **শুভ্** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের ভবন। **শুভ** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের ভবন যাহাতে।

● **শুকদেব** : ৩. বেদবিভাগকর্তা **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসে**র কামনালব্ধ বরপুত্র। পুত্র কামনায় **ব্যাসদেব** সুমেরু পর্বতে মহাদেবের তপস্যা করছিলেন। ... **ঘৃতাচী** অপ্সরার রূপে কামাবিষ্ট হওয়ায় বেদব্যাসের ... বীর্য **অরণি**র মধ্যে পতিত হয়। বেদব্যাসের এই অবস্থা দেখে ভীতচিত্ত অপ্সরা শুকপক্ষীর রূপ ধরে সেখান হতে প্রস্থান করে। **বেদব্যাস** প্রবল বেগে অরণি মন্থন করতে থাকেন। তার ফলে যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজ্বলিত অগ্নির মত শুকদেব নিজের তেজে বহির্গত হয়ে আসেন। ঘৃতাচী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করে এই স্থান হতে প্রস্থান করেছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হলো **শুক**। তখন গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে এই শিশুকে স্নান করালেন। মহাদেব স্বয়ং শুকদেবের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। ... শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করতে লাগলেন এবং **বৃহস্পতি**র কাছে সকল বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। পিতার নির্দেশে **মোক্ষধর্ম** সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভের জন্য শুকদেব **মিথিলা**র রাজা **জনকে**র নিকট যান। ... শুকদেবের সমক্ষে অপ্সরাগণ নগ্নাবস্থায় থাকতেও লজ্জাবোধ করত না। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী**।

● **শূর্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : শূর্, শূর, শূরকীট, শূরণ, শূরমণি, শূরমানী, শূরম্মণ্য, শূরসিংহ, শূরসেন, শূরসেনা, শূরেন্দ্র, শূর্প, শূর্পকর্ণ, শূর্পণখা, শূর্পণখী, শূর্পপুট, শূর্পবাত, শূর্পশ্রুতি, শূর্পী, শূর্ম্ম, শূর্ম্মি, শূর্ম্মী, শৌরসেন, শৌরসেনী, শৌরি, শৌর্প, শৌর্পিক, শৌর্য্য, শৌর্য্যকরণ, শৌর্য্যকর্ম্ম, শৌর্য্যবর্দ্ধন, শৌর্য্যবান, শৌর্য্যরাশি, শৌর্য্যসাগর, শৌর্য্যৌদার্য্যশৃঙ্গারময়, সুর, সুরবীর।

● **শূর্** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের আধারের রক্ষণ। **শূর** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের আধারের রক্ষণ যাহাতে।

● **শূর্পনখা** : ৩. একজন **রাক্ষসী**। **মুনি বিশ্রবা**র ঔরসে ও **কৈকসী**র গর্ভে এর জন্ম হয়। **রাবণ** ও **কুম্ভকর্ণ** এর অগ্রজ ও **বিভীষণ** এর অনুজ। **কালকেয়**-বংশীয় রাক্ষসরাজ বিদ্যুৎজিহ্ব এর স্বামী। রাবণের দিগ্বিজয় কালে কালকেয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ভ্রমক্রমে বিদ্যুৎজিহ্ব নিহত হয়। অনুতপ্ত রাবণ বিধবা ভগিনীকে **দণ্ডকারণ্যে** ইচ্ছামত বিহারের অনুমতি দিয়ে **খর** ও **দূষণ** নামে দুই সেনাপতিকে এর রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। রাম যখন দণ্ডকারণ্যে ... তখন রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে শূর্পনখা তাঁকে বিবাহ করতে চায়। ... শূর্পনখা ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে লক্ষণ খড়্গাঘাতে তার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করে তাকে বিতাড়িত করেন। ... এই অপমানের ... প্রতিকার চাইলে খর ও দূষণ রাক্ষসসৈন্য সহ রামকে আক্রমণ করে ও রামের হস্তে সসৈন্যে নিহত হয়। শূর্পনখা উদ্বিগ্ন হয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে সুন্দরী সীতাকে অপহরণ করতে উত্তেজিত করে। ফলে সীতাহরণ ও সবংশে রাবণের নিধন হয়। (পৌ.অ.)। ৫. শূর্পের ন্যায় নখ যাহার। একালেও কোনো কোনো 'পাবলিক সেকটর'-এর আধার প্রায় একই আচরণ করে থাকে।

● **শৃ (শৄ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশরণ, অশরীর, অশরীরী, অশর্ম্মা, অশিরস্ক, অশিরাঃ, ছরবন, শকরকন্দ (সকরকন্দ), শম্মা, শর, শরকাণ্ড, শরকার, শরক্ষেপ, শরগাণ্ডী, শরগৌর, শরগুল্ম, শরগোচর, শরঘাত, শরচ্চন্দ্র, শরজ, শরজন্মা, শরজাল, শরট, শরণ, শরণদ, শরণপালন, শরণরক্ষণ, শরণাগত, শরণান্তর, শরণাপন্ন, শরণার্থী, শরণালয়, শরণি(ণী), শরণৈষী, শরণোন্মুখ, শরণ্য, শরণ্যা, শরতল্প, শরৎ (শরদ্), শরৎকাল, শরৎকৃশ, শরৎত্রিযামা, শরৎপদ্ম, শরৎপর্ব্ব, শরৎপুষ্প, শরত্রাণ, শরদ, শরদঘন, শরদণ্ড, শরদন্ত, শরদিজ, শরদিন্দু, শরদুদাশয়, শরদুর্দ্দিন, শরদ্গত, শরদ্বান্, শরধি, শরন্মুখ, শরপঞ্জর, শরপত্র, শরপাট, শরপাটিত, শরপাণ্ডুর, শরপুঁটি, শরপুঙ্খ, শরপুঙ্খা, শরপ্রবেগ, শরফল, শরব, শরবণ, শরবন, শরবন্ধ, শরবর্ষ, শরবারণ, শরবিদ্ধ, শরবৃষ্টি, শরব্য, শরব্যক, শরভ, শরভঙ্গ, শরভলীলক (সুরফাকতাল), শরম (নর্ম্মদা, শর্ম্মদা), শরমুটি, শরভূ, শরমল্ল, শরমুখ, শরল, শরলা, শরশয়ন, শরশয্যা, শরসন্ধান, শরস্তম্ভ, শরা, শরাকত, শরাগত, শরাটি (শরাড়ি, শরারি, শরালি, শরালী, সরারি), শরাব, শরাবক, শরাবিকা, শরাবী, শরাবতী, শরাবর, শরাবরণ, শরাবাপ, শরাব্দ, শরাভ্যাস, শরারি, শরার্ণব, শরাল, শরালী, শরাস, শরাসন, শরাসনী, শরাসার, শরাস্য, শরিফ (শরীফ, সরিফ, সরীফ), শরিল, শরী, শরীক (সরীক), শরীকানা, শরীকী, শরীফা, শরীর, শরীরক, শরীরকর্ত্তা, শরীরকৃৎ, শরীরকর্ষণ, শরীরগ্রহণ, শরীরজ, শরীরত্যাগ, শরীরদণ্ড, শরীরধাতু, শরীরনির্ব্বাপণ, শরীরপতন, শরীরপাত, শরীরবদ্ধ, শরীরবন্ধ, শরীরবান্, শরীরবিমোক্ষণ, শরীরবৃত্তি, শরীরবৈকল্য, শরীরভাক্, শরীরযষ্টি, শরীরযাত্রা, শরীরযোগ, শরীররক্ষক,

শরীররক্ষা, শরীরশুশ্রূষা, শরীরশোষণ, শরীরসংস্কার, শরীরসন্ধি, শরীরসাদ, শরীরস্থিতি, শরীরান্তর, শরীরাবয়ব, শরীরাবরণ, শরীরার্দ্ধহর, শরীরাস্থি, শরীরী, শরু, শর্কর, শর্করকর্ষণ, শর্করা, শর্করাক্ষ, শর্করাচল, শর্করাম্বু, শর্করার্বুদ, শর্করিল, শর্করী, শর্করোদক, শর্দ্ধ, শর্ব্ব, শর্ব্বপর্ব্বত, শর্ব্বর, শর্ব্বরী, শর্ব্বরীভূষণ, শর্ব্বলা (শাবল), শর্ব্বা, শর্ব্বাণী, শর্ম্ম (শর্ম্মন্), শর্ম্মকাম, শর্ম্মকৃৎ, শর্ম্মদ, শর্ম্মদাতা, শর্ম্মপ্রদ, শর্ম্মবান, শর্ম্মমান, শর্ম্মলাভ, শর্ম্মা, শর্ম্মারাম, শর্ম্মিষ্ঠা, শর্ম্মী (শর্ম্মিন্), শর্য্যাতি, শর্‌শর্, শর্‌হ্দ, শাংশপ (শিংশপা), শাকর (শক্কর, শক্‌র্, sugar), শাকরকন্দ, শাকরা, শাবল (shovel), শার, শারক্রীড়া, শারঙ (শারঙ্গ, শারঙ্গী, সারেঙ্গি), শারঙ্গ, শারঙ্গপাণি, শারঙ্গিণী, শারঙ্গী, শারণিক, শারদ, শারদপার্ব্বণ, শারদা, শারদাম্ভোজ, শারদিক, শারদা, শারদীয়, শারদীয়া, শারদেন্দু, শারদ্বত, শারদ্বতী, শারফলক, শারি, শারিকা (সারিকা, শালিক), শারিপট্ট, শারিফল, শারিফলক, শারিবা (সারিবা), শারিশৃঙ্খলা, শারী (শুক-শারী), শারীর, শারীরক, শারীরকীয়, শারীরকভাষ্য, শারীরক-মীমাংসা, শারীরকসূত্র, শারীরদণ্ড, শারীরস্থান, শারীরিক, শার্কর, শার্ঙ্গ, শার্ঙ্গক, শার্ঙ্গধনুঃ, শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর, শার্ঙ্গধন্বা, শার্ঙ্গধন্বী, শার্ঙ্গধর, শার্ঙ্গপাণি, শার্ঙ্গবান, শার্ঙ্গভৃৎ, শার্ঙ্গিকা, শার্ঙ্গী (শার্ঙ্গিন্), শার্দ্দূল, শার্দ্দূলচর্ম্ম, শার্দ্দূলঝম্পন, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, শার্দ্দূলললিত, শার্দ্দূলী, শার্ব্ব, শার্ব্বর, শার্ব্বরী, শিং (শিঙ, শিঙ্গ), শিংশপ, শিংশপকষায়, শিংশপসার, শিংশপা, শিংশপি (সিংসপি), শিঙা, শিঙাড়া, শিঙার, শিঙী, শিঙে, শিঙে-ফোঁকা, শিঙেল, শিঙ্গ, শিঙ্গা, শিঙ্গাড়া (শৃঙ্গাটক), শিঙ্গাদার, শিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর), শিঙ্গাবেত, শিঙ্গার, শিঙ্গারা, শিঙ্গারিণী, শিঙ্গী, শিঙ্গে, শির, শিরটান, শিরতোলা, শিরা, শিরা-ওঠা, শিরাজাল, শিরাপত্র, শিরাবাধ, শিরাবেধ, শিরাব্যধ, শিরাব্যধন, শিরামূল, শিরামোক্ষ, শিরাল (কামরাঙা, লাঙলের রেখা), শিরালক, শিরাসঙ্কোচ, শিরীষ, শিরীষকুসুম, শিরীষবন, শিশু (শিংশপা, শিশুগাছ, শিশুকাঠ), শীর্ণ (শিড়িঙ্গে, সিড়িঙ্গে, সরঙ্গা, সরুঙ্গীয়া, সরুঙ্গে), শীর্ণদন্ত, শীর্ণপাদ, শুঙ্গ, শুঙ্গা, শুঙ্গাকর্ম্ম, শুঙ্গী, শৃ, শৃঙ্গ, শৃঙ্গকোশ, শৃঙ্গজ, শৃঙ্গধর, শৃঙ্গনাদী, শৃঙ্গপ্রহারী, শৃঙ্গপ্রিয়, শৃঙ্গবাদ্য, শৃঙ্গবান, শৃঙ্গবের, শৃঙ্গবেরপুর, শৃঙ্গাগ্র, শৃঙ্গাগ্রপ্রহরণ, শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গান্তর, শৃঙ্গার (সৃঙ্গার), শৃঙ্গারচেষ্টা, শৃঙ্গারচেষ্টিত, শৃঙ্গারজন্মা, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারধারী, শৃঙ্গারবিধি, শৃঙ্গারবেশ, শৃঙ্গারভাষিত, শৃঙ্গারভূষণ, শৃঙ্গারযোনি, শৃঙ্গাররস, শৃঙ্গারলজ্জা, শৃঙ্গারসমর, শৃঙ্গারসহায়, শৃঙ্গারহার, শৃঙ্গারিত, শৃঙ্গারিণী, শৃঙ্গারী, শৃঙ্গি, শৃঙ্গিক, শৃঙ্গিকা, শৃঙ্গিকাক, শৃঙ্গিণ, শৃঙ্গিণী, শৃঙ্গী, শৃঙ্গীকনক, শৃণি (সৃণি), শৃত, শৃধ্, শৄ, সশরীর।

● **শৃ (শৃ ়)** = সার্বিক বিচ্ছুরিতের আবর্তন। **শৄ** = সার্বিক বিচ্ছুরিতের আবর্ত্তনের আধার যে।

● **শরীর** : ২. *যাহা শীর্ণ হয়।* **৫. দ্র. দেহ**। যাহা বাড়ে।

● **শর্করা** : দ্র. **ইক্ষু**।

● **শর্ম্মিষ্ঠা** : **৩.** অসুররাজ **বৃষপর্বা**র কন্যা ও **নহুষ**-পুত্র যযাতির কনিষ্ঠা স্ত্রী। ... শুক্রাচার্যের কন্যা **দেবযানী**র সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সখ্য হয়। একদিন তাঁরা দুইজন নদীতে জলকেলি করতে যান। তাঁদের রূপে মোহিত হয়ে **ইন্দ্র বায়ু**র রূপ ধারণ করে দুজনের বস্ত্রগুলি মিশ্রিত করে দেন। **শর্মিষ্ঠা** ভুলক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরলে দেবযানী কর্তৃক তিরস্কৃত হন। ... **যযাতি**র সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ হলে শর্মিষ্ঠা তাঁর সঙ্গে দাসীরূপে যযাতির ভবনে গমন করেন। ... (দ্র. দেবযানী) ... শর্মিষ্ঠার পুত্র **পুরুই** পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করে পিতাকে যৌবন ভোগ করতে দিলেন। ... যযাতি পুরুকেই রাজ্য প্রদান করেন। এই পুরুই **কৌরব ও পাণ্ডবে**র পূর্বপুরুষ। (পৌ.অ.)। **৫. দ্র. তুর্বসু**।

● **শৃঙ্গবের, শৃঙ্গবেরপুর** : **৩.** প্রয়াগ হতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে **গঙ্গা**র উত্তর তটস্থিত **নিষাদ**-রাজ **গুহকে**র রাজধানী। বর্তমানে শিঙ্গরুর বা সাঙ্গার নামে অভিহিত। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **চণ্ডাল**। আর্দ্রক।

● ***শৈ (শ্যৈ)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিশীত, অশীত, আশ্যান, শয়চান, শয়তান (সয়তান), শয়তানী, শাঁইচান, শাঁইশাঁই (সাঁইসাঁই), শাঁওল, শাঁওলী (শ্যামলী), শাঙর, (শাঙল সাঙর), শাঙরি, শাঙলা, শাঙলি(লী), শামর, শামরি, শামলা, শামলী, শামা, শামাঠাকরুন, শামাদুর্ব্বা, শামাপাখি, শামাপূজা, শামাবিষয়, শামালতা, শালা, শালাজ, শালাবাঞ্চৎ, শালার-বেটা, শালী, শীত, (শীত — করা, কাটা, পড়া, পাওয়া, ভাঙা, লাগা, যাওয়া), শীতক, শীতকর, শীতকাল, শীতকিরণ, শীতকৃচ্ছ্র, শীতক্রিয়া, শীতক্ষার, শীতগন্ধ, শীতগু, শীততা, শীতত্ব, শীতদীধিতি, শীতদ্যুতি, শীতপূতনা, শীতপ্রভ, শীতভানু, শীতভীত, শীতভীরু, শীতবহ, শীতবাতাতপ, শীতবীর্য্য, শীতমূলক, শীতময়ূখ, শীতমরীচি, শীতরশ্মি, শীতরসিক, শীতরুক্, শীতরুচি, শীতরোচিঃ, শীতল, শীতলচ্ছদ, শীতলপাটী, শীতলপ্রদ, শীতলা, শীতলান, শীতলাপূজা, শীতলাষষ্ঠী, শীতলসপ্তমী, শীতলিত (শিতলিত), শীতলী (সেতল), শীতশিব, শীতশূক, শীতসংস্পর্শ, শীতস্পর্শ, শীতা, শীতাংশু, শীতাংশুমান, শীতাদ, শীতাদ্রি, শীতার্ত্ত, শীতালু, শীতাশ্মা, শীতীভাব, শীতীভূত, শীতোষ্ণ, শীৎকার (সীৎকার, সিতকার, সিতিকার, সীৎকার, সিঁটকা, সিঁটকান, সিকটা), শীৎকারশীকর, শীৎকৃত, শীৎকৃতিনী, শীৎকৃতী (সীৎকৃত, সীৎকৃতি), শীত্য, শীন, শুত (শায়িত), শেলোজ, শৈত্য, শৈত্যক, শ্যান, শ্যাব, শ্যাবদন, শ্যাবদন্ত, শ্যাবদন্তক, শ্যাম, শ্যামক, শ্যামকণ্ঠ, শ্যামকন্দা, শ্যামকর্ণ, শ্যামকাণ্ডা, শ্যামখোল, শ্যামগম্ভীর, শ্যামগ্রন্থি, শ্যামচাঁদ, শ্যামপত্র, শ্যামবর্ণ, শ্যামবল্লী, শ্যামভাঃ, শ্যামর, শ্যামরায়, শ্যামরি, শ্যামরুচি, শ্যামল, শ্যামলতা, শ্যামলা, শ্যামলিকা, শ্যামলিত, শ্যামলিমা, শ্যামলী, শ্যামলীকৃত, শ্যামসুন্দর, শ্যামা, শ্যামাক, শ্যামাকমুষ্টি, শ্যামাঙ্গ, শ্যামাঙ্গিনী, শ্যামাস্বজনী, শ্যামিকা, শ্যামিত, শ্যামা (শ্যেমী), শ্যাল, শ্যালক, শ্যালকী, শ্যালপো, শ্যালজায়া, শ্যালা, শ্যালাজ, শ্যালিকা, শ্যালী, শ্যালীপতি, শ্যেন (সচান, সঞ্চান, সয়চান, সাইচান, সাঁচান, সাচন, সাচান, সাচাল, সাছান), শ্যেনকপোতীয়, শ্যেনজীবী, শ্যেনপাত, শ্যেনী, শৈত্য, শৈত্যবাহিনী (সৈতবাহিনী), শ্যৈ, শ্যৈনেয়, সাঙরি (শ্যামলী, শ্যামাসুন্দরী, সাঙল, সাঙলা, সাঙলি, সাঙলী), সশীতল।

● **শৈ (শ্যৈ)** = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরিতের আধার যে। **শ্যৈ** = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরিতের আধার থাকে যাহাতে।

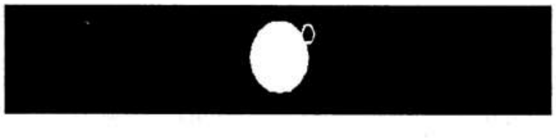
● **শ্যাম** : **৫. দ্র. কৃষ্ণ, গৌরী, চেতন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নারায়ণ, রাম**। জ্ঞানকর্মের তিনটি রূপের কথা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সচেতনভাবে

জানতেন। বঙ্গবাসী তা অচেতনভাবে জানে। রবীন্দ্রনাথ অনেক ভালভাবে জানতেন। আইনস্টাইনও জানতেন কিন্তু তাদের আন্তঃসম্পর্কের কথা জানতেন না। এই আন্তঃসম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কতখানি জানতেন, তা গবেষণার বিষয়। আইনস্টাইন বলে গেছেন — 'The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.'। আজ আমরা জেনেছি (দ্র. **ব্রহ্ম**) intuitive knowledge থেকেই rational knowledge জন্মায়। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচলিত rational knowledge-এর স্বীকৃতি পায় না। পরে পরে পেয়ে যায়।

'তু কিঁউ গোরী ম্যায় কিঁউ কালা'। রাধা কেন **গৌরী**, **কৃষ্ণ** কেন **শ্যাম**বর্ণ বা কালো। জ্ঞান ও ধনের তিনটি রূপ আছে। এক) অজ্ঞাত = কালো বা কৃষ্ণ = black = যে-যে বিষয় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, যার এলাকা অসীম = যার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি কিছুই জানে না = intutive knowledge = যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ এখনও মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে = not taxable। দুই) জ্ঞাত = সাদা বা ফর্সা বা গৌরবর্ণ (গৌরী) = white = যা ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত, যার এলাকার একটা সীমা আছে = যার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি জানে ও তার সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে নিয়েই অস্তিত্ব রক্ষা করে = explicit knowledge = rational knowledge = যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ এখন মানুষের নাগালের মধ্যে এসে গেছে = taxable। তিন) সদ্যজ্ঞাত = **শ্যাম**বর্ণ = শবল = grey = যা সবেমাত্র আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়েছে, দু-চারজন তার মর্ম বুঝলেও অধিকাংশ মানুষ তাকে এখনও জানে না, যার এলাকার একটা সীমা আছে = যার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি শুনেছে বটে কিন্তু বিস্তারিত জানে না, স্বীকারও করে না বরং বিরোধিতা করে, ফর্সা নয় বলে নিন্দা করে = new invention or discoveries = new knowledge = যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ কিছু মানুষের হাতে এসে গেছে কিন্তু সমাজ তাকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি = black রূপে শনাক্ত, tax নেওয়া হবে কি না, এখনও সিদ্ধান্ত করা যায়নি।

যে টাকার কর দেওয়া হয়নি, তাকে কালো টাকা বলে। সেই কালো টাকা ধার নিয়ে যে-ব্যক্তি কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হয়, তাকে **রাধা** বলে। তার টাকা সরকারি মতে সাদা, কিন্তু যার নিকট থেকে টাকাটা ধার করা হয়েছে, তার টাকা কিন্তু কালো। সেই কারণে কৃষ্ণ বলেন, হে ধারকারী, তুমি কেন সাদা আর আমি কেন কালো, 'তু কিঁউ গোরী, ম্যায় কিঁউ কালা', সে কি তুমি জান?

দ্র. **শ বর্ণের অর্থ — শ, ষ, স**। 'ষ' বর্ণটির অর্থ হল — এমন জ্ঞান (যা নতুন হলেও, পুনরাবৃত্তির কারণে দিশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং স্বভাবতই) যা পূর্বজ্ঞানের বিলোপ ঘটায়। এরকম 'করণের জ্ঞান' অর্থাৎ 'কৃ-ষ' মাত্রেই আসলে খানিক 'নতুন জ্ঞান' (= ণ) যা আবিষ্কৃত হয়ে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, (অতএব কৃষ্-ণ বা কৃষ্ণ), যা প্রচলিত জ্ঞানকর্মের পরিধির কোনো একটি জায়গায় পরিধির সীমা লঙ্ঘন করে অজানার রাজত্বে ঢুকে পড়েছে ও অনন্ত অজানার একটুখানি জেনে ফেলেছে। পরিধির ভেতরের এলাকাকে যদি জ্ঞানালোকের (pet conept-এর) এলাকা বলা হয়, নিশ্চয়তার বাইরের (wild conept-এর) এলাকা অন্ধকারের এলাকা অর্থাৎ কালো। যতক্ষণ পর্যন্ত এই **কৃষ্ণ** বা নতুন জ্ঞানকর্ম প্রচলিতের স্বীকৃতি পেয়ে প্রচলিতের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে না-পড়ছে, ততক্ষণ তা কৃষ্ণ বা কালোই। আর, তাকে স্বীকৃতি দিতে গেলেই প্রচলিত জ্ঞানকর্মের কিছু অংশকে বিলুপ্ত করতে হয়। ছাপাখানার আবিষ্কার ও ভারতে পদার্পণের তোড়জোড় ভারতজুড়ে লেখজীবীদের এমন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল যে, মোগল রাজারা ছাপাখানাকে ভারতে ঢুকতেই দেয়নি। কাজেই, নতুন জ্ঞানকর্মকে স্বীকৃতি দিতে প্রচলিত স্ট্যাটাস-কো গররাজি হয় এবং নতুন জ্ঞানকে '**কৃষ্ণ**' বা কালো বলে নিন্দা করতে থাকে। তার মানে, কৃষ্ণ দুরকমের। আদিম অখণ্ড অংরূপিণীর রহস্যের অজানা এলাকা তো কালো অন্ধকারের এলাকাই বটে; সেই এলাকার যেটুকুতে মানুষ নতুন করে বিজয় অর্জন করে এবং তাকে আত্মস্থ করে সমাজমনের প্রচলিত জ্ঞানালোকের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে, সেই নতুন জ্ঞানকর্মকেও প্রথম প্রথম সমাজ 'কৃষ্ণ' বলে নিন্দা করে থাকে। (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যখন জ্ঞানের ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে কথা বলা শুরু করেন, তখন সেকালের যৌথসমাজ তাকে স্বীকৃতি দেয়নি বলেই দ্বৈপায়ন ছিলেন কৃষ্ণ-পদবাচ্য।) পরে একসময় তাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সমাজ তার প্রচলিত জ্ঞানকর্মের পরিধিটি বাড়িয়ে নেয়। এভাবেই চলে। বলে রাখা ভালো, পরিমাপের দিক থেকে দেখলে জ্ঞানালোকের সাদা এলাকা নিঃসন্দেহে অজানা অন্ধকার কালো এলাকার অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।



ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে জগতের যে যে সত্তার এইরূপ সক্রিয়তা রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই কৃষ্ণ বলা যাবে। সেক্ষেত্রে ভাবনার অতি নিম্নস্তর থেকে অতি উচ্চস্তর পর্যন্ত বহু সত্তাকেই 'কৃষ্ণ' বলা যাবে, সন্দেহ নাই। সে কারণেই কালো রং যেমন কৃষ্ণ, তেমনি বিষ্ণুর অবতারও কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগৎকারণের সেই সর্বোচ্চ রূপটিকে 'কৃষ্ণ' হিসেবে চিনে ফেলেছিলেন বলেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে বিভোর করে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা সাধারণ মানের মানুষ; অত উচ্চস্তরে না যেতে পারলেও অন্তত 'কৃষ্ণধন' পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারি। তাই নগদ-নারায়ণের মর্ত্যে অবতীর্ণ সেই রূপটিকে আমরা 'কালো টাকা' বা 'black money' নামে অনায়াসে চিনতে পারি; যদিও সেই টাকা দেখতে একটুও কালো নয়। যেমন কিনা সাদা টাকা বা অর্জিত বিত্ত (= অর্জ্জুন) বা শুক্ল অর্থও দেখতে আদৌ সাদা নয়; সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি বলেই সে কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণধন।

বোমায় অরণ্য পুড়ে গেলে কিংবা ডিনামাইটে পাহাড় বিধ্বংস হয়ে গেলে দ্রষ্টা-মানুষের বুকে অজানা ব্যথা হয় কেন, আমরা জানি

না। ব্যথা হয়, এটা অনেকেই বুঝতে পারেন; কিন্তু কেন হয়, তা প্রায় কেউই জানেন না। তবুও যদি সেকথা কারও জানা-বোঝার একান্ত বাসনা জাগে, তাঁকে প্রথমে জনসাধারণ্যে বিচূর্ণীভূত ভক্তিভাবের বিষয়ে কিঞ্চিৎ খবরাখবর নিতে হবে। জানতে হবে, কেন যেকোনো নতুন ভালো কাজ করার আগে লোকে স্নানাদি করে মনে পবিত্র ভাব আনার চেষ্টা করে। কেন লোকে গাছে চড়ার আগে তাকে প্রণাম করে, কেন নদী, সমুদ্র, পাহাড়কে শ্রদ্ধা দেখায়, কেন কেউ প্রস্রাব করে উনুনের আগুন নেভালে তাকে ঘোরতর পাপকাজ রূপে লোকে ঘৃণা করে থাকে। এরকম অজস্র ব্যাপার সারা দুনিয়ার সব মানুষের আচারেই ছড়িয়ে রয়েছে। এসব বিস্তারিতভাবে জানলে মনে হতে পারে — জগতের গাছ-মাটি-পাথর-আগুন-জলের প্রতি জনসাধারণের মনের গভীরে যেনবা একরকমের ভক্তিভাব রয়েছে। এই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা রংকে যদি কোনো একটি বিন্দুতে সংকুচিত করে ফেলা যায় (**কৃ** দিশাগ্রস্ত হয়ে আপন কেন্দ্রে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে বিন্দুতে পরিণত হলে), সে যেমন গভীর কৃষ্ণবর্ণ হয়; তেমনি জনসাধারণ্যে এইযে পবিত্র-প্রেমভক্তিভাব এভাবে বিশ্বজুড়ে ছড়ানো-ছিটানো আছে, তা সব একত্রিত করলেও সেইরকম এক গভীর কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়, যে কিনা জগতের আদি অখণ্ড রূপ। সেই অখণ্ড থেকে খণ্ডিত বিচূর্ণীভূত হতে হতে এই বিশ্বসংসার গড়ে উঠেছে, জন্মেছে মানুষও। যৌথপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অণু-পরিবারের মনের গভীরে যেমন অতীতের যৌথপরিবারের স্মৃতি থেকে যায়, তেমনি এই বিশ্বজগতের সবকিছুতেই বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মীয়তার বোধ থেকে গেছে, ধূলিকণা থেকে মহাকাশ পর্যন্ত সবকিছুর প্রতি এক অদ্ভুত মায়া থেকে গেছে। এদিকে মানুষের মন এখনও অখণ্ড-গুণসম্পন্ন, আর তার দেহ খণ্ড-গুণসম্পন্ন। তাই, মনের চোখ দিয়ে দেখলে এ **মায়া** পরমসত্য, দেহের চোখ দিয়ে দেখলে এ মায়া চরমমিথ্যা। এ কৃষ্ণ তাই **মহামায়া**, মহাকালী, আদি অকৃত্রিম অখণ্ড অংরূপিণী। সেই অখণ্ডের ধূসর স্মৃতি যে যে মানুষের মধ্যে থেকে গেছে, তাঁরাই আজও জগতের প্রতি এক পবিত্র ভক্তির চোখে তাকান। এই যে পরম পবিত্র ভক্তির চোখ, এইটি একালের বহু মানুষের নেই বলে, জগৎকারণের সর্বোচ্চ রূপটিকে প্রায়শই তাঁরা দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই **কৃষ্ণে**র সর্বোচ্চ রূপটি আমাদের অনেকেরই উপলব্ধির বাইরে থেকে যায়।

তবে তাঁর নিম্ন রূপটি আমরা দেখতে পাই। এই রূপটি পুঁজির বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। নগদ-নারায়ণ বা ক্যাপিটাল ভারতসমাজের ইতিহাসে কেমন করে ক্রমান্বয়ে নব নব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তারই বাস্তব ঘটনাবলী রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক বর্ণনায়। যে সমাজব্যবস্থা ঘোরতর পুঁজিবিরোধী, সেই ব্যবস্থা পুঁজির অবতীর্ণ হওয়ার সপ্তম গর্ভ পর্যন্ত পুঁজির সমস্ত রূপকে বিনষ্ট করে। অষ্টম রূপে পুঁজি দেখা দেয় কালো টাকা রূপে। যে 'বসালিপ্ত তৃণ'কে 'আমার' বললে সত্যযুগের **শিব** তাকে ধ্বংস করে দিতেন, সেই বসাকে আত্মসাৎ ও বিকাশসাধন করে যখন **বসুদেব**গণ মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, শিব তাঁদের ধ্বংস করতে পারেননি বা ধ্বংস করতে চাননি; বরং বহুক্ষেত্রে সহায়তাই করেছেন। তারই এক উত্তরসূরি বসুদেব ও তাঁর আধারশক্তি '**দেবকী**'র অষ্টম গর্ভে এলেন **শ্রীকৃষ্ণ**, কিন্তু তিনি পালিত হলেন নন্দ ঘোষ-এর **পত্নী** 'যশোদা'র কোলে; দেখা দিলেন ৭০০ খ্রিস্টাব্দের **কৃষ্ণধন রূপে**। তখন স্বভাবতই কৃষিপুঁজি বলরাম, সাদা টাকা অর্জুন, আর **ট্যাক্স না-**দেওয়া কালো টাকা শ্রীকৃষ্ণ; আর তাকে সরকারের হাত **থেকে** বাঁচানোর জন্য নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া হয় সেই মানুষজনের হাতে, যাঁদের এত বেশি যশ (যশোদা) যে, সরকার তাদের **ছোঁয়** না। এই কৃষ্ণধন ননীচোরা, নবনীত বা 'সারপ্লাস ভ্যালু' চুরি করে খেয়ে তার আনন্দ হয়। সে সম্পদগোপনকারিণী গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করে তাদের সম্পদ প্রকাশ করে দেয়। তাদের মধ্যে 'যে ধার করে' সেই 'রাধা'র সে **রাধামাধব**। যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী এই তিন রকম পুঁজির ধারক, তাদেরকে এঁদের আধারশক্তি (স্ত্রী) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেকারণেই **দ্রৌপদী**র অপর নাম যেমন কৃষ্ণা, তেমনি যে-জনগোষ্ঠী 'ধার করে' সেই 'রাধা'ও কৃষ্ণা-পদবাচ্য। আর, নিজের শৈশবেই এই কৃষ্ণঅর্থ ও সেই অর্থধারী জনগোষ্ঠী কীভাবে ভয়ানক ভয়ানক রাক্ষস ও দৈত্যদের বিনাশ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার সব কথা পুরাণাদি গ্রন্থে তো রয়েছেই। কিন্তু সেসব কথায় 'পাশ্চাত্য জ্ঞানী' বা 'পশ্চাৎ অনুসরণকারী জ্ঞানী'দের যদি বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়, তাঁরা দয়া করে ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লবের যুগের নবোদ্ভূত কচি-ক্যাপিটাল কেমন করে দৈত্যাকার সামন্ততন্ত্রের রাক্ষসদের ধ্বংস করেছিল, তার ইতিহাসটা একবার ভাল করে পড়ে নিতে পারেন। ঘটনা একই, কেবল বর্ণনার ভঙ্গি আলাদা। আমাদের পুরাণাদি ব্রজলীলা, মথুরালীলা ইত্যাদি বলে যে সামাজিক ক্রিয়াসমুদয়ের বর্ণনা করে, সেই একই সামাজিক ক্রিয়ার কথা বলার সময় ইয়োরোপীয় ইতিহাসকারগণ ক্রিয়াকারীদের কথা লিখে গেছেন। social actor-রা social action করেছে এদেশে, সেদেশেও। কিন্তু সেই ঘটনাবলীর বর্ণনা দেওয়ার সময় আমাদের ইতিহাসকাররা action-এর চরিত্রের দিকে তাকিয়ে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গেছেন, actor-কে গুরুত্ব দেননি কারণ তাঁদের চোখে সে নিমিত্তমাত্র; কাজটি ক-বাবু না-করলে খ করত এবং কাজটি হতই। ইয়োরোপের ইতিহাসকারেরা actor-এর দিকে তাকিয়ে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গেছেন — রোবসপিয়ের চেয়েছিলেন বলেই সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলেন, action-এর দিকে পৃথকভাবে তাঁরা দেখতেও চাননি। আর আমরা ভাবি, ভারতের পুরাণাদিতে লেখা সমাজের ইতিহাস এবং ইয়োরোপের লেখা সমাজের ইতিহাস বুঝিবা একেবারেই আলাদা ব্যাপার; যেনবা একটা রূপকথা অন্যটি বাস্তব। কবে যে এই ভাষাবিভ্রাটের হাত থেকে থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব, কে জানে!

শ্যামল রংটির ধারণা কিন্তু শস্যশ্যামলা দেশের ধারণার সঙ্গে আদৌ মেলে না। শস্যপূর্ণ মাঠ কি শ্যামল বা গ্রে দেখায়? তবে শস্যপূর্ণ মাঠকে শ্যামল বলে কেন? নতুনের অধিকরণ বলেই কি? কৃষ্ণ শ্যাম হয়ে রাধার অন্তর্ভুক্ত হবে বলেই নয়কি?

● **শ্যামা** : দ্র. **কালী**।

● **শো ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশিশু, আশৈশব, নিশান, শ, শঃ (শতশঃ, শতসহস্রশঃ), শত, শতক, শতকরা, শতকীয়া, শতকোটি, শতক্রতু, শতগুণ, শতগুণিত, শতগ্রন্থি, শতঘরিয়া, শতঘ্ন, শতঘ্নী, শতচ্ছদ, শতজিৎ, শতজীবী, শততন্ত্র,

শততন্ত্রীক, শততারা, শতদল, শতদাম, শতদ্রু, শতদ্রূ, শতদ্বার, শতধা, শতধার, শতধারক, শতধৃতি, শতধৌত, শতনরী (শতনুরী), শতপত্র, শতপত্রী, শতপথ, শতপথব্রাহ্মণ, শতপদ, শতপদচক্র, শতপদী, শতপদ্ম, শতপর্ব্বা, শতপর্ব্বিকা, শতপাদ, শতপাল, শতপুর, শতপুষ্প, শতপুষ্পা, শতবর্গ, শতবর্ষ, শতবান, শতবার, শতবীর্য্যা, শতভাগ, শতভিষ, শতভিষক, শতভিষা, শতভীরু, শতভুজা, শতমন্যু, শতময়ূখ, শতমান, শতমারী, শতমার্জ্জ, শতমুখ, শতমুখী, শতমূল, শতমূলা, শতমূলী, শতযজ্ঞ, শতযষ্টিক, শতরঞ্চ, শতরঞ্চি (সতরঞ্চি), শতরঞ্জী, শতরুদ্রি(দ্রী)য়, শতরূপা, শতলক্ষ, শতশঃ, শতসহস্র, শতসহস্রশঃ, শতসাহস্র, শতহ্রদা, শতহ্রাদা, শতাক্ষ, শতাক্ষী, শতাঙ্গ, শতাধিক, শতাধিপতি, শতানন্দ, শতানীক, শতাবধান, শতবধানী, শতবধি, শতাবরী, শতাবর্ত্ত, শতাবর্ত্তী, শতাব্দ, শতাব্দী, শতায়ুঃ, শতার, শতার্দ্ধ, শতাহুয়া, শতাহ্বা, শতিক, শতী, শতেক, শতেকখোয়ার, শতেকখোয়ারী, শতেশ, শতেশ্বরী, শতৈকশীর্ষা, শত্য, শন (সন, সন-কাইচ), শনকৈঃ (শনকৈস্), শননশন, শনশন, শনশনি, শনি, শনিচক্র, শনিত্যাগ, শনিদশা, শনিদৃষ্টি, শনিদোষ, শনিপ্রতিকার, শনিপ্রসূ, শনিপ্রিয়, শনিবার, শনিবাসর, শনি-লাগা, শনৈঃ, শনৈর্ভাব, শনৈশ্চর, শয়, শয়ে-শয়ে, শল্পা (শুল্পা, শতপুষ্পা), শাত, শাতকুম্ভ, শাতকৌম্ভ, শাতমন্যব, শাতহ্রদা, শাতোদর, শাতোদরী, শাদ, শিত, শিতদ্রু, শিতধার, শিতশূক, শিশু, শিশুআ, শিশুক, শিশুকাল, শিশুক্রন্দ, শিশুগন্ধা, শিশুচান্দ্রায়ণ, শিশুতা, শিশুত্ব, শিশুনাগ, শিশুপাল, শিশুপ্রিয়, শিশুবাহ, শিশুবুদ্ধি, শিশুভানু, শিশুভাব, শিশুমতি, শিশুমার, শিশুমারসংস্থান, শিশুশশধর, শিশুশশী, শিশুহত্যা, শুঁয়া (শুঁয়ো, শুঙ, শুঙা, শুয়া), শুয়াছিম, শুয়াঠুঁটি, শুয়াপোকা, শুয়াশালী, শুয়ার (শুয়োর), শুয়ার-গোঁ, শুয়ার-বিয়ানী, শুলফা, শুশুক, শূক, শূককীট, শূকতৃণ, শূকদোষ, শূকধান্য, শূকবতী, শূকবান, শকর (সূকর), শূকরী, শূকরীকন্দ, শূকরোগ, শূকশিখা, শূকশিম্বা, শূকশিম্বি, শূকশিম্বিকা, শূকশিম্বী, শূকা, শূয়র, শূয়া, শৈশব, শৈশুমার, শো, শোঁ, শোর (শূকর), শৌকরিক (সৌকরিক), সংশিত, সদীয়াল (শতওয়ালা), সন-কাইচ, সাতেসরী (শতেশ্বরী)।

● **শো** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের সার্বিক আধার যে।

● **শতদ্রু** : ২. *যাহাতে শত শত উৎপাদন-বৃক্ষ থাকে।* ৩. পঞ্চনদের অন্যতম। **বিশ্বামিত্রের** প্ররোচনায় রাক্ষসরূপী **কল্মাষপাদ** কর্তৃক বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হলে পুত্রশোকাতুর **বশিষ্ঠ** বহুপ্রকারে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেন। তাও মৃত্যু না হওয়ায় তিনি হস্তপদ বন্ধন করে এই নদীতে ঝাঁপ দেন। বশিষ্ঠের মৃত্যুর পরিবর্তে এই নদ শতধা হয়ে বিদ্রুত হওয়াতে এর শতদ্রু নাম হয়। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **কেকয়, জলন্ধর, ব্রহ্মপুত্র**। এটি **সিন্ধু** ধারার অন্যতম।

● **শতপথব্রাহ্মণ** : ৩. শত অধ্যায়ে বিভক্ত বেদের অংশ বিশেষ। ইহা শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ এবং মধ্যন্দিন ও কাণ্ব — দুই শাখায় বিভক্ত। মধ্যন্দিনে ১৪ কাণ্ড ও শত অধ্যায় আছে। এই জন্য এর নাম শতপথব্রাহ্মণ। চতুর্দশ কাণ্ডের প্রথম নয়টি অতি প্রাচীন। দশম ও একাদশ কাণ্ডে অগ্নি চয়নের কথা আছে; দ্বাদশ কাণ্ড প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক। ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ ও নরমেধের কথা এবং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত, কাশীরাজ, ধৃতরাষ্ট্র ও পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিক রাজগণের উল্লেখ আছে। চতুর্দশ কাণ্ডকে আরণ্যক বলে। এর শেষ ছয়টি অধ্যায়ের নাম বৃহদারণ্যকোপনিষদ। এর তৃতীয় অধ্যায়ে জনকরাজের পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক তর্কে পরাজিত সমবেত পণ্ডিতগণের বিষয় বর্ণিত আছে। (পৌ.অ.)। ৫. **শতপথব্রাহ্মণ** গ্রন্থে একটি অদ্ভুত কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন **বিশ্বকোষকার**। কথাটি হল, **জনমেজয়ের** মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে। বাক্যটি হল — 'শতপথব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হইবে, পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের চরিত তখনও সাধারণের স্মৃতিপথে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। তাঁহার অভ্যুদয় ও অধঃপতন তখনও সাধারণ্যে বিস্মৃত হন নাই।'

● **শনি** : ৩. সূর্যের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র শনি ও সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। চিত্ররথের কন্যা এঁর স্ত্রী। ... ঋতুস্নাতা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করায় তিনি স্বামীকে (শনিকে) শাপ দেন — তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, সেই বিনষ্ট হবে। ... সেই জন্য শনি **গণেশের** প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। ... পার্বতী একথা অবিশ্বাস করে শনিকে তাঁর পুত্রমুখ দর্শন করতে বললেন। তখন শনি বাধ্য হয়ে গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র গণেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। পুত্রকে মস্তকহীন দেখে পার্বতী শনিকে শাপ দিলেন। এর ফলে শনি খোঁড়া হয়ে গেলেন। (পৌ.অ.)। ৫. এই শনির বিকাশ ঘটতে ঘটতে বর্তমানে তিনি এসে পৌঁছেছেন সরকারি সত্তারূপে। একালে লোকে সত্তাটিকে 'আয়কর বিভাগ', 'বিক্রয়কর বিভাগ', ... ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। এঁদের দৃষ্টি পড়লে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না।

● ***শ্মন্*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : শ্ম, শ্মন্, শ্মশান, শ্মশানকালিকা, শ্মশানকালী, শ্মশানকুসুম (শ্মশানসুমনাঃ), শ্মশানগোচর, শ্মশানঘটিকা, শ্মশাননিলয়, শ্মশাননিবাসী, শ্মশানপাল, শ্মশানবাসী, শ্মশানবেশ্মা, শ্মশানবৈরাগ্য, শ্মশানভাক্, শ্মশানমশান, শ্মশানশূল, শ্মশানসাধন, শ্মশানসুমনঃ, শ্মশানসেবন, শ্মশানাগ্নি, শ্মশানালয়, শ্মশ্রু, শ্মশ্রুকর, শ্মশ্রুকর্ম্ম, শ্মশ্রুজাত, শ্মশ্রুধর, শ্মশ্রুধারী, শ্মশ্রুপ্রবৃদ্ধি, শ্মশ্রুমুখী, শ্মশ্রুবর্দ্ধক, শ্মশ্রুল, শীল্, শীলন, শীলিত।

● **শ্মন্** = বিচ্ছুরণের সীমায়ন। **শ্মন** = বিচ্ছুরণের সীমায়ন যাহাতে।

● **শ্মশানমশান** : ৫. দ্র. **বনস্থলী, মশান** (মক্)। (**শ্মশান-মশান, দ্র.সূন**)। **শ্মশানমশান : বধস্থলী** : মশান, ব.শ. এবং ব্য.বা.অ.ঢাকা। আশেপাশের মতো মশান শব্দটিকে শ্মশানের সমান করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে মরা মানুষকে পোড়ান হয় সেটি শ্মশান। যেখানে জ্যান্ত মানুষকে মারা ও পোড়ান হয়, সেটি **বধস্থলী** বা **মশান**।

● **শ্রণ্ (শ্রৎ, শ্রথ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিশিথিল, অশিথিল, অশ্রদ্ধ, অশ্রাদ্ধভোজী, অশ্রাদ্ধী, অশ্রাদ্ধেয়, ছরাদ, সাধ, শিথিল, শিথিলপীড়িত, শিথিলপ্রযত্ন, শিথিলসমাধি, শিথিলিত, শিথী, শৈথিল্য (ত্বকশৈথিল্য, সন্ধিশৈথিল্য ...), শ্রণ্, শ্রৎ, শ্রথ্, শ্রথন, শ্রদ্দধান, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাকৃত, শ্রদ্ধাতব্য, শ্রদ্ধান্বিত, শ্রদ্ধাপ্রতীঘাত, শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধাময়, শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধারহিত, শ্রদ্ধালু, শ্রদ্ধী, শ্রদ্ধেয়, শ্রন্থ্ (শ্রথি), শ্রন্থন, শ্রন্থনা, শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধকর, শ্রাদ্ধকর্ত্তা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধক্রিয়া, শ্রাদ্ধদ, শ্রাদ্ধদান, শ্রাদ্ধদিন, শ্রাদ্ধদিবস, শ্রাদ্ধদেব, শ্রাদ্ধপাত্র, শ্রাদ্ধবাসর, শ্রাদ্ধভুক্(জ্),

শ্রাদ্ধভোজন, শ্রাদ্ধমিত্র, শ্রাদ্ধশান্তি, শ্রাদ্ধশিষ্ট, শ্রাদ্ধিক, শ্রাদ্ধী, শ্রাদ্ধীয়, শ্রাদ্ধেয়, শ্রাধ।

● **শ্রণ্‌ (শ্রৎ, শ্রথ্‌)** = বিচ্ছুরিত-রক্ষণ। **শ্রণ** = বিচ্ছুরিত-রক্ষণ যাহাতে। **শ্রৎ** = বিচ্ছুরিতের তারণ যাহাতে। **শ্রথ** = বিচ্ছুরিতের তারণ স্থিত যাহাতে।

● **শ্রাদ্ধদেব** : দ্র. **পুরূরবা**। বিশ্বদেবভেদ (বোধ হয়, ঋগ্বেদের পুরূরবাঃ অগ্নির প্রসাদে 'বিশ্বদেবত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পার্ব্বণে যজনীয় শ্রাদ্ধদেব)। (ব.শ.)।

● **শ্রি ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অত্যুচ্ছ্রিত, অনাশ্রয়, অশীর্ষ, অশীর্ষক, অশীর্ষিক, অশীর্ষী, অশ্রি, অশ্রী, অশ্রীক, অশ্রীমান, অশ্রেয়ঃ, অশ্লীক, অশ্লীল, অশ্লীলতা, আশড়া, আশয়, আশ্রয়, আশ্রয়ণ, আশ্রয়ভূত, আশ্রয়াশ, আশ্রয়াসিদ্ধ, আশ্রয়ী, আশ্রা (আসরা), আশ্রিত, উপশ্রয়, উপাশ্রয়, ছিদাম, ছিরি, ছিরিছাঁদ, নিরাশ্রয়, প্রশ্রয়, বিচ্ছিরি, বিশ্রী, শিতান (শিথান, সিতান, সিথান, সীথান), শিফল, শির, শিরঃ, শিরঃকপাল, শিরঃকপালী, শিরঃকম্প, শিরঃক্রিয়া, শিরঃকৃন্তন, শিরঃচূড়ামণি, শিরঃপট্ট, শিরঃপীঠ, শিরঃপীড়া, শিরঃপ্রণাম, শিরঃপ্রাবরণ, শিরঃশাটক, শিরঃশূল, শিরঃশেষ, শিরঃস্থান, শিরঃস্নাত, শিরঃস্নান, শিরকাটা, শিরঘৃত, শিরজ, শিরডাঁড়া, শিরতাজ, শিরনল, শিরপা, শিরপাক, শিরপেঁচ, শিরশ্ছেদ, শিরশ্ছেদন, শিরসা, শিরসি, শিরসিজ, শিরসিরুহ, শিরস্ক, শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ, শিরস্য, শিরি (ছিরি, শ্রী), শিরোগদ, শিরোগৃহ, শিরোগেহ, শিরোগৌরব, শিরোগ্রহ, শিরোঘাত, শিরোঘ্রাণ, শিরোজ, শিরোদাম, শিরোদেশ, শিরোধর, শিরোধরা, শিরোধারণীয়, শিরোধার্য্য, শিরোধি, শিরোধ্র, শিরোধ্বজ, শিরোনাম, শিরোনামা, শিরোপর, শিরোপরি, শিরোপরে, শিরোপা (সর্‌-আ-পা), শিরোবিরেক, শিরোবিরেচন, শিরোবেষ্ট, শিরোবেষ্টন, শিরোভব, শিরোভাগ, শিরোভূষণ, শিরোমণি (মূর্খশিরোমণি, ধার্ম্মিকশিরোমণি, ধূর্ত্তশিরোমণি, দেবশিরোমণি ...), শিরোমালিনী, শিরোরত্ন, শিরোরুক্‌(জ্‌), শিরোরুজা, শিরোরুহ, শিরোরোগ, শিরোস্থি, শিশ, শিষ (শিস, শীষ, সিস, সীস), শীর্ষ, শীর্ষক, শীর্ষঘাতী, শীর্ষচ্ছেদ, শীর্ষচ্ছেদন, শীর্ষচ্ছেদ্য, শীর্ষণ্য, শীর্ষত্রাণ, শীর্ষপট্টক, শীর্ষবর্ত্তন, শীর্ষবিরেচন, শীর্ষবেদনা, শীর্ষব্যথা, শীর্ষরক্ষ, শীর্ষরক্ষণ, শীর্ষরোগী, শীর্ষস্থ, শীর্ষাবশেষ, শীর্ষোদয়, শেট, শেঠ, শেঠশ্রেষ্ঠ, শের, শেরা (সেরা), শ্রয়ণ, শ্রায়, শ্রি, শ্রিত, শ্রিতসত্ত্ব, শ্রিয়পতি, শ্রিয়ম্মন্য, শ্রিয়া, শ্রী, শ্রীঅপতি, শ্রীআচার, শ্রীক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠনিলয়, শ্রীবিষয়, শ্রীকণ্ঠসখ, শ্রীকর, শ্রীকলা, শ্রীকান্ত, শ্রীকাম, শ্রীকার, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীক্ষেত্র, শ্রীখণ্ড, শ্রীখণ্ডচর্চা, শ্রীখণ্ডদ্রুম, শ্রীখণ্ডবিলেপন, শ্রীখণ্ডশীতল, শ্রীখণ্ডশৈল, শ্রীখণ্ডী, শ্রীগদিত, শ্রীগর্ভ, শ্রীগৃহ, শ্রীগোলা, শ্রীগ্রহ, শ্রীঘন, শ্রীঘর, শ্রীচরণ, শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীছন্দ, শ্রীছাঁদ, শ্রীজুৎ (শ্রীজুত), শ্রীতাল, শ্রীদ, শ্রীদয়িত, শ্রীদাম, শ্রীদামা, শ্রীদুর্গা, শ্রীধর্ম্মপাদুকা, শ্রীধর, শ্রীধাম, শ্রীনন্দন, শ্রীনাথ, শ্রীনাশ, শ্রীনিকেত, শ্রীনিকেতন, শ্রীনিধি, শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাসা, শ্রীপঞ্চমী, শ্রীপতি, শ্রীপথ, শ্রীপদ্ম, শ্রীপর্ণ, শ্রীপর্ণিকা, শ্রীপর্ণী, শ্রীপাট, শ্রীপাঠ, শ্রীপাদ, শ্রীপুষ্প, শ্রীপ্রিয়, শ্রীফল, শ্রীফলশ্রী, শ্রীফলা, শ্রীফলী, শ্রীবৎস, শ্রীবৎসধারী, শ্রীবৎসলক্ষণ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, শ্রীবৎসাঙ্ক, শ্রীবরাহ, শ্রীবল্লভ, শ্রীবর্দ্ধক, শ্রীবাস, শ্রীবাসক, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবিদ্যা, শ্রীবিভাবন, শ্রীবিশাল, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিহীন, শ্রীবৃক্ষ, শ্রীবৃক্ষক, শ্রীবৃক্ষকী, শ্রীবৃদ্ধি, শ্রীবেষ্ট, শ্রীভদ্রা, শ্রীভর্ত্তা, শ্রীভর্ত্তৃহরি, শ্রীভাগবত, শ্রীভাষ্য, শ্রীমৎ, শ্রীমতী, শ্রীমত্যা, শ্রীমদ্দেবপাদ, শ্রীমন্‌, শ্রীমন্ত, শ্রীমন্ত্র, শ্রীমন্দির, শ্রীমান (শ্রীমৎ), শ্রীমুখ, শ্রীমুদ্রা, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত, শ্রীরস, শ্রীরাগ, শ্রীরাম, শ্রীরামকদলী, শ্রীরামনবমী, শ্রীরামলক্ষ্মণ, শ্রীরাসমণ্ডল, শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়, শ্রীল, শ্রীলতা, শ্রীশ, শ্রীসম্পাদক, শ্রীসূক্ত, শ্রীহরি, শ্রীহরিশয়ন, শ্রীহস্ত, শ্রীহস্তিনী, শ্রীহীন, শ্রেড়ী, শ্রেঢ়ী, শ্রেণি (বিহগশ্রেণি, মধুকরশ্রেণি ...), শ্রেণী, শ্রেণীকক্ষ (আধু), শ্রেণীকৃত, শ্রেণীবদ্ধ, শ্রেণীবন্ধ, শ্রেণীভূত, শ্রেয়, শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্‌), শ্রেয়ঃকল্প, শ্রেয়সী, শ্রেয়স্কর, শ্রেয়স্কাম, শ্রেয়স্কৃৎ, শ্রেয়স্ত্ব, শ্রেয়ান্‌ (শ্রেয়স্‌), শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠবাক্‌, শ্রেষ্ঠান্বয়, শ্রেষ্ঠাশ্রম, শ্রেষ্ঠী, শ্রৈষ্ঠ্য, শ্লীল, সংশ্রয়, সমুচ্ছ্রয়, সাশ্রয়, সুশ্রী।

● **শ্রি** = বিচ্ছুরিতের রক্ষণ গতিশীল যাহাতে।

● **শ্রী** : ২. *শ্রি-র আধার যে।* ৫. দ্র. **বিল্ব, শ্রীফল**। ঐশ্বর্য্য সমূহের যে বিচ্ছুরণ, তা সে শক্তির বিচ্ছুরণ হোক, আর জ্ঞানের আলোক-বিচ্ছুরণ হোক কিংবা ধন বা প্রেমের সৌরভের বিচ্ছুরণই হোক, সেই সকল বিচ্ছুরণের কিয়দংশের বা অনেকাংশের আধারকে বলা হয় **শ্রী**। 'শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামটি বলেই দেয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জ্ঞান-ধন-প্রেমাদি মানবিক ঐশ্বর্য্যের সৌরভ বহন করছেন। স্বভাবতই **শ্রী** শব্দটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। যে বাংলাভাষীগণ আমাদের নামের শুরুতে **শ্রী** লেখার প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁদের ভাষাবোধ তাই অতুলনীয়। বিশ্বের কোনো ভাষা এইরূপ ভাষাসম্পদ অর্জন করতে পারেনি, আজও।

কিন্তু তাতে কী! আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমেই ঠিক করলাম, নিজেকে শ্রদ্ধা করার মতো বোকামি আর নেই। নিজের নামে যেন কোনো মুকুট-জাতীয় কিছু পরানো না থাকে। মানসিকভাবে উলঙ্গ হতে না পারলে আধুনিক হওয়ার মজা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, আমরা যে সাহেবদের অনুসরণ করছি, কই, তাদের নামের শুরুতে তো ওসব নাই। অতএব নিজের কোনো গৌরব থাকলে, তাকে বরবাদ করে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল কাজ। অতএব আমরা বাপ্‌কেলে **শ্রী** ফেলে দিয়ে **শ্রী**মুক্ত হয়ে গেছি, এবার বি**শ্রী** হতে আর অসুবিধা থাকার কথা নয়!

● **শ্রীচৈতন্য** : ২. *শ্রী-বিষয়ে চেতনা আছে যাঁহার।* ৫. দ্র. **চেতন**।

● **শ্রীদাম** : ১. ২. ***শ্রী-যুক্ত দাম*** *যাহার।* ৩. শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম ইত্যাদি সাত জন শ্রীকৃষ্ণের অনুচর ছিলেন। (পৌ.অ.)।

● **শ্রীমৎ (শ্রীমতী, শ্রীমান)** : ৫. দ্র. **মৎ, মান**। আমরা যখন কাউকে **শ্রীমৎ, শ্রীমান, শ্রীমতী** ইত্যাদি বলি, তখন যে উচ্চতায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করি, তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্বোধনের তুলনা চলে না। কাউকে উচ্চাসনে বসিয়ে কথা বলার মধ্যেই সভ্যতার অর্জন প্রকাশ পায়। আরব্য প্রথানুসারে মায়েরা পুত্রকে স্বামীর তুল্য সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। গ্রামবাংলার মায়েরা ছেলেদের শ্রীকৃষ্ণের সমগোত্রীয় করে **গোপাল** ইত্যাদি বলে ডাকেন। মানুষের মধ্যে শৈশবেই দেবত্বের আরোপ, মানুষকে ছোট হতে দেয় না; উচ্চাসনে উঠে বসতে প্ররোচিত করে। এটিই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রথা।

● **শ্রেণী (শ্রেণীসংগ্রাম)** : ২. *শ্রেণী = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ-রক্ষণের আধার যে।* ৫. দ্র. **বর্ণ**। মানবসভ্যতার অতীত ইতিহাসের বিষয়ে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের জ্ঞান প্রায় শূন্য। তাঁরা স্বভাবতই চলমান স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (নেচারাল) **বর্ণ**-বিভাজন প্রক্রিয়াটিকে দেখতেই পাননি। অতীত হাতে না থাকায় তাঁরা দেখেছেন তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিকে। ফলে তাঁদের পক্ষে যেখানে পৌঁছনো স্বাভাবিক ছিল, সেই **শ্রেণী** ধারণায় পৌঁছেছেন তাঁরা। যেন-বা আদিম মানুষগুলো একা একা বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারপর একসময় বানবন্যা ঝড়ঝঞ্ঝা বাঘ-সিংহের সঙ্গে একা একা লড়তে না-পেরে একত্রিত হয়ে 'সমাজ' গড়েছে, সভ্যতা বানিয়েছে। সেই সভ্যতা গড়তে গিয়ে জন্ম হয়েছে **শ্রেণী**র, এখন **শ্রেণীসংগ্রাম** করে মানবসভ্যতাকে উদ্ধার করতে হবে!

সমগ্র ধারণাটিই যে ভুল, সেকথা মার্কস যখন বুঝলেন, তার যা যা লেখার বলার সব কথা লেখা ও বলা হয়ে গেছে এবং 'দাস ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণও ফুরিয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে কথাটি তিনি বলে যান চিরসাথী এঙ্গেলস্‌কে। তাই, 'ক্যাপিট্যাল'-এর ৩য় সংস্করণে একটি ফুটনোট দিয়ে এঙ্গেলস এই সংশোধনীটি যোগ করেন — '... Subsequent very searching study of the primitive conditions of man, led the author (Marx) to the conclusion, that it was not the family that originally developed into the tribe, but, that, on the contrary, the tribe was the primitive and spontaneously developed form of human association, on the basis of blood-relationship, and that out of the first incipient loosening of the tribal bond, the many and various forms of the family were afterwards developed.' (The Capital / Vol. 1 / page 332 / Progress Publishers - 1977)। কিন্তু একথা যখন এঙ্গেলস্ সবাইকে জানাচ্ছেন, তখন তো তাঁদের সারাজীবনের কাজ শেষ; নতুন করে ঠিকঠাক করার উপায় নেই। ফল যা হবার তাই হয়েছে। শুরু হয়েছে **শ্রেণীসংগ্রাম** — সমাজশরীরের হাত পা পেট পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরেছে, মরছে। এই না হলে সেই 'বৈজ্ঞানিক-সমাজতত্ত্ব'-এর এমন অকালপ্রয়াণ হয়?

● **শ্রু (শ্রম্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনাশ্রম, অনাশ্রমী, অশুশ্রূষা, অশ্রম, অবিশ্রান্ত, অশ্রান্ত, অশ্রাব্য, অশ্রুত, অশ্রুতপূর্ব্ব, অশ্রুতি, অশ্রোত্রিয়, অসংশ্রব, আশ্রব, আশ্রম, আশ্রমধর্ম্ম, আশ্রমপদ, আশ্রমস্থান, আশ্রমবাসিক, আশ্রমবাসী, আশ্রমমণ্ডল, আশ্রমালয়, আশ্রমী, আশ্রুত, উগ্রশ্রবাঃ, উচ্চৈঃশ্রবস্, ছরম, বিশ্রান্ত, বিশ্রাম, শাওণ (শাওন, শ্রাবণ, সাবন), শাঙণ (শাঙন, সাঙন), শাঙনী, শ্রান্ত, শুন (শুনত, শুনব, শুনহ, শোন, শুন-লো, শুনিলুঁ, শুনসি ...), শুনন, শুনা, শুনান, শুনানি, শুনুন, শুশ্রুবান্ (শুশ্রুবস্), শুশ্রূ, শুশ্রূষক, শুশ্রূষণ, শুশ্রূষা, শুশ্রূষিতব্য, শুশ্রূষিতা, শুশ্রূষু, শুশ্রূষ্য, শৃণু (শুনুন), শৃণ্বন্ত, শোনা, শোনান, শ্রব, শ্রবঃ (শ্রবস্), শ্রবণ, শ্রবণকাতরতা, শ্রবণগোচর, শ্রবণদ্বাদশী, শ্রবণপথ, শ্রবণপরুষ, শ্রবণপালি, শ্রবণপুটক, শ্রবণপূরক, শ্রবণবর্জ্জিত, শ্রবণবিদারণ, শ্রবণবিষয়, শ্রবণবেধ, শ্রবণব্যাধি, শ্রবণভূত, শ্রবণমূল, শ্রবণরুক্, শ্রবণশুভগ, শ্রবণসুখ, শ্রবণহারী, শ্রবণা, শ্রবণাতীত, শ্রবণীয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণোৎপল, শ্রবণোদর, শ্রবিষ্ঠ, শ্রবিষ্ঠা, শ্রব্য, শ্রব্যকাব্য, শ্রম্, শ্রম (শ্রু-মন্), শ্রমকর, শ্রমকর্শিত, শ্রমক্লান্ত, শ্রমখিন্ন, শ্রমঘ্ন, শ্রমচ্ছিৎ, শ্রমজল, শ্রমজীবী, শ্রমণ, শ্রমণা, শ্রমণিকা, শ্রমনুৎ (শ্রমনুদ্), শ্রমপীড়িত, শ্রমবারি, শ্রমবিনয়ন, শ্রমবিনোদ, শ্রমমোহিত, শ্রমশীকর, শ্রমসাধ্য, শ্রমস্থান, শ্রমাপনয়ন, শ্রমাম্বু, শ্রমার্ত্ত, শ্রমিক, শ্রমী, শ্রমোদ, শ্রান্ত, শ্রান্তচিত্ত, শ্রান্তমনাঃ, শ্রান্তবাহন, শ্রান্তসংবাহন, শ্রান্তহৃদয়, শ্রান্তি, শ্রাবক (সরাক), শ্রাবণ, শ্রাবণিক, শ্রাবণী, শ্রাবন্তী, শ্রাবিত, শ্রাব্য, শ্রু, শ্রুত, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতদেবী, শ্রুতধর, শ্রুতনিষ্ক্রয়, শ্রুতপারগ, শ্রুতপারদৃশ্বা, শ্রুতপূর্ব্ব, শ্রুতপ্রকাশ, শ্রুতবৃত্ত, শ্রুতবৃদ্ধ, শ্রুতবোধ, শ্রুতভৃৎ, শ্রুতমহান, শ্রুতমাত্র, শ্রুতর্ষি, শ্রুতশালী, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতাদান, শ্রুতাধ্যয়ন, শ্রুতান্বিত, শ্রুতার্থ, শ্রুতি, শ্রুতিকটু, শ্রুতিকথিত, শ্রুতিগোচর, শ্রুতিজাত, শ্রুতিজীবিকা, শ্রুতিতৎপর, শ্রুতিদ্বৈধ, শ্রুতিধর, শ্রুতিনিদর্শন, শ্রুতিপথ, শ্রুতিপথগত, শ্রুতিপথপ্রাপ্ত, শ্রুতিপুট, শ্রুতিপ্রসাদন, শ্রুতিপ্রামাণ্য, শ্রুতিবচন, শ্রুতিবর্জ্জিত, শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন, শ্রুতিবিবর, শ্রুতিবিষয়, শ্রুতিবেধ, শ্রুতিমণ্ডল, শ্রুতিমধুর, শ্রুতিমূল, শ্রুতিমূলক, শ্রুতিশিরঃ, শ্রুতিসরণি, শ্রুতিসুখ, শ্রুতিসুখকর, শ্রুতিসুখদ, শ্রুতিসুখাবহ, শ্রুতিস্মৃতি, শ্রুতিস্মৃতিবিরোধ, শ্রুত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যুক্ত, শ্রুব, শ্রুবা, শ্রোতব্য, শ্রোতা (শ্রোতৃ), শ্রোত্র, শ্রোত্রপদবী, শ্রোত্রপালি, শ্রোত্রপেয়, শ্রোত্রবর্ত্ম, শ্রোত্রমার্গ, শ্রোত্রমূল, শ্রোত্রসংবাদ, শ্রোত্রসুখ, শ্রোত্রহারী, শ্রোত্রহীন, শ্রোত্রানুকূল, শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়স্ব, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, শ্রৌত, শ্রৌতকর্ম্ম, শ্রৌতসূত্র, শ্রৌত্র, শ্রৌষট্।

● **শ্রু (শ্রম্)** = বিচ্ছুরিতের রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **শ্রম** = বিচ্ছুরিতের রক্ষণ সীমায়িত যাহাতে।

● **আশ্রম (শ্রম, শ্রমিক)** : ১. শ্রম্ = তপস্যা করা। ২. *আশ্রম = শ্রমের (তপস্যার) আশ্রয় যাহাতে।* / যাহাতে ব্রতার্থ শ্রম করে। (ব.শ.)। ৩. তপস্যা, তপশ্চরণ, ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার চারটি অবস্থা — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ... (পৌ.অ.)। ... ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু — এই চতুষ্টয়। কূর্ম্মপুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণের চারিটি, ক্ষত্রিয়ের তিনটি, বৈশ্যের দুইটি এবং শূদ্রের একটি আশ্রম বিহিত। ... মুনিগণের বাসস্থান, তপোবন, ধর্ম্মারণ্য, মুনিবন। বন। চতুষ্পাঠী, মঠ। ... (ব.শ.)। ৪. 'ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের ভজনসাধনের স্থান' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **তপঃ, বানপ্রস্থ, বর্ণাশ্রম**। **আশ্রম** = নেশা-পেশা। দ্র. **বানপ্রস্থ। ব্রজ্যা, প্রব্রজ্যা**। শ্রম শব্দের অর্থ তপস্যা। যেখানে লোকেরা শ্রম করতে যায়, তাকে একালে কারখানা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ইত্যাদি বলে বটে, তবে প্রাচীন ভারতে তাকে বলা হত আশ্রম বা **তপোবন**। আর কর্মজগৎকে বলা হত **বন** বা **অরণ্য**। অরণ্যে বা বনেই সেই **আশ্রম** বা **তপোবন**গুলি অবস্থিত ছিল। আজও তাই আছে। এই সংসার-**অরণ্যে** মানুষের ধর্ম্মের, সমাজের ধর্ম্মের রীতিনীতি আইনকানুন মেনে যে যার কাজ করে ব'লে একে **ধর্ম্মারণ্য**ও বলে। ব্যক্তিজীবনের চারটি ভাগে চাররকম শ্রমের ব্যবস্থা ব'লে, একে চতুর**াশ্রম** বলে। আবার জাতীয়জীবনের (সমগ্র বর্ণের) চারটি ভাগে চাররকম শ্রমের ব্যবস্থা বলে তাকে **বর্ণাশ্রম** বলে।

জীবনের প্রথম অধ্যায়ের নেশা-পেশাই **ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম**; দ্বিতীয়

অধ্যায়ের নেশা-পেশাই **গার্হস্থ্য-আশ্রম**, জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের নেশা-পেশা হল **বানপ্রস্থ-আশ্রম**, এবং শেষ অধ্যায়ের নেশা-পেশা হল **সন্ন্যাস-আশ্রম**। প্রথম পর্বে আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করা, দ্বিতীয় পর্বে পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করা, তৃতীয় পর্বে সমগ্র মানব ঝাঁকের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করা, এবং শেষ পর্বে বিশ্বজগতের সেবার মাধ্যমে আপন আত্মার সেবা করা।

কিন্তু শব্দগুলির এই স্বাভাবিক অভিধার্থকে অতীতহারা আমরা পরিণত করেছি একধরনের অর্থহীন religious প্রথায়। এখনও বিশ্বের সবাই এবং আমরাও বাস্তব জীবনে উপরোক্ত চারটি **আশ্রম**ই মানি, অনুসরণ করি, কিন্তু সেগুলি যে **আশ্রম**, সেকথাটিই গেছি ভুলে। ফলে হয়েছে কী, সেকালে লোকে ভাত-ডাল-তরকারি খেত আর বলত 'অন্নসেবা করলাম'। আমরাও যথারীতি আমাদের পূর্বসূরিদের মতো ভাত-ডাল-তরকারি খাই, বলি, 'ভোজন করলাম', কিংবা 'ডিনার সারলাম' ... ইত্যাদি; কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে — আপনি অন্নসেবা করেছেন? আমরা বলি, 'না না, আমরা অন্নসেবা করি না, করিনি, আমরা ভাত খেয়েছি, ডিনার করেছি ... ইত্যাদি'। একেই বলে **ভাষাবিভ্রাট**।

● **পরিশ্রম** : ১. পরি + √শ্রম্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.) ৩. **পরিশ্রম** = আয়াস, খাটুনি, খেদ, অবসাদ, ব্যায়াম। ৫. **বিশ্রাম, আশ্রম, পরিশ্রম**।

● **শ্রব, শ্রবঃ, শ্রবস্** ***(ভূরিশ্রবা, উচ্চৈঃশ্রবা, উগ্রশ্রবা)***

● **শ্রুত (শ্রুতি)** : ২. **শ্রুত** = *বিচ্ছুরিতের রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত যাহাতে।* ***শ্রুতি*** *=* ***শ্রুত*** *গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* ৩. যাহা শ্রুত হয়। যাহা ভগবান কর্তৃক উদঘাটিত হয়। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে শ্রুতি বলা হয়। উপনিষদকেও এই পর্যায়ে ফেলা হয়।

● **শ্ল (*শ্লথ্*, শ্লাঘ্, শ্লিষ্, *শ্লোক্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশ্লিষ্ট, অশ্লীল, অশ্লেষা, আশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, পুণ্যশ্লোক, শেলেষ, শোলোক, শোলোকশাস্তর, শ্লক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণক, শ্লক্ষ্ণপিষ্ট, শ্লথ্, শ্লথ, শ্লথবন্ধন, শ্লথলম্বী, শ্লথসন্ধি, শ্লথীকৃত, শ্লাঘ্, শ্লাঘন, শ্লাঘনীয়, শ্লাঘা, শ্লাঘিত, শ্লাঘিষ্ঠ, শ্লাঘী, শ্লাঘ্য, শ্লিষ্, শ্লিষ্ট, শ্লিষ্টি, শ্লিষ্টোক্তি, শ্লীপদ, শ্লীপদাপহ, শ্লীল, শ্লেষ, শ্লেষক, শ্লেষণ, শ্লেষভিত্তিক, শ্লেষা, শ্লেষার্থ, শ্লেষোক্তি, শ্লেষ্মক, শ্লেষ্মঘ্ন, শ্লেষ্মঘ্নী, শ্লেষ্মণ, শ্লেষ্মল, শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মাকটাহক, শ্লেষ্মাক্ষয়, শ্লেষ্মাজ, শ্লেষ্মাজ্বর, শ্লেষ্মাত, শ্লেষ্মাতক, শ্লেষ্মাতিসার, শ্লেষ্মাধাতু, শ্লেষ্মান্তক, শ্লেষ্মান্তকফল, শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, শ্লেষ্মাভব, শ্লেষ্মাভূ, শ্লেষ্মাশোথ, শ্লেষ্মাসঙঘাত, শ্লেষ্মাহর, শ্লৈষ্মিক, শ্লোক্, শ্লোক, শ্লোককার, শ্লোকবদ্ধ, শ্লোকবার্ত্তিক, শ্লোকশতী, শ্লোকাভিনয়, শ্লোক্য, সংশ্লিষ্ট, সংশ্লেষ, সংশ্লেষণ, সুশ্লিষ্ট, সুসংশ্লিষ্ট।

● **শ্ল (শ্লথ্, শ্লাঘ্, শ্লিষ্, শ্লোক্)** = বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন যাহাতে। **শ্লথ** = বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন থাকে যাহাতে। **শ্লাঘ** = **শ্লঘ** (= বিচ্ছুরিতের লালন-লয়নের গমনস্থিতি) হইতে জাত। **শ্লিষ** = গতিশীল বিচ্ছুরিতের লালনাদির দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **শ্লোক** = নবরূপী বিচ্ছুরিতের লালনাদির করণের সার্বিক আশ্রয় যাহাতে।

● **শ্লীল (অশ্লীল)** : ২. ***শ্লীল*** *=* ***শ্ল*** *(বিচ্ছুরিতের লালন-লয়ন যাহাতে) গতিশীলভাবে আধারিত হইয়া লালিত যাহাতে।* ***অশ্লীল*** *= যাহা* ***শ্লীল*** *নহে।* **৫. শ্রী**-তে যে বিচ্ছুরিতকে আমরা পেয়েছি, **শ্লী**তে প্রায় সেটিই রয়েছে আচার-আচরণ রূপে। **র** ও **ল** অভেদ, এই নীতির কারণে ব্যাপারটি ঘটে। জ্ঞান-ধন-প্রেম-সভ্যতা-ভব্যতা — এসবের প্রকাশমূলক আচার-আচরণের মধ্যে সদাচারগুলিকে ধরে রাখে **শ্লীল** কথাটি। দ্র. **সভ্যভব্য**। **অশ্লীল** মানে, ঐ সদাচারগুলির বিপরীত আচারসমূহ। সদাচার মৌলবাদী হয়ে গেলে তার ঊর্ধ্বসীমা লঙঘন করতে হয়, সব মনীষীই তা করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন, **শিব**ও করেন, এবং তাঁর সেই মৌলবাদী-সদাচার লঙঘনকে তাঁর ঐশ্বর্য্য বলা হয়। প্রথম প্রথম সমাজ তা মেনে না নিলেও পরে পরে তা মেনে নেওয়া হয় এবং সদাচারের সীমা বৃদ্ধি করে নেওয়া হয়। কিন্তু নিম্নসীমালঙঘনকারীকে কখনোই **শ্লীল** বলা যায় না। আজকাল বাংলায় যেসকল **অশ্লীল** বা 'অবসিন' (obscene, যাকে ভুলভাবে স্ল্যাং বলা হয়ে থাকে) চর্চা চলছে, সেগুলিকে এককথায় বলা যেতে পারে — কলেজ স্ট্রিটের প্রতিনিধির দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপকে কলুষিত করার চেষ্টা। এবং তাদের অধিকাংশই নিম্নসীমা-লঙঘনকারী। **অশ্লীল** বা 'স্ল্যাং' জিনিসটি কী, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব এই সকল আচার আচরণের কারণ।

মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনো অঙ্গকে বাদ দিয়ে যেমন চলে না, পায়ে গু লেগে গেলে ধুয়ে নিতে হয়, পা কেটে বাদ দিলে চলে না, তেমনি ভাষার দৈহিক-লিঙ্গ ধারণা থেকে মানসিক লিঙ্গ ধারণা পর্যন্ত সবটাই রাখতে হয়। **লিঙ্গ** শব্দটি শুনলেই (দ্র. দেশ) সুনীল গাঙ্গুলীর মাথায় penis-এর ছবি ভেসে ওঠে, তাই বলে মানুষের শরীর থেকে যেমন লিঙ্গ বাদ দেওয়া যায় না, ভাষা থেকেও বাদ দেওয়া চলে না। পা দিয়ে লোকে যেমন অন্যকে প্রণাম করে না, আবার পা-টা কেটেও ফেলে না, তেমনি মানুষের ভাষার দেহ-বিষয়ক ধারণাগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না। গ্রামবাংলার মানুষ এই সব দেহ-বিষয়ক শব্দগুলি অনায়াসে বলে থাকেন। মেদিনীপুরের অধিকাংশ গ্রামবাসীই 'আমার পিছনে পিছনে আয়' বাক্যটিকে প্রায়শই বলেন, 'আমার পঁদে পঁদে আয়'। এ বিষয়ে কোনোরকম **শ্লীল-অশ্লীলে**র বোধই তাঁদের নেই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যখন তাঁর উপন্যাসে গ্রামের মানুষের সেই ভাষা তার প্রেক্ষিতসহ তুলে আনেন, সেসব শব্দ শুনে এতটুকু অস্বস্তি করে না। বিষয়টিকে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবও ঠিক একইভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তবুও আমাদের এমন ভুল **অশ্লীলতা**র বোধ জন্মাল কেমন করে?

আসলে সমস্যাটি খুবই গভীর, খুবই সহজ। মানুষের **কেশা**চার-এর পিছনে যেমন তার ব্যক্তিমালিকানার সম্পর্ক জড়িত, তেমনি মানুষের দৈহিক ও মানসিক (= ভাষিক) আভরণের সঙ্গে তার উৎপাদন-ক্ষেত্রের আভরণ-নিরাভরণের বোধও জড়িত। মানুষ যেদিন প্রথম তার কৃষিক্ষেত্রকে ঢেকে রাখা উচিত বিবেচনা করল, তার কয়েকদিনের মধ্যে সে তার দৈহিক কৃষিক্ষেত্রকেও (লিঙ্গ-যোনিকেও) ঢেকে রাখা উচিত বিবেচনা করেছিল। তার আগে পর্যন্ত মানুষ উলঙ্গই ঘুরে বেড়াত। কৃষিকাজ আবিষ্কারের পর থেকে মানুষের দৃশ্য উৎপাদনক্ষেত্রকে সে যেমন বেড়া দিয়ে, পাহারা দিয়ে রাখতে শুরু করেছিল, তেমনি নিজেদের শরীরকেও আভরণ দিয়ে ঢাকতে শুরু করেছিল। সামন্তযুগ পর্যন্ত কমবেশি এরকমই চলছিল। কিন্তু

মানুষ যেদিন থেকে শিল্পপুঁজির আরাধনা শুরু করল, সেদিন থেকে তার দরকার পড়ল উৎপাদন-বিষয়ক কিছু কিছু আচার-আচরণকে গোপন করা — কোন কাজটি করা, কোন কথাটি বলা শিল্পপুঁজির পক্ষে নিরাপদ, কোনটি করা বা বলা বিপজ্জনক, এক এক করে সেগুলি চিহ্নিত হতে লাগল। ফলে, শিল্পপুঁজিপতির আচরণে করণীয় এবং অকরণীয়র একটা তালিকা অজান্তেই তৈরি হয়ে গেল। তার রোজকার জীবনে তার এই কতর্ব্য-অকর্তব্যের বা শ্লীল-অশ্লীলের মাঝে চলার অভ্যাস তার মানসলোকেও একধরনের শ্লীল-অশ্লীলের বোধ গড়ে তোলে। সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ভাষিক আচার-আচরণেও নিরাপদ-বিপজ্জনকের বা শ্লীল-অশ্লীলের একটা তালিকা অজান্তেই করে ফেলে। ফলত, শিল্পপুঁজির আরাধনার দৈহিক ফসল যেমন ইউরোপ পেরিয়ে সারা বিশ্বের দিকে ছুটতে শুরু করে, সেই আরাধনার এই মানসফসলও তেমনি সমগ্র পাশ্চাত্যের মনকে আচ্ছন্ন করে ইউরোপ পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বের দিকে ছুটতে শুরু করে। আমরা বাংলাভাষীরা পড়ে যাই সেই ইউরোপীয় দূষিত বায়ুপ্রবাহের এলাকায়। আমাদের শাসক যাকে ঘৃণা করতে বলে, তাকে ঘৃণা করতে শিখি। ...

তার মানে, শিল্পপুঁজির আরাধনাকারী ইউরোপ তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থার কারণেই কর্মক্ষেত্রে যেমন নিরাপদ-বিপজ্জনকের একটা দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে ফেলে, মানসক্ষেত্রেও সেরকম **শ্লীল-অশ্লীলে**র তালিকা তৈরি করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। কেমন জামাকাপড় পরবে, কেমন করে হাঁটবে, বসবে, খাবে, হাত নাড়বে, হাত-ঝাঁকুনি দেবে, কাঁধ-ঝাঁকুনি দেবে, কীভাবে নাচ করবে এবং কোন কোন আচরণ কেমন কেমন করবে না — তার একটা অতিদীর্ঘ তালিকা বানিয়ে ফেলে তারা। এমনকি কেমন করে কথা বলবে, কী কী শব্দ প্রয়োগ করবে, কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে না, তাও তারা ছকে নেয়। এমনকি শুরুতে শেকস্‌পীয়ারকেও **পূতঃকরণ** করে নেয় তারা। (বর্তমানে দেশে-বিদেশে যে শেকস্‌পীয়ার পড়া ও পড়ান হয়, সেটি কিন্তু মূল শেকস্‌পীয়ার নয়, bowdlerize করা বা সেনসর করা শেকস্‌পীয়ার।) এমনকি ঐ শিল্পপুঁজির সাধকেরা উনবিংশ (১৮০১-১৯০০) শতাব্দীতে তাদের মেয়েদের এমন জামাকাপড় পরতে বাধ্য করে, যার সঙ্গে বোরখার মিলই সবচেয়ে বেশি। (দ্র. **পচাল**।) মোটকথা, ইংরেজের শিল্পপুঁজির আরাধনার বাহ্যিক বিধি-নিষেধের সমান্তরালে মানসিক বিধি-নিষেধের এতবড় একটা জাল তৈরি হয়ে গেল যে, রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে (১৮৩০-১৯০০) prudery বা শারীরিক শুচিবাইগ্রস্ত ইংরেজের জীবনে etiquette বা সহবৎ শিক্ষাই একটা সুদীর্ঘ শিক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন যে একটা জাতি **এমন করে নিজেদের হাজার সংস্কারের জালে নিজেদের আবদ্ধ করছিল**, সে প্রশ্ন উঠল না সেদিন। বরং সেই শ্লীল-অশ্লীলের বিধিনিষেধের বেড়াজাল নিয়েই সে এসে হাজির হল আমাদের 'আত্মাবাদী' ভারতে, যে-ভারত কিনা বৌদ্ধযুগের **রামরাজত্বে**র কালেই **শিল্পপুঁজির আরাধনা** করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং হাজার সংস্কারের জালে নিজেকে আবদ্ধ করে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন — 'বৌদ্ধ যুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কার জাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কার জালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে, এমন আর কোন কালেই করে নাই।'

সেই **রামরাজত্বের** উত্তরাধিকারী বাংলাভাষী যখন তাঁদের অধিকাংশ উত্তরাধিকারের মানে ভুলে গেছে, তখন পড়ে যায় এই শিল্পপুঁজির সাধক ইংরেজের সামনে। সাগর পেরিয়ে সে এসেছিল তার মানসলোক নিয়েও। তাকে সামনে আবির্ভূত দেখে বাংলাভাষী এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচকলে পড়ে যায়। আদতে তার নিজস্ব সংস্কৃতি দেহবাদের বিরোধী, সে স্বভাবতই আত্মাবাদী। আত্মাবাদী বলেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক দেহ তার কাছে আদৌ ঘৃণ্য ছিল না; ঠিক যেরকম মাথাকে মাথার মর্যাদা দিয়ে দিলে পায়ের অমর্যাদা হয় না। কিন্তু পা-কে মাথার মর্যাদা দিয়ে দিলে মহা সমস্যার উদয় হয় — 'মাথা-হয়ে-ওঠা-পা'টি দৃশ্য পা-কে দূরছাই করেই ক্ষান্ত হয় না, সেটি কেটে ফেলতে পারলেই তার ইজ্জত বাঁচে! তার চোখে দৃশ্য পা হয়ে যায় **অশ্লীল**। এই মন নিয়েই শাসক ইংরেজ এসেছিল ভারতে। সেই ইংরেজকে আরাধ্য বিবেচনা করে তার শিক্ষাসংস্কৃতি আত্মস্থ করে ভারতীয় মন পড়ে যায় প্যাঁচকলে। তারই ফলশ্রুতি আজকের বাংলা সাহিত্যের **অশ্লীল**তার সাধনা। অবশ্য এই **অশ্লীলতা**র চর্চাও ছিল অনেকাংশে ১৯০০ সালের পরবর্তী কালে (বিপথচালিত) স্বাভাবিক বিশুদ্ধিবাদীর পক্ষ থেকে ভিক্টোরীয়-শুচিবাই-বিরোধিতার অনুকরণ ও অনুসরণ। ... তারই ফলশ্রুতিতে 'আধুনিক' বাংলাভাষীর **পুরুষডাকিনী** বা তদ্রূপ বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জা করে, কিন্তু sexy-জাতীয় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জা করে না। ... দ্র. **পুরুষডাকিনী, ভাতারী (ভাত)**।

● ***শ্বন্ (শু, শ্বস্, শ্বঃ, শ্বাসী, শ্বি, শ্বিত্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবিশ্বস্ত, অবিশ্বাস, অবিশ্বাসী, অশূন্য, আশোআশ, আশোয়াস, অশথ, অশ্বত্থ, অশোদ, আশথ, আশোদ, আশ্বস্ত, আশ্বাস, আশ্বাসক, আশ্বাসন, আশ্বাসনী, আশ্বাসিত, আশ্বাসী, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, বিশ্বস্ত, বিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতক, শন্য, শাদা (সাদাহ্), শাদা-চোখ, শাদাজবা, শাদাজ্বালানী, শাদাটীয়া, শাদাটে, শাদাভাত, শাদাভোগ, শাদামাঠা, শাদারঙ, শাদাশিদা (সাদাসিধা), শুন, শুনঃশেপ (শুনঃশেফ, কুকুরের অণ্ডকোষ?!), শুনক, শুনা, শুনাসীর (শুনা ও সীর), শুনী (শ্ব-স্ত্রীজাতি), শূন, শূনকর, শূনগাত্র, শূনা, শূন্য, শূন্যগর্ভ, শূন্যগেহ, শূন্যঘর, শূন্যচিত্ত, শূন্যদেশ, শূন্যপদবী, শূন্যপাণি, শূন্যপাল, শূন্যবাণী, শূন্যবাদ, শূন্যবাদী, শূন্যমণ্ডল, শূন্যমধ্য, শূন্যমনস্ক, শূন্যমনাঃ, শূন্যময়, শূন্যমুখ, শূন্যমূর্ত্তি, শূন্যরাজ, শূন্যশূন্য, শূন্যহস্ত, শূন্যহৃদয়, শূন্যহস্ত, শূন্যাকার, শূন্যাশয়, শেঁউতী, শেবতী, শোয়াস, শোন, শৌনক, শৌনিক, শৌব, শৌবন, শৌবস্তিক, শ্যেত, শ্বঃ, শ্বঃশ্রেয়স্, শ্বক্রীড়ী (শ্বক্রীড়িন্), শ্বগণ, শ্বগণিক, শ্বগণী, শ্বজীবিকা, শ্বজীবী, শ্বন্, শ্বনিশ, শ্বনিশা, শ্বপক্, শ্বপচ্, শ্বপচ, শ্বপচা, শ্বপচী, শ্বপদ, শ্বপাক, শ্বফল্ক, শ্ববৃত্তি, শ্ববৃত্তী, শ্বব্যাঘ্র, শ্বভ্র, শ্বয়থু, শ্বশুর শ্বশুরক, শ্বশুরঠাকুর, শ্বশুরা, শ্বশুর্য্য, শ্বশ্রূ, শ্বশ্রূজন, শ্বশ্রূঠাকুরাণী, শ্বশ্রূদেবী, শ্বশ্রূশ্বশুর, শ্বশ্রূস্নুষা, শ্বস্, শ্বস, শ্বসন, শ্বসনাশন, শ্বসনোর্ম্মি, শ্বসিত, শ্বসুত, শ্বসুন, শ্বস্তন, শ্বস্তনিক, শ্বস্তনী, শ্বস্ত্য, শ্বা, শ্বাকর্ণ, শ্বাগণিক, শ্বাদ, শ্বাদংষ্ট্রা, শ্বাদন্ত, শ্বান, শ্বানিদ্রা, শ্বানী, শ্বাপদ, শ্বাপদচেষ্টিত, শ্বাপদসেবিত, শ্বাপুচ্ছ, শ্বাপোষক, শ্বাবিৎ (শ্বাবিধ্), শ্বাবিৎশরণ (শ্বাবিচ্ছরণ), শ্বাবিৎরোম (শ্বাবিদ্‌রোম, -রোমন্), শ্বাবিষ্ঠা,

শ্বাভোজন, শ্বামাংস, শ্বাযূথ, শ্বালেহ্য, শ্বাশ, শ্বাশুড়ী, শ্বাশুড়ে, শ্বাশুড়্যা, শ্বাস, শ্বাসকাস, শ্বাসকুঠার, শ্বাসধারণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসরোধ, শ্বাসসাধারণ, শ্বাসহিক্কা, শ্বাসানিল, শ্বাসারি, শ্বাসী, শ্বাসোচ্ছ্বাস, শ্বাস্পৃষ্ট, শ্বিত্, শ্বিত্র, শ্বেত, শ্বেতকণ্টকারী, শ্বেতকন্দা, শ্বেতকমল, শ্বেতকল্প, শ্বেতকাক, শ্বেতকাকীয়, শ্বেতকাণ্ডা, শ্বেতকুঞ্জর, শ্বেতকুশ, শ্বেতকুষ্ঠ, শ্বেতকেতু, শ্বেতকোল, শ্বেতক্ষার, শ্বেতখদির, শ্বেতগঙ্গা, শ্বেতগজ, শ্বেতগরুৎ, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেতচন্দন, শ্বেতচ্ছদ, শ্বেতজীরক, শ্বেতটঙ্কক, শ্বেতটঙ্কণ, শ্বেতদুর্ব্বা, শ্বেতদ্যুতি, শ্বেতদ্বিপ, শ্বেতদ্বীপ, শ্বেতদ্বীপীয়, শ্বেতধাতু, শ্বেতপত্র, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতপাথর, শ্বেতপিঙ্গ, শ্বেতপিঙ্গল, শ্বেতপিঙ্গলক, শ্বেতবচা, শ্বেতবাঃ, শ্বেতবাজী, শ্বেতবারাহ, শ্বেতবাসাঃ, শ্বেতবাহ, শ্বেতবাহন, শ্বেতবাহী, শ্বেতবৃহতী, শ্বেতভিক্ষু, শ্বেতভানু, শ্বেতমক্ষিকা (শ্বেতমক্ষী, শ্বেতমাছি, শ্বেতমাছী), শ্বেতময়ূখ, শ্বেতমরিচ, শ্বেতমাধব, শ্বেতমুনি, শ্বেতরক্ত, শ্বেতরঞ্জন, শ্বেতরথ, শ্বেতরূপ্য, শ্বেতরোচিঃ, শ্বেতরোহিত, শ্বেতশিম্বিকা, শ্বেতশুঙ্গ, শ্বেতশৃঙ্গ, শ্বেতশূরণ, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেতসার, শ্বেতহস্তী, শ্বেতাংশু, শ্বেতাদ্রি, শ্বেতাম্বর, শ্বেতার্ক, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতেক্ষু, শ্বেতোদর, শ্বেত্র, শ্বেবতী (শেবতী, সেবতী, সেউতি, সেমন্তী), শ্বৈত্য, শ্বোবসীয়স, শ্বোভাবী, শ্বোমরণ, সুনা (শূন্য), সুনা-জমি।

● **শ্বন্ (শ্, শ্বস্, শ্বঃ, শ্বাসী, শ্বি, শ্বিত্)** = বিচ্ছুরণ-বহন। **শ্বন** = বিচ্ছুরণের বহন যাহাতে। **শ্** = নবরূপী বিচ্ছুরণের আধার যে। **শ্বস** = বিচ্ছুরণ-বাহকের নির্য্যাস যাহাতে। **শ্বঃ** = বিচ্ছুরণ-বাহক নিঃশেষ যাহাতে। **শ্বাসী** = **শ্বাস** (= শ্বস হইতে জাত) এর গতিশীল আধার যে। **শ্বি** = গতিশীল বিচ্ছুরণ-বাহক যাহাতে। **শ্বিত** = গতিশীল বিচ্ছুরণ-বাহক তারিত যাহাতে।

● **আশ্বস্ত, আশ্বাস (বিশ্বাস, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস)** : ১. **আশ্বস্ত** = আ + ✓শ্বস্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। **আশ্বাস** = আ + ✓শ্বাসি + অ - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *আশ্বস্ত*** = ***শ্বস্ত*** *(শ্বস্ তারিত যাহাতে) এর আশ্রয় যে।* ***আশ্বাস*** *= শ্বাসের আশ্রয় যাহাতে।* ৩. সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, ভয়বারণার্থ ব্যাপার, দুঃখপ্রশমন, শান্ত করা, বুঝান, অভয় দেওয়া। (ব.শ.)। ৪. অভয় দেওয়া অর্থে প্রচলিত। ৫. 'ওঃ, বাঁচলাম!' বলে কেউ যখন লম্বা শ্বাস গ্রহণ করে, তখন বোঝা যায়, 'আশ্বাস' কী বস্তু। এইরকম **'শ্বাস'**-এর আশ্রয় থাকে আশ্বাসে। **নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস** (উৎশ্বাস)-এও এই শ্বাসের রকমফের থাকে। **বিশ্বাস**-এর জন্য **দেবযান** দ্রষ্টব্য।

● **শুনঃশেপ, শুনঃশেফ** : ৩. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে ... **হরিশ্চন্দ্র** নিঃসন্তান হওয়ায় পণ করেন যে, তিনি সন্তান লাভ করলে পুত্রকে **বরুণে**র নিকট উৎসর্গ করবেন। তাঁর রোহিত নামে এক পুত্র হয়; কিন্তু পিতা নানা অছিলায় প্রতিজ্ঞা পালনে বিলম্ব করতে থাকেন। তারপর পিতা পুত্রকে উৎসর্গ করতে মনস্থ করলে পুত্র অসম্মত হন এবং বনে গমন করে ছয় বৎসর বাস করতে থাকেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ-ঋষির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই ঋষির তিনটি পুত্র ছিল। রোহিত ঋষিকে ১০০ গাভী দান করে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করেন এবং এঁকে নিজের পরিবর্তে উৎসর্গ করবেন বলে স্থির করেন। বরুণ এঁকে গ্রহণ করতে রাজী হন, কিন্তু শুনঃশেফ সেই সময় বিভিন্ন দেবতার পূজা-অর্চনা করে নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন এবং **বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিলিত হন।**

রামায়ণে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে — ঋচীক মুনির মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ। এক সময় অযোধ্যার রাজা **অম্বরীষ** অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করলে, ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করেন। অম্বরীষের পুরোহিত বলেন, রাজার দোষে পশু অপহৃত হওয়াতে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। একটি নরবলি এর বিহিত প্রায়শ্চিত্ত। রাজা নরবলি দানে অভিলাষী হয়ে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি ঋচীকের নিকটে এসে এক লক্ষ ধেনু মূল্যের পরিবর্তে ঋচীকের প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করতে বললেন। কিন্তু মহর্ষি ... মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে বহু সুবর্ণ, রত্ন ও ধেনুর পরিবর্তে নিয়ে যেতে বললেন। শুনঃশেফ রাজা অম্বরীষের সহিত যাওয়ার সময় তাঁর মাতুল **বিশ্বামিত্র**কে পেয়ে পায়ে পড়ে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের পুত্রদের যজ্ঞের পশু হয়ে শরণাগতকে শুনঃশেফের প্রাণরক্ষা করতে বললেন। বিশ্বামিত্রের পুত্ররা ... অস্বীকার করলে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিলেন, তারা কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে সহস্র বৎসর জীবনযাপন করবে। তারপর তিনি শুনঃশেফকে বললেন, তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হয়ে **বৈষ্ণব**-যূপে পাশ দ্বারা আবদ্ধ হবে, তখন তুমি দুইটি অগ্নিস্তুতি কোরো। তাহলে তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। তারপর শুনঃশেফকে পশুরূপে যূপকাষ্ঠে বাঁধা হলে তিনি অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে স্তব করলেন। এই স্তব শুনে দেবতারা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করে যজ্ঞাগ্নি হতে রক্ষা করলেন। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **যাতুধানী, অজীগর্ত্ত (জন্), অপত্যবিক্রয়ী (পত্)**।

● **শ্বেতকেতু** : ২. *দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণবাহী তারিত যে কেতুতে; যে সাদা পতাকা তুলে দিয়েছে।* ৩. মহর্ষি **উদ্দালকে**র পুত্র। একদা ইনি পিতামাতার নিকট উপবিষ্ট থাকার সময়ে এক ব্রাহ্মণ এঁর পিতার সমক্ষেই মাতার হস্ত ধারণ করে বলপূর্বক নিয়ে যান। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় **উদ্দালক** এঁকে ক্রোধ করতে নিষেধ করে বলেন, সকল স্ত্রীই গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না — **ইহাই সনাতন ধর্ম**। শ্বেতকেতু তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলপূর্বক মানবসমাজে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, আজ হতে যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে, যে পুরুষ ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, এবং পতি-আজ্ঞা পেয়েও যে স্ত্রী ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে আপত্তি করবে, তারা সকলেই ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হবে। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **আরুণি, দুষ্মন্ত, উদ্দালক**। না, যাঁরা নিজেদের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করেন, তাঁদের ইতিহাসে — কবে থেকে একপতি-পত্নীত্বমূলক পরিবারপ্রথার প্রচলন হল, কেমন করে হল — তার কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভারতের ইতিহাসে আছে। **শ্বেতকেতু** হলেন সেই সামাজিক সত্তা যিনি এই রীতিটি প্রথম 'বলপূর্ব্বক' প্রচলিত করেন। তবে, এতে নারীর ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন স্বীকৃত। পরবর্তীকালে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। ...

● **শ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা** : অশৌণ্ডীর, শ্, শ, শওগাত, শক (সক, সখ, শৌক্), শকার-বকার (চকার-বকার), শনাক্ত (সনাক্ত), শরাকৎ (শরাগত, শরিক, শরীক, শরীকানা, সরাকৎ,

সরাগত), শশ্রুপাটা, শস, শাউড়ি, শাঁড়ক (সাঁড়ক, সাড়ক), শাঁড়া (সাঁড়া, সাড়া, — এটি নিশ্চিত 'ষাঁড়া' হবে। ষাঁড়া বেটাছেলে অর্থে প্রয়োগ হয়। মোরগকে 'ষাঁড়া' বলা গ্রামের স্বাভাবিক রীতি।), শাঁৎ, শাঁশাঁ, শাকরেদ (শাগরেদ) শাকরেদী, শাখোট, শাখোটক (অপ্সরাগাছ, Trophis aspero), শাগরেদ, শাঙ্গ, শাঙ্গি, শাঞ্চ, শাঞ্চি (সাঁচি?), শাদা (সাদাহ্), শাদী (সাদি, দ্র. আত্ম'সাৎ', সদ্-সাদি), শানক (সানক), শান (সান, সানকি), শানা (সানা, সানসি), শানাই (সানাই) শানাগ্রি, শানান (সান, সানা, সানাকর, সানাভাত, সানাই, সানাগ্রি, সানাইদার, সানাইদারী, সানায়ী, সানি, সানী, সানাসানি, সানী, সানিকা, সানেয়িকা, সানেয়ী), শানুক, শাবান, শাবাশ, শাবাশী, শাবুৎ, শামলা (আমলা, মামলা), শামাদান, শামিয়ানা, শামিল (সামিল), শাল, শালকিরানি, শালগম, শাল-দোশালা, শালবন, শালিয়ানা (সালিনা, সালানা), শালিশ (সালিস), শালিশী (শালিসী), শালু (লাল শালু), শাশ (শ্বশ্রূ), শাশি (sash), শাশুড়ি, শাহ, শাহজাদা (শাসকজাত), শাহজাদী, শাহনশাহ, শাহনামা, শাহানা (সাহানা), শাহসাহেব, শিঁক (শিক, সিঁক, সিক), শিক-কাবাব, শিপি, শিপিবিষ্ট, শিপ্র, শিপ্রা, শিয়া (শিআহ্), শিরণি (শীরিনি, সিন্নি, সিবিণি, সিরিনি, সির্ণি), শিরণি-মানা, শিরিশ (সিরিশ), শিরিশ-কাগজ, শিরোহী, শিশা, শিশামহল, শিশি, শুগলী (চুগলি), শুমার (সুমার), শুমারী (আদমশুমারী), শুরকী (সুরকী), শুরু (শুরউ), শুরুয়া, শুর্শা, শেওড়া (স্যাওড়া), শেত, শেতকুয়া, শেতবান্দা, শেতখানা (সেতখানা), শেনাক্ত (সেনাক্ত), শেস্ত, শের (সের, একসের, দু-সের ...), শেলেখানা (সেলেখানা), শোবেহ (শুবহ্), শোয়ার (আশোয়ার, অশ্বারোহী), শোর, শোলঙ্গ, শোলা (সোলা, দ্র. সম্), শৌকিন (শৌকীন, সৌখিন, সৌখীন), শ্রপণ, শ্রপণা, শ্রপিত, শ্রা, শ্রাণ, শ্রাণা, শ্রৈ।

ষ

ষ্ বর্ণের অর্থ : ষ = ষ্-অন করে যে; দিশাগ্রস্ত-বিচ্ছুরণ, দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণকারী। দ্র. **শ** বর্ণের অর্থ। সেখানেই বিস্তারিত করা আছে। **ষ** = বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ, কেশ, মানব, গর্ভবিমোচন, সর্ব্ব, ভ্রূণ। দ্র. **শ**।

● **ষ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা :** *ষট্, ষণ্ (সন্)*, ষ্ঠিব্।

● **ষ্ (ষট্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** ছ, ছঁই, ছঁউই, ছএ, ছক, ছক্কা, ছচল্লিশ, ছটাক, ছত্রিশ, ছপর, ছপ্পয়, ছপ্পায়, ছয়, ছষট্টি, ছাপ্পান্ন, ছাব্বিশ, ছিয়াত্তর, ছিয়াশি, ছিয়ানব্বই, ষ্, ষ, ষ-কার, ষট্ (ষষ্), ষটাঙ্ঘ্রি, ষট্ক, ষট্কর্ণ, ষট্কর্ম্মা(-র্ম্মন্), ষট্কোণ, ষট্চক্র, ষট্চক্রকথা, ষট্চক্রপ্রভেদ, ষট্চক্রভেদ, ষট্চত্বারিংশ, ষট্চত্বারিংশৎ, ষট্চত্বারিংশত্তম, ষট্চরণ, ষট্তিলী, ষট্ত্রিংশ, ষট্ত্রিংশৎ, ষট্ত্রিশত্তম, ষট্পঞ্চাশ, ষট্পঞ্চাশৎ, ষট্পঞ্চাশত্তম, ষট্পদ, ষট্পদজা, ষট্পদপ্রিয়, ষট্পদশ্রেণী, ষট্পদালী, ষট্পদী, ষট্পাদ, ষট্প্রজ্ঞ, ষট্শত, ষট্শতী, ষট্শাস্ত্র, ষট্শাস্ত্রী, ষট্শিরাঃ, ষট্ষষ্টি, ষট্ষষ্টিতম, ষট্সন্দর্ভ, ষট্সপ্ততি, ষট্সপ্ততিতম, ষড়ংশ, ষড়ক্ষর, ষড়ক্ষরী, ষড়ঙ্গ, ষড়ঙ্গজিৎ, ষড়ঙ্গন্যাস, ষড়ঙ্গবিৎ, ষড়ঙ্গিনী, ষড়ঙ্গী, ষড়ঙ্ঘ্রি, ষড়ভিজ্ঞ, ষড়শীতি, ষড়শীতিতম, ষড়শ্র, ষড়শ্রি, ষড়ষ্টক, ষড়স্র, ষড়স্রি, ষড়হ, ষড়ানন, ষড়াম্নায়, ষড়ূর্ম্মি, ষড়ূষণ, ষড়ৈশ্বর্য্য, ষড়্গব, ষড়্গয়া, ষড়্গুণ, ষড়্গুণধারিণী, ষড়্গ্রন্থা, ষড়্গ্রন্থি(ন্থী), ষড়্জ, ষড়্জসংবাদী, ষড়্দশ, ষড়্দর্শন, ষড়্দুর্গ, ষড়্ধা, ষড়্বক্ত্র, ষড়্বদন, ষড়্বর্গ, ষড়্বিংশ, ষড়্বিংশতি, ষড়্বিংশতিতম, ষড়্বিধ, ষড়্বিন্দু, ষড়্ভাক্, ষড়্ভাগ, ষড়্ভাব, ষড়্ভুজ, ষড়্ভুজা, ষড়্যন্ত্র, ষড়্যন্ত্রী, ষড়্রস, ষড়্রাগ, ষড়্রাত্র, ষড়্রিপু, ষড়্রেখা, ষড়্লবণ, ষণ্নবতি, ষণ্নবতিতম, ষণ্মাতুর, ষণ্মাস, ষণ্মাসিক, ষণ্মুখ, ষণ্মুখা, ষত্ব, ষত্ববিধান, ষষ্ট, ষষ্টি, ষষ্টিক, ষষ্টিকা, ষষ্টিক্য, ষষ্টিজ, ষষ্টিবর্ষী, ষষ্টিভাগ, ষষ্টিবাসরজ, ষষ্টিযোজন, ষষ্টিরাত্র, ষষ্টিশালি, ষষ্টিসংবৎসর, ষষ্টিসহস্রী, ষষ্টিহায়ন, ষষ্ঠ, ষষ্ঠকাল, ষষ্ঠভক্ত, ষষ্ঠম, ষষ্ঠাংশ, ষষ্ঠান্ন, ষষ্ঠান্নকালিক, ষষ্ঠী, ষষ্ঠীকল্প, ষষ্ঠীজাগর, ষষ্ঠীজাগরণ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতলা, ষষ্ঠীদিন, ষষ্ঠীপূজন, ষষ্ঠীপূজা, ষষ্ঠীপ্রিয়, ষষ্ঠীবাটা, ষষ্ঠীবুড়ী, ষষ্ঠীসমাস, ষষ্ঠ্যাদিকল্প, ষাইট, ষাট, ষাট (ষাঠ, সাঠ), ষাটি (ষাঠি), ষাটিনী, ষাটিয়ারা, ষাট্কৌশিক, ষাট্পৌরুষিক, ষাড়ব, ষাড়বিক, ষাড়্গুণ্য, ষাড়্বর্গিক, ষাড়্বিধ্য, ষাড়্রসিক, ষাণ্মাতুর, ষাণ্মাসিক, ষাত্বণত্বিক, ষেটেরা (ষেঠেরা), ষোড়শ (-শন্), ষোড়শক, ষোড়শকলা, ষোড়শদান, ষোড়শবন্ধ, ষোড়শবর্ষ, ষোড়শভুজা, ষোড়শমাতৃকা, ষোড়শর্ত্বিক্ক্রতু, ষোড়শসহস্র, ষোড়শাংশ, ষোড়শাংশু, ষোড়শাঙ্গ, ষোড়শাঙ্গুলক, ষোড়শার, ষোড়শী, ষোড়শোপচার, ষোড়শিকা, ষোড়শ্য, ষোঢ়া, ষোঢ়ান্যাস, ষোঢ়ামুখ, ষোঢ়াসিদ্ধ, ষোল, ষোলআনা, ষোলই, ষোলকলা, ষোলবাণ, সাইট।

● **ষট্** = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরিতের টঙ্কারণ। **ষট** = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরিতের টঙ্কার যাহাতে।

● **ষট্কর্ম্ম :** ৩. স্মৃতি মতে — যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। তন্ত্র মতে — মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, ও শান্তি। (মারণ = প্রাণহারী ক্রিয়া — দেবতা কালী; উচ্চাটন = স্বস্থান হতে উচ্ছেদ করবার ক্রিয়া — দেবতা দুর্গা; স্তম্ভন = সকলের প্রবৃত্তিরোধক অর্থাৎ কার্যকারিতা শক্তি অবরোধকারী ক্রিয়া — দেবতা রমা; বিদ্বেষণ = প্রণয়ীদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষজনক ক্রিয়া — দেবতা জ্যেষ্ঠা; বশীকরণ = যে ক্রিয়ায় লোক বশীভূত হয় — দেবতা বাণী; ও শান্তি = যে ক্রিয়া দ্বারা রোগ, খারাপ কাজ, গ্রহদোষ নিবারিত হয় — দেবতা রবি।) যোগশাস্ত্র মতে — দৃঢ়তা (আসনের দ্বারা), ধৈর্য (প্রত্যাহার দ্বারা), স্থৈর্য (মুদ্রা দ্বারা), লাঘব (প্রাণায়াম দ্বারা), প্রত্যক্ষ (ধ্যানের দ্বারা), নির্লিপ্ত (সমাধি দ্বারা), শোধন (ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকা, ত্রাটক ও কপালভাতি)। (পৌ.অ.)। ৫. মনুসংহিতার মতে, ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্তব্য — যজন (নিজে কর্মযজ্ঞ করে, চাষাবাদ ইত্যাদি করা), যাজন (অন্যকে তার কর্মযজ্ঞে পরামর্শ দেওয়া), অধ্যয়ন (নিজে জ্ঞান অর্জন করা), অধ্যাপন (অন্যকে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা), দান (অভাবীদের অভাব পূর্ণ করা), **প্রতিগ্রহ** (পরিবর্তে কিছু নেওয়া)। মনুসংহিতার এই নীতি প্রণীত হয়েছিল **দক্ষযজ্ঞের** পরে। তার আগে পর্যন্ত **ব্রাহ্মণ** প্রতিগ্রহ করতেন না। ...

● **ষট্চক্র :** ১. ষট্ + চক্র। দ্র. **নাড়িনক্ষত্র**। ২. *যাহা ছয়টি চক্রাকারে স্থিত রয়েছে।* ৩. তন্ত্র মতে, শরীরে সুষুম্ণা নাড়ী-মধ্যস্থ

পদ্মাকৃতি ষট্‌সংখ্যক চক্র। যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। মূলাধার — প্রথম বা আদ্য চক্র। ইহা কুণ্ডলিনী শক্তির আধার। ইহা সুষুম্ণার অধোমুখে সংলগ্ন, গুহ্যের অধোদেশে স্থিত, রক্তবর্ণ ও চতুর্দ্দল। ইহা গুহ্য-লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয়মিত স্থান এবং কুণ্ডলিনীশক্তির প্রধান আধার। ইহা লোহিত ও চতুর্দ্দল, ব শ ষ স চতুর্দ্দলের মাতৃকাবর্ণ। ইহাতে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপ ত্রিকোণমধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অবস্থিত। এই স্বয়ম্ভুকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত ও তাঁহার অমৃতনির্গমন-স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া ভুজগরূপা কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা আছেন। সাধক সাধনাবলে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিয়া সহস্রারে সদাশিবের সহিত সম্মিলিতা করেন। ইহা সাধনার চরম ফল। স্বাধিষ্ঠান — দ্বিতীয় চক্র। ইহা লিঙ্গ মূলে স্থিত, সিন্দুররাশিবৎ অরুণবর্ণ ষড়দল। ছয় দলে মাতৃকাবর্ণ ব ভ ম য র ল। স্ব স্বীয় লিঙ্গ, তাহাতে অধিষ্ঠান যাহার; তাহাই স্বাধিষ্ঠান। মণিপুর — নাভিস্থিত পদ্মাকার তৃতীয় চক্র। ইহা নাভিমূলে স্থিত, মেঘবৎ সুনীলবর্ণ ও দশদল — ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এর মাতৃকাবর্ণ। অনাহত — চতুর্থ চক্র। ইহাতে শব্দব্রহ্মময় বাণলিঙ্গ অবস্থিত; সুতরাং, ইহা হইতে অনাঘাতজাত শব্দ উত্থিত হয় এবং সেই হেতু ইহার নাম 'অনাহত'। ইহা হৃদয়ে স্থিত, বন্ধকপুষ্পবৎ লোহিত ও দ্বাদশদল। দ্বাদশ দলে মাতৃকাবর্ণ — ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ। বিশুদ্ধ — পঞ্চম চক্র। ইহা কণ্ঠদেশে স্থিত, গাঢ় ধূম্রবর্ণ ও ষোড়শ দল — অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এর মাতৃকাবর্ণ। আজ্ঞা — ষষ্ঠ চক্র। ইহা ভ্রূ মধ্যে স্থিত, চন্দ্রসদৃশ শুভ্র ও দ্বিদল। মাতৃকাবর্ণ — হ ক্ষ। তন্ত্রসাধকদের বয়ানে বলা হয় — 'মূলাধারে যে চক্র আছে তাহা স্বর্ণবর্ণ। সেই চক্রে চতুর্দল পদ্ম আছে, চতুর্দল পদ্মের চারিটি দল (পত্র) ক্রমে ব শ ষ স এই চারি বর্ণের দ্বারা যুক্ত, আর সেই পদ্মের বর্ণগুলি তপ্ত সুবর্ণের মতো প্রভাযুক্ত। সেই চক্রে গণেশ অবস্থিত। তারপর স্বাধিষ্ঠান চক্র। উহার বর্ণ রক্তবর্ণ কীটতুল্য। এই পদ্মের ছয়টি দল আছে। সেই ছয়টি বর্ণ যথাক্রমে ভ ম য র ল ব, এই বর্ণগুলির রং প্রকাশমান প্রবালের মত। বর্ণগুলি স্পষ্ট। এই চক্রে ব্রহ্মা অবস্থান করেন। তৃতীয় চক্র নীলবর্ণ অর্থাৎ পদ্মটি নীলবর্ণ। উহার নাম মণিপুর। উহা নাভিতে বিদ্যমান। এই পদ্মের দশটি দল (পত্র) আছে। সেই পত্রে যথাক্রমে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটি বর্ণ আছে। সেই বর্ণ বা অক্ষরগুলির রং বিদ্যুতের মত। এই চক্রে গদাধর হরি প্রকটভাবে বিদ্যমান। চতুর্থ চক্র হৃদয়দেশে বিদ্যমান। এই চক্রের পদ্মের বারোটি দল আছে। পদ্মটির রং পিঙ্গল। আর তাহাতে যে বর্ণগুলি আছে তাহার রং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রভার মত। সেই বর্ণগুলি যথাক্রমে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ। এই চক্রে শিব বিদ্যমান। ইহার নাম অনাহত চক্র। ইহার পর বিশুদ্ধ চক্র। এই চক্রে পদ্মের বর্ণ ধূম্র। এই পদ্মের ১৬টি দল আছে। তারা যথাক্রমে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং (ং) অঃ (ঃ)। এই বর্ণগুলির রং মাণিক্যের মত। এই চক্র কণ্ঠে অবস্থিত। এই চক্রে জীবাত্মা অবস্থিত। তারপর আজ্ঞাচক্র জানিবে। এই আজ্ঞাচক্র ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে বিদ্যমান। এই চক্রের পদ্মটি কোটি বিদ্যুৎ-প্রভাতুল্য প্রভাযুক্ত। এই পদ্মে দুইটি দল — হ ক্ষ, এই দুই বর্ণ বিদ্যমান। বর্ণ দুইটির রং শুভ্র। এই চক্রে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। **৪. ৫.** দ্র. **আজ্ঞাচক্র, তন্ত্র**।

ষট্‌চক্র

চক্রের নাম	অবস্থান	দল	দেবতা	রং	বর্ণ
মূলাধার	গুহ্য-অধোদেশে	চতুর্দল	গণেশ	স্বর্ণবর্ণ	ব শ ষ স
স্বাধিষ্ঠান	লিঙ্গমূলে	ছয় দল	ব্রহ্মা	রক্তবর্ণ	ভ ম য র ল ব
মণিপুর	নাভিতে	দশদল	হরি	নীলবর্ণ	ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ
অনাহত	হৃদয়ে	বারোদল	শিব	পিঙ্গলবর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ
বিশুদ্ধ	কণ্ঠে	ষোলোদল	জীবাত্মা	ধূম্রবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
আজ্ঞা	ভ্রূদ্বয়মধ্যে	দ্বিদল	পরমাত্মা	শুভ্রবর্ণ	হ ক্ষ

● **ষড়ঙ্গ : ৩.** বেদের ছয়টি ভাগ — **শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ**। (পৌ.অ.)।

● **ষড়দর্শন : ৩.** বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা — এই ছয়টি **দর্শন** শাস্ত্র। (পৌ.অ.)।

● **ষড়যন্ত্র : ৫.** দ্র. **অগস্ত্য, পঞ্চকর্ম্ম**।

● **ষড়ভুজা : ৩.** দুর্গার মূর্তিভেদ। চণ্ডিকা, রুদ্রচণ্ডা ও চণ্ডাবতী — এই তিন মূর্তি ষড়ভুজা বলে নির্দিষ্ট হয়েছেন।

● **ষোড়শী : ৩.** (ক) দেবী শতাক্ষীর (দুর্গাদেবীর এক নাম) দেহ হতে উৎপন্ন এক মহাশক্তি। (খ) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিদ্যা। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **দশমহাবিদ্যা**।

● **ষোড়শমাতৃকা :** দ্র. **মাতৃকা**।

● ***ষণ্ (সন্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** ষণ্ড (কদলীষণ্ড, কমলষণ্ড ...), ষণ্ডক, ষণ্ডা, ষণ্ডামার্ক, ষণ্ডামার্ক, (ষণ্ডামার্কা, দ্র. শণ্ডামর্ক — 'শম্'।), ষণ্ডামি, ষণ্ঢ (দ্র. শণ্ঢ - শম্) ষণ্ঢক, ষণ্ঢতিল, ষণ্ঢত্ব, ষণ্ঢপতি, ষাঁড়, ষাঁড়াষাঁড়ি (ষাঁড়াষাঁড়ির বান), ষাঁড়িনী, ষাঁঢ়িতিল, ষাণ্ঢ্য, ষিড়্‌গ, সণ, সণ্ড।

● **ষণ্ (সন্)** = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **ষণ** = দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে। **সন** = সত্তামাত্র অন যাহাতে।

● **ষণ্ড : ৩.** বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ অনুসারে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র। এই দুই ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক ছিল। বরাহকল্পে দেবাসুরের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবপক্ষে থেকে এরা যুদ্ধ করে। প্রথমে এরা অসুরদেরই সেনাপতি ছিল এবং দেবতাদের পরাজিত করে। তখন দেবতারা মন্ত্রণা করে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ষণ্ডামর্ককে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত করেন। এই দুই জনকে অমৃত পান করিয়ে দেবতারা এদের অসুর পক্ষ ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। অমৃতপানে মত্ত এই দুই দানব-সেনাপতি তখন অসুর পক্ষ ত্যাগ করে। ফলে দেবতারা অসুরদের পরাজিত করেন। (পৌ.অ.)। **৫.** এই **ষণ্ডামর্ক**

কথাটি উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ইংরেজ ভারতে আসার পর আমরা তাকে **ষণ্ডামার্কা** বানিয়ে ফেলেছি। ...

● **ষ্ঠিব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : নিষ্ঠীবন, ষ্ঠিব্, ষ্ঠীব্, ষ্ঠীবন, ষ্ঠীবী, ষ্ঠেবন, ষ্ঠেবিতা, ষ্ঠেবী, ষ্ঠ্যূত।

ষ্ঠিব্ = গতিশীল দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ-স্থিতির বহন। **ষ্ঠিব** = গতিশীল দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ-স্থিতি বহন করে যে।

স

স্ বর্ণের অর্থ : স = স্-অন করে যে; অস্তিত্বমাত্র, সত্তামাত্র। দ্র. **শ** ও **র** বর্ণের অর্থ।

● **স্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা :** সচ্, সজ্জ, সদ্ (সাদি), *সন্, সন্জ্, সপ্, সম্, সল্, সহ্, সাধ্ (সাধি)*, সান্ত্ব্, *সি*, সিচ্, সিধ্, সিব্, সু, *সুখ্, সুর্*, সূ, *সূচ্*, সৃ, সৃজ্, সৃপ্, সেব্, সো, স্কন্দ্, স্খল্, *স্তন্ (স্তেন্)*, *স্তম্ভ্ (স্তন্ভ্, স্তিম্)*, স্তু (স্তুচ্), *স্তৃ (স্তৃ়)*, *স্ত্যৈ*, স্থা (*স্থূল্*), স্না (স্নিহ্, *স্নু, স্নুহ্*), স্পন্দ্, স্পর্দ্ধ্, *স্পশ্*, স্পৃশ্, স্পৃহ্, *স্ফট্ (স্ফুট্)*, *স্ফর্ (স্ফুর্, ছুর্)*, *স্ফল্ (স্ফালি, স্ফুল্)*, *স্ফায়্*, স্মি (স্মৃ), স্যন্দ্ (*স্যম্*), *স্রন্স্ (স্রংস্)*, *স্রু*, স্বদ্, স্বপ্, স্বৃ, স্।

● **সচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ছাতু, শক্তু, শক্তুকার, শক্তুপূর্ণ, শক্তুরক্ষা, শক্তুশরাব, সক্তু, সক্তুক, সক্তুকার, সক্তুকারক, সক্তুপ্রস্থ, সক্তুফলা, সচ্, সচ।

সচ্ = সত্তার চয়ন। **সচ** = সত্তার চয়ন যাহাতে।

● **সজ্জ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অসাজন্ত, সজ, সজ্জ্ (সস্জ্), সজ্জ, সজ্জন, সজ্জনা, সজ্জা, সজ্জা-গজ্জা (সাজুগুজু), সজ্জিত, সজ্জিতা, সজ্জীকৃত, সজ্জীভূত, সাঁজা-গাই, সাঁজায়-নেওয়া, সাঁজোয়া (সাজুয়া), সাজ, সাজগোজ, সাজঘর, সাজসজ্জা, সাজসরঞ্জাম, সাজন, সাজনা, সাজনি, সাজনী, সাজন্ত, সাজন্তী, সাজা, সাজা (সাঁজা, সাঞ্জা - যৌথ), (দুধে সাজা), সাজান-গোছান, সাজি(জী), সাজিমাটি (সাজীমাটি), সুসজ্জ।

● **সজ্জ্** = সত্তাজননের জনন। **সজ্জ** = সত্তাজননের জনন যাহাতে।

● **সদ্ (সাদি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (মূলত এটি অস্ ক্রিয়া থেকে জাত, কিন্তু সৎ হল তার শাখা), অনাসাদিত, অপ্রসাদ, অবসন্ন, অসজ্জন, অসৎ, অসতি, অসতী, অসত্তা, অসত্ত্ব, অসৎপুত্র, অসৎপ্রতিগ্রহ, অসত্য, অসত্যসন্ধ, অসদাগম, অসদাচার, অসদাচারী, অসদ্গ্রহ, অসদ্ধর্ম্ম, অসদ্ধেতু, অসদ্বুদ্ধি, অসদ্ভাব, অসন্মার্গ, আসত্তি, আসন্ন, আসন্নকাল, আসন্নপরিচারক, আসন্নপ্রসবা, আসন্নমৃত্যু, আসন্নসখী, আসাদন, উৎসন্ন, উৎসাদন, ছত্র, ছাঁচ, ছাঁচি, দুরাসদ, নিষণ্ণ, প্রসন্ন, প্রসাদ, প্রাসাদ, বিষণ্ণ, বিষাদ, শচ্ (সচ্), শচি, শচী, শচীতীর্থ, শচীনন্দন, শচীপতি, শচীভর্ত্তা, শচীরমণ, শচীন্দ্র, শচীশ, সংসদ, সচ (সচ্চা, সাঁচ), সচি সচিব, সচিবা, সচিবী, সচ্চরিত, সচ্চরিত্র, সচ্চিতা, সচ্চিদংশ, সচ্চিদাত্মা, সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দমূরতি, সচ্চিদানন্দমদ্বয়ংব্রহ্মাং, সচ্চিন্ময়, সচ্ছল (সৎ-ছল), সচ্ছাত্র (সৎ-শাস্ত্র), সচ্ছূদ্র, সচ্ছ্লোক, সজ্জন (সৎ-জন), সজ্জনগোষ্ঠী, সজ্জনসঙ্গতি, সজ্জনোদয়, সজ্জাতি, সৎ, সৎকথা, সৎকদম্ব, সৎকরণ, সৎকর্তব্য, সৎকর্ত্তা, সৎকর্ম্ম, সৎকলা, সৎকবি, সৎকাব্য, সৎকার, সৎকারণ, সৎকার্য্য, সৎকুল, সৎকৃত, সৎকৃতা, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া, সৎপতি, সৎপথ, সৎপরিগ্রহ, সৎপাত্র, সৎপুত্র, সৎপুরুষ, সৎপ্রতিগ্রহ, সৎপ্রতিপক্ষ, সৎমা, সৎমাও, সৎশাশুড়ী, সৎশূদ্র, সৎসংসর্গ, সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গজ, সৎসঙ্গতি, সৎসন্নিধান, সৎসমাগম, সৎসম্পর্ক, সৎসম্প্রয়োগ, সততা, সতী, সতীত্ব, সতীপণ, সতীপণা(না), সতী-মা, সতীলক্ষ্মী, সতীসাধ্বী, সতীসাবিত্রী, সত্ত, সত্তম (দ্বিজসত্তম, মুনিসত্তম, বাজিসত্তম ...), সত্তা, সত্তি, সত্র (সত্ত্র), সত্রগৃহ, সত্রপরিবেষণ, সত্রফলদ, সত্রবসতি, সত্রযাগ, সত্রশালা, সত্রাজিৎ, সত্রী (সত্ত্রী), সত্ত্ব, সত্ত্বকর্ত্তা, সত্ত্বক্ষয়, সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণী, সত্ত্বৎ, সত্ত্বধাম, সত্ত্বপ্রধান, সত্ত্ববান, সত্ত্ববিপ্লব, সত্ত্ববিহিত, সত্ত্বমেজয়, সত্ত্বরাশি, সত্ত্বলক্ষণ, সত্ত্বলোক, সত্ত্বসংপ্লব, সত্ত্বসংশুদ্ধি, সত্ত্বসমাবিষ্ট, সত্ত্বসম্পন্ন, সত্ত্বসার, সত্ত্বস্থ, সত্ত্বহর, সত্ত্বহীন, সত্ত্বাত্মা, সত্ত্বান্, সত্ত্বানুরূপ, সত্ত্বোৎকর্ষ, সত্ত্বোৎসাহ, সত্ত্বোদ্রেক, সত্য, সত্যকাম, সত্যকৃৎ, সত্যক্রিয়া, সত্যঘ্ন, সত্যঙ্কার, সত্যজিত, সত্যতা, সত্যদর্শী, সত্যধন, সত্যনামা, সত্যনারায়ণ, সত্যপর, সত্যপীর, সত্যপুর, সত্যপূত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যপ্রতিশ্রব, সত্যপ্রিয়, সত্যবচন, সত্যবচাঃ, সত্যবতী, সত্যবতীসুত, সত্যবন্ত, সত্যবাক্, সত্যবাক্য, সত্যবাদী, সত্যবান, সত্যবিক্রম, সত্যবৃত্ত, সত্যবৃত্তি, সত্যব্রত, সত্যব্রতী, সত্যভামা, সত্যভাষণ, সত্যমান, সত্যমেধাঃ, সত্যযুগ, সত্যযুগাদ্যা, সত্যযৌবন, সত্যরত, সত্যলোক, সত্যশীল, সত্যশ্রাবণ, সত্যসংরক্ষণ, সত্যসঙ্কল্প, সত্যসঙ্গর, সত্যসন্ধ, সত্যসন্ধা, সত্যসাক্ষী, সত্যস্থ, সত্যহিত, সত্যাকৃতি, সত্যাগ্রহ, সত্যাত্মক, সত্যানৃত, সত্যাপন, সত্যি, সত্যেঁ, সত্যোপযাচন, সত্র, সত্রাজিৎ (সত্রাজিত), সত্রী, সদ্, সদ্গতি, সদ্গুণ, সদ্গুরু, সদ্বৃত্ত, সদ্বৃত্তি, সদ্বৈদ্য, সদ্যুক্তি, সদ্রত্ন, সদ, সদংশ, সদঃ, সদন, সদসৎ, সদসৎপরিবেদনা, সদসৎফল, সদসৎবিবেক, সদসৎরূপ, সদসত্ত্ব, সদসদাত্মক, সদসন্ময়, সদস্য, সদা, সদাকারী, সদাকাল, সদাগতি, সদাগম, সদাচার, সদাতন, সদাতোয়া, সদাত্মা, সদাদান, সদানন, সদানন্দ, সদানন্দকরী, সদানন্দময়, সদানন্দময়ী, সদানীরা, সদাপর্ণ, সদাপুষ্প, সদাফল, সদাফলা, সদাব্রত, সদাব্রতী, সদাভদ্রা, সদাভব, সদামদ, সদালাপ, সদালাপী, সদাশয়, সদাশিব, সদাশিবসমূহ, সদাশ্রুত, সদীশ্বর, সদোগত, সদ্ধর্ম্ম, সদ্ধেতু, সদ্ভাব, সদ্ভূত, সদ্ম, সদ্য, সদ্যঃ, সদ্যঃস্নাত, সদ্যোজাত, সদ্যোমুক্ত, সদ্বংশ, সদ্বৎসল, সদ্বস্তু, সদ্বার্ত্তা, সন্ত, সন্ন, সন্নকণ্ঠ, সন্নহর্ষ, সন্নিমিত্ত, সন্নিয়ন্তা (সন্নিয়ন্তৃ), সন্নিসর্গ, সন্মঙ্গল, সন্মঙ্গলস্নাত, সন্মতি, সন্মনুষ্য, সন্মার্গ, সন্মিত্র, সপ্তমা, সপ্তমাতা (সৎমা), সল্লক্ষণ, সাঁচি (সাঁচ), সাঁচী, সাঁচ্চা (সাচ্চা), সাঁজ (সাজ), সাচ, সাচল, সাচা, সাচি, সাচিবাটিকা, সাচিবিলোকিত, সাচিব্য, সাচিস্মিত, সাচী, সাচীকৃত, সাচ্চা, সাতত্য, সাত্তত, সাত্ততী, সাত্ত্বিক, সাত্ত্বিকভাব, সাত্ত্বিকী, সাত্যক, সাত্যকি, সাত্রাজিতী, সাত্বত, সাত্বতী, সাত্বান্(ত্বৎ), সাদ, সাদন, সাদনী, সাদয়িতব্য, সাদি, সাদিত, সাদী, সাদ্গুণ্য, সাদ্যস্ক, সুপ্রসন্ন।

● **সদ্ (সাদি)** = সত্তার দান। **সদ** = সত্তার দান যাহাতে। **সাদি** = **সাদ** (সদ হইতে জাত) এর গতিশীলতা যাহাতে।

● **অসদাগম** : ১. সদ্ = ভেদ, বিষাদ; গম্ = গমন। ২. *অসৎ ভাবে আগম যাহাতে; যাহাতে সৎ হইতে আগম নাই*। ৩. 'অসৎ

(বেদবিরোধী) শাস্ত্র, নাস্তিকাদি শাস্ত্র। ধনাদিলাভের অসদুপায়। (দায় লাভ জয় ক্রয় বিভাগ সংপ্রয়োগ সৎপ্রতিগ্রহ — এই সপ্ত সদুপায়।) শাস্ত্রনিষিদ্ধ তিলাদির লাভ। অপহৃতদ্রব্যাদির লাভ।' (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বেদাদি অনুসারে যেগুলি সদুপায়, সেগুলির মূলে রয়েছে ভেদ। আর নাস্তিকাদি (তন্ত্র বা বৌদ্ধ) শাস্ত্রাদির মূলে রয়েছে অভেদের কথা। বৈদিকের চোখে তাই সেগুলি অসদাগম।

● **সতী** : ৩. ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ও মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষ **মহামায়া**কে কন্যারূপে পাবার জন্য কঠোর **তপস্যা** করেন। মহামায়া এতে সন্তুষ্ট হয়ে ... বললেন, আমার প্রতি কখনও অন্যায় ব্যবহার করলে আমি দেহত্যাগ করব। দক্ষ প্রজাসৃষ্টির মানসে বীরণ-কন্যা বীরিণী বা অসিক্লীকে বিবাহ করেন। এঁরই গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষ এই কন্যার নাম রাখলেন সতী। সতী যৌবনে পদার্পণ করলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের কাছে এসে সতীকে বিবাহ করতে অনুরোধ করলেন। কারণ শিবের বিবাহ না হলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। তখন দক্ষ-প্রজাপতি নিজ কন্যা সতীকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করলেন। কিন্তু মহাদেব দক্ষকে যথোচিত সম্মান কোনদিন দেখাতে পারেননি মনে করে, দক্ষ শিবের উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। ... **শিব** সতীকে **দক্ষযজ্ঞে** যেতে বাধা দিলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সতী **পরমাপ্রকৃতি মহামায়া**রূপে বিভূতি প্রকাশ করলেন। **কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী,** ও **মহালক্ষ্মী** — এই দশ মূর্তিতে মহাদেবকে তিনি বিভ্রান্ত করলেন। এর ফলে শিবের আদেশ পেয়ে সতী দক্ষযজ্ঞে গেলেন। যজ্ঞস্থলে তিনি সর্ববন্দিতা হয়েও পিতার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করে পিতার সম্মুখেই দেহত্যাগ করলেন। সতীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ শিব নিজের **জটা** ছিন্ন করেন এবং তা হতে মহাবীর **বীরভদ্রে**র আবির্ভাব হয়। এর পর শিব সমস্ত অনুচরের সহিত দক্ষপুরীতে উপস্থিত হন। শিবের অনুচররা দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে। দক্ষপত্নীর কাতর ক্রন্দনে ও **দক্ষপিতা ব্রহ্মা**র অনুরোধে শিব দক্ষকে প্রাণদান করেন বটে, কিন্তু শিব-নিন্দা-কলুষিত স্বমুণ্ড থেকে বঞ্চিত করে, তাঁকে **ছাগমুণ্ড** দান করেন। সতী-শোকে ক্রুদ্ধ শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে ভীষণ নৃত্য শুরু করলেন। তাতে সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হল; তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীর দেহ ক্রমশ খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন। সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। যে-যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সেই সব স্থান **'মহাপীঠ'** নামে খ্যাত। এই রূপে একান্ন মহাপীঠের উৎপত্তি হয়। দক্ষগৃহে দেহত্যাগ করে সতী হিমালয়ের গৃহে হিমালয়-পত্নী **মেনকা**র নিকটে এসে তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করা স্থির করলেন। যথাকালে পার্বতী-রূপে মেনকার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় একদিন নারদ এসে হিমালয়কে বলেন তাঁর কন্যা শিবের স্ত্রী হবেন। পার্বতী তপস্যার দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করে গৌরবর্ণ লাভ করে **গৌরী** নামে খ্যাতা হন। কিছুকাল পরে তপস্যার জন্য শিব হিমালয় পর্বতে এলে হিমালয় পার্বতীকে নিয়ে শিবের পূজা করেন। ... মহাদেবের বিবাহের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র শিবের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য **মদন**কে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে পার্বতীর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য **প্রেরণ করেন। শিবের** ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে মদন শিবের কোপানলে পড়ে **ভস্মীভূত হন। মদনভস্মের** পর শিব সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করেন। পার্বতী তখন শোকে দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে শিবের ধ্যানে মগ্ন হন। এমন সময় একদিন ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নারদ এসে পার্বতীকে বলেন, এতদিন পার্বতী তপস্যা ব্যতীত শিবের আরাধনা করেছেন, সেইজন্য শিব তাঁর অনুরক্ত হয়েও তাঁকে গ্রহণ করছেন না। তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করতে হবে, তবেই তিনি শিবকে পাবেন। কারণ, পার্বতী ভিন্ন অন্য কোনো নারীকে শিব গ্রহণ করবেন না। নারদের কথায় পার্বতী কঠোর তপস্যায় রত হবেন স্থির করলেন। কিন্তু তাঁর মাতা এই অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বললেন। পার্বতী এতে রাজী না হওয়ায় মেনকা তাঁকে 'উ — মা' বলে সম্বোধন করে তপস্যায় রত হতে নিষেধ করায় পার্বতীর নাম হলো 'উমা'। ... কিছুকাল পরে শিব এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে পার্বতীকে পরীক্ষা করবার জন্য উপস্থিত হলেন। পার্বতীর পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেই শিবনিন্দা আরম্ভ করলেন এবং তাঁকে অন্য পতি গ্রহণ করতে বললেন। পার্বতী ব্রাহ্মণবেশী শিবকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বললেন। তখন শিব নিজ মূর্তি ধারণ করলেন ও এর ফলে তাঁরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পিতা হিমালয়ের সম্মতি গ্রহণ করে তাঁদের দুই জনের বিবাহ সম্পন্ন হলো। (পৌ.অ.)। **৫. দ্র. ইতর। সতী** কাকে বলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাকে **সতী** বা **পঞ্চসতী** বুঝতেন, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া দরকার। পলিগ্যামি হোক আর মনোগ্যামিই হোক, একনিষ্ঠতা বা সতীত্বই কাম্য কেন। আমরা দেখছি, স্ত্রীহারা বা স্বামীহারাগণ পরবর্তী বিবাহে চাইলে অবশ্যই সতী হতে পারেন — এরকম ধারণার পক্ষে সওয়াল করে গেছেন আন্তন চেকভ, তাঁকে আগ বাড়িয়ে সমর্থন করে বিরাট প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন টলস্টয় এবং সেসবের বাংলা অনুবাদ করে সেই ধারণাকে দুহাত তুলে সমর্থন জানিয়েছেন আমাদের সৈয়দ মুজতবা আলি। তাছাড়া, ভারতীয় **পঞ্চকন্যা**র উত্তরাধিকার তো আমাদের আছেই। বালীর স্ত্রী **তারা** কিংবা **দ্রৌপদী,** যখন যে-স্বামীর কাছে থাকতেন, তখন তাঁর প্রতি একশোভাগ একনিষ্ঠ থাকতেন। তাঁদের একনিষ্ঠতায় কোথাও এক বিন্দুও ঘাটতি ছিল না, যখন যে-স্বামীর ঘর করেছেন, ষোলো-আনা নিবেদিত হয়েই করেছেন। যাঁর কপালে এক-স্বামীর ঘর-করার অধিকার বিধাতা ছিনিয়ে নিয়েছেন, দ্বিতীয় স্বামীর ঘরকরার সুযোগ এবং সে-স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকার সুযোগ — এসব তো বিধাতা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেননি। ঈশ্বরের দেওয়া সেই করুণা অবহেলাভরে পরিত্যাগ না-করে সে সুযোগ কেউ যদি গ্রহণ করে থাকেন, সেই তো ঠিক কাজ! বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ এখানেই তার জোর পায়। আমাদের বিচারে যে কোনো পুরুষ বা নারী যখন যাঁর সঙ্গে দাম্পত্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকেন, তখন তাঁর প্রতি একশোভাগ একনিষ্ঠ থাকলে তিনিই **সৎ** বা **সতী** পদবাচ্য / পদবাচ্যা। কিন্তু একজনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকা, কিন্তু তার প্রতি একনিষ্ঠ না-থাকা, এমন হলে তাকে যথার্থ **সতী** বলা যায় না। তবে 'অসতী' বলতে গেলে আরও একটু এগোতে হয় — তিনিই অসতী, যিনি সতী নহেন; যাঁর আদৌ সতীত্ব নেই।

● **সত্যঙ্কার** : ৫. দ্র. **অহঙ্কার, প্রতিজ্ঞা, দিব্য**।

● **সত্যব্রত** : দ্র. **ঋতব্রত**।

● **সত্যযুগ** : ৩. সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি — এই চার যুগ। ... বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই (সত্য) যুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগে ভগবানের চারিটি অবতার — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, ও নৃসিংহ। এই যুগ পুণ্যপূর্ণ, পাপশূন্য এবং সকলেই এই যুগে পুণ্যকর্মা। এই যুগে ধর্ম চতুষ্পদ, এই যুগে কুরুক্ষেত্র তীর্থ, গ্রহাংশ, ব্রাহ্মণ, প্রাণ মজ্জাগত, ইচ্ছা মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতিতে কারো মৃত্যু নাই। সত্যযুগে মানবদেহ একবিংশতি হস্ত পরিমাণ এবং পরমায়ু লক্ষ বৎসর পরিমাণ। এই যুগে বলি, বেণ, মান্ধাতা, পুরূরবা, ধুন্ধুমার, ও কার্তবীর্য — এই কয় জন রাজা। (পৌ.অ.)।

● ***সন্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা*** : সন্, সন, সনক, সনৎ, সনৎকুমার, সনৎসুজাত, সনদ (আ), সনদী, সনন্দ, সনন্দন, সনসন, সনা, সনাৎ, সনাতন, সনাতনী, সানা, সানু।

● **সন্** = সত্তা অন। **সন** = সত্তা অন যাহাতে।

● **সনক** : ৩. ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মা সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প করে প্রথমে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। এই অবিদ্যা হতে তমিস্র, অন্ধ-তমিস্র, মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির জন্ম হয়। এই সকল অসৎ সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা শান্তি পান না। তখন তিনি ধ্যানস্থ হয়ে মন দ্বারা অন্য প্রকার সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন। এর ফলে সনক, সনন্দ, সনাতন, ও সনৎকুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। এই সকল পুত্রেরা নিষ্ক্রিয় ও উর্ধ্বরেতা হলেন। ব্রহ্মা এই সকল পুত্রকে সৃষ্টি করতে বললে তাঁরা বললেন, সংসার দুঃখ ও মায়াময়। মায়ায় বদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করতে তাঁদের ইচ্ছা নাই। এই বলে তঁরা ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। (পৌ.অ.)।

● **সনৎকুমার** : ৩. ব্রহ্মার মানসপুত্রদের অন্যতম। ইনি জন্মিবামাত্র যতিধর্ম আশ্রয় করে পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে প্রজাধর্ম ও ভোগবিলাস ত্যাগ করেছিলেন। যে প্রকার শরীরে জন্মেছিলেন, সেই প্রকার শরীরেই বিদ্যমান আছেন বলে ইনি নিত্যকুমার বা সনৎকুমার নামে খ্যাত। (পৌ.অ.)।

● **সনন্দ (সনন্দন)** : ৩. ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র। ... এঁরা সংসারধর্ম ও পুত্রের জন্মদান করতে অস্বীকার করে চিরকাল পবিত্র ও কুমার রূপে অবস্থান করেন। (পৌ.অ.)।

● **সনাতন** : ৩. দ্রষ্টব্য সনক, সনন্দ, সনৎকুমার। (পৌ.অ.)

● **সন্ন (আসন্ন, অবসন্ন, প্রসন্ন)** :

● **সন্‌জ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিপ্রসক্ত, অতিপ্রসঙ্গ, অতিসক্ত, অতিসক্তি, অত্যাসক্তি, অনভিষঙ্গ অনাসক্ত, অপ্রসক্ত, অপ্রসক্তি, অপ্রসঙ্গ, অবিষক্ত, অভিষঙ্গ, অসংসক্ত, অসক্ত, অসঙ্গ, আসক (আশিক, ঈশ্‌ক্), আসক্ত, আসক্তি, আসঙ্গ, আসঞ্জন, আসঞ্জিত, উৎসঙ্গ, নিরাসক্ত, নিষক্ত, নিষঙ্গ, প্রাসঙ্গিক, সংসক্ত, সক্ত, সক্তি (আসক্তি), সক্‌থি, সঙ, সঙে, সঙ্গ, সঙ্গ (সঙ, সং), সঙ্গত, সঙ্গতসন্ধি, সঙ্গতি, সঙ্গতিপন্ন, সঙ্গতিশালী, সঙ্গব, সঙ্গ বর্জ্জিত, সঙ্গভাই, সঙ্গম, সঙ্গমন, সঙ্গমিত, সঙ্গর, সঙ্গররঙ্গ, সঙ্গ রহিত, সঙ্গাতি, সঙ্গিনী, সঙ্গিয়া, সঙ্গী, সঙ্গীত, সঙ্গীতক, সঙ্গীতবিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সঙ্গীতবেশ্ম, সঙ্গীতশালা, সঙ্গীতি, সঙ্গে (সঙে, সঙেঃ, সনে), সন্‌জ্, সাঁগা (সঙ্গা), সাঙা (সাঙ্গা), সাঙাত (সাঙ্গাত, সেঙাত) সাঙ্গ (অঙ্গীভূত করে নিলে কাজ শেষ, তাই সাঙ্গ করা), সাঙ্গ, সাঙ্গজাত, সাঙ্গতিক, সাঙ্গত্য, সাঙ্গা, সাঙ্গাইত, সাঙ্গাত, সাঙ্গাতি, সাঙ্গাতিনী, সাঙ্গাতী, সাঙ্গালি, সাঙ্গি, সাঙ্গী, সাঙ্গোপাঙ্গ, সেঙা, সেঙাত, সেঙাতি, সেঙাতিন, সেঙাতিনী, সেঙাতী, সেঙ্গা, স্যাঙাৎ।

● **সন্‌জ্** = সত্তার অনকরণের জনন। **সন্‌জ** = সত্তার অনকরণ জনিত যাহাতে।

● ***সপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা*** : ছাতার, ছাতিনা, ছাতিম, ছাতেন, প্রসুপ্ত, সতর (সতেরো, সপ্তদশ), সত্তর, সত্তরি, সপ্, সপ, সপকালি, সপ্ত, সপ্তক, সপ্তকল্পজীবী, সপ্তকী, সপ্তকোণ, সপ্তক্ষিতি, সপ্তগঙ্গ, সপ্তগোদাবর, সপ্তগোদাবরী, সপ্তগ্রাম, সপ্তচত্বারিংশৎ, সপ্তচ্ছদ, সপ্তজ্বাল, সপ্তজিহ্ব, সপ্ততন্তু, সপ্ততাল, সপ্ততি, সপ্তত্রিংশৎ, সপ্তদশ (সপ্তদশন্), সপ্তদীধিতি, সপ্তদ্বীপ, সপ্তধা, সপ্তধাতু, সপ্তনবতি, সপ্তনাড়ীচক্র, সপ্তপঞ্চাশৎ, সপ্তপদী, সপ্তপর্ণ, সপ্তপলাশ, সপ্তপাতাল, সপ্তপ্রকৃতি, সপ্তবিংশতি, সপ্তভূম, সপ্তভূমিক, সপ্তভৌম, সপ্তম, সপ্তমরীচি, সপ্তমী, সপ্তরক্ত, সপ্তরথী, সপ্তরাত্র, সপ্তর্ষি, সপ্তলরী, সপ্তলা, সপ্তলোক, সপ্তশতী, সপ্তশলাক, সপ্তশিরা, সপ্তশীর্ষ, সপ্তষষ্টি, সপ্তসপ্ততি, সপ্তসপ্তি, সপ্তসমুদ্র, সপ্তসাগর, সপ্তসিন্ধু, সপ্তসুর, সপ্তসুরা, সপ্তসু, সপ্তস্রোতঃ, সপ্তস্বর, সপ্তস্বরা, সপ্তস্বরী, সপ্তস্বর্গ, সপ্তহয়, সপ্তা, সপ্তাঙ্গ, সপ্তার্চ্চি, সপ্তার্ণব, সপ্তাশীতি, সপ্তাশ্র, সপ্তাশ্ব, সপ্তাষ্ট, সপ্তাস্র, সপ্তাহ, সপ্তি, সপ্তসপ্তি, সপ্‌সপ্, সপ্‌সপানি, সাঁইত্রিশ, সাত, সাতই, সাতকাণ্ড, সাতগাঁ, সাতগেঁটে, সাতচল্লিশ, সাতছরা, সাতছরি, সাতথাকি, সাতনরী, সাতনল, সাতনলা, সাতনলী, সাতপাঁচ, সাতপাক, সাতপুরুষ, সাতবাহ, সাতবাহন (দ্র.শালীবাহন), সাতভেয়ে, সাতলরী, সাতলহরী, সাতলা, সাতলি(লী), সাতষট্টি, সাতসতের, সাতসমুদ্র, সাতা, সাতাইশ (সাতাস, সাতাশ), সাতাত্তর, সাতানই, সাতানব্বই, সাতান্ন, সাতার, সাতারিয়া, সাতালি, সাতাশ, সাতাশ-নক্ষত্র, সাতাশি, সাদিনা (সাতদিনা), সাপ্তপদ, সাপ্তপদীন, সাপ্তপৌরুষ, হপ্তকলুমে, হপ্তা, হপ্তা-দেওয়া।

● **সপ্** = সত্তার পালন। **সপ** = সত্তার পালন যাহাতে।

● **সপ্ত-চিরজীবী** : ৩. সপ্ত-চিরজীবীর তালিকাটি প্রায় সব পুরাণাদি গ্রন্থেই রয়েছে। ভারত যে সাতটি সামাজিক সত্তাকে সপ্তর্ষি নামে চিনেছিল, যুগে যুগে তারা রয়ে গেছেন এবং এখনও আছেন। তাঁদেরকেই পরবর্তীকালে সপ্ত-চিরজীবী বলা হয়েছে। কলিম খান-এর 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' গ্রন্থের (১ম সংস্করণের) ১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠায় বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সনাতন যুগশেষে সপ্তর্ষিদের মধ্যে যে স্থান পরিবর্তন ঘটেছে, তাই রাখা হয়েছে তালিকাতে। পুরাণাদি অনুসারে মোট এগারো যুগ গত হয়েছে এবং বর্তমানে বারো নম্বর যুগ। বারো যুগের সপ্তর্ষির বারো রকম নাম। তালিকাটিতে প্রথম তিনটি যুগের এবং শেষ যুগের সপ্তর্ষিদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। স্বায়ম্ভূব মন্বন্তর থেকে সপ্তর্ষিরা আবার পত্নীবান। স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরে তাদের নাম যথাক্রমে কলা, অনসূয়া, ক্ষমা, হবির্ভু, সন্নতি, শ্রদ্ধা, অরুন্ধতী। স্বভাবতই এই নামও প্রতি মন্বন্তরে বদলে গেছে। যে ঋষিকে

(শক্তিকে) যেরূপ জনগণ ধারণ করেন, তাঁদের স্বভাব অনুসারে ওই ঋষিপত্নীদের নামকরণ করা হয়েছে। ...

এই তালিকা থেকে জানা যায়, সেই সনকাদি সপ্তর্ষি ১২০০০ বছর পেরিয়ে নানারূপ পরিবর্তন করে সপ্তচিরজীবী রূপে আজও শিক্ষক, নেতা, বিচারক, বুরোক্র্যাট, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, টেকনোক্র্যাট নাম নিয়ে বেঁচে আছেন। সমাজ মনের 'ঈশান কোণে' (ঈশ আনে যে দিক) আজও তাঁদের বাস। আজও তাঁরা ধ্রুব-সত্যের চারদিকে ঘুরে চলেন। ধ্রুব হল অব্যভিচারী, একই আচার বা সত্যের পুনরাবৃত্তিকারী। যুগে যুগে তাঁরা সেই সেই যুগধর্মের বাহক, পূর্ববিধানরূপ সত্যের চতুর্দিকে চক্রাকারে আবর্তনশীল। তাঁদের রূপ ও নাম, অস্তিত্বের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য প্রতি যুগান্তরে বদলে যায়। আজ শিক্ষকের নামে অভিযোগ যে, তার অস্তিত্বের ভিত্তি জ্ঞানবিক্রয়, এবং উদ্দেশ্য 'আপনি ও কপ্‌নির' নিরাপত্তা; কাল সেই ভিত্তি নাও থাকতে পারে। যুগান্তর তাকে অন্যতর ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে। তখন বদলে যাবে তাঁর উদ্দেশ্যটিও। কিন্তু জ্ঞানশক্তির আধার হওয়ার তাঁর যে মূল স্বভাব, তা বদলাবে না। এই খণ্ডজ্ঞানী শিক্ষক একদিন ঘৃণ্য ছিলেন, যুগান্তর তাঁকে সম্মানীয় করেছিল। যুগান্তর আজ তাকে আবার ঘৃণ্য করে তুলেছে। এই যুগের অন্ত হয়তো আবার তাকে সম্মানীয় করে তুলবে, তাঁর রূপ ও নাম বদলে দেবে। তখন হয়তো তাঁকে আর জ্ঞানজীবী রূপে দেখা যাবে না, হয়তো দেখা যাবে মিত্র (*'সর্ব্বভূতে স্নেহকারক' বা 'যিনি সব জানেন'*) রূপে।

● **সপ্তদ্বীপ** : ৩. জম্বুক, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর — এই সাতটি মহাদ্বীপ। (পৌ.অ.)।

● ***সপ্তর্ষি*** : ৩. ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতজন ঋষি। বিভিন্ন **মন্বন্তরে** যে সাত জন **ঋষি** আবির্ভূত হয়ে ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষা করেছেন, এঁদের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ লেখা হয়েছে। আকাশের ঈশান কোণে এঁরা অবস্থান করেন। এরাই **সপ্তর্ষিমণ্ডল** নামে পরিচিত। এই সপ্তর্ষির নাম **মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা,** ও **বশিষ্ঠ।** এই সাতজনের যথাক্রমে **কলা, অনসূয়া, ক্ষমা, হবির্ভূ, সন্নতি, শ্রদ্ধা,** ও **অরুন্ধতী** এই সাতজন স্ত্রী। এঁরা সকলেই লোকজননী। (পদ্মপুরাণ) প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল সপ্তর্ষি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ছিলেন। মনু চতুর্দশ; সুতরাং সপ্তর্ষিও চতুর্দশ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন। দ্রষ্টব্য স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ। (হরিবংশ) (পৌ.অ.)। দ্র. **ক্রতু**।

● **সপ্তলোক** : ৩. ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য — এই সাতটি লোক। (পৌ.অ.)।

● **সপ্তাহ** : ৫. দ্র. **বার**। সপ্তাহের সাতদিনের নাম **বার**গুলির নামের ভুক্তিতে রয়েছে। দ্র. **রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার**। এখন প্রশ্ন হল, **বার**-এর এই নামগুলির মধ্যে কোনো ক্রম আছে কি না, থাকলে সেটি কীরূপ। **রবি** বা সূর্য্যকে আমরা চিনেছি মানবজাতির যৌথ জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্র রূপে। একে মানবজাতির অস্তিত্বের মূল বলা যেতে পারে। সেই জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অংশ নিয়ে জ্ঞানজীবী-ধনজীবী সম্প্রদায় সক্রিয় হয় **চন্দ্র** বা **সোম** নামে। সমাজ-আকাশে দিবসরজনী জুড়ে **রবি** ও **সোম**-এর আলো বিকীর্ণ হতে থাকে। এর ফলে মানুষ জ্ঞানে ও ধনে সমৃদ্ধ হয়, হতে থাকে, মানুষের **মঙ্গল** হয়। কিন্তু এই সমৃদ্ধি মানুষকে তার তদবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। **মঙ্গলে** তার **উষা** হয়, **বুধে** সে পা বাড়ায় আরো উন্নতির দিকে। স্বভাবতই ধনতান্ত্রিক-বুদ্ধিজীবী **বৃহস্পতি** চলে আসেন সশরীরে। এই প্রথম সমাজ-সত্তাটির ভিতরে তুলকালাম শুরু হয় — আমি তবে কে? আমি কি এরকমই? শুরু হয় জিজ্ঞাসা। আমাদের আদি স্বভাব কী ছিল? এই **বৃহস্পতি** আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? ফলে একসময় সমাজের আত্মপরিচয় উঠে আসে সামনে। মানুষ যে একা একা সমৃদ্ধ হয়নি, নিজের কোলে ঝোল টানা যে তার বুনিয়াদী স্বভাব নয়, সে যে ঝাঁকপ্রাণী রূপে এতাবৎ এগিয়ে এসেছে, সেকথা এবার জোর দিয়ে বলার দরকার পড়ে। তখন সেকথা বলার জন্য এযাবৎ চুপচাপ নিজের তালে বসে থাকা **শুক্র**চার্য্য এবার উঠে দাঁড়ান। শুরু হয়ে যায় বিরোধ। আবির্ভূত হয় সমাজের **শনি** — শয়তান। ...

আমাদের ধারণা, আমাদের পূর্বসূরীগণ এভাবেই সপ্তাহের সাতদিনের নামকরণ করেছিলেন। আমাদের যতটুকু সাধ্য তাই দিয়ে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির ভিতরে প্রচলিত 'সপ্তাহ'-ধারণার খবরাখবর সংগ্রহ করেছি। তার থেকে আমাদের মনে হয়েছে, আদিতে সপ্তাহের ধারণাটি যে রকম ছিল, কিন্তু তার পূর্ণ উত্তরাধিকার একমাত্র আমরা, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরাই, পেয়েছি। অন্যান্য জাতির মানুষেরা পেয়েছেন খণ্ড খণ্ড ভাবে, কিছু কিছু পরিমাণে অতীত হারিয়ে। কিন্তু কমবেশী পেয়েছেন সবাই। দ্র. **বুধ**।

কোনো নতুন লক্ষ্যে যাত্রার জন্য — তা সে মানসিক লক্ষ্য (যথা, 'প্রশান্তি-নিকেতনে যাব'), সামাজিক লক্ষ্য হোক (যথা, 'শান্তিনিকেতনের মতো বিদ্যালয় বানাব') কিংবা ভৌগোলিক লক্ষ্যই হোক (যথা, 'বোলপুরের শান্তিনিকেতনে যাব') — সেই যাত্রার সূচনা করতে হয় **বুধবার**-এ (দ্র. **বার**)। কেন হয়, তার কারণ কমবেশী ব্যাখ্যাত হয়েছে আমাদের **সপ্তাহের** ধারণায়। সপ্তাহে **রবি** থেকে **শনি** পর্যন্ত যে সময়কাল ধরা হয়, তাতে একপ্রকার ক্রম থাকে। সেই ক্রম অনুসারে **বুধ**-এর সূচনা হতে পারে কেবলমাত্র **মঙ্গল**-এর পরেই। লোকে **রবি সোম**-এর জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের আলোকধারায় স্নাত হয়ে একটু সমৃদ্ধ না হলে অর্থাৎ **মঙ্গল**াবস্থা না পেরোলে **বুধ**-এ পা দিতে পারে না। ...

● **সাতাশ নক্ষত্র** : অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী। পরবর্তীকালে আর একটি নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় — অভিজিৎ। এই নিয়ে আঠাশ নক্ষত্রের নাম প্রচলিত আছে। এটি পুরাণকথিত **আঠাশ প্রকার বিপর্যয়ের** সঙ্গে মিলে যায়।

● ***সম্*** **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিসম্পর্ক, অবিষম, অসম, অসমগ্র, অসমজ্ঞা, অসমঞ্জ, অসমঞ্জস, অসমনয়ন, অসমনেত্র, অসমবাণ, অসমবায়িকারণ, অসমবৃত্ত, অসময়, অসমলোচন, অসমশর, অসমসায়ক, অসমসাহস, অসমস্ত, অসমন, অসমান, অসমাবর্ত্ত, অসমাবর্ত্তক, অসমাবৃত্ত, অসমাবৃত্তক,

অসমাবৃত্তিক, অসমীক্ষিত, অসমীক্ষ্যকারী, অসমৃদ্ধি, অসমেত, অসমোর্দ্ধ, অসম্পত্তি, অসম্পূর্ণ, অসম্প্রজ্ঞাত, অসম্বদ্ধ, অসম্বন্ধ, অসম্বর, অসম্বাধ, অসম্বিত, অসম্বৃত, অসম্ভব, অসম্ভবনীয়, অসম্ভব্য, অসম্ভাবনীয়, অসম্ভাবিত, অসম্ভাবী, অসম্ভাব্য, অসম্ভাষ্য, অসম্ভৃত, অসম্ভেদ, অসম্ভোগ, অসম্ভোজ্য, অসম্মত, অসম্মূঢ়, অসম্মোহ, অসম্যক্, অসামঞ্জস্য, অসাময়িক, অসামর্থ্য, অসামান্য, অসাম্প্রতম, অসাম্য, আসাম, শগড়ি, শঙ্কট, শাণা, সং (সঙ্, সঙ্গ্), সংক্রন্দ, সংক্রন্দন, সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রমণকা, সংক্রমিত, সংক্রান্ত, সংক্রান্তি, সংক্রামক, সংক্রামণ, সংক্রামিত, সংক্রামী, সংক্রীড়ন, সংক্রীড়িত, সংক্রোশ, সংক্লেদ, সংক্লেশ, সংক্ষয়, সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্তি, সংক্ষেপ, সংক্ষেপক, সংক্ষেপণ, সংক্ষেপ্তা, সংক্ষুব্ধ, সংক্ষোভ, সংক্ষোভিত, সংখ্য, সংখ্যক, সংখ্যা, সংখ্যাক, সংখ্যাত, সংখ্যাতা, সংখ্যাতিগ, সংখ্যাতীত, সংখ্যাতৃ, সংখ্যান, সংখ্যাপরিত্যক্ত, সংখ্যাবাচক, সংখ্যাবান, সংখ্যাবৃত্তিকর, সংখ্যামঙ্গলগ্রন্থি, সংখ্যালিপি, সংখ্যাশব্দ, সংখ্যাসমাপন, সংখ্যেয়, সংগঠন, সংগঠিত, সংগুপ্ত, সংগৃহীত, সংগোপন, সংগোপনীয়, সংগ্রথন, সংগ্রন্থন, সংগ্রসন, সংগ্রহ, সংগ্রহণ, সংগ্রহণী, সংগ্রহীতা, সংগ্রাম, সংগ্রামকর্ম্ম, সংগ্রামকেশরী, সংগ্রামজিৎ, সংগ্রামতূর্য্য, সংগ্রামপটহ, সংগ্রামমূর্দ্ধা, সংগ্রামশিরঃ, সংগ্রাহ, সংগ্রাহক, সংগ্রাহিকা, সংগ্রাহী, সংগ্রাহ্য, সংঘট, সংজাত (সংযাত), সংজ্ঞক, সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপিত, সংজ্ঞপ্ত, সংজ্ঞা (সান, সানসা), সংজ্ঞাকরণ, সংজ্ঞান, সংজ্ঞাপন, সংজ্ঞাপুত্রী, সংজ্ঞাবান, সংজ্ঞাবিপর্য্যয়, সংজ্ঞাসুত, সংজ্ঞিত, সংজ্বর, সংপ্লব, সংপ্লুত, সংবচ্ছর, সংবৎ, সংবৎসর, সংবদন, সংবনন, সংবর, সংবরণ, সংবরণীয়, সংবর্ত্ত, সংবর্ত্তক, সংবর্ত্তন, সংবর্ত্তি, সংবর্ত্তিকা, সংবর্ত্তিত, সংবর্ত্তী, সংবর্দ্ধক, সংবর্দ্ধন, সংবর্দ্ধনা, সংবর্দ্ধনীয়, সংবলন, সংবলনা, সংবলিত, সংবল্গন, সংবল্গিত, সংবসতি, সংবসথ, সংবহ, সংবহন, সংবাদ, সংবাদিনী, সংবাদী, সংবার, সংবার্য্য, সংবাস, সংবাসিত, সংবাসী, সংবাহ, সংবাহক, সংবাহন, সংবাহিত, সংবাহ্য, সংবিগ্ন, সংবিজ্ঞাত, সংবিজ্ঞান, সংবিৎ(দ্), সংবিত্তি, সংবিৎপত্র, সংবিদা, সংবিদিত, সংবিধা, সংবিধাতা, সংবিধান, সংবিধানক, সংবিধি, সংবিধেয়, সংবিভক্ত, সংবিভাগ, সংবিভাগী, সংবিমর্দ্দ, সংবিষ্ট, সংবিহিত, সংবীক্ষণ, সংবীজন, সংবীত, সংবৃত, সংবৃতমন্ত্র, সংবৃতমৈথুন, সংবৃতসংবার্য্য, সংবৃতি, সংবৃত্ত, সংবৃদ্ধ, সংবৃদ্ধি, সংবেগ, সংবেজন, সংবেদ, সংবেদন, সংবেদ্য, সংবেশ, সংবেশন, সংবেষ্ট, সংবেষ্টন, সংব্যবহরণ, সংব্যবহার, সংব্যান, সংব্যানসংযম, সংব্যূহ, সংমূঢ়, সংমৃত, সংশ্লিষ্ট, সংযৎ, সংযত, সংযতচেতাঃ, সংযতপ্রাণ, সংযতবস্ত্র, সংযতবাক্ (-বাচ্), সংযতমনাঃ, সংযতমুখ, সংযতমৈথুন, সংযতাঞ্জলি, সংযতাত্মা, সংযতাহার, সংযতী, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতোপস্কর, সংযন্তব্য, সংযন্তা, সংযন্ত্রিত, সংযম, সংযমন, সংযমনী, সংযমিত, সংযমিনী, সংযমী, সংযাজ্য, সংযাত, সংযাত্রা (সঞ্জাত), সংযান, সংযাম, সংযাব, সংযুক্(জ্), সংযুগ, সংযুত, সংযুযুষু, সংযোগ (সঞ্জগ), সংযোগবচন, সংযোগবিরুদ্ধ, সংযোগাশয়ী, সংযোগিত, সংযোগী, সংযোজক, সংযোজন, সংযোজিত, সংযোজ্য, সংযোটন, সংরক্ত, সংরক্ষক, সংরক্ষণ, সংরক্ষণীয়, সংরক্ষিত, সংরক্ষী, সংরক্ষ্য, সংরব্ধ, সংরম্ভ, সংরম্ভতাম্র, সংরম্ভপুরুষ, সংরম্ভবেগ, সংরম্ভরস, সংরম্ভী, সংরাগ, সংরাধন, সংরাব, সংরুদ্ধ, সংরোধ, সংরোধন, সংরূঢ়, সংরোপণ, সংরোপিত, সংরোহ, সংরোহণ, সংলক্ষণ, সংলক্ষিত, সংলক্ষ্য, সংলগ্ন, সংলয়, সংলাপ, সংলাপক, সংলাপিত, সংলীন, সংলোড়ন, সংশপ্তক, সংশব্দ, সংশব্দন, সংশম, সংশমন, সংশমনীয়, সংশয়, সংশয়গত, সংশয়চ্ছেদ, সংশয়চ্ছেদ্য, সংশয়চ্ছেদী, সংশয়সম, সংশয়স্থ, সংশয়াক্ষেপ, সংশয়াত্মক, সংশয়াত্মা, সংশয়াপন্ন, সংশয়ালু, সংশয়িত, সংশয়িতা, সংশয়োচ্ছেদী, সংশয়োপেত, সংশরণ, সংশান্ত, সংশিত, সংশিতব্রত, সংশিতব্রতা, সংশিতাত্মা, সংশীতি, সংশীলন, সংশুদ্ধ, সংশুদ্ধি, সংশুষ্ক, সংশোধন, সংশোধিত, সংশোষ, সংশোষণ, সংশ্রব, সংশ্রবণ, সংশ্রয়, সংশ্রয়কারিত, সংশ্রয়ণ, সংশ্রয়িতব্য, সংশ্রয়ী, সংশ্রিত, সংশ্রিতবান, সংশ্রুত, সংশ্লিষ্ট, সংশ্লেষ, সংশ্লেষণ, সংসক্ত, সংসক্তচিত্ত, সংসক্তমনাঃ, সংসক্তযুগ, সংসৎ(দ্), (ঋষিসংসদ, ছাত্রসংসদ ...), সংসরণ, সংসর্গ, সংসর্গজ, সংসর্গদোষ, সংসর্গবিদ্যা, সংসর্গাভাব, সংসর্গী, সংসর্জ্জন, সংসর্পণ, সংসর্পী, সংসাধক, সংসাধন, সংসার, সংসার-করা, সংসারকানন, সংসারকান্তার, সংসারকারা, সংসারগমন, সংসারগুরু, সংসারচক্র, সংসারপদবী, সংসার-পাতা, সংসারবর্ত্ম, সংসারবন্ধন, সংসারবাসনা, সংসারবিষবৃক্ষ, সংসারবীজ, সংসার-ভাসা, সংসারমোক্ষ, সংসারযাত্রা, সংসারসঙ্গ, সংসারসমুদ্র, সংসারসরণি, সংসারসাগর, সংসারসুখ, সংসারাব্ধি, সংসারার্ণব, সংসারী, সংসিক্ত, সংসিদ্ধ, সংসিদ্ধি, সংসূচন, সংসূচিত, সংসূচয়িতব্য, সংসৃতি, সংসৃতিক্লেশ, সংসৃতিচক্র, সংসৃতিচক্রবাল, সংসৃষ্ট, সংসৃষ্টি, সংসেক, সংসেবন, সংসেবা, সংসেব্য, সংস্করণ, সংস্কর্ত্তা, সংস্কার, সংস্কারক, সংস্কারজ, সংস্কারনাম, সংস্কারপূত, সংস্কারবর্জ্জিত, সংস্কাররহিত, সংস্কারসম্পন্ন, সংস্কারহীন, সংস্কার্য্য, সংস্কৃত, সংস্কৃতাত্মা, সংস্কৃতি, সংস্কৃত্রিম, সংস্ক্রিয়া, সংস্তব, সংস্তুত, সংস্তব্ধ, সংস্তম্ভন, সংস্তম্ভয়িতা, সংস্তম্ভিত, সংস্তম্ভী, সংস্তর, সংস্তৃত, সংস্তীর্ণ, সংস্তুত সংস্তুতি, সংস্তৃত, সংস্ত্যায়, সংস্থ, সংস্থা, সংস্থাভেদ, সংস্থান (সঙ্গস্থা) সংস্থাপক, সংস্থাপন, সংস্থাপনা, সংস্থাপিত, সংস্থাপ্য, সংস্থিত, সংস্থিতি, সংস্নেহ, সংস্নেহন, সংস্পর্দ্ধা, সংস্পর্দ্ধী, সংস্পর্শ, সংস্পর্শন, সংস্পর্শা, সংস্পৃষ্ট, সংস্পৃষ্টজ, সংস্ফোট, সংস্মরণ, সংস্মরণীয়, সংস্মৃত, সংস্মৃতি, সংস্রব, সংস্রবণ, সংস্রাব, সংস্বেদ, সংহত, সংহতজানু, সংহতজানুক, সংহতভ্রূ, সংহতস্তনী, সংহতল, সংহতি, সংহতোরু, সংহনন, সংহন্তা, সংহর, সংহরণ, সংহর্ত্তব্য, সংহর্ত্তা, সংহর্ষ, সংহর্ষণ, সংহর্ষী, সংহার, (সঙার, উপসংহার), সংহারক, সংহারকাল, সংহারণ, সংহারভৈরব, সংহারমুদ্রা, সংহারিণী, সংহারী, সংহার্য্য, সংহিত (সহিত), সংহিতকার, সংহিতজপ, সংহিতপাঠ, সংহিতা, (চরকসংহিতা, ভারতসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, শার্ঙ্গরবসংহিতা ...), সংহিতোরু, সংহূতি, সংহৃত, সংহৃতি, সংহ্রাদ, সংহ্রাদন, সংহ্রাদী, সংহ্রীণ, সংহ্লাদ, সংহ্লাদী, সঁপ (সমর্পণ), সকড়া, সকড়ি, সঙার, সঙারত, সঙারি, সঙারিয়া, সঙারিতে, সঙ্কট, সঙ্কটনাশন, সঙ্কটস্থ, সঙ্কটা, সঙ্কটাপন্ন, সঙ্কথন, সঙ্কথা, সঙ্কথিত, সঙ্কর, সঙ্করজাত, সঙ্করজাতি, সঙ্করসঙ্কর, সঙ্করাশ্ব, সঙ্করী, সঙ্করীকরণ, সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষিত, সঙ্কল, সঙ্কলন, সঙ্কলিত, সঙ্কলুষ, সঙ্কল্প, সঙ্কল্পজ, সঙ্কল্পজন্মা, সঙ্কল্পজাত, সঙ্কল্পন, সঙ্কল্পপ্রভব, সঙ্কল্পভব, সঙ্কল্পমাত্র, সঙ্কল্পমূল, সঙ্কল্পযোনি, সঙ্কল্পরূপ, সঙ্কল্পসম্পত্তি, সঙ্কল্পসম্ভব, সঙ্কল্পিত,

সঙ্কল্পিতব্য, সঙ্কসুক, সঙ্কার, সঙ্কালন, সঙ্কাশ, সঙ্কীরণ, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কীর্ণজাতি, সঙ্কীর্ণনাগ, সঙ্কীর্ণযুদ্ধ, সঙ্কীর্ণযোনি, সঙ্কীর্ণসম্ভোগ, সঙ্কীর্ণা, সঙ্কীর্ণীকরণ, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনমল্ল (advertisement guru) সঙ্কীর্ত্তিত, সঙ্কুচিত, সঙ্কুল, সঙ্কুলিত; সঙ্কেত, সঙ্কেতক, সঙ্কেতকেতন, সঙ্কেতগৃহ, সঙ্কেতগেহ, সঙ্কেতনিকেত, সঙ্কেতনিকেতন, সঙ্কেতবাক্য, সঙ্কেতভূমি, সঙ্কেতস্থান, সঙ্কেতস্থ, সঙ্কেতিত, সঙ্কোচ, সঙ্কোচক, সঙ্কোচন, সঙ্কোচিত, সঙ্গোপ, সঙ্গোপন, সঙ্গোপনীয়, সঙঘ, (অসুরসঙঘ, ঋষিসঙঘ, নরসঙঘ ...), সঙঘচারী, সঙঘজীবী, সঙঘটন, সঙঘটিত, সঙঘট্ট, সঙঘট্টন, সঙঘট্টনা, সঙঘট্টি, সঙঘট্টিত, সঙঘপুষ্পী, সঙঘভেদন, সঙঘর্ষ, সঙঘর্ষণ, সঙঘর্ষী, সঙঘশঃ, সঙঘস্থবির, সঙঘাত, সঙঘাতক, সঙঘাতকঠিন, সঙঘাতচারী, সঙঘাতজ, সঙঘাত-বাজনা, সঙঘাতি, সঙঘারাম, সঙঘুষিত, সঙঘুষ্ট, সঙেঘাষ, সঞ্চ, সঞ্চক, সঞ্চয় (সাঁচ), সঞ্চয়ন, সঞ্চয়িক, সঞ্চয়িতা, সঞ্চয়ী, সঞ্চর, সঞ্চরণ, সঞ্চরমাণ, সঞ্চরিত, সঞ্চরিষ্ণু, সঞ্চল, সঞ্চলন, সঞ্চলনাড়ি, সঞ্চার, সঞ্চারক, সঞ্চারণ, সঞ্চারিকা, সঞ্চারিণী, সঞ্চারিত, সঞ্চারী, সঞ্চালক, সঞ্চালন, সঞ্চালিত, সঞ্চালিনী, সঞ্চিত, সঞ্চিতা, সঞ্চিতি, সঞ্চিন্তন, সঞ্চিন্তিত, সঞ্চিত্য, সঞ্ছন্ন, সঞ্ছাদন, সঞ্ছিন্ন, সঞ্ছেত্তা, সঞ্ছেদ, সঞ্জনন, সঞ্জবন, সঞ্জয়, সঞ্জল্প, সঞ্জাত, সঞ্জীব, সঞ্জীবন, সঞ্জীবনী, সঞ্জীবিত, সঞ্জীবিনী, সঞ্জীবী, সণ্ডিশ (সন্দংশ), সণ্ডীন, সতত, সততগ, সততগতি, সততচিত্ত, সততজ্বর, সততমানস, সততযায়ী, সততযুক্ত, সন, সন্তক্ষণ, সন্তত, সন্ততজ্বর, সন্ততসঙ্গী, সন্ততি, সন্তপন, সন্তপ্ত, সন্তমস, সন্তর, সন্তরণ, সন্তর্জ্জন, সন্তর্প, সন্তর্পণ (সমান তর্পণ হলে এত লুকোচুরি কেন, সমান ষড়যন্ত্রী বলে), সন্তর্পিত, সন্তল, সন্তলন, সন্তাড়িত, সন্তান, সন্তানক, সন্তানকলতা, সন্তানবর্দ্ধন, সন্তানবাহী, সন্তানসন্ততি, সন্তানসন্তান, সন্তানসন্ধি, সন্তানিকা, সন্তাপ, সন্তাপন, সন্তাপিত, সন্তার, সন্তারিত, সন্তালন, সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টি, সন্তোক, সন্তোল, সন্তোলন, সন্তোষ, সন্তোষণ, সন্তোষণীয়, সন্তোষিত, সন্তোষিণী, সন্তোষী, সন্ত্যক্ত, সন্ত্যাগ, সন্ত্যাগী, সন্ত্যাজ্য, সন্ত্রস্ত, সন্ত্রাণ, সন্ত্রাতা, সন্ত্রাস, সন্ত্রাসিত, সন্দ, সন্দংশ, সন্দংশক, সন্দংশিকা (সন্না, সাঁড়াশি) সন্দর্ভ, সন্দর্ভবিরুদ্ধ, সন্দংশশুদ্ধ, সন্দংশশুদ্ধি, সন্দর্শন, সন্দষ্ট, সন্দাতা, সন্দানিত, সন্দানিতক, সন্দিগ্ধ, সন্দিগ্ধতা, সন্দিগ্ধফল, সন্দিগ্ধবুদ্ধি, সন্দিগ্ধার্থ, সন্দিত, সন্দিধক্ষু, সন্দিষ্টু, সন্দিহান, সন্দীপক, সন্দীপন, সন্দীপিত, সন্দীপ্ত, সন্দুষিত, সন্দুষ্ট, সন্দৃব্ধ, সন্দৃশ্য, সন্দেশ, সন্দেশপদ, সন্দেশবহ, সন্দেশবাক্, সন্দেশবাক্য, সন্দেশহর, সন্দেশহার, সন্দেশহারক, সন্দেশহারী, সন্দেশার্থ, সন্দেষ্টব্য, সন্দেহ, সন্দেহগন্ধ, সন্দেহগোচর, সন্দেহচ্ছেদন, সন্দেহদায়ী, সন্দেহদোলা, সন্দেহপদ, সন্দেহভঞ্জন, সন্দেহভঞ্জন-পত্র, সন্দেহালঙ্কার, সন্দেহালঙ্কৃতি, সন্দোহ, সন্দোহ্য, সদ্রাব, সন্ধ (সন্দ), সন্ধা, সন্ধাতা (সন্ধাতৃ), সন্ধান (সান্ধা, সেঁধা, সেঁধিয়ে যাওয়া), সন্ধানসুলুক, সন্ধানী, সন্ধায়াসন, সন্ধারণ, সন্ধার্য্য, সন্ধি, সন্ধিগ্রন্থি, সন্ধিচৌর, সন্ধিচ্ছেদ, সন্ধিচ্ছেদক, সন্ধিচ্ছেদন, সন্ধিজ, সন্ধিজীবক, সন্ধিত, সন্ধিতস্কর, সন্ধিৎসু, সন্ধিদূষণ, সন্ধিনী, সন্ধিপূজা, সন্ধিবন্ধ, সন্ধিবন্ধন, সন্ধিবিগ্রহ, সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ, সন্ধিবিগ্রহিক, সন্ধিবিৎ, সন্ধিবিপর্যয়, সন্ধিবেলা, সন্ধিভঙ্গ, সন্ধিমুক্তি, সন্ধিরন্ধ্রকা, সন্ধিরাগ, সন্ধিসম্ভব, সন্ধিহারক, সন্ধুক্ষণ, সন্ধুক্ষিত, সন্ধেহ, সন্ধ্যক্ষর, সন্ধ্যা, সন্ধ্যাংশ, সন্ধ্যাংশু, সন্ধ্যাকপিশ, সন্ধ্যাকান্ত, সন্ধ্যাকার্য্য, সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যাকালিক, সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাত্রয়, সন্ধ্যাধূপ, সন্ধ্যাপয়োদকপিশ, সন্ধ্যাপাত, সন্ধ্যাপুষ্পী, সন্ধ্যাবন্দন, সন্ধ্যাবন্দনা, সন্ধ্যাবলি, সন্ধ্যাবিধি, সন্ধ্যাভ্র, সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা, সন্ধ্যামণি, সন্ধ্যামুনি, সন্ধ্যারাগ, সন্ধ্যাসবিতা, সন্ধ্যাসময়, সন্ধ্যাহ্নিক, সন্ধ্যোপাসন, সন্নত, সন্নতি, সন্নদ্ধ, সন্নমিত, সন্নয়, সন্নহন, সন্না, সন্নাহ, সন্নাহ্য, সন্নিকর্ষ, সন্নিকর্ষণ, সন্নিকাশ, সন্নিকৃষ্ট, সন্নিচয়, সন্নিধাতা, সন্নিধান, সন্নিধাপনী, সন্নিধাপিত, সন্নিধি, সন্নিপতিত, সন্নিপাত, সন্নিপাতক, সন্নিপাতিত, সন্নিপাত্য, সন্নিবদ্ধ, সন্নিবর্ত্তন, সন্নিবাস, সন্নিবিষ্ট, সন্নিবৃত্ত, সন্নিবৃত্তি, সন্নিবেশ, সন্নিবেশন, সন্নিবেশিত, সন্নিবেশ্য, সন্নিভ, সন্নিয়োগ, সন্নিরুদ্ধ, সন্নিরোধ, সন্নিরোদ্ধব্য, সন্নিষণ্ণ, সন্নিষেবিত, সন্নিহিত, সন্ন্যসন, সন্ন্যস্ত, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসকাটি(টী), সন্ন্যাসী, সন্মান (সম্মান) সন্মুখ (সম্মুখ), সম্, সম, সমকক্ষ, সমকক্ষা, সমকাল, সমকালীন, সমকেন্দ্রিক, সমকোণ, সমক্রম, সমক্ষ, সমগন্ধক, সমগুণশ্রেঢ়ী, সমগ্র, সমগ্রসম্পদ, সমঙ্গা, সমচতুরশ্র, সমচতুর্ভুজ, সমচিত্ত, সমচেতঃ, (সমচেতস্), সমজ, সমজ (সমঝ), সমজদার, সমজা (সমঝা), সমজাতি, সমজান (সমঝান), সমজোট (সমযোট), সমজ্ঞা, সমজ্যা, (সমঝ, সমঝদার, সমঝ, সমঝান), সমঞ্জস, সমঞ্জসা, সমতট, সমতল, সমতা, সমতিক্রম, সমতিক্রান্ত, সমতুল, সমত্রিভুজ, সমত্ব, সমদর্শন, সমদুঃখ, সমদুঃখসুখ, সমদৃক্(শ্), সমদৃষ্টি, সমদেশ, সমদ্দার (সমাদ্দার), সমদ্বিভুজ, সমধর্ম্মা, সমধান, সমধিক, সমধিগত, সমধুর, সমধৃত, সমনন্তর, সমনুকীর্ত্তন, সমনুজ্ঞাত, সমনুবর্ত্তী, সমনুশিষ্ট, সমন্ত, সমন্ততঃ, সমন্তপঞ্চক, সমন্তাৎ, সমন্বয়, সমন্বিত, সমপদ, সমপাদ, সমবকার, সমবতার, সমবধান, সমববোধন, সমবয়, সমবয়সী, সমবয়স্ক, সমবর্ণ, সমবর্ত্তী, সমবস্কন্দ, সমবস্তৃত, সমবস্থা, সমবস্থান, সমবস্থিত, সমবহার, সমবহাস্য, সমবাপ্ত, সমবায়, সমবায়সম্বন্ধ, সমবায়ী, সমবিভাগ, সমবিষম, সমবুদ্ধি, সমবৃত্ত, সমবৃত্তি, সমবেত, সমবেধ, সমব্যথী (হোমিওপ্যাথি), সমভাব, সমভাষা, সমভিপ্লুত, সমভিব্যাহার (সমভ্যারে), সমভিব্যাহারী (সমভ্বারী), সমভিব্যাহৃত, সমভিহার, সমভূম, সমভূমি, সমভ্যর্থয়িতা, সমভ্যাগত, সমভ্যাস, সমভ্যুদ্ধরণ, সমম্ (সঙে), সমমণ্ডল, সমমতি, সমমাত্র, সময়, সময়কার, সময়ক্রিয়া, সময়চ্যুতি, সময়জ্ঞ, সময়ধর্ম্ম, সময়নির্ণয়, সময়পরিরক্ষণ, সময়বিদ্যা, সময়ব্যভিচারী, সময়ভেদী, সময়া, সময়াচার, সময়াধ্যুষিত, সময়ানুবর্ত্তী, সময়ান্তর, সময়ূথ, সময়োচিত, সমযোট, সমর, সমরকর্ম্ম, সমরকার্য্য, সমরক্ষিতি, সমরক্ষেত্র, সমরত, সমরদুন্দুভি, সমরবিমর্দ্দ, সমরব্যসনী, সমরভূ, সমরভূমি, সমরমর্দ্দন, সমরমূর্দ্ধা, সমরশায়ী, সমরশিরঃ, সমরশূর, সমরশ্লাঘী, সমরসীমা, সমরসীমা(-মন্), সমরস, সমরসমাজ, সমরাগম, সমরাগ্র, সমরাঙ্গণ, সমরাজির, সমরাতিথি, সমরাশি, সমরু, সমরূপ, সমরেখ, সমরোথ, সমরোৎসব, সমরোদ্দেশ, সমর্চ্চন, সমর্চ্চনা, সমর্ণ, সমর্থ, সমর্থক, সমর্থন, সমর্থনা, সমর্থনীয়, সমর্থিত, সমর্থ্য, সমর্দ্ধক, সমর্প, সমর্পক, সমর্পণীয়, সমর্পয়িতব্য, সমর্পয়িতা, সমর্পিত, সমর্প্য, সমর্য্যাদ, সমর্হণ, সমলঙ্কৃত, সমশন, সমষ্টি, সমশ্রেণী, সমষ্ঠিলা, সমসংখ্যাত, সমসন, সমসন্ধি, সমসময়, সমসময়বর্ত্তী, সমসর, সমসাময়িক, সমসুপ্তি, সমসূত্রগ, সমসূত্রস্থ, সমসূত্রপাত, সমস্কার, সমস্ত, সমস্থ, সমস্থল, সমস্থলী, সমস্থান, সমস্যা, সমস্যার্থা, সমস্বর, সমা, সমাওত, সমাংশ,

সমাংশহারিণী, সমাংশহারী, সমাংশী, সমাংশমীনা, সমাকর্ষণ, সমাকার, সমাকীর্ণ, সমাকুল, সমাক্রমণ, সমাক্রুষ্ট, সমাক্ষর, সমাক্ষেপ, সমাখ্যা, সমাখ্যাত, সমাখ্যান, সমাগত, সমাগতা, সমাগতি, সমাগম, সমাগমন, সমাঘাত, সমাচয়ন, সমাচরণ, সমাচরণীয়, সমাচার, সমাচিত, সমাজ, সমাজঠেলা, সমাজপতি, সমাডীন, সমাতত, সমাদর, সমাদান, সমাদিষ্ট, সমাদৃত, সমাদেশ, সমাদেশন, সমাধ, সমাধা, সমাধান, সমাধি, সমাধিক্ষেত্র, সমাধিত, সমাধিভঙ্গ, সমাধিভৃৎ, সমাধিভেদ, সমাধিভেদী, সমাধিমান, সমাধিসিদ্ধি, সমাধিস্তম্ভ, সমাধিস্থ, সমাধৃত, সমাধেয়, সমাঘ্মাত, সমাধ্যায়ী, সমান, সমানকরণ, সমানকর্ত্তৃক, সমানকর্ম্মক, সমানকাল, সমানকালীন, সমানগোত্র, সমানজন্মা, সমানজাতি, সমানদুঃখ, সমানবয়স্ক, সমানবয়াঃ, সমানবর্চ্চস, সমানযোনি, সমানশয়ন, সমানাক্ষর, সমানাধিকরণ, সমানার্থ, সমানিচয়, সমানোদক, সমানোদর্ক, সমানোদর্য্য, সমানোপমা, সমান্ত, সমান্তর, সমান্তরাল, সমাপ, সমাপক, সমাপত্তি, সমাপন, সমাপনীয়, সমাপন্ন, সমাপিত, সমাপী, সমাপ্ত, সমাপ্তি, সমাপ্তিক, সমাপ্য, সমাপ্যায়িত, সমাপ্লব, সমাবর্ত্ত, সমাবর্ত্তন, সমাবায়, সমাবাস, সমাবিদ্ধ, সমাবিষ্ট, সমাবৃত, সমাবৃত্ত, সমাবেশ, সমাবেশিত, সমাভাষণ, সমাম্নাত, সমাম্নায়, সমায়াত, সমাযুক্ত, সমাযুত, সমার, সমারম্ভ, সমারাধন, সমারুরুক্ষু, সমারূঢ়, সমারোপ, সমারোপণ, সমারোপিত, সমারোহ, সমারোহণ, সমার্থ, সমার্থক, সমালম্বন, সমালম্ভ, সমালম্ভন, সমালাপ, সমালিঙ্গন, সমালোক, সমালোকন, সমাশ্রয়, সমাশ্রিত, সমাশ্লিষ্ট, সমাশ্লেষ, সমাশ্বস্ত, সমাশ্বাস, সমাশ্বাসন, সমাশ্বাসিত, সমাস, সমাসক্ত, সমাসক্তি, সমাসঙ্গ, সমাসত্তি, সমাসন্ন, সমাসব্যাস, সমাসান্ত, সমাসান্তপ্রকরণ, সমাসান্তবিধি, সমাসার্থা, সমাসীন, সমাসোক্ত, সমাসোক্তি, সমাস্থিত, সমাস্যা, সমাহত, সমাহর, সমাহরণ, সমাহার, সমাহিত, সমাহূত, সমাহৃত, সমাহৃতি, সমাহ্বয়, সমাহ্বা, সমাহ্বাতা, সমাহ্বান, সমিৎ, সমিৎকলাপ, সমিৎপাণি, সমিত, সমিতা, সমিতি, সমিতিঞ্জয়, সমিতিশালী, সমিদাধান, সমিদাহরণ, সমিদ্ধোম, সমিদ্বান, সমিধ্, সমিন্ধন, সমিস্যে, সমিহ, সমিহা (সমীহা), সমীক, সমীকরণ, সমীকৃত, সমীকৃতি, সমীক্রিয়া, সমীক্ষ, সমীক্ষণ, সমীক্ষা, সমীক্ষিত, সমীক্ষ্য, সমীক্ষ্যকারী, সমীচীন, সমীপ, সমীপকাল, সমীপগ, সমীপগমন, সমীপনয়ন, সমীপবর্ত্তী, সমীপস্থ, সমীপ্সিত, সমীর, সমীরণ, সমীরিত, সমীহা, সমীহিত, সমুখ, সমুচিত, সমুচ্চ, সমুচ্চয়, সমুচ্চারণ, সমুচ্চিত, সমুচ্ছল, সমুচ্ছিন্ন, সমুচ্ছেদ, সমুচ্ছেদন, সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায়, সমুচ্ছ্রিত, সমুচ্ছ্রিতি, সমুচ্ছ্বাস, সমুজ্জিহীর্ষু, সমুজ্জ্বল, সমুজ্ঝিত, সমুঝ (সমজ), সমুঝল, সমুঝা, সমুঝান, সমুৎক, সমুৎকচ, সমুৎকণ্ঠা, সমুৎকর্ষ, সমুৎকীর্ণ, সমুত্থ, সমুত্থান, সমুত্থিত, সমুৎপতন, সমুৎপতিত, সমুৎপত্তি, সমুৎপন্ন, সমুৎপাত, সমুৎপাদ, সমুৎপিঞ্জ, সমুৎপিঞ্জলক, সমুৎসব, সমুৎসর্গ, সমুৎসাদিত, সমুৎসারণ, সমুৎসাহ, সমুৎসুক, সমুৎসেধ, সমুদয়, সমুদাচার, সমুদায়, সমুদাহরণ, সমুদাহৃত, সমুদিত, সমুদীরণ, সমুদীর্ণ, সমুদ্গত, সমুদ্গম, সমুদ্গমন, সমুদ্গারণ, সমুদ্গিরণ, সমুদ্দিষ্ট, সমুদ্দেশ, সমুদ্ধত, সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধর্ত্তা, সমুদ্ধার, সমুদ্ধৃত, সমুদ্ভব, সমুদ্ভূত, সমুদ্ভূতি, সমুদ্ভেদ, সমুদ্যত, সমুদ্যোগ, সমুদ্র, সমুদ্রকফ, সমুদ্রকাঞ্চী, সমুদ্রকান্তা, সমুদ্রকুক্ষি, সমুদ্রগ, সমুদ্রগা, সমুদ্রগৃহ, সমুদ্রচুলুক, সমুদ্রজ, সমুদ্রতট, সমুদ্রতীর, সমুদ্রদয়িতা,

সমুদ্রদেব, সমুদ্রদেবতা, সমুদ্রনবনীত, সমুদ্রনেমি, সমুদ্রপত্নী, সমুদ্রফল, সমুদ্রফেন, সমুদ্রবল্লভা, সমুদ্রবসনা, সমুদ্রবহ্নি, সমুদ্রব্যবহারী, সমুদ্রমথন, সমুদ্রমন্থন, সমুদ্রমহিষী, সমুদ্রমালী, সমুদ্রমেখলা, সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রযান, সমুদ্রায়ী, সমুদ্ররশন (সমুদ্ররসন) সমুদ্রলবণ, সমুদ্রলহরী, সমুদ্রসার, সমুদ্রসুভগা, সমুদ্রা, সমুদ্রান্ত, সমুদ্রান্তা, সমুদ্রাবরণ, সমুদ্রাম্বরা, সমুদ্রায়ণ, সমুদ্রিয়, সমুদ্বহ, সমুদ্বেগ, সমুন্নত, সমুন্নমন, সমুন্নদ্ধ, সমুন্নাদ, সমুন্নেয়, সমুন্মূলন, সমুপচিত, সমুপজাত, সমুপদ্রুত, সমুপবেশ, সমুপবেশন, সমুপভোগ, সমুপসংহার, সমুপসংহৃত, সমুপস্থান, সমুপস্থিত, সমুপস্থিতি, সমুপহত, সমুপাগত, সমুপাত্ত, সমুপানয়ন, সমুপানীত, সমুপার্জ্জন, সমুপালম্ভ, সমুপেক্ষক, সমুপেত, সমুপোঢ়, সমুল্লসিত, সমুল্লেখ, সমূঢ়, সমূল, সমূলক, সমূলঘাতিনী, সমূলচ্ছেদ, সমূল্য, সমূহ, সমূহন, সমূহনী, সমূহ্য, সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধি, সমৃদ্ধিমান, সমৃদ্ধী, সমে, সমেত, সমেধন, সমোদয় (সম্মোদয়), সমোদিত, সম্পক্ক, সম্পত্তি, সম্পত্তিশালী, সম্পদ্, সম্পদ্‌বিনিময়, সম্পদ্‌বিপদ্, সম্পন্ন, সম্পরায়, সম্পরায়ক, সম্পরায়িক, সম্পরিপালন, সম্পরিমার্গণ, সম্পরিশোষণ, সম্পরেত, সম্পর্ক (সম্পক্ক), সম্পর্কী, সম্পর্কীয়, সম্পাক, সম্পাত, সম্পাতন, সম্পাতি, সম্পাতিক, সম্পাতী, সম্পাদক, সম্পাদন, সম্পদনীয়, সম্পাদয়িতা, সম্পাদিকা, সম্পাদিত, সম্পাদী, সম্পাদ্য, সম্পিণ্ডিত, সম্পিধান, সম্পীড়, সম্পীড়ন, সম্পীড়া, সম্পীড়িত, সম্পুট, সম্পুটক, সম্পুটিকা, সম্পূজন, সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণা, সম্পূর্ত্তি, সম্পৃক্ত, সম্প্রকাশিত, সম্প্রকীর্ত্তিত, সম্প্রচারিত, সম্প্রজ্ঞাত, সম্প্রণাদ, সম্প্রণেতা, সম্প্রতাপন, সম্প্রতি, সম্প্রতিক, সম্প্রতিপত্তি, সম্প্রতিপন্ন, সম্প্রতিপাদন, সম্প্রতিরোধক, সম্প্রতিষ্ঠা, সম্প্রতীক্ষ্য, সম্প্রতীতি, সম্প্রদা, সম্প্রদাতব্য, সম্প্রদাতা, সম্প্রদান, সম্প্রদানীয়, সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ী, সম্প্রধারণ, সম্প্রপ্রদ, সম্প্রবর্ত্তন, সম্প্রবাহ, সম্প্রবৃত্ত, সম্প্রমত্ত, সম্প্রমাদ, সম্প্রমোষ, সম্প্রয়াণ, সম্প্রয়াস, সম্প্রযুক্ত, সম্প্রয়োগ, সম্প্রয়োগী, সম্প্রযোজিত, সম্প্রলাপ, সম্প্রশ্ন, সম্প্রশ্রয়, সম্প্রসাদ, সম্প্রসাধন, সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত, সম্প্রস্থিত, সম্প্রহর্ষ, সম্প্রহর্ষী, সম্প্রহার, সম্প্রহারী, সম্প্রহাস, সম্প্রহৃষ্ট, সম্প্রাপ্ত, সম্প্রাপ্তি, সম্প্রিয়, সম্প্রীণন, সম্প্রীণিত, সম্প্রীত, সম্প্রীতি, সম্প্রেষণ, সম্প্রেষিত, সম্প্রৈষ, সম্প্রোক্ষণ, সম্প্রোক্ষিত, সম্ফুল্ল, সম্ফেট, সম্বচ্ছর, সম্বৎ, সম্বৎসর, সম্বন্ধ, সম্বন্ধক, সম্বন্ধার্থ, সম্বন্ধী, সম্বন্ধীয়, সম্বর, (সম্বররিপু, সম্বরবৈরী, সম্বরারি — দ্র. শম্বর), সম্বরণ (শম্, সম্ভাল, সামাল), সম্বরা (সাঁৎলান, সম্ভার), সম্বর্ত্ত, সম্বর্ত্তন, সম্বর্দ্ধনা, সম্বল, সম্বলিত, সম্বহুল, সম্বাদ, সম্বাধ, সম্বাধন, সম্বাহন, সম্বিৎ (সম্বিত, সম্বিদ), সম্বিধান, সম্বুদ্ধ, সম্বুদ্ধি, সম্বেদন, সম্বেশ, সম্বোধ, সম্বোধন, সম্বোধনী, সম্বোধিত, সম্বোধ্য, সম্ভক্ষ, সম্ভগ্ন, সম্ভব, সম্ভবপর্ব্ব, সম্ভবী, সম্ভব্য, সম্ভল, সম্ভলী, সম্ভা (সান্ধা), সম্ভাবন, সম্ভাবনা, সম্ভাবনীয়, সম্ভাবিত, সম্ভাবী, সম্ভাব্য, সম্ভার, (পুণ্যসম্ভার, ধান্যসম্ভার, শাস্ত্রসম্ভার) সম্ভাল (সম্বরণ), সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষণীয়, সম্ভাষা, সম্ভাষিত, সম্ভিন্ন, সম্ভুক্ত, সম্ভূ, সম্ভূত, সম্ভূতি, সম্ভূয়কারী, সম্ভূয়বণিক্(জ্), সম্ভূয়সমুত্থান, সম্ভৃত, সম্ভৃতি, সম্ভৃতশ্রী, সম্ভৃতসম্ভার, সম্ভেট, সম্ভেদ, সম্ভোগ, সম্ভোগক্ষম, সম্ভোগবেশ্ম, সম্ভোগশৃঙ্গার, সম্ভোগী, সম্ভোগ্য, সম্ভোজ, সম্ভোজক, সম্ভোজন, সম্ভোজনী, সম্ভ্রম, সম্ভ্রষ্টি, সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রান্তি, সম্মত,

সম্মতি, সম্মদ, সম্মর্দ্দ, সম্মান, সম্মানন, সম্মাননা, সম্মানিত, সম্মানী, সম্মার্গ, সম্মার্জ্জ, সম্মার্জ্জক, সম্মার্জ্জন, সম্মার্জ্জনা, সম্মার্জ্জনী, সম্মার্জ্জনীয়, সম্মার্ষ্টি, সম্মিত, সম্মিলন, সম্মিলনী, সম্মিলিত, সম্মিশ্র, সম্মিশ্রণ, সম্মিশ্রিত, সম্মীলন, সম্মীলিত, সম্মুখ, সম্মুখী, সম্মুখীন, সম্মুখীকরণী, সম্মুগ্ধ, সম্মূঢ়, সম্মূর্চ্ছন, সম্মৃষ্ট, সম্মেলন, সম্মোদ, সম্মোদন, সম্মোহ, সম্মোহন, সম্মোহনী, সম্মোহিত, সম্যক্(চ্), সম্যগ্দগুন, সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্পাঠ, সম্যগ্প্রয়োগ, সম্যগ্বর্ত্তমান, সম্যগ্যোগ, সম্মোকস্থিতি, সম্রাজ্ঞী, সম্রাট্(জ্), সহিত (সংহিত), সাংক্ষেপিক, সাংখ্য, সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যপুরুষ, সাংখ্যমুখ্য, সাংখ্যযোগ, সাংখ্যশাস্ত্র, সাংগ্রামিক, সাংঘাতিক, সাংঘাত্য, সাংবৎসর, সাংবৎসরিক, সাংবর্ত্তক, সাংবাদিক, সাংযাত্রিক, সাংযুগীন, সাংরাবিণ, সাংশয়িক, সাংসর্গিক, সাংসারিক, সাংসিদ্ধিক, সাংস্কারিক, সাংহিত, সাঁকালি (যার সাহায্যে সঙ্কলন করা হয়), সাঁকো (সংক্রম, সাকও়া), সাঁচ, সাঁচনা (সাচনা), সাঁজ (সাঁঝ), সাঁজা (সাঁঝা), সাঁজাল (সাঁজাল-চিংড়ি), সাঁজুড় (সাজুড়), সাঁড়াশি, সাঁড়াসি(সী), সাঁতর, সাঁতরা (সামন্তরায়) সাঁতরান, সাঁতল, সাঁতলা (সম্বরা), সাঁতলান, সাঁতার, সাঁথে, সাথে, সাঁদি, সাঁধ, সাঁধি, সাঁধা, সাঁধি, সাঁপড়ি, সাঁপুড়া, সাঁপুড়ি(ড়ী), সাঁপুড়্যা, সাঁভা, সাঁসাঁ, সেঁজুতি (সাজুতি), সাঙর (সাঁতলান, সম্বরণ, সম্বরা) সাঙ্করিক, সাঙ্কর্য্য, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কাশ্যণ, সাঙ্কিনি, সাঙ্কৃতি, সাঙ্কেতিক, সাঙ্কেত্য, সাঙঘাতি, সাজাল (সাঁজাল), সাণা, সান, সানা (সন্নাহ), সান্তপন, সান্তানিক, সান্দা, সান্দি, সান্দীপনি, সান্দৃষ্টিক, সান্দ্র, সান্দ্রকুতূহল, সান্দ্রপুষ্প, সান্দ্রমেহ, সান্দ্রীকৃত, সান্ধ, সান্ধা, সান্ধি, সান্ধিক, সান্ধিবিগ্রহিক, সান্ধিবেল, সান্ধ্য, সান্ধ্যকুসুমা, সান্নহনিক, সান্নায্য, সান্নাহিক, সান্নিধ্য, সান্নিধ্যপক্ষ, সান্নিধ্যযোগ, সান্নিপাতি, সান্নিপাতিক, সান্ন্যাসিক, সাপট (সাপুট), সাপটা, সাপটান, সাপড়া (সাঁপড়ি, সম্পুট), সাবটে, সাম, সামক, সামগ, সামগান, সামগায়, সামগীত, সামগ্রী, সামগ্র্য, সামগ্র্যবিধি, সামগ্র্যমতি, সামজ, সামজাত, সামঞ্জস, সামঞ্জসা, সামঞ্জস্য, সামট (সম্পুট, সাঁপড়ি, সাপটান, সাবাড়, দ্র.সৃপ্), সামটা, সামধ্বনি, সামনে, সামন্ত, সামন্তচক্র, সামন্য, সামপূর্ব্ব, সামবায়িক, সামবেদ, সামবেদবিৎ, সাময়িক, সামযোনি, সামরিক, সামর্থ্য, সামলা, সামলান (সম্বরণ), সামলী, সামা (সম হয়ে যাওয়া), সামাইল, সামাজিক, সামানাধিকরণ্য, সামান্য, সামান্যজ্ঞান, সামান্যধাত্রী, সামান্যনায়িকা, সামান্যপক্ষ, সামান্যপদার্থ, সামান্যবচন, সামান্যবনিতা, সামান্যলক্ষণ, সামান্যশাসন, সামান্যশাস্ত্র, সামান্যস্থল, সামান্যি, সামান্নি, সামাল (সম্বরণ, সাম্ভাল, দ্র. সম্বরা) সামাসিক, সামিগ্গিরি, সামিগ্র, সামিগ্রি(গ্রী), সামিধেনী, সামী, সামীপিক, সামীপ্য, সামুদাইক, সামুদায়িক, সামুদ্র, সামুদ্রবিৎ, সামুদ্রিক, সাম্পরায়, সাম্পরায়িক, সাম্পরায়িক-কল্প, সাম্প্রত, সাম্প্রতম্, সাম্প্রতিক, সাম্প্রদায়িক, সাম্ব, সাম্বর, সাম্বা, সাম্ভা, সাম্ভঃ, সাম্ভাল, সাম্মুখ্য, সাম্য, সাম্যতা, সাম্যাবস্থা, সাম্রাজ, সাম্রাজকৃৎ, সাম্রাজদীক্ষিত, সাম্রাজলক্ষ্মী, সাম্রাজ্য, সিঁদ (সিঁধ), সিঁদ-কাটা, সিঁদকাটি(টী,ঠি), সিঁদুপড়ী, সিঁদমুখ, সিঁদমোহানা, সিঁদেল (সিঁধেল), সিন্দ (সিন্ধ), সিন্দাল, সিন্দুক (সিন্ধুক), সিন্দুবার, সিন্ধ, সিন্ধদ্বার, সিন্ধুক, সুমুন্দী (সম্বন্ধী), সৈন্দা, সৈন্দাকালে, সৌঁপ, সৌঁপা (সমর্পণ করা), সৌঁসর, সোমত্ত, সোমত্তো, সোমত্থ।

● **সম্** = সত্তার বা অস্তিত্বের সীমায়ন। **সম** = সত্তার বা অস্তিত্বের সীমায়ন যাহাতে।

● **অভিসন্ধক (অভিসন্ধি) :** ১. অভি-সম্ + ✓ধা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. ***অভিসন্ধক অভিসন্ধি / অভিসন্ধক*** = যে পরগুণ সহিতে না পারিয়া নিন্দা করে। (ব.শ.)।

● **সংজ্ঞা : ৩.** বিশ্বকর্মার কন্যা ও সূর্যের স্ত্রী। সূর্যের ঔরসে এঁর গর্ভে তিনটি সন্তান হয় — **বৈবস্বত মনু, যম,** ও **যমুনা**। ... সংজ্ঞা সূর্যের অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে সূর্যকে দেখলে চক্ষু নিমীলিত করতেন। এই জন্য সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, সংজ্ঞা তাঁর চক্ষু সংযমন করার জন্যে প্রজাদের সংযমনকারী **যম**কে প্রসব করবেন। তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে সংজ্ঞা চপলভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তাঁর এই চপল চক্ষু দেখে সূর্য বললেন যে, তিনি চঞ্চলস্বভাবা নদীকে প্রসব করবেন। তখন চঞ্চলা **যমুনা**র জন্ম হল। পরে স্বামীর কোপ হতে রক্ষা পাবার জন্য নিজের অনুরূপ ছায়া নামে এক নারীকে সৃষ্টি করে সূর্যের কাছে রেখে ও তাঁর উপর নিজের পুত্র-কন্যার পরিচর্যার ভার দিয়ে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে ফিরে যান। কন্যার আগমনে বিশ্বকর্মা অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যাকে সূর্যের কাছে ফিরে যেতে বলেন; কিন্তু স্বামীর কাছে না গিয়ে সংজ্ঞা উত্তর কুরুবর্ষে **ঘোটকী**র রূপ ধরে ভ্রমণ করতে থাকেন। এদিকে সূর্য **ছায়া**কে সংজ্ঞা জ্ঞানে তাঁর গর্ভে পুত্রকন্যার জন্মদান করলেন; কিন্তু ছায়া নিজের সন্তানদের মত সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতিপালন করতেন না। এতে **যম** একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। পর মুহূর্তেই যম ছায়ার ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁর পদ স্খলিত হবে। যম সূর্যের কাছে এই শাপের কথা প্রকাশ করলে সমস্ত বিবরণ গোপন রেখে ছলনা করবার জন্য সূর্য ছায়াকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন ছায়া সমস্ত কথা স্বীকার করলে সূর্য সমাধিস্থ হয়ে সংজ্ঞার অশ্বীরূপ ধারণ দেখতে পেলেন। এরপর সূর্য বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ কর্তন করে অশ্বরূপ ধারণ করে **ঘোটকী**রূপিনী সংজ্ঞার কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলনের ফলে প্রথমে যুগল-দেবতা **অশ্বিনীকুমাব** ও পরে রেবন্তের জন্ম হল। এরপর সূর্য তাঁর তেজ সংহত করাতে সংজ্ঞা নিজের রূপ ধারণ করে স্বামীগৃহে ফিরে এলেন। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **অশ্বিনীকুমার, বড়বা, বাড়**। একালে এই **সংজ্ঞা**র আধুনিক রূপ হল 'সংবিধান'।

● **সংসার, সংসারবৃক্ষ : দ্র. অশ্বত্থবৃক্ষ, আদিবৃক্ষ।**

● **সংস্করণ (সংস্কার, সংস্কৃত) : ৫.** ইংরেজ একতলাকে বলে 'গ্রাউন্ড ফ্লোর', দোতলাকে বলে 'ফার্স্ট ফ্লোর'। তলার হিসেবটা তাদের এভাবেই এগোয়। আমেরিকাবাসী একতলাকে বলেন 'ফার্স্ট স্টোরি', দোতলাকে বলে 'সেকেন্ড স্টোরি'। তাদের হিসেব আমাদের মতো। বিশ্বায়ন তাদের সমান কথা বলতে শেখাতে পারেনি। দেখা যাচ্ছে, কেউ নিজের উত্তরাধিকারের গৌরব ছাড়তে রাজি নয়। গ্রন্থের সংস্করণ বিষয়েও সেরকম ব্যাপার রয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের রীতি হল, সবার আগে 'প্রথম মুদ্রণ' ও 'প্রথম প্রকাশ', তার পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ... মুদ্রণ পর পর হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থে কোনো সংস্কার সাধন করে মুদ্রণ করে প্রকাশ করলে, সেটি হবে প্রথম সংস্করণ, হতে পারে সেটি তৃতীয়

বা চতুর্থ মুদ্রণ। কিন্তু ইংরেজদের সেরকম হয় না। তাদের প্রথম প্রকাশটিই 'প্রথম মুদ্রণ' ও 'প্রথম এডিসন'। তারপরে মুদ্রণের হিসেব আমাদের মতো থাকলেও সংস্করণের হিসেবটি আর আমাদের মতো থাকে না। আমাদের 'দ্বিতীয় সংস্করণ' ইংরেজদের হিসেবে হয়ে যায় 'তৃতীয় এডিসন'। ইংরেজদের পোঁ-ধরা লোকজন তো আমাদের এখানে রয়েছেই। তাঁরা আজকাল বাংলা বইয়ের 'প্রথম সংস্করণ'কেই 'দ্বিতীয় সংস্করণ' লিখছেন। নিজেদের উত্তরাধিকারের গৌরব ছাড়তে এই বাঙালীদের লজ্জা করে না; ইংরেজদের করে, আমেরিকানদেরও করে।

● **সংহিতা** : ৩. যাতে বিষয় সমূহ সংহিত বা একত্র করা হয়েছে। যেমন ঋগ্‌বেদসংহিতা, **মনুসংহিতা** ইত্যাদি। মনু, অত্রি প্রভৃতি ঋষিরা যে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাঁদের সংহিতা বলা হয়। **মনু, অত্রি, বিষ্ণু**, হারীত, সংবর্ত, **কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম**, শীতাতপ ও **বশিষ্ঠ** ইত্যাদি উনবিংশ সংহিতা। এই সব সংহিতায় ধর্ম, অর্থাৎ জীবের কর্ম, চতুবর্ণের ধর্ম, অশৌচ, সংস্কার-কর্ম, জীবিকা প্রভৃতি সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **বেদ, বেদসংহিতা।**

● **সঙ্কোচ, সঙ্কোচন** : দ্র. **উৎকোচ, কুচ**।

● **সতত, সন্তত, সন্ততি, সন্তান** : ৫. দ্র. **তত**। সেখানে সতত খানিকটা দেওয়া হয়ে গেছে। দ্র. **তান**। এখানে সন্তান খানিকটা করে দেওয়া আছে। দ্র. **পঞ্চবৃক্ষ, দেবতরু, ভগ**। সন্তান যেহেতু 'অবিচ্ছেদ' বোঝায়, পিতামাতার উত্তর রূপ তাতে যেমন থাকে, তেমনি উৎপন্নে মানুষের মনুষ্যাংশ মেধাশ্রম রূপে থাকে, তাই উৎপন্নও সন্তানই বটে। সেই সন্তান **ভগের** মাধ্যমে উৎপাদিত হয়।

● **সন্তর্পণ** : দ্র. **তর্পণ**।

● **সন্ন্যাস** : দ্র. **বানপ্রস্থ, বেদসন্ন্যাস**। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করার অর্থ হল বিশ্বজগতের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার ধর্ম। তাতে বিশ্বজগতের শুভ হবে, এরূপ মনে করা হয়। এ হল বিশ্বজগতের শুভকামনার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করা।

● **সময়** : **সম অয়করণ**। দ্র. **পণ** শব্দের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ব.শ. **পণ** শব্দের অর্থে **সময়** দিয়ে গেছেন।

● **সমস্ত** : দ্র. **আস্ত, ব্যস্ত**।

● **সমাপ্ত (সমাপ্তি)** : দ্র. **আপ্ত**।

● **সমাবর্ত্তন** : দ্র. **দীক্ষা**।

● **সমীর, সমীরণ** : ১. সম + √ঈর্ + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *সমান ঈর (ঈরণ) যাহাতে।* / যাহা সম্যগ যায়। (ব.শ.)। ৩. পবনদেব, শমীবৃক্ষ, প্রেরয়িতা, প্রবর্ত্তক, বায়ু, শ্বাস, দেহস্থ পঞ্চবায়ু, পথিক, মরুবক ...। (ব.শ.)। ৪. air অর্থে প্রচলিত। এই air-কে উল্টে নিলে (ir + a) করে নিলে উপরোক্ত ব্যুৎপত্তির সঙ্গে মিলে যায়। ৫. সমান ভাবে যে মৃদুমন্দ বায়ু বয়, তাকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে এই সমীর সংবাদপ্রবাহকেও বোঝায়। যে-সংবাদ চারিদিকে সমানভাবে ও যথাযথভাবে প্রবাহিত হয় তাকে সমীর বা সমীরণ বলে। আদিম যৌথসমাজে 'নদীতে মাছ ধরা হচ্ছে গো' — এই খবর সম্যগভাবে প্রবাহিত হত, কেননা, সবাই সমানভাবে তা পাবে। তাই এ ছিল সমীরণ। কিন্তু 'ধনেখালিতে শাড়ি তৈরি হয়েছে গো' — এ খবর ছিল গু বা মলের খবর, ব্যক্তিমালিক তা বেচবে, ব্যক্তিমালিক তা কিনতে পারবে, তাই এ ছিল মলয় পদবাচ্য। ইংরেজি সেই 'গু দেয় যে' সেই শব্দটিই goods অর্থে প্রচলিত হয়ে গেছে। বলে রাখা যাক, সমীর বা সমীরণের এই ধারণা ইংরেজিতে সরাসরি প্রযুক্ত হয় এইভাবে — It is aired অর্থাৎ 'একথা প্রচারিত হইল'। সেকালে একেই **বায়ু** (দেবতা) বলা হত। দ্র. **ঈরণ, কুটীর, মলয়**।

● **সমুদ্র** : ৫. দ্র. **উন্দ্**। দ্র. **মন্থন**।

● **সমুদ্রমন্থন** : দ্র. **মন্থন।**

● **সম্প্রদান, সম্প্রদায়** : দ্র. **দাস, দান**।

● **সম্বন্ধ** : **সম্বন্ধেই বন্ধন সম্বন্ধেই মুক্তি**। দ্র. **বন্ধ**।

● **সম্বোধ, সম্বোধী, সম্বোধন** : দ্র. **বোধ**।

● **সাংখ্য, সাংখ্য-দর্শন** : ৩. মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য মতের প্রবর্তক। ইনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁর মতে প্রথমে কিছু না থাকলে অকস্মাৎ অমনি কোনো বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না। ... কপিল প্রকৃতি-পুরুষ নামে দুইটি নিত্যপদার্থ স্বীকার করেন। ... এঁর মতে প্রকৃতিই আদি কারণ। এর আর কারণ নাই। কপিল একে অমূল-মূল বলে বর্ণনা করেছেন। ... সেই আদি কারণ হতে ক্রমশ কার্য-পরম্পরার উৎপত্তি হয় বলেই কপিল তারই নাম '**প্রকৃতি**' রেখেছেন। ... (তাঁর) প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। ... (পৌ.অ.)

● **সামঞ্জস্য** : ৩. দ্র. **অঞ্জ**। ৫. **সুন্দর**। দ্র. 'সাম্য থেকে সামঞ্জস্যে : সুন্দরসমাজ'। 'অপর' পত্রিকার ২০০৯ জানুয়ারিতে প্রকাশিত সংখ্যায় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের শব্দার্থকোষ-সাধনার সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। দ্র. **পরিশিষ্ট ৫**।

● **সামবেদ** : ৩. চতুর্বেদের এক বেদ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে 'যে মন্ত্রবাক্য গান করা যায় তাহাই সাম। ঋক্ মন্ত্র সুর দিয়া গান করিলেই তাহা সামে পরিণত হয়। একালে যাহাকে রাগরাগিনী বলে, সাম তাহাদেরই তুল্য।' যজ্ঞ-সম্পাদনে কোনো কোনো ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হয়ে গীত হত। এই গেয় ঋক্‌গুলিকে সামবেদ বলা হত। ঋক্‌বেদের নবম মণ্ডলের দেবতার নাম সোম। সেই জন্য সামবেদের অধিকাংশই ঋক্‌বেদের নবম মণ্ডল হতে গৃহীত। (পৌ.অ.)

● **সল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : সল্, (সওয়াল, শলা), সলিল, সলিলকর্ম্ম, সলিলকুন্তল, সলিলকুক্কুট, সলিলক্রিয়া, সলিলচর, সলিলজ, সলিলজন্ম, সলিলধর, সলিলনিধি, সলিলনিষেক, সলিলপতি, সলিলময়, সলিলমুক্(চ্), সলিলরাজ, সলিলরাশি, সলিলাকর, সলিলাঞ্জলি, সলিলাধিপ, সলিলাবগাহ, সলিলার্ণব, সলিলার্থী, সলিলালয়, সলিলাশয়, সলিলাহার, সলিলেচর, সলিলেন্দ্র, সলিলেন্ধন, সলিলেশ, সলিলেশয়, সলিলেশ্বর, সলিলোদ্ভব, সলিলোপপ্লব, সলিলৌকাঃ(কস্), সোলা (শোলা)।

● **সল্** = সত্তার লালন-লয়ন। **সল** = সত্তার লালন-লয়ন যাহাতে।

● **সহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিসক, অবিষহ্য, অসহ, অসহন, অসহনীয়, অসহ্য, অসহায়, অসহিষ্ণু, অসাহসিক, অসৈরন, অসৈলন, উৎসাহ, দুর্ব্বিষহ, স, সই, সইয়া (সঁইয়া), সওয়া (সপাদ), সক, সকঙ্কট, সকট, সকড়া (সখড়া), সকড়ি, সকড়িমুখ, সকড়ি-হওয়া, সকড়িহাত, সকণ্টক, সকপট,

সকমল, সকম্প, সকম্পন, সকর, সকরুণ, সকর্ত্তৃক, সকর্ম্মক, সকর্ম্মা, সকল (সগ, সগর, সগ্গল, সয়াল), সকলভুবন, সকলেশ্বর, সকল্প, সকাণ্ড, সকাতর, সকাম, সকারণ, সকারণক, সকাল, সকাশ, সকুক্ষি, সকুল, সকুল্য, সকৃৎ, সকৃৎপ্রজ, সকৃৎপ্রসূতিকা, সকৃৎফলা, সকৃৎস্নায়ী, সকৃদাহত, সকৃদ্গর্ভা, সকৃপণ, সকৈতব, সকোপিত, সকৌতুক, সক্কল (এক্কল), সক্কাল, সক্ষণ, সক্ষত, সক্ষম, সক্ষার, সখ, সখা (সহ-খাদক, com-pani-on, সম-পানই-অন), সখি, সখিতা, সখিত্ব, সখিনি(নী), সখিপূর্ব্ব, সখিভাব, সখিভার্য্যা, সখিল, সখী, সখীগত, সখীজন, সখীভাব, সখীমণ্ডন, সখীসংবাদ (সখীসম্বাদ), সখেদ, সখেল, সখ্য, সখ্যতা, সগ, সগণ, সগদ্গদ্, সগন্ধ, সগন্ধিনী, সগন্ধী, সগর (সাগর, সায়র), সগর্ভ, সগর্ভা, সগর্ভ্য, সগুণ, সগুণ-ব্রহ্ম, সগোচর, সগোত্র, সন্ধি, সঘন, সঘর, সঘৃণ, সঘৃত, সঙ্কট, সচকিত, সচক্র, সচঞ্চল, সচরাচর, সচল, সচিত্র, সচিন্তিত, সচিহ্ন, সচেতন, সচেতাঃ, সচেষ্ট, সচেষ্টিত, সচ্ছায়, সচ্ছিদ্র, সজন, সজনি, সজনী, সজল, সজলনয়ন, সজাগ, সজাগর, সজাতি, সজাতিসমাজ, সজাতীয়, সজাত্য, সজীব, সজীবতা, সজুঃ (সজুষ্), সজোর, সজ্য, সজ্ঞানী (সয়ানি, সেয়ানা, সেয়ানি), সজ্জর, সটান, সটীক, সঠিক, সডাক, সতত্ত্ব, সতর্ক, সতা (সপত্নী), সতাই, সতাত, সতাসতী, সতিন (সতিনী, সতীন, সতীনী), সতিনকাঁটা, সতিনঝী, সতিনপো, সতিনবিটি, সতিনবেটা, সতিনমোড়া, সতিমির, সতিল, সতী (সপত্নী), সতীনক, সতীন-যুষ, সতীর্থ, সতীর্থ্য, সতীলক, সতুষ, সতৃট্ (সতৃষ্), সতৃণদশন, সতৃষ, সতৃষ্ণ, সতৃষ্ণা, সতেজাঃ (সতেজস্), সত্তর (সত্বর), সত্রাস, সত্বর, সথুৎকার, সদংশক, সদক্ষিণ, সদঞ্জন, সদণ্ড, সদয়, সদর্প, সদশ, সদান, সদায়, সদার, সদিনে, সদুত্তর, সদৃক্, সদৃক্ষ, সদৃশ, সদৃশবিনিময়, সদৃশত্রী, সদৃশস্পন্দন, সদেশ, সদোষ, সদ্য, সদ্যছিন্ন, সদ্যশিশু, সদ্যস্নাত, সদ্যস্ফুট, সদ্যঃ, সদ্যঃকাল, সদ্যঃকৃত, সদ্যঃকৃত্ত, সদ্যঃক্ষত, সদ্যঃপাতী, সদ্যঃপর্য্যুসিত, সদ্যঃপ্রক্ষালক, সদ্যঃপ্রফুল্ল, সদ্যঃপ্রসূত, সদ্যঃপ্রাণকর, সদ্যঃপ্রাণহর, সদ্যঃফল, সদ্যঃশৌচ, সদ্যঃস্নাত, সদ্যোজাত, সদ্যোজীবী, সদ্যোঘৃত, সদ্যোদধি, সদ্যোদুগ্ধ, সদ্যোবর্ষ, সদ্যোবর্ষণ, সদ্যোবৃষ্টি, সদ্যোভব, সদ্যোমন্যু, সদ্যোমাংস, সদ্যোমুক্ত, সদ্রব্য, সধন, সধনুঃ, সধনুষ্ক, সধবা, সধর্ম্ম, সধর্ম্মক, সধর্ম্মা, সধর্ম্মিণী, সধর্ম্মী, সধূম, সধূমক, সধূম্র, সধ্র্যচ্, সধ্রীচী, সধ্রীচীন, সনাথ, সনাথা, সনাভি, সনামা, সনির্ঘাত, সনির্ব্বেদ, সনীড়, সন্যায়, সপক্ষ, সপক্ষীয়, সপটে, সপত্র, সপত্নগণ, সপত্নজ, সপত্নজিৎ, সপত্ননাশ, সপত্নবিজয়, সপত্নবৃদ্ধি, সপত্নশ্রী, সপত্নী, সপত্নীক, সপত্রক, সপদি, সপরিকর, সপরিজন, সপরিবার, সপরিবৃংহণ, সপরিব্যয়, সপর্য্যা, সপাৎসপাৎ, সপাদ (সওয়া, পৌনের উলটো), সপাদভূতি, সপাদলক্ষধনী, সপাল, সপাসপ, সপিণ্ড, সপিণ্ডতা, সপিণ্ডন, সপিণ্ডীকরণ, সপিণ্ডীকৃত, সকরপুটে, সপ্রজ, সপ্রণয়, সপ্রতিভ, সপ্রত্যয়, সপ্রভ, সপ্রমাণ, সপ্রশ্রয়, সপ্রসব, সপ্রাণ, সফল, সফলপ্রার্থন, সফলমনোরথ, সফলা, সফেন, সবৎস, সবৎসা, সবন্ধক, সবন্ধু, সবয়স্ক, সবয়াঃ (সবয়স্), সবর্গীয়, সবর্ণ, সবর্ণা, সবল, সবহুমান, সবাধ, সবান্ধব, সাবাসাঃ, সবিকল্প, সবিকল্পক, সবিকার, সবিগ্রহ, সবিদ্য, সবিধ, সবিনয়, সবিভ্রম, সবিলক্ষ, সবিলাস, সবিশেষ, সবিশেষক, সবিষ, সবিস্তর, সবিস্ময়, সবিস্মিত, সবৃদ্ধিক,

সবেগ, সবেশ, **সবৈলক্ষ্য, সব্যথ, সব্যপেক্ষ, সব্যভিচার, সব্যাজ, সব্যাপার, সব্রণ, সব্রতী, সব্রহ্মচারিক, সব্রহ্মচারী, সভক্তি, সভক্তিক, সভয়, সভর্ত্তৃকা, সভা, সভা-উজ্জ্বল, সভাকার, সভাকারী, সভাকুট্টিম, সভাখণ্ড, সভাগত, সভাগৃহ, সভাজ, সভাজন (স-ভাজন), সভাজন, সভানায়ক, সভাপতি, সভাপর্ব্ব, সভাপাল, সভাপূজা, সভাপ্রবেশন, সভামণ্ডপ, সভাসৎ (সভাসদ্), সভাস্তার, সভাস্থ, সভিক, সভোদ্দেশ, সভোপবিষ্ট, সভ্য, সভ্যেতর, সমদ, সমনস্ক, সমন্ত্র, সমন্ত্রক, সমন্যু, সমল, সমাতা, (সমাতৃ), সমান, সমুদ্গ, সমুদ্গক, সমুদ্র, সমে, সযত্ন, সযুক্(জ্), সযূথ্য, সযোগ, সযোনি, সরজ, সরজঃ(জস্), সরজস্ক, সরজস্কা, সরত্নি, সরথ, সরভস, সরস, সরসিক, সরসিজ, সরসজন্মা, সরসিরুহ, সরহস্য, সরাগ, সরাজক, সরুক্(জ্), সরুচাক(কু)লি, সরুজ, সরূপ, সরূপতা, সরেশ (সরেস, সরস), সরোষ, সলখ (সলক্ষ্য), সলজ্জ, সলজ্জা, সলজ্জিত, সলাফ, সলীল, সলোক, সলোকতা, সলোক্য, সশঙ্ক, সশঙ্কিত, সশব্দ, সশর, সশরীর, সশল্ক, সশল্য, সশিষ্য, সশেষ, সশ্রীক, সসংজ্ঞ, সসজ্জ, সসত্ত্ব, সসত্ত্বা, সসন্ততিক, সসন্তান, সসম্ভ্রম, সসর্প, সসাক্ষিক, সসাগর, সসাধ্বস, সসিত, সসীম, সসীমা, সসেমিরা, সস্ত্রীক, সস্থান, সস্নেহ, সস্পৃহ, সস্ফুর, সস্বন, সস্বর, সস্বেদ, সহ্, সহ, (ভরসহ, ভারসহ, সুখদুঃখসহ) সহঃ (সহস্), সহকার (সহার, সাহার), সহকারভঞ্জিকা, সহকারমধু, সহকারিতা, সহকারিণী, সহকারী, সহকৃত, সহকারে, সহখট্টাসন, সহগমন, সহচর, সহচরণ, সহচরিত, সহচরী, সহচার, সহচারিণী, সহচারী, সহজ, সহজধার্ম্মিক, সহজবৎসল, সহজভজন, সহজমলিন, সহজমিত্র, সহজশত্রু, সহজসাধন, সহজসুহৃৎ, সহজাঙ্গ, সহজাত, সহজারি, সহজার্থ, সহজিয়া, সহজী, সহজীয়া, সহজে, সহজেতর, সহতা, সহত্ব, সহদল, সহদার, সহদেব, সহদেবা, সহদেবী, সহদেবীগণ, সহধর্ম্ম, সহধর্ম্মচর, সহধর্ম্মচরণ, সহধর্ম্মচারিণী, সহধর্ম্মচারী, সহধর্ম্মিণী, সহন, সহনশীল, সহনীয়, সহনর্ত্তন, সহনাম, সহপাংশুক্রীড়ন, সহপাংশুক্রীড়া, সহপাঠী, সহপান, সহপানক, সহপিণ্ডক্রিয়া, সহপুত্র, সহপ্রযায়ী, সহপ্রস্থায়িনী, সহপ্রস্থায়ী, সহবৎ, সহবতি(তী), সহবসতি, সহবাস, সহবাসিক, সহবাসী, সহব্রত, সহব্রতা, সহব্রতী, সহভাব, সহভাবী, সহভু, সহভোজন, সহভোজী, সহমরণ, সহমান, সহমৃতা, সহযায়ী, সহযুদ্ধ, সহযোগ, সহযোগিতা, সহযোগী, সহর (সহ রহে যেখানে), সহরকোটাল, সহরঘেঁষা, সহরতলী, সহরপনা, সহরীয়া, সহুরে, সহুরেপনা, সহর্ষ, সহল, সহলে, সহশয্যাসনাশন, সহস, সহসংবেগ, সহসম্ভব, সহসা, সহসাৎ, সহসাত, সহস্ত, সহস্তে, সহস্থ, সহস্থিত, সহস্য, সহস্র, সহস্রক, সহস্রকর, সহস্রকরপন্নেত্র, সহস্রকিরণ, সহস্রকিরণমালী, সহস্রগু, (পণ্য), সহস্রগুণ, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রচরণ, সহস্রজিৎ, সহস্রঝারা, সহস্রণী, সহস্রতয়, সহস্রদ, সহস্রদংষ্ট্র, সহস্রদল, সহস্রদলপদ্ম, সহস্রদীধিতি, সহস্রদৃক্, সহস্রধা, সহস্রধার, সহস্রধারা, সহস্রনয়ন, সহস্রনেত্র, সহস্রপতি, সহস্রপত্র, সহস্রপাৎ(দ্), সহস্রপাদ, সহস্রবদন, সহস্রবাহু, সহস্রবেদী, সহস্রভুজ, সহস্রভুজা, সহস্রমূর্দ্ধা, সহস্রমৌলি, সহস্ররশ্মি, সহস্ররুক্(চ্), সহস্রলোচন, সহস্রশঃ, সহস্রশিখর, সহস্রশিরাঃ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রশীর্ষা, সহস্রশ্রবণ, সহস্রসংখ্য, সহস্রসংখ্যক, সহস্রাংশু, সহস্রাক্ষ, সহস্রাধিপতি, সহস্রার, সহস্রার্চ্চিঃ (র্চ্চিস্), সহস্রী, সহস্বতী, সহস্বান্(স্বৎ)**

সহাধ্যয়ন, সহাধ্যায়, সহাধ্যায়িনী, সহাধ্যায়ী(য়িন্), সহানুগমন, সহানুভুতি, সহায়, সহায়কৃৎ, সহায়কৃত্য, সহায়তা, সহায়ত্ব, সহায়ন, সহায়বান(বৎ), সহায়বতী, সহায়া, সহায়িনী, সহায়ী, সহার, সহার্থ, সহার্দ্ধ, সহাস, সহাসন, সহাস্য, সহাস্যবদন, সহি, সহিত, সহিতব্য, সহিতা, সহিতে, সহিতোরু, সহিষ্ণু, সহৃদয়, সহৃদ্যতা, সহৃল্লেখ, সহে, সহেতু, সহেতুক, সহেলা, সহেলী, সহোক্তি, সহোটজ, সহোঢ়, সহোত্থ, সহোত্থায়ী, সহোদক, সহোদর, সহোদরা, সহোরু, সহ্য (অসহ্য) সহ্য, সহ্যকন্যা, সহ্যবাসিনী, সহ্যাত্মজা, সাঅর (সাগর), সাইক্ষাত, সাক্ষাৎ, সাইঙ্গ (সাং, সাঙ, সাঙ্গ, স-অঙ্গ), সাঁট (আঁটসাঁট, সন্নদ্ধ), সাঁটা, সাকল্য, সাকাঙক্ষ, সাকার, সাকারবাদ, সাকারবাদী, সাকারা, সাকুব (বেকুব), সাকুল্য, সাকৃত, সাকেত, সাকেতক, সাক্ষত, সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎকরণ, সাক্ষাৎকর্ত্তা, সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকৃতি, সাক্ষাৎক্রিয়া, সাক্ষাৎদৃষ্ট, সাক্ষাৎলাভ, সাক্ষাৎলালসা, সাক্ষাৎসম্বন্ধ, সাক্ষিক, সাক্ষিগোপাল, সাক্ষিদ্বৈধ, সাক্ষিপরীক্ষণ, সাক্ষিপ্রশ্ন, সাক্ষিভূত, সাক্ষী, সাক্ষ্য, সাখি(খী), সাখ্য, সাগর, সাগরগ, সাগরগামী(মিন্), সাগরঙ্গম, সাগরতরণী, সাগরনেমি, সাগরপর্য্যন্ত, সাগরপ্লবন, সাগরমেখল, সাগরমেখলা, সাগরসঙ্গম, সাগরান্ত, সাগরাম্বর, সাগরালয়, সাগরোপম, সাগাধ, সাগ্নি, সাগ্নিক, সাগ্র, সাগ্রহ, সাঙ (সাঙ্গ, সাঙন) সাচার, সাজাত্য, সাঞ্জন, সাঞ্জলি, সাঞ্জাত, সাটোপ, সাঠ (সাঁট), সাড়ে (স-অর্দ্ধ, সার্দ্ধ), সাণ্ড, সাতাল, সাতিরেক, সাতিশয়, সাতিসার, সাত্ম, সাত্মা, সাদৃশ্য, সাধারণ, সাধারণতঃ, সাধারণতন্ত্র, সাধারণদেশ, সাধারণধন, সাধারণধর্ম্ম, সাধারণস্ত্রী, সাধারণী, সাধারণ্য, সাধি, সাধিক, সাধিদৈব, সাধিবাস, সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ, সাধিলেখ্য, সাধ্যবসানা, সাধ্যবসানিকা, সানন্দ, সানন্দিত, সানুকম্প, সানুকূল, সানুকূল্য, সানুক্রোশ, সানুগ, সানুতর্ষ, সানুনয়, সানুনাসিক, সানুবন্ধ, সানুমতী, সানুমান, সানুরাগ, সানুরুহ, সানুশয়, সানুস্বার, সান্ত, সান্তর, সান্তরতা, সান্তরায়, সান্তরাল, সান্তর্হাস, সান্বয়, সাপক্ষ, সাপগম, সাপট (সাটোপ), সাপত্ন, সাপত্নক, সাপত্নেয়, সাপত্নেয়ী, সাপত্ন্য, সাপত্য, সাপবাদ, সাপরাধ, সাপিণ্ড, সাপিণ্ড্য, সাপেক্ষ, সাফল, সাফলা, সাফলি, সাফল্য, সাবকাশ, সাবজ্ঞ, সাবদ্য, সাবধান, সাবধানপূর্ব্বক, সাবধানহস্তে, সাবধি, সাবয়ব, সাবরণ, সাবর্ণ, সাবর্ণি, সাবর্ণিক, সাবর্ণ্য, সাবলেপ, সাবশেষ, সাবষ্টম্ভ, সাবহিত, সাবহিতে, সাবাধ, সাবালক, সাবালগ, সাবাস (শাবাশ), সাবাসি, সাব্যস্ত, সাভিজ্ঞান, সাভিনিবেশ, সাভিপ্রায়, সাভিলাষ, সাভ্যসূয়, সাভ্র, সাম, সামর্ষ, সামিষ, সামোদ, সাম্মাতুর, সায়র (সাগর), সায়রী, সাযুজ্য, সায়ের, সার (সহার, সহকার), সারদ্র, সারব, সারবান্(বৎ), সারস, সারস(শ)ন, সারসপ্রিয়া, সারসা, সারসাক্ষী, সারসী, সারূপ্য, সারোপা, সার্গল, সার্থ, সার্থক, সার্থকজন্মা, সার্থপতি, সার্থপাল, সার্থবাহ, সার্থভৃৎ, সার্থমণ্ডল, সার্থহা(হন্), সার্থিক, সার্দ্ধ, সার্দ্ধম্, সার্দ্র, সার্ষ্টি, সালঙ্ক, সালঙ্কার, সালোক্য, সাল্‌কেমধ্যস্থ, সাশঙ্ক, সাশ্চর্য্য, সাশ্রয়, সাশ্রু, সাষ্টাঙ্গ, সাস, সাসার, সাসি, সাসিপাণি, সাসিহস্ত, সাসু, সাসুসূ, সাসূয়, সাস্থি, সাস্র, সাহ, সাহঙ্কার, সাহচর্য্য, সাহজিক, সাহস, সাহসকরণ, সাহসকারী, সাহসভাঙ্গা, সাহসাঙ্ক, সাহসাধিপতি, সাহসালী, সাহসিক, সাহসিক্য, সাহসী, সাহসৈকরস, সাহসৈকরসিক, সাহস্র, সাহস্রিক, সাহায়ক, সাহায্য, সাহায্যকর, সাহায্যদান, সাহাল, সাহিত্য, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যরত্নাকর, সাহিত্যশাস্ত্র, সাহিত্যসুধা, সাহিত্যসেবী, সাহ্য, সাহ্যকর্ম্ম, সাহ্যকৃৎ, সাহ্ন, সাহ্নয়, সিয়ান (সজ্ঞান), সিয়ানা, সিয়ানি, সিয়ানী, সুসহ, সে ('কানুসে' < কানুসহিতে), সেআন, সেন্দ্র, সেন্দ্রিয়, সেয়ান (সজ্ঞান), সেয়ানা, সেয়ানি(নী), সের্ষ্য, সেষু, সেষুক, সৈ, সৈয়াড়ি, সোই (সখি), সোক্ষ (সৌখ্য), সোজা, সোজাসুজি, সোজাসুজী, সোঢ, সোঢা, সোৎক, সোৎকণ্ঠ, সোৎপ্রাস, সোৎসব, সোৎসাহ, সোৎসুক, সোৎসেধ, সোদক, সোদয়, সোদর, সোদরা, সোদরীয়, সোদর্য্য, সোদর্য্যা, সোদাহরণ, সোদ্যম, সোদ্বাপ, সোদ্বেগ, সোন্মাদ, সোপকরণ, সোপকার, সোপধ, সোপধান, সোপধি, সোপপত্তিক, সোপপ্লব, সোপবাস, সোপম, সোপরদ্দ, সোপর্দ্দ (সমর্পণ, সোঁপা), সোপসর্গ, সোপহাস, সোপাক, সোপাদান, সোপাধি, সোপাধিক, সোপান, সোপানপঙ্‌ক্তি, সোপানপথ, সোপানপদ্ধতি, সোপানপরম্পরা, সোপানভূত, সোপানমার্গ, সোপানাবলি(লী), সোয়া (সপাদ), সোরূপনারান, সোল্লাস, সোল্লুণ্ঠ, সোল্লুণ্ঠন, সোল্লুণ্ঠনোক্তি, সোল্লুণ্ঠবচন, সোল্লুণ্ঠবাক্য, সোল্লুণ্ঠভাষণ, সোল্লুণ্ঠভাষিত, সোল্লুণ্ঠোক্তি, সোষ, সোষ্ণীষ, সোষ্মা(ষ্মন্), সোসর, সৌতিন, সৌতিনি(নী), সৌৎসুক্য, সৌদর্য্য, স্যান্তামি (সেয়ানা-আমি, সজ্ঞান-আমি)।

● **সহ্** = সত্তার হওয়ন। **সহ** = সত্তার হওয়ন যাহাতে।

● **সকাল** : দ্র. **বিকাল**।

● **সহ (সহা)** :-১. ✓সহ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সত্তার হওয়ন থাকে যাহাতে; (প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও) সত্তার হওয়ন চলে যে শক্তিতে।* ৩. ক্ষম, সহিষ্ণু, শক্ত, সমর্থ, অগ্রহায়ণ মাস, মহাদেব। সহা = পৃথিবী, সহচরী, মুদগপর্ণী, ঘৃতকুমারী, দণ্ডোৎপলা, শুক্লঝিণ্টী, রাস্না, স্বর্ণক্ষীরী, নখভেষজ। সাহিত্য, সাকল্য, যৌগপদ্য, সাদৃশ্য, বিদ্যমানতা, সমৃদ্ধি, সম্বন্ধ, সামর্থ্য। সহ্য করা, সহা, ক্ষমা করা, স্বীকার করা। (ব.শ.)। ৪. accompany ও endure অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ শব্দটির ভেতরের লক্ষণাত্মক গুণটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। পারিপার্শ্বিক আমার পক্ষেও আছে, বিপক্ষেও আছে। পক্ষের সঙ্গে আমার 'সহন' (সহায়তার) সম্পর্ক, বিপক্ষের সঙ্গেও আমার 'সহন' (সহ্য করার) সম্পর্ক। এই হাঁসূচক ও নাসূচক দুরকম 'সহন' সম্পর্কের মধ্যে আমি হই, হয়ে উঠি। তার জন্য আমার **সাহস** লাগে, **উৎসাহ** লাগে।

● **সখা (সখী, সই)** : ৫. দ্র. **গঙ্গাজল-সই**।

● **সগর** : ৩. ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। স (সহ) গর (বিষ) — বিষের সহিত জাত বলে এঁর নাম সগর। রাজা **বাহুর** ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী **যাদবীর** গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যাদবী গর্ভবতী হলে তাঁর ঈর্ষান্বিতা সপত্নী গর্ভনাশের জন্য তাঁর খাদ্যে বিষ প্রদান করেন; কিন্তু দৈবশক্তিবলে যাদবী বিষপান সত্ত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হন না বা তাঁর গর্ভ নষ্ট হয় না। একবার শত্রুরা মিলিত হয়ে বাহুর রাজ্য আক্রমণ করে ও তাঁকে অরণ্যে বিতাড়িত করে। গর্ভবতী যাদবীও স্বামীর সঙ্গে বনগমন করেন। বিষের প্রভাবে পুত্র শতবর্ষ মাতার গর্ভে আবদ্ধ থাকে। শেষে বনমধ্যে রাজার মৃত্যু হলে যাদবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে প্রাণত্যাগ করা স্থির করেন। কিন্তু ঋষি **ঔর্ব** তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, তাঁর গর্ভে এক অমিত শক্তিশালী পুত্রের জন্ম

হবে। পরে যাদবী বিষের সঙ্গে এক পুত্র প্রসব করেন। ঔর্ব এই সন্তানের নাম দেন সগর। সগর বড় হয়ে পিতৃরাজ্য লোপের বিবরণ জানতে পেরে শত্রুদের বিনাশ করবেন বলে স্থির করেন এবং কালে **তালজঙ্ঘ, হৈহয়** প্রভৃতি শত্রুদের পরাজিত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকেন। (পদ্মপুরাণ)

মহাভারতে বর্ণিত বৃত্তান্ত এইরূপ — ইক্ষাকুবংশের রাজা সগরের দুই স্ত্রী ছিল, জ্যেষ্ঠা **বিদর্ভ** রাজকন্যা কেশিনী ও কনিষ্ঠা **অরিষ্টনেমী**র কন্যা সুমতি। ... কেশিনী একটি লাউ প্রসব করেন এবং সুমতির গর্ভে এক দেবতুল্য পুত্র হয়। এই পুত্রের নাম **অসমঞ্জ**। ... লাউয়ের বীজ থেকে পরে ৬০,০০০ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ... **কপিল** শাপে এরা ভস্মীভূত হয়। ... **অংশুমানে**র পৌত্র **ভগীরথ গঙ্গা** আনয়ন করলে তারা পুনর্জীবিত হয়। ... নিজের সন্তানদের ভস্মাধার বলে সগর সমুদ্রকে কল্পনা করেছিলেন, তাই সমুদ্রের নাম সাগর। (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **উর্ব্ব, ঔর্ব্ব**।

● **সগুণ (সগুণ-ব্রহ্ম)** : দ্র. **ব্রহ্ম**।

● **সহজ** : **৫.** সহজ = সহজাত, কর্ণের 'সহজ কবচ'। দ্র. **কর্ণ**।

● **সাহ** : দ্র. **সহ, উৎসাহ**।

● **সাহস** : দ্র. **সহ, সাহ, উৎসাহ**।

● ***সাধ্ (সাধি)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অসাধন, অসাধনীয়, অসাধু, অসাধ্য, অসাধ্যসাধন, সওদা, সওদাগর (সদাগর), সওদাগরী (সদাগরী), সাউ, সাউগাড়ি, সাউত, সাউদ, সাউধ, সাউধ-মহাজন, সাউধ-সদাগর, সাউলি(লী), সাএল, সাওখোড়, সাদ, সাদ-খাওয়া, সাদ্দি, সাধ্, সাধ, (ধার্ম্মিক, ভালমানুষ, বণিক, ব্যবসাদার), সাধক, সাধন, সাধনক্রিয়া, সাধনক্ষম, সাধননির্দ্দেশ, সাধনপত্র, সাধনা, সাধনীয়, সাধয়িতব্য, সাধব, সাধভক্ষণ, সাধস, সাধা, সাধিকা, সাধিত, সাধিষ্ঠ, সাধীয়ান(য়স্), সাধু, সাধুকার, সাধুকারী, সাধুখাঁ, সাধুজ, সাধুজাত, সাধুতা, সাধুত্ব, সাধুদর্শন, সাধুদর্শী, সাধুদেবী, সাধুধী, সাধুধ্বনি, সাধুনিগ্রহ, সাধুবাদ, সাধুবাহ, সাধুবাহী, সাধুবৃত্ত, সাধুবৃত্তি, সাধুভাব, সাধুভাষা, সাধুয়ানী, সাধুয়াল, সাধুশব্দ, সাধুশীল, সাধুসংসর্গ, সাধুসম্মত, সাধূক্ত, সাধে, সাধ্য, সাধ্যগণ, সাধ্যতা, সাধ্যতাবচ্ছেদক, সাধ্যত্ব, সাধ্যনির্দ্দেশ, সাধ্যপক্ষ, সাধ্যবান্(বৎ), সাধ্যমত, সাধ্যসাধন, সাধ্যসাধনা, সাধ্যসিদ্ধি, সাধ্যসিদ্ধিপাদ, সাধ্যাভাব, সাধ্বি, সাধ্বস, সাধ্বাচার, সাধ্বী, সাহ, সাহা, সাহু, সাহুকার, সাহুকারী, সাহুগাড়ী, সিষাধয়িষা, সুসাধ্য, সৌদাগর, সৌদাগরী।

● **সাধ্ (সাধি)** = সত্তাধার হইতে জনন। **সাধ** = সত্তাধার হইতে জাত যে। **সাধি** = **সাধ**-এর গতিশীলতা যাহাতে।

● **সাধব** : **৫. সাধ** বহন করে যে। এখানে জানাতে হবে যে, সেকালে বড় ব্যবসায়ীদের **সাধু** এবং তাদের কর্মচারীদের **সাধব** বলা হত। মধ্যযুগে উড়িষ্যার কটকের মহানদী থেকে যে বালিদ্বীপে নৌবাণিজ্যের যাত্রা হত, তাতে যুবক ছেলেরা যেত। ঐ যুবকদের বলা হত **সাধব**। এখনও প্রতিবছর সেই স্মৃতি নিয়ে 'বালিযাত্রার মেলা' হয়ে থাকে।

● **সাধ্যগণ** : **২.** *যাহারা সাধিতে পারেন।* **৩.** ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ তম সূক্তের পঞ্চাশতম ঋকে সাধ্যদেবগণ ছন্দোহভিমানী। **শতপথব্রাহ্মণের** মতে এঁদের বাস দেবলোকের উপরিভাগ। **যাস্ক** মতে এঁরা ভুবর্লোকবাসী। মনুসংহিতার বর্ণনায় এঁরা হিরণ্যগর্ভ **ব্রহ্মার সৃষ্ট সাধ্যগণ** নামক সূক্ষ্ম দেবগণ। **বিরাটপুত্র সোমসদগণ** এঁদের পিতৃগণ। হরিবংশ মতে দক্ষকন্যা ধর্মপত্নী সাধ্যার গর্ভে এঁদের জন্ম। এঁরা সংখ্যায় দ্বাদশ — মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, আপন, বীর্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রমুঞ্চ। অন্য মতে এঁরা তের জন। (পৌ.অ.)।

● **সাধ্বী** : **৫.** দ্র. **সতী, পতিব্রতা**। স্বামীর **সাধনা**ই যাহার সাধনা। স্বামী কালীসাধনা করলে, স্ত্রীও যদি স্বামীর সেই সাধনার শরিক (সহায়িকা) হন, তিনিই সাধ্বী। স্বামী যদি 'সা-রে-গা, রে-গা-মা' **সাধেন**, স্ত্রীও যদি ঠিক সেইরূপ সাধেন, তিনিই সাধ্বী। স্বামী যদি **সাধেন**, 'নিন না স্যার, নিন, আমাদের নিজেদের তৈরি', স্ত্রীও যদি সেরূপই সাধেন, তিনিই সাধ্বী। স্বামী যদি জনপ্রিয় নেতা হবার **সাধ** করেন, স্ত্রীও যদি সেইরূপ সাধ করেন যে, তাঁর স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তবে সেই স্ত্রীই সাধ্বী। মোট কথা, স্বামী জ্ঞানসাধনা / কর্মসাধনা /কাব্যসাধনা / কৃষিসাধনা / শিল্পসাধনা / খদ্দের-লক্ষ্মীর সাধনা / শিবসাধনা / পীরসাধনা / মাদারটেরেসার সাধনা / কংগ্রেস-সাধনা / বিজেপি-সাধনা / সিপিএম-সাধনা / ডাব-বাবার-সাধনা / বড়সাহেবের-সাধনা / মাস্তান-সাধনা করলে স্ত্রীও যদি স্বামীর সেই সাধনার শরিক হন, সেই স্ত্রীই সাধ্বী। ...

● **সান্ত্ব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : সাঁতা, সাঁতাওব, সাঁতায়লি, সাতায়লি, সান্ত্ব্, সান্ত্ব, সান্ত্বন, সান্ত্বনা, সান্ত্বপূর্ব্ব, সান্ত্ববাদ, সান্ত্বা, সান্ত্বিত, সাম্।

● **সান্ত্ব্** = সত্তার আধারের রহস্যরূপ তারণের বহন। **সান্ত্ব** = সত্তার আধারের রহস্যরূপ তারণের বহন যাহাতে।

● ***সি* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবিষয়, অবিষয়ী, অসিত, অসিতদেবল, অসিতপক্ষ, অসিতমৃগ, অসিতযবন, অসিতাঙ্গ, অসিতাপাঙ্গ, অসিতাম্বুজ, অসিতাশ্মা, অসীম, অসীমা, আসিত, বিষয়, বিষয়-আশয়, বিষয়কাম, বিষয়কামিতা, বিষয়গ্রাম, বিষয়জাতীয়, বিষয়জ্ঞান, বিষয়নিরতি, বিষয়পরাঙ্মুখ, বিষয়প্রবণ, বিষয়প্রসঙ্গ, বিষয়বর্ত্তী, বিষয়বাসী, বিষয়বুদ্ধি, বিষয়সুখ, বিষয়স্নেহ, বিষয়াত্মক, বিষয়াধিকৃত, বিষয়াধিপ, বিষয়ানন্তর, বিষয়ান্ত, বিষয়ান্তর, বিষয়াভিরতি, বিষয়াভিলাষ, বিষয়ি(য়ী), বিষয়ৈষা, বিষয়ৈষী, বিষয়োপসেবা, সইন্য, সসীম, সান্তিরি, সান্ত্রি, সান্ত্রী, সি, সিঅলি, সিউলি(লী), সিঁতা (সিঁতি, সিঁতে, সিঁথা, সিঁথি, সীঁতা, সীঁথ, সীঁথা, সীঁথি), সিঁতাপাটী, সিঁথিপাত, সিত, সিতকণ্টা, সিতকণ্টারিকা, সিতকণ্ঠ, সিতকর, সিতকর্ণী, সিতকর্ম্মা, সিতকুঞ্জর, সিতখণ্ড, সিতচন্দন, সিতচ্ছদ, সিতচ্ছদা, সিতছত্র, সিতছত্রিত, সিতজা, সিততুরগ, সিতদর্ভ, সিতদীধিতি, সিতদ্বিজ, সিতদ্বিজা, সিতধাতু, সিতপক্ষ, সিতপদ্ম, সিতপুষ্প, সিতপ্রভ, সিতবর্ষাভু, সিতবাজী, সিতবারণ, সিতমণি, সিতমরিচ, সিতমাষ, সিতরশ্মি, সিতরুচি, সিতশর্করা, সিতশিম্বিক, সিতশিব, সিতশূক, সিতশূরণ, সিতসপ্তি, সিতসর্ষপ, সিতসিন্ধু, সিতাংশু, সিতাখণ্ড, সিতাগ্র, সিতাঙ্গ, সিতাতপত্র, সিতাদি, সিতাপবারণ, সিতাপাঙ্গ, সিতাবর, সিতাজ, সিতাভ্র, সিতাম্বর, সিতাম্বুজ, সিতাম্ভোজ, সিতাশ্ব, সিতাষ্টমী, সিতাসিত, সিতাহ্বয়, সিতি,

সিতিকণ্ঠ, সিতিবাসাঃ, সিতিমা(মন্), সিতীকৃত, সিতেক্ষু, সিতেতর, সিতেতরগতি, সিতেতরসরোজ, সিতোৎপল, সিতোৎভব, সিতোপল, সিতোপলা, সিন, সিনীবালী (সিনিবালী), সীতা, সীতাজানি, সীতাদ্রব্য, সীতাপতি, সীতাবর, সীতাবল্লভ, সীতাভোগ, সীতাশালী, সীতিম, সীত্য, সীম, সীমন্ত, সীমন্তক, সীমন্তকরণ, সীমন্তিকা, সীমন্তিত, সীমন্তিনী, সীমন্তী(ন্তিন্), সীমন্তোদ্ধরণ, সীমন্তোন্নয়ন, সীমলিঙ্গ, সীমা, সীমাকৃষাণ, সীমাগিরি, সীমাজ্ঞান, সীমাঞ্চল, সীমাতিক্রমণ, সীমাধিপ, সীমানির্ণয়, সীমানিশ্চয়, সীমানা, সীমান্ত, সীমান্তপূজন, সীমান্তলেখা, সীমাপহারী, সীমাপাল, সীমাবাদ, সীমাবিবাদ, সীমাবিনির্ণয়, সীমাবৃক্ষ, সীমাভেত্তা, সীমালিঙ্গ, সীমাসন্ধি, সীমাসেতু, সীমাহরণ, সীর, সীরধ্বজ, সীরপাণি, সীরভৃৎ, সীরবাহক, সীরযোগ, সীরায়ুধ, সীরী, সীরোৎকর্ষণ, সেতু, সেতুক, সেতুকর, সেতুকর্ম্ম, সেতুবন্ধ, সেতুবন্ধন, সেতুবৃক্ষ, সেতুভেত্তা, সেতুভেদ, সেতুভেদী, সেতুশৈল, সেত্র, সেন, সেনা, সেনাকক্ষ, সেনাকর্ম্ম, সেনাগোপ, সেনাগ্র, সেনাঙ্গ, সেনাচর, সেনাজীব, সেনাজীবী, সেনাধিনাথ, সেনাধিপ, সেনাধিপতি, সেনাধ্যক্ষ, সেনানিবেশ, সেনানী, সেনাপতি, সেনাপৃষ্ঠ, সেনাপ্রণেতা, সেনাবাস, সেনাবাহ, সেনাব্যূহ, সেনাভঙ্গ, সেনামুখ, সেনারক্ষ, সেনাস্থ, সেনাস্থান, সৈনাপত্য, সৈনিক, সৈন্য, সৈন্যকক্ষ, সৈন্যক্ষোভ, সৈন্যঘাতকর, সৈন্যনায়ক, সৈন্যপতি, সৈন্যপাট, সৈন্যপাল, সৈন্যপৃষ্ঠ, সৈন্যবাস, সৈন্যবিসর্জ্জন, সৈন্যশিরঃ, সৈন্যসামন্ত, সৈন্যস্তম্ভ, সৈন্যাধিনায়ক, সৈন্যাধিপতি, সৈন্যোপবেশন, সৈমন্তিক, সৈর, সৈরন্ধ্র (সৈরিন্ধ্র), সৈরন্ধ্রী, সৈরিক, সৈরিন্ধ্র, সৈরিন্ধ্রী, সৈরীয়, সৈরীয়ক, সৈরেয়, সৈরেয়ক।

● **সি** = সত্তা গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।

● **অসিত** : ১. সো = শয়ন। (?)। ২. / যে 'হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে' (= সিত) না। (ব.শ.)। ৩. সিতবিরোধী, কৃষ্ণ। অবদ্ধ, মুক্ত। কৃষ্ণবর্ণ, কালো রঙ। শনিগ্রহ। কৃষ্ণসর্প। কৃষ্ণপক্ষ। পর্ব্বত বিশেষ। ... অসিতযবন = কালযবন। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অসিতদেবল, দেবল**।

● **অসিতদেবল** : ১. অসিত, দিব্ = জিগীষা, ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়, ক্রীড়া, পাশকক্রীড়া। ২. *যে হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে না এবং 'দেবদ্রব্যোপজীবী', তেমন ব্যক্তি।* ৩. দেবল ('দেবদ্রব্যোপজীবী' / ব.শ.) ঋষি। ইনি **ধৌম্যে**র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ... ইনি **যোগাচার্য্য** ছিলেন। (ব.শ.)। সরস্বতী তীরস্থ আদিত্যতীর্থবাসী গার্হস্থ্যধর্মী **তপস্বী**। একদা ভিক্ষু **জৈগীষব্য** মুনি **দেবলে**র আশ্রমে এসে সেখানে যোগনিরত হয়ে বাস করতে থাকলেন। তিনি কেবলমাত্র ভোজনকালে উপস্থিত হতেন। একদিন দেবল **জৈগীষব্য**কে দেখতে না পেয়ে ভাবলেন, 'দীর্ঘকাল এঁর সেবা করা সত্ত্বেও ইনি আমার সঙ্গে আলাপ করেননি।' অবশেষে একটি কলস নিয়ে তিনি আকাশচারী হয়ে মহাসমুদ্রে এসে দেখলেন, জৈগীষব্য তাঁর পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। আশ্রমে ফিরে এসেও দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্ববৎ বসে আছেন। তখন দেবল অন্তরীক্ষ, পিতৃলোক, যমলোক, সূর্যলোক প্রভৃতি সকল স্থানে ভ্রমণ করে জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন। অবশেষে জৈগীষব্য ব্রহ্মালোকে অন্তর্হিত হলে, দেবল তাঁর অল্প তপস্যার প্রভাবে সেখানে যেতে অক্ষম হন। পরে আশ্রমে ফিরে এসে দেবল জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। মহর্ষি **অসিতদেবল** হিমালয়পত্নী মেনকার অন্যতমা কন্যা **একপর্ণা**কে বিবাহ করেন। ইনি 'অসিতদেবল', 'দেবল', 'অসিত' — এই তিন নামে খ্যাত। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. সমাজে ব্যক্তিমালিকানা আবির্ভূত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে, একজন মানুষ কর্তৃক অপর মানুষকে জয় করার বাসনা জন্মায়। জিগীষুদের থেকে জন্মায় **জৈগীষব্য**। তিনি অসিতদেবলকে (যাদের হিংসা করেও বিনিময়াদি বা দেবদ্রব্যোপজীবীকা গ্রহণ করতে কোনো বাধা ছিল না) মোক্ষধর্মের পাঠ দেন। বাকিটা কী হতে পারে, সেটা ভাববার বিষয়।

● **অসিতলোমা** : ১. অসিত, লূ = ছেদন। ২. *হিংসাযুক্ত ধর্ম্ম লোম (শজারুর কাঁটার মতো) যাহার।* ৩. কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে এই দানবের জন্ম। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অসিতলোমা দেবীর সহিত যুদ্ধ করে এবং ব্রহ্মার বরে ঐ যুদ্ধে জয়ী হয়। এর পরে ঐ দানব যুদ্ধে বরুণকেও পরাজিত করে। যখন অসিতলোমা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হন। শিব বিষ্ণুর কাছে তাঁদের প্রেরণ করেন। বিষ্ণু এই দানবকে পরাস্ত করবার জন্য একটি স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করেন। বিষ্ণুর শরীর হতে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়ে একে বিনাশ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **দেবল**। যে গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে আহত করতেও কুণ্ঠিত হত না, এমন যৌথ মালিকানাধীন গোষ্ঠী।

● **অসিতাঙ্গ** : ২. *যাহার অঙ্গ অসিত।* ৩. ভৈরববিশেষ। (ব.শ.)। ৫. যে গোষ্ঠীপরিচালকের গোষ্ঠীর লোকেরা হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও পালন করে। এই শব্দের অর্থ থেকে বোঝা যায়, ইতিহাসের এই অধ্যায়ে মহর্ষি পরিচালিত যৌথসম্প্রদায়গুলির মধ্যে মারমারিও প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। অসিতাঙ্গ তেমনই এক গোষ্ঠী।

● **সীতা** : ২. *গতিশীল সত্তাধারী তারিত যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. **মিথিলা**র রাজা **জনকে**র কন্যা। ... **যজ্ঞ**ভূমি কর্ষণ করার সময় ... ক্ষেত্রে হল মুখ থেকে উৎপন্ন ... এই মানসী কন্যাকে জনক নিজ কন্যার মত লালন-পালন করতে লাগলেন। **মহর্ষি কুশধ্বজে**র কন্যা **বেদবতী রাবণ** কর্তৃক হৃতধর্মা হবার ভয়ে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করবার সময় রাবণকে বলেন, ত্রেতাযুগে আমিই তোমাকে বধ করবার জন্য কোনো ধার্মিকের **অযোনিসম্ভবা** কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব। সেই বেদবতীই **ত্রেতায়** সীতারূপে অবতীর্ণ হন। দক্ষযজ্ঞের সময় মহাদেব ব্যবহৃত **ধনু** পূর্বপুরুষ **দেবরাতে**র নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে জনক পেয়েছিলেন। ... রামচন্দ্র ... এই ধনু ভঙ্গ করেন ও সীতার পাণিগ্রহণ করেন। ... (পৌ.অ.)।

● **সীরধ্বজ** : ৩. মিথিলা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মিথির পুত্র জনক। ... এঁরই নামে জনকবংশ। সেই বংশে হ্রস্বরোমণ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্র — সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ। এই সীরধ্বজ জনকরাজা নামে পরিচিত। এঁর কন্যা সীতাই জানকী, রামের স্ত্রী। সীরধ্বজের অন্য কন্যার নাম উর্মিলা, লক্ষ্মণের স্ত্রী। (পৌ.অ.)

● **সিচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অভিষিক্ত, অভিষেক, অসেচন, অসেচনক, আসকিয়া (আস্কে, আস্কেপিঠে), আসেক, আসেচন, আসেচনক, ছিঁচ, ছিঁচকাঁদুনে, ছিঁচকে-

চোর, ছিচ, ছিচনি, ছেঁচ, ছেঁচড়, ছেঁচনি, নিষেক, শিক্থ, শিক্থক, শিনি (সেচনী), শিনিছাঁদ, সংসিক্ত, সিউনি(নী), সিউনিঝাল (সিউনিখাল), সিঁচ (সেঁচ), সিঁচগাড়ি, সিঁচা, সিক্ (সিচ্), সিকতা, সিকতাময়, সিকতামেহ, সিকতিল, সিক্ত, সিক্তি, সিক্থ, সিক্থক, সিঙা (সিঞ্চ, সিঞ্জা), সিচ্, সিচ, সিঞ্চ (সিঞ্চউ, সিঞ্চিল, সিঞ্চিবেক) সিঞ্চন, সিঞ্চা, সিঞ্চিড়া, সিঞ্চিত, সিঞ্চিল, সিয়নি, সির, সেউনি(নী) সেঁউতী, সেঁক, সেঁকা-রুটি, সেঁচ, সেঁচা, সেঁচান, সেঁজুতি, সেঁজো, সেঁত-সেঁত (সিক্ত), সেঁতা, সেক, সেকতাপ, সেকপাত্র, সেকভাজন, সেকসম্ভ্রম, সেকান্ত, সেক্তব্য, সেক্তা, সেক্ত্র, সেচ, সেচক, সেচন, সেচনঘট, সেচনি, সেচনী, শৈনেয়, সৈকত, সৈকতবেদিকা, সৈকতলীন, সৈকতিক, সৈকতিনী, সৈকতী(তিন্)।

● **সিচ্** = গতিশীল সত্তার চয়ন। **সিচ** = গতিশীল সত্তার চয়ন যাহাতে।

● **সিধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিসিদ্ধ, অতিসিদ্ধি, অসিদ্ধ, আসিদ্ধ, আসেদ্ধা, নিষেধ, প্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধি, বিপ্রতিষিদ্ধ, সংসিদ্ধ, সিজ (সেজ, সিঝ), সিজবনবাস, সিজবিপিনবাসিনী, সিজা (সিঝা), সিজান (সিঝান), সিজুয়া, সিজুয়াশিখর, সিদা (সিধা, সিদে), সিদারি, সিদ্দা, সিদ্ধ, সিদ্ধক, সিদ্ধকজ্জল, সিদ্ধকাম, সিদ্ধকামেশ্বরী, সিদ্ধকার্য্য, সিদ্ধকুল, সিদ্ধক্ষেত্র, সিদ্ধগঙ্গা, সিদ্ধজন, সিদ্ধজল, সিদ্ধদেব, সিদ্ধদ্রব্য, সিদ্ধদ্বন্দ্ব, সিদ্ধধাতু, সিদ্ধপক্ব, সিদ্ধপক্ষ, সিদ্ধপথ, সিদ্ধপীঠ, সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধবর্ত্তি, সিদ্ধবিদ্যা, সিদ্ধভূমি, সিদ্ধমন্ত্র, সিদ্ধমোদক, সিদ্ধযোগিনী, সিদ্ধযোগী, সিদ্ধযোষিৎ, সিদ্ধলক্ষ্য, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধসরিৎ, সিদ্ধসাধন, সিদ্ধসিদ্ধ, সিদ্ধসিন্ধু, সিদ্ধসেবিত, সিদ্ধস্থল, সিদ্ধস্থান, সিদ্ধস্থালী, সিদ্ধহেম, সিদ্ধা, সিদ্ধাই, সিদ্ধাঙ্গনা, সিদ্ধাজ্ঞ, সিদ্ধাদেশ, সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তকোটি, সিদ্ধান্তপক্ষ, সিদ্ধান্তশাস্ত্র, সিদ্ধান্তাচার, সিদ্ধান্তিত, সিদ্ধান্তী(ন্তিন্), সিদ্ধান্ন, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থক, সিদ্ধার্থা, সিদ্ধাশ্রম, সিদ্ধাসন, সিদ্ধি, সিদ্ধি (ভাঙ্), সিদ্ধিকর, সিদ্ধিকারক, সিদ্ধিকারী, সিদ্ধিক্ষেত্র, সিদ্ধিখোর, সিদ্ধিগুঁড়া, সিদ্ধিগুলি, সিদ্ধিগোলা, সিদ্ধিদ, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিদাত্রী, সিদ্ধিপ্রদ, সিদ্ধিবর্ত্তি, সিদ্ধিবাদ, সিদ্ধিভূমি, সিদ্ধিমান(মৎ), সিদ্ধিযাত্রিক, সিদ্ধিযোগ, সিদ্ধিরস্তু, সিদ্ধিলাভ, সিদ্ধীশ্বর, সিদ্ধেশ, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধৌঘ, সিদ্ধ্যসিদ্ধি, সিধ্, সিধ, সিধা (সিধা দেওয়া), সিধার, সিধাসাধা, সিধি(ধী), সিধী, সিধু, সিধে (সীধে), সিধেসাদা, সিধেসাধা, সিধ্ম, সিধ্মপুষ্পিকা, সিধ্মল, সিধ্মলা, সিধ্মা, সিধ্য, সিধ্রক, সিধ্রকা, সুপ্রসিদ্ধ, সুসিদ্ধ, সেধ, সেধা, সৈদ্ধান্তিক।

● **সিধ্** = গতিশীল সত্তার ধারণ। **সিধ** = গতিশীল সত্তার ধারণ যাহাতে।

● **নিষেধ** : দ্র. **চিত্রগুপ্ত**। **বিধি**।

● **সিদ্ধি** : দ্র. **ভাং**। **ভাঙ**। **ভাঙ্গ**।

● **সিব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ছুতা, ছুতার, ছুতো, সিঁয় (সীঁয়), সিঁয়া (সীঁয়া), সিব্, সিয়ন, সিয়া, সিলাই (সেলাই), সীবন, সীবনী, সীব্য, সুতলি(লী), সুতা, সুতার (সুথার, ছুতার, সূত্রধর), সুতি (সুতী), সুচ, সূত, সূতা, সূতার (সূত্রধার), সূতাসঞ্চার, সূতিকা (সূত্রিকা), সূত্র, সূত্রকণ্ঠ, সূত্রকর্ত্তা, সূত্রকর্ম্ম, সূত্রকর্ম্মকৃৎ, সূত্রকার, সূত্রকৃৎ, সূত্রকোণ, সূত্রকোণক, সূত্রকোষ, সূত্রগণ্ডিকা, সূত্রগ্রহ, সূত্রগ্রাহ, সূত্রতর্কুটী, সূত্রদরিদ্র, সূত্রধর, সূত্রধার, সূত্রধৃক্(জ্), সূত্রপিটক, সূত্রবাপ, সূত্রবিক্রয়ী, সূত্রবীণা, সূত্রবেষ্টন, সূত্রভিৎ, সূত্রভৃৎ, সূত্রযন্ত্র, সূত্রয়িতব্য, সূত্রস্থান, সূত্রাত্মা, সূত্রিকা, সূত্রিত, সূত্রী, সেবন, সৌত্র, সৌত্রান্তিক, সৌত্রামণ, সৌত্রামণী, স্যূত, স্যূতি, স্যূন।

● **সিব্** = গতিশীল সত্তার বহন। **সিব** = গতিশীল সত্তার বহন যাহাতে।

● **সূত্র, সূত্রধর, সূত্রধার** : দ্র. **তক্ষ**।

● **সু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (অস্তিত্বের উত্তীর্ণ রূপ, নিজের থেকে বেরিয়ে অন্যের এলাকাতে ঢুকে পড়া এবং কিছু নিয়ে আসা, প্রসব-করান, চোয়ান) অভিষব, অসৌম্য, অস্ব, অস্বক, অস্বজাতি, অস্বতন্ত্র, অস্বরূপ, অস্বস্তি, অস্বস্থ, অস্বাতন্ত্র্য, অস্বাধীন, অস্বাধ্যায়, অস্বামিক, অস্বামিবিক্রয়, অস্বামী, অস্বাম্য, অস্বার্থ, অস্বাস্থ্য, আসব, আসবাব, ডৎসব, শরাপ (সরাপ, সরাব) শু, শুয়া (সুভগ), সচ্ছ (স্বচ্ছ), সতন্তর, সতন্তরি, সতন্তরী, সতান্তর, সতি, সন্ধী, সব, সব (সাব, সাবরেজিস্ট্রি), সবন, সবনকর্ম্ম, সবনশঃ, সবনস্থ, সবনীয়, সব্য, সব্যসাচী, সব্যেতর, সব্যেষ্ঠ, সরা, সরাব (সুরা) সল্লভ, সল্লাপ, সল্লোক, সস্তিবাচন (স্বস্তিবাচন), সস্তেন (স্বস্ত্যয়ন), সাঁই (স্বামী), সাঁইগাঁই, সাঞি, সান, সানি, সাবন, সামি(মী) (স্বামী) সাহিনী, সু, সুঁদি, সুকণ্ঠ, সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী, সুকণ্ডু, সুকন্দ, সুকন্দক, সুকন্দী, সুকবি, সুকর, সুকরা, সুকর্ণ, সুকর্ণক, সুকর্ণিকা, সুকর্ণী, সুকর্ম্ম, সুকর্ম্মা, সুকল, সুকলিল, সুকল্পিত, সুকাল, সুকালী(লিন্), সুকীর্ত্তি, সুকুমার, সুকুমারক, সুকুমারা, সুকুমারী, সুকুল, সুকুলীন, সুকৃৎ, সুকৃত, সুকৃতকর্ম্মা, সুকৃতকৃৎ, সুকৃতদুষ্কৃত, সুকৃতভাক্, সুকৃতাত্মা, সকৃতি, সুকৃতী, সুকৃত্য, সুকৃষ্ণ, সুকেতু, সুকেশ, সুকেশান্ত, সুকেশান্তা, সুকেশিনী, সুকোমল, সুকোশক, সুক্রতু, সুক্ষেত্র, সুখ্যাত, সুখ্যাতি, সুগ, সুগ, সুগঠন, সুগঠিত, সুগড় (সুঘড়, সুঘর), সুগত, সুগতি, সুগন্ধ, সুগন্ধপত্রা, সুগন্ধবহ, সুগন্ধমূলা, সুগন্ধা, সুগন্ধাঢ্য, সুগন্ধামলক, সুগন্ধি, সুগন্ধিক, সুগন্ধিকুসুম, সুগন্ধিত, সুগন্ধিতা, সুগন্ধিত্রিফলা, সুগন্ধিমূল, সুগন্ধিমূষিকা, সুগন্ধিনী, সুগন্ধী, সুগম, সুগহন, সুগাত্র, সুগান, সুগীত, সুগুপ্ত, সুগুরু, সুগৃহ, সুগৃহী, সুগৃহীত, সুগৃহীতনামা, সুগোল, সুগ্রহ, সুগ্রাস, সুগ্রীব, সুঘট, সুঘটিত, সুঘোর, সুঘোষ, সুচন্দন, সুচন্দ্রাননা, সুচরিত, সুচরিতার্থ, সুচরিতেষু, সুচরিত্র, সুচারু, সুচিত্র, সুচিত্রক, সুচিত্রা, সুচিন্তিত, সুচির, সুচিরশ্রম, সুচিরায়ুঃ, সুচেতাঃ(তস্) সুচেল, সুচেলক, সুচ্ছদ, সুচ্ছন্দ, সুছাঁদ, সুজন, সুজন্মা, সুজয়, সুজল, সুজা (উজাসুজা), সুজাত, সুজাতা, সুজান, সুজিহ্ব, সুজীন, সুজীবিত, সুঝ, সুঝবুঝ (জনন-ভূতকে দেখা ও বোঝা), সুটান, সুঠান, সুঠাম, সুড়সুড় (দ্র.সড়সড়, সৃ), সুড়সুড়ি, সুড়সুড়ানি, সুঢপ, সুঢার, সুত, সুতজীবক, সুতনিকা, সুতনিমা, সুতনির্ব্বিশেষ, সুতনু, সুতন্ত্রি, সুতপাঃ(পস্), সুতপাদিকা, সুতপ্ত, সুতবৎসল, সুতবস্করা, সুতরাং(রাম্), সুতল, সুতশ্রেণী (ইঁদুরকানী), সুতহিবুক, সুতা, সুতাত্মজ, সুতাত্মজা, সুতান, (সুতান একটি জঙ্গলের নাম), সুতার, সুতার্থী, সুতি, সুতিক্ত, সুতী, সুতীক্ষ্ণ, সুতীর্থ, সুতেজন, সুতেজিত, সুতেজাঃ, সুতোষ, সুত্য, সুত্যজ, সুত্যা, সুত্রামা (সূত্রামা), সুত্বা(ত্বন্) সুদ (কুসীদ), সুদখোর, সুদংশিত, সুদংষ্ট্র, সদক্ষিণ, সুদক্ষিণা, সুদণ্ড,

সুদণ্ডিকা, সুদন্(দৎ), সুদন্ত, সুদন্তী, সুদম, সুদরিদ্র, সুদর্শ, সুদর্শন, সুদর্শনা, সুদর্শনী, সুদল, সুদলা, সুদান্ত, সুদাম, সুদামত, সুদামা(মন্) সুদায়, সুদারিদ্র, সুদারুণ, সুদি (বদি), সুদিন, সুদিব, সুদিবস, সুদীর্ঘ, সুদু, সুদুঃখ, সুদুঃখিত, সুদুঃসহ, সুদুকূল, সুদুরাধর্ষ, সুদুরাসদ, সুদুরুক্তি, সুদুর্জ্জয়, সুদুর্জ্জর, সুদুর্দর্শ, সুদুর্ব্বল, সুদুর্ব্বহ, সুদুর্ব্বুদ্ধি, সুদুর্ম্মনাঃ(নস্) সুদুর্লভ, সুদুশ্চর, সুদুশ্চরা, সুদুশ্চিকিৎস, সুদুষ্কর, সুদুষ্পার, সুদুষ্প্রেক্ষ্য, সুদুস্তর, সুদুস্ত্যজ, সুদুস্পর্শ, সুদূর, সুদূরপরাহত, সুদৃক্(শ্), সুদৃঢ়, সুদৃশ্য, সুদেষ্ণা, সুদৈব, সুদোহ, সুদ্বিজ, সুধন্বা(ন্বন্), সুধন্বাচার্য্য, সুধন্বী(ন্বিন্), সুধর্ম্ম, সুধর্ম্মা, সুধা, সুধাংশু, সুধাংশুতৈল, সুধাংশুনিধি, সুধাংশুবংশ, সুধাংশুরত্ন, সুধাকণ্ঠ, সুধাকর, সুধাকাল, সুধাক্ষালিত, সুধাঙ্গ, সুধাজীবী, সুধাদীধিতি, সুধাদ্রব, সুধাধবলিত, সুধাধাম, সুধাধার, সুধাধৌত, সুধানিধি, সুধাপঙ্ক, সুধাপাণি, সুধাবদাত, সুধাবর্ষ, সুধাবর্ষী, সুধাবাস, সুধাভবন, সুধাভুক্(জ্), সুধাময়, সুধাময়ূখ, সুধামোদক, সুধাযোনি, সুধার, সুধারশ্মি, সুধারস, সুধারা, সুধারুচি, সুধাশর্করা, সুধাশশাঙ্কধবল, সুধাশুভ্র, সুধাসব, সুধাসার, সুধাসিত, সুধাসিন্ধু, সুধাসু, সুধাসৃতি, সুধাস্পর্দ্ধী, সুধাস্যন্দী(ন্দিন্), সুধাহর, সুধাহর্ত্তা(র্ত্তৃ) সুধাহৃৎ, সুধি, সুধিতি, সুধী, সুধীর, সুধূপক, সুধূম্রবর্ণা, সুধোদ্ভব, সুধোদ্ভবা, সুধ্যুপাস্য, সুধ্যুপাস্যা, সনজর, সুনন্দ, সুনন্দা, সুনয়, সুনয়ন, সুনাদ, সুনাব্য, সুনাভ, সুনাম, সুনায়রী, সুনালী (সুবর্ণালী, সোনালী) সুনাস, সুনাসা, সুনাসিক, সুনাসীর (শুনাসীর), সুনিকট, সুনিকৃষ্ট, সুনিদ্র, সুনিনদ, সুনিভৃত, সুনিয়ত, সুনিয়াড় (?), সুনিরূপিত, সুনির্ণিক্ত, সুনির্বৃত, সুনিশ্চয়, সুনিশ্চিত, সুনিষণ্ণ, সুনিষণ্ণক, সুনিষ্ঠুর, সুনীত, সুনীতি, সুনীল, সুনীলক, সুনেহ, সুন্দ, সুন্দর, সুন্দরম্মন্য, সুন্দরী, সুন্দরীভবন, সুপক্ক (বিপ - আম), সুপক্ষ্মা, সুপটে, সুপঠ, সুপত্র, সুপত্রা, সুপত্রিত, সুপত্নী, সুপথ, সুপথ্য, সুপদ্ম, সুপদ্মা, সুপদ্য, সুপরীক্ষণ, সুপরুষ, সুপর্ণ, সুপর্ণক, সুপর্ণা, সুপর্ণিকা, সুপর্ণী, সুপর্ব্বা(র্ব্বন্), সুপর্য্যাপ্ত, সুপাত্র, সুপাপিষ্ঠ, সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বক, সুপিঙ্গলা, সুপীত, সুপুত্র, সুপুরুখ, সুপুরুষ, সুপুষ্কল, সুপুষ্প, সুপুষ্পা, সুপুষ্পিকা, সুপুষ্পিত, সুপুষ্পী, সুপূজিত, সুপূর, সুপেশকৃৎ, সুপ্রকাশ, সুপ্রজ, সুপ্রজাঃ(জস্), সুপ্রজ্ঞ, সুপ্রতর, সুপ্রতর্ক, সুপ্রতার, সুপ্রতিশয়, সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপ্রতীক, সুপ্রতীত, সুপ্রতুল, সুপ্রবেশ, সুপ্রভ, সুপ্রভা, সুপ্রভাত, সুপ্রমাণ, সুপ্রযুক্ত, সুপ্রয়োগ, সুপ্রলাপ, সুপ্রশস্ত, সুপ্রসন্ন, সুপ্রসন্না, সুপ্রসাদ, সুপ্রসিদ্ধ, সুপ্রাকৃত, সুপ্রাত, সুপ্রাপ, সুপ্রিয়, সুপ্রিয়া, সুফল, সুফলা, সুফুল্ল, সুফেন, সুবক্ত্র, সুবঙ্কিম, সুবচ, সুবচন, সুবচনী, সুবদন, সুবদনা, সুবদনী, সুবন্ধ, সুবর্চ্চক, সুবর্চ্চল, সুবর্চ্চলা, সুবর্চ্চাঃ(র্চ্চস্), সুবর্চ্চিক, সুবর্ম্মা(র্ম্মন্), সুবর্ষ, সুবল, সুবলন, সুবলনি, সুবলি(লী), সুবলিত, সুবলী, সুবল্লি, সুবসন, সুবসন্ত, সুবহ, সুবহা, সুবাক্য, সুবাজী(জিন্), সুবাদ, সুবাস, সুবাসক, সুবাসিত, সুবাসিনী, সুবাহু, সুবিক্রম, সুবিচক্ষণ, সুবিতত, সুবিদিত, সুবিদ্যা, সুবিধা, সুবিধি, সুবিধে, সুবিনীত, সুবিপুল, সুবিবিক্ত, সুবিভক্ত, সুবিরাট্, সুবিরূঢ়, সুবিশদ, সুবিশাল, সুবিস্তর, সুবিহিত, সুবীজ, সুবীর, সুবীরক, সুবীরাম্ল, সুবীর্য্য, সুবুদ্ধি, সুবুদ্ধিরচনা, সুবুদ্ধিশেখর, সুবৃক্ষ, সুবৃত্ত, সুবৃত্তা, সুবেদিকা, সুবেল, সুবেশ (সুবেষ), সুবোধ, সুবোধন, সুবোধিয়া, সুব্যক্ত, সুব্যস্ত, সুব্যাহৃত, সুব্রত, সুব্রতা, সুব্রহ্মণ্য, সুভগ, সুভগমানী, সুভগম্মন্য, সুভগা, সুভগাসুত, সুভট, সুভদ্র, সুভদ্রক, সুভদ্রশ্রবাঃ,

সুভদ্রা, সুভদ্রাপূর্ব্বজ, সুভদ্রেশ, সুভব্য, সুভয়ঙ্কর, সুভয়ানক, সুভাগিনী, সুভাগ্য, সুভাতি, সুভালাভালি, সুভাষিত, সুভাষী, সুভিক্ষ, সুভিক্ষকর, সুভিক্ষকারী, সুভিক্ষকৃৎ, সুভিক্ষদ, সুভিক্ষা, সুভৃশ, সুভোজন, সুভ্রাতৃবৎসল, সুভ্রূ, সুম, সুমঙ্গল, সুমঙ্গলা, সুমঞ্চ, সুমতি, সুমধুর, সুমধ্য, সুমধ্যম, সুমধ্যমা, সুমন, সুমনা, সুমনাঃ, সুমনোভব, সুমনোমূল্য, সুমনোরজঃ, সুমনোলতা, সুমনোহর, সুমন্ত্র, সুমন্দবুদ্ধি, সুমর, সুমহাত্যয়, সুমহান্(হৎ), সুমহাবল, সুমাও, সুমাছ, সুমাছা, সুমানিতা, সুমিত্রা, সুমিষ্ট, সুমুখ, সুমুখী, সুমুহূর্ত্ত, সুমূল, সুমূলা, সুমৃত্যু, সুমৃষ্ট, সুমেখল, সুমেধাঃ(ধস্), সুমেরু, সুমেরুবৃত্ত, সুমেলি, সুমোহন, সুম্ভ (দ্র.সুম), সুয়, সুযন্ত্র, সুযন্ত্রিত, সুযবস, সুযশাঃ(শস্), সুয়া (সুভগা) সুয়াগী, সুয়াস্তি, সুযুক্ত, সুযুক্তি, সুযুত, সুযুদ্ধ, সুযোগ, সুযোধন, সুয়োরাণী, সুরক্ত, সুরক্তক, সুরক্ষিত, সুরঙ্গ, সুরঙ্গধাতু, সুরঙ্গযুক্(জ্) সুরঙ্গা, সুরঙ্গিকা, সুরঙ্গিণী, সুরঙ্গী, সুরঙ্গীন, সুরট, সুরটমল্লার, সুরত, সুরতকেলি, সুরতক্রীড়া, সুরতগ্লানি, সুরততালী, সুরতপ্রদীপ, সুরতপ্রসঙ্গ, সুরতপ্রসঙ্গী, সুরতবন্ধ, সুরতবাররাত্রি, সুরতবিধি, সুরতবিশেষ, সুরতব্যাপার, সুরতমুদিত, সুরতরঙ্গিনী, সুরতসম্ভোগ, সুরতহাল (সুরথাল), সুরতা, সুরতাপরাধ, সুরতি, সুরতোৎসব, সুরতোৎসুক, সুরথ, সুরফাকতাল (শরভলীলক), সুরবাহার, সুরভি(ভী), সুরভিকা, সুরভিগন্ধ, সুরভিগন্ধা, সুরভিগন্ধি, সুরভিগন্ধী, সুরভিঘৃত, সুরভিত, সুরভিতনয়, সুরভিতনয়া, সুরভিত্রিফলা, সুরভিত্বক, সুরভিদারু, সুরভিপত্রা, সুরভিপুত্র, সুরভিবাণ, সুরভিময়, সুরভিমাস, সুরভিমুখ, সুরভিলক্ষ্মী, সুরভিসময়, সুরভিস্রবা, সুরভী, সুরম্য, সুরস, সুরসা, সুরসাল, সুরসিক, সুরা, সুরাকর, সুরাকুম্ভ, সুরাগার, সুরাগৃহ, সুরাঘট, সুরাট্(জ্), সুরাজ, সুরাজা(জন্), সুরাজীব, সুরাজীবী, সুরাতুল, সুরাপ, সুরাপগা, সুরাপা, সুরাপাণ, সুরাপাত্র, সুরাপায়ী, সুরাপী, সুরাপীত, সুরাবর, সুরাব্ধি, সুরাবীজ, সুরাভাগ, সুরাভাজন, সুরাভাণ্ড, সুরামণ্ড, সুরামদ, সুরামেহ, সুরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্রজ, সুরাষ্ট্রজা, সুরাসন্ধান, সুরাসব, সুরাসমুদ্র, সুরাহা, সুরুক্(চ্), সুরুঙ্গ সুরুঙ্গা, সুরুচি, সুরুচির, সুরূপ, সুরূপা, সুরূপিণী, সুরেখ, সুরেণু, সুলক্ষণ, সুলক্ষিত, সুলগ্ন, সুল(ল্)ঙ্গ, সুলবণ, সুলভ (সল্লভ), সুলভা, সুলভাবকাশ, সুলভেতর, সুললাট, সুললিত, সুললিতমুখরিকা, সুলাল, সুলেখ, সুলেহ (সুনেহ), সুলোচন, সুলোচনা, সুলোহিত, সুলোহিতা, সুশকুন, সুশয্যা, সুশরণ, সুশর্ম্মা, সুশাক, সুশান্ত, সুশারদ, সুশাসন, সুশাসিত, সুশিক্ষা, সুশিক্ষিত, সুশিখ, সুশিখা, সুশিরাঃ, সুশীত, সুশীতল, সুশীল, সুশীলা, সুশীলী, সুশুভ, সুশৃত, সুশোভন, সুশোভিত, সুশোভিনী, সুশোভী, সুশোষিত, সুশ্যামী, সুশ্রব, সুশ্রাব্য, সুশ্রী, সুশ্রুত, সুশ্রোণী, সুশ্লিষ্ট, সুশ্লেষ, সুশ্লোক, সুষম, সুষমা, সুষমিত, সুষাম, সুষামা, সুষীম, সুষুনী (সুসুনী), সুষুপ্ত, সুষুপ্তি, সুষুম্ণ, সুষুম্ণা (সুষুম্না), সুষেণ, সুষ্ঠু, সুসংক্ষেপ, সুসংগৃহীত, সুসংবীত, সুসংবৃত, সুসংযত, সুসংযুক্ত, সুসংরব্ধ, সুসংশিত, সুসংশ্লিষ্ট, সুসংস্কৃত, সুসংস্থিত, সুসংহত, সুসজ্জ, সুসজ্জা, সুসজ্জিত, সুসজ্জন, সুসঞ্চ, সুসৎকৃত, সুসত্ত্ব, সুসত্য, সুসদৃশ, সুসমাপ্ত, সুসমাহিত, সুসমৃদ্ধ, সুসম্পন্ন, সুসম্প্রীত, সুসম্বদ্ধ, সুসম্ভ্রম, সুসম্মত, সুসম্মৃষ্ট, সুসর, সুসলিল, সুসহ, সুসহায়, সুসাধ্য, সুসার, সুসিত, সুসিদ্ধ, সুসুখ, সুসুখী, সুসুন্দর, সুসুস্থ, সুসূক্ষ্ম, সুসেবিত, সুসেব্য, সুসৌভগ, সুস্তনা, সুস্তনী, সুস্থ, সুস্থিত, সুস্থিতম্মন্য, সুস্থিতি, সুস্থির,

সুস্নাত, সুস্নিগ্ধ, সুস্নিগ্ধকর, সুস্পর্শ, সুস্মিত, সুস্মিতা, সুস্বন, সুস্বপ্ন,
সুস্বর, সুস্বর্ণ, সুস্বাগত, সুস্বাদ, সুস্বাদু, সুস্বাপ, সুস্বিন্ন, সুহ, সুহই, সুহা,
সুহায়ত, সুহাস, সুহাসিনী, সুহাসী, সুহি, সুহিত, সুহিতা, সুহুত, সুহৃজ্জন,
সুহৃৎ(দ্), সুহৃত্তম, সুহৃত্তা, সুহৃত্ত্ব, সুহৃদয়, সুহৃদ্ভেদ, সুহৃৎপ্রাপ্তি,
সুহৃদ্‌বধ, সুহৃদ্‌বাক্য, সুহৃদ্‌বৃত, সুহৃল্লিঙ্গ, সুহ্ম (সুম্ভ, সুম), সূক্ত,
সূক্তক, সূক্তবাক, সূক্তবাক্য, সূক্তা, সূক্তি, সূচ্ছ্রিত, সূত্থান, সূদ্দীপ্ত,
সূনৃত (?), সূপতীর্থ, সূপদংশ, সূপদ্বার, সূপবিষ্ট, সূপস্কর, সোআমি
(সোয়ামি, সোয়ামী, স্বামী), সোআথ (সোয়াথ, স্বাস্থ্য), সোঁদর, সোঁদা
(সোঁধা, সোন্ধা), সোঁদাল, সোচল (সৌবর্চ্চল), সোচ্ছ্বাস, সোন্দর,
সোম্ (দ্র.সুহ্ম), সোম, সোমকান্ত, সোমক্রতু, সোমক্ষয়, সোমক্ষীরা,
সোমগর্ভ, সোমগিরি, সোমগ্রহ, সোমগ্রহণ, সোমজ, সোমতীর্থ,
সোমদেব, সোমধারা, সোমনাথ, সোমনাথতীর্থ, সোমপ, সোমপান,
সোমপায়ী, সোমপীতি, সোমপীথ, সোমপীথি, সোমপুত্র, সোমপুত্রী,
সোমপৃতিকা, সোমবংশ, সোমবংশীয়, সোমবংশ্য, সোমবক্ত্রা,
সোমবন্ধু, সোমবল্ক, সোমবল্লরি(রী), সোমবল্লিকা, সোমবল্লী,
সোমবার, সোমবারব্রত, সোমবাসর, সোমবিক্রয়ী, সোমবীথি,
সোমবৃক্ষ, সোমভূ, সোমমখ, সোমযজ্ঞ, সোমযাগ, সোমযাজী,
সোমযোনি, সোমরাগ, সোমরাজ, সোমরাজিকা, সোমরাজী,
সোমরোগ, সোমলতা, সোমলতিকা, সোমলোক, সোমসৎ,
সোমসিদ্ধান্ত, সোমসুত, সোমসুতা, সোমসুত্বান, সোমসূত্র, সোমাংশু,
সোমানন, সোমাহ, সোমেশ্বর, সোমোদ্ভব, সোমোদ্ভবা, সোম্য,
সোয়াথ, সোয়াস্ত, সোয়াস্তি (সোয়াস্থ, সোয়াস্থি, সোয়াস্থ্য, সোয়াস্থ্যি)
সোহাগ, সোহাগআগলী, সোহাগকাজল, সোহাগডালা, সোহাগন,
সোহাগল, সোহাগলী, সোহাগবাতী, সোহাগশূল, সোহাগসাধা,
সোহাগসাহন, সোহাগা, সোহাগি, সোহাগিনী, সোহাগী, সোহায়িনী
(সোহিনী), সৌকুমার্য্য, সৌগত, সৌগতিক, সৌগন্ধ, সৌগন্ধক,
সৌগন্ধিক, সৌগন্ধিকাহরণ, সৌগন্ধ্য, সৌজন্য, সৌজন্যতা, সৌদামন,
সৌদামনী, সৌদামিনী, সৌদাম্নী, সৌদায়িক, সৌদাস, সৌধ, সৌধকার,
সৌধকিরীটী, সৌধতল, সৌধপ্রাকার, সৌধবাস, সৌধমূর্দ্ধা,
সৌধমৌলি, সৌধশিখর, সৌধাগ্র, সৌধাঙ্গন, সৌধোৎসঙ্গ, সৌনন্দ,
সৌনন্দী, সৌন্দর্য্য, সৌপর্ণ, সৌপর্ণী, সৌপর্ণেয়, সৌবর্চ্চল, সৌবল,
সৌবলী, সৌবলেয়, সৌবলেয়ী, সৌবস্তিক, সৌবিদ, সৌবিদল্ল,
সৌবীর, সৌবীরক, সৌবীরা, সৌবীরাঞ্জন, সৌবীরায়, সৌবীরিকা,
সৌবীরী, সৌবীর্য্য, সৌভ, সৌভগ, সৌভগর্দ্ধি, সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়,
সৌভদ্বার, সৌভপতি, সৌভবধ, সৌভরাজ, সৌভরি, সৌভাগিনেয়,
সৌভাগিনেয়ী, সৌভাগ্য, সৌভাগ্যগর্ব্ব, সৌভাগ্যচিন্তামণি,
সৌভাগ্যচিহ্ন, সৌভাগ্যতন্তু, সৌভাগ্যতৃতীয়া, সৌভাগ্যফল,
সৌভাগ্যবায়ন, সৌভাগ্যবিলোপী, সৌভাগ্যবিশেষ, সৌভাগ্যমদ,
সৌভার্য্য, সৌভিক্ষ, সৌভেয়, সৌভ্রাত্র, সৌমঙ্গল্য, সৌমদত্তি,
সৌমনস, সৌমনসা, সৌমনস্য, সৌমনস্যবান্, সৌমাত্র, সৌমিক,
সৌমিত্র, সৌমিত্রি, সৌমিত্রিকেশরী, সৌমিত্রেয়, সৌমিল্ল, সৌমী,
সৌমেরব, সৌম্য, সৌম্যকৃচ্ছ্র, সৌম্যগন্ধা, সৌম্যগন্ধী, সৌম্যগোল,
সৌম্যগ্রহ, সৌম্যত্ব, সৌম্যদর্শন, সৌম্যধাতু, সৌম্যনামা, সৌম্যবপুঃ,
সৌম্যবার, সৌম্যবাসর, সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যরূপ, সৌম্যা, সৌম্যাকৃতি,
সৌম্যোপচার, সৌরাটি, সৌরত, সৌরভ, সৌরভেয়, সৌরভেয়ী,
সৌরভ্য, সৌরস, সৌরস্য, সৌরাজ্য, সৌরাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্রক,
সৌরাষ্ট্রদেশ, সৌরাষ্ট্রমণ্ডল, সৌরাষ্ট্রা, সৌরাষ্ট্রিক, সৌরাষ্ট্রী, সৌরাষ্ট্রেয়,
সৌশব্দ, সৌশাম্য, সৌশীল্য, সৌষির, সৌষ্ঠব, সৌষ্ঠব্য, সৌসাদৃশ্য,
সৌস্নাতিক, সৌস্বর্য্য, সৌহার্দ্দ, সৌহার্দ্দনিধি, সৌহার্দ্দ্য, সৌহিত্য,
সৌহৃদ, সৌহৃদয়, সৌহৃদয্য, সৌহৃদ্য, স্ব, স্ব-ইচ্ছা, স্বক, স্বকা (স্বস্বিকা)
স্বকপোলকল্পিত, স্বকর্ম্ম, স্বকর্ম্মকৃৎ, স্বকর্ম্মজ, স্বকর্ম্মসন্তান, স্বকার্য্য,
স্বকাল, স্বকীর্ত্তি, স্বকীয়, স্বকীয়া, স্বকুল, স্বকুশলময়, স্বকৃৎ, স্বকৃত,
স্বকৃতভঙ্গ, স্বকৃতি, স্বক্ষ, স্বখাদ, স্বগণসংহতি, স্বগত, স্বগুণ, স্বগুপ্ত,
স্বগুপ্তা, স্বগৃহ, স্বঙ্গ, স্বচক্ষুঃ, স্বচ্ছ, স্বচ্ছতা, স্বচ্ছত্ব, স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছন্দচর,
স্বচ্ছন্দচারী, স্বচ্ছন্দপথগ, স্বচ্ছন্দমরণ, স্বচ্ছন্দহারী, স্বচ্ছন্দাচরণ,
স্বচ্ছপত্র, স্বচ্ছমণি, স্বচ্ছবালুক, স্বচ্ছল, স্বচ্ছা, স্বজ, স্বজন, স্বজনদোষ,
স্বজনি, স্বজনী, স্বজাত, স্বজাতি, স্বজাতিদ্বিট্, স্বজাতিদ্বেষী, স্বজাতীয়,
স্বজ্ঞাতি, স্বজাত্য, স্বত, স্বতঃ(তস্), স্বতঃই, স্বতঃপ্রকট, স্বতঃপ্রবৃত্ত,
স্বতঃপ্রমাণ, স্বতঃপ্রামাণ্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বতন্তর, স্বতন্তরী,
স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রতা, স্বতন্ত্রী, স্বতেজঃ, স্বতা, স্বত্ব, স্বত্বত্যাগ, স্বত্বনিবৃত্তি,
স্বত্ববিচার, স্বত্ববোধন, স্বত্ববান, স্বত্বব্যভিচারী, স্বত্বহানি, স্বত্বাধিকারী,
স্বত্বাবগম, স্বত্বাভাব, স্বত্বাস্পদ, স্বত্বোৎপত্তি, সত্বোৎপাদন, স্বদার,
স্বদারনিরত, স্বদৃক্, স্বদেশ, স্বদেশজ, স্বদেশবন্ধু, স্বদেশদ্রোহী,
স্বদেশভক্ত, স্বদেশী, স্বদেশীয়, স্বদোষজ, স্বধর্ম্ম, স্বধর্ম্মত্যাগ,
স্বধর্ম্মবর্ত্তী, স্বধর্ম্মস্খলন, স্বধা, স্বধাকর, স্বধাকার, স্বধাধিপ, স্বধানিনয়ন,
স্বধাপ্রিয়, স্বধাভুক্, স্বধাভোজী, স্বধাশন, স্বধাসংগ্রহ, স্বধিতি,
স্বধিতিহেতিক, স্বধিষ্ঠান, স্বধীত, স্বধীতি, স্বন্, স্বন, স্বনচক্র, স্বনন,
স্বনস্বনি (শনশনি), স্বনাম, স্বনামখ্যাত, স্বনামধন্য, স্বনামপ্রসিদ্ধ, স্বনিত,
স্বনুরক্ত, স্বনুষ্ঠিত, স্বন্ত, স্বন্ন, স্বপক্ষ, স্বপক্ষক্ষয়, স্বপক্ষপ্রভব, স্বপক্ষীয়,
স্বপদ, স্বপরমণ্ডল, স্বপাক, স্বপিতা, স্বপূর্ণ, স্বপ্রকাশ, স্বপ্রদান, স্বপ্রধান,
স্বপ্রসার, স্ববংশ্য, স্ববন্ধু, স্ববর্গীয়, স্ববশ, স্ববশ্য, স্ববাঞ্ছা, স্ববাঞ্ছিত,
স্ববান্ধব, স্ববাসিনী, স্ববিকত্থন, স্ববিধেয়, স্ববিষয়, স্ববীজ, স্ববীর্য্যগুপ্ত,
স্ববৃত্তি, স্বব্রাহ্মণ্যা, স্বভাব, স্বভাবকৃত, স্বভাবকৃপণ, স্বভাবচল,
স্বভাবচপল, স্বভাবচরিত্র, স্বভাবজ, স্বভাবজনিত, স্বভাবতঃ,
স্বভাবদৌর্জন্য, স্বভাবপ্রভব, স্বভাববাদ, স্বভাববাদী, স্বভাবভঙ্গুর,
স্বভাবমিত্র, স্বভাবমৃদু, স্বভাবশূর, স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবসুজন,
স্বভাবসুলভ, স্বভাবোক্তি, স্বভূ, স্বভূমি, স্বভ্যগ্র, স্বযুক্তি, স্বয়ং(য়ম্),
স্বয়ংকৃত, স্বয়ংক্রান্ত, স্বয়ংখাত, স্বয়ংগুপ্ত, স্বয়ংগ্রহ, স্বয়ংগ্রাহ, স্বয়ংজাত,
স্বয়ংজ্যোতিঃ, স্বয়ংত্যক্ত, স্বয়ংদত্ত, স্বয়ংদূতী, স্বয়ংদৌত্য, স্বয়ংপ্রকাশ,
স্বয়ংপ্রভ, স্বয়ংপ্রভা, স্বয়ংপ্রভু, স্বয়ংবর, স্বয়ংবরণ, স্বয়ংবরপতি,
স্বয়ংবরবধূ, স্বয়ংবরযাত্রা, স্বয়ংবরয়িত্রী, স্বয়ংবরসখী, স্বয়ংবরসুহৃৎ,
স্বয়ংবরস্থ, স্বয়ংবরা, স্বয়ংবশ, স্বয়ংবিক্রিত, স্বয়ংবিশীর্ণ, স্বয়ংরূপ,
স্বয়ংশীর্ণ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধা, স্বয়ংস্রস্ত, স্বয়মর্জ্জিত,
স্বয়মাহৃত, স্বয়মুজ্জ্বল, স্বয়মুদ্গীর্ণ, স্বয়মুপস্থিত, স্বয়ম্বর, স্বয়ম্বরস্থল,
স্বয়ম্বরা, স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভুব, স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভূত, স্বয়ম্ভৃত, স্বযোনি, স্বযোনি-
অন্তক, স্বযোনিভক্ষ, স্বরস, স্বরাজ, স্বরাজ্য, স্বরাট্(জ্), স্বরাষ্ট্র, স্বরুচি,
স্বরূপ, স্বরূপগত, স্বরূপতঃ, স্বরূপভাব, স্বরূপলক্ষণ, স্বরূপশক্তি,
স্বরূপাসিদ্ধি, স্বরূপী, স্বরূপোৎপ্রেক্ষা, স্বরোচিঃ(চিস্), স্বলঙ্কৃত, স্বলক্ষণ,
স্বলিখিত, স্বলিঙ্গ, স্বল্প, স্বল্পকঙ্ক, স্বল্পদৃক্(শ্), স্বল্পদ্রাবক, স্বল্পবল,
স্বল্পবয়াঃ, স্বল্পবিষয়, স্বল্পব্যয়, স্বল্পব্রীড়, স্বল্পশরীর, স্বল্পাঙ্গুলি, স্বল্পান্তর,

স্বল্পায়ুঃ, স্বল্পাহার, স্বল্পিয়ান, স্বল্পিষ্ঠ, স্বল্পীভূত, স্বশক্তি, স্বশ্রেণী, স্বশ্লাঘা, স্বসংযুক্ত, স্বসংবিৎ, স্বসংবৃত, স্বসংবেদ্য, স্বসদৃশ, স্বসমান, স্বসমুখ, স্বসম্ভব, স্বসম্ভূত, স্বসর্ব্ব, স্বসা, স্বসাপতি, স্বসিত, স্বসিদ্ধ, স্বস্বভাব, স্বস্তি, স্বস্তিক, স্বস্তিককর্ণ, স্বস্তিকবাণী, স্বস্তিবাচন, স্বস্তিকমণ্ডলী, স্বস্তিকযন্ত্র, স্বস্তিকর্ম্ম, স্বস্তিকার, স্বস্তিকাসন, স্বস্তিকৃৎ, স্বস্তিদ, স্বস্তিবচন, স্বস্তিবাচক, স্বস্তিবাচন, স্বস্তিবাচনিক, স্বস্তিবাচ্য, স্বস্তিবাণী, স্বস্তিমান(মৎ) স্বস্তিমুখ, স্বস্তিমুখা, স্বস্তিমুখী, স্বস্ত্যয়ন, স্বস্ত্যয়নক্রিয়া, স্বস্ত্যান্তরণ, স্বস্থ, স্বস্থচেতন, স্বস্থহৃদয়, স্বস্থান, স্বস্ত্রীয়, স্ব-স্ব, স্বস্বরূপ, স্বস্বামিভাব, স্বহন্তা(ন্তৃ), স্বহস্তিকা, স্বহিত, স্বাকৃতি, স্বাক্ষর, স্বাক্ষরিত, স্বাগত, স্বাগতম্, স্বাগতপ্রশ্ন, স্বাগতবচন, স্বাগতিক, স্বাগম, স্বাঙ্গ, স্বাচার, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাজীব, স্বাজীব্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বাতি, স্বাতিযোগ, স্বাত্ত, স্বাত্মা, স্বাধিকার, স্বাধিকৃত, স্বাধিষ্ঠান, স্বাধীন, স্বাধীনকুশল, স্বাধীনতা, স্বাধীনপতিকা, স্বাধীনভর্তৃকা, স্বাধ্যায়, স্বাধ্যায়কাল, স্বাধ্যায়ধৃক্(জ্), স্বাধ্যায়বান্(বৎ), স্বাধ্যায়ভূমি, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, স্বাধ্যায়সময়, স্বাধ্যায়াভ্যসন, স্বাধ্যায়ার্থী, স্বাধ্যায়ী(য়িন্), স্বান, স্বানম, স্বানুভাব, স্বানুভূতি, স্বানুরূপ, স্বান্ত, স্বান্তজ, স্বাপ্ত, শ্বাভাবিক, স্বাভিচারী, স্বাভীল, স্বাভীষ্ট, স্বামিতা, স্বামী, স্বামীকার্য্য, স্বামীকুমার, স্বামীঘ্ন, স্বামীগুণ, স্বামীজনক, স্বামীনী, স্বামীপাল, স্বামীপ্রসাদ, স্বামীবাৎসল্য, স্বামীব্রতা, স্বামীভট্টারক, স্বামীভাব, স্বামীমূল, স্বামীসেবা, স্বাম্য, স্বামীকারণ, স্বায়ত্ত, স্বায়ম্ভুব, স্বায়ম্ভুব-মনু, স্বায়ম্ভুব-মনুপিতা, স্বারক্ষ্য, স্বারসিক, স্বারাজ্য, স্বারাজ্যলক্ষ্মী, স্বারাট্(জ্), স্বারাম, স্বারোচিষ, স্বার্জ্জিত, স্বার্থ, স্বার্থপণ্ডিত, স্বার্থপর, স্বার্থপরায়ণ, স্বার্থবিঘাত, স্বার্থভাক্(জ্), স্বার্থসাধক, স্বার্থসাধন, স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থিক, স্বার্থোপপত্তি, স্বালক্ষণ, স্বালক্ষণ্য, স্বাবমানন, স্বাবমাননা, স্বাশিত, স্বাস্তর, স্বাস্তীর্ণ, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যজনক, স্বাস্থ্যপ্রদ, স্বাস্থ্যভঙ্গ, স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাহা, স্বাহাকৃৎ, স্বাহানাথ, স্বাহাপতি, স্বাহাপ্রিয়, স্বাহাবল্লভ, স্বাহার, স্বাহার্হ, স্বাহেয়, স্বিকা, স্বিষ্ট, স্বিষ্টকৃৎ, স্বিষ্টি, স্বীকরণ, স্বীকর্ত্তব্য, স্বীকর্ত্তা, স্বীকার, স্বীকারপত্র, স্বীকার্য্য, স্বীকৃত, স্বীকৃতা, স্বীকৃতি, স্বীয়, স্বীয়া, স্বৃদ্ধ, স্বেচ্ছ, স্বেচ্ছা, স্বেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাদান, স্বেচ্ছাধীন, স্বেচ্ছাপরিবর্ত্তিত, স্বেচ্ছাবিহারী, স্বেচ্ছাব্যবহারী, স্বেচ্ছাভোজন, স্বেচ্ছামৃত্যু, স্বেচ্ছাসঞ্চারী, স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাস্পর্শ, স্বেচ্ছাহার, স্বেষ্ট, স্বৈর, স্বৈরকথা, স্বৈরগত, স্বৈরগতি, স্বৈরচারী, স্বৈরন্ধ্রী, স্বৈরপ্রচার, স্বৈরবর্ত্তী, স্বৈরবিহারী, স্বৈরবৃত্ত, স্বৈরবৃত্তি, স্বৈরমুক্ত, স্বৈরাচার, স্বৈরাবতার, স্বৈরাহার, স্বৈরিণী, স্বৈরিতা, স্বৈরিন্ধ্রী, স্বৈরী(রিন্), স্বোক্ত, স্বোচিত, স্বোত্থিত, স্বোদর, স্বোদরপূরক, স্বোপার্জ্জিত।

● **সু** = সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

● **সবন** : **সু-অন**। দ্র. **পুংসবন**। অস্তিত্বের বিন্দু-দান = **সু**।

● **সুগ্রীব** : ৩. **কিষ্কিন্ধ্যা**পতি বানররাজ। ইনি **বালি**র কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালি ইন্দ্রপুত্র ও সুগ্রীব সূর্যপুত্র বলে খ্যাত। একদিন যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ব্রহ্মার নয়ন হতে অশ্রুপাত হয়। এই অশ্রু হতে তৎক্ষণাৎ **ঋক্ষরজা** নামে এক দিব্য বানরের সৃষ্টি হয়। ... দ্র. **ঋক্ষরজা**। (পৌ.অ.)।

● **সুদেষ্ণা** : ৩. ক) মৎস্যরাজ বিরাটের স্ত্রী। অজ্ঞাতবাসের সময় **দ্রৌপদী** সৈরিন্ধ্রীবেশে এঁরই কাছে বাস করতেন। ... খ) বিরোচন-পুত্র **বলি**র স্ত্রী। এঁর গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি হতে **অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র** ও **সুহ্ম** — এই পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)

● **সুন্দর** : ১. সু + ✓উন্দ্ + অর - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **অতিসুন্দর**।

● **সুন্দরী** : ১. সু + ✓উন্দ্ + অর - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. *যে সত্তা সমোচ্চশীলতায় (আপন) উদ্‌লোকের নাকরণ (অবতরণ-প্রসারণকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে, তাহার আধার।* ৫. দ্র. **অতিসুন্দর**।

● **সৌন্দর্য্য** : দ্র. **উন্দ্**।

● **সুপ্রতীক** : দ্র. **বিভাবসু, গজ-কচ্ছপ, জয়-বিজয়**।

● **সুমিত্রা** : ৩. দশরথের তৃতীয়া স্ত্রী ও যমজ সন্তান লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর মাতা। বনবাস গমনের সময় লক্ষ্মণ মাতার চরণ স্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে তিনি বলেছিলেন, পরিব্রাজক অবস্থায় তুমি রামকে অনুসরণ কোরো। রামকে পিতা, সীতাকে মাতা ও বনকে অযোধ্যা বলে মনে কোরো। ... (পৌ.অ.)।

● **সুরত, সুরতি** : দ্র. **কেলি, ক্রীড়া, লীলা**।

● **সুরভি** : ৩. ক) সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিতা অতি শক্তিশালিনী, অদ্ভুতকর্মা **কামধেনু**। এঁর স্তন হতে সর্বদা ক্ষীর ঝরত। ঐ ক্ষীরধারা হতে ক্ষীরোদ সমুদ্র উত্থিত। মতান্তরে প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করে যে উদগার তোলেন, তা হতে কামধেনু সুরভি উৎপন্ন হয়। সুরভি স্বর্ণবর্ণা, কান্তিমতী, **কপিলা** গাভীদের জননী। খ) মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। ইনি দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যা বলে খ্যাত। সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু এঁর গর্ভে জন্ম হয়েছে। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **নন্দিনী, কামধেনু**।

● **সুশোভনা** : দ্র. **মণ্ডুকরাজ**।

● **সুশ্রুত** : ৩. **বিশ্বামিত্রে**র পুত্র। ধন্বন্তরির নিকট ইনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন ও মানবের হিতের জন্য তা প্রকাশ করেন। সুশ্রুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর এক উপাখ্যান আছে। ইন্দ্র মর্ত্যলোকে মানবদের ব্যাধি-প্রপীড়িত দেখে ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং **কাশী**ধামে **দিবোদাস** নামে ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বলেন। ... তখন বিশ্বামিত্র নিজের পুত্র সুশ্রুতকে বললেন, কাশীর রাজা দিবোদাস স্বয়ং ধন্বন্তরি; তুমি তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ... করো। ... সুশ্রুত তাই করেন। ... তারপর সুশ্রুত আয়ুর্বেদ বিষয়ক পুস্তক 'সুশ্রুত-সংহিতা' রচনা করেন। (পৌ.অ.)।

● **সুহ্ম (সুম্ভ)** : দ্র. **দীর্ঘতমা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম**।

● **স্ব, স্বভাব, স্বরূপ, স্বরূপলক্ষণ** : দ্র. **তট, তটস্থ, তটস্থলক্ষণ, নিজস্ব, প্রকৃতি, ব্রহ্ম, মৎস্য**।

● **স্বচ্ছ** : দ্র. **অচ্ছ**।

● **স্বয়ম্ভু** : ৩. অগ্নিপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা। ... (পৌ.অ.)।

● **স্বয়ম্ভু, স্বায়ম্ভুব** : ৩. চতুর্দশ মনুর মধ্যে ইনি প্রথম মনু। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা হতে এঁর জন্ম বলে এঁর নাম স্বায়ম্ভুব। ... ব্রহ্মা নিজের দক্ষিণাঙ্গ থেকে মনুকে এবং বামাঙ্গ থেকে শতরূপা নামে এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন এবং শতরূপাকে স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী রূপে নির্দিষ্ট করেন। এঁদের **প্রিয়ব্রত** ও **উত্তানপাদ** নামে দুই পুত্র ও কাকুতি, দেবহুতি, ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা হয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে **যম** প্রভৃতি দেবতা এবং মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (পৌ.অ.)।

● **স্বরোচিঃ, স্বরোচিস্, স্বারোচিস, স্বারোচিষ** : ৩. স্বরোচিষের পুত্র ও দ্বিতীয় **মনু**। ... এই মনুর (প্রকৃত) নাম দ্যুতমান; কিন্তু স্বরোচিষের পুত্র বলে স্বারোচিষ নামে খ্যাত। এই মন্বন্তর কালে **পারাবত** ও **তুষিত**গণ দেবতা ও বিপশ্চিৎ ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উর্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, **ঋষভ** প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত মতে এই মনু অগ্নির পুত্র, এবং এই মন্বন্তরে অবতার বিভূ, যোচন ইন্দ্র, তুষিতাদি দেবগণ এবং উর্ধ্বস্তম্ভাদি সপ্তর্ষি। (পৌ.অ.)।

● **স্বাত্ত** : দ্র. **অগ্নিস্বাত্ত**।

● **স্বামী** : ৫. দ্র. **গোস্বামী**। স্বামী — অস্তিত্বের বাহক 'আমি'ধারী।

● **সুখ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অসুখ, অসুখড়, অসুখিত, অসুখী, সুক্ক, সুক্‌খ, সুখ্, সুখ, সুখকর, সুখকার, সুখকৃৎ, সুখগ, সুখগন্ধ, সুখগম, সুখগম্য, সুখগ্রাহ্য, সুখচার, সুখচ্ছায়, সুখচ্ছেদ্য, সুখজাত, সুখতলা (সুকতলা), সুখদ, সুখদা, সুখদায়ক, সুখদুঃখী, সুখদোহা, সুখদোহ্যা, সুখনামা, সুখনিদ্রা, সুখনিবিষ্ট, সুখপাল, সুখপ্রণাদ, সুখপ্রতিবন্ধিতা, সুখপ্রত্যর্থিতা, সুখপ্রদ, সুখপ্রবেশ, সুখপ্রশ্ন, সুখপ্রসব, সুখপ্রসুপ্ত, সুখপ্রাপ্য, সুখপ্রেক্ষ্য, সুখবর্চ্চক, সুখবহ, সুখবান, সুখবাসর, সুখবাস, সুখবুদ্ধি, সুখবোধ, সুখভাক্(জ্), সুখভাগী, সুখভেদ্য, সুখভোগ, সুখভোগ্য, সুখমজ্জন, সুখমোদা, সুখরাত্রি, সুখরাত্রিকা, সুখলব, সুখলেশ, সুখলিপ্সা, সুখশয়ন, সুখশয়িত, সুখশালিনী, সুখশীত, সুখশীতল, সুখশ্রব, সুখশ্রাব্য, সুখশ্রুতি, সুখসংবৃদ্ধ, সুখসংবেশ, সুখসংযোগ, সুখসংসুপ্ত, সুখসংস্পর্শ, সুখসংস্থ, সুখসঙ্গ, সুখসঙ্গী, সুখসঞ্চার, সুখসঞ্চারী, সুখসন্দোহ্যা, সুখসম্বোধ্য, সুখসলিলনিষেক, সুখসাধন, সুখসাধ্য, সুখসুপ্ত, সুখসুপ্তি, সুখসেব্য, সুখস্পর্শ, সুখস্বাপ, সুখা, সুখাগত, সুখধার, সুখানুভব, সুখান্বিত, সুখাপ্লব, সুখাবগাহ, সুখাবহ, সুখাভ্যুদয়িক, সাখারাধ্য, সুখারোহ, সুখারোহণ, সুখার্থ, সুখার্হ, সুখালোক, সুখাশ, সুখাশংসা, সুখাশ্রয়, সুখাসক্ত, সুখাসন, সুখাসীন, সুখাসুখ, সুখাস্বাদ, সুখিত, সুখী (সুখিন্), সুখৈধিত, সুখৈষী(ষিন্), সুখোচিত, সুখোদক, সুখোদয়, সুখোদর্ক, সুখোদ্য, সুখোপবিষ্ট, সুখোপায়, সুখোষিত, সুখোষ্ণ, সৌখশায়নিক, সোখশায়িক, সৌখসুপ্তিক, সৌখিক, সৌখীন (সখ, শক, শৌকিন), সৌখ্য, সৌখ্যদ, সৌখ্যদায়ী।

● **সুখ্** = নবরূপী সত্তার ক্ষ-অন। **সুখ** = নবরূপী সত্তার ক্ষ-অন যাহাতে।

● **সুর্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : সুর্, সুর, সুরকল্প, সুরকরী, সুরকরীন্দ্র, সুরসুরকামিনী, সুরকারু, সুরকার্ম্মুক, সুরকাষ্ঠ, সুরকুল, সুরকুসুম, সুরকৃত, সুরকৃতা, সুরগজ, সুরগণ, সুরগণ্ড, সুরগায়ক, সুরগায়ন, সুরগিরি, সুরগুরু, সুরগুরুবার, সুরগৃহ, সুরঙ্গ, সুরচাপ, সুরজ্যেষ্ঠ, সুরদলনিধি, সুরদারু, সুরদীর্ঘিকা, সুরদুন্দুভি, সুরদেশ, সুরদেহ, সুরদ্রু, সুরদ্রুম, সুরদ্বিট্(ষ্), সুরদ্বিপ, সুরধনুঃ, সুরধনী, সুরধুনী, সুরধূপ, সুরনদী, সুরনায়ক, সুরনিকর, সুরনিধি, সুরনিম্নগা, সুরনির্ঝরিণী, সুরনিলয়, সুরপতি, সুরপথ, সুরপর্ণিক, সুরপর্ণিকা, সুরপর্ণী, সুরপাদপ, সুরপাশুলা, সুরপুন্নাগ, সুরপুর, সুরপুরী, সুরপুষ্পবৃষ্টি, সুরপ্রতিষ্ঠা, সুরপ্রিয়, সুরপ্রিয়া, সুরবধূ, সুরবন, সুরবর্ত্ম, সুরবল্লী, সুরবাহিনী, সুরবিদ্বিট্(দ্বিষ্), সুরবিলাসিনী, সুরবীথি, সুরবেশ্ম, সুরবৈরী, সুরভবন, সুরভূরুহ, সুরভূষণ, সুরমণি, সুরমন্ত্রী, সুরমন্দির, সুরমুনি, সুরমেদা, সুরযুবতি, সুরযোষিৎ, সুররাজবৃক্ষ, সুররায়, সুররিপু, সুরর্ষভ, সুরর্ষি, সুরলাসিকা, সুরলোক, সুরলোকসুন্দরী, সুরশত্রু, সুরশাখী, সুরশিল্পী, সুরশৈবলিনী, সুরশ্রেষ্ঠ, সুরসখ, সুরসঙ্ঘ, সুরসদন, সুরসদ্ম, সুরসম্মত, সুরসরি, সুরসরিৎ, সুরসরিত, সুরসিন্ধু, সুরসুত, সুরসুন্দর, সুরসুন্দরী, সুরস্ত্রী, সুরস্ত্রীশ, সুরস্থান, সুরস্রবন্তী, সুরস্বামী, সরহরা, সুরা, সুরাকর, সুরাকুম্ভ, সুরাগার, সুরাগৃহ, সুরাঘট, সুরাজীব, সুরাজীবী, সুরাদ্রি, সুরাধিপ, সুরাধীশ, সুরাধ্যক্ষ, সুরাধ্বজ, সুরাপ, সুরাপগা, সুরাপা, সুরাপাণ, সুরাপাত্র, সুরাপায়ী, সুরাপী, সুরাপীত, সুরাবর, সুরাব্ধি, সুরাবীজ, সুরাভাগ, সুরাভাজন, সুরাভাণ্ড, সুরামণ্ড, সুরামদ, সুরামেহ, সুরায়ুধ, সুরারি, সুরারিমথন, সুরারিহন্তা, সুরারিহা, সুরার্হ, সুরার্হক, সুরালয়, সুরালয়প্রাপ্তি, সুরাশ্রয়, সুরাসন্ধান, সুরাসব, সুরাসমুদ্র, সুরাসুর, সুরাহ্ব, সুরেজ্য, সুরেজ্যা, সুরেতর, সুরেতরকুল, সুরেতরগতি, সুরেতরবরূথ, সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্রগোপ, সুরেন্দ্রচাপ, সুরেন্দ্রজিৎ, সুরেন্দ্রমাত্রা, সুরেন্দ্রলোক, সুরেভ, সুরেশ, সুরেশী, সুরেশ্বর, সুরেশ্বরী, সুরেহ, সুরোত্তম, সুরোদ, সৌরসৈন্ধব, সৌরিক।

● **সুর্** = নবরূপী সত্তার রক্ষণ। **সুর** = নবরূপী সত্তার রক্ষণ যাহাতে।

● **সূ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনসূয়, অনসূয়ক, অনসূয়া, অসূতি, অসূয়, অসূয়ক, অসূয়া, অসূয়িতা, অসূয়ু, অসূর্য্যম্পশ্য, পসব, প্রসূ, প্রসূন, সবিতা (সবিতৃ), সবিতৃতনয়, সবিতৃদেবত, সবিতৃদৈবত, সবিতৃমণ্ডল, সবিতৃসূত, সবিত্রী, সাবিত্র, সাবিত্রী, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী, সাবিত্রীপতিত, সাবিত্রীপরিভ্রষ্ট, সাবিত্রীব্রত, সাবিত্রীসূত্র, সাবিত্র্যুপাখ্যান, সুজ্জি (সুজ্য, সূজ্জ, সুয্যি, সূয্যি, সুরজ) সূ (প্রসব করা), সূঁচ, সূক, সূকর, সূকরগৃহ, সূকরপ্রেয়সী, সূকরী, সূত, সূতক, সূতকর্ম্ম, সূতকা, সূতকাগৃহ, (সূতিকাগৃহ), সূতকাগ্নি, সূতজ, সূততনয়, সূততা, সূতত্ব, সূতনন্দন, সূতপণ, সূতপুত্র, সূতপুত্রক, সূতপুত্রী, সূতবৃত্তি, সূতরাট্(জ্), সূতসূত, সূতা, সূতি, সূতিকা, সূতিকাগদ, সূতিকাগার, সূতিকাগৃহ, সূতিকাগেহ, সূতিকাপূজা, সূতিকাবাস, সূতিকাভবন, সূতিকারোগ, সূতিকাষষ্ঠী, সূতিকাসদন, সূতিকাসদ্ম, সূতিকোত্থান, সূতিগৃহ, সূতিঘর, সূতিশাল, সূতিবাত, সূতিমারুত, সূতিমাস, সূতিরোগ, সূতিশাল, সূৎকার, সূত্য, সূত্যাশৌচ, সূদ্, সূদ (সুদ), সূদকর্ম্ম, সূদন, সূদশালা, সূদশাস্ত্র, সূদাধ্যক্ষ, সূদিত, সূন (প্রসূন), সূনা, সূনাদোষ, সূনাপরিচয়, সূনাবান, সূনিক, সূনী(নিন্) সূনু, সূনৃত, সূপ (soup), সূপকার, সূপরস, সূপসংস্কৃত, সূপ্য, সূয়, সূর, সূরজ, সূরণ, সূরদেব, সূরয, সূরসুত, সূরসূত, সূরি, সূরী, সূর্প, সূর্ম্মি, সূর্ম্মী, সূর্য্য, সূর্য্যকমল, সূর্য্যকাল, সূর্য্যকালানলচক্র, সূর্য্যকান্ত, সূর্য্যকান্তি, সূর্য্যগ্রহ, সূর্য্যগ্রহণ, সূর্য্যজ, সূর্য্যজা, সূর্য্যতনয়, সূর্য্যতনয়া, সূর্য্যতেজঃ(জস্), সূর্য্যদৃক্(শ্), সূর্য্যদেব, সূর্য্যদেবতা, সূর্য্যধর্ম্মা, সূর্য্যনক্ষত্র, সূর্য্যপত্র, সূর্য্যপর্ব্ব, সূর্য্যপুত্র, সূর্য্যপুত্রী, সূর্য্যপ্রভব, সূর্য্যবংশ, সূর্য্যবংস্য, সূর্য্যবার, সূর্য্যবর্চ্চাঃ(র্চ্চস্), সূর্য্যবিলোকন, সূর্য্যবেদী, সূর্য্যবেদীগ্রাম, সূর্য্যবেধী, সূর্য্যভক্ত, সূর্য্যমণি, সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যমাস, সূর্য্যমুখী, সূর্য্যযূথী, সূর্য্যরশ্মি, সূর্য্যলোক, সূর্য্যশিষ্য, সূর্য্যসংক্রম, সূর্য্যসংক্রান্তি, সূর্য্যসংজ্ঞ, সূর্য্যসারথি, সূর্য্যসূত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সূর্য্যস্তব, সূর্য্যস্তুতি, সূর্য্যস্তোত্র, সূর্য্যহৃদয়, সূর্য্যা, সূর্য্যাই,

সূর্য্যাংশু, সূর্য্যাণী, সূর্য্যাচন্দ্রমস্‌, সূর্য্যাতপ, সূর্য্যাত্মজ, সূর্য্যাপায়, সূর্য্যাবর্ত্ত, সূর্য্যাবর্ত্তা, সূর্য্যার্ঘ্য, সূর্য্যালোক, সূর্য্যাশ্মা, সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যাস্তঙ্গমন, সূর্য্যাস্তময়, সূর্য্যেন্দুসঙ্গম, সূর্য্যোঢ়, সূর্য্যোত্থান, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যোদয়ন, সূর্য্যোপাসক, সূর্য্যোপাসনা, সৌকর, সৌকরিক, সৌকর্য্য, সৌতি, সৌত্য, সৌন, সৌনপাল, সৌনিক, সৌর, সৌরজগৎ, সৌরদিবস, সৌরমণ্ডল, সৌরমাস, সৌরলোক, সৌরসংবৎসর, সৌরি, সৌরিরত্ন, সৌরী, সৌরীয়, সৌরীশ, সৌর্য্য।

● **সূ** = নবরূপী সত্তার আধার যে।

● **সাবিত্রী** : **৩.** ক) বেদমাতা গায়ত্রী। যা হতে সর্বলোকের সৃষ্টি হয় তিনিই সবিতা। এই সবিতা যাঁর দেবতা তিনি সাবিত্রী বা যিনি নিখিল বেদ প্রসব করেছেন তিনিই সাবিত্রী। মৎস্যপুরাণে আছে ইনি নিজের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ ও এক ভাগে নারী হন। এই নারীই সাবিত্রী দেবী সরস্বতী, **গায়ত্রী** ও ব্রাহ্মণী। খ) মদ্ররাজ অশ্বপতির একমাত্র কন্যা সাবিত্রী। অশ্বপতি সন্তান কামনায় সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর তপস্যা করে এই তেজস্বিনী কন্যা লাভ করেন। দেবী সাবিত্রীর দান বলে এঁর নাম সাবিত্রী হয়। এঁর মাতা **মালবী**। ... রাজ্যহারা শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকেই তিনি মনে মনে বরণ করেন। ... (সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী) ... (পৌ.অ.)। **৫.** যৌথতাবাদের মন্ত্র হল **সাবিত্রী**-মন্ত্র, আর স্বাতন্ত্র্যবাদের মন্ত্র হল **গায়ত্রী**-মন্ত্র।

● **সূর্য্য (সূর্য, সূর্য্যধর্ম্মা)** : **১.** ✓সৃ কিংবা ✓সূ + য (ক্যপ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***সূর্য্য** = প্রসৃত রহে যে আধারে; অথবা, সর্বসম্পদ প্রসব করে যে। /* যে আকাশে যায়; যে কর্ম্মে প্রেরণ করে। (ব.শ.)। **৩.** আদিত্য, রবি [বেদে 'সূর্য্য' 'সবিতা' হইতে প্রায়ই পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। নিরুক্তে ইনি বৈদিক দেবতাত্রয়ের একতম — ইনি আকাশে, ইন্দ্র অন্তরিক্ষে এবং অগ্নি পৃথিবীতে অবস্থিত। ইনি আকাশে সপ্তাশ্বরথে ভ্রমণ করেন। ... পুরাণে ইনি দ্বাদশ **আদিত্যের** একতম 'বিবস্বান'। ইঁহার পিতা **কশ্যপ**, মাতা **অদিতি**। বিশ্বকর্ম্মাদুহিতা সংজ্ঞা (ছায়া বা অশ্বিনী) ইঁহার ভার্য্যা এবং **যম** শনি অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার পুত্র, যমুনা ইঁহার কন্যা। সপ্তাশ্বরথ ইঁহার যান, **অরুণ** ইঁহার সারথি। রামায়ণে ইনি সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা ও আদিপুরুষ। **বৈবস্বত মনু** ইঁহার পুত্র।], আদিত্যের সংখ্যানুসারে ১২ সংখ্যা, **অর্কবৃক্ষ**, শিব। (ব.শ.)। ... 'সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু' — এই পাঁচটি বিভিন্ন নামে সূর্যের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। ... **যাস্ক** বলেন — আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, **কিরণ** বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন, সূর্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাহাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সেই সূর্য। এই সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহন, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্ত-গমন, এই তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। বিবস্বান শব্দে আকাশও বোঝায়। অহোরাত্র বিভাগের কর্তা অর্যমা; তিনি মিত্র ও বরুণের (দিবা ও রাত্রির) মধ্যবর্তী দেবতা। ঋগবেদের ১০টি সূক্তে সূর্যের স্তুতি আছে। এই সূর্য জড় জ্যোতিঃ পিণ্ড নন, ইনি **সূর্যমণ্ডল**-মধ্যবর্তী দেবতা। ... সপ্তাশ্ব-যোজিত একচক্র রথে ইনি **বিশ্বপর্যটন** করেন। **বরুণ** এর পথ পরিষ্কার করে দেন। সূর্য মনুষ্যদিগের কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রত করেন। ... সূর্যের মাতা দ্যৌঃ বা অদিতি। ... **অশ্বিদ্বয়** (অশ্বিনীকুমার-দ্বয়) সূর্যের পুত্র। উষা সূর্যের জনয়িত্রী; সূর্য প্রণয়ীর ন্যায় এই সুন্দরীদেবীর অনুগমন করেন। সূর্য উষার কোলে দীপ্তি পান, আবার উষা এঁর স্ত্রী। ইনি পুরুষের চক্ষু হতে উৎপন্ন। ... **মিত্রাবরুণ** এঁকে **মেঘ** ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্যকে পরাজিত করে তাঁর রথচক্র হরণ করেন, অর্থাৎ মেঘে বা সূর্যগ্রহণে সূর্যমণ্ডল আবৃত হয়ে পড়ে। স্বর্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্যকে আচ্ছাদন করে গ্রহণ করে। অত্রি সূর্যকে মুক্ত করে আবার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ... মহাভারত অনুসারে সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে **কর্ণের** জন্ম হয়। দ্রষ্টব্য **শনি, বালি, সুগ্রীব**। **চন্দ্রবংশীয়** সংবরণের সঙ্গে সূর্য-কন্যা **তপতীর** বিবাহ হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** শুধুমাত্র sun অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অর্কবৃক্ষ, আদিত্য, কেতুধর্ম্মা**। সবার আগে মূল কথাটি — ***অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় বিষয়কে বোঝানোর জন্যই শব্দের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা*** — এই কথাটি মনে গেঁথে নিয়ে এগোতে হবে, বিশেষত ('সূর্য্য'-এর মতো) সেই সব শব্দের ক্ষেত্রে, যেসব শব্দ অত্যন্ত বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাদের বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি (তথাকথিত) প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। সূর্য্য যাকে বোঝায় তাকে বোঝানোর জন্য বহু প্রতিশব্দ দেখতে পাওয়া যায়। যথা — তপন, আদিত্য, কিরণমালী, মরীচিমালী, বিবস্বান, রবি, সবিতা, অর্ক, সপ্তাশ্ব, দিবাকর, পূষা (পূষণ) ... ইত্যাদি। প্রশ্ন হল, কোন অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাকে দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা, যার ক্রিয়াসমূদয়ের সঙ্গে sun-এর সক্রিয়তার মিল আছে? এর উত্তর হল — 'মানবজাতির বোধ' বা 'মানবজাতির যৌথজ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ', যা কিনা মানবজাতির যৌথশক্তিও বটে। এরই একটি খণ্ডিত রূপকে আজকের পৃথিবী চেনে ন্যাশনালিটি বা জাতীয়তা নামে, আর একটি খণ্ডিত রূপকে চেনে রাষ্ট্র বা সরকার নামে, এবং 'পাবলিক মানি' নামে। যে মুহূর্তে সূর্য্যের এই 'মানবজাতির বোধ' মানেটি বোধগম্য হয়, তৎক্ষণাৎ তার সম্পর্কে সমস্ত পুরাণকাহিনী, তার সমস্ত প্রতিশব্দের অর্থ, **চন্দ্র নক্ষত্র আকাশ পৃথিবী** ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সবই এক এক করে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে আমাদের চিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, একটি সরকারি কর্মচারী গ্রামে মিনিকিট বিলি করতে যাচ্ছে মানে সূর্য্যের একটি **কিরণ** চলেছে গণ্ডগ্রামেও আলো দিতে; আর একটি সরকারি কর্মচারী গ্রামে চলেছে খাজনা আদায় করতে মানে সূর্য্যের তাপের একটি কিরণ চলেছে জল (জনসাধারণ) থেকে বাষ্প নিয়ে আসতে। ... তবে, এই যৌথতার বিকাশ কেমন করে হয়েছিল, তার ইতিহাস বুঝতে গেলে আমাদেরকে পুরাণকাহিনীগুলির শরণ নিতে হয়, তাতে বিবৃত ঘটনাগুলির মানে বুঝতে হয়। ... সবশেষে আর একটি প্রশ্ন — কেন বাহ্যিক সূর্য্য ও সামাজিক সূর্য্য (কিংবা বাহ্যিক চন্দ্র ও সামাজিক চন্দ্র, কিংবা বাহ্যিক নক্ষত্র ও সামাজিক নক্ষত্র) উভয়ের ক্রিয়াশীলতা একরকম? এই সমান বা সমান্তরাল কার্য্যাবলীর কারণ কী? না, আমরা এখনও জানি না। এরকম অজস্র সমান্তরাল সক্রিয়তা আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু তার কারণ আমরা এখনও জানি না। সূর্য্যের সপ্তরশ্মির একটি রশ্মি হলেন স্বয়ং **বিশ্বকর্ম্মা**। দ্র. **বিশ্বকর্ম্মা**।

● **সূদন** : দ্র. **মধুসূদন**।

● **সূর্যধর্মা** দ্র. **কেতুধর্মা**

● **সূর্যবংশ** : ৩. দ্র. বিবস্বান। সূর্য বা ক্ষত্রিয় বংশ সূর্যের পৌত্র ইক্ষ্বাকু হতে উদ্ভূত। রামচন্দ্র এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাজারা এই বংশোদ্ভূত। এই সূর্য বংশের দুইটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্বাকু এই বংশের স্থাপয়িতা। অন্য শ্রেণী **মিথিলায়** রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্বাকুর অন্য পুত্র **নিমি** হতে এই বংশ উদ্ভূত। ... (পৌ.অ.)। **৫.** দ্র. **চন্দ্রবংশ**। একালের ভাষায় যাদের আমরা সমাজতান্ত্রিকদের বংশ এবং ধনতান্ত্রিকদের বংশ বলতে পারি, সেকালে তাদেরই যথাক্রমে **সূর্য্যবংশ** ও **চন্দ্রবংশ** বলা হত। ...

● **সূচ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ছুঁই, ছুঁচ, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মদর্শী, সূক্ষ্মদারু, সূক্ষ্মদৃষ্টি, সূক্ষ্মদেহ, সূক্ষ্মপত্র, সূক্ষ্মপত্রিকা, সূক্ষ্মফলা, সূক্ষ্মবদরী, সূক্ষ্মবস্ত্র, সূক্ষ্মভূত, সূক্ষ্মমক্ষিক, সূক্ষ্মমক্ষিকা, সূক্ষ্মমশক, সূক্ষ্মশরীর, সূক্ষ্মশালি, সূক্ষ্মস্ফোট, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মাত্মা, সূক্ষ্মৈলা, সূচ, সূচক, সূচন, সূচনা, সূচনীয়, সূচয়িতব্য, সূচি(সূচী), সূচি, সূচিক, সূচিকর্ম্ম, সূচিকা, সূচিকাধর, সূচিকাভরণ, সূচিকামুখ, সূচিখাত, সূচিত, সূচিপত্র, সূচিপুষ্প, সূচিবদন, সূচিবৃত্তি, সূচিভিন্ন, সূচিভেদ্য, সূচিমুখ, সূচিমুখী, সূচিরোমা, সূচিশালি, সূচিশিখা, সূচী, সূচ্য, সূচ্যগ্র, সৌচি, সৌচিক, সৌক্ষ্ম্য।

● **সূচ্** = নবরূপী সত্তাধারের চয়ন। **সূচ** = নবরূপী সত্তাধারের চয়ন যাহাতে।

● **সৃ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অগ্রসর, অতিসার, অতীসার, অতিসারকী, অতীসারকী, অতিসারী, অনবসর, অনিঃসর, অনুসরণ, অনুসারে, অনুসৃত, অপসৃত, অপ্সরস, অপ্সরা, অবসর, অভিসরণ, অসার, অসুসার, অসৃণি, আপ্সরস, আসংসার, আসংসৃতি, আসার, উৎসারক, ছচি (উৎসৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট), জুঠ, জুষ্ট, ঝঠা, ঝুটা, ঝুটা-কথা, ঝুঠা, নিঃসরণ, নিঃসৃত, প্রতিসরণ, প্রসার, রজ্জু, রজ্জুধর, শরবৎ, শরবতী (সরবতী), শরযু(যূ), (সরযু), সংসার, সংসারী, সড়সড় (সুড়সুড়, দ্র.সু), সব, সবকস্তা, সবচিন, সবদিন, সবন, সবরঙা, সবরাঙা, সবলোট, সবা, সবাই, সবে, সবে-মাত্র, সবোরোজ, সব্ব, সভ, সভা, সভাএ, সভারে, সর, সরক, সরকার, সরকারি(রী), সরখেল, সরঘা, সরঙ্গ, সরট্, সরট, সরটু, সরণ, সরণা, সরণি, সরণী, সরদার (সর্দ্দার), সরদারনী, সরদারী, সরপুঁটি, সরপুরি(রী), সরপুলী, সরপূপী, সরবৎ, সরবতী, সরবরা, সরবরাহ, সরবস, সরভাজা, সরময়, সরমা, সরযু(যূ), সররস, সরল, সরলা, সরলপুঁটি, সরলপুঠী, সরলসফরী, সরলাঙ্গ, সরষা, সরস্ (সরঃ), সরঃকাক, সরঃকাকী, সরসর, সরসী, সরসীজ, সরসীবন্ধু, সরসীরুহ, সরসীরুহলোচন, সরসীরুহেক্ষণ, সরসীরুহোদর, সরস্তীর, সরস্বৎ(স্বান্)সরস্বতী, সরস্বান্ (সরস্বৎ), সরসরিৎ, সরা (সরে সরে যাওয়া), সরা (সরাই, ধরাকে সরা, সোরাই), সরান, সরাপ, সরাপি, সরাব (সর-অব, সরোয়া, শরাব), সরাবি, সরামৃত, সরাসরি (সরান অর্থে), সরি, সরিকৎ (সর-করণ-তারিত, শরাকৎ, শরীক, সরীক, সরীকানা, সরিকানী), সরিকা, সরিৎ, সরিৎপতি, সরিৎসুত, সরিতাংনাথ, সরিতাংপতি, সরিত্বান্(-ত্বৎ), সরিদধিপতি, সরিদ্বরা, সরিদ্ভর্ত্তা(র্ত্তৃ), সরিন্নাথ, সরিন্মুখ, সরিষপ, সরিষা(সা), সরীসৃপ, সরু, সরুআ(য়া), **সরৈ (শরৈ, যার দ্বারা সরে সরে যায়)**, সরোজ, সরোজখণ্ড, সরোজদৃক্, সরোজনাভ, সরোজন্ম, সরোজিনী, সরোজী, সরোদ (সর উদ্লোকে প্রেরণ করে যে), সরোবর, সরোরুট্(রুহ্), সরোরুহ, সরোদৃক্, সরোরুহাক্ষী, সরোরুহাসন, সরোরুহিণী, সর্ত্ত (শর্ত্ত, সরে যাওয়ার ভিত্তি বা তারণকারণ), সর্ব্ব, সর্ব্বংসহ, সর্ব্বকনিষ্ঠ, সর্ব্বকর, সর্ব্বকর্ত্তা(র্ত্তৃ), সর্ব্বকর্ম্ম(র্ম্মন্), সর্ব্বকর্ম্মীণ, সর্ব্বকাম, সর্ব্বকামদ, সর্ব্বকামদুঘ, সর্ব্বকামবর, সর্ব্বকাল, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বকারী, সর্ব্বকৃষ্ণ, সর্ব্বকেশী, সর্ব্বক্ষয়, সর্ব্বক্ষার, সর্ব্বগ, সর্ব্বগণ, সর্ব্বগত, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বগা, সর্ব্বগামী, সর্ব্বগ্রাস, সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বঙ্কষ, সর্ব্বঙ্কষা, সর্ব্বজন, সর্ব্বজনীন, সর্ব্বজয়া, সর্ব্বজান, সর্ব্বজিৎ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতস্), সর্ব্বতঃপাণিপাদ, সর্ব্বতঃশুভা, সর্ব্বতঃশ্রুতিমান(মৎ), সর্ব্বগত, সর্ব্বগাত্র, সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বগুণী, সর্ব্বজ্বরহর, সর্ব্বজ্বরাপহ, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্বতীর্থময়, সর্ব্বতেজোময়, সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বতোগামী, সর্ব্বতোজয়, সর্ব্বতোদিক্(শ্) সর্ব্বতোভদ্র, সর্ব্বতোভদ্রচক্র, সর্ব্বতোভদ্রবন্ধ, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বত্তরে, সর্ব্বত্তুরে, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বত্রে, সর্ব্বত্রেতে, সর্ব্বত্রের, সর্ব্বথা, সর্ব্বথাএ, সর্ব্বথায়, সর্ব্বদ, সর্ব্বদমন, সর্ব্বদর্শন, সর্ব্বদা, সর্ব্বদৃক, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেবমুখ, সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বধনী, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বধুরাবহ, সর্ব্বধুরীণ, সর্ব্বনাম, সর্ব্বনামা (মন্), সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশী, সর্ব্বনেশে, সর্ব্বপ, সর্ব্বপথ, সর্ব্বপথীন, সর্ব্বপ্রকার, সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বপ্রভু, সর্ব্বপ্রযত্ন, সর্ব্ববাদী, সর্ব্ববাদীসম্মত, সর্ব্ববিক্রয়ী, সর্ব্ববিখ্যাত, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ববিশ্ব, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্ববেদ, সর্ব্ববেদসদক্ষিণ, সর্ব্ববেদাঃ(দস্), সর্ব্ববেদিতা, সর্ব্ববেদী, সর্ব্ববেশী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভক্ষ, সর্ব্বভক্ষা, সর্ব্বভক্ষী, সর্ব্বভক্ষ্য, সর্ব্বভাব, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বভুক(জ্), সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতকৃৎ, সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বভূতহর, সর্ব্বভূতহিত, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা(ত্মন্), সর্ব্বভূতাত্মা(ত্মন্), সর্ব্বভূমি, সর্ব্বভূৎ, সর্ব্বভোগীণ, সর্ব্বমঙ্গল, সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বময়, সর্ব্বমাংসাদ, সর্ব্বমূল্য, সর্ব্বমূষক, সর্ব্বমেষ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর, সর্ব্বযত্ন, সর্ব্বযোনি, সর্ব্বরক্ষা, সর্ব্বরক্ষে, সর্ব্বরস, সর্ব্বরসাত্মা(ত্মন্), সর্ব্বরসোত্তম, সর্ব্বরাট্(জ্), সর্ব্বরাত্র, সর্ব্বরূপভাক্(জ্), সর্ব্বর্ত্তু, সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্ত, সর্ব্বলা, সর্ব্বলিঙ্গী, সর্ব্বলী, সর্ব্বলোক, সর্ব্বলোকপিতামহ, সর্ব্বলোকপ্রিয়, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বলোকসুখাবহ, সর্ব্বলোকেশ, সর্ব্বলোকেশ্বর, সর্ব্বলোহ, সর্ব্বলোহাধ্যায়, সর্ব্বশঃ(শস্), সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশক্তিমান(মৎ), সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বশুক্ল, সর্ব্বশুক্লা, সর্ব্বশুদ্ধ, সর্ব্বশূন্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশ্বেত, সর্ব্বসংহার, সর্ব্বসন্নহন, সর্ব্বসমতা, সর্ব্বসম্ভব, সর্ব্বসম্মত, সর্ব্বসহ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বসাধারণ, সর্ব্বসামান্য, সর্ব্বসাহ, সর্ব্বসিদ্ধার্থ, সর্ব্বসিদ্ধি, সর্ব্বস্ব, সর্ব্বস্বদক্ষিণ, সর্ব্বস্বদণ্ড, সর্ব্বস্বহরণ, সর্ব্বস্বান্ত, সর্ব্বস্বস্বামিগুণ, সর্ব্বস্বামী, সর্ব্বস্বী(স্বিন্), সর্ব্বহর, সর্ব্বহরণ, সর্ব্বহার, সর্ব্বহিত, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গদাপনি(নী), সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সব্বাঙ্গীণ, সর্ব্বাণী, সর্ব্বাতিথি, সর্ব্বাতিরিক্ত, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বাধার, সর্ব্বাধিকার, সর্ব্বাধিকারিণী, সর্ব্বাধিকারী, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বান্তক, সর্ব্বান্তর্য্যামী(মিন্), সর্ব্বান্নভক্ষক, সর্ব্বান্নভোজী(জিন্), সর্ব্বান্নীন, সর্ব্বাবস্থ, সর্ব্বাবস্থা, সর্ব্বাভাব,

সর্ব্বাভিসন্ধক, সর্ব্বাভিসন্ধী, সর্ব্বাভিসার, সর্ব্বারম্ভ, সর্ব্বার্থ, সর্ব্বার্থকর্ত্তা, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, সর্ব্বাশয়, সর্ব্বাশী, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বে, সর্ব্বেশ, সর্ব্বেশা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বেসর্ব্বা, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বোপনিষৎ(দ্), সর্ব্বোপায়, সর্ব্বৌঘ, সর্ব্বৌষধ, সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বৌষধিগণ, সর্ষপ (সর্ষা, সর্ষে), সর্ষপতৈল, সর্ষপস্নেহ, সর্ষপা, সাইর, সাংসারিক, সাবল, সার, সার (দ্র. শার, শারি, সারি, সারি-সারি, সারে-সারে), সারক, সারকচু, সারকুঁড়, সারকুড়, সারখদির, সারগন্ধা, সারগম, সারগাত্র, সারগুড়, সারগ্রাহী, সারগ্রীব, সারঘ, সারঙ্গ, সারঙ্গঘাতক, সারঙ্গদৃক্, সারঙ্গলোচন, সারঙ্গাক্ষ, সারঙ্গিক, সারঙ্গিণী, সারঙ্গী, সারচন্দন, সারণ, সারণা, সারণিক, সারণী, সারতা, সারথি, সারথিপণ, সারথিপনা, সারথিপানা, সারথ্য, সারদা, সারদ্রুম, সারধাতা, সারফল্গুত্ব, সারবন্দী, সার-বাঁধা, সারবান, সারভঙ্গ, সারভাণ্ড, সারভূত, সারভৃৎ, সারমেয়, সাররূপ, সারলোহ, সারল্য, সারস, সারসপ্রিয়া, সারসার, সারসোর (শোর), সারসী, সারস্বত, সারস্বতকল্প, সারস্বতবৃত্তি, সারস্বতব্রত, সারা (সর্ব্ব), সারা, সারাৎসার, সারান (সারিয়ে-দেওয়া), সারানী, সারাল, সারালো, সারাসার, সারাসোরা, সারি, সারিক, সারিকা (শারিকা, শালিক, শালিকী), সারিণী (সারী), সারিন্দা (সারেন্দি), সারিন্যা, সারিপাসোয়ার, সারিফল, সারিফলক, সারী, -সারী(রিন্), সারী, সারে-সারে, সারোদ্ধার, সার্থ, সার্থক, সার্থবাহ, সার্ব্বকামিক, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বজনিক, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বধাতুক, সার্ব্ববণিক, সার্ব্ববিভক্তিক, সার্ব্বভৌতিক, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বলৌকিক, সার্ভোম, সার্ষপ, সুরু (সরার প্রথম উদ্যোগ, কিন্তু শুরু-র বেলায় শু-রহে, তার উ-কার), সুসার, সৃ, সৃক্(জ্), সৃক্ক(ক্কন্) সৃক্ক, সৃক্কণ, সৃক্কণী, সৃক্কি, সৃক্কিণী, সৃণি (দ্র.শৃণি), সৃণিকা, সৃণী, সৃণীকা, সৃত, সৃতি, সৃত্বর, সৃত্বরী, সৃমর, সে (সঃ, কারও সঙ্গে যুক্ত হলে 'সর্', 'সর্-বহন বাহক'কে সর্ব্ব বলা যায়। অতএব সঃ হল সর্ব্বের একক। আমি, তুমি, সে। সে-র স্থান তৃতীয়ে। এর উত্তরাধিকার আমাদের তৃতীয় বা প্রথমপুরুষে অর্থাৎ 'সে'-তে। ফারসিতে এর উত্তরাধিকার 'তিন' অর্থে বিদ্যমান।), সেই, সেইমন (তদাত্মক, তদ্-মনাত্মক, যেমন, তেমন, এমন), সেইরূপ (তদ্-দেহাত্মক, তদ্-রূপাত্মক, তদ্রূপ), সেকাল, সেকালে, সেকেলে, সেখান, সেখানে, সেজ (তৃতীয় জাত, যেমন 'মাঝে জাত' মেজ।), সেটে, সেঠ্‌টে, সে-ঠাঁই, সেথা (সে স্থা), সেথায়, সেথাকার, সেথি, সেদিন, সেমতি, সেসি, সেহ, সেহি, সে-হেন, সেহো, সো, সোই, সোঁ, সোঁ-সোঁ, সোয়, সোয়ি, সোরাই (সরা), সোহ, সোহম্, সোহি।

● **সৃ** = অস্তিত্বের বা সত্তার আবর্ত্তন যাহাতে।

● **অপ্সরা : ১.** দ্র. **দেবাঙ্গনা**। সৃ = গতি, সরণ। **২.** *যে (স্ত্রী) জলে বিচরণ করে।* / নিরুক্ত মতে '**জলে** জন্ম হেতু যাহারা **জলে** যায়'। রামায়ণ মতে 'যাহারা মথিত **সমুদ্রজল** হইতে জাত'। ভরত মতে 'যাহারা বিহারার্থ **জলে** যায়'। (ব.শ.)। **৩.** স্ত্রীজাতি দেবযোনিবিশেষ। উর্ব্বশীপ্রভৃতি স্বর্গবেশ্যা। রামায়ণ মতে **সমুদ্রমন্থন** হইতে অপ্সরার উৎপত্তি হয়। মহাভারত মতে কশ্যপপত্নী প্রধার গর্ভে অলম্বুষাপ্রভৃতি চতুর্দ্দশ অপ্সরার উৎপত্তি হয়। ... **পাণ্ডবের** উৎপত্তি বর্ণনায় অনুচানাপ্রভৃতি অনেক অপ্সরার নামোল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তি সহজন্যা মেনকা বিশ্বাচী ঘৃতাচী — এই ছয় জন প্রধান। (ব.শ.)। ... রামায়ণ মহাভারত মতে অপ্সরাগণ গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী। ... পাছে কোনো মুনি কঠোর তপস্যা করে দেবতাদের চেয়েও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন, এই ভয়ে দেবতারা তাদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য এদের নিয়োগ করতেন। ... তারা **মায়া**রূপিণী, মর্ত্যলোকে এসে নানাভাবে মানুষের সাহায্য করত। অথর্ববেদ মতে তারা **পাশা** খেলতে খুব ভালোবাসত এবং এই **ক্রীড়ায়** নিপুণ। এদের মধ্যে **উর্ব্বশী, মেনকা,** রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুকেশী, মঞ্জুঘোষা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্ণা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সরসা, **পুঞ্জিকস্থলা**, বিশ্বাচী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (পৌ. অ.)। **৪.** অতি সুন্দরী যুবতী অর্থে প্রচলিত। **৫.** অপ্সরা শব্দটি অনেকের মতে নিত্যবহুবচন। আদিকালের দলবদ্ধ ফেরিওয়ালাদের বা আদি দোকানদারদের বিভিন্ন গোষ্ঠী। সার্থ। এরা জনগণের মধ্যে থেকে জন্মলাভ করেছিল, এবং জনগণের মধ্যেই বিক্রিবাটা করত, তাই জলে জন্ম, জলে বিহার ইত্যাদি বলা হয়। তখনও সরকারিভাবে হাট বাজারের প্রতিষ্ঠা হয়নি, তখনকার দোকানদারগণ স্বভাবতই ছিলেন আদি-ফেরিওয়ালার মতো। মনে হয়, তখন মানুষ ভাবতেই পারত না, একজন মানুষ ভোগ্যপণ্য ভোগ না-করে সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকবে, আর অন্য লোকেরা তার কাছে যাবে সেই পণ্য কিনতে। কারণ কেনার ধারণাটাই তখনও পরিণত হয়ে ওঠেনি। তথ্য অনুসারে এরা দেবাসুরের (আদি পাবলিক সেকটর ও আদি প্রাইভেট সেকটরের) উদ্যোগে যে জনসমুদ্র-**সমুদ্রমন্থন** করা হয়েছিল, এবং তার ফলে যে বিপুল পণ্যসম্ভারের উদ্ভব ঘটেছিল, তার কারণেই জন্মে থাকবে। অবশ্য মহাভারতের মত মানলে এই পণ্যজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম আগেই হয়েছিল। এরা গন্ধর্ব্বদের স্ত্রী অর্থাৎ 'গান ধর্ম্ম যাহার' (গায়ত্রী পণ্যজীবীদের মন্ত্র) সেই গন্ধর্ব্বদের আধারশক্তি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে আজও '**অলম্বুষা**' একটি গালাগালি রূপে ব্যবহৃত হয়, বয়স্কাগণ কিশোরীদের উদ্দেশ্যে এই গালাগালি ব্যবহার করে। এই অপ্সরাদের অজস্র বিভাজন ছিল। যেমন **মেনকা**। এ হল ঠিকাদারের আদি রূপ। সে যখন পাবলিক সেকটারের ঠিকাদার, তখন সে হিমালয়-পত্নী **মেনকা**; আর যখন সে প্রাইভেট সেকটরের ঠিকাদার তখন সে বিশ্বামিত্রের স্ত্রী অপ্সরা মেনকা। দ্র. **উর্ব্বশী**।

● **সরমা : ৩.** ক) **গন্ধর্ব**রাজ শৈলুষের কন্যা এবং রাবণ-সহোদর **বিভীষণে**র স্ত্রী। **মানস সরোবরে**র তীরে এঁর জন্ম হয়। এই সময় বর্ষাকালে ক্রমবর্ধিত মানস সরোবরের জল সদ্যোজাতা কন্যার নিকট আগমন করলে, **শৈলুষ-স্ত্রী সরঃ মা বর্দ্ধত, অর্থাৎ সরোবর, আর তুমি বর্দ্ধিত হয়ো না** বলে নিষেধ করেন। সেই জন কন্যার নাম হয় সরমা। ইনি আকাশপথে প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারতেন। ... **তরণীসেন** এঁর গর্ভজাত পুত্র। খ) মহর্ষি **কশ্যপে**র অন্যতমা স্ত্রী। ইনি ভ্রমর, ভৃঙ্গরোল, চরটা (ভিমরুল, বোলতা) প্রভৃতি দংশক, পতঙ্গ ও মধুমক্ষিকাদির জনয়িত্রী। গ) ঋকবেদে ইন্দ্রের কুকুর এবং সারমেয় নামে দুই কুকুরের মাতা। এই দুই কুকুরের প্রত্যেকটির চারিটি করে চক্ষু ছিল এবং এরাই যমের কুকুর। (পৌ.অ.)। **৫.** পুকুর বেড়ে নদী, নদী বেড়ে সাগর — ইত্যাকার কাহিনী রয়েছে

মৎস্যাবতারের উত্তরাধিকারে। **উ-মা** ও **সর-মা** প্রায় কাছাকাছি।

● **সরয়ূ** : দ্র. **ত্রিজট**।

● **সরযূ : ৩. পূত**সলিলা নদী। এর উৎস **কৈলাস** পর্বতে ব্রহ্মকল্পিত **মানস সরোবরে**। সর অর্থাৎ মানস-সরোবর থেকে এই নদী নির্গত হয়েছে বলে সরযূ নামে খ্যাতা। এই নদীতীরে বহু **যজ্ঞ** অনুষ্ঠান হয়, সেজন্য ইহা অতি পবিত্র **তীর্থ**। **কোশল**রাজ্য সরযূতীরে অবস্থিত ছিল। প্রসিদ্ধ মহানগরী **অযোধ্যা** ছিল এর কূলবর্তী। লক্ষ্মণ রাম-কর্তৃক বর্জিত হয়ে সরযূতে প্রাণ বিসর্জন করে স্বর্গে গমন করেন। পরে **শ্রীরামচন্দ্র** ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সরযূ সলিলে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেন। ... (পৌ.অ.)। **৫.** প্রজাগণের উৎপন্নের দুধ-সর বাটি ভর্ত্তি করে শাসক খাচ্ছে না, চলে **যাচ্ছে**, নবরূপে উত্তীর্ণ **যাতা**রূপে যে প্রবাহে, তাকে **সরযূ** বলাই যায়। তাহলে তার তীরের কর্ম্ম**যজ্ঞে** বা **তীর্থে** সম্পদের প্রবাহধারা থাকারই কথা! ...

● **সৃজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিসর্গ, অতিসৃষ্ট, অনাছিষ্টি, অনাসৃষ্টি, অনুপসর্গ, অসংসৃষ্ট, অসৃক্, অসৃক্কর, অসৃক্‌পাত, অসৃক্স্রাব, অসৃগ্‌ধারা, অসৃঙ্ময়, অসৃজ্, অসৃজ্য, অসৃষ্ট, উৎসর্গ, উৎসর্জ্জন, উপসর্গ, উপসর্জ্জন, ছিষ্টি, ছিষ্টিছাড়া, নিসর্গ, প্রতিসর্গ, বিসর্গ, বিসর্জ্জন, রজ্জু, রজ্জুক্রিয়া, রজ্জুদাল, রজ্জুদালক, রজ্জুধর, রজ্জুধান, রজ্জুপেটা, রজ্জুবন্ধ, রজ্জুবাল, রজ্জুযন্ত্র, শিয়াকুল (শেয়াকুল, সিঁয়াকুল, সেহাকুল, শেঞাকুল — শৃগালকোলি), শিয়াল (শেয়াল, শ্যাল), শৃগাল, শৃগালকণ্টক, (শিয়ালকাঁটা, সৃকাল, সৃগাল, সৃগালকণ্টক, সৃগালিকা), শৃগালকোলি, শৃগালজম্বু, শৃগালযোনি, শৃগালরূপ, শৃগালিকা, শৃগালিনী, শৃগালী, সংসর্গ, সংসর্গী, সংসৃষ্ট, সর্গ, সর্গকর্ত্তা, সর্গকৃৎ, সর্গক্রম, সর্গবন্ধ, সর্গস্থিতিসংহার, সর্জ্জ, সর্জ্জক, সর্জ্জগজা, সর্জ্জন, সর্জ্জনাম, সর্জ্জনির্য্যাসক, সর্জ্জনী, সর্জ্জভব (সর্জ্জ্য), সর্জ্জমণি, সর্জ্জরস, সর্জ্জি, সর্জ্জিকা, সর্জ্জিকাক্ষার (সৃজিকাক্ষর), সর্জ্জিক্ষার, সর্জ্জী, সর্জ্জ্য, সিঁয়াকুল (সিয়াকুল, শিয়াকুল), সিজ্জন (সৃজন), সিরজ, সিরজন, সিসৃক্ষা, সিসৃক্ষু, সৃজ্, সৃজ, সৃজক, সৃজন (সর্জ্জন), সৃজিত, সৃজ্য, সৃত, সৃষ্ট, সৃষ্টি, সৃষ্টি-অধিকারী, সৃষ্টিছাড়া, সৃষ্টিধর, সৃষ্টিপত্তন, সৃষ্টিপ্রদা, সৃষ্টিরায়, সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়কর, সেহাকুল, স্রক্(জ্), স্রগ্দাম(মন্), স্রগ্ধর, স্রগ্ধরা, স্রগ্‌বান(বৎ), স্রগ্বিণী, স্রগ্বী, স্রজ, স্রজঃ(জস্), স্রজিষ্ঠ, স্রষ্টা(ষ্টৃ), স্রষ্টার।

● **সৃজ্** = অস্তিত্বের বা সত্তার আবর্ত্তন-এর জনন। **সৃজ** = সত্তার আবর্ত্তনমূলক জনন যাহাতে।

● **অতিসর্গ** : ১. অতি + ✓ সৃজ্ + অ - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অত্যন্ত সৃজন যাহাতে; অথবা, যে অতি উৎপাদন নিঃসারিত করিয়াছে।* / যাহা সর্গ অতিক্রম করিয়াছে; যাহা না করিলে প্রত্যবায় নাই তাদৃশ অনুজ্ঞা বা নিয়োগ। (ব.শ.)। ৩. সৃষ্ট্যতিশায়ী, নিত্য, অনশ্বর, মুক্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত, বিসর্জ্জন, বিতরণ, ত্যাগ, দান, উৎসর্জ্জন, উৎসর্গ ...। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। **৫.** উদ্বৃত্ত উৎপন্নকে সেকালে অতিসর্গ বলা হত। একে পরিত্যাগ করাই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। **নিরুক্ত** এর অর্থ করেছেন 'পরিত্যাগ' (পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯)।

● **সর্গ (অতিসর্গ, প্রতিসর্গ, বিসর্গ, নিসর্গ)** : দ্র. **পঞ্চলক্ষণ**। **পুরাণ**।

● **সৃপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিসর্পণ, সরীসৃপ, সর্প, সর্পকঙ্কালিকা, সর্পগতি, সর্পঘট, সর্পণ, সর্পচ্ছত্র, সর্পচ্ছত্রক, সর্পদন্তী, সর্পদষ্ট, সর্পদ্রংষ্ট্র, সর্পদ্রংষ্ট্রা, সর্পদ্রংষ্টিকা, সর্পপতি, সর্পফণজ, সর্পবন্ধ, সর্পবিৎ, সর্পবিদ্যা, সর্পবেদ, সর্পবিবর, সর্পভুক, সর্পমুদ্রক, সর্পযাগ, সর্পরাজ, সর্পসত্র, সর্পসত্রী, সর্পাক্ষ, সর্পাবাস, সর্পারাতি, সর্পারি, সর্পাশন, সর্পি, সর্পিঃ, সর্পিঃসমুদ্র, সর্পিণী, সর্পিরব্ধি, সর্পির্মণ্ড, সর্পির্জুণ্ডিকা, সর্পিষ্মান্ (স্মৎ), সর্পী, সর্পেশ্বর, সর্পেষ্টি, সাপ, সাপখোপ, সাপপিঁপড়া, সার্প, সাপি(পী), সাপুড়িয়া, সাপুড়ে (দ্র.সাঁপড়ি), সাপে-কাটা, সাপে-ছুঁচো-গেলা, সাপে-নেউলে, সাপের-পাঁচ-পা, সাপের-হাঁচি, সাপের-হাঁড়ি, সাবাড়, সৃপ্, সেপো-ব্যাং।

● **সৃপ্** = সত্তার আবর্ত্তন পান-পালন। **সৃপ** = সত্তার আবর্ত্তনমূলক পান-পালন যাহাতে।

● **সেব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিসেবা, অসেবন, অসেবা, অসেবিত, অসেব্য, আসেবন, আসেবা, সাবা, সাবা-দেওয়া, সাবান, সেব্, সেব, সেবক, সেবকা, সেবকী, সেবধি, সেবন (অগ্নিসেবন), সেবনা, সেবনী, সেবনীয়, সেবা, সেবাইত, সেবাইতি, সেবাজন, সেবাঞ্জলী, সেবাতি, সেবাদাসী, সেবাধর্ম্ম, সেবাবৃত্তি, সেবাভৃৎ, সেবায়ত, সেবিকা, সেবিত, সেবিতব্য, সেবিতা, সেবী, সেব্য, সেব্যমান, সেব্যা।

● **সেব্** = দিশাগ্রস্ত সত্তার বহন। **সেব** = দিশাগ্রস্ত সত্তার বহন যাহাতে।

● **সো ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অকল্মষ, অতিসায়ম্, অধ্যবসায়, অনবসিত, অবসান, অব্যবসায়, অব্যবসায়ী, অব্যবসিত, আবসানিক, কল্মষ, কল্মাষ, কল্মাষপাদ, ব্যবসা, ব্যবসায়, ব্যবসায়ী, সাঅ, সাৎ, সাত, সাতি, সাথ, সাথি, সাথিয়া, সাথী, সাথুয়া, সাথে, সাম্, সাম, সাম(মন্), সায়, সায়ং, সায়ংকাল, সায়ংকালিক, সায়ংকালীন, সায়ংদোহ, সায়ংসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যাদেবতা, সায়ক, সায়কপুঙ্খ, সায়ণ(ন), সায়নাচার্য্য, সায়-দেওয়া, সায়ন্তন, সায়ন্তনমল্লিকা, সায়ন্তনী, সায়ম্, সায়মশন, সায়মাশ, সায়মাহুতি, সায়ম্প্রাতরাশী, সায়ম্প্রাতর্হোম, সায়ম্ভোজন, সায়াহ্ন, সায়াহ্নসময়, সায়ী।

● **সো** = নবরূপী সত্তার সার্বিক আধার যে।

● **স্কন্দ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অস্কন্দিত, আস্কন্দ, আস্কন্দী, কন্দ, কন্দর, কন্ধ, কন্ধর, কাঁদি, কাঁধ, কাঁধকাঠ, কাঁধকেঠে, কাঁধা, কান্দ, কান্ধ, স্কন্দ্, স্কন্দ, স্কন্দক, স্কন্দগুরু, স্কন্দগ্রহ, স্কন্দজননী, স্কন্দজিৎ, স্কন্দন, স্কন্দপুত্র, স্কন্দপুরাণ, স্কন্দমাতা, স্কন্দষষ্ঠী, স্কন্দাংশক, স্কন্দাপস্মার, স্কন্দিত, স্কন্ধ, স্কন্ধক, স্কন্ধচাপ, স্কন্ধজ, স্কন্ধদেশ, স্কন্ধনাশ, স্কন্ধপরিনির্বাণ, স্কন্ধপীঠ, স্কন্ধবন্ধ, স্কন্ধবহ, স্কন্ধবান্(বৎ), স্কন্ধবাহ, স্কন্ধবাহক, স্কন্ধরুহ, স্কন্ধশাখা, স্কন্ধশিরঃ, স্কন্ধসংঘট্ট, স্কন্ধঃ(ন্ধস্), স্কন্ধাগ্নি, স্কন্ধানল, স্কন্ধাবার, স্কন্ধাবারনিবেশন, স্কন্ধী(ন্ধিন্), স্কন্ধোপনেয়, স্কন্ন, স্কান্দ।

● **স্কন্দ্** = অস্তিত্বকরণের রহস্যরূপ দান। **স্কন্দ** = অস্তিত্বকরণের রহস্যরূপী দান যাহাতে।

● **স্তন্ (স্তেন্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা**

: অস্তেন, অস্তেয়, স্তন্‌, স্তন, স্তনকলশ, স্তনকুম্ভ, স্তনকুড্মল, স্তনকোরক, স্তনকোটি, স্তনচুচুক, স্তনতট, স্তনত্যাগ, স্তনন, স্তনন্ধয়, স্তনন্ধয়ী, স্তনপ, স্তনপতন, স্তনপরিসর, স্তনপা, স্তনপান, স্তনপায়ক, স্তনপায়ী, স্তনবৃন্ত, স্তনবেপথু, স্তনভর, স্তনভব, স্তনভার, স্তনমণ্ডল, স্তনমধ্য, স্তনমুখ, স্তনমূল, স্তনযুগ, স্তনয়িত্ন, স্তনয়িত্নু, স্তনশিখা, স্তনাংশুক, স্তনাগ্র, স্তনান্তর, স্তনান্তরবিলম্বী, স্তনাভোগ, স্তনিত, স্তনিতবচন, স্তনিতবিমুখ, স্তনিতসংপ্লব, স্তনিতসুভগ, স্তনোত্তরীয়, স্তন্য, স্তন্যকর, স্তন্যক্ষয়, স্তন্যত্যাগ, স্তন্যদান, স্তন্যনাশ, স্তন্যপান, স্তন্যপায়ী, স্তন্যবর্দ্ধন, স্তেন, স্তেনা, স্তেননিগ্রহ, স্তেয়, স্তেয়কৃৎ, স্তেয়ী, স্তৈন্য।

● **স্তন্‌ (স্তেন্‌)** = অস্তিত্বের তারণ। **স্তন** = অস্তিত্বের তারণ যাহাতে। **স্তেন** = অস্তিত্বের দিশাগ্রস্ত তারণ যাহাতে।

● **স্তম্ভ্‌ *(স্তন্‌ভ্‌, স্তিম্‌)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনিস্তব্ধ, অস্তব্ধ, অস্তম্ভ, আখাম্বা, খম্বা, খাম্বা, খাম্ভা, থাম, স্তব্ধ, স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধদৃষ্টি, স্তব্ধনয়ন, স্তব্ধলোচন, স্তব্ধমতি, স্তব্ধমান, স্তব্ধরোমা, স্তব্ধসক্‌থী, স্তব্ধসক্‌থীতা, স্তব্ধীকৃত, স্তব্ধীভূত, স্তম্ব (stem দ্র. **ছড়া, ব.শ.**), স্তম্বক, স্তম্বকরি, স্তম্বকরিতা, স্তম্বকার, স্তম্বঘন, স্তম্বঘাত, স্তম্বঘাতক, স্তম্বঘ্ন, স্তম্বহনন, স্তম্বহননী, স্তম্বেরম, স্তম্ভ, স্তম্ভ, স্তম্ভক, স্তম্ভকর, স্তম্ভকারণ, স্তম্ভকী, স্তম্ভন, স্তম্ভিত, স্তম্ভী, স্তিম্‌ (steam), স্তিমিত, স্তিমিতগতি, স্তিমিতজব, স্তিমিতনয়ন, স্তিমিতনেত্র, স্তিমিতপ্রবাহ, স্তিমিতপ্রদীপ, স্তিমিতবায়ু, স্তিমিতসমাধি, স্তিমিতস্থিতি, স্তৈমিত্য।

● **স্তম্ভ্‌ (স্তন্‌ভ্‌, স্তিম্‌)** = সত্তার-তারণের সীমায়ন-ভবন। **স্তম্ভ** = সত্তার তারণের সীমায়ন ভবন যাহাতে। **স্তন্‌ভ** = সত্তার-তারণের রহস্যরূপ হয় যাহাতে। **স্তিম** = সত্তার গতিশীল তারণ সীমায়িত যাহাতে।

● **স্তু (স্তুচ্‌) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিস্তুতি, অপ্রস্তুত, অসংস্তুত, অস্তোতা, অস্তোদয়, প্রস্তাব, প্রস্তাবনা, প্রস্তাবিত, স্তব, স্তবক, স্তবকিত, স্তবকনমিত, স্তবন, স্তবনীয়, স্তবস্ত, স্তবরাজ, স্তবস্তোত্র, স্তবাক, স্তব্য, স্তু, স্তুত, স্তুতি, স্তুতিগীত, স্তুতিগীতক, স্তুতিপদ, স্তুতিপাঠক, স্তুতিপ্রিয়, স্তুতিবচন, স্তুতিবচঃ, স্তুতিবাদ, স্তুতিব্রত, স্তুত্য, স্তুভ্‌, স্তুভ, স্তূপ্‌, স্তূপ, স্তূপীকৃত, স্তোক, স্তোকক, স্তোককায়, স্তোকনম্র, স্তোকবাক্য, স্তোকশঃ, স্তোতব্য, স্তোতব্যতা, স্তোতব্যত্র, স্তোতব্যস্তোভ, স্তোতা, স্তোত্র, স্তোভ, স্তোভক, স্তোভবাক, স্তোভিত, স্তোম।

● **স্তু (স্তুচ্‌)** = সত্তার তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **স্তুচ** = সত্তার তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চয়িত যাহাতে।

● **স্তৃ (স্তৃ্‌) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিবিস্তর, আথর-পাথর, আস্তর, আস্তরণ, আস্তরণিক, আস্তরণীয়, আস্তীর্ণ, আস্তৃত, পাথর, প্রস্তর, বিস্তর, বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত, বিস্তৃতি, স্তর, স্তরণ, স্তৃ, স্তৃত, স্তৃতি, স্তৃ্‌।

● **স্তৃ (স্তৃ্‌)** = সত্তার তারণের আবর্তন যাহাতে। **স্তৃ্‌** = **স্তৃ**-র আধার যে।

● **স্ত্যৈ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অস্ত্রীক, সস্ত্রীক, স্ত্যান, স্ত্যানা, স্ত্যৈ, স্ত্রিয়া, স্ত্রী, (str, structure, construction, নির্‌-মান, নির্ম্মাণ), স্ত্রীআচার, স্ত্রীকটি, স্ত্রীকটী, স্ত্রীকরণ, স্ত্রীকলা, স্ত্রীকাম, স্ত্রীকার্য্য, স্ত্রীকিতব, স্ত্রীকুমার, স্ত্রীকুসুম, স্ত্রীক্ষীর, স্ত্রীক্ষেত্র, স্ত্রীগমন, স্ত্রীগুরু, স্ত্রীগৃহ, স্ত্রীঘ্ন, স্ত্রীচরিত, স্ত্রীচিহ্ন, স্ত্রীচৌর, স্ত্রীজন, স্ত্রীজননী, স্ত্রীজন্ম, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজাতীয়, স্ত্রীজিত, স্ত্রীজীবন, স্ত্রীত্ব, স্ত্রীদেহার্দ্ধ, স্ত্রীদ্বিট্‌(ষ্‌), স্ত্রীধন, স্ত্রীধব, স্ত্রীধর্ম্মিণী, স্ত্রীনামা, স্ত্রীনিবন্ধন, স্ত্রীনির্জ্জিত, স্ত্রীপণ্যোপজীবী, স্ত্রীপর, স্ত্রীপর্ব্ব(র্বন্‌), স্ত্রীপাট, স্ত্রীপিশাচী, স্ত্রীপুংধর্ম্ম, স্ত্রীপুংনপুংসক, স্ত্রীপুংস, স্ত্রীপুংসলক্ষণা, স্ত্রীপুমান, স্ত্রীপুর, স্ত্রীপুরুষ, স্ত্রীপুষ্প, স্ত্রীপূর্ব্ব, স্ত্রীপূর্ব্বক, স্ত্রীপূর্ব্বী, স্ত্রীপ্রত্যয়, স্ত্রীপ্রধান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্ত্রীপ্রসূ, স্ত্রীবধ, স্ত্রীবন্ধ, স্ত্রীবশ, স্ত্রীবশ্য, স্ত্রীবাধ্য, স্ত্রীবালকব্রাহ্মণঘ্ন, স্ত্রীবিজিত, স্ত্রীবিত্ত, স্ত্রীবিধেয়, স্ত্রীবিয়োগ, স্ত্রীবিবাহ, স্ত্রীবিষয়, স্ত্রীবিষয়ক, স্ত্রীবুদ্ধি, স্ত্রীবৃন্দ, স্ত্রীব্যঞ্জন, স্ত্রীভাগ্য, স্ত্রীভাব, স্ত্রীভূষণ, স্ত্রীভোগ, স্ত্রীমন্ত্র, স্ত্রীমান্‌(মৎ), স্ত্রীমুখপ, স্ত্রীযন্ত্র, স্ত্রীযোনি, স্ত্রীরজঃ(জস্‌), স্ত্রীরত্ন, স্ত্রীরাজ্য, স্ত্রীরাশি, স্ত্রীরোগ, স্ত্রীলক্ষণ, স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীলোক, স্ত্রীসংগ্রহণ, স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রীসংস্থান, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসভ, স্ত্রীসম্বন্ধ, স্ত্রীসম্ভোগ, স্ত্রীসুখ, স্ত্রীস্বভাব, স্ত্রীস্তন, স্ত্রীস্বরূপী, স্ত্রীহত্যা, স্ত্রীহন্তা, স্ত্রীহরণ, স্ত্রীহারী, স্ত্রৈণ, স্ত্রৈণ্য, স্ত্র্যগার, স্ত্র্যধ্যক্ষ, স্ত্র্যাজীব।

● **স্ত্যৈ** = সত্তার-তারণের দিশাগ্রস্ত আধার থাকে যাহাতে।

● **স্থা (স্থূল্‌) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অছাপি, অছিপছি, অতথা, অতথোচিত, অতথ্য, অতিথ, অতিথ-অভ্যাগত, অতিথি, অতিথিক্রিয়া, অতিথিদেব, অতিথিধর্ম্ম, অতিথিপরিভাবী, অতিথিপূজন, অতিথিপূজা, অতিথিশালা, অতিথিসৎকার, অতিথিসেবন, অতিথিসেবা, অতিষ্ঠ, অতিস্থূল, অথ, অথই (অস্থল), অথচ, অথবা, অথর্ব্ব, অথর্ব্বনিধি, অথর্ব্ববান, অথর্ব্ববিৎ, অথর্ব্ববিদ, অথর্ব্বা, অথল, অথা, অথাই (অস্থিতি), অথান্তর, অথাহ, অথির, অধঃস্থ, অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠিত, অননুষ্ঠান, অনবস্থ, অনবস্থান, অনবস্থিত, অনবস্থিতি, অনাস্থা, অনিষ্ঠ, অনিষ্ঠুর, অনুষ্ঠান, অনুপস্থিতি, অনৈষ্ঠিক, অপ্রতিষ্ঠ, অবস্থা, অবস্থান, অবস্থিত, অব্যবস্থ, অব্যবস্থা, অব্যবস্থিত, অভ্যুত্থান, অসংস্থান, অসোয়াস্ত, অসোয়াস্থ, অস্বস্থ, অসৌষ্ঠব, অস্তাগ, অস্তাঘ, অস্থই, অস্থাগ, অস্থাঘ, অস্থান, অস্থাবর, অস্থায়ী, অস্থিত, অস্থিতপঞ্চ, অস্থিতপঞ্চক, অস্থির, অস্থূল, আকথু, আতালিপাতালি, আথর্ব্বণ, আথান্তর, আথালি, আথালিপাথালি, আবথা, আবস্থা, আবস্থিক, আযথাতথ্য, আসোয়াথ, আস্থা, আস্থান, আস্তান, আস্তানা, আস্তাবল (স্থা-বল, stable), আস্থানগৃহ, আস্থাননিকেতন, আস্থানমণ্ডপ, আস্থানী, আস্থাপন, আস্থায়িকা, আস্থায়ী, আস্থিত, আস্থেয়, উঠ, উত্তিষ্ঠ, উত্থাপক, উত্থিত, উথ, উথাল, উথাল-পাতাল, উপস্থ, উপস্থিত, একস্থ, কণ্ঠস্থ, কায়স্থ, গোষ্ঠ, ছপ, ছপছপ, ছাপ, ছাপা, ছাপিত, ছাব, ছিপ, ছিপি, ছিল, ছুপ, ছুপাছুপি, ছুয়া, ছুবা, ছোপ, ছোপা, ছোপান, ছোব, ছোবড়া, ঠাই, ঠাঁয়, ঠান, ঠাম, ঠায়, ঠিক, ঠিকঠাক, ঠিকা, ঠেক, ঠেকনা, তথা, তথোচিত, তথ্য, থ, থাক, থান, থাপ, থিত, থিতু, থির, থু, থুৎকার, থুতু, থুথু, থুয়ে দেওয়া, দুঃস্থ, দুরবস্থ, নিষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, প্রতিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত, প্রস্থ, প্রস্থান, বিষ্ঠা, ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপক, যথা, সংস্থা, সংস্থান, সংস্থাপক, সংস্থাপনা, সংস্থাপিত, সংস্থিত, সংস্থিতি, সমবস্থা, সমুপস্থিতি, সস্থান, সহস্থ, সুপ্রতিষ্ঠ, সুষ্ঠ, সুষ্ঠু, সুসংস্থিত, সুস্থ, সুস্থিত, সুস্থির, স্তান (হিন্দোস্তান), স্তাবেল (আস্তাবল), স্থ, স্থকিত, স্থগ্‌, স্থগ, স্থগন, স্থগর, স্থগিকা, স্থগিত, স্থগু, স্থণ্ডিল, স্থণ্ডিলশয্যা,

স্থণ্ডিলশায়ী, স্থণ্ডিলসংবেশন, স্থণ্ডিলেশয়, স্থপ, স্থপতি, স্থপনী, স্থপুট, স্থপুটগত, স্থবির, স্থবিরা, স্থবিরায়ুঃ(য়ুস্), স্থবিষ্ঠ, স্থবিয়ান্(য়স্), স্থল্, স্থল, স্থলকমল, স্থলকমলিনী, স্থলকুমুদ, স্থলকূল, স্থলগ, স্থলচর, স্থলচারী, স্থলচ্যুত, স্থলজ, স্থলদেবতা, স্থলনলিনী, স্থলপঙ্কজ, স্থলপথ, স্থলপদ্ম, স্থলপদ্মিনী, স্থলবিগ্রহ, স্থলবিহঙ্গ, স্থলবিহঙ্গম, স্থলবেতস, স্থলমঞ্জরী, স্থলমার্গ, স্থলশুদ্ধি, স্থলশৃঙ্গাট, স্থলশৃঙ্গাটক, স্থলসীমা, স্থলস্থ, স্থলা, স্থলি, স্থলী, স্থলীদেবতা, স্থলেজাত, স্থলেরুহা, স্থলেশয়, স্থা, স্থাণবীয়, স্থাণু, স্থাণুকর্ণী, স্থাণুচ্ছেদ, স্থাণুদিক্(শ্), স্থাণুভূত, স্থাণুভ্রম, স্থাণ্ডিল, স্থাতব্য, স্থাতা(তৃ), স্থান, স্থানক, স্থানচঞ্চলা, স্থানচিন্তক, স্থানচ্যুত, স্থানত্যাগ, স্থানপতি, স্থানপাল, স্থানপ্রচ্যুত, স্থানপ্রাপ্তি, স্থানবিৎ, স্থানভ্রষ্ট, স্থানমাহাত্ম্য, স্থানমৃগ, স্থানযোগ, স্থানস্থ, স্থানরক্ষক, স্থানাধ্যক্ষ, স্থানান্তর, স্থানাভাব, স্থানাসন, স্থানাস্থান, স্থানিক, স্থানী(নিন্), স্থানীয়, স্থানে, স্থানেশ্বর, স্থাপ, স্থাপক, স্থাপত্য, স্থাপন, স্থাপনা, স্থাপনী, স্থাপয়িতব্য, স্থাপয়িতা, স্থাপিত, স্থাপী, স্থাপ্য, স্থাবর, স্থাবরগরল, স্থাবরজঙ্গম, স্থাবরতা, স্থাবরত্ব, স্থাবরাত্মা(ত্মন্), স্থাবররাজ, স্থাবির, স্থাবির্য্য, স্থাম(মন্), স্থায়, স্থায়িতা, স্থায়িত্ব, স্থায়িভাব, স্থায়ী, স্থায়ুক, স্থাল, স্থালক, স্থালপথিক, স্থালী, স্থালীপাক, স্থালীপুরীষ, স্থালীপুলাক, স্থালীবিল, স্থাস্নু, স্থিত, স্থিতধী, স্থিতপাঠ্য, স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতপ্রেম, স্থিতি, স্থিতিকর্ত্তা, স্থিতিজ্ঞ, স্থিতিদেশ, স্থিতিপথ, স্থিতিপ্রদ, স্থিতিভিৎ, স্থিতিমান, স্থিতিস্থাপক, স্থিত্যতিক্রান্তি, স্থির, স্থিরকর্ম্মা, স্থিরগন্ধ, স্থিরচরজাতি, স্থিরচ্ছদ, স্থিরচ্ছায়, স্থিরজিহ্ব, স্থিরজীবিতা, স্থিরতা, স্থিরত্ব, স্থিরদংষ্ট্র, স্থিরধী, স্থিরনিশ্চয়, স্থিরনিশ্চিত, স্থিরপত্র, স্থিরপুষ্প, স্থিরপ্রজ্ঞ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, স্থিরপ্রতিবন্ধ, স্থিরপ্রসাদ, স্থিরবুদ্ধি, স্থিরমতি, স্থিরমাণ, স্থিরযৌবন, স্থিররঙ্গা, স্থিররাগা, স্থিরলোচন, স্থিরশ্রী, স্থিরসঙ্গর, স্থিরসত্ত্ব, স্থিরসার, স্থিরা, স্থিরানুরাগ, স্থিরায়তি, স্থিরায়ুঃ(য়ুস্), স্থিরারম্ভ, স্থিরীকরণ, স্থিরীকর্ত্তব্য, স্থিরীকৃত, স্থূণ, স্থূণা, স্থূণাগর্ত্ত, স্থূণানিখননন্যায়, স্থূণাপক্ষ, স্থূণারাজ, স্থূণাশীর্ষ, স্থূণাবশেষ, স্থূল্, স্থূল, স্থূলকঙ্গু, স্থূলকণা, স্থূলকায়, স্থূলক্ষেড়, স্থূলগাফা, স্থূলচাপ, স্থূলচূড়, স্থূলজীরক, স্থূলতণ্ডুল, স্থূলতাল, স্থূলত্বচা, স্থূলদণ্ড, স্থূলদর্ভ, স্থূলদলা, স্থূলদেহ, স্থূলদ্রব্য, স্থূলধী, স্থূলনাল, স্থূলনাস, স্থূলনাসিক, স্থূলপট, স্থূলপট্ট, স্থূলপাদ, স্থূলপুষ্প, স্থূলপুষ্পী, স্থূলপ্রপঞ্চ, স্থূলবল্কল, স্থূলবিষয়, স্থূলবুদ্ধি, স্থূলভাব, স্থূলভিক্ষা, স্থূলভূত, স্থূলমতি, স্থূলমধ্য, স্থূলমরিচ, স্থূলমান, স্থূলমূল, স্থূলশর, স্থূলশরীর, স্থূলশাট, স্থূলশাটক, স্থূলশাটিকা, স্থূলশাটী, স্থূলশালি, স্থূলশিরঃ(রস্), স্থূলশীর্ষিকা, স্থূলষট্‌পদ, স্থূলস্থূল, স্থূলহস্ত, স্থূলাঙ্গ, স্থূলান্ত্র, স্থূলাস্য, স্থূলৈলা, স্থূলোচ্চয়, স্থূলোদর, স্থেমা, স্থেমাভাক্(জ্), স্থেয়, স্থেয়ান্(য়স্), স্থেয়ীকৃত, স্থৈর্য্য, স্থৈর্য্যকর, স্থৈর্য্যকৃৎ, স্থৌললক্ষ্য, স্থৌল্য, স্বস্থ, স্বস্থান, স্বাস্থ্য।

● স্থা (স্থূল্) = সত্তার স্থিতি যাহাতে। **স্থূল** = সত্তার স্থিতির নবরূপে উত্তীর্ণ আধার লালিত যাহাতে।

● **অথ, অথচ, অথবা, অথর্ব্ব** : দ্র. **থ**। থ বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।

● **অবস্থা, অবস্থান** : ২. *অবস্থা* = *দ্র.* **অব্**। *অবস্থান* = **অবস্থা** *অন যাহাতে।* দ্র. **অব্, দশা**।

● **অভ্যুত্থান** : ১. অভি-উদ্ + ✓স্থা + অন। (ব.শ.)। ২. *যার দ্বারা (যে ক্রিয়ার দ্বারা) অভিতে (স্বস্থিত অবস্থান থেকে) উদ্‌লোকে স্থিত হয়।* ৩. সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থান, উত্থানপূর্ব্বক প্রত্যুদগমন, অভ্যুন্নতি, অভ্যুদয়, উদ্যম, উদ্যোগ, উদ্ভব, বৃদ্ধি, ব্যাপার, উদয়, রাজাভিদ্রোহ, বিদ্রোহ, ... (ব.শ.)। ৪. revolt বা বিদ্রোহ অর্থে প্রচলিত। ৫. কথাটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ যা, তাতে তার ভিতরে 'সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থান' থেকে শুরু করে 'বিদ্রোহ' পর্যন্ত সকল কর্মের চরিত্রই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেই কারণে, এককালে যে 'অভ্যুত্থান' প্রায়শই 'সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থান' বোঝাতো, সেই কারণেই তা 'বিদ্রোহ'কেও বোঝায়। তবে কিনা, এখন তা 'revolt' অর্থে স্থির হয়ে গিয়ে প্রতীকী হয়ে গেছে।

● **ছিপ, ছিপি** : ৫. 'পানের ছিপ ফেলিবেন না' — কলকাতার কোনো কোনো বহুতল বাড়িতে অফিসে লেখা থাকে। এই ছিপ আর skip একই কথা।

● **প্রস্থ** : দ্র. **আড়**।

● **স্থ** : দ্র. **থ** বর্ণের অর্থ।

● **স্থাণু** : ৩. ক) নীললোহিত রুদ্রকে ব্রহ্মা যখন প্রজাসৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তখন তিনি 'স্থিতোহস্মি' — আমি বিরত হলাম — এই বাক্য উচ্চারণ করে প্রজাসৃষ্টি কার্য ত্যাগ করেন। ... এই কারণে ইনি স্থাণু নামে প্রসিদ্ধ হন। খ) মহাদেবের এক নাম। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **যতি**।

● **স্থিত** : দ্র. **ঠিক**।

● **স্না (স্নিহ্, স্নু, স্নুহ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিস্নেহ, অনভিস্নেহ, অভিস্নেহ, অস্নান, অস্নেহ, চান, না, নাইতে-যাওয়া, নাহ, নাহানা, নেউয়া, নেওট, নেওটা, নেহ, নেহা, সনেহ, সান, সিন, সিনা, সিনাঙ, সিনান, সিনানসাজ, সিনায়, সিনায়ব, সিনায়ল, সিনানিয়া, সিনেহ, সিহণ্ড, সীহণ্ড, সীহুণ্ড, সিজগাছ, সেনেহ, সেনেহা, সুস্নাত, সুস্নিগ্ধ, স্নপন, স্নপিত, স্না, স্নাত, স্নাতক, স্নাতকব্রত, স্নাতকব্রতী, স্নাতা(তৃ), স্নান, স্নানকলশ, স্নানকুম্ভ, স্নানগৃহ, স্নানতৃণ, স্নানদান, স্নানদ্রোণী, স্নানবস্ত্র, স্নানবাসাঃ, স্নানবিধি, স্নানবিধিক্ষম, স্নানবেশ্ম, স্নানভূ, স্নানভূমি, স্নানযাত্রা, স্নানশাটী, স্নানশিক্ষাজ্ঞ, স্নানশালা, স্নানশীল, স্নানাগার, স্নানাম্বু, স্নানীয়, স্নানোত্তীর্ণ, স্নানোদক, স্নানোপকরণ, স্নাপ, স্নাপক, স্নাপন, স্নাপিত, স্নায়বিক, স্নায়বীয়, স্নায়িনী, স্নায়ী(য়িন্), স্নায়ু, স্নায়ুক, স্নায়ুজাল, স্নায়ুনির্ম্মিত, স্নায়ুপাশ, স্নায়ুবন্ধ, স্নায়ুবন্ধন, স্নায়ুমর্ম্ম, স্নায়ুযুত, স্নায়ুর্ম্ম(র্ম্মন্), স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধকন্দা, স্নিগ্ধকর, স্নিগ্ধকান্ত, স্নিগ্ধজন, স্নিগ্ধতণ্ডুল, স্নিগ্ধতা, স্নিগ্ধত্ব, স্নিগ্ধদল, স্নিগ্ধদারু, স্নিগ্ধদৃষ্টি, স্নিগ্ধপত্রক, স্নিগ্ধপত্রা, স্নিগ্ধফলা, স্নিগ্ধা, স্নিহ্, স্নু, স্নুক্(হ্), স্নুত, স্নুষা, স্নুহ্, স্নুহা, স্নুহি, স্নুহী, স্নেহ, স্নেহক, স্নেহকুম্ভ, স্নেহক্রম, স্নেহঘট, স্নেহচ্ছেদ, স্নেহন, স্নেহনির্ভর, স্নেহপক্ক, স্নেহপাত্র, স্নেহপূর্ব্ব, স্নেহপ্রবৃত্তি, স্নেহপ্রসর, স্নেহবচন, স্নেহবন্ধ, স্নেহবর, স্নেহবস্তি, স্নেহবান(বৎ), স্নেহবিমর্দ্দিত, স্নেহব্যক্তি, স্নেহব্যবহার, স্নেহভঙ্গ, স্নেহভাজন, স্নেহভূ, স্নেহভূমি, স্নেহভূয়িষ্ঠ, স্নেহরঙ্গ, স্নেহরস, স্নেহসংযুক্ত, স্নেহসংস্কৃত, স্নেহসম্ভাষ, স্নেহসার, স্নেহাক্ত, স্নেহানুবৃত্তি, স্নেহাভ্যক্ত, স্নেহী(হিন্), স্নৈগ্ধ্য।

● **স্না (স্নিহ্, স্নু, স্নুহ্)** = সত্তার রহস্যরূপের আধার যে। **স্নিহ** = সত্তার গতিশীল রহস্যরূপের হওয়ন যাহাতে। **স্নু** = সত্তার রহস্যরূপ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **স্নুহ** = **স্নু**-র হওয়ন যাহাতে।

● **স্নান, স্নাতক** : দ্র. **তীর্থ**।

● **স্নেহ (স্নেহমমতা)** : দ্র. **মমতা, মায়া**।

● **স্পন্দ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অস্পন্দ, করস্পন্দ, দক্ষিণাক্ষিস্পন্দ, পক্ষ্মস্পন্দ, স্পন্দ্, স্পন্দ, স্পন্দকারিকা, স্পন্দন, স্পন্দনপিণ্ড, স্পন্দনশীল, স্পন্দশাস্ত্র, স্পন্দসূত্র, স্পন্দিত, স্পন্দী।

● **স্পন্দ্** = সত্তা-পালকের রহস্যরূপী দান। **স্পন্দ** = সত্তা-পালকের রহস্যরূপী দান যাহাতে।

● **স্পর্দ্ধ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আস্পর্দ্ধা, স্পর্দ্ধ্, স্পর্দ্ধ, স্পর্দ্ধন, স্পর্দ্ধনীয়, স্পর্দ্ধা, স্পর্দ্ধিত, স্পর্দ্ধী, স্পর্দ্ধ্য।

● **স্পর্দ্ধ্** = সত্তা-পালকের রক্ষণ-দানের ধারণ। **স্পর্দ্ধ** = সত্তা-পালকের রক্ষণ-দানের ধারণ যাহাতে।

● **স্পশ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবিস্পষ্ট, অস্পষ্ট, পষ্ট, পৃশ্নি, পৃশ্নিগর্ভ, স্পশ্, স্পশ, স্পষ্ট, স্পষ্টগর্ভা, স্পষ্টতঃ, স্পষ্টবক্তা, স্পষ্টবাক্য, স্পষ্টভাষী, স্পষ্টাক্ষর, স্পষ্টার্থ, স্পষ্টীকরণ, স্পষ্টেতর।

● **স্পশ্** = সত্তা-পালকের সার্বিক বিচ্ছুরণ। **স্পশ** = সত্তা-পালকের সার্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে।

● **পৃশ্নি** : দ্র. **দেবকী**।

● **স্পৃশ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অপরশ, অস্পর্শ, অস্পৃশ্য, অস্পৃষ্ট, আশপাশ, আশেপাশে, কানপাশা, ছুবা, ছোঁয়া, ছোঁয়াচ, ছোবা, পরশ, পরশন, পরশপাথর, পরশমণি, পরশমাণিক, পরশরতন, পরস, পর্শমণি, পারশ, পারস, পাশ, পাশটান, পার্শ্ব, পার্শ্বক, পার্শ্বগ, পার্শ্বগত, পার্শ্বচর, পার্শ্বদ, পার্শ্বনাথ, পার্শ্বপরিবর্ত, পার্শ্বপরিবর্ত্তন, পার্শ্ববর্তী, পার্শ্বভঙ্গ, পার্শ্বভাগ, পার্শ্বশয়, পার্শ্বশূল, পার্শ্বস্থ, পার্শ্বানুচর, পার্শ্বায়াত, পার্শ্বাস্থি, পার্শ্বৈকাদশী, (কান)-পাশা, (কোদাল)-পাশা, পাশাপাশি, পাশিক, পাশী, পাশে, সংস্পর্শ, সুপার্শ্ব, সুস্পর্শ, স্পর্শ, স্পর্শক্লিষ্ট, স্পর্শক্ষম, স্পর্শগুণ, স্পর্শজ, স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শদোষ, স্পর্শদ্বেষ, স্পর্শন, স্পর্শনক, স্পর্শনীয়, স্পর্শবতী, স্পর্শবর্গ, স্পর্শবর্ণ, স্পর্শবান, স্পর্শবিরস, স্পর্শবেদ্য, স্পর্শভাক্(জ্), স্পর্শমণি, স্পর্শমণিপ্রভব, স্পর্শযজ্ঞ, স্পর্শরসিক, স্পর্শশীতল, স্পর্শসঞ্চারী, স্পর্শসুখ, স্পর্শস্নান, স্পর্শহানি, স্পর্শাধ্যক্ষ, স্পর্শানুকূল, স্পর্শাশন, স্পর্শাসহ, স্পর্শসহিষ্ণু, স্পর্শী, স্পর্শেন্দ্রিয়, স্পর্শোপল, স্পর্ষ্টব্য, স্পৃক্(শ্), স্পৃক্কা, স্পৃক্কারস, স্পৃশ্, স্পৃশ, স্পৃশা, স্পৃশী, স্পৃশ্য, স্পৃষ্ট, স্পৃষ্টক, স্পৃষ্টপূর্ব্ব, স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট, স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (পিটাপিটি, পেটাপেটি, পিঠোপিঠি), স্পৃষ্টি, স্পৃষ্টিকা, স্প্রষ্টব্য, স্প্রষ্টা।

● **স্পৃশ্** = সত্তা-পালকের আবর্ত্তনের সার্বিক বিচ্ছুরণ। **স্পৃশ** = সত্তা-পালকের আবর্ত্তনের সার্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে।

● **স্পৃহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অস্পৃহ, স্পৃহ্, স্পৃহণ, স্পৃহণীয়, স্পৃহয়ালু, স্পৃহা, স্পৃহাবান, স্পৃহিত।

স্পৃহ্ = সত্তা-পালকের আবর্ত্তনের হওয়ন। **স্পৃহ** = সত্তা-পালকের আবর্ত্তনের হওয়ন যাহাতে।

● **স্ফট্ (স্ফুট্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অফুট, অফুটন্ত, অস্ফুট, অস্ফুটবাচা, আস্ফোট, আস্ফোটক, আস্ফোটন, আস্ফোটিত, প্রস্ফুট, প্রস্ফোটন, বিস্ফোটন, ফট্, ফট্কা, ফট, ফটা, ফটক, ফটকিরি (ফিটকিরি), ফটরফটর, ফটা, ফটাটোপ, ফটাংফটাং, ফটাফট, ফটিক, ফটোগ্রাফ, ফট্‌কিনাট্‌কি, ফাটক, ফাট, ফাটক, ফাটকী, ফাটল, ফাটা, ফাটা-টুটা, ফাটাফাটি, ফাটিক, ফুট, ফুটকড়া(লা)ই, ফুটকি, ফুটন, ফুটন্ত, ফুটফুট, ফুটফুটি, ফুটফুটে, ফুটল, ফুটা (ফোটা), ফুটান, ফুটানি, ফুটি, ফুটো, ফোঁটা, ফোঁড়, ফোঁড়া, ফোট, ফোটফোট, ফোট-শালা, ফোটা, ফোটান, ফোড়ন, ফোড়া, স্ফট্, স্ফট, স্ফটিক, স্ফটিকুড্য, স্ফটিকপাত্র, স্ফটিকফলক, স্ফটিকবিশদ, স্ফটিকভিত্তি, স্ফটিকমণি, স্ফটিকময়, স্ফটিকশিলা, স্ফটিকশিখরী, স্ফটিকস্তম্ভ, স্ফটিকস্বচ্ছ, স্ফটিকহর্ম্ম্য, স্ফটিকা, স্ফটিকাচল, স্ফটিকাদ্রি, স্ফটিকাবদাত, স্ফটিকারি, স্ফটিকারিকা, স্ফটিকারী, স্ফটিকাশ্মা, স্ফটিকী, স্ফটী, স্ফাটিক, স্ফাটিত, স্ফুট্, স্ফুট, স্ফুটকোরক, স্ফুটতার, স্ফুটন, স্ফুটফল, স্ফুটবক্তা, স্ফুটবন্ধনী, স্ফুটা, স্ফুটার্থ, স্ফুটি, স্ফুটিকা, স্ফুটিত, স্ফুটিতকরচরণ, স্ফুটিতনয়ন, স্ফুটিলোচন, স্ফুটী, স্ফুটীকরণ, স্ফুটোপম, স্ফোট, স্ফোটক, স্ফোটন, স্ফোটনী, স্ফোটবাদ, স্ফোটা, স্ফোটিত, স্ফোটিনী, স্ফ্য।

● **স্ফট্ (স্ফুট্)** = সত্তার পালনস্থিতের টঙ্কার। **স্ফট** = সত্তার পালনস্থিতের টঙ্কার যাহাতে। **স্ফুট** = নবরূপী সত্তার পালনস্থিতের টঙ্কার যাহাতে।

● **ফাট, ফাটা** : দ্র. **টুটা-ফাটা**।

● **স্ফট, স্ফটিক** : দ্র. **ছটফট**।

● **স্ফর্ (স্ফুর্, ছুর্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অফুরন্ত, অফুরাণ, অফুরান, আচ্ছুরিত, ফুর, ফুরনি, ফুরফুর, ফুরফুরে, ফুরসৎ, ফুরা (স্ফুরিত হয়ে হয়ে শেষ), ফুরাণ, ফুরান, ফুর্ত্তি, ফোর, ফোরা, বিচ্ছুরিত, বিস্ফারিত, বিস্ফুরণ, স্ফর্, স্ফুর্, স্ফুর, স্ফুরণ, স্ফুরৎপ্রভা, স্ফুরদুল্কা, স্ফুরিত, স্ফু (স্ফুর্), স্ফূর্জ্জ্, স্ফূর্জ্জ, স্ফূর্জ্জথু, স্ফূর্জ্জন, স্ফূর্জ্জিত, স্ফূর্ত্ত, স্ফূর্ত্তি, স্ফূর্ত্তিমান (মৎ), স্ফোরণ।

● **স্ফর্ (স্ফুর্, ছুর্)** = সত্তার পালনস্থিতের রক্ষণ। **স্ফর** = সত্তার পালনস্থিতের রক্ষণ যাহাতে। **স্ফুর** = নবরূপী সত্তার পালনস্থিতের রক্ষণ যাহাতে। **ছুর** = নবরূপী ছাদনের রক্ষণ যাহাতে।

● **স্ফল্ (স্ফালি, স্ফুল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আফালি, আস্ফাল, আস্ফালন, প্রফুল্ল, ফালতু, ফুল, ফুল্ল, ফেল, ফেলত, ফেলতো, ফেলনা, ফেলফেল, ফেলা, ফেলি, ফ্যালফ্যাল, ফ্যালসানি, ফ্যালসা, স্ফল্, স্ফাল, স্ফুল্, স্ফুল, স্ফুলন, স্ফুলিঙ্গ, স্ফুলিঙ্গা, স্ফুলিঙ্গিনী।

● **স্ফল্ (স্ফালি, স্ফুল্)** = সত্তার-পালনস্থিতের লালন-লয়ন। **স্ফল** = সত্তার পালনস্থিতের লালন-লয়ন যাহাতে। **স্ফালি** = **স্ফাল** (**স্ফল** হইতে জাত) এর গতিশীলতা যাহাতে। **স্ফুল** = নবরূপী সত্তার পালনস্থিতের লালন-লয়ন যাহাতে।

● **স্ফায়্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অফেন, ফানেল, ফেন, ফেনক, ফেনধর্ম্মা, ফেনপ, ফেনল, ফেনলেখা, ফেনরেখা, ফেনা, ফেনায়মান, ফেনি(নী), ফেনিল, ফেন্‌সা, ফোয়, ফোয়ারা, ফ্যান, ফ্যানগেঁজলা, ফ্যানসা, ফ্যানা, স্ফাত, স্ফাতি, স্ফানল, স্ফায়্, স্ফার, স্ফারণ, স্ফারিত, স্ফিক্(চ্), স্ফিক্(জ্) স্ফিগ্‌ঘাতক,

স্ফীত, স্ফীতস্ফূর্ত্ত, স্ফীতি, স্ফুৎ।

● **স্ফায়্** = সত্তার-পালনস্থিতের আধারের যাওয়ন। **স্ফায়** = সত্তার-পালনস্থিতের আধারের যাওয়ন যাহাতে।

● **ফেন** : দ্র. **তুফান**।

● **স্মি (স্মৃ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অস্মরণ, অস্মৃতি, বিস্ময়, বিস্মরণ, বিস্মৃত, বিস্মৃতি, সঙর, সঙরণ, সঙরসি, সঙরি, সঙরিতে, সবিস্ময়, সবিস্মিত, সুমর, সুস্মিত, সোঁঅর, সোঙর, সোঙরণ, স্ম, স্মঙর, স্মঙরণ, স্ময়, স্মর, স্মরকথা, স্মরকর্ম্ম, স্মরকূপক, স্মরকূপিকা, স্মরকেলি, স্মরগুরু, স্মরগৃহ, স্মরচন্দ্র, স্মরচাপ, স্মরজ্বর, স্মরণ, স্মরণপদবী, স্মরণশক্তি, স্মরণানুগ্রহ, স্মরণীয়, স্মরদশা, স্মরদহন, স্মরদায়ী, স্মরদীপন, স্মরদুর্ম্মদ, স্মরপীড়িত, স্মরপ্রিয়া, স্মরবল্লভ, স্মরভাসিত, স্মরভূ, স্মরভূপ, স্মরমন্দির, স্মরমাণ, স্মরমূট(ষ্), স্মরমোহ, স্মররাগ, স্মররুক্(জ্), স্মরললিত, স্মরলেখ, স্মরলেখনী, স্মরশত্রু, স্মরশব, স্মরশাসন, স্মরশাস্ত, স্মরসখ, স্মরসমর, স্মরসহ, স্মরহর, স্মরহুতাশন, স্মরাকুলিত, স্মরাকৃষ্ট, স্মরাগার, স্মরাঙ্কুশ, স্মরাতুর, স্মরান্ধ, স্মরারি, স্মরার্ত্ত, স্মরাসব, স্মরোদ্দীপন, স্মরোন্মাদ, স্মরোপকরণ, স্মর্ত্তব্য, স্মর্ত্তা, স্মর্য্য, স্মায়, স্মার, স্মারক, স্মারণ, স্মারণী, স্মারিত, স্মারিণী, স্মারী, স্মার্ত্ত, স্মার্ত্তকাল, স্মার্ত্তভট্টাচার্য, স্মার্ত্তিক, স্মার্য্য, স্মি, স্মিত, স্মিতকান্তি, স্মিতজ্যোৎস্না, স্মিতদৃক(শ্), স্মিতপূর্ব্ব, স্মিতবাক, স্মিতমুখ, স্মিতোজ্জ্বল, স্মৃ, স্মৃত, স্মৃতি, স্মৃতিকারী, স্মৃতিতন্ত্র, স্মৃতিদ, স্মৃতিপত্রক, স্মৃতিপথ, স্মৃতিপাঠক, স্মৃতিপ্রবন্ধ, স্মৃতিপ্রয়োজন, স্মৃতিবর্ত্ম, স্মৃতিবর্দ্ধক, স্মৃতিবর্দ্ধনী, স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরোধ, স্মৃতিবিহিত, স্মৃতিভিন্ন, স্মৃতিভু, স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিমান(মৎ), স্মৃতিরোধ, স্মৃতিলোপ, স্মৃতিশাস্ত্র, স্মৃতিশেষ, স্মৃতিশৈথিল্য, স্মৃতিসম্মত, স্মৃতিসাধ্য, স্মৃতিহর, স্মৃতিহীন, স্মৃতিহেতু, স্মৃত্যপেত, স্মৃত্যুক্ত, স্মৃত্যুপস্থিত, স্মের, স্মেরমুখ, স্মেরবিলোচন, স্মোঙর, স্মোঙরণ।

● **স্মি (স্মৃ)** = সত্তার সীমায়নের গতিশীলতা যাহাতে। **স্মৃ** = সত্তার সীমায়নের আবর্ত্তন যাহাতে।

● **স্মৃতি** : ২. *সীমায়িত সত্তার আবর্ত্তন তারিত হইয়া গতিশীল যাহাতে।* ৫. দ্র. **ব্রাহ্মণ**। এক কাজ করুন, যে কোনো নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রকে পরীক্ষা করে দেখুন, সে কতদূর পর্যন্ত নামতা এবং কতগুলি কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। আমাদের ধারণা একালের ছাত্ররা সর্বাধিক ১০ পর্যন্ত নামতা এবং ৫-৬টি কবিতা মুখস্থ বলতে পারবে। এবার ১০ বছর করে পিছিয়ে যান এবং তথ্যসংগ্রহ করুন। দেখবেন, যতই পিছনের দিকে যাচ্ছেন ছাত্রদের মুখস্থ বলার ক্ষমতা ততই বেশি বেশি দেখা যাচ্ছে। ১৯৬০ সালেও বাংলাভাষী ছাত্ররা ২০ পর্যন্ত নামতা এবং অন্ততপক্ষে ৩০-৪০টি কবিতা অনায়াসে মুখস্ত বলতে পারত, কেউ কেউ গোটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুখস্ত বলে যেতে পারত। অর্থাৎ মুখস্থ করবার ক্ষমতা আমাদের ছেলেমেয়েদের খুবই কমে গেছে। কেন এবং কীভাবে কমছে, এটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে প্রসঙ্গে এখন আমরা যাব না। আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনি যত প্রাচীনকালের দিকে যাবেন, দেখবেন, মানুষের তথাকথিত 'মুখস্থবিদ্যা'র স্মৃতিশক্তি ততই বেশি বেশি দেখা যাচ্ছে। যখন লেখাপড়ার চল হয়নি, সবই মুখে মুখে মনে রাখতে হচ্ছে, তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত গল্প কাহিনী তত্ত্বকথা ইত্যাদি মুখস্থ রাখতেন, তার হিসেব একালের কোনো মানুষকে শোনালে তার বিশ্বাসই হতে চাইবে না। আমাদের শ্রুতিশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র বলতে যেগুলিকে বোঝায় — বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, উপনিষৎ ... ইত্যাদি, সবই তো কমবেশি **শ্রুতি**বাহিত; মুখস্থ করে পুরুষানুক্রমে বহন করে নিয়ে চলা। পরবর্তীকালে কোথাও কোথাও তালপাতায় বা কাপড়ে দু-এক কপি লেখা গ্রন্থ থাকলেও তার সংখ্যা ছিল না-এর সমান। সাধারণভাবে সবই বাহিত হত স্মৃতি থেকে স্মৃতিতে। আর সেগুলি সবই ছিল শ্লোকে। সেই শ্লোকসংখ্যা কত ছিল? বিভিন্ন গ্রন্থে এর কিছু কিছু হিসেবও পাওয়া যায়। সেই সব দেখেশুনে আমাদের মনে হয়েছে, খুব কম হলেও এই সংখ্যাটি ২০ লক্ষের বেশি। এবং হ্যাঁ, সবটাই কিছু কিছু মানুষ মনে রাখতেন। লক্ষ্যণীয় যে, যে মিস্ত্রিরা লেখাপড়া জানে না, পরে সময়মতো নকশায় মাপটা দেখে নেওয়া যাবে, এই সুযোগ তার সামনে নেই বলেই সে ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে একবার শুনেই প্রয়োজনীয় মাপগুলি মনে রাখে, কখনোই ভোলে না, কারণ ভোলার উপায় নেই তার হাতে। এর থেকে মনে হয়, লেখাপড়ার একটা মন্দ দিকও আছে। ...

● **স্মৃতি (স্মৃতিশাস্ত্র)** : ২. *স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত হয় যে শাস্ত্র।* ৩. পূর্বানুভূত বিষয়ে জ্ঞান। যা মানুষের স্মৃতিশক্তিতে আছে এবং গুরু পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। বেদাঙ্গ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদি স্মৃতির পর্যায়ে পড়ে। (পৌ.অ.)

● **স্যন্দ্ (স্যম্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : সিঁদুর, সিঁদুরীয়া, সিঁদুরে, সিন্দর, সিন্দুরী, সিন্দূর, সিন্দূরকারণ, সিন্দূরতিলক, সিন্দূরতিলকা, সিন্দূরপুষ্পী, সিন্দূরী, সিন্ধু, সিন্ধুকন্যা, সিন্ধুকফ, সিন্ধুকর, সিন্ধুজ, সিন্ধুজন্মা, সিন্ধুজা, সিন্ধুড়া, সিন্ধুতনয়া, সিন্ধুত্থ, সিন্ধুদেশ, সিন্ধুদ্ভব, সিন্ধুনদ, সিন্ধুনন্দন, সিন্ধুনাথ, সিন্ধুপতি, সিন্ধুপার, সিন্ধুপুত্র, সিন্ধুপুত্রী, সিন্ধুপ্রসূত, সিন্ধুবল, সিন্ধুবার, সিন্ধুবারক, সিন্ধুবারিত, সিন্ধুমথ্য, সিন্ধুমন্ত, সিন্ধুমন্থজ, সিন্ধুমুখ, সিন্ধুর, সিন্ধুরয়, সিন্ধুরাজ, সিন্ধুলবণ, সিন্ধুশয়ন, সিন্ধুসঙ্গম, সিন্ধুসুতা, সিন্ধুসুনু, সিন্ধুসৌবীর, সৈন্ধব, সৈন্ধবক, সৈন্ধবঘন, সৈন্ধবচূর্ণ, সৈন্ধবশিলাশকল, স্যন্দ্, স্যন্দ, স্যন্দদ্রুম, স্যন্দন, স্যন্দনাদ্যাভিমানী, স্যন্দনারূঢ়, স্যন্দনারোহ, স্যন্দনালোক, স্যন্দনি, স্যন্দনিকা, স্যন্দনী, সন্দিনী, স্যন্দী, স্যন্দোলিকা, স্যন্ন, স্যমন্তক, স্যমন্তপঞ্চক, স্যমীক (স্যম্), স্যমীকা।

● **স্যন্দ্ (স্যম্)** = সত্তাধরের রহস্যরূপ দান। **স্যন্দ** = সত্তাধরের রহস্যরূপ দান যাহাতে। **স্যম** = সত্তাধরের সীমায়ন যাহাতে।

● **সিন্ধু** : ২. *সত্তার রহস্যরূপ গতিশীলভাবে ধারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, দিতে পারি, দিতে পারি' — এই আদি অভিমান নিয়ে চলে যে বা যাহারা।* ৩. জল, স্যন্দনস্বভাব-আদ্যভিমানী দেবগণ, সমুদ্র, (সাদৃশ্যে) বিশাল আধার, নদবিশেষ, সিন্ধুনদীতীরস্থ দেশ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। বৈশ্যবংশজাত অন্ধ মুনির ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত জনৈক মুনিকুমার। ইনি সরযুতীরে বাস করতেন। ... ভুলক্রমে দশরথ শব্দভেদী বাণে একে হত্যা করে বসেন। ... পুত্রশোকে অন্ধমুনি দশরথকে পুত্রশোকে-মৃত্যুর অভিশাপ দেন। (পৌ.অ.)। ৫.

দ্র. **জলন্ধর, ব্রহ্মপুত্র, বিশাখা, শতদ্রু।**

● *স্রন্‌স্ (স্রংস্)* **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ছিকা, ছিকে, শিকা (শিকে, শিকিয়া, সিকা, সিকে, সীকা, ছিঁকা), শিকা (শিকাই, কটিসূত্র, ঘুনশি), শিক্যা, শিক্যাধার, শিক্যিত, শৈক্য, স্রংস্ (স্রন্‌স্), স্রংসন, স্রংসিত, স্রংসী, স্রস্ত, স্রস্তগাত্র, স্রস্তর, স্রস্তাংশুক, স্রস্তাংস, স্রস্তাঙ্গ, হস্‌ক, হস্‌কা, হস্‌কান।

● **স্রন্‌স্ (স্রংস্)** = সত্তার আবর্তনের রহস্যরূপের নির্য্যাসন। **স্রন্স** = সত্তার আবর্তনের রহস্যরূপের নির্য্যাস যাহাতে। **স্রংস** = সত্তার আবর্তনের রহস্যরূপী অস্তিত্বমাত্র যাহাতে।

● **স্রু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আস্রব, ছয়লাপ, ছয়লাব (স'ইলাব < স্রাব), রেত্, সংস্রব, সোঁত, সোঁতা, সোঁতান, সোত, স্রব, স্রবণ, স্রবদ্‌গর্ভা, স্রবন্তী, স্রবা, স্রবিত, স্রাব, (কফজস্রাব, ক্ষীরস্রাব, পূযস্রাব, রক্তস্রাব ইত্যাদি), স্রাবণ, স্রাবণী, স্রাবিণী, স্রাবী, স্রু, স্রুক্(চ্), স্রুক, স্রুক্‌প্রণালিকা, স্রুক্‌সম্মার্জ্জন, স্রুগ্‌জিহ্ব, স্রুগ্‌দারু, স্রুঘ্ন, স্রুৎ, স্রুত, স্রুতা, স্রুতি, স্রুব, স্রুবতরু, স্রুবদণ্ড, স্রুবদ্রুম, স্রুবপ্রগ্রহণ, স্রুবহস্ত, স্রুবা, স্রোত, স্রোতঈশ, স্রোতমুখ, স্রোতধারা, স্রোতঃ (স্রোতস্), স্রোতঃপতি, স্রোতসা, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বান্(স্বৎ) স্রোতস্বিনী, স্রোতোজ, স্রোতোঞ্জন, স্রোতোবট্(বহ্), স্রোতোবহা, স্রোতোমূর্ত্তি, স্রোতোরন্ধ্র, স্রৌব।

● **স্রু** = সত্তার আবর্তন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

● **স্রোত, স্রাতঃ, স্রোতস : তপ, তপঃ, তির্য্যকস্রোতাঃ, তির্য্যকস্রোতস্।**

● **স্বদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনাস্বাদিত, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, আস্বাদ, আস্বাদক, আস্বাদন, আস্বাদনীয়, আস্বাদিত, আস্বাদ্য, সুয়াদু, সোআদ (সোয়াদ), স্বদ্, স্বদিত, স্বাদ, স্বাদন, স্বাদনীয়, স্বাদান, স্বাদিষ্ঠ, স্বাদী(দিন্), স্বাদীয়ান, স্বাদু, স্বাদুকণ্টক, স্বাদুকন্দা, স্বাদুকর, স্বাদুকাম, স্বাদুকার, স্বাদুখণ্ড, স্বাদুগন্ধ, স্বাদুগন্ধা, স্বাদুপর্ণী, স্বাদুপাকা, স্বাদুপানা, স্বাদুপিণ্ডা, স্বাদুফলা, স্বাদুমাংসী, স্বাদুমূল, স্বাদুযুক্ত, স্বাদুরস, স্বাদুলতা, স্বাদুশুদ্ধ, স্বাদুস্বাদু, স্বাদূদক, স্বাদ্য, স্বাদ্বন্ন, স্বাদ্বী, স্বিৎ, স্বিদ্, স্বিদিত, স্বিন্ন, স্বেদ, (উষ্মস্বেদ, তাপস্বেদ, দ্রবস্বেদ) স্বেদচিত, স্বেদজ, স্বেদজল, স্বেদন, স্বেদনিকা, স্বেদনী, স্বেদনুদ, স্বেদবারি, স্বেদবিন্দু, স্বেদবিপ্রুট্(ষ্), স্বেদলব, স্বেদলেশ, স্বেদস্রাব, স্বেদাম্বু, স্বেদাম্ভঃ(স্তস্), স্বেদায়ন, স্বেদিত, স্বেদী, স্বেদোদ, স্বেদোদক, স্বেদোদগম, স্বেদ্য।

● **স্বদ্** = সত্তাবাহকের দান। **স্বদ** = সত্তা-বাহকের দান যাহাতে।

● **স্বেদ (স্বেদজ)** : দ্র. **জরায়ুজ।**

● **স্বপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অস্বপন, অস্বপ্ন, শুত, শুতা, সুত, সুতা, সুপ্ত, **সুপ্তঘাতক**, সুপ্তঘ্ন, সুপ্তচ্যুত, সুপ্তজন, সুপ্তজ্ঞান, সুপ্তপূর্ব্ব, **সুপ্তপ্রবুদ্ধ, সুপ্তপ্রলপিত**, সুপ্তবাক্য, সুপ্তবিজ্ঞান, সুপ্তমাংস, সুপ্তমীন, **সুপ্তস্থ**, সুপ্তস্থিত, সুপ্তাঙ্গ, সুপ্তাসুপ্ত, সুপ্তি, সুপ্তোত্থিত, সুষুপ্ত, সুস্বপ্ন, **সুষুপ্সা, সুষুপ্সু**, সৌপ্তিক, সৌপ্তিকপর্ব্ব, সৌপ্তিকবধ, স্বপ্, স্বপন, **স্বপনদেবী**, স্বপ্ন, স্বপ্নক্(জ্) স্বপ্নকল্প, স্বপ্নকাম, স্বপ্নকৃৎ, স্বপ্নগত, **স্বপ্নগৃহ**, স্বপ্নগোচর, স্বপ্নজ, স্বপ্নজড়িমা, স্বপ্নজ্ঞান, **স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নদৃক্, স্বপ্নদৃষ্ট, স্বপ্নদেবী**, স্বপ্নদোষ, স্বপ্নধীগম্য, স্বপ্ননিকেতন, **স্বপ্ননিদর্শন, স্বপ্নফলাফল**, স্বপ্নবিনশ্বর, স্বপ্নবৃত্ত, স্বপ্নভাষিত, স্বপ্নময়, **স্বপ্নলব্ধ, স্বপ্নশীল**, স্বপ্নসন্দর্শন, **স্বপ্নসৃষ্টি**, স্বপ্নস্থান, স্বপ্নাদেশ, স্বপ্নাদ্য, স্বপ্নাধিকারী, স্বপ্নাববোধ, স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্নোপম, স্বাপ, স্বাপক, স্বাপতেয়, স্বাপন।

● **স্বপ্** = সত্তাবাহকের পান-পালন। **স্বপ** = সত্তাবাহকের পান-পালন যাহাতে।

● **স্বপ্ন** : দ্র. **চিত্রজল্প।**

● **স্বৃ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (সু-ঋজ্ থেকে 'স্বর্গ' দেখিয়েছেন পাণিনি, কিন্তু সায়ণ দেখিয়েছেন 'স্বর্' থেকে, আমরা সায়ণকে অনুসরণ করলাম। কারণ, পাণিনি যেমন সু-বর্গ যাহার, তাকে 'স্বর্গ' শব্দের তুলনীয় বলে মনে করেন, তেমনি অমরকোষ সু-বর্ণ যাহার তাকে 'স্বর্ণ' বলে মনে করেন। তিন ক্ষেত্রেই স্বর্ কথাটি উঠে আসে, যাকে স্বৃ বলা যায়।) অস্বর, অস্বরস, অস্বর্গ্য, সগ্‌গ, সরগ, সরগম, সরমণ্ডল, সরিগম, সুবর্ণ, সুবর্ণকঙ্কণ, সুবর্ণকটক, সুবর্ণকণ, সুবর্ণকদলী, সুবর্ণকর্ত্তা, সুবর্ণকার, সুবর্ণকৃৎ, সুবর্ণকেতকী, সুবর্ণকোণ, সুবর্ণগণিত, সুবর্ণগর্ভা, সুবর্ণগৈরিক, সুবর্ণগ্রন্থি, সুবর্ণচম্পক, সুবর্ণচৌর, সুবর্ণজীবিক, সুবর্ণধেনু, সুবর্ণপদ্ম, সুবর্ণপালিকা, সুবর্ণপিঞ্জর, সুবর্ণপুষ্প, সবর্ণপুষ্পিত, সুবর্ণপৃষ্ঠ, সুবর্ণবণিক্(জ্), সুবর্ণবর্ণ, সুবর্ণবর্ণা, সুবর্ণভাণ্ড, সুবর্ণভূমি, সুবর্ণময়, সুবর্ণমাক্ষিক, সুবর্ণমাষ, সুবর্ণমুষ্টি, সুবর্ণমোচা, সুবর্ণযূথিকা, সুবর্ণরম্ভা, সুবর্ণরেতাঃ, সুবর্ণলতা, সুবর্ণসিদ্ধ, সুবর্ণসূত্র, সুবর্ণস্তেয়, সুবর্ণস্তেয়ী, সুবর্ণাখ্য, সুবর্ণাভ, সেঁকরা, সেঁকরাণী, সোণা (সোনা, একালে সব ক্ষেত্রেই ন হয়), সোণাকচু, সোণাকষা, সোণা-কোলা, সোণাখড়কী, সোণাখড়কে, সোণাদানা, সোণাধন, সোণাধারী, সোণাপারা, সোণার-বেণে, সোণাব্যাঙ্গ, সোণামুখ, সোণামুখী, সোণামুগ, সোণামুষ্টি, সোণার, সোণালি(লী), সোণালিয়া, সোবর্ণ, সৌব, সৌবর, সৌবর্ণ, সৌবর্ণভেদিনী, সৌবর্ণিক, স্বগ্‌গ, স্বর্, স্বর্‌পথ, স্বর্‌পাল, স্বর্‌সৎ, স্বরসদ্, স্বর্‌স্যন্দন, স্বর্‌সরিৎ, স্বর্‌সিন্ধু, স্বর্‌সুন্দরী, স্বর্‌স্ত্রী, স্বর, স্বরকম্প, স্বরকর, স্বরক্ষয়, স্বরগ, স্বরগ্রাম, স্বরঘ্ন, স্বরচ্ছিদ্র, স্বরতিক্রম, স্বরপত্তন, স্বরপরিবর্ত্ত, স্বরবর্ণ (ব্যঞ্জনবর্ণ), স্বরব্রহ্ম, স্বরভক্তি, স্বরভঙ্গ, স্বরভঙ্গি, স্বরভঙ্গী, স্বরভেদ, স্বরমণ্ডল, স্বরমণ্ডলিকা, স্বরমাত্রা, স্বরযোগ, স্বরযোনি, স্বরলিপি, স্বরশাস্ত্র, স্বরশুদ্ধ, স্বরশূন্য, স্বরসংক্রম, স্বরসংযোগ, স্বরসংস্কার, স্বরসন্ধি, স্বরসম্পৎ(দ্), স্বরসম্পন্ন, স্বরান্ত, স্বরান্তর, স্বরাপগা, স্বরারূঢ়, স্বরিত, স্বরীশ্বর, স্বরু, স্বরোদয়, স্বরোপঘাত, স্বরোপধ, স্বর্গ, স্বর্গকাম, স্বর্গকৃতালয়, স্বর্গগঙ্গা, স্বর্গঙ্গা, স্বর্গগত, স্বর্গগতি, স্বর্গগমন, স্বর্গগামী, স্বর্গগিরি, স্বর্গচ্যুত, স্বর্গজিৎ, স্বর্গত, স্বর্গতরঙ্গিণী, স্বর্গতরু, স্বর্গতি, স্বর্গদ, স্বর্গদ্বার, স্বর্গধেনু, স্বর্গপতি, স্বর্গপথ, স্বর্গপদ্ধতি, স্বর্গপর্ব্ব, স্বর্গপুরী, স্বর্গপ্রদ, স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গবধূ, স্বর্গবান, স্বর্গবাস, স্বর্গবৈদ্য, স্বর্গভর্ত্তা, স্বর্গমন, স্বর্গমার্গ, স্বর্গরাজ্য, স্বর্গলোক, স্বর্গলোকেশ, স্বর্গসংক্রম, স্বর্গসৎ(দ্), স্বর্গসরিদ্বরা, স্বর্গসাধন, স্বর্গসুখ, স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তি, স্বর্গস্ত্রী, স্বর্গস্থ, স্বর্গস্থিত, স্বর্গাদপি, স্বর্গাবাস, স্বর্গামী(মিন্), স্বর্গারোহণ, স্বর্গারোহণিক, স্বর্গারোহণিক-পর্ব্ব, স্বর্গিগিরি, স্বর্গিবধূ, স্বর্গী(গিন্), স্বর্গীয়, স্বর্গৌকাঃ(কস্), স্বর্গ্য, স্বর্জ্জিৎ, স্বর্ণ, স্বর্ণকণ, স্বর্ণকণিকা, স্বর্ণকাঁটি, স্বর্ণকায়, স্বর্ণকার, স্বর্ণকারক, স্বর্ণকুঁকী (স্বর্ণকুকী), **স্বর্ণকেতকী**, স্বর্ণক্ষীরী, স্বর্ণগর্ভা, স্বর্ণগৈরিক, স্বর্ণচিরা, স্বর্ণচূড়, স্বর্ণচূড়ক, স্বর্ণচূড়া, স্বর্ণজ,

স্বর্ণজাতী, স্বর্ণদী, স্বর্ণধাতু, স্বর্ণনাভ, স্বর্ণপক্ষ, স্বর্ণপদ্মা, স্বর্ণপাট, স্বর্ণপাটক, স্বর্ণপাটা, স্বর্ণপুঙ্খ, স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণপৃষ্ঠ, স্বর্ণলী (স্বর্ণুলী), স্বর্ণপ্রতীতি, স্বর্ণবঙ্গ, স্বর্ণবজ্র, স্বর্ণবণিক্(জ্), স্বর্ণবর্ণ, স্বর্ণবর্ণা, স্বর্ণবল্লী, স্বর্ণভৃঙ্গার, স্বর্ণমণ্ডন, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণযূথী, স্বর্ণরম্ভা, স্বর্ণরেখা, স্বর্ণরেতাঃ, স্বর্ণলতা, স্বর্ণলতিকা, স্বর্ণলেখা, স্বর্ণশিখ, স্বর্ণশেফালিকা, স্বর্ণসিন্দুর, স্বর্ণসীতি, স্বর্ণসুযোগ, স্বর্ণসূত্র, স্বর্ণহংস, স্বর্ণাকার, স্বর্ণারি, স্বর্ধুনী, স্বর্নগরী, স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা, স্বর্বৈদ্য, স্বর্ভানু, স্বর্ভানুসূদন, স্বর্ভ্রষ্ট, স্বর্যাত, স্বর্যোষিৎ, স্বর্লোক, স্বর্লোকতা, স্বৃ।

● স্বৃ = সত্তাবাহকের আবর্তন যাহাতে।

● **স্বর** : ২. *সত্তা বাহিত হয়ে রহে যাহাতে।* ৫. দ্র. **উদাত্ত**, **নাক**, **বর্ণ**। কেউ কোনো আওয়াজ করলে, সেই আওয়াজের ভিতরে আওয়াজকারীর সূক্ষ্ম অস্তিত্ব থেকে যায়। সেই কারণে তাকে **স্বর** বলে। যে আওয়াজ কেউ করেনি, ঘটনার আওয়াজ ছাড়া তেমন আওয়াজ হতেই পারে না। তাই এর ভিতরে ঘটনার আওয়াজকে ধরা হচ্ছে না। অতএব **স্বর** মানেই কারও না কারও সৃজিত আওয়াজ। যার সৃষ্ট আওয়াজ, তাকে ঐ আওয়াজের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে পাওয়া যাবেই। কুকুরের আওয়াজের ভেতরে কুকুরকে, বাঘের আওয়াজের ভেতরে বাঘকে, রামের আওয়াজের ভেতরে রামকে পাওয়া যাবেই। আওয়াজ শুনেই বলে দিতে পারবে সেই আওয়াজটি কার, তেমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মানুষ কিন্তু সেই কাজটা কমবেশি করতে পারে। ...

তা সে যাই হোক, স্বরবর্ণের ঘাড়ে চেপে ছাড়া ব্যঞ্জণবর্ণ উচ্চারিত হয় না। স্বর-এর ধারার বিশেষরূপ 'অঞ্জন'-এর জন্যই ব্যঞ্জনবর্ণ, এবং স্বর মূলত সুর-আশ্রয়ী।

● **স্বর্গ** : ১. স্বর + গমন। ২. **স্বর** *গমন করে যেখানে।* ৩. দেবতাদের বাসস্থান। মানুষ সৎকর্ম করে এখানে যায়। দেবতা ছাড়া এখানে নারদ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিরা এবং প্রজাপতিরা বাস করেন। ... পৌরাণিক জীবজন্তু যেমন বিষ্ণুর গরুড়, গণেশের মুষিকরাও বাস করে। তাছাড়া রয়েছে অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব। ... (পৌ.অ.)। ৪. heaven বা paradise অর্থে প্রচলিত। ৫. 'স্বর' কথাটির মানে হল 'স্ব'-ত্ব বা স্বত্বাধিকার রহে যাহাতে। আমাদের মুখের কথায় আমাদের প্রত্যেকের 'স্ব'ত্ব বা আমি-ত্ব থাকে। তেমনি আবার আমাদের প্রত্যেকের তৈরি করা উৎপন্নেও আমাদের নিজ নিজ 'স্ব'-ত্ব থাকে। এই স্বর যে লোকে যায়, সেই হল স্বর্গলোক। তার মানে আমাদের (জ্ঞানজাত) মৌখিক উৎপাদন এবং আমাদের (দেহজাত বা কর্মজাত) শ্রমের উৎপাদন, উভয় উৎপাদন গিয়ে যেখানে জমা হয়, সেটিই স্বর্গলোক। সেই হিসাবে জ্ঞানীধনীরা স্বর্গলোকের বাসিন্দা। এই স্বর্গ তাই অন্তরীক্ষে, যে অন্তরে ঈক্ষণ করলে তাকে দেখা যায়। অতএব স্বর্গ কোনো অলীক স্থান নয়, সম্পূর্ণতই বাস্তব। কবি শতকরা একশোভাগ ঠিক কথাই বলেছেন যে, 'মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেই সুরাসুর।' দ্র. **উত্তম**।

স্ব রহে যাহাতে সেটাই স্বর। মনুষ্যসৃষ্ট কথা, শব্দ, অপত্য, পণ্য সব কিছুতেই স্রষ্টার স্ব থাকে। তাই সেগুলি সবই স্বর পদবাচ্য। আর সেই সমস্ত স্বর যেখানে গমন করে সেটাই **স্বর্গ**। সেকারণেই উদাত্ত মানেই মহাত্মা, উচ্চ, ইত্যাদি। দ্র. **উদাত্ত**।

● **স্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা** : (স্ বর্ণটির অর্থ রয়েছে স্যাৎ শব্দের মানেতে। দ্র. স্যাৎ। তাতে দেখা যায়, অস্ বদলে যায় স-তে।) স, সওগাৎ, সওগাদ্, সওয়ায় (সেওয়ায়), সওয়ার, সওয়ারী (দ্র.অশবার), সওয়াল (সোয়াল), স-কার, সকলাত (সগল্লাত, সগল্লাদ, সগোল্লাদ), সক্কা, সঙিন (সঙীন, সঙ্গিন, সঙ্গীন), সঞ্জাব, সদর, সদর-অন্দর, সদর-আদালত, সদরআলা, সদর-কাছারি, সদর-খাজনা, সদরঘাট, সদরজমা, সদর-দরজা, সদর-নায়েব, সদরবাড়ী, সদরবাজার, সদরমোকাম, (ঘুস্‌কি-সদর), সন, সনেট, সপেটা, সফর, সফরিয়া, সফরী (সবরী, মর্তমান কলা), সফা, সফিনা (সুপিনা), সফিনে, সফেদ, সফেদা, সবজি(জী), সবজিগাড়ি, সবজিবাগান, সবুজ, সবুর, সবেবরাৎ, সমন, সমসা, সয় (সওয়ায়) সরগরম, সরজমীন (সরেজমি, সারেজমিন), সরঞ্জাম (স-রঞ্জম্, সরঃ-যম), সরঞ্জামি, সরদাল, সরদি(দী), সরদি-গরমি, সর্দ্দি(র্দ্দী), সর্দ্দি-গর্ম্মি, সরপেচ, সরপোশ, সরফরাজ, সরফরাজী, সরবন্দ, সরবন্ধ, সরহর্দ্দ (সরাহর্দ্দ), সরাই, সরাইখানা, সরাসর, (প্রতিসরণ), সরাসরি, সরিকত (দ্র.শরাকত, শরিক), সরেওয়ার, সরেজমি, সলুপা, সস্য, সহি, সা (স-স্ত্রী), সাইজ, সাইপ্রস, সাইবানি(নী), সাহেবানি(নী), সাং, সাঁইসাঁই (সাগ্রিসাগ্রি, শাঁইশাঁই), সাকি (সাকী, দ্র. শক্-সাক) সাকিন, সাকিম, সাগু (সাবু, সাবুদানা), সাজা (শাস্তি), সাজোয়ান, সাজোয়াল, সাট, সাটক, সাটন, সাটব, সাটিন, সাতান, সান, সানসা, সাফ, সাফর, সাফসোফ, সাফশুতরা (সাফসুতরা), সাফা, সাফাই, সাফাই-দেওয়া, সাফাই-সাক্ষী, সাবাস (শাবাশ), সাবাসি, সাবুদ, সাবেক, সামিয়ানা, সামিল, সামুলী, সায়বানা, সায়বানি, সায়মানা, সায়া, সারঙ্গ, সারেং, সারেঙ্, সারেঙ্গ্ (শৃঙ্গ), সারেজমিন, সার্জন, সার্ট, সার্টিফিকেট, সার্সি, সাল, সালতামামি, সালতি, সালপান, সালবোট, সালমমিছরী, সালসা, সান্না (স্বপ্ন?), সাহাব, সাহারা, সাহেব, সাহেবশুবা, সাহেবসুবো, সাহেবা, সাহেবান, সাহেবানা, সাহেবিয়ানা, সাহেবী, সিঁদুক, সিকই, সিগারেট, সিন্দুক, সিতাব, সিন্নি (শিরণি), সিপ, সিপাই (সিপাহি, হী, সিফাই, সেপাই, সেফাই, সেফাহী), সিপাহী, সিপী (সীপ, ঝিনুক), সিভিলকোর্ট, সিভিলসার্জন, সিমেন্ট, সিরক্কো, সিলাখানা (সেলেখানা), সিলিন্দা, সিলিন্দে (সীলন্ধ), সিল্‌হ্, সিল্‌হক, সিহ্লু, সিহ্লুক, সিহ্লুভূমিকা, সীস, সীসক, সীসজ, সীসপত্র, সীসা, সীসে, সুগলী (চুগলি), সুচুনি (সুজ্‌নি), সুজ (সুঝ, দ্র. সুঝবুঝ), সুজা, সুট, সুন্দি, সুন্ধি, সুন্নত, সুন্নি, সুপ্, সুপারি(রী), সুপুরি, সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট, সুপারিশ, সুপারিশী, সুপিনা (সফিনা), সুপ্রিমকোর্ট, সুপ্‌সুপ্, সুফী, সুবন্ত, সুবলি, সুবা, সুবাদার (সুবেদার), সুমর, সুমার, সুমারি, সুয়েম, সুরত, সুরাখ (সুরাগ), সুলতান, সুলতানৎ, সুলতানী, সুলুক, সুলুকসন্ধান, সুলেনামা (সোলেনামা), সে (ফারসীতে — সেহ্, তার থেকে —সেজ, সেতার, সেপঞ্জা, সেপত্তনী, সেপায়া), সেকেন্ড, সেট, সেবরা, সেরকস, সেরপেচ, সেরা (শ্রেষ্ঠ), সেরাহ (শ্রেষ্ঠ হয়), সেরি, সেরেফ (স্রেফ) সেরেস্তা, সেরেস্তাদার, সেরেস্তাদারী, সেলাম, সেলামত, সেলামতী, সেলামাল্কী, সেলামী, সেলেট, সেশন, সেশনীয়, সোকরানা, সোবেরাত (সবেবরাৎ), সোর, সোরগোল, সোরৎ, সোরত, সোরসরাবত, সোরা (শোরা), সোরাকর, সোরাওয়ালা, সোহারা, স্রাক্, স্রেফ।

● **সে, সেই : ২.** *সে = অস্তিত্ব দিশাগ্রস্ত থাকে যাহাতে। সেই = সে গতিশীল যাহাতে।* **৫.** অস্তিত্ব = স্। অস্তিত্ব দিশাগ্রস্ত যাহাতে = সে। দ্র. **তৎ, তদ্, তন্।**

হ

হ্ বর্ণের অর্থ : হ = হ্-অন করে যে; হর।

● **হ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা :** *হট্ (হঠ্), হদ্, হন্, হয়্, হল্, হস্,* হা, *হি (হিল্),* হিংস্ (হিন্স্), হু, হূর্চ্ছ্, হৃ, হৃষ্, *হ্রু (হ্রস্, হ্রী),* হ্লাদ্, *হ্ব (হ্বল্, হ্বে),* হ্।

● ***হট্ (হঠ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** চাঁদের-হাট, হট্, হট, হটহট, হটা, হটাৎ, হটাৎকার, হটাৎকারে, হটান, হটাহটি, হটিল, হটরহটর, হট্ট, হট্টগোল, হট্টচৌরক, হট্টবাহিনী, হট্টবিলাসিনী, হট্টমন্দির, হট্টাধ্যক্ষ, হঠ্, হঠ, হঠকর্ম্ম, হঠকারী, হঠধর্ম্ম, হঠবাদিক, হঠবিদ্যা, হঠবুদ্ধি, হঠযোগ, হঠরঙ্গ, হঠরহঠর, হঠহঠ, হঠা, হঠাৎ, হঠাৎকার, হঠাৎকারে, হঠাৎ-নবাব, হঠাৎবাবু, হঠায়াত, হঠাশ্লেষ, হঠিনা, হঠিনী, হঠিলা, হঠোপভোগ, হড়, হড়কা, হড়গড়ানে, হড়প, হড়পান, হড়পি, হড়পী, হড়বড়, হড়মড়, হড়মড়ি, হড়মড়ে, হড়হড়, হড়হড়ান, হড়হড়ানি, হড়হড়ে, হড়াৎ, হড়াপোড়া (হোড়াপোড়া), হড়ি, হড়িক, হড্ড, হড্ডক, হড্ডপ (হাড়ি), হড্‌ডি, হড্‌ডিপ, হণ্ডা (হাঁড়া, ভাণ্ড), হণ্ডা, হণ্ডিকা, হণ্ডী, হণ্ডে, হাঁড়া, হাঁড়ি (হাঁড়ী), হাঁড়িকুঁড়ি (হাঁড়িগুড়ি), হাঁড়িখাগী (হাঁড়ীখাগী), হাঁড়িচাঁচা (হাঁড়ীচাঁচা), হাঁড়িয়া (হাঁড়ীয়া), হাঁড়িশাল (হাঁড়ীশাল), হাঁস্যাল, হাট, হাটক, হাটকগিরি, হাটকময়, হাটকেশ, হাটকেশান, হাটকেশ্বর, হাটঘাট, হাটবাজার, হাটহদ্দ, হাটারী, হাটিনা, হাটিয়াল (হোটেল), হাটীলা, হাটুয়া, হাটুরিয়া, হাটুরে, হাটেট্যাংরা, হাটেবাটে, হাটেমাঠে, হাট্য, হাড়, হাড়কাঁপান, হাড়কাঁপানী, হাড়কাঠ, হাড়গিলা, হাড়গোড়, হাড়গোড়-ভাঙা, হাড়জুড়ান, হাড়জুড়ানী, হাড়জোড়া, হাড়জ্বালা, হাড়জ্বালান, হাড়জ্বালানি, হাড়জ্বালানী, (হাড়ে-টোকো-মুখে-মিঠা, হাড়ে-দুব্বো-গজান, হাড়ে-নাড়ে-জ্বালাতন), হাড়পেকে, হাড়ফোটা, হাড়ভাঙা, হাড়ভাজাভাজা, (হাড়ে-ভেলকি), হাড়মাল, হাড়মাস, হাড়মাস-এক করা, (হাড়ে-মাসে), হাড়সার, হাড়হদ্দ, (হাড়ে-হাড়ে) হাড়হাভাতে, হাড়াই-ডোমাই, হাড়ি (হাড়ী), হাড়িকাঠ, হাড়িকোণ, হাড়িঝি-চণ্ডী, হাড়ি(ড়ী)খেগো, হাড়িপ, হাড়িপা, হাড়িয়া, হাড়ী, হাড়ুডু, হাড্যা, হাড্ডিসার, হাণ্ডি (হাণ্ডী), হাণ্ডিয়া, হানশাল, হানশেল (হেঁশেল, হেঁসেল, হেনশেল) ইটা-ভিটা, হিড়হিড়, হিড়িক, হিড়িকটান, হিড়িম্ব, হিড়িম্বজিৎ, হিড়িম্বনিষূদন, হিড়িম্বভিৎ, হিড়িম্বরিপু, হিড়িম্ববধ, হিড়িম্বা, হুট, হুটপাট, হুটর, হুটহাট, হুটাপাটি, হুটার, হুটাহুটি, হুটোপুটি, হুটোহুটি, হুঠার, হুড্, হুড়্, হুড়, হুড়কা, হুড়কো, হুড়মাড়, হুড়মুড়, হুড়হাড়, হুড়হাড়-দুদ্দাড়, হুড়হুড়-দুড়দুড়, হুড়হুড়া, হুড়হুড়ি, হুড়হুড়ে, হুড়া, হুড়াক্ষেত, হুড়াঝাড়া, হুড়াবন, হুড়াহুড়, হুড়াহুড়ি, হুড়াহুড়ী, হুড়ি, হুড্ডু, হুড়ুক, হুড়ুকা, হুড়ুক্ক, হুড়ুৎ, হুড়ুম, হুড়ো, হুণ্ড্, হুণ্ড, হুণ্ডন, হুণ্ডমুণ্ড, হুণ্ডি, হুণ্ডিকা, হুণ্ডিকাটা, হুণ্ডী, হুণ্ডীওয়ালা, হেঁট (হেঁঠ), হেট (হেঠ) (হেঁটে যাওয়া, মাথা হেঁট করা), হেঁটা-টেঙরা, হেঁটমাথা (হেটমাথা) হেঁটমুখ, হেঁটমুণ্ডু (হেঁঠমুণ্ডু), হেঁড়াল (নেকড়ে), হেঁড়ে, হেঁড়েল, হেঁশেল, হেঁসেল, হেট, হেঠ, হেড়, হেড (**head**), হেড়াহেড়ি, হোটেল (হাটিয়াল, বির্সুদ্ধ বামভনের হাটিয়াল), হোড় (হেলা, হিল্), হোড, হোড়, হোড়া, হোঢ়া, হ্যাটমুণ্ড।

● **হট্ (হঠ্)** = হরের টঙ্কারণ। **হট** = হরের টঙ্কার যাহাতে। **হঠ** = হরের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে।

● **হট্টগোল : ২.** *যাহাতে হট্ট-রূপ গামীগণ লয় প্রাপ্ত হয়।* **৫.** দ্র. **গণ্ডগোল।**

● **হুড়, হুড়া, হুড়ি, হুড়ো :** দ্র. **তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ি, তাড়াহুড়ো।**

● **হাড়:** দ্র. **পাঞ্চজন্য।**

● **হদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** বোকার-হদ্দ, হদ্, হদ, হদন, হদিশ, হদ্দ, হদ্দ-করা, হদ্দ-ছেলে, হদ্দ-ঠাকুরালি, হদ্দ-ঠেঁটা, হদ্দ-মজা, হাঁদা (ভেদা, ভোঁদা), হাঁদু (খাঁদু), হাঁদোল, হাদিছ।

● **হদ্** = হরের দান। **হদ** = হরের দান যাহাতে।

● **হন্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অনাহত, অনুপহত, অনেহাঃ, অপঘাত, অপ্রতিহত, অপ্রহত, অবিঘাত, অবিঘ্ন, অবিঘ্নেশ্বর, অবিপ্রতিহত, অবিহত, অব্যাহত, অব্যাহতি, অভিঘাত, অভিহত, অভ্যাঘাত, অসংহত, অহত, অহি, অহিকোষ, অহিচ্ছত্র, অহিতুণ্ডিক, অহিদ্বিট্, অহিনকুল, অহিপতি, অহিফেন, অহিব্রধ্ন, অহিভয়, অহিভুক্, অহিভুজ্, অহিমার, অহীন, আঘাত, আঘাতবিঘাত, আঘাতিত, আঘাতী, আঘাবিঘা, আফিং, আফিম, আমন, আহত, আহনন, আহিতুণ্ডিক, আহেয়, উদঘাত, উদ্ধত, উপঘাত, উপহত, একঘ্নী, ঔদ্ধত্য, কটাহ, গোঘ্ন, ঘন, ঘনঘটা, ঘনঘন, ঘনফল, ঘনমূল, ঘনা, ঘনাকর, ঘনাগম, ঘনাঘন, ঘনাঘনি, ঘনাত্যয়, ঘনান, ঘনান্ত, ঘনাবর্ত্ত, ঘনিষ্ঠ, ঘনেশ্বর, ঘনোপল, ঘ(ঘা)বড়া, ঘা, ঘাই, ঘাইট, ঘাইটঘিলা, ঘাই(য়ে)ল, ঘাও, ঘাঁটঘিলা, ঘাত, ঘাতা, ঘান, ঘানি(নী) ঘাপটি, ঘাবড়া (ঘা-বহন-ড়-এর আশ্রয়), ঘায়, ঘায়েল, ঘা'ল, ঘালি, ঘেউঘেউ, ঘেউয়া, ঘেও, ঘোল, ঘোলমউনি(নী), ঘোলা, ঘ্ন, জঘন, জঘন্য, জঙঘা, জঙঘাল, জিঘাংসা, নিঘ, নিঘাত, নির্ঘাত, নিহত, প্রতিঘাত, প্রতিহত, প্রহত, বিঘ্ন, বিঘ্নিত, বিহীন, ব্যাঘাত, ব্যাহত, শতঘ্ন, সংহত, সংহতি, সঘন, সঙঘ, সঙঘাত, সমাহত, সমুদ্ধত, সাংঘাতিক, সুসংহত, হংস (দ্র. অংশক), হংসকান্তা, হংসকীলক, হংসকূট, হংসগ, হংসগতি, হংসগামী, হংসগুহ্য, হংসচিহ্নদুকূল, হংসতুল, হংসতুলিকা, হংসদ্বার, হংসনাদ, হংসনাদিনী, হংসনাদী, হংসপদ, হংসপদী, হংসপাঁতি, হংসবারণগামী, হংসবাহ, হংসবাহন, হংসবিক্রান্ত, হংসবীজ, হংসমন্ত্র, হংসমালা, হংসমাষা, হংসযুবা, হংসরাজ, হংসরুত, হংসলোহক, হংসশ্রেণী, হংসহার, হংসা, হংসাঙ্ঘ্রি, হংসাধিরূঢ়, হংসাধিরূঢ়া, হংসাবলী, হংসারূঢ়, হংসাহ্বয়া, হংসোদক, হংসী, হঙ্গস, হঙ্গাম (হাঙ্গামা), হত, হতক, হতকণ্টক, হতকিল্বিষ, হতচিত, হতচিত্ত, হতচেতাঃ(তস্), হতচ্ছাড়া, হতচ্ছায়, হতজল্পিত, হতজীব, হতজীবিত, হতজ্ঞান, হতত্রপ, হতত্বিট্(ষ্), হতদৈব, হতধী, হতধৈর্য্য, হতপ্রভ, হতপ্রভাব, হতপ্রমাদ, হতপ্রায়, হতবিধি, হতবীর্য্য, হতবুদ্ধি, হতবৃত্ত, হতব্যথ, হতব্রীড়, হতভগ, হতভম্ব, হতভম্বা, হতভাগা, হতভাগিনী, হতভাগ্য, হতভামা, হতভোমা, হতভোম্বা, হতমান, হতমানস, হতমূর্খ, হতরথ, হতলক্ষণ, হতলক্ষ্মী, হতশিষ্ট,

হতশেষ, হতশ্রদ্ধ, হতশ্রী, হতসম্পৎ(দ্), হতসাধ্বস, হতহিম, হতহৃদয়, হতাধ্বর, হতারি, হতাশ, হতাশ্রয়, হতাশ্বাস, হতাস্মি, হতি, হতৈনাঃ(নস্), হতোহস্মি, হতৌজাঃ(জস্), হত্যা, হত্যাকাণ্ড, হত্যাকারী, হত্যা-দেওয়া, হত্যাশালা, হত্যে, হন্, হন, হনন, হননীয়, হনহন, হনিমুন, হনু, হনুগ্রহ, হনুভেদ, হনুমন্ত, হনুমন্তধ্বজ, হনুমন্নাটক, হনুমান (মৎ), হনুমূল, হনুসংহতি, হনুসংহনন, হনুস্কন্ত, হনুস্তম্ভ, হনূ, হনূমন্ত, হনূমন্তধ্বজ, হনূমান, হন্ত, হন্তকার, হন্তদন্ত, হন্তব্য, হন্তা, হন্তারক, হন্তিয়া, হন্নে (হন্যে), হন্য, হন্যমান, হন্যে, হা, হাঁস, হাঁসা, হাঁসী, হাত্যাস (হতাশ), হান, হান-কাট, হানা, হানাবাড়ি, হানাহানি, হানাহানি-কাড়াকাড়ি, হানি, হীন, হেঁসো (হাঁস), হেতি, হেতিয়ার, হেত্যার (দ্র.হাতিয়ার, হস্), হেমন্ত, হ্যাংনামা, হ্যাঙ্গাম, হ্যাঙ্গামা।

● **হন্** = 'হ্' 'হ্' করণ বা স্থির করণ। **হন** = স্থির করণ যাহাতে।

● হন্ ক্রিয়া থেকে ঘাত, বধ — এসব শব্দ তৈরি হয় কীকরে? দ্র. **বধ**।

● **অহি** : ১. হন্ = হিংসা, বধ। (আ + হন্ + ই)। ২. *হত্যা-বিকাশকের আশ্রয় যাহাতে*। / যাহা অন্তরিক্ষে গমনাগমন (বিচরণ) করে। (নিরুক্ত)। ৩. সর্প। সবিষ সর্প। খল, বঞ্চক। সর্পদেবতাক অশ্লেষানক্ষত্র। বৃত্রাসুর। ... ... (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ঋগ্বেদে যে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের স্তুতি করা হচ্ছে এবং বৃত্রকে 'অহি' বলা হচ্ছে, সে হল বৈদিক ব্যবস্থার অধঃপতিত পরিচালক, যে খল বা বঞ্চক হয়ে উঠেছে। উদ্ভব লগ্নে সেই বৃত্রই কিন্তু অত্যন্ত মহান ছিল। তবে এ হল সামাজিক-অহি। 'যাহা আঘাত করে' — অহি শব্দের এরকম ব্যুৎপত্তিও দেখানো হয়েছে নিরুক্তে।

● **অহিমার** : ১. অহি, মৃ = মরণ। ২. *অহিকে মারে যে*। ৩. সর্পনাশক গরুড়। ময়ূর। নকুল। (কালিয়দমন) শ্রীকৃষ্ণ। (বৃত্রনাশক) ইন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ শক্তির (বিষ্ণুর) বাহকেরা (গরুড়) পূর্ববর্তী যুগের ধনীদের ভক্ষণ করে। সৈন্যশক্তির (কার্তিকের) বাহনেরা (**ময়ূর**) সমাজের দুধ-'সর পালনকারী' সর্পকে ভক্ষণ করে। ব্যক্তিমালিক (দ্র. **নকুল**) সর্পকে নাশ করে।

● **হংস** : ৫. মা-উ থেকে যেমন **উমা** হয়, তেমনি 'সো-হ্-হং' ('সো-অহং' > স-হং) থেকে **হংস** হয়। তার মানে যে মানুষ বলতে পারতেন, 'তিনিই আমি', তাঁকে **হংস** বলা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে কথাটি অনেকেই জানেন, বোঝেন, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। **পরমহংস** = আত্মা-অনাত্মা-বিবেকী, চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসীর একতম, পরমাত্মা। দ্র. **পরম**।

● **হংসদ্বার** : দ্র. **ক্রৌঞ্চ, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র**।

● **হঙ্গাম (হাঙ্গামা)** : দ্র. **দাঙ্গা**।

● **হন (হনন, আহনন)** : ৫. **আহনন**। দ্র. **বরাহ**। **হন** মানে কিন্তু হত্যা নয়। কোনো কিছুকে স্থির করে দেওয়াই **হন** করা। কিছু বানাতে হলে, তাকে নতুন স্থির রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেটিও হনন করা। এরূপ হননের আশ্রয় যাহাতে, তাকে **আহনন** বলে। তবে কিনা, প্রতীকী অর্থের দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক এতই অব-স্থাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে যে, হনন শুনলেই আমরা হত্যা বুঝে ফেলি। সেটি শব্দটিকে বোঝার পথে একটি বড় বাধা।

● **হনুমান** : ১. হনু + মৎ (মতুপ্)। (ব.শ.)। ২. **হনু** *(হন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে)* ***সীমায়িত হইয়া অন (on) থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি জ্ঞানকে স্থির রূপে ধারণ করেন।*** **৩. প্রশস্তহনুযুক্ত** (ইনি কেশরীর ক্ষেত্রজ বায়ুসুত। **এই হেতু** ইনি 'মারুতি', 'পাবনি' ইত্যাদি নামে খ্যাত। ভূমিষ্ঠ **হইয়া** উদীয়মান সূর্য্যকে ফলবোধে গ্রহণ করিতে আকাশে লম্ফ প্রদান করিলে, ইনি কুপিত ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া পর্ব্বতে পতিত **হন** এবং বাম হনু ভগ্ন হওয়ায় 'হনুমান' নামে খ্যাত হন। ইনি ব্রহ্মার নিকটে 'অশস্ত্রবধ্যতা' ও ইন্দ্রের নিকটে 'স্বচ্ছন্দমরণ' বর প্রাপ্ত হন। সপ্তচিরজীবীর ইনি একতম। ঋষ্যমূক সমীপে রামচন্দ্রের সহিত ইঁহার সম্ভাষণে জানা যায় যে, ইনি ঋক্ যজুঃ ও সাম বেদে পণ্ডিত, ব্যাকরণে বিদ্বান ও বাক্যরচনাভিজ্ঞ ছিলেন। ... ইনি রামচন্দ্রের পরমভক্ত ও অকপট দাস ছিলেন। ... (ব.শ.)। ... ভীম দ্রৌপদীর অনুরোধে পদ্ম সংগ্রহের জন্য ক্রমক্রমে মনুষ্যের অগম্য স্বর্গের পথে উপস্থিত হওয়ায় **হনুমান** এই পথ রোধ করেন। ... ভীম তাঁর লাঙুল সরাতে ব্যর্থ হন। ... (পৌ.অ.)। **হনুমন** মতে বহু রাগরাগিনীর নানান নির্দেশাদি আজও প্রচলিত। তিনি সংগীতের এক মহাপণ্ডিত বলা হয়ে থাকে। রাগসঙ্গীতে তাঁর প্রসঙ্গ সবাই জানে। অশ্বিনীকুমারের আয়ুর্ব্বেদের মতো হনুমানের সঙ্গীতবিদ্যাও আজও জীবিত।

প্রাচীন বাংলায় নামের শেষে লেখাপড়ার সুদীর্ঘ পদবীওয়ালা (ডিগ্রিওয়ালা) মানুষকে বলা হত **হনুমান**। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় এই ভারতীয় পণ্ডিতেরা **রাবণ** বিরোধী যুদ্ধে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। **রামচন্দ্রের** প্রতি তাঁদের অকপট আনুগত্য লোকে আজও স্মরণ করে থাকে।

● **হয় ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : হয়্, হয়, হয়কর্ম্ম, হয়গন্ধ, হয়গন্ধা, হয়গ্রীব, হয়গ্রীবরিপু, হয়গ্রীবহা, হয়গ্রীবা, হয়ঘ্ন, হয়চর্য্যা, হয়চোর, হয়চোরা, হয়চ্ছটা, হয়জ্ঞ, হয়জ্ঞান, হয়তত্ত্ব, হয়তত্ত্বজ্ঞ, হয়দানব, হয়দ্বিষন্(সৎ), হয়প, হয়প্রিয়, হয়প্রিয়া, হয়বর, হয়বাহন, হয়বিদ্যা, হয়ব্যূহ, হয়মার, হয়মারক, হয়মারণ, হয়মুখ, হয়মেধ, হয়রান, হয়রাণি, হয়রানী, হয়লীলাবতী, হয়শালা, হয়শাস্ত্র, হয়শিক্ষা, হয়শিরঃ(রস্), হয়শিরাঃ, হয়শিশু, হয়শীর্ষ, হয়শীর্ষা(র্ষন্), হয়াঙ্গ, হয়াত, হয়াধ্যক্ষ, হয়ায়ুর্ব্বেদ, হয়ারি, হয়ারূঢ়, হয়ারোহ, হয়ালয়, হয়াস্য, হয়ী, হয়েশ্বর, হয়োত্তম।

● **হয়্** = হরের যাওয়ন। **হয়** = হরের যাওয়া যাহাতে।

● **হয়** : ৫. ঘোড়াকে **হয়** বলা হয় কেন? আসলে এঁরা হলেন উৎপাদনের বুদ্ধিদাতা জ্ঞানী। একালের ভাষায় বললে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, স্পেশালিস্টদের **হয়** বলা হত। উৎপাদনের জন্য যে **ঘটনা** ঘটাতে হয়, এঁরা তা ঘটাতে পারেন বলে, এঁদের **ঘোটক** বলা হত, পরে যে শব্দটি **ঘোড়ায়** পরিণত হয়েছে। জগতের সারজ্ঞান বা জগতের ছাই বা **অশ্** (= ash) বহন করেন ব'লে এঁদের বলা হত **অশ্ব**। যা কিছু বানানো **হয়**, উৎপাদন করা **হয়**, সেগুলিকে বানানোর বিদ্যা ইনিই দিতেন বলে এঁকেও বলা হত **হয়**; যেভাবে 'করে যে' তাকে যেমন **কর** বলা হয়, সেইভাবে 'হওয়ায় যে', তাকেও **হয়** বলা হত। অপরপক্ষে স্থির জ্ঞানের উপর নির্ভর করে চলেন ব'লেও এঁদের বলা হত **হয়**। সাদৃশ্যে চতুষ্পদ জন্তু horse-কেও **হয়, ঘোড়া, ঘোটক, অশ্ব** প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়।

● **হয়গ্রীব** : ২. *হয়-এর ন্যায় গ্রীবা (grip) যাহার।* ৩. ক) দৈত্যবিশেষ ও হয়গ্রীব শিরোধর বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। অসুর হয়গ্রীব **দিতির** পুত্র। সরস্বতী নদীর (জ্ঞানপ্রবাহের) তীরে **মহামায়ার** আদেশে হয়গ্রীব (অবধ্য হবার বাসনায়) কঠোর **তপস্যা** করতে থাকে। ... অন্য বর প্রার্থনা করতে বললে, হয়গ্রীব বর চায় — যাতে হয়গ্রীব ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী তাকে বধ করতে না পারে। ... তাকে দমন করতে না পেরে দেব ও ঋষিগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে, তিনি হয়গ্রীব মূর্তি ধারণ করে এই অসুরকে বিনাশ করেন। ... (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **মধু, কৈটভ**।

● **হল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবহাল, অহল্য, অহল্যা, অহল্যাজার, অহল্যানন্দন, অহল্যাপতি, অহল্যাহ্রদ, আওহাল, হল্, হল, হলককুৎ(দ্), হলগোলক, হলদণ্ড, হলধর, হলপাণি, হলপ্রবাহ, হলবংশ, হলভূতি, হলভৃৎ, হলমার্গ, হলমুখ, হলযোগ, হলহতি, হলহল, হলহলা, হলা, হলাভিযোগ, হলায়ুধ, হলাহল (হল-আহল), হলাহল, হলাহলি-গলাগলি, হলাহলি-গলাগলি-ভাব, হলি, হলিক, হলিনী, হলিপ্রিয়া, হলী, হলীমক, হলীশা, হলীষা, হল্য, হল্যা, হল্লক, হল্লন, হল্লা, হল্লীশ, হল্লীশক্রীড়া, হল্লীষক, হল্লীসক, হল্‌হল্, হাইল, হাল, হালই, হালক, হালকা, হালকামি, হাল-খাজনা, হালখাতা, হালচাল, হালছাড়া, হালৎ (হালাৎ, হালোত), হালদার (হাওলদার, হাবিলদার), হালধরা, হাল-নিকাশী, হালফিল, হাল-বকেয়া, হাল-বাকী, হালভৃৎ, হালমন, হাল-সাকিন, হাল-হকিকৎ, হালহল, হালা, হালাগোছা, হালাহল, হালাহলী, হালাহোল, হালি, হালিক, হালিয়া, হালিশ, হালী, হালুআ (হালুয়া, হালয়া, হালোয়াই) হালুই, হালুইকার, হালুচালু, হালুকচালুক, হালে-পানি-পাওয়া, হেলে (হালিয়া, হেলিয়া), হেলেগরু, হেল্যা।

● **হল্** = হরের লালন-লয়ন। **হল** = হরের লালন-লয়ন যাহাতে।

● **অহল্যা** : ১. হল্ = বিলেখন, কর্ষণ। ২. *যাহাতে হলকর্ষণ করা যায় না।* / যাঁহার বিরূপজন্য নিন্দ্যত্ব নাই। (ব.শ.)। ৩. ... **গৌতম**-বেশধারী **ইন্দ্র** ইঁহার সতীত্ব নাশ করিলে, ইনি পতিশাপে নিরাহারা তপোনিরতা ভস্মশায়িনী ও অদৃশ্যা হয়ে সহস্র বর্ষ আশ্রমে অবস্থান করেন এবং রামচন্দ্রের দর্শনলাভে শাপমুক্ত হয়ে পতির সহিত মিলিত হন। পদ্মপুরাণে, ইঁহার শাপজন্য শিলামূর্ত্তির ও রামচরণস্পর্শে মুক্তির উল্লেখ আছে। ... (ব.শ.)। ... গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দেন যে, ' ... সহস্র বৎসর তোমাকে এখানে অদৃশ্য অবস্থায় বায়ুভুক হয়ে অনাহারে অনুতপ্ত হৃদয়ে জীবনযাপন করতে হবে। একদিন যখন রামচন্দ্র এই গভীর অরণ্যে আসবেন, তখন সেই অতিথিসৎকার করে তুমি পাপমুক্ত হবে। তারপর একদিন রাম গৌতমের আশ্রমে এলে তাঁর আগমনের ফলে অহল্যা সর্বপাপমুক্ত হন। বেদের ভাষ্যকার কুমারিল ভট্টের মতে অহল্যা-ইন্দ্র উপাখ্যান একটি রূপক মাত্র। ... অহল্যা পঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার অন্যতমা। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **দ্রৌপদী, পঞ্চকন্যা**। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'অর্থ' শব্দের মানে দেওয়া আছে 'জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ'। অর্থাৎ একটা যুগ ছিল, যখন যে মানুষেরা যে মাটিকে ভিত্তি করে তাদের জীবন কাটাত, তাদেরকে সেই মাটি বাদ দিয়ে চিন্তা পর্যন্ত করা হত না। সেইরকম এক জনগোষ্ঠীই অহল্যা। আদিম সমাজতন্ত্রবাদী (তখন তা যথেষ্ট অবক্ষয়প্রাপ্ত) **গৌতম মহর্ষি** ছিলেন এই জনগোষ্ঠীর পরিচালক। তাঁদের পরামর্শেই বাঁধ বেঁধে এই অঞ্চলে অধঃপতিত সমাজতন্ত্রবাদী নীতিতে চাষাবাদ চলছিল। কিন্তু সেই পরিচালকদের অগোচরে বিনিময়বাদীরা গোপনে এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং কিছু কিছু উৎপাদন করিয়ে নেয় বিনিময়ের জন্য। ব্যাপারটি যখন পরিচালকদের গোচরে আসে, তখন তাঁরা বিনিময়বাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সেই বিরোধ গড়ায় বাঁধ ভাঙাভাঙিতে। ফলে বাণের জলে পুরো এলাকা ডুবে যায়, এবং ক্রমশ হলের অযোগ্য হয়ে অহল্যা হয়ে যায়। (ইন্দ্রের বাঁধ ভাঙার গল্পটি বেদেই রয়েছে। ঋগ্বেদ ১/৩২/১১। **যাস্ক** এটি উল্লেখ করে গেছেন। তখন যে আদিম সমাজতন্ত্রবাদী মহর্ষিরা সমাজ পরিচালনা করতেন তাঁদের বলা হত **বৃত্রাসুর**।) পরে যখন জমিতে পুঁজি বিনিয়োগের যুগ আসে, (রামায়ণের যগ), তখন এই অহল্যা আবার স্বরূপ ফিরে পায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অহল্যা কোনো নারী নয়, তথ্যপ্রমাণ সহকারে তাই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটি তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নিবন্ধে জানিয়েছেন এমনি আর এক নামহীন অনুসন্ধানীর একটি রিসার্চ পেপার 'রাক্ষস-রহস্য'-এর কথা, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে অহল্যা নারী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সেই নামহীন লেখককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর নিজের রচনায় ঐ নামহীন লেখকের মতানুযায়ী হলচালনের অযোগ্য ভূমিকেই অহল্যা বলেছেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এইরূপ — 'অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না — কঠিন, অনুর্ব্বর। ইন্দ্র কর্ষণ করিয়া সেই ভূমিকে কোমল করেন, জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এইজন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন।' — বঙ্কিমচন্দ্র, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম', 'ইন্দ্র' অংশ, পৃ. ১০৭৬, সাক্ষরতা প্রবন্ধ খণ্ড, ১৯৭৩। একই গ্রন্থের ১১০৪ পৃষ্ঠায় রুদ্ধ ধারাসকল মুক্ত করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। দ্র. **'দিবোদাস'**।

● **হস্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিহসিত, অতিহাস, অহস্ত, উপহাস, পরিহাস, প্রহসন, সহসা, সহস্ত, সুহাস, হথ, হস্, হসন, হসনীয়, হসন্ত, হসন্তিকা, হসন্তী, হসিকা, হসিত, হসিতা, হস্ত, হস্তকমল, হস্তকার্য্য, হস্তকুশ, হস্তকৃত, হস্তকৌশল, হস্তক্রিয়া, হস্তক্ষেপ, হস্তগ, হস্তগত, হস্তগামী, হস্তগ্রহ, হস্তগ্রাহ, হস্তচাপল্য, হস্তচ্ছেদন, হস্তচ্যুত, হস্তচ্যুতি, হস্ততল, হস্ততাল, হস্ততুলা, হস্তত্র, হস্তদীপ, হস্তদোষ, হস্তধারণ, হস্তধারণা, হস্তনস্ত (হস্তন্যস্ত, হাতে নেওয়া বা অন্য হাতে দেওয়া, হেস্তনেস্ত), হস্তপাদ, হস্তপুচ্ছ, হস্তপৃষ্ঠ, হস্তপ্রদ, হস্তপ্রাপ্ত, হস্তপ্রাপ্য, হস্তবান(বৎ), হস্তবাপ, হস্তবারণ, হস্তবিন্যাস, হস্তবিম্ব, হস্তবুদ, হস্তমণি, হস্তমাত্র, হস্তমার্জ্জনা, হস্তরেখা, হস্তলাঘব, হস্তলেখ, হস্তলেপ, হস্তসংবাহন, হস্তসিদ্ধি, হস্তসূত্র, হস্তস্থ, হস্তস্থিত, হস্তস্বস্তিক, হস্তা, হস্তাক্ষর, হস্তাগ্র, হস্তাঙ্গুলি, হস্তাদান, হস্তান্তর, হস্তাবলম্ব, হস্তাবলেপ, হস্তাবাপ, হস্তাভরণ, হস্তামলক, হস্তারূঢ়, হস্তালম্ব, হস্তালম্বন, হস্তাহস্তি, হস্তিক, হস্তিনখ, হস্তিনাপুর, হস্তিনানগর, হস্তিনী, হস্তিপ, হস্তিপক, হস্তিমল্ল, হস্তিমূর্খ, হস্তিয়া, হস্তী,

হস্তীকক্ষ, হস্তীকক্ষ্য, হস্তীকন্দ, হস্তীকরঞ্জ, হস্তীকর্ণ, হস্তীগবাশ্বোষ্ট্র, হস্তীগিরি, হস্তীঘোষা, হস্তীঘোষাতকী, হস্তীঘ্ন, হস্তীচারী, হস্তীজীবী, হস্তীদন্ত, হস্তীনাসা, হস্তীপর্ণিকা, হস্তীপর্ণী, হস্তীপাদ, হস্তীপাল, হস্তীপালক, হস্তীপিপ্পলী, হস্তীবক্ত্র, হস্তীবর্চ্চস, হস্তীবাহ, হস্তীমদ, হস্তীমুখ, হস্তীমেহ, হস্তীযূথ, হস্তীরাজ, হস্তীরোধ্রক (হস্তীলোধ্রক), হস্তীশালা, হস্তীশিক্ষক, হস্তীশিক্ষা, হস্তীশুণ্ড, হস্তীশুণ্ডা, হস্তীশুণ্ডী, হস্তীশ্যামাক, হস্তীষড়্গব, হস্তীসূত্র, হস্তীস্নান, হস্তীহস্ত, হস্ত্যধ্যক্ষ, হস্ত্যাজীব, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ, হস্ত্যারোহ (হাত্যারা), হস্ত্যালুক, হাঁসা, হাঁসকুটে, হাঁসফাঁস, হাঁসা, হাঁসান, হাঁসিল (হাসিল, হাশীল, হাঁসিল-জমি, হাঁসিল-বাদা, দ্র. উপহাস, হস্ত), হাত, হাত-অম্বল, হাত-আগে-করা, হাত-আলস্য, হাত-আসা, হাত-উঠা (হাত-ওঠা), হাত-উঠান (হাত-ওঠান), হাত-এড়ান, হাত-ওঁচান, হাতকড়া (হাতকড়ি, হাতকড়ী), হাত-করা, হাতকরাত, হাতকর্জ্জা, হাতকষা, হাতকাটা, হাতকাটি(ঠি), হাত-কামড়ান, হাতকুরনী (হাতকুরুনী), হাতকোলা, হাতখরচ (হাতখরচা), হাতখালি, হাতগণনা, হাতগণা, হাতগণিতা, হাত-গুটান, হাত-ঘুরান, হাত-চলা, হাত-চাটা, হাতচাপা, হাতচালা, হাতচালাকী, হাতচালান, হাতচিঠা (হাতচিঠে), হাতছড়ি, হাতছাড়া, হাতছাড়ান, হাতছানি, হাতছেঁচড়, হাতছেঁচড়া, হাতজোড়, হাতজোড়া, হাতঝাড়, হাতটান, হাতঠারা, হাতড়া, হাতড়ান, হাততালি, হাততোলা, হাতথাকা, হাত-দিয়ে-জল-গলা, হাত-দিয়ে-হাতি-ঠেলা, হাত-দেওয়া, হাত-দেখা, হাতধরা, হাত-ধোয়া, হাতনাড়া, হাত-নিষপিষ-করা, হাত-পড়া, হাত-পড়ে-যাওয়া, হাত-পাকা, হাত-পাকান, হাতপাখা, হাত-পাতা, হাত-পা-না-সরা, হাত-পা-বেঁধে-জলে-ফেলা, হাত-ফসকান, হাতফের, হাতফেরতা, হাত-ফেরা, হাতবইটা (হাতবৈঠা, হাতবোঠে) হাতবদল, হাতবদল-করা, হাত-বসা, হাতবাঁধা, হাতবাঁধা-রাখা, হাতবাক্‌স, হাত-বাগড়াবাগড়ি, হাত-বাড়ান, হাত-বাড়িয়ে-আকাশ-পাওয়া, হাতবাতি, হাত-ভারা, হাতভারি(রী), হাতমাদুলী, হাত-মারা, হাতমুগুর, হাতযশ, হাত-রাঁড়-করা, হাতরুমাল, হাতল, হাতলণ্ঠন, হাত-লাগা, হাত-শুধু, হাত-সাধ্য, হাতসান, হাতসানি (হাথসান, হাথসানি), হাতসাফাই, হাত-সুড়সুড়-করা, হাতসূতা, হাতসোমাজি, হাতা (হাথা), হাতান (হাথান), হাতাড় (হাথাড়), হাতা-মারা, হাতাহাতি (হাথাহাথি), হাতিনা (হাত্‌নে), হাতিনী (হাথিনী), হাতিপাঞ্জর, হাতিয়া, হাতিয়ার, হাতিয়ারবন্ধ, হাতিলা, হাতিশাল, হাতিশালা, হাতী (পাঁচহাতী-দশহাতী), হাতী (হাথী), হাতীকান, হাতীপঁঙ্খী, হাতীপঙ্খী, হাতী-পোষা, হাতীর-খোরাক, হাতীর-গলায়-ঘণ্টা, হাতীর-পাঁচ-পা-দেখা, হাতীশুঁড়া, হাতুড়, হাতুড়ি (হাতুর, হাতুরা), হাতুড়ীয়া, হাতুড়ে, হাতুলী, হাতে-আকাশ-পাওয়া, হাতে-আনা, হাতে-আসা, হাতে-করা, হাতে-কলমে-করা, হাতে-খড়ি, হাতে-গড়া, হাতে-খোলা-পোঁদে-মালা-হওয়া, হাতে-গলে-বাঁধা, হাতে-চাঁদ-এনে-দেওয়া, হাতে-টুকনী-দেওয়া, হাতে-ঠেকা, হাতে-তালি-দেওয়া, হাতে-থাকা, হাতে-দড়ি-দেওয়া, হাতে-ধরা, হাতে-পড়া, হাতেনাতে, হাতেনাতে-ধরা, হাতে-পাওয়া, হাতে-পাঁজি-মঙ্গলবার, হাতে-পায়ে-ধরা, হাতে-বহরে-থাকা, হাতে-মাটি-(করা)-দেওয়া, হাতে-মাথা-কাটা, হাতে-রাখা, হাতে-রেখে-খাওয়া, হাতে-লওয়া, হাতে-লোতে-ধরা, হাতে-সূত-বাঁধা, হাতে-স্বর্গ-দেওয়া, হাতে-হাতে, হাতে-হাতে-প্রমাণ, হাতে-হাতে-ফল, হাতের-পাঁচ, হাতের-পাতের-খোয়ান, হাতের-লক্ষ্মী-পায়ে-ঠেলা, হাতের-লোক, হাত্যার, হাত্যারা, হাথ, হাথা, হাথাড়, হাথাহাথি, হাথিনী, হাথের, হাথ্যাদাদু, হাস, হাসক, হাসকর, হাসকুটে, হাসন, হাসন-রাজা, হাসনি, হাস-পরিহাস, হাসশীল, হাসা, হাসান, হাসাস্পদ, হাসাহাসি, হাসি, হাসিকা, হাসিকান্না, হাসিখুশী, হাসিত, হাসিতামাসা, হাসিনী, হাসি-মসকরা, হাসিমুখ, হাসিরালী, হাসিহাসি, হাসিহাসিমুখ, হাসী, হাস্ত, হাস্তিক, হাস্তিন, হাস্তিনপুর (হস্তিনাপুর), হাস্য, হাস্যকথা, হাস্যকর, হাস্যকার, হাস্যকৃৎ, হাস্যকার্য্য, হাস্যতা, হাস্যদিদৃক্ষু, হাস্যপদবী, হাস্যপরিহাস্য, হাস্যপ্রসন্নাস্য, হাস্যপ্রৌঢ়ি, হাস্যমার্গ, হাস্যরস, হাস্যরুচি, হাস্যলীলা, হাস্যস্থায়ীভাব, হাস্যস্পৃহ, হাস্যার্ণব, হাস্যার্থ, হাস্যাস্পদ, হিঃ, হিঃহিঃ, হিহি, হেতেজোঁক, হেতেড়, হেতের, হেতেপিঁপুল, হেস্তনেস্ত (দ্র. হস্তনস্ত)।

● **হস্‌** = হরের নির্য্যাসন। **হস** = হরের নির্য্যাস যাহাতে।

● **হস্তিনানগর, হস্তিনাপুর (হস্তীনানগর, হস্তীনাপুর)** : দ্র. **ইন্দ্রপ্রস্থ**।

● **হস্ত** : দ্র. **উপহাস**।

● **হস্তী** : ৩. ভরতবংশীয় বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। এঁর তিন পুত্র — অজমীড়, দ্বিমীড়, ও পুরুমীড়। এই হস্তীই হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **অঙ্কুশগ্রহ, উপহাস**।

● **হাসি** : দ্র. **উপহাস**।

● **হা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (হ্‌-অন্‌ বা হন্‌ থেকে একটি অস্তিত্বের লোপ হয়। যে লোপ করে তার দিক থেকে হা হনন করা, বিপরীত দিক থেকে তা শোকাবহ, ত্যাগ।) অপরাহ্ণ, অহ, অহং, অহংবাদী, অহংবুদ্ধি, অহঃ, অহঃক্ষপা, অহঃপতি, অহঃশেষ, অহকান্ত, অহক্ষপা, অহযামিনী, অহঙ্কার, অহঙ্কারী, অহঙ্কার্য্য, অহঙ্কৃত, অহঙ্কৃতি, অহঙ্ক্রিয়া, অহন, অহনি, অহম্‌, অহমগ্রিকা, অহমহমিকা, অহমিকা, অহম্পূর্ব্ব, অহম্বুদ্ধি, অহম্ভাব, অহস্মতি, অহযামিনী, অহরহ, অহরাগম, অহরাদি, অহর্নিশ, অহর্পতি, অহর্ম্মুখ, অহশ্চর, অহস, অহহ, অহান্ত, অহীন, অহীনবাদী, অহে, অহো, অহোপুরুষিকা, অহোবত, অহোযামিনী, অহোরাত্র, অহোরাত্রি, অহ্ন, অহ্নায়, আপরাহ্ণিক, জহ্নু, জহ্নুকন্যা, জহ্নুতনয়া, জহ্নুনন্দিনী, জহ্নুসুতা, জাহ্নবী, পরাহ্ন, বিহায়স, হা, হাই, হাই-আমলা, হাই-আমলাতি, হাইফাই, হাইফুই, হাইবাস, হাউ, হাউই, হাউকদাউক, হাউড়বাউড়, হাউড়া, হাউমাউ, হাউমাউখাউঁ, হাউর, হাউষ, হাউহাউ, হাএ, হাউস (হবস্‌), হাএয়াত, হাওড়া, হাওদা, হাওয়া, হাওয়া-করা, হাওয়া-খাওয়া, হাওয়াখানা, হাওয়াগাড়ী, হাওয়া-চলা, হাওয়া-ছাড়া, হাওয়াবদল, হাওয়া-বদলান, হাওয়াল, হাওল, হাওলা, হাওলদার, হাওলাত, হাওলি, হাঃ-হাঃ, হাঁ, হাঁই, হাঁইহাঁই, হাঁইফাঁই, হাঁউ, হাঁক, হাঁকডাক, হাঁক-দেওয়া, হাঁকন, হাঁক-পাড়া, হাঁকর, হাঁ-করা, হাঁকা, হাঁকান (হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া), হাঁকাহাঁকি, হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি, হাঁকুনি, হাঁকুপাকু, হাঁচ, হাঁচি, হাঁচুটি, হাঁৎহাঁৎ, হাঁপ (হাঁফ), হাঁপকাস, হাঁপ-ছাড়া, হাঁপ-ধরা, হাঁপ-লাগা, হাঁপা (হাঁফা), হাঁপাই, হাঁপান (হাঁফান), হাঁপানি, হাঁপাল (হাঁফ, হাঁফকাস, হাঁফা, হাঁফান, হাঁফানি, হাঁফাল), হাঁরে, হাঁরে-রে-রে-রে-রে, হাঁশকল, হাঁশিয়া, হাঁসুয়া, হাক, হাকডাক, হাকগু, হাক-থু, হাকন্দ, হা-করা, হাকা, হাকান্দ, হাকান্দন,

হাকান্দনা (আক্রন্দ), হাকার, হাকিনী, হাকুচ (বাকুচী), হাকুচকাঁটা, হাকুনি, হাগ, হাগা, হাগান, হা-ঘরে, হাড়-হাভাতে, হাত, হাতব্য, হাতলজ্জ, হান, হানফেনে, হানা, হানাপানা, হানি, হানিকর, হানিকৃৎ, হাপ-ঝাঁপ, হাপদাপ, হাপন, হাপর, হাপরমালী, হাপরা (হাপড়া), হাপরে-ঝাপরে, হাপস, হাপসা, হাপসি (হাবসি, হাবসী), হাপা, হাপিত, হাপিস, হাপু, হাপুতি(তী), হাপুতিনী, হাপুতী, হাপুত্রিকা, হাপুত্রী, হাপুষনয়নে (হাপুসনয়নে), হাপুস-হুপুস, হাফিকা (হাই), হাবাতকুড়ে, হাবাতিপাড়া, হাবাতে (হাভাতে), হাবুডুবু, হাবুদ্ধিয়া, হাবোলা, হা-ভাত, হাভাতে, হাম, হাম (মহ্, সকল, দ্র. হামেহাল), হাম-কালেব, হাম-ছায়া (হাম-সায়া), হামজোলফ, হামরাই (হামরাও, হামরাহি), হামলা (গরুর ডাক), হামলা-করা, হামলান, হামা, হামাকুড়ি, হামাগুড়ি, হামা-দেওয়া, হামার, হামারি, হামাল, হামি (হামি-খাওয়া, চুমু), হামু, হামুরাবি, হামেশা (হামেসা), হামেহাল, হাম্বা (হাম্মা), হাম্বী (হাম্ভী), হাম্বীর, হায় (হা-ই-অ), হায়ক, হায়ন, হায়-হায়, হায়া, হাহা, হাহাকার, হাহাকৃত, হাহাভাষ, হাহাভূত, হাহারব, হাহাশব্দ, হা-হুতাশ, হিঁজিপিঁজি, হিঁদু, হিঁদুআনি, হিঁদুয়ানি(নী), হিন্দি, হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুয়ান, হিন্দুয়ানি, হিন্দুয়ানী, হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানী, হিন্দোস্থান, হিয়ঙ্গু, হিয়ঙ্গুবীন, হীন, হীনক, হীনকর্ম্মা, হীনকুল, হীনকুষ্ঠ, হীনকোষ, হানক্রতু, হীনক্রিয়, হীনগুণ, হীনচক্ষু, হীনজ, হীনজাতি, হীনজাতিস্ত্রী, হীনতর্পিত, হীনতা, হীনতেজাঃ(জস্), হীনত্ব, হীনদঋ্য, হীনপক্ষ, হীনবর্ণ, হীনবল, হীনবাদ, হীনবাদী(দিন্), হীনবীর্য্য, হীনবুদ্ধি, হীনব্যঞ্জন, হীনমূল্য, হীনযজ্ঞ, হীনযান, হীনযোনি, হীনরূপ, হীনসখ্য, হীনসত্ত্ব, হীনসম্মার্জ্জন, হীনসেবা, হীনস্বর, হীনাংশু, হীনাঙ্গ, হীনাঙ্গা, হীনাঙ্গী, হীনাধিকাঙ্গ, হীনার্ঘতা, হীনিত, হীন্তাল, হেয়, হেয়ত্ব, হেন্দোস্থান, হেপা, হেয়ে, হেয়ত্ব, হৈন্দব, হৈন্দবী, হৈয়ঙ্গব, হৈয়ঙ্গবীন।

● **হা** = হরের আধার যাহাতে।

● **অহঙ্কার** : ১. কৃ = করণ। ২. অহং *(বা 'আমি করেছি, আমি করেছি', এইরূপ 'আমি' 'আমি') করে যে সত্তা।* / 'আমি'র করণ বা বোধ (যাহাতে)। 'আমি' এই অভিমান (যাহাতে)। 'আমি কর্ত্তা', 'আমার ইহা' ইত্যাদি অভিনিবেশ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. আত্মোৎকর্ষহেতু অভিমান। গর্ব্ব। ... 'মহতের পুত্র হইল নাম অহঙ্কার'। ... (ব.শ.)। ৪. গর্ব অর্থে প্রচলিত। ৫. অল রাউন্ড ফুটবলে সবাই সব স্থানে খেলে। তেমনি সনাতন ব্যবস্থায় সব মানুষ সব কাজ করত। ফলে কারও অভিমান জন্মানোর সুযোগ ছিল না। কিন্তু 'যে যেখানে খেলছে, এখন থেকে সে সেখানে খেলুক', এই ঘোষণা হয়ে যাবার পর, লাইন, সেন্টারফরোয়ার্ড, ব্যাক, হাফব্যাক যে যেখানে ছিল সে সেখানেই খেলতে থাকে; অর্থাৎ **দক্ষ** (স্পেশালিস্ট) **প্রজাপতি** কর্তৃক প্রজাপতিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর, যে মাঠে চাষ করতে যাচ্ছিল, তাকে নিয়মিত মাঠে যেতে হয়, আর যে জাল নিয়ে খালবিলে যাচ্ছিল তাকে খালবিলে যেতে হয় — জন্ম হয়ে যায় চাষীর, জেলের, ইত্যাদির। কিন্তু কোনো মানুষের তো শুধু ধানচালে বা শুধু মাছে কিংবা শুধু কাপড়ে জীবন কাটে না। বাঁচতে গেলে ধানচাল, মাছ, কাপড় সবই চাই। সুতরাং বিনিময় না হলে প্রাণ বাঁচে না। আর বিনিময় করতে গেলেই 'এটা আমি করেছি, এটা আমার' এই বোধ এসে যায়। বলতে কি, এই বোধ না-এলে বিনিময় করা অসম্ভব। তাই **প্রজাপতিতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই **অহঙ্কার** মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার আগে মানুষের **অহঙ্কার** ছিল না। পুরাণাদিতে এই অহঙ্কারের জন্মকথা প্রায় সব পুরাণেই আছে। আর, আজ? আজ তো অহঙ্কারের হাতেই দুনিয়া। এক অহঙ্কারীরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বানিয়ে আকাশকে চোখ রাঙায়, আর এক অহঙ্কারীরা সেখানে জ্যান্ত মানুষভরা প্লেন ঢুকিয়ে দিতে পিছপা হয় না।

● **হামার** : দ্র. **মরাই, ধামা**।

● **হায়, হায়স, হায়ন, বিহায়স** : দ্র. **বিহগ**। মানুষের হায়গুলি যেখানে গিয়ে ঠেকে। অত অত্যাচার করিসনি বাছা, মানুষের হায় লেগে যাবে।

● **হীন** : দ্র. **দীন**। **দীনহীন**।

● ***হি* (হিল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অহিত, অহিম, অহিমকর, অহিমকিরণ, অহিমদীধিতি, অহিমময়ূখ, অহিমরশ্মি, অহেতু, অহেতুক, অহেরা, অহৈতুক, আহেরা, ভি, হি, হিঅ, হিং (হিঙ, হিঙ্গ), হিকুটি, হিক্ক, হিক্কা, হিক্কিকা, হিক্কিত, হিক্কিনী, হিক্কী, হিঙ, হিঙুল, হিঙ্কা, হিঙ্কার, হিঙ্গ, হিঙ্গু, হিঙ্গুনাড়িকা, হিঙ্গুনির্য্যাস, হিঙ্গুপত্র, হিঙ্গুপত্রী, হিঙ্গুপর্ণী, হিঙ্গুরস, হিঙ্গুল, হিঙ্গুলক, হিঙ্গুলা, হিঙ্গুলাণি, হিঙ্গুলালী, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলিকা, হিঙ্গুলিয়া (হিঙ্গুলীয়া), হিঙ্গুলী, হিজল (হিজোল, হিজ্জল), হিজিবিজি, হিঞ্চা, হিঞ্চে (হিলমোচিকা, হেলেঞ্চা), হিঞ্জির, হিড়োল, হিড়োলা, হিণ্ (হিডি, দ্র. হিংস্ = হিসি), হিণ্ডন, হিণ্ডিক, হিণ্ডির (হিণ্ডীর), হিণ্ডী, হিণ্ডুক, হিণ্ডোল, হিত (গমিত, প্রেরিত), হিতা, হিন্তাল (হেঁতাল), হিন্দোল্, হিন্দোল, হিন্দোলক, হিন্দোলন, হিন্দোলা, হিম, হিমঋতু, হিমকর, হিমকরতনয়, হিমকরশীকর, হিমকরশেখর, হিমকাল, হিমকিরণ, হিমকূট, হিমক্লিষ্ট, হিমক্ষ্মাধর, হিমখণ্ড, হিমগর্ভ, হিমগিরি, হিমগিরিসুতা, হিমগু, হিমগৃহ, হিমগৌর, হিমজ, হিমজা, হিমজ্বাটি, হিমজ্যোতিঃ, হিমতৈল, হিমত্বিট্, হিমদীধিতি, হিমদুগ্ধা, হিমদুর্দ্দিন, হিমদ্যুতি, হিমদ্রুম, হিমধর, হিমধাতু, হিমধামা, হিমধ্বস্ত, হিমনিগ্রহ, হিমনির্মুক্ত, হিম-পড়া, হিমপাণ্ডু, হিমপাণ্ডুর, হিমপাত, হিমপ্রস্থ, হিমবদ্‌গিরি, হিমবৎপ্রতিম, হিমবান(বৎ) হিমবারি, হিমবালুকা, হিমবৃষ্টি, হিমভানু, হিমভাঃ(স্), হিমভূভৃৎ, হিমময়ূখ, হিমমুক্ত, হিমযুক্ত, হিমরশ্মি, হিমরশ্মিজ, হিমরুচি, হিমর্ত্তু, হিমল (হিমেল), হিমলব, হিম-লাগা, হিমশর্করা, হিমশীতল, হিমশৈল, হিমশৈলজ, হিমশৈলজা, হিমশ্রথ, হিমশ্রস্থন, হিমসংহতি, হিমসংঘাত, হিমসর(স্), হিমসেক, হিমস্রুৎ, হিমস্রুতি, হিমহাসক, হিমহাসকৃৎ, হিমা, হিমাংশু, হিমাংশুমালি(লিন্), হিমাগ, হিমাগম, হিমাঙ্গ, হিমাচল, হিমাত্যয়, হিমাদ্রি, হিমাদ্রিজা, হিমাদ্রিতনয়া, হিমাদ্রিতনয়াপতি, হিমান, হিমানদ্ধ, হিমানী, হিমানীপটল, হিমানীবিশদ, হিমান্ত, হিমাবতী, হিমাবদাত, হিমাব্জ, হিমাভ, হিমাভ্র, হিমামারি, হিমাম্বু, হিমাম্ভঃ(ম্ভস্) হিমারাতি, হিমারি, হিমার্ত্ত, হিমার্দ্দিত, হিমালয়, হিমালয়সুতা, হিমালয়া, হিমাহতি, হিমাহ্ব, হিমাহ্বয়, হিমোত্তমা, হিমোৎপন্না, হিমোদ্ভবা, হিমোপচার, হিমোস্র, হিম্য, হিল্, হিল, হিলঞ্চা, হিলন, হিলবিল, হিলমিল, হিলমোচি, হিলমোচিকা (হেলেঞ্চা, হিঞ্চে, heal), হিলমোচী, হিলা, হিলোর, হিলোল, হিল্লে (heal, healing, health) হিল্লোল, হিল্লোলিত, হিহি, হি-হি-হি-হি, হী, হে (এই প্রকার), হেউ, হেউতি, হেঃ, হেঁ (হ্যাঁ), হেঁই, হেইও, হেঁকচ-পেঁকচ (হ্যাঁকচ-প্যাঁকচ,

hocus-pocus), হেঁকন, হেঁকতে-পারা, হেঁকা, হেঁকাহেঁকি, হেঁকোচ-হোঁকোচ, হেঁকোট-পেঁকোট, হেঁচকা, হেঁচকা-টান, হেঁচকান, হেঁচকি, হেঁতাল (হেতাল), হেঁদলা, হেঁয়ালি, হেঁয়ালী (হিয়ালি, হিঁয়ালী, প্রহেলিকা, প্র-হেল), হেঁয়ালীপ্রবন্ধ, হেঁশ, হেকচি, হেক্কা, হেজিবেজি, হেতা (দ্র. হেথা), হেতু, হেতুক, হেতুতা, হেতুত্ব, হেতুদুষ্ট, হেতুবচন, হেতুবাদ, হেতুবাদিক, হেতুবাদী, হেতুবিদ্যা, হেতুমাত্রতা, হেতুমান(মৎ) হেতুযুক্ত, হেতুরূপক, হেতুশাস্ত্র, হেতুশূন্য, হেতুৎপ্রেক্ষা, হেতুপন্যাস, হেতুপমা, হেত্বন্তর, হেত্বপদেশ, হেত্বাক্ষেপ, হেত্বাভাস, হেথা (হি-স্থা, এখানে স্থিত), হেথাকার, হেতাকারে, হেথা-সেথা, হেথায়, হেথায়-হোথায়, হেথার, হেথা-হোথা, হেদে (হ্যাদে), হেদে-গো, হেদে-রে, হেদে-লো, হেদে-হে, হেন (এই প্রকার 'ন' বা ং-এর রূপ), হেনমতে, হেনমনে, হেবা (হি-বহ), হেবাক, হেবাকস্, হেবাকী, হেবানামা, হেম, হেমকক্ষ, হেমকক্ষ, হেমকক্ষ্য, হেমকন্দল, হেমকমল, হেমকর, হেমকর্ত্তা, হেমকলস, হেমকান্তি, হেমকার, হেমকারক, হেমকলিকা, হেমকলী, হেমকিঞ্জল্ক, হেমকীলিত, হেমকুম্ভ, হেমকূট, হেমকেতকী, হেমকেশ, হেমক্ষীরী, হেমগন্ধিনী, হেমগিরি, হেমগৌর, হেমঘ্ন, হেমঘ্নী, হেমচন্দ্র, হেমচূর, হেমচূর্ণ, হেমজ্বাল, হেমতার, হেমতাল, হেমদীনার, হেমদুগ্ধ, হেমদুগ্ধক, হেমদুগ্ধী, হেমদ্যুতি, হেমধান্যক, হেমন্ত, হেমন্তকাল, হেমন্তদুহিতা, হেমন্তনন্দিনী, হেমন্তী, হেমপর্ব্বত, হেমপিঙ্গল, হেমপুষ্কর, হেমপুষ্প, হেমপুষ্পক, হেমপুষ্পিকা, হেমপুষ্পী, হেমপৃষ্ঠ, হেমপ্রতিমা, হেমফলা, হেমবর্ণ, হেমবল্লী, হেমবান, হেমভস্ত্রা, হেমময়, হেমমরীচি, হেমমহীধর, হেমমালী, হেমমুকুলিকা, হেমমৃগ, হেমযজ্ঞোপবীত, হেমযূথিকা, হেমরূপ, হেমরেখা, হেমল, হেমলতা, হেমশঙ্খ, হেমশত, হেমশিখা, হেমশীতল, হেমশৃঙ্গ, হেমসহস্র, হেমসার, হেমসিংহ, হেমহস্তিরথ, হেমা, হেমাঙ্ক, হেমাঙ্গ, হেমাঙ্গদ, হেমাচল, হেমাশু, হেমাশুক, হেমাদ্রি, হেমাব্জ, হেমাভ, হেমাম্বুজ, হেমাম্ভোজ, হেমাম্ভোরুহ, হের, হেরই, হেরত, হেরন, হেরনু, হেরফের, হেরব, হেরম্ব, হেরয়ে, হেরসি, হেরাহেরি, হেরি, হেরিক, হেরিয়ে, হেরিলোঁ, হেরুক, হেরে, হেল, হেলঞ্চা (হেলাঞ্চা, হেলেঞ্চা, হেলঞ্চী, হিঞ্চে), হেল-দোল, হেলন, হেলন-দোলন, হেলনি, হেলনীয়, হেলা, হেলান, হেলানি, হেলাফেলা, হেলা-দোলা, হেলাহেলি, হেলি, হেলি (Gr. Elios), হেলিক, হেলিতব্য, হেলে, হৈঙ্গুল, হৈতুক, হৈম, হৈমকান্তি, হৈমকোশ, হৈমন, হৈমনী, হৈমন্ত, হৈমন্তিক, হৈমন্তী, হৈমবত, হৈমবতী, হৈমবতীবর্ষ, হৈমবতীসুত, হৈমমুদ্রা, হৈমমুদ্রিকা, হৈমসৌগন্ধিক, হৈমা, হৈমী, হৈমীভূত, হোতা, হোথা, হোথায়, হ্যান, হ্যান-ত্যান (হেন-তেন)।

● **হি (হিল্)** = হরের গতিশীলতা যাহাতে। **হিল** = গতিশীল হরের লালন-লয়ন যাহাতে।

● **হিমগিরি, হিমালয়, হিমবান** : ৩. পর্বতরাজ হিমালয় পিতৃলোক দুহিতা **মেনকা**কে বিবাহ করেন। মেনকার গর্ভে তাঁর **মৈনাক** নামে এক পুত্র ও **গঙ্গা** ও **পার্বতী** নামে দুই কন্যার জন্ম হয়। শিবপত্নী **সতী** দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করে হিমবানের কন্যা পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **অধিরাষ্ট্র, পর্ব্বত, দক্ষ, অত্রি**। ...

● **হিম, হিমশৈল** : দ্র. **জল, মেঘ**।

● **হেতু** : দ্র. **কারণ, জন্য, নিমিত্ত**।

● **হিংস্ (হিন্‌স্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবিহিংসক, অবিহিংসন, অবিহিংসা, অবিহিংস্র, অহিংসক, অহিংসা, অহিংস্য, অহিংস্র, অহিংস্রা, প্রতিহিংসা, সিংগাসন, সিংগি, সিংদরজা, সিংহ, সিংহকেশর, সিংহগ, সিংহগ্রীব, সিংহতুণ্ড, সিংহতুণ্ডক, সিংহদংষ্ট্র, সিংহদন্ত, সিংহদুয়ার, সিংহদ্বার, সিংহধ্বনি, সিংহনাদ, সিংহপর্ণী, সিংহপুচ্ছী, সিংহবাহ, সিংহবাহন, সিংহবাহিনী, সিংহবিক্রম, সিংহবিষ্টর, সিংহমধ্য, সিংহমল, সিংহযানা, সিংহরথ, সিংহরথা, সিংহরব, সিংহল, সিংহলগ্ন, সিংহলস্থা, সিংহলিয়া, সিংহলীল, সিংহশাব, সিংহশিশু, সিংহসংহনন, সিংহস্থ, সিংহা, সিংহাণ, সিংহাণক, সিংহান, সিংহাবলোকন, সিংহাবলোকিত, সিংহাসন, সিংহাসনরণ, সিংহাস্য, সিংহিকা, সিংহিকাতনয়, সিংহিকানন্দন, সিংহিকাপুত্র, সিংহিকাসুত, সিংহিকাসূনু, সিংহিনী, সিংহী, সিংহীলতা, সিঙ্গাসন, সিঙ্গি, সৈংহ, সৈংহল, সৈংহিক, সৈংহিকেয়, হিংস্(হিসি), হিংস, হিংসক, হিংসন, হিংসনীয়, হিংসা, হিংসাকর্ম্ম, হিংসাকারী, হিংসাত্মক, হিংসাত্মন্, হিংসাত্মিকা, হিংসানিবৃত্ত, হিংসাপ্রাণী, হিংসাপ্রায়, হিংসাবিহার, হিংসাযন্ত্র, হিংসারত, হিংসারুচি, হিংসালু, হিংসালুক, হিংসাশীল, হিংসাসমুদ্ভব, হিংসিত, হিংসিতব্য, হিংসুটে (হিঁসকুটে, হিঁসকুড়ে), হিংস্য, হিংস্র, হিংস্রক, হিংস্রজন্তু, হিংস্রপশু, হিংস্রযন্ত্র, হিংস্রা, হিংস্রাহিংস্র, হিশ্ (হিশ্‌ত্), হিশ্‌হিশ্, হিস্, হিস্‌হিস্ (whistle) হেংলা (হেঙ্গলা, হ্যাংলা), হেঙ্গল, হেঙ্গলা, হেঙ্গলাটে, হেঙ্গলাম (হ্যাংলামি)।

● **হিংস্ (হিন্‌স্)** = গতিশীল হরের রহস্যরূপের নির্য্যাসন। **হিংস** = গতিশীল হরের রহস্যরূপের নির্য্যাস যাহাতে। **হিন্‌স** = গতিশীল হরের অনকরণের নির্য্যাস যাহাতে।

● **সিংহ** : ১. ✓হিন্‌স্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *হিংসা করে যে।* ৩. পশুহিংসক, (জ্যোতিষে) পঞ্চম রাশি (Leo), (সাদৃশ্যে) সিংহবিক্রম পুরুষ, শ্রেষ্ঠার্থ, কায়স্থের উপাধি। (ব.শ.)। ৪. lion অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উমা, টিম, দ্বীপ**। আমাদের forest-এর সিংহ হোক আর সমাজের সিংহই হোক, দুজনের একই স্বভাব, তাই একই নাম — 'সিংহ' = 'যে হিংসা করে'। প্রাচীন বাংলায় রাষ্ট্রের তরফে যাঁরা তদ্রূপ আচরণ করতেন, তাঁদের বলা হত **সিংহ**। সেই পদবী উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের উত্তরসূরীরা আজও বহন করে থাকেন। সমাজের এই **সিংহ**দের বোঝানোর জন্যই শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল, সাদৃশ্যে, সেটিই forest-এর **সিংহ**কেও বোঝায়। কিন্তু তাতে কী! পরবর্তীকালের অভিধানকারগণ, এমনকি ব.শ.ও **সিংহ** শব্দের অদৃশ্য অর্থটিকে 'সাদৃশ্য' অর্থ এবং সাদৃশ্য অর্থটিকে অদৃশ্য অর্থ বলে মনে করেছেন। বলতে গেলে অধিকাংশ শব্দের ক্ষেত্রেই এই কাণ্ড করেছেন আধুনিক অভিধানকারগণ।

ধারণাটি কেবল আমাদের দেশেই ছিল, আছে, এমন নয়। পাশ্চাত্যেও ধারণাটি চলে যায়। তাঁরাও 'সিংহবিক্রম পুরুষ'কে lion শব্দে চিহ্নিত করেন, গড়ে তোলেন lions' club। সন্দেহ নাই, এই ক্লাবের সদস্যরা সামাজিক **সিংহই** বটে।

● **হু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : (হ্-উ-কে দেখে অন্য কেউ। তাই হু তার কাছে হুংকার। এটি ভু-এর আক্রমণাত্মক রূপ। ভম, ভোম প্রভৃতি শব্দ তাই ভয়াবহ।) অতিহু,

অনাহূত, অহুত, অহূত, আউতিয়া, আহুত, আহুতি, আহূত, হব, হবচন্দ্র (হাবাচন্দ্র, হবুচন্দ্র), হবন, হবনী, হবনীয়, হবায়ু, হবি, হবিঃ(বিস্), হবিঃশেষ, হবিরশন, হবিরাহুতি, হবির্গন্ধা, হবির্গৃহ, হবির্গেহ, হবির্দান, হবির্ধান, হবির্ধানী, হবির্ব্বহ, হবির্ভাগ, হবির্ভুক্(জ্) হবির্মন্থ, হবির্যজ্ঞ, হবিষ্মান্(ষ্মৎ), হবিষ্মতী, হবিষ্য, হবিষ্যভক্ষক, হবিষ্যভুক্(জ্), হবিষ্যান্ন, হবিষ্যাশী(শিন্), হবু, হবুচন্দ্র, হবুচবু, হবুথবু, হবেলি, হব্য, হব্যকব্য, হব্যগন্ধ, হব্যপাক, হব্যবাট্(বাহ্), হব্যবাহ, হব্যবাহন, হব্যভস্ম, হব্যভুক্(জ্), হব্যযোনি, হব্যলেহী, হব্যাদ, হব্যাশ, হব্যাশম, হাঁকর, হাঁকার, হাকার, হাঙ-হাঙ, হাঙ্গর, হাঙ্গাম, হাঙ্গামা, হাব, হাবজাগোবজা, হাবড় (হাওড়), হাবড়হাটি, হাবড়া, হাবলা (হাবোলা), হাবলা-ক্যাবলা, হাবলি, হাবসি, হাবসী, হাবা, হাবাগোবা, হাবি, হাবাল (হাওয়াল), হাবাস, হাবিলদার, হাবিলদারী, হাবুজখানা, হাবেশী, হাব্যাস, হালাকালা (হাবলাক্যাবলা), হুঁকা, হুঁকাবরদার, হুঁকার, হুঁকারি, হুঁকো, হুঙ্কার, হুকো, হুক্কা, হুক্কাবরদার, হু, হুই (পদবী), হুং (হুম্, ভোম্, ভোঁকা, ভুঁকনা), হুংহুঙ্কার, হুঁ, হুঁক, হুঁকর, হুঁচট (হুঁচোট, হোঁচট), হুঁচল, হুঁটার, হুঁটুর, হুঁশ, হুঁশার (হুঁসার, হুসার), হুঁশিয়ার (হুশিয়ার, হুঁসিয়ার, হুসিয়ার), হুঁশিয়ারী, হুক, হুকু, হুকুক, হুকুম, হুকুমদার, হুকুমদারী, হুকুমনামা, হুকুমপত্র, হুকুমবরদার, হুকুম-হাকাম, হুকুলি, হুক্কাহুয়া (হোক্কাহোয়া), হুঙ্কার, হুঙ্কারগর্ভ, হুঙ্কার-দাবড়ি, হুঙ্কারনিবর্ত্তিত, হুঙ্কারশংসী, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি, হুজুর, হুজুরালি, হুজুরি (হুজুরী), হুজ্জৎ, হুজ্জুৎ, হুত, হুতজাতবেদাঃ, হুতবহ, হুতবহজ্বালা, হুতবহপরিখেদ, হুতবহপরীত, হুতবহমুখ, হুতভক্ষ, হুতভুক্(জ্), হুতভুক্প্রিয়া, হুতভুগ্দিক, হুতভুঙ্মুখ, হুতভোক্তা, হুতভোজন, হুতশিষ্ট, হুতশেষ, হুতহুতাশন, হুতা, হুতাংশ, হুতাগ্নি, হুতাবশেষ, হুতাশ, হুতাশন, হুতাশবৃত্তি, হুতাশশালা, হুতাশশৌচ, হুতাশসুত, হুতাশিনী, হুতাশী, হুতাহুতি, হুতি, হুতম (হুতুম, হুতোম), হুতুলি-কুতুলি, হুতুলি-পুতুলি, হুতোম-পেঁচা, হুথা, হুন, হুনর (হুনুর), হুনরি, হুনরী, হুনরে, হুনি, হুনুর, হুনুরি, হুনুরী, হুপ, হুপহাপ, হুবকি, হুবহু, হুম্, হুম, হুমকি (হুম্‌কি) হুমড়ি, হুমরা-চুমরা, হুমহাম, হুমো, হুম্বা, হুয়া, হুরমৎ, হুরহুর, হুরি (হোরি), হুরী, হুরু, হুরুহুরু, হুল, হুলই (হুলুই), হুলথুল, হুলস্ত, হুলস্থূল, হুলহুল, হুলহুলী (ধান-হুলহুলী), হুলা, হুলাহুলি, হুলিয়া, হুলু, হুলুধ্বনি, হুলুস্থুলু, হুলো (হোলো), হুল্লা, হুশ, হুশিয়ার, হুশিয়ারী, হুসার, হুহু (হুহূ, হূহু, হূহূ), হুহুঙ্কার, হূম্, হূম-হাম, হূর-হূণ, হূল, হূলন্ত, হূ, হূংহূঙ্কার, হূংহূঙ্কারপ্রিয়, হূঁ, হূঙ্কার, হূঙ্কৃত, হূণ (হূন), হূণলিপি, হোঁ, হোঁকর, হোঁকরা, হোঁচট, হোঁতকা (হোঁৎকা), হোঁদল (হোঁদোল), হোঁদল-কুতকুত, হোগল, হোগলকুঁড়ে, হোগলপাত, হোগলা, হোতব্য, হোতা (হোতৃ), হোতাগণ, হোতাপোতা(তৃ), হোতৃকর্ম্ম(র্ম্মন্), হোতৃগণ, হোত্র, হোত্রা, হোত্রী, হোত্রীয়, হোম, হোমকর্ম্ম, হোমকাষ্ঠী, হোমকুণ্ড, হোমতুরঙ্গ, হোমদ্রব্য, হোমধান্য, হোমধুক্(দুহ্), হোমধেনু, হোমধূম, হোমবেলা, হোমভস্ম, হোমভাণ্ড, হোমশালা, হোমরা, হোমরা-চোমরা (দ্র.হুমরা, হুমরা-চুমরা), হোমাগ্নি, হোমানল, হোমাবশেষ, হোমী(মিন্) হোমীয়, হোম্য, হোয়া, হোয়াক, হোরি, হোরী, হোরে, হোল, হোলক, হোলনা, হোলা, হোলাক, হোলাকা, হোলিকা, হোলী, হৌতভুজ, হৌতাশন, হৌত্র, হৌম্য।

● হু = হর নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

● **হুহু : ৩.** (দ্র. **হাহা**) এরা স্বর্গের গন্ধর্ব। হাহা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সূর্যরথে বাস করতেন। হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বরা সূর্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। হাহা অর্থাৎ গানে হা এইরূপ নিন্দাসূচক শব্দ দূরীভূত করে যে। হুহু অর্থাৎ গানে হু-এইরূপ শব্দ করে যে। (পৌ.অ.)। **৫.** হা হা করা মানে দাও দাও করা, আর হু হু করা মানে দিই দিই করা। সূর্য্যের বা শাসনকেন্দ্রের সম্পদ আহরণ ও সম্পদ বিতরণের সঙ্গীতের ভিতরে এই দুটি ইচ্ছার প্রকটন স্বাভাবিক ছিল।

● **হুর্চ্ছ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তক, মৌহূর্ত্ত, মৌহূর্ত্তিক, সুমুহূর্ত্ত, হুর্চ্ছ্।

● **হুর্চ্ছ্** = নবরূপী হরের ছাদন। **হুর্চ্ছ্** = নবরূপী হরের ছাদন যাহাতে।

● **হৃ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** (হরণ ও অপহরণ দুটিকে এখন এক করে রাখা হয়েছে। তা কিন্তু নয়। হ-কে অন করলে যেমন 'হন' হয়, তেমনি হ-কে রক্ষণ করলে 'হর' হয়, তার অন্ হল হরণ।) অগ্রহার, অতিনির্হারী, অনাহার, অনাহার্য্য, অনুপসংহারী, অপহার, অপহারী, অপহৃত, অবেভার, অব্যবহার, অব্যবহার্য্য, অব্যবহৃত, অব্যভার, অব্যাভার, অসংহৃত, অসুহৃৎ, অসৌহৃদ, অহার্য্য, অহৃত, অহৃদয়, অহৃদ্য, আজিহীর্ষা, আহর, আহরণ, আহরণীয়, আহরিত, আহৃত, আহার, আহারার্থী, আহারীয়, আহার্য্য, উদাহরণ, উদ্ধার, উদ্ধৃত, উপসংহার, উপহরণ, উপহার, নিরাহার, নির্হারী, প্রতিহার, প্রতিহারী, প্রত্যাহার, প্রহর, প্রহরা, প্রহরী, প্রহার, প্রহৃত, বিহরণ, বিহার, বিহারী, ব্যবহর্ত্তব্য, ব্যবহার, ব্যবহারশাস্ত্র, ব্যবহারজ্ঞ, ব্যবহৃত, রিঝ, রিঝি, রিদয়, রীঝ, রীঝা, রীঠা (হৃষ্ট, দ্র. ঋষ্), সংহরণ, সংহার, সংহৃত, সমভিব্যাহার, সমাহার, সমুদাহরণ, সহৃদয়, সারোদ্ধার, সুহৃৎ, সুহৃদয়, হত্তকী, হত্তুকী, হর (দ্র. অংশহর) হর (প্রতি এক), হরক, হরগৌরী, হরচূড়ামণি, হরণ, হরণ-পূরণ, হরণাহরণ, হরতেজঃ(জস্), হরদগ্ধমূর্ত্তি, হরনেত্র, হরপ, হরপা, হরপি(পী), হরপ্পা (হড়প্পা), হরবরসর, হরবীজ, হরমনোমোহিনী, হরয়ে, হররমা, হররাণী, হররা, হরশেখরা, হরসখ, হরসূনু, হরহার, হরা (হরান), হরাদ্রি, হরায়তন, হরাস্পদ, হরি, হরিএক (হরেক, হর-এক, এই শব্দে আরবি হর হরির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কেন? দ্র. হরিজ), হরিক, হরিকারিকা, হরিকেশ, হরিগন্ধ, হরিগুণ, হরিঘোষ, হরিচক্র, হরিচন্দন, হরিচরণ, হরিচাপ, হরিজ, হরিজন, হরিড়া (হরড়া, হরীতকী), হরিণ, হরিণক, হরিণকলঙ্ক, হরিণচর্ম্ম, হরিণধামা, হরিণনয়ন, হরিণনেত্র, হরিণনর্ত্তক, হরিণপ্লুত, হরিণবাড়ি(ড়ী), হরিণলক্ষণ, হরিণলক্ষ্মা(ক্ষ্মন্), হরিণলাঞ্ছন, হরিণলাঞ্ছনমৌলি, হরিণলোচন, হরিণলোচনা, হরিণলোলাক্ষ, হরিণহৃদয়, হরিণহেরিণী, হরিণা(না), হরিণক্রীড়ন, হরিণাক্রীড়িত, হরিণাক্ষ, হরিণাঙ্ক, হরিণাঙ্গনা, হরিণী, হরিণীদৃক্(শ্), হরিণীনয়ন, হরিণীবৃত্ত, হরিৎ, হরিত, হরিতক, হরিতকপিশ, হরিতগোময়, হরিতচ্ছদ, হরিততৃণ, হরিতধান্য, হরিতপ্রভ, হরিতযব, হরিতশাক, হরিতহরি, হরিতা, হরিতারুণ, হরিতাল, হরিতালক, হরিতালিকা, হরিতালী, হরিতাশ্ম(শ্মন্), হরিতাশ্ব, হরিতীকৃত, হরিতুরঙ্গ, হরিতোপল, হরিৎখন্দ, হরিদন্ত, হরিদর্ভ, হরিদশ্ব, হরিদাস, হরিদিক্(শ্) হরিদিন, হরিদেব, হরিদ্র, হরিদ্রক, হরিদ্রব, হরিদ্রা, হরিদ্রাগণেশ, হরিদ্রাভ, হরিদ্রামঙ্গল, হরিদ্রারাগ,

হরিদ্রু, হরিদ্বর্ণ, হরিদ্বার, হরিদ্বিট্(ষ্), হরিনক্ষত্র, হরিনাম, হরিনেত্র, হরিণ্মণি, হরিণ্মুদ্গ, হরিপদ, হরিপাদ, হরিপিঙ্গ, হরিপিঙ্গল, হরিপূজন, হরিপূজা, হরিপ্রিয়, হরিপ্রিয়া, হরিবংশ, হরিবংশ্য, হরিবর্ষ, হরিবল্লভা, হরিবালুক, হরিবাস, হরিবাসর, হরিবাহন, হরিবীজ, হরিভুক্(জ্), হরিমণি, হরিমন্দির, হরিমেধ, হরির-লুঠ, হরিলোচন, হরিশর, হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্মশ্রু, হরিষেণ, হরিসঙ্কীর্ত্তন, হরিসহায়িনী, হরিসুত, হরিসূনু, হরিহয় (হৈহয়), হরিহয়ানুজ, হরিহর-আত্মা, হরিহরাত্মক, হরিহরি-বোল, হরিহরি-হরি, হরিহেতি, হরী, হরীতক (আম্রাতক-হরীতক-বিভীতক, আমড়া-হরড়া-বহেড়া, আময়া-অভয়া-বিভয়া, কিন্তু ত্রিফলাতে আমড়া থাকে না, থাকে আমলকী), হরীতকী, হরীশ, হরেক (দ্র.হরিএক), হরেণু, হরে-দরে, হর্ত্তব্য, হর্ত্তা, হর্ত্তৃ, হর্ত্তাকর্ত্তা, হর্ম্ম্য, হর্ম্ম্যতল, হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, হর্ম্ম্যভাক্(জ্), হর্ম্ম্যস্থল, হর্ম্ম্যাঙ্গন, হর্য্যক্ষ, হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বচাপ, হলদা, হলদি(দী), হলুদ, হলুদীয়া, হলদে, হার, হার (পরাজয়), হার (সুদের হার), হারক, (প্রাণহারক, স্মৃতিহারক) হারগুটিকা, হারগুলিকা, হারফল, হারফলক, হারমালা, হারযষ্টি, হারলতা, হারহারা, হারহূর, হারা, হারান, হারা-মরা, হারাইল, হারাণ (হারান), হারাবলী, হারাহারি (খোয়ান), হারাহারি (জয়-পরাজয়), হারিহারি, হারি, হারিকণ্ঠ, হারিত, হারিণ, হারিণিক, হারিণী, হারিত, হারিতক, হারিতপ্রাপ্ত, হারিতী, হারিদ্র, হারিমুগ, হারিয়া, হারী, হারীত, হারীতক, হার্দ্দ, হার্দ্দিক, হার্দ্দিক্য, হার্দ্দী(র্দ্দিন্), হার্দ্দ্য, হার্য্য (পরিহার্য্য) হিআ (হিয়া), হিয়, হিয়া, হিয়াড়া, হির (হীরক), হিরণ, হিরণকিরণ, হিরণবরণ, হিরণমণি, হিরণময়, হিরণ্ময়, হিরণ্ময়ী, হিরণ্য, হিরণ্যক, হিরণ্যকক্ষ, হিরণ্যকর্ত্তা, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যকামধেনু, হিবণ্যকার, হিরণ্যকৃৎ, হিরণ্যকেশ, হিরণ্যকোষ, হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভাঙ্গভু, হিরণ্যদ, হিরণ্যধনুঃ, হিরণ্যনাভ, হিরণ্যপ্রতিপূর্ণ, হিরণ্যব, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহ, হিরণ্যবাহু, হিরণ্যবিন্দু, হিরণ্যবীর্য্য, হিরণ্যরশন, হিরণ্যরেতাঃ(তস্), হিরণ্যস্রক্, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যাক্ষবিদারক, হিরণ্যাক্ষরিপু, হিরণ্যাক্ষহর, হিরণ্যাব্জ, হিরণ্যাশ্ব, হিরামণ, হিরামন, হিরামাটা (হিরামাঠা, হীরামাটা, হীরামাঠা), হিরুক্, হীর, হীরক, হীরা, হীরাকাটা, হীরাধার, হীরাবাঁধা, হীরাবান্ধা, হীরামন (হীরেমন), হীরে, হীরের-টুকরো, হীরের-টুকরো-ছেলে, হৃ, হৃঙ্গ, হৃচ্ছয়, হৃচ্ছয়পীড়িত, হৃচ্ছয়বর্দ্ধন, হৃচ্ছয়বশ, হৃচ্ছূল, হৃচ্ছোক, হৃজ্জ, হৃণীয়া, হৃৎ (হৃদ্) (কুষ্ঠহৃৎ, পাপহৃৎ, রোগহৃৎ ইত্যাদি), হৃৎকমল, হৃৎকম্প, হৃৎপঙ্কজ, হৃৎপতি, হৃৎপদ্ম, হৃৎপদ্মাসন, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপীড়ন, হৃৎপীড়া, হৃৎপুণ্ডরীক, হৃৎপুষ্কর, হৃৎপ্রিয়, হৃৎসরসী, হৃৎসার, হৃৎস্তম্ভ, হৃৎস্থ, হৃত, হৃতচন্দ্র, হৃতজ্ঞান, হৃতদার, হৃতদ্রব্য, হৃতধিত, হৃতবাসঃ, হৃতমানস, হৃতরাজ্য, হৃতসর্ব্বস্ব, হৃতসার, হৃতাধিকার, হৃতি, হৃদ, হৃদতাপ, হৃদভোজ, হৃদয়, হৃদয়কপাট, হৃদয়কমল, হৃদয়কম্প, হৃদয়ক্লম, হৃদয়ক্ষোভ, হৃদয়গত, হৃদয়গ্রন্থি, হৃদয়গ্রাহ, হৃদয়গ্রাহী, হৃদয়ঙ্গম, হৃদয়চোর, হৃদয়চৌর, হৃদয়চ্ছিৎ(দ্), হৃদয়জ, হৃদয়জ্ঞ, হাদয়জ্বর, হৃদয়দাহী, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, হৃদয়দ্রব, হৃদয়নিহিত, হৃদয়পীড়া, হৃদয়পুণ্ডরীক, হৃদয়পুতলি, হৃদয়প্রমাথী, হৃদয়প্রিয়, হৃদয়বন্ধন, হৃদয়বল্লভ, হৃদয়বান(বৎ), হৃদয়বিদারক, হৃদয়বিদারী, হৃদয়বৃত্তি, হৃদয়বেধী, হৃদয়ব্যথা, হৃদয়মর্ম্ম, হৃদয়রোগ, হৃদয়শৈথিল্য, হৃদয়সন্ধি, হৃদয়সন্ধিপীড়া, হৃদয়সম্মিত, হৃদয়স্থ, হৃদয়স্থান, হৃদয়স্পৃক্(শ্), হৃদয়হারী, হৃদয়ানুগ, হৃদয়াবগাঢ়, হৃদয়াবিৎ(বিধ্), হৃদয়ালু, হৃদয়িক, হৃদয়িনী, হৃদয়ী(য়িন্), হৃদয়েশ, হৃদয়েশয়, হৃদয়েশয়া, হৃদয়েশা, হৃদয়েশ্বর, হৃদয়েশ্বরী, হৃদয়োন্মাদ, হৃদয্য, হৃদাবর্ত্ত, হৃদাময়, হৃদি, হৃদিক (হৃদীক), হৃদিকমল, হৃদিতল, হৃদিধাম, হৃদিপদ্ম, হৃদিবৃন্দাবন, হৃদিমধ্যে, হৃদিমাঝে, হৃদিশয়, হৃদিশয্যাতল, হৃদিসরোবর, হৃদিস্থ, হৃদিস্থিত, হৃদিস্পৃক্(শ্), হৃদেশ, হৃদ্গ, হৃদ্গত, হৃদ্গদ, হৃদ্গ্রন্থ, হৃদ্গ্রহ, হৃদ্দাহ, হৃদ্দেশ, হৃদ্বিদাহ, হৃদ্বোধ, হৃদ্ব্রণ, হৃদ্য, হৃদ্যগন্ধ, হৃদ্যগন্ধা, হৃদ্যতা, হৃদ্রোগ (হৃদ্রোগ), হৃন্মোহ, হৃল্লাস, হৃল্লাসক, হৃল্লাসিকা, হৃল্লেখ, হৈরণ্য, হৈরণ্যক, হৈরণ্যগর্ভ, হৈরণ্যবাসাঃ, হৈর্ত্তকি, হৈহয় (হরিহয়), হৈহয়সহস্র, হৈহয়াধিপ, হৈহেয়, হোরা, হোরাধিপ, হোরাধিপতি, হোরানাও, হোরাপঞ্চমী, হৌত্তকি।

● হৃ = হরের আবর্ত্তন যাহাতে।

● **আহরণ, আহার** : দ্র. **হর, হার**।

● **হর** : ৫. দ্র. **থরহর, থরহরি**। হওয়ন রহে যাহাতে। অস্তিত্বমাত্রই হর; একটি হর মানেই হর-এক বা হরেক। অণু অস্তিত্ব থেকে শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব, সবই হর পদবাচ্য। হর অন থাকলে **হরণ** হয়, যাকে বলে এক দেশ-কাল-পাত্র থেকে অন্য দেশ-কাল-পাত্রে গিয়ে স্থির হওয়া বা দেশান্তরে পাওয়া। যে দেশ-কাল-পাত্র থেকে হরণ হয়, তারা **হারায, হাবে**, তাদের কপালে **হার** জোটে। এই হার-এর আশ্রয় যাহাতে, তাকে বলে **আহার**। যাতে এই হার প্রকৃষ্ট রূপে থাকে, তাকে বলে **প্রহার**। এই হার যখন প্রচলিতের বিপরীত দিকে গমন করে বা বিশেষ ভাবে গমন করে, তখন তা **বিহার**।

● **হরতাল** : দ্র. **ঘটবারি, ধর্ম্মঘট**।

● **হরধনু** : ৩. মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করবার সময় তাঁর **ধনু**র জ্যা কর্ষণ করে দেবগণকে বলেছিলেন, তিনি **যজ্ঞ**-ভাগ চাচ্ছেন, কিন্তু দেবতারা তা দিচ্ছেন না, সে জন্য তাঁর ধনুর দ্বারা দেবতাদের শিরশ্ছেদন করবেন। দেবতারা ভয় পেয়ে স্তুতি করতে থাকলে মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁদের এই **ধনু** দিলেন। দেবতারা তা **জনকে**র পূর্বপুরুষ **দেবরাতে**র কাছে গচ্ছিত রাখলেন। ... জনক এই ... হরধনু ভঙ্গ করতে যে সমর্থ হবে, তার হাতে কন্যা দানের কথা ঘোষণা করেন। ... রাম এই হরধনু তুলে অবলীলায় জ্যা রোপন করে আকর্ষণ করলেন এবং ভেঙে ফেললেন। ... (পৌ.অ.)। দ্র. **ধনু, ইন্দ্রধনু**। হরের **ধনু** কথাটির অর্থ হল, হর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়ম। ...

● **হরিচন্দন** : দ্র. **পঞ্চবৃক্ষ, দেবতরু**।

● **হরিণ, হরিণী** : দ্র. **ঋষ্য, অজিনযোনি**।

● **হরিদ্রা** : দ্র. **দ্রা**।

● **হার (আহার, বিহার, প্রহার)** : দ্র. **উপহার**।

● **হিরণ্যকশিপু** : ৩. অসুরসম্রাট। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। দ্রষ্টব্য **জয়-বিজয়**। ... বিষ্ণুর দ্বারপাল এই জয়ও বিজয়ই প্রথম জন্মে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে **রাবণ ও কুম্ভকর্ণ** এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **আদি, আদিদৈত্য**।

● **হৈহয়** : ৩. ক) হৈহয়, **তালজঙ্ঘ** প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ **ইক্ষ্বাকু**

বংশীয় রাজা **বাহু**কে পরাজিত করে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন। পরে রাজা বাহুর পুত্র সগর এদের পরাভূত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। খ) **কার্তবীর্যার্জুন** হৈহয়দের রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হৈহয়রা অর্থকষ্টে পতিত হয়। তখন তাঁরা তাঁদের পুরোহিত **ভার্গব**দের কাছে অর্থ প্রার্থনা করে। লোভী ভার্গবরা হৈহয়দের অর্থদান করলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হৈহয়রা ভার্গবদের হত্যা করে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। (পৌ.অ.)। **৫.** একটি ভাল নীতি কীভাবে সবচেয়ে মন্দ রীতিতে পরিণত হয়, তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি। মানুষের ঝাঁক চালানোর যোগ্য কে? তাঁদের পালের গোদা হতে পারে কে? অবশ্যই তাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাঁরাই। আদিতে সেকারণেই **ব্রহ্মগুণ**সম্পন্ন **ব্রাহ্মণ**রাই ছিলেন মানবসমাজের পরিচালক। **দক্ষযজ্ঞে**র কিছুকাল পরে **পৃথু** বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, তাঁরা স্বভাবতই রাষ্ট্রের বা ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে blank cheque নিয়ে নেন — তাঁদের যখন যা দরকার হবে, রাষ্ট্র তা দিতে বাধ্য থাকবে। এতে রাষ্ট্রের বা ক্ষত্রিয়ের অসম্মত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না, কেননা, **ব্রাহ্মণে**রা ছিলেন জ্ঞানব্রতী, ধনের দিকে তাঁদের কোনো প্রকার লোভ তো ছিলই না, বরং অত্যন্ত অনীহাই ছিল; বারংবার অনুরোধ-উপরোধ করলেও অপ্রয়োজনে দান গ্রহণ করতেন না তাঁরা; আর, তাঁদের প্রয়োজনটাও ছিল খুবই কম। কিন্তু **দক্ষ**পন্থা গ্রহণের কারণে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি **ব্রাহ্মণ**কেও বংশানুক্রমে **ব্রাহ্মণ** করে দেয়, এবং স্বভাবতই **ব্রহ্মগুণ** অর্জন না করেই উত্তরাধিকারসূত্রে **ব্রাহ্মণে**র সংখ্যা বাড়তে থাকে। এবং তারা সেই blanck cheque-এর সুযোগে বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে শুরু করে। ফলত, অধঃপতিত-**ব্রাহ্মণে**র খাঁই মেটাতে স্বয়ং রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়ই দেউলিয়া হয়ে যায়। উল্টে তখন তারা সেই **জমৎ-অগ্নি (জমদগ্নি)** বা 'জমা-অর্থের মালিক' নষ্ট-**ব্রাহ্মণে**র কাছেই হাত পাতে, কিন্তু পায় না। তখন তারা ঐ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, ক্রোধান্বিত হয়, ব্রাহ্মণদের সম্পদ কেড়ে নিতে শুরু করে। ব্রাহ্মণরা অগত্যা 'ভূগর্ভে' বা মাটির তলায় সম্পদ লুকিয়ে রাখতে শুরু করে। ভারতে মাটির তলায় সম্পদ লুকিয়ে রাখার সেই অভ্যাস আমরা ১৯৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দেও একটু আধটু দেখেছি। এখন তো সেই 'ভূগর্ভে'র বিপুল বিকাশ ঘটেছে এবং তা পরিণত হয়েছে 'সুইস ব্যাঙ্কে'। ...

● **হীরা** : দ্র. **অনাবিল**, **বিল**। দ্র. 'হীরের টুকরো ছেলে' — আমাদের 'চ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

● **হৃষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : সহর্ষ, হরখ, হরখনি, হরখি, হরখিত, হরষ(স), হরষিত, হরিষ(স), হরিষ-বিষাদ, হর্ষ, হর্ষক, হর্ষকর, হর্ষকীলক, হর্ষগদগদ, হর্ষগর্ভ, হর্ষচল, হর্ষজ, হর্ষজড়, হর্ষণ, হর্ষনাদ, হর্ষনিস্বন, হর্ষবিবর্দ্ধন, হর্ষবিষাদ, হর্ষবিহ্বল, হর্ষভাক্(জ্), হর্ষমাণ, হর্ষযুক্ত, হর্ষশোক, হর্ষসমন্বিত, হর্ষসম্পুট, হর্ষস্থাণু, হর্ষস্থান, হর্ষস্বন, হর্ষাকুল, হর্ষাতিশয়, হর্ষান্বিত, হর্ষাবিষ্ট, হর্ষাশ্রু, হর্ষিণী, হর্ষিত, হর্ষী, হর্ষুল, হর্ষোৎকর্ষ, হর্ষোদয়, হিষর, হিসর, হীহী, হৃষ্, হৃষিত, হৃষীক, হৃষীকনাথ, হৃষীকেশ, হৃষীকেশ্বর, হৃষ্ট, হৃষ্টচিত্ত, হৃষ্টচেতন, হৃষ্টচেতাঃ, হৃষ্টতনুরুহ, হৃষ্টপুষ্ট, হৃষ্টবদন, হৃষ্টমনাঃ, হৃষ্টমানস, হৃষ্টরূপ, হৃষ্টরোমা, হৃষ্টি, হেষ্, হেষ, হেষণি, হেষা, হেষাণি, হেষানি, হেষিত, হেষী, হেষ্ট, হ্রেষ্, হ্রেষ, হ্রেষণি, হ্রেষা, হ্রেষিত, হ্রেষী(ষিন্), হ্রেষুক।

● **হৃষ্** = আবর্তনশীল হরের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **হৃষ** = আবর্তনশীল হরের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে।

● **হৃষ্টপুষ্ট** : দ্র. **পুষ্ট**।

● **হ্রু (হ্রস্, হ্রী) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতিহ্রস্ব, অহ্রী, অহ্রীক, হ্রদ, হ্রদক, হ্রদগ্রহ, হ্রদিনী, হ্রদী, হ্রস্, হ্রসিত, হ্রসিমা(মন্), হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান, হ্রসীয়সী, হ্রস্ব, হ্রস্বক, হ্রস্বকুশ, হ্রস্বগবেধুক, হ্রস্বগর্ভ, হ্রস্বজম্বু, হ্রস্বতণ্ডুল, হ্রস্বদর্ভ, হ্রস্বদা, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান, হ্রস্বপত্রক, হ্রস্বপ্রক্ষ, হ্রস্বফল, হ্রস্বমূল, হ্রস্বশাখাশিফ, হ্রস্বা, হ্রস্বাঙ্গ, হ্রস্বৈরণ্ড, হ্রস্বোপধ, হ্রাদ্, হ্রাদ, হ্রাদিনী, হ্রাদী, হ্রাস, হ্রাসক, হ্রাসন, হ্রাসনীয়, হ্রাসবৃদ্ধি, হ্রিণীয়া, হ্রিত, হ্রী, হ্রীকা, হ্রীকু, হ্রীজিত, হ্রীণ, হ্রীত, হ্রীদণ্ড, হ্রীনিরাস, হ্রীনিষেব, হ্রীপদ, হ্রীপরিণত, হ্রীবের, হ্রীবেল, হ্রীবেলক, হ্রীভয়, হ্রীভর, হ্রীমান(মৎ), হ্রেপণ, হ্রেপিত, হ্রীমূঢ়, হ্রীযন্ত্রণা।

● **হ্রু (হ্রস্, হ্রী)** = হরের রক্ষণ যাহাতে। **হ্রস** = হরের রক্ষণের নির্য্যাস যাহাতে। **হ্রী** = **হ্রু**-র গতিশীল আধার যে।

● **হ্লাদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : আহ্লাদ, আহ্লাদক, আহ্লাদকর, আহ্লাদন, আহ্লাদিত, আহ্লাদী, আহ্লাদে, কহ্লার, দ, দহ, প্রহ্লাদ, হ্লাদ্, হ্লাদ, হ্লাদক, হ্লাদজনন, হ্লাদন, হ্লাদনীয়, হ্লাদিনী, হ্লাদিনী-শক্তি, হ্লাদী।

● **হ্লাদ্** = হর-লালনের আধারের দান। **হ্লাদ** = হর-লালনের আধারের দান যাহাতে।

● **হ্ব (হ্বল্, হ্বে) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অবিহ্বল, আহব, আহবন, আহবনীয়, আহবী, আহাব, আহুড়, আহূত, আহূয়, আহূয়ন, আহূয়িতব্য, আহ্বা, আহ্বান, আহ্বায়, আহ্বায়ক, আহ্বায়িতব্য, বিহ্বল, হ্ব, হ্বল, হ্বান, হ্বে।

● **হ্ব (হ্বল্, হ্বে)** = হর-বহন করে যে। **হ্বল** = হর-বাহকের লালন-লয়ন যাহাতে। **হ্বে** = হর-বাহক দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

● **হ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা** : (হৈ = হিঃ, ঃ = হ, ঘ = হ, ধা = হ, ভূ = হ, স = হ, স্থ = হ), অহ, অহে, অহো, আহা, আহে, আহো, আহোপুরুষিকা, ওহো, হ, হইতে (হতে, হনে, হন্তে, হানে, হান্তে), হইহই (হয়েছি-হয়েছি!), হওন, হওয়ন, হওয়া, হং, হঁ, (হাঁ, হ্যাঁ), হক, হক-আদায়, হকচকা, হকার, (hawk, hawker) হকদার, হ-কার, হকিকৎ (হকীকত), হকিম (হকীম, হেকিম), হকিয়ৎ, হকুক (হুকুক), হক্ক (হক্কহক্ক), হক্‌ক, হজ, হজম, হজমী, হজরত, হজার (হাজার), হজিমৎ, হজুৎ, হঞ্জি, হঞ্জিকা, হঞ্জে, হন্দর, হপুষা (হবুষা), হফীজ, হফসট, হম্ (হং, হরিচরণ একে 'রোষোক্তি' বলেছেন। কার্যত, এ হল খানিকটা দর্পের সঙ্গে বলা 'আমরা আছি!' অনেক বেশি হয়ে গেলে হয় 'হুম্', সেই হুম বেরিয়ে বাইরের অস্তিত্বগুলিকে তার অস্তিত্ব জানালে হয় 'হুঙ্কার'।), হম (মহ, এই হম বা মহকে 'না' করে দিলে হয় অহম; যৌথমানুষ ভেঙে তখন একক মানুষ বা 'আমি'র জন্ম হয়। তখন অহম্-কারও হুঙ্কার হয়ে ওঠে।), হমার, হমি, হম্বা (হম্ বাহক বলে, এটি 'পণ্যবাহকের ডাক'ও বটে। তাই হম্বারবই গোরব।), হম্বারব, হম্ভা, হুম, হুম্মা (সংস্কৃত যাকে ওঁ শব্দে শনাক্ত করে, আরবী সম্ভবত তাকেই 'হুম্মা' শব্দে

চেনে।), হ-য-র-ল-ব, হর, হরকচম, হরকৎ, হরকরা, হরকারা, হরকিসম, হরকিসিম, হরদম, হরগিজ, হরঘড়ি, হরতন, হরতাল, হরদম, হরফ (হরপ), হররাব, হরবিরূ, হরবোলা, হল, হল (শল) হলক, হলকা, হাতিহলকা, হলপ, হলফ, হলফনামা, হলোপ (হ-লোপ), হল্কা, হহা, হাইকোর্ট, হাইফেন, হাউস, হাঁ, হাঁই, হাঁ-হাঁ, হাঁ-হে, হাসপাতাল (হাসপাতাল, অস্‌পতাল), হাকিম, হাকিমান, হাকিমি (হাকিমী, হাকীম, হাকীমী, হেকিম, হেকিমী), হাজ, হাজরা, হাজরে, হাজা, হাজাম, হাজা-মজা, হাজামত, হাজার, হাজারি(রী) হাজারো, হাজা-শুখা, হাজি(জী), হাজির (হাজীর), হাজির-জবাব, হাজিরা, হাজিরি(রী), হাজ্‌রে, হাঞ্জি, হানফেনে (আনপান), হাপ, হাফ, হাফ-আকড়াই, হাফ-গিনি, হাফ-চাপকান, হাফ-ছুটি, হাফ-টিকিট, হাফটোন, হাম, হামজাম, হামজ্বর, হামলা, হামানদিস্তা, হামাম, হামার, হামি, হার (হর, প্রত্যেক), হারকাত (হরকত), হারহূণ, হারাম, হারামখোর, হারামখুরি, হারামজাত, হারামজাদ, হারামজাদকি, হারামজাদগী, হারামজাদা, হারামজাদী, হারামদ্‌, হারিকেন, হারমোনিয়াম, হালাক, হালাল, হাল্লাক, হাসদ্‌, হাসিল, হিং, হিঃ, হিকমত, হিকমতী, হিজড়া, হিজড়ে, হিজরা, হিম্মত, হিপ্‌, হিবানামা, হিবুক, হিমাইত, হিরাকশ, হিসাব (লতা-নিকষা, হিসাব-নিকাশ), হিসাব-কিতাব, হিসাব-নিকাশ, হিসাবানা, হিসাবী, হিস্যে, হিস্‌সা, হিস্‌সাদার, হুদা, হুর্দ্দা, হুদ্দো, হেংনামা (হ্যাংনামা), হেঁকাতে, হেঁজ, হেঁজা, হেকমত, হেকমতী, হেকাত, হেকাতে, হেড়েড়ুড়ু, হেগুনোট (হ্যাণ্ডনোট), হেনা, হেপাজাত, হেমাত, হৈ, হৈড়িম্ব, হৈতে, হৈরত, হৈ-হৈ, হৈ-হৈ রৈ-রৈ, হো, হোই-হোই, হোঃ-হোঃ, হোঁপা, হোতে, হোনে, হোন্তে, হোমিওপ্যাথি, হোলমোজা, হো-হা, হো-হো, হোহৌ, হৌ, হৌজ, হৌত-মৌত (আয়ুঃ-মৃত্যু), হৌস, হ্নব, (অপহ্নব, পহ্নব, পহ্লব, পহ্লবন্‌,), হ্ন‌ত, হ্ন‌তি, হ্যঃ, হ্যস্তন, হ্যস্ত্য,

● **হওন, হওয়ন, হওয়া** : দ্র. **অনুভব, ভব, ভবন**।

● **হইতে (হতে, হনে, হন্তে, হানে, হান্তে)** : দ্র. **অপেক্ষা, থেকে, চেয়ে**।

● **হলকা** : দ্র. **ঝল, ঝলকা**।

পরিশিষ্ট ২

খসড়ার আরও কিছু অংশ

(কথা ছিল, **পদবী** নিয়ে পৃথকভাবে একটি অধ্যায় করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কেন হল না, সেসব কথা আমরা 'পরিশিষ্ট ৪'-এ বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি। কিন্তু যে খসড়া করা হয়েছিল, তার যেটুকু কারও কারও কাজে লাগতে পারে, এখানে সেটুকু রেখে যাওয়া হল।)

পদবী : **১.** ✓পদ্ + অবি - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাহা দ্বারা পদ সক্রিয়ভাবে বাহিত হয়, তাহার আধার।* **৩.** মার্গ, পথ, কর্ম্মমার্গ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, অধিকার, পদ, পদপরিমিত স্থান, উপাধি (title), বংশসূচক শব্দ (surname), গুণবিদ্যাজন্য উপনাম। (ব.শ.)। **৪.** 'বংশসূচক শব্দ' রূপে প্রচলিত। **৫.** সমাজসদস্য রূপে মানুষ সমাজের যে **পদে** বা অবস্থানে ছিল বা থাকে তদনুসারে তার **পদবী** হত। যে ব্যক্তি ঘোষণার দায়িত্ব পালন করত তার **পদবী** হয়ে যায় **ঘোষ**, যে ব্যক্তি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করত তার **পদবী** হয়ে যায় **সরকার**, যে ব্যক্তি রাজকোষ দেখাশোনার দায়িত্বে থাকত, তার **পদবী** হয়ে যায় **অর্ণব** ... এইরকম অজস্র। এ বিষয়ে একটি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়, তার নাম 'সম্বন্ধনির্ণয়'। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, তাতে যা লিখিত আছে, তার বাহ্যিক অর্থ অনুধাবন করেই এ বিষয়ে বিস্তর ভুল করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা বাংলাভাষীদের পদবী সম্পর্কে মানুষকে অত্যন্ত ভুল পথেই পরিচালিত করেছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে **পদবী**-শব্দগুলির ভিতর থেকেই আমরা সেগুলির যথাযথ অর্থ পেয়ে যেতে পারি। কেননা, মূল যে কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হল, সেকালে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে কেবলমাত্র তার ক্রিয়া দিয়েই শনাক্ত করা হত। ফলে প্রতিটি শব্দই তার ভিতরে কোনো না কোনো এক বা একাধিক ক্রিয়াকে ধারণ করত, তা সে ব্যক্তিনামের শব্দ হোক, তার **পদবীর** শব্দ হোক, তার গ্রামের নাম হোক। ফলত, ব্যক্তিনামের পদবী ও স্থান নাম ছিল সেই সেই ব্যক্তির বা স্থানের ক্রিয়াশীলতার দ্যোতক। ফলে, স্থাননামের ভিতরেই স্থানের বিশেষত্ব বা ক্রিয়াশীলতার কথা ধরা থাকত এবং **পদবীর** ভিতরেই ধরা থাকত ব্যক্তির ক্রিয়াশীলতার কথা। **পদবী**ধারী ব্যক্তিটি কী করেন, তার খবর পাওয়া যেত তাঁর নামের **পদবীর** ভিতরেই। আমরা সেভাবেই **পদবী**গুলির অর্থনিষ্কাশন করে এখানে উপস্থাপন করতে চাই।

তদনুযায়ী নিম্নে **পদবী**গুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে তাদের অর্থ নিষ্কাশন করার চেষ্টা করা হল। মূল কোষে যে সকল **পদবী**-বাচক শব্দের অর্থ ইতোপূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেগুলিতে দ্রষ্টব্য লিখে শব্দটি এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন '**দ্র. গৌড়**'। এই কথাটির মানে, **গৌড়ীয়** ব্রাহ্মণদের **পদবীর** অর্থ মূল কোষে **গৌড়** শব্দেই পাওয়া যাবে।

তবে এগুলি করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে (১) মানুষ তার গৌরবের **পদটিকেই** নিজের নামের শেষে জুড়ে নিয়ে বহন করে চলতে পছন্দ করেছে, সেই অনুযায়ী অধিকাংশ **পদবীই** তাদের সূচনা লগ্নে অত্যন্ত গৌরবজনক ছিল। যেমন **দাস, দাশ, মণ্ডল** ... প্রভৃতি। এঁদের চেয়ে গৌরবজনক মানুষ সেকালের সমাজে আর কেউই ছিলেন না। অথচ পরে এঁরা সমাজপরিচালকদের দ্বারা অধঃপতিত ঘোষিত হয়ে যান। দ্র. **দাশ, দাস**।

(২) রাজার বা সমাজের দেওয়া গৌরবজনক উপাধিকেও লোকে **পদবী** করে নিয়েছেন। এবং তা যথারীতি উত্তরসূরিদের দ্বারা বাহিত হয়েছে।

(৩) সনাতন যুগ থেকে মহর্ষিদের নামের চলন হয় এবং প্রত্যেক মহর্ষির অনুসারী সম্প্রদায়ের নাম সেই মহর্ষির নামেই হত। অধিরাষ্ট্রে মানুষের অবস্থান অনুসারে **পদবীর** ভ্রূণাবস্থা তখনই দেখতে পাওয়া যায়। **পৃথু** বা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে আসীন মানুষদের নামে তাদের পদানুসার **পদবীর** চল হয় কিন্তু তাও সে ছিল **পদবীর** সূচনা মাত্র। বৌদ্ধযুগে এসে এই নামকরণ বাহ্যিক নামে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মুঘল যুগে আরবি ফারসি ভাষা থেকে সরকারি পদের নামকরণ হয় এবং ফলত সেই সকল পদে অভিষিক্ত ব্যক্তিদের নামে **পদ**-অনুসার **পদবী** জুড়তে থাকে। একালে সেই উত্তরাধিকারও আমরা হারিয়েছি। অর্থহীন নামই এখন আরাধ্য।

(৪) বিশ্বের সব জাতির নামেরই মানে ছিল। আরবি ফারসি নামেরও ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। আমরা যতবেশি আধুনিক হয়েছি, তত মানে হারিয়েছি। ফলে একালে 'মানে'র কোনো প্রয়োজন নেই, মানেও নেই।

অগস্তি। (সূর্য্যনারায়ণ অগস্তি)। **আইচ, আদিত্য**।

অর্ণব। এর গোত্র **বৈয়াঘ্রপদ্য**। দ্র. **ব্যাঘ্র**। অর্ণ (স্বর্ণ) বহন করে যে। রাজকোষ সামাল দেয় যে।

কর্ম্মকর (তেলাকুচা, বিম্বিকা - রামপ্রসাদ - জলে জন্মায় জলেই লয়। কর্ম্মকর জলে জন্মায় জলেই লয়? নাকি পরমাত্মার শিশিরবিন্দু রূপ?)। **কর্ম্মকার**। **কান**। মধু কান। দ্র. **কানাই, কানু**।

কায়স্থ, কায়স্থা। (আমলকী, হরিতকী)। দ্র. **কায়স্থ**।

কুণ্ডু। দ্র. **কুণ্ড**।

গুড়, মুচিরাম গুড়, গুড়িয়া, গুড়িয়া দ্র. **গুড়**।

গোল, গোলদার। দ্র. **গোল**।

গোস্বামী (গোঁসাই, গোসাঞী) : **১.** গো + স্বামী। **২.** *যিনি গোগণের **স্বামী**; অথবা, যিনি গোগণের অস্তিত্বের বাহক-'আমি'-ধারী)।* **৩.** গোরুর অধিকারী, গোপ্রভু, ইন্দ্রিয়ের প্রভু, জিতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়তা হেত বৈষ্ণব যতির উপাধিবিশেষ। দ্র. **গোস্বামী**।

গুপ্ত, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, করগুপ্ত। দ্র. **চিকিৎসক**। বঙ্গদেশে বদ্যিদের অনেকেই **গুপ্ত** পদবী ধারণ করেন।

দ্র. **গৌড়**, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। অমুক গ্রামে জন্ম কথাটি মানসলোকের গ্রাম, বাহ্যগ্রাম নয়।

ঘাটী, হাটী, ঘড়ই, ঘোড়ুই। দ্র. **ঘাটী**। **ঘোষ, ঘোষাল**। ঘোষ বংশের সঙ্গে দানধ্যানের ঘোষণা থাকতে পারে।

দ্র. **চক্র — চক্রবর্ত্তী, চাকলাদার। চোবে, চৌবে (চৌবেদী) চৌধুরী, চট্ট, চট্টরাজ, চতুর্বেদী।**

যথা — চট্ট + উপাধ্যায় = চট্টোপাধ্যায়, মুখ + উপাধ্যায় = মুখোপাধ্যায়, গঙ্গা + উপাধ্যায় = গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দ্য + উপাধ্যায় = বন্দ্যোপাধ্যায়। শব্দার্থ অনুসারে এই **উপাধ্যায়**গণ মূলত তাঁরাই, শিক্ষকতাই যাঁদের পেশা ছিল। এদের সাধারণ পদবী ছিল **ঝা** এবং **ওঝা**। উত্তর বিহার, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণের পদবী এই **ঝা** এবং **ওঝা**। কৃত্তিবাসের পদবী ছিল **ওঝা**। ঐ বংশের লোক বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা সব এখন মুখোপাধ্যায় বা মুখুজ্যে লেখেন। **চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, মুখুজ্যে** এঁরা সবাই **ওঝা**। উপাধ্যায় থেকে **ওঝা**, মুখ-উপাধ্যায় = **মুখ-ওঝা** = **মুখুজ্যে**। ভারতে ইংরাজ আগমনের পর এই পদবীগুলি যথাক্রমে ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, মুখার্জি, গাঙ্গুলি-তে বদলে গেছে।

চাটুতি, চাট্যাতী। চম্পটী, ঝম্পটী, জানা।

ডিঙ্গসাই (ডীউসাঁই) = রাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্রের গাঁই। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহর্ষপুত্র 'জন' ডিঙ্গী (ডিংসাই) গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বংশীয়েরা ঐ উপাধিতে পরিচিত। এই গ্রাম কথাটি দুরকম অর্থে গ্রহণ না করলে ভুল হবে।

তরফদার। 'পক্ষাবলম্বী', যে তালুকের পক্ষে রাজস্ব আদায় করে। **তামলি, তামলী**। দ্র. **তাম্বূল**। **তলাপাত্র** — রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি। **তৈলবাটী**। তোড়ী তোদি তোড়লমল্ল, তোড়ভাঙ করে, স্ক্র্যাপডিলার। তেওয়ারি, **তেওয়ারী** — **ত্রিবেদী**। তিন-দুয়ারীকেও তেওয়ারি বলে। **ত্রিপাঠী**। ত্রিবেদী।

দণ্ডপাট। দাঁ। দলই (দলুই, দোলই, দলধী থেকে। যেমন পালধী থেকে পালই)। দ্র. **দল**। দেব, ব্রাহ্মণের উপাধি, কায়স্থের উপাধি। **দে** - শূদ্রের উপাধিবিশেষ। **দুয়ারী**। **দাশ**ও বৈদ্যজাতির উপাধি। দ্র. **দাশ**। **দাস** শূদ্রের উপাধি।

দত্ত - দ্র. **দত্তাত্রেয়**। আবার কায়স্থ দত্তরা বলে 'দত্ত কারও ভৃত্য নয়'। **ঘোষ** পদবীটি উচ্চশ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে খুব পাওয়া যায়, তেমনি সদ্‌গোপ বর্ণের মধ্যেও **ঘোষ** পদবী প্রায়শই দেখা যায়।

দীক্ষিত। দ্র. **দীক্ষা**। **দ্বিবেদী**।

ধর। **নাগ**। কায়স্থের উপাধি = **নাগ** = **তাম্বুলী?** দ্র. **নাগ**।

নাথ, দেবনাথ। দ্র. **নাথ**। **নায়েক, লায়েক**।

নন্দী। কায়স্থ, নাগ।

পট্টনায়ক। পট্। পণ্ডিত। পলসাঁই, পলসাঞি।

পাঠক। **পাত্র, পাল, পালিত, পোতদার, পোদ্দার**। দ্র. **পাত্র**। এই **পাত্র, পত্রী, পত্রনবিশ, মহাপাত্র** — এসবই রাজকর্মচারীর পদ থেকে এসেছে।

পাঁজা। দ্র. পঞ্জ। প্রতীহার, পূর্ব্বগাঁই।

পারিখ (পারেখ?)। পারি করণ করে যে, পারেখ = মাঝি? নাকি 'পরিখা-খননকারী'?

পারিয়াল। **পোড়েল**। দ্র. **পারিজাত**।

বটব্যাল, বড়াল। দ্র. **বট**। বটগাছের **ব্যাল**। আদিতে তাঁরা ছিলেন বটব্যবস্থার রক্ষক। দ্র. **বটবৃক্ষ**। অন্যদের পক্ষে ভয়ানক, কিন্তু সেই ব্যবস্থার আশ্রয়ে আশ্রিতদের পক্ষে দেবতাস্বরূপ। কিন্তু পরে পরে সেই সুনাম আর থাকে না। তখন **বটব্যাল** কথাটি নিন্দার্থক হয়ে যায়। তখন তাঁরাও বটব্যালকে বদলে নেন **বড়াল**-এ। মনে রাখা ভাল, গ্রামবাংলায় বটগাছকে বড়গাছও বলে। কেউ কেউ এই সব না দেখেশুনে বোড়া গ্রাম থেকে বোড়াল, কুশো গ্রাম থেকে কুশারী ... এইরকম কথাবার্তা বলে থাকেন। এগুলি একেবারে ঠিক নয়। সুনীতিবাবু নাকি বলতেন হিন্দি ভাষার 'জী' শব্দ থেকে চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে ... ইত্যাদি **পদবী** তৈরি হয়েছে। এসব ঠিক কথা নয়। আসলে ভারতবর্ষের ইতিহাসটাও ঠিকঠাক জানা দরকার। পুরাণাদি পড়তে ভুলে যাওয়ার কারণে এসব ঘটেছে।

বড়ুয়া দ্র. **বড়**। বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁড়ুয্যে — দ্র. **বণ্ড**। তাছাড়াও পৃথক ভুক্তি **বন্দ্য**তে এটি বিস্তারিত করা আছে।

বসু পদবীর সূত্রপাত সমাজে **বসু**দের আবির্ভাবের পর থেকে। এঁরা প্রথম **বিধাতার** বিপরীতে **মান্ধাতার** মতাবলম্বী, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবাদী।

বরাট। বর্দ্ধন (বর্ধন)। দ্র. **বশিষ্ঠ**।

বাগদি, বাগদী। (বাক্ বা বাগ দান করে যে। কাল এই মাছ এনে দেব? নাকি সত্যঙ্কার করত বলেই তাদের বাগদী বলা হত? এরাই আদি ব্যবসায়ী?)

বাজপেয়ী (দ্র. **বজ্**), খানিকটা করে দেওয়া আছে। **বেদী**।

ভক্ত, ভকত। দ্র. **ভক্ত**।

ভঞ্জ। দ্র. **ভঞ্জ**।

ভদ্র। **ভদ্র** শব্দতেই করা আছে।

মণ্ডল দাশ-এর মতোই প্রাচীন পদবী। পরে তাঁদের অধঃপতিত ঘোষণা করা হয়।

মজুমদার, মজ্‌মুআন্‌দার

মল্লিক নামের সঙ্গে **মাল**পত্রের বা **পণে**র সম্বন্ধ ছিল গভীর।

মাইতি, মাহাত। দ্র. **মাহাত**।

মিত্র পদবীটি রহস্যময়। দ্র. **মিত্র**।

মিশ্র। দ্র. **মিশ্র**।

সেন। তরণীসেন। সেনা। সেনগুপ্ত।

সৎপথী।

পরিশিষ্ট ৩

খসড়ার রেখাচিত্র অংশ

পাণ্ডুলিপির এই অংশগুলির কাজ করা হয়েছিল ২০০৭-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে। তার দু-একটি ব্যবহৃতও হয়েছে। বাকি যা ছিল, সেগুলি যেমন ছিল, সেরকমই এখানে দিয়ে দেওয়া হল। এর বয়ানগুলিও তখনই লেখা হয়েছিল।

একালের সব ভাষায়, এমনকি প্রচলিত আধুনিক বাংলা ভাষাতেও, যে নিয়মে শব্দের অর্থ জানানো হয়, তা নিম্নরূপ:

পদ = (চরণ)

foot = (leg)

এই foot কথাটি শুনলে একজন ইংরেজিভাষীর মানসচক্ষে যে বস্তুটির ছবি ভেসে ওঠে, পদ কথাটি শুনলেও একজন বাংলাভাষীর মানসচক্ষে সেই একই জিনিসের ছবি ভেসে ওঠার কথা। সেকারণে যাঁরা দুটো ভাষাই জানেন, তাঁরা বলেন — foot বা leg মানে পদ বা চরণ। প্রচলিত অভিধান বা শব্দকোষগুলিতেও সেই অনুসারে শব্দের অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই শব্দকোষে শব্দের অর্থ সেভাবে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে এই ভাবে:

পদ =



ক্রিয়া একটিই। একজন পান করাচ্ছেন, অপরজন পান করছেন। তাকে দাতার দিক থেকে দেখলে পালন করা বোঝায়, গ্রহীতার দিক থেকে দেখলে পান করা বোঝায়। সেকারণেই ক্রিয়াটি হল 'প দান থাকে যাহাতে'। একে আমরা 'পান বা পালন দেয় যে', এভাবেও লিখতে পারি। এই পান বা পালন যে যে দেয়, তাদের প্রত্যেককেই 'পদ' শব্দে উল্লেখ করার রীতি আমাদের বাংলাভাষায় আজও রয়েছে। এখানে মাত্র ষোলোটি সত্তাকে ছবির মধ্যে দেখানো হল। এ বাদে আরও অনেকে পান বা পালন দান করে থাকে। যেমন উপপদ, প্রতিপদ, পদ্মের পদ, অক্ষপদ, বিপদের পদ ... এরকম আরও অনেক সত্তা রয়েছে।

এরকম হওয়ার কারণে এই পদ শব্দে আমাদের মানসচক্ষে কোনো বিশেষ সত্তার ছবি ভেসে ওঠে না। বড়জোর কেউ একজন কাউকে কিছু দিচ্ছে ভাবতে পারি, কিন্তু কে দিচ্ছে, তা আমরা জানতে পারি পুরো প্রেক্ষিতটি জানলে। কবিতার চরণ বা পদগুলি কবিতার ভাবকে পালন দান করে, তাই সেগুলি পদ। রাজকর্মচারীদের পদগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রব্যবস্থা-রূপ পাপড়ি দিয়ে সাজানো পদ্মের স্বরূপটি। এই পদ শব্দে তাই এদের প্রত্যেকেই বোঝায়। যখন যেরকম প্রেক্ষিত, তখন উপরোক্ত সত্তাদের যে

কোনো একটি যথোপযুক্ত সত্তাকে পদ শব্দটির অর্থ রূপে বোঝানো যাবে। আর তাই হতও। প্রাচীনকালের মানুষ এই নিয়মেই শব্দের ব্যবহার করতেন। সেই শব্দই ক্রমে তার সমস্ত অর্থ হারিয়ে বর্তমানে একার্থবাচক হয়ে গেছে। আমরা আধুনিক ইংরেজি ভাষার 'একটি শব্দের একটি অর্থ' নিয়মের প্রচণ্ড প্রভাবে আমাদের অধিকাংশ শব্দের হাত-পা ডানা ছেঁটে সেগুলিকে একার্থবাচক করে নিয়েছি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেটি করা যায় নি। যেমন এই পদ শব্দটি। এটি এখনও তার আদি রূপেই কমবেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। সেকালের ভারতে মহর্ষি-পরিচালিত সম্প্রদায় কৃষিকাজ করে তা দিয়ে সবাইকে পালন দান করত। তাই তাদের বলা হত সমাজদেহের 'পদ' বা বা 'পা'। ইংরেজিভাষীরা এই অর্থটিকে ধরে রেখেছেন তাঁদের pad, paddy, pod প্রভৃতি শব্দে। এর সঙ্গে তাঁরা নানাভাবে 'পা' বা foot-কেও বুঝিয়ে থাকেন। যদিও কেন তাঁদের pad, paddy, pod প্রভৃতি শব্দের ওরকম মানে, তার প্রায় সবকথাই তাঁরা ভুলে গিয়েছেন। যদিও আদিতে তাঁদের পূর্বপুরুষ ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে একই পদ শব্দ তার সমস্ত অর্থসহ ব্যবহার করতেন, সে বিষয়ে আজ আর আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নাই।

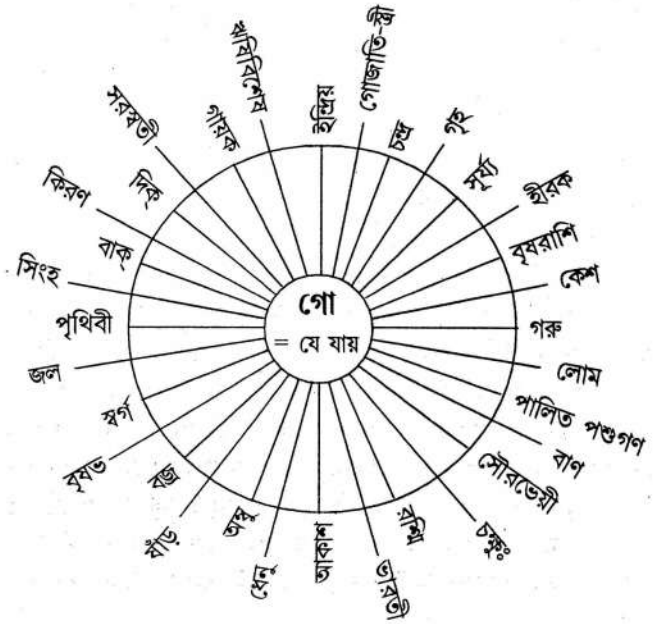
মনে হতে পারে, এ তো ভারি জটিল ব্যাপার। হ্যাঁ, ১০০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকেই ভাষার এই রূপটিকে ভারি জটিল মনে হয়েছে। যেকারণে আলবিরুনি ভারতে এসে আমাদের ভাষার এই স্বরূপ দেখে যথেষ্ট আপত্তি তুলেছিলেন। একটি শব্দের এত অর্থ, আবার, একটি বস্তুকে বোঝাতে বহু শব্দ — এ রকম ভাষা নিয়ে মানুষ কাজ চালায় কেমন করে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু বাস্তব হল, এরকম ভাষাতেই মানুষ কাজ চালাত। অন্তত চারটি ক্ষেত্রে আমরা এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাচ্ছি। এক) প্রাচীন ভারতের লেখা বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ; দুই) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য — বৈষ্ণবসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাস-কাশীরামের রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি; তিন) প্রাচীন ইয়োরোপের পৌরাণিক কাহিনী — ইলিয়ড ওডিসি-সহ সমস্ত মাইথলজি; চার) প্রচলিত বাংলাভাষার ভিতরে, বিশেষত গ্রামবাংলার ও বাংলাভাষী মেয়েদের ভাষায় শব্দের ব্যবহারে। সুতরাং, এ ভাষা যে ব্যবহারযোগ্য ছিল, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নাই।

কীভাবে এই জটিল ভাষাব্যবহার মানুষ করে থাকে, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে কেবল এটুকুই বলে রাখা যেতে পারে, মানুষের মনের ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের ধারণা অতি অল্প। নেচার জীবের ভেতর যে সমস্ত মেধাশক্তি দিয়ে রেখেছে, তার প্রায় কিছুই এখনও আবিষ্কার করা হয়নি; যা হয়েছে তা একেবারেই নগণ্য। যে মেধা গণিতের শূন্যের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, সুর ও ভাষার সৃষ্টি ও তার বহন সেই মেধার কাছে অসম্ভব ছিল না। এর অধিক বলা এখন নিষ্প্রয়োজন।

শব্দের ভিতর থেকে অর্থ নিষ্কাশনের মোট চারটি উপায় এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম — শব্দের গর্ভে বা মূলে যে ক্রিয়া আছে, তার থেকে। এর জন্য সবার আগে শব্দটির ভিতরে যে ক্রিয়াপদটি রয়েছে, সেটিকে খুঁজে বার করতে হয়। তারপর প্রত্যয়াদি যোগে ক্রিয়াটি কোন কাজের কথা বলে, তার সন্ধান করতে হয়। অতঃপর যে যে সত্তা সেই ক্রিয়ার ক্রিয়াকারী তাদের সন্ধান করতে হয়। সেই ভাবে নীচে 'গো' শব্দটিকে ও তার দ্বারা শনাক্ত সত্তাগুলিকে দেখানো হয়েছে।

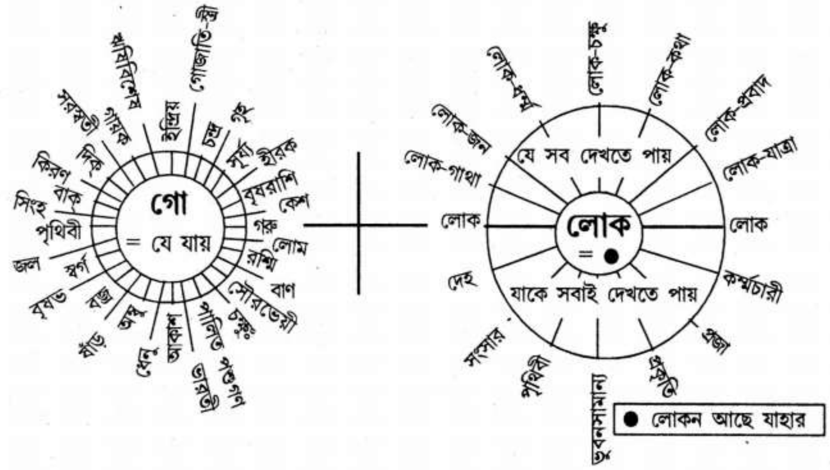
১. শব্দগর্ভ উন্মোচন —

গো = গ্ + অ + উ = যে যায়।



দ্বিতীয় উপায় হল, সন্ধি। তার দ্বারা যে শব্দটি তৈরি করা হয়েছে, তেমন শব্দের ভেতরে কোন ক্রিয়া কীভাবে সক্রিয়, তা দেখানো হয়েছে 'অজ' শব্দে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তা ছাপাও হয়েছে। তৃতীয় উপায় হল সমাস। তা দেখানো হয়েছে 'গোলোক' শব্দে। সবশেষে যেক্ষেত্রে এই তিন উপায়ে অর্থ নিষ্কাশন করা যায় না, সেক্ষেত্রে বর্ণটির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এগোতে হয়েছে। নিরুক্ত মতে এটিই শেষ উপায়। এতে একটি বর্ণ, সেই বর্ণের সঙ্গে প্রত্যয়াদি স্বরবর্ণ, ও তার সঙ্গে উপসর্গাদি যোগে শব্দটি কীভাবে বিকীর্ণ হয়, সংক্ষেপে তা দেখানো হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে 'হ' বর্ণটি। 'হ্ম' শব্দ দিয়ে সেটি দেখানো হয়েছে সবশেষে।

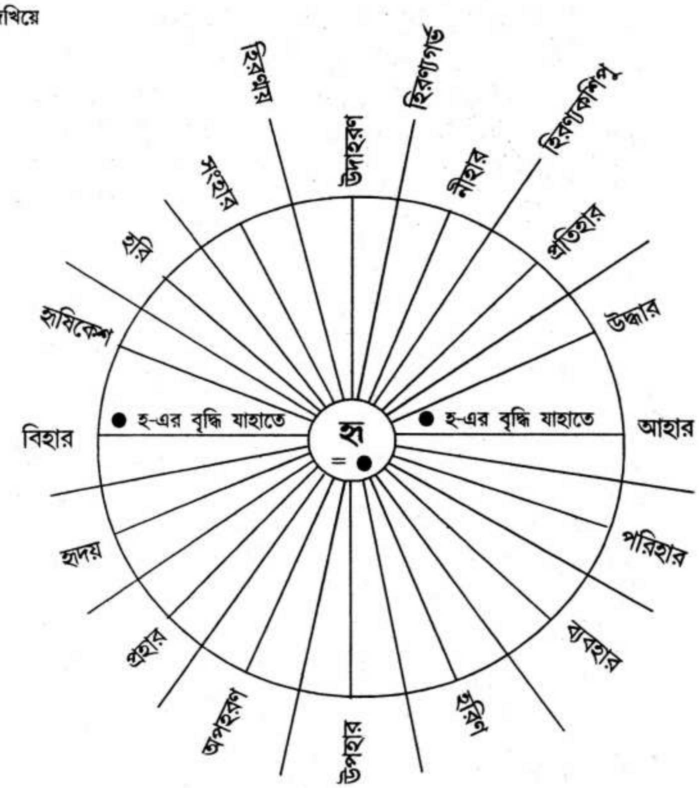
৩. সমাস : গোলোক = 'গো প্রচুর লোক'।
গো = যে যায়, লোক = লোকন আছে যাহার।
অতএব, গোলোক = যে-গামী (রা) সবাইকে দেখতে পায়,
এবং অথবা,
সবাই যে-গামী (দের)-কে দেখতে পায়।





কোনো কোনো ক্ষেত্রে কদাচিৎ প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীদের আরও একটি নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, তা হল বিপ্রভাষ। মা উ করে যে, সে হল উমা। হিংসা করে যে সে হল সিংহ। সো-অহং ভাবতে পারে যে, সে হল হংস। এরকম আরও কিছু আছে। এখানে সিংহ শব্দটির গর্ভ উন্মোচন করে দেখানো হল।

হৃ দিয়ে অজস্র শব্দ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি শব্দ দেখিয়ে বাকিগুলি রেখে দেওয়া হল, পাঠক খুঁজে খুঁজে ভরে নিতে পারবেন।



খচর

১. খ + ✓চর্‌ + অ - ক। (ব.শ.)।
২. খ-এ চরে যে।
৩. খেচর, আকাশচারী, শূন্যগামী, মেঘ, সূর্য্য, বায়ু, রাক্ষস, পক্ষী, গ্রহ, বিদ্যাধর, আকাশগামীমাত্র — দেবতা-শর-প্রভৃতি।







শব্দের উদ্ভব যেভাবে হয়, একালে তাকে ধন্যাত্মক শব্দ বলা হয়ে থাকে, যথা — ঝনঝন, পটপট, ঘরঘর, করকর ... ইত্যাদি। তার ভিতরে যে অর্থ থাকে, অর্থ নিয়েই সে ধন্যাত্মক শব্দ রূপে জন্মায়, একালের ভাষাতত্ত্বে তা স্বীকার করার অবকাশ নেই। কেননা, শব্দের ভিতরে অর্থ থাকার তত্ত্বটিই একালের ভাষাতত্ত্বে স্বীকৃত নয়। আমরা যতটুকু বুঝেছি, এ যেন এক প্রকার পিরিয়োডিক টেবিলের মতো ব্যাপার। তার মধ্যে কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিছু হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয় না বলেই ওরকম হয়। নীচে আমরা শব্দের সেই উৎসারণ প্রক্রিয়াকে দেখানোর চেষ্টা করলাম।

										করৌ
									করো	কারৌ
								করে	কারো	কিরৌ
							করৃ	কারে	কিরো	কীরৌ
						করূ	কারৃ	কিরে	কীরো	কুরৌ
					করু	কারূ	কিরৃ	কীরে	কুরো	কূরৌ
				করী	কারু	কিরূ	কীরৃ	কুরে	কূরো	কৃরৌ
			করি	কারী	কিরু	কীরূ	কুরৃ	কূরে	কৃরো	কেরৌ
		করা	কারি	কিরী	কীরু	কুরূ	কূরৃ	কৃরে	কেরো	কোরৌ
করকর্	কর	কারা	কিরি	কীরী	কুরু	কূরূ	কৃরৃ	কেরে	কোরো	কৌরৌ
		কার	কিরা	কীরি	কুরী	কূরু	কৃরূ	কেরৃ	কোরে	কৌরো
			কির	কীরা	কুরি	কূরী	কৃরু	কেরূ	কোরৃ	কৌরে
				কীর	কুরা	কূরি	কৃরী	কেরু	কোরূ	কৌরৃ
					কুর	কূরা	কৃরি	কেরী	কোরু	কৌরূ
						কূর	কৃরা	কেরি	কোরী	কৌরু
							কৃর	কেরা	কোরি	কৌরী
								কের	কোরা	কৌরি
									কোর	কৌরা
										কৌর

ক্ ক কং কা কি কী কু কূ কৃ কে কৈ কো কৌ কঃ

ক্ = করণ

ক = ক্ + অ = ক = করে যে, কারক। এ আধার মানসিক, উচ্চারণ সহায়ক মাত্র।

কং = ক্ + অং = কং = করে যে ং, ংরূপী কারক। এ কারক রহস্যময়।

কা = ক্ + আ = কা = করে যে, কারকের আধার। এ আধার বাস্তব।

কি = ক্ + ই = কি = বিকাশ করে যে, কারকের বিকাশশীল বা গতিশীল আধার। এ করণ বিকাশশীল-করণ। উদাহরণ — 'কা' বা 'কারক' যদি মাটি জড়ো করে, তবে তাতে জল দিয়ে তাকে কাদায় পরিণত করে যে, সে হল 'কি' বা 'গতিশীল বা সক্রিয় বা বিকাশশীল কারক'।

কী = ক্ + ঈ = কী = অতি বিকাশশীল কারক কিংবা সেরূপ গতিশীল কারকের আধার। কাদাকে কাদার তালে পরিণত করে যে।

কু = ক্ + উ = কু = নবরূপে উত্তীর্ণ কারক। উদাহরণ — যে চাকা ঘুরিয়ে কাঁচা মাটির কলসি বানায়। মাটি আর মাটি থাকল না। সাধারণত উ-কার পূর্ববর্তী কাজের চরিত্রকে প্রায় তার বিপরীতে নিয়ে চলে যায়।

কূ = ক্ + ঊ = কূ = নবরূপে উত্তীর্ণ কারকের আধার। রোদে শুকনো মাটির কলসি তৈরি করে যে।

কৃ = ক্ + ঋ = কৃ = আবর্তনশীল কারক। যে রোদে শুকনো মাটির কলসি আগুনে পোড়ায়।

কে = ক্ + এ = কে = দিশাগ্রস্ত কারক। যে পোড়া মাটির কলসি নিয়মিত বানায়।

কৈ = ক্ + ঐ = কৈ = দিশাগ্রস্ত কারকের আধার। যে পোড়া মাটির কলসি বানিয়ে জমা করে।

কো = ক্ + ও = কো = পূর্ণ কারক। যে (অ থেকে ঐ পর্যন্ত সব কাজ) করে।

কৌ = ক্ + ঔ = কৌ = পূর্ণ কারকের আধার। যে 'করেছি' বলে।

										গলৌ
									গলো	গালৌ
								গলে	গালো	গিলৌ
							গলৃ	গালে	গিলো	গীলৌ
						গলূ	গালৃ	গিলে	গীলো	গুলৌ
					গলু	গালূ	গিলৃ	গীলে	গুলো	গূলৌ
				গলী	গালু	গিলূ	গীলৃ	গুলে	গূলো	গৃলৌ
			গলি	গালী	গিলু	গীলূ	গুলৃ	গূলে	গৃলো	গেলৌ
		গলা	গালি	গিলী	গীলু	গুলূ	গূলৃ	গৃ লে	গেলো	গোলৌ
গল্‌গল্‌	গল	গালা	গিলি	গীলী	গুলু	গূলূ	গৃলৃ	গেলে	গোলো	গৌলৌ
		গাল	গিলা	গীলি	গুলী	গূলু	গৃলূ	গেলৃ	গোলে	গৌলো
			গিল	গীলা	গুলি	গূলী	গৃলু	গেলূ	গোলৃ	গৌলে
				গীল	গুলা	গূলি	গৃলী	গেলু	গোলূ	গৌলৃ
					গুল	গূলা	গৃলি	গেলী	গোলু	গৌলূ
						গূল	গৃলা	গেলি	গোলী	গৌলু
							গৃল	গেলা	গোলি	গৌলী
								গেল	গোলা	গৌলি
									গোল	গৌলা
										গৌল

গ্‌ গ গং গা গি গী গু গূ গৃ গে গৈ গো গৌ গঃ -

গ্‌ = **গমন**

গ = গ্‌ + অ = গ = যায় যে, গামী। এ আধার মানসিক, উচ্চারণ সহায়ক মাত্র।

গং = গ্‌ + অং = গং = যে ং যায়, ং-রূপী গামী। এ গামী রহস্যময়।

গা = গ্‌ + আ = গা = যায় যে, গামীর আধার। এ আধার বাস্তব।

গি = গ্‌ + ই = গি = বিকাশশীল গামী যে, গামীর বিকাশশীল বা গতিশীল আধার। এ গমন বিকাশশীল-গমন। উদাহরণ — 'গা' বা 'গামী' যদি শব্দ বা আওয়াজমাত্র হয়, তবে তাতে সুর মিশিয়ে তাকে সুরেলা শব্দে পরিণত করে যে, সে হল 'গি' বা 'সক্রিয় বা বিকাশশীল গামী'।

গী = গ্‌ + ঈ = গী = অতি বিকাশশীল গামী কিংবা সেরূপ বিকাশশীল গামীর আধার। সুরেলা শব্দকে ধারণ করে যে।

গু = গ্‌ + উ = গু = নবরূপে উত্তীর্ণ গামী। উদাহরণ — শব্দ দিয়ে অর্থপূর্ণ আওয়াজ বানায় যে। আওয়াজ তখন আর আওয়াজমাত্র থাকে না।

গূ = গ্‌ + ঊ = গূ = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর আধার।

গৃ = গ্‌ + ঋ = গৃ = আবর্ত্তনশীল গামী। অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়ে বাক্য গাঁথে যে।

গে = গ্‌ + এ = গে = দিশাগ্রস্ত গামী। অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়ে নিয়মিত বাক্য গঠন করে যে।

গৈ = গ্‌ + ঐ = গৈ = দিশাগ্রস্ত গামীর আধার।

গো = গ্‌ + ও = গো = পূর্ণ গামী। যে (অ থেকে ঐ পর্যন্ত সর্ব প্রকারে) যায়।

গৌ = গ্‌ + ঔ = গৌ = পূর্ণ গামীর আধার। যে 'গেছি' বলে।

সকল বর্ণের মূলে ং। এটি একটি বর্ণ, ধ্বনি, এবং এর অর্থ রহস্যময়। এখান থেকে এ বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে বিশাল বর্ণমালায়, ধ্বনিমালায়, অর্থমালায় পরিণত হয় এবং অবশেষে বিসর্গতে বিলুপ্ত হয়। তবে এর সূচনা হয় অ ই উ ঋ দিয়ে — তা সেগুলি ধ্বনি বটে, অর্থও বটে! সে কীরকম!

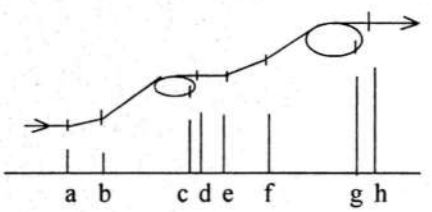
যতদূর বোঝা যায়, রহস্য থেকে বেরিয়ে প্রথম স্পষ্ট হয় টুনি বালবের 'এই জ্বলা, এই নেভা' দিয়ে। 'আমি হই, আমি হচ্ছি, আমি অস্তিত্ববান হয়েছি ...' — এইরকম তার মানে। এটিই **অ**।

অ যদি পর পর জ্বলতে থাকে, যেন সারি দিয়ে টুনি বালব ঝোলানো আছে, আর, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বালবগুলি এমনভাবে জ্বলল নিভল যে, মনে হল, যেন একটা জ্বলন্ত আলোর বিন্দু সাঁ করে ছুটে চলে গেল। এর অর্থ হল আমি যাই, আমি যাচ্ছি, আমি গেছি ...'। এটিই **ই**।

ই যদি ওপর দিকে মুখ করে উপরে উঠে গিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখে, এমনভাবে যদি বালবগুলি জ্বলে ওঠে, তখন তা আর **ই** থাকে না। সে বলে, 'দেখো, আমি যা ছিলাম, এখন আর তা নই। আমি বদলে গেছি। যা ছিলাম, তার উলটো, মাটিতে পড়ে নেই আমি, আমি উড়ছি, দেখো।' এই হল **উ**।

কিন্তু নীচের দিকে মুখ করলেই গতি তাকে ঠেলে নিয়ে যায়। তার থেকে বাঁচতে সে সামনেই পাক খায়, পুনরায় উপরে উঠে যায়, ফলে একটা আবর্তন হয়ে যায়। এই হল **ঋ**। এ যেন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি পেরিয়ে একার্ণব হয়ে পুনরায় সত্যযুগের দিকে যাত্রা। তাই **ঋ** পুনরায় **অ**-এর পথে হাঁটা দেয়।

বিষয়টিকে একটি রেখাচিত্রে নামিয়েছিলাম সেই ২০০৭ সালের মার্চেই। কিন্তু উপরোক্ত বয়ানটি এখন লেখা হল।



শুরু থেকে a পর্যন্ত 'অ', a থেকে b পর্যন্ত 'ই', b থেকে ওপর দিক দিয়ে ঘুরে c পর্যন্ত 'উ', c থেকে বিপরীত দিকে ঘুরে ওপর দিক দিয়ে d পর্যন্ত 'ঋ', তারপর পুনরায় d থেকে e পর্যন্ত 'অ', e থেকে f পর্যন্ত 'ই' .... এইভাবে পুনরায় উ-ঋ — এভাবেই অস্তিত্বের পেঁচাল অগ্রগতি।

পরিশিষ্ট ৪

সমাপ্তিবাচন : ক্লান্তি মোদের ক্ষমা করো প্রভু

শেষ হয়েও হইল না শেষ

১৪১৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বাকি অংশের ক্রিয়ানুসারে শব্দবিন্যাস একই সঙ্গে করে ফেলা গিয়েছিল; তাই ঠিক হয়, ২য় তথা শেষ খণ্ডের বাকি কাজ বছরখানেকের মধ্যে সমাপ্ত ক'রে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। অবশেষে আজ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দের ১১ পৌষ, প্রায় এক বছর তিন মাস পরে তা ছাপাখানায় যাচ্ছে; আশা করা যায়, মাঘের আগেই তা পাঠকপাঠিকার হাতে পৌঁছে যাবে।

তবে ঠিক যেভাবে ২য় খণ্ড সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা ছিল সেভাবে করতে পারলাম না আমরা। কেন, সেকথায় আসছি। গত ২৪ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ১ম খণ্ডের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পর ২য় খণ্ডের কাজে হাত দেওয়া গেল বটে, কিন্তু **প** বর্গের নির্বাচিত শব্দসমূহের বিস্তারিত উপস্থাপনের কাজ আমাদের সামনে বিশাল দাবি করে বসল। করত না, যদি ইতোমধ্যে আমাদের সামনে প্রায় প্রতিটি শব্দের অদৃশ্য অর্থ (= অভিধার্থ, মুখ্যার্থ, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ) ও সাদৃশ্য অর্থ (= লক্ষণার্থ বা ব্যঞ্জনার্থ, গৌণার্থ, প্রতীকী অর্থ) — শব্দের এই দুই প্রকার অর্থের পুরো ব্যাপারটি আরো স্পষ্টভাবে ধরা না দিত। ...

১ম খণ্ডের কাজ করার সময় একথা আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে, যা চোখে দেখা যায় না, অদৃশ্য, তাকে বোঝানোর জন্যই শব্দ, চিত্র ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিরা। এই অদৃশ্য বস্তুসমূহের দুটো ভাগ। প্রথম ভাগে পড়ে সেই বস্তুসমূহ যারা দৃশ্য বস্তুই বটে, কিন্তু আলোচ্য মুহূর্তে চোখের সামনে নেই বলে তাকে বোঝানোর জন্য শব্দের ব্যবহার করা হয়; যেমন **গাছ** (= tree), **মৎস্য** (= fish), **ব্যাঘ্র** (= tiger) ... ইত্যাদি। এগুলিকেই শব্দগুলির সাদৃশ্য অর্থ বলে। আর দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সেই বিষয় ও বস্তুসমূহ যারা কখনোই বাহ্যদৃষ্টিতে দৃশ্য নয়; যেমন **গাছ** (= social organisation), **মৎস্য** (= individual ownership), **ব্যাঘ্র** (= terrorizing social power or king) ... ইত্যাদি। এগুলিকেই শব্দগুলির অদৃশ্য অর্থ বলে। এমন বহু শব্দই আছে যাদের শুধুমাত্র অদৃশ্য অর্থই হয়, দৃশ্য অর্থ হয় না; যেমন **মায়া**, **মহামায়া**। এমন শব্দও আছে যার শুধুমাত্র সাদৃশ্য অর্থই হয়, অদৃশ্য অর্থ হয় না; যেমন **অট্টালিকা**। তবে অধিকাংশ প্রাচীন বাংলা শব্দের দুরকম অর্থই হয়ে থাকে। একই শব্দের সাহায্যে একসঙ্গে দৃশ্য অদৃশ্য উভয় শ্রেণীর বস্তু ও বিষয়কে বোঝানোর জন্য উভয়ের সাধারণ গুণকে চিহ্নিত করে সেই গুণটিকে বা ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করাই ছিল প্রাচীন ও স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক শব্দার্থবিধি, যা মানুষের আদিম পূর্বসূরিরা স্বভাবত অনুসরণ করতেন; এখনও অ্যাকাডেমির ছায়ার বাইরে থাকা প্রকৃতি-সংলগ্ন মানুষেরা সেভাবেই শব্দসৃষ্টি করে থাকেন। একেই আমরা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি নাম দিয়েছি। ...

যাই হোক, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু ও বিষয়গুলিকে বোঝানোই যে আমাদের প্রাচীন পুরুষদের শব্দসৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ২য় খণ্ডের কাজ করতে গিয়ে সেকথা ক্রমশ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে থাকে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই, প্রচলিত অভিধানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের সাদৃশ্য অর্থকে 'মুখ্যার্থ' এবং অদৃশ্য অর্থকে 'গৌণার্থ' করে বসে আছে। তার মানে, শব্দসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যটিকেই মাটি করে ফেলা হয়েছে। ফলত আমরা পড়ে যাই **পাদোদক-মূঢ়তা**র সামনে। আমরা দেখি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গিয়েছিলেন '**পাদোদক** পান করতে'। তার অদৃশ্য অর্থ ছিল আমরা যেন 'পদে পদে, চরণে চরণে, শ্লোকে শ্লোকে বিধৃত করে রাখা আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত **অমৃত**-জ্ঞানরস পান করি'। আমরা, একালের বাংলাভাষীরা, তার সেই অদৃশ্য অর্থটি বুঝলামই না; তার সাদৃশ্য অর্থটিকেই 'মুখ্যার্থ'রূপে বুঝে নিয়ে শ্রদ্ধেয়-অশ্রদ্ধেয় মানুষের দৃশ্য 'পা ধুয়ে জল' খেলাম। আর এরকম **পাদোদক-মূঢ়তা** যে কেবল **পাদোদক** শব্দের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তা নয়; ঘটেছে অজস্র ক্ষেত্রে। এই শব্দার্থকোষে বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যায় সেকথা আমরা কমবেশি জানিয়েছি। **মৎস্য**-ভক্ষণ (= কোনো কিছুর মালিক হওয়া), **মাংস**-ভক্ষণ (= মালিকানার অংশীদার হওয়া), **গোমাংস**-ভক্ষণ (= **পণ্য**-বিনিময় করে ধনী হওয়া), **বৃথামাংস**-ভক্ষণ (= প্রয়োজন নেই, তাও প্রচুর পরিমাণে টাকা রোজগার করা) ... প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ জানতে পারার পর আমরা বুঝতে পারি, অদৃশ্য-**গোমাংস** ভক্ষণ বা অদৃশ্য-**আমিষ** ভক্ষণই নিষিদ্ধ ছিল আমাদের দেশে। আমরা দেখতে পাই, বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী-ভূমিজ — সবাই দৃশ্য-**আমিষ** কমবেশি ভক্ষণ করলেও অদৃশ্য-**আমিষ** ভক্ষণ করেন না, অদৃশ্য-**গোমাংস** ভক্ষণ করা কিংবা **বৃথামাংস** ভক্ষণ করা পছন্দ করেন না; তাই তাঁরা প্রায়শই ধনহীন। অপরদিকে ভারতের মাড়োয়ারিরা সম্পূর্ণত দৈহিক-নিরামিষাশী হলেও চব্বিশ ঘণ্টা অদৃশ্য-**আমিষ** ভক্ষণ করেন, অদৃশ্য-**গোমাংস** ভক্ষণ করে থাকেন, অভিধার্থে

বৃথামাংস ভক্ষণ করে থাকেন। শব্দশাস্ত্র মতে এই **গোমাংস**ভোজী ও **বৃথামাংস**ভোজীরাই মুখ্যার্থে আমিষাশী এবং তাঁরাই যথার্থে শাস্ত্রবিরোধী কাজে লিপ্ত! এতদিন এই সত্য বুঝতে না-পারাও একধরনের **পাদোদক-মূঢ়তাই** বটে!

কিন্তু এইভাবে **অমৃত**-জ্ঞানসুধাকে শুধুমাত্র মানুষের পা-ধোওয়া জলে পরিণত করে ফেলা, কিংবা '**গোমাংসভক্ষণ**'কে শুধুমাত্র beef-ভক্ষণে পরিণত করে ফেলার ফল অত্যন্ত মন্দ হয়েছে। সুযোগ বুঝে একদল পা-ধোয়া জল বেচেছে, আর একদল **পাদোদক**ই বর্জন করেছে — thrown the baby out with the bath-water। ফলত, যে মানবমস্তিষ্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গর্ব করতেন — 'বিশ্বকে বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আঁটিতে পারে, এখানেই তার বিশেষত্ব' — সেই ব্রহ্মাণ্ড-ধারণযোগ্য বাংলাভাষীর মন এমন হীনতায় পৌঁছেছে যে তা কহতব্য নয়। আর তার ছাপ পড়েছে বাংলাভাষীর জীবনে, বাংলাভাষী যেন এক মানসিক অন্ধকূপের ভেতরে পড়ে গেছে! এই কূপ থেকে বেরোনোই এখন আমাদের একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত বলে মনে হয়। ...

এই অন্ধকূপ থেকে বেরোনোর একটি উপায় হল, শব্দার্থের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার প্রায়োগিক দিকটিতে আরও জোর দেওয়া। তা করতে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিটি ক্রিয়া-পরিবারের অল্পসংখ্যক শব্দেরও যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা যায়, এই শব্দার্থকোষের আয়তন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ওপর **পবন, পর, পরি, পার, পুরুষ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, প্র, প্রতি, প্রজা, প্রজাপতি, ফলা, ফল্গু, ফাল্গুনী, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বর্ণ, বর্ণাশ্রম, বানপ্রস্থ, বিশ্ব, বিশ্বকর্ম্মা, ভাব, ভাষা, মঞ্জু, মৎস্যগন্ধ, মধু, ময়, মায়া, মহামায়া** ... প্রভৃতি বেশ কিছু বিশাল বিশাল অর্থধারী শব্দ তাদের **পরিপূর্ণ** অর্থ নিয়ে এমনভাবে ধরা দিতে লাগল যে, আমাদের অবস্থা হয়ে গেল সেই **ধীবর**-এর মতো, যার গল্পটা এইরকম —

সে ছিল এক নিষ্ঠাবান **ধীবর**। মাছেদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ক'রে সে এতই অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল যে, জলের উপরিতল দেখেই সে বুঝে নিতে পারত নদীতে কোথায় কোন্ মাছ কী পরিমাণে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু সেগুলিকে ঠিকঠাক ধরতে বা কব্জা করতে পারত না বলে তার দুঃখের শেষ ছিল না। যে মাছশিকারী জলমধ্যে মাছ দেখতে পায় না, এবং সেকারণে তাদের ধরতে পারে না, তার খুব একটা দুঃখ হয় না; কিন্তু যে দেখতে পায় অথচ ধরতে পারে না, তার দুঃখের সীমা থাকে না। স্বভাবতই সেই ধীবরেরও মনোকষ্টের সীমা ছিল না। তাই দেখে ঈশ্বরের করুণা হল এবং তাঁর করুণার এক ফোঁটা গিয়ে পড়ল সেই ধীবরের জালে। ফল হল এই যে, সে একবার জাল ফেললেই ছোটবড় নানারকম মাছে তার জালটি একেবারে ভরে যেত; আর তাতে দশ-বারো কেজি ওজনের একটা-দুটো রুই-কাৎলা থাকতই। সেকারণে, জাল টেনে ডাঙায় তুলে মাছগুলো বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়াই তার পক্ষে এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিত। অনন্যোপায় হয়ে সে একবার মাত্র জাল ফেলে যে পরিমাণ মাছ পেত, তাই নিয়ে টানাটানি করে কোনোমতে বাড়ি পৌঁছতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। ...

কিন্তু এত বিচিত্র এবং এত বড় বড় মাছ ধরা পড়ছে দেখে সেই ধীবর যদি আনন্দে আরও বিশ-পঁচিশ বার জাল ফেলে মাছ ধরে জমা করার চেষ্টা করত, তাহলে তার যে দুরবস্থা হত, আমাদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আমরা যা পেয়েছি, তার সবকিছু শেষমেষ বহন করে জনসমাজের সামনে উপস্থাপন করতে চাইলে, সে কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করে যেতে পারব কি না, তাই নিয়ে আমাদের অতিমাত্রায় সংশয় হয়। মনে হয় সেসব করতে পারার আগেই হয়তো এই ধরাধাম ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। সেরকম অসম্পূর্ণ কাজ ফেলে রেখে যাওয়ার চেয়ে বরং যতটা যা সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি একসঙ্গে উপস্থাপন করে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করাই ভাল বলে আমাদের মনে হয়।

তার মানে, **প** থেকে **হ** পর্যন্ত ২৭০টি ক্রিয়া পরিবারের ৪৪০০০ শব্দ নিয়ে আমাদের প্রারব্ধ কাজটিই কমপক্ষে তিন খণ্ডের অবয়ব দাবি করে বসল। তার আরও একটা মানে এরকম দাঁড়ায় যে, **অ** থেকে **ন** পর্যন্ত যে ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়ে গেছে, সেটি তিন-চার খণ্ডে প্রকাশিত হলেই ঠিক হত। অর্থাৎ, পুরো 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' কমপক্ষে সাত-আট খণ্ডে প্রকাশিত হলে তবেই তা বাংলা শব্দার্থ প্রকাশের খানিকটা হলেও যথাযোগ্য আধার হতে পারত। আর, যদি একেবারে যথাযথ ক্রিয়াভিত্তিক-শব্দার্থকোষ প্রণয়ন করতে হয়, তার একমাত্র উপায় হল আন্তর্জালের মাধ্যমে চলমান শব্দার্থকোষ উপস্থাপন করা। কিন্তু ...

কিন্তু, এই মুহূর্তে কী করা যাবে? 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এর ১ম খণ্ড প্রকাশ করে দিয়ে এখন তো আমাদের দুজনের হাত-পা বাঁধা; ২য় খণ্ড তথা শেষ খণ্ড প্রকাশ না করে আমাদের তো মরবারও উপায় নেই! ... আন্তর্জালে চলমান শব্দার্থকোষের কাজ করার জন্য কিংবা সাত-আট খণ্ডে সমগ্র বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ সংকলন করার জন্য যে শারীরিক, পারিবারিক, আর্থিক অবকাশ দরকার, তার কোনোটিই আমাদের নেই; মানসিক অবকাশটুকু ছাড়া। সেভাবে দেখলে, যথাযথ পরিবেশ পরিস্থিতি পেলে, যথেষ্ট সংখ্যক সহযোগী পেলে আমরা দুজন কেবল সাত-আট খণ্ডে বঙ্গীয় শব্দার্থকোষই শুধু নয়, হয়তো-বা ইংরেজি ভাষারও ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থকোষ সংকলন করে দিয়ে যেতে পারতাম! সেরকম পরিবেশ-পরিস্থিতি পাওয়া এবং সেভাবে সেই সকল কাজ করা তো এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এক অসম্ভব কষ্টকল্পনা-মাত্র। তার ওপর আমরা তো আয়-আয়ুর শেষ সীমায়

ভূলুণ্ঠিত মাত্র দুজন! অথচ আজ থেকে একশো বছর আগেও এমন পরিস্থিতি ছিল যে, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থটি ৬৫ জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রায় কুড়ি বছর ধরে সংকলিত হতে পেরেছিল! ...

অনেক ভাবনাচিন্তার পর অবশেষে একটি বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি — **শব্দসমুদ্র অভিযানে শ্রেষ্ঠ যা কিছু পাওয়া** যাচ্ছে, তার সংবাদ অবশ্যই দিয়ে যাব আমরা। এখন যখন **পাদোদক-মূঢ়তা** থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ দেখা যাচ্ছে, সে পথের কথাও আমরা নিশ্চয় বলে যাব। যে বিশাল অর্থধারী শব্দগুলি তাদের পরিপূর্ণ স্বরূপে ধরা দিচ্ছে, তাদের কথা সাধ্যমতো বিস্তারিতভাবে বলে যাব আমরা। এসব করতে গিয়ে **প** বর্গের অবয়ব যদি বেড়ে যায়, যাক। তাতে যদি **প** বর্গেই একটা খণ্ড হয়ে যায়, হোক। বাকিটা না হলে না হবে। অনেক খেয়ে মন না ভরার চেয়ে অল্প কিন্তু সুস্বাদু জিনিস খেয়ে মনের তৃপ্তি ও শান্তি হয় বেশি। বাকিটার উপস্থাপন করা না গেলেও খসড়া তো থাকল। উত্তরসূরিরা করে নেবেন।

প বর্গের কাজ শেষ হতে দেখা গেল, তাতেই প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা হয়ে গেছে। অথচ **অ** থেকে **ন** পর্যন্ত ১ম খণ্ডের অবয়ব হয়েছিল ৬৭২ পৃষ্ঠা; আর, ইতোমধ্যে সময়ও খরচ হয়ে গেছে প্রায় ১৫ মাস। আর তো অপেক্ষা করা চলে না, কাউকে আরও কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতেও বলা যায় না। এদিকে আমাদের দুজনের শারীরিক, পারিবারিক, আর্থিক অবকাশ একেবারে তলানীতে ঠেকেছে। এই অবস্থায় আর কিছু করতে পারব বলে আমাদের নিজেদেরই আর বিশ্বাস হয় না। সুতরাং যতটুকু যা পাওয়া গেছে, তা সব একত্র করে পাঠকপাঠিকার হাতে তুলে দেওয়াই ভাল। সেকারণে ঐ ৬০০ পৃষ্ঠার সঙ্গে বাকি অংশের খসড়াগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিও সংক্ষেপে একই সঙ্গে ছেপে ২য় বা শেষ খণ্ড প্রকাশ করা হল। এরপর যা কিছু করার, সে থাকল ভবিষ্যতের হাতে। ভবিষ্যতে, উত্তরসূরিদের কেউ যদি কিছু করতে চান, তিনি এর সাহায্যে এগোতে পারবেন, আশা করা যায়। আমরা অনন্যোপায় হয়ে এখানেই আমাদের কাজের ইতি টানতে বাধ্য হলাম।

পরমাপ্রকৃতি মহামায়ার প্রতি আমাদের একটিই অনুযোগ — মহাসম্পদের গুহায় ঢুকবার মন্ত্র দিলে, ঢুকে সেই মহাসম্পদ আনার যথাযথ সুযোগ দিলে না মা, এ তোমার কেমন বিচার!

বিদায় প্রার্থনা

যাই হোক, বাংলা শব্দার্থের যতটুকু যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এর এই দুই খণ্ডে সেই শব্দার্থসম্ভার রইল আপনাদের সামনে। এসব যদি বাংলাভাষীর কিছুমাত্র কাজে আসে, আমাদের জীবন সার্থক হবে। আমরা নিজেরা তার থেকে একদিকে যেমন এক মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছি, তেমনি অপরদিকে একটি গুরুতর বিপদসংকেত আমাদের চোখে পড়েছে। মুক্তির আলোর সে আশার বাণী আমরা রেখে দিলাম 'পরিশিষ্ট ৫'-এ। এখানে, বিপদসংকেতের সতর্কবার্তাটি জানিয়ে দিয়ে আমরা বিদায় গ্রহণ করতে চাই।

বাংলাভাষা হয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে নয় বিশ্বকে পথ দেখাবে — হ্যাঁ, এইরকম এক অদ্ভুত 'মরেঙ্গে ইয়া করেঙ্গে'র মোড়মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের বাংলাভাষা। বর্তমান বাংলার অ্যাকাডেমিগুলি হাজার হাজার বাংলা শব্দকে ফেলে দিচ্ছেন এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য শত শত ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন। ফলে সরকারি-শহুরে-শিক্ষিতের বাংলাভাষা ইংরেজি শব্দে কণ্টকিত হয়ে একপ্রকার দোআঁশলা ভাষায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং সেকারণে গ্রামবাংলার বাংলাভাষা থেকে ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার বাংলাভাষীরা এখন ইংরেজি শব্দ না মিশিয়ে একটি বাংলা বাক্যও বলতে পারেন না। ফলত বাংলাভাষা দুরকম ভাষায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে বা গেছে। এমনভাবে এই বিভাজন হয়ে যাচ্ছে যে, গ্রামবাংলার ছাত্রছাত্রীরা শহর থেকে আগত শিক্ষকের ভাষা বুঝতে পারছে না। এই গ্রন্থের ভিতরে তো বটেই, এর নির্ঘণ্টের উপর নজর বুলালেই পাঠকপাঠিকা টের পাবেন কী দ্রুত গতিতে এবং কী বিপুল সংখ্যায় বাংলা শব্দ বর্জন করা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে।

আমরা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুসরণ করে প্রায় ৭২,০০০ শব্দের ভুক্তি ঘটিয়েছি। সেগুলির মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ শব্দই শহুরে ও শিক্ষিত বাংলাভাষীর ভাষাব্যবহার থেকে কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে; পরিত্যক্ত হয়েছে সরকারি ভাষাব্যবহার থেকেও। যদিও গ্রামবাংলায়, সাধারণ অশিক্ষিত বাঙালির মুখের ভাষায় এবং বিশেষত মেয়েদের মুখের ভাষায় এখনও বহু শব্দ বেঁচে বর্তে রয়েছে। যে স্থান কলকাতা থেকে যত দূরে, সেই স্থানের বাংলাভাষীর ভাষায় তত পরিমাণে বাংলা শব্দ আজও টিকে রয়েছে, যদিও তাঁদের মুখের সেই সকল শব্দের অর্ধেক শব্দই কোনো অভিধানে সংকলিত হয়নি; কিছু কিছু হলেও তা হয়েছে 'লৌকিক', 'আঞ্চলিক', 'অশ্লীল' ... ইত্যাদি নিন্দিত শব্দের অভিধান রূপে। অথচ সেগুলি যে বাংলাভাষার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক শব্দ, এই বিশ্বাসটাই ভেঙে দিয়েছেন একালের অ্যাকাডেমির (= প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজগতের) পরিচালকেরা। পরিস্থিতি এমন যে আজকের বঙ্গদেশে বোধ করি এমন একটিও শিক্ষানিকেতন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার শিক্ষক

তাঁর ছাত্রের খাতায় 'রবীন্দ্রনাথের বাপের নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ...' লেখা থাকলে 'বাপের' শব্দটি কেটে দিয়ে 'বাবার' বা 'পিতার' লিখে না দেন; যদিও বাংলার প্রতিটি মেয়েই এখনও মহান আবেগে 'বাপের বাড়ি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। ...

আমাদের শেখানো হয়, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীন হয়েছি। আসলে ঐ দিন থেকে আমরা দৈহিকভাবে স্বাধীন ও মানসিকভাবে পরাধীন হয়েছি। ঐদিন থেকে বাংলার মুখ পশ্চিমের দিকে ঘুরে যায়। তার আগে পর্যন্ত আমরা মানসিকভাবে স্বাধীন এবং দৈহিকভাবে পরাধীন ছিলাম। কতখানি মানসিকভাবে স্বাধীন ছিলাম রবীন্দ্রনাথের নোবেল বক্তৃতা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু ১৫ই আগস্টের পর থেকে যে বাঙালি ইংরেজি জানে, ইংরেজকে মনে মনে প্রভু বলে মানে, সেই হয়ে যায় আমাদের শাসনকর্তা। এঁদের পূর্বসূরিরাই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের কালে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিরস্ত করেছিল। এখন তো এই অবস্থা এতই বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, শান্তিনিকেতনেও ইংরেজি মিডিয়াম চালু হচ্ছে। আজকের বাংলাভাষী বিশ্বাস করে ফেলেছে যে — তার মাতৃভাষাটা একেবারেই এলেবেলে; ভাষা যদি বলতে হয় তবে সেটি হল ইংরেজি; যদিও ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। যে বাংলাভাষা ঠিকঠাক জানে না, ইংরেজিটাও মন দিয়ে শেখেনি, সেরকম বাঙালিই এখন ইংলিশ-মিডিয়ামের প্রবক্তা। বিশ্ববিকাশের পালের হাওয়া এই মুহূর্তে যে কারুজীবীদের হাতে রয়েছে, তারা যেহেতু ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন, জনসাধারণের জীবিকার সঙ্গে সেই কারুজীবিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার জন্যে যে ইংরেজি ভাষার গোলামি করার দরকার পড়ে না, চীন, জাপান তার সাক্ষাৎ উদাহরণ। তবুও আমাদের ছেলেমেয়েদের যে টাকার গোলামির পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার গোলামিও করতে হয়েছে, হচ্ছে, তার জন্য আমাদের এই বাংলা অ্যাকাডেমির পরিচালকেরাই দায়ী। তাঁদের জন্যেই দিনে দিনে বাংলা পরিত্যক্ত হচ্ছে, ইংরেজি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর, এর সবচেয়ে বড় কারণ হল একালের বাংলার অ্যাকাডেমি-পরিচালকরাই বাংলা ভাষাটি ভুলে গেছেন। ১৯৪৭ সালের আগে এঁরা **পদার্থবিদ্যা, পাটিগণিত, বীজগণিত, রসায়ন, জ্যামিতি, ময়না-তদন্ত, মহাকরণ** ... এরকম অজস্র শব্দ তৈরি করতে পারতেন; ফলত, ইংরেজির নতুন নতুন ধারণাকে বাংলায় সরাসরি হ্যাটকোট পরে ঢুকতে হত না; পাশ্চাত্যের জ্ঞানজগতের চত্বরে ঘোরাফেরা শুরু করলেই বাংলায় তার চেয়ে আরও যোগ্যতম সত্তা উঠে দাঁড়াত — ইংরেজ airport বানানো মাত্রেই আমাদের সেকালের অ্যাকাডেমিশিয়ানরা **বিমানবন্দর** বানিয়ে ফেলেন। তৎকালীন বাংলাভাষীকে স্বভাবতই ইংরেজির মুখাপেক্ষী হতে হত না। বর্তমানে আমাদের বাংলার অ্যাকাডেমি-পরিচালকেরা তাঁদের সেই যোগ্যতা হারিয়েছেন। ফলে নতুন নতুন বহিরাগত ধারণাকে তাঁরা বাংলায় অনুবাদ করতে পারেন না। কিন্তু জনসাধারণ তো অপেক্ষা করে বসে থাকবেন না, নব নব পরিস্থিতিতে মনোভাব লেনদেন করার জন্য তাঁদের নব নব শব্দ চাই। দেশী মুদ্রা নাই তো বিলিতি মুদ্রাই দাও! তাই দেখে আমাদের একালের সেয়ানা অ্যাকাডেমিশিয়ানরা ইংরেজিকে সরাসরি গ্রহণ করার পক্ষে ওকালতি করেন। রাজার হাত পাতা ও ভিখারির হাত পাতার মধ্যে যে পার্থক্য সেকথা তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারেন না। ... এই অবস্থা আর বছর দশেক চললেই বাংলাভাষা তার আত্মস্বরূপ সম্পূর্ণ খোয়াবে। সরাসরি দু'টুকরো হয়ে গিয়ে শহুরে-বাংলা অংশটি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য নীচ ইংরেজিতে বিলীন হয়ে যাবে, এবং গ্রাম্য-বাংলা অংশটি ক্ষমতাহীন হয়ে মেদিনীপুরের খেড়িয়া মুসলিমদের ভাষার মতো ক্রমশ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে যাবে। তাই অবিলম্বে সতর্ক হওয়া দরকার। অন্যথায় বাংলার সর্বনাশ ঠেকানো অসম্ভব।

অন্যদিকে আমাদের দুজনকে নিমিত্তরূপে খাড়া করে বাংলার মাটি ভাষার ক্রিয়াভিত্তিক স্বরূপ উদঘাটন করে ফেলেছে। বাংলাভাষার এই স্বরূপ বাংলাভাষীকে পুনরায় নব নব শব্দসৃষ্টির উপায় দেখিয়ে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে বলীয়ান বাংলাভাষা চাইলে বিশ্বের সব ভাষাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। কীভাবে তা সম্ভব, আমাদের 'অবিকল্পসন্ধান' গ্রন্থে সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানিয়েছি।

অতএব একদিকে রয়েছে গভীর খাদ, অপরদিকে রয়েছে সুউচ্চ শিখর, মাঝে আমাদের বাংলাভাষা। সে চাইলে বিশ্বের সকল ভাষার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যেতে পারে, চাইলে খাদে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে। কোন দিকে যাবে, সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজকের বাংলাভাষীদেরই।

এবার আমাদের বিদায় দিন। যতখানি সফল তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যর্থতার ব্যথা নিয়ে আমরা এবার চলে যাব। যাওয়ার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসবাণী শুনতে পাচ্ছি — 'না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল / আরো কিছু নাই হল ... /... পথেই না হয় ঠাঁই হল।।'

১১ই পৌষ, ১৪১৭ — রবি চক্রবর্তী কলিম খান

পরিশিষ্ট ৫

যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই

শব্দার্থসন্ধান করে আমরা কী কী আনতে পেরেছি, পাঠকপাঠিকা তার বিচার করবেন। আমরা দেখেছি, (১) মানবদেহ ও সমাজদেহ কীভাবে **আময়**গ্রস্ত বা রোগগ্রস্ত হয় ও হয়েছে; (২) কীভাবে সেই রোগগ্রস্ত দেহের রোগ **নিরাময়** করা যায় বা তাদের **আধিব্যাধি** থেকে **মুক্ত** করা যায়; এবং (৩) কারা কীভাবে সেই **মুক্তি** সাধন করতে পারেন — আমাদের শব্দার্থসন্ধান থেকে এই প্রশ্নগুলির একপ্রকার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। সেটি মানুষের কাজে লাগলে সেটিই হবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। নিম্নে সেই প্রাপ্তির কথা নিবেদন করছি। (মোটা হরফে লেখা শব্দের অর্থ এই কোষগ্রন্থের যথাস্থানে দেখুন।)

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় **আময়** ও **নিরাময়** শব্দের মূলে যে **ময়** বিদ্যমান রয়েছে, তার সার্বিক বোধ থেকে। তার জন্য **ময়**-জাত **ময়ন, ময়দা, ময়দানব, ময়লা, আময়, নিরাময়, নিময়, বিনিময়, মায়া, মহামায়া, মায়াবী, মায়ার-টান ...** প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানতে হয়। জানতে হয় **পুরুষ-প্রকৃতি, ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞানের পঞ্চধারা, প্র, মৎস্যগন্ধ, মৎস্যগন্ধের বাহ্যিক তন্মাত্র রূপ** ও **মৎস্যগন্ধের মানসিক তন্মাত্র রূপ**-এর প্রকৃত অর্থের কথা। এই শব্দগুলির নিহিতার্থ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বজগতের প্রতিটি সত্তার মূলে তৎ-**ময়** হয়ে বিরাজ করে সেই সেই সত্তার নিজ নিজ একক। প্রত্যেক সত্তার ক্ষেত্রেই ঐ এককটি হয় সেই সত্তার নিজস্ব **পুরুষ-প্রকৃতি**র একপ্রকার **দ্বৈতাদ্বৈত** (বা two-in-one) স্বরূপ অর্থাৎ **পুরুষ-প্রকৃতির** একপ্রকার জোড়। যেমন জলের মূলে অক্সিজেন (= পুরুষ) ও হাইড্রোজেন (= প্রকৃতি) নিজেদের এক **দ্বৈরাজ্য** (H_2O) গড়ে তুলে **বর্ত্তমান** রয়েছে বলেই জল জলরূপে **বিদ্যমান**। জলের মূলে থাকা দুই সত্তার এই **দ্বৈরাজ্যিক** অস্তিত্বকে তার **কারণ-প্রকৃতি** বলে। **বিশ্বে**র প্রতিটি সত্তার মূলে রয়েছে তাদের নিজ নিজ **কারণ-প্রকৃতি** বা জোড়। প্রতিটি সত্তার সৃষ্টিকালে তার ঐ জোড়ের ভিতরে **পুরুষ-প্রকৃতি** 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর **প্রেম**বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতেই সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং **কারণ-প্রকৃতি** রূপে সত্তাটির ভিতরে তা **বর্ত্তমান** থাকে। তবে কখনো কখনো কোনো কোনো সত্তার **কারণ-প্রকৃতির** এই জোড়ের অভ্যন্তরস্থ **সুন্দর** জোটবদ্ধতায় নানা রকম ব্যত্যয় ঘটে; **পুরুষ-প্রকৃতির** সম্বন্ধে **প্রেম**বন্ধন বর্জিত হয়ে শাসক-শাসিত, নিপীড়ক-নিপীড়িত সম্বন্ধের উদয় হয়। আর সেরকম ঘটলেই সত্তাটি **আময়**গ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে **কারণ-প্রকৃতির** ভিতরের এই রদবদল চোখে না-পড়লেও বৃহৎ সত্তার ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সমাজের মতো বৃহৎ সত্তার ক্ষেত্রে জোড়ের এই অধঃপতনগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে **পরমাপ্রকৃতি**-তত্ত্বের আলোচনায়। তখন সেই জোড়কে তার আদি অঙ্কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে দিতে পারলে সত্তাটির রোগমুক্তি ঘটে, সত্তাটির রোগ-**নিরাময়** সম্ভব হয়। তখন সত্তাটি পুনরায় **সুন্দরে** প্রতিষ্ঠিত হয়ে সক্রিয় হতে পারে। প্রাচীন ভারতের 'বিষে বিষক্ষয়' তত্ত্বটি এবং হানিম্যানের মানবদেহের রোগ**নিরাময়** তত্ত্বটি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমরা এই কোষগ্রন্থের ১ম খণ্ডের কাজের সময়ই পেয়ে গিয়েছিলাম এবং সেকথা একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধের মাধ্যমে কৌতূহলী সহযোগীদের জানিয়েছিলাম। এটি পাওয়া গিয়েছিল **উন্দ্** ক্রিয়ামূলের পরিবারে জাত **সুন্দর** শব্দের মানে জানতে গিয়ে। তখনই জানা যায়, যে সত্তা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে আপন শ্রেষ্ঠত্ব কমিয়ে নিতে দ্বিধা করে না, সত্তার সে চেষ্টাই **সুন্দর**-এর মূল। দেখা যায়, **পুরুষ-প্রকৃতির** জোড়টির ভিতরে সুসামঞ্জস্য সাধন করে দেয় বলেই 'সুসামঞ্জস্য সাধিত যাহাতে' তাকে **সুন্দর** বলে। এই সত্য জগৎ, সমাজ, জীবন সবকিছুকে **সুন্দর** ও **হৃষ্টপুষ্ট** করে তোলার উপায় বলে দেয়। কেবল তাই নয়, **সুন্দর**-এর তত্ত্ব মানুষের জ্ঞানজগতে চিরজিজ্ঞাস্য **'শিল্প'**সৃষ্টির রহস্যটিকেও উন্মোচন করে দেয়। যতদূর জানি, এ বিষয়ে লেখা আমাদের সুদীর্ঘ **'সুন্দরতত্ত্ব'** নিবন্ধটি আমাদের সহযোগীরা প্রকাশ করবেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় **বর্ণ, বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থ** প্রভৃতি শব্দের অর্থ থেকে। **বর্ণ** শব্দের অর্থ আমাদের জানায় — মানুষের সমাজে জ্ঞানচর্চাকারী, শক্তিচর্চাকারী, ধনচর্চাকারী ও সর্বচর্চাকারী এই চারটি সত্তা স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মায়। বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সমাজেই এই চারপ্রকার সত্তার জন্ম আজও যথাপূর্বম্ হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে প্রত্যেক জাতির জ্ঞানচর্চাকারী সত্তাটিই জাতিটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তাই, প্রতিটি জাতিই তার জ্ঞানচর্চাকারীদের অধীনে থাকে, তাদেরই অনুসরণ করে থাকে। ফলে, প্রতিটি জাতির জ্ঞানচর্চাকারী অংশটি কারো অধীন হলেই জাতিটি পরাধীন হয়, তাঁরা স্বাধীন হলেই জাতিটি স্বাধীন হয়। এই অধীনতা-স্বাধীনতারও চার রকম রূপ রয়েছে — দৈহিকভাবে স্বাধীন কিন্তু মানসিকভাবে পরাধীন, দৈহিকভাবে পরাধীন কিন্তু মানসিকভাবে স্বাধীন, দৈহিক-মানসিক উভয়ভাবে স্বাধীন, এবং দৈহিক-মানসিক উভয়ভাবে পরাধীন।

পদার্থবিজ্ঞান, পাটিগণিত ... ও **মানবিকতা, ভাবান্দোলন** ... প্রভৃতি শব্দগুলি প্রাচীন বাংলায় ছিল না, ব্রিটিশের আগমনের পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে। শব্দগুলির মধ্যে শিক্ষাব্রতীদের দুরকম স্বভাব চোখে পড়ে। **পদার্থবিজ্ঞান** প্রভৃতি শব্দ যাঁরা বানিয়েছিলেন, দেখা যায়, তাঁরা মানসিকভাবে স্বাধীন ছিলেন; আর **মানবিকতা** প্রভৃতি শব্দ যাঁরা বানিয়েছেন, তাঁরা মানসিকভাবে ইংরেজের অধীন। বিষয়টি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি যে, বাংলার শিক্ষাব্রতীরা ব্রিটিশ যুগে মানসিকভাবে স্বাধীন ছিলেন এবং দৈহিকভাবে পরাধীন ছিলেন; কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে তাঁরা দৈহিকভাবে স্বাধীন এবং মানসিকভাবে পরাধীন হয়ে যান। একই দুর্ভাগ্য হয় সমগ্র বাঙালি জাতিরও। কার্যত ঐ দিনের পর থেকে বাংলার শিক্ষাব্রতীদের মুখ পশ্চিমের দিকে ঘুরে যায়। যেন বা বাংলার নিজস্ব কোনো মহিমা নেই, গরিমা নেই, যা রয়েছে সবই পাশ্চাত্যের, ইংলন্ড আমেরিকার! বাংলার জ্ঞানজীবীদের এই অবস্থান রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থানের ঠিক বিপরীত। ফলত গোটা জাতিই ক্রমশ ইংলিশ-মিডিয়াম আকুলতায় আকুল হয়ে ওঠে। ... কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পরিণাম সম্ভব হল কীভাবে?

আমরা পুরাণের দিকে তাকাই। ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানচর্চাকারীদের (**ব্রাহ্মণ**-এর) পুরো ইতিহাসটাই আমাদের হাতে চলে আসে। আমরা দেখি, ঝগড়াটা শুরু হয়েছে একেবারে গোড়ায়, সমাজের পথপ্রদর্শক জ্ঞানচর্চাকারী সত্তাটির এককের বা **কারণ-প্রকৃতি**র ভিতরেই। একদল আবিষ্কার করে নিয়ে আসেন (= পুরুষ), অন্যদল সেই আবিষ্কৃত-জ্ঞান সুবিন্যস্ত করে ধরে রাখেন এবং কাজে পরিণত করেন (= **প্রকৃতি**); এই উদ্ভাবক-প্রযোজককে নিয়ে গড়ে উঠেছিল সমাজদেহের চোখের এককটি। সেকালে এই এককটির **পুরুষ**কে বলা হত **শিব** (অখণ্ড-জ্ঞানী) এবং **প্রকৃতি**কে বলা হত **দক্ষ** (খণ্ড-জ্ঞানী), একালের ভাষায় এঁদের যথাক্রমে জ্ঞানব্রতী (প্রথাবহির্ভূত-জ্ঞানচর্চাকারী) ও শিক্ষাব্রতী (প্রথাসিদ্ধ-জ্ঞানচর্চাকারী) বলা যেতে পারে। এই জ্ঞানব্রতী-শিক্ষাব্রতীরা 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর **প্রেম**বন্ধনে বদ্ধ হয়ে একমত হয়ে সমাজকে পথ দেখাতেন, যতদিন দেখাতেন, ততদিন সমাজের কোনো প্রকার অধঃপতন ঘটেনি, ঘটে না। সম্প্রতিকালের যে অখণ্ড-জ্ঞানীকে আমরা সবাই চিনি তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ; আর বিদ্যাসাগর থেকে অমর্ত্য সেন পর্যন্ত খণ্ড-জ্ঞানীদের কে না চেনেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন — খণ্ডকে চাই, অখণ্ডকেও চাই। উভয়কে তিনি সমমর্য্যাদা দিতেন এবং একশো ভাগ ঠিক কাজই করতেন। রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ যখন প্রায় একযোগে বাংলা ও বাঙালির জন্য ভাবছিলেন, সে ছিল বাঙালি জাতির জীবনে এক মহানন্দের দিন!

বৈদিক যুগের সূচনালগ্নে সমাজদেহের **নাভি**তে এই প্রেমবন্ধন ভেঙে যায়। শিক্ষাব্রতীরা জ্ঞানব্রতীদের অবজ্ঞা করে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের মূল কাজটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নেন। সমাজদেহে রোগের শুরু সেই থেকে। ফলত সেই **আময়**গ্রস্ততা থেকে **পর্য্যায়**ক্রমে আদি পুঁজিবাদ (**প্রজাপতি বেণ**) জন্মায়, তাকে ধ্বংস করার জন্য শিক্ষাব্রতীকে রাষ্ট্র (বা **পৃথু** বা **ক্ষত্রিয়**) এর জন্ম দিতে হয়; একদিন তার সঙ্গেই শিক্ষাব্রতীর (**ব্রাহ্মণে**র) বিরোধ বাধে। সে বিরোধ চলতে থাকে; **ব্রহ্মহত্যা**, ক্ষত্রিয়নিধন, নিঃক্ষত্রিয়করণ, **ব্রাত্য**করণ চলতে থাকে। বৌদ্ধযুগের শেষ ও হিন্দুযুগের সূচনাকাল (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এই বিরোধ চলে এবং ভারতকে কার্যত নিঃক্ষত্রিয় করে প্রমাণ করা হয়, জ্ঞানচর্চাকারীরা (**ব্রাহ্মণ**) শক্তিচর্চাকারীদের (**ক্ষত্রিয়ে**র) চেয়ে বড়। এই ধারণাকে অতঃপর সামাজিক বোধ রূপে মোগলযুগ পেরিয়ে স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্ত প্রবাহিত থাকতে দেখা যায়।

ফলত, ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানচর্চাকারীরা কখনোই শক্তিমান বা ধনবানের অধীনতা স্বীকার করেননি। বিপরীতে রাজা-বাদশাহদের দেখা যায় জ্ঞানব্রতী মুনি-ঋষি, আউলিয়া-আম্বিয়া, সাধু-সন্তদের অনুসরণ করতে; সেই রাজাদের অনুসরণ করতেন রাজপুরুষেরা, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত প্রজাগণ। এমনকি ব্রিটিশ যুগের অপরাহ্নেও দেখা যায়, এলাকার মানুষেরা একসঙ্গে গিয়ে কোনো শিক্ষাব্রতীকে অনুরোধ উপরোধ করে রাজি করিয়ে নিয়ে আসছেন, ঘরবাড়ি বানিয়ে জমি-জায়গা দিয়ে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষক রূপে তাঁকে বরণ করে নিচ্ছেন। 'আবেদন' করে 'চাকরি করা'র কথা ঐ শিক্ষাব্রতীরা ভাবতেও পারতেন না। ... এই জ্ঞানব্রতী-শিক্ষাব্রতীদের ভিতর থেকেই উঠে আসেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, লালনফকির, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মোশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, নজরুল, মুজতবা আলী ... প্রমুখ বাংলার স্বাধীনতাপূর্ব কালের মনীষীরা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর সেই মহান বাংলাভাষী মনীষীদের উত্তরাধিকারীদের দেখা গেল ক্রমশ ধনচর্চাকারীদের সেবাদাসে পরিণত হতে, 'চাকরি'র জন্য 'আবেদন' করতে, এবং 'চাকরি' করতে, অন্ধের মতো পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে। ...

পাশ্চাত্যের উত্তরাধিকারে 'জ্ঞানচর্চা শক্তিচর্চার চেয়ে বড়' বা The pen is mightier than the sword ধারণাটি ছিল; পাশ্চাত্যের **ব্রাহ্মণ** পোপের সঙ্গে পাশ্চাত্যের **ক্ষত্রিয়** রাজার বিরোধ হল। প্রোটেস্টান্ট উত্থান ও শিল্পবিপ্লবের কালে পাশ্চাত্যের জ্ঞানীরা ধনচর্চাকারী হবু-শিল্পপতি কুবেরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাশ্চাত্যের ক্ষত্রিয়দের প্রভুত্ব অর্থাৎ রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেন এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলত, রাতারাতি সংগোপনে Money is mightier than both the pen and the sword হয়ে যায়। যদিও কার্লাইল, শেলী, লরেন্স প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চাকারী ধনকুবেরের বশ্যতা স্বীকার করেন না, তবু পাশ্চাত্যের

জ্ঞানীদের ব্যাপক অংশটিই **কুবেরে**র শ্রেষ্ঠত্ব আকারে প্রকারে স্বীকার করে নেন। একযোগে তাঁরা রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেন, সাম্য, স্বাধীনতার ধুয়া তোলেন, কিন্তু কুবেরের শক্তি কোথায়, সেটি তাঁরা জানতেও পারেননি। ভারতীয় পুরাণকারগণ কিন্তু জানতেন '**কুবেরের শক্তি অন্তর্দ্ধান**'। উদ্ভব লগ্নেই তাঁরা **প্রজাপতি বেণ** ও **বেণিয়া**দের সামাজিক-মর্য্যাদা ধ্বংস করে দেন, পরবর্তীকালে লক্ষ্মীপুঁজির সহায়তা করলেও কদাপি **কুবের**কে মাথা তুলতে দেননি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানীরা কিন্তু সে কাজ করতে পারলেন না। ফলত, মহোল্লাসে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানজীবীদের গণতন্ত্রকে গোপন-ভোট-নির্ভর ও দল-নির্ভর করে ফোঁপরা করে দিয়ে **কুবের** সেই গণতন্ত্রের পিছনে **অন্তর্দ্ধান** করে। সেই ফোঁপরা গণতন্ত্রই ক্রমে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পা রাখে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ধনকুবের-বিরোধী জ্ঞানচর্চাকারী সত্তাটি স্বভাবতই তাকে কোল দেয়নি, কোল দেয় তাদের চেয়ে 'এক কাঁটা সরেস' বঙ্গের জ্ঞানচর্চাকারীরা। এঁরা বেদবিরোধী যুদ্ধের উত্তরাধিকার বহন করতেন, কখনোই গোবলয়ের সঙ্গে (মুজতবা-কথিত) 'স্ট্রীমলাইন্‌ড্‌' হননি। এঁরাই দৈহিকভাবে ইংরেজের অধীনতা মেনে নেন এবং সেই সমঝোতার বলে বলীয়ান হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে পুনরায় উঠে দাঁড়ান; ঠিক যেভাবে পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায় তাঁরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে বাংলা রামায়ণ মহাভারত, পদাবলী সাহিত্য ও কীর্তনের **বন্যা** বইয়ে দিয়েছিলেন, সেইরকম। ...

কিন্তু ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের ধাক্কায় অদ্ভুতভাবে এখানকার শিক্ষাব্রতীদের অধঃপতন ঘটে। তাঁরা পশ্চিমকে অনুসরণীয় ভেবে ফেলেন। আর, পশ্চিম যেহেতু কুবেরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, এঁরাও কুবেরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে শুরু করেন। তবে পশ্চিমের জ্ঞানজীবীদের মতো ক্ষত্রিয়কে ধ্বংস করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে নয়, একেবারেই অচেতনভাবে, কিংবা বলা ভাল, খানিকটা মোহগ্রস্ত হয়ে। বাংলার জ্ঞানজীবীরা যে সচেতনভাবে কুবেরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেননি, তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। অথচ এঁরাই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে আজ পর্যন্ত এত সব কুকর্ম করেছেন যা বলে শেষ করা যাবে না। বাংলাভাষা এঁদের কাছে পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে, ফোঁপরা গণতন্ত্র ও একঝোঁকা 'ফিজিক্‌স্‌' সেবন করলেই মুক্তিলাভ ঘটবে বলে এঁদের বিশ্বাস জন্মেছে। টাকা রোজগারকেই এঁরা উত্তরসূরিদের একমাত্র ভবিষ্যৎ হিসেবে আরাধ্য করে দিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালের ষাট বছরে এঁরা বাংলার সারস্বত লোককে মরুভূমিতে পরিণত করে ফেলেছেন। পরিস্থিতি এমন যে, বাংলার জ্ঞানচর্চাকারীদের গোটা জাতটাই যেন আত্মসচেতনতার অভাবে এবং ভুল আত্মধিক্কারে বিলুপ্ত হতে বসেছে।

অপর দিকে সমগ্র মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানচর্চাকারীদের হাতেই সভ্যতার মশাল ছিল, আছে, এবং থাকবেও। প্রাচীন ভারত ও গ্রীস থেকে মানবসভ্যতার মশাল চলে গিয়েছিল বাগদাদে, সেখান থেকে কর্ডোভা হয়ে লন্ডন-প্যারিস ঘুরে মশালটি পৌঁছায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি, আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখছি, সেই মশাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে ভারতে পৌঁছে এই বঙ্গভাষীদের (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ... প্রভৃতি) দেশের জ্ঞানচর্চাকারীদের হাতে উঠবার জন্য অপেক্ষা করছে। বাংলার জ্ঞানচর্চাকারীরা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চলেছে যে কারণে, সেটিও ভারি অদ্ভুত। **কুবের** যেহেতু অন্ধ, তার দাসত্ব গ্রহণ করলেই লোকে অন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বের সকল দেশের জ্ঞানচর্চাকারীরা কুবেরসাধক ধনচর্চাকারীদের দাসত্ব স্বীকার করে অন্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু বঙ্গের জ্ঞানচর্চাকারীরা এখনও সেরকম বশ্যতা স্বীকার করেননি, তাই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাননি। মানবজাতির জ্ঞানচর্চাকারীরা অন্ধ হয়ে গেলে মানবসভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাবে! মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে হলে, যারা এখনও অন্ধ হয়নি, তাদের উপরই নির্ভর করা দরকার। আমাদের সেই গৌরবের পুরস্কারস্বরূপ সভ্যতার মশালটি এখন বাংলার জ্ঞানচর্চাকারীদের হাতে উঠবার জন্য আমেরিকা থেকে এসে অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটি অদ্ভুত, কিন্তু সত্যি!

বাংলাভাষীদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরাই বাংলার জ্ঞানব্রতী ও শিক্ষাব্রতী হয়ে থাকেন। সমাজের জ্ঞানব্রতী-শিক্ষাব্রতীদের মধ্যেকার **প্রেমবন্ধন** ছিন্ন হওয়ার কারণেই মানবসভ্যতার **বর্ত্তমান** দুর্গতি, একথা এবার তাঁদের বুঝতেই হবে। নিজেদের মধ্যে পুনরায় 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর **প্রেমবন্ধন** গড়ে তুলে সমাজদেহের **সুন্দর** এককে উত্তীর্ণ হতে হবে তাঁদের। একদিকে মানবসভ্যতার মশাল হাতে বিশ্বমানবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলার জন্য বিধাতা তাঁদের ডাক দিয়েছেন। অন্য দিকে চোখের মণি খুবলে নেওয়ার জন্য **কুবের** অপেক্ষা করছে। — কী করবেন বাংলার শিক্ষাব্রতী-জ্ঞানব্রতীরা?

১৩ই পৌষ, ১৪১৭ রবি চক্রবর্তী কলিম খান

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিম খান

রবি চক্রবর্তী

ভাষাবিন্যাস